রিবর্তন

মোরারজী দেশাই ঃ
একান্ত সাক্ষাৎকার

ঈদ উপলক্ষে বিশেষ রচনা গুচ্ছ

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোলারিস

রেডিই ছিল। বার করে এনে টেবিলে রাখলেন মানিকলাল দে।

এই নিন।

কস্তুটা একটা পেনডান্ট। সরু চেনে ঝোলানো একটা লকেট। সোনায় মোড়া লাল পাথর। পদ্মরাগমণি।

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ হাতে নিল পেনডান্টটা। আঙুলের ডগাগুলো খুব অল্প অল্প কাঁপছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কী যেন খুঁজছে।

ধরেছেন ঠিক স্যার, পাথরটা আসলে ডালা। স্প্রিং লক।

চাপা সোনার ফ্রেমের মধ্যে লুকনো আছে। দিন আমাকে।

পেনডান্ট হাতে নিলেন মানিকবাবু। নখের ডগা দিয়ে চাপ দিতেই খুট করে কব্জার ওপর ঘুরে গেল নকল পদ্মরাগের ডালা।

মণিময় অন্দরে একটি ফটোগ্রাফ। যুগ্ম ফটোগ্রাফ। একজন প্রাকৃতী গুহ। আরেকজন....!

(এর পর [illegible]

সম্পাদকীয়

তারাপুরের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রকে যন্ত্রাংশ সরবরাহের ব্যাপারে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। মারকিন বিদেশ সচিব জরজ পি শ্যুলজ দিললিতে সুস্পষ্টভাবে আশ্বাস দিয়েছেন ভারত যেসব যন্ত্রাংশ অন্যান্য দেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে না আমেরিকা তা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। শ্যুলজের এই বিবৃতিকে মারকিন সরকারের অহেতুক করুণা বলে মনে করার কারণ নেই। তা বাস্তবতাকে স্বীকৃতিরই নামান্তর মাত্র। কারণ ১৯৬৩ সালের চুক্তি অনুসারে এই যন্ত্রাংশ সরবরাহের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রেরই। তারা যদি নিজে তা সরবরাহে অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে অন্য সূত্র থেকে তা সংগ্রহ করে এনে দেবার দায়িত্ব তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না।

শ্যুলজ এটি উপলব্ধি করে গেছেন কিনা জানি না, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতবাসীর প্রচন্ড অভিমান রয়েছে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতবাসী একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ বলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। শুধু তাই নয়, কয়েক লক্ষ ভারতীয় মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে বাস করছেন। এই সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়রা ভারত মারকিন সম্পর্ককে আরও নিকট করেছেন। সুতরাং অন্যান্য বহু দেশ যেখানে শুধু ভৌগোলিক অস্তিত্ব মাত্র সেক্ষেত্রে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অতি নিবিড়। গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতবাসীর প্রত্যাশা ছিল মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসন গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণারই সহযোগী হবে - গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে একনায়কতন্ত্র ও জঙ্গী জামানাগুলির সঙ্গেই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর দহরম মহরম। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে এফ-১৬ সরবরাহ করে পাক ভারত উপমহাদেশের শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৬৫ সালের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে সর্বাগ্রে মারকিন অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই দ্বিতীয়বার পাকিস্তানকে অস্ত্রসজ্জিত করার খেলায় যুক্তরাষ্ট্র মেতে উঠেছে। এর ফলে ভারতকেও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। পরিণামে ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুর্বলতর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত মুখে যতই অস্বীকার করুন, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের নৈতিক শক্তি যোগাচ্ছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র।

মারকিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি বারনসের খালিস্তান সংক্রান্ত উক্তি আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাই না বিশেষ করে বারনসের অস্বীকৃতির পর। কিন্তু ডঃ জগজিৎ সিং চৌহান নামক ব্যক্তিটিকে ভারতের কৃষিকর্ম সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান জানানর অর্থ কী? মারকিন সরকার কি মনে করেন ভারতবাসীরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? তথাকথিত খালিস্তান আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে খালিস্তানি নেতাদের প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। দেশদ্রোহী চৌহানকে সাদরে সাড়ম্বরে সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল, তা সত্ত্বেও তারা বলছেন খালিস্তানের ব্যাপারে তাদের কোন সহানুভূতি নেই। মারকিন সরকার যদি প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেমী হন এবং ভারতের বন্ধু হন, তাহলে সর্বাগ্রে ভারতবাসীর মন জয় করতে হবে এবং ভারতবাসীর মন থেকে সন্দেহ দূর করতে হবে।

ভারতের নিরপেক্ষতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সচেষ্ট হওয়া উচিত। ক্রমাগত মারকিন কূটনৈতিক চাপ ভারতকে মারকিন-বিরোধী শিবিরের দিকেই ঠেলে দেবে। আই এম এফ ঋণের ব্যাপারে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিরোধিতা না করলেও সমর্থন করেনি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে ভারতকে ঋণ দেবার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র তো বিরোধিতাই করে। শ্যুলজ দিল্লির মধ্যাহ্নভোজে বলেছেন, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারতের অস্তিত্ব ভারতের নিজের স্বার্থে নয়, আমেরিকা ও বিশ্বস্বার্থেও অত্যন্ত জরুরি। এটা যদি শ্যুলজের মনের কথা হয় তা হলেই আমেরিকা তথা বিশ্বের মঙ্গল।

পরিবর্তন

১৩–১৯ জুলাই ১৯৮৩, বর্ষ ৬ সংখ্যা ২

দাম ২ ২৫, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি : মোরারজি দেশাই/অশোক বসু,
ঈদ/সৌগত রায় বর্মন

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০ ০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ফ্ল্যাট-১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

২০ জুলাই উত্তম সংখ্যা

বহু-প্রতীক্ষিত উত্তম সংখ্যা। গত বছরের মত এবারও নানা বর্ণাঢ্য লেখায় ও অসংখ্য ছবিতে সুশোভিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ সূচি নিচে দেওয়া হল :

আপনজনের স্মৃতি

আমি উত্তমের মা - চপলা দেবী
আমি উত্তমের ভাই - বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
আমি উত্তমকুমারের ছেলে - গৌতম চট্টোপাধ্যায়

পোরট কমিশনারসের দুই প্রাক্তন সহকর্মীর স্মৃতি "কখনও তিনি দেরিতে আসতেন না, ছুটি হলেই 'কাজ আছে' বলে চলে যেতেন।"

উত্তম-বন্ধু

ছেলেবেলার দুরন্তপনা, বাড়ির উঠোনে অভিনয়, চুটিয়ে ক্যারাম খেলা এসব নিয়ে উত্তমের দুই বাল্যবন্ধুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা।

উত্তমকুমারের রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ কর্মকার বলেছেন, নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়ে তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাভাব আমি দেখেছি। কখনও কখনও একটানা দু ঘন্টারও বেশি গান করতেন।

নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তি উত্তমকে নিয়ে অন্তরঙ্গ কাহিনী শুনিয়েছেন।

বোম্বেতে উত্তম কেন অন্য নায়কদের মত বাজিমাৎ করতে পারলেন না, কোন ষড়যন্ত্র ছিল এর পেছনে

এ ছাড়া
চিত্রনাট্যকারদের চোখে উত্তম
চলচ্চিত্র জগতের নানা মানুষের চোখে উত্তম
উত্তমের সাংবাদিক সম্মেলন কী রকম আন্তরিক হয়ে উঠেছিল

সেই সঙ্গে
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ লেখা

নিবেদনমিদং

প্রথমেই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে আমাদের মুসলমান পাঠক-পাঠিকাদের জানাই প্রীতি ও অভিনন্দন। যেহেতু পরিবর্তন সমস্ত সম্প্রদায়ের মুখপত্র সেহেতু ঈদ উপলক্ষে এই সংখ্যায় কয়েকটি বিশেষ রচনা প্রকাশিত হল। যেমন হয়েছিল বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধদের ওপর। ঈদ উপলক্ষে আমরা এই প্রার্থনাই জানাব যে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মাঝে মাঝে যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আগুন জ্বলে, তখন পশ্চিমবাংলার মানুষ যে সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করেন তা আমাদের গর্বের। যে কোন মূল্যে হোক এই গর্ব আমাদের অটুট রাখতে হবে।

বিনাপণে বিবাহের ব্যাপারে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেবার সবশুদ্ধু গোটা চারেক অভিযোগ আমরা পেয়েছি। আমরা এজন্য আবার দুঃখ প্রকাশ করছি। এজন্য ঠিক করেছি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১০ আগস্ট আমরা যে আর এক কিস্তি বিনাপণে বিবাহেচ্ছু তরুণদের বিবরণ ছাপব তার জন্য বিবাহেচ্ছু তরুণদের প্রত্যেককে একটি করে ফর্ম ভর্তি করে পাঠাতে হবে। এছাড়া প্রকৃত ব্যক্তি বাছবার আর কোন পথ নেই। বিবাহেচ্ছু তরুণেরা এই ফর্মের জন্য ৫০ পয়সার টিকিট ও ঠিকানা লেখা খাম সহ অবিলম্বে সম্পাদককে লিখুন। ৩ আগস্ট থেকে পরিবর্তন নিয়মিত ৫৬ পাতার হচ্ছে। এতদিন ৪৮ পাতার পরিবর্তন ছাপা হচ্ছিল। বেশি বিজ্ঞাপন হলে ৫৬ পাতা করা হত। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞাপন থাকুক বা না থাকুক পরিবর্তন হবে ৫৬ পাতার। এর ফলে আমরা পরিকল্পনা মত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা দিতে পারব। এজন্য আমরা মাত্র ২৫ পয়সা বর্ধিত মূল্য দিতে পাঠকদের কাছে সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি। পরিবর্তনের মান না নামিয়ে ২৫ পয়সা মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর আনুকূল্য ছাড়া একটি সংবাদপত্র চালান যে কী কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এক্ষেত্রে আমাদের ভরসা অগণিত পাঠকের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। পরিবর্তনের ষষ্ঠ জন্মদিনে আমরা যে অজস্র অভিনন্দন পেয়েছি সেটাই প্রমাণ করে আমরা ঠিক পথে চলেছি। কারণ এ অভিনন্দনদাতাদের মধ্যে কোন মন্ত্রী বা রাজনীতিবিদ নেই, নেই কোন ভি. আই. পি.। আছেন শুধু সাধারণ মানুষ–তাঁরা সঙ্গে থাকলে আমরা আর কিছুই চাই না।

পা.চ

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি

'পরিবর্তন'কে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অনেক পাঠক-পাঠিকাই বলছেন প্রতি সংখ্যা 'পরিবর্তন' ৫৬ পাতা হক। কিন্তু বিজ্ঞাপনের অনুপাত অন্যান্য অনেক পত্রিকার তুলনায় 'পরিবর্তনে' কম। তা ছাড়া কাগজের দাম ও ছাপার খরচ গত এক বছরে অনেক বেড়ে গেছে। তাই দু টাকা পঁচিশ পয়সায় ৫৬ পাতা কাগজ দেওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য আমরা আগামী ৩ আগস্ট সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যা 'পরিবর্তনে'র দাম ২ টাকা ৫০ পয়সা করতে বাধ্য হচ্ছি। বহু পাঠকই জানিয়েছেন, গুণগত মান বজায় রাখার জন্য এই ২৫ পয়সা মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। আশা করি, সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে পাঠকেরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। পাঠক-পাঠিকাই আমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই প্রচন্ড প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মূল্যবৃদ্ধি হলেও পুরনো গ্রাহকদের কোন বাড়তি মূল্য দিতে হবে না। তিন ও পাঁচ বছরের জন্য হ্রাস-মূল্যে নতুন গ্রাহক নেওয়া আপাতত স্থগিত রইল।

সম্পাদক

ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি

আপনাদের পত্রিকার ৪ মে সংখ্যার একটি কপি আমি পেয়েছি। তাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫-য় আমার সম্পর্কে আপনাদের প্রতিবেদক একটি উক্তি করেছেন। সেই প্রসংগে এই চিঠি।

'তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা' যাই হোক, উপাচার্য অম্লান দত্তের সংগে কোন অবনিবনার জন্য আমি রবীন্দ্র ভবনের পদ ত্যাগ করিনি। অম্লান বাবুর সংগে আমার প্রীতির ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বহুদিনের, 'তথ্যাভিজ্ঞ' ব্যক্তিদের ইচ্ছা, ধারণা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে চিড় ধরবার কোন আশংকা নেই।

বস্তুত আমি যাতে পদত্যাগ না করি তার জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন। আমি নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। আমার নিজের লেখা ও গবেষণার কাজে আমি এখন অনেকটা সময় শক্তি নিয়োগ করতে চাই। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষের কাজটি ঠিকমত করতে হলে যত সময় ও শক্তি তাতে দেওয়া দরকার তা দিলে নিজের লেখার ও গবেষণার জন্য সময় মেলে না। সে কারণেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই, এবং আমার এই যুক্তি মেনে নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ [illegible] অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।

শিবনারায়ণ রায়
কলকাতা ৬৪

প্রসংগ : 'অপারেশনের আগে সম্মোহন'

পরিবর্তন ১ জুন সংখ্যায় সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের 'অপারেশনের আগে সম্মোহন' শীর্ষক লেখাটা পড়লাম।

লেখাটিতে ভারতে সম্মোহন চিকিৎসার প্রথম প্রবর্তক হিসাবে ডাঃ জেমস এসডাইলের নাম দেওয়া আছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, "Indian Journal of Medicine and Physical Sciences" এ একটা প্রবন্ধে নিজের অভিনব সম্মোহন পদ্ধতির সাফল্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডাঃ এসডাইল নিজের নাম লেখেন ডঃ জেমস ইসডেল। সুতরাং কোন নামটা ঠিক কী করে বুঝব? পদবীর উচ্চারণ নিয়ে গোলমাল দেখা দিতে পারে পাঠকদের মধ্যে, এই কথা ভেবে লেখকের উচিত্র ছিল ইংরাজিতে পদবীটা ব্র্যাকেটে লিখে দেওয়া।

লেখকের মতে '১৮৪০ সালে ডাঃ এসডাইল ৭৫টি যন্ত্রণাবিহীন অপারেশনের কথা মেডিকাল বোরডকে জানালেন।' তিনি আরও বলেছেন, এর আগে থেকেই ডাঃ এসডাইল যুক্ত ছিলেন 'হুগলির এক নেটিভ হাসপাতালে।' আসলে ডাঃ এসডাইল যুক্ত ছিলেন হুগলির ইমামবাড়া হাসপাতালে আর সেখানেই ৪ এপরিল ১৮৪৫ সালে তিনি সম্মোহনের সাহায্যে মদন কাওড়া নামে এক কয়েদীর ওপর সম্মোহনের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। এপরিল ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ডাঃ এসডাইল ৭৩টি বেদনাবিহীন অস্ত্রোপচার করেছিলেন ওই হাসপাতালে। এসব পুরনো রেকর্ড ঘাটলেই পাওয়া যাবে। অথচ, লেখকের বর্ণিত অপারেশনের সাল, তারিখ ও সংখ্যা সম্পূর্ণ আলাদা হয় কিসের ভিত্তিতে?

সেই সময় ডাঃ এসডাইলের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে রিপোরট দেখাবার জন্য সরকার সাত জনের এক কমিটি গঠন করেছিলেন, যে কমিটির নামোল্লেখ না করে লেখক লিখেছেন 'কয়েকজন লোক'। কমিটির সভাপতি ছিলেন ইনসপেকটর জেনারেল অব হসপিটালস। কমিটি যখন তাঁর কাজের প্রশংসা করায় সরকার কলকাতার মট লেনে সম্মোহনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি পৃথক হাসপাতাল খোলেন। এক বছরের জন্যে সেখানকার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৪৬-এর নভেমবর মাসে। অথচ, লেখক বলেছেন '১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে কলকাতার সম্মোহনী হাসপাতালে ডাঃ এসডাইল সাড়ে তিন হাজার অপারেশন করেছিলেন ......।' সুতরাং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা কোন সালে, এ নিয়ে লেখকের স্পষ্ট ধারণার অভাব আছে বলে আমি মনে করি।

হাসপাতাল পরিচালনার ভার দেওয়া হয় ডাঃ এসডাইলকে। তাঁর সহকারী ছিলেন সারজেন বদনচন্দ্র চৌধুরী। পাঁচ জনের একটা পরিদর্শক কমিটি গঠিত হয়েছিল। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ মৌয়াট আর ও' শোনেসি। অথচ, এই নামগুলোকে বিকৃত করে লিখেছেন 'এফ জোয়াট (এম ডি) এবং ও সাগনেসি।'

কালকাটা মেসমেরিক হসপিটালে ছিল দুটি বিভাগ : শল্য ও সাধারণ হিসটিরিয়া। বেশি রোগী আসত শল্য চিকিৎসার জন্য। এ ছাড়া বাত, হিসটিরিয়া, মানসিক বিকৃতি, প্যারালিসিস ইত্যাদির জন্য লোক আসত। অধ্যক্ষ ডাঃ এসডাইলকে প্রতি মাসে হাসপাতালের কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোরট পেশ করতে হত। উল্লিখিত সে সময়কার নামকরা সারজারির অধ্যাপক ও' শোনেসির বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য ১৮৪৮ খৃস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায়।

শেষে এ শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের একত্র হয়ে চাঁদা তোলার ফলে ১ সেপটেমবর ১৮৪৮ সালে হাসপাতাল আবার খুলে যায়। কিছু সময় সেখানে কাটাবার পর ডাঃ এসডাইল সুকিয়াস লেন ডিসপেনসারির সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন আর সম্মোহন চিকিৎসা প্রথার প্রচলন করে যান। ওই বছরের শেষে তিনি দেশে ফিরে যান। তিনি বলতেন, এখানকার রোগীদের সরলতাই তাঁর সাফল্যের কারণ।

তথাগত চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা ১৪

টুম্পুর জন্যে একটি আবেদন

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে দেশের সমস্ত সহৃদয় মানুষের কাছে পেশ করছি একটি নিবেদন। সম্প্রতি প্রকাশিত শিশুমংগল এবং ডেঙ্গোরের চিকিৎসা নিয়ে সুসম্পাদিত সংখ্যা দুটি এ চিঠি আপনার দপ্তরে পাঠানর জন্যে সাহস জুগিয়েছে আমার মনে।

আমাদেরও কনিষ্ঠা কন্যা টুম্পু আজ থেকে ৮ বছর আগে টিউবারকিউলোসিস-ম্যানেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলেছে। তখন ওর বয়স ছিল ৩ বছর। মেডিক্যাল কলেজের শিশুনিবাসে চিকিৎসাধীন ছিল আমাদের টুম্পু। হাঁটা চলা, কথা বলা সব শক্তি হারিয়ে শয্যাশায়ী ছিল প্রায় এক বছর। তারপর বসতে শিখল অনেক চেষ্টায়। দাঁড়াতে শিখল। নতুন করে কথা বলতে শেখালুম আমরা। এখন সে সুন্দর কথা বলে। সমান রাস্তায় আস্তে আস্তে চলতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি কোন। চেহারাও হয়ে গেছে বেশ ভারি।

অথচ এখনও নাকি ওর জন্য চিকিৎসা আছে অনেক। কিন্তু আমরা তার হদিশ জানি না। সুপারিশ নেই। সবচেয়ে আগে যেটা দরকার, সেই টাকা — সেটাও আমাদের নাগালের বাইরে। সংসারে একমাত্র রোজগার বলতে আমার স্বামীর মাস মাইনের কটা টাকা। ফাঁক-ফোকরে [illegible] জনাই [illegible]। টুম্পুর জন্যে যে পুরস্কার এনে [illegible] তাকে, সেই টাকাও টুম্পুর চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেছে [illegible] করেই। ৭৮ সালের বন্যায় ভেসে গেছে দেশের সব ঘরবাড়ি। [illegible] উঠতে আমাদের মত সংসারের [illegible] পুরুষেও হবে না।

কিন্তু কন্যাটি যে বড় হচ্ছে [illegible] দিন। ওর বুদ্ধিমত্তা আর [illegible] সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্যে [illegible] নাকি অনেক পথ আছে। [illegible] সহৃদয় চিকিৎসক কি [illegible] যিনি সাহায্য করতে পারেন [illegible] সহানুভূতিসম্পন্ন দরদি মানুষ [illegible] বাংলায় নেই, যিনি নামমাত্র ভাড়ায় কলকাতার কাছাকাছি কোন [illegible] নের সামনে একখানি ঘর দিতে পারেন আমাদের — যেখান থেকে কলকাতায় গিয়ে টুম্পুকে ডাক্তার দেখানর সুযোগ পাব এখন?

সরকারি আর বেসরকারি কোন সংস্থাও যদি এ বিষয়ে [illegible] সাহায্য করেন [illegible] উপকৃত হব আমরা। [illegible] প্রতিদিন শুধু প্রতীক্ষা [illegible] হতাশার মধ্যে [illegible] অপেক্ষায় [illegible] গুনছি বলতে পারেন।

[illegible]
গ্রাম : [illegible]

অভিনন্দন

পরিবর্তন পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

যদিও হাতের কাছে কোন পরিসংখ্যান নেই, তথাপি মনে হয় পরিবর্তনই সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
কলকাতা ১২

অম্লমধুর

অফিসে যান সাঁতার কাটার
পোশাক হাতে নিয়ে,
আপনি বাবু সাঁতার কাটেন
কোন পুকুরে গিয়ে?
বাবু বলে, বৃষ্টি হলেই
কলকাতা হয় নদী,
ফিরব বাসায় কেমন করে
সাঁতার না দিই যদি?

কালিদাস ভট্টাচার্য

কলকাতা শহরে
ডিসকোর বহরে
চোখে মুখে লেগে যায়
কী ভীষণ ভড়কি –
ছেলেমেয়ে দুজনে
ঘোরে শুধু কুজনে
এই আছে এই নেই,
যেন তারা চরকি।

কনক ঠাকুর

ট্রামে বাসে হাট বাজারে
যেখানে যাই খুচরো নাই
এই যে দাদা নোট ভাঙিয়ে
খুচরো দিন, খুচরো চাই।
খুচরো উধাও বাজার থেকে
দিচ্ছি ডিউ স্লিপ,
হারিয়ে যাবার ভয় থাকে তো
লাগিয়ে রাখুন ক্লিপ।

প্রবীর কুমার সামন্ত

সায়েনস ভাই ক্যা বানায়া
বোলনে সে ভি লাগতা শরম
রেল চলেগা পাতাল মে
লেড়কী পবে পেলাট-ফবম!

পরিচয় বসু

কুমরো চুলো, এইয়া গুঁফো
কেউ বা রবি-রামপিসাদ
সেলুনওলার মন্দ কপাল
মুখ জুড়ে তার ভয় বিষাদ।

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোমাবাজি চলছে পথে
উড়ছে ইটের খই
চারদিকেতে, এমন সময়
পুলিশবাবু কই?

মস্তানেরা গায়ের জোরে
মারছে বোমা ওই –
আমরা যত হাবা-গোবা
কোথায় পাবো থই?

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

বঙ্কিম বিরোধী যে
তিনি পান 'বঙ্কিম'।
সি পি এম তাই বুঝি
রেগে হলো বোম কিম?

* * * *

ইচ্ছে হলে পুলিশ আমার
রাখুন খাতায় নাম লিখে,
আমি ঈষৎ বামপন্থী
কারণ, হৃদয় বাম দিকে।

যাদের সঙ্গে আড্ডা মারি
তারা সবাই কমবেশি,
অহিংস লাল পারটি এবং
সহিংস সব কংগ্রেস (ই)।

ইচ্ছে হলে রাখুন আমায়
মাস কয়েক ফাটকে
মুক্তি পেলেই চানস মিলবে
ফিলমে এবং নাটকে।

* * * *

খুচরো চাই? চলে আসুন
এই আমাদের চুঁচড়ো,
একশো টাকার পাত্তি দিলে
মিলবে আশি খুচরো।

মৃদুল দাশগুপ্ত

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

পাঁচ মিনিট

টারজান বনাম গান্ধী

স্থান চৌরঙ্গী। সময় রাত বারটা। গ্লোব সিনেমায় লাসট শো ভাঙার পর গান্ধী একটু ফুরসৎ পাইয়া ময়দানের দিকে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে মীরা বেন, গফুর খান, সুরাবর্দি, নেহরু এমনকি ছাগলটি পর্যন্ত নাই। গান্ধীজী একাই হাঁটিতেছেন। কারণ তিনি 'একলা চলরে' নীতিতে বিশ্বাসী! পরিবহণমন্ত্রী বলিয়া দিয়াছেন রাত নটার মধ্যে কলিকাতাবাসী ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবা। রাত জাগা, কিংবা বেশি হিম লাগান স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। বড় দলের মন্ত্রী। তাই 'বড়দার' উপদেশ মনে করিয়া কলিকাতাবাসী এখন রাত সাড়ে নটার মধ্যে ঘরে ফেরে। শুধু গান্ধীর লাসট শোব জন্য কিছু লোককে দেরিতে ফিরিতে হয়। তাহাদের বিদায় করিয়া গান্ধী লাঠি হাতে একা একা ময়দানে ঘুরিয়া বেড়ান। গান্ধীর মন খারাপ। কলিকাতায় ব্যবসা বড় মন্দা। সারা পৃথিবীতে তাঁহার বাজার রমরমা। কিন্তু কলিকাতায় একে একে সব হল হইতে তিনি উঠিয়া যাইতেছেন। বাঙালি বড় কঠিন সুপারি। ইহাদের ভাঙা শক্ত। অথবা স্ত্রী জাতির মত ইহাদের মহিমা বোঝা দুঃসাধ্য। ইহারা মহাবীরকে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছেন, চৈতন্যকে কলসির কানা মারিয়াছেন।

মৃত্যুব পর অনেকে প্রেত বলে যে কোন ব্যক্তিকে কাছে আনিতে পারেন। গান্ধী প্রেত বলে এন এফ ডি সি-র স্থানীয় প্রচার অধিকর্তাকে ডাকিয়া আনিলেন। ভদ্রলোক চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া হাজির। তারপর ময়দানে পথ চলিতে চলিতে বলিলেন : 'বাপুজি, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

: জী হাঁ। এটা কি সত্যি, আমাকে কলকাতা থেকে এত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটাতে হবে। শহরটা আমার ভাল লে'ছিল। সেই আজাদির সময় এখানে ছিলুম। এত বছর পরেও কলকাতায় আধুনিক সভ্যতার হাওয়া লাগেনি বলে আমার খুব ভাল লাগে। রাত্তির বেলা হলেই লোড শেডিং হয়ে যায়। তখন শহর কেমন প্রকৃতির বুকে ফিরে যায়। রাস্তাঘাটে পিলপিল করছে জনতা। পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যায় এরা এখনও তথাকথিত সভ্য হয়ে যায়নি। ফুটপাথ জুড়ে বাজার বসেছে, আমি খুব খুশি যে এইভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে। মনোপলি ডিপারট-মেনটাল স্টোরস গ্রো করতে পারেনি। হাঁ ভাল কথা, কিন্তু আমার ছবিটা লোকে দেখছেনা কেন? সে কি শুধু সুভাষ বোস নেই বলে?

প্রচারসচিব বলিলেন : আজ্ঞে না, সুভাষ বোস নেই বলে তো ছবিতে বেশি ভিড় হওয়া উচিত ছিল। কারণ তিনি নেই কেন নেই, কতখানি নেই, এসব দেখার জন্যই লোক যেত। এ ছাড়া ছবি শুরু হবার আগেই আমি লোক লাগিয়ে গান্ধী ছবি বর্জন করুন বলে একলাখ পোসটার লাগিয়ে-ছিলাম। হলের সামনে সামনে দুদলেব ডেমোনেসট্রেশনও করিয়ে দিয়েছি। তাতে যে কাজ হয়নি তা নয়। কিন্তু আসল জায়গায় মেরে দিল।

: কে মেরে দিল? জ্যোতিবাবু না সরোজবাবু?

: আরে সিয়া রাম, সিয়া রাম, ওঁরা দেবতুল্য ব্যক্তি। এ ছবি যাতে চলে তাব জন্য ওঁরা যা করেছেন তার তুলনা নেই। কিন্তু যে মেরে দিল ওই দেখুন সে এ দিকেই আসছে।

গান্ধীজী সভয়ে লক্ষ্য করিলেন মধ্যরাত্রের অন্ধকারে কে একজন বিশালদেহী ব্যক্তি হনহন কবিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন।

গান্ধীজী বলিলেন : কে ও? কই ডাকু হ্যায়?

এন এফ ডি সি,র প্রচারসচিব ফিস ফিস করিয়া বলিলেন : ডাকু নাহি হ্যায় বাপুজি, বামফ্রনটকা জমানা মে ডাকুসে কই দিককৎ নাহি হ্যায়। লেকিন ও ডাকুসে বহুৎ ভয়ানক আদমি হ্যায়। উয়ো হ্যায় টারজান। উনহোনে সব পাবলিক ভাগা লেতা হ্যায়।

বহুদর্শী

ঘটমান বর্তমান

(২৭ জুন–৩ জুলাই)

জাতীয়

আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগেই নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সংস্কারগুলি মিটিয়ে ফেলা হবে বলে সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির সভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জগন্নাথ কৌশলের ঘোষণা। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্যই ভারত রুশ প্রযুক্তি আমদানি করবে বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভেংকটরমনের ঘোষণা (২৭.৬)। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন দেশে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থেকে কোন উপকার হয় না সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। মার্কিন বিদেশ সচিব জর্জ প্র্যাট স্যুলজ এর আসন্ন নয়া দিল্লি সফরকে সি পি আই (এম) ভারত বিরোধী বলে উল্লেখ করেছে (২৮.৬)। স্যুলজ এর ভারত সফর সুরু, তাঁর এই প্রথম সফরে তিনি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী জোরদার করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্যুলজ ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত বারনসবিরোধী বিক্ষোভ। সারা দেশে পাটশিল্প জাতীয়করণ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র রাজি আছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। বিমানবাহিনীর চিফ মারশাল দিলবাগ সিং বলেছেন, দেশের চারদিকে শত্রুতা বাড়ছে, ফলে বিমানবাহিনীকে সদাপ্রস্তুত থাকতে হবে (২৯.৬)। জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর বলেছেন, ভারতীয় সমাজের বর্তমান অবস্থা শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত না হলে ভবিষ্যৎ ভয়ংকর হতে বাধ্য, তবে তাঁর মতে দলহীন গণতন্ত্রের পথে কোন স্থায়ী সমাধান আসতে পারে না (১.৭)। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নরসিংহ রাও মার্কিন বিদেশসচিব স্যুলজের ভারত সফরকে সন্তোষজনক এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন (২.৭)। পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারীর কোন ইচ্ছা নেই বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণা (৩.৭)

পাঞ্জাব

রাজ্যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দমনে সরকার ব্যর্থ, এই অভিযোগে পাঞ্জাব হিন্দু সংগঠন বন্ধের ডাক দিয়েছিল, ফলে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে, দুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালায়, এই বন্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে দুদল মানুষের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হন (২৭.৬)। মিশবি মনডিতে তিনজন শিখ যুবক কর্তৃক জনৈক নিরংকারী দোকানদার খুন, জলন্ধরে কারফিউ জারী হয়, স্বাধীনতার পর এই প্রথম জলন্ধর শহরে কারফিউ জারী হল (২৮.৬)। অমৃতসর পুরসভার অফিসার হংসরাজ ভাটিয়া আক্রান্ত, মাঝরাতে স্বর্ণমন্দিরের কাছে কয়েকজন আততায়ী তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন (১.৭)।

হরিয়ানা

মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল দুজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন, এই দুই পূর্ণমন্ত্রী হলেন পূর্ত্তর লছমন সিং এবং রাজস্বর ফুল চাঁদ, পরে ঐ দুই মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন (২৭.৬)। দুই মন্ত্রীর বরখাস্তের প্রতিবাদে আরও পাঁচ মন্ত্রীর পদত্যাগ, সেই সংগে একজন সচিবেরও পদত্যাগ, পদত্যাগী সব মন্ত্রীই প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে ভজনলালের স্বৈরাচারী কার্যকলাপ থামাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। অন্যদিকে ভজনলাল জানিয়েছেন, হাই কমান্ডের সায় নিয়েই তিনি এই কাজ করেছেন, ফলে দিল্লি গিয়ে নতুন করে আলোচনার দরকার নেই (২৮.৬)। রাজ্যপাল তাপাসে কর্তৃক পাঁচ মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গৃহীত। ঐ পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী মুখ্যমন্ত্রী ভজনলালের সংগে আলোচনা করে ঐগুলি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন (২.৭)।

পশ্চিমবংগ

অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের দিল্লি যাত্রা, কেন্দ্রীয় স্তরে ওভারড্রাফট নিয়ে আলোচনার জন্যই তাঁর এই দিল্লি সফর (২৭.৬)। কলকাতায় চক্ররেল ত্বরান্বিত করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী গণিখান চৌধুরীর কাছে সমর্থন জানিয়েছেন। পঞ্চায়েত অরডিনানস গেজেট হল, এর ফলে নতুন পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে পুরানোদের সব দায় দায়িত্ব অর্পণ করে দিতে হবে (২৮.৬)। রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং চারদিনের সফরে কলকাতায়, বিধানচন্দ্রের জন্মদিন, শ্রীচৈতন্যের পাঁচশততম জন্মদিন, রামমোহনের দেড়শততম মৃত্যুদিন প্রভৃতির অনুষ্ঠানগুলিতে এই উপলক্ষে তিনি যোগ দেন (১.৭)। ফরওয়ারড ব্লকের মতে, রাজ্যে সি পি আই (এম) দল তাদের কার্যসূচিগত পরিবর্তন আনবে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার জন্য সি পি আই (এম)-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে ফরওয়ারড ব্লকের এই মন্তব্য (২.৭)। রাজা রামমোহনের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করলেন রাষ্ট্রপতি। এ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রামমোহনকে নব ভারতের পথিক বলে বর্ণনা করেন (৩.৭)।

আসাম

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অসমীয়াকে বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে রাজ্যের কয়েকটি স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া বলেছেন, সরকারের এমন কোন প্রস্তাব আদৌ নেই। অন্যদিকে কাছাড়ের কয়েকজন প্রতিনিধি বলেছেন, আসাম সরকার ইতোমধ্যেই অসমীয়াকে আবশ্যিক করে সারকুলার জারী করেছেন (২৭.৬)। আসু র সভাপতি প্রফুল্ল কুমার মহন্ত বলেছেন, বর্তমান রাজ্য সরকার বেআইনী, তারা এ সরকার মানে না। (১.৭)।

গুজরাট

সৌরাষ্ট্রের বন্যায় মৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তির মোট সংখ্যা ৯৩৫। একমাত্র জুনাগড় জেলাতেই এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৯ জন। এখানকার কোন কোন এলাকা ১ মিটার জলের তলায় ডুবেছিল। সেবা কাজের জন্য সেনাবাহিনীর জওয়ানদেরও অক্লান্ত পরিশ্রম (২৭.৬)।

বিহার

রাজ্য বিধানসভায় তুমুল উত্তেজনা, সরকার ও বিরোধী পক্ষে ঘুষোঘুষি, সিংভূমের সি পি আই বিধায়ক দেবীপদ উপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার ও অত্যাচার করার প্রতিবাদে বিরোধীদের এই বিক্ষোভ (১.৭)।

মহারাষ্ট্র

নাসিকে গত আটদিন ধরে যে উত্তেজনা ও দাংগাহাংগামা চলছে তা থামাতে পুলিশ গুলি চালায়, এতে নিহত ৩, আহতের সংখ্যা ২০০, স্কুল কলেজ সিনেমা হল সব বন্ধ (২৯.৬)। □

আন্তর্জাতিক

চীনের পত্রিকা পিপলস ডেইলি জানিয়েছে, সে দেশের কমিউনিসট পারটিতে নতুন সদস্য নেওয়ার সময় শিল্পোন্নয়নের যে নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে। ফলে কোন কাজে পারদর্শী ব্যক্তিরাই পারটি সদস্য হতে পারবেন। সেই সংগে পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদেরও দলে নেওয়া হবে (২৭.৬)।

জাপানে নতুন সংসদ নির্বাচনে লিবারাল ডেমোক্রেটিক পারটি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, এই দলই এখন শাসন ক্ষমতায় রয়েছে, এবারের নির্বাচনে তারা পেয়েছে ১২৬টির মধ্যে ৬৮টি আসন। ৮২ সালে সারা পৃথিবীতে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা সংস্থার মতে এই রেকরড পরিমাণ বিস্ফোরণের সংখ্যা চুয়ান্ন (২৮.৬)। সোভিয়েত মতাবলম্বী সাতটি দেশ পৃথিবীর সমস্ত পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ দেশগুলির কাছে ঐ মারণাস্ত্র তৈরি বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছে, এ ব্যাপারে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে তাদের মত। (২৯.৬)। ইয়াসের আরাফৎ এবং সিরিয়ার মধ্যে যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে তা মিটিয়ে দেবার জন্য প্যালেসটিনীয় লিবারেশন অরগানাইজেশন একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। রাষ্ট্র সংঘের মহাসচিব জেভিয়ার পেরেজ দ কুয়েলার আগামী সেপটেম্বরের মাসে নিউ ইয়রকে রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি সম্মেলন ডাকার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছেন, বারলিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে কুয়েলার এই সমর্থনের কথা জানান (১.৭)। যে কোষের তৎপরতার ফলে ক্ষতস্থানে রক্তপাত বন্ধ হয় সেই কোষই ক্যানসার সৃষ্টি করে বলে লনডনের জনৈক গবেষকের দাবি, এটি প্রমাণিত হলে ক্যানসার চিকিৎসায় নবদিগন্ত খুলে যাবে বলে পন্ডিতবর্গের অভিমত জ্ঞাপন। আফরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লেসোথোর প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি আক্রমণ চালিয়েছিলেন ৩০ জুন। সরকারি বাহিনীর প্রতিরোধে এরা হটে যান ইয়ামা পাহাড়ের দিকে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১২ জনকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এই আক্রমণকারীরা সকলেই দক্ষিণ আফরিকার সৈন্য (২.৭)। বেলগ্রেডে আংকটাড সম্মেলন কার্যত ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত জ্ঞাপন (৩.৭)।

দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম : সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেইজন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান—যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য।

যখন তার বয়স প্রায় চার মাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা তার হজম ক্রিয়ায় মোলায়েম ভাবে কাজ করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা বিশেষ ভাবে তৈরী—চাল থেকে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে এই হ'ল আদর্শ সহজ পাচ্য সিরিয়াল যা কিনা গ্লুটেন হীন।

আপনার মতো পুষ্টি-সচেতন মায়েরা সর্বদা নেস্টাম চান, কারণ তা জোরদার ১১টি ভিটামিন, আয়রন এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ—শিশুর সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্যে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর ত্বকে উজ্জ্বলতা আনার জন্যে স্বচ্ছ স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্যে এবং অসুখের বিরুদ্ধে সহজাত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে ভিটামিন; সুস্থ রক্তের জন্যে আয়রন এবং শক্ত হাড় ও দাঁতের জন্যে ক্যালশিয়াম।

শিশুকে শক্ত আহার ধরানো খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু দুধ থেকে শক্ত আহার ধরাতে আপনাকে সহজ সরল ভাবে সহায়তা করে নেস্টাম।

তৈরী করা খুব সহজ।

আগে কোটানো কুসুম গরম দুধ ঢালুন।

নেস্টাম দিয়ে মিশিয়ে নিন।

ব্যস্, খাবার তৈরী।

১১টি ভিটামিন ও আয়রনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম®
রাইস

NESTLÉ

রাজ্য-রাজনীতির নেপথ্যে

সি পি আই (এম) এখন পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কমাতে চান, কিন্তু কেন ?

নিশীথ দে

পঞ্চায়েত নির্বাচন কী ভাবে হয়েছে, কতটা অবাধে হয়েছে এসব প্রশ্ন তুললে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। একদিকে যেমন ব্যাপক রিগিং হয়েছে, সরকারি প্রশাসনের সাহায্যে অভিনব কায়দায় রিগিং হয়েছে, নতুন পদ্ধতিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি গ্রামে গ্রামে ক্ষমতার দখল বজায় রাখার জন্য পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা অচল করে দেবার চেষ্টা চলছে। গ্রামবাংলা আজ পুরোপুরি রাজনীতির খপ্পরে।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় গ্রামের শোষিত নিপীড়িত মানুষ ক্ষমতা পেয়েছে কতটুকু তা ভেবে দেখার আছে। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক, গ্রাম বাংলায় শান্তি আজ যেতে বসেছে, পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘদিনের একটি সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বামফ্রন্টের সব রাজনৈতিক দলই পর্যালোচনা করেছেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের উপস্থিতিতেই প্রতিটি জেলায় সি পি আই (এম)-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে তিনটি কারণ দেখানো হয়েছে সব জেলাতেই। এক, পঞ্চায়েত প্রধান বা সদস্যরা গ্রামের মানুষকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মত কাজ করে গিয়েছেন। তার ফলে কোন কোন এলাকায় সি পি আই (এম) জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দুই, পঞ্চায়েতের কাজ করতে গিয়ে দুর্নীতি হয়েছে কিছু কিছু দলবাজীও হয়েছে। তিন, বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে অনৈক্যের জন্য ভোট ভাগাভাগি হয়েছে। সুযোগ নিয়েছে কংগ্রেস (ই)।

এসব সত্ত্বেও সি পি আই (এম) এর নির্বাচনী ফল খারাপ হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে সি পি আই (এম)-এর ক্ষমতা খুব একটা কমছে না। বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতে। অন্তত এক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি আই (এম) এর হাতছাড়া।

গোলমালটা বেঁধেছে ক্ষমতার হাত বদল নিয়ে। অনেক জায়গায় কংগ্রেস (ই) র লোক কালক্ষেপ করতে রাজি নয়, যত তাড়াতাড়ি হাতে ক্ষমতা পাওয়া যায়। কিন্তু আগের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও রাজি নয়। অনেকে ছেড়ে দিতে রাজি কিন্তু হিসাব বুঝিয়ে দিতে রাজি নয়। হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া নিয়েই সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই) র মধ্যে এবার মারদাঙ্গা শুরু হয়েছে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ জানে না।

পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া নিয়ে সি পি আই (এম) এখন রীতিমত চিন্তায় পড়েছে। নেতারা চাইছেন, আর নয়--এবার ক্ষমতা কমাতে হবে। এটা করতে হবে সুকৌশলে। জেলা পরিষদে এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে বেশি আসন না পেয়েও বামফ্রন্ট যে কৌশলে গরিষ্ঠতা পেয়েছে সেটা গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্ভব নয়। অতএব এবার গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কমাতেই হবে। কিন্তু এটা করলে গ্রামের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ আরও বাড়বে, বাড়বে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রেষারেষি এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক অশান্তি।

কংগ্রেস আমলে পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ ১৮ বছর পর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠান নিসন্দেহে বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব। আর কিছু না হোক গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে সাধারণ মানুষ ক্ষমতা পেয়েছে। কোটি কোটি টাকা গ্রামের উন্নয়নে খরচ হয়েছে। আবার এটাও ঠিক এই পঞ্চায়েতই গ্রামে অশান্তি ডেকে এনেছে। আর এ অশান্তির জন্য দায়ী কোন একটি বিশেষ দল নয়, অনেকেই।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এপরিল মাস থেকেই আক্রমণ, পালটা আক্রমণ চলছে। সি পি আই (এম) যেমন শাসক দল হিসাবে শক্তিশালী এবং ক্ষমতায় থাকার সুযোগে বিরোধী দলগুলির লোকের উপর হামলা চালিয়েছে, বহু লোক গ্রামছাড়া, ঘরছাড়া হয়েছে, অনেক লোক খুন হয়েছে, নব নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর হামলাও হচ্ছে। এটাও ঠিক কংগ্রেস (ই) এর লোকেরা সি পি আই (এম)-এর লোকের উপর ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি জেলাতেই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছেন।

সি পি আই (এম)-এর হুগলি জেলা কমিটি অভিযোগ করেছেন, সিঙ্গুর থেকে আরামবাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক হামলা চলছে। ২৪ জুন চুঁচুড়ায় লোকাল কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য পালের বাড়ি চড়াও হয়ে কংগ্রেসের লোকেরা তাঁর বৃদ্ধা মা ও ভাইকে মারধর করে। সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সিঙ্গুরে ২৩ জুন রাত্রে কংগ্রেসের লোকেরা আক্রমণ করলে দু দলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। অন্তত ৪ জন আহত হন। তার আগে হরিপালের অনন্তপুরে জলিল মল্লিক নামে একজন খুন হয়েছেন। খানাকুল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া এবং আরামবাগে পঞ্চায়েত নিয়ে সি পি আই (এম)-এর উপর অন্তত একশটি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

মুরশিদাবাদে গিয়ে জেলা কমিটির নেতা তিমির ঘোষের কাছেও একই অভিযোগ শুনেছি। তিমিরবাবু অভিযোগ করেছেন, সি পি আই (এম) এর অন্তত ৪ জন মারা গিয়েছেন। ডোমকল, ভরতপুর, খড়গ্রাম প্রভৃতি এলাকায় রীতিমত 'কংগ্রেসী সন্ত্রাস চলছে।'

অভিযোগ পালটা অভিযোগ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের দৌলতে সাধারণ গরিব গৃহস্থর শান্তিতে টান পড়ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কেড়ে নিলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে। সি পি আই (এম) আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গ্রামাঞ্চলে প্রস্তুতি শুরু করেছে। গ্রামে পারটি সংগঠনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

কংগ্রেস (ই)ও বসে নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামাঞ্চলে একশ্রেণী লোক কংগ্রেসের সঙ্গে আসছে। সংগঠন হিসাবে জোরদার না হলেও স্থানীয় কংগ্রেসীদের গোষ্ঠী জোরদার হচ্ছে। গড়ে উঠছে সি পি আই (এম) বিরোধী শক্তি।

পঞ্চায়েত নিয়ে সি পি আই (এম) এর পরীক্ষা হয়েছে। এবার কংগ্রেসের পরীক্ষা। অন্তত এক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছেন কংগ্রেস (ই)-এর লোকেরা। দুর্নীতি, দলবাজী, কায়েমী স্বার্থরক্ষা-সব কিছুরই পরীক্ষা হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট এবং নির্বাচনী ফল নিয়ে সি পি আই (এম) জেলায় জেলায় সমীক্ষা করেছে। বর্ধমান ও পুরুলিয়া ছাড়া সব জেলাতেই সি পি আই (এম)-এর ভোট কমেছে। কংগ্রেসের ভোটও কমেছে, তবে সব জেলায় নয়। বিরাশির বিধান সভা নির্বাচনের তুলনায় সি পি আই (এম)-এর ভোট কমেছে কোন জেলায় শতকরা তিন ভাগ, কোন জেলায় শতকরা কুড়ি ভাগ। সব চেয়ে বেশি কমেছে মালদহ, মুরশিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিমদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি। এদিকে ২৪ পরগণায়। হুগলি জেলায় মোটামুটি ভোট আগের মতই, মাত্র ছ হাজার কম। কংগ্রেসেরও হাজার চারেক কম। মুসলমান ভোট সি পি আই (এম)-এর অনেক কমেছে, কংগ্রেসের বেড়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট এবং ফল ধরে সি পি আই (এম) পর্যালোচনা করে দেখছে বিধানসভার আগামী নির্বাচনে কী হতে পারে। বিধান সভার নির্বাচনের এখন চার বছর বাকি। তার আগে লোকসভার নির্বাচন।

বিরাশির বিধানসভার নির্বাচনে সি পি আই (এম) বা বামফ্রন্ট গরিষ্ঠতা পেয়েছে গ্রামের মানুষের ভোটের জোরে। শহরের ভোট বেশি পেয়েছে কংগ্রেস (ই)।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মত যদি আগামী বিধানসভার নির্বাচন হয় তাহলে শুধু গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস (ই) অন্তত ৮০টি আসন পাবে। সবটাই নির্ভর করছে 'যদি'র উপর। চার বছরে পরিস্থিতির নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটবে। সেই পরিবর্তন কোন দলের পক্ষে বেশি সহায়ক হবে তা বলা শক্ত। বামফ্রন্ট-এর শরিকী সম্পর্ক কী দাঁড়াবে? আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক, সি পি আই, মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লকের সঙ্গে সি পি আই (এম) এর সম্পর্ক ভাল হবে কি না আগে থেকে কে বলতে পারে। তার উপর সি পি আই (এম) এর দলীয় সংগঠনের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানে না।

পাঁচ বছরে পঞ্চায়েত প্রশাসনে সি পি আই (এম) আংশিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। দুর্নীতি, দলবাজী প্রশাসনকে বিশেষ স্বার্থে কাজে লাগাতে গেলে কংগ্রেসেরও একই পরিণতি হতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল এই নেগেটিভ ভোটের রাজনীতি কতদিন চলবে? □

আমাকে যিনি সি আই এ এজেনট বলেছেন তাঁকে পাগল ছাড়া কিছু বলা যায় না : মোরারজী

তার মানে আমি উত্তেজিত হয়েছি? আমি কখনও উত্তেজিত হই না। এই তো দেখ না ওরা দুজন একটু আগে বলল, ওয়ান ফরেন প্রেসম্যান কোটেড দ্যাট আই ওয়াজ এ পেড সি আই এ ইনফরমার। ডু ইউ থিংক আই শুড গেট অ্যাংরি উইথ দিস?

হু কোটেড ইউ?

অ্যান আমেরিকান করেসপনডেনট। ডু ইউ থিংক আই ক্যান বি বট? দিস ইজ শিয়ার ম্যাডনেস। হি ইজ এ কমপ্লিটলি ম্যাড ফেলো। আমি ওদেরকে জিগ্যেস করেছি, তোমরা এরকম স্টোরি বিশ্বাস কর? ওদেরকে বলেছি তোমরা যদি এটা পাবলিশ কর আই উইল স্যু ইউ। কিন্তু আমি কখনই ওর (বিদেশি সাংবাদিক) ওপর রাগ করব না। সে যদি এই বাড়িতে আসে, আমি তাকে স্বাগত জানাব এবং বলব, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

কেউ যদি বলে, তুমি পুরুষ নও, তুমি তো মহিলা। তবে কি তার সঙ্গে ঝগড়া করব? না কি অন্য কাউকে বোকার মত জিগ্যেস করব, আচ্ছা আমি কি মহিলা? তেমনই ঐ সব পাগলের ওপর রাগ করাও বোকামো।

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং জনতা দলের নেতা মোরারজী রণছোড়জী দেশাই।

সেদিন ড্রাইভের 'হোটেল বেয়ে ইনটারন্যাশনাল' ও 'ওবেরয় টাওয়ার্সে'র মাঝখানে 'ওসেনিয়া'—সামনে আরব সাগরের অন্তহীন জলরাশি। লিফট বেয়ে ছ তলায় কান্তিভাই-এর ফ্ল্যাটে যখন পৌছলাম, তখন ঠিক বিকেল চারটে। বিশাল ফ্ল্যাটের করিডোর পেরিয়ে মোরারজীভাইয়ের ঘরে পৌছলাম।

ঘরের মেঝে নেভিনীল কারপেটে মোড়া। কোমল পশুচর্মে আবৃত আরামকেদারায় নির্লিপ্ত মুখে 'ভবনস জারনাল' পড়ছেন আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পরনে ধবধবে দুধ-সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। পাশেই টি আকৃতির কাঠের হ্যাংগারে ঝুলছে চিরপরিচিত জহর কোট। পায়ের নিচে কাঠের তৈরি কারভড সাপোরট, নির্মাণসৌকর্যে যা একান্তই অভিনব।

রঙিন সুতোর নকশাকাটা সাদা চাদরে খাটটি আবৃত। লম্বালম্বি প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে আছে অসংখ্য বই।

সন্তর্পণে এগিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর পাশের চেয়ারে বসার নির্দেশ দিলেন। হুঁশিয়ারবাণী ছুঁড়লেন, বিকোর পাবলিশিং দিস ইনটারভিউ ইউ উইল হ্যাভ টু গেট ইট ক্লিয়ারড বাই মি। আদারওয়াইজ আই উইল ডিজওন ইট টোটালি। বিকজ আই ডোনট ওয়ানট টু এনটার ইনটু এনি কনট্রোভারসি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, প্রেসপাঠের আগে নিশ্চয়ই আপনাকে দেখিয়ে নেব।

খানিক নীরবতার পর সাক্ষাৎকার শুরুর অনুমতি চাইলাম। ঠিক চারটে সাত মিনিটের সময় ওঁর সাক্ষাৎকার শুরু করেছিলাম, কিন্তু হোঁচট খেলাম চারটে আটাশে। সেক্রেটারি তাওড়ে একরাশ চিঠিপত্র তুলে দিলেন দেশাইজীর হাতে। লক্ষ্য করলাম, মোরারজীভাই জনতা পারটির কাগজপত্তরের ওপর প্রথম চোখ বোলালেন। এরপর দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি কান্নার কাহিনী পড়ছিলেন।

খানিক নীরবতা। সটান দৃষ্টি হানলেন আমার দিকে। তুমি হয়তো আমাকে বিতর্কে জড়াতে চাও না, কিন্তু আমাকে অহরহ বিতর্কের বেড়াজালে আটকে পড়তে হচ্ছে, টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

যাহোক, ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার শেষ হল বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে। প্রতিশ্রুতি মত অনুমোদনের জন্য কপি দিয়েছিলাম পয়লা জুন, দুপুর সাড়ে দশটায়। সেদিন ওঁর নিকটআত্মীয়বিয়োগ হয়েছে জানলাম। যাহোক, ওঁর সেকরেটারি জানালেন, দোসরা জুন, বিকেল তিনটে নাগাদ আসুন, উনি আপনার সঙ্গে বসবেন।

২ জুন, দুপুর তিনটে। ওসেনিয়ার লিফট বেয়ে উঠলাম আমরা তিনজন। মোরারজীর ব্যক্তিগত সেকরেটারি মিঃ তাওড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে বিশাল ড্রয়িং রুমে বসতে দিলেন।

মিনিট দশেক পর মোরারজীভাই আমাকে ডাকলেন। ঘরে ঢুকে দেখি বাকি দুই ব্যক্তি ভলিপত্তপা গোটাচ্ছেন। দেখলাম শান্ত সমাহিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, হাতে আমার সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎকারের কপি। নীরবতা ভাঙলেন নিজেই, —'না, এটা অনুমোদন করতে পারছি না, এভরিথিং ইজ ইন এ মেস।' আমিও বললাম, হোয়াই ইন এ মেস? কোন কিছু বিকৃত তো করা নেই। আপনার জবানী যথাযথ তুলে ধরেছি এইমাত্র। অরিজিনাল ফ্রেজার ধরে রাখতে প্রশ্নের কোনরকম ক্রমও পরিবর্তন করিনি। মোরারজীভাইয়ের অনুযোগ, না, 'প্রথমদিকে যা বলেছি তা অন দি রেকরড। তখনই তোমাকে বারণ করেছিলাম, তুমি শোননি। কিছুতেই আমি এটা অনুমোদন করতে পারবো না।'

সেটা ঠিক। আমি পুরোপুরি ভুল করেছি। এবার দেখা যাক আপনি কতটুকু কাটছাঁট করেন। 'আচ্ছা তুমি বলছো 'ইন এ হাই পিচ' 'একসাইটিংলি' এসব। আমি কখনও তোমার সঙ্গে হাই পিচে কথা বলেছি? বা আমাকে এক্সাইটেড হতে দেখেছিলে?'

—না, আপনি ভীষণ ভদ্রভাবে বরাবর কথা বলেছেন, কিন্তু ঐ প্রশ্নটির উত্তর দেবার সময় তুলনামূলকভাবে উচ্চগ্রামে উঠে গিয়েছিলেন, সেটাই বোঝাবার জন্য বলেছি।

—দেখছি, তুমি সব খুঁটিয়ে দেখেছ। তুমি ভীষণ বিপজ্জনক মানুষ তো। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে আরো অনেক সতর্ক হতে হবে। তাছাড়া আমি জীবনে কখনো উত্তেজিত হই না। কখনো কৌতুকভরে, কখনো বা আনন্দের উচ্ছ্বাসে হয়ত জোরে বলি।

এই সময় তিনি প্রথমে উল্লেখিত সি আই এ প্রসঙ্গটি তুললেন। সেকারণে ওঁর মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আর ঘাঁটাতে মন সায় দিল না। অনুরোধ জানালাম ঠিক আছে, আপনি এবার সাক্ষাৎকারের কপিটি খুঁটিয়ে দেখেই অনুমোদন করুন। মোরারজীভাই অতঃপর প্রয়োজনীয় সংশোধন করলেন, তবে বাদ দিলেন প্রথম কয়েকটি প্রশ্ন (যা ছিল ওঁর মতে অফ দি রেকরড)। সব কিছু দেখেশুনে এবার নিরুদ্বিগ্নচিত্তে লিখলেন : অ্যাজ কারেক্টেড বাই মি

মোরারজী দেশাই
২/৬/৮৩

পরিবর্তন : আপনার শাসনকালে কাশ্মীর সমস্যা ছিল। এবং এই উপমহাদেশে এটি এখনও জীবন্ত।

মোরারজী : আমি এটাকে একটা সমস্যাই মনে করি না। এটি ভারতেরই অংশ। এর কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

পরিবর্তন : তাহলে, আপনার মতে দেশ এখন কোন প্রধান সমস্যার মুখোমুখি?

মোরারজী : প্রধান সমস্যা: একটি ভাল সরকার। শুধুমাত্র একটি ভাল সরকারের দরকার। উঁচুতলা থেকে নিচুতলা অবধি সর্বত্র, এবং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি এমন থাবা মেলে বসে আছে……

পরিবর্তন : অর্থাৎ, ভাল একটি সরকারের দরকার, এইমাত্র?

মোরারজী : হ্যাঁ, ঠিক তাই।

পরিবর্তন : ভাল কথা, জনতা দল আপনার মধ্যে একটি ধ্রুবতারাকে খুঁজে পায়, এবং আমরা জানি, আপনিই দলের মূল পরিচালিকা শক্তি। তা এই মুহূর্তে আপনি কীভাবে দলের কার্যধারা ও আন্দোলন পরিচালনা করছেন?

মোরারজী : কিসের ধ্রুবতারা? না, কোনমতেই না। আমি দল গড়ি কি কয়েকজন মিলে দল গড়েছেন। আমি সভাপতি ছিলাম মাত্র। কিন্তু এখন আমি কোন পদাধিকারী নই। এবং দলকেও নেতৃত্ব দিতে পারছি না। শুধু দলের জন্য কাজ করছি।

সর্বদাই আমি দলকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি। একটিমাত্র লোক দলকে শক্তিশালী করতে পারে না।

একমাত্র কর্মীরাই পারেন দলকে সবল করে তুলতে।

পরিবর্তন : রাজনৈতিক দল হিসেবে জনতার শক্তি সম্পর্কে আপনি কেমন আঁচ করছেন?

মোরারজী : আমার ধারণা, দল আরো শক্তিশালী হবে। জনতা দলই একমাত্র সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে। কিন্তু একে আরো শক্তিধর হতে হবে। সাধারণ মানুষই আমাদের বিজয়ী করে ছিলেন। তাঁরাই ভোট এবং অর্থ দিয়েছেন। সেই পরিবেশ আবার সৃষ্টি করতে হবে।

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন, জনতা দল আসাম ও অকালি সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ?

মোরারজী : দল যদি ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবে।

পরিবর্তন : তাহলে তাবা সমস্যা গুলোর গুরুত্ব কেমন উপলব্ধি করছেন?

মোরারজী : আমি তা বলতে পারি না। দলের সভাপতি তা বলার অধিকারী, আমি নই। হ্যাঁ, তাদের সমাধান করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

পরিবর্তন : আগামী নির্বাচনে আপনি জনতার সম্ভাবনা কেমন আঁচ করছেন? সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য নির্বাচনী ম্যানিফেসটোতে নতুন কোন গতিময়তা দেবেন কি?

মোরারজী : ম্যানিফেসটো আমি তৈরি করতে পারি না। এটা এমন কতকগুলো নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে যাতে তা কার্যকর হয়। এবং এটা রচনা করবে দল।

এছাড়া কখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই অবস্থার ওপরও এটি নির্ভরশীল। আমি বলতে পারছি না কখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

পরিবর্তন : সম্ভবত আপনি জানেন, প্রথমদিকে সাধারণ মানুষের ওপর চন্দ্রশেখরের পদযাত্রার কোন রকম প্রভাব ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি বেশ নাড়া দিয়েছে। এটা কি ওঁর একার প্রচেষ্টা না, অন্যদের মস্তিষ্ক-প্রসূত? দয়া করে আপনার মতামত দিন।

মোরারজী : ইতোমধ্যে 'অবজার-ভারে' নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি। সেখানে বিস্তারিত জানিয়েছি। ইতোমধ্যে যা বলেছি, তার ওপর যোগ করার মত কিছু নেই। আমি বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমি যা বলেছি, 'অবজারভার–' ত মাত্র ক'দিন আগে তা প্রকাশ করেছে।

পরিবর্তন : কিন্তু আমার পাঠক-দেব জন্য আপনি যদি নতুনভাবে বলতেন.....

মোরারজী : না, নতুনভাবে যোগ করার মত কিছু নেই। এছাড়া পুনরাবৃত্তি করতেও চাই না।

পরিবর্তন : এখন দেখুন, একটি ব্যাপাব খুবই পরিষ্কার। ভাবতীয় বাজনীতিব দিগন্তে, বিশেষভাবে দক্ষিণে, আঞ্চলিক দলগুলো জনতাব সমর্থন পাচ্ছে। এই দলগুলোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, তা নিয়ে আপনি কেমন বুঝছেন? এদেরকে কি আপনি কোনভাবে দেশেব জাতীয় সংহতির পক্ষে ভীতিজনক বলে মনে করেন?

মোরারজী : এটা সব সময়েই ঘটতে পাবে। তাব মানে এই নয় যে, এরা দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে।

জাতীয় সংহতির পক্ষে এবা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু এরা কখনই জাতীয় সংহতি আনতে পারে না। সে যাই হোক, এরা জাতীয়তা বিরোধী নয়। যদি কোন দল জাতীয়তা বিরোধী হয়, তাহলে তাদেরকে কখনই সমর্থন করা উচিত নয়।

পরিবর্তন : দক্ষিণের আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে নেকসাস (মিলন) ব্যাপারটা কেমন বুঝছেন?

মোরারজী : এখানে তুমি নেকসাস দ্বারা কী বোঝাতে চাইছ?

পরিবর্তন : নিজেদের মধ্যে মিলন। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সব সমস্যা ও ঘটনাবলী আলোচনার জন্য এরা একই প্ল্যাটফরমে মিলিত হয়েছেন।

মোরারজী : হ্যাঁ, এটাও এক ধরনের সংহতি। এরা জাতীয় দলে পরিণত হতে চলেছে। এবং পরিণামে জাতীয় দল গড়ার চেষ্টা করবে।

পরিবর্তন : একটা কথা চাউর হয়েছিল যে ইন্দিরাজী রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার সপক্ষে মত দিতে পারেন।

[illegible] জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক নয়। [illegible] জাতীয় সংহতি আনতে পারে না।...... [illegible] জাতীয়তাবিরোধী হয়, তাহলে তাদেরকে [illegible] করা উচিত নয়।

হারসের বইতে দেশাই সম্পর্কে উক্তি

সামুর হারসের 'দি প্রাইস অব পাওয়ার' বইটির কিছু অংশ বংগানুবাদ করে নিচে দেওয়া হল। এই অংশগুলিতে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৩২। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। পাতার নম্বর ৪৫০।

পরবর্তী ছ মাস অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ইয়াহিয়া ভারতের কাছে পরাজিত না হয়েছিলেন, নিকসন ও কিসিংগার ভারতের নির্ভরযোগ্য সূত্রটির মারফৎ পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হোয়াইট হাউসের নীতি নির্ধারণ করতেন। বিশেষ কারণেই এই সোর্স বা সূত্রের নাম কোথাও উল্লেখ করা হত না। এই খবরদাতা ভারতের সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেনসির মারফৎ খবর পাঠাতেন। এই খবরদাতাকে লোক-চক্ষুর আড়ালে রাখতে পারার গৌরব হল নিকসন ও কিসিংগারের। কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেন্টের কিছু লোক জানতেন যে এই খবরদাতার পাঠান তথ্যগুলো ভয়ানকভাবে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এই খবরদাতাটি হলেন ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিক মোরারজী দেশাই। ১৯৬৯ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই দেশাইকে ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসৃত করেছিলেন। তিক্ত রাজনৈতিক বিরোধিতার পরও ইনি শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। দেশাই ছিলেন সি আই এর একজন পয়সা পাওয়া ইনফরমার। সি আই এও তাঁকে বিশেষ প্রয়োজনীয় সূত্র হিসেবে মনে করত। ১৯৪০ দশকের শেষের দিকে মোরারজী দেশাই রাজনীতিতে আসেন। ভারতের অর্থমন্ত্রী ও স্বল্পকালীন উপপ্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়াও ইনি বোম্বাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ইনি একজন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক ও ভয়ানকভাবে শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধী। শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধিতা এঁর লেখা তিন খণ্ডের 'দি স্টোরি অব মাই লাইফ' বইটিতে বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বইটি ভারতে প্রকাশিত। একজন সি আই এর প্রাক্তন অফিসার স্মরণ করতে পারেন যে দেশাই এমন একজন [illegible] ছিলেন যে সি আই এ তাঁকে [illegible] ২০ [illegible] দিত। [illegible] ২০,০০০ [illegible] নিকসন কিসিংগারের [illegible] [illegible]

[illegible] পারি না।

[illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] তাঁরা জোর দিতেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালে। খবরের যথার্থতা সম্পর্কে এতই তারা নিশ্চিত যে এরই সাহায্যে যুদ্ধের প্রশাসন নীতির পরিকল্পনা করা হত। দেশাই ১৯৭৭ সালে মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী হন এবং ইন্দিরা গান্ধী আবার [illegible] ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে।

পাতার নম্বর ৪৫২। পাদটীকা

১৩ আগস্ট টাড্ জুলাক নামে নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সংবাদদাতার প্রতিবেদনে প্রকাশ হল যে, দিল্লি থেকে গোপন সূত্রে পাওয়া একটি খবর। সোভিয়েত রাশিয়ার সংগে ভারতের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর হতে চলেছে—এটিকে ভারতের পরিকল্পনায়—পূর্ব পাকিস্তানকে অনির্দিষ্ট কাল অবধি স্বীকৃতি দিতে দেরি করার মূল্য হিসেবে দেখা হল। এই সংবাদটি রিচারড হেলমসকে বিমূঢ় করেছিল। তিনি হোয়াইট হাউসের ঈগল বোরগ ও ডেভিড ইয়াংকে ফোন করে খবরটি কী করে ফাঁস হল তা অনুসন্ধান করে দেখতে বলেছিলেন। রিচারড বিষয়টি গুরুত্ব দেবার জন্য বলেছিলেন যে এজেনটটি এখন বিপদের সম্মুখীন। এই খবরটি হোয়াইট হাউসের কাছে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজেদের মনোমত যুক্তি খাড়া করলেন কিসিংগার। এই চুক্তিকে তিনি বললেন 'ডিউমিলিয়েট' করার চেষ্টা। চীন ও পাকিস্তানকে হেয় করার জন্যই নাকি এই চুক্তি। আর সেই বিপদের সম্মুখীন এজেনটটি হলেন মোরারজী দেশাই। এই সময় থেকেই নিকসন ও কিসিংগার তাদের বিশ্বস্ত সংবাদ প্রেরকের তথ্য নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এই খবরগুলো যে ইনটেলিজেনস সোর্সের খবরের অংশ [illegible] হতে তা জানতেও পারেননি।

পাতার নম্বর ৪৫৯—৬০

আমেরিকান গভর্নমেনটের উচ্চপদে আসীনরা যখন প্রবল বিতন্ডার সম্মুখীন তখন সি আই এ একটি রিপোর্ট পেল। রিপোর্টটি নয়া দিল্লির মন্ত্রিসভার বৈঠকের। রিপোর্টে শ্রীমতী গান্ধীর পুরো বক্তব্যটি দেওয়া আছে। কিসিংগারের বর্ণনা অনুযায়ী এটির প্রেরক মোরারজী ছাড়া অন্য কেউ নন। কিসিংগার বলেছিলেন, একটি রিপোর্ট আমরা পেয়েছি যেটির সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আজকে এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না যে, প্রধানমন্ত্রী গান্ধী পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্ব কমাতে বদ্ধপরিকর।

একজন সরকারি দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ জানতেন যে দেশাই এর নতুন রিপোর্ট আসছে। রিপোর্টটি ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে। ডিকহেলমস রিপোর্টটি হাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং হেনরী এটি খুলে নেন। আমি এই রিপোর্টটি আজ সকালে দেখেছি। শ্রীমতী গান্ধী কারো সংগে কথা বলছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী জানেন লোকটি ওঁর পক্ষে। তিনি একটু বেশি রেগে কথা বলছিলেন। আমি ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারিনি। আপনারা যদি ইনডিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন তো বুঝবেন এটির কোন মানে হয় না।

পরিচ্ছেদ ৩৩। কিসিংগারের ওপর গোয়েন্দাগিরি।

পাতার নম্বর ৪৭৭।

(ই হাওয়ারড) হানট সহযোগীদের বলেছিলেন যে নিক্সন (জ্যাক) অ্যানডারসনকে খতম করতে বলেছিলেন। এটি সম্ভবত ১৯৭১র শেষ অথবা ১৯৭২র শুরুতে। জ্যাক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তার তথ্য প্রকাশ করে দিচ্ছিলেন তাঁর আত্মজীবনীতে। জি গরডেন লিডি যিনি চার্চ সিনেট ইনটেলিজেনস কমিটির কাছে আত্ম সমর্থন করতে, তিনি লিখেছিলেন যে হানট তাঁকে ১৯৭২ এর গোড়ার দিকে বলেছিলেন যে অ্যানডারসনকে নিবৃত্ত করার দরকার ছিল। 'COWGENCI SOURCE OVERSEAS' এইটি ছিল মোরারজীর সংবাদ পাঠানোর সূত্র নির্দেশ। ইনি এমন একজন ভারতীয় যাঁর রিপোর্টকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কিসিংগার ও নিকসন বিশ্বাস করতেন। □

শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসেন ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে। এখানে হারশ সম্ভবত মোরারজীর হাত থেকে চরণ সিং-এর ক্ষমতা পাওয়ার কথা বলেছেন, যেটি ১৯৭৯ সালের মারচ মাসে।

সম্পাদক

মোরারজী : লোকসভা এটা করতে পারে না। এর মানে দাঁড়াচ্ছে সংবিধানের মূলগত কাঠামো পরিবর্তন। তারা সংবিধানের মূল চরিত্র বদলাতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের রুলিং আছে। এবং আমি এর যোরতর বিরোধী। আমি এই ধরনের সরকারের পক্ষপাতী নই।

পরিবর্তন : শুনেছি রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক বোঝা লাঘব হবে।

মোরারজী : এটা এমনকি বোঝাকে ভারি করে তুলতে পারে।

পরিবর্তন : নিজের নতুন দল গঠন করে মানেকা রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করেছেন। ওঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার পূর্বাভাস কেমন। এবং ওঁর রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন কি?

মোরারজী : রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করার অধিকার সকলেরই আছে। শ্রীমতী মানেকা এর কোন ব্যতিক্রম নন। এবং এই ব্যাপারে মতামত জানাবার কোন প্রয়োজন আমার নেই। ওটা হচ্ছে পারিবারিক ব্যাপার। আমি কোন পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে যাব না। আমি ওঁর সম্পর্কে কিছু বলব না। জনতা দল ও তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি বলেছি।

পরিবর্তন : কমলাপতি ত্রিপাঠী দীর্ঘদিন আপনার অধীনে কাজ করেছেন। আপনি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। শ্রীমতী গান্ধী ওঁর সংগঠন ক্ষমতা না অন্য কোন বিশেষ গুণাবলীর জন্য আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। আপনার কী ধারণা

মোরারজী : তিনি আমার অধীনে কাজ করেছেন এটা আমার বলা উচিত নয়। তিনি দীর্ঘদিন আমার সংগে কংগ্রেস দলে কাজ করেছেন। কিন্তু এখন যখন আমরা ভিন্ন দলে আছি তখন কেন আমি ওঁর সম্পর্কে কিছু বলতে যাব।

পরিবর্তন : বেশ, এখন আপনার কাজকর্ম কী

মোরারজী : যারা আমার কাছে আসেন তাদের সংগে সাক্ষাৎ করি। এবং যেসব চিঠিপত্তর পাই তার উত্তর দিই। দরকার হলে, দলকে শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য রাজ্য পরিদর্শনেও যাই।

পরিবর্তন : দলের জন্য ঘনঘন অন্য রাজ্য পরিদর্শন করেন?

মোরারজী : ঘনঘন নয়। যদি দল আমার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে তখনই অন্য রাজ্যে যাই। গত মাসে বিহার পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। জনতা দলের কর্মীদের একটি সেমিনারের জন্য তিন চারদিনের একটি বেশ দারুণ সেমিনার। প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরিবর্তন : পাঁচ হাজার জনতা কর্মী

মোরারজী : সকলেই জনতা কর্মী ছিলেন কিনা বলতে পারছি না। আমি সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত নই। যাহোক, কিছু যদি কর্মী না হয়েও থাকেন, তাহলে তাদেরকে বলতে পারি জনতার সমর্থক।

পরিবর্তন : সম্প্রতি আপনি কতগুলি রাজ্য পরিদর্শন করেছেন?

মোরারজী : কোন রেকরড রাখি না। যদি কোথাও যাওয়া অর্থময় মনে হয়, তাহলে সেখানে ছুটে যাই।

পরিবর্তন : আপনার প্যাশান কী

মোরারজী : আমার কোন প্যাশান নেই।

সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধিতে বিশ্বাস করি। সেটাই আমার পরম উদ্দেশ্য। জনগণের সেবাই হচ্ছে সেই অস্ত্র যার সাহায্যে আমি সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি করতে পারছি।

রাজনীতি আমার পেশা নয় এবং তুমি দেখ আমার কোন উদ্বেগ নেই। সেটা সম্ভব হচ্ছে ভগবানের দয়াতেই, ভগবানের আশীর্বাদে আমি বেশ শান্তিতে আছি।

পরিবর্তন : অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে মনেপ্রাণে আপনি ধার্মিক।

মোরারজী : ধর্ম ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই মিথ্যে। ধর্মই আমাকে জীবনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

পরিবর্তন : কতক্ষণ ঘুমোন?

মোরারজী : রোজ ভোর চারটায় উঠি। চান সেরে সকালের প্রার্থনা করি সাড়ে ছটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত। সাধারণত নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে ঘুমুতে যাই।

পরিবর্তন : এই বয়সেও আপনাকে বেশ সতেজ ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে

> **সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধিতে বিশ্বাস করি। সেটাই আমার পরম উদ্দেশ্য। জনগণের সেবাই হচ্ছে সেই অস্ত্র যার সাহায্যে আমি সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি করতে পারছি।**

আচ্ছা, আপনি রোজ কী ধরনের খাবার খান?

মোরারজী: কোনরকম দানাজাতীয় খাদ্য শস্য খাই না, শুধু দুধ, ফল ও সবজি খাই। এবং মাসে দুবার ছত্রিশ ঘণ্টা করে উপোস করি,—তখন জল ছাড়া অন্য কিছু খাদ্যগ্রহণ করি না।

পরিবর্তন: লানচ ও ডিনার দুবারই কোনরকম দানাজাতীয় খাদ্য নয়?

মোরারজী: না, কোনরকম দানাজাতীয় খাদ্য নয়।

পরিবর্তন: মনে হয় আপনি একজন মনোযোগী পড়ুয়া। এই বইয়ের ডাঁই দেখে আমার তেমনই ধারণা হচ্ছে।

মোরারজী: না, খুব পড়াশুনা করি না। যেটুকু দরকারি কেবল সেটুকুই পড়ি।

আমার ধারণা, জীবনে মানুষের নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী আচার আচরণ করা উচিত। অন্যথায় বেশি পড়ে লাভটা কী?

পরিবর্তন: কিন্তু আপনার খাটের ওপর কত বই দেখতে পাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই পড়েন।

মোরারজী: না, এই বইগুলোর একটিও আমি কিনিনি। লেখক, শিক্ষায়তন, এঁরা উপহার হিসেবে দিয়েছেন।

পরিবর্তন: এখন, আমার শেষ প্রশ্ন। আশা করি, আপনি 'গান্ধী' দেখেছেন। এটি বহু আলোচিত, এ নিয়ে সর্বত্র চলছে বিতর্ক। একজন সত্যনিষ্ঠ গান্ধীবাদী হিসেবে ছবিটি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

মোরারজী: (হাসিমুখে) এখনও আমি ছবিটি দেখে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমি জানি ছবিটিতে কী আছে।

পরিবর্তন: এখনও আপনি ছবিটি দেখেননি?

মোরারজী: না। যদি লোক জানতে পারেন আমি ছবিটি দেখেছি তাহলে ওরা আমার মতামতের জন্য ছুটে আসবে। এবং আমি এটাও জানি, এই ফিলমটির সুবাদে খুব সমাজ গান্ধীজীর ব্যাপারে আবার উৎসাহ দেখাচ্ছেন। আমি জানি কিছু কিছু খুঁত আছে। কিন্তু সর্বত্র মানুষের ওপর এর সুফলের প্রভাবের কথা ভেবে আমি তা উল্লেখ করতে চাই না।

জীবনে মিথ্যে আমি বলতে পারি না। যদি আমি ছবিটি দেখি তাহলে আমি মতামত দেবার ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারি না। সেজন্যই আমি ছবিটি দেখিনি।

পরিবর্তন: এটা সম্পূর্ণ সত্য। দেশবাসী জানেন, সাধারণ রাজনীতিকদের মত আপনি কোন কারসাজিকে প্রশ্রয় দেন না বা কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন না। ঠিক আছে। পরিশেষে, আমার পাঠকদের জন্য আপনার বাণী লিপিবদ্ধ করুন, আমার অনুরোধ।

মোরারজী: আমার বাণী—তা খুবই সরল ভয়হীন হও এবং দেশের জন্য কাজ কর। (বি ফিয়ারলেস অ্যানড ওয়ারক ফর দি কানট্রি)। □

> আমার ধারণা, জীবনে মানুষের নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী আচার আচরণ করা উচিত।

সাক্ষাৎকার: রীণা মৃণাল

রথযাত্রা ঃ ওড়িশা ও বঙ্গের পবিত্র উৎসব

ব্রজরাজ কিশোর গোস্বামী

'রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'–রথের মধ্যে অবস্থিত বামনদেবকে দেখলে অর্থাৎ দর্শন করলে পুনর্জন্ম হয় না, একথাকে বিশ্বাস করেই ভক্ত হিন্দু নরনারী মাত্রেই রথদর্শনে গিয়ে থাকেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে রথ হচ্ছে দেহেরই প্রতিরূপ। বামন হচ্ছেন পরমাত্মা। সৎস্বরূপ জগন্নাথদেব, চিৎস্বরূপ সুভদ্রা দেবী এবং আনন্দ স্বরূপ বলরাম। এই সৎ চিৎ আনন্দ জগন্নাথ বিগ্রহরূপেই বিরাজ করছেন। যাঁরা পরমাত্মাকে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেননি তাঁরা প্রতি বছরে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রার দিন তা দেখার সুযোগ পেতে পারেন।

আমরা রথযাত্রা বলতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝি। কিন্তু একসময়ে ভারতবর্ষে কী সৌর, কী শাক্ত, কী শৈব, কী বৈষ্ণব, কী জৈন, কী বৌদ্ধ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব স্ব উপাস্যদেবের উৎসব বিশেষে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। তবে রথযাত্রার প্রচলন কবে, কোথায়, এব্যাপারে ঠিক কিছু জানা যায় না। এখন যেমন আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়ে থাকে আগে সেইরকম ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা হত। উৎকলে আবার চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে বিরাট সমারোহে শিবের রথযাত্রা হয়ে থাকে। হিমালয়ের দুই এক স্থানে কার্তিক মাসে দেবীর রথযাত্রার কথাও শোনা যায়। তবে এখন এ প্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত বলা চলে। আবার মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্যদেবের রথযাত্রা হয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণের মতে চাতুর্মাস্যের শেষে ভগবানের উত্থানের পর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রিতে বিষ্ণুর রথযাত্রা করতে হয়। বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধগণ রথযাত্রা করে থাকেন। আবার জৈনপুরাণ অথবা জৈনধর্মগ্রন্থ থেকে মার্গশীর্ষে চাতুর্মাস্যের পর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপে আগে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে হয় কিনা জানা যায় না।

যা হোক, বর্তমানে রথযাত্রা বলতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকেই বোঝায়। পুরীধামের সুবিখ্যাত রথের পরেই পশ্চিমবঙ্গের মাহেশের স্থান। বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী এই পবিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরীতে সমবেত হন। জগন্নাথদেবের বার মাসে বারটি যাত্রামহোৎসবের অন্যতম মুখ্যযাত্রা এটি। এছাড়া চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি যাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে পুরীতে হয়ে থাকে। তবে রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা ছাড়া অন্য সব যাত্রামহোৎসবই জগন্নাথদেবের উৎসব বিগ্রহ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পুরীতে তিনটি রথ পথে বের হয়। এক একটি রথের এক একটি নাম। জগন্নাথের রথের নাম নন্দিঘোষ। এর উচ্চতা ২৩ হাত। বলরামের রথের নাম তালধ্বজ। এর উচ্চতা ২২ হাত। সুভদ্রা দেবীর রথের নাম পদ্মধ্বজ। এর উচ্চতা ২১ হাত। জগন্নাথের রথে ১৬টি, বলরামের রথে ১৪টি ও সুভদ্রা দেবীর রথে ১২টি চাকা থাকবেই। শ্রীচৈতন্যদেব এই রথযাত্রাতে আজ থেকে কত বছর আগে পুরীধামে রথাগ্রে ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করেছিলেন! আজ এত বছর পরেও ভক্তগণ সেই পুণ্য লীলাকে স্মরণ করে বঙ্গদেশ থেকে কীর্তনমণ্ডলী সহ পুরীতে গমন করেন।

শুধু পুরী বা শুধু মাহেশ নয়, সারা ওড়িশা ও বাংলাদেশের একটি বিশেষ উৎসব এই রথযাত্রা। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পবিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেন আনন্দে। উলুধ্বনি জয়ধ্বনিতে দিকমণ্ডল মুখরিত হয়ে ওঠে। রথের দড়ি স্পর্শ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবেন ভক্তমণ্ডলী।

রথযাত্রা পরমেশ্বর জগন্নাথদেবের পবিত্র উৎসব বলে এদিন ভক্তজনের একান্ত প্রার্থনা থাকে, মঙ্গলময়ের সার্বিক কৃপাদৃষ্টি যেন তাঁর উপর বর্ষিত হয়। □

ছবি এঁকেছেন ঃ রাজ

প্রমোদ দাশগুপ্তর বিষয় সম্পত্তি কে পাবেন ?

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

সি পি আই (এম)-এর প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তর বিষয় সম্পত্তি কে পাবেন? প্রমোদবাবু ছিলেন আজীবন পারটির সর্বক্ষণের কর্মী, সংসার ধর্ম কোনদিন করেননি। প্রমোদবাবুর বিষয় আশয়ের দাবিদার সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটি। অথচ আইনের চোখে পারটির দাবি টেকে না। আইন অনুযায়ী প্রমোদবাবুর কোন নিকটআত্মীয় উত্তরাধিকারী হিসাবে দাবি করতে পারেন। সেদিক থেকে দাবি করতে পারেন প্রমোদবাবুর ছোট ভাই মানিক দাশগুপ্ত।

পারটির রাজ্য কমিটি দাবি করেছেন, প্রমোদবাবুর নামে যেসব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তা সবই পারটির সম্পত্তি। প্রমোদবাবুর নামে মোটর গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকাও আছে। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি। ঠিক কত টাকা তা কেউই জানেন না।

প্রমোদবাবুর বিষয় আশয় নিয়ে সি পি আই (এম) নেতারা কিছুটা অসুবিধায় পড়েছেন। এ ব্যাপারে নেতারা আলোচনা করেছেন। প্রমোদবাবুর নামে যা কিছু আছে তা সবই পারটির প্রাপ্য বলে নেতারা মনে করছেন। কেননা পারটির সম্পত্তি প্রমোদবাবুর নামে করা হয়েছিল। এখন মানিক দাশগুপ্ত আইন মোতাবেক প্রমোদবাবুর উত্তরাধিকারী হিসাবে বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে সব কিছু সি পি আই (এম)-এর নামে লিখে দিতে পারেন। তা ছাড়া প্রমোদ দাশগুপ্তর সম্পত্তি পারটির পক্ষে ভোগদখল করা সম্ভব নয়।

মুরশিদাবাদ জেলার এম এল এ বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে সংগে নিয়ে রাজ্য কমিটির এক নেতা বহরমপুরে গিয়েছিলেন মানিকবাবুর কাছে। তিনি মানিকবাবুর কাছে প্রস্তাব করেন, প্রথমত মানিকবাবুকে আদালতে এফিডেভিট করতে হবে যে তিনি প্রমোদবাবুর ছোট ভাই। তারপর তাঁকে কয়েক জায়গায় গিয়ে গোটা কয়েক সই করতে হবে।

মানিকবাবু তাঁদের কিছুটা হতাশ করেছেন। মানিকবাবু বলেছেন, দাদার মৃত্যু তাঁদের বড় রকমের আঘাত দিয়েছে। মন-টন খারাপ। পরে ওসব ভেবে দেখবো। আপনাদের' পারটি পলিটিকসের ব্যাপারে হঠাৎ আমার সইই কী এমন জরুরী ব্যাপার তা তো বুঝতে পারছি না।

পরে আরও কয়েকজন এ ব্যাপারে কথা তুলেছিলেন, তাঁদেরও মানিকবাবু বলেছেন এত তাড়া কিসের। টাকা ব্যাংকে থাকলে পচে তো আর যাবে না। সুদে বাড়বে। আর তাতে ওদের পারটিরই লাভ।

এর পরের ঘটনা : মুরশিদাবাদ জেলা কমিটির কোন কোন নেতা বলেছেন মানিক দাশগুপ্ত কি রাজনীতি শুরু করলো নাকি। দাদার নামে সম্পত্তি যে দাদার নয় এটা তো মানিকবাবু ভাল করেই জানেন। তা হলে কি প্রমোদবাবুর বিষয় আশয় এখন তলে তলে মানিকবাবু নিজে ভোগদখল করার মতলব করছেন?

মানিকবাবুর জবাব : আমাদের পরিবারের কারুর কোনদিন টাকা পয়সা বা বিষয় সম্পত্তির ওপর লোভ নেই। কয়েক লক্ষ টাকা তো দূরের কথা কয়েক কোটি টাকা হলেও নয়।

আসলে মানিকবাবুও আইনজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া কোন রকম সই সাবুদ করতে রাজি নন। পরে তাঁকে আইনগত অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। প্রমোদবাবু প্রথম দিকে ১৯৩৮ সাল নাগাদ কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। তবে সেটা খুব বেশি দিন নয়। তারপর থেকে চল্লিশ বছরের বেশি তিনি পারটির সর্বক্ষণের কর্মী। বাবার সম্পত্তি কিছু পাননি, প্রমোদবাবু নিতেও চাননি।

তা হলে প্রমোদবাবুর নামে এত সম্পত্তি হল কী করে? সি পি আই (এম)-এর এক প্রবীণ নেতা বললেন, পারটির রাজ্য কমিটি বা বিভিন্ন জেলা কমিটির নতুন দফতর ভবনের মালিকানা ইদানীং ট্রাসটের নামে করা হচ্ছে। যেমন ৩১ নং আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মুজফফর আহমদ ভবনের অন্যতম ট্রাসটি ছিলেন প্রমোদবাবু। তার আগে পারটির নেতাদের নামে নামে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হত। মোটর গাড়ি বাড়িও কয়েকজনের নামে কেনা হয়েছে। প্রমোদবাবু নিজেও বোধহয় জানতেন না যে তার নামে কত টাকা ব্যাংকে জমা আছে। প্রমোদবাবু নিজে যদি বুঝতে পারতেন যে আর বাঁচবেন না তাহলে হয়ত নিজেই বিষয় সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে যেতেন।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, নেতাদের নামে সি পি আই (এম)-এর কত সম্পত্তি আছে। ১৯৭০ সালে পারটির দু লক্ষ টাকার বেশি আত্মসাৎ করার অভিযোগে রমেন সেন নামে একজন ক্যাশিয়ার এর বিরুদ্ধে কোরটে মামলা হয় এবং সাজাও হয়। কোরটের সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায় যে পারটির আয়ব্যয়ের কোন অডিট হয় না। পারটির সম্মেলনেও আয় ব্যয়ের কোন বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হয় না।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর গত ছ বছরে সি পি আই (এম) কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলা শহরে জমি বাড়ি কিনেছে। অতি সম্প্রতি ২৪ পরগনা জেলা কমিটির জন্য এস এন ব্যানার্জি রোডে সাত লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি কেনা হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত লোকাল এবং ব্রানচ কমিটিগুলির তহবিল পকেটে পকেটে জমা থাকতো। এখন পারটি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দুই বা তিন জনের নামে ব্যাংকে অ্যাকাউনট করতে হবে। সর্বত্র এই নির্দেশ কার্যকর হয়নি।

তবে পারটির কার্যালয় বা পারটির কাজের জন্য কেনা জমি বা বাড়ির ক্ষেত্রে ট্রাসটি গঠন করা হচ্ছে। সমস্ত জেলা কমিটিই ট্রাসটির নামে বাড়ি করছে।

অনেক জেলায় লোকাল কমিটি জেলা কমিটির কাছে তাদের হিসাব পেশ করে না। লোকাল কমিটিগুলি তাদের তহবিলের অবস্থা জেলা কমিটির কাছে গোপন রাখতে চায়। অবশ্য সব জেলা কমিটিও রাজ্য কমিটির কাছে হিসাব দেয় না।

১৯৭৮ সালে জলন্ধর পারটি কংগ্রেসে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, রাজ্য কমিটিগুলি নিজেদের ইচ্ছামত চলেন, কেন্দ্রীয় কমিটিকে মানেন না। নিয়মিতভাবে রাজ্য কমিটিগুলি কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিকে কোটা দেয় না।

প্রমোদবাবুর হাতে সব সময় মজুত তহবিল থাকতো। সেই তহবিল থেকে পারটির বা পারটির কর্মীদের জরুরী কাজের জন্য খরচ করতেন। প্রমোদবাবুর নিজের জীবনযাত্রা দশ বছরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি।

পারটিতে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রমোদবাবুর জীবিতকালে উত্তরাধিকারীর দলিল কেন তৈরি করা হয়নি। প্রমোদবাবুর অবর্তমানে যে সমস্যা হবে এটা কি কেউ বুঝতে পারেননি।

অনেকের ধারণা, মানিক দাশগুপ্তকে কেউ নিশ্চয় পরামর্শ দিচ্ছেন। শুধু এফিডেভিট করে বা গোটাকয়েক সই করে বিষয় সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ এবং সি পি আই (এম)-এর নামে দান করার ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এত টাকা কোথা থেকে এলো। মৃত্যুকর, সম্পদ কর, আয়কর প্রভৃতি কে দেবে। সবই তো চাপবে মানিক দাশগুপ্তর ওপর। সি পি আই (এম) এর জন্যে মানিক দাশগুপ্ত এত ঝামেলা পোহাবেন কেন। মানিকবাবু তো পারটির লোক নন, এমনকি সমর্থকও নন। পারটির সংগে তাঁর সম্পর্ক প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর খারাপ হয়েছে।

প্রমোদবাবুর খবর পেয়ে মানিকবাবু কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রমোদবাবুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে মানিকবাবু বা অন্য ভাইবোনদের কিছু করতে দেওয়া হয়নি। পারটির নেতারা বলেছিলেন, প্রমোদবাবুর পরিবার বলতে তাঁর পারটি এবং আত্মীয়স্বজন বলতে পারটির কমরেডরা। মানিকবাবু কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে যান। টাটা থেকে প্রমোদবাবুর মেজ ভাই সুবোধ দাশগুপ্ত এবং বোনেরা বহরমপুরে দশদিন অশৌচ পালন করেন। বহরমপুরের বাবুপাড়ার বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করেন।

মানিকবাবু বরাবরই রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। শরীরচর্চা নিয়ে থাকেন। জেলার ক্রীড়ানুরাগী হিসেবে পরিচিত। জেলা স্টেডিয়াম কমিটিতে ছিলেন। রাগ করে সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। চাকরি করেন কালেকটোরেটে। প্রমোদ দাশগুপ্তর ভাই বলে নিজেকে কোনদিন জাহির করেন না। □

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলছেন, আত্মহত্যা
বাপের বাড়ির লোকদের মতে হত্যা,
পুলিশ এখনও অথৈ জলে।
যদি হত্যা হয় তা হলে—

ইন্দ্রাণী হত্যার পিছনে কারা?

পরিবর্তনের ক্রাইম রিপোরটার পিনাকী মজুমদার

ব্যারাকপুরের দুই নিহত কিশোরের মৃত্যুরহস্যের কিনারা হবার আগেই ওই শহরে আর একটি ভয়াবহ মৃত্যুর ঘটনায় বিস্ময়াভিভূত হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষ এবং পুলিশ প্রশাসন। গত ১৭ মে '৮৩ ব্যারাকপুরের তালপুকুর এলাকার বি সি চ্যাটারজি রোডের গৃহবধূ ইন্দ্রাণী ব্যানারজির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই এই রহস্যের সূত্রপাত। ওইদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরের এক নির্জন প্রান্তে রেল লাইনের ওপর ইন্দ্রাণীর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ইন্দ্রাণীর স্বামী সুপ্রিয় ব্যানারজি এবং ওই পরিবারের অন্যান্যর পুলিশের কাছে দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী '১৭ মে '৮৩ সন্ধ্যেবেলা বাড়ির দোতলায় সবাই টি ভি দেখছিল। রাত আটটা বাজতে দশে লোডশেডিং হয়। ইন্দ্রাণী তখন নিচের একটা ঘরে। ছোটদের একটা বইয়ের পাতা নাড়াচাড়া করছে। সুপ্রিয় নিচে আসে। ইন্দ্রাণীকে ওপরে যেতে বলে। ইন্দ্রাণী যেতে চায় না। বচসা হয়। রাগ দেখিয়ে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে যায়। সুপ্রিয় তখন মাকে ডাকে। বলে 'দেখ তোমার বৌমা বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর বেরিয়ে খোঁজাখুঁজি করে। পায় না।' সুপ্রিয় ব্যানারজি এবং ওর পরিবারের লোকজনদের বক্তব্য এরকমই। সুতরাং তাঁরা দাবি করছেন 'ইন্দ্রাণী ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করেছে। ইন্দ্রাণী বদরাগী ছিল, শ্বশুরবাড়িতে ওর মন বসতো না।'

এদিকে ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির লোকজনদের ধারণা 'ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা করতে পারে না। ইন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের আচার আচরণ সন্দেহজনক।' সুতরাং তারা সুপ্রিয় ব্যানারজি সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে পুলিশে এফ আই আর করেছেন। তার ভিত্তিতেই শুরু হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১/৩৪ ধারার মামলা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ প্রয়োগ করা হয় খুনের মামলার ক্ষেত্রে। ২০১ ধারা প্রমাণ লোপের ক্ষেত্রে এবং ৩৪ উপধারাটি 'দলবদ্ধভাবে' কিছু করার ক্ষেত্রে (এখানে 'দলবদ্ধ ভাবে প্রমাণ লোপ' যেহেতু ২০১/৩৪)।

সুতরাং আবারও সেই দ্বন্দ্ব - খুন না আত্মহত্যা? পুলিশ দপ্তর অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোন মন্তব্য করেননি। করেননি, কারণ 'আগে ভাগে কোন মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাই না।' -গোয়েন্দা দপ্তরের এক মুখপাত্রের মন্তব্য। তবু তাদের তদন্তের গতি প্রকৃতি জানান দিচ্ছে ইন্দ্রাণী ব্যানারজির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে তারা কী চোখে দেখছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ অনেক পরের কথা। এখন দেখা যাক ঘটনাটা কী

ঘটনা প্রসঙ্গ

সেদিন সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। ব্যারাকপুরের তালপুকুরের নির্জনতা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে গভীরতর। বিদ্যুতের চমক কিংবা মুষলধারার বৃষ্টি ব্যানারজি বাড়ির টি ভি কে স্তব্ধ করতে পারেনি। পুলিশকে দেওয়া ওদের বিবৃতি অনুযায়ী- ওপরের ঘরে টি ভি চলেছে যথারীতি সন্ধ্যে থেকে। মঙ্গলবার, সুতরাং যথাসময়ে টি ভি-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে নাটক। সে সময়ে দর্শক বলতে বাড়ির গৃহকর্তা পাঁচুগোপাল ব্যানারজি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণীর স্বামী সুপ্রিয়, দেওর সুজিত, বিবাহিত ননদ সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রার স্বামী মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রার একমাত্র দশ বছরের মেয়ে এবং ইন্দ্রাণীর শাশুড়ি রমা ব্যানারজি।

সুপ্রিয়র কথা অনুযায়ী নাটক শেষ হতেই ইন্দ্রাণী নিচের তলায় নেমে আসে। টি ভির অনুষ্ঠান চলতে থাকে। চলতে থাকে বৃষ্টিও। আটটা বাজতে দশে হঠাৎ লোডশেডিং জাঁকিয়ে বসতেই টি ভি বন্ধ হয়। সুপ্রিয় নেমে আসে নিচে। ইন্দ্রাণী তখন নিচের ঘরে একা। ছোটদের বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। সুপ্রিয় ইন্দ্রাণীকে ওপরে যেতে বলে। ইন্দ্রাণী যেতে চায় না। কথা কাটাকাটি হয়। এরপরই ইন্দ্রাণী নাকি রাগ করে বেরিয়ে যায়।

সুপ্রিয় তখন ওর মাকে ডাকে। বলে-দেখ তোমার বৌমা বেরিয়ে গেল। এরপর সুপ্রিয় এবং ওর জামাইবাবু মনোরঞ্জন কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে। কিন্তু কোথাও ইন্দ্রাণীকে পায় না।

সুপ্রিয়র ধারণা হয় ইন্দ্রাণী রাগের মাথায় বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। তার এই ধারণার কথাও পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বৃষ্টি এবং লোডশেডিংয়ের মধ্যেই ইন্দ্রাণীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা সুপ্রিয় এবং মনোরঞ্জনের খুঁজতে বেরনো প্রভৃতি কিছুই কিন্তু চোখে পড়ে না পাড়াপ্রতিবেশীদের। ব্যানারজি বাড়ির তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় রাত এগারটা নাগাদ। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছাকাছি ইন্দ্রাণীর বড় জামাইবাবু জনক ব্যানারজির বাড়ি। রাত এগারটা নাগাদ সে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে সুপ্রিয় এবং ওর জামাইবাবু মনোরঞ্জন।

সুপ্রিয় যদিও পুলিশকে বলেছেন যে, তাদের ধারণা হয়েছিল ইন্দ্রাণী রাগ করে বাপেরবাড়ি চলে গিয়েছে কিন্তু সে রাত্রে ইন্দ্রাণীকে খুঁজতে যেখানে এলেন সেটা ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ি নয় দিদির বাড়ি। বাপের বাড়ি বেহালায়।

ইন্দ্রাণীর জামাইবাবু জনকবাবু সুপ্রিয়র কথা শুনে স্তম্ভিত। সাময়িক ঘোর কাটতেই জনকবাবু জানতে চেয়েছিলেন পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে কিনা। সুপ্রিয়র উত্তর 'না।' খোঁজখবর না করেই ঘরের ব্যাপার পুলিশকে জানাতে যাবো কেন। দিতে হলে কাল সকালেই দেওয়া যাবে।

ইন্দ্রাণীর বড় জামাইবাবু জনকবাবুর অভিযোগ 'এ কথা বলার পরই ওরা নিরুদ্বিগ্নভাবে চলে যায়।' জনকবাবু কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেন না। ওই রাত্রেই স্ত্রী বনানীকে (ইন্দ্রাণীর বড় বোন) সঙ্গে নিয়ে ছুটে যান বেহালায়, ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়িতে। ওখানে মানুষ বলতে ইন্দ্রাণীর মা, একটিই মাত্র ভাই ইন্দ্রাণীর চেয়ে বছর দুয়েকের বড় রাঘবেন্দ্র লাল মুখারজি এবং ছোট বোন মালিনী। ইন্দ্রাণীর আর এক বোন সর্বাণীরও বিয়ে হয়ে গেছে। পেশায় অ্যাডভোকেট সর্বাণী বর্তমানে বহরমপুর থাকেন।

মাঝরাতের এ দুঃসংবাদে ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির তিনটি প্রাণী স্বাভাবিকভাবেই চমকে উঠেছিলেন। তারপরই শুরু হয়েছিল রাতভোর ছুটোছুটি।

জনক ব্যানারজি ওই রাতেই ছুটে

গেলেন কাছাকাছি বেহালা থানায়। ইন্দ্রাণীর দাদা রাঘব দু'একজন বন্ধুকে নিয়ে ছুটে এলেন ভবানীপুরে, সুপ্রিয়র জামাইবাবু মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বেহালা থানার পুলিশের অক্ষমতা প্রকাশ-- 'এটা আমাদের এলাকার কেস নয়। হেড কোয়ারটারের মিসিং স্কোয়াড-কে জানান।' জনকবাবু তখন ওই থানা থেকেই মিসিং স্কোয়াডে খবর পাঠালেন। আর ওদিকে ইন্দ্রাণীর দাদা রাঘবের মনে চরম বিস্ময়। ভবানীপুরে মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে আবিষ্কার করলেন সুপ্রিয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন রাঘব-'বাড়ি থেকে তোমার স্ত্রী উধাও হয়ে গেল-- আর তুমি ঘুমোচ্ছ।'

রাঘবের অভিযোগ-- ওর এ কথায় সুপ্রিয়র মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল একই বক্তব্য--'এত রাতে কোথায় কী করবো। সকাল হোক, তারপর যা করা যায় করা যাবে।'

রাঘব আর দাঁড়াতে পারেনি ওখানে। ফিরে এসেছিল নিজের বাড়িতে। ততক্ষণে জনকবাবুও বেহালা থানা থেকে ফিরে এসে অপেক্ষা করছেন। রাঘব ফিরতেই ওরা মাঝরাতের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই ছুটে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সুপ্রিয়দের বাড়ি।

ইন্দ্রাণী নিখোঁজ। সুপ্রিয় ভবানীপুরে মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে। সুতরাং রাঘব এবং জনকবাবুর ডাকাডাকি হাঁকাহাকিতে বেশ কিছু সময় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ইন্দ্রাণীর শ্বশুর পাঁচুগোপালবাবু। জনকবাবুর অভিযোগ পাঁচুগোপালবাবু দরজা খুলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। বলেন 'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে-- এত রাতে পাড়া জানাতে এসেছ।'

এ কথায় জনকবাবুরা ফেটে পড়েন। চিৎকার করে বলে ওঠেন--'আপনারা কী বলছেন-- আপনাদের বাড়ির বউ উধাও হয়ে গেল, খোঁজ না করে নিশ্চিন্তে আছেন--আর আমাদের বলছেন কিনা মাথা খারাপ হয়েছে।

জনকবাবু বক্তব্য-- এরপর ওদের সংগে আর কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। ওই রাতেই আশপাশ অঞ্চলে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করি। অবশেষে বেহালায় ফিরে আসি।

ভোরের আলো ফুটতেই অর্থাৎ ১৮ মে সকালে আবারও জনকবাবু এবং রাঘব ছুটে যায় ব্যারাকপুরে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ফিরে আসেন আবার। এদিকে সকাল বেলাতেই ইন্দ্রাণীর মেজ বোন সর্বাণীকে খবর পাঠান হয় বহরমপুরে।

দুপুরের দিকে জনকবাবু আবারও ছুটে যান ব্যারাকপুরে সুপ্রিয়দের বাড়ি। জনকবাবুর বক্তব্য--'তখন বেলা একটা দেড়টা। ওরা তখন খাওয়া দাওয়া সেরে উঠলেন।' তখনও ওদের মধ্যে কোন উদ্যোগ না দেখে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় রাস্তায় টিটাগড় থানার ও সি অমিয় চক্রবর্তীর সংগে দেখা। উনি জনকবাবুকে থানায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেন।

ওর কথা মত জনকবাবু টিটাগড় থানায় চলে আসেন। সকালবেলাতে জনকবাবু এই থানাতেই এফ আই আর করে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ও সি থানায় ফেরেন ইন্দ্রাণীর স্বামী সুপ্রিয় এবং শ্বশুর পাঁচুগোপালবাবুকে সংগে নিয়ে। তার পরই ও সি অমিয়বাবু ওদের সবাইকে সামনে রেখে বলেন-'একটু আগেই ব্যারাকপুরের জি আর পি থেকে খবর এসেছে--একটি মহিলার খিখণ্ডিত লাশ গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পলতার কাছাকাছি রেল লাইনের ওপর পাওয়া গেছে। আপনাদের বিবরণের সংগে মিলে যাচ্ছে। মৃতদেহটা বর্তমানে কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে রয়েছে ময়নাতদন্তের জন্যে। আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন।' ও সি অমিয়বাবু যখন এ দুঃসংবাদ শোনালেন তখন বেলা দেড়টা দুটো।

এ সংবাদ শোনার সংগে সংগেই জনকবাবু সংগের গাড়িতেই সুপ্রিয়দেরও তুলে নেন। ছুটে আসেন এন আর এস হাসপাতালে।

ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির তরফে ইন্দ্রাণীর নিখোঁজ হবার সংবাদ মিসিং স্কোয়াডকে জানান হয় ঘটনার দিন রাত্রেই। অর্থাৎ ১৭ মে রাত বা ইংরাজি মতে ১৮ মে আর্লি আওয়ারে। অপরদিকে ইন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ি থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় পরদিন বেলা আড়াইটের সময়। সুপ্রিয়র ভাই সুজিত এ সময় ভবানীভবনে গিয়ে মিসিং স্কোয়াড কে ইন্দ্রাণীর নিখোঁজের খবর দেয়। বলা বাহুল্য এর অন্তত এক ঘণ্টা আগেই ইন্দ্রাণীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গিয়েছেন ওর বাপের বাড়ির লোকজন। সুপ্রিয় এবং পাঁচুগোপাল ব্যানার্জিও।

যাই হোক হাসপাতালে পৌঁছেই ইন্দ্রাণীর মৃতদেহ সনাক্ত করতে একটুও অসুবিধে হয় না। ইন্দ্রাণীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফরসা দুটি পায়ের পাতা ধুলোবালিহীন, অক্ষত। বাঁ পায়ের পাতার ওপর কিছুদিন আগের পোড়া দাগটা তখনও জ্বলজ্বল করছে।

ইন্দ্রাণীর মৃতদেহকে নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে যখন কান্না এবং উত্তেজনার ঢেউ ক্রমান্বয়ে আছড়ে পড়ছে ঠিক তার কিছু আগেই ইন্দ্রাণীর মেজ বোন সর্বাণী বহরমপুর থেকে বেহালা এসে পৌঁছেছেন। তখনও ইন্দ্রাণীর মৃত্যু সংবাদ সর্বাণীর কাছে পৌঁছোয়নি।

ঠিক এমনি সময় (বিকেল চারটে নাগাদ) বেহালার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন সুপ্রিয়র ভাই সুজিত এবং ওর জামাইবাবু মনোরঞ্জন। সর্বাণীর অভিযোগ-'ওঁরা এসেই জিগেস করেন বৌদি কোথায়-- তারপরই বলেন বৌদি এ বাড়িতে যে সব চিঠিপত্র দিয়েছে সেগুলো দিন তো।'

সর্বাণী জানতে চায়-কী হবে সুজিত উত্তর দেয় দরকার হতে পারে, তাই চাইছি। তাড়াতাড়ি দিন।

সর্বাণী জানায় সুজিতের এ কথায় তার সন্দেহ হয়। ফলে সর্বাণী ওকে ফিরিয়ে দেয়।

সর্বাণী ওদের হাতে চিঠিপত্র তুলে না দিয়ে ফিরিয়ে দিলেও ওঁরা ওই বেহালাতেই আর একটি বাড়ির দরজায় উপস্থিত হন। ইন্দ্রাণীর এক বান্ধবীর বাড়ি। অভিযোগ-সুজিত এবং মনোরঞ্জন ইন্দ্রাণীর সেই বান্ধবীর কাছেও ইন্দ্রাণীর চিঠিপত্র চান। সেই ভদ্রমহিলাও ওদের ফিরিয়ে দেন। এই তথ্য সর্বাণীর বিবৃতি থেকে পাওয়া।

কিসের চিঠি ?

চাপা স্বভাবের মেয়ে ইন্দ্রাণী তার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কারুর কাছেই বিশেষ কিছু বলতো না। তবু কোন কোন সময় এমন কিছু কিছু অর্থবহ সংলাপ ওর মুখ থেকে শোনা গেছে যা বর্তমান অবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ওর আত্মীয় স্বজন এবং ঘনিষ্ঠরা। ইন্দ্রাণীর এ সমস্ত কথাবার্তার সমর্থন রয়েছে ওর নিজের হাতের লেখা কিছু চিঠিতে। ইন্দ্রাণীর বেশিরভাগ চিঠিই বড়দি বনানী, বড়জামাই বাবু জনক ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করে লেখা। দু'চারখানা মাকেও লিখেছিল। তাতে ওর মানসিক যন্ত্রণার কিছু প্রতিচ্ছবি ধরা আছে।

ইন্দ্রাণী ব্যানার্জির এই মানসিক যন্ত্রণার কোন খবর কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়ির এলাকার কোন প্রতিবেশী জানেন না। জানা সম্ভবও ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন ওই এলাকার প্রায় সবাই। পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দা শিক্ষক শান্তিকুমার মিত্র জানিয়েছেন সুপ্রিয়র বাবা পাঁচুগোপাল তার স্কুল বয়সের বন্ধু। সে সময় থেকেই তিনি লক্ষ করেছিলেন পাঁচুবাবু আর সাধারণ দশটা ছেলের মত মিশুকে নন। ফলে তার সংগে কারুরই বিশেষ কোন হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি। ওদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হতে পারেননি কেউ।

তবু ওরা লক্ষ্য করেছেন পাঁচুগোপালবাবু ধীরে ধীরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অফিসার হয়েছেন। বাড়ি করেছেন সুন্দর ছিমছাম। সেই সংগে টি ভি, ফ্রিজ, আসবাবপত্র-আধুনিক জীবনযাত্রার আনুষংগিক সব কিছুই।

পাঁচুবাবু রিটায়ার করেছেন কিছুদিন আগে। সুতরাং সংসারের আয়ের মুখ্য উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার দুই ছেলে সুপ্রিয় এবং সুজিত। বর্তমানে ওরা একই ব্যাংকের কর্মী।

সুপ্রিয় চাকরি পেয়েছিলেন অল্প বয়সেই-- গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই। এর কিছুদিন আগে পাঁচুবাবুর একমাত্র মেয়ে সুমিতার বিয়ে হয়ে গেছে কলকাতায় ভবানীপুরের মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সংগে।

সুতরাং কিছুদিনের মধ্যে সুপ্রিয়র বিয়ের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন পাঁচুবাবু, যথারীতি একটি দৈনিক সংবাদপত্রের 'পাত্র পাত্রী' কলমে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল-'ব্যাংকের সু চাকুরে পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই।'

খুব স্বাভাবিক কারণেই এ বিজ্ঞাপনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন অসংখ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। সদ-

ইন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ির ভাঙা গেট বিক্ষোভের ফল / অচিন্ত্য রায়

পিতৃহীনা এক কন্যার বছর দুয়েকের বড়দাদা রাঘবেন্দ্রলাল মুখারজিও ছিলেন এদের মধ্যে।

ব্যাংকের সূচাকুরে পাত্র, ছোট্ট পরিবার, নিজেদের বাড়ি, সুপাত্রের এতগুলো মাত্রার সংযোজন 'বিয়ের আয়োজনে' পরিণত হয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই।

ছেলের বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনরা মেয়ে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছেলে সুপ্রিয় কিন্তু মেয়ে দেখতে এলেন না। বিয়ে পাকা হয়ে গেল।

এই বিয়ের জন্য মুখারজি পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ইন্দ্রাণীর চেয়ে বছর দুয়েকের বড় রাঘব ধার দেনা করে নগদ চার হাজার টাকা যোগাড় করেন। বাকি ছয় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে কথা হয়। বিয়েতে সোনা ২২ ভরি, আসবাবপত্র এবং বাসন দাবি মত এবং ১১টা শাড়ি নমস্কারি হিসেবে দেয়।

দেনাপাওনার এই কুটকচালি মিটে যেতেই বেহালার মুখারজি-বাড়িতে বেজে উঠেছিল বিয়ের সানাই। সে দিনটি ছিল ৫ আগস্ট ১৯৮১।

৫ আগস্ট ১৯৮১ থেকে ১৭ মে ১৯৮৩। ইন্দ্রাণীর বিবাহিত জীবনের পথ-পরিক্রমা এটুকুই। সাকুল্যে ১ বছর ৯ মাস ১২ দিন।

বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রাণী যে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলতে চাইত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে তার লেখা চিঠিগুলোতে। এ রকমই একটা চিঠি লিখেছিল বড় জামাইবাবু জনক ব্যানারজিকে। জনকবাবু তখন অফিসের কাজে হায়দরাবাদে। ইন্দ্রাণী চিঠি লিখল—'........আপনি ওখান থেকে চিঠি দেবেন উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে। কেমন করে সুখে থাকতে হয়, দু'জনে মিলে সংসার করতে হয়। সবাইকে কেমন করে নিজের মনে করতে হয়, সবাইকে আপন করতে হয়।........'

মৃত্যুর মাত্র মাস খানেক আগে মাকে লিখেছিল—'একটা চিঠি লেখার যে কত বাধা তা কী করে বলব। দার্জিলিংয়ে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি দিয়েছি। তারপর ইচ্ছে থাকলেও আর সম্ভব হয়নি। কেমন আছো মা? ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হয়।........এখানে আমার একদম এক তিলও ভাল লাগে না। কী করে কাটাবো মা। কেন বলতো মা আমার এ রকম হল। আমি তো কারুর ক্ষতি করিনি........'।

এ ধরনের আরও কিছু চিঠি এসেছিল ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে ওর বাপের বাড়ির লোকজনদের কাছে। তার প্রত্যেকটিতেই ফুটে উঠেছে ওর মানসিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি।

বাপের বাড়ির লোকজনরা ওর কাছে জানতে চেয়েছেন সংঘাতটা কিসের? কেন এই অশান্তি? এ কথার জবাবে ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাননি ওরা।

ইন্দ্রাণী মেজ জামাইবাবুকে একটি চিঠিতে লিখেছিল--'বাবিদা, ...একটা কাজ যোগাড় করে ছিলাম। ইচ্ছে ছিল তাই নিয়েই থাকব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পেলাম না। একেই বলে বরাত।........একটা করে দিন যায় ভাবি আর কটা দিন এইভাবে কাটাতে হবে।... ....তুমি আমাকে যে কোন রকমের একটা কাজ দেখে দাও। যা হোক আমি সব রকম করতে রাজি। মানে যে কোন রকমের ঘরের কাজ, সমিতির কাজ। যেখানে দু'মুঠো খেতে আর থাকতে দেবে। আর চাই নিরাপদ একটু থাকার জায়গা।'

চাকরির জন্যে শুধু জামাইবাবুই নয়, ইন্দ্রাণী খবরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটা দরখাস্তও করেছিল। নাকতলা থেকে এক ভদ্রলোক তাকে দেখা করবার জন্যে চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

ইন্দ্রাণী যে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল তার আরও প্রমাণ আছে। ইন্দ্রাণী এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যারাকপুরেরই একটা সেলাই স্কুলে ভর্তি হয়। সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস। 'এ দিনগুলোর জন্যে ও মুখিয়ে থাকত'—একথা সেলাই স্কুলের বান্ধবীরা বলেছেন একবাক্যে। ওই স্কুলেরই আর এক বান্ধবী বলেছেন--'ইন্দ্রাণী বলতো-আমার বিয়ে দেড় বছর হলেও আমি এখনও নতুনই আছি।'

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিল মেজদি সর্বাণীর কাছেও। বলেছিল – 'আমি তো এখনও নতুনই।' সর্বাণীর মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধলেও দিদিসুলভ গাম্ভীর্যে কোন প্রশ্ন করতে পারেননি ছোট বোনকে। কিন্তু আজ তাদের মনে প্রশ্ন জাগছে–তবে কি সুপ্রিয়র সংগে ইন্দ্রাণীর কোন সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি? আর সে কারণেই কি ইন্দ্রাণী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল? খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে--'তবে কি সুপ্রিয়র বিয়েতে অমত ছিল? আর সে কারণেই কি বিয়ের আগে মেয়ে দেখতে আসেনি?'

গোয়েন্দা পুলিশের মনেও বর্তমানে এ সন্দেহ দানা বাঁধছে। কারণ ইতোমধ্যেই তাদের কানে এসেছে নানা কথা।

সুপ্রিয় অবশ্য এখনও পর্যন্ত এ সব কথা স্বীকার করেনি। 'ইন্দ্রাণীর মানসিক যন্ত্রণার কারণ অন্য'–বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইংগিতও নাকি দিয়েছেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই ইন্দ্রাণীর বাপেরবাড়ির লোকদের একটা সন্দেহ হয় ইন্দ্রাণী বহু কিছু গোপন করছে। ওদের এই সন্দেহ জাগে ইন্দ্রাণীর হঠাৎ পা পুড়ে যাওয়া নিয়ে। ইন্দ্রাণী সাফাই গেয়েছিল–'চা করতে গিয়ে পা পুড়ে গেছে।' কিন্তু ওর মৃত্যুর পর সেলাই স্কুলের একজন ছাত্রী ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির লোকদের কাছে বলেছিল যে -ইন্দ্রাণীর পায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল বলে ইন্দ্রাণী ওর কাছে গল্প করেছিল।

এছাড়াও গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আর একটা ঘটনা ঘটে। ওই সময় ইন্দ্রাণীর শ্বশুর, শাশুড়ি এবং ননদ সাঁওতালডি যান। বাড়িতে ছিল ইন্দ্রাণী এবং সুপ্রিয়। হঠাৎ একদিন ওর শাড়িতে আগুন লেগে যায়। বাড়ির চাকর সে আগুন নেভায়। এ ঘটনার পর ইন্দ্রাণী ওর দিদিকে চিঠি লেখে–'জানো তো সেদিন চির কালের মত তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম। সুপ্রিয় বলেছে নিতান্ত আগুনের অরুচি বলে তোমায় নিল না।'

আবিষ্কারক এবং শিল্পী ইন্দ্রাণী

'শান্ত কিন্তু হাসিখুশি মেজাজের মেয়ে ইন্দ্রাণীর মুখে কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই। অথচ ওর জীবনের যে এ রকম কোন পরিণতি ঘটতে পারে তা কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। এ যেন স্বপ্নেরও অতীত।'–ইন্দ্রাণীর একমাত্র ভাই রাঘবের হতাশা জড়ানো কণ্ঠস্বর। রাঘব তার আদরের বোন ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এক সময় স্বপ্ন দেখতো ও মস্ত বড় হবে। নাম করবে।

ইন্দ্রাণী সম্পর্কে রাঘবের এই ধারণা 'ভগ্নীস্নেহের' অন্ধ প্রতিক্রিয়ার ফসল নয়। ইন্দ্রাণীর ছাত্রী জীবনকে যারা দেখেছেন তারাই ইন্দ্রাণী সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করেছেন।

ইন্দ্রাণী সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পশ্চিমবংগের প্রাক্তন রাজ্যপাল এ এল ডায়াস, কংগ্রেস (ই) নেতা সুব্রত মুখারজি প্রমুখ।

উন্নতি কর, নতুন কিছু কর : ইন্দিরা গান্ধী

১৯৭৪ সাল। নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মন্ডপ দেখছেন। দেখছেন দেশের নবীনদের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্র। কোথাও এক মিনিট, কোথাও দু'মিনিট, কোথাও কোথাও বা চলতি পথে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন নতুন আবিষ্কৃত কোন যন্ত্র এবং তার আবিষ্কারকের প্রতি।

হঠাৎই শ্রীমতী গান্ধী এসে থমকে দাঁড়ালেন একটি যন্ত্রের সামনে। সে যন্ত্রের আবিষ্কারক কলকাতার সেইন্ট এনড্রুজ স্কুলের দুই কিশোরী ইন্দ্রাণী এবং মালিনী। মুহূর্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ওরা। প্রধানমন্ত্রীকে দাঁড়াতে দেখে সংগে সংগেই ডেমনেসট্রেশন দেওয়া শুরু করল–'ম্যাডাম, দিস ইজ অ্যান ইনসট্রুমেন্ট হুইচ ক্যান ডেভেলাপ দি গ্রোথ অব ফিশ বাই মিউজিক। শব্দের সাহায্যে আমরা মাছের বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয়েছি। লুক হিয়ার ম্যাডাম, হেয়ার ইজ এ......।'

দুই কিশোরীর সাবলীল বাচনভংগী এবং তাদের আবিষ্কারের অভিনবত্ব সম্ভবত আকৃষ্ট করেছিল প্রধানমন্ত্রীকে। দাঁড়িয়ে পড়ে হাসি মুখে বলেছিলেন – ক্যারি অন বেবী!

ওদের ডেমনসট্রেশন শেষ হতে শ্রীমতী গান্ধী ইন্দ্রাণীর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন--'আশা করি তোমরা আরও নতুন কিছু করে দেশের মংগল করতে সাহায্য করবে। এবার তোমরা চেষ্টা কর মানুষের হারট-রেট কনট্রোল করার কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারো কিনা।'

এদিনের এই ঘটনা দিল্লির বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র ইনডিয়ান একসপ্রেসে 'তিন কলম' ছবি সহ প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। তাতে এই দুই কিশোরীর ভূয়সী প্রশংসাও করা হয়েছিল। (ইনডিয়ান একসপ্রেস, ১১ নভেমবর ১৯৭৪)

প্রধানমন্ত্রীর এ উপদেশ ইন্দ্রাণী এবং মালিনী কেউই ভুলতে পারেনি। দাদা রাঘবের উদ্যোগে গড়া নিজেদের বাড়ির ওয়ারকশপে বুঁদ হয়ে থেকেছে ওরা দিনের পর দিন। পরামর্শ নিয়েছে দাদা এবং বাবার কাছ থেকেও। ইন্দ্রাণীদের বাবা রণব্রত মুখারজি মেকানিক্যাল কর্মী ছিলেন। তার উৎসাহ ছিল এ ধরনের নতুন নতুন যন্ত্র সৃষ্টি করার দিকে। ইন্দ্রাণীর বিয়ের মাত্র বছর খানেক আগে অবশ্য তিনি মারা যান। যাই হোক, এরপর বেশ কিছুদিনের প্রচেষ্টায় ইন্দ্রাণী এবং মালিনী সত্যি সত্যি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে। যন্ত্রটির নাম দেয়–'কারডিয়াক রেসিসিটেটর। ১৯৭৫ সালে কলকাতার বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল টেকনলজিক্যাল মিউজিয়ামে সেটি প্রদর্শিত হয়।

রাজ্যপাল ডায়াস এসেছিলেন এই প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করতে। যথারীতি ডায়াস খুশি হয়েছিলেন দুই কিশোরীর এই নবতম আবিষ্কার দেখে। বলেছিলেন- আশা করি তোমরা আরও বড় হবে।

এই একই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন কংগ্রেস (ই) নেতা সুব্রত মুখারজিও। তিনিও চমৎকৃত হয়েছিলেন ক্ষুদে দুই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের অভিনবত্বে।

ইন্দ্রাণীর এই বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম এখানেই থেমে থাকেনি। বোন মালিনী এবং দাদা রাঘবের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন যন্ত্র–ওপেন সীসম বকস, সেলফ সিগন্যালিং লেটার বকস, সেলফ সিগন্যালিং ফায়ার এলারম, রেলওয়ে অ্যাকসিডেনটাল কনট্রোল সিসটেম, ইলেকট্রনিক স্টেথিসকোপ প্রভৃতি।

ইন্দ্রাণীর শিল্পীসত্তা শুধু বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্তৃত হয়েছিল ছন্দময় 'নৃত্য-শিল্পেও'। সেই অর্থে নাচের তালিম না নিলেও তার নাচ প্রকৃতই শিল্পের পর্যায়ভুক্ত ছিল– এ অভিমত প্রকাশ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের এই অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে বর্ষামংগল, ঋতুবিচিত্রা, শ্যামা, শাপমোচন প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে ইন্দ্রাণীর বিভিন্ন ভূমিকার সাফল্যে। নাচ ছাড়া অভিনয়তেও কম পারদর্শিনী ছিল না ইন্দ্রাণী। মালিনী, মুকুট প্রভৃতি নাটকেও অংশ গ্রহণ করেছিল।

অন্য নাটক

আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, রাজ্যপাল ডায়াস, সুব্রত মুখারজি প্রমুখ ব্যক্তিরা ইন্দ্রাণী সম্পর্কে যতটা আশাবাদী ছিলেন ইন্দ্রাণী কিন্তু ততটা পূরণ করতে পারেনি। কলেজের শেষ ধাপ পার হবার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে বাবা রণব্রত মুখারজিকে হারিয়েছিল। সংসারের বোঝা দু' বছরের বড় দাদা রাঘবের কাঁধে চেপেছিল পর্বতের আকার নিয়ে। সুতরাং সেই মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম চালাবার মত আর্থিক সংগতি ওরা করে উঠতে পারেনি। সাময়িক বন্ধ রাখতে হয়েছিল ওদের নিজে হাতে গড়া ওয়ারকশপ এবং গবেষণা।

সংসারের বোঝাটা যখন রাঘব সবে সামাল দিয়ে উঠছে ঠিক তখনই সংবাদপত্রে পাত্রী-চাই বিজ্ঞাপনে চোখ পড়েছিল ওর। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই সেদিনকার ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক তথা শিল্পী 'জীবন শিল্পের' প্রবেশপত্র সংগে নিয়ে যাত্রা করেছিল শ্বশুড়বাড়ির উদ্দেশ্যে। আর তার ঠিক ১ বছর ৯ মাস ১২ দিন পরই তার মৃতদেহ পাওয়া গেল রেল লাইনের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই তাই গোয়েন্দা দপ্তরের সামনে একটাই প্রশ্ন- হত্যা না আত্মহত্যা?

ইন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা করেছে। সুপ্রিয়র দেওয়া বিবৃতি থেকে মনে হতে পারে সুপ্রিয়র সংগে ইন্দ্রাণীর কথা কাটাকাটির পরিণতিতেই ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা করেছে। বস্তুত ব্যানারজি পরিবার সেরকমই দাবি করছেন। অপর দিকে ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির তরফ থেকে খুনের অভিযোগ তুলে এফ আই আর করা হয়েছিল পাঁচজনের বিরুদ্ধে। সেই অনুযায়ী সুপ্রিয় সহ ওদের পরিবারের পাঁচ জনই এখনও পর্যন্ত হাজতে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলা হল কেন?

ইতোমধ্যে গোয়েন্দা দপ্তরের

রাজ্যপাল ডায়াসের সঙ্গে

নৃত্যনাট্যে ইন্দ্রাণী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইন্দ্রাণী

কাছে যে সমস্ত সূত্র এসেছে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন গোয়েন্দা দপ্তরেরই এক মুখপাত্র।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে-১৭ মে অর্থাৎ ইন্দ্রাণী নিখোঁজ হবার দিন বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ বেহালা অঞ্চল থেকে এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন সুপ্রিয়দের বাড়ি। সুপ্রিয়র ভাই সুজিতের বিয়ের ব্যাপারেও সম্প্রতি কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। এই বিজ্ঞাপনের ডাকে যথারীতি বেহালার এই ভদ্রলোক সাড়া দিয়েছিলেন। সেই হিসেবেই সুপ্রিয়র বাবা পাঁচুগোপালবাবু ওকে আসতে লিখেছিলেন।

এই ভদ্রলোক ও বাড়িতে আধ ঘণ্টার মত ছিলেন. তার ফাঁকে পাঁচুবাবু ছাড়া আর একজন মাত্র মহিলাকে চোখে পড়ে। সে অন্তত ইন্দ্রাণী নয় বলেই তাঁর বিশ্বাস।

ইন্দ্রাণীর মৃত্যুর পর ইন্দ্রাণীর ছবি দেখেই তার এই বিশ্বাস জন্মেছে। তাছাড়াও এ ভদ্রলোক ইন্দ্রাণীকে আগে থাকতেই চিনতেন। কারণ ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির কাছাকাছিই এ ভদ্রলোকের বাড়ি। ছোটবেলা থেকে ইন্দ্রাণীকে চিনতেন। কিন্তু জানতেন না যে ইন্দ্রাণীর শ্বশুর বাড়িতে তিনি নিজের মেয়ের সম্বন্ধ দেখতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাঁচুগোপালবাবু কিন্তু একবারও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেননি যে বেহালার ওই একই পাড়ায় তার বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ি।

এদিকে স্থানীয় লোকেদের সূত্রে আরও জানা যায় সুজিতের নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ১৯ মে তারিখে আশীর্বাদ ছিল। স্থানীয় কয়েকজন প্রতিবেশী গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে জানিয়েছেন-যার সংগে সুজিতের বিয়ের আশীর্বাদ ঠিক হয়েছিল সে স্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

গোয়েন্দা দপ্তর এখন ভেবে দেখছেন বিয়ের আশীর্বাদ ঠিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেহালার ওই ভদ্রলোককে ডাকা হয়েছিল কেন কেনই বা তার কাছে চেপে গেলেন বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ির কথা। আর সে সময় বাড়ির অন্য কারুর সংগে পাচুবাবু কেন পরিচয় করালেন না তবে কি ইন্দ্রাণী বা আর কেউ সে সময় বাড়িতে ছিলেন না।

গোয়েন্দা দপ্তরের মনে সন্দেহ বাসা বেঁধেছে আর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা করতে অত দূর যাবে কেন। বাড়ির কাছাকাছি যথেষ্ট নির্জন রেল লাইন ছিল। বিশেষ করে যে জায়গায় ইন্দ্রাণীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সে জায়গায় অত রাতে যাওয়া কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেতে হলে রেল লাইনের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। যেহেতু রেল লাইনের পাশে পায়ে চলার মত কোন পথ নেই। তাছাড়া ওই দিকটা ইন্দ্রাণীর কাছে একেবারেই অপরিচিত।

তাছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। ইন্দ্রাণীর মৃতদেহের সংগে কোন চটি পাওয়া যায়নি। সুপ্রিয় অবশ্য বলেছেন চটি না পরেই ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গিয়েছিল। রাগের মাথায় চটি না পড়ে বেরিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু সেখানেও একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে গোয়েন্দা পুলিশের মনে। ওইদিনে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। ঝড়বৃষ্টি এবং জলকাদার মধ্যে দিয়ে চার কিলোমিটার পথ হেঁটে গেলে পায়ে কিছু জল কাদার দাগ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওর পা ছিল ধুলোবালিহীন এবং অক্ষত। রেল লাইনের খোয়ার ওপর দিয়ে অন্তত দেড় কিলোমিটার হেঁটে গেলে তবেই স্পটটিতে পৌঁছন যায়। খালি পায়ে হাঁটতে অনভ্যস্ত ইন্দ্রাণী ও পথটা হাঁটলে পা কিছুটা ক্ষতবিক্ষত বা ছড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু সে রকম কোন চিহ্নই ওর পায়ে পাওয়া যায়নি।

ইতোমধ্যে অন্ধকার জগতের সোর্স থেকে কিছু মারাত্মক সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। সে সূত্রের খবর গোয়েন্দা দপ্তরকেও জানানো হয়েছে।

অন্ধকার জগতের খবর ঘটনার দিন ইন্দ্রাণীকে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি একটি গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের কাছে ও বাড়িটি দুষ্কৃতকারীদের আড্ডাস্থল বলেই পরিচিত। ওই এলাকার দুই নামকরা মস্তান তখন ওখানে উপস্থিত। এ দু'জন মস্তান এককালে নকশাল নাম ভাঙিয়ে কিছু খুনখারাপি করেছে বলেও সেই সূত্র জানিয়েছে। সেই সূত্রের আরও খবর - ওই দু'জনই ইন্দ্রাণীকে খুন করে থাকতে পারে।

গোয়েন্দা দপ্তর এ খবর পেয়েছেন। তারা ও দু'জনকে বর্তমানে খুঁজছেন। অন্ধকার জগৎ থেকে পাওয়া খবরটিকে ভালমত যাচাই করে দেখছেন অন্ধকার জগৎ থেকে পাওয়া এ খবরটার সত্যতা সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তর কিছুটা আশাবাদী। কারণ ইন্দ্রাণীর পরনে যে শাড়িটি ছিল তা যথেষ্ট ভিজে ছিল না। ওইদিন রাত প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল। মৃতদেহটি যখন আবিষ্কৃত হয় তার মিনিট দশেক আগে বৃষ্টির ধারা কমেছিল। সেই মুহূর্তে সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকেরা এবং ১৬ নম্বর গেটের গেটম্যান।

বলা বাহুল্য বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছন সম্ভব নয়। সুতরাং ইন্দ্রাণীকে ভরাবৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। আর তাতে শাড়ি ভিজে গায়ে সেঁটে থাকার কথা। কিন্তু গায়ের জামা কাপড় সেই পরিমাণ ভিজে না থাকায় পুলিশ ধারণা করছেন যে বৃষ্টিটা কমার পরেই ইন্দ্রাণী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? সুতরাং গোয়েন্দা পুলিশের ধারণা-হয় ইন্দ্রাণী বৃষ্টি নামার অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে অথবা তাকে গাড়ি করে আনা হয়েছে।

তবে ব্যানারজি বাড়ির ঠিকে ঝি কানন আমার কাছে বলেছে বিকেল পৌনে ছটা নাগাদ ও ইন্দ্রাণীকে নিচের তলায় মশারী টাঙাতে দেখেছে।

কাননের এ কথা যদি সত্যি হয় তবে ধরে নেওয়া যায় অন্তত ছটা পর্যন্ত ইন্দ্রাণী বেঁচে ছিল। এদিকে রাত সাড়ে আটটার সামান্য পরে মৃতদেহ দেখতে পায় একজন। সুতরাং যা কিছু ঘটনা এর মধ্যেই ঘটেছে।

এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ময়নাতদন্তের রিপোরটটি পুলিশের হাতে এসেছে। ভিসেরা রিপোরট আসেনি। ময়নাতদন্তের রিপোরটে বলা হয়েছে মৃত্যুর কারণ 'এনটিমরটেম'।

সুতরাং গোয়েন্দা দপ্তরের সামনে এখন একটাই দায়িত্ব যথাশীঘ্রি চারজশীট প্রস্তুত করা। এখন দেখা যায় গোয়েন্দা দপ্তরের জালে শেষ পর্যন্ত কী ওঠে। □

ওখানে ইন্দ্রাণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়

শ্বশুরবাড়ির কাজের লোক

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

জানতে চাই জানাতে চাই

জয়ন্ত কুমার সিকদার, ব্যারাকপুর : আমার ভুঁড়ি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আমি ভুঁড়ি কমাতে চাই। উপায় কী?

জনৈকা পাঠিকা, মেদিনীপুর : আমার বয়স ১৮। দেখতে সুন্দর। কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি বেশ মোটা হয়ে গিয়েছি। শুনেছি, রোগা হওয়ার ট্যাবলেট পাওয়া যায়। এই ট্যাবলেট খেলে ভবিষ্যতে যদি কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে দয়া করে ট্যাবলেটের নাম এবং কটা করে কতদিন খেতে হবে জানাবেন।

–আপনাদের দু'জনেরই সমস্যা শারীরিক স্থূলতা, যাকে আমরা Obesity বলি। Obesity-র প্রধান, কারণ দীর্ঘকাল ধরে শারীরিক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বেশি করে পান ও আহার। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রায় ৩,000 কিলোক্যালরি খাবারের প্রয়োজন। কেউ, ধরুন, ৩৫00 বা ৪000 করে খাচ্ছে। অনেকটা ফিকসড ডিপোজিট স্কিমের কায়দায়, এই অতিরিক্ত ৫00/১000 কিলো ক্যালরি আপনার শরীরের ব্যাংকে সঞ্চিত হতে হতে একদিন ভুঁড়ি বা গোলগাল থপথপে চেহারার আকারে বেরিয়ে আসে। এখন প্রশ্ন হল, কেন কেউ কেউ পরিমাণে বেশি খায়? কারুর বেলায়, এটি স্রেফ একটি অভ্যাস (বদভ্যাস নিঃসন্দেহে)। ভোজনবিলাসীরা খাবার আনন্দে খান। আবার, বিশ্বাস করবেন না, মনমেজাজ খারাপ থাকার জন্যও অনেকে বেশি বেশি করে খান। বলা হয়ে থাকে যে, তারা এভাবেই কোন মানসিক সমস্যা বা ঝামেলা থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার চেষ্টা করেন।

স্থূলতার জন্য রকমারি বিধানের কথা শুনে থাকবেন। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ওল গাইরিং নাইরেন একবার সিরিয়াসভাবেই বলেন, মোটা লোকরা তো পেটটি ভরা না থাকলে খুশি হয় না, ওদের পাকস্থলীতে একটা বড়সড় ফোলা বেলুন ঢুকিয়ে রাখা হোক তাহলে তারা ভরা-পেটের একটা অনুভূতি পাবে। এবং তার ফলে তারা কম খাবে। স্থূলতাও কমবে। যে যাই বিধান দিন, একটা ব্যাপারে সবাই একমত তা হল খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। আপনার পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এমন একটি Diet chart করুন, যাতে আপনার প্রাত্যহিক খাবার ৩000 কিলো ক্যালরির কম হয় (কতটা কম হবে, তা আপনার স্থূলতার ওপর নির্ভর করছে)। প্রথমে Diet থেকে কারবোহাইড্রেট (ভাত, রুটি, আলু, চিনি) পরিমাণে কমিয়ে দিন। দুটি 'মিল'-এর মধ্যবর্তী সময়ে কিছু খাবেন না। সপ্তাহে একদিন নিয়ম করে উপোস দিন। আর, এর সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম বা আসন করুন। কোন মানসিক সমস্যা বা ঝামেলা থাকলে সেটাও দূর করে ফেলুন।

হ্যাঁ, বাজারে রোগা হওয়ার ট্যাবলেট পাওয়া যায় বটে (প্যানডোরাকস ইত্যাদি), কিন্তু এই ট্যাবলেট সকলের ক্ষেত্রে সমান কার্যকর নয় এবং ক্ষণস্থায়ী। তদুপরি, এই ট্যাবলেট খাওয়ার নানা ঝামেলা রয়েছে। আপনার সবসময় ঘুম ঘুম পেতে পারে, পেটে ব্যথা অনুভব করতে পারেন, পেটের গোলমালও দেখা দিতে পারে। প্রচুর অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানেই কেবল এই ট্যাবলেট খাওয়া চলতে পারে। তা-ও অল্প সময়ের জন্য।

গোপীনাথ মুর্মু, হুগলী : আমার ভাই (১৬ বছরের) গত একবছর যাবৎ রাতে এত কাশে যে তার পাশে শোওয়া যায় না। বর্ধমানের এক ডাক্তারবাবুর পরামর্শে একস-রে করিয়েছিলাম। উনি বলছেন, টি বি হয়েছে। কোন ভাল টি বি হাসপাতালে খবর দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

–টি বি হাসপাতাল এই রাজ্যে অনেকগুলিই আছে–যাদবপুর, কাঁচরাপাড়া, কালিম্পং ইত্যাদি স্থানে। এ-ছাড়া, সব বড় বড় হাসপাতালেই Chest Dept রয়েছে, যেখানে টি বি রোগী রাখা হয়। কিন্তু, কাগজে দেখে থাকবেন–এবং ঘটনা হল–এই হাসপাতালগুলি নানা সমস্যার ভারে এতটাই বিপর্যস্ত যে রোগীরা সাধারণ হাসপাতালগুলির চেয়েও কম যত্ন পান। গোপীনাথবাবু, আপনার ভাইকে কোন টি বি হাসপাতালে না দিয়েই চিকিৎসা করাতে পারেন। টি বি এখন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। যে-কোন বড় হাসপাতালের Chest Dept-এ ভাইকে একবার দেখিয়ে নিন। ওখানকার ডাক্তারের পরামর্শ মত চলুন। ওষুধও হাসপাতাল থেকে পেয়ে যাবেন। আমাদের হাসপাতালগুলিতে আর কোন রোগের ওষুধ না মিললেও টি বি রোগের ওষুধ পাওয়া যায়।

উত্তর দিয়েছেন :
ডাঃ মৃণাল বসু

আই আই টি এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজিতে ভর্তি হতে গেলে :

বোমবাই, দিল্লি, কানপুর খড়গপুর, মাদ্রাজ–এই পাঁচটি স্থানে অবস্থিত ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তির জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষে সারা ভারতে অনেকগুলি কেন্দ্রে একটি জয়েনট এনট্রানস পরীক্ষা নেওয়া হয়।

অনেকেই এইসব পরীক্ষায় বসতে চান। তাদের প্রস্তুতির জন্য সময় দরকার। তাই জানিয়ে রাখি এই JEE পরীক্ষায় ফিজিকস, কেমিসট্রি, ম্যাথমেটিকস এবং ইংরাজি এই বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রতিটিতে একটি করে তিন ঘণ্টার চারটি প্রশ্নপত্র সম্বলিত এই পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবেই ভর্তির জন্য বিবেচিত হতে পারবে।

শিক্ষাগত মান কী থাকা আবশ্যক :

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর গণিত নিয়ে ১0+২ শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত পরীক্ষায় বা তার সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যে সব প্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন এবং ফলাফলের অপেক্ষা করছেন তারাও শর্ত সাপেক্ষে ভর্তির জন্য বিবেচিত হতে ইচ্ছুক হলে JEE-তে বসতে পারেন।

বিশদ বিবরণ পাবেন এঁর কাছে :

অরগানাইজিং চেয়ারম্যান,
অ্যাডমিশন কমিটি,
ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজি,
বোমবাই–৪000৭৬

সংরক্ষণ :

তঃ জাতি ও তঃ উপজাতিদের জন্য প্রত্যেক ইনসটিটিউটে যথাক্রমে ১৫% ও ৫% আসন থাকে। যুদ্ধে নিহত বা চিরতরে পঙ্গু বা অক্ষম প্রতিরক্ষা, প্যারামিলিটারি বাহিনীর কর্মীর সন্তানদের জন্য প্রত্যেক ইনসটিটিউটে ২টি আসন রাখা থাকে।

বিশেষ কথা :

এই সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদেরও JEE পরীক্ষায় অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে উপযুক্ততার (Eligibility) স্ট্যানডারড বা মান শিথিল করা হয়েছে।

সরাসরি ভর্তিও কিছু হবে :

বিদেশে বসবাস করছেন এমন ভারতীয় নাগরিক, বিদেশি নাগরিক ও ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থীরা যদি নির্ধারিত যোগ্যতার মান পূরণ করতে পারেন তাহলে সরাসরি ভর্তি হতে পারবেন।

জয়েনট এনট্রানসের ফরম ও তথ্যপুস্তিকা :

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বেরোলে ৫ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা পোসটাল অরডার দিলে আই আই টি খড়গপুর থেকে ব্যক্তিগতভাবে ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। নিজে যেতে না পারলে ডাকযোগেও আনিয়ে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে খামের উপরে বাঁদিকে ঘেঁষে লেখুন JEE Application Form : 1983. এরপর ডাকটিকিট ছাড়া ৩0 সেমি x ১৩ সেমি মাপের খামে পরিষ্কারভাবে নিজের নাম, পুরো ঠিকানা লিখে ফেলুন। সবশেষে আই আই টি খড়গপুরকে প্রদেয় ৫ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা পোসটাল অরডার পাঠাতে হবে। যদি ব্যাঙ্ক ড্রাফট হয় তাহলে সেটি Payable হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া আই আই টি খড়গপুর ব্রাঞ্চ-এ। আর পোসটাল অরডারের ক্ষেত্রে Payable at-এর স্থানে লিখুন: P.O. Kharagpur—712302. ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা পোসটাল অরডার আর খামের সঙ্গে একটি অনুরোধপত্র, যাতে থাকবে দরখাস্ত ফরম ও তথ্যপুস্তিকা (Information Brochure) আপনাকে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ নিচের ঠিকানায় পাঠান :

Chairman,
Admission Committee,
Indian Institute of Technology,
Kharagpur—721302

সূর্যসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবাসী অন্য আব্বাকে ছেড়ে নিজের আব্বার কাছে ফিরল

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

প্রায় এগার মাস পরে নিবাসী ফিরে এল। ফিরে এল বললে একটু ভুল বলা হবে। ফিরিয়ে আনা হল। নিবাসী তার বাবা মায়ের কাছে ফিরেছে সংবাদ পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম খোঁজ খবর নিতে, দেখা করতে।

নাকাশীপাড়া থানার মোটা বড়গাছি গ্রামের বাসিন্দা মনিরুদ্দিন মণ্ডল। স্ত্রী আসিমা বিবি আর চার মেয়ে ও দুই ছেলে নিয়ে তাঁর সংসার। খুবই গরিব, তার ওপর মনিরুদ্দিনের দুটি পা-ই নেই। খুবই অভাবের সংসার। বাড়িতে বসে মনিরুদ্দিন বিড়ি বেঁধে কোন রকমে দিন চালান। বড় মেয়ের কোনরকমে বিয়ে দিয়েছেন।

নিবাসী খাতুন (১৮) বাবার জন্য বিড়ির পাতা ও মশলা নিতে বেথুয়াডহরীতে এসেছিল গত বৈশাখ মাসে। হঠাৎ কয়েকজন অপরিচিতা মহিলা নিবাসীকে তার আত্মীয়র বাড়ি জমপুকুরে যাবার কথা বলে একরকম জোর করেই নিবাসীকে বাসে তোলে। নিবাসী নিজের গ্রাম আর বেথুয়াডহরীর কয়েকটি বিড়ির মশলার দোকান ছাড়া আর কিছুই চেনেনা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিবাসী তাদের সংগে যেতে বাধ্য হয়। বাস পালটিয়ে ট্রেনে, পরে আবার বাসে গিয়ে এক জায়গায় নেমে গিয়ে হেঁটে যায় মহিলাদের সংগে। তারপর একে একে কোথায় চলে যায় তারা, আর খুঁজে পায়না নিবাসী। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, কাউকে জানেনা, চেনেনা দুতিনদিন খাওয়া দাওয়া নেই। নিরুপায়, অসহায় নিবাসী একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে সুরু করে।

হঠাৎ এক পথচলতি বয়স্ক ভদ্রলোক গাছতলায় অল্পবয়সী একটি মেয়েকে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর নিবাসীকে একের পর এক প্রশ্ন করে করে সব ব্যাপারটা জেনে নিয়ে বললেন, চল মা আমার বাড়িতে। কোন অসুবিধা হবে না। আমার চার মেয়ের সংগে তুমিও নিজের মেয়ের মত থাকবে। নিবাসী কি আর করবে সেই ভদ্রলোকের সংগে তাঁর বাড়িতে যায়। নিবাসীর কাছেই জানতে পারলাম ভদ্রলোকের নাম সাজ্জাত মোল্লা, ডাক নাম সাদা মাসটার। তিনি মাসটারি করেন। 'তাঁর আদর যত্ন কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার আব্বা আর আম্মাকে ছেড়ে মনটা খুবই খারাপ লাগছিল। মাঝে মাঝে কাঁদতাম। সাদা মাসটার আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, কাঁদিস না মা। আমিও তোর আব্বার মত মনে করনা। সত্যি খুব আদর যত্নে ছিলাম। জামা কাপড় দিয়েছে, খাওয়ারও কোন অসুবিধা ছিল না। যে জামাকাপড় পড়ে আছি তাও সেই আব্বাই দিয়েছে।' তারপর সেই সাদা মাসটার মশায়ের নাম ঠিকানা বললে নিবাসী। সাজ্জাৎ মোল্লা, গ্রাম ইমাম নগর, পোঃ আলিনগর, জেলা রাজসাহী। থানা গমস্তাপুর আর মহকুমা নবাবগঞ্জ। বলে নিবাসী কাঁদতে আরম্ভ করল।

সাদা মাসটার অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন বাবা মাকে ছেড়ে থাকায় নিবাসী মাঝে মাঝে কাঁদত। তাই সাজ্জাৎ মোল্লা নদীয়া জেলাশাসককে চিঠি লেখেন। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অনুরোধ করেন, আপনার দেশের মেয়েকে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন। তারপর জেলাশাসক চিঠি লিখতে সুরু করেন। দুই দেশে প্রচুর চিঠি লেখালেখির পর নিবাসীকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়। শেষপর্যন্ত গত ৯ মারচ রাজশাহী মালদহ মেহেদীপুর সীমান্তে হাজির হয় নিবাসী। সংগে ইমামনগরের সাদা মাসটার সাজ্জাৎ মোল্লা। নদীয়ার জেলাশাসকের পক্ষে একজন ডেপুটি ম্যাজিসট্রেটের সংগে নিবাসীর আব্বা মনিরুদ্দিন। সকলের চোখেই জল। মনিরুদ্দিন বহুদিন পর তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। নিবাসীও তার আব্বাকে পেয়ে কাঁদতে লাগল। নিবাসীর ইমামনগরের আব্বার দুচোখেও জল। সে এক করুণ দৃশ্য। নিবাসী যখন নিজের দেশে ফিরছে তখন সাজ্জাৎ মোল্লা জলভরা চোখে বললেন, "আমার পাঁচ মেয়ের একমেয়েকে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন। যেন কোন কষ্ট না হয়। কোন অসুবিধা হলে আমায় খবর দিও মা।"

তারপর নিবাসী তার আব্বার সংগে নিজের গ্রাম বড়গাছি রওনা হল। তাদের যাওয়ার পথের দিকে জলভরা চোখে সাজ্জাৎ মোল্লা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানালেন, আল্লা নিবাসীর ভাল কর।

নিবাসী কাঁদতে কাঁদতে বারবার আমায় বলছিল—সাজ্জাৎ মোল্লার কথা। নিজের আব্বার মত ভালবাসত। খুব আদর যত্নে ছিলাম। নিবাসীর আব্বা মনিরুদ্দিন আমায় অনুরোধ জানাল—মেয়েটার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিন, আমি অক্ষম, দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দেন। নিবাসী যখন সমস্ত ঘটনা আমায় বলছিল তখন মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। চোখের জল মুছে আবার শুরু করছিল কথা। ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম তার আব্বার আকুল প্রার্থনা, মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন।

পরিবর্তন যে[illegible] সুপরিম ক[illegible]

নয়া দিললি থেকে তরুণ প্রকাশ গংগোপাধ্যায়

পরিবর্তনে প্রকাশিত একটি রিপোরটকে কেন্দ্র করে গত প্রায় নয় মাস মামলা চলার পর সুপরিম কোরটের নির্দেশে পশ্চিমবংগের ৫ জন যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আদিবাসী মুক্তি পেলেন। সুপরিম কোরটের নির্দেশে, আরও ৯ জনকে দু মাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছেন। পশ্চিমবংগের কোন কারাগারে যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী ১৪ বছরের বেশি মেয়াদ খাটছে কিনা সুপরিম কোরট রাজ্যসরকারকে তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুপরিম কোরটের নির্দেশ : রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে ২৫ জুলাইর মধ্যে রিপোরট পেশ করতে হবে পরিবর্তনের ১৪ জুলাই ১৯৮২ সংখ্যায় মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আদিসাবীদের দুর্দশায় বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ২৪ জুলাই (১৯৮২) সাঁওতাল কবি মহাদেব [illegible] পরিবর্তনে প্রকাশিত [illegible] দারের এই [illegible]

অন্ধের হস্তীদর্শন

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

...াদিবাসী বন্দীদের কথা লিখেছিল ...টের নির্দেশে তাঁরা মুক্তি পাচ্ছেন

সহ সুপরিম কোরটের বিচারপতি পি এন ভাগবতীকে চিঠি দেন। মেদিনীপুরের অ্যাডভোকেট জয়রাম মান্ডি এবং কলকাতার অ্যাডভোকেট বি শাসমলও পরিবর্তনের প্রকাশিত প্রতিবেদনের কপি সহ বিচারপতি পি এস ভাগবতীকে চিঠি দেন। তাঁরা এ-ও অনুরোধ করেন যে, তাঁদের এই চিঠিকে যেন রিট আবেদন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই তিন আবেদনকারীই বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে জানান যে, মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে ২৪ জন আদিবাসীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তাদের অন্যায় ভাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে রাখা হয়েছে।

৮ আগসট ১৯৮২ সুপরিম কোরট এই চিঠিগুলিকে রিট আবেদন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল সুপারিনটেনডেনট ও জেলা শাসককে এই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আদিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাবার নির্দেশ দেন। সুপরিম কোরট আদিবাসী বন্দীদের প্রতিনিধি এবং আদালতের সহায়ক হিসেবে [illegible] আইনজীবী গোবিন্দ মুখো- [illegible]

২ মারচ ১৯৮৩-তে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুপরিম কোরটের কাছে প্রথম হলফনামা এল। পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষে হলফনামা দিলেন মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেনট (প্রিজনস) এ গাংগুলি, হলফনামায় শ্রী গাংগুলি জানালেন, সুপরিম কোরটের কাছে বন্দীদের বিষয়ে যে রিট আবেদন করা হয়েছে তার সব সত্য নয়। এই বন্দীরা ৩০২ ধার অনুযায়ী খুনের কেসের আসামী এবং যাবজ্জীবন করাদণ্ডে দণ্ডিত। সুতরাং সেকশন ৪৩৩ (এ) অনুযায়ী এদেরকে ১৪ বছর মেয়াদ খাটতে হবে। এই কয়েদীদের ১৪ বছর মেয়াদ পূরণ হয়নি।

হলফনামায় আরো বলা হল, রাজ্য সরকার ১৯৭৮ সালের ১৮ ডিসেমবর প্রণীত ৪৩৩ (এ) সেকসন অনুযায়ী বন্দীদের বিচারাধীন অবস্থার মেয়াদকে গণনা করবে না।

পশ্চিমবংগ সরকারের তরফে শ্রী গাংগুলি তাঁর হলফনামায় আরো জানালেন পশ্চিমবংগ জেল কোড ৫৯১-র (১) এবং (৪) ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর ১৪ বছর মেয়াদ পূরণ হবার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনাধীন। এই কোড অনুযায়ী আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনার পর বন্দীকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। যেমন: বন্দীর অপরাধ কী ধরনের, তাঁকে মুক্তি দিলে তা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হবে কিনা? ইত্যাদি অনেক বিষয় বিবেচ্য।

এছাড়া পশ্চিমবংগ জেল কোড (২৯) অনুযায়ী কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর জেল খাটার মেয়াদ ২০ বছরের বেশি হলে তাঁদের শেষ তিন বছরের জেল রিপোরট সন্তোষজনক কিনা শুধু মাত্র তা দেখে মুক্তির সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রীগাংগুলি জানালেন, মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলের ২৪ জন আদিবাসী বন্দীর ১৪ বছর মেয়াদ পূরণ হয়নি। সুতরাং তাঁদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

সুপরিম কোরটের সহায়ক এবং আদিবাসী বন্দীদের প্রতিনিধি গোবিন্দ মুখোটি রাজ্য সরকারের দেওয়া হলফনামার একটি মূল বিষয় ভুল বলে প্রমাণ করলেন। তিনি সুপরিম কোরটকে জানালেন, যেহেতু বন্দীদের দণ্ডাজ্ঞা ১৯৭৮-এর ১৮ ডিসেমবরের অনেক আগে, তাই সেকসন ৪৩৩ (এ) তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে না। কারণ সেকসন ৪৩৩(এ) বলবৎ হয়েছে ১৯৭৮-এর ১৮ ডিসেমবর আর বিতর্কিত বন্দীরা অনেকেই তার আগে থেকেই মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফেলেছে। এ অবস্থায় বিচারাধীন অবস্থার মেয়াদ ও জেল খাটার মেয়াদের সংগে গণনা করতে হবে।

গোবিন্দ মুখোটির বক্তব্য শোনার পর ৩ মারচ ১৯৮৩ সুপরিম কোরটের তিন বিচারপতি পি এন ভগবতী, বিচারপতি পাঠক ও বিচারপতি সেন জানালেন শ্রী মুখোটির বক্তব্যই ঠিক। এই বন্দীদের উপর সেকসন ৪৩৩ (এ) প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সেকসন ৪৩৩ (এ) কে অনুসরণ করা উচিত হয়নি। বন্দীদের বিচারাধীন অবস্থার মেয়াদকেও জেল খাটার মেয়াদ হিসেবে গণনা করতে হবে। তিন বিচারপতি নির্দেশ দিলেন যে, বন্দীদের সম্পর্কে রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নিলেন অবিলম্বে সুপরিম কোরটকে জানান এবং বন্দীদের জেলের মেয়াদ ঠিক কত বছর পূরণ হয়েছে তারও একটি তালিকা পেশ করুন।

রাজ্য সরকার এতদিন বলে এসেছিলেন যে, বন্দীদের মেয়াদ ১৪ বছর পূরণ হয়নি। কিন্তু ২৭ এপরিল ১৯৮৩ রাজ্যসরকারের তরফে শ্রী গাংগুলি সুপরিম কোরটের নির্দেশমত বন্দীদের জেল খাটার মেয়াদ সংক্রান্ত যে তালিকা প্রকাশ করলেন। বন্দীদের বিষয়ে পুরনো কাগজ পত্র ঘেঁটে তাঁরা জানতে পেরেছেন : ২৪ জন আদিবাসী বন্দীর ৫ জনের কারাদণ্ডের মেয়াদ ১৪ বছরের অনেক বেশি হয়ে গেছে। এই পাঁচ জনের কেউ ২২ বছর, কেউ ২৫ বছর জেল খেটেছেন। এছাড়া আরো ৯ জন বন্দীর কেউ ১৬ বছর ৪ মাস, কেউ বা ১৭ বছর ধরে জেল খাটছেন।

হফলনামায় শ্রী গাংগুলি আরো জানালেন, যে পাঁচজন আদিবাসী বন্দী ২২ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদ জেল খেটেছে সুপরিম কোরটের নির্দেশে রাজ্য সরকার ইতমধ্যেই তাদের মুক্তি দিয়েছে। ১৬ থেকে ১৭ বছর মেয়াদের জেল খাটা বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে। তবে এদের মুক্তির জন্য রাজ্য সরকার সুপরিম কোরটের কাছে আরো দু-মাস সময় চাইছে।

রাজ্য সরকারের হলফনামার উত্তরে সুপরিম কোরট পশ্চিমবংগের আর কোন জেলে এরূপ আর কোন বন্দী অন্যায়ভাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে আগামী ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোরট পেশ করতে হবে। □

আগে ভারতবাসী পরে মুসলমান

মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ গতিহীন

ধর্ম মুখ্যত ব্যক্তিগত ব্যাপার

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ ঃ সমসাময়িক জীবন ও ভাবনা

প্রতিটি ধর্মকথার মূল বাণী 'সবকিছুর মাঝামাঝি ভাল'। মধ্যবিত্ত মানুষদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। মাঝের তলার লোকদের সংগে নিচের তলার যেমন লেনদেন ভাব ভালবাসা থাকে তেমনি ওপরের তলারও।

যে সম্প্রদায় যত ক্ষমতাশালী তার মধ্যবিত্তরা তত পরিপুষ্ট—শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান-গুণ, অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন এসব ব্যাপার নিয়েই।

পশ্চিমবাংলায় প্রায় এক কোটি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা মাঝের তলাটা প্রায় নেই বললেই হয়—স্বাধীনতার তিন দশক পেরিয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে সেটা গজাচ্ছে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক তার খানিকটা পুষ্ট হলেও সাহিত্য সাংস্কৃতিকটা বড় পংগু। যতটুকুও বা জন্ম নেয় তাকে স্ব-ভাবের মধ্যে বাঁচিয়ে তোলার স্বাধীন ক্ষেত্র নেই। তাই তাঁরা অভিমানক্ষুব্ধ। দায়ভাগটা চাপাতে চায় অন্যদের ঘাড়ে।

অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে লীগের আমলে গোটা বাংলায় বিশেষ করে নাগরিক সভ্যতায় বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল বেশ ক্ষমতাশালী। ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দির যুগ সেটা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবংগের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মুসলমানরা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেলেন।

স্বাধীনতার তিন দশক পরের চিত্র কিছু আশাপ্রদ হয়ে উঠছে। বড় বড় ব্যবসায় বাঙালি মুসলমানদের দেখতে না পাওয়া গেলেও ছোট ছোট ব্যবসায় আজ তাঁরা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছেন। চাকরির ক্ষেত্রে তাঁদের শতকরা কোন রকম হার নেই বলে বাধ্য হয়ে জীবিকার দায়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ে নামতে বাধ্য হচ্ছেন।

তবে তিন-দশকে সংখ্যালঘু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আদৌ অগ্রগতি হয়নি এমন বলব না। আনুপাতিক হার নগণ্য হলেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছেন।

এইসব নবোদিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি আমরা। তাঁদের ধ্যান ধারণার কথা দেওয়া হল।

নূরুল আলম

হুগলি জেলার খানাকুল থানার সাবলসিংহপুর গ্রামে আদি নিবাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ, এল এল বি, ডিপ্লোমা ইন জারনালিজম পাশ করেছেন। চাকুরি - আকাশবাণী ভবন কলকাতার ফিলড রিপোরটার। কুষ্টিয়া সরকারি আবাসনে থাকেন। বিবাহ—১৯৭২ সালে। স্ত্রী- দিলদার বেগম বি এ (অনারস) বি টি। শিক্ষিকা- আদি বালীগঞ্জ বিদ্যালয়। একটি মাত্র কন্যা, দারাখ্শা বেগম। ৯ বছর বয়স। প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী।

কলকাতা রেডিও অফিসের দোতলায় উঠে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ঘরে ঢুকে প্রথম চেয়ারটিতেই যে মানুষটির সাক্ষাৎ পেলাম ইনিই নূরুল আলম সাহেব। মাঝে মাঝে প্রায়ই রেডিওতে গলা শোনা যায়। পরিবার পরিকল্পনা, সমাজের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সাফাই করণ, গ্রামাঞ্চলের জনকল্যাণকর নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে নূরুল সাহেবকে বেতারে কণ্ঠ দান করতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু মানুষের সংগে সম্পর্ক ও পরিচয় হয়েছে তাঁর।

বললাম, স্বধর্মের লোকদের নিয়ে আপনার ভাবনাচিন্তার কথা যদি একটু বলেন।

সব মানুষকে একভাবে দেখি। .... ধর্ম আর মানুষ দুটো এক ব্যাপার নয়। সবস্তরের লোক সম্পর্কেই ভাবি। পারলে কিছু করি। অবশ্য নিজের চৌহদ্দির মধ্যে।

ধর্ম সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কিছু শুনতে চাই।

নূরুল ইসলাম সাহেব বললেন, ধর্ম মুখ্যত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আজকাল ধর্মকে সামনে রেখে অনেক অপ্রিয় ঘটনা ঘটান হচ্ছে। এটা খারাপ লাগে। ধর্ম নিয়ে বিতর্ক যত বাড়ছে মানুষ ততই বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এটার পরিণতি ভাল হবে কিনা তা নিয়ে ভাবনা মাথায় আসে। মনে হয়, এ দিকটা নিয়ে মানুষ ভাবছে কিনা।

রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে বলবেন কিছু?

নুরুল আলম

চাকরিজীবী হিসেবে রাজনীতির বাইরে থাকি। থাকতেই হয়। তবে 'সমাজতন্ত্র' হলে দেশের ভাল হবে এটা বিশ্বাস করি।

ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন ?

ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়েব প্রয়োজন সবাই বোঝেন। স্বীকার করেন। তবু দ্বিধা সংকোচ আছে। ভয় আছে। লজ্জা আছে। পর্দানশীনবা সুযোগ নিতে আসছে কম। কিন্তু শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্তদের পবিবাবগুলো প্রায় সবই সীমিত। ছোট পবিবাব তাদেব রুচি-সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।

সরকারি চাকবিব ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বা তপশীলিদের সুযোগ সুবিধা প্রসংগে নূরুল আলম সাহেবেব বক্তব্য :

তপশীলবা আইনেব আওতায় সুযোগ পায়। অনাদের শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন কবতে হবে। সংরক্ষণ ছাড়াও সুযোগ হতে পাবে। চাকবি দেওযাব জন্য পাবলিক সাবভিস কমিশন, ব্যাংকিং সাবভিস কমিশন, বেল সাবভিস কমশন প্রভৃতিতে- প্রতি যোগিতায বহু ছেলে সফল হচ্ছেন যোগ্যতাব জোবেই।

মধ্যবিত্ত মানসিকতাব প্রশ্নে নূরুল আলম সাহেব বলেন :

পেশাগত কাবণে কোন মানসিকতা গড়ে ওঠে বলে মনে হয না।

উচ্চবিত্ত হতে চান কিনা ?

অর্থসংগতি ভাল হোক এটা সবার মত আমবাও চাই।

আপনার মতে আদর্শ পুরুষ কে ?

নাম বললে অনেকে বাদ পড়ে যাবার ভযে বলব না।

গ্রামের সংগে যোগাযোগ আছে তো ?

মাঝে মাঝে যাই। সেখানে মা আছেন। আত্মীয়রা আছেন। নানান সেবাকাজে যুক্ত। তাছাড়া গ্রামের সবুজ সজীবতা এমনিতেই টানে। আমাদের গ্রামটাকে গড়তে চেষ্টা করছি।

বিজ্ঞান ভাবনা :

বিজ্ঞান না হলে সমাজ এগোবে না।

নূরুল আলম সাহেব আধুনিকতার পক্ষপাতী। বাড়িঘর। বিছানা পোশাক সর্বত্র আধুনিকতার ছাপ। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, গ্রামীণ প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঘরে সোফা কাম বেড, ড্রেসিং টেবিল, বইভরা আলমারি। কাজের চাপে কিছুটা আগোছালো।

সাহিত্য সংস্কৃতি :

অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। গান লেখারও ঝোঁক আছে। আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার। কবিতাও লিখি মাঝে মধ্যে। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করতে ভাল লাগে।

সাবলসিংহপুরের বা খানাকুল থানার লোকরা আর কেউ কি আপনার মত কলকাতায় এসে রুজি- রোজগার করছেন ?

হ্যাঁ ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে কাজ করে, ছোটখাটো কারখানাও আছে।

শিক্ষার হাব আপনাদেব ওদিকের মুসলমানদের মধ্যে বাড়ছে কি ?

বাড়ছে। বোধহয় পঁচিশ বছর পবে মূর্খ লোক খুঁজে বাব করতে বেগ পেতে হবে।

আব কি 'হবি' আছে ?

আকাশবাণী ও দূবদর্শন কর্মচারী ও শিল্পীদের সমন্বয কমিটির মুখপত্র 'অভিকন'-এর সম্পাদক। এবং আকাশবণী শিল্পী কর্মী সংঘের সম্পাদক।

ডাঃ জাহাংগীর হোসেন

জন্ম : ২৮ কার্তিক ১৩৫৯। জন্মস্থান মুরশিদাবাদ জেলাব বেলডাংগা থানার ঘোল্লা গ্রামে। শিক্ষা: কুমার মহিমচন্দ্র বিদ্যাপীঠে উচ্চ মাধ্যমিক। কলেজ : হাওড়া নবসিংহ দত্ত কলেজ ও বংগবাসী কলেজ--বি এস সি (বাযো)। প্রতাপ চন্দ্র হোমিওপ্যাথিক কলেজের ডি এম এস। এক সময ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

প্রশ্ন কবলাম : আপনারা পাবিবারিক দিক থেকে তো মধ্যবিত্ত ?

তা বলতে পাবেন। আমাদেব পরিবাবে মোট ১৮ জন লোক। ঝি চাকর নিয়ে ২১ জন। জমি প্রায ৬০/৭০ বিঘে। চাষ আবাদ করলে ক্ষেতে সব রকম ফসল হয়। আমরা প্রায় নুন ছাড়া কিছুই কিনি না।

গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ কিছু করেছেন ?

হাই মাদ্রাসা, গ্রামীণ গ্রন্থাগাব, কৃষি সমবায় সমিতি গঠন কবার ব্যাপাবে সব রকম সহযোগিতা করেছি। এখনও নানা বকম কাজে জড়িয়ে আছি।

চাকরি কবেন না তো ?

কিছুদিন করেছিলাম। নবাবের দেশে বাড়ি, মেজাজ আছে, কারো হুকুম তামিল করতে পারি না, বিশেষ করে গোলামী আমার বড় না পসন্দ।

চলে কি করে ?

লোকদলের আমি পশ্চিমবংগ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। চরণ সিং আমার রাজনৈতিক গুরু বা নেতা। মাঝে মাঝে প্লেনে বা ট্রেনে দিল্লিতে যাই। বাড়ি থেকেও টাকা আনি।

পরিবারেব লোকদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

গ্রাম ছেড়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য মধ্য বাংলা থেকে কলকাতায় আমাকে আনার ব্যাপারে আমার ছোটচাচা মোতালেব হোসেনের মদতই বড় ছিল। মা বাবার চাইতেও তিনি ছিলেন বেশি। পশ্চিমবংগ রাজ্যসরকারে পুলিস বিভাগের তিনি একজন দায়িত্বশীল কর্তব্যপরায়ণ কর্মী। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলির কিছু লোক বিদেশে বড় বড় চাকরিও করেন। এক জন বাংলাদেশের উচ্চতম সরকারি অফিসার। একজন লিবিয়াতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, একজন আবুধাবিতে থাকেন অপর একজন থাকেন ইরাকে। দেশে কয়েকজন সরকারি কর্মচারী, কেউ কেউ মসজিদের ইমাম।

দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কেমন আছে ?

আগে ছিল, এখন তেমন নেই, ও বাংলার লোকরা আসার পর সবদিক থেকে চাপ পড়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চাপ। এই তো কিছুদিন আগে প্রচন্ড রকম দাংগা-হাংগামা হয়ে গেল। বাঙালি মুসলমানরা সব দিক থেকে পশ্চিমবংগে বঞ্চিত, অবহেলিত। কলকাতা শহরেও অবাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে বাঙালি মুসলমানরা ভাল ব্যবহার পায় না। সমস্ত মসজিদে মাদ্রাসায় এতিমখানায় তাদের অধিকারই বড়।

পোশাক-আষাক কী পরেন ?

টেরিলিন, টেরিকটন, টেরিউল, বিদেশি কোন জিনিস ব্যবহার করি না। খাদি রেশম ইত্যাদি ব্যবহার করি। কারণ কুটির শিল্পের প্রসার চাই। বেকার সমস্যার সমাধান চাই।

রাজনীতির লোকরা কে কে প্রভাব বিস্তার কবেছিলেন ?

ডঃ জ্যোতি ভট্টাচার্যের প্রভাবে কারল মারকস পড়ি। পরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সংগে যোগাযোগ হয়। চরণ সিং কৃষকের সন্তান। পুঁজিপতিদেব বিরুদ্ধে। তাই তিনি এম পি হয়ে এসেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন তাতে পুঁজিপতিরা চটে যান। তখন তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারকে ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র করে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস শক্তিশালী হবে বলে আশা করেন ?

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়ে তারা দিশেহারা। তপশীলি হিন্দুদেব নানান কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। তাদের টেনে তোলা হচ্ছে কিন্তু দীনতম দরিদ্র হলেও মুসলমানদের তপশীলি বলে কিছু না থাকাতে তারা বঞ্চিত।

মুসলিম দেশগুলোতে আপনার আত্মীয়রা আছেন, সেজন্য আপনার কথায় যেখানে মুসলমানরা বঞ্চিত সেই ভারত সম্বন্ধে আপনার মনে প্রতিক্রিয়া আছে কি ?

না তা নেই। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা শুনিয়েছেন। পৃথিবীর যে যেখানে থাকে সেটা তার দেশ। তার পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি। 'হুব্বুল অত আল্ ইমান'-- দেশকে ভালবাসা ইমান বা ধর্মীয় বিশ্বাসের অংগ।

মাকসুদা কাজী

ডাক নাম লিলি রহমান। হাওড়া বসন্তপুরের মেয়ে। অতন্ত চটপটে। অবাধে ইংরেজি বলেন। অবাধভাবে মেলামেশা করেন। হিন্দু বন্ধু বান্ধবীদের বাড়ি হরদম খাওয়া দাওয়া করেন। কলকাতায় পড়াশুনো।

চাকরি করেন তো ?

গ্লুকোনেট ফারমে চাকবি করি। ওখানে নানান কিছু ওষুধ তৈরি হয়। গভরনমেনট অনডারটেকিং।

গ্রামে যান ?

শহরে মানুষ তবে ছুটিছাটায় গ্রামে যাই। আমরা খাঁটি আরবান।

মুসলিম মেয়ে, বোরখা পরেন না, আধুনিকা হিন্দু মেয়েরা প্রশ্নের চোখে তীরবিদ্ধ করে না ?

মধ্যবিত্ত মডারন হিন্দু যারা গরু খায় তাদের সংগে মিশি, পর্দা প্রথা তারা এবং আমরা 'হেট' করি।

আরবের গরম অঞ্চলে হয়ত কুসুমকোমল নারীদের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য আপাদমস্তক ঢাকা দরকার। তাছাড়া বেদুইনরা নারী লুটপাট করে নিয়ে যেত। এখন শিক্ষা দীক্ষার পর যখন গাড়িঘোড়া অফিস আদালত জাহাজ উড়োজাহাজ সর্বত্রই নারীদের আধিপত্য তখন আর পর্দার বাহুল্য কেন। তাছাড়া এত কাপড় কোথায়। লোকও এখন অনেক বেশি।

বাড়িতে নামাজ পড়েন কেউ

দিদি নামাজ পড়েন। মা আয়েশা খাতুনও নামাজ পড়েন।

আব্বা কি করেন

আব্বা কাজী বশীর রহমান বিজনেসম্যান।

মুসলিম মেয়েদের জন্য দুঃখবোধ আছে

হ্যাঁ দেখলে বড় কষ্ট হয়। ওরা বড় অসহায়, অভাগা।

আপনি আর কি কি করেছেন

জয়পুর দিল্লি গেছি। এন সি সি করেছি। ১৮০০ ফুট মাউনটেনিয়ারিং করেছি। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের সদস্যা। উড়োজাহাজ চালাতে পারি। আমার বোন মাহাফুজা কাজী উড়োজাহাজ ওঠান নামান দুইই জানে।

শরিয়তে যে চার বিয়ের সমর্থন আছে তাতে আপনার সমর্থন আছে

না, আদৌ না। অর্থনৈতিক চাপে এ ব্যবস্থা এখন প্রায় অচল হয়েও গেছে।

আপনারা কতজন লোক

আমি এখনো আব্বার পরিবারভুক্ত। আমরা ৬ ভাই বোন। বড় আপা (দিদি) গ্রাজুয়েট। সেজবোন কমারস গ্রাজুয়েট। ভাই কমারস গ্রাজুয়েট হয়ে টাটা কোমপানিতে চাকরি করছে। আমি পঞ্চম। নিচেরটা পড়ছে।

কটা ভাষা জানেন

বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, আরবি।

আপনার চাকরি পদ

কনফিডেনসিয়াল সেক্রেটারি টু দ চেয়ারম্যান অ্যানড চিফ একজিকিউটিভ অফিসার।

বিয়ে করবেন না

এখনো স্থির নিশ্চিত নই।

আপনি যাকে বিয়ে করবেন তিনি নিশ্চয়ই পণ নেবেন না

পাত্র স্মারট, ভাল উপার্জী ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষিত, সুদর্শন এবং স্বাস্থ্যবান হওয়া চাই। পণ বা অন্য কোন দাবি করলে দরজা দেখিয়ে দেব।

আকমল হোসেন

সমাজ সেবক। ব্যবসায়ী। বয়স ৫০। জেরক্স, সাইক্লোসটাইল, টাইপ কপিং মেশিন আছে। লোকজন কাজ করছেন। ভাইপো দেখাশুনা করেন। লেখাপড়া বিষয়ে কিছু বলেন না কিন্তু চোস্ত ইংরেজি বলেন এবং পড়েন।

দেশের কথা বলুন মানে আপনার গ্রামাঞ্চলের কথা।

দেখুন মাসুন্দি ভবানীপুরে আগে ৬৫% মুসলমান ছিলেন। এখন হাফাহাফি। পূর্ববংগ থেকে আগত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত হিন্দুরা এখন ওখানে জেঁকে বসেছেন। তাঁরাই সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে চাইছেন এবং করছেন। কেন না তাদের শিক্ষা, অর্থ সহায়তা বেশি। চাকরির সুযোগও পাচ্ছেন ওঁরা অনেক বেশি।

তাঁর ৩ মেয়ে ১ ছেলে। পরিবারে মোট ৭ জন। কলকাতার তালতলাতে থাকেন। বড় মেয়ে হামিদাবানু, উচ্চ মাধ্যমিক, ক্যালকাটা গারলস কলেজ। মেজো

বাড়িতে লিলি রহমান

নীলোফার বেগম ক্লাস নাইন, লরেটোতে। ছেলে মঃ রেহান সেণ্ট অ্যানটনিতে ক্লাস সেভেন। ছোট মেয়ে নিশাত বানু সেনট তামিল চার্চ।

কতগুলি ভুনি কাপড় বার করে দেখালেন।

কি হয় এসব

বিধবাদের দান করি। নিজের ব্যবসা থেকে প্রতিদিন প্রথম বিক্রিটা দানের জন্য রাখি। তা থেকে কাপড় কিনে কিনে সপ্তাহ অন্তে দেশে যাই। কাপড় বিতরণ করি। আমার ফসলের ৫০% দান করে দিই। বিধবাদের জন্য ৫ টাকা করে মণি অরডার করে পাঠাই।

আপনার নিজের পোশাক তো . . .

এই রকম, অতি সাধারণ।

শহরে আর কি কি উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত আছেন

রাস্তাঘাট, জল, পায়খানা, পাবক বস্তি উন্নয়নের কাজে আমরা অ্যাসোসিয়েসন গড়েছি। অনেক কাজ করেছি। এ ব্যাপারে থানা ঘেরাও করেছি। জেল খেটেছি। এই দেখুন না, নামী লোকরা আমাদের কাজে যাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে চিঠিপত্র দিয়েছেন তাঁরা হলেন ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, সঞ্জীব রেড্ডি, বি ডি জাত্তি, সিদ্ধার্থশংকর রায়, মাদার টেরেসা, পি সি সেন, জ্যোতি বসু প্রমুখ।

নামাজ পড়েন তো

সুযোগ হলেই পড়ি।

আপনি আগে মুসলমান পরে ভারতবাসী না আগে ভারতবাসী পরে মুসলমান।

আগে ভারতবাসী পরে মুসলমান। বিদেশে গেলে সেই রকম পরিচয়ই তো দিতে হয়।

মালী এ জব্বার

বালককালের চেনা মানুষ। বসার ঘরে মক্কেলদের নিয়ে মামলার কাগজপত্র দেখতে ব্যস্ত। সমাদরে বসালেন। ফ্রিজ থেকে কনকনে ঠান্ডা পানি আনালেন। চা আনালেন। জানালা দিয়ে ঝড়ের আকাশ দেখতে লাগলাম। মক্কেলদের বিদায় দেবার পর ভেতরে আনলেন। টেলিভিশনে নাটক দেখতে থাকা স্ত্রী রাজিয়া বেগমের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলে মেয়েদের দেখালেন। টানাও বিছানা। আধুনিক আসবাবপত্র। বিদেশি ছবি আর বইপত্তর। ফোন এল।

আপনি তো মেটিয়াবুরুজের লোক

হ্যাঁ, আমরা মালী পাড়ার লোক। আমাদের উপাধিও মালী। পিতা হাজী মহম্মদ রবসিদ মালী। মা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী খান বাহাদুর ওয়াজেদ মোল্লার দ্বিতীয় কন্যা তসলিমা বিবি। স্ত্রী রাজিয়া বেগমের বাবা শফিউদ্দিন আহমেদ বর্তমানে অঞ্চল প্রধান পাঁচুড় অঞ্চল মহেশতলা মেটিয়াবুরুজ ব্লক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী সুবিদ আলী মোল্লার ভায়ের নাতনি।

পড়াশুনোর কথা বলুন।

কলকাতা ইউনিভারসিটিতে আইন পড়তে পড়তে হাইকোরটে অ্যাটরনি অ্যাট ল- পাঁচ বছরের কোরসে সুধীরকুমার চাটারজির অধীনে আরটিকেল ছিলাম। অ্যাটরনি অ্যাট ল পাস করার পর সলিসিটর বা অ্যাডভোকেট হিসাবে। অরুণ দেব অ্যাডভোকেটও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এখন নিজস্ব ফারমে অ্যাটরনি বা সলিসিটরের কাজ করি।

অবসর সময়ে আকমল হোসেন

বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আপনার কী বক্তব্য ?

ইতিবাচক নেতিবাচক অনেক কথা বলার আছে। ৪0টা স্বাধীন মুসলিম দেশ। আল্লা তাদের অনেক পেট্রল কেরোসিন বা তরল সোনা দিয়েছেন। মুসলিম দেশ হলেই যেন খনিজ তেল থাকবে এমন ব্যবস্থা, নইলে ভারত টপকে হঠাৎ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তেল থাকবে কেন ' পাকিস্তান, বাংলাদেশেও বোধহয় আছে।

সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে বলবেন ?

পবিত্র কোরআনেও সংখ্যালঘুদের কথা নেই বোধহয়। তখন মুসলমানরা কোন দেশে সংখ্যালঘু হয়নি। তবে যে সম্প্রদায় সৎ কাজ করবে, আল্লার নিয়মে মানবতার পথে চলে তাদের হাতে কর্তৃত্ব আসে। ভারতের মুসলমানরা এককালে সে পথ থেকে সরে গিয়েছিল বলে তাদের অধঃপতন ঘটেছিল। আবার উঠবে তারা যদি নির্যাতন আর অত্যাচারের মধ্যে থেকে শিক্ষা পেয়ে আল্লার পথে চলে। শিক্ষা ও অর্থনীতিতে সচেতন হয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ হলেই তবে ধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে। অধর্মের পথে যে সম্প্রদায় যাবে অদূর ভবিষ্যতে তাদের পতন অনিবার্য।

জব্বার সাহেব কোরাণ শরীফ পড়ছেন

আপনি কি সংখ্যালঘু মুসলমানদের কাছ থেকে অদূর ভবিষ্যতে ভাল ফলাফল আশা করছেন ?

নিশ্চয়ই। ধর্মে তাদের মধ্যে একটা নতুন করে বান ডেকেছে। চিরকালই তারা ধর্মের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়েছে। সৎ হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তারা বঞ্চিত উপেক্ষিত বলেই স্ব ক্ষমতায় বিকশিত হতে শিখবে। বাঁচার পথ তৈরি করবে। অন্যের ভারবোঝা হয়ে থাকবে না।

শাহাবুদ্দীন আমেদ

প্রাক্তন মন্ত্রী হাজী একরামুল হক সাহেব এসটেট বিলডিং। শাহাবুদ্দীন সাহেব এই এসটেটের মুন্সীজী বা ম্যানেজার। সাহেব পাড়ার অনেক ইতিহাস তিনি জানেন। একই সংগে এই মালিকের টি গারডেনসের ডাইরেকটরও শাহাবুদ্দীন আমেদ।

স্ত্রীর নাম রশীদা বেগম। সাংসারিক কারণে দেশে মাঝে মাঝে যেতে হয়। দুটি কন্যা। বড়টি জুনিয়ার হাই স্কুলে ক্লাস সিকসে পড়ে। অন্যটি বাচ্চা। জমিজমা আছে বিঘে ২০/২৫

বললাম, আপনি তো কবিতাও লেখেন ?

হ্যাঁ আমি একজন আধুনিক কবি। 'নিঃস্বের ফরিয়াদ' আমার একটা বই আছে। মুক্ত মেলায় কবিতা পড়ি।

আর কী করেছেন ?

৭৭ সালে আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়িয়ে লড়ে হেরে গেছি। প্রাক্তন ইনডিয়ান আওয়ামী লিগের সেকরেটারি ছিলাম। রাজনীতি করে জেল খেটেছি বার দুয়েক।

ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই তো ?

ধর্মটা খোলস। ধর্মের ধান্দাবাজ লোকরা ওটা পরে থাকে। মুসলমানরা সহযোগিতা আর বিশ্বাসের অভাবে অন্ধকারে পড়ে আছে।

আদর্শ নেতা কাকে মনে করেন ?

মুসলমানদের মধ্যে এখন তেমন কেউ নেই যিনি সমস্ত মুসলিম সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

আপনি তো কবি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার ধ্যান ধারণা কী রকম ?

রবীন্দ্রনাথ মুসলিম মধ্যবিত্ত মানসে নেই কারণ 30% মুসলমানদের আবদুল মাঝি বা দুটি একটি নিচু তলার নাম ছাড়া আর কিছু বলেননি সারা জীবন লেখার পর। অথচ প্রচুর মুসলিম মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের সংগে তার পরিচয় ছিল। এ কে ফজলুল হক, অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন, নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ অনেকের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। মুসলিম দেশগুলোয় গিয়ে তিনি যথেষ্ট সমাদরও পেয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাস বা গল্পে কোথাও মুসলমান চরিত্র নেই। অথচ গোটা বাংলায় তখন মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এটাই কি জনজীবনের ছবি ? আমার ধারণা গান্ধীজীই হিন্দু-মুসলমানের যোগ্য নেতা। মুসলিম পক্ষপাতিত্বের জন্যই তাঁকে গুলি খেয়ে মরতে হল।

শাহাবুদ্দীন আমেদ

এই সংগে বলা যায় শাহাবুদ্দীন সাহেব বহু বিবাহ, তালাক বা বহু সন্তান মোটেই সমর্থন করেন না। তাঁর মতে মুসলিম সম্প্রদায় এখন হিংসা, ঈর্ষা নিয়েই আছে।

নানান বড় কাগজে মুসলমানরা সুযোগ পাচ্ছে না বলে শাহাবুদ্দীন সাহেবের অভিযোগ আছে। চাকরিতেও তারা নাকি বঞ্চিত হচ্ছে নানান অজুহাতে।

কলকাতা শহর আপনার কেমন লাগে ?

ভালও লাগে আবার খারাপও লাগে। ভিড়ের চাপ। লোডশেডিং। নোংরা। ভেজাল। ভিখারি। ছিনতাই। ডাকাতি। আবার ইনটারন্যাশনাল শহরে সাধারণভাবে জীবনযাপনও করতে পারি—অন্যত্র অসম্ভব। সস্তায় এখানে ভোগের সামগ্রীও পাওয়া যায়।

মহিউদ্দিন সাঁফুই

স্থায়ী বসবাস : বাঞ্জন হাড়িয়া, চড়িয়াল, বজবজ, ২৪ পরগনা।

বয়স আনুমানিক ৫৩ বছর। ৩ ছেলে ১ মেয়ে। নাম : নূরউদ্দিন এম এ, এল এল বি কোরটে প্র্যাকটিস করেন। আনিসউদ্দিন বি এস সি। রেহানা খাতুন–বি এ। কামালউদ্দিন, অনারস ফারসট ক্লাস পেয়ে এম কমের ফাইনালে পড়ছেন। ছোটটি ছাড়া সবাই বিবাহিত। স্ত্রী : মরিয়ম আরা। ভাল ইংরেজি জানেন।

আব্বা জাসিমউদ্দিন সাহেব প্রায় আজীবন বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। বহু স্কুল ও হিতকর সংস্থার সদস্য ছিলেন।

সাঁফুই বংশ বিরাট। প্রায় ৬00 জন সদস্য। ভোটারই কেবল ২৫0 জন। এই বংশের সবাই প্রায় ব্যবসায়ী।

বজবজ হালদার পাড়ার কাঠের কারখানায় মহিউদ্দিন সাহেবের সংগে মোলাকাত করা গেল। দীর্ঘ ছ-ফুট এক ইঞ্চি উঁচু মানুষ। পুষ্ট টানটান মাঝারি। মুখে দাড়ি। কাঠগোলায় বানড শ মেশিন চলার শব্দ।

মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। সামনে একটা অসম্ভব মোটা কাপাস গাছ। বেঞ্চিতে আনন্দবাজার পত্রিকা আর পরিবর্তন পড়ে দেখলাম।

বললাম, পরিবর্তন পড়েন নাকি ?

যখন থেকে পরিবর্তনের জন্ম আমি সেই থেকে পাঠক।

ব্যবসার কথা প্রসংগে বললেন, চারপুরুষে আমরা কাঠের ব্যবসায়ী। আব্বার কারপেনটারি ব্যবসা ছিল, আজও আছে চড়িয়ালে। উনিশ বছর হল কারপেনটার শ এ্যানড কোং হয়েছে হালদার পাড়ায়।

কারখানার মধ্যে কয়েকটি লরি। মাল বোঝাই হচ্ছে, মাল খালাস হচ্ছে। একটি অ্যামবেসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

হালদার পাড়ার সম্ভ্রান্ত হিন্দু পল্লীতে আপনার মত মোমিন মুসলমান ব্যবসা করছেন, ওঁরা অসুবিধা করেন না কিছু ?

জিভ কাটলেন মহিউদ্দিন সাহেব। বললেন, খুব সম্মান করেন আমাকে। আমি তো খুব সোসাল লোক। সব রকম চাঁদা দিই ; কাউকে রিক্ত করলে তিক্ত ব্যাপার ঘটে যায়।

সোসাল কাজ কী কী করেছেন ?

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির এডুকেশন বোরডের চেয়ারম্যান ছিলাম যখন গোটা পশ্চিমবংগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ফলাফল সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল। রাজনীতিতে মানসম্মান আর নেই বলে আমরা একদম ওসব জায়গা থেকে সরে এসেছি। আমার সাংস্কৃতিক ঝোঁক চিরকালই ছিল। গুণীজ্ঞানী মানুষদের এনেছি। নানা লাইব্রেরি গড়েছি। ধর্মীয় বই প্রচুর পড়েছি, সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশের বই কিনেছি প্রায় ৭ হাজার টাকার। নামাজ পড়ি রেগুলার। দিললির এক পীরের কাছে মুরীদ হয়েছি। পীর হজরতজী তবলীগ জমাতের লোক। তাঁর প্রথম নির্দেশ 'সৎপথে থাক, অসৎ কোন কিছুর মধ্যে যাবে না।'

অন্য ধর্মের ব্যাপারে.. ...

আমি সহানুভূতিশীল। অন্যান্য ধর্মের বইও পড়েছি। রামায়ণ, মহাভারত,. গীতা, বেদ, বাইবেল,

কথামৃত পড়েছি। এসবেব মধ্যেও প্রভূত জ্ঞান বয়েছে।

হজ্জে যাচ্ছেন শুনলাম।

হ্যাঁ। এ বছর স্বামীস্ত্রীতে হজ্জে যাবার অনুমতিপত্র পেয়ে গেছি। জাহাজে যাব। আমার সমুদ্র দেখার খুব হবি আছে। তাছাড়া হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে যাত্রীদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন আলাপ আলোচনা করে অনেক কিছু জানতেও পারব।

সংখ্যালঘু মুসলমানদেব সম্বন্ধে কিছু বলবেন ·

সংখ্যালঘু সমস্যা আছে প্রচুব কিন্তু সমস্যাটাকে আমল দেওয়া হয় না। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে সমস্যাটা আরো প্রকট হয়েছে।

মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ কিছুটা গড়ে উঠেছে নাকি ?

কিছুটা। গতিহীন বলা যায়। সরকার টেকনিক্যাল শিক্ষা দিলে অর্থনৈতিক সুরাহা হয় অনেকখানি। কিন্তু আলাদা করে গণতন্ত্রে মুসলমানদের জন্য সেটা করলে কি সেকুলারইজম বজায় থাকবে ?

মহিউদ্দিন সাঁফুই

মঃ মসিউর রহমান

জন্ম–১৯৩১, আব্বা-হাফেজ শাহাবুদ্দিন। আম্মা আতেকা বিবি। গ্রাম বাজানহাড়িয়া, বজবজ। কর্মস্থান-হেয়ার স্কুল, কলকাতা। শিক্ষক। ১৯৫৩ সালে নিয়োগ। প্রায় ৩০ বছর।

আরবি পাঠ্যপুস্তকের নোটবই বা পাঠ্যসূচিভুক্ত বহু পুস্তক তিনি লিখেছেন। সাধারণত ৬+৭+৮ শ্রেণীভুক্ত মাদ্রাসার বই এসব।

রমজানের চাঁদ দেখার পর চড়িয়ালের গগনচুম্বী সুন্দর মিনারঅলা মসজিদের মধ্যে ঈশা ও তারাবি নামাজ পড়ার পর মসিউব সাহেবের সাক্ষাৎ মিলল। মুখভরা দাড়ি। ভরাট মজবুত চেহারা। হাতে হাত চেপে খুশি মেজাজে কথা বলতে লাগলেন।

নামাজ তো আপনি বহুকাল পড়ছেন না ·

জী হাঁ। ছাত্রজীবন থেকে।

এই অঞ্চলের লোকবা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন।

আমাকে ভালবাসেন, যতটা পারি সেবা-উপকাবে লাগি। ধর্মেব বয়ান-বক্তৃতা করে বেড়াই। প্রায়ই দূবে দূরে যেতে হয়।

হেয়াব স্কুলে আপনার সম্পর্ক কেমন ·

অত্যন্ত মধুর। হেয়াব সাহেবেব নির্দেশ মত চলি আমবা সকলেই। বিবোধ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব নেই। সবাই চবিত্র বান।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদেব সম্বন্ধে কিছু বলবেন ·

তারা সুস্থ নাগরিক হয়ে থাকুক। সামাজিক মর্যাদা লাভ করুক। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার আচরণে কোন বকম বাধাবাধকতার মধ্যে না পড়ে। পরিবেশের সঙ্গে তাদের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

তাবা কি বঞ্চিত হচ্ছে আপনার ধাবণা ?

ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে এডুকেশনে পেছিয়ে থাকাব জন্য ও যোগ্যতাব অভাবে নানান ক্ষেত্র থেকে তারা হটে আসছে। অর্থনৈতিক দুর্দশাই এখানেব মুসলমানদেব সব চাইতে বড় শত্রু।

সাক্ষাৎকার : আবদুল জব্বার

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

ঈদ-উল-ফিতর

হাবিব আহসান

ঈদ কী?

চাঁদ নির্ধারিত আরবি ক্যালেনডারের দশম মাস শাওয়াল। পয়লা শাওয়াল ঈদ-উল-ফিতর। 'ঈদ' শব্দটি এসেছে আরবি ধ্বনিতত্ত্বের 'উদ' ধাতু থেকে, যাকে বাংলায় বলতে পারি 'পৌনঃপুনিক'। 'ফিতর' শব্দটির মানে দাঁড়ায় সমাপ্তি। টানা একমাস উপবাস ও উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের যে অনুশীলন চলে তার সমাপ্তি এবং জীবনভর সেই আদর্শের পৌনঃপুনিক অভ্যাস।

স্বাগতম মাহে রমজান

আরবি বর্ষপঞ্জীর নবম মাস রমজান। 'রমজান' কথাটির উৎপত্তি 'রমজ' ধাতু থেকে, যার অর্থ খরতাপ। মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র মাস। কোরআনে শুধু এ মাসটিরই উল্লেখ আছে। কোরআনসহ সমস্ত নবীর কাছেই 'সহীফা' ও 'কিতাব' অবতরণ করেছিল রমজান মাসে। 'সহীফা' সংক্ষিপ্তাকারে আর 'কিতাব' বিশদভাবে প্রেরিত আল্লাহর বাণী।

রমজান তাই মুসলমানদের কাছে মহিমামণ্ডিত ও পবিত্র মাস। এ ছাড়াও মুসলিম ইতিহাসের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে মাসটিতে। ৬ রমজান কারবালা যুদ্ধে শহীদ ইমাম হুসাইনের জন্মদিন, ১০ রমজান বিবি খাদিজার তিরোধান দিবস, ১৭ রমজান বদরের যুদ্ধ, ১৯ রমজান মক্কা বিজয়, ২১ রমজান চতুর্থ খলিফা এবং শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ইমাম আলি-আল-রিদআর মৃত্যু দিবস ইত্যাদি।

লায়লাতুল কদর

সাধারণভাবে ২৭ রমজানের রাতই 'লায়লাতুল কদর' হিসাবে উদযাপিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই হাদিসের সূত্র অনুসারে মাসের শেষ পাঁচটি বিজোড় রাত অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ রমজান রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা 'এতেকাফ' করেন। 'এতেকাফ' মানে অবস্থান করা। রাতভর কোরআন পাঠ এবং নামাজ পড়া হয়।

সূরা 'কাদর' (৯৭)-এ 'লায়লাতুল কদরের' উল্লেখ আছে। পূর্বতন নবীদের হাজার হাজার রাতের চেয়েও এ রাত উত্তম। এ রাতে ফেরেশতারা অবতরণ করেন এবং উষার রক্তরাগ বিচ্ছুরিত হবার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও করুণা বর্ষণ করতে থাকেন। এ রাতেই কোরআনের বাণী আসা শুরু হয়। মুসলমানের কাছে 'লায়লাতুল কদর' তাই 'নেয়ামত' বা আশীর্বাদের রাত।

জাকাত-আল-ফিতর

আল্লাহর ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব। তাদের জীবনযাপনের জনাই দান করা হয়েছে পার্থিব সম্পদ। সব মানুষের তাতে সমান অধিকার। কিন্তু আত্মসাৎ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই বৈষম্য দূর করতে ইসলামে ফিতরা-জাকাত-সাদকা-কোরবানী-উসূর প্রভৃতি প্রতিদানের নির্দেশ আছে। ঈদ উপলক্ষে তাই 'জাকাত-আল-ফিতর' বা 'সাদাকা-আল-ফিতর' – এক কথায় যাকে বলা হয় 'ফিতরা' দেওয়ার নিয়ম। এই দান উপবাস ও সাধনার বিভ্রমকে পবিত্র করে এবং দরিদ্র মানুষকে ঈদের আনন্দে শরিক হবার সুযোগ দেয়। সদ্যোজাত শিশু থেকে প্রতিটি জীবিত মানুষের 'ফিতরা' দেওয়া বিধেয়। দরিদ্রদের 'ফিতরা' দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের সাহায্য করার জন্যই 'ফিতরা' সংগৃহীত হয়। 'সায়েব-এ-নেসাব' অর্থাৎ প্রতিটি ভাগাবান ব্যক্তির জন্য 'ফিতরা' প্রদান 'ওয়াজেব' বা আবশ্যিক। সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের পর সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা কিংবা তার সমমূল্যের সম্পদের মালিককে বলা হয় 'সায়েব-এ নেসাব'। উপার্জনশীল ব্যক্তির 'ফিতরা' নিজেকেই দিতে হবে। কিন্তু নাবালক-নাবালিকা এবং নির্ভরশীল পরিজনদের 'ফিতরা' অভিভাবককে দিতে হয়। দাস-দাসীদের 'ফিতরা' দেওয়া আবশ্যিক নয়। কিন্তু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের 'ফিতরা' গৃহস্বামীকেই দিতে হবে। মাথা পিছু সাড়ে সতের শ গ্রাম গম অথবা সমমূল্যের কোন শস্য বা সম্পদ 'ফিতরা'র মূল্যমান। সম্মিলিত তহবিলে বা ব্যক্তিগতভাবে 'ফিতরা' বন্টন করা যায়। এবং ঈদের আগেই তা বিলিয়ে দেওয়ার নিয়ম। দরিদ্র আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং অনাথ ও ভিখারিরা 'ফিতরা'র দাবিদার। একজনের ওপর নির্ধারিত 'ফিতরা' একজনকেই দান করা ভাল, যদিও একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বন্টনে বাধা নেই। মসজিদ, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, মৃতের কফিন প্রভৃতি সামাজিক কাজে ফিতরা-জাকাত-সাদকা-কোরবানীর টাকা খরচ করা বৈধ নয়। তাতে দরিদ্রদের বঞ্চিত করা হয়। এসব সমাজ কল্যাণে 'উসূরে'র টাকা খরচ করা যায়।

ঈদ কবেকার

ঈদের আগে আরবে কয়েকটি ধর্মীয় উৎসবের প্রচলন ছিল। যেমন বসন্ত পূর্ণিমায় 'মিহিরজান', শরৎ পূর্ণিমায় 'নওরোজ' বা ১০ মহরম 'আসূরা' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে, এই 'আসূরা' ইমাম হোসাইন ও হাসানের স্মৃতি বিজড়িত 'মহরম' উৎসব নয়। ইসলামের অন্যতম নবী এবং ইহুদি ধর্মগুরু মূসা বা মোজেসের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল 'অসূরা' উৎসবে। ফেরাউন বা ফারাও-এর দুর্বিষহ নির্যাতন থেকে ১০ মহরম তিনি শিষ্যদের মুক্ত করেছিলেন। এই উৎসবগুলোর পরিবর্তে মহান ধর্মগুরু দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদ উৎসবের প্রচলন করেন, আজ থেকে মোটামুটি চোদ্দ শ বছর আগে। কিন্তু কোরআনের যে সূরাটিতে ঈদের উল্লেখ আছে তার নাম 'মা'য়িদা'। কোরআনের পঞ্চম সূরা। ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে – 'মরিয়ম তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! নভোমণ্ডল থেকে আমাদের জন্য খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাও, আমাদের কাছে তা হবে ঈদের আনন্দস্বরূপ এবং তোমার দেওয়া নিদর্শন, আর আমাদের জীবিকা দান কর এবং তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা (৫ : ১১৪)।'

বাইবেলেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে। কোরআনের শ্লোকে দেখা যায়, ঈসা অর্থাৎ যীশুখৃস্ট এই অলৌকিক ঘটনাকে ঈদের আনন্দের সংগে তুলনা করেছেন। সুতরাং মহান ধর্মগুরুর আগেও ঈদ উদযাপিত হত এমন ধারণা করার সংগত কারণ আছে, যদিও ঈদের প্রচলন আজকের ইহুদি ও খৃস্টান সমাজে নেই। ইহুদিদের 'জসন' বা খৃস্টানদের 'গাই ফকস' উৎসব ঈদের প্রায় সমসময়ে অনুষ্ঠিত হলেও উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিক দিয়ে ঈদের সংগে এ দুটোর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মনে হয় উৎসবটি পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল কিছুটা সংশোধন করে।

ভারতবর্ষে প্রথম ঈদ

ভারতের প্রথম মসজিদ, প্রথম সিনাগগ, প্রথম গির্জা সবই কেরলে। ভারতে ঈদের প্রথম অনুষ্ঠানও হয়েছিল এখানকার কোটংগল্লুর মসজিদ সংলগ্ন বিরাট ময়দানে। সহস্রাধিক মানুষের এই সমাবেশে অমুসলমানের সংখ্যাই ছিল সাতশর বেশি। সম্প্রীতির অনাবিল আলোকতীর্থে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য

কাল রেখা যে ছবি এঁকেছে—সারা গায়ে নিজেই রঙ মেখেছে !

হাই পাওয়ার সার্ফ
ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে-এমন, যা নজরে পড়ে!

মায়েদের পুরোপুরিভাবে সাহায্য করতে লেগে গেছে ময়লা তাড়ানোর চ্যাম্পিয়ান : হাই পাওয়ার সার্ফ ! কারণ, সার্ফে অনেক বেশী সক্রিয় উপাদান আছে, যা সমস্ত ময়লা টেনে বার করে দিয়ে—আপনাকে দেয় সবচেয়ে সাদা ধোলাই । অথচ, সার্ফ আপনার কাপড় আর হাতের কত খেয়াল রাখে !

যেকোনো ঘরণীকে জিজ্ঞাসা করুন—তিনি বলবেন, বাজারে শ'খানেক ওয়াশিং পাউডার থাকতে পারে, তবে নির্ভরযোগ্য একটাই !

সাদা বা রঙীন—সবের জন্যেই ভালো!

LINTAS SU 267 2115 BG

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

রোজা কী এবং কেন?

জয়নাল আবেদীন

ইসলামী হিজরী সনের নবম মাস রমজান। রমজান মাসের পূর্বনাম নাতেক। চান্দ্রমাসের পুরাতন নামগুলি পরে পরিবর্তন করা হয়। নাতেক মাসটি সেই সময় গ্রীষ্মকালে পড়ার জন্যে রামাজান নাম রাখা হয়েছে। রমজ শব্দের অর্থ পুড়িয়ে ফেলা। সূর্যের অত্যধিক উত্তাপ বা গ্রীষ্মের আধিক্য হেতু এই মাসে পাপরাশি নিঃশেষ ও ভস্মীভূত হয় বলে এই রকম নামকরণ করা হয়েছে।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে রোজা অন্যতম। রোজা অর্থে উপবাস। রমজান চাঁদের মাসটা মাস পালন করতে হয় কঠোর উপবাসব্রত। রাত্রিশেষে ঊষার শুভ্র লগ্ন থেকে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন নিরম্বু উপবাস। মানব অন্তরে সারা বছরের সঞ্চিত পাপরাশির জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নির্মল করে নিতে হয় রোজার পুত অনলে। একমাস রোজার কঠোর ব্রতপালনের শেষে আবার স্বাভাবিক নবজীবনযাত্রা শুরু করার উৎসব ঈদ-উল-ফিতর।

রমজানের সংযম সাধনা শুধু খাদ্য গ্রহণের সংযম নয়। রমজানের সংযম সাধনা কথাটি বড় ব্যাপক। শুধু খাদ্য গ্রহণে সংযমী হলে চলবে না—একটি মানুষকে খাঁটি মানুষ হতে হলে মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য তাকে সকল খারাপ অন্যায় কাজ থেকে সংযমী হতে হয়। তার একচুলও কমতি হলে রমজানের সংযম সাধনা সার্থক হবে না।

রমজান হল ট্রেনিং স্বরূপ। এই একমাস যেভাবে সংযমী হয়ে মানুষ চলে, সারা বছর বা সারা জীবন সেভাবে চলার নির্দেশ দেয় রমজান। রমজান মাসে মিথ্যা না বলা, কারো প্রতি অন্যায় অত্যাচার না করা, কাউকে হাত ও মুখের দ্বারা আঘাত না করা, হারাম (অবৈধ) খাদ্যভক্ষণ [illegible]

[illegible]

সেদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, দেড়শ হিজরীর এই ঈদ উৎসব গজনীর ভারত অভিযানের প্রায় দুশ তিরিশ বছর আগের ঘটনা।

ঈদের নামাজ

সূর্যোদয় থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যে কোন সময় ঈদের নামাজ পড়া যায়। শাওয়াল মাসের প্রথম তিন দিনের যে কোন একদিন তা পড়া যেতে পারে। যদিও চাঁদ দেখা দিলেই রোজা শেষ করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। অন্য নামাজের মত ঈদে আজান দেবার নিয়ম নেই। প্রয়োজনও নেই। কারণ ঈদের নামাজের প্রস্তুতি কয়েকদিন আগে থেকেই চলতে থাকে। দু-চারদিন অথবা একদিন আগে মসজিদে মসজিদে ইমামরা সময় ও স্থান ঘোষণা করে দেন। নতুন পুরনোর বাধা-নিষেধ নেই, পরিচ্ছন্ন এবং নিজের সর্বোত্তম পোশাকটি ঈদের দিন পরিধান করা বিধেয়। নামাজের আগে অন্তত সামান্য কিছু, এমনকি এক টুকরো খেজুর ও জল আহার করা উচিত। এবং অবশ্যই ভালভাবে স্নান ও 'ওজু' করতে হবে।

ঈদে মাত্র দু 'রাকআত' (এক রাকআতে দু বার নতজানু এবং নতশির হতে হয়) নামাজ পড়তে হয়। সাধারণ নামাজের সংগে ঈদের পার্থক্য, এই নামাজে কয়েকটি অতিরিক্ত 'তকবীর' উচ্চারণ করতে হয়। 'তকবীর' হল 'আল্লাহ আকবর' — অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমামের সংগে গলা মিলিয়ে দু হাত তুলে সমবেত কণ্ঠে বলতে হয়, প্রথম 'রাকআতে' নামাজ শুরুর সময় তিনবার, মতান্তরে সাতবার এবং দ্বিতীয় 'রাকআতে' 'সিজদা' বা নতশির হবার আগে তিনবার, মতান্তরে পাঁচবার। নামাজের পর ইমাম কোরআন থেকে 'খুতবা' আবৃত্তি করেন। তারপর প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে নামাজের পরিসমাপ্তি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে উন্মুক্ত 'ঈদগাহে' নামাজ পড়াই সংগত। অসুবিধায় মসজিদেও নামাজ পড়ার বিধান আছে। অন্য নামাজ বাড়িতেও পড়া যায়। কিন্তু মসজিদে না পড়লে শুক্রবারের 'জুম্মা' নামাজ সিদ্ধ হয় না। প্রতিবেশীর সংগে মেলামেশা এবং সৌহার্দ্য বিনিময়ই এর উদ্দেশ্য। ঈদের সমাবেশ আরও বিশাল। বৃহত্তর জনসমাজের সংগে পরিচয় ও সম্প্রীতি সাধনের জন্যই ঈদের নামাজ উন্মুক্ত জায়গায় পড়ার নিয়ম।

নারীর অধিকার : বর্তমান সমাজ

কোরআনে বলা হয়েছে : 'হে ঈমানদারগণ, যখন জুম্মার আজান শুনতে পাবে তখন আল্লাহর উপাসনার জন্য ধাবমান হও এবং ব্যবসা বন্ধ কর।' এখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। ঈমানদার পুরুষও হতে পারেন, নারীও হতে পারেন। হজের সময় কা'বা শরীফ তওয়াফ, সা'ফা ও

মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো, মীনা, মুজদালেফা ও আরাফাত ময়দানে অবস্থান সব বিষয়েই নারী-পুরুষ একত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। ঈদের নামাজেও নারীরা পুরুষের শরিক হতেন এবং নবীজীর সংগে নামাজ কায়েম করত।

বোখারী হাদিশে এক জায়গায় (তাবায়ী হাফসা বিনতে শিরিন) বলা হয়েছে, 'আমরা কুমারী মেয়েদের ঈদের দিন বেরোতে দিতাম না। এ সময় খলিফার প্রাসাদে এক মহিলার সংগে আলাপ হল। মহিলাটি বললেন, তাঁর ভগ্নীপতি বারটি জেহাদে নবীজীর সংগে ছিলেন। এর মধ্যে ছটি জেহাদে তাঁর বোনও উপস্থিত ছিলেন। বোন রোগীদের পরিচর্যা করতেন, আহতদের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করতেন।' আসমা বিনতে শিরিন থেকে আরেকটি হাদিশে জানা যায়, 'আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল আমরা যেন ঈদের দিনে বাইরে বের হই এবং কুমারীদেরও পর্দার আড়াল থেকে বের করি। তারা পুরুষদের পেছনে থাকবে, তাদের তকবীরের সংগে তকবীর বলবে, দোওয়ার সংগে দোওয়া করবে এবং বরকত ও পবিত্রতার আশা পোষণ করবে।'

নারীর এই অধিকার কিন্তু আজকের মুসলমান সমাজে প্রদত্ত হয় না। তাই বলে একদল মৌলানা মেয়েদের দাবি কেড়ে রাখে কোন অধিকারে? 'তওবা-তওবা' করে খোদার ওপর খোদকারি করতে তাদের দ্বিধা নেই। কিন্তু এই নিধিরাম সর্দারদের চৌকিদারি নারী সমাজ আর কতদিন মেনে চলবেন সে কথা ভেবে দেখার সময় এসে গেছে।

আনন্দোৎসব

শ্লেট-রঙ সন্ধ্যার আকাশে শাওয়ালের প্রথম চাঁদ উঁকি দিলেই মুসলমান সমাজে খুশির জলতরংগ বেজে ওঠে। ঈদ উদযাপনের ব্যস্ত আয়োজন শুরু হয় ঘরে ঘরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুশির হুল্লোড়ে টগবগ করতে থাকে – নানারকম আতসবাজী, ঝাড়লণ্ঠন, হৈ-চৈ আনন্দে ঈদের চাঁদকে স্বাগত জানায়। মেয়েরা হাতে মাখে মেহেদী। ফুটকি ও আলপনায় হাতের তালু বাহারি করে তোলে। স্নান করে শিঞ্জিনী বাজাতে বাজাতে বউ গিন্নীরা হাত লাগায় রন্ধন শিল্পে। রাতভর বহু কিসিমের রান্নাবান্না – ফিরনি, পায়েস, কোর্মা, কাবাব, হালুয়া, সেমাই, খুশকা, পোলাও, লাচ্চা, কিমাম, বিরিয়ানী ইত্যাদি এবং অবশ্যই দুধসাদা ফিনফিনে চালের রুটি। কলকল কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে, রাঁধতে রাঁধতে রাত কাবার। রান্নার উপকরণ জোগাড় হয় কিছুদিন আগে থেকেই। কোন কোন জিনিসের দাম লাফিয়ে ওঠে চাহিদার চাপে। রোজার শুরুতেই ন টাকা কিলো খেজুর একলাফে পনের টাকা।

সকাল হলেই আতরের ভুরভুর খুশবুতে ঘরবাড়ি মৌ-মৌ। নামাজের পরই কোলাকুলি, নিমন্ত্রণ। এলাহি খানাপিনা। খাওয়ার চেয়ে খাইয়েই বেশি আনন্দ। শুধু মুসলমানই নয়, অমুসলমান বন্ধু বান্ধবরাও ঈদের আনন্দে শরিক হয়। মূল অনুষ্ঠানে অমুসলমানদের যোগদান সম্ভব হয় না। কারণ সবাইকেই নামাজে অংশ নিতে হয়। কিন্তু আনন্দযজ্ঞে সকলের জন্যই দ্বার অবারিত।

ঈদ এক হিসাবে তাই বিশ্ব মিলনের আনন্দ ঘোষণা। বিশ্ব পরিচয়ের অবাধ কল্যাণবাণী তাই দিকে দিকে ঘোষিত হয় এই দিন। □

আলোকচিত্র/সৌগত রায় বর্মন

আশরাফ আর আজলাফ ছাড়া বাঙালি মুসলমান সমাজে অন্য জাতপাত বিচারও আছে

ডঃ মুজিবর রহমান

আলোচনার শিরোনামটাই বিতর্কিত, কারোর কারোর মতে হয়ত বা আপত্তিজনক। কারণ, ইসলামী অনুশাসন এবং জীবনযাত্রা প্রণালীতে জাতিভেদ প্রথা দূরের কথা, তার অনুগামীদের মধ্যে কোনরকম ভেদাভেদেরই স্থান নেই – এই ধারণা সাধারণে তথা বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই ধারণা সৃষ্টির পেছনে দুটো কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমত ইসলামী সমাজকে সর্বতোভাবে গণতান্ত্রিক ধারণার প্রতিফলন এবং সাম্যের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। কোরান, হাদিশ ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক থেকে দেখান হয়, ইসলাম তার অনুগামীদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য স্বীকার করে না। দ্বিতীয় কারণ, পণ্ডিত মহলের একাংশের মতে, জাতিভেদ প্রথা হল হিন্দু সমাজের একান্তভাবে নিজস্ব ব্যাপার। মুসলিম রক্ষণশীলতা এবং হিন্দু সংকীর্ণতা উভয়ই এই ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

কিন্তু সর্বপ্রকার আবেগ ও পূর্বধারণা বর্জিত হয়ে, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াবে বলেই বিশ্বাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আদর্শ ও বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে দুস্তর ফারাক দেখা যায়। কোথাও বা উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। ইসলামী সমাজের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম নেই। মুসলিম সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিচালিকা শক্তি কোরান শরীফে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 'হে মানবজাতি, আমরা তোমাদিগকে কেবলমাত্র নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি . তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, যে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক।' অনুরূপভাবে হাদিশেও বলা হয়েছে, 'ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। আদম ও হাওয়া যে জমিন চাষ করিয়াছিলেন, মানুষ তাহার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। আল্লাহর প্রতি ভীতি ব্যতিরেকে আরবগণ বিদেশিদের অপেক্ষা উৎকর্ষ দাবি করিতে পারে না, কিংবা বিদেশিগণ আরবদের অপেক্ষা -- তোমরা আমার নিকট বংশ পরিচয় নহে, তোমাদের মহৎ কার্যাবলী লইয়া আসিও।'

তা সত্ত্বেও কোরানের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী এবং হাদিশের আনুগত্যে আস্থাশীল সকল মানুষই সমান, তাদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য নেই, এ কথা হলফ করে বলা যাবে কি?

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত আমীর আলিকে অনুসরণ করে বলা যায়, 'প্রথমদিকে ইসলামের গণতান্ত্রিক শিক্ষা সকল প্রকার জাতি, বর্ণ, ভাষা ও উত্তরাধিকারের পার্থক্যকে দূর করে থাকলেও যখন দূরতম রাষ্ট্র সমূহে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটল তখন বিজিত দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের অপেক্ষা আরবগণ শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে লাগল।' শুধু তাই নয়, যে সমস্ত দেশে ইসলাম ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেত, সেখানকার প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাব থেকে ইসলামের অনুগামীগণ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে পারল না। তাই, পারস্যের ইসলামী সমাজে তদানীন্তন 'শাসনীয়' প্রথার স্তর বিন্যাস ব্যবস্থা দেখা দিল, সিরিয়াতে ইসলাম গ্রীক সংস্কৃতির স্পর্শে এল এবং ইসলামী সুফীবাদের মধ্যে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন এবং খৃষ্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা দিল। অন্য দিকে ভারতীয় মুসলমানগণ এদেশে প্রচলিত কঠোর জাতিভেদ প্রথার পরিবেশগত প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি।

সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজ বিজ্ঞানীরা যে বলেন, 'unstratified society is a myth' (সম্পূর্ণরূপে স্তরবিহীন সমাজ একটি অতি কথা মাত্র), তা মুসলিম সমাজ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে উঠল। পৃথিবীর অন্য সব দেশের মত ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজে বিভিন্ন প্রকার পার্থক্য দেখা দিল। যে সমস্ত মুসলমান সরাসরি আরব, পারস্য বা আফগানিস্তান থেকে এদেশে এসেছিলেন, তাদের মৌলিকতার ধারণা স্থানীয় মুসলমানদের (ধর্মান্তরিত) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণে প্ররোচিত করেছিল। এই মৌলিকতার ধারণা আজও তথাকথিত উচ্চবর্ণের মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত। মাত্র কিছুদিন আগেই তো 'সৈয়দ' বংশোদ্ভূত জনৈক মুসলমান আই এ এস অফিসার একটি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ বিভাগের সংগে সাক্ষাৎকারে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সগর্বে জানালেন, যেহেতু তিনি সৈয়দ বংশীয়, তাই 'কনভারট' নন, মৌলিকতার ধারা তাঁর রক্তে প্রবাহিত।

মধ্যযুগের ইতিহাসে এই পার্থক্যের সন্ধান মেলে অনেক। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে ভারতীয় ও বিদেশি মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ অপ্রতুল নয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনি প্রচুর তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন তদানীন্তন সুলতানগণ স্থানীয় মুসলমানদের কী পরিমাণে ঘৃণার চোখে দেখতেন। 'নিম্ন বংশোদ্ভূত' এই অভিযোগে ইলতুৎমিস তেত্রিশ জন ভারতীয় মুসলমানকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। বলবন তাঁর সভাসদ ও উচ্চ পদাধিকারীদের বংশ পরিচয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকও অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রশাসনের উচ্চ পদে বিদেশি বংশোদ্ভূত মুসলমানদের নিয়োগের পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ তো গেল ইতিহাসের কথা। বর্তমানেও মুসলমান সমাজে স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে হাজার রকমের পার্থক্য দেখা যায়। সমাজ বিজ্ঞানীরা মুসলমানদের দুটো বৃহৎ গোষ্ঠীতে ভাগ করেন : 'আশরাফ' ও 'আজলাফ'। প্রথম গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন সমস্ত বিদেশি বংশোদ্ভূত উচ্চবর্ণের মুসলমান এবং শেষোক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে গেলেন দেশজ, ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ। এই দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে আবার অনেক সুস্পষ্ট ও সুসংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একে অন্যের থেকে পৃথক। মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ বলতে অনেকে

জাতপাতের বিচারে এরা কোথায়? আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

শুধুমাত্র সৈয়দ, শেখ, মুঘল ও পাঠান এই চারটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করে থাকেন। কেউ বা শিয়া সুন্নীর পার্থক্যের উল্লেখ করেন। উভয়ই ভুল ধারণা। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে শুধুমাত্র বর্ণাশ্রম কাঠামোর গন্ডিতে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া যেমন ভুল, এটাও তেমনই ভুল।

তবে, মুসলমানদের মধ্যেকার সামাজিক পার্থক্যকে জাতিভেদ প্রথার নিরিখে বিচার করা যাবে কিনা এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও দুটো মত গড়ে উঠেছে। একদল সমাজবিজ্ঞানী 'জাতিভেদ' ব্যবস্থাকে পুরোপুরি হিন্দু সমাজের একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সীমিত রাখতে চান। অন্যদিকে আর একদল জাতি ব্যবস্থাকে কাঠামো ও কার্যগত দিক থেকে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। এদিক থেকে বিভিন্ন অ হিন্দু সমাজের পার্থক্যকেও 'জাতিভেদ' প্রথা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সম্প্রতিকালে 'অ হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা' সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করেছে। ই আর লীচ (সম্পাদিত) : অ্যাসপেকটস অব কাস্টস ইন সাউথ ইনডিয়া, সীলোন অ্যানড নরথ ওয়েসট পাকিস্তান, ইমতিয়াজ আহমেদ (সম্পাদিত) : কাসট অ্যানড সোস্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন অ্যামং দ মুসলিমস, হরজিন্দার সিং (সম্পাদিত) : কাসট অ্যামং ননহিন্দুস ইন ইনডিয়া প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এ প্রশ্ন আলোচনা করতে জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে কিছু তত্ত্বগত ধারণার প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমেই এ ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে না যাওয়াই ভাল, কারণ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন ভাবে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। বরং সর্বতোভাবে স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকেই এই ব্যবস্থার স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যেতে পারে। ১. 'জাতি' হল একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠী, যার সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ণীত হয়, ২. এ ধরনের প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী পৃথক নামে পরিচিত হয় ৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির সদস্যদের বিশেষ পেশা নির্দিষ্ট থাকে, যাকে 'জাতি ব্যবসা' বা 'আদি পেশা' বলা হয়, ৪. প্রত্যেক জাতির লোকেরা অন্যান্য জাতিভুক্ত লোকেদের সংগে খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরার ক্ষেত্রে পার্থক্য বজায় রাখে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা স্পর্শ দোষের স্তর পর্যন্ত পৌঁছয়, যার থেকে ভারতীয় সমাজে 'অস্পৃশ্য' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে একদল মানুষকে (সংবিধান ও আইনগতভাবে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হলেও বাস্তব অন্য কথা বলে), ৫. সমাজ কাঠামোতে প্রত্যেক জাতি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, যেখান থেকে বিচ্যুতি বা উন্নয়ন বিশেষ ব্যতিক্রমের ঘটনা মাত্র, ৬. প্রতিটি জাতির সদস্যদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন জাতির আন্তঃসম্পর্ক ও পার্থক্য বজায় রাখার জন্য নিজস্ব সংস্থা (caste council) থাকে, ৭ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি আপন গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তঃবিবাহ সমাজ প্রায়শই অনুমোদন করে না।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবগুলির প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা সমান গুরুত্ব আরোপ করেন না। গুরুত্ব ও অভিকর্ষের দিক থেকে শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যকে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি বলা হয়, অন্যান্যগুলি হল যথেষ্ট পরিমাণে প্রাসঙ্গিক কিংবা কেবলমাত্র আনুষঙ্গিক।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের নিরিখে বংগীয় মুসলিম সমাজের স্তর বিন্যাসকে বিচার করার চেষ্টা আজকের নয়। বর্তমান শতক শুরু হওয়ার পূর্বেই মৌলভী আব্দুল ওয়ালী 'এথনোগ্রাফিক নোটস অন দা মুহামেডান কাসটস অব বেংগল' শীর্ষক এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেন (দ্রষ্টব্য - জারনাল অব দ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল, খন্ড-৭, পৃঃ ১০৩)। ১৯০১ সালের ভারতীয় জনগণনায় বংগীয় মুসলমানদের মধ্যে আশিটি জাতির উল্লেখ করা হয়। এই সমস্ত জাতির প্রায় প্রত্যেকের পৃথক পেশার কথাও উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে (ইনডিয়ান সেনসাস রিপোরট, ১৯০১, বেংগল, খন্ড-৬এ, অংশ ২, পৃঃ ২৬৮-৮৯)। উক্ত রিপোরটে বলা হয়েছে : 'Amongst the Bengali Muhammedans the Ashrafs or upper class includes all the undoubted descendants of foreign Muslims (Arab, Persian, Afgan) and converts from the highest castes of Hindus and the Atraf or lower class includes the converts from the lower castes of Hindus and the functional groups.'

দেশ বিভাগের পরেও পশ্চিমবাংলার মুসলিম সমাজ-কাঠামো নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব ও প্রচলন খুবই সুস্পষ্ট। হিন্দু জাতিভেদ ব্যবস্থার সংগে কোন কোন বিষয়ে, বিশেষত কঠোরতার মানের তারতম্য থাকলেও মুসলিম সমাজে জাতিভেদ প্রথা বর্তমান এ কথা সকলেই প্রায় স্বীকার করেছেন। তার মধ্যে কিছু কিছু উল্লেখ আশা করি অপ্রাসংগিক হবে না।

উইসকনসিন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জিল্লুর খান ২৪ পরগণার মুসলমানদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে আসেন : '... মুসলিম জোতদার এবং কৃষকগণের মধ্যে একধরনের কঠোর শ্রেণী বিন্যাস গড়ে উঠেছে, যাকে যথাযথভাবে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার সংগে তুলনা করা যায়।' ('কাসট অ্যানড মুসলিম পীজানট্রি ইন ইনডিয়া অ্যানড পাকিস্তান', দ্রষ্টব্য ম্যান ইন ইনডিয়া, এপরিল জুন, ১৯৬৮, পৃঃ ১৩৩)।

শ্রীমতী উমা গুহ তাঁর 'কাসট অ্যামং রুরাল বেংগলি মুসলিমস' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'জাতিভেদ প্রথার অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন খাদ্য ও পানীয়ের দূষিতকরণ, একত্রে আহারের ক্ষেত্রে এবং আন্তঃবিবাহের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ বংগীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে (পূর্বোক্ত পত্রিকা, এপরিল জুন, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬৮)।

এম কে এ সিদ্দীকি কলকাতা মহানগরীর মুসলমানদের উপর ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের মধ্যে বিদ্যমান ও কার্যকর রয়েছে বলে মত পোষণ করেছেন। (মুসলিমস অব কালকাটা, অ্যানথ্রোপোলোজিকাল সারভে অব ইনডিয়া), প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য পুস্তকটিকে ভিত্তি করে আযান বসিদ খান 'দ সেভেনথ ম্যান' নামক তথ্যচিত্র প্রস্তুত করে প্রশংসা পেয়েছেন।

রঞ্জিত ভট্টাচার্য বীরভূম জেলার খিরুলি গ্রামের মুসলমানদের সমাজ কাঠামো নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন, সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত। যদিও তিনি মুসলিম সমাজের এই স্তর ভেদকে প্রকৃত অর্থে জাতিভেদ প্রথা না বলে আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্ক (Inter-ethnic relationship) বলার পক্ষপাতী। (দ কনসেপট অ্যানড ইডিওলজি অব কাসট অ্যামং দ মুসলিমস অব রুরাল ওয়েসট বেংগল, দ্রষ্টব্য : ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ)।

অন্য একটি সমাজ সমীক্ষার প্রতিবেদনে সুরজিত সিংহ এবং রঞ্জিত ভট্টাচার্য মুসলমানদের মর্যাদার তারতম্য অনুযায়ী ভাগ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন তাদের দু ভাগে ভাগ করা হয় : 'ভদ্রলোক' অর্থাৎ উঁচু জাতির মুসলমান, আর সমস্ত নিচু জাতির মুসলমানদের 'ছোটলোক' বলে অভিহিত করা হয়। 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোক' এই বিভাজন হিন্দু জাতিভেদ প্রথার সংগে তুলনীয় এবং সংগতিপূর্ণ বলে লেখকগণ মনে করেন ('ভদ্রলোক' অ্যানড 'ছোটলোক' ইন রুরাল এরিয়াজ অব বেংগল, দ্রষ্টব্য সোসিওলোজিক্যাল বুলেটিন, খণ্ড-১৮, সংখ্যা-১, ১৯৬৯, পৃ: ৫০-৫৬)।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে জাতিভেদ প্রথার লক্ষণগুলি বিভিন্ন এলাকায় অর্থাৎ ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম সমাজের বেলাতেও তা সমান সত্য। এই ব্যবস্থার লক্ষণগুলি সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত সমীক্ষাগুলির প্রায় সব প্রতিবেদনেই দেখান হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। 'আশরাফ' গোষ্ঠীভুক্ত কোন মুসলিমই 'আতরাফ' শ্রেণীর মুসলমানের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান না(বিশেষ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র ছাড়া)। তবে সামাজিক লেনদেন, খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার মত কঠোরতা মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হয় না।

পশ্চিমবংগ তথা ভারতবর্ষের (জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত জেলা মুরশিদাবাদের ঘটনা এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ জেলায় মুসলমানদের দুটো বৃহৎ গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয় : 'খাস' এবং 'আম'। 'খাস' শ্রেণীর মধ্যে পড়েন সৈয়দ, কাজী, খোন্দেকার, চৌধুরী প্রভৃতি জাতির মুসলমান, যারা নিজেদের বিদেশি বংশধর বলে মনে করেন এবং নিজেদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। এই শ্রেণীর মুসলমানদের সাধারণত 'ভদ্রলোক' বা 'মিত্রা' বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে 'আম' শ্রেণীর মধ্যে আছেন অসংখ্য দেশিয় মুসলমান এবং কর্মভিত্তিক জাতিসমূহ, যেমন জোলা, কলু, হাজাম, নিকারি, ধুনুরি, বাজিগর, বেলদার, আব্দাল প্রভৃতি। সমাজ কাঠামোতে এদের পরিচয় 'ছোটলোক' হিসেবে, কোথাও বা শিষ্টাচারে দেখিয়ে 'গেরস্ত' বলে অভিহিত করা হয়। এই দুই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের অবকাশ খুবই সীমিত। কোন 'খাস' শ্রেণীভুক্ত মুসলমান 'আম' শ্রেণীর মুসলমানের সংগে একত্রে পানাহার করতে রাজি হয় না। পুরুষদের বেলায় তা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে আদৌ হয় না বলা যায়।

হিন্দু জাতি কাঠামোতে ব্রাহ্মণদের মতই এই 'খাস' শ্রেণীর মুসলমানগণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন, অধিকাংশ জমির মালিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে অগ্রসর। অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানগণ অর্থনৈতিক ভাবে এদের উপর নির্ভরশীল। তাই সমান সামাজিক মর্যাদা দাবির আগ্রহ প্রকাশ করে না। সামাজিক মর্যাদার তারতম্য অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম জাতিগোষ্ঠী সমাজ কাঠামোতে নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে। কতকগুলি মুসলমান জাতি সামাজিক দিক থেকে পুরোপুরি বর্জিত। যেমন নিকারি, বেলদার বা আব্দাল জাতির মুসলমানদের সংগে অন্য কোনও মুসলমানই সহজভাবে মেলামেশা করে না। অনেক ক্ষেত্রে এদের সংগে 'অস্পৃশ্যে'র মত ব্যবহার করা হয়।

দুটো বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যই শুধু যে হয় তাই নয়, এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। যেমন, 'খাস' শ্রেণীর অন্তর্গত একদল মুসলমান নিজেদের 'আয়মাদার' বলে অভিহিত করে এবং সমাজকাঠামোতে বিশেষ মর্যাদা দাবি করে। 'আয়মাদার' কথাটির অর্থ হল 'আয়মা' জমির মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকারী ব্যক্তি। মুসলমান শাসকদের আমলে জ্ঞানী মুসলমান পবিত্র কর্তব্য পালনের বিনিময়ে খাজনা মুক্ত যে জমি ভোগ করতেন, তারই নাম হল আয়মা। পরবর্তীকালে ধর্মগুরুর উত্তরাধিকারীগণ বংশানুক্রমে এই অধিকার লাভ করে এবং তদনুযায়ী সমাজেও বিশেষ মর্যাদায় অবস্থান করে। বর্তমানে এই সুযোগ বিলুপ্ত হলেও 'আয়মাদার'গণ 'আম' শ্রেণীর মুসলমানদের থেকে তো বটেই, 'খাস' শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য মুসলমানদের সংগেও একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখায় আগ্রহী।

বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে যেক্ষেত্রে সবচেয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা হল বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি মুসলমান জাতি নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিশেষত 'খাস' শ্রেণীর মুসলমান পরিবারের সংগে সাধারণ মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা প্রায় বিরল। বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে আম-শ্রেণীভুক্ত কোন মুসলমান উচ্চশিক্ষা লাভের পর ভাল চাকরি লাভ করলে 'খাস' শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপার গৃহীত হচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় অবস্থিত এই মুসলিমগণ (খাস শ্রেণীভুক্ত) বর্তমানে ইতিহাসের গতিতে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অবক্ষয়ের পথে।

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে এমন সব গ্রাম্য ছড়া ও প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যাতে মুসলমানদের সামাজিক পার্থক্য খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ রকম কিছু ছড়া এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান
আর সব যেমন তেমন।'

এখানে বিদেশি বংশোদ্ভূত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় আর একটি ছড়াতে 'মল্লিক' গোষ্ঠীর মুসলমানদের হেয় করে দেখান হয়েছে :

'শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান
কুকুরের গুয়ে মল্লিকের বাথান।'
['বাথান' কথাটির অর্থ হল আবাস]

পেশায় যারা 'নিকারি' (মাছ বিক্রেতা), তাদের নিম্নমানের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'বেচতে মাছ, কোলে ভাত।'

এ জেলায় 'কাহার' নামে এক শ্রেণীর মুসলমান আছে যাদের বংশগত পেশা ছিল পালকি বওয়া। বর্তমানে তারা এ পেশায় নেই তবুও সমাজ কাঠামোতে তাদের মর্যাদা নির্দেশ করা হয়েছে একটি ছড়াতে :

'পালকি বওয়া জাত
ঘাড় তোদের কাত।'

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সংগে সংগে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, এমন ইংগিত বহন করে কতকগুলি ছড়া :

(১)'আগে ছিলাম তুল্লা মোল্লা,
হয়েছি উদ্দিন,
এবার যদি হয় ধান,
বাড়বে আমার মান
হব সৈয়দ না হয় শেখ।'

(২)'আগে হয় তুল্লা মোল্লা
পরে হয় উদ্দীন
শেখের শেখ আগে যায়
তকদির ফিরে যতদিন।'

আয়তন বৃদ্ধির আশংকাতে আর উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না।

এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে মুসলমান জনগণ ধর্ম বিশ্বাসে এক হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বর্তমান। সেই পার্থক্যগুলিকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার সংগে তুলনা করা যায়। □

মুসলিম সমাজে বিবাহ সমস্যা

ওবায়দ-উল হক

ইসলাম ধর্ম পূর্ণ বয়স্ক, সুস্থ, সবল ও উপার্জনক্ষম পুরুষকে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে। অবশ্য নারীকেও সেই মত উপযুক্তা হতে হবে। ইসলামে এই বিবাহ সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন, অথচ প্রেম ভালবাসায় পূর্ণ। বিবাহ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীনভাবে তাদের ইচ্ছা ও মত প্রকাশ করতে পারেন। পণপ্রথার কোন প্রশ্ন নেই। আছে মোহর (dowry) যা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য। এই মোহরের টাকা অবশ্যই স্বামীকে দিতে হবে এবং সেটা একান্তভাবে স্ত্রীর সম্পদ হিসাবে গণ্য। উভয় পক্ষ সামর্থ্য থাকলে ইচ্ছা মত দেওয়া নেওয়া এবং আত্মীয়জনকে আপ্যায়ন করতে পারেন কিন্তু বাধ্যবাধকতা নেই। পরবর্তী কালে ইসলাম বিরোধী অনেক কাজই প্রচলিত হয় বিবাহ অনুষ্ঠানে। মুসলমান সমাজ জীবনে এই আনন্দ ও উৎসবের জাঁকজমক প্রচলন হয়েছিল নবাব, জমিদার ও আয়মাদার শ্রেণীর মধ্যেই, কিন্তু পরে অনুকরণের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সমাজের সমস্ত স্তরেই সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কালের নিয়মে অনেক রীতি পদ্ধতি রূপান্তর ঘটায় আর্থিক বৈষম্য বেড়েছে। কিন্তু মুসলমানরা বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে খরচের মাত্রা কমাল না, গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ্রাম্য মোড়লের হুকুম মানতে তাদের হাড় ভাঙা খাটুনির উপার্জন এবং সামান্য জমিজমা যা ছিল আস্তে আস্তে হারাতে লাগল। অন্য দিকে বেশির ভাগ সম্ভ্রান্ত ও ধনী মুসলমান নিজেদের আড়ম্বরের ভুয়োগর্ব ও মর্যাদার লড়াই দেখাতে গিয়ে নিজেদের সম্পত্তি, সঞ্চিত অর্থ এবং অলংকার সব মহাজনের হাতে তুলে দিল। দূরদর্শিতার অভাবে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ না করে সরকারি চাকুরি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অর্থের সমাগমের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার উপর অনৈস্লামিক প্রথা ও ভাবধারার আকর্ষণে সম্পদ হাত থেকে বেরিয়ে গেল। ফলে মুসলমানগণের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু আশরাফ (যারা সম্ভ্রান্ত, সমাজে উচ্চ বংশ বলে বিবেচিত) আর আতরাফের (যারা সম্ভ্রান্ত নয়) মধ্যে বিভেদের দেওয়াল ভাঙল না। মনে রাখতে হবে আশরাফ ও আতরাফ কিন্তু সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ভাবধারা।

আশরাফ ও আতরাফের বিচার এতই প্রকট ছিল যে সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী মার্জিত রুচির মেয়ের বিবাহ তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মূর্খ, বেকার, দুশ্চরিত্র ছেলের সংগে দেওয়া হত কিন্তু সম্ভ্রান্ত নয় এমন ঘরের চরিত্রবান, শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম পাত্রের সংগে বিবাহ দেওয়া হত না। এই কারণেই ছেলেমেয়ের বিবাহ গ্রাম, থানা, মহকুমা ও জেলার মধ্যেই বেশির ভাগ সময়ে সীমাবদ্ধ থাকত। মুসলিম সমাজে আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের প্রচলন তার একটা বড় কারণ। এতে পছন্দ মত ছেলেমেয়ের অভাব দেখা দিয়েছে এবং ঘৃণ্য পণপ্রথা চালু হয়েছে।

কর্মদোষে বা ভাগ্যদোষে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যেই আর্থিক কষ্ট প্রকট হয়ে উঠল। শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য দিয়ে, কৃত্রিম মর্যাদার মোহ কাটিয়ে, সময়ের ডাকে বাস্তবকে গ্রহণ করতে পারল না। কিন্তু যারা ছিল এক দিন উপেক্ষিত এবং অশিক্ষিত তাদের মধ্যে দেখা দিল বড় হবার, শিক্ষিত হবার প্রেরণা। গ্রামে, গঞ্জে বৃহত্তর মুসলিম সমাজে দল বাঁধা আরম্ভ হল। এক দলের ছেলেমেয়েদের বিবাহ অন্য দলের পাত্র পাত্রীর সংগে দেওয়া চলত না। এই সমস্যার সংগে সংগে কিন্তু পণের টাকার অংক বাড়ল বই কমল না।

এরই মধ্যে এল দেশ ভাগ। ভারত ও পাকিস্তান দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। বড় মাঝারি ও নিম্ন চাকুরিজীবী মুসলমান প্রায় সকলেই চলে গেলেন পাকিস্তানে। তারই সংগে গেলেন বড় ব্যবসায়ীরাও। আর্থিক সংগতি শূন্য সম্ভ্রান্ত পরিবার, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরিব মুসলমানগণ রয়ে গেলেন দেশের মাটি আঁকড়ে। তাঁদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল জীবন মরণ সমস্যার ঝড়। নতুন পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার চিন্তায় বিভিন্ন পথ মুসলমানরা অবলম্বন করলেন। চাকুরি পাওয়া তাঁদের কাছে এক স্বপ্ন। ছোট ব্যবসা, চাষাবাদ ও হাতের কাজের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ছেলেদের শিক্ষার দিকেও নজর দিলেন। অবশ্য মেয়েরাও শহরে কিছু কিছু শিক্ষার সুযোগ পেলেন। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারলেন না সামাজিক বাধা ও অনুকূল পরিবেশের অভাবে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে মেয়ের বিবাহ সমস্যা যতটা সহজ হওয়া দরকার ছিল তা মোটেই হল না।

কিছু সাধারণ সমাজসেবী মানুষের বিশেষ চেষ্টার ফলে গ্রাম ও শহরে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে কিছুটা এগিয়ে নিতে সাহায্য করল। অনেক কষ্ট স্বীকার করে সময়ের সংগে পা মিলিয়ে চললেন মুসলমানের মাত্র এক অংশ। বিরাট অংশ কপালে হাত রেখে সময় গুণতে লাগল। ফলে মেয়েদের বিবাহ এবং সমাজ জীবন সহজ সরল হল না বরং পারিপার্শ্বিক প্রভাবে নানা জটিল সমস্যায় ভরে উঠল। মেয়েকে শিক্ষা দিয়েও বরপণের সুরাহা হল না। এরই মধ্যে যে সমস্ত ছেলে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক বা কেরানি এবং ইনজিনিয়র হলেন তাঁরাও সমাজের মংগল ও উন্নতির চিন্তাই করলেন না। তাঁদের অভিভাবকরা বরং বরপণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। আর্থিক অক্ষমতার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন। ফলে ঐ সমস্ত দাম্পত্য জীবনে অভাব অনটনের জ্বালায় সুখ শান্তি নষ্ট হল।

ব্যবসা করে অনেক মুসলমান অবস্থা ফেরালেন। চলল বরপণের টাকার প্রতিযোগিতা, ফলে ভাল মন্দ বিবাহযোগ্য পাত্রের দাম গেল আরও বেড়ে। পবিত্র বিবাহ আর পবিত্র রইল না হয়ে উঠল ঘৃণ্য ব্যবসা। আশরাফ ও আতরাফের ভেদাভেদ যদিও বা কিছু কমল কিন্তু পাত্রের উচ্চমূল্য কমল না। দিন আনে দিন খায় এমন অশিক্ষিত পাত্রের জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কম করে দুই থেকে তিন হাজার টাকা ব্যয় করতে বাধ্য করা হল। সামান্য লেখাপড়া জানা পাত্ররা যারা হাতের কাজ বা ছোটখাট সংস্থায় চাকুরি করে, তাদের বেলায় কম করে দশ থেকে পনের হাজার টাকা। উচ্চ শিক্ষিত পাত্রের কথা না বলাই ভাল সেখানে পঞ্চাশ হাজার থেকে লাখ টাকার উপর হিসাব। কয়জন মুসলমানের সামর্থ্য আছে মেয়েদের বিবাহে এই বিরাট টাকা খরচ করার?

মুসলমান সমাজের বিপদ এখানেই শেষ নয়, অন্য এক সমস্যা সমাজের বুকে দানা বাঁধছিল, ক্রমে সেটা বড় হয়ে উঠল। তা হল শিক্ষিত ছেলের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল, পারিপার্শ্বিক প্রভাবে রুচিপরিবর্তন এল। তাদের মনের মত মেয়ের অভাব দেখা দিল। যদিও বা দু'পাঁচ জন শিক্ষিত মেয়ে নজরে পড়ল তারা আবার রূপ, রং, উচ্চতা এবং আধুনিক চাল-চলনের প্রতিযোগিতায় বাতিল বলে গণ্য হল। আবার মুসলমান শিক্ষিত ছেলেরা অমুসলমান শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল, তাদের মধ্যে মানসিক মুক্তির খোরাক পেল।

বিবাহের সংগে নতুনের জন্ম ও বংশবৃদ্ধির প্রশ্ন একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই এখানে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা অপ্রাসংগিক হবে না। ইসলাম ধর্ম যেমন বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার কী কর্তব্য সে কথাও বলেছে। সন্তানকে ঠিকমত খাইয়ে পরিয়ে বিশেষ যত্নে মানুষ করতে বলা হয়েছে, সংগে সংগে ছেলে ও মেয়ের উভয়ের শিক্ষার প্রতি নজর দিতেও হবে। যদি কোন পিতা মাতা তাদের সন্তানের প্রতি ঐ দায়িত্বগুলি পালন করতে অক্ষম হন তবে তাদের সংযম অভ্যাস করতে বলা হয়েছে, পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমনকি মিলনের চরম মুহূর্তে পুরুষকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কথাও বলা আছে। এই সমস্ত নির্দেশের মধ্যেই আধুনিক কালের পরিবার পরিকল্পনার কথার পরিষ্কার ইংগিত নেই কি? আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমান সমাজের এক অংশ ইসলামের বৈপ্লবিক নির্দেশ যা আধুনিক যুগের সংগে খাপ খাইয়ে চলতে বিশেষ সাহায্য করে সেগুলির প্রতি চিন্তা না করেই আধুনিক শিক্ষাকে দোষারোপ করেই নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন।

দুঃখের বিষয়, আজ মুসলমান সমাজে যাঁরা সমাজপতি এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছেন এবং যারা ধর্মগুরু তাঁরা এই ঘৃণ্য পণপ্রথার বিরুদ্ধে এবং ছেলেমেয়েরা ইসলামের নির্দেশ মত যাতে লালিত পালিত হয় সে বিষয়ে কোন আন্দোলনই করছেন না। বিবাহ ব্যাপারে ইসলামের সহজ, সরল নিয়মকে ফিরিয়ে আনবার কোন চিন্তাই করেন না।

মুসলিম সমাজের এই বিপর্যয় রোধ করতে পারে একমাত্র শিক্ষিত যুব এবং ছাত্র সমাজ। তাঁরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন—বিনাপণে বিবাহ করবেন এবং অন্যকে ঐ কাজের কুফল বুঝিয়ে বিরত রাখবেন। মেয়েদের সুষ্ঠুশিক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে তাদের মর্যাদা দিতে হবে। ইসলামের সুষ্ঠু ও বৈপ্লবিক শিক্ষাকে কাজে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে আধুনিক যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইসলামের শিক্ষা বিশেষভাবে সহায়ক, প্রতিবন্ধক নয়। □

সঞ্চয়িতায় লগ্নি করা টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে কি ?

শ্যামল বসু

সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটে টাকা রেখে অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালি রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সে স্বপ্ন আপাতত বিলীন। বড়লোক তো দূরের কথা তারা অনেকেই এখন সর্বস্বান্ত। 'সঞ্চয়িতা' আদালতে অভিযুক্ত হবার পর থেকে প্রত্যেকেরই হতাশ জিজ্ঞাসা আসলটা ফেরৎ পাব তো ? এর উত্তর খুঁজতে প্রথমে দেখা যাক সুপরিম কোরটের সাম্প্রতিক নির্দেশ।

৪ মে সুপরিম কোরট সঞ্চয়িতার আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে একজন কমিশনার নিয়োগ করার আদেশ দিয়েছেন। সুপরিম কোরটের প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি আর এস পাঠক এবং বিচারপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেনচ সঞ্চয়িতার ক্ষুদ্র আমানতকারীদের রিট আবেদন এবং হস্তক্ষেপ প্রার্থনার আবেদনের প্রসঙ্গে এই নির্দেশ দেন। নির্দেশে বলা হয়েছে, যে সব আমানতকারীর আমানতের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকার বেশি নয়—তাঁদের কলকাতা হাইকোরটের মনোনীত কমিশনারের কাছেই তাঁদের দাবি পেশ করতে হবে। এই কমিশনার আমানত ফেরৎ দেবার উপায় ও ব্যবস্থার জন্য সুপরিম কোরটের কাছে সুপারিশ করবেন। ১৯৮৩ সালের ১ সেপটেমবরের আগে ওই কমিশনারকে আমানতকারীদের তালিকা ও প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির সঙ্গে কলকাতা আয়কর দফতরের দাবিও সুপরিম কোরটে জমা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজকে ঐ কমিশনার পদে নিয়োগ করতে হবে।

কমিশনার সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোমপানির সমস্ত সম্পত্তি, নথি ও কাগজপত্র, তার এজেনট, সাব এজেনট, হস্তান্তরকারী এবং বেনামদারদের দায়িত্ব নেবেন। এই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে সুপরিম কোরট কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন বলে কমিশনারকে পাঁচটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১৫ দিন অন্তর দুটি বিজ্ঞাপন দিতে হবে। ঐ বিজ্ঞাপনেই আমানতকারীদের বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন থেকে এক মাসের মধ্যে তাঁদের দাবি পেশ করতে আহ্বান করা হবে।

বিচারপতিদের নির্দেশে বলা হয়েছে সঞ্চয়িতার যে ৫২ লক্ষ টাকা স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় জমা আছে, তা সুদসহ ঐ কমিশনারকে জমা দিতে হবে। কলকাতা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক কমিশনার নিয়োগ করার এক সপ্তাহের মধ্যে এই টাকা তুলে দিতে হবে এবং ঐ কমিশনার ঐ টাকা আবার তাঁর নিজের নামেই ওই ব্যাংকে জমা রাখবেন। স্টেট ব্যাংক অব ইনডিয়া ১৯৮২ সালের ৮ মে থেকেই এই টাকার আমানত ফের নবীকরণ করবে। যদি নিয়মকানুনে অনুমোদনযোগ্য হয় তবেই এই নবীকরণ করা হবে।

কলকাতা আয়কর বিভাগও সঞ্চয়িতার অংশীদার এজেনটদের কাছ থেকে প্রাপ্য কর আদায়ের দাবি পেশ করবেন এই কমিশনারের কাছে এবং কমিশনার তা সুপরিম কোরটের কাছে পেশ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে যে সব তদন্ত চালাচ্ছেন সে সব ক্ষেত্রে কমিশনার সহযোগিতা করবেন এবং কোন নথিপত্র আটকের ক্ষেত্রে সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে যে সব মামলা চলছে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেই সব আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

এই মামলা থেকে স্টেট ব্যাংক অব ইনডিয়া, রিজারভ ব্যাংক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবুও প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের উপস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করা যেতে পারে।

এই কমিশনারের কাছে আবেদনকারীদের সকল দাবিই হলফনামা হিসেবে গণ্য হবে।

টাকাটা কখন ফেরৎ পাওয়া যাবে এই কথাটাই যারা এই মুহূর্তে ভাবছেন তাদের কাছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের কাছে সুপরিম কোরটের এই নির্দেশ কিছুটা আশ্বাস দিতে পেরেছে। এই ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সংখ্যাটা যে কত এবং মোট আমানতের পরিমাণ কত এখনও পর্যন্ত সেই হিসেবটা কেউ জানেন না। এই মোট আমানতের পরিমাণ এবং লগ্নিকারীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করেই তৈরি হবে সুপারিশ। এতদিন পরে তাই ক্ষুদ্র আমানতকারীদের একটা অংশ মনে করছেন এ বছরের শেষাশেষি নাগাদ হয়তো শিকে ছিঁড়তেও পারে। তবে হাতে না পাওয়া অবধি চিন্তার শেষ নেই। 'সঞ্চয়িতা'র টাকা ফেরৎ পাবার জন্য বর্তমানে সারা পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি আমানতকারী সমিতি তৈরি হয়েছে। এদের বিভিন্ন অংশ ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমিতিভুক্ত হয়ে মামলা রুজু করেছেন। আমানতকারীরা বিভিন্ন ধরনের আয়ের মানুষ। পেশাও বিভিন্ন। সংগঠিত কোন রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন সমিতির মত এরা নন। এখনও পর্যন্ত অনেকে ঠিক করতে পারেননি কী করবেন। এদের মধ্যে অনেক-রকম মত ও চিন্তা পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। কোন কেউ বলছেন, যাদের আমানতের পরিমাণ দশ হাজার টাকার কম তাদের প্রস্তাবই আগে ভেবে দেখার দরকার। আবার অন্য পক্ষের মত, যারা দু বছরের কম সময় সুদ পেয়েছেন সেই হিসেবেই টাকা দেওয়ার কথাটা ভাবা উচিত। এখানে দু বছর হিসেবটা শতকরা ৪৮ টাকা হারে প্রাপ্ত সুদের হিসেবে। মোট কথা, সকলেই একটা বিষয়ে আগ্রহী, তাঁর নিজের টাকা যে হিসেবে রেখেছেন তাঁরা সেই ভাবেই বিষয়টি নিয়ে অগ্রাধিকার দেবার দাবি করছেন। এজাতীয় সংস্থাগুলির যে পরিমাণ সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন সে পরিমাণ হতে পারছেন না। কারণ এর মধ্যে অনেক সদস্যই কেবলমাত্র এ ধরনের সংস্থায় আস্থা না রেখে চুপিচুপি—সেই পরিচিত ভদ্রলোকটি, যার কথায় আস্থা রেখে টাকা জমা রেখেছিলেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও রাখছেন। কেউ কেউ পরিচিত লোক ধরে হুমকি কিংবা অনুরোধ করে অর্ধেক কিংবা যতটা পারা যায় ততটা টাকা তুলেও নিয়েছেন। ইনডিয়ান এয়ারলাইনসে চাকরী করেন এমন এক সদস্য এম শর্মা একটি উদাহরণ দিলেন। ধরা যাক, দশ হাজার টাকা কেউ জমা রেখেছিলেন সঞ্চয়িতায়। তাঁর কাছে সেই শতকরা ১২ টাকা সুদের একটা সারটিফিকেটও আছে। পরিচিত লোক ধরে তিনি সেই সারটিফিকেটে সই আছে এমন কোন নামবারের আধিকারিককে খোঁজ করলেন। 'এস বি'র সাবএজেনট ভয় পেয়ে বা অনুগ্রহ করে 'এস বি'র ঠিকানা দিয়ে দিলেন। 'এস বি'র সঙ্গে যখন ঐ আমানতকারী দেখা করলেন তখন তিনি দেখলেন 'এস বি' আসলে একজন সরকারি চাকুরে। কিংবা 'এস বি'র সাব এজেনটটি একজন সরকারি কর্মচারী। কিছু দিন অনুনয় বিনয় চললো। এতে যদি ফল পাওয়া গেল তো ভাল। না হলে আমানতকারী ভদ্রলোক আবার চাপ দিতে শুরু করলেন অন্যভাবে। এবার কিছুদিন বাদে ভদ্রলোকটিকে 'এস বি' প্রস্তাব দিলেন। নিয়ে আসুন সারটিফিকেট। সারটিফিকেটটা নেবার জন্য 'এস বি' অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। কাউকে বললেন 'সি সি' বলে একটা নতুন কোমপানি খুলেছি—সারটিফিকেটের অর্ধেক টাকা নিয়ে যান আর বাকিটা সই করে দিয়ে যান ঐ নতুন কোমপানিতে রাখার জন্য। এইভাবে অর্ধেক থেকে তিন চতুর্থাংশ অবধি এই বিভিন্ন আদালতে মামলা চলাকালে টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোড নামবার হোলডার আমানতকারীর যোগাযোগ সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিংবা কিছু মাসলম্যান সমর্থনপুষ্ট কিনা দেখে

নিয়ে ব্যবস্থা করেছেন। এইটি কেবল বিশেষ কোন 'কোড' নয়', সামগ্রিকভাবে যা চলছে তার উদাহরণ হিসেবে ঘটনাটি বললেন আমানতকারী সংঘের সদস্য। তাঁর হিসেবে এই কারণগুলোই তাদের সমিতিকে সঠিক ভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না।

তরুণ আইনজীবী কুমার চক্রবর্তী, যিনি সঞ্চয়িতা আমানতকারীদের সংঘকে আইনের পরামর্শও দিয়ে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেলে উত্তর পাওয়া যাবে 'এখন তো মশাই আরো বিশ বাঁও জলে। তবে হ্যাঁ, আশা ছেড়ে দেবার কোন কারণ নেই। কিছু সংখ্যক আমানতকারী হয়তো টাকা এবছরের শেষাশেষি পেতে পারেন তবে সকলকে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা তা এ মুহূর্তে ভাবা যাচ্ছে না।

সঞ্চয়িতা পরিকল্পনাকে রাজ্য সরকার প্রথমদিকে চিট এনড মানি সারকুলেশন আইন ১৯৭৮-এর আওতায় আনবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন পারা যায়নি। কতকগুলি টেকনিক্যাল গ্রাউনডে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন সুপরিম কোরট। কালো টাকা না হলে মাত্র সাত হাজার টাকা মূলধন সম্বল করে মাত্র ৫ বছরে একশ কোটি টাকা লেনদেন করতে পারে কি করে? এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য তদন্ত ব্যুরো এখন বিশ্বাস-ভংগ ও প্রতারণার দায়ে ফৌজদারি মামলা রুজু করেছেন। কিন্তু আমানতকারীরা টাকাটা ফেরৎ চান। বড় লোকদের কথা ছেড়ে দিন। নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তদেরই যত সমস্যা। চাকরী থেকে অবসর নেবার পর আমার এক ক্লায়েনট তাঁর পরিচিত জনের পরামর্শে টাকার বেশির ভাগটাই জমা রেখেছিলেন 'সঞ্চয়িতায়'। মাস গেলে বাড়িতে বসে সুদ পেতেন। মোটামুটি ভাবে সুদের অংকটাও কম ছিল না। ভেবেছিলেন এমনি করেই আসলে হাত না দিয়ে সংসার খরচটা চলে যাবে। আর একটি মেয়ের পাত্র খুঁজছিলেন বিয়ে দেবার জন্য। বিয়ের সময় পাকা হিসেবির মত জমা দেওয়া টাকার অর্ধেকটা তুলবেন। পাত্র যখন মিললো তখন আসল টাকার হদিস তিনি পেলেন না। রোজ সকালে দেখবেন অফিস টাইমে ভদ্রলোক এ পাড়ায় একবার করে আসবেন। এদিক ওদিক করে বারবার ৪-৫ নমবর ফ্যানসি লেনের বাড়িটার দিকে যাবেন আর একবার করে আমার কাছে আসবেন। কিন্তু সত্যিই যে এখন কিছু করার নেই ভদ্রলোকটিকে বোঝাতে পারিনি। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। রোজ এসে বলবেন "দিন না চক্কোত্তি সাহেব একটা মামলা ঠুকে। খরচ খরচা ঠিক আদায় হয়ে যাবে। আমাকে বিশ্বাস করুন।" এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, ফিরতি ট্রামে বাড়ি ফিরবেন। একদিন নয়, রোজই ভদ্রলোক ঠিক একই আশায় আসেন। নিজের এমন পয়সা নেই যে মামলা করতে পারবেন। তাই এই সংঘ। আর চাঁদা তুলে আপাতত মামলার খরচ চালান হয়।'

আইনজীবী চক্রবর্তী বললেন-- 'তবে আপাতত যাঁরা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা রেখেছেন তাঁরা একটি হলফনামা দাখিল করলেই দাবিটা আইন অনুযায়ী করতে পারবেন। তবে হলফনামার গুরুত্বটাও যাঁরা হলফনামা দাখিল করবেন তাঁদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত।'

সেটা কী রকম?

'ধরুন, কেউ শতকরা ৪৮ টাকা হারে জমার সময় থেকে সুদ পেয়েছেন। ব্যক্তিগত আয়কর রিটারনে সেটা দেখান আছে কি না? যদি থাকে তবে রিটারন দাখিলের ক্ষেত্রে শতকরা ১২ টাকা হারের সুদ প্রাপ্তির যে চেক তা দেখান আছে কি না? এছাড়া আরো একটি প্রশ্ন, যদি কোন হলফনামায় যে টাকার অংক সঞ্চয়িতায় জমা আছে বলে বলা হয়েছে সেটি আয়কর বিভাগকে পরবর্তী রিটারনে কী ভাবে দেখাবেন? আগে যদি কখনো কোনভাবে এই টাকার হিসেব দাখিল করা না হয় তবে সে ক্ষেত্রে সামান্য অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে সকলেই যে অসুবিধায় পড়বেন তা নয়, তবে টাকার উৎস এত দিন গোপন রাখার জন্য আয়কর বিভাগ প্রশ্ন করতেই পারেন। অতএব হলফনামাটি সঠিকভাবে নিয়মানুগ হওয়া চাই।'

বি এন আইচ ভৌমিক চাকরি করেন একটি আধা সরকারি সংস্থায়। ইনিও সঞ্চয়িতায় নিজের প্রফিডেনট ফানড থেকে টাকা রেখেছিলেন। অফিসের সহকর্মীর অনুরোধে টাকাটা রাখলেও তাঁর যে সুদের প্রতি লোভ ছিল তা অস্বীকার করলেন না। টাকাটা ফেরত পাবার আশা তিনি এখন আর করেন না। চাকরি আছে আর বছর পাঁচেক। এর মধ্যেই ঘাটতিটা সামলে নিতে চান। আরো বেশি রোজগারের সন্ধানে ঘুরছেন। পাশাপাশি সঞ্চয়িতা আমানতকারীদের কয়েকজনকে নিয়ে একটি সংঘ গড়ে তুলতে চাইছেন। আবার কেন একটা নতুন সংঘ? এ প্রশ্নের উত্তরে আইচ ভৌমিকের বক্তব্য, টাকা আমানত করা হলে তার যত দিনেরই সুদ পেয়ে থাক টাকাটা এখন ফেরত পেতে হবে। সুদ দেওয়াটা একটা বিশেষ শর্ত ছিল। এবং যত দিন না টাকাটা হাতে আসে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যোক আমানতকারীরই সুদ প্রাপ্য। ... কেউ কম দিন রেখেছেন বলে ... পাবেন বা বেশি দিন ... পেয়েছেন ... পাবেন এমনটি ...

এই সামান্য ... একের পর এক ... আমানতকারীদের সংস্থা হচ্ছে এখন। এদের মধ্যে সঞ্চয়িতা আমানতকারী সমিতি ও আমানতকারী সংঘ এদু'টি প্রতিষ্ঠান এই মুহূর্তে সরকারি দপ্তরে যাতায়াত করছেন। রাজ্য তদন্ত সেলের সংগে জড়িত ছিলেন এমন একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বক্তব্য 'এজাতীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চয় সরকারকে তদন্ত করতে সাহায্য করতে পারেন। তবে বেশির ভাগেরই কেমন যেন ঢাকঢাক গুড় গুড়। নাম অনেক কষ্টে বলেন তো ঠিকানা বলেন না। ঠিকানা বলেন তো কোন সূত্রে যোগাযোগ তা বলেন না। তবে যাঁরা আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের আবেদনগুলি রাজ্য সরকারকে তদন্ত করতে নিশ্চয় সাহায্য করেছে।'

টাকাটা কবে পাওয়া যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, 'টাকা সঠিক কবে পাওয়া যাবে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে এ বিষয়টিকে আন্দাজ করার জন্য আগে পরিষ্কার হওয়ার দরকার এই সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোমপানির ইতিহাসটা।

ইতিহাসটার আবার দরকার কেন? একথা উঠতে পারে। তাই বলে রাখা ভাল যে টাকা লগ্নিকারীরাও যে এই কোমপানির কাজ কারবারে অন্যতম সহযোগী এটা পরিষ্কার না হলে কার টাকা কিসের টাকা আর কেনই বা ফেরত পাবার প্রশ্ন এগুলো, আর সবচেয়ে বড় কথা কবে পাওয়া যাবে সেটা বোঝার পক্ষে একান্ত দরকার।'

এক প্রাক্তন সরকারি চাকুরের বর্ণনায়, ১৯৭২ সালে বিহারীলাল মুবারকা নামে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, অপর দুজন বাঙালি সহযোগী একজন শম্ভুপ্রসাদ মুখার্জি, অন্যজন স্বপন কুমার গুহকে নিয়ে সঞ্চিতা সেভিংস স্কিম চালু করলেন। শম্ভু মুখারজি ছিলেন একটি কেমিসট শপের সংগে জড়িত আর স্বপনবাবু ছিলেন রিজারভ ব্যাংকের কলকাতা শাখার কয়েন এগজামিনার। সাকুল্যে ৭ হাজার টাকা নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের একটি ভাঙা বাড়িতে ব্যবসা শুরু হল। ব্যবসা হল চিট ফানডের। ভালই চলতে লাগল। তিন বছরের মধ্যেই নতুন সংস্থা হল অনির্বাণ চিট ফানড। মুবারকা, মুখার্জি আর গুহ এই তিন জনের সত্তর দশকের শুরুতে এই চিট ফানড ব্যবসা অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ব্যাংক অব মাদুরা ভবানীপুর অঞ্চলে একটি শাখা খুলল। ওখানে চাকরি নিলেন আর ভেংকটরমন। ভদ্রলোকটি দক্ষিণী চিট ফানড ব্যবসার সংগে বিশেষ ভাবে পরিচিত। এর আগে গোটা দুই ব্যাংকে কাজ করেছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগে আগের দুটি ব্যাংক ছেড়ে আসতে হয়। মাঝখানে কিছুদিন ভবানীপুর অঞ্চলের এক ব্যবসায়ীর অ্যাকাউনটেনট ছিলেন। বর্তমানে ইনি একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের রিজিওনাল ম্যানেজার। কিন্তু উনি যখন ব্যাংক অব মাদুরাতে চিটফানডের ব্যবসা চালু করেন ১৯৭৪ সালে তখন রিজারভ ব্যাংক একটি বিশেষ স্টাডি টিম তৈরি করলেন। এই জেমসরাজ স্টাডি টিমের রিপোরটটি ১৯৭৫ সালে পেশ করা হয়। ১৯৭৫ সালে রিপোরটটি রিজারভ ব্যাংক অব ইনডিয়া থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই সঞ্চিতা সেভিংস স্কিম আর অনির্বাণ চিট ফানড গুটিয়ে গিয়ে নতুন ফারম তৈরি হল সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোমপানি। এটি একটি পারটনারশিপ ফারম হিসাবে রেজিসট্রি করা হল। কাজ হল উপযুক্ত সুদের

৩ লাখ টাকায় তৈরি সংগতিপ্রা

বিনিময়ে সাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া ও ব্যবসাতে লগ্নি করা। ইতোমধ্যে জেমসরাজের রিপোরট অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে চিট ফানড ও মানি সারকুলেশন ব্যানিং অ্যাকট চালু হল। সরকারি ফাইল ঘুরে আসতে সময় লাগল আরো প্রায় দুবছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮০ সালের ২৫ সেপটেমবর কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের ১১৩টি কোমপানির ওপর ব্যবসা বন্ধ করার নোটিশ দিল। ঠিক এর এক দিন বাদে সুপরিম কোরটে এই আইন প্রয়োগের যথার্থতা চ্যালেনজ করা হল। কিন্তু ধোপে টেঁকেনি। এক বছরের মধ্যেই চিট ফানড কোমপানিগুলির ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হল। সঞ্চিতা আর অনির্বাণ এদুটি চিট ফানডের তখন কোন আলাদা অস্তিত্ব ছিল না।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট দক্ষিণ ভারতের 'হিন্দু' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করল। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের কার্যপদ্ধতি রিজারভ ব্যাংকের নিয়মানুগ। এদের নিজেদের এজেনট, সাব এজেনটদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে লাগল। এর মধ্যে বহু ব্যাংকের ম্যানেজার, ক্লারক, ইনডিয়ান এয়ার লাইনসের কিছু কর্মচারীও জড়িত হয়ে পড়লেন। জীবনবীমার বহু কর্মচারীও এদের এজেনট হলেন। আয়কর বিভাগ ও বিভিন্ন বাণিজ্যকর সংস্থাগুলিতে এদের সাব এজেনটের সংখ্যা বেড়ে চলল। মধ্যবিত্তকে মোটা সুদ দেবার টোপ দেওয়া হল। দু বছরেই জমা টাকা উঠে আসবে এমনি সুদের হার। আর আসল তো আসলই থাকবে। বিশ্বাসভাজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে মধ্যবিত্তের সঞ্চয় জমতে লাগল সঞ্চয়িতার ভান্ডারে। আর যাদের কাল টাকা আছে, তাদের কাছে তো হাতে স্বর্গ পাওয়া। এ টাকা কোথায় খাটছে জিজ্ঞেস করলে প্রতিমাসে বাড়িতে আসা এজেনট বা সাব এজেনট বলত, টাকা খাটছে ফিলম ইনডাসট্রিজে। বাড়ি বয়ে যে সুদ দিয়ে যায় তাকে সন্দেহ করা যায় না—এটা মধ্যবিত্তের স্বভাব। বড় লোকেরাও শতকরা ১২ টাকা হারে সুদের চেক নমবর আয়কর রিটারনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহা খুশি। আয়কর বিভাগেও তেমন আপত্তি না থাকায় বড়লোকদেরও কোন অসন্তোষ ছিল না। ব্যাংক ম্যানেজারদের মধ্যে যারা সাব এজেনট ছিলেন তারা কোন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিট করতে এলে তাঁর কাছে সঞ্চয়িতার নানা গুণপনা ব্যাখ্যা করে টাকাটা ব্যাংকে না রেখে সঞ্চয়িতায় রাখাতেন। এতে ম্যানেজার সাহেবের কমিশন হাফ পারসেনট। এজেনটরা পেতেন এক পারসেনট। এটা এল আই সি (L.I.C.) র মতন কখনো কমত না। নামী ক্লাবের জনৈক ফুটবল খেলোয়াড় এরকম একজন সাব এজেনট হিসেবে মাসে দশ হাজার টাকা অবধি আয় করতেন। এক কথায় টাকা তখন যেন পালকের মত হাওয়ায় উড়ছে। টাকাই যেখানে চরম সত্য সেখানে অবিশ্বাস করা যায় না। হিসেবে দেখা যায় শেষ পাঁচ বছর প্রায় ৭৩ কোটি টাকার মত ডিপোজিট সঞ্চয়িতার খাতায় উঠেছে যার মধ্যে ১১ কোটি টাকা কেবল ষোল হাজার ডিপোজিটরদের কাছ থেকে। এদের জমা টাকার পরিমাণ দশ হাজার টাকার কম।

সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের খাতাপত্র থেকে সহজ সাদা কোন প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। এগুলো কখনো বাজারের একসারসাইজ বুকে কিংবা কেবল একটা চিট কাগজেই সব হিসেব লেখা থাকত। আসল হিসেব বলে কোনটাকেই ধরা সম্ভব হয় না। বাজার থেকে এজেনট মারফৎ টাকা তুলে তার বেশির ভাগটাই এরা মাসিক সুদ হিসেবে দিতেন। আর বাকিটা নিজেদের নামে কোথাও নয় থেকে পনের পারসেনট সুদে ধার নিতেন। সঞ্চয়িতার ব্যাংক অ্যাকাউনট ছিল সিনডিকেট ব্যাংক, গ্রিনলেজ ব্যাংক এবং ইউনাইটেড ব্যাংকে. সব জায়গাতেই অ্যাকাউনট খোলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যাংকের রেফারেনস দেওয়া হত। এক একটি চেকে এক কোটি টাকা অবধি ট্রানসফার করা হয়েছে। তোলাও হয়েছে অনেক।

চরণ সিংকে সেই চিঠি

রাজ্যসভার সদস্য আর এন রোডরিগস ৬ জুলাই ১৯৭৯ সালে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে সংস্থাটির কার্যকলাপের কথা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তখনকার উপপ্রধানমন্ত্রী চরণ সিংকে লেখা এই চিঠির সূত্র ছিল হিন্দু পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন। ২৫ ডিসেমবর ১৯৭৮ সালের বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছিল যে সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট 'approved by Reserve Bank of India'। ঘটনাটি সত্য না হওয়ায় রিজারভ ব্যাংকের তরফ থেকে প্রতিবাদ করা হয়। এবং সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোমপানির ব্যবসা যে রিজারভ ব্যাংকের অনুমোদন পায়নি সে কথা জানিয়ে 'বিজ্ঞাপন শুদ্ধি' প্রকাশ করতে বলা হয়। রিজারভ ব্যাংকের কলকাতা অফিসের ৭ আগসট ১৯৭৯-এর চিঠিতে জানান হয় যে রিজারভ ব্যাংকের ৫৪ (সি) ধারা ১৯৩৪ অনুযায়ী কোন নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মূলধন এক লাখ টাকার নিচে থাকলে তারা রিজারভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ১৩ সেপটেমবর ১৯৮০তে রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেকরেটারি (ফিনানস) রিজারভ ব্যাংকের কাছে অনুরোধ করেন যে এই সংস্থাটি চিট ও মানি সারকুলেশন স্কিমের আইনের আওতায় আসে কিনা দেখতে। যদি না আসে তবে কোন আইনে এজাতীয় ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা তাও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালে বিগত মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভেংকটরমনকে অভিযোগ জানান যে এই সংস্থাটির ব্যবসা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সাধারণ মানুষের টাকা এরা গচ্ছিত রাখছে কিন্তু এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। ২২ অকটোবর ১৯৮০ সালে রিজারভ ব্যাংকের ডেপুটি গভরনর জেনারেল শ্রীমিত্রকে জানান যে ১৯৭৮ সালের মানি সারকুলেশন ও চিট ফানড আইনে সাধারণভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

সুখের দিন শেষ হল

তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র কিন্তু হাল ছাড়েননি। তিনি তাঁর দপ্তরের ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশনকে দিয়ে তদন্ত শুরু করালেন। রাজ্যে যে সমস্ত চিট ফানড ছিল তাদের কাজকর্ম বন্ধ করার নোটিশ দিলেন। ইতোমধ্যে ঘটনাটি সংবাদপত্র মারফৎ চালু হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার মানুষ সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের ৪-৫ ফ্যানসি লেনের অফিসের সামনে টাকা ফেরৎ নিতে গেলেন। জানা যায় অকটোবর থেকে ১৩ ডিসেমবর ১৯৮০ (যেটা FIR করার দিন এবং ইনভেসটিগেশন শুরু করার সময়) সঞ্চয়িতা কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০ কোটি টাকা তার আমানতকারীদের ফেরৎ দেবার জন্য ব্যাংক থেকে তুলেছিল। কিন্তু সঞ্চয়িতার টাকার যেহেতু কোন সঠিক উৎস বা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল না তাই সকলের দাবি মেটান তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

FIR অনুযায়ী ১৩ ডিসেমবর ১৯৮০ তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। রাজ্য অর্থদপ্তরের অর্থনৈতিক আইন সংক্রান্ত অপরাধের বিশেষ সেল ১০ নমবর ম্যাডান স্ট্রিটের ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন তদন্তের দায়িত্ব নিলেন। এই অফিসটি কমারশিয়াল ট্যাকস, যেমন সেলস ট্যাকস, প্রমোদকর ইত্যাদি যেগুলো রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত সেগুলির বেআইনি কাজ নিয়ে তদন্ত করে। একজন ডি আই জি-র অধীনে এস পি, দু'জন এ এস পি, জনা দশেক ইনসপেকটর, জনা ষোল সাবইনসপেকটর এবং এক কুড়ি কনসটেবল নিয়ে রাজ্য পুলিশ ডাইরেকটরেটের অধীনে এই দপ্তর। এরা কাজ করে কমারশিয়াল ট্যাকস কমিশনার-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই বিভাগে এ এস পি থেকে কনেসটবল পর্যন্ত সব সময়ই কিছু না কিছু পদ খালি থাকে। এই সংস্থার মূল ভিত্তি যে ইনসপেকটর পদগুলো, সেগুলো কোন সময়ই প্রয়োজনীয় সংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি পূরণ করা থাকে না। তবুও এই ইনভেসমেনট কোমপানিগুলোর তদন্ত শুরু হওয়ার পেছনে এ বিভাগের কৃতিত্ব অনেকখানি।

এক দিনেই অর্থাৎ ১৩ ডিসেমবর ১৯৮০তে ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের ৪-৫ ফ্যানসি লেনের অফিস 'রেড' করে এরা ৪২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৩০ টাকা উদ্ধার করেন। এই টাকাগুলো 'ক্যাশ' হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। কিছু হিসেবের খাতাপত্রও এরা আটক করেন। সেই দিনই সঞ্চয়িতা সংস্থার অন্যতম মালিক শম্ভুপ্রসাদ মুখারজির বাড়ি থেকে এই ইনভেসটিগেশন ব্যুরোর কর্মীরা উদ্ধার করেন একটি ব্যাংকের পাশ বই যার মধ্যে নাম লেখা ছিল আপকার অভি টুন, (Apcar Ave Toon)। ঠিকানা – ৯ নমবর রয়েড স্ট্রিট, কলকাতা-১৭। ব্যাংকটির নাম ছিল সিনডিকেট ব্যাংক, গড়িয়াহাট ব্রানচ, কলকাতা। পাশবইটিতে জমা দেখান ছিল ২৮ কোটি টাকা। পরে জানা গিয়েছিল ওনামে কোন ব্যক্তি নেই এবং ঠিকানাটিও ভুয়ো।

এ ছাড়া নগদ ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা নোটের বানডিল যার মোট হিসাব ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং একটি দেশি ছ ঘরা রিভলভার যার মধ্যে একটি বুলেট ভরা ছিল। ৮ জানুয়ারি ১৯৮১ সাল অবধি এক নাগাড়ে তদন্ত চালিয়ে এই তদন্ত ব্যুরো প্রায় ৮০টি বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়। তারপর সাময়িকভাবে সুপরিম কোরটের স্থগিতাদেশের জন্য তদন্ত বন্ধ থাকে। এদের মোটামুটি ৮৪ জন এজেনট কোড নমবরপ্রাপ্ত ছিলেন। এই এজেনটরাও বিরাট বিষয়-সম্পত্তির মালিক।

যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার থেকে জানা যায় ১ সেপটেমবর ১৯৮০ সাল অবধি এই সংস্থায় আমানত ছিল ৭৬ কোটি ৫১ লক্ষ ২৩

হাজার ৫00 টাকা। এই টাকা কলকাতা, দিল্লি, মাদরাজ, বোম্বে এবং হায়দরাবাদ থেকেই বেশির ভাগ জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ১১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪0 হাজার ৯৫0 টাকা কেবল দশ হাজার টাকার নিচের আমানতকারীদের।

সিনডিকেট ব্যাংকের পাশবই থেকে জানা যায় যে সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের অন্যতম অংশীদার শম্ভুপ্রসাদ মুখারজির ইনট্রোডাকশনে ২১0 নমবর কারেনট অ্যাকাউনটটি খোলা হয়েছিল। এই অ্যাকাউনটটির নাম এবং ঠিকানা ভুয়ো ছিল। ২৮ লক্ষ টাকা দিয়ে অ্যাকাউনটটি খোলা হয়। ৬ ডিসেমবর ১৯৮0-র মধ্যে এই অ্যাকাউনটটিতে মোট ২৭ কোটি টাকার কিছু বেশি জমা পড়ে। এবং এরপর থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকার মত ১১ নভেমবর থেকে কখনও ৫0 লাখ কখনও ৮0 লাখ টাকা হিসেবে তুলে নেওয়া হয়। অ্যাকাউনটটি বন্ধ করা হয় ৬ ডিসেমবর ১৯৮0, ১৩ ডিসেমবর এফ আই আর করার ঠিক এক সপ্তাহ আগে। এখানে পাশবই-এর সঙ্গে লেজারের অমিল দেখা গিয়েছে।

ইউনাইটেড ব্যাংকের কারেনট অ্যাকাউনট নমবরে এস ৫0২ (পাঁচশ দুই) হাইকোরট ব্রানচ থেকে জানা যায় এরা অর্থাৎ সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট অ্যাকাউনটটি ট্রানসফার করিয়ে নিয়ে আসে ফিরপো বিলডিং-এর ব্রানচ থেকে। প্রথমে 'ফিরপো বিলডিং' এর শাখায় কোমপানির অ্যাকাউনট খোলা হয় ন্যাশনাল গ্রিনলেজ ব্যাংক থেকে ট্রানসফার অ্যাকাউনট হিসাবে। এখানেও দফায় দফায় লাখ লাখ টাকা জমা, তোলা এবং এক কোটি টাকার চেক একবারে সিনডিকেট ব্যাংকে ট্রানসফার করা হয় বলে জানা যায়। সেই সঙ্গে সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের একটি দশ লক্ষ টাকার কালার ফিলম ল্যাবরেটরির জন্য লগ্নি করার প্রস্তাব এই ব্যাংক খারিজ করে দেয়।

আটক করা কাগজপত্র থেকে দেখা যাবে যে ১৯৭৭ সালের ৩0 জুনের পর থেকে এই সংস্থা কোন ইনকাম ট্যাকস রিটারনও দাখিল করেনি। এবং অন্যতম অংশীদার শম্ভু মুখারজি দিল্লি লটারির প্রথম পুরস্কার হিসাবে ৮ লক্ষ টাকা পান ১৯৭৯ সালে। আরও জানা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও এজেনটরা সকলেই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী এবং তার অধিকাংশই বোমবে শহরে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এবং প্রয়োজনীয় জাতীয় স্বার্থে সুপরিম কোরটের ২ ফেবরুয়ারি ১৯৮২-র পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের রায়দান প্রসঙ্গে সুপরিম কোরটের প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেন:

"A token capital of Rs 7000 has begotten a wealth of crores of rupees within a span of five years. A bank account opened by the firm in a fictitious name had a sum of Rs tweenty-eight crores in it, which was the before lodging of the FIR. Interest was beeing paid to the depositors at the incredible rate of 48 percent per annum. The firm had no ostensible source of income from which such exorbitant amount [illegible] be paid and its acco[illegible] books, such as were seize[illegible] from its head office, give no clue on its income or its assets. The partners of the firm have become millionaires overnight. Clerks and chemists that they and some of their agents were in 1975, to-day they own the properties which will put a prince to shame. There is no question that the vast wealth has been accuired by the firm generating and circulating black money."

এই অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য টেকনিক্যাল গ্রাউনডে সঞ্চয়িতা ইনভেসমেনট ছাড়া পেলেও সুপরিম কোরটের প্রধান বিচারপতি ও তাঁর সহযোগী বিচারপতিদের বেনচ বিষয়টির ওপর আরও তদন্ত করার সুযোগ দেন রাজ্য সরকারকে। ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থে এই তদন্ত চলার নির্দেশের প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেছিলেন।

পরবর্তীকালে সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনটের সূত্র ধরে মোট ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৬৫ জনকে (আগাম জামিন সহ) জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ইতোমধ্যে জনসাধারণের যে বিরাট অংশ পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলগুলোতে এবং কলকাতায় সঞ্চয়িতার আমানতকারী, তারা নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত দুটি প্রতিষ্ঠান ডিপোজিটারস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য তদন্ত ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বাকিরা ব্যক্তিগতভাবে মামলা করছেন। এখন সরকারি তরফ থেকে মামলাটিকে প্রতারণা মামলায় দাঁড় করান হচ্ছে কিন্তু সমস্যা আইনগত, সেখানে ২৯ জন আসামী বলে অভিযুক্তকে একই সঙ্গে হাজির করান যাচ্ছে না। তবে ছোট মামলাগুলিতে প্রপারটি অ্যাটাচমেনট ও অন্য কিছু সঞ্চয়িতার মত লগ্নি সংস্থার বিভিন্ন মামলা বা হাইকোরট এবং নিম্ন আদালতের আবেদন পরোক্ষভাবে সঞ্চয়িতার মামলাকে সাহায্য করছে। কারণ এই বিচার ও বিশ্লেষণগুলি জনসাধারণ এবং বিচার বিভাগকে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল রাখতে পারছে।

সম্প্রতি রাজ্য তদন্ত ব্যুরোর প্রচেষ্টাতে আরও বেশ কিছু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যার মালিকানা স্বনামে বা বেনামে এই সব অভিযুক্তদের ছিল তা আটক করেছে। এর মধ্যে বাড়ি গাড়ি তো আছেই। সে সঙ্গে ভি সি আর থেকে একটি 'সপ্তডিঙা' নামে মোটর লনচও আছে।

সঞ্চয়িতা ইনভেসটমেনট কোমপানির ইতিহাসটা এখানে জরুরি ছিল এই কারণে যে এর থেকে সাধারণ আমানতকারীর টাকা পেতে কতদিন লাগবে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। টাকা ফেরৎ পাবার উৎস হিসাবে আপাতত দেখা যাচ্ছে যে টাকা এখন পর্যন্ত ক্রোক করা হয়েছে সেটা দ্বিতীয় সূত্র হিসাবে বেনামা সম্পত্তি। বেনামা সম্পত্তিকে আদালতে প্রমাণ দিয়ে তবেই তা বেনামা হিসাবে চিহ্নিত হবে।

যারা ইতোমধ্যে সঞ্চয়িতার এজেনটের সারটিফিকেট তাঁদের এজেনট বা সাব এজেনটকে ফেরৎ দিয়ে অর্ধেক টাকা নিয়েছেন তাদের আর কোন টাকা ফেরৎ পাবার আশা নেই। পরিশেষে সময় হিসাব করে সুদের দাবিতে যদি কেউ আদালতের শরণাপন্ন হন এবং তাতে করে নতুন কোন জটিলতা দেখা যায় তা কাটিয়ে ওঠার সময় লাগবে।

তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সঠিক সময় বলা অসম্ভব। তবে অনেক কষ্টে বন্ধ থাকা জানালা একটা খুলেছে। নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তরা কিছুটা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। এর বেশি এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। □

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

চীন ও তাইওয়ান ঃ চীনের নবকূটনীতি

খগেন দে সরকার

বড় তরফ আর ছোট তরফ, দুই শরিক। দাবিদাওয়া, গোলমাল, লাঠালাঠি, পৃথক হয়ে যাওয়ার পরেও নিষ্পত্তি হয়নি। বড় তরফ অতি প্রশস্ত, প্রাচীন খানদান, কিন্তু অনেক পোষ্য এবং সকলকেই খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে চায়। কুলোয় না। ওদিকে ছোট তরফ একই খানাদনি বংশের। নামে ছোট হলে কি হবে কাজ-কর্মে বড়,—পোষ্য কম, অনেক ধনদৌলত করেছে, প্রতাপশালী সহায়ক-বন্ধুবান্ধব আছে যাদের খাতিরে বড় তরফ লাঠির ভয় দেখানো ছেড়ে দিয়ে ছোটকে অনেক বোঝায় · যা হবার হয়েছে, এবার এসো মিলেমিশে থাকা যাক, তোমরা তো আর অন্য বংশের নও। ছোট তোক বাক্যে গলবার পাত্র নয়কো। সে বলে না।

বড় তরফ চীন মূল ভূখণ্ড, ছোট তরফ সংলগ্ন দ্বীপ তাইওয়ান। সন ১৯৪৯ অকটোবরে চীনদেশ মাও-পরিচালিত কমিউনিসট কর্তৃত্বাধীনে আসার পর থেকে নানাভাবে তাইওয়ানের সংগে একীকরণের প্রচেষ্টা এখনো চলে আসছে। এক সময় তাইওয়ানের উপর দাবি অত্যন্ত সোচ্চার ছিল। ষাট দশকের মাঝামাঝি মূল ভূখণ্ড থেকে তাইওয়ান ও আশেপাশের দ্বীপে (তাইওয়ানের অধীনস্থ) হাজার হাজার কামানের গোলা দাগানো হয়েছে, এবং প্রত্যেকবার ঘোষণা করা হয়েছে এই গেল ১,১২৭-তম হুঁশিয়ারি, এই গেল যতো নম্বরী 'গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারি'। তাইওয়ানও ছেড়ে কেন কথা বলবে, সেও কামান দাগিয়েছে, জংগী বিমান পাঠিয়েছে, এবং বড় তরফের বিরুদ্ধে প্রবল প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছে, নিজের সার্বভৌমত্ব খোয়াতে মোটেই সম্মত নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এতো টানাপোড়েন, যে, চীন সামরিক শক্তিতে অতি বলশালী হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষুদ্র দ্বীপকে না-পেরেছে দখল করতে না পেরেছে বশে আনতে। মাও-উত্তর কমিউনিসট নেতৃত্ব (মাওর মৃত্যু সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭৬) কয়েকটি পরিবর্তন-পর্যায় আত্মস্থ করে তাইওয়ানের প্রতি নিয়েছে নব-কূটনীতি——অনুরোধ, উপরোধ ও নানা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন এবং বশংগতের প্রতি মমতাপূর্ণ সহনশীলতা। বল-প্রয়োগের ধমকানি নেই। এই ধরনের জাতীয় কূটনীতি বিশ্বে প্রায় অভূতপূর্বই বর্তমান কালে। পুরনো ঝাড়-ঝাপটার দিন আর নেই, নেই লম্ফদানে প্রগতি, নেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আবর্ত নেই সেই চার গুণ্ডাদলের উৎপাত। সুতরাং, নব কূটনীতি চলতে পারে ও চলছে। কূটনীতির প্রকরণে পরে আসছি। আগে একবার খোঁজ নেওয়া যাক তাইওয়ানের।

আয়তনে তাইওয়ান ৩৫,৯৮৯ বর্গ-কিলোমিটার (মাত্র ২৫% কৃষিতে এবং ৬০% বন), অধিবাসী ১ কোটি ৭৫ লক্ষ (৩৩% -এর বয়েস ১৫) এবং এর মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। আয়তনে ছোট হলে কি হবে—কৃষি, শিল্পাদি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এশিয়ার অনেক দেশ থেকে এগিয়ে। বস্তুত বর্তমানে তাইওয়ানবাসীদের জীবন-মান ওপর থেকে চতুর্থ স্থানে (প্রথম তিনটি জাপান, হংকং ও সিংগাপুর); প্রতিজনের গড়ে বাৎসরিক আয় ২,২০০ ডলার (আমেরিকান)। খাদ্যশস্যে স্বয়ংভর (প্রধানত ধান, চিনি)। কয়েকটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় তাইওয়ানের শিল্প প্রগতি, যথা ১৯৮০ সনে মোটর-যান তৈরি হয়েছে · প্রাইভেট গাড়ি ৩৭৮, ৩৪৭, ট্রাক-বাস ইত্যাদি ২,৩৬,৭৩৯, মোটর সাইকেল—৩৫,৫৭,৩৭৯; টিভি সেট ৩৮ লক্ষ।

বর্তমান তাইওয়ানের শিল্প উৎপাদনে আছে ইস্পাত, জাহাজ, রাসায়নিক সার, পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যাদি, বস্ত্র, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি, নানান মৌলিক ধাতু, রাসায়নিক সুতো, বস্ত্র, এল্যুমিনিয়ম, বিদ্যুৎ উৎপাদন। সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উন্নত দেশের মতো। তাইওয়ানের দশ-শালা যোজনা অনুসারে ঐ দেশ ১৯৮৯ সনে পরিণত হবে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ঐ সময়ের মধ্যে হবে · দ্বিতীয় ও তৃতীয় আণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, নতুন শহর ও ঘরবাড়ি, অধিকতর সেচের ব্যবস্থা ও কৃষিকাজের অধিকতর যন্ত্রকরণ।

এক কথায়, তাইওয়ান সমৃদ্ধ ও আরো সমৃদ্ধ হতে যাচ্ছে, যার সামগ্রিক তুলনায় চীন ভূখণ্ড অনেক পশ্চাতে। সুতরাং, আশ্চর্য নয়, যে, তাইওয়ান তার সার্বভৌমত্ব ও নিজস্ব জীবনধারা বিসর্জন দিতে অসম্মত।

তাইওয়ানের রপ্তানি প্রায় গোটা চীন মূলভূখণ্ডের মত। তাইওয়ানের রপ্তানি প্রধানত যায় আমেরিকা ও জাপানে, তৃতীয়ত হংকং-এ ও পশ্চিম ইউরোপে। তাইওয়ান তাই একাই একশো!

তাইওয়ান এমন ছিল না। এশিয়ার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো তাইওয়ানেও একদা ওলন্দাজ ও স্পেনীয়রা উপনিবেশ স্থাপনে প্রচেষ্টিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে,—উত্তরে স্পেন, দক্ষিণে ওলন্দাজ। টেকেনি। এর সংগে চীন মূল ভূখণ্ডের তদানিন্তন ইতিহাস ভুললে চলবে না,—ইউরোপীয় দেশের চীনকে বিভক্ত করে নেওয়ার শতাব্দীর প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দী অবধি। ইতিহাস প্রথম মোড় নিল ১৮৯৪ সনের চীন-জাপান যুদ্ধে,—চীনদেশ জাপানকে দিল

মূল ভূখণ্ডের নাবিক তাইওয়ানে

তাইওয়ান দ্বীপ। বিদ্রোহ হয়েছিল দ্বীপে। জাপান তাইওয়ানকে করলো সামরিক ঘাঁটি, এবং ঐ অনুসারে উন্নতকরণের কাজ। জাপানের অবদান অনেক, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। কিন্তু তাইওয়ানের শিল্প-গোড়াপত্তন করে গেছে জাপান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত। আইনত তাইওয়ান ফিরে গেল চীন মূল ভূখণ্ডের একটি প্রদেশ হিসেবে। ওদিকে চীনে গৃহযুদ্ধ—মাও সেতুং ও চিয়াং কাইশেক, একদিকে কমিউনিসট অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা। ১৯৪৯-র অকটোবরে চীন মূল ভূখণ্ড কমিউনিস্টদের অধীনে এল। জাতীয়তাবাদীদের নেতা চিয়াং কাইশেক ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে নানকিং থেকে স্থানান্তরিত করলেন তাঁর রাজধানী তাইওয়ানের তাইপে শহরে। বিশ্বযুদ্ধের আগে কি পরে এই ধরনের বিরাট স্থানান্তকরণ আর কোথাও এইভাবে হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাইওয়ানে পৌঁছে চিয়াং কাইশেক মহড়া দিয়েছিলেন ছয় লক্ষ সৈন্যের। স্থানান্তকরণে তাঁর সংগে এসেছিল প্রায় দশলক্ষ অসামরিক অধিবাসী মূল ভূখণ্ড থেকে। স্থানান্তরিত হয়েছিল শুধু সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদ নয়,—হয়েছিল ৩০-কোটি (ইউ এস) ডলার মূল্যের সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা। চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করলেন এক নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের,—প্রজাতন্ত্রী চীন, আজও রয়েছে ঐ দ্বিতীয় চীন, যার প্রধান শাসক হলেন এখন চিয়াং কাইসেকের পুত্র, চিয়াং চিং-কুও।

যে চীন একদা ছিল মহাশত্রু তার সংগে রাজনৈতিক সমঝোতা করলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭৯ সনের জানুয়ারির প্রথম দিনে। আমেরিকা চীন মূল ভূখণ্ডকে কূটনৈতিক সমর্থন জানাল, এবং তাইওয়ানের সংগে সরকারি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করল অন্তত নামকোওয়াস্তে। প্রেসিডেন্ট কার্টার আরো এগিয়ে গেলেন। তাইওয়ানকে আর সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে মানা হবে না। অস্ত্রশস্ত্র আর দেওয়া হবে না, দুই চীন নিজেদের সামলে নাও; তাল রেখে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে থেকে (যেমন অলিম্পিক) তাইওয়ান বহিষ্কৃত হল তাতে তাইওয়ান মোটেই দমেনি। আমেরিকায় পট পরিবর্তন হল যখন রিগান প্রেসিডেন্ট হলেন ১৯৮০-তে। তিনি খানিকটা মেনে নিলেন তাইওয়ানের স্বাতন্ত্র্য মূল চীন ভূখণ্ডের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলেন। পারোক্ষে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকল। অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে, কিন্তু এফ-১৬ বিমান নয়, অন্য জঙ্গী বিমান দেবে।

আমেরিকা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে ধরি-মাছ-না-ছুঁই পানি গোছের নীতি তাইওয়ান নিয়ে (একটু তাইওয়ান-ঘেঁষা)। কিন্তু তাইওয়ানের শ্রেষ্ঠ কর্তা চিয়াং চিংকুও সিদ্ধান্তে স্থির, তাইওয়ান থাকবে সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমেরিকার সঙ্গে তাইওয়ানের পারস্পরিক আরক্ষা চুক্তি আর নেই, কিন্তু আমেরিকা চীনকে স্পষ্ট জানিয়েছে যে, বলপূর্বক তাইওয়ানকে অধিগত করা চলবে না, পারো তো অন্য পথ নাও। আন্তর্জাতিক জগতে বন্ধুত্ব-শত্রুতা অনেক ঝামেলার, অনেক রূপে অনেক প্রশ্নের মোকাবিলা করায়। আমেরিকা চায় চীনের সহায়তা (চীনও চায়) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। তাইওয়ানের জল ঘোলা করলে আসল উদ্দেশ্যে বাধা আসবে। সুতরাং তাইওয়ান যেমন আছে থাকতে দাও, অন্তত আমেরিকার এই উপদেশ। তবে তাইওয়ানও দাবার চালে অপারগ নয়। এক সময়ে কমিউনিসট দেশের সংগে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল প্রধানত আমেরিকা, জাপান ও হংকং-এর সংগে (এবং পশ্চিম ইউরোপের সংগে)। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে তাইওয়ান ১৯৮১-তে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য আটটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগে। অবশ্য এর একটা রাজনৈতিক দিকও আছে যার প্রভাব খুব কম কিছু নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ছোট তরফ মোটেই ছোট নয়। বড় তরফ অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণের জন্য ছোট তরফকে বিনা বলপ্রয়োগে অধিগত করতে ইচ্ছুক। এবং তারই জন্য চীনের কূটনীতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অভিনব নিরীক্ষা-প্রচেষ্টা। এবার দেখা যাক বড় তরফকে।

মাও-উত্তর চীনের পুর্ণসংগঠিত নেতৃত্ব এক আন্তর্জাতিক ত্রিভুজ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন—সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও তাইওয়ান। বলপ্রয়োগে সে তাইওয়ান জয় করতে হয় তো সক্ষম। কিন্তু রয়েছে অনেক 'কিন্তু'। উত্তরে সোভিয়েত সীমান্তে প্রতিরক্ষার কী হবে, যেখানে ওপারে নাকি আছে ৫০/৬০ ডিভিসন সোভিয়েত সেনাবাহিনী, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে? প্রেসিডেন্ট রেগ্যান এফ-১৬ জঙ্গী বোমারু বিমান দিতে অস্বীকার করেছেন তাইওয়ানকে, কিন্তু অন্যান্য বিমান অস্ত্রাদি দিতে অসম্মত নন। প্রেসিডেন্ট কারটারের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে রেগান্ এক প্রকারের কূটনৈতিক স্বীকৃতিও দিয়েছে তাইওয়ানকে—তা নিয়ে চীনের সংগে বেশ ঝামেলা হচ্ছে ইদানিং। কিন্তু চীন মেনে নিয়েছে ১৯৮২ সনের বাস্তবকে, যে, জোর জবর করে তাইওয়ানকে পুর্ণমিলিত করা সম্ভবপর নয়। অথচ পুর্ণমিলন কাম্য। সুতরাং, চীনের নতুন প্রয়াস,—অনুরোধ, উপরোধ ও প্রলোভনে তাইওয়ানকে ফিরে পাওয়া মূল ভূখণ্ডের এক অংশ হিসাবে। এক বিরাট প্রয়াস, সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল।

এই জাতীয় রাজনৈতিক প্রয়াস-কল্পের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। সন ১৯৮১ অগাসট মাসের কথা। অগাসট মাসের আট তারিখ, সকাল আটটা দশ মিনিট। তাইওয়ান রাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একজন মেজর, হুয়াং জিচেং উড়ে এসে চীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন বিমান সহ। এফ ৫ এফ আমেরিকান্ জঙ্গী বিমান। এর আগের বেশ কিছু বছরে তাইওয়ান থেকে চীন ভূখণ্ডে স্বেচ্ছায় পালিয়ে উড়ে এসেছে ৯০-জন তাইওয়ান বিমান-বাহিনীর অফিসার ইত্যাদি, সংগে এনেছে ৪২-ধরনের বিমান। চীনের প্রবক্তাদের মতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল ৩০ বছর আগে।

যে কোন কারণেই হোক, জিচেং তাইওয়ান জঙ্গীবিমান নিয়ে এলো তাইওয়ানের ওপারে চীন ভূখণ্ডে ফুজিয়ান বিমান বন্দরে। সে বলেছে, আমি একাত্ম হতে চাই চীনের সঙ্গে। তা হোক্। কিন্তু কোন দেশত্যাগীকে অতো সম্মান দেওয়া হয়নি, কোন দেশে, যেমনটি দেওয়া হয়েছিল ঐ বৈমানিক জিচেং-কে। তাকে সরকারি সংবর্ধনা জানিয়েছে চীনের তদানিন্তন প্রধান মন্ত্রী জাও জিয়াং, চীনের চিফ অব জেনারেল্ স্টাফ ইয়াং দেজি, Peoples Liberation Army-র প্রধান, এবং অন্যান্যরা। এই উদাহরণের মর্ম একটি: তাইওয়ান-ত্যাগী বৈমানিককে স্বাগত জানিয়েছেন চীনের প্রধান মন্ত্রী ব্যক্তিগত

মারকিন প্রবাসী তাইওয়ানিজরা বেইজিং-এ

উপস্থিতিতে। এর দুটো অর্থ (১) চীনদেশ তাইওয়ানের মূল্য জানে; (২) আদর আপ্যায়নে পুর্ণমিলনের পথ পরিষ্কার করা।

শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ান ও মূলচীন ভূখণ্ডকে একত্রীকরণের সরকারি ঘোষণা বেজিং থেকে করেছেন চীন পারলামেনটের স্টানডিং কমিটির চেয়ারম্যান ইয়ে জিয়ান্ইং ১৯৮১-র ৩০ সেপটেমবর। বলেছেন, যে, ১৯৭৯ সনে চীন পারলামেনট ঘোষণা করেছিল শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ানের বসবাসকরীদের সঙ্গে "মাতৃভূমির পুনর্মিলন।" এর প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছে চীনদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ এবং তাইওয়ানবাসীরাও। চেয়ারম্যান্ ওই ১৯৭৯ সনের ঘোষণাকে বিলম্বিত করেছেন ১৯৮১ সনের সেপটেমবরে। তাঁর ঘোষণায় আছে:

(১) চৈনিক কমিউনিসট পারটি ও চীনের কুয়োমিনটাং পারটির মধ্যে হোক দ্বিপক্ষীয় আলোচনা জাতীয় পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে। প্রথমত, দুই পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে হোক পারস্পরিক মত বিনিময়। (তাইওয়ানের কুয়োমিন্টাং পারটিকে চীনের কমিউনিসট পারটি বস্তুত সরকারিভাবে মেনে নিল।)

(২) দুই পক্ষের জনগণের ইচ্ছা, যে, সাগর প্রণালীর দুই পাশের সকল প্রজাতিরা নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করুক, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আবার মিলিত হোক, নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ুক, ডাক-তার বিমান-জাহাজ ভ্রমণ, ও সাংস্কৃতিক ক্রীড়া ইত্যাদির বিনিময় হোক, যাতে ক্রমশ একটা চুক্তিতে আসা যেতে পারে।

(৩) দেশ একত্রিত হবার পর, (অর্থাৎ তাইওয়ানের পুনর্মিলনের পর) তাইওয়ান. পারে হাই ডিগ্রি অব অটোনোমি, এবং তাইওয়ান তার নিজের সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিজে রাখতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকার তাইওয়ানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

(৪) তাইওয়ানের বর্তমান (অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক) সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকবে, যেমন থাকবে তাদের অর্থনৈতিক-সম্পর্কিত-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদেশের সঙ্গে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে (বাড়িঘর, জমি, নিজস্ব ব্যবসা-কারখানা, বিদেশে মূলধন নিয়োগ ইত্যাদি) কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না।

(৫) তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচিত লোকেরা জাতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিতে সক্ষম হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্যক অংশ নিতে পারবে।

(৬) তাইওায়নের অর্থ সংকুলান না-হলে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দেবে।

(৭) তাইওয়ানবাসীরা যথেচ্ছা মূল ভূখণ্ডে এসে বসবাস করতে পারেন, কোনো রকম বৈষম্য করা হবে না, এবং তারা ইচ্ছে মত তাইওয়ান থেকে মূল ভূখণ্ডে আসা-যাওয়া করতে পারবেন।

(৮) তাইওয়ানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বাগত জানান হবে চীন মূল ভূখণ্ডে, তারা মূল ভূখণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পেতে টাকা খাটান, তাদের আইনগত অধিকার ও মুনাফা ইত্যাদির গ্যারানটি দেওয়া হচ্ছে।

(৯) পুনর্মিলন চীনাদের দায়িত্ব। "আমরা স্বাগত জানাচ্ছি যে, সর্ব-শ্রেণীর সুকল প্রজাতির লোকেরা ও সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রস্তাবাদি দিন।"

চেয়ারম্যান আরো জানালেন ঐ ঘোষণায়: এই পুনর্মিলন সকল জনগণের আকাঙ্খিত। এশিয়ার পূর্বদিকে আসবে শান্তি। চেয়ারম্যান আশা প্রকাশ করেন যে, হংকং মেকাও ও অন্যান্য দেশের চৈনিক সহরবাসীরা এই পুনর্মিলন প্রস্তাবে সহায়তা করবে।

তাইওয়ান থেকে মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত আছে, বিশেষত যুবক-যুবতীদের, খেলাধূলা ও গানবাজনা সূত্রে। পর্যটন তো আছেই। মূল ভূখণ্ডের চীন তাইওয়ানবাসীদের আপ্যায়নে ত্রুটি রাখেনা। খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে তাদের ফটো ও বিবৃতি ছাপান হয়, অনেক সময় ফলাও করে, যেমন ঐ দেশত্যাগী বৈমানিকের বেলায়। 'চায়না পিকটোরিয়েল সচিত্র ম্যাগজিন' (সম্পাদক এপস্টাইন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সাংবাদিক) ঐ বৈমানিকের সংবর্ধনার পাঁচটি রঙিন ছবি ও এগারটি সাদা-কালো ছবি ছাপিয়েছেন।

১৯৮১-র ২৯মে সুন ইয়াতসেন্ পত্নী মাদাম সুং চিংলিং পরলোকগমন করলেন ৯০ বছর বয়সে। রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়েছিল। ২ জুন হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বেজিং এর রাস্তায় হাজির ছিল দশ লক্ষ শোকার্ত মানুষ। সুন্ চিং লিং-এর আপন ভগ্নি ছিলেন চিয়াং কাইসেকের স্ত্রী। তাঁদেরই পুত্র বর্তমান তাইওয়ানের একছত্র শাসক, রাষ্ট্রপতি। চীনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমিতি আমন্ত্রণ জানালেন তাইওয়ানস্থ (ও অন্যত্র) মাদাম সুন চিং লিন-এর আত্মীয় স্বজনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করতে। সমিতি ঘোষণা করল, যে, তাইওয়ানের যাত্রী বিমান বেজিং অথবা সাংহাই বিমান বন্দরে নামতে পারে তাঁদের নিয়ে, ব্যয় বহন করবে সমিতি।

এইসব আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তাইওয়ানের রাষ্ট্রপতি (চিয়াং কাইশেকের পুত্র) কোনো সাড়া দেন নি। সুংচিং লিং-এর ভগ্নি (চিয়াং কাইশেকের পত্নী) অথবা অন্য কেউ নিকট আত্মীয় তাইওয়ান্ থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আসেননি। সুতরাং তাইওয়ানের বর্তমান রাষ্ট্রিক নীতি চীন ও অন্যান্য দেশকে জানাচ্ছে:

(১) তাইওয়ান সার্বভৌম রাষ্ট্র থাকবে, রাষ্ট্রপুঞ্জ কিংবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে তার স্থান থাকুক আর না থাকুক। (২) চীনের নব-কূটনীতিক ফাঁদে তাইওয়ান্ পা দেবে না। (৩) সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে, তাইওয়ান্ দেশের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র কিনবে। অস্ত্রশস্ত্র কেনার প্রধান ক্ষেত্র হল যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট রেগ্যান 'না' বলেন নি, বলেছেন দেওয়া হবে। তা নিয়ে চীনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। চীন ধমকের সুরে জানাচ্ছে, তাইওয়ানকে আরো সশস্ত্র করলে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ফাটল ধরবে। সুতরাং ঐ দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। ইতোমধ্যে চীন একতরফা তার সাংস্কৃতি আদানপ্রদান চুক্তি বাতিল করেছে আমেরিকার সঙ্গে।

চীনও চালাছে তার নব-কূটনীতি তাইওয়ান্ নিয়ে। খেলাধূলা, সংস্কৃতি, জাহাজী নাবিক এবং অন্য দেশবাসী তাইওয়ানীদের অভ্যর্থনার জন্য চীনে অনেক সংগঠন আছে। আত্মীয়দের চীন ভ্রমণ, টাকাপয়সা চীনে খাটান, অন্য রাষ্ট্রবাসী চীনেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সব আছে। চীনের ঐ কূটনীতির সহায়ক। এমন কি ঐ নীতি অনুসরণে, চীন ১৯৮১-র মারচ মাসে ৪,২৩৭-জন তাইওয়ান বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে ৩৩-বছর কয়েদের পর। □

চৈনিক সমাবেশে মিলিত উচ্ছ্বাস

ভিন্ন মত

গান্ধী ছবির একটি দৃশ্য

অ্যাটেনবরো 'গান্ধী' ছবিতে ইংরেজদের অনেক মহান করে দেখিয়েছেন

গান্ধী ছবিটি দেখার ইচ্ছা ছিল অনেক দিনই। পনেরো কোটি টাকা খরচ করে যে ছবি হয় তা দেখার আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ এত টাকার ছবিতে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকবে যা কম বাজেটের ছবিতে পাওয়া যাবে না। তবে কলকাতায় আসার আগে ছবিটি আমার দেখা হয়নি। দিললিতে একবার চেষ্টা করেছিলাম দেখতে। কিন্তু টিকিট পাওয়া যায়নি বলে দেখা হয়নি। টিকিট পাওয়া যায়নি,কারণ মুগ্ধ হয়ে গিয়ে অনেকে নাকি দুবার তিনবার করে ছবিটা দেখছিলেন।

তবে ছবিটা দেখে আমি মুগ্ধ হতে পারলাম না। বরং ক্ষোভ জন্মেছে। কেন তা হল আমি সে প্রসংগে পরে আসব। তার আগে আলোচনা করা যাক খরচের ব্যাপারটা। ছবিটা দেখে কোথায়ও মনে হয়নি এর জন্য পনেরো কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। আমাদের দেশের কোন পরিচালক এই ছবি করলে আমার মনে হয় তিন কোটি টাকার বেশি খরচ হত না। তবে একটাই সুখের কথা, যে টাকাটা এন এফ ডি সি লগ্নি করেছিল তা উঠে এসেছে। যদিও পৃথিবীর লোকের এটা জানা রইল গান্ধী ছবি করতে পারে এমন পরিচালক আমাদের দেশে নেই।

অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। সব থেকে বেশি করে যা বলা হয়েছে তা হল নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ এবং জিন্নার প্রতি প্রচণ্ড অবিচার করা হয়েছে। তবে আমার মতে অ্যাটেনবরো এর থেকেও বড় অন্যায় করেছেন। তিনি 'গান্ধী' ছবির মাধ্যমে ইংরেজদের অনেক মহান করে দেখিয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই ছবি দেখার পর মনে করবে ইংরেজদের মত ভাল লোক আর হয় না। গান্ধী অহিংস আন্দোলন করলেন। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটল। এবং বৃটিশরা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দিল। ব্যাস।

এবারে আলোচনা করা যাক কেন আমি এই কথা বললাম। সারা ছবিতে এমন কোন আন্দোলন দেখান হয়নি যাতে মনে হতে পারে এদেশে ইংরেজদের ওপরে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, আমাদের দেশ থেকে তাঁদের চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সেই চিত্রটা কখনই তৈরি হয়নি যাতে বোঝা যেতে পারে ইংরেজরা যথেষ্ট ভয় পেয়েছিলেন। অথচ বাস্তব চিত্রটা ছিল একদম অন্য রকম। ভারতে কোন বৃটিশ চাকরি পেলে তাঁকে অনেকবার ভাবতে হত। ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন কিনা।

মানুষ সব সময়ই সুবিধা চায়। যতক্ষণ না বেকায়দায় পড়ছে ততক্ষণ মানুষ সে সুবিধা কখনই ছেড়ে দেয় না। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে অহিংস গণ-আন্দোলন পর্যন্ত সব রকমের আন্দোলন বৃটিশকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেলেছিল বলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। ইংরেজদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারত থেকে চলে না গেলে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হবে। ভারতবাসী মরবে কিন্তু পরাধীনতা মেনে নিয়ে বেঁচে থাকবে না। এই মরণপণ সংগ্রামের চিত্র 'গান্ধী' ছবিতে কোথায়ও দেখা যায়নি। তাই এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে ইংরেজরা খুব ভাল বলেই। এর জন্য ভারতবাসীকে কোন মূল্য দিতে হয়নি বললেই চলে।

ইংরেজদের মহান ভাবার এটা একটা কারণ। আর একটা কারণ হল – ইংরেজরা ভারতবাসীর ওপরে অত্যাচার করেছে তা প্রায় দেখান হয়নি বললেই চলে। দেখান হয়েছে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে এবং লবণ সত্যাগ্রহের সময়। লবণ সত্যাগ্রহের সময় যতটুকু দেখান হয়েছে তাতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। বরং মনে হয়েছে অনেকেই বেশ মজা পেয়েছেন। আইন ভাঙলে পুলিশ মারবেনা তো কী করবে ? অর্থাৎ এই দৃশ্যটি তৈরি করার সময় অ্যাটেন-বরো যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। যাতে কোন সময়ই ইংরেজদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা তৈরি না হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা-তেও একই পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। যখন ইংরেজ কমিশন ডায়ারকে তাঁর কাজের জন্য তীব্র-ভাবে তিরস্কার করল তখন স্বাভাবিক কারণেই দর্শকদের মনে হয়েছে এটা একটা ভুল, ইংরেজরা রাজত্ব কায়েম রাখার জন্য এইরকম একটা ঘৃণ্য পথ নেয়নি। অনেকেই হয়ত জানেন ডায়ার এইরকম অমানুষিক কাজ করতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তী জীবনে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

'গান্ধী' ছবি দেখার পর ইংরেজরা মহান, এই কথা না বলে পার পাবার উপায় নেই। অ্যাটেনবরোর এটা একটা বড় কৃতিত্ব।

অনেকে বলতে পারেন সব কিছু দেখাতে গেলে গান্ধীকে দেখান হত না এবং ছবি অনেক বড় হয়ে যেত। তা কিন্তু হত না। আফরিকার অংশটা অনেক ছোট করে দেওয়া যেত। বিভিন্ন আন্দোলনগুলি কিছু শটের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারত। এটা না হওয়ার ফলে ছবিটা অর্থবহ হয়নি। যদি এটা 'গান্ধীর' জীবনী হত তাহলে ছবিটা অন্যভাবে করার দরকার ছিল। অ্যাটেনবরো তা করতে চাননি। তিনি 'গান্ধী' ছবিকে একটি রাজনৈতিক দলিল করতে চেয়েছেন। আর রাজনৈতিক দলিলে ওগুলি না থাকার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

এবারে আসব নেতাজী এবং রবীন্দ্রনাথকে না দেখিয়ে অ্যাটেন-বরো অন্যায় করেছেন বলে যে কথা হয়েছে সে প্রসংগে। আমি বলব এর থেকে বেশি অন্যায় তিনি করেছেন যেসব নেতাদের দেখান হয়েছে তাঁদের বিষয়ে। সারা ছবিটা দেখার পর মনে হবে গান্ধী ছাড়া অন্য নেতাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন বড় ভূমিকা ছিল না। তাঁদের কাজ ছিল ঘরোয়া সভায় যোগদান করা এবং মাঝে মাঝে গান্ধীর মতের বিরোধিতা করা। তাঁদের সভা সমিতিতে বক্তৃতা করতে দেখা গেছে খুবই কম। তাঁরা আন্দোলন সংগঠন করছেন এটা কখনই দেখা যায়নি।

গান্ধী ছবি দেখার পর এমন ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক নেহরু থেকে আরম্ভ করে অন্য নেতারা স্বাধীনতার পর যা কিছু হয়েছিলেন সবই গান্ধীর কৃপায়। তাঁদের নিজস্ব কোন অবদান বা যোগ্যতা ছিল না।

এ তক্ষণ অ্যাটেনবরোর অনেক অন্যায়ের কথা বললাম। এবারে বলব সব থেকে বড় অন্যায়ের কথাটা। গান্ধী ছবিতে কলকাতার আন্দোলনের কথা কোথায়ও বলা হয়নি। আন্দোলন হচ্ছে এটা না দেখিয়েও কথাবার্তার মধ্যে আনা যেত। একেবারে না দেখালেও ক্ষতি হত না। যখন কলকাতাকে দেখান হল তখন এখানে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দাংগা চলছে। ছবি দেখে এটা মনে হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে কলকাতার কাজ ছিল দাংগা করা। অন্য কিছু নয়।

পরিশেষে বলব 'গান্ধী' ছবি অ্যাটেনবরোকে অনেক কিছু দিয়েছে। তবে তা আমাদের দেওয়া অনেক মূল্যের বিনিময়ে। □

অলক দত্ত

আফ্রিকায় আমাদের অনুষ্ঠানগুলি জনপ্রিয় হয়েছে—আনন্দশংকর

আনন্দশংকর ও তনুশ্রীশংকর সম্প্রদায় সম্প্রতি ঘুরে এলেন আফরিকার কয়েকটি দেশে। ইনডিয়ান কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেশানস আয়োজিত এই সফরে ইথিয়োপিয়া, তানজানিয়া, কেনিয়া, জামবিয়া, মালওয়ি (MALAWI) এই দেশগুলিতে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মোট ২৭টি নৃত্য-বাদন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আফরিকার সাধারণ মানুষের মন জয় করে ফিরলেন। জিগ্যেস করলাম কেমন লাগল আফরিকা? 'অসম্ভব ভাল'। প্রায় একসঙ্গে স্বামীস্ত্রী বলে উঠলেন। আনন্দশংকর বললেন 'জানেন, অন্য দেশগুলোতে যেমন দেখেছি, আমাদের প্রোগ্রাম স্থানীয় লোকরাই বেশি দেখতে চান। অনেক বন্ধু বান্ধবের মুখে শুনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল কোন দেশে গেলে সেখানে কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শকদেরই ভিড় বেশি হয়। কিন্তু আমরা যেখানেই গিয়েছি দর্শক হিসেবে স্থানীয় লোকই বেশি পেয়েছি।'

আনন্দশংকরের ভাষায় এর কারণটা হল আবেদন। মানে সকলের ভাল লাগার মত বিশেষ শিল্পশৈলী এই দলটির আছে। আর তার জন্য আনন্দশংকর সম্প্রদায় সকলের পছন্দমাফিক প্রোগ্রাম প্রস্তুত করে রাখেন। পরিষ্কার হয় No number is based on any pure classical style or authentic rigid style of dance they are all creative' এই কথাটা বললেন। কোন বিশেষ ধ্রুপদী অথবা নিয়মের নিগড়ে আনন্দশংকর তার পরিকল্পনাকে আটকে রাখেন না। সবটাই নতুন সৃষ্টি এবং সময় আর মেজাজে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আবেদন সর্বজনীন। এর নাম দিয়েছেন 'ইনডিয়ান ডানস ক্রিয়েশান'। আর একটি অনুষ্ঠানের নাম 'অডিও ভিসুয়াল একস্ট্রাভাগানজা'—'It is in no way a synthesis of classical and pop but possesses a dynamic character of its own' যার ফলে সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠানগুলি থেকে তাঁদের মনের খোরাক পান। তাই বিদেশেও এই অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়েছে। আফরিকাতেও প্রচুর মানুষের ভাল লেগেছে। আনন্দশংকর জানালেন ইথিয়োপিয়ায়, আদ্দিস আবাবায় তিনটি 'শো' করেছেন তিনটিই হাউসফুল। তানজানিয়ার দার-এস-সালাম আর টাঙ্গায় মোট ৭টা 'শো', কেনিয়ার নাইরবিতে তিনটি 'শো' জামবিয়ার রাজধানী লুসাকাতে তিনটি 'শো' কপার বেল্টে (KABWE, KITWE, LUANSYA, NDOLA) পাঁচটা 'শো', লিভিংস্টোন শহরে একটা শো আর মালওয়ি (MALAWI) এর-লি ওন গিই (LILONGWE) রেলানটি (BLANTYRE) তে মোট পাঁচটা শো করেও মনে হচ্ছিল সেখানকার মানুষ এই অনুষ্ঠান আরও দেখতে চায়। ভাববেন না সিংহের দেশের লোকেরা নাচ ভালবাসে না। ওদের রক্তে আছে নাচ আর সুর। ওরা নিজেরাই একটা নিজস্ব 'রিদম'-এর জগৎ তৈরি করেছে।

ওখানকার সাধারণ মানুষের জীবনে এমন ভাবে এই রিদম জড়িয়ে গিয়েছে যে কোন মেয়ে কিশোরী অবস্থাতেই যে নাচটি শেখে তার নাম এদেশীয় কথায় বলা যায় ('Sex dance') ওদের জীবনের জন্য যেমন খাদ্য দরকার তেমনি রিদম ছাড়া জীবন যাপন ওরা ভাবতেই পারে না।

এছাড়া ওদের যে কোন অনুষ্ঠানেই নাচই হল আসল। এক বিশেষ ধরনের ড্রাম বাজিয়ে তার তালে সবাই মিলে ওরা আনন্দ দুঃখকে যেন ভাগ করে নেয়। আনন্দশংকর আফরিকার দেশগুলিতে দু ধরনের মানুষ দেখেছেন। একদল বৃটিশ উপনিবেশের ফলে শিক্ষিত কেতাদুরস্ত আরেক দল সহজ সরল, প্রকৃতির যেন একটা অংশ। দ্বিতীয় দলে মানুষের সংখ্যাই বেশি তবে এখন ওখানকার সব দেশেই মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার একটা জোয়ার এসেছে। নিজেদের সমস্যা মেটাবার জন্য এছাড়া আর অন্য উপায় কী? প্রায় দেশগুলিই মূলত কৃষি প্রধান ও খনিজ নির্ভর। শিল্পায়ন তেমন একটা হয়নি। তবে এখন হচ্ছে। ওদেশে জল মানে কোন জায়গায় খাবার জল পাওয়াই মুসকিল। তবে 'বিয়ার' প্রচুর। মিনারেল ওয়াটারও পাওয়া যায়। আমরা তো মিনারেল ওয়াটারের ওপর নির্ভর করেই প্রায় ছিলাম। এমন কি কোন কোন জায়গায় একটা টুথপেস্ট পাওয়াও মুশকিল। ফ্রিজে ভর্তি করে মাখন থেকে রোজকার দরকারের জিনিষপত্র রেখে দেন অনেক সচ্ছল পরিবার।

ওদের দেশের অর্থনীতিটা চট করে বোঝা মুশকিল। শহরগুলো পরিষ্কার, ছিমছাম, বিদেশি গাড়ির ছড়াছড়ি, কিন্তু শহরের অংশ আর কতটুকু। ক্রস-কান্ট্রি করতে গেলে বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আর ওর আড়ালেই গ্রামীণ জীবন লুকিয়ে থাকে, তাকে দেখবার সুযোগ আমরা পাইনি। গাড়ির মধ্যে বসে সিংহ দেখার সুযোগ পেয়েছি। হাতিও দেখেছি। কিন্তু সময় বা সুযোগের অভাবে গ্রামীণ জীবনটা দেখা হয়নি।

দিনের বেলা ওখানে গরম কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ঠান্ডাও আছে তবে রাত্রে ঠান্ডা। বেশ ভাল লাগে। ওখানকার ভারতীয়রা ভাল রোজগার করেন এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সম্পর্কও বেশ ভাল। ভারতের মানুষকে ওরা খুব কাছের মানুষ বলে মনে করে।

ওখানকার সব দেশের সরকারি তরফের আন্তরিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তা না হলে জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যাতে ওরা আমাদের আরও কিছুদিন রেখে দিত।

মাওয়াডিতে তো আমাদের ভারতীয় অ্যাম্বাসাডার মিঃ আট্রিক আমাদের অনুষ্ঠান দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে দক্ষিণ আফরিকার হাইকমিশনারকে নিমন্ত্রণ করে ফেললেন। মিঃ আট্রিকের বক্তব্য ওরাও দেখুক ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক চেহারাটা। দক্ষিণ আফরিকার হাইকমিশনার ওখানে 'শো'তে এসেছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে যা শুনেছি আমাদের অনুষ্ঠান ওঁরও ভাল লেগেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক যাই থাক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে যে কোন একটি দর্শকও আমাদের অনুষ্ঠান দেখে তৃপ্তি পেলে আমি খুশি। ☐

সাক্ষাৎকার : শ্যামল বসু

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৫৬

১	২			৩	■	৪	
৫		■	■	৬			■
৭		৮	৯	■	■	১০	১১
	■	১২			১৩	■	
■	১৪	■		■	১৫		
১৬		১৭		■		■	
১৮			■	১৯	■	২০	
২১		■	২২				■

সূত্র : পাশাপাশি

১। ডুবে স্নান
৪। বাস স্থান
৫। সাথে রয়
৬। নারী হয়
৭। মায়ের পিতা
১০। 'বাসনা' কি তা
১২। তর্পণে চাই
১৫। পাখির খাঁচাটাই
১৬। ইহকালের পরে
১৮। চিবানোর তরে
২০। ঘন দুধে হবে
২১। বীণায় এ নাম পাবে
২২। উপরে চলি, এই শব্দে বলি।

সূত্র : ওপর নিচ

১। শেষ না হলে
২। বইছে বলে
৩। নতুন হয়
৪। বায়ু বয়
৮। ইচ্ছা বুঝি
৯। বিষ খুঁজি
১১। সাবধান হও
১৩। চিঠি লও
১৪। ছোঁয়া পাই
১৬। নামশেষে চাই
১৭। শুনতে লাগে জানি
১৯। রোম সম্রাট ইনি
২০। জীর্ণ শীর্ণ হয়, আদৌ সবল নয়।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১০ আগস্ট সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২৮. ৭.৮৩। সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল-৫৬' লিখতে ভুলবেন না।

প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন।

শব্দশৃঙ্খল—৫২ (সমাধান)

কা	জি	ল	■	সু	দ	■	সা
ত্ত	■	তা	স	পা	শা	দা	বা
মী	র	ব	■	রী	■	যা	ম
■	ম	ন	সা	■	প	ল	■
বা	ণী	■	র	ক্ষ	ণ	■	জ
তা	র	■	খি	য	■	সা	ধ
য়	■	তা	■	তা	ম	পু	রা
ন	গ	রা	জ	■	নী	ড়	■

শব্দশৃঙ্খল-৫২ র জন্য কুড়ি টাকা করে পুর- ' পাবেন শর্মিষ্ঠা সরকার (সি-৫৬, এস টি পি এস টাউনশিপ, পোঃ—সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট, জেঃ পুরুলিয়া) এবং তাপস রক্ষিত (গ্রাম ও পোঃ—রামেশ্বরপুর, জেঃ-হুগলি)। ২ জুলাই অনুষ্ঠিত শব্দ-শৃঙ্খল লটারিতে বিচারক ছিলেন পরিতোষ সরকার।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

জুলাই ১৩ থেকে ১৯

মেষ : ছোটখাট অসুস্থতার ওপর বিশেষ নজর প্রয়োজন; মেয়েদের শরীর বেশ ভাল চলবে। আর্থিক পরিস্থিতি ঘোরাল হবে। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোন বদ বদল হবে না; মেয়েদের পরিবেশের ওপর তীক্ষ্ণ নজর প্রয়োজন। কোন সন্তানের জন্য বিশেষ গর্ববোধ। মেয়েদের আকস্মিক বিবাহযোগ। ব্যবসায়ী দের নতুন ভাবনা।

বৃষ : শারীরিক অবস্থার বেশ উন্নতি; মেয়েদের শারীরিক নানা উপসর্গ কাটিল করবে। ব্যয়ের চাপ অনেকটা কমলেও আর্থিক টানাটানি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারেই মানিয়ে নিতে হবে; মেয়েদের নতুন পরিস্থিতিতে সতর্ক পদক্ষেপ প্রয়োজন। পারিবারিক অশান্তি চলবে; কর্মপ্রার্থীদের যান বাহন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মলাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মিথুন : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বাড়বে। আর্থিক অবস্থা কিছুটা সহজ হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না; মেয়েদের কৌশলের সংগে এগোতে হবে। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে কোন সন্তানের জন্য। ব্যবসায়ীদের বিশেষ অগ্রগতি।

কর্কট : অম্বল অজীর্ণ বেশ ভোগাতে পারে, মেয়েদের শারীরিক অবস্থার প্রতিকূল পরিবর্তন। আর্থিক ক্ষেত্রে নানান জটিলতা, সঞ্চয়ে টান পড়বে। কর্মস্থলে কোন কোন ব্যাপারে পরিস্থিতি অনুকূল হবে, মেয়েদের সম্মান বাড়বে। পারিবারিক কোন সংবাদ উৎসাহিত করবে। গৃহ-বাড়ি ক্রয়। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

সিংহ : ছোটখাট ঝামেলা চলবে শরীর নিয়ে; মেয়েদের শরীর চলবে ভাল মন্দ মিলিয়ে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ; অতিরিক্ত লাভ। কর্মস্থলে কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে তৃপ্তি ও প্রশংসা; মেয়েদের নিজ আদর্শ ছাড়তে হবে অনেক ক্ষেত্রে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা। বয়স্কদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

কন্যা : শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের, মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ সুখের হবে। কর্মক্ষেত্রে আগের কোন পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে; মেয়েদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে। পারিবারিক কোন সমস্যার আংশিক সমাধান। ব্যবসায়ীদের লাভ।

তুলা : আগের কোন অসুস্থতার ধাক্কা অনেকটা সামলান যাবে; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। অন্যের পরামর্শে আর্থিক ক্ষেত্রে বড় রকমের ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে দৃঢ়তার প্রয়োজন হবে; মেয়েদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে। কোন সন্তানের বিবাহ ব্যাপারে নতুন অশান্তি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃশ্চিক : পেট সংক্রান্ত ঝামেলা এড়ান মুশকিল, মেয়েদের বাত-অর্শ ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা; প্রচুর ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্যম কিন্তু প্রার্থিত ফলে হতাশা; মেয়েদের পুরনো কৌশল বদলাতে হবে। হঠাৎ ভ্রমণ হতে পারে। মেয়েদের জমান অর্থে হাত পড়বে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

ধনু : শরীর নিয়ে সামান্য অশান্তি; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক অবস্থার উন্নতি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না; মেয়েদের সহজ অগ্রগতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে অন্যের কর্তৃত্বে অশান্তি। মেয়েদের হারান জিনিস ফিরে পাবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

মকর : শরীর ভাল চলবে না; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের। আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রচুর ব্যয়। কর্মস্থলে কিছুটা সংযম প্রয়োজন হবে; মেয়েদের কোন ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কারও পরামর্শ ও সাহায্য লাভ। কোন নিকটজনের সমস্যায় জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ।

কুম্ভ : শারীরিক জটিলতা বাড়বে; মেয়েদের ছোটখাট রক্তপাত। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ ক্ষতি। কর্মস্থলে নতুন কোন সমস্যার সহজ মোকাবিলা; মেয়েদের দুশ্চিন্তা বাড়বে। কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বিবাদ। মেয়েদের ধর্ম-কর্মে বাধা। ব্যবসায়ীদের না-লাভ-না ক্ষতি।

মীন : শরীর চলনসই; মেয়েদের ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন প্রচেষ্টা ফলবতী হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বাধা; মেয়েদের ছোটখাট বিবাদ ও মনোমালিন্য। পারিবারিক কোন বন্ধুর পরামর্শে কোন সমস্যার আংশিক সমাধান। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অবনতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১. Telex 021-7896 IPPL IN

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

PARIBARTAN 13 19 July 1983 Regn. No 32315/78 Postal Regn. No. WB CC 380 Rs. 2.25

পরিবর্তন

উত্তমকুমার স্মরণ সংখ্যা

অপরিচিত তারাশঙ্কর

চিত্র : এস. রায়

পরিবর্তন

২০ – ২৬ জুলাই ১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩

দাম ২.২৫ বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

ভারতের রেলমন্ত্রী আবু বরকত গনি খান চৌধুরী সাহেব, এবারের সম্পাদকীয় আপনাকে উদ্দেশ করেই। আপনি কর্মী পুরুষ, হতভাগ্য পশ্চিমবাংলার উন্নতির জন্য, জবদগব প্রশাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কিছু দেবার জন্য জোর কদমে আপনি কাজ করে চলেছেন। এই জন্য সমগ্র বাঙালির সালাম ও অভিনন্দন আপনার প্রাপ্য। কিন্তু মালদহের মালোপাড়ায় ১৩টি তাজা প্রাণনাশের ঘটনায় আপনার চোখ দিয়ে এতটুকুও জল ঝরল না। আপনি মাসুদ আলমের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলেন। কিন্তু তার পাশের আর একটি গণকবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এটা আপনার সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা বলেই আমরা মনে করি। খান সাহেব, হত্যা যারাই করুক, নিহত যারাই হোক, হত্যা হত্যাই। নৃশংসতার রূপ বিভিন্ন হতে পারে, অত্যাচারীর রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু নৃশংসতা, অত্যাচার সর্বকালে সর্বযুগে এক। মাসুদ আলমের হত্যাকারীদের ধিক্কার জানাবার ভাষা আমাদের নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে মালোপাড়ার নৃশংস শিশুঘাতী বীভৎসতাকে ধিক্কার জানাবার সৎসাহস আমরা হারিয়ে ফেলিনি। ৫ জুলাইয়ের সেই মর্মন্তুদ দিনটির কথা সংবাদপত্রে পড়ে আমরা শুধু আমাদের অদৃষ্টের শিরেই বার বার আঘাত হেনেছি। আমরা রাজনীতি করি না, তাই হয়ত ভাবতেও পারি না কী করে মানুষ উন্মাদ হয়ে প্রবল মৃত্যু-জিঘাংসায় মেতে উঠতে পারে!

পশ্চিমবঙ্গের বুকে ১৯৬৭ সালের পর থেকে যে খুনের রাজনীতি শুরু হয়েছে তা দিয়ে কোন স্বর্গ কেনা হবে তা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তাই আমরা রক্তপাতের বিরুদ্ধে, হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের সামান্য লেখনী মারফৎ প্রতিবাদ হেনে যাচ্ছি এবং যাব। সাঁইবাড়ির সেই নৃশংসতা আমরা ভুলিনি। ভুলিনি বরানগরের সেই পৈশাচিকতা। তারপর গত দুই দশক ধরে একেরপর এক গুপ্ত হত্যা। সন্তানহারা মা ও স্বামীহারা বধূর আর্তনাদে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রাজনীতি বধির, তাই এই আর্তনাদ রাজনৈতিক নেতাদের কানে যায় না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ রাজনীতি করে না। তারা সুখে শান্তিতে বাঁচতে চায়। কিন্তু বাংলার শান্তিপ্রিয়, শান্ত সমাহিত জীবনযাত্রায় কে আজ আনল হিংসার বিপর্যয়? সেদিনের সোনার বাংলা রাজনীতির তীব্র গরলে বিবর্ণ হয়ে গেল। রাজনৈতিক চেতনার আর এক নাম যদি হয় রাজনৈতিক অসহনীয়তা, মতান্তর যদি পরিণত হয় সংঘর্ষে, ক্ষণিকের বিচ্ছেদের পরিণাম যদি হয় উচ্ছেদে, তা হলে ধন্য, ধন্য সে রাজনীতি!

বরকত সাহেব, আপনাদের দল শুনেছি হিংসায় বিশ্বাসী নয়। শুনেছি, আপনারা শ্রেণীসংগ্রাম চান না, চান শ্রেণীসমন্বয় (যদিও গ্রামাঞ্চলে যা হচ্ছে তা তো একই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম। সর্বহারাদের আর কিছুই নেই বলে শুধুই তাদের জীবন হারাবার ভয়)। তা হলে হিংসাকে আপনাদের এত ভয় কেন? আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী। আপনাকে এ সম্পর্কে কিছু বলা ধৃষ্টতা। তবে এইটুকু বোধহয় আপনাকেই বলা যায়, অথবা আপনার দলকেই বোঝান যায় গান্ধীজীর সেই কথা - একটি চোখের বদলে আর একটি চোখ নিলে দেশে শুধু **অন্ধদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি হবে, মানুষের কোন মঙ্গল হবে না।**

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি:পাহাড়ী রায় চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ফ্ল্যাট-১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

২৭ জুলাই

সব দিক থেকেই অভিনবত্বের দাবি করবে এই সংখ্যাটি।

পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটার দিব্যজ্যোতি বসু ও স্টাফ ফটোগ্রাফার সৌগত রায় বর্মন গোয়ালিয়র জেলখানায় গিয়েছিলেন বন্দিনী দস্যু নায়িকা ফুলন দেবীর সংগে দেখা করতে। সেখানে ফুলনসহ চম্বলের আত্মসমর্পণকারী ডাকাতদলের আরও কয়েকজনের সংগে দেখা করেন তাঁরা। কিংবদন্তির নায়িকা এই দস্যু নারীর সংগে সাক্ষাৎকারের রোমহর্ষক বিবরণ পড়ুন পর পর দুটি সংখ্যায় —

২৭ জুলাই প্রকাশিত হচ্ছে

ফুলন দেবীর মুখোমুখি, গোয়ালিয়র জেলে

এ সংখ্যার আর একটি চমকপ্রদ প্রচ্ছদ-কাহিনী :

বাংলার মিষ্টান্ন

পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত মিষ্টান্ন সম্পর্কে সংবাদদাতাদের বিবরণ। সেই সব মিষ্টান্নের গুণগত মান আজ কোথায়? বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পের সমস্যা কী?

এ ছাড়া থাকছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যে সব কান্ড চলছে তার এক দফা সরজমিন প্রতিবেদন।

প্রতিবেশী রাজ্য ও ডেট লাইন ঢাকার খবর।

ইত্যাদি প্রকাশনীর প্রকাশিত পত্রিকাগুলি বিক্রির জন্য

এজেনট চাই

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রকাশিত পত্রিকা পরিবর্তন, খেলার আসর, শিলাদিত্য এবং নবম দশম বিক্রির জন্য ভারতের বিভিন্ন শহরে সক্রিয় এবং সৎ এজেনট চাই। নিচে শহরগুলির নাম দেওয়া হল :

বিহার : পাটনা দেওঘর ভাগলপুর গয়া রাঁচি

ওড়িশা : কটক ভুবনেশ্বর পুরী কেওনঝাড় সম্বলপুর

মধ্যপ্রদেশ : নাগপুর বিলাসপুর দুরগ ভিলাই

উত্তরপ্রদেশ : এলাহাবাদ বারাণসী দেরাদুন কানপুর লখনৌ

মহারাষ্ট্র : বোমবে নাগপুর

এই সংগে অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বত্র এজেনট আবশ্যক।

উপরে উল্লেখিত শহরগুলির ইচ্ছুক এজেনটরা বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলির জন্য লিখুন : ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপলবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২, পশ্চিমবংগ।

নিবেদনমিদং

গত বছরে আমরা উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। এ বছরও করলাম। কারণ আমরা মনে করি এটি আমাদের সাংবাদিক দায়িত্ব। পরিবর্তন সর্বতোভাবেই গণমুখী সংবাদপত্র। জনসাধারণের যে সম্পর্কে আগ্রহ সে বিষয়কে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

গত বছরে উত্তম সংখ্যার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আমরা এবার তিনমাস আগে থেকে এই সংখ্যার পরিকল্পনা করি। প্রথমে আমরা তরুণকুমারের সংগে বসি। তিনিই আমাদের বলে দেন, উত্তমকুমারের অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন কারা। কারাই বা ছিলেন তাঁর সহকর্মী। তরুণকুমার তাঁর দাদা বরুণ ও মাকে দিয়ে লেখান। গৌতমেরও একটি লেখা পেয়ে যাই। এরপর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের জন্য আমাদের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরেন। ভাল ছবির জন্য ফটোগ্রাফারদের কাছে যাওয়া হয়।

উত্তম সংখ্যার অংগসজ্জা-পরিকল্পনা আমাদের শিল্প নির্দেশক নিতাই ঘোষের। সংখ্যাটিকে মনের মত সাজাবার জন্য নিতাইবাবু নিরলস চেষ্টা চালিয়েছেন দিনের পর দিন।

আলোকচিত্র • নিমাইকুমার চক্রবর্তী

উত্তম সংখ্যা প্রসংগে আমাদের কাছে বহু ব্যক্তিই বলেছেন উত্তম-পরবর্তী বাংলা চলচ্চিত্রের ওপর দিয়ে নানা সংকট যাচ্ছে। পরিবর্তনের উচিত এই সংকটের অনুসন্ধান ও সমাধানের পথ নির্দেশ করা। আমরা তাঁদের সে উপদেশ মাথা পেতে নিলাম। পুজোর ঠিক আগে আমরা একটি বাংলা চলচ্চিত্র সংখ্যা প্রকাশ করব ঠিক করেছি। এই সংখ্যায় থাকবে বাংলা চলচ্চিত্রের সংকটের গতি-প্রকৃতির পর্যালোচনা, থাকবে অজস্র সাক্ষাৎকার, অসংখ্য তথ্য প্রমাণ খুঁটিনাটি। থাকবে চলচ্চিত্রের রাঘব বোয়ালদের সম্পর্কেও নানা কথা যারা বাংলা ছবিকে গলা টিপে হত্যা করছে। আমরা সবসময়ই পাঠকদের সংগে নিয়ে চলি। তাই, সে সংখ্যার জন্য দর্শকের রায় এই শিরোনামে আমরা বেশ কিছু পাঠকের চিঠি প্রকাশ করতে চাই। বিষয়, 'কেন বাংলা ছবি চলছে না'। আপনি যদি বাংলা ছবি দেখেন, তা হলে আপনার মতে বাংলা ছবির এই দুরবস্থার কারণ কী - কী ধরনের ছবি আপনি আশা করেন - প্রত্যাশার পূরণ কীভাবে হতে পারে - লিখবেন ২০০ শব্দের মধ্যে। শ্রেষ্ঠ তিনজন লেখক ত্রিশ টাকা করে সম্মানদক্ষিণা পাবেন। আর যাঁদের চিঠি ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাঁরা পাবেন বিনা-মূল্যে এক কপি করে পরিবর্তন।

১০ আগসট সংখ্যায় বিনা পণে বিবাহেচ্ছু তরুণদের তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে। দুঃখিত, আমরা ৫০ জনের বেশি নাম প্রকাশ করতে পারব না। 'স্বাধীনতা দিবসের প্রতিজ্ঞা – আমরা বিনা পণে বিবাহ করব' এই প্রতিজ্ঞা পর্যায়ে আপনার নাম প্রকাশ করার জন্য এখনই ৫০ পয়সার টিকিট সহ খাম পাঠান। আমরা আপনাকে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠাব। ২৫ জুলাই-এর মধ্যে প্রতিজ্ঞাপত্র আমাদের হাতে আসা চাই। মনে রাখবেন আমাদের ফরম ছাড়া অন্য কোনভাবে আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

৩ আগসট থেকে পরিবর্তন নিয়মিত ৫৬ পাতা হচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়ছে। এজন্য আর মাত্র ২৫টি পয়সা আপনাদের অতিরিক্ত দিতে হবে। কিন্তু মাত্র ২৫ পয়সার বিনিময়ে আপনারা যা পাবেন তার দাম কিন্তু কম নয়।

পা. চ.

সমীপেষু

পরিবর্তনের ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বহু পাঠক-পাঠিকা আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। স্থানাভাবে সব চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হল না, অল্প কয়েকটি দেওয়া হল।

— সম্পাদক

সমকালের নিখুঁত দর্পণ

১ জুলাই, '৮৩ পঞ্চমবর্ষ পার হয়ে ষষ্ঠের কোঠায় পা রাখল 'পরিবর্তন'। বলা যায়, কৈশোর ডিঙিয়ে যৌবনের ঘ্রাণ পেল। শুধুমাত্র শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে দীর্ঘ আয়ুষ্কামনা করলেই এই পূণ্য লগ্নের পূর্ণ উৎসব করা হয় না। অর্থনৈতিক সংকট, কাগজের অগ্নিমূল্য, বিভিন্ন বিকৃত রুচির পত্রিকার কাছে জনমানসিকতা বিক্রিত -- এরকম এক পরিবেশে জন্ম নিয়েছিল 'পরিবর্তন'। যেমন বহু পত্রিকাই ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু আঁতুড়েই অকালমৃত্যু ঘটে বেশিরভাগের। যারা টিঁকে থাকে নিতান্ত আর্থিক চাপেই ব্যবসায়িক হয়ে উঠতে হয় তাদের। যার পরবর্তী পদক্ষেপ থাকে কুরুচিপূর্ণ তথ্য ও ছবির বিজ্ঞাপনে।

আর এইখানেই 'পরিবর্তন' এনেছে পরিবর্তন। স্বতন্ত্র তার স্বাদ বর্ণ গন্ধ। নিজস্ব তার আঙ্গিক বিন্যাস। পরিবর্তনের সাফল্য দীর্ঘ অর্ধযুগ ধরে নির্ভীক বলিষ্ঠতার সঙ্গে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে। সত্যের নগ্নমুখ দেখতে যে সমস্ত মেরুদণ্ডী মানুষ আগ্রহী তাদের সকলের চোখে, বাস্তবিক, 'পরিবর্তন' সমকালের এক নিখুঁত দর্পণ।

সুব্রত রায়, আল্পনা বিশ্বাস
কলকাতা ৪২

পরিবর্তনের প্রয়োজন

পর্যটন সংখ্যা মারফৎ জানতে পারলাম পরিবর্তন ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করছে। পত্রিকাটি যে কোন বাধা অতিক্রম করে যেন দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে। আজকের সমাজে পরিবর্তনের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি প্রয়োজন আছে 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির।

অমর ঘোষ
বাস বাড়ি, হাওড়া ৪

সাধুবাদ জানাচ্ছি

পরিবর্তন ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করছে, এই উপলক্ষে আমি ও আমার বাড়ির সকলে পরিবর্তনকে অকুণ্ঠ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আমরা তথা পরিবর্তনের পাঠক-পাঠিকারা এই পত্রিকার পরিকল্পনায় অংশ নিয়ে আমাদের মতামত ও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা যাতে আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হই সে ব্যাপারেও পরিবর্তনের একান্ত সহযোগিতার কথা অকপটে স্বীকার করছি ও সাধুবাদ জানাচ্ছি।

শোভনা চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া ৪

পরিবর্তনকে জানাই শুভেচ্ছা

পরিবর্তন, ১ জুলাই ১৯৮৩ তে ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করল এটা খুব আনন্দের কথা। এই উপলক্ষে সম্পাদক, সাংবাদিক ও অন্যান্য সমস্ত কর্মীবৃন্দকে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটিকে এত উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে তোলবার জন্যে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

দেবজিৎ মুখারজি
বগুলা, নদীয়া

আকর্ষণীয়

১ জুলাই শুভ জন্মদিনে 'পরিবর্তনকে' জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। 'পরিবর্তনের' প্রত্যেকটি লেখাই খুবই আকর্ষণীয়।

ইন্দিরা রায় বর্ধন
কলকাতা ৭৪

পরিবর্তনের আবহাওয়া

দীর্ঘদিন ধরে আমি 'পরিবর্তনে'র নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি আমার ভাল লাগে এই জন্যে যে, এর প্রতিটি লেখা বড় দামী এবং বিচিত্রধর্মী।

আমার মতে, পরিবর্তন সত্যিই এক পরিবর্তনের আবহাওয়া এনেছে।

অজিতকুমার মণ্ডল
হিঙ্গলগঞ্জ ২৪ পরগণা

জবাব নেই

আপনাদের পরিবর্তন 'পর্যটন সংখ্যা' অতিকষ্টে একখানি জোগাড় করেছিলাম। হাতে আসার পর এক নিঃশ্বাসে শেষ করতে না পারলেও অতি অল্প সময়েই শেষ করে ফেলেছি। তবে একবার পড়ে তৃপ্তি হচ্ছে না, বারবার প্রতিটি লেখাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সত্যি, এই সংখ্যার পরিবর্তনের জবাব নেই

মনোজ মজুমদার
বরটাঁড়, ধানবাদ

নিরপেক্ষতা

সগৌরবে আজ 'পরিবর্তন' পাঁচ পেরিয়ে ছয় বছরে পদার্পণ করছে। নিজ গুণেই এই অল্প দিনের মধ্যেই দেশবিদেশের নানা লোকের কাছে 'প্রিয়' হয়ে উঠেছে। 'পরিবর্তন' আজ আমাদের কাছে এত প্রিয় হবার কারণ নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ। আমি 'পরিবর্তন' পত্রিকাটির দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করি।

দেবাশীষ পান
নতুনগ্রাম, হুগলি

বিশ্বের পথে পরিবর্তন

আমি 'পরিবর্তন' এর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠক। পরিবর্তনের ১ জুলাই জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জন্মলগ্ন থেকে একটু একটু করে আজ পরিবর্তন বড় হতে হতে ষষ্ঠবর্ষে সবল কিশোর। নিজগুণে এরই মধ্যে বহু সুধীজনের আশীর্বাদধন্য। শক্ত পায়ে সদর্পে এখন গ্রামবাংলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধুই কি তাই। রাজধানী দিল্লির পথে পাড়ি দিয়ে সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও যেতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে বিশ্বের পথেও পাড়ি জমাবে না এটা কে বলতে পারে?

কল্যাণকুমার খাঁড়া
আলমনগর, ২৪ পরগণা

প্রশংসনীয়

'পরিবর্তন' ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করেছে ১ জুলাই। আমি প্রথম প্রকাশ থেকেই পরিবর্তনের একজন নিয়মিত পাঠক। তাই এই পত্রিকার জন্মদিন উপলক্ষ্যে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বহু বিতর্কিত বিষয়ের ওপর নানা ধরনের প্রবন্ধ বিশ্লেষণাত্মক সংবাদ পাঠকগণের চিঠিপত্র ছাড়াও প্রতিনিয়তই এই পত্রিকার উৎকর্ষ বাড়ানর যে শুভ প্রচেষ্টা আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন তা বর্তমানে প্রচলিত বহু প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার তুলনায় প্রশংসনীয়।

মনোজিৎ সেনগুপ্ত
হাওড়া-১

কেন শুভেচ্ছা জানাই

কোন পত্রিকার নাম তখনই সকলের মুখে ছড়িয়ে পড়ে যখন তার লেখা সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরের মানুষের মনে একঘেয়েমি থেকে পরিবর্তন আনে, সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল রাজ্যের সুখদুঃখের কথা লেখকের বলিষ্ঠ রচনায় দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং পাঠক-পাঠিকাদের কোন বিষয়ে প্রতিবাদ বা সমর্থন জানাবার জন্য অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়।

পরিবর্তন পত্রিকা এই অঙ্গীকার সুন্দরভাবে পালন করছে।

রামমোহন পণ্ডিত
আমতা, হাওড়া

অভিনন্দন অভিনন্দন

পরিবর্তন-এর আমি একজন নিত্য পাঠক, পরিবর্তন ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করল জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। পরিবর্তন আরও উন্নতি লাভ করুক তার শুভ জন্মদিনে এটাই কামনা করি।

মোহাঃ মাসুম আকতার
কলিকাতা–১৪

শুভ কামনা

'পরিবর্তন' বাংলা পত্রপত্রিকা জগতে এনেছে এক বিশাল পরিবর্তন তুলেছে দারুণ আলোড়ন। পরিবর্তন দেখতে দেখতে পাঁচ বছর অতিক্রম করে ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করল এ বড় কম কথা নয়। অল্প সময়ে পত্রিকাটি আমাদের চিত্ত জয় করেছে তার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দ্বারা। আমরা তার শুভ জন্মদিবসে সাফল্য কামনা করি

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা–১৪

যে কারণে অভিনন্দন

১ জুলাই পরিবর্তনে ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণে যে যে কারণে তার অভিনন্দন পাওয়া দরকার :

১।বলিষ্ঠ সংযোজন

২। গ্রাম-গঞ্জ এবং কানাগলির ভিতরে সঠিক মূল্যায়ন।

৩। নিরপেক্ষতা এবং সত্যের উপর নির্ভরশীল।

৪। চলতি সহজ ভাষা ব্যবহার।

৫। সুন্দর ছাপা ও পরিষ্কার ফটো।

৬। সঠিক বিশ্লেষণ।

৭। গ্রাম-বাংলার মানুষের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরা।

মনোজ ঘোষ
নলহাটী, বীরভূম

পরিবর্তনের আবহাওয়া

দীর্ঘদিন ধরে আমি 'পরিবর্তনে'র নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি আমার ভাল লাগে এই জন্যে যে, এর প্রতিটি লেখা বড় দামী এবং বিচিত্রধর্মী।

আমার মতে, পরিবর্তন সত্যিই এক পরিবর্তনের আবহাওয়া এনেছে।

অজিতকুমার মণ্ডল
হিঙ্গলগঞ্জ,২৪ পরগণা

ব্যানড্যান-এর কশাঘাত খুসকিকে করে কুপোকাৎ

TIARA
Ban + Dan
Shampoo
Banishes Dandruff
HELENE CURTIS

ব্যান ড্যান শ্যাম্পু চুলে সৌন্দর্য্যে ভরে, খুসকি দূর করে।

নানান কারণবশতঃ, খুস্‌কিই হ'ল, চুলের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু।

ভীষণ চুলকোয় : অনবরত মাথা চুলকোতে থাকা, সে এক বিশ্রী অবস্থা তো বটেই, তার ওপর সারা কাঁধে খুস্‌কির গুঁড়ো পড়ে থাকা তো আরও খারাপ ব্যাপার। আর তাতে চুলও খুব বেশী উঠে যেতে পারে।

আর ঐ অবস্থা আরও চরমে দাঁড়ায়, যখন আপনার খুস্‌কি দূর করার অন্যান্য শ্যাম্পু, সমস্ত খুস্‌কি যদিও ধুয়ে বার ক'রে দেয়—কিন্তু কিছুদিন পর আপনার চুলকে ক'রে নিস্তেজ, প্রাণহীন ও অতি বিশ্রী...

কিন্তু ব্যানড্যান তা করে না, কারণ এটি যে একেবারে আলাদা ধরণের। এ হ'ল, অন্য যে কোনো খুস্‌কি দূর করার শ্যাম্পুর চেয়ে দ্বিগুণ বেশী ভালো। আর, তাই তো, এদিয়ে যেমন খুস্‌কি দূর হয়, তেমনি চুলও স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে ঝলমলিয়ে ওঠে।

যার মানে হ'ল এই,—খুস্‌কি সেরে গেলেও এটি আপনি সৌন্দর্য্য শ্যাম্পু হিসেবে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন।

এক কথায় দাঁড়ায়, ব্যানড্যান দুধরনের শ্যাম্পুর কাজ একাই করে।

খুস্‌কি দূর হয় : স্ট্যানিসাইড-যুক্ত ও একটি শ্যাম্পুতে খুস্‌কি দূর করার যা যা উপাদান থাকা উচিত, সব এতে আছে। এটি মাথার তালুতে চিটকে থাকা চটচটে খুস্‌কিও তুলে বার ক'রে দেয়, যা অন্যান্য শ্যাম্পু পারে না। ভাবুন তো, কী পরিষ্কারই না হয়!

চুলে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের আগমন : ব্যানড্যান, আপনার চুলকে মোলায়েম, ঝলমলে চিকন ও রেশম-কোমল ক'রে তোলে—যার মানেই, আপনার চুলে সৌন্দর্য্যের বান ডাকে!

যদি আপনি ক্রীম আকারে চান, তাহলে ব্যানড্যান-এর খুস্‌কি দূর করার সমস্ত গুণযুক্ত, ব্যানড্যান ক্রীম শ্যাম্পুও পাওয়া যায়।

টিয়ারা
ব্যানড্যান খুস্‌কি দূর করার শ্যাম্পু

JKHC
HELENE CURTIS

Everest/83/JKHC/291-bn

তেভাগা আন্দোলন

মুখ্যমন্ত্রী ছুটিতে

অম্লমধুর

'যত মত তত পথ' :
আবদুল ববকত
ছ'মাসে চক্ররেল :
গাছে ঝোলে পাকা বেল।
নিচেতে অভুক্ত কাক,
শাক দিয়ে মাছ ঢাক;
অতঃ কিম -
ঘোড়ার ডিম।

'মর্তিব' নামে পাথর পিন্ড
বসছে এখন ময়দানে,
চিনতে কেমন ধন্দ লাগে
রাম না রহিম কে জানে!
ত্যাগ করছে মলমূত্র
বাঁধছে পাখি বাসা,
ছায়াতে তার সাট্টা জুয়া
চলছে কেমন খাসা।
নামলে আঁধার বসছে নিচে
আদিম খেলা নিত্য,
'রক্ষক' তখন 'ভক্ষক' সেজে
জুড়োয় তাহার চিত্ত।

তষিত বর্মন

মাসের গোড়ায় আফস পাড়ায়
কাবুল দেশের পাওনাদার
সবাই তাদের যায় এড়িয়ে
সুদ গুনতে ইচ্ছে কার?
মাসের শেষে সবাই হেসে
তাদের সংগে কথা বলে
ধার না পেলে এই আকালে
শেষ কটা দিন কেমন চলে!

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
তাতেই ভাসে শহর
নামবে যখন ঝেঁপে মশাই
হয়রানিটার বহর
বুঝুন তখন অবস্থাটা
ঘরে বাইরে লহর!

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পুলিশ আছে যত্রতত্র
মওকা মতো কাট
স্বামী-স্ত্রীতে চললে রাস্তায়
স্ত্রী হয় লোপাট।

অলোক ধর

লোডশেডিংয়ে বন্ধ থাকে
লাইট ফ্রিজ হিটার
মাসে-মাসে বাড়ছে তবু
ইলেকট্রিক মিটার।

মিটার রিডিং হয় না তবু
প্রচুর টাকার বিল,
ভূতের সাথে বিলবাবুদের
আছে দারুণ মিল!

এখন থেকে তাই তো বলি :
চাই না নিয়ন-বাতি,
আমরা সবাই সুখেই আছি
অন্ধকারের সাথী।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

সংস্কৃতির সং দেখাতে
শহীদ মিনার লাল
বিজলিবাতির আরেক ঢং-এ
রাজ্য বেসামাল।

প্রদীপ চক্রবর্তী

[illegible] রামমোহনের,
মহান কীর্তি গাথা-
নিয়ে এখন তেমন কেহই
ঘামায় নাকো মাথা।
হাজী মস্তান-ফুলন বাণী,
নয় সাধু দরবেশ :
তবু তাদের কথায় মুখর
হালের গোটা দেশ।

* * * *

মেয়ের বেলায় 'পণ বিরোধী'
নীতিটা বাপ মানেন,
ছেলের বেলায় পণ হাতিয়ে
বউকে ঘরে আনেন!
যে যাই বলুক, সুযোগ নিতে
সকলে বেশ জানেন
পরকে তাই দাবিয়ে রেখে-
নিজ পাতে ঝোল টানেন

বিশ্বপ্রিয়

কোথায় কতটা হল বর্ষণ
এই ছিল আমাদের সংবাদ।
এখন কাগজে শুধু 'ধর্ষণ'
আর আছে দলীয় বিসংবাদ।
কে কতটা করে মাঠ কর্ষণ
শুনতাম মোড়লের বাড়িতে
মুন্ডুটা কার নেই ধড় সন
শোনা যায় ট্রাম-বাস-গাড়িতে।

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

কী পড়াবে, কী শেখাবে
ছেলের জন্য ভাবনা কী!
নেতার খাতায় নাম তুলে দাও
তিন পুরুষের পাতে ঘি।
তাও না হলে বুদ্ধি করে
কালো টাকার খেল্ শেখাও,
ভাতের সাথে জাতে ওঠার
সহজ সরল পথ দেখাও।

প্রবীর দাস

'রেলে চড়ে আর যেও না'
কেঁদে বলেন গিন্নি,
'জয় মা তারা,' ঘর পেরোতেই
মানত করেন সিন্নি।
হেসে বলি, 'ভয় পেও না
প্রাণটা যায় যাবে,
জীবনে যা পারিনি দিতে
লক্ষ টাকা পাবে।'

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কাশিকে ঘুম পাড়ায় গ্লাইকোডিন

Glycodin

মিষ্টি মধুর স্বাদের কাশির সিরাপ যা বহু বছরের বিশ্বস্ত ওষুধ

- মস্তকে কাশির কেন্দ্রকে কাবু রাখে
- গলা খুশ্‌খুশ্‌ বন্ধ করে
- ভেতরের জমা শ্লেষ্মা গলিয়ে বার করে
- বুকের স্নায়ু-বেদনার উপশম করে

গ্লাইকোডিন–কাশি থামানোর এক বিশ্বস্ত ওষুধ যা 8-টি উপায়ে কাজ করে!

জাগুন...এক নতুন আরামের আনন্দে!

৪ জুলাই–১০ জুলাই

জাতীয়

গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলের নেতা হেমবতীনন্দন বহুগুণা অভিযোগ করেছেন আসাম ও কাশ্মীর উপত্যকায় সাম্প্রতিক নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন যে আচরণ করেছে তার ফলে এই সংস্থার প্রতি সকলের আস্থা কমে গেছে। বাঙালোরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই সংগে আরও বলেন যে এর জন্য ভবিষ্যতে দেশে আর অবাধ নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে (৪.৭)। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে দেশের দুটি বিমান সংস্থা এয়ার ইনডিয়া এবং ইনডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন সব মিলিয়ে প্রায় ৫২ কোটি টাকা লাভ করেছে, কেন্দ্রের বিমান চলাচল মন্ত্রী খুর্শিদ আলম খান এ কথা বলেছেন (৫.৭)। কানাডার উপপ্রধানমন্ত্রী অ্যালান জে ম্যাকিয়াশেন তাঁর চারদিনের ভারত সফর শেষ করে পাকিস্তান চলে যান, তিনি যাবার সময় বলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারত সফরে এসেছিলেন তা পুরোপুরি সার্থক হয়েছে। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলন দশ জনের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে জম্মুতে গেলেন, নির্বাচনের সত্যিই কারচুপি হয়েছে কিনা সেটি দেখাই তাঁদের উদ্দেশ্য (৬.৭)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি সি শেঠী অকালিদের নতুন করে যে আলোচনার ডাক দিয়েছিলেন, অকালি হাই কমান্ড তা আবার প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের মতে, চণ্ডিগড় নিঃসন্দেহে পাঞ্জাবের, সেটি তাকে নিঃশর্তে দিয়ে দেওয়া উচিত (৭.৭)। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক এক প্রাথমিক হিসাবে জানিয়েছে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ১৭.৪ শতাংশ বেড়েছে (৮.৭)। ভারতের প্রথম দুই সম্ভাব্য মহাকাশচারী রবীশ ও রাকেশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সংগে দেখা করে মস্কোয় তাঁদের প্রশিক্ষণ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন (৯.৭)। বিদেশ নির্মিত কিছু দামী অস্ত্রশস্ত্র কে বা কারা সরিয়ে ফেলেছে, প্রায় এক কোটি টাকা দামের এই আধুনিক অস্ত্রগুলি গয়ার সরকারি হেফাজত থেকে চুরি গেছে (১০.৭)।

পশ্চিমবংগ

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং চারদিনের সফর শেষে কলকাতা থেকে নয়া দিল্লি ফিরে গেলেন (৪.৭)। মালদহের চৌমুহনি গ্রামে উত্তেজিত জনতার আক্রমণে ১২ জন সি পি এম কর্মী খুন। জলপাইগুড়িতে বন্যা, ৫ জনের মৃত্যু (৫.৭)। বনমন্ত্রী পরিমল মিত্র বলেছেন, দপ্তরগুলির সমন্বয়ের অভাবই রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত করছে (৬.৭)। জনতা দলের নেতা চন্দ্রশেখর কলকাতায় বলেছেন দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে না, এই গুজব আসলে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীই রটিয়েছেন বলে তাঁর অভিমত। দার্জিলিং-এ ধস নেমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন (৭.৭)। সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ রেশন চালু, 300 ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে তার বেশি হলে হুঁশিয়ারির পর লাইন কেটে দেওয়ার প্রস্তাব (৮.৭)। মূল দাবিগুলি না মানার জন্য হাসপাতাল সমূহের হাউস স্টাফ ও ইনটারনিদের 'আউট-ডোর' বয়কট (৯.৭)। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মস্কো উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ, বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন এই সফরের পিছনে কোন রাজনৈতিক তৎপর্য নেই (১০.৭)।

রাজস্থান

চার মন্ত্রী বরখাস্ত, একজন পূর্ণমন্ত্রী, দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রী, তাঁদের পদত্যাগপত্রগুলি রাজ্যপাল ও পি মেহতা গ্রহণ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী শিবচন্দ্র মাথুর বলেছেন কংগ্রেস (ই) হাইকম্যানডের পুরোপুরি সম্মতি নিয়েই তিনি একাজ করেছেন (৪.৭)।

মহারাষ্ট্র

সাংলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী বসন্তদাদা পাতিল উপনির্বাচনে জিতেছেন, তিনি ৫৩ হাজার ২৬৭টি ভোট পেয়েছেন, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী আর শান্তারাম পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৮৬টি, বাকি চারজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদল নিয়ে গুজব শুরু হয়েছে (৪.৭)।

কেরল

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সংস্থা শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালকে এক খণ্ড জমিদান করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কোঝিকোড়ের কাছে মূললাজকোললি ও পুলপল্লি গ্রামে বন্ধ ডাকা হয় এবং সেখানে উত্তেজিত জনতা পুলিশ ও সি আর পি-র উপর আক্রমণ চালায়, পুলিশের গুলীতে ২ জন নিহত (৬.৭)।

অন্ধ্রপ্রদেশ

রাজ্য বিধানসভার সদস্য আর বি গোপাল অন্ধ্র তেলেগু দেশম নামে নতুন একটি দল গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন, গোপাল সম্প্রতি তেলেগু-দেশম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন (৭.৭)। মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামা রাও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট এড়াতে সরকারি কর্মচারী সংগঠনকে সমস্যা মোচনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। এদিকে বিতর্কিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি বারনস রামা রাও-র সংগে হায়দারাবাদে দেখা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় (১০.৭)।

পাঞ্জাব

আর কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয় এবার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় অকালি নেতারা একথা ঘোষণা করেছেন (১০.৭)।

গোয়া

তিনজন কংগ্রেস (ই) এম এল এ র দলত্যাগ, এঁরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শশিকলা কাকোদকরের সংগে একত্র এই দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মতে বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। □

আন্তর্জাতিক

[illegible]

ফ্রনটের ভাঙা সম্পর্ক কি আর জোড়া লাগবে?

নিশীথ দে

সি পি আই (এম) নেতারা ফরোয়ারড ব্লক, আর এস পি, মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লককে আর সহ্য করতে পারছেন না। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তিন শরিক এবং আর এক শরিক সি পি আই-এর সংগে সম্পর্কটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ফ্রনট চলবে শুধু সাইন বোরড হিসাবে, ভাঙা হাঁড়ি আর জোড়া লাগবে না।

রাজ্য কমিটির বৈঠকে নেতারা জেলাওয়ারি যে রিপোরট দিয়েছেন তাতে দেখিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম) 'হেরেছে' 'হেরেছে' বলে যত হইচই করা হচ্ছে আসলে অবস্থাটা তা নয়। বিগত' বিধানসভার নির্বাচনের তুলনায় সি পি আই (এম)-এর শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে। এমনকি মালদহ মুরশিদাবাদেও কংগ্রেস (ই)র চেয়ে সি পি আই (এম) অনেক বেশি ভোট পেয়েছে। ঘাবড়ানোর মত কিছু হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর ক্ষতি করেছে সি পি আই, আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক আর মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক। এই চার শরিককে এবার একটু শিক্ষা দিতে হবে। 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।' আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লকের অনেক বায়নাক্কা সহ্য করা হয়েছে, আর নয়। এই সব শরিকদের পায়ের তলায় মাটি নেই, সি পি আই (এম)-এর সমর্থন ছাড়া এদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। আব, সি পি আই (এম) নিজের শক্তি খর্ব করে কেনই বা এদের টিকিয়ে রাখবে এবং ফ্রনট-এর অস্তিত্ব বজায় রাখবে?

তবু পঞ্চায়েত নির্বাচনে গতবারের তুলনায় এবার আসন কমে যাওয়ার কারণ রাজ্য কমিটিতে বিশ্লেষণ করা হয়। তাতে স্বীকার করা হয়েছে: পারটির নির্দেশমত প্রধান এবং সদস্যরা সব সময় কাজ করেননি, জনগণের সংগে বেশ কিছু এলাকায় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, পঞ্চায়েতের কাজে দুর্নীতি হয়েছে এবং বামফ্রনট শরিকদের মধ্যে বিরোধ-এর জন্য কিছু আসন কমে গিয়েছে। এ ছাড়া কিছু এলাকায় পারটির কর্মীদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বও রয়ে গিয়েছে। কোচবিহারে ফরোয়ারড ব্লকের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির বৈঠকে জেলার কমরেডদের অভিনন্দন জানানো হয়।

সি পি আই (এম) নেতারা ধরে নিয়েছেন, এই হচ্ছে সুযোগ, শরিকদের কোণ ঠাসা কবার। কেননা, এরা ফ্রনটের বাইরে যেতে পারবে না। তাহলে কংগ্রেস (ই) এবং সি পি আই (এম)-এর চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সি পি আই (এম)-এর সাহায্য ছাড়া এইসব শরিক দাঁড়াতে পারবে না। একাত্তরের বিধান সভার নির্বাচনেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

আসলে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য নেতৃত্ব চলছে জ্যোতিবাবুর হুকুম মত। মাঝে মাঝে রাজ্য কমিটির সম্পাদক সরোজ মুখারজির মন্তব্যের দরুন জ্যোতিবাবুকেও বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে। সরোজ বাবু ধরে নিয়েছেন, তিনি প্রমোদ দাশগুপ্তর মত শক্তিধর নেতা। তিনি যা বলবেন, ফ্রনটের শরিকরা মুখ বুজে মেনে নেবেন। আর পারটি তো মানবেই। কিন্তু পারটির জেলা নেতারাও মানছেন না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে শবিক দলের নেতাবা অনেকটা চুপচাপ। সি পি আই (এম) নেতাদের সংগে আলোচনা-বৈঠকে বসে মীমাংসা নিয়ে আব কেউ ভাবছেন না। এবার ভাবতে হচ্ছে আগামী দিনে সত্যিই অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

বিশেষ করে সরোজবাবু মাঝে মাঝে যে সব মন্তব্য করছেন তাতে শরিকদলেব কর্মী থেকে নেতা কেউই আব সি পি আই (এম)-এব সংগে আপস করে চলতে রাজি নন। কিন্তু উপায়ই বা কী? ফ্রনটের বাইরে গেলে মন্ত্রিত্ব যাবে, সব যাবে। ফ্রনটে থাকলে সি পি আই (এম)-এর গোলামী করতে হবে।

সি পি আই, ফরোয়াবড ব্লক, আর এস পি এবং মারকসবাদী ফবোয়ারড ব্লকের নেতারা মাঝে মাঝে গোপনে শলা পরামর্শ করে চলেছেন। কিন্তু কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। খোলাখুলি সি পি আই (এম)-এর সমালোচনা করলে কংগ্রেস (ই) সুযোগ নেবে। অথচ মুখ বুজে সইলে লোকে বলবে সি পি আই (এম)-এর লেজুড় ছাড়া আব কিছু নয়।

তবে সি পি আই, আর এস পি এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক ও ফরোয়ারড ব্লকের মধ্যেই সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। ফরোয়ারড ব্লক এবং আর এস পির বিভিন্ন জেলা কমিটির নেতারা অভিযোগ করেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রকাশ্যে প্রচার করেছে, যাকে ইচ্ছা ভোট দিন, কংগ্রেসকে দিন কিন্তু আর এস পি কিংবা ফরোয়ারড ব্লককে ভোট দেবেন না। আসন রফা করে সি পি আই (এম) অধিকাংশ জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক, সি পি আই-এর বিরুদ্ধে বেনামে সি পি আই (এম) নির্দল প্রার্থী দিয়েছে।

ফরোয়ারড ব্লক এবং আর এস পির মধ্যে এবার সি পি আই (এম)-বিরোধী মনোভাব যেভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে তাতে জেলায় জেলায় বামফ্রনট কমিটি করে কিংবা শরিকদের নিজেদের মধ্যে আপস বৈঠক করে মীমাংসার কোন আশা নেই।

সি পি আই (এম)-এর ধারণা, আগামী লোকসভার নির্বাচনে সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)র মধ্যে সরাসবি ভোট ভাগ হয়ে যাবে। ছ বছরে বামফ্রনট সরকার যা করেছে তাতে সি পি আই (এম)-এর প্রভাব শহরাঞ্চলে কিছু কমে গেলেও গ্রামে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। কংগ্রেস (ই)র নিজেদের মধ্যে লড়াই এর সুযোগে সি পি আই (এম) এবারও বেরিয়ে যাবে।

সুতরাং সি পি আই (এম) এবাব আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরীকে বহরমপুর এবং চিত্ত বসুকে বারাসতের সিট ছাড়তেও রাজি হবেন না। সি পি আই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে বসিরহাটের আসন ছাড়া নিয়েও সমস্যা দাঁড়াবে।

তবে সি পি আই (এম) এর সমস্যা শুধু শবিকদের নিয়ে নয়, নিজের দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই জোবদার হয়েছে। ওপর থেকে নিচে সর্বস্তরের কর্মী ও নেতারা এখন পারটির কাজের চেয়ে সরকারি কমিটি আর পুরসভা পঞ্চায়েতের ক্ষমতা পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে।

যে সব এলাকায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম) একক গরিষ্ঠতা পেয়েছে সেখানে প্রধান উপপ্রধান সভাপতি সহসভাপতি পদের জন্য পারটির মধ্যে লড়াই চলছে। লোকাল কমিটি এমনকি জেলা কমিটির নির্দেশও মানছেন না। লোকাল কমিটি যাকে মনোনীত করেছে অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি।

বিভিন্ন পুরসভাতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই চলছে। নদীয়া জেলায় একটি পুরসভায় চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান দুজনেই সি পি আই (এম)-এর লোক। পারটির মধ্যে এই দুই নেতার দুদল সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতিও হয়ে গিয়েছে।

বরানগর পুরসভার চেয়ারম্যানকে নিয়ে পারটির মধ্যে বিরোধ এখন প্রকাশ্যে চলছে। কামারহাটি পুরসভার এক কর্মকর্তাকে নিয়েও বেশ কিছুদিন ধরে পারটির মধ্যে অশান্তি চলছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, সি পি আই (এম)-এর ক্ষমতাসীন নেতারা আর এস পি ফরোয়ারড ব্লককে কোণ ঠাসা করার চেষ্টা করছে। আব একদিকে সি পি আই (এম)-এর বিক্ষুব্ধরা বিভিন্ন জেলায় তলে তলে আর এস পি এবং ফরোয়ারড ব্লককে মদত দিচ্ছেন।

সি পি আই চুপ করে বসে নেই। রাজ্য নেতৃত্বের পরামর্শ ছাড়াই জেলায় জেলায় বামফ্রনট সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পোসটার দিচ্ছে। জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন সি পি আই-এর জেলার নেতারা।

আর এস পি খুব শীঘ্রই রাজ্য সম্মেলন ডাকছে। এই সম্মেলনেই বামফ্রনট সম্পর্কে নীতি ঠিক করা হবে। ফরোয়ারড ব্লকের রাজ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করছেন।

রাজ্য বামফ্রনট কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়েছিল জেলায় জেলায় বামফ্রনট কমিটি গঠিত হবে ও প্রতি দশদিনে একবার করে বৈঠক হবে এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। যে সব সমস্যা জেলা বামফ্রনটে মীমাংসা হবে না সেগুলি নিয়ে রাজ্য বামফ্রনট কমিটিতে আলোচনা হবে।

আজ পর্যন্ত কোন জেলাতেই বলতে গেলে পাকাপাকিভাবে বামফ্রনট কমিটি গঠিত হয়নি। অনেক জেলায় আর এস পি এবং ফরোয়ারড ব্লক জানিয়ে দিয়েছে আগে ঠিক হোক যে বামফ্রনটের সিদ্ধান্ত মেনে চলা হবে এবং শরিকদলগুলির বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তারপর জেলা বামফ্রনট নিয়ে ভাবা যাবে। □

তোমার আঙিনা জুড়ে কেন আঁকি প্রত্যহ আলপনা,
কেন যে নিঃশব্দে কিংবা পল্লবিত নাম-সংকীর্তনে
প্রায় অষ্টপ্রহরের স্তব্ধতায় বাংলা আখরে
প্রাণের আহুতি জ্বালি হৃদয়ের অধরে-উত্তরে।

বিষ্ণু দে

'সেই অন্ধকার চাই'

দেহপট সনে নট সকলি হারায়। কিন্তু দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তম কিছুই হারাননি। তাঁর কায়া চিতাভস্মে বিলীন, কিন্তু ছায়া মানুষের হৃদয়পটে আজও অমলিন। মৃত্যুর তিন বছর পরেও তিনি উত্তম। মরণসাগর পারে তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

জীবনে তিনি ছিলেন প্রবাদ, মরণে তিনি কিংবদন্তি। বাংলা চলচ্চিত্রের কুরুক্ষেত্রে বহু রথীর রথের চাকা আজ যে মেদিনী গ্রাস করে নেবে তা কে জানত? কে জানত একটি মাত্র নায়কের প্রস্থানেই পাদপ্রদীপের ওপর পড়বে যবনিকা? ছবি যখন স্মৃতি তখন সে শুধু পটে লিখা। কিন্তু যে ছবি প্রতিটি মানুষের 'হৃদিস্থিতেন' – চলমান অনুভূতি – সে ছবি যেন প্রতিটি মানুষেরই আত্মকৃতি। উত্তমকুমারের সার্থকতা এইখানেই। তিনি প্রকৃত অর্থেই বাঙালির 'ম্যাটিনী আইডল' – আপন প্রিয় গৃহবিগ্রহ।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার কথাটি আলোচিত হয় – কখনো সোচ্চার, কখনো নিম্ন স্বরে। বহু কৃতী বাঙালির চিতাতে যে আজও মঠ ওঠেনি সে কি শুধু আত্মবিস্মৃতি? রাজনীতি কখনো বিবেককে তার নিজের মত কাজ করতে দেয় না। আবার কখনো উন্নাসিকতা কর্তব্যের দুয়ারে কাঁটা দেয়। আপন প্রাপ্য না পেয়েও যিনি আপন গৌরবে জীবনকে ধন্য করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে যিনি অমৃত খুঁজে নিতে পারেন তিনিইতো উত্তম।

আপনজনের স্মৃতি

আমি উত্তমের মা—শ্রীমতী চপলা দেবী

আমি আপনাদের 'উত্তমকুমার' এর মা। সে ছিল আমার ছেলে। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে পরিচয় সে আপনাদেরই লোক। আমি তার জন্ম দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তার নবজন্ম লাভ হয়েছিল আপনাদের দাক্ষিণ্যে। নানান মুখে শুনতে পাই বাংলা সিনেমার এখন নাকি এক দুরবস্থা চলছে, তার কারণ নাকি উত্তমের হঠাৎ মৃত্যু। সন্তানের মৃত্যু মায়ের বুকে যে কী পরিমাণ বাজে, সে যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সেই বোঝে। উত্তমের মৃত্যু তবে কি বাংলা সিনেমাকেও এমনই এক অসহনীয় পুত্রশোকে পঙ্গু করে ফেলল? 'সময়' হয়তো একদিন এই অবস্থা থেকে বাংলা ছবিকে আবার তুলে আনবে ওপরে। কিন্তু সেই একই সময়ের জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি কবে সে আমায় অনেক অনেক ওপরে তুলে নিয়ে চলে যাবে আমার এই ধারাবাহিক শোকের জ্বালা কমাতে।

আমার দুই ছেলে সিনেমার লাইনে কৃতী। এক বৌমাও তাই। ইংরেজিতে তাদের বলে Star, মানে 'তারা'। সে হিসেবে আমার বাড়ি হল তারার হাট। এর মধ্যে একটি তারা ক্রমশই যেন বেশি জ্বলজ্বল করছিল। প্রকৃতির নিয়ম মেনে সেটাই আগে নিভে গেল। ১৯৮০-র ২৪ জুলাই, আমার তারার হাটে নামল আঁধার। সেই অন্ধকার আমার ঘর ছাপিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই গ্রাস করল সারা দেশটাকে। একটি মাত্র প্রাণের শিখা নিভে গেলে যে এতখানিটা অন্ধকার সৃষ্টি হতে পারে চারিদিকে, সেটা বুঝেছিলাম উত্তমের চলে যাওয়ার পর। ওর প্রাণহীন দেহটার ওপর জনতার যেন প্রাণের দাবি শুধু এক লহমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ফেটে পড়তে চাইছিল সেদিন আমাদের বাড়ির সামনে। সেদিন মনে হয়েছিল আমি তাহলে সত্যিই রত্নগর্ভা। তিনটে বছর পার হতে চলল। স্মৃতি নিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি। সারা বছর ধরে কাগজে দেখছি এখানে সেখানে উত্তমের পুরনো ছবি দেখান হচ্ছে। কানে আসছে, সেই পুরনো ছবিগুলোও নাকি নতুন অবস্থায় এত চলেনি আগে। আর আমি ভাবি অন্য কথা। এইসব পুরনো ছবিগুলোর কাজ করার জন্য যখনই উত্তম সই-সাবুদ করত তখনই সে আমাকে প্রণাম করত টাকা দিয়ে। ওর বক্তব্য ছিল টাকা দিয়ে মাতৃপ্রণাম করলে সেই টাকা শতগুণে বেড়ে ফিরে আসে। এই সত্যটা সে কোথা থেকে খুঁজে পেয়েছিল জানি না কিন্তু তার সেই মাতৃভক্তিটুকু যে লক্ষগুণ বেদনা হয়ে আমার কাছে ফিরে আসছে একথা আমি জানাব কার কাছে?

শেষের দিকে একটা মনমরা ভাব কেমন যেন গ্রাস করে ফেলেছিল উত্তমকে। আমার চোখে সেটা ধরা পড়তে আমি ওকে কারণ জিজ্ঞাসা

করতাম। ও বলেছিল, 'লোকে বোধহয় আমাকে আর চাইছে না।' জানি না এই বিশ্বাসেই তার হঠাৎ অমৃতলোকে পাড়ি দেবার তাগিদ এল কিনা। তবে তার আত্মা যদি ওপর থেকে লক্ষ্য করে থাকে তবে দেখবে, কত চোখের জলে তার নশ্বর দেহকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল আর আজও কী গভীর ভালবাসা তার প্রতি। এসব দেখে সে হয়ত বলবে তারই অভিনীত এক চরিত্রের মত, 'জন্ম জন্ম যেন আমি এই দেশের মাটিতেই জন্মলাভ করি।'

শুনেছি শিল্পীর মৃত্যু হয় না। উত্তমের বেলায় কথাটা ঠিকই। কিন্তু সন্তানের যে মৃত্যু হতে পারে এবং কখনও কখনও আমার মত মায়েদের সেই মৃত্যুকে মেনেও নিতে হয়, এটা জীবনের চেয়ে অনেক বড় সত্য এবং নির্মম সত্যও বটে। □

আমি উত্তমের ভাই—

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেশ ছিলাম এতদিন নিজেকে নিয়ে। অত্যন্ত জনপ্রিয় দুই অভি-নেতা ভ্রাতার বিরাট মাপের দুটি ছায়ার আড়ালের মাঝখানটিতে থেকে বেশ কেটে যাচ্ছিল আমার। সকালে উঠে বাজারে যাই, অফিস করি, সিনেমা দেখি, আড্ডা মারি। মোট কথা উত্তেজনা-বিহীন দিন-গুলো আর পাঁচজনের মত আমারও কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ 'পরিবর্তন' পত্রিকার কেন যে নজর পড়ল আমার ওপর তা জানি না,অনুরোধ এল আমাকে এই মধ্যম হয়ে 'উত্তম'-এর স্মৃতিচারণ করতে হবে।

আমার দাদা 'উত্তমকুমার' আর ছোট ভাই''তরুণকুমার'। এক সূর্যের প্রখরতার মাঝেই লক্ষ লক্ষ তারারা যায় হারিয়ে আর আমাদের পরিবারে দু-দুটি জনপ্রিয়তার প্রবল অবস্থিতি আমাদের সবাইকে প্রায় করে তুলেছে ফিল্মের নেগেটিভের মত। মানে আলোর দিকে তুলে ধরে চিনতে হয় 'কে-' এ পরিচয় আনন্দের এবং গর্বেরও।

ONLOOKER-এর মত আমি দেখেছি দাদার কী অপরিসীম সাধনা বড় মাপের শিল্পী হওয়ার জন্য। ক্রমে ক্রমে দাদা নাম করল,প্রতিষ্ঠা পেল, তারপর কেমন করে কখন যেন এক বিরাটে পরিণত হল। খুব কাছাকাছি থাকলে এই বিবর্তনটা তো চোখে পড়ে না, কিন্তু বুঝতে পারতাম দাদাকে কেন্দ্র করে আমা-দের বাড়ি, সামাজিক পরিবেশ এমনকি আমরা নিজেরাও কেমন যেন বদলে যাচ্ছি। সেই একটা সময়, যখন এই পরিবর্তনটা আসছে। মনে হত যেন বহুদূরে সমুদ্রের মাঝখান থেকে একটা এগিয়ে আসা ঢেউয়ের মৃদু গুঞ্জন কানে এসে লাগছে। তারপর সেই দূরের ঢেউটাই একদিন কাছে এসে আছড়ে পড়ে চারদিক প্লাবিত করে দিল। দাদা তখন 'শিল্পী' থেকে 'গুরু', 'নায়ক' থেকে 'মহানায়ক;''উত্তম' থেকে 'সর্বোত্তম' হয়ে গেছে। এইসব পরিবর্তন যা কিছু হয়েছিল তা কিন্তু শিল্পী উত্তমকুমারের। আমার দাদা হিসেবে সে রয়ে গিয়েছিল একই রকম। এই ভূমিকায় তার প্রথম পরিবর্তন এল যখন আমাদের বাবা মারা গেলেন। আমাদের সেই শোকের মাঝে দাদাকেই দেখলাম আদল পালটে সংসারে বাবার কর্তৃত্ব, শাসন আর লালনের গুরুভারটা এমনভাবে কাঁধে তুলে নিতে, যার মুখে ভাষা দিলে এই কথাটাই বেরিয়ে আসে 'ভাবনা কিসের? আমি তো আছি।'

সংসারের বাজারের থলিটা তখন আমারই হাতে। দাদার মধ্যে মধ্যেই ইচ্ছে হয় বিশেষ কোন মাছ কিংবা আনাজ খাওয়ার। আর সেটার জন্যে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে নিজে ডেকে ফরমাশ করতে তার ভুল হত না। আমার মনে হত, অনেক উঁচুতে উঠে যাবার পর মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে যে কৃত্রিমতা এসে গ্রাস করে, দাদার এই প্রচলিত বাঙালিয়ানা রান্না খাওয়ার স্পৃহাটুকু বোধহয় তাকে তখনও আমাদের খুব কাছের মানুষ করে রেখেছিল।

আমার এই মাধ্যমিক জীবনের কিছু অস্বস্তিও আছে দাদা ও বুড়োকে কেন্দ্র করে। তার ওপর বুড়ো ঘরে আনল যাকে সেও তখন চলচ্চিত্র আর মঞ্চের নামী হিরোইন সুব্রতা। অস্বস্তিগুলো এই, যেমন, আমি কেন সিনেমায় নামলাম না? যেমন, আমার নিজস্ব পরিচিতির জগতেও আমার আশপাশের ফিস-ফিসানি, 'উত্তমকুমারের ভাই' তরুণকুমারের দাদা'। যেমন নিজের অসুস্থতা নিয়ে পরিচিত ডাক্তারের কাছে গেলেও উত্তর দেবার প্রথম প্রশ্নটি হল 'উত্তমবাবু কেমন আছেন?' এর মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপার হল আর পাঁচজনের মতই দাদার ছবির দর্শক হয়ে হলে বসে আছি, হঠাৎ কেউ চিনে ফেলল এবং 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর' সেই প্রবাদটা হঠাৎ সত্যি হয়ে দাঁড়াল।

তবুও, আজ যখন এসব কথা ভাবি তখন মনে হয় ছবির জগতের লোক না হয়েও, দাদাই আমাকে ধীরে ধীরে এক নেগেটিভ ছবিতে পরিণত করে গেছে। ভাবতে ভাল লাগে, দাদার আলোয় আমার নেগেটিভ ছবিটা আজ 'পরিবর্তন' পত্রিকার পাতায় ছাপার অক্ষরে পজিটিভ হয়ে প্রকাশিত হল। □

আমি উত্তমকুমারের ছেলে—

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

বাবির কথা বলে শেষ করা যায় না। বাবি, বু-কাকু (তরুণকুমার) এত বড় সব অভিনয়ের মানুষ কিন্তু অভিনয়ে নিজেদের কখনও খুব বড় বলে ভাবতেন না বাবি। এমন ভাবও কখনও দেখাননি। সবাই ভাল, কারও নিন্দা করতে কখনও শুনিনি। বলতেন, ছবি দাদুর সাজসজ্জা, অভিনয় আর জহর দাদুর সংলাপ, উচ্চারণ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। পাহাড়ী দাদুব 'আপন ভোলা' চরিত্রগুলির অভিনয় নিয়ে খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন, তুলসীদা (তুলসী চক্রবর্তী) গোল আলু, ডালে ঝোলে ঝালে সবেতেই সমান কদব। কৌতুক ও অভিব্যক্তিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর বায় খুবই প্রতিভাবান। স্টেজে ও সিনেমায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অ্যাসেট।

আমি যদিও স্কুলে অভিনয় করেছি, তেমন কিছু ছাপ ফেলার মত ব্যাপক নয়। অভিনয়, গান বা চলচ্চিত্রের জগৎ কোনদিনই তেমন টানেনি। এমনকি চলচ্চিত্র ব্যবসাতেও এগোতে আগ্রহী হইনি। বাবিও আমার নামে বা মামির নামে কোন চিত্র প্রযোজনা বা বাবসায়িক কোন কিছু করতে আগ্রহ দেখাননি। একবার বু-কাকু আমার নামে গৌতম চিত্রম-এর ব্যানারে 'অবাক পৃথিবী' করেছিলেন। পড়াশুনো করে কৃতী হই এটাই বাবি চাইতেন। তাই দারজিলিং সেনট পলস-এ ভর্তি করেছিলেন। চীনা আগ্রাসনের সময় মামি আর ঠাম্মার কান্নাকাটির জন্য নিজে গিয়ে নিয়ে এলেন, ভর্তি হলাম লা মারটিনিয়ের-এ।

বড় হবার পর সফল ব্যবসায়ী হই এটাই বাবি চাইতেন। একটা ওষুধের দোকানও আমায় করে দিয়েছিলেন। ওষুধ তৈরির ফ্যাকটরি করারও খুব ইচ্ছে ছিল বাবির। সবাইকে সব সময় উদার হাতে সাহায্য করেছেন। একদিন বু-কাকু বললেন 'দাদা, তুমি দিচ্ছ লোক জানবে না কেন?' বাবি বলতেন, 'তম ভাব আসে দান প্রকাশে। দানেব তখন কোন মানে হয় না।'

বাড়িব সবদিকে নজর ছিল বাবির। ছাদের কোন এক কোণে একটা বাল্ব হয়ত খারাপ হয়ে গেছে, যতক্ষণ না নিজের হাতে সেটা পালটাচ্ছেন ততক্ষণ শান্তি পেতেন না। আর কত উদার ছিলেন! আমাদের বাড়ির কাজের লোক, ড্রাইভাব, দারোয়ান, ধোপা, নাপিত এমনকি জমাদার পর্যন্ত সবাইকে সত্যিই ভালবাসতেন। বাবির পায়ে হাত দিয়ে বিজয়াব পর অনেকেই এসে প্রণাম করতেন। তিনিও জড়িয়ে ধরতেন তাকে। এমনই ছিল তাঁর মহত্ত্ব।

সেই বাবি চলে গেলেন। আর সবাইকে চমকে দিয়ে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে মামিও চলে গেলেন। এই কাঁদিয়ে যাবার ছল ছিল বলেই হয়ত স্ত্রীর মায়ার বন্ধন আর ছোট্ট আমার মেয়েটিকে দিয়ে গেছেন তাঁরা। আমার কান্না এরাই মুছিয়ে দেয়, আনন্দে ভরিয়ে তোলে। আর আছেন ঠাম্মা, পি-কাকু, বু-কাকু, বোনেরা। তাই বাবি আর মামিব কাছে এক অসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় মন। কাঁদিয়ে গেছেন কিন্তু একা, অথৈ অসহায়তার মধ্যে ফেলে যাননি তাঁরা। □

আলোকচিত্র : এস রায়

আলোকচিত্র : [illegible]

আলোকচিত্র : এস রায়

ঠিক সময়েই অফিসে আসত, ছুটি হলে চলে যেত

'চাকরি করব না রে। চাকরি ছেড়ে দেব, দশটা-পাঁচটা আমার দ্বারা সম্ভব না। না করলে নয় বলে করছি।'

কথাগুলো বলেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের মুকুটহীন সম্রাট প্রয়াত মহানায়ক উত্তমকুমার। যখন তিনি তদানীন্তন পোরট কমিশনারস অধুনা পোরট ট্রাসটের সামান্য একজন বেতনভুক কর্মী। বলেছিলেন অফিসে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী বীরেন দেকে। সালটা সম্ভবত ১৯৪৯ কি ১৯৫০। 'কামনা' সবে মুক্তি পেয়েছে। উত্তমকুমার এম পি প্রোডাকশনসের পাঁচ বছরের কনট্র্যাকট পেয়েছেন। 'সহযাত্রী' ছবিতে ভারতী দেবীর সংগে অভিনয় করছেন।

বহুদিন পর সেসবেরই স্মৃতি চারণ করছিলেন উত্তমের একদা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বীরেন দে। এখন তাঁর চুল সব সাদা হয়ে গেছে। বসেছিলাম, বীরেনবাবু ডক থেকে পেমেনট সেরে ফিরে এলেন। বয়স পঞ্চান্ন। অবসর নেবেন ছিয়াশি সালে। পোরট কমিশনারসে জয়েন করেছেন ১৯৪৮ সালের ১৭ মে। ক্যাশ সেকশানে বসেই বীরেনবাবুর সংগে কথা হচ্ছিল। বীরেনবাবুর পাশেই ছিলেন উত্তমের আরও একজন সহকর্মী তারক নাথ সেন। উত্তমের সংগে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে এখনও এই দুজনই মাত্র রয়েছেন। বাকিরা রিটায়ার করে গেছেন।

বীরেনবাবুকে জিগ্যেস করলাম–আরো অনেকজন থাকতে আপনার সংগে উত্তমের এত ঘনিষ্ঠতা হল কীভাবে? ঈষৎ হেসে বীরেনবাবু বললেন, এর কারণ আছে–উত্তমের মামারবাড়ি ছিল একান্ন নমবর আহিরীটোলা স্ট্রিটে। আর আমার বাড়ি ছিল একষট্টি নমবর আহিরীটোলা স্ট্রিটে। আমার বাবা ছিলেন উত্তমের মেজমামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া আমার মা এবং উত্তমের মা দুজনে ছিলেন একান্ত অন্তরংগ বন্ধু। এই দিকটি আবিষ্কৃত হওয়ার পরই উত্তমের সংগে আমার হৃদ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তখন ও সবে 'নষ্টনীড়' ছবিতে কাজ করছে। ও সব কথাই আমাকে বলত। আমাকেই প্রথম উত্তম বলেছিল, 'কামনা ছবিতে হিরোর সুযোগ পাচ্ছি। ছবি রায় হিরোইন। ছবি মুক্তি পেলে দেখিস।' সেই সময়ই উত্তম বীরেন বাবুকে জিগ্যেস করেছিলেন'চাকরি করছি, ছুটি পাচ্ছি না। ছুটির খুব দরকার–কী করা যায়।' তখন ট্রেজারার ছিলেন লালচাঁদ দত্ত। উত্তম কাজ করতেন ক্যাশ অ্যানড পে-তে। লালচাঁদবাবুও ভবানীপুরে থাকতেন, উত্তমও ভবানীপুরে থাকত। উত্তমও ডকে পেমেনটে যেত। লালচাঁদবাবু ওকে শ্যুটিং-এর দিন ছেড়ে দিতেন। শ্যুটিংএর দিন থাকলেই উত্তমের মাথা খারাপ হয়ে যেত। লালচাঁদবাবুর কাছে ছুটত ছুটির জন্য। বকাবকি করে উনি ছুটিও দিয়ে দিতেন।

বীরেনবাবুকে জিগ্যেস করলাম, 'কামনা' দেখার পর আপনার মনে হয়েছিল যে আপনার বন্ধু একদিন অভিনয় জগতে খ্যাতির শিখর ছোঁবেন? কোন দ্বিধা না করেই বীরেনবাবু বললেন, হ্যাঁ আমার মনে হয়েছিল। তাছাড়া উত্তমের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচন্ড। ও বলত, দাঁড়াবই। দেখ আমি ফ্রি অভিনয় করি–সেরকম তোর সংগে কথাবার্তা বলছি সেরকমই পারট করি।

উত্তম-ই আপনাদের কামনা দেখাতে নিয়ে গেছিলেন? আমার এ প্রশ্নের জবাবে বীরেনবাবু বললেন, না। ও বলেছিল ছবিটা দেখবি। সম্ভবত উনপঞ্চাশে কামনা রিলিজ করে শ্যামবাজারে 'পূর্ণশ্রী' হলে। মুক্তি পাওয়ার পরে ফারসট উইকেই দেখেছিলাম বেশ মনে আছে বন্ধু বান্ধবদের সংগে নাইট শোতে।

শেষ আপনার সংগে কবে দেখা হয়েছিল? জিগ্যেস করলাম। মৃত্যুর বছর আটেক আগে। উত্তম ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে আমাকে শ্যুটিং

তারকনাথ সেন

বীরেন দে

ও দেখিয়েছিল। উত্তম এখানে কাজ করার সময় একটা নাটকও করে।

বীরেনবাবু আসার আগেই তারকবাবুর সংগে কথাবার্তা সেরে নিয়েছিলাম। তারকবাবু এখন ডেপুটি ট্রেজারার। বয়স চুয়ান্ন/পঞ্চান্ন মতই হবে। অবসর নেবেন আর বছর কয়েকেই। উনি অফিস রেকর্ড থেকে পোরট কমিশনারসে উত্তমের কর্মজীবনের তথ্য দিলেন।

উত্তমকুমারেব অফিসের খাতায় নাম ছিল অরুণ কুমার চ্যাটারজি। চাকরিতে জয়েন করেন ১৯৪৪ সালের চৌদ্দই সেপটেমবর 'বিল রিকভারি' বিভাগে। সাতচল্লিশ সালের পয়লা ডিসেমবর থেকে তাকে ক্যাশ অ্যানড পে সেকশানে বদলি করা হয়। অফিস রেকরডে উত্তমের জন্ম তারিখ রয়েছে এক তিন উনিশশো সাতাশ। চাকরিতে ইস্তফা দেন পঞ্চাশ সালের ৪ ডিসেমবর। মোটামুটি চুয়াল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই কবছর উত্তম তদানীন্তন পোরট কমিশনারসে কাজ করেন।

তারকবাবু বলছিলেন, একেবারে প্রথম দিকে উত্তম অফিসের কাজ সেরেই চলে যেত। অফিস আসত ঠিক সময়ে। তবে কাজ হয়ে গেলে 'কাজ আছে' বলে চলে যেত। প্রথম প্রথম কেউ-ই জানত না। যদি শ্যুটিং-এর চাপ বেশি থাকত তবে উত্তম অ্যাবসেনট হয়ে যেত। কোন কাজ বাকি থাকলে, ওর যদি আগে যেতে হত, ও সহকর্মীদের বলে যেত। অন্যেরা সহযোগিতা করত।

আলোকচিত্র : শিবকৃষ্ণ সাধুখাঁ

তারপর স্টুডিওতে কাজ বাড়তে থাকায় খুব বেশি অ্যাবসেনট হতে শুরু করল। অফিস কর্তৃপক্ষ জানতে চাইল, কী ব্যাপার নিজে থেকেই ফিলমে শ্যুটিং-এর খবর বলে ফেলল। তখন ব্যাপারটা পুরো জানাজানি হয়ে গেল। এবং ধীরে ধীরে উত্তমের অ্যাবসেনট হওয়ার মাত্রাও বেড়ে গেল। অবশেষে ও নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দিল।

তারকবাবুকে জিগ্যেস করলাম চাকরি ছাড়ার পর উত্তম আর অফিসে এসেছিল কিনা। মাথা নেড়ে তারকবাবু বললেন, না, একদিনের জন্যও নয়। তবে পথে-ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে নিঃসংকোচে চিনতে পারত। এবং সেই উষ্ণতা নিয়েই বুকে জড়িয়ে ধরত। চাকরি ছাড়ার বছর পাঁচ/সাত পরে একদিন উত্তমের সংগে দেখা নিউ ক্যাথে চাইনিজ রেস্তোরাঁতে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেতে বসেছে। দেখতে পেয়েই সেই আন্তরিকতা নিয়ে কথাবার্তা বলল। খোঁজখবর নিল।

তারকবাবুকে জিগ্যেস করলাম, মৃত্যুর খবর পেয়ে গিয়েছিলেন

তারকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। যখন মালা দিলাম, উত্তমের ভাই তরুণ বলল, আপনার মুখ আমি চিনি। মানুষ হিসেবে উত্তম সত্যিকারেরই বড় মাপের মানুষ ছিল। □

সাক্ষাৎকার : সুখেন্দু দাশ

ভোলা যায় না 'শ্যামলী'র স্বামী অনিলকে – সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন : উত্তমকুমারের সংগে প্রথম দেখা হওয়া এবং আলাপ হওয়ার কথা কি মনে আছে ?

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় : নিশ্চয়ই। 'নতুন ইহুদী' নাটকের বোরড রিহারসাল চলছিল কালিকা থিয়েটারে। ভানুদা মানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এসে কানে কানে বললেন, 'উত্তমকুমার এসেছে তোমার সংগে আলাপ করতে। উত্তমকুমার তখন মহানায়ক হননি, তবে চলচ্চিত্রে নায়ক হিসেবে নামডাক শুরু হয়েছে। আমার অভিনয়েব প্রশংসা অনেকের কাছেই শুনেছিলেন, তাই আলাপ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

এমনিতেই আমি খুব চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে। ভানুদার কথা শোনা মাত্র মনে এক বিচিত্র অনুভূতি হল।রূপালি পর্দাব জনপ্রিয় ছায়াকে কায়ারূপে দেখতে পাওয়া, কথা বলা, একেবারে মুখোমুটি হয়ে সে এক অদ্ভুত শিহরণ। তড়িঘড়ি ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লাম। উত্তম কুমার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধরে তুললেন। পায়ের আঙুল কেটে রক্ত ঝরছিল তখন। আমার মধ্যে সলজ্জ আড়ষ্টতা হয়তো ছিল। মিষ্টি হাসির সংগে স্বাভাবিক বাচন ভংগিতেই অনেকক্ষণ আলাপ করলেন উত্তমদা।

বলা যায় প্রথম সাক্ষাৎকারটা ছিল রক্তঝরা সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন : 'শ্যামলী' নাটকে উত্তমকুমারের সংগে অভিনয় করতে গিয়ে আপনার কী রকম প্রতিক্রিয়া হল ?

সাবিত্রী : 'শ্যামলী'তে আমার সংগে উত্তমদা নায়ক হচ্ছেন শুনে খুব আনন্দ হয়েছিল। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীই চান সহযোগী শিল্পী যে সুদক্ষ হন। সুদর্শন হলে তো কথাই নেই। আমার এটা জানা ছিল যে উত্তমকুমার কাউনটার অ্যাকটিং-এ অনন্য।

প্রশ্ন : 'শ্যামলী' নাটকের রিহারসাল চলাকালীন আপনি উত্তমকুমারকে অনেক কাছ থেকে দেখলেন। সে সময়কার বিশেষ কোন ঘটনা মনে পড়ে ?

সাবিত্রী : সেরকম কিছু নেই। তবে চরিত্রকে বাস্তব করে তুলতে ওরকম নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পরিশ্রম নিশ্চয়ই একটা আদর্শ। অভিনয়ে যে সিরিয়াসনেস তাঁর মধ্যে দেখেছি

'শ্যামলী'তে উত্তমকুমার - সাবিত্রী

সাবিত্রী-উত্তম অন্য একটি ছবির দৃশ্যে

আজকাল তা বড় একটা দেখা যায় না। কিভাবে চরিত্রকে আরো ভালো করা যায়। আমি কি ভাবে করলে তিনি কী করবেন, এসব নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করতেন আমার সংগে। আমার বাড়িতে এসেও রিহারসাল দিতেন আলাদাভাবে।

প্রশ্ন : পেশাদারী মঞ্চে শ্যামলীতে উত্তমকুমারের প্রথম অভিনয়। কেমনভাবে উত্তমকুমার মঞ্চের সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন ?

সাবিত্রী : পেশাদারী মঞ্চে প্রথম হলেও সখের থিয়েটার তো অনেক করেছিলেন। নিজেদেরও একটা পারিবারিক নাটকের দল ছিল। তাই এখানেও খাপ খাওয়াতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। নিয়মানুবর্তী হলে সবক্ষেত্রেই নিজেকে খাপ খাওয়ানো যায়। সেটা ওঁর ছিল। আর ছিল ব্যক্তিত্ব যা সমীহ করে চলত সবাই। তবে কোন অসুবিধে হচ্ছে বা খাপ খাওয়াতে পারছেন না এমন ভাব প্রকাশ করেননি কখন।

প্রশ্ন : শ্যামলীতে উত্তমকুমার অভিনয় কেমন করেছিলেন ?

সাবিত্রী : উচ্চস্তরের। জায়গায় জায়গায় অতুলনীয়। এই নাটকে শ্যামলীই সব, শ্যামলীকে কেন্দ্র করেই নাটক। তবুও কি ভোলা যায় শ্যামলীর স্বামী অনিলকে!

প্রশ্ন : অভিনয়ের বিষয়ে উত্তমকুমার কী ধরনের আলোচনা করতেন ?

সাবিত্রী : আরো ভাল অভিনয় করার কথা ভাবতেন। তাঁর অভিনয়ে কোন ত্রুটি আমাদের চোখে ধরা পড়েছে কিনা জানতে চাইতেন।

প্রশ্ন : দীর্ঘ ৪৮৪ রাত ধরে একনাগাড়ে এক সংগে অভিনয় করার পর নাটকটা যখন শেষ হল তখন কোন দুঃখবোধ হয়েছিল কি ?

সাবিত্রী : হ্যাঁ, সেটা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন : উত্তমকুমারের মৃত্যুর তৃতীয় বার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিচারণে আপনার বক্তব্য কী ?

সাবিত্রী : উত্তমকুমার যে এ জগতে নেই এখনও কিছুতেই অনুভব করতে পারছি না। তিনি অমর। আমার কাছে তাঁর কোন মৃত্যুবার্ষিকী নেই। কাজেই মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কোন স্মৃতিচারণের প্রশ্নই আসে না। আজও 'নিশিপদ্ম' ছবির 'পুষ্প' ডাকের সেই অনন্য কণ্ঠস্বরের অনুরণন আমার কানে বাজে। ☐

সাক্ষাৎকার :
কল্লোল ব্রহ্মচারী

চিত্রনাট্যকারের চোখে উত্তমকুমার

বুড়ো হলে কি আমার এই ইমেজ থাকবে ?

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

উত্তমকুমারের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় বংগশ্রী কটন মিলস-এর কর্ণধার প্রয়াত শিল্পপতি দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মেট্রোপলিটান বিলডিং-এর ফ্ল্যাটে। আলাপ হয়েছিল এর অনেক আগে গিরীশ মুখারজিদের বাড়িতে। মুখারজি পরিবারের এক কন্যা রমলার সংগে আমার পরিচয় হয় চক্রধরপুরে। আমিও তখন ভবানীপুরের নীলগোপাল মিত্র লেনে মানে থিয়েটার সেনটারের পেছন দিকে থাকতাম। অরুণকুমারের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি পায়ে হাঁটলে পাঁচ মিনিট। রমলার আমন্ত্রণে জগদ্ধাত্রী পুজোর যাত্রা দেখতে গেলাম। গিরীশ মুখারজির প্রাসাদপ্রতিম বাড়ির উঠোনে যাত্রা হত, সেই যাত্রা করত পাড়ার ছেলেরা। অরুণকুমার তথা উত্তমকুমার নায়ক, নাটকের নাম স্বর্ণলংকা। উত্তমকুমার রাম। ফরসা ধবধবে গায়ে নীল রঙ মেখে আশ্চর্য সুন্দর রামরূপে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই রমলা বর্তমানে এক বিখ্যাত শিল্পপতির গৃহিণী।

এরপর উত্তমকুমারের সংগে মাঝে মাঝে দেখা হত, দু একটা সৌজন্যমূলক কথা হত, তারপর যে যার কাজে চলে যেতাম। তারপর দেখা মিঃ ডি এন ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাটে।

মিঃ ভট্টাচার্যের আমি ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলাম, প্রায়ই দেখতাম ওঁরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজদ্রোহী কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছেন। আমার আত্মাভিমান ছিল, আমাকে মিঃ ভট্টাচার্য এ আলোচনায় ডাকছেন না কেন? মিঃ ভট্টাচার্যের অভিমান বিশ্বনাথ এ সম্পর্কে আমাকে কেন অনুরোধ করছে না? অতএব আমরা দুজনেই চুপ। একের পর এক অনেককে দিয়ে কাহিনীর চিত্রনাট্য করিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না। শেষে স্নেহভাজন কৃণাল মুখারজি চিত্রনাট্য করতে নিয়ে গেলেন। এর কয়েকদিন পরেই উত্তমকুমার বললেন বিশ্বনাথবাবুকে দিয়ে চিত্রনাট্য করান।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। উত্তমবাবু কখনও আমাকে ডাঃ রায় বলে ডাকতেন না, সবসময়ে বিশ্বনাথবাবু বলতেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনাকে আমি উত্তমবাবু বলব না অরুণবাবু বলব?

উত্তমবাবু হেসে উত্তর দিলেন ব্যাঙ্কের চেকে যখন উত্তমকুমার সই করি, তাহলে আসল নামটা চাপা পড়ে ছদ্মনামটাই আসল হয়ে গেছে। সত্যিই মানিকতলার চৌধুরী গ্যারাজের মালিক মনোজ চৌধুরীকে গাড়ি কেনার বাবদ যে টাকা দিয়েছিলেন, তাতে সই করেছিলেন উত্তমকুমার।

মিঃ ভট্টাচার্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি লিখবে?

—কৃণাল কবে চিত্রনাট্য শোনাবে?

—আগামী বৃহস্পতিবারে।

—সেই দিন বলব।

বৃহস্পতিবার চিত্রনাট্য শোনা হল। খারাপ হয়নি তবে বড় ঢিলে ঢালা। সকলেই না বললেন। আমি বললাম—এক শর্তে আমি লিখব—

—কি? লাখ টাকা চাই নাকি?

—আমি যদি চাই, না লিখলেও আপনি ও টাকা দিয়ে দেবেন। আপনার দান ধ্যানের কথা দেশের সকলেই জানেন।

—তবে কি চাও?

—চিত্রনাট্যকার হিসেবে কৃণালের নাম থাকবে।

—ব্রেভো। উত্তমকুমার বলে উঠলেন—ঠিক আছে তাই হবে, তবে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আপনার নাম থাকবে।

সেই কথা ঠিক হল। চিত্রনাট্য শেষ করে যখন আবার হাজির হলাম, পরিচালক নীরেন লাহিড়ী বললেন—চমৎকার হয়েছে।

এই চিত্রনাট্যের আর একজন শ্রোতা ছিলেন, তাঁর নাম আরতি ভৌমিক। এত ভাল মেয়ে আমি কদাচিৎ দেখেছি। তাঁর বাড়ি উত্তর কলকাতার সিঁথি অঞ্চলে। তিনি তখন নবাগতা শিল্পী। তিনি চিত্রনাট্য শুনে বললেন আমি নায়িকার ভূমিকায় করতে পারব না। নায়িকার ভূমিকায় করুন সুপ্রিয়াদি আর দ্বিতীয় নায়িকার ভূমিকায় আমি করছি।

উত্তমকুমার বললেন—না। তুমিই নায়িকা হবে। নবাগতার সংগে অভিনয় করে যদি ছবি হিট করাতে না পারি, তাহলে আমি কিসের উত্তমকুমার। আর কোন কথা নয়, আরতি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে। বাকি যাকে যা খুশি দিন। তবে যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেশি কাজ পান না, তাঁদের দিলে

খুশি হব।

মিঃ ভট্টাচার্য সম্মতি দিলেন। আরতি ভৌমিকের নাম বদলে গিয়ে হল অঞ্জনা ভৌমিক। উত্তম-অঞ্জনা অভিনীত রাজদ্রোহী আজও মুক্তি পেলে হাউস ফুল হয়।

রাজদ্রোহীর স্যুটিং যখন চলছে, তখন একদিন উত্তমবাবু আমাকে বললেন—বিশ্বনাথবাবু, আপনার কাছে কোন গল্প আছে? আমি বেণুকে নিয়ে একটা ছবি করতে চাই। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আছে।

—তাহলে রবিবার সকালে গল্প নিয়ে আমার বাড়িতে চলে আসুন। প্রোডিউসারও থাকবেন।

—ঠিক আছে।

আমি চেমবারে চলে গেলাম। সেদিন বৃহস্পতিবার। গল্প লেখা দূরে থাক, আমার মাথাতেও কোন গল্প নেই। কী লিখি, কী লিখি ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে স্নান করে খেতে বসার আগে হঠাৎ নজরে পড়ল কাউনট অব মনটিক্রিসটো বইটা। হঠাৎ খেয়াল হল এই গল্পটাকে আধুনিক এবং বাঙালিয়ানা দিয়ে একটা গল্প লিখলে তো সিনেমার কাহিনী দাঁড়িয়ে যাবে। সেইদিন থেকেই লিখতে আরম্ভ করলাম। শুক্রবার, শনিবার লেখা শেষ করে যখন রবিবার সকালে উত্তমবাবুর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে উপস্থিত হলাম, তখন সকাল নটা বেজে পনের।

চিত্রনাট্য পড়া হল। সকলেই খুশি। আমি নাম দিয়েছিলাম আগন্তুক। উত্তমবাবু বললেন নামটা বদলাতে হবে।

আমি নাম বদলে দিলাম জীবন-মৃত্যু। নাম বদলের সংগে পরিচালকও বদল হয়ে গেল। নীরেন বাবুর জায়গায় পরিচালক হলেন হীরেন নাগ। উত্তম-সুপ্রিয়া অভিনীত জীবনমৃত্যুর কথা সকলেই জানেন।

এরপর কলঙ্কিত নায়ক। বন্ধুবর সলিল দত্ত যখন কাহিনীর চিত্রনাট্য নিয়ে উত্তমবাবুর কাছে গেলেন, তখন বিনাদ্বিধায় সই করলেন এবং সব ডেট দিয়ে দিলেন।

এখানে একটা মজার কথা বলি। জীবনমৃত্যুর পরিবেশক হিসেবে প্রথম চিত্রনাট্য শুনলেন এস বি পিকচারসের শ্রীতারক রায়। তাঁর পছন্দ হল না, তারপরে শুনলেন শ্রীবিষ্ণু পিকচারসের প্রাণকৃষ্ণবাবু। তিনি সংগে সংগে পছন্দ করে সইসাবুদ করে ফেললেন। কলঙ্কিত নায়কের সময় প্রথমে চিত্রনাট্য শুনলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু, তাঁর পছন্দ হল না। তারপরে শুনলেন তারকবাবু। সংগে সংগে তিনি পছন্দ করে সইসাবুদ করে ফেললেন।

এক সেটে জীবনমৃত্যুর শ্যুটিং চলছে, অন্য সেটে অ্যান্টনী ফিরিংগীর শ্যুটিং চলছে। উত্তমকুমার একবার এ সেটে, কিছুক্ষণ পরে আবার ও সেটে। অমানুষিক পরিশ্রম করছেন। কারণ তাঁর প্রয়োজিত হিন্দি ছবি ছোটিসি মুলাকাৎ এ ভয়ংকর রকম ঋণ হয়ে গেছে। সে ঋণ কত বলা মুশকিল, তবে উত্তমবাবু আমাকে বলেছিলেন প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। অমানুষিক পরিশ্রম আর ঋণের দুশ্চিন্তায় হঠাৎ একদিন তাঁর স্ট্রোক হল। তিনি ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে ভেতরের ঘরে শুয়ে। ডাক্তার বারণ করে দিয়েছেন কোন ভিজিটারস দেখা করতে পারবেন না। পাওনাদারেরা বাইরের ঘরে বসে। তাঁদের ধারণা উত্তমকুমার বাঁচবেন না এবং তাঁদের পাওনা টাকা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুপ্রিয়া দেবী সকলকে সকাতরে বললেন, আমায় কিছুদিন সময় দিন, আমি যতটা পারি শোধ করে দেব।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? সকলেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন নিজের প্রাপ্য বুঝে নেবার জন্যে। সুপ্রিয়া দেবী তখন যেখানে যেভাবে যে ভূমিকা পাচ্ছেন, তাতেই অভিনয় করছেন এবং শ্যুটিং করে যে টাকা পাচ্ছেন, বাড়ি ফিরে পাওনাদারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

ধীরে ধীরে পাওনাদারদের বিশ্বাস ফিরে এল। ভিড়ও ফাঁকা হতে লাগল এবং উত্তমবাবুও আবার সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিলেন।

উত্তম-সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়েছিল কি না বলতে পারব না তবে দুজনে অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। একদিন আমাকে সন্ধ্যেবেলায় উত্তমবাবুর বাড়ি যেতে বলেছিলেন। আমি সাতটায় গেলাম। কেউ বাড়িতে নেই। দারোয়ান বলল, আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। আমি অপেক্ষা করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। উঠব উঠব ভাবছি এমন সময় উত্তম-সুপ্রিয়া ঘরে ঢুকলেন। দুজনেই খুব সেজেছেন এবং দুজনের গলাতেই ফুলের মালা। উত্তমবাবু হেসে বললেন, আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। আজ আমাদের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, তাই দেরি হয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম সুপ্রিয়া-দেবীর সিঁথিতে সিঁদুর।

আমি উঠি তাহলে?

পাগল নাকি? আজ ব্রাহ্মণ ভোজন করাব বলে আপনাকে আনিয়েছি। বেনু, তোমার রান্না পরিবেশন শুরু কর।

সুপ্রিয়া দেবী খুব ভাল রান্না করতে পারেন, বিশেষ করে বড় চিংড়ির মালাইকারী। বলতে দ্বিধা নেই আমি ভোজনবিলাসী। আমি ও উত্তমবাবু খেতে বসে গেলাম। উত্তমবাবু স্বল্পাহারী। আমি ছটা চিংড়ি লুচির সংগে উড়িয়ে দিলাম। তারপরে চাটনি, দই, মিষ্টি।

পরের দিন ভোরবেলা উত্তমবাবুর ফোন। রিসিভার তুলতেই জিজ্ঞাসা করলেন, শরীর ভাল আছে তো? অতগুলো চিংড়ি মাছ খেয়ে শরীর খারাপ হয়নি তো?

এখনও ভাল আছি।

তাহলে বেনু ভাল রান্না করে সরটিফিকেট দিচ্ছেন?

নিশ্চয়ই, পেটুক হিসেবেও দিচ্ছি, ডাক্তার হিসেবেও দিচ্ছি।

এরপর অনেকদিন দেখা হয়নি। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল বেলভিউ নারসিং হোমে। আমি একটা পেশেনট দেখে ফিরছিলাম, উত্তমবাবু তাঁর ছেলে গৌতমকে নিয়ে ফিজিওথেরাপি ডিপারটমেনটের দিকে যাচ্ছিলেন। আমার সংগে দেখা হয়ে যেতে প্রাথমিক কথাবার্তার পর বললেন, কাল পরশু একদিন আমার বাড়ি আসুন, জরুরী কথা আছে।

কথা দিলাম এবং গেলাম। উত্তম-সুপ্রিয়া দুজনেই গৌতমের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত এবং ঠিক করেছেন উত্তর কলকাতার আইভি অ্যানড কোমপানি কিনে গৌতমকে চালাবার ভার দেবেন।

চিত্র প্রয়োজক শ্রীঅসীম সরকার সুপ্রিয়া দেবীকে দিদি বলে ডাকতেন এবং আমার ধারণা ছিল অসীমবাবু

গানের রিহার্সালে উত্তম-সুচিত্রা / আলোকচিত্র : এস রায়

সুপ্রিয়ার ছোট ভাই। অসীমবাবু আমার সংগে ঘুরে শ্রীমান গৌতমের ড্রাগ লাইসেনস বিষয়ে নানা কাজ করেন। সেই সময়ে ড্রাগ কনট্রোলার ছিলে ডাঃ অজিত কর। তিনি সবরকম সাহায্য ও সহানুভূতির সংগে কাজ করে অতি দ্রুত লাইসেনস বার করে দেন।

এরপরেই উত্তমকুমারের মাথায় কী খেয়াল হয় তিনি ওষুধের কারখানা করবেন। আমতা অঞ্চলে তাঁর অনেক জমি আছে, সেই জমিতে তিনি কারখানা স্থাপন করবেন। আমার ডাক পড়ল। আমি গেলাম। তাঁর প্রাইভেট চেমবারে আমাকে নিয়ে বসে একটা ফ্যাকটরির ব্লু প্রিনট দেখিয়ে বললেন, দেখুন তো এই ফ্যাকটরি করলে কিছু লাভ হবে কি না?

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। গ্লুকোজ, নরম্যাল স্যালাইন, গ্লুকোজ স্যালাইন প্রভৃতি ওষুধ তৈরি হবে বড় বড় বোতলে, যাকে ওষুধ বিশেষজ্ঞরা নাম দিয়েছেন ইনট্রাভেনাস ট্রানসফিউজন ফ্লুইড (বি টি বটল) ফ্যাকটরি।

ব্লু প্রিনট দেখার পর জিজ্ঞাসা করলাম—এ ব্লু প্রিনট আপনাকে কে দিল?

—দীপংকর ঘোষ।

দীপংকর ঘোষ একজন কৃতী ওষুধ তৈরিকারক কেমিসট। তার উৎসাহ অধ্যবসায় এবং সততা আছে।

এই ফ্যাকটরি করলে যে আপনার লাভ হবে। কে আপনাকে বলেছেন?

—ডাঃ মুরারী মোহন মুখারজি।

মুরারীবাবুর মত বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক আই ভি ফ্লুইড তৈরির বুদ্ধি দিয়েছেন উত্তমকুমারকে। টা ন্যায্য। এই ধরনের ফ্লুইড সারজারিরির সময়ে প্রয়োজন লাগে এবং সবসময়ে এ ধরনের ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ রকমের ফ্যাকটরি করলে যে প্রকারের কারিগরী বিদ্যা ও অর্থের প্রয়োজন তা কজন বাঙালির পক্ষে বায় করা সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমি সেদিন কোন সরাসরি উত্তর দিইনি। বললাম—আমাকে দু একদিন সময় দিন। একটু আলোচনা করে আপনাকে জানাব।

আমি আলোচনা করলাম ড্রাগ কনট্রোলার ডাঃ করের সংগে, অ্যাসিসট্যানট ড্রাগ কনট্রোলার অমল চক্রবর্তীর সংগে এবং আরও অনেক পারদর্শীর সংগে। সকলেরই মত এক ওষুধ তৈরির ফ্যাকটরি, বিশেষ করে আই ভি ফ্লুইডের ফ্যাকটরি তৈরি খুব ব্যয়সাপেক্ষ এবং কারিগরী বিদ্যার নিপুণতাও দরকার। পশ্চিমবংগে এ ধরনের ফ্যাকটরি মাত্র কয়েকটি আছে। এ রকমের ফ্যাকটরি করলে প্রচুর ইনভেসটমেনট করতে হবে।

সমস্ত রকমের তথ্যাদি সংগ্রহ করে এক সংতাহ পরে উত্তমের বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

উত্তমকুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ঠিক করলেন?

আমি পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কী ঠিক করেছেন?

—ভাবছি একটা ওষুধের ফ্যাকটরি করব।

—কে দেখাশোনা করবে?

—কেন? আমি?

—অভিনয় জগত থেকে আপনি চলে যাবেন?

—দেখুন, উত্তমকুমার একটু চিন্তা করে অনেকটা আত্মগতভাবে বললেন—একদিন আমি বুড়ো হব। দাঁত পড়ে যাবে। চুল উঠে যাবে, তখন কি আর আমার এই ইমেজ থাকবে?

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম—কত টাকা পর্যন্ত ইনভেসট করতে পারবেন?

এক্ষুনি চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা। তারপর যখন যেমন দরকার খরচ করব।

কিন্তু খুব বিশ্বাসী লোক না হলে আপনি কোমপানি চালাতে পারবেন না।

—কেন? আপনি রয়েছেন, যতদিন না আমি জয়েন করি, ততদিন আপনি দেখাশোনা করবেন।

এ কথার সরাসরি উত্তর দিতে পারলাম না। বললাম—এক সংতাহ পরে জানাব।

আমার বন্ধুবান্ধব এবং যে কোমপানিতে চাকরি করি, তার কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানালাম। সকলেই না বললেন।

আমি দিন তিনেকের মাথায় ফোন করে জানালাম, আপনার কোমপানিতে আমার কাজ করা হবে না।

তারপর অনেকদিন আমার সংগে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। হয়ত খানিকটা অভিমানে, খানিকটা রাগে আমার সংগে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন এক প্রযোজক আমার কাছে এসে বললেন—আমি উত্তমবাবুকে নিয়ে একটা ছবি করব। গল্প আপনার। হিরোইন নতুন।

আমি ইতস্ততভাবে উত্তর দিলাম—উত্তমবাবুর সংগে আমার বহুদিন যোগাযোগ নেই। তাছাড়া তিনি আমার গল্প নেবেন কিনা তারও ঠিক নেই।

প্রযোজক উত্তর দিলেন—আমি উত্তমবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উত্তমবাবু আমাকে একটা ফোন নমবর দিয়েছিলেন, সেটা টেলিফোন গাইডে ছিল না। লোকে বিরক্ত করত বলে এই ফোন নমবর গোপন রেখেছিলেন। আমি সেই ফোন নমবরে ফোন করে উত্তমবাবুর সংগে কথা বললাম। তিনি বললেন সামনের রবিবারে তাঁর বাড়ি যেতে। প্রযোজককে বললাম, সোমবার আমার সংগে দেখা করতে।

রবিবার যথাসময়ে উত্তমবাবুর সংগে দেখা করলাম। চা বিস্কুট ও ফাইভ ফিফটি ফাইভ খেলাম। উত্তমবাবু হাসিমুখে স্বচ্ছন্দভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর? কেমন আছেন?

—ভালই। আপনার ছবি একটার পর একটা দেখছি।

—হুঁ। আগেকার রাগ অভিমান মিটেছে?

আমি হেসে বললাম—রাগ তো আপনি করেছেন।

—উহুঁ। আমি মোটেই রাগ করিনি।

তবে দুঃখ হয়েছিল। আমার চারপাশে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা শুধু নিজেদের কাজ হাঁসিল করার মতলবে ঘোরে। প্রকৃত বন্ধু আমার নেই বললেই চলে। যাকগে ওসব কথা। আপনি কী প্রস্তাব এনেছেন বলুন।

আমি সংক্ষেপে প্রযোজকের কথা বললাম, উত্তমবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নতুন মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন?

—না।

হুঁ। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে আমি চারলস লটনের মত অভিনয় করি, কিন্তু মনের মত গল্প পাচ্ছি না। আপনি একটা গল্প তৈরি করে পারেন?

আমার মাথায় ঝিলিক মেরে গেল। উইটনেস ফর দি প্রসিকিউশন-এর বাংলা করলে একটা ভাল সিনেমার ছবি হয় এবং উত্তমকুমারও মেজাজের সংগে অভিনয় করতে পারেন। আমার প্রস্তাব উত্তমবাবুকে জানালাম। উত্তমবাবু সংগে সংগে রাজী হলেন। আমি নীরব সাক্ষী নাম দিয়ে গল্প লিখলাম, উনি চিত্রনাট্য শুনলেন, পছন্দ করলেন, তারপর বললেন, আমার আর একটা প্রস্তাব আছে। বলুন, প্রযোজক বললেন, সেদিন প্রযোজক আমার সংগে ছিলেন। উত্তমবাবু বললেন—মানুদাকে পরিচালনায় নিতে হবে, বেচারীর বড় দুর্দিন যাচ্ছে।

মানুদা অর্থে পরিচালক মানু সেন। প্রযোজক আমতা আমতা করে বললেন—বড্ড সেকেলে।

উত্তমকুমার একটু রাগের ঝাঁকে উত্তর দিলেন, তাহলে আমিও সেকেলে। আপনারা আসতে পারেন। নমস্কার—

প্রযোজক ভয় পেয়ে বললেন—না, না, আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

আগে বিশ্বনাথবাবু আর মানুদাকে অ্যাডভানস দিয়ে কনট্রাক্ট করুন, তারপর আমাকে অ্যাডভানস দেবেন, আর নতুন হিরোইনকে নিয়ে আসবেন।

প্রযোজক তাই করলেন। নতুন হিরোইনকে দেখলেন। সুন্দর দেখতে মেয়েটি, মুখখানি ভারি সুন্দর আর স্নিগ্ধ। নাম মঞ্জুলা।

উত্তমবাবু বললেন আমাকে অ্যাডভানস দিন আর ডেট নিয়ে নিন।

মানুদা উত্তমবাবুর পুরো ডেট নিয়ে শ্যুটিং আরম্ভ করার তোড়জোড় করলেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রযোজক আর এগোলেন না, তারপর হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। উত্তমবাবু নীরব সাক্ষীর পুরো ডেটগুলি সলিল দত্তের সেই চোখ শ্যুটিংএর জন্য দিয়ে দিলেন। এমনই আশ্চর্য নরম মনের মানুষ ছিলেন। তিনি কখনও কাউকে না বলতে পারতেন না, বিশেষ করে দুর্দিনে যিনি উত্তমকুমারকে সাহায্য করেছিলেন। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, খোকাদা (বিভূতি লাহা) যদি আমাকে ছাগলের পারট দেন, আমি তাও করব, কারণ আজকের উত্তমকুমারের পেছনে আছে খোকাদার অসামান্য পরিশ্রম। খোকাদা না থাকলে আমি কিছুতেই এত বড় হতে পারতাম না। আর একজনের ঋণ কোনদিন ভুলব না। সে রমা (সুচিত্রা সেন)।

এরপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং দুজনের দেখাসাক্ষাৎ দৈবাৎ হত। তারপর একদিন দূরদর্শনে, রেডিয়োতে শুনলাম তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ, সেদিন ৮ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই, তারাশংকরের জন্মদিন। □

সারাদিন গল্প হত, কত আইডিয়া ছিল উত্তমের : বিধায়ক ভট্টাচার্য

আমার অনেকগুলো ছবিতে পর-পর উত্তম অভিনয় করেছে. প্রায় সবকটিই বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেছে। ক্রমশই পরিচয় গভীরতর হয়ে উঠেছে। আমাদের সেই বন্ধুত্বের মধ্যে বয়স কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে, বিনা সংকোচে আমাকে উত্তম নতুন ছবি সম্বন্ধে অনেক সাজেশান দিয়েছে। 'অবাক পৃথিবী' লেখার সময় ওর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়েছি, ওর সুচিন্তিত মতামত আমাকে চিত্রনাট্য তৈরি করতে অনেক সহায়তা করেছে, একথা স্বীকাব করতে আমার কোন সংকোচ নেই। 'দেয়া-নেয়া' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' লেখার সময় লক্ষ্য করেছি, উত্তম যেন সেই রচনাকাল থেকেই তার অভিনেয় চরিত্রের সংগে একাত্ম হয়ে যেত। ঠিক মনের মত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম খুশি হতে পারত না। নিজের মনোমত জিনিসটি তাগাদা দিয়ে লেখাতে না পেরে, সকাল বেলাতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেছে ওর বাড়িতে, কখনো ভবানীপুরে, আবার কখনো বা ময়রা স্ট্রিটে। সারাদিন ধরে লেখার পর রাত্রে নিজে এসে পৌছে দিয়ে গেছে।

অনেক ছায়া ছায়া ছবির মধ্যে একটি উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠছে। সকাল বেলায় টেলিফোন ধরতেই উত্তম-কণ্ঠ 'এখুনি তৈরি হয়ে নিন, গাড়ি যাচ্ছে।বৌদিকে বলে দেবেন, বাড়িতে খাবেন না।' ব্যস। গাড়ি পৌছল উত্তমের ভবানীপুরের বাড়িতে। অফিস ঘর। এক পাশে ছোট চৌকিতে তাকিয়া দিয়ে বিছানা করা। আমি ঘরে ঢুকতেই উত্তম এগিয়ে এসে প্রণাম করে চৌকিতে বসিয়ে দিল। পাশে কাগজ কলম। আমি আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাতেই উত্তম তার নিজস্ব ভুবনমোহন রহস্যময় হাসিটি হেসে বলল, 'আসলে আজ গণেশ আনতে ভুল হয়ে গেছে, তাই জ্যান্ত গণেশ দিয়েই নতুন অফিস শুরু করলাম।'– সূচনা হল 'উত্তম কুমার ফিলমস'-এর। রচনা আরম্ভ হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র রচিত 'ভ্রান্তিবিলাসের' চিত্রনাট্য।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের সংগে উত্তমকুমার আলোকচিত্র : অলোক বসু

ভীষণ গল্প করত উত্তম–অন্তত আমার সংগে। বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ছিল ওর মাথায়। সব সময় ওর সংগে আমি পাল্লা দিয়ে উঠতে পারতাম না। আগে থেকে ঠিক করা থাকলে পাছে না যাই, এজন্য হঠাৎই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেত ময়রা স্ট্রিটে। এ বাড়িটা আমার খুব ভাল লাগত। ওখানে উত্তমকে খুব সহজ মানুষ বলে মনে হত। সারাদিন গল্প, নানান ধরনের আইডিয়া, নতুন গল্পের প্লট, খাওয়া দাওয়া সব নিয়ে একটা পরিপূর্ণ আনন্দের দিন কেটে যেত ওর সংগে। প্রায়ই বলত 'একটা নতুন ধরনের চরিত্র তৈরি করুন বিধায়কদা। এই শহুরে মেকি মুখোশ আর ভাল লাগছে না। একেবারে নতুন কিছু দিন, যার মধ্যে প্রাণ আছে।' ঠিক এই ধরনের আকুতি শুনেছিলাম আমার নাট্য জীবনের শুরুতে স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে, পরবর্তীকালে বন্ধুবর স্বর্গীয় ধীরাজ ভট্টাচার্যের মুখেও ঐ একই কথা শুনেছি।

উত্তম প্রয়াণের তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্মৃতিচারণের চেষ্টা করলাম, উত্তমের জন্য। কিন্তু সে কাজ খুব সহজ নয়। চলচ্চিত্র জগতের সকলেই জানতেন আমাদের মধ্যের এই পারস্পরিক প্রীতি-মধুর সম্পর্কের কথা। অনেক ক্ষেত্রেই মতান্তর ঘটেছে উত্তমের সংগে, কিন্তু মনান্তর ঘটেনি কখনও।

উত্তমের সংগে প্রথম দেখা হওয়ার ছবিটা উজ্জ্বল রাখতে চাই, কিন্তু কালের প্রবাহে তা ছায়া হয়ে এসেছে, আর শেষ দেখার ছবিটা মন থেকে মিলিয়ে দিতে চাই, কিন্তু বিস্মৃতি সেই শেষ দেখার ব্যথাকে মুছিয়ে দিতে পারেনি। ওকে শেষ-বারের মত দেখলাম দূরদর্শনের পর্দায়। দেখলাম ওর শেষ যাত্রা, মহাযাত্রা।

শিল্প জগতের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের চরণে উত্তমের অভিমানী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, সেই প্রার্থনা জানিয়ে এই স্মৃতিচারণ শেষ করছি।

সাক্ষাৎকার : শিবশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা চোখে উত্তম

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি নায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর তিনটি বছর পার হয়ে গেল। এই তিনবছর ধরে শিল্পীর জনপ্রিয়তা যেন আরো বেড়েই চলেছে। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে চারজন বিশিষ্ট গুণীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে উত্তমকুমারের জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক, অনেক না জানা ঘটনা।

সরযূবালা দেবী

স্টার থিয়েটারে যখন 'শ্যামলী' নাটক করা হবে ঠিক হল তখন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে 'শ্যামলীর' যুগ্ম পরিচালক যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক উত্তমকে নিয়ে এলেন। তখন সবে 'বসু পরিবার' ছবিতে ওর সামান্য নাম হয়েছে। অপূর্ব চেহারা। মুখে মিষ্টি হাসি। 'শ্যামলী'তে ও আমার ছেলের পারট করবে। প্রথমদিন থেকেই ও আমাকে মা ডাকতে শুরু করে। শেষদিন পর্যন্ত তাই ছিল আমাদের সম্পর্ক। অভিনয় চলাকালীন ও প্রতিদিন আমাকে প্রণাম করে স্টেজে ঢুকত। বারণ করলেও শুনত না। ৪৮৪ রাত ধরে শ্যামলী চলেছিল। উত্তম প্রশংসাও পেয়েছিল প্রচুর কিন্তু সবসময়েই দেখতাম ওর মধ্যে একটা অতৃপ্তি রয়েছে। বয়স্ক শিল্পীদের বারবার বলত, আমাকে একটু চালিয়ে নেবেন। বা সিন করে এসে বলত, একদম ভাল হল না। অবসর সময়েও সমবয়সীদের সংগে গল্পগুজব না করে দেবনারায়ণ গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তীদের মধ্যে বসে থাকত। এঁদের আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।

শুধুমাত্র ছবিতে অভিনয় করব, জনপ্রিয়তা হবে তাই ওর লক্ষ্য ছিল না। ওর অনেক পরিকল্পনা ছিল। পুনা ফিলম ইনসটিটিউটের মত একটা সংস্থা কলকাতায় করার ওর খুব ইচ্ছে ছিল। থিয়েটার রোডে এজন্যে একটা জমিও দেখে রেখেছিল। একসংগে সিনেমা হল, অডিটোরিয়াম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর ফিলম লাইব্রেরি থাকবে ভেবেছিল।

যে কোন চরিত্র নিয়েই ও খুব ভাবত, প্রচুর পড়াশুনা করত। ছেলেবেলায় দেখতাম অভিনয়ের আগে দানীবাবু ধ্যানে বসতেন। ওর নিষ্ঠা ছিল ঐরকম।

ব্যক্তিগত জীবনে ও অসম্ভব মাতৃভক্ত ছিল। নিউ আলিপুরের বাড়ির তিনতলাটা ও বিশেষভাবে সাজিয়েছিল বাবা মা'র জন্য। গৌরীকেও খুব ভালবাসত। বলত, গৌরী আমার লক্ষ্মী। পরবর্তীকালে সুপ্রিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠতা হবার পরেও সেই অনুভূতি একই রকমের ছিল। সুপ্রিয়ার সেবা আর গৌরীর সহমর্মিতা দুটোকেই ও সম্মান দিয়ে গেছে। কিন্তু ওকে বুঝতে পারেনি কেউ। ওর মৃত্যুতে কানন দেবী বলেছিলেন, উত্তমের কোন বন্ধু ছিল না। এটাই ওর জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক সত্যি।

মন্মথ রায়

উত্তমকুমারের সংগে আমার প্রথম আলাপ হয় স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটক দেখতে গিয়ে। অভিনয়ের শেষে গ্রিনরুমে ও আমাকে প্রণাম করতে বলেছিলাম, অনেকদিন ধরে তোমাকে কাছে পাবার ইচ্ছে ছিল, আজ পূর্ণ হল। চিরপরিচিত স্মিত হাসি হেসে উত্তম জবাব দেয়, আমারও ঠিক তাই। এরপরে কখনও দেখা হয়েছে, টেলিফোনে কথা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে আমি সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার পাওয়ায় ও শিল্পী সংসদের তরফে আমাকে সম্বর্ধনা জানাতে চাইল। কিন্তু যে তারিখটা নির্দিষ্ট ছিল সে সময়ে আমাকে দিল্লিতে থাকতে হওয়ায় আমি উত্তমকে সেটা জানাই। কিন্তু ও আমাকে কতখানি শ্রদ্ধা করত এবং এ ব্যাপারে কতটা সচেতন ছিল সেটা বোঝা যাবে যে সময়াভাবে সেই সম্বর্ধনা তখন দেওয়া হয়ে না উঠলেও ও তা ভোলেনি। পরে ১৯৮০ সালের ১৬ জুন আমার জন্মদিনে তপন থিয়েটারে আমাকে সেই সম্বর্ধনা দেয়। মানপত্রটিতে ও নিজে হাতে সই করেছিল। মানপত্রের সংগে আমাকে ৫০১ টাকাও দিয়েছিল। আমি সেই টাকা তখনই উত্তমের হাতে তুলে দিয়েছিলাম দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্যে। অভিভূত উত্তম আমার পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

ওর সংগে আমার শেষ দেখা হয় আমার রচিত কাহিনী খনা বরাহের সেটে। ও বরাহ চরিত্রে রূপদান করছিল। প্রণাম করে বলল, বড় কঠিন কাজের ভার পড়েছে, আশীর্বাদ করুন। বললাম, 'জয়োস্তু'।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, জীবনে আমি অসংখ্য সোনার চুড়ির হাতের হাততালি পেয়েছি। উত্তমের ক্ষেত্রেও সেই

কথাই প্রযোজ্য। অকালে ও চলে গেছে বাংলা সিনেমার জগতকে কে এক আকালের মধ্যে ফেলে দিয়ে, কিন্তু যে গৌরব ও বাংলা ছবির জগতকে দিয়ে গেছে তা অক্ষয়।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সেটা ১৯৪৪-৪৫ সাল। রাজেন চৌধুরী 'ওরে যাত্রী' ছবি করছেন। আমি তখন 'দাসীর পুত্র' ছবি করছি। রাজেনবাবু আমার ছবির সম্পাদক। ওঁর অনুরোধে 'ওরে যাত্রী'র শ্যুটিং দেখতে গেছি। নায়ক একটি নতুন ছেলে। নাম উত্তমকুমার। সেদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে নতুন নায়ক উত্তমকুমারের নিখুঁত শট দেওয়া দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, দেখো ও একদিন দুর্গাদাস ব্যানারজির মত বড় শিল্পী হবে।

১৯৫৩ সালে যখন স্টারে 'শ্যামলী' নাটক শুরু হল তখন ওকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানলাম। জহর গাঙ্গুলী ওকে স্টারে নিয়ে আসেন। রিহারসাল চলার সময়ে পরিচালক যামিনী মিত্র একদিন উত্তমের ওপরে বিরক্ত হয়ে কিছু বলেছিলেন। ও আমাকে এসে বলল, আমি বোধহয় পারব না দেবুদা। আমি ওকে উৎসাহ দিলাম। উৎসাহ পেয়ে ও সসংকোচে আমার কাছে একটু আলাদাভাবে তালিম চাইল। এরপর থেকে ও দুপুরবেলা হলে চলে আসত। ফাঁকা হলে তালিম নিত। চরিত্রটাকে বুঝে নিতে চেষ্টা করত। এই নিষ্ঠার ফল উত্তম পেয়েছিল। প্রথম রাতেই অভাবনীয় সাফল্য।

দিনে দিনে শ্যামলী নাটক এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে দর্শকদের জন্যে শো'র শেষে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে স্টার থেকে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু তখনও দেখেছি উত্তম প্রথম দিনগুলোর মতই বিনয়ী। সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের সহযোগিতা পাবার জন্যে সমান ব্যগ্র।

ছবি বিশ্বাস যেদিন মারা গেলেন আমরা স্টারে মরদেহ আসার জন্যে অপেক্ষা করছি। সামনে লক্ষ লক্ষ লোক। পিছনের গলি দিয়ে উত্তম এল। থরথর করে কাঁপছে। জনপ্রিয়তার জন্য ও মরদেহের কাছে যেতে পারবে না বলে ওর সে কী অনুতাপ! শেষে ব্যালকনি থেকে ও শেষ দেখা দেখল। সেদিন বলেছিল, ছবিদার মৃত্যুতে বাংলাদেশের কী ক্ষতি হল জানি না। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল আমার। ছবিদার সংগে অভিনয় করার যে আনন্দ তা আর কোথায় পাব?

একদিন এক মহিলা প্রযোজিকা তার বাড়িতে চিত্রনাট্য শোনানর জন্য আমাকে ডাকলেন। উত্তমও এল। চা খাবার পরে চিত্রনাট্য পড়তে শুরু করেছি এমন সময় সেই মহিলার ইঙ্গিতে বেয়ারা মদ ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে এল। উত্তম তক্ষুনি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে সেই মহিলাকে বকাবকি করতে লাগল আমার সামনে এসব আনায়। এমনই ছিল ওর শ্রদ্ধা। কখনও সামনে সিগারেটও খেত না।

সুব্রতাকে স্টারে পাঠিয়েছিল ওই। বলেছিল, আমাদের বাড়ির বৌকে তো যেখানে সেখানে দিতে পারিনা। আপনি যদি নেন। পরে সুব্রতার সাফল্যলাভে বলেছিল, জানতাম দাদার হাতে পড়লে প্রতিভার বিকাশ হবেই।

ওর প্রতিভার বিশালতা বিচার করতে হলে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয়, বনপলাশীর পদাবলীর মত ছবি পরিচালনা কিংবা পুরো পুরি কমারশিয়াল ছবিগুলোতে ওর অ্যাপরোচ এসবই হিসেব করতে হবে। ও ছিল একজন সম্পূর্ণ শিল্পী।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

শ্যামল মিত্র

উত্তম যখন সিনেমা করত না অর্থাৎ যখন ও উত্তমকুমার হয়নি তখন থেকেই ওর সংগে আমার পরিচয়। তখন থেকেই আমরা বন্ধু। চক্রবেড়িয়ার মোড়ে মোহিনী মোহন রোডের এক আড্ডায় আমরা নিয়মিত আড্ডা দিতাম। এই সময় ও পোর্ট কমিশনারসে চাকরি করত। একদিন এসে বলল, 'কামনা' নামে একটা ছবিতে ও নাকি হিরো হচ্ছে। আমরা বন্ধুরা তো খুব খুশি। সেই থেকে ওর ছবি ফ্লপ করলে আমরা নিরাশ হই। খারাপ লাগে। ক্রমে ছবি হিট হতে লাগল। ওর নাম হতে শুরু করল। আমরাও বন্ধুভাগ্যে গর্বিত বোধ করতে লাগলাম। সে সময়ে আমরা— আমি, উত্তম, ভানু সব এক সংগে স্টুডিও যেতাম। কাজ করতাম। ক্রমশ রকের আড্ডা পেশাগত জীবনেও গভীরতা আনল।

অভিনয় করলেও ও গান খুব ভালবাসত। উত্তম রবীন্দ্রসংগীত খুব ভাল গাইত। মনে আছে আড্ডার মাঝখানে হঠাৎ ওর স্ত্রী গৌরী এসে বলে যেত, বাবা আসছেন। ব্যাস। চুপচাপ একেবারে। ওর বাবা ঘরে ঢুকে গেলে আবার শুরু হত। আড্ডা দিতে, গান বাজনা করতে উত্তম খুব ভালবাসত। নিউ আলিপুরের বাড়ি তখন সবে তৈরি হচ্ছে। ছাত হয়েছে। ছাতের সিঁড়ি হয়নি। ঠিক হল জ্যোৎস্না রাতে ছাতে আসর বসবে। শুনে গৌরী বলল, সেও যাবে। উত্তম গৌরীকে রাগিয়ে দেবার জন্যে বলল, না, না তুমি পারবে না। ঐ বাঁশের মাচা বেয়ে তুমি উঠতে গেলে ভেঙে টেঙে কেলেংকারি হবে। মাঝে মাঝেই আমাদের সকলকে নিয়ে তোপচাঁচী চলে যেত।

আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই এইসব ট্র্যাশ ছবিগুলো করিস কেন? ও উত্তর দিয়েছিল, উপায় নেই। ঐ ছবিগুলোতে আমি কাজ করলে টেকনিশিয়ানরা কাজ পাবে। এইকথা ভেবেই ঐসব ছবিতে কাজ করি।

শ্যামল মিত্র

সাক্ষাৎকার : কল্লোল ব্রহ্মচারী

আলোকচিত্র : গৌতম রায়

মুনমুন সেন

পার্থদা চিঠিতে উত্তমকুমার সম্পর্কে কিছু বলতে বলেছেন। কিন্তু নতুন কথা কী ই বা বলব? নতুন বলার কী-ই বা আছে। উনি তো মহানায়ক।

আমার মায়ের সংগে উনি যখন ছবি করেছেন তখন আমি নেহাৎই ছোট। তাছাড়া আমি বরাবরই বাইরে বাইরে থেকেছি। উত্তমকুমারের সংগে তেমন কোনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মানে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। ওঁর সংগে মায়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। নতুন কথা বলতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা মা-ই বলতে পারেন। কিন্তু মা আজকাল বিশেষ কারোর সংগেই দেখা সাক্ষাৎ করছেন না।

উনি হঠাৎ মারা যেতে মা খুবই দুঃখ পেয়েছেন। বাংলা ছবি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একথা নতুন করে আমি আর কী বলব? উনি নেই, এটাই বড় শূন্যতা।

উত্তমকুমার সম্পর্কে বড় করে বলবার মত আমার স্মৃতির ঝাঁপিতে তেমন কিছুই নেই। আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি। ওঁর অভিনয় ভালোবাসি। এই পর্যন্তই। □

সাক্ষাৎকার : প্রিয়দর্শী

উত্তম আমার নাম শুনে হৈ হৈ করে উঠল

ডাঃ অশোক ব্যানারজি

'উত্তমের মত বন্ধু দুর্লভ'- ছ নমবর হ্যারিংটন স্ট্রিটের চেমবারে বসে বাল্যবন্ধুর স্মৃতিচারণ করছিলেন ডাঃ অশোক ব্যানারজি। 'আমরা দুজনেই একই স্কুলে পড়তাম। আমি প্রথমে ধানবাদে ছিলাম। কলকাতায় আসি ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৪ সালে ভর্তি হই সাউথ সুবারবানে। সেই থেকে অরুণ মানে উত্তমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যদিও মাঝে যখন আমি সাত বছরের জন্য লনডনে ছিলাম এবং পরবর্তীকালে আমরা দুজনেই কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকায় দেখাসাক্ষাৎ কম হত, উত্তমের বাড়িতে কারুর কোন অসুখবিসুখ হলে বা বিপদে আপদে আমার ডাক পড়ত। আর প্রত্যেক বছর থারড সেপটেমবরে আমাকে ওর বাড়িতে যেতে হতই। কারণ ওদিন উত্তমের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা সব বন্ধুরা একত্রিত হয়ে একটু আনন্দ, গপ্পোসপ্পো করতাম।'

আপনাদের স্কুল জীবনের ঘটনা কিছু বলুন না।

'দেখুন স্কুল জীবনে বিমাবকেবল কোন ঘটনা আমাদের ছিল না। দুজনে এক ক্লাসে পড়তাম। পড়াশুনোতে আমি বরাবরই ভালো, অল সেকসানস মিলিয়ে ফাবসট সেকেনড হতাম, উত্তম স্ট্যানড না করলেও পড়াশুনোয ভাল ছেলে ছিল। তবে খেলাধুলায় বিশেষ করে স্কুল স্পোরটসে উত্তমের পারফরমেনস ছিল দুর্দান্ত। আর এখনকার ছেলেদের মত স্কুল পালিয়ে সিনেমা যাওয়া বা খুব দুষ্টুমি কিংবা বেয়াড়াপনা করার সুযোগ আমাদের ছিল না। কারণ তখনকার দিনে সুবারবানে ধরণীবাবু, শীতলবাবু, মণিবাবুর মত বাঘা বাঘা মাস্টারমশাইরা ছিলেন। ওঁরা যেমন ভাল পড়াতেন, তেমনি ছিল ওঁদের কড়া শাসন। ফলে আমরা ওঁদের যেমন ভক্তি করতাম, তেমন ভয়ও করতাম। সুতরাং স্কুলে পড়াশুনোর বাইরে, নির্দিষ্ট খেলাধুলা ছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিল না। স্কুল ছুটি হলে আমি আর উত্তম, দুজনে গপ্পো করতে করতে বাড়ি ফিরতাম।'

শুনেছি, আপনারা ছোটবেলায় অভিনয়-টভিনয় করতেন?

'হ্যাঁ, উত্তমদের গিরিশ মুখারজি রোডে লকু মানে দিলীপদের বাড়িতে বা পাড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর পর যাত্রা হত। আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা সব অভিনয় করত, কিন্তু আমি করতাম না। আমার দেখতেই ভাল লাগত। তবে আমার এক বন্ধু ধীরেন ব্যানারজি, এখন ও খুব বড় ডাক্তার, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে আছে — ধীরেন দারুণ অভিনয় করত। তখন এক এক সময় মনে হত ধীরেন ইজ এ বেটার অ্যাকটর দ্যান উত্তম। কিন্তু পরে দেখলাম, না উত্তমের অভিনয় মোর ন্যাচারল দ্যান ধীরেন। বিহারসালে দেখেছি উত্তমকে দিয়ে যদি একই বই-এর দশটা ক্যারেকটার করান হত, তবে দশটা রোলই ও ডিফারেনটলি প্লে করে দিতে পারত।'

একটু থেমে ডাঃ ব্যানারজি বলে যেতে লাগলেন, ১৯৪২ সালে ম্যাটরিকুলেশানের পর আমি সেনট জেভিয়ারস কলেজে আই এস সি পড়তে গেলাম। আর উত্তম আই কম পড়তে ভর্তি হল আশুতোষে। তখন রোজই প্রায় দেখাসাক্ষাৎ, গল্পগুজব হত। কিন্তু আমি যখন ডাক্তারীতে ভর্তি হলাম, তখন উত্তম আমাদের বাড়িতে এলেও, আমার সঙ্গে খুব কম দেখা হত। কারণ সকাল সাতটার মধ্যে আমায় মেডিকেল কলেজে চলে যেতে হত, আর তার উপর পড়াশুনোর চাপ। কিন্তু উত্তম আমার খোঁজখবর ঠিক নিয়ে যেত। আমার ভাইদের সঙ্গে মা বাবা, ভাগ্নী-ভাইঝিদের সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। তারপর ১৯৫৪ সালে আমি ইংলনডে চলে গেলাম ডাক্তারী পড়ার জন্য। উত্তম কিন্তু তখনও আসত এবং আমার বৃদ্ধ বাবা মার খোঁজখবর নিয়মিত রাখত। কারণ আমার দুই দাদা এবং আমরা তিন ভাই তখন বাইরে থাকি।

আপনি কবে দেশে ফিরে এলেন?

'আমি ফিরলাম সাত বছর বাদে, ১৯৬১তে।'

প্রশ্ন করলাম, এরপর আপনাদের দেখা সাক্ষাৎ হত·

ডাঃ ব্যানারজি বললেন, 'না ঠিক এর পর নয়। বেশ কয়েক মাস বাদে। আমি তখন পি জি হসপিটালে কাজ করছি। উত্তমের তখন খুব নাম ডাক। আমি লনডন যাবার আগেই ও সিনেমায় নেমেছে। কিন্তু যে সময়কার কথা বলছি তখন উত্তম জনপ্রিয় চিত্রতারকা। কোন একটা ছবির, মোসট প্রোবাবলি 'সূর্যশিখা'ই হবে বোধহয়, একটা ব্রেন অপারেশানের সিন তুলতে ওরা পি জি-র ও টি তে শ্যুটিং করতে এল। এখন শ্যুটিং-এ দশ মিনিটের সিকোয়েনসের জন্য অ্যারেনজমেনট করতেই দুতিন ঘণ্টা লেগে যায়। উত্তম চুপচাপ বসে আছে, ওদিকে সব ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার আনডারের কয়েকজন হাউস সারজেন জানত, উত্তম আমার বাল্যবন্ধু। ওদের মধ্যে একজন সাহস করে উত্তমকে জিগ্যেস করল, 'স্যার, আপনি ডঃ অশোক ব্যানারজিকে চেনেন উত্তম তো আমার নাম শুনে হৈ হৈ করে বলে উঠল, কৈ কৈ, অশোক কোথায়, কতদিন দেখা হয়নি। কারণ ওর সঙ্গে আমার লাসট দেখা হয়েছিল বিলেত যাবার আগে। ওদের কাছ থেকে আমার বাড়ির ডিরেকশান নিয়ে, গাড়ি করে উত্তম সোজা আমার বাড়ি চলে এল। পি জি থেকে আমার বাড়ি দু মিনিটের পথ। আমি তখন লোয়ার সারকুলার রোডের সরকারি ফ্ল্যাটে থাকি। নিচে এসেই উত্তম হাঁকডাক শুরু করে দিল। দোতলায় আমার ফ্ল্যাট। আমি তাড়াতাড়ি নিচে গিয়ে ওকে রিসিভ করলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, তুই একটা যা তা হয়ে গেছিস, দেশে ফিরেছিস আমাকে জানাসনি, ইত্যাদি বলে চেঁচাতে লাগল। আমি একটু লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত। কারণ ইনফ্যাকট তখন ডাক্তার হিসাবে সবে প্রফেশানে নেমেছি, প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারিনি - আর উত্তম তখন বাংলা ফিলমের জনপ্রিয় নায়ক। বললাম, ভাই, তোমার কথাই আলাদা, তুমি হলে সিনেমার হিরো, কত নামডাক তোমার, আমি তো এখনও মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই ভয় লাগে। উত্তম এক ধমক দিয়ে বলল, ভয় কিসের? আমরা স্কুলের, ছোটবেলার বন্ধু। আরে দেখ অশোক, যে যার লাইনে বড় হয়, তুইও তোর লাইনে বড় হবি। আর সবচেয়ে বড় কথা বন্ধুত্বের মধ্যে আবার বড় ছোটর কী আছে রে?'

উত্তম আপনার বাড়িতে আসতেন না?

'আমি তো ওকে বার বার বলতাম আসার জন্য। কিন্তু ও বলতো, তুমি বাপু আমার ওখানে চলে এস। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। তোমার বাড়িতে তো আমার যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাইরের লোক একবার জেনে ফেললে, অনেকেই তোমার বাড়িতে উৎপাত করবে, বিরক্ত করবে। তাও গৌতমের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এল। বলল, পাঁচ মিনিট বসব। তারপর মিসেস ব্যানারজি, আমার দুই পুত্রবধূর সঙ্গে পুরনো দিনের গল্প করে যখন উঠল, তখন ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে।'

আলোকচিত্র : [illegible] রায়

ছোটবেলা থেকেই ওর ছিল ভারসেটাইল অ্যাকটিভিটিজ

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইনডিয়ার এক দায়িত্বপূর্ণ বিভাগেব প্রধান অফিসার দিলীপ মুখারজির ৩৯ গিরিশ মুখারজি রোডের বাড়িতে হাজির হওয়া মাত্র তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চললেন অন্দরমহলে। দিলীপবাবু উত্তমকুমারের বাল্যবন্ধু। পুরনো দিনের জমিদারবাড়ির বিস্তৃত ঠাকুরদালান পার হতে হতে দিলীপবাবু বললেন, 'এই যে ঠাকুরদালান দেখছেন, এখানে প্রতি জগদ্ধাত্রী পূজোর পর আমরা যাত্রা করতাম। উত্তম, আমি, আমার ভায়েরা, নিকটআত্মীয়স্বজন, পাড়ার বন্ধুরা সবাই মিলে ওইসব যাত্রা করতাম। অবশ্য মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তারকনাথদা ও বিজয়দা। ১৯৭৫ সালে উত্তম এখানে শেষ অভিনয় করে 'নটী বিনোদিনী' পালায় গুর্মুখ রায়ের ভূমিকায়।' কথায় কথায় আমরা এসে পড়েছি ওঁদের ড্রইংরুমে।

দিলীপবাবুর কাছে প্রশ্ন রাখলাম, 'আপনার সংগে উত্তমবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত কবে থেকে?' দিলীপবাবু জানালেন, 'ঠিক কখন থেকে বন্ধুত্ব, তা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে রিকলেকট করা মুশকিল। তবে যখন আমরা ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ি, তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব।'

'আপনারা কি এক স্কুলেই পড়তেন?'

'আমরা মানে আমি আর উত্তম একই ক্লাসে পড়তাম, কিন্তু স্কুল ছিল আলাদা। ও পড়ত সাউথ সুবারবানে, আমি ভবানীপুর মিত্র ইনসটিটিউশনে। তখন উত্তমের পোশাকী নাম ছিল অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর আমাদের সকলের কাছে উত্তম। উত্তম ওর ডাক নাম।'

আমি বলি, 'আপনাদের ছোটবেলাকার কথা কিছু বলুন না।'

মৃদু হেসে, দিলীপবাবু বলে চলেন, 'জানেন উত্তম যখন ছোট ছিল, কিশোর ছিল, তখন থেকেই ওর ভারসেটাইল অ্যাকটিভিটি ছিল। যেমন ধরুন ও খুব ভাল সাঁতার কাটত। আমরা তখন পদ্মপুকুরে ভবানীপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের মেমবার। আমাদের ট্রেনার ছিলেন নলিন মালিক। নলিনবাবু ১৯৩৬-র অলিমপিকে সাঁতারে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। উনি উত্তমের ফিগার, স্টোক এবং টেনাসিটি দেখে ওকে একজন ভাল সাঁতারু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু উত্তমের তখন সাঁতারে বা স্পোরটসের কোন একটা বিষয়ে লেগে থাক' 'এমন ইচ্ছা ছিল না, তাই উত্তমকে একজন ভাল সাঁতারু হিসাবে আপনারা দেখতে পেলেন না। উত্তম ফুটবলও বেশ ভাল খেলত। ভলিবল, কবাডি, গাদি ইত্যাদি সব খেলাতেই উত্তম বেশ চৌখস খেলোয়াড় ছিল। আমার মনে পড়ছে আমাদেব এই ঠাকুরদালানের সামনের মাঠে আমি, উত্তম, লালু সবাই মিলে করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকটি। ওটাই আমাদের প্রথম অভিনয়। কে কী পারট করেছিলাম মনে নেই। স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র তখন। এরপর ওই ৩৬ গিরিশ মুখারজি রোডের বাড়িগুলো দেখছেন ওখানে আগে এত বাড়ি ছিল না, ছিল মাঠ। ওখানে স্টেজ করে আমরা 'প্রতাপাদিত্য' করি। এতেও কে কার ভূমিকায় নেমেছিলাম মনে নেই। তারপর প্রতিবছরই দু একটা করে নাটক করেছি। পরবর্তী-

কালে যাত্রা করতাম, আমাদের এই ঠাকুরদালানের ফাঁকা জমিতে। একবার 'আগামী কাল' নামে একটা যাত্রা করি। আমি ও উত্তম তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। বড়দের সংগে অভিনয় করি। ওই যাত্রায় আমি কী রোলে নেমেছিলাম মনে নেই, তবে উত্তম নারী চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিল এটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। উত্তম 'তরলা' বলে একটা মেয়ের পারট করেছিল। এরপর যুদ্ধের ঠিক পরেই, আমরা 'আনন্দমঠ'-এর সংক্ষিপ্তকরণ করে 'সন্তান' বলে একটা নাটক করি। যতদূর মনে পড়ছে, উত্তম 'মহেন্দ্র'-র ভূমিকায় অভিনয় করে। এই নাটকের জন্য আমরা কারড বিক্রি করি এবং ১১০০ টাকার একটি চেক অনুষ্ঠানের সভাপতি সতীশচন্দ্র বোসের হাতে তুলে দিই আই এন এ চ্যারিটি ফানডের জন্য।'

বললাম 'এবার পরিণত বয়সের কথা কিছু বলুন।'

'অ্যাকচুয়ালি, উত্তম যখন থেকে ফিলমে গেল, তখন থেকে আমি পড়াশুনো এবং পরে কাজের বা চাকরির প্রয়োজনে কলকাতার বাইরে বাইরে কাটাতাম। আর সিনেমা সম্বন্ধে খুব একটা ইনটারেসটেডও ছিলাম না। তবে মাঝে মধ্যে উত্তমের ছবি দেখতাম, ওর সংগে আমার স্ত্রীকে নিয়ে দু একটা শ্যুটিংও দেখতে গেছি। তবে আমরা দুজনে তো দুই ডিফারেনট লাইনে চলে গেছি। তবে উত্তম আর আমার মধ্যে এমন দারুণ আনডারস্ট্যানডিং ছিল যে আমরা দুজনে দুজনের কাজকে শ্রদ্ধা করতাম।'

ঝিন্দের বন্দী শ্যুটিং-এর অবকাশে সস্ত্রীক দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে

চলে আসবার সময় দিলীপবাবু কিছুটা আত্মগ্লানির সুরে বললেন, 'নিজেদের কর্মব্যস্ততার মধ্যে ফাঁক কাটিয়ে উত্তমকে আমরা মানে ওর পুরনো বন্ধুরা, যদি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কাছে টেনে নিতাম, তাহলে ওর ফিনানসিয়াল লস, ওর টেনশান অনেক কমাতে পারতাম। একটা ঘটনা মনে পড়ছে, তখন ১৯৬৪ কি ৬৫ সাল, উত্তম ওর নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে থাকে, ওইসময় ওর নারভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। তখন কেন জানি না ওর মনে হয়েছিল, আর বেশি দিন বোধহয় বাঁচবে না, তাই আবার নিকট বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে চায়। উত্তম আমাকে, লালুকে

নটী বিনোদিনীতে গুর্মুখের ভূমিকায় নামার আগে

(অবশ্য লালু ডাক্তার হিসাবে সবসময় ওর সংগে পড়ে থাকত) এবং আরো কয়েকজনকে ডেকে পাঠালো। সেইসময় আমরা বেশ একটা ক্লোজ রিলেশানে সেই পুরনো দিনের মত, (যখন উত্তম একবার আমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে, আবার আমি ওকে দিচ্ছি, এই করতে করতে রাত এগারোটা বেজে যেত) সেই-রকম একটা রিলেশন গড়ে উঠেছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, We should try to meet quite ofte.। সেখানে বাইরের এমন কোন লোক থাকবে না, যারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা মেনটেন করা গেল না।' □

স্ত্রী-সন্তান সহ উত্তম সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন শিল্পী

সাক্ষাৎকার : সঞ্জয় সিংহ

আলোকচিত্র : দিলীপ মুখার্জির সৌজন্যে

সংগীতশিক্ষকের চোখে উত্তমকুমার

উত্তমকে আমি গান শেখাতাম

১৯৫৮ সালের ফেবরুয়ারি মাস থেকে শৈলেন্দ্রনাথ কর্মকার উত্তম-কুমারকে রবীন্দ্রসংগীত শেখান শুরু করেন।

তাঁকে জিগ্যেস করি, উত্তম-কুমারকে গান শেখানর ব্যাপারে যোগাযোগ কীভাবে হল?

উনি বললেন : আমি তখন 'দক্ষিণী'র ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সি এ-ও পড়ছি। রাসবিহারী এভিনিউ এর মোড়ে ময়রার দোকানের সামনে বা অমৃতায়নে আমাদের আড্ডা বসত। আমার বন্ধু তরুণ মিত্র, ধ্রুব রায়চৌধুরীর সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। একদিন হঠাৎ ধ্রুব রায়চৌধুরী আমাকে জিগ্যেস করলেন : একজনকে গান শেখাবেন? বললাম : হ্যাঁ, শেখাব। এরপর কয়েকদিন কেটে গেছে। আমি স্বাভাবিক কৌতূহলে জিগ্যেস করলাম : কে গান শিখবে? উনি বললেন উত্তমকুমার।

যোগাযোগের পর থেকে নিয়মিত-ভাবে শেখাতে শুরু করলাম। তিনি যথার্থ সংগীতপ্রেমী ছিলেন। গানের প্রতি, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁর আজন্ম আকর্ষণ ছিল। মনেপ্রাণে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ আমি উপলব্ধি করেছি। নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়ে তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধাভাব আমি দেখেছি। কখনও কখনও একটানা দুঘণ্টারও বেশি গান করতেন। রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও সুরের একাত্মতা তাঁকে মুগ্ধ করত। আমি অনেক সময়ই তাঁর মুখে শুনেছি 'অপূর্ব সংমিশ্রণ। আঃ কী সুন্দর, যেন যাদুর স্পর্শ'। আগেই বলেছি ফেবরুয়ারি ১৯৫৮ সাল থেকে উত্তমকুমারকে গান শেখাতে শুরু করি। উত্তমকুমারকে জিগ্যেস করেছিলাম আপনি রবীন্দ্রসংগীত কেন শিখতে চান? অন্য অনেক গান তো রয়েছে, রবীন্দ্রসংগীতকে বেছে নিলেন কেন? উত্তরে বলেছিলেন — খাঁটি সাংগীতিক ভাব কোন গানে পাই না, অন্য সব গানে মিশেল-টিশেল আছে বলে মনে হয়। খাঁটি সাংগীতিক ভাব শুধু রবীন্দ্রসংগীতেই পাই। প্রথমে শুনলে মনে হত খুব সোজা রবীন্দ্রসংগীত। আর সব গানই প্রায় এক রকম। কিন্তু শিখতে বসে দেখতে পাচ্ছি, না প্রত্যেকটি

গান আলাদা আলাদা।

বসুশ্রী সিনেমা হলে নববর্ষ অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমিও উপস্থিত ছিলাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উত্তম-কুমারকে বলেছিলেন – উত্তম, তুমি তো এখন নামকরা সংগীতশিল্পী হয়ে যাচ্ছ। একবার কলামন্দিরে অনুষ্ঠান হল। প্রথমে গেয়ে শোনা-লেন 'অশ্রুনদীর সুদূরপারে' তারপরে গাইলেন 'ছিন্নপাতার সাজাই তরণী'। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর নৈপুণ্য সেদিনের গাওয়া দুটি গানেই ফুটে উঠেছিল। সেদিন হেমন্ত মুখো-পাধ্যায়কেও বলতে শুনেছি 'তুমি যে নিয়মিত গাইয়ে হয়ে গেলে।' মান্না দেও গান দুটি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেক সময় আমার সংগে বসে উচ্চাংগসংগীতাশ্রিত রবীন্দ্রসংগীত রেওয়াজ করতেন। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে গাইতে বললে ঐ উচ্চাংগ-সংগীতের রবীন্দ্রসংগীতগুলো গাই-তে চাইতেন না।

গান শেখার সময় বাইরের কোন লোক আসলে বা ফোন করলে সাধারণত অ্যাটেনড করতেন না। ওঁর আন্তরিকতাটা, কী বলব – নিষ্ঠাটা এত বেশি ছিল যে, অতি নিকটজন গান শেখবার সময় ফোন করলেও বলতেন এখন নয়, পরে ফোন করতে বল।

১৯৫৮-র ফেবরুয়ারি থেকে মারা যাওয়া পর্যন্ত আমার সংগে সম্পর্ক ছিল। যেদিন উনি মারা যান সেই দিনই আমার ফোন করার কথা ছিল।

মাঝখানে আমি আড়াই বছর জামশেদপুরে ছিলাম। মাঝে মধ্যে এসে শেখাতাম। এ সময়টাতেও উনি আর কারো কাছে গান শেখেননি। এর কারণ ছিল সম্ভবত আমার সংগে ওঁর একটা আনডারস্ট্যানডিং হয়ে যাওয়া।

আমার সংগে ওঁর সম্পর্ক তো অনেক দিনের। এই দীর্ঘ সংগীত-শিক্ষাপর্বের প্রথম দিকে শেখাতে যেতাম রবিবার। কিন্তু রবিবার গান শেখানোয় এক অসুবিধা দেখা দিল। রবিবার সব ফিলম লাইনের লোকেরা এসে যেত। তাই রবিবারের বদলে সংগীত শিক্ষার দিন সোমবার সন্ধ্যে করা হল।

একবার ১ বৈশাখের পরের দিন গেছি। হঠাৎ উঠে টিপ করে প্রণাম করার চেষ্টা করতেই আমি হাতটা ধরে ফেলেছি। বললাম, একি করছেন? আপনি ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়। বললেন, না, আপনি শিক্ষক, আপনি গুরু।

কখনও কখনও গান শেখাতে শেখাতে রাত হয়ে যেত। বলতেন - মাস্টারমশাই খেয়ে যান। পরে গাড়িতে করে ড্রাইভার দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন।

অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি এখন মনে আসছে। একবার আমাকে বললেন - চলুন রাস্তায় একটু হাঁটি। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে যাচ্ছি। আমি, উনি আর সোমা সংগে। পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে চৌরংগীর কাছে এসেছি। বাস যাচ্ছে – যাত্রীরা হঠাৎ দেখতে পেয়ে সিট ছেড়ে উঠে দেখছে।

এক রোববার সন্ধ্যেবেলা। উনি ফোন করে যেতে বলেছেন। তার দু/তিন দিন আগেই আমি 'স্ত্রী' সিনেমাটা দেখেছি। বাড়ির পেছনের বারান্দায় বেলভিউ নারসিং হোমের দিকে মুখ করে তাকিয়েছিলেন। আমি বললাম, ছাত্র, মাই হারটিয়েস্ট কনগ্র্যাচুলেশনস ফর ইয়োর ব্রিলি-য়্যানট পারফরম্যানস ইন 'স্ত্রী'। বলেই হ্যানড-শেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখনই উনি সুপ্রিয়া দেবীকে বললেন, বেণু, আজ মাস-টারমশাইকে খাওয়াতে হবে।

আমার সংগে প্রথম পরিচয় হবার বছর দুই পর উনি ইচ্ছে করলেন - ইলিশ মাছের পাতুড়ি খাবেন। আমি শুনে বললাম – আপনাকে আমি খাওয়াব। সেকালের কাঁসার বড় থালায় আমাদের হরিশ মুখারজি রোডের বাড়িতে পিঁড়ে পেতে বসিয়ে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম। উত্তমকুমার-গৌরী দেবী দুজনেই এসে পরিতৃপ্তিসহকারে আর যাকে বলে চেটেপুটে খেয়েছিলেন।

আরেকবার শ্যামনগরে একটা জুট মিল অডিট করে ফেরার সময় বেশ ভাল সাইজের একটা ইলিশ মাছ এনেছিলাম ওঁকে খাওয়াবার জন্য। সেই মাছ আমাকেও খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে ওঁকে একবার মানপত্র দেওয়া হয়। সে সময় গোবিন্দ দে মেয়র ছিলেন। মানপত্র নিয়ে গৌরী দেবীসহ ফিরে এলেন। আমার সেদিন যাবার কথা ছিল। গিয়ে দেখি তাম্রফলকের মানপত্রটি রাখা আছে। ঐ দিনেও গৌরী দেবী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বললেন, আসুন গান করা যাক। অর্থাৎ 'ডিভোশানটা' ছিল।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমার আগেকার শেখান কিছু গান গাইবার পর অনেক দিন আগে মণ্টুদির নির্বাচন করা গান 'সকল গর্ব দূর করি দিব' দশ/বারোবার শুনে বললেন আমাকে 'মাস্টারমশাই, পরের দিন এটা শিখব।' সেই পরের দিন আর এল না, তিনি ধরার সকল গর্ব দূর করে শান্তিপারাবারে মহাযাত্রা করলেন। □

শৈলেনবাবু, উত্তম, সুপ্রিয়া, সুব্রতা, গৌতম

বাঁদিক থেকে মণ্টুদি, উত্তম, সুপ্রিয়া, সুব্রতা, শ্রী চক্রবর্তী, শৈলেনবাবু

সাক্ষাৎকার : সূর্যসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংবাদিক সম্মেলনে মহানায়ক

'আলটিমেটলি ছবি পরিচালনার কাজেই আসব'

সুখেন্দু দাশ

১৩ আগসট, ১৯৭৯। বিদেশ যাবার আগে উত্তমকুমার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের একটি বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। তাতে আকাশবাণী কলকাতার ইউথ করেসপনডেন্ট হিসাবে আমি ও দেবাশিস ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলাম। সাংবাদিক সম্মেলনের নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকেই দেখলাম একটা তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে উত্তমকুমার বসে রয়েছেন। মেঝেতেই সুদৃশ্য জাজিম পাতা। সকলেই তাকে একপ্রান্তে রেখে বৃত্তাকারে বসে আছেন। প্রায় সকলের হাতেই পানীয়ের পাত্র। মাঝে একটি প্লেটে কিছু কাজু বাদাম। উত্তমের হাতেও একটি পানীয়ের গ্লাস। অন্য হাতে দীর্ঘ একটি জ্বলন্ত সিগারেট। উত্তমের গায়ে লাল একটা পাঞ্জাবি কাজ করা। পরনে সাদা ফুল প্যানট। হাতে বেশ কটা আংটিও দেখলাম।

বৃটিশ এয়ারওয়েজ এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। কারণ উত্তমকুমাব ওদের বিমানেই একমাসেবও বেশি সময়ের জন্য বিদেশ পরিভ্রমণে যাচ্ছিলেন। সংগে সুপ্রিয়া দেবীও। সেদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রিয়া দেবীও উপস্থিত ছিলেন। বিদেশ যাচ্ছিলেন ওখানকার ভারতীয়দেব আমন্ত্রণে। ইটালি, নিউইয়রক ইত্যাদি তাঁর ভ্রমণ তালিকায় ছিল। বিদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবাসী বাঙালিরা উত্তমকুমারকে নিয়ে সেখানে ফাংশন করে অর্থ সংগ্রহের আয়োজন কবেন।

আমি উত্তমকে বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশ্ন করার পর চলচ্চিত্র নিয়ে প্রশ্ন শুরু করলাম : আচ্ছা, আপনার তো বয়স বাড়ছে দিনে দিনে। তার মানে আপনি আর রোমনটিক হিরো করতে পারছেন না। তার মানে আপনার ফিলড অব অ্যাকশান ক্রমশ ন্যারোয়ার হয়ে আসছে। তখন আপনি কী করবেন?

উত্তমকুমার ধীর গলায় বল্লেন, 'কে বললে ' হু উইল জাজ ইট? এখানে তো জাসটিস হয় না। তবে আলটিমেটলি আমি ছবি পরিচালনার কাজেই আসব। সবাইকেই সে পথে আসতে হবে।'

এরপর জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা আপনার তো অনেক ভাল ভাল ছবি ছিল। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, এ্যান্টনী ফিরিংগী সাম্প্রতিক কালের ধনরাজ তামাং ইত্যাদি —এসব ছেড়ে 'লালপাথর' আর 'স্ত্রী' ছবি দুটি নিয়ে যাচ্ছেন কেন? ('স্ত্রী' এবং 'লালপাথর' উত্তম সংগে নিয়েছিলেন বিদেশে প্রদর্শনের জন্য)।

উত্তম বললেন কারণ আর কিছুই না, অন্যান্য ছবির প্রিনট পাওয়া গেল না। লালপাথরে সুপ্রিয়া আছে বলে নিলাম। আর তাছাড়া এতে ফিউডালিসটিক সোসাইটিকেও দেখান হয়েছে।

মিনিট পনেরো কথাবার্তা বলার পরে বল্লাম—আচ্ছা উত্তমদা, তবে উঠি। সেই পরিচিত ভংগিতে নমস্কার জানিয়ে অনাবিল হেসে উত্তমকুমার বিদায় জানালেন। □

উত্তম যখন পরিচালক / আলোকচি

সতীনাথ ও উৎপলা মুখারাজির সংগে উত্তমকুমার / অর্ধেন্দু রায়

উত্তম যখন বোমবায়ে

হিন্দি চলচ্চিত্রে উত্তমকুমারকে কারা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করেছেন

বোমবাই থেকে কলিন পাল

উত্তমকুমার তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের প্রথম দশ বছরের মধ্যে হিন্দি চলচ্চিত্রে একটি ছোট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ছবিটি তোলা হয়েছিল কলকাতায়। নামটা মনে করতে পারছি না এবং যতদূর মনে পড়ে ছবিটি মুক্তি পায়নি। তবুও তার বোমবাই বিশেষ করে হিন্দি ছবিতে আসতে সময় লেগেছিল অনেক।

এ নয় যে উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বোমবাই এর চলচ্চিত্র প্রযোজকরা জানতেন না। সারা ভারতের দর্শকের কাছেই উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা ছিল। তবুও 'ছোটিসি মুলাকাৎ' ছবির আগে তার বোমবাই আসা হয়ে ওঠেনি। কারণটি অজানা।

প্রথম যাঁরা উত্তমকুমারকে নিয়ে ছবি করবেন ভেবেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তিনি ওয়াহিদা রহমানের বিপরীতে উত্তমকে নিয়ে একটি ছবি করার প্রস্তাব করেছিলেন। ছবিটির নাম 'শর্মিলা'। পরিচালনার দায়িত্ব ছিল 'বিশ সাল বাদ' খ্যাত পরিচালক বীরেন নাগের ওপর। উত্তম রাজিও হয়েছিলেন। কনট্রাকটও সই হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন উত্তমকুমার কনট্রাকটা ক্যানসেল করেন। টাকাটাও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ফেরৎ দিয়ে দেন। কিন্তু কারণটি অজানা ছিল।

ঠিক একইভাবে উত্তমকুমার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বোমবাই-এর আর একজন প্রযোজক মোহন সেগলকে। তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'না' অবলম্বনে তিনি হিন্দি ছবি 'দেবর' করার কথা ভেবেছিলেন উত্তমকে নিয়ে। নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর। প্রথমদিকে উত্তমকুমার রাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছিলেন।

আলো সরকার ছিলেন উত্তমকুমারের চিত্রনাট্য লেখক। ব্যক্তিগতভাবে আলো সরকার দৃঢ়চেতা ও উচ্চাভিলাষী মানুষ। মনে মনে স্থির করেছিলেন উত্তমকে নিয়ে প্রথম হিন্দি ছবিটি তিনিই করবেন। পরবর্তীকালে লোকমুখে প্রচলিত হয় উত্তমকুমারের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মোহন সেগালকে ফিরিয়ে দেবার পিছনে যে মানুষটি ছিলেন তিনি আলো সরকার।

আলো সরকারের স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হল। কিন্তু সব স্বপ্নই ভাল হয় না, মন্দও কিছু থেকে যায়। কলকাতার চিত্র পরিবেশক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় আলো সরকার বোমবাই এসেছিলেন উত্তমকুমারকে নিয়ে ছবি করতে। ষাটের দশকে উত্তমকুমার বোমবায়ে এসে উঠলেন তাজমহল হোটেলে। পরিকল্পনামাফিক তাঁর হিন্দি ছবির কাজ শুরু হল। বৈজন্তীমালা নায়িকা হবার জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। বাংলার হিট ছবি 'অগ্নিপরীক্ষার' কাহিনী নিয়ে হিন্দি ছবি 'ছোটিসি মুলাকাৎ'। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন শংকর ও জয়কিষন। শশীকলা ও রাজেন্দ্রনাথ সহশিল্পী। চিত্র পরিবেশনার ক্ষেত্রে ইউ পি, দিললি বোমবাই সারকিট পেলেন গুলশানারী। শ্যুটিং শুরু হবার আগেই ফাইনানসার পালটে গেল। পটভূমিকায় এলেন দীপচাঁদ কাংকারিয়া। পূর্ব ভারতের পরিবেশন স্বত্ব পেলেন ভোলানাথ রায়। এই ভোলানাথ রায়ই একমাত্র লোক যিনি 'ছোটিসি মুলাকাৎ' থেকে পয়সা করেছিলেন।

উত্তমকুমার সুপ্রিয়া দেবীকে বোমবাই নিয়ে এসেছিলেন। অনেকের ভ্রূ কুঁচকালো। উত্তমসঙ্গিনী হিসেবে সুপ্রিয়াকে দেখা গেল সব জায়গায় -এমনকি শ্যুটিং এর ফ্লোরে। উত্তমের সংগে সুপ্রিয়ার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অনেকেই জানতেন না।

শ্যুটিং শুরু হতেই আলো সরকারের নির্দেশনার ভূমিকায় উত্তমকুমার নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। মতপার্থক্য দেখা গেল। বিরোধ এমন জায়গায় দাঁড়ালো যার ফলে শ্যুটিং শেষ করার সমস্যা দেখা দিল। উত্তম আর কোন পথ না দেখে আলো সরকারকে স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে দিলেন। ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আলো সরকার যা বলতেন উত্তমকুমার সেইমত করতে লাগলেন। স্টুডিওর ফ্লোরে উত্তমকুমার আর প্রযোজক নন তিনি একজন সাধারণ অভিনেতা মাত্র।

উত্তমকুমার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অসম্ভব সচেতন ছিলেন, বিশেষ করে তিনি জানতেন তার 'হিন্দি' বলার দুর্বলতাটা। উত্তমকুমার হিন্দি সাহিত্যিক এস আই হাসানকে নিজের শিক্ষক রাখলেন। উচ্চারণ শুদ্ধির জন্য তার এই চেষ্টা। তিনি 'হিন্দি' উচ্চারণের নিখুঁত কায়দা রপ্ত করলেন।

দীর্ঘদিন একটানা আউটডোর শ্যুটিংএর পর 'ছোটিসি মুলাকাৎ' ছবিটি শেষ হল। এর বহির্দৃশ্যগুলি সিমলার কাছে 'কুফরী' বলে একটা জায়গায় তোলা হয়েছিল। শ্যুটিং শেষ করে উত্তম শ্রান্ত। ঠিক হল অল ইনডিয়া প্রিমিয়ার শো হবে কলকাতায়। উত্তমের প্রচুর

ছোটিসী মুলাকাৎ

ফ্যান তাদের 'গুরু'কে হিনিদ সিনেমায় দেখে উল্লসিত। 'ছোটিসি মুলাকাৎ প্যার বন গয়ই' গানটার তালে তালে সারা হল নেচে উঠল। সেই সংগে একদল লোক উত্তমকুমারকে বোঝাতে চেষ্টা করলো হিন্দি সিনেমার প্রথম সারির কয়েকজন এক জোটে উত্তমকুমারের বিরোধিতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁরা নাকি বোমবাই এ ছোটিসি মুলাকাৎ এর শো বানচাল করে দেবেন। এই একটা অদ্ভুত ধরনের মিথ্যা কথা উত্তমকুমারের কান ভারি করতে লাগল।

উত্তমের বয়সের ফ্যানেরাও আগ্রহের সংগে উত্তমকুমারকে হিন্দি ছবিতে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভাল না লাগার কারণ একটাই। সেটা হল উত্তম ফ্যানেরা উত্তমকে শাম্মীকাপুর অথবা জিতেন্দ্রের অনুকরণ করতে দেখতে চাননি। এমনকি উত্তম নাকি বিশ্বজিৎকেও অনুকরণ করেছেন এমন কথাও বলা হয়েছিল। দর্শকদের যা চাহিদা ছিল তা তারা উত্তমের

কাছ থেকে 'ছোটিসি মুলাকাৎ' ছবিতে পাননি বলেই, ছবিটি চলেনি। কিন্তু ছোটিসি মুলাকাৎ 'রিলিজ' হবার পর দর্শকের কাছে উত্তমকুমারের নিজস্ব কোন ইমেজ যেমন রইল না তেমনি ইমেজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করারও অনেক দেরি হয়ে গেল। আলাদা ব্যক্তিত্বের উত্তমকুমার হিন্দি ছবির দর্শকের কাছে পৌছালো না। ছোটিসি মুলাকাৎ ছবিটির রিলিজের সময় উত্তমকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা যাবার জন্য তাঁকে প্লেনে যেতে হয়েছিল দিল্লি ঘুরে। প্লেনে চড়াটা উত্তমকুমার পছন্দ করতেন না। কিন্তু ছবি রিলিজ করার সময়ের মধ্যে পৌছানোর জন্য তাকে প্লেনেই যেতে হয়েছিল। সংগে সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন। প্লেনটি দমদমে নামবার আগেই, উত্তমকুমারের হারট স্ট্রোক হয়। তখন তাঁর আর ছবির ব্যবসায়িক দিক নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। তাই তরুণকুমার এই টাকাপয়সার দিকটা দেখাশোনার ভার নিলেন। টাকা পয়সার হিসেব আর ব্যবসায়িক দিকটা তরুণকুমারও বোধহয় বুঝে উঠতে পারলেন না। উত্তম যখন সেরে উঠলেন তখন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তাঁর আর কিছুই করণীয় ছিল না।

ওদিকে 'ছোটিসি মুলাকাৎ' এর প্রস্তুতি পর্বেই উত্তমকুমার বোমবাই-এর জন্য চারেক প্রযোজকের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত প্রযোজক এন সি সিপ্পিও ছিলেন। 'ছোটিসি মুলাকাৎ' রিলিজ হবার পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁরা আর কেউ চুক্তির কথা উত্তমকুমারকে স্মরণ করাননি। চুক্তির টাকাও ফেরৎ চাননি কেউ।

'ছোটিসি মুলাকাতে'র জন্য উত্তমকুমারের ক্ষতি হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষতিটাই চোখে দেখা যায়। কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে বাড়িয়ে বলার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু এটা ঘটনা যে তিনি ছোটিসি মুলাকাৎ থেকে একটি পয়সাও পাননি। প্রযোজক হিসেবে তো নয়ই এমনকি অভিনেতা হিসেবে প্রাপ্য টাকাও তিনি পাননি। কিন্তু এর চেয়েও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এই ছবিটির পরিবেশকদের। দেনা অনেক ছিল। এমনকি এখনো অনেকেই সে টাকা পাননি। তবুও আমার মনে হয় 'ছোটিসি মুলাকাতের' আর্থিক লোকসানই উত্তমকুমারের হারট অ্যাটাকের প্রধান কারণ নয়। কেননা ছবিটি রিলিজ হয়েছিল তাকে নারসিং হোমে ভর্তি করার পর।

এর প্রায় পাঁচ বছর বাদে উত্তমকুমারের নাম আবার বোমবাই-এর চিত্রজগতে শোনা গেল। শক্তি সামন্তের দু-ভাষার ছবি অমানুষ–উত্তমকুমার অভিনয় করলেন শর্মিলা ঠাকুরের বিপরীতে। শক্তি সামন্তকে বাধার সম্মুখীন হতে হল। চিত্র পরিবেশকরা কেউ ছবিটির দায়িত্ব নিতে রাজি নন। শক্তি সামন্ত যা ভেবেছেন তাই করবেন। হিন্দি-বাংলা ছবি অমানুষ। বাংলা ছবির রিলিজে দেখা গেল বকস অফিস হিট করেছে। তাবৎ বাংলা ছবির প্রদর্শনের রেকরড সৃষ্টি করল। কিন্তু হিন্দি দর্শক কী ভাবে নেবেন সেটাই সমস্যা। একরকম স্থির নিশ্চিত যে এ ছবিটিও ফ্লপ করবে। প্রত্যেক পরিবেশকের কৌতূহলও ছিল। দেখা যাক কী হয়? কে দায়িত্ব নেয়? কেউ যখন পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসলেন না তখন শক্তি সামন্ত তাঁর পরিবেশন প্রতিষ্ঠান শক্তি রাজ ফিলমস এর মাধ্যমে বোমবাইতে ছবিটি প্রদর্শনের আয়োজন করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের অপর মালিক চিত্রাভিনেতা রাজেশ খান্না। শক্তি সামন্তের ধারণাই ঠিক ছিল ছবিটি–তাঁর পরিচালিত 'আরাধনা'র থেকেও বেশি দিন চলল। কিন্তু উত্তম কি বোমবাইয়ের ছবির দর্শকদের কাছে জায়গা পেলেন?

এর উত্তরে হাঁ বলা যায় নাও বলা যায়। অর্থাৎ একদিকে তিনি শক্তি সামন্তের পরিচালনা ও প্রযোজনায় আর একটি ছবি করলেন। ছবিটি 'আনন্দ আশ্রম' এটিও হিন্দি আর বাংলা এই দু ভাষাতেই তোলা হয়েছিল। নিউ থিয়েটারসের ছবি 'ডাক্তার'-এর নতুন রূপ এই 'আনন্দ আশ্রম'। ডাক্তারের ভূমিকায় সেকালে অভিনয় করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। একালের আনন্দ আশ্রমের নায়ক উত্তমকুমার। আনন্দ আশ্রম বাংলায় চলল। কিন্তু হিন্দি ছবির দর্শক নিল না। উত্তমকুমার কিন্তু দারুণ অভিনয় করেছিলেন এই ছবিটিতে। হিন্দিতে ছবিটা চলল না।

উত্তমকুমার ঠিক এই সময়তেই কলকাতার কিছু তথাকথিত নকশালদের কাছ থেকে উড়ো চিঠি পেলেন। উত্তমকুমার বোমবাই চলে এলেন। বেশ কিছুদিন তাঁর থাকার জায়গার ঠিকানা অনেকে জানতেন না। শক্তি সামন্ত আর দেবেশ ঘোষ এ সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একদিন বিকেলে চারজন তরুণ আমার কাছে এসেছিল। তারা উত্তম কোথায় আছেন আমার কাছে জানতে চাইল। আমার তাদের দেখে ঠিক ফ্যান বলে মনে হয়নি। আমি উত্তমকুমারের খবর সেদিন দিতে পারিনি। তারা ভেবেছিল – আমি একজন বাঙালি সাংবাদিক, নিশ্চয় উত্তমকুমারের ঠিকানা জানব। কিন্তু সেদিন আমার জানা থাকলেও আমি তাদের বলতাম না। তাদের উদ্দেশ্য আমার জানা না থাকলেও এটুকু জেনেছিলাম তারা বোমবাই-ইর বহু স্টুডিও ঘুরে বেড়িয়েছে আর উত্তমকুমারকে খুঁজেছে। এই সময় উত্তমকুমার কলকাতার শ্যুটিং-এর দিন ঠিক রাখতে পারেননি – যার ফলে অনেক ছবির প্রযোজক খুব অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁদের চাপে তিনি ফিরে গেলেন কলকাতায় যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা নিয়ে।

কলকাতায় উত্তমকুমার ব্যবসায়িক ছবির অংগ। কিন্তু বোমবাই এ তখন উত্তমকে নিয়ে 'বেটার সিনেমা' করার একটা ঝোঁক পরিচালকদের মধ্যে দেখা গেল। গুলজার করলেন উত্তমের সংগে বিদ্যা সিনহাকে নিয়ে 'কিতাব।' ভীমসেন চেষ্টা করলেন 'অমানুষের'র বাজার ধরতে। তিনি উত্তম-শর্মিলাকে নিয়ে ছবি করলেন 'দুরিয়াঁ'। বাসু ভট্টাচার্যের ছবি হল 'গৃহপ্রবেশ।' বাসু ভট্টাচার্যের সংগে উত্তমকুমারের মতের অমিল হয়েছিল। সাতদিন শ্যুটিং চলার পর বাসু ভট্টাচার্যের পরিচালনা সম্পর্কে উত্তমকুমারের বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছিল: পরে তাই সঞ্জীবকুমারকে এনে বাসু ভট্টাচার্য ছবিটি শেষ করেছিলেন। এটা ভাগ্যের পরিহাস 'গৃহপ্রবেশ' হিন্দি সিনেমায় একটা ব্যবসায়িক সাফল্য এনেছিল। উত্তম অভিনীত হিন্দি ছবিতে যা হয়নি।

উত্তমকুমারের শেষপর্বের দুটি হিন্দি ছবির মধ্যে 'প্লট নামবার ফাইভ' একটি সস্তার রহস্যের ছবি। এখানে অমল পালেকর ছিলেন তাঁর সহ অভিনেতা। আর দ্বিতীয়টি মনমোহন দেশাই এর 'দেশপ্রেম'।

মনমোহন দেশাই বোমবাই চিত্রজগতের সফল লোক। ওঁর করা কোন ছবি মার খায়নি। 'দেশপ্রেম' ছবিটি উনি বোমবাই-এর অমিতাভ বচ্চন, মাদ্রাজের

দুরিয়াঁ ছবির একটি দৃশ্য

আনন্দ আশ্রম ছবির একটি দৃশ্য

শিবাজী গণেশন আর বাংলায় উত্তমকুমারকে নিয়ে করার কথা ভেবেছিলেন। শিবাজী গণেশন স্ক্রিপট শুনে বুঝেছিলেন এ ছবিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অমিতাভ বচ্চনকে। ছবিটির শেষ ভাগ যেন তার জনাই তৈবি হয়েছে। তিনি রাজি না হওয়াতে প্রেমনাথকে নেওয়া হয়েছিল। উত্তমকুমার রাজি হয়েছিলেন। এবং নিষ্ঠা সহকারে অভিনয় করে গিয়েছেন। এই ছবিটি শ্যুটিং চলাকালে উত্তমকুমারের মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে মনমোহন দেশাই ছবিটির শেষ অংশ খাপছাড়া হওয়ার জনা উত্তমকুমারের মৃত্যুই কারণ বলে জানান। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটি তা নয়। কোন মালটিস্টার ছবিতে অমিতাভ তার নিজের মত করেই নিজের জায়গা আর গুরুত্ব করে নেবেন। এটা অমিতাভের রীতি। আর এই ছবির বেলায় তাই হয়েছিল।

উত্তমকুমারের একটি ছবি 'বন্দী'। এটির প্রযোজক ছিলেন এফ সি মেহেরা। পরিচালক ছিলেন আলো সরকার। গল্পটি 'ঝিন্দের বন্দী' অবলম্বনে তৈরি। আবার উত্তমকুমার তাঁর উদার মানসিকতায় জায়গা দিয়েছিলেন আলো সরকাবকে। এই ছবিতে উত্তমকুমার দুটি ভূমিকায় অভিনয করেন। এটিও ব্যর্থ ছবি।

উত্তম অভিনীত শেষ ছবি 'দাবিদার' ছবিটি এখনও মুক্তি পায়নি। সঞ্চয়িতা-খ্যাত তপন গুহের প্রযোজনায় ছবিটি পবিচালনা করেছেন দুলাল গুহ। দুলাল গুহের ইচ্ছে ছিল উত্তমকুমারকে নিয়ে একটি ছবি করাবেন। একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য উনি উত্তম-কুমারকে নির্বাচন করলেন। এর জন্য যোগ্য পারিশ্রমিক উত্তমকুমারকে তিনি দিতে পারেননি। এই ছোট্ট ভূমিকায় উত্তম অভিনয় করবেন কিনা তা নিয়েও দুলালবাবুর দ্বিধা ছিল। সেটা উত্তমকুমাব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। উত্তমেব ভাষায় কোন ছোট বা বড় 'রোল' বা চরিত্র থাকতে পারে না। যা থাকে তা হল ভাল চরিত্র এবং মন্দ চরিত্র। তাও অভিনয় করার সুযোগ হিসেবে। ছবি বিশ্বাসও মাত্র একটি দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন। হেমচন্দ্রের 'সুগন্ধ' ছবিতে বাংলায় ছবিটিব নাম ছিল 'প্রতিশ্রুতি'। ছবি বিশ্বাসের সেটি একটি স্মরণীয় অভিনয়। এই প্রসঙ্গে বোমবাই-এর চিত্র তারকা ধর্মেন্দ্রের একটা কথা মনে পড়ছে। ধর্মেন্দ্রের ভাষায় উত্তমকুমার হয়তো ছবি বিশ্বাসের অভাব বাংলা ছবিতে পূরণ করতে পারতেন। কিন্তু দাবিদার ছবিটি শেষ হবার আগেই উত্তমের মৃত্যু হল।

উত্তম প্রসঙ্গে কোন মূল্যায়ন করতে গেলে—বিশেষ করে বোমবাই-এর চিত্রজগৎ প্রসঙ্গে বলতেই হবে—প্রেমিক নায়ক হিসেবে উত্তমকুমার বোমবাই-এর দর্শকদের কাছে কোন জায়গা পাননি। যে ইমেজটা তাঁর বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে ছিল। ওঁর ছোটখাট যা ত্রুটি ছিল বিশেষ করে যেসব দুর্বলতা ছোটিসি মুলাকাতের মধ্যে ধরা পড়েছিল সেসব তিনি অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু রোমানটিক নায়ক হিসেবে তার নিজস্ব ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে ভাবা হয়েছিল বোমবাই চিত্রজগতে দেরি করে আসা। পঞ্চাশের কোঠায় যখন তার বয়স তখন তার রোমানটিক নায়কের অভিনয় বোমবাই-এর দর্শক মেনে করে নিতে পারেনি। দেবানন্দ বেশি বয়সেও রোমানটিক হিরোর পারট করছেন কিন্তু দেবানন্দ যখন শুরু করেছিলেন তখন তাঁর বয়স কম ছিল। রোমানটিক নায়ক হিসেবে তিনি তাঁর ইমেজ ঠিক সেইভাবেই রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। উত্তমের সমবয়সী দিলীপকুমার, রাজকাপুর, রাজেন্দ্র-কুমার এখন রোমানটিক হিরো হিসেবে ঠিক ততটা সফল নন যতটা সক্ষম তাঁরা বিশেষ চরিত্র অভিনেতা হিসেবে। □

পাঁচ মিনিট

সমাধানদার খুচরো সমাধান

খুচরোর আকালে লোকের ভোগ বেড়েছে, ভোগান্তিরও শেষ নেই। রিজারভ ব্যাংক-এর ধকল বেড়েছে, সরকার নাকাল হচ্ছেন। ট্রেনে-ট্রামে-হাটে-বাসে খুচরোর বাগড়া, খুচরো নিয়ে ঝগড়া। খুচরোর ঝগড়া মধ্যবিত্তের সংসারেও ঢুকে পড়েছে। সেই পাইকারি ঝগড়ার খুচরো বিবরণ দিতে গিয়ে খবরের কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট হচ্ছে। অথচ আমাদের পাড়ার উর্ধ্বপন্থী রাজনীতি করা সমাধানদা বলেন, 'এটা কোন সমস্যাই নয়।' (সব সমস্যার সমাধান মুহূর্তে বলে দিতে পারেন বলেই ওঁর নাম সমাধানদা)।

আমি বললাম, সে কী, খুচরো সমস্যা কোন সমস্যাই নয়?

সমাধানদা রেগে গিয়ে বললেন, 'সত্যি অবাক কান্ড। এই সামান্য একটা ব্যাপার, যা কোন সমস্যার পর্যায়েই পড়ে না, তা নিয়ে দেশের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদরা ল্যাজে গোবরে হয়ে যাচ্ছে।'

আপনি যদি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হতেন তা হলে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করতেন?

সমাধানদা বললেন, 'আমি মন্ত্রী হতে চাই না। আমরা উর্ধ্বপন্থীরা কোন তন্ত্রে বিশ্বাসী নই, কোন জোটে আমাদের আস্থা নেই। আমরা সব সময় 'ওপরওয়ালা ভরসা নীতি'তে বিশ্বাসী। তবে মন্ত্রী না হয়েও এই তথাকথিত খুচরো সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি।'

কীভাবে করবেন একটু বলুন না।

'জনদরদী সরকার জনগণের কাছে আবেদন করবেন - মুক্ত হস্তে খুচরো দান করুন।'

আমি হতাশ হয়ে বললাম – সমাধানদা, আপনি তো জানেন এখন আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয় না। ওভাবে হবে না। এ ছাড়া আর অন্য কী দাওয়াই আছে আপনার ভাঁড়ারে?

'ওতে কাজ না হলে প্রথমে করতে হবে ডিহোরডিং ড্রাইভ বা মজুত উদ্ধার অভিযান। প্রত্যেক বাড়িতে খুচরো মজুত আছে। বিত্তবানের বাড়িতে বেশি, বিত্তহীনের বাড়িতে কম। খুচরো রয়েছে কারও মাটির ঘটে, কারও প্লাসটিকের বোতলে, কফির কৌটোয়, আবার কারোর লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। এইসব খুচরো ইনট্যাক্ট বার করে আনতে হবে।' - এইটুকু বলে সমাধানদা নস্যির ডিবেতে টোক্কা মারতে লাগলেন।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, খুচরো অল্প বিস্তর সব বাড়িতেই আছে। কিন্তু সেটা মজুতদারি আইনের আওতায় পড়বে?

কেন পড়বে না। মজুত ইজ মজুত। তা সে ধান-চালই হোক, আর খুচরো পয়সাই হোক। ধান-চাল উদ্ধার করতে ডিহোরডিং ড্রাইভ চালাতে পার আর খুচরো উদ্ধার করতে কেন ডিহোরডিং ড্রাইভ দিতে পারবে না? প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু মজুত করলেই তাকে মজুতদারির অপরাধে শাস্তি দেওয়া যায়। একই দিনে কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন অঞ্চলে মজুত উদ্ধার অভিযান চালাতে হবে। নতুবা এক অঞ্চলের খুচরো অন্য অঞ্চলে পাচার হয়ে যেতে পারে। অভিযানে পুলিশের সংগে থাকবে রিজারভ ব্যাংক এর লোক। খুচরো দিলেই তারা কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দেবে খুচরোর মালিককে। রিজারভ ব্যাংককেও তৈরি থাকতে হবে। কারণ খুচরো স্টোর করার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

তা ছাড়া এই সংগে আরেকটা কাজও করতে হবে। এরাজ্যে যারা বেকারভাতা পায় তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে -- এক মাসের মধ্যে অন্তত এক শ টাকার খুচরো কয়েন এনে রিজারভ ব্যাংকে জমা দিতে না পারলে আগামী মাস থেকে বেকারভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন পৌনে তিন লক্ষ যুবক যুবতী বেকার-ভাতা পায়। পৌনে তিন লক্ষ ইনটু এক শ' টাকা মানে দু কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। হিউজ ব্যাপার।

ডিহোরডিং ড্রাইভ প্লাস বেকারদের কালেকশন, এই টোটাল খুচরো রিজারভ ব্যাংক বিভিন্ন বণিকসভা, ট্রাম কোম-পানি, স্টেট ট্রানসপোরট করপোরেশন, বাস সিনডিকেট, ট্যাকসি অ্যাসোসিয়েশন, মিনি বাস মালিক এবং বিভিন্ন বাজার কমিটির মধ্যে এদের চাহিদামত ডিসট্রি-বিউট করবে। আমার প্রস্তাবমত কাজ করলে এ রাজ্যে খুচরোর কোন আকাল থাকবে না' – এই বলে সমাধানদা আবার তাঁর নস্যির ডিবেয় টোক্কা মারতে লাগলেন। আমি সমাধানের নোটগুলি বগলদাবা করে সমাধানদাকে ধন্যবাদ দিয়ে অফিসের দিকে পা বাড়ালাম।

নির্মল বিশ্বাস

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

খেলার আসর

মোহন বাগান : ইস্ট বেঙ্গল

১৬ জুলাই মুখোমুখি হল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহন বাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল। কলকাতায় এই খেলা মানেই উৎসব, টেনশন। একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খেলার আসরের প্রতিনিধিরা ঐ গুরুত্বপূর্ণ খেলার খবর পরিবেশন করবেন। খেলাটির টেকনিক্যাল দিক নিয়ে পর্যালোচনা করবেন প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপ চৌধুরী। সঙ্গে থাকছে অসংখ্য ছবি।

ইস্ট বেঙ্গলের সাফল্যে বড় বাধা কর্মকর্তারা— একটি তথ্যবহুল আলোচনা।

এ বছর লিগে ইস্ট বেঙ্গল দু পয়েন্ট খুইয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে। ৪২ বছর আগে স্পোর্টিং শেষবারের মত ইস্ট বেঙ্গলকে হারিয়েছিল পূর্ণ ব্যানার্জির দেওয়া গোলে। সেদিনের যুবক পূর্ণ ব্যানার্জি আজ প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে সেদিনের ম্যাচটির ছবি তিনি উপহার দিচ্ছেন শুধু খেলার আসরের পাঠক-পাঠিকাদের।

ফ্রানজ বেকেনবাওয়ার আবার কসমসে যোগ দিলেন।

'সম্ভাবনাময়' পর্যায়ে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর স্টপার সুব্রত গুহ এবং জাতীয় সাঁতারের রিপোর্ট।

এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীও ক্রিকেট নিয়ে। ৮ জুলাই রাজধানী দিল্লি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে যে রাজসিক সংবর্ধনা জানিয়েছে তার ছবিসহ রিপোর্ট।

বার্লিন থেকে চিরঞ্জীব

আমেরিকায় অদ্ভুত অসুখ 'এইডস'

নিউ জারসি থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

কাপোসিস সারকোমা চর্মরোগ

ত্রিনিদাদ থেকে শ্রীচরণ আর তার স্ত্রী তারা বার বছর আগে নিউ ইয়রকে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কোনদিন 'Acquired Immune Deficiency Syndrome' অথবা সংক্ষেপে AIDS কথাটাই শোনেনি। এগার বছরের ছেলে কারলটন শ্রীচরণকে অসুস্থ অবস্থায় গত ১৮ ফেবরুয়ারি নিউ ইয়রকের স্টোনিব্রুক ইউনিভারসিটির হাসপাতালে ভর্তি করার পর এরা প্রথম শুনতে পেল এ রোগের নাম। ২৮ ফেবরুয়ারি ছেলেটি মারা গেল। তারপর থেকে শ্রীচরণ আর তারা কেবলই ভাবছে—কোথা থেকে কারলটন এমন ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হল, আমেরিকার মত দেশে থেকেও যার চিকিৎসা এবং উপশম কোন কিছুই হল না?

এ প্রশ্ন ইদানীং আমেরিকার বহু মানুষের মনে জেগেছে। আটলান্টার 'Federal Centers For Disease Control' এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৮১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৩৬১ জনেরও বেশি সংখ্যক লোক AIDS-এ আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ৫২০ জন। শুধু নিউ ইয়রক শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রান্ত হয়েছে ৫৪৫ জন। মৃত্যুর হার লক্ষ্য করা গেছে ১৩০০ জনের মধ্যে ৩৭.৬%। চিকিৎসা শাস্ত্রে এরকম অদ্ভুত রোগের সুনির্দিষ্ট কোন কারণ বা ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। তবে বিশেষ ধরনের পরীক্ষার ফলে প্রধানত পাঁচ শ্রেণীর লোকের মধ্যে AIDS-এর লক্ষণ ধরা পড়েছে।

AIDS-এর প্রথম বা প্রধান শিকার হচ্ছে সমকামী পুরুষ (৯৩৩ জন আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৩৫%), দ্বিতীয়—যারা ইনজেকশনের সাহায্যে নানা দলের সংগে কোকেন, হেরোইন ইত্যাদি ড্রাগ ব্যবহার করে (২১৭ জন আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৪০%), তৃতীয়—হাইতি দ্বীপের যে সব ইমিগ্রানট সম্প্রতি নিউ ইয়রক বা মায়ামিতে এসেছে (৬৪ জন আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৫৫%),

চতুর্থ—যারা Hemophiliac, অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে যাদের শারীরিক রক্তপাত বন্ধ হয় না এবং বহু সময়ে ইনজেকশন ব্যবহার করতে হয়, রক্ত নেবার প্রয়োজন হয় (১১ জন আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৭৩%), পঞ্চম—এই চারটি দলের মধ্যে একটি বা দুটির সংগে জন্মসূত্রে বা পারিবারিক সান্নিধ্যে জড়িত শিশুরা (২০ জন আনুমানিকভাবে আক্রান্ত, মৃত্যুর হার ৫০%)।

এছাড়া আরও ৭৫ জন রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে (মৃত্যুর হার ৪৩%) যারা কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত নয়, অথচ AIDS-এ আক্রান্ত হয়েছে। সম্ভবত চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্ত নেবার দরুন, IV ড্রাগ ব্যবহারকারীর শয্যাসঙ্গিনী হবার দরুন, হেশিয়ান পুরুষের স্ত্রী হবার ফলে—নানা সূত্রে এটা সংক্রামিত হয়ে থাকতে পারে।

প্রথমদিকে নিউ ইয়রক, লস অ্যানজেলেস ও সানফ্রানসিসকোর সমকামী পুরুষ সমাজে AIDS-এর সূচনা দেখা দিলেও ক্রমশ আমেরিকার ৩৫টি স্টেটে এবং ফ্রানসে, ডেনমারক ইত্যাদি দেশেও এ রোগের খবর পাওয়া গেল। AIDS TASK FORCE-এর প্রধান Dr James Curran-এর অনুমান, আরও ২০০০ লোক এ বছরে আক্রান্ত হবে। কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও সীমাবদ্ধ থাকলেও, ক্রমশ সাধারণ সমাজে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে—এমন আশংকাও দেখা দিয়েছে অনেক চিকিৎসকের মনে।

AIDS-এর মূল উপসর্গ হল শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার স্বাভাবিক ক্ষমতার অবলুপ্তি। পরবর্তী রোগের লক্ষণগুলি এক এক জনের দেহে এক এক রকম ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। লস অ্যানজেলেসে এক রোগীর গলার ভেতরে প্রথমে সাদা সাদা ক্ষত দেখা গেল। ক্রমশ ক্ষতের প্রকোপে নিঃশ্বাসের কষ্ট, দ্রুত দৈহিক ওজন হ্রাস পাওয়া, নিয়মিত জ্বর এবং লানসে ইনফেমেশন—সব মিলিয়ে ক্যানসারের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিল। রোগ নির্ধারিত হল—Pneumocystis Carinii Pneumonia. এই সমকামী রোগীটি ১৯৮১ সালের ডিসেমবরে মারা গেল। নিউ ইয়রকে আর একজন সমকামী রোগীর AIDS হবার ফলে শরীরে Hodgkin's Disease-এর অনেক লক্ষণ প্রকাশ পেলেও অদ্ভুত এক নতুন উপসর্গ দেখা গেল। তার পায়ে ছিল গাঢ় বেগুনী ও লালে মেশানো এক ধরনের ক্ষত চিহ্ন। ডাক্তারী শাস্ত্রে এই বিশেষ ধরনের চর্মরোগের নাম Kaposi's Sarcoma. সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বংশজাত কিছু লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অবস্থায় এই ধরনের চর্মরোগ বা Skin Cancer দেখা যায়। তাদের ক্ষেত্রে এটিকে এমন কিছু মারাত্মক রোগ হিসাবে ধরাও হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই একই চর্মরোগ আমেরিকায় যুবক সমকামীদের ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রাণনাশক হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং দ্রুত রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ এদের দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন নানা শারীরিক কষ্ট, অপরিসীম দৈহিক ক্লান্তি, রাত্রে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া থেকে শুরু করে একটানা জ্বর, পেটের গোলমাল, গলায়, বাহুমূলে এবং পুরুষাঙ্গে গ্রন্থি স্ফীতি তো আছেই, সংগে দেখা দিচ্ছে নানা ভাইরাস সংক্রান্ত রোগ, যেমন সর্দি কাশি, ফ্লু, হারপিস এবং অন্যান্য চর্মরোগ। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়ে থাকে Kaposi's Sarcoma রোগে, কেউ কেউ Pneumocystis Carinii Pneumonia-তে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়। কারুর ক্ষেত্রে এক ধরনের হারপিসের ফলে Central Nervous System আক্রান্ত হয়। অনেক সময় Toxoplasmosis নামে এক ধরনের Parasitic infection-এর ফলে ব্রেনের ক্ষতি হয় বড়রকম।

হেমোফিলিয়াক রোগী কারলটন শ্রীচরণ

সমকামীদের ক্ষেত্রে এই রোগ এত প্রবলভাবে আক্রমণ করছে কেন? কী তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, যার জন্যে এমন একটি ভয়াবহ অসুস্থতা দানা বাঁধছে? পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, সুস্থ এবং অসুস্থ সমকামীদের মধ্যে জীবনযাত্রার কিছু পার্থক্য আছে। যে সব লোকেদের AIDS হয়েছে তারা বহু সংগীর সংগে বহু রকমভাবে যৌনজীবন যাপন করেছে। সারা জীবনে গড়ে প্রায় হাজারখানেক সংগীর সংগে এদের যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুস্থ সমকামীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অতিরিক্ত উচ্ছৃংখলার নজির নেই। যারা প্রথম দলভুক্ত, তারা স্বভাবতই অন্যান্য সংক্রামক রোগ যেমন, গনোরিয়া, সিফিলিস, হারপিস থেকে শুরু করে নানারকম ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, প্যারাসাইটিক রোগও একে অন্যকে ছড়িয়ে থাকে। এছাড়া AIDS-এর রোগীরা অনেকেই একরকম যৌন উত্তেজক ওষুধ ব্যবহার করেছে, যার ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। সমকামীদের ক্ষেত্রে AIDS হবার কারণ সম্ভবত কখনও যৌনউত্তেজক ওষুধ ব্যবহার, পুরুষ সংগীর সংগে বিকৃত ধরনের যৌন সংসর্গের ফলে পুরুষ দেহে অতিরিক্ত Sperm-এর অনুপ্রবেশ, নানা সংক্রামক রোগের ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া—ইত্যাদি অনুমান করা হয়েছে।

যারা ইনজেকশনের সাহায্যে কোকেন, হেরোইন ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাদের ক্ষেত্রে AIDS হবার-সম্ভাবনাকেও সমকামী সমাজের সংগে যুক্ত করা হয়েছে। কারণ, দেখা গেছে সমকামীদের মধ্যে যাদের AIDS হয়েছে, তারা ৫% কোকেন

নতুন!

MAGGI®

2-মিনিট নুডলস্

NEW
MAGGI®
2-Minute noodles
with tastemaker inside
masala flavour
Fast to cook! Good to eat!

MAGGI MAGGI

সবচেয়ে সুস্বাদু জলখাবার!

উচ্চমানের গম থেকে তৈরী ময়দা এবং উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দিয়ে তৈরী ম্যাগি 2-মিনিট নুডলস্ স্বয়ংক্রিয় কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেদ্ধ করে এবং ভেজে তৈরী করা হয়।

প্রত্যেকটি টেস্টমেকারই হল ভাল ও বিশেষ মসলার সংমিশ্রণ। মসলা, চিকেন এবং ক্যাপসিকা—এই তিনটি চমৎকার গন্ধ থেকে যেটা খুশি বেছে নিন। ফুটন্ত জলে ম্যাগি 2-মিনিট নুডলস্ আপনার পছন্দসই টেস্টমেকারের সংগে মিশিয়ে দিন। তারপর 2 মিনিট ফোটান। ব্যাস্ এবার পরিবেশন করুন এক গরম গরম সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর জলখাবার।

কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরেই পাওয়া যাচ্ছে।

কম সময়ে রান্না! খেতেও চমৎকার!

CLARION/61BEN

বা হেরোইন ইনজেকশন নিত। ফলে যারা সমকামী নয়, অথচ ড্রাগের ইনজেকশন নেয়, নানা জায়গায় অপরিষ্কার সূচের মধ্যে দিয়ে এ রোগ তাদের দেহে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু এ সব যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ করা শক্ত হয়েছে। যারা সমকামী নয়, ড্রাগের ইনজেকশন নেয় না–তাদের ক্ষেত্রে কেন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে নানা অসুস্থতা দেখা দেবে? এমন রোগীও আছে, যাদের আগে পরপর কোন সংক্রামক অসুখও হয়নি। AIDS-এর কারণ নির্ধারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি। কিন্তু লক্ষণগুলি সনাক্ত করা সহজেই সম্ভব হচ্ছে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যে প্রয়োজনীয় T-lymphocytes (এক শ্রেণীর শ্বেত রক্তকণিকা যারা প্যারাসাইট, কোন কোন ভাইরাস, Fungi এবং T B-type Organism-কে প্রতিহত করে)-এর অক্ষমতা এর জন্যে দায়ী। যাদের AIDS হয়েছে, তাদের এই T Cell-এর স্বল্পতা বা অক্ষমতা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি দেখা গেছে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কার্যকরী রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় helper T cell-এর স্বাভাবিক সংখ্যার অনুপস্থিতি।

সমকামীদের বা ড্রাগ আসক্তদের AIDS হবার জন্যে তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অংশত দায়ী করা চলে। কিন্তু যারা Hemophiliac তারাই হল এ রোগের প্রকৃত নির্দোষ শিকার। আমেরিকায় প্রায় ২০,000 Hemophiliac আছে। এদের যে কোন কারণে রক্তপাত ঘটলে তা বন্ধ করার প্রয়োজনে গত দশ বছর ধরে Factor VIII Concentrate নামে একটি ওষুধ জমাট এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখা থাকে। প্রয়োজনে জল মিশিয়ে ইনজেকশন প্রয়োগ করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করা যায়। কিন্তু এটি প্রস্তুত করতে প্রায় কুড়ি হাজার রক্তদানকারীর সংযুক্ত Plasma ব্যবহার করা হয়। ফলে রক্তবাহিত রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। Hemophiliac-দের মধ্যে Factor VIII Concentrate প্রয়োগ করা হয়েছে, এমন এগার জনের AIDS হয়েছে এবং আটজন মারা গেছে। যদি এইভাবে AIDS সুস্থ দেহকে আক্রমণ করতে পারে, তাহলে সারা আমেরিকায় যে তিন মিলিয়ন লোক প্রতিবছর blood transfusion করায়, তাদের কী অবস্থা হবে? 'American Association of Blood Banks' Committee on transfusion-transmitted disease' এর চেয়ারম্যান Dr. Joseph Bove এর মতে–কোন রোগীকে দূষিত রক্ত প্রয়োগ করার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলা চলে। এ পর্যন্ত মাত্র দুজন রোগী AIDS-এ আক্রান্ত হয়েছে। আমেরিকার স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে, যে সব লোকের কোন অপারেশনের সময় রক্ত দেবার দরকার হবে, তারা ইচ্ছে করলে অনেক আগে থেকে নিজেদেরই রক্ত জমা দিতে পারবে। এছাড়া সরকার থেকে বলা হয়েছে–রক্ত এবং প্লাজমা সংগ্রহকারী কেন্দ্রগুলি যেন সন্দেহজনক কাউকে রক্তদানের অনুমতি না দেয়। লস অ্যানজেলেসে একটি বড় Plasma প্রস্তুত কেন্দ্রে একমাসে চারশো সমকামীকে রক্তদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শিশুদের ক্ষেত্রে AIDS-এর প্রকোপ এখনও খুবই সীমাবদ্ধ এবং পারিবারিক বা জন্মসূত্রে সংক্রামিত বলে মনে করা হচ্ছে। অভিভাবকদের মধ্যে কেউ যদি উভয়কামী অথবা ড্রাগের ইনজেকশন নিয়ে থাকে– এরকম পরিস্থিতিতে শিশুদের সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে।

হাইতি দ্বীপের ইমিগ্র্যান্টদের AIDS হবার কারণ কী হতে পারে– এ নিয়ে নানা গবেষণা চলেছে। হাইতি দ্বীপেও এ রোগের প্রকোপ দেখা গেছে। আপাত বিচারে এরা কেউই সমকামী নয়, Hemophiliac নয়, ড্রাগের ইনজেকশনও নেয় না। কিন্তু অনুমান করা হচ্ছে–অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন থেকেও এ রোগের সূত্রপাত হতে পারে। সেই বিচারে, পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিতেও এ রোগের উদাহরণ হয়ত আছে, অন্য নামে, দুরারোগ্য ব্যাধি হিসাবে। আফরিকার কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে Kaposi's Sarcoma আগেও দেখা গেছে ফ্রানসে 80 জন AIDS আক্রান্ত রোগীর মধ্যে বেশ কয়েকজন তার আগে পশ্চিম আফরিকাতে বাস করেছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে অ্যাংগোলা প্রত্যাগত, কিউবান সৈন্যরা এই রোগ বহন করে এনেছে এবং আমেরিকার মায়ামি শহরে কিউবান সমাজে তা সংক্রামিত করে গেছে। হাইতি দ্বীপ আমেরিকার সমকামীদের ছুটি কাটানোর একটি বিশেষ প্রিয় জায়গা। সম্ভবত সেখান থেকেই কোনভাবে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার মাধ্যমে এ রোগ তারা বহন করে এনেছে।

তবে এ সবই এখনও পর্যন্ত অনুমানের বিষয়। ইতিমধ্যে Atlanta Disease Control Center-এ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা রক্ত, দেহের নানা জলীয় পদার্থ, টিসু ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। Cell culture, ইঁদুর, বেড়াল, বাঁদরের ওপর ইনজেকশন প্রয়োগ-- সবরকমভাবে গবেষণা শুরু হয়েছে। অনেক চিকিৎসক বৈজ্ঞানিকদের মতে এই জাতীয় গবেষণার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা উচিৎ তার অভাব ঘটছে। আমেরিকার সমকামীরা রীতিমত আন্দোলন শুরু করেছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা দেশ জুড়ে পুরুষ সমকামীর দল মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছে। প্রকাশ্যে অভিযোগ এনেছে যে AIDS-কে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অসুস্থতা হিসাবে গণ্য করায় এ রোগের গবেষণার ব্যাপারে

অবহেলা ঘটছে। এ অভিযোগ যথার্থ নয়। NIH থেকে এ বছর AIDS-এর গবেষণার জন্যে ৭.৯ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া U.S. Representative Henry Waxman অতিরিক্ত ৪০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব এনেছেন।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গবেষণাকারীরা জানিয়েছেন যে Human T cell leukemia virus (HTLV)-কে তাঁরা AIDS-এর সংগে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করছেন। তিনটি বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রের তথ্যে প্রকাশ—AIDS রোগীদের রক্তের পরীক্ষায় HTLV-এর অনুপাতে Antibodyর মাত্রাধিক্য দেখা গেছে। Dr. James Curran বলেছেন—এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে HTLVই AIDS রোগের কারণ। এমনও হতে পারে, AIDS হবার পর শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যাবার ফলে তাদের মধ্যে এই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। হয়ত এটি AIDS এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, পূর্ববর্তী কোন কারণ নয়।

একই সময়ে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জারনালে এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। AIDS রোগীদের পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে ১৫টি শিশু AIDS জাতীয় অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছে। যৌন সম্পর্করহিত এবং দূষিত রক্তের দ্বারা সংক্রামিত না হওয়া সত্ত্বেও যদি শিশুদের ক্ষেত্রে সামান্য দৈহিক সংস্পর্শে এ রোগ ছড়ায়, তবে বিশেষভাবে সাবধানতার কথা আসে।

সাধারণ আমেরিকানরা এ কারণে চিন্তিত। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে AIDS কে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে সংক্রামক বলে আশংকার কোন কারণ ঘটেনি। হাঁচি, কাশি, সর্দির সংগে এ রোগ বাতাসে ছড়ায় না। রেস্টুরেন্ট বা সাধারণের ব্যবহৃত বাথরুম থেকেও এর সংক্রমণ হয় না। AIDS রোগীদের মধ্যে ৯৫% ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঘনিষ্ঠ দৈহিক সম্পর্কের ফলে অথবা রক্তবাহিত হয়ে রোগ শরীরে প্রবেশ করেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী, চিকিৎসক, নারস, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, বিজ্ঞানী যাঁরা সর্বদা এ রোগের specimen, body fluid নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের কারুর ক্ষেত্রেই এ রোগে আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া যায়নি।

এই রোগে দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে ক্যানসার ও অন্যান্য ধরনের অসুস্থতায় যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের চিকিৎসার চেষ্টা চলছে নানাভাবে। নিউ ইয়রকে Memorial Sloan Kettering Cancer Center-এ এবং অন্যান্য কয়েকটি হাসপাতালে ভাইরাস প্রতিরোধকারী ওষুধ interferon (কোন কোন ক্যানসারে প্রয়োগ করা হয়) ইনজেকশন দিয়ে AIDS-এর চিকিৎসা করা হচ্ছে। এর ফলে Kaposi's Sarcoma-র রোগীরা কিছু উপকার পেয়েছে বটে, কিন্তু আসল যে রোগ অর্থাৎ শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতার অবলুপ্তি, তার কোন উপশম হয়নি। এছাড়া Bone marrow Transplant, সুস্থ লোকের blood plasma দিয়ে অসুস্থ blood plasma-র অপসারণ—পরীক্ষামূলক কোন চেষ্টাই কার্যকর হচ্ছে না।

আমেরিকার পুরুষ সমকামী-সমাজে এক ধরনের আতংক ছড়িয়ে পড়ছে। অনেকের ক্ষেত্রে অসুস্থতার দরুন জীবনযাত্রার গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ঘনিষ্ঠ সংগীর রোগগ্রস্ত অবস্থা, মৃত্যু দেখার পর, রোগ সংক্রমণের ভয়ে ভীত এই সম্প্রদায় প্রকাশ্যে এগিয়ে আসছে সাহায্যের আশায়। নিউ ইয়রকে Gay Men's Health Crisis-এর নামে সংঘবদ্ধ ৪০০ স্বেচ্ছাসেবক নানাভাবে AIDS রোগীদের দেখাশোনা করছে।

হাইতি দ্বীপের ইমিগ্র্যান্ট ২৬ বছরের ডেসটিন আমেরিকায় এসেছিল নতুন জীবনের প্রত্যাশায়। AIDS-এর শিকার হয়ে গত এক বছরে দশবার মায়ামির হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, উপসর্গ—নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, এনসেফেলাইটিস, মেনিনজাইটিস। শরীরের ডান দিক পংগু হয়ে গেছে, বাকি অংশে অসহ্য যন্ত্রণা, জীবনের মেয়াদ সম্ভবত আর কয়েক মাস।

কারলটন শ্রীচরণ ছিল Hemophiliac. গত বছর এপরিল মাসে তাকে রক্ত দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। সম্ভবত তখনই তার দেহে এ রোগ প্রবেশ করেছিল। তারপর উপসর্গ হিসেবে একটানা কাশি শুরু হল। ডাক্তারের কথা মত কাশির ওষুধ খাইয়েছে। সেই কাশি আর সারল না। ফেবরুয়ারি মাসে শ্বাসকষ্ট শুরু হল। তারপর হাসপাতালে লাং বায়োপসি করে রোগ যখন ধরা পড়ল, মৃত্যু তখন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত Acquired Immune Deficiency Syndrome এমনই এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার কারণ নির্ণয় ও উপশমের জন্যে গবেষণা আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। □

আলোকচিত্র : নিউজ ইনডিয়া পত্রিকার সৌজন্যে।

প্রাচুর্যের দেশেও দারিদ্র রয়েছে

সুদীপ মজুমদার

পরিবর্তনের দিল্লি প্রতিনিধি সাংবাদিক সুদীপ মজুমদার ওয়ার্লড প্রেস ইনস্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হয়ে এখন সাত মাসের জন্য আমেরিকায়। প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকার জনজীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রথম কিস্তি এখানে প্রকাশিত হল।

ঘুম ভাঙল যন্ত্রের আওয়াজে। এগার তলার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সূর্য উঠেছে ইসট নদীর ওপারে। বিরাট একটা লোহার সেতু; বাঁদিকে উঁচু উঁচু কোঠাবাড়িগুলোর ছাদে নিওন বাতি জ্বলছে নিভছে। নিচে চওড়া থারড অ্যাভিনিউ। গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করে দিয়েছে; জানলার নিচেই কাছাকাছি একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মজদুরেরা কাজ করছে। একটা বাড়ির সাত তলার পর আট তলার দেওয়াল উঠছে। কিন্তু মোট ৫–৭ জন লোক কাজ করছে। রাস্তার নিচে একজন শ্রমিক ক্রেন অপারেট করছে। সে কতকগুলো বড় বড় সিমেনটের ব্লক ওপরে তুলে দিচ্ছে আর ওপরে যে পাঁচ জন কাজ করছে তারা সেগুলো নানান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একের পর এক রেখে দেওয়াল তুলছে। মাত্র এই কয়েক জন মানুষ একটা অতবড় বাড়ি বানাচ্ছে। ভাবতেও কেমন লাগে। সবকাজই মেশিনকে সঁপে দেওয়া হয়েছে এদেশে।

কিন্তু তা বলে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে যে আরামে দিন কাটাচ্ছে তা নয়। নিউ ইয়রক অন্যতম ধনী শহর হওয়া সত্ত্বেও এই শহরেই হাজার হাজার মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। সবচাইতে জমকালো অঞ্চল হল ম্যানহাটন। কিন্তু ব্রনকস, ব্রুকলিন অঞ্চলগুলোতে সাধারণত গরিব মানুষদেরই বাস। গত বছর খৃস্টমাসের সময় হারলেম অঞ্চলের কয়েক হাজার পরিবার অনাহারে কাটিয়েছে বেশ কয়েক দিন। কেননা চাকরি নেই, রোজগার নেই, খাবার কেনার পয়সা নেই। সরকারি সাহায্য যাও বা একটু আধটু মেলে, তা পেতে হলে নানা কাগজপত্র ও দরখাস্ত লেখালেখি করতে হয়।

এমনই একটি দুঃস্থ পরিবার স্যানড্রা স্মিথ। সাতটি ছেলেমেয়ের মা। স্বামীর সংগে কোন সম্পর্ক নেই। নিজে আরথ্রাইটিস-এর রোগী। সরকারি সাহায্য যা পেত স্যানড্রা তা বন্ধ হয়ে যায় ডিসেমবর মাসে। তারপর আর অনাহারে থাকতে না পেরে সে যায় ইসট হারলেম ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে। কমিটির সাহায্যে স্যানড্রা স্মিথ কোনমতে খাবার কিনে বাড়ি আসে। কিন্তু এখনও ৪৮ বছরের এই মহিলার জীবনে দারুণ অনিশ্চয়তা। চাকরি নেই। পাবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আর পেলেও যে করতে পারবে এমন কথা নয়। কেননা আরথ্রাইটিস ওকে প্রায় পংগু করে রেখেছে।

আমেরিকা প্রাচুর্যের দেশ। কিন্তু এদেশে বেকার ও গরিবদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। রোজই বেশি বেশি করে সাধারণ মানুষ সরকারের কাছ থেকে 'ফুড স্ট্যামপ' চাইছে। 'ফুড স্ট্যামপ' এক ধরনের সরকারি কুপন যা বিলি করা হয় একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে যাদের আয় তাদের। কিন্তু এটা পেতে নানান ঝামেলা পোয়াতে হয়। নানান রকম সারটিফিকেট দিতে হয়। সরকার ইচ্ছা করেই কঠিন ব্যবস্থা করেছে। কেননা দিনে দিনে খাবার চাওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আর সরকারের আবার বিলি করার তেমন কোনও স্পৃহা নেই। যখন বড় বড় কোমপানি হঠাৎ তাদের কারখানা বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়ে দেয়, তখন সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এখনকার আইন-কানুন ও নিয়ম এমন যে, সরকার বড় বড় করপোরেশনগুলোর বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা নিতে পারে না। ওদের হাতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা। এ বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত লিখব।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরোলাম কলমবিয়াতে আমার বন্ধু ইলার হসটেলে যাওয়ার জন্য। স্যুটকেস নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। ট্যাকসির অপেক্ষায়। হলুদ রঙের গাড়িতে কালো দাগ। আমার পাশে আর একজন অফিসগামী তরুণীও অপেক্ষা করছেন ট্যাকসির জন্য। হাত তুলে থাকতে হয় ট্যাকসি পেতে হলে। আমি তো তুলেই ছিলাম। একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াতেই দেখি ঐ তরুণীটি সরসর করে চড়ে বসলেন। আমার তো রাগে গা জ্বলে গেল। এটাতে তো আমার যাবার কথা ছিল। কোনও রকম মন্তব্য না

জন্ম মাস কী

জুলাই।

জুলাই ?

জুলাই।

জুলাই।
এই পেয়েছে।
এবার পালাই…।

কিছু
আমার ভাগ্য ?

আপনার ভাগ্যও
ইউনিটে বাঁধা !

সময়
থাকতে থাকতে
ইউনিট কিনুন !

ইউনিট ? এতে আছেটা কী ?

আপনি যদি শেয়ারে বা ডিবেঞ্চারে কি ভাবে টাকা খাটাতে হয় না জানেন তো কিছু আসে যায় না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ইউনিটের উপর নির্ভর করতে পারেন। কারণ, একমাত্র ইউনিটেই পাবেন নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি।

★ মূলধনের নিরাপত্তা ★ উচ্চ আয়

★ সহজে ভাঙানোর সুবিধা

এবং কর ছাড়ের বিশেষ সুযোগ

আপনি ইউনিটের মাধ্যমে করমুক্ত ১০,০০০ টাকা আয় করতে পারেন (ইউনিটসহ বিশেষ অর্থ লগ্নীর ক্ষেত্রে অনুমোদিত ৭,০০০ টাকা অবধি সাধারণ ছাড়ের ওপর ৩০০০ টাকা কেবল মাত্র ইউনিট থেকে।)

একই রকমভাবে সম্পত্তি করের জন্য ২ লাখ টাকা (ইউনিটসহ বিশেষ অর্থ লগ্নীর ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ ছাড়ের সুবিধে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং ৩৫০০০ টাকা একমাত্র ইউনিট থেকে)।

এই সুযোগ শুধু ৩০শে জুলাই পর্যন্ত পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি করুন, আজই ইউনিট কিনুন!

এখনই ইউ টি আই এজেন্ট, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, মুখ্য প্রতিনিধি বৃন্দ অথবা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

পড়ে থাক সব কিছু
আগে তো ইউনিট কিনি
বছরের সবচাইতে কম দামে

টা ১১.২৫

১৩.৫%
ঘোষিত লভ্যাংশ

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

প্রধান কার্যালয় : বোম্বাই ৪০০ ০২০

আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১

ফোন : ২৩-১৩৯১, ২৩-১৬৩৮, ২৩-৮৮১৮, ২২-৮৭৯৫

সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে

Sista's-UTI 019/83 Ben

করেই ট্যাকসিওয়ালা হুস করে চলে গেল। আমার হাত তুলে দাঁড়ালাম। তখনও রাগ কমেনি।

ট্যাকসি ধরে কলম্বিয়া এলাম যখন তখন প্রায় দুপুর। চত্বরে সব ছেলেমেয়েরা বসে গিয়েছে। পাশে বড় বড় টু-ইন-ওয়ান। বেশ জোরে গান বাজছে। কেউ কেউ আবার নাচছে। পরীক্ষার পর এখন গরমের ছুটি ওদের। বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে। যারা রয়েছে তারা কোন বিশেষ পরীক্ষা অথবা কোর্স করতে রয়েছে।

আমার চোখ তখনও টকটকে লাল। ঘুম হয়নি ঠিকমত আর শরীর সাড়ে দশ ঘন্টার ব্যবধানকে ঠিকমত অ্যাডজাস্ট তখনও করতে পারেনি। রুমে এসে সটান শুয়ে পড়লাম। ইলা চলে গেল ওর কাজ শেষ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে। বিকেলে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে খুলে দেখি এক ভারতীয়। বয়স কুড়ি-পঁচিশের একটি মেয়ে। সুন্দর দেখতে। ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল 'ইলা কোথায়'। আমি বললাম সন্ধ্যে বেলায় ফিরবে। আমার দিকে চেয়ে বলল 'আর ইউ সুদীপ'। একটু অবাক হলাম। আমার এখানে আসার কথা তো আর কারও জানার নয়। যাক মেয়েটি বসে পড়ল। কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ ইংরেজিতে। জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল মেয়েটার পুরো নাম কী। শর্মিলা ব্যানারজি দিল্লির বাঙালি মেয়ে। যখন জানতে পারলাম একচোট খুব হাসলাম ইংরেজিতে এতক্ষণ কথা বলার জন্য। শর্মিলা দারুণ বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিজনেস সাইকোলজি-তে এম এ পড়ছে। স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। মাত্র মাস সাতেক হয়েছে নিউ ইয়র্ক এসেছে। কিন্তু এর মধ্যেই ছোটখাট কাজ জুটিয়ে নিজের পড়াশুনা চালানোর ব্যবস্থা করেছে।

আমেরিকানরা গানপাগল। নানান ধরনের গান। পপ, জ্যাজ, কানট্রি, রক আরও কত রকমের গান বাজনা। শুক্র, শনিবার সন্ধ্যে-বেলায় তো 'বার'গুলো ভরে যায়। [illegible] করলে ও খাবার খেলে বেশি পয়সা দিতে হয়। আমরা ইউনিভারসিটির কাছাকাছি একটা 'জ্যাজ বারে' বসলাম। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক দারুণ রক মিউজিক পরিবেশন করলেন। মাঝরাত পার হয়ে যাওয়ার পরে যখন 'বার' ছেড়ে বেরিয়ে এলাম তখনও রাস্তায় ভরে ভরে মানুষ। [illegible]

[illegible]

হাঁটছি। কিছু পিকচার পোস্টকারড কেনার জন্য একটা গিফট শপে ঢুকলাম। দোকানঘরের চেহারাটা ভারতীয় মনে হল। আমস্টারডাম অ্যাভিনিউ-এর ওপর দোকান। কয়েকটা কথা বলার পর জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, ভারতীয় নাকি? হ্যাঁ, গুজরাতের মানুষ। বছর তিনেক এখানে দোকান খুলেছে। কথা বলছি, এমন সময় আর এক ভারতীয়ের মত দেখতে এক ভদ্র-লোক এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে গেলেন। আর দু'চারটে রসিকতার কথাবার্তা বলে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখি সেই ভদ্রলোক এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এটাও গিফট শপ। জিজ্ঞাসা করলাম পাঞ্জাবিতে, 'এটা কি আপনার দোকান'? পাঞ্জাবিতেই উত্তর পেলাম 'হ্যাঁ'। বছর চারেক হয়েছে দোকান এখানে। বেশ হৃদ্যতার কথা বললেন তিনি। ভেতরে এসে এক কাপ চা খাওয়ারও অনুরোধ কর-লেন। দেরি হয়ে যাবে বলে এগোতে হল। এবার উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো ভারতীয়? বললাম, 'হ্যাঁ আর আপনিও নিশ্চয়।' 'না, আমি পাকিস্তানী।' বা সুন্দর সৌহার্দ্য নিয়ে তিনি পাশাপাশি এক ভারতীয়র সঙ্গে ব্যবসা করছেন। দুজনে একই জিনিস বিক্রি করেন। কিন্তু কোন রেষারেষি নেই। আন্ত-রিকতার অভাব নেই এক ভারতীয় ও এক পাকিস্তানীর মধ্যে। তবু কেন যে দু'দেশের শাসকরা খালি যুদ্ধের আওয়াজ তুলে যায়। মাথার মধ্যে এই ভাবনাটা রয়ে গেল।

ঠিক এমনিভাবেই একদিন ব্রড-ওয়েতে দুই ভারতীয়র সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তা মেরামতের কাজ করছিল। এদের একজন গঙ্গাধরন। কেরালার মানুষ। স্ত্রী আর দুই বাচ্চা নিয়ে রয়েছে এখানে গত দশ বছর ধরে। দেশের কথা বড্ড মনে পড়ে। কিন্তু কী করবে যাতায়াতের কত খরচ আর তাছাড়া ছুটিও পাওয়া মুশকিল।

নিউ ইয়রককে আমেরিকার অপরাধ রাজধানীও বলা হয়। ছিনতাই এখানে অহরহ হয়। রাত নটার পর সাবওয়ে ট্রেনে সাধারণত লোকজনের যাতায়াত কমে যায়। একদিন রাতে আমরা কয়েকজন নিউ ইয়রকের চীনাবাজার থেকে দারুণ চাইনিজ খাবার খেয়ে সাবওয়েতে ফিরছিলাম। রাত তখন বারটা। টাইমস স্কোয়ার এক প্রধান সাবওয়ে স্টেশন। কলম্বিয়াতে আসার জন্য এখানে ট্রেন বদলাতে হয়। ট্রেন চলে সারারাত। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছি বুক স্টলের কাছাকাছি। হঠাৎ দেখি দুজন [illegible] [illegible]

[illegible] বাচ্চুভাই। [illegible] পরিবারের [illegible] দেশের বেশির ভাগ বুক স্টলগুলো কয়েকটি ভারতীয় পরিবার চালায়। বাচ্চুভাই থাকে নিউ ইয়রকের [illegible] পাড়ায়। এখানেই বেশির ভাগ ভারতীয় থাকে। বাচ্চুভাই মনে করে এদেশে তার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ঠিক হতে পারে না। অশিক্ষা ও কু শিক্ষার প্রভাবে পড়বে ওর ছেলে মেয়ে, তাই ভাবনা ওর। কিন্তু দেশে ফিরে কী করবে? [illegible] করা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে মন চায় দেশে ফিরে যেতে। সাংবাদিক জেনে আমাকে আরও খাতির করার চেষ্টা করল অত রাত্তিরেও। কিন্তু আমার ট্রেন এসে গেল। মনে হচ্ছিল বাচ্চুভাই যেন আরও কথা বলতে চায়।

আমার পুরনো সম্পাদক বন্ধু নিহাল সিং এখন নিউ ইয়রকে বাস করেন। ইনি এককালে স্টেটসম্যা-নের এডিটর ছিলেন। ফোনে কথা বলতেই পরদিন একসঙ্গে লানচ খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। নিহাল সিং-এর অফিস রকফেলার সেনটারের ৫৪ তলায়। এক্সপ্রেস লিফটে মাত্র ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড লাগে ৫৪ তলায় পৌঁছাতে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে রাস্তার

[illegible] দেশে ফিরে [illegible]

[illegible]

[illegible] চলল শহর। [illegible] হয়েছে আমার প্রথম দর্শনে। সকালে [illegible]

[illegible] WPI-এর [illegible] সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। [illegible] দিতে। ইলা আর [illegible] থেকে বিদায় নিয়ে [illegible] দিকে [illegible] টায়। তিন ঘণ্টার [illegible] চেক-ইন করে [illegible] হঠাৎ [illegible] পড়ে গেলাম। □

বাংলা ভাষাচর্চা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৬৫ বছর পূর্ণ হল। স্নাতকোত্তর স্তরে দেশে সর্বপ্রথম বাংলা চর্চার শুরু ৬৫ বছর আগে। লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত গবেষক।

তুষারকান্তি মহাপাত্র

একশ' ছাব্বিশ বছরের পুরনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ পঁয়ষট্টিতে পা দেবে আগামী জুন মাসে। আমরা কথায় বলি বাংলা বিভাগ কিন্তু বাংলা বিভাগ বলে আলাদা কোন বিভাগ আজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। মডার্ন ইনডিয়ান ল্যাংগুয়েজ বা সংক্ষেপে এম আই এল বিভাগের একটি অংশ রূপেই তার জন্ম আর অস্তিত্ব। ১৯৩৮ পর্যন্ত বিভাগটির নাম ছিল ইনডিয়ান ভারনাকুলার ল্যাংগুয়েজ, ওই বছর নাম বদলে হল এম আই এল, এই যা তফাত। বিভাগটি আগে ছিল তেরো ভাষার সংসার। কমতে কমতে এখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই- বাংলা আর তামিল। হিন্দি আর উরদুর জন্যে আলাদা দুটি বিভাগ হয়েছে। তামিল পড়ানো বন্ধ ছিল বেশ কিছুকাল, নতুন করে শুরু হয়েছে বছর তিন; বাকিগুলি পড়ানো বন্ধ। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত অসমীয়া ওড়িয়া ফারসি পড়ানো হলেও দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলি পড়ানো বন্ধ চল্লিশের দশক থেকে।

'১৯১৯-এ এম আই এল-এর জন্ম সময়ে মনে করা হয়েছিল এম এ পাশের ক্ষেত্রে কোন একটিমাত্র ভাষাচর্চাই যথেষ্ট হতে পারে না। ভারতীয় নানা ভাষার মধ্যে আছে নিবিড় যোগ। ভাষা ও সাহিত্যের সেই পারস্পরিক যোগটুকুও জানা দরকার। সেজন্যে নিয়ম ছিল একটি প্রধান ভাষার সঙ্গে অন্য একটি ভারতীয় ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিখতে হবে। মোট আটশ' মারকের মধ্যে একশ' মারক নির্দিষ্ট ছিল ওই দ্বিতীয় ভাষাটির জন্যে। আজ ভাবলে একটু অবাক লাগতে পারে যে বাংলা হিন্দি উরদু তামিলের মতো একসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত অসমীয়া ওড়িয়া মৈথিলি ও গুজরাটি ভাষায় এম· এ। এই আটটি ছিল প্রধান ভাষা। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও এ যে কোন একটি নেওয়া যেত। তাছাড়া শুধু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হত আরও পাঁচটি ভারতীয় ভাষা—মারাঠি, মালয়ালাম, কানাড়ি, তেলেগু ও সিংহলি। ভাষা শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি নিয়ে নানা ভাবনা আজকাল প্রায় সবাই ভাবেন কিন্তু তার একটা পাকা ব্যবস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর আগে। এ ইতিহাসটা আজ আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম· এ পরীক্ষা প্রথম নেওয়া হয় ১৮৬১-তে আর ১৯২০-তে হয় বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম এম· এ পরীক্ষা। এই তেষট্টি বছর শুধু প্রতীক্ষায় কাটেনি, নানা চেষ্টা ও বাধার মধ্য দিয়েই পার হয়েছে এই সুদীর্ঘ কাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের আগে থেকেই বিদ্যাসাগর মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তোলার কথা ভেবেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি এই উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১) ও ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩-৫৪)। সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা আবার সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানলে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত হয় না। সুতরাং বাংলায় যদি শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের প্রথম পাঠ নেয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা হবে অফুরন্ত। তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে বই দুটি লিখিত হল--মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্য ভাষা শেখার পথও প্রস্তুত হল। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথম শিক্ষা সব কালে সব দেশেই হয়েছে, বাংলাদেশেও, কিন্তু বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তোলার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য।

আইনের চোখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ২৪ জানুয়ারি ১৮৫৭ কিন্তু প্রকৃত শুভারম্ভ ঘটেছিল ১২ ডিসেম্বর ১৮৫৬, মনোনীত উপাচার্য (উইলিয়ম কলভিল) ও উনত্রিশ জন ফেলোর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। এই ফেলোদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন ছ'জন, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম। আরটস ফ্যাকালটির পনের জন সদস্যের তিন ভারতীয়ের মধ্যেও তিনি ছিলেন। এই সদস্যরাই ঠিক করেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় (এনট্রান্স) অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সঙ্গে দিতে হবে দুটি ভাষা বিষয়ে পরীক্ষা—একটি ইংরেজি, অন্যটি গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দি, উরদু (পরে ওড়িয়া ও বর্মা) ও বাংলা ভাষার মধ্যে যে-কোন একটি। প্রতি ভাষার জন্যে দুটি পত্র। সুতরাং ভাষার ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৮৫৭-র এপ্রিলে (৬-১৩) লাহোর থেকে চট্টগ্রাম এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে তেরোটি কেন্দ্রে ২৪৪ জন বসলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে। প্রথম বিভাগে পাশ করা ১১৫ জনের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। পরের বছর হল বি· এ· পরীক্ষা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্ররাই সে পরীক্ষা দেবার অধিকারী। ১৩ জন ফি জমা দিলেও বসলেন ১০ জন, বঙ্কিম ও যদুনাথ তাঁদের অন্যতম। অন্যদের মতো খারাপ রেজালট না করলেও উভয়েই ইংরেজিতে সাত নমবর কম পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সাত মারক গ্রেস দিয়ে এঁদের দুজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হওয়ার গৌরব দান করলেন। এই পরীক্ষায় অন্য স্মরণীয় ঘটনা—বঙ্কিম যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী বিদ্যাসাগর সেই পরীক্ষার পরীক্ষক। ১৮৫৮-র বি· এ· পরীক্ষায় বাংলা ভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৯০ খৃস্টাব্দে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। পরের বছর সমাবর্তন উৎসবে তিনি তাঁর ভাষণে উচ্চতর শিক্ষায় মাতৃভাষার চর্চা উচিত বলে মন্তব্য করলেন। তারই সূত্র ধরে দুমাস পরে (১ মারচ ১৮৯১) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা, হিন্দি ও উরদুকে কলা বিভাগের পরীক্ষায় আবশ্যিক করার অনুরোধ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠি দিলেন। চিঠিটি আলোচিত হল আরটস ফ্যাকালটির সভায়। আশুতোষ তো বটেই এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সমর্থন সত্ত্বেও প্রস্তাবটি পাশ হল না।

এতে কিন্তু আলোড়ন থেমে থাকল না। আন্দোলন চলল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে। ভিতরে যেমন বঙ্কিম, আশুতোষ প্রমুখেরা ছিলেন তেমনি বাইরে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে। মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা দুটি ব্যাপারই সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস, হীরেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত গুপ্ত, নন্দকৃষ্ণ বসুর সই করা একটি চিঠি বিলি করা হল শিক্ষাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় মাতৃভাষায় শেখা উচিত কিনা এই নিয়ে মতামত চাওয়া হল। অনেকেই সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতা করেছিলেন এবং কার্যত এবারেও বিরোধীরাই জয়ী হলেন। ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা বঙ্কিম, গুরুদাসের মতো মনীষীর প্রশংসা কুড়োলেও জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। অনেক টানাপোড়েনের পর ১৯৪০ খৃস্টাব্দে প্রথম বাংলা ভাষায় অন্য বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়া গিয়েছিল যদিও এজন্যে সরকারি অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৫-এ।

বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে চাই বাংলায় লেখা বই এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিভাষা। গুরুদাসের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্কিমকে দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে বাংলা সংকলন গ্রন্থ রচিত হল, আশুতোষের আমলে দীনেশচন্দ্র সেনকে দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো হল, গবেষণামূলক বইও লেখানো হল। ১৯১৩তে রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প্রাইজ। বাংলা ভাষার দাবি উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেকটা দূর হল। বিজ্ঞান বিষয়ে পরিভাষার অভাব দূর করতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নানা বিষয়ে পরিভাষা রচনা করলেন। সে উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের দানও অপরিসীম। এই সব চেষ্টার সামগ্রিক ফল হিসেবে ১৯১৯-এর ফেবরুয়ারিতে সরকার ভারতীয় ভাষা বিভাগ সৃষ্টির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। স্নাতকোত্তর স্তরে ভারতীয় ভাষা পড়াবার সব বাধা দূর হল।

বত্রিশ জন ছাত্র নিয়ে বাংলায় এম· এ· পড়ানো শুরু হয়েছিল ১৯১৯-এর জুনে। আজ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তিনশ'র কাছাকাছি। ১৯২০-তে শুধু ননকলেজিয়েট ছাত্রদের দিয়ে যে পরীক্ষা হল তার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ষোল। আজ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজারও পার হয়ে গেছে। শুধু একটা ব্যাপারে এখন ঘাটতি। ষোল জন ননকলেজিয়েট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন সাত জন। আজ ননকলেজিয়েট তো দূরের কথা রেগুলার ছাত্রছাত্রীরাও একসঙ্গে সাতটা ফারসট ক্লাস কল্পনাতেও আনতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সহায়তায় আশুতোষ যে কাজ শুরু করেছিলেন তার উপযুক্ত প্রসার ঘটল শ্যামাপ্রসাদের সময়ে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁরও উপদেষ্টা। সাহিত্য পরিষদের পরিভাষা রচনার প্রথম চেষ্টা প্রসার লাভ করল বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত পরিভাষা সমিতির মাধ্যমে (১৯৩৪)। বিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ে পরিভাষা রচিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হল।

বানান নিয়ে ভাবনা তখন রবীন্দ্রনাথকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। একই বানানের নানা রূপ তেত্রিশ কোটি দেবতার মতো বাংলা সাহিত্যে শোভা পাক রবীন্দ্রনাথ তা

বিদ্যাসাগর – বঙ্কিমচন্দ্র

১৮৫৮ খৃস্টাব্দের বি. এ. পরীক্ষার বাংলো দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র যার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক বিদ্যাসাগর, পরীক্ষার্থী বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয় পত্র ভাষান্তরণ :

Tuesday. April 6th Afternoon 2 to 5½ Bengali Examiner,—Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar,

Translate the following passage into English:

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দুল, এই করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও নদনদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে, যে অল্প প্রমাণ জল থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্রসকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রতিদিন অনি সময়েই আহার করিতে হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ, তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপে পাক করা হয় না। আর প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রি শেষে নিদ্রার আবেশ হয় ; কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা নাম্নী এক তাপস কন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, একবারও চক্ষু মুদি নাই।

Translate the following passage into Bengali—

"Having resided at Agra till there was no more to be learned. I travelled into Persia where I saw many remains of ancient magnificence and observed many new accommodations of life. The Persians are a nation eminently social, and their assemblies afforded me daily opportunities of remarking characters and manners, and of tracing human nature through all its variations. From Persia, I travelled through Syria and for three years resided in Palestine, where I conversed with great numbers of Northern and Western nations of Europe; the nations which are now in possession of all power and all knowledge, whose armies are irresistible and whose fleets command the remotest part of the globe. When I compared these men with the nations of our own kingdom, and those that surround us, they appeared almost another order of beings. In their countries it is difficult to wish for anything that may not be obtained; a thousand arts, of which we never heard, are continually labouring for their convenience and pleasure, and whatever own climate has denied them, is their supplied by their commerce."

একেবারেই পছন্দ করতেন না। নিজের লেখায় বানান-সমতা রাখতে ইতিমধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সহায়তায় তিনি একটি খসড়া বানিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদকেও তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন। ফলে ১৯৩৫-এর নভেম্বরে পরিভাষা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির ন'জন সদস্যের চারজন মনোনীত সদস্য যুক্ত করে গঠিত হল বাংলা বানান সংস্কার সমিতি। সমিতির প্রস্তাব অনুসারে 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশিত হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এতে বাংলা বানান যেমন সরল হল, তেমনি তার অ-সমতাও দূর হল অনেকটা।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় শ্যামাপ্রসাদ এবার হাত দিলেন বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসারের দিকে। এর একটি দিক শিক্ষার নানা বিষয়ে সহজ ভাষায় আকারে ছোট কম দামের বই লেখা। শ্যামাপ্রসাদ এই উদ্দেশ্যে গঠন করলেন বাংলা প্রকাশন সমিতি (১৯৩৮) আর রবীন্দ্রনাথকেই অনুরোধ জানালেন একটি বই লিখে দিতে। রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ উপেক্ষা করেননি। ফলে আমরা পেলাম 'বাংলা ভাষা পরিচয়' বইটি (১৯৩৮)। প্রকাশন সমিতি অবশ্য পরবর্তীকালে এই উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। মূলত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রকাশের দিকেই নজর দিল। বাঙালি তাতে হয়তো খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। শুধু 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বিশ্বভারতীর কর্তব্যে পরিণত হল।

বাংলায় এম এ পড়ানো শুরু হতে বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। শুধু শিক্ষকতা নয়, বাংলা সাহিত্যের নানা দিকের পরিচয় তিনি উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর দুটি স্মরণীয় কৃতিত্ব মধ্যযুগের বাংলা পুথি সংগ্রহ এবং লোকসাহিত্য সংগ্রহ। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস বাংলা পুথিতে দেবদেবী কাহিনীর মধ্যেই লুকোনো। বাংলা পুথির সাহায্য না নিলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দীনেশচন্দ্র সেন আশুতোষের আনুকূল্যে পুথি সংগ্রহে মন দিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গড়ে উঠল একটি বিশাল পুথিশালা। এইসঙ্গে গ্রাম্য লোকগীতি সংগ্রহেও তিনি উদ্যোগী হলেন। তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে গোপীচন্দ্রের গান ও মৈমনসিংহ গীতিকার মতো অপূর্ব লোকসাহিত্যের সন্ধান ও সংগ্রহ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রধানত বৈষ্ণব পদ সংগ্রহ ও সংকলনেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সময়ে রবীন্দ্রনাথ দু'বছরের জন্যে বাংলা বিভাগের বিশেষ অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন (১৯৩২-৩৪)। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ক্লাস নেননি ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে যে কটি ক্লাস তিনি নিয়েছিলেন তাতে ছাত্ররা যতটা উপকৃত হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব যে অনেক বেড়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়ে বিভাগের পঠন পাঠনের উন্নতির ওপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত যেমন সেদিকটা উপেক্ষা করেননি তেমনি প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহেও মনোযোগী হয়েছিলেন। বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বীদের অনেক অনাবিষ্কৃত পদ তিনি সংগ্রহ করে গেছেন।

লোকসাহিত্য সংগ্রহে দীনেশচন্দ্র সেনের পরেই বাংলা দেশে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, সেই আশুতোষ ভট্টাচার্যও দীর্ঘ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কিছুকাল বিভাগীয় প্রধানও ছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগীয় প্রধান হয়ে বাংলা ভাষার আর একটি উপেক্ষিত দিকের প্রতি নজর দিলেন। ইতিমধ্যে মূলত শহীদুল্লার চেষ্টায় পূর্ববাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয়ে অভিধান রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পশ্চিমবাংলার আঞ্চলিক ভাষা সংগ্রহে কিছু বিক্ষিপ্ত চেষ্টা থাকলেও একটা পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা তখনও সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেকাজে মন দিলেন। অভিধান হয়ে এই সংগ্রহ আজও প্রকাশ লাভ করেনি বটে কিন্তু পশ্চিমবাংলার সব অঞ্চলের মৌখিক ভাষার শব্দ সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে কিছুকাল আগে।

বাংলা সাহিত্য আজও কবিদের সাম্রাজ্য। তবু বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা তার কৈশোরও পার হতে পারেনি। এমনকি ছন্দের নাম নিয়ে ছান্দসিকেরা যে সমস্যা তুলেছেন তাতে ছন্দপতন বারেবারে ঘটেছে বটে কিন্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দ-আলোচকদের প্রধান ব্যক্তিদের ছন্দসম্পর্কে নানা মন্তব্য গবেষকদের সাহায্যে সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তী ছন্দ-গবেষণার কাজে তা মূল্যবান তথ্য হয়ে উঠবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বানান সংস্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে। তার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে চাইলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও দু-বছর। কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নতুন করে বানান সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন। এটা উচিত কি অনুচিত একমাত্র অনাগত কালই তা বিচার করতে পারে।

পুরনো কলকাতা, তার বিশ্ববিদ্যালয়টাও পুরনো। জীর্ণ কলকাতা। দেনা এসে বাংলা শিক্ষার প্রসারকেও যাতে সঙ্কুচিত করে দিতে না পারে সেইজন্যে কোলে করে বসে আছে তিন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। জ্যেষ্ঠের সম্মান আজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়ে চলেছে, সে সম্মান পাওয়ার যোগ্যতাও সে প্রমাণ করেছে বারে বারে। তবু বোধহয় এখনও অনেক কাজ বাকি। তার দায়িত্ব নেবার ঝুঁকি এড়িয়ে গেলে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। □

অপরিচিত তারাশংকর

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঁচাশিতম জন্মদিন উপলক্ষে

তারাশংকরের ঘনিষ্ঠ মানুষদের অন্যতম হয়ে তাঁকে খুব কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি অনেকদিন। ঘরোয়া পরিবেশে মানুষটার একেবারে অন্য রূপ ফুটে উঠত। তিনি সংসারের মানুষদের ওপর অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ ছিলেন এবং তাঁদের অসুখ বিসুখে খুব বিচলিত হয়ে পড়তেন। তিনি পণপ্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে প্রয়াত সনৎকুমারের বিয়ের কথা হয় শিলিগুড়ির লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী স্বর্গত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের পৌত্রী গৌরী দেবীর সংগে। এই প্রসংগে তারাশংকর সুরেন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন :

১/১এ আনন্দ চ্যাটারজি লেন
বাগবাজার
১৪ ২. ৪৪

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার নিজ বাড়ীর অবস্থায় আমার পূর্ব্বপুরুষেরা জমিদার ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি যাহা পাইয়াছি, তাহার বার্ষিক মুনাফা—আমার অংশ—আন্দাজ ১০০০/১২০০ টাকা। চাষের জমি আমার অংশ ৭৫/৮০ বিঘা। বাগান পুকুর যাহা আছে, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন যে কেবল পল্লীর ভোগের সামগ্রী। কোন আর্থিক আয় তাহা হইতে হয় না। বর্তমানে জমিদারীর অবস্থাও জানেন।

আমার কর্ম্মজীবনে আমি সাহিত্যিক। কলিকাতায় আমার বসবাস উহারই উপর নির্ভর করিয়া। প্রসঙ্গ ক্রমে আপনাদের জানাইযাছি, আমি এখানেও অনেকবারই অর্থকরী সাহিত্য কর্ম্মের সুযোগ ও আহ্বান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি।

বর্তমানে আমার আয় ৩০০/৪০০ টাকা মাসিক। ইহার অধিক নয়। তবে ইহার একটা স্থায়িত্ব আছে বলিয়া আমি মনে করি। কারণ আমার বইগুলির সংস্করণ দ্রুত হইতেছে এবং সেগুলি মরসুমী ফুল বা ফসলের পর্যায় অতিক্রম করিয়া ফলবান বৃক্ষের রূপ নিয়াছে বলিয়া আমার এবং আরও বিশিষ্ট সমালোচকদের ধারণা। কথাগুলি আমার পক্ষে লেখা উচিত নয়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে না লিখিয়া উপায় নাই বলিয়া লিখিতেছি।

আমার এখানকার সংসার যাত্রার মান- অর্থাৎ Standard সাধারণ। বাড়ীতে পাচিকা একটি ঝি - একটি চাকর আছে। বরানগরে Corporation এলাকায় বাড়ীর কথা জানেন। অনেক কর্ম্মই আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রী করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ আজকালকার তথা কথিত অভিজাত সুলভ চালচলন (আপনি অনুমোদন করেন না বলিয়াই আমার ধারণা) আমার সংসারে নাই। তবে মেয়েদের স্বাধীনতা যথাসম্ভব আছে। সেটা নির্ভর করে মেয়েদের নিজের উপর, যাহার যতটুকু সত্যকার শক্তি ও অধিকার- তাহা খর্ব্ব করার প্রয়াস আমার নাই।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আর কিছু আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। মোটামুটি সবই জানাইয়াছি। আপনি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আবার একবার দেখিবেন। পাত্র সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিলাম না। তাহাকে আপনি দেখিয়াছেন, আমিও পূর্ব্বে সব জানাইয়াছি। সমস্ত বিবেচনা করিয়া যাহা আপনার উচিত মনে হইবে, করিবেন। কোন খুঁত কোন দ্বিধা রাখিয়া এ কাজ করিবেন না। মা লক্ষ্মীও নিতান্ত বালিকা নহেন। তাঁহার মতও লইবেন। বাড়ীর কর্ত্রীদের মত লইবেন।

আর একটা কথায় আমাকে আপনার নিকট অপ্রস্তুত হইতে হইতেছে। তাহার ভূমিকায় সমস্ত কথা আপনার নিকট জানাইতেছি। যাহাতে উপরের কথাও আপনার নিকট আরও পরিষ্কার হইবে। সে কথাটা আমার বর্তমান সঞ্চয় সম্পর্কে। আমার জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপার্জ্জনের এই আরম্ভ। এই সময়েই আমাকে বহু ব্যয় করিতে হইতেছে ও হইয়াছে। কলিকাতায় বাড়ী কন্যার বিবাহ, ছেলে দুইটির শিক্ষা ইত্যাদিতে আমার সঞ্চয় কিছুই নাই বলিলে হয়। তবে আমার ঋণ কপর্দ্দকও নাই।

আমার পুত্রের বিবাহ সম্পর্কে আমার কল্পনার কথা আপনাদের কাছে বার বার বলিয়াছি। পণ সম্পর্কে আমার নিজের বিতৃষ্ণা অকপট।

ইতি
বিনীত
তারাশংকর

তারাশংকর তখন বরানগরে একটি বাড়ি কিনিয়াছিলেন। তারাশংকরের এই চিঠি থেকে পরিষ্কার কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমে তিনি সাহিত্যিক-একমাত্র সাহিত্যিক হিসেবেই সংসার প্রতিপালন করার দৃঢ়সংকল্প নিয়েছিলেন। সাহিত্যের আয় এবং জমিদারির নামমাত্র আয় ছাড়া তাঁর আর কোন আয়ের পথ ছিল না। তিনিও সেসব পথে আয় করার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। যে চাকরি তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন, সেই চাকরি গ্রহণ করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বোমবাই যান। পরে তিনি পুনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

দ্বিতীয় : তারাশংকর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়-চেতা ছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে। কালজয়ী কিনা সেকথা ভাবীকালের

পাঠকপাঠিকা বলবেন, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ আজও তাঁর বইয়ের বিক্রি বিপুল এবং ক্রমশ বেড়েই চলেছে বলে প্রকাশকদের অভিমত।

তৃতীয় : তিনি তখন ধনী ছিলেন না। উচ্চবিত্ত বলাও হয়ত ঠিক হবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন আর সেইজন্যেই সাহিত্য সাধনায় কোনরকম ভেজাল হয়নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রোত্তর যুগে তারাশঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন, এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীবদ্দশায় এত সম্মান আর কেউ পাননি।

দিল্লি থেকে একটা চিঠি লিখেছেন তারাশঙ্কর তাঁর বড় ছেলে সনৎকুমারকে। দিল্লিতে তখন তিনি রাজ্যসভার সদস্য। দিল্লিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, কলকাতায় আসাও তাঁর দরকার। চিঠিখানিব ভেতরে সেই আকুলি-বিকুলি নজরে পড়ে।

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি --পার্বতীর (ছোট ভাই) সংগে টেলিফোনে কথার কথাও শুনেছি। তোমাদেব কুশল নিয়ে নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্বনাথের জন্য চিন্তিত রয়েছি। সে বেরুচ্ছে কি না? এবং আমিই বা এখানে কতদিন বসে থাকতে পারি? এ সময়ে একটা কর্তব্যও আছে। কালই আমাকে একটা ফোন কর। কি ভাবে যেতে পারি–তার নির্দেশ নিয়ে যাত্রা করব। আমি ভাল আছি। আশীর্বাদ নাও।

১৪/১/৬৪ ইতি

সনৎ আঃ

টালা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগান্তরে ফোন করে জানিয়ো যে এই অবস্থার মধ্যে গ্রামের চিঠি কাল বুধবার পোস্ট করলেও হয়তো পৌছয়–তবে তার ব্যবস্থা যেন করেন। মনিকে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিয়ো। বাবা

আমার সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি ছিল, কারণ আমি ডাক্তার এবং তাঁর অসুখে বিসুখে তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর নিশ্বাস করতেন। মৃত্যুর দশদিন আগে যে অসুখ করেছিল, তা অতি সামান্য, এবং আমি যে স্পেশালিসটকে ডেকেছিলাম প্রথম দিন ঠিক ওষুধ দিলেন, পরের দিনই ওষুধ বদলে ভুল ওষুধ দিলেন। অনেক করে বললাম, কিন্তু তিনি শুনলেন। তৃতীয় দিনে ইনজেকশন ব্রেনে চলে গেল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তারপরের খবর সকলেই জানেন। পঞ্চম দিনে স্পেশালিসট বললেন, তাঁর ভুল হয়েছে, কিন্তু তখন তারাশংকর নিয়তির নির্দেশে এ জগৎ থেকে বিদায় নেবার সংকেত পেয়েছেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না।

প্রত্যেকটি চিঠি পড়তেন, উত্তর দিতেন। কাজের হোক, অকাজের হোক উত্তর দিতেন। কেউ পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেলে পড়ে দেখতেন, ভাল লাগলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন। অবধূতকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসেন, পূর্ণদাস বাউলকে তিনিই রেডিওর সংগে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এখনকার অনেক তাবড় তাবড় লোক কিন্তু তারাশংকরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করেছেন। তিনি সাহিত্য অকাদেমির অন্যতম সদস্য ছিলেন, তাই অনেকেই আসতেন তাঁর কাছে, সাহিত্য অকাদেমিতে তাঁর বই যাতে অনুমোদন করেন। এই জায়গায় তিনি ছিলেন কষ্টি পাথর। যাচাই না করে কোন বই অনুমোদন করতেন না, সাহিত্যিকের সংগে যতই বন্ধুত্ব থাকনা কেন

অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকেও চিঠি লিখতেন। কোন একজন শ্রীমতী কেয়াকে তিনি একটি চিঠি লেখেন। শ্রীমতী কেয়া কে, তাঁর ঠিকানাই বা কী বলা মুশকিল। চিঠিটির মধ্যে একটা আশ্চর্য মাধুর্য আছে। চিঠিটি তাঁর জীবনের শেষ দিকে লেখা চিঠিখানি দিয়েই শেষ করছি এই নিবন্ধ।

কল্যাণীয়াসু,

শ্রীমতী কেয়া, তোমাকে অনেক আশীর্বাদ জানাচ্ছি ভাই এবং তোমার সব দাবিই আমি প্রসন্ন মনে মেনে নিচ্ছি। তোমার জোর আছে। সত্যিকারের জোর না থাকলে একেবারে তুমি বলতে নিশ্চয় পারতে না।

তোমাকে খুব ভাল লাগছে নাতনি। আমরা সাহিত্যিকরা কত মধুর, কত সুন্দর তা তোমরা বলতে পারো কিন্তু আমার মত বৃদ্ধ সাহিত্যিক জানে এবং বলবে যে নাতনিরাই বেশি মধুর এবং অনেক বেশি সুন্দর।

তোমার রং কেমন তা জানি না - তবে তা কালো হলেও ভাল – আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। তোমার চোখ কেমন তা দেখিনি - তবে তা নিশ্চয় স্নিগ্ধ এবং ডাগর। দেখ, এমনি করে তোমার চুল সম্পর্কেও বলতে পারি – যে চুল মেঘের মত ঘন এবং কালো ও পুঞ্জিত এবং কুঞ্চিত। তোমার রূপের কথা এখানেই থাক। সম্ভবতঃ তাতে তুমি শ্যামপু করে থাক। তোমাকে আমার ভাল লাগছে এবং নাতনি বলেই মেনে নিয়েছি। তোমার কবিতা আমার ভাল লেগেছে। তুমি আমাকে তুমি বলেছ বলে একটুকুও রাগ করিনি। রাগ দূরের কথা, ডাকটি মিষ্টি লেগেছে। আমার বাড়িতে আমার ছ জন নাতনি আছে, তারাও আমাকে তুমি বলে। আমার আশীর্বাদ নাও। আজ চিঠি শেষ করলাম। শরীর আমার ভাল নেই। দশদিন পর সবে কাল বাড়ি ফিরেছি। তোমাদের মংগল হোক।

ইতি, শুভার্থী

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ ৩ ৬৯

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

নবম দশম

১৬ জুলাই সংখ্যার আকর্ষণ

যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে আর রূপকথায় 'ডলফিন' মানুষের পরম বন্ধু হয়ে বেঁচে আছে। কখনও সে ডুবন্ত নাবিককে বাঁচাচ্ছে হাঙরের হাত থেকে ; কখনও বা পথহারা জাহাজকে পথ দেখিয়ে বিপদ-সীমা পার করে দিচ্ছে। মানুষের সঙ্গে যেন তার পরম বন্ধুত্ব। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ডলফিন জলের প্রাণী হলেও আসলে সে ছিল ডাঙার প্রাণী। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ নিয়ে চলছে নানা গবেষণা। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, এদের নিশ্চয়ই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, সমাজ আছে, আর আছে মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ।

এই অদ্ভুত প্রাণী নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী : ডলফিন

বিদ্যালয় পরিচিতি : নয়া দিল্লির বাঙালীদের গর্ব রাইসিনা বিদ্যালয়। এছাড়া বিজ্ঞান প্রসঙ্গ, বিদ্যালয় সংবাদ, কথা আর প্রতিকথা প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ।

ছুটির পড়ায় পুজোর আমেজ নিয়ে আসছে শারদীয় নবম দশম

পড়াশোনার খোশ খবরের সঙ্গে থাকছে উপন্যাস, গল্প, ছড়া আর প্রবন্ধ। কিশোরদের প্রিয় লেখক-লেখিকাদের লেখা নিয়ে শারদীয় নবম দশম হবে এসময়ের সেরা কিশোর সাহিত্য সম্ভার।

ইত্যাদি [illegible] লিমিটেড।
কলকাতা ৭০০০৭২

এখানে ওখানে

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন নিশ্চিহ্নের পথে

পৃথ্বীজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন থেকে নেমে শহরের দিকে আসবার পথে স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের ডানধারে কতকগুলো বড় বড় সাইন বোরড নজরে পড়ে। এইসব সাইন বোরডের নিচে ঢালু জমি, সেখানে সারসার দোকানপাট। রাস্তার বাঁ ধারে কিন্তু কোন দোকানপাট নেই, শুধু চায়ের কয়েকটি ঝুপড়ি দোকান ছাড়া। ডানধারের দোকানগুলোর দিকে একটু নজর করলেই বেমানান একটি ঘর নজরে পড়ে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা রঙচটা ছোট্ট ঘরটির উপরে লেখা 'দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি ভবন।' যারা এক কালের অভিজাত ঐতিহাসিক কৃষ্ণনগরে বেড়াতে আসেন তাদের কাছে এই ছোট ঘরটি কৃষ্ণনগরের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। কারণ, এই ছোট ঘরটি জাতীয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভিটের ওপর অবস্থিত। সমস্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হলেও আজও কবির জন্মভিটের মাটি কৃষ্ণনগরের মাটিতে মিশে রয়েছে।

১৮৬৩ সালের ২০ জুলাই কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সামান্য পঞ্চাশ বছরেই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ইতি ঘটলেও তার অতুলনীয় দেশ প্রেম আর তুলনাহীন ব্যাংগকৌতুকে তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই করেননি, তার লেখনী দিয়ে তিনি এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও দেশপ্রেমের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মত একজন জাতীয় কবি ও নাট্যকারের জন্মভূমি হিসাবে ধন্য কৃষ্ণনগর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি রূপে কৃষ্ণনগর চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি হিসাবে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখবার প্রয়াসেও কৃষ্ণনগর পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় কবি ও নাট্যকারকে ৩৬৪ দিন ভুলে থেকে বছরের মাত্র একটি দিনে দায়সারা ভাবে স্মরণ করাই আজ তার জন্মভূমি কৃষ্ণনগরের রেওয়াজ। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্যি কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রসংগীত শেখার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও দ্বিজেন্দ্রসংগীত শেখার কোন বিদ্যালয় আজও প্রতিষ্ঠা হয়নি। সারাজীবন ধরে দ্বিজেন্দ্রলাল যেসব গান, কবিতা ও নাটক রচনা করেছিলেন তার কোন পাণ্ডুলিপি দূরের কথা, ওই সমস্ত বইয়ের কোন প্রথম সংস্করণও আজ কৃষ্ণনগরের কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। যদিও বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহে রয়েছে বহুমূল্যবান গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাক্ষরিত কিছু বই রয়েছে বটে কিন্তু দীর্ঘদিন অব্যবহারের জন্য সেগুলিও বিনষ্ট হতে বসেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল মারা যাবার প্রায় পঁচিশ বছর পর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 'দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি।' মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের পৈত্রিক বাড়িটা তার বিভিন্ন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়ের প্রাপ্য পৈত্রিক বাড়ির অংশটুকু বেদখল হয়ে যায়। দিলীপ কুমার রায় তখন সাধন পূজন নিয়েই ব্যস্ত, বিষয় সম্পত্তিতে তার মনোযোগ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের পন্ডিচেরী আশ্রমেই দিলীপকুমার নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। পরে যখন দিলীপকুমার পন্ডিচেরী আশ্রম ত্যাগ করেন, তখন তিনি নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়ে একরকম বাধ্য হয়েই তার পৈত্রিক ভিটে বাড়ির অংশটুকু বিক্রি করে দেন। দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষার নাম করেই সে সময় বাড়িটি কেনা হয়েছিল তার কাছ থেকে, কারণ অর্থকষ্টে না পড়লে ওই বাড়ি তিনি বিক্রি করতেন না বলেই মনে হয়। আশ্চর্যের কথা, দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষার নাম করে কেনা হলেও বাড়ি কেনাকেনার মধ্যে 'দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি' কিন্তু ছিলেন না। এমনকি দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষায় এহেন মূল্যবান বাড়িটির হস্তান্তরিত হয়ে যাবার সংবাদটুকু পর্যন্ত সমিতির কারুর কর্ণগোচর হয়নি। এই বাড়ি বিক্রি হবার কিছুদিন আগেই কিন্তু স্মৃতি রক্ষা সমিতি এই বাড়িরই অদূরে কাঠাদুয়েক জমি কিনে প্রতিষ্ঠা করেন 'দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি স্তম্ভ'। ওই সময় যদি স্মৃতি রক্ষা সমিতি দ্বিজেন্দ্র লালের স্মৃতিযুক্ত পৈত্রিক বাড়িটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন তবে হয়তো আজ জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিচিহ্ন গুলো বিনষ্ট হত না। আসলে শুধুমাত্র আর্থিক দুরবস্থা নয়, উদ্যোগহীনতাও রয়েছে দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দীর্ঘ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে দু'কাঠা জমিকে বাড়িয়ে দশ কাঠা করে তার ওপর একটি ছোট ঘর নির্মাণ ছাড়া স্মৃতি রক্ষা সমিতি আর কোন দিকেই বিশেষ নজর দিতে পারেননি। স্থানীয় দ্বিজেন্দ্র মণি মেলা এবং কয়েকজন শিক্ষিত উৎসাহী তরুণ এই ঘরটায় প্রতিষ্ঠা করেছেন 'দ্বিজেন্দ্র পাঠাগার।' পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রমেন রায় জানালেন, পাঠাগারের সমস্যার কথা। পাঠাগারে বর্তমান বইসংখ্যা মাত্র হাজার খানেক, বেশির ভাগই সাধারণ মানুষের দানের পয়সায় কেনা। কোনরকম সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকেই কয়েকজন উৎসাহী তরুণের আন্তরিক প্রয়াসে সেই পাঠাগারটি এগিয়ে চলেছে। □

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল – ৫৭

১		২		■	৩	৪	■
	■		■	৫	■	৬	৭
■	৮		■	৯	১০	■	
১১		■	১২				
১৩		১৪		■		■	
	■		■	১৫			■
১৬	১৭			■		■	১৮
■	১৯		■	২০			

সূত্র : পাশাপাশি

১। ঘরের মধ্যে গোয়েন্দা।
৩। নায়েসের কাছ থেকে লোকে যা চায়
৬। গরুর খাদ্য
৮। বাড়ি বানাতে দরকার
৯। বিয়ে করলে পাওয়া যায়
১১। কাজের জিনিস নয়
১২। তিল তিল করে রূপ সৃষ্টি হল কার
১৩। একটি ফল এবং তার আকৃতি, দুইয়ে মিলে এলোমেলো কাণ্ড
১৫। দুর্যোধনের খেলোয়াড় মামা।
১৬। নবীন শরীর যার, সে এখানে
১৯। মানুষকে খুঁজুন
২০। শিব-পার্বতী

সূত্র : ওপর নিচ

১। ছোট পাহাড়
২। কেউ কাটে কেউ কাটে না
৪। তেজী কুকুর
৫। নামী চিত্রকর
৭। এখানে হাওয়া পাবেন
৮। ছবি আঁকতে লাগে
১০। প্রয়াত মহানায়ক
১১। জানালা
১২। গাছে ফলে, মানুষের গায়েও হয়
১৪। বলের মত চেহারা
১৭। অনেক গাছপালা যেখানে
১৮। পুরুষ নয়

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১৭ আগস্ট সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ৫.৮.৮৩। সমাধান পত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল - ৫৭' লিখতে ভুলবেন না।

প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন।

শব্দশৃঙ্খল – ৫৩ (সমাধান)

শব্দশৃঙ্খল – ৫৩-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন সৌমেন

ঘ	■	গু	■	ম	স	ন	দ
প	রি	হা	স	■	ক্যা	■	র
দ	ম	■	বা	তা	স	■	জা
■	ঝি	■	ক	লি	কা	তা	■
গ	ম	ম	■	কা	ল	জা	ম
র	■	ধ	রা	■	■	■	ঘ
জ	ঠু	র	■	ফু	■	কা	রা
■	শ	■	ক	ম	রো	ন	■

সিংহরায় (১৩ এন এস সি বোস রোড, কলিকাতা ৪০) এবং শ্রীমতী নমিতা বসু (ক্ষেত্রমোহন বিদ্যামন্দির, রবীন্দ্রনগর, বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৬০)।

৯ জুলাই অনুষ্ঠিত শব্দশৃঙ্খল-৫৩ র লটারিতে বিচারক ছিলেন সৈয়দ আসবার আহমদ।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

[জুলাই ২০ থেকে ২৬]

মেষ : শরীর মোটামুটি চলবে, মেয়েদের পেট সংক্রান্ত ঝামেলা। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ মন্দা, কোন প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। কর্মস্থলে নতুন কোন প্রস্তাব ভেবে-চিন্তে গ্রহণ করতে হবে; মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আগের কোন অশান্তির জের চলবে। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলা।

বৃষ : শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে না। আয় বাড়াবার চেষ্টায় বড় রকমের বাধা। কর্মস্থলে কৌশলে কার্যসিদ্ধি; মেয়েদের বিভিন্ন ব্যাপারে দৃঢ়তার প্রয়োজন হবে। কারও [illegible] পারিবারিক কোন সমস্যার সমাধান। দূরের কোন [illegible] উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের [illegible] পরিবর্তন।

মিথুন : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের বড় রকমের শারীরিক ভোগান্তি। আর্থিক জটিলতা সহজ হলেও চটিতি আয় বাড়বে না। কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কারও আকস্মিক আনুকূল্য লাভ; মেয়েদের প্রশংসা। কোন বন্ধু-[illegible] সহায়তায় গৃহসংক্রান্ত [illegible] সমাধান। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে নতুন অশান্তি। ব্যবসায়ীদের সাফল্য।

কর্কট : শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি, মেয়েদের আগের অসুস্থতার জের চলবে। আয় বাড়তে পারে অল্পসল্প। কর্মস্থলে অক্লেশে গুরুদায়িত্ব সমাপন; মেয়েদের নতুন পরিকল্পনা। কোন সন্তানের জন্য বিশেষ উদ্বেগ। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে অগ্রগতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

সিংহ : শরীর মোটামুটি ভাল চলবে; মেয়েদের শরীরও চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে অভাবিত সাফল্য, সদব্যয়। কর্মস্থলে অন্যের মতামত প্রভাবিত করবে; মেয়েদের মানসিক অশান্তি। পারিবারিক কোন পুরনো সমস্যা ব্যতিব্যস্ত করবে। মেয়েদের নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতামূলক কাজে বড় রকমের সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কন্যা : শারীরিক অবস্থার বেশ উন্নতি; মেয়েদের অজীর্ণ অম্বল বেশ ভোগাবে। আর্থিক সমস্যা নতুন করে দেখা দেবে; বেশ ক্ষতি। কর্মস্থলে কোন সুযোগ-অধিকার হাতছাড়া হবার আশংকা; মেয়েদের অন্যেরা ভুল বুঝবে। কোন কোন ব্যাপারে পারিবারিক শান্তি ফিরে আসবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

তুলা : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর আগের চেয়ে ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা। কর্মক্ষেত্রে বদলির ইংগিত; মেয়েদের নতুন পরিস্থিতির সহজ মোকাবিলা। পারিবারিক ঝামেলায় মানসিক চাপ। বয়স্কদের সহজ ভ্রমণ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃশ্চিক : শরীর নিয়ে ঝামেলা থাকবে; মেয়েদের শরীরও ভোগাবে। আর্থিক জটিলতা বাড়বে; সঞ্চয়ে হাত দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নানান টানাপোড়েনে অশান্তি; মেয়েদের নতুন কোন কৌশল কার্যকর হবে। জমিজমা ক্রয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। মেয়েদের বন্ধু বিচ্ছেদ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

ধনু : বাত-ব্যথায় ভোগান্তি; মেয়েদের ছোটখাট আঘাত। উটকো ব্যয়ের চাপ কমবে; সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনায় মানসিক চাপ; মেয়েদের অতিরিক্ত দায়িত্ব। পারিবারিক কোন ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর পরিকল্পনা কার্যকর হবে। নিকটজনের জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের ঋণ

মকর : ছোটখাট অসুস্থতা এড়িয়ে যাবার নয়; মেয়েদের দাঁত সংক্রান্ত ঝামেলা। পারিবারিক কোন ঋণ পরিশোধ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন যোগাযোগ, বড় রকমের পরিবর্তন; মেয়েদের কোন প্রস্তাব গৃহীত হবে। সম্পত্তির ব্যাপারে স্বজন বিরোধ। কর্মপ্রার্থীদের আকস্মিক যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কুম্ভ : শরীর ভাল চলবে না; মেয়েদের আগের কোন শারীরিক ঝামেলা সামাল দেওয়া যাবে। আর্থিক ব্যাপারে হতাশা, মানসিক চাপ। কর্মস্থলে কারও অযাচিত সাহায্যে সহজ অগ্রগতি; মেয়েদের অন্যেরা ভুল বুঝবে। পারিবারিক কোন ব্যাপারে মতৈক্য। কোন অনুজের দূরযাত্রা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : হঠাৎ অস্ত্রোপচারের আশংকা; মেয়েদের পিঠের কোন ব্যথায় ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি, মতবিরোধ। কর্মস্থলে চাপা মানসিক অশান্তি; মেয়েদের শত্রুরা বিপাকে ফেলবে। কোন সন্তানের সংগে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে।

বিনয় আচার্য

●

[illegible] দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-৩১১১) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : [illegible] Telex 021-7896 IPPL IN.

আলোকচিত্র : এস. রায়

বাংলার
মিষ্টান্ন

চন্দ্রশেখরের
সঙ্গে
পাকশালা

পরিবর্তন

২৫ জুলাই - ১ আগস্ট, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদদ্বয় হারটন ও হানট বলেছেন : গুজব হল দ্রুত প্রচারিত কোন ভিত্তিহীন খবর। যে কোন সমাজেই গুজবের জন্ম হতে পারে তবে গুজব গণসমাজেরই অন্যতম পুলক্ষণ। গত ১৬ জুলাই কৃষ্ণনগর লোকালে চলন্ত অবস্থায় একটি মহিলা কামরা থেকে জনৈক যুবককে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে গুজব রটে। আরও গুজব রটে এর ফলে যুবকটির মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন মহিলা ট্রেন থেকে জোর করে ওই যুবককে ফেলে দিয়ে মৃত্যু ঘটিয়েছে। উত্তেজিত জনতা তখন ট্রেন অবরোধ করে ও ওই দুই মহিলাকে আক্রমণ করতে যায়। পরে যুবকের বিবৃতি অনুসারে জানা যায় ট্রেনে অত্যধিক ভিড় থাকার দরুন যুবকটি পাদানিতে ঝুলছিলেন এবং বরদা ব্রিজের কাছে সিগন্যাল পোস্টের ধাক্কায় তিনি পড়ে যান। এটি নেহাত দুর্ঘটনা এবং ওই দুর্ঘটনার সংগে অভিযুক্ত দুজন মহিলার কোন সম্পর্ক নেই।

গুজব গণসমাজের পুলক্ষণ এবং আমাদের সমাজ সেই অর্থে এখনও গণসমাজে পরিণত হয়নি। কিন্তু বাঙালিদের গুজব-প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ট্রামে, বাসে, রোয়াকে, চায়ের দোকানে এবং এমনকি বিশ্বজ্জনদের বৈঠকখানা থেকে প্রতিনিয়ত এখানে অসংখ্য গুজবের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। আলপোরট ও পোসটমান নামে দুজন সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, আড্ডা, খোশ গল্পে সবজান্তা মনোভাব থেকেই গুজবের জন্ম হয়। এ ছাড়া আর এক ধরনের গুজবের উৎপত্তি হয় ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য থেকে। মানুষ অবচেতন মনে যাকে পছন্দ করে না, তার সম্পর্কে নানা কুৎসামূলক গুজব প্রচার করে থাকে। এ ছাড়া অবচেতন মনে অবদমিত কামনা-বাসনা থেকেও গুজবের জন্ম হয়। সুন্দরী মাত্রই অসতী, ধনী মাত্রেই অসৎ, মন্ত্রী বা পুলিশ মানেই ঘুষখোর, এই ধরনের এক একটি 'স্টিরিও টাইপ' মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। তারপর তাকে বিশ্বাস্য করে তোলবার জন্য সে একটি সুনির্দিষ্ট গল্পের অবতারণা করে থাকে। মানুষ স্বভাবতই গুজব গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে। মানুষের এই গুজব বিশ্বাস প্রবণতার জন্য রাজনৈতিক দল, গোয়েন্দা ও গুপ্তচরেরাও তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন সমাজে নানা গুজব ছড়িয়ে থাকে। গুজব অনেকটা ভাইরাসের মত। গুজবকে প্রশমিত করা যায় কিন্তু একেবারে মুছে ফেলা যায় না। কোন রহস্যময় মৃত্যুকে যদি একবার হত্যা বলে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে শত প্রমাণ দিলেও তা আত্মহত্যা বলে লোকে বিশ্বাস করবে না। কোন সেবামূলক বা ধর্মীয় কাজের পেছনে বিদেশি চক্রের হাত আছে, এমন গুজব রটিয়ে দিতে পারলে লোকের মন থেকে সন্দেহ মুছে ফেলা কঠিন। যা রটে তার কিছুটা বটে, এর মত অসত্য কথা যে আর কিছুই হতে পারে না কৃষ্ণনগর লোকালের ঘটনাটি তার প্রমাণ। প্রসংগত বলা যেতে পারে পরিবর্তনের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কোন কোন মহল সুকৌশলে গুজব ছড়াতে শুরু করেছে ইত্যাদি প্রকাশনী কোন একটি বেসরকারি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানেরই মালিকানাধীন। অথচ এটি যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক লিমিটেড কোমপানি এটি কোন গোপন তথ্য নয়। কিন্তু গুজবের মজা হল, কেউ তা যাচাই করার দরকার মনে করেন না। বরং কোন গুজব শোনার পর সুপ্ত অভিপ্রায় বা গোপন বিদ্বেষ বশত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পল্লবিত করে তা প্রচার করে থাকেন, গুজবের জীবাণু যার মধ্যে একবার ঢোকে, তিনিই অজান্তে তার বাহকে পরিণত হন।

গুজবের ফলে গত ১৬ জুলাই দুই নির্দোষ মহিলার জীবনহানি ঘটতে চলেছিল। কিন্তু প্রতিদিন অসংখ্য লোকের ও প্রতিষ্ঠানের চরিত্রহানি ঘটাচ্ছে গুজবের যে বিধ্বংসী ভাইরাস তা থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০ ০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট-১২১২, নূতন দিল্লি ১১০ ০০১, ফোন : ৩১২০২৪

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদে চম্বলের রঙিন ছবি : সৌগত রায় বর্মন ও
মিষ্টান্নের রঙিন ছবি : নিতাই ঘোষ

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

নিবেদনমিদং

পূজো যত এগিয়ে আসছে আমাদের দফতর তত কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। কারণ পূজো সংখ্যার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আরও দ্রুত কাজ তোলবার জন্য আমাদের কর্মীদের এখন রাতের শিফটেও কাজ করতে হচ্ছে। এবারে আপনাদের কাছে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অনবদ্য পূজো সংখ্যা তুলে দিতে পারব আশা করছি। পূজো সংখ্যার লেখার মাল মশলা সংগ্রহ করতে আমাদের স্টাফ রিপোরটার দিব্যজ্যোতি বসু গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে। গোয়ালিয়র জেলে ফুলন দেবীর সংগে সাক্ষাৎ করেন তিনি। দেখা হয় দস্যু মালখান সিং-এর সংগে। এই দুটি লেখার একটি প্রকাশিত হচ্ছে ৩ আগসট। বাকিটা আগসট মাসেই। কিন্তু তাঁর মূল লেখা প্রকাশিত হবে পূজো সংখ্যায়।

আমাদের সহযোগী খেলার আসর সম্পাদক চিরঞ্জীব গেছেন পূর্ব জারমানিতে। দেখি পূজো সংখ্যার জন্য তিনি কী উপহার আনেন সেখান থেকে। পরিবর্তনের সম্পাদক অবশেষে বাংলাদেশের ভিসা পেয়েছেন। ৪ আগসট তাঁর যাত্রার দিন। ঢাকা থেকে' শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিং যাবার ইচ্ছা তাঁর। মনে হচ্ছে পূজো সংখ্যায় কিছু চিত্তাকর্ষক লেখা দেওয়া যাবে। কারণ বাংলাদেশের ওপর পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ অফুরন্ত। বাংলাদেশের কেউ পরিবর্তন সম্পাদকের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন ভারতীয় দূতাবাস মারফৎ। পরিবর্তনের পূজো সংখ্যার বার আনা লেখা এসে গেছে। দুটি গল্প লিখছেন দুজন বেসট সেলার। উপন্যাস লিখছেন এক শক্তিশালী লেখিকা। সেই সংগে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কতকগুলি রচনা যার শিরোনাম শুনলেই পড়তে ইচ্ছে করবে। কিন্তু আর কিছুদিন পর থেকেই আমরা সেগুলোর নাম প্রকাশ করে পাঠকদের কৌতূহল মেটাব।

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা নিশীথ দে এখন চরকির মত সারা পশ্চিমবংগ ঘুরছেন। সম্ভবত তিনিই এখন একমাত্র রাজনৈতিক সংবাদদাতা যিনি ঘুরে এসে লেখেন। তাঁর তথ্যের ঝুলি সবসময় তাই এত ভরতি থাকে। তত্ত্ব দিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হয় না। একজন পাঠক নিশীথবাবুর বাঁকুড়ার উপর লেখা পড়ে অভিযোগ করেছেন নিশীথবাবু নাকি কংগ্রেস (ই)-এর হয়ে ওকালতি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে অনুরোধ, তিনি নিশীথবাবুর ১৩ জুলাই সংখ্যার লেখা দয়া করে পড়ুন। পড়ে মন্তব্য করবেন। একজন পাঠক পরিবর্তন সম্পাদককে অভিযুক্ত করেছেন সি পি আই (এম)-এর স্তাবক বলে।

৩ আগসট থেকে পরিবর্তন নিয়মিত ৫৬ পাতা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের পরিকল্পনা মত আমরা বহু তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা ও প্রতিবেদন এখন থেকে পরিবর্তনে দিতে পারব। পাঠকদের অনুরোধে ৩ আগসট থেকে পরিবর্তনে মাসে দুবার করে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি ফিচার যোগ করা হচ্ছে। এ ছাড়া চিকিৎসা কলমটিও নিয়মিত করা হচ্ছে।

চিকিৎসা বিষয়ক ফিচারে প্রতি মাসে দুটি সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে হোমিওপ্যাথির জন্য। লিখবেন ভারতবিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ও হোমিওপ্যাথি দুনিয়ার কিংবদন্তি ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী। অ্যালোপ্যাথি পর্যায়ে লিখবেন কলকাতার প্রথিতযশা অ্যালোপ্যাথি বিশেষজ্ঞরা।

শব্দশৃংখল সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণা পরপর তিনবার যদি কেউ শব্দশৃংখল প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পান তা হলে তাঁকে দেওয়া হবে ৫০০ টাকা নগদ বিশেষ পুরস্কার।

শব্দশৃংখল পুরস্কারের জন্য বিজয়ীদের নির্ধারিত করা হয়ে থাকে লটারির মাধ্যমে। প্রতি শনিবার এই লটারি হয়। পাঠকরা যে কেউ লটারিতে উপস্থিত থাকতে পারেন।

পরিবর্তনের পাঠক পাঠিকারা যাঁরা পরিবর্তনের মাধ্যমে পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী তাঁরা নাম ঠিকানা দিয়ে লিখুন। আমরা সে সব নাম ঠিকানা নিয়মিত ছাপব। আমাদের যে সব অসংখ্য পাঠক দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন পরিবর্তন হোক তাঁদের পারস্পরিক মৈত্রীর সেতুবন্ধ। খামের উপর বড় বড় করে লিখবেন : 'পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ।'

পরিবর্তনের কোন পাঠক-পাঠিকা যদি পশ্চিমবংগের বাইরে কোন বাঙালির কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সন্ধান পান তা হলে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমীপেষু কলমে দুচার কথা লিখে পাঠান। লোকচক্ষুর অন্তরালে অসংখ্য বাঙালি আজ নিজগুণে কৃতিত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন। তাঁদের কথা আমরা কেউ জানি না। আপনি তাঁদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে এক মহান দায়িত্ব পালন করুন।

পা.চ.

'[illegible] খোরাক হতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি'

[illegible] উড়ালপুল [illegible] সেটা [illegible]

[illegible] আমরা [illegible]

[illegible] এত [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] উপকার [illegible] কি না।

এটা [illegible] আমাদের প্রচার [illegible] ধনী [illegible] শ্রীলাহিড়ীর [illegible] এবং [illegible] উড়ালপুলের [illegible] করে সেগুলির [illegible] সেখানে [illegible] দিয়ে যাত্রীদের জন্য অর্থাৎ পদযাত্রীদের [illegible] ক্যাপিটালিস্টরা ব্যবহার করেন কি না [illegible] দোকানের নাম করেছেন সেগুলি [illegible] সেগুলিতে বা ঐ অঞ্চলের ব্যবসাদারদের [illegible] অবান্তর। উড়ালপুল বানিয়ে আমরা [illegible] শিয়ালদা অঞ্চলে একটা দোকান ঘরের [illegible]

শ্রীলাহিড়ী শিয়ালদার ১০ লক্ষ নিত্যযাত্রীদের [illegible] হলে তিনি পদযাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা [illegible] পারবেন। জগৎ সিনেমা থেকে বেলেঘাটা রোড [illegible] ঢুকতে ট্যাকসি ভাড়া অতিরিক্ত তিনটাকা দিতে হয় কিনা জানি না, তবে জ্যামে আটকে থাকলে ট্যাকসি ভাড়া যে চড়চড় করে [illegible] সেটা অনুমান করতে পারি। কুলি ভাড়ার ব্যাপারটাও আপেক্ষিক, কারণ [illegible] [illegible] আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

[illegible] শ্রীলাহিড়ী উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতার [illegible] চৌরঙ্গী [illegible] অধিবাসী। [illegible] তাঁর বাসস্থান ছেড়ে উত্তর [illegible] পারি না। তবে কাল্পনিক উদাহরণ [illegible] উত্তর কলকাতায় চলে এসেছেন এবং [illegible] বাগবাজার স্ট্রিটটি (অথবা যে রাস্তায় [illegible] শ্রীলাহিড়ী থাকেন সেই রাস্তাটি) [illegible] রাস্তার দু পাশের অধিবাসীরা উত্তর [illegible] এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তাকে [illegible] বাড়ি ঘর ছেড়ে যাবেন কি না, সেটাই [illegible] শ্রীলাহিড়ী কলকাতা গঠনের ইতিহাস নিয়েই উপহাস [illegible] চিত্রশিল্পী নিশ্চয়ই [illegible] দক্ষিণ কলকাতার দিকে তাকালে তাঁর চোখ [illegible] দক্ষিণ কলকাতা উত্তর কলকাতার [illegible] সেখানটা সুদৃশ্য লাগে।

[illegible] উড়ালপুল যে [illegible] সেটা আমরা জানি। এখনও [illegible] স্টেশন চত্বরের পুনর্বিন্যাস, [illegible] হয়নি। সীমিত অর্থের মধ্যে [illegible] এবং কলকাতার বাইরের লোকেদেরও কিছুটা [illegible] কি না সেটাই বিবেচ্য। [illegible] আমাদের [illegible] সমালোচনায় উপকার হয়। যেমন শ্রীলাহিড়ীর লেখা [illegible] আমরা কত [illegible] ব্যক্তিগতভাবে আমি উপকৃত, কারণ ব্যঙ্গচিত্র [illegible] আমি সেই শিক্ষা পেলাম।

সমর বসু
জনসংযোগ অধিকর্তা, সি এম ডি এ।

দক্ষিণ কলকাতার প্রাধান্য

পরিবর্তনে ২৫ মে '৮৩ সংখ্যায় চণ্ডী লাহিড়ী 'সি এম ডি এ র প্রচার সচিব সমীপেষু' লেখাটিতে সি এম ডি এ র কাজের সিংহভাগ হয় দক্ষিণ কলকাতায়, আর উত্তর কলকাতা উপেক্ষিত এই বক্তব্যের সংগে আমি সম্পূর্ণ একমত। পরিবর্তনের ঐ সংখ্যাতেই 'প্রবীণদের চোখে কলকাতার সেকাল' এই শিরোনামায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্মৃতিচারণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে লেখাগুলিতেও দক্ষিণ কলকাতাই প্রাধান্য পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি লেখকগণের নাম এবং লেখকস্থগুলির উল্লেখ করলাম। বিবশ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় - দক্ষিণ কলকাতা, প্রেমেন্দ্র মিত্র দক্ষিণ কলকাতা, প্রতুল গুপ্ত - দক্ষিণ কলকাতা, লীলা মজুমদার - মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতা এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য - মধ্য কলকাতা।

সমীরণ চন্দ্র
কলকাতা ৭৯

হায় উত্তর কলকাতা!

চণ্ডী লাহিড়ী মহাশয়কে ধন্যবাদ তিনি তাঁর 'উড়ালপুল' শীর্ষক চিঠির মারফৎ সি এম ডি এ কর্তৃক উত্তর কলকাতার প্রতি চরম উপেক্ষার ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রশান্ত শূরের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

সি এম ডি এ সৃষ্টি হওয়ার শুরু থেকেই তাদের বিশাল কর্ম প্রবাহ দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত - যা কিছু উন্নতি পরিকল্পনা, ভাবনা চিন্তা ইত্যাদি সবই দক্ষিণ কলকাতার উন্নতি বিধানের জন্য। তা সে রাস্তা নির্মাণের জন্যই হক, বস্তি উন্নয়ন অথবা নতুন কর্ম সংস্থানের জন্য হক। আজ যদি সি এম ডি এ কে খরচের তালিকা প্রকাশ করতে বলা হয় তা হলে দেখা যাবে খরচের সিংহভাগই দক্ষিণ কলকাতার ভাগে। তা ছাড়া যে সব নতুন পরিকল্পনা প্রকাশ করা হচ্ছে তা সবই দক্ষিণ কলকাতার উন্নতি সম্বন্ধে। উত্তর কলকাতার অবস্থা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু, মৃত্যুপথযাত্রীর মত দশায় এনে দাঁড় করান হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, উত্তর কলকাতার পরিশ্রুত জলের যোগানকে ধীরে ধীরে নানান যান্ত্রিক কৌশলের মারফৎ দক্ষিণ দিকে প্রসারের চেষ্টা চলছে। ফলে উত্তর কলকাতার অধিবাসীবৃন্দ ক্রমশ জল কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।

অরুণ কুমার সেন
কলকাতা ৬

গণতন্ত্র এবং জনগণ

ডঃ নিমাইসাধন বসুর সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী প্রবন্ধের জন্য ('ভারতীয় গণতন্ত্র ও মূর্খ কালিদাস' পরিবর্তন - ২৬ ১ ৮৩) তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এটা খুবই সত্যকথা যে আপামর মানুষের অসচেতন সামাজিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ এত বছর পরেও আমাদের লালিত গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানছে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও আমাদের গণতন্ত্র মাতৃক্রোড়ে এবং স্তনদুগ্ধ পানরত। স্তনদুগ্ধ শেষ, তাই শিশুর চরম অপুষ্টি। হয়ত তার শেষ দিন আগত প্রায়।

পুরুষানুক্রমে যদি একই পরিবারের লোকেরা দেশের হাল ধরে এবং দেশের ভাগ্যবিধাতা হয়, আইনের ছকে ঠিক হলেও, তাকে কি যথার্থভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যায়।

শ্রীমতী গান্ধীর পরাজয়ের ঘটনা সবারই জানা। ঐ সময় গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে বলেছিলেন 'আবার যদি কখনও ক্ষমতায় আসি, কদাপি Emergency বলবৎ করব না।' Emergency-তে যাঁর যত অসুবিধাই হয়ে থাক না কেন, আমাদের মধ্যে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। তখনকার এক বছরের মোট খরচ ও তার পরিবর্তে পাওয়া কাজ, বর্তমানের এক বছরের হিসেবের সংগে মিলিয়ে দেখলেই ছবিটা পরিষ্কার ফুটে উঠবে।

আইন করে বলা আছে কোথায় কোথায় এবং কবে কবে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করতে হবে। খবর নিয়ে দেখুন, বেশ কিছু মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা কখনও উত্তোলিত হয় না।

ডঃ বসু লিখেছেন, 'দুর্নীতিকে আমরা জনজীবনের অপরিহার্য অংগ বলে মেনে নিয়েছি। তারই ফলে আমরা প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি অপরিহার্য।'

ডঃ বসুর এই উক্তি ষোল আনা এবং নির্মম সত্য।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্রামপুর কলিয়ারি, মধ্যপ্রদেশ

পাকিস্তানের সমরাস্ত্র

২ মার্চ '৮৩ সংখ্যার 'পরিবর্তনে' প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সংগে ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত সাক্ষাৎকারে' জিয়া সাহেব একটি মন্তব্য করেছেন, 'যদি পাকিস্তান কিছু এফ-১৬ বিমান যোগাড় করে তা হলে তার মানে এই নয় যে পাকিস্তান রাশিয়া বা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। আমরা এমন ক্ষমতা অর্জন করতে চাই যা আমাদের মতে আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে জোরদার করে তুলবে। সম্ভাব্য আক্রমণের ওপর নজর রাখাই সব চেয়ে বড় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আমরা বড় দেশ নই, খুব ধনী দেশ নই, আমাদের সামর্থ অনুযায়ী আমাদের একটা ছোট্ট সুসংহত সেনাবাহিনী থাকলে সারা পাকিস্তানের প্রয়োজন মেটাবে।' এ সম্পর্কে দু একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

জিয়া সাহেব যা বলেছেন মূলত তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগনের "policy of deterrance" এর পুনরুক্তি। মার্কিন প্রশাসন বল ছেন, আমরা যতই নতুন নতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করে arms build-up করব, ততই সোভিয়েতদের ঠেকিয়ে রাখব। অর্থাৎ তারা সোভিয়েতদের চেয়ে সমরাস্ত্রে যতই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে ততই সোভিয়েতদের হুমকি দেখাতে পারবে, "Soviet threat" বুঝতে পারবে। এই "Soviet threat" মার্কিনি অপপ্রচার, কল্পনাপ্রসূত, জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া মাত্র। কারণ প্রয়াত সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ ও তাঁর উত্তরাধিকারী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ওয়াই, ভি, আন্দ্রোপোভ বলেছেন, আমাদের ৬০ বছরের জীবনে আমরা কখনও কোন দেশকে আজ পর্যন্ত আক্রমণ করিনি, ভবিষ্যতেও করব না, কারণ ওটা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ।

পাকিস্তান যে শুধু ৪০খানা এফ-১৬ বিমান আমেরিকার কাছ থেকে (ফ্রান্সের কাছ থেকেও খান কয়েক মিরেজ-2000 বিমান exocet মিসাইল) যোগাড় করে থাকত তা হলে ভাবতের বলবার কিছু ছিল না, উদ্বেগেরও কোন

প্রবাসে চাকরি পাওয়া [illegible]
কান্নাহাসি

পরিবর্তনের পাতায় প্রবাসীদের [illegible] দেখে খুব ভাল লাগছে। সুদূর [illegible] পরিচিত [illegible] ছেড়ে [illegible] সুখী [illegible] খাবার [illegible] বা [illegible]

[illegible]

কিছু বাঙালি অবশ্যই প্রবাসে [illegible] আজও আছেন। এঁদের অনেকে [illegible] নিজেকে আড়ালে রাখেন, [illegible] কারণ ও কাজে নিজের পদ মর্যাদার [illegible] মালিকপক্ষের বা উপরওয়ালার নজরে [illegible] নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগী [illegible] আছেন। এঁরা নমস্য, প্রণম্য। [illegible] জীবনের আলোকময় ভবিষ্যতের দেখা পেয়েছে। [illegible] পথ খুঁজে পেয়ে ভাগ্য দেবতাকে [illegible] জানাচ্ছে।

আজকে প্রবাসে চাকুরির সুযোগ বিশেষ করে [illegible] রয়েছে। কিন্তু হওয়া না হওয়া, পাওয়া না পাওয়ার কান্নাহাসির এ চিত্র বড় প্রকট হয়ে উঠছে প্রবাসের আবাসে আবাসে।

জগৎ দেবনাথ
নাসিক [illegible]

কারণ ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তো অত সহজসরল নয়। পাকিস্তান ওগুলো ছাড়া সংগে সংগে আমেরিকার কাছ থেকে আরও ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অন্যান্য সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রও কিনেছে। পাকিস্তানের 'ছোট্ট সেনাবাহিনীর' জন্যে এ বিপুল মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা অভাবনীয় ব্যাপার, যথার্থ প্রয়োজন ও সাধ্যেরও অতিরিক্ত। ভারতের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা এই জন্যেই।

আরও একটি কথা, পাকিস্তানের 'ছোট্ট সেনাবাহিনীর' জন্যে অত বিপুল সমরোপকরণ যোগাড় করেও সে ক্ষান্ত হয়নি, পাকিস্তান গোপনে পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে। জিয়া সাহেব মুখে এ কথা অস্বীকার করলেও মার্কিন প্রেস এ কথা সোচ্চারে ফাঁস করে দিয়েছে। তাঁর 'ছোট্ট সেনাবাহিনীর' জন্যে পরমাণু অস্ত্রের কিসের জন্য দরকার?

অনিল সোম
জামশেদপুর

সংস্কৃতি ফ্যাসন

অপসংস্কৃতি শব্দটা আজকাল লোডশেডিং শব্দের মত বহুল উচ্চারিত ও অসংখ্যবার পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত। এখনো তার বিজয় অভিযান অব্যাহত।

আমার যা ভাল লাগছে না, রুচিকর ঠেকছে না তাকেই আমি অপসংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে সংগে সংগে লেবেল এঁটে দিচ্ছি। নিজেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক বাহক রূপে জাহির করতে পেরে অহংকারে বুক ফুলছে দশহাত।

গালে হাত দিয়ে কি অত ভাবছ হাঁদাগংগারাম। উচিত অনুচিত, ঠিক বেঠিকের কানাগলিতে ঘোরার কি দরকার। জাতে যদি উঠতে চাও তাহলে দলে ভিড়ে যাও। অপসংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ না জেনেও ভাবেভংগিতে নিখুঁতভাবে দেখাও যে তুমি অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

তুমি যা বলবে তাই ধ্রুব সত্য হতে বাধ্য। নইলে ঊষা উত্থুপের ডিসকো গান আজ রাজনৈতিক নেতার কাছে অপসংস্কৃতি বলে মনে হবে কেন। সংগীত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি তাঁর কাছে যা ভাল তাই সংস্কৃতি আর বাদবাকী অপসংস্কৃতি। এমন নিখুঁত বিচার বিবেচনাবোধ একমাত্র এখানেই সম্ভব।

বিশ্বনাথ মিত্র
চিত্তরঞ্জন

মর্মান্তিক

আমি 'পরিবর্তন' পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক, 'পরিবর্তন' পত্রিকাটি আমার খুব ভাল লাগে, বিশেষ করে 'নারী দুনিয়া'টি। তাই সম্পাদকের কাছে আমার অনুরোধ এই যে তিনি যেন প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে মেয়ে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে কিছু লেখেন। কারণ আমরা প্রতিবন্ধীরা সমাজের কাছে খুবই অবহেলিত। আমার একটা হাত নেই, আমি যখনই কলেজে যাই, কিংবা কোথাও যাই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরে ব্যাঙের ছলে বলতে থাকে 'একটা হাত নেই, একটা হাত নেই'।

আমার একটা হাত না থাকলেও, আমি উল বুনতে, চুল বাঁধতে, রান্না করতে, কাপড় জামা পরতে, কাপড় কাচতে, সেলাই করতে ইত্যাদি যাবতীয় কাজই আমি করতে পারি।

তাই আমি সম্পাদকের কাছে আবার অনুরোধ রাখছি যে তিনি যেন প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা পরিবর্তনে লেখেন।

শম্পা রায়, কলকাতা ৬

লেনিনের জন্মদিনে

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা পরিবর্তনের ১৮ মে ১৯৮৩ সংখ্যায় হিমাংশু হালদার লিখিত 'কানু সান্যাল এবং জংগল সাঁওতাল এখন দুই ভিন্ন পথের পথিক' প্রতিবেদনের তৃতীয় অনুচ্ছেদে C.P.I-(M-L) এর আত্মপ্রকাশ ১৯৭০ সালের ১ মে বলা হয়েছে। কিন্তু C.P.I (M L) দল আত্মপ্রকাশ করেছিল ২২ এপ্রিল ১৯৭০ সালে। ২২ এপ্রিল লেনিনের জন্মদিন।

সন্তোষ ব্যানারজি
শালতোড়া, বাঁকুড়া

সোনার রেল লাইন

'পরিবর্তন' ৪ মে ১৯৮৩ সংখ্যায় দীপেন্দু দে'র 'রেলওয়ে দুর্নীতিতে কারা জড়িত' পড়লাম। লেখাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী সন্দেহ নেই।

লেখক রেলের বেশ কিছু দুর্নীতিমূলক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তবে ভিজিলেন্স এর তদন্ত করতে পারে কিনা এইরকম একটা প্রশ্ন সামনে রেখে নিবন্ধটি শেষ হয়েছে। আসলে সর্ষের মধ্যেই ভূত। রেলে 'টপ টু বটম' সততার অভাব। মধু দণ্ডবতে একসময় বলেছিলেন যে, চুরি বন্ধ করা গেলে রেল লাইন সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া যায়। কথাটা বোধ হয় খুব অযৌক্তিক নয়।

সিতাংশু গোস্বামী
কলকাতা ৫৩

কয়লার দোষ
বিদ্যুৎ সংকট

অন্তর্ঘাত

ইঞ্জিনিয়ারদের ষড়যন্ত্র

বিদ্যুৎ রেশনিং

পাঁচ মিনিট

কলকাতায় অদ্ভুত জ্বর

খবরে প্রকাশ, কলকাতা শহরে এক অদ্ভুত ধরনের জ্বর দেখা দিচ্ছে। এই জ্বরে আক্রান্ত হওয়া মাত্র গায়ের তাপ ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগরি বেড়ে যায়। রোগী দাঁত কিড়মিড় করে এবং প্রলাপ বকতে শুরু করে।

সম্প্রতি বামফ্রনটের কোন এক শরিক দলের নেতাদের কয়েকজন এই বিশেষ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এই জ্বরের ঘোরে তাঁরা এখন বলতে শুরু করেছেন সি পি আই (এম) কাপালিকসুলভ মনোবৃত্তি গ্রহণ করেছে। এর অর্থ সি পি আই (এম) এখন কন্তম? মামনুসর বলে অন্যান্য শরিক দলকে সুকৌশলে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কাপালিকদের মতিগতি কে না জানে! তাদের একমাত্র কাজ ছোট ছেলেপুলে দেখলে ধরে বলি দেওয়া। কাপালিকরূপী এই সি পি আই (এম) মুখে একমুখ দাড়ি, মাথায় জটাজুট, কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে রক্তবসন আর এক হাতে বিরাট খাঁড়া। এই খাঁড়া দিয়ে তারা সব সময় যে মানুষ বলি দিচ্ছে তা নয়, এই খাঁড়া দিয়ে আগামী নির্বাচনে নমিনেশন কেটে দেওয়া হবে সে ভয়ও দেখান হচ্ছে। কাপালিকরূপী সি পি আই (এম) বলছে, আমাকে অনুসরণ না করলে আগামী নির্বাচনে নমিনেশন নাস্তি। এবং নমিনেশন-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়? নমিনেশন না পাওয়ার অর্থ মন্ত্রিত্ব নাশ, মন্ত্রিত্ব নাশ থেকে ক্যাডার নাশ, ক্যাডার নাশ থেকে প্রভাব নাশ, প্রভাব নাশ থেকে রাজনৈতিক বিলুপ্তি।

কিন্তু কলকাতার এক অদ্ভুত ধরনের জ্বর বাস্তববুদ্ধি ঘুলিয়ে দিচ্ছে ও 'আবোল তাবোল' বকতে রোগীকে প্ররোচিত করছে।

খবর পেয়ে বহুদর্শী পি জি হাসপাতালে একজন শরিক নেতার সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়।

বহু : এখন কেমন বোধ করছেন?

নেতা : বোধ করাকরির কী আছে। বামপন্থী শক্তি ছিন্নমস্তা রাজনীতির কবলে পড়েছে। দেখছেন না সে নিজেই নিজের রক্ত পান করছে।

বহু : তাতে ক্ষতি কী। হিন্দুর তো তেত্রিশ কোটি দেবদেবী। ছিন্নমস্তাকেও দেবীজ্ঞানে হিন্দু পুজো করে।

নেতা : আর বোধহয় বেশিদিন পুজো করবে না। দেখছেন না দল ভেঙে সব আমাদের দিকেই আসছে।

বহু : সে কী, আমরা শুনেছি আপনারাই দুর্নীতিবাজ দলত্যাগীদের আশ্রয় দিচ্ছেন!

নেতা : তাঁরা স্বতস্ফূর্তভাবে অর্ধসমাপ্ত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার জন্য আমাদের দলে আসছেন। তাঁরা এতদিনে বুঝতে পারছেন আমরা কতখানি খাঁটি।

নেতা উত্তেজিত। তাঁর চক্ষু আরও রক্তবর্ণ, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবুকে চুপিচুপি জিগ্যেস করলাম, ডাক্তারবাবু সারবে তো? ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন : ভয় নেই। মাত্র সাতদিন। তারপর জ্বর ছেড়ে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

বহুদর্শী

অম্লমধুর

তীব্র শব্দ-তরঙ্গমালা
অকালেই যে করবে কালা
তোমায় আমায় ভাই রে!
কালা হবার যাওবা বাকি,
রেহাই পাবার উপায়টা কী,
ভাবছি বসে তাই রে!
ব্যাপারটা যা দেখছি তাতেই
এবার থেকে কান বাঁচাতেই
'সাইলেনসার' চাই রে!

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

চালের দামটা বাড়ছে দেখে
পাচ্ছি খুব আনন্দ,
চাল কিনে তো করছি মজুত
আমি এবং নন্দ।
উচ্চ মূল্যে চালটা বেচে
হবই বড় লোক।
খাদ্যাভাবে মরলে কেহ
করব নাকো শোক।

কালিদাস ভট্টাচার্য

বাস বাড়ছে কাজ বাড়ছে
ব্রেকডাউনের ঠেলা,
যাত্রীরা সব বাদুড়ঝোলা
সকাল সন্ধ্যে বেলা।
* * * *
ট্রেন বেড়েছে সন্দেহ নেই
আনায় যানায় লেট,
গোড়ায় গলদ শুধরোবে কি
পাঠাই যদি ভেট!
চেলার ঠেলায় জানলা পাখা
কামরা থেকে হাওয়া,
রোদের সময় মুখটি পোড়া
জলের ঝাপটা খাওয়া।

নিতাই ঘোষ

রোজই বাসে চড়তে হয়
প্রাইভেট নয় স্টেট,
তার ওপর কুপনজারি
অফিস সময় লেট।
উড়ো পথে তাকিয়ে থাকি
লম্বা লাইন দিয়ে,
আসবে কখন সরকারি বাস
যাবে আমায় নিয়ে।
এমনি করে আর কতকাল
দাঁড়িয়ে খালি থাকব,
গণতন্ত্রের সুনাম গেয়ে
কলঙ্কটা ঢাকব?

অশোক সেন

COUPON
COUPON
COUPON
COUPON
COUPON
COUPON

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

ঘটমান বর্তমান

১১ জুলাই – ১৭ জুলাই

জাতীয়

তথাকথিত খালিস্তান আন্দোলনের সভাপতি জগজিৎ সিং চৌহান ঐ আন্দোলনের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানর কথা ঘোষণা করেছেন, এদিকে পাঞ্জাবের তরন তারণে অকালি নেতারা যেসব উস্কানিমূলক বিবৃতি দিচ্ছেন কেন্দ্র সে সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নিয়েছে। আসাম বাংলাদেশ সীমান্তে প্রাচীর দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া, বাংলাদেশের সরকার সে ব্যাপারে ভারতের হাইকমিশনারকে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য ডেকে পাঠান। (১১ ৭)। সারা দেশে পবিত্র ঈদ উল ফিতর প্রতিপালিত। রথযাত্রা মহাধুমধামের সংগে উদযাপিত। লনডনের 'ওমানস ওন' কাগজের সংগে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন রাজীব গান্ধী কংগ্রেস (ই) দলের নেতা হলেও দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন এ কথা ঠিক নয় (১২ ৭)। সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো মালদহের গণহত্যার ব্যাপারে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, এই সংগে পলিটব্যুরোর ধারণা কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের পূর্ণ সমর্থনেই মালদহের সাম্প্রতিক গণহত্যা ঘটেছে। খনি অঞ্চলে পুনরায় আইন শৃংখলার অবনতি ঘটায় কেন্দ্রীয় শক্তিদপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিং কলকাতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (১৩ ৭)। লেফটেনান্ট জেনারেল এস কে সিনহাকে বঞ্চিত করে লেফটেনান্ট জেনারেল এ এস বৈদ্যকে পরবর্তী সেনাধ্যক্ষ করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশের কয়েকটি বিরোধী দলনেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, নেতাদের মধ্যে আছেন লোকদলের চরণ সিং, বি জে পি র আদবানি, ডি এস পি র এইচ এন বহুগুণা, কংগ্রেস (জ) র জগজীবন রাম, জনতা পারটির জরজ ফারনানডেজ এবং কংগ্রেস (স) র ধরমবীর সিনহা। ব্যাংগালোরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক আচরণে ভারতকে সদাসতর্ক থাকতে হবে (১৫.৭)। ভারত বৃটেনের কাছ থেকে সাবমেরিন বিধ্বংসী সী কিং এবং জাহাজধ্বংসী সী ঈগল ক্ষেপণাস্ত্র কেনার প্রস্তাব নিয়েছে। গংগার জল বন্টন নিয়ে ভারত বাংলাদেশকে কয়েকটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে (১৬.৭)। জম্মু ও কাশ্মীর হাই কোরটের প্রধান বিচারপতি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে, এ প্রসংগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুক আবদুল্লা বলেছেন, বাইরে থেকে কাউকে বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারটি রাজ্য সরকার কিছুতেই মেনে নেবে না, কেবল হাই কোরটের বিচারপতি খালেদের নিয়োগ নিয়েই এ রকম প্রতিবাদ জানিয়ে ডাঃ আবদুল্লা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছেন (১৭ ৭)।

পশ্চিমবংগ

কলকাতা হাই কোরটের বিচারপতি পি সি বড়ুয়ার এজলাসে বিবৃতি মারফৎ জানান হয়েছে মহাজাতি সদনে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার উপর সভা নাট্যানুষ্ঠান বা সংগীতানুষ্ঠানের জন্য কোনরকম নিষেধাজ্ঞা নেই (১১ ৭)। বর্ধমানের মেডিকেল কলেজের ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটি দোষী ব্যক্তিরূপে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন। প্রাক্তন নকশাল নেতা কানু স্যানয়াল সাম্চা পারটি গড়তে চান বলে কলকাতায় ঘোষণা করেছেন (১২ ৭)। মালদহ জেলার সাম্প্রতিক খুনোখুনির মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য রতুয়া থানার ও সি কে বদলি করা হল। প্রখ্যাত প্রশাসক এম জি কুটি সি এম ডি এ র চিফ এগজিকিউটিভ হিসাবে কাজ করতে করতে অফিসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন (১৩ ৭)। সি পি আই (এম) এর ১৩ জন সদস্য ও সমর্থককে খুন করার প্রতিবাদে মালদহে বন্ধ পালিত, বন্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল সারাদিন (১৬ ৭)। সারা উত্তরবংগে অভূতপূর্ব বৃষ্টি, ফলে বন্যা জলপ্লাবন ধস কালিমপং এ ধস নামার ফলে সারা উত্তরবংগ এবং সিকিম কলকাতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (১৭ ৭)।

মধ্যপ্রদেশ

রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চের নেত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী বলেছেন, তাঁর দল সারা দেশে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করবে, তাঁর মতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থানের মত বড় বড় রাজ্য থাকার ফলেই নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করা কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না (১১ ৭)।

পাঞ্জাব

অকালি নিহাংরা জি টি রোডের উপর জনৈক ব্যক্তিকে খুন করেছে। এই নিহত ভদ্রলোক তারা সিং ছিলেন বড়া বাকলায় হরভজন সিং হত্যা মমলার পুলিশ সাক্ষী (১২ ৭)। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ডি আই জি জে এস আনন্দকে মৃত অবস্থায় চণ্ডিগড় লেকে ভাসতে দেখা যায়, উল্লেখ্য জে এস আনন্দ সঞ্জয় বিচার মঞ্চ নেত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর কাকা (১৩ ৭)। রাজ্য সরকার হাই হরস পাওয়ারের মোটরযুক্ত মোটর সাইকেল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন, সাম্প্রতিক কয়েকটি হত্যা ঘটনায় এই যানটি হত্যাকারী ব্যবহার করেছে বলেই এই নিষেধাজ্ঞা। উগ্রপন্থীদের আক্রমণে চারজন পুলিশসহ ছজন নিহত (১৫ ৭)। লংগোয়াল বলেছেন, আগামী ১৫ আগসট তাঁরা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রকাশ করবেন (১৬ ৭)।

করনাটক

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু, রাজ্য সরকার এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছে, ধর্মঘটীদের দাবি সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ থেকে ৫৮ বৎসর করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ করে ঘোষিত অরডিন্যানস প্রত্যাহার করতে হবে এবং কর্মচারীদের সংগে সরকারের পূর্বতন চুক্তি সরকারকে মেনে চলতে হবে (১৬ ৭)।

মহারাষ্ট্র

প্রখ্যাত গুজরাটি কবি রঘুনাথ ব্রহ্মভট্ট বোমবাইতে পরলোকগমন করেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বৎসর মাত্র ১৮ বছর বয়সে 'বুদ্ধদেব' নামে একটি নাটক লিখে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল (১২ ৭)।

সিকিম

নেপালী কবি ভানুভক্তের ১৬৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত, মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভান্ডারি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, ভানুভক্তের স্মৃতি তর্পণ করেন মন্ত্রিসভার সকল সদস্য, কংগ্রেস (আর) সভাপতি রামচন্দ্র পৌদিয়াল প্রমুখ সকল রাজ্য নেতারা (১৩.৭)।

আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আনোয়ার উল হক বলেছেন, দেশে নতুন যে সংবিধান চালু করার কথা হচ্ছে তা হওয়া মোটেই সম্ভব নয়, কারণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত [illegible]

[illegible] সংশোধনের ফলে সেখানে সামরিক শাসন চালান আর সম্ভব নয়, [illegible] পাকিস্তান পরমাণু বোমা বানাতে যাচ্ছে, এই সংবাদকে জেনারেল জিয়া নেহাৎ রটনা বলে বাতিল করেছেন। [illegible]

পঞ্চায়েত আইন সংশোধন না হলে শরিকী কোঁদল কমবে না

নিশীথ দে

পঞ্চায়েত আইনের ব্যাপক সংশোধন এবং নিয়ম কানুন না বদলালে গ্রামোন্নয়ন আর সম্ভব নয়। পঞ্চায়েত আইনের গোড়ায় গলদের জন্য ঝগড়া মারামারি দাংগা হাংগামা আরও বাড়বে।

গত পাঁচ বছর এম এল এ এম পিদের চেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। এবার এম এল এ-এম পিদের কদর বাড়ল। তবে পঞ্চায়েত আইনের গুণে কোন দল একক গরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা পাচ্ছেন না। ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে মনোনীত এবং পদাধিকাব বলে নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষমতাই বেশি।

এবাব পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর অন্তত এক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাত বদল হচ্ছে। কিন্তু হিসাব-নিকাশের কী হবে ? প্রায় ১৮ কোটি টাকার হিসাব বকেয়া।

নির্বাচনের সময় মন্ত্রী এবং নেতারা সবাই বলেছেন, পঞ্চায়েতের কোন হিসাব বাকি নেই। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অডিট রিপোরট দিয়ে দিয়েছে। অথচ পঞ্চায়েত দফতর রিপোবট দিচ্ছেন (২০ জুন পর্যন্ত) ১৯৭৮-৭৯ সালের অডিট রিপোরট দেয়নি ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৯৭৯-৮০ সালের ৮৫, ১৯৮০-৮১ সালের ১৯৫ এবং ১৯৮১-৮২ সালের ৫১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট রিপোরট বাকি। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের অডিট রিপোরট বাকি অনেক বেশি।

পঞ্চায়েত সমিতির হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বি ডি ও-র এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সরকার নিযুক্ত অফিসারের। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রধানই সব। অনেক ক্ষেত্রে প্রধানরা খাতাপত্র এবং টাকা পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিতে গড়িমসি করছেন। সব মিলিয়ে ৩৩০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত। আগে ছিল ৩২৩৯টি। কিন্তু অর্ধেক গ্রাম পঞ্চায়েতেরই নিজস্ব অফিস নেই। তার জন্য অন্য দলের প্রধানকে রীতিমত অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে।

পঞ্চায়েত দফতব ১২৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব অফিস তৈরির জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেন। কিন্তু ৭৮৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কোন ইউটিলাইজেশন সারটিফিকেট পাওয়া যায়নি। পঞ্চায়েত দফতর ঠিক করেছেন সব ইউটিলাইজেশন সারটিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত আর কোন টাকা মঞ্জুর করা হবে না। অবস্থাটা দাঁড়াল, রামের দোষে শ্যামকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আগের প্রধান হিসাব বুঝিয়ে দিলেন না, তার জন্য নব নির্বাচিত প্রধান কেন বঞ্চিত হবেন ?

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

পঞ্চায়েতের বাজেট নিয়েও অনেক সমস্যা। গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাজেট পেশ করতে বলা হয়েছে সেপটেমবরে, পঞ্চায়েত সমিতিকে অকটোবরে এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জানুয়ারি ফেবরুয়ারিতে। একজনের সংগে আর একজনেব কোন যোগ নেই। তার উপর কথা হল, কত টাকা সরকারি অনুদান হিসাবে পাওয়া যাবে সেটা কেউ জানে না। এতে কাজ কী করে হবে ?

রাজ্য সরকার যে টাকা দেন, বিশেষ করে পবিকল্পনা খাতে, তার হিসাব আদায় করা একটা সমস্যা। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সমস্যা নয়। সমস্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে। অন্তত প্ল্যান-স্কিমের টাকা যাতে এলোপাথাড়ি খরচ না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। তার জন্য পঞ্চায়েতের একসটেনশন অফিসার বা বি ডি ও-কে ক্ষমতা দেওয়া হক। তা হলে প্রশাসনিক দিক থেকে অনেক সুবিধা হবে।

জেলা পরিষদ প্রশাসনে সবচেয়ে বেশি দরকার রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতা। তা ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কাজে বিভিন্ন দফতরের জেলা স্তরেব প্রশাসনকে যুক্ত না করে কোন পরিকল্পনা ঠিক বাস্তবসম্মত নয়। সমন্বয় থাকলে রাজ্য সরকার এবং জেলা পরিষদ দুপক্ষেরই উন্নয়নমূলক কাজের সুবিধা হয়। এটা গত পাঁচ বছর ধরে তদানীন্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করে গিয়েছেন। দেবব্রতবাবুর সময়ে পঞ্চায়েত দফতবেব জন্য মন্ত্রিসভার একটি সাব-কমিটি ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ছিলেন চেয়াবম্যান। বিনয় চৌধুরী পঞ্চায়েত মন্ত্রী হবাব পব সাব-কমিটি তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ আগে সাব-কমিটির বৈঠকেই ঠিক হত সমস্ত কর্মসূচি এবং নীতি। তা হলে কি এটাই সত্যি যে আর এস পি-র মন্ত্রী দেবব্রতবাবুকে ঠুঁটো জগন্নাথ কবে বাখার জন্যেই সাব কমিটি করা হয়েছিল ?

প্রথম দিকে পঞ্চায়েত দফতরকে সি পি আই (এম) বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। ১৯৭৮ সালের নির্বাচন, বন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঢালাও সাহায্য, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প' গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েত প্রশাসনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী এবার সরকাবি অফিসারদের নিয়ে পঞ্চায়েত কো অরডিনেশন কমিটি করেছেন। আসলে বিনয়বাবু পঞ্চায়েত প্রশাসনে সরকারি অফিসারদের উপর বেশি নির্ভর করছেন।

কিন্তু পঞ্চায়েত প্রশাসনের গলদ দূর করার কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। এর আগে পশ্চিমবংগে চার স্তরের পঞ্চায়েত ছিল – গ্রাম সভা, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ নিয়ে। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম সভা তুলে দেওয়া হয়েছে। আগে ছিল প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার করে গ্রাম সভা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট গ্রামের সমস্ত লোককে মিটিং-এ ডেকে সব কিছু খোলাখুলি জানাতে হবে – কোথায় কী কাজ হচ্ছে, আগামী দিনে কী হবে, কত খরচ হবে ইত্যাদি। গ্রামের মানুষের পরামর্শও নেওয়া হত। কিন্তু বর্তমান আইনে গ্রামের সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা নেই। বামফ্রনটের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সমস্ত প্রধানকে জানান হয়েছে যাতে সমস্ত হিসাব নিকাশ, কোথায় কী কাজ হচ্ছে তার তালিকা প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু শতকরা নব্বইটি গ্রাম পঞ্চায়েতই এই সিদ্ধান্ত মানেননি। সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির প্রয়াত সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত অনেকবার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা মানা হয়নি। বামফ্রনটের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক সরোজ মুখারজির নির্দেশ যে মানা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে সে রকম একটা ব্যবস্থা ছাড়া গ্রামের মানুষেব মন থেকে দলবাজি ও দুর্নীতি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করা কি সম্ভব ? পঞ্চায়েতী রাজের মূল উদ্দেশ্য হল, গ্রামের নিচেব স্তরের মানুষেব হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া। গ্রামেব মানুষের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সম্পর্কে বক্তব্য থাকতে পারে। সেই বক্তব্য জানাবার কোন জায়গা নেই। আগের গ্রাম সভাব মত একটা ব্যবস্থা থাকলে পঞ্চায়েত সদস্যও গ্রামের মানুষের সহযোগিতা আরও বেশি পেতে পারেন।

পঞ্চায়েত আইনে আরও অনেক ফাঁক রয়েছে। যেমন নির্বাচিত সদস্যকে অপসাবণ, পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ বি ডি ও-কে বদলি এবং জেলা পরিষদেব চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ জেলা শাসককে অপসারণ করার ঢালাও ক্ষমতা নির্বাচিত সদস্যদের হাতে।

কোন নির্বাচিত সদস্য পর পর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে পঞ্চায়েতের বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করে খুব সহজে সদস্য পদ খারিজ করে দেওয়া যায়। গত পাঁচ বছরে কয়েক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি এবং প্রস্তাব নিয়ে সদস্য পদ খারিজ কবা হয়েছে। এবার অনেক ক্ষেত্রে হাত বদল হয়েছে। বিরোধী পক্ষ আইনের সুযোগে বদলা নিতে পারেন।

ঠিক এইভাবে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে বি ডি ও এবং জেলা শাসককে বদলির জন্য সুপারিশ করা যায়। আর কিছু না হক অন্তত বদলি করার ভয় তো দেখান যায়। □

বিনামূল্যে!

স্টেনলেস স্টীলের আকর্ষণীয় বাটি, একসঙ্গে ২ টিন ফ্যারেক্স কিনলে

কিছু বাছাই করা শহরে এ সুযোগ পাবেন—
স্টক থাকা পর্যন্ত।

গ্ল্যাক্সো-র তৈরী ফ্যারেক্স®

বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে বিশেষ শক্ত আহার।

Glaxo
FAREX
Baby's ideal solid food for all-round growth

CASGLF-43-2441

এ পদযাত্রার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, ইস্যুও নেই : চন্দ্রশেখর

নয়া দিললি থেকে তরুণপ্রকাশ গংগোপাধ্যায়

দেশকো নেতা ক্যায়সা হো

কন্যাকুমারিকা থেকে ৬ জানুয়ারি যাত্রা সুরু করেছিলেন জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর। দীর্ঘ চাব হাজার কিলোমিটার পদযাত্রা শেষে নয়া দিললির নিজামুদ্দিনে ২৫ জুন এসে পৌছলেন তিনি। নিজামুদ্দিন হয়ে ইনডিয়া গেট, রাজঘাট, সেখান থেকে এলেন রামলীলা ময়দান। সর্বত্রই দুপাশে উৎসুক মানুষের ভিড়, হৈ চৈ। যেন মেলা বসে গেছে। নিজামুদ্দিন বয়েজ স্কাউট ময়দানে ক্যামপ বসেছিল। টাঙান হয়েছিল রঙিন চাঁদোয়া।

বিভিন্ন জায়গা থেকে জনতা দলের কর্মীরা এসে জড় হয়েছেন। মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ, কেরল, করনাটক, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা থেকে বাস, ট্রাক, ট্যাকসি, প্রাইভেট গাড়ি, মিনি বাস এবং চাষের ট্রাকটরে চেপে এসেছেন দলে দলে তরুণ তরুণী বৃধ বৃধা। বয়েজ স্কাউট ময়দানের একদিকে এইসব যানবাহন জমাট বেঁধে আছে। প্রত্যেকটি গাড়িব মাথায় টাঙান হয়েছে নিজনিজ রাজ্যেব নাম লেখা কাপড়ের ব্যানার।

ময়দানে ঢোকার মুখে সারি সারি বসে গেছে নানা দোকানপত্তর। কোনটিতে স্টেশনারি জিনিসপত্র, কোনটিতে খাবারদাবার, কোনটিতে বা কাচের চুড়ি খেলনা বা আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে। ছোলা বাদাম ভাজা তো আছেই আর আছে দিললির নানা দর্শনীয় স্থানের রঙিন পোসটকারড। মানুষের দমবন্ধ ভিড়, দোকানীদের তারস্বর চিৎকার, বাচ্চাদের বাঁশি বাজানর আওয়াজ, উনুনে চড়ান মিষ্টির রসের বিচিত্র গন্ধ মিলিয়ে সে এক মেলা-ই বটে।

এরই মধ্যে এক নিভৃত ঘরের কোণে বসে আছেন চন্দ্রশেখর। মাটিতে পাতা তোষক, তাতে আধশোয়া চন্দ্রশেখরকে দুজন কর্মী নিবিষ্টভাবে পা টিপে দিচ্ছেন। বাইরে থেকে ঘন ঘন স্লোগান ভেসে আসছে 'দেশকো নেতা ক্যায়সা হো, চন্দ্রশেখর যায়সা হো'। চন্দ্রশেখরের মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির আলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, অনেক বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে আপনি ভারতযাত্রা শেষ করতে যাচ্ছেন। এ মুহূর্তে কী মনে হচ্ছে আপনার? প্রশ্ন শুনে একটু উঠে বসলেন তিনি। বললেন, ভারতযাত্রার মধ্যে দিয়ে আমি মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছি। মানুষেব মনও জয় করেছি। আমার মনে এখন সেই জয়েব আনন্দ।

নিজামুদ্দিন থেকে বেরিয়ে রাম লীলা ময়দানের দিকে যাবার সময় ফ্লাই ওভার বা ওভার ব্রিজের ওপর থেকে মেয়েরা তাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কত লোক দৌড়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। নিজামুদ্দিনের সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পার্পণ করতে গেছেন, সেখানে মুসলমানরা তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করেছেন, ইনডিয়া গেটে যুদ্ধে শহীদ সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্রে যখন মালা দিতে গেছেন তখন 'অমরজ্যোতি'র চারপাশে শিখ ধর্মাবলম্বীরাও জড়ো হয়েছেন। রাজঘাটেও সেই এক দৃশ্য।

সভাপতি নামে একটি ছেলে মিছিলের আগে আগে হাঁটছিল, কাঁধে লাঙল, পরনে জনতা দলের পতাকার রঙে রঞ্জিত পোশাক। সভাপতি এসেছে তামিলনাড়ু থেকে। চন্দ্রশেখরের সংগে সে-ও কন্যাকুমারিকা থেকে হেঁটে আসছে। বস্তুত সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আন্তরিকতার এতটুকু অভাব ছিল না।

রাজধানী শহরে ঢোকার আগে ২১ জুন এখান থেকে একশ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশ-হরিয়ানা সীমান্তের একটি গ্রামে এসে পৌছেছিলেন চন্দ্রশেখর। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানান হরিয়ানা জনতা দলের নেতা দেবীলাল এবং সে রাজ্যের জনতা বিধায়ক শংকরলাল। পদযাত্রীদের সংগে ছিল সাতটি ভ্যান। তার একটিতে পদযাত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যবহাবের জিনিসপত্র রাখা ছিল। অন্যগুলিতে কোনটিতে ছিল ডাক্তারি সরঞ্জাম, কোনটিতে জলের ট্যাংক, কোনটিতে আলো ও পাখা চালানর জন্য ডিজেল জেনারেটর ইত্যাদি। এগুলি পদযাত্রীদেব প্রতি শুভেচ্ছাব নিদর্শন হিসাবে মহারাষ্ট্র থেকে পাঠিয়েছেন প্রয়াত নেতা রজনী প্যাটেলের স্ত্রী।

দেবীলাল কিস্যা

পদযাত্রী দলটি এখান থেকে হেঁটে গিয়ে উঠল হোডালে। এই যাত্রায় আমিও সংগে ছিলাম। হোডালে বিশ্রাম। সেখানে 'ডাবচিক' বলে একটি টুরিসট হোটেল আছে। বেশ রাজকীয় হোটেল বলা যায়। চারপাশে বাগান ঘেরা। পুরো হোটেলটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এর আউট হাউসটিও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সেখানে চন্দ্রশেখর আশ্রয় নিলেন। দেবীলাল বা শংকরলালও এক একটি ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকে পড়লেন। কয়েকজন যুব নেতার জন্যও একই ব্যবস্থা। বাকিরা লু বওয়া, আগুনঝরা বাগানের এখানে ওখানে ছায়া দেখে বসে পড়লেন!

হোটেলের খাবার ঘরটি বেশ, ঠাণ্ডা, কিন্তু সারি সারি সাজিয়ে রাখা খাবারগুলি ছিল বেশ তপ্ত। সব পদযাত্রীর জন্যই এই খাবারদাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল পকৌড়া, স্লাইজড পাঁউরুটি, মাখন, চাটনি, সস, নানারকম মিষ্টি। তারপর ঠাণ্ডা পানীয়। যে যার নিজেরটা নিয়েই খেতে হল। প্লেট ফুরোবার সংগে সংগে সদাপ্রস্তুত হোটেলকর্মীরা তা পূরণ করে দিয়ে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের জন্য অবশ্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা।

চাইয়ে।' দুজনেই কিন্তু হরিয়ানা জনতাদলের প্রভাবশালী নেতা।

এখানে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হল তা নিচে দেওয়া হল :

এমন দারিদ্রের কথা জানতেন না

পরিবর্তন : আপনার এই পদযাত্রা, যার নাম দিয়েছেন ভারত-যাত্রা তার পেছনে কি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ? আপনি কোন ইস্যু নিয়ে এই পদযাত্রা সুরু করেছিলেন ?

চন্দ্রশেখর : না। গান্ধীজীর লবণ আন্দোলন, বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনের মত বিশেষ কোন ইস্যু নিয়ে আমি এই পদযাত্রা সুরু করিনি। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে মানুষকে বোঝার চেষ্টা করেছি। কোন বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দেশের মানুষের অবস্থা বুঝতে হবে। যেমন, গান্ধীজী দক্ষিণ আফরিকা থেকে ফেরার পর গোখলে বলেছিলেন, Travel the length and breadth of the country to feel the pulse of the people before embarking on plan of action. আমার পদযাত্রার কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। আমি আমার এই দীর্ঘ যাত্রার কোথাও কোন সভায় বা গ্রামের জমায়েতে মানুষজনের সামনে কোন রাজনৈতিক দলের নাম করে সমালোচনা করিনি, কোন নেতার নাম করে বিরূপ মন্তব্য করিনি। আমি মনে করি এখন কেন্দ্রে বা শহরে বসে রাজনীতি করার দিন ফুরিয়ে আসছে।

এখন লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী, যারা ভারতের জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের কাছাকাছি যেতে হবে (Go back to the people)। দেশের সাধারণ মানুষ এবং নেতাদের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য সুরু হয়েছে। জনগণের প্রতিনিধিত্ব যারা করেন তারা অনেকেই জানেন না জনগণ কী চায় ? তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাই বা কী ? রাজধানীতে বসে সুদূর গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন কথা, তাদের মনের কথা বোঝা যায় না।

১৯৮০ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর আমি আমাদের পরাজয়ের কারণ কী তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। একদিন হঠাৎ আমার মনে হয়, রাজধানীর এইসব কিছু ছেড়ে পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে গেলে কেমন হয় ? প্রথমে আমি আমার পদযাত্রার প্রস্তাব দলের নেতাদের দিতে তাঁরা তাতে সম্মতি দেননি। তাঁরা বলেন, আমরা একটা জিপে চেপে অনায়াসেই গ্রামের গ্রামে যেতে পারি।

৮০ থেকে ৮২ এই দুবছর আমি নানান ভাবে আমার এই পদযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছি। পদযাত্রায় সাধারণ মানুষ কতখানি সাড়া দেবেন তা ও যাচাই করেছি। ১৯৮১র অকটোবরে আমি গুজরাটের কয়েকটি গ্রামে পদযাত্রা করি। আমি প্রথম যে গ্রামে যাই সেখানকার প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে জড় হন। তাঁদের সমস্যার কথা শুনি এবং জনতা পারটির তহবিলে কিছু দান করার আবেদন জানাই। সেদিন ১৫০ টাকা উঠেছিল।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি যে, পদযাত্রা আজও মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। এরপর সিদ্ধান্ত নিই, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে পদযাত্রা নয়, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পদযাত্রা করব। ভারতের অন্তরের রূপ দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। ৮০ থেকে ৮২ এক নাগাড়ে দুবছর বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করে বুঝেছি, পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে পৌছন ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।

পরিবর্তন : কত কিলোমিটার পথ আপনি হেঁটেছেন ?

চন্দ্রশেখর : এই বছরের ৬ জানুয়ারি আমি পদযাত্রা সুরু করি। কন্যাকুমারিকা থেকে সমাপ্তিস্থান দিললি। প্রায় চার হাজার কিলোমিটার পথ। আজ হরিয়ানা পৌছনর পর বাকি মাত্র ৮০/৯০ কিলোমিটার।

কন্যাকুমারিকা থেকে কেরল, তামিলনাড়ু, করনাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ অতিক্রম করে আজ সকালে হরিয়ানা পৌছেছি।

পরিবর্তন : এই দীর্ঘ পদযাত্রায় অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলবেন ? আপনার অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কী দেখলেন ?

চন্দ্রশেখর : আমি দেখেছি, সরকারের ভূমি সংস্কারনীতি বা বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সগর্ব ঘোষণা পুরোপুরি মিথ্যে। হাজার হাজার গ্রামের লাখ লাখ মানুষ সেই অকল্পনীয় কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। পারলামেনট লাইব্রেরিতে বসে জলাভাব, খাদ্যাভাবের কথা বইতে পড়ার অভিজ্ঞতার চেয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজের চোখে দেখা ভাল।

দিললিতে বসে সরকারের বড় বড় ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি শোনার পর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মনে হয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক সকল দিকের অবস্থা একবারে ভেঙে পড়েছে। না, এটাও সব বলা হল না বরং বলা ভাল, দেশের বর্তমান অবস্থা অবরুদ্ধ হতে বসেছে। এর মূলে আছে রাজনৈতিক জগতে টাকার খেলা। টাকা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এর পেছনে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ দুঃখের কোন মূল্য নেই।

ভারতযাত্রায় মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, জাতীয় ঐক্যে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত বিশ্বাস আছে। সাম্প্রদায়িকতা বোধ কোন মানুষের মধ্যে নেই, অসংহতি তো নেই-ই। রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনের জন্য কিছু নেতা বা দল ওপর থেকে চেঁচামেচি করে অসংহতির ধুয়া তুলছে। শিক্ষার অভাব আমাদের দেশের মানুষের এক বড় অভিশাপ। আমি স্বীকার করছি, ভারতযাত্রার আগে পর্যন্ত আমারও ধারণা ছিল না যে দেশের মানুষ কী দারুণ কষ্টের মধ্যে বাস করছেন। কী ভীষণ তাঁদের দারিদ্র্যের রূপ।

তাঁদের বাসস্থান নেই, ছত্রিশ বছরের স্বাধীনতার পরও হাজার হাজার মানুষের নিজস্ব একটুকরো জমি বলতে কিছু নেই। মেয়েরা এক টুকরো কাপড় কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে, পুরুষরা অনেকেই নেংটি পড়ে। ছোট ছেলেমেয়েরা জামা কাপড়ের কথা ভাবতেই পারে না। এর ওপর রয়েছে অনাহার ও অর্ধাহারের যন্ত্রণা।

গর্ভধারিণী জননীর পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ ও অন্ধ শিশু। পৃথিবীর অন্ধ শিশুদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী

প্রতি তিনজন অন্ধ শিশুর দুজন ভারতের। গ্রামের মানুষের আজও বিশ্বাস দেবতার অভিশাপই এই অন্ধতা ও বিকলাংগ হবারকারণ। কেউ তাদের বলেননি এই অন্ধতার আসল কারণ কী। এ অভিশাপ দারিদ্র্যের।

প্ল্যানিং কমিশন কি হাজার হাজার গ্রামে জলাভাবের কথা জানে না। সরকার দিল্লিকে সাজাবার জন্য এক হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারে কিন্তু মানুষের খাদ্য, বস্ত্র আশ্রয় বা পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকারের অর্থ বরাদ্দ থাকে না।

সাধারণ মানুষের কাছাকাছি গিয়ে, তাঁদের সংগে কথা বলে এই নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, সারা দেশে এখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের বিশ্বাস এখনও নষ্ট হয়নি। এখনও তারা বিশ্বাস করেন, কোন একজন নেতাই তাঁদের দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাবেন। তাই গ্রামের মধ্যে দিয়ে কেউ পদযাত্রা করে যাচ্ছেন শুনে দলে দলে ছুটে আসেন তাঁরা, সমস্যার কথা বলেন।

জনগণের মানসিক অবস্থা শুকনো বারুদের মত হয়ে আছে। আগুনের ছোঁয়া পেলেই যে কোন সময়ে ফেটে পড়বে। তাদের প্রয়োজন শুধু সঠিক পথে চালনা করার জন্য একজন নেতার, যিনি হবেন স্বার্থত্যাগী আত্মত্যাগী, যিনি সংগঠিত করতে পারবেন। এছাড়া স্বার্থত্যাগী আত্মত্যাগী কিছু কর্মীরও প্রয়োজন।

পরিবর্তন : কোন পথে কিভাবে সাধারণ মানুষের এই অভিশপ্ত দারিদ্র ঘুচতে পারে এবং ভয়াবহ বেকার সমস্যা দূর হতে পারে।

চন্দ্রশেখর : সমগ্র ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। দেশের সম্পদ এবং উন্নতির সব সুফলই চলে যাচ্ছে ধনিক শ্রেণীর হাতে। দেশের সাধারণ গরিবদের কাছে কিছুই পৌঁছচ্ছে না। যে কোন দিন দিল্লির গ্রামারের বিরুদ্ধে তাঁরা গর্জে উঠতে পারেন। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছি, মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী শ্রমিকরা আজও সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা পারিশ্রমিক পান।

পদযাত্রার উপার্জন

পরিবর্তন : আপনার এই দীর্ঘ ছ'মাস ব্যাপী ভারতযাত্রায় এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চন্দ্রশেখর : হ্যাঁ, আমার সারা জীবন মনে থাকবে মহারাষ্ট্রের সেই হরিজন বৃদ্ধাকে, যে দিন ধুলিয়ায় পৌঁছলাম সেদিন বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে যাওয়া হরিজন বৃদ্ধাটি এলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আমার। তারপর আঁচলের গিঁট খুলে পাঁচটি পয়সা আমাকে দিয়ে বললেন, সবস্ব তোমাকে দিলাম।

ধুলিয়া ছেড়ে হেঁটে যাচ্ছি। একদল আদিবাসী পথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন, চন্দ্রশেখর তাঁদের কথা না শুনলে পথ ছাড়বেন না। তাঁদের অভিযোগ, কেন আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দান করার আবেদন রাখিনি। আমি যেতে পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা যে যা পারলেন দান করলেন। রাস্তার ওপর একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশে তবু হেঁটেছি। কারণ আমি জানি গ্রামবাসী সাধারণ মানুষ আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। পদযাত্রা সুরু করেছিলাম মাত্র আশি জনকে নিয়ে। যত হেঁটেছি ততই পদযাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে।

পরিবর্তন : ভারতযাত্রায় আপনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন, এ টাকা কি জনতা পার্টির তহবিলে যাবে। কত সংগ্রহ করেছেন।

চন্দ্রশেখর : প্রায় দশ লক্ষ টাকা তুলেছি। এ টাকা জনতার তহবিলে যাবে না। গ্রামে গ্রামে এ টাকা দিয়ে পাঁচ ছটি সেনটার খোলা হবে। যুবকরা এখানে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ করবেন। মানুষের চাহিদা ও সমস্যার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। সরকার না মেটালে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামা হবে।

পুনশ্চ

চন্দ্রশেখর দীর্ঘ পদযাত্রায় হাইওয়ের আশপাশের গ্রামগুলিতে ঢুকেছেন, ভেতরে যাননি। তাঁর অভ্যর্থনা কমিটিগুলিতে কোথাও কোন হরিজন বা গ্রামের মানুষকে দেখা যায়নি। মহারাষ্ট্রে ছিলেন রাজকীয় হোটেলগুলিতে, করনাটকে ছিলেন চিনি ব্যবসায়ীদের হেপাজতে এবং সর্বদাই তাঁর সংগে পা টিপে দেবার জন্য থকত সদাপ্রস্তুত কিছু দলীয় কর্মী। এই পদযাত্রায় জনতা পার্টির কোন উপকার হয়েছে বলে কেউ স্বীকার করেন না। উপকার যদি হয়ে থাকে তবে তা তাঁর নিজের। কারণ সর্বত্রই শ্লোগান শোনা গেছে : দেশকো নেতা ক্যায়সা হো, চন্দ্রশেখর য্যায়সা হো।

আলোকচিত্র : লেখক

গোয়ালিয়র জেলে ফুলনের মুখোমুখি

নাটকের ফুলন আর বাস্তবের ফুলনের মধ্যে অনেক ফারাক

ফুলনদেবী

আমাকে নিয়ে মিথ্যে গল্প বানিয়ে সিনেমা ও নাটক হচ্ছে : ফুলন

মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে দিব্যজ্যোতি বসু

ফুলন দেবী। ভারতবর্ষের আর পাঁচটা াধারণ গ্রামের মেয়ের মতই নিতান্ত াধারণ একটা মেয়ে। অত্যন্ত সাধারণ-ভাবেই প্রতিদিনের সূর্য, প্রতিরাতের চাঁদ ার জীবনে আলো দিত, ছায়া ফেলত। কোথাও কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। বাবার াণ মেটাতে গ্রামের বহু গরিব মেয়ের যেমন হয়, ওরও তেমনি মাত্র দশ বছর য়সেই বিয়ে হয়েছিল ৪০ বছরের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এক মরদের সংগে। বাবার বিয়ের মাত্র এক বছরের মধ্যেই াপেরবাড়ির অভাবের কুম্ভীপাকে ফিরে াসতে হয়েছিল ওকে। কেননা স্বামী খন অন্য 'জরু' নিয়ে এসেছে ঘরে। বশ্য এটাও তেমন কোন উল্লেখ করার ত ঘটনা নয়। আকছারই এমন হয়, ছে। কিন্তু এর কয়েক বছর পরই এই

তান্ত সাধারণ মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ম্বলের কুখ্যাত দস্যুসর্দার বিক্রম সিং-র দল। শুরু হয় ফুলনের দস্যুজীবন। স, সেই সংগে সংগে এই ঘর রস্থালী করা ফুলন সাধারণ মেয়ে কে পরিণত হল অসাধারণ এক নামে, বিশ্বাস্য এক চরিত্রে। অবশ্য এই মহান র্যটি সম্পাদন করল ভারতবর্ষের

বিভিন্ন সংবাদ—মাধ্যমগুলি। তারা ফুলনকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিল। কাগজে কাগজে, পত্রপত্রিকা-সাময়িকী-তে, রেডিও টি ভিতে ফুলনের খবর তো বটেই, যাত্রা সিনেমা, থিয়েটারেও ভারত বর্ষের প্রতিটি আনাচ-কানাচ ফুলনের খবরে খবরে ছয়লাপ। শুধু ভারতবর্ষই নয়, ফুলনের খবরের জন্য ছুটে আসতে লাগল বহু আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিরা। ফুলনের সৌন্দর্য, ফুলনের দুঃসাহসিকতা, ফুলনের প্রতিহিংসাপরা য়ণতা, ফুলনের প্রেম হয়ে উঠল সমস্ত পৃথিবীর সংবাদোপজীবীদের প্রধান উপ জীব্য বিষয়। মিডিয়া নেটওয়ার্কের কল্যাণে ফুলন হয়ে উঠল সুপার স্টার। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ফুলনের আত্ম সমর্পণ নিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে তুমুল সোরগোল তোলা হল তাও এই মিডিয়ার মাতামাতিরই ফল। সেই রেশ এখনও চলছে। এখনও ফুলনকে আঁকড়ে স্টার হবার আশায় হলিউড থেকে ছুটে আসছে সুসি কোয়েলো রোনোর মত ফ্যাশন মডেল অভিনেত্রী। কিন্তু ফুলনকে

নিয়ে এই যে এত মাতামাতি, ফুলন কি সত্যিসত্যিই তার যোগ্য? মে মাসের তিরিশ তারিখ গোয়ালিয়র সেনট্রাল জেলে ফুলনের সংগে কথা বলে আমার কিন্তু বরং উল্টোটাই মনে হয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন পাঠকও ফুলনকে দেখে বা তার সংগে কথা বলে আমার সংগে একমত হতে বাধ্য হবেন। অথচ আত্মসমর্পণের পরও জেলে ফুলনকে যেভাবে স্পেশাল বন্দোবস্তে রাখা হয়েছে তা আবার ওই মিডিয়ার প্রভাবকেই মনে করিয়ে দিতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয় এই প্রতিবেদক ফুলনের সংগে জেলের ভেতরে কথা বলতে যাওয়ার জন্য এখনও যে কত রকমের ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয় তা পাঠক-দের সামনে পেশ করবে। তারা আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না।

অপারেশন : ফুলন

গোয়ালিয়র পুলিশ দপ্তরের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল অযোধ্যানাথ পাঠক ঠোঁটের কোণে এক চিলতে সরু হাসি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কলকাতায় কে বেশি জনপ্রিয়, ফুলন দেবী না হেমা মালিনী?' জনপ্রিয়তা কথাটার আভিধা নিক অর্থ না হাতড়ে জবাব দিয়েছিলাম 'কলকাতায় ফুলনকে নিয়ে যাত্রা হয়। শুধু যাত্রাই যে হয় তা নয়, সেই যাত্রার জন্য বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালনা ধীন গ্রেট ইসটার্ন হোটেলে।' এরপর শ্রীপাঠকের ঠোঁটের হাসি কান অবধি পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঐ অবস্থাতেই ফোন তুলে লাইন চেয়েছিলেন গোয়ালিয়র সেনট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেনটের সংগে কথা বলবার জন্য। গোয়ালিয়রের অভিজাত এলাকা গান্ধী রোডে শ্রীপাঠ-কের বিশাল বাংলোয় বসে উনি কথা বলছিলেন। ঘড়িতে তখন মাত্র সকাল আটটার হুমকি, কিন্তু বাইরের আগুন মে মাসের গোয়ালিয়রে আমাদের মত ক্যালক্যাটানদের নাজেহাল করতে ডি আই জি সাহেবের বাইরের ঘর অবধি ধাওয়া করে এসেছে। আমরা বলতে আমি আর ফটোগ্রাফার সৌগত রায় বর্মন। শ্রীপাঠক অবশ্য আমাদের পরি-স্থিতি সমঝে সামনে ধরিয়ে দিয়েছেন দুটো 'ডিরেক্টরস স্পেশাল' গ্লাস ভর্তি

নিম্বু-পানি। নিম্বুপানির ঈষৎ ঘোলাটে ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম ফোন করতে করতে ডি আই জি সাহেবের মুখের নানান রকম অভিব্যক্তি। ঠোঁটের কোণ থেকে হাসিটা উধাও হয়ে গিয়েছিল, দুই ভুরুর মাঝখান থেকে ফুটে বেরোচ্ছিল বিরক্তি, খানিকটা অনুরোধ উপরোধের অভিব্যক্তির পর টেবিলের ওধার থেকে শুনতে পেলাম গমগমে আদেশের স্বর। যা আই পি এস অফিসারদেরই মানায়। টেলিফোন নামিয়ে রাখার পর আমাদের দিকে যখন উনি তাকালেন, তখন সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে অশান্তির আলো-আঁধারি। বললেন, 'এই সময়টা জেল কর্তৃপক্ষ ভীষণ কড়াকড়ি করছে। জানেন বোধহয় আত্মসমর্পণকারী ডাকু ঘনশ্যাম ফেরার হয়ে গেছে। তাই ফুলন, মালখান বা অন্যান্য ডাকুদের সংগে বাইরের লোকজনদের দেখা করতে দেওয়ায় জেল অথরিটি নানান রকম রেসট্রিকশন চালু করেছে। ঘনশ্যাম যদি না পালাত তবে পরিস্থিতি এ রকম হত না। (ঘনশ্যামের পালানর নেপথ্য ঘটনা পরে পাঠকদের জানাচ্ছি)। তখন এত সব পারমিশনেরও প্রয়োজন হত না। তা না হলে দেখুন না আপনারা মি মুখার্জির পারমিশন নিয়ে এসেছেন শুনেও জেল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে খানিকটা গড়িমসি করছিল। (আমরা গোয়ালিয়র আসার আগেই ভূপালে নেমে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের ইনসপেকটর জেনারেল, 'ইনটেলিজেনস ও আডমিনিসট্রেশন' বি কে মুখারজির সংগে দেখা করে ফুলন দেবী, মালখান সিং ও অন্যান্য ডাকাতদের সংগে কথাবার্তা বলার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে এসেছিলাম। উনিই আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন 'গোয়ালিয়রে গিয়ে ডি আই জি সাহেবের সংগে দেখা করলেই উনি আপনাদের সাহায্য করবেন')। থাকগে, জেল অথরিটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছেন আপনাদের জেলের ভেতর ঢুকে ফুলন ও অন্যানাদের সংগে কথা বলতে দিতে।' কথা বলা শেষ করেই পাঠক সাহেবের তর্জনী চলে গেল কলিং বেলের বাটনে। সংগে সংগে হাজির স্যালুট এবং বেয়ারা। বেয়ারার ওপর আদেশ হল 'ড্রাইভার কো বুলাও'। মুহূর্তের মধ্যেই ড্রাইভারের আগমন, অতঃপর আবার আদেশ : 'ইন দোনো বাবুকো সেনট্রাল জেলমে মাথুর সাহেব কো পাস লে যাও আওর বোলো সাবনে ভেজা।'

নিম্বুপানির পরিচর্যা ছেড়ে কান, মাথা ঘাড় সাদা তোয়ালে জড়িয়ে আমরা যখন ডি আই জি সাহেবের জিপে চড়ে সেনট্রাল জেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, বাইরে তখন রীতিমত লু চলছে। গরম হাওয়ার সংগে যুঝতে যুঝতে আমরা এগিয়ে চলেছি ইদানীংকালে অপরাধ জগতের সবচেয়ে গরম-চরিত্র বলে কথিত ফুলন দেবীর সংগে কথা বলতে। রাণী লক্ষ্মীবাঈর স্মৃতি বিজড়িত বিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গকে পেছনে ফেলে শহরের একেবারে শেষ সীমানায় এসে ডি আই জি সাহেবের লাল আলো জ্বলা জিপ দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রাকার পরিবেষ্টিত গোয়ালিয়র সেনট্রাল জেলে আমরা পৌঁছে গেছি। জেলের গম্বুজাকৃতি লাল দরজাটা ফাঁক করে সেনট্রি আমাদের ভেতরে যাবার পথ করে দিল। মিঃ মাথুর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয়পর্ব সাংগ হতে তিনি বললেন 'ফুলনদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা। তাই ওদের এই জেনারেল ব্যারাকে রাখা হয়নি। চলুন আপনাদের স্পেশাল জেলে নিয়ে যাই। তবে আপনাদের সংগের ক্যামেরা এখানেই জমা করে যেতে হবে। জেলের ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ।' অগত্যা

ফুলনের মুখোমুখি

সাধারণ কয়েদীর থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে ফুলনের মত অসাধারণ কয়েদীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আলাদা সেল, আলাদা রান্নাঘর, আলাদা বাথরুম-পায়খানা, আলাদা বন্দোবস্ত। সব কিছুই আলাদা। এখানকার সেনট্রিরাও একটু যেন বেশি স্মারট। আমরা স্পেশাল জেলের দোরগোড়ায় পৌঁছতেই পাহারারত সেনট্রি মি মাথুরকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, আপনি ভাল করে দেখে নিয়েছেন তো, আপত্তিকর কিছু নেই?' মাথুর তাকে আশ্বাস দেওয়ায় তবে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল সে। জেলের ভেতরে পা দিতেই চোখে পড়ল এক গাদা বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে। এত বাচ্চা ছেলে মেয়ে কোথা থেকে এল? প্রশ্ন করতে মিঃ মাথুর জানালেন, 'এখানে অনেকেই ফ্যামিলি নিয়ে আছে'। একটা ৪/৫ বছরের ফর্সা বাচ্চা মেয়েকে দেখিয়ে মিঃ মাথুর বললেন, 'ওই তো ফুলনের ছোট বোন মুন্নি। ও ফুলনের সংগেই থাকে।' বলতে বলতেই দেখতে পেলাম উত্তর দিক থেকে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ে এগিয়ে আসছে। পরনে টেরিকটের সাদা ফুল প্যানট আর সাদা হাফ হাতা শারট। না কোন মেয়েলি ছাঁচে বানান নয়, একেবারে সরাসরি পুরুষের পোশাক। দূর থেকে আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা বটগাছের তলায় সিমেনটের বাঁধান চত্বরে একটা পা তুলে দিয়ে একটু কর্কশ স্বরে ডাক দিল 'মুন্নি ইধার আ।' মিঃ মাথুর আমায় বললেন, 'ওই হল ফুলন।' মিঃ মাথুর বলার আগেই বুঝতে বাকি ছিল না যে ওই ফুলন। কিন্তু ফুলনের তো পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স হবার কথা। কাগজে পত্রে যা জেনেছি। এ তো দেখে মনে হয় আঠারোর বেশি হবে না। তাই, কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই নিরীহ, গোবেচারা চেহারার মেয়েটাই গোটা চম্বল এলাকা কাঁপিয়ে বেড়িয়েছে। ভাবতে ভাবতে ফুলনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেছি। মাথুর আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কি আগে ফুলনের সংগে ক বলবেন, না অনদের সংগে আগে ক বলে নেবেন?' আমি মিঃ মাথুরে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ততক্ষণে এগি গেছি ফুলনের কাছাকাছি। বটগাছে নিচে চাতালের ওপর বসে ফু আমাদের দিকেই দেখছিল। কাছে গি পরিচয় দিতেই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হা জোড় করে নমস্কার জানাল। কি কোথেকে রপ্ত করল ফুলন এরং অভ্যর্থনার অনায়াস ভঙ্গি। এ ে একেবারে বিমান সেবিকাদের মত রেডি মেড হাতজোড়, সেই সংগে ঠোঁট টি আলগা হাসি। কলকাতার সাংবাদি শুনে স্পষ্ট জবাব দিল, 'আপনারা সব সমান। সত্যি কথা কিছু লেখেন ; নিজেদের মনের কথা বানিয়ে বানি লিখে দেন। আপনাদের সংগে কী ক বলব?' ফুলনের কথাটা বাধ্য হয়ে হজ করতে হল। এই বোঁচা নাক, ক্ষুদে ক্ষু চোখ, মুখ ভর্তি রাড়তা, চার ফুট দশ ইঞ্চি অনাকর্ষণীয় অবয়বের বৈশিষ্ট্যহী ফুলনকে 'সুন্দরী', 'মোহময়ী' ইত্যা ইত্যাদি বিশেষণে সারা দুনিয়ায় পরিচ করিয়ে দিয়েছিল তো এই সাংবাদিকরাই ফেবরুয়ারিতে ফুলন ও তার দলবলে আত্মসমর্পণের আগে অবধিও ে প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল ফুলন বোধহ দ্বিতীয় হেমামালিনী। আত্মসমর্পণে পর খবরের কাগজে বিভিন্ন পত্রপত্রিক ওর আসল রূপ প্রকাশ পাওয়াতে জনগ আসল সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। ত দিনের আলোয় ফুলনকে একেবা সামনা সামনি দেখে আমার মনে হয়ে ক্যামেরাও ফুলনের প্রতি একটু বে পক্ষপাতিত্ব করেছে। ছবিতে ফুলনে দেহসৌষ্ঠব যদি বিন্দুমাত্রও ধরা পড়ে চোখে দেখা অভিজ্ঞতায় কিন্তু তা মিলি নেওয়া যায় না, হতাশ হতে হয় চেহারার দিক থেকে ফুলন একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন।

বটগাছের নিচেই ফুলনের পাশে ব ওকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন, কে তোমা নামে মিথ্যা লিখল ফলন জবাব দেওয়া আগেই চার-পাঁচজন লোক এগি এসেছে আমাদের সামনে। তাদের মে সর্বাগ্রে ফুলনের প্রেমিক মান সিং। মা সিং-এর প্রশ্ন : 'কী হচ্ছে এখানে সাংবাদিক এসেছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, কথা জেনেই মান সিং হাত নেড়ে ফুলনকে বলেছে 'কুছ মত বোল না, ক্যায়া ফয়দ কুছ না বোলো।' ফুলন অবশ্য মান সিং এর কথা শোনেনি। রূঢ়ভাবে জবা দিয়েছে, 'তুম যাওনা অভি, কলকাত্তাসে আয়া মেরেকো সাথ বাত করনে, ও মাথু সাবনেই তো লে আয়া, কেয়া হোগা বা করনেসে। ম্যায় আপনা জবান বে সামাল না সেক্যা হুঁ।' মান সিং যায়নি কাছেই ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে ফুল বা আমার কথার মধ্যে কোন নাক গলা নি। মান সিং-এর বাধা সরিয়ে দিয়ে ফুল আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেয়া বোল অপনে?' প্রশ্ন শুনে ফুলনের মুখের ভা খানিকটা বদলেছে। জবাব দিয়েছে : ' না লিখেছে, প্রত্যেকে। আমায় লাকারাম

সাংবাদিকদের মুখোমুখি ফুলন দেবী

রিয়াম বন্দী করে দিনের পর দিন ধর্ষণ রেছে এ কথা কোন কাগজ না লিখেছে? মি নষ্ট চরিত্রের একথা তো খোল গল্প যে সব কাগজে ছাপা হয়েছে। তারপর মায় নিয়ে নাটক হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে, ব মিথ্যে ঘটনা সাজিয়ে, মিথ্যে গল্প নিয়ে। আপলোগোনে হামকো বিলকুল নডি বনা দিয়া।' ফুলনের এই ভিযোগের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেছি ন তুমি নিজের মুখেই তো বলেছিলে লালারাম সিরিরাম তোমায় নিয়ে জাক' করেছে, তাই তুমি বেহমাইতে র্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছ?' ফুলনের দে ক্ষুদে চোখ দপ করে জ্বলে উঠেছে: বলেছে আমি এ কথা বলেছি। মার প্রাক্তন প্রেমিক বিক্রম মাল্লারকে লালারাম সিরিরাম মেরেছিল অত্যন্ত পুরুষের মত। ক্লোরোফরম দিয়ে জ্ঞান করে, গুলি চালিয়েছিল ওরা। মাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা ঠই। কিন্তু ঘরে আটকে রেখে দিনের দিন আমার ওপর অত্যাচার লিয়েছে এ কথা আমি কোথাও বলিনি। ক্রমকে ওরা মেরে ফেলার পর আমায় রে ফেলার জন্য সিমরা গ্রামে নিয়ে য়েছিল। কয়েকজন পন্ডিত সে যাত্রায় চিয়েছিল। সেই পন্ডিতরা এখনও বেঁচে ছে। ওদের কাছে গেলেই আমার কথা না যাবে। কিন্তু তা তো কেউ যাবে । গেলে যে গল্প বানানো যাবে না। মি পরদিনই ওদের খপ্পর থেকে লিয়ে জঙ্গলে চলে আসি। আমায় য় যা লেখা হয়েছে সব ঝুট বাত।' পার অক্ষরে ঝুটবাত কি সাচ বাত খা হয়েছে তা পরীক্ষা করার মত ক্ষরজ্ঞান কি ফুলনের আছে? ফুলন নিয়েছে না সে পড়তে লিখতে জানে তবে তার দলের কেউ কেউ আছে া পড়তে পারে, লিখতে পারে, তারা নকে সমস্ত কথা জানিয়েছে। তা া জেলের প্রহরীদের মধ্যেও অনেকে ক পড়ে শুনিয়েছে 'মনোহর কহানিয়া', মযুগ' ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিযোগ তে শুনতে ফুলনকে বলেছিলাম মার ছবি দেখবে? স্বাভাবিক লাসুলভ ঔৎসুক্য নিয়ে সংগে সংগে ও বাড়িয়েছে 'কই দেখি।' আমাদের গ একটা এ বছরের ৩০ মার্চ সংখ্যার রিবর্তন' ছিল, সেখানে ফুলনের ত্মসমর্পণ পর্বের ছবি ছাপা হয়েছিল।

হাতে দিতেই পটাপট পাতা টাতে শুরু করেছে ফুলন, হুমড়ি খেয়ে ছে মান সিং-এর দল। ফুলন নিজের নানানভাবে দেখে, আবার পাতা টাতে শুরু করেছে। পাতা ওলটাতে টাতে চোখ আটকেছে এক সুন্দরী লার ছবির ওপরে। আসলে ওই টা ছিল পাকিস্তানের সেরা চিত্রাভি ী শবনমের। কিন্তু ফুলনের ধারণা রীতা ভাদুড়ীর ছবি। আমি বললাম, । রীতা ভাদুড়ীর নাম শুনেছ?' মুখনা ই জবাব দিল: 'কেন শুনব না। ওই ফিলমে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ সব জামা ড় পড়ে ছবি তুলেছে, আবার নাম ছে কাহানী ফুলন কী'। ওরা ফুলনকে কোন দিন চোখেই দেখেনি, খালি বদমায়েসি করার জন্য এসব করেছে।'

ফুলনের রাগের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে দেখে প্রশ্ন করেছি, 'আচ্ছা ফুলন এর আগে কাগজপত্রে তোমার ডাকাত হবার কারণ হিসাবে যেগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি সত্যি না মিথ্যে?' ঘাড় গোঁজ করেই ফুলন জবাব দিয়েছে: 'সব মিথ্যে তা বলছি না। তবে কেউ কেউ লিখেছিল আমি বদলা নেবার জন্য বাগী হয়েছি। মোটেই তা নয়। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় আমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাতে আমি বিক্রম মাল্লার হাতে ধরা দিয়েছিলাম। তবে একদিকে বিক্রম আমার উপকারই করেছিল। তখন আমি যদি বাগী না হতাম তা হলে আমার পরিবারের লোকজন অত্যাচারিত হতে হতে শেষ হয়ে যেত।' 'কী রকম?' প্রশ্নের জবাব পেয়েছি, 'আমার গ্রামের রিস্তেদাররা (আত্মীয়রা) আমাদের ক্ষেত জমিন সব লুটেপুটে নেওয়ার চেষ্টায় ছিল। আমরা চার বোন ছিলাম আর মাত্র এক ভাই। তাও ভাই ছোট। বাবা আবার গোবেচারা ছিল। যে যা বোঝাত, তাই বুঝত। আমার দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ইটাওয়াতে। ও শ্বশুর বাড়িতেই থাকত। বড় বলতে বাড়িতে আমিই ছিলাম। আমিই ঝগড়াঝাটি করতাম, চেঁচাতাম। কিন্তু তার বেশি আমার কিছু করার ছিল না। এর মধ্যে আবার আর একটা উপদ্রব ছিল। প্রায়ই বিক্রম মাল্লার দল আমাদের গ্রামে এসে আশ্রয় নিত। আমাদের বাড়ি থেকেও কিছু না কিছু দিতে হত। আমরা এমনিতেই গরিব ছিলাম। তাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেও আমি গলাবাজি চালাতাম। কিন্তু কোন ফল হত না, বরং আমার পরিবারের শত্রুরা পুলিশে খবর দিত, আমরা ডাকাতদের আশ্রয় দিই, খাবার দিই ইত্যাদি ইত্যাদি। পুলিশ এসে আমাকে অনেকবার ধরে নিয়ে যেত, নানাভাবে পীড়ন করত। কিন্তু আমার কিছু করার থাকত না। মনে মনে ফুঁসতাম। এরপর একদিন রাতে বিক্রম সিং ও তার লোকজন আমার বাড়ি চড়াও হল। ওরা আমায় খুঁজছিল। পরে বিক্রমের কাছে শুনেছি ওদের কাছে খবর ছিল আমি পুলিশকে ওদের খবরাখবর সব দিয়ে দিই। তাই ওরা আমায় তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল। আমি লুকিয়ে পড়ায় আমার ভাইকে ওরা গুলি করে মারবে বলে হুমকি দেয়। আমার একমাত্র ভাই শিওনারায়ণ। ওকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসতাম। তাই তখন আমার ধরা না দিয়ে কোন উপায় ছিল না। ওদের হাতে ধরা দিলাম। আস্তে আস্তে ডাকাতদের সংগে থাকতে থাকতে ডাকু বনে গেলাম। বিক্রমই আমাকে প্রথম বন্দুক চালাতে শেখায়। নিশানা ঠিক হবার পর বিক্রম আমাকে ১২ বোর রাইফেল ব্যবহার করার জন্য দেয়। ওই বন্দুক দিয়েই আমার হাতেখড়ি।' বিহড়ের অনিশ্চিত জীবনযাপনের সময় রাগেই হক, প্রতিশোধের তাগিদেই হক আর নিছক অপরাধপ্রবণতার জন্যই হক ফুলন কতগুলি প্রাণহরণ করেছে, এ প্রশ্নের উত্তরে ফুলন স্পষ্ট জানিয়েছে; 'নেহি বোলুংগা।' ফুলনের নিজের মুখে এই স্বীকারোক্তি না পেলেও ওকে আবার প্রশ্ন করেছি 'কাগজপত্রে যে লেখা হচ্ছে তুমি বেহমাইতে একসংগে ২০ জনকে হত্যা করেছ, এ কথা কি সত্যি না মিথ্যে?' ফুলন এবার মান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আমি যে বার বার বলছি, এ গুলো মিথ্যে কথা, আমি বেহমাইতে কোনদিন যাইনি। এর বেশি আমায় আর কিছু জিগেস কোর না তো, কিছু বলব না।' হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রশ্নে যাই, 'তুমি একেক সময়ে একেক দলে ছিলে শুনেছি। এ পর্যন্ত কবার দল বদলিয়েছিলে?' ফুলন: 'আমি বিক্রমের সংগে থাকার সময় কোন দলে যাইনি। এরপর কিছুদিন বাবা মুস্তাকিনের সংগে থাকি, কিছুদিন ঘনশ্যামের সংগে থাকি। এরপর নিজেই দল গড়ে নিই।' 'তুমি আত্মসমর্পণ করলে কেন?' এই প্রশ্নে ফুলন মুখস্থের মত জবাব দিয়েছে 'মালখান সিং আত্মসমর্পণ করার পর থেকেই আমরা ভাবছিলাম আমরাও আত্মসমর্পণ করব। বিহড়ের জীবন আর ভাল লাগছিল না। কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করছিলাম অনেক দিন ধরেই। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মসমর্পণ করতাম না যদি চতুর্বেদী (রাজেন্দ্র চতুর্বেদী, গোয়ালিয়রের এস পি) সাহেব জবান না দিতেন যে আমার ভাইয়ের চাকরি দেবেন, আমার পরিবারের দেখ

চলচ্চিত্রে ফুলন : রীতা ভাদুড়ী

বাবা [illegible]

...ল' করবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা ইউ পি পুলিশের হাতে আমায় তুলে দেবেন না। এই অংগীকার করার পরই আমি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হই।' এখন গোয়ালিয়র জেলে ফুলন কি নিশ্চিন্তে আছে? ফুলনের অভিব্যক্তিতে তা তা মনে হল না 'নিশ্চন্ত আর কই। আমাদের তো পাঁচ বছরের সাজা হয়ে গেছে। সাজা মকুব করার তো কোন কথা শুনতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া আমার বাবা শুনছি আবার ইউ পি তে ফিরে গেছে। চতুর্বেদী সাহেব কথা দিয়েছিলেন আমার পরিবারের দেখাশোনা করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বাবাকে কে বা কারা ইউ পি তে নিয়ে গেল? এটা আমার জানা দরকার।' — 'তোমার মা, বোনেদের সংগে তোমার দেখা হয় না?' অনেক দিন মা বোনেদের দেখা না পেয়ে ঈষৎ বিষণ্ণ ফুলন দুঃখ প্রকাশ করল — 'না অনেক দিন ওদের দেখা নেই। কেয়া পাত্তা ওরা কোথায় আছে?' কথা বলতে বলতে ছোট বোন মুন্নিকে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল। ওকে জিজ্ঞাসা করেছি ওকে তোমার কাছে রেখেছ কেন? জেলে থাকতে ওর অসুবিধা হয় না?' মুন্নিকে আদর করতে করতে ফুলন বলেছে, 'না, না, ওর দিকে আমি খুব নজর দিই। জেল থেকে দুধের ব্যবস্থা করেছি। আসলে আমি যখন বাড়ি থেকে বিগড়ে চলে গেছি তখনও মুন্নি হয়নি। আত্মসমর্পণের পর ওর সংগে আমার পরিচয়। আশ্চর্যের কথা, মুন্নিও কিন্তু আমার কাছে থাকতে কোন আপত্তি করেনি। ও আমার কাছেই শুয়ে থাকে।'

ফুলনের পরিবার : ডানদিক থেকে মা, ছোট বোন ও পিছনে ভাই

আলোকচিত্র : সৌগত বসু রায়

ফুলন-মান সিং-এর বেডরুম

বিশেষ জেলে ফুলনের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ সেলটা দেখবার কথা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিলাম। এই প্রসংগে ওকে বললাম, 'তুমি আর মান সিং তো একই সংগে থাক, চল তোমাদের সেল দেখব।' পাঁচ ফুট বাই আট ফুটের আয়তাকার একটা সেলের মধ্যে ফুলন-মান সিং-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা ওরিয়েনট টেবিল ফ্যান। মাটিতে বিছানা পাতা। ঘরের কোণে ছোট্ট তাকে টুকিটাকি জিনিস, আয়না, চিরুনী, ইত্যাদি। মেঝেতে এক কোণে একটা মাটির হাঁড়ি রাখা। আর ঘরের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত একটা দড়িতে মান সিং আর ফুলনের প্রয়োজনীয় জামা কাপড়। মুন্নির দুয়েকটা জামাও দেখলাম ঝুলছে। ঘরের ভেতরে আর না ঢুকে বেরিয়ে এসে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশ্য গৃহকর্ত্রীর ভঙ্গিমায় ফুলন অনেকবার ঘরের মধ্যে আসতে বলেছিল, কিন্তু সেলের ওই স্বল্প পরিসরের চাইতে বাইরের বটগাছের নিচই আমার বেশি ভাল লাগছিল। ফুলনকে তাই বটগাছের নিচেই ফিরে যেতে অনুরোধ করলাম। ফুলনের কাছ থেকে জানতে চাইলাম ওর বাগী জীবনে পুলিশের সংগে সবচেয়ে বড় 'এনকাউনটার' কোথায় হয়েছে? উত্তর শুনে আশ্চর্য হলাম। পুলিশের সংগে একবারও ফুলনের মুখোমুখি মোলাকাত হয়নি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান চষে বেড়িয়েছে ফুলন, এমনকি সুদূর নেপাল সীমান্তেও পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু পুলিশের সাধ্যি হয়নি ওর চুল ছুঁতে। বরং ফুলনের মাথার দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই ধরনের দুঃসাহসী জীবন-যাপন ফুলনের দ্বারা কী করে সম্ভব হল এ কথাটাই বার বার ঘুরে ফিরে আমার মাথায় ধাক্কা মারছিল। তাই সরাসরি ফুলনকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি তো বললে তোমার সম্পর্কে বেশির ভাগই ঝুট বাত লেখা হয়েছে, কিন্তু তুমি নাকি নেপাল অবধি চলে গিয়েছিলে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে, এ কথা কি সত্যি?' এ রকম সন্দেহ প্রকাশ করায় ফুলন ক্ষুব্ধ হল কি না বুঝতে পারলাম না, অকারণে মুন্নির পিঠে একটা চড় মেরে বলল, 'গিয়েছিলামই তো, কেন তোমার সন্দেহ আছে নাকি? আমরা সেওড়ার জংগলের মধ্যে দিয়ে নেপাল চলে গিয়েছিলাম। শুনেছি, আমার মাথার জন্য নেপাল সরকার এক লক্ষ টাকা ইনাম ঘোষণা করেছিল।' এ কথা বলার পর ফুলন ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আমি ঘরে যাব, আমার কাজ আছে। তোমার সংগে আর কথা বলব না, তুমিও তো একগাদা মিথ্যে কথাই লিখবে। আচ্ছা, তুমি কি হিন্দিতে লিখবে?' ঘটনার আকস্মিকতায় আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফুলনের সেই হাত জোড় করার অভিজাত ভঙ্গিমা দেখতে দেখতে পাশ থেকে শুনতে পেলাম সৌগত প্রশ্ন করছে, 'জেল থেকে বেরিয়ে তুমি কী করবে?' নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফুলন জবাব দিয়েছে — 'কোই পাত্তা নেহী।'

ফুলন কি সত্যিই ভয়ংকরী?

বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অপসয়মাণ ফুলনকে দেখতে দেখতে একগাদা প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে, সত্যি সত্যিই কি এই ছোট্ট, গ্রাম্য মেয়েটি এমন সব ভয়ানক কাজকর্ম করেছে? না কি অন্য ডাকাতরা সেইসব কাজগুলি করে ফুলনের নামটা ব্যবহার করেছে? ফুলনকে যারা বাগী জীবনেও বহুবার দেখেছে সেইসব বহু গ্রামবাসীর দৃঢ় ধারণা কিন্তু এরকমই।

তবে ফুলনের নারকীয় শক্তি সম্পর্কিত যেসব কাহিনী পত্রপত্রিকায় চালু আছে, ফুলনকে চোখে দেখে এবং ওর সংগে কথা বলে আমার সেই সব কাহিনী সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্মে গেছে। এর জন্য দায়ী ফুলনের অতি সাধারণ চেহারা এবং তার চাইতেও অত্যন্ত সাধারণ আচার আচরণ। □

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু চিকিৎসা বিভাগ এত ক্ষুব্ধ কেন ?

শনু ঘোষাল

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ফ্যাকালটি বিভাগের পরীক্ষা দিতে পারলেন না পশু চিকিৎসাব ছাত্ররা। বেলগাছিয়ার পশু চিকিৎসার শিক্ষক কর্মচারীরা তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা ১৫ ডিসেমবর ৮২ থেকে ধর্মঘট করতে আরম্ভ করেছেন। কারণ ? তাঁদের বলা হয়েছিল অপশন দিতে। কিন্তু তাঁবা তাঁদের সহকর্মীদের মত আগেকার তারিখে অপশন দিতে চাইলেন। কর্তৃপক্ষ মানলেন না তাঁদের এই অযৌক্তিক দাবি। তাই নামলেন কর্মচারীরা ধর্মঘটের পথে। হেনস্থা হলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মন্ডল।পবীক্ষা দিতে না পারায় ছাত্র-ছাত্রীদেব মানসিক চাপ পড়ল।

কেন এই বিক্ষোভ ? কেন এই নৈরাজ্য ? পশু চিকিৎসা বিভাগ ১৯৭৫ সালের সেপটেমবরে যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এল ঝামেলা কি তখন থেকে সৃষ্টি ? না, সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল অনেক আগে থেকে ? একটা ব্যাপার এখানে পরিষ্কাব থাকা দরকার। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা গন্ড গোল এখানে সেখানে থাকলেও আজকের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে সবটাই পশু চিকিৎসা বিভাগের (ভেটেবিনারি ফ্যাকালটির) জন্য।

আজকে বেলগাছিয়াব পশু চিকিৎসকরা সব সময় উল্লেখ করেন, তাঁরা ছাত্র অবস্থায় বেংগল ভেটেরিনারি কলেজে কী সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। তাঁরা পেয়ে ছিলেন বেলগাছিয়া কলেজেব মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ উন্নত পর্যায়ের খামাব, গোশালা, মুরগির খামাব, পশুখাদ্য ঘাসের ঋতুকালীন চাষ ব্যবস্থা, অশ্বচালনা শিক্ষা, বিভিন্ন গৃহ-পালিত জন্তুব পৃথক পৃথক হাস-পাতাল, রেসের ঘোড়ার চিকিৎসার সুযোগ, সারকাস আব পশুশালার হিংস্র জন্তুর চিকিৎসা। কিন্তু আজকের মোহনপুরের কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আওতায় সে সব কিছুই প্রায় নেই বলতে গেলে।

বিক্ষোভের গভীরে পৌঁছবার আগে পশু চিকিৎসা আর তার চিকিৎসকদের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞানেব পশু চিকিৎসা শাখা একটি উজ্জ্বল বিভাগ। একজন সার্থক পশু চিকিৎসকেব বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে পড়াশুনো করার যে সুযোগ, অন্যান্য ক্ষেত্রেব চিকিৎসকের সে সুযোগ নেই। নিজের বিদ্যা ছাড়া তার থাকছে পশুপালনের বিস্তৃত কার্য কর জ্ঞান, পশুখাদ্য ঘাসের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি আমেবিকা, কানাডায় পশু চিকিৎসার ছাত্ররা জেনেটিক ইনজি-নিয়ারিং,ক্যানসার গবেষণা, জীবা-ণুতত্ত্বে মৌলিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। ব্যাপক পশু চিকিৎসার পাঠ্যসূচী আর চমকপ্রদ মানুষগুলিই হয় পশু চিকিৎসক। চীনের মহান ধর্মপ্রবর্তক কনফুসিযাস ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন উদ্যান এবং পশু পালনের অধিকর্তা। রানী এলিজা বেথ ১৯৮২র ৩১ ডিসেমবর 'সপ অপেরা'র প্রখ্যাত যে শিল্পীকে নাইট উপাধি দিয়েছেন তিনি ব্যক্তি-গত জীবনে পশু চিকিৎসক। অলি-মপিকের প্রথম ভাবতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন দৌড়বীর ডাঃ পি সি ব্যানারজি। ইনিও পশু চিকিৎসক ছিলেন। ওয়েসট ইনডিজের টেসটে ক্রিকেট দলের ক্যাপটেন এবং পরে ম্যানেজার ডাঃ ফ্রানজ আলেকজান-ডার, পূর্বতন সাঁতারু ব্রজেন দাস সকলেই পশু চিকিৎসক। অজস্র নামের ভিড়ে মাত্র দুটি মানুষের কথা বলে এ তালিকা শেষ করব।একজন ডাঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ। আশি বছরের বৃদ্ধ। আমেরিকা প্রবাসী এই ভদ্রলোক ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দান করেন দুঃস্থা নারীদের নারসিং আর মিডওয়াইফারি শিক্ষার জন্য। অপরজন উপজাতি কল্যাণ বিভা-গের পূর্ণমন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মানডি। তিনিও একজন পশু চিকিৎসক। এত বিখ্যাত সব ব্যক্তি এ বিভাগ থেকে বেরিয়েছেন।তবু এই নৈরাজ্য কেন ? উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ডাঃ পি সি দাস বললেন, -বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারি কলেজ শুধু কলকাতার মেডিকেল কলেজেব আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নয়। এই কলেজ দেশ-বিদেশের ছাত্রদের চরিত্র গঠন কবত। যেমন সিংহল, ইন্দো-নেশিয়া, বার্মা, নেপাল প্রভৃতি দেশগুলির ছাত্ররা এখানে শিক্ষা আব চরিত্র গঠন কবে নিজেব দেশকে গড়তে সাহায্য কবতেন। আজ সেই চরিত্র গঠনের বেওয়াজ কোথায় ?

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু বিভাগেব নৈরাজ্য কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। ১৯৫৬ সালের গোড়া থেকেই কথা চলছিল বেল-গাছিয়াব বেংগল ভেটেরিনারি কলেজ মোহনপুরে উঠে যাবে। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি নির্বিশেষে সকলেই শুধু হতাশই নন, রীতিমত দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়েছিলেন। অনেকে আছেন যারা টিউশানি করে পড়াশোনা চালান,তাঁদের মাথায় হাত। মাসটার মশাইদের চিন্তা বাড়ল, কলকাতা ছাড়লে সবদিক দিয়ে অসুবিধা। কিন্তু তখন তাঁদের প্রতিবাদের জোরাল ভাষা ছিল না বলে ছাত্র শিক্ষক সকলে এককাট্টা হতে পারেননি।

তাদের, বিশেষ করে শিক্ষকদের কাছে বিরাট একটা ধাক্কা এল ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার জ্বালানি ও রাসায়নিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের কথায়। ডঃ সেন এসেছিলেন ১৯৫৬-৫৭ সালের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে। উপস্থিত শিক্ষকরা বল-লেন, অন্যায়ভাবে কলেজটা শহর থেকে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পবিবেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই প্রচন্ড। সব শুনে যাদব পুব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপা চার্য বললেন, বেশ তো। আপনাদের আন্দোলন করা উচিত। শিক্ষকদের হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে সংগে সংগে মন্তব্য করলেন, কেন চাকরি যাবে ?

তখন না বুঝলেও বেশ পরে ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সকলেই বুঝে ছিলেন প্রতিবাদ না কবলে কথা কেউ কানে নেয় না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ই কি অবিচার করে-ননি ১৯৬১-৬২ সালে বেতন ভিত্তিতে ধর্মঘটী পশু চিকিৎসার ছাত্রদের ওপর ? অনেক গরিব ছাত্রদের এই ধর্মঘটের বলি হিসেবে ছটি মাস পরীক্ষায় পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। ডাঃ রায় আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন ছাত্রদের মিথ্যা স্তোক দিয়ে। বলেছিলেন, আমি বিধান রায় বলছি তোমরা ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়ে পড়াশোনা কর। তোমাদের পে-স্কেল ভাল করে দেব। হ্যাঁ, তিনি মাইনে বাড়িয়েছিলেন ঠিকই, তবে মোটে পঞ্চাশ টাকা, যেখানে ছাত্রদের দাবি ছিল, অন্যান্য শ্রেণীর ডাক্তার-দের বেতনক্রমের সমান করা। জনৈক পশু চিকিৎসক এ প্রসংগে মন্তব্য করেন, বিধান রায়ই চেয়ে ছিলেন কলেজ মোহনপুরে নিয়ে যেতে, পে-স্কেল ভাল করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর নামের ইউনিভারসিটিতে গন্ডগোল তো হবেই।

ভারতের কোন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

পশু চিকিৎসা বিভাগ

আওতায় কখনই যেতে চায়নি। আজও বোম্বে মাদ্রাজ জব্বলপুর প্রভৃতি বেশ কয়েকটা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৃষি বিদ্যালয়ের আওতায় যায়নি। ১৯৭৭ সালের ফেবরুয়ারি মারচে অনুষ্ঠিত তিরুপতিতে সর্বভারতীয় 'শূকর পালনের আধুনিকতম পন্থার' সম্মিলনীতে মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলেজের ডীন তথা পশুচিকিৎসা ও গবেষণা বিভাগের অধিকর্তা ডঃ ভি রত্ন সভাপতি এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, আমরা কেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাব ? কটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাদের মধ্যে থেকে হয়েছেন ? কথাটা সত্যি। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও অন্তত আজ পর্যন্ত কেউ পশুচিকিৎসা থেকে উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেননি।

একেবারে গোড়ায় যখন কথা উঠেছিল বেলগাছিয়ার কলেজ মোহনপুরে উঠে যাবে, তখন ছাত্র শিক্ষক-কর্মচারী সেটা যেমন মনে প্রাণে মানেননি তেমনি জোরদার কোন আন্দোলন গড়ে তোলেননি। কিন্তু আজ বেলগাছিয়া বনাম মোহনপুরের লড়াই কেন ? কারণ গংগা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যাবার সংগে সংগে পশুচিকিৎসার লড়াকুরা দেখেছে দু-দুটি যুক্তফ্রন্ট রাজনৈতিক ডামাডোল। সত্তর দশকের মাৎসন্যায় ইত্যাদি। তাই চাপ সৃষ্টি করে বেলগাছিয়ার সবকটি বিভাগ মোহনপুরে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শল্য চিকিৎসা বিভাগ যথাপূর্বং তথা পরং।

বেলগাছিয়ার দলের মতে মোহনপুরে ভেটেরিনারি কলেজ যাবার কোন পরিবেশই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন খামার এমনকি গরু পর্যন্ত নেই। পশুশালা, সার্কাস আর রেসের ঘোড়ার চিকিৎসা তো দূরের কথা, দেখারই সুযোগ ঘটবে না।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শ্রদ্ধেয় মাসটারমশাই কলেজ মোহনপুরে থাকার ব্যাপারে বিশেষ সোচ্চার। ও পক্ষে যেমন নানা স্বার্থ আছে এ পক্ষও নানা স্বার্থে জড়িত। প্রমোশনের ব্যাপারে আছে, অনেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত ছিলেন। ভুলে গেলে চলবে না কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙেই বিধানচন্দ্রের গোড়াপত্তন। অনেকের স্ত্রী হয় শিক্ষিকা, না হয় চাকরি বাকরি করছেন। মজা আরও আছে। যাঁরা কিছুদিন আগেও বেলগাছিয়াতে গলা ফাটিয়েছিলেন তাঁরা আবার মোহনপুরে এসে সুর পালটেছেন। কারণটা কী ? প্রমোশন ? মোহনপুরেই কলেজ থাকবে এই মতবাদের দলের অনেকের মধ্যে আছেন কিছু চিকিৎসক। বেলগাছিয়ার মাসটারমশাইদের অসুবিধার কথা বলা হলে এঁরা বলেন সাধারণ মানুষ বাড়ি পালটানর সময়ই তো দেখে এটা নেই, ওটা নেই। কত অসুবিধা। এখানেও হবে প্রথম প্রথম, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দুটি দলের মধ্যে এই দ্বিমুখী নীতি কেন ? অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন যেহেতু তাদের বলা হয়েছিল স্নাতকোত্তর এবং ডকটরেট না করলে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনক্রম দেওয়া হবে না। ঐসব মাসটার মশাইদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রভৃতির কথা বললে বলেন কাদের কাছে ডকটরেট করব ? আমারই ছাত্রর কাছে ? না, মশাই এই বুড়ো বয়সে আমারই ছাত্রকে আর তেল মাখাতে পারব না।

ছাত্ররা সব ব্যাপারটার ওপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ। তারাও তাঁদের মাসটারমশাইদের মত স্বার্থানুসারে দুই শিবিরে বিভক্ত। যদিও ওঁদের অসন্তোষ নানা ব্যাপারে তবু সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় পাশ করার পর চাকরির বেতনক্রমের ব্যাপারে। সেই ডিগরি কোরস চালু হওয়ার সংগে সংগে ওরা মেডিকেলের বেতনক্রম দাবি করে এসেছেন কিন্তু আজও সেটা পেলেন না। অথচ কৃষি বিভাগ সহজে সেটা কীরকম করে আদায় করে নিল। নন-প্রাকটিসিং ভাতা এখনও পশু চিকিৎসকরা পাননি, পশুচিকিৎসা বিভাগ থেকে কেউ না হয়ে কৃষি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তরে ডীন হচ্ছেন। একজন পশুচিকিসক কৃষি-বিভাগে চাকরি পাবেন না অথচ কৃষি বিভাগের স্নাতক পশুপালন দপ্তরের অধিকর্তা হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

বিধানচন্দ্রের নিজস্ব বেশ কিছু ঝামেলা আছে। হিসাব-পত্র নিয়েও অনেকে কথা বলেন। আই সি এ আর যে মোটা টাকা দিত এ-সব কেলেংকারির জন্য সেটা বন্ধ। পশুচিকিৎসা বিভাগের মত কৃষি বিভাগেও ঝামেলা পাকাবে যেদিন কল্যাণী থেকে কৃষিবিদ্যার স্নাতকোত্তর বিভাগ মোহনপুরে তুলে নিয়ে আসা হবে, একথা বললেন ডঃ এম পি হালদার। কারণ স্বার্থ সেই এক। কলকাতার মত কল্যাণীরও বিস্তর সুবিধা। মোহনপুরে এলে সেই সকাল দশটায় মিনি বাসে প্যাক হয়ে এসে বিকেল পাঁচটায় ফিরতে হবে।

আলোকচিত্র :
লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

“ওঃ, তুমি না বড্ড বেশী প্রশ্ন করো, এবার যাওতো ছুট্টে বাবাকে বার্লিটা দিয়ে এসো।”

“বাবা, বাবা, এই নাও তোমার বার্লি।”

ROBINSONS
PATENT
BARLEY

রবিনসনস্ বার্লি

হালকা আর সহজে হজমের পথ্য

LINTAS(C)/ROB/2/2438 BG

প্রচ্ছদ কাহিনী

সরকারি উদাসীনতাই বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পকে বিস্বাদ করে তুলছে

মিষ্টি বাংলার নিজস্ব শিল্প। সন্দেশ, রসগোল্লা মিষ্টি দই - কেবল বাঙালির নয় তাবৎ মানুষের কাছে প্রিয় খাদ্য। মিষ্টান্ন শিল্পের মধ্যে সন্দেশ, রসগোল্লা, দই এই বাংলা ছাড়া অন্য কোন দেশের কারিগর এখনও তৈরি করাব ঠিক কৌশলটি রপ্ত করতে পাবেননি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং বিদেশেও ইদানিং কালে 'বাঙালি সুইটস' বা 'কলকাতা সুইটস' এর দোকান দেখা যায়। হরেক রকম মিষ্টিব মধ্যে কিন্তু বসগোল্লা, সন্দেশ আর বাঙালির মিষ্টি দই তৈরি কবার কারিগরটি কিন্তু অবশ্যই বাঙালি। উপযুক্ত ঘরানা বা শিক্ষা না থাকলে চট করে এইগুলো তৈরি করতে সকলে এখনও পারেন না। হুবহু অনুকরণ করে এই মিষ্টির স্বাদ আনা যায় না। সব জায়গাব সব নয়, কোন বিশেষ জায়গাব বিশেষ মিষ্টি ভাল। কারিগরের হাতযশই এর কারণ। কোন নিয়ম নয় কেবল অভিজ্ঞতাই এদেব সম্বল।

জয়নগরের মোয়া ভাল, জনাই এর মনোহরা, চন্দননগরের জলভরা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, দুর্গাপুরেব কালাকান্দ, বহরমপুরের ছানাব বড়া, কৃষ্ণনগরেব সরপুরিয়া সবভাজা, রানাঘাটেব পানতুয়া, গুপ্তি-পাড়ার কাঁচাগোল্লা আর মোল্লাবচকেব দই ও ভাল। এক ডাকে চেনা যায়। এক এক জায়গার কারিগব এক একরকম মিষ্টি তৈরির বিশেষ কৌশল জানেন। আজ কিন্তু আর কোন নির্দিষ্ট অংশ বা বিশেষ জায়গায় মিষ্টি তৈরিটা আটকিয়ে নেই। নামও কিছুটা পালটেছে। এক ডাকে মনোহরা, জলভরা, কাঁচাগোল্লা হয়েছে সন্দেশ। ল্যাংচা পানতুয়ার সাবা বাংলায় মোটামুটি একই কদব। সেই সংগে একই আদর বিশেষ ধরনের মিষ্টি দই এর। এই সন্দেশ, রসগোল্লা, দই তৈরির মিষ্টির দোকান এখন কেবল ময়রাদের আওতায় নেই। বাঙালি নব বৈশ্যর দল দোকানেব মালিক হয়ে এখন ময়রা ঘরের কারিগব দিয়ে দোকান চালাচ্ছেন। সংগে রেখেছেন কচুরি, সিংগাড়া, লুচি, রাধাবল্লভী, আলুর দম, ছোলাব ডাল, সেই সংগে চা আর বিশেষ ক্ষেত্রে কোলড ড্রিংকসও পাওয়া যাবে। চা বা লস্যির জন্য কারিগর লাগে। বিশেষ কোমপানির কোলড ড্রিংকসগুলো বোতলভরা অবস্থায়ই পাওয়া যায়। বেশির ভাগ শহুরে দোকানেই পাতা বা ভাঁড়েব ব্যবস্থা কমে গিয়েছে। জায়গা নিয়েছে প্লেট গ্লাস। কখনো কাচের কখনো অ্যালুমিনিয়ামের।

'যেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়' –রসিক কবির এ উক্তি সমর্থন মিলবে সারা বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পে। যা ছিল একান্ত লৌকিক, মা ঠাকুমার হাতে গড়া, মনের ছাঁদে গড়া সেই শিল্প কয়েকশো বছরের সাধনায় বাঙালি কারিগরদের হাতে পেয়েছে ধ্রুপদী রূপ। থরে থরে হরেক রূপের হরেক স্বাদের সেই সাজান সম্পদ এখন দ্রুত অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই একান্ত নিজস্ব শিল্পের অপমৃত্যুর জন্য বাঙালি কাকে দায়ী করবে? তারই উত্তর পাওয়া যাবে এই একগুচ্ছ লেখায়। সেই সংগে থাকছে বাংলার প্রতিটি কোণের নিজস্ব মিষ্টান্ন শিল্পের পরিচিতি আর নির্মাণ কৌশল বাঙালির পাঠ্যাস্বাদকে তা তৃপ্ত করতে পারে মাত্র।

শ্যামল বসু

মিষ্টান্ন শিল্পের ওপব। সারা পশ্চিমবংগে মিষ্টি ব্যবসায়ীব' আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এব মধ্যে কলকাতা শহবে নিয়ন লাইট দিয়ে অফিস পাড়া ডালহৌসি অথবা পুরনো পাড়া বৌবাজাবকে নিয়ে সারা কলকাতায় মিষ্টিব দোকানের সংখ্যা ৭ থেকে ৮ হাজাবের মত। বাকিটা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলায়। ১৯৬৫ সালে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভার নির্দেশে ছানার মিষ্টি তৈরি কলকাতা শহরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুধের অভাবই এর পেছনে কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। কলকাতায় শিশুখাদ্য হিসাবে দুধের যোগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে সে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। আবার কলকাতার মানুষ

বলিগঞ্জ বা টালিগঞ্জের লোককে মিষ্টি আনতে গড়িযা বা বারুই-পুর ছুটতে হয় না। তাঁবা তাদেব এলাকাতেই মিষ্টি পেয়ে হাঁফ ছাড়লেন। এখনও অবশ্য বাবড়ি তৈরি ও বিক্রিব ওপব ওই বকম নিষেধাজ্ঞা আছে। যাব ফলে কলকাতা শহবে বাবড়ি পাওযাব একটু অসুবিধা হয। নাহলে সন্দেশ বসগোল্লা পাওয়াব কোন অসুবিধা নেই। ১৯৬৫ সাল থেকেই এই মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীবা সংঘবদ্ধ। ১৯৬৭ সালে তৈরি হল পশ্চিমবংগ মফঃস্বল মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি। ১৯৭৯ সালে কলিকাতা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি এব সংগে মিশে গিয়ে নতুন নাম হল পশ্চিমবংগ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি। বেজিস্টাবড অফিস বা মূলকেন্দ্র সুভাষ বোড, বাঁকুড়া। কলকাতা জেলা কমিটিব আলাদা কার্যালয় বৌবাজাবে বিখ্যাত ভূপতিচরণ রায়ের দোকানে। এখন এটিব নতুন নাম জয়শ্রী। মালিক ভূপতিবাবুর ভাগ্নে শংকব হাজবা। একদা মাইনসেব ব্যবসায়ী। বছব ত্রিশেক এই দোকানের দায়িত্ব নিয়েছেন। ছেলে তাপস কুমাব হাজবা (৩২) নবেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। বংগবাসী কলেজে পড়াকালীনই মিষ্টিব ব্যবসায়ে বাবাব পাশে এসে দাঁড়ান। ইংরাজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে এম এ পাশ কবেছেন। ডালহৌসি পাড়াব 'বিলায়েনস' দোকানটি তিনিই দেখাশুনা করেন। সেই সংগে কলকাতা জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সাধাবণ সম্পাদক। 'সেন মহাশয়ের' পরেশচন্দ্র সেন সভাপতি। আর সারা পশ্চিমবংগ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতিব সভাপতি আইনজীবী মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায, নিবাস তমলুক। সম্পাদক শক্তিপদ ববাট। এখন এঁরা মিছিল, ডেপুটেশন এমনকি হরতাল ধর্মঘট ডাকায়ও রপ্ত হয়ে গিয়েছেন। এঁদের নেতৃত্বে শেষতম ধর্মঘট ছিল গত ৮ এপ্রিল ১৯৮৩। তাপসবাবুর অভিযোগ, বর্তমানে বামফ্রন্ট সবকার বিক্রয় কর বাড়িয়ে দিয়েছেন ৮ শতাংশ। আগে ছিল ৭ শতাংশ অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই মিষ্টান্ন শিল্পের ওপর কোন বিক্রয় কর নেই। গত ১৯৭৯ সালের নভেমবর মাস থেকে মহারাষ্ট্র, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের সরকার বিক্রয় কর তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এই পশ্চিমবংগে কোন মন্ত্রী বা সরকারি তরফের কেউ তাদের সমস্যার কথা শুনতেও আগ্রহী নন। বর্তমানে

বিভিন্ন খাতে কর দিতে হয়। এরমধ্যে মিউনিসিপ্যাল অথবা করপোরেশনের ট্রেড লাইসেনস ফি, হেলথ লাইসেনস ফি, পি এফ এ (Prevention of Food Adulteration) ফি, জলের জন্য ট্যাকস, ছাই ফেলার জন্য ট্যাকস, পুলিশ লাইসেনস, মিলক কনট্রোল অরডারের ফি, পারচেজ ট্যাকস, আয় কর, ৪৪২ ট্যাকস (চেয়ার টেবিল 'পাতা) এমনকি ২৫ পয়সা ৫০ পয়সা দামের মাল বিক্রির জন্যও সেলস ট্যাকস দিতে হয়। আর ট্যাকস আদায়ের রীতিটিও বেশ মজার। যেমন বড় দোকান ছেড়ে দিন যে কোন দোকানেই এক পিস বা দু পিস রসগোল্লার দাম ৫০ পয়সা কি এক টাকা। এরজন্য রসিদ কাটা হয় না। অথচ বছরে চারবার বিক্রির আন্দাজের ওপর তাঁদের সেলস ট্যাকস দিতে হয়। এভাবে তাঁদের ট্যাকস ধবার ভিত্তি কী তাও বলা মুশকিল। তারা যা তৈরি করেন তার সবটাই বিক্রিও হয় না। পচে যাবার সম্ভাবনা থাকায় বিলিয়ে দিতে হয়। এই দুধ বা চিনির কিংবা ছানার ওপব শুধু হিসেব করা যায় না যে কতটা 'মাল' বিক্রি হল। এছাড়া বর্তমান বাজারের কাঁচা মালেব দাম, জ্বালানির দাম খোলা বাজার থেকে কেনার জন্য তাঁরা খরিদ্দারকে এমন কিছু সস্তাতেও মিষ্টি দিতে পারেন না। তাই নিমকি, লুচি ইত্যাদি ভাজাভুজি করতে হয়। খরিদ্দাররা বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত। সস্তায় খিদে মেটানর জন্যই এগুলির দরকার। এখান থেকে কিনে বাড়িতে নিয়ে যান অনেকে। এগুলোব জন্য বিক্রির সঠিক হিসেবটা পাওয়া মুশকিল। তাই গড় বিক্রিব ওপর একটা ট্যাকস ধরে কেবলমাত্র এই মিষ্টান্ন শিল্পকে শুধু যে অসুবিধায় পড়তে হয় তাই নয় কোন ক্যাপিটাল তৈবি কবাও যাচ্ছে না। মিষ্টান্ন শিল্পকে রাজ্য সবকাব ৬৯ সালের এক বিশেষ নির্দেশ বলে কুটিব শিল্পের আওতায় এনেছেন। কিন্তু কুটির শিল্পের মত সুযোগ আমাদের মিষ্টান্ন শিল্পে নেই। সুপরিম কোরটের আদেশে ছোট বড় পাঁচ তাবা হোটেলগুলো অবধি বিক্রয় কর বিশেষ অবস্থায় ছাড় পেয়েছে—কিন্তু মিষ্টান্ন শিল্প কখনই পায়নি। খরিদ্দারের কাছে আদায়ও করা যায় না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সমেত রাজ্যস্তরের অনেক নেতা – যেমন স্নেহাংশু আচার্য, ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বায় অমর বসু, যতীন চক্রবর্তী মশাইও এই রকম বিক্রয় কবেব বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এখন ডেপুটেশন নিয়ে গেলেও কোন নেতাব দেখা পাওয়া যায় না। ৬৭ সালে জ্যোতিবাবু যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখনও তিনি বিধানসভা ভবনে এক বৈঠকে বলেন যে, মিষ্টান্ন-শিল্পের ওপর যে বিক্রয় কর আছে তা তিনি জানেন না এবং সুবিবেচনার জন্য কমিশন গঠনের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের কথা শোনবার লোক পাওয়া যায় না। একবাব বাঁকুড়া সারকিট হাউসে অশোক মিত্র মিষ্টান্ন ব্যবসয়ীদের কাছে বিগত মন্ত্রিসভাব অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন এই শিল্পের সংকট মোচনের কথা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিধানসভায় বর্তমান অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তি ঘটক তাঁদের অসুবিধাব কথা শুনেছেন বলে তাপসবাবু জানালেন।

'তাপসবাবু বললেন, সম্প্রতি লাইসেনস রিনিউ করতে গিয়ে পুলিশের কাছে খবর পেলাম প্রতিটি আইটেমের ওপর আলাদা করে ২৫০ টাকার লাইসেনস ফি দিতে হবে। ১৯৭৯ সালের গেজেটে নাকি এ কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। আইটেম মানে যেমন মিষ্টির ওপর ২৫০ টাকা, নিমকি ভাজাভুজির ওপর ২৫০ টাকা, চা-এর ওপর ২৫০ টাকা, লস্যি-কি ঠাণ্ডা পানীয়ের ওপর ২৫০ টাকা লাগবে। এতদিন আমাদের Eating House হিসেবে মোট লাইসেনস ফি লাগত ২৫০ টাকা মাত্র। আমরা ঠিক করেছি পুলিশ কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।'

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের আরো অভিযোগ যে, 'মিষ্টি বিক্রির দোকানে কারিগর এবং কর্মীদের ইতোমধ্যে পি এফ এবং ই এস আই-এর আওতায় আনা হয়েছে। আবার নতুন করে মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করা হবে। হোক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমরা যারা এই ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গেও কি সরকারি তরফের কথা বলার দরকার নেই? আমরাই মাহিনা দেব, মজুরি দেব আমাদের সঙ্গে আলোচনায় সরকারের লাভ ছাড়া লোকসান হবার সম্ভাবনা নেই। তবুও কী এক অজ্ঞাত কারণে সরকার আমাদের কথা শুনতে চান না।'

আরো যা জানা গেল তা হল এই শিল্পের আওতায় খাদ্যের ব্যবহৃত রং কিংবা খোলা বাজারের থেকে কেনা বনস্পতি অথবা চিনি কিংবা ছানার গুণগত বিচার করার কোন মাপকাঠি এঁদের হাতে নেই। সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তর একবার এই মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হল না। সরকারি উৎসাহে কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রকল্প, যা অন্য কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে আছে তার সুযোগ এই মিষ্টান্ন শিল্পে নেই। এখন একটাই কথা, এই লাগামহীন অবস্থা কতদিন চলবে?

বাঙালির নিজস্ব শিল্প এই মিষ্টি তৈরি আর কতদিন চলবে সত্যিই ভাববার কথা। গজা, লাড্ডু বালুসাই, কুলপী প্যাঁড়া ইতোমধ্যে বাঙালির পরিচিত হয়ে উঠেছে। শুক্রবার দেবী সন্তোষী মার কল্যাণে বাঙালির ঘরে ক্ষীরের মিষ্টির আদরও বাড়ছে। হোক ক্ষতি নেই। কিন্তু এর কল্যাণে বড়বাজার অফিস পাড়া ছেড়ে হালুয়াই দোকানদার গলির মধ্যেও দোকান নিয়েছে মোটা সেলামি দিয়ে। আর শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ শিশু বা কিশোর শ্রমিক তাদের রুটি রোজগার করারও জায়গা পেয়েছে। এমন দিন কি খুব দূরের যে দিন কলকাতার মিষ্টি বলে গজা- লাড্ডু- কালাকাঁদ- সন্দেশ- রসগোল্লার জায়গা নেবে।

এখনও কম পুঁজিতে মিষ্টির দোকান খোলা যায়। তাপস হাজরার মত তরুণ উদ্যোগীর মতে হাজার দশেক টাকায় মোটামুটি জনা সাতেক কারিগর নিয়ে সন্দেশ আব রসগোল্লার দোকান করা যায়। দোকানের সেলামির টাকাটা কিন্তু এই হিসেব থেকে বাদ। আয়টা, যা হবে তা একজন তরুণের কাছে মন্দ নয় তবে আইটেম যত বাড়বে সে অনুযায়ী খরচও বেড়ে চলবে। সেই সঙ্গে আসবে অন্য অসুবিধাগুলো।

সব অসুবিধা সত্ত্বেও মিষ্টান্ন শিল্প বাঙালির নিজস্ব শিল্প। বহুদিন ধরে এর পৃষ্ঠপোষকতাও সে করে এসেছে। ইদানিংকার সংকটেও তাকে বাঁচিয়ে রাখার কি কোন পরিচ্ছন্ন পথ পাওয়া যাবে না? □

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা আর ল্যাংচা

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

এই তো সেদিন ভাবত বনাম মারকিন দলের বাসকেটবল খেলার আসর বসেছিল বর্ধমানের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে। খেলাব পর উদ্যোক্তারা উভয় দলেব খেলোয়াড়, ম্যানেজার, কোচ এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদেব খাবার টেবিলে আপ্যায়ন করলেন। টেবিলে পরিবেশিত হল বর্ধমানেব সেরা মিষ্টি সীতাভোগ মিহিদানা। অতি সুস্বাদু সেই খাবার মুখে পুরে ভারতীয় দলেব খেলোয়াড়বা বল লেন 'বহোত আচ্ছা'। মারকিন দলের সবাই সোল্লাশে চিৎকাব করে বললেন, 'ডিলিশাস্'। শুধু এবারই নয়, বছর দুই আগে চীনা ভলিবল দল এসেছিল বর্ধমানে। খেলা হয়ে যাবার পর উদ্যোক্তা বর্ধমান জেলা ভলিবল বাসকেটবল সংস্থার পক্ষ থেকে তখনও খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়েছিল এই সীতাভোগ মিহিদানা। খেতে খেতে চীনারা একযোগে বলে উঠেছিলেন 'হেন হাও দি!' – কী সুন্দর, কী সুন্দব খেতে!

বর্ধমানে এসেছেন অথচ সীতাভোগ-মিহিদানা খাননি এমন মানুষ নেই-ই বলতে গেলে। এই মিষ্টি বর্ধমানের মাটিতে এল কী ভাবে ? কী করেই বা এত সুদৃঢ় ঘাঁটি গাড়ল ? সেও এক ইতিহাস। অনেক দিন আগের কথা। তখন বর্ধমানেব এত রমরমা ছিল না। ঠিক সেই সময় বর্ধমান রেল স্টেশনে ক্যানটিন চালাতেন হবিদাস দে। বর্ধমান শহরেও ওঁর মিষ্টির দোকান ছিল। আদর্শ মিষ্টান্ন ভান্ডার। এখন সে দোকান নেই। উঠে গেছে। বেল তখন সাহেবদের ব্যক্তিগত কোমপানি। একবার তার বড় সাহেব স্টেশন দেখতে আসবেন শুনে সবাই তটস্থ। খিটখিটে সেই সাহেবের রোষের হাত থেকে সবাইকে বাঁচিয়ে দিলেন হরিদাসবাবু। তিনি সাহেব আর মেমসাহেবের সামনে তুলে দিলেন সীতাভোগ আর মিহিদানা। খেয়ে দুজনেই খুশি। নাম জানতে চাইলে হরিদাসবাবু বললেন, ওই হলুদ রঙের ছোট দানা খাবারটির নাম 'মিহিদানা' আব এই সাদা খাবারটি হল 'সাদা ভোগ'। এই সাদাভোগই লোকমুখে ঘুরতে ঘুরতে নাম নিল 'সীতাভোগ'। খোদ বড় সাহেব প্রশংসা কবেছেন, আর যায় কোথায়! চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল। অনেকে আবার বলেন, সীতানাথ নন্দী নামে এক মিষ্টান্নশিল্পী এটা বানিয়েছিলেন বলে তাঁর নাম থেকেও সীতাভোগ হতে পারে। এরপর এই সীতাভোগ-মিহিদানাকে আরও জনপ্রিয় করলেন ভৈরব চন্দ্র নাগ। ভৈরব নাগের মৃত্যুর পর তাঁর নাতি নিমাই নাগ এবং নিমাইবাবুর ছোটভাই এখনও মিষ্টির দোকান চালাচ্ছেন। ওঁদের দোকানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি সীতাভোগ-মিহিদানার। ঠাকুবদার ঐতিহ্য বজায় বেখে ওঁবা এখনও খাঁটি মাল বিক্রি করছেন।

তবে সে দিন তো আব নেই। কোথায় পাবেন ? সে দুঃখই কর ছিলেন বর্ধমান শহবের রাণীগঞ্জ বাজারেব ঐতিহ্যপূর্ণ মিষ্টির দোকানের মালিক সুজিত দত্ত। ওঁরা দু'ভাই এই মিষ্টির দোকান চালাচ্ছেন। বড় ভাই রণজিত দত্ত। খুব চালু দোকান। সুজিত বাবু বললেন, সীতাভোগ-মিহিদানা করতে চালের গুঁড়ো লাগে। আর চাই খাঁটি ঘি। আগের দিনে চালগুঁড়ি হত জাঁতায় পেষা। এখন পেষা হয় মেসিনে। জাঁতায় পেষা চালগুঁড়ির গন্ধই হত আলাদা। তখন খাঁটি ঘি পাওয়া যেত। এখন সেই ঘি-এর স্থান নিয়েছে বনস্পতি। আগে সীতাভোগ-মিহিদানা হত মচমচে। ভিতরে থাকত রস। আর এখন সবটাই সুজির হালুয়াব মত। তখন নিয়ম ছিল চালগুঁড়ি ভাজা হবে আব সংগে সংগে বসে ফেলা হবে। আব এখন ভাজা চালগুঁড়ি রসে ডোবানই আছে। তোল আব বিক্রি কর। এই পর্যন্ত বলেই সুজিত বাবু বললেন, বলুন ? এতে কি আর স্বাদ থাকে ? অবশ্য আগে থেকে অরডার দেওয়া থাকলে আমরা এখনও সেই ভাল জিনিস করে দিই। দামটাও একটু বেশি পড়ে। সাধাবণ ডালডার সীতাভোগ এখন বিক্রি হচ্ছে কিলোপ্রতি ১১ টাকা। মিহিদানা ১০ টাকা কেজি। আব খাঁটি ঘিয়ের যদি নিতে চান তাহলে দাম পড়বে সীতাভোগ ২৪ টাকা এবং মিহিদানা ২২ টাকা কেজি। সুজিত বাবুর দাদা পঞ্চাশোর্ধ রণজিত দত্ত বলছিলেন, এখন আর একটা বড় সমস্যা হল সে আমলেব কারিগররা এখন আর নেই। তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরবা এখন অন্য পেশায চলে গেছেন। সে আমলে আরও দু-তিনজন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীও এই সীতাভোগ মিহিদানাকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচুর খেটেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গত জগন্নাথ দত্ত। এই জগন্নাথ দত্তের বংশধররা বর্ধমান স্টেশন বাজারে এখনও মিষ্টির দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া ছিলেন জগবন্ধু মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক জগবন্ধু নাগ। তাঁব ছেলে সুধীর নাগ অবশ্য মিষ্টি ব্যবসায়ে আর নেই। তিনি বর্ধমানের খ্যাতনামা একজন শিল্পী। ওঁর খড়ের কাজ, মাটি, শোলার প্রতিমা বিভিন্ন মহলে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় প্রতিমা সাপলাই করতে তিনি হিমসিম খান।

বর্ধমানের শ'তিনেক মিষ্টির দোকানের সবাই সীতাভোগ-মিহিদানা রাখেন। সীতাভোগ-মিহিদানা না রাখলে খদ্দেরও আসবে না। তবে এই সুযোগে একটু সতর্ক করে দিই। বর্ধমান রেল স্টেশন প্ল্যাটফরমে ভেনডাবরা যে সীতাভোগ মিহিদানা বিক্রি কবেন তাবা বেশিরভাগই ওজনে কম দেন। বাসি পচা সীতাভোগ মিহিদানাও বিক্রি হওয়া বিচিত্র নয়। দেখা গেছে ২০০ গ্রাম লেখা বাকসে ১৫০ গ্রাম মাল আছে। সিনিয়র ডিভিশনাল কমারশিয়াল সুপারিনটেনডেনট একবাব হাতেনাতে ধবেও ছিলেন।

শুধু এই সীতাভোগ মিহিদানাই নয়, বর্ধমানের 'বড় বাতাসা', 'ওলা', 'খাজা'ও একসময় ছিল বিখ্যাত। 'বড় বাতাসা'র এখন আর খুব চল না থাকলেও কয়েকটি দোকান পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে এইসব মিষ্টি এখন তৈরি করছেন। বিক্রিও কম নয়। বর্ধমান শহরে রাণীগঞ্জ বাজারে ব্যবসা চালাচ্ছেন সুশান্ত বরাট। তিনি বললেন, এটি আমাদের তিন পুরুষের ব্যবসা। ওঁর দাদু রজনীকান্ত বরাট এবং তাঁর পুত্র সূর্যকান্ত বরাটের আমল পর্যন্ত এই 'বড়বাতাসা' 'ওলা' 'খাজা'র বাজার ছিল রমরমা। শুধু চিনি আর জল দিয়ে পাকান এই 'ওলা' এখন বিভিন্ন পুজো এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়েতেই ব্যবহৃত হয় বেশি।

ট্যুরে বেরিয়েছেন, বর্ধমান ছুঁয়ে গেছেন কিন্তু শক্তিগড়ের বিখ্যাত 'ল্যাংচা' চেখে দেখেননি এ হতে পারে না। এই বিখ্যাত ল্যাংচার আবিষ্কারক কে ? কী করেই বা এটা এত জনপ্রিয় হল ? এর বহুরকম কাহিনী চালু আছে। তারমধ্যে একটি কাহিনীর কথাই এখানকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। শক্তিগড়-বড়শূলের মোড়ে অজিত বাবুর ল্যাংচা ঘর। দোকানে ঢুকতেই চোখে পড়ল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা সিনেমা নায়ক, সংগীতজ্ঞ, রাজনৈতিক নেতাদের প্রশংসাপত্র সারি সারি টাংগান। পেট পুরে ল্যাংচা খেয়েছেন, খুশিমনে সারটিফিকেট দিয়ে গেছেন তাঁরা। তিনি বললেন, প্রায় এক শ বছর আগে এই শক্তিগড় বাজারে শশিভূষণ দাঁ এবং ক্ষুদিরাম দত্ত নামে দুই ব্যক্তি মিষ্টির দোকান চালাতেন। ওঁদের দোকানে একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন খোঁড়া। সবাই তাঁকে ল্যাংড়া দোকানী বলেই চিনত। সে সময় এই শক্তিগড়ে বিজয় গুহ ছিলেন মস্ত ব্যবসায়ী। বিজয় বাবু ছিলেন মিষ্টির খুব ভক্ত। তাঁর নতুন ধরনের মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হওয়ায় ঐ খোঁড়া কাবিগব যে মিষ্টি বানান তারই নাম ল্যাংচা। ল্যাংড়া থেকে সম্ভবত এসেছে নামটা। ক্ষুদিরাম দত্তের দোকান এখন চালাচ্ছেন তাঁব ছেলে কানাই দত্ত। ল্যাংচা মহল ওঁদেরই দোকান। ঠিক এই সময় বাঁকুড়া থেকে এসে এই শক্তিগড়ে মিষ্টির দোকান খুললেন হেম ঘোষ। ভাল কারিগর ছিলেন তিনি। ল্যাংচাকে আবও জনপ্রিয় করাব পিছনে তাঁর অবদানও কম ছিল না। অবশ্য আগে খাঁটি ঘি পাওয়া যেত। এখন তো ডালডায় ভাজা ল্যাংচা। অবশ্য শক্তিগড়েব কিছু দোকান গাওয়া ঘি এর ল্যাংচা এখনও তৈরি কবছেন। দামটা একটু বেশি পড়ে এই যা। গাওয়া ঘি-এব বড় সাইজের ল্যাংচা দু টাকা পিস, মাঝারি এক টাকা। বনস্পতিতে ভাজা ল্যাংচা বড় সাইজ দেড় টাকা, মাঝাবি ৭৫ পয়সা পিস।

ল্যাংচা তৈবি করতে লাগে ছানা, ময়দা, সবেদা, চিনি, খোয়া। বড় সাইজেব গোটা ত্রিশেক ল্যাংচা করতে ১ কেজি ছানা, ১০০ গ্রাম ময়দা, ১০০ গ্রাম সবেদা, ১০০ গ্রাম চিনি এবং লাগে ১০০ গ্রাম খোয়া। এঁরা বলছিলেন, আমাদের যদি আর্থিক সংগতি আরও একটু বেশি হত অথবা ব্যাংক বা অন্য সংস্থা যদি আর্থিক সহায়তা দানেব প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে এই ল্যাংচাকে আমরা বিদেশের মাটিতেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। আরও উন্নত মানের ল্যাংচা তৈরি করে ভালভাবে প্যাক করে বিদেশে পাঠালে ওখানকার খদ্দেররা নিশ্চয়ই এই খাবারকে পছন্দ করতেন এ বিশ্বাস এখানকার ল্যাংচা বিক্রেতাদের আছে। □

সিউড়ির মোরব্বা যেমন মুখরোচক তেমনই রোগীর পথ্যও বটে

সুকুমার দত্ত

বীরভূমের সদর শহর সিউড়ির প্রসিদ্ধি মোরব্বার জন্য।

বীরভূমের মিষ্টিশিল্প মূলত ছানাজাতীয় মিষ্টান্নে সমৃদ্ধ হলেও ঐতিহ্য, প্রাচীনত্ব আর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মোরব্বাই হচ্ছে বীরভূমের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। একদিন এর খ্যাতি ছিল ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সুদূর বিলেতেও। বীরভূমের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্নের কথা জিজ্ঞেস করা হলে আজও তাই মোরব্বার কথাই বলেন বীরভূমের লোকজন।

এই মোরব্বা সিউড়িতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এর উৎপত্তিস্থল সিউড়ি থেকে ২৫ কি মি দূরে রাজনগরে। একদা বীরভূমের রাজধানী। রাজনগরের রাজা বদি উজ্জামাল (১৭১৮-৫২) কয়েকজন পাঠান মিষ্টান্ন কারিগর দিয়ে প্রথম বেল আর চালকুমড়োর মোরব্বা তৈরি করান। এবং সেটাই বীরভূমে মোরব্বা তৈরির সূত্রপাত। কয়েক বছর আগেও রাজনগর থেকে সেদ্ধ করা কাঁচা ফলমূল আমদানী করার পরে চিনির রসে পাক করা হত। কারণ সিউড়ির কারিগরদের কুসংস্কার ছিল কাঁচা ফল সেদ্ধ করলে পাপ হয়।

মোরব্বা শব্দটি আরবি 'মুরব্বা' থেকে এসেছে। আসলে এটা মুসলমান মিষ্টান্ন কারিগরদের দান। সংসদ বাংলা অভিধানে মোরব্বার অর্থ দেওয়া আছে 'চিনির রসে পাক করা ফলমূল'। কাঁচাফল কিংবা মূলগুলোর ছাল ভাল করে ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে গরম জলে সেদ্ধ করার পর ঘন চিনির রসে পাক করা হয়।

শোনা যায়, দিল্লি, লখনৌ বেনারসই মোরব্বা তৈরির আদি স্থান। সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন মিষ্টির দোকান 'মোরব্বা'র মোরব্বা তৈরির প্রধান কারিগর মিশিরলালজির বাড়ি বেনারসে। এখনও উৎকৃষ্ট আমলকীর মোরব্বা তৈরির জন্য বেনারস থেকে কাঁচা আমলকী আমদানি করা হয়।

১৯২১ সালে সিউড়ি শহরে দেবেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক মোরব্বার একটি কোমপানি প্রতিষ্ঠা করেন। কোমপানির নাম : 'ডি সি ভৌমিক এন্ড কোম্পানী, বীরভূম মোরব্বা'। তাঁর পুত্র ভোলা ভৌমিক এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁদের কোমপানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও বিলাতে মোরব্বা রপ্তানি করতেন।

সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বর্তমান কমিশনার বসন্ত দে স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বললেন, 'লর্ড সিনহা, স্যার আশুতোষ মুখার্জি সিউড়ির মোরব্বা এত পছন্দ করতেন যে প্রায় সময়েই তাঁরা এখান থেকে লোকমারফৎ মোরব্বা নিয়ে যেতেন।'

বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নানা অসুখে মোরব্বা ব্যবহারের প্রেসক্রিপশন করতেন কবিরাজেরা। পেটের গোলমাল উপশমে বেল। রক্তপিত্ত, প্লুরিসি, কোষ্ঠ কাঠিন্য আর ক্রিমির জন্যে চাল কুমড়ো। অর্শ, পিত্তশূল, শোথ স্বরভঙ্গের উপশমে হরিতকী। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমলকী আর শরীরের পুষ্টির জন্য শতমূল মোরব্বা ব্যবহারের বিধান দিতেন তাঁরা।

কবিরাজদের বিধানের সঙ্গে সঙ্গে তাই মোরব্বা ব্যবসাতেও কিঞ্চিৎ মন্দা দেখা গেছে। কাঠ ব্যবসায়ীদের নির্বিচার গাছ নিধনের ফলে বনজসম্পদের যথেষ্ট অপচয় হবে মোরব্বা শিল্পও মার খাচ্ছে। শতমূল আমলকী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে কিছু কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। তাছাড়া বাজারে জ্যাম, জেলি আমদানি হওয়াটাও মোরব্বা শিল্প মার খাওয়ার অন্যতম কারণ। সমগ্র মিষ্টান্ন শিল্পে বর্তমান সেলস্ ট্যাক্সেরও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

সাধারণত মোরব্বা ঠিক মত সংরক্ষণ হলে দশমাস পর্যন্ত তার দ্রব্যগুণ ঠিক থাকতে পারে। যারা বাইরে থেকে বীরভূমে বেড়াতে আসেন তারা মোরব্বা কিনে নিয়ে যেতে এক সমস্যায় পড়েন। বহন করার ঠিকমত পাত্র পাওয়া যায় না। মাটির ভাঁড়ই একমাত্র সম্বল।

বীরভূমের বিখ্যাত মোরব্বা ব্যবসায়ী নন্দ দুলাল দে (এদেরই পূর্ব পুরুষ কুঞ্জ ময়রা ৮০-৯০ বছর আগে সিউড়িতে মোরব্বার ব্যবসা করতেন) বৈজ্ঞানিক প্রথায় মোরব্বা সংরক্ষণের উপরে জোর দিলেন। তিনি মাটির ভাঁড়ের বদলে পলিথিনের প্যাকেটে মোরব্বা বহন করার বিষয় খতিয়ে দেখছেন।

সারা বছরের মোরব্বা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কাঁচামাল কিনতে সত্তর থেকে একলাখ টাকার প্রয়োজন; সেই টাকা সব ব্যবসায়ীর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলো যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তবে একটা ঐতিহ্যসম্পন্ন মিষ্টান্ন শিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

মোরব্বা ভাল পাওয়া যেতে পারে সিউড়ি : মোরব্বা, দে'জ মোরব্বা, দাদুভাই নন্দগোপাল, জলপান অসীম সুইটস। বোলপুর : অদ্বৈত সুইটস রামপুরহাট নেতাজী সুইটস।

বর্তমান দর প্রতিকেজি : বেল, পেঁপে, হরিতকী, চালকুমড়ো ১০ টাকা। শতমূল, আম, পটল, কাগজিলেবু, গাজর, কামরাঙা, লংকা ১২ টাকা। নাসপাতি, আনারস, আপেল ১৪ টাকা। বেনারসি আমলকী, চন্দনমূল ১৬ টাকা। চেরী ২৪ টাকা। ☐

আলোকচিত্র : সারদাপ্রসাদ ঘোষ

প্রস্তুত-প্রণালী

বিভিন্ন জিনিসের মোরব্বা

মিশিরলালজি মোরব্বা বানাচ্ছেন

বাঁকুড়ার মিষ্টি সমাচার

বিদ্যুৎ ঘটক

মল্লরাজবংশের শেষ রাজা রামকিশোর সিংহদেবের একমাত্র দৌহিত্র ৮০ বছরের বৃদ্ধ কালিপদ সিংহঠাকুর ই বললেন: 'গান বাজনা 'মতিচুর' তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর. আহা হা, দেশি ঘিয়ে জবজব করত, মুখে দিলেই মিলিয়ে যেত, জলে ভাসত, তবে এখন ত আর দেখি না।' তাঁর কাছ থেকেই শুনলাম প্রায় ৩০০ বছর আগে মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বিষ্ণুপুরে প্রথম এই মিষ্টি তৈরি করেন গোসাইদাস নাগ মন্ডল। গোঁসাইদাস নাগ, এই মিষ্টি তৈরি করে মল্লরাজাদের দেওয়া খেতাব পেয়ে হলেন গোঁসাইদাস নাগ মন্ডল। তবে আমরা বহু খোঁজাখুঁজি করে কোথাও 'মতিচুর' নামের সেই মিষ্টি খুঁজে পেলাম না। এ সম্বন্ধে 'মল্লভূম মিষ্টান্ন ভান্ডারের' বাসু ময়রার ভাইপো জয়ন্ত নন্দী, বললেন, 'কাঁচা মালের ভয়ানক দাম, সরকারি সহযোগিতা না পাওয়া প্রভৃতির জন্য কেবল 'মতিচুর' মিষ্টিই নয়, সোনামুখীর মনোহরাসহ আরো বেশ কিছু মিষ্টান্ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি'র রাজ্য সম্পাদক শক্তিপদ বরাটও আমাদের এই কথা বললেন। সমস্যা আজ মিষ্টান্ন শিল্পকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সমস্যাগুলো জানার আগে জেলার কয়েকটি মিষ্টান্নের বিবরণ, প্রাপ্তিস্থান, ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক) বিষ্ণুপুরের 'মতিচুর' :

চাঁপা ফুলের মত হাল্কা রং, বোঁদের মত ছোট দানা, ঘি চপচপে গোল দলা মিষ্টি। জলে ভাসে। 'পিয়াল' ফলের বীজ থেকে যে বেসন তৈরি হয় তার সঙ্গে সামান্য চালগুঁড়ো মিশিয়ে বোঁদের থেকে সামান্য ছোট দানা দেশি ঘিতে ভাজা হয়, পরে চিনির রসে পাকান হয়। কাঁচা মালের দর অগ্নিমূল্য হওয়ায় এখন এই মিষ্টান্ন ব্যবসা প্রায় লুপ্ত।

খ) বাঁকুড়ার 'কালাকান্দ :

বাঁকুড়ার বর্তমানে সেরা মিষ্টি। স্বয়ং জেনারেল কারিয়াপ্পা, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালের শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বাঁকুড়ার কালাকান্দ', 'বাঁকুড়ার চিত্তরঞ্জন, বাবড়ি' প্রভৃতির সুখ্যাতি করে গিয়েছেন। এ তথ্য জানা গেল জেলার প্রখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কালিকা মিষ্টান্ন ভান্ডারের শক্তিপদ বরাট, মাদ্রাজ কাফে র শ্রীসৌমিত্র নাগ প্রমুখের কাছে। তাঁদেরই কাছে জানা গেল প্রায় ৭০ বছর আগে প্রথম রামনাথ নাগ এবং বৈকুণ্ঠনাথ বরাট সরাসরি দুধ থেকে তাপের তারতম্যে ঘন করে যে সুস্বাদু মিষ্টি তৈরি করেছিলেন তা আজ সারা জেলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

গ) বেলিয়াতোড়ের 'মেচা' :

বাইরে থেকে দেখতে বেসনের শুকনো হলুদ দলা, যার গায়ে আছে শুকনো রসের প্রলেপ। তৈরি হয় ঠিক এভাবে: ১ কিলো গ্রাম ছোলার বেসন থেকে প্রায় ৪০০ গ্রাম ভাল ঘি দিয়ে 'ঝুরি ভাজা' (স্থানীয় ভাষায় 'চনা') তৈরি করে ওগুলো ঢেঁকিতে গুঁড়ো করে ২৫০ গ্রাম ছানা, এলাচগুঁড়ো, পেস্তা ইত্যাদি মিশিয়ে দেড় কিলো চিনির রসে জাল দিয়ে শুকনো করে ঠান্ডা করে শক্ত দলা পাকানো হয়। এবার প্রায় ১ কিলো গ্রাম চিনির থকথকে রসের প্রলেপ লাগিয়ে ঐ গোল্লা শুকিয়ে নেওয়া হয়। আগে ছিল প্রায় ১০ আনা সের। এখন প্রায় ১২ থেকে ১৫ টাকা কিলো।

ঘ) বাঁকুড়ার 'চিত্তরঞ্জন' :

কাচা ছানা বেটে, প্রয়োজনমত চিনি মিশিয়ে, তাপের তারতম্যে, বাষ্পে সিদ্ধ করে, পরে ঠান্ডা করে বরফীর মত টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়। বাংলার বাইরে কোথাও কোথাও এই মিষ্টান্ন 'ভাপা সন্দেশ' নামে বিক্রি হলেও এই জেলাতেই প্রথম এভাবে তৈরি করে এর নামকরণ করেন বাঁকুড়ার 'কল্পনা সুইটস' দোকানের প্রভাস নাগ। বাঁকুড়ারই দেওয়া নাম ও প্রস্তুত প্রণালীসহ আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চিত্তরঞ্জন তৈরি হচ্ছে।

বেলিয়াতোড়ের বাসে মেচা বিক্রি / অনুপ গাঙ্গুলী

ঙ) ইন্দাসের 'খাজা' :

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে, ময়দা চালের গুঁড়ো, চিনি দিয়ে 'চাঁদসাই' এবং 'মাকু' খাজা নামে দুই রকমের মিষ্টি তৈরি হয়। 'চাঁদসাই খাজা' দেখতে পাটে পাটে রসে ভাজা মুচমুচে লুচির মত মিষ্টি এবং মাকু খাজা দেখতে ঠিক নৌকোর মত। খুব মিষ্টি। এই মিষ্টান্ন সাধারণত স্থানীয় উৎসব ভাদু পুজোর সময় বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

চ) ছাতনার 'প্যাঁড়া' :

বড়ো চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এই ছাতনা অঞ্চলের প্যাঁড়াসন্দেশ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের প্যাঁড়ার থেকে স্বাদে সম্পূর্ণ পৃথক। আজও

বাবড়ি তৈরি করছেন বাঁকুড়ার মিষ্টান্ন শিল্পী / বিদ্যুৎ ঘটক

যাঁরা বাঁকুড়া দর্শনে আসেন ছাতনার প্যাঁড়া কিনতে কখনোই ভোলেন [illegible] বিক্রয় করের বোঝা এই শিল্পকে গ্রাস করছে। বর্তমানে [illegible]

এছাড়া, বাঁকুড়ার বিখ্যাত রসগোল্লা পাওয়া যায় সোনামুখীর ভজু রিট, গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে, বাঁকুড়ায় সতীশ নন্দী, গুঁইরামবাবুর কাছে, এছাড়া কল্পনা সুইটস-এর চিত্তরঞ্জন, মাদ্রাজ কাফের রাবড়ি, কালাকান্দ, কালিকার দরবেশ, ছানার পোলাও প্রভৃতির খ্যাতি যে কেবলমাত্র বাঁকুড়ায়ই নয় সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রমাণ, বাঁকুড়ার মানুষ কালিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের শক্তিপদ বরাটের দীর্ঘদিন রাজ্য মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা। বর্তমানে এই সমিতির সম্পাদক হিসেবে তিনি বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরলেন।

সমস্যা : (১) সরকারি দরে চিনি, কাঁচা মাল পাওয়া যায় না (২) মিষ্টান্ন শিল্পের উপর 'বিক্রয় কর' চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (৩) কলকাতায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের 'পুলিশ লাইসেনস ফি' দিতে হয় এবং বর্তমানে তা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রী বরাট বলেন ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিষ্টান্ন শিল্পকে কুটির শিল্পের মর্যাদা দান করলেও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা চিনি, কাঁচা মাল কেনার জন্য কুটির শিল্পের কোন রকম সুযোগ পাচ্ছেন না। হারে এই বিক্রয় করের [illegible] ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রায় ধ্বংসের মুখে। শ্রী বরাট জানালেন গত ৭/৯/৭৮ তারিখে মহামান্য সুপরিম কোর্ট হোটেল ও রেস্তোরাঁয় খাদ্যবস্তুর উপর বিক্রয় কর রহিত করতে এক রায় দিলে, তার প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতির সরকার এই কর প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর প্রত্যাহারের বদলে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছেন। শুধু তাই নয়, 'বিক্রয় কর' দপ্তরের কর্মকর্তারা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম করছেন বলেও তাঁরা সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে জানিয়েছেন। বিনা কারণে কোথাও কোথাও ট্যাকস অফিসারদের 'ঘুষ' দিতেও হচ্ছে বাধ্য হয়ে। আবার কখনও কখনও খাদ্যে 'রং' ব্যবহারের জন্য অল্প শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের জেল জরিমানা হচ্ছে। অথচ পঃ বঃ সরকার খাদ্যে মাপ মত 'রং' ব্যবহারের সরাসরি অনুমতিও দিয়েছেন। তাই সমিতির দাবি, মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হক।

শ্রী বরাট বললেন, তাদের দাবি মেনে নিলে মিষ্টান্নের দামই সামান্য কমবে তা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাঁদের নিত্যদিনের অন্নের সংস্থান হবে, এটা কি কম কথা? □

কাজু সন্দেশ আর বাবরশা

কুমারেশ ঘোষ

কাঁথির কাজু সন্দেশ'

বালি, বালিকা আর বাদাম বরফি-এই তিনের জন্যই নাকি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি বিখ্যাত। এর মধ্যে শেষেরটি অর্থাৎ বাদাম বরফির অন্য নাম কাজু বাদামের সন্দেশ। কাঁথি শহরের উপর দিয়ে গেছেন অথচ এক টুকরো বাদাম বরফি মুখে ফেলেননি এমন লোকের সংখ্যা নিশ্চয় বিরল। একশো বছরেরও বেশি এই বাদাম বরফির ঐতিহ্য। বাসু দত্ত, পুণ্য ময়রা, কালু ময়রা, জীবন গিরি, গুণধর গিরি প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন এই মিষ্টান্ন শিল্পের প্রথম কারিগর।

কাজু বাদামের চাষ কাঁথির বালিয়াড়িতে খুব ভাল হয়। ছানা, চিনি, কিসমিস আর পেস্তা হল এর অন্যান্য উপকরণ। সাধারণত বাজারে যে বাদাম বরফি বিক্রি হয় তার দাম ২৫ টাকা প্রতি কিলো। বিশেষ অর্ডারে তৈরি হলে ৩০ টাকা দাম পড়ে। এই মিষ্টিটি এত শুকনো যে সাতদিন অনায়াসে একে রেখে দেওয়া যায়। তাই উপহারে, আন্তরিকতায়, উপহারে, লৌকিকতায় কাঁথির বাদাম বরফি আজ দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয়। বিবাহে, শ্রাদ্ধে, অন্নপ্রাশনে পাত পেড়ে এমনকি বুফেতেও এখন স্পেশ্যাল আইটেম বাদাম বরফি।

কাঁথির মধুক্ষরার সুভাষ গিরি তিনপুরুষ ধরে এই বাদাম বরফির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত। এককাপ চা ও একপিস বাদাম বরফি খেতে খেতে কাঁথির উঠতি তরুণ সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের এখানেই আড্ডা দিতে দেখা যায়। সুভাষ গিরি ওরফে লালুবাবুর দোকান থেকে প্রতিদিন আধ কুইনটাল বাদাম বরফি নিশ্চয় বিক্রয় হয়। সম্প্রতি নরঘাটে মাতঙ্গিনী সেতু উদ্বোধন হওয়ার পর কলকাতা থেকে মেচেদা হয়ে দীঘা যাওয়ার পথে সব বাস বা প্রাইভেট কারকেই যেতে হয় লালুবাবুদের এই দোকান মধুক্ষরা, মধুচক্র, কালু ময়রা বা রুচিরার সামনে দিয়ে। কাঁথি ছুঁয়ে যাবে অথচ এক টুকরো বাদাম বরফি মুখে ফেলবে না বা প্রিয়জনের জন্য এক প্যাকেট নিয়ে যাবে না এ হতে পারে না।

তবে সমস্যার কথাও লালুবাবু বললেন। ছানা, চিনি, কাজু বাদাম সব কিছুরই দাম বাড়ছে। কাজু বাদামের বর্তমান দর কাঁথির বাজারেই কিলো প্রতি ৪০ টাকা, চিনির বাজার দর বেড়ে এখন সাড়ে চার থেকে পাঁচ টাকা। তার উপর বিক্রয় করের বোঝা চেপেছে। গত মাসে এই বিক্রয় করের প্রতিবাদে তো সারা জেলায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করলেন। এভাবে বাদাম বরফির উপর চাপ পড়লে বাদাম বরফি তার ঐতিহ্য হারিয়ে ক্রমশ টাকার বরফিতে পরিণত হয়ে যাবে বলে লালুবাবুর ধারণা।

ক্ষীরপাইয়ের বাবরশা

জেলার অন্যতম আর একটি মিষ্টান্ন হল ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাইয়ের বাবরশা। মোগল সম্রাট বাবর শাহ দিল্লি থেকে বর্ধমান যাবার পথে ক্ষীরপাইয়ে যখন তাঁবু ফেলেছিলেন তখন তাঁকে দেওয়া নানা উপঢৌকনের মধ্যে তাঁর যে মিষ্টান্ন সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথচ ভাল লেগেছিল তিনি নিজেই তার নাম দিয়েছিলেন বাবরশা। এই ঘটনার থেকেই বোঝা যায় এই মিষ্টান্নের ঐতিহ্য কতদিনের। সে যুগের পরান ময়রা থেকে শুরু করে এযুগে খোকন চন্দ্র চালক, বিশ্বনাথ সিং, সাধন বৈরাগী, বিমল চালক, শক্তি বৈরাগী, বিজয় বৈরাগী প্রমুখ এই মিষ্টান্নের প্রসিদ্ধ কারিগর। ঘাটাল যাবার পথে ক্ষীরপাইতে এক পিস বাবরশা সকলেই খেয়ে যান। স্থানীয় চাহিদা ছাড়াও প্রতিদিন প্যাকিং করে এখানকার জনতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, চণ্ডীচরণ দে'র দোকান বা কালীপদ বিশ্বাসের দোকান থেকে বাবরশা বর্ধমান, দিল্লি, বোম্বে প্রভৃতি জায়গায় পাড়ি দিচ্ছে। কালীপদ বিশ্বাস জানালেন যে তিনি কলকাতার ভীম নাগ কোমপানিকে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তাঁরা যদি রাজি হন প্যাকিং করে বাবরশা কলকাতা পাঠাতে পারেন। কিন্তু কোন উত্তর পাননি।

এ মিষ্টিও শুকনো। ময়দা, ঘি ও দুধ দিয়ে তৈরি শুকনো মিষ্টির উপর খাবার সময় রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শুকনো মিষ্টিটি এক বছর পর্যন্ত রাখা যায় বলে কালীপদবাবু জানালেন। তবে রস ছড়িয়ে দেওয়া মাত্র খেয়ে নিতে হবে। এখন টাকায় তিনটে বাবরশা পাওয়া যায় বাজারে। অরডার দিলে এক একটা বাবরশা একটা বড় মাটি কাটার ঝোড়ার সাইজে করা যাবে। তবে এরকম অরডার কেউ দেয় না। এখন দু টাকা সাইজের পর্যন্ত এক একটা বাবরশা অরডারে তৈরি হয়।

কালীপদবাবু জানালেন যে ২৫/৩০ ঘর কারিগর এখন এই মিষ্টান্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এরা দোকানে গড়ে ২০০ খানা করে বাবরশা তৈরি করে। বাইরেও এই কারিগরদের অনেকে বিয়ে বাড়ি বা অন্য কোন উৎসবে ডেকে নিয়ে যায়। তখন এরা ৩০০ থেকে ৫০০ খানা পর্যন্ত বাবরশা দিনে তৈরি করে দেয়।

এর সমস্যার কথাও বললেন কালীপদবাবু। আগেকার মত মসৃণ মারকা ময়দা বা বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তারও দাম হু হু করে বাড়ছে। ২০/২৫ বছর আগে যেখানে ভাল বাবরশা টাকায় ১২/১৪ খানা পাওয়া যেত এখন তা টাকায় মাত্র ৩টি। তাও আগের মত গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই ব্যবসাটাকে আরো একটু বড় করার জন্য ক্ষীরপাইয়ের ইউকো ব্যাংকে কালীপদবাবু দু দুটো দরখাস্ত করেছেন ঋণ চেয়ে। ব্যাংক আজ পর্যন্ত কোন উত্তর দেয়নি।

বাবরশা তৈরি করতে ক্ষীরপাইয়ের জলের না কি বিরাট ভূমিকা আছে। অন্য কোন জায়গায় হলে এত মুচমুচে বাবরশা হয় না। কলকাতার নোনা জলে তো বাবরশা গড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না বলে কালীপদবাবু জানান। □

মুরশিদাবাদের শাহী মিষ্টি

কালীপদ দাস

মিষ্টান্ন শিল্পের কথা উঠলে বাংলা দেশে যে কটি জেলার নাম মনে আসে তার মধ্যে মুরশিদাবাদ অন্যতম। এর বৈশিষ্ট্য ও খ্যাতির পেছনে কিন্তু মুরশিদাবাদের নবাব, রাজা-মহারাজা, জগত শেঠ পরিবার ও জৈন সম্প্রদায়ের ভূমিকা বড় কম নয়। মিষ্টান্নের প্রতি এদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগী মনোভাব এই শিল্পকে একদিকে যেমন ঐতিহ্যমন্ডিত করেছে, অন্য দিকে তেমনি পশ্চিমবংগ তথা ভারতের সর্বত্র এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারকে সম্ভব করে তুলেছে।

মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন প্রসংগে মনে আসে জিয়াগঞ্জের মালপোয়া, মালাই বরফি, বহরমপুরের ছানাবড়া, বেলডাঙার মনোহরা, রঘুনাথগঞ্জ জংগিপুরের ক্ষীরপানতোয়া, দই এবং ঔরংগাবাদের রসকদম্ব।

জিয়াগঞ্জের মালপোয়ার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও এটা একটি প্রাচীন মিষ্টি। খুবই কড়া রসের মিষ্টি। যার ফলে এক সংগে খুব বেশি এ মিষ্টি খাওয়া যায় না। রসে ফুটিয়ে ফুটিয়ে এর রং চকোলেট হয়ে যায়। জিয়াগঞ্জের এক সময় নাম ছিল বালুচর। যার জন্য এই মিষ্টির পোশাকী নাম বালুচরী মালপোয়া। সিদ্ধি জাতীয় নেশার পর এ ধরনের কড়া রসের মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা আসে। সিদ্ধি থেকে নানা ধরনের নেশা করার প্রচলন স্থানীয় জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব ছিল, কিছু কিছু এখনও আছে। তাই আজও জিয়াগঞ্জ বা বহিরাঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মালপোয়া খুবই প্রিয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও একবার জিয়াগঞ্জে সভা করতে গেলে সেখানকার মানুষ তাকে একটা বিরাট আকারের মালপোয়া উপহার দেন। নেতাজী নিজে হাতে কেটে কেটে সকলের মধ্যে ভাগ করে নিজেও খান এবং এর স্বাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্যবসায়িক অচলাবস্থার কারণে বহু পুরনো মিষ্টির দোকান উঠে গেছে। দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মিষ্টির দোকানটি একটা পুরনো দোকান। তার দুই ছেলের পাশাপাশি দুটি দোকান জিয়াগঞ্জের মান বাড়িয়েছে। এখানকার মালাই বরফির কৃতিত্ব মূলত পার্শ্ববর্তী বরবড়িয়ার ঘোষেদের। সাধারণ খোয়া বা ক্ষীর সকলেই করতে পারে। এখানকার ঘোষেরা বিশেষ উপায়ে ঐ ক্ষীরে ছানা ও সুতো-সুতোর মত এক ধরনের জিনিস তৈরি করেন যাতে স্বাদ অনেক বেড়ে যায়। এই ক্ষীর থেকে প্রয়োজনমত চিনি ও সুগন্ধি দিয়ে কারিগর উৎকৃষ্ট মালাই তৈরি করেন। মালাই তৈরিতে আজিমগঞ্জের 'ভকতের মিষ্টির দোকান' একটি অগ্রগণ্য নাম। ভকতজী মারা যাওয়ায় আজিমগঞ্জে মালাই এখন আর হয় না।

ছানাবড়ার কথায় সবচেয়ে আগে মনে আসে বহরমপুরের আদি লক্ষ্মীনারায়ণ ভান্ডারের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীনারায়ণ সাহার কথা। ছেলে নবকুমারের হাতে দোকান সঁপে দিলেও বৃদ্ধ বয়েসে আজও তিনি নিয়মিত দোকানে বসেন। বয়স ৮০ র কোঠায়। ছানাবড়া শ্রীসাহা ছোট থেকেই দেখছেন। তাই এর উদ্ভব ও খ্যাতি অন্তত ২০০ বছরের বলে তার মনে হয়। কাশিমবাজারের রাজবাড়ির সংগে এই ছানাবড়ার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এখান থেকে উৎসব ও পার্বণে ছানাবড়া ইংলনড, আমেরিকাতে গেছে। এই মাস দুয়েক আগেও নাটোরের মহারাজের নাতনি স্বামীকে সংগে নিয়ে এসে মালপোয়া খেয়ে গেলেন, সংগে নিয়েও গেলেন। কলকাতা হাইকোরটের প্রাক্তন বিচারপতি ও পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন গভরনর সুরজিৎ লাহিড়ি এখানকার ছানাবড়ার বড় ভক্ত। আজও তার বাড়ির মিষ্টি এখান থেকেই যায়। ছেলে নবকুমার সাহা জানালেন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এই ছানাবড়ার আর একজন ভক্ত। এখনও বহরমপুরে আসলে এখানে তাঁর আসা চাই। গভঃ ডিরেকটর বি সি রায় এর খ্যাতি শুনে ১৯৬১ ও ১৯৬৩-তে তার পরিবারের দুটো বিয়েতেই এখান থেকে ছানাবড়া নিয়ে যান। শুধু তাই নয় তিনি ইংলনড ও আমেরিকার বন্ধু-আত্মীয়-স্বজনদের এই মিষ্টি পাঠাতে তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এর স্বাদের বলে তিনি একটি প্রশংসা পত্রে জানিয়েছেন। চন্দ্র ছানাবড়া। এ প্রবাদও প্রচলিত হয়েছে এখানকারই ছানাবড়া থেকে। নাটক, নভেলেও এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুর স্যার ওয়াসেফ আলী মীরজার বাড়িতেও এই ছানাবড়ার যাতায়াত ছিল। খুবই সৌখিন মিষ্টি। ভাল ঘিয়ে ভেজে তৈরি করতে হয়। এখন ভাল ঘি পাওয়াও যায় না, আর দামেও পোষায় না। ফরে ডালডায় তৈরি ছানাবড়াতে আগেকার স্বাদ আর আসছে না। ৪/৫ আনা সেরের মালপোয়া আজ ১০/১২ টাকা কিলো। নবকুমারবাবুই একমাত্র বহরমপুরের এই প্রাচীন মিষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। অন্যত্র এ মিষ্টি বিশেষ আর তৈরি হচ্ছে না। এই মিষ্টির বিশেষত্ব এর উপরটা বেশ শক্ত, ভেতরটা খুব নরম। তবে পানতোয়ার মত নরম নয়। এর ভেতরটা মৌমাছির চাকের মত জালি-জালি। এই চাক তৈরি করা বেশ শক্ত। এখানেই বহরমপুরের কৃতিত্ব।

বেলডাঙার মনোহরা বলতে নাকু সাহার মিষ্টির দোকান। কিছু বিতর্ক থাকলেও নাকু বাবুর বাবা নবনীকুমার সাহা এই মনোহরার জনক বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। নবনীবাবু বা তার ছেলে নাকুবাবু (ভাল নাম বজগোপাল সাহা) আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু মনোহরার খ্যাতি সারা জেলা জুড়ে। মনোহরার বয়স ধরে নেওয়া যায় ১২৫-১৫০ বছর। অবশ্য মনোহরা মিষ্টান্ন শিল্পে পাঁচুগোপাল সাহাও একটি অগ্রগণ্য নাম। এর ব্যাপক খ্যাতির পেছনে তার ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই মনোহরা বিভিন্ন সময়ে ইরাক, ইরান, নেপাল, দিললি, বোমবাই ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় সুনাম অর্জন করেছে। তবে বেলডাঙা স্টেশন বা গাড়িতে ডালায় করে হকাররা যে মনোহরা বিক্রি করেন তা খেয়ে যদি মনোহরার মান নির্ণয় করা হয় তাহলে ভুল হবে। এগুলো বেশির ভাগ চিনির ভাগ বেশি দিয়ে করা হয়। ভাল মনোহরার জন্য আপনাকে অবশ্যই নাকু সাহার দোকানে আসতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় অরডার দিয়ে করিয়ে নিলে। এখন নাকুবাবুর ছেলেরা মনোহরা করছেন। তারা বলেন, বাবা নাকু সাহা যে ধরনের মনোহরা করতেন তা আমরা আজও পারি না। খুব উৎকৃষ্ট ধরনের চাছিকে ভেজে ভাল করে গুঁড়ো করে নিতে হয়। তার সংগে পরিমাণ মত ছানা ও চিনি মিশিয়ে এবং তাতে এলাচ, লবংগ, পেস্তা, জয়িত্রি, জাফরান (ব্যবহার নেই) দিতে হয়। এরপর তাকে গোল-গোল মন্ড তৈরি করে চিনির রসে একটা একটা করে ফেলে প্রথমে কলার পাতায় সাজান হয়। পরে শুকিয়ে গেলে তা শো কেসে তোলা হয়। খুব ভাল মনোহরা এক-দু দিনের বেশি রাখা যায় না। মনোহরা টাটকা খাওয়াই ভাল।

রঘুনাথগঞ্জ জংগীপুরে খুব পুরনো মিষ্টির দোকান খোঁজ করলে সকলেই যে দোকান দেখিয়ে দেবে তা হচ্ছে বাদল ঘোষের মিষ্টির দোকান। তিন পুরুষের মিষ্টির ব্যবসা। বাদলবাবু নিজেও প্রাচীন ও বহুদর্শী মানুষ। বললেন, এখানকার ক্ষীর পানতোয়া, ক্ষীর দিয়েই তৈরি হয়। ফলে এর স্বাদ খুবই ভাল, নরম এবং মোলায়েম। অন্যত্র এখন কিছু কিছু এ মিষ্টি হলেও ছানা বা ছানার সংগে সামান্য ক্ষীর মিশিয়ে করা হয়। ক্ষীরের পানতোয়া এখানে প্রায় ১৫০ বছর থেকে হচ্ছে। এখানে মিষ্টির আর একটি বৈশিষ্ট্য, এখানকার মত কম দামে মিষ্টি সারা পশ্চিমবাংলার আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখনও এখানে ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা কিলো মিষ্টি। আর তা সম্ভব হয়েছে পর্যাপ্ত দুধের জোগানের জন্য। তবে অতি সম্প্রতি এর প্রচলন কমে যাচ্ছে।

জংগীপুর থেকে কিছু উত্তরে ঔরংগাবাদ। সেখানকার রসকদম্ব খুবই বিখ্যাত। উপরে মোয়ার কোটিং, তার উপর পোস্ত ছড়ান, ভেতরে সুস্বাদু মিষ্টি। সব মিলিয়ে এর স্বাদ স্বর্গীয়। রসকদম্বের উদ্ভব যদিও মালদায় তবু ঔরংগাবাদের রসকদম্ব তার সমসাময়িক। সারা শহরের মিষ্টির দোকানে মন্দিরের চূড়োর মত সাজান রসকদম্ব এখানকার রসকদম্বের ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করছে। ভাগলু সাহার মিষ্টির দোকানটি পুরনো। উৎকৃষ্ট ধরনের রসকদম্ব তৈরির জন্য বা বাইরে পাঠাবার জন্য ঔরংগাবাদ নিমতিতার লোক এখানে নির্ভর করে থাকে। মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন শিল্পের খ্যাতির একটা বড় কারণ এখানকার মানুষ মিষ্টি খানেওয়ালা। এখানকার মত মিষ্টান্নপ্রিয় মানুষ অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। তবে দিনে দিনে নানা সমস্যায় মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন শিল্পের সুনাম নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। দিনে দিনে কাঁচামাল ছানা-চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে যে সমস্যায় সারা জেলার শিল্পীরা ধুঁকছেন তা হচ্ছে বিক্রয় কর। বিক্রয় কর ও অফিসারদের চাপে তাদের নাভিশ্বাস। জংগীপুরের বাদল ঘোষ বললেন, কলকাতা বা অন্যত্র মিষ্টির দাম এখানকার প্রায় দ্বিগুণ, অথচ করের পরিমাণ এক। তিনি বলেন, মিষ্টির বিক্রয় দামের উপর এই বিক্রয় কর ধার্য করা উচিৎ।

এক কথায় এই মিষ্টান্ন শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে গণ্য করে এর উপর থেকে বিক্রয় কর তুলে দিলে এবং ন্যায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করলে মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়। ( )

নদীয়ার সরভাজা

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

'উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া,
উঁহু, গড়েছে কি নিধি, দয়াময় বিধি! কত না বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও আহা খালি আঃ।
মদীয় বদনে ঢালিয়া।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ঠাঁই ঠাঁই নদের তুলনা নাই। নেই তার মিষ্টিরও তুলনা। ডি এল রায়ের আমল থেকে আজ পর্যন্ত। মুখের ভাষার মতই নদীয়ার মিষ্টিও সুমধুর। কলকাতার মিষ্টি ও কৃষ্ণনগরের মিষ্টির কাছে হার মেনে যায়, এমন তার স্বাদ।

আজও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির নাম কেবল বিখ্যাতই নয়, সুস্বাদুও। নদীয়ার মিষ্টির মধ্যে কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়ার খ্যাতি আজও সর্বত্র।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ' (১৩১৭) গ্রন্থে এই সরভাজা, সরপুরিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে (২৮৫ পৃঃ)

'সরপুরিয়া -(দেশজ) খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। ইহা দুগ্ধের সর, ছানা, ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া বিখ্যাত ও অতি উপাদেয় খাদ্য।

সরভাজা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। দুগ্ধের সর পাকিয়া পাকিয়া তুলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়। খাইতে অতি সুস্বাদু।'

আজও এই সরভাজা সরপুরিয়ার কদর সর্বত্র। বাইরে থেকে যে কেউ কৃষ্ণনগর এলে যাবার সময় সরভাজা সরপুরিয়া কিনে নিয়ে যাবেই। তবে আগেকার সরভাজা সরপুরিয়া আজকাল পাওয়া যায় না।

সাধারণভাবে সরভাজা সরপুরিয়া দোকানে যা পাওয়া যায় তার দাম ৩০/৩৫ টাকা কেজি। তবে আগের মত সে সরভাজা সরপুরিয়া পেতে হলে সেরকম অর্থব্যয় করে অরডার দিতে হবে। একটি পুরনো মিষ্টির দোকানের মালিকের সংগে কথা বলে সরভাজা সরপুরিয়ার হিসাব নিয়ে জানলাম খুব ভালভাবে করতে গেলে বর্তমানে ১০০/১২০ টাকা কেজি দাম পড়বে, তাও খুব বেশি পরিমাণ করে ওঠা যাবে না। এক কেজি উৎকৃষ্ট সরপুরিয়া করতে জিনিস লাগে কাবলে বাদাম ১০০ গ্রাম, গ্রীন পেস্তা ২৫ গ্রাম, ছোট এলাচ ১৫ গ্রাম, ভাল জাফরান ২ গ্রাম, ছানা ও ক্ষীর ৮০০ করে, সর দুজোড়া, চিনি ৪০০ মত। মোটামুটি যা হিসাব পাওয়া গেল তাতে দাম ঐরকমই পড়বে। এর মধ্যে ভাল জাফরানের দাম সব চেয়ে বেশি আর পাওয়াও শক্ত।

সরভাজা করতে দুধ জাল দিয়ে পুরু সর ফেলে সেই সর পর পর সাজিয়ে ভাল ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ফেলতে হবে।

আগেকার সরভাজা সরপুরিয়া তৈরির নামডাক ছিল, ঐতিহ্য ছিল নদীয়ার সংস্কৃতির সংগে। তখনকার দিনে বক্রেশ্বর কর্তা, অধর কর্তা, ভরত কর্তার নাম ছিল সরভাজা সরপুরিয়ার জন্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর গানে, প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনায় অমর করে রেখে গেছেন এই সরভাজা সরপুরিয়াকে। আজকাল দক্ষ মিষ্টান্ন শিল্পীর অভাব যদিও আছে তবুও আজও দুই এক জন মিষ্টান্ন শিল্পী যাঁরা আছেন তাঁরা সরভাজা সরপুরিয়ার নাম বজায় রেখেছেন। একজন শিল্পী দুঃখ করে বললেন 'জিনিসের দাম বেড়েছে, ভালভাবে করতে গেলে অনেক টাকা খরচ তবুও মাঝে মাঝে আসল সরভাজা সরপুরিয়ার অরডার পাই। কিন্তু ভাল জাফরান পাওয়া শক্ত। গেলেও এত দাম যে অনেকে পেরে ওঠেন না।'

কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া ছাড়াও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে যেসব মিষ্টির নামডাক আছে তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য রাণাঘাটের পানতুয়া, শান্তিপুরের নিখুঁতি, মুড়াগাছার ছানার জিলিপি, গোটপাড়া, ধর্মদা বেথুয়াডহরীর কাঁচাগোল্লা, বেতাইয়ের চমচম, কালীগঞ্জের রসকদম্ব প্রভৃতি। তবে আজ সবই অতীতের কিংবদন্তিতে দাঁড়িয়েছে। কারণ ভাল জিনিস পাওয়া যায় না, ভাল মিষ্টান্ন শিল্পীরও অভাব। তাছাড়া ভাল জিনিসের অভাবে অনেক শিল্পীই আজকাল অন্য মিষ্টান্ন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

তবে বর্তমানে মানুষের চাহিদার তাগিদে সেকালের ছানাজাত মিষ্টির মধ্যে আজকাল মাথাসন্দেশ, বাদামের বরফী, দেদোমোণ্ডা, ছানার গজার আজও সুনাম বজায় আছে। □

আলোকচিত্র : শ্রী সমীর

রাণাঘাটের মিষ্টি : প্রস্তুত প্রণালী

শনু ঘোষাল

উঁচুদরের মিষ্টি নির্মাতাকে যদি শিল্পী বলা হয় তবে রাণাঘাটের ভূতপূর্ব মিষ্টি প্রস্তুতকারককে অবশ্যই শিল্পী বলতে হবে। ধন্য মানুষটি ছিলেন গরিব। স্নেহময়ী মা নিজের হাতে মিষ্টি করতেন, মুড়ি ভাজতেন। সুযোগ্য পুত্র সেগুলি প্লাটফরমে বসে বসে বিক্রি করতেন এককালে। তারপর একদিন 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।' টাকা পয়সা আসতে লাগল, তার চেয়ে ছড়িয়ে পড়ল মিষ্টির সুখ্যাতি : পাবনা রাজশাহি, রংপুর বগুড়া, ময়মনসিং শিলিগুড়ি আর মুরশিদাবাদের মানুষগুলি ভিড় করতে লাগল তাঁর দোকানে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি দোকান করেছেন তখন কাছের রেলবাজারের গলিতে। গাড়ি এখানে না হোক কুড়ি মিনিট থামবে। সকলের সুপরিচিত মানুষটি হলেন প্রয়াত হরিদাস পাল। এঁরই সুযোগ্য পুত্র ইসটারন রেলওয়ের নাম করা খেলোয়াড় বিশু পাল।

রাণাঘাটের মিষ্টিগুলির বিখ্যাত হবার কারণ অনেক। পূর্বতন ই বি আর এবং বর্তমানের ইসটারন রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগের নামকরা জংশন স্টেশন রাণাঘাট। পাঁচটা শাখা লাইন মিলেছে এখানে। শহরের উপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। শহর আর তার ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে রেলকে ঘিরে। পয়সাওলা মানুষের বাস। দত্তফুলিয়া, হাঁসখালি, বগুলার ছানা বিখ্যাত। রাণাঘাটের ধারে কাছে এককালে প্রচুর গো চারণ ভূমি ছিল। দেশ বিভাগের আগে কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি থেকে ফুলিয়া আর তার চারপাশের গো চারণ ভূমিতে চরতে আসত পাল পাল গরু। ঘোষ ভায়েরা সাময়িকভাবে তাঁবু খাটিয়ে থাকত সেখানে। প্রচুর উদ্বৃত্ত দুধ জমত। কাছেই বিরাট জংশন স্টেশন আর ব্যবসা কেন্দ্র রাণাঘাট। 'সুতরাং রাণাঘাটের মিষ্টি তো বিখ্যাত হবেই।

ছোট শহরটায় সরকারি লাইসেনস প্রাপ্ত মিষ্টির দোকানের সংখ্যা ৭৩। জন সংখ্যা আশি হাজার। ছানা কাটতে পারবে দোকানগুলি দিনে ৬৭৬ কেজি, ঐ হিসেবে দই প্রভৃতির জন্য দুধ পাবে ৬১৫২ কেজি (সূত্র : পশ্চিমবংগ দুগ্ধ প্রকল্প, হরিণঘাটা খামার)। রাণাঘাটের বিখ্যাত দোকানগুলি হল 'হরিদাস পালের (মাঝে বন্ধ ছিল বর্তমানে চলছে), জগু ময়রার (যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক), মিষ্টিমুখ (সুধীর প্রামাণিক), মহাদেব ঘোষের, রবি কর্মকারের দোকান। দোকান হিসেবে জগু ময়রার দোকান হরিদাস পালের চেয়ে পুরনো। 'মিষ্টিমুখ' হালফিলের। এটা ছাড়া কোন দোকানের সাইন বোরড নেই। জগু ময়রার মিষ্টির চাহিদা এখন সবচেয়ে বেশি। মিষ্টিগুলি হল পানতুয়া, রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, দই। সব মিষ্টি ২৫ আর ৫০ পয়সার। যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিকের নাতি ভোলা দাবি করেন তাঁর দোকানের দই মিষ্টি দেশি গরুর দুধ থেকে তৈরি।

পশ্চিমবাংলায় প্রায় সব মিষ্টিই ছানা থেকে তৈরি। ছানা 'কাটা'র ওপর নির্ভর করে কী ধরনের মিষ্টি তৈরি হবে। রাণাঘাটের বিখ্যাত মিষ্টিগুলির প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা যাক : (১) পানতুয়া। খোয়া (৩০০ গ্রা), ছানা (৩০০ গ্রা), ময়দা (৩৫ গ্রা), ঘি (৫০০ গ্রা), চিনি (১.২৫ কিলো), জল (১ কিলো)। (২) মৌচাক। ছানা (১

কিলো), ময়দা (১০০ গ্রা), মৌরি (৫ গ্রা), জল (১ কিলো), সেনট (বেনাল্গা)। কাঁচা মৌচাক কাটার পর চিনির রসে ফোটাতে হয় যতক্ষণ না লাল হচ্ছে (৩) **ছানার চমচম**। মৌচাকের মত তবে মৌরি আর সেনট বাদ। (৪) **নিখুতি**। ছানা (১ কিলো), ময়দা (২০০ গ্রা), বড় এলাচ। মৌচাকের মত মোটা রস। লম্বাভাবে কেটে বনস্পতিতে ভেজে রসে ডোবান হয়। পরিবেশনের সময় গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হয়। (৫) **ছানার জিলিপি**। নির্মাণ কৌশল নিখুতির মত। তবে ন্যাকড়ার ফুটো দিয়ে 'মাল' গরম ঘিতে প্যাঁচ ফেলা হয়। চিনির রস হালকা। (৬) **রসমালাই**। রস-গোল্লার ছোট ছোট গুটি হালকা ক্ষীরে ডুবিয়ে তৈরি। চিনি খুব বেশি দেওয়া হয়। (৭) **কাঁচাগোল্লা**। ১ কিলো ছানায় প্রায় ৮০০ গ্রাম চিনি। কাঁচাপাক, রস বেশি। (৮) **কালজাম**। ছানা (১ কিলো), ময়দা (২০০ গ্রা), রং গোলাপী, বড় এলাচ (৭-৮টা), রস নিখুতির মত মোটা। (৯) **ক্ষীরের সন্দেশ**। খোয়া (২২৫ গ্রা), চিনি (১০০ গ্রা), পেস্তা (কয়েকটি), রাংতা, দারুচিনি। হালকা আগুনে কড়াইয়ে বার বার খুনতি দিয়ে নাড়তে হবে। গরম সন্দেশ যখন গোলাকার হবে হাতের আঙুল নাড়ায় - বুঝতে হবে সন্দেশ তৈরি। পেস্তা, রাংতা তখনই যোগ করতে হবে। (১০) **ক্ষীরমোহন**। ছানা (১ কিলো), ময়দা (১০০ গ্রা:)। প্রস্তুত প্রণালী সন্দেশের মত। ওপরে পাতলা ক্ষীরের একটা আবরণ থাকবে। (১১) **রাজভোগ**। রস-গোল্লার মত তৈরির কায়দা কিন্তু ভেতরে ছানা, চিনি আর বড় এলাচের ছোট গুটি রাজভোগকে দেয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। (১২) **কালাকান্দ**। দুধ (১ কিলো), চিনি (৭৫ গ্রা), লেবুর রস (আধ গ্রা), পেস্তা বাদাম, রাংতা, দারুচিনি। গনগনে আগুনে দুধ খুব ঘন ঘন নাড়তে হবে খুন্তি দিয়ে। কাদা কাদা মত হলে চিনি দিয়ে আবার নাড়তে হবে। ১০-১৫ মিনিট ব্যাপারটা চলবে। নামাবার সময় পেস্তা, দারুচিনি দিতে হবে।

পুরুলিয়ায় ব্যাপক খরার জন্য মিষ্টান্নশিল্পও মার খাচ্ছে

সুনীল মাহাতো

চার পুরুষ ধরে গগন সেনদের কারবার। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে গদাই সেন প্রতিষ্ঠা করেন 'গদাই মিষ্টান্ন ভান্ডার'। তার অবর্তমানে বিনোদ সেন এবং বর্তমানে মদন সেন। গগন সেন এবং ছেলে রবি সেন চালিয়ে যাচ্ছেন সেই দোকান। গগন সেনের জেঠামশাই রাধারমণ সেনের ছেলে দুর্গাগতি বিশ্বনাথ পাশেই আলাদা দোকান করেছেন 'গদাই সেনের মিষ্টান্ন ভান্ডার'। গদাই মিষ্টান্ন ভান্ডারের কোন সাইন বোরড নেই, গদাই সেনের মিষ্টান্ন ভান্ডারেরও সাইন বোরড ভেঙে পড়ে আছে, নতুন করে বোরড লাগাবার তাগিদ নেই তাঁদের। বহুদিনের পুরনো এই দোকানের এখনও নাম আছে। মিষ্টির দোকা-নের নাম বলতে বললে পুরুলিয়ার সকলের মুখেই প্রথম যে নামটি বেরোয় সেটি হল গদাই মিষ্টান্ন ভান্ডার। এই দোকানের রসগোল্লা, নিখুতি কালাকান্দের তুলনা নেই। বোমবাই-এর চিত্রতারকা মনমোহন জামশেদপুরে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথে গদাই মিষ্টান্ন ভান্ডারে মিষ্টি খেয়ে যেতেন। তাছাড়া, 'বিশ্বজিৎ সৌমিত্র, উৎপল দত্ত এবং 'হীরক রাজার দেশের' শ্যুটিং-এর সময় সত্যজিৎ রায় তাঁর দোকানে এসে মিষ্টি খেয়ে সুনাম করেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বি ভি আগরওয়ালা, স্বর্গীয় দেবেন মাহাত বিনোদ সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই দোকানে আসতেন।

সেকালে সবকিছুরই প্রাচুর্য ছিল, মিষ্টান্নও তৈরি হত অনেক রকম। বাবা বিনোদ সেন জানতেন ছানার ১২১ প্রকার মিষ্টির কাজ। এখন ভ্যারাইটির কোন প্রশ্নই নেই। ভাল জিনিস তৈরি করতে খরচও প্রচুর বেড়ে গেছে, খদ্দেররা কিনতে পারছেন না। একসময় বিয়েবাড়ি ইত্যাদিতে প্রচুর অরডার সাপলাই এর কাজ ছিল, এখন তেমন নেই। গগনবাবু সাত বছর বয়স থেকে দোকানে বসছেন। এখন বয়স উনপঞ্চাশ। চোখের সামনেই দেখেছেন, দিনগুলো কিভাবে দুর্দিন হয়ে যাচ্ছে। আটা, ময়দা, চিনি, তেল, বনস্পতি সবকিছুতেই ভেজালে ভেজালে ছয়লাপ, ইচ্ছে করলেও সে জিনিস আর তৈরি করা যায় না। দুধের উৎপাদন কমে গেছে, ভালো ছানা পাওয়া যাচ্ছে না এরকম হাজারো অভিযোগ। তিনি আরও বললেন, 'মানভূমের বিভাজন পুরুলিয়া মিষ্টান্ন শিল্পকে শেষ করে দিয়েছে।' বিহারে থাকাকালীন মানভূম কোরটের আওতায় ছিল ধানবাদ, চাইবাসা নিয়ে মোট তিরিশটি থানা। এখন পুরুলিয়ার অধীনে ষোলটি থানা। চাষ, চন্দনকিয়ারী, ধানবাদ, চান্ডিল খনি এলাকা থেকে মামলা মোকদ্দমা এবং অন্যান্য কাজে আসতেন প্রচুর লোক, তাদের হাতে পয়সাও প্রচুর। পুরুলিয়া শহরে মিষ্টান্নের বাজারও ছিল, তখন, এখন তা কল্পনাই করা যাবে না। ভেঙে দু-টুকরো হওয়ার সংগে সংগেই পুরুলিয়া মিষ্টান্ন শিল্পের কোমর ভেংগে গেছে। সন্দেশ গলির 'বান্ধব মিষ্টান্ন ভান্ডারে'র প্রতিষ্ঠা হয়েছে হালে। কেদার সেনের পর করালী সেন, অদ্বৈতচরণ সেন পুরুষানুক্রমে দোকান চালাচ্ছেন। ভাগ্নে শ্রীমন্ত দাস গগনবাবুর উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করলেন - বিহার বেংগল বিভাজন পুরুলিয়ার মিষ্টান্ন শিল্পে আঘাত হেনেছে প্রচন্ডভাবে। তাঁর দোকানের কালজাম এবং নিখুতি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। কালাকান্দ আগে ভাল হত, এখন ছানার গোলমাল। পুরুলিয়াতে ভাল চিনিও পাওয়া যায় না। তাছাড়া তৈরি করার খরচ এত বেড়ে গেছে যে খদ্দেররা কিনতে পারেন না। শ্রীমন্তবাবু আরও বললেন, পুরুলিয়ার মিষ্টান্ন শিল্পে আধুনিকতা কল্পনা করা যায় না। এখন এখানকার ক্রেতা বলতে গ্রামাঞ্চলের লোক এবং তাঁদের হাতে পয়সাও নেই। তাঁদের চাহিদা গুড়ের মিঠাই, চপ, সিংগাড়া, ভাভরা, পকড়ি। এরবেশি এগোবার সাধ্য নেই।

সাহেববাঁধ রোডের 'গণেশ সুইটস'-এর মালিক দুঃখভঞ্জন দে যদিও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে নতুন তবুও দোকান চালাচ্ছেন নবছর। সুন্দর সাজান গোছান আধুনিক দোকান গণেশ সুইটস-এর প্রথমদিকে বিক্রিবাটা ভালই ছিল, এখন চালান হচ্ছে কোনরকমে। তাঁর দোকানের নিখুতি, ক্ষীরকদম্ব, রসগোল্লা নাম করেছে।

গত ৮ এপরিল পুরুলিয়া জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক কালীপদ দাসের নেতৃত্বে তাঁরা সকলেই পশ্চিমবংগ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বানে হরতাল পালন করেছেন বিক্রয় কর মুকুবের দাবিতে। সুপরিম কোরটের রায়ের ভিত্তিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁয় খাদ্য বস্তুর উপর বিক্রয়কর রহিতকরণে মহারাষ্ট্র সরকার এবং অন্ধ্র সরকারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পশ্চিমবংগ সরকার বরং করের পরিমাণ বর্ধিত করেছেন। যদিও পশ্চিমবংগ সরকার মিষ্টান্ন শিল্পকে কুটিরশিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু কুটিরশিল্প হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার দিকে কোন নজর দেননি। দুঃখভঞ্জনবাবু আরও বলেন, কয়লা, জল, পাতা, হাঁড়ি, দুধ ইত্যাদি নির্মাণ এবং সরবরাহকারী, শ্রমিক, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি সকলেই এই শিল্পের সংগে জড়িত। যদিও ডেলি পেমেনট হিসেবেই শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তবু তাদের বেতন, খাওয়া জামাকাপড় আমাদেরকে দিতে হয়। আটা, ময়দা, চিনি, বনস্পতি ইত্যাদি দোকান থেকে কেনার সময় আমাদেরকে সেল ট্যাকস দিয়েই কিনতে হচ্ছে। তিনি একবছরে হিসেব দেখিয়ে বলেন, এই ধরুন এক বছরে সেল ট্যাকস দিতে হয়েছে ১৪০৭.৮০ টাকা, মুহুরির বেতন ধরুন মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ৬০০ টাকা, খাতার দাম ৫০ টাকা এই মোট ২০৫৭.৮০ টাকা। আমরা লেবারকে এই টাকাটা বোনাস দিতে পারি যদি সেল ট্যাকস ছেড়ে দেওয়া হয়। পচনশীল দ্রব্য প্রস্তুতকারক হিসেবে হোটেলকে সেল ট্যাকস রেহাই দিলে মিষ্টান্ন রেহাই পাবে না কেন : ফল, পান, মদের উপরও ট্যাকস নেই। রং ব্যবহারের উপর কড়াকড়ি অথচ রং তো আমরা তৈরি করি না, বাজার থেকে যা পাওয়া যায় তাই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়। আরও মজার ব্যাপার দেখুন টক দই এ সেল ট্যাকস নেই। মিষ্টি দই তে আছে। নোনতা জিনিস যেমন চপ, সিংগাড়া, ভাভরাতে সেল ট্যাকস নেই, মিষ্টিতে আছে। এগুলোর কোন মানে হয় : জয়পুর, বলরামপুর, বরাবাজারের পেঁড়া শিল্পও একই সমস্যার সম্মুখীন। সর্বোপরি-খরাপ্রবণ এলাকা পুরুলিয়ায় মানুষের কাছে খাওয়া পরার সমস্যাই প্রধান। কলকারখানা নেই, সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা নেই। সুতরাং ক্রয় ক্ষমতা নেই। মিষ্টান্ন শিল্প তাই ধুঁকছে। □

জলপাইগুড়ির রসগোল্লা ছানার জিলিপি লালমোহন

বীরেন্দ্র প্রসাদ বসু

জলপাইগুড়ির বিখ্যাত মিষ্টান্ন বলতে বাঙালির প্রিয় রসগোল্লার কথা দিয়েই শুরু করতে হয়।

লাটাগুড়ির রসগোল্লার একটা ঐতিহ্য স্বাধীনতাপূর্ব যুগ থেকে অব্যাহত। প্রফুল্ল দে র রসগোল্লা এখনো লোকের মুখে মুখে। বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা ও রসগোল্লা প্রস্তুতকারী ছিলেন প্রফুল্ল দে। কথাগুলো বলছিলেন লাটাগুড়ির অন্যতম রসগোল্লা প্রস্তুতকারী সুধীর ঘোষ। সুধীরবাবু বললেন, প্রফুল্লবাবুই এ ব্যাপারে নাম করেছেন। তাঁর দোকান বছর ৮/৯ বন্ধ। তিনি এখন লাটাগুড়ির একমাত্র 'হরিসভার' প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতায় প্রফুল্ল বাবুর রসগোল্লা গিয়েছে। নিজেই বলতেন। কথা প্রসঙ্গে সুধীর ঘোষ বললেন, এখন লাটাগুড়িতে মাত্র ৮/৯টি দোকানে রসগোল্লা তৈরি হয়। আগে ছিল প্রফুল্লবাবুর একটি দোকান। সেই সুনামটি এখন আমরা কাজে লাগাচ্ছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'দুধের ওপর রসগোল্লার তারতম্য নির্ভর করে'। প্রফুল্লবাবুর ছেলেরা অন্যের কাছ থেকে ছানা নিয়ে রসগোল্লা তৈরি করছেন। ৫০ পয়সা সাইজের ৬০টি রসগোল্লা তৈরি করতে ১ কেজি ছানা, ৩ কেজি চিনি, ১ কে জিতে ৫০ গ্রাম ময়দার প্রয়োজন। দিনে গড়ে তারা ২০০টির মতন রসগোল্লা তৈরি করেন। প্রফুল্লবাবু ১ সের রসগোল্লা বিক্রি করতে আয়করবাবুদের ঝামেলায় তার ঐতিহ্যশালী রসগোল্লা তৈরি বন্ধ করে দেন। বর্তমান সমস্যা প্রসঙ্গে সুধীরবাবু বলেন, গরুর দুধ ভাল এখন আগের মতন পাওয়া যায় না, খোলা বাজারে বেশি দামে চিনি কিনতে হয়। দুধের দাম বেড়েছে। প্রতি কিলো সোয়া তিন টাকা। মাঝে মধ্যে আয়করবাবুদের ঝক্কি ঝামেলা তো আছেই।

জেলার খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ ধূপগুড়ির ছানার জিলিপির খবর রাখেন। কথা হচ্ছিল ধূপগুড়ির রেবতী মোহন ঘোষের সঙ্গে। বয়স ৫২ দেশ ঢাকা। বছর ১৫ ধরে তিনি এ ব্যবসা করছেন। ধূপগুড়ি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রেবতী বাবু বলেন, ধূপগুড়ির অন্যতম প্রাচীন নাগরিক প্রয়াত বিভূতিভূষণ মিত্র সর্বপ্রথম এখানে ছানার জিলিপি তৈরি করেন। এখান থেকে একদা ছানার জিলিপি অনেকে নিয়ে যেতেন। এক কে জি ছানার সঙ্গে ২০০ গ্রাম ময়দা, ভাল ঘি ৫০ গ্রাম (এখন বনস্পতি চলছে), চিনি ১০০ গ্রাম ও খাওয়ার সোডা একটু। রেবতীবাবু বলেন, সমস্যা বলতে চিনির কোন কোটা নেই। ভাল দুধ না হলে ছানা ভাল হবে না। এখন বাজারে মোটামুটি সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়, আগে পাওয়া যেত না। অপর এক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী (নাম উল্লেখে নারাজ) বললেন, বিভূতিবাবু যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যেও যে ছানার জিলিপি তৈরি করছেন সে ঐতিহ্য এখন আর নেই। কারণ ভাল দুধ ও ঘি পাওয়া কঠিন। বিভূতিবাবু ভোজনরসিক ছিলেন।

বেলাকোবার ধীরেন্দ্রনাথ দে সরকারের চমচম টাংগাইল পোড়াবাড়ির চমচমের কথা মনে করিয়ে দেয়। দেশ ময়মনসিংহের টাংগাইল। বয়স ৬২। আগে কাঁধে নিয়ে ফেরি করতেন চমচম। বেলাকোবার অধিকাংশ মিষ্টান্ন শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দে সরকারের কাছে কাজ শিখেছেন। ধীরেনবাবুর ব্যবসা শুরু হয় ১৩৬০ সালে। বর্তমানে একমাত্র ছেলে ব্যবসা দেখাশোনা করছেন। চমচমের (এক টাকা দামের) সাইজ দেখলে চোখ বড় হয়ে যাবে। একটি চমচম একজনে খুব কষ্ট করে খেতে পারে। ১ কে জি চমচম বানাতে ছানা ৩০০ গ্রাম, চিনি ৬০০ গ্রাম, ক্ষীর ১০০ গ্রাম, সামান্য ময়দা এলাচ প্রয়োজন। ১২টা চমচমে ১ কে জি।

'খুড়ো দে কাচিভেদ অদ্বিতীয় মিষ্টান্ন শিল্পী সুরেন কুড়ির বাদাম বরফি ও নলেন গুড়ের সন্দেশ' ফলক যুক্ত কথাগুলি একদা যে মিষ্টান্নের দোকানে শোভা পেত আজ সে দোকান নেই, নেই সেই অদ্বিতীয় শিল্পী। কিন্তু আজও সুরেন কুড়ির বাদাম বরফি স্মৃতিতে বেঁচে আছে। প্রয়াত কুড়ির আত্মীয় স্বজনদের অনেকেই সুরেন কুড়ি নামটি ব্যবহার করে থাকেন।

১ সের বাদাম বরফি তৈরি করতে ৫ সের দুধের ছানা দরকার। চিনি আধপোয়া, কাজু বাদাম, ছোট এলাচ, ভাল গাওয়া ঘি পেস্তা। সামান্য ময়দা দুধের মধ্যে দিয়ে ছানা কাটাই এর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এখন কাজু বাদামের বদলে সাধারণ কাঠ বাদাম ও ডালডা ব্যবহার হচ্ছে। কাজেই স্বাদের পার্থক্য। খোকন অর্থাৎ সঞ্চিতবাবুর কথামত মারচেনট রোডের **'কাঁঠালতলা'** মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বর্তমান মালিক দুলাল চন্দ্র দাস (সম্পর্কে প্রয়াত সুরেন কুড়ির নাতি) বাদাম বরফির ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা করেন, বলে জানান। ভাল ও দামী অরডারে তাদের নামডাক আছে এখনও। □

রেবতী ঘোষ

দুলাল চন্দ্র

আলোকচিত্র : সৌমিত্র বসাক

ফুলবাড়ির পানতুয়া রাইটারসেও ঢুকেছে

অঞ্জন রায়

ফুলবাড়ির পানতুয়া

শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি রোড, যা ৩১ নমবর জাতীয় সড়ক, তার ওপরই ছোট্ট গ্রাম ফুলবাড়ি। ফুলবাড়িতে রাস্তার ধারেই মিষ্টির দোকান মণীন্দ্রনাথ ঘোষ মশায়ের। ঢাকার মুনসীগঞ্জ থেকে ১৯৫৩ সালে রিফিউজি হয়ে এসেছিলেন মণীন্দ্রবাবু। পাঁচ পুত্র, তিন কন্যার জনক। বয়স হয়েছে। এখন ছেলেরাই দোকান দেখাশোনা করেন। ২৩ বছরের দীর্ঘকেশ দীপককে দোকানেই পাওয়া গেল। জ্যৈষ্ঠের দুপুরে মণীন্দ্রবাবুও দোকানে ছিলেন সেদিন।

ত্রিশ বছরের দোকান হলেও পানতুয়া তৈরি হচ্ছে প্রায় কুড়ি বছর ধরে। আগে একটি পানতুয়ার দাম ছিল ৫০ পয়সা, এখন ৭৫ পয়সা। দৈনিক উৎপাদন হয় প্রায় ৯ কে জি অর্থাৎ ১৮০ খানা। তা বিকালের আগেই ফুরিয়ে যায়। ক্রেতা প্রায় সবাই জাতীয় সড়কের পথিক। স্থানীয় ক্রেতাদের কথা জিজ্ঞেস করতে মণীন্দ্রবাবু বললেন—গ্রামের মানুষ চাল কেনবার টাকাই জোটাতে পারে না, তা পানতুয়া কিনবে কী করে।

সমস্যার কথায় মণীন্দ্রবাবু বললেন—প্রধান সমস্যা হল দুধের। আশপাশের গ্রাম থেকে দৈনিক ১৬ থেকে ২০ কেজি দুধ গড়ে সংগ্রহ করা যায়। ৪ কেজি দুধে ছানা হবে দেড় কেজি আর সমপরিমাণ দুধে ক্ষীর হবে সোয়া এক কেজি। এতে ৯ কেজি মত পানতুয়া তৈরি করা যায়। এছাড়াও পানতুয়ায় লাগে ময়দা, চিনি এবং এলাচের গুঁড়ো।

বেশি দুধ পেলে আরো বেশি পানতুয়া তৈরি করা যেত। শিলিগুড়ির হিমুল দুগ্ধ প্রকল্প প্রসঙ্গে বললেন, হিমুলের দুধে পাউডার বেশি, কাজেই ওই দুধে মিষ্টি তৈরি করা যায় না।

নিজ পানতুয়ার খ্যাতি প্রসঙ্গে বেশ গর্বিত মণীন্দ্রবাবু। শুধু জলপাইগুড়ি জেলা অথবা উত্তরবঙ্গ নয়—তাঁর পানতুয়ার খ্যাতি গিয়ে পৌঁছেছে রাইটারস বিলডিংস পর্যন্ত। পরিবহণ মন্ত্রী শিবেন চৌধুরী নাকি রাইটারসে নিয়ে গিয়েছেন এ পানতুয়া। নামী দামী বহু ব্যক্তি মণীন্দ্রবাবুর দোকানে এসেছেন। পানতুয়ার গুণমুগ্ধদের অন্যতম ছিলেন প্রয়াত বিদ্যুৎমন্ত্রী শংকর গুপ্ত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখারজি তিনবার তাঁর দোকানে এসেছেন। খাতা খুলে দেখালেন সে তালিকায় যাঁরা সই করে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, অমিতকুমার, কাজী সব্যসাচী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, অমুক সিং অরোরা ইত্যাদি নামী ব্যক্তিগণ।

জলপাইগুড়ির কোন বড় সরকারি অনুষ্ঠানে ফুলবাড়ির পানতুয়া বাঁধা। রঘু ব্যানারজি, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর মত ডাকসাইটে ডিভিশনাল কমিশনাররা নাকি প্রায়ই আসতেন। তখন আইভান স্যারিটার আমল। হুকুম হল, জলপাইগুড়ির একটি সরকারি অনুষ্ঠানে পানতুয়া সাপ্লাই করতে হবে। কিন্তু চিনি তখন দুষ্প্রাপ্য। মণীন্দ্রবাবুর মাথায় হাত। ছুটলেন জলপাইগুড়ি, স্যারিটা সাহেবের কাছে। স্যারিটা সাহেব ডিসট্রিক্ট কনট্রোলারকে ডেকে যে করেই হোক চিনির ব্যবস্থা করতে বললেন। ফুলবাড়ির পানতুয়া তাঁর চাইই। কনট্রোলার সাহেব বানারহাটের রসগোল্লা প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে এক কুইনটাল চিনি রিকুউজিশন করে নিয়ে এলেন। আর তাতেই তৈরি হল পানতুয়া। সেটা নাকি ১৯৬৭ সালের কথা।

মণীন্দ্রবাবুর ডায়েরির পাতায় পাওয়া কয়েকটি মজার মন্তব্য এখানে পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি—

সংগীতশিল্পী মান্না দে লিখেছেন—'মণিবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ' (তারিখ ১৮. ২. ১৯৮২)।

'পান্তুয়া দেখেই আনন্দ লাগছে
খেলে কী হবে তাই ভাবছি,
আপনাদের মঙ্গল হোক'

—লিখেছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।
(তারিখ ২৬.৫.১৯৮৩)

যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসির মন্তব্যে তো রীতিমত সাহিত্য -

'এখানকার পানতুয়া
কাকাতুয়ার মত কথা বলে'।
(তারিখ ১৭.৫.১৯৭৫)

সবশেষে মণীন্দ্রবাবু বললেন — অন্তত ১৫ দিন আগে অরডার পেলে সুবিধা হয়। দুধ সংগ্রহই তো সমস্যা। □

কোচবিহারের মিষ্টি দুটি রাজপরিবারের রসনা তৃপ্ত করেছে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সেই রাজার আমল থেকেই মিষ্টান্ন শিল্পে কোচবিহার তার নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ঢাকা থেকে সন্দেশ, নাটোর থেকে কাঁচাগোল্লা আর ঈশ্বরদী থেকে আসত ছানার জিলিপি। এরপর মহারাজা নীতেন্দ্রনারায়ণের আমলে ঢাকা থেকে কয়েক ঘর হালুইকর কোচবিহারে আসেন। বংশপরম্পরায় তারা এখনো এই ব্যবসায় নিয়োজিত।

কথা হচ্ছিল স্বরাজ দাসের সঙ্গে। কোচবিহার শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অমৃতলাল দাস অ্যানড সনসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বরাজবাবুর শিক্ষাগত যোগ্যতা কলা স্নাতক। গর্বের সঙ্গে বললেন, এটা আমাদের জাতব্যবসা। কোচবিহারের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ। তিন প্রজন্ম আমরা কোচবিহারে আছি। বছরের পর বছর কোচবিহার রাজবাড়িতে আমরা মিষ্টির যোগান দিয়েছি। রাজারা খেয়ে তারিফ করেছেন। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ নলেন গুড়ের সন্দেশ ভালবাসতেন। এখনো আমরা কোচবিহার মদনমোহন বাড়িতে মিষ্টি যোগান দিয়ে থাকি। আমাদের নিষ্ঠার কোন ত্রুটি নেই। ভূটানের রাজবাড়িতে এখনো আমাদের মিষ্টি নিয়মিত যাচ্ছে। দরবেশ, লাড্ডু জাতীয় মিষ্টি অবশ্য তাঁদের বেশি পছন্দ। আমরা রাজভোগ, রাবড়ি, রোলিং সন্দেশ, সরপুরিয়া ছাড়াও প্রায় ২০/২৫ রকম মিষ্টি নিয়মিত তৈরি করে থাকি। কোচবিহারের ছেলে যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁরা আমাদের মিষ্টি নিয়মিত বাইরে নিয়ে যান।

আমাদের প্রধান কারিগর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর বয়স প্রায় ৫৮ বছর। গত ৪০ বছর যাবৎ তিনি এখানে আছেন। দেশ ঢাকাতে।

অনেক সমস্যার মধ্যেও আমরা আমাদের মিষ্টির মান বজায় রেখেছি। কোচবিহারের একমাত্র নিজস্ব মিষ্টি হল প্রাণহরা। যদিও ঢাকা থেকে আমদানি করা হয়েছিল কোন একটা সময়ে কিন্তু কালে কালে কোচবিহার তাকে নিজস্ব করে নিয়েছে। এই মিষ্টির একমাত্র প্রস্তুতকারক কদমতলার শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কেন প্রাণহরার এত জনপ্রিয়তা? এ প্রশ্নের উত্তরে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক গোপাল বণিক জানালেন—গুণের কদর সর্বত্র। প্রাণহরা তার নিজগুণে জনমনে আসন করে নিয়েছে। প্রাণহরা প্রস্তুত করতে ছানা এবং ক্ষীর প্রয়োজন। ছানা কড়াপাকে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা করে বেশ কয়েক ঘণ্টার বিরতি দেওয়া হয়। এরপর শুকনো ছানার সঙ্গে প্রয়োজনমত চিনি মিশিয়ে তার সঙ্গে গোলাপজল দিয়ে মেখে নরম করে নিতে হয়। এরপর ছোট ছোট দলা করে তাতে ক্ষীরের আস্তরণ দিয়ে এই মিষ্টি প্রস্তুত করা হয়।

বর্তমান মিষ্টান্ন শিল্পে এতো অগ্রণী হলেও কিন্তু হাজার সমস্যায় জর্জরিত।

কোচবিহার থেকে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার দে জানালেন, পয়সা দিয়েও এখানে ভালো দুধ পাওয়া যায় না। ৪ টাকা কিলো দুধে ৫ কে জি তে ১ কেজি ছানা হয়। বিয়ের মরশুমে পয়সা দিয়েও দুধ পাওয়া যায় না। চিনি, আটা, ময়দা কিছুই সরকার যোগান দেন না। খোলা বাজারে এগুলো কিনতে হচ্ছে বলে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। আগে কিন্তু সব কিছুই তাদের সরকারি কোটাতে কম দামে সরবরাহ করা হত। উপরন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার মিষ্টির উপর বিক্রয় কর ধার্য করেছেন। এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। এজন্য রাজ্যান্তরে যে আন্দোলন হচ্ছে তাঁরা তাতে সার্বিকভাবে সামিল হয়েছেন। কিছুদিন আগেই কোচবিহারের মিষ্টির দোকানগুলোতে পুরোপুরি হরতাল হয়েছে। মিষ্টিতে রং ব্যবহারের বিষয় সরকারি তরফে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের রং বিক্রি কেন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে না সেটা তারা বুঝে উঠতে পারছেন না।

সরকার যদি মিষ্টান্ন শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল না হন তবে অচিরেই মিষ্টান্ন শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। □

চারদিকে সব নাম করা মিষ্টি • শুভ জোয়ারদার

মোল্লার চক-এর দই

দক্ষিণ শহরতলির ডায়মনড হারবার লাইনে পড়বে মগরাহাট স্টেশন। এই মগরাহাট থেকে হাঁটা পথে মাইল দুই গেলে মিলবে হতশ্রী এক গ্রাম। নাম -- 'মোল্লার চক'। এদেশে ইংরেজ শাসন ভাল মত কায়েম হওয়ার পরে (কমবেশি ১00 বছর আগে) অমৃত সমান খাদ্য বস্তুটি দই এর আবিষ্কারক হিসাবে নাম পাওয়া যাচ্ছে মগরাহাট থানা ও মোল্লার চক গ্রামনিবাসী পঞ্চু ঘোষের। পঞ্চু ঘোষ আজ আর নেই। আছেন তাঁর নাতিরা। পঞ্চু ঘোষের পরে তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কয়েক ঘরও এই কারবার করে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। তবে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, মোল্লার চকে সেই বিখ্যাত দই আর ইদানিং খোদ 'মোল্লার চক' গ্রামে তৈরি হয় না। তৈরি হয় শিয়ালদা বউবাজার অঞ্চলের পাঁচটি কারখানা-কাম ভিয়েন ঘরে। কারখানাগুলির এই পাঁচজন মালিকেরই আদত নিবাস হল মগরাহাটের সেই পঞ্চু ঘোষের পাড়ায়। একজন তো এক পঞ্চু ঘোষের আপন নাতি। গ্রামবাংলায় অপরিমিত দুধের যোগান, যানবাহনের অসুবিধা , অরডার পত্র পাওয়ার অনিশ্চযতা -- এ সবের বাধা সরিয়ে মোল্লার চকের দই-এর কারিগররা এখন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

৮৬ নমবর অখিল মিস্ত্রি লেনের শিব মন্দিরের পিছনে মলিন এক গলির মধ্যেই গড়ে উঠেছে এক মিনি মোল্লার চক। এখানকার বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ এক কারিগর হীরুলাল ঘোষের সংগে দু'চারটে কথাবার্তা হল। হীরুবাবুর জবানিতে : মোল্লার চক গাঁয়ে এখন আর দই এর কারবার করছেন না কেউ। যারা তেমন কারবারি, সব চলে এসেছেন কলকাতাতে। কারণ ? দেশ জ্বলছে খরাতে। বিশ্বাস করুন, বিঘে প্রতি এক মন-দেড় মন ধান। এই সিজিনে দই এর কারবার ডাউন। ওদিকে মাঠেও সেই অবস্থা। তাই জমি বিক্রি করে খেতে হচ্ছে আমাদের। কারবার এ বছরে সুবিধের নয় কেন ? প্রতিযোগিতা বেড়েছে। দুধের যোগান নেই। এই দেখুন পাঁচ টাকা লিটার দুধ আজ উঠেছে পনের টাকা লিটার। হিসাব হল – এক কেজি দই-এর জন্য লাগবে এক কেজি আড়াইশ গ্রাম দুধ। তা, পনের টাকায় দুধ কিনে ক টাকায় বিক্রি করলে পড়তায় আসবে, সেটা একটু ভেবে দেখুন দেখি। অখিল মিস্ত্রি লেনের কারখানার মালিক মদনমোহন ঘোষ। লগনসা হলে এখানে কাজ করেন প্রায় পনের কুড়িজন।

মদনবাবু বললেন : কিছুদিন আগেও খুব 'বিজিনেস' করেছি। কিন্তু এখন ভাল দুধের অভাবে মালের কোয়ালিটি রাখতে পারছি না। দুধ আনি চিৎপুরের নতুন বাজার আর লাগোয়া শিয়ালদা বাজার থেকে। গরুকে ওষুধ খাওয়ান জোলো দুধে এ 'কাজ' কিছুতেই বসান যাবে না। তাই, বুঝতেই পারছেন ঐতিহ্যময় এই শিল্পটি যে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। □

বালুরঘাটের সেই মালাইকারি বিলুপ্ত কেন ?

বালুরঘাটের 'নিউ জলযোগ' কিছু আধুনিক আর কিছু সাবেকি ধাঁচের এক সাদামাটা দোকান। মিষ্টির শো-কেসের পিছনে দাঁড়িয়ে কারবার দেখছিলেন এক ফরসা তরুণ। আমার পরিচয় আর আসার কারণ জানাতেই বললেন : সে মিষ্টি এখন আর তৈরি করি না দাদা। যে বানাত, সে গত হয়েছে বছর ১০/১২ হল। তারপরে যে আমরা চেষ্টা করিনি তা নয়। তবে সেই আগের কোয়ালিটি না রাখতে পেরে, গুডউইল নষ্ট হবার ভয়ে মালাইকারি আইটেমটাই তুলে দিয়েছি। জিনিসটা কী কী দিয়ে এবং কেমন করে বানান হত-এটা একটু বলবেন কি ? প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বললেন : দাঁড়ান, আমার বাবা এখনো বেঁচে আছেন। তাঁর হাতেই তৈরি এ দোকান। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই আপনি খাবার আর আমাদের দোকানের ডিটেল পেয়ে যাবেন।

এবারে এলেন ৬০ বছরের বৃদ্ধ মোহিনী রঞ্জন সরকার। জানা গেল যে মোহিনীবাবু তাঁর কৈশোরে আদি নিবাস ঢাকা থেকে চলে আসেন বালুরঘাটে। সে সময়ে সারা দেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। মোহিনীবাবুও সেই দেশপ্রেমের ঢেউ-এ ভেসে গিয়ে গ্রেপ্তারের পরে ঠাঁই পেলেন দমদম সেন্ট্রাল জেলে। এক বছর বাদে ছাড়া পেয়ে বালুরঘাটেই ফিরে এসে উনি একটা ছোট্ট মত মিষ্টির দোকান খুললেন। তখন বালুরঘাট ছিল জংগলে ভর্তি। লোকজন নেই। সারা অঞ্চলে একটাই মাত্র মিষ্টির দোকান। অল্পদিনের মধ্যেই মোহিনীবাবুর মিষ্টির দোকান জমে উঠল। কারণ, ওঁর সংগে তখন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এসে জুটে গেছেন উত্তরপ্রদেশের এক জাত কারিগর। নাম গণেশরাম কানু। কারিগরটি ছিল ভীষণ মেজাজি। আবহাওয়ার মতিগতি বুঝেই সে মিষ্টি বানাত। 'মালাইকারি'র পাক এদিক ওদিক করত। নিখুঁত ছিল তার ভিয়েনঘটিত রসায়নজ্ঞান আর পরিমিতিবোধ। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই শুধু বালুরঘাটে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে 'নিউ জলযোগ' তথা মোহিনীবাবুর মালাইকারির বিজয়-বার্তা ঘোষিত হয়ে গেল। রাজ্যের গভরনর, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন এঁরা একসময়ে বালুরঘাট সারকিট হাউসে উঠেই সাগ্রহে খোঁজ করতেন মোহিনীবাবুর দোকানের আদত মালাইকারির। ফলে এক আইটেমের জোরেই চঞ্চলা লক্ষ্মী মোহিনীবাবুর প্রতি প্রসন্না হলেন। এই দোকান থেকেই এরা এখন বাড়ি, গাড়ি, জমিজিরেত করেছেন; ট্রানসপোর্ট আর কনট্রাক-টরি বিজনেসে নামতে পেরেছেন। মোহিনীবাবু নিজে এখন আর কারবার দেখেন না। তাঁর তিন ছেলের একজন দেখেন ট্রানসপোর্ট-এর কারবার, একজন কনস্ট্রাকশন কাজের ঠিকাদার আর [illegible] জন দেখাশোনা করে এই আদি ব্যবসা, অর্থাৎ মিষ্টির দোকানটি।

সাদা চমচমকে কেটে দু টুকরো করে ক্ষীরের প্রলেপ দিয়ে ওপরে মিহি করে গুঁড়ো পেস্তা ছড়িয়ে দিতে নিপুণ হাতে হালুইকর গণেশ। কিন্তু এই মিষ্টির নাম মালাইকারি হল কেন ? সেটা অবশ্য বলতে পারলেন না মোহিনীবাবু। বললেন, যাক, যতদূর মনে পড়ছে, ঐ গণেশেরই দেওয়া। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক সে। তাই বোধহয় বাংলার সঙ্গে ইংরাজি মিশিয়ে এই ধরনের একটা নাম দিয়ে মিষ্টিটাকে হিট করিয়ে দিয়েছিল বাজারে। তবে কারিগর হলে কী হবে, বড্ড মদ আর আফিম খেত গণেশ। তাই একটু একটু করে শেষ হতে হতে অবশেষে মারা যায় ১৯৭০ সালে। চোখ বুজলো সে। দেশের দিকে ফিরতে না [illegible] পারলেও ওকে আমরা পেনশন দিয়ে এখানে রেখেছিলাম।

যাই হোক না কেন, বালুরঘাটের বিখ্যাত সেই মিষ্টি 'মালাইকারি' দেশ থেকে একেবারেই বিলুপ্ত এটাই আপাতত আমাদের কাছে বড় দুঃখের, তেতো খবর। □

মালদহের কানসাট-ও রসকদম

দুটি ঐতিহ্যময় মিষ্টি-খাবার হল, মালদহ জেলার 'কানসাট' ও 'রসকদম', ' জেলার মথুরাপুর, কালিয়াচক, সুজাপুর এবং খোদ মালদহ শহরের অনেক দোকানই বেশ জমজমাট ব্যবসা চালাচ্ছে এই জাতের ঝরঝরে এবং শুকনো ছানার মিষ্টিতে।

দেশবিভাগের আগেই ওপার বাংলার নাটোরের সন্দেশ এবং কাঁচাগোল্লা, পোড়ামাটির কানসাট, এপারের মালদার রসকদম ও কানসাটের প্রসিদ্ধির কথা সবারই জানা। কারণ হিসাবে গোটা এলাকাতে দুধের অঢেল যোগান আর স্থানীয় কারিগরদের অভিজ্ঞতা ও পটুত্বের কথা অনস্বীকার্য। সরকারি বাসে ৩ ঘন্টার দূরত্বে বালুরঘাটে যখন দুধের দাম কেজি প্রতি ১৫/২0 টাকা, তখন মালদাতে তা মিলবে মাত্র ৫ থেকে ৭ টাকা দরে। অবশ্য বালুরঘাটের মিষ্টি সব গরুর দুধের আর মালদাতে অবশ্যই মহিষ দুধের। কানসাট ও রসকদম তৈরিতে তুলনামূলকভাবে রসকদমের কারিগরি খুঁটিনাটি অনেক বেশি। সাদা চমচমের আকারের 'পাকা মাল'-এর ওপরে ক্ষোয়াক্ষীর, ব্রিটানিয়া বিসকুট ও চিনির গুঁড়োর একটা মোটা প্রলেপ মাখিয়ে তৈরি হয় কানসাট। এবারে বলি রসকদম তৈরির বিষয়ে। ছোট কমলাভোগকে প্রথমে ক্ষীর দিয়ে চারদিক দিয়ে মুড়ে রাখতে হয়। এরপরে পোস্তকে ঝেড়ে বেছে অল্প আঁচে ভেজে গরম অবস্থাতেই একটা পাত্রে রেখে আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা মোটা চিনির রস (কুসুম কুসুম গরম) চামচ করে তুলে ঐ পোস্তর মধ্যে চারধারে ছড়িয়ে দিতে হবে আর একটা কাপড়ের পুঁটলি পাত্রটির গায়ে অনবরত ঘোরাতে হবে। ফলে গরম পোস্তর প্রতি দানার চারপাশে গরম রস লেগে প্রতি দানা দেখতে সাদা ও আকারে ঠিক সাবুদানার মত হবে। এবারে ঐ দানাগুলি দু চারটে করে ছড়িয়ে দিয়ে হাতের ভারসাম্যে সমানভাবে ঘোরাতে হবে সেই ক্ষীরে মোড়া কমলা ভোগের পাত্রটা। সাবুদানার মত চিনিতে মোড়া পোস্তর দানাগুলি এর ফলে সমানভাবে মিষ্টিটার গায়ে লেগে কারিগরি ও স্বাদে সম্পূর্ণ এক নতুন জাতের মিষ্টির আস্বাদন বয়ে আনবে ভোজনরসিকদের কাছে। □

ত্রিপুরার মিষ্টিতে এখনও পুব বাংলার স্বাদ মেলে

অমিয় দেবরায়

ত্রিপুরার মিষ্টান্ন শিল্প পূব বাংলার ধাঁচেই গড়ে উঠেছে। তবে মিষ্টান্ন শিল্পীরাও স্বীকার করেন পূববাংলার যে কোয়ালিটির মিষ্টি পাওয়া যেত সে কোয়ালিটির মিষ্টি এখানে তৈরি করা সম্ভব নয়, যায়ও না। প্রধান অন্তরায় খাঁটি দুধের অভাব। দুধ খাঁটি হলে মিষ্টিও ভাল হবে। আগরতলায় খাঁটি দুধ অমিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সামান্য পরিমাণ খাঁটি দুধ হয়ত মিলতে পারে কিন্তু মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটাবার মত খাঁটি দুধ মেলা ভার।

আগরতলা শহরের লোক সংখ্যা লক্ষাধিক। মিষ্টির চাহিদা প্রচুর! একদিন ঘরে, ঘরে মা, ঠাকুরমারা যেসব উপাদেয় মিষ্টান্ন বানাতেন সে সবের অন্তর্ধান ঘটেছে দেশ ভাগাভাগির পর থেকেই। তাই বাঙালি গৃহস্থালীতে সারা বছরের প্রয়োজনীয় মিষ্টির জোগানটাও এখন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের ওপরেই বর্তিয়েছে। একমাত্র আগরতলার মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের দুধের প্রয়োজন দৈনিক গড়ে আট হাজার থেকে দশ হাজার লিটার। সম্পূর্ণটাই আসে আশেপাশের এবং দূরবর্তী গ্রাম থেকে ফড়েদের মাধ্যমে। জনৈক দোকানদাব বলেন, ভাল মিষ্টির জন্য প্রয়োজন কাঁচা বা সদ্য দোয়া দুধ। পরিবহন সমস্যা তীব্র বলে আগব তলায় মিষ্টির দোকানের দুধ পৌঁছয় বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটাব মধ্যে। এ জন্যেই এখানে একমাত্র 'চানক' (জ্বাল দেওয়া) দুধই সবববাহ হয়ে থাকে।

অবিভক্ত পূববাংলার ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ছিল মিষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আগরতলার পশ্চিমে, পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। আগরতলার অধিকাংশ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা তাঁদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকেই এসেছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল খাঁটি দুধের সাগর। চল্লিশ বছর আগেও সেখানে টাকায় ষোল থেকে বিশ সের খাঁটি দুধ পাওয়া যেত। লেডিকেনি, ছানার পায়েস, রসগোল্লা, ক্ষীরভোগ, লুচি মোহনভোগ প্রভৃতি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনপ্রিয় মিঠাই। কিংবদন্তি, লরড ক্যানিং ঢাকায় এলে একসেরী ওজনের এক একটা লালমোহন তাঁর খাবার টেবিলে দেওয়া হয়েছিল। লেডি ক্যানিং-এর খুব পছন্দ হল লালমোহন খেয়ে। সেই থেকে নাকি লালমোহনের নাম হল 'লেডি কেনিং', তা থেকে 'লেডিকেনি'। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, এই শতাব্দীর গোড়ায় মহাদেব পাঁড়ে নামক এক ব্রাহ্মণ সন্তান উত্তব ভারত থেকে কাজের সন্ধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসেন। বাঙালি কারিগর নিয়ে তিনি একটা মিষ্টির দোকান খোলেন। দোকানের নাম : মহাদেব মিষ্টান্ন ভান্ডার। সুখাদ্য মিষ্টান্নের জন্য মহাদেব মিষ্টান্ন ভান্ডারের খুব নাম ডাক হয়। পাঁড়েজি অনেক আগে গত হলেও আজও তাঁর দোকানটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। তাঁর দোকানের নামের সুবাদে আগরতলায়ও এ নামে দোকান আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনৈক প্রাক্তন মিষ্টান্ন কারিগর এক প্রশ্নের জবাবে পরিবর্তনকে বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সুস্বাদু লুচি-মোহনভোগ প্রস্তুত হত খাঁটি ঘি দিয়ে। খাঁটি ঘি কোথায় যে এখানে সেই লুচি-মোহনভোগ তৈরি হবে? তাই উৎকৃষ্ট জাতের লুচি-মোহনভোগের জমানা চিরতরে খতম হয়ে গিয়েছে। দুধ, চিনি, এলাচ, পেস্তা ইত্যাদির উচ্চমূল্য উৎকৃষ্ট জাতের মিষ্টান্ন তৈরির পক্ষে অন্যতম অন্তরায়। পাঁচ বছর আগেও আগরতলায় দু টাকায় চার পদের প্লেট পাওয়া যেত। আজ এ রকম প্লেটের দাম কম করেও চার টাকা। কোন কোন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান স্পেশাল মিষ্টান্ন তৈরি করে এক একটা নাম করণ করেছেন – যেমন মিলক কেক, প্রাণহরা, চকলেট সন্দেশ ইত্যাদি।

মিষ্টান্ন বিক্রেতা সমিতির সভাপতি চন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, মিষ্টান্নও একটি শিল্প। এই শিল্পকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় মিষ্টান্নেরও একটা ভূমিকা থাকছে। ব্যাংকগুলি উপযুক্ত হারে ঋণ দিয়ে মিষ্টান্ন শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সমিতির সম্পাদক হরিপদ মোদক বলেন, উপযুক্ত কারিগর পাওয়া বর্তমানে কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ আজকের যুবকদের মধ্যে মিষ্টান্ন কারিগর হওয়ার উৎসাহ দেখা যায় না। আর পাঁচ-দশটা কাজে যেমন বাপ দাদার পেশা গ্রহণের ঝোঁক ক্রমশ কমে যাচ্ছে – মিষ্টান্ন তৈরির কাজেও তাই। শিক্ষালাভের সুযোগ, শিক্ষার প্রসার, জীবন ধারণে ব্যয়-বৃদ্ধি ইত্যাদিই এর অন্তরায় বলে তিনি মনে করেন। □

মিষ্টির ছবি :
ভীম চন্দ্র নাগ-এর সৌজন্যে

বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু

আনিসুর রহমান

জেনারেল এরশাদ প্রথম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন ১৯৮২র শেষ দিকে। তখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরুর পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তবে কোন পন্থা নির্ধারিত হয়নি। এরই মধ্যে ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়ারির ঘটনায় রাজনীতি ও প্রশাসন, উভয় পক্ষের কার্যক্রমকে বদলে দেয়। ১৮ ফেবরুয়ারি জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন জাতীয় ডায়ালগের কথা। এর প্রয়োজনীয়তা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন, সুষ্ঠু ও নির্ভরশীল ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। সবশেষে জাতীয় আলাপে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির প্রতি প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল এরশাদ ঘরোয়া রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন।

জেনারেল এরশাদ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছেন। এজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে প্রস্তাবিত হয় রাজনৈতিক আলোচনা। জাতীয় পর্যায়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার যাতে পূর্ণ মেয়াদকাল কাজ করে যেতে পারে জাতীয় ডায়লগ সেই পন্থাও নির্দেশ করতে পারে। ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন এই প্রেক্ষাপটে অনিবার্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে রয়েছে ৬১টির মত বড় রাজনৈতিক দল। প্রায় ১৫টি দল ঘরোয়া রাজনীতি চর্চার প্রথম দিনে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। আরো ১০টি ছোটখাট দলের কে কোথায় কি করছে তার হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়নি সেদিন। আর দলীয় অফিস না থাকায় ১০/১২টি দল তাদের ঘরোয়া রাজনীতি শুরু করে দলীয় নেতার বৈঠকখানায়।

ঘরোয়া রাজনীতির খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেছে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সংকট, দলীয় অস্থিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতার স্পষ্ট ও করুণ ক্লোজ আপ।

এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটিয়েছে সামরিক শাসন পূর্ব ক্ষমতাসীন দল বি.এন.পি। ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে বি.এন.পি র জন্ম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শিবির থেকে সংগৃহীত এই দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। বি এন পি র আভ্যন্তরীণ কোন্দল স্পষ্ট হয় দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার পর। কোন্দলের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয় সম্প্রতি। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বি এন পি র ভাইস চেয়ারম্যান শাহ আজিজুর রহমান পদত্যাগ করেন ৩০ মারচ। ২ এপরিল বি এন পি একটি গ্রুপ কনভেনশন আহ্বান করে। তারা বিচারপতি সাত্তার ও প্রফেসর বদরুদ্দোজার নেতৃত্বাধীন কমিটি বাতিল করে দেয়। শামসুল হুদা চৌধুরী ও প্রফেসর এম এ মাতিনকে যথাক্রমে সভাপতি ও মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়। গঠিত হয় নতুন জাতীয় কমিটি। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সাত্তার বদরুদ্দোজার বি এন পি থেকে বলা হয় কেউ দল ছাড়লেও বি এন পি ভাঙবে না।

জাসদর ঘরোয়া রাজনীতির প্রথম দিনে দলের সভাপতি মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) জলিলের অনুপস্থিতি প্রসংগে সবাই নীরব থাকেন। তারপরই কোন নোটিশ না দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক আসম আবদুর রব সাংগঠনিক সফর শুরু করেন। জাসদ আবার দলীয় সংকটে পতিত এবং এর আগে একই কারণে জাসদ-র দলত্যাগীরা গঠন করেছেন নতুন দল বাসদ।

ঘরোয়া রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে আসন্ন জাতীয় সংলাপে তাদের ভূমিকা কী হবে। তারা কোন মতামত পেশ করবেন।

এ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ কেবল তিনটি বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছেন। এক, ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়ারির ঘটনাবলীর বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিদান ও বন্দীদের মুক্তিদান। দুই, চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বাবস্থায় ১৯৭২ সালের সংবিধান চালু। তিন, ঘরোয়া রাজনীতির বদলে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতার অধিকার।

তারপরই ১৫ দলীয় জোট ৯ এপরিল দাবি দিবস ঘোষণা করে। ১৫ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো দাবি দিবসকে সফল করার উদ্দেশ্যে শুরু করে সাংগঠনিক সফর ও কর্মীসভা।

জাতীয় ডায়লগের পদ্ধতি ও কাঠামো এখনো ঘোষিত হয়নি। কোন পূর্বশর্ত, যা জাতীয় সংলাপকে অচলাবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়টিও সচেতন ভাবে পরিহার করা হয়েছে। এখন রাজনৈতিক দলগুলো ভেবে দেখছেন ডায়লগের পদ্ধতি ও কাঠামোগত দিকটি। এই প্রশ্নে যদি দলগত সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য স্থির না হয় তবে দলের ভেতরে নতুন মেরুকরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই মেরুকরণের প্রশ্নে প্রাধান্য বিস্তার ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে দুটি বিষয়ের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও সেনাবাহিনীর প্রতি দৃষ্টিভংগি। সামরিক সরকারের প্রতি দৃষ্টিভংগির প্রশ্নে রাজনৈতিক মতভেদ আছে। অন্যদিকে জাতীয় ডায়লগে অংশগ্রহণ করলেও, দলগুলো সামরিক বাহিনীর সংগে আলোচনার বিষয়টি নিয়ে মনস্থির করতে পারছে না।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্রেটিক লিগ প্রধান খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেছেন, ডায়ালগের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানেও আলোচনার পথ থাকে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি।

১৫ দলীয় জোটের ন্যাপ (হারুন) প্রস্তাবিত জাতীয় ডায়লগের প্রশ্নে একটি একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী। আলোচনার বৈঠকে ১৫ দলের একক কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করে।

জামাতে ইসলামীর মাওলানা এ কে এম ইউসুফ জাতীয় সংলাপ প্রসংগে মন্তব্য করেছেন, 'আলোচনায় যোগ না দেওয়ার কোন কারণ নেই। তবে আলোচনা অর্থবহ করার জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া দরকার। সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় অংশ নেওয়া একটি শাসনতান্ত্রিক বিষয়।'

জাসদ-র তাত্ত্বিক প্রধান সিরাজুল আলম খানের মতে অস্থিতাবস্থার শক্তির চেয়ে স্থিতাবস্থার শক্তি অনেক শক্তিশালী। এ কারণেই আলাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং ১৫ দলীয় ঐক্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। দলের সম্পাদক আসম আবদুর রব মনে করেন শর্তটা পূর্বশর্ত হলে আলোচনার মধ্যে দেয়াল তোলার সামিল হবে।

দলের সভানেত্রী বংগবন্ধু তনয়া হাসিনা ওয়াজেদ ডায়ালগ প্রসংগে মন্তব্য করেছেন : ডায়ালগ কী জানি না। খবরের কাগজে পড়েছি যে ডায়ালগ হবে। ফলে কিছু বলতে পারছি না। ১৫ দলের বক্তব্য আমাদের বক্তব্য।

ডায়ালগ প্রসংগে বি এন পি-র বক্তব্য এখনো স্পষ্টভাবে আসেনি। কনভেনশনপন্থী বি এন পি-র (হুদা) দু'একজন নেতার মন্তব্য 'বি এন পি ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী তাই আন্দোলনের কর্মসূচী বি এন পি কর্মী বা সদস্যদের উৎসাহিত করে না।'

আওয়ামী লিগ (মিজান) দলের প্রধান মিজানুর রহমান চৌধুরী ১৯৭২ সালের সংবিধানকে সমুন্নত রাখার নিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় অংশ গ্রহণের পক্ষে মন্তব্য করেছেন।

ঘরোয়া রাজনীতি বাংলাদেশে ও এর রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নতুন ঘটনা নয়। নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়া সামরিক শাসনকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির পারলামেনটে নিয়ে যান ঘরোয়া রাজনীতির সূত্রপাত করেই। জেনারেল এরশাদও গণতান্ত্রিক অবস্থায় দেশকে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেছেন একাধিকবার।

ঘরোয়া রাজনীতি সামরিক সরকারে শাসিত দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে দিয়েছে। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসনকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিনন্দন জানিয়েছিল তা বিস্মৃত তথ্য নয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিসেম্বর নাগাদ ধাপে ধাপে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া রয়েছে জাতীয় নির্বাচন। এই কর্মসূচী সামনে রেখে এবার নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি খসড়া ভোটার তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। তারপর তালিকার ভুলভ্রান্তি সংশোধন হবে। ১৯৭৬ সাল থেকে চলতি গণনা পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধির হার ২২ দশমিক ৫৫ ভাগ। ঢাকা জেলায় রয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটার। এ সংখ্যা ৫৩ লাখ ৫৬ হাজার ৭০৮। তারপরই রয়েছে কুমিল্লা, ভোটার ৩৭ লাখ ৪০ হাজার ১২৬ জন। আর ময়মনসিংহ জেলা ৩৬ লাখ ৮ হাজার ১৪৫ জন ভোটার নিয়ে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। মেট্রোপলিটন ঢাকায় মোট ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৯০ জন। খসড়া তালিকা অনুযায়ী ঢাকার ভোটার সংখ্যা ১২ লাখ ৪৩ হাজার ৭৬৫ জন। ঢাকা শহরে ভোটার বৃদ্ধির শতকরা হার ৬৬ ভাগ। □

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

সিঁড়ি দিয়ে দুই বন্ধু উঠে আসতেই দুজনে ছিটকে গেল দুদিকে। নীরস কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

তালা খোলো।

ইন্দ্রনাথকে চেনে পাহারাদার। খুলে দিল তালা।

শ্রাবন্তীর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে জানলা খুলে দিল ইন্দ্রনাথ। আলোয় ভেসে গেল নিরাভরণ ঘর।

সন্ধানী চোখে তাপসিক ঘর-সজ্জার পানে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

দেখা যাক এখন কোথায় আছে ঠিকানাটা।

লকেটে যার ছবি দেখে এলাম?

শুরু হল আগাপাশতলা তল্লাশি। ড্রয়ারের ভেতরে – আলমারির পেছনে ....

হ্যাঁ। – ঘরটা তখন ভাল করে খুঁজিনি। তুইও হাত লাগা, মৃগ।

আলমারির মাথায়, শাড়ি-ব্লাউজ-অন্তর্বাস-দৈনিকের ভাঁজে, খাতার পাতায়, হ্যানডব্যাগের ভেতরে। কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না একখানা চিঠিও – অথবা ঠিকানা!

একখানা চিঠিও লেখেনি কাউকে! কারো ঠিকানা নেই – ডাইরিও নেই!

ত্রিসংসারে কেউই কি নেই শ্রাবন্তীর?

(চলবে)

কলকাতার হাসপাতালে মানুষ-গিনিপিগের ওপর বিদেশে নিষিদ্ধ জন্মনিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করা হচ্ছে

ডাঃ মৃণাল বসু

ডি পি অর্থাৎ ডিপো প্রভেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন। এই ইনজেকশন নেবার পর বহু নারী মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলে বহু দেশেই এই ইনজেকশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু একটি মারকিন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের তৈরি এই ইনজেকশন ইনডিয়ান কাউনসিল অব মেডিকাল রিসারচের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতার বহু রোগিণীর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

'ডি পি সম্পর্কে আমার মনোভাব এতদিন অনুকূল ছিল, কিন্তু এখন আমি ভিন্নমত পোষণ করি। আমার রীতিমত সন্দেহ রয়েছে, যে সব রোগীকে ডিপি দেওয়া হয়, তাদেব শতকরা কুড়ি জনকেও যথাযথভাবে এই ওষুধের কুফল সম্পর্কে অবহিত করা হয় না।'

–'ফাবটিলিটি অ্যানড কনট্রা-সেপশন' পত্রিকায় লনডন হাসপাতালের অবসটেট্রিকস ও গাইনোকলজি বিভাগের জনৈকা সিনিয়র লেকচারার।

'ইনজেকশনেব সাহায্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাবাত্মক সব কুফল রয়েছে। জনসংখ্যা কমানর সহজ উপায় হিসাবে এর অপব্যবহার হতে পারে।'

-সেনটাব ফব এডুকেশন অ্যানড ডকুমেনটেশনের (সি ই ডি) সাম্প্রতিক রিপোরট।

ডি পি। পুরো নাম ডিপো প্রভেরা। ফারমাকোলজিকাল নাম মেড্রকিস-প্রজেসটেরন অ্যাসিটেট। পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে নতুন কনট্রাসেপটিভ হিসাবে এব আবির্ভাব। প্রস্তুতকারক : আমেরিকার আপজন (Upjohn) ইনটারন্যাশনাল কোমপানি। এই ইনজেকশনের প্রচাবে বলা হয়–এর একটি মাত্র 'শট' নিলে তিন থেকে ন'মাসেব জন্য কোন স্ত্রীলোক জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্লিনিকাল ট্রায়াল হয়ে এই ওষুধ বাজারে চালু হতে আরও কয়েক বছব লেগে যায়। তাবপর, কিছুকাল হটকেকের মত বিদেশে এই কনট্রাসেপটিভ চলে। এইসময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক্তাররা তাদের রিপোরটে বলতে থাকেন, এই ওষুধেব মাবাত্মক সব কুফল রয়েছে। মাসিকের গোলমাল থেকে ক্যানসার অবধি নানান বকম এবং এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯৭৮ সালে আমেরিকা সবকার কনট্রাসেপটিভ হিসাবে এর ব্যবহার বন্ধ করে দেন। অল্প কিছুদিন বাদে, ব্রিটিশ সরকাবও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বিদেশে, এখন কনট্রাসেপটিভ হিসাবে নয়, অন্যভাবে ডি পি র ব্যবহাব হয়ে থাকে- তাও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

বিদেশে ডি পি-র যখন এই হাল, তখন কলকাতাব দুটি হাসপাতালে রোগীদের ওপর ডি পি এবং অন্য একটি সমগোত্রীয় কনট্রাসেপটিভ 'নরিজেসট' (এটিও ইনজেকশনরূপে দেওয়া হয়) এখন প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে–এগুলি কনট্রাসেপটিভ হিসাবে এদেশে চলতে পারে কিনা। এটি একটি ক্লিনিকাল ট্রায়াল। এর উদ্যোক্তা ইনডিয়ান কাউনসিল অব মেডিক্যাল রিসারচ (আই সি এম আর)। আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী, অন্তত একশ জন রোগীকে বিপজ্জনক ও অপ্রয়োজনীয় গবেষণার গিনিপিগ করা হয়েছে। এই রোগীদের মধ্যে কয়েকজন যুবতীও আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এদের কাউকেই ইনজেকশনের কুফল সম্পর্কে কিছু অবহিত করা হয়নি। যদিও দস্তুর মাফিক কাগজে ওদের 'কনসেনট' নেওয়া হয়েছে। ইনজেকশন নেবার দরুন এই সব রোগীদের মাসিকে এখন বিরাট রকমের গোলমাল দেখা দিয়েছে। প্রাত্যহিক রক্তক্ষরণে (Bleeding) ভুগছেন এমন রোগীর সংখ্যাই বেশি। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা এমনিতেই কম-বেশি রক্তাল্পতায় ভোগেন, তার ওপর এই বাড়তি রক্তপাতের ফলাফল কী হতে পারে–সহজেই অনুমেয়।

যেহেতু এই ইনজেকশনের সাহায্যে রোগিণীর দেহে হরমোন প্রবেশ করান হয়, কাজেই প্রত্যেক রোগিণীকে ডি পি ইত্যাদি দেওয়ার আগে ভালভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে পরীক্ষা করে দেখার নিয়ম। বিশেষ, যারা এনডক্রিন বা লিভারের পীড়ায় ভুগছেন বা মানসিক ব্যাধি 'ডিপ্রেশনে' আক্রান্ত, তাদের এই হরমোন কিছুতেই দেওয়া যাবে না। প্রস্তুতকাবক আপজন কোমপানি পর্যন্ত প্রতিটি রোগিণীকে ইনজেকশন দেওয়ার আগে Pap Smear করতে ডাক্তারদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের খবর, দুটি হাসপাতালের একটিতেও রোগী নির্বাচনের সময় এসব পরীক্ষার ধারে কাছে যাননি গবেষকরা। অনেকটা এলোপাথাড়িভাবে চট জলদি বোগী বাছাই হয়েছে। ফলত এসব হতভাগ্য বোগীব একাংশ কোনদিনই সুস্থ জীবনে ফিরে আসবেন না–এমন আশংকা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। একটি হাসপাতালের এই গবেষণার সংগে যুক্ত জনৈক ডাক্তারের মন্তব্য রোগীদের জীবন নিয়ে আমরা ছেলেখেলা করছি। এ দেশেই কেবল এই ধরনের রিসারচ সম্ভব। তিনি জানান, ইনজেকশন দেবার পরে শরীরে হরমোনের পরিমাণের (Level-এর) যে তারতম্য হচ্ছে, তা বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে এতটাই ভিন্ন যে তাকে কোন রেনজের (Range) মধ্যেই ফেলা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ আনপ্রেডিকেটবল। এই ডাক্তারবাবু অরও বলেন, 'প্রায় প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রেই মেটাবলিক ডিরেনজমেনট ঘটেছে। এদের কতজনের ক্ষেত্রে কত সময় বাদে আবার গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে আসবে, আমরা কিছুই বলতে পারি না। ডায়াবিটিস ইত্যাদি অসুখেও এরা অনেকে ভুগবেন।' (এখানে উল্লেখ করা দরকার, আমেরিকায় কুকুর ও বাঁদরকে

পরীক্ষামূলকভাবে ইনজেকশন প্রয়োগ করার পর দেখা গিয়েছে, এদের ব্রেসট, সারভিকস ও এনডোমেট্রিয়ামে ক্যানসার হচ্ছে– এই পরীক্ষার পরই ডি পি 'ব্যান' হয়)।

এই রিসারচ সম্পর্কে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার–এখন এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নাকি গবেষণার মূল ফলাফলকে চেপে গিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি মতন রেজাল্ট 'কমপাইল'-এ ব্যস্ত যাতে করে ওঁদের 'কাজ' ডি পি ও নরিজেসটের পক্ষে যায়। রিসারচ যেহেতু এখন শেষ পর্যায়ে, দু'টি কেন্দ্রেই এখন 'ফেভারেবল পেপার' তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। আই সি এম আর-এর কর্তাব্যক্তিরা নাকি ডি পি-র সপক্ষেই রিপোরট চান। প্রসংগত স্মরণ করা যেতে পারে, আই সি এম আর-এর উপ অধিকর্তা ডাঃ বদ্রীনাথ সাকসেনা এ-বছরের জানুয়ারি মাসে একটি বিবৃতিতে কনট্রাসেপটিভ হিসাবে ডিপি-র প্রচুর সুখ্যাতি করেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই কনট্রাসেপটিভটি দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৬০০ জন স্ত্রীলোকের ওপর প্রয়োগ করে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়েছে।

খোঁজখবর নেবার জন্য পি জি হাসপাতাল এবং রামকৃষ্ণ সেবা-প্রতিষ্ঠান দুটিতেই যোগাযোগ করি। প্রথমটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ঐ হাসপাতালের গাইনি বিভাগের প্রধান ডাঃ সরোজ ভট্টাচার্যের অধীনে। দ্বিতীয়টি দেখছেন ডাঃ প্রভাসচন্দ্র সেনগুপ্ত। ডাঃ সেনগুপ্ত এখন বিদেশে, ফিরবেন জুলাইয়ের শেষে।

ডাঃ ভট্টাচার্যের সংগে দেখা করতে প্রথম যেদিন পি জি হাসপাতালে যাই, উনি তখন বেরিয়ে গিয়েছেন। ওঁর ঘরে দু'জন মহিলা ডাক্তার–সম্ভবত হাউস সারজন বা পি জি করছেন–উপস্থিত ছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাই ওঁরা ডি পির পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন কিনা। 'ডিপো প্রভেরা?' ওঁদের একজন বলেন, 'সে কাজ তো অনেকদিন হল শেষ হয়ে গিয়েছে।'

কবে শেষ হয়েছে, কাজের ফল কী ইত্যাদি যদি ওঁরা বলতে পারেন বা এমন কোন রিসারচ অফিসারের নাম যদি বলেন যিনি আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবেন, জিজ্ঞেস করতে ওঁদের একজন দুই-একবার ক্ষীণকণ্ঠে 'মীরাদি' 'মীরাদি' বলেন, তখন অন্যজন–নিশ্চয়ই সিনিয়র–ওর দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকান এবং আমাকে বলেন, 'না, মানে, আপনাকে ডাঃ ভট্টাচার্যের সংগে কথা বলতে হবে। আমরা কিছু বলতে পারব না। আপনি কাল সকাল ন'টার মধ্যে আসুন।'

ভারপ্রাপ্ত রিসারচ অফিসার ডাঃ মীরা ব্যানারজির ঘর খুঁজে পেতে আমার মিনিট দুয়েক মাত্র সময় লাগে। ওঁর সামনে চেয়ারে বসে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে উনি কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন–'আমার কাছে আপনাকে কে পাঠাল?'

–কেউ না। আপনি রিসারচ অফিসার বলে আপনার কাছে এসেছি।

'কিন্তু, ভাই, আপনাকে তো কোনরকম সাহায্য করতে পারব না।' ডাঃ ব্যানারজি খুব মোলায়েম গলায় বলেন, 'আপনাকে ডাঃ ভট্টাচার্যের সংগে কথা বলতে হবে। উনি আমাদের হেড।'

–আপনি যদি একটু ভাসাভাসাভাবেও বলেন ট্রায়ালের ফলাফলটা কী......ধরুন, ভাল, মন্দ, সন্তোষজনক বা......

–'সারি।' তিনি পাশে রাখা কফির গ্লাস তুলে চুমুক দেন।

আচ্ছা, যাদের আপনারা ডি পি দিচ্ছেন, তাদের কাছ থেকে Consent নিশ্চয়ই নিয়েছেন।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন বলুন তো?' তিনি কফির গ্লাস নামিয়ে আমার দিকে ভয়ার্তভাবে তাকান। 'আপনি ডাঃ ভট্টাচার্যের সংগে কথা বলছেন না কেন?'

ডাঃ সরোজ ভট্টাচার্যকে ২৩ জুন রাত ন'টায় ফোন করি। ওঁর সংগে ফোনে আমার এরকম কথোপকথন হয়।

ডাঃ ভট্টাচার্য, আপনি সম্ভবত শুনেছেন যে আমরা Injectable contraceptive নিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করেছি।

–'হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু আপনি কী চান?'

আপনার কেন্দ্রে তো এই নিয়ে কাজ হচ্ছে। আপনি যদি আমাদের কিছু ইনফরমেশন দেন–

–'ফোনে জানান সম্ভব নয়।'

–সে তো নিশ্চয়ই। আমি আসলে আপনার কাছে একটা appointment চাইছি।

–'আপনি সোমবার এগারটায় আসুন।'

–ধন্যবাদ।

–'কিন্তু শুনুন।' হঠাৎ মনে পড়েছে, এরকম গলায় ডাঃ ভট্টাচার্য বলেন, 'আপনাকে তো আমি কোন information দিতে পারব না। আমার দেওয়ার এক্তিয়ার নেই। আমি দিতে পারি না। আপনি একমাস বাদে যোগাযোগ করবেন।'

–একমাস? একমাস বাদে কেন?

–'এটা আই সি এম আর-এর একটা Project। আই সি এম আর বোঝেন? ইনডিয়ান কাউনসিল অব মেডিকাল রিসারচ। এদের Permission ছাড়া আমি কিছু বলতে পারি না। আপনি ওদের সংগে কথা বলছেন না কেন? তাছাড়া, মোট ৬টি সেনটারে এই কাজ এখন হচ্ছে......।'

–সেনটারগুলোর নাম যদি আমাকে বলেন–

–'এ.....এ আমি বলতে পারব না।'

–ডাঃ ভট্টাচার্য, আপনারা যে দুটি ড্রাগ নিয়ে কাজ করছেন, বাইরের দেশে কনট্রাসেপটিভ হিসাবে সেগুলো নাকি Banned হয়ে গিয়েছে......

–'আমাদের কাছে সেরকম কোন information নেই।'

–আপনি সোমবার আমাকে আসতে বলছিলেন। আসব কি?

বিরক্ত গলায়, না। আপনাকে তো বললাম, আমি Trial-এর ব্যাপারে আপনাকে কোন তথ্য দিতে পারব না।'

–অন্য কোনভাবে যদি সাহায্য করতে পারেন......

–'না, পারব না।'

ডি পি এবং নরিজেসট সম্পর্কে অন্য চিকিৎসকরা কী ভাবছেন? প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবেশ লাহিড়ী বললেন, 'কনট্রাসেপটিভ হিসাবে খুবই এফেকটিভ। কিন্তু এর ব্যবহার একমাত্র তখনই করা যেতে পারে, যদি প্রমাণিত হয় যে এর কোন কুফল নেই। আর একটি ব্যাপার, এই কনট্রাসেপটিভের সাহায্যে পাকাপাকি জন্ম-নিয়ন্ত্রণেরও আমি বিপক্ষে।'

–ডিপি নরিজেসট এগুলিকে আমাদের দেশের উপযোগী কনট্রাসেপটিভ বলে আপনি মনে করেন?

'না। আমি মনে করি না। আমাদের দেশের মেয়েরাও এটিকে খুব একটা গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। কারণ–ইনজেকশন নেবার পর রোজ রোজ ব্লিডিং। এটা, আর কিছু না হলেও রীতিমত বিরক্তিকর। এছাড়া, এদেশের লোক সহজে ইনজেকশন নিতে চান না।'

ডাঃ লাহিড়ী স্বীকার করেন, এই কনট্রাসেপটিভের অপব্যবহারের খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। ☐

কবিপক্ষের গান

সন্ধ্যা সেন

পঁচিশে বৈশাখ থেকে শুরু করে একমাস ধরে রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র উৎসবে প্রতিবারই যেন নতুন করে পরিচয় ঘটে সেই অলোকসম্ভব ব্যক্তিত্বের সংগে। তাঁরই বহুধাবিস্তৃত সৃষ্টির পথ বেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যও অরূপ রতনের দেশে পৌঁছই। তাঁর নাটক, নৃত্যনাট্য, কবিতা, গান দৈনন্দিনতায় রিক্ত মানুষের সামনে কত রং, রস, ধ্যানের দিগন্তের উদ্ভাস জাগায়। সব অনুষ্ঠানই রসোত্তীর্ণ নিশ্চয়ই নয়, তবু এই নিত্যশ্রদ্ধা পথ দেখায়, পৌঁছে দেয় তাঁর জ্যোতির্ময় ধ্যানলোকে, যেখানে অপাপিতও প্রাপিত হয়ে ওঠে।

সেইজন্যই ওৎ পাতি যথার্থ শিল্পীদের দ্বারে, যাঁদের কণ্ঠ, সুর, আবেগ কবির গানের রসলোকে আমাদের পৌঁছে দেবার শক্তি রাখে। এরকম গান যে শুনিনি এবারের আসরে তা নয়। তবে শিল্পী সংখ্যা অনুপাতে স্মরণীয় গানের সংখ্যা বড় কম। এবারে সুচিত্রা মিত্র এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা মহিলা শিল্পীদের দুই প্রধান আকর্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন। পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা। তিনি রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে মানুষের মনে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন এসব কথা বহুবার স্বীকার করা যায়। ইদানীংকালের যে কটি আসরে সেই আগের যুগের হেমন্তবাবুকে ফিরে পেয়েছি তারই একটি আসর হল রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আসর। যেমন সতেজ, সবল সুর, তেমনই কণ্ঠের প্রসারতা। ধরা যায় 'সঘন গহন রাত্রি' গানটির কথা। অন্ধবিভাবরীর সংগপরশহারার বিধুরতা যেমন আবেশ রচনা করে, তেমনই সুরের বিপুল ব্যাপ্তি 'ভাসাও স্বপনপাথারে' র যতিতে। নিকষকালো মেঘ, মেঘছেঁড়া চকিত আলো শ্রাবণধারার অবিরল বর্ষণের টুকরো টুকরো দৃশ্য নিয়ে যে মধুর ছবিটি রচিত হল তাকে ছাপিয়ে হলসুদ্ধ শ্রোতার মনও তিনি সেই মায়ালোকে উধাও করে দিতে পারলেন। তেমনই সংবেদনশীল আড়ম্বরহীন, সাদামাটা ভঙ্গিতে 'প্রাঙ্গণে মোর' গানের উদাসী মায়ারচনা। ঋজু সুর সঞ্চালন, পূর্ণ উচ্চারণ, খোলা গলার আতিশয্যবর্জিত আবেগ, এই নিয়েই তো 'হেমন্ত।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথম পর্যায়ে হয়ত হেমন্ত প্রভাবের আওতায় কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে তাঁর কণ্ঠের গাম্ভীর্যে দীর্ঘদিনের চিন্তার প্রসারে, পরিবেশনায় এমন এক সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয়েছে যা নিজের শক্তিতেই মনকে টানে। ঠিক এই কারণেই 'অনেক কথা বলেছিলেম' কিংবা 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজের গান।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় রোমানটিক গানের মাধুর্য সৃষ্টিতে নিপুণ। সেই রঙেই অনুরঞ্জিত তাঁর চারখানি গান। মনে দাগ কেটেছে 'বড় বেদনার মত' গানটি। গানের প্রতিটি কথা যেন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সুকণ্ঠ এবং গায়কীর বলিষ্ঠতায় দীপ্ত হলেও তিনি সব সময় তাঁর গানে স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসী। তাঁর সন্ধানী মনের বিহারলীলার ছন্দ প্রতিটি অনুষ্ঠানেই অনুভব করা যায়। 'ও যে মানে না মানা' কিংবা 'আমাকে যে বাঁধবে' গান দুটির অন্তর্লীন বার্তা মন ছুঁইয়েই–যখন ধরলেন 'স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে', মনে হল গভীর এবং কৌতুক দুটি ভাবেই তিনি সিদ্ধ।

এবারে রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসবে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত হয়ে এসেছে সন্তু মুখোপাধ্যায়ের গান। তিনি অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চিরকুমার সভা নাটকে। কিন্তু সে ভূমিকার অজস্র গান শুধু সুরে লয়ে নয়, সূক্ষ্ম কাজে, নাটকীয় মুহূর্তের সংগে সংগতি রেখে এমন অনায়াস দক্ষতায় গেয়েছেন যে, তাঁকে রীতিমত গাইয়ের পর্যায়ে ফেলা যায়।

অরবিন্দ বিশ্বাসের গানের মধ্যে আলাদা একটা উপভোগ্যতার রস পুরোপুরিই বজায় থাকে। প্রবীণ শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্তর উপস্থিতি ও গান আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে।

অর্ঘ্য সেনের গানের ভঙ্গি, কণ্ঠের ধ্বনি যৌবনকালের সন্তোষ সেনগুপ্তকে মনে করায় যখন তাঁর 'কেন বাজাও কাঁকন' র মধুর ছলনায় সবাই বিবশ। সেই মুগ্ধকারী মাধুর্য ছিল অর্ঘ্যর আবেগভরা গানে। উপরিপাওনা মধুরতার সংগে তাঁর দাপটের মিলন। স্বপন গুপ্ত দেবব্রত বিশ্বাসের গায়কীকেই যেন সযত্নে এবং সংগোপনে ধরে রেখেছেন।

সত্রাজিত বসু 'তোমার সোনার থালায়' গানটি সুন্দর গেয়েছেন। কিন্তু প্রথম অনুষ্ঠান যতখানি প্রতিশ্রুতি তাঁর গানে পেয়েছি সেই তুলনায় বিকাশের দীপ্তি কম কেন? সুব্রত সেনগুপ্ত নবাগত। কিন্তু তাঁর গাওয়া 'না

ভরিয়ে দিল এদের কায়েমি গায়ন শৈলীকে।

গীতা ঘটকের কণ্ঠে 'বন্ধু রহ রহ সাথে' এবং 'কিছুই তো হল না' একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজেশ্বরী দত্তর ডিসকের কিংবদন্তিতুল্য খ্যাতি সত্ত্বেও।

গায়কীর বনেদীয়ানাতেই ভাল লাগিয়েছেন সুপূর্ণা চৌধুরী এবং সুনন্দা চৌধুরী।

সুপ্রীতি ঘোষ অনেকদিনের শিল্পী। ইদানীংকালে সাধারণ মঞ্চে তাঁর গান খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু কত যত্নে ও ভালবাসায় রবীন্দ্রসংগীতের ধ্যান তিনি মনের মধ্যে লালন করছেন আজও তারই স্বাক্ষর ছিল তাঁর গাওয়া প্রকৃতি পর্যায়ের দুটি গানে।

কণ্ঠ সৌন্দর্য এবং পরিবেশনার শিল্পকলায় মুগ্ধ করেছেন কৃষ্ণা হাজরা এবং বন্দনা সিংহ।

সুমিত্রা বসুর গাওয়া 'পূর্বাচলের পানে তাকাই' এক

গীতা ঘটক/আলোকচিত্র : এন সমীরণ

চাহিলে যারে পাওয়া যায়' সকলের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছে। প্রভাত পাল পরিবেশিত 'আমার সোনার বাংলা' গাইবার সাবলীল ভঙ্গি মাঝে মাঝে শান্তিদেব ঘোষের গায়কীকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

মহিলা শিল্পীর সংখ্যাধিক্য দেখে রবীন্দ্রসংগীতের আসরকে প্রমীলার রাজত্ব বললে অত্যুক্তি হয় না।

সুচিত্রা কণিকা এবারে ছিলেন না আগেই বলেছি। ঋতুও গাননি। সুমিত্রা সেন শুনিয়েছেন 'দিন শেষে রাঙা মুকুল' এবং 'ও যে মানে না মানা' তাঁর নিজস্ব স্টাইলে। নিরলংকার কিন্তু উজ্জ্বল।

পূর্বা দাম সুচিত্রা মিত্রর গায়কীকে স্মরণ করিয়েও স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র একখানি গান গেয়ে সকলকে অভিভূত করে দিয়েছেন স্বপ্না ঘোষাল। এঁর গানের সংখ্যা এবং সময়ের দিকে উদ্যোক্তাদের অকৃপণ হবার প্রয়োজন ছিল। কারণ ইনি শুধু অলংকারসমৃদ্ধ, অসাধারণ কণ্ঠেরই অধিকারী নন, গানের মর্মমূলে প্রবেশের গভীর বোধ এবং রবীন্দ্রচেতনা আছে বলেই 'সখি প্রতিদিন হায়' গানটির মত সহজ ও সুকুমার ভাবলালিত্য এমন মর্মগ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

শ্রীমতী মল্লিকের দুখানি গান খুবই ভাল লেগেছে।

আর একটি শোনবার মত অনুষ্ঠান ছিল শিখা বসুর গান। দ্বিজেন্দ্রগীতি এবং অতুলপ্রসাদের গানে ইনি প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হলেও রবীন্দ্রসংগীতও গেয়েছেন প্রশংসনীয় দক্ষতায়।

চিত্রলেখা চৌধুরীর দীর্ঘদিনের রবীন্দ্রচিন্তা, কণ্ঠ সৌকর্য এবং নান্দনিক চেতনার ফলশ্রুতি তাঁর গাওয়া তিনখানি গান।

অনেকদিন বাদে শোনা গেল গীতা সেন ও কমলা বসুর গান। একজনের গাওয়া 'তারায় তারায় দীপ্ত শিখার' এবং অন্যজনের 'আমায় বোলো না গাহিতে'

তমালিকা গুহ

শ্রবণযোগ্য গান। মায়া সেনকে এদিনের আসরে তাঁর পূর্বদীপ্তিতে উজ্জ্বল দেখা গেল।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সংঘমিত্রা গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল এবারের গাওয়া 'বারেক পথ ভুলে' গানটিতে। বিভা সেনগুপ্তর কণ্ঠে 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়' গানটিও ভাল মানের।

তরুণতর গোষ্ঠীর মধ্যে গত দুতিন বছর ধরে রসিক শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তমালিকা গুহ। এর কণ্ঠে 'আমি তোমার মাটির কন্যা' শুনে মনে হল শুধু সুকণ্ঠ ও গাইবার কায়দার সীমা ছাড়িয়ে তিনি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন কথার রসে নিবিষ্টতার কারণে।

বুলবুল সেনগুপ্তের গান বরাবর ভাল মানের। এবারে 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' গানে টপ্পার কাজগুলি আরও ঝকঝকে। অদিতি সেনগুপ্ত বেছে নিয়েছিলেন ছোট্ট একটি সহজ গান 'আমি ফিরে ঘুরি'।

শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য মুনসিয়ানার ছাপ রেখেছেন 'কে

সুপ্রীতি ঘোষ/আলোকচিত্র : এন সমীরণ

বলেছে তোমায় বঁধু' গানে। ছন্দা দাশগুপ্তর গানেও পূর্বসূরিদের ছায়া সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব নিষ্ঠা ও উদ্যমের শীলমোহর ছিল। বিশেষ করে এ কথা মনে হয়েছে 'কার যেন মনে বেদন' গানটি শুনে। তাঁর কণ্ঠও সুন্দর।

জয়ন্তী পুরকায়স্থর কণ্ঠে 'বল বল বলে তোমার' গানটি সুগীত। হেনা সেনের গাওয়া 'কোন সুদূর হতে' গানটির অস্থায়ী অংশে সুর কায়েমি। সেই তুলনায় অন্তরা অংশে সুর দুর্বল। দুটির সমতা এলে এঁর গান শোনবার মতই হবে।

স্বস্তিকা এবং ভাস্বতী দুই মুখোপাধ্যায়ের গান প্রশংসার দাবিদার। একজনের স্বচ্ছ ঝরঝরে প্রকাশভঙ্গি কণ্ঠের পরিসর, অন্যজনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এঁদের গানে প্রাণ এনেছে। এঁরা ছাড়াও ভালমানে গেয়েছেন কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, গীতা মাইতি, সুমিত্রা রায় ও কাকলি রায়।

রুণা মতিলালের কণ্ঠে 'আমি ফুল তুলতে এলেম বনে' রাবীন্দ্রিক ছাঁচের নয়। তবু ভাল লেগেছে সুরের নিখুঁত প্রবাহ, লয় ও উচ্চারণের স্পষ্টতার কারণে।

মঞ্জু চৌধুরীর গানে সম্ভাবনা আছে। অতগুলি আসরের সব গান শোনা যায়নি বলে কিছু উল্লেখ্য শিল্পী বাদ গেলেন। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সাধারণভাবে দুটি মন্তব্য নিবেদন করছি। এক সুকণ্ঠ এবং প্রতিভার অভাব কোন গানের ক্ষেত্রে হয়ত নেই। কিন্তু রেডিও, টি ভি রেকরড তথা প্রকাশ মাধ্যমের সবকটি প্রতিষ্ঠানই তো এঁদের প্রতি নির্মম। মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সদনে গান গেয়ে এঁদের অনুশীলন ও চিন্তার উৎসাহ কতদিন থাকবে?

অবশ্য এমন অনেক শিল্পীকে গাওয়ান হয়েছে যাঁদের সম্বন্ধে আরও বিচারের অবকাশ ছিল। □

আলোকচিত্র : লেখিকা কর্তৃক সংগৃহীত

বিদেশে বাংলা ছবির চাহিদা আছে : প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ছবির প্রসঙ্গেই কথাটা উঠেছিল। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখো পাধ্যায় বললেন, বাংলা ছবিব সমস্যা আছে। আর এই সমস্যা মোকাবিলা করার প্রয়োজনও আছে। ঋত্বিক ঘটক বা তপন সিংহর কথানা ছবি বিদেশে দেখান হয়েছে। বিদেশে বাংলা ছবির চাহিদা আছে। ফ্রানসে ভারতীয় ছবি দেখাব জন্য লাইন পড়ে যায়।

সেদিন নবা বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র বায়েব জন্মদিন। কলকাতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'বাঙালির গর্ব' প্রণব মুখোপাধ্যাযকে সংবর্ধনা জানান হয়। অভ্যর্থনা জানান উদ্যোক্তা ডাঃ বিশ্বনাথ বায। সাহিত্যিক বিশ্বনাথবাবু সমবেশ বসুর বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রজাপতি'ব চিত্রনাট্য এবং সংলাপ বচনা করেছেন। তিনি এই বছর অল ইনডিয়া ক্রিটিক কাউনসিলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান পান।

প্রণববাবু বলেন, অনেক প্রতিভা বান মানুষ একটু সহযোগিতা চান। সহযোগিতা পেলে তাঁরা সৃষ্টি কবতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সহযোগিতা কবার। কেন্দ্রীয় বাজেটে ছবির প্রচারের উপর কর ধার্য করা হয়েছে। আমি কর মকুব করাব ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখব। প্রণববাবু বলেন, রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁবা খুব ক্ষমতাশালী। কিন্তু তাদের অবদান ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কিন্তু যাঁরা কবিতা লেখেন, সাহিত্য সৃষ্টি করেন, ছবি করেন তাঁদেব কাজ ও সৃষ্টি মানুষের মনকে আনন্দ দেয়, তাঁবা ব্রহ্মার মত স্রষ্টা।

চিত্র পবিচালক তপন সিংহ এবং অরুন্ধতী দেবী প্রণববাবুর কৃতিত্বেব জন্য গর্ববোধ করে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন জানান অনুষ্ঠানেব সভাপতি 'পবিবর্তন' পত্রিকাব প্রধান সম্পাদক অশোক চৌধুবী। প্রদেশ কংগ্রেসেব সাধাবণ সম্পাদক ডাঃ গোপাল দাস নাগও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জানান 'পরিবর্তন' সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায় চৌধুরী

সংবর্ধনা সভায় প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং অশোক চৌধুরী

সিংগাপুরের মানদারিন হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৮৩-র আন্তর্জাতিক এশিয়া পুরস্কার প্রদান করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বহু ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকগণ। এটা ছিল এশিয়া পুরস্কারের তৃতীয় বছর।

প্রাপকদের ভেতর ছিলেন পাওয়ার কনট্রোল অ্যানড অ্যাপলায়ানসেস (বোমবে) প্রাঃ লিমিটেডের শ্রীমতী এম মাথুর। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সুমিত কিচেন মেশিনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য শ্রীমতী মাথুরকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিতা করা হয়।

'ইসট ট্রেড' পত্রিকার পক্ষ থেকে এশিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। এশিয়ার বাজারে বিভিন্ন সংস্থার বাণিজ্যিক সাফল্য, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ, উন্নয়ন ও নকশা, রপ্তানির পরিমাণ, কাজের শর্তাবলী এবং সাফল্য প্রভৃতির ভিত্তিতে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ভারতেব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কিচেন মেশিন 'সুমিত' আন্তর্জাতিক বাজারেও ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। সম্প্রতি মালয়শিয়া, সিংগাপুর, শ্রীলংকা, দুবাই, বাহরিন, মসকট, কুয়েত ও লনডনেও সুমিত মেশিন রপ্তানি করা হচ্ছে।

গরলগর্ভা

ক্যালকাটা ওয়ান ওয়ান থিয়েটার ব্যাপারটা কী ? এটি কি শুধুই নাম ? না কোন বিশেষ নাট্য আন্দোলন এঁরা গড়ে তুলতে চান ? ওয়ান ওয়ান অর্থে যদি শুধু পিছনের কালোপরদা হয় এবং সেট বিবর্জিত দৃশ্য সংস্থাপন বোঝায় তাহলে তাঁদেব নাটক 'গরলগর্ভা'য় যথাযথ সেই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু দৃশ্য সংস্থাপন বর্জন করার মধ্যে অভিনবত্ব কোথায়, বিশেষ করে দৃশ্যগুলি যেখানে যাত্রার ফরম্যাটে বাঁধা ?

যাত্রার সব উপাদানই আছে এই নাটকে -- সংলাপ বলতে বলতে চরিত্রগুলির দৃশ্যাবৃত্তের মধ্যে ঢোকা, অতিনাটকীয়তা, স্বগতোক্তি, উচ্চস্বরগ্রামের অভিনয়, সব কিছু মিলিয়ে এ নাটকে যাত্রারই আদল পাওয়া যায়। তবু জ্ঞানমঞ্চে ৪ জুন এই নাটকের বিশেষ শো দেখবার জন্য হোম সেক্রেটারি থেকে মুনমুন সেন সবাই যে উপস্থিত ছিলেন তার কারণ বোধহয় সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয় দেখার আকর্ষণ।

নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে ঝুমরি নামে একটি কৃষক বধূকে নিয়ে। একমাত্র রূপবতী হওয়ার জনাই সে মহাজনের কুনজরে পড়ে। এরপর যা হয়। তবে এ নাটকে আরও বেশি করে সেই সব ঘটনা ঘটে। ঝুমরির স্বামীকে মহাজন খুন করে। ঝুমরি ধর্ষিতা হয়। তারপর সে পালিয়ে আর একটি গ্রামে আসে। এখানেও সে নারীমাংস লোলুপদের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। নাটকের পরিণতি পরিচিত গ্রীক নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়। যেখানে গণিকা-মাকে ভুল করে সম্ভোগ করতে আসে তার নিজেরই ছেলে। অবশেষে আত্মহত্যা করে গরলগর্ভার ঝুমরি নাটকের অবসান ঘটায়। এই শেষ দৃশ্যটির সংগে ঋত্বিকের সুবর্ণরেখার একটি দৃশ্যের মিল আছে। নাটকে সর্বত্র চড়া সুর--ঘটনাব ঘনঘটা সাধারণ দর্শকদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। চরিত্রের মুখে অশ্লীল কিছু কিছু উক্তিও আছে যা জনৈক নামী নাট্যপরিচালক ও অভিনেতার নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটকেব নির্দেশিকায় লেখা নাটকের স্থান হল দেহাতেব গন্ডগ্রাম। অভিধানে দেখলাম দেহাত মানেই গ্রাম। তাহলে দেহাত জায়গাটির ভৌগোলিক অবস্থানটি কোথায় ? যেখানে চাষী ও নিচুতলার লোকেরা হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে ?

ঝুমরির ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবী সহজেই দর্শকের মন জয় করেন। তবে যে ঝকমকে পোশাক তিনি পরে থাকেন তাতে এক এক সময় মনে হয় তিনি বোধহয় কাশ্মীর কি কলির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাঁর বয়সও এই নাটকে আশ্চর্যভাবে কম মনে হয়। খলচরিত্রে নিমু ভৌমিক নাটকটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। দুর্গার ভূমিকায় কণিকা মজুমদারকে মানিয়েছে সুন্দর। তাঁর রুগ্ন বিধুর ভাবটি ভালভাবেই ফুটে ওঠে। খুবই স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন ডাক্তার দীপক বসু। সে তুলনায় পুলিশ অফিসার মানস দাশগুপ্ত অনেক জায়গায় অতিনাটকীয়। ইন্দুলেখা চ্যাটারজির হাদু পিসি অনবদ্য। সেই সংগে অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন কনসটেবলের ভূমিকা - অভিনেতা নাটকটির রচনা ও পরিচালনা মানস দাশগুপ্তের। □

পা. চ.

[illegible]

বিমল এ বছর বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচাব কাজের জন্যে ছটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। পুরস্কারজয়ী কাজেব ভেতর আছে রঙিন বিজ্ঞাপন (প্রথম পুরস্কার), এক পাতার ক্যালেনডার (প্রথম পুরস্কার), বার্ষিক প্রতিবেদন (দ্বিতীয় পুরস্কার)। এছাড়া সুটিং পোসটার ও টেকসলিন ইয়ারন ফোলডারের জন্যে সারটিফিকেট অব মেরিট।

বিমলের কাজ দেখাশোনা করে যে বিজ্ঞাপন সংস্থা সেই 'মুদ্রা কমিউনিকেশনস'ও নকশার জন্যে চারটি পুরস্কার পেয়েছে। এবং বিমল ফ্যাবরিকসের প্রস্তুতকারক 'রিলায়েনস টেকসটাইলস' বিজ্ঞাপনদাতা ও প্রচারক হিসেবে পেয়েছে দুটি পুরস্কার।

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ১৯ এপরিল নতুন দিললিতে উক্ত পুরস্কার বিতরণ করেন।

এবার নিয়ে পর পর চারবার বিমল জাতীয় পুরস্কার পেল।

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল ৫৮

১		২	█	৩	█	৪	
	█	৫	৬		৭		█
	█	৮				█	৯
█	১০		█	█	১১		
█	১২		১৩	█		█	
১৪		█	১৫		█	১৬	
১৭			█	█	১৮		
১৯		█	২০				█

সূত্র : পাশাপাশি

১। মাছের পেটে, ফটাশ ফাটে
৪। পুরোহিতের হাতে,
শব্দ হয় তাতে
৫। মালপত্র বহু, এক কথায় কহ
৮। বলি বারংবার,
'ভাবো' আরেকবার
১০। মোটা মোটেই নয়,
বরং উল্টো হয়
১১। বৃদ্ধের ছেলে, এখানেতে পেলে
১২। খাওয়া নাহি যায়,
তবু মানুষ খায়
১৪। কালো বীচি সাদা শাঁস,
আয় – তা যদি খেতে চাস
১৫। এই কথাটা শোনো,
হাটুর প্রতিশব্দ জানো
১৬। এইটি পেতে শুনতে হয়,
এতে সোনা ঝুলে রয়
১৭। ব্যতিব্যস্ত হলে,
এই কথাটি বলে
১৮। স্বামীর ভগিনী,
কোন নামে চিনি
১৯। নিযুক্ত হলে তখন তাকে বলে
২০। বন নয়, লোকালয়
বুড়োকালে যেতে হয়

সূত্র : ওপর-নিচ

১। জামায় এবং প্যানটে আছে,
তোমার আমার সবার কাছে
২। নক্ষত্রের বেশে,
আকাশেতে ভাসে
৩। উরেঃ বাপ, কেঁউটে সাপ!
৪। নয়কো কথার ফাঁকি,
হেথায় মোরা থাকি
৬। একবারে ওজন ধরে,
দুবার বললে বাধা করে
৭। নাকাল হলে হয়, জেনো সুনিশ্চয়
৯। স্বর্গের নদী, দেখো পারো যদি
১০। সূর্যের ব্রতী ইনি,
'গাইয়ে নট' তাকেও চিনি
১৩। কৌতুক চাই
তামাসাতেও পাই
১৪। লাল রঙা গুঁড়ো,
দোলে মাখে ছেলে বুড়ো
১৬। বেড়াতে চান, এখানে বাগান
১৮। নয়া কিংবা নয়,
অন্য কী বা হয়!

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২৪ আগসট সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১২ ৮-৮৩।

সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠানো এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল ৫৮' লিখতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল–৫৪ (সমাধান)

পা	█	█	ম	█	চ	ম	ক
ব	র	ক	ন্দা	জ	█	রা	বা
ক	স	ম	█	দ	ভা	ই	█
█	ম	ন	সি	জ	█	█	দ
ভ	র	█	স্না	█	আ	রা	ম
রা	█	জ	প	ত	প	█	দ
ডু	লি	█	█	█	ম	র	ম
ঝি	লি	ব্য	ব	স্থা	█	থ	█

শব্দশৃংখল – ৫৪ র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন কার্তিক দাস বৈরাগ্য | অজয় ব্রিজ হাইওয়ে সাব ডিভিশন, পি ডবলিউ (রোডস) কাটোয়া, কাটোয়া, বর্ধমান| এবং শ্রীমতী কাবেরী পাল (৯ হেম পাল রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২)।

১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত শব্দশৃংখল ৫৪ র লটারিতে বিচারক ছিলেন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

জুলাই ২৭ থেকে আগসট ২

মেষ : শারীরিক অবসাদ ও মানসিক উদ্বেগ; মেয়েদের শারীরিক অশান্তি থাকবে। আর্থিক ঝামেলা এড়ান মুশকিল। কর্মস্থলে কোন যোগাযোগ ভেস্তে যাবে; মেয়েদের সুনাম ও অগ্রগতি। পারিবারিক কোন সমস্যা নতুন রূপ নেবে। মেয়েদের প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে অশান্তি। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃষ : শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি; মেয়েদের অম্বল-অজীর্ণ ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন ঝামেলার বহুলাংশে অবসান। কর্মক্ষেত্রে নিজ ধ্যান ধারণা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; মেয়েদের কোন ব্যাপারে অন্যের পরামর্শে অগ্রগতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি ফিরে আসবে। কোন সন্তানের দূর যাত্রা। ব্যবসায়ীদের নতুন যোগাযোগ।

মিথুন : গলার কোন রোগ ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের। অল্প-সল্প আয় বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাট ঝামেলা এড়ান যাবে; মেয়েদের কিছু উপরি লাভ। গৃহাদি নির্মাণ/ক্রয় হতে পারে। সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক কর্মে ব্যর্থতা। মেয়েদের নিজ প্রচেষ্টায় অতিরিক্ত অর্থলাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কর্কট : শরীর চলনসই; মেয়েদের নতুন কোন উপসর্গে শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি। সপ্তাহ জুড়ে ভীষণ বায়যোগ; কর্মস্থলে সুনাম ও প্রশংসা; মেয়েদের কোন আকস্মিক বাধায় মানসিক অশান্তি। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের মতামত প্রাধান্য পাবে। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

সিংহ : পেট সংক্রান্ত ঝামেলায় বেশ ভোগান্তি; মেয়েদের রক্তচাপ-জনিত পীড়া বৃদ্ধি। আর্থিক ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে পারলে লাভ। কর্মক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে; মেয়েদের ব্যর্থতা ও অসম্মান। মায়ের স্বাস্থ্য ভীষণ চিন্তায় ফেলবে। কর্মপ্রার্থীদের অস্থায়ী যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কন্যা : শরীর আগের চেয়ে অনেক ভাল চলবে; মেয়েদের শরীর নিয়ে ঝামেলা। আর্থিক মন্দায় মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে হতাশা; মেয়েদের সুনামহানি। বৈষয়িক ও পারিবারিক ব্যাপারে ন্যায্য অধিকার হাতছাড়া হবে। কোন সন্তানের কাছ থেকে আঘাত। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

তুলা : অর্শ বা ঐ জাতীয় রোগ ভোগাবে; মেয়েদের মেয়েলি রোগ বিব্রত করবে। আর্থিক টানাটানি থাকবে; ভালরকম ঋণ। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি; কোন দাবি নস্যাৎ হবে। মেয়েদের কর্মস্থলে শত্রুরা বেগ দিতে পারে। পারিবারিক মামলা মোকদ্দমায় হার। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

বৃশ্চিক : ব্যথা-বেদনা কাবু করবে; মেয়েদের লিভার সংক্রান্ত গোলমাল। অতিরিক্ত কিছু অর্থলাভের ইংগিত। কর্মক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে; মেয়েদের বিভাগীয় বদলি। নিজ অবিমৃশ্যকারিতায় বড় রকমের পারিবারিক ক্ষতি। কর্মপ্রার্থীদের কোন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে বাধা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

ধনু : শারীরিক ঝামেলা কমবে; মেয়েদের ছোটখাট রক্তপাত। আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে বেশ ঝামেলা; সম্মানহানি। কর্মস্থলে কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না; মেয়েদের নিজ মতামতে দৃঢ়তার প্রয়োজন। বন্ধুবান্ধবের জন্য বিশেষ উদ্বেগ; মেয়েদের স্বজনবিয়োগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মকর : বুকের রোগ ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা; সমস্ত যোগাযোগ ব্যর্থ হবে। কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত ভাব ক্ষতি করবে; মেয়েদের আরও নতুন দায়িত্ব। পারিবারিক বিরোধ তুংগে উঠবে। কোন সন্তানের ব্যবসা ব্যাপারে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : শারীরিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি; মেয়েদের প্রবল জ্বর ব্যথা ইত্যাদির আশংকা। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা চলবে। মেয়েদের মানসিক চাপ ও অশান্তি। তুচ্ছ কোন ব্যাপারে পারিবারিক তুলকালাম। মেয়েদের ভ্রমণ ও লাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মীন : আগের অসুস্থতার ধাক্কা অনেকটা সামলান যাবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে অভাবিত চাপ ও ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে উদ্যমের অভাব এবং নতুন শত্রুলাভ; মেয়েদের একগুঁয়েমিতে ক্ষতি। পারিবারিক অশান্তির জের চলবে; দূরের সংবাদ বয়স্কদের বিচলিত করবে। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোনঃ ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।

পরিবর্তন

মা ও মেয়ে

বিড়লা বাড়ির ইতিবৃত্ত

বধূ হত্যায় ফাঁসির হুকুম

মালদহে হিংসার আগুন

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

ঘেমে গেছে দুজনেই। ইন্দ্রনাথের মুখ কালো হয়ে গেছে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায়।

গদিটা টেনে নামাব

বৃথা চেষ্টা, তলায় ঢুকে দেখে এসেছি। চিঠিপত্র নেই। তোশক তুলেও দেখেছি।

খাঁজে?

কিসের খাঁজে?

খাটের কাঠ আর গদির ফাঁকের খাঁজে।

আয়, তা হলে দেখা যাক।

দুজনে দুপাশ থেকে গদি ধরে হেঁইও টান মেরে এনে ফেলল মেঝেতে। অমনি ঠন করে কী একটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

গড়িয়ে গড়িয়ে কোণের দিকে চলে যাওয়ার আগেই খপ করে ধরে চোখের সামনে তুলে আনল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে রইল হাঁমানের মত।

এ জিনিস এখানে কেন?

জিনিসটা একটা টিনের ছিপি। ইমপোরটেড বিয়ারের ছিপি। মাঝখান থেকে দুমড়োনো এবং ওপরে কতকগুলো ইকড়িমিকড়ি দাগ।

(এর পর তৃতীয় প্রচ্ছদে)

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েতমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী মশাই জানিয়েছেন অবশেষে 'গৃহযুদ্ধ হবেই' একথা তিনি বলেননি। সাংবাদিকরা ভি আই পিদের যে কোন বাক্য বিকৃত করতে পটু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকেও আত্মসমালোচনা করতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। কোন কোন প্রতিবেদক আছেন যাঁরা সংবাদটি বিশেষ গুরুত্ব পাবে মনে করে কোন বক্তব্যকে ঈষৎ বিকৃত করে প্রকাশ করে থাকেন। কখনও বা রাজনৈতিক মতলবও এই বিকৃতির পেছনে কাজ করে থাকে। কোন সাংবাদিক যদি কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী হন, তা হলে তার চেয়ে সমাজের বড় বিপদ আর হতেই পারে না।

বিনয়বাবু গৃহযুদ্ধের কথা কখন কী পরিস্থিতিতে বলেছিলেন তা আমরা জানি না। কারণ সেখানে আমাদের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু শুধু বিনয়বাবু নন, বামফ্রন্টের বিভিন্ন মন্ত্রীর বিবৃতি বলে কতগুলি চাঞ্চল্যকর বাক্য প্রকাশিত হচ্ছে এবং যখন তা নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তাঁরা তা অস্বীকার করছেন। কিছুদিন আগে পরিবহণ মন্ত্রী রবীন মুখার্জির নামে প্রকাশিত হয়েছিল মন্ত্রী কলকাতাবাসীদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁরা যেন সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যান। কারণ বেশি রাত পর্যন্ত ট্রাম-বাস চালান সম্ভব নয়। পরে মন্ত্রী ওই কথা অস্বীকার করেন। গত ২০ জুলাই অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 'পশ্চিমবঙ্গেও আসামের হাল হতে পারে' বলে মন্তব্য করেন। ডঃ মিত্র অবশ্য এখনও ওই উক্তি সম্পর্কে নীরব কিন্তু বিনয়বাবু বলেছেন, অশোকবাবু এ কথা বলেননি। মন্ত্রীদের যে সব উক্তি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তা সবই সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ্য উক্তি। অবশ্য অনেক সময় মন্ত্রীরা সাংবাদিকদের কাছে খোলসা করে অনেক মনের কথা বলে থাকেন এবং পরে বলে নেন এগুলি 'অব দি রেকরড' অর্থাৎ প্রকাশের জন্য নয়। সকল মানুষেরই পেটে এক কথা মুখে এক কথা থাকে। কিন্তু পেটের কথা যদি মুখ দিয়ে কোনক্রমে বেরিয়ে আসে এবং সুযোগ সন্ধানী সাংবাদিক যদি সেগুলি লিখে বসেন তা হলে সেই ব্যক্তিকে অপ্রস্তুতে পড়তে হয় বৈকি। বিশেষ করে ওই ব্যক্তি যদি কোন মন্ত্রী হন।

তবে আমরা আশ্বস্ত যে বিনয়বাবুরা এখন গৃহযুদ্ধের কথা ভাবছেন না। একদা এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি পি আই এমকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবেন বলেছিলেন। পরে বলেছিলেন তিনি ওকথা বলেননি। আমরা এই উভয় বিবৃতিতেই যার পর নাই প্রীত। যদি কোন রাজনৈতিক দল মনে করে থাকেন যে তাঁরা সুযোগ বুঝে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাকেই 'মিনি বিপ্লব' বলে চালাবেন তা হলে তাঁদের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কংগ্রেস (ই) এবং সি পি আই (এম) দুদলকেই উপলব্ধি করতে হবে খুনের পরিসংখ্যান বাড়িয়ে তাঁরা কখনই বৃহত্তর জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাবেন না। ক্ষমতায় থাকাটা বড় কথা নয় ছলে বলে কৌশলে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা বহু শাসক বা শাসক গোষ্ঠীই দখল করেছেন এবং তাঁদের পেটোয়া প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের সম্পর্কে ইমেজ তৈরির ব্যাপক চেষ্টাও চালান হচ্ছে। কিন্তু জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। সমস্ত মানুষ তাঁদের ঘৃণা করে।

পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই হিংসার অবসানের জন্য সুসংগঠিত ও ব্যাপক কোন প্রচেষ্টা কোন মহলেরই চোখে পড়ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা এই হিংসার রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখুন। আপন স্বার্থের জন্য ভ্রান্ত ও হঠকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক সময় নিচুতলার জনগণকে হিংসার পথে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু জনগণকেই উপলব্ধি করতে হবে হিংসায় কাদের প্রকৃত লাভ।

*

পরিবর্তন

৩-৯ আগস্ট, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৫

দাম ২.৫০ টাকা বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি : সৌগত রায় বর্মন

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন ক্লিনসেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সর্বাকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ফ্ল্যাট ১২১২,
নয়া দিল্লি ১১০০০১ ফোন : ৩১২০২৫

পরিবর্তন ১০ আগসট

বিশেষ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

স্বাধীনতার ৩৬ তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১০ আগসট পরিবর্তন প্রকাশ করছে বিশেষ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা। প্রকাশিত হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের কতগুলি সুনির্বাচিত রচনা। বিশেষ করে একটি লেখার জন্য ১০ আগসটের পরিবর্তন প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিই সংগ্রহ করতে চাইবেন। সেটি হল, আমরা ১৯৪৭ থেকে পশ্চিমবংগের বিভিন্ন বৃহৎ রাজনৈতিক ঘটনার সাল তারিখ, বিভিন্ন মন্ত্রিসভা গঠন এবং বিভিন্ন মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের নাম সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আকারে প্রকাশ করছি। এই ইতিহাস আর কোথাও পাবেন না। আপনার কাছে থাকলে ভবিষ্যতে তা অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। এ ছাড়া থাকছে একটি অনবদ্য চাঞ্চল্যকর রচনা

নেতাজী : তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার অন্তরালে

অন্যান্য রচনার সম্ভাব্য তালিকা:

১। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা

ভারতীয় ইতিহাসের কিছু যুগান্তকারি ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপক ঐতিহাসিক ডঃ নিমাই সাধন বসু।

২। আই সি এস ও ভারতের স্বাধীনতা

আই সি এস সাহিত্যিক দেবেশ দাশ আলোচনা করেছেন ভারতীয় আই সি এসরা ভারতের স্বাধীনতায় কীভাবে সাহায্য করেন।

৩। আই এ এস

প্রাক্তন মুখ্যসচিব অমিয় সেন থেকে দীপক রুদ্র, কিছু কৃতি আই এ এস-এর মুখে শুনুন প্রশাসন সম্পর্কে অকপট উক্তি। এই সাক্ষাৎকার দিতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান অনেক বাঘা বাঘা আই এ এস। আপনি যদি আই এ এস হতে চান তা হলে পড়ুন এই সংগে প্রকাশিত আর একটি ফিচার।

৪। বাঙালি কৃষকের দিনরাত্রি

কৃষকদের কথা কি কেউ ভাবে? কেউ ভাবে হাসিম শেখ রামা কৈবর্তর কথা? একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান। সাংবাদিকতা পাশ করা তরুণ ফ্রি-ল্যানস সাংবাদিকের ফিলড ওয়ারক।

৫। ঈশান কোণে ঝড় ও বাঙালি

ত্রিপুরার সংগে কাছাড়কে সংযুক্ত করলে কি সমস্যা এড়ান যায়? অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরায় অনেকদিন ছিলেন। একটি বিতর্কমূলক লেখা।

৬। সারকারিয়ার সংগে সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন পরিবর্তনের প্রতিনিধি। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের মূল্যায়ন করা হয়েছে সংগের একটি নিবন্ধে।

৫৬ পাতার পত্রিকা। দাম ২.৫০ টাকা।

নিবেদনমিদং

মে মাসের প্রচন্ড গরমে চম্বলের বেহড় যেন জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড। গ্রামবাসীরা সেখানে অপরিচিত কাউকে দেখলে সন্দেহ করে ডাকাত বলে এবং ডাকাতরা তাঁদের সন্দেহ করেন পুলিশ বলে। বিশেষ করে আগন্তুক যদি হন দুজন তরুণ।

পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটার দিব্যজ্যোতি বসু ও ফোটোগ্রাফার সৌগত রায় বর্মন প্রায় কুড়ি দিন ধরে চম্বলের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখা করেছেন আত্মসমর্পণকারী ডাকাতদল ও তাদের পরিবার পরিজনদের সংগে। এই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দিব্যজ্যোতি লিখেছেন একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী যা পরিবর্তনের পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। পিনাকী মজুমদারের লেখা কিছুদিন ধরে নেই বলে কয়েকজন পাঠক চিঠি লিখেছেন। পিনাকীবাবুর হাতে এখন দু তিনটি স্টোরি আছে। প্রত্যেকটি খবর তিনি পুংখানুপুংখ ভাবে অনুসন্ধান করেন। বহু জায়গায় তাঁকে যেতে হয়। এগুলি সবই সময়সাপেক্ষ।

দৈনিক কাগজের সংগে ম্যাগাজিনের এখানেই তফাৎ। দৈনিক কাগজের রিপোরটার দিন আনেন দিন খান। যদৃষ্টং তৎ লিখিতং। দিনের কাজ দিনে চুকিয়ে তিনি রাতে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু ম্যাগাজিন সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের। এখানে প্রতিটি বিষয় পূর্বপরিকল্পিত। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তিল তিল করে তিলোত্তমা তৈরি করতে হয়। আমাদের পচ্ছন্দ কাহিনীর পেছনে তাকে অন্তত ছ মাসের পরিকল্পনা, অনুসন্ধান, ছবি সংগ্রহ, চেকিং, রি চেকিং এ এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। অনেক সংবাদদাতার সংবাদ দীর্ঘদিন ধরে দফতরে পড়ে থাকে শুধু মাত্র ওই বিষয় সংক্রান্ত আরও সংবাদ এসে পৌঁছয়নি বলে। প্রতিটি ম্যাগাজিন হল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এবারে পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশে কিছু নিবেদন করি। আমরা এবার প্রাক পুজো সংখ্যায়

'বাংলার বাইরে দুর্গোৎসব' এই পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গার পুজোর বিবরণ দিতে চাই। বাংলার বাইরে দুর্গোৎসবের ছবি ও বিবরণ পাঁচশ শব্দের মধ্যে পাঠান। শেষ তারিখ ৩১ আগসট।

আপনার বাড়ি যদি পশ্চিমবংগের গ্রামে হয় তা হলে এবার পুজোয় আপনার গ্রামের পুজো দেখার জন্য শহরের লোকদের নিমন্ত্রণ করুন না। কলকাতার পুজো দেখে অনেকেই ক্লান্ত। তাঁরা চান পুজোর এ কটা দিন শান্ত পবিত্র পরিবেশে গ্রামে গিয়ে কাটাতে। কীভাবে আপনার গ্রামে যেতে হবে—মোটর ও বাসরুট, ট্রেন পথ, কলকাতা থেকে কত সময় লাগে, কত ভাড়া এবং গ্রামে গিয়ে কার সংগে যোগাযোগ করবেন সমস্ত লিখে জানান। আপনার গ্রামে আর কী কী দেখার জিনিস আছে তাও বলুন।

পরিবর্তনের প্রাক-পুজো সংখ্যায় আপনার আমন্ত্রণ লিপি ও আপনার গ্রামের পুজোর বিবরণ আমরা প্রকাশ করব

'এবার পুজোয় আসুন আমাদের গ্রামে' এই শিরোনামে।

পুজোয় পশু বলি কি আপনি সমর্থন করেন, এ সম্পর্কে আপনার মত কী? ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠান আপনার মতামত।

'পুজোর বিনোদন'—এই পর্যায়ে আর একটি ফিচার আমরা প্রকাশ করব প্রাক-পুজো সংখ্যায়। আপনার গ্রামে অথবা শহরে এবার পুজোর সময় যদি কোন নাটক-যাত্রা আপনারা নিজেরা প্রযোজনা করেন (আমন্ত্রিত দলের অভিনয় নয়) তা হলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের পাঠান। প্রবাসী বাঙালিদের সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা থাকবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

পা.চ

'চুপী' আয়ুর্বেদের অন্যতম পীঠস্থান

১১ মে ১৯৮৩র পরিবর্তনে কবিরাজীর উপর লেখাগুলো সত্যই সুন্দর হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি সমূহের অন্যতম হয়েও এই মহাকাশ যুগেও রোগ চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ কার্যকর ভূমিকা নিতে সক্ষম। তবু, নানা কারণে পুরোপুরি দেশিয় এই চিকিৎসা পদ্ধতি আজও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিদেশিরা কবিরাজীর উপর গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেও দিনের পর দিন এদেশ থেকে আয়ুর্বেদ হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন আয়ুর্বেদ বিষয়ে এক গুচ্ছ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ঐ চিকিৎসা পদ্ধতির গুণাবলী সকলের সামনে তুলে ধরে মহৎ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, কাজল মিত্র লিখিত প্রচ্ছদ কাহিনীতে আয়ুর্বেদের পীঠস্থান হিসাবে ঢাকা ও শ্রীখণ্ডের নাম থাকলেও আমাদের চুপী গ্রামের নাম উল্লিখিত না হওয়ায় বিস্মিত হয়েছি। নিঃসন্দেহে পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামকে বাংলার আয়ুর্বেদের অন্যতম পীঠস্থান বলা উচিত ছিল। এই গ্রামে প্রয়াত অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্যামাদাস বাচস্পতি, কুলদানন্দ গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অমিয় গুপ্ত, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, সন্তোষ কুমার সেনের মত প্রখ্যাত কবিরাজদের বাড়ি এই গ্রামেই। আয়ুর্বেদের প্রাক্তন ডিরেক্টার ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের বড় ছেলে। তাঁরা এই গ্রামেরই মানুষ।

দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়
চুপী, বর্ধমান

বিগত কালের আর একজন বাঙালি কবিরাজ

গত ১১ মে পরিবর্তনে বিগত কালের কয়েকজন কবিরাজ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। এটি বহু তথ্য সম্বলিত এবং তত্ত্বসংকেতপূর্ণ। এই প্রবন্ধে যে কজন স্বর্গত কবিরাজের স্মৃতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে তাদের সঙ্গে আমার প্রপিতামহ খুলনা সেনহাটির বিশ্রুত কীর্তি কবিরাজ পীতাম্বর সেনের নামটি আমি সংযুক্ত করতে চাই। তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং নাড়ীজ্ঞান বিশারদ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিলেন। তার রচিত 'নাড়ী প্রকাশ' তৎকালে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের শেষে বঙ্কিম-যুগের কৃতী লেখক প্রবীণ সাহিত্যাচার্য স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সান্নিধ্যে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার পিতৃদেব সুসাহিত্যিক স্বর্গত অশ্বিনী কুমার সেনের। তাঁর কাছে সাহিত্যাচার্য কথায় কথায় বলেছিলেন, 'তোমার পিতামহ কবিরাজ পীতাম্বর সেনকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান এবং চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় আমি নানাভাবে পেয়েছি। তিনি যদি কলকাতায় থেকে চিকিৎসা করতেন তবে তাঁর সময়ের কলকাতা নিবাসী যে কজন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেছিলেন তিনিও তাঁদের সমকক্ষ হতেন। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে গরিব দুঃখীদের সেবার জন্যই গ্রামে থেকে গেলেন।' মহিলা কবি মানকুমারী বসুর 'যশোহর' নামে একটি কবিতা একবার যশোহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিতরিত হয়েছিল। কবি তাঁর কবিতার এক জায়গায় লিখেছিলেন :-

সেনহাটির পল্লী ছায়
পীতাম্বর নাহি হায়
সেই ধন্বন্তরী সম ভিষক কমল।

আমার প্রপিতামহের আমল থেকে আমাদের পরিবারে বংশানুক্রমিক কবিরাজের ধারা চলে আসছে তাই কবিরাজ বাড়ি বলতে এক সময়ে খুলনা সেনহাটিতে আমাদের বাড়ি চিহ্নিত হয়েছিল।

অমিয় কুমার সেন
আগরপাড়া, ২৪ পরগণা

নজরুল, কিছু কথা

পরিবর্তন ১৮ মে '৮৩ সংখ্যায় 'এখন নজরুল পরিবার' লেখাটির জন্য ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান নজরুল পরিবারের উপর এমন দরদী লেখা ইতিপূর্বে বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে আমার কিছু বক্তব্য প্রতিবেদককে বোধহয় ঠিকমত বোঝাতে পারিনি—তার জন্য তথ্য পরিবেশনায় ভ্রান্ত ধারণার সুযোগ রয়েছে। তাই প্রকৃত তথ্য আপনাকে জানাচ্ছি। শচীন [illegible] যখন কলকাতায় [illegible] সংগীত রেকর্ড করতে আসেন তখন সন্তোষ সেনগুপ্তর মাধ্যমে আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। উনি নজরুলগীতি গাইবার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বর্মণ দাদার গাওয়া মেঘলা নিশি ভোরে গানটি আমার সঙ্গে গুনগুন করে গেয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সময় স্বল্পতার জন্য তাঁরই আগ্রহে আমি শচীন দেববর্মণের গাওয়া চারটে নজরুলগীতির একটি E. P Record প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দিই। কাজেই 'তাঁকে তালিম দিচ্ছি'—একথা ঠিক নয়। তাঁর দরদী মনের যে পরিচয় আমি পেয়েছি—কোনদিন যদি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা নাও হয়—তবুও আমার মনের মনেকোঠায় তাঁর স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে।

**কাজী নজরুল ইসলামকে কিছু পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই অসীমকৃষ্ণ দত্ত মশাই কিছু গানের পরিবর্তে ৪ হাজার টাকা নজরুল ইসলামকে দেন এবং গ্রামোফোনের সঙ্গে চুক্তি হয় যে ঐ সব গানের Royalty অসীম কৃষ্ণ দত্তর নামে বর্তাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রয়াত অসীমকৃষ্ণ বা তাঁর পুত্র অশোককৃষ্ণ দত্ত উক্ত Royalty বাবদ কোনও টাকা কোনদিন গ্রহণ করেননি। কাজেই নজরুলের [illegible] Royaltyর একটা বৃহৎ অংশ [illegible] অবস্থায় গ্রামোফোন কোম্পানীতে জমা রয়েছে। অশোক কৃষ্ণ দত্ত [illegible] তিনি নজরুলের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের ঐ টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানি একটু সহযোগিতা করলেই আমরা টাকাটা পেতে পারি।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী অনিরুদ্ধের জন্ম তারিখ ২০ এপ্রিল ১৯৫৮ এবং সব্যসাচীর জ্যেষ্ঠা কন্যা খিলখিলের জন্মতারিখ ৫ জুলাই ১৯৫৮। কাজেই তথ্যের দিক থেকে আমি নির্ভুল। আমার কন্যা অনিন্দিতার ১ আশ্বিন (১৩৯০) ১৮ বছর পূর্ণ হবে। এ বংশের সর্বকনিষ্ঠা সন্তান অনিন্দিতা।

কল্যাণী কাজী
কলকাতা-৩৭

সংসারী রামকিংকর

১ জুন ১৯৮৩র পরিবর্তনে নমিতা মণ্ডলের 'সংসারী রামকিংকর' রচনাটি পাঠ করে বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী হয়ে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত।

রামকিংকর সংসারী ছিলেন না। তবে ভাইপো দিবাকরকে সাহায্য করেছেন নানা পরিস্থিতিতে। এটা দরদী ও স্নেহপ্রবণ মানুষ – রামকিংকরের পরিচয়। কতগুলি চিঠিকে একত্রিত করে যেভাবে বিশ্ববন্দিত মহাশিল্পীকে অবমাননা করা হয়েছে তাতে লেখিকার অদূরদর্শিতা, তথ্য চয়নের অপারগতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংসারী' শব্দটির ব্যবহার লেখিকা যেভাবে করেছেন তাতে যথেষ্ট সংসারী জ্ঞানের অভাব (লেখিকার) প্রকট হয়ে উঠেছে। সংসারী শব্দের অর্থ বিকৃত হয়েছে। জীবনে নিজের জন্যে কিছু করেননি তিনি। সন্ন্যাসী রামকিংকর ভাইপোকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা তাঁর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকেরা জানেন। 'সংসারী রামকিংকর' বলে রামকিংকরকে কোণঠাসা করা হয়েছে।

গুরুদাস বেঙ্গজ, হরিসাধন পাল, বিশ্বনাথ চৌধুরী
মনোহর দাশ
কাটাবনী, বাঁকুড়া

এ খবর কোথায় পেলেন?

আপনার 'পরিবর্তন' পত্রিকার ২৫-৩১ মে '৮৩ সংখ্যায় 'পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বহু গ্রামে সন্ত্রাস' এই শিরোনামে নিশীথ দে মহাশয়ের একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে দশম ছত্রে 'কল্যাণপুরে আর একজনকে বিচার সভায় ডেকে এনে মারা হয় এবং ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়' এই খবরটি ছাপা হয়েছে।

'আমি জানতে চাই নিশীথবাবু এই আজগুবি খবর কোথায় সংগ্রহ করলেন? নির্বাচনের পূর্বে সি পি আই (এম) পরিচালিত পঞ্চায়েতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্যই কি এই ঘৃণ্য অপপ্রচার করা হয়েছে? পরিবর্তনের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ভাল ধারণা ছিল, সেটা পালটে দিলেন, অবশ্য আমাদের মতামত নিয়ে আপনাদের কিছু যায় আসে না। জেনে রাখুন মিথ্যা কুৎসা প্রচার করেও সি পি আই (এম)-এর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা যায় না–মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। জনগণ সচেতন তার প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন নির্বাচনে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোথাও ঐরূপ বিচার হয় না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বিনোদবিহারী পাত্র
কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
কল্যাণপুর, হাওড়া

পত্রবিতর্ক

এই সংখ্যার বিতর্কের বিষয় 'ইংরাজি মাধ্যম স্কুল আমাদের ছেলেমেয়েদের দুর্বিনীত করে তুলছে ও অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে'। অনেক পাঠকই এই বিতর্কে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যোগ দিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ চিঠিগুলিই প্রকাশিত হল। তবে স্থান সংকুলানের জন্য সে চিঠিগুলিরও বক্তব্য যথাযথ রেখে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। এবারের বিতর্কে পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় তরফেই বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। এই বিতর্কে পুরস্কারপ্রাপ্ত চিঠি পক্ষে : দ্বারকানাথ বসু-র, বিপক্ষে : অজিত ভট্টাচার্য-র।

দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের সেই মানসিকতা

আমরা যদি ভালভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, বড় বড় শহর ও টাউনগুলিতে এই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির চলন বেশি। আমাদের দেশের সংস্কৃতি মূলত গ্রামকেন্দ্রিক, শহরগুলি আমাদের দেশের সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন, শহরকেন্দ্রিক এই স্কুলগুলি আরও বিচ্ছিন্ন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির নিয়মকানুন ও রীতিনীতি সাধারণ স্কুলগুলি হতে যথেষ্ট স্বতন্ত্র। এই স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে থাকাকালীন বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও শেখান ইংরাজি বুলি। এর ফলে তাদের সহজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক আচার আচরণ সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে যায়। তারা দেশের সাধারণ মানুষ ও সাধারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

ইংরেজদের রাজত্বকালে এদেশে কিছু ইংরাজি শিক্ষিত ইংরেজভক্ত চাটুকারের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা কেবল এদেশীয় লোকদের প্রতি ঘৃণা ও অবহেলা দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, দেশীয় লোকদের প্রতি অত্যাচারে ব্রতী হয়েছিল। আর সেই ট্র্যাডিশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে চলছে।

[illegible] সাহিত্য না পড়লে [illegible] জানা হয় না, দেশের সংস্কৃতিকে জানা হয় না। পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি পড়ানো হয়, ফলে পড়ুয়ারা মাতৃভাষা হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তারা সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের স্বাদগ্রহণ করতে অসমর্থ হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর। তাদের থেকে দূরে থাকা মানে দেশের থেকে দূরে থাকা, তাদের ঘৃণা করা মানে দেশকে ঘৃণা করা। দরিদ্র ভারতবাসীকে কি এরা ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে?

দ্বারকানাথ বসু
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

পক্ষে

অহমিকার হালকা ধোঁয়া

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। ধনী অভিভাবকদের ছেলেমেয়েরাই সাধারণত এই সব স্কুলগুলিতে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। স্বভাবতই এইসব ছেলেমেয়েরা সমাজের অন্যান্য সকল ছেলেমেয়েদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বুঝতে শেখে এবং এই ধরনের স্কুলে পড়ে তখন তারা আরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করতে চায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় বাধা আসে অভিভাবকদের দিক থেকে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার আলোকে নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে পারিবারিক মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং হয়ে ওঠে দুর্বিনীত। তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে অভিভাবকদের অপমানিত হতে হয়। রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে তারা যে নানা প্রকার দুর্বিনীত আচরণ করে তা সর্বদাই আমাদের চোখে পড়ে। এ বিষয়ে মেয়েরাও এখন আর পিছু-পা নয়, তারাও আজ যথেষ্ট অগ্রসর। প্রকৃতপক্ষে এটা নারীসমাজের অগ্রগতির পদক্ষেপ না অবনতিরই নামান্তর।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব স্কুলগুলি বর্তমানে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছে যা ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মহান লক্ষ্য এবং কর্তব্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। শিক্ষার পরিবর্তে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। সে জন্য ছেলেমেয়েদের মনের জগতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

মাতৃভাষার পরিবর্তে এইসব ছেলেমেয়েরা যখন সাহেবী কায়দায় ইংরেজি বলে তখন মনে হয় তাদের মাতৃভাষাই ইংরেজি, অথচ মাতৃভাষা বলতে গেলে জিভ আটকে যায়। তারা বাবাকে সম্বোধন করছে ড্যাড বলে এবং সেই সঙ্গে তাকে বন্ধুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। দেবদেবীকে বলছে গড ও গডেস। এটা কি কোন উন্নত সংস্কৃতির রূপ, না অপসংস্কৃতিরই বাস্তব নিদর্শন।

বর্তমান ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবেশ ছেলেমেয়েদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
কাছাড়, আসাম

গ্রাম-শহরের বিরাট ফারাক

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষার প্রথম কুফল হল মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া। মৌলিক মনুষ্যবোধে সেকাল একালে কোন তফাৎ নেই। ইংরেজির জন্ম ইংল্যান্ডে। ভারতবর্ষে নয়। পরের মার দুধ আমার মার মত হতে পারে না। ইংল্যান্ড বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কুপ্রভাবটাই আমাদের ছেলেরা গ্রহণ করছে বেশি।

তুলনামূলকভাবে বাংলা স্কুল অপেক্ষা ইংরেজি স্কুলের ছেলেমেয়েরা আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শেখার সঙ্গে গ্রামের নিকটআত্মীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের থোড়াই কেয়ার করে।

মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত সম্পর্ক, মমতা, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ছোটবেলা হতেই এরা বর্জন করার শিক্ষা পায়। কেননা ওখানে সুকোমলমতি বালক বালিকাদের মানবিক গুণের বদলে পুঁথিগত গুণই বেশি অনুশীলন করতে হয়।

ইংরেজি যে দরকার তা সবারই জানা। কিন্তু তা প্রতি ক্ষেত্রে সবার জন্য এক বিশেষ স্তর থেকে আরম্ভ হওয়া উচিত। এভাবে আমলা কিংবা পুকুর চোর বানাবার বিশেষ বিশেষ স্কুল করা মানে কোটি কোটি নিরন্ন, কংকালসার মানুষকে ব্যঙ্গ করা।

ইংরেজি স্কুলগুলো হচ্ছে বরাবরই শহরাঞ্চলে। গ্রাম ওই সুযোগ হতে পুরোপুরি বঞ্চিত। যার ফলে শহর আর গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিকতায় বিরাট ফারাক। এটা কোনদিন রাষ্ট্র সমাজের পক্ষে সুস্থতা নয়।

আমার সংস্কৃতি, আমার লোকায়ত চিন্তার প্রকাশ, আমার স্বভূমিতে না হলে হবে কোথায়? পরের ছেলে আমার মার কদর কী বুঝবে

সলিল বিশ্বাস
ভীমপুর, নদীয়া।

নকল সাহেব বানাতে

এক শ্রেণীর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে ছেলে-মেয়েদের সাহেবী স্কুলে পড়াশুনার ব্যাপারটা 'স্ট্যাটাস' রক্ষা করার পর্যায়ে চলে এসেছে। অনেক সময় অভিভাবকরা নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখতে সাহেবী স্কুলের দরজায় ঘা মারেন ছেলে-মেয়েদের নকল সাহেব বানাতে। আসলে মানসিক বিকৃতি ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার অভাবে অভিভাবকদের সাহেবী স্কুলগুলোর প্রতি এত দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার ছোঁয়া লেগে যায় তাদের ছেলে-মেয়েদের উপর। তারাও নকল সাহেব বনতে গিয়ে না হতে পারছে সাহেব, না হতে পারছে খাঁটি বাঙালি। জীবনে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে এইসব ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে শুধু ধূসর আকাশ ছাড়া আশার বিন্দুও হয়তো থাকে না। কেননা খাঁটি বাঙালির মত জীবন বাঁচানর তাগিদে কোন কাজই এইসব নকল সাহেবদের দ্বারা সম্ভব নয়। বড় বাধা আত্মসম্মান।

অনেক অভিভাবক কচি কচি প্রাণগুলোকে সাহেবী স্কুলগুলোতে ঠেলে দেন নির্বিচারে। বন্দীদশায় এইসব ছেলে-মেয়েরা জীবনের সুষমা এবং অর্থ হারিয়ে ফেলে। বাধিত কচি কচি মনগুলো ক্ষুব্ধ, বিপন্নতায় বেপরোয়া হয়ে ওঠে স্বাভাবিক কারণেই। এরা জীবনে কি কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে?

কার্তিক দত্ত
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

বিপক্ষে

বড়রা আগে নিজেদের সংশোধন করুন

আজকাল ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকে ছয় ঘণ্টা। বাকি আঠার ঘণ্টাই থাকে মা বাবা বা অভিভাবকদের শাসনাধীন। কাজেই ছেলেমেয়েদের মনে তাঁদেরই আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া উচিত, সেই কথা ফোটার সময় থেকেই বাচ্চাদের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। বাচ্চারা মা বাবার প্রতিটি পদক্ষেপ নকল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাই দেখা যায় বাচ্চাদের যখন জিগেস করা যায় 'খোকা তুমি বড় হয়ে কী করবে ' সে অনায়াসে বলে দেবে, 'বাবার মত ডাক্তার হব' বা প্রফেসর বা অন্য কিছু যা তার বাবা করে থাকেন। বাচ্চাদের এই প্রারম্ভিক শিক্ষা খুব কাজের হয়। নীতি শিক্ষার শুরু এখানেই।

আজ সমগ্র সমাজের নৈতিক চরিত্রের মান যখন নিম্নমুখী তখন বাচ্চারা শুধু নীতিবাদী হবে এমনটি আশা করা ভুল। তাছাড়া নীতিবাদীদের আবার আজকাল অনেকেই অবজ্ঞার চোখে দেখেন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দোষত্রুটি অনেক থাকতে পারে কিন্তু অনুপাতিক ভাবে গুণই হবে বেশি। সেসবের নানা আলোচনা তো পত্রপত্রিকায় চলছে। আমি শুধু বলব শুধু মাত্র ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলগুলির ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে বড়দের নিজেদেরই দোষত্রুটি সংশোধন করা উচিত নয় কি?

বন্দনা দেবী
কায়স্থগ্রাম, কাছাড়

অবাস্তব চিন্তা

এটা ঠিকই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি আমাদের দেশে অপ্রতিহত গতিতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। যেহেতু অর্থকর শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সমধিক এবং সর্বভারতীয় চাকুরি ক্ষেত্রে ইংরেজি অপরিহার্য, সেইহেতু সমস্ত সমালোচনাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির রমরমা অবস্থা চলছে এবং চলবে। তাই বলে এই স্কুলগুলি আমাদের ছেলেমেয়েদের দুর্বিনীত করে তুলছে এবং অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এধরনের অবাস্তব চিন্তা মোটেই সমীচীন নয়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে দুর্বিনীত হওয়ার মানসিকতা কিংবা অপসংস্কৃতি কি কোন ভাষাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে? নিশ্চয়ই না। তাছাড়া যেসব ছাত্রছাত্রী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে না তারা সবাই বিনয়ী এবং সংস্কৃতিবান এ কথাও নিশ্চয়ই হলপ করে বলা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ভর করে এমন শিক্ষার উন্মেষ ঘটে পরিবার ও সমাজগত চিন্তাধারা ও রুচিশীল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। হ্যাঁ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির পড়াশোনা, নিয়মকানুন, চালচলন, ও পরিচালন পদ্ধতি প্রভৃতি সাধারণ বাংলা স্কুলের রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ এই স্কুলগুলি পাশ্চাত্য অনুকরণে চলার পক্ষপাতী। অতএব দুই ভিন্নপন্থী ভাবধারার অনৈক্য থাকাটাই স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু যা আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মেলে না তাই খারাপ বা অপসংস্কৃতির বাহক এ কথার পেছনেই বা যুক্তির অবকাশ কোথায়? আসলে অপসংস্কৃতির, কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তাই অপসংস্কৃতির প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়।

পরিশেষে জানাই কোন স্কুল নয়, কোন ভাষা নয়, সংস্কৃতি, শালীনতা, সুচারুবোধ প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষা নির্ভর করে পরিবারগত পরিমণ্ডলে। অতএব শুধু ইংরেজি মাধ্যম স্কুলকেই অপসংস্কৃতির জন্য দায়ভাগী করলে চলবে না।

পীযূষকান্তি চন্দ্র
খড়গপুর-৪

আই এ এস-রা কি দুর্বিনীত?

ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েরা পরিবেশগত কারণে আচার ব্যবহারে একটু সাহেবী চালে চলতে পারে, বা তাদের পোশাকেআশাকে আদব-কায়দা দেখা যেতে পারে, অথবা তারা একটু যুক্তিবাদী হতে পারে, যুক্তিতর্ক ছাড়া কোন কিছুই বিশ্বাস নাও করতে পারে--তাই বলে তারা যে দুর্বিনীত এ কথা যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরাই শুধু বলবেন।

অন্য দিকে 'অপসংস্কৃতি' দেশের জনগণের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে কারণগুলি তা হল ১। অল্প শিক্ষা। বিভিন্ন পাড়াতে, রকে আড্ডাবাজ রংবেরং-এর পোশাকে সজ্জিত ছেলেরা, যাদের মেয়ে দেখলেই টিপ্পনী কাটা স্বভাব, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুই নেই। ২। 'ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র'-এইসব চলচ্চিত্রে না থাকে শিল্পসৌন্দর্য না থাকে বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রতিফলন। এইসব চলচ্চিত্রে দেখান হয় অর্ধনগ্ন নারী শরীর, নায়কের মস্তানী, নায়কের দুর্বিনীত ব্যবহার যা আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই নকল করার চেষ্টা করে।

আমাদের দেশের আই এ এস অফিসাররা নাকি ইংরেজি মাধ্যম পড়া ছাত্র। কিন্তু তাঁরা কি খুবই দুর্বিনীত? তাঁরা কি অপসংস্কৃতির হোতা? যদি তাই হত তাহলে এই আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দেশে যেখানে আই এ এস অফিসাররাই শাসনব্যবস্থার কাঠামো সেখানে সংস্কৃতি শব্দটাই বোধহয় লোপ পেত।

রামকৃষ্ণ নন্দী
পুরুলিয়া, মানবাজার

ছেলেমেয়েরা ক্রমশ হতাশ হচ্ছে

প্রথমেই বলি ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলারক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতি চেতনার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ছাত্ররাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। সুতরাং জীবনের এই স্তরটিতে তাদের উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং খুব সন্তর্পণে পরিচালনা করা দরকার। আজ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপসংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসানর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে একটি বিষয় বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল নীরস ও অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাপদ্ধতি। আগে শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যে শ্রদ্ধামধুর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেত এখন সেটা ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে।

বরং একটা উগ্রতা ও দুর্বিনীত ভাবই ফুটে উঠছে। এর জন্য শুধু ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ওপর দোষ চাপান ঠিক হবে না। অনেক সাধারণ স্কুলের পরিবেশও আজ খারাপ। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় সমাজের সর্বস্তরেই আজ একটা ক্ষয় শুরু হয়েছে। এলোমেলো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষারীতি এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকট, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নানা অস্বস্তিকর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ছেলেমেয়েদের ক্রমশই হতাশ করে তুলছে। আর সেই হতাশা থেকে জন্ম নিচ্ছে নানা বিকৃতি। তাছাড়া অশ্লীল ও বিকৃত রুচির সিনেমা নাটকের উস্কানিও এর জন্য কম দায়ী নয়।

সুব্রতকুমার করণ,
বাওয়ালী, ২৪ পরগণা

অনুপ্রবেশ -

আমার ভোটার

আমার ভোটার

অম্লমধুর

নৃশংস খুন আত্মহত্যা
দেশেতে জল-ভাত,
চলছে তবু দেশ এগিয়ে
কাটছে তো দিন রাত।

এমন একটা দেশের খবর
আমরা সবাই জানি,
সভ্য দেশের মানুষ এখন
বিশেষ বন্য প্রাণী।

...

যাদুঘরের সবকটি ফোন
দুমাস ধরে মৃত
জ্যান্ত ফোন যাদু ঘরে :
ভূতও হবে ভীত।

হরদেব সাধুখাঁ

নাক কাটা কান কাটা
ভরে গেছে দেশটায়
পটাপট বৌ মারে
নব নব চেষ্টায়।

কেউ ঢেলে কেরোসিন,
দেশলাই জ্বালে
নয় গলা টিপে মারে
ফেলে দেয় খালে।

সকলের ওপরে
বণিকের বাড়ি
ডেডবডি ঘরে রেখে
ঘোরে চেপে গাড়ি।

খায় দায় গান গায়
নেই কোন চিন্তা
বৌটাকে শেষ করে
নাচে তাতা ধিনতা।

নিতাই ঘোষ

পরিবেদনা কাকস্য
বৃদ্ধি কেবল টাকস্য
নস্যি যেমন নাকস্য
যুগটা তেমন বাকস্য
কথায় কাজে ফাঁকস্য
বাজছে তাতেই ঢাকস্য।

...

প্যাংলা নামেই চিনতো লোকে
এখন বাবু বলেন
ব্যস্ত হয়ে সারাটা দিন
দেশের কাজই করেন।
'গ্র্যানডে' এখন ভোজন সারেন
ছুটিতে যান 'ফরেন'
কী করে হয় বলতে গেলেই
জামার কলার ধরেন।

শৈলেন কুমার দত্ত

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
সূর্যি গেল পাটে
অফিস ফেরত আমরা এলাম
ধর্মতলার ঘাটে
ধর্মতলায় ক্যানেল এখন
নয়তো সে আর রোড
একটু পরেই আসবে ভেসে
ডবল ডেকার বোট।

প্রদীপ দাস

আসামেতে 'আসু' আর
পাঞ্জাবে 'অকালি',
ধন্য এ রাজনীতি
কী খেলাই দেখালি।
এর মত ওর মত
মেলা বড় শক্ত,
তাই দেখি মন্দিরে
ঝরে আজ রক্ত।

সমর্পণ বসু

কেন্দ্রবিন্দু

কেন্দ্রে বিরোধীরা তেমন সুবিধে করতে পারছেন না কেন?

অভিমন্যু

দিল্লি :

এবারে লোকসভার বাদল অধিবেশনের আগে ভাবা গিয়েছিল কতকগুলি সমস্যা ঝড় তুলবে। কিন্তু তার আগেই বিতর্কিত সমস্যাগুলির তাপমাত্রা প্রশমিত হয়ে গিয়েছে। তাই বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুন না কেন আগের মত এগুলি তেমন এখন আর বাজার গরম করতে পারছে না। এই বিতর্কিত বিষয়গুলি হল আসাম সমস্যা, অকালি সমস্যা, কাশ্মীরের নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি এবং সর্বশেষ স্বরাজ পাল, এসকরট, ডি সি এম এর ননরেসিডেন্ট শেয়ার হস্তান্তর বিষয়।

প্রথমেই আসা যাক আসাম সমস্যা নিয়ে। নির্বাচন যে ভাবেই হয়ে থাক না কেন একটা পুরোদস্তুর সরকার যে কাজ করতে শুরু করছে এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নেই। বাস্তবিক পক্ষে 'আসু'-র ভেতরেই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় ও বিতর্ক এমন পর্যায়ে গেছে যে গণসংগ্রাম পরিষদও তাদেরকে আর আন্দোলনের যোগ্য সহযোগী হিসেবে মনে করতে পারছে না। 'আসু' র এক অংশ মনে করে যে গণসংগ্রাম পরিষদ অনেক পরিমাণেই চরমপন্থার দিকে আন্দোলন নিয়ে যেতে 'আসু'কে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করেছে। যে প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে বি জে পি দল ও কেন্দ্রের জনতা দল আন্দোলনের সমর্থন আগে করেছিল তাদের সেই সমর্থন এখন আর নেই।

জম্মুর নির্বাচনে ব্যাপক বিপর্যয়ের পর এবং অকালিদের প্রশ্নে অন্যান্য বিরোধীদের থেকে বি জে পি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আসাম আন্দোলনের প্রশ্নে তাদের আগের সেই উৎসাহ তারা এখন আর দেখাচ্ছেন না। এ দিকে জুন মাসের প্রথম দিকে চন্দ্রশেখরের পরামর্শে মোহন ধাড়িয়া আর এস এম যোশী আসাম থেকে ফিরে এসে যে রিপোরট ও মনোভাব নেতৃত্বকে জানিয়েছেন তার ফলে নতুন উৎসাহ নিয়ে আসাম আন্দোলনকে মদত জুগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোভাব আগের মত মজবুত নয়।

মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়ার ব্যক্তিগত কাজ করার পদ্ধতি আন্দোলনকারীদের কাছে খুব অপছন্দের নয়। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শাপে বর হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনোয়ার তৈমুর প্রভৃতির বিক্ষোভ ও উপদলীয় কার্যকলাপ। আন্দোলনকারীদের একাংশ এর ফলে সহজেই মনে করছেন যে হিতেশ্বর সইকিয়া আর যাই হোক খাঁটি অসমীয়া এবং বেশ কিছু পরিমাণ আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যদিও আসামের আন্দোলনকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা শেষে নবোদ্যমে চালিয়ে নেবার কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু আসামের বৃহত্তর জন সমাজের কাছে আন্দোলনের সেই ইমেজটি আর নেই।

দ্বিতীয় বিতর্কিত বিষয় হল অকালি আন্দোলন। অকালি আন্দোলনের প্রথম ও চরম দাবিপত্র এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে সে ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আন্দোলনের প্রতি খালিস্তানিদের চাপ বাড়ছে এবং মডারেট অকালি আন্দোলনের নেতাদের মুহূর্মুহূ মত ও পথ বদলাতে হচ্ছে। যে ভাবে হিংসাত্মক ঘটনা হয়েছে তার ফলে শুধু অশিখ সম্প্রদায়ই নয় — শিখ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশও এই সব কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারছেন না। অকালি আন্দোলনের নেতারা কিন্তু আসলে ফাঁপরে পড়েছেন কারণ একদিকে চরমপন্থীদের চাপ তাদের আন্দোলনকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার হিংসার বিরুদ্ধে পাবলিক সিমপ্যাথি পেয়ে যাচ্ছেন প্রতিদিন এবং রবি-বিয়াস জলবন্টন এবং ফাজিলকা জরিমানা প্রশ্নকে আশেপাশের দুটো রাজ্যের প্রায় সমগ্র জনগণের বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে চেয়ে অকালি আন্দোলনের দাবিকে তাদের একক বিষয় করে আর রাখেননি।

বিরোধী দলও, যার মধ্যে বি জে পি এবং লোকদল, এর বিরুদ্ধে এবং পক্ষে যারা ওকালতির চেষ্টা করে চলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন এইচ এন বহুগুণা। এবং বহুগুণার অত্যুৎসাহ আবার জনতা-দলসহ অন্যান্য দলকে অনুৎসাহিত করে তুলছে এ বিষয়ে কিছু করতে। অকালিমোর্চার সবচেয়ে সজ্জন বিদ্বান এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষ হলেন প্রকাশ সিং বাদল। কিন্তু বাদলের উপর আর কর্তৃত্ব নেই — বাদল এদেরই একজন। মূল নিয়ন্ত্রক লংগওয়াল আর পেছনের মারাত্মক শক্তি হল সন্ত ভিনদ্রেনওয়ালা। যদিও এ কথা সত্য আজকের অকালি আন্দোলনের এই শক্তির পেছনে কংগ্রেসের এক সময়কার উপদলীয় লড়াই এবং দরবারা সিং বিরোধীদের হাতই বেশি কিন্তু এই কার্যটি করে দরবারা সিং-এর নেতৃত্বকেই তারা মজবুত করলেন। কারণ দরবারা হলেন প্রচন্ড অকালিবিরোধী ও আন্দোলনবিরোধী। তাই কেন্দ্র যতক্ষণ মনে করেন অকালিরা ভুল করছে ততক্ষণ দরবারার চাকরি পাকা। সংসদের চলতি অধিবেশনে তাই এই দুটো বিতর্কিত বিষয়েই সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে সব বিরোধীরা এক হতে পারবেন না আর সেইটুকুই কেন্দ্রের লাভ।

ফারুক আবদুল্লা ও কাশ্মীর নির্বাচন নিয়ে যতই হৈ চৈ হোক না কেন এ বিষয়ে কংগ্রেস দল থেকে আবদুল্লাবিরোধী কোন ব্যাপক বিতর্ক উঠবে না কারণ আবদুল্লা ও প্রধানমন্ত্রীর একটা সমঝোতা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, কারণ সেটা উভয়ের স্বার্থেই এখন প্রয়োজন। আর আবদুল্লাকে সরাসরি সমর্থন করতে সংসদে ব্যক্তিগতভাবে বহুগুণা, চন্দ্রজিৎ যাদব ছাড়া দলাহিসেবে কেউই নেই।

এ দিক থেকেও দারুণ কোন ঝুঁকি সরকারের হবে না। কিন্তু শেষ বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে জল অনেকদূর গড়াবে এই জন্য যে স্বরাজ পাল ননরেসিডেন্ট হিসেবে শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি শেয়ার কেনার দাবিদার হতে পারবেন না বলে যে বিধিবদ্ধ বিবৃতি সংসদে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন তাকে চ্যালেনজ করে নিশ্চয়ই বিরোধীরা বলবে যে স্বরাজ পাল সঠিক অর্থে ননরেসিডেন্ট নন, কারণ তিনি পুরোদস্তুর বৃটিশ নাগরিক এবং তার বৃটিশ পাশপোরট আছে। সেক্ষেত্রে তিনি যে এত শেয়ার কিনলেন, কীভাবে তার টাকা পয়সা এখানে এল এসব নিয়ে তদন্ত চাইবেনই বিরোধীরা এবং সেখানে সরকার, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রক, বিশেষ অসুবিধায় পড়বেন। এবং প্রায় সব বিরোধীরা একজোটে যদি কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একমত হন তা হবে এই বিষয় এবং বলা বাহুল্য অর্থমন্ত্রককে এক্ষেত্রে স্বরাজ পালের রেসকিউতে আসতে অনেক বেগ পেতে হবে। আর তা যদি সাধাই হয় তা হলে স্বরাজ পাল বনাম অর্থমন্ত্রক এই লড়াইতে শাসকদলের ক্ষতি বেশি। কারণ শাসকদলের কাছে অর্থমন্ত্রীর তুলনায় স্বরাজ পাল বেশি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ভূমিকা হবে আসল। অনেকটা এরই উপর নির্ভর করবে আগামী কয়েক মাসের রাজনৈতিক চিত্রপট। □

একালের মা ও মেয়েঃ পরস্পরের বন্ধু, না শত্রু?

গৌরী দে

রচনা দেবী ও তৃপ্তি চ্যাটার্জি। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু দাস বর্মন

একটা যুগ ছিল যখন মা-মেয়ের আলাদা কোন অস্তিত্বই ছিল না সমাজে। নারী তখন ছিল পুরুষের ছায়ামাত্র, তার কথা ছিল পুরুষের প্রতিধ্বনি। এইসব অন্তঃপুরচারিণী, অসূর্যম্পশ্যা মা মেয়ের জীবনে তখন একমাত্র সম্বল ছিল চোখের জল। সদ্য বিধবা কন্যাকে যখন মায়ের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত সহমরণে অথবা সমাজের দুর্নামের ভয়ে বালিকা কন্যাকে যখন তুলে দেওয়া হত মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের হাতে, তখনও মায়েদের চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছু করার থাকত না, বালিকা বিধবা কন্যার কঠোর জীবন যাত্রা, বা লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দেখে বুক ফাটলেও মায়েরা প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেতেন না। যুগটা ছিল কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, ধর্মান্ধতা সব কিছু মিলিয়ে। সেই যুগটাকে বোঝা যায়, জানা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না এ যুগটাকে। এই যুগের কন্যাদের। এই নারীবর্ষ, নারী স্বাধীনতার যুগে যখন মেয়েরা পুরুষের সংগে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে জিনস প্যানট, ম্যাকসি, চোস্ত চোলিতে প্রজাপতির মত পুরুষ বন্ধুদের সংগে উড়ে বেড়াচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই পতি নির্বাচন বা ত্যাগ করছে, তখন এহেন শিক্ষিতা, স্বাধীন, স্বাবলম্বী মেয়েরা নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না কেন? কেন তারা পণপ্রথার শিকার হয়ে পড়ছে নিজেরাই? আর কেনই বা তাদের আত্মহত্যা বা হত্যার ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে পারবে তারা এ যুগের মেয়ে, আর যাদের শিক্ষায় তারা বেড়ে উঠছে, তারা এ যুগের মা। তাই ওদের পারস্পরিক মনোভাব জানতে চেয়েছিলাম ওদেরই কাছে। অপ্রত্যাশিত উৎসাহে সাড়া দিলেন বহু মা ও মেয়ে। নিজেরা উদ্যোগী হয়ে জানিয়ে দিল ওদের বক্তব্য।

এক ঘন বর্ষার সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিলাম বি টি রোডে তৃপ্তিদির বাড়ি। কথা ছিল কৃষ্ণা ও কাবেরী ঘোষ তাঁদের তিন মেয়েকে নিয়ে এখানে আসবেন। জানাবেন নিজেদের বক্তব্য। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই গিয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং অপেক্ষা করতে হল। তৃপ্তিদি খানিক বাদে চায়ের ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেলেন। একা ঘরে বসে ভাবছিলাম নানা কথা।

চিন্তায় বাধা পড়ল। হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকলেন মা-মেয়ের দল। প্রায় বিনা ভূমিকায় কৃষ্ণা বললেন অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম তো? কী করব বলুন আজকালকার মেয়েদের টাইম জ্ঞান বড় কম। কৃষ্ণার দুই মেয়ে। বড়টি শুভ্রা বি এস সি ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে। আর ছোটটির নাম শান্তা, হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা দিয়েছে। মায়ের কথা শুনে শুভ্রা একবার মায়ের দিকে তাকাল। হয়ত কিছু বলত, বলা হল না, চা জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তৃপ্তিদি। ডানহাতের পর্ব শেষ হতে মেয়েদের পাশের ঘরে সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম মায়েদের, 'এবার আপনাদের মধ্যে মা-মেয়ের দ্বন্দ্বটা কেমন বলুন তো?' শুধু এঁদের নয়, এই প্রশ্নটাই আমি করেছিলাম সব মায়েদের। শতকরা আশি ভাগ মা, যাঁদের মধ্যে সব বিত্তবান শ্রেণীই আছেন, তাঁদের সকলের বক্তব্য প্রায় একই রকম। এঁদের সকলের মতে, মা-মেয়ের দ্বন্দ্বটা ঠিক পিতাপুত্র বা শাশুড়ি বৌ-এর মত অতটা গুরুতর নয়। অনেকটা প্রিয় বন্ধুর সংগে খুঁটিনাটি ব্যাপারে কথাকাটাকাটি, রাগারাগি বা মান-অভিমান হওয়ার মত। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই একটা মীমাংসা খোঁজে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। অনেক ক্ষেত্রে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেটা খুব কমই হয়। সাধারণত দেখা যায়, আমাদের দেশের মেয়েরা শেষ পর্যন্ত তাদের মা-দিদিমার আদর্শকে একেবারে মুছে ফেলতে পারে না।, আরও বলা যায়, বয়সের সীমারেখা বাড়িয়ে, কন্যাকে যখন মায়ের ভূমিকায় ফেলা যায়, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা-মেয়ে সমব্যথী বা বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে পড়ে। কিন্তু তার আগে? যখন কন্যা নাবালিকা, যুবতী এবং অবিবাহিতা, তখন বেশির ভাগ মা-মেয়ের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা যায়। কারণ এ সময় মা চান মেয়েকে গড়তে, শেখাতে, শাসন করতে বা নিজের দখলে রাখতে। অন্যদিকে মেয়ে তখন তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে মনে করে মায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব বিরোধ অনিবার্য। এ ছাড়াও রয়েছে দুই ভিন্ন যুগের দ্বন্দ্ব। আর দুই ভিন্ন যুগ মানেই দুই ভিন্ন রুচি।

কৃষ্ণা ও কাবেরী ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির সংগে সবসময় মেলে না ওঁদের মেয়েদের। কাবেরীর বয়স বেশি নয়, অথচ ইতোমধ্যে তাঁর পনের বছরের মেয়ে তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

'আমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা নিজের ওপর বড় বেশি আস্থা রাখে।' বললেন কাবেরী। অবাক হলাম ওঁর কথা শুনে, বললাম 'এ তো ভাল কথা, এতে ভাবনার কী আছে!' কাবেরী মাথা নাড়েন, 'না,ওভার-কনফিডেনস ভাল নয়।'

বললাম, 'এ ছাড়া আর কীরকম শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?'

কাবেরী বললেন 'মেয়েকে সব সময় ভালমন্দ বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। অন্তত আমি তাই করি। দেখুন না আজকাল বিয়ের রাতেই অনেক মেয়ে বলে আলাদা হয়ে যাবে। এটা ঠিক না। আমার তো মনে হয় এর জন্যে দায়ী মেয়েদের মায়েরা। বাড়ির শিক্ষা বলতে মায়ের শিক্ষা। আর মায়ের কুশিক্ষা বা প্রশ্রয়ের জন্যেই মেয়েরা এ কথা চিন্তা করতে সাহস পায়।'

কাবেরীর কথায় সায় দেন কৃষ্ণা। 'কথাটা একেবারে ঠিক। আমিও আমার মেয়েদের এই কথাই বলি, প্রথমে সকলের সংগে অ্যাডজাস্ট করে চলতে চেষ্টা করতে হবে, তারপর যদি একান্ত অসম্ভব হয় তখন অন্য কথা।'

বললাম, 'মেয়েদের আপনারা

কন্যাসহ: আরতি ঘোষ। আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

কতটা স্বাধীনতা দিয়েছেন?'

'যতটুকু দেওয়া উচিত।' বললেন কৃষ্ণা ঘোষ। শুভ্রা কলেজের নোটের জন্যে বন্ধুদের বাড়ি যায়, আর একাই যায়, তবে এসব বন্ধুরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণার চেনা। এ ছাড়া বন্ধুদের নিয়ে পিকনিকে যাওয়া বা বাইরে যাওয়া কোনটাতেই তিনি মেয়েকে ছাড়েন না। এ নিয়ে মেয়ের সংগে মনকষা কষি হয় বৈকি। তবে শেষ পর্যন্ত মায়ের কথাই ওরা মেনে নেয়। 'এ ছাড়া খুঁটিনাটি ব্যাপার তো আছেই, তবে ------ ' বলতে বলতে একটু থামলেন কৃষ্ণা। অকারণে শাড়ির আঁচলটা ঠিক করলেন, তারপর একটু গর্ব মেশান হাসি হেসে বললেন, 'যাই বলুন ভাই, আমাকে না হলে ওদের একদন্ড চলে না।'

বললাম, 'ধরুন, আপনাদের মেয়েরা এমন পাত্র নিজেদের জন্যে বেছে নিয়েছে যাদের আপনারা পছন্দ করেন না। এই অবস্থায় কি আপনারা নিজেদের মতটাকেই বড় করবেন - না, ওদের পছন্দমত - '

ওঁরা জানালেন, বিয়ের ব্যাপারে ওঁরা কেউই গোঁড়া নন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমে তাঁরা মেয়েদের বোঝাবার চেষ্টা করবেন। তাতে কাজ না হলে মেনে নেবেন বৈকি।

বললাম, 'সে যুগের মত আপনারাও কি আপনাদের মেয়েদের বিয়ের আগে, বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন?' ওঁরা দু জনেই হেসে উঠলেন, বললেন 'আজকালকার মেয়েদের আর নতুন করে শেখাতে হয় না। ওরা ক্লাস সেভেন থেকে বায়োলজি পড়ে। তবু আমরা মেয়েদের শুধু একটি কথাই বলি এমন কিছু করবে না, যা তোমার জীবনে দুঃখ ডেকে আনবে।'

ঠিক এই ধরনের একটি কথা বলেছিলেন, ডাঃ ব্যানারজির স্ত্রী অঞ্জলি দেবী। এম এ পাশ শিক্ষিতা এই মায়ের মতে, মেয়েদের রক্ষা করে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব। আর এই ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব যৌথভাবে কিছুটা মায়ের, কিছুটা মেয়ের নিজের। তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী। এই শিক্ষা ভবিষ্যতে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর নিজের একটি মাত্র মেয়ে যখন ডাক্তারি পড়তে চাইল, আত্মীয়স্বজন সবার আপত্তির বিরুদ্ধে তিনি মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মেয়ে সুন্দরী, পথেঘাটে একাই যাওয়া আসা করে। তাকে ঘিরে থাকে নম্র গাম্ভীর্য। অঞ্জলি দেবী সেকেলে নন, বরং কিছুটা আধুনিক মনের অধিকারিণী। তিনি মনে করেন সবার সংগে মেয়ের মেশা উচিত, তবে নিজেকে ঠিক রেখে। মেয়েকে তিনি একটি কথাই বারবার বলেন 'সব সময় মনে রেখ তুমি কোন ঘরের মেয়ে। এমন কিছু কর না, যাতে আমাদের পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।' কথাটা ঠিক। এই আত্মমর্যাদা বোধ উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে বর্মের আচ্ছাদন তৈরি করে দেয়। নিজেকে সাধারণের চেয়ে মনে হয় অনেক বড়।

মেয়েকে শুধু উপদেশ দেওয়া নয়, সবসময় প্রায় চোখে চোখেই রাখেন প্রিয়নাথ ব্যানারজি রোডের চন্দনা চ্যাটারজি। তাঁর মেয়ে এ যুগের, তাই পথে ঘাটে কোন অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতে চায়। চন্দনা তা চান না। তবে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তিনি অঞ্জলি দেবীর সংগে একমত।

উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সব মা মেনে নিলেও, অনেকে কিন্তু ছেলেমেয়ের একসংগে পড়া পছন্দ করেন না। যেমন করেন না ফুলবাগানের বাসিন্দা আরতি ঘোষ। তাঁর স্বামীকে প্রায়ই কাজের জন্যে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। সুতরাং আরতি দেবীই তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ের অভিভাবক। বড় মেয়ে সুনন্দা এম এ পড়ছে। বি এ পড়ার সময় সুনন্দার ইচ্ছে ছিল প্রেসিডেনসি কলেজে পড়ে, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা নয়, আর এই নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না

কৃষ্ণা দেবী, শুভ্রা ও শান্তা ঘোষ। আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

গিয়ে সুনন্দা ঠিক করল সে সংস্কৃত নিয়ে বি এ পড়বে। মা এক কথায় রাজি। কারণ সংস্কৃত কলেজে কোন ছাত্র পড়তে পারে বলে তাঁর ধারণা ছিল না। সুনন্দা কলেজে ঢুকল, কিন্তু দেখা গেল, বাকি বিষয়গুলি পড়তে গেলে তাকে প্রেসিডেনসি কলেজে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষার মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না, অতএব সুনন্দা শেষ পর্যন্ত কো এডুকেশনে পড়েই বি এ পাশ করল।

যুগদ্বন্দ্বটা তাঁর ছোট মেয়ে সোনালির সংগে একটু যেন বেশি। সোনালি এ যুগের মেয়ে। শাড়ির চেয়ে পছন্দ করে ম্যাক্সি। আরতি দেবীর ইচ্ছে মেয়ে আরটস নিয়ে পড়ুক। সোনালি বিজ্ঞানের ছাত্রী। তা ছাড়া সোনালি বোঝে না মা কেন চান সে রান্না, সেলাই এসব শেখে! এ সবের জন্যে তো পড়ে রয়েছে সারা জীবন।

প্রায় সব মাকেই বলতে শুনলাম, তাঁরা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অ্যাডজাসট করার শিক্ষা দেন। অথচ তাঁরা চান না মেয়েরা পড়ে পড়ে মার খায়। তাঁদের নিজেদের কথা জিগ্যেস করেছিলাম, আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁরা প্রায় সকলেই বলেছিলেন 'চট করে স্বামী ত্যাগ করতে পারে না হিন্দু মেয়েরা। আজন্মকালের সংস্কার তো। তা ছাড়া এক জায়গায় বাসন থাকলে তো ঠোকাঠুকি হবেই ----।' সত্যিই কি তাই?

হয়ত এর উত্তর দিতে পারে আজকের শিক্ষিতা সংস্কারমুক্ত যুবতীরা। তাই প্রশ্নটা রাখলাম ওদেরই দরবারে। আজ আর মায়েরা নন, আমার চারপাশে বসেছিল শুভ্রা, শান্তা আর শর্মিষ্ঠা। কৃষ্ণা আর কাবেরী ঘোষের মেয়েরা। ওদের মধ্যে শুভ্রাই বড়, তার মতে মেয়েরা আজকাল আর অবলা সরলা নেই। সাহস করে ভবিষ্যতে একা চলার ঝুঁকি নিতে পারে তারাই, যারা যথেষ্ট শিক্ষিতা। উচ্চশিক্ষাই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। আজকাল যেসব গৃহবধূ আত্মহত্যা করছে, শুভ্রার মতে তারা ঠিক করছে না। বনিবনা না হলে সরে এসে নিজে স্বাধীনভাবে থাকাই ভাল বলে সে মনে করে। তবে প্রথম থেকেই এই মনোভাব থাকা নিশ্চয় ভাল নয়। বিয়ের আগে পরস্পরের মন বুঝে নেওয়াও একটা বড় ব্যাপার।

শুভ্রার চিন্তাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা ঠিক, বিয়ের আগে দুচার দিনে কাউকে চেনা যায় না। এর জন্যে দীর্ঘদিনের প্রয়োজন। বিশেষ কোন সংকট মুহূর্ত না এলে পরস্পরকে চেনার সুযোগ আসে না।

শান্তা অভিযোগ করল, 'মা চান না আমরা রাস্তাঘাটে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমার মনে হয় প্রতিবাদ না করলে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দেখুন, ভিড় বাসে কতরকম লোক থাকে। এদের মধ্যে কিছু লোক সব সময় চেষ্টা করে মেয়েদের বিব্রত করতে। এই অবস্থায় একা প্রতিবাদ করতে গেলে অপমানিত হতে হবে, তখন যদি দল বেঁধে প্রতিবাদ করা যায় তা হলে সহজে আর কেউ মেয়েদের ঘাটাতে সাহস করবে না।'

ওদের মায়েরা বলেছিলেন 'খুঁটিনাটি' ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সেই খুঁটিনাটি ব্যাপারটা কীরকম জানতে চাইলাম ওদের কাছে। 'যেমন ধরুন, আমি চুল কাটতে চাইলে মা বলেন এখন না, বিয়ের পর। আমি ভেবে পাই না মায়েরা কেন এমন বলেন? যা এখন দোষের তা বিয়ের পরেও তো

দোষের? তবে?' — বলল শুভ্রা।

একটু হেসে হালকা গলায় বললাম, 'জান তো, বিয়ের আগে পাত্রীর সম্বন্ধে কোন সমালোচনা হলে বিয়ের বাজারে তার দাম কমে যায়, কিন্তু বিয়ের পর আর সে ভয় থাকে না।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে শান্তা বলে ওঠে 'এ ছাড়াও আছে। যেমন মায়ের কতকগুলি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ আছে, যেগুলি আমার ঠাকুমা করতেন, মা সেগুলি আজও বজায় রেখেছেন। আমি মনে করি আজকের দিনে নিজেদের যখন অনেক কাজ করতে হয়, তখন যেগুলো না করলে নয় বা সংস্কারের বশে করা, সেগুলো বাদ দেওয়া উচিত।'

কাবেরীর মেয়ে এতক্ষণ দিদিদের কথা শুনছিল বসে, হঠাৎ সে উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে, 'বিশেষ করে মায়েদের কুসংস্কারগুলো। এতে ক্ষতিও হতে পারে।'

'ক্ষতি হতে পারে?' একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম শর্মিষ্ঠার দিকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কীরকম ক্ষতি হয় বলে তুমি মনে কর?' ওর সাফ উত্তর, 'ধরুন, আমাদের বাড়িতে এক আত্মীয় বেড়াতে এসেছেন। উনি চলে যাবার পরমুহূর্তে লক্ষ্য করলাম তাঁর মানিব্যাগটা ফেলে গেছেন। কিন্তু কুসংস্কার আছে, পেছু ডাকা চলবে না, তা হলে নাকি পথে বিপদ হয়। অতএব ডাকা হল না। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, সেই ভদ্রলোকের কথা, মানিব্যাগ ছাড়া তাঁকে বাসে ট্রামে কতটা বেইজ্জত হতে হবে!'

কাবেরী দেবী ও শর্মিষ্ঠা ঘোষ। আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

মায়েদের এসব কুসংস্কার মেনে নিতে পারে না শর্মিলাও। বালিগঞ্জ সায়েনস কলেজের ছাত্রী, এম এস সি পড়ছে। সেখানে বসেছিল শর্মিলার আরও দুই সহপাঠিনী, অনুরাধা আর সুস্মিতা। শর্মিলা সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ্য করেছিস, মায়েরা অনেক সময় নিজের ছেলে আর মেয়ের স্বাধীনতায় একটা পার্থক্য করেন। এটাও আমার ভাল লাগে না। আমার মতে ছেলে আর মেয়ে সমান সমান। যে কাজ মেয়ে করলে দোষের হয়, সে কাজ ছেলে করলে দোষের নয় কেন?'

সুস্মিতারা দুই বোন, ভাই নেই। তাই শর্মিলার কথায় বলল, 'আমি অবশ্য এরকম কোন সমস্যার মুখোমুখি হইনি, তবে আমার একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে।' বন্ধুরা উৎসুক হয়ে তাকাল। আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা? সেটা কীরকম?' সুস্মিতা যা বলল তার মর্মার্থ হল, ওর মায়ের সঙ্গে ওর প্রায় বন্ধুর সম্পর্ক। কিন্তু একটা ব্যাপারে মা খুব সজাগ। সুস্মিতার মাঝে মধ্যে রান্না করার সখ হয়। কিন্তু মায়ের এ বিষয়ে একটা আতঙ্ক আছে, 'বিয়ের আগে পুড়ে গেলে শরীরে খুঁত হয়ে যাবে, এই ভয়ে মা ওকে কিছুতেই একা রান্নার ব্যাপারে ছাড়েন না।

অনুরাধা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর রান্না, আমার সাজ।' সবাই একসঙ্গে ওর দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম 'সেটা কীরকম?' অনুরাধা জানায় তার মা চান, সে সব সময় সেজেগুজে থাকে। অথচ তার সাজতে একেবারে ভাল লাগে না। এ নিয়ে তার সঙ্গে মায়ের প্রায়ই মন কষাকষি।

এরা সবাই যা অভিযোগ করল, তা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বুদবুদের মত ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়, দাগ কাটে না। কিন্তু বড়লোকের মেয়ে রীতা? সামান্য ব্যাপারে মায়ের বুকে একটা ক্ষত সৃষ্টি করে গেল। রীতা আর রবীন, মেনকা দেবীর দুটি ছেলে মেয়ে। দু জনেই মানুষ হচ্ছিল একরকমভাবে। রীতা বড়, সুতরাং একটু বেশি আদুরে। ওর আলাদা ঘর, আলাদা গাড়ি, বেশ চলছিল। কিন্তু এম এস সিতে ঢোকার পর থেকে মা যেন কেমন বদলে গেলেন। রীতা শাড়ি পরে না, প্যানট পরে কলেজে যেত। মেনকা দেবী আপত্তি জানালেন। তাঁর আপত্তি রীতার একা বেরোনতেও। রীতা মায়ের আপত্তি প্রথমটা গায় মাখেনি। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এখান ওখান যায়। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় রীতার পথ আটকে দাঁড়ালেন মেনকা দেবী। এবার থেকে এসব চলবে না। রীতা কোনদিন মাথা নিচু করতে শেখেনি। সে নিজের পথ বেছে নিল। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া স্মারট শিক্ষিতা মেয়ে, চাকরি জোটাতে অসুবিধে হল না, একটা আলাদা ফ্ল্যাটও জোগাড় হয়ে গেল। এক কথায় সব ছেড়ে রীতা চলে এল

আলাদা ফ্ল্যাটে। কিন্তু এত করেও কি শান্তি পেয়েছিল বীতা? আমার প্রশ্নের উত্তরে ও একটা কথাই বলেছিল, 'বড় নিঃসংগ লাগে।'

নিঃসংগ ভাব বোধটা আপেক্ষিক। তা নাহলে আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়েও রমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত নিঃসংগ বোধ করত কেন? বাবা মার একমাত্র মেয়ে রমিতা ওঁদের চোখের মণি। যুবতী মেয়ে। তাই সর্বদাই বাবা মা আর জ্যাঠাইমার দৃষ্টি শৃংখলে বাঁধা। ওর কাছে তাই বাড়িটা হয়ে উঠল জেলখানা। বাড়ির কাছেই কলেজ। পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, তবু যাওয়া আসার সময় কেউ না কেউ সংগে থাকবেন। এ হেন রমিতা, বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া দূরে থাক, বাড়ির ছাদে উঠতে বা জানলায় দাঁড়াবারও অনুমতি পায় না। রমিতা প্রতিবাদ করে, ঝগড়া করে মায়ের সংগে, কাঁদে। মা অবাক হন, দুঃখ পান। রমিতা গুরুজনদের বোঝাবার চেষ্টা করে না। সে মুক্তির অপেক্ষায় থাকে। তারপর একদিন মায়ের ভালবাসা উপেক্ষা করে রমিতা কলেজ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। রমিতার মা চামেলী দেবী শুধু একটি কথা বলেছিলেন, 'আজকাল-কার মেয়েদের কি মন বলে কিছু নেই? একবার আমাদের কথা ভাবল না?'

চামেলি দেবীর মত নীলিমা দেবীরও আজ একমাত্র সম্বল চোখের জল। নীলিমা দত্তের একমাত্র মেয়ে বিয়ের এক বছরের মধ্যে ফিরে এল মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে। ওর স্বামী অত্যন্ত রাগী, রোজ মার-ধোর করে। নীলিমা দেবী মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে বিষয় সম্পত্তি সব লিখে দিলেন মেয়ের নামে। তাঁর স্বামী অনেকদিন মারা গেছেন। তিনি একা মানুষ, আশা করেছিলেন শেষ বয়সে মেয়ে দেখবে। হল না। বিষয় পেয়ে মেয়ের রূপ বদলে গেল। খবর পেয়ে জামাই এসে উঠল শ্বশুরবাড়ি। স্ত্রীকে খোশামোদ করতে লাগল। মেয়ের কাছে মা হয়ে উঠলেন বোঝা। অতএব মা-মেয়ের ঝগড়ায় পাড়ার লোক অতিষ্ঠ। অথচ নীলিমা দেবী আজ সর্বস্বান্ত। কোথাও যাবার জায়গাও নেই, পয়সাও নেই।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও মোটামুটি বলা চলে মধ্যবিত্ত ঘরে মা মেয়ের দ্বন্দ্ব, মানসিকতা, মিল, অমিল অথবা মায়েদের মেয়ে আগ-লাবার ধরন, এমনকি মেয়েদের জীবনে মায়ের ভূমিকা প্রায় এক-রকম।

কিন্তু আরও দুটি স্তরের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার মধ্যে একটি সর্বোচ্চ, যাকে বলা হয় হাই-সোসাইটি। এখানে হাজার হাজার টাকা সামান্য কাগজমাত্র। এখানে আধুনিকতার নামে চলে চূড়ান্ত ব্যভিচার। এদের মা-মেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। মদ, পারটি, পুরুষ বন্ধু এদের আভিজা-ত্যের তুলাদন্ড। এদের কাছে 'ফ্রি সেকস' বা 'সেকসুয়াল এনজয়-মেনট' হল জীবন উপভোগের একমাত্র পাথেয়। এসব মা-মেয়ের কাছে ধর্ম বা সংস্কারের নামে নিজেকে বঞ্চিত করাটা ইডিওটিক। আর পাপপুণ্যের ভয়টা নিছক সুপারসটিশন।

আলোকচিত্র :

আরও একটি স্তর আছে, যাদের বলা যায় নির্বিত্ত। পেটের জ্বালায়, অন্য সন্তানদের বাঁচাবার আশায় মা গভীর রাতে মুখ লুকিয়ে নিজের যুবতী কন্যাকে কোন ধনীর গাড়িতে তুলে দিতে বাধ্য হন। তার বদলে তাকে অনেক টাকা দেওয়া হয়। সে টাকায় বাকিদের প্রাণ বাঁচে কিন্তু মায়ের চোখের জল শুকোয় না। আবার অনেক মা, যুবতী মেয়ে কীভাবে টাকা আনছে সংসারে, তা আন্দাজ করেও না বোঝার ভান করেন।

এসব মায়েরা সহজে কারও কাছে মুখ খোলেন না। তবে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটি মায়ের কাছে নাম ধাম গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেনেছিলাম তাঁদের দুঃখের ইতি-হাস। এঁরা ফুটপাথের বাসিন্দা নন। এঁদের এককালে জমিজমা ছিল, সচ্ছল অবস্থা ছিল, এখন আর নেই। কোন রকমে মানসম্মান নিয়ে বস্তির একখানা ঘরে বা পুরনো ভাড়ায় কোন পাকাবাড়ির একখানা ঘরে এঁরা বেঁচে আছেন। যাঁর কথা বলছিলাম, তাঁর তিনটি মেয়ে। যতদিন স্বামী ছিলেন একভাবে কেটেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর এখন চারটি প্রাণীর বেহাল অবস্থা। অতিকষ্টে বড় মেয়ে একটা কাজ জোগাড় করে, তিনি নিজেও খুঁজে নিলেন সারারাত রোগীর কাছে থাকার কাজ। গরিবের ঘরের যুবতী মেয়েদের চারপাশে ওত পেতে থাকে হায়নার দল, মাঝরাতেও দরজায় টোকা পড়তে লাগল। মেয়েদের আগলাবেন কী করে অসহায় মা? আর বিয়ে? মেয়ে যদি কাউকে খুঁজে নেয় ভাল, নয়ত তাঁর পক্ষে কোন মেয়েরই বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

যাই ঘটুক না কেন, এর পেছনে আছে দারিদ্র্যের জ্বালা, খিদের যন্ত্রণা। কিন্তু যে সব মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা চাকরি করছেন, তাঁরা কেমন করে আগলাচ্ছেন তাঁদের মেয়েদের বা মেয়েরাই বা কীভাবে গ্রহণ করছে মাকে? প্রশ্নটা রেখে ছিলাম সলট লেকের স্বাতী রায় চৌধুরীর কাছে। তাঁর দুটি মেয়ে। একটি হায়ার সেকেনডারি পাশ, অন্যটি এখনও স্কুলে পড়ে। ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরে উনি জানালেন 'উপায় নেই। কিন্তু জানেন, সারাদিন মন পড়ে থাকে ওদের দিকে, বিশেষ করে ওদের যখন স্কুল ছুটি থাকে।' স্বাতী সংধ্যার পর বাড়ি ফিরে নিজের হাতে রান্না করেন মেয়েদের জন্যে। যদিও তাঁর মেয়েরা খুব শক্ত আর স্বাবলম্বী। স্বাতী রায়চৌধুরীর ধারণা, চাকরিজীবী মায়েদের মেয়েরা অনেক বেশি পরিশ্রমী আর স্বাব-লম্বী হয়। বড় মেয়ে অঞ্জনাকে জিগ্যেস করেছিলাম 'মাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে না?' অঞ্জনা সংগে সংগে উত্তর দিয়েছিল, 'কিছু মনে হয় না, অভ্যাস হয়ে গেছে তো।' তবে ছোট মেয়ে রঞ্জনার মতে, 'শরীর খারাপ হলে মা কাছে না থাকলে দারুণ বিরক্তি লাগে।'

অর্থাৎ মায়ের ভালবাসাই মেয়ের জীবনে শেষ কথা। □

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং : নিয়মের নিগড়ে বাঁধা এক সতেজ প্রাণ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জুলাই মাসের গোড়ায় রাষ্ট্রপতি জৈল সিং কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর কর্মব্যস্ত দিনগুলি থেকে কিছু সময় তিনি দিয়েছিলেন পরিবর্তনের প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদককে। এই প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কোন সাক্ষাৎকার নয়। রাষ্ট্রপতি ও মানুষ জৈল সিং-এর এক সংক্ষিপ্ত আলেখ্য।

ফটো : পাহাড়ী চৌধুরী

'রাষ্ট্রপতি আপনাদের ভেতরে যেতে বলেছেন।'

২ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা। আমরা রাজভবনের দোতলায় পশ্চিম দিকের ব্যালকনিতে বসে। এইমাত্র রাষ্ট্রপতিজী রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পান্ডের সংগে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। আমাদের ফোটোগ্রাফার পাহাড়ী চৌধুরী ক্যামেরা বাগিয়ে বসে ছিল। ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারল না। ক্লিক করতেই হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন কয়েকজন উরদিধারী। কী করলেন, কী করলেন , সর্বনাশ করে ফেললেন! রাষ্ট্রপতি তাঁর পুরো পোশাকে নেই। এই অবস্থায় ছবি তোলা বারণ। সে ছবি কদাচ প্রকাশ করা হবে না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে পার পাওয়া গেল।

এবার আমরা ভেতরে গেলাম। রাষ্ট্রপতি বাগান থেকে বেরিয়ে সবে ঘরে ঢুকেছেন। আমাদের দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম আমাদের প্রধান সম্পাদক অশোক চৌধুরীর সংগে। নিজের পরিচয় দিলাম।

রাষ্ট্রপতি হিন্দিতে বললেন, আইয়ে চৌধুরী সাব। তারপর বসতে বললেন।

আমাকে বসালেন তাঁর পাশে, একাসনে। প্রোটকলে আটকাল কিনা জানি না। তবে মনে হল, রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং প্রোটকলের ধার ধারেন না। সহজ সরল মানুষ। কোথাও কোন অহংকার নেই। আমরা যে ভারতের এক নম্বর পুরুষের সংগে কথা বলছি তা একবারও মনে হল না। মনে হল এক পুরনো পরিচিত শিখ ভদ্রলোকের সংগে অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে, তাঁর সংগে কথা বলছি।

আমার সাংবাদিক জীবনে এই দ্বিতীয় বার ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনাসামনি দাঁড়ালাম। এর আগে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যে বছর মারা যান, সে দিনটিতে এই রাজভবনে, এই একই ঘরে আমি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি ডাঃ রায়ের কথা বলেছিলেন সেদিন।

জ্ঞানীজী বলছিলেন : কলকাতায় আমি স্বাধীনতার আগে কোনদিন আসিনি। স্বাধীনতার পর অনেক বার এসেছি। আমরা কাগজের লোক শুনে বললেন : আমিও কাগজ বার করতাম এককালে। বেশি দিন চালাতে পারিনি। কাগজ চালান সোজা কথা নয়। দুটো জিনিস খুব দরকার। বিজ্ঞাপন আর ভাল একজন ম্যানেজার। এ ছাড়া এমন সব লেখা দেবেন যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। বিতর্ক কাগজের প্রাণ। তবে সেটা এমন পর্যায়ে না চলে যায় যে হিতে বিপরীত হতে পারে। চাঞ্চল্যকর খবর দিয়ে বিক্রি বাড়ান যায়, কিন্তু সেটা সাময়িক। বেশি দিন সেটা টেকে না। আপনারা কিছু খাবেন তো? সংগে সংগে সেকরেটারিকে বললেন, এঁদের চা টা কিছু দাও।

চা বোধহয় তৈরি ছিল না। এল সুদৃশ্য কাঁচের কাপে করে মিন্টি ফলের রস। আমি ও অশোকবাবু কেউই মিষ্টি খাই না, কিন্তু স্বয়ং রাষ্ট্রপতি হাতে করে দিচ্ছেন, তা ছাড়া তিনি নিজেও একটি গ্লাশ তুলে নিলেন।

আমার হাতে একটি বই ছিল। বি কে আলুওয়ালা ও শশী আলুওয়ালার লেখা জৈল সিং-এর প্রামাণ্য জীবনী। 'ফ্রম মাড হাউস টু রাষ্ট্রপতি ভবন'। বইটি রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব এ কে বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বইটি রাষ্ট্রপতির সামনে ধরে বললাম : আপনি একটু স্বাক্ষর করে দিন। উনি আমার ডট পেনটি নিয়ে স্বাক্ষর করে দিলেন। ইংরাজিতে লিখলেন, জৈল সিং।

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর জন্ম ১৯১৬ সালের ৫ মে। এই ৬৭ বছর বয়সে তাঁকে দেখায় যুবকের মত। দীর্ঘদেহী পুরুষ। একবার গুরুতর হৃদরোগ থেকে উঠেও তিনি তরুণ যুবকের মত হাঁটেন। ইন্দিরা তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, জ্ঞানীজীর সংগে মাটির যোগ আছে। কথাটি সত্যি। তাঁর বাবার ৫৬ একর জমি ছিল। বাবার ছোট ছেলে ছিলেন জৈল। বাবা মারা যান ওঁর ছ বছর বয়সে। তাই ওঁর লেখাপড়া বেশি দূর আর এগোতে পারেনি। ১৯৩১ সালের ২৩ মারচ ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হল। তখন জৈলের বয়স ১৫। তাঁর কিশোর প্রাণে এই ঘটনা বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তিনি সেদিন থেকে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জ্ঞানীজী স্কুলের পড়াশোনা বেশি দূর করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। কোরান, গীতা, রামায়ণ তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। শিখ ধর্মের উপর পড়াশোনা করে তিনি জ্ঞানী উপাধি পান। যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণতীর্থ, কাব্যতীর্থ বা শাস্ত্রী উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে ফরিদকোট রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ফলে জোটে পাঁচ বছরের কারাবাস। জেলে বসেই তিনি উরদু শেখেন। শেখেন কিছু ইংরাজিও। জৈল সিং ইংরাজি পড়তে পারেন, কাজ চালাবার মত বলতেও পারেন, তবে ইংরাজিতে একটানা কথাবার্তা চালাতে পারেন না। এ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র হীনমন্যতা নেই। তিনি বলেন : আমার ইংরাজির সমস্যা হয় গ্রামার নিয়ে, নইলে আমি ইংরাজি বলতে পারি।

তবে জ্ঞানীজী হিন্দিতেই বলেন। ইংরাজিতে কথাবার্তা হলে সংগে অনুবাদক থাকে। পৃথিবীর সব দেশেই উচ্চ সরকারি পদে আসীন ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় বিদেশিদের সংগে কথা বলে থাকেন। জৈল সিং যদি ইংরাজি না জানেন, তা হলে তাতে অগৌরবের কী আছে? ১৯৪৩ সালে জেল থেকে বেরিয়ে জ্ঞানীজী অমৃতসরে চলে আসেন। শিখ ধর্মযাজকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় খালসা সেবক পত্রিকা সম্পাদনা চলতে থাকে।

১৯৪৬ সালে আবার ফেরেন নিজের জন্মস্থান ফরিদকোট রাজ্যে। সেখানে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে বাধা পান দেশী সামন্ত রাজার কাছ থেকে। খবর শুনে নেহরুজী চলে আসেন ফরিদকোটে। সেই নেহরুর সংগে প্রথম হৃদ্যতা। তারপর একহাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ফরিদকোট সত্যাগ্রহ শুরু করেন জ্ঞানীজী।

স্বাধীনতার পর ফরিদকোট পেপসু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জ্ঞানীজী নতুন রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পেপসু পাঞ্জাবের সংগে যুক্ত হয়। জৈল সিং রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে তিনি হন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭২-৭৭ তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে পাঞ্জাবে কোন গোলমাল ছিল না। পাঞ্জাবের সবুজ বিপ্লবের তিনিই জনক।

১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জ্ঞানীজী ১ লক্ষ ২৫ হাজার ভোটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের দায়িত্ব দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা বরাবরই কৃতিত্বের ছিল। তিনি আসাম ছাত্র নেতাদের আলাপ আলোচনার বৈঠকে বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তাঁর বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছিলেন বৈরী মিজো নেতা লালডেংগার দাবি মেনে নিলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, জৈল সিং আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকলে আকালি সমস্যার এক সম্মানজনক সমাধান হয়ে যেত। জৈল সিং সর্দার বল্লভ ভাই-এর মত শক্ত জবরদস্ত নীতিতে বিশ্বাসী। লালডেংগাকে দিল্লিতে পাঁচতারা হোটেলে রেখে মাসে দশ হাজার টাকা খরচ করছিলেন ভারত সরকার। জ্ঞানীজী এটা বন্ধ করে দেন। লালডেংগাকে আবার বিদেশে নির্বাসনে ফিরে যেতে হয়। ১৯৮২ সালের ১৫ জুলাই জ্ঞানীজী ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটে ভারতের সপ্তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২৫ জুলাই থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি।

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। তারপর ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭৪, ১৯৭৭ ও সবশেষে ১৯৮২ সালের নির্বাচন। এ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে একমাত্র সঞ্জীব রেড্ডি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এ ছাড়া সবাইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউ তেমন নামী লোক ছিলেন না। কিন্তু ডঃ জাকির হোসেনকে লড়তে হয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুব্বা রাও-এর সংগে। গিরিকে লড়তে হয় সঞ্জীব রেড্ডির সংগে। জৈল সিংকে লড়তে হয় এইচ আর খান্নার সংগে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় খুব করণীয় কিছু নেই, শুধু কিছু রুটিন কাজ ছাড়া। তাঁর বেতন দশ হাজার টাকা। তবে বেতনের চেয়ে বড় হল পারকস।

৪০০ একর জমির ওপর ৫ একর জায়গা জুড়ে রাষ্ট্রপতি ভবন যে কোন মুগল সম্রাটের প্রাসাদের থেকে বড়। ১৯২১-২৯ আট বছর লেগে-ছিল এই প্রাসাদ করতে। এক মাইল দীর্ঘ এক করিডোর আছে এই প্রাসাদে। এই লেখক গত মে মাসে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিবের সংগে দেখা করতে যান। অসংখ্য করিডোর ও ঘর পেরিয়ে মুখ্য সচিবের অফিসে ঢুকেছিলেন তিনি। পথ প্রদর্শক ছাড়া তিনি বেরিয়ে আসতে পারতেন না। রাষ্ট্রপতি ভবনে ঘরের সংখ্যা ৩৪০।

এই বাড়ির রান্নাঘরে এক হাজার অতিথির রান্নার ব্যবস্থা আছে। নিচে যে বরফ কল আছে তা দিয়ে এক সংগে দু টন বরফ তৈরি করা যায়। রাষ্ট্রপতি ভবনে দুটি সিনেমা হল আছে। প্রত্যেকটিতে ৫০০ জন লোক বসতে পারে। রাষ্ট্রপতি ভবনের লনড্রিতে দিনে ৮০০ কাপড় কাচা হয়।

গোটা রাষ্ট্রপতি ভবন যেন একটি শহর। ঠিক ভ্যাটিকান সিটির মত। এখানে বাস করেন ১৮৫০ জন রাজ-কর্মচারী। তাঁদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে ১০,০০০ মানুষ। রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতর আলাদা স্কুল আছে। আছে গলফ কোরস, স্কোয়াস কোরট, টেনিস কোরট, সুইমিং পুল, এমনকি একটি সেলুন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে যেসব ছবি আছে তার দাম দু কোটি টাকা। রাষ্ট্রপতির স্টাফের দুটি ধারা। একদিকে আছেন মিলিটারি, অন্যদিকে সিভিল। মিলিটারি বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সচিব। তাঁর নিচে চিফ অব প্রোটোকল ও কমপট্রোলার। কমপট্রোলারের অফিস বাজেট অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ করে বিভিন্ন বিভাগকে। বছরে বাজেট ৯৯ লক্ষ টাকার মত। কমপট্রোলার ঠিক করেন স্টেট ব্যাংকোয়েটে কী মেনু হবে। এই আদেশ তিনি দেন হেড বাটলারকে। তিনি বিছানার চাদর পালটাবার নির্দেশ দেন, ভবনে যে ৩৭টি অতিথি আবাস (সেলুন) আছে সেখানে অতিথিদের মদ সরবরাহের আদেশ দেন, রাষ্ট্রপতির ১২টি ঘোড়া পরিচর্যার দায়িত্ব তাঁর। সিভিল শাখার প্রধান রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব। একজন আই এ এস (আগে হতেন আই সি এস) এই পদটির দায়িত্বে থাকেন। তাঁর কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মারফৎ বিভিন্ন রাজ্যের খসড়া বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আসে।

রাষ্ট্রপতিকে যথেষ্ট কাজ করতে হয়। তিনি নিজে দিনে অন্তত ১০টি ফাইল ক্লিয়ার করেন। বছরে দশ-হাজার সাক্ষাৎ প্রার্থীর সংগে তাঁকে কথা বলতে হয়।

অতিথিদের স্ট্যাটাস বা মানমর্যাদা অনুসারে তিনি তাঁদের সংগে এক এক ঘরে বসে কথা বলেন। তাঁর অতিথি সাক্ষাৎকারের ঘর হল হোয়াইট গোল্ড মরনিং রুম, টিক লাইনড প্যানেল রুম, ইংলিশ ইয়েলো ড্রইংরুম, বুক লাইনড স্টাডি রুম।

রাষ্ট্রপতি ভবনের নিজস্ব ছাপাখানা আছে। সেখানে ছাপা হয় মেনু কারড, ভোজসভায় বসার ব্যবস্থাদি, প্রতিদিন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের নাম। রাষ্ট্রপতির গ্যারেজে বিদেশি গাড়ির ছড়াছড়ি। বুইক, শেভ্রোলে, দুটি মারসিডিজ বেনজ, একটি রোলস রয়েস। ছয় দরজার একটি মারসিডিজ আছে, যেটি রাষ্ট্রপতি মাত্র বছরে একদিন চড়ে পারলামেনটে যান। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যোগ দিতে যাবার দিন রাষ্ট্রপতির আগে আগে যায় ১৩০টি ঘোড়সওয়ার। ঘোড়াগুলি বছরের এই একটি দিনের জনাই আস্তাবলে অপেক্ষা করে। বিদেশি গাড়ি ছাড়াও রাষ্ট্রপতির ৪০টি ভারতীয় গাড়ি আছে। রাষ্ট্রপতির ঘোড়ার ঘাস কেনবার জন্য দিনে ৫০০ টাকা করে লাগে।

রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন কাজ করার জন্য কর্মচারীর অভাব নেই। বাসনের উপর এনামেলের কাজ করতে হবে, তার লোক আছে। ২০ জন লোক আছে শুধু রুপোর বাসন পালিশ করার জন্য। ভবনের ভেতর ২০০ কেজি চিঠিপত্রের ব্যাগ বিভিন্ন জনকে পৌঁছে দেবার জন্য ৫০ জন পিওন আছে। ১৫০ জন মালি আছে লন আর মুগল বাগান দেখার জন্য। ১২ জন রাঁধুনি রাষ্ট্রপতির রান্না করেন। ১৩০টি ঝাড় লন্ঠন জ্বালা আর নেভানোর জন্য আছে বার জনের মত মিস্ত্রি। জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি হিসাবে আজ এই অমিত বিত্ত ও প্রাচুর্যের অধিকারী। কিন্তু ৪০ দশকের শেষে তাঁর ছেলেমেয়ে-দের লেখাপড়া শেখাবার মত তাঁর টাকা ছিল না। তারা পড়াশোনা করেছে অপরের সাহায্য নিয়ে। এ সম্পর্কে তিনি একটা গল্প এখনও বলেন : ১৯৪৮ সাল। দিল্লিতে এসেছি, সর্দার প্যাটেলের সংগে দেখা করব। উঠেছি চাঁদনি চকের এক ধর্মশালায়। অ্যাপয়েনটমেনট করা আছে। কিন্তু পকেটে পয়সা নেই যে ট্যাকসি করব। একটা টাঙা নিয়ে যখন আওরংগজেব রোডে প্যাটেল সাহেবের বাড়ি গেলাম তখন আমার সময় পেরিয়ে গেছে। দেখা হল না, পরবর্তী অ্যাপয়েনটমেনট পাবার জন্য পাঁচদিন বসে থাকতে হল।

জ্ঞানীজীর এক ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলে যগিন্দর সিং দেশে চাষবাস দেখেন। তিন মেয়ে যগিন্দর কাউর, গুরুদীপ কাউর ও মনজিৎ কাউর। বড় মেয়ে গ্রামে থাকেন, মেজ ও ছোট মেয়ে ডাক্তার। জ্ঞানীজীর পত্নী গ্রাম্য বধূ। ভারতের প্রথম মহিলা এখন স্বামীর সংগে বাস করেন রাষ্ট্রপতি ভবনে।

জ্ঞানীজী কথায় কথায় বললেন : বাঙালিদের আমি খুব পছন্দ করি। ওদের মুখে এক কথা, পেটে এক কথা, মোটেই তা নয়। ওরা যা বলে তাই করে। বাংলা এক সময় অনেক এগিয়ে ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা ছিল। আজ পাঞ্জাবিরাও এগিয়ে গিয়েছে।

তারপর বললেন : আমার সেকরেটারি একজন বাঙালি, জানেন বোধ হয়।

বললাম, হ্যাঁ, মিঃ ব্যানারজিকে এখন কে না চেনে? উনি শিশুর মত হাসলেন। ফোটো তুলছিল পাহাড়ী। কিন্তু রাষ্ট্রপতির প্রেস সেকরেটারি বললেন : এখনও উনি রাষ্ট্রপতির পোশাক পরেননি, দেখছেন না, সেই লম্বা শেরোয়ানি নেই, বুকে নেই সেই গোলাপ। অতএব ওই ছবি কখনও ছাপবেন না।

নিয়মের নিগড়ে বাঁধা মাটির ঘরে মানুষ হওয়া মাটির মানুষটি অসহায়ের মত তাকালেন।

ভাবখানা–তাঁর কিছুই করার নেই। □

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোমা তীর টাঙিগ নিয়ে রিগিং হয়েছে

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে কোনদিন কি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব? এই প্রশ্নটা এবার বেশি করে উঠেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর। শুধু বিরোধী কংগ্রেস (ই) নয়, বামফ্রন্টের শরিক-দল সি পি আই, ফরোয়ারড ব্লক এবং আর এস পি কর্মীরাও ঘরোয়া আলোচনায় এই প্রশ্ন তুলেছেন।

একদিকে বহু প্রিসাইডিং অফিসার অভিযোগ করেছেন, এবার যেভাবে 'রিগিং' হয়েছে তা ভাবা যায় না। বোমা-তীর টাঙ্গির দাপট তো ছিলই, ভোটেব-বাকস চুরি হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে। অন্যদিকে বহু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় এবং চাপে পড়ে প্রিসাইডিং অফিসাররা পক্ষপাতিত্ব করেছেন। বহু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ফল চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করতে বাধ্য করা হয়েছে।

এরপর আছে নির্বাচনী সন্ত্রাস। গ্রামে গ্রামে চলছে বাড়ি চড়াও, বোমাবাজি, বন্দুক থেকে গুলি চালনা, ধান লুঠ প্রভৃতি। অল্প-বিস্তর সব জেলাতেই সংঘর্ষ, খুন, লুঠ পাট হয়েছে। তবে শুধু সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)র মধ্যে নয়, সব দলের মধ্যেই এবার সংঘর্ষ হয়েছে। কোথাও কোথাও এক তরফা হামলাও চলেছে।

রাজ্য জুড়ে ৩১ মে পঞ্চায়েত নির্বাচন যে নির্বিঘ্নে হচ্ছে না এবং জেলায় জেলায় সন্ত্রাস চলছে 'পরিবর্তন' এর ২৫ মে সংখ্যায় তা লেখা হয়েছিল। ৩১ মে অনেক জায়গায় নির্বাচন মাঝপথে পন্ড হয়েছে বা গুরুতর গলদ ধরা পড়েছে। ১৯ জুন নতুন করে ভোট নেওয়ার কারণ, হয় ভোটের বাকস লুঠ, নয়ত গুরুতর অনিয়ম। আর কোন ক্ষেত্রেই দায়ী সরকারি অফি-সাররা নন, দলীয় ভোটকর্মীরা।

জেলা শাসকরা জেলাওয়ারি যে রিপোরট দিয়েছেন, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসার-দের একাংশের উপর হামলা হয়েছে, বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার-রাও পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে অভিযোগ এসেছে।

যেমন মুরশিদাবাদের মালিহাটিতে প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য নির্বাচনী কর্মীরা চাপে পড়ে কাজ করেছেন। বোমা বাজি করে লাশ ফেলে দেবার ভয় দেখিয়ে জোর করে কাজ করান হয়েছে। তাঁরা প্রিসাই ডিং অফিসারকে বেআইনি কাজ করতে বাধ্য করেছেন। খবব পেয়ে মহকুমা শাসক বুথে গিয়েছিলেন। প্রিসাইডিং অফিসার সব কথা তখন ভয়ে বলতে পারেননি, ইঙ্গিতে বলেছিলেন, 'স্যার আপনি আমাদেব এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।' কিন্তু মহকুমা শাসক ইঙ্গিত বুঝতে পাবেননি। গোপনে থানায় জরুরি খবব পাঠান হয়েছে কিন্তু তিন ঘন্টার মধ্যে পুলিশ আসেনি।

প্রিসাইডিং অফিসারকে ভয় দেখিয়ে নির্বাচন ফল এমনভাবে ঘোষণা কবান হয়েছে যাতে পবাজিত প্রার্থীকে জয়ী বলা হয়েছে। আইন অনুসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতেব নির্বাচনী ফলাফল বুথেই ঘোষণা কবা যেতে পারে। আব নির্বাচনেব ফলাফল ঘোষিত হলে সমস্ত ব্যালট পেপাব 'সিল' করা রাখা হয়। আদালতের আদেশ ছাড়া 'সিল' খোলা বা পুনর্গণনা সম্ভব নয়।

রিগিং-এব নয়া পদ্ধতি হিসাবে এবার দেখা দিয়েছে -- যেসব অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী বেশি ভোট পেতে পারে বলে মনে কবা হয় সেখানে বোমা বাজি কবে ত্রাসের সঞ্চাব করা হয়েছে। তাতে ভোটদাতারা ভোট না দিয়ে লাইন ছেড়ে চলে গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বহু জায়গায় হাওয়া খারাপ দেখে ভোটের বাকস এবং তাড়া তাড়া ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। সে সব বাকস বা ব্যালট পেপার ফেরৎ পাওয়া যায়নি, পুলিশও উদ্ধার করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারেব কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রতীক চিহ্নে ছাপ মেবে বাকসে ফেলা হয়েছে। ভোট গণনার সময়ও কারচুপি করা হয়েছে।

মুরশিদাবাদ জেলায় বাকস চুরিব ঘটনার জন্য নির্বাচন বাতিল কবতে হয় ১১টি কেন্দ্রে।

আর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হামলা এবং পালটা হামলাব ঘটনা প্রতিটি ব্লকেই ঘটেছে। আর এস পি এবং সি পি আই (এম) অভিযোগ কবেছে কংগ্রেস (ই)র বিরুদ্ধে। আবার কংগ্রেস (ই) পালটা অভিযোগ করেছে সি পি আই (এম) এবং আব এস পির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস বলছেন, তাঁদের ৯ জন মাবা গিয়েছেন। সি পি আই (এম) নেতারা বলছেন, তাঁদের ৪ জন মাবা গিয়েছেন। জেলা শাসক প্রসাদ বায জানালেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনেব আগে ২ জন কংগ্রেস এবং ১ জন সি পি আই (এম), পঞ্চায়েত নির্বাচনের পব ১ জন সি পি আই (এম) এবং ১ জন কংগ্রেস সমর্থক মারা গিয়েছেন।

এবার মুরশিদাবাদ জেলায় ২৫২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১৫০টি কংগ্রেস দখল কবেছে। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি মালদহেব পব সবচেয়ে বেশি মুরশিদাবাদে। সবকাবিভাবে ৩৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত বাতিল করা হয়েছে। গোলমাল বেঁধেছে সবচেয়ে বেশি বকেয়া হিসাব বুঝিয়ে নিয়ে।

নদীয়ায় শুধু কংগ্রেস নয়, সি পি আই (এম) বাদে প্রায় সব দলই অভিযোগ কবেছেন পঞ্চায়েত নির্বা-চনে সরকারি প্রশাসন এবং অর্থ যেভাবে দলীয় কাজে লাগান হয়েছে তা আগে কংগ্রেস আমলে হয়নি। ভোটের আগেব দিন পঞ্চায়েতের চাল-গম-কাপড় বিলি করা হয় বাছাই করা এলাকায়। সি পি আই (এম) বাড়ি বাড়ি বয়ে টাকা আর চোলাই মদ বিলি করেছে আদিবাসী এলাকায়।

আরও অভিযোগ পেয়েছি, কো-অরডিনেশন কমিটির লোক প্রিসাই-ডিং অফিসাররা অশিক্ষিত ভোটাব দের সি পি আই (এম) প্রার্থীদের ভোট দিতে বলে দিয়েছে। জেলা শাসক ভোটের দিনই দশজন প্রিসাইডিং অফিসারকে বদলি করে-ছেন।

ভোটগণনাব সময়ে ব্যাপক কার-চুপি হয়েছে। প্রতি ৫০টি ব্যালট পেপাব নিয়ে একটি করে বানডিল বাঁধার কথা। একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৪৩টি ব্যালট পেপার-এ বানডিল করে ৫০টি বলে চালান হল। আর একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫০টির বানডিল করা হল ৫৭টি নিয়ে। এর উপর ব্যাপকভাবে ভোট বাতিল কবা হয়েছে।

নদীয়া জেলার ১৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সি পি আই (এম) এবারও সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু কংগ্রেস (ই)ব ফল খারাপ নয়, ৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে। জেলা পরিষদে আগে একটি আসনও ছিল না। এবার কংগ্রেস ৭টি আসন পেয়েছে।

যে জেলাতেই গিয়েছি, শুনেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম) দুহাতে চাল গম টাকা ছড়িয়ে দিয়েছে। অ্যামব্যাসাডর, জিপ, সাই-কেলেব ছড়াছড়ি। সি পি আই (এম) নেতারা অবশ্য স্বীকার করেননি। নেতাদের কথা হল, সব জনগণ দিয়েছে। গ্রামের গরিব কৃষক বর্গাদাররা এগিয়ে এসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তহবিল পূর্ণ করে-ছেন।

অন্যদিকে কংগ্রেস (ই) নেতারা বলেছেন, তাঁদেব নির্বাচন প্রার্থীরা সবাই মোটর তো দূরের কথা, সাইকেলও পাননি। দিল্লি থেকে টাকা এসেছে শুনেছি কিন্তু প্রদেশ থেকে তেমন কিছু সাহায্য পাইনি। প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সন্তোষ

রায় জানালেন, দিল্লি থেকে প্রদেশ কংগ্রেস পেয়েছিল ১৬ লক্ষ টাকা। সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক প্রার্থীকে ছোট এবং বড় পোসটার দেওয়া হয়েছে ৪০ খানা। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছে ২০ টাকা এবং জেলা পরিষদ প্রার্থীকে পাঁচশ থেকে এক হাজার টাকা। জেলা কংগ্রেস সভাপতিরা প্রদেশ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছেন। সন্তোষবাবু বললেন, কংগ্রেসের কেউ আলাদা করে দিল্লি থেকে টাকা এনেছেন কিনা কিংবা এখানে টাকা তুলেছেন কিনা তা তাঁর জানা নেই।

মেদিনীপুর থেকে পুলকেশ ঘোষ

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে মেদিনীপুর জেলা সরগরম। ঠিক নির্বাচনের পরেই যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ করে তা এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। এখন পর্যন্ত হিংসাত্মক ঘটনায় এ জেলায় খুন হয়েছেন তিনজন। দুজন সিপি এমের, অপরজন কংগ্রেসের। নির্বাচনের দু একদিনের মধ্যেই কেশপুরে খুন হন দুজন - দুপক্ষেরই একজন করে। কংগ্রেসের দুখু মিঞা ও সি পি এমের এলাহি বক্স। অপরজন সি পি এমের হিমাংশু জানা কাঁথিতে খুন হন গত ৭ জুন।

এছাড়াও সারা জেলায় অনেক হাংগামা হয়েছে। লড়াই বেশির ভাগ জায়গাতেই সি পি এম এবং কংগ্রেসের মধ্যে। তবে সি পি আই সি পি এমের মধ্যেও সংঘর্ষ কম হয়নি। ঝাড়গ্রামের দিকে ঝাড়খণ্ড ও সি পি এম দলও বেশ সক্রিয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর কিছুদিনের মধ্যেই জেলার সর্বত্র প্রচণ্ডভাবে গণ্ডগোল শুরু হলে কেশপুর, সবং প্রভৃতি এলাকায় সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারও ছিলেন। প্রত্যেক দল থেকে দুজন করে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। জেলায় শান্তি রক্ষার আবেদন জানিয়ে প্রচারপত্রও বিলি করা হয় কমিটির পক্ষ থেকে। এরপরেও কিন্তু বহু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। লক্ষণীয় বিষয় হল একদা যে মেদিনীপুর জেলা সি পি আই এর ঘাঁটি বলে চিহ্নিত ছিল সেখানেই সি পি আই সি পি এমে সদ্ভাব নেই। বরং জেলার অনেক জায়গাতে কংগ্রেস ও সি পি আই সম্পর্ক বেশ ভাল।

কেশিয়াড়ীতে বিভূতি পাণিগ্রাহী কংগ্রেস করেন। পাশের বাড়ির ভানু মিশ্র করেন সি পি আই। ৫ জুন যে গণ্ডগোল হয় তা মূলত এই দুই বাড়ির সংগে সি পি এমের হলেও ঘটনার প্রত্যক্ষ সূত্রপাত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারেই। এ এলাকায় এবার সি পি আই প্রার্থীর হয়ে খেটেছিলেন দুজনেই। জিতেছে সি পি এম। সদর হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে বিভূতিবাবুর ছেলে বিমলবাবু বলছিলেন, '৫ তারিখ বেলা বারটার দিকে আমরা আক্রান্ত হই। আমার ভাই কমলকে মারবার জন্য যখন ওরা মাথার ওপর টাঙ্গি তোলে তখন বাবা গুলি চালাতে বাধ্য হন।' হাতের একটা আঙুল টাঙ্গির আঘাতে ঝুলছে। 'পুলিশ এসে আমাদের বন্দুকটা 'সিজ' করে নিয়ে যায়। আমাদের বলে যায় দরজা-জানালা বন্ধ করে থাকতে। বেলা তিনটের দিকে হাজার তিনেক লোক চড়াও হয় আমাদের বাড়ি। এসেই ভাঙচুর আরম্ভ করে। তাদের দাবি আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বেলদা থানার সারকেল ইনসপেকটার নিজে আমাদের আদেশ দেন বেরিয়ে আসতে। যেখানে বাড়ির বাইরে উন্মত্ত জনতা, সেখানে কীভাবে উনি আদেশ দিলেন জানি না। ওঁর চাপাচাপিতে আমাদের বেরিয়ে আসতে হল। সংগে সংগে টাঙ্গি লাঠি বর্ষণ হতে থাকে আমাদের ওপর। বাবা রাস্তায় পড়ে যান। আমার মাথা লক্ষ্য করে টাঙ্গি ওঠে। মাথা বাঁচাতে গিয়ে হাতটা কেটে ঝুলে যায়।' একটু দম নেন বিমলবাবু। অভিযোগ করেন পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার। মাত্র চার-পাঁচজন পুলিশ হাজার তিনেক লোকের হাতে তো খেলনা। ফলে ও সি নিজেও আহত হন।

কেশিয়াড়ী বাজারে দেখা হয়ে গেল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সি পি এমের দেবেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর সংগে। মনে হল খুব ব্যস্ত। 'দেখুন মশাই, আপনারা সব কাগজের লোকেরা 'ওদের' লোক। প্রকৃত ঘটনা লিখুন বা না লিখুন, সবাই জানেন ওরা বহুকালের জোতদার। অত্যাচার চালিয়ে এসেছে গ্রামের গরিবদের ওপর। সেদিন যখন ওরা গুলি চালাল তখন জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে শোধ নিতে চেয়েছিল এতদিনের অত্যাচারের। আমরা ওদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম। তার বদলে আমাদের বিরুদ্ধে দুটো কেস হল। একটা পাণিগ্রাহীদের তরফ থেকে, অপরটি পুলিশের। লিখবেন, ও সি একদম নিষ্ক্রিয় ছিলেন।' কথাগুলো বলেই কেশিয়াড়ীর বি ডি ও-র সাদা নীল রঙের জিপে চড়ে কোথায় রওনা হয়ে গেলেন। সি পি এমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা স্কুল বোরডের সভাপতি অধ্যাপক দীপক সরকার সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনিও বললেন আমি না থাকলে কী হত বলা মুশকিল। তবে সত্যি কথাই পুলিশ সেদিন খুবই কম ছিল। আমি না থাকলে পুলিশ ওদের বাঁচাতেই পারত না।

সারা জেলায় কংগ্রেস-সি পি এমের মধ্যে সংঘর্ষের হিসেব কষা মুশকিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ডেবরাতে (মাড়োতলা) ১০ জুন। মাড়োতলা ৩ নং অঞ্চল সত্যপুর থেকে কংগ্রেসের দিব্যেন্দু ভূঞা গ্রাম পঞ্চায়েতে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সেদিন সামান্য এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারপিট হয় সকাল এগারটা-বারটা নাগাদ। তার জের হিসেবে বিকেলে দিব্যেন্দুবাবু আক্রান্ত হন। প্রচণ্ড মারধোর খাওয়ার ফলে তাঁকে ডেবরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় সন্ধ্যের দিকে। এদিকে দিব্যেন্দুবাবুর মারের শোধ নিতে কংগ্রেসের সমর্থক বেশ কিছু আদিবাসী সি পি এম সমর্থক অজিত চক্রবর্তীকে মারধোর করে। 'অজিতবাবুকে দেখতে আসা সি পি এমের লোকেরা আমায় হুমকি দিতে থাকে দেখে নেবে বলে। রাত্রের দিকে খবর পেলাম যে আমাকে সেই রাত্রেই পালাতে হবে। নইলে সকালে আমার ওপর আক্রমণ হবে। কিন্তু আমার অবস্থা তখন পালাবার মত নয়। সকাল থেকে হাসপাতালের সামনে লোক জড়ো হতে থাকে। সাড়ে সাতটার দিকে প্রায় ২৫/৩০ জন আমাকে বেড থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আমি প্রাণপণে দুহাতে লোহার রডটাকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। নারস বাধা দিতে এসে গালাগালি খেয়ে ফিরে যান। তারপর আমাকে বাইরে নিয়ে এসে প্রচণ্ড মারধোর করে। মারধোর করার পর ওরাই আবার হাসপাতালে ফেলে দিয়ে যায়। বারবার টেলিফোন করা সত্ত্বেও পুলিশ আসে বেশ পরে।' এই ঘটনার পরই দিবেন্দুবাবু ও অজিতবাবুকে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। 'এটা অবশ্যই লিখবেন যাঁর নামে আমরা জিন্দাবাদ দিচ্ছি, সেই ইন্দিরা গান্ধী আমাদের জন্য কিছুই করছেন না।' দিব্যেন্দুবাবু একথা বলার সংগে সংগেই পাশে বসে থাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক অজিত খাঁড়া বলে উঠলেন 'হ্যাঁ, এটা অবশ্যই লিখুন। কংগ্রেসের একটা মামুলি স্টাডি টিম প্রত্যেক নির্বাচনের পরেই আসছে। তবু আমাদের সমর্থকরা সর্বত্র মার খাচ্ছে। তাদের মজুর বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অবস্থা অনুযায়ী ১০১ টাকা থেকে ১০০১ টাকা পর্যন্ত 'সারেনডার ফি' আদায় করা হচ্ছে। ইন্দিরাজীকে অনুরোধ-- আমাদের বাঁচান।' জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস সমর্থকদের মনে বেশ বিক্ষোভ দেখেছি। অনেকেই বললেন 'সি পি এম না করলেও কংগ্রেস আর করব কিনা নতুন করে ভাবছি।'

জেলাশাসক অসিতকিরণ দেব জানালেন পঞ্চায়েত নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন পরিস্থিতি আয়ত্তে, তবে যেখানে যেখানে কংগ্রেস জিতেছে সে সব এলাকায় সামনের ধানবোনার সময়ে বেশ গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা।

ঝাড়খণ্ড সমর্থকদের গুলিতে আহত সি পি এম-এর অমল কুমার পাহাড়ী

লাঠি ও টাঙ্গির আঘাতে আহত কংগ্রেস সমর্থক মদন দোলুই

বর্ধমান থেকে শ্যামল মুখারজি

এই রিপোরট যখন লিখতে বসেছি তখনই খবর এল আউসগ্রাম থানার পিচকুড়ি ঢালের কাছে উৎকা গ্রামে সি পি এম এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ চলছে। আহত ৯ জন। পুলিস সূত্রে জানা গেছে এই আহত ৯ জনই সি পি এম কর্মী। ওদিকে জেলা কংগ্রেসের জঙ্গী নেতা হিমাংশু বরণ রায় জেলা শাসকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকার কয়েকটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়যুক্ত হবার পর থেকে সি পি এমের স্থানীয় কর্মীরা সংঘর্ষ বাধাবার ছুতো খুঁজছিলেন। সরকারি খাস জমিতে বাড়ি করা হয়েছে এই অভিযোগে কংগ্রেস নেতা, কর্মী, সমর্থক ও ভোটারদের বাড়িগুলোতে বেছে বেছে হামলা চালান হয়েছে। বাড়ি তছনছ করা হয়েছে। ওই গ্রাম থেকে যে দু'টি বন্দুক পুলিশ সিজ করে নিয়ে এসেছে সেই দু'টি বন্দুক কংগ্রেস সমর্থকদের। কিন্তু স্থানীয় সি পি এম নেতার যে বন্দুক থেকে গুলি চালান হয়েছিল সেই বন্দুকটি পুলিশ সিজ করেনি। ঘটনাস্থান থেকে যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই কংগ্রেস সমর্থক বলে হিমাংশুবাবুর দাবি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে এবং অব্যবহিত পর থেকে বর্ধমান জেলার পাঁচটি মহকুমার গ্রামগঞ্জে যে সব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তাতে মারা গেছেন দশজন। প্রায় তিনশ জন আহত হয়েছেন। একশ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে অন্তত পক্ষে কুড়ি রাউনড। এ খবর জেলা প্রশাসন সূত্রের। যে সব খবর সংগ্রহ করেছি সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে সংঘর্ষের ঘটনা, হতাহতের সংখ্যা এবং গুলি চালনার ঘটনা আরও অনেক বেশি।

জেলাশাসক ভি সুব্রহ্মনিয়ান আমাকে বলেছেন, কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে এই সব সংঘর্ষের জন্যে দায়ী করা যায় না। যার যেখানে 'পকেট' অর্থাৎ যেখানে যে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা এবং প্রভাব বেশি তারা সেখানে অপর পক্ষের উপর হামলা চালাচ্ছেন। জেলাশাসক পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, কোথাও লড়াই হচ্ছে সি পি এমের সংগে কংগ্রেসের। কোথাও বা বামফ্রনটের শরিক দলগুলিই লড়ে যাচ্ছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। বর্ধমান জেলার কয়েকটি 'পকেটে' উগ্রপন্থীদের সংগে সি পি এমের সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে। রায়না থানার বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশকে গুলি চালাতেও হয়েছে। অবশ্য পুলিশের গুলিতে কেউ হতাহত হননি। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দক্ষিণ দামোদর এলাকার খণ্ডঘোষের প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রামানিক অভিযোগ করেছেন সমগ্র দক্ষিণ দামোদর এলাকাতেই চলছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। সি পি এমের 'ভৈরব বাহিনী' তান্ডব নৃত্য করে চলেছে রায়না-খণ্ডঘোষের গ্রামে গ্রামে।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতা নুরুল ইসলাম জেলাশাসককে দেওয়া অভিযোগের অনুলিপি পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। সেই অভিযোগে সু নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর উল্লেখ করে নুরুল বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আজ পর্যন্ত দেড়শ জন কংগ্রেস কর্মী আহত হয়েছেন। বিভিন্ন প্রান্তের সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচশটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে আড়াই হাজার কংগ্রেস কর্মী, সমর্থক এবং ভোটার সি পি এমের আক্রমণে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। পুলিশের এক পদস্থ কর্তা অবশ্য নুরুল ইসলামের দেওয়া এসব তথ্য মানতে রাজি নন। সেই পদস্থ কর্তা আমাকে বলেছেন কংগ্রেস কর্মী, সমর্থকদের হামলাবাজিতেও বহু সি পি এম কর্মী নির্যাতিত হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন।

সেদিন কালনা গিয়েছিলাম। এই মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরতে গিয়ে যে রিপোরট সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি তাতে স্পষ্টভাবে লিখতে পারা যায় যে এই সব এলাকায় গ্রাম গঞ্জে চলছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। সব রাজনৈতিক দলই সংঘর্ষে লিপ্ত। সাধারণ মানুষ আতংকগ্রস্ত।

কাটোয়া মহকুমাতে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি সেই একই অবস্থা। জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কাটোয়ার প্রাক্তন এম এল এ সুব্রত মুখারজি বলছিলেন, এই মহকুমার মঙ্গলকোট, সিঙ্গি, সৃদপুর প্রভৃতি এলাকায় সি পি এম কর্মীরা বিজয় মিছিলের নাম করে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছেন।

আসানসোল থেকে বিশেষ প্রতিনিধি

সেই ৩১ মে। পঞ্চায়েতের ভোট গ্রহণ চলছে। বারাবনী ব্লকের পাঁচগাছিয়া বিবেকানন্দ হাইস্কুলে ভুয়া ভোট দেওয়া নিয়ে ঘটনাটা ঘটে গেল। টাঙ্গি, বল্লম, রড, গুলি সবই চলল। আক্রান্ত হলেন সি পি আই (এম) সমর্থকরা। ১৩ জন জখম হলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সংগে সংগে মৃত্যু ঘটল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গোপাল রাহার। আহতদের ৯ জন কাঁদ্যাপুর সাইকেল কারখানার কর্মী।

সি পি আই (এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদক রবীন সেন অভিযোগ করেন, কংগ্রেসীরা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করে। গোপালবাবুকে চায়ের দোকান থেকে টেনে এনে খুন করা হয়। প্রাক্তন এম এল এ মিহির উপাধ্যায় সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে ২ জুন আসানসোল, পাঁচগাছিয়া ও সেনর‍্যালেতে ১২ ঘন্টার বন্ধ পালিত হয়।

ভোটের আগে, ৬ এপ্রিল পুলিশ লক আপে নিলয় চ্যাটারজি নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগেও বন্ধ হয়েছিল।

ভোটের দিন কারখানার কর্মী ভূষণ বিশ্বাসের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়।

নির্বাচনের দিন অন্ডাল থানার একটি ঘটনায় একজন নিহত ও ৫ জন আহত হন। □

আলোকচিত্র : পুলকেশ ঘোষ

বাংলাদেশে এখন চলছে ঘরোয়া রাজনীতি

বিশেষ প্রতিনিধি

ঢাকা : প্রায় এক বছর বিবতির পর বন্দীদশা থেকে রাজনীতি মুক্তি পেলেও নজরবন্দিত্ব কাটেনি। অর্থাৎ পয়লা এপরিল থেকে পুনরায় রাজনীতি করাব অনুমোদন পেলেও তা সীমাবদ্ধ কবা হয়েছে ঘবেব ভেতব। প্রাংগণে এখনও তা নামেনি। ঘরোয়া বৈঠক বা কর্মী সভাতেই তা সীমাবদ্ধ। এ জন্যে এব নাম দেওয়া হয়ছে ঘবোয়া রাজনীতি। রাজনীতি যাতে ঘরেব বাইরে না আসে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় সামরিক আইন বিধিও চালু হয় পয়লা এপরিলের আগেই।

ঘরোয়া রাজনীতির প্রথম দু' দিনেই উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জিয়ার গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) এব দ্বিধা বিভক্তি। এ দলটি তৈরি হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াব নিজস্ব উদ-যোগে। মূলত কিছু কিছু দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন দল থেকে চলে আসা লোকদেব নিয়ে এটি গঠিত হয়। তবে দলে মূলত দুটি ধাবা ভাসানী ন্যাপ ও মুসলিম লীগেরই প্রাধান্য ছিল। অনেকেরই আশংকা ছিল জিয়াউব বহমানেব মৃত্যুব পব এব অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু তা ভুল প্রমাণিত হয়। এমনকি দেখা যায়, বর্তমান সামবিক সবকাব ক্ষমতায় আসাব পব বি এন পি ব ওপর যে ক্র্যাক ডাউন হয়, তার পবও তা টিকে আছে। অত্যন্ত সংগত কারণেই (যেহেতু এদের হাত থেকে সামবিক সরকার ক্ষমতা নেন) সামবিক সরকার এদের এক নমবর শত্রু হিসাবে গণ্য করেন। কিন্তু তার পরেও যখন বি এন পি টিকে গেল, তখনই প্রয়োজন হল একে ভাঙার।

ঘবোয়া রাজনীতি শুরু হওয়ার আগেই বি এন পি-র প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও সেকরেটারি জেনারেল ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অপর পক্ষ তৈরি হল। পয়লা এপরিল ও দোসরা এপরিল দুটি পৃথক সভায় গঠিত হয দুটি জাতীয় কমিটি অর্থাৎ দুটি বি এন পি। আশা করা গিয়েছিল, নতুন বি এন পি অর্থাৎ শামসুল হুদা চৌধুরী (সভাপতি) ও ডাঃ আবদুল মতিন (সেকরেটারি জেনাবেল) সামবিক সবকারের হয়ে কাজ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কারণ ইতিমধ্যেই দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ যদিও বলছেন, তাব রাজনীতি কবার ইচ্ছে নেই এবং বর্তমান সরকার অরাজনৈতিক, তবুও দেশেব বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গত ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়াবির ঘটনার পর তিনি নতুন করে ভাবতে থাকেন। এর আগে মওলানা মান্নান (সাবেক সবকাবেব মন্ত্রী ও একাত্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকালের পাক বাহিনীব দালাল) সাহেবের নেতৃত্বাধীন মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলনে যে স্ট্র্যাটেজি নেন তা পাল্টান। তাবই অনুকূলে গঠিত হয় নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ ও নতুন বাংলা যুব সমাজ। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দলটির কাঠামো তৈরি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি স্বীকৃতি দেননি এদের। এই নতুন ধারায় দেখা গেল বি এন পি ব (হুদা-মতিন) গ্রুপটি তার তেমন কাজে আসছে না এই মুহূর্তে। এ ছাড়াও নতুন গঠিত সংস্থা দুটিতে পুরনো বি এন পি বা তার অংশ সংগঠনগুলোর কর্মীরাই প্রধান। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই এখনও চলছে। কোন নির্দিষ্ট আকার নেয়নি নতুন সরকারের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি।

এদিকে ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়ারির ঘটনার পর সরকার যখন বাধ্য হয়েই সীমাবদ্ধভাবে হলেও ঘরোয়া রাজনীতির স্বীকৃতি দিলেন তখনই আবার রাজনৈতিক দলগুলোও চাংগা হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে যাদের আটক করা হয়েছিল এই ঘটনার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল (বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ)-এর নেতা মোহাম্মদ তোয়াহাকে ছাড়া)। ২১ ফেবরুয়ারিকে সামনে রেখে যে ১৫ দলীয় (আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে) জোট ও ১০ দলীয় (খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে) জোট হয়েছিল তারাও ঘরোয়াভাবে হলেও প্রতিবাদ তুলতে লাগল। ঘরোয়া রাজনীতি চালু করার প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক সংলাপ শুরু করা।

'রাজনৈতিক সংলাপ' নামের নতুন উপাদানটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। বর্তমান সামরিক সরকারের ইচ্ছা রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর সুনির্দিষ্ট অংশ থাকতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনও করতে হবে। সেনাবাহিনীর যুক্তি, যেহেতু সেনাবাহিনী এদেশেরই জনগণের অংশ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশীদার তাই তাদের এটা ন্যায্য পাওনা। কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন রাজনৈতিক নেতারা। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির দুই প্রধান ধারা ১০ দলীয় ও ১৫ দলীয় জোট নেতারা। ১০ দলীয় জোট নেতা মোশতাকের যুক্তি, সেনাবাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ চায় – ভাল কথা। কিন্তু তাদের বিভিন্ন র‍্যাংকের মধ্যেকার ফারায়েজ (অংশীদারিত্ব) আগে ঠিক করে নিক। এছাড়াও সেনাবাহিনী যদি অংশ পায় সরকারি অন্যান্য চাকুরেরাও পাবে। তারাও এদেশের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৫ দলের বক্তব্য : সেনাবাহিনী কোন দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কাজেই তাদের এখানে টেনে না আনাই ভাল।

আবদুস সাত্তার

মোজাফফর আহমেদ

এসব যুক্তি বা পাল্টা যুক্তি সবই হয়েছে বাইরে বাইরে, সামনাসামনি বৈঠকে নয়। অর্থাৎ এখনও এই দুই জোটের কারও সংগে সামরিক সরকারের কোন আনুষ্ঠানিক সংলাপ বা বৈঠক হয়নি।

তবে সংলাপ যে শূন্য হয়নি তা নয়। ২৯ এপরিল প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয় কোন ঘোষণা ছাড়াই। এদিন জাতীয় লীগ-প্রধান প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানের সংগে আলোচনা করেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। এর পর ২ মে মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী) সভাপতি বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীও ৭ মে টি আলী, শামসুল হুদা, এ মতিন ও কাজী আবদুল কাদেরের সংগে আলোচনা করেন। ১৯ মে ন্যাপ (নূরু) সভাপতি নূরুর রহমান ও ২১ মে পিপলস লীগ প্রধান ডঃ আলীম আল রাজীর সংগে আলোচনা হয়। যাদেব সংগে আলোচনা হয়েছে এবা সবাই ব্যক্তি বা ঐ নেতা-সর্বস্ব পারটি। তাই পর্যবেক্ষক মহল এখনও একে তেমন আমল দিচ্ছে না বা এব ফলাফল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ১০ দলীয় ও ১৫ দলীয় জোট এবং বি এন পি। এদের কারও সংগেই আলোচনা হয়নি। ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে জোটের কাউকে এককভাবে ডাকলে হবে না। সবাইকে এক সংগে ডাকতে হবে। ১০ দলের অভিমতও তাই। কিন্তু সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ চাইছেন এক এক করে ডাকতে। এই সমস্যা এখনও ঘোচেনি। ঘোচেনি বলেই আলোচনা হচ্ছে না এদের সংগে। আর এজন্যে রাজনৈতিক সংলাপ কোন সুনির্দিষ্ট আকার পাচ্ছে না। ওদিকে আতাউর রহমান খান বি এন পি র মূল অংশ অর্থাৎ সাত্তার গ্রুপের সংগে 'জাতীয় ঐক্য' গড়ে তোলাব ব্যাপারে আলোচনা করেন। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানান হলেও কী শর্তে তা জানা যায়নি।

সরকার ও বিরোধী পক্ষের এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৫ দলীয় জোটের দুই বড় শরিক আওয়ামী লীগ ও জাসদের অন্তর্দ্বন্দ্বও তীব্রতর রূপ নিয়েছে। আওয়ামী লীগের একদিকে রয়েছেন সাবেক আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন ও শেখ মুজিবের কন্যা সংগঠনের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক। জাসদের সভাপতি মেজর (অবঃ) আবদুল জলিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে লোক পাঠানর অর্থ আত্মসাতের। ফলে দুটো দলই এখন নিজেদেব আভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে ব্যস্ত।

এরই মধ্যে ডিসেমবরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে থানা পরিষদ নির্বাচন। এ নির্বাচন যদিও রাজনৈতিক দলভিত্তিক হবে না তবুও এর গুরুত্ব সমধিক। কারণ বিকেন্দ্রিত প্রশাসনে থানা পরিষদ হবে প্রশাসনের ভিত্তি। এজন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন নিজেদেব অবস্থান মজবুত করতে। ফলে এই মুহূর্তে কোন দলই চায় না সরকারবিরোধী বা সামরিক আইন-বিরোধী কোন আন্দোলনে যেতে। অন্তত ঢাকা বিমান বন্দরে আটক কোটি টাকার চোরাচালানি হাতঘড়ি ও এর সংগে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট আবদুর রউফের মৃত্যু তাই প্রমাণ করে। পর্যবেক্ষক মহলের ধাবণা এ চোরাচালানের সংগে ক্ষমতাসীনদের কেউ কেউ জড়িত রয়েছেন। এ জন্যেই জনাব রউফকে কাসটোডিতে মরতে হয়েছে। এ নিয়ে ছাত্ররা ১৫ দলের নেতাদের কাছে গেলে তারা এ মুহূর্তে কোন আন্দোলনে যেতে উৎসাহ দেখাননি।□

বদরুদ্দোজা চৌধুরী.

ডঃ কামাল হোসেন

মণি সিং

বিড়লাবাড়ির ইতিবৃত্ত

শ্যামল বসু

রহস্যময় বিড়লাবাড়ি। ভারতের সম্পদশালীদের মধ্যে তালিকার দু'নম্বরে যাদের নাম, সেই বিড়লাগোষ্ঠী সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত নেই। বিড়লাদের দুনিয়ার কিছু অংশ জোড়া বিশাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও শ্রেষ্ঠীপদে অভিষেক এই কলকাতা শহরেই। বর্তমান বিড়লাদের পূর্ব পুরুষ কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্য অন্বেষণে। বড়বাজারের একটি ছোট গদিতেই তাঁদের ব্যবসা শুরু। আর আজ তাঁরা কিংবদন্তি। কীভাবে অভ্যুদয় ঘটল বিড়লাগোষ্ঠীর তারই ইতিবৃত্ত নিয়ে এই কাহিনী। সেই সংগে বিড়লা বংশের অন্যতম কৃতী পুরুষ ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মৃত্যুর পর বিড়লা শিল্প গোষ্ঠীতে কোন পরিবর্তন আসন্ন কিনা তারও পূর্বাভাস আছে।

দেওয়ালির আলো জ্বলল

বিড়লাবাড়ি। ঠিকানা ৯/১ আর এন মুখার্জি রোড। মিশন রো দিয়ে টেলিফোন ভবনের দিকে যেতে গেলে, বেন্টিংক স্ট্রিট পার হবার পর ডান দিকে যে রাস্তাটা উত্তরমুখী হয়ে লালবাজার স্ট্রিট এর ট্রাম লাইনে মিশেছে সেই রাস্তার ডান দিকে গোটা দুই বাড়ি ছেড়ে বিড়লাবাড়ি। পনের তলা উঁচু ১২000 স্কোয়ার ফুট করে এক একটা 'তলা' আর সাকুল্যে ৭৪১টি টেলিফোন লাইন নিয়ে বিড়লাবাড়ি। এটা বসবাসের বাড়ি নয়। ব্যবসার বাড়ি। টেলিফোনটা প্রাইভেট বোর্ডের লাইন। আর এই বাড়ির থেকেই আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠীদের অন্যতম বিড়লাগোষ্ঠীর ব্যবসা চালান হয়। এখান থেকে কম বেশি ৩ লক্ষ ৫0 হাজার কর্মচারীর রুটির যোগান আসে, ২ লক্ষ ৫0 হাজার শেয়ার ক্রেতা বৎসরের শেষে ডিভিডেন্ড পাবেন কিনা তাও ঠিক করা হয়। হিসেব মত এই বাড়িতে এখন বিড়লাগোষ্ঠীর ষষ্ঠ পুরুষের রাজত্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। হিসেব ঠিক না থাকলেও বর্তমানে ২000 কোটি টাকার ওপর ব্যবসার ক্ষেত্রে আর এক হাজার কোটি টাকার বেশি বিভিন্ন জনকল্যাণ কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণ এবাড়ি থেকেই করা হচ্ছে।

আদি নিবাস রাজস্থানের পিলানি গ্রামে। এখন আর তা গ্রাম নেই। পৃথিবীর যে কোন আধুনিক শহরকে টেক্কা দেবার মত হয়ে গেছে পিলানি। এই জায়গা থেকেই রূপকথার রাজা হবার স্বপ্ন দেখে এক বৈশ্যসন্তান আজ থেকে একশ একুশ বছর আগে ২৫0 মাইল রাস্তা পার হয়ে মরুভূমি ডিঙিয়ে বোমবাই শহরে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। বিড়লাগোষ্ঠীর প্রথম ব্যবসায়ী পুরুষ শিবনারায়ণ। বয়স তখন তাঁর ১৯ বছর। পিলানিতেই তাঁর ব্যবসার হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসা ছিল কিছুটা মহাজনী আর বীজ বিক্রির। সময়টা ১৮৬২ সাল। ১৮৫৮ সালে শিবনারায়ণের বাবা শোভারাম রাজস্থানের আজমীড়ে মারা যান। সব দায়িত্ব এসে পড়ে ষোল বছরের ছেলে শিবনারায়ণের ওপর। সংসার চালাতে হবে। কয়েক পুরুষ আগে তাঁরা ক্ষত্রিয় গৌরব ছেড়ে বৈশ্য হয়েছেন। তাঁদের বংশের শেষ ক্ষত্রিয় বা প্রথম বৈশ্য ভেদ সিং। ভেদ সিং এর পরবর্তী বংশধররা পদবী পেলেন বিড়লা। ভেদ সিং পিলানি গ্রামের আরো ৭১টি পরিবারের সংগে যেদিন ক্ষত্রিয়ত্ব ছেড়ে বৈশ্য হয়েছিলেন সেদিন তাঁদের প্রয়োজন ছিল টাকার। চাকুরি করার দরকার ছিল জয়পুরের রাজার কাছে। কিন্তু উত্তরপুরুষ শিবনারায়ণ টাকার প্রয়োজনটা মেনে নিলেও মেনে নিতে পারেননি চাকুরি জীবন। শোভারাম তাই শেষ বিড়লা যিনি সরকারি চাকুরে ছিলেন।

শিবনারায়ণের চিন্তা ছিল অন্য রকম। জয়পুরের রাজার অনুমতি না নিয়ে তখনকার দিনে পায়ে রুপোর মল ব্যবহার করা যেত না। রাজা নিজের ইচ্ছেমত এই পদাধিকার বা সামাজিক মর্যাদা দেবার অধিকারী। কারা রুপোর মল পড়বে, কারা সোনার মল পড়বে, কারা হাতি রাখার অধিকারী, কারা উট রাখবে আর কখন সামাজিক মর্যাদায় ঘোড়া রাখার ক্ষমতা পাবেন এসব ঠিক

করতেন তখনকার জয়পুরের রাজা। তখনকার সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ছিল 'রাজা' উপাধি পাওয়া। এই সময়কার মানুষ শোভারাম বিড়লা হয়তো খোয়াব দেখতেন। সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। তাই হয়তো পুত্র শিবনারায়ণকে ছোট বেলায় 'লোরী' শোনাতে গিয়ে নিজের অবদমিত স্বপ্ন বা ইচ্ছের গল্প শোনাতেন। এইসব গল্পগুলো কেবল শোনা কথা। কেন আর কি জন্য হঠাৎ শিবনারায়ণের চিন্তায় ব্যবসা করার কথা এল আর সেই ব্যবসা করতে তিনিই বা কেন নিজের গ্রাম ছেড়ে বোমবাই শহরে আসতে গেলেন, এসব নিয়ে কোন তথ্যভিত্তিক খবর আজকের দিনে বিশাল টাকার মালিক বিড়লাদের জানা নেই। পূর্বপুরুষের ছবি টাঙান ছাড়া অন্য কোন বিশেষ বিশ্লেষণ বা তথ্যনির্ভর ইতিহাস তৈরির চেষ্টা বিড়লাগোষ্ঠীর উত্তরসূরীরা প্রয়োজন বোধ কবেননি। শিবনারায়ণের ইতিকথা অনেকটাই তাই শোনা কথা।

কেনা বেচার ব্যবসায়ী শিবনাবায়ণ বোমবাই শহরে গুছিয়ে বসার পরই ১৮৭৫ সালে বোমবাইতে তাঁব পুত্র বলদেও দাসকে নিয়ে এলেন। পিলানির গ্রাম থেকে বলদেওদাস বিড়লা বাবার কাছে এসে কেনাবেচাব ব্যবসায় যোগ দেবাব চার বছর পব ১৮৭৮ সালে নতুন কোমপানি তৈবি কবলেন। নাম 'শিবনারায়ণ বলদেওদাস'। এবার ব্যবসার পবিধি বাড়ানর জন্য বলদেওদাসের নজর পড়ল তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার দিকে। ব্যবসার ঢঙও তখন পালটিযে ফেলেছেন 'শিবনারায়ণ বলদেওদাস' ফারমের অন্যতম মালিক বলদেওদাস বিড়লা। এবার তিনি সন্ধান পেয়েছেন ভারতের বাইরে যে বাজার আছে সেখানে মাল বিক্রি করা যায়। ১৮৯৮ সালে বলদেওদাস বিড়লা এলেন কলকাতায়। এবার পাকাপাকিভাবে তাঁর গদি তৈরি করলেন কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে। আর ১৯১১ সালে ১৮ নমবর মল্লিক স্ট্রিট বিড়লাদের গদি স্থায়ী তৈরি হল। জায়গাটার আরেক নাম 'কালীগুদাম'। কর্মচারী বলতে জনা দুই আর টেলিফোন লাইন একটাও নেই। অতঃপর চীনে মালপত্র রপ্তানি শুরু করলেন বলদেওদাস বিড়লা। ১৯০১ সালে ব্যবসায়ে নিয়ে এলেন বড় ছেলে যুগলকিশোরকে। যুগলকিশোর বাপের সংগে যোগ দিলেন কলকাতায়। বোমবাই-এর ব্যবসা একেবারে গুটিয়ে নেওয়া হল না। কিন্তু জোর দেওয়া হল কলকাতার ব্যবসায়। এই সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দিকে আর বিশ শতকের গোড়াব দিকে কলকাতা থেকে আফিম রপ্তানি করা হত চীন দেশে। মোটামুটিভাবে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরাই এইসব জাতের ব্যবসা করতেন। পাটের ফাটকাব সংগে আফিমের চালান, নীলেব চালান আর সুতোব আমদানিই ছিল তখনকার মাড়োয়ারি গোষ্ঠীর ব্যবসা। যুগলকিশোর জাপান থেকে সুতো আমদানি করতেন কিন্তু সত্যিই আফিম রপ্তানি করতেন কিনা এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯১১ সালে ১৮ নমবর মল্লিক লেনে বিড়লাবাড়ির গদি তৈরি হবার আগেই কলকাতায় এসে গিয়েছিলেন বলদেওদাসের অন্য ছেলেরা। এরা হলেন যুগলকিশোরের দ্বিতীয় ভাই রামেশ্বরদাস, তৃতীয় ভাই ঘনশ্যামদাস। লরড কারজনের আমল। ইংরেজদের সংগে তখন বিড়লা পরিবারের বেশ ভালই যোগাযোগ ছিল। ইংলনডের সুতোর বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান থেকে সুতো আমদানি করেও বিড়লারা ইংরেজ রাজপুরুষদের সংগে খাতির রাখতেন। ফলশ্রুতিতে বলদেওদাস বিড়লা ইংরেজের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন ১৯২৫ সালে।

যুগলকিশোরের বিচক্ষণতা এখন বিড়লাবাড়ির প্রবাদ। এহেন যুগলকিশোরের কোন সন্তান ছিল না। ছোট ভাই বৃজমোহন ব্যবসা করতে এসে অনেক রূপো আর সোনা কিনে রেখেছিলেন। ভারতের বাজারে তখন সোনা রুপোর দর পড়তির দিকে। বৃজমোহনের ব্যবসায়ে তখন লোকসান যাচ্ছিল। বিড়লাবাড়িতে সে বছর দেওয়ালিতে সে কারণে

ক্যানিং স্ট্রিটের বাড়ি। আলোকচিত্র : অভিজিৎ হাজরা

আলো জ্বলবে না বলে ঠিক হয়। খবর পেলেন বড় ভাই যুগলকিশোর। বৃজমোহনের তলব পড়ল যুগলকিশোরের কাছে। ধমক দিয়ে বললেন, ব্যবসায়ে আজ লোকসান কাল লাভ হবেই। এটুকু সহ্য না করতে পারলে ব্যবসা করতে আসা উচিত নয়। বিড়লাবাড়িতে দেওয়ালির আলো জ্বলবে।

যুগলকিশোরের আদেশে সেদিন বিড়লাবাড়িতে দেওয়ালির আলো জ্বলেছিল। আর ছোটভাইকে ব্যবসা শেখানর জন্য যুগলকিশোর লনডনের রুপোর বাজার থেকে রূপো কিনতে শুরু করলেন। এর ফলে বৃটিশ উপনিবেশ ভারতের বাজারেও রূপোর দাম বেড়ে গিয়েছিল। ছোট ভাই বৃজমোহন লোকসানের হাত থেকে বেঁচেছিলেন।

যুগলকিশোরের মত আর এক প্রবাদপুরুষ যুগলকিশোরের তৃতীয় ভাই ঘনশ্যামদাস বিড়লা। ১৯১৮ সালের আগে সব ভায়েরা আলাদা আলাদা ব্যবসা করতেন। ঘনশ্যামদাসও পাটের বাজারে কেনাবেচা করতেন। একবার সামান্য ভুলের জন্য ঘনশ্যামদাসকে ইংরেজ ক্রেতার কাছে সে সময় এক লক্ষ টাকা খেসারৎ দিতে হয়েছিল। এটা নাকি কেবল কথা রাখার জন্য। বৃটিশ বণিকরাও তাঁকে বিভিন্ন সময় হেনস্থা করেছিলেন। প্রত্যেকটি ছোট ছোট অপমান তিনি মনের মধ্যে রেখে দিতেন। বৃটিশ বণিকদের উপেক্ষা অবজ্ঞার উত্তর দিয়েছিলেন ঘনশ্যামদাস, নিজেকে বিশাল বিড়লা সাম্রাজ্যের রূপকার হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯১৯ সালে বিড়লা ব্রাদারসের জন্ম এঁরই চেষ্টায়। নতুন অফিসের জায়গা ১৩৭ নমবর ক্যানিং স্ট্রিট। বজবজের দিকে জমি কিনে জুট মিল তৈরির চেষ্টা, দিললিতে পুরনো সুতোকল কিনে সুতো ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এই সব নিয়ে ১৯১৮-১৯ সালের বিড়লাগোষ্ঠী যে কেনাবেচাব ব্যবসার মধ্যে ডুবে ছিল তার মধ্যে দিয়েই তৈরি করল শিল্পপতি হবার স্বপ্ন।

১৯১৯ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত ক্যানিং স্ট্রিটের বাড়ি থেকেই ব্যবসা চলত। এর পর ১৯২৮ সালে ৮ নমবর রয়েল একসচেনজে সাহাদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিড়লা ব্রাদারসের রমরমা ব্যবসা শুরু হল। ১৯২৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই ৮ নমবর রয়েল একসচেনজের বাড়িতেই বিড়লারা স্বীকৃত হল প্রতি-

ষ্ঠিত শ্রেষ্ঠী কিংবা শিল্পপতি হিসেবে।

এই পর্বে বিড়লাগোষ্ঠীর জয়ের পর জয়। একের পর এক 'মিল' কারখানা, কেবল তৈরি আর সংযোজন। বছরের হিসেবে একের পর এক নতুন খাতা। বিড়লা জুট মিল (১৯২০) বিড়লা কটন অ্যানড স্পিনিং মিল (১৯২০) দিয়ে শিল্প উদ্যোগের শুরু। গোয়ালিয়রের রাজ পরিবারে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে জিয়াজিরাও কটন মিলস (১৯২১) তৈরি হল। ১৯৭০ সালে বিড়লাদের সদর দপ্তর হল আর এন মুখারজি রোডের এই বাড়িতে। বর্তমানে এই বাড়ি থেকে ২০০টি শিল্প উদ্যোগের কাজকর্ম চালান হয়, সেই সঙ্গে ৩০টি আরও শিল্প উদ্যোগ আছে, যেগুলি পরোক্ষভাবে বিড়লাগোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এছাড়া অগুনতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ভারতের বিভিন্ন শহরের ১০টি মন্দির, অসংখ্য ধর্মশালা, দুটি বড় হাসপাতাল, একটি নারসিং হোম ও একটি তারামন্ডল (প্লানেটারিয়াম) এই বাড়ি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

বিড়লাবাড়ির সম্পদের কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তবে ঘোষিত আয় থেকে এটুকু আন্দাজ করা যায় যে, ১৯৫০ সালে যে সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি টাকা আর বার্ষিক লেনদেন ছিল ৬০ কোটি টাকার কিছু বেশি তা আজকে ২০০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদে পরিণত হয়েছে। ট্রাসটের এবং জমি বাড়ির সম্পদ এর মধ্যে ধরা হয়নি। বিড়লাগোষ্ঠীর প্রথম সারির কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বছরে বিক্রির পরিমাণ একশ কোটি টাকার বেশি। যেমন বিড়লা জুট (১২০), সেনচুরি স্পিনিং (২১০), কেশোরাম (১৪০), হিন্দ অ্যালুমিনিয়াম (১৮০), গোয়ালিয়র রেয়ন (২৯০), হিন্দুস্থান মোটর (২৫০), প্যান আফরিকান পেপারস (১০০), জুড়ি অ্যাগরো (১১০)। এখানে বন্ধনীর মধ্যে কোটি টাকা হিসেবে বার্ষিক বিক্রি উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এন মুখারজি রোডের বিড়লাবাড়িতে এখন চতুর্থ পুরুষ থেকে ষষ্ঠ পুরুষ ব্যবসা পরিচালনা করেন। এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়, অবশ্য বয়সের হিসেবে, তিনি হলেন লছমিনিবাস বিড়লা (৭৩)। ইনি শিবনারায়ণের পৌত্র ও রাজা বলদেওদাস বিড়লার পুত্র ঘনশ্যামদাস বিড়লার বড় ছেলে। আর সবচেয়ে কনিষ্ঠ এ পরিবারের ষষ্ঠপুরুষ। লছমিনিবাস বিড়লার পৌত্র সিদ্ধার্থ বিড়লা (২৭)। এ ছাড়া রামেশ্বরদাস বিড়লার পুত্র মাধোপ্রসাদ, বৃজমোহনের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদও আছেন। ঘনশ্যামদাসের অন্য পুত্ররা যেমন কৃষ্ণকুমার বিড়লা, বসন্তকুমার বিড়লাও এ বাড়িতে কাজকর্ম দেখেন। এছাড়া ৫ম পুরুষের সুদর্শন বিড়লা, আদিত্য বিড়লা, অশোকবিক্রম বিড়লা- এদের মধ্যে অশোব বিক্রম বেশির ভাগ সময় বোমবেতে থাকেন। ৫ম পুরুষের চিহ্নে চিহ্নিত চন্দ্রকান্তই পঞ্চম পুরুষের মধ্যে কনিষ্ঠতম।

বিড়লা বাড়ি — ৮/৯ আর এন মুখার্জি রোড

সতের পয়সায় এক টাকা

শ্রেষ্ঠীর মানদন্ড কখন কখন রাজদন্ড হয়। কখন বা হয় না। কিন্তু সব সময়ই রাজকার্যকে প্রভাবিত করে। দেশের মোট উৎপাদন সম্পদ প্রায় ৬০০০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে নজরে পড়ার মত টাকা আছে এমন ধনী পরিবার বিড়লাগোষ্ঠী। যাদের নিজস্ব সম্পদ, যেটুকুর হিসেব খোলা চোখে পাওয়া যায় তা ধরলে হয় মোট ৩৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৩০০ কোটি টাকা তাদের ব্যবসাকেন্দ্রিক সম্পদ বাকি ১২০০ কোটি টাকা তাদের জনকল্যাণ বাবদ ট্রাসটের সম্পদ। স্বাধীন ভারতের প্রতিটি টাকার মধ্যে একটা বিশেষ অংশের আধিপত্য আছে এই বিড়লা বাড়ির।

ঠিক এই জায়গায় পৌঁছতে এদের কয়েকটি বিশেষ ব্যবসায়িক রীতি জানতে হয়েছে। প্রথমটি হল অর্থ নিয়ন্ত্রণ। আর দ্বিতীয়টি এদের বিশেষ শ্রম সম্পর্ক।

শেয়ার বাজারের রকমফের হিসেবের সঙ্গে এরা পরিচিত। এদের দেশি বিদেশি ব্যবসার টাকাগুলো খুব আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ মানুষের শ্রমে অর্জিত টাকার অংশ। এঁদের বেশির ভাগ ব্যবসাই জয়েনট স্টক কোমপানি। পুরনো মাড়োয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলির মত কোমপানিগুলিকে বিড়লারা কখনই 'সলোমান অ্যানড কোমপানি' হতে দেননি। শেয়ার বাজারের এই ঠাট্টাটি এখনও অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর ব্যবসার চাবিকাঠি। এটি হল, কোমপানির শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে সেটি আবার বেনামে কিনে নেওয়ার প্রবণতা। কিন্তু বিড়লাগোষ্ঠীর ঘরানা প্রতি ১৭ টাকা পিছু একশ টাকার সম্পদ তৈরি করা। এ জাতীয় অর্থনিয়ন্ত্রণ রীতির জন্য যেটি দরকার সেটি হল বিভিন্ন মহলে 'লবি' রাখার। কোমপানিগুলোর গুড উইল বাজারে প্রচার করার। বিড়লাগোষ্ঠী তা করে থাকে।

এছাড়া এদের বিশেষ ঘরানা শ্রমসম্পর্কের। সুপরিম কোরটের রায়ে একজন শ্রমিকের কাজের সময় আইনত সাড়ে আট ঘণ্টা। কিন্তু দিনটা যে চব্বিশ ঘণ্টার। তিন

জয়প্রকাশ জি ডি-র কাছে চাকরি চাইতে গিয়েছিলেন

[illegible]

"... to be employed somewhere under your auspices with monthly salary sufficient to meet his need."

[illegible] ... "His requirements will be covered by Rs 100 per month."

[illegible]

সিফটে কারখানা চালু থাকলে হিসেব মত চব্বিশ ঘণ্টাকে বাড়ান কীভাবে সম্ভব তা বিড়লাগোষ্ঠীই ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাঁরা জানেন।

এঁদের ব্যবসার কয়েকটি মূলমন্ত্র হল : ১। বিড়লারা রেফারেনস ছাড়া যতদূর সম্ভব কোন কর্মচারী বা শ্রমিককে চাকরিতে নেয় না। সে সংগে আছে চট করে কোন কর্মচারীকে বিশ্বাস না করা। ২। বিশ্বাস করার জন্য প্রথম দিন থেকেই সুযোগ দেওয়া। ৩। বিশ্বস্ত কর্মচারীর আজীবন দায়িত্ব নিয়ে রাখা। ৪। চট করে পুরনো কর্মচারী না ছেড়ে দেওয়া। ৫। বিশ্বাস যাকে একবার করা হয়েছে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া।

এই শ্রম সম্পর্কের ফলে বিড়লাগোষ্ঠী পেয়েছে এক বিশাল বিশ্বাসী কর্মচারীর দল। তবে অনিবার্য ভাবেই রেফারেনসের প্রশ্ন থাকায় পশ্চিমবাংলার ব্যবসার ক্ষেত্রে উঁচুপদে বাঙালির সংখ্যা কম নিতান্তই নগণ্য।

বিড়লাবাড়ির প্রাইভেট টেলিফোন এক্সচেনজের ডাইরেকটরি খুললে দেখা যাবে ৭৪১টি লাইনের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটা বাঙালি নাম তাতে রয়েছে।

ব্যবসা এবং রাজনীতি

বাংলাদেশে প্রথম রাজস্থানের লোক যিনি এক ডাকে পরিচিত তিনি ছিলেন রাজা মান সিংহ। বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে এদেশে এসেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দেশ রাজস্থানকে ভালবাসতেন। বাংলা দেশে এসে আকন্দ ফুল দেখে তাই তিনি আত্মহারা হন। অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, 'আমার না হয় চাকরির জন্য ঘর ছেড়ে এত দূর আসতে হয়েছে, কিন্তু তুই কেন ঘরছাড়া?' এটি কলকাতার মাড়োয়ারি মহলে একটি চালু গল্প। মান সিংহের পর যেসব রাজস্থানীর চেহারা এখানে দেখা যায় তাঁরা সবাই বণিক। কিন্তু তাঁদের সংগে বাংলার রাজনীতির প্রবাহের যোগ সবসময়ই ছিল। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা আধুনিককালের রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ করে অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিজেদের সংগে জড়িয়ে রেখেছেন। এটি জগত শেঠ, শ্রীপৎ সিংহ প্রমুখ মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের সময় থেকে শুরু হয়েছিল। এই বিশেষ প্রভাব থেকে বিড়লাগোষ্ঠীও মুক্ত নয়। কেবলমাত্র ব্যবসার প্রয়োজনেই বিড়লাদের কলকাতার রাজনৈতিক জীবনের সংগে জড়িত থাকতে হয়েছিল।

কেবলমাত্র স্বাদেশিকতার টানে কি-না তা পরিষ্কার না হলেও এ কথা পরিষ্কার যে রাজা বলদেওদাস পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য থেকে শুরু করে সে যুগের নবীনতম রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবধি সকলের সংগেই যোগাযোগ রেখেছিলেন। একই সংগে যোগাযোগ ছিল ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদের সংগে। ১৯২৩ সালে বিড়লারা থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায়, এখন যেখানে বিড়লা মিউজিয়াম আছে সেই বাড়িতে। এই বসতবাড়িতেও ইংরেজ রাজপুরুষরা যাতায়াত করতেন। রাজা বলদেওদাস ও তাঁর পুত্র যুগলকিশোর ভিকটোরিয়ান কাজসমৃদ্ধ কাঠের আসবাব পত্র কিনেছিলেন কেবলমাত্র ইংরেজদের আপ্যায়ন করার জন্য। যুগলকিশোর নিজে ছিলেন আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী। চীনে রপ্তানি আর জাপান থেকে আমদানি করার কাজে ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হবার সুযোগ তিনি রাখেননি।

এই পরিবারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব যুগলকিশোরের দ্বিতীয় ভাই ঘনশ্যামদাস বিড়লা। ১৯০৭ সালে কলকাতায় আসেন। কলকাতার আবহাওয়ায় স্বদেশি চেতনার প্রবাহ। ঘরে ঘরে তখন জন্ম নিচ্ছে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ, যারা দেশ প্রেমিক। বংগভংগের উত্তেজনার ঢেউ তখনও ছিল। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা কারলাইল সাহেবের সারকুলারে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বারণ হল। বন্দেমাতরম বলা চলবে না। ফিল্ড অ্যানড অ্যাকাডেমি নামে একটি ক্লাব তখন কলকাতার ছেলেদের আকর্ষণ করছে। এটি ছিল রাজা সুবোধ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব। স্বাধীনতার জন্য দীক্ষা নেবার আদর্শ জায়গা। কলকাতার মাটিতে তখন একদিকে সুরেন্দ্রনাথ অন্যদিকে দেশবন্ধু। দু'জনের কথাই তরুণদের মন কেড়ে নেয়। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি তখন [illegible] নেতা। রডা মামালার সংগে জড়িত শি[illegible] হিম্মৎ সিংকার বন্ধু ছিলেন ঘনশ্যা[মদা]স। ব্যায়ামাগার থেকে তখন তৈ[রি] হচ্ছে নতুন বিপ্লবীর দল। এ[ম]ন একটা ব্যায়ামাগার বিড়লাদের অর্থা[নু]কূল্যে চলত। তার নাম [illegible] ব্যায়ামাগার। ঘনশ্যামদাস বিড়[লা] তার পৃষ্ঠপোষক। আর এই [illegible] ঘিই। ১৯১৯ সালে ঘনশ্যামদা[স] বিড়লা পুরোপুরি ব্যবসায়ী। [illegible] সূত্রে আলাপ হল মহাত্মা গান্ধী[র] সংগে। গান্ধীজীর প্রয়োজন ছি[ল] এমন একটি তরুণের যে প্রয়োজ[নে] অর্থ সাহায্য করতে পারে। কল[কা]তার অন্যতম পুরুষ সুভাষচন্দ্রে[র] সংগেও আলাপ হয়েছিল ঘনশ্যা[ম]দাসের। জওহরলাল নেহরুকে চিনলেন জি ডি। একদিকে ক[ল]কাতায় বসে ইংরেজ রাজপুরুষদে[র] খুশি রাখা অন্যদিকে কংগ্রেসীদে[র] সংগে যোগাযোগ এ দুটোকি[ই] সমানভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন [জি] ডি বিড়লা। কংগ্রেসের চরমপন্থী [বা] নরমপন্থী কারোর দিকেই তি[নি] ঝুঁকেছিলেন, এমন অভিযোগ [কে]উ করেন না।

জি ডি বিড়লার এই রাজনৈতি[ক] ক্রিয়াকাণ্ডের সংগে যে যোগাযো[গ] তাকে সব সময়ই একজন সুপ্[র] ব্যবসায়ীর নিপুণ কর্মতৎপরতা [ব]লে মনে করা হয়। তিনি জা[তীয়] কংগ্রেসের সংগে ঠিক ততটু[কু] ছিলেন যতটুকু তাঁর ব্যবসার প্র[যো]জনে থাকা উচিত।

দেশিয় শিল্পনীতির রূপ[কার] হিসেবে তিনি যে ভঙ্গিতে চি[ন্তা] ভাবনা করতেন পরবর্তীকালে [জও]হরলাল নেহরুও মেনে [নিতে] পারেননি। গান্ধীজীর মৃত্যু পর্যন্ত জি ডি যে জায়গায় ছি[লেন] জাতীয় কংগ্রেসের অন্য নেত[াদের] কাছ থেকে পরবর্তীকালে [ত]া সেখান থেকে অনেক দূরে আসতে হয়েছিল।

গান্ধীজীর চোখ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের দেখতেন। সুভাষচ[ন্দ্র] ...

মন্দির, স্কুল, গবেষণা কেন্দ্র ব্যবসা নয় : এল এন বিড়লা

বিড়লাবাড়ির সবচেয়ে বড় শিল্পপতি ঘনশ্যামদাসের মৃত্যুর পর কার্যত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র লছমিনিবাসের ওপর দায়দায়িত্ব অনেকখানি বর্তাচ্ছে। সে হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসাবুদ্ধির জন্যই ভবিষ্যতে বিড়লাবাড়ির ব্যবসায়িক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। পরিবর্তনের পক্ষ থেকে এই ৭৩ বৎসর বয়স্ক শিল্পপতির সংগে একান্ত সাক্ষাৎকারে সেইসব মূল ব্যাপার নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে।

পরিবর্তন : আপনারা কি খুব ধর্মভীরু, নাকি অন্য কোন চিন্তায় এইসব মন্দিরে বা লোকসেবার কাজগুলো করেন ?

লছমিনিবাস : আমার বাবা ছিলেন ন্যায়ের উপাসক। ধর্মকর্ম যে অর্থে কেবল আচার আচরণ তা হয়ত আমরা খুব একটা আমল দিই না তবে ঈশ্বরকে স্বীকার করি আর শাস্ত্রকেও মেনে চলি।

পরিবর্তন : এই মন্দির, স্কুল বা গবেষণা কেন্দ্রগুলি কি ব্যবসা ?

লছমি : না এগুলো কখনই ব্যবসা নয়। এগুলো সমাজসেবার জন্য তৈরি। এগুলো দেখাশুনাও কোন ব্যবসায়িক ভঙ্গিতে হয় না-এসব একটি করে ট্রাসটের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমিই বর্তমানে এই ট্রাসটের অনেকগুলোর চেয়ারম্যান।

পরিবর্তন : এগুলোকে ট্রাসটের মধ্যে নিয়ে কী সুবিধে হল ? সবগুলো-তেই তো আপনাদের কথনই শেষ কথা।

লছমি : ট্রাসট প্রথমে ছিল না। পরিবার থেকে জনসেবার অংগ হিসেবেই কাজগুলো করা হত। সুখের কথাই বলব সব ছিল। ১৯২৯ সাল থেকে সুখের কথায় যখন রক্ষণা-বেক্ষণ কাজ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় তখন থেকেই এই ট্রাসট। এই দেখুন পিলানি এডুকেশন ট্রাসটের দায়িত্বে বর্তমানে ১২০০০ ছাত্রছাত্রী বছরে পড়াশুনা করে। এগুলোকে বিশৃঙ্খলভাবে ইচ্ছেমত চালানো যায় না।

পরিবর্তন : তা বলে কেবলমাত্র ধর্ম-আচরণের জন্য এগুলো নয় ?

লছমি : ধর্ম বলতে আমরা নিজেদের জীবনযাপনের যে রীতি তার মধ্যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ মানতে চেষ্টা করি। সকালবেলায় আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করি কিন্তু কোন পুজোপাঠ করি না। ভাল লাগলে মন্দিরে যাই। কালীঘাটে যাই, কিন্তু 'রিচুয়ালস' বা ক্রিয়াকর্মই একমাত্র ধর্ম আচরণ এটা আমি মানি না।

পরিবর্তন : সকাল থেকে রাত্রি অবধি কী কী কাজ আপনি করেন ?

লছমি : সকাল ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠি। মাইল তিনেক হাঁটি হরচিকালচারে গার্ডেনে। হাঁটাটা [illegible] পক্ষেই ভাল। ফিরে এসে স্নান, ব্রেকফাস্ট করে নটার থেকে দিনের কাজ শুরু করি। একটু বেলার দিকে অফিসে আসি। অফিসে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ আমার ভাইরা ও [illegible] দেখেন। আমি ট্রাসটের কাজই বেশি দেখি। বিকেল সাড়ে [illegible] মধ্যে অফিস ছেড়ে যাই। দুপুরের খাবার অফিসেই খাই। বাড়ি ফেরার পরেও কাজ থাকে। রাত্রিতেও কাজ করি। প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোবার আগে কিছু পড়ি [illegible] এক মত।

পরিবর্তন : কী বই পড়েন ?

লছমি : বেশির ভাগ ইংরেজি পত্রিকা পড়ি। হিন্দি পত্রিকা কাদম্বরী মাঝে মাঝে পড়ি। দেশি বিদেশি বহু পত্র-পত্রিকা আসে তাই পড়ি।

পরিবর্তন : আপনি বাঙলা পড়েন না ?

লছমি : বাঙলা আমি ইস্কুলে [illegible] অবধি পড়েছি। এখনও অল্প অল্প পড়তে পারি।

পরিবর্তন : জি ডির রোজকার রুটিন কি এই রকমই ছিল ?

লছমি : প্রায় একরকম। তবে উনি সকালে [illegible] ৪ মাইল [illegible] উনি [illegible] আর [illegible] দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতেন। [illegible] বিভিন্ন [illegible] বেশি [illegible]। [illegible] ছিল। আর [illegible] কয়েকদিন আগে [illegible] পি খৈতান আর সিদ্ধার্থ রায়কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পুরো অনুবাদ করা দরকার। শেষকালে আরো বেশি পড়াশুনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

পরিবর্তন : আপনারা সকলেই ত বেশ শরীর সম্পর্কে সচেতন।

লছমি : ঠিক তা নয় তবে কাজের জন্য চাই সময় আর সেই সময় পেতে গেলে শরীরটা ঠিক রাখা দরকার। শরীর ঠিক না থাকলে ত কোন কাজই করা যাবে না।

পরিবর্তন : খাবারের বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম আপনারা মানেন ?

লছমি : তেমন কিছু বিশেষ নিয়ম নেই, তবে আমরা নিরামিষ খাই। ভারতের সব জায়গার খাবারই ভাল লাগে। তবে ঘি মশলা কম হলে ভাল। দক্ষিণ ভারতীয় খাবার আমার খুব পছন্দ। এমনি দুধ ফল, রাত্রে রুটি ফুলকা সংগে সবজি ভাল। আচারটাও ঠিক পছন্দ নয়।

পরিবর্তন : বাঙালি খাবার কি পছন্দ করেন ?

লছমি : বাঙালি খাবার রসগোল্লা, সন্দেশ এমনকি নলেন গুড়ের সন্দেশ যেটা শীতকালে পাওয়া যায় সেটাও ভাল।

পরিবর্তন : আপনাদের বাড়িতে কফির চল কি খুব বেশি ?

লছমি : বেশি কিনা জানি না তবে কফি এক কাপ; ৬০ বছর বয়সের পর বেশ ভাল।

পরিবর্তন : ধর্ম সম্পর্কে আপনার কোন বিশেষ চিন্তা আছে কি ?

লছমি : ধর্ম সম্পর্কে ঐ যে বললাম হিন্দু ক্রিয়াকর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি কাজ হয়। জীবনের পথটা যদি শাস্ত্রীয় পথের সংগে এক করে নেওয়া যায় তবে অন্য কোন সমস্যা থাকে না। মানে বিষয় অনেক সময় অসুবিধা করে। আর যে কোন [illegible] জন্য কাজ করা। □

সাক্ষাৎকার : শ্যামল বসু

সংগে তাই তাঁর মতান্তর ছিল। পরবর্তীকালে নরমপন্থীরা তাঁকে সহ্য করতেন কেবলমাত্র গান্ধীজীর জন্য।

বিড়লাবাড়ির পুরনো কর্মচারীর মুখে শোনা যায় যে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বরমা থেকে বিড়লাবাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন। বিড়লাদের স্টারচ কারখানা ছিল বরমায়। নেতাজী বরমায় এসে সেটি চালু করার প্রস্তাব দিয়ে বরমার স্টারচ কারখানার এক কর্মচারীকে পাঠান। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ সেদিন জি ডির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। রাজস্থানী কর্মীটিকে আর বরমায় ফেরৎ না পাঠিয়ে তিনি ফেরৎ পাঠালেন রাজস্থানে, লোকটির গ্রামে। আবার জি ডির প্রস্তাব ছিল অন্তত বাংলাটা যেন ভাগ করা না হয়। তখনকার পূর্বপাকিস্তানে জি ডির কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা ছিল।

বিড়লাবাড়ির সংগে নেহরু সরকারের বিরোধও চরমে উঠেছিল। ভারতের শিল্পবাণিজ্য নীতি নির্ধারণের জন্য প্রশান্ত মহলানবীশকে চেয়ারম্যান করে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ঘটনাটি গান্ধীজীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই। জি ডির নিজস্ব একটি চিন্তা ছিল। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে এই পর্বে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু নেহরু তা আমল দেননি। বরং পরবর্তীকালে সম্ভবত ১৯৫৫ সালে নেহরু জামাতা ফিরোজ গান্ধীর মত দক্ষ বাগ্মীর সমালোচনা জায়গা পেয়েছিল স্বাধীন ভারতের পারলামেনটে। শেষমেশ একচেটিয়া ব্যবসা সংক্রান্ত যে আইন তৈরি হল তা

প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে নেহরু, বিজয়লক্ষ্মী, প্রফুল্ল সেন সঙ্গে জি ডি। আলোকচিত্র : অশোক বসু

দিয়েও নেহরু আটকাতে পারলেন না এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর অগ্রগতি-কে।

ঘনশ্যামদাসের চিন্তায় গান্ধীর সামাজিক উন্নয়নমুখী শিল্পনীতির সঙ্গে কোন মিল ছিল না।

বিদেশি সাংবাদিকদের কাছেও তিনি সরাসরি এবং পরিষ্কার করে কথা বলতে পছন্দ করতেন। কয়েক-বছর আগে লনডনে এক বিদেশি সাংবাদিক মোরারজীপুত্র কান্তি ভাই আর ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলেন। জি ডি সরাসরি উত্তর দেন, কান্তিভাই একজন 'ইডিয়েট' আর সঞ্জয় 'উইকেড ও ইডিয়েট'। নিজপুত্র কে কে বিড়লা যখন লোকসভায় নির্বা-চনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তখন জি ডি তাঁর উপর খুব প্রসন্ন হননি। তিনি মনে করতেন ব্যবসায়ীর মূল কাজ ব্যবসা করা, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা নয়। আড়ালে থেকে রাজনীতির চিন্তায় মদৎ যোগান বা নতুন কোন সংযোজন করা ব্যবসায়ীর কাজ হতে পারে। এটাই বিড়ালাবাড়ির অহংকার। আর সে অহংকার জি ডি সযত্নে লালন করতেন। তাঁর উত্তরসূরী-দেরও সে শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন।

এই বিড়লাবাড়ি থেকে যেমন সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে আইনের পরামর্শ চাওয়া হয়, তেমনি ১৯৭২—৭৭ সালে জ্যোতি বসুর কাছেও সমান আগ্রহে আইনের পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল।

রুপোর থালায় ডাল রুটি

বিড়লা সাম্রাজ্যের তরুণতম কর্ণ-ধার সিদ্ধার্থ বিড়লার সঙ্গে শোভা-রামের সাত পুরুষের ব্যবধান। কিন্তু এখনও রোজ সকাল হয় বিড়লাবাড়িতে ভোর পাঁচটায়। সাতটার মধ্যে সকলে প্রস্তুত। সাড়ে সাতটায় ঘড়ির ঘণ্টার সঙ্গে প্রাতঃ-রাশের টেবিলে। খাদ্যরীতিতে সামান্য রদবদল হয়েছে, যেমন রুটি মাখন এসে নতুন জুটেছে। ইডলি সম্বর, কফিও চতুর্থ পুরুষের আম-দানি। কিন্তু আলতে নিরামিষ-ভোজীর অহংকারটা এখনও আছে আর আছে সময়ের জ্ঞান সম্বন্ধে অভিমান।

প্রাতঃরাশের টেবিলে থাকে রুটি, মাখন, দুধ, মিষ্টি ফল, কফি, ইডলি, সম্বর, দুধের মাঠা এইসব। দুপুরে কর্তাব্যক্তিরা খেয়ে নেন অফিসেই একটু সুপ আর ভেজিটেবল কাট-লেট। বিকেল তিনটে নাগাদ চা আর খান চারেক বিসকুট। রাতের খাবার আবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে কাঁটায় কাঁটায়। এটাই নৈশ ভোজ। রুটি ফুলকা, সঙ্গে গোটা দুয়েক সবজি আর ডাল। দুপুরের খাওয়া বাদে অন্তত সকাল আর রাতে বিড়লাবাড়ির সদস্যারা যথাসম্ভব এক সঙ্গে থাকতে চান।

টেবিলে খাবার সময় সাধারণত এবাড়িতে কাচের পাত্র ব্যবহার করা হয়, তবে রাতের খাদ্য খাওয়া সাধারণভাবেই হয় ভারতীয় রীতিতে। ছোট চারপায়া টেবিলে রুপোর বাসনে খাওয়া দাওয়া হয়।

রাত সাড়ে নটার মধ্যে হালকা কিছু পানীয় নিতে পারেন কেউ কিন্তু ঠিক সাড়ে নটা হল বিড়লাবাড়ির সদস্যদের নিজেদের শোবার ঘরে যাবার সময়। অভ্যাসমত বই পড়া আছে। তবে সকাল বেলা প্রাতঃরাশের সময় নিজেকে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে।

বিড়লাবাড়ির কর্তাপিছু তিনটে করে ড্রয়িংরুম। থাকার ঘর প্রয়োজন মত কমবেশি হলেও বসবার ঘর তিনটে চাই। খুব দরকার না থাকলে কাউকে এঁরা বাড়িতে ডাকতে চান না বা দেখা করেন না। দেখা করার জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বসতে হবে সিরিজের প্রথম ঘরটিতে। দ্বিতীয় ঘরটি থেকে [illegible] করার দরকার আর তৃতীয় ঘরটি একান্ত পরিচিত বা আত্মীয় অথবা মহিলাদের ব্যবহারের জন্য। প্রত্যেকটি ঘরই কারপেটে ঢাকা, অন্তত দুটি করে সোফা সেট আর সেন্টার টেবিল। কোন ঘরে একটা ডাইনিং টেবিলের মত তাকে ঘিরে কয়েকটি চেয়ার, সেই সঙ্গে একটা দেয়াল আলমারি অন্তত থাকবেই। বিড়লা পরিবারের কোন কোন সদস্য কোন একটি ঘরে সাবেকি কায়দায় গদি পেতে রাখতে পছন্দও করেন।

আসবাবপত্রের মধ্যে যেগুলো পুরনো দিনের সেগুলো বেশির ভাগই ইংলিশ ফারনিচার আর কারো ঘরে ফরাসি কায়দার ফারনি-চারও আছে। কিন্তু সব ঘরেই একটি করে বিশেষ রুচির ছাপ স্পষ্ট।

বিড়লাবাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যর পুরনো দিনের ফারনিচারের প্রতি দুর্বলতা আছে। বিড়লা মিউ-জিয়ামের বাড়িতে আগের দিনের অনেক দুর্লভ স্টাইলের আসবাবের প্রমাণ আছে, সে সব নিয়ে গল্প শোনা যায়। এখন পরিবারের নিজস্ব আবাস বিড়লা নিকে-তে সবাই থাকেন। বিড়লা নিকে দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর অঞ্চলে।

বিড়লা পরিবারের সদস্যরা রোজকার প্রয়োজনের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ জিনিসই ব্যবহার করেন তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগের উৎপাদন থেকে। এমনটি বোধহয় সারা ভারতের কোন অন্য পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র স্টিল ছাড়া বিড়লার উৎপাদনের কারখানা নেই এমন জিনিস সম্ভবত নেই। পরিবারের কাছে তাই বিদেশি জিনিস ব্যবহারের কোন আগ্রহ নেই। এদের প্রথম মন পসন্দ নিজেদের তৈরি, দ্বিতীয় পসন্দ অ[illegible] দেশি জিনিস, আর একান্ত না হলে চলে না এমন ক্ষেত্রে বিদেশি জিনিস।

এই পছন্দের ব্যাপারটা স[illegible] জায়গাতেই। অফিসের কেরানি থেকে ম্যানেজার নিয়োগের বেলায় এই পছন্দ কাজ করে। রেফারেন্স যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে জা[illegible] জাতি এগুলোও দেখা হয়। [illegible] পরিবারের রাজমিস্ত্রির কাজ কোনদিন থেমে থাকে না, [illegible] একটা রীতির চল আছে। কোথাও কোথাও হয় ইসকুল বাড়ি, না [illegible] মন্দির, না হয় কারখানা কিছু না কি[illegible] একটা তৈরি হচ্ছেই। তবে এক্ষেত্রে পছন্দের ব্যাপার আছে। বিড়লা বাড়ির সাহায্যে তৈরি জনকল্যাণ মূলক কাজকর্ম এমনকি মন্দিরে শতকরা আশি ভাগই এঁদের নি[illegible] গ্রাম 'পিলানি'তে। বাকি ২০ ভা[illegible] সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। [illegible] বাড়ির উজ্জ্বল পুরুষ জি ডি বিড়[illegible]

শোভারাম

শিবনারায়ণ

বলদেওদাস

যুগলকিশোর
(নিঃসন্তান)

রামেশ্বরদাস

গজানন
অশোকবর্ধন
যশোবর্ধন

মাধোপ্রসাদ
(নিঃসন্তান)

৮ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ
আলোকচিত্র : অচিন্ত্য হাজরা

লছমিনিবাস

সুদর্শনকুমার

সিদ্ধার্থ

কৃষ্ণকুমার
(তিন কন্যা পুত্র নেই)

বসন্তকুমার

আদিত্যবিক্রম

কুমারমঙ্গলম

একবার এক বিদেশি সাংবাদিককে ভারত দেখার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। অসম্ভব খাতির করে সেই বিদেশি সাংবাদিকটিকে যা দেখিয়েছিলেন তা হল পিলানি। এমন স্বাজাত্যবোধের অভিমান বোধহয় বহু মাড়োয়ারিরই থাকে না। তবে বাকি ২০ ভাগের মধ্যে কলকাতার বিড়লা তারামন্ডল বা দিললির লছমি নারায়ণ মন্দিরের কাজ মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করার মত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এই বাড়ির ট্রাসটিরা দেখাশুনো করেন।

এই 'ট্রাসট' বিষয়টি বিড়লা পরিবারকে দিয়েছে এক অসম্ভব গৌরব। গান্ধীজীর চিন্তার প্রভাব হিসেবে ১৯২৯ সালে এই ট্রাসটের আবির্ভাব। এ বাড়ির কিছু না হলেও ১000 কোটি টাকার কিছু বেশি টাকা লগ্নি করা আছে ট্রাসটে। সুদের খরচে চলে উন্নয়নমূলক কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দেবালয়ের সব খরচই এই বিশেষ ট্রাসটের টাকায়। ট্রাসটের বেশির ভাগ সদস্যই বিড়লা পরিবারের সদস্যরা এমনকি বহু ক্ষেত্রে কর্মচারীরাও। ঘনশ্যামদাস বিড়লাই এর রূপকার।

এছাড়া এ বাড়ির আর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে অন্যতম, এই পরিবারে কেউ কখন মদ্যপান করেন না বা সিগারেট খান না। দ্বিতীয়ত রাতে কোন ক্লাব বা পারটিতে যেতে হলে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর তৃতীয় যেটি সেটি অনেক সাধারণ ভারতীয়র নেই, তা হল যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে তখনই আলো কিংবা পাখা অথবা ঠান্ডা মেশিনের সুইচ বিড়লাবাড়ির যে কর্তাব্যক্তি শেষ পর্যন্ত থাকবেন তাকেই অফ করতে হবে।

চাকরি পেয়েও খুশি নয় ?

বিড়লা গোষ্ঠীর সম্পর্কে একথা শোনা যায়, যখন কোন ভারতীয় যদি কখনও একটি টাকা খরচ করেন তার মধ্যে প্রায় ১৮ পয়সাই বিড়লাদের বিচক্ষণতা আর বিড়লা উদ্যোগের শ্রমিক কর্মচারীর ঘাম রক্তে তৈরি। তবুও সাধারণ মানুষের কাছে একটা ভাল ইমেজ বিড়লাবাড়ির কর্তাব্যক্তিরা তৈরি করতে পারেননি। তাদের ভাল কাজ হয়তো আছে। সেই ভাল কাজ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ পায়নি। তেমনি খারাপ কাজ বা দুর্নামও যথেষ্ট ছড়ান আছে। সেগুলি নিয়ে অবশ্য বিড়লা বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা আদৌ চিন্তিত নন। এর কারণ হিসেবে বলা হয় বিড়লা কর্তারা একশ্রেণীর ম্যানেজারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের ইমেজ দেখেন।

বিড়লাবাড়তে রাজনৈতিক সমঝোতা আছে—যার ফলে এদের কারখানা ওরিয়েনট ফ্যান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও রাজ্য সরকারও কিছু করেন না। টেকসম্যাকো বা হিন্দমোটর এলাকার শ্রমিক বসতিতে শ্রমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কারো নজর কাড়া যায় না। পশ্চিমবাংলায় বিড়লাদের জুটমিল, মোটর গাড়ির কারখানা, কাপড়ের কল, ইনজিনিয়ারিং শিল্পে যে সব শ্রমিক কর্মচারী আছেন তাদের বেশির ভাগই যেখানে কাজ করেন সেই কোমপানির নাম সগর্বে উচ্চারণ করতে চান না। এরা কোনদিনই টাটার কর্মচারী বা [illegible]

ভগবানদেবী (মোহতা) জয়দেবী (কোঠারি) কমলাদেবী (মন্ত্রী)

বৃজমোহন

ঘনশ্যামদাস

গঙ্গাদেবী (সোমানি)

গঙ্গাপ্রসাদ

চন্দ্রকান্ত

...দ্রকলা দেবী (দাগা) শান্তিদেবী (মহেশ্বরী)

অনসূয়াদেবী (তাপারিয়া)

...পাবলিক সেকটরের কর্মচারীদের ...সংগে নিজেদের তুলনা করেন না। ...দানিং কালে কেবল পশ্চিমবাংলায় ...য়, সারা ভারতেই গুজরাটি মালিক-...দের শ্রমসম্পদকেও ভাল বলা যায়। ...কিন্তু প্রাইভেট ফারমের চাকরি ...হিসেবে বিড়লা গোষ্ঠির উদ্যোগে ...কাজ পাওয়া যেন সাধারণভাবে ...লোকজন ভাল চোখে দেখেন না। ...কোন তরুণের কোথাও কাজ হয়েছে ...শুনলে সকলে খুশি হন। কিন্তু ...বিড়লা বাড়িতে চাকরি করছে শুনলে ...ছেলের শুভার্থীরা সময় নিয়ে ধীরে ...সুস্থে অন্য চাকরি খুঁজে নিতে ...পরামর্শ দেন। অথচ বিড়লাদের ...জনকল্যাণের কাজ, রাজনৈতিক ...সম্পর্ক সবার জানা আছে। তবুও ...কর্মদাতা হিসেবে বিড়লাবাড়ির ...সুনাম নেই কেন? এটা একটা ...বিস্ময়। ইমেজ তৈরি করা হয় কর্তার ...ইচ্ছায়। কর্তারা ফুরসত যে পাননি ...এমন নয়, তবুও যে কাজ করেছেন ...তার সঠিক প্রতিদান তারা ভারত-...বাসীর কাছ থেকে পান না। কিন্তু ...মন্দেরা বা জ্যোতি বসু বিড়লা ...[illegible] নিবেদন করেন--

এটা সত্যি, কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে মুখে এই ঘটনাগুলোকে তারিফ করা হয় না।

বিড়লাবাড়ির কর্মচারীরা চাকরি থেকে অবসর নেন না বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু অবসর উপযুক্ত বয়সে নিলে তার নিজের প্রাপ্য টাকা পেতে সময় লাগে অনেক। বিড়লা বাড়ির এই ইমেজও তৈরি করেছে এ বাড়ির মালিকদের তথাকথিত উন্নাসিকতা।

ফোন করে জন সংযোগ রাখার ফলে মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতা বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির সংগে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যের নিজস্ব কোন জনসংযোগ দপ্তর নেই। ফলে 'করপোরেট ইমেজ' তৈরি করতে বিড়লা মালিক-রা বরাবরই ব্যর্থ। টাকার জোরে বিক্ষিপ্তভাবে সূক্ষ্মবুদ্ধির লোককে নিয়োগ করার প্রচেষ্টা একটা অভি-মান তাঁদের আছে, এটা ঠিক। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের কাছে প্রতি-ষ্ঠান সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরি করার কোন কুশলী কারিগর নেই। যদিবা কেউ থাকেন তিনি কর্তাব্যক্তি-দের কাছে কখনও নিজেকে গুরুত্ব-পূর্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিংবা বলা যায়, বিড়লা বাড়ির মালিকরাই সে সুযোগ দেননি।

অনেকে বলেন, বিড়লাবাড়ি সং-বাদপত্রকে তোয়াক্কা করে না। সম্ভবত এ অভিযোগটাও বিড়লা-কর্তাদের জানা নেই। কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে অথবা পত্রিকা মালিকের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করে নিজেদের ইমেজ রাখার চেষ্টাটা অবশ্যই নন-প্রফেশনাল। ব্যক্তিগত অহংকারের এখানে কোন জায়গা নেই, একথাটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। একথাও পাশাপাশি সত্যি যে কেবল মাত্র জন সংযোগ নয়, সেই সংগে পরিচালন ব্যবস্থার যে যে ত্রুটিগুলোর জন্য বিড়লা গোষ্ঠীর কর্মচারীদের অস-ন্তোষ, তাকে দূর করতে হবে। গত ...শ চব্বিশ বছর একইভাবে চলছে ...লাদের উদ্যোগ ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ধরন, এটি এবার পালটান দরকার। ব্যক্তিগত যোগা-যোগ, ক্ষমতা, টাকা, মামলা করার ক্ষমতা সব কিছু থাকলেও যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শ্রমিক কর্ম-চারীর চোখে মুখে অসন্তোষ প্রকাশ পায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তার চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছুই নেই।

তাছাড়া অন্য আর একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণ মানুষ মনে করেন যে বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগের দিক থেকে তারা অনেক আধুনিক। এই আধুনিকতার ইমেজ বিড়লাদের নেই কেন? এটা কি ঘটনা, নাকি রটনা হিসাবেই এটা সত্যের মর্যাদা পেতে বসেছে? □

আলোকচিত্র : ব্যক্তিচিত্র বাদে অন্যান্য শংকর দাস নাগ

সত্যিই দেখে-দেখে অবাক

নতুন অধিক শক্তিশালী সুপার ৭৭৭ ডিটারজেণ্ট বার

এর শ্রেষ্ঠতার দাবি কেবল জোরদারই নয়, সেই দাবির অঙ্গীকারও বর্ণে-বর্ণে পালন করে।

এখন নতুন সুপার ৭৭৭ ডিটারজেণ্ট বারে আমি পাচ্ছি সবচেয়ে অধিক সাদা কাচা। এর ডিটারজেণ্ট ফর্মূলা আগের থেকেও ভাল হওয়ার দরুন. আগের চেয়ে অধিক ফেনা হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল চলে। এ সবের জন্যেই তো, এটা অন্য সব ডিটারজেণ্ট বার বা সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল।

ব্যবহার করে দেখুন ..আপনিও দেখে-দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন।

Shilpi DM 2/83 Ben.

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর কলম

হোমিও চিকিৎসা

[illegible]

পরিবর্তনের মত উচ্চমানের এবং বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে লেখার সুযোগ পাওয়াতে আমি আনন্দিত। হোমিওপ্যাথির মত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি মানুষের সেবা করতে চাই। আমার লেখায় বিভিন্ন অসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কথা পাঠক-পাঠিকাদের জানাব। এতে যদি তাঁরা সামান্য উপকারও পান তা হলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব। প্রথমে আমি মুখবন্ধ হিসেবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনপ্রিয়তার কারণ এবং কীভাবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হল সে বিষয়ে সামান্য দু চার কথা বলে নিতে চাই।

আজ হোমিওপ্যাথির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার মূল কারণ চারটি বলে আমার মনে হয়েছে। প্রথমত, এই চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর এবং এতে অসুখ সারে। দ্বিতীয়ত, অসুখ সেরে যাবার পরেও চিকিৎসার জন্য কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ আফটার-এফেকট হয় না। তৃতীয় কারণ হোমিও ওষুধের দাম কম। চতুর্থত শিশুদের এই চিকিৎসা ও ওষুধ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। হোমিওপ্যাথি ওষুধের স্বাদ মিষ্টি মিষ্টি, ছুঁচ ফোঁড়া নেই। কাজেই বাচ্চারা এই চিকিৎসায় আপত্তি করে না। আর তারা বড় হয়েও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দিকেই আগ্রহী হয়।

পৃথিবীর অত্যন্ত উন্নত দেশগুলিতেও আজ হোমিওপ্যাথি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমেরিকা, জারমানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বত্রই আজ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মানুষ খুব আগ্রহী হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে আমি দেখেছি মানুষের আগ্রহ। ঐ সব দেশে হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তার কারণ, তাঁরা দেখছেন এই চিকিৎসায় অসুখ সেরে যায় অথচ ওষুধের কোনওরকম খারাপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। অজস্র দোকানে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। অনেক অ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকানে হোমিওপ্যাথির জন্য আলাদা কাউনটার রয়েছে। সেখানে দেখেছি সব সময়েই ভিড়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্মদাতা মহাত্মা ডাঃ ফ্রেডেরিক স্যাম্য়েল হ্যানিম্যান কিন্তু ছিলেন সেকালের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক। জারমানির ড্রেসডেন হাসপাতালের প্রথম সারজন ছিলেন তিনি। মহাত্মা হ্যানিম্যান বহুভাষায় লিখতে আর পড়তেও পারতেন। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অগাধ।

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান মহাত্মা হ্যানিম্যানের সুনাম সারা ইউরোপে ছড়িয়েছিল একজন অ্যালোপ্যাথ হিসেবেই। এত নাম, যশ, অর্থ সত্ত্বেও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। কারণ তিনি দেখছিলেন চিকিৎসায় রোগ সারার পরে দেখা দিচ্ছে ওষুধের খারাপ প্রতিক্রিয়া। তিনি ভাবলেন, শুধুই কি টাকা রোজগারের জন্য চিকিৎসা করছি তা হলে? হতাশ হয়ে তিনি ডাক্তারি করাই ছেড়ে দিলেন। অনেক ভাষা জানতেন তিনি। তাই বিভিন্ন বই অনুবাদ করে কোনওক্রমে সংসার চালাতে লাগলেন।

একবার একটা সংস্থা কালেনস এর মেটিরিয়া মেডিকা তাঁকে অনুবাদ করতে দিলেন। অনুবাদের কাজ করতে করতে তিনি কুইনিন সংক্রান্ত চ্যাপটারে এসে থমকে দাঁড়ালেন। শুরু হল তাঁর বিপুল গবেষণা। প্রায় আঠার বছরের গবেষণার পরে তিনি 'অরগানন অব মেডিসিন' লিখলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রথম বই এটি। এই প্রসংগে জানিয়ে রাখি হোমিওপ্যাথি নামটা যেমন তাঁরই দেওয়া, অ্যালোপ্যাথি কথাটাও তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

অন্যান্য সব টেকনিকের মতই মহাত্মা হ্যানিম্যানের নতুন তত্ত্ব ও তথ্যে বহু লোক ভীষণ চটে গেল। অ্যালোপ্যাথি ওষুধের ব্যবসায়ীরা তাঁকে খুন করার ভয় দেখালেন। তিনি স্ত্রী পুত্র নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। বহু অত্যাচার আর দুর্ভাগ্যের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল। এই সময় ফ্রানসের এক ভদ্রমহিলা ওঁকে ফ্রানসে আসার আমন্ত্রণ করলেন। সেই ফরাসি ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করে শেষ জীবনটা মহাত্মা হ্যানিম্যান সে দেশেই কাটান। সারা জীবন এত কষ্ট পেয়েও তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং গবেষণা থেকে এক চুলও সরে যান নি। তিনি বলেছিলেন, জ্ঞানী হবার মত সাহস যাদের আছে তাঁদের সকলেরই এই ধরনের দুর্ভাগ্যের জন্য তৈরি থাকা উচিত। নিজের সমাধি ফলকে লেখার জন্য তিনি একটি বাক্যই পছন্দ করেছিলেন – আই ডিড নট লিভ ইন ভেন। অর্থাৎ জীবনটা আমি বৃথাই কাটাইনি।

ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচলনের কাহিনীও অনেকের কাছে খুব আকর্ষণীয় হতে পারে। মহারাজ রণজিৎ সিং সেই সময়ে খুব অসুস্থ। তাঁর দরবারে একদিন এলেন হনিক বারজার নামে এক জারমান হোমিও চিকিৎসক। রাজার অনুরোধে তিনি চিকিৎসা শুরু করলেন। প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী রাজা সুস্থ হয়ে উঠছেন দেখে স্থানীয় হাকিমরা হনিকের সংগে শত্রুতা শুরু করল। প্রাণভয়ে তিনি জারমানিতে ফিরে গেলেন। এরপরে তিনি আসেন কলকাতায়। কলকাতায় হোমিও চিকিৎসা শুরু হল। কলকাতা পুরসভায় হোমিও চিকিৎসককে প্রথম হেলথ অফিসার পদে নিয়োগ করা হল। ফোরট উইলিয়ামেও দু জন হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। এই সময়ে কলকাতায় হঠাৎ কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দিলে হোমিও চিকিৎসায় বহু মানুষের প্রাণরক্ষা হল।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় সকলেই হোমিও চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিও চিকিৎসা শুরু করলেন। তিনি যে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের চিকিৎসক ছিলেন সে কথা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন। অবশ্য হোমিও চিকিৎসার জন্য ডাঃ সরকারকে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

১৮৮১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা হোমিওপ্যাথি কলেজ। আজ সেটি সরকারি অধিগ্রহণে চলছে। ১৯৪৩ সালে ফজলুল হক হোমিও চিকিৎসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেন। ১৯৬৩ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন হোমিও চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারও হোমিও চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, মুখবন্ধ এখানেই শেষ হল। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আমরা বিভিন্ন অসুখ ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব। আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তারও জবাব দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করব। □

অনুসন্ধান

নদীয়ার জেলা শাসক সপ্তঋষির সঙ্গে সি পি এম নেতাদের বিরোধের নেপথ্যে

নদীয়া মুরশিদাবাদের অধিকাংশ বি ডি ও পঞ্চায়েতে কাজ করতে চাইছেন না

বিশেষ সংবাদদাতা

নদীয়া মুরশিদাবাদের অধিকাংশ বি ডি ও পঞ্চায়েতের কাজ করতে রাজি নন। বহু বি ডি ও জেলা থেকে বদলি হতে চান। নদীয়ায় শুধু বি ডি ও নয়, এস ডি ও এবং জেলান্তরের সরকারি অফিসাররাও বদলি চেয়েছেন। ইতোমধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনেক বি ডি ওকে দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে।

দুই জেলাতেই সি পি আই (এম) নেতারা বি ডি ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট অভিযোগ জানাননি, বলছেন, 'বি ডি ওরা সি পি আই (এম) বিরোধী মানসিকতায় ভুগছেন। বি ডি ওরা মনে করছেন সি পি আই (এম)-এর আবার দুর্দিন আসছে।'

মুরশিদাবাদের জলংগী ব্লকের বি ডি ও এবং নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বি ডি ওর উপর হামলাবাজির ঘটনার পর দুই জেলার সমস্ত বি ডি ও কাজ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুই জেলার দুই জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে এবং অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বি ডি ওরা প্রশাসনের স্বার্থে তাঁদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন। অনেকক্ষেত্রে পুলিশও বি ডি ওদের কথা শুনছে না। এমনকি বি ডি ও থানায় ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ ডায়েরি লেখাতে রাজি হয়নি।

নদীয়ার জেলা শাসক এল ভি সপ্তঋষির বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কো-অরডিনেশন কমিটির জেলা স্তরের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুরশিদাবাদের জেলা শাসক প্রসাদ রায়ও বেশ শক্ত মানুষ। রাজনৈতিক দলের নেতারা বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে জেলা শাসক কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায় একদিকে সরকারি অফিসাদের মনোবল কিছুটা শক্ত হয়েছে অন্যদিকে হামলাকারীরা আগের মত বেপরোয়া হতে পারছে না।

জলংগীর বি ডি ও জেলা শাসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফৌজদারি মামলাও দায়ের করেছেন। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বি ডি ও সুনীল মজুমদার মুনসেফের কোরটে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি এবং লোকাল কমিটির সম্পাদক আশুতোষ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। জলংগীর বি ডি ও সি পি আই (এম)-এর দশজনের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। জেলা শাসক প্রসাদ রায়ের কাছে এ ব্যাপারে মীমাংসার প্রস্তাব করা হয়েছিল। জেলা শাসক জবাব দিয়েছেন, অপরাধী আইন মাফিক শাস্তি ভোগ করলেই মীমাংসা হতে পারে। তা ছাড়া সম্ভব নয়।

নদীয়ার জেলা শাসকের সম্পর্কে সি পি আই (এম) নেতাদের বিরূপ মনোভাব এবং কো-অরডিনেশন কমিটির এক শ্রেণীর নেতার আচরণে সমস্ত সরকারি অফিসার মহল বিক্ষুব্ধ। জেলার সরকারি অফিসাররা প্রশ্ন তুলেছেন, জেলা শাসক এল ডি সপ্তঋষির অপরাধটা কী? জেলা শাসক নিজে অভিযোগের তদন্ত করেন এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন। সপ্তঋষিই প্রথম জেলা শাসক যিনি মন্ত্রীকে নিজের আসন ছেড়ে দেওয়াটা বিধিসম্মত বলে মনে করেননি। পঞ্চায়েত নিয়ে অভিযোগের শতকরা ৯০টি জেলা শাসক নিজেই তদন্ত করেছেন। জেলার অন্তত ১২ জন প্রধানকে গুরুতর দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করেছেন। শুধু সি পি আই (এম) নয়, কোন রাজনৈতিক দলকেই তিনি যে তোয়াজ করে চলেননি তার অনেক নজির মিলবে।

জেলা শাসক সপ্তঋষির সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর বিরোধ চলছে এক বছর ধরে। মাস চারেক আগের ঘটনা। খরার ব্যাপারে জেলা শাসক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন। সি পি আই (এম)-এর জেলা কমিটির সম্পাদক সমরেন্দ্র সান্যাল, কংগ্রেস (ই)র বিশ্বরূপ মুখারজি এবং সব দলেরই নেতারা আলোচনায় যোগ দিলেন। বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব করা হল, জেলাস্তরে কমিটি নয়, পঞ্চায়েত স্তরে কমিটি করা হোক। তা না হলে কোন কাজ হবে না। সি পি আই (এম) ছাড়া মোটামুটিভাবে সবাই প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। সি পি আই (এম) বিরোধিতা করল। সি পি আই (এম) নেতা বললেন, যে কমিটিই হোক না কেন সিদ্ধান্ত হবে জেলা কো-অরডিনেশন কমিটির বৈঠকে।

জেলার মন্ত্রী অমৃতেন্দুবাবু খুব চটে গেলেন। তিনি জেলা শাসককে আবার বৈঠক ডাকতে বললেন। মাস খানেক পরে জেলা শাসক আবার বৈঠক ডাকলেন। অমৃতেন্দুবাবু জেলা শাসকের চেয়ারে গিয়ে বসতে জেলা শাসক বললেন, স্যার সারকিট হাউসে মিটিং-এর জায়গা করেছি। অমৃতেন্দুবাবু ধরে নেন যে, জেলা শাসকের চেয়ারে বসাটা যেন সপ্তঋষি সহ্য করতে পারছেন না। তিনি জেলা শাসকের ওপর দারুণ চটে যান।

এরপর জেলা শাসক খরা পরিস্থিতি নিয়ে আবার বৈঠক ডাকেন। সি পি আই (এম) জেলা কমিটি জানিয়ে দেন যে 'শাসক দল হিসাবে সি পি আই (এম)কে আলাদা করে ডাকতে হবে। বিরোধী দলের সংগে ডাকলে চলবে না।'

জেলা শাসক বিরোধী দল অর্থাৎ কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (স), এস ইউ সিকে বৈঠকে ডাকলেন। কিন্তু বৈঠক হতে পারল না। জেলা কংগ্রেস (ই)র নেতা বিশ্বরূপ মুখারজি জেলা শাসককে বললেন, শাসক দল ছাড়া কোন আলোচনা করে লাভ নেই। খরার ব্যাপারে বৈঠক আর ডাকা হয়নি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর জেলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য জেলা শাসক ৪ জুন সর্বদলীয় বৈঠক (মেমো নং ৩৫৫৮/২০) ডাকলেন। বৈঠক চলছে। এমন সময় হঠাৎ চিৎকার চ্যাঁচামেচি। না, এ সব চলবে না। ডি এম-এর ইচ্ছামত প্রোমোশন দেওয়া চলবে না। একজন ড্রাইভারকে কেন প্রোমোশন দেওয়া হবে।

জেলা শাসক বৈঠক থেকে উঠে বাইরে গেলেন। কো-অরডিনেশন কমিটির একদল সমর্থক জেলা শাসকের উদ্দেশে বলতে থাকেন, আপনার গতিবিধির উপর এখন থেকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। জেলা শাসকের সংগে তাঁদের কথা কাটাকাটিও হয়।

কৃষ্ণনগরে যেদিন যাই সেদিন জেলা শাসক সপ্তঋষি ছিলেন না। ছুটি নিয়ে দিললি গিয়েছিলেন। জেলা শাসকের অফিসে তখন আলোচনা চলছিল, কোন ভদ্রলোক এভাবে কাজ করতে পারেন না। দিললিতে গিয়েছেন নিশ্চয় বেড়াতে নয়, অবশ্যই বদলি হতে চান। সপ্তঋষি সাহেব বোধ হয় পশ্চিম বংগে থাকতে চান না। ডি এম-এর ওপর কো-অরডিনেশন কমিটির লোক ছড়ি ঘোরাবে, পারটির নেতারা বলবেন জেলা শাসক কংগ্রেস (ই)-র লোক। এভাবে কোন অফিসার প্রশাসন চালাতে পারেন না। অতিরিক্ত জেলা শাসকরা বদলি হয়ে যাচ্ছেন। দুজন এস ডি ও চলে গিয়েছেন। বি ডি ওরা তো পা বাড়িয়ে বসে আছেন।

জেলা শাসকের অপরাধটা কী? সি পি আই (এম)-এর জেলা কমিটির এক নেতা বললেন, এখানে কিছু বলব না। কলকাতায় গিয়ে কমরেড সরোজ মুখারজির সংগে কথা বলবেন। আমরা তথ্য প্রমাণ সব পারটির পি সিতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এটা ঠিক, জেলা শাসক হিসাবে সপ্তঋষি কনভেনশন মানেননি। কংগ্রেস (ই)-র নেতারাও গোড়ায় গোড়ায় আশা করেছিলেন, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল হিসাবে কংগ্রেস (ই)কে জেলা শাসক খাতির করে চলবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। পঞ্চায়েত দুর্নীতির ব্যাপারে সি পি আই (এম)-এর অনেক প্রধানকে যেমন তিনি গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি মারদাংগা এবং বে-

আইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে কংগ্রেস (ই)র অন্তত ৫০ জনের বাড়ি তল্লাশ করা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলা যুব কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করে হাজতে পোরা হয়েছে। কংগ্রেস (ই)র নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রীর অনুরোধও জেলা-শাসক রক্ষা করেননি।

নদীয়া জেলার লোকের একটা সুবিধা হল, যে কেউ সরাসরি জেলা শাসকের সংগে দেখা করতে পারেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঘরের সামনে সাক্ষাৎপ্রার্থীর ভিড়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজে তদন্ত করেন। তা না হলে জেলার পদস্থ অফিসার তদন্ত করে সাতদিনের মধ্যে রিপোরট দেন।

নদীয়ার জেলা শাসক সংতথ্যষির পর সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কৃষ্ণগঞ্জের বি ডি ও সুনীল মজুমদারকে নিয়ে। বি ডি ওরা পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসারও বটে। শক্ত ঘাঁটি কৃষ্ণগঞ্জে এবারের নির্বাচনে ধস নেমে গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশুতোষ ঘোষ, যিনি বি ডি ওকে জুতো মেরেছিলেন বলে অভিযোগ, পরাজিত হয়েছেন। আর শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও নির্বাচনে হেরেছেন।

কৃষ্ণগঞ্জের বি ডি ও সুনীলবাবু রানাঘাট থেকে বদলি হয়েছেন ১৯৮০ সালের ২১ জুলাই। তারপর থেকেই নানা ব্যাপারে ঠোকাঠুকি চলছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশুবাবু পেশায় স্কুল মাস্টার হলে কী হবে, সভাপতি হবার পর তাঁর দাপট বেড়ে যায়। কথা বার্তায় তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন বি ডি ওরা পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নির্দেশ মতই তাঁকে কাজ করে যেতে হবে।

প্রথম দিকে আশুবাবু কিছু কিছু ব্যাপারে বি ডি ওর সংগে পরামর্শ করতেন। পরে সে সব পাট চুকিয়ে দেন। মাঝে মাঝে খাতির করতেন বি ডি ওকে দিয়ে সই সাবুদ করানর জন্য। কিন্তু সুনীলবাবু কতকগুলি ব্যাপারে সই করতে আপত্তি জানান। জমি বিলি, মাটি ফেলা, খাল কাটা প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রামবাসীর অভিযোগ সম্পর্কে বি ডি ও তদন্ত করেন। জেলা শাসকই বি ডি ওকে তদন্ত করতে বলেন। এই তদন্ত করার ব্যাপারে একজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আপত্তি জানান।

টাকা পয়সা লেন-দেন সবই করতেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশুবাবু। বি ডি ও বললেন, আর্থিক লেনদেনের কোন ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নেই। তাতে আশুবাবু নাকি আপত্তি জানিয়ে বলেন, আমাকে আইন শেখাতে আসবেন না। আমার পারটি আমাকে এমনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করেনি।

মাঝে মাঝে বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মধ্যে কথাও বন্ধ হয়ে যেত। বি ডি ওকে বদলি করার কথাও উঠেছে। এরপর গোলমাল বাধে সিমেনট বিলি এবং সভাপতির নামে ব্যাংক অ্যাকাউনট খোলা নিয়ে। অভিযোগ ওঠে প্রায় তিন হাজার বস্তা সিমেনটের হিসাব নিয়ে। বি ডি ও অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসার অভিযোগ করেন, নদীয়া জেলা পরিষদ কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের জন্য ২৯৮০ বস্তা সিমেনট বরাদ্দ করেন। প্রতি বস্তায় থাকে ৫০ কেজি সিমেনট। সাত কিস্তিতে ওই সিমেনট পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালের ১০ জুলাই প্রথম কিস্তি দেওয়া হয়। এরপর ৬ আগসটের কিস্তিতে (মেমো নং ৩৭১৩/৮৪৮) যে বার শ বস্তা সিমেনট দেওয়া হয় তা সভাপতির ইচ্ছামত বিলি করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এর কোন হিসাব রাখা হয়নি। এগজিকিউটিভ অফিসার সংগে সংগে আপত্তি জানান এবং বলেন, সিমেনট বিলি বা টাকা পয়সা ইচ্ছামত খরচ করার কোন অধিকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নেই।

জেলা পরিষদ থেকেও অভিযোগ করা হয় যে তিন হাজার বস্তা সিমেনট বিলির ব্যাপারে নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না। এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে রিপোরট চেয়ে পাঠান। অভিযোগ, সিমেনট বিলির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠকে নেওয়া হয়নি। কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলেছেন তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতিব কাছ থেকে এক বস্তাও সিমেনট পাননি।

১৯৮১ সালের ১৪ সেপটেমবর জেলা পরিষদ সচিব এক নির্দেশে [মেমো নং ১৮২২ (২)] জানিয়ে দেন, জেলা পরিষদ থেকে পাওয়া যে কোন জিনিস এবং টাকা পয়সার হিসাব রাখার দায়িত্ব পুরোপুরি পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসারের অর্থাৎ বি ডি ওর।

এখানেই শেষ নয়। পঞ্চায়েত সমিতির হিসাবে গোলমাল, ক্যাশ বুক ঠিক নেই, নিয়মিত সভা ডাকা হয় না, ব্যাংক অ্যাকাউনটে বড় রকমের গরমিলের অভিযোগ নিয়ে কৃষ্ণগঞ্জের গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়। কৃষ্ণগঞ্জ গরিব এলাকা। প্রতি বছরই খরায় ক্ষতি সইতে হয়। জেলা প্রশাসনের এক মুখপাত্র অভিযোগ করেন, টাকার অভাবে বছরের পর বছর ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়নি। গরিব মানুষ কোন ত্রাণ সাহায্য পায়নি। পঞ্চায়েতের কাগজ পেনসিল কেনা হয়নি। কিন্তু সাত হাজার তিন শ টাকার জল খাবার খাওয়া হয়েছে। আর এই খরচের কোন পাকা রশিদও নেই।

বিস্ফোরণ ঘটল ৩ অকটোবর। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশুবাবু একটি ছেলেকে চিঠি এবং অথরিটি লেটার দিয়ে বি ডি ওর কাছে পাঠান তাঁর অনারেরিয়াম বাবদে মাসিক ১৫০ টাকা দেবার জন্য। বি ডি ও নাকি পালটা চিঠি দেন যে, ছেলেটির বয়স ১২ বছর, সাবালক নয় আর অথরিটি লেটার ঠিকমত লেখা হয়নি। অভিযোগ, এরপর আশুবাবু রেগেমেগে সাইকেল নিয়ে বি ডি ওর ঘরে চলে আসেন এবং শুয়োরের বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন। আশুবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বলেন, শুয়োরের বাচ্চা তুই আমাকে আইন শেখাবি! বি ডি ও সুনীলবাবু প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বলেন, আপনি কি সুস্থ আছেন? এরপর আশুবাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে বি ডি ওকে পায়ের জুতো খুলে মারেন। অফিসের কর্মচারীরা প্রথমে হকচকিয়ে যান। দ্বিতীয়বার জুতো দিয়ে মারার চেষ্টা করলে কর্মচারীরা আশুবাবুকে বাধা দেন। এরপর থেকে বি ডি ও এবং আশুবাবুর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। ইতোমধ্যে বি ডি ওকে বদলি করারও চেষ্টা হয়েছে।

জেলা শাসক এল ভি সংতথ্যষি বি ডি ওকে জুতো মারার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য মহকুমা শাসক আলম এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক আর গাংগুলিকে কৃষ্ণগঞ্জে পাঠান।

কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপ্তি রায়-চৌধুরীর কার্যকলাপে ওই এলাকায় গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। দীপ্তিবাবুর নির্দেশে কয়েকজনের জমির উপর দিয়ে খাল কাটা হয়। গ্রামের লোক দলমত নির্বিশেষে এক জোট হয়ে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত জেলা শাসক হস্তক্ষেপ করেন। তখন দীপ্তিবাবু বলেন, প্রধানের কাজে সরকারি আমলাদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু গ্রামের সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)র সমর্থকরা বলেন, প্রধান গ্রামের গরিব মানুষের ওপর বেশ কিছুদিন থেকেই জুলুম চালাচ্ছিলেন। জেলা শাসক নির্দেশ দেন আইন নিজে হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারুর নেই। অবিলম্বে খাল বুজিয়ে দেওয়া হোক।

শিবনিবাস গ্রাম বহু প্রাচীন গ্রাম। বিরাট শিব মন্দির দেখতে দূর দূর থেকে লোক আসে। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক সি পি আই (এম)-এর শক্ত ঘাঁটি। শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েত গত ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে পুরোপুরি সি পি আই (এম) দখল করে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি আই (এম)-এর হাত থেকে কংগ্রেস (ই) ছিনিয়ে নিয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশুবাবু এবং শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপ্তি রায়চৌধুরী পরাজিত হয়েছেন। দুজনেই হেরেছেন কংগ্রেস (ই)র কাছে।

মুরশিদাবাদের জলংগী ব্লকের বি ডি ওর ওপর হামলাবাজির ঘটনায় গোটা জেলায় এখনও সরকারি অফিসার মহলে বিক্ষোভ চলছে। ঘটনাটি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের। নির্বাচনের মনোনয়ন বৈধ না অবৈধ এই নিয়ে বি ডি ওর সংগে সি পি আই (এম) প্রার্থী ও তাঁর সংগীদের সংগে কথা কাটাকাটি চলে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর বি ডি ও মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেন। অভিযোগ হল, সংগে সংগে কয়েকজন লোক ভাঙচুর শুরু করে। কয়েকজন বি ডি ওকে মারধর করে এবং মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণার দাবি জানাতে থাকে।

বি ডি ও তাঁদের বলেন, কংগ্রেসের তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করার সময় তো কোন আপত্তি বা হাংগাম হয়নি। অথচ অবৈধ মনোনয়নপত্র কীভাবে বৈধ করা যায়! এটা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বৈধ বলে না ঘোষণা করায় বি ডি ওর উপর একদল লোক চড়াও হয়। বি ডি ও প্রাণ ভয়ে টেবিলের তলায় ঢুকে পড়েন। কিন্তু লোকজন তাঁকে টেনে বের করে পিঠের উপর পামপ সেট চাপিয়ে দেয়।

ওই অবস্থা দেখে একজন ছুটে গিয়ে থানায় খবর দেন। কিন্তু থানা থেকে পুলিশ আসেনি। ঘণ্টা খানেক হামলাবাজির পর লোকজন বি ডি ও অফিস থেকে চলে যায়। এরপর বি ডি ও নিজে থানায় যান কিন্তু পুলিশ তাঁর ডায়রি নিতে অস্বীকার করে।

বি ডি ও সোজা বহরমপুরে এসে সমস্ত ঘটনা জেলা শাসককে জানান। জেলা শাসকের নির্দেশে দশজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। □

দালাই লামার নেতৃত্বে নির্বাসিত তিব্বত সরকারের কাজকর্মে ভারত আপত্তির কিছু দেখছে না

নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার

বেশ প্রকাশ্যে ১৯৬০ সাল থেকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিবেশী তিব্বতের নির্বাসিত সবকার ভারতের হিমাচল প্রদেশস্থ ধরমশালায় পবিত্র দালাই লামার একচ্ছত্র নেতৃত্বে। নিউইয়রক, টোকিও, জেনেভা, ব্যাংকক ও অন্যান্য দেশের মত ভারতেও আছে এই নির্বাসিত তিব্বত সরকারের দূতাবাস। নয়া দিললির দক্ষিণভাগে ১০ নমবর বিং রোডে এদের দূতাবাসটি রয়েছে, অবশ্য ভাবত সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু বলা যায়, চোখ বুজে এই নির্বাসিত সরকারকে তাবা মেনেই নিয়েছে।

সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে জানতে পারি, ১৯৫৯ সালে দালাই লামা চীন-অধিকৃত তিব্বত থেকে চলে আসছেন গৌতম বুদ্ধের জন্ম-দেশ ভারতে। সংগে ছিল কিছু সৈন্য সামন্ত, অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি ও তাঁর নেতৃত্বে (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক) বিশ্বাসী কয়েক সহস্র তিব্বতি। আজ তাঁবা ভারতে প্রায় ৮০ হাজাব। নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদেব অনেকে আবাব অন্যান্য দেশেও আছেন। মুখ্যত এই এদেব সরকাব। তিব্বতিদের নির্বাসিত সবকার কাজ করে যাচ্ছেন ১৯৬০ সাল থেকে। এবং অনেক প্রকাবে সতাসতাই কাজ করছে এই সরকার।

ইচ্ছা করলে ভাবত সরকার এইসব তিব্বতি কাজকর্মে বাধা দিতে পারত। সেই ইচ্ছা কোন কারণে কার্যকর কবা হয়নি। এক সময় সরকারি বিবৃতিতে মাত্র বলা হয়েছিল, ভারতে দালাই লামা যেন রাজনৈতিক কাজে ব্যাপত না হন। নীতিগতভাবে দালাই লামার নেতৃত্বাধীন সরকার ভারত সরকারকে সন্তুষ্ট রেখেছে। কেননা ঐ নির্বাসিত তিব্বতি সরকার শুধু দেখভাল করছে ভারতে বসবাসকারী তিব্বতিদের। সেই সংগে তিব্বতের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তাভাবনা করে তারা।

দিল্লিস্থ চীনা দূতাবাসের সামনে তিব্বতি বিক্ষোভ

বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, আজ তিব্বতের রাজধানী লাসা কার্যত স্থানান্তরিত হয়েছে ধরমশালায়। ওখানেই নির্বাসিত সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। সংবাদপত্র পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন, তাদের দাবি হল তিব্বতের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ তিব্বতিরা নিজেরাই স্থির করবেন। এতে ভাবত সত্যি জড়িত কিনা সে প্রসংগ অবান্তর।

দালাই লামা সরকারের আছে ক্যাবিনেট যাকে ওরা বলেন 'কাশাগ', উচ্চতম কার্যনির্বাহক সংগঠন। তাদের ভাষায় মন্ত্রীদের বলা হয় 'কালন'। তাদের নির্বাচিত করেন দালাই লামা নিজে। কিছুকাল আগেও ছিল ছয়জন কালন এবং একজন উপ-কালন।

দালাই লামা সরকারের শাসন বিভাগের মন্ত্রকের মধ্যে আছে : ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাগ যেটার অধীন শিক্ষা বিভাগও। এসব একটি পরিষদের অধীনে এবং এদের একটি প্রধান কর্তব্য হল নির্বাসনে তিব্বতিদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বজায় রাখা। ভারত ও অন্যান্য দেশের সবকারের সহায়তায় এই পরিষদ একশ পঞ্চাশটিরও অধিক মঠ স্থাপন করেছে ভাবত, নেপাল, ভূটান, আমেরিকা, ইংলনড ও সুইৎজারল্যানডে। এদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল সারনাথ ও ধরমশালায়। এখানে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে অনেককে পাঠান হয়। এগুলিতে থাকেন অনেক মঠবাসী লামা।

আরও মন্ত্রক আছে। যেমন ধরা যাক, স্বরাষ্ট্র। এটি ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মত নয়। এর অধীনে আছে তিব্বতিদের জন্য গোটা বার কৃষি-বসতি। আর আছে ২০টি কৃষিগত শিল্প সংস্থা এবং গোটা দশেক কুটির শিল্প সংস্থা। এগুলোর আওতায় পড়েন প্রায় পঞ্চাশ হাজার তিব্বতি। বর্তমানে সে সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই শাসন বিভাগের অধীনে আছে ১৫/২০ হাজার তিব্বতি যারা বসতি নিয়েছেন নেপালে। ভূটানে কিছু কাল আগেও ছিল ছয়টি কৃষি-বসতি এবং প্রায় চার হাজার তিব্বতি। অনেকেরই মনে আছে নিশ্চয় সাম্প্রতিক কালে এরাই ভূটানের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করার জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারত সরকার সে সময় জানিয়েছিল যে প্রয়োজন হলে ওদের ভারতে শরণার্থী হিসাবে নেওয়া হবে। এদের ছাড়াও ভূটানস্থ কিন্তু

ভাটিনায় তিব্বতিদের শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

তিব্বতিকে নিয়ে ভূটান সরকারের সমস্যা আছে। এইসব কথাবার্তা চলে ভারত-ভূটান ও ধরমশালার তিব্বতি সরকারের মধ্যে।

কিন্তু ঐ মন্ত্রক অথবা বিভাগ এখনও সমাধান করতে পারেননি প্রায় ২০ হাজারের মত তিব্বতিদের সমস্যা। এদের অধিকাংশই জীবন যাপন করেন দার্জিলিং, কালিমপং, শিলং, ধরমশালা, মুসৌরি ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ছোটখাট ব্যবসা করে। এদের অনেককেই আমরা শীতকালে দেখি সমতলের এলাকায়, তারা অনেক ধরনের পশমের জামাকাপড় নিয়ে আসেন কলকাতা, দিললি, সিমলা, চন্ডীগড়–বড় বড় প্রায় সব শহরে। অনেকের কাছে থাকে হাতে আঁকা ছবি, এক ধরনের কমদামী পাথর, গলার হার ইত্যাদি।

প্রতিটি তিব্বতি বসতির শাসন চালান একজন করে 'ওয়েলফেয়ার অফিসার'।তাঁকে নিযুক্ত করে নির্বাসিত তিব্বতি সরকার। এই কর্মচারীর অধীনে থাকে সহযোগী সমিতি, হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং শিশুদের দেখাশোনার কেন্দ্র।

এই সরকারের শিক্ষা পরিষদের হাতে ন্যস্ত এক গুরু দায়িত্ব–যাতে বিদেশস্থ তিব্বতিরা ভিন দেশের পরিবেশে না হারিয়ে ফেলে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ভিন দেশের ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের মত যেন না হয়ে যায়। এরা যাতে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে সেটা দেখাই এর উদ্দেশ্য। ধরমশালার এক সরকারি ভাষ্য অনুসারে, 'ভবিষ্যৎ তিব্বতের বীজ-কে' রক্ষা-আরক্ষা এই পরিষদের কাজ।

অনেকে হয়ত বিস্মিত হবেন যে এই পরিষদ পরিচালনা করে প্রায় পঞ্চাশটি বিদ্যালয়। ভারত, নেপাল ও ভূটানের নানা তিব্বতি বসতিতে এগুলি আছে এবং এগুলির মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। সাত আটশ তিব্বতি আছেন শিক্ষণ কাজে। এক বছর আগেও প্রায় তিনশ জন তিব্বতি শিক্ষা নিচ্ছিলেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্ম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এই তিব্বতি শরণার্থীদের মধ্যেই গড়ে উঠেছে প্রায় দুশ বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক। সেই সংগে আছেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা প্রায় নয়শ জন।

এই নির্বাসিত সরকার অনাথ শিশুদেরও ভোলেনি। অন্যদের সহায়তায় এরা চালাচ্ছেন অনাথ কেন্দ্র ধরমশালাও মুসৌরিতে। দেখভাল করছেন প্রায় দুহাজার শিশুকে।

দায়িত্ব বাড়ার সংগে সংগে নির্বাসিত সরকারকে গড়তে হয়েছে একটি অর্থ বিভাগ, বলা যেতে পারে অর্থ মন্ত্রক। ঐ সরকার পরিচালনার জন্য টাকা পয়সা এই বিভাগ সংগ্রহ করেন। এবং পরিচালনা করেন কয়েকটি ব্যবসামূলক সংস্থা, যাতে তিব্বতিরা কাজ করার ও উপার্জনের সুযোগ পান। হাতে গড়া সামগ্রী তৈরির কাজে এই বিভাগ সক্রিয়। হাতের কাজের মধ্যে ভারতের তৈরি তিব্বতি কারপেট অনন্য। এদের একটি সংস্থা আছে দিললিতে, যেমন আছে একটি তিব্বতি ওষুধের সংস্থা।

এ সরকারের আদেশ অনুসারে প্রতিটি উপার্জনশীল তিব্বতি তাঁর সরকারকে ঐচ্ছিকভাবে দেয় এক টাকা প্রতি মাসে। আর যারা মাসিক মাইনে পায় কিংবা সম্পন্ন অবস্থার, তাদের দিতে হয় মাসিক আয়ের শতকরা দুই ভাগ। বিদেশস্থ তিব্বতিরাও এই সরকারের কোষে ভাল টাকা দিয়ে আসছেন। অর্থ বিভাগ চোদ্দটি দেশের সংগে রপ্তানি ব্যবসা দেখাশোনা করে। স্বভাবতই পুণ্যাত্মা দালাই লামার সরকারের আছে একটি নিরাপত্তা বিভাগ এবং একটি তথ্য বিভাগও।

সরকারের আছে সেকরেটারিয়েট, তাতে কাজ করেন প্রায় তিনশ জন। এরা মন্ত্রণালয় পরিচালনা বিভাগের অধীন। দিললির 'মিশন'-এও ব্যস্ত বেশ কয়েকজন তিব্বতি স্ত্রীলোক ও পুরুষ। পন্ডিত ব্যক্তিরা ও গবেষকরা জেনে খুশি হবেন যে, স্বয়ং দালাই লামার অধিকর্তৃত্বে আছে একটি লাইব্রেরি এবং প্রাচীন পুস্তকাদির রক্ষণশালা, যাতে আছে ৩৩ হাজারের মত মূল্যবান দলিলপত্র ও গ্রন্থাদি।

এর থেকেই বোঝা যায় পরিপূর্ণ সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের কোন ঘাটতি নেই। □

আলোকচিত্র : দালাই লামার তথ্যদপ্তর থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

কার্পেট সারানর কাজে তিব্বতি

পত্নী হত্যার অভিযোগে বীরভূমের সুকুমার মন্ডলের ফাঁসির আদেশ

কেউ বলছেন ফাঁসির আদেশ যথার্থ, কারও মত – এ বড় অমানবিক

পরিবর্তনের
ক্রাইম রিপোরটার
পিনাকী মজুমদার

সিউড়ি জেলের এক নমবর কনডেমড সেল। সেলের প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বছর কুড়ির এক সুদর্শন যুবকের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ।

নাম সুকুমাব মন্ডল। ফাঁসিব আসামী সুকুমার মন্ডল। আপিল অগ্রাহ্য হলে পত্নী হত্যাব অপবাধে সিউড়ি জেলে ফাঁসি হয়ে যাবে তার।

পশ্চাদপট

সিউড়ি টাউন থেকে ৬ কিলোমিটার দূরের মালিহা গ্রামেব বাসিন্দা মুক্তিপদ মন্ডল, তার স্ত্রী গায়ত্রী কিংবা আশেপাশের প্রতিবেশীদের চোখে এখনও ভেসে ওঠে ফুটফুটে ফরসা একটি মেয়ে। শান্ত, সুশ্রী। সিউড়ি টাউনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী মুক্তিপদ মন্ডলকে কেউ কেউ হাঁক পেড়ে বলেছেন--তোমার বড় মেয়েডা সুন্দর হইয়েনছে বটে!

মুক্তিবাবুর প্রথম সন্তান অন্নপূর্ণার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে স্বাভাবিক রীতিতেই। সেই সংগে আশেপাশের লোক মুগ্ধ হয়েছেন তার শান্ত এবং বিনম্র স্বভাবের জন্যেও। কাছাকাছি বাণী মন্দির স্কুলেই মুক্তিবাবু ওকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। স্কুলের পরিবেশে মেধাবী ছাত্রী হিসেবে যতটা না পরিচিত তার চেয়েও বেশি–'ভীষণ শান্ত, দারুণ ভদ্র' হিসেবেই।

'পরিচিত জনের কাছে অতিপ্রিয় শান্ত স্বভাবের অন্নপূর্ণার জীবন কিন্তু শান্তিপূর্ণ হয়নি।'–এ ক্ষোভ এখন শুধু মালিহা গ্রামই নয়, গোটা বীরভূম জেলাকেই আচ্ছন্ন করছে। সুন্দরী অন্নপূর্ণা তখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্রী। অন্নপূর্ণাব এক জ্যাঠামশায়ের 'সম্বন্ধী' সম্বন্ধ আনলেন বিয়ের, অন্নপূর্ণার জন্যে। পাত্র ইমাদপুর গ্রামের গদাধর মন্ডলের দ্বিতীয় পুত্র সুকুমার। সুদর্শন যুবক, মাধ্যমিক পাশ করতে পারেনি। জায়গা-জিরেত, হাল বলদ আশেপাশের লোকের ঈর্ষাব কারণ। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত চাষী পরিবারের সব কটি মাত্রার সুসম সমন্বয়। সুতরাং হাতে স্বর্গ পাবার মত করেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন ব্যাংকের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মুক্তিপদ মন্ডল।

'এ বিয়েতে দেনা-পাওনার ব্যাপারটাও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।' – এ দাবি করেছেন অন্নপূর্ণার বাবা মুক্তিবাবু এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা। সুতরাং পাত্রপক্ষের চাওয়া পাওয়ার সমান্তরাল রেখায় মুক্তিবাবুর হাত গলে বেরিয়েছে ভরি ছয়েক সোনা, ছেলের আংটি, বোতাম, ঘড়ি এবং নগদ টাকা তিন হাজার। পরিণতিতে গত ১৮ এপরিল ১৯৮০ তারিখে মালিহা গ্রামের মন্ডল বাড়িতে বেজে উঠেছিল বিয়ের উলুধ্বনি।

উলুধ্বনি, শংখধ্বনি, যজ্ঞ, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই ষোড়শী অন্নপূর্ণা এবং বছর কুড়ির সুকুমারের শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হল। অবশেষে অন্নপূর্ণার পতিগৃহে যাত্রা।

পবিবর্ধিত বিবাহানুষ্ঠান, অষ্ট মংগলা এবং দ্বিরাগমনকে কেন্দ্র করে মোট দুবার অন্নপূর্ণা ফিরে এসেছিল বাপের বাড়িতে। সংগে স্বামী সুকুমার। 'ওই শেষ। এবপর আর বাপের বাড়ি আসা ওব ভাগ্যে হল না।' –অন্নপূর্ণার বাবা মুক্তিবাবুর অশ্রুভেজা আক্ষেপ।

অন্নপূর্ণা শেষবাবের মত বাপেব বাড়ি থেকে ঘুরে যাবার পর অবশ্য মুক্তিবাবুর বাড়ির তরফ থেকে বাব দুই অন্নপূর্ণার খোঁজ নেওয়া হয়েছে। প্রথমবাব অন্নপূর্ণার ছোট ভাই কল্যাণ। পরের বার জ্যাঠামশায় গুরুপদ মন্ডল।

কল্যাণ দিদির বাড়ি থেকে ফিরে আসতেই মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা ছেঁকে ধবেছিলেন ওকে। 'কী রে! দিদিকে কেমন দেখলি?......শ্বশুববাড়ির লোকজন কেমন?....আদর যত্ন করল?......জামাইবাবু?'

ঝাঁকঝাঁক প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু কল্যাণের উৎফুল্লতা প্রকাশ পায়নি। বছর পনেরর কিশোর কল্যাণের মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছিল। 'হুঁ হাঁ' করে এড়িয়ে গিয়েছে। পরে আড়ালে মাকে বলেছে--'দিদিকে খুব হাসিখুশি দেখলাম না।'

পনের বছরের কিশোরের এ কথায় খুব একটা গুরুত্ব দেননি মুক্তিবাবু। এ স্বীকারোক্তি মুক্তিবাবুর নিজেরই। ভেবেছিলেন 'ওইটুকু ছেলে কী বুঝতে কী বুঝেছে, কে জানে!'

গুরুপদবাবু ফিরে এসেও কিন্তু একই মন্তব্য করেন। দাদার কথায় মুক্তিবাবু সামান্য চিন্তিত হন। 'অন্নপূর্ণা শান্ত হলেও গোমড়ামুখো মেয়ে নয়। তবে?' অথচ সোজাসুজি এ সব কথা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে জানতে চাওয়া যায় না।

মুক্তিবাবু চিন্তিত ছিলেন। খোঁজ নেওয়ার কথা ভাবতেন। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠছিল না। চিঠিপত্রে এ সব কথা জানতে চাইলে শ্বশুরবাড়িতে প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভবনাই বেশি। 'তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।' সুতরাং আশা করেছেন যদি মেয়ের কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র আসে।

'কিন্তু আসেনি। আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে খুবই চাপা স্বভাবের। ওর দুঃখের কথা জানিয়ে সম্ভবত আমাদের চিন্তায় ফেলতে চায়নি।' –চিঠিপত্র না দেওয়ার ব্যাপারে অন্নপূর্ণার পক্ষে যুক্তি টেনেছেন ওর বাবা মুক্তিবাবু। বলেছেন–'হয়ত বা ও বুঝতেও

পারেনি যে এরকম কিছু ঘটবে। সরল ছিল তো খুব।'—অবশেষে......

ডাকাত! ডাকাত!!

সিউড়ি শহর থেকে ষোল কিলোমিটার দূরের গ্রাম ইমাদপুর। আয়তন কিংবা লোকসংখ্যার বিচারে একেবারে ছোট না হলেও মাঝারি আকারের। ছোট বড় বেশ কিছু মাটির বাড়ি ছড়ান ছিটান। দু'পাশে চাষের জমি।

নির্জনতায় ভরা গ্রাম্য পরিবেশের অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় একটা মাটির দোতলা বাড়ি। এ বাড়িরই বাসিন্দা সুকুমার মণ্ডল এবং ওর স্ত্রী অন্নপূর্ণা। সুকুমার ওর বাবা গদাধর মণ্ডলের সংগেই থাকেন। অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবার। কিন্তু সুকুমারের বাসস্থান মূল বাড়িটা থেকে বিচ্ছিন্ন।

গত ১০ জুন ১৯৮০ তারিখে যথারীতি ইমাদপুর গ্রামে মাঝরাতের নিস্তব্ধতা নেমেছিল রাত নটা বাজতে না বাজতেই। সন্ধ্যের দিকে আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির ছিটে ফোঁটা রুক্ষ মাটির উত্তাপকে নামাতে পারেনি এতটুকু। তবু নিস্তব্ধতা জাঁকিয়ে বসেছিল গ্রাম্য পরিবেশের সহজাত রীতিতেই।

রাত প্রায় দেড়টা। ইমাদপুরের গ্রাম্য পরিবেশে তখন একটানা ঝিঁঝি পোকার কান্না। দু'চারটে রাতজাগা পাখির এলোমেলো ডানা ঝাপটানর আওয়াজ। তাছাড়া শুধু শুনশান নিস্তব্ধতা।

কিন্তু হঠাৎই সেই নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছিল একটা চিৎকারে 'ডাকাত' ডাকাত পড়েছে বাড়িতে' কই গো কে আছ শিগ্গি এইসো।'

আশেপাশের বাড়ির মানুষগুলোর কানে সে চিৎকারের রেশ পৌছলেও হুড়মুড়িয়ে কেউ বেরিয়ে আসেনি। প্রতিবেশী একজন জানিয়েছেন-'ডাকাত, ডাকাত রব উঠলেও, চিৎকারটা শুনে বুঝতে পারিনি এ রকম একটা ঘটনা ঘটে গেইনছে।' শুধু এই একজনই নয়, বেশ কয়েকজনই এই প্রতিবেদকের সংগে কথা বলার সময় যে কথা বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে—বাড়িতে ডাকাত পড়লে সাহায্যের জন্যে যে তীব্র আর্তনাদ ওঠে সেদিন সেই 'ডাকাত, ডাকাত'-রবের মধ্যে তার ছিটে ফোঁটাও ছিল না।

তবু কিছুক্ষণের মধ্যেই সুকুমার মণ্ডলের বাড়ির সামনে বেশ কিছু গ্রামবাসী এসে জড়ো হলেন। ততক্ষণে সুকুমারের বাড়ির লোকেরাও এসে পৌছেছেন। সুকুমার তখন হাউমাউ করে গ্রামবাসীদের জানিয়েছিল-'সব্বোনাশ হয়ে গেছে। ডাকাত পইড়েছিল। অন্নর গা থেকে সব সোনা গয়না লুঠে নিয়েছে। অন্ন বাধা দিতি গেছিল। ওরে কোপায় গেছে ডাকাতরা। হায় হায় কী সব্বোনাশ......!'

'সুকুমারের এই আফশোসের রেশ ফুটে উঠেছিল ওর বাড়ির লোকজনদের কথাতেও।' -উপস্থিত কয়েকজন গ্রামবাসী এবং পুলিশের মুখপাত্রের অভিযোগ এরকমই। যাই হোক, সুকুমার এবং ওর বাড়ির লোকজনদের কথায় উপস্থিত গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সুকুমারের বাড়ির মধ্যে ঢোকেন। তারা লক্ষ্য করেন বাড়ির সদর দরজা অক্ষত। বাড়ির মধ্যে কোন হুটোপুটির চিহ্ন নেই। লণ্ডভণ্ডও হয়নি কোন কিছু।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই সুকুমারের শোবার ঘর। ঘরের দরজা তখন খোলা। আর সেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়েই দেখা যাচ্ছে ঘরের তক্তাপোষের ওপর ডান দিকে মাথা কাত করে চিত হওয়া অবস্থায় রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে রয়েছে অষ্টাদশী অন্ন। পাশে সুকুমারের শোয়ার জায়গাটাও রক্তে ভেসে গেছে।

আঁতকে উঠেছিলেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী। 'এ কী বীভৎস আক্রমণ' কোপের পর কোপ মারা হয়েছে। গলার কাছে এবং মাথার ওপর কিছুটা অংশ হাঁ হয়ে আছে!' প্রত্যক্ষদর্শীরা এক মুহূর্তেই অনুমান করতে পেরেছিলেন অন্নপূর্ণার দেহে প্রাণ নেই।

ইতিমধ্যেই রাতের পাহারাদার তথা চৌকিদারের কানেও এই দুঃসংবাদের রেশ এসে পৌচেছিল। ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছিল সুকুমার মণ্ডলের বাড়ির দরজায়।

লাঠি হাতে চৌকিদার ঘটনাস্থলে পৌছেই উপস্থিত গ্রামবাসী এবং সুকুমারের উদ্দেশে জানতে চেয়েছিল - ডাকাত - কখন এল - কোনদিক দিয়ে এল, গেলই বা কোনপথে - ক'জন ছিল দলে -

চৌকিদারের এই ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্নে গ্রামবাসীরা নিরুত্তর। দু' একজন শুধু বললেন কী জানি, আমরা তো কিছু টের পাইনি। হঠাৎ ডাকাত ডাকাত চিৎকার শুনে এসে দেখি এই ব্যাপার।

সুকুমার কিন্তু সে মুহূর্তে নিরুত্তর থাকেনি। চৌকিদারের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল-'কোনদিক দিয়ে এসেছিল কী করে জানব' দরজা ধাক্কা দিতে দরজা খুলি। চার পাঁচজন লোক হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে। অন্নর গা থেকে গয়না খুলতে গেলে অন্ন বাধা দেয়। একজন টাঙি দিয়ে অন্নকে কোপ দেয়। আমাকে ধাক্কা দেয়। আমি ঘরের বাইরে ছিটকে পড়ি। তারপর আর কিছু জানি না। ওরা দুই দিক দিয়ে পালিয়ে যায়।'—সুকুমার বাড়ির ডানদিকের রাস্তা দেখায়।

ঘটনা কি সত্যি?

সুকুমারের এই বক্তব্য জানিয়েছেন এই ঘটনার তদন্তকারী একজন পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের কাছ থেকেই জানা যায়, 'এর সামান্য কিছু পরেই সুকুমার ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় ওই গ্রামেরই একজনের বাড়িতে। বলে—এ দৃশ্য সে আর সহ্য করতে পারছে না। তাই অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে।'

সুকুমার চলে গেল গ্রামেরই একজনের বাড়িতে, স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রেখে। বাড়ির সামনে জমে রইল গ্রামবাসীদের ভিড়। সুকুমারের বাড়ির লোকেরাও রয়েছেন। ওরই মধ্যে চৌকিদার অস্ফুটে কয়েকজন গ্রামবাসীকে বললেন -'আমি তো একটু আগেই এখান দিয়ে ঘুরে গেইনছি। কিছুই তো দেখলাম না বটে। আর ইদিকেই তো আমি ছিলাম গো।'

চৌকিদারের কথার রেশ স্পর্শ করল উপস্থিত গ্রামবাসীদেরও। ওদের মুখ থেকেও শোনা গিয়েছিল একই সুর। -'আমরাও তো ডাকাতদের কোন সাড়া শব্দ পাইনি। না গুলি গোলা, না চিৎকার চেঁচামেচি। তবে -'

আলোর ব্লটিং পেপার রাতের অন্ধকারকে শুষে নিতে না নিতেই গ্রামবাসীদের মনে এই দানা দানা সন্দেহ পাহাড় প্রমাণ হয়ে মাথা চাড়া দিয়েছিল। তবু সোজাসুজি কেউ কোন মন্তব্য যাচ্ছিলেন না। যা কিছু আলোচনা, সবই সুকুমার মণ্ডলের বাড়ির লোকজনদের কান বাঁচিয়ে। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর পাঠিয়েছেন সিউড়ি থানায়। দু'জন যুবক ছুটে গিয়েছেন অন্নপূর্ণার বাপের বাড়ি মালিহা গ্রামের উদ্দেশ্যে।

পুলিশে খবর দেওয়া হল নিয়মমাফিক। সিউড়ি থানার পুলিশ এ খবর পাওয়ার সংগে সংগেই ছুটে গিয়েছিলেন ঘটনাস্থলে।

জিজ্ঞাসাবাদ এবং......

পুলিশের তলব পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বছর কুড়ির সুদর্শন যুবক সুকুমার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে উপস্থিত হয়েছিল তার নিজের বাড়ির দোরগোড়ায়। ওপরে শোবার ঘরে তখনও রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মাত্র ৫২ দিনের বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী অন্নপূর্ণার মৃতদেহ। পুলিশ অফিসাররা ততক্ষণে বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন। অন্নপূর্ণার মৃতদেহ যে ঘরে রয়েছে অর্থাৎ সুকুমার এবং অন্নপূর্ণার শোবার ঘরের সব কিছুও পরখ করে নিয়েছেন। এমনকি মৃতদেহের অবস্থানটাও যথার্থভাবে লক্ষ্য করেছেন। গ্রামের লোকজনদের সংগেও কিছু কথাবার্তা সেরে নিয়েছেন।

ঠিক এরকম সময়ই অন্নপূর্ণার বাবা মুক্তিপদ মণ্ডল হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন ঘটনাস্থলে। মুক্তিবাবুকে খবর দিতে যে দু'জন ছুটে গিয়েছিলেন মালিহা গ্রামে তারা সেই মুহূর্তে অন্নপূর্ণার মৃত্যু সংবাদ ওদের দেননি। দেননি মানবিক কারণেই। তারা শুধু মুক্তিবাবুকে জানিয়েছিলেন যে সুকুমারদের বাড়িতে গত রাত্রে ডাকাত পড়েছিল। ওদের মারধোর করেছে।

এ খবর পেয়ে ছুটে আসা মুক্তিবাবু মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন ওদের বাড়ির দরজায় পৌছেই। ওপরে উঠে মেয়ের মৃতদেহ দেখে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মুক্তিবাবু অভিযোগ করেছেন এই হত্যার ঘটনায় বাড়ির কারুর মধ্যেই সেরকম কোন শোকের ছায়া পড়েনি। মুহূর্তের মধ্যেই মুক্তিবাবুর মনে পড়ে গিয়েছিল তার ছেলে কল্যাণ এবং দাদা গুরুপদবাবুর মন্তব্য। কিছুদিন আগেই তারা অন্নপূর্ণার বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়ে জানিয়েছিল যে 'অন্নপূর্ণাকে ওরা হাসিখুশি দেখেনি।' মুক্তিবাবু জানান, 'এছাড়াও ওদিন ঘটনাস্থলে পৌছেই সুকুমার এবং ওদের বাড়ির লোকজনদের হাবভাব দেখে আমার সন্দেহ হয়। পাড়ার লোকেরাও কিছু সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের কাছে সংগে সংগেই আমি আমার সন্দেহের কথা জানাই। অফিসাররা সে কথা সংগে সংগে লিখে নেন।'

মুক্তিবাবুর এ কথার সত্যতা যাচাই করা গেছে পুলিশী সূত্র থেকেও। তারা জানান, 'অন্নপূর্ণার বাবা অন দি স্পট এফ আই আর

করেন। তাতে তিনি বলেন, তার ধারণা তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে।'

সুকুমার মণ্ডল যখন তার নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছল, ওখানে তখন হাজার লোকের জটলা। সিউড়ি থানার পুলিশ অফিসাররা ওকে নিয়ে বসলেন।

সিউড়ি থানার অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের প্রশ্ন ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকল। এলিমিনেশন পদ্ধতিতে ক্রমশ ঘটনার মূলে প্রবেশ করতে লাগলেন। প্রশ্নের ধরন ধারণও বদল হতে থাকল ক্রমশ। 'দরজা খুললে কেন? তবে কি মনে হয়েছিল কোন পরিচিত লোক? তোমাকে না কুপিয়ে তোমার স্ত্রীকে কেন কোপাল? স্ত্রী বাধা দিয়েছিল? কীভাবে? শুয়ে শুয়ে, না উঠে বসে? উঠে বসেই যদি বাধা দেবে তাহলে টাঙির কোপ খেয়ে নিজের শোবার বালিশেই বা পড়বে কী করে?'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। রকম-ফেরে একই প্রশ্ন অন্যভাবে। 'সুকুমারের চোখমুখের রঙ ক্রমশ বদলাতে শুরু করল। ঘাম দেখা দিল শরীরে। পরস্পরবিরোধী উত্তর বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে।' — সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে একজন তদন্তকারী অফিসারের মন্তব্য এ রকমই।

সুকুমার মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকেও পুলিশ ঘরের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। এছাড়া অন্নপূর্ণার বাবা মুক্তিবাবুও উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিবাবু এবং আরও দু'একজন পুলিশের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন—সুকুমারের বক্তব্যের মধ্যে ক্রমশ অসংগতি ফুটে উঠছিল।

সেই অসংগতি জোরদার হয়ে উঠেছিল আরও একটি প্রশ্নে—বলে দাবি করেছেন পুলিশের এক মুখপাত্র। তিনি জানিয়েছেন পুলিশ বারবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করছিল—কেন সুকুমার কিছু না বুঝেই দরজা খুলল? অন্নপূর্ণা বাধা দিল কীভাবে, শুয়ে শুয়ে?

বারবার এ প্রশ্ন করার কারণ, অন্নপূর্ণার মৃতদেহ চিত হয়ে পড়ে ছিল তার নিজের শোবার জায়গায় তার নিজের বালিশের ওপরই। বাড়িতে ডাকাত পড়লে স্বাভাবিকভাবেই অন্নপূর্ণার বিছানা ছেড়ে উঠে বসা উচিত। এমনকি বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ানটাও বিচিত্র নয়। এ সময় ডাকাতরা ওর গা থেকে গয়না খুলতে গেলে বাধা দেওয়ার কথা সুকুমারেরই। সে ক্ষেত্রে সুকুমারই আহত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। উল্টে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে অন্নপূর্ণাকে। একজন নারীর গা থেকে গয়না খুলতে গেলে সে কতটুকু বাধা দিতে পারে, যার জন্যে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে হল? আর হত্যার পর তাকে তার বিছানায়, তার বালিশের ওপরই বা পাওয়া গেল কী করে? যদি বাধাই আসত অন্নপূর্ণার কাছ থেকে তবে ঘরের মধ্যে হুটোপুটির চিহ্ন থাকত। রক্তের দাগও থাকত ঘরের সর্বত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রক্ত ছিল শুধু বিছানায়। শুধু ফিনকি দিয়ে ছিটকে যাওয়া কিছু রক্তের বিন্দু ছড়িয়ে ছিল এদিক সেদিক। তবে? খুব স্বাভাবিকভাবেই সেদিনের তদন্তকারী অফিসারদের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, অন্নপূর্ণাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করা হয়েছে। এ ধরনের ধারণার পেছনে রয়েছে যেমন 'অন্নপূর্ণার মৃতদেহের অবস্থানগত' সূত্র, সেই সংগে তারা লক্ষ্য করেছেন ঘরে বা বাড়ির অন্য কোন জিনিস ডাকাতি হয়নি। ডাকাতি হয়েছে শুধু অন্নপূর্ণার গায়ের সামান্য কিছু গয়না। তবে? তবে কি 'গয়নার জন্য হত্যা? না হত্যার জন্যেই গয়না?'—এই ভাবনায় তাড়িত হয়ে সেদিনের পুলিশ অফিসাররা এরপর কিছু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন সুকুমারের প্রতি। সেই সংগে মাঝে মাঝেই সহানুভূতির প্রলেপ—'সত্যি কথা বল সুকুমার। জান তো সত্যি কথা বললে অনেক অপরাধই লঘু হয়ে যায়। সত্যি করে বল, কী হয়েছিল!'

এ ঘটনার তদন্তকারী অফিসার, সিউড়ি আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী দাবি করেছেন—'সেদিন ঘটনাস্থলেই সুকুমার পুলিশের জেরায় জেরায় বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিল যে—ডাকাতের কথাটা তার নিজেরই সাজান। তার স্ত্রীকে সে নিজেই ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে।'

সুকুমার মণ্ডলের এ স্বীকারোক্তির সমর্থনে 'সারকামসটেনসিয়াল এভিডেন্স' চাই। সুতরাং সেই মুহূর্তেই পুলিশ অফিসার জানতে চেয়েছিলেন—সেই টাঙিটা কই? অন্নপূর্ণার গায়ের গয়না, রক্তমাখা জামাকাপড়—সেগুলোই বা কোথায়?

পুলিশী সূত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী 'এরপর আর সুকুমার নিজেকে ডিফেনড করার চেষ্টা করেনি। পুলিশ এবং এক বিশাল জনতাকে সংগে নিয়ে গিয়ে সুকুমার একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা টাঙিটা বার করে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। রক্তমাখা নিজের পরনের লুঙ্গি এবং জামাটাও বার করে এনেছে। লুঙ্গি এবং জামার রক্ত ধোয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখনও কিছু রক্তের দাগ স্পষ্ট হয়ে ছিল। পরে ফরেনসিক টেস্টে জানা গেছে লুংগি এবং জামার রক্তের সংগে অন্নপূর্ণার দেহের রক্তের মিল রয়েছে। যাই হোক, এরপর সব শেষে সুকুমার মাটি খুঁড়ে বার করে এনেছে অন্নপূর্ণার গায়ের গয়নাগুলো।' পুলিশ এই উদ্ধারকার্য চালাবার সময় এক বিশাল জনতাকে সাক্ষী রাখেন। আদালতে মোট ২৩ জন সাক্ষীকে পুলিশ হাজির করেছিলেন।

সিউড়ি থানার পুলিশ আদালতে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে 'অন্নপূর্ণাকে তার স্বামী সুকুমার মণ্ডল বিয়ের মাত্র ৫২ দিনের মাথায় খুন করেছে পরিকল্পিতভাবেই।' পুলিশের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছে—সুকুমার নাকি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিল যে হত্যার আগে আরও দু বার অন্নকে সে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। পুলিশী সূত্র থেকেই বলা হয়েছে—'ঘটনার দিন সুকুমার তার স্ত্রীকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়। তারপর সে টাঙি দিয়ে তাকে হত্যা করে।'

ফাঁসির আদেশ : জনমানসে প্রতিক্রিয়া

ঘটনাস্থলেই রহস্যের সমাধান। তদন্তের কাজও বেশির ভাগই শেষ ওদিনই। সাক্ষীসাবুদ সবই ঠিক। সুতরাং পুলিশকে এ ব্যাপারে বেশি দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়নি। সুকুমারকে কোর্টে চালান দিতে না দিতেই পুলিশ তার তদন্তের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছিল।

আর তারই পরিণতিতে গত ২ মে সিউড়ি আদালতের ডিসট্রিক্ট এবং সেশন জজ মাননীয় পি পি রায় 'সুকুমার মণ্ডলকে' ফাঁসির আদেশ দেন।

এই রায় প্রসংগে মাননীয় বিচারপতি পি পি রায় এক জায়গায় উল্লেখ করেন—'I have been convinced as to his guilt. He has finished Annapurna whom he accepted as his partner for life only 52 days prior to the incident, in a most horrible manner. He took Annapurna as a piece of log and like a woodcutter struck her body mercilessly by a tangi and as a result she expired......'

এই ফাঁসির আদেশকে কেন্দ্র করে ৪৫১৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বীরভূম জেলার মোট ১৭,৭৫,৯০৯ জন মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

বাস্তবিকপক্ষে বীরভূম জেলায় সাধারণ মানুষ গত ২০ বছরের মধ্যে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হননি। বছর কুড়ি আগে অবশ্য এই জেলা আদালত থেকেই কোরবান শেখ এবং হরিয়া গোয়ালা নামে দু'ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আদেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন জেলা-জজ মাননীয় রাধাবল্লভ সাহা।

তারপর এই দীর্ঘ সময়ের পর সেই আদালত থেকেই গত ২ মে ১৯৮৩ তারিখে বর্তমান জেলা-জজ মাননীয় পি পি রায় ফাঁসির হুকুম জারি করলেন সুকুমার মণ্ডলের বিরুদ্ধে। বিচারপতি পি পি রায়ের জীবনে এটাই প্রথম ফাঁসির হুকুম নয়। কয়েক বছর আগে তিনি নদীয়া জেলা আদালতে একজনের বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন।

যাই হোক এই ফাঁসির হুকুম জারি করার পর মাননীয় বিচারপতি পি পি রায়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া কী রকম—সেটা জানার আগ্রহ নিয়ে ওঁর কাছে যাই। বিচারপতি পি পি রায় হাসি মুখেই বলেন—'সাংবাদিকদের ইনটারভিউ দিতে হলে উচ্চ-আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। সুতরাং এই মুহূর্তে ইনটারভিউ দেওয়া সম্ভব নয়।'

তবু পীড়াপীড়িতে তিনি বলেছেন—ফাঁসির আদেশ দেওয়ার ফলে তার মধ্যে কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। অন্যান্য দিনের মতই সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে একমাত্র ছেলেকে (সামান্য অ্যাবনরমাল) সংগ দিয়েছেন। বিচারপতি রায়ের অবসর সময় কাটে বাড়ির মধ্যেই ব্যাডমিনটন খেলে। সেদিন অবশ্য খেলেননি। তার কারণ গত কয়েকদিন ধরেই বিকেলের পর থেকে জোড়ো হাওয়া বইছিল। 'এত হাওয়ায় খেলা সম্ভব নয়, তাই।'

এর বাইরে আর কিছু তিনি বলতে চান না উচ্চ আদালতের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত। সিউড়ি আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর আবদুল রকিব কিন্তু সহজভাবেই কথা বলেছেন। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেন—'আমি মনে করি ঠান্ডা মাথায় খুনের ক্ষেত্রে ফাঁসির আদেশের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এতে ক্রাইম কমে। ফাঁসির আদেশ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বলে মনে করি না। এই তো বেশ কয়েকজন স্থানীয় নামী লোক এই

রায় বেরোবার পর আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। জেলার কাগজগুলোও অভিনন্দন জানিয়েছে।'

এই কেসের সংগে সংশ্লিষ্ট এই দু'জন ছাড়া বাকি যাদের প্রতিক্রিয়া জানা গেছে, সেগুলো এরকম।

এস কে দাস (এস ডি ও) :

ফাঁসির আদেশ সমাজের ওপর কী ইমপ্যাকট সৃষ্টি করবে জানি না। এতে কি সত্যি ক্রাইম কমবে · তবে যে স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করে তার শাস্তি কঠোর হওয়াই উচিত।

আমার ধারণা, এই আদেশকে কেউই অমানবিক বলে গণ্য করবে না। অন্তত সাধারণ মানুষ।

পরিবর্তন পত্রিকার তরফ থেকে আমার পরবর্তী প্রশ্নে এস ডি ও মিসটার দাস হেসে ফেললেন। বললেন—আমার কোন প্রিয়জন এ রকম কোন ক্রাইম করতে পারে না। সুতরাং তাদের কারুর ফাঁসির আদেশ হলে আমি সেটাকে কীভাবে নেব—সে প্রশ্ন ওঠেই না।

হীরালাল ভট্টাচার্য (ব্যাংক কর্মচারী) :

ফাঁসি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফাঁসি দিতে হবে এবং তা প্রচার করতে হবে। এতে সমাজ কিছুটা উপকৃত হবে। এ ব্যবস্থা বন্ধ হলে ক্রিমিনালদের মনোবল বেড়ে যাবে।

ফাঁসি অবশ্যই বর্বরোচিত, কিন্তু দেশের দশের প্রয়োজনে এটা থাকা উচিত। তবে সেই সংগে মনে করি একবার অন্তত সুযোগ পাওয়া উচিত।

তপতী ব্যানারজি (গৃহবধূ) :

ফাঁসি দেওয়াটা ঠিক নয়। কিন্তু শাস্তি হওয়া উচিত। কঠোর কোন শাস্তি। যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ওই রকম কিছু।

তবে শাস্তির মূল লক্ষ্য শুধু নির্যাতন করাই যেন না হয়। শাস্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অপরাধীকে তার কাজের জন্য অনুতপ্ত করা, এবং সেই সংগে সে যাতে নতুন করে সমাজ জীবন শুরু করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ফাঁসির ব্যাপারটা বড় অমানবিক মনে হয়।

পালু দে (হোটেল ব্যবসায়ী) :

সিউড়ি শহরের প্রখ্যাত হোটেল 'হোটেল অরোরা'র মালিক বছর তিরিশের যুবক পালু দে খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন—না, আমি ফাঁসির বিপক্ষে। এতে একজনের হাত থেকে সমাজ বাঁচল বটে কিন্তু সমাজে প্রতিনিয়ত ক্রিমিনাল সৃষ্টি হচ্ছে। সেটা বন্ধ করার জন্যেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। ফাঁসি দিয়ে যদি অপরাধ বন্ধ করা যেত তবে ফাঁসিই হত একমাত্র শাস্তির বিধান।

জনৈকা স্কুল শিক্ষিকা :

খুন এবং খুনের জন্য ফাঁসি দুটোই অমানবিক। খুনও বন্ধ হওয়া উচিত। আবার ফাঁসির বদলে অন্য কোন বিকল্প শাস্তির বিধান থাকা উচিত।

সিউড়ি থানার অফিসার :

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই পুলিশ অফিসার একটু নিচু গলায় জানান—আমরা কি এটা চেয়েছিলাম? না। এত সুন্দর ছেলেটা, ইস। তবে শাস্তি হওয়া উচিত।

মুক্তিপদ মন্ডল (মৃতার বাবা)

অবশেষে মৃতার বাবা মুক্তিপদ মন্ডলের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম। মর্মাহত মুক্তিবাবু বলেন—এখন তো আর কিছু করার নেই। আইন যা ভাল বুঝবে তাই করবে। কী আর বলি—এত সুন্দর ছেলে দেখে বিয়ে দিলাম। আপনি দেখেন নাই। ওদের দু'জনকে যা সুন্দর মানাত যে দেখলে চক্ষু জুড়াইবার লাগে। কী যে ওর ভীমরতি ধরল। হাজার হলেও জামাই মানে তো ছেলেরই মতো। আমি কি মন থেকে চাইতে পারি যে ওর এরকম কিছু হোক। কিন্তু কী আর করবো বলেন। যা কপালে আছে... ...হবেই। □

আলোকচিত্র : সংগৃহীত

মৃত্যু-দন্ড প্রসংগ

অজিত কৃষ্ণ বসু

৮ মে, ১৯৮৩ সকাল বেলা খবরের কাগজে পড়লাম :

ফাঁসি স্থগিত

'নয়া দিললি, ৭ মে। আজ সকাল বেলা একটি বিশেষ বৈঠকে সুপরিম কোরট কর্তার সিং এবং উজাগর সিং-এর ফাঁসি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে বিদ্যা জৈনকে হত্যার অপরাধে আগামী কাল ভোরবেলায় তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার কথা ছিল।

সাময়িকভাবে তাদের ফাঁসি থেকে রেহাই দেবার কারণ এই দুজন দন্ডিত আসামীর পরিবার থেকে আবেদনে জানানো হয়েছিল যে ফাঁসি দেবার পদ্ধতিটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং আমাদের সংবিধানের ২১নং ধারার (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ) বিরোধী।

ফাঁসিদান পদ্ধতির সাংবিধানিক বৈধতা আছে কিনা, সুপরিম কোরট তার বিচারে বসবেন গরমের ছুটির পর আগামী ১৯ জুলাই তারিখে।'

দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে শ্বাসরোধ করে এবং ঘাড়ের হাড় ভেঙে আইনসংগতভাবে হত্যার পদ্ধতি আমাদের দেশে বৃটিশ সভ্যতার অন্যতম দান। ভারতীয় ঐতিহ্যে ঘাতক বা জল্লাদের হাতে খড়্গ বা খাঁড়া দেখা যায়, দড়ি নয়। সম্ভবত আমাদের প্রাচীন দন্ডবিধি রচয়িতারা খাঁড়ার এক ঘায়ে মুন্ডুচ্ছেদকেই প্রাণহরণের দ্রুত এবং কম যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি বিবেচনা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন ফরাসি আইন সম্মত প্রাণহরণ-যন্ত্র গিলোটিন-এর উদ্ভাবক, যদিও তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত।

ফাঁসিদান সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফাঁসি বিশেষজ্ঞ, ২৫ বছরেরও বেশিদিন ধরে ইংলনডের সরকারি জল্লাদ, অ্যালবারট পিয়েরপয়েনট (Albert Pierrepoint) কী বলেন দেখা যাক।

'What Happens at an Execution' (অর্থাৎ মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত আসামীকে ফাঁসি দেবার সময়ে কী ঘটে) এই শিরোনাম সহ লনডনের একটি খবরের কাগজে নিম্নরূপ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তার কর্তিতাংশ আমার কাছে আছে, তাই থেকে অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

লনডন, অকটোবর ২৬। অ্যালবারট পিয়েরপয়েনট, যিনি ২৫ বছর ধরে ইংলনডের সরকারি জল্লাদের পদে অধিষ্ঠিত, গত মংগলবারে টেলিভিশনে বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন কীভাবে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় এবং তখন কী কী ব্যাপার ঘটে।

মৃত্যু-দন্ড সম্বন্ধে একঘণ্টাব্যাপী বি বি সি র (বৃটিশ ব্রডকাসটিং করপোরেশন) আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনিই ছিলেন প্রথম 'সাক্ষী'।

টিভি-র দর্শক এবং শ্রোতৃবৃন্দ মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে ক্যানটারবেরি গির্জার আরচবিশপ ডঃ এ এম র‍্যামজে এবং ওয়েসটমিনসটারের রোমান ক্যাথলিক আরচবিশপ কারডিনাল গডফ্রের মতামতও শুনতে পেয়েছিলেন।

টেলিভিশন-পর্দার বুকে দর্শকদের খুব কাছাকাছি এসে পিয়েরপয়েনট বর্ণনা করেছিলেন কোন দন্ডিতকে ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে কীভাবে বালির বস্তা দিয়ে রিহার্সাল দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, 'ফাঁসি দেবার সময় যখন আসন্ন, আমরা তখন আসামীর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকবার সংকেতের জন্য অপেক্ষা করি। এমন ব্যবস্থা করি, যেন আমরা যখন ঘরে ঢুকি, আসামীর মুখ তখন অন্যদিকে থাকে, সে আমাদের দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে না পড়ে।'

কীভাবে আসামীকে তার হাতদুটিকে পিছন দিকে বেঁধে ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে গিয়ে তার মাথার ওপর একটা শাদা টুপি আর গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হয়, তার বর্ণনা দিয়ে পিয়েরপয়েনট বলেন,

'গেরোটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওটাকে রাখতে হয় আসামীর বাঁদিকের চোয়াল ঘেঁষে, তাহলেই সে যখন ঝপ করে পড়ে যাবে তখন গেরোটা শেষ পর্যন্ত চিবুকের তলায় এসে চিবুকটাকে পিছন দিকে ঠেলে দেবে। কিন্তু গেরোটা ডান দিকে বসলে লোকটির পতনের সংগে সংগে সেটা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াবে ঘাড়ের পিছনে। ঘাড়টাকে ঝুঁকিয়ে দেবে সামনের দিকে। তার ফলে হবে শ্বাসরোধ। সেই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ফাঁসিতে ঝুলতে ঝুলতে সে পনের মিনিট জীবিত থাকতে পারে।

ফাঁসি বিশেষজ্ঞ পিয়েরপয়েনট-এর এই সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় জল্লাদের সামান্যতম আনাড়িপনার ফলে হতভাগ্য মৃত্যুদন্ডিত আসামীকে বহুক্ষণব্যাপী বীভৎস যন্ত্রণা ভোগ করতে হতে পারে। বিচারপতি খোসলা (গান্ধী হত্যা মামলায় গডসের আপিলের শুনানিতে তিনজন বিচারপতির একজন) তাঁর 'Murder of the Mahatma' (মহাত্মার নিধন) নামক দীর্ঘ স্মৃতিচারণ নিবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন উক্ত মামলায় প্রাণদন্ডে দন্ডিত নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তেকে যখন জেলের ভিতরে দুটি পাশাপাশি ফাঁসমঞ্চে ফাঁসি দেওয়া হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ঝুলে পড়বার পর নারায়ণ আপ্তের দেহ কিছুক্ষণ ছটফট করে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গডসের দেহ ছটফট করেছিল পনের মিনিট ধরে।

জল্লাদদের কথা কিছু লেখেননি বিচারপতি খোসলা। ফাঁসিদান বিদ্যায় সুপন্ডিত অ্যালবারট পিয়েরপয়েনটের উক্তির আলোয় অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে আপ্তের গলায় যে ফাঁসুড়ে ফাঁসির দড়ি পরিয়েছিল, তার তুলনায় গডসের গলায় যে দড়ি পরিয়েছিল সে ছিল অপেক্ষাকৃত আনাড়ি, অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক, অর্থাৎ জল্লাদভাগ্যে আপ্তে ছিল গডসের চাইতে বেশি ভাগ্যবান।

ইংলনডের ভূতপূর্ব সরকারি জল্লাদ অ্যালবারট পিয়েরপয়েনট সম্বন্ধে যে বিবরণ পড়েছি, তা সত্য হলে তিনি ছিলেন জল্লাদ সম্বন্ধে আমাদের যেরকম ধারণা ঠিক তার

বিপরীত চরিত্রের মানুষ—কোমল-হৃদয়, সহানুভূতি-সম্পন্ন, মৃদু সৌখীন, মধুর চরিত্র ভদ্রলোক। তাঁর সম্বন্ধে বলা হত একটি মাছি মারতে পর্যন্ত তিনি ইতস্তত করতেন ("He wouldn't hurt a fly")। বিচারকের আইনানুগ আদেশে যে সব অপরাধী (অথবা সম্পূর্ণ নিরপরাধ) হতভাগাদের ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিতে হয়, তাদের প্রাণ কত কম যন্ত্রণা দিয়ে কত তাড়াতাড়ি হরণ করা যেতে পারে, এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করে তিনি ফাঁসিদান প্রণালীর (technique of hanging) অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। আমাদের শিবু ডোম প্রমুখ সরকারি ফাঁসুড়েরা এ ব্যাপারে এতটা মাথা ঘামিয়েছে বা ঘামান দরকার বলে মনে করেছে কিনা জানি না।

ফাঁসিদান সম্পর্কে একটি বিশদ বই আমার সংগ্রহে রয়েছে, চারলস ডাফ (Charles Duff) বিরচিত 'A Handbook of Hanging'—বইটির বাংলা অনুবাদ করলে 'পুরোহিত দর্পণ' গ্রন্থটির অনুকরণে তার নাম দেওয়া যেত 'জল্লাদ-দর্পণ'। ১৯২৭ সালে লনডনে প্রকাশিত বইটি পড়লে বোঝা যায় যে, জল্লাদ যতই দক্ষ, অভিজ্ঞ, সতর্ক, সহৃদয় হোক না কেন, ফাঁসিতে মৃত্যু অনিবার্যভাবেই অমানুষিক যন্ত্রণাদায়ক এবং বিলম্বিত।

ডাফ লিখেছেন :

'মৃত্যুদন্ডাদেশে সময়-সীমা কিছু নির্ধারিত থাকে না। গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দন্ডিতের দেহটিকে ঝুলিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না মৃত্যু ঘটে (To be hanged by the neck until dead), এই হল মৃত্যুদন্ডের বয়ান। এই কারণেই ফাঁসি দেওয়া আসামীকে অন্তত এক ঘণ্টা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তার ঘাড় ভেঙে গিয়ে যদি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি মৃত্যু না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু সুনিশ্চিত।......

(ফাঁসিতে) মৃত্যু তাৎক্ষণিক (instantaneous) একথা কোন বৈজ্ঞানিকই প্রমাণ করতে পারেন না এবং এটাই বেশি সম্ভব যে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে ফাঁসিতে মৃত্যু হতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগে। এবং এই সময়ে জ্ঞান বিলুপ্ত থাকে, এমন কোন প্রমাণ নেই। ফাঁসিতে মরার পর কেউ এসে তার মৃত্যুকালীন অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের শোনাতে পারেনি।'

ডাফ-এর বইটি থেকেই জানতে পারি ১৯২৬ সালে একজন সারজন 'বৃটিশ মেডিকাল জারনাল' পত্রিকায় তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। চারটি আসামীর ফাঁসি অনুষ্ঠানে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল, ফাঁসি হয়ে যাবার পর তাদের দেহ পরীক্ষা করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করবার জন্য। সেই জল্লাদের অন্য একটি কাজে অন্যত্র যাবার তাড়া ছিল, তাই সে একজনের পর আরেকজনকে না ঝুলিয়ে সময় সংক্ষেপের জন্য জোড়ায় জোড়ায় ঝুলিয়েছিল। তারপর উক্ত সারজনের প্রদত্ত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করছি :

'প্রথম জোড়ার ফাঁসি হবার পর আমার কর্তব্য হল তাদের পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করা। সাধারণত আসামীকে ঝুলিয়ে দেবার পর প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত তার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন শোনা যায়। এক্ষেত্রে ঐ স্পন্দনের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর এমন কিছু রইল না যা থেকে দেহে প্রাণ শক্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে বলে কল্পনা করা যায়। পনের মিনিট বাদে দড়ি কেটে দেহ দুটিকে পাশের কামরায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। আমি সভয়ে লক্ষ করলাম দুজনের মধ্যে একজন ভীষণভাবে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে, তখনও প্রাণটা বেরিয়ে যায়নি। দুটি দেহকে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে আবার ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হল আরো পনের মিনিটের জন্য। জল্লাদটি ছিল পাকা ও অভিজ্ঞ, এবং আসামী দুটির শরীরের গঠন আর ওজন অনুযায়ী তাদের পতনের (drop) দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়েছিল। প্রণালীর দিক থেকে কোন ত্রুটি হয়নি। ফাঁসিদানের ব্যাপারে লক্ষ্য থাকে আসামীর ঘাড়ের অস্থি ভংগ (Dislocation of the neck is the ideal aimed at)। কিন্তু ফাঁসিতে সরকারি ফাঁসুড়ের হাতে নিহত বহু আসামীর দেহ পরীক্ষা করে (post mortem) দেখেছি যে ফাঁসিতে ঘাড় ভেঙে মৃত্যু ব্যতিক্রম মাত্র, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটেছিল ধীরে ধীরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে।'

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে জল্লাদ যতই দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং নিখুঁত হোক না কেন, ফাঁসিতে নিহত প্রত্যেকটি আসামীকে বেশ কিছু সময় ধরে অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ফাঁসি যখন দেওয়া হয় সাধারণ লোক চক্ষুর আড়ালে কারাগারের অভ্যন্তরে গোপনে, নরহত্যা পাপের বীভৎস পরিণাম জনসাধারণকে বুঝিয়ে সাবধান করে দেবার জন্য প্রকাশ্যে নয়, তখন মৃত্যুদন্ডের আসামীদের সহজ মৃত্যুর ব্যবস্থা না করে অমন বর্বরোচিত অমানুষিক অত্যাচার করে তাদের হত্যা করার

কী ভাবে ফাঁসি হয়?

[illegible]

সার্থকতা কোথায় ?

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ফরাসি ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কামু (Albert Camus) তাঁর 'Reflections on the Guillotine' (গিলোটিন সম্পর্কে চিন্তা) নামক দীর্ঘ নিবন্ধে এ প্রসংগে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

কামু তাঁর নিবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন : 'আমার বাবা ছিলেন মৃত্যুদন্ড প্রথার জোরাল সমর্থক। একবার তিনি একজন অতি নৃশংস হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়া দেখতে গেলেন। গিলোটিন যন্ত্রের তীক্ষ্ণ গুরুভার ফলার আঘাতে ধড় থেকে আসামীর মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ঝুড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে কাটা গলা থেকে যখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, আর বাকি সারা দেহটা অমানুষিক যন্ত্রণায় বীভৎসভাবে ছটফট করতে লাগল, তখন সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বাবা পাগলের মত হয়ে গেলেন। সুস্থ স্বাভাবিক হতে তাঁর মাসখানেক সময় লেগেছিল এবং তারপর থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মৃত্যুদন্ড প্রথার ঘোরতর বিরোধী।

গিলোটিনে মৃত্যু যে এত বীভৎস এবং দীর্ঘসময়ব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুদন্ডের ঐ বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করার আগে সে ধারণা ছিল না আলবেয়ার কামুর পিতৃদেবের।

আলবেয়ার কামু তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধে মৃত্যুদন্ড প্রথা বিলোপের জন্যই আবেদন জানিয়েছেন। উপসংহারে বলেছেন এই বীভৎস (এবং অসার্থক) প্রথা যতদিন বিলুপ্ত না হচ্ছে ততদিন মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত আসামীদের অনর্থক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা না করে তাদের মৃত্যুকে যথাসম্ভব সহজ করা হোক। তিনি বলেছেন তাদের ঘুমের বড়ি দেওয়া যেতে পারে, তাদের নিজেদের পছন্দমত মৃত্যুবরণ প্রণালী বেছে নিয়ে আত্মহত্যার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, এবং আত্মহত্যা করবার মত মনোবল যদি তাদের না থাকে, তাহলে সরকারি ঘাতকই এমন কোনরকম ইনজেকশন দিয়ে দিতে পারে যাতে মৃত্যু সহজে আসবে এবং কম যন্ত্রণাদায়ক হবে। মৃত্যুই তো যথেষ্ট ভীষণ শাস্তি, তাকে বীভৎস এবং যন্ত্রণাদায়ক করে তোলার সার্থকতা কী ? তাতে কার কী লাভ ? বিশেষ করে যখন আইনসম্মত হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হচ্ছে কারা প্রাচীরের অন্তরালে গোপনে, জনশিক্ষার জন্য প্রকাশ্য স্থানে নয়। এই প্রসংগে একটি ইংরাজি কবিতা (Soliloquy in a condemned cell) থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"Tell me Grim Goddess of Justice,
Will my death bring back the life I took
In a moment of mad frenzy?
Will my being killed by the Society's hired killer,
Like a helpless mouse in a trap,
In the secluded privacy of his prison,
Hidden away from public view,
Deter would-be killers from killing?
Will Society, or anybody, gain anything from my death?"

সরকারি জল্লাদের হাতে বীভৎসভাবে নিহত হবার জন্য বধ্যমঞ্চের দিকে যেতে যেতে ফাঁসির আসামীর মর্মান্তিক অন্তিম প্রশ্ন :

'সমাজ বা অন্য কেউ কি আমার এই মৃত্যুতে কিছুমাত্র লাভবান হবে ?'

মার্কিন মুলুকে ক্যারিল চেসম্যান (Caryl Chessman) নামক একটি তরুণ যুবক মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে দশ বছর সরকারের বিরুদ্ধে আইনের লড়াই করে কারাগারে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারি জল্লাদের পরিচালনায় সরকারি গ্যাস চেমবারে দীর্ঘ সময় শ্বাসরোধ-যন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণ ত্যাগ করেছিল। তার আগে তার শেষ লেখায় সে যা লিখে গিয়েছিল, তার সারমর্ম :

'শেষ পর্যন্ত আমাকে নিহত হতেই হচ্ছে। এই অকাল মৃত্যু এড়াবার আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু যাবার আগে আমি এই প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি : আমাকে হত্যা করে সমাজের কী লাভ হল ?'

মার্কিন মুলুকের যে অংশের কারাগারে আসামী চেসম্যানকে সরকারি জল্লাদ আইনসম্মতভাবে হত্যা করেছিল, সেখানে আসামীদের হত্যা করা হত গ্যাস চেম্বারে।

হলিউড থেকে আগত এবং নায়িকার ভূমিকায় অসামান্যা অভিনেত্রী বারবারা স্ট্যানউইক (Barbara Stanwyck)-এর অভিনয়ে সমৃদ্ধ 'আই ওয়ানট টু লিভ' (আমি বাঁচতে চাই) ছবিটি যারা দেখেছেন, আমার মত তাঁরাও মৃত্যু-বিধানের গ্যাস-চেমবার প্রণালীর শ্বাসরোধকারী বীভৎসতা পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।

বধ-প্রকোষ্ঠে একটি গদিওয়ালা চেয়ারে বধ্যব্যক্তিকে (নর বা নারী) বসিয়ে তার হাত পা বেশ শক্ত করে স্ট্র্যাপ দিয়ে চেয়ারের হাতল এবং পায়ার সংগে বেঁধে দেওয়া হয়। চেয়ারের তলায় অ্যাসিডপূর্ণ একটি বালতি থাকে, যার উপরে ঝুলনো থাকে কাপড়ের থলিতে পোরা কতকগুলো বিষাক্ত গুলি। দেখতে অনেকটা ন্যাপথলিনের গুলির মত। প্রকোষ্ঠে বাতাস ঢোকবার একটি মাত্র দরজা, সেটি বন্ধ করে দিলে বাতাসের সাধ্য নেই ভিতরে ঢুকবার। প্রকোষ্ঠের ওপর দিকে কয়েকটি চতুষ্কোণে কাঁচ বসান, যার ভিতর দিয়ে আলো আসে, বাতাস আসে না। এগুলো হচ্ছে সংবাদপত্র প্রতিনিধি এবং অন্যান্য যাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের মৃত্যু দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করবেন, তাঁদের জন্য। ঐ চৌকো কাঁচগুলির মধ্য দিয়ে দেখা যাবে বধ্যব্যক্তি কী ভাবে গ্যাসে ভরা ঘরে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় ধীরে ধীরে মৃত্যু-যন্ত্রণা সয়ে সয়ে শেষ পর্যন্ত শবদেহে পরিণত হয়।

নির্দিষ্ট মুহূর্তে জল্লাদ বায়ু নিরোধক দরজাটি ভালভাবে বন্ধ করে দেয়, তারপর সে একটি যন্ত্র টিপে দিতেই বধ্য ব্যক্তির চেয়ারের তলায় ঝুলনো থলিটি উলটে গিয়ে ভিতরের বিষাক্ত বড়িগুলি বালতিভরা অ্যাসিডের মধ্যে পড়ে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে।সেই গ্যাসই সেই বন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে গিয়ে বধ্যব্যক্তির শ্বাসরোধ ঘটাতে শুরু করে। এবং বলা বাহুল্য জীবিত অবস্থা থেকে মৃত অবস্থায় পৌঁছতে বধ্য ব্যক্তিটি বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয়।

মার্কিন মুলুকের বিখ্যাত এবং বৃহৎ সিং সিং কারাগারে সরকারি হত্যার যন্ত্রটি হচ্ছে বৈদ্যুতিক চেয়ার। বধ্যকে ঐ চেয়ারে বসিয়ে চেয়ারের সংগে শক্ত করে তার হাত পা বেঁধে তার দেহে প্রবল বিদ্যুৎ-তরংগ প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। ফল, শুধু বৈদ্যুতিক শক-এর তীব্র যন্ত্রণাই নয়, বিদ্যুৎ-তরংগের তাপে বেচারার দেহের ভিতরের মাংস পুড়তে থাকে এবং জীবন্ত পোড়া নরমাংসের গন্ধে হত্যাস্থানের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, সে গন্ধ অনেকে সইতে পারে না।

এই বীভৎস সরকারি হত্যানুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে গেছেন সিং সিং কারাগারের অধ্যক্ষ (Warden) লিউইস এডওয়ারড লজ (Lewis Edward Lawes), ১৯৪৭ সালে ৬৪ বছর বয়সে যাঁর তিরোধান ঘটেছিল। তাঁর মূল্যবান অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণ গ্রন্থটির নাম 'সিং সিং কারাগারে বিশ হাজার বছর' (Twenty Thousand Years in Sing Sing)। তাঁর কার্যকালে সিং সিং কারাগারে যারা বন্দী ছিল, তাদের সকলের দন্ডকাল যোগ করলে যোগফল দাঁড়ায় বিশ হাজার বছর। সেই হিসেবেই বইটির নামকরণ।

মহান চরিত্র কারাধ্যক্ষ লজ তাঁর গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমার কার্যকালে সিং সিং কারাগারে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত ১৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে; তাদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিল।

দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে যে মৃত্যুদন্ড প্রথাটির কোন সার্থকতা নেই এবং এটি একটি হৃদয়হীন বর্বর প্রথা।'

ফাঁসি, গ্যাস-চেমবার, গিলোটিন, বৈদ্যুতিক চেয়ার—পৃথিবীতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার প্রচলিত প্রধান এই চারটি প্রণালীই সমান ভয়ংকর অনেকক্ষণ ধরে বীভৎস যন্ত্রণা দিতে কোনটিই কোনটির চাইতে কম নয়।

এবার ফিরে আসি ১৯৭৩ সালে বিদ্যা জৈন হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর্তার সিং এবং উজাগর সিং প্রসংগে। ফাঁসি সম্ভাবনা সামনে নিয়ে এরা দশ বছর অতিবাহিত করেছে, যেমন করেছিল মার্কিন মুলুকে ক্যারিল চেসম্যান (Caryl Chessman) গ্যাস-চেমবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা সামনে নিয়ে।

দণ্ডিত সিং ভাই দুটির আত্মীয়দের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট এই বলে আগ্রাহ্য করে দেননি যে এতদিন তো এই পদ্ধতিতেই মৃত্যুদণ্ডিতদের সরকারি জল্লাদ দ্বারা হত্যা করা হয়ে আসছে, এর সাংবিধানিক বৈধতা অবৈধতার প্রশ্ন তো কখনো ওঠেনি ; বরং সর্বশ্রী বালকৃষ্ণ এরাদি এবং সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় বিচারপতিদ্বয় আবেদন মঞ্জুর করে ফাঁসি স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছেন, এবং ফাঁসি প্রণালীর সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন বিচারের তারিখ ধার্য হয় ১৯ জুলাই।

আমার মনে হয় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মৃত্যুদন্ড প্রথাটাই আমাদের দন্ডবিধি থেকে বাতিল করে দেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, কিন্তু এবিষয়ে আমি আলবেয়ার কামু-র (Albert Camus) সংগে সম্পূর্ণ একমত যে মৃত্যুদন্ডিতকে যন্ত্রণা দিয়ে মারা নিতান্তই অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা, তাকে যথাসম্ভব সহজভাবেই মরতে দেওয়া উচিত।

মৃত্যুই তো যথেষ্ট ভীষণ শাস্তি, তাকে অনর্থক বিলম্বিত যন্ত্রণাদায়ক করে কার কী লাভ ? □

পাঁচ মিনিট

খোঁড়া অথরিটি

সি এম ডি এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্য সরকার এরকম আরও দুএকটা 'অথরিটি' টথরিটি গঠন করতে গোপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর একটা স্টেটমেনট থেকে আমাদের বিশ্বস্ত সূত্রের খবরের কনফারমেশনও পাওয়া গেল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যখন তখন কলকাতায় খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না। যার খুশি যেখানে খুশি যখন খুশি খোঁড়াখুঁড়ি করবে, এভাবে চলতে পারে না। এটা বন্ধ করতে হবে। এটা শুনে বিভিন্ন দফতরের পেটোয়া ঠিকাদাররা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

বিগত তিন দশক ধরে কলকাতায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, কিন্তু কোন মুখ্যমন্ত্রী তো খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করার কথা বলেননি। হঠাৎ এই বৈপ্লবিক ঘোষণা কেন - এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই আমরা সরকারের সেই গোপন প্রচেষ্টার কথা জানতে পেরেছি। গোপন প্রচেষ্টা আর কিছুই নয়, সি এম ডি এর ধাঁচে সরকার আর একটা অথরিটি গঠন করতে চলেছেন। এর নাম হবে সি এম কে এ বা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন খোঁড়া অথরিটি। এখানে খোঁড়া মানে লেম নয়, টু ডিগ, কনটিনিউয়াস টেনস-এ ডিগিং। ডেভলপমেনটের 'ডি' এবং ডিগিং-এর 'ডি' এই দুটো গুলিয়ে গিয়ে জনগণের যাতে বোঝার অসুবিধা না হয় সেইজনাই নাকি এই অথরিটির নাম ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিগিং অথরিটি না করে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন খোঁড়া অথরিটি করা হচ্ছে।

খোঁড়া অথরিটি গঠন করার যাবতীয় প্রাথমিক কাজকর্ম নাকি শেষও হয়ে গেছে। বিধানসভা এখন নট ইন সেসান, তাই এ নিয়ে একটা অরডিনানস জারি করতে হবে। এবং সেই অরডিনানস-এর খসড়া এখন জুডিশিয়াল ডিপারটমেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ঠিকাদাররা যাতে কোন বাগড়া না দেয়, মামলা না ঠোকে তার জনাই নাকি সরকার এত গোপনীয়তা রক্ষা করছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই এই অরডিনানস জারি হয়ে যাবে বলে আমাদের ধারণা।

যতদূর জানতে পেরেছি তাতে দেখছি, নগর উন্নয়ন দফতরের পুরো মন্ত্রী এবং আধা মন্ত্রী (বা রাষ্ট্রমন্ত্রী) যথাক্রমে এই অথরিটির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হবেন। একজন সদ্য রিটায়ার করা আই এ এস অফিসার হবেন এই সংস্থার চিফ এগজিকিউটিভ।

এই অরডিনানস পাস হওয়ার পর সি এম কে এর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কলকাতার যতত্র খোঁড়াখুঁড়ি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। খোঁড়ার শরিকদের (সি ই এস সি, সি টি সি, সি আই টি, পি ডবলিউ ডি, ক্যালকাটা টেলিফোনস এবং কলকাতা পুরসভা। পাতাল রেল এই আওতার বাইরে থাকবে।) রাস্তাঘাট বা মাঠ খোঁড়ার জন্য এই অথরিটির কাছে ইনডেনট দাখিল করতে হবে এবং জানাতে হবে খোঁড়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ। তাছাড়া সব শরিককে এক সংগে খুঁড়তে হবে, কেউ আলাদাভাবে খুঁড়তে পারবেন না।

এখন সব শরিকরাই রাস্তাঘাট খোঁড়ে, বোজায় না কেউ। এরা রাস্তা সারায়, ড্রেন ভরায়। আবার ড্রেন খুঁড়ে সব মাল রাস্তায় ছড়ায়। খোঁড়ার গরজ সবার আছে, বোজানর দায় কারো নেই। এই সব দেখেশুনে সরকার স্থির করেছেন, খোঁড়া অথরিটি যে শুধু খোঁড়ার ব্যাপারেই সর্বেসর্বা হবেন তা নয়, বোজানর ব্যাপারেও এর কর্তৃত্ব থাকবে। খোঁড়া অথরিটির মূল নীতি হবে—যে খুঁড়বে সেই বোজাবে। এই শর্তে রাজি না হলে কোন শরিককে খোঁড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে শরিকে শরিকে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেন কোন লড়ালড়ি না হয় তার জন্য একটি সমন্বয়সাধক কমিটি থাকবে বলে অরডিনানসে উল্লেখ আছে। এই কমিটিতে সব শরিকদের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে এবং থাকবেন একজন খোঁড়া বিশেষজ্ঞ। এরা খোঁড়ার ইনডেনটগুলি যাচাই করে চেয়ারম্যানের কাছে ফরওয়ারড করবেন। চেয়ারম্যান ও কে করলে চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ওয়ারক অরডার ইস্যু করবেন।

সুতরাং এই অরডিনানস মোতাবেক খোঁড়া অথরিটির কাজ শুরু হয়ে যাবার পর কলকাতার রাস্তাঘাটে ইরাটিক খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ হয়ে সিসটেমেটিক খোঁড়াখুঁড়ি চালু হবে, এমন আশা ক্যালকাটানরা করতেই পারেন।

নির্মল বিশ্বাস

বই-এর খবর

ট্রেজার আইল্যানডের শতবর্ষ

লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি বিশ্ববিখ্যাত বই-এর শতবর্ষ পূর্ণ হল। সেটি রবারট লুই স্টিভেনসনের ট্রেজার আইল্যানড। কলিনস এন সাইক্লোপিডিয়া মতে ১৮৮৩ সালে ট্রেজার আইল্যানড প্রকাশিত হয়। কিন্তু আরথার কমপটন রিকেট তাঁর বিখ্যাত ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৮২ সালকে এই বই-এর প্রকাশকাল বলে উল্লেখ করেন। একশ বছর ধরে এই বইটি পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে একাধিকবার। তবে প্রদীপ সেন অনূদিত ও কসমস প্রকাশিত ট্রেজার আইল্যানড বোধহয় সাম্প্রতিকতম অনুবাদ। এই বছরই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভূমিকায় শতবর্ষের কথাটি উল্লেখ করা নেই। সম্ভবত এটি তাঁদেরও চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকবে।

স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০ সালের ১৩ নভেম্বর এডিনবরা শহরে। বিখ্যাত লাইট হাউস এনজিনিয়রের ছেলে স্টিভেনসন বাবার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনজিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলেন সাহিত্যই তাঁর লাইন। যখন ছ বছর বয়স তখন 'হিসট্রি অব মসেস' মুখে মুখে বানিয়েছিলেন। কলেজে উঠে তো রীতিমত প্রবন্ধ লেখক, তবু সাহিত্য থেকে যদি রুটি না জোটে এই মনে করে ১৮৭৫ সালে আইনটি পড়ে রাখলেন। কিন্তু তাঁর ভবঘুরে মানসিকতা কোন স্থায়ী বৃত্তি গ্রহণের পথে ছিল ঘোরতর প্রতিবন্ধক।

তা'ছাড়া ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন চিররুগ্ন। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য স্টিভেনসন ভ্রমণ করেন প্রচুর। নৌকোয় করে জলযাত্রার বিবরণ নিয়ে প্রথম গ্রন্থ লেখেন অ্যান ইনল্যানড ভয়েজ (১৮৭৮)। তার পরের বছর আর একটি বই বেরোয়। কিন্তু জনসাধারণের কাছে সাহিত্যখ্যাতি পাননি তিনি। ব্যর্থ হয়ে ক্যালিফোরনিয়া চলে যান। সেখানেই বিবাহ করে ঘর বাঁধেন। ১৮৮০ সালে ফেরেন স্বদেশে। ১৮৮২ বা ১৮৮৩ সালে ট্রেজার আইল্যানড প্রকাশ করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর আগের পক্ষের ছেলের সন্তোষ বিধানের জন্য। এই বইটি লেখার পর তাঁর জনপ্রিয়তার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এরপরে লেখেন বিখ্যাত কিডন্যাপড, ডাঃ জেকিল অ্যানড মিঃ হাইড, প্রিনস অটো প্রভৃতি গ্রন্থ। ১৮৮৭ সালে স্টিভেনসন ইংলনড ছেড়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সামোয়া দ্বীপে বাসা বাঁধেন। আর ফিরে আসেননি। সমসাময়িক রোম্যানটিক যুগের সাহিত্যের ধারা থেকে স্টিভেনসন ছিলেন বিচ্ছিন্ন। রচনারীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন প্রচন্ড খুঁতখুঁতে। তা ছাড়া সূক্ষ্ম হাস্যরসের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর রচনারীতিও ভাবাবেগ বর্জিত। ট্রেজার আইল্যানডে হকিনসের বাবার মৃত্যুর ঘটনা চটপট সেরে নিয়েছেন।

ট্রেজার আইল্যানডের টাইপ চরিত্রগুলি এখন তো কিংবদন্তিতে পরিণত। ডাঃ লিভজি, জন সিলভার, বুড়ো ক্যাপটেন। প্রদীপকুমার সেন সাবলীল ভাষায় বইটির অনুবাদ করেছেন।

শুধু ট্রেজার আইল্যানড নয়, কসমস আরও দুটি ক্লাসিকসের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। রবিনসন ক্রুশো, ড্যানিয়েল ডিফো। ভাষান্তর অর্ণব রায়। গালিভারস ট্রাভেলস, জোনাথান সুইফট। অনুবাদ চিরঞ্জীব সেন। অনুবাদকেরা সবাই সিদ্ধহস্ত। সেদিক থেকে কিছুই বলার নেই। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত কসমো স্ক্রিপটের (৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৭০০০০৯) অঙ্গসজ্জা। অত্যন্ত যত্ন করে ছাপা হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের এই ক্লাসিকসগুলি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শুধু কিশোর নয়, বয়স্কদের কাছেও অনূদিত গ্রন্থগুলি আদৃত হবে।

পা.চ

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা—১

এই সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য পদরেণু স্পর্শে ধন্য স্থানগুলির বিবরণ।

যদু মল্লিকের বাড়িতে ঠাকুর সিংহবাহিনীর পুজো দেখেন

নির্মলকুমার রায়

উত্তর কলকাতার ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটের মহানচেতা ও পরমভক্ত যদুলাল মল্লিকের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কয়েকবার শুভাগমন হয়েছিল। সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শন ও ঠাকুরের সংগে যদুলাল মল্লিকের মাতার অপূর্ব বাৎসল্য রসের মাধুর্যে এই বাড়িটি ধন্য। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ির দক্ষিণপাশেই যদুলালের একটি বাগানবাড়ি থাকায় সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং যদুলালের আহ্বানে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে মাঝে মাঝে ভক্তগণসহ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটের বাড়িতে আসেন।

১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সংগে নিয়ে যদুলাল মল্লিকের বাড়িতে 'সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শনের জন্য আসেন। মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেই দিনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তার কিছু অংশ :– 'ঠাকুর যদু মল্লিকের বাটী আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। যে ঘরে 'সিংহবাহিনীর নিত্য সেবা হইতেছে, ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসংগে উপস্থিত হইলেন।. . . ঠাকুর 'সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন। কি আশ্চর্য, দর্শন করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্থ। প্রস্তর মূর্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূন্য! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভংগ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন --মা আসি গো! কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না,--সেই একভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।' ...... ইত্যাদি। (কথামৃত--৩য় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড--তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে যদুলালের এমন একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে কয়েকবারই তিনি সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন। যদুলালের পরিবারবর্গের সংগে ঠাকুর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন এবং বাড়ির অন্দর মহলেও (অধুনা ৭নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিট) যাতায়াত করতেন। যদুলালের মাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাৎসল্যভাবে ভজনা করতেন, নিজ হাতে নানাবিধ উপাদেয় আহার্য বস্তু খাওয়াতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এখানে যদুলালের মাতা সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদুলালের পিতা মতিলাল মল্লিক অপুত্রক থাকায় তাঁর শ্যালিকা (দয়াল চন্দ্র আঢ্য মশায়ের স্ত্রী) শ্রীমতী রাধারানী দেবীর একমাত্র পুত্রকে 'দত্তক' হিসাবে গ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তীকালে যদুলাল নামে খ্যাত। বিভিন্ন গ্রন্থে 'যদুর মাসী' বলে যাঁর নামের উল্লেখ আছে, তিনি দত্তক গ্রহীতা মাতা, তথা মাসিমা শ্রীমতী রংগনমণি দেবী, অর্থাৎ মতিলাল মল্লিকের স্ত্রী।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যদুলাল খড়দহের শ্রীমৎ নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন; তাঁর গৃহদেবতা 'রাধাশ্যামসুন্দর জীউর মূর্তি দর্শন করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই 'বাড়িতে কখনো ভাবাবেশে গান গাইতেন, আবার কখনো সমাধিস্থও হতেন। তাঁর বাড়ির পূজার দালানে কুলদেবী 'সিংহবাহিনীর মূর্তি দর্শন করে ঠাকুর বিভোর হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন একথা উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ঠাকুর এই মূর্তিকে জাগ্রতা দেবী বলে মানতেন। এই 'সিংহবাহিনী মূর্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, এই দেবী রাজা রাজবর্ধন দেবের আমলের বিগ্রহ এবং কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে যদুলালের পূর্বপুরুষের আমল থেকে বংশের সকলের দ্বারা পালাক্রমে পূজিতা। যদুলাল প্রতি ৯ বৎসর ৪ মাস অন্তর, ৪ মাসের জন্য এই দেবীসেবার পালার অধিকারী এবং প্রতি ২৭ বৎসর অন্তর উক্ত দেবীর 'শারদীয়া পূজার ৩ দিনের পালার অধিকারী ছিলেন। এখনও পালাক্রমে এই দেবীকে তাঁদের আত্মীয় স্বজনের নানা বাড়িতে পূজা করা হয়। বিগ্রহের অনুপস্থিতিতে এই বাড়ির ঠাকুর দালানে দেবীর শূন্য পূজার বেদীতে মূর্তির একটি ক্ষুদ্র ছবি শোভা পায়। পূর্বে যেমন এ বাড়িতে প্রায় বারোমাসই পূজা-পার্বণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত, বর্তমানেও তেমনি এ বাড়ির ঠাকুর দালানে নানা সাংস্কৃতিক কর্মধারা, সংগীতানুষ্ঠান, যদুলাল মল্লিকের জন্মবার্ষিকী উৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন আনন্দযজ্ঞে বাড়িটি প্রায়ই মুখরিত থাকে এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের স্মৃতি রক্ষার্থে যদুলালের বংশধরগণ ঠাকুরের 'সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শন উপলক্ষে নির্দিষ্ট দিনে মহা আড়ম্বরে ধর্মীয় সভার আয়োজন করেন এবং তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাও যোগদান করেন।

যদুলালের বাড়ি ৬৭নং পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ নতুন বাজারের কাছে চিৎপুর রোড (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণি) থেকে পশ্চিম মুখে পাথুরিয়াঘাটের সরু রাস্তাটি শুরু হয়েছে। এই রাস্তায় কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই রাস্তার ওপরই ডানদিকে দোতলা বাড়িটি বিদ্যমান। অপর প্রান্তে পশ্চিমদিকে সত্যনারায়ণ পারকের কাছে 'সিংহগড়' (সিংহবাহিনী দেবীর নাম অবলম্বনে) থেকে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর স্ট্রিটের ভেতর দিয়ে পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটে এসে পড়লে কয়েক মিনিট হাঁটলেই বামদিকে এই বাড়িটি পড়ে। বাড়ির প্রধান ফটক পেরিয়ে বামদিকে মূলবাড়ির প্রবেশ পথ। বাড়ির ভেতরে মাঝখানে বড় খোলা উঠোন ও চারপাশে বারান্দা; এই উঠোনের সংলগ্ন প্রখ্যাত ঠাকুর দালানে 'সিংহবাহিনী মূর্তি দর্শন করে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হয়েছিল। বাড়ির সর্বত্র বনিয়াদীর চিহ্ন এখনও বর্তমান। □

যদু মল্লিকের বাড়ি। আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায় চৌধুরী

আমেরিকার চিঠি

নিষিদ্ধ জন্মনিরোধক 'ডেপো-প্রোভেরা' ইনজেকশন আমেরিকায় ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ওপর ব্যবহার করা হচ্ছে

আমেরিকা থেকে সুদীপ্ত মজুমদার

আমেরিকায় প্রেস ও মিডিয়া (অর্থাৎ সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন) এক বিরাট শিল্প। বড় বড় করপোরেশনের মত মিডিয়ার মালিকানাও ধনীদের হাতে। এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিডিয়ার প্রবেশ। প্রায় প্রত্যেকটি রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন কোন না কোন চেইন দ্বারা যুক্ত। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা এদের। আমেরিকার ২২ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৭৩ জন খবরের কাগজ পড়ে প্রত্যেকদিন। প্রায় সাড়ে আট কোটি বাড়িতে রঙিন টিভি আছে। প্রায় চার কোটি বাড়িতে দুটো করে টিভি সেট আছে। প্রত্যেক বাড়িতে দিনে গড়ে অন্তত ছয় থেকে আট ঘণ্টা টি ভি সেট চালু থাকে।

টিভিতে যেসব প্রোগ্রাম হয় তার বেশির ভাগই সস্তা চটুল অথবা স্পোর্টস এবং খবর। সিরিয়াল ফিলম দেখান হয় যাতে খুন খারাপি কিংবা ভাঁড়ামোই বেশি। খবরের এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের মাঝে মাঝেই ৩০ সেকেন্ডে অথবা এক মিনিটের বিজ্ঞাপন। কুকুরের খাবার থেকে আরম্ভ করে জাপানি টয়োটা গাড়ি সব কিছুরই বিজ্ঞাপন টিভিতে দেখা যায়। যখন পপুলার ফিল্ম সিরিয়াল অথবা স্পোর্টসের প্রোগ্রাম দেখান হয় তখন মাত্র ৩০ সেকেন্ডের একটা বিজ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন কোমপানিগুলো টিভি কোমপানিগুলোকে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে কী পরিমাণ ব্যবসা করে টিভি কোমপানিগুলো।

সারা আমেরিকায় ১৭৩০টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া প্রকাশিত হয় হাজার হাজার সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকা। সবচেয়ে বেশি সারকুলেশন হল ওয়াল স্ট্রিট জারনাল (প্রত্যহ ২০ লাখ কপি)। খবরের কাগজগুলোর বেশির ভাগ আয় বিজ্ঞাপন থেকে। নিউ ইয়র্ক টাইমস সারা পৃথিবীতে সিরিয়াস কাগজ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু বেশির ভাগ মিডিয়াই খবর পরিবেশন করে গতানুগতিকভাবে। সরকারকে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু সমাজের সমস্যাগুলো কী করে সমাধান করা যায় সেদিকে কোনরকম পথ নির্দেশ করে না। এবং যেহেতু মিডিয়ার মালিকানা বড় বড় করপোরেশনের হাতে এবং এই করপোরেশনগুলি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে দারুণ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান, তাই এদের কুকীর্তিগুলো পাঠকের সামনে আসে না। কিন্তু এমন অনেক নির্ভীক সাংবাদিক এখানে আছেন যারা করপোরেশনের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করে ছোট-খাট পত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। এমনই একজন সাংবাদিক হলেন কারেন ব্রানান। মিনিয়াপোলিসের সাংবাদিক। অনেক দিন যাবৎ একটা অনুসন্ধান চালান এবং তারপর সে বিষয়ে রিপোর্ট লেখেন। কারেনের বয়স প্রায় চল্লিশ। মহিলা। ওঁর সংগে কথাবার্তা বলে এবং নানান নথিপত্র ঘেঁটে এক করপোরেশনের অসামাজিক কার্যকলাপের এই রিপোর্টটা তৈরি হয়।

'সরকারি নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের যে ডেপো প্রোভেরা ইনজেকশন ক্যানসার এবং প্রসব-সমস্যার জন্য আমেরিকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সেই ইনজেকশনই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সমেত কয়েকটি বিকাশশীল দেশে লক্ষ লক্ষ মহিলার ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

মিচিগানের আপজন করপোরেশনের তৈরি এই ওষুধ ভারত, ব্রাজিল, কানাডা, জাপান, সুইডেনসহ আরো কয়েকটি দেশে জন্ম নিরোধক হিসাবে ব্যবহারের জন্য লাইসেনস পায়নি। ইংল্যানডেও এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জিমবাবোয়ে ও নিকারাগুয়াতেও এর ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, একবার ডেপো প্রোভেরা ইনজেকশন নিলে অন্তত তিন মাস গর্ভসঞ্চারের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

এই ইনজেকশন আমেরিকায় কিছু কৃষ্ণাংগ ও ভারতীয় মহিলার ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে, এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর এখন এই ডেপো প্রোভেরা বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যানড ড্রাগ অ্যাডমিনিসট্রেশন এবং অন্যান্য সংস্থার বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত বোরড অব এনকোয়্যারি এখন এই ওষুধ নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে। যদিও এই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা আপজন করপোরেশন তাদের তৈরি এই ইনজেকশন সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই দাবি করেছেন। ওয়ারলড হেলথ অরগানাইজেশন এবং ইনটারন্যাশনাল পেরেনটহুড ফেডারেশনও এই দাবি সমর্থন করছেন এবং ওষুধ প্রস্তুতকারকদের মদত দিচ্ছেন।

বস্তুত, সরকারি সংস্থা ইউ এস এজেনসি ফর ইনটারন্যাশনাল ডেভেলপমেনটই (USAID) এই ওষুধ তৈরির উদ্যোক্তা। USAID এর ১৯৭৯ সালের একটি দলিলের উল্লেখ করে সানফ্রানসিসকোর পত্রিকা 'মাদার জোনস' এ বলা হয়েছে যে এই সংস্থা তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে মেকসিকো, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের ৪,৫০,০০০ মহিলার ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ডেপো প্রোভেরা ইনজেকশন পনের বছর আগে তৈরি হয়েছে কিন্তু আজ অবধি জন্মনিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হবার সরকারি অনুমোদন পায়নি। ১৯৭৮ সালে এই ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন করে ব্যর্থ হয়। কারণ তখন বেশির ভাগ লোক এই ওষুধের প্রয়োগের বিপক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। আপজন করপোরেশন মূলত বানর এবং কুকুরের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন এই অজুহাতে বিজ্ঞানীরা এটা নিষিদ্ধ করার সপক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেন।

কুকুরের ওপর যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সমস্ত কুকুরের জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেগুলি মারা যায়। এছাড়া ওদের স্তনগুলিতে সাংঘাতিকভাবে স্ফীত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর বানরের ওপর প্রয়োগ থেকে দেখা গেছে এর থেকে জরায়ুতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু আপজন করপোরেশন ক্রমাগত তাদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা অস্বীকার করে গেছে। তারা অজুহাত দেখিয়েছে, যেসব পশুর ওপর এই ওষুধের পরীক্ষা চালান হয়েছে মডেল হিসেবে সেগুলি ভাল ছিল না।

ন্যাশনাল হেলথ নেট ওয়ারক এর সভ্য সাংবাদিক কারেন ব্রানান এই প্রতিবেদককে বলেছেন যে ৭০টি দেশের এক কোটি মহিলার ওপর এখনও এই ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। USAID এই অননুমোদিত ওষুধ ব্যবহারযোগ্য নয় জেনেও এই ব্যাপারে মদত দিচ্ছে। ব্রানান মিনোপলিসের অনেক মহিলা (যাদের 'ডেপো' ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে) বিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সংগে কথা বলে এই ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ফাঁস করে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।

এফ ডি এ অনেক কারণে এই ওষুধ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সেগুলি হল ঋতুস্রাবের অনিয়ম, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, ওজন বৃদ্ধি এবং স্তনে ক্যানসারের সম্ভাবনা।

ব্রানান মিনেসোটার রাজধানী সেনট পলের রামসে মেডিকেল সেনটারে বারবারা অ্যানি মুর নাম্নী একজন কৃষ্ণাংগ রমণীর সংগে কথা বলেছেন। ওঁকেও ডেপো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী মুর বললেন 'ওরা বলল যে ইংল্যানডে সবাই কয়েক বছর ধরে এই ওষুধ ব্যবহার করছে। আমি ভাবলাম ইংল্যানড-এর মহিলারা নিশ্চয়ই জানে তাদের ওপর কী ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে।'

ব্রানান জানান, শ্রীমতী মুর একমাস পরে দ্বিতীয়বার হাসপাতালে এলেন 'ডেপো' ইনজেকশন নেবার জন্য। এবং তাকে সেই ইনজেকশন দেওয়া হল তাঁর গর্ভ সঞ্চারের বিষয়ে কোনরকম পরীক্ষা না করেই। কিন্তু পরে ডাক্তাররা দেখলেন ওই মহিলা ছমাস আগেই গর্ভবতী হয়েছেন। তখন তাঁকে বলা

হল, তুমি কি এই সন্তান রাখবে? শ্রীমতী গুর বললেন, হ্যাঁ। তখন ডাক্তাররা তাঁকে বোঝালেন এই সন্তানের বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ। তারপর গর্ভপাত করান হল। গর্ভপাতের পর মহিলা তাঁর ভ্রূণটি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ সেকথায় কর্ণপাতও করেনি। পরে জানা গেল যে ভ্রূণটির মধ্যে কিছু খারাপ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

সব কিছু জেনে শুনে কেন এই ওষুধ এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উত্তরে বলা যায় যে, ডেপো প্রোভেরা আইনানুগভাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে, কারণ এটা এখন এক ধরনের ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া যে ডাক্তাররা এটাকে জন্মনিরোধক হিসেবে ব্যবহার করার কথা সুপারিশ করছেন তাদের ওপর এফ ডি এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানকার কিছু ডাক্তার এখনও এটা সুপারিশ করছেন কারণ তাঁদের মতে এটা এক ধরনের সার্থক জন্মনিরোধক ওষুধ।

ডেপো প্রোভেরার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন ৬০০ জন মহিলার নাম সংগ্রহ করেছেন ন্যাশনাল উইমেনস হেলথ নেট ওয়ার্ক। সারা বিশ্বে যাঁরা ডেপোর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের নাম জানাবার জন্য এই সংস্থা সবার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ক্রেতা-স্বার্থে উৎসাহী বহু সংগঠন ডেপো-প্রোভেরা নিষিদ্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তদুপরি তাঁরা USAID-এর এই ওষুধ প্রয়োগের ব্যাপারে ক্রমাগত মদত দেওয়ার নিন্দা করেছেন। অথচ USAID এর সূত্র থেকে বলা হয়েছে মহিলাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই ওষুধের প্রতি চাহিদার জন্যই তাঁরা এই ওষুধ প্রয়োগের কথা বলছেন। এই সংস্থার একজন প্রাক্তন মুখপাত্র বলেছেন 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই বিস্ফোরণ এখনই বন্ধ না করলে এদেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে। বহির্বিশ্বে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন।'

কথা হচ্ছিল রোনালড রসের সঙ্গে। বয়স্ক সাংবাদিক। ভিয়েতনামে বছর পাঁচেক কাটিয়েছেন। এখন ম্যাকলেসটার কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান। বর্তমান আমেরিকান মিডিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে দারুণ ক্রিটিকাল। এখানকার প্রেসের ওপর কতকগুলো সূক্ষ্ম সেনসরশিপ কাজ করে। মানহানির মামলা তাদের মধ্যে অন্যতম। কোন ছোটখাট পত্রিকার পক্ষে ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখলেই মানহানির মামলার হুমকি আ... ...পূরণ হিসাবে দশ বার থেকে ৫০ লাখ কিংবা এক... ...টি টাকা পর্যন্ত দাবি করতে পারে বাদী পক্ষ। যদিও অত টাকা নাও দিতে হয় ওই ধরনের হুমকিই প্রেসকে বিতর্কিত বিষয় থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। সবচেয়ে আশংকার ব্যাপার এই যে কিছু সাহসী ও অ্যাগ্রেসিভ পত্রিকা যদিও রিসারচ করে কিছু ছাপে, সেটা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারে না।

এদেশে এমন অনেক সাংবাদিক আছেন যাঁরা সত্য অনুসন্ধান করার জন্য নানান ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু মিডিয়া মালিকানা ও প্রতিষ্ঠিত এডিটররা চান না সে ধরনের ঝুঁকি নিতে, কেন না তাহলে কাগজের ব্যবসায় লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রেস আমেরিকার তৃতীয় বৃহৎ শিল্প। শেয়ার হোলডাররা চায় যত বেশি মুনাফা কামান যায়।

কারেনের মত আরও কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এদের কয়েকজন এখন একটা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। বিষয় হল আমেরিকার বড় বড় করপোরেশনগুলো ভাড়াটে প্রাইভেট সৈন্যদের পয়সা দিয়ে এল সালভাদোরে স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষ নিয়ে গেরিলাদের খতম করার কাজে নিযুক্ত করছে। দারুণ চাঞ্চল্যকর খবর। □

বিজ্ঞান

কারবন ডাই-অকসাইড এবং পরিবেশ

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

অতিরিক্ত পরিমাণে কয়লা, তেল পুড়িয়ে পুড়িয়ে এখন এমন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে যে বসবাসের পক্ষে তা অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য। যে সব দূষিত গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ুকে বিষিয়ে তুলছে তার মধ্যে সালফার ডাই-অকসাইড, কারবন মনো-অকসাইড আর নাইট্রোজেনের অকসাইডও আছে। কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এতেও পৃথিবী বসবাসের অনুকূলে থাকতে পারবে না। পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

কারবন ডাই-অকসাইডকে শোষণ করতে পারে তেমন প্রধান সূত্রগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সমুদ্র আর অপরটি হচ্ছে গাছপালা। গাছপালারা বায়ুর কারবন ডাই-অকসাইডকে গ্রহণ করে থাকে। তারপর জল, সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে তার শর্করা বা কারবোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে থাকে। এই পদ্ধতির নাম সালোক সংশ্লেষ।

মানুষ সে খাদ্য গ্রহণ করে। পশুরাও। কারবোহাইড্রেট থেকে তারা শক্তি নিয়ে থাকে আর তা করতে গিয়ে তারা কারবন ডাই-অকসাইড আবার ফিরিয়েও দেয়। এই পদ্ধতিরই নাম বেসাপবেশন বা শ্বাস।

প্রকৃতিতে কারবন ডাই-অকসাইডের সমতা এইভাবেই রক্ষা পায়। বাড়তেও পারে না, কমতেও পারে না। কিন্তু একদিকে গাছপালা ধ্বংস আর অন্যদিকে অফুরন্ত কয়লা এবং তেলের ব্যবহার চলার ফলে কারবন ডাই-অকসাইড সাইকেলের সাম্যতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারছে না। কারখানার পর কারখানা গজিয়েই উঠছে। অথচ অতিরিক্ত কারবন ডাই-অকসাইডকে যে বায়ুতে নির্গত হওয়ার থেকে দমন করা অন্য কী উপায়ে সম্ভব হতে পারে তার পথ নির্ণয় অদ্যাপিও হয়ে উঠল না। কারবন ডাই-অকসাইড শোষণের আরেকটি বড় সূত্র হল সমুদ্র। বৃষ্টি হলেও বায়ুর কারবন ডাই-অকসাইড কারবনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। সমুদ্রে কারবন ডাই-অকসাইড কারবনেটে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমুদ্রও আজ আর অতিরিক্ত কারবন ডাই-অকসাইডকে শোষণ করতে পারছে না। পরিবর্তিত অবস্থা এখন অনেকটা বেসামাল হয়ে গেছে। সমুদ্রও কারবন ডাই-অকসাইড শোষণ করে করে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। আর কারবন ডাই অকসাইড শোষণের ক্ষমতা বড় বেশি নেই।

কারবন ডাই-অকসাইড বায়ুতে অতিরিক্ত পরিমাণে বর্তমান থাকলে সব চাইতে মুশকিল হল এই যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এতে নানা অসুখ-বিসুখও হয়। কতকগুলি রোগ হল চামড়ার ক্যানসার, হারটের রোগ ইত্যাদি। কত পরিমাণে কারবন ডাই অকসাইডের কনসেনট্রেশন বাড়ছে তার সঠিক মাত্রা না জানলেও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন প্রতি একশ বছরে ত্রিশ শতাংশ পরিমাণে কারবন ডাই-অকসাইডের কনসেনট্রেশন বাড়ছে। তারা আরও হিসেব করে দেখেছেন যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতি একশ বছরে এক ডিগরি সেলসিয়াস করে বাড়ছে। এও বিশ্বাস করা হচ্ছে যে যদি কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ ক্রমশ এইভাবেই বাড়ে তবে অদূর ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের বরফও গলে যাবে। তার জন্য মাত্র চার ডিগরি সেনটিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধিই যথেষ্ট।

তাপমাত্রা যে বাড়ে তারও একটা কারণ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। সূর্যের আলোকে কারবন ডাই-অকসাইড রুখতে পারে না। কিন্তু সূর্যের আলো একবার যদি ঢোকে তবে তার থেকে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তার বিকিরণ কারবন ডাই-অকসাইডের উপস্থিতিতে সম্ভব নয়। এইভাবেই কারবন ডাই-অকসাইডের উপস্থিতিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলছে। একেই 'গ্রিণ হাউজ এফেকট' বলা হয়ে থাকে।

কারবন ডাই-অকসাইড নিয়ে আর যেটি বড় সমস্যার কথা সেটি হল এই যে ধনীরা ধনী হবে আর গরিবরা আরও গরিব। এর মানে হল এই যে পৃথিবীর যে সব অঞ্চল এতকাল শীতপ্রধান দেশ বলে গণ্য হয়েছিল, সেইসব অঞ্চল অতঃপর উষ্ণতর হবে। সুতরাং সেইসব অঞ্চলে নানা রকমের ফসলও ফলান সম্ভব। সেই দেশগুলির মধ্যে পড়ছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ক্যানাডা, উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপ, আরজেনটিনা, চীন, নিউজিল্যানড ইত্যাদি।

এটা ঐসব দেশে প্রযোজ্য হলেও ভারতের মত উষ্ণপ্রধান দেশে তা খাটবে না। উষ্ণতর এলাকাগুলি আরও উষ্ণ হয়ে উঠবে। এতে ভারতের মত দেশগুলির ক্ষতিও হতে পারে।

কয়লা এবং তেলের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও, বৃক্ষরোপণ একটি উপায় যাতে কারবন ডাই অকসাইডকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। □

খবর খবর

পুর নির্বাচন কবে?

বিশেষ সংবাদদাতা

কলকাতা, হাওড়া এবং অন্য কোন পুরসভার নির্বাচনই আগামী এক বছরে হচ্ছে না। বামফ্রনটের বৈঠকে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন আগামী বছর ফেবরুয়ারির মধ্যে করা হয়। হাওড়া পুরসভার নির্বাচন করার কথা তার আগেই। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন তৎপরতা নেই।

শহরতলির ছটি পুরসভাকে কলকাতা পুরসভার মধ্যে আনার জন্য অনেকদিন থেকেই তোড়জোড় চলছে। পাঁচটি পুরসভা সি পি আই (এম)-এর দখলে। কিন্তু সেই সব পুরসভার সি পি আই (এম) নেতারাই কলকাতা পুরসভার সংগে সংযুক্তিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত রাজ্যসরকার আপত্তি অগ্রাহ্য করে যাদবপুর, দক্ষিণ শহরতলি এবং গারডেনরিচ পুরসভার সংযুক্তি সম্পর্কে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। কিন্তু বরানগর দমদম ও দক্ষিণ দমদম পুরসভা সংযুক্তির কোন উদ্যোগ নেই।

ছ'টি পুরসভার সংযুক্তির পর অন্তত ৯ মাস সময় দিতে হবে ভোটার তালিকা ও অন্যান্য প্রস্তুতির জন্য। শহরতলির পুরসভাগুলিকে কলকাতা পুরসভার সংগে যুক্ত করার ব্যাপারে সি পি আই (এম)-এর মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়। সি পি আই (এম) নেতারা নিশ্চিত যে, হাওড়ায় পুর-নির্বাচন হলে বামফ্রনট জিততে পারবে না। কলকাতা পুরসভাতে সংযুক্তি ছাড়া জয়ী হওয়া অসম্ভব।

পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর আর নতুন পুরসভা গঠনে রাজি নন। তিনি চাইছেন, আশপাশের 'পাঁচ-ছ'টি পুরসভাকে নিয়ে একটি পুরসভা গঠন করতে। তাতে প্রশাসনিক খরচ কমবে এবং কিছু উন্নয়নমূলক কাজও হতে পারে।

পুরকর বৃদ্ধিতে ক্ষোভ

রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় কর বৃদ্ধির ফলে দারুণ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। করদাতারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। রাস্তাঘাট মেরামত হয় না, পানীয় জলের জন্য চারদিকে হাহাকার। কোন সুরাহা নেই। পুরসভায় নতুন লোক নিয়োগ হচ্ছে, পুর কমিশনারদের জন্য খরচ-খরচা বাড়ছে। আর যত দুর্ভোগ বাড়ছে করদাতাদের। কোথাও কর বেড়েছে দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ। আবার অনেক জায়গায় পুরপিতারা নিজের লোকের কর কমিয়ে দিয়েছেন। বরানগর এবং কামারহাটির দুটি পুরসভায় সি পি আই (এম) দ্বিধাবিভক্ত। দুই চেয়ারম্যানই পারটির লোক। এঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থাও জানিয়েছেন সি পি আই (এম)-এর কমিশনাররাই।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের খরচ

এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য খরচ দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে খানাপিনার জন্য। ভোটারদের তর্জনীতে ফোঁটা দেবার কালি নাকি এ রাজ্যে পাওয়া যায়নি। আনতে হয়েছে কর্ণাটক থেকে। শুধু এই কালি কিনতে লেগেছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আর কালির অরডার দিতে, তাগাদা দিতে অফিসাররা তিনবার কর্নাটক ঘুরে এসেছেন বিমানে। তাতে খরচ হয়েছে আরও হাজার দশ টাকা। রবার স্ট্যামপ—যা দিয়ে ভোট দিতে হয়, সেই রবার স্ট্যামপও কিনে আনতে হয়েছে রাজস্থান থেকে। সাকুল্যে তিন লক্ষ টাকা। মন্ত্রীর ঘরে বৈঠক করে ঠিক হয়েছিল কাগজ, পেনসিল, হ্যারিকেন যা লাগে, কেনা হবে জেলায় পাইকারী সমবায় থেকে। কিন্তু ১৩টি জেলায় সমবায় থেকে একটি পয়সার জিনিসও কেনা হয়নি। দশ টাকার হ্যারিকেন কেনা হয়েছে তিরিশ টাকায়। একটা পেনসিলের দাম দেড় টাকা।

গতবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দৌলতে অনেকে ছাতা, জুতো, রেনকোরট, ব্রিফকেস পেয়েছিলেন। এবারও খুব খারাপ হয়নি। □

জীবনবাবু অভিযোগ করেছেন, 'রতুয়া থানার ও সি গণহত্যার চক্রান্তের সংগে যুক্ত। ও সির শাস্তি দাবি করা হয়েছে।'

জেলার পুলিশ প্রশাসনের একজন পদস্থ অফিসার বললেন, রতুয়া থানার ও সি সৌকত আলির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, তদন্ত কারী অফিসারের কাছে তাঁরা কোন তথ্য প্রমাণ দিতে পারেননি।

রতুয়া থানার ও সি সৌকত আলি ঘটনার পাঁচ দিন পর ছুটি নিয়েছেন। ৬০ দিনের ছুটি। সি পি আই (এম) দাবি জানায়, ছুটিতে থাকার সময় সৌকত আলির কোয়ারটারে থাকা চলবে না। বাধ্য হয়ে তিনি ২৪ পরগণার বনগাঁয় চলে যান। ১০ জুলাই থেকে রতুয়া থানার দায়িত্ব নেন সাবকেল ইনসপেক্টর দয়াল প্রামাণিক।

মালোপাড়ার রতুয়া থানার চাঁদ মুনি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি

গণহত্যায় মারা এখনও আতঙ্কিত

মালোপাড়ার গণহত্যার নায়ক কারা ?

মালদহ থেকে ফিরে নিশীথ দে

মালোপাড়ার গণহত্যা কি মাসুদ আলমের খুনের বদলা - নাকি কংগ্রেস (ই)র পরিকল্পিতভাবে খুন-সন্ত্রাসের রাজনীতির সূচনা মালোপাড়ার গণহত্যাকে যে যতই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বলে চালাবার চেষ্টা করুন না কেন নিঃসন্দেহে নৃশংস ঘটনা। মালোপাড়ার গণ-হত্যার ব্যাপারে সি পি আই (এম) সংযত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। মাসুদ আলমের খুনের ঘটনাকেও মালোপাড়ার মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে। মাসুদের খুনী কি সি পি আই (এম) ? না কি কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন নিয়ে কোন্দলের পরিণতি -

মালদহের মালোপাড়ার ঘটনা নিয়ে একটা রাজনৈতিক ইস্যু করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। মালদহ বনধ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। জেলা জুড়ে সি পি আই (এম) মালোপাড়ার 'গণহত্যা'র বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। আর কোন ইস্যুতে সি পি এম এত বেশি প্রচার চালায়নি।

মালদহ জেলায় রাজনৈতিক সংগঠন মূলত দুটি দলের, সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)। আর কংগ্রেস (ই)র মূল শক্তি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরী। সি পি আই (এম)-এর মালদহ জেলার আক্রমণের মূল লক্ষ্য কংগ্রেস (ই) নয়, গনি খান চৌধুরী, পুরোপুরি ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লড়াই।

শুধু সি পি আই (এম) নয়, দলের প্রতিটি গণ সংগঠন - ছাত্র ফেডারেশন, যুব ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, নিখিলবংগ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে হাজার হাজার হ্যানডবিল বিলি করা হয়েছে। জেলার সি পি আই (এম) সম্পাদক জীবন মৈত্র এবং অন্যান্য নেতা কয়েকশো পথসভা করেছেন। জীবনবাবু অভিযোগ করেন, রেলমন্ত্রী কংগ্রেস কর্মীদের বলেছেন 'যাঁরা বামপন্থীদের খুন করতে পারবে না তাঁদের কংগ্রেসে স্থান নেই।' অবশ্য কংগ্রেসের জেলা নেতাদের বক্তব্য হল, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর সি পি আই (এম) রেলমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা প্রচারে নেমেছে।'

রেলমন্ত্রী গনি খান চৌধুরীর নামে কয়েকটি রাস্তার মোড়ে লেখা চোখে পড়লো, 'আমার চিন্তাধারা বেকার সমস্যার সমাধান - খুন, সন্ত্রাস, ক্তি আর টি আর নয়।'

মালোপাড়ার ঘটনা নিয়ে কলকাতায় যে প্রচার চলছে এবং শহর মালদহে মাইকের শব্দ যত সরগরম, মালোপাড়ার পরিস্থিতি কিন্তু মোটামুটি স্বাভাবিক। সেই ৫ জুলাই এর বীভৎস ঘটনার সাক্ষ্য চারদিকে ছড়ানো - আধপোড়া বাড়ি, কয়েক শ ভাংগা টালি, ইট। সন্তানহারা মায়েরা এখন আর চোখের জল ফেলেন না, মাঝে মাঝে বুক চাপড়ান। এখনও গাঁয়ের অনেক জোয়ান ছেলে ফেরার। গাঁয়ে সশস্ত্র পুলিশ ক্যামপ বসেছে, পুলিশ বাড়ি বাড়ার আগে থেকেই টহল দিয়ে বেড়ায়। গাঁয়ের মানুষ আর অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে রাজি নয়। মানুষজন আবার আগের মতই স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছেন। পুলিশ বহু লোককে গ্রেফতার করেছে, অনেকের খোঁজে গ্রামে গ্রামে পুলিশী অভিযান চলছে কিন্তু পুলিশী হামলা বা হয়রানির অভিযোগ পায়নি।

সি পি আই (এম) প্রচার অভিযানের সময় অভিযোগ করেছেন, 'বরকত সাহেবের ভৈরববাহিনী মালোপাড়ায় গণহত্যা করেছে। বরকত সাহেব যে এই গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে।'

গ্রাম। মালদহ থেকে দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটারের মত। রতুয়া থানা থেকে ১৯ কিলোমিটার। সামসি থেকে মালোপাড়া যাওয়ার আট কিলোমিটার রাস্তা শুধু কাঁচা নয়, এবড়ো খেবড়ো। এক ঘন্টা বৃষ্টি হলে কাদায় কাদা, কোন গাড়ি ঢুকতে পারে না।

মালোপাড়া বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু একটিও দোকান নেই। অসুখ-বিসুখ করলে ছুটতে হয় বিশ কিলোমিটার দূরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

সি পি আই (এম) নেতা আবদুল বারির জামাই মহঃ আফাজুদ্দিন জনগণনা কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁর পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামের লোকসংখ্যা ১২শর মত। পরিবার দুশোর কিছু বেশি। পুরোপুরি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। একজনও হিন্দু নেই। চাঁদমুনি বা মালোপাড়ায় কোন ডাকঘর নেই। সামসি থেকে ডাক পিওন আসে। গাঁয়ে কোনদিন খবরের কাগজ আসেনি। মালোপাড়া নিয়ে খবরের কাগজে এত হৈ চৈ হয়েছে তা জনা তিন চার ছাড়া কেউ জানে না।

মালোপাড়ার মেয়ে বউরা লেখা পড়া জানে না বললেই হয়। মালোপাড়ার গ্রামের মেয়ে পুরুষ কিন্তু প্রচন্ড পরিশ্রমী। ধর্মে মুসলমান ঠিকই তবে বাদিয়া সম্প্রদায়ের। এঁদের পূর্বপুরুষ শের শাহের সেনাবাহিনীতে ছিলেন। বিবাহিতা মেয়েরা অনেকে সিঁথিতে সিঁদুর দেন, হাতে শাঁখা পরেন।

সমস্ত পরিবারই জমির উপর নির্ভরশীল। অনাবাদী জমিতে এঁরা সোনা ফলান। পাকা বাড়ি চোখে পড়েনি। মাটির মোটা দেওয়াল। সুন্দর করে নিকানো দাওয়া।

মালোপাড়ায় রাজনীতি করেন অনেকেই কিন্তু এক পরিবারের সংগে আর এক পরিবারের ঝগড়া রেষারেষি ছিল না। চাঁদমুনি হল সি পি আই (এম) এর 'ভিয়েৎনাম।' পশ্চিমপাড়া পুরোদস্তুর সি পি আই (এম), পূর্বপাড়ার কিছুটা কংগ্রেস ঘেঁষা। আবদুল বারি সাহেব জেলা পরিষদে সি পি আই (এম) সদস্য এবং পার্টিরও লোকাল কমিটির সদস্য। আর ৪ জুলাই অর্থাৎ গণহত্যার আগের দিন নৃশংসভাবে খুন হন রতুয়া ব্লক যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আলম। আলমের বাড়ি বারি সাহেবের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে। অবশ্য বারি সাহেব বেশির ভাগ সময় থাকেন রতুয়ায়। দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল, সদ্ভাব ছিল, মারামারি ঝগড়াঝাঁটি হয়নি।

মালোপাড়ার গণহত্যা কি পূর্ব পরিকল্পিত?

হাংগামার সূত্রপাত মাসুদ আলমের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে নয়, তার অনেক আগে থেকে। বছর দুই আগে খুনের মামলার আসামী হয় মাসুদ আলম। বাটনা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সি পি আই (এম)-এর হান্নান সাহেব খুন হন। এর পর আরও একটি খুনের ঘটনায় মাসুদকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মাস দুই হাজতবাস করার পর মাসুদ জামিনে খালাস পায়। দুটো মামলাই চলছিল। রতুয়ার বিধানসভার সদস্য সমর মুখার্জি অভিযোগ করেছেন, মাসুদ আলমের বিরুদ্ধে অনেক দিন থেকেই একটা চক্রান্ত চলছিল। ৪ জুলাই যাঁরা মাসুদকে চক্রান্তের জালে জড়িয়েছিল, তাঁদের কেউ কেউ ওঁর আত্মীয় কিন্তু সি পি আই (এম) এর সদস্য।

সমরবাবু আমার কাছে অভিযোগ করেছেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আবদুল বারির নেতৃত্বে সি পি আই (এম) মাসুদ আলমের মাথার জন্য ১১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। চাঁদমুনি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল পুরোপুরি সি পি আই (এম) এর দখলে - সি পি আই (এম) ১০ আর কংগ্রেস ১ জন। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম) জয়ী হয়েছে ৪ টি আসনে আর কংগ্রেস ৭টি আসনে। পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর সি পি আই (এম) এর লোকেরা মরীয়া হয়ে ওঠে। মাসুদ ফাঁদে পা দিল ৪ জুলাই এর চক্রান্তে। লোভ দেখাল ওর আত্মীয়, 'চল, মাছ মেরে আসি।'

মাসুদের মার কাছে জানতে চাইলাম সমস্ত ঘটনা। সবেয়া বিবি বললেন, ঢোলঘাট থেকে এসেছিলেন তোফি মাসটার (কংগ্রেস করে) ইশাক আলি (মোষ কেনাবেচা করে) আর আলাউল্লা। চারজন গেল মাছ মারতে। দুপুরে সের দেড়েক ট্যাংরা পাবদা নিয়ে ফিরে এল মাসুদ। বলল, খেতে দাও। আবার মাছ মারতে যাব পাশের খাড়িতে। ইশাক আলিই পরে মাসুদের বাড়িতে খবর দিয়েছিল, সি পি আই (এম) এর লোকেরা মাসুদকে ঘিরে ধরেছে। সেদিন রাত্রেই খুব হল্লা হল। মাসুদের মৃতদেহ পাওয়া গেল টুকরো টুকরো অবস্থায়। এক জায়গায় মুন্ডু, আর এক জায়গায় দেহ-হাত পা কাটা, পুরুষাংগ নেই। বর্শা বল্লম, পাইপগান দরকার হয়েছে একটা জোয়ান ছেলেকে খুন করতে। ধড়হীন মুন্ডু কেন? মুন্ডুর জন্য কি পুরস্কার মিলেছিল? কেউ জানে না।

মালোপাড়ায় গিয়ে তিন মাকে দেখেছি। তিনজনই কেমন যেন উন্মাদ। আবদুল বারি সাহেবের বাড়িতেই আগে গিয়েছিলাম। বারি সাহেবের বিবি তহসিনা বিড় বিড় করে বকছিলেন। বেশ বিরক্তির ভাব। কলকাতা থেকে রিপোর্টার, ফটোগ্রাফাররা আসে। বক বক করে, খটখট করে ছবি তোলে। বুকের ধন-বুকে ফিরিয়ে দিতে পারে না কেউ। খালি বক বক, খটখট। বারি সাহেবের তিন মেয়ে, তিন ছেলে। মেয়ে হামেদা খাতুনের সংগে শাদি হয়েছে মহম্মদ আফাজুদ্দিনের। জোয়ান পুরুষমানুষ বলতে তখন জামাই আফাজুদ্দিন ছাড়া কেউই বাড়িতে ছিল না।

আবদুল বারির বিধ্বস্ত গৃহ

বারি সাহেবের বাড়ির সামনে চালের পুরনো টালি সাজান। ভাঙা টালি চারদিকে ছড়ান। বাড়ির ভেতর ঢোকার মুখেই ইটের স্তূপ। ভাঙা ঘর। সব মিলিয়ে ছখানা ঘর তছনছ। মাটির মোটা দেওয়াল। ছাদে টালির বদলে কালো পলিথিন। আগুনে পোড়া বাঁশ খুঁটি, ঘরের আসবাব।

আফাজুদ্দিন বললেন, বারি সাহেব ৪ জুলাই একবার বাড়ি এসেছিলেন। সেদিনই চলে যান। আফাজুদ্দিন নিজেও ঘটনার সময় ছিলেন না। বললেন, আমার বিবি হামেদা খাতুন সব ঘটনার বিবরণ দিতে পারবে। বিবি হামেদা খাতুনকে একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দিল। হামেদা খাতুনের বয়স বছর ষোল। সাংবাদিকদের সামনে অনেকবার বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন সেই ৫ জুলাই ছিল রোজা। রাত তিনটার সময় উঠে ভাত রাঁধা হয়। বাড়ির সবাই ভাত খেয়েছি। কিছুক্ষণ পরই শোনা গেল চিৎকার-সি পি আই (এম) কে রাখা হবে না, আগুন লাগিয়ে দে, জ্বালিয়ে, মার মার......

বারি সাহেবের দাওয়ায় তখন লোকজন গমগম করছে-মেয়ে বউরা কোলের বাচ্চা নিয়ে জড় হয়েছে। ৫ জুলাই-এর পর থেকে দশ দিনের মালোপাড়ায় যত লোক গিয়েছে, এক বছরেও বাইরে থেকে অত লোক যায় না। মন্ত্রী-চারজন রাজ্যের মন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, বড় বড় নেতা, ছোট বড় রং বেরঙের গাড়ি মালোপাড়ার লোক আগে কোনদিন দেখেনি।

হামেদা খাতুন বলতে লাগলেন, 'চারদিক থেকে মিছিল আসছিল। ঘিরে ফেলেছিল মালোপাড়াকে, ওদের হাতে ছিল বর্শা, বল্লম, বোমা, পাইপগান, লাঠি- সবই ছিল। প্রথম ঢোকে বারি সাহেবের বাড়ি। হামলা চলে বেপরোয়াভাবে। প্রথমে ঘর থেকে টেনে আনে ১৬ বছরের ছেলে মহম্মদ পেশকার আলিকে। বারি সাহেবের ছোট ছেলে। ক্লাস নাইনে পড়তো। মা বাধা দিতে গিয়েছিল, লাথি মেরে তাঁকে ফেলে দিল। তারপর মার সামনে পেশকার আলির পেটে ছোরা চালিয়ে দিল-মার সামনে ছেলের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল। মাটির দাওয়া রক্ত শুষে নিয়েও মাটি কাদার মত ভিজে উঠল-লাল রং এর কাদা।

মেয়ের কথার পিঠে বিবি তহসিমা বলে উঠলেন, খুনীকে আমি চিনেছি, মালোপাড়া, রসুনগঞ্জ হাঁড়িকুল, পিন্ডনতলার লোক তারা। ওদেরই একজন হুকুম দিয়েছিল-দে, আগুন লাগিয়ে দে।

আফাজুদ্দিন বললেন, বারি সাহেবের আর এক ছেলে আমিনুল হককেও ঠিক ওইভাবে খুন করা হয়েছে। খুন, মারদাংগা শেষ নয়, ঘর থেকে সব জিনিস লুঠ করেছে একদল, আর একদল ঘরদোর ভেঙেছে। মেয়েদের গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু কানের দুল কেটে নিয়েছে। হামেদা খাতুনের ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

আগুন লাগিয়েছে মালোপাড়ার তিনটি বাড়িতে, প্রবীণ কৃষক আবদুল হক, নাজমুল হক এবং মফিজুদ্দিন

সাহেবের বাড়িতে। আবদুল হককে গুরুতর আহত অবস্থায় রতুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভরতি করা হয়। পরে নিয়ে যাওয়া হয় জেলা সদর হাসপাতালে। নাজমুল হক খুন হন। আর মফিজুদ্দিন পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। লুঠ হয়েছে এবং ভেঙে চুরমার করা হয়েছে চারটি বাড়ি।

মালোপাড়া ঘুরে বেশ বুঝতে পারছিলাম, এলোপাথাড়ি হামলা হয়নি। হামলাকারীরা বেছে বেছে হামলা চালিয়েছে। যেমন বারি সাহেবের বাড়ি ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু ঠিক পাশে বা সামনের-বাড়িতে হামলা হয়নি। মেয়েদের উপরেও হামলা হয়নি।

হামলাকারীরা কি সবাই মালো পাড়ারই লোক? না, সবাই নয়। চাঁদমুনি ১ ও ২, সামসি, শ্রীপুর, ভাদু অঞ্চলের লোকও ছিল। আফাজুদ্দিন বললেন, মালোপাড়ার এই পশ্চিম পাড়ায় ৪ ঘর বাদ দিলে সবাই সি পি আই (এম) সমর্থক।

প্রশ্ন : তাহলে চাঁদমুনি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত [illegible] সি পি আই (এম) [illegible]

[illegible] বারি সাহেবের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছে। সেদিনও বারি সাহেবকে খুন করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সে জন্য বারি সাহেব রতুয়ায় থাকেন, সেখান থেকেই কাজ চালান।

প্রশ্ন : বারি সাহেবের সংসার চলে কী করে?

আফাজুদ্দিন : বারি সাহেব প্র্যাকটিস হোমিওপ্যাথ। দু-একর জমি আছে। তা থেকেই সংসার চলে যায়। বারি সাহেব ১৯৭৮ সাল থেকে জেলা পরিষদ সদস্য।

ঘটনাটা কখন ঘটে এবং কতক্ষণ হামলা চলে? কেউই ঠিকমত বলতে পারেনি। কেউ বললেন হামলা চলে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত কেউ বললেন সাড়ে নটা পর্যন্ত। বারি সাহেবের মেয়ে বললেন, হামলা শেষ হয় বেলা সাড়ে দশটায়। পুলিশ আসে বেলা সাড়ে ১১টায়। পুলিশকে আসতে দেওয়া হয়নি। সামসিতে মতিগঞ্জের মোড়ে পুলিশকে আটকে দেয়।

প্রশ্ন : কে আটকালো?

আফাজুদ্দিন : মালোপাড়ার গণহত্যার নায়ক কংগ্রেস (ই)-র এক নেতা ১৯৭৮ সালে কংগ্রেস (ই) বারি সাহেবের বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের নির্বাচনে পরাজিত হয়। মাসুদ আলম '৮০ সালের নির্বাচনের পর হিংস্রতম হয়ে ওঠে। যে কোন সমাজবিরোধী কার্যকলাপে এগিয়ে যেত মাসুদ আলম। বারি সাহেবের সংগে মাসুদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

মাসুদ আলমের হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত?

মাসুদ আলমের বাড়িতে গেলাম একেবারে শেষে। মাঝখানে উঠোন। চারপাশে মাটির ঘর আর নিকোনো দাওয়া। উঠোনে ধান শুকোচ্ছিল। বসার জন্য দাওয়ায় পাতা চৌকি দেখিয়ে দিলেন মাসুদের মা। ৬ ছেলে ১ মেয়ে। মাসুদই বড়, বছর বাইশ তেইশের জোয়ান। দশ বছর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছিল মহেশপুরে মামার মেয়ে ডোহরা বিবির সংগে। দুটো মেয়ে।

মাসুদ কংগ্রেস (ই) করছে বছর পাঁচেক। তারপর থেকেই যত হাংগামা। মাসুদের বাবা হাজি আব্দু তালের কিছু করেন না। মালোপাড়ার ঘটনার দিন তিনেক পর থেকেই নিখোঁজ। সঙ্ঘাবে সতেরটা পেট। কিছু জমিজমা আছে তাতেই চলে যায়। [illegible] খুন [illegible]

[illegible] হাংগামা কোনদিন দেখিনি। বারি সাহেবের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। রাতের বেলায় ভয়ে বের হতে পারি না। মাঠে আড়াই বিঘা জমির পাকা ধান কাটতে পারছি না। পুলিশকে বললে পুলিশ জবাব দেয়, আমরা কি মাঠে মাঠে ডিউটি দিয়ে বেড়াব। আমার দুটো ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করছে। ভাশুরের দুটো ছেলেও হাজতে।

মাসুদ আলমের মা ছেলের খুনের জন্য যে ১৪ জনকে দায়ী করলেন তাঁদের মধ্যে সাতজন ৫ জুলাই খুন হয়েছেন।

মাসুদ আলমের খুন হওয়ার খবর রতুয়া থানার পুলিশ ৪ জুলাই রাতেই পেয়েছিল। আবদুল বারিও হাংগামার আশংকা করে থানার ও সির সংগে দেখা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পুলিশ কেন মালোপাড়ায় গেল না? মাসুদ আলমের খুনের ব্যাপারেও পুলিশ কি সেদিন নিষ্ক্রিয় ছিল? জেলার পুলিশের ইনটেলিজেন্স বলে কি কিছু ছিল বা আছে?

পুলিশ কি হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে জড়িত?

রতুয়া থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই) দু পক্ষেরই। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, রতুয়া থানা হল সি পি আই (এম)-এর একটা ক্লাব। ৫ জুলাই-এর পরে পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রান করছে। রতুয়ার এম এল এ সমর মুখার্জিও পুলিশের কাজে অসন্তুষ্ট। সমরবাবু খবর পেয়েই মালোপাড়া এবং আশপাশে বিভিন্ন গ্রাম সফর করেন। খুব সাদামাটা লোক। জলকাচা ধুতি, ময়লা শার্ট আর চটি। মাইলের পর মাইল ঘুরেছেন জনগণকে সংযত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সি পি আই (এম) ৫ জুলাই এর ঘটনার পর যে সংযত আচরণ করেছেন তাতে গ্রামের লোক স্বস্তি বোধ করেছেন। বদলা নেওয়ার রাজনীতির রাস্তা ধরলে গোটা মালদহ জেলায় হয়ত খুনের রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ত। অন্যদিকে হাংগামার আশংকা ছিল ১৬ জুলাই—সি পি আই (এম) যেদিন 'মালদহ জেলা বনধ' এর ডাক দেয়। জেলার ছ জন কংগ্রেস (ই) এম এল এ—সমর মুখারজি, ফণীভূষণ রায়, যোখিলাল মণ্ডল, মহবুবুল হক, হুমায়ুন চৌধুরী এবং আবদুল ওয়াহেদ। ১৪ জুলাই থেকে সামসিতে ক্যাম্প করেন। তাঁরা [illegible] কাছে আবেদন জানান যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বনধ পালন করা হয়।

[illegible] এম এল এ মহবুবুল হক [illegible] সুপারের কাছে অভিযোগ করেছেন, সি পি আই (এম) বেশ কিছুদিন ধরে মারধর, খুন, লুঠতরাজ, আগুন লাগান, হামলা সবই চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

মালোপাড়ায় যাওয়ার পথেই পড়ে রতুয়া থানা। সেদিন পদস্থ একজন পুলিশ অফিসার থানাতেই বসেছিলেন। তিনি আগেই বলে দিলেন, ডি আই জি, সি আই ডি সাহেব তদন্ত করছেন। আমরা আর মুখ খুলতে পারব না। ধরপাকড় চলছে। ৭ জুলাই মালোপাড়ায় একটা স্কুল বাড়িতে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। উঁচু জায়গা। সেখান থেকে গোটা গ্রাম দেখা যায়।

তবু এ কথা সে কথার পর যেসব বেরিয়ে এল তা হল : 'সেই ৪ জুলাই সন্ধ্যা থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। সে জন্য মালোপাড়ার রাস্তায় ছিল এক হাঁটু কাদা। মালোপাড়া এবং আশপাশের গ্রামে সন্ধ্যে নামলেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিদ্যুৎ যায়নিও সব গ্রামে। রতুয়া থানায় খবর আসার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ মালোপাড়ায় গিয়েছিল।

'সেদিন নয়, তার কয়েকদিন আগে থেকেই রতুয়া থানার টেলিফোন ছিল অচল। একখানি মাত্র ঝরঝরে জিপ-তাও অকেজো। রতুয়া থানা থেকে মালোপাড়া ১৮ কিলোমিটার। মালদহ শহরে জেলার পুলিশ সুপার এ বি চৌধুরীকে খবর পাঠান হয় লোক মারফৎ। পুলিশ সুপার এবং চাঁচল (২৬ কিলোমিটার দূরে) থেকে সারকেল ইনসপেকটর দয়াল প্রামাণিক আসেন পাঁচ জুলাই বিকালে।

'রতুয়া থানার ও সি সৌকত আলি আগে ছিলেন মালদহ শহরে। সেখান থেকে বছর দেড়েক আগে বদলি হন রতুয়ায়। বছর বত্রিশ বয়স। তিনটি ছেলেমেয়ে।' পদস্থ সেই অফিসার বললেন, আমি কিন্তু সৌকত আলির কাজে কোন ত্রুটি দেখিনি। মাসুদ আলমের খুনের খবর থানায় এসেছে পরের দিন। মাসুদের খুনের ব্যাপারে ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের একজন আবদুল বারির ভাই। ওদিকে ৫ জুলাই ১৩ জন খুনের ব্যাপারে ১৮৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। প্রথমে যে ৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের মধ্যেও ৯ জন সি পি আই (এম) এর লোক ছিলেন।

রতুয়া থানার এলাকা ১৮৬ বর্গমাইল। ১২ জন কনসটেবল, ২ জন সাব ইনসপেকটর এবং ২ জন এ এস আই নিয়ে অন্তত তিন লক্ষ লোকের শান্তি রক্ষা করতে হয়। অনেক দিন থেকেই আরও বেশি পুলিশ, জিপ ইত্যাদি চাওয়া হয়েছে, পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৫ জুলাই এর ঘটনার পর রতুয়া থানায় ৪ খানি জিপ, একখানা বড় ভ্যান এক প্লেটুন সশস্ত্র পুলিশ এসে গেল।

মালোপাড়ার পুলিশ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আনন্দ ঘোষ বললেন, মালোপাড়া এখন শুধু শান্ত নয়, বোঝা যাবে না যে কদিন আগে ১৪ জন মানুষ নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।

৫ জুলাই আহত হন ১৭ জন। এঁদের মধ্যে ১৪ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় রতুয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি করে। একজনকেও রাত নটার আগে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ইন্দুমোহন দাস বললেন, রতুয়ার ব্লকে এত বড় ঘটনা কোনদিন ঘটেনি।

কলকাতা থেকে অনেক মন্ত্রী, নেতা গাড়ি ছুটিয়ে মালোপাড়া গিয়েছিলেন। মালদহে এবার যা আম হয়েছে অনেক দিন হয়নি, গাছ নুইয়ে পড়েছে। অনেকে দুতিন টুকরি আম নিয়ে ফিরেছেন। এক মন্ত্রী বলে গেলেন, অনেক দিন পর মালদার ভাল জাতের আম খেল্যাম! □

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

প্রশ্ন : City and Guilds London, Technical Diploma (Radio) পরীক্ষা দিতে চাই কলকাতায় কোথায় যোগাযোগ করবো?

City and Guilds London-এর ঠিকানাটা কি?

প্রশ্ন করেছেন রূপলাল চট্টোপাধ্যায়, ডায়মনড হারবার, ২৪ পরগণা।

উত্তর : আপনি City and Guilds-এর পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় খবরাখবর কলকাতায় Director of Industries-এর নিকট পাবেন। ঠিকানা নিউ সেক্রেটারিয়েট বিলডিংস, ৯ম তল। ১ নং কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০১।

London-এর ঠিকানা : City and Guilds of London Institute. Technical college, Finsbury, London, U.K.

প্রশ্ন : বিজনেস ম্যানেজমেনট পড়ার জন্য কিরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন। ডাকযোগে ঐ Course পড়া যায় কিনা, চাকবি করেও পড়া যায় কি? ঐ কয়েকটি Institution এর ঠিকানা জানাবেন।

তাপস চৌধুরী, হাফলং আসাম থেকে জানতে চেয়েছেন। Indian Institute of Business Management & Social Welfare থেকে যে Certificate দেওয়া হয় তা কি অন্যান্য স্বীকৃত সংস্থার সমতুল?

প্রশ্নটি পুরুলিয়া থেকে মনোজ মুখার্জির।

এ ছাড়া Management এর Degree or Diploma Course সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন বালিসাই, মেদিনীপুর থেকে অনুপ মাইতি।

উত্তর : আপনাদের সকলের প্রশ্নের উত্তরে জানাই Business Management Courseটি মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর আশুতোষ বিলডিংস এ বিজনেস ম্যানেজমেনটে মাসটার ডিগরি পড়ান হয়। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলারস ডিগরি অথবা উহার সমতুল কৃষি, বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান, ইনজিনিয়ারিং এ ডিগরি। তিন বছরের কোরস। ছয়টি সিমেসটারে পড়ান হয়। ভর্তির পূর্বে যোগ্যতা নির্ধারক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। জুন, জুলাই মাসে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়, এছাড়া Indian Institute of Social Welfare and Business Management থেকে Master Degree on Business Administratrion পড়ান হয়। নবাগতদের জন্য দুই বৎসরের দিবা কোরস এবং বিভিন্ন কোমপানি প্রেরিত চাকরিরত প্রার্থীদের জন্য তিন বৎসরের সান্ধ্য কোরস। এইসব Certificate অন্যান্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের Certificate এর সমতুল। এই সংস্থার ঠিকানা : Indian Institute of Social Welfare & Business Management, College Square West, Calcutta-73 এ ছাড়া ডায়মনড হারবার রোড জোকা, ২৪ পরগণাতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত Indian Institute of Business Management রয়েছে। এখানে অনেক Certificate course-এর ব্যবস্থা আছে। উপরোক্ত ঠিকানায় Principal-এর সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : পশ্চিমবংগ পুলিশের সাব ইনসপেকটর পদে চাকবি নিতে হলে ন্যূনতম যোগ্যতা এবং করণীয় কী জানাবেন।

টুটুল রায়, আসানসোল

উত্তর : পশ্চিমবংগ পুলিশের সাব ইনসপেকটর পদে বর্তমানে সরাসরি নিয়োগ হচ্ছে না। কেবলমাত্র এমপ্লয়মেনট একসচেনজের মাধ্যমে নিয়োগ হয়। যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়মেনট একসচেনজগুলি প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করেন, এরপর প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা, মেধাগত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। আপনি এই চাকরি পেতে চাইলে আপনার এলাকার সংশ্লিষ্ট একসচেনজে নাম লেখান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য Central Reserve Office, Lalbazar, Calcutta। এ যোগাযোগ করতে পারেন

প্রশ্ন : পুলিশী আইনে রয়েছে 'নুইসেনস অ্যাকট'। এই অ্যাকটের মধ্যে কী কী বিষয় পড়ে? এটি কত নম্বর আইন, এই আইন ভংগ করলে দোষীকে কে শাস্তি দেবে, পুলিশ না বিচারালয়? আইন ভংগকারীকে কি কেউ পুলিশের হাতে দিতে পারে

প্রশ্নগুলি করেছেন মনসাদ্বীপ, ২৪ পরগণা থেকে প্রবালকান্তি হাজরা

উত্তর : দেখুন প্রবালবাবু, পুলিশী আইনে 'ন্যাইসেনস অ্যাকট' বলে কোন আইন নেই। তবে এই জাতীয় আইনগুলি আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

1) Prohibition of Smoking in passenger vehicle Act XVI of 1953.

2) West Bengal prohibition of smoking in show houses and public halls Act XXXV of 1950

যত্রতত্র প্রস্রাব পায়খানা করবার জন্য Calcutta police Act XXXXXXVIII (A) (68A). এবং Bengal police Act এর 1961-র 34 ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পুলিশ দোষীকে কোন অবস্থায় নিজে শাস্তি দিতে পারেন না। আদালতে হস্তান্তর করতে হয়। এইগুলি জামিনযোগ্য অপরাধ। আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানাই, না, পুলিশ ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি দোষীকে পুলিশের হাতে দিতে পারেন না। এমনকি অপরাধের জন্য পুলিশ কেবলমাত্র ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে ধরতে পারেন। অন্য সময় নয়।

প্রশ্ন : লায়নস ক্লাবস ইনটারন্যাশনাল ডিসট্রিকট ৩২২/বি-র ঠিকানা কী?

কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা থেকে ভূধর চক্রবর্তী।

উত্তর : ডঃ জে কে শরাব, (চেয়ারম্যান) ৪ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, ফোন ৪৪ ১২১১

প্রশ্ন : বিহার সার্কেলের State Bank এ করণিক নিয়োগ করার অফিসের ঠিকানা কী

বিপ্লব কুমার রায়, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

উত্তর : Regional Recruitment Board, State Bank of India Group, Patna Circle, Patna, Bihar

উত্তর দিয়েছেন :
সোমনাথ মিত্র

গ্রামে সাপ কমে যাচ্ছে : সাপুড়েদের মাথায় হাত

খেদাইতলায় সাপের মেলা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সাপ বিকিকিনির বাজার। সাপের মেলা থেকে ঘুরে এসে এই লেখা।

রমেন দাস

সাপের মেলা। সাপের খেলাও। নানা জাতের নানা মাপের সাপ নিয়ে দেশদেশান্তর থেকে সাপের ব্যাপারীরা আসেন খেদাইতলার মেলায়। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে জমজমাট এই মেলায় প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী ছুটে আসেন। তাদের বিশ্বাস, খেদাইতলার ক্ষেত্র পঞ্চানন জাগ্রত দেবতা। তার কাছে ভক্তি ভরে কিছু মানত করলে তা খুব দুর্লভ হয় না।

নদীয়া জেলার চাকদা স্টেশন থেকে বনগাঁমুখী পাকা পথ। এই সড়কপথ ধরে বেসরকারি বাসের আনাগোনা। চাকদা স্টেশন থেকে আধঘণ্টার যাত্রা শেষে বিষ্ণুপুর গ্রাম। বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে খেদাইতলার দূরত্ব কমবেশি দুই কিলোমিটার। কাঁচা মাটির হাঁটাপথ। সময় সুযোগে গরুর গাড়ি চলে। এখানেই বসে সাপের মেলা।

গতবছর এই সাপের মেলায় দেখা হয়েছিল চাঁদপাড়ার কানাই বৈদ্যের সংগে। আপশোসের সুরে বললেন : চার পাঁচ বছরের মধ্যে গাঁয়ের সাপগুলো যেন কোথায় উধাও। এখন আর আগের মত ব্যাপকভাবে সাপের সন্ধান মেলে না। ব্যবসা অতএব মন্দা। শ্রাবণ ভাদ্র দু মাস কানাই সাপ ধরে কাটান। বাকি সময় চাষবাস।

পাশেই ছোট একটি ঝুড়িতে একটি গোখরো সাপ নিয়ে বসে ছিল তার সাত আট বছরের ছেলে দুখাই। তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে কানাই বৈদ্য বললেন : একমাত্র ছেলেকে আমি সাপুড়ে করে তুলতে চাই। সব ছাড়লেও, বাপ ঠাকুরদার ব্যবসা ছাড়া যায়? প্রশ্ন করলাম, এই ব্যবসায়ে তো জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। ভয় হয় না?

কানাই বৈদ্য হাসলেন বিজ্ঞের মত। বললেন : ভয়ডর কাকে কয় আমাদের জানা নেই। জন্মালে তো একদিন মরতেই হবে।

একটু এগোতেই এক আশ্চর্য সুরের গান কানে এল। গোরাচাঁদ তলার যুগল দুর্লভ তার ভাগ্নে হীরেন মণ্ডলকে সংগে নিয়ে তালে তাল দিয়ে গান গাইছেন :

মাকে আনতে চল যাব
ক্ষীরনদীর কূল--
গলায় দেব ফুলের মালা,
চরণে দেব ফুল।

কোন মাকে বন্দনা? এ কি মা মনসার গান? পাশে দাঁড়িয়ে ওদের গুরু কেনারাম তখন কয়েকটা কেউটে আর পদ্মবাজ তার হাতের মুঠোয় ধরে বললেন : প্রতিটি সাপের দাম মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। হাতের সাপগুলি তখন কিলবিল করছিল।

বিজয় নগরের নলিনী সিংহ বয়সে তরুণ। গান বাজনায়ও তুখোড়, কয়েক বছর আগে এক ওস্তাদের কাছ থেকে সাপ ধরার জাদু শেখেন। এক গাদা কেউটে হাতের মুঠোয় তুলে নলিনী বললেন : যদিও একেবারে সদ্য ধরা তবু ভয় নেই। বিষ-দাঁত ভেঙে দিয়েছি। কেউটের খুচরো দর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। জাত এবং আকারের হেরফেরে দাম কমে বাড়ে।

সাপগুলি ততক্ষণে অধীর চঞ্চল। প্রসারিত ফণার ওপরে রূপালী রঙের পদ্মফুলের ছাপ সুস্পষ্ট। ফোঁস ফোঁসানির শব্দে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়লাম। নলিনী সংগে সংগে বেহুলা লখিন্দরের গান জুড়লেন। পাশে বসা অধর বাঁশিতে সুর তুললেন। সাপগুলি এখন অনেকটা শান্ত। নলিনী তাদের আবার ঝুড়িবন্দী করলেন। বললেন : অনেক গান গাই। কোন গানেই ওরা তেমন শান্ত হয় না। কিন্তু বেহুলা লখিন্দরের গান শুনলেই ওদের বেশ শান্ত নিস্তেজ বলে মনে হয়।

নলিনীর কথা শেষ হতে না হতেই একটা আলগা ঝুড়ির মধ্যে থেকে চার পাঁচটা কেউটে বিরাট ফণা তুলে দাঁড়াল। ফণা জুড়ে চোখ জুড়োন আলপনা। নলিনীর হস্ত ক্ষেপে তাদের আবার ঝুড়িবন্দী করা হল। কিন্তু তখনও হিস হিস শব্দে আমাদের গা কাঁপছিল। নলিনী আমাদের চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে হেসে উঠলেন। বললেন প্রাণের জন্য এত মায়া? সাপও মানুষকে ভয় পায়। কোন ক্ষতি না করলে বা ভয় না পেলে সাপ কখনও মানুষকে তাড়া করে না। বলেই তার অন্যরূপ। বিরাট এক কেউটের সামনে তিনি ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়লেন। কেউটেও তার ফণা মেলে নিজেকে বিকশিত করল। প্রায় দু'হাত উঁচু সাপের ফণার সংগে নলিনী খেলা শুরু করলেন হাঁটু গেড়ে মাটিতে উপুড় হয়ে। তারপর এক নিমেষে কেউটের ফণায় চুমু এঁকে দিলেন নলিনী। বোধহয় সাপটিও চুমু বিনিময় করল। চলল কেউটের সংগে প্রেম। এবার নলিনী দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন বিরাট কেউটেকে। তারপর একের পর এক সাপ তুলে গলায় জড়াতে থাকলেন।

সাপ নিয়ে খেলা

সাপের নাচন

বনগাঁর দিলীপ সাপুড়ের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। ঝুড়িতে বেশি সাপ নেই। জানালেন, দু চার দিনের মধ্যেই বীরভূম যাত্রা করবেন সাপের খোঁজে। বীরভূমের গ্রামে বড় আকারের বিষাক্ত সাপ খুব সহজেই পাওয়া যায়।

দিলীপের সংযোজন : সাপের কারবারেও মহাজনদের দারুণ উৎপাত। টাকা দাদন দেয়। আগাম দাদনের সুযোগ নিয়ে তারা খুব কম দামে সাপ কিনে নেয়। তারপর আড়ত ভর্তি করে রাখে। পরে সময় ও সুযোগ বুঝে সেই সাপই চড়া দরে বিক্রি করে।

যে খেদাইতলার মেলাকে ঘিরে এই সাপের হাট, খেদাইতলার সেই পূজারীর নাম কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান : খেদাই তলায় যে নিমগাছটির গোড়ায় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পূজা হয়, সেই গাছটির বয়স তাঁদের অজানা। সত্তর আশি বছর ধরে গাছটি একই রকম আছে। ঐ গাছে এক সময় বিষাক্ত সাপ কিলবিল করত। ডালে ডালে সাপ ঝুলত।

খেদাইতলার পাশেই সাত শালকির বিল। এই বিলেও কেউটে সাপ কিলবিল করত। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে এখনও সেখানে সাপের উৎপাত কম নয়। তবে আগের তুলনায় অনেক কম।

নদীয়ার প্রাচীনতম এই মেলা উৎসবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও এক সময় আসতেন বলে কেউ কেউ দাবি করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে নানাভাবেই কৃষ্ণচন্দ্রের এই অঞ্চলে আগমন এবং সাময়িক অবস্থানের সমর্থন মেলে। ইতিহাস এবং কিংবদন্তি যাই বলুক না কেন, খেদাইতলার মেলার জনপ্রিয়তা এখনও অতুলনীয়। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

অঞ্জনা ব্যানারজি / আলোকচিত্র : নিমাই ঘোষ

অঞ্জনা ব্যানারজির নৃত্য অনুষ্ঠান

সম্প্রতি মৃদংগমের উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হল শ্রীমতী অঞ্জনা ব্যানারজির ভরতনাট্যম। গুরু দক্ষিণামূর্তির নির্দেশনা সত্যই দক্ষতাপূর্ণ। অতি দ্রুতগতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছ'টি নৃত্য নিবেদন এক ঘণ্টার মধ্যে রংগমঞ্চে উপস্থাপিত হয়। এতে কোথাও একঘেয়েমি বা অতিরঞ্জন ছিল না। নৃত্যে যাঁরা সংগীত সংগত করেছিলেন তাঁরাও নির্দ্বিধায় প্রশংসনীয়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী মংগলামণির কণ্ঠস্বর।

অঞ্জনা নটরাজ অঞ্জলি দিয়ে নৃত্য শুরু করেন। এটি চিরাচরিত দেব ও গুরু বর্ণনা আশ্রিত একটি স্বল্প আকারের নিবেদন। এরপরে আসে আদি তাল এবং রাগমালার উপর বর্ণম। নায়ক শিবের রূপ বর্ণনা এবং তাঁর নৃত্য ও জীবনের কাহিনীই এই নৃত্যটির মূল প্রসংগ। খুবই বিখ্যাত রচনা এই বর্ণমটি। যদিও অঞ্জনার নৃত্য সাবলীল ছিল, মাঝে মাঝে যেন ভাবের পরিস্ফুটতার অভাব দেখা দিচ্ছিল।

কৃষ্ণকে নায়করূপে বন্দনা করা হয় সুরদাসের ভজনে এবং জবল্লিতে। দুটিরই সংগীত সুললিত ও মধুর। অঞ্জনা অভিনয়ে ভাব ব্যক্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রসংগীতে সুরের চেয়েও কথারই গুরুত্ব বেশি। শ্রীমতী মংগলামণির কণ্ঠে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি উচ্চারণের ত্রুটির কারণে ভাল শোনায়নি। নাচটিও তেমন কিছু খোলেনি। পুরো নিবেদনটি যেন কষ্টসাপেক্ষ হয়েছিল। আনন্দধারারই যেন অভাব দেখা দিয়েছিল।

শ্রীলালগুড়ি জয়ারামের রচিত তিল্লানাটি নিঃসন্দেহে সেদিন সকলের মনকে জয় করেছিল। গানটি শ্রীমতী মংগলামণি গেয়েছিলেনও খুবই আকর্ষণীয়ভাবে। অঞ্জনার মুদ্রা, হস্ত ও পদসঞ্চালনের মধ্যে স্পষ্টতা ছিল, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের বিশেষ অভাব ছিল।

ঐ একই সন্ধ্যায় আশীষ ভট্টাচার্য ধ্রুপদী গান করেন এবং পার্থ ও গৌরী ঘোষ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাংগদা' থেকে পাঠ করে আমাদের মুগ্ধ করেন।

কানন সেনের নৃত্য অনুষ্ঠান

সম্প্রতি জ্ঞানমঞ্চে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করলেন শ্রীমতী কানন সেন। প্রয়াত গুরু রামনারায়ণজীর কাছে বহুদিন ধরে তালিম নিয়েছিলেন শ্রীমতী সেন। বর্তমানে তিনি নৃত্যশিক্ষা এবং নৃত্যচর্চা নিয়ে ব্যস্ত।

গণেশ বন্দনা দিয়ে তাঁর নৃত্যের শুরু। এরপরে একে একে ত্রিতাল ও ধামারে তিনি নৃত্য প্রদর্শন করেন। তাঁর লয় ও তাল জ্ঞান প্রশংসনীয়। তাঁর অভিনয় এবং ঠুমরি ভাবও (বিন্দাদিন মহারাজের 'মেরী শুনো শ্যাম' এর উপর) সুস্পষ্ট।

অমিতা দত্ত

পাঁচ সহস্র রজনী

আমাদের দেশে দুহাজার রজনী অভিনয় হয়েছে এমন কোন নাটক নেই। কিন্তু লনডনে স্ট্যানড থিয়েটারে 'নো সেকস প্লিজ, উই আর বৃটিশ' নাটকটি পাঁচ হাজার রজনী পূর্ণ হল। লনডনে বহু নাটকই বছরের পর বছর ধরে চলে। ১৯৬০ সালে আমি যখন প্রথম লনডন যাই তখন আগাথা ক্রিসটির মাউসট্র্যাপ নাটকটি চলছিল। ১৯৭৮ সালে গিয়ে দেখলাম সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে। সব শুদ্ধ ৩১ বছর ধরে চলছে 'মাউসট্র্যাপ'। হয়ত ৫০ বছর পূর্ণ করে ওঁরা ছাড়বেন। ইতিমধ্যেই ১৯৭১ সালে নো সেকস প্লিজ নাটকটির প্রথম অভিনয় শুরু হয়। এ পর্যন্ত নাটকটি দেখেছেন ৩৫ লক্ষ দর্শক। ৫০ লক্ষ পাউনড অর্থাৎ ৫ কোটি টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। অথচ এই নাটকটি যখন শুরু হয় তখন খবরের কাগজ খুব খারাপ সমালোচনা করেছিল।

১৯৭৮ সালে স্ট্যানড থিয়েটারে আমি-যখন নাটকটি দেখি তখন খুব একটা ভিড় ছিল না। গিয়েই টিকিট পেয়েছিলাম। তবে সব আসন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নাটকটি একটি প্রহসন। বৃটিশ জাতির অশ্লীলতা সম্পর্কে গোঁড়ামির প্রতি বিদ্রুপ করে নাটকটি লেখা। এক দম্পতির বাড়িতে ভুল করে এক গাদা পরনোগ্রাফি ডেলিভারি দেওয়া হয়। সেই ঘটনা থেকে নাটকের উৎপত্তি। তারপর সেই বিব্রত পরিবারের কান্ডকারখানা নিয়ে দমফাটান হাসির নাটক।

নাটকটির প্রযোজক ছিলেন জন গেল। নাট্যকার অ্যানটনি মেরিয়ট ও অ্যালিসটার ফুট।

সানডে টাইমসের হ্যারলড হবসন নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করায় দর্শক সমাগম হতে শুরু করে। নয়ত খারাপ সমালোচনাই নাটকটির বারটা বাজিয়ে দিত।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিলাদিত্য

১ আগস্ট সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ রচনা

একটি বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান মাত্রেই কিছু মুখ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে গৌণ অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে থাকে। এরকম গৌণ অনুষ্ঠান যুক্ত এক সন্ধ্যা সম্প্রতি হয়ে গেল বিজন থিয়েটারে। প্রথম অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বেখেছেন জয়ন্তী গুহ। তার সাবলীল ভঙ্গিমায় উদ্বোধনী কবিতা (কবির অতীত) পাঠ ভাল লাগে। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রাচীন কল্পনাময় কাব্যের উপর রচিত 'শাপমোচন কয়েক জায়গায় বিরাট ভুল থাকলেও দর্শকদের মন ছুঁয়েছে।'

নৃত্য : অরুণেশ্বর ও কমলিকা চরিত্রে রঞ্জন গুহ এবং কুহুকেকা ভৌমিককে বড়ই বেমানান মনে হয়। উর্বশী কেয়া ভৌমিক হয়ত জানেন না বা স্মরণে নেই রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই উৎপাত পছন্দ করতেন না। তিনি চিরকালই লাস্যময়ী রূপটাকে ফুটিয়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সখা ও সখীদের প্রতি মনে হয় পরিচালিকা নজর দিতে পারেননি। কেউই ঠিক গ্রুপতাল অনুসরণ করেননি। এর মধ্যে তবু বলতে হয় অরুণেশ্বর এর একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'না যেও না......' দর্শকের অনেকদিন মনে থাকবে।

গীত : 'ভরা থাক' গাইতে গিয়ে জয়ন্তী দত্ত বার কতক হোঁচট খেয়েছেন। অরুণেশ্বররূপী শ্রীময় মিত্রর সুমধুর কণ্ঠস্বর থাকলেও রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অসচেতন। কোন গানেই তিনি নোটেশন অনুসরণ করেননি। বিশেষ করে 'আনমনা আনমনা' গান যে কোন শ্রোতার কানে আঘাত করেছে।

অর্পিতা গুপ্ত সম্ভাবনাময়. আরও একটু তুলে গাইলে ভাল হত না?

দেবাশীষ দাশগুপ্ত কিন্তু সখাদের নেতৃত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছেন ভিড়ের মাঝে নিজেকে তুলে ধরা যায়।

পাঠ : পিঠ চাপড়ানির দলে নয় এমন বহু দর্শকই সেদিন একবাক্যে স্বীকার করেছেন শাশ্বতী দাসের কণ্ঠে কমলিকা সত্যিই ভোলবার নয়। এ ছাড়া অন্যান্যরা স্বাভাবিক।

বাদ্য : সেতার আর বেহালা কিন্তু শাপমোচনের কাঠামো। সেসব শোনা যায়নি। তবে তবলায় শিবেন দত্ত মুনসিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

সাথী চট্টোপাধ্যায়

সারস্বত গোষ্ঠীর বাসবদত্তা

বাসবদত্তা-র একটি দৃশ্য

১০ এপরিল সারস্বত সম্মেলন তাঁদের সংগীত প্রভাত উপহার দিলেন – অ্যাকাডেমি মঞ্চে সকাল ৯ ৩০এ বাসবদত্তা নৃত্যনাট্য ও সমবেত কয়্যার সংগীতের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের অভিসার অবলম্বনে বাসবদত্তার সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন সারস্বত গোষ্ঠী। এই নৃত্যনাট্যের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশনে ছিলেন মর্মস্পর্শী। তবে মনের মাঝে দাগ কাটে 'দীপ নিভে গেছে মম' 'শ্রান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নাটিকাটিকে একটা নিটোল রূপ দেবার আন্তরিক প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও সামান্য কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। প্রথম যেটা চোখে পড়ে সেটা হল শিল্পীদের নাচের মধ্যে ভরতনাট্যমের ছোঁয়াই বেশি পেলাম বিশেষত বাসবদত্তা রূপী অনিতা মল্লিকের মধ্যে। লয়কারীর কাজ এর দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি দেখা গেল। বসন্তের সমবেত নৃত্যের মাঝে একজন ছাড়া সকলের মুখই দেখলাম অভিব্যক্তিহীন। উপগুপ্ত যখন বলেন – 'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি ব্যসবদত্তা' তখন কিন্তু মঞ্চের মাঝে টাঙগানো প্রেক্ষাপটে দেখলাম সূর্যস্নাত শরতের মেঘের আনাগোনা। রবীন্দ্রসংগীতে লয়ের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে, কিন্তু এঁরা ঢিমে লয়ের গানকে দ্রুতলয়ে কেন গাইলেন বোঝা গেল না।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ১০টি গান পরিবেশন করেন, সঙ্গে নাচ। এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ তরুণীর তারুণ্যের জোয়ারে , ভেঙে গিয়েছিল তুচ্ছ প্রাদেশিকতার সীমারেখা, অখণ্ড ভারত মূর্ত হয়েছিল সেদিন ওঁদের গানের মাঝে। ভারতের সব নদীকে ওঁরা এক করে একাকার করে দিয়েছিলেন।সে মিলিত নদীর জলের রঙ ছিল তারুণ্যের দীপ্তিতে সবুজ, ব্যাপ্তিতে আকাশের মত নীল।

আলোর সাইকোডেলিক এফেকট নাগা নৃত্যকে একটা শুধু ছন্দ নয় একটা নতুন রূপ দেয়।

নাচে নাম করতে হয় অনিতা মল্লিক, প্রদীপ্ত নিয়োগী চন্দ্রকণা চ্যাটারজির আর গানে সবিতা ঘোষ , মনুজেন্দ্র ঠাকুর, রূপা ব্যানারজির উপস্থাপনার কৃতিত্ব শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষের।

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লিতে সি সি আই অনুষ্ঠান

সি সি আই সম্পাদক অসীম সেন জানাচ্ছেন গত ৭ জুন নতুন দিল্লির আইফ্যাকস হলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন সুপরিম কোরটের বিচারক এ এন মোল্লা। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পুরস্কার পান ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রঞ্জিৎ মল্লিক ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'বিজয়িনী' চিত্রে অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী 'কফন' চিত্রে অভিনয়ের জন্য দীপ্তি নাভাল। শ্রেষ্ঠ পরিচালক দিলীপ রায় 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' চিত্রের পরিচালনার জন্য। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী 'জয় মা কালী বোরডিং'এ অভিনয়ের জন্য ঝুমুর ভট্টাচার্য। শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ নাটক পরিচালনার জন্য জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে ডঃ রঘুনাথ রথ।

বিশেষ প্রতিনিধি

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল–৫৯

১		২	৩		৪	■	৫
	■	৬		■	৭	৮	
	■		■	■	৯		
১০		■	১১	১২	■	■	■
■		■	১৩		১৪	১৫	■
১৬		■	১৭				১৮
	■	১৯		■		■	
২০				■	২১		

সূত্র ঃ পাশাপাশি

১। বসন্তের দূতের গান
৬। এর রস থেকে মিছরি হয়
৭। বিলাতি পাখি
৯। রান্না এবং বাজি দুটোতেই লাগে
১০। বিপ্লবের রঙ
১১। পা পিছলে আলুর – ?
১৩। মেয়েদের থাকার কথা
১৬। শরীর
১৭। মিষ্টান্ন কাদের প্রাপ্য ?
১৯। মাঝে মাঝে এমন বৃষ্টি ভালই লাগে
২০। জমজমাট অবস্থা
২১। দেওয়ালেও এটি দেখা যায়

সূত্র ঃ ওপর-নিচ

১। বিশ্বখ্যাত ঠান্ডা জলের বোতল
২। লতিয়ে উঠেছে এমন
৩। নদীর পাড়
৪। তুলতুলে – !
৫। এক রকমের বন্দুক
৮। দশ দুগুণে কত হয় ?
১১। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী
১২। জমিয়ে রাখা
১৪। এক হাতে বাজে না
১৫। মাথায় থাকুক
১৬। স্থিরতার অভাব
১৮। অবনত করা
১৯। 'মাথা' চাই

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৩১ আগস্ট সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১৮ ৮ ৮৩।

সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল–৫৯' লিখতে ভুলবেন না।

প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন।

শব্দশৃঙ্খল–৫৫(সমাধান)

■	চ	শ	মা	■	অ	গ্নি	ভ
ত	ল	■	স	রা	ব	■	সু
প	ম	স	■	ম	ধ্য	ম	■
স্যা	■	রো	মা	ন	■	ধু	ম
■	ম	জা	■	ব	ন্ধু	■	ত
বা	নী	■	■	মী	■	লা	■
চ	ন্দ্র	গ্রা	স	■	তা	না	ক
ম	■	ম	ন	■	স	■	লি

শব্দশৃঙ্খল–৫৫-এর জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন সৈকত ঘোষ (৩ কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া) এবং কাঞ্চন কুমার ভট্টাচার্য (১৯৫ কে জি আর এস পাথ, ভদ্রেশ্বর, হুগলী)। শব্দশৃঙ্খল–৫৫ র লটারিতে বিচারক ছিলেন শেখ জাহাংগীর আহমেদ।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

আগস্ট ৩ থেকে ৯

মেষ ঃ শরীর চলনসই; মেয়েদের শারীরিক ঝামেলা বাড়বে। আর্থিক ক্ষেত্রে ছোটখাট যোগাযোগ। কর্মক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি, মেয়েদের সম্ভ্রম ও প্রীতি বৃদ্ধি। দূরের কোন সংবাদ উৎসাহিত করবে। সম্পত্তি ক্রয় বা লাভ। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

বৃষ ঃ শরীর মোটামুটি ভাল চলবে, মেয়েদের শরীর সুবিধের নয়। আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি, লাভ ও সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে কোন কঠিন সমস্যায় সঠিক মোকাবিলা সম্ভব মেয়েদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। গৃহাদি বদল বা সংস্কার। কাছের মানুষের দ্বারা ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মিথুন ঃ নতুন কোন উপসর্গে শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি, মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও অন্যের পাল্লায় ব্যয়বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে স্থিত অবস্থা ফিরে আসতে পারে, মেয়েদের মতবিরোধ। বিশেষ পেশার মানুষদের বড় রকমের ব্যর্থতা ক্ষতি। ধর্মকর্মে বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কর্কট ঃ শরীর ভাল চলবে মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের। বাড়ের চাপ সামলান গেলেও আর্থিক টানাটানি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা সহযোগিতা করতে বাধ্য হবে, মেয়েদের নতুন কৌশল কার্যকর হতে পারে। পারিবারিক শান্তি আকস্মিকভাবে বিঘ্নিত হবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

সিংহ ঃ পেটের ঝামেলা সংক্রান্ত ভয় চলবে, মেয়েদের মানসিক অবসাদ ও হতাশা। আর্থিক ক্ষেত্রে সাচ্ছল্য বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে দূর যাত্রা; মেয়েদের কোন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। নিকটজন বিয়োগ। সন্তানদের বিবাহ ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন।

কন্যা ঃ শরীর মোটামুটি চলবে, মেয়েদের ভাল মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি, ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে নিঃসংগতা ও অশান্তি; মেয়েদের কোন দায়িত্বের পুনর্মূল্যায়ন। পারিবারিক ঝামেলা বাড়বে, সন্তানদের সংগে মনোমালিন্য। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

তুলা ঃ শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি; মেয়েদের ছোটখাট অস্ত্রোপচার। আর্থিক অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না; ঋণ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অন্যেরা ভুল বুঝবে; মেয়েদের সংযম ও ধীরতার প্রয়োজন। পারিবারিক অশান্তি ও স্ত্রীর সংগে মনোমালিন্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃশ্চিক ঃ ক্লান্তি ও অবসাদে শারীরিক অচলাবস্থা, মেয়েদের শারীরিক ঝামেলা থাকবে। আয় বাড়বে পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কারও সংগে মতের অমিল; মেয়েদের সকলের কাছ থেকে অকৃপণ সহযোগিতা। সন্তানদের কোন আচরণে বিশেষ অশান্তি। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যম।

ধনু ঃ চোখের কোন রোগ বেগ দেবে; মেয়েদের নতুন জটিলতায় শারীরিক অবস্থার অবনতি। আয় বাড়ানর প্রচেষ্টায় পন্ডশ্রম। কর্মস্থলে কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তার স্বীকৃতি; মেয়েদের পারিপার্শ্বিক ঘটনায় মানসিক চাপ। নতুন আত্মীয় কুটুম্বের সংগে মনোমালিন্য। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মকর ঃ শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আশার আলো; নতুন উদ্যমে আংশিক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে আগের কোন সমস্যায় নতুনভাবে বিব্রত হতে হবে, মেয়েদের সহজ অগ্রগতি। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা। মেয়েদের বিশেষ কোন ইচ্ছে পূরণ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কুম্ভ ঃ শরীর নিয়ে অল্পবিস্তর ঝামেলা; মেয়েদের দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদ। আয় বাড়বে কিন্তু অন্যের প্ররোচনায় ব্যয় ও ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন বা নতুন কর্মলাভের ইংগিত; মেয়েদের কোন সমস্যার আকস্মিক সমাধান। পারিবারিক অশান্তির জের চলবে। ব্যবসায়ীদের অল্প লাভ।

মীন ঃ শরীর মোটামুটি; মেয়েদের শরীর ভাল মন্দয় মিলিয়ে চলবে। আর্থিক চাপ চলবে। কর্মক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দিলে চূড়ান্ত ক্ষতি, মেয়েদের কোন দায়িত্ব থেকে আংশিক অব্যাহতি। কোন ভাইয়ের সংগে মত বিরোধ; অর্থনাশ। মেয়েদের প্রবল ব্যক্তিগত ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইন্ডিয়া প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস ৭৭/২/১ লেনিন সরণী কলকাতা ৭০০ ০১৩

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

লালবাজার। দুপুর একটা। ইন্দ্রনাথ আর মৃগাঙ্ককে দেখেই উঠে দাঁড়াল দেবনাথ।

তোকেই খুঁজছিলাম, ইন্দ্র। খবর আছে।

কী ?

এটা কী ?

শ্রাবন্তীর ঘর থেকে নিয়ে এলাম। বিয়ারটা এখানকার তৈরি নয়। জাহাজী মাল, খিদিরপুরে গেলে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়।

দুই চোখ ছোট হয়ে এল দেবনাথের।

বলিস কী রে! মিউজিক টিচারের ঘরে বিয়ারের ছিপি!

কিন্তু খালি টিন বা বোতল একটাও পাইনি। সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ছিপিগুলোও ফেলে দেওয়া হয়েছে – এটা ছাড়া।

পেলি কোথায় ?

শ্রাবন্তীর খাটে। গদির ফাঁকে গড়িয়ে গিয়ে ঢুকে গেছিল – কারো চোখে পড়েনি। পড়লে ফেলে দেওয়া হত।

কী বলতে চাস ?

বিয়ার খাটে বসে খোলা হয়েছিল।

শ্রাবন্তী ...... ?

না, শ্রাবন্তী খোলেনি। খায়ওনি। যে খুলেছে, যে খেয়েছে, সে অধিকার পেয়েছিল শ্রাবন্তীর খাটে বসার!

(চলবে)

PARIBARTAN 3—9 August 1983 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 2.50

পরিবর্তন

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ
একান্ত সাক্ষাৎকার

চৌরঙ্গীতে একলা
মেয়েরা সাবধান !

মধ্যবর্তী নির্বাচন কি আসন্ন ?

সম্পাদকীয়

সমঝোতার বাতাবরণ তৈরির মুহূর্তে হিংসার বিষবাষ্প ছড়ান কারোর কাছেই কাম্য নয়। অথচ বাস্তবে তাই ঘটেছে। যখন রাজধানী দিল্লিতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তুতি চলছিল ঠিক তখনই প্রতিবেশী দেশ জ্বলে উঠেছে হিংসার আগুনে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষীদের সংগে সিংহলিদের হানাহানি। শুধু যে দেশের মানুষই এই হিংসা-হানাহানিতে অংশ নিয়েছে তাই নয়, জয়বর্ধনের সরকারও এই হানাহানিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে তামিলভাষীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। অথচ শ্রীলংকার মোট জনসংখ্যার সাড়ে বার শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষী, দীর্ঘদিন ধরে এঁরা শ্রীলংকায় বাস করছেন সিংহলিদের সংগে পাশাপাশি। শ্রীলংকার এই সাম্প্রতিক হানাহানিতে সরকারি হিসেব মত ৩১৫-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং গৃহহীন হয়েছেন লক্ষাধিক। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষী। শ্রীলংকা স্বাধীন হবার পর সেখানে এ ধরনের দাংগা কখনও হয়নি।

সব থেকে বিস্ময়ের কথা শ্রীলংকা সরকার এই দাংগার পেছনে বিদেশি শক্তির মদতের গন্ধ পেয়েছেন। এবং বিদেশি শক্তি বলতে ভারতকেই বোঝানর চেষ্টা। যার জন্য জয়বর্ধনের সরকার কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে আগাম সাহায্য চেয়ে রেখেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সাহায্য প্রার্থনার কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শ্রীলংকা আক্রমণেব. আশংকা যদিও শ্রীলংকা সবকার প্রকাশ্যে এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকাব করেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় বাখা এবং কোন রাষ্ট্রেব আভ্যন্তবীণ ব্যাপারে নাক না গলানই ভাবতের নীতি। কিন্তু তাই বলে এই দাংগা নিয়ে ভাবতের কোন উদ্বেগ থাকবে না সেটাও ঠিক ভাবনা নয়।

তামিলভাষীদের শ্রীলংকায় নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে তৎকালীন শ্রীলংকা সরকারের সংগে ভারতের একটা চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই চুক্তি আদৌ কাজে পবিণত হয়নি, যার ফলে তামিলভাষীদেব মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীব নাগরিক কবে রাখা হয়েছে।

ইতোমধ্যে শ্রীলংকায় আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তার একটি হল, শ্রীলংকায় সংসদে গৃহীত একটি বিল। এই বিল আইনে পরিণত হলে সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচারকাবী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করতে পারবেন। শ্রীলংকার সংবিধানে এই ষষ্ঠ সংশোধনের মূল লক্ষ্য তামিল সংযুক্ত মুক্তি ফ্রন্ট। এই বিলে বলা হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচার করলে তার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড। স্বাভাবিকভাবেই তামিলভাষীদের আশংকা হতে পারে যে এই বিল পাশ হওয়ার পর তাদের ওপর বর্তমান সরকারের দমন-পীড়ন আরো বাড়বে। আর দ্বিতীয় ঘটনা হল জয়বর্ধন শ্রীমতী গান্ধীকে জানিয়েছেন যে এই গোলযোগের ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দূত শ্রীমতী গান্ধীর কাছে যাবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হবে কীভাবে শ্রীলংকায় শান্তি বজায় রাখা যায় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষীদের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়।

জয়বর্ধনের সরকার একটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন। একদিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দমন-পীড়নের নয়া কায়দা খোঁজা, সারা দ্বীপে ভারতবিদ্বেষী জিগির তোলা, গোপনে বিদেশি রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করা, প্রেস সেনসর করে বহির্বিশ্বকে দেশের খবর জানতে না দেওয়া, আর অন্যদিকে ভারতের সংগে বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। এই সব জেনেশুনেও ভারতের ভূমিকা কী হবে সেটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করাটাই এখন আশু কাজ। ভারত কী ভূমিকা নেবে ? শুধু 'দেখা যাক কী হয় ?' নাকি অন্য কিছু ? যাই হোক শ্রীলংকায় এমন শান্তির বাতাবরণ তৈরি হোক ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষীরা যাতে কোনরকম নিরাপত্তার অভাব বোধ না করেন। এই মুহূর্তে এটাই সবার কাম্য।

পরিবর্তন

১৭ ২৩ আগস্ট, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৭

দাম ২.৫০ বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি : নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়–অমিতাভ বিশ্বাস
তরুণ সৈনিক–সৌগত রায় বর্মন

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

'পরিবর্তন

২৪ আগস্ট সংখ্যার আকর্ষণ

জমি বাড়ি ফ্ল্যাট ঃ মধ্যবিত্তের কাছে মরীচিকা

মধ্যবিত্তের কাছে কলকাতায় মাথা গোঁজার এক টুকরো আশাও এখন অসম্ভব হয়ে উঠছে। বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া যা পাওয়া যায় তারও গুনাগার দিতে হয় অনেক। ফলে মধ্যবিত্তদের সরে যেতে হচ্ছে মফঃস্বল অঞ্চলে। সেখানেও কি নির্বিঘ্নে ঠাঁই মিলবে? সে আশাও বোধহয় সুদূরপরাহত হয়ে আসছে। অতঃপর?

এই সংগে মধ্যবিত্তদের আশার আলো হাউসিং কো-অপারেটিভ কীভাবে গঠন করতে হয়, কীভাবে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য পাওয়া যায় সে বিষয়ে তথ্যমূলক অন্য একটি লেখা।

কাজ চান গণি খান

রেলমন্ত্রী গণি খান তাঁর তৎপরতা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষের প্রশংসা পেতে শুরু করেছেন। এ প্রসংগে রেলমন্ত্রী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য—তাঁর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। সেই সংগে থাকছে চিত্তরঞ্জন ইনজিন কারখানা এবং রেল দুর্ঘটনা কীভাবে বন্ধ করা যায় সে সম্পর্কে দুটি আলাদা লেখা। আর থাকবে নিত্যযাত্রীদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ নিয়ে পর্যালোচনা।

মেয়েরা কেমন বন্ধু চায়?

বন্ধু আর স্বামী, মেয়েদের কি এ দুটি সম্পর্কের কোন পার্থক্য আছে? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বন্ধু কি কখনও স্বামী হতে পারে? অথবা স্বামীকে কি জীবনে পরম বন্ধু বলে মেনে নেওয়া যায়? এ বিষয়ে কয়েকজন বাঙালি তরুণীর অন্তরংগ মতামত।

সংগে থাকছে নিয়মিত ফিচার।

নিবেদনমিদং

গত বইমেলার সময় তাঁর অমনিবাস প্রকাশ উপলক্ষে যাযাবর এসেছিলেন কলকাতায়। ছিলেন তাঁর আত্মীয়ের বাসা মেঘমল্লারে। আগে থেকে অ্যাপয়েনটমেনট করে পরিবর্তনের সম্পাদক হাজির হয়ে ছিলেন তাঁর কাছে। অনেক প্রাণখোলা আলোচনা হল। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে যাযাবর এখন থাকেন দিল্লিতে বসন্ত বিহারে (১৫/৯ বসন্ত বিহার। নিউ দিল্লি ১১০০৫৭)। পশ্চিমবাংলার অবস্থা দেখে যাযাবর ব্যথিত। সমস্ত কিছুই এখানে এলোমেলো। সাধারণ মানুষ দিশাহারা। দিল্লিতে সমস্ত কিছু গোছানো। সেখানে অফিসে, ব্যাংকে, দোকানে কেউ কাজের জন্য গেলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য সকলেই চেষ্টা করেন। কলকাতায় প্রবণতা হল, কনজিউমারকে কীভাবে আরও হয়রানি করা যায়। কথায় কথায় সম্পাদক বললেন: পরিবর্তন পুজো সংখ্যার জন্য আপনার লেখা চায়। আমরা পুজো সংখ্যায় গল্প উপন্যাস এতদিন ছাপতাম না। কিন্তু পাঠকদের দাবি অন্তত পুজোর সময়টা আমাদের আপনারা নির্বাচিত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্প-উপন্যাস দিন। এটি খুবই সমস্যার বিষয়। কারণ পুজোর বাজারে পাইকারি গল্প-উপন্যাস লেখা হয় এবং একজন লেখকের প্রেসটিজ নির্ভর করে তিনি কী লিখলেন তার ওপর নয়, কোথায় লিখলেন এবং কতগুলি লিখলেন। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের মত এক্ষেত্রেও মিডিয়মটাই হল যেন মেসেজ। এক্ষেত্রে আমাদের যদি খুব সিলেকটিভ হতে হয়, তাহলে এমন লেখক বাছতে হবে যাঁরা লেখেন খুব অল্প, টাকার জন্য লেখেন না। তাই লেখেন কম। যাযাবর এই বিরল লেখকদের একজন। যাযাবর বললেন: মিডিয়ম নির্বাচনে আমি খুবই সিলেকটিভ। পরিবর্তনে লিখতে আমার নীতিগতভাবে আপত্তি নেই। তবে আমি লেখার জগৎ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছি। এরপর অনেকক্ষণ ধরে মেঘমল্লারে বসে আলোচনা হল। যাযাবরকে পুজো সংখ্যায় লিখতে রাজি করিয়ে সম্পাদক ফিরে এলেন। তারপর দু'একবার তাগাদার পর যাযাবরের গল্পটি যখন দফতরে এসে পৌঁছল তখন পরিবর্তনের অগণিত পাঠকের পক্ষ থেকে যাযাবরকে আগাম ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে দুটি মাত্র নির্বাচিত ছোট গল্প। তার একটির লেখক যাযাবর তথা বিনয় মুখোপাধ্যায়।

যাযাবর

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘে যোগদানের জন্য এইভাবে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাবে তা আমরা ভাবিনি। ৭ সেপটেমবর থেকে নাম ছাপা শুরু হবে। আমরা চাই পরিবর্তনের পাঠক-পাঠিকাদের ভেতর সুস্থ মৈত্রী ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক। দূর হোক নিকট বন্ধু, পর হোক ভাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই মৈত্রী সংঘ থেকে সবচেয়ে উপকৃত হবেন মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন তরুণ তরুণীরা। পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ তাঁদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলবে। মৈত্রী-সংঘের সদস্যভুক্তির জন্য দুটি ৫০ পয়সার টিকিট পাঠান। আপনাকে আমরা একটি ফরম পাঠাব। ফরমটি ভরতি করে পাঠালে আমরা তাঁর নাম-ঠিকানা প্রকাশ করব। শেষ করার আগে আর একটি কথা বলে নিই। অগ্রহায়ণ মাসে আমরা একটি বিশেষ বিবাহ সংখ্যা প্রকাশ করছি। ওই সংখ্যায় প্রকাশের জন্য আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ৩০০ শব্দের মধ্যে লেখা চাইছি। লেখার বিষয়: সুখী দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি কী? দয়া করে শুধু বিবাহিতরাই এই আলোচনায় যোগ দেবেন। অলমিতি।

পা. চ.

দরিদ্র আখ্যাও পেলনা

সাতচল্লিশ থেকে তিরাশিতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের ৬,০০,০০০ গ্রামের মধ্যে ৩,৪০,০০০ গ্রামে পানীয় জলটুকু পর্যন্ত নেই।

সাতচল্লিশে টাকায় দু সের চাল, চিনি চৌদ্দ আনায় এক সের, সর্ষের তেলের দাম ছিল প্রতি সের এক টাকা বার আনা। এক সের ঘি পাঁচ টাকা, কয়লা এক মন দেড় টাকা।

আটাত্তর সালে চালের দর হল দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা কেজি। আটার কিলো এক টাকা ষাট পয়সা, চিনি সাড়ে তিন টাকা, সর্ষের তেল এক কিলোর দাম দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তিরাশি সালের স্বাধীনতা দিবসের বাজার দর–চাল এক কিলো চার টাকা চল্লিশ, চিনি ছ'টাকা, সর্ষের তেল ষোল টাকা, ডাল গড়ে সাড়ে পাঁচ টাকা কেজি। কয়লার মন একুশ টাকা, এক লিটার কেরোসিন দু টাকা।

সাতচল্লিশে সোনার ভরি ছিল চৌষট্টি টাকা, তিরাশিতে সোনার ভরি দু হাজার টাকা।

এই দেশের সাইত্রিশতম স্বাধীনতার বছরেও জনসংখ্যার বিরাট অংশ এমনকি দরিদ্র আখ্যাও পেল' না। এখনও তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে।

আমাদের চোখের সামনে চলে নরবলি, পণপ্রথার শিকার হয়ে নববিবাহিতা তরুণী আত্মহত্যা করে কিংবা তাকে পুড়িয়ে মারা হয়–দোপাতার অনাহারের জ্বালা সইতে না পেরে দরিদ্র গ্রামবাসী নিজের মেয়েকে বাজারে বিক্রি করে দেয়, হরিজন ঘৃণ্যতর জীব হয়ে দাঁড়ায়–তাদের গুলি করে নিধন করা হয়, এক শিশি কেরোসিন তেল সংগ্রহ করতে গিয়ে বিধবার একমাত্র সন্তান প্রাণ দেয়–এইসব ঘটছে, ঘটুক।

জীবন ভৌমিক

কলকাতা–১

ক্রীতদাসের মত

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন দপ্তর ডাক ও তার বিভাগে একশ্রেণীর কর্মচারীকে ক্রীতদাসের মত কাজ করতে কার্যত বাধ্য করা হয়। অবহেলিত এই কর্মীদের বলা হয় 'একসট্রা ডিপারটমেনটাল স্টাফ'। এদের সংক্ষেপে বলা হয় 'ই ডি' কর্মী।

সারা ভারতে ডাক ও তার বিভাগের মোট কর্মচারীর মধ্যে অর্ধেকের বেশিই হল ই ডি কর্মী। এই ই ডি কর্মীরাই ডাক ব্যবস্থাকে সচল করে রেখেছেন। অথচ তাঁরাই এই দপ্তরে উপেক্ষিত এবং সর্বোপরি অবহেলিত। ডাক ও তার দপ্তরের বিভাগীয় কর্মীদের সংগে সমান তালে কাজ করেও এই ই ডি কর্মীরা মর্যাদা পাননি। পান না শ্রমের মর্যাদা।এরা সারা মাস হাড়-ভাঙা খাটুনির পর হাতে পান সাকুল্যে দেড়শ থেকে পৌনে দুশো টাকা। অথচ একই কাজ করে বিভাগীয় কর্মীরা পান চার থেকে পাঁচগুণ বেশি বেতন।

চরম দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়নায় ই ডি কর্মীরা নামমাত্র বেতনে কাজ করতে এসে যেভাবে বঞ্চনার শিকার হন তার নজির নেই। এদের চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই। নেই কোন সুযোগ সুবিধা। এমনকি অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটি নিলে এদের কপালে কানাকড়িও জোটে না। একে নামমাত্র বেতন তার ওপরে 'নো ওয়ারক নো পে'। শত অসুস্থতা নিয়েও ই ডি কর্মীরা কাজ করতে আসেন।

পশ্চিমবংগে ই ডি কর্মীর সংখ্যা প্রায় চার লক্ষের মত। তার মধ্যে মহিলা ই ডি কর্মী প্রায় দু লক্ষ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রভাবিত ইউনিয়নগুলি ই ডি কর্মীদের সম্বন্ধে অনেক গালভরা কথা শুনিয়ে মাসান্তে তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে। এইসব ই ডি কর্মীরা চাঁদা দিয়ে ইউনিয়ন তহবিলকে পুষ্ট করছেন বটে কিন্তু তাঁরা নিজেরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়েছেন। কবে যে এঁরা অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখবেন তা কেউ বলতে পারেন না। কল্যাণ ঘোষ

কলকাতা ৬০

ভ্রমণকারীর পত্র

আমি প্রদীপ, নিউ ইয়রক থেকে লিখছি। তিরিশ জনের দল আর আটচল্লিশ টন মালপত্তর নিয়ে ইউ এস এ এবং কানাডার বিভিন্ন শহরে ইন্দ্রজাল দেখাতে এসেছি। ইতিমধ্যে ফোয়েনিকস, সান ফ্রানসিসকো, সান জোস, বারকলে, টোরানটো ইত্যাদি বহু শহরে ইন্দ্রজাল দেখান হয়ে গেছে। গতকাল নিউ ইয়রকের বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ার হল এ শো হল। ছ হাজার দর্শক একসংগে শো দেখলেন। এখানকার এক সমালোচক লিখেছেন যে গত পঁচিশ বছরে এত ভাল ম্যাজিক এঁরা দেখেননি। কয়েক বছর আগে আমি বিশ্ব জাদু সম্মেলনে যোগ দিয়ে ছিলাম। আপনাদের আশীর্বাদে আমি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছি। এঁরা আমাকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ জাদুকরের স্বীকৃতি দিয়েছেন। টি ভি তেও বহুবার শো করেছি। টোরানটো এবং সান ফ্রানসিসকোতে চোখ বেঁধে সাইকেল চালিয়েছিলাম। খুব হৈ চৈ হচ্ছে। এই সংবাদ যদি পরিবর্তনে ছাপান হতো খুব আনন্দ পেতাম।

প্রদীপ

(পি সি সরকার)

নিউ ইয়রক, ৭ জুলাই

প্রবাসীর চিঠি

পত্র-পত্রিকার জন্যে কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়

প্রবাসী হিসাবে 'পরিবর্তন' পত্রিকায় প্রকাশিত [illegible] আগ্রহসহকারে পড়ি। [illegible] এর মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালি [illegible] ধারণা পাওয়া যায়।

[illegible] বাংলার বাইরে এসেছি। [illegible] নিয়েছে। ডেহেরি এবং [illegible] বসবাস করেন। [illegible] সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার [illegible]

[illegible]

সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

পরিবর্তনের পাঠকরা নানা সিরিয়াস লেখা পড়তে পড়তে এবং দৈনন্দিন নানা সিরিয়াস ঝামেলা ঝক্কির মধ্যে থেকেও এমন সব তির্যক লেখা পাঠিয়েছেন যাতে এবারের জনমত ব্যংগ এবং রসিকতায় হীরকখণ্ডর মত জ্বলে উঠেছে। কেননা এসব রংগরসিকতার মধ্যে আসলে লুকিয়ে আছে ক্ষোভ, বিরক্তি এবং কখনও কখনও ক্রোধ। এই ক্ষোভ, বিরক্তি এবং ক্রোধ স্বাভাবিক। কিন্তু এবারের চিঠিগুলি আর একটি মাত্রা পেয়েছে। তা হল ব্যংগের ছলাকলা। এবারে এমন চিঠি কয়েকটি প্রকাশিত হল। আগামী সংখ্যায় বাকি চিঠিগুলি প্রকাশিত হবে। সেই সংগে দুই সংখ্যার সব চিঠি মিলিয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত পত্রলেখকদের নামও ঘোষণা করা হবে।

প্রাইজ পাবার যোগ্য তৎপরতা

স্টাইপেনড অ্যানড স্কলারশিপ (মাধ্যমিক) বোরডের কর্তৃপক্ষের একটি সচিত্র প্রতিচ্ছবি......

এই কর্তৃপক্ষের নিদারুণ অমনোযোগিতার জন্য কত ছাত্রছাত্রী কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও এবং দৈনন্দিন এই অব্যবস্থার মধ্যেও (অর্থাৎ জল নেই, আলো নেই) পড়াশুনো করেও আজ পর্যন্ত তাঁদের পাওনা-গন্ডা অর্থাৎ স্কলারশিপের টাকা ও মেরিট সারটিফিকেট পাননি! ঠিক এইরকমই একটি ছাত্র ন্যাশনাল স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য ওয়েসট বেংগল বোরড অব সেকেনডারি এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত হল ১৯৭৮-৭৯ সালে। সেই ছেলেটি তখন কিছুদিন বাদে তার পাওনা প্রাইজ বাবদ ১০০ টাকা এবং মেরিট সারটিফিকেট দাবি করল বোরড কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আজ দেব কাল দেব করে দীর্ঘদিন ধরে তাকে ঘোরাতে থাকল। সে তখন তিতিবিরক্ত হয়ে আমার এক আত্মীয়ের কাছে কথায় কথায় প্রকাশ করল তার হেনস্থা হওয়ার কাহিনী। হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো, সে কী করে বুঝবে এইসব বোরড-ফোরড কত কঠিন ঠাঁই! এরপর এর ভার নিয়ে আমি ও আমার সেই আত্মীয়টি দুজনে মিলে প্রথমে বোরডের হেড অফিস (মাধ্যমিক) ৭৭/২, পারক স্ট্রিটের অফিসের ওপরওয়ালার সংগে দেখা করে আনুষংগিক কাগজপত্র দেখাই ও বলি এটার একটা সুব্যবস্থা করে দিতে। তিনি সেটা নেড়ে চেড়ে অনেক ক্ষণ ধরে দেখলেন, কদিন ঘোরালেনও। 'এর কাছে যান, ওর কাছে যান—করে দেবেখন' বলে হঠাৎ ঘোষণা করলেন, 'এর কাগজপত্র আমাদের কাছে নেই। আপনি ৬নং ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা—৭৩-এ গিয়ে দেখা করুন।' অগত্যা, আমরা আবার সব কাগজপত্র নিয়ে ভবানী দত্ত লেনে এসে দেখা করি।

এই করতে করতে আরও বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে যায় ছাত্রটির পাওনা পেতে। এখানেও এ-সেকশন সে-সেকশন করে যখন ঠিক লোকের কাছে পৌঁছই, তখন সেই ভদ্রলোক আমাদের হাতের কাগজ-পত্রগুলি দেখে (তার মধ্যে ছিল দরখাস্ত করা রেজিসটারড চিঠির কপি এবং ন্যাশনাল প্রাইজ পাওয়ার বোরড কর্তৃক মনোনীত পত্রের কপি) তিনিও বললেন 'যায়নি যখন তখন কেসটা মনে হয় গড়বড় আছে।' আমরা যারপরনাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি 'সে আবার কী· ছেলেটার হকের পাওনা, তার মধ্যে আবার গড়বড় ঢুকল কীভাবে? শুধু তাই না, সেই ৭৮-৭৯ র কেস। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত প্রায়। আর আপনারা বলছেন, কেসটা গড়বড়! তা এতদিন একটা চিঠি পর্যন্ত না দিয়ে এরকম বলছেন! ব্যাপারখানা কী?' আমরাও খুব জোরে চেপে ধরি। কী হয়েছে ভেতর ভেতর, তা জানার জন্য আমরা সেই ভদ্রলোকের পেছনে আঠার মত লেগে থাকি। এরপর যা ঘটে তা একান্তই সংক্ষিপ্ত। দেখা গেল, ফাইলে ছাত্রটির সবই তৈরি আছে, এনারাই এতদিন পাঠাতে সময় পাননি। আমরা বলে কয়ে চলে আসার ১৫ দিন বাদে ছাত্রটির মেরিট সারটিফিকেটটা ডাকযোগে পাঠান হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত তার প্রাইজের ১০০ টাকা পাঠান হয়নি। এ ব্যাপারে কাগজের সম্পাদক সমীপেষু কলমেও বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে-কে-সেই। অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও নির্বিকার।

তপন চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া—৪

স্যার আসছেন...... এলেন, এবং

'এমারজেনসি' শব্দটা যে কত অর্থহীন তা মালুম পেলাম নীলরতন সরকার (এন আর এস) হাসপাতালের এমারজেনসি ওয়ারডে একঘণ্টা সময় কাটিয়ে। হাইপারটেনশন এবং পুরো ডানদিক অসাড় হয়ে যাওয়া আমার বাবাকে ১৬ জুলাই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় ডাক্তার নিরলস চেষ্টায় ব্লাডপ্রেসার ১৭০/১১০-এ নামিয়ে আনেন এবং চিকিৎসাগুণে ডান হাতে সেনসেশন ফিরে আসে। এসবই ঘটে আমার অনুপস্থিতিতে কারণ আমি তখন অফিসে। ফোনে খবর পেয়ে আমি যখন হাসপাতালে পৌঁছাই তখন বাবাকে অ্যামবুলেনসে এন আর এস এ পাঠান হচ্ছে examination and advice এর জন্য। এন আর এস এ যখন পৌঁছালাম ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। আমার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শুরু তখন থেকেই......

হাইপারটেনশন রোগীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। স্ট্রেচার বইতে কম করে চারজন দরকার হয়। ওঁরা বললেন, 'অপেক্ষা করুন, লোক এসে যাবে।' পনের মিনিট অপেক্ষা করার পর বললাম 'আমাদের সংগে কিন্তু স্ট্রোক পেসেনট আছে।' উত্তর এল, 'অ, দেখুন পাশের ঘরে বোধহয় একটা ট্রলি আছে।' পাশের ঘরে নয়, পাশেরও পাশের ঘরে একটা ট্রলি পাওয়া গেল। অ্যামবুলেনস থেকে এমারজেনসির সিঁড়ি অবধি হাঁটিয়ে তারপর ট্রলিতে শুইয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলাম 'কোথায় শোয়াব?' এবারও সেই পাশের ঘর। দরজা জানালাহীন বদ্ধ পাশের ঘরে ঢুকে মনে হল কোথাও একটা বেড়াল মরে পচে রয়েছে। পরে বুঝেছিলাম 'বেড়াল' নয়, বহু দিনের 'পুঁজ-রক্ত-বমি পেচ্ছাপ পায়খানা জমে পচে ঐ গন্ধ ছেড়েছে!......

ইতোমধ্যে আমার দাদা অনেক সাধ্যসাধনা করে একজন ডাক্তারকে রোগীর কাছে নিয়ে যেতে পেরেছে। তিনি পরীক্ষা করে বলেছেন, স্যার এসে ডিসিশন নেবেন।...... স্যার যে কে তা জানতে আমাদের সময় লেগেছে ঘণ্টা দেড়েক। বাবা এর মধ্যে বললেন তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা পেয়েছে। ডাক্তারকে বলতে তিনি কোণে বসা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তোতাপাখির মত বললেন, 'একটু দাঁড়ান, জমাদার আসছে।' কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর ডাক্তারকে বলতে বাধ্য হলাম 'স্ট্রোকের রোগীকে হাঁটিয়ে ল্যাটরিনে নিয়ে যাচ্ছি, যদি কিছু হয় তার দায়িত্ব পুরোপুরি আপনাদের।' ডাক্তার নীরব।

কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে বাবাকে ল্যাটরিনে নিয়ে যাবার পর আবার ঠোক্কর। ল্যাটরিনে এক ইনচি জায়গা খালি নেই যাকে পরিষ্কার বলা যায়। এমন কি ল্যাটরিনের ভেতর একটা ভাঙা ট্রলির ওপরও কে বা কারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে গেছে!

স্যার এলেন এবং বাবাকে দেখলেন। প্রেসক্রিপশনে compla-mina এবং persantin ট্যাবলেট লিখে বললেন, 'রোগীকে বাড়ি নিয়ে যান, সোমবার নিওরোলজি ডিপারটমেনটে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।'

আরও একটা ব্যাপারে বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের উপস্থিতিতে বাগমারি থেকে মাথায় ভোজালির কোপ খাওয়া জনৈক যুবককে একদল যুবক এমারজেনসিতে নিয়ে এল। পুলিশ কেস। আমরা যখন ফিরে আসব তখন ঐ যুবকদের একজন জনৈক ব্যক্তির (সম্ভবত ডাক্তার) কাছে ঘটনার বিবরণ এবং অপরাধীদের নামধাম রেকরড করাচ্ছিলেন। আহত ব্যক্তিকে কে হাসপাতালে আনল এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ যুবক সবার নাম বলতে যখন উদ্যত তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে ঐ ভদ্রলোক নিজে থেকে বলে উঠলেন, 'অমুক অ্যানড আদারস লিখে দিচ্ছি।' আইন যারা একটু আধটু বোঝেন তারা জানেন 'অ্যানড আদারস' শব্দটা কত অর্থহীন।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আমি নিজে একজন বামফ্রনটের সমর্থক। আপনাদের ভাষায় 'কমরেড'। কিন্তু কাজকারবার দেখে আমারও কেমন যেন 'ধন্দ' লাগছে। জনসাধারণ এসব 'বিপ্লব' সাদা চোখে নেবে তো?

কিংশুক ব্যানারজি
বাটানগর

ওজনদার বামহস্ত

রথযাত্রা উপলক্ষে চলেছিলাম পুরীধামে, কিছু পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে। যাত্রাপথে গাড়ি থেমেছে বাংলা-ওড়িশা বরডারে। আধ-ঘণ্টাটাক গাড়ি দাঁড়াবে এখানে। ইত্যবসরে কেউ কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে চলে গেছেন। আমিও গাড়ি থেকে নেমে এধার ওধার ঘুরে দেখছি। একধারে দেখলাম মাল বোঝাই ট্রাকগুলি ওজন হচ্ছে। বিরাট একটা লোহার প্লেট, তার ওপর গাড়িগুলো উঠছে আর পাশের একটা ঘরে গম ভাংগা মেশিনের মত যন্ত্রে তার ওজন জানা যাচ্ছে। ঘরটার জানালাগুলি সব বন্ধ। জানালার ছিদ্র দিয়ে তাকালাম ঘরের ভিতরে। টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। চেয়ারে বসে এক পক্বকেশ বৃদ্ধ। ঘরে রয়েছেন তাঁর এক সহকারী। পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল এক দশাসই পাঞ্জাবি ড্রাইভার। এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। বের করল তিনটি কুড়ি টাকার নোট। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখনও খাতার কাজে মগ্ন। ড্রাইভার আস্তে আস্তে টাকা কটি রাখল বৃদ্ধের পায়ের কাছে। ভদ্রলোক বিরক্তিকর কণ্ঠে বলে উঠলেন- ওঁহা নেহি, ইস ড্রয়ার পর রাখখো। তারপর আরও একজন, আরও. . .

আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এতক্ষণ কী ঘটনাটা ঘটল। এই ওজনদার বাবুটি যাতে ওজনে কমবেশি দেখিয়ে ট্রাকগুলোকে বে-আইনি বা ওজনের চেয়েও বেশি মাল নিয়ে যেতে দেয় তারই জন্য এই দুনম্বরী ব্যবস্থা। সরকার এই পক্বকেশ বৃদ্ধটিকে বসিয়েছে শুধু নিজের পকেট ফোলাবার জন্য, আইন মানার জন্য নয়।

মধুসূদন কবিরাজ
ঠাকুরপাড়া, বর্ধমান

নির্বাচনী সমাচার

একদিন যমরাজের দরবারে এসে চিত্রগুপ্ত বললেন : মহারাজ, আমার পক্ষে জম্বুদ্বীপের পাপপুণ্যের হিসাব রাখা খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাদের পাপের হিসাব রাখতে আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আপনি অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করুন।

যমরাজ : কেন, মুশকিল কেন?

চিত্রগুপ্ত : আর বলবেন না, প্রেতরাজ! বেশ কিছুদিন ধরেই এ অবস্থা হচ্ছিল। ভাবলাম সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু, না একজনের পাপপুণ্যের হিসাব করতে করতেই দেখি আর একজনের হিসেব শুরু না করলে সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারটা বকেয়া থেকে যাচ্ছে। আর বেশিদিন বকেয়া থাকলে তামাদি হয়ে যেতে পারে। তাই......

যমরাজ : হুঁ চিন্তার বিষয়, আচ্ছা জম্বুদ্বীপের জন্যে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যদি আমরা তৈরি করি, যাতে আপনা আপনি সব হিসাব লেখা হয়ে যাবে তাহলে খুব সুবিধা হয়, তাই না?

চিত্রগুপ্ত : প্রস্তাবটি সত্যিই উত্তম, কিন্তু করবে কে?

যমরাজ : কেন, কয়েকদিন আগে জম্বুদ্বীপেরই পূর্বপ্রান্ত থেকে এক-জন প্রযুক্তিবিদ এখানে এসেছে। চাকরি না পেয়ে যে আত্মহত্যার কেস। ওর উপর ভার দিয়ে দাও। ঠিক করে ফেলবে।

এর কয়েকদিন পর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি হয়ে গেল। অদ্ভুত সে যন্ত্র। মর্তে কেউ যদি কোন মিথ্যা কথা বলে বা অন্য কোন পাপ করে তবে যন্ত্রটি সংগে সংগে বেজে উঠবে এবং সেই ব্যক্তির নামে আপনা আপনি হিসাব লেখা হয়ে যাবে। বেশ চলছিল স্বাভাবিকভাবে। যন্ত্রটাও খুব একটা বাজতনা। কিন্তু একদিন চিত্রগুপ্ত হঠাৎ যমরাজের কাছে দৌড়ে এলেন।

চিত্রগুপ্ত : মহারাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি ক্রমাগত বেজে চলেছে। কান ঝালাপালা। কারণ কী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রযুক্তিবিদ ছেলেটিকে দিয়ে পরীক্ষা করালাম। সে বললো যন্ত্র ঠিকই চলছে। এদিকে তো টেকা দায় হয়ে পড়ল। কারণটা একটু খতিয়ে দেখলে হত না, স্যার?

যমরাজ : শোন, তুমি এখনি দুজন দূতকে জম্বুদ্বীপে পাঠিয়ে দাও, এখানে যখন যন্ত্র ঠিক আছে, ওখানের অবস্থা ওরা দেখে আসুক। যথারীতি দূতরা গেল এবং ফিরেও এল। তারা রিপোর্ট দিল : মহারাজ যন্ত্র এখন ক্রমাগত বাজবেই, কারণ জম্বুদ্বীপে নির্বাচন আসন্ন। আর সমস্ত নেতারাই জোরদার ভাষণ দিচ্ছেন তাই যমরাজ সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, অ। চিত্রগুপ্ত স্বস্তিতে কান চুলকোতে লাগলেন।

সুদর্শন নন্দী
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

বাকি চিঠিগুলি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাঁচ মিনিট

পাত্র চাই

কোন এক ভারতীয় বিপ্লবী পার্টির জন্য উপযুক্ত বিপ্লবী পাত্র চাই। পাত্রকে অবশ্যই অভারতীয় হইতে হইবে। চীনা কিংবা কিউবান পাত্রে আপত্তি নাই তবে রুশি পাত্রের দাবি অগ্রগণ্য। বিবাহের পর পাত্রকে পাত্রীর পরিবারের দায় দায়িত্ব লইতে হইবে। পাত্র অবশ্যই সাচ্চা বিপ্লবী হইবেন। সুউপার্যী ও সচ্ছল পরিবারের পাত্রের দাবি অগ্রগণ্য।

যদিও দাবিদাওয়াহীন পাত্রই আমাদের কাম্য তবে পাত্রীপক্ষ বিবাহে সাধ্যমত খরচ করিবে।

পাত্রীপক্ষ বিশ্বাস করে প্রকৃত বিবাহ স্বর্গে নির্ধারিত হইয়া থাকে। বিবাহের বন্ধন চিরস্থায়ী ও তাহাকে ছেদ করা কঠিন। তাই প্রত্যাশা, উপযুক্ত পাত্রের সংগে বিবাহ বন্ধন চিরস্থায়ী হইবে। তবে বিবাহের পর পাত্রপক্ষকে গ্যারান্টি দিতে হইবে যে তাঁহারা নিয়মিত পাত্রীর বাপের বাড়ির লোকজনকে আমন্ত্রণ করিবেন। পালা পার্বণ উৎসবে তো বটেই, তা বাদে চিকিৎসা, বিশ্রাম, পরামর্শ ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁহাদের আমন্ত্রণ বলবৎ থাকিবে। এইবার পাত্রীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাক। পাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক বিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রির অধিকারিণী। পাত্রী সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। আক্রান্ত হইলে আক্রমণের মোকাবিলা করিতে সমর্থা। গৃহকর্ম ও গৃহযুদ্ধ উভয়ে সমান পটু। অসাধারণ মেধাবিনী ও উচ্চাশাসম্পন্না। পাত্রী বর্তমানে দুইটি বাড়ির মালিক। তবে ভবিষ্যতে সমস্ত বাড়ির মালিক হইবার সম্ভাবনা আছে। এ ব্যাপারে জ্যোতিষীর অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতিষী পাত্রী সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী দিয়াছেন যে পাত্রী একদিন না একদিন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিবেন। পাত্রী এমনিতে নম্রস্বভাবা। তবে চরিত্রে কেহ অযথা কলঙ্ক লেপন করিলে ছাড়িয়া কথা বলে না। বর্তমানে পাত্রী একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যা। ঝগড়াটে ও কুচুটে জেঠিমা কাকিমাদের সহিত স্রেফ নিজেদের উদারতার জোরে ঘর করিয়া যাইতেছেন। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য, পাত্রীর সহ্যশক্তি ও ধৈর্য সত্যই প্রশংসনীয়।

পাত্রীর অভিভাবক সতীনাথ ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি পাত্র দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সুপাত্রপক্ষ তাঁহার সহিত সত্বর যোগাযোগ করিতে পারেন।

পুনঃ ডিভোর্সি পাত্রেও আমাদের আপত্তি নাই।

বহুদর্শী

অম্লমধুর

দিন দুপুরে রাহাজানি
চলে রাস্তায় [illegible]
[illegible] কাড়ি
নিচ্ছে সবাই লুটে।

মন্ত্রী [illegible] বসে থাকে
[illegible]
ভাবখানা তার এমনি যে
[illegible] কেন।

মার যাচ্ছে মার যাচ্ছে
আর সকলে চুপ।
ডাকাত দলের পান্ডা দেখায়
নিজের আসল রূপ।

নিতাই ঘোষ

বন্যা খরা প্লাবিত দেশে
ওই আশাতেই বই,
পঞ্চায়েতে আবার তখন
উড়বে টাকার খই।
না খেতে পেয়ে গরিব দুখী
মরে তখন মরুক,
দানের টাকায় আমার ঘরের
ভাঁড়ার আগে ভরুক।

সুব্রত কুমার করণ

দেশ যায় রসাতলে
দোষ দেব কিসকে।
হিন্দি ছবির গান,
পপ আর ডিসকো।

মৃণাল কান্তি দাশ

আয় বৃষ্টি যা বৃষ্টি
আমার সোনার দেশে,
এদিক পোড়ে খরায় যখন
ওদিক গেল ভেসে।
সময় মত এলে গেলে
ধান দেব রে মেপে,
কালো গরুর দুধ দেব
উঠোন দেব লেপে।

অরুণা কর্মকার

গোলটা দিয়ে প্লেয়ার মশাই
পড়ে গেলেন লজ্জায়:
কেঁদে কেটে মুখ ঢাকলেন,
শুলেন মাঠের সজ্জায়।
কী হয়েছে, প্লেয়ার বাছা,
কিসের এত কান্না -
'গট-আপ গেমে গোল করেছি
টিম যে এটা চান না!'

সুদেব বকশী

হা হতোস্মি!
কি করোস্মি!
কপাল মোদের মন্দ
নেইকো তাতে সন্দ।
তাই দিনে রুদ্ধ শ্বাসে মোরা
লোডশেডিং এ জ্বলি রাতে,
দিনে রাতে চাঁদার গুঁতো
সুখেই আছি কলকাতাতে।

প্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায়

আট টাকার শিক্ষক দাদু
ছিলেন দুধে ভাতে।
ষাট টাকার কেরানি বাবা
ছিলেন কোনমতে।
হাজার টাকার শ্রমিক আমি
হাহাকার করি,
দ্রব্যমূল্যের চাপে হায়
খাই গড়াগড়ি।

আশীষ কুমার ঘোষ

পণ নেব না শপথ আমার
যৌতুক দেয় দেবে,
সুস্থ বাঁচায় কী কী লাগে
মেয়েই বুঝে নেবে।
পণটা নেওয়ায় মনটা আমার
সব সময়েই বিরূপ
প্রথমেই তাই খোঁজ নিতে চাই
মেয়ে দেখতে কী রূপ

সুশান্ত কুমার মাইতি

মাংস গেছে, মাছও গেছে
দুধ ও ডিমের ভাবনা মিছে
কাঁকরমণি চাল, সেটাও
খাদ্য থেকে বাদ।
হুজুর করে নিত্য ভোজন
বাড়িয়ে যাবেন দেহের ওজন
আমরা শুধুই শুনব, দেশে
হচ্ছে এশিয়াড।

ভগীরথ মিশ্র

কবি কয়, 'পাখি, মোর ভাই রে!
গানের তুলনা তোর নাই রে।'
পাখি কয়, 'বাজে কথা,
হয়েছে পেটের ব্যথা,
গলা ছেড়ে কাঁদিতেছি ভাই রে।

কেদার-বদরির পথে একটি বিকেলে
শুনি এক টুইটিবি একান্ত একেলে
দূরে হিমালয় দেখে
তাহারে বলিছে ডেকে,
'হিমালয়, তুমি বাপু নিতান্ত সেকেলে।'

★

যাদুঘরে দু' কফিনে দুই মহাদামী
একটি মামীরে কহে আরেকটি মামী :
'একঘেয়ে শুয়ে শুয়ে
মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে
ইচ্ছে হয় ফের যেন বেঁচে উঠি আমি।'

অজিত কৃষ্ণ বসু

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

সি পি আই (এম)-এর অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নে এখন দুই গোষ্ঠী

নিশীথ দে

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে মন্দা বাজার চলছে বেশ কিছুদিন থেকেই। সবচেয়ে যাঁরা লড়াকু তাঁরাও কেমন যেন চুপসে গিয়েছেন। অথচ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টই হল যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রাণ ভোমরা। রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস ট্রেড ইউনিয়ন, আয় বেশি হয় ট্রেড ইউনিয়নের হাত ঘুরে। এই পশ্চিমবঙ্গেই এমন এক একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আছেন যাদের মাস গেলে খরচ পনের বিশ হাজার টাকা। অবশ্য সবাই নন। সব পক্ষেই বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আছেন যাঁরা এক জামা কাপড়ে ট্রেড ইউনিয়ন করে চুল পাকিয়ে ফেললেন। এঁদের মন্দা বাজার চড়া বাজারে কোনোদিনই কোন হেরফের হয় না। দিন খারাপ চলছে 'পনের বিশ হাজারের' নেতাদের। শুধু যে আয় কমে যাচ্ছে কিংবা আন্দোলনে ভাটা চলছে তাই নয়, ইউনিয়ন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও দিশেহারা। সি পি আই (এম)-এর অধিকাংশ ইউনিয়নে এখন দুটি করে গোষ্ঠী। সি আই টি ইউ নেতৃত্ব অনেক জায়গায় দ্বিধাবিভক্ত। জেলা স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে মানছেন না। জেলার নেতারা অভিযোগ করছেন, ট্রেড ইউনিয়নের কৌশলের নামে উপর তলার নেতারা মালিকদের সুবিধা করে দিচ্ছেন, দুর্নীতি স্বজনপোষণ করছেন। ইউনিয়নের তহবিল নিয়েও গোলমাল চলছে। জরুরি অবস্থায় মালিকরা যে সব সুযোগ সুবিধা নিতে পারেননি, বাধা পেয়েছেন, বামফ্রন্টের রাজত্বে সেই সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন।

জরুরি অবস্থার সময় চটকলগুলিতে 'ভাগাওয়ালা পদ্ধতি' চালু হয়। যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন, আয় কমে গিয়ে। পদ্ধতিটা হল, একজন শ্রমিককে হয়ত বলা হল, পাঁচশটি বস্তা সেলাই করতে হবে। অথচ তার পক্ষে তিনশ-র বেশি সেলাই করা সম্ভব নয়। তখন ওই শ্রমিককে তাঁর নিজের লোক এনে বাকি দুশ বস্তা সেলাই করিয়ে নিতে হবে। আর ওই দুশ বস্তা সেলাই-এর মজুরি দিতে হবে ওই শ্রমিককেই। অর্থাৎ তাঁর নিজের মজুরি কমে যেতে বাধ্য। কাজের বোঝা বাড়ছে, মজুরি কমছে। এটা শুধু চটকলে নয়, বিভিন্ন শিল্পে এটা ঘটছে। সি পি আই (এম) চটকল শ্রমিককে নিয়ে কোন রকম ধর্মঘটে যেতে রাজি নয়। তবে কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে পাটশিল্প জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করতে রাজি আছেন। সি পি আই (এম) নেতারা ভাল করেই জানেন, পাট শিল্প জাতীয়করণ কোনদিনই হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কৌশল নিয়ে সিটু নেতারা দ্বিধা-বিভক্ত। সিটুর জন্মের পর থেকেই সি পি আই (এম) 'ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের কর্তব্য' সম্পর্কে বেশ কয়েকবার গাইড লাইন দিয়েছেন কিন্তু তা মানা হয়নি। ১৯৮১ সালের মে মাসে সি আই টি ইউ সম্মেলনের উদ্বোধন করে সি পি আই (এম) এর প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট থেকে সুবিধাবাদীদের হঠানর আহ্বান জানিয়েছিলেন। যাই হোক সে সব ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে।

অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে · সিনেমা কর্মচারীদের ইউনিয়ন নিয়ে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের বিরোধ এখন প্রকাশ্যে চলছে। জেলার সি পি আই (এম) নেতৃত্ব অভিযোগ করেছেন, বেঙ্গল মোশান পিকচারস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ 'সুবিধাবাদী' ভূমিকা নিয়েছেন। বি এম পি ই ইউ-তে অন্য দলের লোক থাকলেও নেতৃত্বে আছেন মূলত সি পি আই (এম) নেতারাই। সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক হীরেন মুখারজি। কার্যকরী সভাপতি সি পি আই (এম) এর এম এ সঈদ, এম এল এ। ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকও ইউনিয়নে আছেন। সিনেমা কর্মচারীদের বেতন হারের দাবি দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে রাজ্য সরকার বেতন হার সম্পর্কে যে সুপারিশ করেন তা কার্যকর করার দাবিতে বেশ কয়েকবার ধর্মঘট ও আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু সিনেমা কর্মচারীদের একটা বড় অংশ সেই তিমিরেই। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ছবি তৈরির জন্য দুহাতে টাকা ঢেলে যাচ্ছেন। প্রমোদকর রেহাই দিয়েছেন বহু ছবিতে। সিনেমা হল মালিকদের টিকিটের দাম বাড়ান ছাড়াও নানা ভাবে সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। কিন্তু সিনেমা কর্মচারীরা কী পেয়েছেন?

বিভিন্ন জেলায় সি পি আই (এম) নেতৃত্বের মদতেই বি এম পি ই ইউ-এর পালটা জেলা কমিটি গড়ে উঠেছে। যেমন হুগলি জেলায় একই নামে দুটি জেলা কমিটি চলছে। একটি জেলা কমিটি আগেই ছিল—সভাপতি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ এবং সম্পাদক অমর চক্রবর্তী। পালটা কমিটি গঠন করা হয় ১৯৮০ সালের ফেবরুয়ারিতে। এই কমিটির সম্পাদক হলেন সি পি আই (এম)-এর গৌরী ভট্টাচার্য।

গৌরীবাবু সি পি আই (এম) এর সর্বক্ষণের কর্মী। গৌরীবাবু এবং অমরবাবু দুপক্ষই দাবি করেছেন তাঁদের কমিটি বি এম পি ই ইউ এর দ্বারা স্বীকৃত। সঈদ সাহেব সি পি আই (এম) এর প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। শুধু তিনি নয়, এই সংস্থার ব্যাপারে সিটুর সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়, নিরঞ্জন মুখারজি এম এল এ, রাজদেও গোয়ালা যুক্ত আছেন। তা সত্ত্বেও সি পি আই (এম) এর লোক পালটা কমিটি গড়ে তুলল কেন আর কেই বা মদত দিল?

পালটা কমিটি গড়ে তোলার আগে সি পি আই (এম) জেলা কমিটির কয়েকজন নেতা পারটির রাজ্য কমিটির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জেলা কমিটির অফিসেই পালটা কমিটির অফিস চলছে।

জেলা কমিটির এক নেতা বললেন, দেখুন আমরা নিজেরা কিছু করতে চাইনি। পারটি থেকে বলা হল, সিনেমা কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে মালিকদের সঙ্গে বি এম পি ই ইউ এর কয়েকজন নেতা 'বোঝা-পড়া' করে চলছে। মার খাচ্ছে কর্মচারীরা। একটি সিনেমায় ১১ বছর কাজ করার পরও অস্থায়ী এবং বেতন সাকুল্যে ১০০ টাকা। ইউনিয়নের নেতারা স্বজনপোষণ, দুর্নীতি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। সিনিমা কর্মচারীদের একাংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে গৌরীবাবুদের শরণাপন্ন হন। সঈদ সাহেব অবশ্য হুগলি জেলার সি পি আই (এম)-এর ওই নেতার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, দুটি ইউনিয়ন নয়, হুগলি জেলায় দুটি ফ্যাকশন চলছে। যাই হোক পারটির নেতৃত্বেই ১৯৮০ সালের ফেবরুয়ারিতে কোন্নগরে পালটা কমিটি হয়। শম্ভুবাবুকে সভাপতি করা হয়েছিল কিন্তু তিনি স্বভাবতই রাজি হননি। কিন্তু বি এম পি ই ইউ-এর অন্তত পাঁচ জন কেন্দ্রীয় নেতার মদতে পালটা ইউনিয়ন চলছে শুধু নয়, আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১১ ফেবরুয়ারি তাঁরা লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেন। জেলা শাসক গত ১০ ফেবরুয়ারি গৌরীবাবুদের ইউনিয়নের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। যদিও তার আগে ২ ফেবরুয়ারি বি এম পি ই ইউ এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লিখিত-ভাবে জেলা শাসককে জানিয়ে দেন, সভাপতি শম্ভু ঘোষ এবং সম্পাদক অমর চক্রবর্তীর ইউনিয়নই তাঁদের এক মাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন। তাঁরা ১১ ফেবরুয়ারি কোন লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেননি। এরপরেও কয়েকটি হলের মালিক গৌরীবাবুদের ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এই ইউনিয়ন লক আউট প্রত্যাহার, সরকারি সুপারিশ অনুযায়ী বেতন হার চালু করা প্রভৃতির দাবিতে ২১ আগসট আবার প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। গৌরীবাবু হ্যানডবিল দিয়ে প্রচার করেছেন, 'বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর প্রমোদকর বাদে টিকিটের দাম বেড়েছে ৩৫ পয়সা থেকে ১২০ পয়সা। আর রাজ্য সরকার বেতন হার সুপারিশ করেছেন দু দশক আগে হিসাবের ভিত্তিতে। এখনকার হিসেবে বেতন হার অনেক বেড়ে যায়।'

বহু সিনেমায় কর্মচারীদের মাস মাহিনা ৮০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। সি পি আই (এম) নেতারা আন্দোলনে যে নামতে রাজি নয় সেটাও ঠিক নয়। তাঁরা আন্দোলন করবেন যেখানে মালিকপক্ষ বামফ্রন্ট সরকার এবং সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে রাজি হবেন না। আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন যেখানে শ্রমিক কর্মচারীরা মাস গেলে কেউ হাজার টাকার কম বেতন পান না। উদ্দেশ্য চাপ দিয়ে বোঝাপড়ার রাস্তায়। স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা উঠলেই তাঁরা এড়িয়ে যান। বোঝাবার চেষ্টা করেন ছোট মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। শ্রমিক কর্মীদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তুলতে হবে। □

জয়বর্ধনের চাল সামাল দিতে হবে শ্রীমতী গান্ধীকে

অভিমন্যু সেন

শ্রীলংকায় ভারতীয়দের মধ্যে দক্ষিণের প্রাধান্য বেশি। এবং এদের উপর নির্ভরশীল হয়েই অনেক সময় শ্রীমতী বন্দরনায়েকের দলকে ক্ষমতায় আসতে হত।

স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই শ্রীলংকায় তামিলভাষী শ্রীলংকা নাগরিক বা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংগে ছোটখাট বিবাদ লেগেই আছে। সেনা নায়েক সরকারকেও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে আবার বন্দর নায়েক সরকারও এই সমস্যার মোকাবিলা করেছে।

এখন শ্রীলংকায় সংকটাবস্থা। উগ্র দক্ষিণপন্থী সরকার নিয়ে প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে রাজত্ব করছেন। তাঁর সরকারের প্রতি রাজনৈতিক কারণেও তামিল ভাষীদের বিরোধিতা ছিল। কিন্তু এ বারের সংঘর্ষ কারাপ্রাচীরের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়ল যা কখনও এর আগে হয়নি। এই ঘটনায় ভারত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার কথাও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তার সমস্ত কূটনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষা করে যেভাবে পরিস্থিতি প্রতি হয়েছে এবং দ্রুত বিদেশমন্ত্রীকে কলম্বো পাঠান হয়েছে তা সংসদ ও জনগণের প্রশংসা পাবে। শরণার্থীদের সরিয়ে আনতে জাহাজ পাঠাবার সিদ্ধান্তও অভিনন্দযোগ্য।

প্রশ্ন জাগতে পারে এ রকম সংঘর্ষ যখন ভারতের কোন প্রান্তে হয় তখন আমরা এত সক্রিয় হই না কেন জামসেদপুর আলিগড়, মোরাদাবাদ, মীরাটের দাংগার সময় জনতা বা কংগ্রেস কোন সরকারের প্রশাসনিক পদক্ষেপই যে যথার্থ হয়নি তার প্রমাণ মিলেছে প্রত্যেকটির এনকোয়ারিতে। বিশেষ করে জামসেদপুর দাংগায়। ত্রিপুরার উপজাতি বাঙালি সংঘর্ষের সময়ও একই ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের তিন চার দিন অবধি প্রশাসন অচেতন। আর সম্প্রতি আসামের আন্দোলনের ভয়ংকর দিনগুলোতে যখন বহু ভাষা সংখ্যালঘু পরিবার আসাম উপত্যকায় বিভিন্ন শহরে অসহায় তখন তাদের উদ্ধার বা নির্ভয়ে রাখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাঝে মধ্যে সি আর পি'র টহল বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

শ্রীলংকা প্রশ্নে ভারত সরকারের মনোভাব আমাদের দেশের সংহতি ও মর্যাদার প্রশ্নকে তুলে ধরেছে। অন্য দিকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধেও সৃষ্টি করেছে। তামিলনাড়ুতে ডি এম কে আর এ আই ডি এম কে'র সব রাজনীতিটাই হল তামিলভাষা। তামিল সংস্কৃতি আর তামিলদের অধিকার নিয়ে। সেখানে কে বেশি প্রতিবাদে সোচ্চার হবে সেটাই বড় প্রশ্ন। করুণানিধির পক্ষে এখন বিরোধীরা যোগাযোগ করেছেন পণ্ডিচেরী সরকার বাতিল হবার পর থেকে। আর দক্ষিণের তামিলনাড়ুতে জনতা, লোকদল, বি জে পির প্রভাব নেই বললেই চলে। আগে মুখ্যমন্ত্রী রামচন্দ্রন সব দলকে এক করে রাজ্যের মানুষের হয়ে প্রতিবাদ করার নামে নেতৃত্ব দিয়ে নেমে পড়লেন।

শ্রীমতী গান্ধীর দল সম্প্রতি দক্ষিণে মার খেয়েছে। তামিলনাড়ুতে ডি এম কের সংগে বন্ধন ছিন্ন করেছেন। এই সুবাদে বিক্ষোভ, সমাবেশ, ধর্ণা, অবস্থান করে তারাও এগোতে চাইছে তামিল ভাষাভাষীদের কাছে, তাদের দুঃখের শরিক হয়ে। সব আগে শ্রীলংকা হাইকমিশনের সামনে কংগ্রেস সংসদ সদস্যরাই বিক্ষোভ করেছেন। এই সূত্রে এম-জি আর ও শ্রীমতী গান্ধীর দলের বন্ধন দৃঢ়তর হল। দু'দলই এর সুফল ভাগ করে নেবার চেষ্টা করবেন। বিরোধীরা আর একবার এই প্রশ্নে কৌশলগত কারণে পিছিয়ে গেলেন। সংসদেও এই বিষয়ে সর্বদলীয় ঐকমত্যে শ্রীমতী গান্ধী সার্বিক নেতৃত্ব পেলেন এবং অনেক হৈ চৈ করার বিষয়, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নানা পরিস্থিতি নিয়ে করবার জন্য বিরোধীরা তৈরি হচ্ছিলেন, তা চাপা পড়ে গেল; কারণ এবারে সংসদের অধিবেশন খুব অল্প দিনের। শ্রীলংকার তামিলভাষীদের সর্বনাশ আমাদের দেশে কিছু রাজনৈতিক শক্তির কাছে পৌষ মাস হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু এশিয়া ভূখণ্ডে এই ঘটনা নিয়ে যে চাল চেলেছেন জয়বর্ধনে, তাকে সামাল দিতে হবে 'ন্যাম' চেয়ারম্যান শ্রীমতী গান্ধীকে। □

পূর্ব জারমানিতে ভারত সম্পর্কে লোকের আগ্রহ প্রচুর

লিপজিগ থেকে চিরঞ্জীব

লিপজিগ ২৫ জুলাই।

এক সপ্তাহ আফরো-এশিয়ান, ল্যাটিন আমেরিকান সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নানা জনের সংগে কথা বলে এবং পূর্ব জারমানির নানা শহর ঘুরে নতুন অভিজ্ঞতা হল। এতদিন জানতাম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ আছে, কিন্তু এখানে এসে সে ধারণা বদলে গেছে। আমার বিষয় খেলা এবং এই মুহূর্তে এদেশে খেলা ছাড়া যেন কোন খবর নেই। কিন্তু তারই মধ্যে জারমানির রেডিও, জারমানির কাগজ, জারমানির টেলিভিশন যেভাবে ভারত সম্পর্কে আগ্রহী তা না দেখলে বা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

অনেকের হয়ত জানা, এদেশের কর্মক্ষেত্রের বেশির ভাগ জায়গা দখল করে আছেন মেয়েরা। তা হোটেলের রিসেপশন যেমন, তেমনি বাস, ট্রাম, ট্রেন সর্বত্র। যখনই যাঁর সংগে দেখা হচ্ছে এবং ওঁরা যখন জানতে পারছেন আমি ভারত থেকে এসেছি তখনই জিজ্ঞাসা করছেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কেমন আছেন? তাঁর স্বাস্থ্য ভাল আছে তো? তাঁর ছেলে রাজীব কেমন কাজ করছেন? রাজীব কি দাদু জওহরলাল বা মা ইন্দিরার স্থান নিতে পারবেন? আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনজন মেয়ে সাংবাদিক এসেছিলেন। তাঁদের দুজন সিরিয়ার একজন নিকারাগুয়ার। এঁদের মধ্যে যাঁর বয়স বেশি তাঁকে আমি লিডার বানিয়ে ইন্দিরা নাম দিয়েছি এবং অনেকে তা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু জারমানির কেউ তা মানতে রাজি নন। তাঁরা বলছেন, ইন্দিরা অনেক বুদ্ধিমতী, অনেক শক্তিমতী, তাঁর মত মহিলা সারা পৃথিবীতে এখন পাওয়া যাবে না।

লিপজিগ স্পারটাকিয়াড়ের জনৈক মহিলা কর্মকর্তা বললেন, 'ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বশান্তির জন্যে যা করছেন তা আর কেউ পারেনি। বারবার অসম্পূর্ণ কাজ শুধু সম্পূর্ণ করা নয়, তাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' তিনি আরও বললেন, 'গত বছর তোমাদের রাজধানী দিল্লিতে যে এশিয়ান গেমস হল তা তো বিশ্বশান্তিরই অন্যতম কর্মকাণ্ড। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন তো প্রত্যক্ষ কাজ কিন্তু পরোক্ষে তোমরা যেভাবে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করছ তা সারা পৃথিবী অত্যন্ত আগ্রহের সংগে লক্ষ্য করছে। আমরা তাই চাই তোমাদের প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোন।'

মানেকা গান্ধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও আছে। এঁরা বলছেন, 'সঞ্জয় মারা যাবার পর, সে কি পাগল হয়েছে? ওকে কারা নাচাচ্ছে?'..

আজ এখানে স্পারটাকিয়াডের উদ্বোধন উপলক্ষে সারা দেশ উৎসবে মেতেছে। প্রতিটি কাগজের হেড লাইন 'স্পারটাকিয়াড'। আমরা কলকাতায় ক্রিকেট টেস্ট বা মোহন বাগান ইস্ট বেংগল ম্যাচ থাকলে যা করি, স্পারটাকিয়াড ঘিরে তার থেকেও হয়ত একশ গুণ বেশি হৈ-চৈ। কিন্তু তারই মধ্যে ইন্দিরার খবর অধিকাংশ কাগজে ডাবল কলম গুরুত্ব পেয়েছে — মধ্য-আমেরিকায় আমেরিকার কার্যকলাপ নিয়ে ইন্দিরা যা বলেছেন সেই খবর। শুধু তাই নয়, গত কাল টেলিভিশন এবং জারমান রেডিও ইন্দিরার বক্তব্য পনের মিনিট ধরে প্রচার করল।

রাজীবের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের কথাও এখানকার কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে ও প্রচার করেছে। ছাপা হয়েছে তাঁর ফটো বড় বড় করে সোভিয়েত নেতাদের সংগে।

আমি তো একজন সাংবাদিক। আমার সম্পর্কে এঁদের আগ্রহ থাকার কথা নয়, কিন্তু যেহেতু ভারতের প্রতিনিধি, তাই বিভিন্ন জন এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছেন, যদিও রাজনীতি আমার বিষয় নয়। আমি ভারতের প্রতিনিধি, তাই এঁরা বারলিনে এবং লিপজিগে পৃথকভাবে ভারতীয় খাবার রান্না করে দিচ্ছেন।

আর আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, যাঁরা সাহিত্য নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন তাঁরাই 'টেগোর' নিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। ভাগিস, আমার সময় বাংলা ছোট গীতাঞ্জলি এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলি নিয়ে এসে ছিলাম! □

প্রগতি ময়দানে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে

নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার

নয়া দিললি হোক কি পুরনো দিললি হোক যে কোন স্কুটার রিকশ কি ট্যাকসিকে বলুন যাব 'প্রগতি ময়দান'। তারা তক্ষুণি চিনবে, নিয়ে যাবে, যদি রাস্তাঘাট জানা না থাকে তা হলে একটু ঘুরিয়ে, কিন্তু যাবে ঠিক। তাই ওটা জনপ্রিয়তার একটা সূচি। অত্যন্ত চেনাজানা স্থান এই রাজধানীতে।

প্রগতি ময়দান কলকাতার ময়দানের মত নয়। বলতে পারেন মস্ত একটা কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি কলোনি, বাড়িঘর গাছগাছড়া ও সযত্নরক্ষিত রাস্তা ও বৈদ্যুতিক আলো বিশিষ্ট একটি স্থান, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে। পাশেই শের শাহ আমলের পুরনো কেল্লা।

একটি চিরস্থায়ী প্রদর্শনী স্থান এই প্রগতি ময়দান। এলাকা ১৫০ একর জায়গা জুড়ে। মনে হবে শহর ও গ্রামের সমাবেশ। এই প্রগতি ময়দানের প্রধান কাজ হল মেলা সংগঠিত করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। প্রত্যেক বছরে হয় একটি আন্তর্জাতিক মেলা এবং অবসরে আবো অনেক ধরনের জাতীয় মেলা। উদ্দেশ্য? ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের বেচা-কেনা। প্রধানত, আমদানি ও রপ্তানিকারীদের মেলা। যারা ব্যবসায়ে বা উৎপাদনে যুক্ত আছেন, তারা জানেন এই প্রগতি ময়দানে ১৯৭৭ সালের মারচ মাস থেকে হয়েছে কোটি কোটি টাকার লেনদেন।

আমাকে যেমন বললেন এই প্রগতি ময়দানের চেয়ারম্যান, মহম্মদ ইউনুস (প্রখ্যাত সীমান্ত গান্ধীর পরিবারের আপনজন) : আমরা ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সুযোগ দিই একত্রে আসার। তারা বেছে নিন কে কী কিনবেন। ঠিক, তারা কেনেন ও বেচেন, প্রত্যেক বছরে কয়েকশ কোটি টাকার মাল। আমরা ও কেন্দ্রীয় সরকার দিই সহায়তা, যেমন দিই আমাদের রপ্তানিকারীদের বেশ কিছু সাবসিডি (subsidy), তারা হয়ত জানেনই না। ব্যাংক, ইনসিওরেনস, গ্যারানটি ইত্যাদি নানা subsidy, আমরা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার দেন। যারা ব্যবসায়ে আছেন কি আসতে চান, আমাদের 'প্রগতি ময়দান' মেলা তাঁদের দিচ্ছে প্রচুর সুযোগ।

শুরু হয়েছিল 'এশিয়া মেলা' ১৯৭২ সালে, তার স্মরণে এখনও আছে সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থান 'এশিয়া হাউস'। তারপর কয়েক বছর ওটি চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এবং ১৯৭৭ থেকে জনতা সরকারের আমলে প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যায়। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং এই 'প্রগতি ময়দান'-কে প্রায় একটা মরুভূমি তৈরি করে ফেলেছিলেন। তারা মাত্র কয়েক বছরে শুধু জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিকে এস্থানে স্তব্ধ করেননি, রুদ্ধ করেছিলেন সমস্ত কাজকর্মের সুযোগও। আমি সাংবাদিক হিসাবে তার সাক্ষী। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এলেন ক্ষমতায় ১৯৮০ সালে এবং ওরই সংগে আবার এল আমাদের প্রগতি ময়দানের প্রগতি।

এর গোড়ায় আছেন ঐ একটি ব্যক্তি, মহম্মদ ইউনুস, যিনি বাণিজ্য মন্ত্রকের সচিব হয়েছিলেন ১৯৭১ সালে, সংগঠিত করেছিলেন 'এশিয়া ৭২' প্রদর্শনী। ছিলেন একদা প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি। এবং অনেক ঘাট পেরিয়ে এই পাঠান সন্তান Trade Fair Authority of India (TFAI)র চেয়ারম্যান হলেন ১৯৮০ সালের এপবিল মাসে। ইনি এই 'মেলা কৃষ্টি'র প্রাণ স্বরূপ।

এঁকে জানতে হলে, জানতে হবে প্রগতি ময়দানকে। প্রদর্শনীর জনা আছে স্থায়ী বিলডিং এবং উন্মুক্ত স্থান। প্রথমটি আছে ফেয়ার প্যাভিলিয়ন, হল অব নেশনস, হল অব স্টেটস, আরব প্যাভিলিয়ন, লেক ভিউ প্যাভিলিয়ন ইত্যাদি অনেক জায়গা জুড়ে, স্থাপত্যও দেখবার মত। উন্মুক্ত স্থানে মেলার সময় যেকোন রাজ্য সরকার অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পছন্দমত প্যাভিলিয়ন তৈরি করেন। আছে বিনোদনের জন্য অনেক কিছু। যথা : কয়েকটা সিনেমা ঘর (সারা বছর চলে), রেস্তোরাঁ, লোকসংগীত পরিবেশনের বন্দোবস্ত, একটি ভারতীয় গ্রাম এবং একটি কেন্দ্র, যেখানে যারা হাতের কাজ করেন সেই শিল্পদ্রব্য তৈরি করার প্রদর্শনী। পাথর কেটে মূর্তি হোক, তাঁতে বোনা কাপড় কি বেতের বাসকেট, চেয়ার ইত্যাদি। আরো আছে অনেক প্রকারের সরকারি সংস্থা, যেমন কাসটমস, ব্যাংক, রেলের বুকিং, ট্যাকস রেহাই স্থান, এমনকি গাছ গাছড়া কেনারও একটি জায়গা আছে।

সস্ত্রীক পেরেজ দ্য কুয়েলার ইউনুসের সংগে মেলায় / আলোকচিত্র : লেখক

প্রগতি ময়দানকে দেখে অনেক সময় মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার কথা। তফাৎ এই যে, এটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান এবং চিরস্থায়ী, এবং এতে অংশ গ্রহণ করেন অনেক আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংস্থা।

ভারতীয় বাণিজ্য মেলার চেয়ারম্যান ইউনুস সাহেব একান্ত সাক্ষাৎকারে বললেন : দেখুন, আমি যা করছি তা এই উপমহাদেশে অনেককাল হয়ে আসছে। এই মেলায় আসেন দশজন লোক তাদের একই প্রকারের তৈরি দ্রব্য নিয়ে। ক্রেতাবা তা থেকে বেছে নেন তাদের পছন্দমত জিনিস।

গত বছরের আন্তর্জাতিক মেলায (১৯৮২) আমদানি-রপ্তানির কারবার হয়েছিল ৯২৫ কোটি টাকার, ঐ মেলা. স্থানেই। আগের বছব হয়েছিল ৫00 কোটি টাকার. এটা একটা নমুনা মাত্র। কেননা, মেলায় ঐ লেনদেন থেকে হয়েছে অনেক ভারতীয় ও বিদেশি কোমপানির স্থায়ী লেনদেন। রাজ্য সরকাবগুলির এতে আছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তারা বাড়াতে পারেন রাজ্যের রপ্তানি। বিদেশে আছে অনেক চাহিদা। ডলার, পাউনড, ডয়েশমারক, ইয়েন জানতে চায় ভারত থেকে আমরা কী দিতে পারি তাদের। গত বছর রাজ্য সরকারদের মধ্যে অগ্রগামী ছিল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। তাদের রপ্তানিতে ছিল : সাইকেল, ক্রীড়াসামগ্রী (Sports goods), কাগজ কাটার মেশিন, কৃষি-মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রাদি। বিদেশে পশ্চিমবংগ ও ত্রিপুরার হস্তশিল্পের অনেক চাহিদা আছে। তারা এই মেলায় বিক্রির চেষ্টাও করতে পারে।

ইউনুস সাহেব 'পরিবর্তন'-কে বললেন : দেখুন, ১৯৭৮ সালে আমাদের মেলায় লেনদেন হয়েছিল ৩৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ১৯৮২ সালে ঐ অংক উঠে গেল ১৩-শ কোটি টাকায়। একইভাবে ১৯৭২-৮0 এই ৮ বছরে বিদেশে যে সমস্ত বাণিজ্য মেলায় আমরা ছিলাম, তাতে ভারত বিক্রি করেছিল ১২ কোটি টাকার সামগ্রী। একটু প্রচেষ্টায় ১৯৮২ সালে ঐ অংক উঠলো ৯৬ কোটি টাকায়।

প্রশ্ন : এই প্রকারের 'প্রগতি ময়দান' কি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, অন্তত কলকাতা, মাদ্রাজ, বোমবে এই সব শহরে?

ইউনুস সাহেব : নিশ্চয়ই হতে পরে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে, সব রাজ্যের রাজধানীতে হওয়া উচিত এই প্রগতি ময়দান ধরনের স্থায়ী প্রদর্শনী স্থান। তার জন্য বাজ্য সরকারগুলি এগিয়ে আসুন। আমরা যেভাবে পারি সহায়তা দেব, কিন্তু আমাদের তো নিজেব টাকাপয়সা নেই। তা আসবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মাধ্যমে।

উনি আরো বললেন : আমাদের প্রগতি ময়দানে চাইছি রাজ্য সরকারগুলি স্থায়ী প্যাভিলিয়ন করুক। গুজরাত করেছে। আমবা পশ্চিমবংগকে ভাল বড় জায়গা দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আগ্রহ প্রকাশ করেছেন স্থায়ী প্যাভিলিয়ন তৈরি করতে।

প্রগতি ময়দানের মত জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা কেন্দ্র এখন আছে : আলজিয়েরস, কায়রো, জাকাবতা, মসকো, টোকিও, প্রায় সমস্ত পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশে। সবচেয়ে বড় কেন্দ্র চেকোস্লোভাকিযাতে। আমেরিকার শিকাগোতে এবং পশ্চিম জারমানির হানোভার নগবে। এসব ছাড়া আছে যাকে বলা হয় Trade Centres. আমাদের 'প্রগতি ময়দান' একটি গ... করাব মত প্রতিষ্ঠান। ☐

চৌরঙ্গীতে একলা মেয়েরা সাবধান !

ছায়া সাহা

চৌরঙ্গী এলাকায় এক শ্রেণীর পেশাদারি রোমিওর দাপটে ভদ্রমেয়েদের একলা চলা দায় হয়ে উঠেছে। লেখিকা সাংবাদিকতার একজন এম এ, পেশায় ফ্রিল্যানস সাংবাদিক। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় একা ঘুরে 'ইভ-টিজার'দের সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন।

চৌরঙ্গী। শহর কলকাতার পিকাডালি সারকাস, টাইমস্ স্কোয়ার কিংবা নরিম্যান পয়েন্ট। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চৌরঙ্গীর ফুটপাথে অবিরল জনস্রোত। নানা বিকিকিনির ভিড়, হকারদের চিৎকার, স্টিরিওর দোকান থেকে ভেসে আসে পপ গানের সুর। ভিখারি, বাটপাড়, স্মাগলার, দেহ-ব্যবসায়িনী, বিদেশি পর্যটক, স্বদেশি প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলনকেন্দ্র চৌরঙ্গী।

এই চৌরঙ্গীর বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে টেরিলিন জিনস পরা, হাতে ইলেকট্রনিক ঘড়ি, বাহারি চুল, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে কিছু ছেলেকে। এমনকি বেশ কিছু বয়স্ক লোককেও। চেহারা দেখে বোঝা যাবে এরা এসেছে সচ্ছল পরিবার থেকে। মুখের ভাষা শুনে বোঝা যাবে এরা একটি বিশেষ ভাষাভাষী সম্প্রদায়, যাঁদের আর যাই হোক টাকার অভাব নেই। ব্যস্ত পথচারীর দৃষ্টি এদের ওপর পড়বে না। কারণ তারা ভাববে এরাও এসেছে চৌরঙ্গীতে বেড়াতে। হয়ত অপেক্ষা করছে বান্ধবীর জন্য। শিকারী বাঘের মত এদের চোখ গিলে খায় পথচারীদের। বিশেষ করে মহিলাদের দিকেই ওদের শ্যেনদৃষ্টি। ওরা অপেক্ষা করে কখন কোন একাকিনী মহিলাকে সামনে পাবে।

অসংখ্য তরুণী, বহু মহিলা আজকাল নানা কাজে পথে ঘাটে একা বেরোন। চৌরঙ্গীতেও তাঁরা আসেন নানা কাজে। এঁদের কাউকে সামনে পেলে ওই ছেলেদের একজন তার পিছু নেয়। গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। তারপর কানে কানে ছুঁড়ে দেয় কু-প্রস্তাব। নয়ত ভিড়ের মধ্যে শুধুই ধাক্কা দিয়ে চলে যায় স্পর্শ সুখ অনুভবের জন্য।

পুলিশ এদের চেনে। চেনে চৌরঙ্গীর দোকানদাররাও। কিন্তু কেউ এদের ঘাঁটায় না। কলকাতা শহরে অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার রেওয়াজ নেই, মাঝে পুলিশ চৌরঙ্গী থেকে তেইশ জন যৌন বুভুক্ষু এই রোমিওদের ধরে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। ব্যস ওই পর্যন্তই। চৌরঙ্গীর রাস্তায়—মেট্রো সিনেমা ও মিউজিয়ামের আশেপাশে ঘুরে বেড়ান দেহোপজীবিনীদের মাঝে মাঝে ধরলেও পেশাদার ওই রোমিওদের পুলিশ আর ধরেছে বলে খবর পাওয়া যায়নি।

কলকাতার রাস্তায় সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় এমন একজন ট্রানসপোর্ট বিজনেসম্যানের কথায়, এরা এনশিয়েনট ইনডিয়া থেকে কারেনট ইনডিয়া পর্যন্ত খারাপ করে দিচ্ছে। অর্থাৎ এদের গতিবিধি ইনডিয়ান মিউজিয়াম থেকে সেনট্রাল এভিনিউর ইনডিয়ান এয়ার লাইনস পর্যন্ত। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তবে আসল জিওগ্রাফি কিন্তু আরও বিস্তৃত। বলতে গেলে, পারক স্টিট, পারক স্টিটের মোড় থেকে সোজা গিয়ে ডানদিকের লম্বা কিড স্টিটের রাস্তা, তারপর মিউজিয়ামের রাস্তা, এর পর গ্লোব, যমুনা, লাইটহাউস, নিউ এমপায়ার ও বকসি সিনেমার রাস্তা, আর একটু গিয়ে আবার ডানদিকের রিগ্যাল, এলিট, লোটাস এবং অন্যদিকের ক্রাউন, ম্যাজেসটিক, মিনার্ভা, সোসাইটি, অপেরা, নিউ সিনেমা, জ্যোতি, হিন্দ, ওরিয়েনট, প্যারাডাইস, জনতা, এই সবগুলো সিনেমা হল ও তার আশপাশ অঞ্চল এবং নিউ মারকেটের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে এই ভ্রাম্যমাণ রোমিওরা। বাঁদিকের শহিদ মিনার, এসপ্লানেড ট্রাম গুমটি, কারজন পারকও এদেরই হাতে। বাদ রইল কোন জায়গা? বাদ থাকবে কী করে? কারণ চৌরঙ্গী ধর্মতলা-পারক স্টিটের সর্বত্রই যে এদের অবাধ বিচরণ। ঐ চত্বরের বাস স্ট্যানডগুলিও ওদের আস্তানা।

এরা কারা ?

আগেই বলা হয়েছে চৌরঙ্গীর রোমিওরা বেশির ভাগই পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ী শ্রেণী অথবা ব্যবসায়ী বাপের ছেলে। বয়স ২৫ থেকে আরম্ভ করে ৫০, ৬০, ৬৫ পর্যন্ত। সকালবেলায় লোকে যেমন তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে অফিস বেরোয় তেমনি এই 'প্রেমিক'রা সকাল সকাল ফিটবাবু হয়ে বেরিয়ে পড়ে মেয়েদের পিছু নেওয়ার জন্য। এদের আনাগোনা চলে রাত পর্যন্ত। এদের ধারণা, যে মেয়ে একা রাস্তায় বেরিয়েছে সে সহজলভ্য। কিছু টাকা দিলেই এদের পাওয়া সম্ভব।

তেইশ, চব্বিশ বছরের এক বিবাহিতা চাকরিরতা মহিলা তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বললেন, ভরদুপুরে চৌরঙ্গী মোড়ের কাছে এক পানের দোকানে মিষ্টি পান কেনার জন্য তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং আরেকদিন দাঁড়িয়েছিলেন কে সি দাসের দোকানের সামনের একটি ডট পেনের দোকানে ডট পেন কিনবেন বলে। তিনি জানান, উভয় জায়গাতেই যতই সরে সরে দাঁড়াই পাঁচ মিনিটে কম করে কুড়ি জন হাত দিয়ে ঠ্যালা মেরে মেরে গেল একইভাবে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি প্রত্যেকেই ঠ্যালা দিচ্ছে ইচ্ছে করে। রাস্তায় কি এতই জায়গার অভাব পড়েছে যে আমাকেই ঠ্যালা দিয়ে দিয়ে যেতে হবে? প্রশ্ন করলাম, পাঁচ মিনিটে কুড়ি জন ধাক্কা দিল? ভদ্রমহিলা এবার একটু রেগে গিয়ে বললেন, আপনি এটাকে ধাক্কা ধাক্কা বলছেন কেন? এগুলো হল স্রেফ ভিড়ের সুযোগে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া। তা ছাড়া আর কী? তিনি বলেন, অবস্থা এমন চরমে পৌঁছল যে কে সি দাসের দোকানের কাছের সেই দোকানদারের ডট পেন সাজান টেবিলের উপর উঠে যদি আমি দাঁড়াতাম তা হলেও ওরা গায়ে হাত লাগাত।

ওরা সিনেমা, রেস্তোরাঁয় কেন ?

চৌরঙ্গী-ধর্মতলা প্রতিটি সিনেমা হল ভ্রাম্যমাণ 'প্রেমিকদের' এক একটি শক্ত ঘাঁটি। সিনেমা হলে ওরা কী করে? প্রথমত ওদের জ্বালায় কোন হলেই কোন মেয়ে ভদ্রভাবে যেতে পারে না। এক মিনিটও কোন বন্ধু বা স্বামী আসার অপেক্ষায় কোন মেয়ে শান্তিতে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। অবশ্যই যদি সেই মহিলা একা থাকেন। যেসব মেয়ে একটু মুডি টাইপের যেমন সিনেমা হলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে হয়ত একটা টিকিট কিনে একা একা সিনেমায় চলে গেল কিংবা খিদে পেয়েছে বলে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল কিংবা একা একা রেস্তোরাঁয় বসে কোন বন্ধুর জন্য

অপেক্ষা করছে সেইসব মেয়েদেরই এই 'প্রেমিক'রা ডিসটারব করে বেশি। ওরা ফলো করতে করতে মেয়েটি রেস্তোরাঁয় গেলে সেখানেও ঢুকে পড়ে। তারপর পাশের টেবিলে বসে নানারকম ইংগিত করতে থাকে তার টেবিলে আসার জন্য। কখনও কখনও একেবারে সামনে এসে বলে, আপনার একটু সময় হবে কিংবা আর ইউ ওয়েটিং ফর সামবডি? আমি এখানে বসি? চমৎকার, এদের সাহসের জুড়ি নেই। থাকবেই বা না কেন? কে বাধা দিচ্ছে? কেই বা এগিয়ে আসছে এদের তিরস্কার করতে?

ধরা যাক, রক্সি সিনেমা হলে কেউ অগ্রিম টিকিট কাটতে গেল। কাউনটারে দাঁড়ানর মিনিট দুয়েকের মধ্যে জুটে যাবে পাঁচ সাতজন 'প্রেমিক'। প্রত্যেকেই নানাভাবে ইশারা করবে সংগে যাওয়ার জন্য। তারপর রক্সি থেকে চৌরংগী মোড়ের বাস স্টপ পর্যন্ত মেয়েটির সংগে সংগে নানারকম কু প্রস্তাব দিতে দিতে আসবে প্রায় সাত, আটজন। এখানে উল্লেখ্য, তখন কিন্তু বেলা দুটো। স্থানে শয়ে শয়ে লোকের সামনে খোলাখুলি চৌরংগীর মত বড় রাজপথেই চলছে এদের নারী শিকার। অলিগলিতে বা রাতের অন্ধকারে নয়। ভ্রাম্যমাণ 'প্রেমিকদের' একটা বিশেষ আর্ট হচ্ছে হলের মধ্যে বেশি টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে ভুলেও সে টিকিট কিন্তু ওরা কোন ছেলেকে দেবে না। কেন টিকিট মেয়েদের দেয়? মেয়েরা হলে ঢুকে কিছুক্ষণ বাদেই দেখে তাঁর পাশের চেয়ারে যিনি বসলেন টিকিটটি তার কাছ থেকেই কিনেছিলেন। তারপর? কখনও চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে রাখবে, কখনও মেয়েটির দিকে ঘেঁষে বসবে কিংবা কখনও কনুই দিয়ে গায়ে বা পা দিয়ে পায়ের সংগে ছোঁয়া লাগানর চেষ্টা করবে। কাজেই ওরা হলের বাইরে যেমন অসভ্যতা করে তেমনি করে হলের ভিতরে বসেও।

প্যারাডাইস হলের সামনে দিয়ে ভালভাবে হেঁটে যাবে এমন সাধ্য আছে কোন মেয়ের? তেমনি গ্লোব। কিছুদিন আগে কেনাকাটা সেরে নিউ মারকেটের মেন গেটের কাছ থেকে একটি মেয়ে ট্যাকসি ধরে দরজা খুলে ঢুকতেই ঠিক তার উল্টোদিকে গ্লোব সিনেমার গেট থেকে একটি লোক দৌড়ে এসে ট্যাকসির অপর দরজাটি খুলে ড্রাইভারকে বলে, চলুন, পারক স্ট্রিট যাব। মেয়েটি এক ধমক দিতেই আস্তে আস্তে কেটে পড়ল। ড্রাইভার বলে, কী বলব দিদিমণি, এই জানোয়ারগুলো এখানে সব সময় ঘুরে বেড়ায়, ওদের কাজই হল এই।

সোসাইটি হলে ম্যাটিনি শোতে যাবে বলে কেউ হয়ত হলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধুর জন্য। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন লোক তাকে একেবারে উত্যক্ত করে ফেলছিল, কিন্তু যেই মেয়েটির বন্ধুটি এসে গেল তখন ওরা ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে যায় ওদের টিকিটিও দেখা যায় না। ছবি আরম্ভ তিনটেয়। তখন প্রায় পৌনে তিনটে। মেয়েটি জানায়, জ্যোতি সিনেমা হলের বাইরে তখন স্বাভাবিক ভাবেই লোকের প্রচণ্ড ভিড়। আমি অপেক্ষা করছিলাম একজনের জন্য। পাঁচ করনার থেকে পাঁচজন সমানে চোখ দিয়ে ইশারা করছে আর মিট-মিট করে হাসছে। দু একজন কানের কাছে গুনগুন করে কয়েকবার বলে গেল, টিকিট চাইয়ে? তিনটে দশ। হল প্রায় ফাঁকা। হঠাৎ পেছনে ফিরে দেখি ঐ পাঁচ জন একসংগে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সে বলে, জানেন তো, ওরা সব একই দলের লোক। ওদের বিরাট দলও থাকতে পারে। এর পর আমার বন্ধু তিনটে পনেরয় এলে হলে ঢুকে পড়ি।

লাইটহাউস সিনেমা হলে তখন রেখার 'উমরাও জান' চলছিল। সবে বেরিয়েছে। ব্ল্যাক মারকেটারদের দৌলতে এখন সবসময়ই টিকিট পাওয়া যায়। কাজেই আগের থেকে সে টিকিট কাটেনি। গাড়িটা পারক করে বাইশ বছরের এই মেয়েটি হলে এসে দেখে, কালো কালো কতকগুলো লোকের সংগে সিনেমা দর্শকদের টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি চলছে। ওদিকে না গিয়ে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে কাঁচা পাকা চুলের ৬০, ৬৫ বছরের একটি লোক বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। তবে এত পান খায় যে, দাঁতের রঙ সাদার বদলে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। মনে হল টিকিট আছে। কাছে যেতেই ভদ্রলোকই একটু হেসে বলেন, টিকিট লাগবে? মেয়েটি হ্যাঁ বলতেই চুপিচুপি একটি বের করে তার হাতে দিল। টাকা পয়সা চুকিয়ে টিকিট নিয়ে মেয়েটি হলে ঢুকে পড়ল। ম্যাটিনি শোতে। যথারীতি লোকটি খানিক বাদে তার পাশে এসে বসল। কিন্তু সে ছবি দেখবেন কি, সমানে বকবক করে চলেছেন, তোমার নাম কী কোথায় থাক, কতদূর পড়েছ নানাবিধ প্রশ্ন। তারপর পকেট থেকে বের করে একটি কারড ধরিয়ে দিল। মিসটার..... আগরওয়াল। থাকেন বালিগঞ্জে। বিরাট একটি ব্যবসার মালিক। মেয়েটি বলে, ছবিটি খুবই ভাল, মনোযোগ দিয়ে দেখছি। ওর অনবরত কথাতে ডিসটারব ফিল করছিলাম। তবুও বিশেষ কিছু বলিনি। লোকটি বাংলা ভালই বলেন। একসময় বলেন, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আবার কবে আসছ? মাঝে মাঝে ঘুরতে টুরতে যাবে তো? সিনেমা ভাঙলে ভিকটোরিয়া যাবে? কোন অসুবিধা হবে না। সংগে গাড়ি আছে, পৌঁছে দেব। মেয়েটি এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে জানায়, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে লোকটা এর জন্যই টিকিট দিয়েছে আমাকে। তারপর একটু চেঁচিয়েই আমি বলি, কী আরম্ভ করেছেন তখন থেকে? আপনার সংগে ঘুরতে যাব কেন? আপনি গাড়ি দেখাচ্ছেন? আমার গাড়িও পারক করা আছে মারকেটের কাছেই। তা ছাড়া আমাদের ফ্যাকটরিতে আমার বাবার আরও চার চারখানা গাড়ি পড়ে আছে। স্কাউনড্রেল কোথা-কার। সংগে সংগে লোকটি অর্ধেক সিনেমা দেখে সেই যে বেরিয়ে গেল আর এ-মুখো হল না। মেয়েটি আরও বলে, একদিন কৌতূহলবশত ওই কারডের নমবর দেখে ফোন করি। ঠিকই ওর দুই ছেলে, দুই মেয়ে। এরমধ্যে এক ছেলে, এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ফোনটি ধরেছিলেন তাঁর স্ত্রী। আরেকদিন ফোন করলাম অফিসে। একজনের হাত ঘুরে মিসটার আগরওয়ালের কাছে এলে তিনি শুধু হ্যাঁ, না, বলে যাচ্ছেন। মানে অফিসের লোকের সামনে মেয়েদের সংগে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন। পাছে তাঁরা কিছু জেনে ফেলেন। আর এদিকে ঐ লোকটিকে আমি এখনও প্রায়ই দেখি বিভিন্ন হলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং গ্লোব সিনেমার কাছের একটা এয়ার কনডিশান রেস্তোরাঁয়ও প্রায়ই চারটের সময় বসে থাকতে দেখি স্যানডউইচ আর চা নিয়ে। আমাকে দেখলেই সরে পড়ে। বুঝলেন তো, ওর কাজই হল মেয়ে খোঁজা আর টোপ ফেলা। এদিকে নিউ আলিপুরের এই সুন্দরী মেয়েটির চলা ফেরা, কথাবার্তা কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র। একে যদি ওরা প্রস্তাব দিতে পারে তবে আর কি কেউ বাদ যাবে? এখানে কয়েকটি সিনেমা হলের কয়েকটি ঘটনামাত্র তুলে ধরা হল। চৌরংগী-ধর্মতলার প্রতিটি সিনেমাতেই এই একই অবস্থা।

এদের বাড়বাড়ন্ত কোথায়?

ভদ্রমহিলা কুড়ি বছর ধরে চাকরি করছেন ধর্মতলার একটি নামী কোমপানিতে। উত্তর কলকাতার এই ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় বছর চল্লিশ। উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী। দেখলে বত্রিশ, তেত্রিশ মনে হয়।

যশকুন্ধা নিউ সিনেমার কাছে বাসের জন্য বা, ট্রামের জনা কোন মেয়ে অপেক্ষা করছে অথচ কেউ তাকে ধাক্কা দেবে না এমন হতে পারে না। তা সে দুপুর বারটা হোক, বিকেল চারটে হোক। সন্ধ্যাবেলা হলে তো কথাই নেই। এত জায়গা থাকতে যেখানে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিক তার পেছন দিয়েই সে পাশ কেটে যাবে (মানে ধাক্কা দিয়ে যাবে), কখনও তাঁর সামনের দিক দিয়েই ধাক্কা মেরে তবে রাস্তা ক্রস করবে। কেউ কেউ একবার ধাক্কা দিয়ে হটতো চলে গেল উল্টো ফুটপাতে বা এদিক সেদিক। খানিক বাদে আরেকবার দিল, খানিক বাদে আবার, এমন বার তিন, চার ধাক্কা একজন লোকও দিতে পারে। বললাম, এটা মগের মুলুক নাকি? হ্যাঁ, ওরা যা করে অনেকটা তাই গিয়ে দাঁড়ায়। আর প্রতিদিন এভাবে মেয়েদের অসম্মান করে করে পার পেয়ে যাচ্ছে বলেই আজ কলকাতা শহরের রাজপথের উপর ধর্ষণের মত গর্হিত কাজও হয়ে যাচ্ছে।

এই ভদ্রমহিলারই এক বান্ধবী জানালেন, ধর্মতলার মোড় থেকে সোজা মেটরো, ডোরিনা মোড়, বাটা ধরে কোন মেয়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা হেঁটে যাবে এবং এসব 'প্রেমিকদের' ধাক্কা খাবে না তা যদি হয়, আমি আমার নামই পালটে ফেলব। কানের কাছে গুন গুন তো আছেই। এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার এই আধুনিকা তরুণীটি চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটি অফিসে কাজ করছেন প্রায় দশ বছর। প্রতিদিন যাতায়াত করেন বাসে, ট্রামেই। তিনি আরও বলেন, এই রাস্তাটায় ঐসব লোকেরা সব সময় এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে। যেই একটি মেয়েকে হেঁটে যেতে দেখল, অমনি ছুট, ছুট। তাঁর পেছন পেছন ধাওয়া করবে। কখনও পাশ থেকে ধাক্কা মারবে, কখনও কনুই দিয়ে। নানারকম অসভ্য আচরণ করবে, অশালীন প্রস্তাব দেবে। যেমন জেলেরা নদীতে জাল বিছিয়ে মাছের অপেক্ষায় থাকে ওরা তেমনি সবসময় ওৎ পেতে থাকে কখন একটি মেয়ে দেখবে আর তার সঙ্গে অসভ্যতা করবে। মেয়েটি ওদের সঙ্গে নাই বা গেল, তাতে কী এসে যায়। অসভ্যতা করতে দোষ কী! কেউ তো ওদের কিছু বলবে না। সে বিষয়ে ওরা খুব ভালভাবেই জেনে গেছে। একটু রেগেই বললেন, এমন খোলা বাজার বোধ হয় বিশ্বের আর কোথাও নেই। কিন্তু আছে আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গী ধর্মতলাতে। এবার একটু ব্যঙ্গ করে বলেন, হ্যাঁ এর জন্য উচিত। কারণ ওদের চোখের সামনেই তো সব ঘটছে। সত্যি, মিনিবাসে ঘাড় কুঁজো করে যেতে যেতে বাঙালি ছেলেগুলোর মেরুদন্ড একেবারেই বেঁকে গেছে। আশ্চর্য, হাজার অসহায়তা দেখলেও ওদের মুখ ফুটে আজকাল কোন রা বেরোয় না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। থাকেন দক্ষিণ কলকাতার নাকতলাতে। প্রতিদিন ধর্মতলা থেকেই বাস চেনজ করে কলেজ স্ট্রিটে যান। তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, 'বিকেল চারটে হবে। কলেজ স্ট্রিট থেকে ট্রামে করে ধর্মতলার মোড়ে নেমেছি। বাড়ি যাওয়ার খুব তাড়া ছিল। দেখি মেটরোর সামনে দু তিনটে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে। একটি ট্যাকসির সামনে গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ছয় সাত জন ছেলে দৌড়ে এসে ট্যাকসির বডিটাকে একেবারে ঘিরে ফেলল এবং প্রত্যেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলছে কোথায় যাবেন, চলুন, আমিও যাব। এদের বয়স হবে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। অত্যন্ত নিচ রুচির ছেলে বলেই মনে হল। মুখে পান। আমাকে একেবারে হরির লুটের বাতাসার মত ছেঁকে ধরেছিল। পরে বাড়ি এসে শুনি ঐ জায়গাটা নাকি খুব খারাপ।' তাঁর মন্তব্য, 'কিন্তু কেন? কারা খারাপ করছে, কিসের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে জানোয়ারেরা এসব বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে এখন। খারাপ বললেই চলবে না। বর্তমানে মেয়েরা কলেজে যাচ্ছে, ইউনিভারসিটিতে যাচ্ছে, নানা কাজে বেরোচ্ছে বহু মেয়ে, কাজেই ওসব রোমিওর দল যাতে মেয়েদের বিরক্ত করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মেয়েরা কি সবসময় সঙ্গে এসকরট নিয়ে কাজে বেরোবে? আর ধর্মতলা দিয়ে সকাল, দুপুর, বিকেলে মেয়েরা একা চলতে পারবেই বা না কেন?' সে জানায়, 'মেটরো সিনেমার মত অভিজাত হলের সামনে কোন ভদ্র মেয়ে দাঁড়াতে পারবে না, সেখান দিয়ে কোন মেয়ে ভদ্রভাবে হাঁটতে পারবে না, এটা কলকাতার সকলের পক্ষেই রীতিমত লজ্জার ব্যাপার।'

পয়সা হলেই বুঝি সব মেয়েকে পাওয়া যায় আর কি।'

ভ্রাম্যমাণ 'প্রেমিকদের' এই ধরনের আচরণে সব মেয়েই কি চুপ করে থাকে? মোটেই না। কিছু একরোখা মহিলাও আছেন। তবে এসব লোকেরা হয় খুবই কাপুরুষ। তাই কোন মেয়ে একটু চোখ রাঙিয়ে পেছন ফিরে যখন বলে,—তখন থেকে আমার পেছন পেছন ঘুর ঘুর করছেন কেন? কিংবা কটমট করে তাকিয়ে যদি বলা হয়, 'আপনি কি আমাকে চেনেন, তবে সেই থেকে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছেন কেন? ইয়ারকি পেয়েছেন, জুতো খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে?' তখন এরা মাথা নিচু করে সুড় সুড় করে ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে পালিয়ে যায় আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। অনেক সময় এর থেকেও বেশি বাড়াবাড়ি করে অনেক মেয়ে। যেমন দুর্গাপুর নিবাসী একটি ডানপিটে মেয়ে চৌরঙ্গীর বাটার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রাত আটটার সময়। কয়েক দিনের জন্য সে কলকাতায় মাসির বাড়ি বেড়াতে এসেছে। হঠাৎ একটি ছেলে এসে বলে, আপনার সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ আমাকে চিনতে পারছেন না? আপনি ক্যাবারে নাচেন না? চলুন হোটেলে যাবেন? মেয়েটির উত্তর আলাপ, তোমার সঙ্গে আমার কবে আলাপ? আমি থাকি দুর্গাপুরে, কি করে আলাপ হয় এখানে, তোমার সঙ্গে অনেক টাকা আছে বলে তুমি পারটি কিনতে চাও? আমি এই এলাকাতে থাকি না আর ক্যাবারেও ড্যানসও করি না, বলেই পায়ের জুতো খুলে সপাং করে একেবারে ছেলেটির দুই গালের উপর বসিয়ে দিল এবং চটপট সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি মিনিবাসে উঠে পড়ল।

যারা নেহাৎ দর্শক

সত্তর দশকের আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে বেশ কিছু লোক বিপন্ন মেয়েদের সামনে এগিয়ে আসত। আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই এই ধরনের 'গুড সামারিটান' এখন আর পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে সাধারণ লোকের এখন কী ভূমিকা? ভ্রাম্যমাণ 'প্রেমিকে'র জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন একটি মেয়ে 'চাংওয়া' রেস্তোরাঁর

ভদ্রলোকের সাহায্য চাইলে ভদ্রলোক তাকে পরামর্শ দিলেন, আপনি এক্ষুণি এই স্পট থেকে একটি ট্যাকসি নিয়ে বাড়ি চলে যান তা হলে আর আপনার পেছন পেছন যেতে পারবে না। তেমনি নিউ মারকেটের কারকো রেস্তোরাঁর গেটের কাছে দাঁড়ান কয়েকজন বাঙালি ছেলেকে একদিন একটি মেয়ে গিয়ে যেই বলল, 'দেখেছেন, এরা বাস স্টপ থেকে আমার পেছন পেছন আসছে।' দলের একজন ছেলে তখন দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, 'আপনাকে হয়ত খুব ভাল লেগেছে ওদের, তাই সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে।'

আরেকদিন আরেকটি মেয়ে সাহায্য চাইতে গেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন দুজন ভদ্রলোক। উপদেশও দিয়ে গেলেন, আপনি জানেন না, দিস ইজ চৌরঙ্গী?

চৌরঙ্গীর পথে ভ্রাম্যমাণ 'প্রেমিকদের' সম্বন্ধে ডি সি ডি ডি সুবিমল দাশগুপ্ত কী বলেন? 'কই, আমি তো কোনদিন দেখিনি। আমি আমার বউকে নিয়ে, বোনকে নিয়ে সিনেমায় যাই একজন সাধারণ নাগরিকের মতই, তখন তো এরা থাকে না। আমার চোখে তো কোনদিন পড়েনি। এমনকি উই হ্যাভ নো কমপ্লেন ফ্রম এনি লেডি। তবে ওখানে অনেক বাজে বাজে মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতি মাসে এ ধরনের কয়েকশ মেয়ে আমরা ধরে আনি। অবশ্য ভাল মেয়ে বাজে মেয়ের কোন চিহ্ন নেই। এদের মধ্যে আজকাল অনেকেই সুশ্রী, ভদ্রমেয়েও আছে। এরা সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে। আপনি একদিন সন্ধ্যাবেলা আসুন, এই মেয়েগুলোর সঙ্গে মিট করিয়ে দেব। অনেক কিছু জানতে পারবেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে ভাল মেয়েদের কেউ 'টিজ' করে বলে আমার জানা নেই, আমি শুনিনি।' সুবিমলবাবুকে বললাম, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত চৌরঙ্গী এলাকায় পুলিশ তেইশজন রোমিওকে পাকড়াও করেছে। অভিযোগ : এরা রাস্তায় মেয়েদের বিরক্ত করত' – খবরটি ২২ অকটোবর, ১৯৮১-র একটি দৈনিক কাগজে বেরিয়েছিল এবং ধরা হয়েছিল তদানীন্তন ডি সি ডি ডি কমলেশ রায়ের নির্দেশেই। তাঁর মন্তব্য, তখন হয়ত এসব ছেলেরা ঘুরে বেড়াত। এখন কলকাতা অনেক ভাল হয়ে গেছে।'

তখনকার তুলনায় কলকাতা এখন আরও ভাল হয়ে গেছে? প্রশ্ন শুনে ডি সি ডি ডি বললেন, আমরা রেকরড দেখছি, কয়েকদিন বাদে আসুন। ইতোমধ্যে এই 'প্রেমিকদের' সম্বন্ধে কয়েকজন অফিসারকে দিয়ে

ইসকুলের মেয়েদেরও পথ চলা দায়

ছায়া সাহা

সাধারণ আইন-শৃংখলার অবনতির সুযোগ নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন মধ্যবিত্ত পাড়ার মেয়েদের স্কুলের সামনে ইভ-টিজারদের উৎপাত আবার বাড়তে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে কলকাতার কয়েকটি মেয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হল।

কলকাতার এই গভীর অসুখ নিয়ে সবাই যে চিন্তিত নয়, এ কথা বলা যায় না। কেউ কেউ খুবই চিন্তিত। এরকম কয়েকজন চিন্তিত মানুষের দলে পড়েন কলকাতার কয়েকটি গারলস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরা।

তাঁদের চিন্তিত হবার স্বাভাবিক-ভাবেই কতকগুলো কারণ থাকে। একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে তার ছাত্র-ছাত্রীরাও পুত্রকন্যাসম। বাড়িতে যেমন পিতামাতার স্নেহ ও শাসনে, বাড়ির বাইরে বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর ছায়ায় তারা বেড়ে ওঠে। সমস্ত শিক্ষকদের তাই একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়, তাদের ছাত্রছাত্রীদের শাসনে এবং স্নেহে সমস্ত বিপদ থেকে দূরে রেখে মানুষ করে তোলার। এরকম দায়িত্ববান কয়েকজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাছে গিয়েছিলাম কলকাতার রাস্তায় মেয়েদের উত্যক্ত করা সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে। জানতে চেয়েছিলাম, তারা কী ভাবছেন, কতখানি নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁদের ছাত্রীদের।

বেলতলা গারলস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চ্যাটার্জি এই স্কুলটির সংগে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে জড়িত আছেন। তিনি বললেন, 'সাধারণত ক্লাশ সেভেন এইটে পড়া মেয়েদের থেকেই এই বিরক্ত করা শুরু হয়। তবে সব থেকে বেশি বিরক্ত করা হয় ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাশের মেয়েদের। এই সব বাচ্চা মেয়েরা এতে ভয় পেয়ে যায়, লজ্জাও পায়। অনেক সময় বড়দের এসব কথা বলতে সাহসও পায় না। তার ফলে রাস্তা-ঘাটে ওদের ওপর এই অত্যাচার বেড়েই চলে।' তাঁর কথা সমর্থন করেই ঐ স্কুলের কয়েকজন অল্পবয়স্ক শিক্ষিকা বললেন, 'এতে অনেক মেয়ের পড়াশোনারও ক্ষতি হয়। অনেকে অনেক সময় স্কুলে আসা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়।' চৌরংগী অঞ্চলে রাস্তায় মেয়েদের যেভাবে বিরক্ত করা হয় সেকথা বলতেই জ্যোৎস্না দেবী বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, ওখানে কেউ দুমিনিটও নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁটতে পারবে না। ওই জায়গার কথা আর না তোলাই ভাল।'

কমলা গারলস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী গীতা ঘোষ খুবই কড়া ধাতের মহিলা। এই প্রসংগ উঠতেই তিনি বললেন, 'আমার স্কুলের ছাত্রীদের ব্যাপার হলে আমি নিজেই ট্যাকল করি। তবে, সাধারণত যেটা দেখা যায়, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যদি এসব করে, তাদের কাছে অনেক সময়ই মানবিকভাবে আবেদন রাখলে কাজ হয়। এই যেমন একবার আমার স্কুলের সামনে কিছু ছেলে দল বেঁধে এসেছিল মেয়েদের পেছনে লাগবে বলে। আমি নিজে গিয়ে ফেস করেছি। ওদের বুঝিয়ে বলেছি। তারপর থেকে কেউ আসেনি। আমি ছাত্রীদের সব সময় বলি স্কুলের বাইরে এমনভাবে চলাফেরা করবে না যাতে কেউ মন্তব্য করতে পারে। এভাবে ওদের নিজেদের শক্ত হতে শেখান উচিত। তবে হ্যাঁ, আজকাল অনেক সময়ই সাধারণ মানুষ অনেক অন্যায় ঘটনা দেখলেও প্রতিবাদ করেন না। সেটা তো ঠিক না।'

শ্রীমতী ঘোষ অবশ্য এ ব্যাপারে ছেলেদের ওপরই সব দোষ চাপিয়ে দিতে চান না। তিনি বলেন, 'আজকাল রাস্তা ঘাটে অনেক মেয়ের ভেতরেও শালীনতা কমে যাচ্ছে। দৃষ্টিকটু জামাকাপড় পরে তারা। এতেও অনেক সময় তাদের অবাঞ্ছিত ঘটনার শিকার হতে হয়।'

বেথুন স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অপর্ণা দত্ত বললেন, 'আমাদের স্কুলের ঠিক সামনেই এ ধরনের কোন ঘটনা আমাদের চোখে পড়েনি। তবে আমাদের নজরে এলে আমরা প্রোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা করি। যেমন, আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্কুলেরই একটি মেয়ে। রোজ শ্যামবাজার থেকে স্কুল-বাসে আসত। কিন্তু যাওয়ার বা ফেরার সময় ওকে একটি লোক রোজ বিরক্ত করত। পরে ভয়ে ভয়ে ও একদিন সব কথা আমাদের বলে দেয়। আমরা সংগে সংগে অ্যাকশন নিই। স্কুল বাস ওকে তারপর থেকে অন্য জায়গা থেকে আনত আর নামিয়ে দিত। আমরা ওখানকার স্থানীয় লোকদেরও ঘটনাটি জানাই। তারাও আমাদের সাহায্য করেন। তবে, সব জায়গায় তো এরকম করা যায় না। আমাদের নজরের ভেতর না এলে আমরা আর কী করতে পারি - আর চৌরংগী এলাকায় আজকাল যা চলছে তা যদি সমানেই চলতে থাকে তা হলে তো কলকাতা একদিন জংগল হয়ে যাবে।'

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীদের এই মনোভাব জানার সংগে সংগেই চেষ্টা করেছিলাম এই শহর কলকাতার আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে, যারা নিরাপদে মানুষকে বাঁচার আশ্বাস দেন কলকাতা শহরে, যারা অপরাধমুক্ত করে শহরকে পরিষ্কার রাখেন, সেই কলকাতা পুলিশ এ ব্যাপারে কী ভাবছেন তাই জানতে। এই সব প্রশ্ন নিয়েই গিয়েছিলাম ডি সি ডি ডি, শ্রীসুবিমল দাশগুপ্তের কাছে।

তিনি বললেন, 'চৌরংগী, ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট নিয়ে অবশ্য অনেকেরই অভিযোগ আছে। আজকাল শ্যামবাজার, বাগবাজার, গড়িয়াহাটেও নাকি এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে অবশ্য এ ধরনের কোন স্পেসিফিক কমপ্লেন আমরা এখনও পাইনি, আমরা চেষ্টা করছি ঐ অঞ্চলে যেখানে বাজে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের পেছন পেছন যারা আসে তাদের ধরে আনতে। এতে হয়ত একটা ভদ্র অবস্থার সৃষ্টি করা যাবে। আমরা চারদিকে এখন বিশেষভাবে নজর দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে আজকাল কিছু মেয়ে এমন অশালীন চালচলন করে যে ফলে তাদের বাজে মন্তব্য শুনতে হয়। আমরা হয়ত আইনের সাহায্য নিয়ে যারা বিরক্ত করে তাদের ধরতে পারি, কিন্তু মেয়েদের সাজপোশাক চালচলন তো আর বন্ধ করতে পারি না। কাজেই দু পক্ষেরই একটু শালীন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আশ্চর্য, এটাই কেউ বুঝতে চায় না।'

জ্যোৎস্না চ্যাটার্জি

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ-এর একশো বছর

পিনাকী ঘোষ

পাবক স্ট্রিট যেখানে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পড়েছে ঠিক সেই মোড়েই ২৪ নং পাবক ম্যানসন। বিশাল বাড়ি। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। সেকালের ইঁট থেকে সাগরপারের গন্ধ এখনও নাকে আসে। নানান প্রতিষ্ঠান এই বাড়ির বিভিন্ন অংশ ভাড়া নিয়েছে। তবে পাবক ম্যানসন বললেই কিন্তু আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ-এর কথাই আগে মনে আসে।

আলিয়ঁসের তথ্য বিভাগ চার তলায়। নিচে দরজার গায়ে টাঙান বোর্ডে সেরকমই নির্দেশ। লিফট আছে, পাশে কাঠের চওড়া সিঁড়ি। লক্ষ্য করলাম প্রায় প্রত্যেকেই লিফট ছেড়ে সিঁড়ি ধরছেন। ব্যাপারটা বুঝলাম না। কাঠের সিঁড়ি ভাঙার লোভ না লিফটের যান্ত্রিক বিপর্যয়

চারতলায় উঠে খোঁজ পেলাম তরুণ জনসংযোগ অফিসার বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির। এ বছর আলিয়ঁসের শতবার্ষিকী। সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে যেখানে আলিয়ঁসের শাখা আছে সেখানেই পালিত হবে একশো বছর পূর্তি উৎসব।

কলকাতায় আপনাদের বিশেষ পরিকল্পনা কী? প্রশ্ন শুনে বিশ্বনাথবাবু পাশের ঘরে বসা ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। খোঁজ নিয়ে জানালেন এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। অনুষ্ঠানসূচি তৈরি করতে সময় লেগে যাবে।

আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৩-র ২১ জুলাই। উদ্দেশ্য বিশ্বে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার। বর্তমানে এক হাজার শাখা পাঁচটি মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। মূল দপ্তর প্যারিতে। ছাত্রছাত্রী প্রায় ২৫০,০০০। এর মধ্যে কলকাতায় ৫০০।

যতক্ষণ ছিলাম বিভিন্ন বয়সী পড়ুয়ার ভিড় নজরে এল। সদ্য তরুণ-তরুণী থেকে মাঝবয়সী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারাও আছেন। তবে অধিকাংশই বিত্তশালী পরিবারের অন্তত কাপড় জামা, হাবভাব তাই বলে।

কৌতূহল হল। এঁদের ফরাসি ভাষা শেখার পেছনে কারণ কী? নিছক শেখা না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে? কৌতূহল মেটালেন বিশ্বনাথবাবু। আলিয়ঁসে যেসব পড়ুয়া আসেন তাঁদের একটা মোটা অংশের উদ্দেশ্য সময় কাটান। অবশ্য স্ট্যাটাস রক্ষার ব্যাপারও আছে। কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলারা বেশির ভাগ এই দলে পড়েন। সিরিয়াস ছাত্রছাত্রীরাও আসেন। তাঁদের অনেকের লক্ষ্য মূল ভাষায় ফরাসি সাহিত্য পড়া আবার অনেকে আসেন দোভাষী, অনুবাদক ইত্যাদি কর্মসন্ধানের তাগিদে। স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। আলিয়ঁসের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে প্রতিবছর ভাষা শিক্ষা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সফল হলে আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ, প্যারি র আমন্ত্রণে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রানস ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়।

অন্যান্য কেন্দ্রের মত কলকাতাতেও ভাষা শিক্ষা ছাড়া ফিলম শো, নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, থিয়েটার, গান-বাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ছবি দেখান হয় সপ্তাহে দুটো করে। ইংরাজি সাবটাইটেল থাকে। তবে মূল লক্ষ্য ভাষা শিক্ষার্থীদের কথ্য ফরাসিতে সড়গড় করে তোলা। থিয়েটার, গান-বাজনা ইত্যাদি পরিবেশনের জন্য ফ্রানস থেকে যেমন শিল্পীরা আসেন তেমনই কলকাতার শিল্পীরাও অংশ নেন। এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দু দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড় করা।

অন্য আকর্ষণটি হচ্ছে লাইব্রেরির। কলকাতা কেন, সারা বাংলা দেশে এরকম আধুনিক ফরাসি পাঠাগার আর নেই। ভাষা শিক্ষার্থীরা ছাড়াও সাধারণ লোক এই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। তার জন্য আলিয়ঁসের সদস্য হতে হবে। রেজিসট্রেশনের ফি পঞ্চাশ টাকা আর এক বছরের চাঁদা আশি টাকা।

পাঁচজন শিক্ষক কলকাতায় পড়ান। তিনজন ফরাসি, দুজন ভারতীয়। পড়ুয়াদের ভিড় দিন দিন বাড়ছে। ভর্তির সময়ে ভিড় সামলাতে কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হয়। অবশ্য শুরু করেন অনেকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো চালান খুব কমই, জানালেন বিশ্বনাথবাবু।

যারা সদস্য হতে চান

কলকাতায় আলিয়ঁসে ফরাসি শিখতে হলে আপনাকে এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো জানতে হবে। জানুয়ারি ও জুলাই বছরে দুবার শিক্ষাকাল শুরু। এ বছর জুলাইয়ের শিক্ষাকালে ভর্তি শুরু হয়েছে জুনে। ক্লাসের সময় সকাল ৯টা থেকে ১২টা আর বিকেল ৪.৩০ থেকে ৭.৩০টা।

আপনার সুবিধে মতন দিনের বিভিন্ন সময়ে ক্লাস করতে পারেন। সকালে ৭.৩০টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ও ১০.৩০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কিংবা বিকেলে ৪.৩০টা থেকে ৫.৩০টা পর্যন্ত অথবা সন্ধেবেলায় ৫.৩০ থেকে ৭টা ও ৭টা থেকে ৮.৩০-এর মধ্যে যে কোন সময় বেছে নিন।

ভর্তির সময় রেজিসট্রেশন ফি বাবদ ২৫ টাকা আর দুমাসের মাইনে আগাম দিতে হবে। মোট তিন ধরনের কোরস আছে – অডিও-ওরাল, অডিও ভিস্যুয়াল আর ক্র্যাশ কোরস।

অডিও ওরাল তিন বছরের কোরস। সপ্তাহে দুটো করে ক্লাস। ছ'টা সেমিসটারে ভাগ করা। ১ম, ২য় ও ৫ম সেমিসটারের জন্য মাসে দিতে হবে ৩০ টাকা আর ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সেমিসটারের জন্য ৪০ টাকা। ১ম ও ২য় বছরের শেষে আলাদা আলাদা সারটিফিকেট পাবেন এবং ৩য় বছরের শেষে পাবেন ডিপ্লোমা। এই ডিপ্লোমা দেয় ফরাসি সরকারের শিক্ষাবিভাগ। ৩য় বছরের পর ইচ্ছে মতন আপনি আর এক বছর সাহিত্য বা কমারশিয়াল ফ্রেনচ পড়তে পারেন।

ক্র্যাশ কোরসের মেয়াদ ছ'মাস। অন্যান্যরা এক বছরে যা শিখবেন আপনাকে ছ'মাসে তাই শেখান হবে। এতে কাজ চালানর মত ফরাসি বলা ও লেখা শেখান হয়। বিভিন্ন ব্যাপারে ফ্রানসে যাওয়া হঠাৎ ঠিক হলে এই কোরস খুবই কাজে লাগে।

সোম থেকে শুক্র সপ্তাহে পাঁচটা ক্লাস। সময় সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯টা। এই কোরসের মাইনে স্বভাবতই বেশি। মাসে ৭০ টাকা। ভর্তির সময়ে ছ'মাসের মাইনে একসঙ্গে দিতে হবে।

অডিও ভিস্যুয়াল কোরসের ক্লাস চলে সোম থেকে বৃহস্পতি। সপ্তাহে চারটে। বিকেল ৫.৩০টা থেকে ৭.৩০টা। মাইনে মাসে ৬০ টাকা।

যে কোন কোরসে ভর্তি হলে আপনার জন্য আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজের সদস্য চাঁদার হার বছরে ২০ টাকা। সদস্য হলে আপনি পাঠাগার, রেকরড লাইব্রেরি ফিলম শো, ক্যাসেট লাইব্রেরির বাড়তি সুবিধেগুলো পাবেন।

সবরকম খোঁজখবরের জন্য সোজা উঠে যাবেন চারতলায়, আলিয়ঁসের অনুসন্ধান অফিসে। □

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা – ৩

বিদ্যাসাগরের বাটী

নির্মলকুমার রায়

স্বনামধন্য পুরুষ পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উত্তর কলকাতাব বাদুড় বাগানের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮২ খৃস্টাব্দের ৫ আগসট বেলা ৪টাব সময শুভাগমন করেছিলেন এবং কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের 'মেটবোপলিটন ইনসটিটিউশনে'ব প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাসটাবমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মশায়ের সংগে আলাপ কবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবায় মাসটারমশাই মহেন্দ্র নাথ গুপ্তের সহায়তায় উভয়ের সাক্ষাতেব ব্যবস্থা হয।এবং সেই মত ঠাকুব নিজেই মাসটাব মশায়েব সংগে বিদ্যাসাগব মশাযেব বাড়িতে শুভাগমন কবেন।

এই সম্পর্কে কথামৃতকাব মাসটাব মশায়েব বর্ণনাব কিছু অংশ - "বিদ্যাসাগরের বাটীব সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংবাজ পছন্দ। জায়গাব মাঝখানে বাটী ও জায়গাব চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ীর পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্প-বৃক্ষ। পশ্চিম দিকের নিচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন।সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে – এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্ব সীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী – কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাবপত্রের খাতা, দুচারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে–দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে--সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।......ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে,– এতে কিছু দোষ হবে না?' গায়ে একটি লং ক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্ণিশ করা চটি জুতা। মাষ্টার বলিলেন; 'আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দবকাব নাই।' বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমন নিশ্চিন্ত হইলেন।" (কথামৃত--তৃতীয় ভাগ, প্রথম খন্ড–প্রথম পরিচ্ছেদ)।

সেদিন প্রথম আলাপেই ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন–'খাল বিল, নদী অনেক দেখেছি; এবার সাগর দেখতে এলাম।' বিদ্যাসাগরও পরিহাস করে উত্তর দিয়েছিলেন-- 'কিন্তু এ সাগরে শুধু নোনাজল–তাই খানিকটা নিয়ে যান।' ঠাকুর তাতে বলেন-'নোনাজল কেন হবে গো! তুমিতো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর–তুমি ক্ষীর সমুদ্র।' এইভাবে নানা কথায় সেদিন তাঁদের কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রসংগের মধ্যে ঠাকুর সেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন যে, সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু 'ব্রহ্ম' আজ অবধি উচ্ছিষ্ট হননি; 'ব্রহ্ম' কী, তা মুখে বলা যায় না। একথা শুনে বিদ্যাসাগর বিস্মিত হয়ে বলেন–'আজ একটি নতুন কথা শিখলাম।' শক্তির তারতম্য সম্পর্কেও ঠাকুর সেদিন বিদ্যাসাগরের সংগে আলোচনা করেন এবং গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর ঠাকুরের সব কথাগুলি মন দিয়ে শোনেন। সেদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ঠাকুর কয়েকখানি গানও গেয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত্রে বিদায়কালে ঠাকুরকে প্রণামপূর্বক বিদ্যাসাগর স্বয়ং বাতির আলো ধরে রাস্তায় নেমে গাড়িতে তুলে দিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের অপূর্ব মিলনস্মৃতি ধারণ করে বাদুড় বাগানের সেই বাড়িটি আজো দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কথামৃত-গ্রন্থে বর্ণিত বাড়ির সেই 'শ্রী' বর্তমানে আর নেই; কিছু অদল-বদল হয়েছে। 'শ্রীম-দর্শন'–পঞ্চদশ ভাগের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে পরবর্তীকালে লেখা হয়েছে– 'বিশ্রামান্তে অন্তেবাসী পুনরায় ঠাকুরের স্থান সমূহ দেখিতে বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন–বাদুড়-বাগান বিদ্যাসাগর-ভবনে। এখন অন্দর বাড়ীর পূর্বাবস্থা নাই। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি ছিল পশ্চিমে। সামনে বড় বিলিতি ঝাউ গাছ ছিল। প্রবেশদ্বারাদি সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এখন ঐ বাড়ীতে একটি স্কুল।'

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে সেখানে কোন স্কুল নেই। বাড়িটি পরবর্তীকালে বিক্রয় করে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বাড়িটি ত্যাগ করেন। বর্তমানে বাড়ির দ্বিতলে অনেক মুখোপাধ্যায় পরিবার বাস করেন এবং বাড়ির একতলার ঘরগুলিতে কয়েকজন অবাঙালি পরিবার থাকেন। বাড়ির উঠানে কিছু পাম গাছ ও দু একটি বড় ফুলের গাছ ছাড়া আগেকার সেই মনোরম পুষ্প উদ্যান নেই। বাড়ির বাহিরের অংশ সংস্কারের অভাবে ক্রমশ জীর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং বাড়ির 'জাফরী'-গুলিও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হচ্ছে। বাড়ির প্রবেশ পথের কাঠের ফটক-টির বদলে বর্তমানে সেখানে বড় বড় দুটি টিনের পাল্লার ফটক তৈরি হয়েছে। ফটক পেরিয়ে পূর্বের সুদৃশ্য প্রাচীর ঘেরা উদ্যানের বদলে বর্তমানে প্রায় চারিদিকেই গ্যারেজ ঘর এবং মোটর গাড়ি সারাবার একটি কারখানা। প্রধান ফটকের বামদিকের দেওয়ালে রাস্তার ওপরেই শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে– 'Here lived Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, C.I.E.—Educationist, Reformer and Philanthropist,—Born 1820, Died 1891.' বাড়ির ডানদিকের সরু রাস্তাটির নাম বাদুড় বাগান লেন। বাড়ির ঠিকানা–৩৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা ৯। বাড়িটি বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের ওপরেই। পথ নির্দেশ : উত্তর কলকাতার গড়পারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে 'মূক-বধির বিদ্যালয়ের' ঠিক বিপরীত দিকের রাস্তাটিই বিদ্যাসাগর স্ট্রিট। এই বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের শেষ প্রান্তে 'হৃষীকেশ পারক', পারকের কাছে গিয়ে ডানদিকে সামান্য একটু বেঁকে গেলেই রাস্তার ডানদিকে বিদ্যাসাগরের বাড়িটি বিদ্যমান। অপর দিকে রামমোহন সরণিতে অবস্থিত আমহারস্ট স্ট্রিট থানার কাছে হৃষীকেশ পারকের পাশ দিয়ে বামদিকের রাস্তায় ঢুকেও বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের এই বাড়িতে আসা যায়। □

বিদ্যাসাগরের বাড়ি

বিদ্যাসাগরের বাড়ি

আলোকচিত্র
শংকর নাগ দাস

পশ্চিমবঙ্গ থেকে হজের পুণ্যযাত্রা শুরু হয়েছে

এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ

হজ ইসলামের এক অন্যতম স্তম্ভ। আরবী হজ শব্দের বাঙলা অর্থ দাঁড়ায় গভীরভাবে ইচ্ছা পোষণ করা, দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। পবিত্র মক্কায়, সৌদি আরবের কিছু পুণ্যময় স্থানে বছরের বিশেষ সময়ে সমবেত হয়ে, নির্দিষ্ট বিধান পালন এবং পরম প্রভু আল্লাহকে স্মরণ করে পাপমুক্তির আকুল প্রার্থনাই হজ।

বিশ্বের বহু দেশের ইসলাম বিশ্বাসী মানুষ হজ করার ইচ্ছায় উপস্থিত হন সৌদি আরবে। মুসলমান জনমণ্ডলীর শুভ কামনার সবুজ জমিনে আভাসিত হয়ে ওঠে খুশির আলো। প্রতিটি মুসলমানের কাছে সযত্নে লালিত আকাঙ্ক্ষা হজ সমাপন করার। এ বছর ভারত থেকে হজযাত্রীরা যাত্রা শুরু করেছেন। সমুদ্র পথে এবং আকাশপথে হজযাত্রীরা পাড়ি দেন।

বোমবাই শহরে হজযাত্রীদের জন্য রয়েছে সুবিশাল গৃহ। পান্থশালা। ত্যাগী পুরুষ সাবু সিদ্দিক স্থাপন করেন এই অট্টালিকা যেখানে বোমবাই হজ কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হজযাত্রীরা এইখানে সামান্য সময় অবস্থান করে জেদ্দার পথে রওয়ানা হন। এয়ার ইনডিয়া এবং মোগল শিপিং লাইনস নামের দুই সরকারি সংস্থা বহন করে হজযাত্রীদের।

গত বছর পৃথিবীর মোট হজ যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৭৯১৬৮ জন। সৌদি আরবের মক্কা শহরে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় ভারতের হজযাত্রীর সংখ্যা ২৬২৯৯ জন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে হজযাত্রীর একটি বিরাট দল বোমবাই যাত্রা করলেন গত ৩০ জুলাই দুপুরে হাওড়া স্টেশনে এই হজযাত্রীদের সংবর্ধনা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটি। প্রতিটি হজযাত্রীর হাতে মিষ্টান্ন এবং ফুলের মালা তুলে দেওয়া হল। ঝলসে উঠল ক্যামেরা। নিকটআত্মীয়, গ্রামবাসী প্রতিবেশীরা বিদায় দিতে এসেছিলেন হজ যাত্রীদের।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির সভাপতি রাজ্যের আইনমন্ত্রী সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ। তিনি হজযাত্রীদের কী কী ধরনের সুযোগ সুবিধা রাজ্য হজকমিটি দিচ্ছে তা বললেন। সহ সভাপতি এম এল এ মীর আবদুস সঈদ বললেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ বছর ১২৯৭ জন যাত্রী যাচ্ছে জাহাজে। ৭২ জন যাত্রী বিমানে যাবেন। কমিটি থেকে প্রত্যেক হজযাত্রীকে একটি পুস্তক বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এতে হজ যাত্রার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবছর রাজ্যের হজযাত্রীদের দেখাশোনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুজন ওয়েলফেয়ার অফিসার পাঠান। এরা জাহাজে সৌদি আরব যান। রাজ্য হজ কমিটির খরচে। যাত্রীদের দেখাশোনা করেন। এ বছর যে দুজন ওয়েলফেয়ার অফিসার যাবেন তাদের নাম ১। চৌধুরী আব্দুল আলিম। বীরভূমের ডিসট্রিকট ইনসপেকটর অব স্কুলস এর সাব ইনসপেকটর। ২। হাজী সেকেন্দর আলী, পশ্চিম দিনাজপুরের দাশপাড়া হাই স্কুলের আরবী শিক্ষক।

বোমবাই থেকে জাহাজে প্রায় আট দিন লাগে সৌদি আরবের জেদ্দা বন্দর যেতে। বিমান পৌছায় ছয় ঘণ্টায়। পিলগ্রিম পাশ (পাশপোর্ট) ইমিগ্রেশন, বৈদেশিক মুদ্রা, ইত্যাদির করণীয় কাজ সমাধা হয় বোমবাই হজ কমিটি অফিসেই। পশ্চিমবঙ্গের হজযাত্রীরা আগে ভাগেই কলকাতা থেকে মাথাপিছু এগার হাজার টাকার মত ব্যাংক ড্রাফট করে জমা দিয়েছিলেন মহাকরণে রাজ্য হজ কমিটি অফিসে। সেই ড্রাফট বোমবাই হজ কমিটিকে পাঠান হয়। অবশ্য লটারিতে সফল নির্বাচিত হবার পরই তা হয়। বোমবাই থেকে যাত্রার আগে হজ যাত্রীরা পেয়ে যাবেন একটি ব্যাংক ড্রাফট যা সৌদি আরবের ব্যাংকে ভাঙান যাবে। বিনিময়ে মিলবে সৌদি মুদ্রা রিয়াল। সৌদি এক রিয়ালের দাম ভারতীয় টাকায় প্রায় তিন টাকার মত। হজযাত্রীরা সামান্য কম খরচে জেদ্দায় সরকারি অতিথিশালায় অবস্থান করেন জাহাজ থেকে নেমে। হজযাত্রীর ইচ্ছামত পছন্দ করা প্রতিনিধি তথা মোয়াল্লেমের নাম বোমবাই থেকেই পাশপোরটে লেখা থাকে।

যাত্রীরা সরকারি তত্ত্বাবধানে বাসে পবিত্র মক্কা শরীফে যান নিজ নিজ মোয়াল্লেমের দপ্তরে। জেদ্দা আধুনিক নগরী। বিলাস আর প্রাচুর্যের শহর। বলতে গেলে সোনা বাঁধান পথ। নানা রকম গাছ দিয়ে শহরের সৌন্দর্য বাড়ান হচ্ছে। দু আড়াই ঘণ্টায় জেদ্দা থেকে মক্কা যাওয়া যায়। মক্কায় রয়েছে পবিত্র কাবাগৃহ। কৃষ্ণবর্ণ পাথরের এই গৃহ হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পূত স্পর্শধন্য। পরম কারুণিক আল্লার ঘর বা বায়তুল্লাহ্ এই কাবাগৃহ।

এই ঘর প্রদক্ষিণ করা, আল্লাহকে স্মরণ করে বিনম্র চিত্তে দোয়া প্রার্থনা, ক্ষমা প্রার্থনা করেন হজ যাত্রীরা। আকুল হয়ে শিশুর মত কাঁদতে থাকেন বিশ্বের নানা দেশের নানা প্রান্তের সাদা কালো অনেক মুসলমান নারী পুরুষ। এত মানুষের ভিড়, এক কলতান, এত ভিন্ন ভাষার প্রকাশ অথচ কোন শৃঙ্খলাহীনতা নেই। যাত্রীরা পেট ভরে পান করেন জমজম কূপের স্বচ্ছ পবিত্র জল। যে জলের গুণাগুণ আজও অম্লান। নবী বা প্রচারকের স্ত্রী তাঁর শিশুপুত্রকে নির্জন প্রান্তরে রেখে দুই পাহাড়ের মাথায় ছুটোছুটি করেছিলেন জলের আশায়। শিশুর পদ সঞ্চালনেই সৃষ্ট কূপ জমজম নামে প্রসিদ্ধ। ধার্মিক মায়ের জলের জন্য আকুতি উদভ্রান্তের মত পাহাড় প্রদক্ষিণের মুহূর্তকে চিরন্তন করার জন্যই সাফা এবং মারওয়া নামের দুই পাহাড়ে ছুটে যেতে হয় হজযাত্রীদের। এটাই নির্দেশ।

মক্কা থেকে কয়েক দিন পর হজের দিনে যেতে হয় অন্যত্র। মিনায়, আরাফাতে। নামাজ পাঠ এবং আকুল প্রার্থনা চলে। হজের মোট সময় পাঁচ দিন। মিনা নামক স্থানে মানুষের রিপু দমনের জন্য শয়তানের কু-চিন্তা কু ভাবনা বিসর্জনের শপথ নিতে হয়। তার আগে পশু কোরবানী করতে হয়। মক্কা ফিরে এসে হজযাত্রীরা সামান্য বিশ্রামের পর রওয়ানা হন পবিত্র মদীনা শহরের উদ্দেশ্যে। অবশ্য কেউ কেউ হজের আগেই মদীনা যান।

মদীনা শহরে বর্তমানে লেখক গিয়েছিলেন মক্কা থেকে প্রাইভেট কারে। সর্বাধুনিক দামী গাড়ি সাত জন যাত্রী নিয়ে রাত এগারটায় পাহাড় কাটা পথ ছুঁয়ে অতি দ্রুত হৃদকম্প সৃষ্টিকারী গতিতে ছুটেছিল। ভোরের আলো ফুটেছিল। ঊষাকালের ফজরের সুললিত আরবী কণ্ঠের আজান শুরু হয়েছে। মদীনা আমাদের চোখের সামনে। ইসলাম ধর্মের শেষ প্রচারক এবং শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং সমাধি এই শহরেই।

বলে রাখা ভাল সৌদি আরবে প্রবেশের বেশ কিছু আগে প্রতিটি হজযাত্রীকে সমস্ত পোশাক বদল করে সাদা সেলাইবিহীন কাফিনের কাপড় পরিধান করতেই হয়। নারী পুরুষের একই বিধান। মুখে বলতে হয় 'লাব্বায়েক'। অর্থাৎ আমি তোমারই দাস গোলাম, তোমার কাছে উপস্থিত, একমাত্র তুমিই প্রভু, তোমার কোনও শরীক নাই, প্রশংসা তোমারই ...

হজ সমাপন হলেই ঐ পোশাক ত্যাগ করে সাধারণ পোশাক পরিধান করা যায়। হজের শেষের দিকে কোরবানি, পশুবলির পর মস্তক মুণ্ডন করতে হয় প্রতিটি পুরুষকে। একটা কথা বলে রাখা ভাল হজযাত্রার জন্য কি সৌদি আরব সরকার, কি ভারত সরকার কেউই সরকারি অর্থ ব্যয় করেন না। হজের মরশুমে সৌদি আরবে ভারতীয় চাল ডাল, আনাজপত্র, নামাজ পাঠের সুন্দর মাদুর, প্লাসটিকের ব্যবহার্য দ্রব্য, তসবীহ বিছানার চাদর, মিষ্টান্ন, শুষ্ক ফল, খেজুর, বই পত্র, পবিত্র কোরান শরীফ, রেহেল সৌদি আরবে যায়।

এ বছর হজে যাচ্ছেন হাজী সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব। ফুর

সমবেত পুণ্যকামী হজযাত্রী / অভিজিৎ হাজরা

ফুরার আলা বড় হুজুর পীর কেবলা (রঃ) প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পত্রিকা নেদায়ে ইসলামের সহকারী সম্পাদক। ছয় নমবর নুরজাহান নামের জাহাজে একশ ছেষট্টিজন যাত্রী নিয়ে ইনি যাচ্ছেন। তিনবার ইনি হজ কমিটির ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে হজযাত্রা করেন। বাষট্টি সাল থেকে বোমবাই হজ কমিটির স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে হাজীদের সেবা করে আসছেন। ইনি হজ যাত্রীদের জন্য সহজ পুস্তক রচনা করেছেন এবং নেদায়ে ইসলাম পত্রিকায় কয়েক বছর হজ সংখ্যা প্রকাশ করছেন। তিনি বললেন এ বছরে সমুদ্র পথে হজযাত্রীর খরচ পনের হাজার টাকা। বিমান পথে কুড়ি হাজার টাকা। বীরভূমের মুহম্মদ বাজার থানার, ভাঁড়কাটা গ্রামের হাজী নজির হোসেন মল্লিক গত বছরে হজ করতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা মাকে সংগে নিয়ে। তাঁর মতে ভারতীয় হজযাত্রীরা অনেকেই অনভিজ্ঞ। অনেকে বিদেশে প্রথম যাচ্ছেন। সৌদি আরবে সর্বত্রই ভাষা আরবী। যাত্রীদের অসুবিধার সীমা থাকে না।

কলকাতায় ব্রাইট স্ট্রিটের মুহম্মদ নুরুল ইসলাম বসিরহাট কো-অপারেটিভ ইনডাসটিয়াল ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। স্বামী স্ত্রীতে হজ করেছেন। বললেন—আমার বার বার যেতে ইচ্ছে হয়। তবে শরীরে তেমন বল পাই না। তপসিয়ার হজযাত্রী মুহম্মদ আরিফ কমবয়সী যুবক। আগসটের ৯ তারিখে বোমবাই থেকে নুরজাহান জাহাজে জেদ্দা অভিমুখে যাবেন। তাঁর মতে তরুণ বয়সেই হজ করা উচিত। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের হজ যাত্রীরাই বয়সে তরুণ।

মুরশিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ঘোলোয়া গ্রামের আজিজুর রহমান (৩৩) যাচ্ছেন। তাঁর দুঃখ প্রতিবছর একই লোক যাতে হজ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেই হজ কমিটির।

কলকাতার টেরেটি বাজারের আফসারউদ্দীন মল্লিক সাহেব বলেছেন এ বছর যেসব হজযাত্রী বিফল হলেন লটারিতে তাদেরকে আগামী বছর যাতে সুযোগ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা চাই।

মুসলমানদের কাছে হজ চিরকালই বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু। হজ সমাধা করে জীবনযাত্রায় আরও বেশি ধর্মপরায়ণতা আনেন মুসলমানরা। তাই বলে হজ করার পর সংসারে সব কিছু ছেড়ে খোদার সাধনা করার কথা নেই। হজ করার পর সংযত হতে হবে এটাই প্রার্থিত। এ বছর

হাজী মুহম্মদ নজির হোসেন মল্লিক

সেপটেমবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ হজ হবে। ভারত সরকার হজের সময় পররাষ্ট্র দপ্তরের উদ্যোগে হজ গুড উইল ডেলিগেশন পাঠান সৌদি আরবে। পশ্চিমবংগ থেকে ঐ শুভেচ্ছা দলে বেশ কয়েক বছর প্রতিনিধি নেওয়া হয়নি। উপযুক্ত প্রতিনিধি নেওয়া দরকার। এছাড়া সেনট্রাল হজ কমিটির সভা পশ্চিমবংগে কেন করা হবে না তাও ভাবা দরকার। পশ্চিমবংগ রাজ্য হজ কমিটির নির্বাচন হওয়া উচিত। কোন দিনই সভায় যোগ দেন না এমন ব্যক্তির নামও হজ কমিটিতে থাকে বলে অভিযোগ আছে। বোমবাই শহরে হজ ভবন নির্মাণের জন্য পশ্চিমবংগ মোটা চাঁদা দিয়েছে অথচ বোমবাই হজ অফিসে পশ্চিমবংগের হজ অফিসার ও কর্মীদের থাকার জন্য কোন অফিস ঘর দেওয়া হয় না। অবহেলায় থাকতে হয়। □

আলোকচিত্র : লেখক

প্রতিবেশী রাজ্য

আসামের মানুষ এখন স্বস্তি চাইছেন

আসাম থেকে কে. কে. মিশ্র

আসামের মানুষ আর নতুন কোন আন্দোলন এই মুহূর্তে চাইছেন না। তারা এবার একটু স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরতে চাইছেন। গত ১ জুলাই নতুন ছটি জেলা গঠনের প্রতিবাদে সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন ও গণসংগ্রাম পরিষদ যে আসাম বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন কার্যত তা ব্যর্থ হয়েছে। সারা আসামের কোন জায়গা থেকে বিশেষ কোন ঘটনার খবর ছিল না। সেদিন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়া শিবসাগরে জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন, তখন শিবসাগর শহরের প্রায় সব মানুষই জনসভায় হাজির ছিলেন। কোথাও কোন কাল পতাকা দেখানোর খবর নেই – কেউ প্রচারপত্র বিলিও করেননি। দুপুরের প্রখর গরমে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনেছেন। বিহু নাচের মধ্যে দিয়ে সেদিন শিবসাগরের মানুষ যেন দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন।

এমনি উৎসাহ মেতে ছিল সারা আসাম গত জুন মাসের ২৫ তারিখে। প্রুডেনশিয়াল কাপ জেতার আনন্দে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানাতে মধ্যরাতে আসামের মানুষ ঘর ছেড়ে সদর রাস্তায় আনন্দ হুল্লোড়ে মেতে উঠেছিল। আসামের বাজার পাট এখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। ট্রেনে-বাসে যাত্রী বোঝাই হয়ে চলাচল করে। মহিলা কিশোরীরা আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। তিন লক্ষ উদ্বাস্তুর সাময়িক আচ্ছাদনও মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়া এখন মনোবলে বলীয়ান। তিনি একদিকে এস. ও. এস গ্রামে শিশুদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে থেকে তাদের 'মা' খুঁজে দিচ্ছেন। অন্যদিকে ছিন্নমূল মানুষগুলোর পুনর্বাসনের জন্য ৫০০০ টাকা নগদ, ৩০০০ টাকার লোহার পাত, ১৫০০ টাকার গরুর গাড়ি কেনার জন্য ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আবার একই সংগে রাজ্যের রাজস্ব বাড়ানোর চিন্তাও তাঁর মধ্যে এসেছে। তিনি এখন চান গৌহাটিকে একটি স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হোক। তিনি যে একজন দক্ষ প্রশাসক এ কথা জানাতেও তাঁর কুণ্ঠা নেই। যখন মুখ্যমন্ত্রী হন তখন রাজ্যের খাতে ওভারড্রাফট ছিল ৩২ কোটি টাকা। এখন সেখানে রাজ্যের উদ্বৃত্ত ১৫ কোটি টাকা। এসব দাবিগুলি তিনি জনমন যাচাই করে করেছেন। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। সেই সংগে তিনি নতুন একটি দাবি তুলেছেন – আসাম-বাংলাদেশ ২৭৫ কিলোমিটার সীমানায় এক দেওয়াল তুলবেন। এই দেওয়াল দিয়ে বিদেশিদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাবে। মোট কথা হিতেশ্বর সইকিয়া নিজের একটা 'পপুলার ইমেজ' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আসাম আন্দোলনের সপক্ষে আর বিপক্ষে সব লোকেরাই এবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন যে তারা ভবিষ্যতে কী করবেন?

হিতেশ্বর সইকিয়ার জনপ্রিয়তার চাপে আসু আর গণসংগ্রাম পরিষদের নেতারাও যথেষ্ট চিন্তিত। তারা বেশ বুঝতে পারছেন আসামের আন্দোলন এই সময় আর জোরদার করা যাবে না। এখন প্রফুল্ল মোহন্ত আর ভৃগু ফুকনকে প্রায়ই বলতে হয় আমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি। না হ[illegible] পরিষদের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। নতুন করে এখন তারা আর কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবেন না।

হিতেশ্বর সইকিয়ার নির্দেশে রাজাজোড়া যে বাকি পরীক্ষাগুলো চালু করার তোড়জোড় চলছে প্রফুল্ল মোহন্ত আর ভৃগু ফুকন এবার সেই পরীক্ষা দিচ্ছেন। □

খবর খবর

আয়ুর্বেদের ভাগ্য ফিরল

রুদ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাজ্য সরকার এখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কলেজ আছে অনেক। কিন্তু ওষুধ তৈরির উপযোগী গাছগাছড়ার অভাব। কবিরাজি চিকিৎসায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুই আগ্রহী।

এই রাজ্যেই যাতে আয়ুর্বেদের ওষুধ তৈরির প্রয়োজনীয় গাছগাছড়া পাওয়া যায় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বনমন্ত্রী পরিমল মিত্রকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। পরিমলবাবুও যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতিবাবুর কবিরাজ নির্মল রায় তিনশ গাছের একটি তালিকা তৈরি করে বনমন্ত্রীকে দিয়েছেন।

রাজ্য সরকার চান এইসব আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়া যাতে এ রাজ্যেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। এর জন্য কলকাতার লবণ হ্রদ এলাকায় এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে বিরাট এলাকায় জমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই দুই জায়গায় আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গাছ লাগান হবে। এর জন্য প্রায় তিনশ গাছের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

এরাজ্যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াবার জন্য একাধিক কলেজ আছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে বহু আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এইমতে চিকিৎসার নানান পরামর্শও দিয়ে থাকেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এই চিকিৎসার জন্য গবেষণার কোন ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। এছাড়া বহু ওষুধই পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দাম পড়ে অনেক। তার ওপর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব একটা জনপ্রিয় নয়। দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় সুফল না পেয়ে আয়ুর্বেদের দ্বারস্থ হয়েছেন। কবিরাজদের মতে, অন্য চিকিৎসায় সময় নষ্ট করার আগে এইসব রোগীরা যদি শুরু থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করাতেন তাহলে সুফল পেতেন খুব তাড়াতাড়ি।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে সরকারি আগ্রহের সূত্রপাত সি পি আই (এম)-এর প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের চিকিৎসা চলার সময়। বুকের জটিল হাঁপানি রোগে আক্রান্ত প্রমোদবাবু দীর্ঘদিন ধরে নানান ধরনের চিকিৎসা করিয়েছিলেন তাঁর রোগ উপশমের জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মারা যাওয়ার বছর দেড়েক আগে বর্তমান পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের মাধ্যমে যোগাযোগ করে প্রমোদবাবু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করেন কবিরাজ নির্মলচন্দ্র রায়ের কাছে। তাঁর চিকিৎসায় প্রমোদবাবু দীর্ঘদিনের কষ্ট থেকে মুক্তি পান। যাই হোক, এর পরের কথা সকলেরই জানা। 'পরিবর্তনের' পাঠকদের আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সে কথা থাক, যদিও পুরমন্ত্রী প্রশান্তবাবু তাঁর রোগ উপশমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সুফল পেয়েছেন অনেক আগেই। প্রমোদবাবু এই চিকিৎসা শুরু করার পর সরকারি মহলে এ নিয়ে আগ্রহ বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে কবিরাজ নির্মল বাবুর কাছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর চিকিৎসার পরামর্শ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ হওয়ার পর অনেক নামকরা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার ভার নেওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিবাবু একাধিক বার নির্মল বাবুর পরামর্শ নিয়েছেন। এছাড়া স্বর্গত শংকর গুপ্তের জীবনের শেষ লগ্নে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা কবিরাজ নির্মলবাবুর সাহায্য চান। সংসদ সদস্য নীরেন ঘোষসহ অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই চিকিৎসকের পরামর্শ নেন।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই কার্যত আয়ুর্বেদে চিকিৎসা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বর্তমানে প্রকৃত রূপ পেতে চলেছে। প্রমোদবাবুর চিকিৎসার সময় থেকেই এই উদ্যোগ শুরু। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই চান প্রয়োজনীয় আয়ুর্বেদ ওষুধ যাতে এরাজ্যেই সব পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। এর জন্য বনমন্ত্রী পরিমল মিত্রকে তিনি কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। পরিমলবাবুও এতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। বনমন্ত্রী কবিরাজ নির্মলবাবুর সঙ্গে একাধিকবার দেখা করে অবিলম্বে কবিরাজি গাছগাছড়ার এক বিস্তারিত তালিকা চেয়েছেন। সেই অনুযায়ী কবিরাজ মশাই তিনশ গাছের যে তালিকা বনমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন, তাতে দেখা যাবে এরাজ্য থেকে ক্রমশ সংরক্ষণের অভাবে এইসব গাছ উধাও হয়ে যেতে বসেছে। এক সময় প্রচুর পাওয়া যেত কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। নির্মলবাবুর মতে, এই তালিকা অনুযায়ী গাছগাছড়া পাওয়া গেলে এরাজ্যে আয়ুর্বেদ ওষুধের দাম অনেক কমবে, সাধারণ মানুষেরও এই ওষুধ পেতে সুবিধা হবে। দুজয়গাতে এর জন্য জমি নেওয়া হয়েছে কেন? এ ব্যাপারে বন দফতর সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায় পাহাড়ী এলাকায় উঁচু জমিতে জন্মায় এমন বহু গাছের কথাও বলা হয়েছে। তাই এই ব্যবস্থা।

এমন বহু গাছ আছে যা এরাজ্যে প্রচুর পাওয়া যেত। কিন্তু এখন খুব কমই পাওয়া যায়। যেমন নাগেশ্বর। কফ ও বায়ুজনিত রোগের ওষুধ তৈরিতে অত্যন্ত ফলপ্রদ। জটামাংসী গাছ রক্তচাপ ও বায়ু রোধ করতে খুবই ভাল কাজ দেয়। যেহেতু এরাজ্যে কমই পাওয়া যায়, তাই বাজারে পাওয়া গেলেও এর দাম প্রচুর। হৃদরোগ ও সংশ্লিষ্ট উপসর্গের উপশমের জন্য খুব প্রয়োজন অর্জুন গাছের ছাল। এ তো গেল বড় গাছের কথা। যকৃতের বহু রোগ ভাল করতে আর রক্তহীনতা, জনডিস (ন্যাবা) প্রভৃতি রোগ ভাল করতে কুলেখাড়া পাতার রস কবিরাজদের মতে অমৃতের মত কাজ করে। এই পাতা চাষ করতে হয় না। জলা জমিতে প্রায় নিজে থেকেই জন্মায়। কিন্তু এগুলিও যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কবিরাজ নির্মলবাবুর মতে, হৃদরোগের ক্ষেত্রে যে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয় তা সব সময় সঠিক নয়। তাঁর মতে এর জন্য খাদ্য তালিকা এত কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এতে শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, তাঁর একজন ৬৫ বছর বয়স্ক হৃদরোগী আছেন। তাঁর বুকে পেস মেকার বসান আছে। চিকিৎসকরা তাঁর প্রায় সব খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝোল এবং ভাত। প্রায় এক বছর ধরে নির্মলবাবু ওই ভদ্রলোকের চিকিৎসা করছেন। বর্তমানে রোগী তাঁর পছন্দ মত খাবার খাচ্ছেন, সুস্থ অবস্থায় কাজও করছেন। ❑

বই-এর খবর

প্রবীর ঘোষ

এবার ছোটদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু আনন্দ সংবাদ। দে'জ পাবলিশিং ছোটদের অদ্ভুত যত ভূতের গল্প নিয়ে প্রকাশ করেছেন ছোটদের প্রিয় লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূত অদ্ভুত'। ছোটদের আর একটি বইও ওঁরা বের করেছেন। ইন্দিরা দেবীর 'বুকুনের অসুখ'।

নাথ পাবলিশিং থেকেও ছোটদের জন্য দুটো বই প্রকাশ করা হয়েছে। লীলা মজুমদারের 'ছোটদের পুরাণের গল্প' ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'গোল'। বড়দের জন্যেও একটা বড় খবর রয়েছে। এঁরাই গত সপ্তাহে প্রকাশ করলেন নীললোহিত-এর 'চোখে চোখে'।

বিশ্ববাণী একটা মহৎ কাজ করেছেন। প্রকাশ করেছেন 'দাদাঠাকুর রচনা সমগ্র'।

পক্ষিরাজ প্রকাশনী এখন আর শুধু 'পক্ষিরাজ' পত্রিকা নিয়েই সন্তুষ্ট নন, সঙ্গে ছোটদের বই প্রকাশও শুরু করেছেন। রথের দিন প্রকাশিত হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার 'হিজ্ বিজ্ বিজ্' ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'এক যে ছিল পায়রা'।

দেবসাহিত্য কুটির প্রা. লি. থেকে ছোটদের প্রিয় পত্রিকা 'শুকতারা' আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

'শুভতারা' নামে আর একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা রথযাত্রার আগের দিন থেকে যাত্রা শুরু করল।

১৬ জুলাই থেকে আরও একটি ছোটদের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। নাম – 'ছেলেবেলা'।

ঈদ উপলক্ষে কলকাতা থেকে ঈদ সংখ্যা 'কাফেলা', 'প্রগতি', 'রাহেলা', 'বুলবুল' ও আরও কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকেও কয়েকটি ঈদ সংখ্যা সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যামন্দির ১৪ জুলাই প্রকাশ করলেন উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রচনা সমগ্র। পিতা-পুত্রের এই যুক্ত রচনা সমগ্রের ছবি এঁকেছেন সত্য চক্রবর্তী। এইদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিম পুরস্কার' প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানালেন বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ।

গত ২৬ জুন স্বরের আড়ালে প্রতি প্রকাশনীর পক্ষ থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা নামে একটি কাব্য সংকলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত অসমীয়া কবি ও গীতিকার কেশবচন্দ্র মহান্ত। ❑

বাঙালি তরুণের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে কেন?

দিব্যজ্যোতি বসু

কিছুকাল আগে সামরিক বাহিনীর লোকেরা কলকাতায় এসেছিলেন 'বিশেষ রিক্রুটমেন্ট' প্রকল্প অনুসারে সৈনিক নির্বাচন করতে। খবর পেয়ে হাজার হাজার বাঙালি তরুণ এসেছিলেন সৈনিক হতে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অল্পজনই মাত্র সফল হতে পেরেছেন। অধিকাংশকেই ফিরে যেতে হয়েছে নিরাশ হয়ে। কিন্তু কেন? তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই প্রতিবেদনে, সেই সঙ্গে লেখা হয়েছে অতি স্নেহপ্রবণ সুখী বাঙালি জননীদের কথা, যারা তাঁদের সন্তানদের বাঙালি ঘরে রাখতে চান, মানুষ করতে চান না।

নদীয়া জেলার বীরনগরের সমীর কুমার ঘোষ। বেপরোয়া আঠার উনিশের টগবগে তরুণ। সারাদিনের হৈ-হুল্লোড়ে আর সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কিন্তু ১৯৮৩-র ২০ মারচ সকাল থেকেই ফূর্তিবাজ সমীরের মুখে ভ্রূকুটি। সারাদিনটা প্রায় কারও সংগে কোন কথাই বলল না, বন্ধু-বান্ধব এসে ফিরে গেল। একবার হাঁক পাড়তে না পাড়তেই যে ছেলে সটান হাজির হয় রান্নাঘরে মার সামনে, সেদিন ডেকে ডেকেও তার সাড়া পেল না মা, দিদি, বৌদিরা। 'কি হয়েছে রে তোর?' বাবা দাদাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও বার কয়েক ঢোঁক গিলে চুপ করে গেল মন্টু ওরফে সমীর। বাড়ির লোক ভেবেছে 'এ বয়সের ছেলে, হয়ত বন্ধু-বান্ধবের সংগে ঝগড়া হয়েছে, ও ঠিক হয়ে যাবে।' সমীরকে ডাকতে এসে ভ্রূকুটি দেখে যারা ফিরে গেছে সেইসব বন্ধু-বান্ধবরা ভেবেছে 'সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয় বলে বাড়িতে বোধহয় একচোট ঝামেলা হয়ে গেছে, ও আস্তে আস্তে ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

তারপর আর কেউ খেয়াল করেনি। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা রাত দশটা থেকে এগারটা, এগারটা থেকে বারটা পেরোনর পরই খোঁজ হয়েছে 'মন্টু কোথায় গেল?' পাড়া-পড়শি, বন্ধু-বান্ধব, কাছাকাছি আত্মীয় স্বজনের বাড়ি লোক পাঠান হয়েছে। সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় তালাশ করা হয়েছে কিন্তু মন্টুর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

হাওড়া জেলার চেংগাইলে শেখ আইজুর রহমানেরও ২০ মারচ ভীষণ অশান্তিতে কেটেছে। সারা দিন বাপজান, আম্মার সংগে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে হয়েছে। ওদের নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছে একুশ বছরের আইজুর। কিন্তু মা-বাবা কিছুতেই অনুমতি দেননি ছেলেকে। ফলে রাগ করে রাত্রে আইজুর কিছু মুখে দেয়নি। ছেলের ওপর রাগ করলে কি হবে, ছেলে কিছু খায়নি বলে মাও নিজে থেকে মুখে কিছু তোলেননি। এক গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু কাকভোরে উঠে ছেলেকে ডাকতে গিয়ে দেখে ছেলের বিছানা শূন্য, ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাইরে এসেছে আইজুরের আম্মা। চিৎকার চেঁচামেচিতে আইজুরের বাপজান উঠে পড়েছে। দু জনে মিলে ছেলের নাম ধরে হাঁকাহাঁকি করায় আশেপাশের অনেকেই ছুটে এসেছে, ফিরে আসেনি শুধু আইজুর। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলের বালিশের তলা থেকে বেরিয়েছে চিরকুট 'আম্মা, আমি চললাম।'

এই মন্টু বা আইজুরের মত বহু ছেলেই গত ২০ মারচ রাত্রিবেলায় বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। কিন্তু কি এমন কথা ছিল যা মন্টু মুখ ফুটে বলতে পারল না মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। তাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে হল? আর আইজুরই বা কি এমন অন্যায় আবদার করেছিল মা-বাবা কিছুতেই যা মেনে নিলেন না, ফলে ঘর ছাড়তে হয়েছিল আইজুরকে? এই প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর আমরা পাই তা নেহাৎই অবাক হবার মত।

মন্টু বা আইজুররা হাজার হাজার বাঙালি ছেলের প্রতিভূ হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই চাওয়ার পথে অজস্র বাধা-বিঘ্ন এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। মা, বাবা পরিবারের আত্মীয় অভিভাবকের দল, সর্বোপরি আমাদের এই বৈশ্য সমাজ আজও সৈনিকের জীবনকে চিহ্নিত করেন যাবতীয় অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনার প্রতীক হিসেবে। তাই তরুণ বয়সের সজীব উৎসাহ উদ্দীপনা সৈনিক জীবন গ্রহণে যথেষ্ট প্রবোচিত করলেও মা, বাবা বা পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অভিভবাবকরা চেষ্টা করেন তাদের ছেলেদের ওই অনিশ্চিতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে, নানান ভাবে তারা চেষ্টা করেন 'সেনাবাহিনী'তে ভর্তি হওয়া থেকে তাদের বিরত করতে। ফলে কেউ কেউ কিছু না জানিয়ে পালিয়ে আসে, আবার অনেকে যুক্তি তর্কে অভিভাবকদের বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করে। যেমন এসেছে মন্টু আর আইজুর। ওদের দুজনের সংগেই আমার দেখা হয়েছে ২১ মারচ রেস কোরসের উল্টোদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর রিক্রুটমেন্ট র‍্যালিতে। মা, বাবা বা পরিজন পাঁচজনের বাধাকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে এসেও ওদের পদে পদে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হাজার হাজার মন্টুর মুখে শোনা তাদের সেই বাধা-বিপত্তির কথাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরব। তবে তার আগে ২১ মারচ থেকে ২৪ মারচ রেড রোড ক্যাম্পে রিক্রুটমেন্ট র‍্যালি দেখার যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তার কথা কিছু বলে নেওয়া যাক।

কলকাতার যেসব স্বাস্থ্যপ্রেমী নাগরিক ফোর্ট উইলিয়ামের উল্টোদিক থেকে শুরু করে রেস কোরসের আগ অবধি বিস্তৃত ফাঁকা

মাঠ-ময়দানকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মুক্তাঞ্চল করে রেখেছেন, তারা গত ২১ মার্চ ভোরবেলা তাদের কায়দা কসরতের জন্য গুটি গুটি হাজির হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করেছিলেন। কেন না ওদের কসরতের জায়গা তখন দখল করে বসে আছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার ছেলে ছোকরার দল। ওরা প্রত্যেকেই এসেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবার প্রত্যাশায়। ২০ তারিখ রাত থেকেই লাইন দিয়ে বসে আছে ২১ তারিখ সকাল বেলা পরীক্ষা দেবে বলে। সকাল আটটা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নেওয়া শুরু হবার কথা। সোয়া আটটা নাগাদ আমি যখন সেদিন রেড রোড ক্যামপে পৌঁছই, তখন সেখানে রীতিমত জনস্রোত। হু হু করে এগিয়ে আসছে ক্যামপের দিকে। গেটে বেশ কয়েকজন গুরখা ব্রিগেডের লোক চেক করে নিচ্ছেন, যারা এসেছেন তারা প্রত্যেকেই প্রার্থী কিনা। অনাবশ্যক লোকজনকে মিলিটারি মেজাজে গলা ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ক্যামপের ভেতরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গোটা তিরিশেক তাঁবু ফেলা হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবার পর প্রার্থীদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে উচ্চতার মাপদণ্ডের পরীক্ষায়। এই পরীক্ষার মাপকাঠি অবশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীগত পার্থক্যের কথা মনে রেখে। যেমন একজন পাঞ্জাবী প্রার্থীর ন্যূনতম উচ্চতা যতটা হওয়া দরকার, একজন বাঙালি প্রার্থীর উচ্চতা ঠিক ততটা না হলেও চলবে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া যোগ্যতা অনুযায়ী একজন বাঙালি প্রার্থীকে অবশ্যই ১৬৬ সেনটিমিটার লম্বা হতে হবে। রেসকোর্সের দিক থেকে বিরাট লাইন করে সব প্রার্থীদের দাঁড় করান হয়েছে এবং একে একে এগিয়ে এসে ইয়ার্ডস্টিকের নিচে দাঁড়াচ্ছে। যারা ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি পেরোতে পারছে তাদের সবাইকে এক জায়গায় জড় করা হচ্ছে এবং যারা যোগ্যতার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হচ্ছে তাদের সেখান থেকেই পত্রপাঠ বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে।

এত ক্ষিপ্রগতিতে এই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, যে সফল হচ্ছে সেও যেমন বুঝে উঠতে পারছে না যে নিমেষের মধ্যে কি হল না হল, আর যে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সে তো অসন্তোষ ভরে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছে যে 'যথাযথভাবে মাপা হচ্ছে না'। সাদা চোখের চাহনিতে কিন্তু বহু ছেলেকে দেখলাম যারা উচ্চতার মাপকাঠিতে অন্যান্য অনেক ছেলের চাইতে লম্বা। তারা হঠাৎ বাতিল হয়ে গেল কেন জানতে চেয়েছিলাম সংগী ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং এর কাছে। উনি জানালেন যে, 'যাদের ওপর ডিসিশন নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সেনট পারসেনট পারফেকট। কাজেই তারা যা ভাল বুঝেছে করেছে।'

ডিসিশন মেকারদের সিদ্ধান্তে যারা সফল হয়েছেন তাদের মধ্যে এরপর অঞ্চল অনুযায়ী ভাগ করে ফেলা হয়েছে। যেমন কলকাতার প্রার্থীদের একদিকে বসান হয়েছে, বিভিন্ন জেলার প্রার্থীদের অন্যদিকে এবং শিলিগুড়ি বা মুরশিদাবাদ অঞ্চলের প্রার্থীদের আবার আরেক দিকে। উচ্চতার মাপকাঠিতে পাশ করার পর সফল প্রার্থীদের বলা হল প্যানট শারট খুলে ফেলতে। এরপর দেহের ওজন ও বুকের ছাতি মেপে দেখা হবে। এখানেও সেই জাতিগত প্রভেদ রাখা হয়েছে। বাঙালি প্রার্থীদের জন্য বুকের ছাতির ন্যূনতম মাপ রাখা হয়েছে ৭৮ সেনটিমিটার ও দেহের ওজন কমপক্ষে ৫১ কিলোগ্রাম। বেশির ভাগ প্রার্থীই জামা কাপড় খুলে একটা শরট প্যানট বা জাঙিয়া পরে প্রস্তুত হয়ে নিল। এখানে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রয়োজনীয় সারটিফিকেটও পরীক্ষা করে নেওয়া হল। এই বুকের ছাতি মাপার পরীক্ষাতেই দেখলাম খুব বেশি সংখ্যক প্রার্থীকে ছাঁটাই করে দেওয়া হল। এখানেও আপাতদৃষ্টিতে বেশ কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ডিসিশন-মেকার বা জাজদের বিচারে অপেক্ষাকৃত কৃশদর্শন বহু প্রার্থী সুঠাম স্বাস্থ্যবান প্রার্থীকে অতিক্রম করে পরবর্তী পর্যায় মেডিকেল টেসটের জন্য উত্তীর্ণ হল। এবার আর আমি কুলদীপ সিংকে কোন প্রশ্ন করিনি।

নাক-কান-গলা সব খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে

মেডিকেল টেসটে প্রার্থীদের চোখ, নাক, কান, গলা থেকে শুরু করে শরীরের প্রতিটি প্রত্যংগের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে সেনাবাহিনীর ডাক্তাররা যাদের 'সব ঠিক হ্যায়' বলে সারটিফিকেট দিলেন তাদের আবার নিয়ে যাওয়া হল 'ফিজিক্যাল টেসট'-এর পরীক্ষা ক্ষেত্রে। এখানে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থীদের এনডিউরেনস টেসট নেওয়া হল। প্রথমে ৪০০ মি: দৌড়, পরে হাতের বাইসেপস বা ট্রাইসেপসের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কাঠের পোসট ধরে চিনিং করা ও সবশেষে দৌড়ে এসে ৯ ফুট চওড়া পরিখা পার হয়ে যাওয়া।

এই সব পরীক্ষায় পার হতে পারলেই কিন্তু শেষ হল না। এই সব প্রত্যেকটি পরীক্ষায় সফল হবার পর সবশেষে বসতে হল 'লিটারেসি টেসটের জন্য' আরমি রিক্রিয়েশন ক্লাবের রিডিং রুমে। এই পরীক্ষায় যারা কৃতকার্য হল তাদের বলা হল 'তোমরা তৈরি হয়ে নাও, তোমাদের রিক্রুট করা হল।' অর্থাৎ ওই রেড রোড ক্যামপ থেকেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন ট্রেনিং সেনটারে।

সেনাবাহিনীর ট্রেনিং বলতে সর্বাংগীণ একটা শিক্ষাকেই বোঝায়। যে বিষয় নিয়ে যে আগ্রহী তাকে সেই বিষয় নিয়েই ব্যস্ত রাখা হবে। টেকনিক্যাল বা নন টেকনিক্যাল সমস্ত পর্যায়েই যে ব্যাপারে অন্তত প্রয়োজন মেটাবার মত শিক্ষা দেওয়া হয় তা হল অস্ত্র শিক্ষা বা অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা। সেনাবাহিনীর ট্রেনিং এ নৈতিক দায়িত্ব গঠনের সংগে সংগে অন্যান্য সংগঠনমূলক কাজকর্মের প্রতিও সৈনিক-শিক্ষানবিশীদের উৎসাহী করে তোলা হয়। মোটের উপর সেনাবাহিনীর চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই আজ সারা ভারতবর্ষের

তরুণদের মধ্যে এই চাকরি সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর রেড রোড ক্যামপে অনুষ্ঠিত 'রিক্রুট-মেনট র‍্যালি'তে যে পরিমাণ উৎসাহী প্রার্থী এসেছে তা দেখলেই এই চাকরির জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা অনুধাবন করা যায়। ২১ মারচে উচ্চতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ ৪৪৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৪ জনকে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সন্তোষজনক (Medically fit) বলে নির্বাচিত করা হয়েছে। কিন্তু ক্যামপ থেকে কাউকে ট্রেনিং সেনটারে পাঠান হয়নি। ২২ মারচে ১১,৯১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৪ জনকে মেডিক্যালে ফিট বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৬৭ জনকে ট্রেনিং-এর জন্য রিক্রুট করা হয়েছে। ২৩ মারচ ক্যামপে প্রাথমিক ভাবে ২১,০০০ প্রার্থীকে নির্বাচিত করার পর ২২৪ জনকে মেডিক্যালি ফিট বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৪৬ জনকে ট্রেনিং সেনটারে পাঠান হয়। ২৪ তারিখে প্রার্থী হাজিরা প্রায় রেকরড পরিমাণে দাঁড়ায়। এদিন প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০,১০০ প্রার্থীর মধ্যে 'মেডিক্যালি ফিট' হয় ৫৬৩ জন, ও শেষ অবধি ট্রেনিং সেনটারের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয় মাত্র ২৫৭ জন। অতএব দেখা যাচ্ছে এই চারদিনের র‍্যালি বা সমাবেশে প্রায় ৭৭,৪৯৪ জন প্রার্থী হাজিরা দিয়েছে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে মাত্র ৪৭০ জন। অর্থাৎ প্রার্থী হাজিরার তুলনায় মাত্র .৪৫ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়েছে। তবে যেসব প্রার্থী সমাবেশ প্রাঙ্গণে ঢোকার অনুমতিই পায়নি কিংবা ডিসিশন মেকারদের বিচারে উচ্চতার পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেছে তাদের সংখ্যা গণ্য করলে তো এই ফারাক আরও অনেক কমে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন 'কলকাতায় যে সমাবেশ (Rally) হবে সেখান থেকে অন্তত শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বাঙালি ছেলেদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হবে।'

এখন কথা উঠতে পারে যোগ্যতার পরীক্ষায় বাঙালি ছেলেরা তো কৃতকার্যই হতে পারছে না। সেক্ষেত্রে ২১ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে যেসব ছেলেরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছে তাদের খানিকটা পরিচয় দেওয়া যাক।

ফোরট উইলিয়াম থেকে রেড রোড ক্যামপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়েছিল বরানগরের অসীম চ্যাটারজির সঙ্গে। ভোর পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দীর্ঘ চেহারার অসীম। মাথায় অন্তত পাঁচ ফুট আট কি নয় ইঞ্চি হবে। ও আমায় সরাসরি জানাল 'আমায় ভালভাবে পরীক্ষাই করল না। মাপকাঠির নিচে দাঁড়ানর পরই ডিসকোয়ালিফায়েড বলে ঠেলে দিল। অথচ আমার চেয়ে বেঁটে বেঁটে অনেক ছেলে ওখানে চানস পেয়েছে।' অসীমের দিকে তাকিয়ে দেখি মাথায় দীর্ঘ হলেও, স্বাস্থ্য তার খুব একটা পোক্ত নয়। কিন্তু সেরকম কোন পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে ওকে উচ্চতার পরীক্ষাতেই বাতিল করে দেওয়া হল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র 'ডিসিশন মেকাররাই' দিতে পারবেন। সারাদিন রোদের মধ্যে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত যোগ্যতার প্রশ্নে ছাঁটাই হয়ে গেছে রবীন অধিকারী। হুগলীর জাঙ্গীপাড়া থেকে ২১ তারিখ রাত্রে রওনা দিয়ে রেড রোড ক্যামপে হাজির হয়েছে রবীন। ১৩১ জনের পর লাইন দিয়ে সারা রাত্রির দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২২ তারিখ সকাল বেলায় গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতার পরীক্ষায় 'অ্যালাউ' হয়ে বুকের ছাতির মাপ দিয়েছে। কৃতকার্য হয়ে মেডিক্যাল টেসট দেবার জন্য বেলা বারটার গনগনে সূর্যকে মাথায় নিয়ে স্রেফ একটা জাঙিয়া পরে অপেক্ষা করতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকক্ষণ ধরে নানান পরীক্ষা করার পর ডাক্তার বলেছে 'তোমার কানে ময়লা আছে। ময়লা পরিষ্কার করে কালকে এসো'। কানের ময়লা তড়িঘড়ি পরিষ্কার করাতে গিয়ে কিছুই নোংরা পায়নি রবীন, কিন্তু আবার ২৩ তারিখ সকালবেলা হাজির হয়েছে রেড রোড ক্যামপে। কিন্তু ২৩ তারিখ সকালে এসে ও শুনল ওকে আবার উচ্চতা পরীক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হবে। গ্রামের ছেলে রবীনের মুখ দিয়ে ক্ষীণ প্রতিবাদ বেরিয়েছিল 'আমি তো কালকেই সব পরীক্ষা দিয়েছি, আজকে আবার কেন?' জবাবে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে সরে এসেছে রবীন। এবং আবার সেই অর্ধ উলঙ্গ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু এবার বুকের ছাতির মাপ নিতে গিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে সেনা বাহিনীর এক অফিসার। রবীন জেনেছে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী তার বুকের ছাতি 'কমতি আছে'। মাত্র একদিনের ব্যবধানে এভাবে 'কমতি' হয়ে যাওয়া বুকের ছাতি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে রবীনের দেখা হয়েছে। ওর গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়েছে 'অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল আরমিতে জয়েন করব, চানসও পেয়েছিলাম, কিন্তু ইচ্ছে করে আমাকে হটিয়ে দিল।'

রবীনের মত না হলেও একেবারে সব পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি রাজাবাজারের চঞ্চল শিকদার আর খিদিরপুরের মোহিত ব্যানারজির। 'লিটারেসি টেসট' দিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এসে চঞ্চল দেখে মা ওর জন্য অপেক্ষা করছে। চঞ্চলকে দেখেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছে ওর মা, 'যাসনি বাবা, তোর দরকার কি আছে মিলিটারি হবার। তোর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুই না গেলে আমি এখানে মাথা খুঁড়ে মরব।' অগত্যা চঞ্চলকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে। আর মোহিতও যখন জামা কাপড় পড়ে ট্রেনিং সেনটারে যাবার জন্য রেডি হয়ে আছে তখন ও শুনেছে ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কেননা, ওর বয়স ১৭ না পেরোনোর দরুন এখনও আইনের ভাষায় 'মাইনর', তাই ওর বাবা এসেছেন আইন প্রয়োগ করে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

প্রতিবেদনের গোড়াতে যে মন্টু আর আইজুরের কথা বলা হয়েছিল ওরা দুজনেই অকৃতকার্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। মন্টু এ বছর সুযোগ পেল না বুকের ছাতির মাপ কম হওয়ায়। তবে ও প্রতিজ্ঞা করেছে আগামী বছর ও আবার আসবে। ইতিমধ্যে নিজেকে রীতিমত প্রস্তুত করে নেবেই নেবে। আইজুরও হয়ত সামনে আর একবার সুযোগ পেলে ফিরে আসবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য। যদি সমাজের অভিভাবকদের 'মানুষ' করে রাখার চেয়ে 'বাঙালি' করে রাখার প্রবণতা বাঙালি ছেলেদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া থেকে বিরত না করে কিংবা যতদিন পর্যন্ত তথাকথিত 'ডিসিশন মেকারদের' একদেশদর্শিতা দূর না হয় ততদিন মন্টু, আইজুর, রবীন বা অসীমের মত তরুণদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থে এই সম্ভাবনাকে অপনয়ন করা একান্তই প্রয়োজন। তার জন্য সেনাবাহিনী সম্পর্কে জনগণের মনে স্পষ্ট ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলতে হবে। এবং 'বাঙালি'দের 'কমজোরী' মনে করে সেনাবাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা দূর করতে হবে। □

সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে হলে

প্রাক্তন ক্যাপটেন
সুশান্ত কুমার দে

সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতে ভর্তির জন্য সারা দেশে রয়েছে ৬১টি রিকরুটিং অফিস। এর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে রয়েছে তিনটি। সেগুলো হল কলকাতা, শিলিগুড়ি ও মুরশিদাবাদে। আরমিতে একজন সাধারণ জওয়ান হিসাবে ঢুকে অফিসার হবার যোগ্য হতে পারে এবং এর জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা, আরমি ক্যাডেট কলেজ। স্থল বাহিনী বা আরমিতে জওয়ান হিসাবে দুই ভাবে ভর্তি হওয়া যায়, প্রথমটি হল নরমাল এনট্রি ক্যাটাগরি। এখান থেকে ইনফ্যানট্রি বা পদাতিক, আরটিলারি, বা গোলন্দাজ বাহিনী, আরমার্ড কোর বা সাঁজোয়া বাহিনীতে ঢোকা যায়। ফৌজে কী না দরকার। তাই এখানে আছে রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী, ধোপার কাজ করার লোক – এ এক বিরাট পরিবার। এ সমস্ত শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অন্ততপক্ষে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করা চাই, বয়স ১৭ থেকে ২০ র মধ্যে। অন্যটি হল ম্যাটরিক এনট্রি ক্যাটাগরি। এর মাধ্যমে একজন টেকনিক্যাল ট্রেডস যেমন কোর অব সিগন্যালের রেডিও অপরেটার, মেল নারসিং অ্যাসিস টেনট হওয়া যায়, এ ছাড়া যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে এবং গ্রাজুয়েট হয়ে ভর্তি হতে চান তারা আরমি এডুকেশন কোরের হাবিলদার পদে যোগ দিতে পারেন।

এতো গেল শিক্ষাগত যোগ্যতা। এবার দেখা যাক দৈহিক মাপকাঠি। এটা অবশ্য বিভিন্ন এথনিক্যাল গোষ্ঠী ভিত্তিক। বাঙালিদের জন্য কমপক্ষে উচ্চতা ১৬৬ সেনটিমিটার, বুকের মাপ ৭৮ সেনটিমিটার এবং ওজন কম করে ৫১ কিলোগ্রাম হওয়া চাই। আরটিলারির বড় বড় কামানগুলো যে সমস্ত ট্রাকটর নিয়ে যায় তার ড্রাইভার ও গানারদের উচ্চতা কম করে ১৭৩ সেনটিমিটার, বুকের মাপ ৮০ সেনটিমিটার এবং ওজন ৫৪ কিলোগ্রাম হওয়া চাই! অনেকটা যে ধরনের কাজ করতে হবে সেই অনুযায়ী দেহের মাপ ঠিক করা হয়েছে!

পুরনো দিনের সেনাবাহিনীর সংগে আজকের সেনাবাহিনীর বিরাট ফারাক। আজ তারা কেবলমাত্র দেশরক্ষার কাজে পাহাড়ে পর্বতে, মরুভূমিতে বা বনে জংগলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেশ রক্ষার কাজের সংগে তারা এগিয়ে এসেছে দেশ গড়ার কাজে। অন্যান্য যে সমস্ত দায়িত্বে তারা এগিয়ে আসে সেগুলো মোটামুটি তিন ধরনের, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রয়োজনে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সাহায্য করা। সে যেখানেই হোক না কেন, যেমন ধরনের কাজ হোক না কেন, রাজস্থানের খরার মোকাবিলায়, বিহারের বন্যা বা অন্ধ্র প্রদেশের সামুদ্রিক তুফানে।

হিংসাত্মক দাংগা হাংগামার সময় সেনাবাহিনীর ভূমিকা খুবই জটিল। ওই সময়ে আইন শৃংখলা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হলে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করাই হল এদের কাজ।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধেও এদেরকে রুখে দাঁড়াতে হয়, অবস্থার মোকাবিলার জন্য বলা যেতে পারে এদের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। একটি ইনফ্যানট্রি রেজিমেনটের ফৌজিদের সাধারণভাবে সারাদিন কী কী করতে হয় তার একটা ছবি তুলে ধরা যাক।

খুব ভোরে সবাইকে উঠে পড়তে হয়, সে রাজস্থানের মরুভূমিতে বা উত্তর পূর্বাঞ্চলে ঘন জংগল এলাকায় যেখানেই থাকুক না কেন। সকালে তাকে পিটি বা ফিজিক্যাল ট্রেনিং এ হাজির হতে হবে। তারপর ব্রেক ফাসট সেরে হাজির হতে হয় পরের ট্রেনিং ক্লাসে। ড্রিল, হাতিয়ার সম্পর্কে ক্লাস বা যে যার ট্রেডের উপর ট্রেনিং হচ্ছে। ড্রাইভার তার গাড়ির ব্যাপারে রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে জানছে। অন্যদিকে হয়ত সিগন্যালম্যান কী করে ওয়ারলেস মারফৎ খবর পাঠাতে হয় শিখছে। সর্বত্র কিছু শেখা বা জানার অদম্য প্রচেষ্টা, এর যেন শেষ নেই। তাই অনেকেরই ভুল ভেঙে যায়, যারা ভাবে ফৌজে ঢুকলে আর পড়াশোনা করতে হবে না এটা খুব অল্পদিনে কত ভুল সেটা বোঝা যায়। দুপুরের খাবারের জন্য সবাই লংগরে হাজির হয়। সেখানে হয় সবার সংগে গল্পগুজব। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর থাকে এডুকেশন ক্লাস। এগুলো সাধারণত আরমির মাস্টার জীরা করেন। আরমি এডুকেশন কোর থেকে আসেন ওঁরা। এই সমস্ত ক্লাসে থাকে ম্যাপ রিডিং, সাধারণ জ্ঞান, হিন্দি, ইংরাজি প্রভৃতি বিষয়।

বিকালে থাকে খেলাধুলো, প্রায় সব খেলাই হয় ও বিভিন্ন মাঠে একই সময় হয়ে থাকে। কেউ হয়ত হকি স্টিক নিয়ে দৌড়চ্ছে, অন্যদিকে হচ্ছে ফুটবল খেলা। রাতটা সাধারণত থাকে বিশ্রামের জন্য। আজকের দিনে রাত্রেই বেশি যুদ্ধ হয়ে থাকে, তাই থাকে মাঝে মাঝে রাত্রের ট্রেনিং। এ ছাড়া রয়েছে পালা করে গারডের ডিউটি। ফৌজে ট্রেনিং সবার জন্য - সে বান্নার কুক, অফিসের বাবু বা একজন রাইফেল-ম্যান যেই-ই হোক। প্রত্যেককে তার ডিউটি সম্পর্কে পুরোপুরি দক্ষ হতে হবে, তা সে যে কোন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, সব কিছুর মোকা-বিলা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে তাই এই ট্রেনিং। তাই বলা হয়ে থাকে শান্তির সময়ে ঘাম ঝরালে যুদ্ধের সময় কম রক্ত ঝরবে। কঠিন ট্রেনিং বা যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য চাই সুস্থ সবল শরীর ও মন। এ ব্যাপারে তাদের সচেতন করে তোলা

বাধা বিপত্তি ফেলে এগিয়ে যেতে হবে, তাই ট্রেনিং

হয়, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া রয়েছে তাদের ও পরিবারের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

সৈনিক যদি সুখী হয় তা হলে সে কর্মক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রমী ও তার কাজে আরও আগ্রহী হবে। এই ধরনের পেশায় বিভিন্ন কারণে তাকে অনেক সময় তার পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়, তাই পরিবারের সুখ সুবিধে বিশেষ গুরুত্বের সংগে দেখা হয়। সেনা বাহিনীতে বিভিন্ন রকমের কল্যাণ মূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়। এর জন্য প্রতেক ইউনিটের সেকেনড ইন কমানডের উপর এই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুঃসাহসিকতা এবং খেলাধূলোয় উন্নতি করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে আরমিতে, অনেক বেশি প্রসারের জন্য রয়েছে আরমি অ্যাডভেনচার ফাউনডেশন ও আরমি স্পোরটস কনট্রোল বোরড।

সুবিশাল এই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভাবতে যে সামরিক বাহিনীর ভরণপোষণ করতে হয় তার থেকে প্রায় ৫৫ হাজার সৈনিক প্রত্যেক বছর অবসর গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ৯০০ জন অফিসার, সাধারণ সৈনিকদের ক্ষেত্রে এ সময় তাদের বয়স ৩৩ থেকে ৪১ বছরের মধ্যে। এই সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকেরা কেবলমাত্র তাদের নিজের নিজের ট্রেডের শিক্ষা পায়নি, তাদের পুনর্বাসনের কথা মনে রেখে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে তারা অবসর নেওয়ার পর তাদের পুনর্বাসনের কোন অসুবিধা না হয়।

জুনিয়র কমিশনড অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মভিত্তিক, টেকনিক্যাল ও নন টেকনিক্যাল, ব্যাংকিং পরীক্ষার উপর শিক্ষা দেওয়া হয় থাকে।

পশ্চিমবংগ সরকারের অধীনে যে সমস্ত পদ রয়েছে তার প্রথম শ্রেণী পদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণী পদের মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণী পদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ ও চতুর্থ শ্রেণী পদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ পদ প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও পাবলিক সেক্টরেও এই ধরনের পদ সংরক্ষিত আছে। এই পদগুলির জন্য কর্মপ্রার্থীর তালিকা রাজ্য সরকারের অধীনে রাজ্য ও জেলা সৈনিক বোরড দিয়ে থাকে।

যেৌজে যে সমস্ত অফিসার ও জওয়ান সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে তাদের বিভিন্ন ধরনের সম্মান দেওয়া হয়। সেই সমস্ত কৃতি সৈনিকদের পশ্চিমবংগের অধিবাসী হলে রাজ্য সরকার সাহসিকতার জন্য যে অনুদান দিয়ে থাকেন তা হল : পরমবীর চক্র এককালীন অর্থের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা বা বার্ষিক অর্থের পরিমাণ ৬০০ টাকা, মহাবীর চক্র ৫,০০০ টাকা বা ৩০০ টাকা, বীর চক্র ২,৫০০ টাকা বা ১০০ টাকা, অশোকচক্র ৮,০০০ টাকা, কৃতিচক্র ৪,০০০ টাকা, সৌর্যচক্র ২ ০০০ টাকা। পশ্চিমবংগের অধিবাসী যে সমস্ত সৈনিক যুদ্ধে প্রাণ হারান বা আহত হয়ে থাকেন রাজ্য সরকার থেকে যে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে তা হল নিহত হলে : অফিসার ৫০০০ টাকা জুনিয়ার কমিশনড অফিসার ৩০০০ টাকা, সাধারণ সৈনিক ২০০০ টাকা। আহত হলে : (শতকরা ৫০ ভাগ পঙ্গু বা তার উপর) অফিসার ৫,০০০ টাকা, জুনিয়ার কমিশনড অফিসার ৩,০০০ টাকা, সাধারণ সৈনিক ২,০০০ টাকা। এ ছাড়া সেই সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার (১) বিনামূল্যে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ কোন সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিয়ে থাকেন। (২) হসটেলের খরচা, ও (৩) বইপত্র ও পোশাকের জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন।

সেনা বাহিনীতে বেতন কাঠামো মোটামুটি পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ট্রেড এই সমস্ত গ্রুপের মধ্যে রয়েছে এবং এই গ্রুপের মধ্যে রয়েছে র‍্যাংক ব্যবস্থা, সুবেদার মেজর, সুবেদার, নায়েব সুবেদার, হাবিলদার, নায়েক এবং সিপাই।

একজন সিপাই যখন ভর্তি হন, তখন তিনি কম করে ৪০০ টাকা মাসিক বেতন পান। এ ছাড়া রয়েছে ফ্রি ফুড, পোশাক, থাকার ব্যবস্থা। জওয়ানদের জন্য গ্রুপ ইনসিওরেনস ৫০,০০০ টাকা, রয়েছে আরমি ওয়েলফেয়ার হাউসিং, বছরে একবার ট্রেনে ফ্রি যাতায়াতের ব্যবস্থা। অন্যবার দরকার হলে ৫০ ভাগ ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। ছুটি বছরে ৬০ দিন ক্যাজুয়াল ৩০ দিন। প্রত্যেক জওয়ান প্রত্যেক বছরে ছুটি পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কড়া নিয়ম রয়েছে। সবদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই পেশা তরুণদের বেশ আকর্ষণ করে সেটা বোঝা যায় রিকরুটমেনট র‍্যালি বা যে কোন রিকরুটিং অফিসে। ☐

আলোকচিত্র :
মেজর এস সি সাহা

আদবানি এবং নামবুদিরিপাদ দুজনেই মনে করেন মধ্যবর্তী নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী

দিল্লিতে কয়েকটি বিরোধী দলের সংগে কথা বলে এই ইংগিত পেলাম যে, প্রায় সকলেই অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে বলেই মনে করেন। তার মধ্যে বি জে পি এবং সি পি এম নিশ্চিত যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবেই। সি পি আই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে এই ধারণা নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভা ডেকেছে গত ১৬ জুলাই থেকে।

ব্যতিক্রম শুধু দুজন। এক, চন্দ্রশেখর। দুই, শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং। শ্রীমতী গান্ধী গত দু তিন মাস যাবৎ বিভিন্ন সভা সমিতিতে বলে আসছেন, দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা নেই।

ওদিকে জনতা পারটির সভাপতি চন্দ্রশেখরও তাঁর ভারতযাত্রা শেষে ঘোষণা করেছেন, দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে না। চন্দ্রশেখরের মতে, শ্রীমতী গান্ধী অন্তর্বর্তী নির্বাচন করে কোনও লাভ করতে পারবেন না। তিনি মনে করেন সারা দেশ-ব্যাপী অন্তর্বর্তী নির্বাচনের নামে যে প্রচার চলছে তা আসলে গুজব। আর এই গুজবের পেছনে নাকি স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীই আছেন। সি পি এম এবং বি জে পি দুই অন্যতম প্রধান বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ই এম এস নামবুদিরিপাদ ও লালকৃষ্ণ আদবানির সাক্ষাৎকার নিয়েছি। অবশ্য অন্তর্বর্তী নির্বাচন ছাড়াও সি পি এমের সাধারণ সম্পাদকের কাছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও কিছু প্রশ্ন করেছি। দুটিই পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম :

ছবি : ...

লালকৃষ্ণ আদবানি

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে? যদি সম্ভাবনা থাকে তবে তার পেছনে কারণ কী?

আদবানি : ১৯৮২ সালে শাসক দল পরিকল্পনা করেছিল যে, ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা করবে। শাসক দল ভেবেছিল এই সময় নির্বাচন হলে তারা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। কিন্তু এই বছরের প্রথম দিকে অন্ধ্র এবং করনাটক নির্বাচনের ফল তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়েছে। এই কারণে ১৯৮২ সালের পরিকল্পনা কার্যকর না করলেও আমি এবং আমাদের দল বি জে পি মনে করি, শ্রীমতী গান্ধী ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। তিনি ১৯৮৪-র প্রথমেই কোন এক সময় মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাক দেবেন।

১৯৮৪ সালের প্রথম দিকেই শ্রীমতী গান্ধী মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘোষণা করবেন। কারণ প্রথমত, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যেভাবে অবনতি ঘটছে এবং সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে শ্রীমতী গান্ধীর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, যে জন্য তিনি এবং তাঁর দল মনে করছেন যে ১৯৮৫ সালের চেয়ে ১৯৮৪-ই নির্বাচনে জেতার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। দ্বিতীয়ত, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পুত্র রাজীবকে প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখে যাওয়ার জন্য দারুণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তৃতীয়ত, অন্তর্বর্তী নির্বাচন করলে শাসক দলের অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। কেননা আইনানুসারে মাত্র তেত্রিশ দিনের নোটিশ দিলেই চলে। নির্বাচন ক্রমশই অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের তুলনায় শাসক দলের সুযোগ অনেক বেশি। শ্রীমতী গান্ধী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন।

পরিবর্তন : অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য আপনারা কি প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

আদবানি : হাঁ, আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। আমরা আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন লোকসভা আসন ধরে ধরে আমরা এখন আমাদের সাংগঠনিক শক্তির মূল্যায়নে ব্যস্ত। দিল্লিসহ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনের ফলকে সামনে রেখে আমরা আত্মসমালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করছি।

পরিবর্তন : বি জে পি কি কোন বিরোধী ফ্রন্টে যোগ দেবে?

আদবানি : হাঁ। আমাদের দল একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পক্ষে প্রস্তাব নিয়েছে। বি জে পি এমন একটি বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের পক্ষে, যে ফ্রন্টে জাতির একতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলি থাকবে। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, সি পি আই (এম), সি পি আই এবং মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক দল নিয়ে যদি বিরোধী ফ্রন্ট গঠিত হয় তবে বি জে পি তাতে যোগ দেবে।

পরিবর্তন : আপনারা কি এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগ নিয়েছেন?

আদবানি : হাঁ। লোকদল, জনতার মত দলগুলি থেকে আমরা এই ফ্রন্ট গঠনের যেমন প্রস্তাব পেয়েছি, তেমনি আমরাও বিভিন্ন দলের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। এই নিয়ে জনতা, লোকদল, কংগ্রেস (জ) ইত্যাদি দলগুলির সংগে কথা হয়েছে। এইরূপ একটি ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে আমি যেমন গুরুত্ব দিই, তেমনি আমি আশাবাদী যে, এমন একটি ফ্রন্ট গঠিত হবে।

ফ্রন্ট গঠনের পক্ষে আমরা সমস্ত রকম দরজাই খোলা রেখেছি। ফ্রন্ট গঠিত হলে আমরা তাতে যোগ দেব। না হলে, আমরা একাই নির্বাচন লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

পরিবর্তন : পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? মধ্যবর্তী নির্বাচন যদি হয় তবে তাতে পাঞ্জাব পরিস্থিতির কীরূপ প্রভাব পড়বে?

আদবানি : আমি মনে করি পাঞ্জাবের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেস দল এবং তার সরকার দায়ী। ঠিক সমপরিমাণ দায়ী অকালি দল।

পাঞ্জাব সমস্যার শীঘ্র সমাধান হবে বলে আমার মনে হয় না। অকালিদের মনোভাবের যদি পরিবর্তন হয় এবং তাঁরা হিংসার পথ ছাড়েন এবং সংগে সংগে অকালিদের এবং পাঞ্জাবের মূল সমস্যার প্রতি সরকারেরও মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবেই সমাধান সম্ভব।

সরকার কিন্তু এই সমস্যা জিইয়ে রাখতেই আগ্রহী। কারণ সমস্যা জিইয়ে রেখে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তারা নির্বাচন ঘোষণা করবে। অর্থাৎ নির্বাচনী মুনাফা অর্জনের জন্য সরকার জাতীয় স্বার্থের কথাও চিন্তা করছে না। সরকারের এই মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

ই এম এস নামবুদিরিপাদ

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে? আপনারা কি প্রস্তুত হচ্ছেন?

নামবুদিরিপাদ : দেশের যে কোন যুক্তিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিরই অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে বলে মনে করা উচিত। কেননা শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে বিরোধী দলগুলিকে আকস্মিক মোকাবিলায় ফেলতে চান।

আপনাদের প্রশ্নে 'প্রস্তুত হচ্ছেন' কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কংগ্রেস এবং কিছু কিছু বিরোধী দল নির্বাচনের জন্য যেমন বিরাট অংকের অর্থ সংগ্রহ করে বা অনুরূপ অন্যান্য প্রস্তুতি নেয়, আমাদের দল সেই ধরনের প্রস্তুতির কথা চিন্তাই করতে পারে না। আমাদের কাছে নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচনী সংগঠন সাধারণ সময়ের রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রচারেরই অংগ।

পরিবর্তন : আগামী নির্বাচনে বা পাঁচ–দশ বছরের মধ্যে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) পারটি মিলিত হবার সম্ভাবনা আছে কি? প্রতিবন্ধকই বা কী? আপনার সহযোগী হরকিষণ সিং সুরজিত সি পি আই-র বিরুদ্ধে শ্রেণী-সহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন। আপনারও কি সেই মত?

নামবুদিরিপাদ : দুই পারটির মিলিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই যদি না দূর হয় সেই সব মূল মতানৈক্য যা একদা পারটিকে বিভক্ত করেছিল ১৯৬৪ সালে।

আপনারা হয়ত লক্ষ করেছেন, দুই পারটির দুই মুখপত্রে (সি পি আই র 'নিউএজ', সি পি আই (এম) এর পিপলস ডেমোক্রেসি) তে সম্প্রতি যেসব মত বিনিময় চলছে, তা সংশ্লিষ্ট লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত নয়। সেগুলো দুই পারটিরই যৌথ অভিমত। যে বিরাট আদর্শগত বৈষম্য দুই পারটির মধ্যে ছিল তা বহুল পরিমাণে রয়ে গেছে। যদিও এই বৈষম্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যৌথ আন্দোলনের প্রতিবন্ধক নয়। তবু দুই পারটির মিলিত হবার বা মিশে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

পরিবর্তন : অন্তর্বর্তী নির্বাচন হোক বা না হোক। আগামী সংসদীয় নির্বাচনে সি পি আই (এম) কি এমন একটি সর্বভারতীয় বিরোধী ফ্রন্টে সামিল হবে, যেখানে থাকবে বাম দল এবং অকংগ্রেস (ই) ও অন্যান্য দল? নাকি শুধুমাত্র বামদলগুলিকে নিয়ে সি পি আই (এম) কোন সারা ভারত বামফ্রন্ট করতে ইচ্ছুক?

নামবুদিরিপাদ : সব বিরোধী দলকে নিয়ে একটা সারা ভারত বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করাকে আমাদের পারটি কার্যকরী বা কাম্য মনে করে না। কারণ নানা বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিস্তর ফারাক। আবার একটা নির্বাচন কেন্দ্রে অনেকগুলি বিরোধী দল দাঁড়িয়ে কংগ্রেস (ই) কে যে সুযোগ করে দেয় সেটাও কাম্য নয়। তবে এই কাজ করাটাও সহজ নয়।

পরিবর্তন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে যেসব খুনখারাপি হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

নামবুদিরিপাদ : পারটিগতভাবে যারা শিকার হয়েছেন তার বিচার করলে এটাই প্রমাণ হয়, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী খুনখারাপি সংগঠিত করেছে কংগ্রেস (ই) দল ও তার সমর্থকরা। আগুনে ঘি ঢেলেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণি খান চৌধুরীর মত কিছু কংগ্রেস (ই) নেতার উত্তেজক বক্তৃতা।

পরিবর্তন : পাঞ্জাবের বর্তমান রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

নামবুদিরিপাদ : পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহহীনতা। বিরোধী দল, অকালি এবং সরকারকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যে মোটামুটি সহমত গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার তা কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হল তার পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীরা। সর্বসম্মতিক্রমে এর নিন্দা করেছেন অকালি দল সহ সকল বিরোধী দল। উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য এবং ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে নেওয়া সহমতকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধীদের সহায়তা নিতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করলেন।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল, একদিকে বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যগুলো এবং অন্য কয়েকটি রাজ্য দাবি করছে আরো অর্থনৈতিক ক্ষমতার ও স্বায়ত্ত শাসনাধিকার। কিন্তু রাজ্যগুলো নিজেরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আরও অর্থ কেন সংগ্রহ করে না: যেমন কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য থেকে অনেক চাষী আরও বিত্তশালী হয়ে উঠছেন। বস্তুত তাঁদের ওপর কোন কর নেই। কেন্দ্রই যদি রাজ্যকে অধিকাংশ অর্থ জোগাবে তবে তো কেন্দ্রের কাছেই ঢাকের কাঠি।

ই এম এস মনে করেন না যে, সর্বতোভাবে কৃষিক্ষেত্র বিত্তশালী হচ্ছে। তিনি বলেন ওদের মধ্যে কোন কোন জোতদার বিত্তশালী হচ্ছে। কিন্তু তারা মনোপলি ক্যাপিট্যালিসটদের ধারেকাছেও আসতে পারে না।

ই এম এস নামবুদিরিপাদ মনে করেন মনোপলি ক্যাপিট্যালিসট এবং জোতদারদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি ও মনোভাব তা পরিবর্তন করা উচিত।

তিনি বলেন, 'যে যে রাজ্যে আমরা সরকার গঠন করেছি, সেইসব রাজ্যে বাম আন্দোলনের সপক্ষে আমরা সরকারি নীতি বদলিয়ে কিছু কিছু করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বাধা দিচ্ছে। ১৯৫৭–১৯৫৯-এ কেরলে এবং ৭০ দশকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা কী করতে পেরেছিলাম সে কথা ছেড়ে দিলাম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধানসভার অনুমোদনক্রমে ভূমিসংস্কারসহ অনেকগুলো আইনের বিল কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্যে। কয়েক বছর ধরে সেই আইনের বিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফাইল বন্দী হয়েই পড়ে আছে।'

কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের পর আমি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ই এম এস এর কাছে তুলেছিলাম। প্রশ্নটা হল, 'সম্প্রতি আপনি সি পি আই (এম) দলের পক্ষ থেকে চীনে গিয়েছিলেন। আপনার কি মনে হয় মসকো এবং বেজিং এর মধ্যে সমঝোতা উজ্জ্বল? এই দুই শক্তিকে কাছাকাছি আনতে সি পি আই (এম) কি কোন সহায়তায় আসতে পারে?' ই এম এস এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: 'আমরা চীনে যাবার আগেই স্বতন্ত্রভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছিল। নানা সংবাদপত্র তাই বলেছে। আমরা আশা করি তাদের চেষ্টা সফল হবে। আমাদের পারটি কিংবা অন্য কোন পারটি এই দুই শক্তির সমঝোতায় কোনও সহায়তা করতে পারবে কিনা সে প্রশ্ন ওঠে না।'

উনি নিজেই বললেন: 'জ্যোতি বসু মসকো গিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিসট পারটির আমন্ত্রণে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য। যা তাঁর স্বাস্থ্যের সাম্প্রতিক অবনতির জন্য প্রয়োজন। □

সাক্ষাৎকার :
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : অশোক বসু

অনুসন্ধান

গুয়াতে বেকার যুবককে পুলিশ প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারল

মহাশ্বেতা দেবী

জামশেদপুর থেকে আন্দাজ ১৫০ কি মি দূরে পাহাড় ও জংগলের দেয়ালে আড়াল করা ছোট্ট শহর গুয়াতে ১ জুন যে নারকীয় কান্ড ঘটে, তার কিছু খবর এ রাজ্যের কাগজপত্রে বেরিয়েছে, তবে সব ঘটনাটি কোন কাগজই প্রকাশ করেনি। বর্তমান লেখাটি সম্ভবত প্রথম আনুপূর্বিক বিবরণী। যাঁরা নিজেদের বিপন্ন করে খবরগুলি জোগাড় করেছেন, ছবি তুলেছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাঁদের নামধাম প্রকাশ করা গেল না।

১৯৮০ সালের ৮ সেপটেমবর গুয়াতে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে ৫ জন বিহার মিলিটারি পুলিশ ও ১৩ জন আদিবাসী যখন নিহত হন, তখন তা দেশের প্রায় সব বড় কাগজে 'খবর' হয়েছিল।

১৯৮৩ সালের ১ জুন গুয়াতে কোন সংঘর্ষ হয়নি, যা হয়েছে তা 'বর্বরোচিত হত্যা।'

গুয়া ইসকো নগরী। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় যুবকরা ইসকোর কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থা ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। বদলি বা ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসেবে মাসে কয়েকদিন করে বছরের পর বছর যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের টপকে অনেক সময়েই বিহারে ও সর্বত্র প্রচলিত 'চাচা ভাতিজা' প্রথায় অন্যদের বাঁধা চাকরিতে নেয়া হচ্ছে। নতুন পদে শ্রমিক নিয়োগকালেও স্থানীয় যুবকরা বিবেচনা পান না। ১৯৮০-র সেপটেমবরের পর যুব কংগ্রেস (ই) সংগঠনের স্থানীয় শাখাও শ্রী রিজভি বা ছব্বনের নেতৃত্বে স্থানীয় দাবিগুলিকে সমর্থন করছিলেন। এ অঞ্চলে আদিবাসীদের দাবিদাওয়া সমর্থক। আন্দোলনকারী দলগুলির সংগে এ সংস্থা এক নতুন সংযোজন।

স্থানীয় যুবকরা চাকরির দাবিতে ১৯৮২ সালে ইসকো কর্তৃপক্ষকে এক মেমোর‍্যানডাম দেন। বলা হয় যে ১৯৮৩ র মে মাসের মধ্যে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কর্তৃপক্ষের তরফে।

২৩-২৯ মে ইসকোর রৌপ্য-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুবকরা পূর্ব দাবির ভিত্তিতে ম্যানেজিং ডিরেকটরকে আর সংগমেশ্বরমের সংগে দেখা করতে চান। চাকরির ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা ভয় পেয়ে যান ও সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটি ভেস্তে দিতে সক্ষম হন।

আশা ভংগে ক্রুদ্ধ যুবকেরা ৩০-৫-৮৩ তারিখে ইসকো অফিস আক্রমণ করেন। তারপর সিনিয়র অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার এম কে পি আখৌরি, পারসোনেল ম্যানেজার জে এম মিনজ, ডেপুটি পারসোনেল ম্যানেজার এস কে মহান্তি, এই তিনজনকে মারধোর করেন। কোমপানির তরফে মহান্তি গুয়া থানায় রিপোর্ট করেন। গুয়া পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে থাকে। কিন্তু অঞ্চলে চাপা উত্তেজনা গুমরোয়।

কিরিবুরুর ডি এস পি দীপক ভার্মা জানতে পারেন যে তাঁর আত্মীয় আখৌরি স্থানীয় যুবকদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। গুয়াতে তখনই পুলিশ পেট্রলিং শুরু হয়েছে। দীপক ভার্মা গুয়াতে এসে পৌঁছে যান।

৩১ মে গুয়া বাজার থেকে গুয়া পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে। বিডার নাগ (পিতা নন্দু নাগ), জিতুরাম লোহার (পিতা ভোলা লোহার), জুলিয়ান জোয়াকিম ভেংরা (পিতা ইসাক ভেংরা), শ্যাম তাঁতি (পিতা চরণ তাঁতি) এবং কিশোর পান্ডে (পিতা ইউ. পান্ডে) গ্রেপ্তার হন।

এখানে বলা দরকার ৩০ মে মহান্তি যে রিপোর্ট করেন তাতে বলেছেন, আক্রমণকারীদের মধ্যে তিনি চিনতে পেরেছেন জবজ গুইরা, মগেশ, মহেশ দাশ, আরমাজির তির্কি, চন্দ্রা মৌলি, বিডার নাগ ও মাচুয়া তাঁতিকে।

৩১ মে বিডার নাগ ইসকোর অস্থায়ী কর্মী কারখানা থেকে ফিরছিলেন। বিডার নাগ বিহার রেজিমেনটের প্রাক্তন জওয়ান। তাঁর দুই স্ত্রী শান্তি (বুধনি) ও লাড়ুমণি। শান্তির মা গুয়া হাসপাতালে রাঁধুনির কাজ করেন। বিডার বাংলাদেশ যুদ্ধে গুলিতে জখম হয়েছিলেন।

১-৬-৮৩তে বিকালে গুয়া থানা থেকে গুয়া বাজারে একটি জিপ ছুটে আসে। পুলিশ ড্রাইভার সেলিম চালক। পাশে স্বয়ং দীপক ভার্মা। জিপের পেছনে পাঁচ বন্দী যুবক দড়িতে বাঁধা। গুয়ার পাথুরে রাস্তায় আছড়িয়ে ও হেঁচড়ে এঁদের আনা হয়। বাজারে ঢুকেই ভার্মা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'গুয়া ওয়ালোঁ! আপনে আঁখোঁ সে দেখ লো অফসারোঁ কো পিটনে কা নতিজা।'

বন্দীদের হাত পা বেঁধে শুওরের মত আড়বাঁশে টাঙান হয়। তারপর পুলিশ বাহিনী উন্মত্তের মত গালাগালি দিতে থাকে ও অমানুষিকভাবে মারতে থাকে ওদের। বারটি বেটন ভেঙে যায়। ভার্মা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বেটন ভেঙে যেতে তিনি একটি বাঁশের লাঠি তুলে নেন। সমবেত জনতা আতংক নিশ্চল নিশ্চুপ। বিডারের প্রথমা স্ত্রী শান্তি ও তার শিশুকন্যা শুধু আর্ত কান্না ও মিনতিতে চেঁচাতে থাকে।

তারপর থানা। তারপর গুয়া হাসপাতাল। শান্তির মা মুনি দেবী বলেন যে (ক) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিডারকে ভর্তি করতে চান না, কেন না সে তখন মারা যাচ্ছে। (খ) হাসপাতালে মরণোন্মুখ বিডার জল চাইলে তাকে আবার পিটোন হয় ও কান লক্ষ্য করে জল ছোড়া হয়। থানাতে বিডার রাত ১০টা নাগাদ (কেউ বলেন সাড়ে আটটায়) প্রাণ ত্যাগ করে।

২-৬-৮৩ তারিখে B.R.S. 3779 মিনিবাসে নি[illegible]

নব রামায়ন

জখম চারজনকে চাইবাসা নিয়ে যাওয়া হয়। বাস চালান খাসিয়া সোনাব। বাসটি ইসকো কোমপানির। চাইবাসা হাসপাতালের জমাদার বৈকুণ্ঠ কারোয়া ও রেংগো কারোয়ার মতে বিডারের দেহে অসংখ্য জখম ছিল। ময়নাকারী ডাঃ কে এল শাহ্ বেলা ১১টা ৩০ এ ময়না করেন ও রিপোরটে (ক) বিডারের দেহে লাঠির আঘাত উল্লেখ করেন না, (খ) মৃত্যুর কারণটি 'অ্যানাফাইলেকটিক শক' শব্দে এড়িয়ে যান, (গ) মৃত্যুর সময় আন্দাজ '২৪ ঘণ্টা আগে' বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ যদিও গুয়ার বাজারে অনেক লোক জানে যে বিডার মারা গেছে ১-৬-৮৩ রাতে, কিন্তু তাঁর মতে ১-৬-৮৩ সকাল এগারটা নাগাদ সে মারা গেছে।

এরপর লাশ পুলিশ হেফাজতে যায়। প্রথমা স্ত্রী শান্তি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাকে না এনে দ্বিতীয়া স্ত্রী লাড়ুমণিকে গুয়া থেকে আনা হয়। পুলিশ তার কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দিয়ে তার কাছে পাঁচটি কাগজে টিপছাপ নেয়। নিরক্ষর স্ত্রীলোকটি টিপছাপ কিসে দিল তা জানতে পারে না। তারপর তাকে দশ টাকা দিতে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বিডারের মৃতদেহটি দেখে সে জ্ঞান হারায়। অচৈতন্য অবস্থাতে তাকে গুয়াতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং হুঁশ ফিরলে সে দেখে যে আঁচলে দশ টাকা বাঁধা। এর পর শান্তি ও লাড়ুমণি গুয়া থানাতে সহস্র মাথা কুটেও বিডারের লাশের খোঁজ পায়নি। পরে জানা গেছে যে পুলিশ লাশটি জ্বালিয়ে দেয়। অবশ্য এটাও জানা যাচ্ছে যে লাড়ুমণির টিপছাপ দেওয়া কাগজটির (সাদা) দৌলতে পুলিশ প্রমাণ করবে যে লাড়ুমণিই লাশের জিম্মাদারি নিয়েছিল।

চাইবাসা থানাতে এ বিষয়ে খবর সংগ্রাহককে বিডারের সংগী চারজনই বলেন, তাঁরা নির্দোষ। আখোরিকে নির্যাতনের জন্য তাঁদের ফাঁসান হয়েছে। বিডার পাকা চাকরির জন্য জোর করছিলেন। অন্যদের উপর তার খানিকটা প্রভাব ছিল, সে জন্যই তাঁর নাম এফ আই আর-এ দেয়া হয়। বিডার দোষী হলে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে চলে বেড়াতেন না।

এস পি রণধীর ভার্মার মতে গুয়া এখন 'শান্ত'। সত্যিই কি তাই? স্থানীয় তরুণরা পুলিশের ভয়ে জংগলে পালিয়ে গেছে। প্রশাসন ও জাতীয় কাগজগুলি অফিসারদের পিটোনর ব্যাপারটিকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। ইসকোর অফিসাররা আবার চাকরির দাবিতে কী হয় ভেবে শঙ্কিত।

প্রবীণ ইউনিয়ন নেতা আর সি পালিওয়াল, যুবক নেতা ছম্বন, এঁরা বিডারের হত্যার প্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ গুয়াবাসীদের সমস্যার প্রতিকার এবং অপরাধী দীপক ভার্মা ও তাঁর সহকারী পুলিশদের শাস্তি চাই ছেন। অরণ্যমন্ত্রী মুচিরাই মুণ্ডা ১২ জুন ৬ তারিখে গুয়া গিয়েছিলেন। ১৯৮০-র হত্যাকান্ডের পর তৎকালীন এক রাজ্যমন্ত্রী ও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুয়াতে ঢুকতে অনুমতি পাননি বলে শুনেছি। বিধানসভায় সি পি আই সদস্য তুলসী রজক ও প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পূর্ণেন্দু মজুমদার এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। □

ব্যংগচিত্র ঃ লাহিড়ী

একান্ত সংবাদ

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় আগুন ও শরট সারকিট

শ্যামল সান্যাল

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় বারবার আগুন লাগার কারণ কী? শিয়ালদা স্টেশনের গায়েই পূর্ব রেলের ক্লেম ব্রাউন স্টেজের পাশে রাজাবাজার ট্রাম ডিপো। রাতে এখানে সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত টামগুলি সামান্য বিশ্রাম নেয়। প্রচুর লোকলস্কর আছে এখানে। তাদের কাজ নোংরা ট্রামগুলি সাফসুতরো করা, যান্ত্রিক অবস্থা পরীক্ষা করা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বেও কর্মী আছেন।

এত সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও দুবার দুটো বড় আগুনে প্রায় ৭০টা ট্রাম পুড়ে ছাই হয় কী করে? অনেকেই এ প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রথমবারে আগুন লেগেছিল ৭৪ সালের ১ সেপটেমবর। ঐ আগুনে ৩৬টা ট্রাম পুড়ে ছাই হয়। ৭টা ট্রামের প্রচুর ক্ষতি হয়। আর চলতি বছরের সাম্প্রতিক আগুনেও মোটামুটি ৩০টির মত ট্রাম আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই ৩০টি ট্রামের দাম প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

সাম্প্রতিক ৫ জুনের আগুনের পরেই সরকারি মহলে সন্দেহ করা হয়েছিল, এক শ্রেণীর কর্মীর অবহেলা এই আগুনের জন্য দায়ী। দমকল সহ কোন কোন মহল এই ব্যাপারটাকে সাবোতাজ বলে সন্দেহ করেন। আগুনের ঘটনাটির পরেই এবারে পরিবহণ বিভাগ একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে। পুলিশকেও আলাদাভাবে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৫ জুলাই-এর ভেতরে সকলকে রিপোরট দিতে বলা হয়।

[illegible] ভেতরে খোঁজ পড়ে ৭৪ সালের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার রিপোরটটির। মহাকরণ তোলপাড় করেও প্রাথমিকভাবে রিপোরটটির কোন খোঁজ মেলেনি বলে পরিবহণ বিভাগের কর্তারা সাংবাদিকদের জানান।

অথচ দমকলের সদর দপ্তরে এবং মহাকরণে নাকি এই রিপোরটটি ছিল। দমকলের তৎকালীন ডিরেকটার সুভাষ চ্যাটারজির এই রিপোরটে রাজাবাজারে আগুনের ঘটনাটিকে অন্তর্ঘাতমূলক বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

আমরা সেই রিপোরটটি দেখেছি। ১৬/১০/৭৪ তারিখে সুভাষবাবু তাঁর রিপোরট দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে টাইপ করা ৬ পাতার শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি লিখেছিলেন, '...টেকিং ইনটু অ্যাকাউনট অব অল মেটিরিয়াল এভিডেনসেস অ্যানড ফ্যাকটস অ্যানড ফিগারস, আই হ্যাভ নো হেজিটেশন ইন স্টেটিং দ্যাট দিস ইজ এ কেস অফ আরসন। বাট অ্যাজ উই হ্যাভ নো প্রুফ উই ক্যান অনলি সে অ্যাজ টু দা কজ অব ফায়ার ইজ স্ট্রংলি সাসপেকটেড কেস অব আরসন...।' অন্যদিকে পুলিশী রিপোরটে এটাকে শরট সারকিটের ঘটনা বলা হয়েছিল।

এবারের আগুনের কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিটিতে কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ না থাকায় অনেকেই বিস্মিত। কমিটিতে আছে সিটু, দমকল, ট্রামওয়েজ, পরিবহণ প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিরা।

কিন্তু অনেকেরই কাছে প্রশ্নটা হল, রাজাবাজার ট্রাম ডিপোতেই শুধু আগুন লাগে কেন? আর দুবারই আগুনের কারণ শরট সারকিট। এটাই বা কী করে সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়? □

গলায় যদি কাঁটা ফোটে

ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

খেতে বসে জীবনে একবারও গলায় মাছের কাঁটা ফোটেনি এমন ব্যক্তি প্রায় নেই বললেই হয়। অর্থাৎ প্রতি নিয়তই আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ এই জাতীয় দুর্ঘটনায় পড়ে-ছেনই। অথচ আশ্চর্যের কথা আকস্মিক বিপদ এড়াতে আমরা কেউই তেমন আগ্রহী নই। তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য একটু কষ্টের বিনিময়ে আমরা এই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকি। তবুও মনে রাখা দরকার গলায় কাঁটা ফুটলেই যেমন বেরিয়ে যাওয়াই নিয়ম কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কাউকে কাঁটা বার করতে হাসপাতাল অবধিও দৌড়তে হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে কাঁটা বার করতে অপরেশনেরও প্রয়োজন হয়। কদাচ কেউ কেউ এই বিপদে পড়ে প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছেন এমনও শোনা যায়।

শুধু কাঁটা কেন, মানুষের শরীরে অনেক রকমের বহিরাগত বস্তুই (Foreign body) প্রবেশ করতে পারে। যেমন ধরুন, মাংসের হাড়, টাকা, পয়সা, কৃত্রিম দাঁত, জ্যান্ত মাছ, পেরেক, সূচ, সেফটিপিন–আরও কত কি।

এবার আলোচনা করা যাক এই সব বস্তু কিভাবেই বা শরীরে প্রবেশ করে আর তার প্রতিবিধানই বা কী।

গলায় মাছ কি মাংসের কাঁটা বা হাড় ফোটে প্রধানত আমাদের নিজেদেরই ভুলে। মাছ ভাল করে না বেছে খাওয়া, অল্প আলোয় খেতে বসা, অন্যমনস্ক হয়ে খাওয়া-দাওয়া করা অথবা বেশি গল্পগাছা কি হই-চই করতে করতে খাওয়া-দাওয়া করাই এর প্রধান কারণ। এছাড়া অন্য যে সব কারণে কাঁটা ফোটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেশা করে খেতে বসা অথবা খুব তাড়াহুড়ো করে খাওয়াদাওয়া করা। আমাদের মধ্যে যারা কৃত্রিম দাঁত ব্যবহার করেন তাদের কিন্তু খুবই সবধান হওয়া উচিত। কারণ কৃত্রিম দাঁতের স্পর্শ ক্ষমতা নেই। ফলে মুখে কাঁটা বা হাড় গেলে তারা বুঝতে না পেরে গিলে ফেলেন।

খাওয়ার ব্যাপারে শিশু ও বৃদ্ধদের অনেক সময়েই অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে অপরের দায়িত্ব-হীনতায় তারা এই ধরনের বিপদের শিকার হন।

আজকালকার মায়েরা অনেকেই চাকুরিজীবী। তারা নিজেদের চরম ব্যস্ততার কারণে অনেক সময়েই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছেলেমেয়েদের খেতে বসিয়ে দারুণ তাড়া দেন। এমন কি কখনও কখনও জোর করে মুখে খাবার পুরে দিতেও দ্বিধা করেন না। আর তারই বিষময় ফল ভোগ করে শিশুরা। মায়ের তাড়ায় শুধু গলায় কেন শ্বাসনালী-তে পর্যন্ত কোন খাদ্যবস্তু আটকে যেতে পারে। মনে রাখবেন শিশুরা গিলতে কি কাশতে খুবই অপটু। ফলে গলায় কিছু প্রবেশ করলে তারা বড়দের মত সহজেই তাকে কেশে তুলে দিতে পারে না, অথবা গিলে ফেলতেও অক্ষম। আর এই অপারগতার কারণেই শ্বাসনালীতে খাদ্য আটকিয়ে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পারে।

এছাড়াও শিশুদের আর একটি অভ্যাস তাদের অনেক সময়েই এই রকম কোন বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। ওরা চোখে কিছু দেখলে তা শুধু হাতে পেয়ে ক্ষান্ত হয় না, একবার খেয়েও দেখতে চায়, তার স্বাদ কেমন। এর ফলে তারা অনেক সময়েই এমন সব অবাঞ্ছিত বস্তু মুখে দিয়ে ফেলে, যা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। কোন শিশু ঝাঁটার কাঠি, পেনসিল, নিব খেয়ে বা গলায় আটকিয়ে বিপদে পড়েছে এমন কথা ত প্রায়ই শোনা যায়। এমন কি কখন কখন ফিনাইল, চুন বা অন্য কোন বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই শিশুদের হাতের কাছে এমন কিছু রাখা উচিত নয়, যা তাদের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমি একটি শিশুকে জানি, যে মুখের মধ্যে একটা জ্যান্ত মাছ পুরে ফেলে প্রাণ হারিয়েছিল। তার বাবা বাজারের থলিটা রেখেছিল মেঝের উপর। তার ভিতরে ছিল একটা জ্যান্ত কই মাছ। তারই একটি তখন থলি থেকে বেরিয়ে এসে মেঝের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কাছেই শিশুটি কোথাও খেলা করছিল। সে মাছ দেখে হামা দিয়ে এসে সোজা তাকে মুঠোয় নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দেয়। সেটি তখন আটকে গিয়েছিল তার শ্বাসনালীতে। হাসপাতালে যখন শিশুটিকে আনা হল, তখন অবশ্য সেই হতভাগ্যের জন্য আমাদের কিছুই করার ছিল না।

এবার, এইসব চিকিৎসার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক। কাঁটা সাধারণত গলার এমন জায়গায় ফোটে, যেখান থেকে ওটা বের করে আনা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। যেমন ধরুন, টনসিলের গায়ে বা জিভের গোড়ায়। খুব দূরে গেলে বড়জোর গলবিলের (Pharynx) পিছনের দেওয়ালে অথবা শ্বাসনালীর মুখের দুপাশে যে দুটি গর্তের মত জায়গা আছে, যাকে পাইরিফরম ফসা (Pyrifrom fossa) বলা হয়, সেখানে গিয়েও আটকাতে পারে। গলা থেকে কাঁটা বার করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় জিভ চাপার একটি যন্ত্র (Tongue depre-ssor) এবং একটি ফরসেপস এর (Hartmanns forceps)। গলার ভিতর আলো ফেলার জন্য একটি বুলস আই ল্যাম্প (Bull's eye lamp) এবং একটি হেড মিরার (Head mirror) বা আয়না। রোগীর বাড়িতে আলোর প্রয়োজনে আমরা টেবিল ল্যাম্প বা বড় টর্চও ব্যবহার করতে পারি। অনেকেই আছেন যাঁরা মুখের মধ্যে যন্ত্র দিলেই বমি করে ফেলেন। তাঁদের স্বাভাবিক রাখার জন্য আমরা আগেভাগেই তাঁদের গলায় জাইলোকেন (xylocain) নামের লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া (local anaesth-esia) প্রয়োগ করে নিই। কাঁটা বার করার এত সব সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা অধিকাংশই এইসবের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী নই, কাঁটা ফুটলেই আমরা শুকনো ভাত, চিঁড়ে, মুড়ি কি কলা খেয়ে সেটাকে নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। এই সব প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা অবশ্য অনেকেই উপকার পেয়ে থাকি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এমন হয় না। এমন দেখা গেছে যে কারও

কারও কাঁটাটি গলার কোন নিকটতম স্থান থেকে সরে গিয়ে অনেক দূরে খাদ্যনালীর কোথাও আটকে গিয়েছে। অর্থাৎ, এতক্ষণ যা ছিল হাতের নাগালে, তাকেই এখন বার করতে হবে অপারেশন করে। তাই আমরা সর্বদাই বলি, অহেতুক বিপদ না বাড়িয়ে প্রথমে হাসপাতালে বা কোন গলার চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে হাসপাতাল বা চিকিৎসক দুইই দুষ্প্রাপ্য সেখানে রোগী কী করবে। এর উত্তরে বলতে হয় খুব ছোট কাঁটা হলে অবশ্যই কোন ভয় নাই এবং সেটা বার করার জন্য গার্হস্থ্য চিকিৎসার সাহায্য নিতে কোন বাধা নাই। কারণ সে কাঁটা শরীরে থেকে গেলে আপনিই গলে পচে কদিনের মধ্যে খসে পড়ে। অবশ্য কষ্ট থাকলে, এবং চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ না থাকলে, রোগীর উচিত গরম নুন জলে কুলকুচি করা এবং নিয়মিত কদিন পেনিসিলিন ট্যাবলেট খাওয়া। পেনিসিলিনে অ্যালারজি থাকলে তার বদলে Erythrocin খাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ওষুধ খেলে কাঁটা থেকে সম্ভাব্য কোন বিপদ ঘটার আশঙ্কা একদমই থাকবে না। মাছের বড় কাঁটা বা মাংসের হাড় হলে অবশ্য অপেক্ষা করে বসে থাকা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ মোটা কাঁটা কখনই নিজের থেকে সরে যাবে না। এবং বেশিদিন বিঁধে থাকলে পেরিটনসিলার এবসেস (Peritonsillar abscess) বা ইডিমা লেরিংকস (Oedema larynx) এর মত কোন মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হবেই। শিশুদের ক্ষেত্রে ইডিমা লেরিংকসও দারুণ ভয়ের। শ্বাসনালীকে আটকে দিয়ে যে কোন সময়েই মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

আমি একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারকে জানি যাদের বাড়িতে প্রায়ই কারও না কারও গলায় কাঁটা আটকায়। ফলে তাদের প্রায়ই হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। আজ কিছুদিন হল আর তাদের হাসপাতালে দৌড়োতে হচ্ছে না। যদিও কাঁটা ফোটার ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে চলেছে। কারণ তাদের বাড়ির বড় বৌ মীরা দাস এখন নিজেই যন্ত্রের সাহায্যে কাঁটা বার করার বিদ্যেটা রপ্ত করে ফেলেছেন। তিনি উপহাস করে বলেন, 'ব্যাপারটা এতই সহজ অথচ ডাক্তার বাবুরা এর জন্য কত টাকাই না চেয়ে বসেন। আমার উপায় থাকলে সকলকেই এ বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতাম।' তিনি ঠিকই বলেন। শেখার আগ্রহ থাকলে অনেকেই অধিকাংশ কাঁটাই ঘরে বসে বার করে ফেলতে পারেন। খুব ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অবশ্য নিজেরা চেষ্টা না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই কর্তব্য।

শ্বাসনালীতে খাদ্য আটকে শিশুরা মারা পড়তে পারে, সে কথা আগেই বলেছি। এই জাতীয় বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে একটা এমারজেনসি চিকিৎসা শিখে রাখা যেতে পারে। সাংঘাতিক ভাবে খাবার আটকেছে সন্দেহ হলেই শিশুটির পা দুটি ধরে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পিঠে বার বার চাপড় মারা উচিত। এমনতর উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে অনেক সময়েই একটি মরণাপন্ন শিশুকে বাঁচান যায়। কিন্তু বিপদে পড়লে সাধারণ বুদ্ধি এমনই লোপ পেয়ে যায় যে, কোন কিছুই তখন মনে পড়তে চায় না। কী বড়দের কী ছোটদের। এই অবস্থায় বিকল্প চিকিৎসা হল প্রথমে যত শীঘ্র সম্ভব ট্রেকিওসটমি (Tracheostomy) অপরেশন করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা এবং পরে লেরিংগোস্কোপ (laryngoscope) করে শ্বাসনালীর মুখ থেকে খাদ্যবস্তুগুলি বার করে আনা। এ ধরনের চিকিৎসা একমাত্র বড় বড় হাসপাতালেই সম্ভব। আর সে রকম হাসপাতাল আমাদের দেশের সর্বত্র আশাও করা যায় না। তাই এসব বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ বিপদ এড়িয়ে চলা। আপনাদের অনেকেরই মনে থাকার কথা আমাদের দেশের এক মহান প্রাণ এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখারজি প্রাণ হারিয়েছিলেন এই রকম এক দুর্ঘটনায়।

আগেই বলেছি, খাদ্যনালীতে যে সব বস্তু আটকাতে পারে তার মধ্যে মাছের কাঁটা ও মাংসের হাড়ই হল প্রধান। তাছাড়াও অবশ্য নকল দাঁত। টাকা পয়সা ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই আটকাতে পারে। নিয়মমাফিক খাদ্যনালীতে কিছু প্রবেশ করলে তা নেমে গিয়ে পাকস্থলীতে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু বস্তুটি যদি সেফটিপিন, সূচ, বা আলপিনের মত সূচালো হয় তাহলে তা সাধারণতই খাদ্যনালীর গায়ে আটকে পড়ে। এ ছাড়া খাদ্যনালীর কয়েকটি স্থান স্বাভাবিক ভাবেই কিছু সংকুচিত হওয়ার দরুন বড় কিছু প্রবেশ করলে তা নিচে পাকস্থলীতে নেমে না গিয়ে খাদ্যনালীর ওই রকম সংকুচিত কোন স্থানেও আটকে পড়তে পারে।

চিত্র-২ : খাদ্যনালীতে মাংসের হাড়

খাদ্যনালীতেও বহিরাগত বস্তু আগমন ঘটে প্রধানত আমাদেরই ভুলে। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে মুখে এমন কিছুই রাখা উচিত নয় যা খাদ্যবস্তু নয়। যেমন ধরুন টাকা পয়সা, সেফটিপিন, সূচ জাতীয় জিনিস মুখে রাখা খুবই বিপজ্জনক। অন্যমনস্কতা বা কথা বলার সময় এইসব জিনিস হঠাৎই মুখ থেকে নেমে গিয়ে খাদ্যনালীতে আটকে পড়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও অনেক সময়েই দেখা যায় মুখে পয়সা, গুলি অথবা অন্য কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কড়া শাসনে তাদের এখুনিই এই বদ-অভ্যাস ত্যাগ করান উচিত।

১নং একসরে ছবিটি লক্ষ্য করুন। দেখুন খাদ্যনালীর মাঝখানে একটা টাকা আটকে আছে। রোগীটি একটি ১৬/১৭ বছরের বালক, মুখের মধ্যে টাকাটা নিয়ে সে একদিন ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল হঠাৎ তখন আর একটা ঘুড়িকে কেটে দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে উঠতেই টাকাটি নেমে গিয়ে সোজা খাদ্যনালীতে আটকে পড়েছিল। ভাগ্য ভাল শ্বাসনালীতে আটকায়নি। তাহলে হয়ত আর এ ছবি তোলার প্রয়োজনই হত না।

এবার ২ নং একসরে ছবিটি লক্ষ্য করুন দেখুন খাদ্যনালীর ভিতরে একটা মাংসের হাড় আটকে আছে। রোগিণী ছিলেন অতি দরিদ্র এক মহিলা। নিমন্ত্রণ খেতে বসে তাড়াহুড়ো করে মাংস খাচ্ছিলেন। বেশি খাওয়ার আশাতেই সম্ভবত বেছে খাওয়ার সময় দিচ্ছিলেন না। খাওয়া অসমাপ্ত রেখেই তাকে হাসপাতালে উঠে আসতে হয়েছিল। সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, এই সব ঘটনাগুলিই ঘটেছিল এই শহর কলকাতাতেই। ফলে তাঁরা সহজেই মুক্তি পেয়েছিলেন। দূরে গ্রামে কোথাও এই ঘটনা ঘটলে কী হত তা বলা শক্ত।

এবার ৩ নং একসরেটা দেখুন। লক্ষ্য করুন খাদ্যনালীর মধ্যে সরু সরু তারের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওগুলো সবই তারের হুক। অর্থাৎ খাদ্য নালীর মধ্যে একটা নকল দাঁত আটকে আছে। দাঁত আটকানো কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। কারণ বার করার সময় ওই তারের হুকের আঁচড়েই খাদ্য নালীটি ছিঁড়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। সুখের কথা, আজকাল তার ছাড়াও দাঁত তৈরি হচ্ছে। তাই যারা

নতুন দাঁত নিচ্ছেন তাদের এই ধরনের দাঁত গড়ান উচিত। দাঁত খাদ্যনালী বা শ্বাসনালীতে আটকায় প্রধানত পুরনো হয়ে গেলে। অর্থাৎ আলগা হয়ে ঢলঢলে হয়ে পড়লে। আলগা হয়ে গেলে তাকে যত শীঘ্র সম্ভব পালটে নেবেন। এইখানেই আমাদের আর একটা বদভ্যাসের কথা বলে রাখি। সেটা হল মুখে পান সুপারি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। এই বদভ্যাসের কারণে কত লোক যে নিত্যই শ্বাসনালীতে পান বা সুপারি ঢুকিয়ে বিপদে পড়েছেন তা না বলাই ভাল। মনে রাখবেন নকল দাঁত পরে বা মুখে পান সুপুরি নিয়ে কখনই ঘুমোন উচিত নয়।

শ্বাসনালী কি খাদ্যনালীতে সূচ বা পেরেক ঢোকার ঘটনার কথাও প্রায়ই শোনা যায়। এইসবই ঘটে থাকে আমাদেরই অন্যায় অভ্যাসের সুযোগে। অনেক মেয়েরই সেলাই করার ফাঁকে ফাঁকে সূচটাকে দাঁতের মধ্যে চেপে ধরার প্রবণতা আছে। ধরুন ঠিক ওই সময় পাশ থেকে যদি কেউ একটা হাসির কথা বলে অথবা গলা খুসখুস করে কাশির দমক আসে, তাহলে, মুখের সূচটি হঠাৎই শ্বাসের টানে উড়ে গিয়ে সোজা শ্বাসনালী কি খাদ্যনালীতে প্রবেশ করতে পারে।

ঘরামী কি কাঠেব মিস্ত্রিদের অনেকেই এই একই বদভ্যাসে ভোগেন। দেখা যায় যে তাঁরা একটা পেরেক যখন ঠুকছেন, তখন আর একটা পেরেক দাঁতের মধ্যে ধরে রাখছেন। অথবা অনেক উঁচুতে কোথাও সেলাই করতে উঠে প্রতি বার সুতো ছেঁড়ার সময় সূচটাকে দাঁতে চেপে রেখে হাত খালি করছেন। এই সময়েই হয়ত কাশি এল অথবা কাউকে ডাকার প্রয়োজন হল। তখন ভুলেই গেলেম যে দাঁতের ফাঁকে পেরেক কি সূচ ধরা আছে। এবারে বুঝতেই পারছেন, পরিণামে কি ঘটতে পারে।

এইসব বিপদের অবশ্য কোন টোটকা চিকিৎসা নেই। তাই প্রত্যেককেই এরকম কোন বিপদে

চিত্র-৩ : খাদ্যনালীতে কৃত্রিম দাঁতের তার

চিত্র-৪ : খাদ্যনালীতে বেরিয়াম তুলো

পড়লে হাসপাতালেরই শ্বারস্থ হতে হয়। মনে রাখা দরকার এরকম কোন ঘটনা ঘটলে অহেতুক সময় নষ্ট না করে খুব তাড়াতাড়ি কাছের কোন বড় হাসপাতালে বা মেডিকেল কলেজে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ। কারণ দেরী হয়ে গেলে রোগীর প্রাণ বাঁচান খুবই কষ্টকর হতে পারে।

অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করার কথা শ্বাসনালী বা খাদ্যনালীতে কোন বস্তু প্রবেশ করলে আমরা কি ভাবেই বা ডায়াগোনেসিস করি এবং কেমন করেই বা বার করে আনি।

ডায়াগোনেসিসের জন্য প্রয়োজন একসরের। সাধারণ একসরের দ্বারা এদের অধিকাংশেরই অবস্থান সঠিক ভাবে নির্বাচন করা যায়। কিন্তু যে সব বস্তু একসরে স্বচ্ছ, যেমন ধরুন সুপুরি, প্লাসটিকের টুকরো, কড়াই শুটি, বাদাম বা অন্য কোন সব্জির টুকরো সে ক্ষেত্রে আমরা কনট্রাসট (Contrast) একসরের সাহায্য নিই। সেক্ষেত্রে বেরিয়াম (Barium) বা লিপিডল (Lipidol) এর মত কোন তরল পদার্থ খাদ্যনালী বা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিয়ে একসরে তোলা হয় তখন বস্তুটিকে চেনা যায় তার নেগেটিভ ছায়া (Negative Shadow) দেখে। অর্থাৎ যেখানে বস্তুটি আটকে আছে, সেখানে তো আর বেরিয়াম বা লিপিডল ঢুকতে পারবে না। তাই তখন ছবি তুললে বস্তুটিকে একটা কালো ছায়ার মত দেখাবে। (চিত্র ৪)

অনেক সময় বস্তুটি যদি খুব ছোট হয়, তা সে একসরে অস্বচ্ছ (Radio Opeque) হলেও ছবিতে দেখা যাওয়ার কথা নয়। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। ধরুন, খুব ছোট্ট একটা মাছের কাঁটা ফুটেছে। রোগী বলছে কষ্ট হচ্ছে। অথচ একসরেতে দেখা যাচ্ছে না। বিদেশে হলে টোমোগ্রাম (Tomogram) করে কাঁটাটির ছবি তুলত। কিন্তু আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা না থাকায় আমরা রোগীকে একটা ছোট্ট তুলোর টুকরো বেরিয়ামে ভিজিয়ে খেতে দিই। একটু পরেই একসরে তুললে দেখা যায় তুলোটি একটা বিশেষ জায়গায় আটকে আছে। অর্থাৎ যেখানে কাঁটাটি আটকে আছে তুলোটিও ঠিক সেখানেই আটকে গেছে। কাঁটা না থাকলে তুলোটি পেটেই চলে যেত। এই ভাবে তুলো খাওয়ালে কাঁটাটিকে বার করে আনতেও বেশ সুবিধা পাওয়া যায়। কারণ খাদ্যনালীর ভিতর ছোট কাঁটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হলেও তুলোটি খুঁজে নেওয়া মোটেই শক্ত কাজ নয়। আর তখন তুলোটি খুঁজে পাওয়া মানেই কাঁটাও খুঁজে পাওয়া। ডায়াগোনেসিসের শেষ কথা রোগীর কষ্টের কথা উপেক্ষা না করা। রোগী যদি বলতেই থাকে যে তার কষ্ট কমছে না, তাহলে কোন প্রকার একসরেতে তাকে পাওয়া যাক বা নাই যাক একবার রোগীকে অজ্ঞান করে যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যনালী বা শ্বাসনালীটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে নেওয়াই উচিত।

এইসব বস্তুগুলিকে বার করার জন্য আমরা এক প্রকার লম্বা টিউবের মত আলোকিত যন্ত্র এবং লম্বা ফরসেপস ব্যবহার করে থাকি যার নাম ইসোফেগোস্কোপ (Oesophagoseope) বা ব্রনকোস্কোপ (Bronchoscope)। পাকা সার্জেনরা এই ধরনের অপরেশন অতি অক্লেশে এবং নিরাপদেই সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু কখনও কখনও বস্তুটি এমনই গোলমেলে আকারের হয়ে থাকে যা বার করে আনতে গেলে খাদ্যনালী বা শ্বাসনালী ফুটো হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন খোলা সেফটিপিন, বাঁকা সূচ বা কানের দুল, হুক যুক্ত নকল দাঁত ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে নলের সাহায্য না নিয়ে খাদ্যনালী বা শ্বাসনালী কেটে জিনিসটিকে বার করাই যুক্তিযুক্ত।

অপারেশন অবশ্য আজকাল খুবই সহজ ব্যাপার কিন্তু তার চেয়ে সহজ হল অপারেশনের শিকার না হওয়া। তাই না? এই জন্যেই প্রয়োজন সাবধানতার। দেখেছেন তো মৃত্যু আমাদের পদে পদেই জড়িয়ে আছে। তার বেড়াজালকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। বিশ্ববিখ্যাত রোগ তত্ত্ববিদ (Pathologist) বয়েড (Boyd) বলেছিলেন, মানুষ যে মরে যায় এতে আমি একটুও আশ্চর্য হই না। কী করে সে বেঁচে থাকে, এইটাই বরং আমাকে বিস্মিত করে। তাই বলছি, আসুন, আমরা সাবধান হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। আসুন, সুস্থ হয়ে বেঁচে থেকে পৃথিবীকে বুঝিয়ে দিই—'মক্ষিতে চাহিনা আমি সুন্দর এ ভুবনে'। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

মার্গ সংগীতের আসরে যাওয়া এখন স্ট্যাটাস সিমবল হয়ে দাঁড়িয়েছে : নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

সনটা সম্ভবত : ১৯৪৫ কি '৪৬– মাইহারে বসে কলকাতা রেডিও-য় এক শিল্পীর সেতার শুনে সংগীত-গুরু আলাউদ্দিন খাঁ তাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'তোমার অনুরোধ মত রেডিওতে বাজনা শুনলাম– একেবারেই অশ্রাব্য। আসলে তুমি কিছুই জান না, তাই গলার গহনা কানে পরেছ, পায়ের গহনা হাতে লাগিয়েছ, হাতের গহনা মাথায় চাপিয়েছ......এইরকম আর কী! তবে হ্যাঁ, মনে হল তোমার মধ্যে একটা শক্তি কোথাও লুকোন আছে বটে, সেটাকে জাগাতে হবে......'

কোন শিল্পীর পক্ষে এ চিঠি পরম গৌরবের বলে মনে হবে কি? বিশেষত, যখন তিনি নয় নয় করেও সাত বছর ধরে আকাশবাণীতে নিয়মিত বাজিয়ে আসছেন?

কিন্তু চিঠি পেয়ে সেই সেতারিয়া সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেননি, বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছেন–না, দুঃখে নয়, আনন্দে। সেদিনের সেই শিল্পীর নাম নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স চোদ্দ বছর।

যোধপুর পারকে তাঁর বাড়ি 'নীরব'-এ বসে স্মৃতির পাতা খুঁজে এই অমূল্য ঘটনাটির বিবরণ দিচ্ছিলেন বর্তমান সংগীত জগতের কিংবদন্তি তুল্য মানুষ পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যস্ত মানুষ, শুধু দেশ জোড়া নয়, তিনটি মহাদেশ জুড়ে এখন তাঁর নামডাক। তাছাড়া বেশ কয়েক ঘণ্টার নিয়মিত রেওয়াজ তো রয়েই ছে, তার মাঝখানেই প্রায় আড়াই ঘণ্টার মত সময় দিয়েছিলেন পরিবর্তনকে। বললাম, 'আপনার প্রথম জীবনের কথা কিছু বলুন, শুনি।' চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ডুবে গেলেন তাঁর স্বপ্নময় অতীতে-

'সে অনেক কথা। কত ঘটনা কত স্মৃতি এসে ভিড় করে মনের মধ্যে...... জন্ম এই কলকাতাতেই ১৯৩১ এর ১৪ অকটোবর। তখন আমরা থাকতাম পারক সারকাসে। বাবা ভর্তি করে দিলেন মডারন স্কুলে। স্কুলটা ছিল বাড়ির কাছাকাছি। সেতারের তালিম কিন্তু তার আগেই শুরু। প্রথম তালিম নিতে শুরু করি বাবার কাছে, উনিও সেতার বাজাতেন। তালিম আর পড়াশুনো চলত একই সংগে। ঐ মডারন স্কুলেই আমার সহপাঠী ছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। তখন অবশ্য তিনি ওস্তাদ হননি, বড় জোর বছর দশেক বয়স ছিল তাঁর।' বলতে বলতে হেসে উঠলেন তিনি, 'তখন কি আর ছাই বুঝতাম যে কত বড় প্রতিভাবান শিল্পী লুকিয়ে আছে ওঁর মধ্যে।' একটু থামলেন নিখিল বাবু, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'বিলায়েতের মত অত বড় সেতারি আজ অবধি জন্মায়নি বুঝলে, হ্যাঁ হ্যাঁ জন্মায়নি......কী টোনাল কোয়ালিটি বল তো......কী সুর, গোটা যন্ত্রটার ওপর এমন দখল.... উঁহু আমার ত মনে পড়ে না শুনেছি বা দেখেছি কখনো......সত্যি ওর সংগে কারোর তুলনা হয় না।' চুপ করলেন নিখিলবাবু। বললাম, তারপর?

'হ্যাঁ কী যেন বলছিলাম? ও, সেই মডারন স্কুলের কথা না- না, বেশিদিন আর পড়তে পারলাম কই সেই স্কুলে! ছেচল্লিশের দাংগায় পারক সারকাসের বাড়ি ছেড়ে দিতে হল। এসে ভর্তি হলাম সাউথ সাবারবান ব্রানচ স্কুলে, সেখান থেকেই ম্যাট্রিক দিলাম ৪৮ এ। সে ভয়ংকর দাংগা তো আর তোমরা দেখনি–বোধহয় জন্মাওনি তখন। মানুষের জীবনে যে অত বড় অভিশাপ আসতে পারে, না দেখলে তা কল্পনা করতে পারবে না। বিশেষ করে শিল্প আর সংস্কৃতির কি কোন জাত হয়, বল?' পরিষ্কার বেদনার ছাপ তাঁর মুখে। আর সেই মুহূর্তে কী এক অজানা কারণে আমার মনে পড়ে গেল স্বর্গীয় সাহিত্যিক নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের একটি ছোট্ট গল্প 'ওস্তাদজী'র কথা।

নিখিলবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, 'প্রথম যখন অল ইনডিয়া রেডিওতে বাজাই তখন আমার বয়স সাত–বাজিয়েছিলাম 'গল্প দাদুর আসরে।' জেনারেলে বাজাই তার চার বছর বাদে। আর তিন বছর বাদে প্রথম দেখা হল 'বাবার' সংগে, বোধহয় মিনারভা হোটেলে। কলকাতায় এলে ঐ হোটেলটাতেই বাবা উঠতেন। এর মধ্যে আমি তালিম নিয়েছি কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব, জন অ্যানড্রুস গোমেস আর রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের কাছেও গিয়েছিলাম তবে তাঁর কাছে আর শেখা হয়ে ওঠেনি কারণ তখন তিনি একরকম অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিলেন। তবে জন অ্যানড্রুস গোমেসের ভালবাসা আর অনুপ্রেরণায় এবং কুমার বীরেন্দ্র কিশোরের পথনির্দেশ ছাড়া আজকের আমাকে তোমরা দেখতে পেতে কিনা সন্দেহ। কুমার সাহেবের নির্দেশেই তো আমি প্রথম 'বাবা' আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে যাই। শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ভীষণ বাছ বিচার করতেন। প্রথম দিকে হোটেলে তাঁর ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসেই থাকতাম। শেষে একদিন বললেন, রোজ রোজ যে আস, 'কী চাও আমার কাছে?' তখন আমি একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলাম, বললাম, 'আমাকে আপনার শেখাতেই হবে।' উনি বললেন, 'কিন্তু আমি তো তোমার বাজনা শুনিনি। আর এখন শোনার সময়ও নেই।' তার কিছুদিন বাদেই রেডিওতে আমার একটা বাজনা ছিল। সেই তারিখটা বলে বললাম, 'ঐ দিন রেডিওতে আমার একটা বাজনা আছে, যদি আপনি একটু সময় করে শোনেন।' উনি বললেন, 'দেখি, যদি সময় পাই তো শুনব।' তারপরই তো মাইহার থেকে বাবার নামে এল ওই চিঠি। তাতে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কী লিখেছিলেন তা তো আগেই বললাম।

এরপর শুরু হল আমার মাইহারের জীবন। এক নতুন অধ্যায়, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সচরাচর কাউকে 'গন্ডা' বা নাড়া বাঁধতেন

না। বাবা একরকম জোর করেই ওঁকে দিয়ে আমায় 'গণ্ডা' বাঁধিয়েছিলেন। 'গণ্ডা' বাঁধা কী জান তো? আর পাঁচজন সংগীত গুণীকে সামনে সাক্ষী রেখে গুরু তোমার হাতে নাড়া বেঁধে দেবেন। তারপর একটা মিষ্টি তিনি অর্ধেকটা খেয়ে তোমায় বাকি অর্ধেকটা নিজের হাতে খাইয়ে দেবেন। এর অর্থ পাঁচজন সংগীত গুণীর সামনে গুরু তোমায় শিষ্যত্বে বরণ করলেন ও নিজের সমস্ত শিক্ষা তোমায় দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। শিষ্যকেও সারাজীবন গুরুকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে চলতে হবে এবং তাঁর পরিবারকেও একইভাবে মেনে চলতে হবে। গুরু-শিষ্যের এই মধুর সম্পর্ক আমাদের দেশে তো আজকের ঐতিহ্য নয়, সেই তপোবনের ভারতবর্ষ থেকেই চলে আসছে। বরং আজকালকার দিনেই যেন কোথায় তার তাল কেটে যাচ্ছে। নামী শিল্পীকেই গুরু করার একটা প্রবণতা ক্রমশ আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। শিল্পী আর শিক্ষক তো এক জিনিস নয়, কিন্তু একথা আর আজকের দিনে বুঝছে কে? বোধহয় পাবলিসিটি বা প্রচারের দানব এই সম্পর্কের চিড় ধরাবার জন্য একমাত্র দায়ী।'

শ্রোতাদের সম্পর্কে বললেন 'মার্গ সংগীতের আসরে যাওয়া তো এখন একটা সোশাল স্ট্যাটাসের অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমঝদার স্রোতাবা কন ফাবেনসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন একটা টিকিটের আশায়। কোন মতে যদি বা একটা কমদামী টিকিট জোটে তাহলে পেছনের আসনে গিয়ে বসেন। সামনের দিকের সারিতে যাঁরা বসেন তাঁরা হয় অনুষ্ঠানের মাঝখানে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন নয় তো হঠাৎই সকলে মিলে কাশতে আরম্ভ করেন। এতে শিল্পীদের মনোসংযোগ কতটা নষ্ট হয় সেটা বোঝার মত ক্ষমতাও এদের নেই। আমি কোনকালেই এইসব শ্রোতাদের কথা ভাবি না, সত্যিকারের শ্রোতাদের জন্য বাজাবার চেষ্টা করি। কদিন আগেই একজন সাংবাদিক এসে আমাকে বলছিলেন যে, ইনডোর স্টেডিয়ামে এক যুগলবন্দীর অনুষ্ঠানে তেহাইয়ের প্রথম পাল্লাতেই সে কী হাততালি! তুমি বল, এরপর শিল্পীরা যদি অনুপ্রেরণার অভাবে সাদামাটা বাজনা বাজান তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়? অথচ বাংলা দেশের মত সমঝদার শ্রোতা তুমি কোথায় পাবে?' প্রশ্ন করলাম, 'সত্যিকারের শ্রোতারা যে অনুষ্ঠানে ঢুকতে পারে না তার জন্য পরোক্ষভাবে শিল্পীরাই কি দায়ী নয়? একেক জন এত বেশি সম্মানমূল্য নেন যে তার ফলে টিকিটের দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তাই নয় কি?' একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন নিখিল ব্যানারজি এই প্রশ্নে, 'আর কারো কথা বলতে পারব না, তবে নিজের সম্বন্ধে খুব পরিষ্কারভাবেই বলতে পারব, তুমি লিখে নাও, আমি এখন যে টাকা নিই তার অর্ধেকের অর্ধেক টাকা নিয়ে অনুষ্ঠান করতে আমি রাজি। তবে শোন, একটা দুর্ভাগ্যের গল্প শোনাই তোমাকে — বছর দুয়েক আগের কথা, একদল কর্মকর্তা এসে আমাকে ধরলেন তাদের সামর্থ্য কম, অর্ধেক টাকায় আমায় অনুষ্ঠানে বাজাতে হবে। তাদের কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভাল লাগল। রাজিও হয়ে গেলাম বাজাতে। তারপর দিনকয়েক বাদেই এল এক চিঠি, তাতে তাঁরা জানিয়েছেন যে আমাকে আর তাঁদের দরকার নেই। তাঁরা অন্য শিল্পীকে ঠিক করে ফেলেছেন। কারণ সেই শিল্পী যখন আমার চেয়ে অনেক বেশি টাকা নিচ্ছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল বাজান। বলতে পার, এই চিঠির পর আমার কী করণীয় থাকতে পারে?' মাথা নিচু করে চুপ হয়ে রইলাম। যুক্তি দিয়ে এই লজ্জাকে ঢাকা যায় না। প্রসংগ এড়িয়ে গিয়ে তাই প্রশ্ন করলাম, 'কোন কোন রাগ আপনার প্রিয়?' মার্গ সংগীতের বিকৃতি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনায় আবহাওয়া বন্ধ হয়ে উঠেছিল। নিখিলবাবুও আর ঐ আলোচনায় থাকতে চাইছিলেন না। আমার প্রশ্নে তাই যেন খানিকটা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'মাইহারে থাকতে আমার গুরু প্রধানত চারটি রাগের তালিম দিতেন। সকালে একদিন ভৈরোঁ, একদিন বিলাওল। আর বিকালে একদিন ইমন, আরেকদিন পূরিয়া ধানেশ্রী। গুরু বলতেন এই চারটে রাগ ভালভাবে বাজাতে জানলে সব রাগই ভালভাবে বাজান যায়। বছরের পর বছর ধরে এই চারটে রাগই শুধু বাজিয়েছি। ভোর চারটে উঠে বাজনা শুরু করতাম, চলত সেই রাত এগারটা অবধি। প্রতিদিন। এর মধ্যে যে দিন রাত্রি কখন কেটে যেত খেয়ালই থাকত না। মাঝখানে শুধু স্নান খাওয়া দাওয়া আর সামান্য বিশ্রামের জন্য ছেদ পড়ত। ফলে ক্রমাগত বাজিয়ে ঐ চারটে রাগ আমার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। তখন অবশ্য মাঝে মাঝে যে একঘেয়ে লাগত না একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে।'

বললাম, 'তখন অন্য রাগ বাজাতে ইচ্ছা করত না?'

'তার কি আর উপায় আছে'! বলতে বলতেই হেসে ফেললেন নিখিলবাবু। 'আমি যখন মাইহারে যাই, তার অনেক আগেই পণ্ডিত রবিশংকরজী কিংবা আলি আকবর খাঁ সাহেব, ওরা সবাই শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে গেছেন। আমি তখন একেবারেই একা। ফলে গুরুর নজর এড়িয়ে কোন কিছু করা ছিল অসম্ভব। সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। সকাল দুপুর আর সন্ধ্যা এই তিনবেলা নিয়ে বসতেন

আমাকে। একদিন কী হল জান রাত্রিবেলা-ক্রমাগত মূর্ছনা, অল ংকাব এইসব বাজাতে বাজাতে ভীষণ একঘেয়ে লাগছে, তাই ভাবলাম এখন তো কেউ কোথাও নেই, একটু আলাপ বাজাই। কারনা ইচ্ছা করে বল - কিন্তু যেই সবে আলাপ শুরু করেছি অমনি ঘবের দরজাটা দড়াম কবে খুলে গেল। দেখি গুরু আলাউদ্দিন খাঁ দাঁড়িয়ে। আমায় বললেন, 'যাও, বাকস প্যাটবা গুছিয়ে নাও, কালকেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।' শেষে অনেক ক্ষমাটমা চাওয়াব পব তিনি শান্ত হলেন। তখন ভাবতাম, দেখ একা থাকার কী জ্বালা! এখন বুঝি সেটা ছিল কত বড় সৌভাগ্য। অবশ্য আমাব গুরু ওকথা বলতে পাবতেন। পযসা নিয়ে তো আর শেখাতেন না, উলটে ছাত্রদেব খাওয়া পরাব সমস্ত ভার ছিল তাঁব। পিতাব মত স্নেহ আব শাসন ছিল তাঁর ছাত্রদের ওপর। সেই গুরুকে দেখেছি তো, তাই আমি নিজে আজ কোন ছাত্রকে শেখাই না। যেদিন বুঝব তাব পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে পারছি, তাব খাওয়া পবাব সমস্ত ভাব নিতে পাবছি সেদিনই শেখাব নইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তবে হাঁ, মাইহারে গুরুর কাছে আমাব সংগে আরও একজন শিখতেন বটে, তিনি আমার গুরুকন্যা অন্নপূর্ণাদি। ওঁর কাছেও অনেক কিছু শিখেছি আমি।'

আলাউদ্দিন কন্যা অন্নপূর্ণার প্রসংগ এসে পড়তে আর প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না, অনেক কৌতূহল ঘিরে রয়েছে ঐ শিল্পীকে কেন্দ্র করে। শুধোলাম, 'আপনি তো ওঁব বাজনা শুনেছেন, কোন স্তরের শিল্পী ছিলেন উনি ?' উত্তরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন নিখিল ব্যানার্জি, তারপর ধীরে ধীরে অ... স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আমাব গুরু বলতেন তাঁর যত শিষ্য-শিষ্যা আছেন তাব মধ্যে সবাব সেরা অন্নপূর্ণা। না, মেয়ে বলে বলতেন না। আমবা তো শুনেছি। তাই আমবা জানি শাস্ত্রীয় সংগীতের যে স্তব সাধাবণ মানুষের জন্য নয়, শুধুমাত্র অতি উঁচু দরের সমঝদারদের জন্য, সেই স্তরের বাজনা বাজাতেন অন্নপূর্ণাদি। আসলে উনি ছিলেন শিল্পীদেব শিল্পী। ওঁকে ঐভাবেই শেখান হয়েছিল। আসলে গুরু আমাদের সবার ক্ষমতা বুঝে, ঝোঁক বুঝে, মানসিকতা বুঝে সেই মত তালিম দিতেন। আমার যে সংগীতের গভীরে যাবার ঝোঁক সেটা গুরু আগে থাকতে বুঝতে পেরেই আমাকে সেইভাবেই তৈরি করেছেন। রবিশংকরজীর সংগে আমার বাজনার একটা তফাত থাকে ঐখানেই। ওঁর ধরন অন্য। সেইভাবেই ওঁর তালিম।'

'আর ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর বাজনা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?'

'উনি যে কত বড় শিল্পী তা ভাবা যায় না। আমাব এমনও হয়েছে যে ওঁর বাজনা শুনে আত্মহারা হয়ে গেছি। সেই সংগেই মনে জেদও চেপে গেছে ভীষণ রকমের। বাড়িতে ফিরে সংগে সংগে সেতাব নিয়ে বসে গেছি, উনি যা বাজিয়েছেন সেটা তোলবাব জন্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়েছে ততক্ষণ আসন ছেড়ে উঠিনি। নাওয়া খাওয়াব কথা মাথায় আসে নি। আসলে তুমি নিজে তো সেতাব বাজাও, কারুর বাজনা শুনে হঠাৎ মনে হয় না যে এরকম বাজাতেই হবে। তখন জেদ চেপে যায়, ওইরকম না বাজাতে পারা অবধি শান্তি নেই। আমার এরকম আরও হয়েছে। আমীর খাঁ, বড়ে গোলাম আলি খাঁর গান শুনেও হয়েছে। তবে আমীর খাঁ সাহেব আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ওঁর বাড়ি যাতায়াতও ছিল। নবীন শিল্পীদের পক্ষে বড় শিল্পীদেব অনুপ্রেরণা যে কী কাজে দেয় তা বলে বোঝান যায় না। আমিও খুব চেষ্টা করি এখনকার তরুণ প্রতিভাদেব অনুপ্রেরণা দিতে এই দেখ না সমরেশ চৌধুরী বা অজয় চক্রবর্তী কী সুন্দর গাইছে। আর তবলায় তো এখন আমাদের বাংলা দেশের বাইরে যাবার দরকারই নেই, স্বপন চৌধুরী থেকে শুরু করে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-এরা তো খুবই ভাল বাজাচ্ছে। বাংলা দেশের তবলার এই উন্নতির জন্য প্রধানত যে মানুষটি দায়ী তিনি হলেন জ্ঞানবাবু। আমাদের শ্রদ্ধেয় জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ। সরোদেও বেশ কিছু নতুন ছেলে ভাল বাজাচ্ছে।'

'বহুদিন থেকে একটা কৌতূহল ছিল', নিখিলবাবুর কথার ফাঁকে বললাম, 'আপনিই সেই কৌতূহল মেটাবার পক্ষে যোগ্যতম মানুষ। আচ্ছা, পন্ডিত রবিশংকরজী এবং অন্যান্য শিল্পীরা পশ্চিমে গিয়ে আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের যে বহুল প্রচার করেছেন এবং বহু বিদেশিকে শিক্ষাদান করছেন সেইসব ছাত্রদের মধ্যে কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আপনার চোখে পড়েছে কি ?'

'ওটা হয় না, একেবারেই সম্ভব নয়। একেক দেশের শাস্ত্রীয় সংগীতের পেছনে থাকে তার প্রকৃতি, পরিবেশ, তার হাজার হাজার বছরের সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। রক্তের মধ্যে, অন্তরের মধ্যে সেই টান অনুভব না করলে, শুধু রেওয়াজ তালিম দিয়ে তুমি কতদূর এগোবে! আজ যাঁরা রাতারাতি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীতের মিলন ঘটিয়ে হাজার বছরের সেই পাঁচিলকে ভেঙে দিতে চাইছেন তাঁরা রেকরড বিক্রির রয়্যালটি পেতে পারেন কিন্তু সঠিক কিছু পাচ্ছেন না। তবে পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, ভারতবর্ষ এখনও পৃথিবীকে দুটি জিনিস শেখাতে পারে। এক হল সংগীত, অন্যটি হল দর্শন। আমাদের এদুটি ভান্ডার এত বেশি সম্পদশালী যে তাতে আর ওসব করবার দরকার কী ? স্বামী বিবেকানন্দ এই ভারতের সম্পদকে নিয়েই কি বিশ্বজয় করে আসেননি ? বিশ্বজয় করেননি রবীন্দ্রনাথ ? আন্তর্জাতিক মিলনের প্রশ্নে আমরাই তো সবচেয়ে মহান কথাগুলি বলেছি। সস্তা চটকের দরকার কী ? উনবিংশ শতকের এই দুজন মনীষী - একজন সূর্যের মত তেজস্বী, অন্যজন সাগরের মত ব্যাপ্ত - সর্বক্ষণ আমার চেতনাকে জুড়ে থাকে। আমি বোধহয় তাই ঐ দিকগুলোতে যেতে পারলাম না।'

প্রশ্নের পালা শেষ। কিন্তু কোথাও যেন একটা রেশ রয়ে গেছে। সেই রেশটুকু কাটাতে মন চাইছিল না। শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিতে এসে পরিচিত হলাম চেতনার গভীরে আত্মস্থ এক অন্য মানুষের সংগে। বিদায় জানিয়ে যখন চলে আসছি তখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'সব প্রশ্নই তো হল। এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করি।' বললাম, 'নিশ্চয়ই, বলুন।' বললেন, 'অনেক কথাই তো জানতে চাইলে, কিন্তু একবারও তো জিজ্ঞাসা করলে না যে আজকের ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, পন্ডিত রবিশংকর বা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বাজনা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হন তার মূল উপকরণটির কারিগর কে ? শুধু তুমি নও, কেউই আমাদের তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করে না। আমাদের প্রতিটি সেতারের পেছনে অনেক পরিশ্রম আর অভিজ্ঞতা ঢেলে যে মানুষটি আমাদের হাতে তা তুলে দেন তাঁর নাম হীরেন রায়। নামটা লিখতে ভুলো না।' □

সাক্ষাৎকার : অজয় সেন

আলোকচিত্র : প্রতীপ বিশ্বাস

দেশের শিল্পকলা না বুঝে রোদ্যাঁর প্রদর্শনীতে উপছে পড়া ভিড় সাহেব ভক্তিরই নামান্তর

অশোক মিত্র

রোদ্যাঁর প্রদর্শনীর প্রত্যাশিত মহৎ সাফল্যে বাঙালিমাত্রেই বিশেষ গর্ববোধ করবেন। ১৯৮১ সালে ওয়াশিংটনে সম্পূর্ণ প্রদর্শনীটি যখন দেখি তখন মনে হয়েছিল, আহা কলকাতাতে যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত! সম্ভব হয়েছে, তার জন্য দেশিবিদেশি উদ্যোক্তাদের সকলে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। দিল্লিতে কয়েকমাস আগে রোদ্যাঁ প্রদর্শনী হয় কিন্তু আমার আশংকামত এখানে কলকাতার উৎসাহের সামান্যমাত্রই দেখা গেছে।

এই প্রসংগে আমার একটি কথা বারবার মনে হচ্ছে, যদিও এটি উপযুক্ত ক্ষণ বা উপলক্ষ কিনা সে বিষয়ে আমার মনে বিশেষ দ্বিধা এবং সংশয় বর্তমান। কারণ রোদ্যাঁ প্রদর্শনীর স্মৃতি ও মহান প্রভাব আমাদের চেতনায় কিছুমাত্র খর্ব হয় এ আমার একেবারেই অভিপ্রায় নয়। তবুও আমার নিবেদন, কোন বিদেশি শিল্পীকে বুঝতে গেলে নিজের দেশের শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ ও বোধ বিশেষ প্রয়োজন। বেটোফনের নবম সিম্ফনি সংগীত রাজ্যে চূড়ান্ত সৃষ্টি। কিন্তু তার আসল কথা তার অদ্ভুত জটিল স্থাপত্য। বিরাট অরকেসট্রার জাঁকজমক নয়, যদিও বিরাট অরকেসট্রাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানর সাফল্যও কিছু কম মনোমুগ্ধকর নয়। কিন্তু তার ঐশ্বর্য সম্যক হৃদয়ংগম করতে গেলে, অথবা মিসা সলেমনিসের আধ্যাত্মিক প্রেরণা রক্তে অনুভব করতে গেলে, সম্পূরক হয় আমাদের দেশের ভৈরবী বা পূরিয়া রাগ, যার স্বর্গীয় পবিত্রভাবের তুলনা মেলাও ভার। দুই রাজ্যের সমতা বজায় না রাখলে, অন্তত পক্ষে কিছুটা আপেক্ষিক মূল্যবোধ না থাকলে, শিল্প ব্যাপারে এই ধরনের প্রদর্শনীর প্রতি উৎসাহ অন্যান্য ব্যাপারের মত, আমাদের মজ্জাগত সাহেব-ভক্তির নামান্তরই থেকে যায়, প্রকৃত মূল্যায়ন আসে না। স্বাজাত্যাভিমানের প্রাচুর্য যদিও আমার নেই, তবুও মনে হয় নিজের দেশের শিল্পীদের না বুঝে অথবা অবহেলা করে, পরধর্ম আগ্রহ বা বিশ্বাস বিশেষ দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না। যা হয় তা নেমন্তন্ন বাড়িতে নামজানা অথচ অপরিচিত বড়লোকের গা ঘেঁষে একটুক্ষণ বসতে পারার আনন্দ।

রোদ্যাঁর চুম্বন নামক ভাস্কর্যটির কথাই ধরা যাক। কাগজে দেখি উদ্বোধনের দিন অনেকেই 'চুম্বনটা কই' প্রশ্ন করতে করতে অধীরভাবে ভাস্কর্যটি খোঁজেন। স্ত্রী পুরুষ বয়স নির্বিশেষে এ আগ্রহ খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক। আমাদের শাস্ত্রে পড়ি শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করেন, ভগবন্ আপনি ব্রহ্মস্বাদের কথা বলেন, সে কেমন অভিজ্ঞতা? গুরু বলেন, কথায় সে-অভিজ্ঞতা তো বোঝাতে পারি না, তবে ব্রহ্মস্বাদের সংগে মানুষী বা প্রাকৃত অভিজ্ঞতার যদি কিছুমাত্র পরোক্ষ তুলনা সম্ভব হয় তবে তা স্ত্রীসংগমের সংগে। যে আত্মনিবেদনে মানুষের আমিত্ব সম্পূর্ণ লয় হয়ে অন্য আত্মা বা বৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, চুম্বন সেই ঐশী, অতীন্দ্রিয় অবস্থার পার্থিব, স্থূল প্রতীক। রোদ্যাঁ নিজে বিশেষ আবেগভরে খেদ করেছেন ভারতীয় ভাস্কর্যে এই সম্পূর্ণ মিলন ও আত্মনিবেদনের যে ভূরিভূরি নিদর্শন দেখা যায় তার তিলাংশও ইউরোপীয় ভাস্কর্যে নেই, এবং তিনি যা করেছেন তা নিজস্ব প্রয়াস মাত্র, ভারতীয় ভাস্কর্যের এই ধরনের প্রকাশের সংগে তার তুলনা হয় না। এ প্রসংগ তুলে আমি রোদ্যাঁর সুমহান কীর্তি কোন মতেই খাটো করতে চাই না। আমার সে উদ্দেশ্যই নয়। ঠিক যে-হিসাবে আমি রোদ্যাঁর হাত-জোড় করা কেথিড্রালের সংগে ড্রারারের যুক্ত করের উল্লেখ করে কোনটি বড় কোনটি ছোট আলোচনা করার কথা ভাবতেই পারি না। অন্যদিকে অযথা স্বাদেশাভিমানে স্ফীত হবার ইচ্ছাও আমার নেই। আমার শুধু খেদ এই, দেশজ পরিবেশে বা আলোচনায় রোদ্যাঁর মহৎ সৃষ্টির ভারতীয় মানসে যে মূল্যায়ন সম্ভব হ ত [illegible] এ উপলক্ষে হল না। চোখের সমুখে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত পাশাপাশি উপস্থাপিত করা সম্ভব নাই হোক, এমনকি লিখিত আলোচনাতেও হল না। ফলে আমাদের রোদ্যাঁর শিল্পশিক্ষা এবং আস্বাদন অসম্পূর্ণ থেকে গেল। নতুন তীব্র আনন্দময় অভিজ্ঞতা হল নিশ্চয়, কিন্তু তার কতখানি বিদেশির প্রতি সম্ভ্রমপ্রসূত, কতখানি প্রকৃত রসাস্বাদসম্ভূত বলা শক্ত। এমনকি এ সম্বন্ধে আরো একটি প্রাসংগিক সচেতনতাও এল না। রোদ্যাঁ কী ভাবে নরনারীর অস্থিমাংসপেশী সম্বলিত প্রাকৃত দেহের পরস্পরকে জড়ান যুগ্ম-হিলিকস বা ডবল স্পাইরাল রূপের শিল্পগত নিরাকরণ করলেন, আর ভারতীয় শিল্পীই বা কীভাবে তার সমাধান করেছেন, প্রাকৃত অপ্রাকৃত দেহের গঠন ও আকারের কী তারতম্য ঘটিয়ে ঐশী বা অতীন্দ্রিয় ভাব এনেছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর তো দূরের কথা, এ ক্ষেত্রে আরো একটি প্রাসংগিক কথা হচ্ছে রোদ্যাঁ একজন বিশিষ্ট শিল্পী এবং ভারতীয় ভাস্কর্য ভারতীয় অভিজ্ঞতার প্রতীক। ঠিক যেমন রোদ্যাঁ, মিকেলানজেলো একদিকে পড়েন, এবং মধ্য বা গথিকযুগের ইওরোপীয় ভাস্কর্য অন্যদিকে পড়ে। একজন দেখাচ্ছেন মানুষ একা কী করতে পারে, অন্যটি দেখাচ্ছে একটি যুগ কী করতে পারে।

আসল প্রস্তাবে আসি। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। হীনমন্যতা আমাদের স্বভাবে। আমার বিশ্বাস, রুচি ও বিচার তখনই নির্ভরযোগ্য হয় যখন আমরা স্বদেশের শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশি শিল্পের এবং বিদেশি শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে দেশি শিল্পের মূল্যায়ন করতে পারি, তাদের স্ব স্ব গুণাবলী শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করতে পারি। তা না করে দেশের সত্যিকারের মহান শিল্পীর আলোচনা প্রসংগে আমাদের এখনও কয়েকটি বিদেশি নাম করতে হবে, যে নামগুলি আসলে শতাব্দীর শেষে আর শোনা যাবে না, অথচ সেই অনুপাতে আমাদের দেশীয় শিল্পীর নাম অন্তত আরো দু একশ বছর থাকবে, অবশ্য যদি বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, সরকার এবং জনগণের সে আগ্রহ থাকে। (অবশ্য সে আগ্রহ জাগরূক রাখার দায়িত্বও আমাদের চিত্ররসিক সমালোচকদের কিছুটা আছে বৈকি)। আগড়ুম বাগড়ুম দুটো বিদেশি নাম না করতে পারলে আমাদের কেউ সমালোচক বলে মানবে না। নিজেকে বড় হীন মনে হবে। উপরন্তু আমাদের শিল্পীও পদে উঠবেন না।

এখন যখন রোদ্যাঁ প্রদর্শনী শেষ হল তখন আমার বিশেষ ইচ্ছা হয় যাতে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আমাদের দেশের ভাস্করদের পরপর চারটি প্রদর্শনী হয়। তাহলে আমরা প্রকৃতভাবে বুঝতে পারতুম রোদ্যাঁর স্থান কোথায়, কত ঊর্ধ্বে, এবং আমাদের সার্থক ভাস্করদের স্থানই বা কোথায়। কোথায় আমাদের ভাস্কররা ব্যক্তিগতভাবে মহৎ অথবা সীমিত, কোথায় তাঁরা প্রকরণ, উপকরণ, অবস্থা-ব্যবস্থার অভাবে

সীমিত। আরো বুঝতে পারতুম কেন কিছুকাল রোদ্যাঁ অবহেলিত ছিলেন এবং কেন তাঁর এই পুনরভ্যুদয়। ধরা যাক আমাদের চারজন ভাস্কর : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রামকিংকর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিন্তামণি কর, আমাদের দেশের পটভূমিতে গুরু হিসাবে, শিল্পী হিসেবে, শিল্পগত সমস্যাবলী নিবাকরণে এবং সব ছাপিয়ে দার্শনিক আবেগে ও বক্তব্যে এবং মননশীলতায় এঁদের অবদানের, ইউরোপীয় পরিবেশে রোদ্যাঁর স্থানের সংগে অনেকাংশে তুলনা চলে। এঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত তাঁদের বিব্রত করা আমার মোটেই অভিপ্রায় নেই, যদিও এ উক্তি তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু দেবীপ্রসাদ বা রামকিংকর সম্বন্ধে একথা বলতে কোন বাধা নেই। এঁদের অনেকগুলি কাজ একত্র করে আমরা যদি ধীরেসুস্থে দেখার সুযোগ পাই তবেই রোদ্যাঁর কীর্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা আসা সম্ভব হবে, যার সংগে অপরিচিতের প্রতি উচ্ছ্বাসের বা অহেতুক সাহেবভক্তির সম্বন্ধ থাকবে না। এই ধরনের পরস্পর সম্পূরক প্রদর্শনীতেই জাতীয় রুচি ও শিল্পচেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়ে নতুন মূল্যবোধে পৌঁছয়। তা না হলে একটি আধটি সুবৃহৎ অথচ অসংপৃক্ত প্রদর্শনী ভেলকিবাজির স্মৃতিতেই পর্যবসিত হয়। তদপেক্ষাও যা ক্ষতিকর, হীনমন্যতা বাড়ে। 'সাহেবরা যেটা পারে, সেটা কি আমরা পারি - গরু খাওয়া হাড় ওদের।' অথচ এই চারজন ভাস্করের কাজ যদি ভাল করে দেখতে পেতুম, কেউ যদি ভাল করে আলোচনা করতেন, বুঝিয়ে দিতেন (এ ক্ষেত্রেও ভাল গুরুর প্রয়োজন, গুরুর কৃপা ছাড়া বোধশক্তিও বাড়ে না) তাহলে বুঝতে পারতুম, পুঁটিমাছ আর কলাইয়ের ডাল খাওয়া হাড়ে কী সম্ভব, অথবা সম্ভব নয়, আর গরু খাওয়া হাড়েই বা কী সম্ভব, অথবা সম্ভব নয়। এখানে একমাত্র গ্রাহ্য প্রশ্ন হবে দেশকালপাত্র ভেদে শিল্পকলার গুণাগুণ বিচার, যে-বিচারে আমাদের রুচি মার্জিত হবে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। □

বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতার সংস্কৃতি—খরা না বন্যা?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কলকাতার রদ্যাঁ প্রদর্শনীর পর সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালির কাছে বিশিষ্ট শিল্পরসিক অশোক মিত্র কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। পরিবর্তনের প্রতিবেদকও কিছু প্রশ্ন রেখে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্পরসিকদের কাছে।

কলকাতার সংস্কৃতি বোঝা বড় দায়! কখনও মনে হয় সংস্কৃতির ভরা বন্যায় এবার বুঝি শহর ভাসিয়ে নেবে, কখনও মনে হয় সংস্কৃতির মাঠে এখন ধু ধু খরা। এই যেমন কয়েক মাস আগে ফরাসি ভাস্কর অগুস্ত রেনে রদ্যাঁর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী দেখতে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। একঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে, যেমন ধাক্কা-ধাক্কি করে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে পুজো দিতে হয়, তেমনি রদ্যাঁর অনুপম সৃষ্টি দেখতে হয়েছিল কলকাতার মানুষকে। না, ওই ভিড়ে যে সব মুখগুলোই পাকা চুল, পাকা জুলপি, খদ্দরের ছাপা পাঞ্জাবি, পাইপ শোভিত ইনটেলেকচুয়ালদের তা নয়, বরং ব্যাংকের কেরানি থেকে এগজিকিউটিভ, লেডি ব্রাবোর্নে পড়া তরুণী থেকে 'উত্তম ফ্যান' মহিলা, সবাই 'দ্য কিস' এবং ''আই অ্যাম বিউটিফুল' দেখেছিলেন বিস্ময় নিয়ে। কাজেই, যদি মনে হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবার বুঝি হয়ে গেল কলকাতায় তা হলে দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না।

এবার খরার চিত্রটি দেখা যাক। রদ্যাঁর সংগে সংগে কলকাতায় এল 'মহান' নামক একটি চলচ্চিত্র। আর আশ্চর্য, সেই সব মুখগুলোই, অর্থাৎ যাদের আমরা ট্রেনে, বাসে, ট্রামে ঠিক পাশের সিটটাতেই বসে থাকতে দেখি, আবার রদ্যাঁর প্রদর্শনীতেও দেখি, তাদেরই দেখা গেল পনের ষোল-টাকা দামে ব্ল্যাকে টিকিট কেটে একই আগ্রহের সংগে 'মহান' দেখতে। 'মহানে'র মত এমন কত অজস্র হিন্দি মারদাঙ্গা ছায়াছবি যে কলকাতার বাজারে এসে টিমটিম করা বাংলা সিনেমার পাশে দারুণভাবে পয়সা লুটে নিচ্ছে তা বোধহয় কোন অবোধকেও বুঝিয়ে বলতে হয় না। অথচ রদ্যাঁ দেখতে উপচে পড়া মানুষ দেখে অনেকে, হ্যাঁ, অনেকেই বলেছিলেন সার্থক শিল্প কলকাতার মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, কদর বুঝে কলকাতার মানুষ দু হাতে জড়িয়ে ধরেছেন তাকেই, যা কিনা শিল্প।

আশ্চর্য, সংস্কৃতিবান মানুষদের শহর এই কলকাতায় যে নব্বই বছরের পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস পেতে বসেছে তার নাম হল 'ইনডিয়ান কলেজ অব আর্ট'। এই কলেজ ভবনটির গায়ে নোনা লাগা ইঁটের দাঁত তো কবেই বেরিয়ে গেছে, এখন ঝড়ে উড়ে গেছে তার ছাদ, জল পড়ছে তার দেয়াল চুঁইয়ে চুঁইয়ে, ভাবী শিল্পীদের ছবি আঁকার জায়গা নেই এ কলেজে, নেই আধুনিক শিল্পমাধ্যম শেখার কোন ব্যবস্থা। অথচ একটু এগোলে ওয়েলিংটনের মোড়ে ডিসকো গানের ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে হু-হু করে, ভিড় উপচে পড়ছে 'জ্যোতি'তে মুক্তি পাওয়া রঙিন হিন্দি ছবিতে। রদ্যাঁর দর্শকদের কাছ থেকে কি এতখানি অবহেলা আশা করা যায় - না কি সত্যিই তারা রদ্যাঁর দর্শক নন - আসলে কলকাতায় শিল্পের বদলে যেটা আছে সেটার নাম কি হুজুগ - এইসব প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম কলকাতার কয়েকজন ঝকঝকে প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের কাছে।

প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলাম শিল্পী পরিতোষ সেনকে। তিনি বললেন, 'ঠিক কথা। এরকম প্রশ্নই আজ ওঠা উচিত। একে আমিও সমর্থন করি। সত্যিই যদি সংস্কৃতিবান হব আমরা, কলকাতার মানুষরা, তা হলে মাত্র কয়েক মাস আগে রদ্যাঁ দেখে কী শিক্ষা পেলাম? শহরের বুকে সব থেকে পুরনো একটা আর্ট কলেজ আজ ধ্বংস হতে বসেছে, তা নিয়ে তো কারুর কোন আলোচনা শুনি না। বরং সেই একই রকম হিন্দি সিনেমার ভিড়, হৈ-হুল্লোড়। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই সব কিছু একটা হুজুগ। শিল্পবোধের ব্যাপার যদি সত্যিই থাকবে তা হলে মানুষের রুচি এর পরও পালটালো না কেন? আর এসব কথা ছেড়েই দিন। শিল্পের দিক দিয়েও কি আমরা বিশেষ কিছু শিক্ষা পেলাম? এই কিছুদিন আগে রদ্যাঁর ভাস্কর্যও দেখলাম, আর এখন সরকারি সাহায্যে গড়া আমাদের এখানে মূর্তিগুলোও দেখছি। এগুলোকে কী মনে হয়? জঞ্জাল না পুতুল?'

চিত্রশিল্পে এই সময়ের আরেকজন মেধাসম্পন্ন প্রতিভা, দারুণ রাগী চেহারার অমিতাভ ব্যানার্জি বললেন, 'আসলে শিল্প বোধটোধ নয়, আধুনিক প্রচারযন্ত্রগুলো তাদের ভূমিকা ভালভাবে পালন করে,

লোককে রদাঁ বা ঐ সব প্রদর্শনীতে আকৃষ্ট করে। যেমন ভাল বিজ্ঞাপন করে। কাজেই, সংস্কৃতিবোধ আছে এ কথা বলা যায় কি? আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা কোন-দিনই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। খুব স্বাভাবিক, শিল্প সম্পর্কে তাদের একটা অনীহা থেকে গেছেই। কাজেই শিল্পকে ভালবেসে তারা কোথাও আসে না। অথচ শিল্পেরও একটা বিরাট ভূমিকা আমাদের জীবনে আছে। এটাও তাদের বোঝান দরকার।'

'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বললেন, 'এখানে তো পেলেকে দেখতেও লোকের ভিড় হয়, 'বাবা তারকনাথ' দেখতেও লোক ভিড় করে, আবার রদাঁ দেখতেও ঐ একই লোক যায়। এটা কি শিল্পবোধ? পুরোটাই আসলে হুজুগ। সর্বত্র আমাদের শূন্যকুম্ভতা বিরাজ করছে। অথচ দেখুন, একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, ফুটবল তো একটা জনপ্রিয় খেলা কলকাতায়। তার উন্নতির জন্য আমরা কি সচেষ্ট হতে পেরেছি কোনদিন? তেমনি এই যে এখানকার মানুষরা, যারা রদাঁ দেখতে যায়, আবার 'বাবা তারকনাথ'ও দেখে, তাদের যেসব জনপ্রিয় নেতারা তারা কি ওদের রুচিবোধ উন্নতির জন্য কিছু করতে পেরেছেন কোনদিন? ফাঁকটা এখানেই।'

চলচ্চিত্র শিল্পী ভিকটর ব্যানারজির মতে 'রদাঁ বা পিকাসো যে কোন শিল্পীকেই কলকাতায় আনা যাক না কেন, উৎসাহ কলকাতার লোকের ভেতর দেখা দেবেই। আমি তাদের এই ভাল লাগাটাকে হুজুগ বলতে রাজি নই। প্রচারযন্ত্র তাদের আকৃষ্ট করেছে, এ কথাও বলতে চাই না। তারা নিজেরাই কিছুটা উৎসাহ নিয়ে এসব দেখতে আসেন। শুধু বিদেশি কেন, আমি তো এখানকার শিল্পীদের, যেমন ধরুন হুসেনের প্রদর্শনী করে দেখেছি, লোক বেশ ভিড় করে। আমার যেটা মনে হয়, এখানকার শিল্পের দুরবস্থাটা আমরা তাদের হয়ত ভালভাবে বোঝাতে পারছি না, বা তাদের কাছে যেতে পারছি না। হয়ত ঠিকমত বোঝাতে পারলে তারা সাহায্য করবেন। যেমন এই ইনডিয়ান আর্ট কলেজের কথাই বলা যায়, এই কলেজের সঙ্গে যারা জড়িত তারা যদি রাস্তায় নেমে একদিন কলকাতার মানুষদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে সবাই তাদের সাধ্যমত সাহায্য করবে।'

এখনকার অন্যতম ভাস্কর শ্রীমতী মীনা মুখার্জির চুলে কিছুটা পাক ধরলেও তাঁর ভাস্কর্যের গতি ত্বরা উঠেছে আরও দুরন্ত। স্বতন্ত্র পথে চলা শ্রীমতী মুখার্জি প্রশ্নের উত্তরে বললেন 'আমরা সবাই জীবনে লড়াই করতে করতে একটা গণ্ডির ভেতরে আটকে পড়েছি। সেই গণ্ডি পেরিয়ে এখন আর অন্য কোন কিছুর প্রতি আমরা উৎসাহ বোধ করি না। এখানেই গণ্ডগোলটা হয়ে গেছে। এর বেশি আর কী বলতে পারি। তবে অন্য কারুর কথা জানি না, যদি কোনদিন শিল্প সংস্কৃতির উন্নতির জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত।'

কিন্তু শুধু এরাই নয়। ভবিষ্যতের যারা শিল্পী, যাদের কাঁধে দায়িত্ব আছে কলকাতার বুকে সুস্থ শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে তোলার, যারা ইনডিয়ান আর্ট কলেজের ধসে যাওয়া বাড়িতে ভাঙা ছাদের তলায় বসে ছবি এঁকে যাচ্ছেন, আর লড়াই চালাচ্ছেন নব্বই বছরের পুরনো এই কলেজটিকে বাঁচিয়ে তোলার, তাদেরও একটা মতামতের প্রয়োজন আছে। তারা জানালেন 'সরকারের সংস্কারের শর্ত কি এটা? এই যে ভাঙা ছাদের তলায় দীর্ঘ দিন অবহেলার মধ্যে আমরা যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, কোথাও কোন নিশ্চয়তা নেই কই তা নিয়ে তো এখানকার মানুষ একটাও কথা বলেন না? এখন এখান থেকে আমরা যদি অপসংস্কৃতির পাঠ নিয়ে যাই তাহলে দোষটা কাকে দেব?'।

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

শুভ্রার মৃত্যু কি একটি অব্যবস্থার প্রতিবাদে?

পিনাকী মজুমদার

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার যোগমায়াদেবী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শুভ্রা মিত্র অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাবার পর তার আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীরা অনেক অভিযোগ তুলেছেন এই কলেজের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে। এই নিয়ে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার সরজমিন তদন্ত করেছেন। তাতে [illegible] এই প্রতিবেদন।

জন্মদিন মৃত্যুদিন

দক্ষিণ কলকাতার বিজয় মুখারজি লেনের বাসিন্দা অষ্টাদশী শুভ্রা সহজভাবেই ওর বড় জামাইবাবু শান্তিময় ব্যানারজিকে বলেছিল -- 'আগামী কাল আসছেন তো?'

শান্তিময়বাবুদের বাড়ি শুভ্রাদের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়। কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষ শান্তিময়বাবু কিছুদিন আগেই বিয়ে করেছেন শুভ্রার একমাত্র দিদি শুক্লাকে। শুধু শুক্লাকে বিয়ে করার সুবাদেই নয় - শান্তিময়বাবু শুভ্রাকে চেনেন ওর শিশু অবস্থা থেকেই। শুভ্রা ছোটবেলা থেকেই কাছাকাছি এলাকার 'বৈজয়ন্তী মণিমেলার' সংগে যুক্ত হয়ে পড়ে। খেলাধুলা, বিতর্ক, নাটক, নাচগান প্রভৃতিতে অংশ নিতে শুরু করে। সে সময়ে শান্তিময়বাবু শুভ্রার পাড়ার দাদাই নয়, ইনসট্রাকটরও বটে। সুতরাং পরবর্তীকালে শান্তিময়বাবু শুভ্রার জামাইবাবু হলেও ওদের সম্পর্কের মধ্যে চটুল রসিকতার সম্পর্ক বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। সহজ কথার সহজ উত্তর - এ ভাবেই শান্তিময়বাবুর সংগে শুভ্রার সম্পর্ক গড়িয়ে চলেছিল। সুতরাং শুভ্রার এ আমন্ত্রণের প্রশ্নে শান্তিময়বাবুর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর – 'না এসে পারি! বিখ্যাত লোকের জন্মদিন বলে কথা।'

: শুধু জন্মদিনই নয়, মৃত্যুদিনও বটে। সুন্দরী শুভ্রাও উত্তর দিয়েছিল ঝটিতি।

শুভ্রা এবং শান্তিময়বাবুর এ কথার মধ্যে কিছু 'না-বলা' কথাও লুকিয়ে ছিল। পরের দিনটি ১ জুলাই। ও দিনটি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন। আবার ও দিনটিতেই জন্মেছে শুভ্রা মিত্রও। সুতরাং আগের দিন রাত্রে শুভ্রা নিজের জন্মদিন উপলক্ষেই শান্তিময়বাবুকে পরের দিন ওদের বাড়িতে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তার উত্তরে শান্তিময়বাবু সহজ রসিকতায় শুভ্রাকে বিখ্যাত লোকের সংগে তুলনা করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন 'কাল না এসে পারি? বিখ্যাত লোকের জন্মদিন বলে কথা!'

উত্তরে শুভ্রা বলেছিল, 'শুধু জন্মদিনই নয়, মৃত্যুদিনও বটে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তিময়বাবু বা বাড়ির আর কারুরই মনে হয়নি শুভ্রার এ কথার মধ্যেও কিছু না-বলা কথা লুকানো ছিল। 'কথার পিঠে কথা' ভেবেই এরপর চুপ করে গিয়েছিলেন শান্তিময়বাবু। শুভ্রাও সহজভাবে টুকটাক কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে। সদ্য মা হওয়ার সুবাদে কয়েক মাস বাপের বাড়িতে থাকা দিদি শুক্লার সংগে সহজভাবেই কথা বলেছে। শান্তিময়বাবু বিদায় নেবার আগে যথারীতি শুভ্রাকে ডেকে বলেছেন, 'টুটু চললাম।' শুভ্রাও উত্তর দিয়েছে, 'কাল আসবেন কিন্তু।'

শান্তিময়বাবু বিদায় নিতেই মা জয়ন্তী দেবী ওদের খেতে যাবার জন্যে তাগাদা দেন। বার কয়েক তাগাদা খেয়েও দুই বোনের মধ্যে কথার রেশ ফিকে হতে চায় না। অবশেষে মা জয়ন্তী দেবীর মধ্যে সামান্য উষ্মা – 'কি রে! তোরা খেতে আসবি? নাকি সারারাত গল্পই করবি?'

মায়ের এই তাগাদায় শুক্লা ছোট বোন শুভ্রাকে তাড়া দেয় – 'চল, মা রেগে যাচ্ছে।' শুভ্রা হাসে। বলে 'চল'।

আর দশটা স্বাভাবিক রাতের মতই ৩০ জুনের রাত। দুই বোন, এক ভাই, মা-বাবা খাওয়া দাওয়া সারে এক সংগে। একটি মাত্র বড় ঘরের খাটের ওপর শুক্লা তার সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে শোয়। নিচে বিছানা পেতে মা এবং শুভ্রা। অন্য ঘরে বাবা এবং ছোট ভাই প্রদীপ।

ছেলেবেলায় শুভ্রা/লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

শোয়ার একটু আগে শুভ্রা নিজের থেকেই দিদির বাচ্চার কাঁথাগুলো ভাঁজ করে দেয়। তারপর বিছানা করে মার পাশে যথারীতি শুয়ে পড়ে।

রাত প্রায় দুটো নাগাদ বাচ্চার কান্নায় শুক্লার ঘুম ভেঙে যায়। আলো জ্বালায়। বাচ্চাকে খাওয়ায়। আধঘন্টার চেষ্টায় ঘুম পাড়ায়। তারপর নিজেও শুয়ে পড়ে। সে মুহূর্তে শুভ্রা যথারীতি মায়ের পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎই রাত চারটে নাগাদ ঘরের বাইরে থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ এসে আছড়ে পড়ে ঘরের মধ্যে – 'মা গো! জ্বলে গেলাম।'

ক্ষীণ কণ্ঠের এই গোঙানি একটিবারের জন্যেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তাতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শুক্লা এবং জয়ন্তী দেবীর। দুজনেই ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে লাইট জ্বালতেই লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা খোলা। ঘর ছেড়ে দু জনে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরোতেই মা জয়ন্তী দেবী আর্তনাদ করে ওঠেন সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়ে যাওয়া শুভ্রাকে দেখে। সংজ্ঞা [illegible]

আত্মহত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা বা বাধ্য করাও কম অপরাধ নয়। এর জন্যেও তাই শাস্তির বিধান রয়েছে আইনে। কিন্তু 'কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি' যদি কাউকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে? সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার যোগমায়াদেবী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শুভ্রা মিত্রর আত্মহত্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম কলকাতার এক প্রখ্যাত আইনজীবীর কাছে।

ক্রিমিনাল কেসে ঝানু এই আইনজীবী ভদ্রলোক কিন্তু সংগে সংগেই এর উত্তর দিতে পারেননি। দু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছেন - 'না, এ রকম কোন আইন আমাদের হাতে নেই যা সেই 'ব্যবস্থা বা পদ্ধতির' বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়।'

সুতরাং দক্ষিণ কলকাতার সুদর্শনা শুভ্রা মিত্রর আত্মহত্যার ঘটনায় ওর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী এবং কাছাকাছি অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের ক্ষোভ এবং হতাশা আছড়ে পড়ছে। সমস্বরে তারা প্রশ্ন তুলছেন-'এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার মত কি কোন আইনই নেই? প্রতিকার নেই কোন?'

মুহূর্তে মা জয়ন্তী দেবী জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমার এ অবস্থা হল কী করে? নিজে করলে?'

শুভ্রার গায়ের পোশাকের তখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। গায়ের চামড়াও পুড়ে শেষ। সেই অবস্থাতেই কোনরকমে বলে 'আমি নিজেই করেছি।'

: কিন্তু কেন, কেন, কেন? শুভ্রা হাউহাউ করে ডুকরে উঠেছিল। শুভ্রা জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে কোন রকমে বলেছিল, 'ওরা যে বলল তোমাকে আর কলেজে আসতে হবে না। তুমি ফেল করেছ ....।' শুভ্রা শেষ করতে পারেনি তার কথা। তার সংজ্ঞাহীন দেহটার উদ্দেশে দিদি শুভ্রার তখনও উদ্বিগ্ন প্রশ্ন আছড়ে পড়ছে 'কে তোমাকে কলেজে যেতে বারণ করেছিল? কে? বলো আমাকে, কে?'

এ প্রশ্নের উত্তর শুভ্রা দিতে পারেনি। পারবেও না আর কোনদিন। ওর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে সংগে সংগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে। ওখানে 'বারন ওয়ারড' নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল। সংগে সংগেই বাড়ির লোকেরা শুভ্রার সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে ছুটলেন এস এস কে এম হাসপাতালে। এরপর কয়েকঘণ্টা ধরে চলে যমে-মানুষে টানাটানি। অবশেষে ১ জুলাই বেলা ১২টা বেজে ৫ মিনিট নাগাদ শুভ্রা মৃত্যুর কোলে মাথা রাখে জন্ম এবং মৃত্যুকে একই মালায় গেঁথে।

আত্মহত্যার পেছনে

শুভ্রা আত্মহত্যা করল! ঠিক যে বয়সে মেয়েরা জীবন সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে – কল্পনার মুখোশ ছিঁড়ে বাস্তবের মুখোমুখি হতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই শুভ্রা বাস্তব জগতের সমস্ত চাওয়া পাওয়া থেকে নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিল।

যে কোন খুনের ব্যাপারে যেমন একটা মোটিভ কাজ করে, ঠিক সে রকমই যে কোন আত্মহত্যার পেছনেও থাকে একটা ইমোশন বা আবেগ। হতাশা, ক্ষোভ, দারিদ্র, ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েই আত্মহত্যা করে। এ অভিমত মনোবিশেষজ্ঞদের। সুতরাং আত্মহত্যা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। আইনের চোখেও এটা অপরাধ।

তবু আত্মহত্যা হচ্ছে। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লে, শাস্তির বিধান আছে আইনে। এ কথা জেনেও অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আর বেশির ভাগ আত্মহত্যার পেছনে কারণ থাকে – সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু এ সমস্ত কারণ ছাড়াও কেউ কেউ বিচিত্র কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। যেমন, দেশে 'জরুরী অবস্থা' চলাকালীন কোন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে আটক করার প্রতিবাদে সারা পৃথিবীতে বেশ কয়েকজন অনুগামী প্রকাশ্যে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেয়। অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু শুভ্রা মিত্র? তার আত্মহত্যার পেছনে কী কারণ? সমস্যা থেকে মুক্তি? নাকি কোন কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ?

শুভ্রা মিত্রের আত্মীয়-স্বজন এবং সহপাঠীরা একযোগে অভিযোগ করেছেন – 'শুভ্রার আত্মহত্যা কোন সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নয়। ও আত্মহত্যা করেছে 'একটি অব্যবস্থার প্রতিবাদে।'

২ জন ছাড়া সবাই ফেল

দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পারক সংলগ্ন আশুতোষ কলেজের প্রাতঃকালীন বিভাগ যোগমায়া দেবী কলেজ। এ কলেজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান শাখায়। উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির জন্যে যোগ্যতার মাপকাঠি ঠিক করেছেন 'হাই সেকেন্ড ডিভিশন।'

সুতরাং, বেলতলা গারলস হাই স্কুল থেকে সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা শুভ্রা মিত্র এসে উপস্থিত হয়েছিল যোগমায়াদেবী কলেজে ভর্তির জন্য। ওর হাতে ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৫০৬ নম্বরের যোগ্যতাপত্র। 'হাই সেকেন্ড ডিভিশন' পাওয়া অন্যান্য মেয়েদের মত শুভ্রাও সহজেই ভর্তির সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

এরপর গত একটা বছর – শীত গ্রীষ্ম বার মাস সকাল হতেই চশমা পরা সুন্দরী শুভ্রা ঠিক সময়েই হাজির হয়েছে কলেজে। ক্লাস করেছে। অবসর সময় বা অফ-পিরিয়ড কাটিয়েছে দু চারজন বান্ধবীর সংগে কমনরুমে গল্প করে।

শুভ্রা মিত্রর পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনরা দাবি করেছেন শুভ্রা কলেজে যাওয়া ছাড়া অন্য সময়ে কখনও বাড়ি থেকে বেরত না। বেরলেও একা নয়। বাড়ির কারুর সংগে। কলেজের ঘনিষ্ট সহপাঠিনীরা জানিয়েছে ও স্বভাবে ছিল শান্ত। কথা বলত কম। আর দশটা সদ্য কলেজে ঢোকা মেয়েদের মত সিনেমা দেখা, ঘোরা, বাধাবন্ধহীনভাবে যা খুশী তাই করা প্রভৃতির প্রতি ওর কোন আকর্ষণ ছিল না। খুব খোলাখুলিভাবেই শুভ্রার তিন সহপাঠিনী সোমা পাল, শর্মিষ্ঠা বোস এবং দীপান্বিতা বোস বলেছে – 'শুভ্রার কোন ছেলে বন্ধু ছিল না। থাকলে আমরা জানতাম। এমনকি ছেলেদের প্রতি সহজাত আকর্ষণও বিশেষ ছিল না।'

সুতরাং শুভ্রা মিত্রর ছাত্রী জীবন যথার্থভাবেই পড়াশোনা এবং কলেজ যাতায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বপ্ন ছিল বড় হবার। কথার ছলে বাড়ির লোকজনদের কাছে তার সেই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছে– 'বড় হয়ে আমি একটা লাইব্রেরি করব। অনেক বই কিনব......পড়ব।'

'পড়ার প্রতি ওর ঝোঁক চিরকালেরই'–এ কথা জানিয়েছেন ওর দিদি শুভ্রা। 'পাঠ্যবই ছাড়াও যা হাতে পেত তাই পড়ত। নিয়মিত 'পরিবর্তন' পত্রিকা পড়ত, 'পরিবর্তন' পত্রিকার শব্দ-শৃংখল নিয়েও মাতামাতি করত।'

'হাই সেকেন্ড ডিভিশনে' মাধ্যমিক পাশ করা শুভ্রার পড়াশোনা নিয়ে মাতামাতি বেড়ে গিয়েছিল কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা আসতেই। অর্থাৎ একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা। এ পরীক্ষা কলেজ কর্তৃপক্ষই নিয়ে থাকেন। কলেজ কর্তৃপক্ষই প্রশ্নপত্র তৈরি করেন, খাতা দেখেন কলেজের অধ্যাপকরাই। সুতরাং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও শুভ্রার কাছে তা মনে হয়নি। –শুভ্রার জামাইবাবু শান্তিময়বাবু শুভ্রা সম্পর্কে এ দাবী করেন। তাঁর মতে শুভ্রা কলেজের ক্লাস প্রমোশনের পরীক্ষার জন্যও ফাইন্যাল পরীক্ষার গুরুত্ব নিয়েই প্রস্তুতি নিয়েছিল। শান্তিময়বাবুর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় শুভ্রার ঘনিষ্ঠ সহপাঠিনীদের কাছ থেকেও।

অবশেষে পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে বাড়ির লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে উচ্ছ্বসিতভাবেই শুভ্রা বলেছিল পরীক্ষা যথেষ্ট ভাল হয়েছে। ওর ঘনিষ্ঠজনরা দাবী করেছেন–এ পরীক্ষা দেওয়ার পর শুভ্রাকে কখনও চিন্তিত হতে দেখিনি।

সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই শুভ্রা গত ১০ জুন সকালে কলেজে পৌঁছে ছিল। ওইদিনই ওদের রেজাল্ট বেরবার কথা। বেরলও। লিস্ট টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে মাত্র দু জনের নাম। বলা বাহুল্য সে দু'জনের মধ্যে শুভ্রা মিত্র নেই।

এবার শুভ্রার অবাক হবার পালা। ওর টিউশন ফি সমেত অন্যান্য ফি আপ-টু-ডেট। তাহলে?

· তবে কি ও ফেল করেছে ?

শুভ্রা খোঁজ নেবার চেষ্টা করে। শুধু শুভ্রাই নয়, ওর ক্লাসের অন্যান্যরাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল প্রমোশন লিসটে তাদের নাম না থাকায়। তারাও খোঁজ নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওদিন ওরা জানতে পারেনা যে কেন তাদের প্রমোশন লিসটে নাম নেই।

শুভ্রা বাড়িতে ফিরে সে কথা জানায়। ফলে পরের দিনই শুভ্রার কাকা প্রভাত মিত্র খোঁজ নিতে কলেজে যান। প্রভাতবাবু অভিযোগ করেন যে, ওদিন তিনি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত গুপ্তর সংগে দেখা করার জন্য। কিন্তু তিনি নাকি তাকে দেখা করার অনুমতি দেননি। ফলে প্রভাতবাবু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এ ঘটনার দু'একদিন পর শুভ্রার জামাইবাবু শান্তিময়বাবু কলেজে যান। তিনিও প্রিনসিপালের সংগে দেখা করার অনুমতি চান। সেদিন শুধু শান্তিময়বাবুই নন, অধিকাংশ ছাত্রীর অভিভাবকরাই এসেছিলেন। তারাও প্রিনসিপালের সংগে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ছাত্রীদের অভিভাবক এবং ইউনিয়ন সূত্রে জানা যায় এদিনও কলেজ কর্তৃপক্ষের কেউই অভিভাবকদের সংগে দেখা করতে চান না। ফলে একসময় জনাদশেক ছাত্রীর অভিভাবক বিনা অনুমতিতেই প্রিনসিপালের ঘরে ঢুকে পড়েন।

বেশ কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন-'এ ভাবে বিনা অনুমতিতে প্রিনসিপালেব ঘরে ঢুকে পড়ায় প্রিন্সিপাল অসন্তুষ্ট হন। একটু উষ্মাও প্রকাশ করেন।'

সেদিন সেই অনুপ্রবেশকারী দলেব মধ্যে শুভ্রার জামাইবাবু শান্তিময়বাবুও ছিলেন। তিনি তখন শুভ্রার প্রসংগে জানতে চান। প্রিনসিপাল তখন 'রেজাল্ট বুক' আনান। সেটা দেখিয়ে শান্তিময়বাবুকে বলেন, শুভ্রা একমাত্র এ্যাডিশনাল সাবজেক্ট ছাড়া বাকি পাঁচ বিষয়েই ফেল করেছে।

শান্তিময়বাবু বিশ্বাস করতে পারেন না নিজের কানকেই। যে মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায ৫৬ ২ % নমবর পেয়ে পাশ করেছে, যে মেয়ে ক্লাস প্রমোশনের পরীক্ষাব জন্য গত তিন মাস ধরে আন্তরিকভাবে পড়াশুনা করেছে, সে মেয়ে সব বিষয়ে ফেল করেছে!--কিছুটা বিস্ময়াভিভূত চোখেই শান্তিময়বাবু রেজাল্ট বুকের ওপর চোখ রাখেন। কিন্তু এ কী!

শান্তিময়বাবু রেজাল্ট বুকেব ওপব আঙুল তুলে প্রিনসিপাল সুব্রতবাবুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন--'এ তো শুভ্রা ঘোষ। আমার ক্যানডিডেটের নাম তো শুভ্রা মিত্র।'

'প্রিনসিপাল সুব্রতবাবু এ কথায় কিছুটা থতমত খেয়ে যান। তারপর বলেন--শুভ্রা ঘোষ বলে ওদের ক্লাসে কেউ নেই। ওটা ভুল করে 'ঘোষ লেখা হয়েছে।' -সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী অভিভাবকদেব অভিযোগ এ রকমই। শান্তিময়বাবু আরও অভিযোগ করেন-এরপর প্রিনসিপাল একজন ক্লারককে ডাকেন। তিনি সবার চোখের সামনেই 'রেজাল্ট বুকে' লেখা 'শুভ্রা ঘোষ' কেটে 'শুভ্রা মিত্র' করেন।

শান্তিময়বাবু বা অন্যান্য অভিভাবকদের এই অভিযোগেব সত্যতা যাচাই করতে গত ৭ জুলাই আমি নিজেই প্রিনসিপাল সুব্রতবাবু সংগে দেখা করি। সুব্রতবাবু সে কথা অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন--'রেজাল্ট বুকে ভুল করে শুভ্রা ঘোষ লেখা হয়েছিল। সেটা সংগে সংগেই কারেকশন করে দিই।'

যাই হোক, এরপব শান্তিময়বাবু অধ্যক্ষকে বলেন যে শুভ্রার এত খারাপ রেজাল্ট তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুতরাং তাদের খাতা দেখতে দেওয়া হোক। সুব্রতবাবু বলেন--'খাতা দেখান যাবে না। কারণ একমাত্র অনাবসেব খাতাই দেখতে দেওয়া হয়।'

'তাহলে উপায় ?' জানতে চেয়েছিলেন শান্তিময়বাবু। সুব্রতবাবু উত্তর দিয়েছিলেন--'আগামী ২ জুলাই' একবাব আসুন। দেখা যাক কী করা যায়।'

শান্তিময়বাবু ফিবে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন ২ জুলাই আবাব যাবেন। এদিকে শুভ্রা কিন্তু কলেজ যাওয়া বন্ধ করেনি। প্রায় প্রতিদিনই কলেজ গিয়েছে। দু' একদিনেব মধ্যেই জানতে পেরেছে ওদের ক্লাসের মোট ৭৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ৬৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে ২ জন মাত্র পাশ করেছে। কয়েকদিন পবে আরও ১২ জনকে প্রমোশন দেওয়া হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকেও সে লিসট দেখিয়েছেন। তারপর বলেছেন--'আমরা ঠিক করেছিলাম মোটামুটি যারা তিনটি বিষয় পর্যন্ত ফেল করেছে তাদের একটা রি-টেসট নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আমরা রিটেসটের নোটিশও দিয়ে দিয়েছি।

যাইহোক শুভ্রা শেষবারেব মত কলেজ যায় মৃত্যুর দিন চারেক আগে। সেদিন ওকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বলে জানিয়েছে ওর দু'জন সহপাঠিনী। ইউনিয়নের একজন সদস্যাও সে কথা জানান। তিনি জানিয়েছেন--ওদিন ওকে বিমর্ষ দেখে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম--অত মন খারাপ করছিস কেন ? দেখা যাক না কী হয়।

অনন্যা সেন

শুভ্রা কিন্ত 'শেষ পর্যন্ত দেখার' ধৈর্য ধরতে পারেনি। ১ জুলাই ভোর রাত্রেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

পরীক্ষার ফল এত খারাপ কেন ?

শুভ্রা আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় যোগমায়াদেবী কলেজের প্রিনসিপাল শোক প্রকাশ করেছেন। আমার সংগে কথা বলার সময়ে বলেছেন--'শুভ্রার মৃত্যুতে আমরা নিদারুণ দুঃখিত--এ কথাটাও দয়া করে লিখে দেবেন।'

কলেজ কর্তৃপক্ষ শুভ্রার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেও কলেজের ছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং কলেজ ইউনিয়ন তীব্র ভাষায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাদের ক্ষোভ শুধু শুভ্রাব মৃত্যুর জন্যেই নয়। পরীক্ষা সংক্রান্ত অব্যবস্থার জন্যেও। কলেজ ইউনিয়নেব সম্পাদিকা অনন্যা সেন এবং তার দুই সহকারি সুস্মিতা পন্ডা এবং শুক্লা ভাওয়াল লিখিতভাবে আমাদেব কাছে অভিযোগ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে--'যোগমায়াদেবী কলেজের প্রথম বর্ষে ও একাদশ শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ছাত্রী পরীক্ষায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফলাফলে তার অনুপস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে। আবার কোন ছাত্রী যে বিষয়ে পরীক্ষা দেয়নি সেই বিষয়ে তিনি পাশ করে গেছেন।......এ সমস্তই পরীক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট অব্যবস্থাই প্রমাণ করে।

আমরা ছাত্রী সংসদের পক্ষ থেকে এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং তদন্ত করে ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের সন্দেহ নিরসনের জন্য তদন্ত করতে হবে--এই মর্মে অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।'

ছাত্রী ইউনিয়নের লিখিত এই অভিযোগ থেকে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে চিত্রটা আন্দাজ করা যায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে পরীক্ষার ফল নিয়ে ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে।

শুধু একাদশ শ্রেণীই নয়, বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্রীরাও একই অভিযোগ করেছেন। তারাও জানিয়েছেন প্রথম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষার সামান্য কয়েকজন পাশ করেছে। বাকি সবাইকে রি-টেসট দিতে হচ্ছে। ছাত্রীদের তরফ থেকে আরও জানান হয় রি-টেসটের জন্যে প্রত্যেক ছাত্রীকে ৬ টাকা করে জমা দিতে বলা হয়েছে। তারা সে টাকা জমা দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ নাকি তার কোন রসিদ এখন পর্যন্ত দেননি। ছাত্রীদের দু'একজন অভিভাবকও এ কথা জানিয়েছেন।

তাছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষের অসংখ্য ভুলের নজির তারা তুলে ধরেন। যেমন--একাদশ শ্রেণীর নূপুর মুখারজি প্রথমে জানতে পারে সে বায়োলজিতে মোট ১৭ নমবর পেয়েছে। পরে দেখে সে শুধু জুওলজিতেই পেয়েছে ২৩ নমবর। বোটানিব নমবর এখনও জানতে পারেনি। তাহলে বায়োলজিতে তার মোট নমবর ১৭ হয় কী করে ?

বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী মহুয়া সবকাব জানায় রেজাল্ট বেরোতে সে দেখে লিসটে তার নাম নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেন সে সব বিষয়ে ফেল করেছে। মহুয়া তখন নিজেই তদ্বির করে রেজাল্ট দেখে। তাতে দেখা যায় সে সব বিষয়ে পাশ। তখন অফিস থেকে বলা হয়--ভুল করে তার নাম সায়েনস গ্রুপে চলে গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে মৃতা শুভ্রা মিত্রর তিনটি বিষয়ের খাতা আমাদের হাতে এসেছে। ইংরেজি, বায়োলজি এবং ফিজিকস। খাতা দেখা হয়েছে দু'রকম কালিতে। প্রথমে যে নমবর দেওয়া হয়েছে পরে অন্য কালিতে সে নমবর কেটে কমানো, বাড়ানো হয়েছে। এই 'কারেকশন' করার জন্য কোন ইনিশিয়াল করা হয়নি।

এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্রী ইউনিয়ন এবং ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'অব্যবস্থার' অভিযোগ তুলছেন। তারা সরাসরি বলছেন--'প্রত্যেক ক্লাসেই সামান্য কয়েকজনকে পাশ করিয়ে বাকিদের রি-টেসট দিতে বাধ্য করছেন। রি-টেসটের জন্য ফি নিচ্ছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের এটা ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তি।' শুভ্রার জামাইবাবু শান্তিময়বাবু সন্দেহ প্রকাশ করে বলছেন--'রি-টেসটের ফি আদায় করার জন্যেই কি কর্তৃপক্ষ পাইকারী হারে ফেল করাচ্ছেন ? এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া উচিত।' □

আলোকচিত্র : লেখক

আমেরিকার চিঠি

আমেরিকান সমাজে হিপোক্রেসি যেমন আছে তেমনি আন্তরিকতাও আছে

মিনিয়াপোলিস থেকে সুদীপ মজুমদার

এক সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হলাম একটা পারটিতে। পারটি আমেরিকান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংগ। শুক্রবারের সন্ধ্যায় যদি পারটি হয় তা হলে তো কথাই নেই। আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা কোনও আমেরিকান এর বাড়িতে আমন্ত্রিত হওয়া। বেশির ভাগ তরুণ সাংবাদিক আসছে জেনে উৎসাহ বাড়ে। নিজের কামরা থেকে বেরোতেই দেখি এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। বয়স বছর ৩৫ হবে, আয়ারল্যানডের মানুষ, কিন্তু এখন এদেশেই সাংবাদিকতা করছেন। আমাদের গ্রুপের আরও কয়েকজন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ওই পারটিতে। গাড়িতে গিয়ে বসার পর আইরিশ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনারা রাতের খাবার খেয়েছেন তো?' মনে মনে ভাবলাম এ আবার কী ধরনের পারটি যে খেয়ে দেয়ে যেতে হয়! প্রশ্ন থেকে ইংগিত পেয়ে বললাম, 'না, তবে পথে খেয়ে নিলে কেমন হয়?' ঠিক তাই হল। রেসটুরেনটে ডিনার খেয়ে বাইরে বেরোতে আইরিশ সাংবাদিক বললেন, যে যার নিজের ড্রিংকস কিনে নিন। এক দোকান থেকে সবাই নিজের পছন্দমত ড্রিংকস কিনে নিল। আমার অবাক লাগছিল। কারও বাড়িতে আমন্ত্রিত হলে কি বাড়ির থেকে খাবার খেয়ে পান করার সামগ্রী নিয়ে যেতে হয়!

যাই হোক, মিনিয়াপোলিস শহরের একপ্রান্তে সাজান দোতলা বাড়ি। থাকেন একজন মহিলা টি ভি সাংবাদিক। আইরিশ ভদ্রলোকের প্রাক্তন বান্ধবী। জনা কুড়ি সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত। এরা সবাই খবরের কাগজ, রেডিও অথবা টি ভি স্টেশনে কাজ করেন। একজন লস অ্যানজেলেস টাইমসের রিপোর-টার। এখানে এসেছেন ছুটি কাটাতে। বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা করে যাবেন। বৈঠকখানা ঘরে স্টিরিও বাজছে। আধুনিক রক মিউজিক। বেশ জোরে। কানে লাগে। গেলাসে অথবা বোতলে চুমুক দিয়ে সবাই এর ওর সংগে আলাপ করার চেষ্টা করছেন। এক গ্লাস জল নিয়ে এক কোণে সোফায় চুপচাপ বসে গেলাম। কোণ থেকে দেখতে ভাল লাগে। আমার সংগে চীনের জিং, ফিনল্যানডের কিম, যুগোশ্লাভিয়ার মিলোভান, জারমানির উলমাগাং আর সুইজারল্যানডের ইভন এসেছিল। জিং এই প্রথম চীন ছেড়ে বাইরে এসেছে। পিপলস ডেইলির বিদেশনীতি বিভাগে কাজ করা সত্ত্বেও আমেরিকান সমাজের এরকম দৃশ্য ওর জানা ছিল না। মহিলারা তাদের বন্ধুদের নিয়ে নাচতে শুরু করলেন। মিউজিক যত উদ্দাম হতে লাগল, মাতোয়ারা অতিথিরা তত দুলতে লাগলেন। আশেপাশে অন্যান্য অতিথিরা বসে আছেন। কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। হঠাৎ একজন একপাশে একটা প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। হেসে বললাম, না, ধন্যবাদ। কিন্তু পরক্ষণেই একটু সন্দেহ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কী? সাংবাদিকটি বললেন, 'মারিজুয়ানা।' ড্রাগের নেশার কথা শুনেছি। দেখেছিও অ্যাডিকটদের। কিন্তু এমনভাবে মারিজুয়ানা খেতে দেখিনি কখনও আগে, আমার কাছে একটু অবাক লাগছিল। কিন্তু কোনও কিছুতেই অবাক হলে চলবে না। একটা সমাজকে বোঝার জন্য সব রকমের তথ্যের দরকার।

আমেরিকানরা তের কি চোদ্দ বছর পেরোলেই আমাদের ভাষায় 'প্রাপ্ত বয়স্ক' অভ্যাস আয়ত্ত করে নেয়। কথা হচ্ছিল গ্রেচেন আর স্টিভের সংগে। এরা দুজনেই ২৫ বছরের কাছাকাছি। সাংবাদিকতার অ্যাপ্রেনটিস। দুজনেরই বয় ফ্রেনড ও গারল ফ্রেনড আছে। হাই স্কুল পার হতে না হতেই ছেলেদের মেয়ে-বন্ধু আর মেয়েদের ছেলেবন্ধু হয়ে যায়। সিগারেট, মাদক দ্রব্য এবং যৌনতা সম্বন্ধে এদের অভিমত একেবারে খোলাখুলি। প্রাক-বিবাহ সেকস-এর চল এদেশে। এদের মতে পুরুষ ও স্ত্রী যদি সহবাস না করে একে অন্যের সব কিছু না জানতে পারে তা হলে কী করে বিয়ে করে বাকি জীবনটা কাটান সম্ভব হবে! তাই কয়েকজন বন্ধু অথবা বান্ধবী থাকা একজন আমেরিকান-এর কাছে কোনরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। শুধু তাই নয়, একই সময়ে কয়েক জনের সংগে একই সম্বন্ধ চালিয়ে যাওয়াও খুব একটা বড় কোনও ব্যাপার নয়। 'এই রকমভাবেই তো আমরা জীবনসাথী খুঁজে বার করি। ভাবতেও অবাক লাগে তোমাদের দেশে কী করে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার পছন্দমত না জানা না শোনা একজনের সংগে দুম করে বিয়ে করে নেয়', বলছিল গ্রেচেন।

মারিজুয়ানার ধোঁয়া, লাউড মিউজিক আর মেঝে কাঁপান নাচ। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রাত তখন প্রায় বারটা। আমার তো চোখ জ্বালা করছে। কিম আর মিলোভানকে বললাম, 'চল, ফেরা যাক, রাত অনেক হল'। কোথায় কিম আর মিলোভান। দুজনেই বেশ গিলেছে। আর মাথা দোলাচ্ছে। কিম বলল, 'বহুদিন পরে একটা পারটিতে এসেছি। ফিনল্যানড ছেড়েছি কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেছে। দাঁড়াও না। আরও কয়েক ঘন্টা থাকা যাক।' কী আর করব। মাথা ঠিক রেখে সবাইকে নিয়ে আস্তানায় ফিরে যাওয়ার দায়িত্বটা মনে হল আমার কাঁধেই। কিছুটা জিং-এরও অবশ্য, কিন্তু জিং একটু চুপচাপ আর আড়ালে থাকতেই ভালবাসে।

কী আর করব। বসে রইলাম। আমার পাশে এসে বসল র‍্যালফ। সাংবাদিক। কথা পাড়তেই 'গান্ধী' ছবির আলোচনা শুরু হল। অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' বিদেশে গান্ধী ও ভারত সম্বন্ধে বেশ উৎসাহ বাড়িয়েছে। কেননা আমাকে ভারতীয় জেনে প্রায় প্রত্যেক আমেরিকানই একবার না একবার 'গান্ধী' ছবি নিয়ে আলোচনা করার প্রসংগ তুলেছেন।

র‍্যালফ আর আমার চারপাশে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়ে গেল। কথায় কথায় আলোচনার প্রসংগ আমেরিকার মধ্য আমেরিকা নীতি হয়ে গেল। একজন তো জোর গলায় আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এল সালভাদোরের স্বৈরাচারী শাসকমণ্ডলীকে সাহায্য করার সমর্থন করে গেল। শুধু তাই নয় ভিয়েতনামে মারকিন মারণনীতির সপক্ষেও তিনি যুক্তি রাখলেন। এই ধরনের গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার আমেরিকান এখানে অনেক। এরা আমেরিকার বিশ্ব আধিপত্যে বিশ্বাস করে। বাকি সব দেশগুলো এদের কাছে দাবার বোড়ের মত। তাই ব্যবহারে কথাবার্তায় দারুণ অহমিকা আর গোঁড়ামি দেখা যায়।

আমেরিকানরা এবং এদের শাসকমণ্ডলী তাদের জংগী নীতির সমর্থন পাওয়ার জন্য 'কমিউনিজমের ভূত' সম্বন্ধে উদ্ভট সব প্রোপাগানডা চালিয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতারা অহরহ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিবৃতি দেয়। পত্র-

পত্রিকা, টি ভি ও রেডিওতে সোভিয়েতবিরোধী জিগির চলছে সব সময়ে। কমিউনিসট বলে যেকোন কাউকে অকল্পনীয় দুরবস্থার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী বিরোধী ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী সরকারগুলো সমানে পুঁজিবাদী প্রোপাগানডা চালিয়ে গেছে। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র ও বিদেশনীতিতে রয়েছে হিপোক্রেসি। পোল্যানডের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে সাহায্য করতে আমেরিকান সরকার উৎসুক। কিন্তু এদিকে নিজের দেশের সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার ক্ষমতা নেই। সারা আমেরিকার লেবার ফোরসের মাত্র শতকরা ১৮ জন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। বাকি সবাই মালিকের কৃপায় চাকরি বজায় রাখে।

কয়েকটা অপ্রিয় তথ্য পেশ করতেই আমাদের আলোচনা বিতর্কের পর্যায়ে এসে পৌঁছল। সবাই উৎসুক হয়ে বিতর্কে যোগ দিতে চান। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠে। আমেরিকান সমাজের কতগুলো কদর্য বৈশিষ্ট্যের দিকে অংগুলি নির্দেশ করাতে কেউ কেউ চুপ হয়ে গেলেন। অন্যরা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং নিজের দেশ সম্বন্ধে এদের অজ্ঞানতা আমাকে অবাক করেছে।

ঠিক এমনিই এক অভিজ্ঞতা হয় মিনিয়াপোলিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমেরিকান ও সোভিয়েত দুই অ্যাকাডেমিক গ্রুপ 'আরমস রেস'-এর ওপরে এক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করছিলেন। হল ভর্তি লোকজন। যখন প্রশ্নোত্তর শুরু হল তখন বেশ কয়েকজন আমেরিকান শ্রোতা সোভিয়েত ইউনিয়নে মানবিক অধিকারের অবমাননা নিয়ে তীক্ষ্ম প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন করার সংগে সংগেই হল ঘরে হাত-তালি। সোভিয়েত ডেলিগেটরা চুপচাপ বসে। একজন সোভিয়েত ডেলিগেট কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'এ আপনাদের কী রকম স্বাধীন সমাজ! আমি এখানে একজন আমন্ত্রিত অতিথি। আমাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভিসা দেওয়া হয় না। আমাদের সমাজে নানান ত্রুটি আছে। কিন্তু আমাদের সমালোচনা করার আগে নিজেদের ঘর ঠিক করুন না।'

শ্রোতারা চুপ হয়ে যান। এই ধরনের মন্তব্য কারও খুব একটা পছন্দ হয় না, কেননা অনেক আমেরিকান (না স্বীকার করলে কী হবে) জানেন যে এদেশে তারা নানান ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এদেশে কালো মানুষেরা অথবা নারীজাতি কিংবা হিসপানি-কেরা নির্মম সাদা চামড়ার শাসনের চাবুক সহ্য করেন।

সে রাতের পারটি কখন ভেঙেছে পরে জানলাম। কেননা রাত দুটোর সময় আর থাকতে না পেরে কয়েকজনকে সংগে করে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমাদের গ্রুপের কয়েকজন (এরা সবাই ইউরোপীয়ান) থেকে যান রাস্তায় সারি সারি গাড়ি অত রাতেও। পাঁচদিন কাজ করার পর শুক্রবারের রাতে এখানকার মানুষ আমোদ প্রমোদ করতে বার, পারটি অথবা রেসট্যুরেনটে যান।

প্রত্যেক WPI ফেলোর এক একটি আমেরিকান পরিবারের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার হোসট ফ্যামিলিতে মাত্র দুজন। লি কেরি ও তাঁর স্বামী টেরি সিনস্কি। দু জনেরই বয়স ৩৫ বছরের নিচে। লী এক পাবলিক টেলিভিশনে কাজ করে। আর টেরি কমপিউটার টেকনোলজিসট। দু জনের শরীরেই আইরিশ রক্ত বইছে। এদের পূর্বপুরুষেরা এককালে আয়ারল্যানডের বাসিন্দা ছিলেন। অন্যান্য আমেরিকান ইমিগ্র্যানটদের মত এরাও বহু বছর আগে আমেরিকায় এসে বসবাস শুরু করেন।

লি ও টেরি সাধারণ আমেরিকান মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ, লেখা-পড়া জানা। খুবই বন্ধু-বৎসল। প্রথম আলাপেই আমাকে আপন করে নেয়। একদিন লি টেলিফোন করে বলল, 'চল আজ তোমাকে ঝাল খাবার খাওয়াব। এখানে তো কোন ইনডিয়ান রেসট্যুরেনট নেই। একটা আফগান রেসট্যুরেনটেই চল।' অভিভূত হলাম ওদের আন্তরিকতায়।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলায় লি ও টেরি আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। টেরি চিকেন রোসট করতে লাগল। লি স্যালাড বানাচ্ছিল। আমি দেশ থেকে এক প্যাকেট পাঁপড় নিয়ে এসেছিলাম। কয়েকটা পাঁপড় ভাজলাম। চা-কফির সংগে খাওয়ার জন্য। ওরা তো খেয়ে দারুণ প্রশংসা করতে লাগল।

রাত হতে ডিনারের ডাক পড়ল। কিন্তু লি এসে বলল, 'দাঁড়াও আজ একটা বিশেষ দিন। তাই তোমাকে আমাদের কথা মত চলতে হবে।' বিরাট ফ্রিজ থেকে একটা সাদা কেক বার করে তার পাশে ছোট ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে লি বসার ঘরে এল। কেকের ওপরে আমার নাম লেখা। লি বলল, 'জানি তুমি চমকে গেছ। আজ তোমার জন্মদিন। তোমার জন্মদিন আমরা আমেরিকান প্রথায় পালন করব। নাও এখন এক ফুঁ দিয়ে এই সব কটা মোমবাতি নিভিয়ে দাও।'

সত্যিই ওদের আন্তরিকতায় মনটা ভরে যায়। আমার জন্মদিনটা পর্যন্ত মনে রেখেছে। কেক কাটার পর ধুম করে খাওয়া-দাওয়া হল। লি ও টেরির বন্ধু-বান্ধবরাও এসেছিল। ডিনারের পর কফি খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ লি একটা সুন্দর কাগজে মোড়া প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বলল; 'এটা তোমার জন্য, আমাদের তরফ থেকে।' মোড়ক খুলে দেখলাম আমেরিকা সম্বন্ধে লেখা এক রেড ইনডিয়ান লেখকের বই। আমেরিকার সব্ব কর্মাক্ত গলি ঘুপচির জীবন যেটা সাধারণত সবার চোখের সামনে আসে না, সেই বিষয়ের ওপরে লেখা। আবার অভিভূত হলাম। আজ পর্যন্ত আমার জন্মদিন এভাবে কখনও পালিত হয়নি। হবার কথাও নয়। দেশে আমরা এসব রীতি রেওয়াজ তো মানি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লি ও টেরির সেদিনকার আপ্যায়নে এক উষ্ণ বন্ধুত্বের ছোঁয়া ছিল। আমাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে লি আবার বলল, 'কখনও কিছু দরকার পড়লে সোজা টেলিফোন করবে। ও হ্যাঁ, তোমাকে গরম জল করার একটা হট পট দিয়ে যাব কাল। এখন শুভ রাত্রি।'

ওই পারটির সাংবাদিক যুবক, গ্রেচেন, লি, টেরি এরা সবাই আমেরিকান। কিন্তু এদের মধ্যে অনেক ফারাক। মনকে বললাম, কোন একজনকে দেখে অথবা শুনে চট করে ধারণা করে ফেলার বিপদে পড় না। এখনও আরও চমক ও হতাশা বাকি আছে।' □

জানতে চাই জানাতে চাই

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের কোন পলিটেকনিক কলেজে ত্রিপুরার কোন রিজারভেশন আছে কি? যদি থাকে তাহলে কখন কী ভাবে যোগাযোগ করতে হয়? কী রকম নামবার পেলে হবে? কয়েকটি পলিটেকনিক কলেজের নাম ও ঠিকানা দেবেন। সেই সংগে ভর্তির নিয়মাবলী জানাবেন।

প্রশ্ন করেছেনে বর্ধমান থেকে হীরালাল সাহা।

উত্তর : আপনার প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই জানাই রিজিওন্যাল প্রিনটিং টেকলোনজি ছাড়া পশ্চিবঙ্গের কোন পলিটেকনিক কলেজে ত্রিপুরা বা অন্য কোন রাজ্যের কোন রিজারভেশন নেই। ভারতবর্ষের নাগরিক মাত্রেই শিক্ষার অধিকাবী।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। বয়স উর্দ্ধসীমা ২০ বৎসর, তপসিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তিন বৎসর শিথিলযোগ্য। ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে যোগ্যতা নির্ধারক একটি জয়েনট এনট্রানস পরীক্ষায় বসতে হবে। পরীক্ষা হবে গণিত (১00), পদার্থ-বিদ্যা (৫0) এবং রসায়ন-বিদ্যা (৫0)। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে ওয়েসট বেংগল বোরড অব এগজামিনেশন ফর এডমিশন টু ইনজিনিয়ারিং মেডিকেল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডিগ্রি কলেজ, প্রযত্নে : বেংগল ইনজিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া ৭১১00৩, ওয়েসট বেংগল, এর অনুকূলে ১২ টাকার পোসটাল অরডার সহ নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে।

আমি পশ্চিমবঙ্গের পলিটেকনিক কলেজগুলির নাম ঠিকানা এবং নির্ধারিত আসন সংখ্যা দিলাম।

১। এ পি সি রায় পলিটেকনিক–যাদবপুর, কলকাতা–৭000৩২।
(সিভিল–৬0, ইলেকট্রিক্যাল–৪0, মেকানিক্যাল–৬0)

২। সেনট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক, ২১–কনভেনট রোড, কলকাতা–১৪।
(ই–৩0, মে–৬0, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেসন–৩0)

৩। জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক, ৭ ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা–৭000২৩।
(সি–৬0, ই–৪0, মে–৬0)

৪। নরথ ক্যালকাটা পলিটেকনিক, ১৫ গোবিন্দ মন্ডল লেন, কলকাতা–৭0000২।
(সি–৬0, ই–৪0, মে–৬0)

৫। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প পীঠ, বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭000৫৬।
(সি–৬0, ই–৪0, মে–৬0)

৬। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।
(সি–৬0, ই–৪0 মে–৬0)

৭। রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব প্রিনটিং টেকনোলজি–যাদবপুর, কলকাতা–৭000৩২।
(প্রিনটিং টেকনোলজি–৫৫, কমারসিয়াল ফটোগ্রাফি–৫)

৮। উইমেনস পলিটেকনিক, (কেবল মহিলাদের জন্য) যোধপুর পারক, কলিকাতা ৬৮।
(ইলেট্রনিকস টেলিকমিউনিকেশন–৪0, আরকিটেকচারাল অ্যাসিট্যানটশিপ–৩0)।

এছাড়া রাজ্যের সব জেলাতেই পলিটেকনিক ইনসটিটিউট রয়েছে।

প্রশ্ন : কলকাতায় ফটোগ্রাফি শিক্ষা কেন্দ্র আছে কিনা, থাকলে, ঠিকানা, কতদিনের কোরস, কত টাকার প্রয়োজন, ভর্তি হবার জন্য কি যোগ্যতা প্রয়োজন দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

লিখেছেন চয়ন গুহ কলকাতা ৮

উত্তর : কলকাতায় সরকারি পর্যায়ে ফটোগ্রাফি কেবলমাত্র যাদবপুরে রিজিওন্যাল ইনসটিটিউট অব প্রিনটিং টেকনোলজিতে শেখান হয়। ঠিকানা – রিজিওন্যাল ইনসটিটিউট অব প্রিনটিং টেকনোলজি, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, যাদবপুর কলকাতা – ৩২। তিন বছরের দিবা কোরস। পলিটেকনিকগুলিতে ভর্তির জন্য যে জয়েনট এনট্রানস পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনপক্ষে মাধ্যমিক। বয়স অনধিক ২0। মাসিক মাহিনা ১২ টাকা।

এছাড়া কলকাতায় আরও দুএকটি ফটোগ্রাফি শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদম। ঠিকানা – যশোর রোড, নাগের বাজার, দমদম, কলকাতা – ২৮। এখানে বিনাব্যয়ে প্রতিবছর অনেক ছাত্র ছাত্রীকে উন্নত প্রথায় হাতে কলমে ফটোগ্রাফি শিক্ষা দেওয়া হয়। ভর্তির জন্য একটি যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা দিতে হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমরা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। মেরিন ইনজিনিয়ারিং পড়তে চাই। এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী দয়া করে জানালে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

জংগলপাড়া হুগলী থেকে লিখেছেন–দীনবন্ধু পাত্র ও অমিত কুমার মান্না।

উত্তর : মেরিন ইনজিনিয়ারিং পড়ার জন্য–শিক্ষাগত যোগ্যতা ফিজিকস, কেমিসট্রী ও মাথামেটিকস নিয়ে ১0+২ প্লাস পাশ। বয়স ১৬–২0, তফসিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর শিথিলযোগ্য। কোরসের সময় কাল ৪ বৎসর। আসন সংখ্যা ১২0। তফসিলী জাতির জন্য ১৫ শতাংশ ও তফসিলী উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত।

ইচ্ছুক প্রার্থীদের আই আই টি খড়গপুর আয়োজিত একটি জয়েনট এনট্রানস পরীক্ষায় বসতে হবে। প্রতি বছর মে মাসে জয়েনট এনট্রানস পরীক্ষার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কলকাতা অফিসের ঠিকানা – ডাইরেকটরেট অব মেরিন ইনজিনিয়ারিং ট্রেনিং, পি–১৯ তারাতলা রোড, কলকাতা–৮৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডাইরেকটর জেনারেল অব শিপিং, জি পি ও বোমবাই-এর অনুকূলে ৪ টাকার পোসটাল অরডার পাঠিয়ে একসিকিউটিভ অফিসাব (ট্রেনিং) ডাইরেকটরেট জেনারেল অব শিপিং, জাহাজ ভবন, ওয়েল চাঁদ হীরাচাঁদ মারগ, বোমবাই–৪000৩৮ নিকট আবেদন করুন।

প্রশ্ন : আমি বর্ধমানের বি এ (পাশ কোরস)। বি এড পড়তে চাই। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোথায় কোথায় ডাকযোগে অথবা হসটেলে থেকে বি এড পড়বার সুবিধা রয়েছে দয়া করে জানাবেন।

অনিতা সরকার, দুর্গাপুর

উত্তর : মাইগ্রেশন নিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে বি এড কলেজগুলিতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ২৫ শতাংশ আসন নবাগত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ডাকযোগে কোথাও পড়বার ব্যবস্থা নেই। আমি আপনার অনুরোধ মত কয়েকটি গারলস কলেজের নাম ঠিকানা দিলাম। এপরিল মে মাস নাগাদ আপনি সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিনসিপালের নিকট আবেদন করতে পারেন। আপনার আবেদনপত্রের সংগে মারকসিট ও সারটিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল দিতে ভুলবেন না। নিম্নোক্ত কলেজগুলিতে কমবেশি হসটেলের সুবিধা রয়েছে: ইনসটিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন, হেসটিংস হাউস, আলিপুর, কলকাতা ২৭ লরেটো কলেজ, ৭ মিডলটন রোড, কলকাতা ১৬; শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ, ১১ লরড সিনহা রোড, কলকাতা ১৬; হাওড়া গারলস কলেজ হাওড়া; স্কটিশ চারচ কলেজ আজাদ হিন্দ বাগ, কলকাতা ৬।

প্রশ্ন : লাইব্রেরিয়ানশিপ কোরস কি কেবলমাত্র যাদবপুরই পড়ান হয়, এই কোরস পড়তে শিক্ষাগত যোগ্যতা বয়স, শিক্ষার মাধ্যম এবং ফরম ও প্রসপেক্টাস কবে কোথায় পাওয়া যাবে?

ছন্দা দে, উকরা-বর্ধমান

উত্তর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বৎসরের ডিপলোমা কোরস চালু রয়েছে। ভর্তির যোগ্যতা ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েশন। কোন ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমা নেই।

লাইব্রেরিয়ানশিপ যাদবপুর ছাড়াও কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ান হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বৎসরের বি-লিব কোরস এবং ১ বৎসরের এম-লিব কোরস রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ১ বৎসরের সান্ধ্যকালীন বি-লিব কোরস এবং দিবা বিভাগে দুই বৎসরের এম-লিব কোরস চালু রয়েছে। বি-লিব কোরসে ভর্তির যোগ্যতা যে কোন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। তবে মাসটার ডিগরি ও অনারস ডিগরি হোলডারগণ অগ্রাধিকার পান। জুলাই মাসে কোরস শুরু হয়। ফরম ও প্রসপেক্টাসের জন্য লিখুন, – ইউনিভারসিটি সেলস কাউনটার, ইউনিভারসিটি অব ক্যালকাটা, কলকাতা ১২।

এ ছাড়াও কলকাতায় বেংগল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, পি ১৩৪, সি আই টি স্কিম, কলকাতা ১৪, লাইব্রেরিয়ান শিপের ওপর তিনমাস ও ছয়মাসের কোরস পরিচালনা করেন।

আপনার অপর প্রশ্নের জবাব আগামী সংখ্যায় পাবেন।

উত্তর দিয়েছেন : সোমনাথ মিত্র

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিরোধ

অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্রব্যমূল্য যদি নিরীহ গরু অথবা মন্থরগামী মেষ হত, তা হলে একে একটি খোঁয়াড়ের মধ্যে আটক রেখে এর খাওয়া দাওয়া কমিয়ে সহজে একে ক্ষীণকায় পশুতে পরিণত করা যেত। কিন্তু আসলে এ একটা শক্তিশালী বাংলার বাঘ বা সমুদ্রগর্ভস্থ অক্টোপাসের মত। প্রায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই ভারতের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান রিজারভ ব্যাংক, যার প্রশাসন এখনও পরিচ্ছন্ন ও দক্ষতাপূর্ণ, অবিরাম চেষ্টা করেও দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ করতে পারছে না। অবশ্য অর্থনৈতিক মাপ কাঠিতে রিজারভ ব্যাংকের দৌড়ও বেশিদূর যেতে পারে না। এর প্রধান হাতিয়ার হল টাকা পয়সার মোট পরিমাণ ও ব্যাংক মারফত ঋণদান নিয়ন্ত্রণ। এর একতিয়ারের বাইরে দ্রব্যমূল্য বাড়াতে একটা বিরাট শক্তি রয়ে গেছে যা হল পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ।

দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি

দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ বছরকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে – (১) ১৯৭১-৭৫, (২) ১৯৭৫-৭৯ এবং (৩) ১৯৭৯-৮৩। ১৯৭১ ৭৫ এই চার বছরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে গড়ে বছরে ১৫.৩ শতাংশের মতন। এই সময় টাকা পয়সার সরবরাহ বেড়েছিল গড়ে বছরে ১৩.১ শতাংশ আর জাতীয় উৎপাদন (National Product) ১.৬ শতাংশ। ১৯৭৫-৭৯ এই চার বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার বেশ সীমিত ছিল – শতকরা ১.৬ ভাগের মতন। অপরদিকে ঐ সময় টাকা পয়সার সরবরাহ বেড়েছিল গড়ে বছরে শতকরা ১৬.৪ ভাগ, সে তুলনায় জাতীয় উৎপাদন বেড়েছিল বছরে শতকরা ৫.৯ ভাগ। ১৯৭৯-৮০ থেকে দ্রব্যমূল্য আবার দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করেছে। ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৭৯-৮০ তে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ২১.৪ শতাংশ; ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮০-১৯৮১তে বেড়েছে ১৬.৭ শতাংশ, ১৯৮১-৮২তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.৪ শতাংশ এবং ১৯৮২-৮৩ তো ২.৮ শতাংশ। এ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও জিনিসটির দাম আগেকার স্তরে কোন দিনই নামে না। নিচে সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরা হল – সারণি-১।

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণভাবে উৎপাদন বাড়ার সংগে মূল্য কমা এবং উৎপাদন কমার সংগে মূল্য বাড়ার একটা মোটামুটি সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গত দশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন ১৯৭৬-৭৭ সালে উৎপাদন কমে যাওয়া সত্ত্বেও মূল্য কমে গিয়েছিল, এর প্রধান কারণ ১৯৭৫-এর জুন মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণা যার ফলে প্রশাসনও বেশ শক্ত হয়েছিল এবং বাজারের অবস্থাও

সারণি-১
দ্রব্যের পাইকারি মূল্যসূচি (ভিত্তি বৎসর ১৯৭০-৭১=১০০) এবং উৎপাদন-সূচি (ভিত্তি ১৯৬৯-৭০=১০০)

	৭৪-৭৫	৭৫-৭৬	৭৬-৭৭	৭৭-৭৮	৭৮-৭৯	৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮২
চাল – মূল্যসূচি	১৮৩	১৭৯	১৫৭	১৬২	১৬১	১৮৪	২০৬	২২৬
উৎপাদন সূচি	১০১.৩	১২৪.৭	১০৭.২	১৩৪.৭	১৩৭.৫	১০৮.৩	১৩৭.২	১৩৭.১
গম – মূল্যসূচি	১৮৩	১৬০	১৫২	১৫৭	১৫৪	১৬১	১৭৬	১৯২
উৎপাদন সূচি	১৩৩.৬	১৫৯.৯	১৬০.৮	১৭৬.০	১৯৬.৮	১৭৬.৪	২০১.২	২০৯.৭
খাদ্যদ্রব্য – মূল্যসূচি	১৯৬	১৭৪	১৫৩	১৭০	১৭৩	১৮৩	২১৭	২৩৭
উৎপাদন সূচি	১০৪.৩	১২৭.২	১১৫.৭	১৩৩.৬	১৩৯.৩	১১৪.৮	১৩৭.৫	১৪০.৮

[উৎস : ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Survey), ১৯৮২-৮৩]

সবই সরকারি মূল্যসূচক অনুযায়ী যার ভিত্তি হল কতকগুলি সংগঠিত বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর পাইকারি মূল্য। কিন্তু এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এ মূল্যের সংগে জনসাধারণ খোলা বাজারে তাঁদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য যে দামে কিনে থাকেন তার কোন নিকট সম্পর্ক নেই।

ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দুর্বলতা

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিস্থিতিতে ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বড় রকমের দুর্বলতা আছে। (১) এখনও অনেক ব্যবসা ব্যাংকের মাধ্যম ছাড়াই সংগঠিত হয়। সুদূর গ্রামাঞ্চলে এবং শহরগুলির দৈনন্দিন বাজারের কেনাবেচা কাঁচা টাকাতেই সম্পন্ন হয়। এ কারণে নিছক টাকার মোট পরিমাণ দিয়ে ক্রয় ক্ষমতার বিচার করা যায় না। টাকার হাত ফেরির (velocity of circulation) প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একটি ১০০ টাকার নোট যদি বছরে ১০০ বার হাত বদলায়, তা হলে তা মোট ১০,০০০ টাকার ক্রয়ের সামিল হয়। (২) অপরদিকে খোলা বাজারের সংগে সমান্তরালভাবে আর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে যাকে বলা হয় কালোবাজার (black market), দ্রব্যমূল্যের ওপর যার প্রভাব বেশ সুদূরপ্রসারী। হাজার হাজার টাকার জিনিসপত্র কেনা, দীর্ঘদিন ধরে মজুত করে রাখা, বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা এবং লোক চক্ষুর আড়ালে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি করা কালোবাজারি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

উৎপাদনের সংগে মূল্যের সম্পর্ক

ভারতের অর্থনীতিতে বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে যে যখনই কৃষিক্ষেত্রে খরা বা বন্যা অথবা অন্য কোন কারণে অজন্মা বা উৎপাদন ঘাটতি দেখা দিয়েছে তখনই বাজারে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে। আর যে জিনিসের দাম একবার বাড়ে তা আর কমার লক্ষণ দেখা যায় না, এমনকি উৎপাদন পুনরায় সংযত হয়েছিল। অপরদিকে উৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও ১৯৮০-৮১ তে মূল্য বেড়ে গিয়েছিল তার একটি কারণ সরকার ধান গমের সংগ্রহ মূল্য (procurement price) বাড়িয়ে দিয়েছিলেন **এই সময় সারের দামও বেশ বেড়ে গিয়েছিল** যা নিচের তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে

সরকারের সংগ্রহ-মূল্য (টাঃ)
(কুইনটাল প্রতি)

	৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩
ধান (নভেম্বর-অকটোবর)	৯৫	১০৫	১১৫	১২২
গম (এপ্রিল-মারচ)	১১৫	১১৭	১৩০	১৪২

টন প্রতি সারের দাম (টাঃ)

	মে, ৮০	জুন, ৮০	জুন, ৮১
ইউরিয়া	১৫৬৫	২১০০	২৪৬৭
ডি এ পি	২৩৮০	৩২০২	৩৭৮০
নাইট্রো ফসফেট	১৬২৩	২১৫২	২৫২০

এ ছাড়া ১৯৮১-র জুলাই এ পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ৫৩ পয়সা, ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৩২ পয়সা এবং কেরোসিনের দাম লিটার পিছু ১৫ পয়সা বাড়ানো হয়েছিল এবং রেলের মাশুল ১৯৮২ র জানুয়ারি থেকে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বেড়েছিল। বস্তুতপক্ষে সম্প্রতি যে দ্রব্যমূল্য বেশ

বেড়েছে তার একটি প্রধান কারণ সরকার কর্তৃক যে সব দ্রব্যের মূল্য বা বন্টন নিয়ন্ত্রিত তাদের অধিকাংশের নিয়ন্ত্রিত দাম বাড়ানো যাদের মধ্যে পেট্রোল ও রেল মাশুল ছাড়াও আছে ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদি। ১৯৮১-র ২৪ আগস্ট রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী পি সি শেঠী বলেছিলেন যে জুলাই ১৯৮১ সালে পেট্রোল জাত দ্রব্যের দাম বাড়ানোর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বছরে আয় বাড়বে ১০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি। এর সঙ্গে যদি ঐসব দ্রব্যের বন্টন সংস্থাগুলির মুনাফা যোগ করা যায়, যার পরিমাণ বছরে ১০০০ কোটি টাকার কম হবে না তাহলে দেখা যাবে কেবল পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির চাপ পড়েছে জনসংখ্যার উপর মাথাপিছু বাৎসরিক ৩০ টাকার মতন। যেহেতু পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় বা বিক্রয় মূল্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবহন জনিত, সেজন্যে সরকার কর্তৃক পেট্রোল-জাত দ্রব্যের দাম এবং রেল মাশুল বাড়ানোর পরোক্ষ চাপ যে ক্রেতা সাধারণকে বহন করতে হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি ভারতের শিল্প সংক্রান্ত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনের (Industrial Credit and Investment Corporation of India) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী অধিকাংশ শিল্প সংস্থায় শক্তি ও জ্বালানি কাঠ বাবদ ব্যয় বেড়েছে গড়ে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ হারে।

প্রতিরোধের উপায়

তবে কি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার কোন উপায় নেই? হাঁ, আছে। অন্তত কতগুলি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

(১) নিত্য ব্যবহার্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই বৃদ্ধির হার বজায় রেখে যেতে হবে। সর্ব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। (২) যাতে কোন সময় প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে উৎপাদন কম হলে বাজারে অভাব সৃষ্টি না হয় সে উদ্দেশ্যে অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আপৎকালীন মজুত (buffer stock) গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে চাল, গমের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে এই ক্ষেত্র প্রসারিত করে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীও মজুত রাখার আয়োজন করতে হবে যেমন চিনি, খাবার তেল, ডাল, কেরোসিন ইত্যাদি। (৩) আবশ্যক হলে বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশীয় উৎপাদনের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। (৪) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কল-কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তিও (productivity) বাড়াতে হবে। অধিকমাত্রায় উপকরণাদি (inputs) প্রয়োগ করে অল্পমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধি করার পথ অবলম্বন করলে উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকাশক্তি অন্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশ কম; সারের ব্যবহার, সেচের উন্নতি, ভাল বীজ বপন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করলে উৎপাদিকাশক্তি যে বাড়ানো সম্ভব তা ইতিমধ্যে এই দেশেরই দু একটি রাজ্য যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রমাণ করে দিয়েছে। এদের দৃষ্টান্ত সারা দেশে অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। অপরদিকে অনেক কল কারখানায় বেতনের হার ক্রমশই বেড়ে চলেছে কিন্তু উৎপাদিকাশক্তি সে অনুপাতে বাড়ছে না। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলিতে এ অবস্থা খুব শোচনীয়। উৎপাদিকাশক্তি ভিত্তিক শ্রমিক মালিক চুক্তি (productivity based collective agreements) প্রথা সব শিল্প সংস্থায় চালু করতে হবে নতুবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দুষ্ট চক্র ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণীকেও গ্রাস করবে। এ বিষয়ে জাতীয় স্বার্থে শ্রমিক সংঘগুলিকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। (৫) গণবন্টন ব্যবস্থা (public distribution system) আরও জোরদার ও সম্প্রসারিত করতে হবে। ছোট ছোট শহরগুলি বা শহরতলিতে রেশনিং প্রথা চালু করতে হবে এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানের সংখ্যা দ্রুত বাড়াতে হবে। রেশন দোকান ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত আরও অনেক রকমের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির বন্দোবস্ত করতে হবে। (৬) ভারতে ক্রেতাসাধারণের মধ্যে কোন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বা সংগঠন নেই। এখানে অধিকাংশ বাজার বিক্রেতাদের করতলগত (sellers market). শ্রমিকদের সংঘ আছে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমিতি আছে। কিন্তু ক্রেতারা বিক্ষিপ্ত, সংগঠনের অভাবে তাঁরা অসহায়, অথচ সংখ্যায় তাঁরাই সর্বাধিক। গণতন্ত্রে আসলে চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁদেরই হাতে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রেতা সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করা অপরিহার্য। (৭) ব্যাংক কর্তৃক ঋণ দেওয়া এবং টাকার সরবরাহ সীমিত করারও প্রয়োজন আছে, তবে এরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বোধ হয় রিজার্ভ ব্যাংকের একপেশে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ (credit control) নীতি পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। (৮) সর্বোপরি, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কল্পে সরকারি প্রশাসনকে আরও শক্ত হতে হবে। অনেকদিন আগে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ গানার মিরডাল (Gunner Myrdal) মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনেক উন্নতিশীল দেশের রাষ্ট্র নরম (soft state) অন্যক্ষেত্রে সরকারি নীতি যাই হোক না কেন, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরকারকে প্রয়োজন হলে নির্মম হতে হবে। যাঁরা ইচ্ছা করে বাজারে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি করেন এবং ক্রেতাদের কাছে চড়া দামে সেগুলি বিক্রি করেন – এঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় – তাঁদের মধ্যে অন্তত দু চারজন প্রথম সারির অপরাধীকে নিকটবর্তী ল্যাম্প পোস্টে ফাঁসি দেওয়া অথবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবজ্জীবন কারাবাসী করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যাতে সেই দৃষ্টান্ত অবশিষ্টদের সংযত করতে পারে। □

জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য মধ্যবিত্তদের উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী

শ্যামল বসু

সমস্যাটা ক্রমশই গভীর হচ্ছে মধ্যবিত্ত নামে মাস মাইনের চাকুরেদের নিয়ে। মধ্যবিত্ত বলতে সরকারি হিসেবেও সংখ্যাটা ক্রমাগত পালটিয়ে যাচ্ছে। ই এস আই অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসাদির খরচ বা সুযোগ এবং আই ডি অ্যাক্টের মধ্যে আপাতত ১৬০০ টাকা মাস মাহিনার কর্মচারীরা পড়েন। মধ্যবিত্ত হিসেবের কিন্তু এটা নিচে। নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর সুবিধাগুলো ক্রমশ ৭০০ টাকার থেকে বাড়তে বাড়তে আজ ১৬০০ টাকার মাসিক আয়ের মধ্যে পড়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে যারা আছেন তাদের নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এখন এই বৃহত্তর নিম্নবিত্ত শ্রেণী যে তৈরি হয়েছে—যাদের 'মনের মধ্যেকার' বাবুগিরিটা একদম মধ্যবিত্তের মতন তাদের কাছেই সমস্যাটা বেশি প্রকট। মান খোয়াতে পারব না আবার জাতও ঠিক রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই যাদের ধার না করে মাস চলে না এমন একটা বড় অংশ কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। এরাই এখন বৃহত্তর নিম্নবিত্ত অথবা বৃহত্তর মধ্যবিত্ত যে কোন নামেই পরিচিতি পেতে পারেন। সরকারি হিসাবেই ১৯৬০ সালের হিসাবকে ১০০ ধরে যে মূল্য সূচক তা ১৯৮০ সালের মারচ মাসে ছিল ৩৫৬, ১৯৮১ সালের মারচ মাসে ৩৮৫, ১৯৮২ সালের মারচ মাসে ৪১৬ আর '৮৩র মারচ মাসে দাঁড়িয়েছে ৪৫৭তে। অর্থাৎ সরল হিসাবে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩র মধ্যে মূল্যসূচক বেড়েছে ১০১ পয়েন্ট। এই ১০১ পয়েন্টের মাসিক বৃদ্ধির হিসাব গড়ে ৬ পয়েন্ট। শ্রমিক বা নিম্ন আয়ের লোকেরা প্রতি পয়েন্ট-এর জন্য ভাতাবৃদ্ধি পান। কিন্তু সে টাকা যখন মেলে তখন কিন্তু আরো কয়েকটা মাস পার হয়ে যায়।

বাজারের দর কিন্তু তখন আরো উঁচুর দিকে। ঠিক এই সময় যেমন রেশন ছাড়া, খোলা বাজারে চালের দাম শহরে ৪ টাকা ৭০ পয়সা থেকে ৫ টাকা ২০ পয়সা। মুসুর ডাল প্রতি কেজি ৪ টাকা ৮০ পয়সা, কলাই ৬ টা ৭০ পয়সা, মুগ ৫ টাকা ৩০ থেকে ৭০ পয়সার মধ্যে। মটর ডাল ৫. ৫০ পয়সা, অড়হর ডাল ৬ টাকা ৫০ পয়সা ছোলার ডাল ৪ টাকা। সবজির বাজারেও আগুন। এক কেজি এক টাকার নিচে কোন সবজি পাওয়া যায় না। আলুর দাম এখনই ১ টাকা ৭০ পয়সা। আগস্ট মাসে গিয়ে সরকারি ঘোষণা যেখানে ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সার বেশি হবে না, দাঁড়িয়েছে দু টাকার মত। ভোজ্য তেল-সরষে ১৫ টাকা ৫০ পয়সা কেজি, বাদাম ২৪ টাকা কেজি, রেপসিড ১২ টাকা কেজি। মাছের বাজার তো কথাই নেই। দেড় কেজি দু কেজি কাৎলা মাছ, মৃগেল মাছ এখন কাটা পোনা নামে বিকোয়। দাম মওকা বুঝে ২৮ টাকা, ৩০ টাকা যেমন খুশি। মাছের বাজারের স্ট্যানডারড দাম এখন গড়ে ২৩ টাকা থেকে ২৮ টাকা। চিংড়ি অবশ্য এর মধ্যে বাদ। ৩৫ টাকা ৪০ টাকায় জ্যান্ত ডিম ভরা ট্যাংরা মাছও বিক্রি হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার নামকরা বাজারে। সবচেয়ে সস্তা যে মাছ তা পমফ্রেট কেজি প্রতি ১২ টাকা। এবার দুধ। গোয়ালার দুধ কেজি ৬ টাকা আর জলের অনুপাতে ৪ টাকাতেও পাওয়া যাবে। হরিণঘাটার সরকারি দুধ তিন টাকা লিটার, মাদার ডেয়ারি বিক্রি হয় ১ টাকা ৪৫ পয়সা আধ লিটার। খোলা বাজারে চিনি ৫ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি কেজি।

ছোটবেলার গল্প শোনার দিনগুলোর মত সের দরে

বা পোয়া দরে কিছু আজ বিক্রি হয় না। এখন আর আনা পাই হিসেব চলে না। সেই সংগে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের মধ্যে এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে একটা ফ্রিজ। একটা টি ভি। ফ্যামিলি সাইজ যেমন ছোট হয়েছে, তেমন স্বামী স্ত্রীর সংসার প্রথম থেকেই পর্দার নিত্য নতুন কাপড়ের মত বদলান হচ্ছে। সেলাই কল আজ ঘরে ঘরে নেই। রিটে দিয়ে বাড়ি সুধু লোকের কাপড় সেধ হবার বড় কালো কড়াইও নেই। এই জীবনযাত্রার রীতি পরিবর্তনও বাজারের জিনিস পত্রের দাম বাড়ার একটা কারণ। আগে যা ছিল হরাইজনটাল বস্তি এখন সেখানে ভারটিকাল বস্তি। হিসেব, স্কোয়ার ফুটে ঢাকা যাবে কতটা কারপেট এরিয়া। এখন নিজের জমিতে বাড়ি তৈরি হচ্ছে না তা নয় তবে মধ্যবিত্তদের বেশি পছন্দ রেডিমেড। তাই ফ্ল্যাটের চাহিদা এখন বেশি। সরকারি ফ্ল্যাট পাওয়া আর লটারি পাওয়া একই কথা। বেসরকারি ফ্ল্যাট এখন প্রতি স্কোয়ার ফুট হিসাবে ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা। কমেও আছে, তবে তার জন্য অনেক ঝক্কি। সিমেনট লোহার দাম নিয়ে এখন ফিনিস স্কোয়ার ফুট বাড়ি একতলার খরচ যেখানে ১৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়, সেখানে জেনে বুঝেই মধ্যবিত্ত সংস্কার চায় রেডিমেড। তাই দামটাও বেশি দিতে হয়। প্রভিডেনট ফানড গহনা বন্ধক বা বিক্রি করেও দু থেকে তিন কামরা সাজান একটা ছিমছাম ফ্ল্যাটের টুং টাং শব্দের বেল বাজাতে চার হাজারী রোজগেরে বাবু বিবির হাসিমুখ দেখতে চান। ছেলেমেয়ের ইস্কুলের জন্য কমপক্ষে মাথা পিছু দেড়শ টাকা। বাস ভাড়া প্রাইভেট টিউটর নিয়ে খরচ করতে না পারলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। দুটি বা তিনটির জন্য ব্যয় সাকুল্যে সাড়ে পাঁচশ থেকে ছশ টাকা করাটাই দরকার। এছাড়া হালফ্যাশানের জামাকাপড়। এখন দিন দিন আত্মীয়-স্বজনকে তিথি পার্বণে দেওয়াটা বন্ধ হলেও নিজের ঘরে গড়পড়তা যা খরচ পড়ে তাতে হিসাবের অঙ্কটা

ভোগ্যপণ্যর মূল্যসূচক সারণি

(১৯৬০ সালকে ১০০ হিসাবে ধরে)

	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩
জানুয়ারি	৩৫৭	৩৭৯	৪১৯	৪৫২
ফেবরুয়ারি	৩৪৮	৩৮৪	৪১৩	৪৫১
মারচ	৩৫৬	৩৮৫	৪১৬	৪৫৭
এপরিল	৩৬২	৩৯৭	৪২২	
মে	৩৭১	৩৯৯	৪৩০	
জুন	৩৭৫	৪০৬	৪৩৭	
জুলাই	৩৮১	৪০৮	৪৩৯	
আগসট	৩৮৭	৪১২	৪৫০	
সেপটেমবর	৩৯৬	৪২৩	৪৪৪	
অকটোবর	৩৯৩	৪২৯	৪৪৯	
নভেমবর	৩৯৭	৪২৬	৪৭০	
ডিসেমবর	৩৭৯	৪২৬	৪৬৬	

মন্তব্য ১। মূল্যসূচক ১৯৬০ থেকে '৮০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বেড়েছে ৩৫৭ পয়েনট।

২। '৮০ সালের ডিসেমবর মাস ও '৮১ সালের জানুয়ারি মাসে এবং '৮১ সালের নভেমবর ডিসেমবর মাসে মূল্য স্থির ছিল।

৩। নিম্নমুখী ছিল '৮০ সালের অকটোবর ডিসেমবর '৮২ সালের জানুয়ারি, ফেবরুয়ারি মাসে। '৮২ সালের ডিসেমবর মাস থেকে '৮৩ সালের ফেবরুয়ারি পর্যন্ত।

৪। মূল্যসূচক সবচেয়ে বেশি হয়েছিল '৮২ সালের নভেমবর (৪৭০) মাসে। বছর অনুযায়ী '৮১ সালের অকটোবর মাসে (৪২৯) এবং '৮০ সালের নভেমবর মাসে (৩৯৭)। এগুলো মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত জীবনের উৎসবের মাস।

(সূত্র : চেমবার অব কমারস)

একই থাকে। এগুলো সবই একান্ত দরকারি। এখানে কোন অজুহাতই চলবে না।

হিসেবে দেখা যায়, আজকের দিনে মধ্যবিত্তের রোজগার একা অথবা দুজনে মানে স্বামী-স্ত্রী মিলিয়ে হাজার চারেক টাকা কিংবা সাড়ে তিন তো দরকার হবেই। এর নিচে যাদের রোজগার কিংবা পরিবারে পাঁচজনের বেশি সদস্য তাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই ফেলা হবে। অবশ্য এর মধ্যেও কিন্তু আছে। এখনও কিছু যৌথ পরিবার আছে। বাবা পয়সা করেছিলেন, এখন চার ছেলের চার বৌমা। সংগে জনা দশেক নাতি নাতনি নিয়েও সংসার দেখা যাচ্ছে—সেখানে কিন্তু দেড় হাজারের রোজগারিও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে। মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে এই বিশেষ জাতীয় মধ্যবিত্তের সংখ্যাটা বেশি। চোদ্দ বছর চাকরি করে ব্যাংকের কুলীন কেরানিবাবু এখন মাইনে পান ২২০০ টকার মত। টেক হোম প্যাকেট ১৮০০ টাকার মত। তাঁর পক্ষে সম্ভব বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার খরচা বাবদ ৫০০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে নিজের জন্য নিদেনপক্ষে একটি স্কুটার বা মোটর সাইকেল কেনার। দরকার মত অফিস থেকে দেনা করে একটা ফ্ল্যাট কিংবা আলাদা করে একটা বাড়ি করার।

আর এক শ্রেণীর পরিবার এখন মোটামুটি সচ্ছল। তারা হলেন যাদের বাড়ির জামাই অথবা ছেলে আমেরিকা, ইংলনড এমনকি আরব দেশে চাকরি করছেন। খাওয়া ছাড়া বাড়িটা যদি নিজের কিংবা কোমপানির ফ্ল্যাট অথবা পুরনো ভাড়ায় হয় তবে এরাও আজকের দিনে সুখী মধ্যবিত্ত। কেননা অধিকাংশ বিদেশি জিনিস এদের ঘরে। ডলার কিংবা পাউনডের স্রোত এদের অনেক অভাবই মিটিয়ে দিতে পারে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা সেটা হল বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের ওঠানামাও এই বিশেষ শ্রেণীর মধ্যবিত্তদের জন্য হয়। এদের একজাতীয় ক্রয় ক্ষমতা থাকে যেখানে বাজারের চলতি দরকে ছাপিয়ে হঠাৎ দাম বেড়ে যায়। কিংবা কথাটা ঘুরিয়ে বলা যায়, আজকাল যে শ্রেণীর মধ্যে ক্রয় ক্ষমতা আছে আর যারা ইচ্ছেমত জিনিস কিনতে পারেন তারাই আজকের দিনে মধ্যবিত্ত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কারণগুলো এক জায়গায় জড় করলে এই শ্রেণীর সংখ্যাটা নিতান্ত গৌণ নয়।

আকাশছোঁয়া বাজার দরের অভিযোগ কিন্তু আজকের নয়। এটা চিরকালের। দাম বাড়ার কতগুলো প্রত্যক্ষ আর কতগুলো পরোক্ষ কারণ সব সময়ই থেকে যায়। প্রত্যক্ষ কারণগুলির মধ্যে যেমন যানবাহনের খরচা বা সরকারি শুল্ককে ধরা যায় তেমন বাজারের পরোক্ষ কারণগুলোর মধ্যে মানুষের অপেক্ষাকৃত ভাল থাকার চিরকালীন ইচ্ছেটাও স্বীকার করে নিতে হবে। এই অপেক্ষাকৃত ভাল থাকার চিন্তায় কতকগুলো বিষয়কে নিজের অজান্তেই প্রশ্রয় দিয়ে ফেলা হয়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা শ্রেণীর ফাটকা করার বা দাঁও মারার চেষ্টা থাকে। বাজারের মাছ বিক্রি করে একজন যে প্রতিদিন দুই থেকে তিন কেজি টাটকা মাছ আনে। ছোট আড়তদারের কাছ থেকে আনলে সে কে জি পিছু পাঁচ থেকে সাত টাকা লাভ করে আর একটু দূরের থেকে আনলে তার লাভ আরো বেশি। চাকুরে বাবুর সময় কম। তিনি বাজারের থলিটা বাড়িয়ে দেন তিনশ কিংবা পাঁচশ গ্রাম মাছের জন্য। তা সে যে দামই নিক না কেন। দব কবে বাজার ঘুরে কেনার সময় তাঁর নেই। অফিস যাবার চাটারড বাসটা ঠিক সময় ধরতে হবে। আর বাজারটাও ঠিক করতে হবে। তাই দর দস্তুরের বালাই নেই। আর করবার চেষ্টা করলেও শুনছে কে? সরকারি দপ্তরের ওয়েট অ্যানড মেজার বলে একটা ডিপারটমেনট আছে। তাদের কাউকে কখন বাজারে গিয়ে ওজন পাল্লা দেখতে বা পরীক্ষা করতে দেখা যাওয়া এক দুর্লভ বিষয়। অতএব তিন কেজি মাছ জলসমেত পাঁচ কেজিতে দাঁড় করাতে কষ্ট কোথায়? এটা একটা উদাহরণ মাত্র, ক্ষেত্রবিশেষে এটার বদল হয়। যেমন সোরস ট্যাকস হিসেবে অনেক সময় যেসব ট্যাকস কেটে নেওয়া হয় বিশেষ করে ওষুধ আব মণিহারী জিনিস কিংবা প্যাক করা তেল সাবান ইত্যাদিতে, সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে দোকানদার পেনসিল দিয়ে আর একটা দাম লিখে রাখে। যেটা প্যাকেটের গায়ে ছাপা দামের চেয়ে বেশি। জিগ্যেস করুন উত্তর পাবেন ওটা সেলস ট্যাকস। কোন ক্যাশমেমোর বালাই নেই। থাকলেও চুঙ্গি কর বা সেলস ট্যাকস নিতে গেলে যে বিক্রেতার যে ভাবে দাম হিসাব করে রসিদ দেওয়া উচিত তার কোনটাই করতে চায় না এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা। প্রস্তুতকারক কিন্তু খুচরো বিক্রেতাকে যথারীতি কমিশন দিচ্ছেন এবং তখন কিন্তু একটা ট্যাকসের হিসেবও হয়ে যাচ্ছে। পরের বার খুচরো বিক্রেতাকে যখন কোন ভোগ্যপণ্য বা ওষুধ যার যা দরকার বিক্রি করছেন তখন কিন্তু তার ইচ্ছেমত একটা অঙ্ক লিখিত দামের ওপর চড়িয়ে দিচ্ছেন। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের মাসকাবারি ধারের খাতায় না হয় ওটা সুদ। কিন্তু নগদ পয়সায় কেনার জন্যও অমন মাশুল কেন দিতে হবে এটা বোঝার চেষ্টা করেও কেউ পারবেন না। দোকানদার হিসাবটা মেলানর জন্য সাত পারসেনট অথবা দশ পারসেনট ট্যাকস বলে দেবে কিন্তু আদতে এভাবে ট্যাকস নেওয়ার কোন রীতিই নেই। কেবলমাত্র অজ্ঞতা বা মধ্যবিত্ত উদাসীনতাই এজাতীয় দাম বাড়ার অসাধু চেষ্টাকে উৎসাহ দেয়। সরকারি তরফের বক্তব্য, কোন স্পষ্ট অভিযোগ আমাদের কাছে নেই।

দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্ত মানসিকতার একটা বিশেষ লক্ষণ 'স্ট্যাটাস ক্রেজিং'। পাশের বাড়ি অথবা ফ্ল্যাটের গৃহিণীর মত হবার বাসনাও অনেকটা সুযোগ দেয় এই জাতীয় দাম বাড়াবার। উচ্চবিত্তদের থেকে এদের তফাৎ এরা হেঁটে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাজার করেন। ইংরাজিতে বলেন মারকেটিং করতে গিয়েছিলাম। উচ্চবিত্তরা গাড়ি নিয়ে যান। দক্ষিণে থাকলে বনেদীয়ানা দেখাতে উত্তর কলকাতার মুদিখানার দোকান থেকে মাসকাবারি বাজার করেন। অবশ্য যদি

গাড়ির তেলের খরচ কোম্পানি বা এজেন্সি পারিবারিক অ্যাকাউন্টে হয় তবেই। সন্ধ্যার পর স্নাব বা কারো ফ্ল্যাটে জমায়েত হন। দুপুরে এসব বাড়ির স্ত্রীরা [ঘুমোন] না। ইকাবেনা অথবা কুকিং ক্লাসে যান নতুবা এক চক্কর নিউ মারকেটটা ঘুরে আসেন।

বাজারে জিনিসের দাম পেটরোল, ডিজেল কিংবা রেলের মাশুল বৃদ্ধির জন্য, উৎপাদন ব্যাহত হবার জন্য, বিদ্যুতের ঘাটতির জন্য বেশি হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাঁটোয়ারাও অন্যতম কারণ। এগুলো কিন্তু বাজারের গড় দাম ছ পয়েন্ট হিসেবে বাড়ার মধ্যে ৪ পয়েনটের জন্য, কিন্তু বাকি দু পয়েনটের জন্য দায়ী থাকে সব সময়ই হঠাৎ টাকা খরচ করার মালিকরা। দশ জনের সংসার চালাতে গিয়ে একা রোজগেরে এল আই সির ব্রানচ ম্যানেজার তিন হাজার ছ'শ টাকা বেতন পেয়েও কাবু। যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকা কেরানি মালটিন্যাশনাল অথবা বিগ হাউস নয় এমন কোন কোম্পানির ম্যানেজার কাবু হন। আর এই কাহিল অবস্থা কাটাতে প্রায় সব মধ্যবিত্তকেই এখন ধারদেনা করতে হচ্ছে। কিছুটা উদাসীনতা কাটাতে পারলে মধ্যবিত্তদের দৈন্যদশা হয়ত বা কিছু ঘুচলেও ঘুচতে পারত। □

বিদেশে ডিগরি করতে যাবার আইন-কানুন

আমেরিকা

আমেরিকাতে প্রায় ৩000 কলেজ ও ইউনিভারসিটি আছে। বলাই বাহুল্য এর সবগুলিই কুলীন নয়। অর্থাৎ ...খানে প্রেসিডেন্সি কলেজের মত কলেজও আছে ...আবার বসিরহাট কলেজের মত কলেজও আছে। ...বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপার একই। ক্যালিফোর-নিয়া, হারভারড, প্রভৃতি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়-...গুলির বিশ্বব্যাপী নাম। তবে ভারতীয়দের এসব ...বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ বিশেষ দেওয়া হয়না। বা ...সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় ...না।

আমেরিকায় স্কুল পাস করে কলেজে পড়তে যাওয়া ...যায়। মাসটার ডিগরি করতে যাওয়া যায়। ডকটরেট বা ...পোসট ডকটরেট করতেও যাওয়া যায়। আমেরিকার ...কলেজে পড়তে গেলে ৩ ঘণ্টার স্কলাসটিক ...অ্যাপটিটিউড টেসট সংক্ষেপে 'স্যাট' দিতে হয়। মাসটার ...ডিগ্রি বা ডকটরেট করতে গেলে গ্রাজুয়েট রেকরড ...একজামিনেশন দিতে হয় এবং টোয়েফল অর্থাৎ টেসট ...অব ইংলিশ এ্যাজ ফরেন ল্যাংগুয়েজ।

...যারা ম্যানেজমেনট পড়তে যান তাদের গ্রাজুয়েট ...ম্যানেজমেনট এডমিশন টেসট পরীক্ষা দিতে হবে। যারা ...মেডিকেল পড়তে যান তাদের একজামিনেশন অব দা ...এডুকেশনাল কাউন্সিল ফর ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েট ...দিতে হয়। যারা আইন পড়তে যান তাদের দা ল স্কুল ...এডমিশন টেসট দিতে হয়। যারা পোসট ডকটরেট ...করতে যান তাদের জি আর ই পরীক্ষা দিতে হয় না।

...উপরের পরীক্ষায় পাস করবার পর স্কলারশিপের ...চেষ্টা করতে হবে। এজন্য আমেরিকান কনসুলেটে গিয়ে ...যোগাযোগ করতে হয়।

সোভিয়েত দেশ

সোভিয়েত দেশে যেতে গেলে রাশিয়ান ভাষা শিখতে হবে। কলকাতার গোর্কী সদনে এই ভাষা শেখার সুযোগ আছে। ওখানে ইন্দো সোভিয়েত কালচারাল রিলেশনের লোকজনদের কাছে অথবা পারক স্ট্রিটের সোভিয়েত কনসুলেটে গিয়ে সোভিয়েত দেশের পড়াশুনা করার ব্যাপারে বিশদ জানা যায়। মোটামুটিভাবে সোভিয়েত দেশে যেতে গেলে কোন ফর্মাল পরীক্ষায় বসতে হয় না। মেধার সংগে রাজনৈতিক বিশ্বাসও ওদেশে পড়তে যাবার একটা শর্ত। এজন্য একটু 'যোগাযোগ' রাখতে হয়। আইন অনুযায়ী খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে আবেদন করতে হয় সোভিয়েত দেশে পড়তে যাবার জন্য। বছরের গোড়ায় এই বিজ্ঞাপন প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজে প্রকাশ হয়। বছরে ১২৫/১৩০ জন ভারতীয় ছাত্র সোভিয়েত রাশিয়া যেতে পারেন। অবশ্যই ওদের দেশের স্কলারশিপ নিয়ে। নিজ ব্যয়ে ওদেশে পড়া যায় না।

ব্রিটেন

ব্রিটেনে পড়তে যাওয়ার জন্য আছে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ। কিছু বেসরকারী স্কলারশিপও আছে। এজন্য পরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষা সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য আছে ৮ নং শেকসপীয়র সরণীর ব্রিটিশ কাউনসিল লাইব্রেরি, কলকাতা ১৬।

ফ্রানস

ফ্রানসে পড়তে গেলেও ফরাসী ভাষা শিখতে হয়। কারণ ওদেশে শিক্ষার মাধ্যম ফরাসী ভাষা। এই ভাষা পারক স্ট্রিটের আলিফাঁসে কেন্দ্রে শেখার ব্যবস্থা আছে। মোটামুটিভাবে দু'বছর ওখানে পড়াশুনা করতে পারলে ফ্রানসে পড়াশুনা করতে যাবার বিশেষ অসুবিধা হয় না। ফ্রান্সে যাবার নিয়ম কানুনও বিশদভাবে ওখান থেকে জানা যায়। শিল্প, সাহিত্য, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২৫টি ছাত্রবৃত্তি ফরাসী সরকার ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বছর দেন। এজন্য একটা পরীক্ষা হয়। ইউ জি সি ফ্রানসে পড়তে যাবার জন্য ছাত্রদের নির্বাচন করে। পন্ডিচেরী এবং চন্দননগরের ছাত্রছাত্রীরা যারা ছোটবেলা থেকে ফরাসী ভাষা শেখেন তারাই ফ্রানসে পড়তে যাবার পরীক্ষায় বেশির ভাগ সুবিধা করতে পাবেন। ফ্রানসের কমপিউটর টেকনোলজি বিশ্বের সেরা। সুতরাং ঐ বিষয় পড়তে যাবার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ভিড় সব থেকে বেশি হয়। [১৯৬১] সাল থেকে প্রায় ২000 ভারতীয় ফ্রানসের টেকনোলজি ইনডাসট্রিয়াল রিসেপশন প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন।

পশ্চিম জারমান

পশ্চিম জারমানে পড়তে যাবার জন্যও জারমান ভাষা শিখতে হয়। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডস্থিত ম্যাকসমূলার ভবনে জারমান শেখার ব্যবস্থা আছে। পঃ জারমানে পড়তে যাবার নিয়ম কানুনও ওখান থেকে জানা যায়। □

বরুণ দাশ

নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী

অমিতাভ চৌধুরী

একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মানসী নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন (১৮৫৯–১৮৮৪)। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে নতুন বৌঠান ছিলেন তাঁর প্রেরণা। তাঁর মৃত্যু কবিকে সেদিন প্রচন্ড দুঃখ দিয়েছিল। সেই সুখ দুঃখের নানা স্মৃতি ছড়িয়ে আছে কবির বিভিন্ন লেখায়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নষ্টনীড়ের চারুলতার মধ্যে নতুন বৌঠানকেই খুঁজে পাওয়া যায়।

গত ৪ জুন আবৃত্তিলোক এক অভিনব অনুষ্ঠান করেছিলেন নতুন বৌঠান স্মরণে। বসন্ত চৌধুরী একক আবৃত্তি ও পাঠে সেদিনের সেই বিষণ্ণ স্মৃতিকে শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। কলকাতার সংস্কৃতি জগতের প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন এই অভিনব অনুষ্ঠানটিতে।

বসন্তবাবুর বিভিন্ন মুডের আবৃত্তি ও পাঠের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল দৃশ্যানুগ আলোকসম্পাত।

ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাদম্বরী দেবীর যে সংক্ষিপ্ত জীবনীটি প্রচারিত হয়েছিল তা এখানে প্রকাশ করা হল।

আবৃত্তি করছেন বসন্ত চৌধুরী। আলোকচিত্র : অভিজিত রায়

কাদম্বরী দেবী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ন' বছর বয়সে নতুন বউ হয়ে আসেন। তাঁর প্রাকবিবাহ জীবনের বিশদ বিবরণ যেমন জানা যায় না, তেমনি জানা যায় না তাঁর নিজের জবানিতে পরবর্তী জীবনের কথা। সামান্য তথ্য মেলে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের রচনায়, চিঠিতে ও আলাপচারিতে। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য বউদের মত তিনি আত্মকথা লিখে যাননি। শুধু তাই নয়, তাঁকে লেখা বা তাঁর লেখা কোন চিঠিও পাওয়া যায়নি।

কাদম্বরী দেবীর জন্ম কলকাতায়। ১৮৫৯ সালের ৫ জুলাই। তাঁর বাবার নাম শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। শোনা যায় বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল কাদম্বিনী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে গাঙ্গুলি পরিবারের সম্পর্ক অনেক দিনের। প্রিনস দ্বারকানাথের ঠাকুরদা নীলমণি ঠাকুরের ভাই গোবিন্দরামের স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইপো জগমোহন গাঙ্গুলিকে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে হাড়কাটা গলিতে বাড়ি করে দেন। তাঁরই চেষ্টায় দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণি দেবীর সঙ্গে জগমোহনের বিয়ে হয়। এই জগমোহনেরই নাতনি কাদম্বরী দেবী—শ্যামলাল গাঙ্গুলির সেজ মেয়ে। তাঁর মুখের গড়ন ছিল সুন্দর, রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম। তাঁর একটি জন্ম ছক পাওয়া যায়। তাতে রাশি নক্ষত্রের পরিচয় আছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের বাড়ির সকলের রাশিচক্র সংকলন করেছিলেন। এই সংকলন আছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে।

জন্ম ১৭৮১ . ২/২১/১৬/৫০ শক ২২ আষাঢ় ১২৬৬ বঙ্গাব্দ। মঙ্গলবার। শুক্ল ষষ্ঠী। পূর্ব ফাল্গুনী সিংহ রাশি। মঙ্গলের দশা ভোগ্য ৪/৬/১৩/৮।

কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়েতে আপত্তি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। তিনি চেয়েছিলেন এই বয়সে ছোট ভাইয়ের বিয়ে না দিয়ে পড়াশুনোর জন্যে তাঁকে ইংলন্ড পাঠাতে। ১৮৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি আহম্মদনগর থেকে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে চিঠিতে তিনি লেখেন 'আমি যদি নতুন হইতাম তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না। কোন্ হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না।'

এই আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে হয় যথাদিনে। বিয়ের তারিখটি কাদম্বরী দেবীর জন্মদিনও। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় খবরটি ছাপা হয় এই ভাবে ব্রাহ্মবিবাহ, গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়েছে। বিবাহসভায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া কিছুর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।'

বিয়ের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন না। ছিলেন মারী হিলসে। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ভাইপো এবং অবনীন্দ্রনাথের জ্যাঠামশাই গণেন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন 'প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু আমার সাধ ও কল্যাণকর কার্য হইয়াছে তাহা তোমার প্রযত্নেই হইয়াছে।' পারিবারিক হিসাবের খাতা থেকে জানা যায় ঘটক বিদায় কুলীন বিদায় অধ্যাপক বিদায় পাকস্পর্শ ইত্যাদি হিন্দু আচার এই বিয়েতে পালন করা হয়। তাছাড়া বিবাহ উপলক্ষে বাটীর সমুদায় বালকবালিকাগণের পোশাক তৈরির ব্যয় বাবদ দু'শ বারো টাকা সাড়ে পনের আনা খরচ হয়েছে এবং অরুণেন্দ্র সোমেন্দ্র রবীন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ বাবুর জন্য ইংরাজের দোকান হইতে জুতো কেনা হয়েছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ এই বিয়ের পরও তাঁর আপত্তির কথা একটি চিঠিতে লেখেন 'শ্যামবাবুর মেয়ে মনে করিয়া আমার কখনই মনে হয় না যে ভাল মেয়ে হইবে। কোন অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না।' সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মনের কথা দেবেন্দ্রনাথকে জানালে তিনি জবাবে লেখেন, 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এই-ই ভাগ্য। একে তো পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানের জন্য পিরালীরা আমাদিগকে ভয় করে।'

সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ইচ্ছে ছিল অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার। ওঁরা চেয়েছিলেন ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর মেয়ের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ে হোক। জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন 'সূর্যকুমার চক্রবর্তীকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডাক্তারী শেখাতে বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বড় মেয়ে মিস্ কারপেনটারের সঙ্গে বিলেত থেকে এসেছিল।...... শ্যামলা রঙের ওপর তার মুখশ্রী ভাল ছিল। তাকে আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল। কলকাতায় এসে তাঁকে দেখিয়েও ছিলুম।'

অনুমান করা অসংগত নয় যে, একটা বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই কাদম্বরী দেবী ঠাকুরবাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাব তো স্পষ্টই। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে বিয়ের সব ভার দেওয়া হয় তাঁর অতি বিশ্বস্ত গণেন্দ্রনাথকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বা হেমেন্দ্রনাথ তিন জ্যেষ্ঠ সহোদর কোন দায়িত্ব পাননি বা নেননি।

কাদম্বরী দেবীর বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত। বিয়ের স্মৃতি তাঁর মনে আছে। সাত বছরের দেওর ন'বছরের নতুন বৌঠাকরুন সম্পর্কে বলেছেন—'এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ, কচি শ্যামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি।' রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমবয়সী কাদম্বরী দেবীর কাছ

ছেকে পেলেন মায়ের আদর দিদির স্নেহ বন্ধুর ভালবাসা। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।'

বিয়ের আগে কাদম্বরী দেবী সম্ভবত নিরক্ষর ছিলেন। ঠাকুর-বাড়ির পারিবারিক খাতায় দেখা যায় বিয়ের তিনমাস পরে তাঁর জন্যে কেনা হয়েছে ধারাপাত এবং বিয়ের ন'মাস পর কেনা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। তারপর আশ্চর্য দক্ষতায় তাঁর উত্তরণ। শিক্ষায় দীক্ষায় তিনি ঠাকুরবাড়ির উপযুক্ত তো হলেনই, সেইসঙ্গে অতিরিক্ত কিছু গুণ তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলল। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, সেকালের সাহিত্যিকদের গুণগ্রাহী, অভিনয়ে পারদর্শিনী, অশ্বারোহণে কৃতী এবং অন্যান্য গুণে অসামান্যা।

১৮৮০ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী নাটকে তিনি অভিনয় করেন উর্বশীর ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ সাজেন মদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্র। ১৮৭৭ সালে 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকে হেমাঙ্গিনী সেজেছিলেন বলেও শোনা যায়। সেকালের সেই পর্দার যুগে স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর ময়দান ও ইডেন গারডেন ঘুরে আসার কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয়। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন দার্জিলিং, গঙ্গার ধারে চাঁপদানির বাগানে, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাংলোয় এবং বোমবাই প্রেসিডেনসিতে মেজ ভাসুরের কাছে। দার্জিলিঙে নতুন দাদা ও নতুন বৌঠানের সঙ্গী না হতে পারার অভিমান ও চন্দননগরে সঙ্গী হতে পারার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া 'জোড়াসাঁকো বাড়ির তেতলায় দিনের শেষে ছাদের ওপর যখন পড়ত মাদুর আর তাকিয়া, বউঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর জড়িয়ে বসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরে গান'—ছাদটাকে তিনি একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। দুপুরবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসতেন নিচের তলার কাছারিতে—কাদম্বরী দেবী ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু থাকত তার সঙ্গে। আর তার ওপর ছড়ানো হ'ত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস, কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা দুটোর সময় রওনা করে দিতেন।

কাদম্বরী দেবীর শিল্পপ্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় বাইরের বিশিষ্ট অতিথিরাও পান। শুধু তাই নয় তাঁর সেবা ও হাতের রান্না—দুটোই ছিল মধুর। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ঐ মোরান সাহেবের বাগানের কথায় মনে পড়ে এক একদিন রান্নার আয়োজন হত বকুল গাছতলায়। সে রান্নায় মশলা বেশি ছিল না। ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বউ ঠাকরুন আমাদের দুই ভায়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের। আমার একটা বড় মুশকিল ছিল শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর সব ছেলে রোগে পড়তে জানত, তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়। তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।'

কাদম্বরী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গী ও গানের শ্রোতা। কিন্তু উপযুক্ত তারিফ পেতেন না বলে ক্ষোভ যেমন ছিল, তেমনি ছিল আরও ভালভাবে তৈরি হওয়ার চেষ্টা। নানা বিষয়ে দুজনের তর্কও হত। দুজনে একসঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতেন। একটু প্রশংসা পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর পছন্দসই পাতলা সুপুরি পর্যন্ত কেটে দিতেন। কিন্তু স্নেহ যতই থাকুক না কেন, তাঁকে প্রশ্রয় যতই দিনই না কেন, কাদম্বরী দেবীর প্রিয় কবি ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনি বলতেন, বিহারীলালের মত না লিখতে পারলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'সাহিত্যে বউঠাকুরানির প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল।...... এই সময় বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরানি এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজ হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসনও দিয়াছিলেন।'

এই আসন নিয়ে বিহারীলাল পরে তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থ লেখেন। বইয়ের ভূমিকায় বিহারীলাল বলেছেন—'কোনো সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার সারদামঙ্গল পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারিমাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম সাধের আসন। সাধের আসনে অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া সারদামঙ্গল হইতে এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে
ধেয়াও।

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি এবং বাটীতে আসিয়া তিনটি শ্লোক লিখি। কিছুদিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসনদাত্রী এখন জীবিত নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্যের উপহৃত আসনের নাম রহিল 'সাধের আসন--।'

কাদম্বরী দেবী শুধু বাড়ির ভিতরে নয়, অন্যান্যদের সঙ্গে বাইরেও যেতেন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে। শরৎকুমারী চৌধুরাণী জানান, জানকীনাথ ঘোষালের রামবাগানের বাড়িতে ভারতীর জন্য লেখা প্রবন্ধ পাঠের আলোচনায় তিনি যোগ দিতেন। জোড়াসাঁকোর ভিতর বাড়ির ছাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পড়ে শোনাতেন বঙ্গাধিপ পরাজয় এবং আরও অনেক বই।

বাড়িতে নিকটজনেরা রহস্যচ্ছলে তাঁকে ডাকতেন হেকেটি—গ্রীকদের ত্রিমুণ্ড দেবী। কেন হেকেটি? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁর হৃদয়ে ছিল ত্রিবেণী সঙ্গম—বিহারীলালকে শ্রদ্ধা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রীতি এবং রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ।

কাদম্বরী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন বাইরে বাইরে। কাদম্বরী দেবীর নিঃসঙ্গ জীবনের সহচর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—যাঁকে তিনি স্নেহে, মমতায় নিবিড়ভাবে বেঁধে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের পর তিনি আরও নিঃসঙ্গ হয়ে যান। আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল। চারবছর আগে ১৮৮০ সালে আর একবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। □

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

ইন্দ্রনাথ যে ভেতরে ভেতরে এত উত্তেজিত হয়েছিল, মৃগাঙ্ক বুঝতে পারেনি। চমকে উঠেছিল কণ্ঠ-বিস্ফোরণ শুনে। থতমত খেয়ে গিয়েছিল দেবনাথ।

জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছি।

যেন শংকর মাছের চাবুক পড়ল ইন্দ্রনাথের মুখে। কিছুক্ষণ আর মুখে কোন কথা সরল না। তারপর –

ছেড়ে দিলি?

কিন্তু ঠিকানা রেখে দিয়েছি।
চামড়ার হ্যানড ব্যাগ কারখানায় কাজ করে।

এসেছিল কেন?

শ্রাবন্তী গুহ বলে কে মারা গেছে, কাগজে খবর বেরিয়েছে শুনে এসেছিল।

বিচিত্র অনুসন্ধিৎসা! খবরের কাগজ পড়ে লালবাজারে?

ঐ নামে একটা মেয়ে নাকি অনেকগুলো ব্যাগ কিনে পালিয়েছে–দাম দেয়নি।

তুই ছবি দেখালি?

ছবি দেখে তো বললে এ-মেয়ে সে-মেয়ে নয়।

নাম? ঠিকানা?

বাসন্তী গুপ্ত, রাধানাথ মল্লিক লেন।

(চলবে)

বাংলা পপ গানের এই ধারা কি অচিরেই বন্ধ করা উচিত?

মনোশ্রী লাহিড়ী

পপ সংগীত মূলত এসেছে পশ্চিমী লোকসংগীত ও লোকনৃত্য থেকে। এই লোকসংগীত ও লোকনৃত্য আবার নিগ্রো সংস্কৃতির সংগে অনেকখানি যুক্ত। জাজ সংগীত যেমন কৃষ্ণাংগদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার ব্যাপার অথচ ইওরোপ আমেরিকায় প্রসারমান তেমনই পপ সংগীত পশ্চিমী উপজাতি আদিবাসী এবং কৃষিজীবী ও পশুপালক সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে মুক্ত হয়েছে অনাবিলভাবে।

এই অনাবিল ভাবটি অনেক সময়ই রুদ্ধ হয়ে গেছে অবশ্য শহরজীবনে এসে। পশ্চিমী উন্মার্গগামিতা ইদানিং কালে এর সংগে মিশে গিয়ে এমন এক ভাবচ্ছটা বা রংগরস প্রকাশ করছে যা শহুরে মানুষের কাছে সমর্থনযোগ্য হয় না। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, অনেক সময় গ্রামীণ কৃষিজীবী সংস্কৃতি শহুরে মানুষের কাছে কৃত্রিম এক পরিবেশের জন্যও গৃহীত হয় না।

বাংলাতেই এমন অনেক গান বা গায়নভংগি আছে যা নেহাৎই কৃষিজীবী সংস্কৃতির ধারা বহন করে এসেছে। অথচ আমাদের মধ্যবিত্ত চিন্তাচর্চায় তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি না। নীতিবাগীশ মনোভাব ও রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া যে কোন ধরনের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারে। সে কারণে বাংলার অনেক লৌকিক সম্পদ লুপ্ত হয়ে গেছে।

পপ সংগীত যুগ বদলানর সংগে সংগে চেহারাও বদলেছে। প্রত্যেক দশকে সে তার চেহারা ও চরিত্র বদলেছে। শ্রোতারাও এক একটি সময়ে এক এক ধরনের গানকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমর্থন করেছেন। আমাদের স্মরণকালের জাজ নিয়ে এই উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণা ছিল, পরে এল রক-এন-রোল সেই সমান উত্তেজনা নিয়ে।

জাজ এবং রক-এন রোল গেয়ে কিংবা সুর বাজিয়ে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী এসময়ে নাম করেছিলেন। এদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ভাসিয়ে দিয়ে এলেন চারজন যুবক, বিটলস। বিটলসদের গান সারা পৃথিবীতে আলোড়ন নিয়ে এল। বিশেষত যুবক যুবতীরা বিটলসদের নামে পাগলের মত রাস্তায় নেমে এসেছিল।

গোষ্ঠীগতভাবে গান পরিবেশন করার এই কায়দা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল। এদেরই অন্যতম উত্তরাধিকার হিসাবে এল ওসিবিসা। যাদের বলা যায় বিটলসদের পরে অন্যতম সেরা সংগীত গোষ্ঠী। ওসিবিসা কলকাতায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে গেছে। তাদের সুর ও তাল জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী শক্তির কেউ কি বিরোধিতা করবেন?

ইদানিং কালে জাজ সংগীতকে লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত বলে স্বীকার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে টপ্পা, ঠুংরি, গজল বা কিয়ৎ পরিমাণে কাজরীকেও লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত বলা হচ্ছে। বিশেষ করে ডিউক এলিংটন-এর মত অভিজাত শিল্পীদের ছোঁয়ায় জাজ সংগীত আভিজাত্যের মহিমা পেয়েছে। তাই, আজ যা লোকায়ত আগামীকাল তা চিরায়ত, এভাবেই শিল্পসংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে সর্বত্র। এলিংটন কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন অনুষ্ঠান করতে। যাঁরা সে অনুষ্ঠান শুনেছিলেন তাঁরাই জানেন সে মহিমার কথা।

পপ সংগীত বলতে কী বুঝব? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কিন্তু সহজসাধ্য নয়। প্রখ্যাত সেতারী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি যা বললেন সেটা হয়ত অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তাঁর মতে, সকলে এমনকি গান বাজনা না জানা লোকও যে সংগীতের রস পেতে পারে তাকেই পপ সংগীত বলা যায়। পপ সংগীতে একটা লিফটিং টিউন (Lifting tune) থাকবে, অর্থাৎ কিনা যা মানুষকে আনন্দ দেবে কিন্তু আনন্দের মধ্য দিয়েই উন্নীত করবে। ওঁর এই কথা থেকে একটা কথা কিন্তু বোঝা যায় যে পপ সংগীতকে তিনি অন্তত কুরুচিকর কোন কিছু বলে মনে করেন না। গায়িকা বনশ্রী সেনগুপ্ত বেশ কিছু পপ গান গেয়েছেন। তিনি বলেন, 'পপ গান সম্বন্ধে আমার খুব একটা ধারণা নেই। আমার মনে হয় পপ সং এমনই একটা গান, যা শুনলে আমাদের মনে হালকা বিস্ফোরণের মতই একটি ছোট্ট চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই ধরনের গানে মুখ্য যন্ত্র থাকবে ড্রামস। ড্রামস-এর শব্দে মনে আমাদের বিস্ফোরণ ঘটতে থাকবে।' বনশ্রীর উল্লেখিত বিস্ফোরণ কথাটি কিন্তু খানিকটা আক্ষরিক বটে। কলকাতা আলোড়িত করে যাওয়া ওসিবিসার স্মৃতি নিশ্চয়ই মন থেকে মুছে যায়নি। সাম্প্রতিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহারের দরুন এই সব গানের শব্দের কম্পাংক অনেক বেশি হয়। অর্থাৎ অনেক উঁচু পর্দায় আঁটা। পপ সংগীতে যাঁর যথেষ্ট খ্যাতি এবং পরিচিতি সেই শ্রাবন্তী মজুমদার কিন্তু সরাসরি জানালেন পপ সং সম্বন্ধে তিনি তেমন কিছুই জানেন না; মূলত তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের ছাত্রী, মুনাব্বর আলির কাছে তালিম নিচ্ছেন বহু বছর, রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন মায়া সেনের কাছে, কিন্তু নানা ধরনের গান গাইতে তাঁর ভাল লাগে। এই ভাল লাগা থেকেই খানিকটা চ্যালেনজের ভংগিতে প্রথমে কোলে বিসকুটের বিজ্ঞাপনে পিন্টু ভট্টাচার্যের সংগে দ্বৈতকণ্ঠে একটি গান গেয়েছিলেন। সেই থেকে তাকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে পপ গায়িকা বলে। তিনি এই বিশেষ অভিধায় মোটেই সন্তুষ্ট নন। তিনি কীর্তনাংগে গান গাইলেও তাকে পপ সং-ই আখ্যা দেওয়া হয়, এতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। তাঁর অনুমান, এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের কোন ভিত্তি নেই অন্তত বাংলা গানের ক্ষেত্রে। তবে একটু অন্য ধরনের কণ্ঠ, পাশ্চাত্য স্বরক্ষেপণ ভংগি বা গায়কভংগিতে পাশ্চাত্য প্রভাব, গানের ভাষায় কিছু বক্তব্য এক ছন্দ বা রিদম প্রধান গান এ সবের সমন্বয় ঘটলেই হয়ত তাকে পপ গান বলা যেতে পারে। অনেকের সংগে আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বাংলায় পপ গান বলতে স্পষ্ট কোন ধারণাই এখনও হয়নি। কেননা বাংলায় লোকসংগীতের যে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে বাংলায় পরিবেশিত পপের সংগে তার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ বলা চলে। কারণ হয়ত এই যে, এ গানের মূল প্রোথিত রয়েছে আবার পাশ্চাত্যে। পাশ্চাত্যে পপ সংগীতে ব্যক্তিগত অনুভূতির

ইনডিয়ান মাইম থিয়েটার

গত ২৪ মার্চ শিশির মঞ্চে ইনডিয়ান মাইম থিয়েটারের 'মূকাভিনয়' অনুষ্ঠিত হল। নির্দেশক ও পরিচালক নিরঞ্জন গোস্বামী।

[illegible]

জায়গা শ্লান্তিকর মনে হয়েছে এই কারণে যে একই অংগভংগি বা হাতের মুদ্রা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। শেষ আইটেম হল 'বিমেমব্রেন্স'। [illegible]

কথাই প্রাধান্য পায় কিন্তু প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত অনুভবেও অনেক ফারাক।

বাংলায় পপ সং কথাটি প্রথম শোনা গেল সম্ভবত ষাটের দশকের শেষ ভাগে উনসত্তরে যখন হেমন্ত-কন্যা রানু মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'বুশি বল' গানটি শোনা গেল। একটি পোষা কুকুর ও তার প্রভুর সম্পর্ক নিয়ে গানটির কথা অংশ। রানুর একটু তীর্যক উচ্চারণ ভঙ্গি ও নিচুগ্রামে গাওয়া, চেরা কণ্ঠস্বর– গানটির অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে এর কোন উপকরণটি কিংবা সবকটি উপকরণের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল কিনা সেটা নির্ণয় করা কঠিন। এই গানটির সুর দিয়েছিলেন বালসারা। শ্রাবন্তীর কণ্ঠে 'আমার যখন সাত, তার বয়েস সবে এগার' গানটিও একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। এ ধরনের আরও কিছু গান শ্রাবন্তী এবং রানু দুজনেই করেছেন। শ্রাবন্তীর কণ্ঠে 'আমি একটা ছোট্ট বাগান করেছি' বা 'আমি নিজেই জানি না' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে আটবট্টিতে বনশ্রী সেনগুপ্তের গাওয়া 'নিঃঝুম রাত নিরালা', রবীন্দ্র জৈনের সুরে 'এ কী, চলে যাচ্ছ, বাইরে যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে' প্রভৃতি গানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ঊষা উত্থুপের কণ্ঠে বাংলা পপ গান 'আহা সুন্দরী কলকাতা' বহু জনেরই মনোহরণ করে। খবর পাওয়া গেল, অতি সম্প্রতি ঊষা আরো এগার বারখানি গান রেকরড করেছেন এই পর্যায়ে, তার মধ্যে একটির কথা সম্ভবত 'কেউ বুঝল না কেউ শুনল না'।এই গানের জন্ম ইতিহাস সহজেই অনুমান করা যায়। এদেশে অতি সম্প্রতি ডিসকো মিউজিককে যদি পপ গানেরই রূপভেদ মনে করা যায় তাহলে রুনা লায়লার 'সুপারুনা' এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই উল্লেখ পাবে। গত পুজোয় সুবীন সরকারের গাওয়া 'আজ রোববার' এবং সুব্রতা মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে স্বকণ্ঠে গাওয়া 'কলকাতা গান্ধারী'কেও এ পর্যায়ে আনা যায়। আসলে আধুনিক বাংলা গান ও বাংলা পপ গানের মধ্যে সীমারেখাটি খুব স্পষ্টভাবে টানা যায় না।

এ তো গেল ছায়াছবির বাইরে ডিসকো গানের প্রসঙ্গ। বহুকাল আগে থেকে হিন্দি ফিলমে এবং বছর পনের ষোল আগে বাংলা ফিলমে পপ গানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'ফরিয়াদ' ছবিতে 'আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কী' গানটি নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে। 'ছিন্নপত্র,' 'রোদনভরা এ বসন্ত' এ সব ছবিতেও আছে পপ গান। সত্তরের দশকে মান্না দের কণ্ঠে 'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না'-কেও নিঃসংশয়ে পপ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 'জয়জয়ন্তী' ছবিতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'আরো কাছে এসো না' গানকেই বা পপ ছাড়া আর কী বলা যায়! হালের বাংলা ছবিতে ক্রমশ ক্যাবারে জাতীয় নাচ গানের মুহূর্ত ক্রমশই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। নাচ বা বেশভূষা প্রসঙ্গে না গিয়েও গানগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে হয়ত বা এগুলোকেও পপ পর্যায়েই ফেলতে হবে। মনে রাখতেই হবে এধরনের গানে প্রতিষ্ঠিত বহু সম্মানিত শিল্পীও কণ্ঠ দিচ্ছেন। একই কথা বলা যায় বাংলা নাটক প্রসঙ্গেও। পেশাদারি মঞ্চে উপস্থাপিত নাটকগুলিতে ক্যাবারে এবং তার অনুষঙ্গী গান থাকছে, ক্যাবারে না থাকলেও বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের নাটকে পপ গানের ব্যবহার হচ্ছে। পপ গান ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, একথা অনস্বীকার্য।

কাজেই, পপ গানকে অপসংস্কৃতি বলা যাবে কিনা, আধুনিক যুবমানসে তার প্রভাব কী, জনজীবনে অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলছে কিনা এসব গান, এমন সব বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে বাংলা আধুনিক গানের একটি উপশাখা হিসেবে জন্ম নিয়ে ক্রমে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রয়োগ, পাশ্চাত্য সংগীতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এসব নিয়ে নতুন একটি ধারা হয়ে বয়ে চলেছে বাংলা পপ গান। এখন তাকে স্বাগত জানাব, না শিকড় থেকেই উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করব আমরা, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেখানে। □

এন এস এস ও স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের গণদেবতা

ন্যাশনাল স্যামপল সারভে অরগানাইজেসন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বনভোজন এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।

১৯ জুলাই বিশ্বরূপা মঞ্চে ওঁদের তৃতীয় বার্ষিক আনন্দানুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভাষণ দিয়ে।

এর পর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেন সভাপতি এ কে পাল।

ম্যাজিক শো-এর পর এদিনকার সর্বশেষ ও সবচেয়ে মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান ছিল 'গণদেবতা' নাটক।

গণদেবতা নাটকে কুশীলবদের প্রত্যেকের অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে 'গণদেবতা' নাটকের শিল্পীরা সকলেই পেশাদার। বিশেষ করে ছিরু পালের চরিত্রে নরেন চৌধুরী, পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ, অনি কামারের অভিনয়ে হিমাংশু চক্রবর্তী এবং দুর্গার চরিত্রে গীতাঞ্জলি ব্যানারজির অভিনয় অতিনাটকীয় মনে হয়নি। তবে অনেক সময় মনে হয়েছে অভিনয়ে স্বাভাবিকতা থাকলেও মেকআপের বাড়াবাড়ি বেশ কিছু চরিত্র বেমানান করে দিয়েছে। অনি কামারের স্ত্রী নীলিমা বসু ও দেবু ঘোষের স্ত্রী অর্চনা মুখারজির অভিনয় যথাযথ।

সাথী চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

'শৃংখল'

'শৃংখল' বর্তমান যুগের রঙিন প্রতিচ্ছবি। নবীন পরিচালক আশীষ বসু দর্শকদের মনের কথা ভেবে তাঁরই কাহিনীর চিত্রনাট্য করেছেন। কাহিনীর মধ্যে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের একটি বিতর্কিত উপন্যাসের আদল রয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় অভিজিৎ সেনের। চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রবীণ নটবাবলের কন্যা বীণা অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় করেছেন। বীণার অভিনয়ে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। শ্রীলা মজুমদার এতদিন আর্ট ফিলমেই কাজ করেছেন, কমারশিয়াল ফিলমে চরিত্রচিত্রণ করে প্রমাণ করেছেন তিনি [illegible]। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট একটি ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন। উৎপল দত্ত ও সন্তোষ দত্ত [illegible] ভূমিকা [illegible] চিত্রনাট্যের [illegible] অনুযায়ী। [illegible] চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। নায়ক জয় সেনগুপ্তর অভিনয় মার্জিত এবং সাবলীল। রবি ঘোষের কাছ থেকে আরও কিছু প্রত্যাশা ছিল। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরের চেয়েও গানগুলির কথা ভাল এবং সুপ্রযুক্ত।

পরিচালক অধিকাংশ শুটিং [illegible] করেছেন, ফলে কাহিনীর পটভূমি চিত্রিত হয়ে গেছে।

[illegible] শেষ দিকে [illegible] ফোটোগ্রাফিকে শেষ করেছে। [illegible] কি করে হয়, তার কোন [illegible] লেখক ও পরিচালকের [illegible] শেষের দিকের সমস্ত [illegible] তিনি ছবির [illegible]। [illegible] 'শৃংখল' একটি উন্নত [illegible] [illegible] আশীষ বসুর [illegible] চরিত্রগুলিতে [illegible] রঙিন ছবি [illegible] যুক্ত হবে

বীণা রায়

তেপান্তরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

ছোটদের একটি সুন্দর কাগজ তেপান্তর। তাকে ঘিরে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিশুসাহিত্যের যে সম্মান, তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। শুধু ছোটরা নয়, ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন, ছবি আঁকেন, অভিনয় করেন, গান শোনান–সবাইকে নিয়ে তেপান্তরের যে বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি তা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। যেমনি ছিল ছোটদের গানের আসর, মজার নাটক, তেমনি ছিল শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি। ছোটদের সেরা লিখিয়ে হিসেবে রঞ্জন ভাদুড়ী, সমীর চট্টোপাধ্যায় আর অশোক মিত্রকে জানান হল সংবর্ধনা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হল যে পুরস্কার সে-ও তো তেপান্তরের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পুরস্কার প্রদানের পরেই ছিল ছোটদের গানের আসর। শৈবাল মজুমদারের পরিচালনায় শুভা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপর্ণা ঘোষ, রঞ্জিনী রায়, শম্পা দেব, সংঘমিত্র কর, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মহুয়া ভট্টাচার্য, শর্মিলা ঘোষ, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বৈশাখী মজুমদার মুগ্ধ করেছেন শ্রোতাদের।

সবশেষে ছিল তেপান্তর নাটক বিভাগের নাটক 'শেষ পর্যন্ত'। ছোটদের লেখক নির্মলেন্দু গৌতমের লেখা। পরিচালনা এবং মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন সুধাময় গৌতম। ক্ষুদে শিল্পীদের সকলকেই বাহবা জানাই অকপটে। তবু অলক ঠাকুর, রাজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব গঙ্গোপাধ্যায়, অমিত ঘোষ দস্তিদার আর সংযুক্তা গুপ্তকে ভুলতে পারব না কোনদিন। তেপান্তর নাটক বিভাগের তারা গর্ব।

কার্তিক ঘোষ

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৬১

১	২	৩	৪		■	৫	৬
৭				■	৮		
	■	■	৯	১০			■
১১	১২	■	১৩		■	১৪	১৫
■	১৬	১৭	■	■	১৮		
১৯			২০	২১	■	■	
	■	■	২২			■	
২৩					■	২৪	

সূত্র : পাশাপাশি

১। চানাচুরে-মিষ্টিতে,
দুয়েতেই ভাল খেতে

৫। আকার দিলে ব্যায়ামবীর,
নইলে আঠা ইংরেজির

৭। রসিক মহাশয়, দেখি অসময়

৮। রাবণ যথা সীতায় ধরে,
তেমনি করে চুরি করে

৯। বেদের ভাগে পাই,
গানের সুরে গাই

১১। সর্প জানি একে,
আবার পদবিতেও থাকে

১৩। প্রেমে কিংবা গানে,
ক্রোধে অভিমানে

১৪। কথার অর্থ খুঁজি,
নিজের বলতে বুঝি

১৬। রাজার খোঁজে রাশিয়া যাই,
উল্টে নিয়ে তবে পাই

১৮। তরকারি চাও ? দেখ যদি পাও

১৯। আসীন পদ্মফুলে,
লোকে লক্ষ্মী বলে

২২। জেল্লা বা সমারোহ,
প্রতিশব্দ ভেবে কহ

২৩। সুস্বাদু শাক,
ভাতের পাতে থাক

২৪। রোগা ইনি নন, মেদবহুলই হন।

সূত্র : ওপর-নিচ

১। মজুরেরা এই ঘরে,
জিনিসপত্র তৈরি করে

২। ফল থেকে পাই, যদি রস চাই

৩। আকার পেলেই নারী,
বাঁয়ে চিনতে পারি

৪। অনিচ্ছায় কাজ করা,
তাকে বলে ? –

৫। যদি সাজা পায়, অপরাধীরা যায়

৬। কে জি-র হিসেব নহে,
চল্লিশ সেরে কহে

৮। ভবিষ্যতের হয়,
কী কথাতে কয় ?

১০। আরাকানবাসী,
হেথায় দেখ আসি

১২। গ্রীষ্মকালে পাই,
এ অনুভূতিটাই

১৫। পাবে গাছের ডালে,
খাবে চচ্চড়ি বা ডালে

১৭। মাটির কলস বড়,
তাহাতে জল ভর

১৯। কথকতা নয়, নাচের কথা হয়

২০। জল আছে তাই, এইরূপে পাই

২১। 'নাম' থাকে আগে,
অংকেতে লাগে।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১৪ সেপটেমবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১. ৯. ৮৩। সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল—৬১' লিখতে ভুলবেন না। ছক না পাঠালে কোনমতেই লটারিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন।

শব্দশৃঙ্খল—৫৭(সমাধান)

চু	ব	টি	কি	■	সে	বা	■
লা	■	কি	■	পা	■	ঘা	স
■	ই	ট	■	ক	ষ্ট	■	মী
বা	জে	■	তি	কো	ত	মা	র
ভা	ল	পো	ল	■	র	■	ণ
র	■	লা	■	প	ঙ্ক	শি	■
ম	ব	কা	ব	■	বা	■	মা
■	ল	র	■	ঘ	র	গো	ষ্ঠী

শব্দশৃঙ্খল—৫৭-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন সৌমেন দাশ (৪/২ তপসিয়ালেন, কলকাতা-৪৫) এবং গৌতম সেন (৫/সি অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা-১২)। ৬ আগসট অনুষ্ঠিত শব্দশৃঙ্খল—৫৭-র লটারিতে বিচারক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ গাংগুলি।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

[আগসট ১৭ থেকে ২৩]

মেষ : শারীরিক ঝামেলা থাকবে মেয়েদের ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। আর্থিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি; কিছু সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে কোন অপ্রত্যাশিত সাহায্য কোন ঘটনার মোড় ফেরাবে; মেয়েদের কোন প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা শক্ত হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে বড় রকমের মতের অমিল। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের নতুন অসুবিধে। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বৃষ : কোন ব্যথা-বেদনা কাবু করবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা; বড় রকমের ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না; মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট ক্ষতি। কোন বন্ধুর জন্য বড় রকম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কোন সন্তানের আঘাত। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে।

মিথুন : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অবনতি; হঠাৎ অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা। আর্থিক চাপ চলবে; সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না; মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য। পারিবারিক ক্ষেত্রে আপোষ করতে হবে; কোন সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন।

কর্কট : শারীরিক ঝামেলা চলবে; মেয়েদের রক্তচাপজনিত পীড়া বাড়বে। আর্থিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক কোন সুযোগ বিশেষ সহায়ক হবে; মেয়েদের আগের কোন সমস্যা নতুনভাবে বিব্রত করতে পারে। ব্যবসায়ীদের অচলাবস্থা।

সিংহ : শারীরিক ঝামেলা চলবে; মেয়েদের শরীর ও মন দুইই ভাল যাবে না। আর্থিক চাপ থাকবে; অল্পবিস্তর ঋণ। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাপারে উদ্যোগ ও উৎসাহ উন্নতির সহায়ক হবে; মেয়েদের নিজস্ব মতামতে দৃঢ় থাকা প্রয়োজন। কোন সন্তানের বিদেশ-যাত্রা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কন্যা : শরীর নিয়ে অল্পবিস্তর অশান্তি; মেয়েদের শরীর ভাল যাবে। আয় বাড়বে নানা সূত্রে; কিছু সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে অনেকদিনের কোন ইচ্ছে পূরণ; মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন কোন যোগাযোগ। পারিবারিক কোন সমস্যা সমাধানের ইংগিত। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

তুলা : শারীরিক ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন হবে; মেয়েদেব শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন উদ্যমে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে পুরনো কোন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যাবে; মেয়েদের সুনাম ও সম্পত্তি সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধের অনুকূল অবসান। মেয়েদের শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, সুনাম। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃশ্চিক : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের আগের শারীরিক ধকল কিছুটা সামলান যাবে। অনাত্মীয়ের জন্য প্রচুর ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক কোন প্রাপ্তিযোগ; মেয়েদের অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না। পারিবারিক কোন সম্পত্তির আংশিক প্রাপ্তিযোগ। মেয়েদের কোন দামী জিনিস হারাবার আশংকা। ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি।

ধনু : শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক অবস্থার সামান্য হেরফের। কর্মক্ষেত্রে কোন গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা; মেয়েদের কোন ব্যাপারে পরাজয়। বয়স্করা অনেকে ভুল বুঝবে, ফলে অশান্তি। সৃজনমূলক কাজে কোন সন্তানের বিশেষ সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মকর : শরীর মোটামুটি; মেয়েদের গলার কোন রোগ ভোগাবে। উটকো ব্যয় বিশেষ বিব্রত করবে। কর্মক্ষেত্রে সহজ অগ্রগতি ও দূর যাত্রা; মেয়েদের মানসিক অশান্তি ও হতাশা। পারিবারিক নানান ব্যাপারে স্ত্রীর পরামর্শ সুখের হবে; কর্মপ্রার্থীদের অস্থায়ী যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কুম্ভ : প্রচন্ড জ্বর ও পেট সংক্রান্ত গোলমালে ভোগার আশংকা; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি। আর্থিক মন্দা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে কোন পক্ষের অকারণ বিরোধিতায় মানসিক চাপ; মেয়েদের দক্ষতা ও কৌশল স্বীকৃত হবে। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোগে বাধা।

মীন : শরীর মোটামুটি; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন বন্ধুর পরামর্শ কার্যকর হবে। কর্মক্ষেত্রে কোন আপোষের জন্য মানসিক অশান্তি; মেয়েদের ছোটখাট সমস্যা। কোন সন্তানের স্বাস্থ্যহানি; মেয়েদের আর্থিক ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

বিনয় আচার্য

... আনন্দবাজার প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ...

ক্রিকেট

খেলার আসর

নবম দশক

পাঁচ মিটারের
আলোড়ন
জাগায়
রোমাঞ্চকর
শিহরণ!

সম্পাদকীয়

গত ১১ আগস্ট রাজ্য সভায় একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দফতরের উপমন্ত্রী জনার্দন পূজারী জানিয়েছেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির বিভিন্ন শাখার কাজকর্ম সম্বন্ধে যেসব দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং অন্যান্য গুরুতর অভিযোগ রয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখার জন্য রিজারভ ব্যাংক একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে। তদুপরি রিজারভ ব্যাংক সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেও ব্লক স্তরে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে ব্যাংকগুলির কাজকর্মের তদারকি করার ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। রিজারভ ব্যাংকের এই প্রচেষ্টা নির্দ্বিধায় প্রশংসনীয় এবং ব্যাংক ব্যবস্থা-সংশ্লিষ্ট মানুষ এই প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানাবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনা ঘটেছে আজ থেকে অনেক দিন আগে। রাষ্ট্রায়ত্ত করার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল ব্যাংক ব্যবস্থার সুফল যাতে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায়, আমানতকারীরা যাতে আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা পান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যাতে উদার শর্তে ঋণ পান এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে যাতে আরো বেশি লগ্নি হয় তার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া বেকারদের কর্ম সংস্থানের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য উদার শর্তে ঋণ দেওয়া আর ছিল সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর মানুষের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য যোগানর অংগীকার।

কিন্তু ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার দীর্ঘদিন পর আমরা বাস্তবে কী দেখছি! দেখছি আমানতকারীদের দুর্ভোগ আর হয়রানি বেড়েছে। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংগে সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের মানুষ আজ তিতিবিরক্ত, ক্ষুব্ধ। রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে এ ধরনের পরিবেশ ছিল না।

এই সব ব্যাংকের কর্মীদের মাইনে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। তবুও ব্যাংকে প্রতিনিয়ত আন্দোলন এবং বিক্ষোভ চলছে। দাবি আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার অধিকার ব্যাংক কর্মীদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই আন্দোলন করতে গিয়ে যদি আমানতকারী এবং ব্যবসায়ীদের হয়রানি বাড়ে বা তাঁরা যথাযোগ্য সেবা না পান সেটা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়।

সুদূর গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ উদ্যোগ নেওয়ার কথা সেটাও যথাযথভাবে করা হয়নি। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির যে পরিমাণ সাহায্য করার কথা সেটাও প্রার্থিত পরিমাণে হয়নি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে লগ্নির পরিমাণও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তদুপরি এই সব ব্যাংকগুলিতে ঋণ দাদনের ব্যাপারেও রয়েছে বৈষম্য এবং এক শ্রেণীর অসাধু কর্মীদের যোগসাজসে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ ক্রমবর্ধমান।

রিজারভ ব্যাংকের শুধু একটি বিশেষ সেল তৈরি করে দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিষয় খতিয়ে দেখলেই চলবে না। দেখতে হবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কিনা।

পরিবর্তন

২৪—৩০ আগস্ট, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৮
দাম ২'৫০ বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা,
ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
(পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিললি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ,
ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিললি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

৩১ আগসট সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

এখন বৈষ্ণব সমাজ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর পাঁচশো বছরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তারই এক অন্তরংগ ছবি। একদিকে নবদ্বীপের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ভগ্নদশা, অন্যদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসকনের অতুল বৈভব। সংঘাত, নাকি দুজনের আপসই এখন টিকে থাকার সবচেয়ে বড় উপায় - উত্তর মিলবে দৈনন্দিন সেই অন্তরংগ ছবির মধ্যেই। সেই সংগে থাকছে কয়েকজন প্রখ্যাত ধর্মগুরুর কথা। কয়েকটি বৈষ্ণব উৎসব নিয়েও পৃথক লেখা থাকছে।

ইংলনডে পাল সাম্রাজ্য

ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে এখন যাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আতংক ও আলোড়ন, সেই বৃটিশ নাগরিক স্বরাজ পাল এখন কলকাতায় রয়েছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই শিল্পপতি কিভাবে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্য লনডন গেলেন এবং মেয়ের মৃত্যুর পর অতি সামান্য অবস্থা থেকে বৃটেনের এক প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন, তারই ঘরোয়া ইতিহাস। সেই সংগে থাকছে পরিবর্তনের প্রতিনিধির সংগে স্বরাজ পালের খোলামেলা সাক্ষাৎকার।

সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসে যাবেন না

সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন, 'কংগাই' তাঁর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাঁকে ভুল বুঝিয়েছে। তা হলে কী করবেন তিনি? নতুন দল গড়বেন - সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। পরিবর্তন প্রতিনিধির কাছে সাক্ষাৎকারে কত অজানা কথা বলেছেন তিনি। কত নেতা সম্পর্কেও না-জানা কথা।

দস্যু-সর্দার মালখান সিং

চম্বলের বজ্রপাত, ভয়াবহ মৃত্যুস্বরূপ একদা ডাকাত মালখান সিং এখন শান্তিতে কারাজীবন যাপন করছেন। পরিবর্তনের নিজস্ব প্রতিনিধি সম্প্রতি চম্বল ঘোরার সময় এই শান্ত মালখান সিং এর সংগেই দেখা করেছিলেন। কী বললেন তিনি, কেমন আছেন, ভবিষ্যতেই বা কী করবেন?

রাজ্য রাজনীতির নেপথ্যে

ইউনিয়ন করার নামে পুলিশ নিজেই এখন চূড়ান্ত বিশৃংখল। সেই বিশৃংখলা নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন।

নিবেদনমিদং

এবারের পুজো সংখ্যা পরিবর্তনের একটিমাত্র উপন্যাস লেখার জন্য আমরা নির্বাচিত করেছি এ যুগের শক্তিশালী লেখিকা কবিতা সিংহকে। কবিতা সিংহের জীবন-বোধ, সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ঘরোয়া জীবনের বাইরে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সুদূর-প্রসারী। এই তো এই উপন্যাস লেখার মাঝেই তিনি ঘুরে এলেন হিমালয়। সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের আশংকা হল উপন্যাসটি মাটি হল বুঝি! কিন্তু না, যথাসময়ে তিনি পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছেন প্রেসে। আমরা চেয়েছিলাম পরিবর্তনে প্রকাশিত উপন্যাসের একটি সামাজিক লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকবে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তা হবে গতানুগতিকতা-বর্জিত। কারণ পাঠক পাঠিকারা আর 'বয় মিটস গারল' স্টোরি পছন্দ করছেন না। ভাবালুতা, রোমান্টিকতা, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিকতার উপযোগী মেড টু অরডার উপন্যাসের দিন শেষ হয়ে আসছে। কবিতা সিংহ বেছে নিয়েছেন উনিশ শতকের কলকাতার অন্দরমহল। সেই অন্দরমহলের অন্তরালে নারী জীবনের করুণ আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। অনবদ্য এই উপন্যাসটির নাম তিনি প্রথমে রেখেছিলেন 'শিশির কুমারীর আত্মচিন্তা'। পরে ফোন করে বললেন : এর নাম দিলাম 'মোমের তাজমহল। এই নামটি আরও অর্থবহ।'

আমরা বলেছিলাম, এবার পুজো সংখ্যায় আমরা কোন তত্ত্বকথা শোনাব না, শুধু চিত্তাকর্ষক তথ্যবহুল লেখাই উপহার দেব। এজন্য অনেকদিন ধরে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। পাইলট মুক্তা মুখোপাধ্যায় তো বলেই ফেললেন, পরিবর্তনের পুজো সংখ্যার জন্য লিখতে আমাকে একমাস ধরে রোজ ঘুরতে হয়েছে। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, পাইলট-সের নিয়ে লিখতে। সেই সঙ্গে প্লেন কীভাবে আকাশে ওড়ে, কীভাবে নামে, খুব ঝরঝরে ভাষায় গল্পের মত করে লিখতে। মুক্তা নিজেও বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে পাশ করা পাইলট। বিষয়টি তাঁর নিজস্ব। কনটাকটও প্রচুর। অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক এই লেখাটির নাম 'উধাও মেঘলোকে'—পুজো সংখ্যা পরিবর্তনের এক অবিস্মরণীয় আকর্ষণ। পুজোয় অনেকেই বাইরে বেরুবার প্ল্যান করছেন। পরিবর্তনের কথা মনে আছে তো? যেখানেই যান, সংগে কাগজ কলম আর ডাক টিকিট নিয়ে যেতে ভুলবেন না। আপনার ভ্রমণের দুচার লাইন অভিজ্ঞতা থেকে অন্যান্য পাঠকদের বঞ্চিত করবেন না।

ভ্রমণকারীর পত্র এই পর্যায়ে আমরা আপনার চিঠি খুব যত্ন নিয়েই প্রকাশ করব।

অনেকে পরিবর্তনের জন্য নানা সাজেশান পাঠাচ্ছেন। আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমরা প্রত্যেকটি সাজেশান ফাইলে রেখে দেই। তারপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেগুলি নিয়ে আলোচনায় বসি। পাঠকদের শতকরা ৫০ ভাগ সাজেশানই আমরা এ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি। পরিবর্তন যে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে, বাঙালি সংস্কৃতির সংগে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে সে শুধু পাঠকরা ভালবাসেন বলেই। পরিবর্তনের সম্পাদক থেকে শুরু করে অনেক কর্মীই এই সংস্থায় এসেছেন মোটা বেতনের লোভে নয়, সাধারণ বাঙালির নিজস্ব কাগজ গড়ে তুলবেন বলে। পরিবর্তনের কোন আলাদা গোষ্ঠী নেই, লবি নেই। তার পেছনে কোন বিশেষ দল নেই। পাঠকের সমর্থন যদি এমনি অব্যাহত থাকে তাহলে এই চ্যালেন-জের আমরা যথার্থই মোকাবিলা করতে পারব।

পা. চ.

সেবার নমুনা

আমার সৌভাগ্য (বা দুর্ভাগ্য) হয়েছিল হাজরার চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন হাসপাতালটির ভেতরে গিয়ে তার কাজ-কর্ম দেখার। গত ১০ মে আমার 'মা' হাসপাতালে ভর্তি হন একটি মেজর অপারেশন করাবার জন্য। মোট পনের দিন হাসপাতালে থাকতে হয় এবং অপারেশনের পর সুস্থ মা বাড়ি ফেরেন।

অপারেশনের পর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে রুগী বিছানায় এল এবং তার চিকিৎসাও চলল। দুদিন পরেই তাঁকে ৪০/৫০ গজ দূরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পায়খানা করাবার জন্য। অথচ ১২ নম্বর কেবিনে যেখানে রুগী ছিল সেখানে অ্যাটাচড টয়লেট আছে। এত দূরে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে জেনারেল থেকে টয়লেট ব্যবহার করার কারণটি হল—১২ নম্বর কেবিনের টয়লেট প্যান ভাঙা এবং পরে ডাক্তারদের কাছ থেকে খোঁজ খবর করে জানতে পারি, ভাঙা অবস্থায় ওটি গত দু-বছর যাবৎ পড়ে আছে। সুপার-এর কাছে গিয়েছিলাম জানতে—উনি নীরবে আমার অভিযোগ শুনেছেন। আর কোনও প্রতিকারের রাস্তা না পেয়ে রুগীকে বাড়িতে নিয়ে আসার দিন টয়লেটের একটি ছবি তুলে রাখি—অনেককে জানাব বলে।

রুগী বাড়ি ফেরার কয়েকদিন আগে একটু পেটের গোলমাল শুরু হয় এবং বার কয়েক দাস্ত হয়। জমাদার সেই সময় বেডপ্যান থেকে ময়লা তুলে থুথুর পাত্রে ঢেলে রুগীর মুখের কাছে নিয়ে বলে 'আর কত হেগে করবি এত ময়লা সাফ করতে পারবো না।'

বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য
কলকাতা – ৩২

পতিবাদ

পরিবর্তনের ১ জুন ৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংসারী রামকিংকর' (রচয়িতা নমিতা মন্ডল) রচনার নামকরণ লেখিকা যদি 'দিবাকরকে রামকিংকরের চিঠি' করতেন তবে যথাযথ হত। রামকিংকরকে না জেনে, না বুঝে প্রবন্ধ লিখলে তা বোধ হয় প্রবন্ধ হয় না।

রতন কুমার ভৌমিক
মণিপুর, বাঁকুড়া

আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গে

আপনার ১১ মে ১৯৮৩-এর পরিবর্তনে 'কবিরাজির দিন কি শেষ?' শিরোনামায় কাজল মিত্র যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে বিচিত্র সংবাদসম্ভারের মধ্যে একদিকে যেমন কিছু মারাত্মক ভুল খবর আছে, অন্যদিকে তেমন আয়ুর্বেদ ধ্বংসের মুখে, পঞ্চকর্মই যেন আয়ুর্বেদ, আর কবিরাজ কৃষ্ণানন্দ গুপ্তই এর উদ্ধারকর্তা – এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করাই যেন প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। এতে সাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। তাই জানাচ্ছি তাঁর সংস্কৃত বা সাধারণ ইংরেজি শিক্ষায় কোন উপাধি নেই। তাঁর নামে 'তর্কতীর্থ' সংযোগ করা তাহা মিথ্যা। অধিকন্তু মধুসূদন গুপ্ত কবিরাজ গঙ্গাধর রায়ের ছাত্র ছিলেন না কিন্তু এই ভারত বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধরই নিজের কৃতিত্বে এবং সুযোগ্য ছাত্রগণ, যথা, মহা-[illegible] দ্বারকানাথ সেন, ধীর[illegible] ভূমের কবিরাজ গয়ানাথ, কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী, পরেশ কবিরাজ প্রভৃতির মাধ্যমে সমস্ত ভারতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও চিকিৎসার প্লাবন এনেছিলেন। কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক তাঁর নামের পূর্বে 'মহামহা-ধ্যাপক' লিখতেন। মহামহোপাধ্যায় নামক সরকারি খেতাব তিনি পাননি কখনও।

মিশ্রপাঠ্যক্রমই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ধ্বংসের প্রধান কারণ। উহার প্রণেতৃদের মধ্যে কবিরাজ শ্যামাদাস ও রামচন্দ্র মল্লিকও ছিলেন। মিশ্রপাঠক্রমের ফলে না হয় কবিরাজ, না হয় ডাক্তার। 'প্রবীণ' কবিরাজ বলে যাদের মনোনয়ন ও চাকরি হল তারাও মিশ্রপাঠক্রমের ফসল, ফলে আয়ুর্বেদ যে তিমিরে সেই তিমিরে। এতে প্রণববাবু অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন গৌরব করবার নেই। এরা না কবিরাজ, না ডাক্তার।

ডাক্তারির সঙ্গে পার্থক্য আছে বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়ু-র্বেদ ফ্যাকালটি স্থাপন করেছে ডাক্তারি ফ্যাকালটি থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং মিশ্রপন্থীদের আত্মঘাতী নীতি ও আন্দোলন অজ্ঞানপ্রসূত ও আয়ুর্বেদ ধ্বংসকারী।

—জনৈক আয়ুর্বেদানুরাগী
কলকাতা ৯

অপারেশনের আগে সম্মোহন

পরিবর্তনের ১ জুন, ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ মৃণাল বসুর 'অপারেশনের আগে রোগীকে যাঁরা অজ্ঞান করেন' আর অজয় চট্টো-পাধ্যায়ের 'অপারেশনের আগে সম্মোহন' শীর্ষক প্রতিবেদন দুটির জন্য ধন্যবাদ। অ্যানেসথেসিয়া আর হিপনথেরাপী হল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংগ। তাই এ দুটি বিষয় সম্বন্ধে জন মানস থেকে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা দূর করার জন্য তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়ো-জনীয়তা রয়েছে। ডাঃ বসুর প্রতি-বেদন এ প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে পারলেও শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনটি তথ্যগত দিক থেকে অপুষ্ট এবং বিকৃত।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে লনড়নে ডাঃ এলিয়টসন আর কলকাতায় ডাঃ জেমস এসডেল হিপন-অ্যানেসথেসিয়ার সাহায্যে যেসব অপারেশান করেছেন শুধুমাত্র তার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যেই শ্রী চট্টোপাধ্যায় কেন নিজের আলো-চনাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন তা আমাদের বোধগম্য হল না। তিনি কি বলতে চান আধুনিক কালে আমাদের দেশে হিপন-অ্যানাসথেসিয়া কোন কাজেই লাগছে না? আমরা যতদূর জানি ডাঃ শান্তি ভট্টাচার্যের সহ-যোগিতায় হিপন-অ্যানেসথেসিয়ার সাহায্যে (১৯৭৬-৭৮ সাল নাগাদ) বেশ কয়েকটি জটিল অপারেশান সম্পাদন করা হয়েছে 'স্টুডেন্টস হেলথ হোমে'। এ ছাড়া বিশিষ্ট হিপনথেরাপিস্ট সমীরচন্দ্র দাসের সহযোগিতায় দুর্গাপুরের ফাইন আর্টস স্কুলে এবং দমদমের নাগের বাজারস্থ সাইকোসোমাটিক ট্রেনিং সেনটার (১৯৮১-৮৩ সাল নাগাদ) বেদনাহীন সন্তান প্রসব এবং Ingury-Migrain-Dysmenorrhoea প্রভৃতি জনিত ব্যথা বেদনার উপশমের জন্য হিপন অ্যানাসথেসিয়া এবং অ্যানালজে-সিয়া একাধিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফ শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিকতার প্রতি আমাদের সন্দিহান করে তুলেছে। 'সাইকো'ই পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগ্য হিপনসিস চর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র! আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোবিদ ডাঃ ধীরেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পাভলভ ইনস্টিটিউট, বিধান সরণী), ডাঃ শান্তি ভট্টাচার্য (ইনসটিটিউট অব বিহেভিয়ার থেরাপি, লেনিন সরণী), সমীরচন্দ্র দাস (সাইকো সোমাটিক ট্রেনিং সেনটার, দমদম নাগের বাজার), ডাঃ রণেন কুমার ব্যানারজি (ইনস্টিটিউট অব ড্রাগস অ্যানড মেডিকেল রিসার্চ, হাওড়া) হিপনথেরাপির ক্লিনিক্যাল প্রয়োগ ও গবেষণা সংক্রান্ত যেসব কাজ করে যাচ্ছেন সেসব বিষয়ে শ্রী চট্টোপাধ্যায় নীরব কেন? শ্রী চট্টোপাধ্যায় কথিত 'সাইকো' কি এদের সম্মিলিত কাজ কর্মের চেয়েও বেশি কাজ করছে?

ডাঃ এস কে ঘোষ, কলকাতা ২৪
ডাঃ কে চক্রবর্তী, কলকাতা
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, মেদিনীপুর
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলকাতা
গৌতম কুমার দত্ত, কলকাতা
অসিত কুমার ঘোষ, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা।

ডেথ সারটিফিকেট নিয়ে, নাচতে নাচতে

মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। একটি প্রাণকে বাঁচানর শেষ চেষ্টা।

ট্যাকসি এগিয়ে চলেছে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় নেচে নেচে। মহাপ্রস্থানগামী যন্ত্রণায় অজ্ঞান। হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

কী ব্যাপার?

সামনে বিরাট মিছিল। গাড়ি ঘুরে যাবে। অগত্যা......

গাড়ি ঘুরল। কিছু দূরে আবারও গতিরুদ্ধ, সামনে 'নো এনট্রি' বোরড। রঙিন পর্দার জনপ্রিয় কোন অভিনেতা এ পথ দিয়ে আসবেন। জনগণের সেবার্থে এ রাস্তা বন্ধ। সুতরাং......

এতক্ষণে হয়ত্ রোগী চিত্রগুপ্তের দরবারে হাজিরা দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছল। ডাক্তার নারসের অবসর বিনোদন ভঙ্গিতে গল্প গাছায় বিঘ্ন। বিরক্ত ডাক্তার রোগী দেখে খিঁচিয়ে উঠলেন—ইয়ারকি পেয়েছেন? লোকটাকে মেরে ডেথ সারটিফিকেট চাইছেন?

অনেক কষ্টে ডেথ সারটিফিকেট নিয়ে মৃতদেহ চলল বাড়ি। (তবু রক্ষে, হাতকড়া পড়েনি হাতে!)

পথে বিভ্রাট আবার। গাড়ির চাকা গেল ফেঁসে। রাস্তায় মৃত আগ্নেয়গিরির মত বড় বড় গহ্বর।

যাক, শেষে চাকা সারানো হল। এগিয়ে চলল গাড়ি। নাচতে নাচতে। সি এম ডি এর গর্ত সামলে, পাতাল রেলের পাহাড় সামলে বাড়ি ঘুরে শ্মশান।

শ্মশানে বিরাট লাইন। তবু কিছু সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে মড়া উঠল বিদ্যুৎ-চুল্লিতে। 'বল হরি হরি বোল'।

কিন্তু......ধুস। লোডশেডিং। বিদ্যুৎ-কর্মীদের ধর্মঘট বোধহয়। নাকি সাঁওতালডির টারবাইন জ্বলে গেছে!

পলাশ চ্যাটারজি
পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান

সবার পেছনে আসল স্বামী

অল্প কয়েকদিন আগের ঘটনা। ভারত ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় করল; ২৫ জুন ১৯৮৩, শনিবার, রাত ১২টা অবধি রেডিও র রিলে শুনে মনের আনন্দে ঘুমোতে গেলাম।

সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

[illegible]

মনে আছে সেদিন রাত্রে সারা কলকাতা ও শহরতলি মেতে উঠেছিল উৎসবে। পরদিন সকালবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিকট চিৎকারে। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি একদল শ্মশানযাত্রী চলেছে এক সধবা মহিলার মৃতদেহ নিয়ে। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই শ্মশানযাত্রীদের পথ, তাই এতে নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু শববাহী যুবকের দলের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—'মরল কে? লয়েডের বৌ।' অর্থাৎ ওয়েসট ইনডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের স্ত্রী। আমার মন বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হল এই জঘন্য দৃশ্য দেখে। মৃতের প্রতি সম্মান জানান প্রচলিত প্রথা, শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বেই এই সম্মান জানানর প্রথা আছে বিভিন্ন ভাবে। সেই মৃতদেহের প্রতি এইরূপ অসম্মান কোন সভ্য দেশের নাগরিক যে করতে পারে, তা কল্পনারও বাইরে। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম এই দৃশ্য যদি বিদেশিদের চোখে পড়ে তাহলে আমাদের দেশের মর্যাদা কতখানি ক্ষুণ্ণ হবে? যুবকদের এইরূপ রুচিপূর্ণ বীভৎস ব্যবহারে দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে মনটা হতাশায় ভরে গেল। আর এটাই বা মেনে নিলেন কী করে ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী? সধবা যখন, তখন নিশ্চয়ই মৃতা ভদ্রমহিলার স্বামীও সেখানে ছিলেন। আসলে এটাই তো ভাবা যায় না, যারা খেলাধুলো ভালবাসে কিংবা এত উৎসাহ পায় হৈ চৈ করে তারা কিনা পরাজিত পক্ষকে এমন ভাবে অপমান করতে পারে?

বিশ্বজিৎ গুপ্ত
কলকাতা-৭৪

সিঁদুর-বৈচিত্র্য ও দর্শক

ঘটনাটা সামান্য হলেও বোধহয় বিচিত্রই বলা যায়। সেটা ছিল অগ্রহায়ণ মাস। অভিজাত পল্লীর কোন একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। প্রচুর জাঁকজমকের মধ্যে আমিও আমন্ত্রিত অতিথি। বিবাহরীতি অনুযায়ী কন্যাপক্ষীয় সব সাজসরঞ্জামই মজুত। সানাই-এর শব্দে আর লোকজনের আসা-যাওয়ায় ভারী ব্যস্ততা চারিদিকে। গোধূলি লগ্নে বর আসার প্রতীক্ষারত সবাই। আমিও তাদের একজন। প্রতি তলায় মুখোমুখি দুটি করে ফ্ল্যাট। বিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে তিন তলায়। বিয়েতে যৌতুকের সুন্দর নকসা করা খাট ঢুকল মুটের মাথায়। হঠাৎ দেখি তার পেছন পেছনই ঢুকছে আর একটি খাট, শ্মশান যাত্রার বোমবাই খাট। গন্তব্য ওরই সামনের ফ্ল্যাটটি। ওই ফ্ল্যাটের তরুণী বউটির স্বামী মারা গেছেন ঘণ্টা দুয়েক আগে। একটি মাত্র গেট, তাই অসম্ভব ভিড় বরযাত্রী ও শবযাত্রীর। এদিকে যখন লগ্ন সমাগমে কন্যার মাথায় সিঁদুর দেওয়া দেখতে প্রচন্ড ভিড়, ঠিক তখনি ওদিকে বউটির মাথার সিঁদুর তোলা দেখতেও সমান দর্শক সমাগম। ভবের হাটে আসা-যাওয়ার এমন করুণ চিত্র আর কোনদিন চোখে পড়েনি। দুটি ফ্ল্যাটের মাঝখানটিতে সানাই বেজে চলেছে। অবরুদ্ধ বিস্ময়ে আরো দেখলাম যে বিবাহ পক্ষীয় যাত্রীরা একবার-তির্যক ভাবে ঐ ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে খাবার জায়গার সন্ধানে ছোটাছুটি করতে লাগলেন।

তার চেয়েও আশ্চর্য, তৃতীয় পক্ষ যারা ঐ তরুণী বধূটির জন্যে একটু আগে আহা-উহু করে এলেন তারাই ফেরার পথে বিয়ে বাড়ির হুল্লোড়ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, 'সত্যি সাজিয়েছে বটে মাইরি!'

রমা বসু
কলকাতা ৭০০ ০৩০

রেলের টিকিট রেলেই মিলবে

এপরিল মাসের প্রথমে টিকিট কাটতে গেছি, শোনা গেল জুনের প্রথম পর্যন্ত কোন বারথ খালি নেই। বসার সিট তাও মে মাসের চার তারিখের পর অতএব পাঁচ তারিখে। দুটো টিকিট সিট রিজারভেশন করলাম। নির্দিষ্ট দিনে প্ল্যাটফরমে গাড়ি ঢুকল সন্ধ্যা সাতটায়। সমস্ত গাড়িটাই অন্ধকার। সিট খুঁজে নেবার কোন উপায় নেই। যেখানে সিট কথা সেই জায়গায় সব সিটেই লোক রয়েছে। দাদাদের সিট নম্বর জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর এল না। আমার [illegible]

সত্য সেলুকাস!

একদিন দেখলাম একজন বৃদ্ধ ট্যাকসি ড্রাইভারকে কয়েকটি ছেলে মিলে মারছে। ড্রাইভার এক হাতে মাথার রক্ত চেপে তাড়া করতেই ওরা সবাই মিলে পালিয়ে গেল।

অশোককুমার চক্রবর্তী, কলকাতা ৭০০ ০৫০

পরিবহন ব্যবস্থা কলকাতায় এমনই যে যাত্রীদের চলাফেরায় খুব সুবিধে, শুধু জীবনটুকু যদি হাতে রাখা যায়।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ফেলীর হাট, কোচবিহার।

লেনিন সরণিতে দেখলাম এক ভদ্রলোক ফুটপাতে গাড়ি রেখে চা খাচ্ছেন আর মিনিবাসের নামে যাতা মন্তব্য করছেন, সেই সঙ্গে নিজেই হি হি করে হাসছেন।

শ্যামল মজুমদার, শিউড়ি, বীরভূম।

ভদ্রমহিলা টেবিল থেকে পা না নামিয়েই বললেন, কাল আসবেন। এখন আমরা ভীষণ ব্যস্ত।

কল্যাণী সামন্ত, বারাসাত, ২৪ পরগণা

দিদিমণি আমার মেয়ের খাতায় 'আমব্রেলা' বানানে দুটো 'এল' কেটে একটা 'এল' করে দিয়েছেন, আর লিখে দিয়েছেন, ইয়োর ডটার ইজ ভেরি ইন-অ্যাটেনটিভ ইন দ্য ক্লাস।

শ্যামাবিবি (সানু), কলকাতা ৭০০ ০১৯

আমার ছিলেন। তিনি একটি সিটের উপর থেকে একটি বস্তা নামিয়ে বসার উপক্রম করতেই একজন তেড়ে এলেন। তাকে তার সিট নমবর জিজ্ঞাসা করতে কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। কমপারমেনটের চেকারকে সাহায্য করার কথা বললে, তিনি বললেন গাড়ি ছাড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে অতএব আমরা দুজনে রিজারভেশনের টিকিট দুটিকে হাতে নিয়ে দুটি জায়গায় কোন রকমে বসে রইলাম গাড়ি ছাড়ার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দুজন চেকার এলেন সব ঠিক করতে। দেখা গেল যিনি মাকে তেড়ে এসেছিলেন তার কোন রিজারভেশনই নেই। পাশে ডেকে একটু কথা বলবার পর তাঁর সব ঠিক হয়ে গেল এবং তিনি এক জায়গায় বসলেন।দুটি ভদ্রলোক দুটি জানলার ধাব দখল করে বসেছিলেন তাদের টিকিট দেখাতে বললে তারা দুটো রিজারভেশন করে দিতে বললেন এবং উপরি উক্ত পদ্ধতিতে তাদেরও রিজারভেশন হয়ে গেল এবং এই পদ্ধতিতে রিজারভেশন করে একটি বেনচিতে ছজন এবং একটি বেনচিতে সাতজন বসলেন। আসলে চারজন করে বসার কথা।

তা চারজনের জায়গায় সাতজন বসতেই পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, অত কষ্ট করে যদি বসাই তাহলে আগে থেকে অমন সব সিট রিজারভ হয়ে যা কি করে? কারা নেয় সে সব টিকিট? কেই বা দেয়? কেন দেয়? তার চেয়েও বড় কথা, এসব লোক তাহলে আবার ট্রেনে বসেই সিট রিজারভ করছে কেন? আর জানলই বা কি করে যে চেকার এলে সব ঠিক হয়ে যাবে-

সন্দীপ মিত্র
কাঁচরাপড়া, ২৪ পরগণা

উত্তরের যাত্রীরা যে পাপ করেছিলেন

১৯৮১ সালের ডিসেমবর মাসে পন্ডিচেরী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মাদ্রাই ছিল আমাদের গন্তব্য। মাদ্রাইগামী ট্রেনটি আসে অন্যদিক থেকে যাত্রী বোঝাই হয়ে। আমাদের রিজারভেশন থাকা সত্ত্বেও তাই বিশেষ সুবিধা হল না। কোন কামরায় এতটুকু জায়গা ছিল না। আমার স্বামী করিডোরে দাঁড়িয়ে আমাকে ও আমার কন্যাকে কোন ক্রমে একটি কামরায় ঢোকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেখানে একটি দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার ছিলেন। তাঁরা তখন মহানন্দে তাঁদের ইডলি দোসার ঝাঁপি খুলে সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত ছিলেন। নতুন আগন্তুক দুটিকে দেখে তাঁরা কটাক্ষে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। একটু খালি জায়গা দেখে তাঁদের উষ্মা উপেক্ষা করে আমবা বসে পড়লাম। চকিতে বাথরুম থেকে তাঁদের আরেকজন বেরিয়ে এসে রুক্ষস্বরে বললেন, দিস প্লেস ইজ মাইন। অগত্যা আমরা মাতাকন্যা আবার স্ট্যানড আপ হয়ে গেলাম। দুর্বোধ্য শব্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে তাঁবা বারবারই আমাদের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। একবার ইংরেজিতে বললেন, গভরনমেনটের উচিত রিজারভড কামরায় দিনেও লোক ঢোকান বন্ধ করা। আমাব কিশোরী কন্যা অপরাধীর মত একরাশ সংকোচ ও বিব্রতভাব নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। আমিও মুখে যথাসম্ভব কারুণ্য ফোটালাম, যাতে ওঁরা মনে করেন, অনুপ্রবেশকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে নেহাৎ দৈব বিড়ম্বনাতেই। মাথায় মালা জড়ান মহিলা সদস্যের সংগে আলাপ জমানর চেষ্টাতেও এঁদের অপ্রসন্নতা কমল না।

এরপর আরেকটি কামরা অপেক্ষাকৃত খালি হওয়াতে আমরা বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। আমার স্বামী তাঁদের বললেন, 'আপনাদের অসুবিধে সৃষ্টি করার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।' তাঁরা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন-'না না। আসলে আমরা যখন নরথে গিয়েছিলাম, তখন তোমাদের উত্তরের লোকদের কাছে ট্রেনে অসৌজন্য পেয়ে মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। তাই তোমাদের দেখে বোধ হয় সেই দুঃখটাই অজান্তে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছু মনে কর না।'

সেদিন সমগ্র আর্যাবর্তের প্রতিনিধিস্বরূপ আমরা তিনজন অজানা সেই উত্তুরে জাতভাইদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম।

রূপশ্রী দত্ত,
কলকাতা–৭০০০১৩

আপন বেগে একটি দেশ

শীতকাল। কোলফিলডে ধানবাদ যাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষিত আসনে আমি বসে। আমার সামনে সামরিক বাহিনীর একজন লোক। এখন অবসর নিয়েছেন। বাংলা বলতে পারেন না। হিন্দিতে আমায় জানালেন যে, তিনি বর্ধমান যাবেন। রোজই নাকি একই ট্রেনে বর্ধমান যাচ্ছেন। থাকেন দেরাদুন। আশ্চর্য লাগল ওনার কথা শুনে। প্রশ্ন করলাম–থাকেন দেরাদুন কিন্তু রোজ কোলফিলডে বর্ধমান পর্যন্ত যাচ্ছেন কেন-

একজনকে খুঁজতে যাই। আমার বিশ্বাস, আমি একদিন না একদিন ওকে পাবই।

কথা বলে যা জানতে পারলাম তা আশ্চর্যজনক। ঘটনাটি এরকম–একদিন উনি এই কোলফিলডে জরুরি কাজে যাচ্ছিলেন। হাওড়া থেকে হঠাৎ এক অচেনা যুবক তাঁর কামরায় উঠে পড়ে। কিছুটা করুণাবশত ছেলেটিকে সংরক্ষিত কামরায় বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গাড়ি কিছুটা এগিয়ে যেতেই ছেলেটি ওকে সিগারেট অফার করে।তার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর তিনি দেখেন তার আর কোন জিনিসপত্র নেই। গাড়ি বর্ধমানে দাঁড়িয়ে। ছেলেটি সমস্ত কিছু নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। তারপর ভদ্রলোক অনেক অনসন্ধান করে খোঁজ নিয়েছেন ছেলেটি হাওড়া-বর্ধমান লাইনে এই কাজ করে বেড়ায়। সেই ছেলেটির সন্ধানে তিনি কিছুদিন ধরে ঘুরছেন। আশ্চর্য, একটি করে প্লাটফরম আসামাত্র তিনি নেমে যাচ্ছিলেন। খুঁজে না পেয়ে আবার নিজের সিটে এসে বসছেন। ভদ্রলোকের সন্ধানী দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলাম না। যাই হোক সেদিন গাড়ি যথারীতি বর্ধমানে এসে দাঁড়িয়েছে। জানলা দিয়ে কী যেন খানিক দেখলেন। তারপর হঠাৎ চিৎকার 'মিল গায়া'! কিছু বোঝার আগেই তিনি দ্রুত নেমে গেলেন। একটি বছর চব্বিশের ছেলেকে কলার চেপে ধরে নিজের সিটের পাশে বসালেন। গাড়ি একসময় ছেড়ে দিল। শুরু হল প্রচন্ড মার। সে এক অসহনীয় দৃশ্য। আমি বাধা দেবার জন্য উঠতেই হাত তুলে যথাস্থানে আমায় বসতে বলে দিলেন। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে তখন। দুপা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইছে তার কৃতকার্যের জন্য।

কিন্তু কে কাব কথা শোনে। গাড়ি তখন প্রচন্ড বেগে সামনে ছুটে চলেছে। রক্তাক্ত ছেলেটিকে কোনরকমে তুলে ধরে খোলা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে সজোরে এক লাথি। এক আর্ত চিৎকার আমার কানে ভেসে এল। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা তখন সারা কমপারটমেনটে। লোকটি তখন হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমার মনে পড়ে গেল, এই ছেলেটির শিশুটির কথা। ও কি জানে, ওর বাবা প্রতারক? ওর বউ কি জানে ও এই কাজ করে সংসার চালায়?

লোকটির কি ছেলেটিকে এইভাবে বাইরে মেরে ফেলে দেবার অধিকার ছিল? হাজার প্রশ্নে সেদিন মন ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার উত্তর এখন ও পর্যন্ত পাইনি। সম্ভবত পাওয়া যাবেও না। কারণ অতি পুরনো এই দেশটা চলছে আপন গতিবেগে। কারোর চেষ্টায় বা উদ্যোগে নয়।

বিপ্লব সেনগুপ্ত
কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা

কংগ্রেসের নতুন অ্যাডহক কমিটি নিয়ে বিরোধ

নিশীথ দে

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে? বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা এবং কর্মী নেতৃত্বের নামে দিল্লির কর্তৃত্বকে মানতে রাজি নন। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? এগিয়ে গিয়ে কেউ বলতে পারছেন না, ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী যা বলবেন তা মানতে রাজি নই, আলোচনা করতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেসকে এ আই সি সি-র 'চামচা' করে রাখা চলবে না। কেউই একা এগোতে সাহস পাচ্ছেন না। যদি ম্যাডাম চটে যান, কংগ্রেস থেকে বের করে দেন! অথচ হুকুম হজম করতেও পারছেন না।

প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন অ্যাডহক কমিটি নিয়ে বিরোধ আরও মাথা চাড়া দিয়েছে। নতুন অ্যাডহক কমিটির জন্য তিন চারটি প্যানেল পাঠান হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য আবদুস সাত্তার, অজিত পাঁজা, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রবীণ নেতা প্রফুল্লকান্তি ঘোষ এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধীকে লম্বা চিঠি দিলেন, তার সঙ্গে প্যানেল। তাঁর প্যানেল হল: সভাপতি পদে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি ও কোষাধ্যক্ষ কে কে বিড়লা। প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শতবাবু) প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর ডান হাত ছিলেন। তিনি এখন আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নন। শতবাবুও প্রদেশ কংগ্রেসকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। অর্থাৎ কংগ্রেসে এখন রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছেন। মাঝে মাঝে প্রবীণ নেতাদের মধ্যে গোপনে ঘরোয়া বৈঠক হচ্ছে। মাঝে সিদ্ধার্থবাবু দিন কয়েকের জন্য দিল্লি থেকে কলকাতায় ঘুরে গেলেন। সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গেও অনেক কংগ্রেস (ই) নেতা দেখা করেছেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত দিল্লির 'মাতব্বরি' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবু এক সময় এক ব্যারিসটার নেতাকে উদ্দেশ করে বলেন, তুমি তো চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছ, মাথা নিচু করে থাকো কেন? ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী যা বলবে সব বেদবাক্য বলে মানবে কেন - কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেয় দেবে।

শতবাবুই এঁদের মধ্যে কিছুটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। শতবাবু বলেছেন, তাঁর প্রস্তাব মত প্রদেশ কংগ্রেস অ্যাডহক কমিটি হলে এ রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে আসবে। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে।

গোলমাল বেঁধেছে প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসিকে সাধারণ সম্পাদক করার প্রস্তাব নিয়ে। প্রিয়বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী রাজি হননি। কেউ কেউ বলেছেন, 'প্রিয়বাবু সবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, এখনই দায়িত্ব দেওয়া উচিত হবে না। আগে দেখা যাক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি তিনি কতটা অনুগত। তাতে প্রতিবাদও হয়েছে। প্রিয় কংগ্রেসে নতুন নয়, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, ইন্দিরা গান্ধীর পা রাখার মত একটু জায়গা করেছে এই প্রিয়। বরং বলা যায়, রাজীব গান্ধী কংগ্রেসে নতুন। রাজীবকে মাথার ওপর বসান যায় আর প্রিয়কে প্রদেশ কংগ্রেসে দায়িত্ব দেওয়া যায় না? এ সব কথা বললে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

প্রদেশ কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতা গজগজ করছেন, সামনে এলেই চুপ। পেছনে বলছেন, 'কী আর বলব বলুন! সামনে তো বলতে পারছি না। সি পি আই (এম) একটা রেজিমেনটেড পারটি, সেখানেও আলোচনাটা হয়। আর কংগ্রেসে দিল্লি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেস হল এ আই সি সি র 'চামচা'। জেলা কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেসে কারা থাকবে সেটাও ঠিক করে দেবে দিল্লি? বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করার কোন অধিকার প্রদেশ কংগ্রেসের নেই। সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের কোন ক্ষমতা নেই, ঠুঁটো জগন্নাথ। সবাই শ্রীমতী গান্ধীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রীমতী গান্ধী চটলেই সর্বনাশ। প্রত্যেকের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ শ্রীমতী গান্ধীর হাতে।'

গত ১৯৭৭ সালের তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাব নিশ্চয়ই বেড়েছে, অনেক লোক কংগ্রেসে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের কজন কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী? পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা চলছে। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা পঞ্চায়েত নির্বাচন অন্যভাবে পর্যালোচনা করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা দিল্লির নেতাদের বুঝিয়েছেন, বিধানসভার নির্বাচনে শহরের অনেক আসন কংগ্রেস পেয়েছে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের মানুষও সি পি আই (এম)-এর কাছ থেকে সরে কংগ্রেসের দিকে এসেছে।

কয়েকজন প্রবীণ নেতা রাজীব গান্ধী এবং সি এম স্টিফেনকে লিখেছেন, 'ভুল ধারণা, ভুল পর্যালোচনা করা হয়েছে। গত ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল চার হাজার আসন। এবার বেড়ে হয়েছে চোদ্দ হাজার। আসন বেড়েছে ঠিকই কিন্তু ভোটের শতকরা হার বাড়েনি। তার চেয়েও বড় কথা হল, কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে জিতেছেন কারা এবং কেনই বা ভোট পেয়েছেন? ভোট পেয়েছেন বেশি সি পি আই (এম) বিরোধী বলে। অধিকাংশই কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী নয়। এঁদের একটা বড় অংশ কংগ্রেসের মনোনয়ন ভিক্ষে চাননি বরং মনোনয়ন ছিনিয়ে নিয়েছেন। এঁরা কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশ মেনে চলবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। আসলে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস চলছে ব্যক্তিভিত্তিক নেতৃত্বে। যেমন মালদহে বরকত সাহেবের লোক, নদীয়ার আনন্দ বিশ্বাসের লোক, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গোবিন্দ নসকরের লোক, কোথাও সুব্রত মুখারজির লোক ইত্যাদি। এই নেতারা যেদিকে 'কংগ্রেসীলোকরা'ও সেদিকে। এঁরা প্রদেশ কংগ্রেস কিংবা এ আই সি সি কী বস্তু জানেন না, মাথাও ঘামান না।'

পশ্চিমবঙ্গের আর এক প্রবীণ নেতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখেছেন, কংগ্রেসের বড় শত্রু বাইরে নয়, ভেতরেই আছে। নির্বাচনে জেতা বা হারা অনেকটা নির্ভর করে কংগ্রেসের এই ঘরের শত্রুর ওপর। বিধানসভার ময়না কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করা যেত। কিন্তু কংগ্রেসের লোকই হারিয়েছে। যাদবপুরের উপনির্বাচনেও কংগ্রেস যাতে হেরে যায় সে জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময়েই পরিকল্পনা করা হয়।

প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা শতবাবু শ্রীমতী গান্ধীকে লিখেছেন, 'ডিসিপ্লিন কাকে বলে দেখে এলাম সি পি আই (এম) অফিসে। প্রমোদ দাশগুপ্তর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। হাজার হাজার লোক লাইন দিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবীরা নিয়ে যাচ্ছেন মরদেহের সামনে। যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দিত তা হলে পুলিশের সাধ্য ছিল না শৃঙ্খলা আনার। কিন্তু পারটির ক্যাডাররাই শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। একে বলে পারটি ডিসিপ্লিন।'

কংগ্রেসের নামে টাকা তোলার ব্যাপারে আবার হৈ চৈ শুরু হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস, বিভিন্ন জেলা কমিটি এবং ব্লক কমিটির নামে টাকা তোলা হয় কিন্তু তার হিসাব কোথায়? দিল্লি থেকে প্রতি মাসে গড়ে এক লক্ষ টাকা আসে। তারও কোন হিসাব নেই। দিল্লির নেতারাও তাঁদের মনোমত লোক ছাড়া অন্য কারও হাতে টাকা দেন না। পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অভিযোগ করেছেন, এ রাজ্যের কংগ্রেসের অনেক নেতা মুখে যাই বলুন আসলে নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে তাঁদের মাথা ব্যথা নেই। এঁরা নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঝে মাঝে মোটা টাকা [illegible]

গট আপ খেলা

অম্লমধুর

সেদিন রাতে স্বপ্নে দেখি
মস্ত একটা ইলিশ
চোখ পাকিয়ে বলছে এসে
'আমায় কি তুই চিনিস?
আমার দিকে নজর দিলে
মাস মাইনে ফিনিশ!'

জীবন ভৌমিক

কলকাতার ফুটবল
বলো হরিবোল,
সত্তর মিনিটের খেলায়
একশো চোদ্দ গোল!

মল্লিকা সিকদার

চক্ররেলের বক্রপথের
ধাঁধায় ঘোরেন 'গণি,
গোঁফের আগায় তেল মাখিয়ে
আমরা যে দিন গুনি।
'পাকবে কাঁঠাল মাস ছয়েকে'
শুনছি আশার বাণী,
না ফুটতে ডিম মোরগছানা
গুনছি কি, না জানি!

উদয়ভানু

বৃষ্টিতে কলকাতার পথে
বইলে জলের বান,
যান বাহনের গণ্ডগোলে
হেঁটেই বাড়ি যান!

জলের নিচেই খন্দ খানা
সংগে জলের টান,
কল্লোলিনী এ কলকাতায়
পথচারী সাবধান!

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

তেলে ভেজাল, চায়ে ভেজাল,
ভেজাল বেবি-ফুডে,
ওষুধে ভেজাল, দুধে ভেজাল
সইছি কেমন মুড়ে!
ওপর ভেজাল, তলাও ভেজাল,
ভেজাল কথায় কামে,
ভেবে আকুল দেশনেতারা
কপাল চোঁয়া ঘামে।

স্বপন কুমার আ

গণি খান কাজ চান

নিশীথ দে

এক বামপন্থী নেতা তাঁর এক সাকরেদকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ওসব বাজে কথা বাখ তো। এখন যদি ইলেকশান হয় কংগ্রেস মেজরিটি পাবে না। বামফ্রন্ট তো বটেই, সি পি আই (এম) একাই গরিষ্ঠতা পাবে। কিন্তু জ্যোতি বসুর বিকল্প মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্বাচন হোক, দেখবি সিদ্ধার্থ রায়, প্রফুল্ল সেন, প্রশান্ত শূর, বিনয় চৌধুরী হেরে যাবে। লোকে গণি খান চৌধুরীকে ভোট দেবে। লোকে কাজ চায়, বক্তৃতা শুনতে চায় না। বামফ্রন্টের ছ বছরে শুধু বক্তৃতা শুনে শুনে লোকের বিবক্তি এসে গিয়েছে। পশ্চিমবংগ থেকে অনেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু গণি খান চৌধুরীর মত জনসমর্থন কেউ পায়নি। এখানকার মন্ত্রীদের দক্ষতা হল অজুহাত খাড়া করার।

বাহাত্তর সালের আগে পর্যন্ত লোকে চিনত একটা বড় নামের জন্যে—আবুল বরকত আতাউল গণি খান চৌধুরী। অন্তত পশ্চিমবংগ বিধানসভার সদস্য তালিকায় এত বড় নাম কারুর নেই। প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৭২ সালে। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মন্ত্রিসভায় সেচ ও বিদ্যুৎ দফতরের মন্ত্রী। সিদ্ধার্থবাবু ঘোষণা করলেন, দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাব। দায়িত্ব গিয়ে পড়ল বরকত সাহেবের ওপর। জল-ঝড় রোদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। রোদে পুড়েছেন, পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছে। সেদিন কিন্তু পারেননি। অনেক বদনাম কুড়োতে হয়েছে—রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে বেকারদের চাকরি দেবার নাম করে 'কংগ্রেসী মস্তান' ঢুকিয়েছেন বার হাজার।

[illegible] পার্কের কাজ চলছে

বরকত সাহেব দুঃখ করে বলেছেন, আমি গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলাম, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে গ্রামের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে চেয়েছিলাম। গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে কৃষিতে পানজাব গড়তে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই গ্রামের বার হাজার বেকার ছেলেকে চাকরি দিয়েছিলাম। এরা সবাই কংগ্রেসের ছেলে নয়, বামপন্থী দলের ছেলেও আছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আমার সেই স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। গ্রামবাংলার উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

বিরাশির আগে বরকত ছিলেন সাধারণ একজন কংগ্রেস নেতা, জেলা কংগ্রেস নেতা। তিরাশিতে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কিত মন্ত্রী, বিতর্কিত নেতা। পশ্চিমবংগ থেকে কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন অনেকেই। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অল্প দিন। অশোক কুমার সেন, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, হুমায়ুন কবির, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, মনোমোহন দাস, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শচীন চৌধুরী, এ কে এম ইশহাক, প্রণব মুখোপাধ্যায়, আরও অনেকে। এঁদের পাণ্ডিত্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, নাম-ডাক অনেক। রেল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন পরিমল ঘোষ। কিন্তু এত হৈ চৈ হয়নি। প্রণববাবু দশ বছরের বেশি কেন্দ্রের মন্ত্রী। কিন্তু গণি খানের ব্যাপারটা অন্যরকম। তাঁর জনপ্রিয়তা এমনই যে এখন মালদার দেয়াল ভবে গিয়েছে শ্লোগানে—'বরকতদার আর এক নাম উন্নয়ন।'

পশ্চিমবংগে মুসলিম নেতা জন্মেছেন অনেক। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রে এবং রাজ্যে অনেক মুসলিম নেতা মন্ত্রী হয়েছেন, জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জয়মাল্য পেয়েছেন কজন?

বরকত সাহেবও খানদানি মুসলমান। মালদার অভিজাত জমিদার পরিবারের সন্তান। কিন্তু বরকত সাহেবের পরিচিতির পেছনে কোন তকমা নেই। তিনি মুসলমান, নিষ্ঠাবান মুসলমান কিন্তু মূলত মানবতাবাদী, মনে প্রাণে বাঙালি।

বরকত সাহেবের কাছে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই। তাঁর সব সময়ের সংগী, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় যাঁর হাত দিয়ে, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি নয় অথচ তার চেয়ে বেশি- তিনি অতুল দাস। সরকারি কাজে তাঁর ডান হাত স্পেশাল সেক্রেটারি—আই এ এস দিলীপ বিশ্বাস। রাজনীতিতে ডান হাত বাঁ হাত সব হিন্দু। তবে কে হিন্দু আর কে মুসলমান এসব তাঁর মনেও থাকে না। তার একটাই হিসাব, কে কাজের লোক। যে কাজের বাইরে থাকে তার

সংগে বরকত সাহেবের সম্পর্ক নেই। আর পছন্দ করেন না যাঁরা বিপদের দিনে সরে দাঁড়ান।

বরকত সাহেবের সবচেয়ে বড় গুণ বা দোষ একটাই, অসম্ভব জেদি। যা মনে করবেন তাই করবেন। সিদ্ধান্ত নিতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না। আসলে রাজনীতিতেও এসেছেন হঠাৎ। বনজি স্টেডিয়ামে রেল অফিসে বসে একদিন গল্প করতে করতে বললেন, রাজনীতিতে আসাটাও একটা আকস্মিক ঘটনা। একদিন মোটর গাড়িতে চড়ে আসছি। মালদাতেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। দেখি সামনে সারি দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে একজন সাইকেল চালকের সংগে একটা গরুর গাড়ির সামান্য ধাক্কা লাগে। সাইকেল চালক রেগে গিয়ে পা থেকে জুতো খুলে গরুর গাড়ির চালকদের মারতে লাগলেন। আর তারা গরিব মানুষ, রাস্তায় পড়ে মার খেল বিনা প্রতিবাদে। বরকত সাহেব গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে সাইকেল চালকের জামার কলার চেপে ধরলেন- আপনার বড্ড সাহস দেখছি ! গরিব মানুষ বলে আপনি এইভাবে মারবেন ইচ্ছে করে তো ধাক্কা দেয়নি, ধাক্কা লেগে গেছে।

সেদিনই ঠিক করলাম রাজনীতি করব। সেটা ১৯৫১ সাল। সদ্য বিলেত ফেরত। কয়েক মাস পরেই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ইলেকশানে দাঁড়ালাম নির্দল প্রার্থী হয়ে। জিতলাম অনেক ভোটে। তারপরই কংগ্রেসে যোগ দেই। বয়স তখন ২৬ বছর।

ওঁর জন্ম ১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর। জমিদার বাড়ির ছেলে, রাজনীতি করছে। কংগ্রেস বিরোধীরা ভাল চোখে দেখেননি।

বাবা-মা চেয়েছিলেন ছেলে জমিদারি চালে চলবে। মোটর হাঁকাবে, ঘোড়া ছোটাবে, মাঝে মাঝে বিদেশ যাবে, পারটি দেবে। কিন্তু গ্রামের লোককে নিয়ে মাতামাতি করবে কেন? এসব কি জমিদার বাড়ির ছেলেকে মানায়? নাকি তাতে জমিদার পরিবারের ঠাট বজায় থাকে? তার ওপর আবু হল বাবা-মা'র বড় ছেলে। মা-বাবার আদরের আবু, কত আশা। বড় ব্যারিসটার হবে, চারদিকে নাম হবে। তা নয়, পালিটিকস ! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান !

চার ভাই, চার বোন—সবারই বড় বড় পরিবারে বিয়ে হয়েছে। বড় ভাই ছাড়া কেউ পারটি পলিটিকস করেনি। বাবা আবুল হায়াৎ খান ইউনিয়ন বোরডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৮ বছর। বাবা-মা দু জনেই ইন্তেকাল করেছেন অনেক দিন আগে। মালদার কোতুয়ালিতে বিশাল খান চৌধুরী ভবনের সামনেই সমাধি আছে।

আদরের আবু কোনদিন মা'র অবাধ্য হননি। ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের গরিব মানুষের উপকার করতে এগিয়ে যেতেন। বাবা মাঝে মাঝে রাগারাগি করতেন। মা আল্লার কাছে সব সময় দোয়া করতেন—আবুকে তুমিই বিপদ থেকে দূরে রেখ খোদা। মা বলে গিয়েছিলেন, যেখানেই থাক না কেন ঈদের সময় এই মালদার বাড়িতে আসবে। সবাই, সব ভাই-বোন একসংগে রোজা ভাঙবে, এক সংগে নামাজ পড়বে।

মার কথা আজও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন বরকত সাহেব। এ বছরও সব ভাই-বোন দূর দূরান্ত থেকে এসে 'খান চৌধুরী ভবনে' মিলিত হয়েছিলেন। চেহারায় ভাই-বোনদের মধ্যে দারুণ মিল। কিন্তু অন্য ভাইয়েরা প্রায় সাহেব। বরকত সাহেব তখন মালদায় ছিলেন না। গিয়েছিলাম 'খান চৌধুরী ভবনে'। বিরাট এলাকা জুড়ে জমিদার বাড়ি। তিন মহলা ভবন। দুটি ফটক পার হলে তবে অন্দর মহলে ঢোকা যায়। তিন মহলা ভবনের বাইরে আছে অতিথিদের জন্য বিরাট সুসজ্জিত হল। শ দুই চেয়ার। চারদিকে পাখা। মেঝেতে ফরাস পাতা। দেয়ালে বরকত সাহেবের নানা অনুষ্ঠানে তোলা ছবি। এটা হল সাধারণ সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অপেক্ষা করার জায়গা। মালদায় থাকলে বরকত সাহেব প্রতিদিন বেলা ৮টায় এই হলঘরে এসে বসবেন এবং এক এক করে সকলের অভাব অভিযোগ শুনবেন। এমন কোনদিন নেই যেদিন দু হাজার লোকের ভিড় হয় না। নদীয়া থেকে মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর পর্যন্ত বরকত সাহেবের গাড়ি দেখার জন্য দু হাজার লোকের ভিড় হয়- 'খান চৌধুরী সাহেবের গাড়ি-খান দাখরে ! আমাদের মন্ত্রী তো অনেক হইয়েছে কিন্তু খান চৌধুরী ......'

ফটকের বাঁদিকে আর একটা ছোট অতিথি ভবন। সরকারি অফিসাররা, অচেনা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে বরকত সাহেব তাঁদের সংগে ওইখানে বসে কথা বলেন। ফটকে

প্রহরী একজন নেপালি বাহাদুর।

ফটকের বাঁদিকে লেখা 'খান চৌধুরী ভবন'। ডানদিকে ইংরেজিতে নেমপ্লেট এ বি এ গণিখান চৌধুরী। ভেতরে বিরাট গেসট হাউস—লাউনজ, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বড় বড় নেতারা কেউ এলে এখানে থাকেন। এর আগেও 'খান চৌধুরী ভবনে' গিয়েছি। বরকত সাহেব ঘুম থেকে লাউনজে এসে বসেছেন। পরনে লুঙ্গি, কাঁধে তোয়ালে, খালি গা, হাতে দু-তিন প্যাকেট সিগারেট—রেলমন্ত্রী হিসাবে বেমানান। মানিয়ে যায় মালদার সকলের বরকতদা হিসাবে।

এবার গিয়ে দেখলাম, বরকত সাহেব নেই, ঈদের পরদিনই বাঙ্গালোর চলে গিয়েছেন। দূর থেকে দেখলাম, পরনে শরটস, গায়ে স্যানডো গেনজি - সাহেবের মত রং। দেখলেই বোঝা যায় বরকত সাহেবেরই ভাই। ওঁর ছোট ভাই এর সংগেও আলাপ হল- ফুলপ্যানট ফুল শারট। বিশিষ্ট অতিথিদের ঘরে বসালেন। বরকত সাহেবের মেজ ভাই - আবু নাসের খান চৌধুরী। সবাই ডাকে লেবুভাই বলে। ইংলনডে অধ্যাপনা করেন। পরের ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী ব্যবসা করেন। ছোট ভাই আবু ফজল খান চৌধুরী বাইশ বছর সুইজরল্যানডে প্রবাসী। বাংলা বেশি বলতে পারেন না কিন্তু মালদার টানে বলে যান। চার বোনের তিন বোন থাকেন বিদেশে। ছোট বোন রুবী নূর থাকেন মালদা শহরে। ওঁর স্বামীও ব্যবসায়ী।

বরকত সাহেব কারও সংগে দুর্ব্যবহার করেছেন এমন অভিযোগ পাইনি। যাঁরা বিরোধী তাঁরা অভিযোগ করেছেন, বরকত সাহেব সমাজবিরোধীদের মদত দেন। কোন রকম নিয়ম কানুন মানেন না, বেআইনিভাবে হাজার হাজার ছেলেকে চাকরিতে ঢুকিয়েছেন।

সি পি আই (এম)-এর মালদহ জেলা কমিটির সম্পাদক জীবন মৈত্র অভিযোগ করেছেন, মালদা জেলার উন্নয়নের নামে বরকত সাহেব লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করেছেন, অনেক পকেটেও গিয়েছে।

কেন্দ্রে মন্ত্রী হবার পর বিশেষ করে রেলমন্ত্রী হবার পর কি বরকত সাহেব মালদা জেলায় পপুলার হয়েছেন?

জীবনবাবুর জবাব: মোটেই না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলই তার প্রমাণ—জেলায় বিধানসভার নির্বাচনের চেয়ে বামফ্রনটের ভোট পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেড়েছে আর কংগ্রেসের ভোট কমেছে।

তাহলে জেলা পরিষদের তিরিশটি আসনের মধ্যে এবার কংগ্রেস ১৫টা পেল কী করে? এর কোন জবাব বিরোধীরা দিতে পারেননি। জেলার ২টি লোকসভা আসনই সি পি আই (এম)-এর হাত ছাড়া হয়েছে। বিধানসভার ১১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছে ৬টিতে। মুসলিম ভোটে জিতেছে কংগ্রেসের হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রার্থী। এটা সম্ভব হয়েছে বরকত সাহেবের জন্যেই।

বিরাশি পর্যন্ত বরকত ছিলেন জেলা স্তরের নেতা। মালদহ জেলাকে

'বরকতাবাস'

নয়া দিল্লিতে রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরীর বাসভবন ১২ নং আকবর রোড। মালদার বাড়িতে এলে যেমন হাওয়ায় খবর উড়ে বেড়ায়, নয়া দিল্লিতেও তেমনি। বরকত সাহেব দিল্লির বাসভবনে আছেন জানতে পারলেই ভিড় ভেঙে পড়ে। সবাই চাকরি প্রার্থী নন। কেউ আসেন সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের জন্য, কেউ বা শুধু 'বরকতদা'র টানে। বলাই বাহুল্য বেশির ভাগই মালদার লোক। পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলার লোকও আছেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকেও অনেকে আসেন - তদ্বির করতে, অভিযোগ করতে এবং অনুযোগ করতে। কেউ বলেন বরকত সাহেব বেশির ভাগের কাছেই বরকতদা। বরকত সাহেব নয়া দিল্লির নয়া বাসিন্দা কিন্তু তাঁর বাসভবনের ভিড় অনেক মন্ত্রীরই ঈর্ষার কারণ।

মন্ত্রী হিসেবে নতুন হলেও সবচেয়ে বড় দপ্তর তাঁর হাতে। তাঁর অনেক সচিব আছেন—ভিড় সামলাতে হয় তাঁদেরই। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি গা, পরনে লুঙ্গি, হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ। বরকত সাহেব এসে বসে পড়লেন সোফায় শুনতে লাগলেন অনুযোগ, আবেদন। শোনেন, এক মিনিটও ভাবতে হয় না তাঁকে, সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন মুখে মুখেই। সচিবদের ডেকে নির্দেশ দিয়ে দেন। কারো প্রতি বিরক্তি নেই, চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দেন— এ তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী। এরপর আছে রেলদপ্তরের অফিসারদের সংগে বৈঠক। প্রয়োজনীয় ফাইলে সই সাবুদ। তারপর আছে তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধবদের সংগে আলাপ আলোচনা। ঠিক সন্ধ্যেবেলাতেও আবার একইরকম ঠাসা কর্মসূচী। অনেক মন্ত্রী অবাক হয়ে যান—'লোকটা পারে বটে।' মালদার লোক হলে বরকত সাহেব একটু যেন মরমী হয়ে পড়েন। তাঁর বাছবিচারও তখন থাকে না। কে কোন

পুরোহিত মংগল তিলক পরাচ্ছেন / আলোকচিত্র: অশোক বসু

পারটির লোক, খুব একটা মাথা ঘামান না। বরকত সাহেবের যারা মুখ চেনা তাঁদের অনেকেই বেড়াতে এসে ১২ নং অকবর রোডের বাড়িতে উঠে পড়েন। বরকত সাহেবেরও ঢালাও অরডার-'অতিথি—আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয়।'

সকাল আটটা নাগাদ এই 'বরকতাবাস'-এ কেউ যদি হঠাৎ হাজির হন, দেখবেন লাউনজের বাইরে বিরাট লাইন, ভেতরের লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার রাশভারী গলাটা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দিনে কত চিঠি তাঁকে দেখতে হয় - এক হাজার, দু হাজার না কি আরো বেশি! কত লোক তাঁর কাছে আসেন - কেউ জানে না। হিসেব রাখতে গেলে আরও জনা আষ্টেক লোক দরকার।

বরকত সাহেব কিন্তু জনসংযোগের দোহাই দিয়ে অফিস কামাই করেন না। কিংবা আমলাদের হাতে কাজ ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। ঘড়ি ধরে রোজ রেলভবনে যান। প্রতিটি কাগজপত্র দেখেন, সংগে সংগে নির্দেশ দেন। ওজর আপত্তি আমল দেন না। মন্ত্রী হিসেবে যেমন মেজাজী, তেমন কড়া। কাজের লোক বরকত সাহেবের কাছে কদর পান।

রেলযাত্রীদের অভাব অভিযোগের চিঠি তাঁর কাছে টপ-প্রায়োরিটি। কোন যাত্রীর সংগে রেলকর্মী দুর্ব্যবহার করেছেন কিংবা অমুক স্টেশনের প্ল্যাটফরম নোংরা, স্টেশনে নিয়মিত টিকিট চেক হয় না ইত্যাদি অভিযোগ পেলেই বরকত সাহেব কড়া হুকুম দেন 'টেক আকশন, ইমিডিয়েটলি' 'সাসপেনড করুন, শোকজ করুন।'

বরকত সাহেবের আপনজন হলেন দুর্দিনে যাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সংগে ছিলেন। হাওয়া খারাপ দেখে সরে দাঁড়াননি। সোমেন মিত্র, নুরুল ইসলাম, আনন্দমোহন বিশ্বাস, গোবিন্দ নস্কর, এরা এবং এদের মত আরও কয়েকজন বরকত সাহেবের কাছে দুর্দিনের বন্ধু। দিল্লিতে এলেই এরা সোজা গিয়ে ওঠেন ১২ নং আকবর রোডের বাড়িতে। জমিয়ে আড্ডা মারেন। আড্ডা নির্ভেজাল নয় রাজনীতিটাই বেশি। বরকত সাহেবের সংগে সাংবাদিকদের সম্পর্কটা অনেকদিনের। অবশ্য সবাই যে বরকত সাহেবকে পছন্দ করেন এমন নয়, কিন্তু বরকত সাহেব কোন সাংবাদিকের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন না, এটা তাঁর মস্তগুণ।

বরকত সাহেব ধর্মবিশ্বাসে নিষ্ঠাবান মুসলমান। কিন্তু তাঁর বাড়িতে অবারিত দ্বার সবধর্মের মানুষের। তিনিও সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই যোগ দেন।

বরকত সাহেব প্রায় প্রতিদিনই এম পি-দের সংগে বৈঠক করেন—জনমত নির্বিশেষ এম পি, এম এল এ দের পরামর্শ চান। তাঁর একটাই কথা 'রাজনীতি যে যাই করি, পশ্চিমবংগের দিকটা একটু দেখুন। মানুষ কাজ চায়, কাজ করলে মানুষ মনে রাখে।'

তরুণ প্রকাশ গংগোপাধ্যায়

কোন জেলাই তেমন গুরুত্ব দেননি। খরা বন্যার জেলা। মালদা শুধু ভাল জাতের আমের জন্যে বিখ্যাত। কৃষি উৎপাদনও বড় গলায় বলার মত নয়, কলকারখানার নামগন্ধ নেই। রেশম শিল্প ধুঁকছে। মালদা শহর বছর পনের আগে ছিল নোংরা জায়গা। গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী—সেজন্য মালদার প্রতি লোকের করুণা হত, সহানুভূতি দেখাত। ব্যস, ওই পর্যন্ত।

উত্তরবঙ্গে বন্যা প্রতিরোধের জন্য মাসটার প্ল্যান হয়েছে, অনেক লেকচার হয়েছে, যথারীতি ফাইলবন্দীও হয়েছে। প্রায় প্রতি বছর বন্যায় ডুবেছে মালদা।

মালদাকে নিয়ে রাজনীতি করেছে সবাই, গুরুত্ব দেয়নি। বামফ্রন্টও প্রথম মন্ত্রিসভায় মালদহ থেকে কাউকে মন্ত্রী করেননি। দায়ে পড়ে মন্ত্রী করতে হয়েছে, তবে পুরো নয়, রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায়। লোকে বলে বরকত সাহেবের পপুলারিটিকে ঠেকাবার জন্য মন্ত্রী করতে হয়েছে।

সি পি আই (এম) এর কাছে মালদা জেলায় কংগ্রেস (ই) মূল শত্রু নয়, মূল শত্রু এ বি এ গণি খান চৌধুরী। রাজ্যের সি পি আই (এম) নেতারাও বরকত এর খুঁত খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যতদিন মালদার নেতা ছিলেন ততদিন ভাবনা ছিল না, কিন্তু বরকত এখন যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই সংবর্ধনা পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন, হাত তালি পড়েনি। কিন্তু বরকত সাহেব সেই অনুষ্ঠানে ঢুকতেই করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান হয়েছে।

আজ পর্যন্ত কোন রেলমন্ত্রী সরজমিনে যাত্রীদের দুরবস্থা দেখতে যাননি। পশ্চিমবঙ্গের সন্তান পরিমল ঘোষ রেল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনিও ট্র্যাডিশন ভাঙেননি। অফিসারদের মুখে ঝাল খেয়েছেন—সব ট্রেন ঠিক সময়ে চলে। সব ঠিক হ্যায়।

বরকত সাহেব বরাবরই কেতাবি অভিজ্ঞতার চেয়ে ঠেকে শিখতে চেয়েছেন। মালদহ অবহেলিত বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভেঙে খানখান, গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যুৎ চাই, পরিবহন ব্যবস্থা চাই আর চাই আর্থিক সাহায্য, ঋণ। তার আগে কিছু প্রাথমিক সমস্যার সমাধান।

সবার আগে ভুতালিদিয়াড়া বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প কার্যকর করেছেন যার ফলে আজ মালদাকে বন্যার ভয়ে থাকতে হয় না। আগে মালদা শহরে রাস্তা ছিল তিনটি। আজকে অনেক রাস্তা হয়েছে। আধুনিকতম বাজার গড়ে উঠেছে চারটি, আরও একটি তৈরি হচ্ছে। সুইমিং পুল, পারক, রবীন্দ্র ভবন, বাস রুট, স্কুল কলেজ, সেচ দফতরের অফিস, বিদ্যুৎ সরবরাহের ট্রানসমিশন লাইন, রেল হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাংক, নূরপুর ব্যারেজ, টেলিভিশন রিলে সেনটার, আরও অনেক কিছু হয়েছে।

আগামী দিনের মালদা হবে শিল্পোন্নত মালদা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বরকত সাহেব উদ্যোগ নিয়েছেন। অসংখ্য ব্যাংক, ফরাক্কা সুপারথারমাল প্ল্যানট আর রেলওয়ে ইয়ারডের সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন দ্রুতগামী ট্রেন চালু করে মালদার মন জয় করে নিয়েছেন। তাই বলে মালদার পুরনো ঐতিহ্যকে ভুলতে দিতে চান না। কেন্দ্রের দু কোটি টাকা খরচ করেছেন আম বাগানে স্প্রে করার জন্য। যার ফলে এ বছর মালদহে আম নষ্ট হয়নি, ফলন হয়েছে সব চেয়ে বেশি। রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র খরচ করেছেন দশ কোটি টাকা।

মালদা থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে। বগবাড়ি উড়াল পুল তৈরি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে আরও বাজার, পারক। মালদা রেল স্টেশন, মালদা শহর আলো ঝলমল করছে। তবু মালদা মুখ চেয়ে আছে বরকত সাহেবের। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অবহেলা থেকে মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে মালদার মানুষ।

মালদার রাস্তার মোড়ে অনেক জায়গায় বরকত সাহেবের ছবি আর তাঁর কথা লেখা আছে—'একদা গৌড় যে রূপ বাংলার রাজধানী ছিল আমি চাই মালদা পুনরায় তার মর্যাদা ফিরে পাক উন্নয়নের মাধ্যমে।'

বরকত সাহেব খোলাখুলি বলেন, হ্যাঁ, আমি মালদার লোক শুনলে একটু দুর্বল হয়ে পড়ি। মালদা পিছিয়ে পড়া জেলা। আমি মালদার নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমি না দেখলে মালদাকে কে দেখবে? মানুষ চায় কাজ। কাজ করলে মানুষ তাকে মনে রাখবে।

বরকত সাহেব সত্যিই কাজ পাগল। ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। শুধু মন্ত্রী হিসাবে নয়, কংগ্রেসকর্মী হিসাবেও কাজ করে গিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসে কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তারপর ৭৮ সালে কংগ্রেস ভাঙার পর প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে নানা অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন, কুৎসা রটিয়েছেন কিন্তু বরকত সাহেব কারুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য করেননি বরং দুর্দিনে অনেক বিরোধী নেতাকে তিনি সাহায্য করেছেন, কোনদিন তা প্রকাশ করেননি।

রাজ্যের বিদ্যুৎ ও সেচমন্ত্রী হিসাবেই বরকত সাহেব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসা পেয়েছেন। ফরাক্কার জল বণ্টন নিয়ে ইউ এন ও-তে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বরকত সাহেব সাংবাদিক, বন্ধু, সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডায় জমে যান। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও ভাইবোন, ছেলেমেয়ের খোঁজ নেন, চিঠি লেখেন। এক ছেলে, এক মেয়ে। ওঁরা বিদেশে।

বরকত সাহেবের পরিবার খান চৌধুরীরা যেমন তেমন জমিদার ছিলেন না। মালদা, মুরশিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, বিহারের রাজমহলেও জমিদারি। জমিদার বাড়ির ছেলে হয়ে বরকত সাহেব কিন্তু কর্মচারীদের ওপর কোনদিন হম্বিতম্বি করেননি।

ছোটবেলা থেকেই অমায়িক ব্যবহারে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। ভাল ফুটবল-ব্যাডমিনটন খেলতেন। শিকার করার নেশা বরাবর। এখনও সুযোগ পেলে ছাড়তে পারেন না। লেখাপড়ায় বরাবরই ভাল ছাত্র। ভাইবোনদের খুব ভালবাসতেন। ম্যাটরিক পাশ করেছিলেন বহরমপুর থেকে। বি এ পাশ করার পর বিলেত গিয়েছিলেন ব্যারিসটারি পড়তে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিসটারি পড়া ভাল লাগেনি। জেনেভাতে পলিটিক্যাল সায়েনস পড়তে গেলেন। অনেক এগিয়েছিলেন। ডকটরেটের জন্য থিসিসি প্রায় শেষ। মার অসুখের খবর গেল। থিসিস জমা না দিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

বরকত সাহেব আজও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। কাজই তাঁকে মাতিয়ে রাখে। কাজ নিয়েই ডুবে থাকতে চান।

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

কী করছেন গণি খান, বিদেশের লোকরাও জানতে চান

পূর্ব জারমানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে চিরঞ্জীব

পূর্ব জারমানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় ও অভারতীয় মহলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বিদেশমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাওয়ের পর আমাদের দেশের যিনি বহু-আলোচিত মন্ত্রী তিনি বরকত গণি খান চৌধুরী। বারলিনে আফ্রো এশীয় ও লাতিন আমেরিকার সাংবাদিকদের সেমিনারে জামবিয়া, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইরাকের প্রতিনিধিরা বারে বারে জিজ্ঞাসা করেছেন গণি খান সম্পর্কে। আমি শুধু ভারতীয় নই, বাংলার এবং আমাদের রেলমন্ত্রীও আমারই রাজ্যের, তাই বেশ গর্ব বোধ করছিলাম। ঐসব দেশের পত্র-পত্রিকায় আমাদের রেলমন্ত্রী সম্পর্কে নানা খবর বেরিয়েছে। তিনি নতুন নতুন ট্রেন চালু করছেন, রেল-যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন। কলকাতায় মেট্রো এবং চক্ররেলের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে ইত্যাদি এবং এসবের জন্য তাঁকে প্রশংসা করা হচ্ছে। জামবিয়া ও ইরাকের সাংবাদিকরা জানালেন, তাঁদের দেশেও ট্রেন লেট আছে এবং যাত্রীদের উপর নানা সময়ে সমাজবিরোধীরা চড়াও হয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ভারত যেসব ব্যবস্থা নচ্ছে এখানেও তাই করা হোক।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমাদের বিষয় খেলাধুলা থাকলেও মাঝে মাঝে অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হত ঘরোয়াভাবে। কোন দেশের পরিবহন কেমন, এ নিয়ে আলোচনাকালে গোটা চারেক দেশ কৃতজ্ঞতা জানাল আমাকে তাদের রেল পরিবহনে ভারত সাহায্য করেছে বলে। 'ইথিওপিয়ায় টাটার বাস খুব জনপ্রিয় এবং বেশ ভাল' মন্তব্য করলেন ওঁদের চার প্রতিনিধিই।

বারলিনের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা 'নিউজ ডয়েসল্যানড' কিছুদিন আগে বরকত গণি খানকে ইন্দিরা মন্ত্রিসভার অন্যতম তৎপর সদস্য বলে মন্তব্য করে। লাইপজিগে একাধিক ভারতীয় তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে এই প্রতিবেদকের কাছেএসে।

মসকোয় ভারতীয় দূতাবাস কর্মীদের কথা বলব না। তাঁরা সকলেই সরকারি কর্মচারী। অন্যত্র কর্মরত বাঙালিদের কথাও বলব না। তাঁরা তো অনেক খবর রাখেন। ওখানকার সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা ভারত-বিশেষজ্ঞ, তাঁদের প্রশ্ন ছিল পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে। এখানে জ্যোতি বসু ও বামফ্রনট সরকারের পরেই রেলমন্ত্রী গণি খানের নাম এসেছে। তিনি আমাদের রাজ্যে রেলের উন্নতিতে কী কী কাজ করছেন ইত্যাদি। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর সম্পর্কে বেশ ভাল ধারণা --মনে হয় কলকাতার মেট্রো রেলে সোভিয়েত সাহায্য আছে বলে। নানা পত্রিকায় আমাদের নির্মীয়মাণ এই মেট্রো নিয়ে নানা নিবন্ধ বেরিয়েছে। কিছুদিন আগে রেলমন্ত্রী মেট্রো ট্রায়ালে বেরিয়েছেন, সে ছবিও বের হয়।

মসকোর গিয়ে মেট্রোয় চড়ুন।

যদি কেউ শোনেন আপনি ভারতীয়, এবং কলকাতাবাসী, পরক্ষণেই প্রশ্ন শুনবেন---কলকাতায় তো এখনও মেট্রো হয়নি, কাজ চলছে অনেকদিন ধরে, কবে শেষ হবে, ওখানকার ভূগর্ভে কাজ করতে খুব সমস্যা বুঝি! নিউক্লিয়ার ফিজিকসের এক অ্যাকাডেমিসিয়ান, তিনি থাকেন ওরকিয়েভ বুলভারে, নাম অধ্যাপক গ্যেরা। তাঁর প্রশ্নবাণে বেশ জর্জরিত হয়ে পড়ি। মেট্রো রেলের পর তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল আমাদের যাত্রা নিয়ে। □

পাঁচ মিনিট

গণি খানের ঘাটগাড়ি

কাশীপুর ইসটিশানে গাড়িটা আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল। মোটামুটি ফাঁকা দেখে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। কামরার পরিবেশটা বড় ভাল লাগল। আগরবাতির ধোঁয়া গোটা কামরায় সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। অগুরু সেনটের সুবাস ম ম করছে। আর দরজার সামনের সিটটার তলায় দুটো মাটির কুম্ভিকা। এখানে ওখানে কিছু খই ছড়ান। গাড়িতে সাধারণত নিত্যযাত্রীদের ঘাম, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে ভেনডারের চুপড়ি এবং হকারের মালের যে অ্যাসোরটেড বোঁটকা গন্ধ থাকে, এ গাড়িতে সেটা নেই। তদুপরি পাশের কামরা থেকে খোল খঞ্জনি সহযোগে কেত্তনের আওয়াজ আসছে। এই পরিবেশ দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে সিটে বসার কথা ভাবলাম। আমার সামনের সিটে একজন নবীন, একজন প্রবীণ বসে। তাদের পাশে চাদর মুড়ি দিয়ে লম্বালম্বি শুয়ে আরেক জন। চাদরে আলতার ছাপ। আমি নবীনকে উদ্দেশ করে বললাম, যিনি শুয়ে আছেন তিনি কি আপনাদের সংগী? নবীন বললেন 'হ্যাঁ, তবে উনি আমাদের সংগী নন, বরং আমরা ওঁর সংগী।' ঠিক আছে, তা হলে ওঁকে একটু জাগিয়ে দিন, আর একটু উঠে বসতে বলুন। তা হলে আমি একটু বসতে পারি।

নবীন : উনি উঠতে পারবেন না! ওঁর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

কেন? উনি কি অসুস্থ? ঠিক আছে। অসুস্থ হলে আর ওঁকে জাগিয়ে কাজ নেই। আমি বরং দাঁড়িয়েই যাচ্ছি।

নবীন : উনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এখন আর অসুস্থ নন। উনি এখন নেই।

দিব্যি বহাল তবিয়তে শুয়ে আছেন। আর আপনি বলছেন উনি নেই!

নবীন : (একটু রেগে) এখনও বলছি উনি নেই। উনি মারা গেছেন

সে কি?

প্রবীণ : হ্যাঁ ভাই, উনি ইহলোক ছেড়ে পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছেন। আমরা নিমতলা শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাচ্ছি ওঁকে দাহ করতে।

তা আপনাদের সংগে আর লোকজন কই? ট্রেনে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছেন?

প্রবীণ : হ্যাঁ ভাই, এখনতো এ ভাবেই মৃতদেহ নিয়ে যায়। ওতে শবযাত্রীদের বিকট চীৎকার এবং অসভ্যতা বন্ধ হয়েছে। আর খরচ-খরচাও কম।

খরচ কম কেন?

প্রবীণ : রেলওয়ে বোরড জানিয়ে দিয়েছে ডেড বডির কোন টিকিট লাগবে না। তা ছাড়া প্রত্যেক কামরায় দুটো করে স্ট্রেচার থাকবে যাতে ঘাট স্টেশনে নেমে দুজনে স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে পারে।

নবীন : দাদা কি চক্ররেলে এই প্রথম উঠলেন?

প্রবীণ : (ধমকে) তোমাকে কতবার বলেছি এটাকে চক্ররেল বলবে না। এটা ঘাটগাড়ি। ঘাটে যাবার গাড়ি।

আজ্ঞে, এটাকে ঘাটগাড়ি কেন বলছেন?

প্রবীণ : যে গাড়ির সবকটা স্টেশন ঘাটের কাছাকাছি তাকে ঘাটগাড়ি না বলে আর কী বলব? যেমন ধর কাশী মিত্তির ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, নিমতলা ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, আরমেনিয়ান ঘাট, প্রিনসেপ ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, বাবুঘাট।

নবীন : কেন, হাটেও তো যায়।

প্রবীণ : হ্যাঁ, সব ঘাটের মাঝে একটাই হাট, মাঝের হাট। যেহেতু হাট স্টেশন একটা এবং ঘাট স্টেশন বহু, সেই জন্য এটাকে ঘাটগাড়ি বলাই যুক্তিযুক্ত। তবে হ্যাঁ, রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই গাড়ি চালু করেছেন। যে লোকগুলি জ্যামজটে নিত্য আধমরা হয়ে বেঁচে আছে তারা পুরো মারা যাবার পর অন্তত একটু ফাঁকায় ফাঁকায় ঘাটে যেতে পারবে। জীবনে অশান্তিতে ভুগে মরণে শান্তি পাবে। সারা জীবন দাঁড়িয়ে রেলে চড়ে অন্তত একবার শুয়ে যেতে পারলেন।

নিমতলা ঘাট স্টেশন আসতেই ওঁরা মৃতদেহটিকে স্ট্রেচারে চাপিয়ে দুবার বলহরি হরিবোল বলে নেমে গেলেন। আমি ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। □

নির্মল বিশ্বাস

নির্বাচনে কংগ্রেস সুইপ করবে : গণি খান

: রেলমন্ত্রী হিসাবে নয় পশ্চিমবঙ্গের একজন কংগ্রেস কর্মী হিসাবে বলছি, দেখবেন আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস 'সুইপ' করবে।

প্রশ্ন করলাম, এত জোর দিয়ে আপনি বলছেন কি করে -

রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী : বলছি তার কারণ বামফ্রন্ট চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ কংগ্রেসকে চায়।

পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসে যতটা, কংগ্রেস (ই)-তে ততটা নয়। আসলে ব্যাক গ্রাউনডটা ভুলে গেলে তো চলবে না। কংগ্রেস একবার ভাগ হল ১৯৬৯ সালে। তখন কিছু লোক ক্ষুব্ধ হলেন। এরপর ১৯৭৮ সালে আবার কংগ্রেস ভাগ হল। তখন আবার কিছু লোক ক্ষুব্ধ হলেন। সুতরাং একটা বিবোধ, আদর্শগত বিরোধ এবং স্বার্থ নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। যাঁরা আগে কংগ্রেসে এসেছেন তাঁরা

'ডাঃ নাগ তো অনেক পরে কংগ্রেসে এসেছেন। সুতরাং ডাঃ নাগ এবং আমার ইডিওলজি এক হতে পারে না।'

বরকত সাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কলকাতায়, এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে যে গোষ্ঠী বিরোধ আছে। এই বিরোধ কি নির্মূল করা সম্ভব ?

বরকত : গোষ্ঠী রাজনীতি বলতে কে কী বোঝেন জানি না। তবে সব রাজনৈতিক দলেই তো ব্যক্তির [illegible] থাকে। তবে এটা ছাত্র

পরে আসা লোকদের পছন্দ করেন না, মেনে নিতে পারেন না। এইভাবে বললে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু গোষ্ঠী বলাটা ঠিক নয়। ধরুন, ডাঃ গোপাল দাস নাগ। ডাঃ নাগ তো অনেক পরে কংগ্রেসে এসেছেন। সুতরাং ডাঃ নাগ এবং আমার ইডিওলজি এক হতে পারে না। সন্তোষ রায়ও অনেক পরে এসেছেন। আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ঘোর দুর্দিনে ছিলাম। আমাদের রাজনীতিটা হচ্ছে

যতটা না কংগ্রেসের তার চেয়ে বেশি ইন্দিরা গান্ধীর দর্শনকে ভিত্তি করে। আমাদের ভয়টা কোথায় ? ভয়টা হল ইন্দিরা গান্ধী যদি আবার কোনদিন বিপদে পড়েন তাহলে এই সুবিধাবাদী লোকগুলো পালিয়ে যাবে। আমাদের বিপদে ফেলবে। যে

শ্রদ্ধা [illegible] মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়, বিরোধী দলের নেতা হিসাবে।

পরিবর্তন : জ্যোতিবাবুর পর সি পি আই (এম) দলের কে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত বলে আপনি মনে করেন ?

বরকত : সি পি আই (এম) সম্পর্কে আমার ধারণা কম। তবে আমি মনে করি না যে ব্যক্তিত্ব [illegible]

'জ্যোতিবাবুকে শ্রদ্ধা করি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়, বিরোধী দলের নেতা হিসাবে।'

জন্য আমরা মানে আমি সিদ্ধার্থ রায়কে কংগ্রেসে নেওয়ার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছি। বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য কি ? সিদ্ধার্থ রায় তো আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে শত্রু বা ব্যক্তিগত বন্ধু নন।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। আগামী দিনে কি আরও শক্তিশালী হওয়া সম্ভব ?

নেতৃত্বে অভাব আছে। [illegible] নির্ভর করছে সুযোগের [illegible]। জ্যোতিবাবু তো [illegible]সূত্রে নেতা নন। সি পি আই (এম)-এ নেতা নিশ্চয় আছে।

পরিবর্তন : বামফ্রন্ট [illegible] কতটা সফল বলে মনে করেন ?

বরকত : বামফ্রন্ট শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

পরিবর্তন : ব্যর্থতার মূল কারণ

'কংগ্রেসের এখানে নেতৃত্বের অভাব।'

বরকত : কংগ্রেসের এখানে নেতৃত্বের অভাব। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুব ছাত্ররা কংগ্রেসকে চায়, কংগ্রেসের নেতৃত্ব চায়।

পরিবর্তন : সিদ্ধার্থ রায় কি কংগ্রেসে ফিরে আসতে চাইছেন ?

বরকত : আমি জানি শুধু ফিরে আসতে চাইছেন তাই নয়, পা বাড়িয়ে বসে আছেন।

কী ?

বরকত : বামফ্রন্ট পার্টির স্বার্থকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেছেন।

পরিবর্তন : আগামী নির্বাচনের ফলাফল কী রকম হবে বলে আপনি মনে করেন ?

বরকত : কংগ্রেস নেতৃত্ব দিতে পারলে কংগ্রেস জিতবে শুধু [illegible]

'বিদ্যুৎ সমস্যার মূলে যন্ত্র নয়, মানুষই গোলমালটা পাকাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সমস্যার সৃষ্টি করছেন।'

পরিবর্তন : সিদ্ধার্থবাবুকে কি ফিরিয়ে নেওয়া হবে ?

বরকত : এটা নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর উপর। তবে আমাদের যদি জিগেস করেন তাহলে বলব সিদ্ধার্থবাবু যাতে কংগ্রেসে না আসতে পারেন তার জন্যে যত রকম ভাবে সম্ভব বাধা দিয়ে যাব।

পরিবর্তন : জ্যোতি বসু নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কতটা সফল ?

'সুইপ' করবে।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গের [illegible] সমস্যা কী বলে আপনার মনে হয় ?

বরকত : প্রথমত শিল্পের [illegible] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে পরিবেশ তৈরি করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার তার বিনাশ ঘটিয়েছে। যেমন ধরুন বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ না হলে শিল্প বিকাশ সম্ভব নয়। জ্যোতিবাবুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিল্প পরিবেশ ইনফ্রাসট্রাকচার ভেঙে ফেলেছেন।

'চক্র রেল যদি আমরা করতে পারি তাহলে মনে করব একটা বড় কাজ করতে পেরেছি।'

বরকত : এ বিচার করবেন জনগণ। আমার বক্তব্য যখন তিনি ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি দারুণ জনপ্রিয়। তবে আমি জ্যোতিবাবুকে

দ্বিতীয়ত, সরকার পরিচালিত সংস্থাও আছে, ব্যক্তি মালিকানার শিল্পও আছে, বিদ্যুতের [illegible] পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা [illegible]

বেড়েছে।

পরিবর্তন ঃ আপনি তো নিজে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন। আপনি কি করেছেন?

বরকত ঃ আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছি। তখন এত বিদ্যুৎ সংকট ছিল না। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের। সে জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে বারো হাজার না তের হাজার মনে নেই। আমি পানজাবের মত কৃষি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলাম। এই বারো-তের হাজার ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে গ্রামে ইউনিট গড়ে তুলে কাজ করাতে চেয়েছিলাম। আমার সব স্বপ্ন বামফ্রন্ট সরকার ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। শিল্পের উৎপাদন, কৃষির উৎপাদন তাই কমে গিয়েছে।

পরিবর্তন ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গলদটা কোথায়?

বরকত ঃ এক এক জনের দৃষ্টিভঙ্গি এক এক রকম। তবে আমি মনে করি বিদ্যুৎ সমস্যার মূলে যন্ত্র নয়, মানুষ। মানুষই গোলমালটা পাকাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সমস্যার সৃষ্টি করছেন।

পরিবর্তন ঃ হাওড়া–আমতা রেলপথের ভবিষ্যৎ কী?

বরকত ঃ দুকোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই টাকা খরচ করতে পারলে আরও দুকোটি টাকা দেওয়া হবে। হাওড়া আমতার জন্য টাকা আছে।

পরিবর্তন ঃ তারকেশ্বর, বনগাঁ, কৃষ্ণনগর-লালগোলা সিংগল লাইন ডবল লাইন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

বরকত ঃ রেল দফতরের হাতে এখন টাকা নেই। টাকার খুব অভাব। আমরা জোর দিচ্ছি কলকাতার চক্র রেলের উপর। চক্র রেল যদি আমরা করতে পারি তাহলে মনে করব একটা বড় কাজ করতে পেরেছি।

পরিবর্তন ঃ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব আপনি নিতে পারবেন?

বরকত ঃ এখন তো এরকম প্রশ্ন ওঠে না। হ্যাঁ, আমি মনে করি কংগ্রেস আগামী নির্বাচনে সুইপ করবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোন মন্তব্য করব না। ☐

সাক্ষাৎকার ঃ
বিশেষ সংবাদদাতা

রেলে নিত্যযাত্রী ঃ অসহ্য কষ্ট ঘোচাতে কয়েকটি প্রস্তাব

শ্যামল বসু

রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাত্রে যিনি বাড়ি ফেরেন চলতি কথায় তাকে বলা হয় ডি পি বাবু। অর্থাৎ ডেলি প্যাসেনজার।

এখনকার রেল কোমপানির ডেলি প্যাসেনজাররা বাবু হলেও রাজা বাদশা নন। অতি সাধারণ খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। বেশির ভাগই চাকুরে আর কেউ কেউ ছোট ব্যবসায়ী। এদের সংগে কথা বললে পরিচয় পাওয়া যাবে কলকাতার সংগে যুক্ত লোকাল ট্রেনগুলির দুরবস্থা, দুর্দশা এবং অনিয়মের। যদিও নিত্যযাত্রীরা এ ব্যাপারে আর কোন রকম মাথা ঘামাতে পছন্দ করেন না। এ নিয়ে আলাদা করেও কিছু ভাবেন না। ওঁরা মেনে নিয়েছেন যে ওঁরা হলেন রেল কোমপানির দুয়োরাণীর পোষ্য। শহরতলির ট্রেন সারভিসকে ওরা দুয়োরাণী বলে ডাকতে ভালবাসেন। আর রসিকতার শেষ ওইখানেই।

যেমন ধরা যায়, বারুইপুরের নবীন চন্দ্র চ্যাটারজির কথা। সারাদিনে তাঁর চার ঘণ্টার ওপর কাটে এই ট্রেনেই। তবুও তিনি যে ঠিক সময় মত অফিসে আসবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? সকালবেলা তারই মত অফিসে যাবার জন্য ট্রেনে চেপে বসেন ক্যানিং-এর বিষাদহরণ হালদার, বজবজের নমিতা সামন্ত, রানাঘাটের তপন দে সরকার, মাঝপথের ট্রেনের যাত্রী টালিগঞ্জ স্টেশনের বিশু দাশগুপ্ত। নিশ্চয়তার কথায় বিশুবাবু জানান, শনিবার ২৩ জুলাই টালিগঞ্জ স্টেশনের ৮-৪৮-এর গাড়ি যে পৌছবে না তাই জানতে সময় লেগেছিল ঘণ্টাখানেক। ট্রেন বন্ধ ছিল সেদিন। পারক সারকাস স্টেশনে কারা যিস্‌প্লেট সরিয়ে রেখেছিল। সে খবর টালিগঞ্জ স্টেশনকে জানান হয় প্রায় দশটার সময়। তারপর শ খানেক নিত্যযাত্রী পড়ি মরি করে বাসে ট্রামে ছোটেন তাদের চাকরি বাঁচাতে। অতএব ট্রেন শুধু চলা নয় সঠিক খবর পাবারও যো নেই এই শহরতলির ট্রেনের যাত্রীদের। কলকাতা থেকে ফেরার পথে এরাই আবার ট্রেনে চাপবেন বাড়ি ফেরার জন্য। ট্রেনই এদের আড্ডা ইয়ারকি বা সুখ-দুঃখের গল্প করার জায়গা। রবিবার সে দিক দিয়ে একজন ডেলি প্যাসেনজারের কাছে উৎসবের দিন। ট্রেনে না চড়ার উৎসব। রবিবার বা কোন ছুটির দিনে হাজার প্রলোভনেও এঁরা কেউ ট্রেনে চড়তে চান না।

কৃষ্ণনগরের দেবেন পুরকায়স্থ বলেন, আরে মশাই নিত্যযাত্রী হলেই যে ট্রেন পাবেন এমন নিশ্চয়তাও নেই। এই তো গত ১০ জুলাই একটা বিশেষ কাজে বিকেলের দিকে কলকাতায় আসার দরকার ছিল। রবিবার বলে অফিস ছিল না। ঐ দিন বিকেলের দিকে কেবলমাত্র শান্তিপুর থেকে একটি লোকাল চলেছে শিয়ালদা যাবার জন্য। প্রায় ঘণ্টা চারেকের মধ্যে অন্য কোন ট্রেন ছিল না। রানাঘাট, কল্যাণী, নৈহাটি বা ব্যারাকপুর থেকেও সে সময় কোন ডাউন গাড়ি ছিল না। তার মানে কম করেও চারটি গাড়ির যাত্রীর ভরসা ছিল ঐ একটি ট্রেন। ভেনডারের কামরাতেও পা রাখার জায়গা ছিল না। একে রবিবার তায় বিকেলের ট্রেন তাই চাপ কিছু কম, অন্য কোন কাজের দিন হলে কী হত বলুন দিকিনি?

হয় না যে তা নয়। তেমন হলে সেদিন ডেলি প্যাসেনজারদের বাধ্যতামূলক ক্যাজুয়াল লিভ। অবশ্য রেলবাবুদের সই করা লেট স্লিপ দেখাতে পারলে কোন কোন অফিসে কামাই মাফ হয়ে যেতে পারে।

যে কোন ই এম ইউ কোচের ভিতরের চেহারা প্রায় সর্বত্রই এক। পাখা-আলোর কাঠামো আছে, পাখা-আলো নেই। ওগুলি হয়ত পাওয়া যাবে স্টেশনের বাইরে কিংবা ছোটখাট মফঃস্বল বাজারে। বসার আসনের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। আর রেলের বিজ্ঞাপনে, 'জাতীয় সম্পত্তি' কথাটার তাৎপর্য বুঝে ফেলে রসিক যাত্রী লিখে দেন 'জাতীয় সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে, আমার অংশটুকু বুঝিয়া পাইলাম।'

রসিক যাত্রীদের মন্তব্য কখনও শেষ হয় না। অনেকগুলো গাড়ি বাতিল হবার পর অবশেষে কোন গাড়ি এলে প্যাসেনজাররা বলেন ওই 'মামা' এলেন। আবার অনেকক্ষণ ধরে প্ল্যাটফরমের ওপর যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। গাড়ি আসছে না। এমন সময় ধীর লয়ে আশি বগির একখানা মালগাড়ি এল-যাত্রীরা বলেন 'শ্বশুরমশাই' এসেছেন।

'শ্বশুর' বা 'মামা' যাই হোক না কেন কর্মকর্তাকে নিয়ে কিংবা তার

প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়ে কোন যাত্রী সচরাচর রসিকতা করেন না। সে বিষয়ে রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর কিংবা বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড-হারবার সর্বত্রই রেলওয়ের কর্তা-ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্যাসেনজারদের উদাসীনভাব। এই উদাসীনতা কোন কর্তাব্যক্তি যদি ভক্তি শ্রদ্ধা বলে মনে করেন তবে তিনি গোড়ায় ভুল করবেন। কারণ মাঝে মাঝেই দেখা যায় স্টেশনে স্টেশনে ভাঙচুর হচ্ছে, স্টেশন মাস্টার নিগৃহীত হচ্ছেন, এসবই তো গুমরে গুমরে হঠাৎ ফেটে পড়ার অভিব্যক্তি।

ফেটে পড়তে হয় কেন? সাধারণ যাত্রীরা কোনদিনই কোন ঝামেলা পছন্দ করেন না। বাড়িতে ছেলেপুলে আর বউ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসেন এঁরা, আবার সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতে পারলেই তাঁদের আনন্দ। ঝামেলায় তারা জড়িয়ে পড়তে যাবেনই বা কেন? কিন্তু ধরা যাক হঠাৎ তাঁরা আটকে পড়লেন হালিশহরে। সামনে সিগনাল খারাপ বলে গাড়ি চলছে না। ঘণ্টা কয়েক পরে জানা গেল সিগনাল খারাপ হওয়ার ঘোষণাটি নেহাৎ বাজে কথা। আসলে রেকে গণ্ডগোল কিংবা সন্ধ্যাবেলাই কারা তার কেটে নিয়ে গিয়েছে।

সারারাত ট্রেনে বসে থাকার পরদিনও একগাদা উৎকণ্ঠার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা। উদ্বিগ্ন আত্মীয়-জন ঘিরে ধরল তাঁকে। তাতেও অবশ্য ছুটি নেই। কারণ এখনই স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে আবার দৌড়তে হবে ট্রেন ধরতে। ট্রেন ধরতে চাইলেই যে ধরা যাবে তা তো নয়। ট্রেন না পেলে বাসে করে নৈহাটি, সেখান থেকে ব্যারাকপুর, ব্যারাকপুর থেকে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার থেকে অফিস। এবং ট্রেন একদিন বন্ধ থাকলে বাসে ওঠা যে কী ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

লোকাল সেকশানে মাসে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র লোপাট হয়। যাত্রীদের একটা অংশ বিনা ভাড়ায় যান তবে ডেলি প্যাসেনজারদের অধিকাংশেরই মানথলি টিকিট। মানথলি টিকিটের ভাড়া বাড়লেও এঁরা চটে যান। চটে যান কারণ প্রত্যেক রেল-বাজেটের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা রেলপথের অনেক উন্নয়নের গল্প শোনান। যাত্রীদের আপত্তি মন্ত্রীর অহেতুক আশ্বাসে। মল্লিকপুরের নিত্যযাত্রী শিক্ষিকা [illegible] সেন যেমন নিস্পৃহ ভাবে বললেন, ভাড়া বাড়বে সে তো [illegible]। কিন্তু তার জন্য অত প্রতিশ্রুতি কেন? প্রতিশ্রুতি রাখতে [illegible] রাজস্বের খাতে একটু একটু করে ক্ষয়ে যায়—এটা কি মন্ত্রীরা বা কর্মকর্তারা জানেন না?

লোকাল সেকশনে সরকারি পক্ষ যেমন সক্রিয় তেমনিই বেসরকারি বিরাট একটা চক্রও সক্রিয়। কোন কোন পক্ষ জাল টিকিট, ব্যবহৃত টিকিট সরকারি রেলকর্মীদের সহায়তায় চালিয়ে যাচ্ছে। পাখা, আলো, কাঠের পাটাতন এমনকি জানালার শিকও চুরি যায় এক শ্রেণীর রেল রক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায়। তবে ট্রেন বাতিলের কৃতিত্ব একা রেলকর্মীদের। রেলের ইনজিনিয়ারিং বিভাগ ভারতের যে কোন সরকারি কর্মক্ষম ও দক্ষ বিভাগের সমতুল্য। সেই ইনজিনিয়ারিং বিভাগের কাজ করার জিনিসপত্র অনেক সময়ই নিম্নমানের আর দ্বিতীয়ত চোরাই মাল হাত ফেরতা হয়ে আবার বিক্রি করা হয় রেল বিভাগকে। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। অনেক কিছুর মতই অভ্যস্ত হয়ে যাবার ঘটনা মাত্র।

প্ল্যাটফরমে বা ট্রেনের কামরায় ভিখারিদের ভিড় আটকানর দায়িত্ব কাদের অথবা ট্রেন লাইনের ধারে ঝুপড়িবস্তি কেন হয়? এসব প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। অথচ এই ভিখারিদের দাপটে নিত্যযাত্রীর ওঠা নামা একরকম অসম্ভব হয়ে ওঠে। অন্ধ, খঞ্জ, ছোঁয়াচে রোগী সকলের উৎপাতই এই ট্রেনের কামরায়। আর আছে সেই সংগে অগুনতি লাইসেনসবিহীন হকার আর বিনা টিকিটের যাত্রীর ভিড়। লাইসেনস ব্যবস্থা সরল করা কিংবা হকার নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রেল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু এ বিষয় তাঁরা কিছু করতে চান বলে মনে হয় না। যেমন উলুবেড়িয়া লাইনের ফুলেশ্বর স্টেশনের নিত্যযাত্রী রাজা চক্রবর্তীর অভিযোগ। তিনি অভিযোগ করেন রেল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই চান রেলে বিশৃংখলা হোক। তা না হলে রেল লাইনের ওপর দিয়ে প্ল্যাটফরমে যেতে তারা যাত্রীদের উৎসাহ দিতেন না। বিশ্বাস না হয় চলুন দেখে আসবেন ফুলেশ্বর স্টেশনে। এখানে যেমন টিকিট কাটার জায়গা নেই, তেমন যাত্রীদের যাতায়াত করার রাস্তাও নেই। স্টেশনের উত্তর দিকে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের সব যাত্রীকেই রেললাইন দিয়ে প্ল্যাটফরমে আসতে হয়। গাড়ি এসে গেলে টিকিট কাটা হচ্ছে কি না তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। রেলের স্টেশনে আসার রাস্তা জঙ্গল হয়ে আছে। কয়েকদিন বাদে দেখবেন ওখানেও ঝুপড়িবস্তি হয়ে গিয়েছে। তখন যতই করুন ঐ বস্তি ওঠাতে পারা মুসকিল হবে। অথচ রাজপুর খাল অবধি রাস্তাটা ঠিক করে দিলে রেল কোমপানির নিজেরই লাভ হবে। নিজের সুবিধে তারা নিজেই বোঝেন না।

ঠিক তেমনভাবেই অনেকে বলেন টিকিট না বিক্রি করাটা এক শ্রেণীর রেল কর্মীর মদতে হয়। টিকিট ঘরে বাবু থাকেন না, মাঝপথে চেকার থাকেন না। আবার বিশেষ বিশেষ জায়গায় চেকাররা কেবলমাত্র পয়সা নিয়ে কিংবা ছাপান জাল টিকিট বেচে পয়সা উশুল করেন। এতে রেল কোমপানির কোন লাভ হয় না। ঐ এক শ্রেণীর কর্মচারীদের চোরা পথে পেট মোটা হয়।

আবার অন্য অভিযোগ যাত্রীদের কাছে টিকিট দেখতে [illegible] যাত্রীর হাতে [illegible] কেন? নিত্যযাত্রীরা [illegible] বলেন, এ অভিযোগ [illegible] পেছনে বহুদিনের অকর্মণ্যতার [illegible] হ্রাস পেয়েছে। যাত্রীরা যদি টিকিট দেখাতে অভ্যস্ত হতেন তবে এ অসন্তোষের কথা উঠতই না। তাছাড়া ঠিক সময় ট্রেন চললে, ট্রেনের কামরার ভিতরে যাত্রীরা যাত্রী হিসেবে যেটুকু পাওয়া উচিত সেটুকু পেলে টিকিট দেখাতে কেই বা আপত্তি করতেন?

যাত্রীরা জানেন তাদের ভাড়া যথাযথ মূল্য পায় না যে যাত্রাপথে, সেখানে তাঁদের কোন দায়িত্ব থাকারও কথা নয়। কেন দায়িত্ব নিতে [illegible] তাঁরা? যাত্রীরা ইচ্ছে করলে [illegible] চুরি আটকাতে পারেন, এমন ঘটনা ঘটেছেও। ট্রেনের ডাকাত ধরেছেন যাত্রীরাই। কিন্তু তারপর? আর পি-এফ আর জি-আর-পির বন্দুকের নল বা লাঠির ডগা কাদের দিকে উদ্যত হয়েছে!

একটা নিত্যকার যাত্রপথ [illegible] হোক শান্তিপূর্ণ কিংবা [illegible] হোক এতো রেল কর্তৃপক্ষও চান। [illegible] নিয়ে তারা বহুবার বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন, আবেদনও প্রচুর। কিন্তু সক্রিয় ভাবে কতটুকু তাঁরা করেছেন? দুর্ঘটনার পর কটা লেভেল ক্রসিং নিরাপদ করেছেন? কটা গাড়িতে আলো, পাখা, কাঠের আসন চুরি আটকিয়েছেন? কটা গাড়িতে ভিখারি বা হকারের অনু-প্রবেশ বন্ধ করেছেন?

না, মনে রাখার মত একটাও [illegible] রেললাইন-রেলগাড়ি কোন [illegible] নিত্যযাত্রীদের কাছে নিরাপদ [illegible]। এর জন্য রাজ্য সরকার [illegible] কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা রেলমন্ত্রকও এখনও অসহায় দর্শক কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে উদাসীন।

এই উদাসীনতাই নিত্যযাত্রীদের মাঝে মাঝে উত্তেজিত করে তোলে। ভাঙচুর হয় জাতীয় সম্পত্তি, আহত হন রেলকর্মী। কিন্তু জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব একা যাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে রেলকর্তৃপক্ষ খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ যে কিছু করেননি এমন কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

সাবারবান রেল ব্যাপারটা ইংরেজ আমলে তেমন জোরদার ছিল না। রেলওয়ে তখন থেকেই 'সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে পরিচিত। এখানকার কর্মচারী থেকে মন্ত্রী সকলেই এই এক [illegible] পোষণ করতেন। স্বাধীনতার পর থেকে রেল বোর্ডই চরম [illegible] অধিকারী ছিল। কিন্তু গত [illegible] ১৯৮২ থেকে এই চিন্তায় [illegible] আঘাত করলেন বর্তমান রেলমন্ত্রী

বি এ গণি খান চৌধুরী। উন্নয়নশীল দেশের মূলমন্ত্র যেখানে সাধারণ মানুষের জনকল্যাণ সেখানে সরকারি দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকা রেল কোমপানিকে আয়-ব্যয় দেখার সংগে কিছু প্রয়োজনীয় কল্যাণকর্ম করতে হবে। আর এই দায়বদ্ধতার জন্যই রেলওয়ে বোরডের চিন্তাকে বেশি করেই জনসাধারণের প্রয়োজনটা ভাবতে হবে। আয়ের হিসেব সবক্ষেত্রে মিলবে এমন নয়। অন্তত সাবারবান শাখায় তা সম্ভব হয় না। বিদেশে তাই সাবারবান স্টেশনগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আঞ্চলিক নগর উন্নয়ন কমিটি আছে। তারা নিত্য-যাত্রীর গাড়ি পারকিং সমস্যা থেকে শুরু করে সব সুবিধার দিকে নজর রাখার জন্য সহায়তা পান। কিন্তু ভারতে এ জাতীয় ব্যবস্থা কোথাও নেই। আর পশ্চিমবংগে তো সরকারি লাল ফিতের ফাঁস স্বাধীন ভারতে কৃচিৎ কখনও আলগা হয়েছে। তাই সাবারবান স্টেশন বা ট্রেন কোন জনমুখী পরিকল্পনার অংশ হতে পারেনি। সাবারবান রেলকে কেবলমাত্র 'কমারশিয়াল ইউনিট' হিসেবে দেখলে হবে না। দেখতে হবে সাধারণ মানুষের রোজকার প্রয়োজনের অংগ হিসেবে। রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরীর বর্তমান কাজকর্মে সেই জাতীয় একটা আশা দেখা যাচ্ছে। তাই এ প্রস্তাবনার প্রয়োজন। ফর্দ করে বললে চট করে বোঝা যাবে। যেমন: ১। সময় মত ট্রেন চলার দরকার। পরিকল্পনা ছাড়া কোন ট্রেন চলবে এমন আশ্বাসের প্রয়োজন নেই। গাড়ি নেই, লোক নেই এসব মামুলি অজুহাতগুলিই পরিকল্পনাহীনতার মধ্যে পড়ে।

২। ট্রেন কমপারটমেনটগুলির যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে প্রতিদিন কারশেড থেকে ছাড়তে হবে। ছোটখাট ইলেকট্রিকাল অথবা অন্য মেরামতির জন্য রানিং স্টাফ রাখতে হবে। ট্রেন কারশেডে ফিরে আসা পর্যন্ত দায়িত্ব এই রানিং-রিপেয়ারিং ইউনিটের ওপর থাকবে।

৩। সিংগল লাইন, ডবল লাইন ক্রসিং এসব সমস্যা চিন্তা করে টাইম টেবিল তৈরি করতে হবে। কোন অহেতুক বিভ্রান্তি তৈরি করে সময় নষ্ট যাতে না হয় তার জন্য সামরিক বাহিনীর মত নিয়মানুগ 'রানিং কার স্টাফ'দের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করতে হবে।

৪। স্টেশন থেকে বাস বা গাড়ির রাস্তায় তাড়াতাড়ি পৌছনর জন্য সবচেয়ে কম দূরত্বের সড়ক যোগাযোগ করতে হবে। মাঝের স্টেশনগুলোর চারদিক দিয়েই যদি খোলা থাকে তবে তার জন্য গেট আর টিকিট ঘর তৈরি করার কী দরকার? দেখতে হবে সাধারণ মানুষ যাতে সহজেই স্টেশনে ঢুকতে পারে, রেল লাইন পার হবার প্রবণতা যাতে কমতে পারে আর সহজে টিকিট কাটার সুযোগ থাকে।

৫। সিকিউরিটি স্টাফ কোন সামান্যতম ক্ষেত্রে এমনকি রাজনৈতিক কারণেও যাতে নিজের কাজ উপেক্ষা না করতে পারে সেটা দেখার দরকার। ভিক্ষুক কিংবা যোগ্য লাইসেনস ছাড়া হকার অথবা পোরটার স্টেশনেই যেন ঢুকতে না পারে সে বিষয় কঠোর হতে হবে।

৬। টিকিটবাবুদের কাছে থেকে নকল টিকিট বইটির অনুসন্ধান করতে হবে। রেলওয়ের নির্ধারিত টিকিট বই ছাড়াও এদের কাছে এবং স্টেশনের বুকিং ক্লারকদের কাছে নকল টিকিট বই থাকে। দাম কম লেখা পুরনো টিকিট কেবল ছাপা হরফে সংশোধন করে বিক্রি করা যাবে।

৭। নির্দিষ্ট ওজনের মাল কেবলমাত্র ভেনডার কামরা ছাড়া সাবারবান রেলওয়ের কোন যাত্রী কামরায় তোলা বন্ধ করতে হবে। কেবল যাত্রীদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যাত্রী কামরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার দরকার।

৮। রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী কোন নিরাপত্তার দায়িত্ব না রেখে যেন নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই ব্যবস্থা নিতে পারে। অন্তত সাবারবন রেলওয়ে এই ব্যবস্থা চালু করার দরকার। এক্ষেত্রে রেলের জমিতে জবরদখলকারীদের সরানর ক্ষমতা রেলওয়ের নিজস্ব এক্তিয়ারে আনতে হবে।

৯। রেলপথ, গাড়ি ও যাত্রীর নিরাপত্তা সুখসুবিধা সবটুকুই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য রেলকর্মচারীদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রেল কর্মচারীদের স্থির সময়ের ব্যবধানে প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁদের জন সংযোগের ও জনকল্যাণ কাজের কর্মী হিসেবে প্রথম দিকে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে ভুল ত্রুটির জন্য রেলওয়ে সারভিসের বিশেষ কনডাকট রুল ও শাস্তি দিতে হবে। সৌজন্যতার অভাব রেলকর্মচারীর পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে দেখা দরকার।

১০। সাবারবান রেলপথ দেখাশুনা, পরিচালনা করার জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার পদের অনুরূপ সম্পূর্ণ আলাদা ও নতুন পদসৃষ্টির ভয়ানক দরকার। যিনি ব্যক্তিগতভাবে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কাজের জন্য দায়ী থাকবেন। এই প্রস্তাবগুলি কোনটাই কল্পনাপ্রসূত নয়। নিত্যযাত্রীদের থেকে পাওয়া। অনেকগুলো অভিযোগ আর সমস্যা, সেই সংগে কিছু সমাধানের সূত্র জুড় করে দেওয়া হয়েছে এখানে। এ প্রস্তাবগুলো জনস্বার্থে গ্রহণযোগ্য কিনা—সে দায়িত্ব রেলমন্ত্রীর। পূর্বরেলের মোট সাবারবান রেলপথ ৬০২.৬০ কি মি। এরমধ্যে শিয়ালদা স্টেশনের এক্তিয়ারে ৪৮১.০৯ কি মি, পশ্চিম রেলের ৬০.১৫ কি মি, মধ্য রেলের ১৮৫.৬৪ কি মি। রেলসূত্রে পাওয়া খবর শিয়ালদাই সবচেয়ে বড় সাবারবন জোন। এক্ষেত্রে পরীক্ষাটাও শিয়ালদার বিপুল সমস্যাকে সামনে রেখে শুরু করা চলতে পারে।

রেলমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা যায় তিনি এ বছরে কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলায় সাড়ে ন হাজার রেলকর্মী নিয়োগ করতে চান। ঠিক এই সময় প্রস্তাবটাও একটু ভেবে দেখার সুযোগ আছে। রেলকর্মীদের গতানুগতিক চিন্তার হাত [illegible] মুক্ত করাটাই আসলে [illegible]। রেলওয়ে বোরডের [illegible] এটা রেলমন্ত্রী বুঝেছেন। [illegible] লক্ষণ। □

স্বজনপোষণ আর দুর্নীতির জন্য চিত্তরঞ্জন রেল-ইনজিন কারখানার নাভিশ্বাস

বিশ্বদেব ভট্টাচার্য

চিত্তরঞ্জন রেল-ইনজিন কারখানা দেশের গর্ব, জাতির গর্ব। বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম স্বাধীনতা পাওয়ার মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমরা দেশে রেল-ইনজিন তৈরির কাজে নেমেছি। প্রয়াত ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টার ফল চিত্তরঞ্জন। কিন্তু সেই চিত্তরঞ্জনের আজ কী হাল!

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশবন্ধু জায়া বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জন রেল-ইনজিন কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেই বছরেরই ১ নভেম্বর ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ারকসের নামকরণ করেন।

১৯৭৮–৭৯ সালে ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কারখানার আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। ৮৩–৮৪ সালেও শেষ হবে কি না কেউ জানেন না। শুধু যে সময় পিছিয়ে যাচ্ছে তাই নয় খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি টাকায়।

চিত্তরঞ্জনে বিশাল কারখানা তৈরি হল রেল-ইনজিন তৈরির। কিন্তু রিসারচ ও ডেভেলপমেনট-এর পূর্ণাঙ্গ ইউনিট চালু হল না। তেত্রিশ বছর পরও বিদেশ থেকে রেল-ইনজিন আমদানি করার কথা উঠেছে।

৮৬ সালের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার দক্ষ কর্মী অবসর নেবেন। দশ বছর আগে কর্মীদের যে আন্তরিকতা ছিল, নিষ্ঠা ছিল, ঐকান্তিকতা ছিল আজ তার অভাব। আজ অনেক কর্মীর কাজে গাফিলতি, দেরিতে হাজিরা বেড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, কাজ নেই তো বসে থেকে বা লাভ কী?

চিত্তরঞ্জনকে কুরে কুরে খাচ্ছে দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ। বাইরে থেকে ঘরের তালা বন্ধ, ভেতর থেকে একটি জেনারেটর উধাও।

কিন্তু কেন চিত্তরঞ্জনের এই হাল? প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার [illegible] রমনের সঙ্গে কথা বলেছি।

শ্রীরমন জুলাইতে অবসর নিয়েছেন। কথা বলেছি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এস আর দাসের সঙ্গেও।

চিত্তরঞ্জন রেল-ইনজিন কারখানার প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার কে রমনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :

পরিবর্তন : এই কারখানার সম্প্রসারণ হল না কেন?

রমন : চলতি বছরে সম্প্রসারণ হয়নি টাকার অভাবে। তবে আগামী বছরে পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদন করতে রাজি হবেন বলে বিশ্বাস করি।

পরিবর্তন : চিত্তরঞ্জনের ইনজিন বিশ্বের বাজারে কেমন খ্যাতি অর্জন করেছে?

রমন : এশিয়ার বৃহত্তম হলেও এই কারখানার প্রযুক্তিবিদ্যায় আমরা প্রায় তিন পুরুষ পিছিয়ে আছি। সুইজারল্যান্ড অবশ্য রেল-ইনজিন নির্মাণে প্রথম। আমরা তো ইনজিন রপ্তানি করি না, তাই বিশ্ববাজারে এর খ্যাতি কতখানি তার পরিমাপ করতে পারি না।

পরিবর্তন : আমাদের দেশে ইনজিনের অভাব আছে কি?

রমন : এর উত্তর একদিকে হ্যাঁ, অন্যদিকে না বলা যায়। দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে লোকোর উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। সকলেই চায় তাদের উৎপাদন বাড়ুক। কোচ ফ্যাকটরি বলছে টাকা চাই, ডি এল ডবলু বলছে টাকা চাই, আমরা বলছি টাকা চাই......। তাই অভাব থাকলেও তা সব সময় নেতিবাচক নয়। তবে পণ্য পরিবহনকারী ইনজিনের চাহিদা যাত্রী বহনকারী ইনজিনের তুলনায় বেশি।

পরিবর্তন : আপনার কারখানার বার্ষিক উৎপাদন সম্পর্কে কিছু বলুন।

রমন : আমরা ৮০–৮১ বছরে যে উৎপাদন করেছি তার মূল্য ৭১.৬৯ কোটি টাকা, ৮১–৮২ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০ কোটি টাকা, ৮২–৮৩তে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা। তবে কারখানার উৎপাদিত ইনজিন আমরা রেলকে উৎপাদন মূল্যে দিয়ে থাকি। এই কারখানা কর্তৃপক্ষ বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে থাকেন। আমি মনে করি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সামাজিক যে দায়িত্ব আছে তা যদি পালন করা হয় তা হলে লাভের পরিমাণ সামাজিক দায়িত্বে রূপান্তরিত হবে। যা ব্যক্তিগত মালিকানার কারখানায় হয় না।

পরিবর্তন : আপনারা বাষ্পীয় ইনজিন বন্ধ করে শুধু বৈদ্যুতিক ইনজিন ও ডিজেল ইনজিন নির্মাণ করতে চাইছেন কেন?

রমন : মনে রাখতে হবে একদিন কয়লার অভাব আসবে। তাই কয়লার বিকল্প কোন জ্বালানি খুঁজে বার করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা ৩টি বাষ্পীয় ইনজিন যা করতে পারে ১টি ডিজেল বা ১ টি বৈদ্যুতিক ইনজিন তাই করতে পারে। দ্রুত-গতিতে বেশি ওজন বইতে পারে।

পরিবর্তন : বিদেশ থেকে ২০টা ইনজিন আনা হচ্ছে কেন? আমরা কি আমাদের দক্ষতা হারাচ্ছি?

রমন : না, আমরা দক্ষতা হারাচ্ছি না। যদি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইনজিন আনা হয় তাহলে গাড়ির গতিবেগ বাড়ান সম্ভব। আমরা বর্তমানে যে ইনজিনগুলো তৈরি করে থাকি সেগুলো ৩০০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু যে ২০টি ইনজিন আনা হবে তাদের ক্ষমতা ৬০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন। এগুলো অত্যন্ত আধুনিক ধরনের। শুধু গতিবেগ বৃদ্ধিই হবে না, এর ফলে বেশিমাত্রায় মাল বহন করাও সম্ভব। জাপান, জারমানসহ ৫টি দেশ বিশ্ব টেনডারে যোগ দেবে এবং আশা করা যায় ৮৫ সালের শেষ নাগাদ প্রথম লট আমাদের দেশে আসবে। সেগুলো দেখে আমরা পরবর্তীকালে ইনজিন তৈরি করব।

পরিবর্তন : বছরে ওভারটাইম কত দিতে হয়?

রমন : প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আগের তুলনায় এর পরিমাণ অনেক কম। ওভারটাইম কমায় উৎপাদন কমেনি।

শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস আর দাসের সাক্ষাৎকার

পরিবর্তন : এই কারখানার বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] ইউনিয়নের আপনি তো সাধারণ সম্পাদক। আপনার চোখে এখানকার প্রধান সমস্যা কী কী?

দাস : এখানকার সমস্যা দুরকমের। প্রথম, এখানকার জীবনধারায়, দ্বিতীয়টি ইউনিয়নগত। জীবন-ধারণের অন্যতম সমস্যা হল এক-বেলা করে প্রতি কোয়ারটারে জল দেওয়া হয়। ফলে জলের পরিমাণ বেশি হলেও সংরক্ষণ করে রাখার মত কোন ব্যবস্থা নেই। তার উপর যেহেতু এই শহরটি উঁচু নিচু তাই সর্বত্র জল সমানভাবে আসে না। সর্বোপরি দীর্ঘকাল রক্ষণাবেক্ষণ হয় না জলের পাইপ, ভালব ইত্যাদি। এর উপর আছে লোডশেডিং।

আর একটা কথা শুনলে আপনার নিশ্চয় অবাক লাগবে : যে কারখানার বয়স ৩৩ বছর হয়ে গেল সেখানে স্বীকৃত কোন ইউনিয়ন নেই। তাই ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনার স্থানীয় রেকরড থাকলেও দিল্লিতে তা রেকরড হয় না।

পরিবর্তন : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

দাস : এই কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং ঠিকমত নিয়মকানুন মানা হয় না তা সকলেই লক্ষ করে থাকবেন। কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন মাত্রাকে তারা কাজে লাগাতে পেরেছেন। এটা ঠিক নয়। আমরা মনে করি ঐ পরিমাণ হবে শতকরা ৬০ ভাগ। যেভাবে কারখানার জন্য মাল কেনা হয় তার পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। কোটেশন এবং সাপলাই এই দুয়ের মধ্যে যোগসাজশ প্রয়োজন অল্পতম সময়ের ক্ষেত্রে। তার উপর মেটিরিয়েল ওয়েসটেজ, চুরি এসব তো আছেই। সব মিলিয়ে এই বিষয়গুলোর উপর পরিচালকের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন।

পরিবর্তন : শ্রমিকদের অশান্তির মূল কারণ কী?

দাস : ন্যায্য দাবি নিয়ে যখন আমরা যেতাম এবং তা যদি মোটামুটি মানা হত তাহলেই অশান্তি বাড়ত। রেলওয়ে বোরডের অরডার পর্যন্ত মানা হত না। তবে এই দাবিগুলো ছিল অর্থনৈতিক। আজও যে ঠিকমত সব অরডার মানা হচ্ছে এটাও ঠিক নয়। ◻

পরিবর্তন ২৪ আগস্ট ১৯৮৩

বিশেষ রচনা

নিরাপত্তার আধুনিকতম ব্যবস্থা হলে আর রেল দুর্ঘটনা ঘটবেই না

সিতাংশু শেখর ঘোষ

সাম্প্রতিককালে রেলের বড় বড় দুর্ঘটনার মর্মন্তুদ বিবরণ শোনার সময় একটা প্রশ্ন সকলকে নাড়া দিয়েছে - এত দুর্ঘটনা ঘটছে কেন - এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যে ভারতীয় রেলে কী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে বা থাকলেও আরও কত কী করা দরকার?

সাধারণভাবে দেখলে, তিন রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। চলন্ত অবস্থায় লাইনচ্যুতি, দুটি ট্রেনের মধ্যে মুখোমুখি বা সামনে পেছনে সংঘর্ষ আর প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। বেশির ভাগ ট্রেনকে এদেশে সুসংবদ্ধ 'রাস্তাবন্ধ' নীতির নিয়মে চালান হয় যদিও খুব ঘন ঘন ট্রেন চলাচলের অঞ্চলে যেমন, শহরতলি পরিসীমায়, ট্রেনগুলো চলে স্বয়ংক্রিয় প্রথার অনুশাসনে। 'রাস্তাবন্ধ' প্রণালীতে ধরে নেওয়া হয় ক ও খ দুটি স্টেশনের মধ্যের লাইনে কারোর প্রবেশাধিকার নেই, কেবল ওই দুজনের পরস্পরের সম্মতি ও সহযোগিতায় যদি খ স্টেশন নির্দিষ্ট পন্থায় বিধিসম্মত অনুমতি দেয় তবেই ক স্টেশন থেকে খ এর দিকে গাড়ি ছাড়তে পারা যাবে। অতএব এক সংগে লাইনের একই অনুভাগে যদি দুটি ট্রেন না ঢুকতে পারে তাহলে ধাক্কাধাক্কির প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া লাইন ক্লিয়ার দেবার যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈরি, যাতে কেউ ইচ্ছে করে বা ভুল করেও একসংগে দুদিক থেকে দুটি ট্রেনকে ছাড়বার অনুমতি না দিতে পারে। এই হিসেবে হাওড়া থেকে দিললি যদি একটি কপাট-বন্ধ অনুভাগ ধরা হয় তো একটি ট্রেন হাওড়া থেকে ছেড়ে দিললি পৌঁছে রাস্তা খালি করে না দিলে পরের ট্রেনটিকে হাওড়া থেকে ছাড়া চলবে না। কিন্তু তা হলে তো তিন দিন পরে পরে একটি করে ট্রেন ছাড়তে হয়। মানুষের সার্বিক প্রয়োজন জনপদের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনার পর, সেইজন্যে এই দীর্ঘ পথকে ছোট ছোট ৮/১০ কিলোমিটারের অংশে ভাগ করে এক একটি স্টেশন বসান হয় যেগুলোর প্রাথমিক কাজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রবেশ পথের কপাট বিধি অনুযায়ী খোলা আর বন্ধ করা। কিন্তু একটি ট্রেন মনে করুন, বারাকপুরে আনিয়ে দাঁড় করান হল আর তারপর যথাবিহিত অনুমতি নিয়ে আর একটি ট্রেনকে টিটাগড় থেকে ছাড়া হল। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ট্রেনটি তো বারাকপুর স্টেশনের ভেতরে দাঁড়ান ওই প্রথম ট্রেনটিকে ধাক্কা মারতে পারে। এরকম বিপর্যয় যাতে না হতে পারে সেইজন্যে প্রত্যেক স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের সবটা নানান ধরনের সদাসতর্ক সিগন্যালের প্রহরায় রাখা হয়। অতএব দুর্ঘটনা এড়ানর সংগে সামঞ্জস্য রেখে ট্রেনের অগ্রগতি বা গতিবেগ যাতে সঠিক নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্যে সিগন্যালের গুরুত্ব সব থেকে বেশি। সিগন্যাল যেমন স্টেশনের চত্বরসীমার ভেতরে নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে, তেমন দুটি স্টেশনের মাঝখানেও চলমান ট্রেনকে সুরক্ষিত করে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া-নিবদ্ধ অনুমতি দেওয়া-নেওয়ার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। অতএব সিগন্যালের নির্দেশ যথাযথ মানলে সংঘর্ষ জনিত দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে না। তা ছাড়া আধুনিকতম উন্নতির কৃপায় সিগন্যাল প্রযুক্তি কতটা সুসংবদ্ধ হয়ে বর্তমানে নির্ভর যোগ্যতার কোন মানে পৌঁছেছে সে সম্বন্ধে কারোর তেমন ধারণাও নেই। খালি চোখে দেখা যায় যে, কেবিনম্যান লিভার টানলেই সিগন্যাল ডাউন হয় বা রং বদলায়। সেই জন্যে অনেকেরই ধারণা যে কেবিনম্যান ভুল করে বেঠিক লিভার টানলেই ভুল সিগন্যাল, ভুল সংকেত দেবে আর দুটি গাড়ি তৎক্ষণাৎ নড়ে যাবে। এটা একেবারেই অসম্ভব ও অমূলক। কেবিনম্যানের পক্ষে যা ইচ্ছে তাই লিভার টানা কোন মতেই সম্ভব নয় কেননা 'ইনটারলকিং' প্রক্রিয়ার জন্য সঠিক বিন্যাস অনুক্রম না মেনে লিভার টানলে কোনটাকেই এতটুকু নড়ান যাবে না।

নিরাপত্তার সংগে সংগতি রেখে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ান আর তার সংগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গতিবেগকে দ্রুততর করার ব্যাপারে সিগন্যালিং-এর বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। তাই আধুনিক কারিগরি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে টোকেনহীন লাইন ক্লিয়ার যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং, অ্যাবসলুট পারমিসিভ ব্লক, মধ্যবর্তী ব্লক পদ্ধতি, রুট রিলে/প্যানেল ইনটারলকিং প্রভৃতি উন্নত প্রকরণগুলি আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব প্রসারিত করা হচ্ছে। এদের ভেতরে আবার রুট রিলে ইনটারলকিং এবং ট্র্যাক সারকিটের ওপর সাম্প্রতিককালে খুব জোর দেওয়া হচ্ছে।

হাওড়া, শিয়ালদা, দিললি প্রভৃতি বড় বড় কর্মব্যস্ত স্টেশনের মত পরিবহনের সমস্যাপীড়িত সব স্টেশনে আজকাল রুট রিলে পদ্ধতির প্রবর্তন করা হচ্ছে, কেননা এই ব্যবস্থায় একই স্টেশনে ছড়িয়ে থাকা পাঁচ ছটি কেবিনের বদলে একটি মাত্র কেবিনের বৈদ্যুতিক প্যানেল বোরডের ওপর মাত্র দুটি বোতাম টিপে মুহূর্তের মধ্যে পয়েনট সেট হয়ে লাইন বানিয়ে সিগন্যাল পর্যন্ত যথাযথ সংকেত জানিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া দশ জনের বদলে এক জনের হাতে ভাবনা-চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব এবং সুবিধে দেওয়া থাকে বলে ভুলভ্রান্তির প্রায় কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

আশার কথা, বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম দান হিসেবে যে স্বয়ংক্রিয় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করা শুরু হয়েছে তার ফলে ড্রাইভাররা ভুল করে সিগন্যালের লাল সংকেত না মেনে এগোতে চাইলেও গাড়ি নিজে থেকেই থেমে যাবে। যদিও প্রয়োজনমত অর্থের অনটন থাকবেই, তবু যেদিন এই ব্যবস্থা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার এবং শহরতলির লাইনে বসান যাবে তখন যে ট্রেন দুর্ঘটনা প্রায় গল্প-কথায় দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সংগে যদি কর্মীদের নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে পঠন-পাঠন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারগুলোকে জোরদার করা যায় তা হলে তো আর ট্রেনে চড়ে কোন দুশ্চিন্তার কারণই থাকবে না। □

মেয়েরা কেমন বন্ধু চায়?

বিনতা সাহা

ছেলেটির পরনে লাল শারট। জিনের প্যানট চোখে সান গ্লাস। মাথায় চামড়ার টুপি। আর বুক খোলা শারটের ভিতর থেকে উঁকি মারছে রূপোর চেনের সংগে মস্ত বড় একটি লকেট। ঝড়ের বেগে মোটরবাইক চালিয়ে একটি চলমান বিদ্যুতের মত চলে গেল ছেলেটি। দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, একজন বলল চমৎকার। অন্যজন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল যাচ্ছেতাই। পরে কিন্তু জানা গেল সেই যাচ্ছেতাই বলা মেয়েটিই ঠিক ঐরকম একটি ছেলের গলায় মালা দিয়েছে এবং প্রথমজন জীবন সংগী হিসাবে বেছে নিয়েছে এক ভাবুক কবিকে। এরপরও কি ঋষি বাক্য স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি তবে অভিযোগটা মেয়েদেরই বেশি শুনতে হয়।

'আসলে কি জানেন, মেয়েদের জীবনটাই বড় আশ্চর্যের' বললেন সদ্যবিবাহিতা পাঞ্জাবি মেয়ে দম দমের দীপা টানডন। বিয়ের আগে ছেলেদের সংগে একেবারেই মিশিনি। কিন্তু সব মেয়েরই কিছু না কিছু ছবি মনে মনে এঁকে থাকে, তারপর যাদের কল্পনা বাস্তবের সংগে মিশে যায় তারা তো সৌভাগ্যবতী। দীপা তার স্বামীকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে করে এবং যথার্থ বন্ধুত্বের মাপকাঠি রূপে প্রধান যে জিনিসটাকে দীপা মূল্য দেয় সেটি হল পারস্পরিক বিশ্বাস। 'স্বামীই হোক আর অন্য কেউই হোক সে যদি সহানুভূতি দিয়ে

মনে না পড়ে পারে?

সত্যি মেয়েরা কীরকম সংগী চায়? প্রত্যেকেরই নিশ্চয় নিজস্ব কিছু না কিছু পছন্দ আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই তো পরমবন্ধু রূপে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাদের জীবনের সংগী খুঁজে চলেছে। এই খোঁজার মধ্যে ভুলভ্রান্তি কেউ করে না তা নয়, ভুল ছেলেরাও করে মেয়েরাও করে

অপরের সমস্যাগুলি বিচার করতে না পারে তাহলে সে কখনই বন্ধু হতে পারে না।'

সুমিতা সাহা, প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যের ছাত্রী। খুব সপ্রতিভ ভাবে বলল 'বন্ধু অনেক আছে কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর সন্ধান এখনও পাইনি। এমন একজন কাউকে আমি চাই যে সৎ হবে, হৃদয়বান হবে, মদ খাবে না, বেশি ধনী হবে না এবং অবশ্যই শিক্ষিত হবে।'

তাহলে তো কুমোরটুলীতে অর্ডার দিতে হয়। আমার কথার উত্তরে ঝকঝকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল 'তা অবশ্য ঠিক, তবে পেয়েও তো যেতে পারি।' একটা কথা সুমিতা অকপটে স্বীকার করল যে মেয়েদের থেকে ছেলেদের মন অনেক বেশি পরিষ্কার। ওরা অহেতুক ঈর্ষায় ভোগে না।

কত রকমের মানসিকতা যে আছে সেটি ওপর থেকে চোখ বুলিয়ে ধরা যায় না। রূপে তোমায় ভোলাব না এই মানসিকতা যেমন আছে আবার রূপ লাগি, আঁখি, ঝুরে সেই মনোভাবও আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি মেয়ে জোর গলায় বলেছিল 'আমি একটি বেকার ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু অসুন্দরকে নয়, তাকে দেখতে সুন্দর হতেই হবে। একজন আধুনিকা শিক্ষিতার মুখে এ কথা, ভাবা যায়?

কথা হচ্ছিল নিজজাফর এম এ পাইকপাড়ার শর্মিষ্ঠা সরকারের সংগে। সে তার মনের মত বন্ধু খুঁজে পেয়েছে। খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল 'আমি বিশ্বাস করি জীবন সংগী সেই হবে যার সংগে একটি মানসিক সেতু রচনা সম্ভব, যার উপর নির্ভর করা যায়।' শর্মিষ্ঠা তার বন্ধু ও ভাবী স্বামীর কথা বলতে গিয়ে দু একটি ঘটনার উল্লেখ করল, 'ছোটবেলা থেকেই আমার সেতার শেখার খুব সখ ছিল, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। শত ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠিনি। ও আমাকে এখন জোর করে সেতারের ক্লাসে ভর্তি করেছে। আমার ইচ্ছার প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি সে খুবই মর্যাদা দেয়। নাহলে হয়ত আমাদের এই গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠত না।'

স্বামী কি সত্যিই বন্ধু হতে পারে বা বন্ধু যখন স্বামীতে রূপ পায় তখনও কি তার মধ্যে একজন যথার্থ বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়? এই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। আসলে সামাজিক পরিবেশের চাপে স্বামীর মধ্যে কর্তৃত্ব ও অধিকারের ভঙ্গিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই যারা নিটোল বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু। গভীর দুটি চোখ তুলে মিনতি রায়চৌধুরী

দীপা টানডন

সুমিতা সাহা

শর্মিষ্ঠা সরকার

জানালেন, 'আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছি, দুজনেই পছন্দ করতাম ঝকঝকে প্রাণবন্ত জীবন তাই মনের মিল হয়েছিল সহজেই। যদি জিজ্ঞাসা করেন আজ আমি সুখী কিনা তাহলে বলব অবশ্যই আমি সুখী। আমার প্রতি তার সচেতনতা, শুভেচ্ছা এ তটুকুও কম নেই, সেদিক থেকে তিনি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।' একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু নিজের

অনুরাধা সেন

জগতে, নিজের কাজে তিনি এত বেশি মগ্ন হয়ে থাকেন যে, মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অসহায় লাগে।'

সবার অলক্ষ্যে কি ব্যক্তিত্বময়ী মিনতি দেবীর একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস পড়ল ?'নিঃসংগ সময়গুলোতে এক-জন বন্ধুর অভাব ভীষণভাবে মনে হয়। যে আমাকে বুঝবে, যার কাছে মন খুলে কিছু কথা বলা যাবে এবং যে আমার দুর্বলতার কোন সুযোগ নেবে না।'

সব মেয়েদেরই 'কিন্তু একটি প্রধান বৈশিষ্ট তারা নিরাপত্তা চায়। নিতান্ত অর্বাচীন ছাড়া সিনেমার নায়কের মত কাউকে দেখে চট করে কোনও মেয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয় না। দিলেও অভিভাবকদের মগজ ধোলাই দ্রুত কাজ করবে। একটি মেয়ে একবার একজন ফেরিওয়ালা যুবকের সংগে নতুন জীবনের সন্ধানে অগস্ত্য যাত্রা করে (হয়ত যুবকটির প্রেমে ঘাটতি ছিল না)। পরে মেয়েটির বাড়ির লোকরা তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে অনেক বোঝায়।মেয়েটিও সব বুঝে আবার পড়াশোনায় মন দেয় এবং যত তাড়াতাড়ি যুবকটিকে মন দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি সেটি ফিরিয়ে আনে।

এই প্রসংগটি তুলতেই অনুরাধা সেন তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন 'নিরাপত্তা বলতে যদি শুধু অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তার কথা মনে করেন তাহলে ভীষণ ভুল করবেন। মেয়েরা আসলে ছেলেদের মধ্যে যেটি দেখতে চায় সেটি হল দায়িত্ববোধ আর

চন্দনা রায়

সততা। এ দুটো যার মধ্যে মেয়েরা পায় তাকেই সত্যি বন্ধু বলে মনে করে।' অনুরাধা সেনের অভিমত মিথ্যে নয়। যতই ধনী হোক, ঝকমকে পোশাক পরুক, অন্তঃসার শূন্য ছেলেদের কিন্তু মেয়েরা বেশি প্রশ্রয় দেয় না।

অর্থনৈতিক দিকটি না দেখলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি মেয়েরা কতটা নজর দেয় ? কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা কতটা সচেতন ? দক্ষিণ কলকাতার চন্দনা রায় মনে করেন এ ব্যাপারটি খুবই আপেক্ষিক। 'বন্ধু বাছার সময় আমি আগে দেখব সে আমার সংগে সমতালে চলতে পারবে কিনা। অসম বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। স্ট্যাটাস বলতেও বিরাট একটা কিছু হোমড়াচোমড়া হতে হবে তা নয় তবে যার ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করবে না তাকে আমার বন্ধু বলেও গ্রহণ করতে পারব না।' না, কবি টবি চন্দনার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু সুনন্দ মিত্র খুজছেন একটি যথার্থ সংস্কৃতিমনা মানুষকে। সে গরিব হোক আপত্তি নেই, বাহ্যিক সৌন্দর্য তাকে আকর্ষণ করে, না বন্ধু হিসাবে সংগী হিসাবে তিনি চান একটি শিল্পী মনকে। দীপা, সুমিতা, শর্মিষ্ঠা, চন্দনাদের হৃদয়সমুদ্র খুঁজে এই ঝিনুকগুলিরই সন্ধান পাওয়া গেল। জানি না তাদের অন্তরে প্রিয়তম বন্ধু বলতে আরও কোন গভীর ইচ্ছা বা পছন্দ রয়েছে কিনা। এ প্রসংগে দীপা ট্যানডনেরই উক্তিটি আকর্ষণীয় ও মনে রাখার মত 'কভি কভি দিলকি বাত দিলমেই রাখনা পড়তা।' □

আলোকচিত্র :
লেখিকা কর্তৃক সংগৃহীত

মানেকার কাকার মৃত্যু : হত্যা না আত্মহত্যা ?

ভি কুমার

মানেকা গান্ধীর কাকা এবং বরডার সিকিউরিটি ফোরসের ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল জে এস আনন্দের মৃত্যুকে ঘিরে জল এখন অনেকটা ঘোলা হয়েছে। ভারতের সবকটা সংবাদপত্রে আনন্দের এই মৃত্যুসংবাদ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে এ বিষয়ে বিভিন্নরকম প্রশ্নও উঠেছে। কেউ আনন্দের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলতে চাইছেন, কেউ বলছেন এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। তবু আনন্দের মৃত্যুকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে। যার ফলে প্রথম একবার পোসট মরটেম হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার আবার পোসট মরটেম রিপোরট তৈরি করতে হয়েছে। প্রথম পোসট মরটেমে অবশ্য আনন্দের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলা হয়েছিল। কিন্তু সন্দেহের বাতাস ভারী হয়ে ওঠার ফলেই দ্বিতীয়বার পোসট মরটেম রিপোরট তৈরি করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কোন মৃত্যুকে নিয়ে এত গুঞ্জনের বোধহয় জন্ম হয়নি। অবশ্য এর যথেষ্ট কারণও আছে। আনন্দের মৃত্যু সম্পর্কে কখনই কোন স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়নি। বরং পরস্পর বিরোধী সব সূত্র এবং মন্তব্য পুরো ব্যাপারটাকে রহস্যজনক করে তুলেছে। আর এই রহস্যকে আরও জটিল করেছেন স্বয়ং শ্রীমতী মানেকা গান্ধী। তিনি বলেছেন তার কাকার মৃত্যুর পিছনে পুরোপুরি রাজনৈতিক কারণ আছে।

পুরো ঘটনাটিকে একটু খতিয়ে দেখা যাক। জে এস আনন্দকে গত ১৩ জুলাই চণ্ডীগড়ের সুখনা লেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মাত্র একটি শারট ছাড়া তার পরনে আর কিছু ছিল না। আনন্দ ছিলেন পাঞ্জাবের সব থেকে প্রবীণ ডি আই জি। তিনি যোধপুরের বি এস এফ কম্যানডানট হিসেবে কাজ করছিলেন। আনন্দ যোধপুরে বদলি হয়ে যাওয়ার পরও তার পরিবারবর্গ চণ্ডীগড়ে থেকে গিয়েছিলেন। আনন্দ যোধপুরে তার বড় ভাই, একজন সেনাবাহিনীর ডাক্তার, সি এস আনন্দ এর সঙ্গে থাকতেন। যতটুকু জানা গেছে গত জুলাই মাসে আনন্দ তার পরিবারবর্গের সংগে দেখা করার জন্যই চণ্ডীগড়ে এসেছিলেন।

১৩ জুলাই সকাল ৭টার সময় আনন্দের মৃতদেহটি একজন কনসটেবল লেকের জলে ভাসতে দেখে। তার সারা শরীরে শুধুমাত্র পরনের শারটটুকু ছাড়া আর কোনরকম আচ্ছাদনই ছিল না। পুলিশ তার শারটের পকেট থেকে ৭৬৭ টাকা এবং ববখাস্ত পুলিস কর্মীদের একটি তালিকা পায়। কিন্তু আনন্দের মৃতদেহের কাছ থেকে বা তার বাড়ি থেকে কোনরকম আত্মহত্যাকালীন জবানবন্দী পুলিশ খুঁজে পায়নি। আনন্দের মৃতদেহ যখন সুখনা লেকে ভাসতে দেখা যায়, তার ঠিক আধঘন্টা আগে আনন্দের স্ত্রী ইন্দুকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি নাকি অতিমাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

ঘটনার সূত্র ধরে জানা যায় আগের দিন রাতে আনন্দ এবং তার স্ত্রীর ভেতর একটু ঝগড়াঝাটিও হয়েছিল। আগের দিন রাতে, অর্থাৎ ১২ জুলাই, আনন্দ, তার স্ত্রী ইন্দু, ছেলে নিক্কি এবং ভাইপো স্যানডিকে নিয়ে তার পুরনো প্রতিবেশী করনেল গুর্দিবেড়িয়ার বাড়িতে বেড়াতে যান। রাত প্রায় সোয়া এগারটা নাগাদ আনন্দ পরিবার তাদের বাড়িতে ফেরেন। এর পরই নাকি স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়াঝাটি হয় এবং একে কেন্দ্র করেই রাত সাড়ে বারটা নাগাদ আনন্দ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান। নিক্কি এবং স্যানডি আনন্দকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার পেছন পেছন যায়। আনন্দ সেইসময় তাদের বলেন যে তিনি একটু পায়চারি করার জন্য বেরোচ্ছেন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতরই ফিরে আসবেন। কিন্তু তারা তবু গলফ ক্লাব অবধি তার পেছন পেছন যায়। গলফ ক্লাবের কাছে পৌঁছে নিক্কি এবং স্যানডি দুজনই বাড়িতে শ্রীমতী আনন্দকে ফোন করার জন্য ক্লাবের ভেতরে ঢোকে। আনন্দ তখন বাইরেই ছিলেন। কিন্তু ফোন করে এসে তারা আর আনন্দকে দেখতে পায়নি। তারা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাড়িতে ফিরে আসে এবং তাদের প্রতিবেশীর থেকে একটি স্কুটার নিয়ে আবার আনন্দকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সারারাত খোঁজাখুঁজি করেও তারা আনন্দকে কোথাও পায়নি বরং ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে এসে তারা শ্রীমতী আনন্দকে অচেতনা অবস্থায় দেখতে পান।

প্রাথমিক পোসট মরটেম রিপোরটে বলা হয়েছে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই আনন্দের মৃত্যু ঘটেছে। দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। এই রিপোরটকে ভিত্তি করেই পুলিশ একে 'আত্মহত্যার ঘটনা' বলে বর্ণনা করে।

কিন্তু পুলিশ যখনই আনন্দের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত শুরু করল, তখনই আরও নানারকম রোমাঞ্চকর তথ্য তাদের হাতে এল। এছাড়া আনন্দ পরিবারের লোকদের দেওয়া জবানবন্দীর ভেতরও পরস্পর বিরোধী নানারকম কথাবার্তা এবং অসংগতি ধরা পড়ল। আনন্দ পরিবারের লোকদের রহস্যজনক আচরণ এবং এড়িয়ে চলার প্রবণতাও পুলিশকে তাদের প্রতি কিছুটা সন্দেহজনক করে তুলল। ফলে পুলিশের মনেও ধারণা জন্মাল যে এটা নিছক 'আত্মহত্যা'র ঘটনা নয়। তাই তারা নতুনভাবে তদন্ত শুরু করল। আনন্দ পরিবারের লোকজনরাও অবশ্য এর আগে বলছিল এটা আত্মহত্যার ঘটনা নয়। এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। এইসব ঘটনাকে ভিত্তি করেই পুলিশ দ্বিতীয়বার পোসট মরটেম রিপোরট তৈরি করল।

এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশকে যেটা সব থেকে ভাবিয়ে তুলল তা হল শ্রীমতী আনন্দের দেওয়া একটি চমকপ্রদ তথ্য। শ্রীমতী আনন্দ পুলিশকে বলেছিলেন যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে আনন্দের কাছে একটি ফোন আসে। কিন্তু কে কী বিষয়ে ফোন করেছিল তা আনন্দ বাড়ির কাউকেই জানান না। পুলিশও এখন পর্যন্ত এই রহস্যজনক ফোনটি কে করেছিল তা উদ্ধার করতে পারেনি। আগের

অবৈধ সম্পর্কের পরিণতিতেই কি আনন্দের মৃত্যু ?

কোন অবৈধ সম্পর্কের পরিণতিতেই কি জে এস আনন্দের এই রহস্যজনক মৃত্যু ? সি বি আই-এর যেসব অফিসার আনন্দ হত্যার তদন্ত করছেন তারা এই সন্দেহকে একেবারে মনগড়া বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। কয়েকটি সূত্র ধরে তারা এদিক দিয়েও তদন্ত করছেন। তারা এ বিষয়ে কতকগুলো চমকপ্রদ তথ্যও পেয়েছেন। তারা নাকি জানতে পেরেছেন চণ্ডীগড়ে তিন জন উচ্চবিত্ত মহিলার সংগে আনন্দের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঐ মহিলাদের ভেতর একজন নাকি আবার হরিয়ানার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার পুত্রবধূ। এরকম তথ্য পেয়ে সি বি আই-ও একটু চিন্তায় পড়েছে। কারণ ভবিষ্যতে তদন্ত আরও এগোলে এটা হয়ত একটা 'রাজনৈতিক কেচ্ছা'র রূপ ও নিতে পারে। সি এম সোম, ডি আই জি, সি বি আই যিনি এই তদন্ত পরিচালনা করছিলেন তিনি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করানর জন্য দিল্লি চলে গেছেন। এখন দেখার বিষয় সত্যি সত্যিই যদি এরকম কোন কেলেংকারি আনন্দের হত্যার পিছনে কারণ হিসেবে থাকে, তাহলে তাকে জনসমক্ষে সি বি আই তুলে ধরে কিনা।

দিন রাতে যে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল এ কথাটিও শ্রীমতী আনন্দ অস্বীকার করেন। অথচ আনন্দের প্রতিবেশীরা পুলিশের কাছে জানিয়েছেন গত রাতে শ্রীমতী আনন্দের সংগে তার স্বামীর প্রচণ্ড ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। শ্রীমতী আনন্দের কথায় আরও কিছু অসংগতিও ধরা পড়ে। তিনি পুলিশকে বলেছেন যে তার স্বামী নিক্কি এবং স্যানডিকে নিয়ে বেড়াতে যান। কিন্তু তার আগে নিক্কি এবং স্যানডি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে তারা আনন্দকে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনবার জন্যই পেছন পেছন গিয়েছিল। পুলিশের কাছে শ্রীমতী আনন্দের আর একটি মন্তব্যও অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। শ্রীমতী আনন্দ বলেছেন তিনি ঐ মাঝরাতে তার বোনের বাড়িতে এক কাপ কফি খাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ এই কথা কোনমতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। শ্রীমতী আনন্দ পুলিশকে জানিয়েছেন বোনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তিনি এক গ্লাশ বিয়ার এবং একটা ঘুমের বড়ি খান। কিন্তু মেডিক্যাল রিপোর্ট তার কথার বিরোধীতাই করেছে।

আনন্দ পরিবারের এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা শুনে পুলিশের ধারণা হয়েছে তারা কোন কিছু গোপন করতে চাইছেন। আনন্দ পরিবারের লোকজনদের পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানয় এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে পুলিশকে এখন বাধ্য হয়ে আনন্দ পরিবারকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার ভয় দেখাতে হচ্ছে।

আনন্দের মৃত্যু রহস্য যখন এর কম জটিল আকার ধারণ করেছে ঠিক সেই সময় তাকে জটিলতর করে তুলেছেন প্রয়াত আনন্দের ভাইঝি শ্রীমতী মানেকা গান্ধী। তিনি চণ্ডীগড়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক খুন। ১৯৭৭ সাল থেকেই নাকি আনন্দকে তার সংগে সম্পর্ক রাখার জন্য নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছিল। আনন্দের মৃত্যুকে পুলিশ যে 'আত্মহত্যার ঘটনা' বলেছিল তাকেও তিনি সরাসরি চ্যালেনজ জানিয়ে বসেছেন। একটি পূর্ণাংগ তদন্তও দাবি করেছেন তিনি। মানেকা বলেছেন, আনন্দের ভাই করনেল সি এস আনন্দ নাকি মৃতের গলায় এবং হাতে আঘাতের চিহ্নও দেখেছেন। কিন্তু মানেকার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যখন এই প্রতিবেদক আনন্দ পরিবারের লোকজনদের সংগে দেখা করেছিলেন, তখন তারা ঐ বিষয়টি অস্বীকার করেন। এমনকি মানেকার মত তারা এটিকে 'রাজনৈতিক হত্যা' বলতেও রাজি নন। আনন্দ পরিবারের বিভিন্ন লোকজনের সংগে কথা বলে এ প্রতিবেদকের এমন ধারণাও হয়েছে যে তাদের সংগে মানেকার পরিবারের সম্পর্ক কখনই খুব একটা ভাল ছিল না।

আনন্দের মৃত্যু রহস্যকে আরও জটিল করে তুলেছে আর একটি বিষয়। তা হল আনন্দের বন্ধু করনেল গুলবেড়িয়ার ফিয়াট গাড়িটি চুরি হওয়া। গুলবেড়িয়ার গাড়িটি এবং আনন্দের গাড়িটি প্রায় একই রকম দেখতে। আনন্দের মৃতদেহ যেদিন পাওয়া যায় সেদিনই চণ্ডীগড় হাসপাতালের সামনে থেকে গুলবেড়িয়ার গাড়িটি চুরি হয়। পুলিশ এখনও পর্যন্ত এই গাড়িটিকে খুঁজে বের করতে পারেনি। এছাড়া পুলিশ আনন্দের জামাকাপড়ও এখনও পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। পুলিশের ধারণা এই হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে আনন্দের মৃত্যুর রহস্য লুকিয়ে আছে। তাদের আরও ধারণা আনন্দ মৃত্যুর আগে কোন জায়গায় গিয়েছিলেন। কোথায় গিয়েছিলেন সেটাই এখন পুলিশ খুঁজে বের করতে চায়।

কতকগুলো সূত্র বিচার করে অবশ্য আনন্দের মৃত্যুকে 'হত্যা' বলেই সন্দেহ হয়। যদি আত্মহত্যা করাই আনন্দের উদ্দেশ্য ছিল তাহলে বাড়ি থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে লেকে যাওয়ার তার কোন দরকার ছিল না। তিনি নিজের রিভলভার দিয়েই আত্মহত্যা করতে পারতেন। তাছাড়া আনন্দ একজন ভাল সাঁতারু ছিলেন। তার পক্ষে লেকের জলে আত্মহত্যা করাও একটা অবাস্তব ঘটনা। এছাড়া মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বাড়ির লোকজনদের সংগে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে পরিকল্পনাও করেছিলেন। কাজেই তিনি যে আত্মহত্যার জন্য তৈরি ছিলেন না এটা বোঝাই যায়। আরেকটি ঘটনাও এখানে লক্ষ্য করার মত। আনন্দের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল মাত্র আড়াই ফুট গভীর জলে। বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী অত কম গভীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাদের ধারণা আনন্দকে অচেতন্য অবস্থায় জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আনন্দ-হত্যার পেছনে সঠিক কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বা এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় পোস্ট মরটেম রিপোর্ট হাতে না পেয়ে পুলিশ এ সম্পর্কে কিছুই বলতে চাইছে না। আনন্দ-হত্যার পেছনে অবশ্য পুলিশ সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোলের কোন সূত্র পায়নি। তবে কোন 'অবৈধ সম্পর্ক'-র ইংগিত পুলিশ একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না।

চণ্ডীগড় পুলিশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেছে। [illegible] ইতিমধ্যে সি বি আই এই হত্যার তদন্তের ভার নিয়েছে। কিন্তু সি বি আই-এর কাঁধে এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার কারণ কী? দেখেশুনে মনে হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চান না আনন্দের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানেকা গান্ধী কোনরকম রাজনৈতিক [illegible] লাভ করুক। এখন শুধু একটাই [illegible] করবার বিষয়। তা হল, সি বি আই কি পারবে আনন্দের মৃত্যু-রহস্যের কিনারা করতে? নাকি [illegible] গান্ধীর বাবার মৃত্যু-রহস্যের [illegible] মানেকার কাকার মৃত্যু রহস্যটিও অতল জলে হারিয়ে যাবে? □

আলোকচিত্র : [illegible]

দ্বিতীয় পোসট মরটেম :
আনন্দের পাকস্থলীতে বিষ

আনন্দ হত্যা রহস্য উন্মোচনের জন্য চণ্ডীগড়ের পোসট গ্র্যাজুয়েট ইনসটিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশনের তিনজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে দ্বিতীয়বার পোসট মরটেম করার জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছিল তার রিপোরটে এটিকে হত্যার ঘটনা বলে সন্দেহ করা হয়েছে। এর আগে প্রথম পোসট মরটেম রিপোরটে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এই দ্বিতীয় পোসট মরটেম রিপোরটে বলেছেন, জলে ডুবে শ্বাসরোধ হওয়ায় আনন্দের মৃত্যু হয়নি। বিষ প্রয়োগের ফলেই আনন্দের শ্বাসরোধ হয়েছিল। তার গলায় এবং পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে বলেও এই রিপোরটে জানান হয়েছে। ভিসেরা রিপোরটে বলা হয়েছে আনন্দের পাকস্থলীতে কীটনাশক বিষাক্ত ওষুধ পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পোসট মরটেম রিপোরটে তাই সন্দেহ করা হয়েছে বিষ প্রয়োগেই আনন্দকে হত্যা করা হয়েছে। এই রিপোরটের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি মারডার কেস রেজিসট্রি করেছে।

জাল ওয়ারেনট দেখিয়ে এশিয়াবাসীরা পশ্চিম জারমানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বনে যাচ্ছেন

বারলিন থেকে অমলেন্দু কুন্ডু

আপনি নেদারল্যানডের মল্লিক-কে ফোন করুন প্যারিস থেকে। ওকে জানান প্যারিসের পুলিশ আর আপনাকে থাকতে দিচ্ছে না। আপনার নতুন আশ্রয় চাই।

মল্লিক আপনাকে ফ্রানসের কোন একটা সীমান্ত শহরে অপেক্ষা করতে বলবে। নির্দিষ্ট সময় আপনি ঠিক স্থানে থাকবেন। দেখবেন এক ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে হাজির। আপনাকে উঠে আসতে বলবে। তারপর গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে পশ্চিম জারমানির দিকে।

আপনার কাছে জারমানিতে ঢোকার কোন ভিসা নেই। এমনকি পাশপোরটটা আপনি ইচ্ছে করেই হারিয়ে ফেলেছেন।

অন্ধকার রাতে জারমান সীমান্তে হাইমে একটা জংগলের রাস্তা দেখিয়ে মল্লিক বলে দেবে, আপনি এই জংগলের মধ্য দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা রাস্তা পাবেন। দেখবেন একটা টেলিফোন বুথ আছে। আপনি ওখানে দাঁড়ান, আমি সীমান্ত চেকপোসট ঘুরে গাড়ি নিয়ে আসছি। ভদ্রলোকের গ্রিন লাইসেনস আছে। ইওরোপের কোথাও যেতে ওনার বাধা নেই। উনি একটু ঘুরে সীমান্ত চেকপোসট হয়ে গাড়ি নিয়ে আপনার কাছে চলে এলেন, তারপর আবার কিছুটা যাওয়া। এরপর উনি আপনাকে একটা ট্যাকসি স্ট্যানডে নামিয়ে দিয়ে বলবেন আপনার গন্তব্যস্থান এসে গেছে। আপনি একটা ট্যাকসি ধরে ৩00 কি মি পরিয়ে কোলান চলে যান। তারপর সোজা থানায় গিয়ে বলবেন, আপনার পাশপোরট হারিয়ে গেছে, আমাকে আশ্রয় দাও এবং ভিসা কারড দাও।

মল্লিকের কাজ এখানেই শেষ। এক দেশ থেকে আর এক দেশে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েই তিনি মুক্ত। কাজ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে আপনি এক হাজার মারক দিয়ে দিন। মল্লিক আপনাকে সানুনয়ে জানাবে, 'ভবিষ্যতে কোনরকম দরকার হলে আমি আছি।' এবার আপনার কাজ শুরু। আপনি একটা ট্যাকসি ডাকবেন। তারপর যেখানে যেতে চান বলবেন। ওরা আপত্তি করবে না। এমনকি অতিরিক্ত পয়সাও চাইবে না।

ইতিমধ্যে আপনি আপনার ব্রীফ-কেস দেখে নিন। থানায় কী কী দিতে হবে। উকিলের কী কী কাগজ লাগবে, যেহেতু আপনি রাজনৈতিক আশ্রয় চান, সেহেতু আপনার একটা ডকুমেনট চাই, আপনার দেশে শাসকরা আপনার বিরুদ্ধে। কোন চিন্তা নেই আপনার কারণ ইতিমধ্যে প্যারিসে আপনি কলকাতা বা ঢাকা হাই কোরটের অথবা কোন জেলা মুনসেফ কোরটের একটা জাল রাবার স্ট্যামপ করিয়ে নিয়েছেন। সেই সংগে একটা নকল কোরট পেপার। ওটা আপনি দেশ থেকেই সংগে এনেছেন। সব ঠিক মতন হলে আপনার রাজনৈতিক আশ্রয় কে আটকায়। ভোরের দিকে আপনি ধরুন কোলন শহরে পৌঁছে গেছেন। ট্যাকসিওলাকে ২00 মারকের বিল চুকিয়ে ছেড়ে দিলেন। এরপর সোজা একটা টেলিফোন বুথে চলে যান, স্থানীয় পুলিশথানার নম্বর জানতে অথবা হাঁটতে হাঁটতে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিন।

থানায় পৌঁছে আপনি ভাঙা ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিন, পাশপোরট হারিয়ে গেছে, দেশে আপনার বিরুদ্ধে হুলিয়া বেরিয়েছে, গ্রেপ্তারি পরোয়ানার। অতএব আপনি আশ্রয় চান, ভিসা চান।

পুলিশ খুব তৎপর হয়ে উঠবে, বড়বাবু ছোটবাবু, এ দপ্তরে ও দপ্তরে ফোন করে শেষে আপনাকে একটা ভিসা কারড দেবে। সেই সংগে আপনার থাকার ব্যবস্থা করবে কোন হোটেলে। তারপর সেখানে আপনাকে নিয়ে গিয়ে হাতে কিছু জলপানি দিয়ে থাকতে বলবে, খাওয়াও ওখানে।

ইতিমধ্যে আপনি একজন উকিল জোগাড় করেছেন ১00 মারক ফি দিয়ে। তাকে আপনি আপনার পাশ-পোরট হারানর গল্প, সেই সংগে কেন আপনি দেশ ছেড়েছেন আর উদ্দেশ্য কোনরকমে লিখে দিলেন, সংগে অবশ্য নকল হুলিয়াটাও দিলেন। অদ্ভুত আপনার বুদ্ধিমত্তা, আপনার আদালতের হুলিয়াটা এত নিখুঁত, এত স্পষ্ট কোরটের জলছাপ যে, কোন জারমান সেটা ধরে! উকিল পরদিনই আদালতে আপনার কেসটা ফাইল করে সানুনয়ে বিচার-ককে আবেদন করলেন 'মান্যবর বিচারপতি, এ লোকটার জীবন সংকট। যদি আপনি একে আশ্রয় না দেন তাহলে এর দেশের শাসক গোষ্ঠী একে হয় গ্রেপ্তার করবে, নয়ত গুলি করে হত্যা করবে। আমরা জারমানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিবেকসম্পন্ন মানুষ, একটা লোক বিপন্ন জেনেও তাকে কী করে আশ্রয় না দিয়ে পারি। আপনি তো জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসি অরাজকতার সময় পৃথিবীর কত দেশ আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। এশিয়ার মহান দেশ ভারত, পাকি-স্তান, শ্রীলংকা আমাদের মানুষদের বিনা দ্বিধায় আশ্রয় দিয়েছিল, তাই জারমানি যখন যুদ্ধোত্তর দেশ গড়ার সংকল্প নেয়, তখন তাদের ঘোষিত নীতিই ছিল পৃথিবীর যে কোন অত্যাচারিত মানুষ যদি আশ্রয় চায়, তাহলে তাদের জন্য আমাদের দ্বার অবারিত। হে মান্যবর বিচারপতি, আপনিই বিচার করুন, এই লোক-টিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা?'

আদালত একটু পরেই রায় দিল, যদি এই ব্যক্তি সত্যিকারের রাজ-নৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়, তাহলে তাকে সসম্মানে আশ্রয় দেওয়া হোক। তবে ইতিমধ্যে পুলিশ অনুসন্ধান করে খবর দিক লোকটা প্রকৃত আশ্রয় পাবার যোগ্য কিনা।

ব্যাস, আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের অভিনয় শেষ, এরপর আপনি তো জারমান জামাই। পুলিশ আপনার খোঁজ খবর নেবে, দেশে জানতে পাঠাবে আপনি সত্যি বিপন্ন কিনা। সন্দেহ হলে একজন সাংবাদিককে সংগে দিয়ে পুলিশ পাঠাবে আপনার গ্রামে, কিন্তু ততক্ষণে ৪/৫টি বছর কেটে যাবে, এবং ততদিনে আপনি হয়ত লক্ষ-পতি হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন।

অবশ্য সবটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে। যদি ঘুঁটির চাল ঠিক থাকে, তাহলে আপনি রাজা, না হলে হাজতবাস।

আদালতের রায়ের পর আপনাকে পুলিশ দু তিনটে কারড দেবে। একটা আপনার ভিসা কারড। একটা মেডিকেল বেনিফিট কারড। আর একটা মাসোহারা নেবার কারড।

আদালত থেকে হোটেলে যাবার পথেই আপনাকে আগের ২৪০

মারক মাসোহারা দিয়ে বলা হবে, আপনার জন্য সব ঠিক করা হচ্ছে। যতদিন না তা হচ্ছে আপনি এই হোটেলেই থাকবেন খাবেন। শুধু দুটো অনুরোধ, সপ্তাহে একবার থানায় মুখ দেখিয়ে যাবেন, আর এ শহর থেকে অন্য শহরে যেতে পারবেন না। আরও একটা নিষেধাজ্ঞা আছে, সেটা হলো আপনি কোথাও কোন কাজ করতে পারবেন না।

আইনত বাধা থাকলেও আপনি কিন্তু কাজের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদিও একবছর আপনার কাজ করতে বাধা। এবং খাওয়া পরার চিন্তা নেই। তবু পয়সা করতে এসে এক বছর সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব বেআইনি কাজ সংগ্রহের চেষ্টা করুন, যদি কিছু পয়সা আসে। কিন্তু খুব সাবধান, সরকারি চাকরির দিকে যাবেন না। দেখুন না কোন হোটেলে বা দোকানে চাকরি জুটে যায় কিনা। চেষ্টা করতে করতে পেয়েও গেলেন।

এবার সরকারি মাসোহারা ছাড়াও আপনার হাতে টাকা আসতে শুরু করেছে। আপনার লাভ বিনাপয়সায় সুস্বাদু খাবার পানীয়। অবশ্য হোটেলে আপনি ভালই খাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে আপনার একবছর কেটে গেল, আদালত বা পুলিশের কোন উচ্চবাচ্য নেই। হঠাৎ একদিন শুনলেন, আপনার পোলার হাউস বা হাইমে জায়গা হয়েছে। আপনি স্বর্গ পেলেন হাতে। সুন্দর আয়োজন। রান্নাঘর বাথরুম ফারনিচার রয়েছে। এমনকি গরম জল ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা রয়েছে, ঘরে সফেদ বিছানা, লেপ কম্বল, ঘর গরম করার ব্যবস্থা মায় ফ্রিজ পর্যন্ত।

একবছর হয়ে গেছে, এবার পুলিশ আপনার চাকরির চেষ্টা করবে। তারা খোঁজ খবর নেবে কোথায় কাজের লোকের দরকার। এতদিনে আপনি আইনত চাকরি করতে পারেন। আপনি নিয়োগকারীকে জানালেন, বেতন বাড়াও, বড্ড কম। ইতিমধ্যে আপনি কাজে পটুতা দেখিয়েছেন। তার থেকে বড় কথা জারমান ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছেন। আপনার বেতন ঘণ্টায় ৬ থেকে বেড়ে ১৫ হয়ে গেল। দিনে ৫ ঘণ্টা কাজ। অর্থাৎ ৭৫ মারক দিনে রোজগার। সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ।

আমি একজন বাংলাদেশীকে জানি যিনি ৭৭ সালে এখানে এসেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর দেশের ধারটার শুধে ঢাকায় বেশ কয়েক বিঘে জমি কিনেছেন, একটা বাড়িও করেছেন। তার স্ত্রী ও দুটি ছেলে মেয়ে সহ পরিবার ঢাকায়, শুধু ছেলে

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দিন গুনছেন কবে ফিরবেন। দেশে পৌনে দুলাখ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন একটা বাস বার করবার জন্য। পারমিট লাইসেন্স সবই এখানে বেরিয়ে গেছে। ওনার ইচ্ছে গাড়িটা চলতে শুরু করলেই অর্থাৎ পয়সা উপায়ের একটা ধান্দা হয়ে গেলেই তিনি বাড়ি ফিরবেন।

হাইমে ওনার টি ভি স্টিরিও, জিনের জামা প্যান্ট প্রয়োজনীয় সবকিছু আছে, ভদ্রলোকের প্রায় কোন খরচ নেই, নেশা করেন না। মদ খান না।যেহেতু একটি হোটেলে কাজ করেন, তাই দুবেলা খাওয়া ফ্রি।

যারা রান্না করে খান তাদের দুবেলা মুরগির মাংস, ভাত, ডাল, সবজি খেতে মাসে ৭৫ মারকের বেশি খরচ হয় না। একজন জানালেন যদি মদ আর মহিলা দোষ না থাকে তাহলে দু বছরে আপনি স্বাবলম্বী। হাইমের সংগে চিপ ক্যানটিন আছে। সেখানে দুধ, পাউরুটি, চাল, সবজি, মায় সেনট, পাউডার, চকোলেট সস্তায় পাওয়া যায়। এক বছর কাজ করলে আপনি পুরনো একটা গাড়ি কিনে নিন ১৫০০ কিংবা ২০০০ টাকায়। অসুখ হলে ডাক্তার পুলিশ অ্যামবুলেনস সোজা আপনাকে হাইম থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করতে সময় লাগবে মোটামুটি দশ মিনিট।

উকিলকে মাঝে মাঝে দক্ষিণা পাঠাবেন। পুলিশে এখন ছয়মাসে একবার গেলে চলে। যেহেতু আপনারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন না, কোথাও অসভ্যতা করেন না, পুলিশ আপনাদের উপর খুব খুশি।

ইতিমধ্যে আপনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রেমট্রেম করে বেড়াচ্ছেন। নরম দেহের স্পর্শে আপনিও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। মেয়েটি রাজি হয়ে গেল বিয়ে করতে।

আপনার এখন মহা আনন্দ। এই হল রাজ্য জয়ের আনন্দ। আর কে আপনাকে তাড়ায়। উপায় থাকলে আপনি মা শীতলাকে পাঁচ মারক বাতাসা পুজো দিতেন কিংবা জোড়া পাঁঠা মানত করতেন।

বিয়ে হয়ে গেল। আপনি একজন জারমান মহিলার স্বামী। অতএব কোন আইন নেই আপনাকে বার করে দেয়। আর কোন কিছু লুকনো নেই। আপনাকে পোলার হাউসের শরণার্থী শিবিরে থাকতে হবে না। সুন্দর কার্পেটে মোড়া গরম ঘরে ততোধিক সুন্দরী বৌকে নিয়ে আপনি রাত্রি যাপনের আস্বাদ পাবেন। আপনার স্ত্রীও চাকরি করে। অতএব দুজনের উপায়। যদি অকারণ কোন বিরোধ না হয়, তাহলে সুখী জীবন যাপন করতে পারেন। পুলিশের কাছে খবর এসে গেছে আপনার তলে তলে বৈবাহিক আছে। অতএব আবার দেশের একটা নতুন বডি ওয়ারেনট দেখাতে হবে, যেটা হয়ত আপনার পরিবারের কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে। অবশ্য সবই আপনার নকল হাত থাকার উপহার বলতে পারেন। এর মধ্যে আপনার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আদালতে আবেদন জানালেন। আপনি ওঁর বিবাহিতা স্বামী। এবং তাকে যেন আপনার থেকে কোনভাবেই পৃথক করা না হয়।

জারমানির মহামান্য বিচারক এত বড় অন্যায় কখনও করতে পারেন না। আপনার স্ত্রীরই জয় হল। মাঝখান থেকে আপনি যদি সরকারি মহার্ঘ ভাতা পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা বন্ধ হল। অবশ্য তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। কারণ হোটেলের চাকরিটা তো আছেই। ওই একটাই অসুবিধা, রাত্রে ডিউটি। আপনি কিন্তু এবার ইউনিয়নের কাছে গেলেন। ইউনিয়ন চাপ সৃষ্টি করে এত বড় অন্যায়টা বন্ধ করে দেবে অর্থাৎ আপনি দিনেও কাজ করতে পারবেন।

এবার আপনার নতুন জীবন শুরু হল। যদি পয়সা করে দেশে ভাগতেন, তাহলে ভাল হত। কিন্তু মধু খাবার লোভে ভুল যে একটা করেছেন তা পরে পরেই বুঝবেন। দেখলেন, আপনি স্ত্রীর গোলাম হয়ে গেছেন। আপনার স্ত্রী জানে স্বামিত্ব ঘুচলে আপনার নিরাপত্তা নেই। অতএব ঘরের কাজ করুন, রান্না করুন, বাসন মাজুন, এমনকি গতরাত্রে আপনার স্ত্রী যে বিছানায় বয় ফ্রেনড নিয়ে রাত কাটিয়েছেন সেটা পরিষ্কার করুন।

এতক্ষণে আপনার সেই মল্লিকদার কথা মনে পড়ে যাবে। আহা যেন সাক্ষাৎ ভগবান। আপনি পুরনো খাতার পাতা খুলে ফোন নম্বর বার করুন। 'দাদা খুব বিপন্ন। আর তো সয় না, এবার পথ দেখান।' কিন্তু যাবেন কোথায়? সব দেশ যে এতদিনে জোচ্চুরি ধরে ফেলেছে, দেখছ না, জারমানিতে বেকার ছেলের সংখ্যা বাড়ছে। তারা এখন সংখ্যায় ২৫ লক্ষ।

যা হোক, মল্লিকদা সময় নিলেন। মেকসিকোর সীমান্ত দিয়ে আমেরিকার কোথাও ঢুকলে কেমন হয়। আবার অজানার পথ। আবার সীমান্ত পুলিশের ঝামেলা। দেশে ফিরতেও পারছেন না। কারণ দেশের ঘর বাড়ি তো বিক্রি করে এসেছেন। তাছাড়া ওখানে মুখই বা দেখাবেন কী করে।

বরং আপনি তো বাপাই জমিয়েছিলেন। কিন্তু জারমান বউ আপনাকে এই কায়দায় ফতুর করে ছেড়েছে। এখন তো চাকর বানিয়ে ফেলেছে। না, আর উপায় নেই। পালাতেই হবে। যা আছে তাতে মল্লিকদাকে কমিশন দিয়ে অন্তত তিনমাসের খরচ কুলিয়ে যাবে। ধরা পড়লে জেলে যাওয়া ভাল। তবু দেশে কী করে ফিরব। এতদিনে তো লোকাল পুলিশ জেনে গেছে, আমি ভুয়ো তথ্য দিয়ে জাল দুনিয়া দেখিয়ে এখানে আছি।

অগত্যা রাত্রের অন্ধকারে মল্লিকদার সেই বিশ্বস্ত গাড়িতে মুখ লুকিয়ে পালান ছাড়া গতি কী।

জারমানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ নিয়ে কিন্তু দালাল কীভাবে কাজ করছে এবং তার পরিণতি সম্পর্কে ওপরে যা বললাম তা কোন গল্প নয়।

কোলনে আমরা যে পোলার হাউসটা দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকরা থাকে। এই ধরনের হাইম বা কলোনি শুধু এই শহরেই ১৬টা আছে। জারমানির অন্য শহরেও কম-বেশি হাইম রয়েছে।

কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষের পাল্লায় পড়ে এখানে প্রকৃত যারা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী তারা সংখ্যায় কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন।

বাংলাদেশের আমি একজনকে চিনি যার জিয়ার মৃত্যুর পর দেশে ১৪ বছরের জেল হয়েছিল, কোনরকমে তিনি পালিয়ে এসে বেঁচেছেন। জিয়ার মৃত্যুর সময় যে সৈনা বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে তিনি চতুর্থ রেজিমেনটের একজন সৈন্য হিসাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরশাদ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওই রেজিমেনটের কয়েক শ অফিসার ও জওয়ানকে ফাঁসিতে চড়িয়েছেন।

আবার কিছু পাঞ্জাবিও দেখলাম যারা ভারত থেকে ১৯৭৭ সালে পালিয়ে এসেছেন। এখানে বলেছেন যেহেতু তারা ইন্দিরাপন্থী তাই জনতা সরকার তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। কিন্তু ইন্দিরা সরকার ফিরে আসার পর যখন জারমান সরকার প্রশ্ন তুলল এবার তো তোমাদের সরকার এসে গেছে। ফিরে যাও? তখন ওরা রাতারাতি মানেকাপন্থী হয়ে গেছেন। কেউ কেউ খালিস্তানপন্থীও হচ্ছেন। তবে এ ব্যাপারটা বেশিদিন চলবে বলে মনে হয় না। কেননা পশ্চিম জারমানিতেই এখন এ নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সোচ্চারভাবে। □

আমেরিকার চিঠি

শান্তির দাবিতে আমেরিকার মানুষ সোচ্চার

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সফররত সুদীপ মজুমদার

স্কট বাবগউইন যখন বিভিন্ন অঞ্চলে তার বন্ধুদের সংগে নিয়ে একটা নীল রঙের ৮টি বই বিলি করে বেড়াচ্ছিলেন তখন অনেকেই হয়ত বুঝতে পারেননি, ঐ ৮টি বইটিতে কী ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নের ছবি আঁকা রয়েছে। সে দুঃস্বপ্ন আর কিছুই নয়, পারমাণবিক অস্ত্রের হুংকারে পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষা করা।

অবশ্য যারা এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নটির অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন তারা কিন্তু স্কট এবং তার সংগীদের সংগে দীর্ঘ আলোচনা করলেন এবং আলোচনার শেষে এ রকম দাবিও তুললেন যে অবিলম্বে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। অন্য সব পরমাণু অস্ত্র বিরোধীদের মতই স্কট ও যুক্তিপূর্ণ ভাবে পরমাণু অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলেছেন। পরমাণু অস্ত্র বিরোধীরা তাদের সপক্ষে আমেরিকার জনসাধারণকে নিয়ে আসার জন্য কতগুলো যুক্তিও দিয়েছেন। যেমন (ক) মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন পারমাণবিক শক্তি আছে যা দিয়ে অতি সহজেই তারা এক লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট যে কোন রাশিয়ান শহরকে চল্লিশবার ধ্বংস করতে পারে। আবার রাশিয়ার এমন শক্তি আছে যে তারা যে কোন আমেরিকান শহরকে বাইশবার ধ্বংস করতে পারে। (খ) বোসটনের মত যে কোন একটা শহরের ওপরে যদি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা যায়, তা হলে সেই শহরের আগুনে ঝলসে যাওয়া মানুষদের চিকিৎসা করতেই দেশের সমস্ত ওষুধপত্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। (গ) পারমাণবিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া যারা নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকবে তাদের ওপর তো পড়বেই, এ ছাড়াও যারা দেশ থেকে অন্যত্র সরে যাবে তাদের ওপরেও পড়বে। এই কথার প্রতিধ্বনি করেই মিনেসোটা অঞ্চলের পরমাণু যুদ্ধবিরোধীদের নেতা স্কট বাবগউইন আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'আমাদের সবার ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই আমাদের এটা বন্ধ করা উচিত।'

গত ২০ জুন তারিখে সমস্ত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে তাই 'পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ দিবস' পালন করা হল। এই আন্দোলনে এখন ডানিয়েল এলসবারগ এবং বেনজামিন স্পকের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এই আন্দোলনের সমর্থকদের ভেতর আছেন প্রাক্তন সেনাপতি, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, সেনেটের সদস্য থেকে শুরু করে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও। হোয়াইট হাউসের একজন প্রাক্তন পরামর্শদাতা এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারী এলসবারগ এখন আমেরিকান সমরনীতির একজন বিশিষ্ট সমালোচক। এলসবারগ এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এই 'উন্মাদপ্রায় অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনকি পথ অবরোধ থেকে শুরু করে ধরনা দেওয়ার মত গণবিক্ষোভেও অংশ নিচ্ছেন। কিছুদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার সিটিতে ভাষণ দেবার সময় তিনি বলেছিলেন, 'অনেক মানুষই মনে করেন আমাদের সরকার প্রথমেই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে আমরা আক্রমণাত্মক অস্ত্র বানানোয় মেতেছি। প্রতিরক্ষা দপ্তরে আমার কাজই ছিল এইসব অস্ত্রের মান নির্ণয় করা। এর জন্য আমাকে বেশ মোটা টাকাও দেওয়া হত।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'লিভারমোরের গবেষণাগারে এই সব অস্ত্রের নমুনা তৈরি করা হয়। ঐ গবেষণাগারটি আমাদের সময়ের একটি মারণাগার।'

কিছুদিন আগে সেই ক্যালিফোর্নিয়াই আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যখন হাজার হাজার স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুরা লিভারমোর গবেষণাগারের পথ অবরোধ করে সেখানকার কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য এ ঘটনা আঁচ করে পুলিশ আগে থেকেই তৈরি ছিল। প্রায় হাজারখানেক বিক্ষোভকারীকে তারা গেপ্তার করল।

একই সময়ে দেশের আরেক প্রান্তে, নিউ ইয়র্কে, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং আরেকজন বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী নেতা ডাঃ বেনজামিন স্পক রাষ্ট্রসংঘের অফিসের বাইরে এক বিশাল গণঅবস্থানে অংশ নিচ্ছিলেন।

ডাঃ স্পক মন্তব্য করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন নিরস্ত্রীকরণে বিশ্বাস করেন না। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র অস্ত্র উৎপাদন করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে নিজের আখের গোছাচ্ছে এ রকম যারা ভাবেন, তারা অনেকেই স্পকের এই মন্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকি প্রচার মাধ্যমের একটা বেশ বড় অংশও এই ধারণাকে সমর্থন করেছিল। সম্প্রতি নিউ ইউরক টাইমস একটা তালিকা প্রকাশ করে দেখিয়েও দিল সমরাস্ত্রের দিক দিয়ে দুই পক্ষের অবস্থা কেমন। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত অভিনেতা এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের তথ্য বিভাগের উপদেষ্টা পল নিউম্যান টাইমসকে লেখা একটা চিঠিতে প্রতিবাদ করে জানালেন এই তালিকা সম্পূর্ণ ভুল। নিউম্যান লিখলেন, 'স্থল বাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনী সব মিলিয়ে আমাদের মোট পারমাণবিক সমরাস্ত্রের সংখ্যা ১০,১৭০। অপরদিকে সোভিয়েতের এই সংখ্যা হল ৭,৪০০। এগিয়ে থাকার এই সুবিধা নিয়েই মারকিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে এই সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে ১৬,০০০-এ নিয়ে যেতে। নিউ ইয়রক টাইমস ২১ জুন তারিখে পল নিউম্যানের এই চিঠিটি প্রকাশ করে।

অস্ত্র প্রতিযোগিতার তীব্রতা

	মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষা	সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া
প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা	২-১২-১৯৪২	২৫-১২-১৯৪৬
প্রথম অ্যাটম বোমা	১৬-৭-১৯৪৫	২৯-৮-১৯৪৯
প্রথম হাইড্রোজেন বোমা	১-১১-১৯৫২	১২-৮-১৯৫৩
ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিক্রিয়া	২৬-৪-১৯৪৯ (ন্যাটো)	১৪-৫-১৯৫৫ (ওয়ারশ চুক্তি)
ইউরোপে পারমাণবিক অস্ত্রাদি	১৯৫৪	১৯৫৭
আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র	১৯৫৬	১৯৫৬
দ্রুতগতি বোমারু বিমান	১৯৬০	১৯৭৫
সামুদ্রিক ক্ষেপণাস্ত্র	১৯৬০	১৯৬৮
রকেট ক্ষেপণাস্ত্র	১৯৬০	১৯৬৮
বহুমুখী ক্ষেপণাস্ত্র	১৯৬৬	১৯৭৩
ক্ষেপণাস্ত্র আধুনিকীকরণ	১৯৬৮	
উচ্চগতিসম্পন্ন যুদ্ধযান	১৯৭০	১৯৭৫
কম্পিউটারযোগে ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালনা	১৯৭০	১৯৭৫

'চূড়ান্ত সন্ত্রাসবাদ' (Ultimate Terrorism)-এর প্রণেতা রিচারড বারনেট একটি তালিকার মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে এগিয়ে আছে।

নিরস্ত্রীকরণ সমর্থকরা বলেন, 'এখন পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা তেমন করে বোঝা যায়নি। কেননা তেমন কোন দুর্ঘটনার সামনে আমরা পড়িনি বা সেভাবে এই অস্ত্রগুলোকে এখনও ব্যবহার করা হয়নি।' তারা বলছেন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই এমন কমপিউটার চালিত ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে যে এর ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার দিক থেকে আক্রমণের আশংকা দেখা দিলেই তারা সেটা বুঝতে পেরে প্রতিআক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা হল, সোভিয়েত কি নিরস্ত্রীকরণে রাজি হবে।

স্কটের মতানুযায়ী, নিরস্ত্রীকরণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার লাভই হবে। কেননা, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নেমে তাদের অর্থনীতির ওপর অনাবশ্যক চাপ পড়ছে।

এই পরমাণু অস্ত্রবিরোধী বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া অস্ত্র উদ্ভাবকদের ওপর কতখানি তা জানতে চাওয়ায় লিভারমোর গবেষণাগারের পরিচালক রজার ব্যাটজেল বললেন, 'এটা অন্তত অনেক মানুষকে এক জায়গায় আনতে পেরেছে। তবু তাদের একবার অন্তত ভেবে দেখা উচিত যে তারা কি অহেতুক ভয় সৃষ্টি করছে না।'

কিন্তু এসব সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ পরমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছেন। এবং ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করার ফলেই বিষয়টি এখন বেশ জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরোধী একজন যুবক বললেন, 'সব থেকে ভয়ের কথা, এই অস্ত্রগুলো এখন কিছু ক্ষমতালোভী দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের হাতে চলে গেছে।' □

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর কলমে

হোমিও চিকিৎসা

ইদানিং প্রায়ই বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণের কথা শোনা যায়। কলকাতায় বায়ু দূষণের ঠিক মাপটা বলতে পারব না। কিন্তু অবস্থাটা যে খুবই ঘোরাল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ এই বায়ু দূষণের শিকার অজস্র মানুষ চিকিৎসার জন্য আসছেন।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শহর কলকাতা বা হাওড়ায় স্বাভাবিক নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। হাওয়ার সংগে ডিজেলের ধোঁয়া, ধুলো আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ছে। এর সংগে আছে কলকারখানার বিষাক্ত নানা রকম পদার্থ। এইসব বিষ অনবরত বাড়ছে।

আমরা দেখছি এই বিষাক্ত আবহাওয়ার ফলে প্রচুর মানুষ ব্রংকাইটিস, সাইনাস, টনসিলাইটিস, ফ্যারেনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অনেকেই এসে বলছেন, নাক বুজে যাচ্ছে— নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরকম অবস্থা চলার আর একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হল ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

রাজ্য সরকারের পরিবেশ দপ্তর এই বিষয়ে চিন্তিত তা আমরা জানি। কিন্তু রাতারাতি তো এই বিষাক্ত পরিবেশ বদলে ফেলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রচুর টাকাও দরকার। তা সরকারিভাবে চেষ্টা হচ্ছে হোক। আমার মনে হয় এ বিষয়ে প্রতিটি নাগরিকেরও কিছু করার আছে।

যেমন রাস্তায় জল দেবার ব্যবস্থা করা। প্রচুর গাছ পোঁতা। যেখানে সেখানে জঞ্জাল না ফেলা। পেচ্ছাপ পায়খানা যত্রতত্র করার অভ্যেস বদলান। যাঁদের গাড়ি আছে, তাঁদের দেখা উচিত ধোঁয়া যেন না বেরোয়-ইত্যাদি। এসব সামান্য কাজের ফলাফল সুদুরপ্রসারী।

একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি দেখছি দূষিত আবহাওয়ার শিকার হচ্ছেন ছোট বড় গরিব বড়লোক সকলেই।

বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ জিন্দাল একদিন বললেন, ডাক্তারবাবু কলকাতায় এলেই আমার নাক বন্ধ হয়ে যায়। রাতে ঘুমতে পারি না। ড্রপ দিতে হয় খালি। কী করা যায়?

যা করা যায় তা করায় তাঁর আর রাতে ঘুমনের অসুবিধা হয় না। নিশ্বাস নিতে পারছেন স্বাভাবিক ভাবেই। বিশ্ববিখ্যাত সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশংকর। কলকাতাতে এলেই ধুলো ধোঁয়া শব্দে ওঁর অ্যালারজি হয়। তা তাঁরও চিকিৎসা করছি।

আর অজস্র সাধারণ মানুষ, ছোট বড়, তাঁরাও আসছেন এই একই রোগের শিকার হয়ে। আমি সেই জন্য এইসব অসুখের প্রতিষেধক হিসেবে কিছু ব্যবস্থার কথা বলছি। ওষুধগুলি ব্যবহার করে ঠিকমত ফল না পেলে অবশ্য চিকিৎসকের কাছে যাবেন। অবহেলা করবেন না। আর রোজ সকালে যতটা পারেন মুক্ত পরিষ্কার হাওয়া বুকে টেনে নেবেন। রাতে শোবার আগে সামান্য গরম জলে ভাল করে নাক মুখ ধুয়ে সাফ করে নেবেন। এই ধোয়াধুয়ির সময়ে নিজেরাই দেখবেন শরীর থেকে কী পরিমাণ কালো কালো নোংরা বেরিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকটি অসুখ ও ওষুধের নাম এবারে বলছি। টনসিলাইটিস : স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীরা বেশি করে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গলা ব্যথা, জ্বর হয়, যদি ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে রিউম্যাটিক ফিবার হতে পারে। হার্টেও ধাক্কা লাগতে পারে। কিডনির ক্ষতিও হয়। এমনকি বিপজ্জনক রোগ নেফ্রাইটিসও হতে পারে এ থেকে। চোখ, কান, ব্রেনের ক্ষতি হতে পারে। টনসিল আমাদের গলায় দারোয়ানের কাজ করে। ওর দায়িত্ব হল ধুলো-ধোঁয়ার হাত থেকে হার্ট-ফুসফুসকে বাঁচান। কিন্তু ধুলো-ধোঁয়ার চাপ এতই বেড়েছে যে দারোয়ান টনসিল নিজেই বেচারি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। টনসিলের অসুখ : সাধারণভাবে আমি কয়েকগুলি ওষুধের নাম বলছি। বেলেডোনা-৩০ বা ২০০, মারকশল-ঐ, হিপারসালফ-ঐ, ব্যারাইটা কারব-ঐ, ব্যারাইটা মিউর-ঐ, ফাইটোলক্কা-ঐ, মারকবিস আয়ড-ঐ, মারকপ্রোটো আয়ড-ঐ, ক্যালকেরিয়া কারব-ঐ, ব্যাসিলাইনাস-২০০ ইত্যাদি।

এই প্রসংগে জানাই, সম্প্রতি স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের আর্থিক সাহায্যে হাওড়ায় মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি কলেজে টনসিল নিয়ে একটা গবেষণা হয়। একশ পঁয়ত্রিশ জন রোগীর ভেতরে একষট্টি জনের গলায় বিটাহিমোলিটিকাস জীবাণু পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পরে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাত্র ছ জনের বিটাহিমোলিটিকাস জীবাণু রয়ে গেছে। বাদবাকিদের আর নেই। পরেও আর ঐ রোগে তাঁরা আক্রান্ত হননি।

টনসিলের রোগে সারজারি একটা বড় চিকিৎসা। পুঁজ পড়লে অপারেশন করা ছাড়া উপায় কী? কিন্তু আধুনিক মহিলারা অপারেশন করার আগে হাজারবার ভাবতে চান। কারণ দারোয়ান না থাকলে ফুসফুস হার্ট অরক্ষিত হয়ে পড়ে। তার ফলে আরও গুরুতর বেশ কিছু অসুখ হবার ভয় বেড়ে যায়।

আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছোট্ট নাতির আর এক সংগীত শিল্পীর কথা বলতে পারি। বাচ্চাটিই বংশের একমাত্র ছেলে। তার টনসিল অপারেশনের কথায় দাদুর দারুণ আপত্তি। আমার কাছে এসে সব বললেন। আমি তাকে দেখে শুনে ফাইটোলক্কা ওষুধ দিয়েছিলাম। তারপরে আর ছেলেটির গলা কাটার দরকার হয়নি। এখন সে বেশ বড়সড় হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। গায়ক দীপংকর চট্টোপাধ্যায়ের গান আপনারা শোনেন। কিন্তু টনসিল নিয়ে ওর খুব মুশকিল। আমি ওকে ওষুধ দিই। তারপরে অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বলে, উৎরে গেছি। রেকরড করে স্বচ্ছন্দে। আর রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপকদের প্রায় সকলেই টনসিলের রোগী। তাঁরাও ওষুধ খান। তবে এই অসুখের রোগীদের সিগারেট না খাওয়াই ভাল। আর গলার যত্ন নেওয়াও উচিত। □

জমি বাড়ি ফ্ল্যাট ঃ বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে এসব এখন মরীচিকা মাত্র

সারা পৃথিবীর মানুষের কাছেই মূল সমস্যা তিনটি ঃ রুটি, কাপড় এবং ঝোপড়ি। রুটির সমস্যা না মিটলে বেঁচে থাকার সমস্যাও আর থাকে না, ফলে সেটি সবার আগেই মেটান চাই। বস্ত্র সমস্যা তার পরে এবং সে সমস্যা সভ্যতা এবং উন্নয়নের সংগেই যুক্ত।

তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ মাথা গোঁজা একটুকরো ঠাঁই নিয়েও উন্নয়নের অগ্রগতি বা রুদ্ধতা নির্ভর করে। ভারতের সবচেয়ে সমস্যাবহুল শহর কলকাতাতে এই তৃতীয় সমস্যাটি দিনের পর দিন যেভাবে প্রকট হচ্ছে তাতে হয়তো একদিন যে কোন ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আশ্রয়হীনের সংখ্যা কী ভাবে এখানে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে বাড়বে সে সমস্যার তীক্ষ্মতাই এ প্রতিবেদনে রূপায়িত হল।

অশোক কুমার চক্রবর্তী

'মধ্য কলকাতার দু কামরার স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। ভাড়া ছ'শো। অগ্রিম লাগবে। ছোট পরিবার বাঞ্ছনীয়।'

'ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর, চন্দন নগর, চুঁচুড়া, উত্তরপাড়ায় জমি/বাড়ি চাই। মূল্য সহ লিখুন।'

দৈনিক পত্রিকায় এমন বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই হরদম অনেকেরই চোখে পড়বে। অবশ্য ফ্ল্যাট বা বাড়ির মালিকরা যতটা বিজ্ঞাপন দেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞাপনের সংখ্যা হয় যারা ফ্ল্যাট বা বাড়ি কিনতে কিংবা ভাড়া নিতে চান তাঁদের পক্ষ থেকে। যেমন কর্মখালির চেয়ে কর্মপ্রার্থীর বিজ্ঞাপন বেশি থাকে। দৈনিক পত্রিকাকে সেদিক দিয়ে সমাজদর্পণ বলা যায়। বছর পনের আগেও হয়তো ছবিটা এমন একপেশে ছিল না। তখন বাড়ির মালিকরাও বেশ আগ্রহভরেই ভাড়াটে চাইতেন।

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, কলকাতার অলিগলিতে বেশ কিছু বাড়িতে আগে 'টু লেট' কথাটা ঝোলানো থাকত। এখনকার লোকজনের কাছে এ কথাটা প্রায় অজানাই বলা যায়। কারণ কোন একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট থেকে পুরনো ভাড়াটে ওঠার আগেই নতুন ভাড়াটে 'বায়না' ধরিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির মালিককে।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এই হিসাবেরই অন্য পিঠ। সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের এখন কলকাতায় থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে কেউ জমি বা বাড়ি কিনতে চাইলে খোদ কলকাতায় তা কেনার কথা ভাবতেও ভয় পান।

খবরের কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'বাড়ি ঘর ফ্ল্যাট' কলামে একটি বিজ্ঞাপন দেখে আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছিলেন। বন্ধুটি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে। তাছাড়া খুব সুন্দর ছবি আঁকেন। স্বামী স্ত্রী আর একটি শিশু কন্যা। সল্ট লেকে এক সহকর্মী বন্ধুর ফ্ল্যাটে এতদিন কোনরকমে একটু মাথা গোঁজার জায়গা পেয়েছিলেন। বন্ধুর বাবা মা বাংলাদেশ থেকে সামনের মাসে কলকাতায় চলে আসছেন। তাই তাঁকে ঘর ছাড়তেই হচ্ছে। কর্মস্থল [illegible] এলাকায়। ঐ এলাকায় [illegible] বাড়ি খোঁজা বৃথা। কলকাতার এদিক ওদিক কোথাও মাথা গোঁজার মত জায়গা না পাওয়া গেলে অগত্যা শহরতলি বা আরও দূরে মফঃস্বল শহরে ঘর ভাড়া নিতে হবে। দিন পনেরর মাথায় ঐ বাড়িওলার কাছ থেকে চিঠি পেলেন ঃ 'সরি, ফ্ল্যাটটা অলরেডি বুকড।' শোনা গেল এক অবাঙালি ভদ্রলোক, বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স করেছেন।

আগের দিনে কলকাতায় দুঘরের একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া পড়ত মাস গেলে সত্তর। আর এখন এক ভাড়াটে ওঠার দু'এক মাস আগে থেকেই অন্যজন 'বুক' করে রাখেন। বিজ্ঞাপনের কোনও দরকারই হয় না। দালালই যথেষ্ট। শুধু একটু খবর দিলেই হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিন লাইনের এক সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনের জবাবে এক বাড়িওলা ভদ্রলোক সাকুল্যে একশ' তেইশ খানা চিঠি পেয়েছিলেন। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে 'বাড়ি-ঘর ফ্ল্যাট' কলামে এখন আশ্রয়প্রার্থীদেরই বিজ্ঞাপন বেশি। বাড়িওলা তরফে বিজ্ঞাপন খুবই কম। যেসব বাড়ি একেবারে নতুন, দশ/বিশ হাজার অগ্রিম গুনতে হবে, বিজ্ঞাপন কেবল সেগুলির জন্যেই। 'উত্তর শহরতলিতে ১ লাখ টাকার মধ্যে ছোট বাড়ি কিনতে চাই।'

'উত্তরপাড়ায় ৪০ হাজারে পুরনো ছোট বাড়ি বিক্রয়।'

'ডায়মণ্ড হারবার রোডের সন্নিকটে ১ লাখ টাকার মধ্যে ছোট বসতবাড়ি চাই।'

'দমদম রোডে দেড়লাখ টাকায় নতুন একতলা বাড়ি কিনতে চাই।'

ভাত ছড়ালে যেমন কাকের অভাব হয় না, এ শহরে এতদিন টাকা ফেললে মনের মত বাড়ি বা জমি কিংবা মাথা গোঁজার ফ্ল্যাট ঠিকই মিলে যেত। কিন্তু ইদানিংকার বিজ্ঞাপনগুলো লক্ষ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে, শুধু চাই আর চাই। বাড়ি চাই। জমি চাই। ফ্ল্যাট চাই। টাকার অংকটা বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সেটাও পাঠক লক্ষ্য করবেন। ১ লাখ, দেড় লাখ, এমন কি দু'লাখ টাকা ফেলে লোকে ছোট বাড়ি চাইছেন। ভাড়া দেওয়ার জন্য, ব্যবসা করার জন্য নিশ্চয়ই নয়। চাইছেন নেহাৎই নিজেদের মাথা গোঁজার জন্যে।

শহরতলিতে জমির দাম গত এক দেড় বছরে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। গত বছর বরানগর দমদমে ৪ হাজার টাকা যে জমি কাঠা দরে বিকিয়েছে, সেটাই এখন ষোল হাজারে দের 'বায়না' হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি চন্দননগর শহরে এক কাঠা জমি বিশ হাজার টাকা। তারকেশ্বরে বারো হাজার দর উঠেছে। সোদপুরে জমি নেই। বেহালাতেও একই অবস্থা। সরশুনায় জমির দাম বারো হাজার টাকা কাঠা। আন্দুলে দশ থেকে বারো হাজার চলছে। কোন্নগরে খালি জমি নেই। শ্রীরামপুরে দশ হাজারে জমি খুঁজলে মিলেও যেতে পারে। হাওড়া রামরাজাতলায় জমি বিক্রি হচ্ছে ষোল হাজার টাকা

তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট। [illegible] একটি আবাসন সমবায় [illegible]

কাছে। সাঁতরাগাছিতে স্টেশনের কাছেই দশ। ভেতরে ছয় আট।

'দালালদের অন্নজল উঠতে বসেছে। শহরতলিতে জমি কই - ফ্ল্যাটই বা কোথায়? একবার ভাড়াটে বসে গেলে ফ্ল্যাট খালি হতে যুগ কাবার।'

কথা হচ্ছিল বিজয় দাসের সংগে। বিজয় বি টি রোড-টবিন রোড, সিঁথির মোড় এলাকায় বাড়ি জমির দালালি করেন। বয়স চল্লিশ।

'জানেন,' বিজয় বললেন, 'আগে আমরা ফ্ল্যাটে ভাড়াটে বসিয়ে দিতে পারলে এক মাসের ভাড়া নিয়ে খুশি থাকতুম এখন দু'মাসের ভাড়া দালালকে দিতে হবে। এ জিনিস সবখানেই চালু হয়েছে। আগে মাসে আট দশটা ফ্ল্যাটে ভাড়াটে ঢোকাতাম। এখন দু'টোর বেশি 'কেস'ই হয় না।'

ইলেকট্রিক ট্রেন কলকাতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে নৈহাটি কল্যাণী। ওদিকে বারুইপুর সোনারপুর ডায়মনডহারবার। চন্দননগর তারকেশ্বর থেকেও লোকে দৈনিক অফিসে যাতায়াত করছে। আন্দুল, কোলাঘাট, মেচেদা, মায় পাঁশকুড়া থেকে ডেলি প্যাসেন্জার আসছেন শহরে। কাজেই শহর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে শহরতলিতে। ইলেকট্রিক ট্রেনে দিব্যি যাতায়াত। তাছাড়া বিধিবদ্ধ রেশন এলাকাও বেড়েছে। চন্দননগর এবং শ্যাম বাজারে লোকেরা একই হারে রেশনে চাল চিনি গম পান। নতুন সিনেমা এক সংগে শহরে এবং শহরতলিতে 'মুক্তি' পায়। স্থানীয় সুপার মারকেট এবং নিউ মারকেটে পার্থক্য খুব সামান্যই। এমন কি, লোডশেডিংয়েও বিশেষ কোনও তারতম্য নেই। এইসব নানা কারণে লোকে শহরতলির দিকে বেশি করে ঝুঁকছে। যে যেখানে পারছেন জমি কিনে বসে যাচ্ছেন। শহরে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রব; শহরতলিও লোকের চাপে ডুবুডুবু। যাকে বলে, বে-সামাল অবস্থা।

কলকাতায় এখন তেঁতুল-পাতায় ন'জন। নতুন অতিথির শয্যা পাতার জায়গা নেই। হঠাৎ করে কেউ এসে রাত্রে থাকতে চাইলে গৃহস্বামীর অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ে। একটুকু বাসার অভাবে কত ছেলে মেয়ের বিয়ে আটকে রয়েছে সে হিসেব কে রাখে? অবস্থা যা তাতে বলা যায়, শহর কিংবা শহরতলিতে জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট নিম্ন মধ্যবিত্তের কাছে সবই দুরাশা।

মহানগরীর আকাশ ফুঁড়ে যতই নতুন নতুন সুরম্য অট্টালিকা গজিয়ে উঠুক, সরকারের তরফ থেকে বছর বছর যতই ফ্ল্যাট বণ্টন করা হোক-এই শহরে মধ্যবিত্তের বাস-স্থান সংকট পাঁচ বছর আগের তুলনায় বেড়েছে বই কমেনি। কলকাতা শহরে বাড়ির জোগান এবং চাহিদার মধ্যে ফারাকটা অল্প কিছুদিন হল খুব বেশি বেড়ে গিয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে কল-কাতার ওপর জনসংখ্যার চাপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে এটা যেমন সত্যি, অপর দিকে তেমনি নতুন বাড়ি তৈরি আর তেমন হচ্ছে না বললেই চলে। ফলে, শহরে মধ্যবিত্তের বাসস্থান সংকট এই মুহূর্তে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

তথ্যানুসন্ধান করে জানতে পেরেছি, এই শহরে শতকরা ৮৩ জন মানুষ বাস করেন ভাড়া বাড়িতে। শতকরা মাত্র ৫ জন লোকের কপালে জোটে সরকারি আবাসন। এবং প্রায় ১০ লাখ লোকের ঠিকানা হল বস্তি। খাস কলকাতায় প্রতি বারো বাই দশ ফিট ঘরে ৪ জন লোকের বাস। মাথা পিছু ৩৯ বর্গফুট জায়গা সকলে পান কিনা সন্দেহ। শহরে শতকরা ৭৭ জন মানুষই ৩০ বর্গফুটেরও কম জায়গায় থাকতে বাধ্য হন। তবেই বুঝুন অবস্থা।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, বৃহত্তর কলকাতায় বছরে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ষাট হাজার বাড়ি তৈরি না হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সে-জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে মাত্র ৭ হাজার। ফলে, একটুকু বাসার খোঁজে গৃহস্থ প্রতিদিন হিমসিম খেয়ে বেড়াচ্ছেন। মওকা বুঝে ফ্ল্যাট ভাড়াও বাড়ান হচ্ছে। তবু পয়সা ফেলেও মনের মত বাড়ি মিলছে কই?

মেলা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন সাধারণ মধ্যবিত্তরা সরে যাচ্ছেন শহরতলির আরও গভীরে। অর্থাৎ আমাদের চেনাজানা শহরতলির মধ্যেও আর ভাড়া বা কেনার জন্য ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। একদিকে এটা যেমন সত্যিই তেমনই উল্টোদিকে এটাও সত্যি যে সহর-তলি অঞ্চলে ভাড়াটের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু বাড়িওলার আনু-পাতিক হার উল্লেখযোগ্য রকম কমে যাচ্ছে।

সি এম ডি এ-র একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে পাঁচটি শহরতলি অঞ্চলে ১৯৬৮ সালে ভাড়াটের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৬ ভাগ এবং বাড়িওলার সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ। ১৯৮১ সালে এসে ভাড়াটের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে শতকরা ৪০ ভাগ এবং বাড়িওলার সংখ্যা সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে। অন্য ২৮টি শহরতলি অঞ্চলে ১৯৭৪ সালে ভাড়াটের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ এবং বাড়িওলার সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৭ ভাগ। ১৯৮১ সালে তা দাঁড়াল যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ভাগ ও শতকরা ৬৫ ভাগে।

বাড়িওলাদের এই ক্রমহ্রাসমান হার কোন ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে? এর সামাজিক তাৎপর্য ভয়াবহ হতে বাধ্য নয় কি - একদিকে পরনির্ভর আশ্রয়ের মানসিকতা বাড়তে থাকবে এবং অন্যদিকে নির্ভরতার মনোভাব পরাজিত হবে ক্রমশ। এর সংগে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে পিছু হটার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কারণ কলকাতা থেকে যারা চলে গিয়ে উপযুক্ত মূল্যে ভাড়া বা কেনাকাটি করছেন, প্রতি বছর নতুন নতুন শহরত্যাগীর ভিড়ে সে প্রতি-যোগিতাও তুঙ্গে উঠবে এবং অপেক্ষাকৃত কম বিত্তশালীরা তাতে হেরে গিয়ে আরও পিছনে সরে যেতে বাধ্য হবেন। হয়ত সবশেষে তখন কলকাতার কোন প্রাক্তন ভাড়াটেকে বাঁকুড়ায় ফ্ল্যাট নিতে দেখা যাবে। এখন এ কথায় চাপা হাসি অনেকের ঠোঁটেই হয়ত ফুটে উঠবে, কিন্তু হিসাবের অংকটি মেলালে এমন পরিণতি হতে পনের বছরও লাগবে বলে মনে হয় না।

কলকাতা করপোরেশনের হিসেবের খাতায় চোখ বোলালে শহরেও নতুন বাড়ির সংখ্যা কীভাবে দিনে দিনে কমে আসছে সে চিত্র স্পষ্ট হবে। দেখা যাচ্ছে গত ৬৫-৬৬ সালে এই শহরে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাড়ি উঠেছে বছরে ২৬১৬টি। ৬৬-৬৭ সালে খানিক কমে ওই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩১৫। ৬৮-৬৯ সালে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে ১৮৫৪টি। ৬৯-৭০ সালে ১৮২৪টি। ৭০ সাল থেকে বাড়ি তৈরিতে ভাটা পড়তে শুরু করে। ইমারতি দ্রব্যের [illegible]

[illegible]

আছেই। তাছাড়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাড়ি তৈরিতে মন্থরতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। ৭০–৭১ সালে কলকাতাসহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক ঘটনা রাতারাতি বৃদ্ধি পায়। লোকে বাড়ি–জমি জলের দরে বেচে দিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন। ১৯৭২ সালের পর থেকে অবস্থা কিছুটা ভাল হতে থাকে। এই সময় থেকে পরবর্তী এক দশক বা তার কিছু বেশি সময়ে শহরে নতুন বাড়ি তৈরির গড় সংখ্যা ছিল ১৯০০। অবশ্য এ পরিসংখ্যান কেবল মাত্র কলকাতা করপোরেশন এলাকার। শহরতলির বাড়ির নকশা অনুমোদন করেন সংশ্লিষ্ট পুরসভা। সেখানকার পরিসংখ্যান জুড়লে বড়জোর আরও হাজার পাঁচেক নতুন বাড়ি সংযোজিত হবে। তাহলে সব মিলিয়ে মহানগরী কলকাতায় এখন বছরে গড়ে হাজার সাতেক নতুন বাড়ি হচ্ছে। প্রয়োজন খুব কম করেও ৬০ হাজার।

তিনশ' সত্তর টাকা হাজারের ইট এখন সাতশ। বিয়াল্লিশ শ টাকা টনের লোহা ছ'হাজার। পঞ্চান্নর সিমেন্টের বস্তা নব্বই। বার টাকা রোজের রাজমিস্ত্রির খাঁই কুড়ি-বাইশ। ন'টাকার মজুর বার টাকাতেও নিমরাজি। এক যুগের ফারাক নয়। মাত্র তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের আগে পরে ইমারতি দ্রব্যের দামের এই রকমফের। এখন নতুন বাড়ি তৈরির খরচ ১০০ টাকা প্রতি বর্গফুট। সল্ট লেক এলাকায় তারও বেশি। বছর পাঁচেক আগেও ৬০/৬৫ টাকা স্কোয়ার ফুটে বাড়ি দাঁড়িয়েছে। বাড়ি তৈরির খরচ বেড়েছে। পক্ষান্তরে, লোকের সেই অনুপাতে আয় বাড়েনি। ঋণ মঞ্জুরও হয় আগের হারে। তাই এই মন্দা।

শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখেছি। নতুন বাড়ি তৈরির কাজ চোখে পড়েনি এমন নয়। কিন্তু সেখানে কাজ হচ্ছে খুবই ঢিমেতালে। এটা আছে তো ওটা নেই। ইট-খোলা শূন্য। ইটের চাহিদা এখন তুঙ্গে। ভাল কয়লার অভাবে ইটভাটাগুলো দারুণ মার খাচ্ছে। বালির খাদ বসে যাচ্ছে বলে বালির জোগানও হ্রাস পেয়েছে। দাম বেড়েছে প্রতি দু'শো সি এফ টি লরি পিছু দেড়শ' টাকার মত। পাঁচশ টাকায় কিছুদিন আগেও পান্ডুয়ার ভাল মালের বালি মিলেছে। এখন সেই বালিই সাড়ে ছ'শো। গৃহস্থ বাড়ি তৈরিতে নেমে থাকে বলে বিপর্যস্ত। মন্ত্রীর গয়নাগাটি বেচেও উপায় পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি তৈরির কাজে বেসরকারি উদ্যোগে বাড়ি পড়ছে। সরকারকে এগিয়ে [illegible] একমাত্র সরকারই

পারেন নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থকে মনের মত একটা দু'কামরার ফ্ল্যাট উপহার দিতে।

সরকারি আবাসন বিভাগ কিন্তু গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য কাজ দেখাতে পারেননি। যদিও মন্ত্রী-মহোদয় ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। তিনি যত ফ্ল্যাট তৈরির আশ্বাস দিচ্ছেন বছর শেষে তার সিকি ভাগও সম্পূর্ণ হচ্ছে না। সরকারের তো আর পয়সার কোনও ঘাটতি নেই। সেখানে তবে অন্তরায় কোথায়? খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেল সরকারি আবাসন দপ্তরকে

ডোবাচ্ছেন ঠিকাদার গোষ্ঠী। তারা একসংগে অনেক কাজ হাতে নিয়েছেন। কোনটাই সময়মত শেষ করে উঠতে পারছেন না। তাছাড়া ঠিকাদারদের কাজে অবিশ্বাস্যরকম গাফিলতি এবং চূড়ান্ত অবহেলার নজির তো আছেই। ফলে, প্রকল্প অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে না। কচ্ছপের মত গতিসম্পন্ন কর্মকাণ্ডে সরকার নিজেই হতাশ। বরানগর, পাইকপাড়া, লেকটাউন-কালিয়াদহ, মানিকতলা, বেহালা-সরশুনা, মলয় গ্রীনে সম্প্রতি বেশ কয়েক হাজার ফ্ল্যাট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া, সল্ট লেক তো আছেই। সল্ট লেকে সরকারি এবং বেসরকারি দু'তরফেই ফ্ল্যাট উঠছে।

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। বড় রাস্তার মোড়ে সি এম ডি এ ফলক টাঙিয়েছেন। কলকাতার শ্রী ফেরাতে তাঁরা অক্লান্ত।

বস্তিবাসীদের বস্তিবাসের অভিশাপ ঘোচাতে সি এম ডি এ ইতিমধ্যেই অজস্র অর্থব্যয় করেছেন। তাতে পুরোপুরি না হলেও বস্তির চেহারায় কিছুটা চটক লেগেছে। হতশ্রী ভাবটা এখন ততটা প্রকট নয়। কলকাতায় দশ লাখ মানুষের ঠিকানা হল এইসব বস্তি। তাঁদের দিকে নজর তো দিতেই হবে।

কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্তের বাসস্থান সংকট ঘোচাতে সি এম ডি এ ভরসার পাত্র কি?

শহরবাসীদের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে চতুর্থ যোজনায় সি এম ডি এ-র বরাদ্দ ছিল ৩৭ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে ৪০ হাজার ইউনিট বাড়ি তৈরির কথা। সেই সংগে কথা ছিল এর মধ্যে ১৭ হাজার বাড়ি তারা মাসিক কিস্তিতে নিম্ন মধ্যবিত্তদের মালিকানা দেবেন আর ১৭ হাজার মাসিক ভাড়ায় দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সি এম ডি এ এগিয়ে চলেছেন। তবে এখানেও ঠিকাদার সি এম ডি এ-কে ডোবাচ্ছে। সময়মত ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শেষ হচ্ছে না। এদিকে সি এম ডি এ-র ফ্ল্যাট পাওয়ার আশায় হাজার হাজার পরিবার তীর্থের কাক সেজে

অপেক্ষা করছেন। সি এম ডি এ নিম্ন আয়ের লোকেদের এ পর্যন্ত ১৯২০টি ফ্ল্যাট দিয়েছেন। কালীদহতে ৮০৮টি ফ্ল্যাট ও ১০৮টি বাস্তু জমির উন্নয়নের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সরকারি ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য কলকাতাবাসী মুখিয়ে আছেন। এক হাজার ফ্ল্যাট বিলির জন্য ৫০ হাজার দরখাস্ত পড়েছে। ভাগ্যবান ফ্ল্যাট পাচ্ছেন লটারির মাধ্যমে। আবাসন দফতরে অনেকের হাঁটা-হাঁটিই সার। সেখানে বলা হচ্ছে 'ফ্ল্যাট নেই।' শহরে মাথা গোঁজার মত জায়গা চেয়ে লোকে জায়গা পাচ্ছে না। নতুন বাড়ির ভাড়া লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সরকারের এক হাজারের ফ্ল্যাটের জন্য পঞ্চাশ হাজার দরখাস্ত। লটারি। মন্ত্রীর কাছে উমেদারি। আগাম টাকা জমা দেওয়া। ফ্ল্যাটের জন্য কত কী! কতরকমের ঝকমারি। তবু ফ্ল্যাটের চাবি গৃহস্থের কাছে মরীচিকা।

অপরদিকে আরেক শ্রেণীর ভাগ্যবানকেও দেখতে পাই। অবশ্য যদি তাদের 'ভাগ্যবান' বলা যায়! ধরুন, কৈলাস বোস স্ট্রিটের মত জায়গায় ওপর-নিচ মিলিয়ে সাতখানা বেডরুম, রান্নাঘর, বাথরুম। পৃথক জল-কল। উঠোন। বারান্দা। মাসিক ভাড়া আজও সাতান্ন টাকা। ভাবা যায়? রাধাবাজারের মত জায়গায় বিরাট বিরাট দোকান-ঘর, মাসিক ভাড়া আজও মাত্র পনের টাকা।

কলকাতা শহরে উত্তরে দক্ষিণে লাহাদের বহু বাড়ি এমনি জলের দরে ভাড়া দেওয়া আছে। শুধু লাহাদের কেন, বহু বনেদি পরিবার তাদের বাড়ি থেকে নামমাত্র ভাড়া পান। সেই মান্ধাতা আমল থেকে ভাড়াটেরা বাড়িতে রয়েছেন। এক পয়সা ভাড়া বাড়াননি। কিছু বলতে গেলে রেন্ট কনট্রোল দেখান ভাড়াটেরা। ফলে, এইসব বাড়ি দীর্ঘদিন কোনও সংস্কার হয়নি। কোনও কোনও বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানতে পারি এই ধরনের বিপজ্জনক বাড়ি শহরে এখন বিশ হাজার। কিংবা তারও বেশি। বহুদিন ভাঙার নোটিশ হয়েছে। বাড়িওলা কিংবা ভাড়াটে কেউই নোটিশকে তেমন গা করছেন না। কিছু হলে দেখা যাবে, এরকম একটা ভাব। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে বড়বাজার, আমহার্স্ট স্ট্রিট কিংবা খিদিরপুর এলাকায় মানুষ দিনের পর দিন বসবাস করছেন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। মাথার ওপর বাড়ি পড়ো-পড়ো। তবু গৃহস্থ নির্বিকার নিরুত্তাপ, অচঞ্চল। আসলে এইসব মানুষ যাবেনই বা কোথায়? □

আলোকচিত্র : নিতাই ঘোষ

আবাসন সমবায় সমিতি কী করে গঠন করবেন এবং আবাসন ঋণ কী করে পাবেন ?

ঊষা ভৌমিক

আবাসন সাধারণমানুষের তৃতীয় সমস্যা। অন্ন-বস্ত্রের পরই মানুষকে ভাবতে হয় আবাসনের কথা। আর এই তৃতীয় সমস্যা সমাধানের পথও তিনটি–ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সরকারি ব্যবস্থা এবং সমবায় উদ্যোগ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একক প্রচেষ্টায় শহর বা শহরতলিতে একটি বাড়ি বা মাথা গোঁজার মত একটু ঠাঁই করা আজ সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ শহর ও শহরতলিতে জমির দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে জমি ন্যায্য দামে পাওয়াটাই দুষ্কর। তদুপরি বাড়ি তৈরির মাল মশলার দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে খুব সচ্ছলতা না থাকলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শহর বা শহরতলিতে বাড়ি তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। আর আবাসনে সরকারি উদ্যোগ অত্যন্ত সীমিত। তাই আজ সাধারণ মানুষকে আবাসন সমস্যার সমাধানে যৌথ উদ্যোগের কথা ভাবতে হচ্ছে। বাড়ির বদলে ফ্ল্যাটের চিন্তা করতে হচ্ছে। সমবায় আবাসন সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ছে।

আবাসন সমবায় সমিতি গঠন করলে যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেটা অনেকের জানা নেই, কারণ এ ব্যাপারে সরকারি প্রচার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। সুযোগ সুবিধার কথা জানার আগে এই ধরনের একটি সমবায় সমিতি কী করে গঠন করতে হয় সেটা জানা প্রয়োজন।

নিজেদের বসবাসের জন্য বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি করতে ইচ্ছুক ন্যূনপক্ষে এমন ৮ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজন একটি আবাসন সমবায় সমিতি গঠন করতে। সমবায় সমিতির আইন অনুসারে এই সমিতি রেজিস্ট্রি করতে হবে। প্রথমে এই সমিতি গঠনের জন্য মডেল বাই ল বা উপবিধি এবং দরখাস্তের ফরম সংগ্রহ করতে হবে। এই ফরমগুলি পাওয়া যাবে ১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ২৩-এ নেতাজী সুভাষ রোড (৮ তলা), কলকাতা-৭০০ ০০১ এবং প্রত্যেক জেলায় অবস্থিত জেলা সমবায় ইউনিয়ন অফিসে, ২। ওয়েসট বেংগল স্টেট কো-অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন, পি ১৫ ইনডিয়া একসচেনজ প্লেস একসটেনশন, কলকাতা-৭০০-০৭৩ এবং এদের শাখা অফিসগুলিতে - ক। দুর্গাপুর-সিটি সেনটার, রুম নং জি আর ৯, দুর্গাপুর-৯, খ। শিলিগুড়ি ৫৫ জগদীশ বসু রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, গ। মেদিনীপুর শহীদ ক্ষুদিরাম বসু রোড, মেদিনীপুর, ঘ। বহরমপুর-২৯, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

উপবিধিতে লেখা আছে এই সমিতির উদ্দেশ্য এবং কেমন করে পরিচালনা করতে হবে সেই কথা। উপবিধির বিভিন্ন ধারাগুলি সম্যক ভাবে উপলব্ধি করে উদ্যোক্তারা এটি গ্রহণ করবেন একটি মিটিং এ। দরখাস্তের ফরম ও উপবিধির শূন্য অংশগুলি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের কোন অসুবিধা হলে তাঁরা প্রত্যেক জেলার সমবায় ইউনিয়ন অফিসে সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের পরামর্শ নিতে পারেন। কলকাতায় সমবায় ইউনিয়ন রয়েছে ৮ বি আর এন মুখারজি রোড, কলকাতা-৭০০-০০১-এ। এ ছাড়া প্রত্যেক জেলায় রয়েছে সমবায় সমিতির সহ নিয়ামকের অফিস, প্রত্যেক ব্লকে রয়েছেন এক সমবায় পরিদর্শক। তাঁদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যাবে।

এই সাংগঠনিক কাজ করার সংগে সংগে উদ্যোক্তাদের জমির কথা ভাবতে হবে। কারণ জমি কেনা না হলে বা অন্তত জমি কেনার বায়নানামা দেখাতে না পারলে আবাসন সমবায় সমিতি রেজিসট্রি করা যাবে না। সমিতিকে রেজিসট্রেশনের জন্য আবেদনপত্রের সংগে যেসব কাগজ পত্র দাখিল করতে হবে তা হল ১। উদ্যোক্তাদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির প্রত্যায়িত প্রতিলিপি, ২। উদ্যোক্তাদের সই সাবুদ করা এবং যথাযথভাবে পূরণ করা তিন প্রস্থ উপবিধি, ৩। যে জমি কেনা হয়েছে সেই জমির দলিল বা কেনা না হয়ে থাকলে বায়না নামা, ৪। প্রস্তাবিত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের প্ল্যান ও এসটিমেট, কত ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ, ৫। প্রস্তাবিত সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব। সভ্যদের কাছ থেকে শেয়ার ও ভর্তি ফি বাবদ যে টাকা আদায় করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ, ৬। প্রস্তাবিত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের জন্য উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা যে ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে সেই ব্যাংকের কাছ থেকে গচ্ছিত টাকা সম্বন্ধে একটি সারটিফিকেট, ৭। প্রত্যেক উদ্যোক্তার কাছ থেকে একটি এফিডেভিট বা শপথ পত্র। এই শপথ পত্রে উদ্যোক্তার নামে কোন জমি বা বাড়ি আছে কিনা সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে, ৮। আরবান ল্যানড সিলিং অথরিটির কাছ থেকে জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত অনুমতি পত্র এবং ৯। উদ্যোক্তাদের যে স্থায়ী আয় আছে, তার বিবরণ।

সমবায় সমিতি রেজিসট্রেশন করার জন্য প্রত্যেক জেলায় রয়েছে একজন করে সমবায় সমিতি সমূহের সহনিয়ামক (Assistant Registrar of Co-operative Societies)। এই সহনিয়ামকের অফিসেই জমা দিতে হবে প্রস্তাবিত সমিতির কাজগপত্র। আর কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার মধ্যে হলে রেজিসট্রেশনের দরখাস্ত এবং যাবতীয় কাগজ পত্র জমা দিতে হবে ডেপুটি রেজিসট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, হাউসিং, কালকাটা মেট্রোপলিটন এরিয়া, ৯ রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ এই ঠিকানায়। রেজিসট্রেশনের আবেদন জমা দেওয়ার পর সমবায় দপ্তর থেকে আবেদনপত্রের যথার্থতা এবং উদ্যোক্তাদের দাখিল করা বিবরণ সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে। এই তদন্তের প্রতিবেদনে সমিতি রেজিসট্রেশনের কথা সুপারিশ করা হয়। তবে যদি উদ্যোক্তাদের দেওয়া বিবরণ কোন ক্ষেত্রে অসত্য প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার রেজিসট্রেশন সম্বন্ধে সুপারিশ নাও করতে পারেন।

সমিতি রেজিসট্রেশন হয়ে যাবার পর আসবে ঋণের কথা। আবাসন সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দেবার জন্য এ রাজ্যে রয়েছে একটি শীর্ষ সংস্থা–ওয়েসট বেংগল স্টেট কো অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন লিঃ (পি-১৫ ইনডিয়া একসচেনজ প্লেস একসটেশন, কলকাতা-৭০০-০৭৩)। এই সংস্থা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ঋণ দেন না। শুধু মাত্র আবাসন সমবায় সমিতিগুলিকে বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরির জন্য ঋণ দেন। সমিতি সভ্যদের মধ্যে সে ঋণ বিলি করেন। সর্বভারতীয় নীতি অনুসারে আবাসন সমবায় সমিতির সভ্যদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণী, খ। নিম্ন আয় বিশিষ্ট, গ। মধ্য আয়-বিশিষ্ট এবং ঘ। উচ্চ আয়-বিশিষ্ট। 'ক' শ্রেণীর সভ্যদের বার্ষিক আয়ের সীমা ধরা হয়েছে ৪,২০০ টাকা পর্যন্ত। তাঁরা ৬০০ স্কোয়ার ফুট এরিয়ার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের জন্য জমির দাম বাদে মোট খরচের ৯০%, বা ৪৮ মাসের মাইনে বা ২৯,০০০ টাকা যেটা সবচেয়ে কম সেটাই ঋণ হিসেবে পাবেন। 'খ' শ্রেণীর সভ্যদের বার্ষিক আয়ের সীমা ৭,২০০ টাকা। তাঁরাও 'ক' শ্রেণীর সভ্যদের সমপরিমাণ ঋণ পেতে পারেন। 'গ' শ্রেণীর সভ্যদের বার্ষিক আয়ের সীমা ১৮,০০০ টাকা। তাঁরা ১২০০ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট বা বাড়ির জন্য জমির দাম বাদে মোট খরচের ৮০%, বা ৪০ মাসের মাইনে বা ৮০,০০০ টাকা, যেটা সবচেয়ে কম সেই পরিমাণ টাকা ঋণ হিসেবে পেতে পারেন। আর 'ঘ' শ্রেণীর সভ্যরা যাদের বার্ষিক আয়ের সীমা ৩৬,০০০ টাকা তারাও ১২০০ স্কোয়ার ফুটের জমি বা বাড়ি তৈরির জন্য 'গ' শ্রেণীর সভ্যদের সম পরিমাণ অংকের ঋণ পেতে পারেন। যাদের বার্ষিক আয় ৩৬০০০ টাকার উর্ধ্বে তারা আবাসনের কোন ঋণ পাবেন না।

ওয়েসট বেংগল স্টেট কো অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন আবাসন সমবায় সমিতিগুলিকে যে ঋণ দেয় তার বার্ষিক সুদের হার ১৩%। কিন্তু সময় মত এই ঋণ পরিশোধ করলে ১%, রিবেট পাওয়া যায়। সভ্যরা সুদ সমেত এই ঋণ পরিশোধ করবেন ২০ বছরে, ৮০টি কিস্তিতে (ত্রৈমাসিক)। ঋণ ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কারিগরী সাহায্য, আইনগত পরামর্শ ও বাড়ি তৈরির মালমশলা সংগ্রহের শুলুক সন্ধান।

সমবায় আবাসন সমিতি গঠন ও ঋণের সুযোগ সুবিধার কথা বলার সংগে সংগে প্রাসংগিকভাবে একটি কথা এসে পড়ে। তা হল, কোন আবাসন সমবায় সমিতি বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি করছে এটা জেনে কেউ বাড়ি বা ফ্ল্যাটের জন্য টাকা জমা দিতে চাইলে ওই সমিতি সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নিয়ে সেটা করবেন। ওই আবাসন সমিতিতে কটি ফ্ল্যাট বা বাড়ি আছে, কত জন সভ্য রয়েছেন এবং টাকা জমা দিলে সভ্য হয়ে ফ্ল্যাট বা বাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এটা খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ আবাসন সমবায় সমিতি গঠন করে সুখে শান্তিতে আছেন এমন লোক যেমন বহু আছেন, তেমনি বাড়ি বা ফ্ল্যাটের জন্য টাকা জমা দিয়ে প্রবঞ্চিত হয়েছেন এবং সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। □

জলপাইগুড়ির মানুষের কি কোনদিন বন্যার হাত থেকে রেহাই নেই?

চিন্ময় ঘোষ

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে তো ডরাবেই। জলপাইগুড়িতে বন্যা শুনলেই বুকটা ঢিপ ঢিপ করে। যে কখনও জলপাইগুড়ি শহরে যায়নি, সেও যেন করলা নদীর করাল গ্রাস দেখতে পায়। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরের সেই বিধ্বংসী বন্যা আজও বিভীষিকা। টাপুর টুপুর বৃষ্টির শব্দ শুনলে শহরবাসীর মনে শিহরণ জাগায় না, শিউরে ওঠে।

বিলেতি জমানায় এই করলার কত দেমাক ছিল। জলপাইগুড়ির বনেদি নদী 'করলা'কে তখনও আদর করে বলত লণ্ডনের টেমস। এখন সেই করলা নামেই নদী, আসলে একটা বড়সড় নর্দমা। করলার বুকের ওপর জল ধোয়া মাটি, ঘর গেরস্থালির জঞ্জাল, আবর্জনা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। করলা আর বেগবতী নয়, শুধু নদী।

জল ছাপিয়ে শহর ভাসায়।

এই তো কদিন আগেই অবিরাম বৃষ্টি হল, করলা জমা জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে জল ধরতে পারল না, শহরের নিচু এলাকা ভাসিয়ে দিল। জুলাই-এর প্রথম পাঁচ দিনে বৃষ্টি হয়েছিল চার শ মিলিমিটার। জল জমেছিল কোথাও কোথাও ৫-৬ ফুট।

করলার জল তিস্তায় গিয়ে পড়ার কথা। ১৯৬৮ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর শহর ঘেঁষা তিস্তার পাড় শহরের বসতির চেয়ে উঁচু। করলার জল তিস্তা টানতে পারে না, বরং তিস্তার জল গিয়ে পড়ে করলায়। আর সেই জলে প্রতি বছর প্লাবিত হয় হাসপাতাল, সেনপাড়া, বাবুপাড়া, সমাজপাড়া ও কাছারি অঞ্চল।

বন্যার হাত থেকে শহরকে বাঁচানর জন্য নানা পরিকল্পনায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করাও হয়ে গেছে। তারপরও যদি শহর ভাসে, খড়-কুটোর মত স্রোতের টানে মানুষ উধাও হয়ে যায়, বাড়ি ঘর ধসে পড়ে, জীবনযাত্রা গতি হারায় তখন অতি জরুরি কাজ একটাই হাতে থাকে, তা হল পরিকল্পনায় কোন গলদ আছে কিনা খুঁজে বের করা। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের নামে জোড়াতালি দেওয়া, দায়সারা কাজ হয়েছে কিনা তা দেখা এবং সব শেষে অবিলম্বে স্থায়ী সমাধানের কাজে হাত লাগান।

জলপাইগুড়ি ছাড়া এ রাজ্যের এমন আর একটিও জেলাকেন্দ্র নেই যে শহরের ভিতর দিয়ে একটি নাতি-পরিসর স্রোতধারা প্রবাহিত। লোকে এক সময় শহরটাকে লনডনের সংগে তুলনা করে নদীটাকে বলত টেমস।

বিলেতি জমানায় চা বাগিচা মালিকদের এই জনপদটি ছিল যথেষ্ট আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন। শহরের এক প্রান্তে, তিস্তার তীর ঘেঁষে সিভিল লাইনস এরিয়া, রেসকোরস, অতিকায় বলডানস রুম সহ বিশাল দোতলা প্লানটারস ক্লাব, হারড কোরট টেনিস লন, হাতিশালা, ইমপেরিয়াল টোবাকো বিলডিংসের লালবাড়ি—সব মিলিয়ে একটা কড়া-মিঠে, সৌখিন-তাজা গন্ধে ভরা ছিল বাতাস।

রায়কত পাড়া, কদমতলা, দিনবাজার, বাবুপাড়া তো ছিল বাঙালি বাবুদের বসবাসের জায়গা। এঁরা উকিল-মোক্তার, চা বাগান মালিক ও কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও সরকারি আমলা।

তখন সবকিছুই যেন সুন্দর আর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আজকের এই হতকুচ্ছিত দুর্গন্ধযুক্ত করলারও সেদিন ছিল আরেক রূপ। রীতিমত পণ্যবাহী নৌকো চলাচল করত এই নদীতে। শহরের এক পুরনো

বাসিন্দা তাঁর প্রায় সত্তর বছরের স্মৃতিকথায় লিখছেন : 'বর্তমান স্থানে শহর পত্তনের জায়গাটি পছন্দ করা হল নানা কারণে। পূর্ব দিকে তিস্তা নদী, উত্তরে সুদৃশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা। শহরের ভেতর দিয়ে চলেছে কল্লা নদী সাহিত্যিক ভাষায় করলা। বোধহয় তখন কলকল করে স্রোত বইত। শহরের দক্ষিণ পূর্বে মিশেছে তিস্তা নদীতে। উত্তরপূর্ব থেকে ছোট ধরধরা মিশেছে করলার মাঝামাঝি জায়গায়। এই তিনটি নদী শহরকে করেছিল অতি সুন্দর। প্রায় ৫০ বছর আগে নদীগুলি ছিল অনেক কম চওড়া কিন্তু গভীর। জল ছিল স্বচ্ছ ঝকঝকে। নিচে বালি পাথর দেখা যেত। করলায় নৌকো চলত অনেক। তিস্তা করলার খোলা মুখ দিয়ে বহু দূর থেকে আসা নৌকো ভিড় লাগাত দিনবাজার কালীবাড়ি ঘাটে। ১৮৮৪ সালে একটি কাঠের পুল দিয়ে করলায় যাতায়াত হত। ১৯১৫ ১৬ সালে কাছারির কাছে হেঁটে যাবার আরেকটি পুল তৈরি হয়। কালা আদমি এতে পা দিতে পারত না।' জলপাইগুড়ি জেলাটির জন্ম কিন্তু ১৮৬৫ সালে। জলপাইগুড়ি পুরসভার জন্ম ১৮৮৫।

সেকালে শহরটিতে খালি জমি আর নালা নর্দমাই ছিল বেশি। মানুষের বাড়ি আর কটা বর্ষায় পথে কোন জল জমত না। করলা নদীর খাদ ছিল গভীর। প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও সব বাড়তি জল করলা দিয়ে তিস্তায় গিয়ে পড়ত।

১৮৭২ সালে শহরের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে ছ হাজার। ২৮ বছর পর অর্থাৎ ১৯০১ সালে তা বেড়ে মাত্র দশ হাজার। ১৯৪১ সালে আঠাশ হাজার, কিন্তু দেশ বিভাগের পর ক্রমশ জনসংখ্যা বেড়ে আজ শহর ও শহরতলি নিয়ে এক লাখের ওপর। এক কথায় শহরটার পরিধি বাড়ল এমন অস্বাভাবিকভাবে যার কোন তুলনা মেলে না। করলার দুই পাড়ে ঘন জঙ্গল কেটে মানুষের বসতি, রাস্তা, বাজার গড়ে উঠল। যত বসতি বাড়ে তত বাড়ে ন্যাড়া জমি। আর যত ন্যাড়া জমি তত ভূমিক্ষয়। সুতরাং জলধোয়া মাটি বালি, ঘর গেরস্থালির যাবতীয় আবর্জনা গত ৩৫ বছরের, তা সব তো করলাতেই আশ্রয় নিল। ওগুলো এক জায়গায় জমা করতে পারলে পাহাড় হয়ে যেত সন্দেহ নেই।

তবু রক্ষা পাওয়া যেত যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে এমন কমে না যেত, তিস্তা অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ বালি পাথর ঠেলে নিয়ে যেতে পারত। জলস্রোতের এই অক্ষমতার ফলে শহরের কোন কোন এলাকার জমি এখন তিস্তাগর্ভ থেকেও অনেক নিচু। এই অবস্থা সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা হচ্ছে, করলার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল আরও দক্ষিণে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ বাঁধ দিয়ে অর্থাৎ এখন তিস্তার সমান্তরাল হয়ে করলা প্রবাহিত হতে থাকল। এতে আপাতত শহরবাসী নিশ্চিন্ত হলেন

করলা'র চিত্র

ঠিকই, শহরের নিম্নাঞ্চলে জল জমার বিপদ অনেক কমে গেল কিন্তু করলার বুকে মজুত বালি, মাটি, আবর্জনা যে একদিন নিশ্চয়ই বিপদ ঘটাবে সে কথা হয়ত সেদিন গুরুত্ব

বন্যাঃ কী করেছি, কী [illegible]

এন ডি বাচেরা

দিয়ে বিচার করা হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে '৮২ সালের বর্ষা মোটামুটি ভালভাবেই কেটেছিল কিন্তু ঐ বছরের জুলাইতে একটানা ৫ দিনের বর্ষণ সব কিছু বিপর্যস্ত করে দিল।

এইবার দেখা যাক প্রকৃতপক্ষে করলা নদী এখন কী হয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের ভেতর কোন এক মজুত প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে করলার উৎপত্তি। প্রায় ৪০ কিলোমিটার আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আরও অনেক ছোট বড় ঝরণা নালার জল বয়ে শহরের একেবারে উত্তর প্রান্তে এসে বুক বুকা এবং চুক চুকা নামের দুটি স্রোতধারায় মিশেছে। এরপর হাসপাতালের কাছে আরেকটি ছোট স্রোত ধরধরা।

করলা দিয়ে এখন সারা বছর গড়ে ১৫ থেকে ২০ কিউসেক জল মাত্র প্রবাহিত হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর শহর পার হবার সময় সেই জলের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৭-৮ ফুটের বেশি থাকে না। বর্ষাকালে নদীর গভীরতা সর্বোচ্চ ৮-৯ ফুট আর অন্য সময় দেড় থেকে দু ফুট। ফলে বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে জলের গতিবেগ প্রায় নেই বললেই চলে। এই যৎসামান্য গতি নিয়ে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। বড় জোর রাশি রাশি আবর্জনা ও বালিমাটি ধীরে ধীরে তিস্তায় মেলবার মুখটাতে এসে জমা হতে পারে। তাই নদীর বুকে এখন ঘন কচুরিপানা থেকে শুরু করে নানা ধরনের লতা, গুল্ম, জলঘাস। সাধারণভাবে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের মজুত জলাশয়টি বর্ষার কয়েকমাস ছাড়া অন্য সময় প্রায় শুকনোই থাকে।

এক নজরে জলপাইগুড়ি রিজিয়নের বৃষ্টিপাত :

সাল		বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে সারা বছর	
১৯৬৩-৬৪		৪০০০	মিলিমিটার
১৯৭৭	–	৩২৭৫	মিলিমিটার
১৯৭৮	–	২১৬২	মিলিমিটার
১৯৭৯	–	২৮০০	মিলিমিটার
১৯৮০	–	৩১০০	মিলিমিটার
১৯৮১	–	২৬০০	মিলিমিটার

সুতরাং এমন আশা করা খুব বোকামি হবে যে একটানা বৃষ্টিপাত হলেই করলায় নতুন করে স্রোত আসবে আর সেই স্রোতে নদীর বুকে জমে থাকা জঞ্জাল ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। আসলে খুব বর্ষা হওয়া দরকার পাহাড়ে ও ফরেস্টে এবং তা অবশ্যই যেন সারা বছর সমতা রক্ষা করে। এখনকার মত বিক্ষিপ্ত বর্ষণে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি।

ধরে নেওয়া যাক, পরিবেশগত কারণে ভবিষ্যতে জলপাইগুড়ি রিজিয়নে বছরে গড়ে ৩০০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত কিছুতেই হবে না। তা হলে কি করলা এত বড় একটি শহরের কেবল বৃহৎ নর্দমা হয়েই থাকবে? মশা, মাছি, দুর্গন্ধ এবং সময় বুঝে জলস্ফীতির ফলে শহরটা ভাসতেই থাকবে? পরিবেশ সংরক্ষণের কারণেও কি এখন করলার আমূল সংস্কার সাধন প্রয়োজন নয়? সংস্কারের পর সেই জলের নিচে মাছ চাষ এবং ওপরে উন্নত জাতের হাঁস পালন কি খুব বেশি কষ্টকল্পনা? □

আলোকচিত্র : লেখক

রিগিং বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু করা : মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার

গণতন্ত্রের ছাউনির নিচে যে যুদ্ধ বাধে তা সাধারণত ব্যালট বাক্সে, সেখানে রক্তপাত হয় না – অন্তত হওয়ার কথা না। কেননা ব্যালট বাক্সের এ যুদ্ধে রাজায় রাজায় যে ঝগড়া হয়, তা মেটাবার জন্য মজুত থাকে উলুখাগড়ারাই। কিন্তু সময়ের দোলাচলে এখন এই ব্যালটযুদ্ধেও এত বেশি রক্ত ঝরতে শুরু করেছে যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে এই ছাউনির কাঠামোতেই বুঝি কোথাও ফুটি-ফাটা হয়ে গেছে, খুব বেশি দেরি না হতে হতেই সারিয়ে নেওয়া দরকার। হালফিলের আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর কিংবা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন এ ধরনের ভাবনা-চিন্তাকে রীতিমত দুর্ভাবনায় ঠেলে নিয়ে গেছে। আর এই দুর্ভাবনা নিয়ে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের বেশির ভাগ জনসাধারণের মত মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রামকৃষ্ণ ত্রিবেদীও রীতিমত শঙ্কিত। তিনি তাই সাংবিধানিক আইনবিধির নানান ফাঁক-ফোকর মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে নানান প্রস্তাব পেশ করেছেন। নয়া দিল্লির 'নির্বাচন সদন'-এ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের অফিসে বসে খোদ রামকৃষ্ণ ত্রিবেদী সাহেবের নিজের মুখ থেকেই শুনছিলাম তাঁর প্রস্তাব আর সুপারিশের কথা। প্রয়োজনমত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করছিলেন ষাটোর্ধ্ব বয়সের সৌম্যদর্শন আই এ এস অফিসার ত্রিবেদী সাহেব। 'নির্বাচন সদন'-এর দোতলায় একেবারে কোণার দিকে তাঁর অফিস ঘরে বসে প্রথমেই ত্রিবেদী সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম : 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে সাংবিধানিক সংশোধনের জন্য আপনি তো নানান প্রস্তাব করেছেন। সেগুলো কী কী একটু বিস্তারিত বলবেন কি?' খুব অল্প হলেও পরিপাটি বিন্যস্ত গোটা কয়েক রুপোলি চুলে হাত বুলোতে বুলোতে শ্রীত্রিবেদী জবাব দিয়েছেন :

'আসলে আমি বেশ অনেকগুলি প্রস্তাবই পেশ করেছি। আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি বলে যেটা মনে হয়েছে তা হল নির্বাচনে আসন সংখ্যা স্থির রেখে নির্বাচনকেন্দ্রগুলির সীমা নির্দিষ্ট করা। বিশেষত তফসিলী জাতি আর উপজাতিদের জন্য যেসব কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা আছে সেগুলির সীমা নির্দিষ্ট করা আগে দরকার। কেননা এগুলি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসছে। আমরা এ নিয়ে বহুবার নানান তরফ থেকে নানানভাবে শুনে আসছি যে এই কেন্দ্রগুলির এখন পরিবর্তন বা রোটেশন হওয়া উচিত। কিন্তু সাংবিধানিক শর্ত বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতে তো ২০০১ সালের সেনসাসের আগে কোনরকম কোন ডিলিমিটেশনের সুযোগই নেই। তাই আমি ডিলিমিটেশনের সপক্ষে সংবিধানের রদবদল করার জন্য সুপারিশ করেছি। দ্বিতীয়ত যে ব্যাপারটা নিয়ে জোর দিয়েছি সেটা হল নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কয়েকটি অসুবিধা নিয়ে। আর এই অসুবিধাগুলি মূলত সাংবিধানিক ত্রুটির জন্যই হচ্ছে। যেমন কমিশনের কর্মীরা কেউই ঠিক কমিশনের অধীন নয়। আমি বলতে চাইছি অন্যান্য কনসটিটিউশনাল এজেনসি যেমন পাবলিক সারভিস কমিশন, কমট্রোলার বা অডিটর জেনারেল কিংবা হাই কোরটের কর্মীদের মত অটোনমাস স্টাফ এই কমিশনেরও হওয়া দরকার। তা না হলে খুব অসুবিধা। একটা সেকুলার ম্যানেজমেন্ট না গড়ে তুলতে পারলে নির্বাচনের নানান গলতিগুলি শোধরান যাবে না। তৃতীয়ত যে ইস্যুটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে তা হল রাজনৈতিক দলগুলির সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা। সাংবিধানিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের বিচার করে দেখা প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলির প্রকৃত অবস্থিতি কোথায়? শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক দলগুলির সংজ্ঞা ঠিক করার পর সেই শর্তগুলি সম্পর্কেও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যার নিরিখে ইলেকশন কমিশনার রাজনৈতিক দলগুলিকে রেজিস্টার করতে পারবে। একটা রাজনৈতিক দল কোথা থেকে কীভাবে টাকা পাচ্ছে কিংবা টাকা খরচ করছে সেই সব খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার অধিকারও নির্বাচন কমিশনের থাকা দরকার। আমি অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করে সে সম্পর্কেই ইনটারেসটেড। কিন্তু নির্বাচনের সময় বা নির্বাচনের প্রয়োজনে একটা রাজনৈতিক দল কতটা টাকা খরচ করছে বা সে টাকা তারা কোথা থেকে জোগাড় করছে তার সঙ্গে সুষ্ঠু বা অবাধ নির্বাচনের একটা ডাইরেক্ট এফেক্ট রয়ে গেছে। আমি তাই এই নির্বাচনকেন্দ্রিক টাকা পয়সার উৎস বা খরচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার সাংবিধানিক ক্ষমতা দাবি করে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করেছি।' কিন্তু কেন্দ্র কি এ সমস্ত দাবি মেনে নেবেন – এরকম একটা আশঙ্কা স্বভাবতই জনগণের মনে প্রশ্ন তোলে, বিশেষত শ্রীত্রিবেদীর দাবিগুলি যখন রীতিমত সোচ্চার। তবে প্রায় ৪০ বছরের প্রশাসনিক রীতিনীতির অভিজ্ঞতায় শ্রীত্রিবেদী যেটুকু বুঝেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলতে পারেন, 'আমি এমনভাবে আমার প্রস্তাবগুলি পেশ করেছি যেগুলি অত্যন্ত কার্যকর আর দুর্নীতি রোধের বেসিক সলিউশনও বলা যায়

আমি যে প্রস্তাবগুলি পাঠিয়েছি তার মধ্যে কিছু কিছু মাত্র দিন দুই আগে ক্যাবিনেটের সমানে পেশ করা হয়েছে।'

প্রশ্ন : প্রধানত কোন কোন বিষয় নিয়ে ক্যাবিনেট কমিটি ভাবনা চিন্তা করছে, জানতে পেরেছেন কি?

শ্রীত্রিবেদী : হ্যাঁ, জানতে পেরেছি। এখনও অবধি দুটো ইস্যু নিয়েই ক্যাবিনেটে আলাপ আলোচনা চলছে। একটা হল ডিলিমিটেশন নিয়ে আর একটা হল আগামী নির্বাচনগুলিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু করা।

প্রশ্ন : ডিলিমিটেশন সম্পর্কে আপনার প্রস্তাবগুলি একটু বিস্তারিত করে বলবেন কি?

শ্রীত্রিবেদী : লোকসভা আর বিধানসভা এই দুই নির্বাচনেই ডিলিমিটেশন সম্পর্কে আমার প্রধান যা বক্তব্য তা হল সংরক্ষিত আসনগুলি রোটেট করা বা পরিবর্তন করা। দ্বিতীয়ত বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের সুযোগসুবিধা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আসনগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা উচিত বলে আমার মনে হয়। যেমন ধরুন, এখন বহু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে, প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে, নতুন নতুন জেলা তৈরি হয়েছে, যার ফলে কোন কোন নির্বাচনকেন্দ্র একটা জেলার বদলে দুটো জেলার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। হয়ত কোন বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রের যে জেলার আওতায় পড়ার কথা, প্রশাসনিক বিস্তৃতির দরুন তা অন্য এক জেলার অন্য এক মহকুমার আওতায় পড়ে গেছে। এখন এই ধরনের ব্যাপারগুলি সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির দরুন। কিন্তু তাতে নির্বাচন ব্যবস্থা খানিকটা অসুবিধা ভোগ করছে। এ জন্যই ডিলিমিটেশন বা সীমা নির্দিষ্ট করা একান্ত দরকার। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন বা নির্বাচনরীতির পরিবর্তনের মধ্যে সমতা আনতে হলে ডিলিমিটেশন অবশ্যই প্রয়োজন।

প্রশ্ন : আর ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু করার কথা হঠাৎ ভাবলেন কেন?

শ্রীত্রিবেদী : আমি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু করার ব্যাপারে প্রচন্ড উৎসাহী। এই উৎসাহের পেছনে নানান কারণ রয়ে গেছে। প্রথমত, এই ইলেকট্রনিক যন্ত্র চালু করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক খরচখরচাও অনেক কমে যাবে। তাছাড়া গোটা নির্বাচন পদ্ধতিটাই এত কম সময়ে হয়ে যাবে যে সেক্ষেত্রেও প্রচুর সময় ও অর্থ দুইয়েরই সাশ্রয় করা যাবে। আর সব চাইতে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হল নির্বাচন নিয়ে কোন গড়বড় হবে না। কোনরকম কোন রিগিং হবে না, কোন বুথ দখলের ঝামেলা পোয়াতে হবে না, ব্যালট পেপার নিয়ে কোন ঝক্কি থাকবে না। আর এই ব্যালট পেপার নিয়ে এত বেশি ঝুট-ঝামেলা পোয়াতে হয় যে এটা না থাকলে একটা বড় রকমের শান্তি পাওয়া যাবে। প্রথমত ব্যালট পেপারের জন্য কাগজ যোগাড় কর, তারপর কাগজ ছাপাও, তারপর সেই ছাপান ব্যালট পেপার পাহারা দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত কর – সে এক দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। কিন্তু ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু হলে এসব কিছু করতে হবে না। এমনকি ভোট নেওয়ার জন্য যে খরচ খরচা তাও অনেক কমে যাবে।

প্রশ্ন : কিন্তু এক একটা মেশিন কিনতেই তো কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে, তা হলে আর খরচ কমবে কীভাবে?

শ্রীত্রিবেদী : প্রাথমিকভাবে হয়ত বেশ কিছু টাকা ইনভেসট করতে হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখলে দেখা যাবে আখেরে লাভই হবে। এক একটা মেশিন কিনতে খরচ হবে পাঁচ হাজার টাকা। হিসেব করে দেখা গেছে সমস্ত দেশে এই যন্ত্র চালু করতে গেলে ইনিশিয়ালি ১৫৮ কোটি টাকা খরচ হবে। কিন্তু যদি শতকরা ৫০ ভাগ খরচ কেন্দ্র আর শতকরা ৫০ ভাগ খরচ রাজ্যগুলি বহন করে তবে কেন্দ্র বা রাজ্যগুলিকে ২৮ কোটি টাকা করে খরচার দায়িত্ব নিতে হবে। বিশ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বাজেট বা সমস্ত রাজ্যগুলির যৌথ বাজেট হিসেবে পঁচিশ হাজার কোটি টাকাকে বিবেচনা করলে এই আটাশ কোটি টাকা কিছু নয়। কিন্তু একটা নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যে সময়, তার জন্য যা খরচ, তা বেঁচে যাবে। উপরন্তু সমস্ত রকমের গড়বড় বা অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আর প্রাথমিকভাবে যে খরচ হবে তা যন্ত্র চালু হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই উঠে আসবে।

প্রশ্ন : এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলি কীভাবে ব্যবহার করা যাবে?

শ্রীত্রিবেদী : যন্ত্রের ব্যবহারও অত্যন্ত সোজা। যন্ত্রের মধ্যে দুটো বাকস গোছের থাকবে। একটা হল রেজিস্টারিং বকস আর অন্যটা হল ব্রেন বা কনট্রোল বকস। এই কনট্রোল বকস অপারেট করার জন্য একজন লোক থাকবেন এবং তিনি যতক্ষণ না ওই যন্ত্রের ওপর বসছেন ততক্ষণ কোন ভোট রেকর্ড করা যাবে না। এই রেকরডিং ব্যাপারটাও অত্যন্ত গোপনে হবে। যে ভোট দেবে তাকে একটা স্ক্রিন বা পর্দার আড়ালে যেতে হবে। পর্দার আড়াল থেকেই তিনি তাঁর পছন্দমত নির্বাচন প্রার্থীর প্রতীকের নিচের বোতামের ওপর চাপ দেবেন, তৎক্ষণাৎ কনট্রোল বকসে তাঁর ভোট রেকরড করা হয়ে যাবে। তিনি যদি একবারের বেশি দুবার বোতাম টিপতে যান, তবে মেশিন আপনা থেকেই তা বাধা দেবে। সেই ভোট রেজিস্টার করা যাবে না এবং কনট্রোল বকসে যে বসে থাকবে সে যতক্ষণ না আবার সুইচ চালু করবে ততক্ষণ পরবর্তী ভোটদাতা ভোট দিতেই পারবেন না। এখানে একেবারে ফুল প্রুফ বন্দোবস্ত করা আছে। কোনরকম কোন অবৈধ ভোট বা রিগিং থাকবে না, তুলনামূলকভাবে খরচও কমে যাবে। তাছাড়া এই যন্ত্র এত বেশি কার্যকর যে আধঘণ্টার মধ্যে কত ভোট পড়ল তা জানা যাবে মাত্র একটা বোতাম টিপেই। আমি খুব চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু করে দেওয়া যায়।

প্রশ্ন : ঠিক কবে নাগাদ চালু হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

শ্রীত্রিবেদী : আগামী তিন বছরের মধ্যে এটা চালু হবেই। তবে ট্রায়াল হিসেবে আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করে দেখা হবে।

প্রশ্ন : তার মানে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে বলে আপনি মনে করেন?

শ্রীত্রিবেদী : আমার মনে হওয়া নিয়ে কোন ব্যাপার নেই। অন্তর্বর্তী নির্বাচনের একটা সুযোগ রয়ে গেছে। যদি নির্বাচন হয় তবেই এই যন্ত্র ব্যবহার করা হবে।

প্রশ্ন : এই মেশিনগুলি কি বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে?

শ্রীত্রিবেদী : একেবারেই না। এই যন্ত্রগুলি কোনটাই বিদেশ থেকে আনা হবে না। সবগুলোই পুরোপুরি স্বদেশি। এক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই নিজেদের টেকনোলজির সাহায্যে উন্নত মানের যন্ত্র তৈরি করছি। এগুলির সংগে পশ্চিমী যন্ত্রগুলোর কোন মিল নেই। এই যন্ত্রে একসংগে ১২ জন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রয়ে গেছে। এমনকি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেদের পক্ষেও এ যন্ত্র ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন : তবে এই যন্ত্র চালু করার ব্যাপারে আপনারা গড়িমসি করছেন কেন?

শ্রীত্রিবেদী : এখন একটিমাত্র সমস্যার জন্য যন্ত্রগুলি চালু করা যাচ্ছে না। সেটা হল টাকা। সরকারি তরফ থেকে কোন রকম কোন বাধা-বিঘ্ন নেই।

প্রশ্ন : নির্বাচনে শাসকদল দলীয় স্বার্থে যেভাবে সরকারি সুযোগসুবিধার অপব্যবহার করে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

শ্রীত্রিবেদী : হাতে নাতে প্রমাণ না পেলে এ সম্পর্কে কোনরকম কোন মন্তব্য করা যায় না। যখনই যে দল গদিতে থাকেন, বিরোধীরা তাদের বিরুদ্ধে সরকারি সুযোগসুবিধা অপব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। কোন কোন সময় অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, কখনও কখনও দেখা যায় সমস্ত অভিযোগই ভুয়ো। তবে এইজন্য তো অবশ্য নির্দিষ্ট আচরণবিধিই ঠিক করা আছে। এই আচরণবিধি কে কতটা লংঘন করল, তা খতিয়ে দেখতে হবে। কোন কোন সময় এই খতিয়ে দেখার কাজটা হয়, বেশির ভাগ সময় হয়ই না।

প্রশ্ন : তবে যে দল ক্ষমতায় থাকেন, তারা তো খানিকটা সুবিধা পেয়েই থাকেন, তখন কি তারা সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার করেন না?

শ্রীত্রিবেদী : অ্যাকচুয়ালি সেই জনাই আমি এই কোড অব কনডাকট বা আচরণবিধিতে ঠিক বিশ্বাসী নই। আমার সুপারিশ ছিল যে এই আচরণবিধিকে যাতে একটা নির্দিষ্ট আইনের আওতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। যদি আইনভুক্ত হওয়ার পরও প্রমাণিত হয় যে সরকারি বন্দোবস্তকে এক্সপ্লয়েট করে পারটির কাজে লাগান হয়েছে তখন শাস্তি পাওয়ার বা শাস্তি দেওয়ার একটা রাস্তা খোলা থাকবে। নচেৎ শুধু আচরণবিধির হাল্কা নিয়মে কোন লাভই হবে না।

প্রশ্ন : নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফটো-আইডেনটিটি কারড চালু করবার জন্য অনবরত চেষ্টা চালান হচ্ছে কেন? এর ফলে লাভটা কী হবে?

শ্রীত্রিবেদী : ফটো-আইডেনটিটি কারড চালু করা গেলে নির্বাচন ব্যবস্থা অনেকখানি সুষ্ঠু করা যায়। এই ফটো-আইডেনটিটি কারড চালু করার প্রধান উদ্দেশ্যই হল দুর্নীতি রোধ করা। কিন্তু ইতোমধ্যে সিকিম, মেঘালয় আর নাগাল্যানডে এই স্কিম চালু করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেখানে দুর্নীতির যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। আমরা পরীক্ষা করেও দেখেছি যে এই দুর্নীতির অভিযোগ বহুলাংশেই ঠিক। তা ছাড়া এই কারড চালু করার ব্যাপারে আর একটা মুশকিল আছে, তা হল খরচ। একটা কারডের পেছনে অন্তত ২ টাকা খরচ তো হবেই। কিন্তু তাও সব জায়গায় সমান নয়। সিকিমে যে কারড ২ টাকায় পাওয়া যাবে, নাগাল্যানডে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৫ থেকে ৭ টাকায়। এখন ৩০ কোটিকে ৭ দিয়ে গুণ করলে দেখা যাবে তা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ২১০ কোটি টাকার মোট খরচে। এখন এই ২১০ কোটি টাকা খরচ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমার নিজস্ব ধারণা দুর্নীতি খুব অল্প জায়গায় হয়। আর নির্বাচন প্রতিনিধি বা রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেরা যদি একটু বেশি সচেতন হন তা হলে দুর্নীতি খুব একটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। কাজেই ফটো-আইডেনটিটি কারড চালু করার খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন : কিন্তু রিগিং বন্ধ করার জন্য কি এই কারড চালু করা আবশ্যিক নয়?

শ্রীত্রিবেদী : রিগিং হল গিয়ে মাসল পাওয়ারের অপব্যবহার। রিগিং মানে আপনি পোলিং বুথে গিয়ে মিঃ বাসু কিংবা মিঃ ত্রিবেদীকে বললেন, হঠো হিঁয়াসে, আমি দেখছি কে কত ভোট দিল, তোমায় কিছু দেখতে হবে না। আপনি ব্যালট বাকস নিজের দখলে নিয়ে নিলেন, সিল ভেঙে নিজের পছন্দমত ব্যালট পেপার পুরে দিলেন, বাস হয়ে গেল। পুরো বুথটাই আপনার দখলে। ফটো-আইডেনটিটি কারড সেখানে মাসল পাওয়ারের সংগে কী করে যুঝবে?

প্রশ্ন : জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে গণ্ডগোল বাড়তে দিয়েছে বলে যে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে সে সম্পর্কে কী বলবেন?

শ্রীত্রিবেদী : এমনিতে অনেক অভিযোগই শোনা যাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনের পর থেকে। তবে নির্বাচনের সময় যতটা গণ্ডগোল হয়েছে, বলে ফলাও করে ছাপা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে অতটা হয়নি বলেই আমার ধারণা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে গণ্ডগোল হয়নি এই তো রাজ্য সরকার অভিযোগ করছেন যে ত. প্রয়োজনমাফিক পুলিশী সাহায্য পাননি, অথচ অন্যদিকে সাধারণ জনগণের বক্তব্য, গণ্ডগোল বাধার পরও প্রয়োজনের সময় রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ নিয়োগ করেননি। কাজেই বুঝতে পারছেন, এ ধরনের উভয়মুখী অভিযোগ থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা ভীষণ মুশকিল। আমি অবশ্য জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারটা ভালভাবে খতিয়ে দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলেছি সরজমিন ঘুরে দেখতে।

কথা বলতে বলতে শ্রীত্রিবেদীর মুখে একটা ক্ষীণ হাসির আভাস ফুটে উঠছিল। এরকম গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকে এ ধরনের হাসির অতর্কিত আবির্ভাবে খানিকটা অবাক হলাম। অবশ্য রহস্য ঘোচালেন ইলেকশন কমিশনার সাহেব নিজেই, 'হাসছিলাম কেন জানেন তো। এই আপনার সংগে কথা বলতে বলতে কত সহজেই নানান সমস্যার সমাধান আমরা করে ফেলতে পারছি, তাই না? কিন্তু ইন প্র্যাকটিস এই ব্যাপারগুলো কি এত সহজেই হয়? নাকি হওয়া সম্ভব হয়? আসলে কী জানেন ব্রাে. আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যতক্ষণ না সমাজের নৈতিক উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতি, অনাচার আর অবৈধ ব্যাপার স্যাপার চলতেই থাকবে। আনলেস দ্য মরাল স্ট্যাচিওর অব দ্য সোসাইটি ইজ রেইজড, ইওর ইলেকশনস উইল নেভার বি ফেয়ার অ্যানড নিট। আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য কী আদর্শ খাড়া করে রাখছি বলতে পারেন?

এই অমোঘ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলেনি। ঘরের বতাস ভারী হয়ে উঠেছে লজ্জাকর এক মৌনতায়। নিঃশব্দ বাতাবরণ ভেদ করে জন্ম নেয়নি কোন সাহসী জবাব। এরপর নতুন কোন প্রশ্নও ভরসা পায়নি মাথা তুলে দাঁড়াবার। ফলে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে আসতে হয়েছে।□

সাক্ষাৎকার : দিব্যজ্যোতি বসু

আলোকচিত্র : তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

জানতে চাই জানাতে চাই

প্রশ্ন : আমি শুনেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে নতুন পাঁচ বছরের কোরস চালু হচ্ছে। যদি তা সত্যি হয় জানাবেন এবং কোন্ মাসে ভর্তি শুরু হবে ও অন্যান্য নিয়ম জানাবেন।

–জয়ন্তী বিশ্বাস, গৌহাটি, আসাম।

উত্তর : হ্যাঁ' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বছরের নতুন আইনের কোরস শুরু করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন, তবে এখনও পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। প্রস্তাব গৃহীত হলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।

প্রশ্ন : পশ্চিমবংগে কোথায় কোথায় এল এল বি অর্থাৎ আইন স্নাতক পাঠক্রম পড়ান হয়? কী যোগ্যতা দরকার ও অন্যান্য বিষয় জানতে চাই।

–মলয়কুমার মণ্ডল, উলুবেড়িয়া।

উত্তর : পশ্চিমবংগে মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই আইন পড়ান হয়। কলকাতার আইন কলেজগুলির নাম হল–১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল'কলেজ, কলেজ স্ট্রিট ২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল'কলেজ, হাজরা ৩। সুরেন্দ্রনাথ ল'কলেজ ৪। যোগেশ চৌধুরী ল'কলেজ ৫। সাউথ ক্যালকাটা গারলস কলেজ। এ ছাড়া উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ল'কলেজ আছে। এই সব কলেজে ভর্তির জন্য কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে ভর্তি শুরু হয় ডিসেমবর নাগাদ।

প্রশ্ন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'এর ছাত্রী। ডাক যোগে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম কম পড়তে চাই। অবশ্য আমি বি কম পাশ করেছি। আবেদন-পত্র কোথায় পাব, কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করব? এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের কি শুধু সিলেবাস জানিয়ে দেওয়া হয়, নাকি বই-পত্তর পাঠান হয়? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে ভীষণ উপকৃত হব।

–সুমিতা মুখোপাধ্যায়, শ্যামনগর।

উত্তর : আপনি এই ঠিকানায় রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যোগাযোগ করুন–ইউনিভারসিটি অব রাজস্থান, গান্ধীনগর, জয়পুর –৪, পিন–৩০২০০৪, রাজস্থান। ইংরাজিতে চিঠি লিখে ওদের নিয়মাবলী ও ভর্তির ফরম চেয়ে পাঠান। সাধারণত সব ডাকযোগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই সিলেবাস এবং উত্তরাংশ বা পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে, অনেক ক্ষেত্রে বাজার থেকে বইপত্র কিনে নিতেও হয়। ডাকযোগেই তাঁরা কতকগুলি প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন কিন্তু মূল পরীক্ষাগুলি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কিংবা তাঁদের নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে দিতে হয়।

প্রশ্ন : 'পরিবর্তন' পত্রিকায় জনমত বিভাগে যে 'পত্র বিতর্ক' অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার বিষয়বস্তু আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না। অনুগ্রহ করে জানাবেন, কীভাবে পত্রবিতর্কের বিষয়বস্তু জানা যায়?

–সুব্রত ব্যানারজি, সিউড়ি, বীরভূম।

উত্তর : সাধারণত পরিবর্তনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'নিবেদনমিদং' কলমেই পত্রবিতর্কের বিষয়বস্তু ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : শুনলাম সাধক সীতারামদাস ওংকারনাথ তিরোধানের কিছু দিন আগে বালক ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন, এটা সত্য না মিথ্যা জানালে বাধিত হব।

–অনাথনাথ পাল, বর্ধমান।

উত্তর : ঠাকুর ওংকারনাথ আশ্রমের প্রধান কার্যালয় মহামিলন মঠের সংগে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন : আমি সান্ধ্য কোরসে কমপিউটার সায়েনস, ডাটা প্রসেসিং ও কমপিউটার প্রোগ্রামিং পড়তে ও শিখতে চাই। কোন কোন কলেজে বা ইনসটিটিউশনে উপরোক্ত বিষয়গুলি পড়ান হয় জানালে এবং পূর্ণ বিবরণ দিলে বাধিত হব।

-কৌশিক দাশগুপ্ত, কলকাতা ৪০

উত্তর : আপনি পরিবর্তন পত্রিকার ২০ এপরিল ১৯৮৩ সংখ্যা দেখুন। ঐ সংখ্যায় এই বিভাগে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঠিকানা ও তথ্য দেওয়া হয়েছে। আপনি বরানগরের আই এস আই (সান্ধ্য বিভাগ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সংগে যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন : উত্তরবংগে লাইব্রেরি সায়েনস পড়ার কোন সরকারি বা নির্ভরযোগ্য সংস্থা আছে কি? থাকলে পুরো নাম ঠিকানা জানাবেন এবং দয়া করে বলবেন কোন সময়ে ভর্তি হয়।

–পাপিয়া চন্দ, দার্জিলিং ও দিলীপ সরকার, ময়নাগুড়ি

উত্তর : উত্তরবংগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রটি হচ্ছে বি এল এ'র উত্তরবংগ শাখা। ঠিকানা– বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, প্রযত্নে: বংগীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং। এখানে ভর্তির জন্য সাধারণত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় জানুয়ারি মাসে এবং ফরম দেওয়া শুরু হয় সাধারণত ঐ জানুয়ারি ফেবরুয়ারি মাসে। এ ছাড়া আপনারা উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : শুনেছি কলকাতায় বাউল গানের ও নাচের একটা স্কুল হয়েছে, ঠিকানাটা জানতে চাই।

নূপুর চক্রবর্তী, দমদম পারক, ও মুক্তিনারায়ণ ব্যানারজি, খড়দহ।

উত্তর : পূর্ণদাস বাউলের নবগঠিত বিদ্যালয়ে বাউল গান ও নাচ শেখান হয়। ওঁদের ঠিকানা–৫৯/১, মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা।

প্রশ্ন : এম এল এদের এবং এম পিদের কাছে চিঠি লিখতে হলে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করব?

–গণেশ চন্দ্র বল ও জয়দেব বল, চিত্তরঞ্জন।

উত্তর : এম এল এ অর্থাৎ রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের সংগে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভা ভবন। কারণ সব বিধানসভা অফিসেই সেই রাজ্যের বিধানসভা সদস্যদের নাম ঠিকানা সব থাকে। ঠিক একই রূপ ব্যবস্থা আছে দিললির পারলামেনট ভবনে এম পিদের জন্য। তবে নামেরপাশে এম এল এ অথবা এম পি–এটা লিখতেই হবে, সম্ভব হলে তাঁর এলাকা বা নির্বাচন কেন্দ্রের নাম। পশ্চিমবংগের ক্ষেত্রে বিধানসভা ভবন, কলকাতা–১, এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই হবে।

প্রশ্ন : বিবিধভারতীর 'মনের মত গান' অনুষ্ঠানের ঠিকানা জানতে চাই।

–ভবসিন্ধু দাস, সন্দেশখালি।

উত্তর : আকাশবাণী, কলকাতা, বিবিধভারতী, 'মনের মতো গান' বিভাগ, ইডেন গারডেন, কলকাতা–১।

প্রশ্ন : লাইব্রেরি সায়েনস ডিপলোমা বা ডিগ্রির জন্য কোথায় যোগাযোগ করব?

–শ্যামল কুমার পাত্র, তারাতলা ও শ্রাবণী সাহা, লেকটাউন, কলকাতা।

উত্তর : এই বিষয়ে গত বছর ১৭ নভেমবর, ১৯৮২ সংখ্যায় পরিবর্তনের এই কলমে লেখা হয়েছিল।

প্রশ্ন : বাজারে এখন সারা বছর আমরা একটা সবজিকে খুব দেখি এবং কিনি। তার নাম পটল। 'পটল তোলা' আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সবজি হিসাবে এর গুরুত্ব কী?

–উজ্জ্বল, শ্যামল ও সুমনা গংগোপাধ্যায়, ত্রিবেনী, এবং শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা।

উত্তর : পটলকে এভাবে উপেক্ষা করবেন না, খাদ্য হিসাবেও পটল খুবই উপকারী। এর বৈজ্ঞানিক নাম ট্রাইকোজ্যানথিস ডাইওইকা। এতে আছে প্রোটিন শতকরা ২ ভাগ, স্নেহ পদার্থ ০.৩ ভাগ, তন্তু ৩ ভাগ, বিভিন্ন কারবোহাইড্রেট ২.২ ভাগ, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ০.৫ ভাগ, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, জলীয় পদার্থ ৯২ ভাগ। পটল সহজপাচ্য, রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, তাই রোগীর পথ্য হিসাবে পয়োজনীয়।

বিজ্ঞাপনের ওপর যে সব কোরস পড়ান হয় তার ঠিকানা জানতে চাই। এই সংগে অন্যান্য তথ্যগুলো জানাতে অনুরোধ করছি।–শংকর ঘোষ, তপন ঘোষ।

শুধু মাত্র বিজ্ঞাপন বিষয়ক কোরসের প্রধান কেন্দ্র দিললি। ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত আই আই এস সি। শুধু ভারত নয় ভারতের বাইরেও এই সংস্থার যথেষ্ট মর্যাদা আছে। পুরো নাম ঠিকানা হল ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব ম্যাস কমিউনিকেশন, ডি–১৩, সাউথ একসটেনশন পারট টু, নিউ দিললি–১১০০৪৯। কলকাতাতেও একটি সংস্থা আছে।

এই কোরসটি নয় মাসের, শুরু হয় সাধারণত আগসট মাসে। প্রার্থীর বয়স ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। এটা পোসট গ্রাজুয়েট ডিপলোমা কোরস। সুতরাং কমপক্ষে শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোন শাখার গ্রাজুয়েট। শুধু তাই নয় মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নমবর যাদের আছে একমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবে।

কলকাতায় যে সংস্থাটি আছে সেটি বেসরকারি। নাম ও ঠিকানা :– ভারতীয় বিদ্যাভবন, কলেজ অব কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড ম্যানেজমেনট, বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন বিলডিং, ৫৯ এ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা–১৯। যে কোন শাখার গ্রাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কোরসটি শুরু হয় জুলাই মাস নাগাদ।

উত্তর দিয়েছেন : কুমারেশ চক্রবর্তী।

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোলারিস

কাটা-কাটা স্বর ইন্দ্রনাথের।

ওয়ান-নাইন-সেভেন ডায়াল কর। ডাইরেকটরি এনকোয়ারি। ঐ ঠিকানায় কোন টেলিফোন আছে কিনা জিজ্ঞেস কর। থাকলে ফোন করে জেনে নে বাসন্তী গুপ্ত ওখানে কাজ করে কিনা।

দেবনাথ স্পষ্টত বিরক্ত হল ইন্দ্রনাথের এ-হেন কণ্ঠস্বর শুনে।

হুকুম তামিল করার পর কিন্তু পালটে গেল

লেদার ফ্যাকটরি ?

দেদার ফ্যাকটরি ?

চামড়া! চামড়া! চামড়ার কারখানা তো এটা ?

চামড়ার কারখানা ! কে আপনি।

ভ্রূকুটির জায়গায় এল বিহ্বলতা।

আমি লালবাজার থেকে বলছি ......এটা রাধানাথ মল্লিক লেন তো ?......চামড়া কারখানা নয় ?....

কস্মিনকালেও ছিল না ?.... রায় বাহাদুর তারানাথ শিকদারের বাড়িতে কোন কারখানা ছিল না....থাকবেও না ?....আপনি তাঁর ছেলে ?

....বাসন্তী গুপ্ত বলে কোন ভদ্রমহিলাকে চেনেন ?.... জীবনে নাম শোনেননি ?.... থ্যাংকিউ....ছাড়লাম।

মাত্র নব্বই মিনিটে পৃথিবী পরিক্রমা করবেন ভারতীয় নভোচারী

নয়া দিল্লি থেকে
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী বছর (১৯৮৪) ইনদো-রুশ যৌথ চুক্তিমত মহাকাশে পাড়ি দেবে অন্যান্য রুশ মহাকাশচারীদের সংগে একজন ভারতীয় নভোচারীও। সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার ব্রেজনেভ স্টার সিটিতে ইউরি গ্যাগারিন সেনটারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন দুজন ভারতীয় মহাকাশচারী, উইং কমানডার রবীশ মালহোত্রা ও স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। এই দুই নভোচারী সোভিয়েত রাশিয়ায় তাদের প্রথম পর্যায়ের ন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে মাস দুয়েকের ছুটিতে দেশে এসেছেন। ছুটি কাটাতে ঘুরে বেড়াবেন দিললি, বোমবাই, বাংগালোর, কলকাতা ছাড়াও অন্যান্য আরও কয়েকটা শহরে। দিললির রাষ্ট্রপতি ভবনের সংলগ্ন সাউথ ব্লকে সাংবাদিকদের সংগে মিলিত হবার পর সুযোগ হয়েছিল নিভৃতে রবীশ আর রাকেশের সংগে কথা বলবার। মহাকাশে ওড়বার জন্য কীভাবে তৈরি হচ্ছেন ওঁরা, কিংবা দীর্ঘ ন মাস ধরে কী ধরনের ট্রেনিং হল, এসব নানান তথ্য জানা গেল এই একান্ত সাক্ষাৎকারে।

উইং কমানডার রবীশ মালহোত্রা আর স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা দুজনেই ঠিক একই রকমের ট্রেনিং নিলেও প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে ওড়বার সুযোগ পাবেন ওদের মধ্যে যে কোন একজন। সংগে থাকবে অন্য দুজন রুশ মহাকাশযাত্রী। এই মহাকাশযাত্রায় দুটি মহাকাশযান ব্যবহার করা হবে। একটা হল সোইয়ুজ আর অন্যটা স্যালিয়ুট। স্যালিয়ুট মহাকাশযানে মূলত নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান হবে। এটা আকারে সোইয়ুজের চাইতে অনেক বড়। নানান যন্ত্রপাতি সমেত পৃথিবীর থেকে পাঁচ-ছশ কিলোমিটার ওপরে ঘুরে বেড়ালেও স্যালিয়ুটকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পৃথিবীর মাটি থেকেই। পৃথিবীর মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে বোতাম টিপে স্যালিয়ুটের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সোইয়ুজ মহাকাশযানে চেপেই হয় রাকেশ না হয় রবীশ মহাকাশে পাড়ি দেবেন। সেকেনডে আট কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন সোইয়ুজের জন্য মহাকাশে অপেক্ষা করে থাকবে স্যালিয়ুট। মস্কো থেকে কয়েকশ কিলোমিটার দূরের পৃথিবী বিখ্যাত মহাকাশ [illegible] কেন্দ্র [illegible] [illegible] ঠিক যে মুহূর্তে

সোইয়ুজ মহাকাশের পথে যাত্রা করবে ঠিক সেই সময়টা জানিয়ে দেওয়া হবে স্যালিয়ুটকে। সময়ের হিসাব নিকাশ করে স্যালিয়ুট তৈরি হয়ে থাকবে কখন সোইয়ুজ এসে পৌঁছয় তার অপেক্ষায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করে আছে উইং কমানডার রবীশ মালহোত্রা আর স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা দুজনেই। ওদের দুজনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

পরিবর্তন : রাশিয়াতে আপনাদের প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর দিলেন উইং কমানডার রবীশ মালহোত্রা।

রবীশ : প্রথমে আমাদের শিখতে হল রুশ ভাষা। কারণ আমাদের প্রশিক্ষক রুশ ভাষাতেই প্রশিক্ষণ দেবেন এবং যন্ত্রাদির পরিচয় ও নির্দেশ সবই রুশ ভাষায়। এ ছাড়া নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি ও কারিগরী সম্পর্কে পড়াশুনোও করতে হবে রুশ ভাষায়। তত্ত্বগত বিষয় ছাড়াও আমাদের ব্যায়াম ও শারীরিক চর্চাও করতে হত। যেমন সকালে উঠেই তিন কিলোমিটার জগিং, টেনিস, সাঁতার ও ব্যায়াম ইত্যাদি। যে মহাকাশ গবেষণাগারে আমরা প্রশিক্ষণ নিই সেখানে 'সোইয়ুজ' এর আকৃতিতে একটি মহাকাশযান রাখা আছে। বলতে পারেন প্রশিক্ষণের জন্য রাখা এটি একটি নকল সোইয়ুজ। মহাকাশের যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই, সেখানে আমরা কীভাবে গবেষণার কাজ চালাব এই সোইয়ুজে আমরা তার প্রশিক্ষণ নিই। আবার একটি উড়ন্ত গবেষণাগারেও আমরা প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এই গবেষণাগারটিকে বৈজ্ঞানিক কারিগরীর সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণহীন করা হয়েছিল। নকল স্যালুয়েটের সংগেও আমাদের পরিচয় হয়।

পরিবর্তন : আপনাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে কী কী প্রশিক্ষণ নিতে হবে?

রবীশ : এবার সোভিয়েতে ফিরে গিয়ে আমরা দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ নেব। এই পর্যায়ে সোইয়ুজের ভেতর সাধারণ এবং আপৎকালীন অবস্থায় কাজকর্মের পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ নেব আমরা। এছাড়া সোইয়ুজ চালনা, সোইয়ুজকে মহাকাশে অপেক্ষারত স্যালুয়েটের সংগে যুক্ত করা, যুক্ত হওয়ার পর সোইয়ুজ থেকে স্যালিয়ুটের ভেতরে যাওয়া, আবার স্যালয়ুট থেকে সোইয়ুজকে আলাদা করে সোইয়ুজের ভেতরে প্রবেশ করা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ হবে।

পরিবর্তন : মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় কেমন অনুভূতি হয়?

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর রাকেশ উত্তর দিলেন।

রাকেশ : মনে হয় আমরা বুঝি পাখি হয়ে গেছি। গবেষণাগারের

ছাদ ও মেঝের মাঝখানে ভাসছি। একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিশেষ চেষ্টা না করেই ভেসে যেতে পারি। মৃদু ধাক্কায় গোটা মহাকাশ-যানের একধার থেকে অন্যধারে ভেসে যাই।

পরিবর্তন : মহাকাশযানের আকৃতি কত বড়?

রাকেশ : দৈর্ঘে সাত ৭ প্রস্থে ৬.৮ মিটার।

পরিবর্তন : এই মহাকাশযাত্রার মূল লক্ষ্য কী?

রবীশ : মূল লক্ষ্য, মহাকাশে নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। মাধ্যাকর্ষণহীনতায় ওষুধ-পত্র, বস্তুবিজ্ঞান (Material Science) এবং রিমোট সেনসিং-এর পরীক্ষা করা।

পরিবর্তন : আপনারা নিজেদের শারীরিকভাবে উপযুক্ত রাখতে কী করেন?

রাকেশ : আমরা বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করি। আমাদের প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ আরম্ভই হত শারীরিক উপযুক্ততা বিষয়ক অধিবেশনে। যেমন ধরুন প্রথমেই তিন কিলোমিটার জগিং, ৪৫ মিনিট ধরে টেনিস খেলা। সাঁতারও ছিল আবশ্যকীয়। এ ছাড়া ভারোত্তোলনও করতে হত।

পরিবর্তন : মহাকাশেও কি এই ধরনের ব্যায়ামাভ্যাস বজায় রাখবেন?

রবীশ : নিশ্চয়ই। আমাদের এই দৈনিক ব্যায়াম মহাকাশেও চালিয়ে যেতে হবে শরীরকে উপযুক্ত রাখার জন্য।

পরিবর্তন : এই যে সাত দিনের মহাকাশযাত্রায় যাবেন মাঝে মাঝে ভয় কিংবা আতংক হয় না?

রবীশ : (হেসে) না, মোটেই না। দেখুন আমরা এমন প্রশিক্ষণ পাচ্ছি যে, মহাকাশে যদি কোনও বিপদ আসে তবে তা থেকে আমরা সহজেই মুক্তি পেতে পারব। যেমন এবার ভারতে ছুটিতে আসার ঠিক আগেই সমুদ্রে পড়ে গিয়েও বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণ নিয়েছি। অর্থাৎ কোন আপৎকালীন অবস্থায় যদি মহাকাশযান সমুদ্রে পড়ে যায়, তখন মহাকাশযান থেকে কী করে বাইরে বেরিয়ে সমুদ্রে বেঁচে থাকতে পারা যায় সেই পদ্ধতির প্রশিক্ষণই নিয়েছি।

রাকেশ : প্র্যাকটিক্যালি মহাকাশযান চালনায় ভুল করার সম্ভাবনা এত কম যে আমাদের সাধারণ বিমান চালানোর চেয়ে মহাকাশযান চালনা অনেক বেশি নিরাপদ। এমনকি রাস্তায় একটা মোটরগাড়ি চালানোর চাইতেও কম বিপজ্জনক।

পরিবর্তন : মহাকাশে কী ধরনের খাবার খাবেন?

রবীশ : আমাদের সৌভাগ্য যে, সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের দেশ থেকেই আমাদের জন্য খাবার যাবে। যদিও খাবারের মেনু এখনও কিছু ঠিক হয়নি। কিন্তু আমাদের সকলেরই খাবার হবে শুকনো এবং ভারী (সলিড)। তা না হলে মহাকাশে টিন থেকে খাবার বেরিয়ে শূন্যে ভাসতে থাকবে। কিসে করে খাবার যাবে এবং তার আকৃতি কী হবে তা ঠিক হবে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী।

পরিবর্তন : ভারত-সোভিয়েত যুক্ত মহাকাশযাত্রায় আপনাদের দুজনের মধ্যে একজনকে নেওয়া হবে। অন্য জন থাকবেন অপেক্ষমাণ। যিনি যেতে পারলেন না তাঁর কি আশাভংগ হবে না?

রবীশ : আমার জানা নেই এই ধরনের যাত্রায় যে যেতে পারলেন না তাঁর কোন আশাভংগ হয় কিনা। আমার মনে হয় না এতে আমাদের কারও আশাভংগ হবে। কার্যত প্রথম থেকেই আমাদের প্রশিক্ষণ ছিল চারজনের যুক্ত প্রয়াস। রাকেশ এবং আমাকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংগে ছিলেন দুজন মহাকাশচারী। আমরা প্রথম থেকেই জানি, আমাদের মধ্যে থেকে একজনকেই মহাকাশযাত্রায় নেওয়া হবে। এবং আমরা তাতে সম্মত হয়েই প্রশিক্ষণে যোগ দিয়েছি।

পরিবর্তন : মহাকাশযানের গতি-বেগ কত?

রাকেশ : মাটি থেকে শূন্যে ওঠার গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৮ কিলোমিটার। সুতরাং প্রতি নব্বই মিনিটে পৃথিবী পরিক্রমা করতে পারব।

কথা শেষ করে উঠতে উঠতে উইং কমানডার খানিকটা অবাঙালি ঘেঁষা বাঙলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো বাঙালি?' ওঁদের মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা শুনেও অতটা অবাক হইনি যতটা এই প্রশ্নের আকস্মিকতায় হলাম। আমার মুখের চেহারা দেখে রহস্য ভাঙলেন রাকেশ শর্মা 'রবীশ তো কলকাতার ছাত্র। কলকাতার খিদির পুরের সেনট টমাস স্কুল থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেছে।

রবীশ মালহোত্রা সম্পর্কে আরও জানা গেল যে ওর জন্ম অধুনা পাকিস্তানের লাহোর শহরে ১৯৪৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর। ১৯৫৯ সালে এয়ার ফোরস ক্যাডেট হিসেবে খরকভাসলা ন্যাশনাল ডিফেনস অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে তিনি ১৯৬৩ সালে কমিশন পান, সেই থেকে রবীশ পর পর ১৮টি অপারেশন করেছেন দক্ষতার সংগে। ১৯৬৪তে অ্যাডভানস ওয়েপন কোরস নেয় আমেরিকায় এফ ৮৬, টি ৩৩ জংগী বিমানে। এ ছাড়া ১৯৭০-এ ফ্লাইং ইনসট্রাকশন কোরস, ১৯৭৪-এ এক্সপেরিমেনটাল পাইলট কোরস নেয় আমেরিকায়। ৪০ রকমের যুদ্ধবিমান তিনি দক্ষতার সংগে চালনা করেছেন। যেমন ভ্যামপায়ার, এফ ৮৬, টি ৩৩, প্যানথম, এফ-৪, টি-৩৮, এ-৭, এ-৩৭, বি-৩২, এফ-১০০, মিগ ২১, সুখোই-৭। এখন পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে ৩৪০০ ঘণ্টা আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

রাকেশের একনাগাড়ে আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা ১৬০০ ঘণ্টা। দুই নভোচারীর মধ্যে রাকেশই বয়সে ছোট। ১৯৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারি প্যানজাবে রাকেশের জন্ম। নিজের জন্মের তারিখ বলতে বলতে হেসে উঠেছে রাকেশ শর্মা : 'আমি কিন্তু 'আনলাকি থারটিনে' বিশ্বাস করি না। আর যদি 'থারটিন' সংখ্যাটা 'আনলাকি'ও হয়, তবে বলতে পারেন আমি তা ভুল প্রমাণ করেছি।' এ কথা অবশ্য রাকেশের মুখেই মানায়। কেননা ১৯৭১-এর যুদ্ধে ২১ বার দক্ষতার সংগে মিগ চালান, কিংবা ভেরিয়ান্টস, এইচ এস-৭৪৮, হানটার, ইসকারা, মারুট, এইচ পি টি ৩২-এর মত জংগী বিমানগুলি চালানর ছাড়পত্র যেদিন রাকেশ পায় সে দিনটাও ছিল ১৩ তারিখ। ওই ১৩ তারিখেই ভারতীয় বিমানবাহিনীতে 'কমিশন' পায় রাকেশ। বিমান চালান ছাড়াও রাকেশের অন্যতম হবি হল ক্রিকেট খেলা। ইনটারভিউ চলাকালীন বার-বারই উনি মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন, 'সন্ধেবেলা প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।' প্রধানমন্ত্রীর সংগে কথা বলতে পারাব গৌরবতো আছেই, কিন্তু রাকেশের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হল 'আমার প্রিয় ক্রিকেটারদের সংগেও ওখানে দেখা হবে, কথা হবে। কপিল আমার অত্যন্ত ফেভারিট প্লেয়ার।'

মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রস্তুত দুই নভোচারী ঠিক ওই মুহূর্তে শিশুর মত হেসে উঠলেন। প্রিয় ক্রিকেটারদের সংগ, উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দুর্লভ সাহচর্য পাবার জন্য ওঁরা রীতিমত ছটফট করছিলেন। তাই করমর্দন করে আর শুভেচ্ছা জানিয়ে উঠে এলাম। □

আলোকচিত্র : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে

শিলাদিত্য

১৬ আগস্ট সংখ্যায় কয়েকটি বিশেষ রচনা

সম্পাদক : বিমল কর

ইউকোপ্ল্যান—কিন্তু কথাটার মানে কী ?

আপনার সঞ্চয় আপনি কীভাবে বাড়িয়ে তুলতে চান?

সরল ঋজু
তাল গাছের মত ?

না, শাখা সমৃদ্ধ
বট গাছের মত ?

উত্তরে অবশ্যই বলবেন, সঞ্চয় থেকে দ্রুত উপার্জন বাড়াতেই আপনি চান।

এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে ইউকোব্যাঙ্কের ইউকোপ্ল্যান।

ইউকোপ্ল্যান

সঞ্চয় এক। সুদ অনেক

আমানত (টাঃ)	মেয়াদ	মোট আয় (টাঃ)
প্রতি মাসে ১২৫.00	১ম ১২০ মাস	২৭,২১৫.00
২৭,000.00	২য় ১২০ মাসের জন্য সুদের যোজনায়	৭৯,৯২০.00
প্রতি মাসে ১২৫.00	২য় ১২০ মাস	২৭,২১৫.00
মোট		১,০৭,৯০৫.00

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুসারে সুদের হার পরিবর্তন সাপেক্ষ

ইউকোপ্ল্যান আপনার সঞ্চয় দ্রুত বাড়িয়ে তোলার এক অনন্য উপায়। জমানো টাকা একাধিক পরিকল্পনায় সুদে-আসলে কেমন করে বাড়ানো যায়, ইউকোপ্ল্যান তারই সন্ধান।

পাশের সারণীটি একবার মন দিয়ে দেখুন। মাসে মাসে ১২৫ টাকা জমিয়ে আপনি ২০ বছরে ১ লক্ষ টাকারও বেশী পেতে পারেন ইউকোপ্ল্যানের মাধ্যমে, ইউকোব্যাঙ্কে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

UCO/CAS-127/83 BEN

দিললিতে দক্ষিণ এশীয় বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠক ব্যর্থ

নয়া দিললি থেকে তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়া দিললিতে গত পয়লা আর দোসরা আগস্ট এই দুদিন সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের বিদেশমন্ত্রীদের যে বৈঠক হয়ে গেল তা এক কথায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। কেননা, এই বৈঠক ডাকার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই সাতটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা আর সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করা। সাত দেশের এই বৈঠকের শেষে যৌথ-ভাবে যে সরকারি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও এই সহযোগিতা অটুট রাখার জন্য নানান অঙ্গী-কারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু কথার ওপর ভরসা না করে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর বুলোলেই দেখা যাবে যে এই সব সম্প্রীতি, সহযোগিতা আর সম্পর্ক উন্নয়নের গালভরা আশ্বাস কতখানি রাজনৈতিক অস্থিরতা আর অনৈক্যের বাস্তুভূমিতে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে। নয়া দিললির এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীরা। দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দেশের মধ্যে ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ তো রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক যে কোন ছুতোনাতা নিয়েই পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতীতের বহু ঘটনা এ বক্তব্যকে সমর্থন তো করেই এমনকি দিললিতে যে সময় বৈঠক চলছে সেই সময়ও শ্রীলংকায় ভারতবিরোধী তথা তামিলবিরোধী হিংস্র কার্যকলাপ রীতিমত লংকাকান্ড বাধিয়েছে। নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই শ্রীলংকাবাসী তামিলদের ওপর যে-ভাবে নির্বিচারে হত্যা, লুঠতরাজ চালান হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে এই বৈঠকের যৌথ ঘোষণাপত্রে উচ্চারিত আশার বাণীগুলি কেমন যেন ফাপসা মনে হয়। ভারতবিরোধী এ জেহাদ শ্রীলংকার মত পাকিস্তানেও যেমন সোচ্চার, তেমনি বাংলাদেশও কখনও গঙ্গার জল, কখনও তিস্তার জল একটা না একটা ঝুট ঝামেলা নিয়ে ভারতের পেছনে লাগবার জন্য সবসময়ই প্রস্তুত হয়ে আছে।

শ্রীলংকার গণমাধ্যমগুলি তো ভারতকে রীতিমত শত্রুদেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মারকিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ইউনাইটেড প্রেস ইন্টার-ন্যাশনালের মাধ্যমে যে খবরটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকেই এ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওই খবরে বলা হয়েছে ভারত শ্রীলংকা আক্রমণ করবে এই আশংকা করে শ্রীলংকা আমেরিকা, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের কাছে মিলিটারি সাহায্য প্রার্থনা করেছে। যদিও ইউ পি আই-এর সংবাদদাতাকে শ্রীলংকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বরং বর্তমানে শ্রীলংকায় ভারত-বিদ্বেষী আবহাওয়া যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে 'সহযোগিতা' শব্দটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা ভারতের বিদেশমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সাম্প্রতিক শ্রীলংকা সফরও শ্রীলংকা সরকার ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু পছন্দ না করলেও সেরকম বাধা দেওয়ার তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা তামিলভাষা-ভাষীদের ওপর নির্বিচারে যে রকম-ভাবে 'গণহত্যা' (কলম্বো থেকে লনডন টাইমসের প্রতিনিধির প্রতি-বেদন অনুসারে) চালান হয়েছে তাতে তো ভারতের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনকে টেলিফোন করে এ ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, নরসীমা রাওয়ের শ্রীলংকা সফরেরও বন্দোবস্ত করে-ছেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম-গুলি তো ভারতবিরোধী প্রচার চালাতে পারলে আর কিছু চান না। এমনকি নয়া দিললির বৈঠক চলার সময়েও নিউ ইয়র্ক থেকে পি টি আই জানিয়েছে পাকিস্তান আমে-রিকার কাছ থেকে মারাত্মক ক্ষেপ-ণাস্ত্র 'হারপুন' পাবার জন্য রীতিমত তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন এই 'হারপুন'গুলি সাব-মেরিন বা জাহাজ থেকে অনায়াসে অব্যর্থভাবে লক্ষ্য ভেদ করতে পারে। ওই মুখপাত্রের মতে আমে-রিকা ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের জন্য পাকিস্তানকে ইন্ধন জোগাচ্ছে। আমেরিকার এই মনো-ভাব নিন্দনীয় তো বটেই, কিন্তু পাকিস্তানের মনোভাবই বা কী? ভারতীয় চলচ্চিত্র পাকিস্তানে অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তো পাকিস্তান সরকার সবরকম ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন ওদেশে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এমনকি ভারতীয় সংগীত-নৃত্য-কলাকুশলী-দের পাকিস্তানে যাবার ব্যাপারে এমন এক ফিকির ফেলে রেখেছেন যে করাচি দিয়ে ছাড়া তাদের যাবার জন্য অন্য কোন রাস্তা আর খোলা রাখা হবে না। ফলে একগাদা খরচের জন্য অনেককেই পিছিয়ে আসতে হয়। এ তো একরকম পাকিস্তানে না ঢুকতে দেওয়ারই ছল। অথচ ভারতে এ ধরনের কোন কড়াকড়ি নেই। ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের মনোভাবও রীতিমত অসূয়ক। ওখানকার সংবাদমাধ্যমগুলি সব-সময়ই ভারতকে দোষী সাব্যস্ত করে। ভারত কলকাতা বন্দর বা উত্তরবঙ্গের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও গঙ্গার জল বা তিস্তা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ছিল, কিংবা বঙ্গোপসাগরের মুর দ্বীপের সীমা নির্ধারণ নিয়েও তো ভারত বন্ধুর মতই এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার উত্তরে বাংলাদেশ তো একরকম মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলই বলা চলে। আর আসামের শরণার্থী সমস্যা? এও তো ভারতবর্ষকে বাংলাদেশেরই দেওয়া উপহার!

অথচ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট সরকারেরই আয়-ত্তাধীন। তাই ভারত সম্পর্কে এই গণমাধ্যমগুলির বক্তব্যকে সরাসরি সরকারি বক্তব্য হিসেবেই ধরে নিতে হয়। এ সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের জন্য বর্ত-মান সময় ঠিক সুসময় নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সহযোগিতাই যেখানে নেই, সেখানে শুধু আলোচনার কী মূল্য থাকতে পারে? আর বৈঠকের শেষ দিন শ্রীলংকার বিদেশমন্ত্রী হামিদের অনুপস্থিতি কিংবা ওঁর তড়িঘড়ি স্বদেশে ফিরে যাওয়া থেকেই তো বর্তমানের কালবেলা সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া যায়। ফলে এই বৈঠককে ব্যর্থ বলা ছাড়া আর কী বলা যায়? □

আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান

ইনস্টিটিউট মিউজিয়াম হলে আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান একটু দেরি করেই আরম্ভ হয়েছিল। ঘোষক দেবাশিস বসু রসিকতার ঢঙে 'ট্রানসমিটারের গোলযোগ -----' জাতীয় কথাবার্তা বলে উপস্থিত সকলের বিরক্তি কাটিয়ে দিলেন। দেবাশিস সমস্ত অনুষ্ঠান জুড়েই গোলাপজল ছড়িয়ে গেছেন।

প্রথম শিল্পী ছিলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের পূজা এবং প্রেম পর্যায়ের পাঁচটি গানই তাঁর আন্তরিক পরিবেশন। প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি কিংবা শক্তি ঠাকুরের গানও আসরকে প্রাণবন্ত করেছে।

তবে এদিন সবচেয়ে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল লোকসংগীত শিল্পী স্বপন বসুর। তাঁর অনুষ্ঠানের শুরুতে দেবাশিস বসু জানিয়ে দেন স্বপন বসু ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছেন, ইত্যাদি। কিন্তু, একজন সংগীত শিল্পী তাঁর গান দিয়েই নিজের প্রমাণ দাখিল করলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। স্বপনের গান চটুলতা দিয়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে না। স্বপনের গানে তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং নিজস্বতার প্রকাশ ধরা পড়ে। সুর এবং ভাষার গভীরতা দিয়ে তিনি শ্রোতাদের স্পর্শ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের গানের বৈশিষ্ট্য এবং ভাষার পার্থক্য স্বপন স্পষ্ট করে তোলেন। এ দিনের উল্লেখযোগ্য পরিবেশন 'তিন যুগ চলিয়া গেল', 'ও মোর কাঠল কুঠার দুভারা', 'ছাতা ধর হে দেওরা' এবং 'ননদ গো তোর ভাই গেল বিদেশে'।

এ দিনের অনুষ্ঠানে সবশেষে ছিল অনিন্দিতা বসুর পরিচালনায় 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য। বোঝাপড়ার অভাবে অনুষ্ঠানটি কিছুটা এলোমেলো হয়ে আসে।

দিব্যজ্যোতি বসু

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখার 'অচ্ছুৎ কন্যা'

জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, বেগার শ্রমিকদের সমস্যা এবং নির্যাতনের কাহিনীকে কেন্দ্রবিন্দু করে গড়ে ওঠা নাটক—'অচ্ছুৎ কন্যা'। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখা এই নাটকের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজন থিয়েটার মঞ্চে গত ১৮ জুলাই ১৯৮৩ সন্ধ্যায়।

নাট্যকার তার 'অচ্ছুৎ কন্যার' জন্য বেছে নিয়েছেন পুরুলিয়া-র কুড়ার রুক্ষ পটভূমিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বেগার শ্রমিকদের ও পর মহাজন শ্রেণীর শোষণ এবং অত্যাচারের রুক্ষতাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নামকরণ—'অচ্ছুৎ কন্যা' কেন? অচ্ছুৎ কন্যা 'ধোলী' এই নাটকে কতটুকু প্রাধান্য পেয়েছে? জাত-পাতের দ্বন্দ্বে ব্যর্থ হয়েছে ধোলীর প্রেম। সে প্রেমের জ্বালা এবং কসল সমজাতের একজন মাথা পেতে নিয়ে ধোলীকে সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করেছে। এভাবেই জাত-পাতের দ্বন্দ্বের আশু সমাধান দেখিয়েছেন নাট্যকার চিররঞ্জন দাস। কিন্তু নাটকের মূল বক্তব্য কি তাই?

না, তা নয়। অন্তত নাট্যকার তা বলতে চাননি। সুতরাং তার নাটকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বেগার শ্রমিকদের শোষণ-যন্ত্রণার প্রকৃত চিত্র। তার প্রতিক্রিয়াও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন শ্রমিকদের সংগ্রাম [illegible] তুলতে আলোর অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন—'প্রতিঘাতের দিন আগত'। তাহলে নামকরণ 'অচ্ছুৎ কন্যা' কেন? 'বেগার শ্রমিকদেরই' কি তবে রূপক হিসেবে ওই নামে ভূষিত করার চেষ্টা? সে ক্ষেত্রেও বলব—বেগার শ্রমিকদের ফুঁসে ওঠা অনেক বেশি পুরুষালী। সুতরাং নামকরণের মেয়েলীত্ব ওদের সঠিক রূপের বিপরীত বলেই মনে হয়েছে।

সেই সংগে বলতে হয়—এ নাটক শুধু অভিনয় করে দেখানর জন্যই নয়, শোষিত মানুষকে সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই হওয়া উচিত। আর তাই যদি হয় তবে নাটকের কিছু দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলা উচিত।

হিন্দি সংলাপ প্রচুর আছে। সেই সংগে বাংলার মিশেল। কিন্তু যে বাংলা বলা হয়েছে তা একেবারেই বিশুদ্ধ 'কালকেসিয়ান বাংলা' ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেই বাংলার টান থাকার কথা। টিম ওয়ার্ক মোটামুটি ভাল। তবে আর একটু আড় ভাঙা উচিত। আর অবশ্যই 'ধোলী' চরিত্রের নায়িকা সুস্মিতা বাগ যেটা করেছেন সেটা আর যাই হোক অভিনয় নয়। অন্যান্যদের প্রশংসা করে কিছু বলা যায়। কিন্তু তাতে নাটকটির গুণগত মান বাড়বে না—তাই না বলাই ভাল।

পিনাকী মজুমদার

উত্তম স্মৃতি তর্পণ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উত্তম স্মৃতি তর্পণ

গত তিন বছর ধরে উত্তমকুমার শুধু ছবি হয়ে আমাদের ভেতর রয়েছেন। যখন তিনি রাজা হয়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎকে শাসনের রাজদন্ড ঘুরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তখন তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করেছি, সমালোচনা করেছি, ভালবেসেছি, অবজ্ঞা করেছি। কিন্তু ভুলে থাকতে পারিনি তাঁকে কেউ-ই কখনও। তাঁর দীর্ঘ ছায়া চলচ্চিত্র জগৎকে ঢেকে রেখেছিল অনেক বছর, ঢেকে রেখেছে আজও। তাই, গত তিন বছর ধরে ২৪ জুলাই, মহানায়কের মহাপ্রয়াণের দিনটিতে নানা অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন মানুষ অশ্রুতে, গানে, স্মৃতিচারণায় ছবি হয়ে যাওয়া উত্তমকুমারকে রক্ত মাংসের হেঁটে চলে বেড়ান উত্তমকুমার হিসেবে ফিরে পেতে চান।

এ বছরও ২৪ জুলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁকে আবার স্মরণ করলেন অনেকে। স্মৃতিচারণ করলেন, শ্রদ্ধা জানালেন তাঁর সহশিল্পীরা, অনুরাগীরা। শিল্পী সংসদ কার্যালয়ে সকাল থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের সংগে জড়িত ব্যক্তিরা এসে মহানায়কের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে যান। উত্তমকুমার তাঁর জীবিতাবস্থায় শিল্পী সংসদের সভাপতি ছিলেন। যাঁরা প্রয়াত মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশে সংসদের বর্তমান সভাপতি অনিল চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এদিন রঙমহল থিয়েটারেও 'বিবর' নাটকের প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগে একটি মহানায়কের প্রতিকৃতি, ফুল ও আলপনা দিয়ে সাজান হয়। নাটকের সমস্ত কলাকুশলী মঞ্চে সমবেত হয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে মহানায়কের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দর্শকমণ্ডলীও তাঁদের সংগে উঠে দাঁড়িয়ে প্রয়াত নায়কের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান। এদিন ভবানীপুর ফিলম সোসাইটির পক্ষ থেকেও এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তরুণ রায়, সবিতাব্রত দত্ত, অনুপকুমার, শুভেন্দু চ্যাটারজি, রানু মুখারজি, তরুণকুমার এবং উত্তমপুত্র গৌতম চ্যাটারজি। এই অনুষ্ঠানে ফিলম সোসাইটির পক্ষ থেকে কতকগুলি প্রস্তাবও নেওয়া হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল—ভবানীপুর লেডিজ পারকের নাম 'উত্তমকুমার বাগ' করে ওখানে মহানায়কের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, টাউনসেনড রোডের নাম পরিবর্তন করে উত্তমকুমার সরণি রাখা, বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে উত্তমকুমার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া, ইত্যাদি। প্রয়াত মহানায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন তপন থিয়েটারেও 'নহবৎ' নাটকের প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগে নাট্য পরিচালক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহানায়কের প্রতিকৃতিতে মালা দেন এবং স্মৃতিচারণ করেন।

তবে এদিন সব থেকে বেদনাবিধুর আবহাওয়া ছিল বোধহয় উত্তমকুমারের গিরিশ মুখারজি রোডের বাড়িতে। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষ, যাঁরা রক্ত-মাংসের উত্তমকুমারের কাছের মানুষ ছিলেন, তাঁরা চোখের জলে স্মরণ করলেন সেই মানুষ উত্তমকুমারকে। গিরিশ মুখারজি রোডের বাড়িতে উত্তমের বসার ঘরে মালা আর চন্দন দিয়ে সাজান ছিল তাঁর ছবিগুলি। প্রয়াত মহানায়কের গুণমুগ্ধ ভক্তরা, শিল্পীরা সারাদিন এসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে তাঁদের ভালবাসা আর শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। উত্তমপুত্র গৌতম এবং সুব্রতা চ্যাটারজি তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সুপ্রিয়া দেবী বিবেকানন্দ সেবা সদন কর্তৃপক্ষের হাতে ৫০০১ টাকা দিলেন/ছবি: সুবিনয়

মহানায়কের স্মৃতি তর্পণে পীড়াদায়ক অনুষ্ঠান

২৪ জুলাই রবীন্দ্র সদনে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মহানায়কের একটি ছবিকে অন্ধকারে রেখে 'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা' গান দিয়ে শুরু হল মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতি-তর্পণ, 'স্মৃতি' নিবেদিত।

প্রথমে তর্পণ করলেন সুপ্রিয়া দেবী। এই অনুষ্ঠানের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের পাঁচ হাজার এক টাকা তুলে দিলেন হুগলী জেলার মান্দ্রা গ্রামের বিবেকানন্দ সেবা সদন কর্তৃপক্ষের একজনের হাতে। সেই সংগে ডাঃ সুনীল সেনের দেওয়া পাঁচশ টাকাও। এ দান মহৎ উদ্দেশ্যে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু সেই সংগে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। সেটা হল, মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান কেন টিকিট কেটে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হবে? কেনই বা অনুষ্ঠানের মঞ্চ সংগতিপূর্ণ করে সজ্জিত করেও মঞ্চের ওপর দুটি ঢাউস সাইজের স্পিকার রাখা হবে মহানায়কের ছবিকে দর্শকদের দৃষ্টির আড়াল করে? আর কেনই বা ঘোষণা করা হবে 'অমুক শিল্পী বিনা পারিশ্রমিকে তার গোটা দল নিয়ে এসেছেন আপনাদের গান শোনাতে'? বেসুরো গান কেন গাওয়া হবে সংগীতপ্রেমী নায়কের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনে? যা জলসায় করা হয়, তা কেন করা হবে উত্তমকুমারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠানে?

সুপ্রিয়া দেবীর পর একে একে অনেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি এবং পাঠের মাধ্যমে। এঁদের মধ্যে ছিলেন সমরেশ বসু, বাণী ঠাকুর, আনন্দ ও তনুশ্রীশংকর, সতীনাথ-উৎপলা, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শক্তি ঠাকুর, গৌরী ঘোষ, হৈমন্তী শুক্লা, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, অমৃক সিং অরোরা, ঊষা উত্থুপ এবং শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ। আর স্মৃতিচারণ করলেন মহানায়কের ছবির প্রথম নায়িকা ছবি রায় এবং শেষ ছবির নায়িকা সুমিত্রা মুখারজি। অনুষ্ঠানের একমাত্র বেসুরো বিসদৃশ গানটি সুমিত্রা মুখারজিরই গাওয়া। আরও বিসদৃশ – মঞ্চে বসে সোমা চ্যাটারজির হাতে পায়ে তাল ঠোকা, সতীনাথের গানের সংগে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয় বার মঞ্চে এলেন ঊষা উত্থুপ প্রায় জনা চল্লিশেক যন্ত্রশিল্পী নিয়ে। তখনই বোঝা গেল মঞ্চের ওই ঢাউস সাইজের স্পিকার দুটির আয়োজন তাঁরই প্রয়োজনে। তাঁর সহকারীদের জগঝম্পের ঢক্কা নিনাদে, তাঁর আত্মপ্রচারের ফুলঝুরি এবং লাস্যে এই স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠানের পরিবেশ পরিবর্তিত হল। মাইক হাতে আলোর বৃত্তের মধ্যে মঞ্চে সদম্ভ পদচারণা, মাঝে মাঝে 'লেডিজ অ্যানড জেনটেলমেন' বলে পুকার, 'আই গট এভরি রাইট টু সিং' বলে হুংকার এবং বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি বক্তৃতার খিচুড়ি এবং বারেবারে –'হাউ ডু ইউ লাইক ইট' এর প্রশ্ন এই সব শুনে মনে হয়েছে আমরা বুঝি কোন নাইট ক্লাবে সমবেত হয়েছি, মহানায়কের মৃত্যু বার্ষিকীর স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠানে নয়।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারাও কি এটাই চেয়েছিলেন?

অনুষ্ঠান পরিচালনায় উদ্যোক্তারা আরও আন্তরিক এবং মার্জিত হলে 'স্মৃতি'র স্মৃতি-তর্পণ স্মৃতি-সুখকর হত।

[illegible]

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৬২

১	২	■	৩		৪		■
৫		■		■		■	৬
	■	৭	■	৮		৯	
১০			১১		■	১২	
	■	১৩			■		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■		■	১৮		
১৯		■	২০		■	২১	

সূত্র : পাশাপাশি

১। আজ প্রথমেই অজ
৩। লোডশেডিং ঘন ঘন হওয়ায় বিদ্যুতের এই নাম সার্থক
৫। বাসে ট্রামে যা ভিড়, উঠতে হলে এটি প্রয়োজন
৮। এখানে যা, তা বিচার না করাই ভাল
১০। চটপটে কাজের লোক খোঁজ করুন, এখানে পাবেন
১২। আমরা এই দেশেরই মানুষ
১৩। ঈশ্বর যা ছিলেন, ইনি পার করেন
১৪। ধার দিলে মহাজন, আর নিলে ?—
১৫। ধূসর বর্ণের সাংখ্য প্রবক্তা
১৭। যার বাড়িতে কিল চড় দুষ্প্রাপ্য, তিনি স্বয়ং
১৮। ফল বটে, কিন্তু নিষ্ফলা
১৯। দুধে পড়ে
২০। এটি মাটিতে ঘুরে পড়লে ছেলেদের হাতে দড়ি
২১। জিনিসটার দর বেশ, মেয়েদের কাছে কদরও বেশ

সূত্র : ওপর-নিচ

১। গাছে থাকে, কিন্তু ফল বা পাতা নয়
২। এখানে 'তৈরি' শব্দ
৩। কেটে গেলেই হবে
৪। এখন সকাল
৬। 'হাতি' হাজির
৭। বাচ্চারা বিরক্ত করলে আপনি তাদের কী করতে বারণ করেন ?
৮। একটা 'জাত' এদেশি নয়, বিদেশি
৯। মহান চিত্রকর
১১। উড়িষ্যায় পাবেন
১৪। গোলা-বাড়ি
১৫। একটু থামার চিহ্ন
১৬। মনোরমা রমণী
১৭। ৩০ দিনে, ৪ সপ্তাহে, ২ পক্ষে ১—?

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২১ সেপটেমবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ৮-৯-৮৩।

সমাধানপত্রের সঙ্গে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল—৬২' লিখতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল—৫৮-র সমাধান

প	ট	কা	■	ঢো	■	ঝাঁ	ঝা
কে	■	ল	ট	ব	হ	র	■
ট	■	পু	ন	র্বা	র	■	অ
■	স	ক	■	■	বী	র	ম
■	বি	ধ	য	■	ন্দ	■	কা
আ	তা	■	তা	হু	■	কা	ন
বি	ব্র	ত	■	■	ন	স	ন্যা
র	ত	■	বৃ	ন্দা	ব	ন	■

শব্দশৃঙ্খল—৫৮-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন দীপক বসু (১৮, মদন মিত্র লেন, দ্বিতল, কলকাতা-৬) এবং প্রশান্ত চক্রবর্তী (৭/২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কদমতলা, হাওড়া-১)।

১২ আগসট অনুষ্ঠিত শব্দশৃঙ্খল—৫৮-র লটারিতে বিচারক ছিলেন অরুণা আঢ্য।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

আগসট ২৪ থেকে ৩০

মেষ : ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক সচ্ছলতা, অন্যের জন্য ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে বিশেষ লাভ : মেয়েদের মানসিক চাপ। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে নতুন করে আলোচনা। মেয়েদের কারো আচরণ বিশেষ ক্ষুব্ধ করবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃষ : শরীর মোটামুটি চলবে ; মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল লাভে বাধা ; মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক পদক্ষেপ কোন সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে ; মেয়েদের কোন ঘটনা আত্মসম্মানে আঘাত করবে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন।

মিথুন : হঠাৎ জ্বরে বেশ কাবু করতে পারে : মেয়েদের শারীরিক ব্যাপারে বিশেষ উদ্বেগ। আর্থিক অবস্থায় সামান্য হেরফের ; ঋণ। কর্মস্থলে আগের কোন জটিলতা দূর হবে ; মেয়েদের কিছু নতুন দায়িত্ব। পারিবারিক ব্যাপারে নিকটজনের সঙ্গে মতান্তর ও মনান্তর। মেয়েদের কোন পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কর্কট : শরীর আগের চেয়ে ভাল চলবে : মেয়েদের শরীর ভোগাবে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নতুন উদ্যোগে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে না : মেয়েদের কোন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। পারিবারিক কোন ঘটনা সকলকে সমান বিচলিত করবে। ব্যবসায়ীদের নতুন কোন প্রচেষ্টা ফলবতী হবে।

সিংহ : শরীর চলনসই ; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক জটিলতার অনেকটা অবসান ; আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা ও লাভ ; মেয়েদের ছোটখাট ক্ষতি। পারিবারিক যৌথ প্রচেষ্টায় বাধা ও মতান্তর। কর্মপ্রার্থীদের পুরনো যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

কন্যা : শারীরিক ঝামেলা চলবে ; মেয়েদের মানসিক চাপ। আর্থিক ব্যাপারে নতুন আলোকপাত। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা নতুন করে সক্রিয় হবে ; মেয়েদের আগের কোন প্রয়াসে সাফল্যের আভাস। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরামর্শ গুরুত্ব পাবে। সন্তানদের কারও হঠাৎ বিবাহযোগ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

তুলা : শরীর ভাল চলবে ; মেয়েদের আগুন থেকে ছোটখাট ক্ষতি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে ; পুরনো ধার-দেনা শোধ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতা—দুয়েরই প্রয়োজন হবে : মেয়েদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান। পারিবারিক বিভিন্ন ব্যাপারে লাভ। ব্যবসায়ীদের হঠাৎ মন্দা।

বৃশ্চিক : শরীর ভোগাবে ; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক টানাটানি ; সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য কোন দাবি উপেক্ষিত হতে পারে ; মেয়েদের নতুন প্রস্তাব ভেবে-চিন্তে গ্রহণ করতে হবে। কোন আপনজনের জন্য বিশেষ উদ্বেগ। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে নতুন বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

ধনু : শরীর মোটামুটি চলবে ; মেয়েদের অম্বল-অজীর্ণ ভোগাবে। আর্থিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হলেও পুরনো ধার-দেনা বিব্রত করবে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাট ঝামেলা ; মেয়েদের কোন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। পারিবারিক কোন ঘটনায় মানসিক চাপ ; মেয়েদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মকর : শরীর চলনসই ; মেয়েদের আগের অসুস্থতার জের চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আগের কোন প্রয়াসে সাফল্যের আভাস। কর্মস্থলে মন কষাকষি, ঝগড়া-বিবাদ ; মেয়েদের মানসিক চাপ। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ভ্রমণে ক্ষতির আশংকা। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

কুম্ভ : শারীরিক ঝামেলার অবসান ; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে সহজ অগ্রগতি। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোন কিছু করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না ; মেয়েদের সহজ অগ্রগতি। বন্ধুজনের সংস্পর্শে পারিবারিক আনন্দ। গৃহ সংস্কার বা বদল হতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মীন : শরীর ভোগাবে ; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক সচ্ছলতা, কিন্তু আচমকা ব্যয় বিব্রত করবে। কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগ, উৎসাহের অভাব ; মেয়েদের ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা উচিত। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সন্তানের জন্য উদ্বেগ। মেয়েদের প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে বাধা বা অসম্মান। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

ইত্যাদি প্রকাশনার আরো তিনটি অসাধারণ প

শিলাদিত্য

খেলার আসর

নয়নদর্শন

PARAGON

FABRICS

পরিবর্তন

এখন বৈষ্ণব ধর্ম

ইংলনডে পাল সাম্রাজ্য

সিদ্ধার্থ রায় কি

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে ভারতের স্কটল্যানড ইয়ারড বলা হয় কেন, সে প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া গেল সেদিন। ভুল মানুষ মাত্রেই করে। কিন্তু ধূর্ত দক্ষ অফিসার রজনী দেবনাথ সে ভুল শুধরে নিল বিদ্যুতের গতিতে।

প্রথমটা নিষ্ফল ক্রোধে ফেটে পড়েছিল দেবনাথ।

টেলিফোন ছুঁড়ে দিয়ে দমাদম ঘুসি বসিয়ে দিয়েছিল ইঁটের দেওয়ালে।

পরক্ষণেই শুরু হয়ে গেল ও সি হোমিসাইডের ভেল্কি।

কোথায় চললি?

কনট্রোল রুমে।

কনট্রোল রুম থেকে সজাগ করে দেওয়া হল সারা কলকাতাকে।

বাসন্তী গুপ্ত....মাঝারি হাইট....

বাসন্তী গুপ্ত....মাঝারি হাইট....পরনে গেরুয়া শাড়ি.... লাল পাড়.... সাদা ব্লাউজ.... চোখে কাল ফ্রেমের চশমা.... হাতে কাল ব্যাগ।

বেতারে খবর চলে গেল ভ্রাম্যমাণ রেডিও ভ্যানে।

লালবাজার ঘিরে সাদা পোশাকে প্রহরারত প্রহরীদের কাছেও পৌছে গেল বাসন্তী গুপ্তের চেহারার বিবরণ।

নাম তার বাসন্তী গুপ্ত

পরিবর্তন

৩১ আগস্ট-৬সেপ্টেম্বর, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৯

দাম ২.৫০ বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ১০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ১৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

কিছুকাল আগে, পাকিস্তান সফর শেষে আমরা লিখেছিলাম যে জিয়া এখন বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি সেখানে আগুন নিয়ে খেলা করছেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানের সে বারুদের স্তূপে আগুন লেগে সেদিনের সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হল। পাকিস্তান আবার এখন অগ্নিগর্ভ। প্রতিদিনই সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে পাঞ্জাব ও সিন্ধু উত্তাল। জেনারেল জিয়া কিছুদিন আগেও আফগানিস্তানে রুশ জুজুর ভয় দেখিয়ে গণতন্ত্রকামী মানুষের গণবিক্ষোভকে চাপা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করে সর্বাত্মক ইসলামীকরণের মধ্য দিয়ে এক নয়া জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই—জিয়ার আমলে পাকিস্তানি কূটনীতি অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল। অন্তর্কলহে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম দুনিয়ার ওপর জিয়া সহজেই নিজেকে নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই ফলশ্রুতি স্বরূপ জিয়া পেয়েছিলেন ইসলামিক পরমাণু বোমার আশ্বাস। তদুপরি জিয়ার হাতে তুরুপের তাস ছিল ৩০ লক্ষ আফগান উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তুদের তাঁদের ইসলামিক পিতৃভূমিতে আবার পুনর্বাসিত করার জন্য জিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পতন অভ্যুদয় এই নিয়েই সামরিক একনায়কদের জীবন। জিয়ার দীর্ঘ ছ বছরের রাজত্বকালে বিক্ষোভ এই নতুন নয়। কিন্তু এবারের বিক্ষোভের ধরনধারণ দেখে বৃটিশ পত্র-পত্রিকাও জিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারেননি। ভুট্টোর প্রাণদণ্ড এবং তাঁর পত্নী ও কন্যাকে নজরবন্দী করে রেখে জিয়াউল হক তাঁর পথের কাঁটাকে সরাতে চেয়েছিলেন। কিছুকাল আগে ভুট্টোপত্নী চিকিৎসার জন্য বিদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলে জিয়াউল হক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু জিয়াউল হক বোধহয় অবগত ছিলেন না যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে এই উপমহাদেশে কখনও গুলি ও বেত্রাঘাতের দ্বারা দমন করা যায় না। নেতারা কারারুদ্ধ হলে জনতা তখন রাজপথে নেমে আসেন এবং সেই জনরোষে একনায়কতন্ত্রের ভিত বারবার কেঁপে ওঠে। পাকিস্তানের বর্তমান আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য জনগণ বেগম নাসিম ওয়ালি খানকে নেত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবন কর্মিটি যাঁরা এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা তাঁদের মধ্যে সব দলই যে প্রগতিশীল তা নয়। তবে আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি ভুট্টোপন্থী অথবা বেগম ওয়ালি খানের হাতে থাকে তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যথেষ্টই বাধা পাবে বলে আমাদের ধারণা।

সাধারণত দেখা যায় এই ধরনের আন্দোলনের সুযোগ নেয় সেনাবাহিনীরই আরেকটি অংশ। জিয়া যদি এখনই গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে দেন তাহলে সেটি হবে তাঁর পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচয়। কিন্তু তিনি যদি তা না করেন তা হলে ইতিহাসই তার নিজের পথ করে নেবে।

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের ছবি : সৌগত রায় বর্মন

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
(পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, [illegible]
নতুন দিল্লি ১১০০০১ [illegible]

পরিবর্তন

৭ সেপটেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

পরিবর্তনের ৭ সেপটেমবর সংখ্যা মূলত বিশেষ চলচ্চিত্র সংখ্যা, তবে এই সংখ্যার উদ্দেশ্য গ্ল্যামার-সর্বস্ব তারকাদের স্বপ্নিল জীবন নিয়ে রম্য কাহিনী পরিবেশন নয়—বাংলা ছবির মরণদশা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজ্ঞজনের মতামতের ভিত্তিতে এক বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান। এই সংখ্যার মূল উপজীব্য তাই

বাংলা ছবির সংকট কেন ?

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চিত্রতারকা, পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক ও দর্শকেরা কী চোখে এই সমস্যাকে দেখছেন তারই গভীরতর বিবরণ এই সংখ্যার সম্পদ। এই বিবরণ যাতে পরিসংখ্যানেই শেষ না হয়ে যায় তার জন্য মননশীলতাকেই সমস্ত রচনায় প্রধান অবলম্বন করে তোলা হয়েছে। শুধু সমস্যাই নয়, সমাধানের পথেরও হদিস দিয়েছেন চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তার মধ্যে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অপর্ণা সেন, সমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেই সঙ্গে আছে- **বাংলা ছবি চলছে না কেন ?**
পাঠকদের মতামত। এই পর্যায়ের অবশ্য-উল্লেখযোগ্য রচনা

১) **মুমূর্ষু চলচ্চিত্রকে বাঁচাবে কে ? অশোক চৌধুরীর মতামত।**
২) **উত্তমবিহীন বাংলা ছবি—উত্তম বিহনে বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থার এক গভীরতর বিশ্লেষণ।**

অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনা :

দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্ম

দেখতে দেখতে শিল্পনগরী দুর্গাপুরের দ্বিতীয় প্রজন্ম আজ তরতাজা তরুণ। তাদের মা-বাবারা একদিন যে দুর্বার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুর্গাপুরে এসেছেন তা কতখানি সঞ্চারিত হতে পেরেছে এই দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে। আমরা এর আগের প্রতিবেদনে লিখেছি দুর্গাপুরের কলকারখানা নিয়ে। এবার লেখা হল সেখানকার মানুষের ইতিকথা।

রাজধানীর বাঙালি

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির বাঙালিরা আজ এক বৃহৎ জনসমষ্টি। হিন্দি ও পাঞ্জাবিভাষীদের পরেই তাঁদের স্থান রাজধানীতে।বহু বাঙালি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। তাঁদের দিকে তাকালে যে কোন বাঙালিরই যদি কোন হীনমন্যতা বোধ থাকে তা কেটে যেতে বাধ্য। পরিবর্তন তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল্লির এই সমৃদ্ধ বাঙালি সমাজের বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এছাড়া থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিভাগ।

নিবেদনমিদং

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে শংকর লিখেছিলেন 'কত অজানারে।' এই বইটিকে কেন্দ্র করেই শংকরের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। তারপর থেকে 'কত অজানারে' পড়েননি, এমন ব্যক্তির সংখ্যা বিরল। 'কত অজানারের' সেই বারওয়েল সাহেবকে মনে আছে, যে বারওয়েল সাহেব শংকরকে 'কত অজানারে' জানিয়েছিলেন? পঁচিশ বছর পরে শংকর আবার লিখতে চলেছেন 'কত অজানারে'র দ্বিতীয় অধ্যায়, বহু অকথিত কাহিনী নিয়ে রচিত হচ্ছে তাঁর আগামী গ্রন্থ। পরিবর্তন গর্বিত 'কত অজানারে'র এই অকথিত অংশ তিনি পরিবর্তনের পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন আগামী পুজো সংখ্যায়।

লেখার নাম 'বারওয়েল সাহেব'। যাযাবর ও শংকর বাংলা সাহিত্যের এই দুই জনপ্রিয় লেখকের দুটি ছোট গল্পই হবে পরিবর্তনের পুজো সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

পরিবর্তন সম্পাদক তাঁর ১৪ দিনের ঢাকা সফর শেষ করে ফিরেছেন। বাংলাদেশে পরিবর্তনের যে এত জনপ্রিয়তা তা ওদেশে না গেলে বোঝা যেত না। পরিবর্তন সম্পাদক ওখানে বেসরকারি জনগণের কাছ থেকে যে স্বতস্ফূর্ত ভালবাসা ও অভিনন্দন পেয়েছেন তাতে তিনি অভিভূত। ঢাকা ও সিলেট প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকেরা তাঁকে চা-চক্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব (তথ্য) পার্থসারথি রায় তাঁর সম্মানে বাড়িতে একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে যোগ দেন বাংলাদেশের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা। ঢাকা পূর্বাণী হোটেল ও সিলেট সার্কিট হাউসে সকাল থেকে রাত্রি কত যে মানুষজন আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। সকলকে সময় দেওয়া যায়নি। সব আমন্ত্রণ রক্ষা করা যায়নি। যেমন, ভারতীয় দূতাবাসের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে কুষ্টিয়ার সাংবাদিক মিজানুর রহমান আমন্ত্রণ জানান শিলাইদহ পরিদর্শনের। কিন্তু সময়াভাবে মিজানুর ভাই-এর এই আমন্ত্রণ এবারে রাখা সম্ভব হল না। তবে সর্বত্র জানা গেল এপার বাংলার একটি সংবাদ সাপ্তাহিক ওপার বাংলার মানুষের কাছে কত জনপ্রিয় হতে পারে। এই জনপ্রিয়তার বড় প্রমাণ ভারতীয় দূতাবাস প্রতি সপ্তাহে ৫০ কপি পরিবর্তন কিনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। পরিবর্তন নিজ গুণেই এখন প্রতিনিধিত্বমূলক ভারতীয় সংবাদ সাপ্তাহিকের স্থান দখল করে নিয়েছে।

অলমিতি

পা চ.

একপেশে সম্পাদকীয়

পরিবর্তন 'উত্তমকুমার স্মরণ সংখ্যায়' প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি একপেশে এবং মোটেও সময়োপযোগী হয়নি। কংগ্রেসী নেতা গণি খান চৌধুরীর যে সমালোচনা আপনারা করেছেন তার উত্তরে জানাই যে, অতি সম্প্রতি ধিক্কার সমাবেশে মারকসবাদী নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, আক্রান্ত হলেই হাত উঠবে। গণি খান চৌধুরীও মাসুদ আলমের হত্যার পর বলেছিলেন, সি পি এমের নৃশংস হত্যার পরিণতিতেই মালোপাড়ার জনরোষে ঐ গণহত্যা সংগঠিত হয়। আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাই যে বেশ কয়েকবছর আগে বর্ধমানে সাঁই পরিবারের কয়েকজনকে নৃশংসভাবে খুন করে পুত্রের রক্তে মাকে স্নান করান হয়। এবং এই ঘটনার পর প্রয়াত মারকসবাদী নেতা হরেকৃষ্ণ কোনার বলেছিলেন, তিনি ঐ ঘটনার জন্য গর্বিত।

মারকসবাদী নেতা বিনয় চৌধুরী আগাম জানিয়ে রেখেছেন পশ্চিমবাংলায় ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধ হবেই। এই মারকসবাদী সরকারের রাজত্বকালে নৃশংস আরও কয়েকটি খুনের ঘটনা হল :

১ কসবায় প্রকাশ্যে আনন্দমার্গীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা।

২. তিনজনার ও সি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যর হত্যা।

৩. শোয়াদাদার কাছে মেয়েদের একটা স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকাকে তিনি ফেল করা কয়েকজন ছাত্রীকে পাশ করাননি বলে ঘেরাও করে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে হত্যা করা।

৪. বহরমপুর পুরসভার আর এস পি কমিশনার স্বপনবাবুকে নৃশংসভাবে হত্যা।

৫. কুচবিহারে ১১ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে চোখ উপড়িয়ে ফেলা।

৬ [illegible]

৭ [illegible]

এদের জনৈক প্রাক্তন হাফমন্ত্রী জড়িত থাকার অভিযোগ।

কংগ্রেসী নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে প্রথমে বাড়িতে এবং পরে বাঁকুড়ায় হত্যা করার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মারকসবাদীদের দ্বারা মাসুদ আলমকে নৃশংসভাবে হত্যা :

গণি খান চৌধুরী পশ্চিমবাংলার মানুষকে সঠিক নেতৃত্বই দিয়ে চলেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

চন্দ্রনাথ সেন
কলকাতা-৬৪

অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না, বলে অত্যাচারিতরা

আমরা পরিবর্তনের নিয়মিত পাঠক। আপনার ২০ জুলাই '৮৩-র সম্পাদকীয় পড়লাম। এখানে আপনি মাননীয় রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরীকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, 'তিনি মাসুদ আলমের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলেন কিন্তু তার পাশে একটা গণ কবরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।' মেনে নিচ্ছি রেলমন্ত্রী অন্যায় করেছেন কিন্তু আমাদের গরিবদরদী মন্ত্রীরা যখন মালোপাড়ায় গেলেন কোথায় তাঁরা তো মাসুদ আলমের বাড়িতে একবারও যাননি। তাঁরাও তো কোনও বামপন্থী মানুষের সঙ্গে কথা বলেননি। তাঁদের এই ভুলের বেলাই কেন আপনাদের সম্পাদকীয় কলম গর্জে ওঠেনি ?

আপনার অবগতির জন্য জানাই যে আমরা এই ঘৃণ্য ঘটনার সমর্থক নই। কিন্তু আপনার সম্পাদকীয়র প্রতিবাদ না করে পারছি না। কারণ আমাদের মনে হয় এই লেখা অত্যন্ত একপেশে এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এই লেখানুযায়ী মনে হচ্ছে যে এই গণহত্যার সঙ্গে মাননীয় রেলমন্ত্রী ও তাঁর দল জড়িত। কিন্তু ঘটনা তা নয়। এটা একটা গণ অভ্যুত্থান। একটি প্রবাদ আছে অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না কিন্তু যারা অত্যাচারিত হয় তারাই শেষ কথা বলে। এই ঘটনাটাও ঠিক সেইরকম।

উৎপল মিশ্র ও আরও অনেক
কাগমারী, মালদহ

সাহসিকতার পরিচয়

মালদহের রতুয়া থানার মালোপাড়ার ঘটনা সম্পর্কিত আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের (২০ জুলাই) জন্য আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। ভারতের রেলমন্ত্রী মহামান্য গণি খান চৌধুরী মহাশয়ের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের যথার্থ সত্য উল্লেখ করে যে কৃতিত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন, আপনার 'পরিবর্তনে'র অগণিত পাঠকের কাছে তা অভিনন্দনযোগ্য।

চক্রদাস মণ্ডল
ইটাবেড়িয়া, মেদিনীপুর

পরিবর্তনের ভাবনা-চিন্তা

অনেক মূল্যবান অথচ অবহেলিত বিষয়কে 'পরিবর্তন' গুরুত্ব দিয়ে আসছে। যার ফলে জনমানস এবং প্রশাসন দুইই নাড়া খেয়েছে। গত ১৩ জুলাই সংখ্যায় আর একটি ভাল উদ্যোগ দেখলাম। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে নিয়ে কোন ভাল সাহিত্য বা কর্মচেষ্টা খুব একটা চোখে আসে না। যেজন্য দেশের এই বিরাট জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন এবং ভ্রান্ত কিছু কিছু খাপছাড়া ধারণা নিয়ে বসে আছেন। 'পরিবর্তন' এদের কথা ভাবছে এবং এদের জীবনচর্চাকে তুলে ধরতে চাইছে সেজন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। তবে ব্যাপারটা একটু পরিকল্পিত হলে আরও ভাল হত। মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কে আবদুল জব্বার সাহেবের প্রতিবেদনটুকু স্বচ্ছ এবং যুক্তিসমৃদ্ধ। কিন্তু যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাঁরা প্রায়ই উচ্চবিত্ত অথবা অর্থনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কলকাতায় এইসব পালিশ করা বনেদী মুসলমানরা গ্রাম-বাংলা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন।

কাজল আহসান
কাটোয়া

'পরিবর্তন'কে আন্তরিক ধন্যবাদ

গত ১০ আগস্ট পরিবর্তন স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় 'বিনা পণে বিবাহেচ্ছু' কলমে আমি একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এই বিজ্ঞাপন দেওয়ায় আমার কাছে পাত্রীপক্ষ থেকে প্রচুর চিঠি আসে। পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদককে জানাচ্ছি যে আমি সেই চিঠিগুলি থেকে আমার পাত্রী নির্বাচন করেছি। পাত্রী কলকাতা নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা চিনু রায় (মনা)। এই সহযোগিতার জন্যে সম্পাদককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভরত সিমলাই (চট্টোপাধ্যায়)
কলকাতা-২৬

প্রতিবাদ জানাচ্ছি

৮ জুন '৮৩ র 'পরিবর্তনে' প্রকাশিত আমেরিকান একসপ্রেস এর কর্মী চিন্ময় ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত করে নারী সংখ্যায় দিব্যজ্যোতি বসু মহাশয়ের যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিবাদে জানাচ্ছি।

ঐ লেখার একটি উদ্ধৃতি থেকে শুরু করা যাক 'সোনারপুর থানায় Diary করা সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি' আমার প্রশ্ন কে বা কারা Diary করেছিল।

এই ব্যাপারে যদি কোন Point থাকত তাহলে Police ছেড়ে কথা বলত না।

Proceeding হতই. এ থেকে এটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে ব্যাপারটি তাদের মনগড়া এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমার পারিবারিক দুঃখজনক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি দুষ্টচক্র খুবই সক্রিয় হয়ে উঠে, যে দুষ্টচক্রের বিভিন্ন সময়ের নানারকম অর্থনৈতিক দাবি আমি মেটাতে সক্ষম হইনি।

আমার স্ত্রী স্বপ্না মারা যাবার পর আমার শ্বশুরমশাই অসীম কুমার ব্যানার্জি এবং তার পরিবারের সকলে কি এটাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে মেনে নেননি। যদি না নিতেন তাহলে মেয়ের মেয়ের জীবনে ক্ষতিপূরণ করতে তিনি কি Legal Proceeding এর আশ্রয় নিতেন

না : এই ভেবে একটি বিষয়ে বিস্ময়ের অবধি থাকছে না যে, কিসের উপর ভিত্তি করে আমাদের মত এরূপ একটি সাধারণ পরিবারের বিরুদ্ধে অযথা কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাতে পারি আমাদের পরিবারে একের সংগে অপরের যথাযথ সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক আর পাঁচটা পরিবারের মতই বিদ্যমান।

চিন্ময় ভট্টাচার্য
আমেরিকান একসপ্রেস
কলকাতা

আমাকে দায়মুক্ত করুন

ছ বছর আগে আমার স্বামী দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর আমি নিজেও অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়েছি। কিন্তু এখনও নিজ কন্যাটিকে বিয়ে দিতে পারিনি। তেমন কোন আত্মীয় স্বজনও নেই যাঁরা চেষ্টা করবেন।

আমি একেবারে নিঃস্ব হলেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিয়ে দেব। মেয়েও প্রকৃত সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা। রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমা আছে। বিনা পণে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছে আমার আকুল আবেদন উপযুক্ত কেউ একজন আমার বিবাহযোগ্য মেয়েটিকে উদ্ধার করে আমাকে দায়মুক্ত করুন।

শ্রীমতী কানন দাস রায়
সরাই বাজার
বিদ্যাধর পুকুরের নিকট
পোঃ দাঁতন
জেলা : মেদিনীপুর

'রুচিবান' নয়, 'রুচিমান'

'পরিবর্তনের' বিজ্ঞাপনের ভাষায় কিছু ত্রুটি আছে, এবং সম্পাদক অথবা প্রচারসচিব মশাই খেয়াল না করায় তার সংশোধন হচ্ছে না।

লেখা হচ্ছে—'পরিবর্তন রুচিবান পাঠকের রুচিশীল সংবাদ সাপ্তাহিক।'

'রুচিবান' শব্দটি কি শুদ্ধ? যতদূর জানি অস্ত্যর্থে 'বতুপ্' বলে কোন প্রত্যয় নেই। 'অ', 'আ' অথবা উপধা 'ম'-এর পর 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' 'ব' হয়ে যায়। এই নিয়মে—জ্ঞান + মতুপ্ = জ্ঞানবান্(জ্ঞানবান), শ্রদ্ধা + মতুপ্ = শ্রদ্ধাবান্(শ্রদ্ধাবান), লক্ষ্মী + মতুপ্ = লক্ষ্মীবান্ (লক্ষ্মীবান)। অন্যসব ক্ষেত্রে কিন্তু 'মতুপ্' এর 'ম' অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান), শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান্ (শ্রীমান), অংশু + মতুপ্ = অংশুমান্ (অংশুমান)। সুতরাং হওয়া উচিত রুচি + মতুপ্ = রুচিমান (রুচিমান্)।

আর তাছাড়া, মশাই বাহুল্য, যাঁরা রুচিমান তাঁরা রুচিশীল পত্রিকাই পড়বেন। 'রুচিশীল' শব্দটির মুখর ঘোষণায় তাই প্রয়োজন আছে কি? 'যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে'—এক্ষেত্রে 'রুচিশীল' শব্দটি ব্যক্ত না হয়ে অব্যক্ত অনুরণন সৃষ্টি করুক না। STRESS এর প্রয়োজনে 'রুচিশীল'-এর জায়গায় 'একমাত্র' বা 'সাথী' বা 'নিত্যসাথী' বা 'আহেলী' (খাঁটি, আসল, নতুন) শব্দ বসালে কেমন হয়?

গোপালেন্দ্র লাহিড়ী
পাগলাচণ্ডী, নদীয়া

ধর্মীয় চেতনার অভাব

পরিবর্তনে প্রায় নারী নির্যাতন, বধূহত্যা ইত্যাদি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বধূ-আত্মহত্যা। পিনাকী মজুমদারের লেখায় এগুলি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। পিনাকীবাবু এ সবের বহু কারণ বলেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি আসল কারণে হাত দিতে পারেননি। আমার মনে হয় এ সবের মূল কারণ ধর্মীয় চেতনা-বোধের অভাব। মুসলমান ধর্মে বিয়ের সময় যেভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনাগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, জানিয়ে দেওয়া হয় স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত অধিকার, বুঝিয়ে দেওয়া হয় স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আন্তরিকতা ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য। এর ফলেই হয়ত তুলনামূলকভাবে মুসলিম সমাজে এ সব নির্যাতনগুলি কম দেখা যায়।

আসলে সব কিছুর মূলে আছে চরিত্রের অভাব। নৈতিক দায়িত্ব ও চেতনাবোধই স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও দায়িত্বশীল করে চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। আর এই নৈতিক দায়িত্ব আসে ধর্মীয় চেতনা হতে।

ফারিদা ইয়াসমিন
সিউড়ী, বীরভূম

সত্যের মুখ

দেবযানী সম্পর্কে লেখাটি অনেক সত্যের মুখ খুলে দিয়েছে। এরকম অনেক দেবযানী বিচারের অভাবে চোখের জল ফেলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে কে তার হিসাব রাখে?

এ সমস্ত হত্যার পিছনে শ্বশুর বাড়ির লাঞ্ছনা যেমন দায়ী, বাপের বাড়ির অবহেলাও কোন অংশে কম দায়ী নয়। কেউই হয়ত চায় না তাদের মেয়ের অকাল—অস্বাভাবিক মৃত্যু, তবু অনেকের এ ধারণা থাকে যে—বিয়ে হবার পর দায়িত্ব তাদের অনেকটা কমে গেল, আর এই ধারণার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ঐ পরিবারের শ্বশুর-বাড়িগুলি।

শঙ্কর ভট্টাচার্য
কলকাতা-৮

এখন নজরুল পরিবার

'পরিবর্তন'-এ 'চরম দারিদ্র্যে নজরুলের দুই নাতনির দিন কাটছে' শীর্ষক শ্যামল বসুর লেখায় একটি ভুল চোখে পড়েছে। লেখার শেষ দিকে উল্লেখ রয়েছে 'কবি নজরুল ১৯২৫ সালে একটি চিঠি পান অধ্যক্ষ ইদ্রিস খানের কাছ থেকে।' ইনি প্রকৃতপক্ষে ইদ্রিস খান নন, ইব্রাহিম খান; শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে প্রিনসিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ নামেই বেশি পরিচিত। নজরুলকে লেখা খাঁ সাহেবের চিঠিটি ভাদ্র, ১৩৩৪ সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় এবং নজরুলের দেয়া জবাব পৌষ, ১৩৩৪ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হাসান মীর
রংপুর, বাংলাদেশ

প্রবাসীর চিঠি

কাশীতে আমরা ভাল আছি

বাংলার বাইরে অনেক প্রতিকূলতায়, কাশীতে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে বেশ ভাল আছি। এখানে আছে অতি প্রাচীন এক বাঙালি-সমাজ, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, শতাব্দী-পুরানো এক পাঠাগারে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় গ্রন্থ সম্ভার। আমাদের আছে বেশ কয়েকটি দুর্গা পূজা, কালী পূজা, বাসন্তী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্তিক পূজা ও সরস্বতী পূজার পরম্পরা। এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে নববর্ষ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী। ব্যাঙের ছাতার মত নিত্য নূতন সংস্থার জন্ম না হলেও এখানকার বেশ কতকগুলি নাট্যসংস্থা প্রায় সারা বছর কিছু না কিছু নাটক করে থাকে। এখানে অনুষ্ঠিত হয় দুটি সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা। একটি পূর্ণাঙ্গ, অন্যটি একাংক। ফলাফল নিয়ে অল্পসল্প কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হলেও নানা রাজ্যের নিত্য নূতন নাট্য চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার দুটি খোলা জানালা।

কাশীতে আছে রবীন্দ্রভারতীর মান্যতাপ্রাপ্ত রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষায়তন। বিভিন্ন সংস্থায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চাও হয়ে থাকে। তাই আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে কখনও কখনও শোনা যায় রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান। নিন্দুকেরা অবশ্যই আমাদের উচ্চারণ কটুতা বা বা সুর বিকৃতিতে কটাক্ষ করে থাকেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা অবশ্যই পরিবেশ ও জলবায়ুর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব। অন্যথায় আমরা নিশ্চয় রবীন্দ্র সংগীত অনুরাগী।

আমাদের ছেলে মেয়েরা বাংলা শিখতে পাচ্ছে না। এখানকার শিক্ষায়তনে বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ নেই বললেই চলে। বর্তমান পাঠ্যক্রমের গুরুভারে পীড়িত ছেলে-মেয়েদের আলাদাভাবে বাংলা শেখানো কঠিন, তাই তাদের জিভে বাংলাতর ভাষার অবাধ আনাগোনা। নবাবী আমলে যেমন বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এখানে তারই নব্যায়ন চলছে। তবুও আমরা ভাল আছি। কেননা এখানকার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে আছে সঙ্কটমোচন মন্দিরের চারদিনব্যাপী, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শিক্ষায়তন RIMPA-র তিনদিনব্যাপী ও পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের সংস্থা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ জন্ম শতাব্দী সমারোহের তিনদিনব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন। এসব নিয়ে আমরা ভালই আছি।

কিন্তু কতটা ভাল জানতে চাইলে এখানকার ভাষায় বলতেই হয় (কেননা বাংলা ভাষাটা খুব কমজোর হচ্ছে) রা-জা! আমরা বড় চৌ-চক আছি।

কল্যাণকৃষ্ণ ঘোষ
ডি. এল ভবন, মদনপুরা

সব চেয়ে সুস্বাদু জলখাবার তৈরীর উন্নততর স্বাদিষ্ট পন্থা

নতুন!

MAGGI®

2-মিনিট নুডলস্

1 মাত্র দেড় কাপ জল ঢালুন এবং ফোটান

2 নুডল্‌সকে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে নিন

3 ফুটন্ত জলে নুডল্‌স ফেলে দিন টেস্ট-মেকার সমেত

4. মাত্র মিনিট দুই ফুটতে দিন, মাঝে-মাঝে নাড়িয়ে দিন।

ম্যাগি—এর একান্ত নিজস্ব বিশেষ টেস্ট-মেকার রয়েছে, তিনটি চমৎকার সুগন্ধে—মসলা, চিকেন ও ক্যাপসিকা।
ম্যাগি—সর্বোচ্চ গুণমানের এবং ইতিপূর্বে বিরল সুস্বাদু রেঞ্জ।

NEW
MAGGI
2-Minute noodles
Masala flavour
Fast to cook! Good to eat!

নীট ওজন 100 গ্রাম

গরম পরিবেশন করুন
স্বাদ অপূর্ব।

আপনি এই সহজ পদ্ধতিগুলি
যখনই কাজে লাগাবেন তখনই
কিন্তু ম্যাগি 2-মিনিট নুডলসের
অপূর্ব স্বাদে আপনি রূপায়িত করবেন।

রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!

CLARION/141/R BEN

অম্লমধুর

বাপের থাকলে গাড়ি-বাড়ি,
ব্যাংকে অঢেল টাকা—
বুড়ো হলেও কেমন তাকে
হয় তোয়াজে রাখা !
তেমন দাপট নেইকো যার,
জীবনটাই ফালতু তাই,
বউ-বেটার সংসারে আর
দিন কাটে না সোজা ।

অসীমা সান্তারা

বিয়ের রাতে সোহাগ ভরে
বউ হেসে কয় পতিরে,
ক'দিন বাদে টিপবে গলা
কও দেখি আজ সতীরে ?

তপন বিশ্বাস

স্বাধীন দেশের যুবক আমি
স্বাধীন আমার চিত্ত ।
স্বাধীন বলেই বেকার আছি
হইনি কারো ভৃত্য ।
শিশু রাষ্ট্র যুবক হয়ে
রকেট ওড়ায় শূন্যে,
ফাঁকা পেটে আমরা বাঁচি
সেই কৃতিত্বের জন্যে—
'গরিবি হঠাও' স্লোগানেই
আমরা জুড়ি নৃত্য ।

★

'হকার হঠাও' অভিযানে
বলছে পুলিশ কানে কানে
আজকে তোমায় হটিয়ে দিলেও—
দুদিন পরে এস !
পাওনা আমার মিটিয়ে আবার
এইখানেতেই বস !

প্রদীপ দাস

'সুইসাইড নয়', 'মার্ডার'
বলছে বলুক লোকে ।
কী এসে যায় মন্ত্রী দাদার,
ঠুলি বাঁধা চোখে ।
বলছে কাগজ আবোল তাবোল,
পাবলিক সব পাগল ।
মিথ্যা সবাই বলছে বলুক,
'সাচ্চা' আমি কেবল ।

কালামুখ

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

পাঁচ মিনিট

অথ রোবট কথা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটি রোবট বানিয়েছেন। রোবটটি ড্রেন সাফাই থেকে শুরু করে প্রচণ্ড তাপ ও ধুলো ময়লার মধ্যে কাজ করতে পারবে ।

রোবটটির সন্ধান পেয়ে বহুদর্শী সম্প্রতি রোবটটির নির্মাণকর্তা ডঃ চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ।

ডঃ চাকলাদার বহুদর্শীকে যথেষ্ট খাতির করে রোবটটি দেখাতে নিয়ে গেলেন । একটি শেডের নিচে রোবটটি তখন বসে ছিল ।

ডঃ চাকলাদার রোবটের সঙ্গে বহুদর্শীর পরিচয় করিয়ে দিলেন । মিঃ রোবট, ইনি একজন লেখক, আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছেন ।

রোবট : লেখক তো বুঝলাম । যিনি লেখেন তিনিই লেখক । কোন দলের ? মানে কোন বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন ?

বহুদর্শী : আজ্ঞে আমি কোন আমলে কোন পুরস্কারই পাইনি । এর দ্বারা প্রমাণ হয় আমি কতখানি নির্দল ।

রোবট : রোবটদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?

বহুদর্শী : আজ্ঞে, খুব ভাল ধারণা । এই যে চারিদিকে এত অশান্তি, গোলমাল, এর পিছনে একটাই কারণ মানুষ বড় বেইমান । সরকার যে জনগণের জন্য এত কিছু করছে তারা বুঝতে চায় না । তারা চিরকাল অসন্তুষ্ট...

রোবট : জনগণ বলবেন না, বলুন জনগণের একাংশ । আর আপনারা লেখক সাংবাদিকেরা ওই একাংশকে ক্ষেপিয়ে তোলেন । তাই তারা কাজ করতে চায় না, সব সময় গোলমাল পাকায় ।

বহুদর্শী : যা বলেছেন । সে তুলনায় আপনারা কত শান্তশিষ্ট । যা বলা হয় মুখ বুজে তাই করেন ।

রোবট : আপনি দেখছি আমাদের বন্ধু । আসুন করমর্দন করি ।

রোবট তার লোহার তৈরি শক্ত হাত বাড়িয়ে দিল । বহুদর্শী আলতোভাবে তা স্পর্শ করল ।

বহুদর্শী : আচ্ছা আপনি কী কী কাজ করতে পারেন মিঃ রোবট ?

ডঃ চাকলাদার এবার বললেন : রোবট নানা শ্রেণীর হতে পারে । ইনি হচ্ছেন প্রগেসেভিয়া টাইপ টু টাইপের । অর্থাৎ যে কোন বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম করতে ইনি বিশেষভাবে পটু ।

বহুদর্শী : যেমন ?

রোবট নিজেই উত্তর দিলেন—যেমন : অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে নানা কর্মসূচি । হকার উচ্ছেদের ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিন্দা করে নানা বিবৃতি, কেন্দ্রের নানা চক্রান্তের ব্যাপারে জনগণকে অবহিত করার ব্যাপারে নানা বিবৃতি রচনা ।

বহুদর্শী : আপনি এত দুরূহ কাজ পারেন, লোডশেডিং বন্ধ করতে পারেন ?

রোবট : লোডশেডিংকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না । এই সমাজ ব্যবস্থায় লোডশেডিং থাকবে । এজন্য সমাজ ব্যবস্থাকে পালটাতে হবে । আর এই সমাজ ব্যবস্থা পালটান মাত্র একজন রোবটের কাজ নয় । এর জন্য অনেক রোবটের দরকার ।

ডঃ চাকলাদার : এখনও দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রোবট উৎপাদন শুরু হয়নি । উনি একজন প্রটোটাইপ রোবট । পরীক্ষার জন্য ওকে তৈরি করা ।

রোবট : একটা রোবট দিয়ে কী হতে পারে ?

ডঃ চাকলাদার : কিছুই হবে না, উনি শুধু রোবটের মহিমা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবেন মাত্র । আমাদের বক্তব্য, গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম যেখানে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করা দরকার, আর সরকারের সঙ্গে নীতিগতভাবে সহযোগিতা দরকার সেসব কাজে রোবটের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । যেমন ধরুন পাবলিক সেক্টর কোমপানিগুলির চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কাগজের সম্পাদক ।

বহুদর্শী : আমি শুনেছি এই রোবট উৎপাদন পরিকল্পনায় টাকা নাকি দিয়েছেন কেন্দ্র । তাহলে এর উৎপাদন কি শুধু কেন্দ্রই নিয়ে যাবেন নাকি ?

ডঃ চাকলাদার হেসে বললেন : একজন বাঙালি হিসাবে আমি আমার রাজ্যের স্বার্থ সর্বাগ্রে দেখেছি । আমি রাজ্য সরকারকে রাজি করিয়েছি এই রোবট উৎপাদন পরিকল্পনা হবে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ সেকটরে । শেয়ার ৬০ : ৪০ । এই নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে চুক্তিও হয়েছে । ব্যবসায়িক ভিত্তিক উৎপাদনের প্রথম রোবটটি রাজ্য পাবেন ঠিক হয়েছে । এই রোবটটি হবে একটি মালটিপারপাস রোবট । কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা থেকে রাজ্যের মন্ত্রী যে কোন ধরনের চাকরি একে দিয়ে করানো যাবে । এই বলে ডঃ চাকলাদার হো হো করে হাসতে লাগলেন । কিন্তু রোবট মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়েছিল । ডঃ চাকলাদার বললেন : সেকি তুমি হাসছ না যে । এই বলে রোবটের কাছে গিয়ে কী একটা যন্ত্র টিপে দিতেই রোবট খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল ।

ডঃ চাকলাদার বললেন : দেখেছেন কেমন প্রাণবন্ত হাসিখুশি রোবট । □

বহুদর্শী

ইউনিয়নবাজির নামে পুলিশে উলট-পুরাণ, হাবিলদারের ভয়ে অফিসাররাও তটস্থ

নিশীথ দে

পুলিশের লোকেরা নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন, ডিসিপ্লিন বলে আর কিছু নেই। 'ডিসিপ্লিন'ই পুলিশ বাহিনীর মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। পুলিশের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ঢুকেছে, রাজনীতি ঢুকেছে, দলবাজি চলছে।

পুলিশের মধ্যে যে দুটো দল হয়ে গিয়েছে তা আজকে আর গোপন নেই। যে কোন জেলায় গেলে দেখা যাবে পুলিশ লাইনে প্রতিদিন একটা না একটা সংঘর্ষ কিংবা বিক্ষোভ অথবা ঘেরাও চলছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি আই (এম)-এর মদতে নন-গেজেটেড পুলিশদের নতুন একটি সংস্থা গঠিত হয়।

এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে দেখা যাবে নিচের তলার পুলিশ কর্মচারীদের একটা বড় অংশ অফিসারদের কোন নির্দেশ মানতে চান না। ইচ্ছেমত ছুটি নেন, ডিউটি শেষ না করে চলে যান। পদস্থ অফিসার কৈফিয়ত চাইলে অপমানিত হন, বদলি করার ব্যবস্থা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করেছেন, 'বিভেদকামী গোষ্ঠী' পুলিশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষের পুলিশের প্রতি আস্থা চলে যাচ্ছে। দলবাজি করতে গিয়ে পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি ডেকে এনেছে। পয়সা পাইয়ে দেবার মত থানায় পোসটিং করা হবে লোভ দেখিয়ে দলে টানা হচ্ছে। পুলিশই আজ পুলিশের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকে এমন কোন জেলা নেই যেখানে পুলিশের মধ্যে শৃঙ্খলা আছে। জেলার পুলিশ সুপার-এর ঘরের সামনে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। একজন পুলিশ আর একজনকে ছুরি মারছে। পুলিশই থানায় পুলিশের ডায়েরি নেয় না এমন অভিযোগও অনেক।

বিশৃঙ্খলা, রেষারেষি, দলবাজি, জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করার অভিযোগ শুধু থানার ক্ষেত্রে নয়, পুলিশের প্রতিটি বিভাগেই চলছে। পুলিশের একদল—তাঁরা পদস্থ অফিসার নন, সাব ইনসপেকটর, হাবিলদার, কনসটেবল—উপরওয়ালার কোন নির্দেশ মানেন না, কোন ডিউটি করেন না, বরং অন্যকে বদলি করার ভয় দেখান। একজন সাব-ইনসপেকটর-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করা হচ্ছে যে তিনি কোন ডিউটি করেন না, পুলিশের ইউনিফরম পরেন না। সরকারি গাড়ি নিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ান। গত বছর তার জন্যে পেটরল বাবদ খরচ হয়েছে ৯৬ হাজার টাকা। আর একজন হাবিলদারের খুঁটির জোর এত বেশি যে তিনি একজন ডি এস পি-র কোয়ারটার দখল করে বসে আছেন। কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না।

আর ভাল ভাল জায়গায় পোসটিং নিয়ে দলবাজির অভিযোগ অপুনতি। চক্ষুশূলদের ক্ষেত্রে ঘন ঘন এলোপাথাড়ি বদলি চলছে। আর এ সব নিয়ে পুলিশ লাইনে চলছে বিক্ষোভ। পুলিশ খুন হচ্ছে, কিন্তু আসামীর চারজশিট হচ্ছে না এমন অভিযোগ এখন বিক্ষোভে রূপ নিয়েছে। পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং নন-গেজেটেড পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হয়রানি এবং অন্যান্য অভিযোগ করেছেন।

প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের এই দুই বিবদমান গোষ্ঠীর বিরোধ নিয়ে মাঝে মাঝে হিমসিম খেতে হয়। কথায় কথায় এস পি, অতিরিক্ত এস পি, ডি এস পিরা ঘেরাও হন। গত ৩ আগসট আলিপুরে ডি এস পি (ডিসিপ্লিন)-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান হয়। কেন এটা ঘটল? একজন পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে ওই ডি এস পি তদন্ত করছিলেন। ওই পুলিশ কর্মীটির সেদিন বক্তব্য পেশ করার কথা। কিন্তু সেদিন তিনি নিজে হাজির না হয়ে উপরওয়ালার কাছ থেকে একটি চিঠি লিখিয়ে কর্তব্যরত একজন কনসটেবলকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। ডি এস পি তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে সশরীরে হাজির হতে বলেন। চিঠিতে লেখা ছিল বক্তব্য পেশ করার জন্য যেন একমাস সময় দেওয়া হয়। ডি এস পি নাকি আগে কয়েকবার সময় দিয়েছেন। পুলিশের সারভিস রুল অনুযায়ী ওই কর্মচারীর পুরো ইউনিফরম পরে হাজির হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি তা করেননি। এরপর একদল পুলিশ কর্মচারী ডি এস পি-র ঘরে ঢুকে পড়েন এবং তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হবে বলে হুমকি দেন। বিক্ষোভকারীরা পালটা অভিযোগ করেছেন, ডি এস পি পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা। সেজন্য পালটা সংস্থার সদস্যদের হয়রান করছেন।

অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের পদস্থ অফিসাররা দুই গোষ্ঠীর বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। প্রমোশনের লোভে কোন কোন অফিসার কোন কোন গোষ্ঠীর নেতাকে খুশি করার চেষ্টা করেন। পদস্থ অফিসারের সামনেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হচ্ছে না। একজন ডি এস পি-র সামনে একজন পুলিশ কর্মচারী আরেকজন পুলিশ কর্মচারীর হাতে ছুরিকাহত হন বলে অভিযোগ করা হয়। অ্যাডিশনাল এস পি গ্রেফতারের আদেশ দিলেন, কিন্তু তা মানা হল না।

পুলিশী পোস্টার

থানার ও সি এবং এস ডি পি ওরা এস পির কাছে অভিযোগ করেন। এস পি নিচের তলার কোন পুলিশ কর্মচারীকে শো কজ করলে অথবা কৈফিয়ত তলব করলেই বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। এক শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারী প্রকাশ্যে এস পি, অ্যাডিশনাল এস পি, ডি এস পিদের অনেক সময় সাবধান হওয়ার জন্য শ্লোগান দেন। গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি করে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে পুরুলিয়া, মুরশিদাবাদ এবং বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারদের। লিখিতভাবে অন্তত দশজন পদস্থ পুলিশ অফিসার ডাইরেকটর জেনারেলের কাছে প্রতিকার চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি।

মালদহের মালোপাড়ার ঘটনা নিয়ে রতুয়া থানার ও সি সৌকত আলিকে দায়ী করায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন ক্ষুব্ধ। অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য হল, কসবা থানার নাকের ডগায় ১৩ জন আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে মারা হল। কসবা থানার ও সি বা অন্য কোন অফিসারকে দায়ী করা হয়নি। ইসলামপুরের ঘটনায় দায়ী কোন একজন পুলিশ কর্মচারীকে সাজা দেওয়ার বদলে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তিলজলার ও সিকে খুন করার ব্যাপারে পুলিশী তদন্তের রিপোরট চাপা পড়ে আছে। রিপোরটে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যকে কে বা কারা খুন করেছে পুলিশী তদন্তে জানা যায়নি। তবে হাঙ্গামা হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলের কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক সহ ১২ জন জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ খুন এবং পুলিশের উপর হামলার আরও কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে মামলা চলছে, কিন্তু পুলিশ চারজশিট দিচ্ছে না।

নিচের তলায় প্রমোশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিক্ষোভ আরও বাড়ছে, বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। থানার ও সি পর্যন্ত উপরওয়ালার নির্দেশ মেনে চলেন। কিন্তু অধিকাংশ থানায় ও সির নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে মানা হয় না ☐

আলোকচিত্র : শংকর দাস নাগ

কেন্দ্রবিন্দু

তীর্থংকর - সঞ্জীব মামলায় রাজ্য সরকার বেকায়দায়

অভিমন্যু সেন

তীর্থংকর-সঞ্জীব মৃত্যু নিয়ে আদালতের বিতর্ক এখন পশ্চিমবঙ্গবাসীর নতুন আলোচ্য বিষয়। সি বি আই অথবা নো সি বি আই, জনস্বার্থ না জনবিরোধী-স্বার্থ—এসব ব্যাপার নিয়ে হাই কোরট সরগরম। চূড়ান্ত ফয়সালা যাই হোক, এই ঘটনায় বামফ্রনট সরকার ফাঁপরে পড়েছেন। তা এড়াতে সর্বত্র এই সরকারকে প্রচণ্ডভাবে লড়তে হবে। কোনভাবে যদি একবার প্রমাণ হয় যে তীর্থংকর ও সঞ্জীব খুন হয়েছিল তাহলে পরিষদীয় গণতন্ত্রের রীতি-নীতি অনুযায়ী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সর্বনাশ। তিনি বিধানসভায় আগেভাগে বলেছেন যে, এটা আত্মহত্যা, উলটো প্রমাণ হলে সিরিয়াস ধরনের প্রিভিলেজের প্রশ্ন নিয়ে বিরোধীরা অসত্য বক্তব্য বিধানসভায় রাখবার জন্য স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে চেপে ধরবেন। সেক্ষেত্রে বৃটিশ নিয়মনীতির যে বন্দোবস্ত হাউস অব কমনসে চালু আছে সেই উদাহরণ অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা যেতে পারে। কেরালায় রাজন হত্যা মামলায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী করুণাকরণকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল বিবৃতির যথার্থ রক্ষা না হওয়ায়। কেরালার উদাহরণ বামফ্রনটের চোখের সামনে থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বয়ানকে রক্ষা করতে বামফ্রনটকে সাচেষ্ট হতেই হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসী বিধানসভা সদস্য পরিমল সাহাকে খুন করার তদন্তে রাজ্য সরকার কিন্তু সি বি আই তদন্ত মেনে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিকে সরকার উপেক্ষাই বা করবেন কী করে?

তীর্থংকর-সঞ্জীব হত্যা নিয়ে কলকাতা, শহরতলী ও সব মফঃস্বল শহর তোলপাড়। গল্প স্তোরি যে এর মধ্যে নাকি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রীতি-ভাবাপন্ন সব রাঘববোয়ালদের সম্পর্ক আছে। চূড়ান্ত ফয়সালা একদিন হবে কিন্তু তীর্থংকর-সঞ্জীবকে পাওয়া যাবে না। ধানবাদে কলকাতার তরুণ অডিটারের মৃত্যু, আসামে ইনজিনিয়ার রবি মিত্রের খুন এবং দিল্লির প্রাক্তন অ্যামবাসাডর ও তাঁর পত্নীর মৃত্যু সহ মানেকা গান্ধীর কাকা জে এস আনন্দের মৃত্যু—সব বিষয়েই একটা না একটা সরলরেখার মত সূত্র বেরিয়ে পড়ছে। বিহারের ববি মৃত্যু রহস্য সরকারের ইমেজকে ছোট করেছে আর তীর্থংকর-সঞ্জীব মৃত্যু রহস্য এবং তার তদন্তে বামফ্রনটের অকারণ অপ্রয়োজনীয় প্রতিরোধ বা অনীহা কিন্তু সরকারের প্রতি সবার অবিশ্বাস দৃঢ় করবে। এর থেকে পথ বের করে সত্যকে মুখোমুখি মোকাবেলা করাটাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। তা না হলে হয়ত এই ঘটনাই হবে সরকারের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের প্রথম কালো মেঘ।

তীর্থংকর সঞ্জীব মৃত্যু রহস্য নিয়ে ব্যারাকপুর মহকুমায় কিছুটা হই-হল্লা হলেও গোটা রাজ্যে কিন্তু এই নিয়ে বিরোধী দলের কেউই তেমন হৈ-চৈ করতে চাননি। তার একটা বড় কারণ বোধহয় কেউই যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চিন্ত নন যে এর পেছনে কারা আছে। কানাঘুষোতে যে সব খবরাখবর বের হচ্ছে তা থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার-পক্ষীয় দলের কিছু হিতৈষীর নাম এমনভাবে রটে গেছে যে বিরোধী দলগুলোর পক্ষে যথেষ্ট অসোয়াস্তির কারণ হয়েছে।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আইনসম্মত ব্যবস্থার উপর। □

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ ভেঙে পড়ছে মায়াপুরে জড়ো হচ্ছে রাজকীয় ঐশ্বর্য

শেষ বিকেলের আলোয় মহাপ্রভু-স্মরণ

[illegible] পরিচয়জ্ঞাপক একটি লেখা।

যীশু চৌধুরী

রাই জাগো, রাই জাগো

পাঁচশো বছর ধরে জীবন চলছে খঞ্জনির তালে। বৃদ্ধা উমাশশী ভোর হতেই কপালে তিলক কেটে কৃষ্ণনামের ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সমাজবাড়ির আশ্রমে পুজো করবেন বলে। দোকানগুলি খুলতে সুরু করে, মিষ্টির দোকানের সামনে কাকেরা নেমে আসে, নামাবলি আর কণ্ঠির দোকানে সাজান গোছান শেষ হয়ে যায়। ফুলের ঝারি হাতে মেয়েরা ভিড় করে সোনার গৌরাংগ, শ্রীবাস অংগন বা সমাজবাড়ির দেবমূর্তির সামনে। গুরুগম্ভীর স্বরে কেউ বা গান গেয়ে ওঠেন, বিস্তীর্ণ দেবস্থানে সেই সংগীতধ্বনি শত-পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হয়।

এই প্রাচীন শহরের ধুলোয় এখনও হয়ত মিশে আছে শ্রীগৌরাংগ মহাপ্রভুর স্পর্শ, মিশে আছে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্বেদ অথবা আবেগ অশ্রু, মিশে আছে শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর বা মুকুন্দের আকৃতি অথবা চরম শ্রদ্ধার স্মৃতি। তাই এখানে চাপা গলি, দুপাশে বিশাল পুরনো খিলানঅলা বিস্তীর্ণ মঠ-মন্দির-আশ্রম দিনের আলো ফোটার সংগে সংগে আলোকিত হয়ে ওঠে, সন্ধ্যা নামার সংগে সংগে ঘনিয়ে আসে শ্লথ আঁধার।

মুক্তি এ শহরে মিলবে কি? কত সম্প্রদায়, বৈষ্ণব ভক্তের দল, কত নিবিষ্ট মানুষ এখানে পাঁচশত বৎসর আগেকার এক রত্নগর্ভা মায়ের কোলে শায়িত কোন মহামানবকে উপলব্ধি করতে আসেন অথবা আরও পরেকার কোন ছবি, পথে পথে ঊর্ধ্ববাহু চলেছেন কোন অগ্নিময় তরুণ, কণ্ঠে তাঁর গান, এবং সমবেত অনুগামীদের কণ্ঠেও সেই স্রোতঃধারার মত গান। ধারা বাহিত হয়ে এল পাঁচশো বছর ধরে।

কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও এই পাঁচশো বছরে পথ পরিক্রমা করেছেন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, গানও হয়েছে সমবেত। কখনও বা ইতিহাসের আলো পড়েছে সে পথ পরিক্রমা, সমবেত সংগীতের উপর, কখনও তাও পড়েনি। অন্তর্নিহিত সুতোর মত তা থেকে গেছে মাত্র।

তবু কি নবদ্বীপচাঁদের প্রবর্তিত সেই ধারাই এখনও বহমান? যা ছিল নেহাৎ ভক্তি ও প্রেমানুভূতি, তাই-ই কি এখনও অবলম্বন মাত্র? নাকি সাড়ে চারশো বছর ধরে বৈষ্ণব গৌড়ীয় পন্থা তার গতি পরিবর্তন করেছে? এখনই বা তার প্রকৃত চেহারা কী?

বাংলা, আসাম এবং ওড়িশার চৌহদ্দি পেরোলে শ্রীচৈতন্যের সংগে বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে প্রত্যক্ষভাবে। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে বৈষ্ণবদের ধ্রুপদী অবলম্বন স্ফুরিত হয়েছে মথুরা ও বৃন্দাবনে। দ্বারকেশ্বর মন্দির বা যমুনাত্রীর মন্দিরে মন্দিরে তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদনরত। কিন্তু নবদ্বীপে সে বংশী শ্রীচৈতন্যের অধরে চুম্বিত সংগীতময়। মণিপুর রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের অনুমহাপ্রভুর মন্দিরে তাই শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বংশীবাদনরত।

যে অষ্টধাতু মূলত শ্রীকৃষ্ণের দেবমূর্তির অবলম্বন, নবদ্বীপে বা কাটোয়ায় তা নিতাই গৌরাংগের দেবমূর্তিতে ব্যবহৃত। কিন্তু এ শুধু বাহ্যিক বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আত্মিক ভাবেও কখনও লৌকিক পথে ঘুরেছে, কখনও বা ধ্রুপদী সাজসজ্জা নিয়েছে। অতি সম্প্রতি কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে আবার আলোড়ন এসেছে বিদেশি নিয়ন্ত্রিত একদল বৈষ্ণব ভক্তকে অবলম্বন করে। কেউ এই ভক্ত সম্প্রদায়ের ওপর রুষ্ট, কেউ [illegible] তাঁদের প্রকৃত বৈষ্ণব হিসাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

এই প্রত্যাখান বা স্বীকৃতিরও রকমফের আছে। আচার আচরণ বা

[illegible]িকতার দিক থেকে স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদেশিদের বাহিক ঐশ্বর্যের ধারে কাছেও আসেন না। কিন্তু সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা তো শুধু সম্পদ দিয়ে হয় না, একাত্মতার দিক থেকেও হয়। তাই প্রশ্ন উঠেছে বৈষ্ণব ধর্ম আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, আগামীকাল তাহলে তাঁর যাত্রা কোন পথে? আরও পাঁচশো বছর পরে সত্যিই কি নবদ্বীপচন্দ্রের সংগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্কের কথা কেউ মনে রাখবেন? নাকি নব নব সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাঁর স্মৃতি?

যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান

নবদ্বীপের শ্রীবাস অংগনে মহাপ্রভু এসে প্রতিদিন ভক্তসমাবৃত হয়ে নামগান করতেন বলে জানা যায়। এখানে একটি কদম গাছ পুঁতেছিলেন তিনি নিজের হাতে। গাছটির কান্ড নষ্ট, শিকড়ের উপর এখন দাঁড়িয়ে আছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ভক্তরা জানেন এর মাটি অতি পবিত্র। নীরবে এক তরুণী বধূ এসে তার মাটি কিছুটা তুলে নিলেন, মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে রাখলেন তিনি। তারপর মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলেন বহুক্ষণ ধরে। গলায় আঁচল জড়িয়ে করজোড়ে কতক্ষণ সেই গাছের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। চোখ ছাপিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ছিল তাঁর।

শ্রীবাস অংগনের মোটা মোটা থামের উপর পাথরে বাঁধান বিশাল পৈঠা। শেষ বিকেলের অস্তগামী সূর্যরশ্মি এসে সেই পৈঠার আনাচে-কানাচে পড়েছে। এমনই এক থামে ঠেস দিয়ে স্বাভাবিক আলোতে ঝুঁকে পড়ে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ক একটি বই পড়ছিলেন সত্যচরণ লাহা। পাশে পরিষ্কার হাফ হাতা শার্টটি খুলে রাখা আছে, শোয়ান রয়েছে লম্বা একটি ছাতা। আমাদের ছায়া পড়তেই মুখ তুলে তাকালেন। চোখে মুখে প্রশান্তি। আশেপাশে ঐ একাগ্র বধূটি ছাড়া আর কেউ নেই।

সত্যচরণবাবু এসেছেন ত্রিপুরা থেকে, ত্রিশ বছর আগে। সেখানে বেশ বড় ব্যবসা ছিল তাঁর। কিন্তু ছায়েদের অদ্ভুত ব্যবহারে সব ছেড়ে দিলেন, ব্যবসারও স্বত্বটুকু পর্যন্ত নিজের জন্য রাখলেন না। মানসিক শান্তির জন্য চলে এলেন নবদ্বীপে।

শান্তি পেয়েছেন তিনি? হ্যাঁ, সত্যচরণবাবুর অন্তত তাই মত। এখানে ভোর হলেই তাঁর জীবন শুরু হয়ে যায়। আর কাজ মানে কোন রকমে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি আর এই শ্রীধাম অংগনের নির্জনে বসে মহাপ্রভুর লীলা পাঠ, একান্ত মনে মনে।

সমাজবাড়ি মূলত ওড়িয়া ভক্তদের একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আশ্রম। ঢোকার সময়ই চোখে পড়বে প্রৌঢ়া ভক্তিমতীরা গোল হয়ে বসে মালা গাঁথছেন। কয়েকটি শিশু আগ্রহ ভরে সেই মালা গাঁথা দেখছে। অদূরে দুই পান্ডা পাথরের থামে হেলান দিয়ে বসে আছেন। একজন ঐ অবস্থাতেই মালা জপ করছেন। অন্যজন উর্ধ্বমুখী নীরব। প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন এক বৃদ্ধা মালা জপের থলি নিয়ে অর্ধভংগ হয়ে এলেন। বসলেন সেই চত্বরে। দেবমঞ্চের দিকে মুখ করে। সে দেবস্থানের দরজা বন্ধ। বিকাল পাঁচটার পর মোহান্ত আসবেন, তখন দেবস্থানের দরজাও খোলা হবে। অতিবৃদ্ধ এই মোহান্ত গোপনে বসে মালা জপ করেন। তাঁর ছবি তুলতে গেলে ঘোরতর আপত্তি জানান।

ও রে নেয়ে, পার হয় কি নিমাজ্ঞি?

না, আমার ছবি নয়, আমার ছবি নয়। কিছুতেই ছবি তোলা গেল না তাঁর। কেন? কিসের আপত্তি? না, বাবা আমরা সব বৈষ্ণব গা। এই খাইদাই নামগান করি। আমাদের নয়, ছবি আমরা কী করব?

প্রত্যেক মন্দিরের সামনেই চত্বরের কথকঠাকুর ভাগবত পাঠ করবেন বলে তাঁর বসার ও শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা আছে। পুরনো মঠগুলিতে এ ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু নতুন মঠগুলিও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। যেমন মহানাম মঠেও সামনে থেকে ঢুকেই বিরাট চত্বর। সামনেই দেবমঞ্চ, কোল্যাপসিবল গেটের বাইরে থেকেও সে মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু পুরনো মঠগুলির কোথাও বাইরে থেকে দেবমূর্তি দর্শন করা যায় না। দরজা দিয়ে ঢুকে তবেই দেবস্থান দর্শন করার জায়গায় আসতে হয়।

মণিপুর অনুমহাপ্রভুর মঠে প্রথম প্রবেশ করলে মনেই হবে না এখানে কোন মানুষ থাকেন বলে। চুপচাপ, নির্জন। কয়েকটি পাখির ডাক এবং গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মন্দির মঞ্চে তিন মণিপুরী মহিলা শুধু পুজোর আয়োজন করছেন। কেউবা নিঃশব্দ করতালি দিয়ে নামগান করছেন, তাও নিঃশব্দে।

এই মন্দিরের পুরোহিত মদন শর্মার বয়স বেশি নয়। তবে এগার বছর ধরে এ মন্দিরে রয়েছেন। মণিপুরীদের মন্দিরের পুরোহিত হলেও এঁর মাতৃভাষা কিন্তু মণিপুরী নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। ত্রিপুরী ভাষারই একটি সংখ্যালঘু ধারা। তবে মণিপুরী ভাষায় তাঁর দক্ষতা কারোর চেয়ে কম নয়।

মদন শর্মা সেই কতকাল আগে জন্মস্থান ত্রিপুরা ছেড়েছেন শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থানে থাকবেন এই লোভে। অবশ্য একে লোভ বলা উচিত নয়। কারণ বৈষ্ণবদের লোভ করতে নেই। তবু বলা যায় এক আকাঙ্ক্ষা। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাবা মা-এর কাছ থেকে তাঁকে টেনে বের করেছে। তারপর হয়ত নবদ্বীপচন্দ্রের মত আর এক ভাবে পথ পরিক্রমা। প্রথমে এসেছিলেন গোবিন্দ মন্দিরে। এটি সম্ভবত ত্রিপুরীদের মন্দির। সেখান থেকে অনুমহাপ্রভুর মন্দিরে চলে এসেছেন।

অনুমহাপ্রভুর মোহান্ত রাজকুমার টোকেন্দ্রজিৎ অতি সাধারণ এক পোশাকে, খালি গায়ে এসে হাজির হলেন। একে একে পরিচয় করালেন এই মন্দিরের সব কিছুর সংগে। এখানে কত মানুষজন থাকেন। কত ঘর, কত শিশু সবই একে একে বোঝা গেল। এ এক নতুন পৃথিবী। এখানে নাচ হয়, গান হয় এমন কি বিয়ে বা শ্রাদ্ধও হয়। কিন্তু সবই সরলতা ও বিনয়ের সংগে।

তারমধ্যেও এক প্রচ্ছন্ন গর্ব নেই এমন নয়। যেমন রাজকুমার আমাকে নিয়ে গেলেন দেবস্থানের কাছে। বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, পড়ন এটা। মণিপুরী অজস্র নাম খোদাই করা রয়েছে পাথরে পাথরে। লিপি বাংলা। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, মণিপুরীরা প্রাচীন এক লিপি ইদানিং খুঁজে পেয়েছেন। ফলে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই এখন বাংলা লিপি বাতিল হয়ে গেছে।

রাজকুমার যে খোদাই করা পাথরটির লেখা পড়তে বললেন দেখি সেখানে লেখা রয়েছে 'শ্রীপাঠ বাঘনাপাড়া নিবাসী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী শ্রীমতী অমলা-দেবী এবং কলিকাতা বহুবাজার গোবিন্দ সেনের লেন নিবাসী গৌর-মোহন দে মহাশয়ের পুত্র নিতাইগত প্রাণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে এই শ্রীমন্দির নির্মাণ কল্পে আংশিক ব্যয়ভার বহন করায় তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থে এই...... স্থাপিত হইল।'

অমলা দেবী যে রবীন্দ্রনাথের সংগে দ্বৈত কণ্ঠে গান গেয়েছেন সে কথা জানেন রাজকুমার টোকেন্দ্রজিৎ। আর শোনালেন কিভাবে অমলা দেবী এখানে এসে পড়লেন। তখন মন্দির পড়ো পড়ো। অমলা দেবী সারা নবদ্বীপ ঘুরে বেড়াচ্ছেন একজন পরম বৈষ্ণবের মত। এখানে এসে সেই ভাঙা মন্দিরের মধ্যে হঠাৎ পেলেন রাজদর্শন। মন্দিরটি পুরোপুরি তৈরির প্রস্তাব দিলেন তৎকালীন মোহান্তকে। মোহান্ত সংগে সংগে রাজি।

অবশ্য পুরোটা দেখে যেতে পারেননি অমলাদেবী। এই যোগাযোগের সূত্রেই অনুমহাপ্রভু মন্দিরের এক শরিকী মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন এবং এ মন্দিরের সম্পত্তি সংক্রান্ত ফয়সালা হয় মূলত তাঁরই উদ্যোগে।

সকাল হলেই প্রায় সকলেই নগর সংকীর্তনে মেতে ওঠে। ভোরের সুর ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে, মঠ মন্দির গৃহস্থালিতে। এই নাম সংকীর্তন ধারাবাহিক ভাবে হয়নি। মাঝে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন মঠ মন্দিরের উদ্যোক্তারা আবার এর প্রচলন করার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে প্রধান নগর সংকীর্তনটি পরিচালনা করেন শ্রীবাস অংগন ও সোনার গৌরাংগ মন্দিরের মোহান্ত প্রভুপাদ নিমাই-চাঁদ গোস্বামী।

প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী নিত্যানন্দ বংশধারার উত্তরপুরুষ। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যেমন আছে তেমনই বৈষ্ণবের স্বাভাবিক বিনয়েরও অভাব নেই। কার্যত তাঁরই প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যে শ্রীবাস অংগন ও সোনার গৌরাংগ এখনও বৈষ্ণব দর্শকদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সোনারগৌরাংগ মন্দিরের বিস্তীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে সারি সারি ছবি সাজান রয়েছে দেখতে পাওয়া যাবে। এরই একটি ছবি কোমপানি আমলের প্রথম দিককার। একদল মানুষ নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছেন।

শ্রীবাস অংগন থেকে যে নগর সংকীর্তনের মিছিল বেরোয় তার পুরোভাগে থাকে এই ছবিটি। কীর্তনীয়া ও নগর পরিক্রমাকারীদের মধ্যে তরুণতরদেরও অভাব নেই। এদেরই একজন সর্বাগ্রে ছবিটি ধরে থাকেন। পেছনে হলুদ পতাকা উড়িয়ে উদাত্ত গান গাইতে গাইতে চলেন মিছিলকারীরা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশতম আবির্ভাব মহা-তিথি উপলক্ষে প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামীর এই নগর পরিক্রমা প্রতিদিন ভোরবেলাকে সতেজ করে তোলে। সেই মিছিল যায় গংগার ধার পর্যন্ত। ভোর চারটের সময় এই মিছিল রওনা দেয়। ছটার মধ্যে তা ফিরে আসে শ্রীবাস অংগনের চত্বরে।

মহানাম মঠে জীবনবন্ধু সুন্দর ওঠেন প্রতি ভোর সাড়ে তিনটের সময়। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মূর্তি ও দেববিগ্রহের পূজার্চনা শুরু করতে হবে। তিনিই সব গোছগাছ করেন। স্নান করেন। প্রায় মৌন এই মঠাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ, সংসারত্যাগী। সকাল হলে পূজার্চনার পর ভোগের আয়োজন চলে। তিনি একা তাঁর ঘরটিতে বসে পড়াশুনা করেন। চারদিকে বই-এর আলমারি। তার মধ্যে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর লিখিত বইও আছে।

জীবন বন্ধু সুন্দর কথা বলেন কম, কিন্তু যখন বৈষ্ণব ধর্ম ও ভক্তির প্রসংগ ওঠে তখনই তিনি উদ্দীপিত, একাগ্র। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বলেন, ঈশ্বরের কাছে যেতে না পারলে জীবনের কোন অর্থ নেই। জীবন সার্থক করতে হলে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আশ্রয় নিতে হবে।

নিমাই চাঁদ গোস্বামী

সারাদিন তারপর চুপচাপ মহা-নাম মঠ। হয়ত বিকালের দিকে আবার সন্ধ্যারতি, কীর্তন ও ভোগ হবে। তখন কিছুটা উত্তেজনা জেগে ওঠে। জেগে ওঠেন জীবনবন্ধু জাগতিক ভংগির মধ্যে। রাত ঘন হলে মঠের মূল দরজা আবার বন্ধ হয়ে যায়। আবার সব চুপচাপ হয়ে যায় চারপাশ।

ভাগীরথী ও জলংগী যেখানে এসে মিশেছে সেখানে চারটে শুশুক ভুস করে ডুব দিচ্ছে আবার উঠে আসছে। ডিগবাজি খাচ্ছে আপন খেয়ালে। বাঁ পাশে শুশুকের সেই খেলা ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম মায়াপুরের দিকে। এখানেই আছে ইসকনের মন্দির।

আগের দিন ইসকনের এক ভক্ত সাহেবের সংগে মারামারি হয়ে গেছে এক বাস ড্রাইভারের। আমাদের নৌকোর মাঝি যেন রেডিও-র ধারাভাষ্যের মত বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সাহেবের সংগে ড্রাইভারের ধাক্কা-ধাক্কি হয় প্রথমে তারপর ছায়েব লাফায়ে ওঠে আর ডেরাইভারকে মারে, লাফায়ে ওঠে আর মারে।

নানা জাতি লোক যাতে অর্বুদ অর্বুদ

ব্যাপারটি নিয়ে বাস ড্রাইভার এবং সাইকেল রিকশাওলারা এক কাট্টা হয় এবং ইসকনের সাহেবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এই উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে ভেবে পুলিশ আসে এবং সেই সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করে। পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান। এই অবস্থায় স্বাভাবিক কারণে ইস-কনের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে এটা মায়াপুর পৌছলেই বোঝা যায়।

বিশাল একটি নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে এখানে। চন্দ্রোদয় মন্দিরের আশপাশে কয়েক বছর আগেও যে চাষের জমি ছিল তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। সম্ভবত খুব বেশি দামেই এগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দিরের সামনে গজিয়ে উঠছে বহু ছোটখাট দোকানপত্তর। দর্শকদের চাহিদা মেটানর জন্য এটি থাকাও দরকার। এরকম ছোট্ট একটি চায়ের দোকানের ভেতর গোল একটা শক্ত পিসবোরডের উপর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ইংরেজিতে : মনোরম গংগার ধারে বাগানসহ বাড়ি মাত্র ৮ হাজারে।

চায়ের দোকানের কিশোর ছেলে-টিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আট হাজার টাকায় বাগানবাড়ি কে বিক্রি করছে ভাই? এই দোকানের কেউ? 'না এখানকার কেউ নয়। উনি অবশ্য মায়াপুরেই থাকেন। আর ওটা আট হাজার টাকা নয়, আট হাজার ডলার।' আমার দ্বিধান্বিত প্রশ্নের এমন চটপটে উত্তর থেকে মনে হয়, এমন প্রশ্ন তাকে অনেকেই করেছে আমার আগে। কিন্তু প্রশ্নটি থেকেই যায়। পশ্চিমবংগের একটি মফঃস্বল শহরে বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনে ডলারের হিসাব কেন? সাহেবদের চোখে পড়তে পারে এই ভেবে?

ইসকন বস্তুত নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে একটা আলোড়ন এনেছে। সমাজবাড়ি, শ্রীশ্রী অনুমহাপ্রভু বা মহানাম মঠের শান্ত বৈষ্ণব জীবনের পাশাপাশি এই রাজকীয় সাজসজ্জা বিপরীতার্থক বিপ্লবের সূচনা করে আনছে কি?

প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামীর মতে, ইসকনের ভক্তরাও প্রকৃত ভক্ত। কী এসে যায় তাদের জাঁকজমকে? যে ধর্ম ঝিমিয়ে পড়েছে, যে ধর্মে প্রায় বিস্মৃতি এসে গেছে তাকে জাগিয়ে তুলেছে আমার ইসকন। বাহ্যিক আচার আচরণ দেখেই কি আর ভক্তের সাধ আহ্লাদ বোঝা যাবে। এই তো সেদিনও তারা এসেছিল আমার কাছে। আমার পরামর্শ নিয়েছে মাঝে। যদি সত্যিই তাদের ধর্মে মতি না থাকত তা হলে কি আসত আমার কাছে?

কিন্তু এই যে বিশাল রথযাত্রা কলকাতার পথে, ট্রামের তার এড়াবার জন্য রথের চূড়ো যন্ত্রের সাহায্যে আস্তে আস্তে নামিয়ে আনা, কিংবা রথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো কলকাতার রাস্তাঘাট, মানুষজনের ছবি মুভি ক্যামেরায় তুলে নেওয়া—এর উদ্দেশ্য কী? প্রভুপাদ মনে করেন, ইসকন বৈষ্ণব ধর্মকে আধুনিক পৃথিবীর সংগে খাপ খাওয়ানর জন্যই এমন সব আধুনিক পদ্ধতি নিয়েছে। নইলে আর লোক জড়ো করা যেত না।

অনুমহাপ্রভু মন্দিরের পুরোহিত মদন শর্মা কিন্তু মনে করেন না, বৈষ্ণব ধর্মমতে রাজসিকতার কোন স্থান আছে। সেদিক দিয়ে ইসকনের প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত পড়তে পারে এটা ঠিকই কিন্তু ধর্মের কোন গুণ তাতে বাড়বে না, বরং কমবে। মন্দিরের সেবায়েত বংশের এক তরুণতর রাজকুমার তাঁকে মন্দিরপুরীতে কী যেন বললেন। মদন শর্মা অতঃপর ইসকন প্রসংগে আর কোন কথাই বললেন না। বরং অন্য প্রসংগে গিয়ে বললেন, এখানকার লোকেরা এমনিতে জগাই মাধাই কিন্তু ধর্মে মতি তাদের স্থির। কখনও কোন ব্যাপারে অবাঞ্ছিত কিছু করেননি।

ইসকন প্রসংগে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের এক অনুগামী বললেন, সবই প্রভুর ইচ্ছা। যা হচ্ছে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে তার ভাল ফলও ঘটতে পারে। সমাজবাড়ির ওড়িয়াভাষী

মোহান্ত অবশ্য জানেন না ইসকন কী? কী তাদের বক্তব্য, কেমন তাদের ক্রিয়াকলাপ? নবদ্বীপের সাধারণ মানুষ ইসকনের ওপর কিছুটা বিরক্ত। এবং এ বিরক্তি সম্প্রদায় বিশেষে কম বেশি।

প্রাচীন মায়াপুরে মহাপ্রভুর তথাকথিত জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। 'তথাকথিত' কেন বললাম সে কথায় পরে আসছি। এখানে অতিমুখর এক রিকশাচালক আমাদের পরামর্শ দিলেন, মায়াপুরে ইসকনওয়ালাদের কাছে যান। 'ভোগ পাবেন যা না সে একটা ব্যাপার [illegible]। আর মন্দিরও করেছে বটে। [illegible]কে সব পাথরের ইঞ্জিনিয়ার। [illegible] ফুটে আছে, তা পাথরের। [illegible] কত সব সায়েবসুবো।' আমরা যখন ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে পৌঁছাই তখন ভোগের কোন আয়োজন নেই কোথাও। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবে সমাগত ভক্তদের কাছে শুনেছি সত্যিই ভোগের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য নেই এখানে। সুসজ্জিত বিশালকায় রক্তাভ বাসগৃহ এক পাশে, ফটক পেরিয়েই সামনে চন্দ্রোদয় মন্দির। দুপাশে ফুল গাছ। ডানদিকে নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে। তাও আকারে বি[illegible]। চলার পথে দুদিকে সাবধান বাণী, [illegible]র ফুল ছিঁড়িবেন না কিংবা [illegible] ফুলে হাত দিবেন না।

এত[illegible] রাজকীয় আয়োজনে টাকা আসে কোথা থেকে? তাইল্যান্ডের জনৈক ইসকন ভক্তকে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরও খুব সরল : ভক্তরা টাকা দেন এবং সেই সঙ্গে মার্কিন শিল্পপতি ফোর্ডের নাতি পরম বৈষ্ণব অম্বরীশ দাসও অনেক দানধ্যান করেন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য। আমার আরও প্রশ্ন ছিল : যেখানে বৈষ্ণব নেই সেখানেই তো ধর্মপ্রচার করা উচিত, [illegible] পীঠস্থানে এসে এতবড় মন্দির [illegible] সার্থকতা কী? এখানে তো [illegible] করার জন্য আরও অনেক গোষ্ঠী আছে, তাদেরই কি সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর অবশ্য ঐ ভক্তটি জানেন না। প্রভু জয়পতাকা কিংবা সেই জাতীয় আর কোন ধর্মনেতা তার উত্তর দিতে পারবেন।

কিন্তু টাকা পয়সা ছাড়া তো আর এতবড় মঠমন্দির চালান সম্ভব নয়। তা হলে নবদ্বীপের অন্যান্য মঠ-মন্দিরগুলি চলে কী করে? প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামীকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, আমরা ভেট নিয়ে থাকি। ভক্তরা যে ভেট দেন তা দিয়েই মঠের খরচ চলে। চারদিকে নানা প্রাচীন বই পুথির মধ্যে বসেছিলেন প্রভুপাদ। তাঁর বসার ঘরের পাশ দিয়েই উঠে গেছে বিস্তৃত সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপরেই সোনার গৌরাঙ্গের অপরূপ মূর্তি। অষ্টধাতুর তৈরি এই মূর্তি সোনার ভাগটাই বেশি। ফলে শত আলোক ঝলসে ওঠে কয়েকটি প্রদীপ জ্বালালেই।

সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের পাশেই শ্রীবাস অঙ্গন। এখানে ভেট নেবার জন্য লোক বসে আছেন। ভেট নিয়ে ছাপান একটি টিকিট দিয়ে দেন তিনি। বাঁদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলে বিরাট দেবস্থান লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভেতরে ঢোকার একটি মাত্র দরজা। দেবস্থানের মধ্যবর্তী হয়ে রয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ শ্রীচৈতন্যদেব। বাঁদিকে বিষ্ণুর দশাবতার ও অন্যান্য মূর্তি এবং ডানদিকে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তশিষ্যদের প্রতিমূর্তি। সবই এক সঙ্গে পুজো পান। পুজোর মন্ত্র কী?

পুরোহিত বয়সে নবীন। তিনি বললেন, প্রভুপাদেরই এক পূর্বপুরুষ একটি গাথা রচনা করেছিলেন। পুজোয় তা পাঠ করা হয়। জগাই মাধাই উদ্ধার আশ্রম এই দুই বিখ্যাত মন্দিরের সামনেই এবং সমাজবাড়ির ডানদিকে। এই আশ্রম যিনি দেখাশোনা করেন তিনি একজন তরুণ, স্নাতকোত্তীর্ণ এবং ধর্ম সম্পর্কে রীতিমত সচেতন। বললেন, ঠিক এখানেই জগাই মাধাইকে পাপকৃতি থেকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ভেট প্রথা আছে এখানেও। শুধু এখানে কেন, ভেট প্রথা নবদ্বীপের সর্বত্র। তবে গোবিন্দ বাড়িতে কোন ভেট দিতে হয় না।

সকল ভক্তই যে যেচে এসে ভেট দেন এমন তো আর নয়। তা হলে ভেট আনা যায় কী করে? এর জন্য পাণ্ডার ব্যবস্থা আছে। পাণ্ডা বলতে অবশ্য অন্যান্য ধর্মস্থানের পাণ্ডার মত নয়। এখানে রিকশাচালক বা হোটেল মালিক যে কেউ পাণ্ডার কাজ করতে পারেন। মঠাধ্যক্ষরা সে কথা অবশ্য স্বীকার করেন না। কিন্তু যে রিকশাচালক, হোটেল মালিক বা অন্যান্য নিযুক্ত মানুষ দলে দলে ভক্তদের এখানে নিয়ে আসেন তাঁরা প্রদত্ত ভেট থেকে কমিশন পান। এই কমিশনের রকমফের আছে, কোথাও সিকি ভাগ কোথাও আধাআধি।

ভেটও নানা জায়গায় নানা রকম। যেমন মহাপ্রভুর বাড়িতে ৩৩ পয়সা। এখানে কিন্তু কাউকে কোন কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ভক্তরা এখানে আসবেন জেনেই মধ্যস্থতা করার জন্য কাউকে রাখা হয়নি। শ্রীবাস অঙ্গনে ২৫ পয়সা। জগাই মাধাই উদ্ধার আশ্রম, উপনয়ন লীলা আশ্রম, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম এসব জায়গায় ভেট-এর ভাগাভাগি হয় পঞ্চাশ শতাংশ হারে।

কোন আশ্রমের আবার নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে। যেমন সমাজবাড়ির। নবদ্বীপের কাছাকাছি একটি অঞ্চলে এবং মেদিনীপুরে এদের বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তি। সেখানে যারা চাষের কাজ করেন তাঁরাও সমাজবাড়ির সেবক হিসাবেই কাজ করেন। ভোরবেলা নবদ্বীপ থেকে কেউ একজন সেই কৃষিকাজ তদারক করতে চলে যান। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করেন। সন্ধ্যা হলে ফিরে আসেন আশ্রমে। মেদিনীপুরে অবশ্য অন্য লোক আছেন। তিনি সেখানেই থাকেন দেখাশোনার সুবিধার জন্য। জমির পরিমাণ, কেউ বলেছেন ষাট বিঘা, কেউ বলেছেন আশি/পঁচাশি বিঘা। সমাজবাড়ির পক্ষ থেকে অবশ্য মেদিনীপুরের জমির কথা উল্লেখই করা হয়নি।

এই জমির ফসল বিক্রি করে সমাজবাড়ির দৈনন্দিনখরচপত্র যোগান হয়। উদ্বৃত্ত ফসলও থাকে কোন কোন বছর। এখানে দেবসেবা, নিত্য ভাগবৎ পাঠ, পূজার্চনা সবই চলে ভালভাবে।

কিন্তু সমস্যা তৈরি করেন ছোটখাট মোহান্তরা। এদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ নন। নিজের বাড়িতেই মহাপ্রভুর মূর্তি স্থাপন করে এরা শিষ্য জোগাড় করতে বের হন। গ্রামে গঞ্জেই এদের শিষ্য সংখ্যা বেশি। নবদ্বীপের পাঁচ পুরুষের বাসিন্দা এক ভদ্রলোক বললেন, এদের সম্পর্কে অনেকেরই নানা অভিযোগ আছে। কেউ বিধবা শিষ্যাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে তাঁর পুরো সম্পত্তিটাই লিখিয়ে নিয়েছেন বাড়িতে স্থাপিত দেবমূর্তির নামে। কেউ বা গুরুগিরি করতে গিয়ে কোন অনাথা অসহায়া মহিলার দৈনন্দিন জীবনের স্বামী হয়ে বসেছেন।

অনাথা অসহায়া নারীদের জন্য নবদ্বীপে আছে ভজনাশ্রম। মাড়োয়ারি এক ভদ্রলোক এর পরিচালক। মেয়েদের প্রতিদিন দুবেলা চাল আটা নুন ইত্যাদি বিলি করা হয়। পুরোহিত বাঙালি। আমরা গিয়ে ঢুকতেই অতি দ্রুততার সঙ্গে খাতা খুলে তিনি হিসাব দেখিয়ে দিলেন। ৮ তারিখে ২৮ সের আটা, ২ সের নুন, ৯ তারিখে ৩২ সের আটা, আড়াই সের নুন ইত্যাদি। কিন্তু এসব দান-খয়রাতের টাকা আসে কোথা থেকে? উত্তর একই : ভক্তরা দেন। সকালে অনাথ মেয়েদের আমরা টিকিট দিই, দুপুরে আটা নুন সেই মত বিলি হয়। বিনিময়ে মেয়েরা মন্দিরে ভজন করেন। মন্দিরের দেবতা মথুরাপতি। নানা ভাষাভাষী, নানা মতাবলম্বী এই বৈষ্ণবদের নানা মঠ মন্দিরে ভক্তদের দান ছাড়াও উপার্জনের কোন পথ আছে কি? কেবল ভক্তদের দানেই কি এতবড় খরচ চালানো যায়?

তা হলে কোথা থেকে আসছে এই খরচপত্র? সেটা রহস্যই। এ রহস্য ভেদ করা কারোর পক্ষে সম্ভব কী? অবশ্য রহস্যই বা বলা যায় কি করে? ভেট পদ্ধতি তো আছেই। ভারতের সব ধর্মস্থানেই তা আছে।

নবদ্বীপের কবিরাজ এবং অশ্বিনীকুমার আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠানের ভিষকশিরোমণি প্রাণাচার্য শৈলেন্দ্রকুমার কাব্যব্যাকরণতীর্থ বললেন, সরকার একবার আইন করে ভেট পদ্ধতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জানিনা, তারপর কী ঘটল। ভেট তো দেখছি যথারীতি চলছে। ভেটের জন্যেই মঠ মন্দিরগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ

কার্যত নবদ্বীপ বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান হলেও এক মঠের সঙ্গে আর এক মঠের কোন রকম সদ্ভাব যে নেই এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইসকন পরিচালকরাও সেটা বুঝেছেন। সে কারণে তাদের পক্ষে স্থানীয় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা অনেক সহজ হয়েছে। এ কারণে মহাপ্রভুর জন্মের পাঁচশ বছর পূর্তি পালন করার জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরি হয়নি। কম

কি জন্মস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা রছিলেন, সেটাও নাকি ঠিক নয়। কেউ কেউ বলছেন, মহাপ্রভুর কৃত জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে ছে। কিন্তু কোথায় ছিল সে ন্মস্থান? শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান চীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ দের শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ জন্মভূমির তিহাস এ বলেছেন মহাপ্রভুর ন্মস্থান হিসাবে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি নটি স্থানের নাম করেছে : যথা । নদীয়া নগর ২। নবদ্বীপ এবং । মায়াপুর। কিন্তু টেরিটোরিয়াল ারিসটোক্রেসি অব বেংগল-এ া হয়েছে মহাপ্রভু 'রামচন্দ্রপুর'-জন্মেছিলেন। Ganga Gobi-da Singha built a Temple : Ramchandrapure on the ery spot near Nadia where ouranga Chaitanya is id to have been born. প্রায় বছর আগে শ্রীধাম নবদ্বীপ চারিণী সভার প্রকাশিত বই াচীন নদীয়ার অবস্থিতি মাংসা'য় বলা হয়েছে '১৯0 বৎসর র্বে গঙ্গাদেবীর ঘন ঘন পরিবর্তনে ীচৈতন্যের জন্মগৃহ) ভূতলশায়ী ইয়াছিল। মহাপ্রভুর অপ্রকটের 07 বৎসর পরে দেওয়ান (গোবিন্দ ংহ) নবদ্বীপ মন্ডলে গঙ্গার াড়ে রামচন্দ্রপুর গ্রামে মন্দির র্মাণ করেন।'

তা হলে মীমাংসা তো কিছুই চ্ছে না। এখন ইতিহাস ও ত্নগবেষণা অনেক বৈজ্ঞানিক ও র্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। এইসব ন্মোৎসব কমিটিগুলির উচিত সেই দ্ধতির সাহায্য' নিয়ে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করা। রকার মত এ ব্যাপারে সরকারি হায্যের জন্যও আবেদন করা হাক। যাঁর জন্মোৎসব পালন রছি তাঁর প্রকৃত জন্মস্থানটা ন্তত জানা দরকার নয় কি?

'সবই মহাপ্রভুর ইচ্ছা।' কিন্তু হাপ্রভু পাদপদ্মে আজ যাঁরা প্রকৃত ান্তি প্রার্থী তাঁরা কোথায় গেলেন? া কি যুগে যুগে তাঁরা যেমন ছিলেন তমনই থাকবেন? শুধু বাহ্যিক পৃথিবীতে চলতে থাকবে ধর্মের ারিদ্র্য ও ধর্মীয় জৌলুসের সংঘাত। লে দলে ভক্তরা আসেন যান। কাল হয় নামগানে, সন্ধ্যা হয় াগবতের মৃদু কম্পনস্বরে। কণ্ঠ-র বদলায় কিন্তু দরিদ্র, গ্রামীণ, মজীবী মানুষের মিছিল থামে না, লতেই থাকে।

জগাই মাধাইরা এখনও উদ্ধার য়নি। এই-ই হয়ত সার্বিকভাবে র্মীয় সত্য। □

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

রাধামোহন ঠাকুরের গিরিধারীজী এখনও পুজো পাচ্ছেন

রাধামোহন ঠাকুরের সমাধিবাড়ি / আলোকচিত্র : লেখক

শান্তনু ঠাকুর

শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকট। তাঁরই বংশে জন্ম নেন খ্যাতনামা রাধামোহন ঠাকুর। আজ থেকে প্রায় তিন শো বৎসর আগে মুরশিদাবাদ জেলায় ভরতপুর থানার অন্তর্গত মালিহাটীতে রাধামোহন ঠাকুর ১৬৯৭ খৃস্টাব্দে কার্তিক মাসে পৌর্ণমাসি রাত্রি শেষে ভূমিষ্ঠ হলেন। মালিহাটী তাই বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থ স্বরূপ।

রাধামোহন অতি অল্পবয়সে বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার অধ্যয়ন করেন। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত পাঠের সময় তিনি প্রেম ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন।

পিতা জগদানন্দ গোপালপুর নিবাসী ঈশান রায়ের কন্যা রাণী ঠাকুরাণীর সঙ্গে রাধা মোহনের বিয়ে দেন। রাধামোহন প্রথমে তাঁর পিতা জগদানন্দ এবং পরে শ্যামানন্দ পুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাই তাঁর বংশের কেউ নিজের গুরুজন ছাড়া অন্য গুরু করতে পারেন না।

পরে বৃন্দাবন গিয়ে তিনি নিত্যা-নন্দ মহাপ্রভুর এক গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করলে ব্রজ ভূমিতে তাঁর পান্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবনে ছয় বৎসর বাসকালে তিনি বহু পদ টীকা ও গান রচনা করেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ-কর্তাদের পদাবলীর ব্যাখ্যা সংস্কৃতে লিখেছিলেন। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যা রচনা রাধা-মোহন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় দেয়। বাংলা ভাষায় পদাবলী সংগ্রহের একখানি পুস্তক 'পদামৃত সমুদ্র' রচনাকালে তিনি সমস্ত সংগৃহীত পদাবলীর 'মহাভাবানুসারিণী' নামে সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন। বাংলা পদাবলী সংস্কৃত ভাষায় আর কেউ রচনা করেছেন বলে জানা যায় না। রাধা মোহন ঠাকুরের লেখা অনেক পদাবলী এই সংগ্রহে আছে।

কাটোয়ার গঙ্গার যে ঘাটে মহাপ্রভু মস্তক মুন্ডন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, সেই ঘাটে মুরশি-দাবাদের নবাব মীরজাফরের সভা-পন্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য এক তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে রাধামোহনকে গুরু হিসাবে মেনে নেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বহু বিখ্যাত বৈষ্ণব পন্ডিতের সামনে রাধামোহন দিগ্বিজয়ী পন্ডিত কৃষ্ণদেবকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেছেন শুনে নবাব মীরজাফর আনন্দে অধীর হয়ে যান। তিনি রাধামোহনকে এক জয়পত্র দেন এবং জমিদার করতে চান। রাধা মোহন এই অতুল সম্পত্তি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। নবাব তখন তাঁকে এক ভাবুক মাহালের সনদ দেন।

নবাবের দেওয়ান মহারাজা নন্দ-কুমার রাধামোহনের শিষ্য ছিলেন। দীক্ষাগুরু নবাবের সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করলে তিনি মেদিনীপুরে এক হাজার বিঘা জমি গুরুদেবকে দান করেন। এ কথা গুরুদেবের অজ্ঞাত ছিল। পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্র-নাথ রায়ও রাধা মোহনের শিষ্য ছিলেন। শুধু রাজা মহারাজা নয় অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরও তিনি দীক্ষাগুরু ছিলেন। সকলকে দিতেন সৎ উপদেশ। রাধা মোহন সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর গল্প বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে: একবার মহারাজা নন্দকুমার মাতৃ শ্রাদ্ধে গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু সেখানে অপমানিত বোধ করলে গুরু জানলা পথে সশিষ্য মালিহাটী চলে আসেন। জানা যায় তারপর আর কোনদিন নন্দকুমার প্রভুর দর্শন পাননি।

আর একবার কয়েকজন তস্কর শিষ্য সেজে প্রভুর বাড়ি আসে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর তারা পুকুর ঘাটে যেতে পারছে না কারণ তারা অন্ধ। প্রভুর কৃপায় তারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করে তিনি মালিহাটী ফিরে আসেন। এই খ্যাতনামা মহাপুরুষ ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথির প্রাতে ৮১ বছর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। জানা যায় মৃত্যুর পরও তিনি তার স্ত্রী ও দুই প্রিয় শিষ্যকে দেখা দেন। এ কথা বৈষ্ণবগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত শ্রীপাঠ মানিক্যহারের গিরিধারীজী এই মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতা। আজও তাঁর বংশধরেরা সেবা চালাচ্ছেন। গিরিধারীজী কোন মূর্তি নয়, পাথরের উপর চরণচিহ্ন। বৃন্দাবনেও অনুরূপ চরণচিহ্ন আছে। □

শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাংগ ভক্তসেবা আশ্রম এবং রামদাস বাবাজী

পুলক দেবনাথ

প্রায় আট বছর আগে ব্যারাকপুরে ভুষিপাড়া অঞ্চলে 'শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাংগ. ভক্তসেবাশ্রম' গড়ে ওঠে। এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পপতি রবীন রাহা। পাঁচশ' টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে নেমে নিজ অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের বলে আজ প্রচুর টাকার তিনি মালিক। প্রথম দিকটায় ঘোর নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মা বরানগরের পাটবাড়ির রামদাস বাবাজীর প্রাণাধিক শিষ্য সনাতন দাস বাবাজীর শিষ্যা। পরবর্তীকালে রবীনবাবু এই সনাতন দাস বাবাজীর সংস্পর্শে এসে ভগবৎ বিশ্বাসী হন। ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি লেখেন 'ভক্তের প্রার্থনা', 'সপার্ষদ শ্রীগৌরাংগ', 'রামদাস চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ-গুলো। শুধু তাই নয়, ১৯৮১ সালের ১ ফাল্গুন তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন আশ্রম-মন্দিরটি। তাঁরই অনুরোধে সনাতন দাস বাবাজীকেই এই আশ্রমের সমস্ত ভার নিতে হয়। এই সনাতন দাস বাবাজীই আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র।

কিন্তু এই মন্দির আশ্রমটি যেমন এতং অঞ্চলের ভক্তদের মধ্যে প্রবল সাড়া জাগায়, তেমনই একে ঘিরে শুরু হয় নানা বিতর্ক, গুজব। প্রচার হয় এই মন্দির-আশ্রম না কি গড়ে উঠেছে কালো টাকায় এবং মন্দিরের মধ্যে অবৈধ সম্পত্তি গচ্ছিত আছে! শেষ পর্যন্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা রবীন রাহা এক প্রেস কনফারেন্স ডেকে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সাংবাদিক-দের কাছে বক্তব্য রাখতে বাধ্য হন। সনাতন দাস বাবাজীর সংগে আর যে সমস্ত বৈষ্ণবরা এই আশ্রমে এসে বসবাস করতে শুরু করেন, শুরু হয় তাঁদের নিয়েও জোর গুজব। এরা নাকি সব ডাকাত। আশ্রমের মুখে কলংক লেপবার অপচেষ্টা হচ্ছে বুঝতে পেরে রবীনবাবু ছুটলেন এবার থানায়। আশ্রম সম্পর্কে যে সমস্ত রটনা হচ্ছে তা যে ভিত্তিহীন, তার স্বীকৃতিপত্র থানা থেকে আনা হল। ঐ স্বীকৃতিপত্রের কয়েক শো ফটোস্টাট কপি ছাপিয়ে বিতরণও করা হল। আশ্রম মোহান্ত বললেন, 'আমি আগে যখন গংগায় স্নান করতে যেতাম, তখন কেউ কেউ আমায় শুনিয়ে বলত, ঐ দেখ ডাকাত সর্দার যাচ্ছে। সেদিন যারা আমায় ডাকাত সর্দার বলেছিল আজ তারাই আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। আসলে একটা দলই আছে, যাদের কাজ হল গুজব রটান। এ অঞ্চলের মধ্যে এত বড় আশ্রম-মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখে ঈর্ষাকাতর কেউ কেউ এই গুজব রটাতে পারে।'

পলতা স্টেশন থেকে মাত্র ১০ মিনিটের পথ। আর ৮৫ বাসরুটে ভুষিপাড়া বাস স্টপেজের প্রায় নিকটেই শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাংগ ভক্ত-সেবাশ্রম। সুসজ্জিত এবং পরিচ্ছন্ন বিশালাকায় মন্দিরটি যে কোন ভক্তের হৃদয়গ্রাহী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ প্রভুর দারুনির্মিত বিরল লাবণ্যময় নাটুয়া-মূর্তি অতীব হৃদয় গ্রাহী। এছাড়াও জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ, রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিও রয়েছে। মন্দিরপ্রাংগণে মনোরম তুলসীর কানন, নাটমন্দিরে মহাপ্রভুর পার্ষদ-গণের সাধন ভজনের প্রত্যক্ষ চিত্রপটসমূহ এবং বৈষ্ণব জগতের তত্ত্বসমন্বিত বিভিন্ন ভক্তিমূলক পয়ারসমূহ পাঠ করলে হৃদয়-মন পবিত্র হয়। প্রাংগণের দক্ষিণ দিকে বৈষ্ণব মোহন্তগণের সুবিস্তৃত দ্বিতল বাসস্থান। এখানে একটি বৈষ্ণব লাইব্রেরিও আছে। উত্তরে মোহান্ত বাবাজীর সন্ন্যাস গুরু শীতল দাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির—মন্দিরের অভ্যন্তরে বাবাজীর অপূর্ব মর্মরমূর্তি।

এই সেবাশ্রমের মূল উদ্দেশ্যই হল বৈষ্ণব সেবা অর্থাৎ সংসারধর্ম-বর্জিত বৈষ্ণবের সুখ-দুঃখ, বৈষ্ণবের মনোবাসনা পূরণ, অসুস্থতায় সেবা, বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের শেষ জীবনে ভজনানুকূল্যে ব্যবস্থাদি করা ইত্যাদি। সকলেই বিনা খরচায় এখানে প্রসাদ বাসস্থান পান। সংসারত্যাগী মা বোনেদের সাধন-ভজন এবং সেবা-কার্যাদি করার জন্য একটি ভগিনি-নিবাসও আছে এখানে। নবদ্বীপ, পুরী, বৃন্দাবন এবং বিভিন্ন তীর্থ-মন্দির থেকে অভ্যাগত সাধু-বৈষ্ণবগণও এখানে যেকদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন নিখরচায়। বর্তমানে এই সেবাশ্রমে ৪০ জনের মত স্থায়ী বৈষ্ণব আছেন।

নানা বৈশিষ্ট্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ এই সেবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠার পর ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রবল সাড়া জাগায়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আজও দিবারাত্র ২৪ ঘন্টা এখানে অখন্ড নাম-সংকীর্তন হয়ে চলেছে। এছাড়াও সুবল দাস বাবাজী কর্তৃক প্রত্যহ শ্রী ভাগবত পাঠ, মদন দাস বাবাজী কর্তৃক নিত্যসেবা এবং ভোগারতি প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রত্যহ ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। রথযাত্রা, গুন্ডিচামার্জন, কালি-সমর্পণ, হরিদাস ঠাকুরের নির্বাণ উৎসব, ঝুলনযাত্রা, রাসলীলা, অন্ন-কূট মহোৎসব, মহাপ্রভু এবং নিত্যা-নন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি পালন, চৌষট্টি মোহান্তের ভোগরাগ ইত্যাদি এখানে বিশেষ ভক্তি সহ-কারে পালিত হয়। এতদ্ব্যতীত চরণদাস বাবাজী মহারাজ, রামদাস বাবাজী মহারাজ এবং শীতলদাস বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিও পালিত হয়। অন্যান্য গোস্বামীগণের তিথিও বাবাজী মহারাজের আদর্শে পালিত হয়।

এই সেবাশ্রমের প্রাণ পুরুষ যিনি, সেই অকৃতদার, সরল, নিরহঙ্কারী সনাতন দাস বাবাজীর জন্ম ১৩২৫ বংগাব্দের ৩০ বৈশাখ। জন্মস্থান যশোহর জেলার বড় কালিয়ার। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের নাম সত্যেন সেন। বাবা মহেন্দ্রনাথ সেন এবং মা কিরণবালা দেবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ঈশ্বরানুসন্ধিৎসু। স্কুলে পড়তে পড়তে একদিন তিনি গৃহ-ত্যাগ করেন। হরিদাস ঠাকুরের ভজনধন্য বেনাপোলে আসেন এবং সেখান থেকে চলে যান বৃন্দাবন। এখানে এসে সাধন ভজনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। রাধাকুণ্ডে বাস করে রাধারাণীর কৃপাভিক্ষা করেন। এখানে বহু সিদ্ধ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে কুসুম সরোবরের তীরবর্তী এক নির্জন গোম্ফায় বেশ কিছুদিন সাধনভজন করেন। অতঃপর শ্রীরামদাস বাবা-জীর সংস্পর্শে এসে তাঁর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং বরানগ-রের পাটবাড়িতে থেকে জীবসেবা ও সাধন-ভজন করে যেতে থাকেন। সেখান থেকে ব্যারাকপুরের এই আশ্রমে এসে একে অলংকারময় করে তুলেছেন। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

বৈষ্ণব চূড়ামণি কুঞ্জদাস বাবাজী

সুখেন্দু দাশ

'তৃণাদপি সুনীচেন' বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। যেন সাক্ষাৎ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিমূর্তি। শ্বেতশুভ্র দুইখানি চীরখণ্ড অংগে।

আজীবন কেউ এলেই 'জীব দেহে নিত্যানন্দের বাস-' প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের এই বাণীর মর্যাদা দিয়ে আগেই তাঁকে প্রণাম করতেন নত হয়ে। শেষের দিকে বার্ধক্যের জন্য যখন প্রণাম করতে পারতেন না, দুঃখ করে বলতেন, আমি তো প্রণাম করতে পারলাম না। এবারে সাধু হতেও পারলাম না।

আর যিনি আসতেন তাঁর কাছে, তাঁকে প্রথম কথাই বলতেন, প্রভু সুন্দরের মন্দির পরিক্রমা হয়েছে মন্দির-পরিক্রমার অসীম শক্তি। নাম করা হয় তো : করতাল বাজে : নাম এবং নামী অভেদ।

এই ছিলেন তিনি। জীবদ্দশাতেই অর্ধকোটি ভক্তের কাছে কিংবদন্তির 'গুরুদেব'-এ পরিণত হয়েছিলেন। প্রচারে সম্পূর্ণ বিমুখ বৈষ্ণব চূড়ামণিকে কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতে একেবারেই পাদপ্রদীপে আনা সম্ভব হয়নি। কারণ একটাই - তাঁর নিঃসীম প্রচার অনীহা। প্রভুসুন্দরের আবির্ভাবস্থল জগদ্বন্ধু ধামে গুটিকয় বৈষ্ণবসাধু নিয়ে দিনরাত নামগান নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সময় অতিবাহিত করে দিয়েছেন। কত যে অশান্ত হৃদয় বিচিত্র মেজাজ-চরিত্রের নারী পুরুষকে মহাউদ্ধারণ লীলার ব্যাখ্যায় মনের প্রশান্তি পেতে সহায়তা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

এত যাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ভক্তকুলে, তিনি কিন্তু সর্বদাই নিজেকে দীন কাঙাল কুঞ্জদাস বলেই প্রকাশ করেছেন। তাঁরই ইচ্ছেমত আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে 'কুঞ্জদা' বলে সম্বোধন করতেন। শেষের দিকে ভক্তকুল সে বাধা আর মানেনি। ভক্তির আপ্লুত ধারায় কখন তাঁকে অজান্তে গুরুদেব করে নিয়েছিলেন।

মুরশিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া চিন্ময়ধামের গুরুদেব শ্রীশ্রী কুঞ্জ দাস বাবাজীই এই গুরুদেব। পূর্বাশ্রমের নাম কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। স্বয়ং প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর নিজেই কুঞ্জ বিহারীকে ডেকেছিলেন। -'জয় জগদ্বন্ধু কুঞ্জ' বলে। তাই আর নাম পরিবর্তন হয়নি। যশোরের হরিণী কুণ্ড গ্রামে বাংলা ১২৯৫ সালের ২১ পৌষ বুধবার কুঞ্জদাস বাবাজী ধরাধামে আবির্ভূত হন। ছেলেবেলা থেকেই কৃষ্ণগৌর নামে তন্ময় হয়ে গিয়ে বিলীন হয়ে যেতেন যেন। বাহ্য পরিবেশ সম্পর্কে চেতনাই থাকত না কোন। পিতা যাদবচন্দ্র বিশ্বাস এবং মা গুরুদাসী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কুঞ্জদাস ছেলেবেলা থেকেই কিন্তু মেধাবী। অংকে ছিল তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞান নিয়েই পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু হরিনামে যাঁর প্রাণের আরাম মনের প্রশান্তি-স্কুল কলেজের প্রথাসিদ্ধ বিদ্যা তাঁকে আর কতটুকুই বা দিতে পারে।

স্বপ্নে কুঞ্জদাস অনুভব করলেন শ্রীধাম ডাহাপাড়াই মহাউদ্ধারণ লীলা ভাণ্ডার। এখান থেকেই বিতরিত হবে চারিটি মহাদেশে হরিনাম মহানাম কীর্তনের মন্ত্র। মহানাম যজ্ঞ শুরু হল যেন। আর শ্রীধামে তার পুরোহিত হলেন শ্রী কুঞ্জদাস বাবাজী। আর একদিকে পরবর্তী সময়ে জগৎ পরিক্রমা শুরু করলেন শ্রীশ্রী মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী। দুজনের কণ্ঠে একই মহানাম মহাউদ্ধারণ লীলার ব্যাখ্যা।

বৈষ্ণবচূড়ামণি এই মহাসাধক বাংলা ১৩৮৪ সালের ৫ শ্রাবণ মংগলবার ধরাধাম ত্যাগ করে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে সত্যিই মনে হয়েছে 'তোমা বিনা হইল মেদিনী বন্ধু শূন্য!' নিজ ঘরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

আলোকচিত্র : দেবব্রত দাশ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দামোদর মহারাজ বললেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বৈষম্য থাকবেই

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এ বসে কথা হচ্ছিল ৫২ বৎসর বয়স্ক শ্রীদামোদর মহারাজের সংগে। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী দু বছর হল মারা গেছেন। বর্তমানে দেশে বিদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ভার পড়েছে ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিবল্লভ মহারাজের উপর। তাঁর সংগে সরাসরি কথা বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ত্রিদণ্ডীস্বামী আশ্রমে না থাকায় প্রশ্ন রাখলাম দামোদর মহারাজের কাছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বললেন—

'অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থাগুলির মত সাধারণ মানুষের সেবায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে যায় না। তার কারণ বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিগতভাবে পার্থিব সাহায্য করে মানুষের সারা জীবনের অভাব মোচন করতে পারে না। তা ছাড়া ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বৈষম্য থাকবেই। তাই মানুষের যেটি প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তা হল আত্মানুশীলন শিক্ষা করা। আর এই আত্মানুভূতি সম্ভব হলেই মানুষের পার্থিব বস্তুর প্রতি লোভ কমে যাবে' সে নিজেই তখন তার মংগল সাধন করতে পারে।'

প্রশ্ন করলাম : 'আচ্ছা, মহারাজ, আপনি বললেন ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বৈষম্য থাকবেই। কিন্তু আমরা জানি সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বর সকলকেই সমানভাবে দেখেন। তবে কেন এই বৈষম্য?'

উত্তরে একটু চিন্তা করে নিয়ে মহারাজ আমাকে একটি ছোট গল্প বললেন, 'একবার এক ভক্তের ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলেছিলেন 'সকলকে ধন দিলেই সকলে নিতে পারে না। আর এই পরীক্ষা করার জন্য এক ভিখারির সামনে বেশ খানিকটা সোনা নিয়ে ঈশ্বর ফেলে দিলেন। কিন্তু ভিখারি তখন ভবিষ্যতে অন্ধ হয়ে গেলে চলতে পারবে কিনা পরীক্ষা করার জন্য চোখ বুজে রাস্তায় চলছিল। তাই সে সোনাটি দেখতে পেল না এবং চলে গেল।'

এবার প্রশ্ন করলাম, 'মহারাজ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি আমাদের আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আপনারা কীভাবে ঐ মূর্তিতে ভক্তি বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন?' মহারাজ বললেন, 'আত্মানুশীলনের দ্বারা মানুষ উন্নত স্তরে পৌঁছলেই সে ঈশ্বরকে নিজের আত্মীয় করে নিতে পারে, তাই তখন ঈশ্বরকে কেউ পুত্র, কেউ স্বামী কেউ কন্যা আবার কেউ অসীম মহিমাময় হিসাবে দেখে।'

আমার শেষ প্রশ্নটি ছিল খুবই সাধারণ কিন্তু আমার বিশ্বাস মহারাজের মনকে তা মুহূর্তের জন্য নাড়া দিয়েছিল। প্রশ্ন করেছিলাম, 'মহারাজ, সংসারে ফিরে যেতে বা সংসারের কারো সংগে দেখা করতে ইচ্ছা করে না?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহারাজ বললেন, 'সংসার? এই মঠই তো আমার সংসার। কৃষ্ণ পিতা, রাধা আমার মা আর মঠে এত সব ভাইরা রয়েছে এই তো আমার সংসার।' □

সাক্ষাৎকার: সুকুমার বৈরাগী

রাজগ্রামের বৈষ্ণব অনুষ্ঠানে অন্নপূর্ণা পুজোও হয়

দুর্গা চট্টোপাধ্যায়

ছত্রিনারায়ণ সামন্ত ভূঁইয়াদের দেওয়া দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর এলাকাটিতে বরাবরই ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য। চট্টরাজরাই এখানকার পুরনো বাসিন্দা। কালক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায় নানান কারণে এসেছেন এবং বিশেষত কুণ্ডু ও দত্তগণ এখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জমিদারি, তেজারতি এবং বিভিন্ন ব্যবসা-সমৃদ্ধ এই গ্রামই এককালের বাঁকুড়ার প্রাণকেন্দ্র। রাজগ্রামের ইতিহাস, ধর্মচেতনা, শিল্প ও সংস্কৃতি বেশ ঐতিহ্যপূর্ণ। নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান এখানকার বিশেষ লোক-উৎসব। তা শুধুমাত্র নামগানে সীমাবদ্ধ নয়, এক বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বটে। উৎসবটি জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরার সময়েই শুরু হয়। দুটি পৃথক উৎসবই খোল আনায় চলে। একটি দত্ত সম্প্রদায়ের, অন্যটি শ্রীরামপুর খোল আনায়। কখনও পাঁচদিন কখনও নয়দিন, কখনও তিনদিন। সেই অনুযায়ী এর নামকরণও হয় পঞ্চরাত্রি, নবরাত্রি বা চব্বিশ প্রহর হিসাবে। পুরনো কালের কাঠের ঘেরা তৈরি করা আছে যার আকৃতি কতকটা চুড়োওয়ালা মন্দিরের মত। এটিই মূল ঘেরা। এর বাইরের চারদিকে চৌকো একটি কাঠের ঘেরা আছে যাকে বাইরের ঘেরা বা 'বার ঘেরা' বলে। এই ঘেরাগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হাতের কাজ কাগজে কাটা নকশা, নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে সাজান হয়। ঘেরা দুটি সাজাতে তিন চার দিন সময় লাগে। শিল্পকর্মগুলি সব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মূল ঘেরার ভেতরেই থাকেন বিগ্রহ। চারপাশে চার জোড়া নিতাই গৌরাঙ্গ রাখা হয়, রাজগ্রামে ইনি 'রাধা গোবিন্দ' নামে পূজিত হন। উৎসব শুরুর পূর্বদিন অধিবাস এবং শেষদিন বৈষ্ণবী মহানিশা বা 'জাগরণ'। এই দিনের অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্য সহকারে পালিত হয়। যে কদিন উৎসব চলে দিবারাত্রি বিভিন্ন সম্প্রদায় ঘেরার চারপাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পালা করে নাম দেন, নাম কখনই বন্ধ হয় না। এই উৎসবের সঙ্গে আরও দুটি পুজো হয়—একটি হল ভাণ্ডারের জন্য 'কুবের পুজো', অন্যটি 'অন্নপূর্ণা পুজো।' 'অন্নপূর্ণা পুজো' একটি বাড়তি সংযোজন। নবরাত্রি পঞ্চরাত্রি ছাড়া বৃহৎ আকারের এই উৎসব হল নবকুঞ্জ, চোদ্দমাদল। নবকুঞ্জ হলে নয়টি ঘেরা লাগে আর চোদ্দমাদল হল চোদ্দটি মাদল বাজনা হবে এবং চোদ্দ দিন উৎসব চলবে। অতীতে রাজা জমিদারদের আমলে যেমন উৎসব হত সে তুলনায় বর্তমানের উৎসব যদিও অনেক ম্লান তবু সাংস্কৃতিক দিকটি এবং সেই শিল্প-সুষমা পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

নাম সংকীর্তনের বিগ্রহ যে রাধা-গোবিন্দ তাঁর পুজোয় অধিকার গোস্বামীদের। এঁরা আজ প্রায় ছয়-সাত পুরুষ এখানে এসেছেন বৃন্দাবন থেকে। দুশ বছর কি তার কিছু বেশি হবে। গোস্বামীদের পাট অনুযায়ী এরা হলেন শ্রীজীবের পাটভুক্ত। তিনবার ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা—বাল্য, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালীন। নিবেদনের সময় পর্দা ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ শাক্তদের যেখানে একাধিপত্য, আজ থেকে দেড়শ বছর পূর্বে শাক্তদের যখন প্রবল প্রতাপ সেখানে বৈষ্ণব মতাদর্শের এই উৎসবের সূচনা ঘটল কীভাবে? যতদূর জানা গেছে চট্টরাজদের পরে যাঁরা এসেছিলেন অনেক পরে সেই দত্ত এবং কুণ্ডু সম্প্রদায়ই এই সংকীর্তনের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। দুটো সম্প্রদায়ই শাক্তদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন, শ্রদ্ধা করতেন। দুটো কারণ থাকতে পারে। এক : দত্ত ও কুণ্ডু জমিদারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণরা কেউ উচ্চবাচ্য করেননি, সংকীর্তন প্রবর্তনের বিরোধিতা করেননি। দুই : এই সংকীর্তনের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্তদের সমমর্যাদা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার প্রমাণ অন্নপূর্ণা পুজো। অন্নপূর্ণা পুজোর ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা যথাযথ প্রতিষ্ঠা করে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমতকে পাশাপাশি রেখেছেন। কাউকেই অমর্যাদা করা হয়নি। এখানে দুই ধর্মীয় মতবাদের একত্রে সহাবস্থান। ব্রাহ্মণরা আজও অনেকে রাধা-গোবিন্দের প্রসাদ খান না। উল্লেখ্য যে অন্নপূর্ণা পুজো ব্রাহ্মণেরা করেন। রাধা-গোবিন্দের পুজোর পূর্বে অন্নপূর্ণা পুজো শুরু হয়। রাধা-গোবিন্দের পুজো করেন গোস্বামীরা।

উৎসবটির প্রতিটি অঙ্গেই রয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতির অপূর্ব বিন্যাস। যাঁরাই এই উৎসব সুদীর্ঘকাল পূর্বে শুরু করেছিলেন তাঁদের শিল্প ও সংস্কৃতি বোধ যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তার প্রমাণ আজও উত্তরসূরীদের কাছে পাওয়া যায়। ঘেরা সাজানর ভিতর যে শিল্প-নিপুণকলা, সূক্ষ্ম কাগজের কাজ নিঃসন্দেহে তা এখানকার শিল্প চিন্তার সোনালি ফসল। বহু দূর-দূরান্তর থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আজও ভিড় করেন শুধু ঘেরা সাজান দেখতে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল বাঁকুড়ার বিখ্যাত ঝুমুর, তরজা, বাউল ও কবিয়াল লড়াই। রাস্তায় মোড়ে মোড়ে এই ধরনের আসর বসে। উৎসবের আরও নানান আকর্ষণের ভিতর রয়েছে 'সঙ' অর্থাৎ ছোট ছোট অপেরা টাইপ নাটক বিভিন্ন মোড়ে চৌমাথায় বিভিন্ন দল পরিবেশন করে। এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে উৎকর্ষতার জন্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

আজকের অর্থনৈতিক সংকটে এই উৎসব অনেকাংশে বেমানান, অর্থও নেই। সবাই দিনাতিপাতে ব্যস্ত, তবুও উৎসব চলেছে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত সীমিত অর্থে এবং উৎসাহী তরুণদের উদ্যোগে। □

রাধা-গোবিন্দ

আলোকচিত্র : পরেশ দত্ত

নাম সংকীর্তনের দলগুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, গ্রামে গ্রামে নামগানও তেমন নেই

মানবাজারে নগর সংকীর্তন

সমীর দত্ত

পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে নাম সংকীর্তন একসময় গণউৎসবের রূপ নিয়েছিল, বর্তমানে তা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিহারের সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষী অঞ্চলকেও ধরা হয়েছে। জংগল মহল নামক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভূমিতে এক সময় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম চূড়ান্ত প্রসার লাভ করেছিল। স্থাপত্য কলার ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন জেলা গুলিতে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কালক্রমে এই ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পায়। চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্য সূচিত হয়। চৈতন্যদেবের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধিত না হলেও নাম গানের প্রসার দেখে অনুমান হয় এখানে চৈতন্য অনুগামী শিষ্যদের আগমন ঘটেছিল। এই নাম আবার একই শব্দাবলী সমন্বিত নয়। ভিন্নতা আছে। যেমন, ১। হরি বলো, ... ২। রাধা গোবিন্দ জয়.... ৩। রাম নারায়ণ, . . ৪। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ইত্যাদি। 'হরি বলো' নামে সহজেই যে কোন সুর আরোপ করা যায় তাই এই নামের প্রচলন বেশি। রাম নারায়ণ ও বত্রিশ অক্ষরাবলী নাম সাধারণত বিহারের গ্রামাঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

অখ্যাত এবং দুর্গম অঞ্চলেস্থিত গ্রামগুলিতে সাধারণ পূজাপার্বণাদি অপেক্ষা স্বল্পদিন-ব্যাপী নাম গানের আকর্ষন ভিন্ন স্বাদের। স্বভাব ধর্মভীরু মানুষ গ্রামীণ উপকরণের ডালি সাজিয়ে এই কটা দিনকে সানন্দে আপ্যায়ন জানায়। নাগরিক উৎসবগুলির মেজাজ নির্ভর করে অর্থের ওপর। কিন্তু এখানে ওটা গৌণ। ধর্মের সাথে উৎসবের নিবিড় ঐক্য সমন্বয়ে যে অনাবিল আনন্দ তা এদের কাছে তুলনাহীন। জাতি নির্বিশেষে গ্রামের সকল ব্যক্তি এতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কোথাও কোথাও দানকৃত জমির উৎপন্ন ফসলের আয় থেকে খরচ চালান হয়। সাধারণত নামের সংকল্প গ্রামের খোল আনার নামে করা হলেও যেখানে জমিদার প্রতিষ্ঠিত আসর থাকে সেখানে তার নামেও সংকল্প হয়। গ্রামগুলির অর্থনৈতিক ভিত ক্রমশঃ দুর্বল হবার হওয়ার ফলে স্থায়িত্বকাল কমে নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। নিয়মটুকু রক্ষা না করলেই নয়। মাড়ার (আসর) আটচালা মণ্ডলাকৃতি হয়। কমিটির আর্থিক সংগতি অনুযায়ী সাজসজ্জা নির্মাণ করা হয়। অহোরাত্রি (সারা রাত), থেকে শুরু করে অষ্টপ্রহর (চব্বিশ ঘণ্টা), চব্বিশ প্রহর (তিন দিন), পঞ্চম সপ্তম নবম চৌদ্দমাদল (চৌদ্দটি মাদল চতুর্দশ রাত্রিতে বাজান হয়), উন্মাদল (উনিশ দিন), হরির হাট (একমাস) অবধি এক সংগে সংকল্প করা যায়। এছাড়া নবকুঞ্জ বলতে মাড়ার অনুরূপ সংস্করণ আরও আটখানি তৈরি হয়। নামগানই যাদের পেশা ও নেশা এরূপ বৈষ্ণবদের সন্ধানে বৎসরাধিক কাল ধরে বিরতিহীন ভাবে নামগান চলে এমন জায়গাও আছে। যেখানে খোরাকির বিনিময়ে নামগান করতে হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত, বদড়ার গোবিন্দদাস ও অধরদাস, ভগড়ার হেমাংগ পাঠক ও কানাই পাঠক, নদার হেমদাস ও নরসিংহদাসের নাম গান প্রসারে অবদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একসময় একডাকে এদের সকলকে চিনতেন যেমন মহুলবনার অদ্বৈতদাস মোহান্ত, আঁকরোর রাধারমণ নারায়ণ দেব, ধরণীর বিশ্বনাথ সেন, কুমারীর পঞ্চানন সেন, মানবাজারের মদন দত্ত, শশধর দত্ত, কালাচাঁদ দাস, বঙ্কিম ওস্তাদ প্রমুখ। স্থানীয় একসময়কার খ্যাত সৌখিন দলের বর্তমান দুই প্রতিনিধি ভোলানাথ দাস ও বাহাদুর দত্ত। এদের মন্তব্য মহাজনী তালবদ্ধ রাগে (যেমন শিবরঞ্জনী, দরবারী কানাড়া, মালকোষ) ইদানীং নাম গান খুব কম হচ্ছে। উপযুক্ত শ্রোতা এবং গায়ক দুইয়ের অভাব। প্রায় আসরেই রঙের (হিন্দি, লোকগীতি, রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক ইত্যাদি গানের সুর) চাহিদা বাড়ছে। খোলের বোল এবং উচ্চাংগ রাগ রাগিনী বিশিষ্ট নামের মাধুর্যের চেয়ে অংগভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করছে। সুরবিকৃতিও ঘটছে হামেশাই। কীর্তন দলগুলিকে মোটামুটি তিনভাগেভাগ করা যায়। সৌখিন সম্প্রদায় এই দলগুলির কোন পূরণ লাগে না। বেকার, ছাত্র, শিক্ষক, চাষী, ব্যবসাদার ইত্যাদি সকল রকম লোক থাকে। ভাল খাওয়া দাওয়া থাকে। আমন্ত্রণ পেয়ে নামগান করতে যান। ২। পেশাদার সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশি। নির্দিষ্ট পূরণ থাকে। আমন্ত্রণ পেয়ে এরাও নামগানে যান। ৩। গৃহস্থ সম্প্রদায় - অপেক্ষাকৃত কম দল। সাধারণত যাদের নাম গান অবলম্বনে ভিক্ষা বৃত্তিই জীবিকা এরা তার মধ্যে পড়েন। মূলত সারা দিনমানে এদের দ্বারাই নাম টিকিয়ে রাখা হয়। আজকাল মেয়েদের নিয়েও দল গড়া হচ্ছে। একেবারেই পাড়াগাঁর দিকে নগদ টাকার ঘাটতির দরুন দলগুলিকে পরিমাণ মতো চাল ডাল, কাঠ, তরিতরকারী সবকিছু সরবরাহ করতে হয়। দলের মান অনুযায়ী পূরণের টাকা সোয়াশ থেকে চারশ অবধি লাগে। দল সংখ্যা অনুপাতে আসরের স্থায়িত্বকাল নির্ধারিত হয়। নাম সংকীর্তনে দৈহিক পরিশ্রম প্রচণ্ড। বিক্রম প্রদর্শনে বায়েন অর্থাৎ খোল বাদকেরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দুয়ারীদের (কীর্তনীয়া) পরিচালনা করেন যিনি তিনি সর্বাগ্রে থাকেন। পরিশ্রান্ত মানুষগুলোর রাত্রি একটা কি দুটোর সময় গোগ্রাসে মুড়ি চিবোন দেখে অভাবগ্রস্ত গাঁয়ের ক্ষুধার্ত অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। ফেরীর (ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপহার) টাকা বিভিন্ন পরিমাণ পড়ে।

নাম চলা কালীন সময়ে গ্রামের কিশোর, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু একই রকম। কী রকম দল, কত চারজ, নতুন গায়ক - খোলবাদকের শৌর্য ইত্যাদি। এই কটা দিন সকলেই মোটামুটি শুদ্ধাচার ও নিয়মে চলেন। বিভিন্ন নিয়মাদির মধ্যে প্রতি প্রহরে বিগ্রহকে ভোগ নিবেদন। শুরু থেকে শেষ অবধি ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়িতে একটি ঘৃত প্রদীপ অনির্বাণভাবে জ্বলতে থাকে। দৈবাৎ নিভে গেলে পুনরায় নতুন ভাবে সংকল্প করতে হবে। এছাড়া কোন কোন আসরে পালাক্রমে বিরতিহীনভাবে নাম জপ করার জন্য বিশেষ লোক নিয়োগ করা থাকে। তারা মনে করে খোল করতাল সহযোগে নামের মধ্যে ছেদ পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। শুরুর পূর্বে গন্ধ (দেবতাদের আবাহন জানান) দেওয়া ও শেষ করা কালীন গিরি গোবর্ধনমূর্তি তৈরী ইট গুড়োর সাহায্যে ও দধিভাণ্ড ভাংগা, অন্ত্য দিনে শতাধিক ভোগ নিবেদন ইত্যাদি প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। নাম ভাঙার পর দল সহযোগে ধূলট (আবীর ধূলা প্রভৃতি পরস্পরকে মাখিয়ে গ্রাম পরিক্রমা) পালিত হয়।

এ প্রসংগে গোপাল নগরের গুরুপদ কর্মকার বললেন, এই গ্রামের সংগে লালবাজার গ্রামের আত্মীয়কুটুম্বাদির আধিক্য থাকার ফলে এই কদিন এখানটাও লাল বাজারে পরিণত হয়ে যায়। অতিথি অভ্যাগতদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে যথাযোগ্য সম্মান বজায় রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। গোপালনগরে যি বছরই নির্দিষ্ট দিনে শুরু হয়। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান নেমে গেছে। খ্যাত দলগুলোও আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে।

নাম গানে কোন জাতিগত নিষেধ নেই। সকলরকম জাতি এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবু কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় এখন বৈষ্ণব বাউরী নামগানে অধিকার পান না। এগুলি সংখ্যায় নগণ্য। বর্তমান সময়ে সাধারণ দল নিয়ে চব্বিশ প্রহর (তিন দিন) নাম শুরু করলে বাইশ থেকে চব্বিশ শো টাকার কমে চালান কষ্টসাধ্য। গত দশকের তুলনায় খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনগুণ। এই কর্মময় যুগে আপাতদৃষ্টিতে এসব অর্থহীন বলেই মনে হয়। কিন্তু গ্রামীন জনজীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এর মূল্য অসীম। যা অর্থে পরিমাপযোগ্য নয়।

গ্রামীণ জনজীবনে নামগান এছাড়াও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং মানুষে মানুষে মিলনের নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগায়। অর্থাৎ উৎসবের যেটি মূলকথা এই নামগানেও তাই। □

আলোকচিত্র : লেখক

সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসে ফিরছেন, না নিজেই নতুন দল গড়তে চান?

নিশীথ দে

সিদ্ধার্থশংকর রায় কি কংগ্রেসে ফিরে আসছেন? নাকি নিজে নতুন দল করছেন? ছ বছর সিদ্ধার্থবাবুকে রাজনীতির রাজপথে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যায়, তিনি আসছেন। আবার সেই দীর্ঘকায়, সৌম্যদর্শন পয়লা সারির ব্যারিসটার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় কংগ্রেসের নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন?

মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাবার পরই ব্যারিসটার সিদ্ধার্থ রায়। কংগ্রেসে সঞ্জয় গান্ধীর সংগে বনিবনা হয়নি। রাজনীতিতে ইস্তফা দিয়ে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন। কলকাতা-দিল্লি-বোমবাই-মাদরাজ-গৌহাটি করে বেড়ান। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে চলে যান লনডনে—শ্বশুরবাড়িতে। রাজনীতির অনেক রিসক কিন্তু রোমানস আছে। প্রয়োজন নেই তবু প্রলোভন হয়—রাজনীতিতে রমরমা। কলকাতায় এলেই সিদ্ধার্থবাবুর ২ নং বেলতলা রোডের বাড়িতে অনেকের গোপনে এবং প্রকাশ্যে আনাগোনা চলে। তা হলে কি সত্যিই সিদ্ধার্থবাবু রাজনীতিতে নামছেন? আবার ইন্দিরা গান্ধীর সংগে তাঁর ছবি ছড়িয়ে পড়বে?

কেউ কেউ বলেন, তা ছাড়া উপায় কী? আর কে আছে পশ্চিমবংগে নেতৃত্ব দিতে পারে? একমাত্র সিদ্ধার্থ রায়।

না, সিদ্ধার্থ রায় নয়, কিছুতেই নয়। বেশ ভরাট গলায় বরকত সাহেবের প্রতিবাদ। সিদ্ধার্থ রায়কে আমরা কংগ্রেসে ঢুকতে দেব না। .... কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু কি কংগ্রেসে ফিরতে চান? কী বলছেন! সিদ্ধার্থবাবু এক পা বাড়িয়ে আছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু কী বলেন? দুদিনের জন্য কলকাতায় আসেন। চুটিয়ে আড্ডা দেন। তাঁর ২ নং বেলতলা রোডের বাড়িতে অনেকেই উঁকি ঝুঁকি মারেন। সিদ্ধার্থবাবু নিজেও চলে যান বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি।

সেদিন শনিবার, ৩০ জুলাই। বেলতলা রোডের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, সিদ্ধার্থবাবু দাঁত দেখাতে ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। স্ত্রী মায়া রায় গিয়েছেন কালীঘাটে পূজো দিতে। বলতে বলতেই মায়া রায় ফিরে এলেন। পরনে সাদা খোলের ইঁট রঙা ফুল পাড় শাড়ি। কপালে সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, গোলা সিঁদুর। হাতে ছোট্ট ঝুড়িতে প্রসাদ, ফুল, বেলপাতা। একে অভিজাত, বিলেতে মানুষ তার ওপর ব্যারিসটার— আশ্চর্য! মিসেস রায়ও কালীঘাটে যান!

হোয়াই নট? আমি প্রতি শনিবার কালীবাড়ি যাই। আমার কথা বাদ দিন। কোন বাঙালি মেয়ে মনে মনে মা কালীকে না ডাকে বলুন! আচ্ছা আপনারা একটু বসুন, এক্ষুনি আসছি। আপনাদের কী দেবে? কোলড অর

না, না, কিছু লাগবে না। আপনি আসুন গল্প করা যাবে।

মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এলেন, গল্প পেলে আমার আর কিছু চাই না, মানুরও তাই। ও এক্ষুনি এসে পড়বে। আপনাদের বসতে বলে গিয়েছে।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে মা'র কাছে কী প্রার্থনা করলেন?

তা বলব না। তবে সব মেয়েই স্বামীর জন্যে প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা করলেন, সিদ্ধার্থবাবু যাতে আবার পশ্চিমবংগের রাজনীতিতে সফল হন, জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হন?

মোটেই না। আমি চাই না মানু আর রাজনীতি করুক। চামচা রাজনীতি ...।

কথার মাঝখানে অ্যামবাসাডর থেকে নামলেন সিদ্ধার্থবাবু। সেই বাহাত্তরের মতই বাষট্টি বছরেও সমান স্মার্ট। হালকা আকাশী রং-এর স্যুট। চার-পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলেন, সরি, একটু দেরি হয়ে গেল। না, দাঁত তুলতে হবে না। কালকেই দিল্লিতে ব্যাক করব। মায়া, তুমি ওদের সংগে গল্প কর। আর কিছু আনাও, কোলড ড্রিংক ...। আগে থেকেই একদল মক্কেল ওঁর চেমবারের সামনে পায়চারি করছিলেন। মিনিট দশেক পরেই নিজে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন। দেওয়াল ঢাকা পড়ে গিয়েছে, চারদিকে শুধু মাপসই র‍্যাকে ভরতি আইনের বই। ত্রিশটা গণেশ মূর্তি—তিন ইনচি থেকে ছ ইনচি সাইজের।

বল, কেমন আছ তোমরা। আচ্ছা তোমাদের কী মনে হয়?

আমাদের মনে হওয়াটা কোন ব্যাপার নয়। অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে আপনি কংগ্রেসে আসছেন। কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। যেমন ধরুন, কেন্দ্রের দুই মন্ত্রীর এক মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু বরকত সাহেব বলছেন, কভি নেহি। সিদ্ধার্থবাবুকে কিছুতেই কংগ্রেসে নেওয়া হবে না। ওঁর কথা হল, 'উই উইল অপোজ সিদ্ধার্থ টুথ অ্যানড নেইল।'

একটু হেসে বললেন, কারেকট। তবে ওঁরা হাওয়ার সংগে যুদ্ধ করছেন।

তার মানে?

মানে খুব পরিষ্কার। অনেকেই আমাকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে চান। আবার অনেকে চান আমি রাজনীতিতে ফিরে আসি। সিদ্ধার্থবাবু একটু থেমে হঠাৎ যেন এক নিঃশ্বাসে বললেন, কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার কোন বাসনা আমার নেই। হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি। আমাকে নিয়ে অনেকদিন থেকে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে। তবে এটাও ঠিক, কিছুদিন আগে আমি বলেছিলাম কতকগুলি শর্ত মেনে নিলে আমি কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারি। আমার শর্তগুলি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও জানিয়েছি। আমি মাথা নিচু করে নয়, মাথা উঁচু করে কংগ্রেসে ফিরে যেতে রাজি আছি।

সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে লোকসভার নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর ইন্দিরা-বিরোধী অনেক স্টলওয়ার্ট কংগ্রেসে ফিরে আসার জন্য মাথা নিচু করে লাইনে সামিল হয়েছিলেন। ওয়াই বি চবন, কে সি পনথ, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি, ডাঃ জয়নাল আবেদিন ....। তা হলে সিদ্ধার্থবাবু কি কোনদিন এঁদের সগোত্র নন? কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুকে নিয়ে এত তোলপাড় হচ্ছে কেন?

এককালের সিদ্ধার্থবাবুর ঘনিষ্ঠরা বলছেন, সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেসে আসার জন্য খুবই আগ্রহী। কিন্তু বাধা। কে বাধা? কেউই ঠিক ভাঙছেন না। মাস দুই আগে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধী 'পরিবর্তন' সম্পাদককে বলেছেন, না, সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেসে ফিরে আসার জন্য কোন আবেদন করেন-নি। সুব্রতবাবু বললেন, আমি নিজে সিদ্ধার্থবাবুর চিঠি এ আই সি সি অফিসে দিয়ে এসেছি। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সন্তোষ রায় একদিন বললেন, মানুদা দলের অনেক ক্ষতি করেছেন। কিন্তু তবু আমি কংগ্রেসের স্বার্থেই চাই সিদ্ধার্থবাবু ফিরে আসুন। রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী ছাড়া আর

কেউ সোচ্চারে সিদ্ধার্থবাবুর বিরোধিতা করছেন না।

সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেস বা কংগ্রেস (ই) বলেন না। বলেন, 'কংগ্রেস'। এক সময় ইন্দিরা গান্ধীর নাম না নিয়ে বলতে গেলে জল খেতেন না। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভাগ করার সময় সিদ্ধার্থবাবু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাঙনের মুখে কলকাতার ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর মিটিং-এ সভাপতিত্ব করবেন কে তাই নিয়ে বিরোধ বাধে। ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

ইন্দিরা এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ সফরে,সঙ্গী সিদ্ধার্থ রায়। শুধু সঙ্গী নয়, সড়ক পথে মোটরগাড়ি ড্রাইভ করেছেন সিদ্ধার্থবাবু। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি করার পর ১৯ নভেমবর ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে সিদ্ধার্থবাবু এক জনসভায় বলেছিলেন প্রত্যেকটি মানুষের উচিত জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য ভারতের একমাত্র নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানান।

সিদ্ধার্থবাবু বরাবরই একটু আবেগপ্রবণ। আসলে রাজনীতিতে প্রবেশ আকস্মিকভাবেই। সিদ্ধার্থবাবু নিজেই গল্পটা একদিন বলেছিলেন। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাস। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করি। বরাবরই আমার ঘুমোতে রাত হয়। আইনের বই বাদ দিয়ে রাত্রে শুয়ে শুয়ে অন্য বই পড়ি। ঘুম থেকে উঠি বেলা আটটার আগে নয়। এখনও এই অভ্যাস আছে। বাড়িতে কেউ আমাকে ডাকতে সাহস পেত না। সেদিন ভোর পাঁচটায় টেলিফোন এল। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ফোন। অন্য কেউ হলে বাড়ির কাজের লোকরাই বলে দিত, পরে টেলিফোন করবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, তার ওপর ডাঃ রায়! উঠে টেলিফোন ধরলাম। ওপাশ থেকে রাশভারি গলা, তুমি একবার আমার বাড়িতে চলে এস। বললাম, কোরট থেকে ফেরবার পথে যাব।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ গেলাম ডাঃ রায়ের বাড়িতে। তাঁর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন সরোজবাবু। আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালেন। মিনিট খানেক পরেই ডাক পড়ল ডাঃ রায়ের।

ঢুকে দেখি জনা চারেক লোক বসে আছেন। আগে এদের কাউকে দেখিনি। কাগজে ছবি দেখেছিলাম। তাই অতুল্য ঘোষকে চিনতে পারলাম। প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখারজিকে চিনতাম না। সামনে একটা বড় টেবিল। অনেক ম্যাপ ছড়ান। ডাঃ রায় ডাকলেন আমাকে। ম্যাপের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, এই দেখ মানু, এই যে .... এইটা তোমার ----।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কী আমার? আমি তো কিছু চাইনি।

ডাঃ রায় বললেন, এই হল বিধানসভার ভবানীপুর কেন্দ্র। এখান থেকেই তোমাকে কংগ্রেস প্রার্থী হতে হবে।

আমি একেবারে অবাক। বললাম, আমাকে দুদিন সময় দিন, ভেবে দেখি।

যাই হোক, সেই '৫৭ সালের নির্বাচনে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। প্রস্থান ১৯৭৭-৭৮ সালে। না, না মাঝখানে প্রবেশ-প্রস্থান ঘটে গিয়েছে। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন আইনমন্ত্রী। বনিবনা হল না, পদত্যাগ করে সংবাদের শিরোনামে এলেন। বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে সিদ্ধার্থবাবু উপনির্বাচনে জয়ী হলেন অবিভক্ত কমিউনিসট পারটির সমর্থনে। সিদ্ধার্থবাবু বাড়িতে কমিউনিসট পারটির নেতাদের ডিনার দিয়েছিলেন। রটে গেল সিদ্ধার্থবাবু কমিউনিসট পারটিতে যোগ দিতে চেয়েছেন। সিদ্ধার্থবাবু সাফ জানিয়ে দিলেন, সব বাজে কথা।

এরপর অনেকদিন সিদ্ধার্থবাবু দলছাড়া, নির্ভেজাল নির্দল। চীনের ভারত আক্রমণের ঘটনায় সিদ্ধার্থবাবু কমিউনিসটদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। কোরট বন্ধ, হাতে কাজ না থাকলে চলে যান শ্বশুরবাড়ি লনডনে।

পরের ঘটনাটা বলেছিলেন একান্তে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। বোধহয় প্রফুল্লদা সিদ্ধার্থবাবুর মন্তব্যে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। বললেন, সময়টা ঠিক মনে নেই। আমি তখন মুখ্যমন্ত্রী। বিলেত থেকে মানু চিঠি লিখল আমাকে, প্রফুল্লদা আমি আপনার নেতৃত্বে কাজ করতে চাই। যাই হোক, আমি লিখলাম, কাজ করতে চাও তো ভাল কথা। বিলেতে বসে থাকলে তো হবে না। যাই হোক, মানু দেশে ফিরে মানে দমদম এয়ার পোরট থেকে সোজা রাজভবনে আমার বাসায় এল।

আমি কংগ্রেসের মিটিং-এ বললাম, মানুকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিতে হবে। সে কী বলব, সবাই যেন ফেটে পড়ল, প্রফুল্লদা আপনি মানু রায়কে কংগ্রেসে নিতে চান? আপনাকে যে লোকটা অপমান করেছে তাকে আপনি -----। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, এখন নয়, বছর খানেক বিধানসভায় নির্দল থেকে মানু রায়কে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যেতে হবে। তারপর তাকে কংগ্রেসে নেওয়া হবে। মানু তাতেই রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু আজকে, এই তিরাশি সালে সিদ্ধার্থবাবু আর ইমোশনাল নন। এখন ভাবছেন। এক পা এগোবার আগে দশবার ভাবছেন।

বোধ হয় অনেকদিন পর, আঘাত পাওয়ার পর তিনি সচেতন হয়েছেন। খুব আক্ষেপের সুরে বললেন, যাদের আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি তারা অনেকে অনেক ওপরে উঠেছে, দেখা হলে পালিয়ে যায়, এড়িয়ে চলে। আমি অনেক ফ্রানকেনসটাইনও তৈরি করেছি।

আসল কথাটা বলি। বছরখানেক আগেই আমি বললাম: আমার কতকগুলো শর্ত আছে। সেই শর্তগুলো না মানা হলে আমার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কোন বাসনা নেই। এটা কিন্তু কংগ্রেসের সবাইকে জানিয়েছি। তবু শুনছি আমি কংগ্রেসে যোগ দিতে চাই, কোন কোন কাগজ লিখেছে আমি যোগ দিয়েছি। কোন কাগজ লিখেছে, আমি ইন্দিরার দেখা পাওয়ার জন্য দিন গুনছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক, আমি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াবার জন্যে মনোনয়ন চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তার কোন উত্তর পাইনি। মনোনয়ন পাইনি। কেন পাইনি জানি না।

ইন্দিরা গান্ধী নিজেই আপনাকে মনোনয়ন দিতে চাননি? জানি না। কালকে তো একজন বলে গেল ইন্দিরা নাকি বলেছেন, সিদ্ধার্থকে কংগ্রেসে নেব না। যাকগে, আমার সেই সব শর্ত বিবৃতিতে যা উল্লেখ করেছি তা মনে করে সব তো বলতে পারব না। বিবৃতির কপি দিল্লিতে আছে। মোটামুটি বলছি। প্রথমত, সব কিছু আলোচনা করতে হবে এবং আলোচনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রদেশ কংগ্রেসগুলিকে তাঁদের নিজেদের মত চলতে দিতে হবে, এ আই সি সি র হস্তক্ষেপ চলবে না, যাতে সাধারণ লোক প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখতে পারে, প্রদেশ কংগ্রেসকে এ আই সি সি-র চামচা না মনে করে।

কংগ্রেসের প্রত্যেক নেতা এবং কর্মীকে মাসে অন্তত তিন সপ্তাহ গ্রামে যেতে হবে। গ্রামের মানুষের মধ্যে কাজ করতে হবে। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ থাকেন গ্রামে। কংগ্রেসের গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে, বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের মধ্যে কোন সংগঠন নেই। এর পর আছে কংগ্রেসের নামে অর্থ সংগ্রহ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ঠিক করবেন কংগ্রেসের

তহবিলের জন্য কে যা কারা টাকা তুলতে পারবেন, তাঁদের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। আমি বলছি না যে কেউ অসৎ। তবে এটা করা দরকার এবং কোন ক্ষেত্রেই রসিদ ছাড়া যেন টাকা না তোলা হয়। যার যেমন ইচ্ছে টাকা তুলছে। প্লেনে বোম্বাই হয়ে দিল্লি ছুটছে, দিল্লিতে নেতাদের কাছে প্রদেশ কংগ্রেসের নামে অভিযোগ করছে। এ সব কী? প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব শক্তিশালী না হলে কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থা থাকতে পারে না। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা দেশেই প্রদেশ কংগ্রেস যেন এ আই সি সি-র চামচা।

আমি বলছি, ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে সি পি আই (এম)-এর হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে পেরেছিলাম। আমি, আবদুস সাত্তার, বরকত, প্রিয় আরও অনেকে তখন মাসের পঁচিশ দিন গ্রামে ঘুরেছি। তারপর ধরুন, ১৯৭১ এবং ৭২ সালে আমরা দুটো নির্বাচন করেছি। জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলোর সংগে আলোচনা করে প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছি। দিল্লির হস্তক্ষেপের দরকার হয়নি। নির্বাচনী ফল ভাল হয়েছে।

সাতাত্তরে বিধানসভার নির্বাচনে আপনি দাঁড়ালেন না কেন?

আমি দাঁড়াইনি, তার কারণ আমাকে দাঁড় করিয়ে হারাবার প্ল্যান করা হয়েছিল। কংগ্রেস থেকেই আমাকে হারাবার প্ল্যান করা হয়। পেছনে কে ছিলেন নাম বলতে চাই না। লোকসভার আসনেও কংগ্রেসের ছ জনকে প্ল্যান করে হারান হয়। রাজভবনে আমি তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্ল্যানের কথা বলেছিলাম। উনি তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ওম মেটাকে টেলিফোনে বললেন।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসকে এলোমেলো করে দেওয়া, দিল্লিতে নালিশ জানাতে যাওয়া, এসব শুরু হয় ১৯৭৬ সালে।

তখন কি সঞ্জয় গান্ধী এঁদের মদত দিয়েছিলেন?

আমি কারুর নামই বলব না। প্রদেশ কংগ্রেসকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখার জন্যেই কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক দল মাথা চাড়া দিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে এন টি রামা রাও উঠেছেন এই জন্যেই।

অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে আপনার বাড়িতেও আঞ্চলিক দল গঠনের ব্যাপার নিয়ে মিটিং হয়েছে? এটা কি সত্যি?

না, কোন মিটিং হয়নি। আমি মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেই অনেকে আসেন। কথাবার্তা হয়, আড্ডা হয়। তবে এটা ঠিকই বহু লোক এমনকি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় অনেকে আঞ্চলিক দল গড়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। বহু লোক আমার কাছে আসেন, নানা ব্যাপারে অভিযোগ করেন। কংগ্রেসে কেউ তো অভিযোগ শোনার নেই এবং প্রতিকার করারও কেউ নেই। বামফ্রন্ট সরকারের বড় শরিক সি পি আই (এম) শহরে গ্রামে অত্যাচার চালাচ্ছে। আমি জেলাওয়ারি তথ্য যা পেয়েছি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। ৭৮ থেকে ৮২ সালের মধ্যে অন্তত ১২ খানা চিঠি দিয়েছি, ৬টি জেলাওয়ারি তালিকা দিয়েছি। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া দূরের কথা, প্রাপ্তি স্বীকার করে কোন চিঠি পাইনি। আমি মারকসবাদী কমিউনিস্টদের ভালভাবে জানি, তারা ব্যর্থ হবেই। কিন্তু কংগ্রেস কোথায়? সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল, কংগ্রেসে ভাল ভাল কর্মী বা নেতার অভাব নেই, কিন্তু তাঁদের ঠিক মত কাজে লাগান হল না। বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীরা পথে নেমেছেন। কিন্তু ডঃ শিশির বসু এবং ডঃ কিরণ চৌধুরী ছাড়া কেউ তো কংগ্রেসে আসেননি। আমি অনেক চেষ্টা করে একবার ইন্দিরা গান্ধীর সংগে দেখা করলাম। উনি রাজি হলেন বুদ্ধিজীবীদের সংগে বৈঠক করতে। তালিকাও তৈরি করে দিলাম। উনি ডায়েরি দেখে তারিখও ঠিক করলেন। কিন্তু সেই পর্যন্তই। আর কোন সাড়াশব্দ নেই। শ্রীমতী গান্ধী কেন বৈঠক ডাকলেন না বুঝতে পারলাম না।

লোকসভার শ্রীরামপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে বলেও আপনাকে মনোনয়ন দিল না অথচ তার আগে ১৯৮০ সালের ৬ জানুয়ারির নির্বাচনে নাকি আপনাকে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিল?

একদিন বরকত আমাকে বলল কলকাতায় অশোক সেনের সিটে দাঁড়াতে হবে। আমি রাজি হইনি। অশোক সেনের সিটে দাঁড়াব কেন?

তাহলে আপনি আঞ্চলিক পারটি করবেন?

এখন উপযুক্ত সময় নয়। তা ছাড়া অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে। রাজনীতির অভিজ্ঞতা বেদনাদায়ক। শরীরটা ফিট আছে। কিন্তু বয়স তো হয়েছে – বাষট্টি। আর না হয় দশ বছর ফিট থাকতে পারি। অবশ্য ফিট না থাকলে প্রফেশনেও থাকা যায় না। আমি আমার প্রফেশনকে ভালবাসি। আমি রাজনীতির বাইরে। তবু আমার কাছে লোকজন আসেন। আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। এবারেও অনেকে বললেন, আঞ্চলিক পারটি করার জন্যে। কিন্তু আমি ভবিষ্যৎটা ভাবছি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ভোট পেয়েছে শতকরা ৩২ ভাগ। সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে। আঞ্চলিক পারটি কার ভোট ভাঙবে? কংগ্রেসের ভোট। তাতে লাভ কার? সি পি আই (এম)-এর।

পাশ থেকে একজন বললেন, অনেকে বলেন, সিদ্ধার্থ রায়-এর সময়ে ক্ষমতায় ছিল 'ব্যাড কংগ্রেস', আর জ্যোতিবাবুরা হলেন 'গুড কংগ্রেস'।

সিদ্ধার্থবাবু বেল বাজিয়ে চা আনতে বললেন।

আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম কোন কাজ করেছি কিনা তা জনসাধারণই বিচার করবেন। আমরা মারকসবাদী নই, মারকসবাদকে অনুসরণও করি না। কিন্তু বর্তমান মারকসবাদীদের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে আমরা মারকসের চিন্তাধারায় গরিব মানুষের স্বার্থে কাজ করেছি। বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারে একটিও নতুন কথা বলেননি, ১৯৬৪ সালে অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস ব্যানারজিই সবার আগে এসব কথা বলেছেন। ১৯৭২ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন বাজেটে ঘাটতি ৬৩ কোটি টাকা, ৭৭ সালে যাবার সময় উদ্বৃত্ত বাজেট রেখে গিয়েছিলাম। ৭২ থেকে ৭৭ – প্রতিবছর গড়ে এক লক্ষ বেকারের চাকরি হয়েছে, নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। খাদ্য উৎপাদন ৬২ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে করেছিলাম ৮৯ লক্ষ টন। বামফ্রন্টের রাজত্বে বাড়ান দূরের কথা, কমে দাঁড়িয়েছে ৬৮ লক্ষ টনে। সমবায় ঋণ আদায়ের হার ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। হ্যাঁ, এটা ঠিক ১৯৭৪ সালে বিদ্যুৎ সংকট শুরু হয়। কিন্তু কারা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টা করেছিল? উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পর সমস্যা কতটুকু ছিল? আজকে তো সংকটজনক পরিস্থিতি, মানুষের তৈরি করা সমস্যা। বামফ্রন্ট সরকার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি। বিদ্যুতের অভাবে আজ সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর বিকল্প কোন নেতা কংগ্রেসে নেই। তবু কেন সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেসে প্রবেশ করার পথে কাঁটা ছড়ান হচ্ছে?

বরকত সাহেব একদিন বললেন, এই ভদ্রলোকই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝিয়েছিলেন জরুরি অবস্থা জারি করা কত জরুরি। আর ঠিক একমাসের মাথায় বলতে লাগলেন, জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া দরকার। বাবু জগজীবন রামের সংগে গোপনে শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন। ৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী সিদ্ধার্থ রায়।

সিদ্ধার্থবাবুর অনুগামী এক প্রবীণ নেতা বললেন সিদ্ধার্থ রায় ইন্দিরার খুব কাছে থেকে হঠাৎ দূরে হয়ে গেলেন ১৯৭৫ সালের ১২ জুন। সেদিন এলাহাবাদ হাইকোরট রায়-বেরিলি থেকে ইন্দিরার নির্বাচন বাতিল করে দিলেন। সিদ্ধার্থ রায় সেদিন পরামর্শ দিলেন, আপনি সুপ্রিম কোরটে লড়ে যান।

তাহলে তো প্রধানমন্ত্রীর পদে সাময়িকভাবে ইস্তফা দিতে হয়। এই সময়ে কে প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালাবেন?

সিদ্ধার্থ রায় নাকি বলেছিলেন, 'আমি চালিয়ে যাব।'

সঞ্জয় গান্ধী মাকে বুঝিয়েছিলেন, সাবধান, মা, তুমি বুঝতে পারছ সিদ্ধার্থ রায় প্রধানমন্ত্রী হতে চায়!

সিদ্ধার্থ রায় সত্যিই কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিন - নাকি আজও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেন. ☐

আলোকচিত্র:
সৌগত রায় বর্মন

প্রেসিডেনট রেগনের বক্তৃতার নিচে মারভ ডেভিডবের আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সফররত সুদীপ মজুমদার

মাত্র আট ঘণ্টার জন্য প্রেসিডেনট রোনালড রেগন মিনিয়াপোলিসে এসেছিলেন কদিন আগে। কিন্তু সারা শহর বেশ কয়েকদিন আগের থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল প্রেসিডেনটের সফর উপলক্ষে। সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল সিকরেট সারভিস আর শহরের পুলিস কমিশনার অ্যানথনি ইবাজার। সিকরেট সারভিসের ওপর দায়িত্ব প্রেসিডেনটের নিরাপত্তার আর পুলিসেব ওপর ভার নানান ধরনের বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে রাখা। সাংবাদিক হিসাবে প্রেসিডেনটের সফর কভার করতে পারা অনেকের কাছে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ারলড প্রেস ইনসটিটিউটের ফেলো হিসাবে আমরা সুযোগ পেলাম প্রেসিডেনটের সফর কভার করার। তবে প্রত্যেকেরই সিকিউরিটি ক্লিয়ারেনস হল। অর্থাৎ W.P.I.-এর ডাইরেক্টার এক ধরনের গ্যারানটি দিলেন যে আমাদের মধ্যে কেউই সিকিউরিটি রিসক নয়। প্রত্যেককে প্রেস কারড দেওয়া হল যা গলায় সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যাতে সিকরেট সারভিসের লোকেরা দেখে বুঝতে পারে আমরা প্রেসের লোক।

রোনালড রেগনের প্লেন, যার নাম এয়ার ফোরস ওয়ান, ঠিক ১২টা ২০ মিনিটে এসে এয়ারপোরটে নামল। চারদিকে মেশিনগান ও পিস্তলধারী প্রহরী। কেউ কেউ ইউনিফরম পরিহিত, অন্যরা কোট-সুট পরনে। কালো ছ-দরজার একখানা লিমোসিন হুস করে প্রেসিডেনটকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হপকিনস স্কুলের দিকে। রোনালড রেগন অথবা আমেরিকান প্রেসিডেনটকে আততায়ীর হাত থেকে বাঁচান সবচেয়ে কঠিন কাজ। রেগনকে একবার আততায়ীর গুলি খেতে হয়েছে বছর দুয়েক আগে। তারপর থেকে আরও বেশি করে সতর্ক হয়ে গেছে সিকরেট সারভিসের লোকজনেরা। তাছাড়া ইদানিং রেগন আবার মারমুখী সব বুলি আওড়াতে শুরু করার দরুন এদেশে ওঁর বিরোধী পক্ষ দলে বাড়ছে। এদের মধ্যে আছে অনেক শান্তিপ্রিয় যুবক-যুবতীরাও।

হপকিনস স্কুলে আমরা পৌছে গেলাম প্রেসিডেনটের পৌছনর আগেই। অন্তত আধ কিলোমিটার দূরেই গাড়ি থেকে নেমে পুলিসের বেড়ার পর বেড়া পার হয়ে হেঁটে যেতে হবে। বড় রাস্তার একপাশে সারিসারি বিক্ষোভকারী। এদের হাতে প্ল্যাকারড। বাচ্চা, বুড়ো, ছেলে-মেয়ে মিলে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। এঁরা রেগনকে জানাতে এসেছিলেন এঁদের অসন্তোষ। রেগনের সেনট্রাল আমেরিকা ও যুদ্ধবাজ নীতির প্রতি এই অসন্তোষ এখন দেশের সর্বত্র। এখানে বিক্ষোভকারীরা কেউই মারমুখী নন। শুধু হাতে ধরা প্ল্যাকারডটা নাড়াতে থাকেন। পুলিস গম্ভীর মুখে, হাতে বেত এবং কোমরে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্কুল বিলডিং-এর ভেতরে পৌছন পর্যন্ত প্রেস কারড থাকা সত্ত্বেও অন্তত পাঁচ বার পুলিসের প্রশ্নের জবাব দিতে হল। আমার গায়ের রং সাধারণ ভারতীয়র মত বাদামী। পুলিস এধরনের মানুষকে দেখে আরও বেশি সন্দেহের চোখে তাকায়। শেষে হলঘরে ঢুকতে যাব, হঠাৎ এক সাদা পোশাকের এজেনট রাস্তা আটকাল। বলল, পকেট থেকে পয়সা-চাবি ইত্যাদি মেটাল সব কিছু রেখে এই দরজার নিচে দিয়ে পার হও। হলাম। ওটা একটা মেটাল ডিটেকটর। সাধারণত এয়ারপোরটেই দেখতে পাওয়া যায়। এতে পরীক্ষা করা হয় সংগে করে কেউ কোন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভেতরে যাচ্ছে কিনা।

ভেতরে ঢুকেই দেখি স্টেজের ঠিক উল্টোদিকে স্টেডিয়ামের গ্যালারির মত কাঠের পাটাতন সাজান। তাতে প্রায় কয়েক শ টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্রের রিপোরটার গিজগিজ করে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে। বিরাট বিরাট টিভি ক্যামেরা আর আরক-ল্যামপ। কয়েকজন রিপোরটার আবার ওখানে বসেই রেডিও টেলিফোনে নিজ নিজ অফিসে ধারাবাহিক বিবরণী দিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেনটের আসতে তখনও প্রায় মিনিট কুড়ি বাকি। হলঘরের এক পাশে স্কুলের ছেলেমেয়েরা বসে আছে। এদের সংগে কথা বলতেই বুঝতে পারলাম যে বেছে বেছে এমন ছেলেমেয়েদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে যারা কোনরকম গোলমাল করবে না, শুধু প্রেসিডেনটের ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে হাততালি অথবা বাহবা দেবে। দুষ্টু ছেলেদের ভেতরে আসতেই দেওয়া হয়নি। একথা স্কুলের একজন সুপারিনটেনডেনটও আমার কাছে স্বীকার করলেন। কতকটা আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতার ভাষণে ভাড়া করে লোক আনার মত।

অবাক হলাম প্রেসের বাড়াবাড়ি দেখে। একটা স্কুলে সাধারণ এক অনুষ্ঠান। যে ধরনের অনুষ্ঠান রোজ গোটা দুয়েক যেকোন প্রেসিডেনট অথবা প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এসব জায়গায় বক্তারা একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে থাকেন। হারড নিউজ বলতে সাধারণ কিছুই পাওয়া যায় না। ঠিক তাই হল। কিছুই হারড নিউজ পাওয়া গেল না সেদিন।

প্রেসিডেনট রেগন এসে ঢুকতেই ছ ফুট লম্বা, শক্ত, চোখে কালো চশমা-পরা সিকরেট সারভিস এজেনটরা তৎপর হয়ে উঠল। রেগন একসময়ে ফিলম স্টার ছিলেন। কাউবয় হিসাবে ফিলমে অ্যাকটিং করতেন। এখনও কথাবার্তায় ফিলমি ভাব যেমন আমাদের এন টি রামা রাওয়ের। বক্তৃতায় গভীরতা নেই, আছে নাটকীয়তা। এতেই খুশি প্রেস। রেগন বসার আগে গায়ের কোট খুললেন। দেখাদেখি অন্যরাও স্টেজের ওপর কোট খুলে চেয়ারের ওপর রাখলেন। ক্যামেরা ফ্ল্যাশ করে উঠল। টি ভি ক্যামেরার ঘড়ঘড় শব্দ। রিপোরটাররা খসখস করে নোটবুকে নোট করতে থাকলেন। আমার পাশেই মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউনের এক তরুণ রিপোরটার দাঁড়িয়েছিল। কথায় কথায় আলাপ হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কজন এসেছ তোমাদের কাগজ থেকে?' বলল 'চারজন।' দুজনের ওপর ভার একটা ফিচার স্টোরি করার।

আসলে রেগন এখানে এসেছিলেন টাকা জোগাড় করতে। মিনিসোটার সেনেটর রুডি বসউইটজ (Rudy

Boswitz) ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে আবার দাঁড়াবেন রিপাবলিকান পার্টির ক্যানডিডেট হয়ে। নির্বাচন লড়তে গেলে টাকা চাই। আর টাকা জোগাড় করার নানান কায়দা নেতাদের জানা আছে। এই কায়দা আঁচ পাওয়া গেল বিকেলে লিমিংটন (Leamington) হোটেলে।

শহরের মাঝখানে বিলাসবহুল হোটেল। রাস্তার একদিকে এক বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়েছে রেগনের নানান নীতির বিরুদ্ধে। আর অন্য একদিকে অপেক্ষারত কম সংখ্যায় একদল মানুষ, যাঁরা রেগনের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাতে এসে ছিলেন। পুলিশের ওপর দায়িত্ব এই দুই দলকে সংঘর্ষ থেকে আলাদা করে রাখা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছাত্র, যুবক-যুবতী, নারীমুক্তি আন্দোলনের সদস্যরা, শিক্ষক, পিস (Peace) আন্দোলনের কর্মীরা। প্ল্যাকারডে লেখা শ্লোগান, 'Reagan recognises unions in Poland, but not at home.' 'Stop US aid to Israel' এবং 'Gandhi Lives'. একজন আবার লিখেছিল 'Free Nancy Reagan.' এদের সংগে কথা বললে বুঝতে পারা যায় আমেরিকান সরকার ও প্রেসিডেন্টের দুমুখো নীতির স্বরূপ। আমেরিকার সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মাত্র শতকরা ১৮ জন ইউনিয়নের অন্তর্গত। এখানে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার নেই। এদেশে মেয়েরা এখনও ছেলেদের মত সমান অধিকার অর্জন করেনি আইনের চোখে। মুখে গণতন্ত্রের বুলি কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকদের মদত জোগান, ইজরায়েলকে মদত জুগিয়ে প্যালেসটাইনের বাসিন্দাদের খতম করা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারকে মদত দেওয়া ইত্যাদি।

মারভ ডেভিডব (Marv Davidov) একজন বিক্ষোভকারী এবং আমেরিকান সরকারের এক কট্টর সমালোচক। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন কয়েকবার কোর্ট মারশাল হয় বিক্ষোভ করার জন্য। আজকাল পুরোপুরি পিস আন্দোলনের সংগে যুক্ত এবং সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। 'আমেরিকা পৃথিবীর খেটে খাওয়া ও শান্তিপ্রিয় মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। শুধু তাই নয়, এদেশের মানুষেরও বড় শত্রু আমেরিকান সরকার।' রাস্তায় নেমেছেন ডেভিডব। সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী পাঁচ বছরের প্রতিরক্ষা খাতে খরচের একটা হিসাব করেছেন। শুনলেও মাথা ঘুরে যায়।

নানান রকম যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা খাতে আমেরিকা ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে খরচ হবে ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। দশ লাখে এক মিলিয়ন, এক হাজার মিলিয়নে এক বিলিয়ন ও এক হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন। এটাকে টাকায় রূপান্তরিত করলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় তার একটা নমুনা দেওয়া যাক। যীশু খৃস্টের জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যদি রোজ এক মিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ প্রায় এক কোটি টাকা) করে জমা করা হয় তাহলেও আমেরিকার পাঁচ বছরের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার খরচের সমান পরিমাণ জমা হবে না। ভাবলেও মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু কথাটা সত্যি। এই বিশাল মারণ-যজ্ঞের বলি কারা? আমেরিকার সাধারণ মানুষ আর বিশ্বের অন্য এমন সব দেশ যারা মারকিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

মারভ ডেভিডব তাই চিৎকার করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সারা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে তিনি এই কথাই বলার চেষ্টা করছেন যে যদি এই মুহূর্তেই মারকিন সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত না হানা যায় তাহলে গোটা পৃথিবীর সামনেই এক ভয়ংকর ছবি ফুটে উঠবে অতি সত্বর।

হোটেলের ভেতরে ঢুকতেই ঐশ্বর্যের জৌলুস আর রেগনের মারমুখী বক্তৃতা শুনতে পেলাম। কালো স্যুট, বো-টাই আর জমকালো পোশাক পরে হীরের হার দুলিয়ে ধনী, ব্যবসায়ী, মিলমালিক দম্পতিরা এসেছেন তাঁদের রিপাবলিকান পার্টি আর রোনাল্ড রেগনকে সমর্থন জানাতে। রেগন প্রত্যেকের সংগে হাত মেলালেন। দম্পতিরা হাজার ডলার (দশ হাজার টাকা) গুঁজে দিলেন সেনেটর রুডি বসউইটজ-এর নির্বাচনী তহবিলে। তারপর গোলটেবিলের চারপাশে হলঘরে বসলেন মুরগির মাংস, কফি, কেক ও মদ খেতে। মাথাপিছু ডিনারের দাম ৫০০ ডলার (অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা)। প্রেসিডেন্টের সংগে এক হলঘরে বসে খাওয়া। মামুলি কথা? অনেকে ছবি তুলিয়ে বাড়িতে টাঙিয়ে রাখবেন।

পরদিন জানা গেল সেনেটর রুডি বসউইটজ আট ঘণ্টা রেগন সফরের দৌলতে চার লাখ ডলার (অর্থাৎ চল্লিশ লাখ টাকা) নির্বাচনী তহবিলে জোগাড় করে ফেলেছেন। নির্বাচন বেশ খরচের ব্যবসা। বসউইটজ নিজে কোটিপতি। কিন্তু নির্বাচন তো টাকার খেলা। হলঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এত টাকা খরচ করে নির্বাচিত হয়ে ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতারা ভাষণ দেবেন যে তাঁদের হৃদয় গরিবের জন্য কাঁদে। সংসদীয় গণতন্ত্রের কী আজব মহিমা!

ডিনারের শেষে রেগন বক্তৃতা দিতে উঠলেন। দশ মিনিটের বক্তৃতায় সাত মিনিট কাটালেন কী করে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধবাজ নীতির কারণে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তিনি ব্যস্ত। বাকি সময়টাতে সবাইকে আহ্বান জানালেন রুডি বসউইটজকে পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী করানর জন্য। ঘন ঘন করতালিতে হলঘর ফেটে পড়ল। বক্তৃতা শেষে রেগন পেছনের দরজা দিয়ে কালো লিমোসিনে চুপি চুপি উঠলেন। সুযোগ বুঝে আমি সরে পড়েছিলাম। গাড়ির খুব কাছাকাছি থেকে একটা ছবি তোলার চেষ্টা করছিলাম, এই সময় দারুণ এক ধাক্কায় সরে পড়তে হল। সিক্রেট সারভিসের নজর এড়াতে পারিনি। ওদিকে বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিতে শুরু করেছে। সবার আগে মারভ ডেভিডব। পুলিশ ওদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। প্রেসিডেন্ট রেগন নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার পর আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে এল শহরে। পরদিন সকালে সবকটি কাগজে রেগনের ছবি—কোট খোলার, বক্তৃতা দেবার, হোটেলে খাবার। সব প্রথম পাতায়। বিক্ষোভের ছবিও আছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায় রেগনের বক্তৃতার উচ্চকিত উদ্ধৃতির ছড়াছড়িতে। □

১ জুলাই ১৯৮৩

শিক্ষা

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি ছাত্রের সংখ্যা বেড়েছে

আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৯৮২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এশিয়া থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই এর কারণ। এইবার নিয়ে মোট আট বছর যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ইনসটিটিউট অব ইনটারন্যাশনাল এডুকেশন এই তথ্য জানিয়েছেন।

১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে মারকিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৩,২৬,২৯৯ অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার ২.৬ শতাংশ। ইউ এস এডুকেশনাল একসচেনজ তাঁদের বার্ষিক সমীক্ষায় এই তথ্য জানিয়েছেন।

ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছেন আমেরিকার ২,৪৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

সমীক্ষার রিপোরটে বলা হয়েছে, এককভাবে ফ্লোরিডার মায়ামি-ডাডে কমিউনিটি কলেজেই বিদেশি ছাত্র ভর্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বিদেশি ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে সাদারন ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাডিসনের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়, অসটিনের টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলমবিয়া ও বসটন বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদেশি ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে ক্যালিফোরনিয়া। ১৯৮২ সালে ক্যালিফোরনিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১,৫২০। এর পরবর্তী স্থান নিউ ইয়রকের। এখানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮,২২২। এর পর যথাক্রমে টেকসাসে ২৪,৩৯৭ জন, ফ্লোরিডায় ১৭,০১১ জন ও ম্যাসাচুসেটসে ১৫,৪৪৬ জন। এডুকেশনাল একসচেনজ এজেনসির সমীক্ষায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি বিদেশি ছাত্রছাত্রী আসছে ইরান থেকে। ইরানের পরেই স্থান তাইওয়ান, নাইজেরিয়া, কানাডা, জাপান, ভেনেজুয়েলা, ভারত, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং হংকং।

ইনসটিটিউট অব ইনটারন্যাশনাল এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট ওয়ালেশ এডগারটন জানিয়েছেন, এশিয়ার দেশগুলি বরাবরই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও গত ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে মোট সংখ্যার ২২ শতাংশ হয়েছে।

এডগারটন জানিয়েছেন ওপেক দেশগুলি থেকে আগত ছাত্রসংখ্যা অবশ্য বিগত শিক্ষাবর্ষে হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপীও ছাত্রসংখ্যা গত বছর সামান্য বেড়েছে — বর্তমানে মোট বিদেশি ছাত্রের ৮.৯ শতাংশ। দশ বছর আগে কিন্তু এই সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

'বিহার বাঙালি সমিতির প্রচেষ্টাতেই বাংলা অ্যাকাডেমির স্থাপনা হয়েছে'– বিভূতিভূষণ

গত ১২ মে পাটনায় ভারতবর্ষের প্রথম সরকারি বাংলা অ্যাকাডেমি স্থাপনা করলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ। অ্যাকাডেমির প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বাংলা অ্যাকাডেমিকে কেন্দ্র করে বিহারবাসী পঁচিশ লক্ষ বাঙালির মনে যেমন নানান কৌতূহল তেমনি প্রশ্ন – অ্যাকাডেমির পরিকল্পনাটা কী?

এ সম্পর্কে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণের এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হল।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষের প্রথম সরকারি বাংলা অ্যাকাডেমির প্রথম চেয়ারম্যান হওয়ার পর আপনার কেমন লাগছিল?

উত্তর : খুব যে একটা বড় বিশিষ্ট ঘটনা হল এটা আমার মনে হয়নি। সাধারণভাবেই নিয়েছিলাম। হয়েছে, ভালই হয়েছে। এরকমই আমার মনে হয়েছে, আমি নিজেকে Prominent হয়ে ওর মধ্যে বসাইনি। বিশেষ করে মন্টু সরকার ও শরদিন্দু ঘোষাল মশাইয়ের কথা মনে পড়ছিল।

প্রশ্ন : আপনার মতে বাংলা অ্যাকাডেমির সর্বপ্রথম কোন কাজ হাতে নেওয়া উচিত?

উত্তর : এখনও ত' বাংলা অ্যাকাডেমি পুরোপুরি formation হয়নি। তবে আমি ওদের একটা Programme দিয়েছি।

বিহারে বাঙালিদের অনেকেই বেশ কৃতী। সেই কৃতীদের মধ্যে পূর্ণেন্দুবাবু ছিলেন। ভূদেববাবু হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যে কাজগুলো highlighted হয়ে রয়েছে, তাতে কতটা বিহারিদের অবদান আছে তা তুলে ধরতে হবে। এটা একটা research এর কাজ। এর জন্য প্রথমে একটা ডিরেকটারি তৈরি করতে হবে। আমি চাই বিহারিদের একটু Prominent করে নিয়ে আসতে। আমরা প্রত্যেক সেনটারে লোক পাঠিয়ে দেব। সে বিষয়ে বিভিন্ন article নিয়ে একটা বড় বই করব। কাজটা আমরা normal wayতেই করব।

প্রশ্ন : বিহারে বহু স্কুল কলেজে বাংলা পড়ানর বন্দোবস্ত নেই। এমনকি বাংলা পড়ান সম্বন্ধে প্রতিরোধ রয়েছে। বাংলা অ্যাকাডেমি এ ক্ষেত্রে কী করবে?

উত্তর : এই কাজটা বিহার বাঙালি সমিতি করছেন আর যা কিছু হয়েছে এবং যে বাধা-বিঘ্ন আসছে তা সরানোর জন্য ওরা কাজ করছেন। বাংলা অ্যাকাডেমি এ বিষয়ে জোর দেবে, যাকে বলে 'কাঁধ দেওয়া' আর কি!

প্রশ্ন : আপনি দ্বারভাঙায় রয়েছেন এবং বাংলা অ্যাকাডেমির আপনি চেয়ারম্যান অথচ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্বারভাঙায়) বাংলায় এম এ পড়ানর বন্দোবস্ত নেই। এ বিষয়ে আপনি কি কিছু ভেবেছেন?

উত্তর : আমি অনেকবার এ বিষয়ে জিগ্যেস করেছি। যে বাধাগুলো রয়েছে তা বড় খারাপ ধরনের। মনে হয় যেন কেউ না এলেই ভাল। এই রকম মনোভাব। কয়েকটা Case এই ভাবে mainupulate করা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কারুকে অনুরোধ করিনি। অন্যভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই হয়নি। শেষদিকে গোলমাল করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : বিহার থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার উন্নতির জন্য বাংলা অ্যাকাডেমি কী সাহায্য করবে?

উত্তর : বাংলাঅ্যাকাডেমিতা পারে না। কেননা বিহারে অনেক জায়গায় অনেক কাগজ আছে। যেমন সমস্তিপুর থেকে 'সৌরভ' বেরুচ্ছে, পাটনা থেকে 'সপ্তদীপা'। এই রকম বহু জায়গা থেকে বহু কাগজ বেরুচ্ছে। কাকে তুমি সাহায্য করবে আর কাকে করবে না, এটা চিন্তার ব্যাপার। এ বলবে আমি যোগ্য, ও বলবে আমি বেশি দিনের। তাই আমার ওদিকে যাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই।

প্রশ্ন : বিহারে এখন বহু উচ্চমানের লেখক, কবি আছেন যাঁদের রচনা পশ্চিমবঙ্গের কাগজে প্রকাশিত হয় না। উচ্চমানের রচনা প্রকাশের বিষয়ে সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা বাংলা অ্যাকাডেমির আছে কি?

উত্তর : লেখকদের নিজেদেরকেই চেষ্টা করতে হবে। কারণ এটা বাছাই করা খুব মুশকিল। এ সম্বন্ধে পরে চিন্তা করা হবে Committee র temper অনুযায়ী। কারণ এগুলো বিতর্কের ব্যাপার। সরকার মাত্র দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছেন, তাই এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমার ইচ্ছে রয়েছে, কেদার বাবুর বই পড়ে রয়েছে, শরদিন্দু, সতীনাথের বই নষ্ট হচ্ছে, সেগুলো revive করার কাজটা হাতে নেব।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় কারুর একক প্রচেষ্টায় বাংলা অ্যাকাডেমির স্থাপনা হয়েছে না বিহার বাঙালি সমিতির প্রচেষ্টায়?

উত্তর : বিহার বাঙালি সমিতির প্রচেষ্টাতেই বাংলা অ্যাকাডেমির স্থাপনা হয়েছে, এটা অবধারিত সত্য। '৭২ থেকে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। শরদিন্দু ঘোষাল ও মন্টু সরকার খুবই চেষ্টা করেছেন। Resolution হয়েছে। Govt.-র কাছে চেষ্টা করা হয়েছে যে কেন আমাদের দেওয়া হবে না। মজার কথা, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলা ভাষা এত সমৃদ্ধ, তার অ্যাকাডেমির কী প্রয়োজন?

প্রশ্ন : বাংলা অ্যাকাডেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, এতে বিহার-বাংলার সম্বন্ধ ভাল হবে। আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : Relation তো ভাল হওয়া উচিত। মন্দ হওয়ার তো কারণ নেই। আমরাও এমন কিছু করব না, ওরাও এমন কিছু করবে না যাতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে। ওদিককার বই এদিকে থাকবে, এদিককার লেখকদের আদর থাকবে ওদিকে। সম্বন্ধ ভাল হওয়াই সম্ভব। □

সাক্ষাৎকার : শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং শচীন চৌধুরী

একান্ত সংবাদ

প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা বিভাগে কোটি টাকার তেল পুড়িয়েও কোন কাজ হচ্ছে না

শ্যামল বসু

১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকাব কিছু বেশি রাজ্যের প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে য়য়-ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ। জনতা সরকারের আমলে প্রতি-রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্পটির নাম রুরাল ফাংসনাল লিটারেসি প্রোগ্রাম। এই কর্মসূচিমত প্রতি দুটি ব্লকের জন্য একটি করে প্রোজেকট চালু কবার কথা। এক একটি প্রোজেকটে ৩০০টি করে বয়স্ক শিক্ষালয় পরিচালনা করবে। প্রতিটি শিক্ষালয়ে একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর অধীনে ৩০ জন করে গ্রামীণ মানুষ পড়াশুনা করতে পারবেন। এদের বয়স ১৪ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। প্রতিটি প্রোজেকটের জন্য খরচ হবে ৫ লাখ ০ হাজার টাকার মত। এখানে যা শেখান হবে তা কেবল পুঁথিগত পড়াশুনা নয়—গ্রামীণ মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় আচার বিধিও র অন্তর্ভুক্ত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার র জন্য খরচের ৫০ শতাংশ দেবেন। বাকি ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। ১৯৭৯ সালে এই প্রকল্প শুরু হল। ১৯৭৯–৮০, ১৯৮০–৮১, ১৯৮১–৮২ সাল অবধি মাত্র ২৯টি প্রোজেকট কাগজে কলমে রাজ্যে হল। ১৯৮১ সালের মধ্যে সারা ভারতের এজাতীয় প্রোজেকট হয়েছে ২৪১টি। ১৯৮২–৮৩ আর্থিক বছরে এ রাজ্যে রুরাল ফাংসনাল লিটারেরি প্রোগ্রামের সর্বমোট ৪৫টি শিক্ষালয় তৈরি হল। এই শিক্ষালয়গুলির কোন নিজস্ব বাড়ি নেই। শিক্ষকদের বাড়িতে অথবা অন্য কোন চণ্ডীমণ্ডপ অথবা স্কুল-বাড়িতে এই শিক্ষালয়গুলি চলে। এদের কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাসূচি নেই। সিলেবাসও এখন পর্যন্ত হয়নি। কখন কখন কিছু বইপত্র রাজ্য সরকারের বিশেষ ডাইরেকটরেট থেকে পাঠান হয় কিন্তু মোট আট মাসের এই শিক্ষা সময় হয় তখন শেষ হতে চলেছে না হয় পার হয়ে গিয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্যও কোন পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এরা মাইনে ও খরচ বাবদ মাস গেলে ৭৫ টাকা হিসেবে সাম্মানিক পান। এদের কাজকর্ম দেখার জন্য সুপারভাইজার আছেন। অ্যাসিসটেনট প্রোজেকট অফিসার পদ আছে আর মূলকর্তা হিসেবে আছেন একজন করে প্রোজেকট অফিসার। বেশির ভাগ জায়গাতেই অ্যাসিসটেনট প্রোজেকট অফিসারের পদ খালি। এ পদের জন্য বেতন ধার্য করা আছে ৩৮০–৯১০/৪৪০–১১৭০ টাকা, অফিসারের জন্য ৪৭০–১২৩০ টাকা/৫০০–১৩৬০ টাকা। সুপার-ভাইজারদের ক্ষেত্রে ৮ মাসের চুক্তি হিসেবে মাসিক ৫০০ টাকা পাওয়ার কথা। একটি প্রোজেকট এ প্রতি ৩০টি শিক্ষালয় পিছু ১ জন করে সুপারভাইজার আছেন। ১৯৮০ সাল থেকে এরা কাজ করে যাচ্ছেন। বছরে এরা বহুক্ষেত্রেই বাব মাসেরই মাইনে পান। এরা কারা বা কী এদের কাজ এমন প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার-ভাবে পাবার সুযোগ নেই। জেলা-গুলির প্রোজেকট অফিসারদের এখনও সরাসরি রিপোরট করতে হয় এই প্রথা-বর্হিভূত বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটরের কাছে। এই অফিসটি কলকাতায়। এখানে কয়েকজন পরিসংখ্যান বিভাগের লোক আছেন। এই অফিসের কাজ চালানর জন্য একটি ডেপুটি ডিরেক-টর ও দুটি অ্যাসিসটেনট ডিরেকটরের পদ এখনও খালি। এখনও বাস্তব অর্থে কোনদিনই লোক নিয়োগ হয়নি। কোথায় কী আছে, বা কী ভাবে কাজ চলছে—কোন সঠিক উত্তর এই দপ্তর থেকে পাওয়া যাবে না। কেননা গ্রামের যাদের জন্য এই প্রকল্প তাদের সম্পর্কে রাজ্য সরকারের এই দপ্তর পুরোপুরি উদাসীন।

এবার একটা প্রোজেকটের চেহারা দেখা যাক। প্রথম শর্ত, একটি এলাকায় ৩০০টি শিক্ষালয় থাকবে। পুরুলিয়া জেলার আরসা-বড় বাজা-রের দুটি ব্লকে এমন প্রোজেকট আছে। সেখানে সাকুল্যে শিক্ষালয়ের সংখ্যা ২১০টি। বাকিগুলো তৈরি না হবার কারণ হিসেবে বলা হয় খরা, চাষ নেই ইত্যাদি আড়মোড়া ভাঙা গল্প। এই শিক্ষালয়গুলির জন্য শিক্ষক ১৪১ জন আর শিক্ষিকা ৭০ জন আছেন। ডিসট্রিকট সোসাল এডুকেশন অফিসারের সই করা তিন মাসের নিয়োগপত্র নিয়ে সুপারভাই-জাররা এখানে কাজ করে যাচ্ছেন। জেলার বয়স্ক শিক্ষার জন্য আলাদা অফিসার নেই। সাকুল্যে এখানে ৫৯৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম পাওয়া যাবে, যার মধ্যে তপসিলী জাতির ৭০০ জন, তপসিলী উপজাতির ২০৭৬ জন। এদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৪৮৯ জন আর পুরুষের জন্য সংখ্যা ৪৪৭৮ জন। ৫৯৬৭ জনের মধ্যে ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষ সম্পূর্ণ করেছেন বা পরীক্ষায় বসেছেন ২৪১৩ জন যাদের মধ্যে উত্তীর্ণের হিসাব ১৩৪৭ জন। এঁদের মধ্যে ১১৩৮ জন পুরুষ আর ২০৯ জন মহিলা।

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল প্রবাদ যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য আত্মতৃপ্তির সুযোগ আছে। বায়নাক্কাও আছে। বায়-নাক্কা, যেমন কেন গ্রামের বয়স্ক মানুষ পড়াশুনা করবে?

পুরো প্রকল্পের চিন্তাটাই এমন পরিকল্পনাহীনভাবে গড়ে উঠেছে। বিভাগীয় মন্ত্রী ছায়া বেবা নিজেও পুরোপুরি বিষয়টি জানেন না কোথায় কীভাবে চলছে। কোন সামান্য সচেতন মানুষকে এইভাবে কয়েক কোটি টাকার অপব্যবহার নিশ্চয় চিন্তিত করে তুলবে।

টাকার হিসেবটা এক কথায় চোখে লাগে। ১৯৭৯–৮০, ৮০–৮১, ৮১–৮২ সালগুলোতে মোট ২৯টি শিক্ষা-লয়ের খাতে কাগজে কলমে অস্তিত্ব রাখতে খরচ হয়েছে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। আর ৮২–৮৩ সালের জন্য ৪৫টি শিক্ষালয় খাতে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। এই মোট ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার খরচের পর বিভাগীয় ডিরেকটরের হিসেবে মোট ২ লক্ষ ১৬ হাজার মানুষ এই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছেন। এ বছর তাদের লক্ষ্য আছে ৪ লক্ষ লোককে এই শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনার। এতে মাথাপিছু শিক্ষার খরচ ৫০০ টাকার কিছু বেশি পড়ছে। আবার তাও যদি প্রকল্পটি উদাসীনতার শিকার হয় তবে কয়েকশ কোটি টাকা খরচের পরও দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ যে অন্ধকারে ছিল অন্তত এ ক্ষেত্রে সেই অন্ধকারেই থেকে যাবে।' □

বিজেপি

সাময়িক

পাকিস্তান বি... বিস্ফোরণ...

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৩ জুন। সময় সকাল আটটা। বাঙ্গালোরের কাছে ভারতের যে সাইজমিক স্টেশন রয়েছে তাতে ভূকম্পন অনুভূত হয়। তার থেকেই জোর খবর পাকিস্তান সম্ভবত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যদিও সংবাদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি, এটি সত্য যে পাকিস্তান পারমাণবিক প্রযুক্তিতে বিগত দশক থেকে উন্নত হয়ে উঠতে জোর প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। পার-মাণবিক বিস্ফোরণের সংবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হলে আর বুঝতে সন্দেহ থাকবে না যে, পাকিস্তানও পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি।

পারমাণবিক প্রযুক্তিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন প্রযুক্তি উপাদানের যোগান

...পারমাণবিক ...টিয়েছে ?

ব্যংগচিত্র : লাহিড়ী

বজায় রাখা। এখানে প্রস্তুতি উপাদানটি হল ইউরেনিয়াম। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ভঙ্গকরণ সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের সমৃদ্ধি-করণ। তার জন্যে আবার চাই অনুরূপ প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবস্থাপনা। প্রসঙ্গত এটা বলা চলে পাকিস্তান দুয়েতেই বিগত দশক থেকে জোর চেষ্টা চালিয়েছে।

যেদিন থেকে ভারত পোখ্‌রানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সেই সমকালীন সময় থেকেই পাকিস্তানও উঠে পড়ে লেগে যায়। ভারতের পোখ্‌রান বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭৪ সালে। পাকিস্তানও যে পারমাণবিক প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে দৃঢ়সংকল্প তা পূর্ব থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ভুট্টো নিজেই বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে পাকিস্তানকে যদি ঘাস খেয়েও থাকতে হয় তবুও পারমাণবিক বোমা সে ফাটাবেই। অনেকে ইসলামিক বোমার কথা শুনে আতঙ্কও প্রকাশ করেছিলেন। ভুট্টো নিজেই সৌদি আরব এবং লিবিয়ার সংগে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন যাতে আর্থিক সাহায্যও পাওয়া যায়।

১৯৮০ সালের নভেম্বরে ইসলামিক বোমার সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রও সমর্থন করেছিল। পাকিস্তান যাতে করে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় তাতে মুসলিম দেশ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র এবং, কয়েকটি পশ্চিমী দেশও সায়ও দিয়ে থাকে। ইসরায়েল এবং দক্ষিণ আফরিকা ইতোমধ্যেই পারমাণবিক প্রযুক্তিতে যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র এতে খুশীই হয়েছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রও চায় পাকিস্তানও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হোক। পাকিস্তানও বলতে বাকি রাখছে না যে মুসলিম স্বার্থেই পারমাণবিক প্রযুক্তিতে তার উন্নত হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অবশ্য অন্য ধরনের। আফগানিস্থান এবং কাবুলে সোভিয়েত প্রভাব যাতে না বাড়ে যুক্তরাষ্ট্র তাই চায়। যুক্তরাষ্ট্রও তার পার্শিয়ান গাল্‌ফ ডিফেনস স্ট্র্যাটেজির অংশীদার হিসেবে নিউ-ক্লিয়ার পাকিস্তানকেই রাখতে চাইছে।

ফ্রানসের ভূমিকাও তুচ্ছ কিছু নয়। পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন লংঘন করেও ফ্রানস থেকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধি করণের প্রযুক্তিবিদ্যা সংগ্রহ করতে দ্বিধা করেনি। পাকিস্তান ইউরে-

যোগানের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এরাই হল প্রস্তুতি উপাদান। পাকিস্তান নাইগার থেকে ইউরে-নিয়াম অকসাইড সংগ্রহ করেছে। নাইগার লিবিয়া এবং পাকিস্তানে ইউরেনিয়াম অকসাইড খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। এর জন্যে চুক্তিও ভঙ্গ হল না কারণ নাইগার পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে সই করেনি। ফলে পাকিস্তানের পক্ষে মাল সংগ্রহ করতে খুব বেশি বাধাও পেতে হয়নি। কেবলমাত্র ফ্রানস থেকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্রযুক্তি-বিদ্যা সংগ্রহে পাকিস্তানকে পার-মাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি লংঘন করতে হয়েছে।

ইউরেনিয়াম সাধারণত তিন আকারেই বর্তমান আছে। এরা হল ইউরেনিয়াম ২৩৮, ইউরেনিয়াম ২৩৫ আর ইউরেনিয়াম ২৩৪। ইউরেনিয়াম ২৩৮ হল প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। এটি ফিশন্যাবল নয়। ইউরেনিয়াম ২৩৫ ফিশ-ন্যাবল। সুতরাং প্রাকৃতিক ইউরে-নিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম ২৩৫ পেতে হলে যে প্রযুক্তিবিদ্যার দরকার তার সংগ্রহ করাও একান্ত-ভাবে প্রয়োজন। এই প্রযুক্তি-বিদ্যার খরচও অফুরন্ত। শুধু ভারত কেন, অনেক দেশই যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে থাকে। সমৃদ্ধকরণের খরচটা বহন করার মত ক্ষমতা অনেক দেশেরই নেই। যুক্তরাষ্ট্র 'গ্যাসি-য়াস ডিফিউশন' পদ্ধতির অনু-করণে ইউরেনিয়ামকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পাকিস্তান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধি করণের যে প্রযুক্তিবিদ্যা সংগ্রহ করেছে সেটি হল সেন্ট্রিফিউগ্যাল পদ্ধতি। পাকিস্তান যে সেন্ট্রি-ফিউজ সিসটেমের ব্যবহার চালাবে তাতে কিছু না হলেও বছরে প্রায় ছটি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের জন্যে যতটা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের দরকার তার যোগান সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে। এই প্রযুক্তিবিদ্যা কাহো-তায় প্রয়োগ করা হয়েছে। অধি-কাংশগুলিই বৃটেন থেকে আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যন্ত্রপাতির জন্যে পাকিস্তান প্যারিস এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলছে। সুতরাং পাকিস্তান যদি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েও থাকে তবে আশ্চর্যের কিছুই

‘যদি ভাবতাম পালাব, দুনিয়ার কোন জেলে আমায় আটকে রাখতে পারত না’ – মালখান সিং

মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে দিব্যজ্যোতি বসু

একদা চম্বল-ত্রাস দুর্ধর্ষ ডাকাত মালখান সিং এখন গোয়ালিয়র জেলে বন্দী, আত্মসমর্পণের পর। কৈশোরের ভজন গায়ক মালখান কী করে বঞ্চনার শিকার হয়ে যৌবনে 'বাগি' হলেন, হাতে তুলে নিলেন আধুনিক অস্ত্র, ঘুরে বেড়ালেন বিহড়ের দুর্গম জংগলের খানাখন্দে দস্যু মালখান সিং হয়ে। সেই সব পুরনো স্মৃতির রোমন্থন করেছেন মালখান সিং গোয়ালিয়র জেলে পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটারের মুখোমুখি বসে।

এমন কিছু মানুষ আছে যাদের সংগে মিনিট দুয়েক আলাপ-সালাপ হওয়ার পরই মনে হতে থাকে এর সংগে যেন অনেকদিন আগেই কোথায় পরিচয় হয়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক আর অনাড়ম্বর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কেটে যায় অপরিচিতির জড়তা। চম্বলের 'রবিন হুড' মালখান সিংও ঠিক এইরকমই একজন মানুষ। গোয়ালিয়র সেনট্রাল জেলে মালখানের সংগে কথা বলে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। জেলের ভেতরে ফুলন দেবীর সংগে কথা বলার পর ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট মিঃ মাথুর যখন আমাদের মালখান সিং-এর সেলের সামনে নিয়ে গেলেন তখন বুঝতেই পারিনি এই লোকটা এ ওটা মিশুকে হবে। বরং মালখান ঘুমিয়ে থাকার দরুন মিঃ মাথুর ওকে জাগাবে ন জাগাবেনা ভেবে ইতস্তত করছিলেন দেখে ভেবেছিলাম, বোধহয় তিরিক্ষি মেজাজের লোক, তাই মাথুর সাহেব ঘুম ভাঙাতে ভয় পাচ্ছেন। আর মাথুরের গলার শব্দে মালখানের ঘুমন্ত মুখ যখন আস্তে আস্তে ভুরুতে ধনুক তুলে ভয়ংকর বিরক্তি নিয়ে আমাদের দিকে চোখ মেলে চাইল তখন তো রীতিমত ঘাবড়ে গেছিলাম। কারণ ঘড়িতে তখনও বেলা বারটা বাজতে কয়েক মিনিট দেরি থাকলেও এমন একজন লোকের অসময়ের ঘুম আমরা ভাঙালাম যার নাম শুনলে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ র জুন মাস পর্যন্ত গোটা চম্বল এলাকা ভয়ে কেঁপে উঠত। কিন্তু চোখ মেলে আমাদের দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন মালখান। মাথুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া হুয়া?' মাথুর খানিকটা সলজ্জ ভংগিতে জানালেন 'কুছ নেহি দদ্দা, ইয়ে লোগোনে কলকাত্তা সে আয়া, আপকে সাথ থোরা সা বাত চিত করনে কে লিয়ে' - ব্যাস, মুহূর্তের মধ্যে মালখানের চেহারা গেল পাল্টে। প্রশস্ত ডান হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আইয়ে, আইয়ে, অন্দর আজাইয়ে। আপকা শুভনাম কেয়া হ্যায়?' পারস্পরিক আলাপ-পরিচয়ের পর বিছানার ওপর বসা অবস্থাতেই দু হাতের চেটোর ওপর ভর দিয়ে তড়াক করে নিজের শরীরটাকে পেছনে সরিয়ে একেবারে দেওয়ালের এক কোণে টেনে নিয়ে গেলেন মালখান। এরপর কোঁচকানো বিছানার চাদর দুহাত দিয়ে পরিপাটি করে আমাদের আহ্বান জানালেন, 'ইধার আরামসে বৈঠিয়ে।' যে লোকটা ছ বছরের বাগি (বিদ্রোহী) জীবনে ৬০ জন লোকের প্রাণ নিয়েছে, ৩০ লক্ষেরও বেশি টাকা লুঠ করেছে, চম্বলের বিহড়ে বিহড়ে, ঘন জংগল-ভাঁর কুয়ায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটাতে কাটাতে একশরও বেশি ছোট-বড় অপরাধ করেছে, তার কাছ থেকে এ ধরনের সুগৃহিণীর মত আদর আপ্যায়ন পেয়ে ভীষণ অবাক লাগছিল। বিছানার ওপর উঠে বসে লজ্জিত স্বরে বললাম, 'আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বিরক্ত করলাম তো?' মালখান সংগে সংগে দুহাত জোড় করে বলে উঠলেন 'ছি, ছি, এভাবে বলবেন না, সারাদিন ধরেই তো শুয়ে থাকি, জেলের মধ্যে তো কোন কাজ নেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২-র ১৬ জুন অবধি ঘুম কাকে বলে জানিনি, তাই ওই সময়ের সব ঘুম এখন সুদে আসলে তুলে নিচ্ছি।' রসিকতাটক করতে পেরে মালখান

যেন আরও বেশি খুশি হয়ে উঠলেন, হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা এসেছেন, দুটো অন্যরকম কথা বলতে পারব, আমার খুব ভাল লাগছে। আপনারা ছবি তুলবেন না? ক্যামেরা আনেননি?' আমরা জবাব দেবার আগেই মাথুর মুখ খুলেছেন 'নেহি দদ্দা, ইস সময় তসবির খিঁচনেকে লিয়ে পারমিশন নেহি মিলা।'

মালখানের খানিকটা মেয়েলি গলার স্বর এবার তীক্ষ্ণ হয়েছে, 'কিঁউ, ও সমর্পণ কে বাত ছোড়ো, উনকি বাদ ভি তো প্রশাননে (প্রশান্ত পানজিয়ার) কন্টী বার ইধার আকর মেরে তসবির খিঁচ লে গয়া।' আমরা তখন বলেছি, 'আমাদের বলা হয়েছে, জেলের ভেতর ছবি তোলা বারণ, তাই ক্যামেরা জমা করে দিতে হয়েছে।' মিঃ মাথুর আবার পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টায় বলেছেন 'আরে, বাত তো সমঝো দদ্দা, আভি আভি ঘনস্যা (ঘনশ্যাম) ফারোর হো গয়া ইস লিয়ে প্রশাসন জ্যাদা সে জ্যাদা হোসিয়ার রহনা চাহতে হ্যায়।' এ কথায় মালখান আবার হেসে উঠেছে - 'ছবি তোলার সংগে ঘনশ্যামের ফারার হওয়ার কী সম্পর্ক আছে? সে তো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। মালখান সিং সেই জাতের লোক নয়। আমি যদি ইচ্ছে করতাম পালাবো, তাহলে দুনিয়ার কোন জেল আমায় বন্ধ করে রাখতে পারত না। কিন্তু 'গদ্দারি' (বিশ্বাসঘাতকতা) করা আমার আদতে নেই। একবার যখন মা দুর্গার নাম করে শাসনের সামনে সারেনডার করেছি তখন আর যাই হোক ভাগব না। আপনারা জানেন, আমি মনে করি মরদের ইজ্জত হল তার জবান। একবার মুখ থেকে যা বেরিয়েছে, তা ফিরিয়ে নেওয়ার মত বেইমানি আর হয় না। এই জেলের লোকেরা বহুবার আমার সংগে বেইমানি করেছে। কিন্তু আমি পালিয়ে যাইনি। বরং অনশন করেছি, দু-দুবার আমি পাঁচ ছদিন একফোঁটা জলও মুখে দিইনি। প্রশাসন বাধ্য হয়েছে আমার দাবি মেনে নিতে। কিন্তু একবার সারেনডার করে ভাগার কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনি।'

– 'তাহলে ঘনশ্যাম পালিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছে বলছেন?'

– 'জরুর। ইয়ে গদ্দারি করনা কা ক্যায়া জরুরত থা? তোমার বাপ-ভাইয়ের সংগে ইউ পি পুলিশ খারাপ ব্যবহার করছে, তুমি এম পি পুলিশকে বল ব্যবস্থা নিতে, তারপর যদি ওরা কোন ব্যবস্থা না করে তখন অনশন করে দেখ কী হয়, তা না করে ফোর্সেকে কী খবর পেল ঘনশ্যাম, সংগে সংগে ফারার হয়ে গেল, এ অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে।'

ছবি তোলা থেকে আলোচনা নিজেদের অজান্তেই অন্য দিকে মোড় নিয়েছে দেখে মালখান নিজেই আবার খেই ধরলেন: 'এদের উচিত ছিল ছবি তোলার পারমিশন দেওয়া। আপনারা যদি আর কিছুদিন আগে আসতেন তবে আমার সংগে জেলের বাইরেই দেখা হয়ে যেত। আমি প্যারোলে ছুটি নিয়ে প্রায় মাসখানেক বাড়িতে ছিলাম। জেলে ফিরে আসার তারিখ পেরিয়ে যাওয়ারও পাঁচ ছদিন পরে এসেছি। এবার আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিল।'

'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করাতে ক্রেপ টেবিকটের দামী কুর্তা তুলে, দুধে আলতা গায়ের রঙের খানিকটা অনাবৃত করে পেটের কাছে যে জায়গায় বাঁধা সেই জায়গাটা দেখালেন মালখান। দেখলাম ইঞ্চি তিনেক জায়গা তখনও নীল হয়ে রয়েছে। 'ডাক্তার দেখাননি?' – 'হাঁ, দেখিয়েছিলাম, দাওয়াই ভি দিয়েছে, ওই তো দেখুন না এখনও অনেক দাওয়াই তাকে রাখা আছে।'

দাওয়াই দেখতে দেখতে একবার পুরো সেলটার দিকেই নজর দিয়ে নিলাম। ১০ ফুট বাই ৮ ফুট মাপের আয়তাকার ঘরের কোথাও কোন জিনিস অগোছালো নেই, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখা। ঘরের বাঁদিকে অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে মেঝের ওপর মোটা তোষকের বিছানা পাতা। তোষকের ওপর খয়েরী আর ঘিয়ের স্ট্রাইপ দেওয়া একটা বেড-কভার পাতা। দুটো পাতলা পাতলা নরম বালিশ, বোম্বে ডাইং-এর পিলো কভার দেওয়া। বিছানার পায়ের দিকে ছোট্ট একটা শেলফ। তাতে আয়না, চিরুনি, ডেটল, দাড়ি কাটবার সরঞ্জাম; ছোট একটা কাঁচি, একটা ল্যাকমে পাউডারের কৌটো, আরও টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস। শেলফের ওপরে দেওয়ালের গায়ে আটকানো হ্যাঙারের সংগে ঝুলছে একটা জামা, দুটো প্যান্ট। ঘরের ডানদিকে মেঝে থেকে হাত খানেক ওপরে একটা প্ল্যাটফরম বানানো আছে। প্ল্যাটফরমের কোণার দিকে পাথরের দুর্গা মূর্তি আর একটা দুর্গার বাঁধানো ছবি। প্ল্যাটফরমের নিচে একটা ছোট্ট মাটির কলসী আর একটা ছোট হুইলার দেওয়া স্যুটকেস – না, ভি আই পি বা নাম করা কোমপানির নয়। ঘরের চারিদিকে আমায় চোখ বোলাতে দেখে মালখান বললেন, 'এই যে 'দুর্গা মাই'র তসবির দেখছেন এটা কলকাতা থেকে আনানো।' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে, কলকাতায় আপনার চেনা লোক আছে?' আমার আশ্চর্য হওয়া দেখে মালখান নিজেও আশ্চর্য হলেন। তারপর পাতলা গোলাপি ঠোঁট দুটোয় একটু মুচকি হাসি এনে বললেন, 'ভারতবর্ষের সব জায়গায় আমার চেনা লোক আছে। অবশ্য এই জানা-শোনা এই ছ বছরেই তৈরি হয়েছে। আমি বাগি থাকার সময় দিল্লি, বোম্বে, গুজরাট সব জায়গায় গেছি। কলকাতায় যাওয়া হয়নি। তবে কলকাতা থেকে বন্দুক এনে দিত একজন আদমি। ওর নাম ঠিকানা আমার কাছে আছে। লেকিন আমি আপনাদের কাছে তা প্রকাশ করব না। কলকাতাতেই সবচেয়ে সস্তায় বন্দুক পাওয়া যায়। একটা ৩০৩ বোরের বন্দুক মাত্র ৮000 টাকায় কলকাতা থেকে কিনেছি, আর সেই একই বন্দুক কানপুরে বিক্রি হয় ১0,000 টাকায়। অন্য জায়গায় আরও অনেক বেশি দাম।' বন্দুক আর অস্ত্র শস্ত্রের প্রসংগ এসে পড়ায় অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্নটা করব ভাবছিলাম সেটা করে ফেললাম 'আপনারা অস্ত্র শস্ত্র বা বোমা বন্দুক কোথা থেকে পেতেন? সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি কী ব্যবহার করেছেন?' মিশুকে মালখান কিন্তু এবার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বদলে খানিকটা গম্ভীর হলেন, পরক্ষণেই আবার মিচকি হাসি হেসে জবাব দিলেন, 'আপনার পরের প্রশ্নটার জবাব দিতে পারি, প্রথমটার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ আমি তো আগেই বলেছি আমার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা কখনও হবে না।' আমি বললাম, 'বেশ, পরের প্রশ্নের জবাবটাই আগে দিন'। মালখান কিন্তু কথার মার প্যাঁচটা ঠিক ধরে ফেললেন। হাসিমুখেই জবাব দিলেন 'আগে পরে না, ওই একটার উত্তরই আপনি পাবেন। আমার কাছে সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্র বলতে যা ছিল তা হল এস এল আর বা সেলফ লোডিং রাইফেল। মাউজার তো অনেক আগে থেকেই ব্যবহার করেছি।' এস এল আর এমনিতে পাওয়া মুশকিল, কেননা জেনারেল পারপাসে ব্যবহার করার জন্য কোন এস এল আরই ইস্যু করা হয় না। সামরিক প্রয়োজন আর প্রশাসনিক কাজকর্মের বিস্তৃতা দমনে এই বিশেষ রাইফেল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে কি চম্বলের ডাকাতদের সংগে সরকারি মহলের সরাসরি কোন যোগসাজশ আছে যার ফলে এস এল আরের মত দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র অত্যন্ত সুলভেই তারা ব্যবহার করতে পারে? এই ধরনের জিজ্ঞাসার উত্তরেও কিন্তু মালখান কোন জবাব দেননি, শুধু হেসেই গেছেন। হাসতে হাসতে ডান হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে রেখে বলেছেন, 'আরে ইয়ার, ছোড়ো ইয়ে সব বাত, ও জমানা তো খতম হো গয়া। অব ক্যেয়া ফয়দা ও সব বাত করনেসে।' বাধ্য হয়ে অন্য 'বাতে' যেতে হয়েছে। প্রশ্ন করেছি, 'বেশ তা হলে তুমি 'বাগি' কেন বনলে সেই কথাই বল।' এবার দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে জমপেশ করে বসেছে মালখান। মুখ খুলতে বেরিয়ে এসেছে পুরনো দিনের স্মৃতি ....

.... মালখানের সংগে আইনের প্রথম টক্কর হয় ১৯৭১ সালে। তখন মালখান মাত্র ১৯ বছরের দুঃসাহসী যুবক। ওকে বে-আইনী অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগে দু বছরের জন্য ভিন্দ জেলে পাঠান হল। এর আগে মালখান গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে ভজন গেয়ে বেড়াত। মিষ্টি সুরেলা গলার জন্য সবাই ওকে খুব ভালবাসত। তবে পুলিশের চোখে ছোটবেলা থেকেই মালখান সন্দেহভাজন ছিল। কেননা, বিলাও গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত গিরধোলিয়া, কানহাই, নাথুরাম প্রত্যেকেরই খুব কাছের লোক ছিল মালখান। এরা প্রায়ই মালখানকে বিহড়ে নিয়ে যেত, ওদের গান শোনানোর জন্য। সে খবর পুলিশের কানে গিয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে পুলিশ ওকে গ্রেফতার করতে পারছিল না। একদিকে পুলিশ অন্যদিকে গ্রামের সরপঞ্চ কৈলাশ পণ্ডিতও মালখানকে স্বস্তি দিত না। প্রায়ই নানাভাবে উৎপীড়ন করত। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভজন গায়ক মালখান বিলাও গ্রামের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল। এই রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই মালখান আর কৈলাশের বিরোধ চরমে ওঠে। ১৯৭০ সালে কৈলাশের দলের লোকেরা মালখানের এক আত্মীয়াকে ইলোপ করে নিয়ে যায়। প্রতিবাদে মালখানের বন্দুক গর্জে ওঠে, কিন্তু কৈলাশ বেঁচে যায়। এরপর বারে-বারেই কৈলাশ আর মালখানের দ্বন্দ্ব গুলি-গোলার সাহায্যে বিরাটাকার ধারণ করেছে। বারবার দুজনেই চেয়েছে দুজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু দুজনেই বেঁচে গেছে কোন না কোন ভাবে। এর মধ্যে মালখানকে আরও কয়েকবার জেল থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে। এর পর ১৯৭৬-এ যে মাসে এক সকালে বিলাও গ্রামের ভজন গায়ক মালখান ঘুম ভেঙে জানতে পারল যে গ্রামের দুর্গা মন্দির ও তার সংলগ্ন ১৬ বিঘা জমি কৈলাশ অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছে। শুধু

তাই নয়, মন্দির আর জমি কুক্ষিগত করার পর সবপক্ষ কৈলাশ পণ্ডিত ফরমান জারি করেছে : কোন ছোট জাতের লোককে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মালখানরা ছিল জাতে মিরধা ফলে আঘাতটা ওদের ওপরই এসে পড়ল। রাগে অন্ধ হয়ে মালখান ছুটল কৈলাশের খোঁজে। কৈলাশ তখন বাড়ির দাওয়ায় বসে। সটান বাড়ির ভেতরে হাজির হয়ে গুলি চালিয়ে দিল মালখান। মরল কি না মরল দেখার সময় নেই, আর ঘরেও ফেরার উপায় নেই। অগত্যা শুরু হয়ে গেল ওর বিহড়ের জীবন। এর কিছুদিন পরেই ১৯৭৬ এর ১৭ আগস্ট ভিন্দ পুলিশের একটা নতুন ফাইল বাড়ল : মালখান সিং, মিরধা, পিতার নাম মতিরাম মিরধা, গ্রাম বিলাও, থানা উমরি, জিলা ভিন্দ। যে জ্যান্ত অথবা মৃত ধরে এনে দিতে পারবে ১000 টাকা নগদ পুরস্কার পাবে। এই ১000 টাকা অবশ্য পরে ৭0.000 টাকায় উঠে এসেছিল।

এই হল মালখানের বাগি হবার ইতিহাস। মালখানের মুখে ওর নিজের কথা শুনতে শুনতে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম মালখান বর্ণিত ১৯ বছরের ভজন গায়কের সংগে আমার সামনে বসা ৩0 বছরের মালখানকে। ছ ফুটের ওপর দীর্ঘ একহারা চেহারার মালখানের মুখের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে বিশাল একজোড়া গোঁফ, সেই সংগে গালপাট্টা। ব্যাক ব্রাশ করা চুল ঘাড় অবধি নেমে গেছে। ক্রিম রঙের দামী কুর্তা আর ঢলঢলে প্যান্টে শারীরিক আকৃতির অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। গলায় দামী পাথরের মালা। হাতে দামী রত্ন। মণিবন্ধে যথেষ্ট দামী ঘড়ি। দীর্ঘ ছ বছরের বিহড় জীবন মালখানের চেহারায় যথেষ্ট ভাঙচুর এনেছে। এক নজর তাকালেই তা বোঝা যায়। পুরনো কথা বলতে বলতে মালখান খানিকটা মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন আর ভজন গান করেন না?' মালখানের গলার আওয়াজই যেন সুর হয়ে বেরিয়ে এল, 'দিন রাত গাই, ভজন ছাড়া মানুষ বাঁচে না কি?' আমাদের গান শোনাবার অনুরোধ করাতে মালখান বললেন, 'জরুর শোনাব, আমাকে এখন আর কেউ, গান শোনাবার কথা বলে না। আমিই মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান ধরি, ভিড় জমে যায়।' যখন চম্বলের বিহড় আর জংগলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন মালখান তখনও কি ও এরকম গান গাইতেন? প্রশ্ন শুনে মালখান বলেছে 'গাইতাম, তবে সেরকম প্রাণ খুলে গান গাওয়া হত না। বাইরে থেকে বিহড়ের জীবন সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না। আমরা যেখানে সেখানে শুয়ে থাকতাম, বহুদিন গেছে কিছু পেটে পড়েনি। আমার বেশ মনে আছে রতনগড় কী মাইর মন্দিরের কাছে আমরা তখন লুকিয়ে আছি। সারা দিন পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের সময় একটা আস্তানায় এসে খাবারদাবারের জোগাড় করছি। এমন সময় খবর এল পুলিশ আসছে। উনুনের ওপর খাবার ফেলে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তারপর টানা তিনদিন পায়ে হেঁটে শিবপুরী জেলার অন্য এক জায়গায় চলে গেছিলাম। এরকম আরও বেশ কয়েকবারই হয়েছে। তাই চিন্তা ভাবনা থাকায় প্রাণখুলে গান গাওয়া অনেকদিন হয়নি। বর্ষাকালে ৪ ৪ মিটার বর্ষাতি দিয়ে তাঁবুর মত বানিয়ে নিতাম। হঠাৎ খবর এল পুলিশ আসছে, ব্যাস, তাঁবু পড়ে রইল, দে চম্পট অন্য জায়গায়।' বিহড়ের জীবন যখন এত কণ্টকাকীর্ণ তখন মালখানের মত ভুক্তভোগীদের কি উচিত না নতুন নতুন ডাকাত হওয়া থেকে চম্বলবাসীদের বিরত করা? মালখানের উত্তর 'হ্যাঁ। আমি চাই ডাকু সমস্যার শেষ হয়ে যাক। তবে আমি বললেই তো আর শেষ হবে না। এর জন্য চাই সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন।' মালখান কি নিজে কখনও বর্তমানের ফারার ডাকাতদের সমঝানোর জন্য আবার বিহড় গিয়েছিলেন? হ্যাঁ গিয়েছিলেন বার দুই, তবে কবে, কোথায় গিয়েছিলেন তা বিশদ জানাতে মালখানের ভীষণ আপত্তি। উনি বলেছেন, 'আমি তো আগেই বলেছি, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। আমি যদি বলি কবে কোথায় গিয়েছি তবে শাসনের (প্রশাসন) সংগে গদ্দারি করা হবে। আমি এসব কথা প্রকাশ করতে নারাজ।' 'বর্তমানে পুলিশ যাকে নিয়ে বিষম বিব্রত সেই রমেশ সিকারওয়ালকে কি পুলিশ ধরতে পারবে?' মালখানের কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মালখান এবারও এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু কী ভেবে আবার বললেন, 'রমেশ সিকারওয়ালকে এখন ধরা মুশকিল আছে। ও নিজে থেকেও ধরা দেবে না। অন্যসময় যদিও সারেনডার করার কথা মাথায় আসত, কিন্তু এখন আর তা হবে না। কেননা ঘনস্যা পালিয়েছে দেখে ও ভাববে জেলে নিশ্চয়ই খারাপ ব্যবহার করছিল, তাই ঘনশ্যাম পালিয়েছে। আমিও তা হলে আর সারেনডার করব না। আর ঘনশ্যাম যদি ওর সংগে গিয়ে যোগ দেয় তা হলে তো সোনায় সোহাগা।'

এইবার মিঃ মাথুর আমাদের তাড়া দিলেন, 'আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমার অন্য কাজ আছে।' আমরা কিছু বলার আগেই মালখান বললেন, 'আপনি আপনার কাজে যান না, আমরা কথা বলছি।' মাথুর তাড়াতাড়ি মালখানকে বুঝিয়েছেন, 'নেহি দদ্দা, এয়সা বাত নেহী, হামারা উপর পারমিশন হ্যায় ইন লোগোকো দেখভাল করনেকে লিয়ে, ইসে ছোড় কর ম্যায় যা নেহী সকতা।' মালখানকে আমরাও এবার বোঝালাম যে উনি যখন চাইছেন তখন আমরা না হয় উঠি, তবে একটা প্রশ্ন রয়েছে 'আপনাকে 'রবিন হুড' বলা হত কেন?' রবিন হুডের গল্প মালখানের জানা ছিল না তাই উত্তর দিতে পারলেন না। একটু অপ্রস্তুত হাসলেন। মিঃ মাথুর বললেন, 'Actually he used to rob the rich & help the poor. That earned him the reputation of a modern day 'Robin Hood'. Besides, he had a great esteem for women'. আমাদের পরস্পরের এই কথাবার্তায় মালখান মূক দর্শক হয়েই রয়েছেন, কোন কথা বলেননি। শুধু উঠে আসছি যখন তখন বলেছেন 'আপনারা আর কয়েকদিন আগে এলে জেলের বাইরে বসে অনেক কথা বলতে পারতাম। ইয়ে লোগ 'হারামী' হ্যায়, সিরফ কানুনকে বকওয়াশ করতে হ্যায়। আমার বন্ধু ছিল কল্যাণ মুখারজি আর প্রশান্ত পানজিয়ার। ওদের সংগে তো আমি প্রাণ খুলে কথা বলতাম কেউ কিছু বলত না। এখন আবার বেশি কড়াকড়ি।' ক্ষুব্ধ মালখান এবার মরিয়া হয়ে বলেছেন, 'এক কাম কিজিয়ে, কাল আমি ভিন্দে যাব কোর্টে হাজির হতে, আপনারাও আমার সংগে চলুন। অনেক কথা হবে।'

পরের দিন মালখানের সংগে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সকাল বেলায় হাজির হয়েছিলাম সেনট্রাল জেলে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ সেদিন মালখানকে ভিন্দ নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন। অগত্যা ফিরে আসার আগে মালখানের সংগে আর একবার দেখা করতে গেলাম। সংগে এবার মিঃ মাথুর নেই। বদলে একজন প্রহরী। মালখান আমাদের দেখে এগিয়ে এসে সেলের ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে আমাদের হাত ধরেছেন। সারা মুখ বিরক্তিতে ভরপুর। গলায় অভিযোগ, 'ইয়ে লোগ ইসবার বহুত খারাব কাম কিয়া, হাম ভি দেখ লুংগা।' আমরা মালখানকে বুঝিয়েছি, 'রাগ করে কোন লাভ নেই। আবার দেখা হবে।' মালখান তখন আমাদের ঠিকানা জানতে চেয়েছে। প্যাডের কাগজে ঠিকানা লিখে ওর হাতে তুলে দেওয়ার সময় মালখান আবার সজোরে হাত চেপে ধরেছেন। মুখে বলেছেন 'এবার প্যারোলে ছুটি পেলে কলকাতা যাব। জরুর মিলনা।'

মালখানের সংগে দেখা করে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবছিলাম এই সরল মনের মানুষটিই ছিল কিনা সমাজবিরোধী? কেমন যেন ভাবতে খারাপ লাগে। আর আত্মসমর্পণের সময় ফটোগ্রাফার প্রশান্ত পানজিয়ার বন্দী মালখানের ছবি তুলতে অস্বীকার করেছিল কেন সে কথাও মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলাম। মালখানের আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে সাংবাদিক কল্যাণ মুখারজি আর প্রশান্ত পানজিয়ার বেশ কয়েকদিন মালখানের সংগে একসংগে ছিলেন। স্বভাবতই মালখানের সংগে বন্ধুত্ব যথেষ্ট গাঢ় হয়ে উঠেছিল। এরপর মালখানকে ১৯৮-র ১৭ জুন সন্ধ্যেবেলায় যখন গোয়ালিয়র জেলে নিয়ে আসা হল, তখন সমস্ত প্রেস ফটোগ্রাফাররা ওই বিশেষ মুহূর্তের ছবি তোলার জন্য তৎপর হলেও প্রশান্ত তার ক্যামেরা নামিয়ে রেখে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওর কথা ছিল, 'গারদের মধ্যে মালখান আর বাইরে দাঁড়িয়ে আমি ছবি তুলছি, এ হতে পারে না। অসম্ভব, আমি পারব না ...' একেই বলে বোধহয় বন্ধুত্ব। বাস্তবিকই মালখানের মত লোকের সংগে কয়েক মিনিট কাটানোর পরও তার সংগে বন্ধুত্ব হবে না, এরকম লোক পাওয়া বোধ হয় একান্তই অসম্ভব। □

আলোকচিত্র : গোয়ালিয়র পুলিশ দপ্তরের সৌজন্যে

কোমরের বেদনা

এস. সি. দে, ফিজিওথেরাপিসট

কোমরের বেদনা রোগীকে শয্যাশায়ী করে তোলে। অনেকে দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প কোমরের বেদনায় কষ্ট পান। আবার কারও হঠাৎ করে বেদনা শুরু হয়। বিপদ ঘটে দেহকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ভারি ওজন তোলবার সময়।

দেহের শিরদাঁড়ার নিচের অংশটি হল কোমর। মেরুদণ্ডটি প্রধানত (১) সারভাইকেল, (২) ডরসাল, (৩) লামবার, (৪) সেকরাম ও (৫) ককস—এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিপদ ঘটে লামবার ও সেকরামের সংযোগস্থলে (লামবো-সেকরাল জয়েনট)। কোমর বলতে সাধারণত এই অঞ্চলটিকেই বোঝায়।

শিরদাঁড়াব গঠন অনেকটা শিক কাবারের মত। একটি শিকের মধ্যে কতকগুলি মাংস টুকরো পরস্পর রেখে দেওয়া হয়। তেমনিভাবে আমাদেব দেহের মেরুদণ্ডটি অনেকগুলি ভারটিব্রা একটি মেরুরজ্জুর উপর সাজান থাকে। ভারটিব্রাগুলির মাঝখানে ছিদ্র আছে এবং ঐ ছিদ্রপথে সুষুম্না শীর্ষটি নিহিত। ভারটিব্রাব ডিসকের মধ্যে এক প্রকার নরম জেলির ন্যায় পদার্থ থাকে। এটা বাইরের আঘাত থেকে মেরুরজ্জুকে রক্ষা কবে, অনেকটা শক-আ্যাবজরবারের মতন কাজ দেয়। ভারটিব্রাগুলি পরস্পর পেশীবন্ধনী বা লিগামেনট দ্বারা আটকান থাকে। এই পেশীবন্ধনীকে আরও শক্তিশালী করে মাংসপেশী। শিরদাঁড়ার প্রতিটি ভারটিব্রার সংযোগ সৃষ্টিকারী স্থানকে বলা হয় সাইনোভিয়াল জয়েনট। সুষুম্নাশীর্ষ থেকে বহির্গত কতকগুলি স্নায়ু দেহের নিতম্ব থেকে গোড়ালি কিংবা পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাকে লামবার প্লেকসাস বলা হয়। এই প্লেকসাস থেকে সাইটিক নারভের উৎপত্তি। দেহের মধ্যে সাইটিক নারভের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। এই নারভের উপর ভারটিব্রার চাপ বা অসটিও-আরথারাইটিসের দরুন অস্থিবৃধিতে সাইটিক নারভটি ফুলে ওঠে ও ব্যথা হয়। একে সাইটিকা বা সাইটিকের ব্যথা বলা হয়। কোমরের ব্যথায় সাইটিক নারভের ব্যথার প্রভাব অনেকখানি। কোন কারণে ভারি ওজন তুলতে বা অত্যধিক পরিশ্রমে কোমবে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। তা 'লামবাগো' নামে পরিচিত। কোমরে ভারটিব্রার উপর প্রতিনিয়ত চাপাধিক্যের ফলে অস্থির অবক্ষয় (ডিজেনারেটিভ চেনজ) শুরু হয়। একস-রেতে এই স্থানের অস্থির পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থাকে লামবার স্পনডাইলোসিস বলা হয়।

নিতম্বের কশেরুকা (লামবার ভারটিব্রা) যদি জীবাণু ঘটিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে এ স্থানে ব্যথা প্রকট হয়। প্রাথমিক সাধারণ চিকিৎসার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে তেমন উপশম হয় না। ক্ষয়রোগ, ক্যারিস স্পাইন ইত্যাদি জীবাণু ঘটিত রোগের প্রভাব। পেশীবন্ধনী বা পেশীতন্তু হঠাৎ টান লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। আবার অনেক সময় কোমরের অস্থির স্থানচ্যুতি হলে মধ্যস্থান থেকে নরম জেলির মত পদার্থ নিউক্লিয়াস পালপস বের হয়ে এলে রোগীর অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। ব্যথা কোমর থেকে শুরু করে সারা পায়ে ছড়িয়ে পড়ে। রোগের এই প্রকার অবস্থাকে বলা হয় প্রলেপস অব ইনটার ভারটিব্রেল ডিসক (পি আই ডি)।

জন্মগত অংগবৈকল্য, এনকোলাইসিস স্পনডাইলাইটিস, রিম্যাটয়েড আরথারাইটিস থেকে কোমরে যন্ত্রণার উদ্ভব হয়। দীর্ঘদিন ধরে যদি কোন রোগী এই সকল রোগে ভোগেন তা হলে শিরদাঁড়ার গঠন প্রকৃতির প্রভূত পরিবর্তন হয়। এতে শিরদাঁড়া দেহের সম্মুখে বা পশ্চাদদিকে বেঁকে যায়। আবার কখনও বা শিরদাঁড়াটি পাশাপাশি দিক থেকে সর্পাকার রূপ নেয়। শিরদাঁড়ার এই সকল বিকৃতি যথা, কাইফোসিস, লরডোসিস বা স্কোলিওসিস অন্যতম। এতে অংগের স্বাভাবিক সঞ্চালন ক্ষমতা হ্রাস, রক্তবহন, পুষ্টি ও পেশীতন্তুর দুর্বলতা দেখা যায়।

যে সকল সম্ভাব্য কারণ কোমরে ব্যথায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি :

(১) অত্যধিক কায়িক শ্রম, (২) দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে কাজ করার অভ্যাস, (৩) জন্মগত অংগবৈকল্য, (৪) দেহভঙ্গির বিকৃতি, (৫) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, (৬) অধিক কামসম্ভোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, (৭) স্প্রিং কিংবা স্পঞ্জের নরম বিছানায় শোয়া, (৮) যানবাহনে অধিক যাতায়াত, (৯) ক্ষয় রোগ, রিম্যাটয়েড আরথারাইটিস, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, এনকোলোসিস স্পনডাইলাইটিস অথবা দীর্ঘদিন একইভাবে বিছানায় পড়ে থাকা এবং (১০) দৈহিক ওজন বৃধি, সারাদিন বসে শুয়ে সময় কাটান এবং নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন না করা।

কোমরের ব্যথায় নিচের লক্ষণগুলি রোগীর দেহে সমধিক প্রকাশ পায় :

(১) সাইটিক নারভের ব্যথা, ঝিঁ ঝিঁ লাগা অথবা পায়ে অসাড়তা অনুভব। দিনের বেলায় কম এবং রাত্রে ব্যথার তীব্রতা বৃধি (২) দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা বা দীর্ঘ পথ হাঁটলে কোমর থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা শুরু হয় (৩) লামবার–৫ এবং সেকসাম ১ সংযোগস্থলে অথবা সাইটিক নারভের বের হবার পথ, পায়েব হাঁটু এবং পায়ের পাতাব মাঝামাঝি স্থানে (গ্যাসটোকনিমি সলিয়াস) চাপ দিলে সূচ ফোটানর মত ব্যথা হয় (৪) চিত হয়ে শুয়ে পা সোজা উপরে তুলতে পারা যায় না, সামান্য নড়া চড়াতে ব্যথা হয় (৫) কোমর ও পায়ের পেশীর দুর্বলতা (৬) কোমব ভারবোধ, টানধরা, শুয়ে পাশ ফিরতেও রোগীকে বেগ পেতে হয় (৭) দেহকে সামনের দিকে বাঁকাতে ব্যথা অনুভব হয় (৮) হাঁচি, কাসিতে রোগী অসহ্য বেদনা বোধ করে ইত্যাদি।

রোগেব প্রকট অবস্থায় রোগীকে শয্যায় শুইয়ে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করান প্রয়োজন। এইরূপ অবস্থায় কয়েক সপ্তাহ কোমরে ট্রাকশন ও ব্যথা কমাবার প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কোমরে আঘাত লাগলে অস্থি-শল্যচিকিৎসক দ্বারা রোগের গুরুত্ব মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ট্রাকশন নেওয়া, বিশ্রাম এবং লামবো-সেকসাম 'বেলট' বা কোমর বেষ্টনী 'ব্রেস' ব্যবহার করতে হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া রোগীর হাঁটা বা বসা পর্যন্ত উচিত নয়। ব্যথার তীব্রতা খানিকটা হ্রাস পেলে ফিজিওথেরাপি শুরু করা অপরিহার্য। অনেকে ফিজিওথেরাপি বলতে ব্যায়াম, মর্দন, যোগাসন ইত্যাদি বুঝে থাকেন। কিন্তু ফিজিওথেরাপি শুধু তা নয়।

কোমরের ব্যথাতে ফিজিওথেরাপিসটের নির্দেশানুসারে পিঠ ও কোমরের ব্যায়াম এবং সেই সংগে পেটের ব্যায়াম করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগের অবস্থা মোটামুটি দেখে শুনে ফিজিওথেরাপিসট বা চিকিৎসকের মতামত নিয়ে সকল প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশে রোগীর কোন প্রকার ব্যায়াম বা আসন করা উচিত নয়। অধিক ব্যথাতে ব্যায়ামের সময় ও সংখ্যা কম করতে হয়। এ অবস্থায় ব্যায়াম কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করে রাখতে হয়। ব্যথা কম হলে পুনরায় তা অভ্যাস করতে হয়।

ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় ইলেকট্রোথেরাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। মেরুদণ্ডের বন্ধনী ও গভীর পেশীতন্তুতে পুষ্টি ও রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তুলতে ইলেকট্রোথেরাপির অন্তর্ভুক্ত 'শরটওয়েভ ডায়াথার্মি' অপরিহার্য। আবার বাহ্যিক পেশীতন্তু, নড়ুল ও পেশীকাঠিন্য রোধে, রক্ত সঞ্চালনে সর্বাধুনিক 'আলট্রা সাউনড থেরাপি' সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর কোন অংশে, কখন, কীভাবে তার প্রয়োগ হবে তা অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিসটগণই বলতে পাবেন।

দুর্বল মাংসপেশী ও স্নায়ুর শক্তি বৃধি করতে গ্যালভেনিক ও ফারাডিক নামক দুই প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়। পোলিও, প্যারালিসিস ও ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুর কার্যকর ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে এর জুড়ি নেই। অনেক সময় স্পনডাইলোসিসে কোমরের ব্যথায় পা ও শ্রোণিচক্রের পেশীশক্তি ফিরিয়ে আনতে এটা অপরিহার্য। অল্প ব্যথা ও পেশী কাঠিন্যে ম্যাসাজ ক্রিম, ইনফ্রা রে বা হট ব্যাগ ঘরে বসে নেওয়া চলে। কোমরেব ব্যথায় পেলভিক ট্রাকশন গ্রহণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রোগের অবস্থানুসারে ট্রাকশনের সময়, ওজন ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়। কোমর ও নিতম্বের সংযোগস্থলে পারস্পরিক দূরত্বহ্রাস, অস্থিচ্যুতি, অস্থির অবক্ষয় বা পি আই ডি হলে ট্রাকশন দেওয়া হয়।

ইলেকট্রোথেরাপি, ট্রাকশন ও পিঠের ব্যায়াম ব্যথা কমাবার ওষুধ গ্রহণে কোন উপকার না পাওয়া গেলে কিংবা ব্যথা ক্রমান্বয়ে বৃধি পেলে সত্বর অস্থি-শল্যবিশারদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অস্থিশল্যবিদ প্রয়োজনে তা করে থাকেন। অস্ত্রোপচার করার পরেও ফিজিওথেরাপি করান দরকার হয়। ব্যথা কমে গেলে অন্তত কয়েক সপ্তাহ রোগীকে সতর্কভাবে হাঁটাচলা, ওঠাবসা ও শুতে হয়।

বেলট, ব্রেস কিংবা ট্রাকশন দেওয়াও প্রায় ক্ষেত্রে চালু রাখা হয়। মূলত অস্থি-শল্যবিদ ও ফিজিওথেরাপিসটের নির্দেশ মেনে চললে রোগের পুনরাক্রমণ, অংগবৈকল্য, কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়। ☐

জানতে চাই জানাতে চাই

প্রশ্ন : সম্প্রতি কাগজে দেখলাম Board of Secondary Education, (Correspondence Course) Bhupal 462011 ইন্টারমিডিয়েট কোরসে ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এই বোরড কি স্বীকৃত?

এ ছাড়া USA-তে গিয়ে ডাক্তারি পড়বার জন্য কোথায় যোগাযোগ করব দয়া করে জানাবেন।

জানতে চেয়েছেন বিডন স্ট্রিট, কলকাতা থেকে রাধামাধব বসাক।

উত্তর : আপনার প্রথম প্রশ্নে ঠিক বোঝা গেল না আপনি কোন বোরডের স্বীকৃতির কথা বলেছেন। তথাপি আপনাকে জানাই, Board of Secondary Education Bhupal, আমাদের রাজ্যের স্কুল বোরড কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু আপনি যে correspondence course-এর কথা লিখেছেন ত আমাদের Board কর্তৃক স্বীকৃত নয়।

USA-তে গিয়ে ডাক্তারি পড়বার বিস্তারিত নিয়ম কানুনের জন্য আপনি United States Educational Foundation in India, 8 Short Street Calcutta-700 017 ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে এ বছর থেকে স্কুল ছেড়ে বাড়িতে পড়াশুনা করছে এবং স্কুলে নাম কাটান হয়েছে। এমতাবস্থায় বছর দুই পরে যদি ঐ ছাত্র প্রাইভেটে মাধ্যমিক দিতে চায় তবে কি দিতে পারবে? এ বিষয়ে কী কী নিয়ম আছে জানাবেন।

প্রশ্নটি বেলাপাড়া, বাঁকুড়া থেকে সুদর্শন নন্দীর।

উত্তর : হ্যাঁ, প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে স্কুল আছে যেগুলির মাধ্যমে প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব। ঐ নির্দিষ্ট স্কুলে ১২ টাকা সহ আবেদন করতে হবে সংগে অবশ্যই বয়স প্রমাণের জন্য স্কুলের সারটিফিকেট অথবা কোরটের এফিডেভিট-এর নকল এবং একটা পাসপোরট সাইজ ফটোগ্রাফ দরকার। সর্বমোট ৭১ টাকা লাগে। ফেবরুয়ারি মারচ মাসে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগতভাবে West Bengal Board of Secondary Education, 77/2 Park Street, Cal 16-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : কলকাতা বা তৎসংলগ্ন এলাকায় কোথায় কোথায় সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়? এ ব্যাপারে কোথায় খোঁজ খবর নেওয়া উচিত?

জানতে চেয়েছেন দারজিলিং থেকে কাঞ্চন ভদ্র।

উত্তর : রাজ্য পর্যায়ে West Bengal Cyclist Assosiation নামে একটি সংস্থা রয়েছে। এখানে বছরে একবার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রোড রেস এবং টাইম ট্রায়াল দুটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা হয়। সাধারণত ডিসেমবর জানুয়ারি মাসে। নির্ধারিত মানে পৌঁছুলে যে কেউ অংশ নিতে পারেন। এখান থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য নাম সুপারিশ করা হয়। কলকাতা ছাড়া আঞ্চলিকভাবে চন্দন নগর, মেদিনীপুর ও চিত্তরঞ্জনেও প্রতিযোগিতা হয়। আপনি বিস্তারিত বিবরণের জন্য West Bengal Cyclist Assosiasion-এর বর্তমান অফিস বসাক জিমনাসিয়াম, ২১ নং শাখারীটোলা স্ট্রিট কলকাতা ১৪ যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন : কলকাতায় Baby Show কোথায় কখন হয়, সবাই কি তাদের বাচ্চাদের নিয়ে যেতে পারে? কত বছরের বাচ্চা পর্যন্ত এই Baby Show হয়। কোথায় কীভাবে যোগাযোগ করব? স্বাস্থ্য ছাড়া বাচ্চাদের বুদ্ধিবৃত্তিরও কি পরীক্ষা হয়?

প্রশ্ন করেছেন লেকটাউন কলকাতা থেকে সুতপা সরকার।

উত্তর : কলকাতায় Baby Show অনুষ্ঠিত হয় গভরনর হাউসে। উদ্যোক্তা, ইনডিয়ান রেড ক্রশের পশ্চিমবংগ শাখা। মোটামুটি দুভাগে প্রতিযোগিতা হয়। একটি পেয়িং অন্যটি ননপেয়িং। যেসব পিতামাতা ৫ টাকা প্রবেশ ফি দিতে পারেন না তাঁদের জন্য নন পেয়িং ব্যবস্থা। প্রতি বিভাগে তিনটি গ্রুপ। প্রথম গ্রুপ বাচ্চার বয়স ৬ মাস থেকে ১ বছর, দ্বিতীয় গ্রুপ বাচ্চার বয়স ১ বছর থেকে ২ বছর এবং তৃতীয় গ্রুপের বাচ্চাদের বয়স ২ বছর থেকে ৩ বছর। প্রতি গ্রুপে আবার প্রথম তিন জনের জন্য তিনটি পুরস্কার। প্রতিবছর ফেবরুয়ারি মাস নাগাদ কলকাতায় সমস্ত প্রধান দৈনিকগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিলে প্রথমে বাচ্চাদের একটি Medical Board-এ উপস্থিত করতে হবে। সেখানকার পরীক্ষার পরে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। ঐ বয়ঃসীমার মধ্যে সব বাচ্চাই যোগ দিতে পারে। কেবল স্বাস্থ্য নয়, বাচ্চাদের বুদ্ধিবৃত্তিসহ সামগ্রিক বিচার করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য জনসংযোগ আধিকারিক, ইনডিয়ান রেড ক্রস, (পশ্চিমবংগ শাখা) গভরনর হাউস, ওয়েসট কলকাতা ১, ফোন ২৩-৩৬৩৬-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

উত্তর দিয়েছেন : সোমনাথ মিত্র

একটা ব্যক্তিগত মর্মস্পর্শী সমস্যার জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থী। (হয়তো আরও অনেকের এই সমস্যা থাকতে পারে)। ১৯৬৭ সালে আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু হয়। ১৯৭১ সালে আমার একটি কন্যা হয়; কিন্তু নারসিং হোমের অবহেলায় ও ত্রুটির জন্য বাচ্চাটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। এরপর দ্বিতীয় সন্তানটির সময়ে স্ত্রীকে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দ্বিতীয় সন্তানটিও জন্মের ৩/৪ দিন বাদে মারা যায়; শুধু তাই নয় আমার স্ত্রীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মানসিক দিক দিয়ে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

তাই আমার প্রশ্ন—আমাদের দেশে অবাঞ্ছিত শিশুকে কি আমাদের দেশের মানুষ 'দত্তক' নিতে পাবে? এ অবস্থায় আমরা কি দত্তক নিতে পারি? যদি দত্তক নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে কোথায়, কি ভাবে কাদের সংগে যোগাযোগ করবো জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সরকারি কর্মচারী, ২৪ পরগণা।

মৈত্রেয়ী দেবীর খেলাঘর অনাথ আশ্রমের ঠিকানা জানতে চাই। এ রূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা জানালে বাধিত হবো।

দত্তক আইন বা অ্যাডপটেশন এ্যাক্ট ভারতীয় সংবিধানের একটি বৈধ আইন। অবশ্যই একজন ভারতীয় একটি ভারতীয় শিশুকে দত্তক নিতে পারে। তবে আইন অনুসারে কিছু সর্ত ও বিধি পালন করতে হয়। যার মধ্যে প্রাথমিক হল যাকে দত্তক নেবে তার পিতা মাতার সম্মতি এবং যারা দত্তক নেবে তাদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা আদালত মারফৎ করতে হবে।

কোথায় শিশু পাবেন? সরাসরি পিতামাতার কাছ থেকে অথবা পুলিশ, সরকারি উদ্ধার আশ্রম, হাসপাতাল, নারসিং হোম তা ছাড়া মাদার টেরিজা, মৈত্রেয়ী দেবীর খেলাঘরের মত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে। নিচে কয়েকটি এরূপ প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল,

মিশনারিস অব চ্যারিটি, ৫৪এ লোয়ার সারকুলার রোড, কলকাতা –১৬, (মাদার টেরিজার)।

খেলাঘর শিশু নিবাস ও শিক্ষা কেন্দ্র, ৩১/১ পার্ক এভিনু, কলকাতা –১৯, (মৈত্রেয়ী দেবীর)।

টেরি ডে'স হোমস (ইনডিয়া) সোসাইটি, ৯, মে ফেয়ার রোড, কলকাতা–১৯।

চারচ অব নরথ ইনডিয়া শিশু সংগপান গৃহ, ১০৬এ গৌতম নগর, নিউ দিল্লি–৪৫, কলকাতা অফিস :– ১৭৪এ এস পি মুখারজি রোড, কলকাতা–২৬।

ইনসটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজির ঠিকানাটা জানাবেন দয়া করে। –প্রদীপ গংগোপাধ্যায়, অরূপ চ্যাটারজি।

ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি (কাউনসিল অব সায়েনটিফিক অ্যানড ইনডাসট্রিয়াল রিসারচ) ৪, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলকাতা।

উত্তর দিয়েছেন : কুমারেশ চক্রবর্তী

জানাতে চাই

সানডে ক্লিনিক

সানডে ক্লিনিক একটা নতুন আন্দোলন। রবিবার অনেক সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না। হঠাৎ দরকার হলে অনেক নাগরিকই সমস্যায় পড়েন। তাই 'কৈলাস' স্থির করেছেন ডাক্তারদের সহযোগিতায় পাড়ায় পাড়ায় রবিবার সকালে বিভিন্ন সানডে ক্লিনিক শুরু করবেন। প্রথম ইউনিটটি নিতাই সেন মেমোরিয়াল সানডে ক্লিনিকটি উদ্বোধন করেন বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর। ১২৪, বি টি রোড, কলকাতা-৬৫ এই ঠিকানায় ৮ মে ১৯৮৩তে। সভাপতি ছিলেন সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক ডঃ অতুল সুর।

স্বামী শিবানন্দ

শিল্পপতি স্বরাজ পাল বৃটেনে বিপুল পাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলছেন

শ্যামল বসু

বৃটেনের ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতি স্বরাজ পাল সম্প্রতি ভারতের ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগী মহলে রীতিমত আলোড়ন তুলেছেন। তিনি এখানকার কয়েকটি কোম্পানির শেয়ার কিনতে গিয়ে রীতিমত বিরোধিতার সামনে পড়েছেন। এই বিরোধিতা কিন্তু মেনে নিতে রাজি নন স্বরাজ পাল। ভারতীয় জনগণের কাছে এখানকার শিল্পপতিদের তথাকথিত একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে সব খোলামেলা বলতে চান তিনি। আর সেই সঙ্গে চান বিদেশে শিল্পোদ্যোগের এক বিপুল সাম্রাজ্য গড়তে। এ প্রতিবেদন [illegible] পরিচয়। সঙ্গে থাকছে স্বরাজ পালের সঙ্গে [illegible] একটি একান্ত সাক্ষাৎকার।

'আমি কোন আদালতে যাব না। আমার যা অভিযোগ তা জানাব জনতার আদালতে।' কোন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতার থেকে অংশটি তুলে দেওয়া হয়নি। উক্তিটি করেছেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইংলনড প্রবাসী শিল্পপতি। নাম স্বরাজ পাল। বয়স ৫২ বছর। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। স্থায়ী ঠিকানা কাপারো হাউস, ১০৩ বেকার-স্ট্রিট লনডন।

কাপারো গ্রুপ লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্বরাজ পালের এই কথা শুনে ২৯ জুলাই পারক হোটেলের সংগম হলে হাজার খানেক সাধারণ শেয়ার হোলডার ও লগ্নিকারক সেদিন করতালি দিয়ে উঠেছিলেন। এক শিল্পপতি তাঁর অভিযোগ জানাবেন ভারতীয় সাধারণ মানুষের কাছে, তাও কি সম্ভব? সত্যিই সম্ভব সেদিন হয়েছিল। দিললি ক্লথ মিলসের মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বরাজ পাল অভিযোগ এনেছেন জালিয়াতির। ভারতীয় শিল্পপতিদের আমন্ত্রণে ভারত সরকারের অ্যাটরনি জেনারেলের অনুমতিক্রমে ১৩ কোটি টাকার শেয়ার কেনার জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে মারফৎ টাকা জমা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু শেয়ারের কাগজ তাঁর হাতে আসেনি। ডি সি এমের রাজরা ভাবছেন শেয়ার হাতে পেলে স্বরাজ পাল কোমপানির মালিক হয়ে বসবেন। মালিকানার সাধের গদি তা হলে ছাড়তে হবে। তাই শেয়ার দিতে টালবাহানা। স্বরাজ পালের কথায় ভারতের সাধারণ শেয়ার ক্রেতার স্বার্থ জড়িত আছে এই ঘটনার সংগে।

স্বরাজ পাল ভারতীয় শিল্প-জগতের মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছেন। সেই সঙ্গে জনমত ও সংবাদপত্রকে দিয়ে নিজস্ব গণ্ডির দেওয়াল আরও শক্ত করতে চাইছেন। ডি সি এম-এসকর্টস কোমপানির মালিকদের সংগ জয়েনট স্টক বা পাবলিক লিমিটেড অন্য কোমপানির মালিকরাও আজ তাঁর এই সাহসী আক্রমণে বিপর্যস্ত। এতদিন ধরে যে মধু তাদের একচেটিয়া ছিল, সেখানে এখন সাধারণ শেয়ার হোলডাররাও তার অংশ দাবি করবেন এ কথা তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতনই। দেখা যাক রেজিসট্রার অব কোমপানিজ কী পদক্ষেপ নেন।

কেবল ঢিল ছোড়ায় পক্ষপাতী স্বরাজ পাল নন। তিনি নিজেও একজন সফল এবং বুদ্ধিমান শিল্পপতি। ১৯১০ সালে স্বরাজ পালের বাবা প্যারেলাল ব্যবসা শুরু করলেন পাঞ্জাবের জলন্ধরে। বাড়ির মধ্যে একটা চালাই কারখানা বানিয়ে সেখানে লোহার যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। পরবর্তীকালে প্যারেলালের চার ছেলে কলকাতায় ব্যবসা করতে এলেন। বড় ছেলে সং পাল, তার পর জিৎ, স্বরাজ ও সুরিন্দর (পরিবর্তন ৪ জুন সংখ্যা)। বর্তমানে ভারতের অন্যতম শিল্প-উদ্যোগ এ পি জে সুরিন্দর গ্রুপ এদেরই নিয়ে। ১১টি কোমপানির মালিক এরা। কর্মচারীর সংখ্যা দশ হাজার। বার্ষিক লেনদেন ১০০ কোটি টাকা। স্টিল, ইনজিনিয়ারিং, ফারমাসিউটিকালস, জাহাজ থেকে হোটেল এবং ঘরবাড়ি সম্পত্তির ব্যবসাও এদের আছে। হরিয়ানার মানুষ জিৎ পাল ই এখন ভারতের এ পি জে সাম্রাজ্যের মাথা। সংগে সবচেয়ে ছোট ভাই আছেন সুরিন্দর পাল। সেজ ভাই স্বরাজ পাল বিদেশের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটালারজি পোসট গ্র্যাজুয়েট ডিগরি নিয়ে ১৪ বছর কলকাতায় কাটিয়ে গিয়েছেন। ব্যবসার হাতেখড়ি তাঁর কলকাতাতেই। ৫৩ সালে কলকাতায় এসে যা কিছু শিখলেন সবই মেজদা জিৎ পালের কাছে। জিৎ পালই এ পি জে র প্রাণপুরুষ। কলকাতার পুরনো বাড়িগুলি এক এক করে কিনে আধুনিক জোব চারনক হবার ইচ্ছে আছে তাঁর। পারক স্ট্রিট

অঞ্চলের বেশ কিছুটার মালিক এখন এ পি জে। এখানে একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটা সুপার বাজার তৈরি করার পরিকল্পনাও তাঁর মাথায় আছে।

১৯৬৬ সালে স্বরাজ পাল তাঁর বড় মেয়ে অম্বিকাকে নিয়ে লনডনে যান। লিউকোমিয়ার চিকিৎসা করাই এই বিদেশ গমনের উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের কথা সেই কন্যাটিকে স্বরাজ হাজার চেষ্টা করেও সুস্থ করতে পারেননি। কন্যার বিয়োগব্যথায় পিতার কাছে সেদিন সংসারের সবং ব্যাপার অসাড় মনে হয়েছিল। ১৯৬৬ থেকে প্রায় বছর দুয়েক তিনি বিভিন্ন জায়গায় সাধুসংগ করেছেন। মানসিক শান্তি পাবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই অধ্যাত্মজীবনের পথ থেকে ১৯৬৯ সালে তিনি আবার কর্মজীবনে ফিরে আসেন। তবে এবার আর তাঁর চেনা ভারতের মাটিতে নয়। তিনি

জিৎ পাল / সৌগত রায় বর্মন

ইংলনডেই একটি ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত জামিনে ৫000 পাউনড ধার করে ইস্পাত কেনা বেচার ব্যবসা শুরু করেন। 'ন্যাচারাল গ্যাস টিউব' (NGT) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে যাত্রা শুরু এ সময়ই। বিশেষ ধরনের স্টিল টিউব এখানে তৈরি করা হত। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বৃটেনের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাউথ ওয়েলসের নতুন কারখানাটির উদ্বোধন হয় ১৯৭৯ সালে। ট্রেড গারের এই কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী সেদিন অবশ্য প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না। ১৯৭৭ সালের বিপর্যয়ের পর স্বরাজ পাল শ্রীমতী গান্ধীকে লনডনে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর ও পরিবারের অন্যান্য দের সংগে সেসময় ইন্দিরা ঘনিষ্ঠ

হন। ইতোপূর্বে স্বরাজ পাল ১৯৭০ ৭১ সালেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এককভাবে ইংলনডে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বেসরকারি দূত হিসাবে প্রচার কাজ চালিয়ে ছিলেন। এ প্রসংগে জানিয়ে রাখা ভাল যে, জিৎ পাল ও পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও পরস্পরের বেশ ঘনিষ্ঠ।

স্বাভাবিক দূরদৃষ্টি থাকার জন্য স্বরাজ পাল ১৯৭৬ সালে বৃটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। আজ সেই বৃটিশ নাগরিক হিসাবেই তিনি কাপারো গ্রুপের চেয়ারম্যান। এখন সে সূত্রে ১৫০ মিলিয়াম ডলারের মালিক। এখানে কাজ করেন ৪ হাজার কর্মী। কাপারো গ্রুপ ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে তৈরি হয়। বর্তমানে বৃটেনের একটি হোলডিং কোমপানি হিসেবে এরা জাহাজের, রিয়েল প্রপার্টির হোটেলের এবং ৫২টি প্রতিষ্ঠানের মালিক। সেই সংগে অন্যান্য পরিচালন মণ্ডলীতেও তারা অংশ নিয়ে থাকেন।

ন্যাচারাল গ্যাস টিউব কোমপানিটি তৈরি হয় ১৯৬৬ সালে। ৯000 স্কোয়ার ফুটের এই কারখানাটি হানটিংডনে। জল-নিকাশী ব্যবস্থার জন্য যে পাইপ লাগে সেগুলোই এরা তৈরি করত। এই কারখানাটি যে কোনদিন বড় হতে পারে এমন ধারণা সে যুগে কেউ কখনও করতেন না। ১৯৭০ সাল থেকে স্বরাজ পাল নিজে এই ব্যবসা দেখাশুনা করতে শুরু করেন। কারখানাটি ১৯৭৭ সালের মধ্যে নিজের বাজার তৈরি করতে সক্ষম হয়। চাহিদার যোগান দিতে সাউথ ওয়েলসের ট্রেডগারে ১ লক্ষ স্কোয়ার ফুটের নতুন কারখানা তৈরি হয়। বর্তমানে এই কারখানা থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন টিউব তৈরি করা হচ্ছে। পাইপ ও টিউব তৈরির কুশলতার জন্যও এই কারখানার

স্বরাজ পাল / সৌগত রায় বর্মন

যথেষ্ট সুনাম আছে। কৃষি কাজ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের গ্যাস পাইপ লাইনের কাজেও এই কোমপানির তৈরি টিউব ব্যবহার করা হয়

১৯৭৬ সালে কাপারোর অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্টিল সেলস লিমিটেড বিখ্যাত ব্রানকসম টাওয়ার হোটেলটির মালিকানা হাতে নেয়। ৯ একর জমির ওপর পাহাড়ী পরিবেশে এক মনোরম হোটেল এটি। সামনে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ সৈকত। এখানে পর্যায়ক্রমে ১৮টি বাড়ি ও ৪২টি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটও তৈরি করা হল। ১৯৮০ সালের মধ্যেই এই হোটেলটিকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করলেন স্বরাজ পাল। ১৯৭৮ সালে স্বরাজ পালের কোমপানি তোরকোয় আর একটি হোটেলের পরিচালনভার হাতে নিলেন। হোটেলটির নাম অসবরন হোটেল। ১00 কামরার রাজকীয় হোটেলটি ১৮৪৬ সালে তৈরি হওয়ার পর এই প্রথম কোন বৃটিশ কোমপানির মালিকানায় তা এল। আর স্বরাজ পালই হলেন সেই বৃটিশ নাগরিক। এই হোটেলটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে।। এটি আর সি আই নামে আন্তর্জাতিক হোটেলগুলির সংগে যুক্ত। যার ফলে এখানে যিনি অবসর যাপন করতে চান তিনি অন্য যে কোন আর সি আই চেনের হোটেল যেখানে আছে তার সংগে বদল করে নিতে পারেন। ৮0 বছরের লিজে নেওয়া এই হোটেলে অনেকখানি সংস্কার কাজও হয়েছে। এখন এখানে ২৬0টি বিলাসবহুল অ্যাপারটমেনট আছে।

বাড়ি সম্পত্তির ব্যবসার জন্য কাপারো গ্রুপের সহযোগী সংস্থার নাম কাপারো প্রপারটিজ লিমিটেড। অম্বিকা হাউস – পোরট ল্যানড প্লেসের একটি নামকরা বাড়ি। ২৪টি ফ্ল্যাটের এই বাড়িটিতে অফিস, কাজের জায়গা আছে ২২৭00 বর্গফুট। স্বরাজ পাল এ বাড়ি তৈরি করেন দীর্ঘমেয়াদী লিজে। এই বাড়িটিতেই বৃটিশ কাউনসিলের সদর দপ্তর রয়েছে। বৃটিশ কাউনসিল এর জন্য স্বরাজ পালের কাছ থেকে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। ১০৩ নমবর বেকার স্ট্রিটের বাড়িটির নাম কাপারো হাউস। ১0 হাজার বর্গ ফুট জায়গায় বহুতল বাড়িটি কাপারো গোষ্ঠীর সদর দপ্তর। ১৯৮২ সাল থেকে এর আবার সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে।

ওয়েল বেক হাউসের মালিকও

অম্বিকা পাল / সৌগত রায় বর্মন

স্বরাজ পাল। ২০টি ফ্ল্যাটের এই বাড়িটির একতলায় বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারক কোমপানি জনবেল অ্যানড ফ্রুয়ডেন কোমপানির সদর দপ্তর। ভাড়াটে হিসাবে আছে এই কোমপানিটি।

লনডনের শেয়ার বাজারে আর বিভিন্ন লগ্নি ব্যবসায় কাপারো তথা স্বরাজ পাল এক ডাকে পরিচিত। জাহাজ কোমপানি, চা বাগান, হোটেল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাপারোর টাকা লগ্নি করা আছে। প্লাসটিক রবাব কমপাউনডের প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্যারো হেপবারন গ্রুপ লিমিটেডের মোট শেয়ারের ২৮ ভাগই স্বরাজ পালের কোমপানির। তেমনি শতকরা ১৪ ভাগ করে শেয়াব আছে বেবউইক টিমপো লিমিটেডে আর আসাম ফ্রনটিয়াব টি হোলডিংস লিমিটেডে। বেরউইক টিমপো লিমিটেডের ১৪ শতাংশ শেয়ারের দাম বর্তমানে ৫৫0,000 পাউনড। বর্তমানে টাকার হিসেবে এক পাউনডের দাম ১৯ টাকার কিছু বেশি।

কেবল চা-ই নয়, সেই সংগে কগ তানি আমদানির জন্য যে জাহাজ, সেই জাহাজের কোমপানিব খবরদারী কবার অধিকারও স্বরাজ পাল রাখেন। কোমপানির নাম সেটমুর শিপিং। এই কোমপানির ৬টি আধুনিকতম জাহাজ আছে। তাদের মোট ১২১,000 ডি ডাবলু টি ওজন বওয়ার মত ক্ষমতা আছে। এ ছাড়া বৃটেনে ভারতের আপেজী সুরেন্দ্র এবং সাগর শিপিং কোমপানির দেখাশুনার দায়িত্বও ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ শিল্পপতি স্বরাজ পালেব।

স্বরাজ পাল নিজে মনে করেন তিনি এই সাম্রাজ্যের কেবলমাত্র পরিচালন কর্তা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮0 সাল, এই এগার বছরের মধ্যেই নিজেকে কেমন করে বিদেশে প্রতিষ্ঠা করলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে স্বরাজ পাল বলেন বড় হবার সংগে সংগে আমরা অন্যান্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলির মত চিরাচরিত নিয়মকানুনগুলো মানতে চাইনি এবং সেগুলোর বিরোধিতা করেছি। যুগের সংগে তাল রাখতে চেষ্টা করেছি আর তা হল আমাদেব ব্যবসা যাঁদেরকে নিয়ে -- যেমন শেয়ার হোলডার, কর্মচারী, বিক্রেতা, ক্রেতা এদের সকলের সংগে একাত্মবোধ তৈরি করতেও চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আঘাত করেছেন স্বরাজ ভারতীয় শিল্প-উদ্যোগগুলির মূল উদ্যোক্তাদের। উদ্যোক্তারা লাভের গুড় খান তাতে স্ববাজের আপত্তি নেই। আপত্তি তাঁর তখনই যখন উদ্যোগের সমানাতম অংশের অংশীদাব শেয়ার হোলডাররা অন্ধকারে থাকেন। তিনি লাভের অংশ না পেতে পারেন, লোকসান কেন হল তার কারণ কেন জানবেন না - উদ্যোগের সাফল্যের আশ্বাসেই মানুষ টাকা লগ্নি করে, কোমপানির কাগজ কেনে কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটুকু কাগজের পাতায় দেখে কিংবা দেরিতে ডাকে পাওয়া ছাড়া অন্য কোন সংবাদ তাদের কাছে বিন্দুমাত্র পৌঁছয় না। এটা কেন হবে? এই মৌরসিপাট্টা ভাঙতে কি কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না?

স্বরাজ পাল ডি সি এমের মালিক রামদের কাছ থেকে হুমকি শুনেছেন কোন ভারতীয় আদালতের দ্বারস্থ হলেও তাদের নাকি কিছু যাবে আসবে না। ভারতীয় বিচার বিভাগের ত্রুটিকে হয়ত রামরা ব্যবহার করতে চান। করুন, তাতে ক্ষতি নেই। স্বরাজ পাল কিন্তু আদালতেব দিকেই যাবেন না বলে জানিয়েছেন। আব তিনি যা কিছু বলার তা একমাত্র জনতার আদালতেই বলেছেন। তবে ইংলেনডের বিপুল শিল্পসাম্রাজ্যের মালিক হবার স্বপ্নের কথা তিনি কখনও গোপন করেননি। তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হবে সেখানকার শেয়ার ক্রেতা আর শেয়ার হোলডারদেব জনাই। কারণ স্ববাজ বৃটেনের প্রতিটি শেয়ার হোলডার ও সাধারণ শেয়ার ক্রেতার রীতিমত আস্থাভাজন।

সে কারণে অনেকেই বলেছেন স্বরাজ পাল ভারতে ব্যবসা করতে এলে হয়ত বা এখানকার শেয়ার ক্রেতা ও শেয়ার হোলডারদেরও ভাগ্য ফিরে যেতে পারত। সেই ভয়েই হয়ত কবেন এখানকাব পুবনো শেকড়গাড়া শিল্পপতিরা। □

ভারতীয় শিল্পপতিদের মানসিক চিকিৎসা দরকার— স্বরাজ পাল

গত ২৯ জুলাই পারক স্ট্রিটের আমিরচাঁদ প্যারেলাল অব জলন্ধর (এ পি জে) অফিসে বেলা ১২·০৫ মিনিট থেকে ১২·৪৫ মিনিট পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রতিনিধি টেপ-রেকর্ডে একান্ত সাক্ষাৎকারটি নেন।

পরিবর্তন: কবে কলকাতায় পৌঁছেছেন? কতদিন থাকবেন?

স্বরাজ পাল: গত পরশুদিন কলকাতায় এসেছি। আগামী সোমবার অবধি কলকাতায় থাকব। তারপর বোম্বে আর দিল্লি ঘুরে আবার কলকাতায় আসব। এদেশে আমি আরো আড়াই সপ্তাহ থাকব বলে ছুটিতে এসেছি। কলকাতা তো আমার নিজের বাড়ি।

পরিবর্তন: আপনি কি পড়াশুনা কলকাতায় করেছিলেন?

স্ব পাল: না ঠিক কলকাতায় নয়। ভারতের পাঞ্জাবে আমার স্কুলিং আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা। আমার ইউ এস এ-তে। ম্যাসাচুসেটসে আমি মেটালারজি নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হয়েছি। তবে কলকাতায় আমার কর্মজীবন শুরু। সেটা ৫৩ সাল, তারপর থেকে টানা তের বছর আমার কলকাতাতেই কেটেছে। ৬৬ সালে আমি লনডনে যাই।

পরিবর্তন: কলকাতায় কোথায় থাকতেন?

স্ব পাল: প্রথমে আমরা মিডলটন স্ট্রিটে থাকতাম। তারপর উঠে যাই আলিপুর অ্যাভিনিউতে, শেষে আলিপুর রোডের বাড়িতে। এবারেও সেখানেই উঠেছি। আপনি তো জানেন আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি। সেজ ভাই, ছোট ভাই-এর সঙ্গে আমি বরাবর একসঙ্গেই থেকেছি।

পরিবর্তন: তারপর কি আপনি লনডনে চলে গেলেন? কবে বৃটিশ নাগরিক হলেন?

স্ব পাল: আমি লনডনে যাই ১৯৬৬-তে আর নাগরিকত্ব নিই ১৯৭৬ সালে।

পরিবর্তন: আপনি একজন সার্থক ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে সার্থক শিল্পপতি হলেন কী করে? বৃটিশ রক্ষণশীলতার জন্য আপনাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি?

স্ব পাল: বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে দিই। আমি ইংলনডে কোন কাজ করব বলে যাইনি। গিয়েছিলাম একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে সঙ্গী করে। আমার একটি মেয়ে ছিল। অম্বিকা। তার চিকিৎসার জন্যই ১৯৬৬-তে আমি ও আমার স্ত্রী অরুণা লনডনে যাই। বছর দুই ওখানকার হাসপাতালে বেঁচে ছিল অম্বিকা। অবশেষে তাকে আমি হারালাম। তার মৃত্যুর পর মনটা ঠিক হচ্ছিল না। আমি একটু শান্তি খুঁজছিলাম। ভারতে আর ফিরব না বলে মনস্থ করলাম। তখন আমার কোন কাজ ভাল লাগছিল না। মানসিক শান্তির জন্য আমি সেই সময় সন্ন্যাস নিতে পর্যন্ত যাচ্ছিলাম। বছর দেড়েক এইভাবেই কাটল। মনে শান্তি পেলাম না। তারপর ১৯৬৯ সাল নাগাদ আমি কাজ শুরু করলাম।

পরিবর্তন: প্রথমে আপনি কী কাজ করতেন?

স্ব পাল: আমি শুরু করেছিলাম স্টিল কেনা বেচার ব্যবসা দিয়ে। তাতে মূলধন কম লাগত, আর লাগত একটা ডেসক ও একজন সেক্রেটারি। আমিও সেভাবেই শুরু করেছিলাম।

পরিবর্তন: তবু আপনার কত টাকা লেগেছিল ব্যবসা শুরু করতে?

স্ব পাল: এক রকম কিছুই লাগেনি বলা যায়। আমি ব্যক্তিগত জামিনে কেবল সই করে ৫০০০ পাউনড ধার নিয়েছিলাম লনডনের 'উইলিয়ম অ্যানড গেলম' ব্যাংক থেকে। সেটা ১৯৬৯ সাল। তখন ঐ টাকা দিয়েই স্টিল কেনা বেচার ব্যবসা শুরু করলাম।

পরিবর্তন: তারপর?

স্ব পাল: তারপর ভাগ্য খুব একটা অসহযোগিতা করল না। আমি হানটিংডেমে একটা ছোট টিউব তৈরির কারখানার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লাম। কারখানাটা খুব ছোটই ছিল। এক সময় এটি আমি কিনেও ফেললাম। তিন চার বছর কারখানাটাকে দিয়ে বাজার রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই বড় কারখানা করলাম ওয়েলস-এ। এর জন্য তখন আমার দরকার ছিল ৬০ লক্ষ পাউনড। টাকাটা আমি জোগাড় করলাম বৃটিশ সরকারের শিল্প দপ্তর আর ইউরোপিয়ান স্টিল অ্যানড কোল কমিউনিটি থেকে।

পরিবর্তন: আপনি তো তখনও বৃটিশ নাগরিক নন। কোন অসুবিধা হয়নি বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা পেতে?

স্ব পাল: না, আমার কোন অসুবিধা হয়নি। ওখানে বৃটিশ না ইনডিয়ান এ নিয়ে সরকারি তরফের কোন মাথাব্যথা নেই। ইংলনডের যে কোন মানুষই সমান সুযোগ পেয়ে থাকেন।

পরিবর্তন: তারপর কি আপনার বিশাল প্রতিষ্ঠান 'কাপারো'-র সূচনা?

স্ব পাল: এটা বিশাল কিনা জানি না, তবে আমাদের এই মুহূর্তে যতটা বড় হবার প্রয়োজন ছিল এটা ঠিক ততটাই।

পরিবর্তন: ইংলনডে আপনার কর্মচারীর সংখ্যা কত?

স্ব পাল: আমাদের ওখানে ৪ হাজার কর্মী আছেন, এ ছাড়া ভারতে (আসামে) আমাদের কোমপানির তিনটি চা বাগান আছে। এখানে প্রায় ২৭০০০ কর্মী আছেন।

পরিবর্তন: এখানকার চা বাগানগুলোর নাম কী?

স্ব পাল: আসাম-ফ্রনটিয়ার, সিংলো হোলডিংস আর এমপায়ার প্ল্যানটেশন।

পরিবর্তন: ইংলনডে আর কী কী কোমপানি আছে?

স্ব পাল: আমাদের কাপারো গ্রুপকে নিয়ে মোট ৫২টি কোমপানির মালিকানা আছে। এই ৫২টি কোমপানিতেই ৪ হাজার কর্মচারী।

পরিবর্তন: ইংলনড ছাড়া আর কোথায় আপনার ব্যবসা আছে?

স্ব পাল: ইংলনডের বাইরে কানাডায় আমাদের একটি কারখানা আছে, পশ্চিম কানাডাতেও একটা আছে। এ ছাড়া আমরা স্টক একসচেনজ মারফৎ ইউ এস এ ও জাপানের কিছু কোমপানিতে টাকা লগ্নি করেছি।

পরিবর্তন: শিল্পপতি হিসেবে আপনি সফল কিন্তু রাজনৈতিক মহলে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন কীভাবে? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কী করে?

স্ব পাল: যোগাযোগে অবাক হবার কী আছে? আমি ভারতকে ভালবাসি। একজন ভারতীয় হিসেবে নিজে গর্ব অনুভব করি। আমি ইংলনডে থাকলেও মনে করি যে ইংলনডের মানুষের কাছে ভারতকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে। ভারত সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা দরকার। আমি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় প্রথম অনুভব করি যে, পশ্চিমীরা ভারতের ভূমিকাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। তারা অনেকেই ভারতকে হেয় করতে চাইছেন। সেই সময় আমি প্রতিবাদ করতে শুরু করি। একা একটি প্রচার

মন্ত্রের মত পণ্ডিতদের অপপ্রচারের বিরোধিতা করতাম। এই সময়ই আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংস্পর্শে আসি।

পরিবর্তন : শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কি আপনার প্রায়ই যোগাযোগ হয় ?

স্ব পাল : প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এতটা সময় কোথায় ? তবু তিনি যখন ইংলনডে যান তখন আমি তাঁর কাছে যাই। আমি শ্রীমতী গান্ধীর একজন গুণমুগ্ধ। আমি মনে করি শ্রীমতী গান্ধী একজন এমন ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

পরিবর্তন : রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা কতটা ?

স্ব পাল : ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কী মানে করছেন আমি জানি না। তবে রাজীব গান্ধীকে আমার ভাল লাগে। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি। যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের অন্য মানুষদের চিনি। আমি নিজে কোন রাজনৈতিক দলের লোক নই। কিন্তু আমি দেখেছি যে, লোককে বোঝান একটা সমস্যা। রাজনীতি ছাড়াও মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারে। রাজনীতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে একজন শ্রীমতী গান্ধীর গুণমুগ্ধ হতে পারে। যোগাযোগও রাখতে পারে। রাজনীতি আমি পছন্দ করি না। তবুও এদেশের সাংবাদিকরা এত রাজনীতি ঘেঁষা যে, আমি যদি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে করমর্দন করি তাহলেও তাঁরা বিষয়টির মধ্যে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলার সুযোগ আমি কমই পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি তিনি রাজনীতি ছাড়াও অনেক বিষয়ে আগ্রহী। যেমন শিশু শিক্ষা, প্রবাসী ভারতীয়রা কতটা ভাল থাকতে পারে ইত্যাদি। সে সম্পর্কে আলোচনাও করেন। তিনি শিল্প সংস্কৃতি বিষয়েও কথা বলতে ভালবাসেন, সমাজকল্যাণেও তাঁর সমান আগ্রহ। আর আমি এইসব বিষয় নিয়েই কথা বলি।

পরিবর্তন : সমাজকল্যাণ বিষয়ে কি আপনি খুব আগ্রহী ? সমাজকল্যাণের কী কী কাজ আপনি করেন ?

স্ব পাল : আমি অবশ্যই আগ্রহী। আমি মানুষকে ভালবাসি, ইংলনডে প্রবাসী ভারতীয়দের সুখ-সুবিধা নিয়েই কাজ করতে ভালবাসি। যেমন আর পাঁচজন ভারতীয় করে থাকেন।

পরিবর্তন : এবার একটু অন্য দিকে আসা যাক। আপনি কি মনে করেন এখন ভারতে শিল্প বিনিয়োগ লাভজনক ? আপনি তো সম্প্রতি ১৩ কোটি টাকা ভারতীয় কোমপানিতে লগ্নি করেছেন।

স্ব পাল : দেখুন বিষয়টাতে যাওয়ার আগে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে, এই প্রথম ভারত সরকার কোন প্রবাসী ভারতীয়কে কোন ভারতীয় কোমপানিতে লগ্নি করার সুযোগ দিলেন। যদিও বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থলগ্নি করার জন্য অনুরোধ, আবেদন করছিলেন। আমার এই লগ্নি করার কারণ কিছুটা দেশপ্রেম আর কিছুটা নিজের দেশে টাকা লগ্নি করে নিরাপদ বোধ করা। নিজের দেশ বলেই বোধহয় এই অনুভূতি। আমার মত অনেক প্রবাসী ভারতীয়ই এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতীয় শিল্পপতিরা যেভাবে বিষয়টিকে নিয়ে 'ডিগবাজি' খেলেন তাতে অবাক হতে হয়। এরা আদতে শিল্পপতি কিনা সে নিয়ে সন্দেহ জাগে। মনে হয় এরা শিল্প উদ্যোগের কাজকর্ম বা উন্নতির বিষয়ে আগ্রহী নন কিংবা শিল্পপতি হতে গেলে কী কী আচরণ করা উচিত তা জানেন না। ভারতীয় শিল্পপতিদের বর্তমান আচরণ বিদেশে ভারতের যথেষ্ট মর্যাদা নষ্ট করেছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী ভারতের সুনাম বাড়ানর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, সেখানে ভারতীয় শিল্পপতিদের আচরণ খুবই ক্ষতিকর। বিশ্বের কাছে ভারতীয় শিল্পপতিদের কথার কোন দাম রইল না। আমি একজন প্রবাসী ভারতীয় হিসেবে লজ্জিত বোধ করছি। ভারতীয় শিল্পপতিদের এই অসুস্থ মনোভাব সারানর জন্য মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

স্বরাজ পাল

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন যে প্রবাসী ভারতীয়দের পাঠান বছরে দেড় থেকে দু হাজার কোটি টাকা যদি জয়েনট স্টক কোমপানিতে বিনিয়োগ করে তবে কোমপানি সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে কোন বড় রদবদল হতে পারে ?

স্ব পাল : কোমপানি ফরমেশনে রদবদল হবে কেন ? শেয়ার কিনতে গিয়ে যে কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে তা হল এখন যারা ২/৩ শতাংশ শেয়ার নিয়ে কোমপানির মালিক বলে পরিচয় দেন তাঁরা আদৌ কোমপানির মালিক নন। তাঁরা 'পেড এগজিকিউটিভ'। কোমপানির পয়সায় তারা মহারাজার মত থাকেন তা সাধারণ মানুষ এতদিন জানতেন না। নিজেদের স্ত্রীপুত্র বান্ধবদের কাছে কোমপানির মালিক বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেন। বাস্তবটা তারা কোনদিন মেনে নিতে চাননি।

পরিবর্তন : 'ডি সি এম' বা 'এসকর্টে'র শেয়ারগুলোর জন্য আপনি কি এখন কোন আদালতে যাবেন ?

স্ব পাল : আমি কোন আদালতে যাব না। আমি অপেক্ষা করব। আর দেখব ভারতের সাধারণ মানুষ এবং জনমতের জোরে কিছু করা যায় কিনা। □

সাক্ষাৎকার : শ্যামল বসু

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

কলকাতার শেয়ার মারকেট ঃ দালাল ও কারবারিদের মাঝখানে সোনার সেতু

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কলকাতা স্টক একসচেনজের বয়স হল পঁচাত্তর বছর। এ উপলক্ষে শেয়ার বাজারের গঠন প্রণালী এবং কাজকর্ম নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের আরও কয়েকটি শেয়ার বাজারের মত এখানেও আছে ফাটকাবাজির কচিৎ প্রবণতা। কিন্তু সে প্রবণতা ঠেকাবার জন্য সরকারি ও ব্যবসায়ীদের দিক থেকে যথোচিত যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তারও এ প্রতিবেদনে [illegible]।

১৯৮৩, কলকাতা স্টক একসচেনজের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। এই ৭৫ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কলকাতা স্টক একসচেনজ যেমন নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জীবন্ত তেমনি আকর্ষণীয়।

বর্তমান কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বিবাদী বাগ তখন প্রায় ফাঁকা এক ধূ ধূ প্রান্তর। একটি নিমগাছের তলায় কিছু লোক জটলা করে ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালাচ্ছে। তারই পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে একটি ছাত খোলা ফিটন গাড়ি। ঢিমে তালে দৌড়ে চলা গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোচোয়ান গেয়ে চলেছে ঃ

'ভূত চড়ে নিমগাছের ডালে
সুদ চড়ে ভাই সুদের ঘাড়ে,
যাচ্ছে ফিটন মাইল হাজার
উঠছে নামছে শেয়ার বাজার।'

পুরনো দিনের অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে এই ঢিমে তেতালা সুরে গাওয়া গানটিও হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই কোচোয়ান আর তার ফিটন গাড়ি, কিন্তু শেয়ার বাজার আজও আছে। আর তারই সঙ্গে ওঠানামা করছে বহু কারবারির পণ্য।

নিমগাছের তলায় বসে সেই কারবারিরা ১৯০৮ সালে সংঘবদ্ধ ভাবে ২নং নিউ চায়না বাজার স্ট্রিটে (বর্তমানে রয়েল একসচেনজ বলে পরিচিত) যে ব্যবসার গোড়াপত্তন করেন, সেই শেয়ার বাজারের কারবার আজ ফুলে ফেঁপে আরও সমৃদ্ধ। রাস্তার নাম বদলালেও ২নং বাড়িটা আজ অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, আর কলকাতা স্টক একসচেনজ বা শেয়ার বাজার উঠে এসেছে ৭নং লায়নস রেনজে, মহাকরণের ঠিক পেছনে।

এই পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত শুনতেই হাজির হয়েছিলাম কলকাতা স্টক একসচেনজের সহ সচিব পি কে রায়ের কাছে। তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'কীভাবে এই শেয়ার ব্যবসার গোড়াপত্তন হল?' প্রশ্ন শুনে শ্রীরায় টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন তাঁর রিসারচ ফাইলটি। বললেন, 'শেয়ার কেনা বেচা এবং লগ্নি ব্যবসা প্রথম শুরু হয় এই কলকাতাতেই, ১৮৩০ সালে। তখন ইসট ইনডিয়া কোমপানি বাজারে বনড ছাড়ত এবং পরিবর্তে সুদ দিত শতকরা ৪, ৫, ৬ টাকা হিসাবে। সিকিউরিটিও কেনা বেচা হত।'

প্রঃ উনিশ শতকের শেয়ার বাজারের অর্থনৈতিক অবস্থাটা ঠিক কীরকম ছিল?

উঃ ১৮৩৬ সালের ইংলিশম্যান পত্রিকা থেকে জানা যায় যে সেই সময় এই ব্যবসার পরিমাণ বেশ ভালমত বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে, সেই সময় তিনটি সংস্থা—ব্যাংক অব বেংগল, ইউনিয়ন ব্যাংক এবং আগ্রা ব্যাংক খবরের কাগজে কোটেশান দিত। এবং ব্যবসা যে কী পরিমাণ লাভবান ছিল তা বোঝা যায় ব্যাংক অব বেংগলের একটি শেয়ারের বাজার দর থেকে। একটি ১০০ টাকা মূল্যের শেয়ারের বাজার দর ছিল প্রায় ৫,০০০ টাকা।

পরবর্তী পাঁচ বছরে এই ব্যবসার পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে। বুম্যাক অ্যানড কোমপানির অর্থনৈতিক বাজারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রায় ৯১টি যৌথ লগ্নিকারক সংস্থা এই শেয়ার কারবারে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে কয়লা এবং চা ব্যবসায়ীদের প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়।

প্রঃ ব্যবসায়িক কাজকর্ম কোথায় চালান হত?

উঃ বিবাদী বাগে যেখানে বর্তমানে চারটারড ব্যাংকটি আছে, সেইখানে একটি নিমগাছ তলায়

সহ সভাপতি শ্রী কে সাহা

ব্যবসায়িক লেনদেন হত। যখন চার্টার্ড ব্যাংক তার বর্তমান বাড়িটির নির্মাণ কাজ শুরু করে তখন ব্যবসাক্ষেত্রটি স্থানান্তরিত করা হয় এরই সংলগ্ন এলাকায় যেখানে এখন এলাহাবাদ ব্যাংক অবস্থিত।

কিন্তু খোলা আকাশের তলায় রোজকার এই কারবারের জন্যই একদিন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। এর উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯০৮ সালের ২ মে-র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই শেয়ার কারবারিরা বাবু বলদেওদাশ দুদুওয়ালার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ ভাবে 'দা ক্যালকাটা স্টক একসচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন'-এর গোড়াপত্তন করেন। বাবু বলদেওদাশ ২নং নিউ চায়না বাজার স্ট্রিটের বাড়ি এবং বাড়ি সংলগ্ন খোলা জায়গাটি ব্যবসায়িক কাজকর্মের সুবিধার জন্য নিজের নামে মাসিক ১০৮০ টাকা ভাড়ায় ২০ বছরের জন্য লিজ নেন। বলদেওদাশকে মিউনিসিপ্যালিটি করের অর্ধেক বিলও মেটাতে হত। ১৯০৮ সালের ১৫ জুন এই বাড়িতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ করা হয়।

প্রঃ তখন কলকাতা স্টক একসচেঞ্জের কতজন সদস্য ছিলেন?

উঃ প্রায় ২১০ জন। সেই বছর জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত অবশ্য কোনও প্রবেশ মূল্য ছিল না, তারপর প্রবেশ মূল্য ধার্য হয় ৫০ টাকা।

প্রঃ আচ্ছা এই একসচেঞ্জ কত সালে রেজিসট্রিকৃত হয়?

উঃ ১৯০৮-১৯২৫ পর্যন্ত এই সংস্থাটিটি একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করে, এবং ১৯২৫ সালের ৭ জুন এই সংস্থাটি রেজিসট্রিকৃত হয়। তখন মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ টাকা, এবং ১,০০০ টাকা দরে ৩০০ শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়েছিল।

প্রঃ কিভাবে শেয়ার বাজার এই লায়নস রেনজে উঠে এল?

উঃ আসলে ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ নং নিউ চায়না বাজার স্ট্রিটের বাড়িটিতে জায়গার স্থান সংকুলান সমস্যা দেখা গেল। তৎকালীন অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সাগরমল নাথানী নামক জনৈক ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় ৭ নং রেনজে একটি ফাঁকা জমি ১৯২৬ সালের ২ নভেম্বর ৪৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়। ম্যাকিনটস বারন কোমপানি প্রায় ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা খরচ করে এইখানে বর্তমান ৫ তলা বাড়িটি পাকা একবছর সময় নিয়ে তৈরি করেন। ১৯২৮ সালের ২ জুন তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন আনুষ্ঠানিক ভাবে এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১১ জুন ব্যবসায়ীরা পাকাপাকি ভাবে ঐ বাড়িতে উঠে আসেন। এরপর ১৯৫৬ সালে 'সিকিউরিটি কনট্রাকট অ্যাকট' অনুযায়ী স্টক একসচেঞ্জ সরকারি অনুমোদন লাভ করে এবং তখন থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই অনুমোদন নবীকরণের বন্দোবস্ত বজায় ছিল। অতঃপর ১৯৮০ সালে ভারত সরকার কলকাতা স্টক একসচেঞ্জকে স্থায়ী অনুমোদন দান করেছেন।

শ্রীরায়ের দেড়তলার ঘর ছেড়ে একা নেমে আসি একতলায় বিরাট হল ঘরে, ভিড়ের মধ্যে পা মিলিয়ে দিই। কান ঝালাপালা করা চিৎকারের মাঝে মাঝে উঠে আসছে 'বেচা! বেচা! বেচা!, লিয়া! লিয়া! লিয়া!' সুদৃশ্য সুশীতল সুগন্ধী কক্ষ, তার দেয়াল জোড়া কালো কালো বোরড যাতে শেয়ার দরের ওঠা নামা লেখা হচ্ছে। অসংখ্য টেলিফোন আর টেলিপ্রিনটারে নিরন্তর আসছে দেশের আরও নানান বাজার থেকে শেয়ারের দাম দরের খবরাখবর। দালালরা হাত পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করেও শেয়ার বাজারে দামের ওঠা পড়ার ধারাটাও বুঝিয়ে দেন।

অন্যান্য শেয়ার বাজারের মতন কলকাতায় ব্যবসায়িক লেনদেন চলে মূলত দু ধরনের শেয়ারের উপর। এখানে ৪৭টি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 'Securities on Cleared List' এর অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট প্রায় ১২০০টি প্রতিষ্ঠান 'Cash Delivery List'-এর আওতায় পড়ে। প্রথমে মাত্র ১৮টি সংস্থা এই প্রথম শ্রেণী ভুক্ত ছিল, পরে ব্যবসায়িক সাফল্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক সংস্থা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করেছেন। আবার বিভিন্ন লোকসানের ফলে প্রথম শ্রেণীর অনেক সংস্থাকে দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত করবার নিয়মও শেয়ার বাজারে চালু আছে।

নিয়মানুযায়ী 'Cash Delivery List'-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার লেনদেনের কারবার চুক্তি সম্পাদনের তিন দিনের মধ্যে করা হয়, কিন্তু প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ব্যবসায়িক বহু কর্মের নিষ্পত্তি হয় চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী 'Clearing Date'-এ। প্রতি ১৪ দিন অন্তর এই 'Clearing Date' ধার্য করা হয়। তখন এই 'Clearing Date'-এ শেয়ার মূল্যের পরিবর্তন ঘটলেও শেয়ার স্থানান্তরিত নাও হতে পারে। যে ক্ষেত্রে সেদিনের শেয়ারের বাজার দরের ওপর একটি সুদ চাপান হয় যাকে বলা হয় 'সাট্টা' বা 'সিধা বদলা' এবং ঐ পরিবর্ধিত দামে পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য আবার চুক্তিটিকে দীর্ঘায়িত করা যায়। সাধারণত সাট্টার পরিমাণ নির্ভর করে সেই দিনকার শেয়ারের বাজার দর এবং চাহিদার ওপর।

ধরা যাক 'ক' নামক কোনও প্রতিষ্ঠানের একটি শেয়ার কোনও একজন ক্রেতা কোনও একটি মাসের দুই বা তিন তারিখে ১০ টাকায় কিনলেন। সেই মাসে ১৪ তারিখ হয়ত 'Clearing Date' ধার্য আছে। ঐ নির্দিষ্ট দিনে শেয়ারটির দাম বেড়ে ১৫ টাকা কিংবা কমে ৫ টাকাও হতে পারে। তাহলে পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য ক্রেতা তার চুক্তিটিকে দীর্ঘায়িত করতে চাইলে তার জন্য তাকে বদলা বা সাট্টা দিতে হবে। ধরা যাক সাট্টা ধার্য হল ৫০ পয়সা। সেক্ষেত্রে চুক্তিটি নবীকরণ করা হবে শেয়ারের দাম ১৫ টাকা ৫০ পয়সা ধরে কিংবা ৫ টাকা ৫০ পয়সা হিসাবে। এইভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই ব্যবসাকে জিইয়ে রাখা যায়। এতে অবশ্য অনেক টাকা লগ্নি হয়ে যায়।

সাধারণভাবে শেয়ার ব্যবসা মানেই আমরা ফাটকা খেলা বুঝি। ধরা যাক বাজারে একটি শেয়ারের খুব চাহিদা রয়েছে, তখন উপরোক্ত পদ্ধতিতে কেনা বেচা করতে করতে দেখা গেল সেই প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ শেয়ার বাজারে আছে, তার থেকে বেশি সংখ্যক শেয়ারের ওপর কারবার চলছে। এই অবস্থায় কোন ক্রেতা যদি তার প্রাপ্য শেয়ার দাবি করেন: এবং বিক্রেতা সেই দাবি না মেটাতে পারেন তবে বিক্রেতাকে ক্রেতার স্বার্থে সেই প্রতিটি শেয়ারের ওপর একটি দর দিতে হয়, যাকে বলে 'উল্টো বদলা'। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ১৪

স্টক একসচেঞ্জের পুরো হল

দিনের জন্য চুক্তি নবীকরণ করা হয় সেদিনের শেয়ারের বাজার দর থেকে 'উল্টা বদলা' বাদ দিয়ে।

এইখানেই কিন্তু ফাটকা খেলার আসল বিপদটি লুকিয়ে আছে, যদি কোন কারণে দেশে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় তবেই বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়। ক্রেতারা তাদের শেয়ার দাবি করেন এবং চুক্তিটিকে নবীকরণ না করে মিটিয়ে ফেলতে চান, তবে দালালদের হয় অনেক ক্ষতি স্বীকার করে শেয়ার হস্তান্তরিত করতে হবে নাহলে সেই পরিমাণ টাকা মেটাতে হবে। সীমিত অর্থ-নৈতিক ক্ষমতার জন্য অনেক দালালকে তখন ব্যবসা গুটিয়ে দেউলিয়া হতে হয়। মাঝের থেকে মারা পরে তাদের মক্কেল ক্রেতারা।

এই বিপদ থাকা সত্ত্বেও যখন ফাটকাবাজি প্রচণ্ড আকার ধারণ করল, তখন ১৯৬৯ সালে সরকার আইন করে এই ব্যবসা বন্ধ করলেন। সরকার বাধ্য করলেন যে প্রতি ১৪ দিন অন্তর পুরনো চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং সেইসঙ্গে 'বদলা'ও বেআইনি ঘোষিত হল।

কিন্তু ধুরন্ধর ফাটকা কারবারিরা সরকারকে ফাঁকি দেবার পথ আবিষ্কার করলেন। 'Securities on cleared list'-এর নাম বদলে রাখা হল 'Land delivery system in specified shares'। প্রতি দশ দিন অন্তর 'clearing date' ধার্য হল। এবং 'clearing date'-এ খাতায় কলমে পুরনো চুক্তি বাতিল করে, 'বদলা' সমেত নতুন চুক্তি সম্পাদন হল। খালি সরকারের চোখে ধুলো দেবার জন্য 'বদলা' বা 'সাট্টা'কে আগের মতন আলাদা করে দেখান হল না। বোমবের শেয়ার কারবারিরাই এই পদ্ধতির সূত্রপাত করলেন। পরে সকলেই এই পদ্ধতিতে কাজ শুরু করলেন এবং ক্রমে ক্রমে পুরনো প্রথানুযায়ী ১৪ দিন বাদে বাদেই 'clearing date' ধার্য করা হল। কলকাতা সহ দেশের আরো ১১টি শেয়ার বাজারে এই প্রথা বলবৎ হল এবং এরই ফলে বোমবের শেয়ার বাজারে 'রিলায়েন্স' কোমপানির শেয়ার এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

বিদেশি একসচেঞ্জগুলিতে সমস্ত দালালদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে একটি আপৎকালীন ভাণ্ডার। এটির উদ্দেশ্য হল, যখন কোন কারবারির অর্থনৈতিক অক্ষমতা দেখা দেবে তখন সেই মূলধন থেকে তার মক্কেলদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতায় এই ব্যবস্থা চালু করার বিরুদ্ধে অনেক কারবারি যুক্তি দেখিয়েছেন যে এতে অসাধু ব্যবসায়ীরা আরও বেশি ফাটকা খেলবেন। কারণ তারা নিশ্চিন্তে থাকবেন যে বিপদের দিনে আপৎকালীন ভাণ্ডার থেকে বন্দোবস্ত হবে। তাই এখানে কোন আপৎকালীন ভাণ্ডার সৃষ্ট হয়নি।

কলকাতা শেয়ার বাজারের প্রশাসন এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। যখনই কোন শেয়ারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত ফাটকা খেলা হয়, তখন কমিটি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শেয়ারের ওপর একটি বিশেষ টাকার মার্জিন ধার্য করেন, এবং সেই পরিমাণ টাকা দালালদের কমিটির কাছে জমা রাখতে বাধ্য করেন। কিংবা যে সংখ্যক শেয়ারের ওপর কারবার চলছে তা কমিটির কাছে পেশ করতে বলেন। এক্ষেত্রে যেহেতু দালালদের মার্জিন বাবদ অনেক টাকা জমা রাখতে হয় তাই তারা ফাটকা থেকে বিরত থাকেন। তবে চালাক কারবারিরা তাদের পেটোয়া দু তিনজনের মাঝে মোট ব্যবসায়িক পরিমাণকে ভাগ করে দিয়ে প্রশাসনকে ফাঁকি দেন।

কলকাতা স্টক একসচেঞ্জের প্রশাসনভার যে কমিটির হাতে ন্যস্ত আছে তার সদস্য সংখ্যা ২০। যার মধ্যে ১৫ জন নির্বাচিত সদস্য, তিনজন কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত সদস্য, একজন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং একজন দালালে মনোনীত প্রতিনিধি।

কলকাতায় যারা এই কারবারে যুক্ত আছেন তারা প্রায় সকলেই এর দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। কলকাতা স্টক একস-চেঞ্জের সভাপতি শ্রী বি এন

প্রেসিডেন্ট খানডেলওয়াল

খানডেলওয়াল জানান, এখানে কমিটি কারবারিদের ব্যবসার ওপরে কড়া নজর রাখেন। যে কোন বিপত্তির সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আমরা কারবারিরা এখানে নিজেদের একটি যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। দেশের অন্যান্য বাজারে যদিও শেয়ারের দাম ২০-৩০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে কলকাতাতে এই দামের ওঠা-নামা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকে।'

তবে বিপত্তি যে একদমই ঘটেনি তা বলা যাচ্ছে না। এক্জি-কিউটিভ ডিরেক্টর এস আর বসু বললেন, 'মাত্র তিনবার কলকাতার বাজারে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা যায়, ফলে শেয়ারের দাম প্রায় শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ পর্যন্ত পড়ে যায়। এই তিনবারের মধ্যে প্রথমটি ঘটে ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সময়। দ্বিতীয়টি ৬২ সালের

এক্জিকিউটিভ ডিরেক্টর এস আর বসু

চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এবং তৃতীয়টি ১৯৭৪ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার 'ডিভিডেন্ড কার্ট' ঘোষণা করেন। তবে এটা ঠিক যে গত দশ বছরে কোনো কারবারি দেউলিয়া হয়ে যায়নি'।

প্রঃ আচ্ছা আপনাদের কল-কাতা স্টক একসচেঞ্জের জন্য নতুন কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ কাজ যেভাবে বাড়ছে তাতে আমাদের শীঘ্রই নতুন বাড়ি করতে হবে। তাছাড়া শেয়ার ব্যবসাকে আরও সম্মানজনক এবং শেয়ার কারবারিদের আরও শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমরা একটা অবৈতনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছি।

এই প্রসঙ্গে আরও বিশদ ভাবে জানালেন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিরেক্টর বি বি ঘোষ, বয়সে প্রবীণ। শ্রী ঘোষ জানালেন যে, এই কেন্দ্রের শিক্ষা সময় তিন মাস। সর্বসাকুল্যে ২৪টি বক্তৃতার আয়ো-

ট্রেনিং-এর ডিরেক্টর বি বি ঘোষ

জন করা হয় এই তিন মাসে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে আছে কলকাতা স্টক একসচেঞ্জের ইতিহাস, শেয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় আইন কানুন এবং হিসাব শাস্ত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়। শ্রী ঘোষ বললেন, 'শেয়ার কারবারে যুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিও এই শিক্ষণ শিবিরের পাঠ নিতে পারেন। যেমন ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর দুজন অফিসার এই পাঠ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অফিসাররাও এই শিক্ষণশিবির সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।'

তিন মাসের এই শিক্ষাকাল শেষ হলে ছাত্রদের একটি পরীক্ষা দিতে হয় এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বছরে চারটি এই রকম শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করা হয়।

একজন সফল ছাত্র অশোক কুমার চৌধুরী তাঁর পৈতৃক শেয়ার কারবারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার, তাঁর মতে এই পাঠ্যসূচি থেকে তিনি এই শেয়ার কারবার সম্বন্ধে আরও বিশদ জানতে পেরেছেন। তবে তিনি মনে করেন যে শুধুমাত্র কলকাতা স্টক একসচেঞ্জ-এর উর্ধ্বতন অফিসারদের বক্তৃতার বন্দোবস্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণী শিক্ষক অন্যান্য স্টক একস-চেঞ্জের প্রতিষ্ঠিত সদস্য এবং বিদেশি সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা উচিত।

আরেকজন সফল ছাত্র কেশো-প্রসাদ চিরিমারের মতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি খুব প্রয়োজনীয় হলেও তিনি এর থেকে খুব বেশি লাভবান হতে পারেননি। তিনি বলেন, 'আমি গ্র্যাজুয়েট এবং গত ২০ বছর যাবৎ এই ব্যবসায়ে যুক্ত। তবে যেহেতু সম্প্রতি নিজের নামে এই ব্যবসা শুরু করেছি তাই আমাকে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে।'

অন্ত তিনবছর ধরে নবাগতদের পক্ষে মাত্র এই শিক্ষণকেন্দ্রের সারটিফিকেটই বাধ্যতামূলক নয়, তাঁদের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করাটাও আবশ্যিক। কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের সচিব পি কে দে জানান যে নতুন করে শেয়ার কারবার শুরু করতে হলে স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালিত পাঠক্রম শেষ করার পর নবাগতকে কম করে দু' বছরের জন্য কোন অ্যাকটিভ সদস্যের সহকারী হিসাবে কাজ করতে হবে। তারপর সদস্য পত্র পেতে হলে তাকে দেড় লাখ থেকে দু' লাখ টাকার মূলধন দেখিয়ে ২000 টাকা জমা রাখতে হবে স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে আপৎকালীন মূলধন হিসাবে। তারপর যদি সেই নবাগত সদস্য 'Land delivery system' এ কাজ করতে চান তবে তাঁকে আরও ৭৭,000 টাকা জমা রাখতে হবে।

এছাড়াও এক্সচেঞ্জের একটি শেয়ারের মালিকানাও থাকা চাই।

শ্রী দে জানান, ১৯৫৭ সালের পর এক্সচেঞ্জের ১,000 টাকা মূল্যের প্রতিটি শেয়ারকে ২৫0 টাকা করে মোট ৪টি শেয়ারে ভাগ করা হয়, এতে স্টক এক্সচেঞ্জের মোট শেয়ার সংখ্যা ৩00 থেকে বেড়ে ১২00-তে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে একটি শেয়ারের বাজার দর প্রায় ১২,000 টাকা। মোট ৬৪৩ জন সদস্যের অ্যাকটিভ সদস্য সংখ্যা ২৫0।

শ্রী দে জানান যে যদি কোন প্রতিষ্ঠান নতুন করে তাঁদের দাম কোট করতে চান তবে তাঁদের শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এছাড়া আরও নানাবিধ নিয়ম কানুন আছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে কলকাতা ছাড়া আরও ১১টি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে। সেগুলি অবস্থিত বোম্বে, আমেদাবাদ, মাদরাজ, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বাঙ্গালোর, কোচিন, লখনৌ, পুনে, দিল্লি ও লুধিয়ানায়।

কিন্তু কলকাতায় ৭ নম্বর লায়নস রেঞ্জের বাইরে ঠিক উল্টোদিকে চলেছে বেআইনি ফাটকাবাজি। ছোট ছোট কাঠের ঘুপচি ঘরে। টেলিফোন কাঁধে করে কারা অনর্গল চেঁচামেচি করছে। এরা মূলত পাটের ওপর ফাটকা খেলে। এর মাইলখানেকের মধ্যেই ক্লাইভ রোতে চটজাতীয় দ্রব্যের ওপর চলছে ফাটকা কারবার। এই ব্যবসা চলে মূলত যে পরিমাণ পাট বা পাটজাতীয় দ্রব্য কোনদিন বাজারে আসবে না তার ওপর। ফলে আজকের দাম এবং ভবিষ্যতের দামের মাঝের ব্যবধানের ওপর টাকা লেনদেন চলে। কিন্তু উপরোক্ত দুটি জায়গাতেই ফাটকা খেলা বেআইনি।

এই ব্যাপারটা বুঝতে হাজির হলাম ইসট ইনডিয়া জুট এ্যানড হেসিয়ান এক্সচেঞ্জের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি জ্যোতির্ময় রায়ের কাছে। তিনি জানান, একমাত্র বি টুইল ছাড়া অন্যান্য পাট দ্রব্য ও কাঁচা পাটের ওপর ফাটকা সরকার-অনুমোদিত। ১৯৫৮ সালে তাঁদের এই সংস্থাটিকে সরকার অনুমোদন দান করেন। তাদের সদস্য সংখ্যা ৭00। এখানে সদস্য হতে হলে ৪,000 টাকা প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হয়। বাৎসরিক চাঁদা ৪00 টাকা। এছাড়াও এক্সচেঞ্জের ১,৫00 জন রেজিসট্রিকৃত সদস্য নয় এমন লোকও নথিভুক্ত আছেন। এদের প্রবেশ মূল্য ১00 টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ২৫0 টাকা। এই সংস্থার বাইরে যারাই কাজকর্ম চালান তারাই বেআইনি ব্যবসায়ে জড়িত। সদস্যদের নানান নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। মাত্রাতিরিক্ত ফাটকা খেললে মারজিন চাপান হয়। কিন্তু বাইরের কারবারিদের ওপর কোন নিয়মকানুন চলে না। মাঝে মাঝে শোনা যায় যে বেআইনী কারবারিদের ওপর পুলিশী হস্তক্ষেপ হয়। কিন্তু কিছুদিন বাদেই এরা আবার ব্যবসায়ে ফিরে আসেন। □

আলোকচিত্র :
সৌগত রায় বর্মন

'সমমতাদর্শীদের সঙ্গেই আছি'—জর্জ ফারনানডেজ

ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় যে কজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নিজেদের লালনপালন করেন তাদের ভেতর জরজ ফারনানডেজ এক স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার সময় ফারনানডেজ আত্মগোপন করে সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমন কী তিনি সেইসময় চরমপন্থী বিপ্লবের দিকেও ঝুঁকেছিলেন, পরবর্তী কালে যেটা বরোদা ডিনামাইট মামলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৭-এ কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি সংসদীয় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করেন এবং মুজাফফরপুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন।

এই প্রতিবাদী মানুষটির সঙ্গে আমি তার তুঘলক ক্রিসেনট রোডের বাড়িতে দেখা করি। প্রথমে অবশ্য ফারনার্নডেজ কিছুতেই সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হননি। বেশ কিছুক্ষণ তাকে বোঝানর পর তিনি আমার পেশ করা প্রশ্নপত্র-র ওপর চোখ বুলিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাস্যে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলেন।

পরিবর্তন : বিভিন্ন নেতার বিরোধের ফলে জনতা পারটির ভেঙ্গে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন মানুষের মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আছে বলে আপনি মনে করেন ?

ফারনানডেজ : জনতা পারটি যেসব কারণে ভেঙ্গে গিয়েছিল তা সবই তো কাগজে বেরিয়েছে। আমার মনে হয় না জনতা পারটি ভেঙ্গে যাওয়া বা তার নেতাদের আচরণ সম্পর্কে এখন লোকের মনে কোনরকম বাজে ধারণা আছে। সাধারণ মানুষ এতদিন পরে এ বিষয়ে এখন আর মোটেই উৎসাহী নয়।

পরিবর্তন : ১৯৭৭-এ বিপরীত-ধর্মী সব রাজনৈতিক দলগুলোকে মিলিত করে একটি মাত্র দল গঠনের চেষ্টা পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আপনার দল যে এখনও সেই একই পথে পা বাড়াবে না এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা আছে কি ? আর নেতৃত্ব নিয়ে যে এবারও কোনরকম বিরোধ দেখা দেবে না তা কি আপনি বলতে পারেন ?

ফারনানডেজ : রাজনীতিতে উচ্চাশা সবসময়ই একটা বড় ভূমিকা পালন করে। কাজেই কেউ যদি ক্ষমতায় আসার কথা চিন্তা করে তা হলে আমি সেটাকে ভুল বলতে পারি না। সেই চিন্তা নিয়েই ১৯৭৭-এ জনতা পারটির জন্ম হয়েছিল। কাজেই সেটাকে আমি ভ্রান্তি বলতে পারি না। সেরকমই নেতৃত্ব নিয়েও প্রতিযোগিতা হতে পারে। যারা রাজনীতির এই লড়াই-এ ভয় পায় তাদের রাজনীতিতে আসা উচিতই নয়।

পরিবর্তন : সমস্ত বিরোধী নেতারাই বলছেন ১৯৭৬-৭৭-এ গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন বিপন্ন হয়েছিল, ঠিক সেরকম অবস্থাই এখন দেখা দিয়েছে। যদি তাই তাদের সত্যিকারের চিন্তা হয়, তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মিলনে বাধা কোথায় ?

ফারনানডেজ : আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর নানারকম নীতিই তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব দল এই ধরনের উক্তি করেছে তাদের নেতারা হয়ত এ বিষয়টা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারবেন।

আপনি জগজীবন রামকে একরকম প্রশ্ন করছেন কেন ? এই তো কিছুদিন আগেও তিনি চরণ সি- এর নাম সহ্য করতে পারতেন না। আর অ- তারা একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

পরিবর্তন : এই দুই নেতার এবং তা- দলের মিলনকে আপনি কীভাবে নেবেন ?

ফারনানডেজ : ঐ মিলনকে আমি স্বা- জানাবো।

পরিবর্তন : এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি- কোন কোন রাজনৈতিক দলকে আপনি আপন- আদর্শের কাছাকাছি বলে মনে করেন ?

ফারনানডেজ : যাদের সঙ্গে আমার আদর্শে- মিল আছে আমি তাদের সঙ্গেই আছি। আর যা- আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী তারাও আমাদের সঙ্গে- আছেন।

পরিবর্তন : জনতা পারটির সাংগঠনিক অব- এখন কেমন ?

ফারনানডেজ : খুব একটা ভাল নয়। আম- চেষ্টা করছি দলকে সুদৃঢ় করে তুলতে। ত- বিহার আর করণাটকে দলের অবস্থা সব থে- ভাল।

পরিবর্তন : কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি ক- আপনারা দলকে ভালভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন ?

ফারনানডেজ : আমরা প্রধানত সাধার- মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান করার ওপর জো- দিচ্ছি। দলের কর্মপদ্ধতি ঠিক ঠিক ভাবে পাল- করে আমরা দলকে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তুলতে চাইছি

পরিবর্তন : বিভিন্ন কাগজে জনতা পার্টি- সভাপতি চন্দ্রশেখরের পদযাত্রার সমালোচনা ক- হচ্ছে। এমন কি রাজনৈতিক মহল থেকেও বিভি- ধরনের বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে। এই পদযা- সম্বন্ধে আপনার কী মতামত ? চন্দ্রশেখর কি তা- ব্যক্তিগত প্রভাব যাচাই করে নেওয়ার জন্য এ- পদযাত্রা করেছিলেন ?

ফারনানডেজ : চন্দ্রশেখরের পদযাত্রার সিদ্ধা- নতুন নয়। এই সিদ্ধান্ত তিনি অনেক আগে- নিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই পদযাত্রা- ফলে জনতা পারটির কর্মীদের সঙ্গে দেশের হাজা- হাজার মানুষের একটা যোগসূত্র গড়ে তোলা সম্ভ- হবে। জনতা পারটির কর্মীরা সাধারণ মানুষে- দুঃখ, দুর্দশা, অভিযোগ ঠিকমত বুঝতে পারবেন কাজেই একে সমালোচনা করার কোন যুক্তি নেই যদি আপনি এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের দেওয়া বক্তব্য খতিয়ে দেখেন, আপনার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

পরিবর্তন : মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বাধী- জনতা সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার ঠিক আগে আপনি- পারলামেনটে ভাষণ দিতে গিয়ে সরকারি কাজ- কর্মের প্রশংসা করে বলেছিলেন ক্ষমতায় থাকার অধিকার এ সরকারের আছে। কিন্তু তার কিছুদি- পরই আপনি মোরারজীর বিপক্ষে যোগ দিলেন এটা কি আপনার সততার প্রতি একটু সন্দেহ জাগায় না ?

ফারনানডেজ : এ বিষয়ে তো অনেকবা- বিতর্ক হয়েছে। আমার মনে হয় না বর্তমানে এ প্রশ্নের কোন যৌক্তিকতা আছে। ☐

সাক্ষাৎকার : রাজীব রঞ্জন নাগ

নেপালের রাজপরিবার : একশ পাঁচ বছরের বন্দীদশা ঘোচাতে ত্রিভুবনের রাজকীয় বিদ্রোহ

মুক্তিপদ চৌধুরী

নেপালের জাতীয় উৎসব ইন্দ্রযাত্রা। আট দিনের এই জমকালো উৎসব হয় আশ্বিন মাসে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর দিন থেকে। এই উৎসবের কেন্দ্রস্থল কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ হনুমান ঢোকা চত্বর। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ (উৎসবের তৃতীয় দিনে) নেপালের রাজা রানীর কাছ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিয়ে কুমারী দেবীরূপে জীবন্ত মানবীর ভৈরব ও গণেশ দেবতার সংগে রথে চড়ে শহর পরিক্রমা।

নেপালের ইতিহাসেও এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুশ পনের বছর আগে ১৭৬৮ খৃস্টাব্দের ২৬ সেপটেম্বর নেপালে গুর্খা রাজবংশের (বর্তমান রাজবংশ) প্রতিষ্ঠাতা শ্রী পঞ্চ বড়মহারাজাধিরাজ পৃথ্বী নারায়ণ শাহ কাঠমাণ্ডুর শেষ মল্ল রাজা জয়প্রকাশ মল্লকে হটিয়ে দিয়ে হনুমান ঢোকা রাজপ্রাসাদের সিংহাসনে আনুষ্ঠানিকভাবে বসেন। ঐ দিনটিতে ছিল ইন্দ্রযাত্রা উৎসবের তৃতীয় পর্ব, অর্থাৎ কুমারী দেবীর রথযাত্রা। পৃথ্বীনারায়ণ শাহ সিংহাসন থেকে উঠে গিয়ে কুমারী দেবীকে প্রণাম করলে কুমারী দেবী নতুন রাজার কপালে সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে দিলেন। জয়টিকা ও রাজটিকা একই সংগে।

আগের দিন রাত্রি থেকে মল্লরাজার যে সৈন্য ও প্রজারা উৎসবের আনন্দে রকসির (বাড়িতে তৈরি নেপালী মদ) নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন, সবাই নতুন রাজাকে অভিনন্দন জানালেন, জয় শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহদেব কি জয়।

এক রাজা গেলেন, আর এক রাজা এলেন।

কাঠমাণ্ডুর (পূর্ব নাম কান্তিপুর) রাজা জয়প্রকাশ মল্ল পালিয়ে পাশের রাজ্য পাটনে (পূর্ব নাম ললিতপুর) আশ্রয় নিয়েছিলেন। পৃথ্বীনারায়ণ শাহ পাটনে পৌঁছলে জয়প্রকাশ মল্ল পাটনের রাজা তেজনর সিং মল্লকে নিয়ে ছুটলেন উপত্যকার তৃতীয় রাজ্য ভদগাঁওয়ের (অপর নাম ভক্তপুর) দিকে। ভদগাঁওয়ের বৃদ্ধ রাজা রণজিৎ মল্লের পক্ষে গুর্খাবীর পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। ফলে সেখানে সবাই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

পৃথ্বীনারায়ণ শাহ কাঠমাণ্ডু উপত্যকার তিন মল্ল রাজাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে তাঁদের ইচ্ছে অনুযায়ী বসবাস করার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। ভক্তপুরের রাজা রণজিৎ মল্ল গেলেন কাশী। কাঠমাণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মল্ল বললেন, উনি বাকি জীবনটা পশুপতিনাথের কাছে থেকে কাটিয়ে দেবেন। এই বয়সে আর উপত্যকা ছেড়ে যাবেন না। ললিতপুরের রাজা তেজনর সিং মল্ল কোথায় গেলেন কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন, উনি কোন ইচ্ছে প্রকাশ না করায় আমৃত্যু বন্দী করে রাখা হয়। কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় গুর্খা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল ও ক্রমে ক্রমে পাশাপাশি রাজ্যগুলোও গুর্খা রাজার অধীনে এল। পৃথ্বীনারায়ণ শাহ মল্লরাজাদের ছেড়ে যাওয়া রাজপ্রাসাদে না থেকে প্যাগোডা আকারের নয়তলা নতুন রাজপ্রসাদ তৈরি করালেন, যার নাম বসন্তপুর দরবার। মল্লরাজাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ হনুমান ঢোকা ও কুমারী মন্দিরের মাঝখানে।

কাঠমাণ্ডুর সিংহাসনে বসার মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে ১৭৭৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাহান্ন বছর বয়সে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ মারা যান।

যুবরাজ প্রতাপ সিং শাহ চব্বিশ বছর বয়সে কাঠমাণ্ডুর সিংহাসনে বসলেন। গুর্খা রাজবংশের পরবর্তী রাজাদের সংগে পরিচিত হওয়ার আগে গুর্খাদের সম্বন্ধে কিছুটা জেনে নেওয়া ভাল।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় গুর্খা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রায় পাঁচশ বছরেরও বেশি মল্ল রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। এঁরা ছিলেন পাবা ও কুশীনগরের মল্লদের বংশধর। মল্লদের আগে প্রায় এক হাজার বছর উপত্যকায় রাজত্ব করেছেন লিচ্ছবী রাজবংশ। লিচ্ছবীরাও উপত্যকায় এসেছিলেন উত্তর ভারতের বৈশালী থেকে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে লিচ্ছবী, মল্ল, শাক্য অতি পরিচিত নাম। শাক্যবংশীয় কোন রাজার নাম নেপালের প্রামাণ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে উপত্যকার অধিবাসীদের গরিষ্ঠভাগ অর্থাৎ নেওয়ারী সম্প্রদায় যে শাক্য বংশোদ্ভূত অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের আপনজন, এ কথা অনেক শাক্য উপাধিধারী নেওয়ারীদের কাছ থেকে শোনা যায়। অবশ্য প্রামাণ্য তথ্য নেই। গুর্খা বলে নেপালে আলাদা কোন জাতি নেই। যদিও পৃথিবীর সবার কাছে গুর্খা নামটি অতি পরিচিত। গুর্খাদের সাহস, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে সবাই একমত। বৃটিশ ভারতের সৈন্য বাহিনীতে গুর্খা রেজিমেনট ছিল একটি গুরুগম্ভীর নাম।

আসলে গুর্খা রাজ্য ছিল নেপালের আরও অসংখ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলোর একটি। লামজুং, তানাহুঁ, গণ্ডকী, কাসকি, থাকলা, নুয়াকোট, থানকোট প্রভৃতি পাহাড়ী রাজ্যগুলোর মত। মধ্য নেপাল ও উত্তর নেপালের পাহাড়ী উপজাতিদের মত এখানেও বাস করতেন মগর, গুরুং, তামাং, শেরপা, নেওয়ার, রাই প্রভৃতি জাতি। রাজ্যের আরাধ্য দেবতা গোরখনাথ থেকে গোর্খা বা চলতি নাম গুর্খা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজপুতানার মেওয়ার রাজ্যের রাজধানী চিতোর থেকে রানা ভূপাল নামে এক চন্দ্রবংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজা আফগানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উত্তর ভারতের নানা জায়গা ঘুরে গণ্ডকী নদীর তীর ধরে পশ্চিম নেপালের পালপা রাজ্যের রিদিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

এই চন্দ্রবংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয়ের বিভিন্ন বংশধর মগর, গুরুং, তামাং প্রভৃতি উপজাতিদের যুদ্ধে পরাজিত করে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা বা দলপতি হয়ে পড়েন। রানা ভূপালের এক বংশধর দ্রব্য শাহ ঠিক এইভাবেই গুর্খা দলপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে গুর্খা রাজ্যের রাজা হন। তাঁকেই বলা হয় নেপালে গুর্খা বংশের আদি পুরুষ। কারণ জাতির একতা বজায় রাখার জন্য তিনি গুর্খা রাজ্যের সব উপজাতিদের এক নাম দেন, তা হল গুর্খা, যাকে নেপালী ভাষায় বলা হয় গুর্খালী। তিনি নিজেও নিজেকে গুর্খালী বলেই পরিচয় দিতেন।

এবার ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকান যাক। রাজপুতবীর দ্রব্য শাহ যখন গুর্খারাজা হলেন, তখন দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে হারিয়ে দিল্লির সম্রাট হয়েছেন চোদ্দ বছরের কিশোর আকবর শা। যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রকৃত শাসনভার তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁয়ের হাতে।

বাংলা ও বিহারের শাসনভার তখনও আফগানদের কবজায়। কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় মল্লদের শাসন। কাঠমাণ্ডুর রাজা নরেন্দ্র মল্লের রাজত্বের শেষ বছর। পরের বছরই তাঁর ছেলে মহেন্দ্র মল্ল কাঠমাণ্ডুর রাজা হন। তখন অবশ্য কাঠমাণ্ডুর নাম ছিল কান্তিপুর। একটি কাঠের তৈরি বিরাট কাষ্ঠ মণ্ডপ (কাঠমাণ্ডুতে গোরখনাথের মন্দির) থেকে কান্তিপুরের নাম হয় কাঠমণ্ড ও পরে কাঠমাণ্ডু। এইটেই সবচেয়ে প্রচলিত প্রবাদ। দ্রব্য শাহের সময় থেকে গুর্খারাজ্যে রাজাদের তালিকায় পৃথ্বীনারায়ণ শাহ একাদশ রাজা। ঠিক একইভাবে যুবরাজ ত্রৈলোক্য বীর বিক্রম শাহকে ধরলে বর্তমান রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ কাঠমাণ্ডুর উপত্যকা তথা সারা নেপালে প্রতিষ্ঠিত গুর্খা রাজবংশের একাদশ রাজা (ত্রৈলোক্য বীর বিক্রম শাহ যুবরাজ থাকাকালীন মারা যান)।

পৃথ্বীনারায়ণ শাহের বাবা নর ভূপাল শাহ একবার কাঠমাণ্ডু উপত্যকা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু জয়প্রকাশ মল্লের কাছে নুয়াকোটের যুদ্ধে হেরে গিয়ে মনে এত ব্যথা পেয়েছিলেন যে তারপরই যুদ্ধ, রাজ্য জয় এসব ছেড়ে দিয়ে সব সময় ধর্মচিন্তা নিয়ে সময় কাটাতেন। কুড়ি বছরের যুবরাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে গুর্খা রাজ্যের ভাবী রাজা

হিসাবে রেখে ১৭৪২ খৃস্টাব্দে নর ভূপাল শাহ মারা যান। বেশ কয়েক বছর আগে কিশোর যুবরাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহ প্রায় তিন বছর কাঠমান্ডু উপত্যকার ভদগাঁও রাজ্যে রাজা রণজিৎ মল্লের অতিথি হয়েছিলেন। সে সময় উপত্যকায় রাজাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা, চক্রান্ত ও ছোটখাট যুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকত। তখনই পৃথ্বীনারায়ণ শাহের মনে হয়েছিল, হিমালয়ের কোলে এতগুলো ছোট রাজ্য না থেকে যদি একটা বেশ বড় স্বাধীন রাজ্য হয়, তা হলে বাইরের শত্রুদের পক্ষে নেপাল আক্রমণ করা বেশ কঠিন হবে। তা ছাড়া উপত্যকার মধ্যে চাই শক্তিশালী রাজা। বাইরের শত্রু এলে, পাহাড় পর্বতের রাজ্যগুলোয় না গিয়ে আগে উপত্যকা আক্রমণ করবে। ১৭৪২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৬৮ খৃস্টাব্দ। সময়টা কম নয়। পুরো ছাব্বিশ বছর ধরে পৃথ্বীনারায়ণ শাহ নিজেকে নানাভাবে প্রস্তুত করেছেন। উদ্দেশ্য, কাঠমান্ডু উপত্যকা জয় করে একটা বিরাট নেপাল রাজ্য তৈরি করা।

এর মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষের বহু পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজরা দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমকে বকসারের যুদ্ধে হারিয়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী আদায় করেছে। মুহম্মদ শাহের সময় নাদির শাহের দিল্লি লুণ্ঠনের পর যেটুকু বাদশাহী ধন-সম্পদ ছিটেফোঁটা পড়েছিল, দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বে সেটুকু তুলে নিয়ে গেছেন আহমদ শাহ আবদালি। বাংলার নবাব নাজিম সৈফুদ্দৌলা ইংরেজদের অধীনে বেতনভোগী মুর্শিদাবাদের জমিদার। দশম গুরু গোবিন্দ সিং এর পর খালসা শিখদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বান্দা বাহাদুর। বান্দা বাহাদুর মোগল সম্রাট ফারুকশিয়রের হাতে নিহত হবার পর থেকে শিখ খালসাদের নাম আর শোনা যায় না। আহমদ শাহ আবদালির হাতে মার খেয়ে মারাঠা শক্তিও প্রায় হতবল। বালাজী বাজী রাওয়ের ছেলে চতুর্থ পেশোয়া মাধবরাও চেষ্টা করছেন কী করে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত মারাঠাদের গৌরব আবার ফিরিয়ে আনা যায়। গুর্খাবীর পৃথ্বীনারায়ণ শাহ সব খবরই রেখেছেন। শুধু খবর রাখা নয়, মনে দারুণ উত্তেজনা। দেরি করার সময় নেই। বয়স চল্লিশের কোঠার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। যা কিছু করার সবই পঞ্চাশের আগে করে ফেলতে হবে। পৃথ্বীনারায়ণ শাহ গুর্খা রাজ্য থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর কী ঘটেছিল সে তো আগেই বলা হল। তবে তিনি আর গুর্খা রাজ্যে ফিরলেন না। পূর্ব নেপালের মোরাং, কিরাত ও ইলাম রাজ্য জয় করে যখন সিকিমে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ঠিক সেই সময় ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দেবীঘাটে মারা গেলেন। শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ প্রতাপ সিং শাহ হলেন নেপালের নতুন রাজা।

মহারানী ঐশ্বর্য

মাত্র তিন বছরের তাঁর রাজত্বকাল। ১৭৭৪ খৃঃ থেকে ১৭৭৭ খৃঃ। চব্বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসে মারা গেলেন সাতাশ বছর বয়সে। এর মধ্যে কাকা দলজিৎ সিং ও ভাই বাহাদুর শাহের চক্রান্ত। চক্রান্ত ধরা পড়লে ভাইকে বন্দী করে পরে রাজ পুরোহিতের অনুরোধে বিহারের বেতিয়ায় নির্বাসিত করেন। কাকা দলজিৎ সিং কোথায় পালিয়ে গেলেন, সে খবর আর পেলেন না।

প্রতাপ সিং শাহ মারা যাওয়ার পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর দু বছরের শিশু রানা বহাদুর শাহ। রিজেনট হলেন প্রতাপ সিং শাহের বিধবা রানী রাজেন্দ্র লক্ষ্মী। রানীর মনে হল অনাত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষীর চেয়ে আত্মীয় কুচক্রী ভাল। অবশ্য এটা রাজপ্রাসাদে বাহাদুর শাহের সমর্থকদের উপদেশ। তাই নির্বাসিত দেবরকে বেতিয়া থেকে ডেকে পাঠালেন। যাতে রাজকার্য পরিচালনায় তিনি বৌদিকে দুঃসময়ে সাহায্য করেন। বাহাদুর শাহ কাঠমান্ডুতে ফিরে এলেন।

নেপালের ইতিহাসে বাহাদুর শাহ একজন খ্যাতনামা পুরুষ। নেপালের সীমানা বাড়াতে গিয়ে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেছিলেন। এর ফলে নেপালকে চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হয় ও চুক্তি হয় যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পিকিং-এ নেপালের প্রতিনিধি দল পাঠাতে হবে।

চীনের সঙ্গে গন্ডগোল শুরু হওয়ায় নেপাল সরকার ভারতের গভর্নর জেনারেল লরড করনওয়ালিসের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। লরড করনওয়ালিস সৈন্য না পাঠিয়ে করনেল কারক প্যাটরিককে চীনের সঙ্গে নেপালের শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করার জন্য পাঠালেন। করনেল নুয়াকোটে পৌঁছানর আগেই চীন ও নেপালের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়ে যায়। করনেল কারক প্যাটরিক সঙ্গে সঙ্গে ভারতে না ফিরে কাঠমান্ডু উপত্যকায় দেবদেবীর মন্দির ও আরও অনেক দর্শনীয় জায়গা ঘুরে বেড়ালেন। ভারতে ফিরে গিয়ে করনেল কারক প্যাটরিক কাঠমান্ডু উপত্যকা ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখলেন, There are as many temples as there are houses and as many idols as there are men (যতগুলি বাড়ি, ততগুলি মন্দির ও যত মানুষ, তত বিগ্রহ)।

করনেল কারক প্যাটরিক কাঠমান্ডু উপত্যকার প্রথম ইংরেজ আগন্তুক। রানা বাহাদুর শাহ সাবালক হওয়ার পরেই নেপালে গুর্খা রাজত্বের দুর্দিন শুরু হল। এর মধ্যে রাজেন্দ্র লক্ষ্মী মারা গিয়েছেন। রানা বাহাদুর আর কাকার কথা-মত চলতে রাজি হলেন না। নিজে নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি করলেন। তাঁদের মন্ত্রণায় কাকাকে বন্দী করে প্রাসাদে রাখলেন। বাহাদুর শাহ বন্দী দশায় মারা যান। কেউ কেউ বলেন, হত্যা করা হয়। রানা বাহাদুর শাহ এখন মুক্ত রাজপুরুষ। কুচক্রীদের হাতের পুতুল। দুই রানী থাকতে কান্তাবতী নামে আর একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে রানী করলেন। গিরবন যুদ্ধ বিক্রম শাহ কান্তাবতীর সন্তান। এর পর অনেক বড় ইতিহাস।

রানা বাহাদুর শাহ আদরের রানী কান্তাবতীর শিশুপুত্র গিরবন যুদ্ধ বিক্রম শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে ও বড় রানী রাজরাজেশ্বরীকে রিজেনট নিযুক্ত করে সন্ন্যাসীর পরিধান পরে কান্তাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে পশুপতিনাথের কাছে মৃগস্থলী ও তারপর ভারতের কাশী। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারলেন না। এর মধ্যে রানীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচে।

আবার কাঠমান্ডু ফিরে এলেন। নাবালক পুত্র গিরবন যুদ্ধ বিক্রম শাহ নেপালের রাজা। রানা বাহাদুর শাহ আর রাজা হতে চাইলেন না। নিজেকে করলেন প্রধানমন্ত্রী। রানা বাহাদুর শাহ মারা যাওয়ার পর তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর ভীমসেন থাপা হলেন প্রধানমন্ত্রী ও রানা বাহাদুর শাহের সবচেয়ে ছোট রানী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী হলেন রিজেনট। গিরবন যুদ্ধ বিক্রম শাহ দের আর সাবালক হননি। আঠার বছর বয়সে শিশুপুত্র রাজেন্দ্র বিক্রম ও দুই নাবালিকা রানী রেখে মারা গেলেন।

দু বছর বয়সের রাজেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ নেপালের মহারাজাধিরাজ, ঠাকুমা ত্রিপুরা সুন্দরী রিজেনট ও ভীমসেন থাপা প্রধানমন্ত্রী।

ভীমসেন থাপা সুদীর্ঘ তিরিশ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থেকেছেন। রাজেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ সাবালক হতে ভীমসেন থাপাকে শুধু যে সরিয়ে দেওয়া হল তাই নয়, বন্দী করে রাখা হল। অপমানে তিনি নাকি বন্দী দশায় আত্মহত্যা করেন।

ভীমসেন থাপার পর একে একে প্রধানমন্ত্রী হলেন রানা জঙ্গ পান্ডে, রঙ্গনাথ পোড়েল, পুষ্কর শাহ, দ্বিতীয়বারের জন্য রানা জঙ্গ পান্ডে, চৌতারিয়া ফতে জঙ্গ শাহ, মাথবর সিং থাপা, পুনরায় চৌতারিয়া ফতে জঙ্গ শাহ ও সবশেষে নেপালে রানাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গ বাহাদুর রানা (পূর্ব নাম বীর নরসিং কুনোয়ার)।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে ভীমসেন থাপার পতনের পর থেকে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে জঙ্গ বাহাদুর রানা প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত এই নয় বছরের মধ্যে সাত জন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ও গিয়েছেন।

এর মধ্যে রাজপ্রাসাদে চলেছে প্রাক্তন ও বর্তমান রানীদের মধ্যে উত্তরাধিকারের ষড়যন্ত্র। কোন রাজপুত্র সিংহাসনে বসবে তাই নিয়ে দলাদলি। প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে থাপা, পান্ডে, চৌতারিয়া ও বাসনেতদের মধ্যে ঝগড়া। সেনাপতিদের মধ্যে ক্রমাগত চেষ্টা, খামখেয়ালী নাবালক রাজাদের প্রিয়তমা যুবতী রানীদের প্রিয়তম লোক হয়ে পদোন্নতি করা যায় কীভাবে। রাজারা নাবালক হলে কী হবে, রানীরা প্রায় সবাই সাবালিকা। নেপালের ইতিহাসে ঠিক এইভাবে আবির্ভূত হলেন জঙ্গ বাহাদুর রানা, যিনি ছিলেন প্রথমে রাজা রাজেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের রাজকীয় শিকার দলের একজন শিকারী। পরে সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়ে যুবরাজ সুরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের দেহরক্ষী। অন্তঃপুরে আসা যাওয়ার সুযোগ পেয়ে রাজেন্দ্র বিক্রমের ছোট রানী রাজ্যলক্ষ্মী দেবীর প্রিয়ভাজন হলেন। ছোট রানীকে গোপনে আশ্বাস দিলেন, নেপালের সিংহাসনে যুবরাজ সুরেন্দ্র বীর বিক্রমকে বাদ দিয়ে ছোটরানীর ছেলে রণেন্দ্র বীর বিক্রমকে বসতে সাহায্য করবেন। কিন্তু তাঁর আর একটু রাজকীয় ক্ষমতা চাই। মানে দেহরক্ষী পদটা নিম্নস্তরের। সেনাপতি বা ঐ রকম কোন একটা পদ পেলে মন্দ হয় না।

রাজা রাজেন্দ্র বীর বিক্রম ছোট

রানীর কথায় ওঠেন বসেন। জংগ বাহাদুরকে ছোট রানীর অনুরোধে সেনাপতি করলেন। জংগ বাহাদুর থামলেন না। রাজার কানে লাগিয়ে দিলেন, অন্য এক সেনাপতি গগন সিং ছোটরানীর বিশেষ প্রিয়জন। সুতরাং রাজা ভাবলেন, হয়ত ভবিষ্যতে রানীর এই প্রিয়জনটিকে সরাতে গেলে জংগবাহাদুরের প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে জংগ বাহাদুর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাথবর সিং থাপাকে মানে নিজের মামাকে ছোট রানীর নির্দেশে হত্যা করেছেন। এক সময় মাথবর সিং থাপা ছোটরানীর প্রিয়জন ছিলেন। গগন সিংকেও পৃথিবী ছেড়ে যেতে হল। ছোট রানী রাজ্যলক্ষ্মী দেবী প্রিয়জনের হত্যার খবর পেয়ে জংগ বাহাদুরকে আদেশ করলেন, হত্যাকারীকে সাজা দেওয়া হোক। তিনি জানতেন না যে হত্যাকাণ্ডের নায়ক, স্বয়ং জংগ বাহাদুর রানা।

রানীর নির্দেশমত জংগ বাহাদুর সাজা দিয়েছিলেন। এক জনকে নয়। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের সেপটেমবর মাসে পৃথিবীর একটি বৃহত্তম গণহত্যা সংঘটিত হল। মিথ্যা খবর দিয়ে বড় বড় রাজকর্মচারীদের মাঝরাতে রাজপ্রাসাদে ডেকে এনে হত্যা করা হল।

তারপর থেকে জংগ বাহাদুর রানা নেপালের সবকিছু। ছোট রানীর ছেলের কপালে নেপালের সিংহাসন জুটল না। জংগ বাহাদুর রানা যুবরাজ সুরেন্দ্র বীর বিক্রমকে সিংহাসনে বসালেন। রাজা রাজেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ কাশীতে নির্বাসিত হলেন। পরে তিনি আবার নেপালে ফিরে আসেন ও জংগ বাহাদুর রানার হাতে বন্দী হন।

নাবালক মহারাজাধিরাজ সুরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের সিংহাসনের নিচে বসে জংগ বাহাদুর রানা তাঁর কাছ থেকে সব কিছু ক্ষমতা আদায় করলেন। এমনকি প্রজাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পর্যন্ত। এ ছাড়া রানা পরিবারের বংশপরম্পরায় প্রধান মন্ত্রিত্ব ও রাজপরিবারের সংগে বিয়ের সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রী নামটার মধ্যে কেমন যেন চাকরি চাকরি গন্ধ। তাই জংগ বাহাদুর রানা মহারাজাধিরাজের কাছ থেকে মহারাজা উপাধি নিলেন। নেপালের মহারাজাধিরাজ স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, তিনি থাকবেন মন্দিরে, তাঁর পক্ষে কি রক্ত মাংসে গড়া মানুষ যা করে, তা শোভা পায়? তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রীর তৈরি রাজকীয় নথিপত্রে প্রয়োজন মত সই করবেন। এমন একটা মনোভাব তৈরি করাতে সক্ষম হলেন রাজার কাছে। ফলে রাজা নিজে দৈনন্দিন রাজকাজ থেকে

দূরে সরে পড়লেন। সেই থেকে নেপালের রাজা শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ রাজপ্রাসাদে বন্দীও হলেন। আর নেপালের কর্ণধার হলেন শ্রীতিন মহারানা জংগ বাহাদুর রানা ও তাঁর ভাবী বংশধরগণ। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দ থেকে প্রায় একশ পাঁচ বছর নেপালের জনসাধারণের সংগে পৃথিবীর লোকের যোগাযোগ রইল না। সবাই জানতেন, নেপালের রাজা মানেই নেপালের শ্রীতিন মহারানা। আর নেপালের যিনি আসল রাজা, সেই শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ যে সোনার খাঁচায় বন্দী, সে কথা কেউ জানতেন না। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তীর্থযাত্রীরা পশুপতিনাথ, স্বয়ম্ভূনাথ, বোধনাথ প্রভৃতি মন্দির দর্শনে আসতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সাহস করে জিজ্ঞেস করতেন না, শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ কোথায়? নেপালের জনসাধারণেরও বিষ্ণুর অবতার শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজের মন্দিরে মানে হনুমান ঢোকা রাজপ্রাসাদ ও পরে নারায়ণ হিতি দরবারে প্রবেশ নিষেধ। ইন্দ্রযাত্রা বা অন্য কোন যাত্রায় অন্যান্য দেবদেবীর সংগে রথে বা হাতির পিঠে চড়ে শহর পরিক্রমা করার সময় তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেতেন।

এইভাবে সোনার খাঁচায় একে একে রাজা সুরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ, ত্রৈলোক্য বীর বিক্রম শাহ (যুবরাজ অবস্থায় মারা যান। অনেকে বলেন রহস্য মৃত্যু), পৃথ্বী বীর বিক্রম শাহ ও ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ দীর্ঘ একশ পাঁচ বছর কাটালেন।

১৯৫০ খৃস্টাব্দের নভেমবর মাসে নেপালের জনসাধারণ জানলেন তাঁদের আরাধ্য দেবতা শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ সপরিবারে কাঠমাণ্ডু ছেড়ে দিললি চলে গিয়েছেন। শ্রীতিন মহারাজা মোহন সামশের জংগ বাহাদুর রানা নারায়ণ হিতি দরবারে ভুলে ছেড়ে যাওয়া শিশু রাজকুমার জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহকে নেপালের সিংহাসনে বসিয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব রাজা ত্রিভুবনের নাতি ও যুবরাজ মহেন্দ্রর

বিক্রম শাহের ছোট ভাই)। এরপর থেকে শুরু নেপালের আধুনিক ইতিহাস।

১৯৫১ খৃস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি, সোমবার 'ফ্রি নেপালে' কে সি খান্না লিখলেন, A king leads the revolution—flies from luxury and bondage of the palace—Thrilling story of Nepal king's escape to India—on 11th November, 1950, Tribhuban landed at Delhi.

পরের খবর ১৫ ফেবরুয়ারি, ১৯৫১ খৃস্টাব্দে Arrival of Tribhuban at Kathmandu. রানাদের চোখে ধুলো না ছিটিয়ে, স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে রাজা ত্রিভুবনের সপরিবারে সোনার খাঁচা থেকে পালিয়ে যাওয়া শুধু নেপালের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়।

১৯৫১ খৃস্টাব্দের ১৮ ফেবরুয়ারি রাজা ত্রিভুবন রাজকীয় ঘোষণায় সবাইকে জানালেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা সুরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ রানা প্রধানমন্ত্রী জংগ বাহাদুর রানাকে যেসব চিরস্থায়ী ক্ষমতা দিয়েছিলেন তা বাতিল করা হল।

যদিও শেষ রানা প্রধানমন্ত্রী মোহন সামশের জংগ বাহাদুর রানাকে কিছুদিন অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। শ্রীতিন মহারানা পরিস্থিতি বুঝে ফেলেছেন। দেরি না করে নারায়ণ হিতি দরবারে গিয়ে রাজার কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন, মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা। নেপালে রাজার নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। রাজা ত্রিভুবন ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে জুরিখে মারা গেলেন। মহারাজাধিরাজ হলেন যুবরাজ মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ।

১৯৫৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৭২ খৃস্টাব্দ, দীর্ঘ সতের বছরের শাসনে রাজা মহেন্দ্র নেপালের উন্নতির জন্যে বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁর সময়ে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে টংকাপ্রসাদ আচার্য, কুনোয়ার ইন্দ্রজিৎ সিং, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা, সূর্য বাহাদুর থাপা ও কীর্তিনিধি বিস্তা। অন্য বহু ভাল কাজের মধ্যে নেপালের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। ১৯৭২ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাওয়ায় নেপালের অধিপতি হলেন সাতাশ বছরের যুবরাজ বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ। দু বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭০ খৃস্টাব্দে লেঃ জেঃ কেন্দ্র সামশের জংগ বাহাদুর রানার বড় মেয়ে ঐশ্বর্য রাজ্যলক্ষ্মী দেবীর সংগে বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের বিয়ে হয়। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক।

রাজা বীরেন্দ্র দারজিলিং এর সেন্ট জোসেফ, ইংলনডের ইটন, টোকিও ও আমেরিকার হারভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন।

রাজা হওয়ার পর থেকেই বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েও রাজা ত্রিভুবন ও রাজা মহেন্দ্র পরিকল্পিত সব কটি উন্নয়ন কার্যক্রম রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন। রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের দের বছর রাজত্বে, ভবানী মন্দিরে। সাংবাদিকেরা তাঁর চোখেমুখে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। ঠাকুর্দা ত্রিভুবন পরিকল্পিত ও বাবা মহেন্দ্র প্রবর্তিত দলবিহীন পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রই একমাত্র নেপাল দেশকে উন্নতির চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে বলে তিনিও বিশ্বাস করেন। এই তো মাত্র কদিন আগে গত ৩০ জুলাই শনিবার, নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী লোকেন্দ্র বাহাদুর চাঁদ কাঠমাণ্ডুর পঞ্চায়েত বিশ্লেষণ কেন্দ্রে বললেন, এই যে জাতীয় গণনির্দেশ ও নেপালের সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনের অনুশীলন, এটা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বললেন, শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজের প্রাণবন্ত ও সক্রিয় নেতৃত্বের জন্যেই এরকম বৃহত্তর উন্নয়নের কাজগুলো সাফল্যের সংগে সম্পন্ন হয়েছে (The Rising Nepal পত্রিকার ৩১ জুলাই, ১৯৮৩ খৃস্টাব্দের খবর)। একজন শান্ত, সরল, ধর্মভীরু নেপালী ভদ্রলোক খবরটা শুনে বললেন, শ্রীপঞ্চ সরকার ব মহারাজাধিরাজ চিরকাই সময় বাঁচোস (শ্রীপঞ্চ সরকার ও মহারাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী হোন)। □

আলোকচিত্র : নেপাল রাজকীয় সরকারের তথ্য বিভাগের সৌজন্যে

নেপালে রাজার নির্দেশেই কি প্রধানমন্ত্রী সূর্যবাহাদুর থাপা সরে দাঁড়ালেন?

অরবিন্দ ঘোষ

গত ১১ ও ১২ জুলাই নেপালের পঞ্চায়েতী রাজনীতিতে এক বিরাট পটপরিবর্তন ঘটে গেল। এই পরিবর্তন আকস্মিক না হলেও অভূতপূর্ব তো বটেই। ১১ জুলাই নেপালের রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী সূর্যবাহাদুর থাপার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ১০৭-১৭ ভোটে গৃহীত হল। পরের দিন প্রস্তাবক লোকেন্দ্র বাহাদুর চন্দ ১০৭ জন রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত সদস্যের সমর্থনে ও কোনরকম বিরোধিতার মোকাবিলা না করেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক সূর্যবাহাদুর থাপা গত চার বছর ধরে প্রধানমন্ত্রিত্ব পদে আসীন থেকেছেন। তাঁকে ৪৪ বছর বয়স্ক লোকেন্দ্র বাহাদুর চন্দ যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছিনিয়ে নিলেন। কেবল বাইরের লোকের পক্ষেই নয়, অনেক নেপালবাসীর কাছেও নাটকের পরিণতি একটু আশ্চর্যজনক। কেননা তাঁরা এতদিন ধরে দেখে এসেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ বা বরখাস্ত করাটা কেবলমাত্র রাজপ্রাসাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। গত ৩২ বছর ধরে শ্রীপঞ্চ মহারাজাধিরাজ (নেপালের প্রত্যেক রাজার নামের আগে পাঁচবার 'শ্রী' লিখতে হয়) ত্রিভুবন, তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও মহেন্দ্রর পুত্র বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেবই প্রধানমন্ত্রীর পদে তাঁদের পছন্দমত রাজনৈতিক নেতাকে নিয়োগ করেছেন ও ইচ্ছামত তাঁদের বরখাস্তও করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা, যাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করে ও ভালবেসে 'বি পি' বলে ডাকতেন। তিনি সত্যিকারের নির্বাচনে জয়লাভ করে ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্র তাঁকেও বরখাস্ত করেছিলেন ১৯৬০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। সে অবশ্য অন্য কাহিনী।

তবে আজকের কাহিনীর সূত্রপাত কিন্তু ঐ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬০ সালেই। বি পির নেপালী কংগ্রেস (ভারতের কংগ্রেস দলের শাখা নয়) সরকারকে বরখাস্ত করে রাজা মহেন্দ্র দেশে 'দলবিহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেন। তিনি আপন নেতৃত্বে যে নয় সদস্যের মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করেন, তারই অন্যতম সদস্য ছিলেন সূর্যবাহাদুর থাপা। লিখিতভাবে না হলেও রাজার প্রিয়পাত্র ও নেপালী কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তুলসী গিরিই কার্যত এই মন্ত্রিসভায় প্রধান ছিলেন। সাধারণত ক্যাবিনেটের বৈঠকে রাজা স্বয়ং সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তুলসী গিরিই এই দায়িত্ব পালন করতেন।

১৯৬২ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহারাজাধিরাজ আগের সংবিধান বাতিল করে পঞ্চায়েত সংবিধান দেশকে প্রদান করেন। এই পঞ্চায়েত সংবিধান অনুসারেই গত ২১ বছর ধরে দেশের শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। তবে তা তিনবার সংশোধন হয়ে গেছে। এই সংবিধানে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী বলে কোন পদের ব্যবস্থা ছিল না। ছিল মন্ত্রিপরিষদের অধ্যক্ষের পদ। তুলসী গিরি এই পদ অলংকৃত করে ছিলেন বছর তিনেক। মজার ব্যাপার এই যে, যখন সংবিধানের প্রথম সংশোধনে (জানুয়ারি, ১৯৬৭) প্রধানমন্ত্রীর পদ স্থাপনা করা হল তখন কিন্তু রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র তুলসী গিরি আর মন্ত্রিসভাতে নেই। তাঁর বদলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন সূর্যবাহাদুর থাপা। এই পদে তিনি ১৯৬৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ছিলেন।

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎই একদিন সকালে রেডিও নেপাল ঘোষণা করল, শ্রীথাপা পদত্যাগ করেছেন। আট বছরের ওপর মন্ত্রিসভায় থাকার পর অন্য কাউকে মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ দেবার জন্যই নাকি তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। এরপরে কীর্তিনিধি বিস্তা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত শ্রী থাপা রাজনৈতিক নির্বাসনে ছিলেন। এর মধ্যে তুলসী গিরির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় (১৯৭৬-৭৮) থাপাকে ১৮ মাস জেলে কাটাতে হয়। থাপার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় আবার গিরিও জেলে গিয়েছিলেন।

১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি আশ্চর্যজনকভাবে নেপালের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই ফাঁসির বিরুদ্ধে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা নিয়ে ছাত্র আন্দোলন দানা পাকিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত খোদ কাঠমাণ্ডুতেই ছাত্ররা সরকারি কাগজ 'গোরখাপত্র' ও 'রাইজিং নেপাল'-এর অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ছাত্ররাই প্রধানত গত ১৮ বছর ধরে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করে পূর্ণাংগ প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য নিরলসভাবে লড়াই করে এসেছে। সব সময়ই ছাত্ররা রাজার একচ্ছত্র শাসনের বিরোধিতা করে এসেছে। তারা পঞ্চায়েতী প্রজাতন্ত্রকে নিরংকুশ রাজতন্ত্র বলে এসেছে। কেননা আজও এই ব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। এখনও নেপালে সমস্ত রাজনৈতিক দলই বেআইনী।

১৯৭৯ র এপ্রিল ও মে মাসের ঘটনায় হাওয়ার গতি বুঝে রাজা বীরেন্দ্র ঘোষণা করলেন যে, তিনি ১৯৮০তে রাজ্যব্যাপী গণভোট নেবেন। গণভোটের উদ্দেশ্য, দেশের লোক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চায় নাকি অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা চায় তা জানা। সেই সময় দ্বিতীয়বারের জন্য কীর্তিনিধি বিস্তা নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন।

রাজা বীরেন্দ্রর বাড়ি

তাঁকে সরিয়ে দিয়ে রাজা বীরেন্দ্র সূর্যবাহাদুর থাপাকে আবার রাজ্যের শাসনব্যবস্থার ভার দিলেন।

থাপা চিরকাল পারলামেনটারি ব্যবস্থার বিরোধী। এই গণভোটে অধিকাংশ ভোটদাতারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সমর্থন করায় প্রজাতন্ত্র সমর্থকেরা ভীষণ ধাক্কা খেলেন।

বীরেন্দ্র এর মধ্যে আবার ঘোষণা করলেন যে, ১৪০ জন সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতের জন্য ১৯৮১তে যে নির্বাচন হবে তার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করা হবে।

পারলামেনটারি প্রথার সমর্থকরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।' কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন পারটি ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন। কিন্তু পঞ্চায়েত সমর্থকদের মধ্যেই দুটো ভাগ হয়ে যায়। একদিকে থাপার সমর্থকরা, অন্যদিকে লোকেন্দ্র বাহাদুর চন্দ, প্রকাশচন্দ্র লোহানী, পশুপতি শমশের রানা ও বি পির বৈমাত্রেয় বড় ভাই মাতৃকা প্রসাদ কৈরালা।

নির্বাচনে কিন্তু থাপার সমর্থকরাই বেশি সংখ্যক আসন পেয়ে যান। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৪০ জন রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ভোটে থাপা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। লোকেন্দ্র বাহাদুর তখন কিন্তু থাপার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি।

কিন্তু গত দু বছর ধরে তাঁরা থাপা সরকারের 'অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির' বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। তারা এই বছরের প্রথম দিকে জনকপুর, লাহান ও কাঠমাণ্ডুতে বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। এই সভাগুলোতে জনসমাবেশের বিশালতা দেখে অনেকেই আশ্চর্য হন।

তারপর এল জুনের শেষ দিকে রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতের অধিবেশন। আর এই অধিবেশনে চন্দ পেশ করলেন থাপার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। থাপার মন্ত্রিসভার সদস্যরা একে একে পদত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অর্থমন্ত্রী যাদবপ্রসাদ পন্থ বাজেট পেশ করার পর তা পাশ হবার আগেই পদত্যাগ করলেন। শেষ পর্যন্ত ১১ জুলাই ১০৭-৯৯ ভোটে পরাজিত হয়ে থাপা পদত্যাগ করলেন ও চন্দ তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হলেন।

সয়ম্ভুনাথ বুদ্ধ মন্দির

এই পট পরিবর্তনের কারণ কী? অনেকেই মনে করেন যে, দেশের অর্থনীতির ব্যাপক বিফলতার জন্য থাপা সরকারকেই দায়ী করে মহারাজাধিরাজ বীরেন্দ্র তলে তলে চন্দকে উসকে দিয়েছেন। এটা হয়ত পুরোপুরি সত্য নয়, কিন্তু আমাদের এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, চন্দ বা তাঁর সমর্থকেরা কেউই পারটি ব্যবস্থার সমর্থক নন ও সকলেই রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে রাজাই একমাত্র ভরসা। কাজেই সূর্যবাহাদুর হোন বা লোকেন্দ্র বাহাদুরই হোন রাজার ক্ষমতাতে কোনো আঁচড়ই পড়বে না। এ কথাটাও ভুললে চলবে না যে আজও নেপালের সার্বভৌমত্ব রাজার ওপরই নির্ভর করে, জনসাধারণের ওপর নয়।

ইচ্ছে করলে মহারাজাধিরাজ বীরেন্দ্র সূর্যবাহাদুরকে বরখাস্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে রাস্তা নেননি। অন্য প্রজাতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থার মত নেপালেও তিনি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করলেন। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার কাঠামোতে এ একটা সম্পূর্ণ নতুন ও অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু এটা দিয়ে রাজা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর দেশে এখন প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থাই চালু। এতে বিশ্বে তাঁর সম্মান একটু বাড়বে। কেউই তাঁকে একচ্ছত্র শাসনকর্তা বলবে না।

দ্বিতীয়ত, তিনি নিজের দেশের লোকদেরও দেখিয়ে দিলেন যে, পারটি ছাড়াও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালান যায়। তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বদল করেন না, জনপ্রতিনিধিরাই এই কাজটা করেন। তা ছাড়া নির্বাচন তো বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কাজেই রাজনৈতিক পারটির দরকারই বা কী?

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, পারটিগুলোকে রাজনীতিতে খোলাখুলিভাবে নামতে দিতে বাধাটা কোথায়? গত ২২ বছরের কঠোর শাসনেও কিন্তু পারটিগুলো শেষ হয়ে যায়নি। কৈরালার নেপালী কংগ্রেস আজও জীবিত। যদিও বি পি এক বছর আগে মারা গেছেন। কমিউনিসট পারটিগুলোও দিব্যি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। নেপালী কংগ্রেস তো এখন প্রায় প্রকাশ্যে জনসভা করে। রাজা তা দেখেও কিন্তু চুপ করে থাকেন। অবস্থা এমন যে এখন পারটিগুলোকে আসরে নামতে দিলেই হয়। বিশেষত যখন দেশের বৃহত্তম দল নেপালী কংগ্রেস বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা রাজতন্ত্র বিরোধী হলেও রাজার বিরোধী নয়। তাঁরা সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন।

কিন্তু রাজা বীরেন্দ্র কি পুরোপুরি পারলামেনটারি প্রথা আবার চালাতে দেবেন? তিনি কি ঘড়ির কাঁটা ২২ বছর পেছনে ঘুরিয়ে দেবেন? অনেকে কিন্তু বলেন যে ১৫ ডিসেমবর ১৯৬০ সালের আগেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় না। তাঁরা বলেন সেদিন থেকেই ঘড়ি স্তব্ধ। এখন দরকার প্রজাতন্ত্রের দম দিয়ে প্রগতির বন্ধ ঘড়িকে আবার চালান। □

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

নাগারকোট [illegible] থেকে [illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা—৪

রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি

নির্মল কুমার রায়

১৮৫২ খৃস্টাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুরে ১৬/১৭ বছর বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (তৎকালীন গদাধর) প্রথম কামারপুকুর থেকে কলকাতায় আসেন এবং রামকুমারের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে যোগদান করেন। এই সময় রামকুমার তাঁকে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং পল্লীর বিভিন্ন গৃহে তাঁকে গৃহ-দেবদেবীদের পূজায় নিযুক্ত করেন। ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতেও এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺নারায়ণ পূজা করতেন এবং এই উপলক্ষেই সেই সময় এই রাজ বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের ১ম ভাগের উপক্রমণিকায় এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থেও এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে। 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থের নানা ভাগে, বিশেষত দশম ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং পঞ্চদশ ভাগের অষ্টম ও দ্বাবিংশ অধ্যায় দুটিতেও এই মিত্র বাড়িতে পূজার বিষয়ে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই রাজা দিগম্বর মিত্রের ঝামাপুকুরের এই বাড়িটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির বাহকরূপে মূল্যবান।

রাজা দিগম্বর মিত্র সম্পর্কে মাসটারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি বর্ণনা—"দিগম্বর মিত্র ব'লে কলকাতায় একজন জমিদার ছিলেন। পনের বিশ হাজার টাকা আয় মাসে মাসে। গরীব অবস্থা থেকে উঠেছেন দোকান করে। আস্তাবল ভরা ঘোড়া আর গাড়ী। কিন্তু ছেলেদের অতি Simple (সরল-ভাবে) জীবনযাপন করতে শিখিয়ে-ছিলেন। হেঁটে হেঁটে হিন্দু স্কুলে যেতো—এক হাতে বই, আর এক হাতে ছাতাটি হাতে ক'রে নিতে হবে। অত গাড়ী ঘোড়া—কিন্তু তা' চড়তে দেবেন না। বলতেন, 'কেন, মানুষ কি পায়ে হেঁটে চলে না?' পোষাক-পরিচ্ছদে, খাওয়া-দাওয়ায় অতি সাধারণ ভাব। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'ছেলেদের এভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার—নয়তো সম্পত্তি রাখতে পারবে না। তারপর যখন বড় হবে, বুঝবে সব, তখন যা ইচ্ছা তা করুক। ছেলেবেলায় কঠোর শাসনে—Strict discipline-এ রাখতে হয়।' নিজে গরীব ছিলেন তাই Simplicity (জীবনযাত্রায় সরলতার) কত দরকার সব বিষয়ে তা বুঝেছিলেন।" (শ্রীম-দর্শন, ১ম ভাগ – ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)।

প্রথম জীবনে এই দিগম্বর মিত্রের বাড়িরই পূজারী ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব দরিদ্র অবস্থা থেকে শ্রীমিত্র নিজের অধ্যবসায়ে এত ধনশালী হয়ে ওঠেন এবং দেশের বহুদায়িত্বপূর্ণ কাজে এত নিযুক্ত থাকেন যে, সরকারের কাছ থেকে তিনি সি এস আই, 'রাজা' প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। অবশ্য মাসটারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দিগম্বর মিত্রের ঝামাপুকুরের রাজবাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার এখন বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই এবং আস্তাবলভরা ঘোড়া বা গাড়িরও কোন অস্তিত্ব নেই। বিরাট প্রাসাদের অধিকাংশই বিক্রয় হয়ে গেছে এবং প্রাসাদ সংলগ্ন স্থানে নতুন নতুন বাড়িও তৈরি হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে (বাড়ির বামদিকের ভাগে) অবশ্য পুরাতন সেই বনিয়াদীর চিহ্ন বিদ্যমান। বাড়ির বর্তমান প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরের সুন্দর বাঁধানো উঠানে গেলে বামদিকে অতি সুন্দর ও অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত শ্বেতপাথরের দালান, এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক ইদানীংকালে 'ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই দালানে মনোরম পরিবেশে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। এখানে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্ম প্রসঙ্গ ও ভজনের ব্যবস্থা আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ বা অন্যান্য মনীষীগণও মাঝে মাঝে এখানে ধর্ম প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন, ঠাকুরের জন্মোৎসবও মর্যাদা সহকারে এখানে পালন করা হয়। এ ছাড়াও কিছু কিছু সেবাকাজেরও এখানে ব্যবস্থা আছে। বাড়ির দোতলায় ঠাকুর ঘরে, শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিত সেই ৺নারায়ণ শিলাও নিত্য পূজা করা হয়, অবশ্য তার ব্যবস্থাপনায় আছেন দিগম্বর মিত্রের দৌহিত্র বংশীয়গণ।

দিগম্বর মিত্রের এই বাড়িটি 'ঝামাপুকুর রাজবাড়ি' নামে খ্যাত, ঠিকানা—১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯, পথ নির্দেশ—উত্তর কলকাতার বিধান সরণিতে অবস্থিত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির অপর প্রান্তে পূর্বদিকে বেচু চ্যাটারজি স্ট্রিটে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই বাঁদিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আর ডানদিকে ঝামাপুকুর লেন,—এই রাস্তায় ঢুকে কিছুটা এগুলেই বাঁদিকে রাস্তার ওপরেই এই 'ঝামাপুকুর রাজবাড়ি।' অপর দিকে কেশবচন্দ্র স্ট্রিট থেকে ঝামাপুকুর স্ট্রিটে ঢুকলে এই বাড়িটি ডানদিকে পড়ে। □

রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি

রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির ভিতর ঠাকুর দালান

আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

বোমবাই চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই ঘোড়দৌড়ের পেছনে টাকা খাটান

বোমবাই থেকে কলিন পাল

জি পি সিপ্পি দুটি ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া। তিনি ছবি প্রযোজনা করেন দুরন্তগতিতে আর ঘোড়া ছোটান তেমনভাবেই। 'শোলে' করে তুঙ্গে উঠে গেছেন আর বোমবাই-এর প্রযোজকদের শীর্ষ সংগঠন অল ইনডিয়া ফিলম প্রোডিউসারস কাউনসিলের সভাপতিও হয়েছেন দুবার। তাঁর ঘোড়াগুলি যদিও ইনডিয়ান ডারবি অথবা ইনভিটেশান কাপ অব ইনডিয়ার মত তেমন সম্মান-জনক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়নি কিন্তু রয়েল ওয়েসটারন ইনডিয়া টারফ ক্লাব লিমিটেডের কমিটিতে তিনি পর পর দুবার নির্বাচিত হয়েছেন। একবার ১৯৮১র ডিসেমবর এবং দ্বিতীয়বার ৮২ ডিসেমবরে। ফিলম দুনিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম এই কমিটিতে এলেন।

চন্দ্রমোহন এবং মোতিলালের যুগ থেকেই চলচ্চিত্র জগতের সার্থকনামা ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে ঘোড়-দৌড়ের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। চন্দ্রমোহন এবং মোতিলাল দুজনেই রেসের ঘোড়ার মালিক ছিলেন কিন্তু ভাগ্য তাঁদের তেমন প্রসন্ন ছিল না এবং তাঁদের জীবনের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটেছে ঐ শ্লথগতি ঘোড়াগুলির জন্যই।

এই দুই অভিনেতার মত সবাই অবশ্য হতভাগ্য নন। অনেকেই জানেন স্বর্গত এস এস ভাসানের যে রেসের ঘোড়াটি ছিল সেটি তার অস্পার্বিস্তর ভাগ্য ফেরাতে পেরেছিল। ঘোড়াটির নাম ছিল জেমিনি। সেই অবস্থায় ভাসান আর কখনও ঘোড়দৌড়ের মাঠমুখো হননি। বুদ্ধিমানের মত পুরো টাকাটা তিনি অতঃপর জেমিনি স্টুডিও তৈরির কাজে লাগান এবং সেই স্টুডিওই তাঁকে চলচ্চিত্রজগতের খ্যাতিমান হিসাবে হাজির করে। স্টুডিওর নাম আগে নাকি ঘোড়ার নাম আগে সে ব্যাপারে কেউ অবশ্য নিশ্চিত নয়।

চল্লিশের দশকে ঘোড়দৌড়ের নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক চান্দুলাল শাহ। ১৯৪৬ সালে চলচ্চিত্র মহলের তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ডারবি জিতেছিলেন। আরও কয়েকবার জিতে তিনি রমরম করে এগোতে থাকেন। কিন্তু স্টক একসচেনজে গিয়ে রাতারাতি দুকোটি টাকা তাঁর লোকসান হয়ে যায়। রেসের যাবতীয় সম্পত্তি এবং রঞ্জিত মুভিটোন বিক্রি করে দিয়ে তিনি সেই লোকসান মেটান। বিরাট জুয়াড়ি হয়েও প্রত্যেকটি পাই পয়সা মিটিয়ে দেন। কিন্তু রেসের মাঠ কখনও ছাড়েননি। বাকি জীবন নিয়মিত সেখানে যেতেন গোহর বাঈকে সংগে নিয়ে। বাজি ফেলতেন কিন্তু মাঝে মধ্যে। অথচ আগে লাখ লাখ টাকা বাজি ফেলতেন, হেরে গেলে মুচকি হাসতেন, জিতলেও তাই। রেসের মাঠে হোক আর চলচ্চিত্রের কোন লোকই হোক, এখনও পর্যন্ত তাঁর মত রেসুড়ে আর হয়নি।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত শ্রীমতী মেরি এইচ ওয়াদিয়া আসা পর্যন্ত আর কেউ ছিলেন না। ওয়াদিয়াকে চিত্রজগতে এক সময়ে 'ভয়হীনা ওয়াদিয়া' বলা হত। তিনি ডারবি জিতেছিলেন। তারপর ১৯৭২ সালে আবার সঞ্জয় খান ইনডিয়ান ডারবি উইথ প্রিনস খারটুম জিতলেন। ঐ বছর মাদরাজে ইনভিটেশন কাপ অব ইনডিয়া জিতলেন তিনি এবং চলচ্চিত্র জগতে সঞ্জয় খানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই মর্যাদাজনক ট্রফিটি জিতেছেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জগৎ আর রেসের মাঠের কোন কাহিনীই মেহমুদকে ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না।

মেহেমুদের ঘোড়া হারড হেলড বেশ সম্ভাবনাময়। ১৯৬৯-এ এটি ২ হাজার ভারতীয় গিনি পেয়েছিল। সাপ্তাহিক স্ক্রিন-এ এ ঘোড়াটির প্রথম হওয়ার একটি ছবি সামনের পাতায় ছাপানর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন মেহমুদ। কিন্তু রবিবার ডারবি হলে শুক্রবার তা ছাপা যাবে না ফলে মেহমুদ এক সাজান রেসের দৃশ্য আগেই তোলার চেষ্টা করলেন। সেখানে ফটোগ্রাফার এলেন, ছবি তুললেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আসল ডারবিতে ঘোড়াটি চতুর্থ হল। এদিকে সব তৈরি স্ক্রিন পত্রিকার। ফলে মেহমুদ ও তাঁর পি.আর.ও.স্ক্রিন পত্রিকায় অবৈধ ব্যক্তি হয়ে গেলেন। যাই হোক, হারড হেলড কিন্তু পরে আবার ভাল ফলই করেছে।

চল্লিশের দশকে অশোককুমার রেসের মাঠে খুব যেতেন তবে তিনি ঘোড়া নির্বাচন করতেন সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে। একটা ঘোড়ার ওপর কখনই তিনি ১০ টাকার বেশি বাজি ধরতেন না। তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শশধর মুখারজি এক সময় তো ঘোড়ার মালিকই ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কম সময়ই বাজি ধরতেন। দিলীপকুমারের রেসের ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না তবে কিছুদিনের জন্য কমেডিয়ান আগা খানের সংগে একত্রে একটা ঘোড়ার মালিক হয়েছিলেন। মনে করা হত, কালো টাকাকে সাদা করার জনাই চলচ্চিত্র মহলে রেসের প্রতি এই আগ্রহাতিশয্য ছিল, তবে সত্যি কথা বলতে কি এটা করার জনা কোন সময়েই হেরে যাওয়া চলবে না। এমন মনোভাব অবশ্য রাজেন্দ্র কৃষ্ণের আগে পর্যন্ত ঘটে এসেছে।

রাজেন্দ্র কৃষ্ণ চলচ্চিত্রের সার্থকনামা সংগীত ও চিত্রনাট্য রচয়িতা ছিলেন। মাদরাজে তাঁর খুব প্রতিপত্তিও ছিল। ঘোড়দৌড় তিনি পছন্দ করতেন এবং সে সূত্রে একদিন তিনি ৪৯ লাখ টাকা জিতেও গেলেন। এর পুরোটাই ছিল করবহির্ভূত। এ ঘটনার কথা চারদিকে ছড়িয়ে গেল এবং তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর কানেও কথাটা উঠল। তিনি তারপরই লটারি ও জুয়াকে আয়করের অধীনে নিয়ে এলেন। আড়াই হাজারের ওপরে যা কিছুই ভাগ্যে মিলে যাক না কেন তার শতকরা ৩৪ ভাগ আয়করে চলে যাবে। চলচ্চিত্রের লোকজনের ঘোড়দৌড়ের প্রতি আসক্তি এরপরই হয়ত ক্রমশ কম গেছে।

শ্রীমতী ওয়াদিয়া বাদে বোমবাই-এর আর এক অভিনেত্রী বিন্দুও রেসের ঘোড়ার মালিক। মালিক হিসাবে তাঁর নাম থাকলেও অবশ্য আসল মালিক কিন্তু তাঁর স্বামী চম্পকলাল জাভেরি। বিজ্ঞাপন জগতের এই ভদ্রলোক রেসের ব্যাপারে রীতিমত আগ্রহী। অন্যদিকে একমাত্র পৃথিরাজ বাদে কাপুর পরিবারে আর সবাই ই ঘোড়দৌড় পছন্দ করেন। রাজ কাপুরের একটি ঘোড়াও ছিল। শাম্মী কাপুর তো একবার কলকাতায় ইনভিটেশন কাপ অব ইনডিয়ায় বোমবের ফেবারিট প্রিনস প্রদীপ হেরে যাওয়ার জনা অনেক টাকা খুইয়েছিলেন।

বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতের যেসব ব্যক্তির রেসের ঘোড়া আছে তারা হলেন ফিরোজ খান, মেহমুদ, জি পি সিপ্পি, এন এন সিপ্পি, জ্যোতি স্বরূপ, মুখরী এবং বাঙালি চলচ্চিত্র প্রযোজক এস এন পাল। শ্রীপাল বাঙালোরেই থাকেন এবং কন্নাড় ভাষায় ছবি করেন। এদের অবশ্য বাজি ধরার চেয়ে রেসেই আগ্রহ বেশি।

আজকাল রেসে বাজি ধরার ক্ষেত্রে জ্যাকপটেরই প্রভাব বেশি। জনৈক ছবি-প্রদর্শক বোমবাই থেকে ৬০ মাইল দূরে খোপোলিতে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতেন। তিনি কয়েক বছর আগে জ্যাকপটে ছ অংকের একটা বাজি জিতে স্থায়ী একটি সিনেমা ঘর তৈরি করেছেন এবং নাম দিয়েছেন 'গুডলাক টকিজ'। পরে অবশ্য এমন সৌভাগ্য আর কখনও তাঁর হয়নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘোড়দৌড়ে জুয়াড়িরা সব সময় ভাল ফল করেন এমন নয়। তবে চলচ্চিত্র জগতের লোকজন ঘোড়দৌড়ে অংশ নেন গ্ল্যামারের জন্য, আগে দেশের রাজা মহারাজারা যা করতেন তারই অনুকরণ আর কি। অবশ্য রেস কোর্সেই এইসব চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ফ্যানদের অত্যাচার ছাড়া খুব সহজে ঘোরাফেরা করতে পারেন। কেননা ঘোড়দৌড়ে ঘোড়ারাই সুপার স্টার। তাদের বাদ দিয়ে সেলুলয়েড স্টারদের নিয়ে সেখানে কে মাথা ঘামাবে ? □

'শপথ'-এর 'ধর্মযুদ্ধ'

কোন পেশাদার মানুষের সামগ্রিক ব্যর্থতায় যদি নাটকের প্রয়োগ নৈপুণ্য ব্যর্থ হয় তো সেই নাট্যদলের কর্মীদের মনোবেদনার কারণ হয়, তাঁরা হতোদ্যম হন, আর দর্শকদের পক্ষেও সেটা এক বিড়ম্বনা। এমন অভিজ্ঞতাই হল ১৫ জুলাই অ্যাকাডেমি মঞ্চে, সৌরেন মিত্রের সুন্দর গল্প 'ঊষাকাল'-এর বলিষ্ঠ নাট্যরূপ 'ধর্মযুদ্ধ' দেখতে গিয়ে।

শপথ প্রযোজিত 'ধর্মযুদ্ধ' আধ ঘণ্টা দেরিতে শুরু হল এই যুদ্ধের আলোক-সম্পাতীর যুদ্ধক্ষেত্রে দেরিতে পৌঁছনর জন্যে। তারপর নাটক শুরু হতেই আলোক-সম্পাতী যেন নাট্য নির্দেশকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন, কী করে তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ব্যর্থ করা যায়। যখন যে অঞ্চলে আলো পড়ার কথা নয় সেই অঞ্চলে আলো পড়েছে, 'স্পট' মুখে পড়ার বদলে ঘাড়ে বা নিম্নাঙ্গে পড়েছে। যখন 'আলো কাটার' কথা তার আগেই 'আলো কেটে' দেওয়া হয়েছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলেছেন। তদুপরি আলোর কাজ করতে গিয়ে যেসব বিচিত্র ধরনের শব্দ সৃষ্টি করেছেন তাতে মনে হয় এই 'ধর্মযুদ্ধে'র শব্দ প্রক্ষেপণের দায়িত্বও বুঝি আলোক সম্পাতী কনিষ্ক সেনেরই ছিল।

এত কিছু সত্ত্বেও নির্দেশক শ্যামল ভট্টাচার্য নাটক শেষে ব্যর্থতার সব দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এতে নির্দেশকের মহানুভবতা প্রকাশ পায় কিন্তু আলো প্রক্ষেপকের অক্ষমার্হ ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে না।

'ঊষাকাল' সমকালের গল্প। মুখোশ পরা শিরোমণি তার অসৎ-পথে অর্জিত টাকায় কেনা প্রভাব প্রতিপত্তিতে সমাজের একদল মানুষকে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখে। এদের মাধ্যমে সব রকম সামাজিক অনাচার করে নির্দ্বিধায়। কিন্তু এই পুতুলরা একদিন কথা বলতে শেখে আলোর নিশানা দেখে পথের নিশানা পেয়ে। তারা আশায় বুক বেঁধে জোট বাঁধে, তৈরি হয়। যুদ্ধ ঘোষণা করে অনাচারের বিরুদ্ধে। হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

নাটের গুরু অঘোর মিত্তিরের জালে জড়িয়ে যারা তার শিকার হয়েছে সেইসব চরিত্রগুলিই এই নাটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পরীশ মৈত্র ও কল্পনা বিশ্বাস এদের সপ্রাণ অভিনয়ে নাটকের মূল কাঠামোটাকে ধরে রেখেছেন। তার পর এই মন্দির প্রাঙ্গণে এসেছে একে একে অনেক চরিত্র। তাদের মধ্যে বিকাশ ছাড়া আর কাউকেই অবাস্তব মনে হয়নি নেলো সর্দারের ছেলে নদের মানসিক পরিবর্তনে পদ্ম একাই একশ। গাঁয়ের মেয়ে পদ্ম তার ঠাকুর বাবার শিক্ষায় শিক্ষিতা, দীক্ষায় অনুপ্রাণিতা। গীতার দর্শন পদ্ম ঠাকুর বাবার কাছেই শিখেছে। তাই নিজের অন্তিম পরিণতির কথা জেনেও সে অকুতোভয় অবিচল। যে নেলো ছিল অঘোরের ভাড়াটে গুণ্ডা সেও পদ্মর অকুতোভয়ে অবিচলতায় ভয় পেয়েছে। তারও মনে একটা অন্য অনুভূতি জেগেছে। কিন্তু যাতে ধরা না পড়ে তাই সে মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে বলেছে 'হুকুম', 'শাসন'। এটা গুণ্ডা নেলোর হুমকি নয়, পরাজিত নেলোর মর্মবেদনা। যে পরাজয় তাকে উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

'ধর্মযুদ্ধ' নাটকের একটি মুহূর্ত / ছবি: অময় দত্ত

পদ্ম ও নেলোর চরিত্রে শ্যামল ও শ্যামলী ভট্টাচার্য যা করেছেন তা কোন সময়েই অভিনয় বলে মনে হয়নি। চরিত্রের গভীরে গিয়ে একাত্ম হয়ে ওঁরা যে চরিত্রায়ণ করেছেন তা দর্শকদের অভিভূত করেছে। গাঁয়ের মেয়ে পদ্ম চলনে বলনে গাঁয়ের মেয়ে বলেই মনে হয়েছে। ওঁর সংলাপ উচ্চারণের স্বকীয়তা, সে কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। আর শ্যামল ভট্টাচার্যের 'নেলো' অনবদ্য। ওঁর নির্দেশনায় যেমন মুন্সিয়ানা অভিনয়েও তেমনি সপ্রাণ, সনিষ্ঠ। 'অঘোর মিত্তির'-এর চরিত্রে কেষ্ট মিত্র যথাযথ। চা-ওয়ালাবেশী অরূপ গাঙ্গুলি রিলিফট্রিক্ সাবলীলতায় পরিবেশন করেছেন।

ধর্মযুদ্ধের সংলাপ সুরচিত, গতানুগতিকতা মুক্ত। তবে আবহ সংগীতের দৌরাত্ম্যে অনেক সময়ই সংলাপ শোনা যায়নি। শব্দ গ্রাহক হিমাদ্রি ভট্টাচার্য সুরচিত আবহকে দুর্বিষহ করেছেন। তাঁর উদাসীনতায় চণ্ডীপাঠ মর্মভেদী না হয়ে মর্মন্তুদ হয়েছে। তবে সুখের কথা একটাই, সেটা হল দুই পেশাদারের (আলো প্রক্ষেপক ও শব্দ গ্রাহক) অক্ষমতা 'ধর্মযুদ্ধে'র কুশীলবদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে ঢাকা দিতে পারেনি। কারণ ওঁদের শপথ সৎ ও বলিষ্ঠ নাটক করার। সেটা ওঁরা করতে পেরেছেন, নির্দ্বিধায় বলা যায়। □

ঊষা ভৌমিক

ভারনা চলচ্চিত্র উৎসবে দুলিয়া পুরস্কৃত

পরিচালকদের সরকারি অনুদান অথবা ছবিকে রঙিন করলেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচান যাবে না। সময়মত ছবির মুক্তির কথাও ভাবতে হবে।

এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি ভাল ছবি গত দু তিন বছর ধরে মুক্তি প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। আবার এই মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে-বিদেশে বহু প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত।

পুরস্কৃত হবার সময় সময়ই যদি ঐসব ছবিগুলি মুক্তি পেত তাহলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প নিশ্চয়ই লাভবান হত। কারণ আমরা দেখেছি কোন বই বা সিনেমা পুরস্কৃত হলেই তার ব্যবসায়িক সাফল্য বেড়ে যায়। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর ক্ষেত্রেও এই ঘটনা প্রমাণিত।

বিদেশে পুরস্কৃত মুক্তি প্রতীক্ষায় এ রকমই একটি ছবি দুলিয়া। পরিচালক সৈকত ভট্টাচার্য এবং কাহিনী ধীমান দাশগুপ্তর। ছবিটির একটি বিশেষ প্রদর্শনী হল ৫ আগস্ট গোর্কি সদনে। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে একটি সাঁওতাল রমণী ও

দুলিয়া ছবিতে দেবিকা মুখোপাধ্যায় / সমর দাস

তার পুত্রের অসুস্থতাজনিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

কাহিনীটির মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকলেও যেভাবে সামাজিক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন পরিচালক সেখানেই তাঁর মুনশিয়ানা। এখানে আপসহীন সাংবাদিকের চরিত্রটিও আমাদের ভাবায়।

এই দুলিয়া ছবিটিই (১৩-২৭ জুন ১৯৮৩) বুলগেরিয়ার '১০ম ভারনা চলচ্চিত্র উৎসবে' আন্তর্জাতিক জুরিদের বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে বিভিন্ন মানবিক সমস্যাগুলির সৎ এবং শিল্পসম্মত চিত্রায়নের জন্যই এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে ২২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হল পশ্চিম জার্মানি, স্পেন, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, নেদারল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি।

এই উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে স্পেনের ছবি—গ্যারি কুপার হু আরট ইন হেভেন (পরিচালক— পিলার মিরো)। বুশ ছবি লাস্ত অ্যাট ইওর ওন ডিসিশন-এ অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন—ইভ জেনিয়া র. সেন কো। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন রিচারড ড্রেফায়ারস আমেরিকান ছবি হুজ লাইফ ইজ ইট এনিওয়ে ছবিতে অভিনয়ের জন্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে দুলিয়া টরেনটো এবং প্যারিসের তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র উৎসবেও আমন্ত্রিত।

সৈকত হাজরা

'অমৃত মজলিস'-এর 'দুটি প্রতিশ্রুতি'

গত ১০ জুলাই সন্ধ্যায় বিড়লা অ্যাকাডেমি মঞ্চে 'অমৃত মজলিসে'র ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল 'দুটি প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। আয়োজন করা হয়েছিল গান এবং নাট্যাংশ পাঠের।

'অমৃত মজলিস' তাদের আমন্ত্রণ পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, উপস্থিত শ্রোতা এবং সংগীত সমালোচকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে দুই নবীন সংগীত শিল্পীর। এই দুই সংগীত শিল্পী হলেন সুব্রত মিত্র ও সুস্মিতা সেন। 'অমৃত মজলিস'কে অন্তত একটা কারণে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। চলতি মজলিসের ধারা অনুযায়ী তারা জনপ্রিয় গায়ক গায়িকাকে মঞ্চে উপস্থিত করে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি। বরং তারা বেছে নিয়েছিলেন তুলনামূলকভাবে একটি দুঃসাহসিক পথ - সেইসব নবীন প্রতিভা, যথাযোগ্য প্রচারের অভাবে যারা অন্তরালেই থেকে যান, তাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলাই বাহুল্য এ ধরনের অনুষ্ঠানের পেছনে কোন ব্যবসায়িক ছল থাকে না। অবশ্য কোন অপেশাদারি সংস্থার পক্ষে একেবারেই ব্যবসায়িক লাভ ছাড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করাও আবার একদিকে অসম্ভব। ভাল কাজ করতে গেলে যেটুকু অর্থ দরকার সেটুকু যোগাড় করার জন্য অন্তত প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সে কথা মনে রেখে এই সংগীত সন্ধ্যার সংগে তারা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' থেকে নাট্যাংশ পাঠের আয়োজন করেছিলেন দেবরাজ রায়, অনুরাধা রায় এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। এই অংশটি কিছুটা ব্যবসায়িক হলেও সব অর্থেই ছিল শৈল্পিক।

অনুষ্ঠানের সংগীতাংশটিতে সুব্রত মিত্র পরিবেশন করেন গজল ও আধুনিক গান। সুস্মিতা সেন পরিবেশন করেন নজরুলগীতি। এই দুই নবীন শিল্পীর সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায় গানের গলা দুজনেরই ভাল। উপযুক্ত সুযোগ পেলে এবং নিষ্ঠায় অবিচল থাকলে এরাও প্রতিভার মুখ দেখতে পারবেন। তবে, গজল গানে সুব্রত মিত্রর গলা আরেকটু দরাজ হলে বোধহয় ভাল শোনাত। সুস্মিতা সেন গেয়ে শোনালেন অনেকগুলো নজরুলগীতি। তার ভেতর বেশ কয়েকটিই বেশ জনপ্রিয়। শ্রীমতী সেনের সুরেলা কণ্ঠস্বরে ভালই শুনিয়েছিল গানগুলো। তবে, তিনি যদি জনপ্রিয় কোন গায়িকার কণ্ঠস্বর কিছুটা অনুকরণ না করার থেকে স্বকীয়তার দিকেই ঝুঁকতেন, তাহলে আরও ভাল লাগত বোধহয়।

দেবরাজ রায়, অনুরাধা রায় এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায় তিনজনের শৈল্পিক চেতনার মিশ্রণে 'কবি' নাটকটির পাঠ হয়ে উঠেছিল শ্রুতি মধুর। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন সজল মিত্র।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

খেলার আসর

২-৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী কীভাবে মোহন বাগান তিরাশির কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হল, লিখেছেন মোহন বাগানের কোচ অরুণ ঘোষ। মোহন বাগানের সাধারণ সচিব ধীরেন দে এবং ফুটবল অধিনায়ক গৌতম সরকারের একান্ত সাক্ষাৎকার। ছেলেবেলার গল্প বলেছেন মোহন বাগানের 'চির নবীন' ফুটবলার শ্যাম থাপা। ছবিতে মোহন বাগানের বিজয়োৎসব।

এ বছর পোর্ট ট্রাস্ট থেকে ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন অলোক সাহা। দলের প্রয়োজনে কখনও স্টপার হিসাবে, কখনও সাইড ব্যাক হিসাবে খেলেছেন এবং প্রথম বছরেই বড় দলে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অলোক সাহাকে নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলে কারা খেলতে পারেন ? –একটি পর্যালোচনা।

হেলসিঙ্কিতে সদ্য সমাপ্ত প্রথম বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিক্সের ছবিসহ রিপোর্ট এবং ভারতীয় ফুটবল দলের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের সংবাদ।

২৬ আগস্ট থেকে ধারাবাহিক রচনা ঃ

চিরঞ্জীবের

স্পার্তাকিয়াদ থেকে স্পার্তাকিয়াদে'

খেলাধূলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন শীর্ষে। ছোট হলেও বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে একইভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছে পূর্ব জার্মানি—জি ডি আর। সম্প্রতি শেষ হল এই দুই দেশের জাতীয় ক্রীড়া উৎসব স্পার্তাকিয়াদ। ভারত থেকে এই দুটি উৎসবে একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন খেলার আসর সম্পাদক চিরঞ্জীব। স্পার্তাকিয়াদের ফাঁকে তিনি ওই দুই দেশের খেলাধূলায় অগ্রগতি ছাড়াও নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক বিবরণ বের হচ্ছে খেলার আসরে ২৬ আগস্ট থেকে।

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৬৩

১		২		৩	■	৪	৫
	■		■	৬			
৭	৮	■	৯		■	১০	
■	১১			■	১২	■	■
১৩	■	■	১৪	১৫			১৬
১৭	১৮		■		■	■	
১৯		■	২০		২১	■	
■	২২			■	২৩	■	

সূত্র : পাশাপাশি

১. কথা বানানোর খেলা
৪. শুধু মেয়েরাই কি এটি ভালবাসে ?
৬. সব চাষীই এই, তবে বলরামকেই বুঝি
৭. মনের ভাষা মুখে প্রকাশ পেলে কী হয় ?
৯. জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই আ[illegible]ই করে
১০. 'কবে' পাই
১১. কোন কিছু কমলে তবে হয়
১৪. মাসের চার-পাঁচটি লালরঙা দিন
১৭. আপনার আমার নিজস্ব আচরণ
১৯. নদীতে আর ধনুকে পাবেন
২০. মজলিস
২২. ঘুমিয়ে নাকি !

সূত্র : ওপর-নিচ

১. খরগোস ধরুন
২. গণ্ডারের এক, গরুর দুই পাহাড়ের অনেক
৩. একটি মুহূর্তের ব্যাপার
৪ সাধন করেন যিনি
৫. পানের সঙ্গে জমে ভাল
৮. ভাত খেতে লাগে
৯. গর্তে খুঁজুন
১২ এর নাকি শত্রু নেই
১ প্রভাময়ী
১৫. যা থেকে রস চলে গেছে, তাই
১৬. ' ' রাঘব রাজারাম
১৮. একটি বিরাট দেশ, একটি মহাসাগর
২০. সবজি, কোন না কোনভাবে প্রায় রোজই খাই
২১. উল্টে নিলে পরিত্রাণ পাবেন

★

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২৮ সেপটেম্বর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫.৯.৮৩।

সমাধান-পত্রের সঙ্গে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর 'শব্দশৃঙ্খল — ৬৩' লিখতে ভুলবেন না। প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন।

শব্দশৃঙ্খল—৫৯ (সমাধান)

কো	ষ্ঠি	ল	কু	জ	ন	■	দো
কা	■	ভা	ল	■	র	খি	ম
কে	■	ম	■	■	ম	শ	লা
লা	ল	■	দ	ম	■	■	■
■	ব	■	লা	ই	ক	ভা	■
অ	জ	■	ই	ত	র	জ	ন
হি	■	শি	লা	■	ভা	■	ব
র	য	র	মা	■	লি	খ	ম

শব্দশৃঙ্খল—৫৯-এর জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন কাজল মিত্র ও রীতা চক্রবর্তী (চণ্ডীপুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর—৭২১৫০৭) এবং প্রশান্ত চক্রবর্তী (৭/২ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া—৭১১১০১)।

২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত শব্দশৃঙ্খল—৫৯-এর লটারিতে বিচারক ছিলেন প্রশান্তকুমার রায়।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

আগসট ৩১ থেকে সেপটেম্বর ৬

মেষ : শারীরিক অবস্থার অবনতি। পুরনো কোন রোগ ভোগাতে পারে : মেয়েদের শরীর চলনসই। আচমকা ব্যয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি। কর্মস্থলে নতুন কোন পরীক্ষায় সাফল্য : মেয়েদের নতুন অশান্তি। সম্পত্তিগত ব্যাপারে কোন সুরাহা। দূরের কোন সংবাদে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃষ : রক্তচাপজনিত রোগ ভোগাবে : মেয়েদের শরীর ভালমন্দয় মিলিয়ে চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগে ব্যর্থতা ; ধার, দেনা। কর্মস্থলে কারও পরামর্শ সুখের হবে : মেয়েদের হতাশা, ক্রোধ। কোন সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আকস্মিক বাধা। ভৃত্যদের থেকে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মিথুন : আগের অসুস্থতার সাময়িক নিবৃত্তি, মেয়েদের শারীরিক অবস্থার বিশেষ অবনতি। আর্থিক চাপ সামান্য কমবে, অন্যের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত অর্থ লাভ। কর্মক্ষেত্রে সহজ অগ্রগতি, মেয়েদের বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা নরম হবে। পারিবারিক অশান্তি গুরুতর আকার নেবে। ব্যবসায়ীদের নতুন পরিকল্পনায় সাফল্য।

কর্কট : শরীর ভাল চলবে : মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন প্রলোভনে ক্ষতি। কর্মস্থলে শত্রুদের ওপর আংশিক প্রভাব বিস্তার, মেয়েদের কর্মস্থলে মন কষাকষি, বিবাদ। বয়স্কদের জন্য পারিবারিক দুশ্চিন্তা। মেয়েদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

সিংহ : পেট নিয়ে ভোগান্তি, মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে ; ভালমতন সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে আগের কোন প্রয়াসে সাফল্যের অভাব ; মেয়েদের পুরনো কোন ব্যাপারে নতুন অশান্তি। পারিবারিক কোন ব্যাপারে আলোকপাত। মেয়েদের কৃত কর্মের জন্য অনশোচনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কন্যা : শারীরিক অবস্থায় কিছুটা উন্নতি ; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন যোগাযোগে শেষ মুহূর্তে ব্যর্থতা। কর্মস্থলে কোন জটিলতার আকস্মিক অবসান, মেয়েদের কারও আচরণ ক্ষুব্ধ করবে। পারিবারিক কোন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

তুলা : শরীর নিয়ে ছোট-খাট ঝামেলা : মেয়েদের আগের কোন অসুস্থতার জের চলবে। পুরনো ধার-দেনা বিব্রত করবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনায় আত্মসম্মানে আঘাত, মেয়েদের কিছু বাড়তি লাভ। কোন বন্ধু-বান্ধবীর পরামর্শে বাড়ি-ঘর সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান। কাছাকাছি ভ্রমণ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃশ্চিক : শরীর মোটামুটি চলবে, মেয়েদের কোন আঘাত পঙ্গু করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বড় রকমের ক্ষতির আশংকা। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনার আকস্মিকতা বিস্মিত করবে : মেয়েদের মানসিক চাপ চলবে। পারিবারিক ব্যাপারে মনকষাকষি, ঝগড়া, বিবাদ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

ধনু : স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হবে, মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ; আগের কোন ধার-দেনার আংশিক শোধ। কর্মস্থলে কোন কৌশলে কার্যসিদ্ধি : মেয়েদের কোন ব্যাপারে মনক্ষুণ্ণ হতে হবে। খুব নিকটজনের জীবনাশঙ্কা। ব্যবসায়ীদের অবস্থার সামান্য হেরফের।

মকর : শরীর নিয়ে নানান ঝামেলা : মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আগের উত্তেজনা প্রশমিত হবে : পরিবর্তনের ইঙ্গিত। মেয়েদের কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে তীব্র মত-বিরোধ। কোন সন্তানের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা। পারিবারিক কোন হিতৈষীর সংকট। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : শরীর মোটামুটি চলবে ; মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য, নানান সূত্রে অল্প আয়াসে আয় বাড়বে। কর্মস্থলে আরও কিছুকাল সংযম ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ; মেয়েদের কারও সঙ্গে মনান্তর। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : শরীর চলনসই ; মেয়েদের মানসিক অবসাদ ও চাপ। আর্থিক টানাটানি চলবে। কর্মক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাপারে দৃঢ়তার প্রয়োজন, মেয়েদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কর্মপ্রার্থীদের আগের কোন যোগাযোগে সাফল্য। বয়স্কদের জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী কলকাতা ৭০০ ০১৩
[illegible]

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

বেশি দূর যেতে হল না। লালদীঘির ধারে টেলিফোন ভবনের পাশে পাথরের মূর্তির তলায় পাথরের মত বসে থাকতে দেখা গেল গেরুয়া শাড়ি পরা এক নারীমূর্তিকে।

ঐ তো!.... ঐ তো!

উদাস চোখে তাকিয়ে আছে রোদ্দুর-জ্বলা আকাশের দিকে।

আরো কাছে গিয়ে দেখা গেল অশ্রুর আস্তরণ ছলছল করছে ঘোলাটে চোখে।

নাম ?

বাসন্তী গুপ্ত

চলুন—লালবাজারে

মাদ্রাজি হোটেলে রসম-সম্বর খেয়ে ইন্দ্রনাথ আর মৃগাঙ্ক এসে শুনল, মুখ ব্যথা হয়ে গেছে দেবনাথের।।

মুখে চাবি দিয়ে বসে আছে—একটা কথাও বলছে না।

চ' তো

তিন বন্ধু ঘরে ঢুকতেই একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল প্রৌঢ়া।

PARIBARTAN 31 August–6 September 1983 Regn. No. 32815/76 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 2.50

সীমন্ত-অংব[illegible]

পরিবর্তন

৭-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

চলচ্চিত্র সংখ্যা

বাংলা ছায়াছবি কোথায় দাঁড়িয়ে ?

রাজধানীর বাঙালি

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

ইন্দ্রনাথ বসল না। তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে রইল ভদ্রমহিলার মুখের দিকে।

ভদ্রমহিলার ফর্সা মুখ যেন কালিমাখা – অম্বলের রুগি। পথশ্রম, উদ্বেগ তো আছেই। চোয়াল শক্ত, দৃঢ় – আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ

জেরার নিয়ম হট অ্যানড কোলড ট্রিটমেনট। তাই দেবনাথের রুক্ষ প্রশ্নজালের পর আর্দ্র কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন শুরু করল ইন্দ্রনাথ।

কিছু খাওয়া হয়নি, না?

না।

চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল বাসন্তী গুপ্তর। দেবনাথকে চোখের ইসারা করল ইন্দ্রনাথ।

রাজভোগ আর লস্যি।

সহজ হয়ে বসল বাসন্তী গুপ্ত। ফুলফোরসে পাখা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

মাথার কাপড়টা খুলুন, মাসিমা। আমরা আপনার ছেলের মত।

তুমি কে বাবা?

পুলিশ নয়। আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

পুলিশ নও? তাহলে এখানে কেন?

পরিবর্তন
৭–১৩ সেপ্টেম্বর, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১০
দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

একে আমরা কী বলবো ? চায়ের কাপে তুফান না বামফ্রন্ট শাসনের মুষলপর্ব ? জনৈকা পপ সংগীতশিল্পীর মহাজাতি সদনে গান গাওয়াকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের দুই শরিকে যে চাপান উতোর পালা চলছে, আমরা দুঃখিত সেই আসরে আমরা ঘনঘন করতালি বা 'এনকোর এনকোর' ধ্বনি কিংবা নিছক সিটি দিয়ে উৎসাহ জানাতে অক্ষম। আমরা মনে করি, একটি অতি নগণ্য ও সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে দুই শরিকদল তিলকে তাল করে তুলছেন। শুধু তাই নয়, বিষয়টি মহামান্য আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। একদল যুবক এই ঘটনার জের হিসাবে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে নির্মমভাবে লাঠিপেটা পর্যন্ত খেয়েছেন।

ভাবতে অবাক লাগে, আজ পশ্চিমবঙ্গ যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং সেসব সমস্যা সমাধানের পথ দূর অস্ত তখন আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কোন পপ শিল্পীর সংগীত সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি তার চুলচেরা বিচারে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয়, তার জন্য এক দল ব্যক্তি ভিন্ন মতাবলম্বীদের লাঠিপেটা করতেও পেছপা নন। আবার একদল ব্যক্তি 'যাক প্রাণ থাক মান' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সে লাঠি খেতেও রাজি। যখন কোন জাতির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গতি রুদ্ধ হয়ে আসে তখন সে রুদ্ধ গৃহে স্তিমিত প্রদীপে বসে পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে কালপাত করে।

আমাদের প্রশ্ন : ঊষা উত্থুপের গান সংস্কৃতি কি অপসংস্কৃতি তার বিচার কি আজ এতই জরুরী ? এই বিচার নিয়ে পন্ডিতদের উনিশ পিপে নস্য ফুরিয়ে যায়, সওয়ালের পর সওয়াল চলে, বিক্ষোভ মিছিলের সামিল হয়ে পুলিশের লাঠি খেতে হয়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সীমিত ও মূল্যবান সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের অনেকগুলি মুহূর্ত এই প্রশ্নোত্তরে ব্যয় করেন এবং শুধু তাই নয়, বামফ্রন্টও এই বিষয়টি নিয়ে চাল ডাল বিদ্যুতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়। কারণ বাজারে চালের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, আসামের উদ্বাস্তুদের ঘরে ফেরার স্বপ্ন আজও বিলীন, বিদ্যুতের অবস্থার যে বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় না, রাজ্য যে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল যে ঠিক সময় বার হয় না, রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের গতি যে স্তব্ধ, রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা যে ক্রমশ অবরুদ্ধ,এক কথায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা, হতাশা এবং উদ্বেগ তা নিয়ে বামফ্রন্টের আশু কোন বৈঠকের অ্যাজেনডা আছে কিনা চোখে পড়ে না। মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন সফরসূচির মধ্যে সাঁওতালডি,ব্যানডেল কিংবা ঘুমিয়ে থাকা কোলাঘাট আছে কিনা তা জানা নেই। মুখ্যমন্ত্রী আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে কর্মসম্ভাবনায় উজ্জ্বল কোন কারখানার উদ্বোধন করছেন কিনা তা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা শুধু জানতে পারলাম মুখ্যমন্ত্রী 'ঊষার রেকরড' শুনবেন। স্বস্তি পাই যখন কোন মুখ্যমন্ত্রী গান শোনেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যদি গানকে রাজনীতির মধ্যে টেনে না আনতেন এবং সংস্কৃতির ব্যাখ্যার সঙ্গে যদি শরিকি কোন্দল এসে যুক্ত না হত, তা হলে আমরা এক সংগীত রসিক মুখ্যমন্ত্রীর কায়মনবাক্যে সংগীত প্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারতাম।

আমাদের বক্তব্য কোন বিশেষ হলে কোন বিশেষ সংগীত গাইবার বিধিনিষেধ আরোপ করার অধিকার সেই হল কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই আছে। 'হাউস রুল'কে মেনে চলার অর্থ মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ নয়। প্রত্যেক সংগীতের জন্য তার স্থানকালপাত্র নির্ধারিত। পপ সংগীতেরও প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে নাইট ক্লাবেরও। কিন্তু মহাজাতি সদনকে নাইট ক্লাবে পরিণত করতে হবে এ কেমনতরো আবদার দুঃখের বিষয়, শরিকি ঈর্ষায় কাতর বড় শরিক সমদর্শী হলে অতি সহজেই ব্যাপারটির ইতি ঘটাতে পারতেন।

কোন কোন মহল এই ধিকি ধিকি আগুনে বাতাস দিচ্ছেন। কিন্তু এই বাতাস যে 'কুলোর বাতাস' এবং অপসংস্কৃতির ভূত ছাড়াবার প্রতি যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি বামফ্রন্টকে বিদায় করার চেষ্টা,তা কি তাঁরা বুঝতে সক্ষম ? না, মুষলপর্বের গোড়ায় যদুপতিরাও যে আসন্ন সর্বনাশের কোন আভাস পান না এটাই ইতিহাসের শিক্ষা ?

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদে টালিগঞ্জের রঙিন ছবি : অর্ধেন্দু রায়
ও দিল্লির রঙিন ছবি : সৌগত রায় বর্মন

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১. ফোন : ৩১২০৫৪

পরিবর্তন

১৪ সেপটেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

এই সংখ্যা থেকে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

শহীদ মিনার
আলোকচিত্র : সুশীল সূত্রধর

১৪ সেপটেমবর সংখ্যা :

রাজনৈতিক শূন্যতা : সামরিক প্রশাসনেরই হাত শক্ত করছে।

এই সংগে থাকছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকার, যার মধ্যে আছেন শেখ হাসিনা, ডঃ রাজ্জাক, খন্দোকার মোশতাক প্রমুখ।

এই সংখ্যার আর একটি অভিনব আকর্ষণীয় রচনা :

চরিত্র

চরিত্র বলতে আমরা কী বুঝি · চরিত্রের কি সংজ্ঞা বদলাচ্ছে : মদ্যপান, পর নারী আসক্তি, দুর্নীতি, অসদাচার এগুলি কি চরিত্রহীনতার লক্ষণ · চরিত্র ব্যাপারটি এখনও আমাদের কাছে ধোঁয়াশা! সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সতীনাথ উৎপলা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ ও স্বাতীলেখা থেকে মঠ মিশনের ও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। পরিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক অবিস্মরণীয় দলিল।

আসানসোলের কয়লা চক্র

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, কীভাবে কয়লা চক্র নষ্ট করে ফেলছে আসানসোলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে।

ধর্মপর্যায়ে ইদুজ্জোহা ও রামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা।

আমেরিকার চিঠি। প্রতিবেশী রাজ্য আসাম। ত্রিপুরার বর্ণনা।

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭২

নিবেদনমিদং

ওপরের যে ছবিটি দেখছেন তা কোন পর্বতারোহীদের নয়। ওঁদের একজন (লাঠি হাতে) পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটার দিব্যজ্যোতি বসু ও অপর জন স্টাফ ফোটোগ্রাফার সৌগত রায় বর্মন। স্থান চম্বল উপত্যকা। ওঁরা তখন যাচ্ছিলেন সামনের গহন অরণ্যে পলাতক দস্যুসর্দার ঘনশ্যামের ডেরার দিকে গত মে মাসের গনগনে চম্বলে সেটা ছিল তাঁদের এক বিরাট অভিযান। গোয়ালিয়র জেলে ফুলন আর দস্যু মালখান সিং এর সংগে দেখা করে তাঁরা এগিয়ে চলেন চম্বলের গভীরে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল 'অভিশপ্ত চম্বলের পথে বিপথে'। পরিবর্তন পূজা সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ এই কাহিনী আর সৌগতর তোলা ছবি

এ সপ্তাহের খবরের মধ্যে নিশীথ দে আবার বেরিয়ে গেছেন জেলা সফরে। পরিবর্তনের লেখক শ্যামল বসু ঘুরে এলেন আসানসোল কয়লা খনি অঞ্চল। সেই সংগে ঘুরে এলেন দুর্গাপুর। দুর্গাপুরের ওপর তাঁর লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল

আগামী সংখ্যা থেকে তিন সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হবে পরিবর্তন সম্পাদকের বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন। পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে বড় লেখা 'সিলেট ডায়রি।' ইতিমধ্যেই পরিবর্তন সম্পাদকের সিলেট ভ্রমণের খবর সেখানকার পত্র পত্রিকায় বিশদভাবে প্রচার হয়ে গেছে। একজন আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন ১৫ আগসট সংখ্যার 'যুগভেরী।' সেই সংখ্যার ২৬ পয়েন্ট হেডলাইন দিয়ে বেরিয়েছে 'সিলেট প্রেসক্লাবে কলিকাতার পরিবর্তন সম্পাদক'। যুগভেরী সিলেটের প্রাচীনতম পত্রিকা।

১৭ আগসট পরিবর্তনে প্রকাশিত হয়েছিল 'চৌরংগীতে একলা মেয়েরা সাবধান।' লেখাটি প্রকাশের পর দু একজন পুরুষ আমাদের আক্রমণ করে চিঠি লিখেছেন। আমরা নাকি এক অবাস্তব মনগড়া কল্পকাহিনী তুলে ধরেছি। আমরা ভাবছিলাম এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বক্তব্য জানাব। এমন সময় আমরা দুটি চিঠি পেলাম। একটি লিখেছেন মুরশিদাবাদ লালগোলার সীমা সান্যাল। তাঁর বক্তব্য 'গত ১৭ জুলাই '৮৩ তারিখের পরিবর্তনে প্রকাশিত চৌরংগীতে একলা মেয়েরা সাবধান রচনাটি পড়লাম। প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী লেখাটি প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয় এবং লেখিকাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।' এক শ্রেণীর বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি আছে যাদের উদ্দেশ্য হল পুরুষ সংগীবিহীন একা কোন মহিলাকে অশ্লীল ইংগিত এবং কুদৃষ্টিপূর্ণ ব্যবহার করে লাঞ্ছিত করা। এদের উপস্থিতি শুধু চৌরংগী এবং তার আশেপাশেই সীমাবদ্ধ নয়। জনবিরল জনাকীর্ণ, শহর মফঃস্বল সর্বত্র এরা দুঃসাহসী এবং অবাধ।

দ্বিতীয় চিঠির লেখক একজন পুরুষ। সঞ্জীব রায়। কলেজ রো, কলকাতা ১২। চৌরংগীতে তাঁর অভিজ্ঞতা এরকম, 'কিছুদিন আগে আমি আমার বোনকে নিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাস না আসায় আমি বোনকে দাঁড়াতে বলে পাশের সিগারেটের দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনে ফিরে এসে দেখি বোনের মুখটি লাল হয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে ও আমাকে বলল ; পাশের ওই লোকটি আমায় বলল, কি যাবে নাকি'

অনেকে বলছেন চৌরংগী দেহ পসারিনীদের তীর্থক্ষেত্র হয় ওঠায় ভদ্রলোকের মেয়েদের পক্ষে চলাই মুশকিল হয়ে উঠছে। সত্যিকথা বলতে কি, চৌরংগী দেহপসারিণী, চোরাকারবারী, পকেটমার, রিক লাগা ভিখারি ও হকারদের লীলা ক্ষেত্র। এ ব্যাপারে পুলিশ নীরব দর্শক। কলকাতা বহুকাল ধরে নগরপিতাহীন। পিতৃহীন শহরের যা হয় তাই হচ্ছে।

কেউ কেউ বলছেন, এক শ্রেণীর মহিলারা কুরুচি পোশাক পরে চলাফেরা করে বলেই পুরুষের বিকৃত-মনস্কতা প্রশ্রয় পায়। এ ব্যাপারে মহিলারা কি বলেন · মেয়েদের মধ্যে উত্তেজক পোশাকের এত আধিক্য ঘটছে কেন · এ সম্পর্কে মেয়েরা আমাদের ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখুন। পরিবর্তন পিউরিটান মনোভাবাপন্ন নয় কিন্তু রুচি ও শালীনতায় সে বিশ্বাসী। ... তাই · এই বিতর্কের অবতারণা।

অলমিতি

পা. চ.

অলিম্পিক কোচ জিম ও'ডোহার্টি বলেন:
"শক্তি আর স্ট্যামিনা গড়তে কমপ্লান® অদ্বিতীয়!"

প্রখ্যাত অলিম্পিয়ান জিম ও'ডোহার্টি ভারতসমেত, সারা জগতেই প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়দের জোরদার কঠিন প্রতিযোগিতার জন্য ট্রেনিং দেন। তাঁর মতে চ্যাম্পিয়নরা মাটি ফুঁড়ে জন্মায় না, তাদের তৈরী করতে হয়। আর বিজয়ী হতে গেলে যেমন জোরালো ইচ্ছাশক্তির দরকার, <u>তেমন</u>-ই জোরালো দৈহিক শক্তিরও দরকার।

"সাঁতারু, অ্যাথলেট আর বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের আমি নিয়মিত কমপ্লান দেয়ার পরামর্শ দিই" বলেন জিম ও' ডোহার্টি। "কমপ্লান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ সম্পন্ন এক সম্পূর্ণ আহার যা সুস্থ-সবল শরীর গড়ে ও স্ট্যামিনা বাড়ায় আর অতি সহজেই হজম হয়।"

অভিজ্ঞ জিম ও' ডোহার্টির মতামতটি আপনিও মানুন। আপনার বাচ্চাদেরও সর্বাঙ্গীন, সুস্থ-সবল বাড়ের জন্য প্রতি দিন কমপ্লান দিন। কমপ্লান পাওয়া যায় চমৎকার স্বাদ-গন্ধে, যা বাচ্চারা দারুণ ভালবাসে।

Glaxo
Complan
COMPLETE PLANNED FOOD
STRAWBERRY FLAVOUR

কমপ্লান®-সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GLC.9-2317 BN

কেন বাংলা ছবি চলছে না ?

বাংলা ছবির ইদানিংকার অবস্থা দেখে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই রীতিমত চিন্তিত। এখানে প্রকাশিত পাঠকদের চিঠিগুলি সেই দুশ্চিন্তারই ফসল। অবশ্য অধিকাংশ পত্রলেখকই এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ বাৎলেছেন বাস্তবসম্মত অনেক প্রস্তাব রেখে। চিঠিগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মূলত তিনটি কারণে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প ডুবতে বসেছে। সেগুলি হল : উত্তমের পরে আর একজন উত্তমের অভাব, অযোগ্য পরিচালকদের দাপট এবং হিন্দি, ইংরাজি ছবির ব্যর্থ অনুকরণ। এর সঙ্গে, অবশ্য অনেকেই টালিগঞ্জ পাড়ার অকেজো যন্ত্রপাতি, সারা ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পে রাঘববোয়ালদের চক্রান্ত এবং প্রযোজকদের সাহসের অভাবের কথাও বলেছেন। বস্তুত সব কটি প্রকাশিত চিঠিই নতুন চিন্তার খোরাক জোটাবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবারের পুরস্কার-প্রাপ্ত তিনটি চিঠির লেখক লেখিকা হলেন ১। সুব্রত রায় ২। রীতা দাশগুপ্ত এবং ৩। সঞ্জীব কুমার বসাক। বাকি পত্রলেখকদেরও শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

এক এক ছবি এক এক কারণে

বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলা চলচ্চিত্রে ভাটার টান চলছে। তার কারণস্বরূপ প্রথমেই চিত্রনাট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। মনোগ্রাহী করে একটি নিটোল গল্প অন্তত বলতে না পারলে তা দর্শক মনে ঠাঁই পায় না। যাঁরা মনে করেন বাংলা ছবিতে আনন্দের খোরাক নেই, বা দর্শকদের রুচি বিকৃত হয়ে গেছে বলেই চলে না, তাদের মতবাদ যে কতখানি ভ্রান্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সাহেব,' 'আদালত ও একটি মেয়ে' ইত্যাদি ছবির সাফল্য দেখে, এমনকি জয়া, প্রতিমা, হারমোনিয়াম, উত্তর-ফাল্গুনী ইত্যাদি ছবি এলে এখনও হাউস ফুল হয়। ঠাস বুনুনি গল্পের জনাই এগুলি ভাল চলছে।

উপযুক্ত গান এবং সুরের অভাবও ছবি না চলার একটি কারণ। মনমাতান সুর এবং গানের যথাযথ প্রয়োগ কাহিনীকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এর আবেদন দর্শকমনে স্মরণীয়। তাই 'দেয়া নেয়া' 'মণিহার,' 'এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি', 'হংসরাজ' ইত্যাদি ছবি এত দর্শক টানতে পেরেছে।

অভিনয় যে কোন ছবির প্রাণ। যে ছবিতে স্বতঃস্ফূর্ত, চরিত্রানুগ অভিনয় নেই তা দর্শককে টেনে রাখবে কী করে - 'বাঘিনী' 'সন্ন্যাসী রাজা' 'স্ত্রী', 'অপরিচিত' ইত্যাদি ছবির গল্পই শুধু ভাল বলে সার্থক হতে পেরেছে এমন কথা বলা যায় না, বলিষ্ঠ অভিনয়ও এই সাফল্যের সঙ্গে সমান অংশীদার।

উপযুক্ত ও প্রচুর নায়ক নায়িকার অভাব বাংলা চলচ্চিত্রের আর একটি সমস্যা। ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য চাই নতুন মুখ--নতুন প্রতিভা।

বাংলা ছবির দুরবস্থার কথা বলতে গেলে অনেক কথাই এসে পড়ে। যথেষ্ট সংখ্যক পুঁজির অভাব তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ভাল ল্যাবরেটরি, স্টুডিও এসব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অনুন্নত। পরিবেশনা ও প্রদর্শনের ব্যাপারেও নানা বাধা এবং কায়েমি স্বার্থের দাপট দেখা যায়। সুযোগসন্ধানী কিছু প্রযোজক-পরিচালক দু'পয়সা কামাবার জন্য এরই মধ্যে ভিড় করেছেন। বাংলা ছবিতে হিন্দির প্যাটারন এনে সহজে বাজিমাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন 'অমানুষ', 'অনুসন্ধান', 'প্রহরী'। কিন্তু বাঙালির রুচির সঙ্গে তাদের প্রয়াসের আন্তর মিল না থাকায় এইসব বোমবাই মারকা ছবি বাংলার সর্বস্তরের দর্শকদের চাহিদা মেটাতে পারল না। কলকাতার স্টুডিও, ল্যাবরেটরি ইত্যাদির উন্নতি করে, টেকনিক্যাল কাজগুলি যদি ভালভাবে করা যায়, এবং উৎসাহী পরিচালকদের ক্ষেত্রে অনুদান পরিকল্পনার পরিধি যদি আরও বাড়ান যায়। ভাল ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাও প্রয়োজন।

আলোচ্য সমস্যাগুলোর সমাধান হলে বাংলা ছবির দুর্দশা অনেকটা ঘুচবে। তাতে যত্নবান পরিচালকের পরিচালনায় রুচিশীল ছবিরও জন্ম হবে। আর এভাবেই বাংলা ছবির দর্শক হিসেবে আমাদেরও প্রত্যাশার পূরণ ঘটবে বলে আশা রাখি।

রীতা দাশগুপ্ত
মকদুমপুর, মালদা

'স্বল্প বাজেটের বুদ্ধিসম্পন্ন ছবি চাই'

দুয়ের মাঝে পা

ইদানিং বয়স্করা ছাড়া খুব কম লোকেই বাংলা ছবি দেখতে যান। অধিকাংশেরই বক্তব্য, 'প্যানপ্যানানি দেখার ধৈর্য নেই।' আসলে সিনেমার জগতের কাছে মানুষ অনেক বেশি অবাস্তবতা দাবি করে। এটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের পরোক্ষ প্রভাব। সিনেমার অধিকাংশ দর্শক এন্টারটেনমেন্ট চান। সঙ্গে যদি কিছু উত্তেজক সুড়সুড়ি থাকে তবে তো কথাই নেই। মোটামুটি যেসব ফরমূলা ছবি দেখতে ভিড় হয় তাতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব ইচ্ছাকৃত ফারাক রাখা হয়। ফলে দৈনন্দিন সংঘাতে পর্যুদস্ত সাধারণ দর্শকের ইন্দ্রিয় সাময়িক তৃপ্তি পায়। সে কৃতিত্ব পরিচালকের। তাঁরা ফিলমকে ব্যবহার করছেন ব্যবসা হিসাবে। পাশাপাশি অন্য ছবিও আছে। যেগুলোকে আমরা বলি সুস্থ ছবি। তার বাস্তব ভিত্তি আছে, আনন্দদানের রীতিও নির্মল।

বস্তুত আজকের বাংলা ছবির বেশির ভাগই এই দুই জাতীয় ছবির মাঝামাঝি। একদিকে হিন্দি ও বিদেশি 'এ' মারকা ছবির বাজারী প্রভাব, অন্যদিকে সেনটিমেনট ছোঁয়ার বাঙালি প্রচেষ্টা। মাঝখানে পড়ে বাংলা ছবিতে টেকনিক্যাল জাগলারি, গিমিক ইত্যাদি তো দূরস্থান সমগ্রতা বলেও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের মত বিশ্ববন্দিত উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নাম কিনছেন অনেক তরুণ পরিচালকও। কিন্তু সিনেমার বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট বিচার করে দর্শকেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সার্থক ছবি অনুভবের জন্য চাই সার্থক দর্শক মন। নয়তো রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিও সরকারি অনুদানে চালাতে হয় কেন?

ফিলমের বিষয়ে যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব সক্রিয় সাহায্য করছেন, প্যারালাল ডিসট্রিবিউশন চালু করার কথা হচ্ছে তবু সবই অর্থহীন। যতক্ষণ দর্শক সস্তা ছবির মোহ না ভাঙছেন পাশাপাশি পরিচালকেরাও বাঙালি দর্শক মানসিকতা সঠিক বিচার না করে ছবি করছেন ততদিন বাংলা ছবির রুগ্নতা কাটবে না।

সুব্রত রায়
কলকাতা--৭০০০৭৮

জীবনের মৌল প্রশ্নগুলি

প্রায় সকল বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনী ঐতিহ্যবাহী। সামাজিক সাংসারিক পরিবেশ ও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তা রচিত। এই রুচি বৈচিত্র্যহীনতা আমাদের ভাল লাগার বিশেষ সত্তাকে আহত করে। চলচ্চিত্র কোন স্থাণু ভাবনা নয়, চলমান জীবনবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর পরিধি বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে হবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিককে তার মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে।

২। প্রায় অধিকাংশ চলচ্চিত্র রক্ষণশীলতার জালে বন্ধ। প্রযোজনবোধে, প্রচলিত তথা প্রথাগত সামাজিক রীতি-নীতি অতিক্রম করার জন্য যৌবনদীপ্ত সাহসিকতার প্রয়োজন।

৩। চলচ্চিত্র হল একটি পদ্ধতি, যার অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করে মূলত উন্নত সাহিত্য, অভিনয়-দক্ষতা এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার উপরে। উত্তর স্বাধীনতা পর্বে, বাংলা চলচ্চিত্র অনেকাংশে 'উত্তমকুমার'-এর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই মহানায়কের প্রস্থানে এই শিল্প কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

৪। এমন কোন বাংলা পত্রিকা নেই যা এই চলচ্চিত্রের বাজার সৃষ্টি ও প্রসার করার পক্ষে সহায়তা করে।

৫। সরকারি ঔদাসীন্য ও সুষ্ঠু সরকারি নীতির অভাবে এই শিল্প ধ্বংসের মুখে উপস্থিত। চিরকালীন তথা আধুনিক প্রশ্নগুলির উপরে এই শিল্পের গুরুত্ব নির্ভর করছে।

এই সকল মুখ্য কারণগুলির পাশাপাশি সীমিত অভিনয় ক্ষমতা দুর্বল প্রচার ব্যবস্থা, ধ্বংসাত্মক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দি ও ইংরাজি ছায়াছবির

ভগ্নস্বাস্থ্য, প্রাচীন ও জীর্ণ সাজ সরঞ্জাম, অতিরিক্ত করের বোঝা বাংলা চলচ্চিত্রের করুণ অবস্থাকে করুণতর করে তুলছে। এই চলচ্চিত্র মরুভূমিতে কয়েকজন মাত্র পরিচালক মরূদ্যানের মত আমাদের সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। এই আগ্রাসী মরুভূমির প্রসাররোধে অতিসত্বর সবুজ বৃক্ষের বেড়া দেওয়া প্রয়োজন এবং সেখানেই বাংলা চলচ্চিত্রের স্থায়িত্ব।

সঞ্জীব কুমার বসাক
কলকাতা-৭০০০০৬

'বই' নয়, ছবি

বাংলা ছবি না চলার প্রধান কারণ দুটি। এক সঠিক চিন্তা ভাবনার অভাব। দুই অযোগ্য লোকের ভিড়। সস্তা মেলোড্রামা, মোটা দাগের চরিত্রচিত্রণ আর একশো বছর আগেকার বিবর্ণ কিছু মূল্যবোধ সম্বলিত জোড়াতালি মারকা একটা চিত্রনাট্য খাড়া করে টালিগঞ্জের অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ পরিচালকরা বছরের পর বছর,যে 'বই' তৈরি করে চলেছেন, এ যুগের মাপকাঠিতে তা অচল। আজকের দর্শক চলচ্চিত্রে মনোরঞ্জনের সঙ্গে কিছুটা বুদ্ধির সংযোগ আশা করেন। প্রফেশনাল কমপিটেনসির অভাবেই আজ বাংলা ছবির এই দুরবস্থা। তাছাড়া যাঁরা যোগ্য ব্যক্তি তাঁরা এখানে ছবি করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

সার্থক প্রফেশনাল বাণিজ্যিক ছবি এবং সমাজ সচেতন নব্য ধারার ছবি, এই দু'ধরনের ছবিই আমরা আশা করি। অর্থাৎ বাংলা ছবি মানেই যারা বোঝেন চড়া সেনটিমেনটে আক্রান্ত অতি নাটকীয় আবেগবহুল ছবি, সে ধরনের ছবি আমরা চাই না। চাই বাস্তবমুখী বাণিজ্যিক ছবি, যে ছবি তাৎক্ষণিক আনন্দদানের পণ্যমাত্র নয়। সেই সঙ্গে চাই এমন ছবি যা দেশ ও সমাজের সম্পূর্ণ বাস্তব চেহারা তুলে ধরবে।

বাংলা সাহিত্যে চলচ্চিত্রের উপযোগী ভাল গল্পের অভাব নেই। টালিগঞ্জ স্টুডিওর দৈনাদশার কথা মনে রেখেই বলা যায়, একটু সততা, আন্তরিকতা আর পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই এখান থেকে সুস্থ রুচির জীবনধর্মী বুদ্ধিদীপ্ত বাণিজ্যিক ছবি তৈরি করা যায়। রাজ্য সরকারই পারেন সফল এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন পরিচালকদের দিয়ে সৎ বাণিজ্যিক ছবি তৈরি করাতে।

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর,
হুগলি

টালিগঞ্জের আগাছা

আগে যেখানে বছরে ৬০–৭০টা করে বাংলা ছবি হত আজ সেখানে ২০টা ছবি হওয়াই কষ্টকর। অবস্থা যেমন করে হোক থাবর ল্যাটং শেষ করাই তাদের আসল লক্ষ্য। তবে মুষ্টিমেয় কিছু ভাল পরিচালক অবশ্যই আছেন, কারণ 'চোখ', অ্যাকভাব হয়।

আর একজন উত্তম, আর একজন সুচিত্রা চাই'

এমন দাঁড়িয়েছে যে মনে হয় এই শিল্পের অস্তিত্ব অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিলুপ্ত হবে। এই অবস্থার জন্য যেসব কারণগুলো দায়ী :

১। টালিগঞ্জ পাড়ার সমস্ত স্টুডিও হচ্ছে মান্ধাতার আমলের। যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরি সব অকেজো হয়ে গেছে। রঙিন ল্যাবরেটরিরও ভীষণ অভাব। কাজেই প্রথমেই টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোকে ঢেলে সাজান দরকার।

২। সাধারণ দর্শকদের জন্য ছবি করেন এমন পরিচালকের অভাব। অযোগ্য পরিচালকে আজ টালিগঞ্জ ছেয়ে গেছে। অবিলম্বে তাদেরকে সসম্মানে বিদায় করা দরকার। যে সমস্ত বুদ্ধিমান পরিচালক বর্তমানে আছেন তারাও তাঁদের ছবির বাণিজ্যিক দিকটা দেখেন না। মনে হয় তাঁরা যেন পুরস্কার জেতার জন্যই ছবি করছেন। তাঁদের ছবির ভাষাও সাধারণের বোধগম্য নয় সব সময়।

৩। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিগত পাঁচ বছরের শাসনকালে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এক কোটি আটাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এজন্য তাদের সাধুবাদ জানাতেই হয়। তাদের প্রযোজিত কয়েকটি চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব ছবি আজও বাকসবন্দী হয়ে পরে আছে। কাজেই পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রিলিজের ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে।

সুব্রতজিৎ সাহা
বরাকর, বর্ধমান

শিল্পগুণ নেই, বাণিজ্যও হয় না

বর্তমান বাংলা ছবির যে হাল হয়েছে তাতে বাঙালি দর্শকদের মরিয়া হয়ে রুচিবদল করতে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি একদা প্রথিতযশা বাংলা ছবির এই পতন চোখে দেখা যায় না। বাংলা ছবির অধঃপতনের প্রথম এবং প্রধানতম কারণ হল যোগ্য পরিচালকের একান্ত অভাব এবং অযোগ্য ও অপরিণত পরিচালকদের প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি। টালিগঞ্জের এইসব অযোগ্য পরিচালকগণ প্রকৃত অর্থে ছবি তৈরির প্রায় কিছুই জানেন না। 'খারিজের' মত ছবিও তৈরি হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বোম্বের সেকস ভায়োলেনস জাতীয় ছবির অনুকরণ। কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা ব্যর্থ হচ্ছেন, ফলে বাণিজ্যিক সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং বর্তমানে বাংলা ছবিকে বাঁচাতে গেলে এমন ছবি তৈরি হওয়া উচিত, যা হবে শিল্পগুণসমন্বিত অথচ সহজবোধ্য। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে লোকে ঠকবেন না। সেই ছবি নির্মল আনন্দ দান করে দর্শকদের রুচিবোধ জাগিয়ে তুলবে।

কুন্তলা কর্মকার
হাওড়া

গল্প ভাল, চিত্রনাট্য দুর্বল

বর্তমানে 'বাংলা চলচ্চিত্র চলছে না কেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু কারণ দেখান যায়। যেমন : ১। উত্তমকুমার সুচিত্রা সেন-এর মত জনপ্রিয় নায়ক নায়িকা এবং শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর বড়ই অভাব। ২। কিছু অযোগ্য পরিচালক আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ছবি উপহার দিচ্ছেন। ভাল পরিচালকরা প্রযোজকের অভাবে বসে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল গল্প থাকা সত্ত্বেও দুর্বল চিত্রনাট্যের জন্য ছবিটি নীরস হয়ে পড়ে। ৪। নব্বইভাগ বাংলা ছবিই সাদা কালোয় তোলা হয় এবং ক্যামেরার মানও অনুন্নত। ৫। পরিচালকদের সাহসের অভাবে নতুন ছেলেমেয়েরা অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ বাংলা ছবির দর্শকরা এখন নতুন মুখ দেখতে আগ্রহী। ৬। আর্ট ফিলমের পাশাপাশি উন্নতমানের কমারশিয়াল বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা ছবি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

সমীরকুমার সাহা
শ্রীরামপুর,
হুগলি

দুধের স্বাদ ঘোলে

সালটা ছিল ১৯৫২। তখন বাংলা ছবির একচ্ছত্র নায়ক রূপে বিরাজ করছিলেন অসিতবরণ, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাছাড়া চরিত্রাভিনেতা হিসাবে ছিলেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলিরা। ঠিক সেই সময়ই বাংলা ছায়াছবির জগতে উত্তমকুমারের মত প্রতিভাবান শিল্পীর

একটানা তিরিশ বছর সেই প্রতিভাবান শিল্পী সকলকে পিছনে ফেলে স্ব ক্ষমতায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। তার ছবি হলেই বকস অফিসে পয়সা আসত। প্রযোজক পরিচালকরা ভরসা পেতেন। টাকা বিনিয়োগ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সেই মানুষটার আকস্মিক মৃত্যুতেই বাংলা ছায়াছবিতে আজ চরম সংকট। প্রযোজক পরিচালকগণ মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন আজ। সকলের এখন একটিই প্রশ্ন উত্তমের পর কে?

এই প্রশ্নের উত্তর আজ তিন বছরেও পাওয়া গেল না। বাংলা ছবিতে আজ এমন কেউ নেই যিনি উত্তমের শূন্যস্থান পূর্ণ করবেন। পুরনো বা নতুন তেমন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। প্রযোজকরাও আর অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি হচ্ছেন না নতুনদের কাউকে নিয়ে। অন্তত ওরা যে উত্তমের বিকল্প নন সেটা তো এতদিনে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। অতঃকিম ·

সুব্রত কুমার মুখোপাধ্যায়
সিউড়ি,বীরভূম

সহজ সরল ছবি

প্রতি সপ্তাহে নতুন বাংলা বই রিলিজ করার পরই এক সপ্তাহের বেশি আর চলছে না। কিন্তু পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যাচ্ছে পুরনো ছবিগুলি নতুন ছবির থেকেও বেশিদিন চলছে।

আজকালকার ছবিগুলি টেকনিকের দিক থেকে যত উন্নতির দিকে যাচ্ছে গল্প ও বক্তব্যর ব্যাপারে ততই নেমে যাচ্ছে, সুন্দর মুখশ্রী যেমন প্রথমেই সকলকে আকৃষ্ট করে তেমনি ছবির শ্রী বা সৌন্দর্যই হল স্বাভাবিক চরিত্র নিয়ে বলিষ্ঠ কাহিনী।

দর্শকের মন সাধারণত শিশুর মত সহজ সরল জিনিস দেখতেই ভালবাসে, কোন কৃত্রিমতা দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আসলে আরট বা কমারশিয়াল যে কোন ধরনের ছবিতে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এমন একটা জগতে নিয়ে যেতে হবে যেখানে গিয়ে দর্শকরা আপাতবিরোধী দুটো জিনিস উপলব্ধি করতে পারে, একটি হল বর্তমানের সমস্যা পীড়িত জীবনকে ভুলে অন্য এক পৃথিবীতে পৌঁছে যাওয়া অথবা বর্তমান পৃথিবীর সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ান।

সিনেমা হল নিছক আনন্দ। দর্শক এই তিন ঘণ্টা নিজেকে ভুলে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিটি ছবিতে

যদি সেই একই চিন্তাধারা, একই ছকে বাঁধা কাহিনী দেখতে পান তাহলে তার নিজেকে ভুলে থাকা আর হয় না। জীবন নিয়ে বা সমস্যা পীড়িত সমাজ নিয়ে বলিষ্ঠ কাহিনী, স্বাভাবিক অভিনয়, স্বচ্ছন্দ গতি থাকলেই বাংলা ছবি দেখে তৃপ্ত হওয়া যায়।

তাই ভাল বাংলা ছবি করতে গেলে চাই ভাল পরিচালক। দরকার বলিষ্ঠ কাহিনী যা মানুষের মনকে সহজেই ছুঁতে পারবে। কারণ আজকাল দর্শকরা বেশির ভাগই জটিলতা পছন্দ করেন না। তাই তিন ঘণ্টা আনন্দের উপকরণ হিসেবে সহজ সরল অথচ সুন্দর আবেগপ্রবণ কাহিনী বিবেচনা করা উচিত।

নূপুর ভট্টাচার্য
আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাংলাকে ভালবাসা হয়নি

প্রধান কারণ আর্থিক সমস্যা ও বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি শিক্ষিত সমাজের তাচ্ছিল্য ভাব। তাছাড়া কিছু শিল্পী আছেন যারা বাংলা চলচ্চিত্রে একটু নাম করলেই মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়ে হিন্দি সিনেমায় মেতে ওঠেন।

এই দুরবস্থা দূর করতে হলে, ভালবাসতে হবে বাংলাভাষাকে। আর বাংলাভাষাকে বাংলার কৃষ্টিকে ভালবাসলে পরিচালকদের ভাল ছবি পরিচালনা করতে অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রাণ দিয়ে রকমের ছবি পছন্দ করছে লক্ষ রাখতে হবে। ত্রয়ী, অমানুষ, অনুসন্ধান, দাদার কীর্তি, রাজবধূ এসব ছবির সাফল্য দেখে মনে হয় বোমবাইয়ের ঢংটি উপস্থাপনা করা ব্যবসায়িক বাংলা ছবির জন্য খুবই দরকার। সুমিত্রা মুখারজি, সোমা দে, আরতি ভট্টাচার্য এবং চরিত্রাভিনেত্রী। নায়িকা হিসাবে এদের ভাবা যায় না। সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী, মাধবী প্রমুখ অভিনেত্রীদেরও বয়স হয়ে গেছে। নায়িকাকে স্মারট অল্পবয়সী ও সুন্দরী হতে হবে। কারণ বর্তমান যুগের ছবিতে অভিনয়ের থেকে গ্ল্যামারের বেশি প্রয়োজন। মুনমুন সেন, আলপনা গোস্বামী, দেবশ্রী রায় এদের নিয়ে ছবি করতে হবে। তবেই হয়ত শেষ পর্যন্ত বাংলা ছবি বাঁচতে পারে।

গোপাল দাস
গোবরডাংগা, ২৪ পরগণা

১৭–৩০ বছর বয়সী দর্শক

সিনেমা একটা বাণিজ্যিক শিল্প। সেইজন্যে লগ্নীকৃত টাকা সুদআসল এবং লাভ সমেত ফিরে পেতে চাওয়াটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বিকৃত শরটকাটের ফাঁদে পা দিয়ে প্রযোজকদের আজ হসেনাদাম অবস্থা। তারা বোমবাই মারকা দেহপশরা সাজিয়ে, গানের নামে দামামা পিটিয়ে মারদাংগা খুনের বাতিল ফরমুলা মেরে কুবের হতে চেয়েছিলেন। তারা বাঙালির মৌল চরিত্রকেই বুঝতে চাননি। শুধু ১৭ থেকে ৩০ বছর বয়সের দর্শকদের মুখ

'পুরনো বস্তাপচা 'আশীর্বাদ' মারকা কাহিনী চলবে না'

অভিনয় করতে এবং দর্শকদের বাংলা ছবি দেখতে কোন অসুবিধাই হবে না।

তাপসী রাণী হবকরা,
কাঁকিনাড়া,
২৪ পরগণা

প্রৌঢ়া নায়িকা

যে কোন কাজের গতি একদিকে হওয়াই ভাল। কিন্তু বর্তমানের ক্ষমাবশিয়াল বাংলা ছবি কোন গতিতে চলছে বলা কঠিন। বাংলা ছবিতে ভাল কাহিনী নির্বাচিত হচ্ছে না। সংমা, ছোট মা, মায়ের আশীর্বাদ এসব সেনটিমেনটাল কাহিনী দিয়ে আধুনিক যুগের দর্শককে পর্দার সামনে উপস্থিত করা যায় না। এর জন্য অবশ্য পরিচালক ও প্রযোজক বিশেষভাবে দায়ী। বাংলা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে হলে দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী ছবি করতে হবে। দর্শক কী

চেয়ে ছবি করছেন। মোট সিনেমা দর্শকের এরা মাত্র ৩৫%। কিন্তু তাদের ভেতরেও তো বিরাট একটা সংখ্যা মননশীল, সাংস্কৃতিক চারুশীলতায় শ্রদ্ধাবান। ফলে, ওই বাং-হিন্দি ছবির জগাখিচুড়িতে তাদের অরুচি। তাহলে বৃহত্তর বাঙালি দর্শকের মনোভাব ? আসলে বাঙালি মানসিকতা অনুভব-উপলব্ধির রস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে ভালবাসে। এককভাবে ভাল গল্প, মহৎ পরিচালক বা শুধু প্রিয় তারকার নামে আর ছবি কাটে না। সব কিছুর সমন্বয়ে একটা উত্তরণের বোঝাই আসল। অতএব নিবিড় মানবিক ভাবসম্পদের শিল্পশোভন অথচ হৃদয়স্পর্শী রসসম্পৃক্ত ছবি তৈরি না করতে পারলে, বাংলা ছবির বাঁচবার আর অন্য রাস্তা নেই।

সিতাংশু শেখর ঘোষ
হাওড়া–১

অন্যের ঘাড়ে চেপে

দুরবস্থার প্রধান কারণ অধিকাংশ বাংলা ছবির প্লটহীন গল্প, বাঁধনছাড়া চিত্রনাট্য। পরিচালকদের এক বড় অংশ ক্যামেরাই ধরতে জানেন না, বোঝেন না চিত্রনাট্যের শ্রেণীবিন্যাস। তার ওপর চরিত্রানুযায়ী শিল্পীনির্বাচন করেন না। অথচ ভাল ছবির অন্যতম শর্ত হিসাবে এ বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শুধু ক্যামেরাম্যান আর সহকারী পরিচালকদের ঘাড়ে চেপে ভাল ছবি হয় না। আসলে এরা উপযুক্ত রিলিজ চেন পাওয়া যায় না। ফলে নতুন পরিচালকদের তৈরি ছবিগুলি বিশেষ পাত্তা পাচ্ছে না। রাজ্য সরকার যদি এদিকে উপযুক্ত সদিচ্ছা নিয়ে এবং এই সদিচ্ছা পূরণ করার জন্য কার্যক্ষম অফিসার নিয়োগ করে ছবি রিলিজের ব্যবস্থা করেন তবেই এর কিছুটা সমাধান হতে পারে। যে কোন ব্যবসাতে মারকেট অ্যানালিসিস হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলা সিনেমার বাজার নিয়ে যথাযথ সমীক্ষা এখনও হয়নি। পৌরাণিক ছবি, সামাজিক ছবি, ঐতিহাসিক ছবি প্রভৃতি কীরকম

'সমাজ সচেতন দক্ষ পরিচালক না হলে বাংলা ছবি ডুববে'

ছবির টাইটেল কারডে নিজেদের নামের আগে 'কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনা' ইত্যাদি বিশেষণ দেখতে উৎসাহী, ঐসব বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্রও যোগ্য নন।

অনুপ কুমার দত্ত
কলকাতা- ৭০০০৬৪

রিলিজ চেনের অফিসার

'সিনেমা' কথাটা লিখিতভাবে চালু হলেও সাধারণের কাছে সিনেমা 'বই' হিসাবে পরিচিত। এই বই কথাটি থেকেই বোঝা যায় দর্শক চান একটি নিটোল গল্প। যদিও এই একই দর্শকের প্রত্যাশা হিন্দি সিনেমার কাছে অন্য রকম। সুতরাং এই নিটোল গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যারেটিভ স্টাইলও দর্শক সিনেমাতে আশা করেন। আবার বর্তমানে দর্শকদের কাছে বিনোদনের সময় কম থাকায় বাংলা সিনেমার ন্যারেটিভ স্টাইলের কাজও খুব সংক্ষেপে সারতে হবে। যাতে দর্শক তার অভিরুচি অনুযায়ী মনের মত জিনিস খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু বাংলা সিনেমা অনেকগুলি কারণে এই সমস্ত জিনিস দর্শকদের কাছে পৌছে দিতে পারছেন না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সিনেমা শিল্পে জড়িত অভিজ্ঞ কলাকুশলী বা পরিচালকের অভাব আছে। কিন্তু ক্ষমতা তাঁদের সীমিত। বস্তাপচা মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা নিয়ে আমাদের কলাকুশলীরা যেসব ছবি উপহার দিয়ে আসছেন তার চেয়ে বেশি আশা করা অন্যায়। একটা ছবির কলাকৌশলগত দিক উন্নত হলে তার ন্যারেটিভ স্টাইলেরও উন্নতি হয় যা দর্শকদের চোখকে নান্দনিক তৃপ্তি দেয়। বর্তমানে বাংলা সিনেমায় দক্ষ অভিনেতার অভাব না থাকলেও অভাব আছে গ্ল্যামারসম্পন্ন অভিনেতা, বা অভিনেত্রীর। বাংলা সিনেমার আর এক সর্বনাশা কারণ বাজার নেয় এবং এর দর্শক কতখানি, তার উপযুক্ত সমীক্ষা হওয়া দরকার। অন্যদিকে বাংলা সিনেমায় গানের প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল। গানের কথা এবং সুরের সংগে অনেক সময়ই মিল থাকে না। গানের কথার কাব্যিক দিক ভীষণভাবে উপেক্ষিত, আরও উপেক্ষিত এর সুরের দিক। ছবির গান ভাল হলে, রিলিজের আগে ছবির প্রচারে তা-ও সহায়তা করে।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
মকদুমপুর,
মালদা

ইমোশন আছে মোশন নেই

বাঙালিরা দক্ষিণ ভারতীয়দের মত হিন্দি বিদ্বেষী নয়। তাছাড়া তারা হিন্দিভাষা নানা কারণে বুঝতে পারে।

আর এ কথাও অনস্বীকার্য, বাংলার তুলনায় হিন্দি ছবির টেকনিক্যাল স্ট্যানডারড অনেক উন্নত। এ কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে, সিনেমা শুধু ইনটেলেকচুয়াল লাকসারি নয়। সিনেমাকে গণমুখী করতে হলে সর্বোপরি তাকে আনন্দদায়ক হতে হবে। বাংলা সিনেমাকে সুস্থ, সুবোধ্য, সুরম্য ও শিক্ষামূলক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত পারিবারিক তথা সামাজিক ছবির নামে 'মান-অভিমান' মারকা সেনটিমেনটাল মেলোড্রামা দেখতে-দেখতে আমরা আজ তিতিবিরক্ত। 'কখনো মেঘ' ও 'শেষ অংকের' মত ডিটেকটিভ ছবি হচ্ছে না কেন? যেখানে একজনও রোম্যানটিক নায়ক নেই, সেখানে সার্থক 'রোম্যানস' সৃষ্টির কথাও অভাবনীয়। বাংলা ছবির জগতে অ্যাকশন দূর-অস্ত্। 'ওয়ার ফিলম'-এর প্রসংগ উত্থাপন উন্মাদের প্রলাপ। অথচ 'হকীকৎ' ও 'হিন্দুস্তান কী কসম' হয়েছে।

তৃতীয়ত, বাংলা ছবিতে 'ইমোশন' থাকলেও 'মোশন' নেই, হিন্দিতে আছে। চতুর্থত, এখানে অভিনয় ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ সীমিত। এসব ত্রুটি দূর না করে সংকট মোচনের চেষ্টা হবে বাতুলতা।

অমলকান্তি বিশ্বাস
দুর্গাপুর,
বর্ধমান

শিল্পসৃষ্টি, না বালখিল্যপনা

বাংলা ছবির দর্শক হিসেবে পরিচালকদের শিল্পসৃষ্টির নামে বালখিল্যপনা দেখে মনে হয়, আর কিছু করার নেই বলে সম্ভবত তারা ছবি তৈরির কাজে নেমেছেন। তা না, হলে ইচ্ছেপূরণের মামুলি আলু ভাতে মারকা ছবিগুলো তৈরি হল কী করে। এগুলো না হলে বাংলা ছবির কী ক্ষতি হত। একটা বই আবেকটার প্রকসি হিসেবে বেরিয়ে যেন ফিসফিস করে বলছে 'কাউকে বোলো না'।

এরই পাশাপাশি যেন সসংকোচে আত্মপ্রকাশ করছে 'দূরত্ব' 'খারিজ' কিন্তু এইসব বাংলা ছবি দর্শকদের টানতে পারছে না। দর্শকদের শ্রেণীবিভাগ মেনে নিতেই হবে। উন্মাসিকের মত শুধু বিদেশি পুরস্কার এবং কফি হাউস রেস্টুরেন্ট ড্রয়িং রুমে ঝড় তোলার জন্য ছবি করার দায়িত্ব নিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সম্ভবত আর একটু বিস্তৃত করে ভাববার দিন এসেছে।

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী
শিলিগুড়ি, দারজিলিং

মন্দের আকর্ষণই বেশি

হঠাৎ কী এমন ঘটল যে বাংলা ছবি আজ জনসাধারণের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে হিন্দি ছবি পূর্ণ হয়ে উঠল। এর কারণ, হিন্দি ছবির জগতেও বিশাল পরিবর্তন। হিন্দি ছবির মাতব্বররা সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে যে জিনিস জনসাধারণকে গিলিয়ে দিচ্ছেন তা কতটা আমোদ প্রমোদ আর কতটা মূল্যবোধহীন চরিত্র ধ্বংসকারী তা ইদানিং সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

মন্দের আকর্ষণ ভালর চেয়ে চিরদিনই বেশি। গাঁজা মদের দোকানে ওষুধের দোকান থেকে বেশি লাভ হতেই পারে। তা বলে ওষুধের দোকান তুলে দিয়ে গাঁজা মদের দোকান করতে হবে এটা নিশ্চয় কেউ সমর্থন করে না। গোটা সমাজ যাতে গাঁজা মদে আসক্ত না হয় তার জন্যে কত আইনকানুন বিধিনিষেধ রয়েছে। তাহলে মানবিকতাহীন নীতিশূন্য হিংসাসর্বস্ব হিন্দি ছবির বেলায় কেন কোন রকম আইন চালু হবে না। আঞ্চলিক ছবিগুলিকে বাঁচাবার জন্যে অন্তত তা করা দরকার।

শ্যামল কর্মকার
কলকাতা ৭০০০৩১

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

ছবিকে আকর্ষণীয় এবং কাহিনীকে টেনে ধরে রাখার মত দক্ষ নায়ক নায়িকার অভাব, দক্ষ পরিচালকের অভাব, অর্থের অভাব এবং মানুষের রুচির পরিবর্তন বাংলা ছবির পটপরিবর্তনে অনেকখানি দায়ী। হিন্দি ছবির জৌলুসে দর্শকের মন ঝলসে উঠেছে, তাই স্বভাবতই জৌলুসহীন বাংলা ছবি দর্শকের মনকে টানতে পারছে না। যুগের পরিবর্তনের সংগে রুচির পরিবর্তনও ঘটেছে। দু'একটা ভাল ছবি মানুষের মনকে কতদিন আর বেঁধে রাখতে পারবে। তাই যুগের হাওয়ার সংগে তাল মিলিয়ে কিছু ছবি অবশ্যই করতে হবে। সে সংগে লক্ষ্য রাখতে হবে দর্শক কী চায়, কাকে চায়। আর একটি কথা এই প্রসংগে বলা যায়, বাংলার বাইরে যত বাংলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা আছে পশ্চিমবাংলায় তার অনেক বেশি হিন্দি ছবি দেখান হয়। ঐদিকে সরকার যদি একটু নজর দেন তাহলে হয়ত অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। কারণ এর পিছনে অর্থের দিকটাও তো রয়েছে। অর্থের কথা ভেবেই তো অনেক দক্ষ পরিচালকও ছবি করতে দ্বিধান্বিত হন।

বীণা নাথ
বড়জাগুলী,
নদীয়া

একপেশে মাতামাতি

অনেক জঘন্য ছবিতেই উত্তম কুমারের একক অভিনয় সেই সব ছবিকে সুপার হিটের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। আর ছিল সুচিত্রা উত্তম জুটির বিখ্যাত সব ছবি। এঁদের এই সব ছবি আর সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ প্রমুখ ভাল পরিচালকদের ছবির যোগফল বাংলাছবির জনপ্রিয়তা বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়, ক্রমবর্ধমান গতিতে বেড়ে গিয়েছিল।

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ; তরুণ মজুমদার, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, রাজেন তরফদার, সুশীল মজুমদার, বিজয় বসু, অরুন্ধতী দেবী – এঁদের প্রত্যেকের একটি করে ছবি যদি এক বা দেড় বছরে ক্রমান্বয়ে পাওয়া যেত তাহলে বাংলা চলচ্চিত্র উপকৃত হত। দেখা গেছে অনেক ভাল পরিচালক প্রযোজক না পেয়ে ছবি তৈরি বন্ধ রেখেছেন নয় তো অন্য রাজ্যে চলে গেছেন অন্য ভাষায় ছবি তৈরির জন্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত, যখন দেখা যাবে কোন ভাল পরিচালক প্রযোজক পাচ্ছেন না তখনই সেই পরিচালকের ছবিতে টাকা দেওয়া।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ প্রভৃতি নতুনদের নিয়ে এবং পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্তকে নিয়েও মাতামাতি হচ্ছে আজকাল। এঁরা যে ধরনের ছবি তৈরি করছেন তা বাংলা ছবিকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। চলচ্চিত্র উৎসবে হৈ চৈ হওয়ার মানে এই নয় যে বাংলা ছবিতে প্রাণসঞ্চার করা। এঁদের ছবি মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্য মাত্র, সকলের জন্য নয়।

অমরেন্দ্র নাথ ধর
পাটনা, বিহার

সংক্ষিপ্ত মতামত

বাংলা ছবি চিরদিনই সাহিত্য নির্ভর। ছবির চরিত্রগুলো ঠিক আমাদেরই মত। তাতে নেই হিন্দি ছবির মত চোখ ধাঁধান রঙ-চঙ, নেই মন মাতান ডিসকো. ডানস, আর পাওয়া যায় না গব্বর সিং ভিলেনের সংলাপ, তাই আমাদের সাদা কালো ছবি সহজে মানুষের মন কেড়ে নিতে পারে না।

সন্ধ্যা দত্ত, ডিব্রুগড় আসাম

যে ছেলেরা ডিসকো নাচগান করে তারাই 'দাদার কীর্তি' 'চরণ ধরিতে দিও' রবীন্দ্রসংগীতটি গায়। সুতরাং কোন আরট ফিলম না চললে বুঝতে হবে ডিরেকটর কমিউনিকেশনে ব্যর্থ হয়েছেন।

কুমকুম দত্ত
রাধানগর, বর্ধমান

আমাদের দেশে অধিকাংশ দর্শক নিম্নবিত্ত। এই নিম্নবিত্তদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সীমিত, তাই আরট ফিলমের বাজার খুবই মন্দা। এক কথায় বলা যায়, আমাদের দেশে আরট ফিলম বোঝার দর্শক প্রায় নেই ই।

মৃণালকান্তি দাশ কলকাতা ৭০০০০৪

বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুন করে ভাবতে হবে। সেখানে থাকবে সৎ ও সাবলীল শিল্প ও নিপুণতা তৈরি করতে হবে নতুন ধারার ছবি। তা হবে বুদ্ধিদীপ্ত, রোমানটিক এবং অবশ্যই এনটারটেইনিং।

দুলাল চক্রবর্তী, ডাকবাংলা রোড,
কালিয়াগঞ্জ

সংকটমোচনে দরকার সরকারি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ ও সেখানে নিয়মিত ছবি মুক্তির ব্যবস্থা করা। সেই সংগে সরকারি প্রচারাভিযান শুরু করা চাই। অবশ্য চিত্র সমালোচকদের মানোন্নয়ন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি তৈরির জন্যও প্রচার চালাতে হবে।

অনিলচরণ কুণ্ডু
বাটানগর,
২৪ পরগণা

ভবিষ্যতে ভাল বাংলা ছবির জন্য চাই আদর্শবান শাসকপক্ষের হস্তক্ষেপ। উচিত বাংলা ছবির পক্ষে ও অন্যান্য ছবির বিপক্ষে সরকারের তরফ থেকে প্রচারপত্র বের করা।

সুব্রত নন্দী, মধুপুর,
বিহার

ভাল ছবির পরিচালককে পুরস্কার দিয়ে ছবিগুলি ক্যানবন্দী করে রাখলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। ফিলম-সোসাইটিগুলিকে ও প্রগতিশীল সরকারকে, জনগণকে সুস্থ চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব নিতে হবে। শুধুমাত্র এক টাকার টিকিট জাতীয় কোরামিন দিয়ে বাংলা ছবিকে বাঁচানো যাবে না।

বিপ্লব বিশ্বাস,
করিমপুর, নদীয়া

এখনকার শিল্পীদের দিয়ে যদি বাংলা ছবিকে জনপ্রিয় করতে হয় তাহলে ছবির পিছনে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। এবং ছবিতে কিছু আজগুবি তথ্য থাকবে এবং পুরো ছবিটি রঙিন করতে হবে।

কৃষ্ণদয়াল কর্মকার,
পথন্না হাটতলা, বাঁকুড়া

মহানায়ক উত্তমকুমারকে 'ওয়ান ম্যান ব্রিগেড' বলে সম্বোধন করলে বোধ করি, অত্যুক্তি হবে না। বাংলা ছবির দুর্দিনে উত্তমকুমার পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মধু গুঁই,
সহরিপাল, হুগলি

হল মালিকরা বাংলা ছবি রিলিজ করতে বাধা দেন কারণ টাকা তেমন উঠবে না। পাশাপাশি হিন্দি ছবি নিলে মালিকের মোটা টাকা লাভ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৭০০০৩০

শেষের সে দিন

অম্লমধুর

দশের টাকা
করছে ফাঁকা,
কাজের নামে কে বা কারা ?
বলতে মাসি,
পাচ্ছে হাসি,
তোমার আমার কুটুম তারা ।।

তৃষিত বর্মন

এ তো বড় রংগ জাদু
এ তো বড় রংগ—
কোন রংগ বলতে পার ?
যাব তোমার সংগ—
সেপটেমবরে আবার নাকি
বনধ হবে বংগ
বনধ ফুরলেই হরতালিরা
রণে দেবেন ভংগ ।।

শুভাশিস হালদার

মন্ত্রীর পুত্রের
চুরি গেল গাড়ি,
ছোটে পুলিশ সেই খোঁজে
জাগে থানা ফাঁড়ি।
ডাকাত এসে মেরে-ধরে
নিয়ে গেলে সব,
তুমি আমি কেঁদে মিছে
করি কলরব।

সুব্রত কুমার করণ

থানায় এলে গরিব মানুষ
অকারণে ধমকানি।
ধনীর বেলায় 'আসুন, বসুন—
সবুর করুন, চা আনি।'

রামকৃষ্ণ দে

শ্রাবণ গেল টিপির টিপির
মিলল নাকো ইলিশ—
বলতে পারিস রুপোলি ধন
কোথায় তোরা মিলিশ ?
ভেতো বাঙালি মাছ কাঙালি
মরছে তোমার শোকে
আর কতকাল চুনোপুঁটি
খাবে দেশের লোকে ?
দাখা দিয়ে হৃদয় জুড়োও
তেলে-ঝোলে-ঝালে,
পদ্মা ছেড়ে থাক এসে
বাগবাজারের খালে।

প্রণতি বর্মা

ব্যংগচিত্র : লাহিড়ী

শ্রীলংকার এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের উৎস কোথায়?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল-ভাষীদের কেন্দ্র করে শ্রীলংকার অসন্তোষের ধুয়ো কিন্তু অনেক-দিনের। এই অসন্তোষই এতদিন চাপা থাকতে থাকতে এবার প্রবল দাঙ্গায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদিও ভারত এবং শ্রীলংকা সরকার এতদিন পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখিয়ে এসেছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এই অসন্তোষের আগুন চাপা পড়েনি তা বোঝা গেল এবার।

বিদ্বেষের উৎসটা কিন্তু অন্য জায়গায়। এই তামিলভাষী ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীলংকায় বসবাসকারী। এবং এরা প্রত্যেকেই শ্রীলংকার বিভিন্ন ব্যবসায়ে ও প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে এই একটি কারণেই এদের ওপর গোঁড়া সিংহলিদের আক্রোশ। এবং এদের এই তামিলভাষাকে কেন্দ্র করে গোঁড়া সিংহলিরা কখনই এদের নিজেদের লোক বলে মেনে নিতে পারেনি। এই দূরত্ব এবং অর্থ নৈতিক বৈষম্যই বিদ্বেষের আগুন ধীরে ধীরে জ্বালিয়ে তুলেছে। আর তামিলভাষাকে কেন্দ্র করে এই তামিলভাষীদের গোঁড়া সিংহলিরা চিরকালই ভারতীয় হিসেবে ভেবেছে। যদিও ভারতের সঙ্গে এই তামিলভাষীদের যোগসূত্র খুবই সামান্য, শুধুমাত্র ওই তামিল-ভাষাটুকুতেই। আর ভারত বিদ্বেষী জিগিরের জন্ম এই থেকেই। এই জিগিরকেই ইন্ধন যোগান হয়েছে চিরকাল বিভিন্ন মহল থেকে।

এই বিদ্বেষ যতই দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করেছে ততই তামিলভাষীরা তাদের নিরাপত্তার দাবিতে সিংহলে স্বতন্ত্র তামিল-প্রদেশ 'তামিল ইলাম' গড়ার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আর এখন এ দাবি তামিলভাষী মহলে বেশ জোরাল। এই তামিলভাষী সিংহলিরা চিরকালই সিংহলের মাটিতেই তাদের জীবন-যাপন ও জীবিকার শেকড় গেড়ে এসেছে। ভারতবর্ষ এদের কাছে যে কোন অন্যান্য বিদেশের মতই একটি বিদেশ।

শ্রীলংকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ এই তামিলভাষী ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। এরা অধিকাংশই চা এবং রবার শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ১৯৪৭-এর আগে কিন্তু এরা শ্রীলংকায় প্রায় পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদাই ভোগ করত। এমনকি ১৯৩১, ৩৬ এবং ৩৭-এর শ্রীলংকার নির্বাচনে এরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮-এ শ্রীলংকা স্বাধীন হওয়ার পর এদের নতুন করে নাগরিকত্বের আবেদন করতে বলা হল। প্রায় ৮ লক্ষ ২৫ হাজার তামিলভাষী আবেদন করল। কিন্তু আবেদন গ্রাহ্য হল মাত্র ১ লক্ষ ৩৪ হাজারের। আর বাকি সবাই মুহূর্তের মধ্যে অসিংহলীয় হয়ে গেল। অথচ এই বিশাল তামিলভাষী জনগণ কিন্তু বহু বছর আগে শ্রীলংকাকেই তাদের মাতৃ-ভূমি বলে গ্রহণ করেছিল। তাদের জীবনযাপনের যাবতীয় শেকড় গেঁথেছিল শ্রীলংকার মাটিতেই। শুধুমাত্র তামিলভাষাটুকু ছাড়া তাদের সঙ্গে ভারতের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ আশ্চর্য, আইনের প্যাঁচে তারা রাতারাতি হয়ে গেলেন অসিংহলীয়।

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে

১৯৫২-য় স্বাধীন শ্রীলংকার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু এক বিশাল সংখ্যক তামিলভাষী এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারল না। কারণ শ্রীলংকার সংসদে ১৯৪৯ সালে গৃহীত 'ইনডিয়ান অ্যানড পাকিস্তানি রেসিডেনটস সিটিজেনশিপ অ্যাকট'-এর ফলে তাদের নাম ভোটার তালিকাতেই তোলা হয়নি। বলা যায় তামিল-ভাষীদের ওপর পরোক্ষ নির্যাতনের শুরু সেই থেকেই। বিলটি লোয়ার হাউসে পাশ হলেও সেনেটে যায়নি। কারণ শ্রীলংকার তৎ-কালীন প্রধানমন্ত্রী ডাডলি সেনা-নায়েক ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মধ্যে ১৯৫৩ সালে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দিন ধার্য হয়ে যাওয়ার জন্য। পরে অবশ্য সেনানায়েকের পদত্যাগ করার ফলে ১৯৫৩-র ৩০ অকটোবর শ্রীলংকার নতুন প্রধানমন্ত্রী কোটালেওয়ালার সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। দুই দেশের মধ্যে এ বিষয়ে নতুন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু শ্রীলংকা সরকারের মনো-ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। ১৯৫৫ সালে নেহরু শ্রীলংকা সরকারকে লেখা একটি চিঠিতে এ বিষয়ে বেশ উদ্বেগও প্রকাশ করেন। তবে শ্রীলংকা সরকার যে দৃষ্টিতে তামিল-ভাষীদের দেখছিলেন তার উন্নতি তো কখনই হয়নি, বরং বেশ কিছুটা অবনতিই হয়েছিল। ঐ ১৯৫৫ সালেই শ্রীলংকা পারলা-মেনটে ভাষণ দেবার সময় কোটালেওয়ালা বলেছিলেন, 'যদি ভারত বৃটিশদের প্রতি 'ভারত ছাড়' আওয়াজ তুলতে পারে, তবে আমরাও 'ভারতীয়রা সিংহল ছাড়' আওয়াজ তুলতে সক্ষম।' অবশ্য

কোটালেওয়ালার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েক এ বিষয়ে কিছুটা আপোসের মনোভাব দেখিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীলংকা পারলামেন্টে তিনি বলেছিলেন যে তামিলভাষীদের শ্রীলংকায় বহির্ভূত মনে করার কোন কারণই নেই। সলোমন বন্দরনায়েকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েক শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রীত্বে আসীন হন। সিরিমাভো অবশ্য বরাবরই ভারত এবং তামিলভাষীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখিয়ে এসেছিলেন। কারণ তিনি এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীলংকা অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ এই তামিলভাষীরা। কাজেই নির্বাচনে যদি জয়লাভ করতেই হয় তাহলে এদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতে হবে। বলা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি ১৯৬৪ সালে ভারত সফরে আসেন এবং ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে একটি চুক্তিও করেন। এরপর ১৯৭৩ ও ৭৪-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সিরিমাভো বন্দরনায়েক যথাক্রমে শ্রীলংকা ও ভারত পরিদর্শন করেন। তাঁরা ১৯৬৪ সালের শাস্ত্রী-সিরিমাভো চুক্তি অনুযায়ী তামিলভাষী সংক্রান্ত বিষয়টি যৌথভাবে ফয়সালা করার কথাও বলেন।

জয়বর্ধনপরায় শ্রীলংকার নতুন সংসদভবন

১৯৭৭ সালে দু দেশেই সরকারের পরিবর্তন ঘটে। শ্রীলংকায় বন্দরনায়েকের পরিবর্তে জয়বর্ধনে ক্ষমতায় আসেন, ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর পরিবর্তে মোরারজি দেশাই। ঐ ১৯৭৭-এর আগস্টেই তামিলভাষী জনসাধারণকে কেন্দ্র করে শ্রীলংকায় আর একবার দাঙ্গা বাধে।

শ্রীলংকায় ১৯৭৭-এর নির্বাচনে কিন্তু জয়বর্ধনের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউ এন পি) তামিল অধ্যুষিত উত্তর এবং পূর্ব শ্রীলংকায় বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। ঐ সময়ই তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (টি ইউ এল এফ) স্বতন্ত্র তামিল প্রদেশ গঠনের দাবি জানায়। এমনকি ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারিতে যখন তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই শ্রীলংকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সেখানে যান, টি ইউ এল এফ তখন সেই উৎসব বর্জন করে। মোরারজি অবশ্য দেশে ফিরে বলেছিলেন, বিরোধীপক্ষ ও তামিলভাষীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রীলংকার উন্নতিতে কাজ করে যেতে রাজি। এর পরবর্তী সময়ে দু দেশের রাষ্ট্রনায়কদের ভেতর আর কোন বড় সফর বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

এতবার দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ভেতর সফরের ফলে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মূল ব্যাপারটা হল, যখন যে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করেই তামিলভাষী সংক্রান্ত বিষয়টি এগিয়েছে। কিন্তু কোন গ্রহণযোগ্য পথে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি ফয়সালা করা আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। কিছু না কিছু ফাঁক বরাবরই থেকে গেছে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। পুরো সমস্যাটাই ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে আছে। উভয় পক্ষের ক্ষোভ বেড়েছে। আর এতদিন পর সেই আগুনে পড়েছে ঘৃতাহুতি। এখন শুধু এটাই দেখার বিষয়, এই নবহত্যার পেছনে আসল উস্কানি কার? উপমহাদেশে অশান্তির রাজ্য সৃষ্টি করে কোনপক্ষ লাভবান হবেন? আর এই অশান্তি দমনে শ্রীলংকা সরকার সঠিক মনোভাব নেবেন নাকি তারা এই অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা দীর্ঘদিন ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে চালিয়ে যাবেন? শ্রীমতী গান্ধীর বন্ধুত্বপূর্ণ হাত জয়বর্ধনে কতদিনে ধরেন এখন সেটাই দেখার। □

আলোকচিত্র :
শ্রীলংকা তথ্য দপ্তরের সৌজন্যে

বামফ্রনটের চার শরিকের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর অভিযোগ

নিশীথ দে

সি পি আই (এম) অংক কষে দেখিয়ে দিয়েছে বামফ্রনটের চার শরিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধেই আক্রমণ বেশি কেন্দ্রীভূত করেছিল, কংগ্রেস (ই)র বিরুদ্ধে নয়। এই চার শরিক হল ফরোয়ারড ব্লক, আর এস পি, সি পি আই এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক। সি পি আই (এম) নেতারা বলেছেন, সব জেলাতেই আমরা শরিকদের সংগে চুক্তিতে আসার চেষ্টা করেছি। দু মাসের বেশি এই চেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু প্রতিটি জেলাতেই ব্যর্থ হয়েছি। মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর আমরা ৩২০০ সি পি আই (এম) প্রার্থীর নাম ত্রিস্তরের আসনগুলি থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম। সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, যে কোন মূল্যে বামফ্রনটের ঐক্য রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেই সংগে এ কথাও সত্য যে সি পি আই (এম)-এর শক্তি খর্ব করে, আসন সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে বামফ্রনটের ঐক্য শক্তিশালী করা যায় না। কয়েকটি বাম দল সি পি আই (এম)-কে খর্ব করে, সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের শক্তি বাড়াতে চায়। সি পি আই (এম) এর বিরোধিতা করে বাম ঐক্য শক্তিশালী করা সম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'ইন্দিরা কংগ্রেস' সফল হয়েছে এটা সি পি আই (এম) স্বীকার করে না। সি পি আই (এম) নেতাদের হিসাবে বামফ্রনটের অনৈক্য সত্ত্বেও সি পি আই (এম)-এর ফল কয়েকটা জেলায় অত্যন্ত ভাল। ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে প্রদত্ত ভোটও বেড়েছে। নির্বাচনী সংগ্রামে এবং ভোটের অংকে ইন্দিরা কংগ্রেস তার অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি করছে।

তবু গতবারের তুলনায় সি পি আই (এম) এবং বামফ্রনটের আসন কমল কেন? সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্ব স্বীকার করেছেন, বামফ্রনটের অনৈক্য ছাড়াও পারটির মধ্যে অনেক দুর্বলতা আছে। যেমন দুর্নীতি, পারটিতে নিয়ন্ত্রণের অভাব, সুবিধাবাদ, পঞ্চায়েত সমূহের নেতাদের ব্যক্তিগত কাজকর্মের ধাঁচ ও আমলাতান্ত্রিক আচরণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কমরেডদের আমলাতান্ত্রিক আচরণের দরুন কিছু কিছু এলাকায় আমরা অন্যদের কাছে আসন হারিয়েছি। কিছু স্থানীয় কমরেড ব্যক্তিগত কারণে এবং দুর্বলতার দরুন যোগ্য প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পারটির প্রভাব এবং শক্তি সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল ভ্রান্ত।

তাছাড়া ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী অনেক এলাকায় ঘৃণিত বা অপ্রিয় নন। কিছু এলাকায় ইন্দিরা কংগ্রেস কর্মীরা আমাদের কর্মীদের তুলনায় অনেক বেশি উৎসাহ ও সংকল্প নিয়ে অস্বাভাবিক গরমের মধ্যে কাজ করেছেন।

কিছু এলাকায় আমাদের লোকাল কমরেডদের ধারণা ছিল সি পি আই (এম) এবং ইন্দিরা কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন পারটির প্রভাব বা শক্তি নেই। এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যে সব এলাকায় সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত অথবা ঘৃণিত ব্যক্তিদের বামফ্রনটের অন্য শরিকদল প্রার্থী মনোনীত করেছিল সেখানে তিক্ততা চরমে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনে এইসব প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করে।

সি পি আই (এম) মনে করেন, তারাই একমাত্র বাম ঐক্য রক্ষার জন্য কাজ করেছেন। অন্য শরিক-দল বাম ঐক্যবিরোধী কাজ করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেস অনেক আসন পেয়েছে। আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক, সি পি আই এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক সমঝোতা চুক্তি মানেনি।

সি পি আই (এম) অভিযোগ করেছে, নদীয়া জেলার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন সমঝোতার ভিত্তিতে ফরোয়ারড ব্লক পেয়েছিল, পরে তারা ওই দুটি আসনে কংগ্রেস (ই) কে সমর্থন করে ইস্তাহার প্রচার করে। পুরুলিয়ায় দুটি জেলা পরিষদ আসনে সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও ফরোয়ারড ব্লক ওই আসনে প্রার্থী দেওয়ায় সি পি আই (এম) দুটি আসন হারিয়েছে।

তবে শুধু আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক নয় সি পি আই (এম)-এর জেলা কমিটি এবং লোকাল কমিটিও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মানেননি। মুরশিদাবাদে আর এস পি সমঝোতার ভিত্তিতে দুটো আসন পেয়েছিল। কিন্তু আঞ্চলিক কমিটি জেলা কমিটির নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করে। জেলা কমিটি জানতে পেরে প্রার্থী প্রত্যাহার করতে বলে কিন্তু তারা তা করেনি। পরবর্তী সময়ে লোকাল কমিটি ভুল স্বীকার করে।

সি পি আই (এম)-এর প্রাথমিক হিসাবে বামফ্রনটের শরিক দলগুলির লড়াই-এর ফলে অন্তত তিন হাজার আসন কংগ্রেস (ই) পেয়েছে। শুধু মেদিনীপুর জেলায় সি পি আই এর জন্য সি পি আই (এম) গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৭টি আসনে এবং সি পি আই (এম)-এর জন্য সি পি আই হেরেছে ৩৯টি আসনে। সব মিলিয়ে সি পি আই (এম) হেরেছে ফরোয়ারড ব্লকের জন্য ৩৭৪, আর এস পি'র জন্য ৭৬, মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লকের জন্য ৮৩ এবং অন্যান্য বামপন্থীদের জন্য ২২২টি আসনে। মোটামুটিভাবে দেখা গিয়েছে, সি পি আই, ফরোয়ারড ব্লক, আর এস পি এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক—এই চার শরিক কেউ কারো জন্য কোন আসন হারায়নি।

সি পি আই (এম)-এর হিসাবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৬,১৫৩টি আসনে শুধু বামফ্রনটের প্রার্থী ছিল ৬২,৯০০, পঞ্চায়েত সমিতির ৮৬৬৪টি আসনে ১১,৩০৩ এবং জেলা পরিষদের ৬৭৮টি আসনে ৯১০ জন। সব মিলিয়ে সি পি আই (এম)-এর আসন সংখ্যা ৩৪,১৮৩ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২৯,৮৭৭।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করে সি পি আই (এম) বলেছেন, অফিসারদের একাংশ আতংকগ্রস্ত হন এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে বামফ্রনট বিরোধী অংশ 'প্রচলিত নির্বাচন বিধি লংঘন' করে উৎসাহ নিয়ে বামফ্রনট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। পশ্চিমবংগ পুলিশ সমিতির নেতৃত্বের একাংশ হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও পুলিশ কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার জিগির তোলেন। অনেক জায়গায় আমাদের কমরেডরা কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের যোগসাজসে আমলাতন্ত্রের একাংশ ও পশ্চিমবংগ পুলিশ সমিতির নেতৃত্বের একাংশের এই অপকীর্তির মোকাবিলা করেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সি পি আই (এম) বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনের মত গুরুত্ব দিয়েছিল গোড়া থেকেই। পারটি কর্মীদের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে গণ্য করার আহ্বান জানান হয়েছিল। সি পি আই (এম) স্বীকার করে না যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস সফল হয়েছে, আসন বেড়েছে।

সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্ব পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করে এটাও বলছেন, 'অগ্রগতি যত সামান্যই হোক এবং অগ্রগতির প্রকৃতি যাই হোক, ইন্দিরা কংগ্রেসের এই অগ্রগতিকে আমাদের ছোট করে দেখলে চলবে না। ইন্দিরা কংগ্রেস বুঝতে পারছে, সে জনগণের থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পশ্চিমবংগে জনসাধারণের উপর বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রভাব বাড়ছে। এখন এই প্রভাব আগেকার তুলনায় অনেক বেশি গভীর। তাই কংগ্রেস (ই) ফিরে আসার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে।'

সি পি আই (এম)-এর নির্বাচনী ফল পর্যালোচনা পরস্পর বিরোধী। প্রথমত জানা দরকার কংগ্রেস (ই) যে ভোট পেয়েছে তার কি সবটাই কংগ্রেসের ভোট না কি বামফ্রনট বা সি পি আই (এম) বিরোধী ভোট। পঞ্চায়েত নিয়ে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, দলবাজি, ক্ষমতার অপব্যবহার কি মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেনি? পারটির সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা তো সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্ব বার বার স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাতে কী হল। কাগজে-কলমে ভুল স্বীকার, নতুন বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ এবং কংগ্রেস (ই)-র বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। এর পরেও যখন কিছু হচ্ছে না তখন শরিক দলগুলির বিরুদ্ধে দোষারোপ করছেন। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামের গরিব কৃষক, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে কংগ্রেসের কোন সংগঠন নেই। সি পি আই (এম) এর কৃষক সংস্থার সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের বেশি। সি পি আই (এম) এর সওয়া লক্ষ সদস্যের শতকরা ৭০ জন গ্রামের লোক। তা সত্ত্বেও কেন কংগ্রেস সতের হাজার আসন ছিনিয়ে নিল? এ সুযোগ করে দিয়েছে সি পি আই (এম)। সেটাও সি পি আই (এম) অজ্ঞাতে বলে ফেলেছেন। পারটিতে সদস্যদের ৬০ জন নতুন। এদের কোন রাজনৈতিক শিক্ষা বা সচেতনতা নেই। এরা কারা? এদের বড় অংশ কখনও কংগ্রেসে যায় কখনও সি পি আই (এম) এ। সি পি আই (এম) এদের যতই কংগ্রেস বিরোধী মনে করুক না কেন, এদের একটা বড় অংশ গ্রামের মানুষের কাছে কংগ্রেসের চেয়েও খারাপ। □

মুমূর্ষু চলচ্চিত্রকে বাঁচাবে কে ?

অশোক চৌধুরী

আজ ফিলম নিয়ে নানান কথা হচ্ছে। সব কথাগুলি যোগ করলে একটা কথাই বেরিয়ে আসে : আমাদের দেশের ফিলম এগোতে পারছে না। দু চারটে ছবিকে বাদ দিলে তার বাদবাকি সবই বাজে। কোন ছবিরই কোন স্থায়ী মূল্য নেই। এবং ছবির সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টা মাত্র। এতেও হয়ত সান্ত্বনা পাওয়া যেত যদি ছবিগুলি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারত এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত কলা-কুশলীরা সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে পারতেন। কিছু লোককে বাদ দিলে অন্যদের অবস্থা কতটা করুণ তা সবারই জানা আছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে এ প্রহসন চলছে কেন ? এবং এর জন্য দায়ী কারা ?

দায়ী যদি কাউকে করতে হয় তাহলে প্রথমেই আসে একটি চিন্তার কথা। আজও আমাদের ধারণা চলচ্চিত্রের কাজ হল মানুষকে আনন্দ দেওয়া। এর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এই চিন্তার ফলেই ছবিতে সবরকমের রুচির লোককে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যাঁরা খানিকটা সফল হচ্ছেন তাঁরা কিছু পয়সা করে নিচ্ছেন। আর বাকীদের ভরাডুবি হচ্ছে। তবে সুখের কথা অনেকের ভরাডুবি দেখেও অনেকে এগিয়ে আসছেন ছবিতে টাকা বিনিয়োগ করতে। কারণ তাঁরা ব্যর্থ লোকদের মত নিজেদের অতটা অপদার্থ মনে করছেন না। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। একদিন প্রায় সবাইকেই বলতে হচ্ছে---পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলে অবোধ হয়ে না দেখিলি, না শুনিলি এবেরে পরাণ কাঁদে।

এই রাতারাতি বিখ্যাত এবং অর্থবান হওয়ার জগৎ ফিলম শুধু যে একদল বড়লোককেই ডাকে তা নয়। ডাকে অনেককেই। এবং তা নিশির ডাকের মত। অনেক ছেলেরা এবং মেয়েরা ছুটে যায় টালিগঞ্জ পাড়ায়। যাদের আশা আর একটু বেশি, তারা পাড়ি দেয় আরব সাগরের তীরের সেই সহরে। বোমবাই নিশির ডাকে পাওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে স্বপ্নপুরী। পরিণামে কী ঘটে অনেক বার তা আলোচিত হয়েছে। আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের ছেলেরা আরব দেশে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ ওখানে গেলেই নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ফেরা যায়। এই পাগলামির ফলে শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়ায়, কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা সর্বস্বান্ত না হয়। ওই সব দেশে যাওয়ার জন্য সরকারের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নেননি। যদিও প্রচুর ছেলেমেয়ে এখানে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য রোজ স্টুডিওর দরজায় এসে ভিড় করছে।

যাতে টাকা বাজে ভাবে খরচ করা না হয় তার জন্য সরকার এই বছর একটি আইন করেছেন। বিজ্ঞাপন খাতে যে টাকা খরচ করা হবে তার শতকরা কুড়ি ভাগ আয় বলে ধরে নিয়ে আয়কর ধার্য করা হবে। এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। তবে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে প্রতিটি কোমপানি বিজ্ঞাপন খাতে কম টাকা খরচ করতে শুরু করে দিয়েছে।

এইরকম একটা ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের জন্যও করা দরকার। যারা যত টাকা খরচ করে ছবি করবেন তার একটা অংশের ওপর আয়কর দিতে হবে। এবং দশ লক্ষ টাকার ওপরে যারা খরচ করবেন তাঁদের করের হার হবে বেশি। তাছাড়া ছবি যদি নির্দিষ্ট কোন সামাজিক কর্তব্য পালন না করে সেই ছবির ওপর বিশেষ করের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে যেসব বাজে ছবি হচ্ছে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। চলচ্চিত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে যে জুয়া খেলা চলছে তাও একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন যারা ছবি করতে এগিয়ে আসেন তাদের বেশির ভাগেরই এই শিল্প সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাঁদের জ্ঞানের পরিধির পরিমাণ একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে। একদিন এক বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে এক বাজির কথা হচ্ছিল। অনেক কথার পর পরিচালক জানালেন তিনি ছবির মাধ্যমে মানুষের মন তৈরি করছেন এ কথা তাঁর জানা ছিল না। তিনি মনে করতেন ছবির একমাত্র কাজ হল লোককে আনন্দ দেওয়া।

একদিন আমার সঙ্গে এক নামকরা অভিনেতার কথা হচ্ছিল। তিনি আবার মাঝে মাঝে ছবি নির্দেশনার কাজও করেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন—আমরা একটা পাঁঠা পেলে কেটেকুটে খাই। এই পাঁঠাটি হচ্ছেন যিনি ছবির জন্য টাকা লগ্নি করেন তিনি। অর্থাৎ অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে একজন

কাউকে পাওয়া গেলে কিছু দিনের জন্য কিছু লোক খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। তাঁরা একবারও ভাবছেন না যে ভদ্রলোক টাকা লগ্নি করে মার খেলেন তাঁকে দেখে আর অন্য কেউ ছবি করতে এগিয়ে আসতেন না। আর যদি না আসেন তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? হয়েছেও তাই। আজ বাংলা ছবি করার জন্য লোক এগিয়ে আসতে চাইছেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা হওয়া উচিত ছিল একেবারে অন্যরকম। কোন ভদ্রলোককে টাকা লগ্নি করার জন্য পেলে সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত ছিল যাতে ভদ্রলোক অন্তত কিছু টাকা লাভ করতে পারেন। সেটা তখনই সম্ভব যদি ছবি ভালভাবে চলে। একজনকে সফল হতে দেখলেই অন্যেরা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতেন। একদিন এমন হত ছবি করার জন্য লোকের অভাব হত না। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছেন। কিন্তু লগ্নিকারীর সম্বন্ধে যদি তাঁরা দরদী মন রাখতে পারতেন তাহলে আজ এমন অবস্থাটা এসে দাঁড়াত না।

আর একটি বড় মুশকিল হচ্ছে স্টার প্রথা। এক একটি ছবি করতে আজ অনেক টাকা লাগছে। এর একটি কারণ হল জাঁকজমক। অন্য কারণটি হল নায়ক-নায়িকাদের বেশি করে টাকা দেওয়া। শোনা যায় অনেকে নাকি একটি ছবি করতে গিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। তাঁদের কাজ হল শিল্প থেকে টাকা রোজগার করে নেওয়া। বিনিময়ে শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁরা কোন বড় ভূমিকা পালন করেন না। কেউ কেউ ছবি করেন। এতে কিছুটা উপকার হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের যে অনিশ্চয়তা তা থেকেই যায়।

এই নায়ক-নায়িকাদের অবদান কিছুই নেই। কিন্তু টাকা তাঁরা যত খুসি নিতে পারেন। আইনে কোন বাধা নেই। খালি আয়কর দিয়ে দিলেই হল। অথচ যাঁরা বড় বড় কোমপানি তৈরি করছেন যেখানে হাজার হাজার লোক চাকরি পাচ্ছেন এবং জাতীয় আয় বাড়ছে তাঁদের ক্ষেত্রে রোজগারের সীমা নির্ধারণ করা আছে। একটি বিরাট কোমপানির ম্যানেজিং ডিরেকটর মাইনে, কমিশন এবং অন্যান্য সুবিধা বাবদ মোট দু লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন বছরে। যদি কোমপানি কোটি কোটি টাকা লাভ করে তাহলেও। যদি কোমপানি লোকসান করে তাহলে টাকার অংক অনেক কমে যাবে। কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে লাভ হোক বা লোকসান হোক নায়ক-নায়িকারা ওই টাকাটা পেয়েই যাবেন।

অনেকে হয়ত বলবেন--নায়ক-নায়িকাদের সত্যিই কি কোন অবদান নেই। তাঁরা ছবিতে অংশগ্রহণ করে লোককে আনন্দ দিচ্ছেন। এবং ছবিকে কেন্দ্র করে অনেক লোক টাকাও রোজগার করছেন। এর উত্তরে আগে যা বলেছি এখনও তাই বলব। ভাল ছবি না হওয়ার ফলে অবদান কিছুই থাকছে না। আর রোজগারের যে সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাও খুবই সাময়িক এবং সীমিত। বরং চলচ্চিত্র শিল্পের যদি একটি আয় ব্যয়ের হিসাব করা যায় দেখা যাবে এই শিল্পে যত টাকা লগ্নি করা হচ্ছে তা ফিরে আসছে না। লাভ তো অনেক দূরের কথা।

অনেকের মনে হতে পারে ম্যানেজিং ডিরেকটরের রোজগারের সঙ্গে চিত্রতারকাদের রোজগারের ব্যাপারটা টেনে আনা ঠিক হয়নি। কারণ কোমপানিতে জনসাধারণের টাকা লগ্নি হয়। ওখানে ব্যাংক টাকা দেয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত টাকা লগ্নি হয়। তাই ওখানে আয়ের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমি বলব আসে। কারণ ওই টাকাটা ওখানে চলে না গেলে অন্য শিল্পে বা ব্যাংকে যেতে পারত। যেখানে রোজগারের নির্দিষ্ট সীমা থাকার ফলে বহু লোক স্থায়ী চাকরি পেতে পারতেন। আমাদের দেশ টাকার টানাটানিতে ভুগছে। সেই সময় টাকা এমনভাবেই লগ্নি হওয়া উচিত যাতে সত্যিকারের কিছু কাজ হয়।

এতক্ষণ যা বলেছি তাতে মনে হতে পারে আমরা চাইছি না ছবি হোক। একথা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। আমরা চাইছি ছবি হোক। তবে তা সুস্থ ছবি। যা মানুষের কাজে লাগবে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কিছু লোকের খেয়াল চরিতার্থ হোক তা আমরা চাই না। যে গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তা বন্ধ হোক। সব জিনিসটা যেন একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে হয়। এ ব্যাপারে কতকগুলি প্রস্তাব রাখছি:

প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারের চলচ্চিত্রের ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা দরকার। কোন কোমপানি যদি চলচ্চিত্রের ব্যবসা করে তাহলে সে কোমপানি ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না। কোথাও কোথাও হয়ত ব্যাংক ঋণ দিয়েছে। তবে তা নেহাতই ব্যক্তির নিজস্ব জোরে। কোন নির্ধারিত নীতির ফলে নয়। চলচ্চিত্র শিল্পকেও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প হিসাবে বিবেচনা করা হোক। যাতে ঋণ পেতে কোন অসুবিধা না হয়। যদি চলচ্চিত্র শিল্পকে এই বিশেষ ব্যবস্থায় আনা না যায় তাহলে আমরা দেশের যে উন্নতির কথা ভাবছি তা কোন দিনই সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রের মানুষের মানসিক উন্নতি না ঘটলে রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। আর চলচ্চিত্র এই ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা নিতে পারে। যা বোধহয় বিতর্কের কোন অপেক্ষা রাখে না।

এবারে কেন্দ্রীয় সরকার বা ব্যাংক প্রশ্ন করতে পারেন ফিল্মের পেছনে টাকা লগ্নি করলে তা ফেরত আসবে কি? ওটা একেবারেই অনিশ্চিত ব্যাপার। কথাটা ঠিক। তবে অনিশ্চয়তা এসেছে কোনরকম বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার প্রয়োগ এই শিল্পে ঘটেনি বলেই। ছবি করা হয়েছে যিনি যেমন মনে করেছেন। খুসি হলেই এবং

কালী ফিল্মস স্টুডিও

মুভিওয়ালা

যোগাযোগ থাকলেই ছবির জন্য কাজ করা যায়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অনিশ্চয়তার প্রশ্ন স্বাভাবিক।

যেমন অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতা না থাকলে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হয় না তেমনি এখানেও তা করা যেতে পারে। পুনা ফিলম ইনস্টিটিউটের মত সংস্থা সারা ভারতে কয়েকটি তৈরি করা হোক। এবং আইন করে দেওয়া হোক ওখান থেকে পাশ না করলে কাউকেই ছবিতে কাজ করতে দেওয়া হবে না। এই ব্যবস্থা নিতে সময় লাগবে। তাই মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে যাঁরা ফিলমের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হোক। কোন অবস্থাতেই যেন অযোগ্য লোক স্থান না পান। ছবির অনিশ্চিত অবস্থার জন্য এরাই বিশেষভাবে দায়ী।

অনিশ্চিত অবস্থাটা দূর করার জন্য দ্বিতীয় যে ব্যবস্থা নিতে হবে তা হল সমীক্ষার। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সমীক্ষা হচ্ছে। বারবার জানার চেষ্টা চলছে লোকে কী চাইছেন। এই শিল্পে আজ পর্যন্তও তা হয়নি। ফল যা হবার তাই হয়েছে। মানুষের মনের কথা যাচাই না করে ছবি করার ফলে মানুষ তা বর্জন করেছেন। এবং চলচ্চিত্র শিল্পে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিয়েছে।

অন্য যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে একটা প্রোজেক্ট রিপোরট তৈরি করতে হয়। ওর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার রিপোরট দিতে হয় যার থেকে বোঝা যাবে ওই বিশেষ বস্তুটির চাহিদা আছে কিনা এবং তা চলবে কি না। এই সমীক্ষাটি বলতে গেলে মূল রিপোরটের হৃৎপিণ্ড। এইটি না থাকলে ওই শিল্পের জন্য কেউই টাকা দেবেন না। কারণ এটা বোঝাই যাবে না ওই শিল্পটি চলবে কিনা এবং টাকা ফেরতের সম্ভাবনা থাকবে কিনা। চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে এমনি কোন ব্যবস্থা নেই। যার ফলে লগ্নি করা টাকা ফেরত আসার ব্যাপারে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিচ্ছে। এবং ব্যাংক টাকা দিতে চাইছে না।

প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে। তবুও ব্যাংক টাকা দেয়। কারণ বিপদগুলি সম্পর্কে সতর্ক থেকে সব রকমের ব্যবস্থা নিয়ে তবেই টাকা দেওয়া হয় যার ফলে ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায় এবং টাকা মার খায় না। ছবির ব্যাপারেও তা করা সম্ভব। যদি সমীক্ষা করে সাধারণ মানুষের মনের চাহিদা জেনে নেওয়া যায় তাহলে ছবি মার খাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কেটে যাবে। এ প্রসঙ্গে অনেকে বলতে পারেন ছবি শিল্পীর শিল্পকর্ম, এখানে ফরমায়েসের স্থান নেই। এ কথা আরট ফিলমের ব্যাপারে নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু বাণিজ্যিক ছবির ব্যাপারে এ কথা একদম চলবে না। এই ক্ষেত্রে শতকরা একশ ভাগই প্রফেশনাল হতে হবে।

এই ব্যাপারটি হয়ে গেলে তারপরে আর একটি ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। সেটা হল চিত্রনাট্য। এর উপরই ফিলমটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করবে। যেসব ছবি মার খায় তার বেশির ভাগেরই চিত্রনাট্য খুব দুর্বল থাকে। চিত্রনাট্য নিশ্চয়ই পরিচালক তৈরি করবেন। কিন্তু ছবি করার আগে তা একটি বিশেষ কমিটিকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। যেমন অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট রিপোরট পাশ করিয়ে নিতে হয়। এ কথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না এই কমিটি তৈরি হবে প্রফেশনালদের নিয়ে।

কমিটি অনুমোদন করে দিলে এবং সমীক্ষা রিপোরট সঙ্গে থাকলে ব্যাংককে ঋণ দিতে হবে। এবং তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই। কারণ এর পরে ওই ছবিটি না চলার কোন কারণ নেই। হয়ত কিছুটা ঝুঁকি থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাংককে তো তা নিতে হবে নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে।

এবারে আসা যাক আসল বিষয়ে। আমি বলেছি সমীক্ষা করতে, একটি কমিটি করতে এবং ব্যাংককে টাকা দিতে। কিন্তু খরচের ব্যাপারটা কারা দেখবেন এবং কারা টাকা ব্যাংক থেকে নেবেন? এই প্রশ্নটা এসে যায়। আমার প্রস্তাব হচ্ছে—চলচ্চিত্রের গোটা ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রেখে কোমপানি পর্যায়ে নিয়ে আসার আইন করা হোক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকার ফলে চলচ্চিত্রের আজকে এই অবস্থা। যেমন করে বড় কোমপানিগুলি তৈরি হয় তেমনিভাবেই এই কোমপানিগুলিও তৈরি হবে। প্রতিটি কোমপানির নিজস্ব কিছু সিনেমা হল থাকবে যাতে তাদের তৈরি করা ছবির মুক্তি পেতে কোন অসুবিধা না হয়। খরচ এই কোমপানিগুলিই সব বহন করবে। কারণ লাভ যখন সবটাই কোমপানির ঘরে জমা পড়বে তখন সব তাদেরই বহন করতে হবে। তবে যাঁরা চিত্রনাট্য অনুমোদন করবেন সেই কমিটির খরচ কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। অত লোকের যেখানে রুজি রোজগারের ব্যাপার জড়িয়ে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এটুকু দায়িত্ব নেবেন না এটা হতে পারে না।

রাজ্য সরকারকেও একটা ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। এই কোমপানিগুলি গোড়ার দিকে ভাল লাভ করতে পারবে না। তাই এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিন বছর প্রমোদকর ছাড় দিতে হবে। তিন বছরে যত টাকা এই কোমপানিগুলি পাবে প্রমোদকর ফেরত হিসাবে তাতে যদি কোন ছবি মারও খায় পরবর্তী পর্যায়ে তাহলেও তাদের কোন অসুবিধা হবে না। প্রমোদকরের টাকাটা রিজার্ভ ফানড হিসাবে কাজ করবে। রাজ্য সরকারকে এটা সইতে হবে চাকরির কথা বিবেচনা করে। এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও অনেক বেশি টাকা প্রমোদকর হিসাবে পাওয়া যাবে বলে। এই কোমপানিগুলি অনেক ছবি করবে তাই প্রমোদকরও পাওয়া যাবে বেশি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা তাঁরা বিভিন্ন পরিচালককে

দিয়েছেন ছবি করার জন্য। এর ফলে পুরস্কার পাওয়া গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অনেকে টাকা নিয়েছেন কিন্তু ছবি মুক্তি পাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যে টাকাটা লগ্নি করা হয়েছে তার কতটা সরকারের ঘরে ফিরে আসবে তা কারোরই জানা নেই। অর্থাৎ ধরে নিতে হয় টাকাটা দিয়ে কিছু সম্মান কেনা গেছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছুই হয়নি। যদি আরও কিছু টাকা সরকার বরাদ্দ করেন তাহলে আরও কয়েকটা ছবি করার চেষ্টা হবে। কিছু লোক আরও কিছুদিন খেতে পরতে পাবেন। তারপরে শুরু হবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দিন গোনা। একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে এমন বাড়িতে পলেস্তারা লাগিয়ে কোন লাভ নেই। দরকার ঐ বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলে ঐ জায়গায় আর একটা নতুন বাড়ি করা। যাতে মরার ভয় আর না থাকে।

আগে বলেছি নায়ক-নায়িকাদের অত টাকা দেওয়া বন্ধ হোক। এই বলার পিছনে ঈর্ষা কাজ করছে না। যদি চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অত টাকা দিযে দিলে চলবে না। কোন কোমপানির ম্যানেজিং ডিরেকটর যদি বছরে তিরিশ বা চল্লিশ লক্ষ টাকা নিয়ে নেন তাহলে সেই কোমপানি কি চলবে? চলতে পারে না। আর চললেও যাঁরা ঐ কোমপানিতে চাকরি করবেন তাঁরা মাইনে পাবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ থাকবে। শেয়ার হোলডারদের ডিভিডেনড পাওয়ার তো প্রশ্নই নেই। এর ফলে শেয়ার-হোলডাররা টাকা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করবেন। গণ্ডগোল হবে। এবং, একদিন কোমপানিই উঠে যাবে।

এই অবস্থা সমাধানের পথ হবে ঐ কোমপানিগুলি তৈরি করা। নায়ক-নায়িকা থেকে আরম্ভ করে সবাই ঐ কোমপানিগুলিতে চাকরি করবেন। মাইনে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আর পাঁচটা কোম-পানির মতই হবে। এর ফলে কাউকেই আর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে হবে না। প্রভিডেনড ফানড, পেনসন, গ্র্যাচুইটি এমনি সব সুযোগ সুবিধারই ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন লাভ হলে টাকা দিতে আপত্তিটা কোথায়? এই চিন্তাটাই চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বনাশের একটা বড় কারণ। একটা ছবিতে লাভ হলে সেই টাকাটা যদি খরচই করে ফেলা হয় তাহলে পরের ছবি হবে কী করে? এর উত্তরে বলা হবে —কেন,আসল টাকাটা তো থেকেই গেল! কিন্তু যদি দ্বিতীয় ছবিটা না চলে তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আর টাকা থাকবে না ছবি করার। যা এখন হচ্ছে। এই অবস্থাটার কথা চিন্তা করেই প্রতিটি কোমপানিতে লাভের অংশ থেকে রিজারভ ফানড তৈরি করার ব্যবস্থা আছে। যাতে দুর্দিনে কোমপানি চলতে পারে।

নায়ক-নায়িকাদের অত টাকা না দেওয়ার পেছনে আরও কারণ আছে। এই টাকা দেওয়ার ফলে প্রতিটি ছবির খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ছবি বেশিদিন না চললে খরচ উঠে আসছে না। সব ছবিই অনেক দিন ধরে চলবে এটা আশা করা উচিত নয়। বরং আমি বলব ছবি কম দিন চলার পরই টাকা উঠে আসা ভাল। এতে লোকসানের ভয় থাকবে না। আর এক একটা ছবি সিনেমা হাউস থেকে লাভ অর্জন করে তাড়াতাড়ি ফেরত এলে অন্য ছবির মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। এর ফলে ছবির সংখ্যা অনেক বাড়বে এবং শুধু চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করেই অনেক চাকরির পথ খুলে যাবে।

নায়ক-নায়িকাদের টাকা দেবার ব্যাপারটা ভাবার পরই আর একটা ব্যাপার ভাবা দরকার। এখন যে কোন পরিচালকই যত খুশি ছবি করতে পারেন। সে ছবি চলুক আর না চলুক। এই ব্যাপারে আইন করা দরকার যাতে কোন পরিচালক অসফল হলে তাঁকে আর ছবি করতে দেওয়া না হয়। দিতে গেলে তার আগে বুঝে নিতে হবে তিনি নিজেকে শুধরে নিয়ে সফল ছবি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছেন কিনা। কোন জায়গাতেই কোন দুর্বলতা রাখা চলবে না।

সব শেষে আসব দর্শকদের ব্যাপারে। অনেক দিন ধরে পচা জিনিস পেতে পেতে এবং দেখতে দেখতে আমাদের মানসিক অবস্থা বদলে গেছে। এখন পচা জিনিসই ভাল লাগে। তবে একথা সবার বেলায় নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। কারণ দেখা গেছে ভাল ছবি দেখার লোকের অভাব নেই। আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখব, আসুন আমরা সবাই ভাল ছবি দেখার জন্য মনেপ্রাণে তৈরি হই এবং চমকদারি ছবিগুলিকে বর্জন করি।

চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন করে এবং সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্য আমি কতগুলি প্রস্তাব রাখলাম। আরও অনেক দিক বিবেচনা করার সুযোগ থেকে গেল। এই শিল্পে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যাঁরা আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আরও অনেক বিষয়ে আলোকপাত করবেন। আমাদের কাগজে তাঁরা যদি লিখতে চান আমরা তাহলে খুশি হব। আমি আশা করছি তাঁরা তাঁদের সুনিশ্চিত মতামত জানাবেন। এবং আমি আশা করছি আমাদের দেশের সরকার এখুনি এগিয়ে আসবেন চলচ্চিত্র শিল্পের সার্বিক উন্নতির জন্য। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি না হলে আমরা আমাদের দেশের যে উন্নতির কথা ভাবছি তা সম্ভব নয়। □

আলোকচিত্র : অর্ধেন্দু রায়

উত্তম-বিহীন বাংলা ছবি

সঞ্জয় সিংহ

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প এক সময় ছিল অনেকাংশেই উত্তম-নির্ভর। সুদর্শন নায়ক উত্তমকুমারকে ঘিরেই ছিল প্রযোজক, পরিবেশক আর প্রদর্শকদের ব্যস্ততা! অগণিত দর্শকের মনে এবং মননে ছিল যুগজয়ী নায়ক উত্তমকুমারের প্রভাব। বস্তুত গত দুই দশক ধরে উত্তমকুমারই ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণপুরুষ। বাংলা ছায়াছবির সঙ্কট সময়ে উত্তমকুমার ছিলেন প্রাণের জোয়ার, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। জনপ্রিয়তার এমন অবিরল ধারা সমকালে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে আর কোন নায়কের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তাই উত্তমকুমার শুধু চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রতীকই ছিলেন না, ছিলেন কিংবদন্তিতে পরিণত এক নায়ক।

আলোকচিত্র : অর্ধেন্দু রায়

অনেকেই বলেছেন উত্তমের মৃত্যুর তিন বছর পর বাংলা ছায়াছবির সঙ্কট গভীরতর হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে শূন্যতা। অবশ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চলচ্চিত্র শিল্পে এসেছেন অনেক নবীন পরিচালক তাঁদের নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে। যদিও অনেক পুরনো প্রযোজক চলচ্চিত্র প্রযোজনা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এদের বেশির ভাগই উত্তমকুমারকে কেন্দ্র করেই টাকা লগ্নি করতেন। এই তিন বছরে উত্তমকুমারের ছবি সহ অনেক ছবিই মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্য জুটেছে মাত্র কয়েকটি ছবির ক্ষেত্রে। নবাগত প্রযোজকদের অনেকেই অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁদের ব্যয়বহুল ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য দেখতে পাননি। তাই চলচ্চিত্রে নতুন করে টাকা লগ্নি করতে দ্বিধাগ্রস্ত। এছাড়া সরকারি প্রযোজনায় এবং অনুদানে তোলা অনেক ছবি মুক্তি পায়নি পরিবেশকের অভাবে, প্রদর্শকদের অনীহায়। তবে এর মধ্যে যেটা সুখের কথা সেটা হল গত তিন বছরে কয়েকটি বাংলা ছবি দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে, পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ছবির পুরস্কারপ্রাপ্তিই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কটমুক্তি নয়।

উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার পর্যালোচনা এই শিল্পের স্বার্থেই প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার জন্যই আমরা গিয়েছিলাম চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কিছু অভিজ্ঞ পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকের কাছে। তাঁদের মতামত থেকেই আজকের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কটের কথা বোঝা যাবে।

সমস্যার উৎস সন্ধানে

অগ্রগামী-খ্যাত পরিচালক সরোজ দে ১৯৫৬ সাল থেকে উত্তমকুমারকে নিয়ে বহু ছবি করেছেন। এখনও ছবি করছেন। সরোজবাবু জানালেন, "উত্তমকুমার যখন জীবিত, তখনও সমস্যা ছিল, এখনও সমস্যা আছে। তবে এখনকার সমস্যা অন্যরকম। উত্তমবাবুর সব ছবিই তো হিট করত না। বছরে ছটা ছবির মধ্যে দুটো সুপার হিট। বাকিগুলোর দুটোর খরচ উঠল টায়টায় আর বাকি দুটো একেবারেই ফ্লপ। কিন্তু যদি চারটে ছবিও ফ্লপ করত তাহলেও দেখা যেত প্রযোজকরা টাকা লগ্নি করছেন। অনেক পরিচালকই উত্তমবাবুকে বেস করে ছবি করতেন, হয়ত টেকনিক্যাল দিক দিয়ে ছবির মানও বিষয়বস্তু খুবই নিচু, কিন্তু উত্তমবাবুর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার জোরে ছবি চলে যেত। প্রযোজকের লাভ না হয়েও খরচটা উঠে এলেই তিনি আবার নেকসট ছবি ধরতেন। বরাবরই ইনডাস্ট্রিতে একটা ফ্লোটিং ফিনানস বলে জিনিস আছে। উত্তমবাবুর সময়েও ছিল। অনেকেই ভাবতেন উত্তমকুমারকে দিয়ে ছবি করালেই পয়সা উঠে আসবে। এতে আর কিছু হোক আর না হোক, অনেক টেকনিসিয়ানই কাজ পেতেন। এখন কিন্তু এই ফ্লোটিং ফিনানসারদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এখন হয়ত অনেক ছবির কাজ স্টুডিও ফ্লোরে হচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্ছে মাত্র কয়েকটি। আবার সম্পূর্ণ হয়ে যে সব ছবি বাজারে রিলিজ করছে তার মান এত

পরিচালক সরোজ দে। আলোকচিত্র : অভিজিৎ রায়

খারাপ যে দর্শক সেইসব ছবি দেখছেন না, নিতে চাইছেন না। ফলে এক্জিবিটার বা হল মালিকদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটিয়ে, ডিসট্রিবিউটারদের শেয়ার দিয়ে প্রযোজকের হাতে যে পয়সা আসছে, তাতে নতুন কোন ছবির কাজ শুরু করা যায় না। তার ওপর, উত্তমবাবুকে দিয়ে যে কোন রোলই করান যেত। এখন সেরকম কোন আরটিসট নেই যাঁকে দিয়ে যেমন তেমন রোলেই নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বকস অফিস হিট করানর মত আরটিসট নেই। এখন ভ্যাকুয়াম অব কোয়ালিটি চলছে, কিন্তু এখনও অবধি বাংলা সিনেমা ইনডাসট্রিতে ভ্যাকুয়াম অব কমারস হয়নি।'

পরিচালক বিজয় বসুও সরোজবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, উত্তমকুমার যখন ছিলেন তখনও বাংলা ছবির সমস্যা ও সঙ্কট ছিল, আজও আছে। তবে আগে প্রযোজকরা বা ব্যবসায়ীরা টাকা লগ্নি করতেন, ঝুঁকি নিতেন এবং এসবই করতেন উত্তমবাবুর জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে। এখন অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা – অভিনেত্রী আছেন। কিন্তু তাদের নিয়ে কেউই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। আসলে প্রযোজকরা বরাবরই চলতি ঘোড়ার দিকেই ঝুঁকি নেন, তাই এখন বাংলা সিনেমায় বোমবাই-এর বহু জনপ্রিয় চিত্রতারকাকে নায়ক করে আনা হচ্ছে। উত্তম মারা যাবার পর সমস্যাটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। এই সময় দরকার ছিল দর্শকচিত্ত জয় করবার জন্য ভাল অভিনেতা, পরিচালকের, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। ভাল গল্প নেই। তার ওপর সিনেমা হলগুলির দমবন্ধ করা পরিবেশ। আগে গরমের দুপুরটা বহু ছেলেমেয়ে ঠাণ্ডাঘরে কাটাতে গিয়ে সিনেমা দেখতেন, কিন্তু এখন সিনেমা হলে ঢোকা মানেই শরীর খারাপ করে ফেলা। হয়ত বলবেন, তা হলে হিন্দি ছবি দেখতে ইয়াং জেনারেশন এত উৎসাহী কী করে? উত্তর হিসাবে বলতে পারি, হিন্দি ছবির অ্যাকশান টেকনিক্যাল কাজ, নাচ, গান ওই রকম

গ্ল্যামার আমাদের বাংলা ছবিতে নেই। আর অত খরচও আমাদের পোষাবে না। সুতরাং অন্তত আড়াই ঘণ্টা দর্শককে হাজার অসুবিধার মধ্যে টেনে রাখার ক্ষমতা হিন্দি ছবির আছে, বাংলার নেই এবং কেন নেই এটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনা অনেক করা হলেও বাস্তবে কোনটাই কাজে লাগছে না।'

কিন্তু সত্যি কি বাংলা ছবির প্রযোজনার সংখ্যা কমে গেছে? হয়ত কাগজে কলমে কমেনি, কারণ এই বছর নববর্ষে টালিগঞ্জের বিভিন্ন স্টুডিওতে অন্তত চল্লিশখানি ছবির মহরৎ হয়েছে এবং ১৯৮৩-র মে মাস পর্যন্ত মোট ছত্রিশখানি ছবি মুক্তি পেয়েছে। এরও আগের কয়েক বছরে অর্থাৎ ১৯৮০, ১৯৮১ এবং ১৯৮২ সালে যথাক্রমে তেত্রিশটি, সাতাশটি এবং পঁয়তাল্লিশটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৮০ থেকে ৮২ এই তিন বছরে উত্তমকুমারের মোট বারখানি ছবি মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু 'পংখীরাজ', 'দুই পৃথিবী' এবং 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছাড়া কোন ছবিই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেনি, অন্যদিকে উত্তম ছাড়া যে সব বই বাজারে এসেছে, সেগুলির অধিকাংশই দুতিন সপ্তাহ টেনে টুনে কলকাতার ও শহরতলির হলগুলিতে চলছে। তাতে লাভের থেকে লোকসানই বেশি হয়েছে। আবার রাজ্য সরকার জনগণকে ভাল ছবি দেখান এবং রুগ্ন অসুস্থ বাংলা ছবি ও তার স্টুডিওগুলোকে বাঁচাতে বহু ছবি প্রযোজনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া সবই বাকসবন্দী হয়ে পড়ে আছে। পরিবেশকের অভাবে ছবি রিলিজ করছে না। আবার সরকার-প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি লাভের মুখ দেখছে, সেই লভ্যাংশ সরকারের তহবিলে (দেখাশুনার অভাবে) জমা পড়ছে না। যেমন 'গণদেবতা' ছবিতে বহু টাকা সরকারের প্রাপ্য হয়েছে, কিন্তু বার লাখ টাকা খরচ করা 'গণদেবতার' প্রদর্শনী বাবদ সরকারি তহবিলে জমা পড়েছে মাত্র তিন লাখ টাকা। সরকার প্রযোজিত ছবিগুলির বেশ বড় অংশ বাণিজ্যিকভাবে রিলিজ না করায় সরকার নতুন করে বড় ছবি প্রযোজনার কাজেও হাত দিচ্ছেন না।

প্রযোজক অসীম সরকার আজ বার বছর ছবি প্রযোজনা করছেন। উত্তমকুমারকে নিয়ে মোট আটখানা ছবি করেছেন। এই আটখানার মধ্যে অসীমবাবুর নিজের কথায়, 'ধনরাজ তামাং', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'রাজবংশ' এবং 'সব্যসাচী' সুপার হিট। প্রশ্ন করলাম, 'উত্তম-পরবর্তীকালে ছবি করতে গিয়ে আপনাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে?' উত্তরে অসীমবাবু বললেন, 'আগে উত্তমবাবুর একটা ছবি শেষ হতে না হতে ডিসট্রিবিউটাররা পরের ছবি কী করছি তার খোঁজ-খবর শুরু করে দিতেন, বা পরের ছবিতে যদি উত্তমবাবু থাকতেন তবে অ্যাডভানস নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন। ধরুন, 'সন্ন্যাসী রাজা' যখন রিলিজ করল, তখন আমার 'রাজবংশের' কাজ শেষের মাথায়। মানে একটা ছবির কাজ শেষ করেই আরেকটা ছবির কাজে হাত দিতে পারতাম। উত্তমবাবুকে নিয়ে ছবি করলে সবসময় যে ছবি হিট করত তা নয়, তবে মিনিমাম একটা গ্যারানটি সেল পাওয়ার অ্যাস্যুরেন্স থাকতই। শুধু ডিসট্রিবিউটাররাই নয়, একজিবিটারাও ভাল একটা চেন দিয়ে দিতেন। আর এখন অনেক ভাল ছবি হলেও ডিসট্রিবিউটার থেকে একজিবিটার কেউই তেমন ইনটারেসট নিচ্ছেন না। এমনকি হল মালিকদের একটা ফিক্সড অ্যামাউনট হল ভাড়া, প্রোটেকশন মানি, হোলডওভার মানি দেওয়ার পরও একটা ভাল চেন ধরার জন্য কালো টাকা দিতে হচ্ছে। আগে ডিসট্রিবিউটররা উত্তমবাবুর ছবি হলে অ্যাকচুয়াল কসটের ওপর সেভেন্টি পারসেনট অ্যাডভানস দিতেন, এখন সেখানে ফরটি পারসেনট দিচ্ছেন। সমস্ত র-মেটিরিয়ালের দাম বেড়ে গেছে। আগে উত্তমবাবুকে নিয়ে ছবি করলে, অন্যান্য চরিত্রের খুব একটা নামী-দামি আর্টিসট না হলেও চলে যেত, কিন্তু এখন দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য বড় বড় আর্টিসট নিতে হচ্ছে। ফলে খরচ বেড়েছে তিন গুণ। 'সন্ন্যাসী রাজা' যখন রিলিজ করেছে, সেইসময় সপ্তাহে ৩০,০০০ টাকা বিক্রি হলেই পয়সা উঠে আসত, এখন সপ্তাহে ৫০,০০০ হলেও খরচ উঠছে না। তার ওপর একমাত্র ম্যাটিনি ও ইভনিং শো-র ওপরই আমাদের নির্ভর করে থাকতে হয়। নাইট শো-র বিক্রি তো আজ কবছর নেই বললেই চলে। দুটো শোর থেকে যে টাকা ওঠে তা হল মালিকদের রেনট দিতেই চলে যায়।'

'তাহলে বাঁচার উপায় কী?'

অসীমবাবুর মতে, 'এই অবস্থা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ

উত্তমকুমার অভিনীত বহু ছবির প্রযোজক অসীম সরকার

আমরাও কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয় সরকার যদি ইনসিয়েনটিভ দেন তো সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

প্রশ্ন করলাম 'সরকারি ইনসিয়েনটিভ যথেষ্ট নেওয়া হয়েছে। কত ছবি সরকার প্রযোজনা করেছেন'...আমার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই, অসীমবাবু বললেন, 'না সে কথা নয়। আমি বলছি আমাদের মত প্রোডিউসারদের সরকার ইন্ডিরেক্ট সাহায্য করতে পারেন। ধরুন প্রমোদকর বাবদ সরকার যে পঁচিশ পারসেনট ছেড়ে দিচ্ছেন; তাতে কিন্তু বাংলা ছবির এবং প্রযোজকদের যে খুব একটা লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং এই ২৫% তারা যদি কালেক্ট করে 'প্লাউব্যাক' করে দেন তাতে লাভ আছে। আমাদের ক্যাশ টাকা দিতে হবে না, আমরা যখন পরের ছবিটা করব তখন র-স্টক কেনার জন্য, বা স্টুডিও কিংবা ল্যাবের ভাড়া ওই টাকা থেকে সরকারই দিয়ে দেবেন। এতে আমাদের দেড় থেকে দু লাখ টাকা খরচ বেঁচে যাবে এবং একটা ছবি সেনসারে পাঠিয়ে আমি পরের ছবির কাজে হাত দিতে পারব। আমার ধারণা এটা ইনসেনটিভ হিসাবে কাজ করবে।'

আলোচনা প্রসঙ্গে অসীম সরকারের এই অভিমত নিয়ে তরুণ চলচ্চিত্র পরিবেশক যোগীন দে-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। যোগীনবাবু অসীমবাবুর বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে বললেন, 'অসীমবাবু যে প্লাউব্যাকের কথা বলেছেন, আসাম সরকার ১৯৭৬-৭৭ সালেই এই ব্যবস্থা চালু করেছেন। ওখানকার তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী হিতেন্দ্র শইকিয়া সমগ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝেই এই প্লাউব্যাক এবং আরও নানা ইনসেনটিভ দেওয়া চালু করেন। যার জন্য আগের চেয়ে আসামে বর্তমানে ছবি প্রযোজনার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।'

'খারিজ', 'আজ কাল পরশুর গপ্প', 'নাগমতী' প্রভৃতি ছবির পরিবেশক যোগীন দে র কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, 'এইসব ছবি তো ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি, আপনি ব্যবসা করছেন কি করে?'

যোগীনবাবুর উত্তর, 'দেখুন আমি রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র ছিলাম, চিরকালই আমার ফিলমের উপর

একটা ফ্যাসিনেশান আছে, তাই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও এইসব ছবি হাতে নিই আর ক্ষতিটা পুষিয়ে নিই অন্যান্য কমারশিয়াল ছবি, যেমন 'অপরূপা' মাইথোলজিক্যাল ছবির সাহায্যে। তবে এতে আমাদের সমস্যা মিটবে না আমাদের সরকার প্রায়ই কাঁদুনি গান 'আমাদের ছবির জন্য পরিবেশক পাওয়া যাচ্ছে না।' কিন্তু আপনি-বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি 'গণদেবতা, 'ঝড়', 'নাগপাশ' এবং 'বন্দুকবাজে'র জন্য বহুবার সরকারের দরজায় গেছি, রাজ্য সরকারের চলচ্চিত্র দফতরের দুই ভারপ্রাপ্ত অফিসার সঙ্গে ওইসব ছবির ব্যাপারে পাকা কথা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে ছবিগুলো পেলাম না। তবে কে এত হ্যাপা সহ্য করে সরকারের ছবি নেবে বলতে পারেন? আর আজকালকার ইনটেলেকচুয়ালই বলুন আর কমার্শিয়াল ছবিই বলুন না চলার কারণ ছবিতে গল্প বলাটা ঠিকমত হচ্ছে না। কারণ মফঃস্বলে আমার একটা হল আছে, ওখানে জোর করে 'আজ কাল পরশুর গল্প' এবং 'খারিজ' চালিয়ে দেখেছি দর্শকরা ছবি দেখতে চাইছেন না। এর কারণ একটাই, গল্প বলার স্টাইলটা ঠিকমত হচ্ছে না। বাংলা সিনেমার দর্শকরা অল্পতেই সন্তুষ্ট হন। অথচ, আমাদের পরিচালকরা সেটুকুও দিতে পারছেন না। অথচ, দেখুন, এই সেদিন একটা পুরনো ছবি 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাংক' নিয়ে কয়েক সপ্তাহ চালিয়ে দেখলাম ভালই ব্যবসা হচ্ছে।'

প্রযোজক-পরিবেশক সংস্থা চণ্ডীমাতা ফিল্মের পক্ষে প্রণব বসু বললেন, 'উত্তমকুমার চলে গেছেন বলেই যে বাংলা সিনেমা ডুবতে বসেছে তা নয়। তবে উত্তমকুমার থাকাকালীন আমরা ওঁর উপর অনেকটা নির্ভর করতে পারতাম। একটা আন্দাজ করতে পারতাম কিরকম সেল পেতে পারি। উত্তমকুমার থাকাকালীন যে সাকসেসফুল ছবি পেয়েছি তার সিকি ভাগ এখন সাকসেস নেই, অথচ খরচ বেড়েছে। হলের ভাড়া বেড়েছে, ডিসট্রিবিউটারদের অ্যাট্রাকট করার জন্য প্রযোজকদের বেশি শেয়ার অফার করতে হচ্ছে, কিন্তু আয়ের পরিমাণ কমেছে। আগে উত্তমবাবুকে কেন্দ্র করে বহু পরিচালকই ছবি করতেন, তাদের অবস্থা এখন শোচনীয়। কারণ উত্তমবাবুর মত আরটিসট এখন নেই। আগে উত্তমবাবুর অভিনীত ছবি নেবার জন্য ডিসট্রিবিউটররা নিজেরাই এগিয়ে আসতেন, এখন তাঁরা একটা ছবি নিতে গেলে, অনেক হিসেব-নিকেশ করে আসছেন, এবং সেটা করাই স্বাভাবিক কারণ আমরা সবাই ব্যবসা করতে নেমেছি। টিকিটের দাম বেড়েছে, কিন্তু দর্শকদের সুখ সুবিধা বাড়েনি। ছবির কনটেনটে কোন নতুনত্ব নেই। বাংলা ছবি টিকে থাকবে কেমন করে?'

এরপর বহু প্রদর্শক বা একজিবিটারদের কাছেও গিয়েছি। কিন্তু অনেকেই তেমনভাবে কিছু বলতে চাননি, বা কেউ কথাই বলেননি। একজন বাঙালি প্রদর্শক যাঁর উত্তর,—মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতায় তিনটে বড় সিনেমা হল আছে, যিনি একাধারে পরিবেশক এবং প্রযোজকও বটে, তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'প্লিজ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ বাংলা সিনেমার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হলে, আমাকে প্রযোজনা, পরিবেশনা এবং প্রদর্শন সব নিয়েই কথা বলতে হয় এবং আমি তিনটে লাইনের সঙ্গেই যুক্ত। আর এই তিনটে লাইনেরই কথা পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং আমার পক্ষে কিছু বলাটাই মুশকিল।' এই সম্বন্ধে টালিগঞ্জ পাড়ার একজন অভিজ্ঞ প্রযোজকের মন্তব্য, 'উনি কিছু বলবেন কি ও'র হলে একটা ভাল চেন পেতে তো অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।'

কিন্তু সব দোষ, সব সমস্যারই কি মূলে প্রদর্শক বা একজিবিটাররা? মিনার, বিজলী, ছবিঘর সিনেমার মালিক সোমনাথ পালের কাছে গিয়েছিলাম আজকের বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যা একজন প্রদর্শকের চোখে কি ধরনের এই প্রশ্ন নিয়ে। সোমনাথবাবু বললেন, 'দেখুন আজকের বাংলা ছবির প্রধান সমস্যা ভাল গল্পের অভাব। উত্তমকুমার মেয়েদের মধ্যে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, তেমন কোন নায়ক আজ বাংলা ছবিতে নেই। জানেন তো মেয়েরাই বাংলা সিনেমার বড় খদ্দের। দেখুন যত দোষ তো নন্দ ঘোষের দল আমরাই। কয়েক বছর আগে, শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ তো আমাদের চোর বলে আখ্যা দিলেন। কিন্তু আমি নিজের কথায় বলতে পারি, আমি প্রথম বামফ্রনট আমলে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বারংবার অনুরোধ করেছি, আপনাদের ছবিগুলো দিন, আমার হাউসগুলোতে দেখাচ্ছি। তারপর বর্তমান 'ওয়েসট বেঙ্গল কালার ফিল্ম অ্যানড সাউনড ল্যাব করপোরেশনে'র ম্যানেজিং ডিরেকটার-এর কাছে অনেকবার ছবি চেয়েছি, কিন্তু ওরা নিজেরাই ঠিক করে উঠতে পারছেন না কী করবেন। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না সরকার কেন ভায়া মিডিয়া কাজ করতে যাচ্ছেন। আমরা হল মালিকরা যখন বলছি সরাসরি কাজ করুন, তখন তাঁরা কেন এত দোনামোনা করছেন বুঝতে পারছি না। আরেকটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার, আমাদের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে একটা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যেমন, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীকে আমি কথা দিয়েছি, সরকারকেও কথা দিয়েছি 'চোখ' আমি রিলিজ করব, মিনার, বিজলী, ছবিঘরে চলবে। কিন্তু দেখাব বললেই তো দেখান যায় না, 'চোখের' আগে আমি যাঁদের কথা দিয়েছি, তাঁদের ছবিগুলো তো আমায় রিলিজ করিয়ে দিতে হবে। হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলাম উৎপলেন্দু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, 'ছবি করবো কি? ছবি করলেও তো রিলিজ হয় না' ইত্যাদি। বলুন এরপর কি বলার আছে। আসলে সরকার আগে থেকে আমাদের সঙ্গে যে কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন সেটা মনে করেন না। কিন্তু বেসরকারি প্রযোজকরা এডিটিং চলাকালীনই বা শ্যুটিংএরশেষ পর্যায়েই আমাদের সঙ্গে পাকা কথা বলে নেন।' পাল্টা প্রশ্ন রাখলাম 'আজকে দর্শকদের বাংলা সিনেমা না দেখার আরেকটি কারণ হল-এর কনডিশান। আপনারা এর জন্য কি করছেন?', সোমনাথবাবু বললেন, 'আমি আমার হলগুলো যথেষ্ট ভাল রাখার চেষ্টা করি। এখনো বিজলীতে এয়ার কনডিশনার চালাচ্ছি তবে কতদিন চালাতে পারব জানি না। কারণ ইলেকট্রিক বিল যে হারে বাড়ছে। তার উপর আছে কর্মীদের মাইনে-পত্র। রাজ্য সরকারের শ্রমদফতর গত ১৩. ১০. ৮৩-তে সিনেমা হল কর্মচারীদের জন্য যে পে-স্কেল চালু করার সাজেশান দিয়েছেন তা মানতে গেলে টিকিটের যে দাম বাড়বে তাতে নিচের টিকিটই আপনাদের কাটতে হবে ৪ টাকা দিয়ে। ২'৪৫ টাকার টিকিট কেটেই লোকে দেখতে আসছে না, তো ৪ টাকা দিয়ে লোকে দেখবে? আর সত্যি কথা বলতে কি, বিগত ১০-১২ বছরে কি ২০ বছরে কোন হল হয়েছে খোদ কলকাতায়? হয়নি। সরকার কি ভাবছেন জানি না, তবে শুধু আমাদের ঘাড়ে

দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। হলের ডিমানড আছে, তাই ডিমানড অ্যানড সাপ্লাই-এর রুল অনুযায়ী হলের ভাড়া বাড়ছে, সস্তায় হল পাওয়া এখন দুরূহ। আর ওপর মওকা বুঝে অনেকেই দুপয়সা করে নিচ্ছেন।'

বর্তমানে বাংলা সিনেমার ব্যস্ততম নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোন ছবির শ্যুটিং-এর অবসরে কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে সৌমিত্রবাবুর বক্তব্য, আমাদের কটা সিনেমা হাউসে বাংলা ছবি দেখানো হয়? সরকার থেকে বহুবার, কি রাইটিসট, কি লেফটিসট যে কোন সরকারই হক না কেন, আমাদের নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নতিকল্পে অনেক মিটিং-ফিটিং হয়েছে, আমরা অনেক কার্যকরী প্রস্তাব পেশ করেছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।'

পরিবেশক গোবিন্দ রায়, দীর্ঘ ২২ বছর আর ডি বনসল ডিসট্রিবিউটারস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার পর নিজেই ডি এস এনটারপ্রাইজ নিয়ে একটি পরিবেশক সংস্থা খুলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাংলা ছবির বহু সমস্যা, তাও নতুন করে বিজনেস শুরু করছেন? গোবিন্দবাবু বললেন, 'সমস্যা তো বাংলা ছবিতে সব সময়। এখন তো আরও বেশি। ভালো কাহিনী নেই, রূপবান, দক্ষ আরটিসট নেই, সারা দেশে যখন কালার ছবি হচ্ছে, সেখানে এখনও আমাদের কালার ল্যাব নেই, ভাল টেকনিসিয়ান থাকলেও ভাল ইকুইমেনট নেই। তবু সমস্যা নিয়ে চলতে হবে। দরকার মত পেটের তাগিদে হিন্দি ছবি নিয়ে ব্যবসা করব।'

অতঃ কিম ?

রাজ্যের ভেঙেপড়া রুগ্ন চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে সরকার এখন অনেক পরিকল্পনার কথাই ভাবছেন। কালার ল্যাব তো হচ্ছেই, তাছাড়া অহীন্দ্র মঞ্চ, রবীন্দ্র সদনের পাশে যে আরট থিয়েটার হচ্ছে সেখানে সিনেমা হল তৈরি করে রাজ্য সরকার প্রযোজিত ছবিগুলি দেখাবেন। বাকি সময়ে যেসব স্বল্প ভাড়ায় ওইসব হলে প্রদর্শিত হবে তরুণ পরিচালকদের ছবি। কিন্তু সরকার প্রযোজিত যেসব ছবি মুক্তি পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই কয়েক সপ্তাহের বেশি চলেনি। এর কারণ কি! এই প্রশ্নের জবাবে রাজ্য সরকারের চলচ্চিত্র বিষয়ক দপ্তরের একজন পদস্থ অফিসার বললেন, 'বাংলাদেশে ছবি চলেনি তো কি হয়েছে। ফরেন থেকে আমাদের সব পয়সা উঠে এসেছে। এইতো মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' এখানে চলেনি, আমরা পয়সা পাইনি, কিন্তু সাড়ে ছয় লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ছবির সব পয়সা ফরেন মারকেট থেকে উঠে এসেছে। গৌতম ঘোষের 'দখলে'র জন্য খরচ হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন লাখ। সব উঠে এসেছে ফরেন মারকেট থেকে। আসলে আজকের ডিরেকটররা সবাই দেশের থেকে বিদেশের মারকেটটা ভাল চেনেন। এইতো মৃণালবাবুর 'খারিজে'র প্রযোজকরা তো সব পয়সা পেয়ে গেছেন বিদেশে ছবিটার প্রদর্শন করে।' কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারলাম সাড়ে ন লাখ টাকা ব্যয়ে এই ছবির প্রদর্শনী বাবদ কলকাতা থেকে তিন মাসে একলাখ টাকাও পাওয়া যায়নি।

রাজ্য সরকার গত সাত বছরে ১৩টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি সম্পূর্ণ করেছেন, তিনটির কাজ প্রায় সমাপ্ত এবং তিনটি শিশু চলচ্চিত্র করেছেন। খরচ হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। কিন্তু বাংলা ছবির দর্শকরা তিনটি কি চারটি ছবি দেখতে পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। তাও ছবিগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। ওদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রে একদল পরিচালক ছবি দিচ্ছেন, তা দর্শকদের মন ভরাচ্ছে না। দর্শকরা ভিড় জমাচ্ছেন আড়াই ঘন্টার আমোদ প্রমোদের জন্য হিন্দি সিনেমার দরজায়। ফলে উত্তমকুমার মারা যাবার পর, নতুন করে ছবি করার উন্মাদনায় যে সব ছবির কাজ শুরু হয়েছিল, টালিগঞ্জ পাড়া নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছিল, সঠিক হিসেব নিকেশ এবং সরকারি নীতি যদি সঠিকভাবে করা হত, তবে মরা গাঙে হয়তো জোয়ার আসত। □

আলোকচিত্র :
লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

অনেকেই তো ছবির কাজে ব্যস্ত, তবে সংকট কীসের?

বাংলা চলচ্চিত্র এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে, প্রযোজকরা অন্তত সকলে একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা অনেকেই নতুন ছবি তৈরির কাজে প্রতিনিয়তই ব্যস্ত থাকেন। সংকট তো তাঁদের বেকার করে দিত, তা করেনি। তবে কোন কোন প্রযোজকের মতে, বাংলা ছবিতে কিছুটা দুরবস্থা আছে। তার নানা কারণের কথা বলেছেন তাঁরা। কেউ কেউ চলচ্চিত্র সমালোচকদের প্রতিও এ জন্য দোষারোপ করেছেন।

প্রায় ৫-৬ বছর হল বাংলা চলচ্চিত্রের অবস্থা নিয়ে চারদিকে একটা গেল গেল রব উঠেছে। হাতে গোনা কয়েকটা ছবি আর্থিক সাফল্য পেয়েছে, অন্য ছবিগুলো কোনটা তিন সপ্তাহ চলেছে, কোনটা বড় জোর চার সপ্তাহ। ইদানীং দেখা যাচ্ছে ছবি মুক্তির দিনেও হলগুলোতে হাউসফুল বোরড ঝুলছে না। স্বাভাবিকভাবে সর্ব স্তরে এই অবস্থা নিয়ে ব্যাপক ময়না তদন্ত বা গবেষণা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি উত্তমকুমারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে অনেকেই একথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছেন যে উত্তমের পরবর্তীকালে বাংলা সিনেমা কি তবে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে? ভাল ছবি হচ্ছে না, অন্যদিকে বহু বিতর্কিত ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। স্টুডিওগুলোতে কাজ নেই। নেই তা নিয়ে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা—এই সবই বাংলা চলচ্চিত্রের জীবনপঞ্জীতে এক দুঃসময়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ বিষয়ে এক পর্যালোচনা এবং এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির বিষয়ে কয়েকজন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মিতালি ফিলমসের অমর নান গোড়াতেই আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে অসম্মত হন। ওঁর মতে বাংলা চলচ্চিত্রের অবস্থা মোটেই খারাপ নয়। শ্রী নানের বক্তব্য, 'তাহলে এতগুলো সংস্থা তাদের এত বিশাল আয়োজন নিয়ে টিকে আছে কী করে?'

শ্রী নানের বক্তব্যের একটা যুক্তি দেখেছি আরো অনেক প্রযোজনা সংস্থায় ঘুরে ঘুরে। সব সংস্থাই একটা দুটো বাংলা ছবি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রে প্রযোজকদের পাইওনি ঐ কারণে। শুনলাম তাঁরা ছবির কাজে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে অন্তত ১৮টি ছবির কাজ চলছে বিভিন্ন স্টুডিওতে। আউটডোরে আরো বেশ কিছু। অর্থাৎ একেবারেই দুর্দশা হলে এতগুলো ছবি নিশ্চয়ই শুরু হত না। তবে দু'একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এর মধ্যে কালোটাকা খরচ করে ফেলার প্রবণতার কথাও মনে রাখতে হবে।

মোহিনী পিকচারস বা কালীমাতা প্রোডাকসনস-এর প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, বর্তমানে বাংলা ছবির দুরবস্থা সম্বন্ধে এঁরা প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল, তবে সকলেই আশা করেন যে হয়ত তাদের ছবিটাই একটা নতুন আলোর সন্ধান দেবে। এবং নিরন্তর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলেই বাংলা ছবি এখনো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সম্মানীয় সংস্থা অরোরা ফিলমস করপোরেশন। ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন সকলেই কোন না কোন সময় এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রতিক কালের উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গেও এই সংস্থার কিছু সম্পর্ক রয়েছে। বাংলায় প্রথম আরট ফিলম প্রযোজনার কৃতিত্বেরও এরাই দাবিদার। জগদীশ চক্রবর্তী পরিচালিত 'অভিনব' নামে একটি আরট ফিলম অরোরাই প্রযোজনা করেছিল। বর্তমান আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে অরোরার কর্ণধার অজিত বসুর সঙ্গে কথা বললাম। অজিতবাবু দুর্দশার কথা স্বীকার করলেও হতাশ হবার পক্ষপাতী নন। প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তমকুমারের মৃত্যু বাংলা চলচ্চিত্রের ওপরে কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা। তিনি তা স্বীকার করেছেন। এবং বর্তমান অবস্থার জন্যে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরই দায়ী করেছেন। শ্রীবসু বলেন, এই অবস্থার সব থেকে বড় কারণ, আমরা এতদিনেও দর্শক তৈরি করতে পারিনি। এতদিনেও বাংলা ছবি বাণিজ্যিক বা শিল্পসম্মত কোনটাই হয়ে উঠেনি। প্রমোদচিত্রের ক্ষেত্রে আমরা অনেকাংশেই ব্যর্থ এবং শিল্পসম্মত চিত্র যা আরট ফিলম নামে প্রচলিত, তার দর্শকও নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি মৃণাল সেনের 'খারিজ' ছবিটির কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া বাংলা স্টুডিওগুলোর টেকনিকাল দিকের ত্রুটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন। অজিতবাবু দুঃখ করলেন যে বোমবাই বা মাদরাজের স্টুডিওগুলোর তুলনায় কলকাতার স্টুডিওগুলোর কী দৈন্য। ওড়িশাতে পর্যন্ত এত সমৃদ্ধ স্টুডিও আছে যে সেখানে উন্নত মানের কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে। ঝকমকে ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে। অনেক বাংলা ছবি পর্যন্ত তোলা হচ্ছে মাদরাজ বা ওড়িশাতে। এই ব্যাপারে সরকারের অনেক কিছু করার আছে এ কথা অজিতবাবুর মতই আরো অনেকে বলেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জনের মতে, কেবল ছবি তোলার জন্যে পরিচালকদের অনুদান না দিয়ে সরকারের উচিত অবিলম্বে স্টুডিওগুলোতে আধুনিক সরঞ্জাম ইত্যাদি আনার ব্যবস্থা করা। অরোরার অজিতবাবু বাংলা ছবির অবস্থার জন্যে দর্শকদের দায়ী করতে চান না। ওঁর মতে দর্শক যদি একই দাম দিয়ে বেশি আমোদপ্রমোদের উপকরণসমৃদ্ধ হিন্দি ছবি দেখতে পান তবে কেন দেখবেন না? তবু তো বাংলা ছবির দর্শকরা এখনো বাংলা ছবিকে একেবারে বর্জন করেননি। শ্রীবসু পরিবর্তনের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে আরো পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আবেদন রেখেছেন। এই প্রতিবেদক এই সংখ্যায় এ বিষয়ে দর্শক পাঠকদের কিছু চিঠি প্রকাশিত হবে জানালে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং এই উদ্যোগের জন্যে পরিবর্তনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শ্রীবসু এবং অন্যান্যদের কাছে প্রশ্ন ছিল, কী করে এই অবস্থার উন্নতিবিধান সম্ভব? বিস্তারিত আলোচনা থেকে বুঝেছি যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাংলা ছবির বাজারের প্রসার ঘটান। বর্তমানে গোটা পশ্চিম বাংলায় মোট ৭৩টি চিত্রগৃহ আছে যেখানে মোটামুটিভাবে বাংলা ছবি দেখান হয়। কয়েক বছর আগের এক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ছবি মাত্র শতকরা ১২ ভাগ অর্থ পায়, বাকিটা অন্য ভাষার ছবি নিয়ে নেয়। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে হলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন প্রচুর। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হল স্থাপিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। একটা প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করতে ন্যূনপক্ষে প্রয়োজন ৫ থেকে ৭ লক্ষ টাকা, অথচ তা থেকে লাভ পাওয়া নিশ্চিত নয়।

এই সঙ্গে প্রয়োজন দর্শক তৈরির দিকে মন দেওয়া। চিত্রনির্মাতা থেকে সাংবাদিক সকলেরই এদিকে উদ্যোগী হতে হবে। নতুন প্রযোজক অসীম দত্তের মতে, অনেক ছবির সাফল্য ব্যাহত হয়ে যায় সাংবাদিকদের বা সমালোচকদের সহানুভূতিহীন আচরণে। তাঁর মতে ব্যাপক অর্থব্যয় করে একটা ছবি তৈরি করার পর প্রথমেই যদি খুঁটিনাটি বিষয়ে অংগুলি নির্দেশ করে সমালোচকরা ছবিটিকে ব্ল্যাকমারকড করে দেন, তাহলে আর পরবর্তীকালে সে ত্রুটি সংশোধনের অবকাশ থাকে না।

বাংলা ছবির অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ প্রচুর, প্রয়োজনও অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে চিত্রপ্রযোজকেরা একমত। সীমিত বাজারের কথা ভেবে ব্যয় সংকোচ করা দরকার, দরকার কলাকৌশলের উন্নয়ন। এই মুহূর্তে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিলে এই ভাটা দূর হবে। বাংলা ছবির পালে মৌসুমী হাওয়া লাগবে এটাই মনে হয়। □

অজিত বসু। আলোকচিত্র : গৌতম রায়

সাক্ষাৎকার : কল্লোল ব্রহ্মচারী

হিন্দি ছবি বাংলার পুরো বাজারটাই দখল করে নিয়েছে

নতুন দুই পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও উৎপলেন্দু চক্রবর্তী বাংলা ছবির এই সংকটকে কীভাবে নিচ্ছেন, পরিবেশকদেরই বা দৃষ্টিভঙ্গি কী · তাঁরা চান সংকট ঘুচুক। কিন্তু হল মালিকদের টাকার খাঁই মেটাতে হিমসিম অবস্থা। কলাকুশলীরাও এ কারণে প্রায় বেকার। আর সেই বেকারত্ব এবং হতাশা বাংলা সিনেমা শিল্পেরই দৈন্যদশার প্রতীক। এর ওপর রয়েছে হিন্দি ছবির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন।

সকাল নটা। টালিগঞ্জ (আদরের নাম টলিউড) এ নিউ থিয়েটার্স ওয়ান স্টুডিও চত্বরে কেমন একটা গাছাড়া ভাব। ব্যস্ততা চোখে পড়ে না। ঢুকে বাঁ হাতে বিশাল ফ্লোর। ফাঁকা। এলোমেলো ছড়ান সেট সাজাবার নানান টুকিটাকি, লাইট, ক্যামেরা স্ট্যানড। খানিকটা হেঁটে এলে বাঁদিকে মোড় ঘুরলে ক্যানটিন। তিন চারটে টেবিলে দু'তিন জনের ছোটখাট জটলা। সামনে চায়ের কাপ। খাটো ধুতি, ছেঁড়া প্যান্ট ঢোলা শারট, ঠোঁটে বিড়ি আর ভাঙা চোয়াল এইসব মানুষদের অনেকেই এক লহমায় চিনতে পারেন। এঁরা টেকনিসিয়ান।

'এক কথায় অ্যানিমিক' বললেন সুবীর ঘোষ। ক্যানটিনে বসে কথা হচ্ছিল। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সুবীরবাবুর নিবিড় যোগ টালিগঞ্জের তথা বাংলা ছবির ইনডাসট্রির সংগে। কাজ করেন প্রোডাকশন অ্যাসিসটেনট হিসেবে। তাঁর কাছে জানতে পারলাম আগে এপাড়ায় স্টুডিওর সংখ্যা ছিল চোদ্দ। এখন সাকুল্যে চারটে। তাও মুভিটোন কোনরকমে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। এক ইন্দ্রপুরীতেই ছিল সাতটা ফ্লোর। তার মধ্যে চারটেতে এখন তালা ঝুলছে। ফলে অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। তার ওপর কলকাতা মফস্বল মিলিয়ে বেশ কিছু হল বন্ধ। যেকটা চলছে সেখানেও জমজমাট হিন্দি ছবির মারদাংগা ভিড়। তার ওপর প্রযোজকরা সাড়া দিচ্ছেন কম। খুব ভাল ব্যবসায়িক সাফল্য আছে আঁচ করতে পারলেই অধিকাংশ প্রযোজক বাংলা ছবি করতে এগিয়ে আসেন। পরিবেশকদের অবস্থাও খুব ভাল নয়। বাংলা ছবি বাজার পাচ্ছে না। ফলে দীর্ঘ দিনের বাংলা ছবির পরিবেশককেও বাধ্য হয়ে হিন্দি ছবি পরিবেশনার কথা ভাবতে হচ্ছে। এমনকি অনেক পরিচালকও ঝুঁকেছেন হিন্দি ভাষায় ছবি তৈরি করার দিকে।

'দূরত্ব', 'নিম অন্নপূর্ণা' ও সদ্য সমাপ্ত 'গৃহযুদ্ধ'র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সংগে কথা হচ্ছিল দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাড়ির এক তলার ঘরে। বাংলা ছবির বর্তমান দুর্দশার কথা তুলতেই বুদ্ধদেববাবু প্রথমেই আনলেন হলের প্রসংগ। পশ্চিমবংগে গত দশ বছরে হলের সংখ্যা বলতে গেলে বাড়েনি। অথচ অন্যান্য প্রদেশে বিশেষত দক্ষিণ ভারতের নানা রাজ্যে এই সময়ের মধ্যে হলের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। ফলে ছবি দেখাবার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এর উপর আছে বন্যার জলের মত ধেয়ে আসা হিন্দি ছবির স্রোত। এই স্রোতে ভেসে গেছে বাঙালি। মধ্যবিত্ত বাঙালির নিজস্ব পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এইসব নিম্নরুচির বোমবে মারকা হিন্দি ছবির দাপটে লোপ পেতে বসেছে। নিচুমানের হিন্দি ছবির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে বহু আগে থেকেই। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় সিনেমা হলগুলিতে রাজাবি হিন্দি ছবি 'সগৌরবে দশ সপ্তাহ' ব্যানার লাগিয়ে হাউস ফুল চলছে আর একটু দূরেই হয়ত বাংলা ছবির কাউনটারে মাছি উড়ছে।

শুধু শহরে নয়, গ্রামেও একই অবস্থা। কলেজে অধ্যাপনা সূত্রে বুদ্ধদেববাবুকে ষাট দশকের শেষ দিকে বেশ কয়েক বছর পশ্চিম বাংলার এক গ্রামে থাকতে হয়। তখনই তিনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিম বংগের প্রত্যন্ত গ্রামে হিন্দি ছবির জনপ্রিয়তা। মোবাইল সিনেমা বলতে গেলে গ্রামের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সেইসব হিন্দি সিনেমা যার বিষয় বা বক্তব্যের সংগে গ্রামের মানুষের সমাজ জীবনের বিস্তর ফারাক।

এই তো গেল হিন্দি ছবির কথা। বাজারি হিন্দি ছবির মত একধরনের বাংলা ছবি পাশাপাশি তৈরি হয়েছে। অনেকাংশেই বোমবের দুর্বল অনুকরণ। সেনটিমেনট, আবেগে প্যাচপেচে এক ধরনের বাংলা ছবি টালিগঞ্জে বেশ কয়েক দশক ধরে তৈরি হয়েছে। সংগে হিন্দির দেখাদেখি মারদাংগা, যৌনতা ইত্যাদির মিশেল। প্রথম প্রথম এসব ছবি কিছুটা চলেছে। কিন্তু ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে গেল। তাছাড়া বোমবের জৌলুস টালিগঞ্জে নেই। 'মুকদ্দার কা সিকন্দার' বা 'শোলে' অথবা 'কুরবানি' বা 'সত্যম শিবম সুন্দরম' টালিগঞ্জ তৈরি করতে পারে না। ফলে দর্শক একই পয়সা দিয়ে বাংলা ছবির টিকিট কাটে না। বরং ব্ল্যাক হলেও দৌড়য় হিন্দির কাউনটারে।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর মুখেও একই অভিযোগ। পাইকপাড়ায় তাঁর বাড়িতে যখন পৌঁছই তখন সকাল আটটা। কাছাকাছি কোথাও তাঁর

স্বরে মাইকে বাজছে 'আই অ্যাম এ ডিসকো ড্যানসার'। উৎপলেন্দু সেদিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে মন্তব্য করলেন 'তাহলেই বুঝতে পারছেন এতদিনের এত মানুষের প্রচেষ্টার কী ফল আমরা পাচ্ছি'।

বাংলা ছবির সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে উৎপলেন্দুর স্পষ্ট অভিযোগ বাংলা ছবির পরিচালনা, প্রযোজনা, পরিবেশনা প্রভৃতি সব কিছুরই বিরুদ্ধে। সবাই পরিচালক হবার জন্য ব্যস্ত, বললেন উৎপলেন্দু। কী করলে ভাল ছবি হবে, ছবির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ খেয়ে পরে বাঁচবে সেদিকে নজর নেই। তার ওপর হলের সমস্যা। প্রচুর ছবি তৈরি হয় কিন্তু রিলিজ হয় কটা? হল মালিকরা প্রায়ই 'প্রোটেকশন মানি' হিসেবে কালোটাকা দাবি করে। ফলে পরিবেশকরা সব সময় ঝুঁকি নিতে রাজি হন না। প্রযোজকের সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও উৎপলেন্দু চক্রবর্তী দুজনেই 'বাংলা ছবির বর্তমান সংকটের দায় অনেকটাই সরকারের' বলে মন্তব্য করেছেন। রাজ্যে একটি বামপন্থী সরকার থাকা সত্ত্বেও এখানে তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দি ছবির এত বোলবোলা কী করে হয় সে সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করলেন উৎপলেন্দু। আর বুদ্ধদেব তো সরাসরিই বললেন 'বাম রাজনীতি এ রাজ্যে ভোট মানসিকতার জন্ম দিয়েছে, জন্ম দেয়নি সাংস্কৃতিক সচেতনতার।' তা না হলে যে হারে বাংলা ছবি প্রদর্শনের জায়গাগুলোতে তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দি আর দক্ষিণ ভারতীয় ছবি দিন দিন নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে চলেছে তার কোন প্রতিরোধ নেই কেন? এ ব্যাপারে ওড়িশা সরকার একটা জোরদার পদক্ষেপ নিয়েছেন, বললেন বুদ্ধদেব। সেখানে ওড়িয়া ছবি বাধ্যতামূলকভাবে দেখাতে হবে বলে হল মালিকদের প্রতি সরকার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ রাজ্যে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা সরকার এখনও নিতে পারেননি।

ছবি করার জন্য সরকারি অনুদান সবসময় যোগ্য হাতে দেওয়া হচ্ছে না বলে মন্তব্য করলেন উৎপলেন্দু। স্বজন-পোষণের সরকারি নীতিতে এমন অনেকেই টাকা পেয়েছেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত ছবি শেষ করতে পারেন নি। তার ওপর আছে ছবি মুক্তির সমস্যা। সরকারি অনুদানে করা প্রচুর সংখ্যক ছবি বাকসবন্দী হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। অথচ 'প্রাইভেট প্রোডিউসার'রা হল মালিককে প্রয়োজনে কালো টাকা দিয়ে তাদের প্রযোজিত ছবির মুক্তি ত্বরান্বিত করছে। 'হল মালিকদের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই' বললেন উৎপলেন্দু। আর একটা ব্যাপার আছে। 'সরকারি টাকায় করা ছবি হলে মুক্তি পাবার আগেই বিভিন্ন অকেসানে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হলে মুক্তি পেলেও ভিড় হয় না।' উৎপলেন্দুর অভিযোগ 'সরকারি কমিটিগুলোতে এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁরা ছবির ট্রেড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন।'

সরকারি অনুদানের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন 'সরকার অনুদান দিতে গিয়ে সংগত-অসংগত নানান কারণে সমালোচিত হচ্ছেন। একে কেন টাকা দেওয়া হল, ওকে কেন দেওয়া হল না এইসব নিয়ে জল ঘোলা করা হচ্ছে। সরকারের উচিত একটা রিলিজ চেন কমিটি তৈরি করা। যে কমিটির কাজ হবে ছবি তৈরির পর সুস্থ নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করা কোন ছবির প্রযোজককে সরকার অনুদান দেবেন। এবং এই নির্বাচিত ছবি সরকারের নিজের রিলিজ সারকিটে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এরপর দেখা যাক যাঁদের হাতে পরিবেশনার দায়িত্ব তাঁরা কী ভাবছেন। দেখা করেছিলাম বলাকা পিকচারসের কর্ণধার প্রফুল্ল দত্তগুপ্তের সঙ্গে তাঁর লেনিন সরণির অফিসে। বলাকা পিকচারস 'চিড়িয়াখানা', 'অশনি সংকেত', 'ঠগিনী' ইত্যাদি বহু ভাল ছবির পরিবেশক। প্রফুল্লবাবুকে সমস্যার কথা বলতেই খুব চিন্তিত মনে হল। তাঁরও অভিযোগ হিন্দি ছবির জায়গা দখলের বিরুদ্ধে। গত কুড়ি বছর ধরে একটু একটু করে হিন্দি ছবি কলকাতা শহরের পঁচাত্তর ভাগ সিনেমা হলে নিজের জায়গা কায়েমী করে নিয়েছে। একে হল কম। তার ওপর হিন্দি ছবির জবর দখল। ফলে বাংলা ছবি প্রদর্শনের অবস্থা এক কথায় করুণ।

প্রফুল্লবাবু বললেন, আগে হল মালিক পরিবেশককে 'গ্যারানটি মানি' হিসেবে কিছু টাকা দিত। এখন সে চল নেই। উল্টে পরিবেশককে টাকা দিতে হয়। কলকাতায় হল ভাড়া কম করে পনের হাজার টাকা প্রতি সপ্তাহে। মফস্বলে আট-ন হাজার টাকা। ছবি চলুক না চলুক, পরিবেশককে এই টাকা হল মালিককে দিতে হয়। ফলে খুব ব্যবসায়িক সাফল্য আছে এমন ছাড়া কোন বাংলা ছবি বর্তমানে পরিবেশকরা নিতে চান না।

বাংলা ছবিকে তথা ইনডাসট্রিকে বাঁচাতে হলে কতকগুলো কার্যকর ব্যবস্থা এই মুহূর্তে নেওয়া দরকার বলে মনে করেন প্রফুল্ল বাবু। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল ট্যাকস মকুব করা। গুজরাটে, দক্ষিণ ভারতে এই ব্যবস্থা আছে। সেখানে গুজরাটি বা দক্ষিণ ভারতীয় ছবি মুক্তির পর ছ'মাস সরকার কোন ট্যাকস নেয় না। এ ব্যবস্থা এখানেও করা দরকার। স্বাধীনতা দিবসে বা বছরে অন্যান্য কয়েকটি দিনে ট্যাকস ছাড়ের ব্যবস্থা করে অভাবনীয় সাড়া মিলেছে। এই ব্যবস্থা যদি ছবি মুক্তির পর তিন থেকে ছ'মাস চালু করা যায় তবে বাংলা ছবির দর্শক বাড়বে, ইনডাসট্রি খেয়ে পরে বাঁচবে। তার ওপর শনি রবিবারের টেলিভিশনে ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারটাও আছে।

আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আসাম, বিহার, ওড়িশায় কিছুদিন আগেও বাংলা ছবির বাজার ভাল ছিল। কিন্তু আজ সে বাজার ছোট হয়ে গেছে। প্রবাসী বাঙালি ক্লাবগুলোর উদ্যোগে ছুটির দিনে মর্নিং শো হয় বটে, কিন্তু বাঙালি অধ্যুষিত বিহার, ওড়িশা, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ছবির সে রমরমা আর নেই। কয়েকটা জায়গা অবশ্য ব্যতিক্রম। যেমন আসামের কাছাড়। ওখানে বাংলা ছবির কদর এখনও কমেনি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মৌলালির দিকে কয়েক পা হাঁটতেই ডান দিকে চণ্ডীমাতার অফিস, সেখানে বসেছিলেন ভবেশ কুণ্ডু। বললেন 'ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পঁয়ত্রিশ বছরে এই প্রথম হিন্দি ছবি নিতে বাধ্য হলাম – 'বেমিসাল'। বাংলা ছবির বাজার মন্দা কেন প্রশ্নের জবাবে ভবেশবাবুর তাৎক্ষণিক উত্তর 'ভাল গল্প নেই। পরিচালকরা দর্শকের চাহিদা মেটাতে সবসময় সফল হচ্ছেন না। ভিড় বাড়ছে হিন্দি ছবিতে।' প্রশ্ন করলাম 'কেন, অনেক ক্ষমতাবান পরিচালক তো বাংলা ছবি করতে এগিয়ে এসেছেন। তবুও বাংলা ছবির এই হাল কেন?' আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর দিলেন ভবেশবাবু 'ভাল পরিচালক এসেছেন সত্যি। কিন্তু তাঁরা যে ছবি করছেন তা পুরস্কার পেতে পারে, দেশি বিদেশি বুদ্ধিজীবী মহলে হৈ চৈ ফেলতে পারে, কিন্তু ব্যবসা করতে পারে কি?'

এই হল অবস্থা। সবদিক থেকেই বাংলা ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে। টালিগঞ্জে অনেক ছবির শুরু হয়। মহরত হয়। হয়ত দিন দুই শুটিংও হয়। কিন্তু তারপর? হয় প্রযোজক টাকা দিতে চাইছেন না, নয়ত পরিচালক ছবি ছেড়ে অন্য কোন ব্যবসা করার কথা ভাবছেন। আবার ছবি তৈরি হলেও হল নেই। শ্রমিক অসন্তোষে স্ট্রাইক বা লক আউট। যে কটা হল খোলা আছে তাতে হিন্দি ছবির দর্শক ভোলান রঙিন হাতছানি। সব মিলিয়ে অবস্থাটা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এভাবে চলতে থাকলে বাংলা ছবির মৃত্যু ঘটতে বেশি দেরি লাগবে না। যদিও শেষ সময় তবু এখনও যদি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায় তবে হয়ত বাংলা ছবিকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যেতে পারে। □

সাক্ষাৎকার : পিনাকী ঘোষ

আলোকচিত্র : শুভজিৎ পাল

চিত্রতারকাদের চোখে

বাংলা ছায়াছবির সমস্যা ও সমাধানের উপায়

একদা বাংলা ছায়াছবির ঐতিহ্য ছিল। আজও দেশে এবং বিদেশে বাংলা ছায়াছবি গুণগত উৎকর্ষের জন্য পুরস্কৃত হচ্ছে, সমাদৃত হচ্ছে। অন্যদিকে গত এক দশক ধরে এ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্প সংকটাপন্ন, মুমূর্ষু। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছবি তৈরি না হওয়া, সীমিত বাজার, লগ্নিকারীর অভাব, রিলিজ চেইন না পাওয়া, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব এবং অসম প্রতিযোগিতায় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে আজ শুধু দৈন্য আর হতাশা। এই বিষয়ে আমরা কয়েকজন প্রথিতযশা চিত্রতারকার কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম: ১) বাংলা ছায়াছবির মূল সমস্যা বা সংকট কোথায় এবং ২) এই সমস্যা সমাধানের উপায় কী? চিত্রতারকারা অকপটে তাঁদের নিজস্ব যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাই পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'বাংলা ছবির সংকট সম্বন্ধে সত্যিকারের আগ্রহ কার কার আছে, সে বিষয়ে আজ আমার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ গত ১০-১৫ বছর ধরে আমরা বাংলা ছবির সংকটের কথা বলে আসছি, এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। গত পঁচিশ বছরে সরকারি বেসরকারি তরফে বহু কমিটি গঠন করা হয়েছে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে। যেমন সেন কমিশন হয়েছিল, তারপর প্রথম যুক্তফ্রন্ট রাজত্বের সময় কনসালটেটিভ কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট কোথায় এবং সংকট দূর করার উপায় নিয়ে কী কী করা যায় এ নিয়েও পত্রপত্রিকায় বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নিট ফল কিছু কি হয়েছে? স্বাধীনতার আগে কি ঠিক স্বাধীনতার সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে, বছরে প্রায় একশ খানা করে ছবি হত। আর আজ বছরে, পঁচিশ তিরিশটা ছবি হচ্ছে। ফলে সহজেই বুঝতে পারছেন ছবির সংখ্যা এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে কী হারে কমেছে।

প্রঃ এই ছবির সংখ্যা কেন কমতির মুখে?

সৌমিত্রঃ প্রথমত দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছবির বাজারটা কমে গেছে। অবশ্য এর থেকেও বড় কারণ বাংলা ছবির মুক্তির সমস্যা রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র শ চারেকের মত সিনেমা হল আছে; এরমধ্যে নিয়মিতভাবে দশ বারোটা হলে বাংলা ছবি দেখান হয়, আর অনিয়মিতভাবে খুব বেশি হলে শ দেড়েকের মত হলে বাংলা ছবি চলে। বাদবাকি পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হলেই নিয়মিতভাবে হিন্দি ছবি দেখানো হচ্ছে। চিত্রগৃহের মালিকরা মোট বিক্রয়লব্ধ টাকার শতকরা ৮০ ভাগই নিয়ে যান, এই বড় মাপের অংশ বাংলা ছবি তো আর দিতে পারে না, ফলে হিন্দি ছবি বেশ ভাল মত আসর জাঁকিয়ে ব্যবসা করে চলে যাচ্ছে। এরপর আছে পরিবেশকদের কমিশন। সবশেষে সবাইকে দিয়ে-থুয়ে প্রযোজকের হাতে কিছুই আসে না। কখনো বা যদি কিছু আসে, তার পরিমাণ এতই কম যে, নতুন করে নতুন ছবির জন্য অর্থলগ্নি বা বিনিয়োগ করার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। দ্বিতীয়ত, এককালে এই চিত্রগৃহের মালিকরাই ছবির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতেন, এখন তা একেবারেই বন্ধ। ওদিকে তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানেন, চলচ্চিত্র এমনই এক সামগ্রী যে, তাঁদের 'হল' নামক দোকান ছাড়া এটা বিক্রি করা যাবে না। তাই তাঁদের এই কর্তৃত্ব বাংলা ছবির সংকটের একটা বড় কারণ। তৃতীয়ত, একটা টিকিটের থেকে সরকারকে যে পরিমাণ ট্যাকস দিতে হয় সেটাও একটা কারণ। কারণ আমার মনে হয় যে দলের সরকারই হোক না কেন, সরকার কিন্তু মূল সমস্যার ক্ষেত্রে উদাসীন। আরেকটা ব্যাপার হল দীর্ঘদিন ধরে যে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে ইনডাসট্রিকে চলতে হচ্ছে, তাতে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা যাচ্ছে না বা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কারিগরী এবং চলচ্চিত্রের আধুনিকিকরণের দিক দিয়েও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। ফলে ছবির গুণগত উৎকর্ষ কমে যাচ্ছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় / আলোকচিত্র : নীতেশ দাস

প্রঃ এ অবস্থার অবসানের উপায় কী?

সৌঃ চঃ উপায় বা সংকট মোচনের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে বা সরকারি আনুকূল্যে ছবি করেই সংকট দূর করা যাবে না। প্রথমেই যেটা করা উচিত তা হল, সরকারি তরফে পালটা রিলিজ চেন তৈরি করা, বছরে বাধ্যতামূলক ১৩ সপ্তাহ বাংলা ছবি এই পশ্চিম বাংলায় দেখানোর ব্যবস্থা করা এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের যুক্তিসম্মতভাবে সুসম বণ্টন ব্যবস্থা চালু করা। প্রযোজকরা যাতে ছবি করার পর মার না খান, পরিবেশক, প্রদর্শকের সঙ্গে তাঁরাও যেন সমানভাবে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত পান সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা। আরেকটা ব্যাপারও এ প্রসঙ্গে আমার বলার আছে, তা হল, ভাল ছবি দেখার জন্য দর্শকদের রুচির আরো উন্নতির জন্য সংবাদপত্র বা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার এবং ফিলম সোসাইটিগুলিকেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। অপটু এবং অহেতুক সমালোচনা ছেড়ে গঠনমূলক আলোচনার দ্বারা এঁরা এই কাজটা করে যেতে পারেন, তাতে বাংলা ছবির একটু উপকার হবেই।

মাধবী মুখোপাধ্যায় [চক্রবর্তী]

বাংলা ছবির কাজ এখনো টুকটুক করে হচ্ছে, কিন্তু ব্যবসাটা হচ্ছে না এবং যার জন্যেই আজ বাংলা চলচ্চিত্রকে এত প্রশ্নের, এত সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন কেন ব্যবসা হচ্ছে না? উত্তর একটাই, প্রদর্শক ও পরিবেশককে অর্থ দিয়ে প্রযোজকের হাত শূন্য হয়ে যাচ্ছে, ফলে নতুন করে ছবি করা সম্ভব

হচ্ছে না। তারপরই ধরুন ভাল গল্প, দর্শককে আকর্ষণ করে ধরে রাখার মত সুস্থ রুচিসম্মত উপ করণেরও অভাব রয়েছে। সর্বোপরি সিনেমার 'সন্তানেরা' আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে, ফলে দর্শকদের বেশ বড় অংশই সেদিকে নজর দিয়েছেন। সিনেমার সন্তান মানে টি ভি বা ভি ডি ও এসে গেছে। প্রতি শনিবার রবিবার টি ভিতে একটা বাংলা এবং একটা হিন্দি ছবি দেখান হচ্ছে। ঘরে বসে যদি কেউ সব দেখে নিতে পারেন, তাহলে হলে গিয়ে সিনেমা দেখার আকর্ষণ তো কমে যাবেই। হিন্দি ছবি তবু চলছে কারণ অত গ্র্যানজার, অ্যাকশান আছে। বাংলা ছবির আর্থিক অবস্থা খারাপ তাই অত খরচাপাতি করা সম্ভব নয়। স্বল্প ব্যয়ে যেটুকু করে দেওয়া যাচ্ছে তাও নানা কারণে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে অক্ষম হচ্ছে। সুতরাং দিনে দিনে মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছে। এই অবস্থায় অক্সিজেনের প্রয়োজন। সেই অক্সিজেন যোগাতে একমাত্র সক্ষম সরকার। নতুন হল, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযোজনার মাধ্যমে, ও যাঁরা বাংলা ছবি প্রযোজনা করতে ইচ্ছুক তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করে সরকার রুগ্ন এবং মৃতপ্রায় বাংলা চলচ্চিত্রকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে পারেন। ইতোমধ্যে সরকার কিছু ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। আরো নিশ্চিত এবং গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারকে বাংলা সিনেমার দুর্দিনে এগিয়ে আসতে হবে।

সুমিত্রা মুখার্জি

বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যস্ততম নায়িকা সুমিত্রা মুখার্জির মতে, 'বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যাই বলুন আর সংকটই বলুন, তা একটাই, বাংলা ছবি দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। বাংলা ছবিতে এমন কোন মালমশলা থাকছে না যা দর্শককে টেনে রাখতে পারে। আমাদের বাংলা ছবির জগতে যেটা প্রধান জিনিস দেখা যাচ্ছে তা হল, ভাল চিত্র পরিচালক আছেন তো ভাল গল্প নেই। ভাল চিত্রনাট্য নেই। মূল সমস্যা, ভাল প্রযোজকের। সেই প্রযোজক আছেন তো ভাল পরিচালক নেই। অনেক প্রযোজক ভাল মনেই ইনডাসট্রিতে আসছেন, পয়সা দিচ্ছেন, কিন্তু পয়সাটা অপাত্রে দান করার মত খরচ হয়ে যাচ্ছে। ফলে যে প্রযোজক একটার জায়গায় চারটে ছবি করতেন, তিনি কোনমতে একটা ছবি শেষ করেই আর পরবর্তী প্রযোজনার জন্য অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছেন না। অযোগ্য লোকের ভিড়ে, কাজ না জানা পরিচালকের দুর্বল পরিচালনায় যেসব ছবি বাজারে আসছে তা যেমন প্রযোজককে পয়সা দিতে অসমর্থ হচ্ছে, তেমনি দর্শক মনোরঞ্জনেও ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলা সিনেমার দর্শক অনেক কিছু ক্ষমা-ঘেন্না করেও ছবি দেখেন। তাঁরা অল্পেই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু আমরা দর্শকদের সেই ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেই অপারগ হচ্ছি। আবার অনেক প্রযোজক, পরিচালকরা নিছক গ্ল্যামারের মোহে বা একটু আনন্দফুর্তির জন্য আসছেন এবং আমাদের শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি করে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। জানেন অনেক পরিচালক আছেন যারা ভাল করে 'কাট-স্টার্ট' ক্যামেরা কখন বলতে হয় তাও জানে না। এরা ছবি করতে আসেন। ছবি হয়ত শেষই হল না বা শেষ হলেও চলল এক সপ্তাহ। এতে ফল হচ্ছে দর্শকরা বাংলা সিনেমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। তারপর র মেটিরিয়ালের দাম হু হু করে বাড়ছে, হল ভাড়া তিন চারগুণ বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরে। অথচ আয়ের পরিমাণ সে তুলনায় বাড়েনি। কেন বাড়েনি ও বাড়তে পারছে না কেন কারণ তো বললামই।'

প্রশ্ন করলাম, এই সংকট মোচনে আপনার মতে সমাধানের রাস্তা কী?

উত্তরে সুমিত্রা বললেন, 'ভাল গল্প নিয়ে, স্বল্প খরচে অথচ গুণগত উৎকর্ষ বজায় থাকে এমন ছবি করতে হবে। যে সমস্ত ভাল প্রযোজক ক্রমশ ইনডাসট্রি থেকে সরে যাচ্ছেন, তাঁদের সরকারিভাবে সাহায্য দিয়ে, আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা দিয়ে কাজ করে যা আজকে খুবই দুর্লভ, আবার নতুন করে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সেইসব প্রযোজকদের যুক্ত করতে হবে। জানেন, আজ এই লাইনে সিনসিয়ারিটির বড্ড অভাব। এই সিনসিয়ারিটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এবং আমার মনে হয় কমার্সিয়াল ছবি এবং আর্ট ফিলম এই শ্রেণী বিভাগটা তুলে দেওয়া উচিত। সময়ে সময়ে আর্ট ফিলম বা অন্য ছবির নামে দুর্বোধ্য জিনিস দর্শকদের সামনে দেওয়া হচ্ছে, ছবি করা হচ্ছে বিদেশ থেকে প্রাইজ আনার কথা ভেবে। অথচ দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভাবা হচ্ছে না। আবার ব্যবসায়িক সাফল্যও আসছে না। এখন সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে কীভাবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচান যায়।'

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

'বাংলা সিনেমা সংকট নিয়ে আমি কী বলব বলুন তো? কারণ আমি একজন সাধারণ চরিত্রাভিনেত্রী। আমার অভিজ্ঞতা এই লাইনে খুবই অল্প। তবে, আমার স্বামী তরুণকুমার এবং দাদা (প্রয়াত উত্তমকুমার)-র অভিজ্ঞতা থেকে শুনে এবং কিছু ছবিতে কাজ করে মনে হয়েছে এখনকার সমস্যা দশ বছর আগে যা ছিল তার থেকে অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেটা সমস্যা তা হল ভাল গল্প নেই, শিল্পীদের প্রপারলি ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না। কমার্সিয়াল সাকসেসের জন্য একটা ছবির যেসব গুণ থাকা উচিত, যে কারণেই হোক সেটা থাকছে না। কাজের পরিধি কমে আসার জন্য, আমরা শিল্পীরাও বাছ বিচার না করে একটু ভাল স্ক্রিপট শুনেই কাজে নেমে পড়ছি, পরে কাজ করতে করতে যখন গলদগুলো নজরে পড়ছে বা মনে হচ্ছে তখন এক মানসিক অশান্তি নিয়ে যে কাজ করছি তা কি ভাল হতে পারে। বহু অযোগ্য লোক এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এমনও হচ্ছে, শুটিং করছি ওদিকে জানিই না যে ক্যামেরায় ফিলম নেই। যেসব প্রযোজক আসছেন সাহস করে, তাদের অকালেই সোনার ডিমের লোভে এমন ভাবে খরচের ধাক্কায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যে পরে তারা এমুখো হচ্ছেন না। তারপর আছে ইনডাসট্রিতে গ্রুপিং। এটা অবশ্য

'বোমবে, মাদ্রাজ, সর্বত্র আছে, কিন্তু আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এটা দারুণভাবে রয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের সমস্ত ফিলম সোসাইটি, শিল্পীদের যেসব সমিতি আছে যেমন শিল্পী সংসদ, অভিনেত্রী সংঘ এবং মহিলা শিল্পী সংসদ সবাই যদি এক হয়ে কাজ করত তবে সমস্যা একেবারে দূর না হলেও কিছুটা দূর তো হত। অন্তত ইনডাসট্রিতে অযোগ্য লোকেদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যেত।'

অপর্ণা সেন

বাংলা ছবির সংকটের প্রধান কারণ হিসাবে সৌমিত্রদা বা শুভেন্দু-বাবু বলেছেন যে আমাদের মারকেট খুব ছোট। আমারও সেই মত। একেই তো মারকেট ছোট, তার উপর আবার সেই মারকেটে হিন্দি ছবির সঙ্গে কমপিট করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, যেটুকু শুনেছি, কারণ আমার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে কম, যে ছবি ডিসট্রিবিউশান এবং এগজিবিশানের ক্ষেত্রেও প্রোডিউ-সারদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তৃতীয়ত, যেটা মারাত্মক বাংলা ছবির সংকটের ক্ষেত্রে, তা হল ল্যাক অব ট্যালেনটস। একদল ছবি করতে আসছেন কোথাও কিছু হল না বলে, শেষ চেষ্টা হিসাবে, একটু নামটাম করার ইচ্ছায়। আর একদল আসছেন বিভিন্ন ফিলম ক্লাব করার পর, বিদেশি ছবির ধাঁচে ইনটেলেকচুয়াল কিছু করার জন্য। কিন্তু সেটা করার জন্য যে প্রতিভা বা কাজ জানা উচিত তা তাঁরা জানেন না। এই দুদলের কাজকর্মই একসট্রিম। মাঝামাঝি কিছু নেই।

আমার মনে হয় সংকট থেকে বাঁচার উপায় 'ডবল ভারসান' ছবি শুধু নয়। লো বাজেটে এখন বোমবাই থেকে নিউ ব্রিড অফ স্টারদের নিয়ে যেসব সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত ছবি হচ্ছে, এইরকম ছবি করা। কমারসিয়াল হিন্দি ছবির মত বা হিন্দি বাংলা ডবল ভারসান যেসব সিনেমার কাজ এখানে হচ্ছে, তার জন্য শিল্পী থেকে আরম্ভ করে ফাইট কমপোজার, মিউজিক ডিরেকটার থেকে কসটিউম ডিজাইনার পর্যন্ত বোমবাই থেকে আনা হচ্ছে। এতে আমাদের ইনডাসট্রির টেকনিসানদের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হচ্ছে না। আমার মতে এখানকার টেকনিসিয়ানদের নিয়েই দরকার হলে ওখানকার নবাগত শিল্পী নিয়ে এখান থেকে স্বল্প খরচে ভাল স্ক্রিপ্ট করে ছবি করা উচিত। আর অল-ইনডিয়া বেসিসে (ডবল ভারসান ছবির জন্য) ভাল ডিসট্রি-বিউটারদের ধরে ছবি রিলিজ করান। আর হিন্দি ছবির প্রোডিউসারদের মত 'অ্যাকটিভ' প্রডিউসার দরকার এই মৃতপ্রায় শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য। এখনকার প্রোডিউসাররা টাকা দিয়েই খালাস, কিন্তু তাঁরাও যে অ্যাকটিভ ইনভলমেনট দরকার সেটা তাঁরা ভাবেন না। যে টাকা নিয়ে তাঁরা ব্যবসা করতে আসছেন তা সত্যিকারের ইউটিলাইজেশান হচ্ছে কি না, তা দেখা প্রয়োজন। বোমবাইতে কিন্তু প্রোডিউসাররা নিজেরাই, এসব ব্যাপারে খুব তৎপর। ছবির খরচ কমাতে এমনভাবে কমপ্রোমাইজ করা হচ্ছে, যাতে ছবির টেকনিক্যাল কোয়া-লিটি ভীষণভাবে হ্যামপার করছে। হয়ত একটা সিকোয়েনসের জন্য পাঁচটা শটের দরকার, সেখানে দুটোতেই কাজ সারা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। ছবির কোয়ালিটির উন্নতির জন্য এইভাবে শিল্পগত দিক থেকে কমপ্রোমাইজ করাতে, সব ব্যাপারটাই আধা-খেঁচড়া হয়ে থাকছে। এই রকম মেনটা-লিটি এখনই এলিমিনেট করা দরকার। না হলে বাংলা ছবি নিয়ে ব্যবসা করা খুবই মুশকিল।'

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ছবির সংকটটা প্রথমত আর্থিক। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছবির মারকেটটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু সে তুলনায় প্রোডাকশন কসট প্রায় দশগুণ বেড়ে গেছে। কাগজে শুক্রবারের সিনেমার পাতায় চোখ রাখলে অমুক ছবির মহরৎ, অমুক ছবির শুটিং-এর খবর দেখা যায়, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে দশটার ভেতর নটা ছবি শেষ হয় কিনা সন্দেহ। প্রযোজকরা যে টাকা ঢালছেন তা আর ফেরত পাচ্ছেন না। সুতরাং মানি রোলিং একেবারেই বন্ধ। এরপর আছে হল মালিক, ডিসট্রিবিউটারদের হাজার রকম বায়নাক্কা, সবাই যে যার পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু প্রোডিউসার বা ইনডাসট্রির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে। এ তো গেল বাণিজ্যিক দিক। এরপর আসল কাজের মানও অনেক নেমে গেছে। এমন সব পরিচালক আসছেন, যারা কোনরকমে একটা বলির পাঁঠার মত প্রোডিউসার জোগাড় করে, দুপয়সা করে নেবার ধান্দায় ইনডাসট্রিতে ঢুকে পড়েছেন। অ্যাসিসটেনট আরট ডিরেকটরদের গিলড আছে, ক্যামেরাম্যান, টেকনিসিয়ানদের সংস্থা আছে, যেখানে মেমবার হয়ে তবে ইনডাসট্রিতে ঢুকতে হয়। কিন্তু পরিচালকদের কোন সংস্থা বা মেমবারশিপের ব্যাপার নেই, কোন রকমে টাকা ম্যানেজ করে ঢুকে গেলেই হল। এটা ইমিডিয়েট বন্ধ করা দরকার। বাংলা ছবিকে বাঁচাতে এখন 'ডবল ভারসান' ছবি করা প্রয়োজন। ডবল ভারসান বলতে শুধু হিন্দি বাংলা ভারসানই নয়—ওড়িয়া, অসমিয়া, ভোজপুরী ভাষারও ছবি করতে হবে।

তারপর সরকার বিগত কয়েক বছরে ছবি করার জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচা করলেন, কিন্তু সত্যি কি বাংলা ছবির তেমন কিছু লাভ হয়েছে? হয়নি। বরং সরকার যদি ওই টাকা খরচ করে একটা স্টুডিও কমপ্লেকস করতেন তবে বহু কলাকুশলী এবং বাংলা ফিলম ইনডাসট্রির লাভ হত। কারণ প্রতিবেশি রাজ্য আসাম আগে ব্ল্যাক অ্যানড হোয়াইটের কাজ করার জন্য এখানে আসতেন, কিন্তু এখন রঙিন ছবির ব্যাপারে ওঁরা বোমবাই বা মাদ্রাজে যাচ্ছেন। যদি এখানে সরকার কালার ফিলম ল্যাবরেটরি তৈরি করতেন তবে কিছু অর্থ বাংলায় আসত এবং আমাদেরও রঙিন ছবির জন্য অন্যত্র যেতে হত না।

এরপর আছে সরকারকে প্রমোদকর বাবদ যে টাকা দিতে হয়, তা যদি তারা 'প্লাউ ব্যাক' করার ব্যবস্থা করতেন, যা আসাম, ওড়িশা, প্রভৃতি রাজ্যে আছে তবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কিছু উপকার হতই।

কলকাতার হলে বাংলা ছবি দেখিয়ে প্রযোজকদের যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, রিলিজ চেন পাবার জন্য যে হয়রানি হয়, তার জন্য আমাদের সরকার আদৌ কিছু ভাবেন বলে তো মনে হয় না। কারণ আমরা বহুবার এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, ফল কিছুই হয়নি। অথচ ওড়িশা, মাদ্রাজ, আসাম সরকার তাদের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে যে পজিটিভ ভাবনাচিন্তা করেছেন, তার ফলে দিনের দিন ওঁদের ইনডাসট্রি ফ্লারিশ করছে, ওঁদের ব্যবসার পরিধি বাড়ছে, আর আমরা সংকট, সমস্যার কথা ভেবে আর আলোচনা করে খালি হাহুতাশ করছি।'

বিকাশ রায়

'সংকট তো বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গে। চলচ্চিত্রের দুটো ভাগ। একটা হচ্ছে প্রদর্শন ক্ষেত্র এবং অপর ভাগ হচ্ছে উৎপাদন। প্রদর্শন ক্ষেত্র সম্বন্ধে আজকাল আমার তেমন কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, যখন নিজে ছবি প্রযোজনা করতাম তখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার অবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফলে এ বিষয়ে আমার কিছু মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে যেটুকু শুনি তাতে মনে হয় এই প্রদর্শন ক্ষেত্র যা চলচ্চিত্রের ব্যবসার মূলকেন্দ্র সেখানেই এক বিরাট গোলমাল রয়ে গেছে। ছবির পর ছবি তৈরি হয়ে পড়ে থাকে, অলিখিত কারণে সেগুলো রিলিজ হয় না। ফলে আমাদের কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ প্রযোজনার ক্ষেত্রে টাকা ফিরে আসে না। সুতরাং নতুন ছবি হয় না—সংকট প্রকট

হয়ে দেখা দেয়। আর অভিনয়ের সূত্রে এখনও উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত আছি বলে বলতে পারি এখন আমরা কেউই নিজেদের কাজের প্রতি সৎ নেই। প্রযোজকরা আসেন মূলত ব্যবসা করতেই। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের হয় সরে যেতে হয় না হয় গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে হয়। প্রযোজনার ক্ষেত্রে আজ বাংলা সিনেমার প্রথম সংকট ভাল পরিচালকের অভাব। এখন যে কেউ একজন প্রযোজক জোগাড় করেই সিনেমার পরিচালক হয়ে বসছে। আমরা শিল্পীরা সব জেনে বুঝেও যে যা পারছি দিনগত পাপক্ষয়ের মত কাজ করে কিছু রোজগার করে নিচ্ছি। দর্শককে আকৃষ্ট করার মত ভাল কাহিনী নেই। অবশ্য আজকাল বিদেশি কাহিনীবিহীন কিছু কিছু ছবি হচ্ছে, কিন্তু সে তো সাধারণ দর্শকদের জন্য নয়, জ্ঞানী-গুণীদের জন্য। তেমনি আমাদের এখানেও কাহিনী ছাড়া যে ছবি করা হচ্ছে তাতে ব্যবসায়িক সাফল্য হল কি না হল তাতে কারুর মাথাব্যথা নেই। এলোমেলো কাহিনী নিয়ে যে ছবি হচ্ছে তার ফলে বাংলা চলচ্চিত্র আর্থিক দৈন্যে ভুগছে। নতুন যন্ত্রপাতি কেনা যাচ্ছে না, ফলে ছবির গুণগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যে প্রযোজক একবার টাকা লগ্নি করছেন, ক্ষতির পরিমাণ তাঁকে এমন এক জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে যে, তিনি নতুন করে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারছেন না। এই আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে এখানকার স্টুডিওগুলির অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। একটি স্টুডিওতে সর্বসাকুল্যে চারটে মাত্র লেনস আছে, তার মধ্যে আবার মাত্র দুটো লেনস ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজের ফল যে কী হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। চলচ্চিত্রের কলাকুশলীরা এতই অর্থাভাবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন যে দুবেলা তাঁদের ভাল করে খাওয়া জুটছে না। অভাবের তাড়নায় তাঁরাও আজ আর ডিসিপ্লিনড নয়। এটা তাঁদের নিজেদের দোষ না হলেও বাংলা সিনেমার রুগ্ন অবস্থার একটা কারণ।

এর সঙ্গে পত্রপত্রিকার সমালোচকরা আছেন। এঁরা সমালোচনার নামে যা করছেন তা বাংলা চলচ্চিত্রকে উচ্ছন্নের পথে এগিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। কমারসিয়াল ছবি থেকে তবু কিছু পয়সা আসে, কিন্তু এইরকম ছবি যাঁরা করছেন, তাঁরা এইসব সমালোচকদের দ্বারা শুধু সমালোচিতই হচ্ছেন না, শিল্পী, পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই সমালোচকদের ব্যঙ্গ পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠছেন। সত্যি কথা বলতে কি, বহু কাগজের সিনেমার সমালোচনার পাতাটি হাস্য-পরিহাসের পাতা হয়ে উঠেছে। অথচ যাঁরা তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল বা আরট ফিলম করছেন, তাঁদের ছবি ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, দর্শক তাঁদের ছবি না নিলেও, ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা তো বাদই দিলাম, তবু সমালোচকরা বলছেন, ঐসব ছবি দারুণ ভাল ছবি। তা বলুন, আপত্তি নেই। বাংলা ছবির যে কোন অংশকেই ভাল বললেই ভাল। কিন্তু এদিকে দর্শকরা যে বাংলা ছবি দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হিন্দি ছবির দিকে চোখ রাখছেন, সেটা তাঁরা দেখছেন না বা ভাবছেন না।

এই সমস্যা বা সংকট মোচনের জন্য সবাইকে এগিয়ে এসে একাত্মভাবে কাজ করতে হবে। যদিও রাজ্য সরকার কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য বা প্রত্যক্ষভাবে ছবি প্রযোজনার কাজে নেমেছেন, কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প তো স্টেট স্পনসরড নয়। তাই নিজেদেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলতে হবে।

সাংবাদিক-সমালোচকদের কাছে অনুরোধ জানাই, কাগজের পাতায় ইনটেলেকচুয়াল বাংলা ছবির গুণগান করুন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে কোথায় বাংলা ছবির ভুল হচ্ছে, কোথায় গলদ, ধরিয়ে দিন। সমালোচনা করুন। কিন্তু অযথা পরিহাস করবেন না।' □

সাক্ষাৎকার: সঞ্জয় সিংহ

প্রদর্শকের চোখে

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রদর্শকদের আগ্রহ ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে

পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র প্রদর্শন সংকটজনক অবস্থায় এসে পড়েছে। একদিকে রাজ্য সরকারের প্রমোদ-করের বোঝা অপর দিকে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি সিনেমা হল মালিকদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে।

রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে সরকার প্রমোদকর বাবদ একুশ কোটি ষোল লক্ষেরও অধিক টাকা আয় করেন। পরবর্তী বার্ষিক বছরে ২৪ কোটি টাকা এই খাতে সংগৃহীত হবার কথা এবং চলতি আর্থিক বছরে সেই সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

এদিকে, বর্তমান রাজ্য সরকার সিনেমা হল কর্মীদের জন্যে যে পে-স্কেলের প্রস্তাবনা দিয়েছেন তা মালিকপক্ষ মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় রাজ্যের প্রায় ৪০টি সিনেমা হল বন্ধ আছে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্যে কয়েকজন অভিজ্ঞ সিনেমা হল মালিক ও ম্যানেজারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

তাঁদের সকলের কাছেই মোটামুটি এক ধরনের প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। প্রশ্নগুলি তুলে দেওয়া হল : ১। চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসা লাভজনক কি? ২। আপনি কি চলচ্চিত্রকে আরট বলে মনে করেন? ৩। আপনার সিনেমা হলে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন কি? ৩ক। এই সিনেমা হলে বেশির ভাগ হিন্দি ছবি প্রদর্শন করেন কেন? ৪। হিন্দি ছবি প্রদর্শনের পূর্বে পরিবেশকদের মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয় কি? ৫। এসব ক্ষেত্রে কি কালো টাকার লেনদেন হয়? ৬। আজকাল সিনেমার টিকিটের এত কালো-বাজারি বেড়েছে কেন? প্রতিকার কী? ৭। বিভিন্ন সিনেমা হলের মালিকরা প্রমোদকরের টিকিট লাগানর ব্যাপারে কারচুপি করে থাকেন বলে শুনেছি। এ ব্যাপারে মন্তব্য করুন। ৮। সিনেমা হলের কর্মচারীরা একটা টিকিটকে দুবার বিক্রি করে সরকার ও মালিককে ফাঁকি দেন, একে ডাবলিং বলে, এ সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কি? ৯। ভিডিও এবং টিভি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসার ক্ষতি করছে বলে আপনার মনে হয়? ১০। চলচ্চিত্র ব্যবসা চালাতে অসুবিধার কথা কিছু বলুন।

প্রদর্শন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যেভাবে উত্তর দিয়েছেন তা উল্লেখিত।

যমনভাই মানসাটা :

জনতা সিনেমা প্রপারটিজ অ্যানড ফাইনানস লিমিটেডের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য। এই কোমপানির মালিকানাধীন জনতা সিনেমা। জ্যোতি সিনেমার মালিক এবং ১৯৩৯ সাল থেকে এই সিনেমা হলের সঙ্গে তিনি যুক্ত। যমনভাই সাক্ষাৎ-কারের সময় জ্যোতি সিনেমার ম্যানেজার সুকুমার ঘোষকে পাশে রেখেছিলেন। কেননা জ্যোতি সিনেমার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল।

১। লাভজনক নয়, কেননা সরকার বকস অফিস থেকে অর্জিত অর্থের অধিকাংশই নিয়ে যাচ্ছেন।

২। নিশ্চয়ই।

৩। খুব কম। তার কারণ বাংলা ছবির পরিবেশকরাই চালাতে চান না। তাছাড়া ভাল বাংলা ছবির ব্যাপারে আমরা উদারতা দেখাতে প্রস্তুত আছি। আমাদের জ্যোতি সিনেমায় বাংলা ছায়াছবি আগে দেখান হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'র ব্যাপারে আমরা এন এফ ডি সি-র সঙ্গে কথা বলেছি। মনে রাখবেন, আমরা আগে পরিবেশক ছিলাম। সেসময় 'পলাতকে'র মত ছবিতে অর্থ লগ্নি করেছিলাম।

৩ক। ব্যবসায়িক দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে।

৪। ছবির চাহিদার উপর নির্ভর করে। অগ্রিম টাকা অনেকে দিয়ে থাকেন।

৫। আমার অভিজ্ঞতা নেই।

৬। এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি বলা যায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণই দায়ী। আর প্রতিকার? সে তো পুলিশই করতে পারে।

৭। মাঝে মধ্যে শুনি। তবে পশ্চিমবঙ্গে কম, বিহারে বেশি হয়।

৮। আমার হলে এসব হয় না।

৯। প্রচণ্ডভাবে করছে। কেননা এই ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ ঘরে বসে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, সেজন্য তাঁদের সিনেমা হলে গিয়ে ছায়াছবি দেখার প্রবণতা ক্রমে যাচ্ছে।

১০। আগেই বলেছি, সরকার আমাদের অর্জিত অর্থের সবটাই তুলে নিচ্ছেন। তাছাড়া কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুতের ভাড়া, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি আমাদের পঙ্গু করেছে। সে সঙ্গে লোডশেডিংয়ের ফলে জেনারেটরের আরেকটি খরচ বেড়েছে। মোদ্দাকথা সিনেমা হল চালান এখন লাভজনক নয়।

সুশীল কুমার গাঙ্গুলি :

মধ্য কলকাতার সোসাইটি সিনেমা হলের সঙ্গে যুক্ত আছেন ১৯৫৪ সাল থেকে। এই সিনেমা হলের তিনি ম্যানেজার।

১। লাভজনক নয় কেননা আয় ব্যয় প্রায় সমান সমান।

২। চলচ্চিত্র একটা মাধ্যম, আরট করলে ব্যবসা হয় না। সেজন্যে এক আমি আরট বলে ধরি না।

৩। না, করি না। চলে না বলে।

৩ক। ব্যবসার কথা চিন্তা করে।

৪। অনেক সময় ভাল সেল হবে এমন ছবির জন্যে মোটা টাকা দিতে হয় বৈকি। তাকে আমরা গ্যারানটি মানি বলি।

৫। শোনা যায়, তবে আমবা করি না।

৬। সাধারণ মানুষের অভাব আর পুলিশের কর্তব্যহীনতা। একমাত্র পুলিশ এটা বন্ধ করতে পারে, অথচ করে না। কেননা তারা হয়তো ভাবে এই কালোবাজারি বন্ধ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজবিরোধী অন্যান্য কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে। সেসঙ্গে কালোবাজারির চক্র থেকে পুলিশের অর্থনৈতিক মুনাফাও আসে।

৭। আমিও শুনেছি এ রকম হয়।

৮। মাঝে মধ্যে কর্মচারীরা মালিককে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে।

৯। টি ভি নয়, ভিডিও। ভিডিও একদিন চলচ্চিত্র শিল্পকে গ্রাস করবে। যেহেতু হিন্দি ছায়াছবি মুক্তি পাওয়ার আগে হাজার হাজার দর্শক ভিডিও-তে সেইসব নতুন নতুন চলচ্চিত্র দেখে ফেলছেন ফলে সেসব ছবি আর বাজার পাচ্ছে না। যেমন 'স্বামী দাদা' কেবলমাত্র সেই কারণে কলকাতায় মুক্তি পেল না।

১০। পূর্বাঞ্চলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদকরের হার বেশি।

এফ, আর, ভূরী :

জেনারেল ম্যানেজার, এলিট ও মিনারভা সিনেমা।

আপনি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসায় সঙ্গে কতদিন জড়িত?

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই ব্যবসায় আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করছি। তবে হ্যাঁ, মধ্যে একবার বিরতি ছিল; সেবার আমি ইওরোপে ছিলাম।

১। সবাই ভাবে এটা খুবই লাভজনক, আসলে কিন্তু তা নয়। আগে ছিল। এখন কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুতের খরচ এবং যন্ত্রাংশের মূল্য যে হারে বেড়েছে লাভের অঙ্ক ততখানি বৃদ্ধি পায়নি।

২। এটা তো একটা ব্যবসা। চলচ্চিত্রকে আরট বলে ধরা ঠিক হবে না।

৩। বাংলা ছায়াছবির দর্শক উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় বেশি, সেজন্যে আমাদের মনে হয় বাংলা ছবি এখানে চলবে না। এটা একটা সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য যে হিন্দি ছবি চালাতেই হচ্ছে। কেননা আমাদের দেশের ইংরেজি ছবির পরিবেশকরা বেশি মুনাফা লুটতে চাইছে। ফলে হলের অস্তিত্ব বাঁচাতে আমরা হল ভাড়ায় খাটাতে বাধ্য হচ্ছি।

৪। আমাদের কখন তা দিতে হয়নি।

৬। কালোবাজারিদের টিকিট দিয়ে সাহায্য করে বকস অফিসের কর্মচারীরা, আর পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করে বসে থাকে।

৭। পশ্চিমবাংলায় মফস্বলে এরকম হয় শুনেছি, কলকাতায় কখন শুনিনি।

৮। কোন অভিজ্ঞতা নেই।

৯। না, মোটেই নয়। কেননা ভিডিও এবং টি ভি খুবই অল্প সংখ্যক লোকের ঘরে থাকে। তবে কোন ছায়াছবি মুক্তি পাবার আগে তা ভিডিওতে প্রদর্শন করার সুযোগ দিলে ক্ষতি করবে। এ ব্যাপারে আইন করা উচিত।

১০। ভারতীয় ছায়াছবির দৈর্ঘ্য একটু কমানর চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। কেননা হলের ভিতর পরিচ্ছন্ন করার সময়ই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রযোজনার ব্যয় সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ আসবে।

শিবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় :

ম্যানেজার, নিউ এমপায়ার থিয়েটার। শিবজ্যোতি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসায় বছর বিশেক ধরে জড়িত। সম্প্রতি তিনি এই সিনেমা হলে যোগদান করেছেন।

১। আগে এই ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল। বছর পাঁচেক ধরে মন্দা যাচ্ছে।

২। নিশ্চয়ই।

৩। কদাচিৎ। ইংরেজি ছায়াছবি প্রদর্শনই আমাদের লক্ষ্য।

৬। বকস অফিস এবং পুলিশ এরাই সুযোগ দিচ্ছে বলে টিকিটের কালো বাজারি বেড়ে গেছে।

৭। কলকাতায় এসব হয় না বাইরে হয় বলে শুনেছি।

৮। সাধারণত হাউসফুল হয় না অথচ সেল ভাল হচ্ছে, তখন কমবেশি ডাবলিং করার সুযোগ কর্মচারীরা কাজে লাগায়।

৯। হ্যাঁ, কিছুটা তো করছেই। ছবির মুক্তির আগে এইসব মাধ্যমে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা উচিত।

১০। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এই ব্যবসার সমূহ ক্ষতি করছে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসা থেকে সরকারের এক বিরাট অংকের রাজস্ব আয় হচ্ছে। অথচ সরকার চলচ্চিত্রকে এখন শিল্প হিসেবে মেনে নেননি। ফলে আমরা সিনেমা হলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, অন্যান্য শিল্পে সরকার বিদ্যুতের যে দর বেঁধে দিয়েছেন, সে সুযোগ পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তা করা উচিত।

ডি নরিম্যান :

ম্যানেজার, গ্লোব থিয়েটার। ছবছর তিনি এই সিনেমার সংগে জড়িত।

১। এই ব্যবসা আগে লাভজনক ছিল, এখন লাভের হার কমেছে।

২। এ তো নিছক একটা ব্যবসা।

৩। না। কেননা 'পরশুরাম' চালিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে।

৪। কেউ কেউ দিয়ে থাকে, আমাদের সে প্রশ্ন নেই।

৬। পুলিশের প্রশ্রয়ই এজন্য দায়ী।

৭। কোন কোন সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ফাঁকি দেয় বলে শুনেছি।

৮। আমার হলে এসবের সুযোগ নেই, অন্য কোথাও হতে পারে।

৯। টি ভি করছে না, করছে ভিডিও।

১০। কোন অসুবিধাই নেই।

মন্টু বোস :

মালিক, বসুশ্রী সিনেমা। ১৯৪৭ সাল থেকে এই সিনেমা হলটি চালাচ্ছেন।

১। আগে ছিল, ইদানিং বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারি করের বোঝা এই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

২। নিশ্চয়ই।

৩। এখানে বাংলা ছবি দেখাতাম, এখন অনেকটা বাধ্য হয়ে বন্ধ করেছি, কেননা পরিবেশক গোষ্ঠী আমাদের ছায়াছবি দিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন। ফলে আমাদের হল চালান মুশকিল হয়ে পড়ত। মনে রাখবেন, বাংলা ছায়াছবিকে আমরা সর্বাগ্রে সুযোগ দিতাম। 'পথের পাঁচালি' আমরাই প্রথম প্রদর্শন করেছিলাম। এবং একটা হিন্দি ছবির মুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি রদ করে 'সোনার কেল্লা' চালিয়েছিলাম।

৩ক। ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

৪। ব্যবসা সফল ছবির ওপর নির্ভর করে। অগ্রিম টাকা অনেকে দেন।

৫। সুযোগ থাকতে পারে, তবে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম। কেননা আমার সিনেমা হল ভাড়ায় চালায়।

৬। দর্শকরা কেনে বলে। পুলিশই এটা বন্ধ করতে পারে তবে জনসাধারণের সহযোগিতাও দরকার।

৭। আগে কেউ কেউ ফাঁকি দিত।

৮। শুনেছি এ রকম হয়।

৯। ভিডিও ক্ষতি করছে।

১০। সিনেমা হল চালান এখন খুবই কঠিন ব্যাপার। যেহেতু সরকারি প্রমোদকরের বোঝা, বিদ্যুতের বিল, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, কলকাতা করপোরেশনের কর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশের মূল্য যে হারে বেড়েছে তাতে এই ব্যবসা আর বেশি দিন চালান সম্ভব হবে না।

জগদীশ চোখানী :

ইস্টারন ইনডিয়া মোশান পিকচারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদর্শন বিভাগের সভাপতি। নবীনা সিনেমার মালিক।

১। মোটেই নয়। কেননা প্রচন্ড করের বোঝা এই ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

২। নিঃসন্দেহে।

৩। না। পরিবেশকরা দেন না।

৩ক। ব্যবসায়িক সুবিধার জন্যে।

৪। ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের ওপর নির্ভর করে।

৫। অসম্ভব।

৬। বকস অফিস ও পুলিশের জন্যে। পুলিশ মনে করলে বন্ধ করে দিতে পারে। সেসংগে জনসাধারণের সহযোগিতাও দরকার।

৭। এখন আর ওসব হয়না।

৮। কোন অভিজ্ঞতা নেই।

৯। ভিডিও এই মুহূর্তে তেমন ব্যাপকভাবে ক্ষতি করছে না, তবে ভবিষ্যতে খুবই বিপদ ডেকে আনবে বলে মনে হয় আমার।

১০। সরকার আরোপিত করের বোঝাই প্রধান অসুবিধা।

রাজ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসার সংকট সম্পর্কে রাজ্য সরকার সচেতন। স্মর্তব্য, চলতি বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নতুন স্থায়ী সিনেমা হল তৈরির ব্যাপারে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নতুন সিনেমা হল থেকে প্রমোদকর ও রঙিন ছবির জন্যে অতিরিক্ত কর বাবদ প্রথম বছর আদায়কৃত সব টাকা সেই সিনেমা হলের মালিককে ভরতুকি বা মঞ্জুরী হিসেবে দেবে।

উল্লেখ্য, কলকাতা শহরে একটা বিলাসবহুল সিনেমা হল করতে গেলে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এবং সেই বিনিয়োগকৃত টাকায় রিটারন যা আসবে তা তুলনায় কম। কেননা আজকাল যেকোন ট্রেডিং ব্যবসায় লাভের অংক অপেক্ষাকৃত বেশি। সেজন্যে সিনেমা হল নির্মাণে আগ্রহী লোকের সংখ্যা কম।

তবে, রাজ্য সরকার যে সুযোগের প্রস্তাব দিয়েছেন তাও যথেষ্ট লোভনীয়। কলকাতা শহরে এমন অনেক সিনেমা হল আছে যেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে সরকার প্রমোদকর বাবদ প্রতিমাসে এক থেকে সওয়া লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, সরকারের এই সুযোগ কাজে লাগালে প্রথম বছরের শেষে নতুন সিনেমা হলের মালিক ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ফেরৎ পাচ্ছেন। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে দ্বিধাগ্রস্ত। এসবই ব্যবসায়ীদের মানসিকতার ব্যাপার। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে রাজ্য সরকারের আরোপিত প্রমোদকরের বোঝা-ই প্রদর্শন ব্যবসা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের প্রচন্ড অনীহ করে তুলেছে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, একদিকে ব্যবসায়ীদের অত্যধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা অপর দিকে সরকারের রাজস্ব আদায়ের লাগামহীন প্রতিযোগিতায় প্রদর্শন ব্যবসা সংকটাপন্ন। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসায় নৈরাজ্য ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে বাধ্য। ☐

সাক্ষাৎকার :
সৈয়দ আসরার আহমদ

বাংলা ছবি ঃ দর্শকদের কাছে এক চরম হতাশার ছবি

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প যে এক গভীর সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে কথা এই শিল্পের সংগে জড়িত বিভিন্ন মহল বেশ কিছুদিন ধরেই বলে আসছেন। কিন্তু যাদের নিয়ে চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছে সেই দর্শকরা কী ভাবছেন?

বাংলা ছবির দর্শকরাও আজ হতাশ, তাঁরা ভাবছেন, এই প্রমোদ : ধ্যম এবং তার শিল্প সম্ভাবনা আবার কবে সুস্থির হয়ে দাঁড়াবে?

বাংলা ছবি ঃ হতাশার ছবি তাই / আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে'

ইউনাইটেড স্টেট্স ইনফরমেশন সারভিসের চীফ্ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (৫০) প্রথম ছায়াছবি দেখতে গিয়েছিলেন ছয় বছর বয়সে বাবা মায়ের সংগে। ছবিটি ছিল ইংরাজি। স্বভাবতই সে ছবির স্মৃতি আজ সম্পূর্ণ 'ধূসর'।

প্রথম দেখা বাংলা ছবি স্মৃতিতে রয়েছে। 'উদয়ের পথে।' তখনও ইস্কুলের ছাত্র–উঁচুর দিকে।

ইস্কুলে পড়াকালীন খুব বেশি ছবি দেখার সুযোগ সুপ্রিয়বাবু পাননি। 'দেখুন। আমাদের ছিল গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবার। একটা রক্ষণশীল আবহাওয়ার মধ্যে আমি বড় হয়েছি। খুব সীমিত একটা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আমাদের পরিবারের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। আর সিনেমা, থিয়েটারে যাওয়াটা 'অসংস্কৃত' বলে বিবেচিত হত। প্রকৃতপক্ষে, কলেজ জীবনে প্রবেশ করার পর থেকেই আমি স্বাধীনভাবে সিনেমা দেখতে শুরু করি।'

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 'সাধারণ নিয়মিত চলচ্চিত্র' দর্শকদের তালিকায় পড়েন না। সিনেমা দেখার ব্যাপারে মোটামুটিভাবে তাঁর নিজস্ব বিশেষ নির্বাচন রয়েছে। সাধারণত সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার পরিচালিত ছবি দেখেন। এছাড়া, ঋত্বিক ঘটকের বেশির ভাগ ছবিই দেখেছেন। 'সাধারণ' হিন্দি ছবি দেখেন না। তবে সাম্প্রতিক কালের 'আক্রোশ', 'শোধ', 'চক্র' প্রভৃতি নতুন ধরনের প্রায় সব ছবিই দেখেছেন।

গত তিন মাসে দেখা বাংলা ছবির তালিকায় রয়েছে 'চেনা অচেনা', 'ফটিকচাঁদ' এবং টেলিভিশনে 'পরশপাথর'। ইংরাজী ছবি 'গান্ধী' এবং 'পিকু'।

সুপ্রিয়বাবু সিনেমা দেখতে যান মূলত চিত্তবিনোদনের জন্য। 'তবে একটা শিক্ষামূলক ব্যাপারও সংগে থাকে, সেটা অস্বীকার করা যায় না'। তবে ছবি দেখবার পর তাত্ত্বিক নান্দনিক ইত্যাদি জটিল চুলচেরা তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী আলোচনায় আগ্রহী নন।'

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, হালের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প একটা বিরাট সংকটের সম্মুখীন। তাঁর ভাষায়, 'একটা ভীষণ এবং অদ্ভুত নৈরাজ্য এসেছে। দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ পরিচালকদের না আছে মাধ্যমের উপর দখল, না আছে চিন্তায় কোনও ন্যূনতম বুদ্ধিমত্তার ছাপ। চিন্তার এত দৈন্য এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রীদের কেউ ভালো করে বাংলাই উচ্চারণ করতে পারেন না। 'অভিনয়' তো অনেক দূরের কথা। বসন্ত চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা ছাড়া বর্তমানে নায়ক নায়িকার ক্ষেত্রে একটা বিরাট শূন্যতা। ওম পুরী বা সাধু মেহতা-র মতন একজন অভিনেতা আছেন বাংলা চলচ্চিত্রে? বাংলা ছায়াছবির সংগীত সম্পর্কেও এক কথা। যেমন সংগীতের ভাষা, তেমনি গায়নভংগি। আমাদের মধ্যযৌবন পর্যন্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান আমাদের জমিয়ে রাখত। গানের ভাষাও ছিল অনেক পরিণত। এখন একমাত্র মান্না দে ছাড়া আর কারও গান শোনা যায় না। গীতিকার, সুরকার সম্পর্কেও এককথা। অক্ষম অনুকরণ, চটুল ভাষা, বাদ্যযন্ত্রের অপব্যবহার এই-তো চলছে। সব বিভাগেই চরম ফাঁকিবাজি, কারও কিছু শিখবার আগ্রহ নেই।'

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশংকর বিভূতিভূষণের মহান সাহিত্যকর্মের একাধিক চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে। সত্যজিৎ 'চারুলতা' করলেন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে। কাহিনীগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'চারুলতা' বিশ্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি পেল। অন্যদিকে বিভূতিভূষণের অসামান্য উপন্যাস আরণ্যক নিয়ে যে ছবিটি হল, সেটি একটি চতুর্থ শ্রেণীর ছবি ছাড়া কিছুই নয়।'

সাম্প্রতিক 'প্যারালাল' সিনেমা সম্পর্কে সুপ্রিয়বাবুর অভিমত 'এই সব নবীন চলচ্চিত্রকারদের ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব, উৎপলেন্দু, গৌতম, বিপ্লব রায়চৌধুরী প্রমুখ এইসব পরিচালকদের সিনেমা মাধ্যমের উপর অসাধারণ দখল রয়েছে। তবে এদের ছবিতে প্রচারধর্মিতা বড্ড বেশি। আমি মনে করি না, সিনেমা দেখিয়ে সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লব আনা যাবে। যে সমাজের পরিবর্তন এঁরা চাইছেন, সেই সমাজের সাধারণ নাগরিকেরা কী চাইছেন সেই দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখব না, এই মনোভাব একেবারে ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, এই সাধারণ দর্শকরাই কিন্তু বাংলা ছবিকে পয়সা দেন, বাঁচিয়ে রাখেন।'

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু নৈরাশ্যবাদী নন, 'পঞ্চাশ দশকের একেবারে গোড়ায় ঠিক একইরকম একটা মন্দা এসেছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া মারা গিয়েছেন। নিউ থিয়েটারস প্রায় বন্ধের মুখে। কানন দেবী ছায়াছবির জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। তবু তো 'পথের পাঁচালী' হল। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন-এর মত অভিনেতা অভিনেত্রী এলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্যের ধারায় হয়ত সাময়িক চড়া পড়তে পারে, কিন্তু জোয়ার আবার আসবেই। এক শতাব্দীতে দুইজন সত্যজিৎ রায় জন্মাননা। কিন্তু তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদারের মতন দু'একজন পরিচালককে পেলে বাংলা ছবি উপকৃত হত।'

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় পরিচালকদের মধ্যে আছেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার এবং অবশ্যই সত্যজিৎ রায়। 'সত্যজিৎ রায় যে শহরে বাস করেন সেই শহরের বাসিন্দা আমিও–এই ব্যাপারটা গর্বিত করে।'

'সুবর্ণরেখা' এবং 'ভুবন সোম' সুপ্রিয়বাবুর দেখা শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির

'চিন্তার এমন দৈন্য আগে দেখা যায়নি'

মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ভালো লেগেছিল 'গংগা', 'অতিথি' 'কাবুলীওয়ালা' এবং অবশ্যই সত্যজিৎ এর সবক'টি ছবি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, কলকাতা শহরের অধিকাংশ সিনেমা হলগুলো অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা। দর্শকরা সিনেমা দেখতে যান চিত্তবিনোদনের জন্য। কিন্তু যে অবস্থায় তারা ছবি দেখেন, তাতে অবসর বিনোদন তো দূরের কথা, তিনগুণ অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। এটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভাবা দরকার। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকটের আওতার বাইরে এটা পড়ে না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্ষেপ, শিশু-চলচ্চিত্র আমাদের দেশে হয় না। ওয়াল্ট ডিজনির ছবিগুলির মত ছবি বা 'দ্য উইজার্ড অব্ অজ' এর মতন ছবি। এটা নিয়ে সত্যিকারের ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে। শিশুদের আনন্দ বিনোদনের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা উচিত নয়।

প্রথম ছবি 'কার পাপে ?'

মৌলানা আজাদ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শৈবাল মিত্রের (৩৯) সংগে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম পরিচয় ছয় বছর বয়সে। ছবিটি ছিল 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'-'কার পাপে', বাবা-মায়ের সংগে গিয়েছিলেন। কিছু মনে নেই সে ছবির কথা। কতক্ষণে 'বিরতি' হবে-বাদাম, কেক, বিস্কুট আসবে তার জন্য শুধু ছটফট করছিলেন মনে পড়ে।

কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই নিয়মিতভাবে ছবি দেখা শুরু করেন। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী সবরকম ছবি দেখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনও মোটামুটিভাবে নিয়মিত ছবি দেখেছেন। এখন ছবি দেখার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা বদলেছে। সাধারণত ভালো ছবি ছাড়া দেখেন না। কোনও মাসে হয়ত ৩/৪টা ছবি দেখলেন। আবার তিনচার মাসে ছবি দেখেননি, এমনও রয়েছে।

সাধারণ বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্র র আগ্রহ নেই। গত তিন চারমাসে দেখা ছবির মধ্যে রয়েছে 'পরশপাথর' (টেলিভিশনে) এবং 'বন্দিনী কমলা'।

শৈবালবাবুর কাছে 'ফিল্ম' দেখবার মূল উদ্দেশ্য নিছক 'বিনোদন' নয়। 'শিল্পকলা' শিক্ষা একটি অন্যতম এবং আবশ্যিক শর্ত। 'যাঁর ছবি দেখে কিছু লিখতে পারব তাঁর ছবিই দেখব। যাঁর লেখা পড়ে কিছু শিখতে পারব তাঁর লেখাই পড়ব। অন্যদের নয়। স্বভাবতই অনেক ছবি (এবং লেখাও) ইচ্ছে করেই অগ্রাহ্য করি।'

বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্রের বক্তব্য রীতিমত 'রাগী'। 'আজকের বাংলা ছবি দেখে একশ বছর পরে লোকে হাসবে। দর্শক ঠকানর নোংরা বেসাতি চলছে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে। প্রযোজক পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রী ডিসট্রিবিউটর কেউ বাদ নন এই মুৎসুদ্দি ধূর্ত নোংরামি থেকে। চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে 'কালোবাজারী টাকার আড্ডাখানা'। কোন শিল্প আশা করবেন এদের কাছ থেকে? হাতে গোনা যায় এরকম চার পাঁচজন পরিচালক বাদে চলচ্চিত্রের মৌলিক এবং আবশ্যিক শর্ত 'সিনেমালজি' ব্যাপারটা এখানে কেউ জানেন না। অথচ এটা চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব।

অধিকাংশ দর্শক আজ হিন্দি ছবির দিকে ঝুঁকেছেন। কারণ কী? বাংলা ছবির দীনতা?

অধ্যাপক মিত্র : না, ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে বিচার করা যাক। হিন্দি ছবির জাঁকজমক, বিলাসিতা, বাড়ি, গাড়ি এগুলো সাধারণ মানুষের স্বপ্ন বা কল্পনাকে প্রজ্জ্বলিত করে। একজন বিত্তবান নায়ককে দেখে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত দর্শক স্বপ্ন দেখেন অর্থনৈতিক ঐ উঁচু সোপানে পৌঁছতে। এই গতি, এই স্বপ্ন এগুলোও কিন্তু শিল্পের অঙ্গ। কিন্তু এখানেও একটা মজার খেলা চলে। এইসব হিন্দি ছবিগুলোতেও একটা 'অদৃষ্টবাদ' প্রচ্ছন্নভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মানে, এই যে সামাজিক অর্থনৈতিক পার্থক্য, এটা অদৃষ্টের ব্যাপার। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতে রয়েছে। সবচেয়ে ভালো রয়েছে 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রোগেস'-এ 'ফেইথ্' এবং 'টক'-এর কথোপকথনে। এটা না করলে যাঁরা এইসব ছবি দেখাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠবে।

বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান সংকট সম্পর্কে শৈবালবাবুর বক্তব্য: গোটা দেশ জুড়ে সংকট চলছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজজীবন, শিল্প, সাহিত্য সবক্ষেত্রে। চলচ্চিত্রকে তো এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখান যায় না।

অধ্যাপক মিত্রর অভিযোগ, নামী পরিচালকরা রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশংকরের লেখা নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু মূল গল্পের 'স্পিরিট'টা পালটে যায়। প্রসংগত তিনি 'চারুলতা' প্রসংগে সত্যজিৎ রায় এবং অশোক রুদ্রের বিখ্যাত পত্র-বিতর্কের উল্লেখ করলেন। শৈবালবাবু মনে করেন, শ্রীরুদ্র ঠিকভাবেই বলেছেন 'নষ্টনীড়' ও 'চারুলতা'র থীম ও প্লট সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার না করে সত্যজিৎবাবু তো মৌলিক গল্প নিয়েই ছবি করতে পারতেন। বিদেশী ছবি, যেমন শেকসপীয়র এর 'ওথেলো' 'ম্যাকবেথ' 'হ্যামলেট' বা হালের 'রুটস' ছবিগুলোতে কিন্তু উপন্যাসের মূল 'স্পিরিট'টা বজায় থেকেছে'-অধ্যাপক মিত্রের অভিমত।

শৈবালবাবুর আর একটি বড় অভিযোগ, বিখ্যাত পরিচালকরা মুখে শিল্পের সম্পর্কে অনেক গালভরা বুলি আউড়েও মূলত 'কলাকৈবল্যবাদী' এবং এটা করে তারা স্বস্তি পান। 'জীবনধর্মিতা' সম্পর্কে এদের মূল্যবোধ এখনও 'সামন্ততান্ত্রিক' পর্যায়ের উপরে উঠতে পারেনি। 'যে নন্দনতত্ত্বের কথা বলছিলাম, একমাত্র ঋত্বিক ঘটককে বাদ দিলে কোন পরিচালকের কাজে তার বিন্দুমাত্র ছাপ আছে? সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক ব্যাপার। সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু এমনকি মহাশ্বেতা দেবীও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।'

নবীন পরিচালকদের সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্রর অভিমত এরা খুব দক্ষ। মাধ্যমের উপর অসাধারণ দখল। কিন্তু কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে। এঁদের কাহিনীর অধিকাংশই নেওয়া সুনীল, শীর্ষেন্দু, দিব্যেন্দু পালিত, কমলকুমার মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের থেকে। তবু এঁদের সম্পর্কে প্রত্যাশা আছে। এঁরা ছবি করে পেটের ভাত জোটাতে পারেন না। ডিসট্রিবিউটররা শেষ করে দিয়েছে বুদ্ধদেব, উৎপলেন্দু, গৌতম, নীতীশ দে, শংকর ভট্টাচার্যদের।

'ভারতবর্ষে বোধ হয় দীর্ঘদিন আন্দোলনের আগুন বুকে নিয়ে বেঁচে থাকা মুশকিল। তবে এবিষয়ে ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধা করি। শেষদিন পর্যন্ত অন্তত একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। আপস করেননি।'

শৈবালবাবু মনে করেন, এই ভিন্নধর্মী ছবিগুলোও একটা ছকে পড়ে যাচ্ছে। মানুষের ছকে অরুচি ধরে যায়। এর বাইরে কিছু শিল্পকর্ম করতে হবে। জীবনদর্শন জীবন থেকে উঠে আসে। দর্শন, ইতিহাস বা সাহিত্য পড়ে হয় না। এ ব্যাপারে আমরা তুরস্কের পরিচালক গুনে বা গদার-এর ছবি দেখেছি। আর ভিন্নধর্মী হিন্দি ছবিগুলো সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছে 'এদের নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে বিশ্বাস কম।

ফিলম ক্লাবগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে শ্রী মিত্রর অভিমত, ও অন্য গোলার্ধের ব্যাপার - 'হস্তিদন্তমিনার' থেকে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছন যায় না।

বাংলা ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে শৈবালবাবুর মত, 'অসম্ভব ক্ষমতাবান শিল্পীরা ছিলেন এবং এখনও আছেন। উত্তমকুমারের মতন শিল্পী অত্যন্ত বাজে ছবিও শুধু অভিনয়ের জোরে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। এছাড়া সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, গংগাপদ বসু, ছায়া দেবী ও অসম্ভব ক্ষমতাবান কয়েকজন শিল্পী এখানে কাজ করেছেন এবং এখনও অনেকে করছেন - যেমন অপর্ণা সেন, মাধবী চক্রবর্তী। মুগ্ধ হয়েছিলেন 'অভিযান' এ ওয়াহিদা রহমানের অসামান্য অভিনয় দেখে। এইসব শিল্পীদের সবচেয়ে বড় গুণ অভিনয়ের মধ্যে ভারতীয়ত্ব চরিত্রটা বজায় রাখা।

শিশু কিশোর চলচ্চিত্র সম্পর্কে শ্রী মিত্রের বক্তব্য : যেদেশে প্রতিবছর দশলাখ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, দু'লক্ষ অন্ধ হয়ে যায়, পঞ্চাশ হাজার জন্মের পরে মারা যায়, তিন কোটি শিশু শ্রমিক সেখানে কোন শিশুদের জন্য ছবি - হতে পারে তোপসে কে নিয়ে ছবি নিউ আলিপুর, বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট অঞ্চলের উচ্চবিত্ত সমাজের শিশু কিশোরদের জন্য ছবি। 'খারিজ'-এ মৃণালবাবু একটি শিশুভৃত্যের মৃত্যু দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে কে? ঐ শিশুটির বাবা নয়। উচ্চ-মধ্যবিত্ত এক দম্পতির মানসিক উদ্বেগ।

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট মোচনে সরকারি ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্র মনে করেন, সরকার একটি 'মস্তিষ্কহীন জীবদেহ'। যতদিন এই 'মস্তিষ্ক' না গজাবে, ততদিন কিছু হবে না। সরকারের একটি নিজস্ব সিনেমা হল আছে? অন্য প্রসংগ তো বাদই দিলাম।

বাংলা ছবির সংকট মোচনের জন্য শ্রী মিত্র-র অভিমত জানতে চাইলে বললেন, জাঁ পল সার্ত্র মৃত্যুর অব্যবহিত আগে লিখেছিলেন 'প্রত্যেক মানুষকে নিজের সুযোগ নিজেকে করে নিতে হবে এবং দায়বদ্ধ কর্মের সুষ্ঠু পালনের মধ্য দিয়ে।' দায়িত্ব সকলের আছে। এই দায়িত্বগুলো আমরা প্রত্যেকে সুষ্ঠুভাবে পালন করলে, নিশ্চয়ই 'সদর্থক' একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবেই।

প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের (পরিসংখ্যান শাখা) কম-পিউটিং ইনভেসটিগেটর দীপক সেনগুপ্ত (৩৭) প্রথম ছবি দেখে-ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। শ্রী সেনগুপ্ত তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' সেই বয়সেই দীপকবাবুকে মুগ্ধ করেছিল। নিজেকে 'অপু'র ভূমিকায় রোজ স্বপ্ন দেখতেন। আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলেই খালি পায়ে, খালি গায়ে বাবার ছেঁড়া কাপড় পরে একটা বোতল নিয়ে কেরোসিন তেল আনতে বেরোতেন। বাড়িতে বকুনি খেয়েছেন, বন্ধুরা ইস্কুলে গিয়ে 'অপু' 'অপু' বলে ডেকে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু শ্রী সেনগুপ্তর অপু হবার সখকে ছ'সাত মাস কেউ আটকাতে পারেনি।

ক্লাস টেন থেকেই মোটামুটিভাবে নিয়মিত সিনেমা দেখতে শুরু করেন। হিন্দি ছবি দেখতেন না। এখনও সেরকম আগ্রহ নেই। কলেজে পড়াকালীন 'বাংলা ছবি বাদ যেতনা, বিশেষত উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন থাকলে।'

বাংলা চলচ্চিত্রের মননশীল দর্শক হিসেবে শ্রী সেনগুপ্তকে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না খুব একটা। এখনও ছবি দেখেন তবে প্রথম যৌবনের প্রাথমিক আবেগ, উচ্ছা-সের জায়গা নিয়েছে এখন যুক্তি গ্রাহ্যতা এবং জীবনধর্মী সচেতনতা। দীপকবাবু জানালেন 'দেখুন, মা, বাবা, তিনবোন নিয়ে আমাদের সংসার। পরিবারে উপার্জনক্ষম বলতে আমি একাই। সুতরাং জীবনে পোড় খেয়ে খেয়ে, বর্তমান সাধারণ বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কী পাই আমি। সেই ফরমূলা রোমানস, আবেগ, প্যাচপেচে সেনটিমেনট। এসব আমাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। আর নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা নিয়ে যারা ছবি করছেন (তিনি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন যিনিই হ'ন) আমাদের চেহারা জানেন না।'

তবু কেন ছবি দেখতে যান? শ্রী সেনগুপ্ত, 'উদ্দেশ্য একটাই। বর্তমান সমাজ সম্পর্কে, বর্তমান শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবাদী ছবি হচ্ছে কিনা দেখতে যাওয়া।

কিছু নবীন পরিচালক তো প্রতিবাদী চলচ্চিত্র করছেন। তাঁরা তো সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা, অবিচারের বিরুদ্ধে ছবি করছেন!

শ্রী সেনগুপ্ত: আপনি বুদ্ধদেব, উৎপলেন্দু, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, বিপ্লব রায়চৌধুরী এঁদের কথা বলছেন নিশ্চয়ই। 'না, সেখানেও কিছু পাচ্ছি না। উৎপ-লেন্দু, শুনেছি, বামপন্থী সংগ্রামে সক্রিয় সামিল হয়েছিলেন। সুতরাং, স্বভাবতই প্রত্যাশা ছিল। ওঁর মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবি দেখেছি।

প্রত্যাশা পূরণ তো দূরের কথা, সংগ্রামী ময়দানী যোদ্ধার কাছ থেকে এই ছবি? খেলা চলছে – একটা মজার খেলা! কে কত সরকারি আনুকূল্য পেতে পারেন–তাই নিয়ে। অথচ উৎপলেন্দুর প্রকৃত সংগ্রামী অভিজ্ঞতা ছিল। ইচ্ছে করলে পারতেন। আর কার প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতা নেই? সুতরাং হাজার চিৎকার করলেও 'আউটপুট' শূন্য। বরং অনেক বেশি ভাল লেগেছে 'আক্রোশ' এবং 'গরম হাওয়া'। বিশেষত 'গরম হাওয়া'।'

গত তিন চার মাসে দীপক বাবু ছবি দেখেছেন–বাংলা: অগ্রদানী, ফটিক চাঁদ (পিকু), পরশ পাথর, (টেলিভিশনে), তিতাস (চ্যারিটি শো), অশ্লীলতার দায়ে এবং দুটি পাতা। ইংরেজি ছবি দেখেছেন: বিটার লাভ, এবং বুবু। একমাত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়া অন্য ছবিগুলোতে শ্রী সেনগুপ্ত কোন 'জীবনধর্মীতার' ন্যূনতম শর্ত-টুকুও খুঁজে পাননি।

'আজকের বাংলা ছবি দেখে একশো বছর পরে লোকে হাসবে'

দীপকবাবু ভীষণভাবে ভাবিত বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকট সম্পর্কে। 'দুর্বল গল্প, দুর্বলতর চিত্রনাট্য, হিন্দী ছবির অক্ষম এবং ব্যর্থ অনুকরণ, কস্তাপচা আবেগ, অবাস্তব রোমানটিকতা বাংলা ছবিকে ক্রমশ পঙ্গু করে তুলছে। কেউ কিছু ভাবছেন না, বুদ্ধির অপপ্রয়োগ ঘটছে। নিছক যৌনতা এবং খলনায়কের জন্য বোমবাই থেকে আমদানি করা হচ্ছে তথাকথিত 'হিট' নর্তকী বা 'আম-জাদ খান' স্তরের শিল্পীকে। সোজা কথায় দর্শক ঠকানর বেসাতি চলছে।'

শ্রী সেনগুপ্তর স্পষ্ট বক্তব্য, 'ঐতিহ্য ইত্যাদি স্রেফ কথার কথা। বাংলা ছবি বাঁচবেনা। সাধারণ দর্শক কী চান? কোনও পরিচালক এ নিয়ে সমীক্ষা করেছেন? অনেকেই বল ছেন, 'টেকনিকাল' সুযোগসুবিধা অনেক কম অথচ তা সত্ত্বেও 'অযান্ত্রিক' 'মহানগর'-এর মত ছবি হয়েছে। আসলে সমস্যা অন্যত্র। পরিচালকদের সাহসের অভাব এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক শূন্যতা। মাধবী, সৌমিত্র, অপর্ণা, শুভেন্দুর মত শিল্পী নেই। নতুন যাঁদের অভিনয় দেখছি মনে হয় না এই শূন্যতা পূরণে তাঁরা সক্ষম হবেন। একটা আপসের আবহাওয়া এসে গিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের সব বিভাগে। না, আমি বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী নই।

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট-মোচনে সরকারি ভূমিকা প্রসঙ্গে আপনি অভিমত জানতে চেয়েছেন। মাপ করবেন, আমি এ ব্যাপারে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করছি। তবে, কারিগরী দিক সম্পর্কে সরকার এগিয়ে আসতে পারেন। ভাল ল্যাবরেটরি, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে পারেন। চলচ্চিত্রের বিষয়গত এবং আঙ্গিকগত দিক সম্পর্কে শিক্ষাক্রম চালু করতে পারেন।

শ্রী সেনগুপ্তর প্রিয় পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। দেখা ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোমলগান্ধার'। সবচেয়ে বাজে ছবি, শুনলে আহত হবেন, সত্যজিৎবাবুর 'অশনি সংকেত'। শেষে লেখাটি পর্দায় না থাকলে রঙ্গীন বাহারে আমরা ভুলতে বসেছিলাম ওটা একটা দুর্ভিক্ষের ছবি।'

প্রথম ছবি 'মানে না মানা'

হিন্দু অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখার প্রধান শিক্ষক, ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় (৪০) প্রথম বাংলা ছবি দেখেছিলেন ছয় বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে। ছবির নাম 'মানে না মানা'। সে ছবির কথা তেমন মনে নেই। শুধু একটা দৃশ্যে এক বৃদ্ধকে ওপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়ায় খুব কান্না পেয়ে গিয়েছিল। এটুকু মনে আছে।

নিয়মিতভাবে ছবি দেখেছেন বছর কুড়ি বয়স থেকে। এখনও ছবি দেখেন, তবে যৌবনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক নিয়মেই ভাঁটা পড়েছে। ফলে বর্তমানে ছবি দেখেন অনেক কম। গত তিনচার মাসের মধ্যে বাংলা ছবি দেখেছেন 'চেনা অচেনা' 'অগ্রদানী', 'ফটিকচাঁদ' (পিকু'), এবং 'রবি সোম'। হিন্দি ছবি দেখেছেন 'অনধা কানুন'। 'গান্ধী'র হিন্দি চিত্ররূপ দেখেছেন। ইংরাজি ছবি দেখেছেন একটিই, 'ফর ইওর আইজ অনলি'।

অবসর বিনোদন এবং চিত্রবিনোদনের উদ্দেশ্যে সিনেমায় যান ত্রিদিববাবু। দেখতে ভালবাসেন প্রেমের ছবি এবং বাঙালি সাধারণ জীবনের গৃহস্থ ছবি।

নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে যে সব পরিচালক গত কয়বছর ধরে ছবি করছেন, তাঁদের অনেকের ছবিই ত্রিদিববাবু দেখেছেন। দেখেছেন 'দূরত্ব', 'দৌড়', 'ময়না তদ… 'খারিজ' 'আকালের সন্ধানে… পাশাপাশি এই একই জাতে… ভিন্নধর্মী হিন্দি ছবির মধ্যে দেখেছে… 'শোধ,' 'আক্রোশ', 'চক্র… শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বাঁধাধ… ছকের বাইরে এইজাতীয় বাং… ছবিগুলির অভিনয়, শিল্প নির্দেশ… আলোকচিত্র অসামান্য। কিন্তু রা… নীতির সরব প্রচার বড্ড বেশি। এ… ছবির আবেদন মুষ্টিমেয় কয়েক… দর্শক ছাড়া অন্যান্যদের কা… একেবারে নেই। আর তাছা… এভাবে সমাজ পালটান যায়নি… কোনও দেশে যায়নি। তবু এরই ম… ভাল লেগেছে শংকর ভট্টাচার… 'দৌড়'। পাশাপাশি বরং হিন্দি ছ… 'আক্রোশ', 'শোধ' বা 'চক্র'… সামাজিক শোষণের চিত্র তুলে ধ… সত্ত্বেও প্রচারের অতটা বাড়াবা… নেই।'

ত্রিদিববাবু বাংলা চলচ্চিত্রে সংক… চলছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে… এর প্রধান কারণ বাণিজ্যিক ছবি… সঙ্গে দু'একটা সমকালীন সমস্… ঢুকিয়ে দিয়ে সাধারণ পরিচালক… একটা 'জগাখিচুড়ি' তৈরি করছেন… এছাড়া ছবি টেনে নিয়ে যাবার মত… নায়ক নায়িকার অভাব রয়েছে… বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্বলতম বিভা… সংগীত।

তবে, ত্রিদিববাবু মনে করেন, নব… অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে থেকে… নিশ্চয়ই ভাল শিল্পী উঠে আসবেন… অনেক তরুণ পরিচালক ছ… করছেন। আস্তে আস্তে তাঁরা… পরিণত হবেন।

বাংলা ছবির সংকটমোচনে সর… কারি ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীবন্দ্যো… পাধ্যায় ক্ষুব্ধ। 'ওঁরা সামগ্রিকভা… কিছুই ভাবছেন না। নিজেদে… লোকদের বেছে বেছে টাকা দিচ্ছেন… তাও তো হাজারটা শর্ত। ওঁদে… পছন্দ না হলেই সে ছবি আ… প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কিনবে… না। এ তো পুরোপুরি মহাজনদে… মত ব্যাপার।'

প্রথম ছবি 'মহাশ্বেতা'

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বিজ্ঞা… শাখার তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রবিশংক… বল (২২) এর দেখা প্রথম বাং… ছবি 'মহাশ্বেতা'। না, প্রথম দে… চলচ্চিত্র রবিশংকরের মনে তেম… কোনও বিস্ময়বোধের উদ্রে… করেনি।

গত তিনবছর যাবৎ রবিশংক… চলচ্চিত্রের নিয়মিত দর্শক। সাম্প্র… তিক কালের দেখা বাংলা ছবির মধ্যে… রয়েছে 'ফটিকচাঁদ' এবং 'অগ্রদানী'… হিন্দি ছবি 'বেমিসাল'। মূলত বাংল… ছবির দর্শক শ্রী বলের ভাললাগ…

ছবির তালিকায় রয়েছে 'দূরত্ব', 'দৌড়' 'হীরকরাজার দেশে', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ' এবং 'ময়না তদন্ত'। হিন্দি ছবি 'আক্রোশ', 'চক্র', 'শোধ' এবং 'অ্যালবার্ট পিনটো'

চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে 'বিনোদন' প্রধান ব্যাপার হলেও রবিশংকর বাংলা ছায়াছবির 'ট্রিটমেন্ট' এবং বক্তব্য বিষয়েও সমান আগ্রহী। সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক এবং 'জীবনধর্মী' ছবি দেখতে ভালবাসেন। ভালবাসেন প্রেমের ছবি দেখতেও। তবে এখানে কি বাংলায়, কি হিন্দিতে তো আর ভাল প্রেমের ছবি হয়না। 'রোমান হলিডে বা ফ্রেনডস এর মত ছবি কই ?'

সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে রবিশংকরের বক্তব্য, সাধারণ ছবিগুলোর কথা বলছি। একটাও বসে দেখা যায়না। কিছু নেই এই ছবিগুলোতে। বাজে গল্প, দুর্বল চিত্রনাট্য, অক্ষম পরিচালনা, নিকৃষ্ট মানের অভিনয় এই নিয়ে গত দু'তিনবছর বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে। টেকনিক্যাল কাজকর্মও অত্যন্ত নিচু মানের। এরই মধ্যে চলছে বোম্বে থেকে 'হিট' দু'একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিয়ে এসে দর্শক টানবার চেষ্টা। এতে বাংলা ছবির 'জীবদ্দশা' সংকুচিত হচ্ছে।

বাণিজ্যিক বাংলা ছবির পাশাপাশি নবীন পরিচালকদের তৈরি ভিন্নধর্মী ছবিগুলো সম্পর্কে রবিশংকর : বক্তব্যের দিক দিয়ে এঁরা একটা নতুন হাওয়া আনতে চেষ্টা করছেন। এটার দরকার ছিল। বুদ্ধদেব এবং গৌতমের ছবিতে চলচ্চিত্রের ভাষা খুঁজে পাই। ভালো লাগে বিপ্লব রায়চৌধুরীর ছবি। তবে এঁদের অনেকের ছবিতেই সামাজিক সমস্যার স্বরূপটা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েনা। বরং এইজাতীয় হিন্দি ছবিগুলোতে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্পের ভাষাও অনেক বেশি পরিণত।

রবিশংকরের প্রিয় পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এবং গৌতম ঘোষ। প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কানু মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা সেন। এযাবৎ দেখা ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ : তিতাস একটি নদীর নাম।

প্রথম ছবি 'দ্য কীড'

হরিশ মুখারজি রোডের গৃহবধূ দীপালি সোম (৪৬) প্রথম ছবি দেখেছিলেন বার বছর বয়সে। ইংরাজি ছবি চারলি চ্যাপলিনের 'দ্য কিড'। এক অদ্ভুত মুগ্ধতায় আবেশে বিভোর হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। নিয়মিত ছবি দেখতে শুরু করেন ইনটারমিডিয়েট পাশ করার পর থেকেই। দুই সন্তানের জননী দীপালি দেবী-র স্বামী কাজ করেন একটি বেসরকারি সংস্থায়। জ্যেষ্ঠপুত্র সবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। কনিষ্ঠ সোমনাথ পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে। হাতে অফুরন্ত সময়। সঙ্গে রয়েছে সিনেমা দেখার দারুণ নেশা। সুতরাং বাংলা চলচ্চিত্রের একজন নিয়মিত দর্শক।

গত তিনচার মাসে ছবি দেখেছেন, এই ছিল মনে, চেনা অচেনা, কাউকে বোলোনা, দুটি পাতা, ফটিকচাঁদ, শৃংখল, অগ্নদানী, অশ্লীলতার দায়ে। হিন্দি ছবি দেখেছেন বেমিসাল, অবতার, শুন মেরি লায়লা। ইংরাজি ছবির তালিকায় আছে গান্ধী, মডারন টাইমস, ব্যাটল বিয়নড স্টারস।

'ছবি দেখতে ভালবাসি, তাই ছবি দেখতে যাই। না, অন্য কোনও দর্শনের কথা ভাবিনা।' সবধরনের ছবি দেখতে ভালবাসেন। তবে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে সামাজিক গৃহস্থ সংসারের ছবি, প্রেমের ছবি এবং কিশোর চলচ্চিত্র। বাংলা ছবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে, শ্রীমতী

'সামাজিক সমস্যা ঢুকিয়ে সাধারণ পরিচালকরা জগাখিচুড়ি তৈরি করেন'

সোম সেরকম মনে করেন না। তবে বাংলা ছবির মান অনেক কমে গেছে এটা স্বীকার করেন। বিশেষত: উত্তমকুমার মারা যাবার পর নায়কের ক্ষেত্রে ভীষণ একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছে। আর, ভালো লাগে না হিন্দি ছবির অনুকরণে অহেতুক নাচ বা মারামারির দৃশ্যগুলো। এ ছাড়া, বাংলা ছবিগুলো গতিমন্থরতায় ভোগে। কাহিনীগুলোও অনেকসময় একঘেঁয়ে হয়ে যায়।-

নবীন পরিচালকদের ছবি খুব একটা দেখেননি। শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' দেখে ভালো লাগেনি। ছবিতে আবার রাজনীতি কেন ? বুদ্ধদেবের 'দূরত্ব' দেখে ভালো লেগেছে। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর ময়না তদন্ত মোটামুটি ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগেছিল মৃণাল সেনের খারিজ দেখে।

সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রিকা পড়েন না। তবে, খবরের কাগজ বা দেশ ইত্যাদি পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচনা নিয়মিত পড়ে থাকেন। ফিলম সোসাইটি আন্দোলন সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় পড়েছেন। কিন্তু কোন ধারণা নেই।

শ্রীমতী সোমের প্রিয় পরিচালক, সত্যজিৎ রায়। শ্রেষ্ঠ ছবি হীরক রাজার দেশে। প্রিয় অভিনেতা/অভিনেত্রীদের তালিকায় রয়েছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং অনুপকুমার। অন্যান্য ভালোলাগা ছবির তালিকায় রয়েছে মেঘে ঢাকা তারা, ভুবন সোম, হংসমিথুন, গৃহদাহ। নতুন নায়ক নায়িকাদের মধ্যে ভালো লাগে সন্তু মুখারজি, তাপস পাল, মহুয়া রায়চৌধুরী।

বাংলা ছবিতে সরকারি ভূমিকা প্রসঙ্গে দীপালি দেবীর মন্তব্য: শুনেছি অনেককেই টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। তবে সেইসব টাকায় যে সব ছবি হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই রাজনীতির গন্ধ মেশান। শিল্পের থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখা উচিত। বাংলাছবির ত্রুটিগুলো দূর করতে গেলে, শ্রীমতী দত্তর মতে, নামকরা পরিচালকদের আরও বেশি ছবি করা দরকার। মহান সাহিত্যিকদের উপন্যাস, গল্প নিয়ে ছবি করা দরকার। আর হিন্দি ছবির অনুকরণে অনাবশ্যক নাচ, মারামারি এবং যৌনতার আধিক্য দূর করতে হবে।

প্রথম ছবি 'ইনটারভিউ'

দেবেশ দাস (৩৭) পেশায় হকার। প্লাসটিকের তৈরি জিনিসপত্র ফুটপাতে বসে বিক্রি করেন। 'উজ্জ্বলা' সিনেমা হল থেকে অগ্নিসংস্কার দেখে বেরিয়ে আসার সময় ধরলাম।

অবিবাহিত দেবেশবাবু প্রায় নিয়মিত বংলা ছবি দেখেন। প্রথম দেখা বাংলা ছবি '৭১ সালে মৃণাল সেনের ইনটারভিউ। সদ্য বাংলাদেশ থেকে তখন পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। হিন্দি ছবিও দেখেন। গত কয় মাসে ছবি দেখেছেন ফটিকচাঁদ নাগমতী, অশ্লীলতার দায়ে, অগ্নদানী, চেনা অচেনা। হিন্দি ছবি দেখেছেন পেইনটার বাবু, মহান এবং খুব সম্প্রতি অবতার।

আনন্দ পেতে চান দেবেশবাবু সিনেমাতে। ভালো লাগে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার উপর নির্মিত বাংলাছবি এবং ভালো প্রেমের ছবি।

দেবেশ বাবু-র মতে, দশবছর আগে যে ধরনের বাংলাছবি দেখেছি, এখন সেই জাতীয় ছবি তৈরি হচ্ছে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন মতে গোঁজামিল দিয়ে বেশির ভাগ ছবি করা হচ্ছে।

তাঁর মতে, এই সংকটের মূল কারণ খারাপ অভিনয় আর কাহিনীর অবাস্তবতা। নবীন পরিচালকদের ছবি দেবেশবাবু অনেকগুলিই দেখেছেন। খুব ভালো লেগেছে দৌড়, ময়না তদন্ত, নিম অন্নপূর্ণা। এছাড়া মৃণাল সেনের একদিন প্রতিদিন এবং আকালের সন্ধানে অসাধারণ লেগেছে। ভালো লেগেছিল আক্রোশ।

সিনেমা সংক্রান্ত কোনও পত্র পত্রিকা পড়েন না বা ফিলম সোসাইটি আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত নন।

দেবেশবাবুর প্রিয় পরিচালক মৃণাল সেন। শ্রেষ্ঠ ছবি একদিন প্রতিদিন। প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের তালিকায় রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, শ্রীলা মজুমদার এবং সুপ্রিয়া চৌধুরী। নতুন নায়ক নায়িকাদের মধ্যে কারও অভিনয় সামগ্রিকভাবে রেখাপাত করে না।

বাংলা ছবিতে সরকারি ভূমিকা সম্পর্কে দেবেশবাবু বললেন, নতুন অনেক পরিচালক কে সরকার টাকা দিয়ে সাহায্য না করলে আমরা কিছু ভালো ছবি দেখতে পেতাম না, এটা ঠিক কথা। তবে, আমাদের নিয়ে, হকার, বস্তিবাসীদের নিয়ে কেন কোনও ছবি করতে দেন না ? □

সাক্ষাৎকার : বিশেষ প্রতিনিধি

আলোকচিত্র : [illegible]

সত্যিই
দেখে-দেখে অবাক

অধিক শক্তিশালী
সুপার 777

নতুন অধিক শক্তিশালী সুপার ৭৭৭ ডিটারজেণ্ট বার

এর শ্রেষ্ঠতার দাবি কেবল জোরদারই নয়, সেই দাবির অঙ্গীকারও বর্ণে-বর্ণে পালন করে।

এখন নতুন সুপার ৭৭৭ ডিটারজেণ্ট বারে আমি পাচ্ছি সবচেয়ে অধিক সাদা কাচা। এর ডিটারজেণ্ট ফর্মূলা আগের থেকেও ভাল হওয়ার দরুন. আগের চেয়ে অধিক ফেনা হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল চলে। এ সবের জন্যেই তো, এটা অন্য সব ডিটারজেণ্ট বার বা সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল।

ব্যবহার করে দেখুন . আপনিও দেখে-দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন।

Shilpi DM 2/83 Ban.

সিনেমা টিকিটের ব্যাপক কালোবাজারির সব হালচালই পুলিশ জানে

সৈয়দ আসরার আহমদ

সিনেমা টিকিটের কালোবাজারি কলকাতা ও মফস্বল শহরগুলোতে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে হিন্দি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ক্ষেত্রে এই অসাধু ব্যবসা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

সিনেমা টিকিটের কালোবাজারি কেন হচ্ছে? এই প্রশ্নের প্রথম ও সহজ উত্তর হচ্ছে, দর্শকরা কেনেন বলে।

এই কথা বলে সব দোষ দর্শকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তো চলবে না। দর্শকরা ন্যায্য মূল্যে টিকিট না পেলে কী করবে?

ইদানীং যে দৃশ্যটা সকলের চোখে পড়ে তা হচ্ছে : সিনেমা হলের গেটের মাথায় 'হাউস ফুল' এর বোরড ঝুলছে। বুকিং কাউনটারের ঝাঁপ বন্ধ। বাইরে চার পাঁচজন ছেলে বেশি দামে টিকিট বিক্রি করছে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এরা এত টিকিট পেল কোথা থেকে?

হ্যাঁ, বকস অফিসের কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া আর কোথাও এত টিকিট একসংগে হাতে পাওয়ার কথা নয়।

কলকাতার প্রায় প্রতিটি সিনেমা হলের বকস অফিসের কর্মীদের সংগে সংশ্লিষ্ট কালোবাজারিদের যোগাযোগ আছে। বকস অফিসের কর্মীরা কমিশনের ভিত্তিতে কালোবাজারিদের টিকিট দেয়। এই কমিশন নির্ভর করে চলচ্চিত্রের ওপর। যেমন 'সুপার হিট' ছবির জন্যে প্রত্যেক শ্রেণীর টিকিট পিছু ১ বা ততোধিক টাকা কমিশন দিতে হয়। মোটামুটি 'হিট' ছবির জন্যে ৫০ পয়সা টিকিট পিছু কমিশন লাগে। কখনও কখনও ২৫ পয়সা করে কমিশন দিতে হয়।

সিনেমা হলগুলিতে ছবি মুক্তির সাধারণত তিন দিন আগে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়। কলকাতার বড় বড় সিনেমা হলগুলোয় দর্শক আসন সংখ্যা গড়ে ন'শো। সামনের সিটগুলো ছাড়া তিন দিনের তিনটে করে শো'র সব টিকিট বিক্রি শুরু হয়। অর্থাৎ সর্ব মোট ৮,১০০টি টিকিট বিক্রির জন্য রাখা থাকে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কোন চলচ্চিত্র মুক্তির আগেই অগ্রিম টিকিট কেনার জন্য যতই ভিড় হোক পাঁচশর বেশি লোক সাধারণত থাকে না। যদিও বলা হয়ে থাকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারটি করে টিকিট দেওয়া হবে তথাপি এই পাঁচশ লোকের সবাই টিকিট পায় না। যেহেতু বকস অফিসের কর্মীরা অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে টিকিট দিতে বিলম্ব করে থাকে। ওদিকে একের পর এক শ্রেণীর টিকিট ফুল হতে থাকে। মোট টিকিটের ত্রিরিশ শতাংশ টিকিট সাধারণ মানুষ পায় না। যেখানে চারটি করে টিকিট দিলেও প্রায় দু হাজার লোক সকলেই টিকিট পেত এবং কিছু বাড়তি টিকিট থেকে যেত।

অগ্রিম টিকিট বিক্রির আগের দিন বুকিং ক্লার্করা কালোবাজারিদের কাছ থেকে স্থিরীকৃত কমিশন সহ সব টাকা হস্তগত করে নেয় এবং তাদের নির্ধারিত টিকিট সযত্নে সরিয়ে রাখে। সেজন্য টিকিট-কালোবাজারির সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কেউই টিকিট কেনার লাইনে দাঁড়ায় না। বরং দেখা যায় পুলিশের সেপাইদের লাইন ম্যানেজ করতে ওরা সাহায্য করে থাকে। আরও বাড়তি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে, সেপাইদের জন্য চা, সিগারেট বা ঠান্ডা পানীয়র বোতল সিনেমা হলের মালিককে সরবরাহ করতে হচ্ছে না, সব চলে আসছে টিকিট কালোবাজারির দলের নেতার অংগুলি নির্দেশে।

বলা বাহুল্য বুকিং খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। মোট টিকিটের প্রায় ৬০ শতাংশ টিকিটই কালোবাজারিরা পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট ৪০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ দর্শকরা পায়। বাকি ১০ শতাংশ পরিবেশক, সিনেমা হলের মালিক, ম্যানেজার ও কর্মীদের মধ্যে বিলি বণ্টন হয়।

কালোবাজারিদের একজন দল নেতা থাকে। সে টাকা বিনিয়োগ করে। কাবুলিওয়ালা বা যে কোন সুদের কারবারির কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সে এই লাভজনক ব্যবসা চালায়। তার অধীনে সাত আট জন ছেলে কাজ করে। এই ছেলেরা টিকিট বিক্রির জন্য শো পিছু ১০ টাকা করে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে কাউকে পুলিশ ধরলে দলনেতা যাবতীয় খরচে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

মধ্য কলকাতায় কোন একটি সিনেমা হলের টিকিটের কালোবাজারির নেতা স্বীকার করেছে, স্থানীয় থানার কনসটেবল এবং অফিসারদের সংগে তার মাসিক বরাদ্দ আছে। কোন কোন সমাজ সেবীও স্থানীয় ভিত্তিতে একথায় সায় দিয়েছেন।

বাংলা ছবি হতাশার ছবি, তাই.....

দেখা যাচ্ছে টিকিটের কালোবাজারি ব্যবসা চালাতে অসাধু ব্যবসায়ীটি সুদের দায় ঘাড়ে নিয়ে বকস অফিসের কর্মীদের কমিশন দিচ্ছে। টিকিট বিক্রি করার আগে কোন কোন পুলিশকেও 'ফিট' করাতে খরচ করছে। সে সংগে তার নিযুক্ত কর্মীদের জন্য ব্যয় হচ্ছে। ফলে সব ব্যয় সুদে আসলে তুলতে তাকে মিডিল স্টলের টিকিট অর্থাৎ ২.৮৫ টাকার টিকিট ৬ থেকে ৮ টাকায় বিক্রি করতেই হয়। ঠিক এভাবে রিয়ার বা ব্যাক স্টলের ৪.৬৫ টাকার টিকিট ১০ থেকে ১৫ টাকায়। ব্যালকনি অর্থাৎ ৫.৬০ টাকার টিকিট ১২ থেকে ১৮ টাকায় এবং ড্রেস সারকেলের ৭.৭০ টাকার টিকিট ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি না করলে চলবে কী ভাবে?

পুলিশের নাকের ডগাতেই কালোবাজারিরা নির্বিঘ্নে টিকিট বেশি দামে বিক্রি করছে আর সাধারণ দর্শক নির্বিকার হয়ে তাই কিনছেন।

এবার ফ্রনট স্টলের কথায় আসা যাক। হ্যাঁ, এই স্টলের টিকিট বিক্রি করে লাভ একটু বেশি হয়। অধিকাংশ সিনেমা হলে টিকিটে কালোবাজারিরা এই টিকিট পিছু ২ পয়সা করে কমিশন দেয়। অর্থা ১.২৫ টাকার টিকিট ১.৫০ টাকা কিনে তা চড়া দামে বিক্রি করে উল্লেখ্য যে ফ্রনট স্টলের টিকি মিডল স্টল ফুল না হলেও ২ টাকা ২.৫০ টাকায় বিক্রি হয়ে যায় স্টলগুলো ফুল হলে এর দাম আর বেড়ে যায়। কেননা গরিব দর্শক বেশি দাম দিয়ে সিনেমা দেখতে পা না। ফলে এই টিকিটই তারা কেনে

প্রসংগত বলা দরকার যে কল কাতার কয়েকটি সিনেমা হলে যেগুলোতে বাইরে কালোবাজারিদে কাছে টিকিট পাওয়া যায় না সে হলগুলোর কর্মীরা একজোট হ হলের ভেতরে নিজেরাই টিকিটে কালোবাজারি করে। এরা পুলিশে চোখে ধুলো দিয়ে টিকিটের কালো বাজারি চালাচ্ছে। এইসব হল গুলোতে বেশিরভাগ ইংরিজি ছায় ছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, সিনেমা টিকিটে এইসব ধরনের কালোবাজা সম্পর্কে কলকাতা পুলিশ অত ওয়াকিবহাল অথচ তারা এ ব্যাপারে নির্বিকার। পুলিশ চাইলে এই কালোবাজারি একেবারে ব করতে পারে। ☐

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য র

ধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা—৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি

২৭ নং ঝামাপুকুর লেন

নির্মলকুমার রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত, তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুরে বাস করতেন, তখন অসুস্থ বিজয়কৃষ্ণকে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন হয়। ঠাকুরের সংগে বিজয়কৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং প্রথমজীবনে ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের অনুসরণে বিজয়কৃষ্ণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যান্য স্থানে ঠাকুরের সংগে মিলিত হতেন। তাই অসুস্থতার দরুন কিছুদিন বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে যেতে না পারায় ঠাকুর তাঁকে দেখার জন্য নিজেই বিজয়কৃষ্ণের বাড়িতে এসেছিলেন।

শ্রীম দর্শন গ্রন্থগুলির কয়েক স্থানে কথামৃত প্রণেতা মাস্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি:

'এই ২৭ নং ঝামাপুকুর লেন। এখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন। তাঁকে দেখতে এসেছিলেন ঠাকুর একদিন। অনেকদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান নাই, আর, একটু অসুস্থ ছিলেন, তাই।'

(শ্রীম দর্শন, দশম ভাগ-চতুর্থ অধ্যায়)

'আরো কিছু অগ্রসর হইয়া ডানহাতের ২৭নং বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, এখানেও এসেছিলেন ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখতে। ইহা একটি ছোট দোতলা বাড়ী। গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল এখানে ছিলেন।'

(শ্রীম দর্শন, তৃতীয় ভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়)

'২৭নং ঝামাপুকুর লেন। এখানে বিজয় গোস্বামীকে দেখিতে আসিয়া ছিলেন ঠাকুর।'

(শ্রীম দর্শন সপ্তম ভাগ প্রথম অধ্যায়)

এখানেই ঐ লেনে ২৭ নম্বর বাড়ীতে মেছুয়াবাজার যেতে বাঁ হাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন। তাঁর অসুখ হয়। তাঁকে দেখতে এই বাড়ীতে এসেছিলেন।'

(শ্রীম দর্শন পঞ্চদশ ভাগ দ্বাবিংশ অধ্যায়)

অসুস্থ বিজয়কৃষ্ণকে দেখার জন্য ঠাকুর যে বাড়িতে শুভাগমন করেছিলেন, তার ঠিকানা : ২৭ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

পথ নির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণিতে অবস্থিত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির অপর প্রান্তে পূর্ব দিকে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই বামদিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আর ডানদিকে ঝামাপুকুর লেন। এই রাস্তায় ঢুকে সামান্য একটু এগোলেই বাঁদিকে রাস্তার ওপরই এই ২৭ নং বাড়ি। বাড়িটি দোতলা, কিন্তু খুব পুরনো। বাড়ির সামনে ডানদিকের প্রবেশপথে ঢুকলেই ছোট একটি উঠোন, উঠোনের বামদিকে একটি ছোট পূজোর দালান, এই দালানে বসেই নাকি বিজয়কৃষ্ণের সংগে ঠাকুর কথাবার্তা বলেছিলেন। এসংবাদ জানা যায় এই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দাদের কাছ থেকে যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছে একথা শুনেছিলেন। বাড়িটি অবশ্য বিজয়কৃষ্ণের নিজস্ব ছিল না। বাড়ির মালিক ছিলেন প্রয়াত হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর বংশধরগণই এখন এ বাড়িতে বাস করেন। শ্রীম দর্শন, প্রথম ভাগের দ্বাদশ অধ্যায়ের একস্থানে উল্লেখ আছে যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিলেন।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ 'ব্রাহ্মধর্ম' ত্যাগ করেন এবং ঠাকুরের নির্দেশে বৈষ্ণবধর্মের সাধনায় ব্রতী হয়ে আধ্যাত্মিকতার চরমশীর্ষে উন্নীত হন।

আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

রাজধানীর বাঙালিরা

দিব্যজ্যোতি বসু

রাজধানী দিললির অ্যাসফলট জংগলে রীতিমত সবুজের ভিড়। কস্তরবা গান্ধী মারগ বা রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অন্য যে কোন রাস্তায় 'সূর্যকিরণ' বা ওই ধরনের যে কোন মালটিস্টোরিড বিলডিংয়ের একেবারে মাথার ওপর থেকে দিললি শহরের দিকে পাখির নজরে চোখ বুলালে দেখা যায় ইট-কাঠ পাথরের সার সার ইমারতের পাশাপাশি কেমন যেন একটা আরামদায়ক সবুজের ঘন গালচে পাতা রয়েছে। এবং এই ইট-পাথর বা ঘন সবুজ প্রত্যেকেই যে যার নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনরকম কোন অগোছালো ভাব নেই। আর শুধু ওপর থেকেই বা কেন, দিললির মসৃণ রাজপথ ধরে পায়ে হেঁটে চলার অভিজ্ঞতাও চোখকে কোনরকম কোন অবিন্যস্ততার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় না। বিশেষ করে দিললির রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট, বাজার-হাটের পরিপাটিভাবটা কলকাতার লোকেদের রীতিমত লজ্জায় ফেলে। কলকাতা শহরের ময়লা ছাই ছাই রঙ এখানে কলুষমুক্ত সবুজ আর ধূপছায়ায় মেশামেশি। কলকাতা শহরের জ্যাম-যন্ত্রণা এখানে খবরের কাগজের শরীর বেয়ে যতটুকু পৌঁছয় ততটুকুই। লোডশেডিং একেবারে অপরিচিত না হলেও দেখা দেয় কালেভদ্রে। কলকাতার লোকেরা এখানকার রাস্তাঘাটে গর্ত বা খোঁড়াখুড়ি না দেখে আশ্চর্য হয়ে পড়েন, আশ্চর্য হন রাস্তাঘাটে ছেঁড়াফাটা ময়লা পোশাক পরা ভিখিরি, গরু-মোষের খাটাল কিংবা বেওয়ারিশ পথের কুকুর না দেখতে পেয়ে। কলকাতার লোকেদের এ সমস্ত প্রতিদিনের চোখে দেখা অভ্যাস দিললিতে এসে রীতিমত থমকে দাঁড়ায়।

প্রধানত বাঙালিদের শহর কলকাতা থেকে এসে দিললির বাঙালিদের জীবনযাপনের চেহারাটা লক্ষ্য করতে গেলেও কলকাতার অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। দিললির মেটরোপলিশ চরিত্রের মধ্যে বাঙালিদের প্রতিদিনের চলাফেরা, ওঠা-বসাকে ঠিক আলাদা করে চিহ্নিত করা একটু কষ্টসাধ্য। সেখানে এক জন পাঞ্জাবী, সিন্ধি বা অন্যান্য ভাষাভাষীদের সংগে বাঙালিদের তফাৎ সামান্যই চোখে পড়ে। রাজধানীর ৬৪ লক্ষ লোকের মুখের বুলি প্রধানত হিন্দি আর ইংরেজির ওপরই নির্ভর করে। যে যার নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পান তার নিজস্ব ভাষাভাষী লোকজনের সংগে কথায়-বার্তায়। রাজধানীর বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ মাত্র আড়াই লক্ষর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য দিললিতে বাঙালি ঠিক কতজন আছেন এর সঠিক সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত আছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতে 'দিললিতে বাঙালিদের সংখ্যা এখন প্রায় তিন লক্ষর মত' কিন্তু দিললির অন্যতম পুরনো বাসিন্দা সেন পরিবারের লোকেদের মতে দিললির বাঙালি মেরেকেটে আড়াই লক্ষ হবে। তার বেশি কিছুতেই নয়। ১৯৮১র আদমসুমারিতে যেহেতু নির্দিষ্টভাবে বাঙালিদের সংখ্যা এত, বা পাঞ্জাবীদের সংখ্যা তত এরকম কোন প্রাঞ্জল হিসেব দেখান নেই, তাই সংখ্যাটা ওই আড়াই থেকে তিন লক্ষর মাঝামাঝিই স্থির রাখতে হয়। সেই দিক থেকে বিচার করলে রাজধানীর মোট বসবাসকারী ৬৪ লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালিরা একটা মাত্র কোণ ঘেঁষে রয়েছে। কিন্তু কসমোপলিটন চরিত্রের জন্য হিসেব করে দেখা যায় দিললিতে বাঙালিদের তৃতীয় ভাষাভাষী শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হিন্দি ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা এখানে ২১ থেকে ২২ লক্ষ; আর পাঞ্জাবীরা আছেন ১৫ থেকে ১৬ লক্ষর মত। তবে লোকসংখ্যার বিচারে বাঙালিদের অবস্থিতি চতুর্থ স্থানে। প্রথম স্থানটি দখল করে আছেন পাঞ্জাবীরা (১৫ থেকে ১৬ লক্ষ)। দ্বিতীয় স্থানে আছেন মারোয়াড়ি এবং বাঙালিদের ঠিক আগে তৃতীয় স্থানে আছেন সিন্ধিরা (৫ থেকে ৬ লক্ষ)। জনসংখ্যার হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে দেখা যায় যে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা যে হারে রাজধানীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন খুব শীগগিরই তারা বাঙালিদের চতুর্থ স্থান থেকে ঠেলে পঞ্চম স্থানে নামিয়ে দিলেও দিতে পারেন।

অথচ একটা সময় ছিল যখন লোকসংখ্যার বিচারে দিললিতে বাঙালিরাই ছিল শীর্ষস্থানে। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকারের হুকুমে নতুন ভাইসরয় হারডিঞ্জ সাহেবের তদারকিতে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল দিললিতে। কলকাতার চেয়ে দিললিতে রাজধানী পত্তন করা হলে সুবিধা অনেক। সমস্ত দেশের ওপর নজর রাখা দিললি থেকেই সহজ হবে। তাছাড়া মুঘল শাসকদের প্রতাপপ্রতিপত্তির ব্যাপারটাও হয়ত মনে মনে কাজ করেছিল। অতএব 'দিললি চলো।' ওই সময় কলকাতায় যারা বৃটিশ সরকারের সংগে কর্মসূত্রে জড়িয়ে ছিলেন তারাও বাধ্য হলেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে দিললি চলে আসতে। উচ্চপদস্থ বহু কর্মচারী তাদের আত্মীয় পরিজনদের সংগে করে স্থায়ীভাবে এসে আস্তানা গাড়লেন রাজধানী দিললিতে। এই সরকারি চাকরির ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা কলকাতা বা পশ্চিমবংগ থেকে আরও বহু লোককে দিললি নিয়ে এলেন বৃটিশ সরকারের অধীনে কাজ করবার জন্য। রাজধানী দিললি ক্রমশই বাঙলি-অধ্যুষিত হয়ে এল। উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাসীন অবস্থায় তখন বাঙালিদেরই প্রতিপত্তি। এই ক্ষমতা, এই প্রতিপত্তি স্বাধীনতা পর্যন্ত একরকম প্রায় অটুট ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই অবস্থা একটু একটু করে বদলাতে লাগল। সরকারি উচ্চপদে আসীন বহু বাঙালি মুসলমান ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগি হওয়ায় পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। রাজধানী দিললিতে প্রচুর পাঞ্জাবী এসে বসবাস করা শুরু করলেন। কেউ এলেন সরকারি কর্মসূত্রে, কেউ এলেন রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র থেকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবেন বলে।

ফলে আস্তে আস্তে বাঙালিদের যে একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল তা খর্ব হল। সরকারি উচ্চপদেও ক্রমশই অবাঙালিদের ভিড় বাড়তে লাগল। যত বেশি পাঞ্জাবী বা অন্য ভাষাভাষী লোক দিল্লিতে এসে আস্তানা গাড়তে শুরু করলেন, বাঙালিরা ততই প্রতিপত্তির আসন থেকে হটে আসতে লাগলেন। অবাঙালিদের ভিড়ে বাঙালিদের ক্রমশই হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে আরও একটা ব্যাপার উল্লেখ করা যায়। তা হল দিল্লির আশেপাশে শিল্প প্রসার। বৃটিশ সরকার রাজধানী দিল্লির বুকে শিল্প প্রসারের ব্যাপারে ততটা গুরুত্ব দিতে চাননি। তবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে দিল্লির আশেপাশে শিল্প বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। এই শিল্পপ্রসারের সংগে সংগেই উচ্চ পদস্থ বা সাধারণ, বিভিন্ন ধরনের কর্মী ও শিল্পোৎসাহী মানুষজন দিল্লিতে এসে ভিড় করেছে। এই ভিড়ের ভিতর কিন্তু বাঙালির সংখ্যা নিতান্তই কম। স্বাভাবিকভাবেই অবাঙালির ভিড় দিল্লির জনসংখ্যার চেহারাটা আমূল বদলে দিয়েছে। ইদানীংকালেও দিল্লি শহরের উপকণ্ঠে ফরিদাবাদ থেকে গাজিয়াবাদ অঞ্চলে বিভিন্ন ইনডাসট্রি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা থেকে দিল্লির জনসংখ্যায় বাঙালীদের উপস্থিতি সম্পর্কে একটা আশংকা রয়ে যায়।

তবে এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে কেউ যদি ভেবে বসেন যে দিল্লি থেকে বাঙালিরা ক্রমশ অন্যত্র সরে যাচ্ছেন, তা হলে অত্যন্ত ভুল হবে। স্বাধীনতার আগে বৃটিশ রাজত্বকালে রাজধানীতে বাঙালিরা যতখানি প্রভাবশালী ছিলেন, পরবর্তী কালে তা বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথা যেমন সত্যি, ইদানীংকালে বাঙালিরা যে খুব বেশি সংখ্যায় দিল্লিতে এসে আবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইছেন একথাও তেমনিই সত্যি।

এইসব বাঙালি পরিবার রাজধানীতে কেমনভাবে আছেন কেনই বা তারা আবার নতুন করে দিল্লিতে বাসা বাঁধতে চাইছেন - আর কীভাবেই বা তারা এখানকার পাঁচমেশালী পরিবেশের সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন - একথা পশ্চিমবংগের বাঙালিদেরতো বটেই, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিদের কাছেও চরম কৌতূহলের বিষয়। সম্প্রতি দিল্লি ঘুরতে গিয়ে রাজধানীর বাঙালি সমাজ, বিভিন্ন বাঙালি উপনিবেশ বা বাঙালি সংস্কৃতির প্রবাসী অবয়বের সংগে পরিচয় হল। বিভিন্ন বাঙালি পরিবারের সংগে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে এল ওপরের ওইসব জিজ্ঞাসার উত্তর।

নয়া দিল্লির দক্ষিণপ্রান্তে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল চিত্তরঞ্জন পারক। একসংগে এত বাঙালি পরিবারের ঘন সন্নিবেশ দিল্লিতে আর কোথাও নেই। সেদিক থেকে ধরতে গেলে একা চিত্তরঞ্জন পারককেই দিল্লির বাঙালি সমাজের প্রতিভূ হিসেবে ধরা যায়। অবশ্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু বাঙালি পরিবার রয়েছে কাশ্মীরী গেট থেকে অভিজাত এলাকা গ্রেটার কৈলাস পর্যন্ত। ছোটখাট বাঙালি কলোনি গড়ে উঠেছে লক্ষ্মীনগর, মডেল টাউন আর ইন্দ্রপুরীতেও। তবে চিত্তরঞ্জন পারকের সংগে অন্যান্য জায়গার খানিকটা তফাৎ রয়ে গেছে। নয়া দিল্লির দক্ষিণ প্রান্তে একমাত্র এই একটি এলাকাই রয়েছে যেখানে রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় যেদিকেই তাকান যায় নিশ্চিত ভাবে হয় ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র নয় ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, মুখার্জিদের নেমপ্লেট চোখে পড়ে। পুঁটি মৌরলা, ট্যাংরা মাছ কিংবা কাঁচা লংকা, পুঁইশাক বা ধনেপাতা কিনবার জন্যও সমস্ত দিল্লি শহরের একমাত্র ভরসা চিত্তরঞ্জন পারকের বাজার।

১৯৬৯ সালে চিত্তরঞ্জন পারক পত্তন হওয়ার আগে কিন্তু এই এলাকা ছিল সম্পূর্ণ খানা, খন্দ, ঝোপ ঝাড়, কাঁটায় ভরা বিস্তীর্ণ পাথুরে জমি। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয় পূর্ববংগ ছেড়ে আসা দিল্লির বাঙালিরা পাবেন এই জমি। প্রথমে ২২০০ প্লট বিক্রি করা হল ২০ টাকা প্রতি বর্গ গজ হিসেবে। সরকারের সংগে চুক্তি হল ৯০ বছরের লিজের মেয়াদ অনুসারে এই জমির টাকা পাঁচ বছরের মধ্যে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য এক বছর পরেই জমির দাম সরকার বেঁধে দিলেন ৩০ টাকা প্রতি বর্গগজ হিসেবে। সেই দাম আজ ১৪ বছরে বাড়তে বাড়তে কোথায় যে এসে দাঁড়িয়েছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কেননা সরকার থেকে জমি বিলি শেষ। এখন ব্যক্তিগত মালিকানায় কেউ কেউ নিজেদের স্বত্ব নিজেদের পছন্দমত দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এই বিক্রি ব্যবস্থার ফাঁক গলে যে দিল্লির এই একমাত্র বাঙালি উপনিবেশ রীতিমত নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছেন সে কথা অনেকেই বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। এই অভিযোগ চিত্তরঞ্জন পারকের বাসিন্দাদের অনেকেরই।

চিত্তরঞ্জন পারকের অন্যতম আদি বাসিন্দা শ্রী সমর সরকার নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলতে গিয়ে এই আশংকার কথাও তুলে ধরলেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় সমরবাবু পা রেখেছিলেন রাজধানীর মাটিতে। সহায়সম্বলহীন সমরবাবুকে মদত দেবার মত কেউ ছিল না। নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে দিললির মত জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এদিক ওদিক ঘুরে ১৯৫০ সালে ফিলিপস কোম পানিতে একটা সামান্য মাইনের চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। তারপর আর পিছিয়ে তাকাননি। আস্তে আস্তেচাকরিতে পদোন্নতি, বিয়ে, পুত্র কন্যা লাভ সবই হয়েছে। রাজধানী দিললি তার সাক্ষী। এ সবের পরও যে পাওনাকে সমরবাবু সবচেয়ে বড় পাওনা বলে মনে করেন তা হল রাজধানী দিললির এক প্রান্তে একটা ছোট্ট মনের মত বাড়ি। সমববাবুর কথায় 'চিত্তরঞ্জন পাবকে সমস্ত পূববাংলাব বাঙালিদের জমি দেওয়া হবে শুনে কপাল ঠুকে এগিয়ে এসেছিলাম। জমি রেজিসট্রেশন, প্ল্যান স্যাংশন ইত্যাদি ইত্যাদি পেরিয়ে একটা ছোট্ট বাড়িও কবে ফেললাম। চিত্তবঞ্জন পাবকে বাড়ি কবে ভেবেছিলাম যে যাক্ বাঙালি পাড়ার মধ্যে বাঙালি প্রতিবেশীদের সংগে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। এখানে এখন অনেক খালি জমি পড়ে আছে। সেগুলি অবশ্য অনেক দিনই বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু সেই জমির মালিকবা অনেকেই এখন আর চিত্তরঞ্জন প্যরকে বাড়ি করায় আগ্রহী নয়। বদলে তারা চাইছেন উঁচু দামে জমি বিক্রি করে মুনাফা তুলতে। ওবা জমির দাম যে দরে হাঁক পাড়ছেন সেখানে সাধাবণ বাঙালিদেব পৌছান বেশ মুস্কিল। ফলে এই সুযোগে মারোয়ারিরা প্রবেশ করছেন চিত্তরঞ্জন পারকে। অনেকেই দোতলা বাড়ি করে এক তলাটা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। জমির মত বাড়িভাড়ার জনাও এমন দর এরা চাইছেন যে, সেখানেও ওই মারোয়াড়িরা ছাড়া আর কারো পক্ষেই সাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আস্তে আস্তে অবাঙালিরাও এই বাঙালি উপনিবেশে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। বাঙালিদের নিজস্ব এলাকা বলে এই চিত্তরঞ্জন পারকের যে পরিচিতি ছিল, অবস্থা এরকম চলতে থাকলে তা খুব তাড়াতাড়িই মুছে যাবে।

অবশ্য অবাঙালিরা আসাতে চিত্তরঞ্জন পারকের চরিত্র বদলে যাবে, একথা অনেকে মানতে রাজি নয়। তাঁদের বক্তব্য অবাঙালিরা আসলে কি এমন হেরফের হবে? এখানে বাঙালিরা একসংগে আছেন কলোনি করে এটা ঠিক কথা, কিন্তু কোন কসমোপলিটন সিটিতে তো এক জায়গায় শুধু বাঙালিরাই থাকবেন, এক জায়গায় শুধু পাঞ্জাবীরাই থাকবেন, এরকম বিধি বদ্ধ কোন নিয়ম চলতে পারেনা। আর সত্যি কথা বলতে কি চিত্তরঞ্জন পারকে বাঙালি কলোনিতে যারা রয়েছেন তারা নিজেরা কতটা বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে পারছেন? এখানে যারা থাকেন তাদের শতকরা ৬০ জনের ছেলেমেয়েরাই পড়াশুনা করে ইংলিশ মিডিয়ম কনভেনট স্কুলে। শতকরা ১০ জনের বাচ্চারা যায় পাবলিক স্কুলে। বাকি ৩০ ভাগ পড়াশুনা করে একটা মিশ্র মাধ্যমে। যেখানে একটামাত্র সাবজেকট হিসেবে বাংলা পড়ান হয়, বাকি ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাবজেকটগুলো ইংরেজিতেই পড়ান হয়। ফলে দেখা যায় যে এ বাঙালি পরিবেশের মধ্যে থেকেও শতকরা ৬০ জন বাংলা পড়তেই জানেনা, বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোনের সংগে কথা বলার মত বলতে পারে। শতকরা ১০ জনের অবস্থা আরও সংগীন, তারা পড়া-লেখা তো দূরের কথা, বাংলা কথা বলতে গিয়েও আঁকড়ে ধরতে হয় ইংরেজি, হিন্দি অথবা পাঞ্জাবী ভাষাকে। বাকি ৩০ ভাগ বাংলা শিখছে ঠিকই, কিন্তু যতটা বাঙলা শিখছে তার চাইতে অনেক বেশি শিখছে ইংরেজি আর হিন্দি। কাজেই এখন হয়ত ২২০০ প্লট জুড়ে শুধু বাঙালিরাই বাড়ি করল। কিন্তু তাদের উত্তরসূরীরা যখন এই বাড়িগুলির মালিক হয়ে বসবেন, তখন তাদের মধ্যে ঠিক কতজন পাড়া পড়শীর সংগে বাংলায় কথা-বার্তা চালাতে পারবেন? এক বাড়ির গৃহিণী আর এক বাড়িব গৃহিণীকে বলতে পারবেন, 'আজ, কী রান্না করেছো, ভাই?'

প্রকৃত পক্ষেই এই ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মত। সমস্ত দিললি শহরে বাঙালি পরিচালিত যে কটা স্কুল আছে তাদের মধ্যে মিডিয়াম হিসেবে বাঙলা ব্যবহার চারটে মাত্র স্কুলে। মতিবাগের বিধানচন্দ্র উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাশ্মীর গেট বেঙ্গলি হাই স্কুল, বিনয়নগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাইসনয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া আরও চারটে স্কুল রয়েছে যেখানে বাংলা নামে একটা সাবজেকট রয়েছে। অথচ অন্যান্য সাবজেকট পড়ান হয় ইংরিজিতেই। সংগে সংগে হিন্দিতেও। এগুলি হল লোধি স্ট্রিটে শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যালয়, গোলমার্কেটের ইউনিয়ন অ্যাকাদেমি, লেডি আরউইন স্কুল আর নিউ রাজেন্দ্র-নগর বিদ্যাভবন।

চিত্তরঞ্জন পারকের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলির মত পরিবেশ যথাসম্ভব সুন্দর রাখার জন্য বিভিন্ন কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিজেদের মধ্যে সেধরনের কোন র‍্যাপোরট গড়ে না ওঠার ফলে কোন কমিটিই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই র‍্যাপোরট বা সংযোগ সেভাবে গড়ে না ওঠার কারণ হিসেবে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা যে ব্যাপারটাকে দায়ী করেন তা হল অর্থনৈতিক বৈষম্য। বিভিন্ন ইনকাম গ্রুপের লোকেদের চলা-চলতি, জীবনধারণের কলাকৌশলে বিস্তর ফারাক। বেশি অংকের মাইনের চাকুরিজীবী লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম আয়ের লোকেদের সংগে খানিকটা পার্থক্য রেখে চলতে চান। ফলে এই অঞ্চলের সংহতির মধ্যে বারেবারেই একটা চিড় ধরেছে। সেই সুযোগে কাশ্মীরী গেট, হাউজ খাস, গোলমারকেট ও অন্যান্য অঞ্চলেব বাঙালিরা চিত্তরঞ্জন পারকের অধিবাসীদের সমালোচনা শুরু করেছেন। তাঁদেব অভিযোগ 'দিললিতে এসে কেউ যদি বাঙালিদের সম্পর্কে উৎসাহ দেখান তবে তাদেব বলা হয় চিত্তরঞ্জন পারকে গিয়ে খোঁজখবর করতে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন পারকের বাসিন্দারা আর কতদিন ধরে ওই অঞ্চলে একজোট হয়েছেন তার অনেক আগে থেকেই দিললির বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে বাঙালি-দের বিভিন্ন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান। বেংগলি অ্যাসোসিয়েশন বা বেংগলি ক্লাবের মত বাঙালি সংগঠন অনেক-দিন আগে থাকতেই বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে রাজধানীর বুকে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে জাগিয়ে রেখেছিল। নতুন করে চিত্তরঞ্জন পারকের অধিবাসীরা আর কতটুকু কি সংস্কৃতির নজির রেখেছেন?

রাজধানী দিললিতে বাঙালি সংস্কৃতির বীজ ছড়ানো হয়েছিল বহু আগে থেকেই। সেই বৃটিশের রাজত্বকালে, তখনও নয়া দিললি গড়ে ওঠেনি, দিললিতে স্থায়ীভাবে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন-'সেন-পরিবার।' দিললির বাঙালিদের কাছে 'সেন পরিবার' আজও তাই একমেবাদ্বিতীয়ম। সেন পরিবার বলতে বিশদ কোন পরিচিতির প্রয়োজন নেই। দিললিতে প্রথম বাঙালি পরিবার বলতে এই 'সেন পরিবারের' নামই উল্লেখ করতে হয়। এই 'সেন পরিবার'কেই তাই রাজধানীতে বাঙালি সংস্কৃতির জন্মদাতা বলে মনে করা হয়। অবশ্য কারও একার পক্ষে তো সম্ভব হয় না কোন সংস্কৃতি বা তৎসংক্রান্ত সৃজনমূলক কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাই পরবর্তী সময়ে সেন পরিবারের সংগে অন্যান্য বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্গাপূজো, নাটক, জলসা, বাঙলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে রাজধানীতে বাঙালি সংস্কৃতির সূত্রপাত করলেন। সেই থেকে সমানে চলেছে। দিললিতে বাঙালী নাটকের দল আছে এখন ৩৩টা। তার মধ্যে শনিচক্র, নবোদয় গোষ্ঠী, বেংগলি অ্যাসোসিয়েশনের নাট্যদল বা নিউ দিললি কালীবাড়ির নাটকের দলের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নয়া দিললিতে এখন সর্বজনীন দুর্গাপূজোই হয় এখন ১০০র মত। আর সেইসব পূজো কলকাতার মত চোখ ধাঁধানো আলো, কান ফাটান মাইকের চিৎকার আর হুল্লোড় সর্বস্ব নয়। পূজোর চারদিন এখানে নিষ্ঠভরে আচার-অনুষ্ঠানের সংগে সংগে নাটক, গান বাজনা, সিনেমার মত অনাবিল আনন্দের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করা হয়। এই পূজো-পার্বণ ছাড়াও দিললির বাঙালিরা একসংগে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসেন দেশের আভ্যন্তরীণ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বোকাপড়া করতে। যেমন গত কয়েক বছর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের বন্যাবিধ্বস্ত আর্তদের ত্রাণের জন্য একযোগে এগিয়ে এসেছিলেন বেংগলি অ্যাসোসিয়েশন, চিত্তরঞ্জন পারকের সংস্কৃতি পরিষদ, মহিলা সমিতির মত অন্যান্য সংগঠনগুলিও। একই ভূমিকা পালন করেছিলেন এইসব ক্লাবগুলি পশ্চিমবংগের খরাত্রাণে সাহায্যের জন্যও। কখনও তারা নিজেরাই টিকিট বিক্রি করে নাটক করেছেন, কখনও বিখ্যাত বাঙালী চলচ্চিত্রকারদের ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। মোটের ওপর বাংলা সংস্কৃতির সংগে কসমোপলিশ দিললির যোগসূত্র বজায় রাখার ব্যাপারে দিললির বাঙালি ক্লাবগুলি প্রবল উৎসাহী। এই প্রসংগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব সংগঠন 'গীতাঞ্জলি'র নামও উল্লেখ করা যায়। একটা কথা বাঙালীদের সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে তিনজন বাঙালী এক জায়গায় হলে একটা কালীবাড়ি আর একটা নাটকের দল তারা গড়ে তুলবেনই। তাই আড়াই থেকে তিন লক্ষ বাঙালি যেখানে রয়েছেন সেখানে নাটকের দল আর কালীবাড়ি তো থাকবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে দিললির গোল মারকেটের কালী-বাড়ির জনপ্রিয়তা এত বেশি যে

পশ্চিমবঙ্গ বা অনান্য প্রদেশের মধ্যবিত্ত বাঙালিরা দিললি যাওয়ার প্রোগ্রাম করলেই প্রথমে কালী বাড়িতে এসে আশ্রয় নেবার কথা ভাবেন।

রাজধানী দিললিব গায়ে সাধারণত কোন বিশেষণের তকমা আঁটা হয় না। তবে যদি কেউ একে 'রাজনীতির শহব' আখ্যা দেন তবে কারও আপত্তিও হবে বলে মনে হয় না।

রাজধানীব রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজনীতি। আর এখানকাব এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায যে দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীব নাম প্রায় সবারই মুখে মুখে ঘোবে তাবা দুজনেই বাঙালি। একজন কেন্দ্রীয অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায, অন্য জন হলেন কেন্দ্রীয় বেলমন্ত্রী আবু ববকত গণি খান চৌধুরী। বাজধানীর রাজনৈতিক মহলে এদেব দুজনকে যথেষ্ট প্রভাবশালী বলেও মনে করা হয়। এঁরা ছাড়াও সবকারি উচ্চপদে বহু বাঙালি রয়েছেন রাস্ট্রপতি ভবনেব কথাই ধবা যাক। ভারতবর্ষের সর্বোত্তম পদাধিকারীব বাসস্থান এবং অফিস। সেই রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রী জ্ঞানী জৈল সিং-এব অনুপস্থিতিতে পুরো রাষ্ট্রপতি ভবনের দায়দায়িত্ব যাঁর ওপব বর্তায় তিনিও একজন বাঙালি। রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতেও অবশ্য রাষ্ট্রপতির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বা পরামর্শ দেবার দায়িত্বও রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাষ্ট্রপতি ভবনেব শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ঘরে বসে কথা বলতে বলতে দিললি সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা শুনছিলাম। ১৯৪৮ সালের আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করে'৪৯ সালে সরকারি চাকরিতে আসেন। ২০বছরেবওপর দিললিতে রয়েছেন অশোকবাবু। ওর কথায় '২০ বছর আগের দিললির সঙ্গে এখনকার দিললির সেরকম কোন তফাৎ চোখে পড়েনা। শুধু লোকজন আরও একটু বেড়েছে। আগে যারা চাইতেন যে চাকরি জীবন কোনরকমে দিললিতে কাটিয়ে ফিবে যাবেন ফের কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে তারা এখন বাধ্য হয়ে চিন্তার মোড় ঘুরাচ্ছেন। কেন না যে সুখ যে স্বাচ্ছন্দ্য তারা দিললিতে পেয়ে গেছেন, ভারতবর্ষের আর কোথাও গেলে তা মিলবে না। কলকাতার কথা তো প্রশ্নেই আসে না। ফলে তারা এখানে বাধ্য হয়ে সেটল করার কথা ভাবছেন।' দিললির বাঙালিদের সম্পর্কে যারা বলেন যে তারা বাজধানীতে ক্রমশই ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়ছেন, তাদের সঙ্গে অশোকবাবু একমত হতে পারেন না। তিনি বলেন, 'আমি একথা মানি না যে ১৯৪৭ সালের পর বাঙালিরা তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি কিছু খুইয়েছেন। বরং আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। আগে এখনকার মত কমপিটিশন ছিল না, এখন অনান্য জাতির লোকেদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি উচ্চপদে এখনও বহু বাঙালি আছেন। 'এখন দিললিতে সরকারি মহলে সেকরেটারি ডেপুটি সেকরেটারি বা সমপর্যায়ের প্রভাবশালী পদে অন্তত দশজন বাঙালি রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অতিরিক্ত একান্ত সচিব অর্জুন সেনগুপ্ত, প্ল্যানিং কমিশনের সেকরেটারি অনিল কুমার মজুমদার, মিহির চৌধুরী বা অনান্য দফতরের সেকরেটারি হিসেবে দিলীপ বিশ্বাস, বীরেন গঙ্গোপাধ্যায, প্রহ্লাদ কুমার বসু, সুবোধ কুমার ঘোষ, দয়াময় মুখারজি প্রমুখরা রয়েছেন।

রাজধানীতে শ্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বা অনান্য প্রভাবশালী সরকারি কর্মচাবীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও দিললির বেশির ভাগ বাঙালিদের ধারণা রাজধানীর বাজনৈতিক মহলে সেভাবে কোন 'বেঙ্গলি লবি' গড়ে ওঠেনি। ফলে দিললির বাঙালি বাসিন্দাদের অভিযোগ 'আমরা নিজেদের বক্তব্য ঠিকমত কার্যকর করতে পারব বা প্ল্যান অনুযায়ী কোন কাজ করতে গিয়ে সফল হবই, অন্তত সরকারি বা প্রভাবশালী মহলের মদতটুকু পাব, এরকম প্রতিশ্রুতি আমরা পাই না। এই বেঙ্গলি লবি গড়ে না ওঠার দরুন দিললিতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীরা ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছে।'

সত্যিসত্যিই দিললির ব্যবসা-বাণিজ্য মহলে বাঙালিদের খুঁজতে গেলে রীতিমত হতাশ হতে হয়। বাঙালিদের এই অনুপস্থিতির কারণ কি শুধুই 'বেঙ্গলি লবি' না গড়ে ওঠা? না অন্য কিছু? এ ব্যাপারে দিললির বাঙালি ব্যবসায়ী বিকাশ বিশ্বাস নিজস্ব অভিজ্ঞতার থেকে খানিকটা আলোকপাত করেছেন। রাজধানীতে হাতে গোনা যে কজন বাঙালি ব্যবসায়ী আছেন, তাদের মধ্যে বিকাশবাবুর নামই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত। বিকাশবাবু অবশ্য নিজের পরিচয় দেন একজন 'বিজনেস কনসালটানট' হিসেবে। জাপান, তাইওয়ান দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রী বিশ্বাস আয়রন ওর একসপোরট করেন। বিকাশবাবুর

বক্তব্য 'বাঙালি লবি না গড়ে ওঠায় এখানে ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালিরা কোন সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। এটা সত্যি কথাই। কেননা অন্য প্রভিনসের এক একটা লবি রাজধানীতে বেশ জাঁকিয়ে রয়েছে। তারা নিজেদের পরিচিত প্রভাবশালী লোকেদের সাহায্যে নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন। অন্তত পক্ষে দাবি করার সুযোগটুকু। রাজনীতির উচ্চ মহলে যোগাযোগ না রাখতে পারলে ব্যবসা করায় বিশেষ অসুবিধা। আমার তো মনে হয় অন্তত শতকরা ৯৬ ভাগ রাজনৈতিক মদত না পেলে ব্যবসা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বাঙালিদের মধ্যে তো বিজনেস অ্যাটিটিউড একেবারেই নেই। তাদের কাছে 'বিজনেসম্যান' এই শব্দটাই 'লেস রেপুটেবেল'। ফলে প্রথমত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই বাঙালীদের গড়ে উঠছেনা। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক মদত বা সাহায্য না পাওয়ায় বাঙালি সেভাবে রাজধানীতে ব্যবসা গুছিয়ে নিতে পারছেন না। আপনি চিত্তরঞ্জন পারক ঘুরে দেখুন অনেক বাঙালি ছোট ছোট দোকান করে বসেছে দেখতে পাবেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্মল স্কেল ইনডাসট্রি অবধিই বাঙালির দৌড়। এর বেশি যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কেননা সেই রিসোরসেস তাদের কাছে নেই। তবে সুখের কথা ইদানীং অনেক বাঙালি তরুণের মধ্যে 'বিজনেস প্রন্সিভিটি'টা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই আমার কাছে এসে পরামর্শ নিচ্ছেন 'বিকাশদা একটা কিছু উপায় বলুন তো, বিজনেসে নেমে পড়ি। এই মানসিকতার জোরে যদি কিছু হয়। এছাড়া অন্য কোন রাস্তা বাঙালি ব্যবসায়ীদের সামনে খোলা নেই।' দিললির রাস্তায় চলতে চলতে প্রায় জায়গাতেই দেখা যায় 'বেংগলি সুইটস' হোরডিং। কিন্তু এই ধরনের বেশির ভাগ দোকানের মালিকই কিন্তু অবাঙালি। আর বাংলাদেশের মিষ্টিও সেখানে বিক্রি হয় না, শোনপাপড়ি, লাড্ডু বা প্যাঁড়ার প্রদর্শনী সেখানে বেংগলি নামটাকে রীতিমত উপহাস করে। সাধারণত বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে মাছ আর ভাতের নাম করা হয়ে থাকে। কিন্তু দিললির বাজার খুঁজি ঘুরলে দেখা যায় চিত্তরঞ্জন পারক ছাড়া অন্য যেসব বাজারে মাছ বিক্রি হয় তার বেশির ভাগের মালিকানাই অবাঙালিদের হাতে। কাশ্মীরী গেট অঞ্চলের অধিবাসী অনিল রায় অত্যন্ত অবাক হয়ে যান যখন কয়েকবছর আগেকার অবস্থার সংগে এখনকার তুলনা করা হয়। অনিলবাবুর বক্তব্য 'বছর পাঁচ ছয় আগেও দেখতাম জমজমাট মাছের বাজার নিয়ে দিব্যি ব্যবসা জমিয়ে নিয়েছে তারাপদ, বলাইর দল। কিন্তু এখন ওদের আর সেভাবে দেখা যায় না। তারাপদর তো কোন খোঁজই নেই, আর যে বলাইয়ের দোকানে মাছ কেনার জন্য বাঙালিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ত সে এখন সেই মাছই বিক্রি করছে, কিন্তু কর্মচারী হিসেবে। নিজের দোকান বিক্রি করে দিয়েছে এক পাঞ্জাবীর কাছে। আর নিজে এখন সেই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর অধীনে কর্মচারী হয়ে বসেছে। এভাবে সব জায়গা থেকেই তারাপদ, বলাইরা হটে আসছে।'

চিত্তরঞ্জন পারক, কাশ্মীরী গেটে, গ্রেটার কৈলাশ বা দেশুনগর প্রভৃতি জায়গা ছাড়াও দিললিতে আরও এমন কিছু বাঙালি রয়েছেন যাদের ঠিকানা 'ঝুগি-ঝুপ্পি' যা পশ্চিমবাংলায় বস্তি হিসেবে পরিচিত। এদের বসতি সীমাপুরী জাহাংগীরপুরী অঞ্চলে। দিললির তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা এদের সংখ্যা প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাজারের মত হবে। এরা সংখ্যায় যত ভারী, বিত্তর দিক দিয়ে যে ততখানি নয় তা এদের বাসস্থান দেখেই আন্দাজ করা যায়। এদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই পেশা হল দৈনিক শ্রমিক বা সবজি আনাজ বিক্রেতা, রাজমিস্ত্রি, দর্জি ইত্যাদি ঐ ধরণের। অনেকেই ২০/২৫ গজ জমি পেয়েছেন সরকার থেকে। তার ওপর কোনরকম মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছেন। এখানে স্বামীদের সংগে সংগে স্ত্রীরাও নানান ভাবে সংসারের সাহায্যের জন্য উপার্জন করে থাকেন। কেউ বাবুদের বাড়িতে কাজ করে, কেউ ছোট খাট হোটেলে থালা বাসন মাজে। আবার কেউ কেউ অফিসে অফিসে টিফিন কেরিয়ার করে খাবার নিয়ে যায়। এদের সংগে কথা বলতে গিয়ে টের পেয়েছি দিললিতে বিত্তশালী বাঙালিদের সম্পর্কে এদের কোনরকম কোন উৎসাহ নেই। ওদের কাছে চিত্তরঞ্জন পারক, বা ওইসব এলাকার বাঙালীরা একজন পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, বা মারোয়াড়ির মত সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। পুজো-উৎসবের সময় যখন সিনেমা, নাটক বা জলসা হয় তখন এই সীমাপুরী, জাহাংগীপুরীর অধিবাসীরা ভিড় করে আসে এইসব তথাকথিত 'পশ' এলাকায়।

কিন্তু সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় এই সীমাপুরীর লোকজনেরা কিন্তু কলকাতা বা পশ্চিমবংগের অন্যত্র যেসব বস্তিবাসী বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা আছেন তাদের চাইতে আর্থিক দিক থেকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আছেন। আর্থিক অনটন, বাসস্থানের অভাবে নোংরা ভাবেই দিন কাটান বা হীনবৃত্তি গ্রহণ কিন্তু এদের মধ্যে পশ্চিমবংগের তুলনায় খুব কমই দেখা যায়। কলকাতা আর দিললির আর্থিক বৈষম্য কিন্তু রাজধানীর বিত্তশালী বাঙালিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মাথা পিছু গড় আয়ের পরিমাণ কলকাতার বাঙালিদের তুলনায় দিললির বাঙালিদের অনেক বেশি। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিললিতে কলকাতার তুলনায় কমের দিকে। কলকাতায় এক কেজি গমের দাম যেখানে ৩ থেকে চার টাকার মধ্যে, সেখানে দিললিতে ২ থেকে আড়াই টাকার মধ্যে এক কে জি ভাল মানের গম পাওয়া যায়। একইভাবে এক কেজি বাসমতী চালের দামও কলকাতায় ৬ থেকে ৮ টাকার তুলনায় দিললিতে ৬ থেকে ৭-৫০ টাকা। চিনির দাম বাজারে কিনতে গেলে যেখানে কলকাতায় দিতে হয় পাঁচ থেকে ছ টাকা, সেখানে দিললিতে পাঁচ থেকে পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা দিলেই জিনিস হাতের মুঠোয় চলে আসে। বিদ্যুতের খরচ কলকাতায় যেখানে প্রতি ইউনিটে ৪০ থেকে ৫৫ পয়সা সেখানে লোডশেডিং ছাড়াই দিললিতে বিদ্যুতের পেছনে খরচ খরচা হয় প্রতি ইউনিটে মাত্র ২০ থেকে ২৫ পয়সা। একটা প্রচলিত ধারণা আছে কলকাতার মত সস্তায় ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরে বাসে-ট্রামে ওঠা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি মারকেটিং অ্যানড রিসারচ গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড এক সারভে করে প্রমাণ করেছেন যে প্রতি ৫ কিমি রাস্তা বাসে যেতে দিললিতে খরচ হয় মাত্র ৪০ পয়সা। কিন্তু কলকাতায় এই রাস্তা যেতে খরচ পড়ে ৬০ থেকে ৬৫ পয়সা। ফলে রাজধানীর বাঙালি বাসিন্দারা কলকাতার তুলনায় যথেষ্ট আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন। তদুপরি লোডশেডিং রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম, ইত্যাদির মত দুর্বিপাকের খপ্পরেও তাদের পড়তে হয়না। কথায় বলে 'The only way to the heart is through the stomach'— কথাটা বোধহয় সাম্প্রতিক কালে দিললি আজও বেশি সংখ্যক বাঙালিদের পছন্দ শহর হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ।

তবে দিললিকে 'মন-পসন্দ' শহর করতে গিয়ে বাঙালিরা যেভাবে বাংলাভাষাকে ভুলে যাচ্ছেন, তা দেখে আশংকা হয় আগামী প্রজন্মের ঘোষ, বোস, মুখারজি, ব্যানারজি পদবীধারীরা আদৌ 'অ-আ-ক-খ'-কে মনে রাখতে পারবে তো? নাকি ঐগুলিই শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে 'গ্রীক অক্ষরে' পরিণত হবে? □

দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্ম

দুর্গাপুর বিধাননগরের প্রথম গেট

শ্যামল বসু

দুর্গাপুর। নডিহা থেকে ফুলঝোড় অবধি চওড়ায় ১৬ কিলোমিটার আর মুচিপাড়া থেকে জি টি রোড বরাবর ১০ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আধুনিক ভারতের অন্যতম শিল্পনগরী দুর্গাপুর। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বলে দাবিদার দুর্গাপুর কেবল একা সরকারি শিল্প সংস্থার কর্মীদের শহর নয়। এখানে অনেক বেসরকারি সংস্থা আছে, ব্যবসা কেন্দ্র আছে, অনেক সাধারণ মানুষ আছেন, অনেক নতুন পুরনো বসতি এলাকাও আছে। বয়স চুরি করা চেহারার কিন্তু এদের খবর কি কেউ রাখে? দুর্গাপুর বিধাননগরের বাসিন্দা আটান্ন বছর বয়সী কমল মিত্র বললেন, এ কথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না যে, সরকারি সংস্থার কর্মচারীরা অস্থায়ী বাসিন্দা। নিজেদের সংস্থার উন্নতির জন্যই তাঁদের চিন্তা, যে যে এলাকায় বাস করেন সেই এলাকার মালিক তাঁদের সংস্থা। দুর্গাপুরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য তাঁরা ভাববেন কেন? কিন্তু এদের পাশাপাশি দুর্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দারাও আছেন আর আধুনিক শিল্পনগরীর সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক নতুন প্রজন্ম। এ'দের বাবা-মা হয়ত বর্ধমান, কলকাতা বা আসানসোল অথবা ভারতের অন্য কোন এলাকা থেকে এসেছিলেন এরা কিন্তু দুর্গাপুরেই জন্মেছেন। বড় হয়েছেন। আর দুর্গাপুরের নতুন জনবসতে দুর্গাপুরের মানুষ হিসেবে বাস করছেন। এরা বহিরাগতের সন্তান, নতুন প্রজন্ম। কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠেছেন। সাগরডাঙ্গার চাটুজ্জ্যে পরিবারের মত এরাও একদিন পুরনো দুর্গাপুরের গল্প বলতে পারবেন। তাই ভবিষ্যতের সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা এদেরই বেশি।

মেজিডি গ্রামকে ভেঙে দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরী হওয়ার ঘটনা বত্রিশ কি তেত্রিশ বছর। কিন্তু তার আগেও ওখানে জনপদ ছিল, মানুষ থাকত। তাদের কেউ কেউ গোপাল মাঠের দিকে উঠে গিয়েছেন, কেউ কেউ সরকারি সংস্থার কাজ পেয়ে সরকারি কোয়ারটারেই থাকেন। আবার কেউ কেউ সাগরডাঙ্গার দিকে নতুন ঘর বানিয়েছেন। এরাই দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। কেননা এদেরই তো এখানে থাকতে হবে। তাই এ'রা দুর্গাপুরের পুরনো ইতিহাসটাকে মাঝে মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখতে চান। 'ভবানী পাঠকের টুম্ব' বা ডাকাত কালু ডোমের শেষ আস্তানা নিয়ে মত বিনিময় করেন। বাঁকুড়ার জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সগোদ (গরুর গাড়ি) কী করে ভেঙেছিল। সেই থেকে গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায় কী করে সগোদ-ডাঙ্গার পত্তন করলেন সেই গল্প। বেনিয়াচিত্তি কী করে বেনেচিতিতে দাঁড়াল। পুরনো দুর্গাপুরকে ঘিরে যে তিনটে বড় জঙ্গল ছিল গড়বন, কুরূপীবন আর দিঘীবন সেগুলো কোথায়? জমিদার গোপীনাথের সাত ছেলে ছিল—দুর্গাদাস, কালিদাস, বিহারী, শ্যাম, নারায়ণ, ভৈরব, আনন্দ। এই সাত ছেলের নাম অনুসারে সাতটা 'পুর' তৈরি হল কী করে। সুন্দরী রূপা কী করে কুরূপী হয়েছিল, আবার বনের মধ্যে কি করে হারিয়ে গিয়েছিল। এইসব নিয়ে প্রবীণদের আড্ডা। পুরনো দিনের স্মৃতি-বিস্মৃতির গল্প আর ভবিষ্যতের কল্পনায় কখনো আশা—কখনো নিরাশা। এসব যারা ভাবেন তারা চোখের ওপর দুর্গাপুর শিল্পনগরীকে গড়ে উঠতে দেখেছেন। দেখেছেন মানুষের মূল্যবোধ কীভাবে আধুনিকতার সঙ্গে দিন দিন পালটে গেছে। সেজন্য এদের কোন ক্ষোভ নেই। দুঃখ কেবল এই তিরিশ বছরে যে নতুন যুবক সম্প্রদায় বেড়ে উঠেছেন তাদের নিয়ে।

প্রথম পর্বে দেখা যাক টাউনশিপের অবস্থা। সরকারি সংস্থার আনুকূল্য নিয়ে যে বসতগুলো গড়ে উঠেছে সেখানে সাজান সারি সারি কোয়ারটার আছে। বিদ্যুৎ জল সবই সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। পিচের রাস্তার ধারে বাসস্থল, ছোট বড় হলুদ রঙের দু তিন কামরার কোয়ারটার, সামনে একফালি বারান্দা। বারান্দার সামনে আর পিছনে কিছুটা জায়গা ছাড় দেওয়া, ওখানে গৃহকর্তার ইচ্ছানুযায়ী কিছু গাছগাছালি। কলি পড়েনি বা রঙ করা হয়নি বহুদিন, তবুও কোয়ারটারগুলি বাইরে থেকে দেখতে মন্দ নয়। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি আবাসন দফতরের ছড়ান ছিটন কিছু কিছু ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়ার জন্য তৈরি হয়ে পড়ে আছে। বছর দুই ধরে পুরনো হচ্ছে এমন কোয়ারটারের সংখ্যাও কম নয়। হস্তান্তর করার অসুবিধা হচ্ছে জলের অভাব। সিটি সেনটার এলাকায় ৭২টি স্বল্পআয়ী আর দুখণ্ডে ১০৮ মধ্য-আয়ীর জন্য সরকারি আবাসন দফতরের কোয়ারটার পড়ে আছে। এছাড়া বিধাননগরের এল আই সি কোয়ারটারের সংখ্যা ১২৬০টি সগোদডাঙ্গা অঞ্চলে দু'খণ্ডে ১৮৯২টি আর ১৩৮টি। আবাসন দফতরের কিছু বাড়ি এখন বিক্রির অপেক্ষায় বিধাননগরে আছে। এগুলির সংখ্যা বেশি নয়। দাম ৬৫ হাজার টাকা থেকে ৯০ হাজার টাকা।

সরকারি হিসেবে ১৯৮৫ সালে দুর্গাপুরের সরকারি শ্রমিক ও অন্যান্য স্তরের কর্মীদের একটা বড় অংশ কাজ থেকে অবসর নেবেন। ইতোমধ্যেই বেশ কিছু কর্মী অবসর নিয়েছেন কিন্তু বর্তমান সমস্যাটা একটু অন্যরকম। যারা অবসর নিতে চলেছেন তাদের বৃহত্তর অংশই চান দুর্গাপুরে স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হতে। পুরনো

দুর্গাপুরের বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা

কোয়ার্টার তাদের ছেড়ে দিতে হবে। কেউ ফিরে যাবেন নিজের ঘরে আবার কেউ কেউ তো পিছন-দিকটাকে ভুলে ফেলে এসেছেন। তাই নতুন বসত না হলে থাকবেন কোথায়? দুর্গাপুরের বেসরকারি আবাসিক অঞ্চলে জমির দাম এখন ৬ হাজার টাকা কাঠা। এই দাম ঠিক করেছেন আসানসোল দুর্গা-পুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। আদতে এর দ্বিগুণ দামেও নাকি জমি পেতে হলে অনেক চেনাজানা মানুষের সুপারিশ লাগে। যারা স্থায়ী ঘর বাঁধতে চান তাদের সে বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। ওরা মেনে নিয়ে-ছেন সরকারি নিয়মের মধ্যে এটাও একটা অলিখিত নিয়ম। কিন্তু তারপর? বাড়ি তৈরির খরচের হার এখন ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা স্কোয়ার ফুট। দু বছর আগেও যা ছিল ৬৫ টাকা থেকে ৭০ টাকার মধ্যে। এছাড়া জল একটা বড় সমস্যা। বর্ষাকালেই জল পাওয়া যেখানে দুষ্কর সেখানে আর অন্য সময় তো কথাই নেই। গত গ্রীষ্মে দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির কর্তৃপক্ষ ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে সারা দুর্গাপুর অঞ্চলকে চারভাগে ভাগ করে জল বিলিয়ে-ছেন। সদ্য রিটায়ার করা জনৈক মেজর কাজের শেষ জীবনে দুর্গা-পুরে হাজির হয়েছিলেন। কয়েক কাঠা জমি তিনি তার পুত্র মারফৎ পেয়েছেন বিধাননগর এলাকায়। বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে এখন তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এক কর্মীর বিধাননগরের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। দু ঘরের একতলা বাড়ি ভাড়া মাসে ৫০০ টাকা। নিজের জমিটা কাছেই বলে দেখাশোনা করার সুবিধে। যে পুত্রটি কাজের জন্য দুর্গাপুরে ছিলেন অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছেন। আদি বাড়ি ছিল ওপার বাংলা। আত্মীয় স্বজন সব কৃষ্ণনগরেই থাকেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে একটু খোলামেলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে চান। তাই দুর্গাপুরে থাকা। মেজর সাহেব যখন বর্তমান বাড়ি ভাড়া নেন তখন সেখানে আলো ছিল না। ৫০০০ টাকা ডি পি এল এ জমা দিয়ে কেবল তদবির। অবশেষে ডি পি এল কর্তৃপক্ষ জানালেন তাদের ফুট পোস্ট লাইন টানার মত কেবল নেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষে আট মাসের সময় বাড়িতে ইলেকট্রিকের বাতি পেলেন। নিজের বাড়ির ভিত তৈরির আগেই এই অভিজ্ঞতা তাকে বাড়ি তৈরি সম্পর্কে অনেক সচেতন করে তুলেছে।

বিধাননগরের বেসরকারি কলোনির বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় হাজার নয়েক। মোট প্লট বিলি হয়েছে এক হাজারের কিছু বেশি। রাস্তাঘাটগুলো এখনও সম্পূর্ণ নয়। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভয়াবহ। ড্রেনের থেকে রাস্তা নিচু। ডাস্টবিনগুলোর ময়লা ফেলার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নেই। ফলে সেখান-কার ময়লা সেখানেই পচে। কয়েকদিন আগে রাজ্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের সচিব নিজে সরেজমিন তদন্ত এই সব অবস্থা সরজমিনে দেখে এসেছেন।

এবার উপেক্ষার অন্য তালিকা মানুষ, যারা দুর্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা তাদের অবস্থাটি দেখা যাক।

দুর্গাপুর রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাস স্ট্যানডের পর কোন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আজ ৩২ বছর পরেও করা হয়নি। খোলা রাস্তার উপর বাস স্ট্যানড। দূরপাল্লার বাসযাত্রীরা এখানেই অপেক্ষা করেন। শিলিগুড়ি দীঘা পুরী টাটা এমন জায়গার বাস এখান থেকেই ছাড়ে। বাস স্ট্যানড একটা করা হয়েছিল কিন্তু সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বাসে ওঠা সম্ভব নয়। পাশে থাকা কয়েকটি অস্বাস্থ্যকর হোটেল আর বাস-স্ট্যানডের সমাজবিরোধীদের আড্ডায় যেকোন মহিলা যাত্রীকে অসুবিধায় পড়তে হয়। হোটেলগুলোতে প্রকাশ্যেই মদ বিক্রি চলে। পান করায়ও কোন নিষেধ নেই। আশেপাশে কখন কোন ট্রাফিক কনসটেবলও চোখে পড়ে না। মলমূত্রের পূতিগন্ধময় নরক-কুণ্ডের মাঝখানে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর দুর্গাপুরের দূরপাল্লার বাস স্ট্যানড।

বাস স্ট্যানড থেকে বাঁকুড়া রোডের দিকে এগুলে প্রতীক নগর, রাঘডাঙ্গা দেশবন্ধুনগর সুভাষপল্লী সুকান্তনগর শ্যামপুর এলাকা। এই এলাকাগুলিতে প্রায় হাজার দশেক পরিবার থাকেন। এরা বাড়ি দূরে থাকুক, সরকারি সদর রাস্তাতেও আলোর দেখা পান না। বাঁকুড়া রোড দিয়ে বাসনবেড়া পর্যন্ত একটি সংকীর্ণ রাস্তা আছে যেটি সরকারী অর্থে পাকা। বর্ণিব ট্রাক যাবার রাস্তা বাঁকুড়া পুরু

লিয়ার সঙ্গে অন্যতম সড়ক যোগাযোগও বটে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে ডি পি এল কর্তৃপক্ষ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জমা নিয়ে রেখেছেন বৈদ্যুতিক আলোর জন্য। কিন্তু এখনও আলোর নামগন্ধ নেই। বাঁকুড়া রোড থেকে সুকুমার নগর হয়ে দামোদর বাঁধ পর্যন্ত ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে রাস্তায় আলো দেওয়ার গল্প এখানকার মানুষের মুখে মুখে। যেমন আরও বিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দের গল্প আছে বাঁকুড়া রোড থেকে সুভাষ পল্লী, সুকান্ত পল্লী, শরৎ পল্লী, শ্যামপুর হয়ে নডিহার জন্য। এই টাকার বরাদ্দ নিয়ে যদি কেউ কখনও ডি পি এলের জনসংযোগ বিভাগে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তবে উত্তর একটাই- এমন কথা আছে নাকি ? তাতো জানা নেই। খোদ বিভাগীয় কর্তা জনসংযোগ আধিকারিক অবশ্য একটু গুছিয়ে বলবেন। তিনি জানাবেন, না মশাই সামান্য দেড় কিলোমিটার মত এলাকা রায়ডাঙ্গা শ্রমিকনগর দেশবন্ধু নগরকে দেবার বিদ্যুৎই ডি পি এল-এর এখন নেই—তো ঐসব বরাদ্দ নিয়ে ভাববে কখন। জনসংযোগ অফিসার অবশ্য তার 'ক্রিয়েটিভ' ক্ষমতার কথা সবিস্তারে বলবেন। জানাবেন, সম্প্রতি একটি হিন্দি ছবিতে তাঁর গল্প নেওয়া হয়েছে। কিংবা রিক্সা-চালকের ব্যথা বেদনায় লটারির টাকা পাওয়ার সঙ্গে একজন রমণীকে কত আপন করে পেতে পারে সেই গল্পটি তার শেষ হতে কতটা দেরি।

আসলে দুর্গাপুরে একটা বিশেষ কালচার চলছে তা হল কনট্রাকটারি কালচার। কাঁচা পয়সা নিজ তার ... কিছু অফিসারের ...

আমলার কবলে থেকে দুর্গাপুর ধুঁকছে। সেইসঙ্গে রাজনীতিঃ দলবাজীও আছে। কোন দলের লোক নয় বলে ভরত পালদের ঘর রায়ডাঙ্গা উন্নয়নের নামে বিনা নোটিশে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কনট্রাকটর কালচারের কথাটা পরিষ্কার করে বোঝালেন দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড-এর সর্বময় কর্তা ব্যক্তি ত্রিপুরারী চট্টোপাধ্যায়। প্রবীণ অভিজ্ঞ ইনজিনিয়ার। ১৯ অকটোবর ১৯৮১ সালে মৃতপ্রায় সংস্থা দুর্গাপুর প্রজেকট লিমিটেডের দায়িত্ব নিয়ে দুর্গাপুরে আসেন। দুর্গাপুরকে তিনিও ভালবেসে ফেলেছেন। ৮০-৮১ সালে যেখানে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৭১৩ মিলিয়ান ইউনিট ৮২-৮৩-তে সেটা দাঁড় করিয়েছেন ৮৮৩ মিলিয়ান ইউনিটে। লোকসান ছিল ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। এবছর অর্থাৎ ৮২-৮৩-তে লাভ করেছেন ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। মাত্র দু বছরে এটা কী করে সম্ভব হল সেকথাই তিনি বলছিলেন। প্রথমত তিনি বিভিন্ন জায়গায় যে অপচয় হত তাকে কনট্রোল করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তার শ্রমিক কর্মচারীদের উৎপাদনমুখী করার চেষ্টা করেছেন। শ্রম সম্পর্কে উৎপাদন-মুখী করে তোলাটা সম্ভব হয় একেবারে প্রথম থেকে কিন্তু মাঝপথে হওয়া কষ্টকর। সেই মাঝপথের থেকে তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা যেমন একসঙ্গে ৪০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন তেমনই তিনি তাঁদের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে কোন শ্রমিক কর্মচারীর সমস্যার কথা শোনেন। যেমন এখানকার একশ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে যে প্রভাবশালী ...

ত্রিপুরারী চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডি পি এল

দুর্গাপুর সমাজবিরোধীদের কবলে

উৎপল অধিকারী

রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় যদি কয়লা-চোরাকারবারি ও মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য হয় তবে দুর্গাপুর লোহা-চোরাকারবারি ও কারখানার কয়লা পাচারকারীদের নন্দনকানন। অণ্ডাল, ওয়ারিয়া, কাদারোড, গোপাল মাঠ থেকে শুরু করে দুর্গাপুর স্টেশন এলাকা, বেনাচিতি, মুচিপাড়া, পুরো এলাকাই এখন মস্তান খুনে সমাজবিরোধীদের কবলে।

চোরাকারবারিদের নেতৃত্বে আছে স্থানীয় কিছু ব্যবসাদার। কিন্তু সমস্ত অপরাধ ও অসামাজিক কাজের প্রয়োজনে এসব অঞ্চলের আশেপাশে গজিয়ে উঠেছে বহু বে-আইনি ঝুপড়ি। আর এইসব ঝুপড়িগুলিই হচ্ছে চোরাকারবারিদের মূল আড্ডা। এখানেই অবাধে চলে সব অপরাধমূলক কাজ প্রায় প্রকাশ্যেই। কিন্তু পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার জন্য জনসাধারণও কোন প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

শুধুমাত্র ডি এস পি থেকে প্রতিদিন পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের ... , ফিসপ্লেট প্রকাশ্যে পাচার হয় স্থানীয় পুলিশ, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী ও রেলপুলিশের সহযোগিতায়। এসব চোরাই লোহা কাঁটা থেকে প্রতিদিন প্রকাশ্যে ট্রাকে করে এবং ওয়ারিয়া স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনগুলিতে শয়ে শয়ে দরিদ্র শিশু ও স্ত্রীলোকদের মাধ্যমে চোরাকারবারিরা পাচার করে পানাগড়, পারাজ ও অন্যান্য অঞ্চলে চোরাই লোহার গুদামে। সেখান থেকে হাওড়ার কারখানাগুলিতে এসব মাল ঢালাই হয়ে নতুনভাবে বাজারে বিক্রির জন্য আসে। ট্রেনের যাত্রীরা বাধা দিলেও রেলরক্ষীবাহিনীর লোকরা যাত্রীদের হেনস্থা করে। কিছুদিন আগে এক রক্ষী ওয়ারিয়া স্টেশনে সন্তোষ আগরওয়াল নামে এক প্রতিবাদকারী যাত্রীকে গুলি করতে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে দু ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ রাখে এবং রেল পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সেই রক্ষীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সমানে চলছে লোহাপাচার। অণ্ডাল রেল ইয়ার্ড থেকেও একই ঘটনা ঘটছে। গাড়ী-গাড়ী কয়লা বোঝাই হয়ে যাওয়ার দৃশ্য সবসময় দেখতে পাওয়া যাবে।

দুর্গাপুর বেনাচিতিহাটে ডি পি এল থেকে বেরিয়ে আসা কয়লা ভর্তি ওয়াগান দাঁড় করিয়ে দিনের আলোয় কয়লা লুঠের দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়া জায়গাটি নির্জন ও দুপাশে খাড়াই মাটির স্তূপ থাকায় রাতের বেলা মালগাড়ি থামিয়ে ওয়াগ্যান থেকে কাপড়, ওষুধ, চাল, গম, চিনির বস্তা নামিয়ে ট্রাকে করে পাচার হয়। কিন্তু জনসাধারণের অভিযোগ পুলিশ সবকিছু জেনেও নীরব। মাঝে মধ্যে 'পুলিশী তৎপরতা' দেখাতে ধরপাকড় হলেও এসব চুরি বন্ধ হয় না। অনেকের অভিযোগ পুলিশের সঙ্গে এসব চোরাকারবারিদের যোগসাজস রয়েছে।

দুর্গাপুর স্টেশন এলাকায় ও জি টি রোডের দুধারে কোন হোটেলেই ভদ্র পরিবারের লোকজন খেতে যেতে সাহস পায় না। সবকটি হোটেলেই প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হয় এবং মদ্যপানের আসর বসে। এসব হোটেলগুলো চোরাকারবারিদের লেনদেনের স্থান।

চোরাকারবারিদের কথা ছেড়ে দিলেও খুন, পাল্টা খুন, চুরি-ছিনতাই, শ্রমিক সংঘর্ষ, কারখানা-কারখানাতে শ্রমিক বিক্ষোভ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। অণ্ডাল থানা এলাকায় খুন তো প্রায়ই হয়। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন সেসব খুনের খবর থানায় ... না, পুলিশও নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে এ ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান ... না। তবে অন্যান্য শিল্প শহরের চেয়ে এখানে রাজনৈতিক ... অনেক কম। তা সত্ত্বেও এই সরকারের আমলেই রাজনৈতিক ... দুর্গাপুরে খুন হয়েছেন নিখিল দাস, সুজিত ব্যানার্জি, ... স্বপন পাল, কল্যাণ সাহা, মানিক সরকার, কাজল বিশ্বাস, ...

প্রবণতা আছে তাও তিনি জানেন। তিনি তাদের নিরস্ত করেন। আবার পাশাপাশি স্থানীয় সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনযাত্রা-রীতিকে অপেক্ষাকৃত ভাল করে তোলার চেষ্টা করেন। তবুও তার ক্ষোভ, 'আমরা ...

সহ বেশ কয়েকজন। এছাড়া আলাদা কারণে খুন হয়েছেন দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেডের ড্রাইভার রতন সিং, ফিলিপস কার্বন লিমিটেডের অনেক নিরাপত্তারক্ষী। জানা যায় গত বছর ২৫ জুন কারখানার ভেতর থেকে মালচুরির ব্যাপারে বাধা দেওয়ায় দুষ্কৃতকারীরা তাকে খুন করে পালিয়ে যায়। গত নভেম্বরেই দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের গ্যারেজের কাছে এক হোটেলের ভেতর অশোক রায় নামে এক যুবক খুন হয়। সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বড় খুনের ঘটনা হল দুর্গাপুর স্টেশনের কাছে দুজন যুবককে একসঙ্গে খুন করে লাশ গায়েবের চেষ্টা। হুগলির খানাকুল থেকে অশোক বক্সী ও সনাতন মাঝি এসেছিলেন দুর্গাপুর সিমেন্ট কারখানা থেকে সিমেন্ট নিতে। কিন্তু ২৫ মে রাতে সিমেন্টের টাকা জমা দিয়ে যখন সাগরভাঙায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা খুন হন। সেই মৃতদেহ উদ্ধার হয় পাশের এক খাদ থেকে পরদিন দুপুরে। এসব খুনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসামীরা ধরা পড়লেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত আসামীদের গ্রেপ্তারের কোন খবর পাওয়া যায়নি। দুর্গাপুর থানা এলাকাতে গ্রামাঞ্চলে চুরির চেয়ে শিল্পাঞ্চলের কোয়ার্টারে ছোট খাট চুরি হামেশাই ঘটে। ইস্পাতনগরীর বিভিন্ন জোনে দু দল যুবকের মধ্যে এলাকা দখল নিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইও প্রায়ই ঘটে। নিউ টাউনশিপ থানা এলাকায় ছিনতাইবাজদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়ছে। সিটি সেনটারের ভবানী পাঠকের টিলার কাছে প্রায়ই ছিনতাই হয়। এই সেদিনও এম এ এম সি কারখানার শ্রমিক পরেশচন্দ্র ঘোষাল সন্ধ্যার সময় বাজার করে ফিরছিলেন, সে সময় কিছু দুষ্কৃতকারী তাকে ছুরিকাহত করে তার হাতঘড়ি, টাকা ও সাইকেল নিয়ে চম্পট দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় এম এ এম এম সি হাসপাতালে কিছুদিন ভর্তি থেকে অনেক কষ্টে তিনি বেঁচে উঠেছেন। এ অঞ্চলটি দুর্গাপুর থানা ও নিউ টাউনশিপ থানার মাঝামাঝি জায়গায় হওয়ায় কেউ কেস নেয় না। দুই থানায় ঘুরে অনেকেই আর তাদের অভিযোগ দায়ের করে না। এম এ এম সি টাউনশিপে প্রায়দিনই সন্ধ্যায় শুরু হয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুবক দলের বোমাবাজির লড়াই। ছিনতাই-এর আরেকটি ভয়াবহ স্থান হল স্টেট ডেয়ারির নিউ কলোনির মোড়। ছিনতাইকারীরা শুধুমাত্র টাকা পয়সা ছিনতাই করে ক্ষান্ত হয় না, তারা দলবদ্ধভাবে সশস্ত্র আকারে নিরীহ যাত্রীরা এদের হাতে প্রায় সময় আক্রান্ত হন। এই মার্চ মাসেও বিধাননগর হাউজিং কলোনির রবীন্দ্রনাথ দে ও উপেন্দ্রনাথ রায় এদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। অবশ্য পুলিশ মাঝে মধ্যে ধরপাকড় চালিয়ে রিভলভার, পাইপগান, ভোজালি উদ্ধার করে। আর এ ব্যাপারে কোক ওভেন থানা খানিকটা সক্রিয়। শিল্পনগরী-সংলগ্ন গ্রামগুলির মধ্যে ভিড়িঙ্গি, সগর জি টি রোড, প্রান্তিকা হকার্স কর্নার, মেন গেট, ওয়ারিয়া, কাদারোড, শোভাপুর, মামরাবাজার, দুর্গাপুর স্টেশন বাসস্ট্যান্ড, আকুরিয়া, শ্যামপুর, মামরা, পুরুলা গ্রামে চোলাই মদের ভাটি রয়েছে। সঙ্গে অবাধে নারীদেহের ব্যবসা।

দুর্গাপুরের আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এখানকার শিল্প সমস্যাও। দুর্গাপুর আই এস পি, পিয়ালো, ইষ্টার্ন, মেশিন টুলস কারখানার বড় বড় সরকারি ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ। কয়েক হাজার শ্রমিক সম্পূর্ণ বেকার। সঙ্গে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সহ কয়েকটি কারখানায় ঠিকাদারি শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি চলছে।

[illegible] দুর্গাপুর [illegible] ঘটছে। [illegible] এবং [illegible] না আসেন, [illegible] দুর্গাপুর [illegible] চলেছে। □

যখন কাজ করতাম তখন সময়টা কোন সময়ই হিসেবের মধ্যে আনতাম না। কাজ শেষ করাটাই বড় কথা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঐ যে ফুরনে কন্ট্রাক্টার দিয়ে কাজ করানোর রীতি এটাই এই সব শিল্প-উদ্যোগের কর্মীদের কাজের উৎসাহ নষ্ট করে দেয়। আমরা যদি কাউকে কনটিনিউয়াস কাজের ধারার মধ্যে রাখতে না পারি বা একজন এনজিনিয়ারকে কেবল সুপারভাইজ করার জন্য রাখি তবে সাধারণভাবে কাউকেই ঠিক মোটিভেটেড করা যায় না। ডি পি এল-এও যে খুব একটা মোটিভেটেড করা যাচ্ছে তা নয়। তবে মোটিভেটেডের সঙ্গে 'কনট্রোল' ব্যাপারটিও আছে। এই দেখুন না সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় আমি প্ল্যানটে যাচ্ছিলাম। জাসট একটু ঘুরে দেখতে। এই দেখার ফলে মোটিভেটেড হোক না হোক, অন্তত কিছুটা কনট্রোল করা যায়। অবশ্যই আমি এখানকার সকল ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের সহযোগিতা পেয়েছি। তা না হলে এটুকুও সম্ভব হত না।' শ্রী চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেন, জনসংযোগের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে অন্তত শ্রমসম্পর্কের ক্ষেত্রে। তবে তিনি জানেন তার জনসংযোগ বিভাগ ঠিক কাজের নয়। ডি পি এল নিজের কর্মীদের মধ্যেই ডি পি এল জনসংযোগ বিভাগ সম্পর্কে একটা উদাসীনতাও আছে।

কনট্রাক্টারি কালচারের পটভূমিকায় দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্মের সামনে যে জীবন-যাত্রার ছবি আছে তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা দুর্গাপুরের এখনকার তরুণদেরও নেই। এদের মধ্যে তবুও একটা অংশ আছে যারা ভাবতে চান। গান করেন, গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, সমাজ জীবন সম্পর্কে জানবার কৌতূহলও আছে। সমাজ-অনুসন্ধিৎসু দুর্গাপুর নিবাসী পৃথ্বীশ চক্রবর্তীর ভাষায়, মদ্যপানের কালচারও আধুনিক জীবনের কাছে বেশিভাবেই আদৃত হতে চলেছে। যেমন তাদের জীবন-যাত্রার পথও পালটেছে। পালটেছে মূল্যবোধও।

গার্লস কলেজ তৈরি হতে এখনও অনেক বাকি

টাউনশিপ পশ্চিম, পূর্ব, ভিড়িঙ্গি, গোপালমাঠ, ওয়ারিয়া বনগ্রাম ধুপচুরিয়া অণ্ডাল তামলা কুমুড়িয়া, ঝাওদিহি কাঁকরা আমরাই কাস্তেশ্বর শোভাপুর কাঁকসা গোপালপুর নডিহা নাচন ধবনী অঙ্গদপুর ফরিদপুরের প্রায় তিন লক্ষের মধ্যে বিভিন্ন আয়ের মানুষের মধ্যে একশ্রেণীর আধুনিকতার নামে মদ্যপানের প্রবণতা তথা পাশ্চাত্যের অনুকরণের চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠছে। এসব অঞ্চলে ঝুপড়ি চায়ের দোকানের মত দেশি বিদেশি মদের দোকান গজিয়ে উঠেছে। জি টি রোডের ধারে নৈশ হোটেলও আছে। সুযোগ সন্ধানী হঠাৎ পয়সা হাতে আসা কনট্রাক্টররাও যেমন আছে সেই সঙ্গে আছে ওয়ারিয়া অণ্ডাল বা ডি এস পি-র দু নম্বর রেলগেট থেকে মাল চোরাকারবারির দল। এক কথায় এ ব্যবসাটি দুর্গাপুর অঞ্চলে এখন রমরমা।

দ্বিতীয়ত অন্য যে কোন আধুনিক শহরের মত এখানকার যুবকদের মধ্যেও নৈরাশ্য বা অতি আধুনিকতার আবেগ রয়েছে। কোন সরকারি দোষে নয়, কেবল পারিবারিক আর সমাজের সহজ বাহবা পাবার চেষ্টায় এরা ব্যবসা করতে চান, বাবার অবর্তমানে চাকরির আশায় বসে থাকেন। সকাল সন্ধ্যে ইভ টিজিং করেন, স্ট্যাটাস সিম্বল সম্পর্কে নিজেদের রোমানটিকতা দিয়ে ধারণা তৈরি করেন। মদ্যপানও করেন, নেশা করার জন্য ওষুধও খান। একটা শিল্পনগরীর যন্ত্র যদি কোন ভুল ইঙ্গিতে ঘুরতে থাকে তবে দ্বিতীয় পুরুষের কাছে যা যা হওয়া উচিত দুর্গাপুরেও তাই হচ্ছে। কোন ব্যতিক্রম নয়। তরুণরা এখানেও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দুর্গাপুরে বাসের

জন্য। কিন্তু কোন সংগঠিত আন্দোলন এরা করতে পারেন না। এদের বক্তব্য দুর্গাপুরের কোন গড ফাদার নেই। গড ফাদার বলতে চান উন্নয়নের দায়িত্ব কার আর আন্দোলনটা কার বিরুদ্ধে কিভাবে করা হবে ? প্রসঙ্গত এখনও পর্যন্ত দুর্গাপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা কখনও নিজেদের থাকার জায়গা রাস্তা-ঘাট যানবাহন এমনকি জনস্বাস্থ্য নিয়েও কোন সংগঠিত আন্দোলন করতে পারেননি। অথচ দুর্গাপুর শ্রমিক আন্দোলনের পীঠস্থান।

শিল্পনগরীর দোষগুণে গড়া দুর্গাপুরের অন্যতম সমস্যা এই শহর আর কোনরকমেই বাড়ছে না। এখানে উন্নয়নের সুযোগগুলোও যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে এই শহরের মানুষদের রোজগার বাড়ানোর প্রবণতাও এর ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশটাই সুস্থ প্রগতির পথ আটকে দিচ্ছে। এই সমস্যাটা সমীর ঘোষ, উৎপল অমর প্রতাপ তরুণ বিমল দে-র মত তরুণদের ক্রমশই দিশেহারা করে দিচ্ছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে যে কর্মী নিজেকে আদর্শ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই তার ধ্যান জ্ঞান ছিল কারখানা—উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ আট ঘণ্টার সময়ের হিসেব ভুলে গিয়ে কাজটাই যেন সব কিছু মনে করতেন—ইদানিং কালে তাদের কাছে সব বিষয়টা যেন হলেও হয়, না হলেও হয় গোছের একটা ভাব। যে পরেশবাবু অথবা স্বরূপ গুহ নিজে টুলরুমে কাজ করতেন, আজ সময় পেরিয়ে তারা সুপারভাইজার। গিন্নিরা বলেন এখন আর কস্তাকে হাতে করে কাজ করতে হয় না। এই পদোন্নতির ভার সামলাতে গিয়ে পরেশবাবুদের কারখানাতেও সমঝে চলতে হয়। তার থেকে দশবছর বাদে ঢোকা সরিৎ মুখোপাধ্যায় তার সঙ্গে একই ডিপারটমেনটে। বসতের জন্য কোমপানির দেওয়া কোয়ারটার লাগোয়া প্রায়। সরিৎবাবু নিজের পজিসন রাখতে গিয়ে স্ত্রীকে শোনান এবার কত টাকা বকেয়া ডি-এ একসঙ্গে পাওয়া যাবে। কারখানাটা তার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করার সময় 'অফিস' হয়ে দাঁড়ায়। নেহাৎ এ শিফট বি শিফট সি সিফটগুলোতে হাজিরা দিতে হয় তাকে—তবে তিনি পছন্দ করেন জেনারেল শিফটের ডিউটি দিতে। পাড়ার মেয়েকে বিয়ে করা, তার ওপর আগে থেকে জানাশোনা। ছেলে হিসেবেও খারাপ নন। বি এস সি-টা পাশ করেছিলেন। অনেকদিন বেকার থাকার পর কোয়ারটার সমেত চাকরিটা নাই বা হল স্ত্রীর ভগ্নীপতির মত ব্যাংকের, তবু কমটা কিসে ? এই সমস্যাগুলোই সরিৎবাবুকে নিজে না চাইলেও স্ত্রীর কাছে খবর হিসেবে জানিয়ে দেয়--তাকে হাতুড়ী পিটতে হয়নি, হাতুড়ী পেটেন পাশের বাড়ির পরেশবাবু। যথারীতি মধ্যপথের অবসরে এ বাড়ির সরিৎবাবুর স্ত্রী ও বাড়ির পরেশবাবুর জন্য সহানুভূতি জানাবেন। আর তা জানাবেন অন্য পড়শীর সামনেই। বেচারা পরেশবাবু বাড়ি ফিরে ক্লাস নাইনে পড়া ছেলের সামনে স্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে পাবেন যে তিনি কত বোকা। বই থেকে মুখ তুলে অবাকভাবে পরেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে ক্লাস নাইনে পড়া টুবলু। টুবলু ওরফে তপনই এই দুর্গাপুরে নতুন প্রজন্ম। টুবলুকে বিশ্বাস করবার জন্যই কয়েকদিন বাদে পরেশবাবু ফাঁকি যে তিনিও দিতে পারেন তার গল্পটা শোনাবেন স্ত্রীকে। বাবার কাজের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা থাকলেও টুবলুর আস্থা বাড়বে বাবার বুদ্ধির ওপর। এইভাবেই দুর্গাপুরের শান্তিপ্রিয় পরেশববুরা তাদেরই উত্তরপুরুষকে মূল্যবোধ নষ্ট করতে সাহায্য করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই পরেশবাবু রাজি হবেন তার বন্ধু নিতাইবাবুর সঙ্গে যৌথভাবে একটা দর্জির দোকান কিংবা বোমবে অথবা জলন্ধরের মিলের এজেনট হয়ে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে শার্টিং-স্যুটিং বিক্রি করতে। এটাও কারখানার মধ্যে কিন্তু সংসারের দাবি রাখতে এমন একটা সময় এসে যায় যখন কেবল হাজিরা দিয়েই কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়া। বাইরে দোকান বা সাপলাই-এর ব্যবসা করা। টুবলুর চোখে, স্ত্রীর কাছে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের একনিষ্ঠ শ্রমিক কারখানার হাতুড়ি ছেড়ে

সিধু স্টেডিয়াম তৈরি সম্পূর্ণ হবে ?

শিল্পপতি হবার স্বপ্ন দেখে বাহবা পাবেন। আর টুবলু এক হলে ক্ষতি নেই। বাবার পর তার চাকরি বাঁধা। কোনরকমে ইসকুলের শেষ পরীক্ষাটা শেষ করতে পারলেই হল। টুবলু, পরেশবাবু অথবা সরিৎবাবু এক্ষেত্রে সঠিক নাম নয় কিন্তু এখন টুবলু বা তপনের আর দুটি ভাই থাকলেও ক্ষতি নেই। রাস্তার মোড়ে বাস স্ট্যানডে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিয়ে, সিনেমা, খেলা, যাত্রা নিয়ে নতুন যৌবনকে ব্যবহার করাটা তারা সহজেই রপ্ত করে ফেলবে। পয়সার অভাব পড়লে ডি এস পির দ্বিতীয় রেল গেট অথবা রাণীগঞ্জের কাছে চোরাই কয়লা চক্রের সঙ্গে আঁতাত করলেই কাঁচা পয়সা। আর খরচ করার ব্যাপারটা হিন্দি সিনেমার দৌলতে আজানাই বা থাকবে কেন?

১৮ বছর থেকে ২৫ বছরের এই নতুন প্রজন্মের কাছে কোন রাস্তা খোলা নেই। লেখাপড়া, বেশ তাই ধরা যাক। দুর্গাপুরে ছেলেমেয়েদের একটি কলেজ, একটি নতুন মেয়েদের কলেজ আর একটি ইনজিনিয়ারিং কলেজ। ইনজিনিয়ারিং কলেজ বাদ দেওয়া যাক। স্থানীয় কলেজে যতগুলি ছাত্রছাত্রীর আসন থাকা উচিত ততগুলোও নেই। অনার্স পড়ার সুযোগও কম। ফলে মাধ্যমিক স্তরের পর থেকেই এই নতুন প্রজন্মের লেখাপড়া শেখা সমস্যা। টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এর তেমন সুবিধেও নেই। এরা করবে কি? চোখের ওপর দিয়ে কিছু ছেলেমেয়ে কলেজে পড়বে, কিছু যাবে বর্ধমান কিংবা রাণীগঞ্জে। সকাল আটটায় বন্ধুরা বেরোবে, ফিরবে সন্ধ্যায়। আধুনিক শিল্পনগরীর সমাজজীবনের শিকার এই তরুণদের সারাদিন করার আছেটা কি? ফুলের মত মেয়ে প্রভাতী, মিতা, অলকারাও ট্রেনের টিকিট না কাটতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুর থেকে বর্ধমান আর বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর এই যাওয়া আসাটাই আসল, রোমাঞ্চের। টিকিট চেকার থেকে স্টেশনের লোকজন সবাই এদের বন্ধু। কিন্তু সারাক্ষণের প্রয়োজনে যে পড়াশোনা তার সময় কই! ক্লাস টেনে পড়া জয়তী মনে করে কলেজে পড়ার আনন্দ ঐ ট্রেনে বিনা পয়সায় যাতায়াতে। হাসতে হাসতে প্রভাতী কটব্যাল বলে, বাবা যখন বর্ধমান যায় তখনই মুশকিল। টিকিট না কাটলে বাবা ট্রেনে চড়বে না। আমাকেও বিনা টিকিটে ফারসট ক্লাস ছেড়ে বাবার সঙ্গে সেকেনড ক্লাসেই চড়তে হবে। প্রভাতী মিতা অলকাদের কি সত্যি কোন দোষ দেওয়া যাবে? কিংবা টুবলু, তপন, সমীরদের যারা কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে সময় কাটাবার জন্য সমাজ-বিরোধীদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে? কিংবা এদের বাবা মা? এই প্রজন্মের দাবি কার কাছে? কোন উত্তর হয়ত মিলবে না। কিংবা সঠিক রাস্তা থাকলেও এড়িয়ে যাবেন রাজনীতির নেতারা, সমাজের কর্তারা, পাবলিক সেক-টরের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেকটরটা। পাবলিক সেকটরের দায়িত্বে সোশাল ওবলিগেশন একট বিশেষ দায়ভাগ। পশ্চিম-বঙ্গের কোন পাবলিক সেকটরই কি এর দায়িত্ব পালন করেছেন? প্রয়োজনের মত আশার বাণী শোনান হয়েছে মাত্র। একদা ১৯৫৩টি পরিবার ইস্পাত নগরীর জন্য নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়ে দিয়েছিল। তারা আশা করেছিল কর্তা-ব্যক্তিরা তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখবেন। ১১৬ কোটি টাকার কারখানা-নগরী পত্তনের তালে তালে তাদের কথা দেওয়ারও শেষ ছিল না। ভিটে ছাড়া দুর্গা-পুরের মানুষ তাদের বিশ্বাস করেছিল। তারপর-তারপর অনেক নির্বাচন, অনেকে নতুন করে গড ফাদার হবার চেষ্টা করেছেন। নতুন রাজনৈতিক নেতারা যেমন তরুণ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র হালদারেরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। শ্রমিক জনকে আশ্বাস দিয়েছেন আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় লাবণ্য ঘটকেরা—আরও অনেক কেন্দ্রীয় নেতারা। 'কিন্তু কেউ কথা রাখেনি।'

দুর্গাপুরের নতুন প্রজন্মের সঙ্গী আর পুরনো প্রজন্মের সাহচর্য পেয়েছেন এমন অনেক বাইরের তরুণ যারা দুর্গাপুরকে ভালবেসে ফেলেছেন, খুব কাছ থেকে দেখেছেন যেমন তরুণী শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভা দে, মঞ্জু মুখো-পাধ্যায়রা সবাই একস্বরে বলে ওঠেন 'কেউ কথা রাখেনি।' □

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর কলম

হোমিও চিকিৎসা

কিছুদিন আগের কথা। এক সন্ধ্যায় চেমবারে রুগি দেখছি। এমন সময়ে বোমবে থেকে টেলিফোন। ওপার থেকে কথা বলছেন হরিবংশী বচ্চন। তাঁর নাতির ব্রংকাইটিস সারছে না কিছুতেই। তা আমি যদি একবার বোমবে যেতে পারি......।

পরের সপ্তাহে আমার বোমবে যাবার কথা ছিল। গেলাম বচ্চনদের বাড়িতে। ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে অভিষেকের চিকিৎসা শুরু হল। অভিষেকের মা জয়া আর বাবা অমিতাভর কথা তো আপনাদের অনেকেরই জানা। জয়া দেবী আব শ্রীমান অমিতাভর উৎকণ্ঠিত জেরার জবাবে আমি বলেছিলাম ভয়ের কিছু নেই। ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে।

জয়ার পাশেই অমিতাভ দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই খুক খুক করে কাশছিলেন। জয়া আমাকে হাসতে হাসতে বললেন–ছেলের বাবারও তো ঐ ধাত। তা ওর চিকিৎসার কী হবে? আমি বললাম বাপ ছেলের চিকিৎসা একই সংগে হতে পারে। কিন্তু অমিতাভ কি কড়া নিয়মকানুন মেনে চলতে পারবেন?

অমিতাভ নিজেই কবুল করলেন না ডাক্তারবাবু! আমার যা কাজের চাপ তাতে কোন রকমে ঠেকা দিয়ে চালান ছাড়া উপায় নেই।

আমি দিল্লি বোমবেতেও কলকাতার মতই অজস্র ব্রংকাইটিসের রুগি পেয়েছি। বেশির ভাগেরই রোগটি এসেছে পরিবেশ দূষণের জন্য। এটাকে অ্যালারজিক ব্রংকাইটিস বলা হয়।

অভিষেকের মত শিশুর ব্রংকাইটিস হলে অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। ছেলে-বুড়ো সকলেরই এই অসুখটি হতে পারে। ভয়েরও কিছু নেই। এমনকি বংশগত হলেও ঘাবড়াবার দরকার নেই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে বংশে কারো রোগটি থাকলে শিশুর মধ্যেও এর উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অবিলম্বে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে এই অসুখের চিকিৎসার জন্য আমি কতকগুলি ওষুধের কথা এখানে বলছি। তবে সব সময়েই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অবশ্য ভাল।

ওষুধগুলি হল : ব্যাসিলিয়াম–২০০; নেট্রোসালফ ৩০ বা ২০০; সুনজিয়া ৩০ বা ২০০; ক্যালিকার্ব ক্যালিবাইক্রোমিকাপ; হিপারসালফ আবসেনিক; অ্যারোলিয়া; গ্রাইনডেলিয়া; ব্যাসিলাইনাম; থুজা ইত্যাদি।

এই অসুখের রোগীদের জন্য আরও কয়েকটি পরামর্শ দিচ্ছি; ক) সিগারেট ছেড়ে দিলেই উপকার পাবেন অনেকটা; খ) ধুনো, ধোঁয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবেন; গ) ঠান্ডা লাগাবেন না; ঘ) এয়াব কনডিশনড সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোঁরা ইত্যাদি জায়গায় যতটা সম্ভব কম যাতায়াত করবেন; ঙ) বৃষ্টিতে ভিজবেন না।

সাইনোসাইটিস-সোজা কথায় সাইনাস রোগে কলকাতার বহু মানুষ ভুগছেন। শুধু কলকাতা বললে মনে হতে পারে যেন দিল্লি বোমবেতে কারো এই অসুখটা হয় না।

আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি খুবই হচ্ছে। এমনকি লনডন, আমেরিকাতেও দেখেছি সাইনোসাইটিসের আক্রমণের বহর ক্রমশই বাড়ছে। নগর সভ্যতার সুফলগুলির সংগে বহু ভয়াবহ কুফলও আমাদের হজম করতে হচ্ছে। সাইনাসের অসুখ তার ভেতরে একটা। দূষিত বায়ু আর নানা রকমের জীবাণু আমাদের নাক দিয়ে প্রতিমুহূর্তে ঢুকছে নিঃশ্বাসের সংগে। তার ফলে শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাইনাসের ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপকভাবে। সাইনাসে হচ্ছে ইনফেকশন। নাকে আর কপালে শ্লেষ্মা জমে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করেন রুগি।

বেশিদিন শ্লেষ্মা জমে থাকার ফলে নাক দিয়ে পচা গন্ধ ছাড়ে। তার কারণ শ্লেষ্মা নাকে আর কপালে জমে থাকতে থাকতে পচে যায়। অনেকেরই নাক দিয়ে তেলের মত পদার্থ বেরোতে থাকে এর ফলে। রক্ত পড়াও বাদ যায় না।

এই অসুখে হয়ত মৃত্যু হয় না ঠিকই। কিন্তু ভুক্তভোগীরাই জানেন সাইনোসাইটিসের যন্ত্রণা কী মারাত্মক।

এই অসুখটিকে অবহেলা করার ফলে চোখের ক্ষতি হয়। কানেরও ক্ষতি হয় খুব। গোটা শরীরেই আস্তে আস্তে ইনফেকশন ছড়িয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই রুগির কাজ করার ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। সব সময়ে মনে হয় মাথাটা বুঝি যন্ত্রণায় ছিঁড়েই যাবে। চোখের যন্ত্রণা, কানের কষ্ট হতে থাকে।

মাস ছয় সাত আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। রুগি ভারতের একজন বিখ্যাত শিল্পপতি–প্রায় টাটা বিড়লা গোত্রের মানুষ। তিনি বেশ কয়েক বছর ভুগছেন সাইনোসাইটিসে। রাতেও ঘুমতে পারেন না। দেশে তো বটেই, বিদেশেও বড় বড় জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু অবস্থার হের-ফের হয়নি। মাথার যন্ত্রণায় সব সময় ছটফট করছেন ভদ্রলোক। তাঁর চিকিৎসা করে সারিয়ে দিই। তখন আর তাঁর মাথার যন্ত্রণা নেই। রাতেও ঘুম হয় চমৎকার।

এক উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রীর কথা বলতে পারি। তিনিও এই অসুখে ভুগছিলেন। জীবন তাঁর দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাঁকে সুস্থ করার পরে আমার দেওয়া সেই ওষুধ তখন তিনি তাঁর পরিচিত অন্যান্য সাইনোসাইটিস রুগিদের দিয়ে থাকেন। সেদিন ভদ্রমহিলা নিজেই এই ডাক্তারির কথা বলছিলেন।

আপনারা জানলে খুশি হবেন, খুব সাধারণ কয়েকটা কাজ করলে এই রোগটিকে প্রতিরোধ করা যায়।

যেমন রোজ কুসুম কুসুম গরম জলে নুন মিশিয়ে নাক দিয়ে টানলে খুব ভাল ফল হবে। প্রথম প্রথম নাক দিয়ে জল নিয়ে নাক দিয়েই ছেড়ে দেওয়া সহজ। আস্তে আস্তে অভ্যাস করলে ঐ জল মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসবে। এধরনের জল নেওয়া-ছাড়ায় সাইনোসাইটিসের রুগিরা খুব উপকার পাবেন।

প্রক্রিয়াটা অবশ্য নতুন কিছুই নয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা অনেক আগেই এইসব চিকিৎসার কথা বলে গিয়েছেন। খুব শীতের সময়ে আমি ইংল্যানডেও দেখেছি বহু রুগি এইভাবে জল নিয়ে-ছেড়ে উপকার পেয়েছেন। গরম নুন জলে গারগল করেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আমি শহরের বাসিন্দাদের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ জোর দিতে চাই।

তাঁদের আরও কয়েকটা পরামর্শ দিয়ে রাখি। তাহলে অসুখ ও ওষুধ দুটোই এড়ান যাবে। ক) সকালে উঠে কিছুক্ষণ টানা নিঃশ্বাস নিন আর ছাড়ুন। খ) ধোঁয়া-ধুলো যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। গ) যদি ঐসব জায়গায় নেহাৎ যাধা হয়েই যেতে হয় তাহলে নাকটি বেশ ভাল করে চাপা দেবেন।

সাইনোসাইটিসের জন্য ওষুধগুলি এবারে বলছি।

১। ক্যামি আয়ড ২০০
২। ক্যালিবাইক্রোসিকাস ২০০
৩। অনস সোডিয়াম ২০০
৪। আইরিশভারস ২০০
৫। স্যাংগুইমেরিয়া ক্যানাডেনসিস ২০০
৬। ঐ নাইট্রিকাস ২০০
৭। অ্যাসন কার্ব ২০০
৮। অ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩০ বা ২০০
৯। বেলেডোনা ঐ
১০। ব্রায়োনিয়া ঐ
১১। জেলসিমিয়াম ঐ
১২। সাইলেশিয়া হিপার সালফ

অসুস্থ অবস্থার প্রথম দিকে বেলেডোনা, অ্যাকোনাইট ব্যবহার করে না সারলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন।

সাইনোসাইটিসের সংগে সংগে কানে ব্যথা, পুঁজ পড়া উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধগুলি হল:

১। পালসিটিলা ৩০ বা ২০০
২। ক্যালকেরিয়া কার্ব ঐ
৩। ক্যালিমিউর ঐ

আর যদি কান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ব্যারাইটামিউর দেওয়া চলে।

সাইনোসাইটিসের চোটে চোখটিও লাল হয়, ব্যথা, পুঁজ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধ হল :

১। বেলেডোনা ৩০ বা ২০০
২। রাসটকস ঐ
৩। ইউফ্রেশিয়া ঐ
৪। হিপার সালফ ঐ
৫। সাইলেশিয়া ঐ
৬। ক্যালকেরিয়া পিক ঐ
৭। আরজেনটাম নাইট্রিকাস ঐ

তবে বিভিন্ন লক্ষণের ওপরে তো ওষুধের কাজ নির্ভর করে। তাই ডাক্তারবাবুর সংগে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। ☐

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল-৬৪

১		২	৩	■	৪		৫
	■	৬		৭		■	
	■		■		■	৮	
৯	১০	■	১১		■	১২	
■	১৩			■	১৪		■
১৫		■	১৬			■	১৭
	■	১৮		■	১৯	২০	
২১				■	২২		■

সূত্র : পাশাপাশি

১। শুরুতেই 'সুতো পড়ল'
৪। সমুদ্র সন্ধান
৬। হাব-ভাব
৮। বাসি নয়, একেবারে টাটকা
৯। শব্দ কিংবা পাখির ডাক
১১। গলায় দিলে পরাজয়
১২। গলা চুলকোয়? নাকি রাগ হয়েছে?
১৩। হিপিদের প্রিয় নেশা
১৪। চতুরে কিংবা মাসটারমশাই এর হাতে
১৫। নদীর হঠাৎ আসা জলস্রোত
১৬। মাথার ঠিক নেই যার
১৮। এ জিনিস বেকারে পায়, চাকুরেও চায়
১৯। দাঁত পরিষ্কার করতে লাগে
২১। এক রকমের পাতাল
২২। সোজা কথায়, নমস্কার করি

সূত্র : ওপর-নিচ

১। ছুতোর মিস্ত্রি হাজির
২। সামনে 'পা' দিয়ে অনেক উঁচুতে
৩। একেবারে নিচে
৪। ঋজু গাছ কিংবা বছরের হিসেব
৫। মুসলমানি পরব
৭। শীতকালের সংগী
৮। চিবিয়ে খান, নাকে দিন, দাঁতে লাগান—নেশা হবে
১০। কথার কথা—তবে খনার সংগে মানায় ভাল
১১। বাঁচতে হলে কিংবা মরতে হলে লোকে আসে
১৪। চলছেই
১৫। সারা কলকাতাটাই এখন '–'
১৭। এখানে একটি গরিব লোক
১৮। বাঙালির প্রধান খাদ্যটি উপস্থিত
২০। জায়গা বা জিরেত

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৫ অকটোবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২২.৯.৮৩।

সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের উপর শব্দশৃংখল-৬৪ লিখতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল—৬০ (সমাধান)

চা	ম	ড়া	■	য	স	ল	দং
বি	য়া	■	ভ	■	খা	তা	■
■	ল	শ	ক	র	■	মো	মা
সা	■	হি	ত	বা	ণী	■	গ
বা	রি	দ	■	র	■	চা	রি
লি	■	■	গ	■	মৌ	চা	ক
কা	ঠি	■	দা	মা	মা	■	■
■	ক	ড়া	ই	■	ছি	ব	ড়ে

শব্দশৃংখল ৬০-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন শাশ্বত ব্যানারজি (২০/৩ চারুচন্দ্র সিংহ লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া) এবং নিমাই চাঁদ সাউ (নামখানা বি ডি ও অফিস, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা) শব্দশৃংখল- ৬০ লটারিতে বিচারক ছিলেন বিনতা রায়চৌধুরী (সাহা)।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

[সেপটেমবর ৭ থেকে ১৩]

মেষ : শরীর সংক্রান্ত ব্যাপার শুভ; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম। কর্মক্ষেত্রে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও এগনো যাবে; মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন কোন সমস্যা বিব্রত করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন প্রিয়জনের দ্বারা ক্ষতি। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে নতুন বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃষ : ফোঁড়া-ব্রণ ইত্যাদি ভোগাতে পারে; মেয়েদের কোন আঘাত। আর্থিক ব্যাপারে অন্যের মতামত এড়িয়ে চলা উচিত। কর্মক্ষেত্রে কারও আচরণ বিশেষ ব্যথিত করবে; মেয়েদের কর্মস্থলে আগের জটিলতা দূর হয়ে যাবে। কোন সন্তানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়। দূর ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোগ।

মিথুন : শরীর ভোগাবে; মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা চলবে। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে কোন ভুলভ্রান্তির জন্য অসম্মান, অনুতাপ; মেয়েদের কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কারও বিশেষ সহায়তা লাভ। পারিবারিক কোন ব্যাপারে ভীষণ মতান্তর, অশান্তি। মেয়েদের বন্ধুদের পরামর্শে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের হঠাৎ মন্দা।

কর্কট : অম্বল-অজীর্ণ নতুন করে বিব্রত করবে; মেয়েদের ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। আর্থিক ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত শুভ। কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে নড়া ঠিক হবে না; মেয়েদের নিজের দোষে নতুন সমস্যা সৃষ্টি। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে সন্তানদের কারও আচরণে। স্ত্রীর জন্য ঋণ। ব্যবসায়ীদের উন্নতির ইংগিত।

সিংহ : মানসিক উদ্বেগ চলবে সম্ভাহভব; মেয়েদের ব্যথা বেদনা কাবু করবে। আর্থিক সচ্ছলতা কিন্তু অন্যের প্ররোচনায় বড় রকমের ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে সচেতনতার অভাবে কোন সুযোগ হাতছাড়া; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন কৌশলে কার্যোদ্ধার। পারিবারিক কোন ঘটনায় আত্মসম্মানে আঘাত। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কন্যা : হঠাৎ ভোগান্তি শরীর নিয়ে; মেয়েদের পেট সংক্রান্ত কোন অস্ত্রোপচার। কোন ঋণ বিশেষ বিব্রত করবে; আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা কর্মক্ষেত্রে কোন জটিলতা দূর হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে অন্যের ব্যাপারে মাথা না গলানোই ভাল। কোন অনুজের দ্বারা বড় রকমের প্রবঞ্চনার আশংকা। ব্যবসায়ীদের নতুন যোগাযোগ।

তুলা : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর গতানুগতিক। আর্থিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তৎপর সিদ্ধান্তের প্রয়োজন; মেয়েদের কর্মস্থলে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে। পারিবারিক বিরোধ তুংগে উঠবে। আচমকা প্রাপ্তিযোগ মেয়েদের। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বৃশ্চিক : পেট সংক্রান্ত ঝামেলা চলবে; মেয়েদের মেয়েলি রোগ ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য; মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়। কর্মস্থলে অন্যের পরামর্শে ক্ষতির আশংকা; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কাজের চাপ। সন্তানদের কারও বিয়ের ব্যাপারে নতুন সমস্যা। ব্যবসায়ীদের আয় বাড়বে।

ধনু : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর উৎপাতসূচক। আচমকা ব্যয় ও অর্থহানি। কর্মক্ষেত্রে বিভাগীয় বদলি; মেয়েদের কর্মস্থলে স্বকীয়তা স্বীকৃত হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে দূরের আত্মীয় কুটুম্বদের আগমনে আনন্দ। কোন সন্তানের কর্মলাভ। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

মকর : রক্তচাপজনিত রোগ ভোগাবে; মেয়েদের বিশেষ রক্তপাতের আশংকা। আর্থিক ক্ষেত্র আশাব্যঞ্জক। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি কিন্তু মানসিক উৎকণ্ঠা; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে শেষ মুহূর্তে পরাজয়। মেয়েদের প্রেম-প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সমঝোতা। গৃহাদি সংস্কার-বদলির ইংগিত। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : চোখ সংক্রান্ত কোন গোলমাল ভোগাবে; মেয়েদের চর্মরোগ বিব্রত করবে। আর্থিক ব্যাপারে ঝুঁকি নিলে ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তায় সুফল পাওয়া যাবে; মেয়েদের কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে দূর ভ্রমণ। কোন বন্ধু সুহৃদের আকস্মিক বিয়োগের আশংকা। মেয়েদের কারো অযাচিত উপদেশে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

মীন : ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর; মেয়েদের পিঠের কোন ব্যথা-বেদনা বিশেষ ভোগাবে। আর্থিক টানাটানি; সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা; মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট বিরোধ। কর্মপ্রার্থীদের দূরের কোন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

বলছি। আগে খেয়ে নিন – তারপর।

ঘরে ঢুকল দেবনাথ। ফের আড়ষ্ট হয়ে গেল বাসন্তী গুপ্ত।

একটু পরেই এল লস্যি আর রাজভোগ।

অনেক পীড়াপীড়ি করার পর লস্যির গেলাসে চুমুক দিল প্রৌঢ়া – রাজভোগ পড়ে রইল।

কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। যেন কাঠের পুতুল। ভয়ার্ত চাহনি অনুসরণ করছে দেবনাথকে।

মাসিমা, আপনার আসল নাম কী?

বাসন্তী গুপ্ত।

ঠিকানাটা মিথ্যে?

হ্যাঁ।

কেন?

আর জল ঘোলা করতে চাই না বলে।

এরপরেই ইন্দ্রনাথ যা বলল, তা শুনে সজোরে চড় খাওয়ার মত চমকে উঠল বাসন্তী গুপ্ত। সেই সঙ্গে দেবনাথ আর মৃগাঙ্ক।

কিন্তু না জানলে শ্রাবন্তীর হত্যাকারীকে বার করব কী করে?

কী হবে বার করে?

মা হয়ে মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন না?

(চলবে)

সম্পাদকীয়

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া এখন দৃঢ় সংকল্প। শইকিয়া ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আসামের আন্দোলনকারীদের বাড়া-ভাতে ছাই দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা তাঁর এই প্রস্তাবটিকে অবাস্তব ও অপরিণামদর্শী বলেই মনে করি। মনে রাখতে হবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত একটি সাজান বাগান নয়, ৩,৩০০ কি মি বিস্তৃতএক ভূখণ্ড।এই বিরাট সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে একবার ঘিরতেই ৫00 কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর উপর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় দাঁড়াবে বছরে আরও অন্তত একশ কোটি টাকা। দ্বিতীয়ত সীমান্ত বরাবর দুর্বৃত্ত ও চোরাচালানকারীরা এত সক্রিয় যে একটু সতর্কতার অভাব ঘটলেই মাইলের পর মাইল তার লোপাট হবার সম্ভাবনা। জনাকীর্ণ নগরীর মধ্য থেকে দুর্বৃত্তরা যেখানে পারকের রেলিং, টেলিফোনের ভূগর্ভস্থ তার, বৈদ্যুতিক ট্রেনের উচ্চ ভোলটেজের তার কেটে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে গভীর জংগলের মধ্যে বা জনবিরল স্থানে কাঁটাতারের বেড়া কীভাবে অব্যাহত থাকবে তা আমাদের অজানা।

আর অনুপ্রবেশের অভিযোগ শুধু কি বাংলাদেশ থেকেই? নেপাল থেকেও তো বহু ব্যক্তি এসে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং বহু ভারতীয় এলাকায় তারা বসতি স্থাপন করেছে। তাহলে তো গোটা নেপাল-ভারত সীমান্ত ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া লাগাতে হয় এবং ভারতীয় কাঁটাতারের উৎপাদনকে ফসল উৎপাদনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। ভারতবর্ষের অসীম ভাগ্য যে হিমালয় এবং সমুদ্র তার প্রাকৃতিক সীমান্ত-প্রহরীর কাজ করছে। তা নাহলে গোটা ভারতকেই হয়ত শাসক গোষ্ঠী একটি লৌহ যবনিকায় পরিণত করতেন।

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সীমান্ত যে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তত বর্তমান পৃথিবীতে দুই বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে এমন নজির আমাদের জানা নেই। আমরা এতদিন জানতাম বহির্গমন রোধের জন্যই ইওরোপের কোন কোন রাষ্ট্র সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়, প্রাচীর তোলে, সীমান্তে মাইন পুঁতে রাখে। কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ঠেকানর জন্য এবম্বিধ জংগীসুলভ উদ্যম কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চোখে পড়েনি। আজ যখন বিশ্বের আধুনিক প্রবণতা - সমমর্মী রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, শুল্ক বিলোপ, অবাধ যাতায়াত, সেখানে এক প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের মাঝামাঝি কাঁটাতারের বেড়া তুলতে হচ্ছে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এটি অত্যন্ত পরিতাপ-জনক ঘটনা। এর ফলে অনুপ্রবেশ কতখানি আটকান যাবে জানি না, কারণ পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র থেকে সীমান্ত-প্রহরীদের প্রবল কড়াকড়ি সত্ত্বেও স্মাগলিং ও উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা যায়নি। বাংলাদেশের সামরিক প্রশাসক লে: জে: এরশাদ এই সীমান্ত-বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর প্রতিবাদের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। এবং ভারত স্বচ্ছন্দে সে প্রতিবাদ উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু এই কাঁটাতারের বেড়া উভয় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ মৈত্রীর পথে একটি কাঁটা যে হয়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

আসামে বিদেশি অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে সমস্যা। কিন্তু এতদিন অনুপ্রবেশ ঘটেছে রাজনীতিবিদদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে, সীমান্ত-রক্ষীদের অসাধুতা ও পুলিশের সমর্থনে। যে কোন রাষ্ট্রেরই অধিকার আছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রবেশে বাধা দেবার কিন্তু তার জন্য একটি সদা তৎপর পুলিশী ব্যবস্থাই যথেষ্ট ছিল। কাঁটাতারের বেড়া না দিয়ে সরকার সমস্ত সীমান্ত রাজ্যগুলির অধিবাসীদের জন্য আবশ্যিক পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা রাখুন। পাঁচশ কোটির অনেক কম ব্যয়ে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। বিদেশে বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এই ব্যবস্থা চালু আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে তো আছেই। সেই সংগে সীমান্তরক্ষীদের আরও তৎপর করুন, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারি আরও তীব্র করুন। পুলিশ ও সীমান্ত-রক্ষীবাহিনীর চরিত্র যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে তারাই কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে অনুপ্রবেশকারীদের ভেতরে আসার পথ করে দেবে।

পরিবর্তন

১৪-২০ সেপ্টেম্বর, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১১

দাম ২.৫০ বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
(পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

২১ সেপটেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

'বাংলাদেশের অভ্যন্তরে' পর্যায়ে
এবারের প্রতিবেদন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পর্কে এটি একটি অনালোচিত প্রতিবেদন। বাংলাদেশে এখনও প্রায় দু'কোটি হিন্দু আছেন। বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছেন নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও সরকারি তৎপরতার অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের নানা অভাব অভিযোগ আছে। কী এইসব অভাব অভিযোগ? কী চান তাঁরা? এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সংগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক জগন্নাথ হল সম্পর্কে একটি বকস আইটেম -'এই কথাটি মনে রেখো'।

মাফিয়ানগরী বোমবাই

মাসখানেক আগে পরিবর্তনের পক্ষ থেকে কয়েকটি অন্তর্তদন্ত করার জন্য বোমবাই পাঠান হয় একজন ফ্রিলানস সাংবাদিককে। তারই একটি কিস্তি এবার প্রকাশিত হচ্ছে। স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য বোমবাই। কীভাবে সেখানে গড়ে উঠেছে এক মাফিয়ারাজ্য তার রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে দুটি রচনা

'বিধবা বিবাহ আজও জনপ্রিয় হল না কেন?'

ও

'কারমাটারে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের স্বপ্ন আজও সফল হয়নি।'

শেখ ফারুক আবদুল্লা কলকাতায় এসে প্রায় এক ঘন্টার একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে গেছেন পরিবর্তনের প্রতিনিধিকে।

এ ছাড়া আরও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক রচনা ও ফিচার।

নিবেদনমিদং

এবার পুজোয় আসুন আমাদের গ্রামে' এই অভিনব শ্লোগানটি বহু মানুষকে যে স্পর্শ করেছে তার প্রমাণ আমরা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। মাত্র দশ পনের টাকা খরচ করে বাংলার কোন নিভৃত গ্রামে আন্তরিক পরিবেশের মধ্যে যদি শহরের মানুষ পুজোর একদিন দুদিন অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন এর চেয়ে বড় জিনিস আর কী হতে পারে। আমরা আনন্দিত গ্রামের মানুষ পরিবর্তনের এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন। যাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন শহরবাসীদের 'আসুন আমাদের গ্রামে।' অনেকে থাকার জায়গা ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। এই চিঠিগুলি ২১ সেপটেমবর কিছু ও ৫ অকটোবর কিছু মোট দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হবে। পুজো সম্পর্কিত আর কোন চিঠি দয়া করে পাঠাবেন না। পশুবলি সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও পুজোর বেলেল্লাপনা বন্ধ হোক পর্যায়ের চিঠিপত্র আমরা ৫ অকটোবর প্রকাশ করব। যাঁরা পরিবর্তনে প্রকাশিত আমন্ত্রণলিপিতে সাড়া দিয়ে এবার পুজোয় গ্রামে যাবেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে ভুলবেন না। যাঁরা ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা অল্প কথায় আমাদের জানাবেন। বিশেষ করে কী কী অসুবিধার মুখে আপনাদের পড়তে হয়েছে সেগুলি জানাতে ভুলবেন না। ভারতবর্ষে জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ পর্যটন, অথচ আজও এদেশে সুষ্ঠু পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। ট্রেনে, বাসে, হোটেলে, সর্বত্র পর্যটকরা নানা অসুবিধা ভোগ করছেন। এইসব অসুবিধার কথা প্রকাশ হওয়া দরকার। ২৮ সেপটেমবর পরিবর্তনের কোন সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে না। ওই দিন প্রকাশিত হচ্ছে পুজো সংখ্যা। পুজো সংখ্যায় আমরা বৈচিত্র্যমূলক রচনা ছাপবার চেষ্টা করেছি। যেমন ধরুন, প্ল্যানচেট ও ডাইনীর উপর দুটি দারুণ আকর্ষণীয় লেখা আছে। রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত সংকর্ষণ রায় লিখেছেন সাগরের নিচে যে সম্পদ আছে তার কাহিনী। গত বছর আমরা কমল হাসানের একান্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলাম। এবার শত্রুঘ্ন সিনহা দিয়েছেন দীর্ঘ একান্ত সাক্ষাৎকার। পুজো এগিয়ে আসছে। আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে প্রাকপুজো সংখ্যা (৫ অকটোবর) ও পুজো অবকাশ সংখ্যা (১২ অকটোবর)। পুজো অবকাশ সংখ্যায় থাকবে চিত্তাকর্ষক বিশেষ রচনা যাকে আপনারা মিনি পুজো সংখ্যাও বলতে পারেন। সবশেষে আমাদের আর একটি ঘোষণার কথা জানাই। পরিবর্তন মৈত্রী সংঘের জন্য ইতিমধ্যেই বহু আবেদন এসেছে। আমরা পুজোর পর থেকে নাম ঠিকানাগুলি ছাপতে শুরু করব। বিনা পণে বিবাহের পক্ষে আমাদের প্রচার অভিযান অব্যাহত থাকবে। ১৯৮৫ সালের মধ্যে আমার এক সহস্র উদারমন তরুণ চাই যাঁরা বিনা পণে বিবাহের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করবেন। নভেমবরে আমরা একটি বিশেষ বিবাহ সংখ্যা প্রকাশ করছি। এই সংখ্যার জন্য "দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠি কী -" এই সম্পর্কে ৩০০ শব্দের মধ্যে লেখা পাঠাতে বলেছি। ওই সংখ্যায় আমরা পরীক্ষামূলকভাবে বিবাহের বিজ্ঞাপন ছাপব। আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগ ন্যূনতম ৫০ টাকায় বিজ্ঞাপন ছাপতে রাজি হয়েছেন। তবে বকস নমবরের জন্য অতিরিক্ত দশ টাকা বেশি দিতে হবে। এই বিজ্ঞাপনের বিস্তৃত রেট ২৮ সেপটেমবরের পরিবর্তনে প্রকাশিত হবে। তবে পাশাপাশি বিনা পণে বিবাহেচ্ছু তরুণদের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপা হবে। বিনা পণে বিবাহেচ্ছু তরুণরা ৫০ পয়সার ঠিকানা লেখা খামসহ ফরমের জন্য লিখুন। ইতিমধ্যে বিনা পণে বিবাহের জন্য যাঁরা নাম ছাপিয়েছেন তাঁরা চিঠির বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন। আমরা একটি চিঠি প্রকাশ করলাম। এটি থেকেই পাঠকের বোধগম্য হবে পরিবর্তনে দু লাইন কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ফলাফল কী -

পা. চ.

প্রতিদিন গড়ে ৭০/৭৫ টি করে চিঠি পাচ্ছি। সুদূর বমবে, ভূটান, ব্যাংগালোর, ত্রিপুরা, অর্থাৎ আসমুদ্র হিমাচল, যেখানেই বাঙালি, সম্ভবত সেখানেই 'পরিবর্তন' পৌঁছেছে। ১০.৮ তারিখে বিনা পণে বিয়ে করব বিজ্ঞাপন দেখে, যেমন বিশিষ্ট মন্ত্রী-তাঁর নিকটতম আত্মীয়ার জন্য লিখেছেন, তেমনই বিশিষ্ট ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে দরিদ্র মানুষরা সকলেই লিখেছেন। চিঠির বন্যায় ভেসে যাচ্ছি। সকলকে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিতে গেলেও প্রায় বছর খানেক লাগবে। বেশ কয়েকটি জায়গায় অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছি। ফলে কেবলমাত্র তাঁদের সংগে ছাড়া অনিবার্য কারণে আর কারও সংগে যোগাযোগ করে উত্তর দিতে অক্ষম।

বিদ্যুৎ ঘটক
স্কুলডাংগা, বাঁকুড়া

নিছক ভ্রম

আমি পরিবর্তনের নিয়মিত পাঠক। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আপনাদের সংবাদ ও লেখা পাঠকদের বেশ আকর্ষণ করে। কিন্তু 'অতি জনপ্রিয়তা'র প্রলোভনে ধীরে ধীরে পত্রিকাটি হালকা হয়ে যাচ্ছে। 'কালান্তরে' বিপ্লবী আব্দুর রেজ্জাক খানের প্রতিবাদ পড়লাম। এখন আমাকেও প্রতিবাদের লেখনী ধরতে হল। ১৭-২৩ আগসট সংখ্যায় মহাশ্বেতা দেবীর নামে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছেন তাতে যে ফটোটি ছাপিয়েছেন, তা বিডার নাগের নয়, সি পি আই এম এল এ তুলসী রজক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পূর্ণেন্দু মজুমদারের ফটো। ইতিমধ্যে এ ফটো 'কালান্তরে' ও দিল্লির 'নিউএজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটিকে কী বলবেন? সৎ সাংবাদিকতা ও রুচিসম্পন্ন সংস্কৃতি বোধের প্রকাশ?

প্রতিবাদপত্রটি প্রকাশিত হলে সততার পরিচয় পাব। ভাববো, এটা নিছক 'ভ্রম'।

গোবিন কাঁড়ার,
হাওড়া

লেখিকার বক্তব্য

গৃয়াতে বিদর নাগের হত্যাবিষয়ক লেখাটির সংগে মুদ্রিত ছবিটি বিদর নাগের নয়। তুলসী রজক এম এল এ এবং পূর্ণেন্দু মজুমদারের। ওটি ভ্রম এবং কোন অসাবধানতায় ঘটেছে তা আপনারা দেখবেন। এই ছবিটি অন্যান্য কাগজে বেরিয়েছে বলে কিছু প্রশ্ন উঠেছে বলে জানলাম। এক ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় তখনি বেরোয়, যখন তা একই উৎসে প্রাপ্ত। জানান দরকার মনে করি, চাইবাসার রঞ্জিত দাশ নিজেকে বিপন্ন করে এ বিষয়ে তথ্য জোগাড় করেন ও ছবি সংগ্রহ করেন। সংবাদটির গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি অনেককেই তথ্য ও আলোকচিত্র দেন। একই ছবি শুধু 'নিউ এজ' ও 'কালান্তর' ছাপেনি, কলকাতার একটি ইংরিজি দৈনিকও প্রকাশ করে। আমি নিজে রঞ্জিত দাশ প্রদত্ত তথ্য থেকে কয়েকটি ইংরিজি ও বাংলা রিপোরট লিখেছি, স্বয়ং রঞ্জিত দাশের লেখা 'অনুষ্টুপ' কাগজেও বেরিয়েছে এ মাসে। প্রসংগটি গুরুত্বপূর্ণ, এ নিয়ে সিংভূমে আন্দোলন চলছে এবং সমস্যাটির গুরুত্ব বিবেচনায় এসব তথ্য ও ছবি (শুধু এটি নয়) নিশ্চয় অন্যত্রও ব্যবহৃত হবে। কোন কাগজই সম্ভবত অন্য কোন কাগজ থেকে ছবি 'লিফট' করেননি। এখানে, যিনি একই বিষয়ক ছবি বহু জায়গায় দিয়েছেন, তাঁর কাছে সমস্যাটি আলোকিত হওয়াই বড় কথা ছিল। আমি রঞ্জিত দাশের কাছে প্রাপ্ত ছবিই আপনাদের দিই। যখন আমি লেখাটি আপনাদের পাঠাই, তখন অবধি সংবাদদাতার পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এখন তেমন কোন বাধা নেই। রঞ্জিত দাশের ও পূর্ণেন্দু মজুমদারের সংগে আমার যথেষ্ট যোগাযোগ আছে এবং যা যা লিখলাম সবই তাঁরা জানেন। রঞ্জিত দাশ ওই ছবি কোথায় পেয়েছেন, তা তিনিই ভাল জানবেন। একটি ইংরিজি দৈনিকও এই ছবি ছেপেছে। এ ছবি ছেপে 'পরিবর্তন' কোন সাংবাদিক অসততার পরিচয় দিয়েছে এমন বলা হাস্যকর,—আর আন্দোলন তো চলছে। যাঁরা জড়িতে জড়িত, তাঁরা তা ভাবছেন না, এর চেয়ে বেশি বলা গেল না।

মহাশ্বেতা দেবী
কলকাতা

মিথ্যে দোষারোপ

পরিবর্তনের ২ জুন '৮২ সংখ্যায় 'বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শিশু পাচার চক্র ও রহস্যময় পুরুষ জ্যাক প্রেগর' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপান হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আমাকে আমার সম্পর্কে কিছু না জেনেই হেয় এবং চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তদন্তে প্রমাণিত হয় এই সব কুমীর ছানার মাংসখেকো শিয়াল পণ্ডিতরাই শিশু পাচার চক্রের পাণ্ডা।'

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে যেসব অনাথ শিশুকে বিদেশে পাঠান হয়েছে তা বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের অনুমতিক্রমেই এবং বাংলাদেশ সরকারের সুদৃঢ় সমর্থন ছাড়া একটি শিশুও দেশ থেকে বাইরে যায়নি এবং তার প্রয়োজনীয় কাজগপত্রও রয়েছে।

পরিবর্তনের প্রতিবেদকদ্বয় গভীরভাবে অনুসন্ধান না করেই একজন ভণ্ড বিদেশির (জ্যাক প্রেগর) বক্তব্যের উপর নির্ভর করে কীভাবে আমাকে আমার সংস্থাকে দোষী করলেন তা আমার সামান্যতম চিন্তায়ও আসে না। আর যেখানে উক্ত বিদেশিকেই আপনারা 'রহস্যময় পুরুষ' বলেছেন সেখানে কী করে তার বক্তব্যের উপর নির্ভর করে অন্যকে দোষারোপ করেন বুঝতে পারি না।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আপনাদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় এরকম প্রতিবেদনের ফলশ্রুতিতে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সামরিক আইনে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং মাননীয় আদালতের বিচারে প্রমাণিত হয় ঐ সমস্ত সংবাদ মিথ্যা। ভিত্তিহীন।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার পরে আমি একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিবাদটি আপনারা প্রকাশ করেননি কিংবা সেটা আপনাদের হাতে পৌঁছায়নি, যার ফলে সম্ভব হয়নি প্রকাশ করা। বাংলাদেশে আপনার অবস্থানের সময় সম্পূর্ণ সত্য বিষয়টি আপনাকে অবগত করাবার পরে আপনি সম্মত হয়েছে যে, আমার প্রতিবাদ আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করে পাঠকমনের বিভ্রান্তি নিরসন করবেন।

অবশেষে, অনুরোধ করব শুধুমাত্র বিশেষ সেনসেসন সৃষ্টির জন্যে ভুল সংবাদ, তথ্য পরিবেশন করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করবেন না। কেননা, গোষ্ঠীভিত্তিক চিন্তাভাবনার সহজ আবেগে আপ্লুত হয়ে তথাকথিত নির্যাতীত নিপীড়িতদের সপক্ষে প্রতিবেদন পেশ করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুনাম ক্ষুণ্ণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাছাড়া পাঠকদের কাছ থেকে মিথ্যে বাহবা পাওয়ার জন্যে এ ধরনের বানোয়াট ভিত্তিহীন প্রতিবেদন ছাপান থেকে বিরত থাকলে কখনো সাংবাদিকতার নীতি লংঘন হবে না। কেননা পাঠক সঠিক ঘটনা জানতেই আগ্রহী, অলীক সংবাদ জেনে বিভ্রান্তিতে পড়তে তারা রাজি নন।

মাসলেম আলী খান, ঢাকা

সুচিত্রা বাদ উত্তম?

পরিবর্তনের যতগুলি সংখ্যা পড়েছি তাতে শুধু মুগ্ধ নয়, বিস্মিত হইছি আপনাদের নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ দেখে, কিন্তু 'উত্তমকুমার স্মরণ সংখ্যা' পড়ে হঠাৎ হোঁচট খেলাম। কারণ আমার মনে হয় সুচিত্রা সেনকে বাদ দিয়ে উত্তমকুমারকে ভাবা যায় না। অর্থাৎ পূর্ণভাবে ভাবা যায় না! যে সমস্ত ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করে মহানায়ক' হয়েছেন, সেই সমস্ত ছবির প্রায় সবগুলিতেই সুচিত্রা সেন আছেন।

সেখ সেকেন্দার আলী
বাকসী, হাওড়া

ভরিল না চিত্ত

২০ জুলাই-এর 'উত্তম স্মরণ সংখ্যা' হাতে পেয়েই আদ্যোপান্ত পড়লাম। উত্তরকুমারের মৃত্যুর তিন বছর পরেও তাঁকে স্মরণ করার জন্য পরিবর্তন সম্পাদকের এই সাধু প্রয়াসকে প্রশংসা না করে পারি না। ধন্যবাদ শিল্প-নির্দেশক নিতাইবাবুকে, সংখ্যাটিকে বড় মনের মত করে সাজিয়েছেন তিনি। মূল্যবান স্মৃতিচারণার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক চিত্র সংযোজন যেন সোনায় সোহাগা। তবু যেন মনে হল 'ভরিয়াও ভরিল না চিত্ত'। আগামী বছর আবার 'পরিবর্তন' এই মহৎ কাজে প্রয়াসী হোক।

সুশান্তকুমার মাইতি
ইসলামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর

ভাষা নেই

'উত্তমকুমার স্মরণ সংখ্যা' পড়ে কত যে খুশী হয়েছি, তা এই সামান্য পত্রের মাধ্যমে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

উত্তরকুমার সম্বন্ধে প্রতিটি রচনা ও ছবি অতি নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা মন কাড়ার মত।

দুর্গাদাস চন্দ্র
দুবরাজপুর, বীরভূম

ছোটা সা মুলাকাৎ

'উত্তমকুমার স্মরণ সংখ্যা' 'পরিবর্তন' (২০ জুলাই ১৯৮৩) পড়লাম। 'হিন্দি চলচ্চিত্রে উত্তমকুমারকে কারা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করেছেন'—এ সম্পর্কে কলিন পালের বক্তব্য সোৎসাহে পড়তে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত, উত্তমকুমারের সঠিক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা এখনও হচ্ছে না।

উত্তমকুমার যখন বোমবায়ে 'ছোটী সী মুলাকাৎ' করেন, তখন পুরো ব্যাপারটাই তাঁর পক্ষে ছিল একটি খামখেয়ালি ঝুঁকি। তিনি পছন্দ করলেন 'অগ্নিপরীক্ষা'র মত একটি প্রাচীন সংস্কার-আশ্রয়ী 'প্লট'। অথচ তার 'ট্রিটমেনট' ও 'সেটিং' হয়ে গেল 'আলট্রা মডার্ন'। এখানেই দেখা দিল স্ববিরোধ। এ কথাও অনস্বীকার্য, 'অগ্নিপরীক্ষা'র কাহিনী নায়িকা-প্রধান। কতটুকু 'রোল' ছিল উত্তমের? সন্ত্রস্তভাবে কটি হিন্দি কথা উচ্চারণ করেছেন উত্তম এ ছবিতে। অভিনয় ক্ষমতা প্রকাশের পক্ষে কতটুকু সুযোগ ছিল 'ছোটী সী'-এর চিত্রনাট্যে? তাছাড়া বৈজয়ন্তীমালার লাস্যময়ী ভাবমূর্তি কি তখন থেকেই অপসৃয়মাণ হচ্ছিল না? উত্তমের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মঃ রফির 'প্লে-ব্যাক' এতটুকু খাপ খেয়েছে কি? এ ধরনের কমারসিয়াল ছবি করতে যা খরচ লাগে, 'ছোটী সী মুলাক্বাৎ' এ তা হয়েছে কি? তা হয়নি বলেই বিশেষভাবে গানের দৃশ্যগুলিতে মাত্র কয়েকটি 'শট' বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'প্রোজেকট' করা হয়েছে। আলো সরকারের পরিচালনার দোষে ছবিটিতে কোন 'সাসপেনস' সৃষ্টি হয়নি। অথচ 'প্লট'টিতে সে সুযোগ ছিল। দ্বিতীয়ত, হিন্দি ভাষাভাষী দর্শককুল ও পত্র-পত্রিকাগুলি বহুকাল থেকে উত্তমকুমারকে আখ্যা দিয়েছিল বাংলার দিলীপ-কুমার হিসেবে। এবং দিলীপ-কুমারের 'ইমেজ' তখন 'King of tragedy' রূপে। অতএব, উত্তমকুমারের উচিত ছিল কোন 'সিরিয়াস' চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়া।

অমলকান্তি বিশ্বাস
দুর্গাপুর ৪

অপূর্ব উত্তমকুমার সংখ্যা

পত্র-পত্রিকা মানুষের মন তৈরি করে। সেটার বড় প্রমাণ পেলাম ২৪ জুলাই শহরের বিভিন্ন স্থানে মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ-দিবসে প্রজ্ঞাপন দেখে। আমি মনে করি 'পরিবর্তন' পত্রিকা এই সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য আংশিক দায়ী। 'উত্তমকুমার' সংখ্যা এক-কথায় অপূর্ব। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তরুণকুমার
৪৬, গিরীশ মুখারজি রোড,
কলকাতা-৭০০০২৫

প্রশংসনীয় উদ্যম

পরিবর্তন বিশেষ নারী সংখ্যা পড়লাম। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দূরে থাকায় বাংলা পত্রিকা আর পড়া হয়ে ওঠে না। কারণ সহজলভ্য নয়। তবুও পরিবর্তনের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ আছে।

পণপ্রথার উপর পত্র বিতর্কের আহ্বান করে আপনারা যেভাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। আমি চাই Antidowry জনমত সমস্ত বাংলাকে উদ্বেলিত করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ুক।

সমরেন্দ্র গোস্বামী
বীরভদ্র, উত্তরপ্রদেশ

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় 'বনমানুষের হাড়' প্রকাশ করা সম্ভব হল না। — সম্পাদক

পাঁচ মিনিট

ঐতিহাসিক লং মারচ

আজ কলকাতার দৃশ্যটা একটু অন্যরকম। রাস্তায় কোন যানবাহন নেই। আছে শুধু পুলিশ আর পুলিশের গাড়ি। রাস্তার ধারে ধারে মোড়ের মাথায় মাথায় বাঁশের বেড়া বাঁধা। বেড়ার সেই বাঁশ ধরে ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আবালবৃদ্ধবনিতা। তাছাড়া বাড়ির দরজায়-জানালায়-ছাদেও শুধু মানুষ আর মানুষ। সবার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা—কখন আসবে সেই মিছিল, কখন শুরু হবে সেই বহু প্রতীক্ষিত 'লং মারচ'।

এই মিছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। কোন ধ্বনি-ধিক্কার নেই, 'চলবে না, চলবে না' নেই। আর কারো কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবার সরব আস্ফালনও নেই। কিন্তু এটা মৌন মিছিলও নয়। এই মিছিল রাজ্য সরকারের সক্রিয় তিন মন্ত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, মহানাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই মিছিল ৪২ হাজার গরু মোষের, যারা এতদিন কলকাতার বিভিন্ন খাটালে ছিল এবং যাদের অতি সম্প্রতি লাল কারড দেখিয়ে মারচিং অরডার দেওয়া হয়েছে। অবশ্য খাটাল মালিকরা এটা রদ করতে শেষ চেষ্টা করেছিল মহাকরণে মন্ত্রীদের সঙ্গে মিটিং-এর সময়। ওঁরা বলেছিলেন, দেখুন খাটাল যদি অস্বাস্থ্যকর হয় তাহলে আমাদের এত তাগড়াই স্বাস্থ্য কী করে হয়? মন্ত্রী মহোদয়রা সে কথায় কর্ণপাত করেননি। তাঁরা বলেছেন, কলকাতায় খাটাল রাখতে দেওয়া হবে না। রাজ্য সরকারের নিদানে এবং বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানে গঙ্গানগরে যে গোশালা তৈরি হয়েছে সব গরু-মোষ সেখানে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে জায়গা না হলে হরিণঘাটায়। অগত্যা খাটাল মালিকরা রাজি হয়েছেন। তাই আজ তাঁরা তাঁদের ৪২ হাজার গরু-মোষ নিয়ে ময়দানে সমবেত হয়েছেন। সেখান থেকেই শুরু হবে গঙ্গানগর ও হরিণঘাটার উদ্দেশ্যে লং মারচ। লং মারচ-এর রুট সেনট্রাল অ্যাভিনিউ, গিরিশ পারক, বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা হয়ে ভি আই পি রোড।

এই মিছিল দেখার জন্য আমরা প্রেসের লোকরা মহাজাতি সদনের সামনে সরকারের তৈরি প্রেস গ্যালারিতে বসে আছি। হঠাৎ শুনলাম ভটভটির শব্দ, সামনের পুলিশগুলো টান টান করে অ্যাটেনশন হল। প্রথমে অ্যারজেনট-পাইলট পেছনে ওয়ারলেস ভ্যান। গরু-মোষগুলি এগিয়ে চলেছে গদাই লশকরি চালে, এ ওকে ঠেলে গুঁতিয়ে। বাচ্চাগুলো তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে, হাম্বা, হা-ম-বা ডাকছে (এই জন্যই এটা মৌন মিছিল হয়নি)। ওরা জানে ওরা 'বেই বেই' যাচ্ছে। কিছু লোক লাঠি হাতে, মাঝে মাছে দু এক ঘা দিচ্ছে। এক বৃদ্ধা তাঁর নাতিকে বলছেন, দাদুভাই শেষ বারের জন্য গরু মোষ দেখে নাও। এরপর গরু-মোষ দেখতে গেলে কলকাতার বাইরে যেতে হবে, সে অনেক খরচের ব্যাপার।

এই সময় কয়েকটি গরু-মোষ হঠাৎ নিত্যকর্ম করে ফেলল। ব্যাস, ঘ্রাণ যায় কোথায়। 'গোমাতা কি জয়' বলে কিছু লোক পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তায়। লড়াই শুরু হয়ে গেল গোবর ও গোচোনা সংগ্রহের জন্য। পুলিশ লাঠি চারজ করবার জন্য তৈরি। এই সময় পশুপালনমন্ত্রী মাইক হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, বন্ধুগণ আপনারা গোবর-গোচোনা নিয়ে লড়ালড়ি কাড়াকাড়ি করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি আগামী সপ্তাহ থেকে প্রত্যেক মিলক ডিপো থেকে পলিথিন প্যাকেটে গোবর-গোচোনা ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হবে। মন্ত্রীর আশ্বাসে জনতা শান্ত হল। গরু-মোষরা আবার চলতে শুরু করল।

এই সময় এক রিটায়ারড দাদু মন্তব্য করলেন, কিন্তু আমি যে আমার নাতির জন্য রোজ খাটালে গিয়ে সামনে দুইয়ে খাঁটি দুধ নিতাম, কাল থেকে তো সেটা পাব না।

মন্ত্রীমশাই কোন উত্তর দেননি। □

নির্মল বিশ্বাস

এ আই সি সি টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন, প্রদেশ কংগ্রেস বিপাকে

• নিশীথ দে

এ আই সি সির সংগে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পর্কটাও এখন 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' মত দাঁড়িয়েছে। অন্তত কয়েকজন নেতার তাই মত। এ আই সি সি চার মাস হল প্রদেশ কংগ্রেসকে চেক পাঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। ওদিকে এ আই সি সি বলছেন, প্রদেশ কংগ্রেস টাকা-পয়সা কীভাবে খরচ করছে তার কোন হিসাব নেই।

প্রদেশ কংগ্রেসের এখন প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ। এই টাকা আসত এ আই সি সি থেকে।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের জন্য তিন-চারখানা গাড়ি সব সময় ভাড়া খাটছে। তেল, মবিল অন্যান্য খরচ বাদে প্রতিটি গাড়ির জন্য মাসে ভাড়া দিতে হয় তিন হাজার টাকা। মিটিং বা সেমিনার হলেই খরচ কয়েক হাজার টাকা। অথচ প্রদেশ কংগ্রেস অফিসের যাঁরা কাজ চালান তাঁরা পান মাসে চার থেকে পাঁচশো টাকা। শুধু একজন পান মাসে হাজার টাকা। নেতাদের কাছে এঁরা নেহাৎই কর্মচারী। অতুল্য ঘোষের সময় কেউ এঁদের কর্মচারী ভাবতে সাহস পেতেন না। সব সময় অতুল্যবাবু এদের দলের 'নিষ্ঠাবান সর্বক্ষণের কর্মী'র মর্যাদা দিয়েছেন। অতুল্যবাবু-কে কেউ 'বাবু' সম্বোধন করেননি -- বলতেন, অতুল্যদা। এখন ছেলের বয়সী নেতাকে বলতে হয় বাবু। সামনে বসতে ভরসা পান না, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সম্পর্কটা সওদাগরি অফিসের বাবু আর কর্মচারীর মত। মাঝে মাঝে এঁদের মাইনেপত্র নিয়ে কথা ওঠে। দু-চার জন নেতা মাইনে বাড়ানর কথাও তুলেছেন। একজন যুবনেতা তো বৈঠকের মধ্যেই বলেছিলেন, আমরা সমাজতন্ত্র আনতে যাচ্ছি অথচ আমাদের ঘরের লোকের প্রতি সুবিচার করি না। চার-পাঁচ শো টাকায় কি একটা লোকের সংসার চলে? চটকলেও এখন ন্যূনতম বেতন ছশো টাকা। অতুল্যদার সময় সবাই পূজোয় খাদির জামা-কাপড় পেতেন। সংসারে বিপদ-আপদে কংগ্রেস তহবিল থেকে সাহায্য দেওয়া হত। অতুল্যদার সবদিকে নজর ছিল।

ইন্দিরা কংগ্রেস হওয়ার পর এ আই সি সি থেকে প্রতিমাসে এক লাখ টাকার চেক আসত। পরে সেটা দাঁড়াল আশি হাজার টাকায়। আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সভাপতি হবার পর কমে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

আগে প্রদেশ কংগ্রেসের খরচ চালাতে নোটের বানডিল দিয়ে যেতেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বরকত গণি খান চৌধুরী।

হঠাৎ এ আই সি সির চেক বন্ধ হল কেন? কেউ বলছেন, হিসাব না পাওয়ায় এ আই সি সি অসন্তুষ্ট। কেউ বলছেন, নতুন অ্যাড হক কমিটির হাতেই এ আই সি সি টাকা দেবে। অনেকের ধারণা, প্রণববাবু টাকা দিচ্ছেন বলে আলাদা করে এ আই সি সি আর টাকা দিতে চান না।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে। এখন সদস্য পাঁচ লক্ষের মত। হিসাব মত প্রদেশ কংগ্রেস তহবিলে জমা পড়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা। উত্তর কলকাতার এক প্রবীণ নেতা বললেন, আমি নিজেই তো সত্তর হাজার টাকা দিয়েছি। যাই হোক পাঁচ লক্ষ টাকার পুরো হিসাব নেই। টাকা-পয়সা কোথায় যাচ্ছে কিসে খরচ হচ্ছে কেউ জানে না।

নির্বাচন, বড় রকমের মিছিল, মিটিং, সেমিনার হলে টাকার লেন-দেনও বাড়ে। অতি সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস থেকে একটা সেমিনার হয়ে গেল। একবেলার সেমিনার। হিন্দি হাই স্কুল ভাড়া নেওয়া হল। টাকাও দিয়ে দেওয়া হল। তারপর ঠিক হল ওখানে হবে না। টাকা যা গিয়েছে যাক। মহাজাতি সদনে হবে। হাজার সাতেক টাকা সংগে সংগে খরচ হয়ে গেল।

এত বড় একটা দল। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু দলের নিজস্ব বাড়ি নেই, নিজস্ব অফিস নেই। নিজস্ব বাড়ি ছিল না যে তা নয়। সি আই টি রোডে বাড়ি কেনা হয়েছে। এখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ মৈত্র। আজ পর্যন্ত সে বাড়ি কংগ্রেসের দখলে আসেনি, ভাড়াটিয়াদের দখলে। কে ভাড়া আদায় করে কেউ জানে না।

পরে থিয়েটার রোডে একটি বাড়ি কেনার ঠিক হয়। দাম ১১ লক্ষ টাকা। প্রধানত বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছে টাকা তোলা হয়। তোলা হয় ১১ লক্ষ নয়, ১৬ লক্ষ টাকা। তখন ঠিক হল বাকি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিট করা হবে। ব্যাংকের সুদের টাকায় বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত খরচ চলবে। শেষ পর্যন্ত বাড়ি কেনা হল না। কেন হল না? নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি? সেই ১৬ লক্ষ টাকা কী হল? এক নেতা বললেন, কী আর হবে। যাঁদের কাছে টাকা তোলা হয়েছিল তাঁদের ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হল।

নেতারা কোন সময় দলের সংগঠন গড়া নিয়ে মাথা ঘামান না। সব সময় লড়াই চলছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার। কংগ্রেস (এস) ইন্দিরা কংগ্রেসে মিশে গিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস (এস)-এর লোক এখনও এঁদের কাছে অচ্ছুৎ।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসিকে বলতে গেলে কংগ্রেস (ই) অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। অথচ তাঁকে ঠেকায় পড়লে কাজে লাগান হচ্ছে। প্রিয়-বাবুকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়েছে। প্রিয়বাবুর মিটিং-এ যত লোক হয় আর কোন নেতার মিটিং-এ সেই লোক হয় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস নেতারা দুহাতে টাকা খরচ করেছেন কিন্তু প্রিয়বাবুকে তাঁর জিপের তেলের খরচও দেওয়া হয়নি।

বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস কর্মী-দের উপর হামলা হচ্ছে। সবার আগে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন প্রিয়বাবু। কয়েকজন নেতা নিয়মিতভাবে কং-গ্রেস অফিসে আসেন শুধু খবরের কাগজে বিবৃতি দেবার জন্য।

আসলে কয়েকজন নেতা প্রিয়-রঞ্জন দাশমুনসিকে সামনে আসতে দিতে চান না। ভয় প্রিয়বাবু প্রদেশ কংগ্রেসে জায়গা পেলে তাঁদের নেতৃত্ব চলে যাবে।

ইতিমধ্যে প্রবীণ এবং যুবনেতা-দের একটা বড় অংশ প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসিকে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করার দাবি জানিয়েছেন। প্রিয়বাবুর সংগে ব্যক্তিগতভাবে কারুর সম্পর্ক খারাপ নয়। নেতারা এমন ভাব দেখান যে প্রিয়বাবুকে কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। যত বাধা সব সুব্রত মুখারজির। অথচ সুব্রতবাবু আজকে আর আগের মত প্রিয়বাবুর বিরোধী নন।

কলকাতার এক কংগ্রেস নেতা এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধীর কাছে গোপন চিঠিতে লিখেছেন, অতুল্যবাবুর আমলেও প্রদেশ কংগ্রেসের কাছ থেকে জেলা কমিটিগুলি অর্থ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু আজকে কটা টাকা পায়? প্রদেশ কংগ্রেস এ আই সি সি থেকে টাকা পায়। অনেক নেতা কংগ্রেসের নাম করে টাকা তোলে কিন্তু কংগ্রেস তহবিলে জমা পড়ে না। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত টাকা খরচ করেন। দলের স্বার্থেই এ ব্যাপারে তদন্ত করা উচিত।

এখানেই শেষ নয়। দলের এম এল এ-দের নির্বাচনের সময় পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কংগ্রেস থেকে দেওয়া হয়। এম এল এ-দের মাইনে থেকে প্রতিমাসে কংগ্রেস তহবিলে চাঁদা হিসাবে দেওয়ার কথা। বলতে গেলে কেউই দেন না। উপরন্তু তাঁরা অনেকে নিয়ে যান।

প্রদেশ কংগ্রেসে অবস্থাটা চলছে জোর যার মুলুক তার। জেলা কমিটি হিসাবে টাকা আদায় করা মুশকিল। কিন্তু অনেক জেলা কমিটির নেতা আদায় করে নিয়ে যান। যুব নেতাদের অনেকে চিঠি লিখে লোক পাঠান। বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে দিতে হয়। দু-তিনজন যুবনেতা প্রদেশ কংগ্রেস থেকেও টাকা নেন আবার বরকত সাহেবের কাছ থেকেও মাসে মাসে টাকা পান।

দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—প্রণববাবু এবং বরকত সাহেব সামনে অন্তত চেষ্টা করছেন যাতে কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হয়। কিন্তু ভেতরে দুই মন্ত্রীর সমর্থকরা এক সংগে বসতে পারেন না। প্রণববাবু যেমন প্রদেশের নেতাদের হাতে নোটের বানডিল দিয়ে যাচ্ছেন, বরকত সাহেবও তেমনি তাঁর সমর্থক নেতাদের ছোট ছোট নোটের বান-ডিল তুলে দিচ্ছেন।

ওদিকে প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসিরা এখনও এক ঘরে। কাগজে-কলমে কংগ্রেস (এস) মিশে গিয়েছে কংগ্রেস (ই) তে। কিন্তু প্রিয়বাবুরা আলাদা ভাবে কাজ করছেন, আগের অফিসে বসছেন, নিজেদের খরচের টাকা নিজেরা যোগাড় করে যাচ্ছেন। ☐

বাইরের হাত

অম্লমধুর

ভাগের মা গংগা পানি
গংগা পাবে না,
আসল কথা কমিশনে
সূত্র মেলে না।
আরো কিছু বছর যাক
গাঙে পড়ুক চর,
মিলবে তখন ভাগের অংক
পানির শুভংকর।

প্রবীর দাস

বৌ বলল বাজার আনলে
তিরিশ টাকা দিয়ে,
ছোট্ট থলি, তাও ভরেনি
দেখলুম তাকিয়ে।
টাকা দিয়ে মদ খেয়েছ
কারও পাল্লায় পড়ে,
বাজার আগুন বৌকে সেটা
বোঝাই কেমন করে?

কালিদাস ভট্টাচার্য

পরিবার ছোট রাখুন
সুখ যদি চান,
শুনে শুনে উপদেশ
ঝালাপালা কান।
বাজার হাটে সবখানেই
লাইন দেখি আজ,
দুটি বাছায় কী করে
চলে বল কাজ?

সুব্রত কুমার করণ

বাজার থেকে ফিরে এসে
বাবা বলেন 'বৎস
দামটি শুনে ক্ষান্ত থাক
আর খেও না মৎস্য।'
পুত্র বলে খাওয়া নিয়ে
মাথা-ব্যথা নেইকো আর
গলা ছেড়ে গাইতে দিও
আমি ডিসকো ডানসার।

সুনন্দা রায়

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সোভিয়েত সফর

অভিমন্যু সেন

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাম্প্রতিক সোভিয়েত সফর নিয়ে নানা ধরনের গুজব চলছে। কেউ বলছেন, এই সফরের পর জ্যোতিবাবুর সংগে সোভিয়েতদের ব্যাপারটা আরও বেশ জমে উঠেছে। কেউ বলছেন, চিকিৎসার জন্য তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গেলেও তার সংগে মূলত সি পি এস ইউ-র কর্তাব্যক্তিদের গোপন শলাপরামর্শ-টাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সব গুজবের মধ্য দিয়ে কাকতালীয় কিছু ঘটনার মিল দেখে রাজনীতির নবজাতকেরা মাঝে মাঝে হৈ চৈ করার মাত্রাটা বাড়িয়ে দেন। অথচ এতে কোন গভীর ব্যাপার কিছু ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রীর সোভিয়েত সফরের সবচেয়ে বেশি সময় কেটেছে ক্রিমিয়ায়। বলতে গেলে তিনি সেখানে বিশ্রাম করছিলেন। সোভিয়েত দুনিয়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সংগে তার প্রাতরাশ করার সুযোগ পর্যন্ত আসেনি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কিছুদিন আগে সেই দেশে গিয়েছিলেন কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধীর জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সংগে বৈঠক করাবার, প্রোটোকলের ক্ষেত্রে তার সিকিভাগের সিকিভাগও মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ছিল না। রাজীব গান্ধীর ও মুখ্যমন্ত্রীর সোভিয়েত সফরের সফরসূচির পূর্ণাংগ তালিকা প্রকাশ করে মিলিয়ে দেখলে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্রীমতী গান্ধীর পর ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজীব গান্ধীকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তার সফরসূচি ব্যবস্থা হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক রাজীব গান্ধীর প্রতি সোভিয়েত অনুরাগ অনেক বেশি এখন। রাজীব গান্ধীর সফর ও কর্মসূচির বিষয় সেখানকার কমসোমল কাগজ থেকে রুশভাষার বিখ্যাত কাগজগুলিতে ছবিসহ ছাপা হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে তা বের হয়নি।

এ দেশের সংবাদপত্রে জ্যোতিবাবুর সংগে সোভিয়েত কম্যুনিসট পারটির শীর্ষস্থানীয় নেতার বৈঠক প্রসংগে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার গুরুত্ব সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিটিতে অত্যন্ত সাধারণ। উলিয়ানসকি নামের এই ভদ্রলোক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারত বিষয়ক একজন গবেষক ও চিন্তাবিদ। উলিয়ানসকির চিন্তাধারা হল ভারতের কমিউনিসটদের উচিত নিঃশর্তভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে ও তাঁর সরকারকে সমর্থন করে যাওয়া। বলা বাহুল্য এই বিষয়টি নিয়েই আরও একবার জ্যোতিবাবুকে সেই একই কথা শোনানো হয়েছে। জ্যোতিবাবুর সংগে উলিয়ানসকির বৈঠকের পেছনে সোভিয়েত কর্তাদের একটাই উদ্দেশ্য, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ভারতের সি পি আই (এম) দলের উগ্র ইন্দিরা-বিরোধিতা তারা পছন্দ করেন না। যে যতই বদনাম করুক জ্যোতিবাবু একথা একদম হজম করতে পারেননি এবং উলিয়ানসকির কথায় 'জো হুজুর' বলেও তিনি আসেননি। বরং তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে তাদের মূল ভিত্তটাই কংগ্রেস বিরোধিতার উপর এবং ইন্দিরা বিরোধিতার উপর তৈরি, কাজেই এ কাজ করতে গেলে তার দল থাকবে না। তবে দেশের দক্ষিণপন্থী আঁতাতের সংগে কোন গাঁটছড়া বাঁধা হবে না এমন একটা আশ্বাস জ্যোতিবাবু উলিয়ানসকিকে দিয়ে এসেছেন। প্রোটোকল অনুযায়ী উলিয়ানসকি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম কুড়িজন নেতার মধ্যেও তালিকাভুক্ত নন কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এমন একজনের সংগে আলোচনার ব্যবস্থা হওয়ায় মনে মনে মুখ্যমন্ত্রী খুশি নন। তাঁকে ক্রিমিয়ার পর আবার লনডনে বিশ্রাম নিতে কেন হল বোঝা গেল না। তবে পশ্চিমী বন্দোবস্তে আস্থাভাজন মুখ্যমন্ত্রী যে তার মূল চিকিৎসার কাজটি সোভিয়েতে না করে লনডনে করেছেন একথা সবাই জানেন।

স্বদেশে ফিরেই নয়া দিললিতে তাঁর পলিটব্যুরোর সংগে বৈঠক করতে হয়, প্রথমত সেখানেও তিনি সব রিপোর্ট রেখেছেন। কমরেড বাসবপুন্নায়া যিনি ইদানিং শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ আস্থাভাজন হিসেবে কমরেড রামমূর্তির জায়গায় কাজ করছেন তিনি কিন্তু ক্রমেই উলিয়ানসকির দর্শনের সমর্থক হয়ে উঠছেন। নামবুদ্রিপাদ বাংগালোরে দক্ষিণপন্থীদের সংগে আঁতাতের সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে না দিলেও জ্যোতিবাবু কিন্তু অখণ্ড বি জে পি, লোকদল মোর্চার ধারে কাছে যেতে প্রস্তুত নন, এমন মনোভাব পরিষ্কার করে জানিয়েছেন।

বিদেশ যাবার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর যে সামান্য ক্ষণ আলোচনা হয়েছিল সেখানে কিন্তু অশোক মিত্র প্রসংগ ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফেরার দু দিনের মধ্যেই তড়িঘড়ি বেংগল ক্লাবে রাজ্য সরকারের কৃপাধন্য ও সোভিয়েত বাহির্বাণিজ্যে চা-এর ব্যবসায়ে রুশ দূতাবাসের আস্থাভাজন অমিয় গুপ্তর উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী, সোভিয়েত কনসাল জেনারেল ইভানভ এবং অমিয় গুপ্তর নৈশ ভোজে সফরের ফসল নিয়ে অন্তরংগ কথাবার্তা হয়। বর্তমান কনসাল জেনারেল এক সময়ে সোভিয়েত যুব সংগঠন কমসোমলের একজন কর্তা ছিলেন। তিনি খুব আশাবাদী যে সি পি আই (এম) দল কখনই বি জে পি-লোকদল আঁতাতে যাবে না। এমনকি কোন অবস্থাতেই জনতাকেও সমর্থন যোগাবে না। উলিয়ানসকির যে দাওয়াই তা এখানকার কমিউনিসটদের সেবন করানই হল এ দেশের সোভিয়েত প্রতিনিধিদের প্রধান কাজ।

সি পি আই (এম) নেতারা যাই বলুন তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এই নিয়ে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব যে আকার নিতে শুরু করেছে তাতে আগামী দিনের চিত্রপট যে কী হবে তা বলা মুশকিল। সি পি আই (এম) দলের যুব নেতাদের একাংশের (কেন্দ্রে) খুব ইচ্ছে ছিল পুনা কনভেনশনের ইন্দিরা বিরোধী সব যুব শক্তির সংগে এক হয়ে কিছু করা। কিন্তু এখনও তাদের কাছে সিগন্যাল আসেনি নেতৃত্বের, তাই তারা অসোয়াস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন আর পুনা কনভেনশনের নেতা সুরেশ কলমাড়িকে তাদের দুঃখের কথা বলছেন।

কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী আর যাই করুন তিনি কোন মতেই তাঁর দলকে এমনভাবে পরিচালিত করতে দেবেন না যাতে বামশক্তি ও দক্ষিণপন্থী শক্তি সবাই সংঘবদ্ধ হয় যা সম্ভব হয়েছিল জয়প্রকাশের নেতৃত্বে। সে জন্যই বোধহয় পশ্চিমবংগের কংগ্রেস নিয়ে এবং সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে তাদের লড়াই নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর খুব বড় একটা মাথাব্যথা নেই। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুও একথা জানেন।

মালোপাড়ার ঘটনার পর তড়িঘড়ি বরকত সাহেব ইন্দিরাকে এনে মালদায় সভা করে হাওয়া নিজের অনুকূলে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাতে সম্মত হননি। সেই থেকে বরকত সাহেবের মত খারাপ। তিনিও আর সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে তর্জনগর্জন গত দুমাস ধরে করছেন না। শ্রীলংকা পরিস্থিতি, আসাম, পাঞ্জাব সব মিলিয়ে ঘরে-বাইরের যা চেহারা, অন্যদিকে সোভিয়েতের ক্রমাগত প্রভাব সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিবাবুদের যে কী লাইন নিতে হবে সেটা হয়ত ঠিক করে দেবেন দলের ভেতরে বাসবপুন্নায়া গোষ্ঠী। এই পটভূমিতে পশ্চিমবাংলার লোকসভা নির্বাচন হবে অনেকটা ফ্রেনডলি এগজিবিশন ম্যাচের মত। কংগ্রেস জিতলেও ভাল, সি পি আই (এম) জিতলেও শ্রীমতী গান্ধীর অত ভয় নেই। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা মনে করেন সি পি আই (এম)কে অত বিশ্বাস করা যায় না। কারণ মোরারজীর ক্ষেত্রে তাঁর সংকটের সময়ে তারা উল্টো করে ছিল। সেখানে প্রগতিবাদীদের একটাই যুক্তি, মোরারজীভাই তো আর সোভিয়েতের অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন না।

অতএব জ্যোতিবাবু এটা রাশিয়া সফর করে ভাল করে বুঝে এসেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস দলের সংগে সম্পর্ক খুইয়ে সি পি আই, সি পি আই (এম) এর সংগে দোস্তি বাড়াবার জন্য রাশিয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বরং কংগ্রেসকে কিছুটা মানিয়ে নিয়ে এবং ইন্দিরাকে অনেক বেশি মেনে নিয়ে যদি এরা এগিয়ে আসে তাহলেই সোভিয়েত কর্তারা বেশি খুশি হবেন। দ্বিতীয়ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বেঁচে থাকতে এবং প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় রাজীব গান্ধীর যা গুরুত্ব রাশিয়ার কাছে সেই গুরুত্ব কখনই জ্যোতিবাবুসহ তাঁর দলের কোন কর্তাব্যক্তিরই নেই রাশিয়ার কাছে। তৃতীয়ত দক্ষিণপন্থী জোটের শক্তি জোগাতে স্বদেশি কমিউনিসটরা যদি এগিয়ে যান তাহলে সোভিয়েত দুনিয়া ভীষণ চটে যাবেন।

সব ব্যাপারটাই শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অনুকূল, বিরোধীদের কাছে ভীষণ সমস্যার। বিশেষ করে সি পি আই (এম) দলের কাছে। জ্যোতিবাবুর সোভিয়েত সফরের পর তাই কংগ্রেসের ধারণা, জ্যোতিবাবু রফা করে এসেছেন আর সি পি আই (এম) দলের একাংশের ধারণা, উনি আপস করেছেন। □

বাংলাদেশ ঃ জনগণ গণতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল, সামরিক প্রশাসন ব্যাকুল জনগণের মন পাবার জন্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১

বাংলা দেশ সফর শেষে পরিবর্তনের সম্পাদক **পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

১৯৫৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কায়ানি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন : 'আমাদের সেনাবাহিনী মহান। এঁরা নিজের দেশকেই জয় করে নিয়েছেন।'

কায়ানি কথাটি বলেছিলেন, পাকিস্তানের সামরিক শাসক আয়ুব খান সম্পর্কে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৯৭৫ সাল থেকে পাকিস্তানের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অর্থাৎ এক এক সমর নায়ক ক্ষমতায় আসছেন এবং তাঁদের কার্যত প্রধান ভূমিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিজের দেশ জয় করা। পাকিস্তানে আয়ুব অনেকখানি সফল হয়েও এ ব্যাপারে শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

বাংলাদেশে জিয়াযুর রহমান কিন্তু পেরেছিলেন। সামরিক একনায়ক থেকে গণতান্ত্রিক নেতা হিসাবে তাঁর উত্তরণ লোকে ভালভাবেই নিয়েছিল। কিন্তু জিয়ার ঘাতকের হাতে মৃত্যু হল। তাঁর পথ ধরে হুসাইন মোহম্মদ এরশাদ এখন বঙ্গবিজয়ে গোটা সেনাবাহিনীকে নামিয়ে ফেলেছেন।

এ ব্যাপারে প্রয়াত জিয়াযুর রহমানের মত ও পথকেই অনুসরণ করছেন তিনি। অর্থাৎ ধীরে ধীরে বেসামরিক জনগণের মধ্যে তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা। এবং ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা। বাংলাদেশে চোদ্দ দিন থেকে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে এরশাদ জিয়ার মতনই একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের দিকে এগুচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ছাত্রদের মধ্যে তাঁর দল তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদধন্য নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। আমি থাকতে থাকতেই এই সংগঠনটির অফিস ঘরের উদ্বোধন হয়ে গেল।

এরশাদের পরবর্তী কর্মসূচি হবে জিয়ার বি এন পি-র মত একটি নতুন দল গঠন। তার আগে ১৯৮৫ সালের গোড়ায় এরশাদ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে থানা পরিষদের নির্বাচন সেরে ফেলবেন। এই নির্বাচন হবে অরাজনৈতিকভাবে। বলা বাহুল্য এরশাদ প্রতিটি থানা পরিষদেই তাঁর মনোমত প্রার্থী দেবেন। ইতিমধ্যেই বকলমে তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহার আঠার দফা কর্মসূচির লক্ষ লক্ষ কপি জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। (জিয়ার ছিল ১৯ দফা) আঠার দফা বাস্তবায়ন কমিটির মারফৎ এরশাদ সমস্ত জায়গাতেই তাঁর অনুগামী সিভিলিয়ানদের চিহ্নিত করে ফেলেছেন। এই নির্বাচন যদি এরশাদের অনুকূলে যায় (এরশাদ ভাবছেন যাবেই) তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে আর্মির ধরাচূড়া ছেড়ে এরশাদ নিজেই প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে যাবেন।

এক্ষেত্রে তিনি দেশের দক্ষিণপন্থী ইসলামি দলগুলির সাহায্য পাবেন। তাঁর গ্রামের ভিত, যাকে 'ঘাসের গোড়া' বলে, সেটা তো আগে থেকেই তৈরি হয়ে রইল।

এরশাদ নিজে কিন্তু কট্টর ইসলামপন্থী নন। তাঁকে বলা যায় 'রাইট টু দি সেনটার'। তিনি দক্ষিণ-ঘেঁষা মধ্যপন্থী। পাকিস্তানের জিয়ার মত তিনি বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিতে চান না। কারণ বাংলাদেশে প্রগতিশীলদের সংগঠনগুলিও শক্তিশালী। তাছাড়া এরশাদ বুঝে গেছেন এখানে ঘোষণা করে কিছু পালটান চলবে না। দেশের লোকেরা প্রকৃতিগতভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধী। যদি কেউ ভাবে কেউ কিছু ওপর থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে, তাহলেই তার প্রতিবাদে সারা দেশ ফেটে পড়বে। আমাকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বললেন, 'আরবি তো কোরআনিভাবে ইসকুলেই প্রথম শ্রেণী থেকে পড়ান হচ্ছে। আমরা এটাকে প্রতিষ্ঠানবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। এটাকে রাজনৈতিক দল মূলধন করে আন্দোলন শুরু করে দিল।'

বাংলাদেশে ইসলামীকরণ জিয়াই শুরু করে যান। এরশাদ সেগুলি ত্বরান্বিত করছেন। এটা যে তিনি খুব বিশ্বাস করেন বলে করছেন তা নয়। এর পেছনে আরব দেশগুলির চাপ আছে। যেমন পাকিস্তানের পেছনে ছিল। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং শতকরা পঁচাত্তর ব্যক্তিই নিরক্ষর। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে কোনক্রমে জড়াতে পারলে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া অনেক সোজা বলে অনেকের বিশ্বাস। ইসলামি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব তাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এত প্রবল।

পাক-বাংলাদেশ রাজনীতির আর

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের মৌন মিছিল

একটি বড় হাতিয়ার ভারত-বিরোধিতা। থেকে থেকে হিং টিং ছট বলে ওঠার মত ' মাস লিডার'দের এটা একবার করে বলতেই হবে। জনসভায় গিয়ে উলেমা ও মৌলবিদের সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু কিছু ধর্মকথা বা ধর্মীয় আচার পালন করতে হবে। তারপর একবার দুবার ভারতকে গালাগালি দিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এই সব নেতাদের সংগে কথা বলুন, তখন এদের খুবই অমায়িক, ভদ্র, অতিথিপরায়ণ ও মানবিক বলে মনে হবে। বিশেষ করে ভারতীয় কাউকে পেলে তিনি তো পরম বন্ধুর মত ব্যবহার করবেন। একদা কট্টর ভারত-বিরোধী বলে পরিচিত জাসদ নেতা মেজর জলিলকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : সত্যি কথা বলুন তো, আপনি এত কট্টর ভারতবিরোধী কথাবার্তা বলেন কেন? জলিল সাহেব জবাব দিয়েছিলেন : এখন ভারত সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। নির্বাচনে বিরোধীরা ভারত-বিরোধী সেনটিমেনটকে ব্যবহার করছিল, আমি ভাবলাম, আমিও বা কেন করব না।

এরশাদ ভারত সম্পর্কে মোটামুটি নরম-গরম নীতি অবলম্বন করছেন। ভারতও তাঁকে তোয়াজ করার চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। তাঁকে দিল্লিতে রেড কারপেট অভিনন্দন দেওয়াটা বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা ভাল চোখে দেখেননি। তাঁদের বক্তব্য : আপনারা গণতান্ত্রিক দেশ, একজন সামরিক একনায়ককে এত খাতির করাটা আপনাদের শোভা পায় না।

এরশাদ এখন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এটা তাঁর একটা প্রেসটিজের ব্যাপার ছিল। ১৯৮৫ সালের মধ্যে এরশাদ যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন এই ঘোষণাটির পেছনে দুটি জিনিস কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। এক : গত ফেবব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলন। দুই : মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ। এরশাদের সংগে রেগনের দেখা হওয়ার আগে এটাই ছিল পূর্ব সর্ত।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরশাদ ভারসাম্য বজায় রেখে চলছেন। কোন পক্ষকেই চটাতে চান না তিনি। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তুষ্ট করার জন্য মুজিব নগরে স্মৃতি সৌধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হচ্ছে। আবার কট্টর ইসলামপন্থীদের খুশি করার জন্য তিনি বলেছিলেন একুশে ফেবব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে কোরানখনি হবে এবং আলপনা দেওয়া চলবে না। তা নিয়ে হৈ চৈ কান্ড হয়ে গেল।

এরশাদ জিয়ার মত প্রাক্তন মুসলিম লিগ বা দক্ষিণপন্থীদের কাউকে ক্যাবিনেটে নেননি। তিনি বেছে বেছে সুশিক্ষিত দক্ষ ও যোগ্য অফিসারদেব ক্যাবিনেটে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। আমি যে তিনজন মন্ত্রীর সংগে দেখা করলাম তাঁরা সকলেই জনসাধারণের চোখে শ্রদ্ধেয়। যেমন কৃষি ও সেচ মন্ত্রী ওবাইদুল্লাহ। তিনি একজন কবি ও যথার্থ ভদ্রলোক। ফারাক্কা প্রশ্ন নিয়ে তাঁর মনোভাব খুব সহযোগিতামূলক ও বাস্তব বলে মনে হল। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বিদেশ ঘোরা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন অ্যাকাডেমিসিয়ান। তথ্যমন্ত্রী হাসেম সাহেব একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং দিলখোলা মানুষ।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সামরিক শাসনে অসামরিক ব্যক্তিদের 'জো হুকুম' ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এরশাদের ক্যাবিনেটে শিল্প, কৃষি, অর্থ, শিক্ষা, তথ্য, সমাজকল্যাণ, আইন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও বিদেশমন্ত্রী অসামরিক। এছাড়া খাদ্য, গৃহনির্মাণ, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, শক্তি ও যোগাযোগ দফতরগুলি সামরিক ব্যক্তিদের হাতে।

অসামরিক মন্ত্রীরা সামরিক অফিসারদের ভয়ে এতই জড়োসড়ো যে সর্বদা তাদের ভয় এই বুঝি চাকরি যায়। এই ভয়ে তো অর্থমন্ত্রী ও ধর্মমন্ত্রী আমার সংগে দেখাই করলেন না। তথ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে এরশাদ সাহেবের সংগে একটা অ্যাপয়েনটমেনট করিয়ে দেবার। তাঁরা বললেন, সি এম এল-এর প্রেস সেকরেটারি মেজর মুনিরকে এটা বলতে পারি। ফরেন অফিস তো এই সাক্ষাৎকারের কাগজপত্র সি এম এল-এ সেকরেটারিয়েট পর্যন্ত পাঠাতে ভয় পেলেন এবং চারমাস ভিসা দিতে দেরি করলেন। সবাই ভীত, ভারতীয় সংবাদপত্রে যদি বিরূপ কিছু বেরিয়ে যায় তাহলে হয়ত সামরিক সরকারের কাছে তাঁদের দায়ী হতে হবে।

বহুক্ষেত্রে প্রশাসন বিভ্রান্ত এবং সর্বত্র একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া। এরশাদ প্রশাসনে দক্ষতা আনার চেষ্টা করছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে চাইছেন। এরশাদ যতটা পেরেছেন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলিতে এমন সব লোকদেব বসিয়েছেন যাঁবা বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তবে পাকিস্তানের মত বাংলাদেশের ব্যুরোক্র্যাসি অত দক্ষ নয়। সর্বত্র ঢিলে ঢালা ভাব। এছাড়াও দুর্নীতিও প্রচুর। দ্রব্যমূল্যের প্রচন্ড বৃদ্ধিব ফলে দুর্নীতি বেড়েছে আগের তুলনায়।

সামরিক বাহিনীর হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা। এই সামরিক প্রশাসন অসামরিক প্রশাসনের সংগে সমান্তরালভাবে চলছে। যেমন মুখ্য সামরিক প্রশাসকের নিচে চারজন আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক। তাঁদের নিচে আছেন আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক, তার নিচে উপ আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক। প্রত্যেক জেলায় আছেন একজন করে জেলা সামরিক প্রশাসক। ৪৬২টি পাবলিক করপোরেশনের প্রধান সামরিক বাহিনীর লোক। জেলার পুলিশ প্রশাসনের নেতৃত্বও সামরিক অফিসারদের হাতে। অসামরিক আদালতের সমান্তরালভাবে চলছে সামরিক আদালত। সেখানে কোন ধরনের

মামলার বিচার হবে তা নির্ধারিত। তবে পুলিশ মনে করলে কোন মামলা সামরিক আদালতে পাঠাতে পারে। এই আদালতে সাতদিনের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি হয়।

আসামী কোন উকিল দিতে পারেন না। তবে কোন উকিল আসামীর বন্ধু হিসেবে এসে তাঁকে সমর্থন করে যেতে পারেন।

এরশাদ এখন জোর দিচ্ছেন প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। পাক শাসনের আমলে মুজিব মহকুমাগুলিকে জেলা করতে চেয়েছিলেন। এরশাদ এক কলমের খোঁচায় সব ৪৯৩টি থানার মধ্যে ৪০০ থানাকে উপ-জেলা করে দিয়েছেন। এরশাদের এই আইডিয়াটি আমার মন্দ লাগেনি। উপ-জেলার অর্থ জেলা ম্যাজিসট্রেটের সমান ক্ষমতা পাবেন উপ-জেলার বেসামরিক প্রশাসক। পদমর্যাদায় যিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট, সিলেটের গোলাপগঞ্জে এমন একটি উন্নীত থানা দেখতে গিয়েছিলাম। আপাতত ইউনিয়ন পরিষদের ছোট অফিসেই কোনক্রমে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দেখলাম নতুন অফিস বাড়ি তৈরি হচ্ছে। নির্বাচন হয়ে গেলে এই অফিসাররা হবেন চিফ এগজিকিউটিভ। নির্বাচিত থানা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন সর্বেসর্বা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেমন পঞ্চায়েত প্রধান। তবে বিডিওর চেয়ে থানা পরিষদের এগজিকেউটিভের প্রশাসনিক ক্ষমতা অনেক বেশি।

এরশাদ বিচার বিভাগকেও বিকেন্দ্রীভূত করেছেন। পয়লা নম্বরে হাইকোরটকে ভেঙে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, যশোর, বরিশাল, ঢাকা ও সিলেট এই সাত জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাম হয়েছে হাইকোরট বেনচ।

উন্নীত উপ-জেলায় ১২৫ জন মুনসেফ নিয়োগ হয়েছে। আরও ২৫০ মুনসেফ নিয়োগ হবে।

এই বিকেন্দ্রীকরণের জন্য অফিসার লাগছে প্রচুর। স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে তার জন্য। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। যারা উত্তীর্ণ হয়ে সারভিসে আসবেন তাঁদের বয়স ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বেতন নির্ধারণ করা হচ্ছে।

পুরনো অফিসারদের নিজের জেলাতেই অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। তবে রাতারাতি যাদের গ্রামে বদলি হতে হল তারা ক্ষুব্ধ। সবচেয়ে ক্ষুব্ধ বার। আমাকে হাইকোরটের একাধিক আইনজীবী বললেন হাইকোরট বিকেন্দ্রীকরণ করে ছেলেখেলা হচ্ছে। মফস্বলে খুনের মামলা বা আপিল কেস করার মত উকিল কোথায়?

ঢাকা থেকে উকিল ব্যারিসটার নিয়ে যেতে হচ্ছে জেলায় জেলায় ফলে মক্কেলের খরচ বেড়েছে। হাইকোরটের অ্যাডভোকেটদের প্লেন খরচ দিয়ে মফস্বলে নিয়ে আসতে হচ্ছে। যারা আনতে পারছেন না, তাঁদের মামলায় জেলায় যে মানের উকিল পাওয়া যায় তাঁদেরই লাগানো হচ্ছে। অথচ হাইকোরটের মত সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ মামলা।

জিয়া অসন্তুষ্ট সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়ে এরশাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এরশাদ তাই সর্বাগ্রে সেনাবাহিনীকে খুশী রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি বারবার বলছেন বাংলাদেশে বেসরকারি প্রশাসকেরা সাংগঠনিক, কারিগরি ও ইনজিনিয়ারিং বিদ্যায় তেমন দড় নন। সেনাবাহিনীরই এইসব নৈপুণ্য আছে। তাই সেনাবাহিনীকে এসব কাজে লাগাতে হবে। এরশাদ চান সংসদেও সেনাবাহিনীর জন্য আসন রাখতে। এইভাবে সেনাবাহিনীকে তিনি রাজনীতির মধ্যে পাকা আসন তৈরি করে দিয়ে যেতে চান। সেনাবাহিনীর জন্য নানা সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি ঘর ফ্লোর তৈরির জন্য সরকারি জমি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এরশাদ লক্ষ রাখছেন সেনারা যেন কোনমতেই অসন্তুষ্ট না হয়। আর কোথাও বেচাল দেখলে তিনি আগে থেকে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

আমি ঢাকা থাকতে থাকতে ঢাকা এলাকার আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসককে সরিয়ে দেওয়া হল। এই নিয়ে কত গুজব যে ছড়ান ঢাকা শহরে। সেনাবাহিনীর মর‍্যাল ঠিক রাখার জন্য টিভিতে দুর্জয় বলে একটি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য তদানীন্তন পাকিস্তানি আমলেও সেনাবাহিনী যে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দের মধ্যে ছিলেন, তার প্রমাণ এরশাদ স্বয়ং। ১৯৫৫ সালে তিনি যখন লেফটেন্যানট তখন তিনি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ৬০ বিঘা জমি পান চাষ বাসের জন্য। পাশে আর একজনের ৬০ বিঘা জমি বরাদ্দ হয়। দুই জমি মিলিয়ে ১২০ বিঘা জমি এরশাদ চাষ করে আসছেন। এই চাষ থেকেই বছরে তাঁর আয় দেড়লক্ষ টাকা। আমি এই ত া তাঁর নিজের বিবৃতি থেকেই দিচ্ছি।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনী একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। সি এম এল এ অফিসে এরশাদের ব্যক্তিগত সামরিক সচিব করনেল আমাকে কনট্রোল রুম দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটা বড় হল ঘরে সারি সারি ম্যাপ আর চারট। তাতে লেখা দৈনন্দিন বাজার দর। মাসিক অপরাধের খতিয়ান, আমদানি রফতানির হিসেব, বন্যা পরিস্থিতি। করনেল আমাকে চারটে দেখালেন সামরিক আইন জারি হওয়ার আগে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মামলা মুলতুবি ছিল। এখন মুলতুবি মামলার সংখ্যা ৮৬০০০। কোন থানায় যদি মাসে দুটো খুন হয়, তাহলে দারোগা বাবুকে জবাবদিহি করতে হয়। তাঁর বদলি হবার পক্ষে এই ঘটনাই যথেষ্ট। খুনের সংখ্যা কমেছে। ১৯৮২-৮৩ সালে খুন হয়েছে ৮২৩ জন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সামরিক সরকার প্রশাসনের ওপর ছোট বড় নানা রিপোরট তৈরি করেছেন। মাত্র ৬ মাসে প্রশাসন সংস্কারের ওপর এক রিপোরট শেষ হয়েছে। সরকারি অফিসে কার কী কাজ, এ সম্পর্কে

নৌঃ অ্যাডমিরাল মাহবুব আলি খান, যোগাযোগ

কোন ম্যানুয়াল ছিল না। দুমাসে তাঁরা এই ম্যানুয়াল করে ফেলেছেন। এসব কখনও এর আগে করা হয়নি। আমি ওঁদের কাজের প্রশংসা করতেই কর্নেল বললেন গণতন্ত্র বিশ্বকে কে প্রথম দিয়েছিল জানেন অলিভার ক্রমওয়েল। তিনি ছিলেন একজন আর্মি ম্যান।

এরশাদের এখন যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি বেশ ভাল। ১৫ আগস্টের দিন বোর্ডে লেখা ৪৪৪৯৩৮ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য দেশে মজুদ। চালের দাম ৬২৫ থেকে ৬৬২ টাকা কুইন্টাল। কোথাও চালের দাম বাড়ছে খবর এলেই সেখানে মজুদ খাদ্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য পাঠান হয়। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম যথেষ্ট। তেল ৩০-৩৫ কিলো। এক কাপ চা এক টাকা। আর সাধারণ রেস্টুরেন্টে মাছভাত খেতে গেলে ১৫ টাকা লাগে। বাজারে মাছের আমদানি কম। গ্রামের বাজারে মাছ প্রায়ই পাওয়া যায় না।

এমনকি বরিশালের গ্রামের এক ভদ্রলোক বললেন, বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। মাছের প্রশ্ন উঠলেই বিব্রত হই। কারণ এই আলোচনা কিছুক্ষণ চললে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা জানা। মাছ নেই কেন না পানি নেই। পানি নেই কেন না ফরাক্কা। ফরাক্কার ব্যাপারটি যদিও এখন তেমন উত্তপ্ত রাজনৈতিক ইস্যু নয় তবু ওটি প্রায় প্রত্যেকটি বাংলাদেশির মনে গভীর ক্ষতের মত কাজ করে। ওঁরা বিশ্বাস করেন, ভারত বড় দেশ বলে শুধু গায়ের জোরেই ফরাক্কার সব জল শুষে নিচ্ছে। আমার ধারণা এই সমস্যাটির একটা সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেলে বড় রকমের মনকষাকষির ব্যাপারটা কমে যায়।

বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম আগুন ছোঁওয়া। ভারতের চেয়ে দেড় থেকে তিনগুণ দাম। অথচ বেতন কাঠামো ভারতের মতই। তবে যারা ব্যবসাপত্র করেন আর যাঁদের কেউ বিদেশে আছে তাঁদের কোন অসুবিধে নেই। ১৯৮২ সালে ৬২,৭৬২ জন বাংলাদেশি বিদেশে চাকরি করতে যান। ১৯৮২ সালে বিদেশ থেকে বাংলাদেশ এক হাজার উনত্রিশ কোটি টাকা আয় করেছে। আইন শৃঙ্খলার অবস্থা বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে খারাপ নয়। গ্রামে ডাকাতির খবর পাওয়া যায়। ঢাকায় ১৪ দিনে একটি ডাকাতি বা ছিনতাই এর ঘটনা কাগজে দেখিনি। অনেক রাতেও হোটেলে ফিরেছি। জীবন-যাত্রা সর্বত্র স্বাভাবিক। লোডশেডিং আছে সর্বত্র। একাধিক বার হয় তবে কোনবারই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এরশাদ শিল্পোন্নয়নের কোন বিশেষ কর্মসূচি নেননি। তবে মুজিবের আমলে যে সব মিল রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছিল এখন সেগুলি আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকও বেসরকারি মালিকানায় চলে যাবে। মালিকেরা এসে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করে দিচ্ছেন। এনিয়ে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ। শিল্প বলতে বাংলাদেশে অধিকাংশ ছোট শিল্প। চার হাজার শিল্প ইউনিটে মাত্র ৬৫ লক্ষ লোক কাজ করেন। সুতো, পাট, সিমেন্ট, কাগজ, নিউজ প্রিন্ট, সার, ম্যাচ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল শিল্প রয়েছে বাংলাদেশে। রেডিও টি ভি বাংলাদেশে অ্যাসেমবেল হয়, বিদ্যুতের জন্য কাপড়, সিমেন্ট, ইস্পাত, মোটর গাড়ি ও টিভি প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ওঁরা বলছেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশে সারের অভাব হবে না। কাগজ আর আমদানি করতে হয় না। পাট ও চা তো এখনই বিদেশে রফতানি হয় তবে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দেশে নেই। সেজন্য গোটা দেশকে বহুল পরিমাণে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয় এবং প্রধানত চা, পাট ও কাগজ রফতানি করেই শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশি মুদ্রা আসে। যার পরিমাণ ১৬০০ কোটি টাকা। কিন্তু তার শতকরা ৮০ ভাগই দিতে হয় পেটরোল আমদানির জন্য। বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন শূন্য থেকে এখন বছরে ৩.৮ শতাংশ। বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় ২৪০ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। এসব কারণে ১৯৭০ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের যে অবস্থা দেখেছিলাম তার চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভাল। জিয়ার আমলে অনেক অফিস বাড়ি, রাস্তা সেতু হয়েছে। ঢাকায় এখনও সমানে কুড়ি বাইশ তলা অফিস বাড়ি উঠছে। ঢাকা শহরে ভিখারির সংখ্যা কলকাতার মতই। তবে একটাকার নোট ভিক্ষে দেওয়ার লোকও প্রচুর দেখেছি। রাজনৈতিক দলগুলিকে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা মাঠে ময়দানে বক্তৃতা কিংবা মিছিল বার করতে পারেন না। খবরের কাগজে সেনসর নেই। কিন্তু বলে দেওয়া আছে কী ছাপা যাবে আর যাবে না। বলাবাহুল্য এজন্য কেউ ঝুঁকি নেননা। কাগজ পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। একটি আওয়ামি লিগপন্থী দৈনিক এরশাদ সম্পর্কে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলেন, কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনি কিছু কিছু বেপরোয়া কাগজ এখনও বন্ধ আছে। নতুন সংবাদপত্র প্রকাশে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তবে ১৯৮০ সালে জিয়ার আমলে বেসরকারি লোকজন যেমন ভারতীয়

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শহিদ ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

এয়ার ভাইস মারশাল (রিঃ) এ জি মাহমুদ, খাদ্য

সাংবাদিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ভয় পেতেন, এখন সে ভয় কেটে গেছে। আমি বহু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলেছি। ইচ্ছামত ঘুরেছি। আমার কাছে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত লোকজন এসেছেন। গত ফেবরুয়ারির আন্দোলন জনসাধারণের মনে একটা সাহস এনে দিয়েছে। এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায় যাঁরা চান বাংলাদেশে সামরিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হোক। ভারতে যাঁরা মনে করেন সামরিক শাসনই 'মুশকিল আসান,' তাঁদের বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ভাল। পক্ষান্তরে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি বাংলাদেশের সকলেই শ্রদ্ধাশীল।

এরশাদ ব্যক্তিগতভাবে ভাল কি মন্দ এ ব্যাপার নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামান না। জিয়ার একটা আলাদা ভাবমূর্তি ছিল এই কারণে যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন। এরশাদ সে তুলনায় অপরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। তাঁর সহযোগীরা অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে পোসটেড ছিলেন। তাঁর জন্ম ও ছোটবেলাও কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। এরশাদ গান ও কবিতা লিখে দেশবাসীর কাছাকাছি আসতে চাইছেন। তাঁর কবিতা রাষ্ট্রায়ত্ত দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্থনৈতিক মুক্তি ও সংগ্রাম নামক আঠারো দফা কর্মসূচির প্রচার পুস্তিকার শুরু হচ্ছে তাঁর একটি ছোট দেশাত্মবোধক গান দিয়ে। সরকারি গণমাধ্যমগুলি প্রতিদিনই তাঁর বিবৃতি, বক্তব্য ও ভাষণ ছেপে যাচ্ছে। কিন্তু এরশাদ এখনও জনমানসে তেমন দাগ কাটতে পারেননি। এর মানে এই নয় যে লোকে দুবেলা তাঁর মুণ্ডপাত করছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এখন যেন গণতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। □

আলোকচিত্র :
বাংলাদেশ তথ্য বিভাগ

রাজনৈতিক শূন্যতাই সামরিক প্রশাসনের হাত শক্ত করছে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গত ফেবরুয়ারি মাসে বাংলাদেশে দেশজোড়া ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলন দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন সামরিক শাসনের শেষ অধ্যায় বুঝি শুরু হল, তাঁরা এতদিনে হতাশ হয়েছেন। বাংলাদেশে আবার নবপর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড যখন শুরুর মুখে তখন দেখা গেল, প্রধান দলগুলির মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দেশের অগ্রণী দল আওয়ামি লিগের মধ্যে আর এক দফা ভাঙন প্রগতিশীল শিবিরকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছে। কারণ ভারতবর্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের মত আওয়ামি লিগই একমাত্র দল যাদের সর্বত্র সংগঠন আছে। আওয়ামি লিগের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে নানাধরনের, নানা চরিত্রের লোক থাকলেও এই দলের আদর্শ প্রগতিশীল। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এই দলের আদর্শ। দ্বিতীয়ত দীর্ঘকাল ক্ষমতাচ্যুত থাকায় আওয়ামি লিগ সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থাও ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যিনি কিছুটা আপন কৃতকর্মের জন্য, কিছুটা শাসকদলের ভয়ে, কিছুটা অপপ্রচারের জন্য ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশের জনজীবন থেকে প্রায় মুছে যাবার মত হয়েছিলেন, এখন তিনি ধীরে ধীরে আবার মানুষের মনে একটা আসন করে নিচ্ছেন। যদিও জাতির জনক হিসাবে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটতে আরও সময় লাগবে। গত ১৫ আগসটে তাঁর মৃত্যুদিনে ঢাকায় তাঁর ৩২ নং বাড়িতে মানুষের ভিড় দেখে আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে যত দিন যাবে তাঁর প্রতি লোকের আস্থা ক্রমশ ফিরতে শুরু করবে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত একমাত্র আওয়ামি লিগ কর্মীদের সংবাদপত্র ও বইপত্র ছাড়া বাংলাদেশে কোন আগন্তুক জানতেই পারবেন না যে এই দেশে মুজিবর রহমান বলে একদা একজন নেতা ছিলেন।

১৯৮১ সালের ১৫ অকটোবর বাংলাদেশের যে শেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে তৎকালীন শাসক দলের নেতা আবদুস সাত্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আওয়ামি লিগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন ৫৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৩ ভোট পেয়েছিলেন (আবদুস সাত্তার পান ১ কোটি ৪২ লক্ষ ১৭ হাজার ৬০১টি ভোট)। ওই নির্বাচনে যে ব্যাপক রিগিং হয়েছিল সে কথা হাফিজ্জে হুজুরের মত দক্ষিণপন্থী নেতাও বলে গিয়েছেন। **মেজর জালিলের মত কট্টর আওয়ামি** লিগ বিরোধী নেতাও বলেছেন। কোথাও টাকা দিয়ে, কোথাও চালগম দিয়ে ভোট কেনা হয়। ব্যাপক ভাবে জাল ভোট দেওয়া হয় এবং বহু জায়গায় ছোরা, পিস্তল উঁচিয়ে আওয়ামি লিগের পোলিং এজেনটদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে ডঃ কামাল হোসেন ৭২ পৃষ্ঠার যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন তার একটি কপি তিনি আমাকে দেন। আমার বক্তব্য ওই চূড়ান্ত রিগিং এর মধ্যেও আওয়ামি লিগের প্রার্থী ডঃ হোসেন প্রায় ৫৭ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন। নির্বাচন অবাধ হলে তিনিই জিততেন অথবা সামান্য ব্যবধানে হারতেন। তাঁর এই বিপুল ভোটের পেছনে ছিল আওয়ামি লিগের সংগঠন যা আবদুর রাজ্জাক সাহেবের মত জবরদস্ত সাংগঠনিক নেতার হাতে ছিল। তদুপরি ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনাই এই ভাবমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু সেই শেখ হাসিনা ও রাজ্জাক আজ উপদলীয় কোন্দলে দ্বিধাবিভক্ত। আমি রাজ্জাক সাহেব, ডঃ কামাল হোসেন, ও শেখ হাসিনা তিনজনের সংগেই দেখা করেছি। তিনজনেই বলেছেন, এই মতানৈক্য দুর্ভাগ্যজনক। শেখ হাসিনা ও ডঃ কামাল হোসেন এখন একই শিবিরে। রাজ্জাকের মতে ডঃ কামাল হোসেন-গোষ্ঠী আওয়ামি লিগের ঘোষিত বাকশাল নীতির বিরোধী। তাঁদের এই বিরোধ আদর্শগত। অন্যদিকে ডঃ হোসেনের বক্তব্য, এই বিরোধ আদর্শগত নয়। কিছু ব্যক্তি দলের শৃঙ্খলা—মেজরিটির সিদ্ধান্ত লংঘন করেছেন। তাই দলের নির্দেশেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব আওয়ামি লিগ ভেঙে এবং দলীয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ (বাকশাল) গঠন করলে দলের মধ্যে প্রথম ভাঙন শুরু হয়। প্রথম সরে যান জেনারেল ওসমানী। পরে তিনি গঠন করেন জাতীয় জনতা পারটি। খন্দকার মোসতাক গঠন করেন ডেমোক্র্যাটিক লিগ। ১৯৭৮ এ সরে যান মীজানুর রহমান চৌধুরী। ১৯৮২ সালে চলে যান দেওয়ান ফরিদগাজী। বি এন পিতে যোগ দেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। বাকশাল গঠন হলে আওয়ামি লিগ ব্যানারটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখেন"মালেক উকিল। শেখের শোচনীয় মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে মালেক উকিলের আওয়ামি লিগ ও বাকশাল আবার এক হয়ে সাবেক আওয়ামি লিগ নাম নেয়। শেষ হয় বাকশাল অধ্যায়। বাকশালে অন্য যে সব রাজনৈতিক দল ছিলেন তাঁরাও ফিরে যান নিজেদের সাবেক ব্যানারে। এই প্রত্যাবর্তন মুহূর্ত থেকেই আওয়ামি লিগে বিরোধের বীজ।

ওয়াকিবহালরা মনে করেন এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে। বামপন্থীরা স্বভাবতই রুশ ঘেঁষা, দক্ষিণ পন্থীরা তার বিরোধী। বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতা রাজ্জাক সাহেবের সংগে আছেন প্রাক্তন ন্যাপ থেকে আওয়ামি লিগে আসা মাতিয়া চৌধুরী, মোনায়েম সরকার প্রমুখেরা। ন্যাপ (মোন্যাপ ও হারুন ন্যাপ) রুশ ঘেঁষা বামপন্থী দল। এই হিসেব মেলেনা যখন দেখা যায় সৈয়দ জোহরা তাজউদ্দিন, পরলোকগত তাজউদ্দিন সাহেবের পত্নী (প্রগতিশীল শিবিরের লোক বলে পরিচিত) যখন ডঃ কামাল হোসেনের গোষ্ঠীতে থাকেন। শেখ হাসিনার এই গোষ্ঠী সমর্থনও ব্যাপারটি যে শুধু আদর্শগত বিরোধ তা প্রমাণ করেনা।

আওয়ামি লিগের ছাত্র ফ্রনট এর অনেক আগেই ভাগ হয়ে যায়। দেখা যায় বাংলাদেশ ছাত্রলিগ মুকুল বসু গোষ্ঠী রাজ্জাককে সমর্থন করছে। বাংলাদেশ ছাত্রলিগ জালাল জাহাংগীর গোষ্ঠী সমর্থন করছে হাসিনা—কামাল হোসেনকে। বস্তুত এই বিভক্ত ছাত্রলিগকে কেন্দ্র করেই আওয়ামি লিগে নতুন সংঘাতের সূত্রপাত। গত ১১ জুন আওয়ামি লিগের হাসিনা-হোসেন-তোফায়েল গোষ্ঠী ফজলু-মুকুল গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি না দিয়ে যখন জালাল-জাহাংগীর গোষ্ঠীকে সরকারি

স্বীকৃতি দেন, তখনই রাজ্জাক গোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আমি যে চোদ্দদিন ঢাকায় ছিলাম রোজই চলত আওয়ামি লিগের দুই গোষ্ঠীর সমর্থকদের প্রকাশ্য লড়াই। বংগবন্ধু এভিনিউর একই অফিসের ভেতর উভয় গোষ্ঠীর সমর্থকেরা রোজই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন। গত ৩১ জুলাই কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে দুই গোষ্ঠীর হাজার কয়েক সমর্থক লাঠি সোটা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

ভাঙন যে শুধু আওয়ামি লিগেই তা নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি পদ্মা মেঘনার মতই পাড় ভেঙে চলছে। এক সেখানে বহু হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সত্তরটির মত। আদিতে চার পাঁচটি দল থেকেই এদের উৎপত্তি। আওয়ামি লিগের পর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদ প্রগতিশীল ও সেকুলার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। দলের নেতৃত্ব ছিল মেজর জলিল ও আবদুল রব-এর মত টগবগে তাজা তরুণের হাতে। কিন্তু এই দলেও এই দুই নেতার মধ্যে উপদলীয় সংঘর্ষ এসে উপস্থিত হয়েছে।

জিয়া তাঁর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) গঠন করেছিলেন বিভিন্ন দলছুট নিয়ে। মধ্যপন্থী দক্ষিণঘেঁষা এই দলটিও আজ দ্বিধাবিভক্ত। একটি সাত্তার ও শাহ আজিজ গোষ্ঠী বলে পরিচিত। আর একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শামসুল হুদা। রুশপন্থীরা তিনভাগে বিভক্ত। বর্তমানে ন্যাপের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের চেষ্টা চলছে। চীনপন্থীরা প্রায় ৮ ভাগে বিভক্ত। চীনপন্থী (যারা বাংলাদেশ নকশাল বলে পরিচিত) তাদের মধ্যে চারটি দল আনডার গ্রাউনডে। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের একটি সশস্ত্র উপগোষ্ঠী (গণবাহিনী) যশোর, খুলনা, পাবনা, রাজশাহীতে কাজ করছে। নকশালদের গুপ্ত গোষ্ঠীও এইসব এলাকায় রয়েছে। সুযোগ পেলেই তারা শ্রেণীশত্রু খতম করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতিদের শান্তি বাহিনীও একটি সশস্ত্র গুপ্ত সংগঠন। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অতি বাম থেকে অতি ডান সমস্ত শিবিরেই রয়েছে। মুসলিম লিগও দ্বিধাবিভক্ত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন চলছে চারটি ধারা। প্রথম ধারায় আছেন মডারেট এবং বামপন্থী। এঁদের বলা যায় লেফট টু দি সেনটার। এঁরা ১৫ দলের জোট তৈরি করেছেন গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের জন্য। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এঁরাই সর্বাধিক সোচ্চার। এই দলেই আছেন আওয়ামি লিগের বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাসদ, ন্যাপ প্রভৃতি। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে আছেন ১০টি দল। এঁদের নাম জাতীয় ঐক্যজোট। ১৯৮৩ সালের ২৬ মারচ এই ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা। এঁরা কেউ ইসলামিক রিপাবলিক চান, কেউ এ ব্যাপারে অতটা সোচ্চার নন। তবে এঁরা সবাই ঘোরতর বামপন্থী বিরোধী–ইসলামী রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল। এঁদের বলা যেতে পারে রাইট টু দি সেনটার। তৃতীয় গোষ্ঠীতে আছেন অতি বাম গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে আছেন অন্তত আটটি চীনাপন্থী সংগঠন। চতুর্থধারায় কট্টর ইসলামপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দল আছে অন্তত দশটি। এই দলগুলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে ও কিছু দীক্ষিত ধর্মান্ধ ব্যক্তি আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য মুজিবের সময় সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। মুজিবের মৃত্যুর পর এইসব দলগুলির ওপর যে শুধু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাই নয়, শাসক গোষ্ঠী এদের মদত দিতে থাকেন। বর্তমানে এরশাদ প্রশাসনও এই গোষ্ঠীদের মদত দিয়ে চলেছেন। বিনিময়ে এঁরাও সামরিক শাসনকে সমর্থন করে চলেন। পাকিস্তানেও ঠিক এই একই জিনিস দেখে এসেছিলাম। তবে এই দক্ষিণপন্থী শিবিরেও ভাঙন আছে, মতদ্বৈধ আছে। যেমন জামাত ইসলামির মধ্যে দুই গোষ্ঠী। একটি গোষ্ঠীর নেতা গোলাম আজম। আর একটির নেতা আবদুর জব্বর। গোলাম আজম বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। বাংলাদেশ হবার পর তিনি পাকিস্তান চলে যান। দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ঢাকায় ফেরেন। মুসলিম লিগের অনেক নেতাও পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এখন সবাই ফিরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্রমাগত এই ভাঙা গড়ার খেলায় জনসাধারণ রাজনৈতিক দলগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। আমাকে একজন সাংবাদিক সখেদে বললেন, বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বি এ পি অর্থাৎ বাংলাদেশ আরমি পারটি। রাজনৈতিক দলে ভাঙনের পিছনে যে সেনাবাহিনী আছে এটাও অনেকের সন্দেহ। তবে সেনাবাহিনী না থাকলেও বাংলাদেশে রাজনীতির পিছনে বিদেশি টাকার খেলা আছে। অনেকে মনে করেন আওয়ামি লিগের ভেতরে একটা মারকিন লবি আছে। আর একটি রুশ লবি। রুশ, মারকিন, চীন, সৌদি আরব, লিবিয়া ও ইরান এই ছ'টি দেশের নিজস্ব অর্থে পুষ্ট এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল আছে বাংলাদেশে।

বেগম জিয়াউর রহমান : বিষণ্ণ স্মৃতি। আলোকচিত্র : খন্দকার তারেক

আবদুস সাত্তার : আলোকচিত্র : খন্দকার তারেক

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল

সেক্যুলার পন্থী, প্রগতিশীল বামপন্থী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল। ১৫ দলের ঐক্যজোট বলে পরিচিত।

১। গণ আজাদি লিগ
২। ন্যাপ (মজঃফর)
৩। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল (জলিল, রব)
৪। বাংলাদেশ কম্যুনিসট পারটি (মণি সিং)
৫। একতা পারটি (আলতাফ হোসেন)
৬। সাম্যবাদী দল (তাহা)
৭। আওয়ামি লিগ (মিজান)
৮। আওয়ামি লিগ (ফরিদ গাজী)
৯। ওয়াবকারস পারটি (হায়দার, আকবর খান রনো)
১০। ন্যাপ (হারুন)
১১। সাম্যবাদী দল (দিলীপ বড়ুয়া)
১২। বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী দল (খালিকুজ্জমান ভূঁইয়া)
১৩। কৃষক-শ্রমিক সাম্যবাদী দল (নির্মল সেন)
১৪। মজদুর পারটি
১৫। আওয়ামি লিগ (হাসিনা)
[আওয়ামি লিগকে এখানে গোষ্ঠী বিরোধের আগে ধরা হয়েছে]

১০ দলের ঐক্যজোট। মধ্য দক্ষিণপন্থী দলসমূহ। সেক্যুলারিজম বিরোধী।

১। ডেমোক্র্যাটিক লিগ (মোস্তাক)
২। কৃষক-শ্রমিক পারটি
৩। নিজামে ইসলাম
৪। মুসলিম লিগ (টি আলি)
৫। জাসটিস পারটি
৬। রিপাবলিক্যান পারটি
৭। ন্যাপ (নাসের)
৮। বাংলাদেশ জাতীয় দল (আমিনা বেগম) ৯। ইসলামিক পারটি
১০। গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির

অতিবামপন্থী দলসমূহ

১। সর্বহারা পারটি (শামসুজ্জোহা)
২। বিপ্লবী কম্যুনিসট পারটি (আবদুল হক)
৩। বিপ্লবী কম্যুনিসট লিগ (টিপু বিশ্বাস)
৪। সাম্যবাদী দল (নগেন সরকার)
৫। সাম্যবাদী দল (সুধাংশু দত্ত)
৬। ওয়ারকারস পারটি (বাদেদ খান মেনন ও অমল সেন)
৭। বাংলার কম্যুনিসট পারটি (দেবেন বিশ্বাস)

গোঁড়া দক্ষিণপন্থী ইসলামি দল, গোষ্ঠী ও সংগঠন।

১। পি ডি পি (শোভান)
২। জামাত-ই-ইসলাম
৩। নিজাম-ই-ইসলাম
৪। খিলাফৎ রববানি
৫। ওহাবি আন্দোলন পারটি
৬। ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লিগ
৭। মুসলিম লিগ (সবুর খান)
৮। মুসলিম লিগ (হুদা)
৯। জমিয়তারিয়ৎ
১০। মসজিদ মিশন
১১। ইসলামিক শিবির
১২। যোশ-ই-ইসলাম

উল্লেখযোগ্য, মুসলিম লিগ দ্বি জাতিতত্ত্ব ও ইসলামিক রিপাবলিকে বিশ্বাসী হলেও নিজেদের গোঁড়া বলে অভিহিত করেন না।

এই তালিকার বাইরে আছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিসট পারটি বি এন পির দুই গোষ্ঠী ও কাজি জাফরের বামপন্থী দল ইউনাইটেড পিপলস পারটি। আরও কিছু দল বাদ যাওয়াও বিচিত্র নয়। □

তবে ভারতীয় লবি যদি কিছু থাকে সেটি খুবই দুর্বল। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের মজা যে তাঁরা প্রকাশ্যে বলবেন যে আমি কশ সমর্থক, আমি চীন সমর্থক, খোমেইনি আমার আদর্শ পুরুষ, কিংবা আমেরিকার প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে প্রশংসা করবেন, কিন্তু প্রকাশ্যে ভারতের সমর্থন করতে সকলেই লজ্জা পাবেন। ভারতীয় এজেনট বলে বাজারে বদনাম রটাটা সি আই এ কিংবা কে জি বি একেনটের চেয়েও অবমাননাকর। সরকারি অফিসাররাও খুব সন্ত্রস্ত থাকেন, এই বুঝি ভারত সমর্থক বলে তিনি চিহ্নিত হয়ে পড়লেন। তবে ভারতীয় সাংবাদিক হিসেবে আমাকে সব দলের রাজনৈতিক নেতাই মন খুলে কথা বলেছেন। আমি আওয়ামি লিগ, জাসদ, বি এন পি এবং মুসলিম লিগের নেতাদের সংগে কথা বলেছি। তাঁদের সকলের সৌজন্যেই আমি মুগ্ধ। বাংলাদেশের মানুষ ভীষণ খোলামেলা। সকলেই মনের কথা অকপটে বলেন। একজন রাজনৈতিক নেতা তো আমাকে বললেন, আমাদের টাকা নেই, তাই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছিনা। আন্দোলন চালানোটাকার খেলা। শাসকদল না হলে ব্যবসায়ীরা কেউ টাকা দেবেনা। রুশরাও প্রগতিশীলদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন না। আরবরা তো আর আমাদের টাকা দেবেনা। তাই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেরা যে খুব আর্থিক কষ্টে আছেন তা মনে হল না। তবে একথা সত্যি দল চালাতে গেলে বা রাখতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার। সে টাকা কৃষিপ্রধান একটি গরীব দেশের মানুষের পক্ষে তুলে দেওয়া মুশকিল। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এত বিদেশি টাকার খেলা চলে। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র দু তিন বছরের মধ্যে বি এন পি ৬৬ লক্ষ টাকা দিয়ে অফিস বাড়ি কেনে। দলের কয়েক কোটি টাকার হিসাব নিয়ে গন্ডগোল বাধে।

রাজনৈতিক দলগুলি থমকে দাঁড়ালেও ছাত্ররা আবার আন্দোলনের জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমি ডাকসুর সভাপতির সংগে কথা বলেছি। কথা বলেছি ছাত্রলিগের নেতাদের সংগেও। ১৯৮২ সালের ২৪ মারচ সামরিক আইন জারী হওয়ার পর রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যত ছাত্রদের হাতেই চলে এসেছে। ১৭টি ছাত্র সংগঠন নিয়ে (এর মধ্যে পাঁচটিই বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছাত্রলিগ যা আওয়ামি দলের ছাত্র সংগঠন) গঠিত হয়েছে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। তিনটি চীনাপন্থী ছাত্র সংগঠনও এর মধ্যে আছে। আর আছে অরাজনৈতিক ডাকসু অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপটেমবর থেকে শিক্ষানীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে এঁরা একযোগে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৮২ সালের ১১ জানুয়ারি ছাত্ররা শিক্ষামন্ত্রণালয় অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘটের প্রোগ্রাম নেন। ওই প্রোগ্রাম কার্যকর হয় ১৪ ফেবরুয়ারি। ওই দিনই পুলিশের সংগে সংঘর্ষ। ৫৪ জনের মৃত্যু। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও নোয়াখালিতে। রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। তিনমাস তিনদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এখন পাঁচদফা দাবির সমর্থনে আবার আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে জানালেন ছাত্রলিগের নেতা মুকুল বসু। এই পাঁচদফা হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, জাতীয়করণ নীতি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের দাবিতে, ছাত্রদের বাসে কনসেশন দান ও শত্রুসম্পত্তি আইন প্রত্যাহার।

কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারও অনেকখানি তৎপর হয়েছেন। সরকার সমর্থিত ছাত্রদলও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারা আন্দোলন থেকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলুকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৮৫ সালে নির্বাচন ঘোষণায় এরশাদও হাতে সময় পেয়েছেন ঘর গোছানোর। ক্যানটনমেনটের সংগে জনসাধারণের প্রভাবশালী অংশের একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান এরশাদ। সেইসংগে চান তাঁদের ভাষায় 'দুর্নীতিগ্রস্ত', 'আদর্শভ্রষ্ট' এবং 'নির্দিষ্ট গতিহীন' সোস্যাল ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদ ও "নাস্তিক কম্যুনিসটদের" সম্পর্কে জনসাধারণের মোহভংগ ঘটাতে। এই লড়াইটা এরশাদ এবার শুধু বুলেট বা কাঁদানে গ্যাস দিয়ে লড়তে চাননা-'নতুন এক বাংলাদেশ গড়বোই গড়বো' এই শ্লোগান দিয়ে লড়তে চান। এরশাদ ভাবছেন এখনকার রাজনৈতিক শূন্যতাই তাঁর এখন সবচেয়ে বড় ভরসা। □

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরই সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে : শেখ হাসিনা

ক্যামেরা যদি প্রায়শঃই কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তিনি মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা। মিষ্টি চেহারার এই রাজনৈতিক নেত্রীকে (জন্ম ১৯৪৭) ফোটোর চেয়ে সামনাসামনি অনেক সুন্দর দেখায়। ৩২ নং ধানমন্ডীর পৈত্রিক বাড়িতে শেখ হাসিনা থাকেন না, থাকেন ঢাকার এক প্রান্তে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী তাঁর স্বামীর ফ্ল্যাটে। ১৯৬৭ সালে তাঁর বিবাহ। ছেলে জয় এর জন্ম ১৯৭১ সালে। মেয়ে পুতলির জন্ম ১৯৭৩ সালে। দুজনেই ইংরাজিতে কথা বলে। 'বিদেশে বড় হওয়ার জন্যই তারা ইংরাজি বেশি শিখেছে।'

১৯৭৫ সালের ৩০ জুলাই হাসিনা ও তাঁর স্বামী জারমানি চলে যান। শেখ পরিবার যখন নিহত হন তখন তিনি হল্যান্ডে। ১৫ আগস্ট সেই কালো দিনটি। তার আগে ১১ আগস্ট ট্রাঙ্ক কলে বাবার সঙ্গে কথা হয়। সেই শেষ কথা।

শেখ হাসিনা শোক সামলে নিয়ে এখন রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আওয়ামি লিগের তিনি এখন সভানেত্রী। মৃদুভাষিণী, হাসিখুশী এবং বাবার কাছ থেকে যে গুণটি তিনি পেয়েছেন সেটি হল একটা খোলামেলা ভাব। শেখ হাসিনা কোন দেহরক্ষী নিয়ে চলেন না। তাঁর সঙ্গে মোটরে লিফট নিয়েছিলাম। পথের প্রতিটি মোড়ে প্রত্যেকটি ভিখারিকে তিনি ব্যাগ খুলে টাকা দিলেন। তিনি যাচ্ছিলেন পারটির এক গোলমেলে মিটিঙে। তাঁর খুব টেনসন যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে চলেছেন। সর্বদা তাঁর চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ে। **সাক্ষাৎকারটি রেকরড করা** হয় ৪ আগস্ট দুপুরে তাঁর ঢাকার বাড়িতে।

পরিবর্তন : আপনাকে প্রথম যেটি জিজ্ঞাসা। আপনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, আপনার কাছে আপনার দল অনেক কিছু আশা করে। আপনি যখন দলে রয়েছেন তখন সে দলে ভাঙন কী ভাবে অনিবার্য হয়ে উঠল?

হাসিনা : এ বড় কঠিন প্রশ্ন। ভাঙন একে কীভাবে বলছেন জানি না। আমি একে ভাঙন বলে মনে করি না। যারা দলের বিভিন্ন পদে থাকেন বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ পদে, তাঁদের উচিত দলের সিদ্ধান্তকে মেনে চলা। যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন তাঁরা যদি এটা না করেন, তাহলে দলের কর্মীদের সামনে আমরা কোন আদর্শই তুলে ধরতে পারব না। ঠিক এই ধরনের কিছু ঘটনা দলে ঘটে গেছে। দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ যদি কিছু বলে সেটা দলের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করে, দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে অসুবিধে হয়। আমি মনে করি কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারও দ্বিমত হতেই পারে তবে সেটা দলের ফোরামে বলা উচিত। আমাদের বিরাট, দল, গ্রাম পর্যন্ত সংগঠন রয়েছে। এই দল সব সময় মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছে। অন্যান্য দলকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছে এই দল। এই দলের ভেতর যাতে সব সময় বিশৃঙ্খলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সব সময় তার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যারা এদেশে ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধকে অনুমোদন করেনি, সেই সময় বিদেশি শক্তিগুলি আমেরিকা, চীন, সৌদি আরবিয়া মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের মদত দিয়েছে, তাদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল বিরাট পরাজয়। সেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তিগুলি পরাজয় মেনে নিতে পারেনি বলেই তাদের চেষ্টা ছিল এই স্বাধীনতার সুফল ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করা। তারই পরিণতি বঙ্গবন্ধুর হত্যা। তারপর ওই স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির হাতেই এই দেশের ক্ষমতা চলে যায়। তারা জানে এই দল যদি শক্তিশালী হয়ে যায় তাহলে ১৫ আগস্টের পর থেকে যে চক্র ক্ষমতায় আছে তাদের ক্ষমতায় থাকা কষ্টকর হবে। তাই সব সময় একটা কান্না তারা এই দলে বিভেদ আনতে চেষ্টা করে। এখন কে যে কার শিকার তা বলা মুশকিল। আমার কথা যদি বলেন, আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে এক দায়িত্বভার দিয়ে। দলের মধ্যে এই বিভক্তি আগে থেকেই ছিল। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি দলের ঐক্য বজায় রাখতে। তবে দলের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ যে করবে দলের অধিকার আছে তার কাছে জবাবদিহি চাইবার।

পরিবর্তন : আপনি যেটা বলছেন, সেটা হল শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রশ্ন, কোন আদর্শগত বিরোধ নয়?

হাসিনা : বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ে তোলবার জন্য কৃষক, শ্রমিক, আইনজীবী, চাকরিজীবী, বি ডি আর সেনাবাহিনী নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলেন। বাকশালের এই ভাবেই সৃষ্টি। বাকশালের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতার সুফলকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এগিয়ে যান। আওয়ামি লিগ এই মেনিফেস্টোর মধ্যে বাকশালের কর্মসূচিকে গ্রহণ করেছি। এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সুতরাং আদর্শগত বিরোধের কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

পরিবর্তন : একথা কি ঠিক যে বাকশালের প্রশ্নে আপনাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়? আপনার গোষ্ঠী

বঙ্গবন্ধুর ছবির নিচে শেখ হাসিনা

বাকশালকে সমর্থন করেন না, অপর গোষ্ঠী করেন। এর ফলেই যত বিরোধ?

হাসিনা: দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি অর্থাৎ বাকশালের কর্মসূচি মেনে নিয়েই একজনকে আওয়ামি লিগের সদস্য হতে হয়। অতএব আদর্শের দ্বন্দ্ব ঠিক নয়।

পরিবর্তন: একথা কি ঠিক বংগবন্ধুর মৃত্যুর পর যে সরকার গঠিত হয় আওয়ামি লিগের সদস্যরা তাতে যোগ দেন। তাঁরা আবার এখনও আপনার সংগে আছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন শৃংখলা-ভংগের অভিযোগ আনেননি?

হাসিনা: আমি আসার আগে থেকেই দল যখন রিভাইভ করে সে সময় যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা আওয়ামি লিগের ভেতর ছিলেন। তবে আপনি নিজেই তখনকার কাগজপত্র খুঁজে দেখবেন, যাঁদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে তাঁদের অনেকেই দুদিকে ছিলেন।

পরিবর্তন: বংগবন্ধুর শেষের দিকে আপনার পারটির মধ্যে শৃংখলাহীনতা দেখা দিয়েছিল। সব কিছু ভেঙে পড়ছিল। তার ফলেই বংগবন্ধুর মৃত্যুর মত দুর্ঘটনা ঘটল। এমন অবস্থা হয়েছিল যে দলকে রাখা যাচ্ছিল না, এটা কি ঠিক?

হাসিনা: এটা ঠিক নয়। বংগবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয় তখন তো তিনি শুধু আওয়ামি লিগ নয়—বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে বাকশাল গঠন করেছিলেন। তখন তো আওয়ামি লিগ একক ছিল না। দলের দুর্বলতার প্রশ্নই ওঠে না।

পরিবর্তন: আপনি কি মনে করেন বংগবন্ধু কিছু কিছু জায়গায় দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিলেন বিশেষ করে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারেননি। আপনি কি মনে করেন বংগবন্ধুর সমস্ত নীতি অভ্রান্ত ছিল?

হাসিনা: আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বংগবন্ধুর প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগেও তাঁর নীতি সময়োপযোগী ও কল্যাণকর ছিল বলে আমরা মনে করি।

পরিবর্তন: বর্তমানে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সে সম্পর্কে কি আপনি ও আপনার দল ওয়াকিবহাল?

হাসিনা: জাতির জনক বংগবন্ধুকে হত্যা করার পর এই সব ঘটনা শুরু হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে সচেতন।

পরিবর্তন: আপনি কি মনে করেন আপনার দলে এই যে ভাঙনের ঘটনা ঘটল তাতে আপনার দল দুর্বল হয়ে গেল, প্রগতিশীল আন্দোলনের ওপর একটা বিরাট আঘাত এল?

হাসিনা: ঠিক আওয়ামি লিগ দুর্বল হয়ে যাবে এ আমি ভাবি না। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। আর তাছাড়া এটা তো ভাঙন নয়। তবে এ ঘটনা এমন সময় ঘটল যখন দেশের মানুষ একটা বিকল্প কিছু খুঁজছিল। গত আট বছর ধরে দেশে কোন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। আইন প্রশাসনের অবনতি ঘটছে। জনজীবন অতিষ্ঠ। প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। প্রতিটি স্তরেই অবনতি। এই সময় দেশের মানুষ যখন আওয়ামি লিগকে বিকল্প শক্তি হিসাবে গ্রহণ করছিল, তখন এই ঘটনায় সাময়িকভাবে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দেবে। একটা ধাক্কা তাদের মনে লাগবে। তবে লোকে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়বে না। এটা অত্যন্ত সাময়িক। যে কোন গণতান্ত্রিক দলে এমন ঘটনা ঘটে। □

সাক্ষাৎকার: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র: খন্দকার তারেক

আবদুর রাজ্জাক কী ভাবছেন?

বংগবন্ধুর হত্যা

বংগবন্ধুকে হত্যা করেছে মারকিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের এদেশীয় এজেনট খন্দকার মোশতাক।

বিরোধিতার উৎস

আমাদের মধ্যে বিরোধিতা এখন তিনটি (১) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগের নীতি গ্রহণ (২) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নীতি ঘোষণায় দ্বিধা সংকোচ (৩) ভূমি সংস্কার। সামরিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের ঐতিহ্য। এই বিরোধিতার ব্যাপারেও আমাদের গড়িমসি চলেছে।

বাকশাল

যেহেতু সে পরিস্থিতি নেই, যেহেতু বংগবন্ধু এখন জীবিত নেই, সেহেতু বাকশালকে আর আগের কাঠামো মাফিক পুনর্জীবন দেওয়া সম্ভব নয়। সেহেতু বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আওয়ামি লিগের কর্মসূচি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করা আমাদের লক্ষ্য। প্রগতিশীল দলগুলির সূচি থেকে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগের কর্মসূচি বিচ্ছিন্ন নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা

বংগবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির যে সূচনা করেছিলেন তাতে তিনি বিশ্বাস করেন বলেই করেছিলেন। কিন্তু দেশে আজ এক অশুভ শক্তি আছে। যা ধর্মকে সম্বল করে, বিদেশি শক্তির প্ররোচনায় গণমানসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই শক্তিকে আমরা নিশ্চিহ্ন করতে পারিনি, তার আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছি। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ছাড়া প্রগতিশীল রাজনীতি হয় না। ব্যর্থতা দুঃখজনক। ১৯৭৮–৮১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় আওয়ামি লিগ। জিয়াউল রহমান সাহেব যে ভাবমূর্তি স্থাপন করেছিলেন তার বিরুদ্ধেও গণ আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু ইদানিং রাজনীতিক দলগুলির ব্যর্থতার ফলে ছাত্ররা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ভারতের সংগে সম্পর্ক

ভারতকে আমরা পরম বন্ধু বলে মনে করি। কারণ ভারত আমাদের দুর্দিনে যে সাহায্য করেছে সেই হিসাবে ভারতের সংগে আমাদের বন্ধুত্ব দুর্দিনের বন্ধুত্ব। চিরঞ্জীব বন্ধুত্ব। কিন্তু এই বন্ধুত্ব সমান সমান বন্ধুত্ব। সবাই এটা আশা করে। সোভিয়েতকেও আমরা দুর্দিনের বন্ধু বলে মনে করি।

আওয়ামি লিগের মধ্যে ভাঙন

এটি সামরিক শাসনের হাত শক্ত করেছে। সামরিক আইন জারি হবার পরে আমাদের সমর্থক একটি পত্রিকার জয়োল্লাস আমাকে আহত করেছিল। তারপর থেকে একটি বিশেষ মহল আওয়ামি লিগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার একটি পারিবারিক চক্র যারা আওয়ামি লিগের মধ্যে বংগবন্ধুর বিরোধী শক্তি তারা তাঁকে নিয়ে বিভিন্নভাবে খেলা করে যাচ্ছেন। এবং এই খেলার মধ্যে তিনি পড়ে গেছেন। আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি তাঁকে নিবৃত্ত করার। আজও আমি বিশ্বাস করি তিনি যদি উপলব্ধি করেন তিনি খেলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবেন। তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন। তার জন্য আওয়ামি লিগ কর্মীরা তাঁকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত। □

আলোকচিত্র: সুশীল সূত্রধর

এরশাদের স্কুল জীবন কেটেছে কোচবিহারে – ডাকনাম পেয়ারা

কোচবিহার থেকে অরবিন্দ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল হুসেন মহ: এরশাদের স্কুল জীবন কেটেছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায়। এরশাদের ডাক নাম পেয়ারা। ১৯৪৬ সালে তিনি দিনহাটা বয়েজ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পশ্চিমবংগের কৃষিমন্ত্রী কমলকান্তি গুহ তাঁর সহপাঠী। এরশাদের বাবা মহ: মকবুল হুসেন পেশায় ছিলেন আইনজীবী। দিনহাটা মহকুমা আদালতে তিনি নিয়মিত প্র্যাকটিস করতেন। এরশাদরা চার ভাই। এরশাদ, মোজাম্মেল, গোলাম এবং আপেল। ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে এরশাদ রংপুর কারমাইকেল কলেজে ভরতি হন। সেখান থেকে তিনি ইনটারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৫০ সালে মকবুল হুসেন চলে যান তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের রংপুর জেলায়। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে এরশাদ বি এ পাশ করে আইন পড়েন এবং পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে এরশাদের বিয়ে হয় গাইবান্ধার মহকুমা শাসকের মেয়ের সংগে। তার আগেই তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন।

দিনহাটা শহরে বাসস্ট্যানডের পেছনে এরশাদের চাচা মহ: বিলায়েত হুসেনের বাড়ি। এখানেই কেটেছে এরশাদের স্কুল জীবন। আমাদের রিকসা চালক পূর্ণচন্দ্র বর্মন বিলায়েত হুসেনের বাড়ির হদিস দিতে পারেনি। এরশাদের নাম করাতে সে বলেছে এ নামে সে কাউকে চেনে না।

পাইওনিয়ার ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এরশাদের নাম করাতে একটু হেসে বিলায়েত হুসেনের বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাচ্চা ছেলে, সে ছুটে গিয়ে ভেতরে খবর দিতেই ৭৫ বছর বয়স্ক বিলায়েত হুসেন বেরিয়ে এলেন। সাংবাদিক শুনেই তিনি বলে উঠলেন, আমি অসুস্থ, কিছু বলতে পারব না। এরশাদের প্রসংগ তুলতেই তিনি বললেন, আপনারা কি পেয়ারার খবর জানতে এসেছেন? সে সব আমি বলতে পারব না। পেয়ারার নিষেধ আছে। আমরাও নাছোড় বান্দা। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হয়ে আমাদেব এক ঘণ্টা পরে আসতে অনুরোধ করলেন।

সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ দ্বিতীয় বার এসে দেখি বিলায়েত হুসেন বাইরের ঘরে বসে আছেন। সংগে তাঁর ছেলে মহ: মোসাম্বার হুসেন (নান্টু) ও আরও কয়েকজন পারিবারিক সদস্য। মোসাম্বার হুসেন দিনহাটা কোরটের সরকারি উকিল, বয়স বছর ৪৫। এরশাদের সংগে চেহারার অনেকটা মিল আছে।

বিলায়েত হুসেন ছিলেন এরশাদের বাবা মকবুল হুসেনের মুহুরি। এরশাদরা এখান থেকে চলে যাবার পরও তিনি মুহুরির কাজ করেছেন। এখন আর কোরটে যান না। বাড়িতেই লোকজন আসে বুদ্ধি পরামর্শ নিতে। বৃদ্ধ বিলায়েত বললেন, পেয়ারা তো আমার কোলে-পিঠেই মানুষ। ছোটবেলায় ছিল শান্ত, ধীর, স্থির। কোন দিন জোরে কথা পর্যন্ত বলতে শুনিনি। কেমন করে ও যে মিলিটারি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। আরও যখন ছোট ছিল মাছ-মাংসে ঝাল দিলে রান্না করা তরকারি জল দিয়ে ধুয়ে খেত। এই ছিল আমার পেয়ারা। বিলায়েত সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, আপনার পেয়ারা আজ বাংলা দেশের সর্বেসর্বা – এতে আপনার গর্ববোধ হয় না? শিশুর মত সরল হেসে বিলায়েত বললেন, রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। আজ যে ক্ষমতার শীর্ষে কাল সে কোথায় হারিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া আমার আবার গর্ব কী? বাবা, আমি তো এখন আল্লাহর কাছে যাবার জন্য দিন গুনছি। ও বড় হয়েছে, দশজনের একজন হয়েছে এতেই আমার আনন্দ।

গতবছর নভেমবর মাসে রংপুর গিয়েছিলাম। বরডার পার হতেই দেখি হাজার মানুষ ওপারে অপেক্ষা করে আছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। মাস দুই ছিলাম রংপুর সেন পাড়ায় পেয়ারাদের বাড়িতে। ওদের বাড়ির নাম 'স্কাই ভিউ'। টেলিফোনে খবর গেল পেয়ারার কাছে। ও নিজে এসে হাজির। আদরযত্ন কেমন পেলেন চাচা? আমার মুখ থেকে প্রশ্ন সরতে না সরতেই বৃদ্ধ বিলায়েতের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি বললেন, আমাকে আদরযত্ন করবে না তো করবে কাকে? আমার কাছেই তো ও বড় হয়েছে। আমার কাছে এসেছে ঐ ক'দিন, পুরনো অনেক কথা জানতে চেয়েছে, হাসি ঠাট্টা করেছে, কিন্তু মিলিটারির পোশাক পরলেই ও যেন কেমন বদলে যায়। আমার পেয়ারাকে আর চেনা যায় না। এরশাদের জ্যাঠাইমা জোবেদা খাতুনই (আট্টা মা) নিজের ছেলের মত করে এরশাদকে মানুষ করেছেন। তিনি ছিলেন নি:সন্তান।

বিলায়েত হুসেনের বড়ছেলে মোসাম্বার হুসেনের (নান্টু) কথা মত দাদা (এরশাদ) ভাল ফুটবল খেলতেন। তিনি ছিলেন বয়েজ ক্লাবের দলপতি। প্রতিপক্ষ ফ্রেনডস ইউনিয়নের সংগে প্রায়ই ছোটখাট গন্ডগোল লেগেই থাকত। আবার খেলা শেষ হতেই ভাব জমে যেত।

দাদার সংগে শেষ দেখা হয়েছে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে। এরশাদ তখন দিললিতে সামরিক প্রশিক্ষণরত ছিলেন। সেসময় ৬ দিনের জন্য তিনি দিনহাটায় এসেছিলেন। পদমর্যাদায় সে সময় তিনি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার। তখন শেখ মুজিব জীবিত। ঐ ৬ দিন দাদা পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সংগে চুটিয়ে গল্প গুজব করেছেন। সে সময় কমলদার (কমল গুহ) সংগে দাদাব অনেক বিষয় আলোচনা হয়। ১৯৭১ এর মুক্তি সংগ্রামের সময়কার অনেক বিষয়ে তিনি খোঁজ খবব নেন।

আমাদেব আলোচনার সময় এরশাদ সাহেবেব খুড়তুতো ভাইবোনরাও হাজির ছিলেন। তাঁরা সবাই দাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিলায়েত সাহেব আমাদের দেখালেন এরশাদের পড়ার আলমারী, পড়ার টেবিল, যে টেবিলে বসে এরশাদ পড়াশোনা করতেন সেখানে ব্লেড দিয়ে খোদাই করে তিনি নিজেই নিজের নাম লিখেছেন 'এরশাদ'। □

জেঃ এরশাদ উবাচ

রাজনৈতিক দল

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির চাপে প্রশাসনের কোন উন্নতি ঘটান যায়নি এতদিন। জাল শিল্পপতিদের লাইসেনস, পারমিট দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁরা দলে চাঁদা দিতেন। দুবৃত্তরা রাজনৈতিক দলের দালাল হিসেবে কাজ করত। তারা সমাজকে সশস্ত্র করে রেখেছিল। ক্ষমতাসীন দল এদের তোষামোদ করে চলত। সেজন্য কোন রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় এসে সমাজ বদলাতে পারেনি। ১৯৮১ সালে প্রতারণা ও জালিয়াতি করে ব্যাংক থেকে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আমাদের দেশে ব্যর্থ হয়নি। যা ব্যর্থ হয়েছে তা হল বিদেশ নীতির সীমাবদ্ধতা। গণতন্ত্র বলতে আমি এমন এক রাষ্ট্র কাঠামো ভাবি যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

গান

আমি ভালবাসি নজরুল গীতি ও রবীন্দ্রসংগীত। যখনই বাড়িতে সময় পাই গান শুনি। সকালের নামাজের পর অফিস যাওয়ার আগের সময়টা আমার গান শোনার সময়।

কৃতজ্ঞতা

সৈনিকের জীবনে বড় স্বপ্ন প্রধান সেনাপতি হওয়ার। আমি মুসলমান–এজন্য আল্লার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমার স্বপ্ন সফল করেছেন।

ইসলাম

রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে সর্বত্র ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন হোক এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

'এখন সমস্ত বাংলাদেশই ভারতের বিরুদ্ধে' : খন্দকার মোসতাক আহমেদ

খন্দকার মোসতাক আহমেদ

বাংলাদেশের বিতর্কিত নায়ক ও শেখ মুজিবর রহমানের নারকীয় হত্যার পর, ক্যু এর নায়কেরা যাকে ৮৩ দিনের জন্য রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়েছিল সেই খন্দকার মোসতাক এখন ডেমোক্র্যাটিক লিগের সভাপতি। এই দলের প্রথম শ্লোগান 'ধর্মই আমাদের জীবনের ভিত্তি।' অন্যতম আদর্শ 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব।' মুজিব হত্যালীলা খন্দকারের মতে 'দুঃসহ রজনীর অবসান।' সেদিনের ক্যু তাঁর মতে 'সিপাহী বিপ্লব।' খন্দকার এখন দাড়ি রেখেছেন। টুপি আগেই পরতেন। এখন তাঁর কথাবার্তা কট্টর ধর্মীয় নেতার মত। তাঁর দলের পতাকা সবুজ। মাঝে চাঁদ তারা। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেমবর জিয়ার শাসনকালে খোন্দকার দুর্নীতির মামলায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৮০ সালের ২৫ মারচ তিনি মুক্ত হন। এখন ঢাকায় স্বগৃহে বাস করছেন। তাঁর মুক্তির পর ১৯৮০ সালের ২৩ মে তাঁর এক জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ওই বোমায় ছ'জন মারা যান। মোসতাক এখন কট্টর ভারত-বিদ্বেষী। তাঁর ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এবং বক্তৃতায় সর্বাগ্রে ভারতের বিরুদ্ধে ঝরে পড়ে ঘৃণা। ১৯৮০ সালের ৮ জুন খুলনায় এক জনসভায় তিনি বলেন 'বাংলাদেশকে ভারতের সেবাদাসে পরিণত করতে দেওয়া হবে না।' জিয়া যখন ভারতের কাছে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত গ্যাস বিক্রির প্রস্তাব করেছিলেন, তখন খোন্দকার বলেছিলেন হিন্দুস্থানের কাছে (ভারতকে তিনি পূর্বতন পাক নেতাদের মত হিন্দুস্থান বলেন) গ্যাস বিক্রি করা চলবে না।

ব্যক্তিগতভাবে মোসতাক এই প্রতিবেদকের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছেন। এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ১০ আগস্ট, ঢাকার ৫৪ আগামসী লেনে, মোশতাক সাহেবের বাড়িতে।

পরিবর্তন : আপনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর হত্যাকারীরা আপনাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। আপনিও দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। এটা কী করে সম্ভব হয়েছিল একটু বুঝিয়ে বলবেন?

মোসতাক : সফল ক্যু যারা করে তারাই সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আমি রেডিও স্টেশনে ওদের সংগে আলাপ করেছি। একটা সিভিল ওয়ার হবে এই আশংকা যে করিনি তা নয়। দেশকে সেই গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি ক্ষমতা নিয়েছিলাম। সেদিন তো ফণীবাবুও আমার পাশে ছিলেন। ধরুন, আমাকে না নিয়ে আর একজনকে বসাবার অধিকার সেদিন যারা বিজিত তাদের ছিল। আপত্তিটা কি আমাকে নেওয়া নিয়েই? সেদিন যদি ওঁরা নিজেরাই ক্ষমতায় বসে পড়তেন? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাকে কেন আমারও তো অন্যান্যদের মত পরিণতি হতে পারত? ওঁরা সেদিন বলেছেন, You are the only acceptable person in Bangladesh. You shall have to. I said yes. কিন্তু আমি কনস্টিটিউশন রাখব, পারলামেনট রাখব, সিভিল গভরনমেনট থাকবে। যদি তা না হয় আপনারা আমায় নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। আপনারা দেখেছেন সবই ছিল। পারলামেনট থাকার দরুন, আমি তিনটার সময় ওথ নিয়েছি। ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যরা সাড়ে তিনটায় ওথ নিয়েছে। সেদিন আওয়ামি লিগ বাকশালের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা ছিলেন, তারাই ওথ নেন। আমি তিনটার সময় ওথ নেওয়ায় দায়িত্বটা আমার ওপর এসে পড়ল আর যারা সাড়ে তিনটার সময় ওথ নিলেন তাদের কোন দায় দায়িত্ব নাই নাকি? আমার শাসনকালে একটা বুলেটও ব্যয় হয়নি। এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। আমার সময় মারশাল ল আদালত ছিল না। I saved the nation. I saved the then Awami League Leaders representatives. ক্ষুব্ধ জনতার ভয়ে একটা লোকও সেদিন প্রকাশ্যে ছিল না। সবাই ইঁদুরের গর্তে ছিল। আমার বিরুদ্ধে উলটো চারজ, আওয়ামি লিগের লোক হওয়ায় আমার মন্ত্রিসভার সবাইকেও আমি আওয়ামি লিগ থেকে নিয়েছিলাম। যারা ক্যু করেছিলেন তারা বলেছে আমরা ক্যু করেছি, এর মধ্যে কেউ নেই।

পরিবর্তন : কিন্তু আওয়ামি লিগের নেতারা বলছেন, আপনি ক্যু করিয়েছেন।

মোসতাক : ব্যক্তিগত কারণে, রাজনৈতিক কারণে যদি ওঁরা বলেন, তাহলে আমি তো ওঁদের মুখ আটকে রাখতে পারব না। এই প্রশ্নটা আবার করি, তিনটার সময় আমি ওথ নিলাম, ওরা দুধের ধোয়া যখন তখন সাড়ে তিনটায় ওঁরা ওথ নিলেন কেন? এখন যারা আছেন তাদের মধ্যে সবাই তো আমার ক্যাবিনেটে ছিলেন। এটা বিশ বছর মিনসের ঘর করেছি হেঁসেলে যেতে দেইনি, তেমন কথা হল। যারা করেছে ক্যু, তারা নিজেরা বলছে, এর দায়দায়িত্ব তাদের। আমি এটুকু বলতে পারি আমি জাতিকে বাঁচিয়েছি।

পরিবর্তন : মুজিব হত্যা যে দুঃখজনক এটার কি আপনি কখনও নিন্দা করেছেন?

মোসতাক : দুঃখজনক তো বটেই। তাঁর এই পরিণতি কেউ চায়নি। কিন্তু উনি যেভাবে কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বাভাবিক গতিতেই এখনও যা হচ্ছে, আপনি যদি দেশকে দাবিয়ে রাখতে চান, তাহলে কোন না কোন দিক থেকে তার একটা বিস্ফোরণ হবেই। তা আমি পছন্দ করি বা নাই করি। শেখ মুজিবর রহমানের মত পপুলার নেতা আমি তো কাউকে দেখিনি। এই শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর ইন্নালিল্লাহ করার মত লোক পাওয়া গেল না বাংলাদেশে। আমার কাজে আমি যদি ঠেলে দেই, কোন না কোন জায়গা থেকে তার জন্য বিস্ফোরণ হবেই।

পরিবর্তন : কিন্তু আপনি তো ওঁর দলেই ওঁর শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন। এজন্য দল থেকে তো চলে আসেননি

মোসতাক : আমি তার জন্য রেহাইমুক্তি চাইছি না। শেখ মুজিবর রহমান ১৯৪৯ সালে আওয়ামি মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠাতা নন। I am one of the founders. আমি তাঁকে কী বলেছি না বলেছি সেটা শেখ মুজিবর জীবিত থাকলেই

বলাতে পারতেন। তিনি জীবিত থাকতে ফারাক্কার ব্যাপারে আমায় নিয়ে যান। কেউ আমায় রাজি করাতে পারেননি। আমি বলেছিলাম, in that case I resign you go ahead

পরিবর্তন : বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার চাই বলে অনেক দিন ধরেই দাবি উঠছে। এ সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

মোসতাক : বিশ্বের নিয়ম অনুযায়ী যারা সফল বিপ্লব করে, তাদের বিচার করার ক্ষমতা কারও থাকে না। বিশ্বের নিয়ম অনুযায়ী তাদের ইমিউনিটি দেওয়া হয়ে থাকে। যদি টেকনিক্যাল কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে জেনারেল ওসমানি সাহেবকে প্রশ্ন করতে পারেন, কারণ সে সময় তিনি আমার ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ছিলেন।

পরিবর্তন : আপনার সরকার যদি ক্ষমতায় আসে এবং সংসদ যদি ভোটাধিক্যে স্থির করে যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন?

মোসতাক : পারলামেন্ট যদি ডিসাইড করে হবে, দেখি তো নাই কখনও এমন, শুনিও নাই।

পরিবর্তন : ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তার মূল ভিত্তি ছিল চারটি। আপনার দল কি সেই সংবিধানের সংশোধন চান?

মোসতাক : ১৯৭২ সালের সংবিধান সংশোধন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই হয়েছে। সেকুলারিজম অনাবশ্যক বলে তুলে দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্র হলে সেকুলারিজম আর দরকার পড়ে না তাই বাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রও তুলে দেওয়া হয়েছে।

পরিবর্তন : সেই সংশোধিত সংবিধানকেই আপনি সমর্থন করছেন?

মোসতাক : আমি তো ধর্মনিরপেক্ষ নই, আমি ধর্ম সপক্ষ। যে কোন দেশের যে কোন ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা সে দেশের অকল্যাণ করতে পারেনা বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পরিবর্তন : আপনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করেন?

মোসতাক : আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, যদি গণতন্ত্রের মাধ্যমে বেশির ভাগ লোক ইসলামিক চায়, অস্বীকার করবার আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতা নাই। যদি বামকে ডান করে, ডানকে বাম করে সেটা নির্ভর করবে জনপ্রতিনিধিদের ওপর। তারা যদি ইসলামিক রাষ্ট্র করে তাহলে ইয়েস, করবে আমি একা বাধা দেবার কেউ না। আমি ডিক্টেটরশিপ তো পছন্দ করি না, সমস্ত দেশ যদি ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান করে, ওয়েলকাম।

৩২ নং ধানমন্ডী, বঙ্গবন্ধু ভবন। আলোকচিত্র : কল্লকার তারেক

পরিবর্তন : বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময় এখানে প্রগতিশীল মনোভাব বাড়ছিল, সাম্প্রদায়িক মনোভাব কমছিল। আজ মনে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আজ মনে হচ্ছে আবার যেন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

মোসতাক : এটার প্রেরণা তারা সেকুলার ভারতবর্ষ থেকেই পাচ্ছে। কারণ সেকুলার ভারতবর্ষেই মাসের পর মাস এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই।

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্য কোন রক্ষাকবচ দরকার?

মোসতাক : ডেমোক্রেসিতে আলাদা রক্ষাকবচের কোন প্রয়োজন নেই।

পরিবর্তন : দুদেশেই সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা দরকার। এ সম্পর্কে আপনার কী মত?

মোসতাক : আমরা তো দেখেছি আপনাদের ওখানেই এটা প্রথম প্রয়োজন। আপনাদের ওখানে মুসলিম লিগ আছে। আমাদের এখানে মুসলিম লিগ আছে। জমায়েত-ই ইসলামি আছে। এখানে ওই তবলিগ টবলিগ যারা আছে তাদের হেড কোয়ারটার দিল্লিতে। আপনারাই তো সাম্প্রদায়িকতার উৎস।

পরিবর্তন : আপনার মতে ভারতের ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল কী হতে পারেনি?

মোসতাক : আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষ সাহায্য করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের সৈনিকেরা আমাদের সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তাদের রক্ত এক সঙ্গে ঝরেছে। বড় দেশ, গণতান্ত্রিক দেশ। প্রতিবেশী দেশ, তাই বড়র ব্যবহার, প্রতিবেশী-সুলভ ব্যবহার আশা করেছিলাম। আমরা নিরাশ হয়েছি। যুদ্ধের পর অস্ত্রশস্ত্র সব চলে গেছে। আমাদের দুর্দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব খাদ্য এসেছে তার শতকরা ৪০ ভাগ ক্যালকাটা পোরট থেকে ভারতে চলে গেছে। ফারাক্কা আপনারা তৈরি করেছেন পূর্ব পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবার জন্য। এখন পূর্ব পাকিস্তান তো নেই। এখন যে ফারাক্কা শত্রুর জন্য করেছিলেন, সেটা ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও।

আজ When I don't have water you are grabbing my water When I donot need more water I will have flood. এটা একতরফাভাবে করছেন। মীমাংসার দায়দায়িত্ব আপনার। আরও সাতটা যে মিনি ফারাক্কা করেছেন এটা কি বন্ধুসুলভ আচরণ? আমি বাঁচব কী ভাবে? আপনার বিরুদ্ধে আমার শত্রুতা করার মন নাই, শক্তিও নাই, মানসিকতাও ছিল না। Why did you make me enemy? সমস্ত বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে ছিল, এখন সমস্ত বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে কেন, আপনিই এর উত্তর দিন? □

সাক্ষাৎকার :
পার্থ চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

কল্যাণবন্ধু মিত্র

চরিত্র আসলে কী? মানুষের সভ্যতার সংগে সংগে এই নৈর্বস্তুক বিষয়টি নিয়ে মানুষ কম ভাবনাচিন্তা করেনি। কিন্তু সত্যিই এর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি। তবু তো প্রশ্নটি থেকেই যায়। আমাদের প্রতিবেদক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গেছেন প্রশ্নটি নিয়ে। তাঁদের বিচিত্র, বর্ণাঢ্য এবং কখনও কখনও উদাসীন উত্তর মিলেছে। সংজ্ঞা নির্ধারণের পারম্পর্য এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে এ প্রশ্নের যতটুকু উত্তর মিলেছে ততটুকুই আমরা তুলে দিলাম পাঠকদের কাছে। আশা করা যায় পাঠকদের এ-তাবৎ কালের ভাবনাচিন্তাকেও তা কিছুটা আলোড়িত করবে।

এ যুগে চরিত্র নিয়ে নাকি কেউই মাথা ঘামায় না। কথাটা কি সত্যি? তাহলে মাঝে মাঝেই কার চরিত্র খারাপ, কার চরিত্র ভাল এবং কতদূর খারাপ বা ভাল সে সব নিয়ে তুফান বয়ে যায় কেন? এখনও বিয়ের কথা কিছু দূর এগোতেই পাত্র এবং পাত্রীর সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়ে যায় কেন?

চরিত্র কাকে বলে? চরিত্রের আদৌ কি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায়? সতীত্ব জিনিসটাই বা কী? দেহের শুচিতা, এক পতি বা পত্নীতে প্রেমের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং নেশায় আগ্রহ অনাগ্রহ দিয়েই কি একটা মানুষের চরিত্র ঠিকমত বিচার করা যায়?

১৮৭১ এ প্রকাশিত স্যামুয়েল স্মাইলসের Character বইটির কিছু কথা দিয়েই শুরু করা যাক। চরিত্র মানুষের ভেতরকার এমন এক শক্তি যা তাকে সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, এবং দায়িত্ববান করে, নিজের নীতিতে অবিচল থাকবার প্রেরণা জোগায়। কেউ বিরাট জ্ঞানী বা বিরাট ধনী হতে পারল না তাতে দুঃখের কিছু নেই—কিন্তু তাকে অতি অবশ্যই সৎ হতে হবে, নইলে সে প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না। চরিত্র এমন এক সম্পদ যার দৌলতে কোন পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারী না হয়েও কোন কোন লোক সকলের কাছে মুকুটধারী রাজার সম্মান লাভ করে থাকেন। প্রতিভার অনেক ওপরে চরিত্রের স্থান। প্রতিভাধর ব্যক্তি যদি সত্যনিষ্ঠ না হন তাহলে তিনি শুধু প্রতিভার জন্য কখনই সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন না।

মহাভারতের সংশপ্তক বধ পর্বাধ্যায়ের শত্রুবধের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণে প্রকাশ পেয়েছে সে যুগের চারিত্রিক মানদন্ড, 'যদি আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না করে যুদ্ধ থেকে ফিরি যদি তাঁর নিপীড়নে ভীত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই, তবে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপ, গুরুদারগামী ও পরস্বাপহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, শরণাগতকে ত্যাগ করে, প্রার্থীকে হত্যা করে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের অপকার করে, বেদের বিদ্বেষ করে, ঋতুকালে ভার্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাদ্ধ দিনে স্ত্রী-গমন করে, ন্যস্ত ধন হরণ করে, প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, দুর্বলের সংগে যুদ্ধ করে, এবং নাস্তিক অগ্নিহোত্র বর্জিত পিতৃমাতৃত্যাগী এবং অন্য বিধ পাপকারিগণ যে নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব।'

১৯৪১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডারদের কাছে লিউ শাও কি র লেখা 'কী করে ভাল কমিউনিস্ট হতে হয়' বইটি পড়তে হত। এতে কমিউনিস্টদের অবশ্যপালনীয় যে আচরণবিধি ও নিয়ম নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে সৎ-চরিত্রের একটা সর্বকালীন চিরায়ত ছবি।

লিউ শাও কি লিখেছেন, 'প্রত্যেক কমিউনিস্টের উচিত মাটিতে পা রাখা, প্রকৃত ঘটনা থেকে সত্য বের করা, আত্মপরীক্ষায় কঠোর পরিশ্রম করা, আত্মঅনুশীলনে সচেতনভাবে কাজ করা এবং নিজের চিন্তা ও গুণাবলী ধীরে ধীরে উন্নত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কোন সম্পদ অথবা সম্মান তাকে দুর্নীতি পরায়ণ করতে পারে না, দারিদ্র অথবা খারাপ অবস্থা তাকে নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, ভয় অথবা শক্তি তাকে টলাতে পারে না। নিজের অপরাধী মনোবৃত্তি সৃষ্টি হবার মত কিছু না করার ফলে সে নিষ্কলঙ্ক থাকে এবং সাহসের সংগে নিজের ভুল ও অক্ষমতা সংশোধন করতে পারে যেগুলো চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণের মত। যেহেতু তার ন্যায়বিশ্বাসের সাহস আছে তাই সে কখন সত্যকে ভয় পায় না, সাহসের সংগে তা তুলে ধরে, প্রচার করে এবং এর জন্য লড়াই করে। সে সমালোচনাকে ভয় পায় না এবং একই সময়ে সাহস ও আন্তরিকতার সংগে অন্যের সমালোচনা করতে সক্ষম। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে সে কারও চাটুকারিতা করে না অথবা অন্যের চাটুকারিতা দাবী করে না। ব্যক্তিগত বিষয় হলে সে জানে কীভাবে নিজেকে চালাতে হবে এবং অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য নত হওয়ার কোন দরকার নেই।'

সমাজে প্রচলিত কতকগুলো নৈতিক নিয়মের সংগে একজনের স্বভাব কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সামঞ্জস্যহীন তা দিয়েই ঠিক করা হয় তার চরিত্রের ভাল মন্দ। অর্থাৎ সাধারণভাবে চরিত্র বলতে নৈতিক চরিত্রকেই বোঝান হয়ে থাকে। এই মাপকাঠি এক এক দেশে এক এক রকম। আবার একই দেশে ভিন্ন কালে ভিন্ন রকম। একশ বছর আগে এদেশের শিক্ষিতদের মদ খাওয়া এবং রক্ষিতা রাখার রেওয়াজটিকে সাধারণ মানুষ 'তাদের নিছক সাধ আহ্লাদ' বলে ধরত। রক্ষিতার সংখ্যা নিয়ে রেষারেষি চলত। এযুগে রক্ষিতার কথা লোকে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে পারে না। বরং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এখন অতি স্বাভাবিক। রক্ষণশীলতা এবং উদারপন্থা এইভাবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান বদল করে।

কার চরিত্রকে 'ভাল' বা 'মন্দ' হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে যে নৈতিক নিয়মগুলোকে সামনে রাখা হয় সেগুলির সম্বন্ধে অনেক সময়ই সকলের ঐকমত্য থাকে। কিন্তু গোলমাল বাধে প্রয়োগের সময়। কেউ কখনও খারাপ বলে চিহ্নিত হয়ে গেলে দেখা হয় না কেন সে ওরকম হল এবং ঐজন্য তার স্বভাব কতটুকু দায়ী। আর একবার কেউ খারাপ হয়ে গেলে তাকে চিরকাল খারাপ চোখে দেখা হবে, সেই অবস্থা থেকে সে নিজের চেষ্টায় উন্নীত হলেও। একথা অনস্বীকার্য যে চরিত্রের যথাযথ মূল্যায়নে স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ একটা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগির প্রয়োজন। কারণ 'ভাল'র বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলে। তাই মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্র বর্ণনায় আমরা প্রায়ই 'অতিরিক্ত দেবত্ব' আরোপ করে ফেলি। তাদের জীবনকে দেখাই কলংকশূন্য সুন্দর, অপাপবিদ্ধ হিসাবে। কিন্তু একটি বিদেশি প্রবাদ বলে—যদি সর্বোত্তম মানুষটির কপালে তাঁর দোষত্রুটিগুলো লেখা থাকত তাহলে তিনি তাঁর টুপির অগ্রভাগটি সবসময় ভ্রূ অবধি নামিয়ে রাখতেন।

ভলতেয়ার বলেছিলেন, এমন কোন লোক নেই যিনি কোন না কোন ঘৃণ্য পাশবপ্রবৃত্তিকে অন্তরে বহন করেন না।

মানুষ নীতিজ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। জন্মমুহূর্তে তার মন একটা সাদা কাগজের মত থাকে। পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সেই মনের ওপর দাগ কাটতে থাকে। এইসব আঁকিবুকি তার নিজস্ব প্রবণতার ওপর জড়ো হয়ে তৈরি করে চরিত্রের কাঠামো। তার মন ও চরিত্রের প্রাথমিক স্ফুরণ হয় তার বাড়ির মধ্যেই। সে যা দেখে তাকেই অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। সে সব থেকে বেশি দেখে নিজের মা কে। তাই তার ভবিষ্যৎ

চরিত্রের ভিত্তিনির্মাণে একশ জন বিদগ্ধ শিক্ষকের তুলনায় একজন আদর্শ মা র অবদান অনেক বেশি হয়ে থাকে।

অন্তহীন কর্মব্যস্ততা চরিত্রের কমনীয়তাকে নষ্ট করে দেয়, চরিত্রের প্রসারকে থামিয়ে দেয়। গার্হস্থ্য-জীবনের মাধুর্যই চরিত্রের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়। দম্পতিদের একের চরিত্র অন্যের চরিত্রে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

চরিত্রের প্রশ্নে নৈতিকতার প্রয়োগে সমাজের এক্তিয়ার কতটা সে প্রসংগে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি যখন কাহাকেও তার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। সুতরাং কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে কাহারো সত্যিকার অধিকারে হাত দিতেছি কি না।

যদিও সামাজিক লোকের এই অনধিকার অত্যন্ত ব্যাপক এবং কোথায় ইহার সীমারেখা কোথায় পা দিলে অনধিকার প্রবেশ হইবে না এই লইয়া সংসারে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক মতভেদ, তবুও সীমা যে একটা আছেই সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নেই। এই সীমা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারো নেই, সমাজেরও না। সমাজ এই সীমা অতিক্রম করিয়া শুধু যে পরকেই নষ্ট করে তাহা নয়, নিজেকেও দুর্বল করে, করিয়া ধ্বংস করে।

অথচ এই সীমা কোন সমাজেই চিরদিন একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকে না, প্রয়োজনমত সরিয়া বেড়ায়। যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মান্ড সরে, সেই নিয়মে এও আপনি সরে।'

স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের যুগেও চরিত্রমূল্যায়নে স্ত্রী পুরুষের জন্য আলাদা বিধান। এখনও আমরা মেয়েদের দেহের পবিত্রতা অপবিত্রতাকে তাদের চরিত্রের ভাল মন্দ বলে মনে করে থাকি। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলছেন : 'ইংরাজ বলে 'Chastity', তবুও ইহার দ্বারা তাহারা নরনারী উভয়কেই নির্দেশ করে, কিন্তু এদেশে ও কথাটার বাংলা করিলে 'সতীত্ব' দাঁড়ায় সেটা নিছক নারীরই জন্য।'

অথচ 'সতীত্ব' মেয়েদের চরিত্রের সবটুকু নয়, একটা অংশমাত্র। পুরুষশাসিত সমাজ এতদিন স্বামীর সংগে সম্পর্কের ভিত্তিতেই মেয়েদের সবকিছু বিচার করে এসেছে বলে তাদের চরিত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। তাই কোন মেয়ের দৈহিক শুচিতার ঘাটতি থাকলে তার হাজার ভাল কাজকেও কেউ সাদরে গ্রহণ করে না। 'চরিত্র' সম্পর্কে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কী ভাবছেন, সেই সামাজিক অনুসন্ধানের জন্যই 'পরিবর্তন-এর পক্ষ থেকে চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম সমাজের বিভিন্ন মহলের মানুষের কাছে। তাঁরা সকলেই আগ্রহ দেখিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। এই সহযোগিতা থেকেই বোঝা যায় সত্যিই ব্যাপারটি নিয়ে তাঁরাও কতখানি অলোড়িত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক দীপেন্দু চক্রবর্তী বললেন : কতকগুলো শুকনো নিয়মসূত্র দিয়ে মানুষের চরিত্রকে বিচার করে চলেছি আমরা, যে বিচারের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, নেই কোন নিরপেক্ষতা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে সে নিয়মের পক্ষে ওকালতি করি, অন্যথায় বিরুদ্ধে ফোঁসফাঁস করি। যারা এসব নিয়ম মানেন না বলে দাবি করেন তাঁদের সেই ডোন্ট কেয়ারও একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশি

দীপেন্দু চক্রবর্তী

যেতে পারে না। তাঁদের দৃষ্টিতে সমাজের আর পাঁচজনের বিচার ভ্রান্ত মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজে থাকতে গেলে তাঁদের মতামতকে একেবারে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। কারণ প্রত্যেকের সামাজিক সত্তা স্বীকৃতি পায় আর পাঁচজনের সংগে সম্পর্কিত হবার দরুণই।

নৈতিক চরিত্রের বিভিন্ন ধারণা সময়ের সংগে বদলায়। মেয়েদের সিগারেট খাওয়াটা এখনও আমাদের চোখে খারাপ লাগে। হয়ত দশবছর বাদে এটা এখানে সবাই মেনে নেবেন। কিন্তু একটি মেয়ে মা হবার পর যদি শিশুকে অবহেলা করে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে তাহলে তার সে কাজ কোনমতেই নৈতিক সমর্থন পাবে না। এটা সব যুগে একইভাবে দেখা হবে।

সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ বললেন : অভিধান মানতে হলে চরিত্র মানে স্বভাব। সেটা স্থির থাকে না, বদলাতেই পারে। বদলায়ও। বাল্য কৈশোর যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে জীবনের বাঁকে বাঁকে

সন্তোষকুমার ঘোষ

চরিত্রের চেহারা আলাদা। আবার স্রোত যদিও প্রবহমান তবু মূল খাতটা প্রায়শ ঠিকই থাকে। অবশ্য কোন-কোন দস্যু যদি পরে হন কিংবা রত্নাকর বাল্মীকি, তাহলে তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, ব্যতিক্রম। একটা চরিত্র নিয়ে জন্ম তো হল। তারপর অবস্থাটা কতকটা ডাকের চিঠির মত। ক্রমাগত পরিবেশ, পরিবার, সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতির কত যে শীলমোহরের ছাপ, গুণে শেষ করা শক্ত। কেউ কেউ আবার আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বা প্রেরণায় আলাদা রকমের হয়ে যান। ভাগ্য বিপর্যয়েও চরিত্র বদলায়। চরিত্রের ভালমন্দের স্তর তো অনেক। তবে ন্যূনতম ধাপ বা শর্ত বোধহয় নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। সেখানে চুরি চলে না। চললে চরিত্র থাকে না। সাধারণত অবশ্য মানুষের অন্ত জীবনের চেয়ে বাইরের আচার আচরণ দিয়েই চরিত্র মাপা হয়।

ছেলেদের আর মেয়েদের চরিত্রে কিছু তফাৎ এযুগেও থাকবে বৈকি। কারণ এই ইউনিসেকসের হুজুগ সত্ত্বেও ছেলেরা ছেলেই আর মেয়েরা মেয়েই। ব্যতিক্রম আছে তবু সাধারণ নিয়ম এই যে একশ্রেণী ছোটে আর একটি শ্রেণী বাঁধে। এর সংগে জৈব কোষ আর শারীর গঠনও সম্পৃক্ত।

এই অস্থির যুগেও মুক্ত মেয়েদের অনেকেই যথাকালে একটু থিতু হতে চায়। সেটাই চরিত্র। সতীত্বের সূত্রপাত সম্ভবত আর্থনীতিক দাসী বৃত্তিতে। পুরুষশাসিত সমাজের একটি সহজাত শৃংখল। তবে এ শৃংখল পারিবারিক তথা সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে কতকটা সহায়ক হয় সেটা অস্বীকার করা অনুচিত। মেয়েরা সতী হবে অথচ ছেলেরা সৎ হবে না এ এক আজব রীতি। বিদেশি প্রবাদ বলে রাজহংস এবং রাজহংসীর একই সস্ বিধেয়। ব্যভিচার অথবা নেশার সংগে চরিত্রের মৌল কোন ঝগড়া আছে বলে মনে হয় না। বহু তথাকথিত ব্যভিচারী জীবনের নানা দিকে নিজস্ব কীর্তিতে দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। আর নেশা? ওটা যদি চরিত্রের পবিত্রতা নাশ করত তবে তো পাশ্চাত্ত্য জগতের বৃহদংশকে চরিত্রহীন বলতে হয়। এমনকি আমাদের পৌরাণিক দেবতাদেরও। কারণ তাঁদের প্রায় সবাই সুরাপায়ী। তবে একটা পরিমিতিবোধ থাকা বোধহয় ভাল। নইলে নৌকো নোঙর ছিঁড়ে তলিয়ে যেতে পারে। যৌনরোগ ব্যক্তিগত জ্বালা, পানাসক্তিতে স্বাস্থ্য আর অর্থহানি--তা সত্ত্বেও এইসব দোষে দোষী অনেক ব্যক্তি ইতিহাসের পর্বে পর্বে প্রতিভার বিস্ময়কর স্বাক্ষর রেখেছেন, যার মূল্য তথাকথিত সংযমী চরিত্রবানদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। উপমায় বলতে গেলে চরিত্র হল সেই বৃক্ষের মত যাতে কাটা যতই থাকুক ঋজু উঠে যায়। শরীরের যেমন শিরদাঁড়া, অন্ত লোককে সোজা আর খাড়া রাখতে তেমনি চরিত্র।

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর কাছে যা প্রশ্ন রেখেছিলাম তাতে রাজনীতির কথা এসে পড়েছিল অনিবার্যভাবেই। তিনি বললেন : সকলের বিরোধিতার মধ্যেও নিজের সত্য বিশ্বাসকে মনে প্রাণে পালন করা উচিত। এটাই চরিত্রের প্রধান কথা। সব কিছুকে খোলা চোখে দেখতে হবে। খোলা মনে বিচার করতে হবে। রাজনীতি মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্রের সংগে যুক্ত। কিন্তু আবহমানকাল ধরে রাজনীতির একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য প্রচলিত নৈতিকতার বিরুদ্ধে বয়ে চলেছে। মহাভারত ও রামায়ণের বহু কাহিনীতে দেখা যায় যে রাজনীতিশাস্ত্র বিরোধী তাকে রাজনীতি সঠিক বলে অনুমোদন করেছে। প্রেমে এবং শত্রুনিপাতে ছলনা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া অবৈধ নয় একথা মহাভারতে বারবার বলা হয়েছে। এযুগের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটা সত্য বরং এখন এর রূপ হয়েছে আরও ভয়ংকর। কিন্তু রাজনীতি এযুগে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে। আজকের রাজনীতি, কোন কল্যাণবোধের দ্বারা চালিত হচ্ছে না। নেতাদের মধ্যে তাঁদের আদর্শের সংগে সাম

সমরেশ বসু

ত্যাগপূর্ণ ত্যাগ-তিতিক্ষার চিহ্ন নেই। তাঁরা যে তত্ত্বে বিশ্বাসী তার সঠিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁরা এখন শুধু স্বার্থসিদ্ধির চিন্তায় আর পরমত-বিদ্বেষে মত্ত। মূর্তিপূজা বিরোধী তত্ত্বাদর্শের রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা যে বারোয়ারী পূজামন্ডপে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, স্টল খোলেন, সে কি নিছক রাজনৈতিক ঔদার্যের তাগিদেই? অনেক শ্রমিক নেতা যে ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাতে আর তাঁদের আপনি আচরি ধর্ম অপরকে শেখান যায় না। তাই এখনও একজন লেনিনের দেখা পাওয়া গেল না যিনি নিজেকে প্রকৃত সর্বহারায় পরিণত করতে পেরেছেন। আজ বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী যুবকও শ্বশুরবাড়ি পাওনা-গন্ডা বুঝে নিতে পেছপা হয় না।

অনেক সময় পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করে উল্টো পথে চলতে। লেখকের কর্তব্য সেসব স্ববিরোধিতার প্রকাশে নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ থাকা। শুধু লেখক নয় প্রত্যেকেরই উচিত নিজের ভেতরকার ত্রুটি ও কলুষকে প্রকাশ করা, স্বীকার করা। কিন্তু এটা করতে গেলে সমাজের অন্যান্যদের স্ববিরোধিতার কথাও প্রকাশিত হয়ে পড়ে, অন্যদের অন্তরের অন্ধকার অট্টহাস্য করে ওঠে। তারা তখন মরীয়া হয়ে সেই স্বীকারোক্তিকে আক্রমণ করে বসে। সামাজিক নৈতিকতার খাতিরে অনেক সাহিত্যকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে নির্বাসন দন্ড দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তারপরে কি দেশের মানুষের চরিত্র ও মানসিকতার অনেকটা উন্নতি হয়? সামাজিক ব্যাধিগুলি একেবারে নির্মূল হয়ে যায়?

যিনি নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কারওকে দেহদান করেন না এমন নারীকেই আমরা সতী বলে থাকি। কিন্তু তার মনকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে তিনি 'এই অর্থে অন্তরে সতী নন। কি পুরুষ, কি মহিলা মনের দিক থেকে সবাই বহুগামী। সমাজের ভাঙন রোধে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করতে বিবাহ প্রথাকে মেনে নিয়েছেন সবাই। সৃষ্টিকাজে পুরুষ এবং নারীর মিলন অপরিহার্য হলেও মানবসন্তান নারীর দেহেই দীর্ঘদিন বাহিত হয়। তাই নারীর শরীরের মূল্য পুরুষের থেকে অনেক বেশি। আত্মজের আশ্রয়মন্দির নিজের শরীরকে রক্ষা করার একটা চেতনা নারীর মনের গভীরে সর্বদা জেগে থাকে। সতীত্বের সঙ্গে দৈহিক শুচিতাকে এত জরুরীভাবে বিচার করার কারণ বোধহয় এটাই।

আজ আইন এবং ওষুধপত্র সেকসকে আমাদের জীবনে অনেক সহজ করে দিয়েছে। একজন কুমারী মেয়ে এখন নির্ভয়ে দশ বারোজন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। অতীতের মূল্যবোধ ছেড়ে এখন নতুন মূল্যবোধে আমরা সব কিছুকে দেখছি। কিন্তু একটা কথা বোধকরি মনে রাখা উচিত সকলের, সব যুগেই—মানুষ মানুষই, পশু নয়। একজন বিবাহিত পুরুষ বা নারী নিজের স্ত্রী বা স্বামী ভিন্ন অন্যের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলে তার পেছনে যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি থাকা প্রয়োজন। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ব্যভিচারকে, লাম্পট্যকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক প্রবন্ধটি লিখে ১৯২১–২২ সালে খুব বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন রাধারাণী দেবী। তাঁর সঙ্গে কন্যা নবনীতা দেবসেন এবং দৌহিত্রী অন্তরাকেও রাজি করালাম চরিত্র প্রসঙ্গে কিছু বলবার জন্য।

রাধারাণী দেবী জানালেন: মানুষেরা কেউই নিজেকে ঠিকমত জানে না। যে গলদ নিজের ভেতরেই তার খোঁজে সে অন্যের ঝুলি ধরে টানাটানি করে। কি রাজনীতি কি ঘরকন্না সর্বত্রই আমরা সব কিছুর জন্য অপরপক্ষকে দায়ী করি। অতীতকালের প্রতি সম্মান বজায় রেখে চলমানকালকে সঠিক রেখে ভবিষ্যৎকালের হানি না করে কাজ করার প্রবণতা যার থেকে আসে তাই-ই সৎচরিত্র। মূল মানবিকতা যেখানে অক্ষুণ্ণ চরিত্র সেখানেই অটুট।

সতীত্বের প্রশ্নে পুরুষ ও নারীর বিচার ভিন্ন হওয়া দোষের নয়। সুপ্রজননের জন্যই স্বামী স্ত্রীর খানিকটা আলাদা থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সন্তানজন্মের আগে ও পরে সহবাস নারীর পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াতে পারে। জীবসৃষ্টির দায়িত্ব মেয়েদের অনেক বেশি, সন্তানের লালন-রক্ষণের জন্য অনেক দীর্ঘমেয়াদী ত্যাগ স্বীকারের দরকার। কিন্তু ঐ সময়টির মধ্যে নিজের দৈহিক কামনাকে অবদমিত রাখা অনেক পুরুষের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। এইজন্যই আগের যুগ বহু বিবাহ সমর্থন করত।

অনেক মহৎ লোকের নারী সম্বন্ধে দুর্বলতা দেখেছি। তাঁরা কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদার এতটুকু হানি হতে দিতেন না। তাঁদের স্ত্রীরাও স্বামীকে শ্রদ্ধা করতেন। আসলে বারনারীর কাছে যাওয়াটা ব্যভিচার নয়। আত্মীয়কন্যা, পরস্ত্রী গমনই ব্যভিচার।

রাধারাণী

নিত্য নতুন নারীসঙ্গ যদি কোন প্রতিভাবানকে সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, মনের যৌবন এনে দেয় তাহলে তাঁদের বিপুল সৃষ্টির খাতিরে সেটাকে ক্ষমা করা উচিত। তবে এই অজুহাতে তার একাধিকবার বিবাহবিচ্ছেদ কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। দেহের বাইরের শত্রুর তুলনায় ভেতরের শত্রুর সংখ্যা অনেক। এদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র প্রতিষেধক সংযম। পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ কিন্তু কাম নয়, লোভ। লোভকে সংযত করা উচিত সর্বাগ্রে।

কালের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ধারণা বদলালেও মানবিকতার মূল ভিত্তিগুলি কখনও বদলায় না।

নবনীতা দেবসেন বললেন: পরিপার্শ্বের অন্য মানুষের সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখ লাঘব করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কার কত বেশি সেটাই আমার মতে চরিত্র নির্ণয়ের মাপকাঠি। কথায় এবং কাজে মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ঘুষ নেওয়াটা নেশা করার চেয়ে অনেক বেশি নিচ কাজ যেমন লাম্পট্যের চেয়ে জোচ্চুরি অন্যের স্ত্রী বা স্বামীকে কেড়ে নেওয়ার চেয়ে অন্যের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়ায় বেশি চরিত্রহীনতা আছে।

যৌনতা মানবচরিত্রের একটা দিক মাত্র, সর্বস্ব নয়। জৈব কার্যকলাপে সংযম বা অসংযম দিয়েই মানুষকে বিচার করা হয়। এটা সব সময় ঠিক নয়। তবে অসংযমের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় চরিত্র তাতেই খুন হয়।

সমাজে চরিত্র নির্ণয়ে স্ত্রী পুরুষের ক্ষেত্রে যে এক মান প্রয়োগ করা হয় না তার প্রমাণ ভাষাতেই পাওয়া যায়। রমণী বা কামিনী শব্দের মত 'সতী'রও কোন পুংবাচক শব্দ নেই। এ থেকেই বোঝা যায় সমাজের পক্ষপাত কোন দিকে। স্ত্রী পুরুষের জৈব ভূমিকা কোনদিনই এক হবে না—মাতৃত্ব পিতৃত্ব কোনদিনই উল্টে-পাল্টে ব্যবহার করা যাবে না। জীবপালিনী দায়িত্ব গর্ভধারিণীর একার হয়ে দাঁড়ায়। 'কুমারী মাতা' শব্দটা আছে, নেই 'কুমার পিতা' শব্দের ব্যবহার। যেহেতু জৈব দায়িত্ব নারীর শরীরে অর্পিত তাই নৈতিক দায়িত্বও নারীর চরিত্রেই অর্পিত হয়ে যায়। প্রতিভাধরদের চরিত্রদুষ্টি প্রতিভাস্ফুরণের সহায়ক বলে মনে করি না আমি। প্রতিভার সুযোগ নিয়ে চরিত্র এবং সমাজের দুর্যোগ ঘটানর কোন কারণ দেখি না। নবনীতা দুহিতা অন্তরার বয়স এখন ঠিক উনিশ। দর্শন নিয়ে বি এ পড়ছে। অন্তরার মতে: সামাজিক ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলে চরিত্র চিহ্নিতকরণ ও ত্রুটিপূর্ণ হবে। ছোটবেলায় মিথ্যা বলাটা দোষ বলে শিখে এসে পরবর্তীকালে দেখি এটা সব সময় দোষের নয়। যেখানে সাম্য নেই সেখানে চুরি করাকেও নৈতিক দিক দেখে দোষাবহ বলা যাবে না। আসলে পারিপার্শ্বিকের অবস্থা, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বোধের ওপরেই বিভিন্ন মূল্যবোধ দাঁড়িয়ে থাকে। এর সঙ্গেই নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈতিক বিষয়গুলিও জড়িত।

নেশার ব্যাপারটায় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন রয়েছে—নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানটা ভাল নয়। এটাই বলতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া। সমাজটা ভীষণ লাগাম-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এখন তাই দরকার সংযমভিত্তিক কঠোর সামাজিক কানুন, কিছুদিনের জন্য। যতদিন না আমরা সকলে নিজেদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সতর্ক হচ্ছি। অর্থাৎ চরিত্রকে চিরস্থায়ী কোন আইনে বাঁধার বিপক্ষে আমি।

সংগীতশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উৎপলা সেনের সম্পর্ককে ঘিরে এরকম অনেক গল্প দু তিন দশক ধরে চলে আসছে, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে ওরা বিবাহিত দম্পতি।

সতীনাথবাবু জানালেন: অনেকের ধারণা আমি নাকি নিজের বৌ ছেলেমেয়েকে ছেড়ে উৎপলার সঙ্গে আছি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল উৎপলাই আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ নারী এবং আমার বিবাহিত

স্ত্রী। আগে আমি ওকে গান শেখাতাম. অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না আমাদের মধ্যে। মিঃ সেনের মৃত্যুর পর সহায়হীনা উৎপলা ও তার ছেলেকে নিরাপত্তা দিতে ওকে বিয়ে করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিল না। এতে দুই পরিবারের সায় ছিল। কিন্তু আধুনিককালে বিধবাবিবাহ করে আমরা দুজনেই চরিত্রহীন প্রতিপন্ন হলাম। আমার শিল্পী-জীবন অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চরিত্রকে আমি অত্যন্ত জরুরী মনে করি। কারোকে খুব কাছ থেকে না দেখে তাকে চরিত্রহীন বলে রায় দেওয়াটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। সংযম যার আয়ত্তাধীন সে সৎচরিত্র বজায় রাখতে পারে। সৎসঙ্গেরও প্রয়োজন আছে। এটা মানুষকে কু অভ্যাস ত্যাগ করিয়ে নিজের মনের প্রভু হতে সাহায্য করে।

যাত্রাজগতের অনন্য প্রতিভাধর অভিনেতা স্বপনকুমার জানালেন : স্ত্রীর কাছে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার পেয়েছিলাম। দশ বছর ধরে মিটমাট করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছি। বিয়ে ঐ একবারই হয়েছিল। অভিনেত্রী স্বপ্নাকুমারী আমার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু। বিয়ে না করে একসংগে থাকাটাকে আমি দোষের মনে করি না। আমার মতে বিশুদ্ধ ভালবাসাটাই সৎচরিত্র। নিজের বিবেককেই আমি ঈশ্বর ও ধর্ম বলে জানি।

চরিত্রের মূল কথা হল জীবনের সত্যের প্রতি অনুগত থাকা। সেটা আমার আছে। নইলে একজন মানুষ নিজের ঘর ছেড়ে একটানা সতের বছর আমার সংগে থাকলেন কী করে? কথাগুলি বললেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী।

তিনি বললেন : আমার দেখা লোকেদের মধ্যে প্রায় সত্তর শতাংশ মনে এক মুখে এক। পনের শতাংশ ভালমন্দে মেশান আর বাকিরা প্রকৃতই ভাল। প্রথমোক্তদের মধ্যে কিছু আছে মেরুদণ্ডহীন' কাপুরুষ স্তাবক আর কিছু ভণ্ড। ভণ্ডদের চেনা বড় শক্ত। কিন্তু যখন এদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন তারা ভয়াল ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

আগে সবাইকে বিশ্বাস করতাম খুব। উত্তমবাবু চলে যাবার পর আমার চোখ খুলে গেল। এখন যে কোন লোকের ঠোঁট নাড়া দেখেই তার মনের ভাব বুঝে ফেলি। সব দেখেশুনে স্থির করেছি আর মানুষকে বিশ্বাস করা নয়। অহিংসা পরম ধর্ম জাতীয় নীতিবাক্যের যুগ অনেক দিন চলে গেছে। এখন সব সময় সতর্ক হয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

দেহ নয়, মনের শুচিতাই চরিত্রের মূল উপাদান। তাই পাঁচজনের সংগে বেড শেয়ার করার তুলনায় একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিককে ডিচ করাটা অনেক বেশি চরিত্রহীনতার কাজ বলে মনে করি।

সব শেষে বলি এখানে যার পয়সা আছে তার চরিত্র ঠিক থাকবে। কারণ তার কোন কিছুতেই লোকে দোষ দেখতে পাবে না। প্রকৃত চরিত্রবানরা, দেবতুল্য মানুষরা সারা জীবন দুঃখভোগই করে যাবেন। আদর্শ শিক্ষকরা পবিত্র চরিত্র সম্বল করে অনাহারে মারা যাবেন চিরদিন।

'এন্টনী কবিয়াল' এবং 'বারবধূ' নাটক দুটি যাঁকে খ্যাতির শিখরে বসিয়েছিল সেই কেতকী দত্ত বললেন : যিনি দায়িত্ববান, কর্তব্য পরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ এবং উন্নাসিকতা মুক্ত তিনিই চরিত্রবান। যার ব্যবহারে স্বার্থপরতা, বঞ্চনা, শঠতা এবং শোষক মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে তিনি মন্দ চরিত্র। এই অর্থে নিজের চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে সচেতন। আমি লোকের সমালোচনা করা পছন্দ করি না। এমনকি নিজের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজেকে জড়াই না। সমাজে প্রচলিত চরিত্র নির্ণায়ক মাপকাঠি নিয়ে তবু কিছু বলার থেকে যায় আমার। শুধু অভিনেত্রী কেন যে কোন মেয়ে খারাপ প্রতিপন্ন হলেও তাদের উপার্জনটা কিন্তু সমাজ-সংসারের সব কাজেই ভালভাবে লাগে। মেয়েটিই শুধু খারাপ হয়ে থাকে চিরদিন, তার কর্তব্যবোধ ত্যাগ তিতিক্ষাকে কেউই মর্যাদা দেয় না।

এই যুগেও অভিনেত্রীদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অপাংক্তেয় থাকতে হয়। নিকট আত্মীয়ারা তাদের পরিচয় দিতে লজ্জিতা অথবা শঙ্কিতা হন। দৈহিক শুচিতাই মেয়েদের সতীত্বের মাপকাঠি বলে এখনও চলে আসছে। অন্য সবার কথা কী করে বলব, তবে অভিনেত্রীদের দৈহিক শুচিতা বজায় থাকে এ দাবি করে ভণ্ড প্রতিপন্ন হতে চাই না।

গৃহবধূর জন্য নির্ধারিত আদর্শ আমাদের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয় না সব সময়। আমাদের দরকার একটা গণ্ডিমুক্ত জীবন। আমার নিজের জীবনে এটাই বুঝেছি এখনও এদেশে অভিনেত্রীদের সাজান গোছান সংসারের স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। সেখানে ভেতরে ও বাইরে শুধু ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কোন প্রাপ্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করে না।

নান্দীকারের প্রাণপুরুষ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বললেন : চরিত্রকে বজায় রাখতে হলে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেও মনের জানালাগুলো খুলে রেখে নিজের অস্তিত্বের প্রতি অণুপরমাণুতে আলোবাতাস লাগাতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে দেখি অভ্যাসের শক্ত খোলসের মধ্যে নিরাপদভাবে প্রচলিত সামাজিক নীতি অনুযায়ী অভ্যাসী চরিত্রবান হয়ে বসে থাকতে। এদের মধ্যে চরিত্রকে অনুপস্থিত বলে মনে হয় আমার। চরিত্রবান লোক চরিত্রকে সজীব প্রাণবন্ত রাখতে, লালন করতে পরীক্ষা নিরীক্ষার ঝুঁকি নেবেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি সজ্ঞানে কারোকে আঘাত করে তার ক্ষতির কারণ হবেন না।

যেসব শিক্ষিত লোক মদ আর নারীতে আসক্তিকে চরিত্রহীনতার মাপকাঠি বলে প্রচার করে তারা নিজেরাই সে সবে গাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন এক একটা ভণ্ড। নিজের ক্ষুদ্রতার জ্বালা ভোলবার জন্য অনেকে কৃতী মানুষদের চরিত্রহনন করে আনন্দ পায়। আবার কোন মানুষের ওপর অলৌকিকত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাকে স্বার্থসিদ্ধির মাদুলিতে পরিণত করার চেষ্টা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে।

রুদ্রপ্রসাদ-ঘরণী স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় : নিজেদের খতিয়ে না দেখে নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার প্রবণতা থেকেই ভ্রান্ত চরিত্র নির্ণয় পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। প্রতিমুহূর্তে যে যার নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং সেই মত ব্যবহার করা উচিত। আর প্রয়োজন কঠোরভাবে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা। তবে দেখতে হবে ঐ কঠোরতা যেন মনকে মেরে না ফেলে। সবাই এভাবে চললে কেউ আর কারোর মধ্যে চরিত্রহীনতা খুঁজে পাবে না।

এখন চারদিকে ধর্মগুরুদের ছড়াছড়ি। লোকে তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধেও কত কথা শোনেন। ধর্মালোচনার ফাঁকে ফাঁকে এ নিয়ে কথা তুলেছিলাম। স্বামী শিবানন্দ গিরিকে জিগ্যেস করেছিলাম তাঁর সংগে মহিলা ভক্তদের জড়িয়ে নানা কথা শোনা যায় কেন? আমার জিজ্ঞাসা

ছিল সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অসংযমের অভিযোগের যথার্থতা সম্বন্ধে।

স্বামী শিবানন্দ গিরি বললেন : ঐ সব অভিযোগ আমাকে সামনাসামনি শুনতে হয়নি কোনদিন। তারা সামনে এসে বলতে সাহস পায় না কেন? আমি স্ত্রী পুরুষের ভেদ দেখি না। সব ধর্মস্থানেই বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারীই হলেন মহিলারা। ধর্ম বেঁচে আছে ওদের জন্যই। আর এখানে যেসব সমাজসেবার কাজ হয় তাতেও মহিলারা অনেক বেশি স্বেচ্ছাশ্রম দান করেন। তাই বোধহয় শিবানন্দ সম্বন্ধে লোকেদের মনে এত অশান্তি।

চরিত্র গঠনে তিনটি জিনিস প্রয়োজনীয় — সত্য, সংযম ও অহিংসা। মন যা সায় দেয় তাই করি, এটা সব মনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা শিক্ষাপ্রাপ্ত মনের ক্ষেত্রেই ঠিক। মন শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে সে সঠিকভাবে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে পারবে না, শিক্ষাপ্রাপ্ত মনের নামই বিবেক।

নীতিবাগীশরা নারীকে বলেছেন 'নরকের দ্বার'। আমি বলি সে দ্বার দিয়ে যেমন নরকে প্রবেশ করা যায় তেমনই নরক থেকে বেরিয়ে আসাও যায়! নরের পক্ষে একা কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। নারীর সাহায্য নিয়েই সে এই পৃথিবীকে কখনও স্বর্গে কখনও নরকে পরিণত করে।

বিবেকানন্দ নিধির মুখপত্র 'ভাল্যু অরিয়েন্টেশন'-এর সম্পাদক **স্বামী যুক্তানন্দ** জানালেন : সব কাজেই স্থির লক্ষ্য এবং পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা রেখে প্রস্তুতি ও প্রয়োগ চালান উচিত। প্রথমে পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করতে হবে নিজের স্থিতি। তারপর অন্য ব্যক্তি বিষয় ও ঘটনার সংগে নিজের সঠিক সম্পর্ক স্থির করা যাবে। এর পরবর্তী ধাপে নিজের আদর্শ অনুযায়ী সমীচীন আদানপ্রদানের মাধ্যমেই হবে মূল্যবোধভিত্তিক চারিত্রিক প্রকাশ।

চরিত্রের সংগে যে দুটি বিষয়ে জড়িয়ে রয়েছে সেই বিবেক এবং ইচ্ছাশক্তি এ যুগে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। আমাদের মৌলিক চিন্তাশক্তি রাজনৈতিক শ্লোগান এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের হাতে পড়ে পংগু হয়ে গেছে। এখানে গণতন্ত্রেরও কোন চরিত্র নেই। নইলে গোপন ভোটের জন্য অথবা এম এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য এত সশস্ত্র প্রহরার দরকার হয় কেন?

আমরা সকলেই নির্বিরোধী ভাল মানুষ হয়ে পড়েছি। আমাদের এই নিষ্ক্রিয় ভালমানুষী, যার অপর নাম কাপুরুষতা তার জন্যই আজ চার পাঁচটা সমাজবিরোধী অনায়াসে কলকাতাকে অচল করে দেবার স্পর্ধা রাখে।

অভাবে সব সময় স্বভাব নষ্ট হয় না। কিন্তু অযৌক্তিক সম্পদের উপস্থিতি বা আহরণের মোহই মানুষের মনকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। নীতি শিক্ষাটাই চরিত্র গঠনের সব নয়। এখন তো চারদিকে গুরুর ছড়াছড়ি। কিন্তু সাধারণভাবে প্রচলিত আচারসর্বস্ব ধর্মচেতনা মানুষের গুণগত পরিবর্তন আনতে পারছে কি?

সন্ন্যাসীদের জীবন একটা কঠিন ক্ষেত্র। একজন ব্রহ্মচারী যদি কঠোর পরিশ্রমে অথবা গভীর ধ্যানজপে লিপ্ত না থাকেন তবে শরীরে সঞ্চিত তেজঃরাশির তাড়নায় তিনি তাঁর ব্রতপালনে সফল নাও হতে পারেন। তাঁর সামাজিকভাবে অসৎ হওয়ার আশংকা খুব বেশি। কোন কোন সন্ন্যাসীর যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার বা গোপনে নির্বীজকরণের ঘটনার মূল এখানেই। তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে সমকামিতায় লিপ্ত হবার অভিযোগও নিছক কল্পনাপ্রসূত চরিত্রহনন নয়।

প্রবীণ পুরাতন ও নতুন মূল্যবোধের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কী চোখে দেখছেন এ যুগের চরিত্রকে?

তুলসী চরণ চক্রবর্তী (৬২) : সেযুগে আমাদের এতটুকু বেচাল দেখলে গুরুজনেরা শুধু তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাতেন। সেই দৃষ্টিই আমাদের সংশোধন করত। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা ছিল চরিত্রের অন্যতম অংগ। এখন পরিবর্তন আসছে অনেক। সামাজিক টাবু থাকছে না। তবে এখনও বলব নীতিজ্ঞানের পুঁথির পাতা নয়, দৈনন্দিন জীবনই চরিত্র গঠনের প্রধান যন্ত্র। ভবিষ্যতে সৎ উপদেশ দেবার জন্য, রচনা লেখার জন্য এবং চাকরির জন্য ক্যারেকটার সারটিফিকেটের প্রয়োজনে চরিত্র বা Charater কথাটা আশা করি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হবে।

বিমল কুমার সুর (৬৪) : এযুগের মানুষদের চরিত্রে উপলব্ধি, দৃষ্টিভংগি এবং নীতির বিষয়ে নিষ্ঠার ও একাগ্রতার অভাব চোখে পড়ে। প্রায় সকলেই সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠেছেন। এ যুগে শ্রদ্ধার বদলে যুক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে। তাতে স্বতন্ত্র চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস অবহেলিত হচ্ছে। বয়স্করা মাঝে মাঝে স্ববিরোধী হয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে ভণ্ড প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছেন।

সতীত্ব এখন অলস তর্কের বিষয়। সেকসকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে ধরি না। তাই সেকস ছাড়া বাকি বিষয়গুলি দিয়ে চরিত্রের বিচার করাটাই সঠিক পদ্ধতি বলে মনে করি।

হারাণচন্দ্র বণিক একটি ছোট স্টেশনারি দোকানের মালিক। তিনি চরিত্র নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। শ্রীবণিক বললেন : আমি একদল মানুষকে অনেক দিন ধরে অনেক কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পাই। তারা এ পাড়ার বাসিন্দা এবং আমার দোকানের খরিদ্দার। ওদের মধ্যে দিয়েই দেখতে পাই মানুষের চরিত্রের বিকাশ ও পরিবর্তন। দেখি কীভাবে কতকগুলো ঘটনা ও পরিস্থিতি মানুষের চরিত্রকে, ধ্যানধারণাকে উল্টে দেয় বা অন্য পথে নিয়ে যায়। ব্যবসা করতে গেলে আমাদের নৈতিক চরিত্র খুব শক্ত রাখতে হয়। দোকানে আসা একজন মানুষও যেন না বিরক্ত হন বা কোন মহিলা ক্রেতার যেন এতটুকু অসম্মান না হয় সেদিকে নজর রাখতে হয়। সমাজ থাকলেই চরিত্রের প্রশ্ন থাকে। এখনও তো এ পাড়ায় কোথাও কেউ ছেলে বা মেয়ের সম্বন্ধ করলে আমার কাছ থেকেও তাদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে যান।

এখন লোক শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে এটাই আমার মতে চরিত্রের একটা বড় সংকট। নিজের নিয়ন্ত্রক নিজেকেই হতে হবে। সেটা আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখি না।

'চরিত্র নিয়ে সব থেকে বেশি মাথা ঘামায় মধ্যবিত্ত সমাজ। তাদের পরচর্চার অন্যতম হাতিয়ার হল অন্যের চরিত্রের ছিদ্রানুসন্ধান। কাজেই চরিত্রহনন এ সমাজের একটা বড় আমোদের বিষয়। যদিও সেসব চরিত্র-সচেতন ব্যক্তিরা চরিত্র সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট সীমারেখা সম্বলিত ছবি দিতে পারবেন না আপনাকে।'

কথাগুলি বলছিলেন শিল্পী অসীমায়ন দত্ত। তাঁর উপলব্ধিতে 'চরিত্রবান চরিত্রহীন এ দুটো কথাই অর্থহীন।' আর একজন শিল্পী স্বপন পালচৌধুরী বললেন 'প্রচলিত অর্থে ভাল চরিত্র রাখার গ্যারানটি এখন প্রায় নেই। আমি

এখনও জানি না কাল আমার চরিত্র হারিয়ে যাবে কি না।'

একটি প্রেসের মালিক অলক দত্তও ভণ্ডামীসর্বস্ব মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র নির্ণয়ের অনেক ত্রুটিপূর্ণ রীতিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন বাড়ির সকলের কথা ভেবেই। 'যখন নিজের মুখোমুখি হই তখন মনে হয় এভাবে সব কিছু বজায় রেখে চললে প্রকৃত অর্থে চরিত্র থাকে না, চরিত্র বিকিয়ে যায়। এটাই সব থেকে দুঃখের উপলব্ধি।'

গ্রামবাংলা ছেড়ে কলকাতায় শালকরদের দোকানে কাজ করতে এসেছেন নদীয়া মায়াপুরের তরুণ সুখচাঁদ শেখ। ২৪ পরগণার ধানুয়ার নিরঞ্জন দাস স্ক্রীন প্রিন-টিং-এর কাজ করছেন। ওরা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে ভুগছেন। কলকাতার জীবন ওদের সামনে অনেক জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান দেখিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রাম্য সমাজ এখনও অনেক পেছনে পড়ে। তারা দুজনেই কলকাতার কালচারের সামিল হতে পারেননি অথচ গ্রামের থেকেও মানসিকভাবে নির্বাসিত হয়েছেন। অবচেতন মনে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের ধাক্কা তাদের দিশাহারা করে দেয়। নিরঞ্জনের দেশে যেতে ইচ্ছে করে না তাই।

মুদ্রাপুরের ধনঞ্জয় অধিকারী এবং বাণীগড়ের বিমল দাস ও রুমা দাস কলকাতার রাস্তায় বাউল গান গেয়ে অন্ন সংস্থান করেন। আমার প্রশ্ন ওদের খুব উৎসাহিত করল। ওদের মতে 'নেশায় আর লালসায় মানুষের চরিত্র যায়। লোকে ভাবে আমরা পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করি, আমাদের কোন চরিত্র নেই। সেটা খুব ভুল। আমরা চরিত্রকেই বড় অবলম্বন বলে মনে করি। ভালবাসা বড় মধুর জিনিস। এর টানেই তো আমরা সবাই বাঁধা। স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে। লোকে দাঁড়িয়ে গান শোনে পয়সা দেয়, সেও তো ভালবাসার টানে। সে জিনিস কখনও খারাপ হতে পারে?

২৪ পরগণার নেহালপুরের কাশেম আলি মণ্ডল সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বসলেন সর্দারপাড়ার দ্বিপ্রাহরিক মজলিসে। সেখানে ছিলেন জানি সর্দার মহম্মদ মোকাজ্জম হোসেন, মোশারেফ হোসেন, আমিনা নিশা, সাকেয়া বিবি, নুরজাহান বিবি প্রমুখ আরও অনেকে।

এরা দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। উচ্চবর্ণের মুসলমানরা এদের দিয়ে লাঠিয়ালের কাজ করিয়ে নিজেদের জোত রক্ষা করেছে এক সময়। আজও এরা গুণ্ডা, বদমাস, পকেটমার আখ্যা নিয়ে ঘোরে। কবর খুঁড়ে দেবার সময় এদের ডাক পড়ে কিন্তু এদের উপস্থিতিতে সমাধি দেওয়া হয় না। মুসলমান হয়েও মসজিদে ঢোকা নিয়ে কথা শুনতে হয়। পাঠশালাতে অন্য মুসলিম ছেলেদের গা বাঁচিয়ে বসতে হয় এদের সন্তানদের। শুধু দারিদ্রের সংগ্রাম। আর কিছু নয়। একজনের রোজগারের মুখ চেয়ে বসে থাকে সাত আটটি প্রাণী। এদের সমাজে দেখা গেল চরিত্রটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যা শুধুই জঠরের জ্বালা। মুক্ত মেলামেশা এখানে অবাধ। দৈহিক শুচিতা নিয়ে কোন প্রশ্ন অবান্তর। কৃষিজীবীপ্রধান পল্লী কর্মকার পাড়ায় বৈদ্যনাথ মল্লিক পড়েন বসিরহাট কলেজে। এ সমাজে শিক্ষার আলো এসেছে বলে নারী পুরুষের মেলামেশা বা প্রেম করে বিয়ের চল বেড়েছে। বয়স্করাই এসবের বিরুদ্ধে কথা বলেন। নেহালপুরের সম্ভ্রান্ত মুসলিম গোষ্ঠীর সদাহাস্যময় যুবক আনিসুল করিম বেতার ও দূরদর্শনে নিয়মিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি বললেন—এখানে লোকেদের চরিত্রের বিচার করা হয় সমাজের প্রথাসিদ্ধ কতকগুলো নিয়মনিষ্ঠা পালনের নিরিখে। প্রথা-বহির্ভূত যে কোন বিষয়ই অনাচার। তরুণ তরুণীদের সামান্য মেলামেশা বাঁকা চোখে দেখা হয়। প্রেম করাটা তো রীতিমত বৈপ্লবিক ব্যাপার।

কিন্তু তেইশ বছরের হেমায়েত সিদ্দিকি এই প্রশ্নে হৃদয়ের সঙ্গে কপটতা না করে সব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ির সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও আপন প্রেমিকাকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে ১৯৮৩ তেই সমাজচ্যুত হয়েছে। বরণ করে নিয়েছে দারিদ্র্য ও স্বজনহীন এক কণ্টকিত জীবন। হেমায়েত বলল : গ্রামের মানুষ সহজ সরল নয়। এরা শুধুই সন্দেহপ্রবণ। এই নিম্নস্তরের মানসিকতার জন্য এসব গ্রামে নিজেকে এ যুগের মত করে গড়ে তোলার উপায় নেই। কুৎসা তৈরি এখন গ্রামবাংলার একটা অগ্রণী কুটির শিল্প।

উত্তর কলকাতার একটি বাড়ির পরিচারিকা শ্রীমতী কমলা মল্লিক (৫৫) কলকাতায় বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করেছেন। দু একটি পরিবারের অবৈধ প্রণয়ের ঘটনার সাক্ষী তিনি। শুধু তাই নয় মনিবদের লালসার শিকার হতে হয় যুবতী পরিচারিকাদের। পরিচারিকা মহলে গর্ভপাত অতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে বলে তিনি জানালেন। 'এসব চেপে রেখে সবাই ভাল সাজে। কিন্তু পাপ তো চাপা থাকে না।' গ্রাম্যভাষাতেই তিনি বললেন পাঁচিলের ওপর কাক যখন 'বিষ্ঠা ত্যাগ' করে যায় তখন সেটা কেউ না দেখতে পেলেও পরে ও দাগ অনেক দিন থাকে আর তা দেখে লোকে সেটাকে কাকের কর্ম বলেই জানতে পারে।

তাহলে তাঁর মতে চরিত্রটা কী? বড় অদ্ভুত উত্তর পেলাম-যে কাজের লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে চুরি চামারী করে আর যে মনিব কাজের লোককে হাড়ভাঙা খাটিয়ে পেটভরে খেতে দেয় না, মাইনে দিতে ভোগায় তারা দুজনেই সমানভাবে চরিত্রহীন।

যেখানের জীবনে আলোর দিকটা সামান্য অন্ধকারই বেশি সেই লাল বাতি এলাকার একজন বাসিন্দা হলেন রাণু পাল। ন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল রাণুর। সাড়ে ন বছরে স্বামী তাঁকে সোনাগাছির একজন মাসির কাছে বিক্রি করে দেন। তখন এসব কিছুই বুঝতেন না শিশু রাণু। দশ বছর ট্রেনিং এবং তারপর সাত বছর একজনের রক্ষিতা থাকার পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করলেন রাণু। এখানে দশ বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। রাণুর ভাষায় : ব্যবসার খাতিরে অগুনতি লোককে দেহদান করতে হয়েছে কিন্তু আমার স্বামীর মত চরিত্রহীন মনে হয়নি কারোকে। ভাবতে পারেন কত অমানুষ হলে তবে মানুষ এভাবে নিজের স্ত্রীকে বেচতে পারে। একেবারে ছোটবেলা থেকে এই পরিবেশে বেড়ে উঠেছি। চরিত্রের ভালমন্দের বিচার আমার পক্ষে হয়ত সঠিক হবে না। কিছু কিছু লোকের অস্বাভাবিক পাশবিক তাড়না মেটান সাধারণ মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক বিবাহিত লোকও আসে। অনেকে আসে শুধু শান্তি পেতে। আমার আত্মীয়দের আমি খারাপ বলে চিন্তা করি না, শুধু ভাবি আমি মরব আর ওরা সব টাকাপত্র পাবে সেই চিন্তায় বসে আছে। যাই হোক আমার কাছে যাঁরা আসেন তাদের আমার চরিত্রহীন মনে হয় না।

এসব কথাবার্তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে পারিপার্শ্বিক সমাজই মানুষকে বাধ্য করে কখনও ভাল কখনও খারাপ হতে। এই পৃথিবীতে কেউই সপ্তাহে একটানা সাতদিন ভালমানুষ হয়ে থাকতে পারেন না। তাকে বাঁচার তাগিদেই অন্তত একটা দিন খারাপ হতেই হয়। ☐

আলোকচিত্র : তপন মিত্র

কলকাতার পঙ্গু দমকল ব্যবস্থাকে বাঁচানর জন্য সাবধানঘণ্টি বাজতে শুরু করেছে

শহর কলকাতার বুক চিরে লাল টকটকে গাড়িগুলো ছুটে চলে সশব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে। এই একনাগাড়ে ধাবমান ঘণ্টাধ্বনি শুনে পথচারী বা অন্যান্য গাড়িগুলি মুহূর্তে রাস্তা খালি করে দেয়। ভি আই পির লালবাতি মোটরও ছেড়ে দেয় এই লালগাড়ির পথ। ফায়ার ব্রিগেড কি তাহলে ভি ভি আই পির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ? এই সংস্থাটিকে সত্যিই কি রাজ্য সরকার এতখানি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক সংস্থা বলে মনে করে?

প্রথম প্রশ্নের জবাব, ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল ভি ভি আই পির থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, রাজ্য সরকার দমকল বিভাগকে অতি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক সংস্থা বলে মনে করে, মুখে এ কথা বললেও কাজে ঠিক তার উল্টো আচরণই করে চলেছে।

এর ফলে আগুন লাগলে দমকল সময় মত ছুটে যেতে পারে না। যদিও বা কোনরকমে গিয়ে পৌঁছয় তো শুধুমাত্র জলের অভাবেই আগুন নেভাতে হিমসিম খান কর্মীরা। বরাতে জোটে স্থানীয় লোকজনদের হাতে মারধোর। দমকলের কর্মীদের কয়েকজন দারুণ আহত হয়েছেন। এমনকি একজনের মৃত্যুও হয়েছে। গাড়ি এবং যন্ত্রপাতির ক্ষতি তো হচ্ছেই। আর দমকল কর্মীদের সময় মত তৎপর হবার অভাবে অগ্নি-দেবতার পেটে গত এক বছরেই

শ্যামল সান্যাল

গেছে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি, ৪০১ জন হতভাগ্য মুমূর্ষু এবং ১১৯টি জীবজন্তু।

সরকারি ঔদাসীন্য

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দমকলের সদর দপ্তরে লোডশেডিং-এর নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে দরদর করে ঘামতে ঘামতে এক অফিসার বললেন, মশাই, আমরা আসলে ঠুঁটো জগন্নাথ – ঢাল তলোয়ারহীন ছাড়া নিধিরাম সর্দার। আইনগত কোন ক্ষমতাই নেই। যন্ত্রপাতি নেই। টাকার ভাঁড়ার বাড়ন্ত। কিন্তু কাজে গাফিলতি হলে লোকের হাতে মার খেতে হবে। গভরনমেনটের শাস্তি হজম করতে হবে। সবটাই এক-তরফা।

সরকারি সদিচ্ছা আর তৎপরতার নমুনা : ১৯৭৪ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় ফায়ার প্রিভেনশন অ্যাকট নামে একটি বিল। আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বহুতল বাড়ি, হোটেল, অফিস, সিনেমা হল ইত্যাদির ক্ষেত্রে আগুন সম্পর্কিত আইনগুলি কঠোরভাবে মানতে বাধ্য করা। কিন্তু ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই বিলটিকে আর আইনে পরিণত করা হয়নি। দমকল বিভাগ বার বার চাপ দিয়েছে অনুরোধ করেছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে হয়নি কিছুই। এই আইনের জোরে অন্তত বহুতল বাড়িগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়টা দমকলের দায়িত্বে থাকত। তা না হওয়াতে এখন শুধু পুরসভা বহুতল বাড়িগুলোর প্ল্যান দমকলের কাছে পাঠায়। দমকল বিভাগ আগুনের ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো আছে কি না দেখে তাঁদের মতামত জানায়। তারপর সেই বহুতল বাড়ি, হোটেল, অফিস বা সিনেমা, থিয়েটার হলে আইন অনুসারে কাজ হল কি না তা আর দেখার ব্যবস্থা নেই। দমকলের নির্দেশ উপেক্ষা করলেও আইনত কিছু করার ক্ষমতা নেই।

ফলে আগুন লাগলে ঐ সব বাড়ির নিজস্ব আগুন প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে না। দমকলও বিপদে পড়ে। আইনের এই দুর্বলতা দমকলের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে।

দমকল ও কলকাতা পুরসভার হিসেবনিকেশ মত এখন কলকাতায় এক হাজারের মত বহুতল বাড়ি আছে। আঠার মিটারের বেশি উঁচু বাড়িকেই 'টল বিলডিং' আইনের

আওতায় আনা হয়েছে। শহরের সব থেকে উঁচু বাড়ি 'চ্যাটারজি ইনটারন্যাশনাল সেনটার।' এই বাড়িতে দমকলের কোন আইনই নাকি মানা হয়নি। দমকলের কর্তাদেব অসহায় অভিযোগ, আমাদেব কথা কেউই প্রায় শোনেন না।

পশ্চিমবংগ দমকলের ডিরেকটরেটেব এলাকা গোটা বাজ্যটাই। কিন্তু বোমবে তে দমকলের এলাকা মাত্র বোমবে পুব এলাকার ১৯টা স্টেশন। এদের একজন ডিরেকটর এবং ৩ জন ডেপুটি ডিরেকটর আছেন। পশ্চিমবংগেব দমকলেব ডিরেকটরের কাঁধে ঝুলছে ৭৪টি স্টেশন। তাঁর ডেপুটি ডিরেকটর মাত্র ২ জন। ৪ জন ডেপুটি ডিরেকটব চেয়ে বাজ্য সবকাবের কাছে প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল প্রায় ৪ বছর আগে। কাজ এগোয়নি।

অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

বাজ্য দমকলকে ১২টা ডিভিশনে ভাগ করা আছে। তার জন্য আছেন ১২ জন ডিভিশনাল অফিসাব। অভিযোগ, এঁদের কাজেব চাপ অত্যন্ত বেশি। আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই কবা ছাড়াও এঁদেব প্রশাসনিক কাজ-কর্মও দেখতে হয়। এক একটা ডিভিশনের অধীনে ১৫-১৬টা দমকল স্টেশনও আছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকাবের নিয়ম অনুযায়ী একটা ডিভিশনের আওতায় ৬টার বেশি স্টেশন থাকা উচিত নয়। ডিভিশন (ডি) এব হেড অফিস চব্বিশ পরগণাব ব্যারাকপুরে। এই ডিভিশনের এলাকাব ভেতরে পড়ে মুবশিদাবাদেব বহরমপুরও। ওদিকে কৃষ্ণনগর, এদিকে কাঁকিনাড়া, বারাসত, বসিরহাট। উত্তরবংগের (এইচ ডিভিশন) এর হেড অফিস শিলিগুড়িতে। আর এলাকা ? দিনহাটা, দারজিলিং, কালিমপং, মালদা, বালুরঘাট, ইসলামপুব, জলপাইগুড়ির হ্যামিলটন গঞ্জ। জি ডিভিশনের হেড অফিস দুর্গাপুরে। এখান থেকেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, রামপুর হাট, বর্ধমানের ওপর নজর রাখতে হয়। দমকল বিভাগের কর্তারাও স্বীকার করেন এভাবে কাজ হয় না। সেইজন্য ৮টা ডিভিশনে এবং হেড অফিসে প্রশাসনিক কাজ সামলাতে মোট ১০ জন সহকাবী ডিরেকটব চাওয়া হয় বছর ৪/৫ আগে। তা আজও মঞ্জুর হযনি।

বহু পদ খালি

অফিসাব পর্যায়ে প্রায় ২৭৫টি পদ খালি পড়ে আছে ৫ বছর হল। কর্মীদের জন্য প্রায ২০০ পদে লোক নেই। অর্থাৎ মোটামুটি ৫০০টি পদ আছে। কিন্তু কর্মী নেই। দমকলেব মত অত্যাবশ্যক সংস্থায় বছরেব পর বছর এই অবস্থা চলছে ভাবা যায় ?

বেহাল যন্ত্রপাতি

১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে দমকলের কিছু গাড়ি কেনা হয়েছিল। তারপবে গত ১৮ বছবে তেমন গাড়ি আর নতুন কবে কেনা হয়নি। ১৮-২০ বছর আগেব গাড়িগুলোর হাল এখন বেতো ঘোড়ার মত। দমকলের হিসেব মতই প্রায় ১০০টা নতুন গাড়ি এখনই দবকার। কিন্তু তা হচ্ছে না।

নতুন যন্ত্রপাতির কথা

রাজ্য দমকলের ডিরেকটর কল্যাণ দাশগুপ্ত জানালেন : রাজ্যেব সবকটি দমকল স্টেশনে বেতাব যোগাযোগের ব্যবস্থা তৈবি করা হচ্ছে। আগামী বছরের ভেতরে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ হবাব সম্ভাবনা আছে। এব জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকাব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে আসছে ১০০ ফুট উঁচু সিঁড়ি লাগান একটা গাড়ি আর ৩০টা পামপ। মোট ৬০ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এই টাকা বাজ্য সবকাবেব কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ধার দিয়েছে জেনারেল ইনসিওরেনস করপোরেশন। এছাড়া পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর নিজেও উদ্যোগ নিয়েছেন দমকলের রোগ সারানর।

ইউনিয়ন

মোট কটা ইউনিয়ন দমকলে আছে তার নাকি হিসেবই নেই। কেউ বলেন ২২, কেউ মনে করেন ২৬টা। দমকলেব কর্তারা মনে করেন এদের রেশন ভাতা, ঝুঁকি ভাতা ইত্যাদি দাবিগুলি মানা উচিত। তাই এসব দাবির বিষয়ে তাঁদেব সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। কর্তাদের অভিযোগ, কর্মীরা কাজে ফাঁকি দেন প্রচন্ড। গোটা অফিসে পোসটারে ভর্তি, ডেপুটেশন আর দাবি নিয়েই যদি সময় কাটে তো কাজ কখন হবে ?

নতুন পরিকল্পনা

কলকাতার বেহাল টেলিফোনের অনিশ্চয়তাব হাত থেকে বাঁচাব জন্য দমকল বিভাগ এবাব বেতার বাবস্থায যাচ্ছেন। পুলিশেব মতই তাঁরা আর টি ব্যবহাব কববেন। এ জন্য বাজ্য সরকারি সংস্থা ওয়েবেল কে অবডাব দেওয়া হয়েছে। আগামী বছরেব ভেতরে কলকাতা হেড অফিসের সংগে হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশ পবগনাব দমকলকেন্দ্রগুলি যুক্ত হতে পারে। প্রাথমিক খরচ ৩০ লক্ষ টাকা। সমস্ত পবিকল্পনার কাজ শেষ হলে রাজ্যেব প্রায় সব দমকল বিভাগগুলিই আর টি মারফৎ যুক্ত হবে। মোট খবচ ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ধবা হয়েছে।

জল চাই

কলকাতায় হাইড্রানটগুলোতে জল নেই। এব ফলে আগুন নেভানর কাজে ভীষণ দেরি হচ্ছে। ডিরেকটর শ্রী দাশগুপ্ত জানালেন সব আধুনিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জল ছাড়া আগুন নেভান অসম্ভব। আর কলকাতায় এই জলাভাব ক্রমশই বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত সীমায় এসে গেছে। যে কোন সময়ে বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল না থাকায়। সেই সম্ভাব্য বিপর্যয় ঠেকানর জন্য এখনই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সতর্ক হওয়া ভীষণ দরকার। □

আলোকচিত্র : কল্যাণ চক্রবর্তী

তদন্ত কমিটি বলেছেন রাজাবাজার ট্রাম ডিপোয় আগুনের পিছনে অন্তর্ঘাত নেই। কেউ কেউ বলছেন আগুনের কারণ শরট সারকিট। আসল ঘটনা কী ?

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর রাজাবাজার ট্রাম ডিপো

পিনাকী মজুমদার

'আগুন ! আগুন !' মাঝরাতের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছিল গুটি কয়েক ভীত কণ্ঠের মিলিত আর্তনাদে। তাদের সেই আশঙ্কাগ্রস্ত আর্তনাদকে মুখরিত করে তুলেছিল রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর বিপদ ঘণ্টি। বিপদ সংকেত এবং ট্রাম ডিপোর গুটি কয়েক রাতের পাহারাদারের মিলিত আর্তনাদ ঘুমন্ত কলকাতার শ্রবণেন্দ্রিয় যখন স্পর্শ করল রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর আগুন তখন লেলিহান শিখা হয়ে ঊর্ধ্বমুখী। আশপাশ অঞ্চলের মানুষজন সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ততক্ষণে ডিপোর মধ্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রামগুলো দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে ট্রাম ডিপোর প্রটেকটেড এরিয়ার মধ্যে অসংখ্য মানুষের জটলা। চিৎকার, চেঁচামেচি- 'দমকলকে খবর দে। জল কোথায়, জল ?' ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা। দিনটি ছিল ৫ জুন ১৯৮৩।

হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি এবং চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যেই দমকল বাহিনীর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল যথারীতি দূরভাষ যন্ত্রের মাধ্যমে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘণ্টা বাজিয়ে দমকল বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছিল ঘটনাস্থলে! তারপর একটানা রাত চারটে পর্যন্ত তারা স্থানীয় মানুষের সাহায্যে লড়াই করে আগুনকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। এরই মধ্যে স্থানীয় লোকেরা ১ নম্বর কারশেডের সামনের দিকের ট্রামগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে ঠেলে ঠেলে ডিপোর বাইরে বার করে নিয়ে আসেন। রেসিডেনসিয়াল ফোরম্যান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন—'ও সময়ে ট্রামের 'ওভারহেড' লাইনে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছিল না। কেন, জানি না। বিদ্যুৎ প্রবাহ না থাকায় ট্রামগুলোকে ঠেলে বার করতে প্রচুর সময় লাগে। এর ফলে শেডের ভেতর দিকের ট্রামগুলো বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

যাই হোক, দমকল বাহিনী এবং স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টায় রাত চারটে নাগাদ আগুন আয়ত্তে এলেও পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত দমকল বাহিনীকে আগুন নেভানর কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই ওই কারশেডের ১২০টি ট্রামের মধ্যে ২৬টি ট্রাম পুড়ে শেষ। শুধু তাই নয়, ১ নম্বর কারশেডের মাঝামাঝি অংশের চাল পুড়ে ভেঙে পড়েছে। তবে কারশেডের সামনের কিছুটা অংশ এবং একেবারে পেছনের দিকটা প্রায় অক্ষতই রয়ে গিয়েছিল। আগুনের যা কিছু রুদ্ররোষ তা শুধু কারশেডের মাঝামাঝি অংশের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রকৃত অর্থেই বিস্মিত হয়েছেন আশপাশ অঞ্চলের মানুষজন। তাদের এই বিস্ময় শুধুমাত্র এদিনের অগ্নিকাণ্ডের করাল প্রকোপের জন্যেই নয়। এ ঘটনার মাত্র ৯ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে এরকমই আর একটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার ভয়াল অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদের। ঘটনাস্থল ছিল একই—অর্থাৎ সেই রাজাবাজার ট্রাম ডিপো। সেই মাঝরাত…। তীব্র আর্তনাদ—আগুন, আগুন ! বিপদঘণ্টি এবং জলের জন্য হাহাকার। পরিণতিতে মোট ৪২টি ট্রামের ভস্মাবশেষ মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে।

১৯৭৪ সালের অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি স্থানীয় লোকদের মন থেকে মুছে যেতে না পারলেও এ অগ্নিকাণ্ডের 'তদন্ত-পর্ব' কিন্তু পরিণতি পায়নি। কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন--'১৯৭৪ সালের রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর অগ্নিকাণ্ডের রিপোর্ট আমরা পাইনি।' কিন্তু দমকল বাহিনীর ডিরেকটর কল্যাণ চক্রবর্তী বলেছেন—'১৯৭৪ সালের অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ণয় করা যায়নি।'

এদিকে পরিবহণ সচিব দীপক রুদ্র এবারের আগুন লাগার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন—'১৯৭৪ সালের অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের জন্য আলাদা করে কোন 'তদন্ত কমিটি' গঠন করা হয়নি। ট্রাম কোমপানির তৎকালীন ডিরেকটর, দমকল বাহিনীর ডিরেকটর এবং কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আলাদা আলাদা ভাবে বিষয়টি তদন্ত করেন। তাদের সেই রিপোরটের ভিত্তিতেই ৪০ পাতার একটি সুপারিশ নোট তৈরি করে তৎকালীন মুখ্য সচিবকে

দেওয়া হয়েছিল। সেই সুপারিশ অনুযায়ীই এরপর ট্রাম ডিপোর মধ্যে আগুন নেভাবার প্রয়োজনে জলাধার তৈরি করা হয়। রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর মধ্যেও একটা করা হয়েছিল।'

পরিবহণ সচিব দীপক রুদ্রের কথা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ঘটনার জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠিত না হলেও, ট্রাম কর্তৃপক্ষ দমকল বাহিনী এবং কলকাতা পুলিশ আলাদা আলাদা ভাবে এর তদন্ত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে পুলিশের এক মুখপাত্র বলছেন—'১৯৭৪ সালের কোন রিপোরট আমরা পাইনি।' দমকলের ডিরেকটরের বক্তব্য—'১৯৭৪ সালের ঘটনার কারণ নির্ণয় করা যায়নি।'

পরস্পরবিরোধী এই ত্রিমাত্রিক মন্তব্যের মতই ১৯৭৪ সালের রাজাবাজার ট্রামডিপোর অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে—কৌতূহল, বিস্ময় এবং সন্দেহ নামক মানুষের সহজাত তিন অনুভূতি। আর সে কারণেই এবারের ঘটনাতে সাধারণ মানুষের এই তিন অনুভূতি পেয়েছে তীব্রতম মাত্রা। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন—'পর পর দু-বার একই জায়গায় আগুন কি নিছকই দুর্ঘটনা? নাকি এর পেছনে আছে কোন অন্তর্ঘাত? তদন্ত হবে তো শেষ পর্যন্ত?'

সাত সদস্যের কমিটি রিপোরট এবং...

আশঙ্কাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের কৌতূহল, বিস্ময় এবং সন্দেহ দূর হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই। এই অগ্নিকাণ্ড তদন্ত করার জন্য গঠিত হয়েছিল সাত সদস্যের এক তদন্ত কমিটি। এ কমিটির পাঁচজনই ট্রাম কোমপানির অফিসার। বাকি দু-জনের একজন হলেন দমকল বাহিনীর ডিরেকটর। অন্যজন রাজ্য সরকারের মুখ্য বৈদ্যুতিক ইনসপেকটর। এ কমিটির কনভেনার নির্বাচিত হয়েছিলেন ট্রাম কোমপানির জেনারেল ম্যানেজার পি কে দে।

ঘটনার ঠিক একদিন পর অর্থাৎ ৭ জুন ১৯৮৩ তারিখে আরবান ট্রানসপোরট সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের নেতা জি মেনকফ রাজাবাজার ট্রামডিপোর ধ্বংসাবশেষ সরজমিন প্রত্যক্ষ করতে আসেন। বেশ কিছু সময় ধরে পুড়ে যাওয়া ট্রামের কঙ্কাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। কয়েকজনকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করেন। পরে তিনি মন্তব্য করেন, যে আগুনে কাচ পর্যন্ত গলে গেছে সে আগুন অনেক আগেই লেগেছে।'

এদিকে তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করার আগেই যথারীতি পুলিশ দফতরের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেন—'সম্ভবত শরট সারকিট থেকেই আগুন লেগেছিল। কর্তব্যে গাফিলতির কারণে শরট সারকিট হয়ে থাকতে পারে।'

কলকাতা পুলিশের এনফোরসমেনট বিভাগের ডেপুটি কমিশনার স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি রিপোরট পেশ করেন জুলাই মাস নাগাদ। তাতে পরিষ্কার করেই বলা হয়—'৫ জুন রাত্রে রাজাবাজার ট্রামডিপোর আগুনের পেছনে কোন অন্তর্ঘাত নেই।' অর্থাৎ ঘটনার একদিন পর কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর যে সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল জুলাই মাসে পেশ করা এনফোরসমেনট বিভাগের রিপোরটে।

অবশেষে, আগসট মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া গেল এই অঘটন সম্পর্কে রাজ্য সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির অনুসন্ধান রিপোরট। 'সাত সদস্যের এই কমিটি ৫০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সমস্ত জিনিস এবং বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এই কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ৫ জুন রাতে রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর আগুনের পেছনে কোন অন্তর্ঘাত নেই। এই আগুনে ক্ষতির পরিমাণ মোট ১ কোটি ৮১ লাখ টাকা।'

অর্থাৎ অঘটনের একদিন পরেই কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ অন্তর্ঘাতের সম্ভবনার কথা একরকম বাতিলই করে দিলেন। বললেন 'সম্ভবত আগুন লাগার কারণ শরট সারকিট।' এর ঠিক এক মাস পরই এনফোরসমেনট দফতরের যে রিপোরট স্বরাষ্ট্র দফতরে পৌঁছেছিল তাতেও সরাসরি বলা হল—'এ ঘটনার পেছনে কোন অন্তর্ঘাত নেই।' অবশেষে রাজ্য-সরকার গঠিত কমিটির রিপোরট। সাধারণ মানুষের যাবতীয় আশঙ্কা এবং সন্দেহ দূর করতে সেই রিপোরটেও উচ্চারিত হয়েছে একই সংলাপ—'অন্তর্ঘাত নেই।'

★

সুতরাং সরকারের চোখে রাজাবাজার ট্রামডিপোর বিধ্বংসী আগুনের পেছনে কোন অন্তর্ঘাত নেই। রয়েছে অন্য কারণ। এই কমিটি তার রিপোরটে আগুনের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—'Poor maintenance and negligence on the part of the staff, and inefficient management led to the devasting fire in the Rajabazar depot of the Calcutta Tramways Company (CTC) in which 26 tramcars were gutted on the night of the June 5.

তদন্ত কমিটির কাছে আগুন লাগার কারণ এটাই। সেই কারণকে বিশ্লেষণ করে তারা বলেছেন—'heat generated due to the constant arcing caused by looseness beetween contact pins of the lamp holder and the contact plates of the lamp of the trailor of car number 139 tabled in bay number 4' অর্থাৎ আগুনের উৎপত্তি—কারশেডের চার নমবর লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ১৩৯ নমবর গাড়ির ট্রেলরের বালব-হোলডারের কনট্যাকট পিন এবং বালবের কনট্যাকট প্লেট আলগা থাকার ফল।

আবার এই রিপোরটেই বলা হয়েছে—'কী করে আগুন লাগল তা দমকলের কাছ থেকে তারা জানতে পারেননি।' পুলিশ রিপোরট বলেছে—এটা নাশকতামূলক কাজ নয়। ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতে শরটসারকিট থেকে আগুন লাগতে পারে। বিদ্যুৎ ইনসপেকটর অবশ্য বলেন, প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ না থাকলে শরটসারকিট থেকে এত বড় আগুন লাগতে পারে না। তবে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ দীর্ঘ সময় আলগা হয়ে থাকলে তার থেকে বড় আগুন লাগতে পারে।'

সুতরাং এই রিপোরটের বক্তব্য অনুযায়ীই বলা যায় সাত সদস্যের এই কমিটির ট্রামওয়েজের পাঁচজন ছাড়া বাকি যে দু'জন ছিলেন তাদের একজনের কাছ থেকে কমিটি 'আগুন লাগার কারণ জানতে পারেননি' এবং অপর জনের কাছ থেকে পেয়েছেন—'প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ না থাকলে শরটসারকিট থেকে এত বড় আগুন লাগতে পারে না।

তবে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ দীর্ঘ সময় আলগা হয়ে থাকলে তার থেকে বড় আগুন লাগতে পারে।'

রাজ্য সরকারের মুখ্য বৈদ্যুতিক ইনসপেকটরের এই বক্তব্যের মধ্যে দুটি সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সি টি সি-র কিছু এনজিনিয়ার এবং সাধারণ কর্মী। তারা বলতে চাইছেন মুখ্য বৈদ্যুতিক ইনসপেকটরের এই বক্তব্য থেকে যে দুটি সম্ভাবনা মাথা চাড়া দেয় তা হচ্ছে— ১। প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থের অবস্থিতি এবং শরটসারকিট। ২। বৈদ্যুতিক সংযোগ দীর্ঘক্ষণ আলগা হয়ে থাকা এবং তা থেকে আগুনের উৎপত্তি।

আশঙ্কা কেন ?

রাজ্য সরকারের মুখ্য বৈদ্যুতিক ইনসপেকটরের বক্তব্যে রয়েছে 'প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থের' উল্লেখ। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন 'প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ' বলতে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন ? ট্রামের ট্রেলরের মধ্যে কোন কোন বস্তু 'প্রচণ্ড দাহ্য' বস্তু ? তাদের অভিমত সেই অর্থে 'প্রচণ্ড দাহ্য' কোন বস্তু ট্রাম ট্রেলরের মধ্যে থাকে না। আর শরটসারকিটের প্রশ্নটিও কিছু এনজিনিয়ার বাতিল করে দিয়েছেন। তার কারণ, 'শরটসারকিট হয় একমাত্র দুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মধ্যে ডিরেকট সংযোগ বা সংস্পর্শ ঘটলে। অর্থাৎ কোন কারণে যদি দুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপরকার অপরিবাহী আচ্ছাদন ছিঁড়ে গিয়ে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তবেই শরটসারকিট হওয়া সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোন সম্ভাবনা থাকতেই পারে না বলে তাদের অভিমত। কিন্তু কেন ? তার কারণটা এবার খুঁটিয়ে দেখা যাক।

ট্রামের এনজিনে এবং ট্রাম-ট্রেলরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় ওভারহেড লাইন থেকে ট্রলির (ওভারহেড লাইন এবং ট্রামের সংযোগ দণ্ড) মাধ্যমে। বলা বাহুল্য ট্রামের ওভারহেড লাইন এক তার (wire) বিশিষ্ট। ট্রলির মাধ্যমে ট্রাম ট্রেলরে বিদ্যুৎ প্রবাহ এসে ট্রামের চাকার মধ্যে দিয়ে আরথিং হয়ে সারকিট পুরো করে। সারকিট পুরো না হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে পারে না—এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম।

সুতরাং এক তার (wire) বিশিষ্ট 'ওভারহেড' লাইনে শরটসারকিট হতে পারে না একেই অভিমত প্রকাশ করেছেন কিছু সংশ্লিষ্ট এনজিনিয়ার। তাহলে শরটসারকিট হল কোথায় ? ট্রাম ট্রেলরের ভেতরে ?

এ সম্ভাবনাটিকেও তারা বাতিল করে দিচ্ছেন। তারা বলছেন— সি টি সি-র আইন অনুযায়ী ওভারহেড লাইনের বিদ্যুৎ সরবরাহ রাত ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয় ডিপোর সাব স্টেশন থেকে। সেই সঙ্গে বিশেষ সতর্কতার জন্য ট্রলিগুলোকেও ওভারহেড লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। ৫ জুন রাতে আগুন দেখা গিয়েছিল রাত ১টা বেজে ২৫ মিনিটে। সুতরাং ও সময়ে ট্রাম-ট্রেলরের মধ্যে বিদ্যুৎ সররবাহ পুরোপুরি বন্ধ। অন্তত আইনানুযায়ী তাই হবার কথা। তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই অথচ 'শরট সারকিট' কিম্বা 'লুজ-কনট্যাকট' কী করে সম্ভব ?

তবে কি ধরে নিতে হবে ওইদিন 'পাওয়ার সাব স্টেশনের (ডিপোর মধ্যেই অবস্থিত) কর্মীরা এবং ট্রলি বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব যাদের তারা একই সঙ্গে একই দিনে কাজে গাফিলতি করে নির্ধারিত সময়ের পরও বিদ্যুৎ সরবরাহ চালিয়ে গিয়েছিলেন ? যদি তাই হয় তবে কি সেটাকে শুধুমাত্র কাজে গাফিলতি হিসেবে দেখা যায় ? তাতে কি মনে হতে পারে না উভয় বিভাগের কর্মীর মধ্যে যোগসাজসের মাধ্যমেই রাতে ১টার পরও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়নি ? নাকি আগুন লাগার কারণ বিদ্যুৎ সংক্রান্তই নয়, অন্য কোনভাবে লাগান হয়েছে ? —এ সমস্ত যুক্তিই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু এনজিনিয়ার এবং কর্মীর।

আরও কিছু জটিল প্রশ্ন তুলছেন তারা তদন্ত কমিটির রিপোরটকে ঘিরেও। তদন্ত কমিটির রিপোরটে বলা হয়েছে ৫০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য সেদিন রাতে রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর ডিউটিতে ছিলেন মাত্র ১৪ জন। নাইট কার ক্লিনার ৮ জন, ট্রলিম্যান ৫ জন, জমাদার ১ জন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু কর্মীর বক্তব্য—এই ১৪ জন ছাড়া বাকি কাদের সাক্ষী হিসেবে নেওয়া হল ? তারা কি সবাই বাইরের লোক ? তাদের সাক্ষ্য কতটুকু কার্যকর হতে পারে ?

এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়াও তাদের মনে সন্দেহের অবকাশ আছে আরও। পুলিশের প্রাথমিক রিপোরটে বলা হয়েছিল ঘটনার সময় একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। পুলিশের এই রিপোরটের কিছু সত্যতা যাচাই করা গেছে। স্থানীয় কয়েকজন জানিয়েছেন তারা একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছিলেন। তবে তা বোমা না অন্য কিছু তা ধারণা করতে পারছেন না।

আশঙ্কা এবং অভিযোগের কারণ কী ?

কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানির এক শ্রেণীর কর্মচারী এবং কিছু ওয়াকিবহাল সাধারণ মানুষ সরাসরি অভিযোগ করে বলেছেন— 'এ তদন্ত রিপোরট সঠিক নয়।' অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাকে তারা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। পারছেন না তদন্ত রিপোরট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু কর্মী আরও অভিযোগ করেছেন সাতজনের কমিটির যে পাঁচজন ট্রামওয়েজের উচ্চপদস্থ অফিসার, তাদের একজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই করে দেখছেন ভিজিলেনস কমিশন। আর একজন এমন একটি পদে গত ১০ বছর ধরে রয়েছেন যে পদে সারভিস কনডাকট রুল অনুসারে এতদিন ডেপুটেশনে থাকা যায় না। কিন্তু তিনি রয়েছেন গত ১০ বছর ধরে। ১৯৭৪ সালে রাজাবাজার ট্রামডিপোয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সময় যিনি ডেপুটি পদে ছিলেন তাকে পরবর্তীকালে প্রমোশন দেওয়া হয়। এ সমস্তই একটি কর্মী ইউনিয়নের কারসাজিতে হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক শ্রেণীর কর্মীর ধারণা—মাথাভারী প্রশাসন এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ঢাকতেই আগুন লাগার প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা হচ্ছে না। চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী—'আগুন মানেই শরটসারকিট' ফরমুলা প্রয়োগ করছেন। তাদের সূত্রেই জানা যায় বর্তমানে এই সংস্থার মোট কর্মী ৯ হাজার। ট্রাম প্রতি কর্মী সংখ্যা ৩৩ জন। তা সত্ত্বেও মোট বেতনের প্রায় ২৬ শতাংশ দিতে হয় ওভারটাইম বাবদ। বর্তমানে ওভারটাইম সমেত বেতন বাবদ মাসিক ৭১ লাখ টাকা ব্যয় হয়। অভিযোগ সেই ইউনিয়নের ইচ্ছেতেই ওভারটাইম দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ।

এ ছাড়াও বছরের পর বছর সরকারকে এই সংস্থার জন্য ভরতুকীর পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। গত ১৫ মারচ ট্রামের ভাড়া বাড়িয়েও সেই ভরতুকীর পরিমাণ কমান যায়নি। একটি পরিসংখ্যান থেকে এ ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ভাড়া বাড়ার আগে গড় দৈনিক টিকিট বিক্রি হত ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, ২৭৫টি ট্রাম থেকে। ভাড়া বাড়ার পর মোট ২৯৫টি ট্রাম থেকে টিকিট বিক্রি বাবদ আসছে মোট ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা। সুতরাং আয় বাড়ল মাত্র ১৫ হাজার কিন্তু সেই সঙ্গে ট্রামের সংখ্যাও বেড়েছে ২০টি।

বিশ্বস্ত সূত্রেই জানা গেছে এই আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। আর সে কারণেই গত ১৯৮০-৮১ সালে সরকারকে মোট ভরতুকী দিতে হয়েছে ৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। ১৯৮১-৮২ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮ কোটি ৮৯ লাখ টাকা।

সুতরাং ট্রামের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং সি ইউ টি পি-র স্পেশাল রিনোভেশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিদেশ থেকে অসম্ভব দামী যন্ত্রপাতি আনিয়ে পুরনো ট্রামকে নতুন রূপ দিয়েও এই ভরতুকীর পরিমাণ কতৃপক্ষ কমাতে পারছেন না। এর জন্যে সরকার থেকেও ট্রাম কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ আসছে। আর তাই ওই সংস্থার এক শ্রেণীর কর্মচারী প্রশ্ন তুলছেন—এ সমস্ত বিষয় থেকে সরকারের এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যেই কি বারবার ট্রাম ডিপোয় আগুন লাগছে ? আর সে কারণেই কি আগুনের কারণ শরট-সারকিট বা অন্য কোন গোলযোগ বলে চালাবার চেষ্টা চলছে ? তারা আরও দাবী করছেন—আগুন লাগার বিষয়টি নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। □

আলোকচিত্র : কল্যাণ চক্রবর্তী

আসানসোলের কয়লা চক্র

শ্যামল বসু

লতিকারা আজকের আসান-সোলে কোন বারবধূ নয়, ওরা যেন সমাজেরই আয়না। যে সমাজের রঙ কয়লার মত কালো। এই সমাজে লতিকার মত মেয়েদের দেহের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয় আট ফুট বাই বার ফুট বেড়াচালের আশ্রয়। মণ্টুরা-যারা আসানসোলের কয়লার মত অন্ধকারের জীব তারা খনি অঞ্চলের প্রাণফোয়ারাকে টাকার জোরে শুধু লুটে নেয়। নারী, মদ, জুয়া আর বেপরোয়া জীবনের দোলায় দুলতে দুলতে আসানসোলের খনি অঞ্চলের ইতিহাস শুধু পুলিশের খাতাতেই ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। বাইরে শুধু কালোহীরের আলোটাই দেখেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আলোর নিচে অন্ধকারের আড়ালে যে একটা প্রজন্ম ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ কেউ রাখে না।

৭ জুলাই ১৯৮৩। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় নীল রঙের একখানা ডামপার এসে দাঁড়ায় জি টি রোডের ওপর ওয়েসাইড হোটেলের সামনে। লছীপুরের চারশ ঘর বারবনিতা পাড়ার নাম করা হোটেল। লাই-সেনস না থাকলেও মদ বিয়ার মহিলা সবই পাওয়া যায় এই 'ঢাবা'য়। কোন হাংগামা নেই। চেনা পরিচয়ের কোন বালাই নেই। যে কেউ ঢুকে পড়লেই পয়সায় সব কিছু কিনে নিতে পারে হোটেল থেকে। পিছনে বারবধূদের খুপড়ি ঘর। এই হোটেলে বসেই খদ্দের ঠিক করে লতিকারা। খদ্দেরের আশায় সেদিন লতিকাও আর কয়েকজন মেয়ের সংগে বসে ছিল। তিন সাকরেদকে নিয়ে একটা কাঠের পায়ে দাপিয়ে বেড়ায় যে এই অঞ্চল সেই মণ্টু এসে বসে হোটেলে। জনপ্রিয় হিন্দি নায়কের ভঙ্গিমায় মণ্টু তার পরিচিত লতিকাকে আসানসোলে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। ঢাকা বিক্রমপুর থেকে মাস দুয়েক আগে আসা লতিকার সংগে মণ্টুর একটা বোঝা পড়া গড়ে উঠেছে। মণ্টুর কথায় লতিকা নিজের ঝুপড়ি থেকে ম্যাকসি ছেড়ে শাড়ি পরে আসতে চায়। মণ্টু বাধা দেয়। বলে আসানসোলে গিয়ে শাড়িও কিনে দেবে। এর আগেও লতিকা মণ্টুর সংগে বাইরে গিয়েছে। আজকের প্রস্তাবে সে রাজি হয়। ম্যাকসি পরেই সে উঠে বসে ডামপারের সিটে। পরের দিন ৮ জুলাই শুক্রবার সকালে লতিকাকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায় দোমহানি রেল কলোনি এলাকায়। লতিকার জবানবন্দিতে পাওয়া যায় যে তাকে নিয়ে মণ্টু ও তার তিন সংগী মধ্যরাত থেকে ডামপারের মধ্যেই বলাৎকার করে এবং সেই সংগে তাকে ভোজালি দিয়ে আহতও করে। ডামপার থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তারা চলে যায়। স্থানীয় পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে কোন হদিশ করতে পারেনি মণ্টুর।

বারবধূ নয়, ঘরের বউ দুলি বাউরি (৩৫)। রাণীগঞ্জ থানার গ্রামের বাউরি পাড়ার মেয়ে দুলি। স্বামী তার ই সি এলের খনির মজুর ছিল। নিজের মাইনে কত তার হিসেব সে কোনদিনই জানত না। অঞ্চলের মাতব্বর রামজয় মণ্ডল। সবটাই ছিল রামজয়ের হাততোলা। এই রামজয় সুযোগ বুঝে খনির মজুরদের বাড়তি কাজ দিত বে আইনী কোন কয়লা খোঁড়ার পিটে। দুলির স্বামীকে সেই কাজে পাঠিয়ে রামজয়ও সতীত্ব হরণ করল দুলি বাউরির। জানাজানিটা পুলিশ পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু রামজয় মণ্ডলদের কোন শাস্তি হয় না। কয়লা খনি অঞ্চলের নতুন জীবন-ধারায় ওরাই আসল পথচারী।

আসানসোল সাব ডিভিশনের ৩৫০ স্কোয়ার কিলো মিটার এলাকায় কয়লা মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়। ইসটারন কোল ফিলড লিমিটেডের (ই সি এল) আইন কানুন মেনে চালু কোলিয়ারির সমান সংখ্যক বেআইনী কয়লা তোলার ব্যবস্থাও এখানে আছে। জাতীয়করণের পর কয়লা শিল্পের শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন বেড়েছে কয়েক গুণ। কাগজে কলমে সুবিধের অভাব নেই। কিন্তু আদতে কয়লা খনির শ্রমিকরা যেমন ছিল তার চেয়ে খারাপই আছেন। যে কোন কোলিয়ারির মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৮০ জনই এখনও টিপ সই দিয়ে মাইনে নেন। ৭০ জন জানেন না কত পাইনে কী বাবদ কত ভাতা এরা পান। এদের কাছে 'বাবু'দের নজর ব্যক্তিগত মালি-কানায় থাকা কোলিয়ারি 'বাবু'দের থেকে এতটুকু কমেনি। জীবন ধারণের মত এরাও জানেন 'ধার' করতে হয়। আর টাকার প্রয়োজন হলে দলের সর্দার তার ব্যবস্থা করে দেবে। কোমপানির কাগজ যদি জমা দেয় তবে সে ধার পাবেই। কিন্তু কে তাকে ধার দেয় আর কোমপানির কাগজ বলতে সে যে বোঝে কেবল পে কারড টিকে তার মূল্য কত তা সে জানে না। ই সি এল কর্তৃপক্ষর সংগে সাধারণ শ্রমিকদের এখনও বহু ক্ষেত্রেই ভাসুর ভাদ্দর বৌ-এর মত সম্পর্ক। দলের সর্দার, রক্ষীবাহিনীর কর্মী, কোলিয়ারি মুনসি কিংবা ট্রেড ইউনিয়ানের ছোট নেতাই এখনও এদের কাছে ভগবান। এই সুযোগ গুলো দলের সর্দার সিকিউরিটির কর্মী থেকে শ্রমিক নেতা পর্যন্ত সকলেই নিয়ে থাকেন। ই সি এলের শ্রমিকদের বেতনের বেশি ভাগটাই এঁদের কাছে যায়। যার বেতন তিনি পান না। দিন আনা দিন খাওয়া চলে যায়। যে কোন খনির যে কোন মজুর বসতিতে গিয়ে দেখলেই এই চেহারা দেখা যাবে। মাটির ঝুপড়ি বাড়িতে দৈনন্দিন 'না থাকা'র সংসার। প্রয়োজনে টাকাটা ধার শতত্বর। রামনিবাস ধীরুরা যোগাড় করতে পারে তাই কোনমতে দিন চলে। মাটির ঘরে একটা খাটিয়া আর ঘরের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল অবধি টাঙান দড়ি দড়া আর যা পাওয়া যাবে তা হল, ছেঁড়া ময়লা কাপড় বিছানা নামক কাঁথার কুণ্ডলী ও অ্যালুমিনি-য়ামের কিছু বাসন। ধারের টাকায় খাদ্যবস্তু কেনা ছাড়া আর যা চলে তা হল মদ। শতকরা ৮০ জন শ্রমিকই স্থানীয় শ্রমিক নেতা অথবা মাতব্বরদের সংগে বসেই মদ্যপান করে। কখনো কখনো হিন্দি সিনেমা দেখা এই টুকুই রিক্রিয়েশন। গায়ে গতরে জোর থাকলে মাতব্বররা যখন বেআইনী খনি তৈরি করে সেখানে কাজ করলে দিনের পয়সা দিনে পাওয়া যায়। দিন প্রতি ১২ থেকে ২০ টাকা। এ টাকায় কোন মহাজনের দেনা শুধতে হয় না তাই ই সি এল কারখানার শ্রমিকদের নজর এদিকেই বেশি। অন্তত তারা চোখে টাকাটা দেখতে পায়। স্থানীয় 'মস্তান'দের নজরেও থাকা যায়। ঘরে যুবতী বউ বা মেয়ের ইজ্জত নিয়ে খুব একটা টানাটানি হয় না। শরীর নিয়ে বেশি চিন্তা করতে না হলে অর্থাৎ রোগ বালাই না থাকলে মোটামুটিভাবে দিন কাটাতে অসুবিধা হয় না। অসুবিধা হয় যখন কেউ একটু সুস্থ অথবা শান্তির জীবন

দিনলিপি

কয়েকটি বিশেষ রচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দিনলিপি

১ নভেম্বর ১৯৫০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। এই দিনলিপিটি ১৯৫০ সনের। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ-ছদিন আগে তাঁর দিনলিপি রচনা বন্ধ হয়ে যায় সহসা। বিভূতিভূষণের দিনলিপির মধ্যে এইটিই শেষ রচনা। পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে এক ধরনের নরনারীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা সম্পর্কহীনতা-জনিত একাকিত্বের বেদনায় নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র। এদের নিয়ে অসামান্য এক আলোচনা

অশ্রুকুমার সিকদারের 'যুগলের নিঃসঙ্গতা'

অন্যান্য প্রবন্ধ

অমিতাভ চৌধুরী মনোজ মিত্র ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

চারটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

একটি হাসির উপন্যাস আশাপূর্ণা দেবী

অন্য তিনটি

মহাশ্বেতা দেবী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দিব্যেন্দু পালিত

বড় গল্প

বিমল কর

গল্প

প্রতিভা বসু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রতন ভট্টাচার্য মিহির মুখোপাধ্যায় সুধাংশু ঘোষ শিশির লাহিড়ী অমলেন্দু চক্রবর্তী সত্যেন্দ্র আচার্য বুদ্ধদেব গুহ সমরেশ মজুমদার শেখর বসু সুব্রত সেনগুপ্ত শৈবাল মিত্র প্রমুখ

দীর্ঘ কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতা

অরুণ মিত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন সুশীল রায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শঙ্খ ঘোষ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সুধেন্দু মল্লিক আলোক সরকার প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত উৎপলকুমার বসু আনন্দ বাগচী অমিতাভ দাশগুপ্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সিংহ সুনীল বসু শিবশম্ভু পাল রত্নেশ্বর হাজরা সাধনা মুখোপাধ্যায় ভাস্কর চক্রবর্তী কালীকৃষ্ণ গুহ দেবারতি মিত্র আশিস সান্যাল মনুজেশ মিত্র বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রদীপচন্দ্র বসু দাউদ হায়দার রানা দাস ও আরো অনেকে।

প্রচ্ছদ

দুর্গাচিত্র ।। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।দু'শ পাতারও বেশি। দাম পনের টাকা

চায়। শতত্বর রামনিবাসরা তখন চাকরি বেচে দিয়ে দেশে চলে যায়। চাকরি বেচে দেওয়াটা এখানে একটা চালুপ্রথা। রামনিবাস তার শরীরের অপটুতার জন্য অবসর পেতে পারে, তার জায়গায় আসানসোল কোরটের এফিডেভিট করা আত্মীয় তিনি যেই হোন না কেন আর তার পদবীও যাই হোক না কেন সে পুত্র জামাতা বলে পরিচয় দিয়ে চাকরি পেতে পারে। শ্রমিক নেতাদের ধরেই এ জাতীয় কাজ হয়। রামনিবাসরা হাজার আট দশ টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে। এই টাকাটা যিনি চাকরি নেবেন তাকেই দিতে হবে। এই কোরটের কাছে হলফনামা করা পুত্র বা জামাতার সংখ্যাটা এই অঞ্চলে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে।

আর যদি কোন মহাজন, শ্রমিক নেতা কিংবা সিকিউরিটির লোক একবার বাগে পায় রামনিবাসদের তাহলে তো কথাই নেই। বেআইনী খনিতে রামনিবাসের বৌ মেয়েকে দিয়েও কাজ করাবে। দেনাব জালে জড়িয়ে পড়া রামনিবাস শতত্বরা বেআইনীভাবে কাটা খনিব ধসে চাপা পড়ে মাবা যাবে। হয়ত তাদেব পবিবারেব মহিলাবাও ধসেব নিচে চাপা পড়ে যাবে। কিংবা গায়ে গতবে যৌবন থাকলে চোবা খনিব ব্যবসায়ীর সংগসুখ দিতে গিয়ে জীবনেব বাকি সময় কাটাবে লছী পুরের 'লাল এলাকায়।' কেউ কেউ যে নিজের গ্রামে গিয়ে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে ঘর করবে না তাও নয়। কেউ কেউ হয়ত আবার নিজেব বাড়ি ফিরে গিয়ে মা অথবা বোন অথবা স্ত্রীব ভূমিকায় নেমে পড়বে। সবাব অলক্ষ্যে যার পরিবর্তন ঘটে যাবে তা হল এই সমাজ জীবনের মূল্যবোধ। যেখানে কেবল শরীর মানে শরীব আর যে কোন মূল্য মানেই টাকা। আজকের আসান সোল মহকুমার ১১৪টি গ্রামের মধ্যে শতকবা ৭০টি গ্রামের সমাজ জীব-নের চেহারায় যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আসানসোল মহকুমার এক নজরে চেহারাটা এ প্রসংগে জেনে রাখা দরকার। ৯ লক্ষর সামান্য কিছু বেশি এখানকার জনসংখ্যা, ব্লক ৭টি, গ্রাম ১১৪টি, পুরসভা ২টি, নোটিফায়েড এরিয়া ৪টি, সিনেমা হল ১৪টি, মহকুমা হাসপাতাল ১টি, মানসিক প্রতিবন্ধীকল্যাণ কেন্দ্র ১৬টি, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানা পাঁচটি, (চিত্তরঞ্জন লোকো ওয়ারকস, হিন্দুস্থান কেবলস ইসকো, সাইকেল করপোরেশন বারন স্টানডারড) এ ছাড়া কয়লা খনি অঞ্চল।

এখানে কাঁচা টাকার গল্প শুনতে হয় না। যে কোন সাধারণ চায়ের দোকানের ছেলে অথবা সাইকেল

লছীপুরের চারশ ঘরের কয়েক ঘরণী

রিকশাওয়ালাই জানিয়ে দেবে কোথায় গেলে আর কী ভাবে কাঁচা টাকা পাওয়া যাবে, তার হদিস মিলবে। চোরাই কয়লা কাটার এবং বিক্রির ব্যবসা এখানে কী ভাবে হয়? কে কে করে? সব কিছুই সবাই জানেন। কোথায় কোথায় খনিব মুখ তৈরি করা যায় বা আছে। কোথায় কোথায় 'ডামপার স্পট' আছে। এক ঝুড়ি কয়লা কেটে নিয়ে আসলে, কোথায় বাখতে হবে আর তাব দাম কোথা থেকে কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। কিংবা কেউ যদি কয়লা কেনার পব বাইরে পাঠাতে চান কী ভাবে পাঠাবেন তার জন্য লোক ঠিক করা লবি ঠিক করা বিশেষ নজরদার বাহিনী ভাড়া করা এবং সবশেষে বিহার পার করে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী অবধি পৌঁছে দেওয়া সবই প্রায় কনট্রাকট নেবার মত ব্যবসা করে কিছু লোক বসে আছেন। এদেব খুঁজতে কষ্ট নেই। বিরাট সংখ্যক বেকার ছেলেকে আর আসানসোল জি টি রোডের ধারের দুপাশের স্টেশনারি থেকে চায়ের দোকানে এই সব লোকদের পাওয়া যাবে। ক্রেতার চালচলন দেখলে তারা নিজেরাই কেউ কেউ এগিয়ে আসবে অথবা যিনি এই ব্যবসা করতে চান তিনি আসানসোলের যে কোন শ্রেণীর হোটেলে ঢুকে যে ছেলেটি চা দিচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন। আসানসোলে কয়লা থেকে বেআইনী রোজগার হয় দুভাবে। এক পুরনো কিছু খনির মালিক নতুন কিছু সাগরেদ জোগাড় করে যততত্র কয়লা কেটে বের করছেন। দুই ই সি এলের কয়লা যেখানে মজুত থাকে সেখান থেকে অথবা রেলে ওজনের সময় কিংবা ওয়াগন থেকে চুরি করে। আসানসোলের পুলিশের কাছে যে হিসেব তাতে বেআইনী-ভাবে যেখানে সেখানে খনি খোঁড়ার ঘটনা এখন অনেকটা কম। তাদের মূল সমস্যা চোরাই কয়লা নিয়ে। ১৫ থেকে ২০ টন এক ট্রাক কয়লা আসানসোল মহকুমার বাইরে নিয়ে যেতে পারলেই ট্রাক পিছু ২০০০ টাকা লাভ। এ লাভ খরচ খরচা বাদে। রাণীগঞ্জের এক ওস্তাদ কিছুদিন আগে ধরা পড়েছেন। ইনি দিনে পঞ্চাশটি ট্রাক মাল পাঠান। এর সংগে প্রায় হাজার দুয়েক শ্রমিক শ'চারেক অন্য পেশার লোকও জড়িত। দৈনিক রোজগার কিছু না হলেও ৯০ হাজার টাকার মত। রাণীগঞ্জের পাঞ্জাবীর মোড়ে ওই ওস্তাদ একডাকে পরিচিত। সে কেবল টাকা লগ্নী করে। ওর লোক আছে যারা ট্রাক ভাড়া করে, বেআইনীভাবে কাটা কয়লা যোগাড় করে, ই সি এলের গো ডাউন থেকে চুরি করে নিয়ে আসে। কিন্তু ওস্তাদকে আটকে রাখাব কোন পথ পুলিশের নেই। পুলিশ লবি আট কায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আইনে ধরে কোরটে চালান দেয়। কিন্তু এ আইন দিয়ে এত বড় ক্ষমতাশালী চক্রের মালিকদের আটকান মুশকিল। ওস্তাদের সংগে সকল শ্রেণীর মানুষই জড়িয়ে আছে বলে পুলিশের অভিযোগ। আসান-সোল মহকুমার গ্রামাঞ্চলের দিকেই বেশি আন-অথরাইজ মাইনিং হয়। ই সি এলের খনির পাশেও হয় কিন্তু কোন দুর্ঘটনা না থাকলে অথবা কেউ কারো সম্পত্তি চুরি করছে বলে অভিযোগ না করলে এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেমবরের মধ্যে বেআইনী কয়লা ধরা হয়েছিল ৫৫০০ মেট্রিক টন। ট্রাক ধরা হয়েছিল ৩০০ টি আর লোক ধরা পড়েছিল ৬৮০ জন। ১৯৮২ সালে কয়লা ধরা হয়েছিল ৯৭০০ মেট্রিক টন ৫২৩টি ট্রাক আর ৫৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালের জুলাই মাস অবধি ধরা হয়েছে ১৯০০০ মেট্রিক টন কয়লা। ৮৭০ টি ট্রাক আর ৬২৫ জন লোক। পুলিশ কয়লা ধরে আলাদা করে রাখবার ব্যবস্থা করে। ই সি এল কর্তৃপক্ষ সব সময় সহযোগিতা করেন না। পুলিশেরও লোক কম তাই রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় কয়লা রেখে দিতে হয়। ই সি এলের কাছে কয়লা ডামপ করা জায়গা চেয়েও পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের অভিযোগ। ১৯০০০ মেট্রিক টন কয়লার দাম তো কম নয় ৭০ লাখ টাকার মতন। ট্রাকগুলোর মালিক খুঁজে বের করে বড়জোর সপ্তাহ তিনেক আটকে রাখা যায় কেস হয় E C Act-55 এর 7(10) ধারায়। লোকজনকেও আইনের ফাঁকের জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তারপর আবার বাস্তবিক অর্থে পুলিশ কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতির চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া এই সব চোরা ব্যবসায়ীদের কিছুই করতে পারে না। কেননা সে আইন তাদের হাতে নেই।

আসানসোলের এ ডি এম আশীষ বহুগুণা অবশ্য মনে করেন আপাতত যে টুকু আইনের সুযোগ আছে তাকেই লাগান যায় শুধু দরকার ই সি এল অথবা কোন তরফের থেকে অভিযোগ। এখানে কেউ চট করে অভিযোগ করেন না। যার জিনিস চুরি যাচ্ছে তারই যদি অভিযোগ না থাকে তবে জিনিসটা যে চুরি এটা প্রমাণ করার অসুবিধা থাকে। আসানসোলের বরবনী, জামুরিয়া, কুলটি আর আসানসোল এই চারটি থানাতেই কয়লা নিয়ে চোরা চালান চক্র গড়ে উঠেছে। এইটাই বহুগুণার অভিজ্ঞতা। যারা এখন বেআইনী-ভাবে খনি কেটে কয়লা তোলার কাজে ব্যাস্ত আছেন তাদের প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি বেনারস অথবা পাটনা থেকে আসা খদ্দেরদের সংগে যোগাযোগ করেন তিনি অবশ্যই এই অঞ্চলের কোন হোটেল, স্টেশনারি, হোলসেল অথবা অন্য কোন ব্যবসার সংগে যুক্ত থাকবেন। টাকা লগ্নি তিনিই করবেন। এই কাজের জন্য অন্তত জনা ছ'য়েক মোটরবাইক চালাতে জানে এমন যুবক দরকার। দরকার কোন লোকাল ট্রানসপোরট

অমৃতের দিশারী........

সেদিন উদ্বোধনের দিনে গিয়েছিলাম প্রখ্যাত জ্যোতিষ গবেষক অমৃতলালের নতুন চেম্বারে। অমৃতলাল এখন প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে ঠিক গড়িয়া হাট থানার সামনেই তাঁর নিজস্ব চেম্বারে বসছেন চেম্বারের ঠিকানাটা হল - ১/৮ ডোভার লেন, কলিকাতা- ৭00 0২৯। 42-6581 তাঁর চেম্বারের ফোন নাম্বার। আর বাড়ির নাম্বার 36-2612. সবার সুবিধার জন্য তিনি রবিবারও চেম্বার খোলা রাখছেন। এছাড়া দূরের মানুষের জন্য ডাকযোগেও বিচারের ব্যবস্থা রেখেছেন। উদ্বোধনের দিন সমাজের বিভিন্নস্তরের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি তাঁদের অন্তরের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন অমৃতলালের কাছে।

এরই মধ্যে সময় করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি আমাদের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে বললাম - "আচ্ছা, আপনার কাছে ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিরা আনাগোণা করেন, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে কোন সমস্যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি?"

জবাবটা ওঁর ঠোঁটের আগায় যেন ছিল। বললেন, দেখুন, আপনার পায়ে যদি ফোঁড়া হয়, কোষ্ঠী বা হাত বিচার করেই বিবাহ সম্পন্ন হত। ফলে দাম্পত্য জীবনে এখনকার মত চরম অশান্তি কম দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এই যোটক বিচারের প্রচলন কমে যাবার ফল আমরা হাতে হাতেই পাচ্ছি। (একটু থেমে) তারপর দেখুন এই বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার সঙ্গে আরও প্রচুর আনুষঙ্গিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে। যেমন : (১) বিবাহের আগে প্রণয়ে বিশ্বাসভঙ্গ, (২) প্রণয়ে বিচ্ছেদ (৩) বিবাহে বিলম্ব (৪) বিয়ে ঠিক হয়েও শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে যাওয়া, (৫) দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন কারণে অশান্তি, (৬) বিবাহের পরও স্বামী বা স্ত্রীর অবৈধ বা গুপ্ত প্রণয় থাকা, (৭) স্বামী বা স্ত্রীর যৌন অতৃপ্তি, (৮) বিবাহ বিচ্ছেদ, (৯) বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক অবস্থান, (১0) সন্তান না হওয়া, (১১) সন্তান বেশিদিন জীবিত না থাকা, (১২) রোগাক্রান্ত সন্তান, (১৩ কুসন্তান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু সমস্যা রয়েছে যার গুরুত্ব কেউ কারও থেকে কম নয়। আর উত্তরোত্তর এ ধরনের সমস্যাগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

প্রশ্ন : এই যে বার-তেরটি সমস্যার কথা বললেন, দেখা যাক Metal Tablet কিভাবে কাজ করে। ধরুন আপনাকে যদি ১00 গ্রাম করে পৃথকভাবে গুঁড়ো চা, দুধ, চিনি ও জল দেওয়া হয় এবং মিশ্রিত করতে বলা হয়, তাহলে কি সুস্বাদু চা তৈরি হবে? কিন্তু আনুপাতিক হারে যদি এগুলো মিশ্রণ করা হয়, তবেই চা তৈরি হবে। আবার সবাই একই রকম চা পান করেন না। কেউ কেউ চিনি, দুধ বা লিকার কম বা বেশি দিয়ে চা খেতে ভালবাসেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কার্যকারণে রুচির তারতম্য রয়েছে। ঠিক তেমনি Metal Tablet তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যক্তি বিশেষের জন্মকালীন গ্রহগুলির কিরকম strength আছে তা পৃথকভাবে নির্ণয় করা হয়। তারপর সেই ব্যক্তির কোন্ গ্রহের কতটুকু strength দরকার তা calculation করা হয়। এবার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন Metal গ্রহগুলির strength অনুসারে বিচার করে আনুপাতিক হারে (যেটা যতটুকু দরকার) সংমিশ্রণ করে Metal Tabletটি তৈরি করা হয়। আমি এমন বহু ব্যক্তিকে দেখেছি যারা প্রচুর মূল্যের বিভিন্ন ধরনের বেশ কয়েকটি stone ধারণ করেও যে উপকার পান নি, এই Metal Tablet ধারণ করে তাঁরাই দারুণ উপকৃত হয়েছেন। আবার যেই নির্দিষ্ট

অমৃতলাল। যিনি নিয়মিতভাবে ভারতবর্ষে বর্তমানে সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজী সাপ্তাহিক SUNDAY পত্রিকাতে ব্যক্তিজীবনের ভবিষ্যদ্বাণী করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একটা নির্দিষ্ট Guide-line দিয়ে চলেছেন - তারই সম্পর্কে এই বিশেষ প্রতিবেদন।

তাহলে যতটা ব্যথা অনুভব করবেন, শরীরের অন্যান্য স্থানে যদি ফোঁড়া হয় - তাহলে তারচেয়ে নিশ্চয়ই কম অস্বস্তি বোধ হবে না। আসল কথা, প্রতিটি সমস্যাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকট বলে মনে হয়। তবে বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা আমাদের দেশে একটা বিরাট এবং ব্যাপক সমস্যার রূপ নিতে চলেছে। এর ভয়াবহ ও করুণ পরিণতি আমরা রোজ বিভিন্ন পত্রিকা খুললেই দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন করলাম - এই বিবাহ-সমস্যাকে কেন আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন?

অমৃতলাল : কেন দেব না? বিবাহ জাতিকে সন্তান এনে দেয় এবং জাতির কলেবর বৃদ্ধি করে। এই সন্তান যদি সুসন্তান হয়, তাহলেই জাতি ও দেশ তার অভিপ্রেত প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। আজ থেকে একশ বছর আগে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাব এমন প্রচুর সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা জাতিকে এবং দেশকে একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে কিন্তু কোষ্ঠী (HOROSCOPE) বা যোটক বিচারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ছেলে এবং মেয়ের এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার কাছে আসেন?

অমৃতলাল : নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সকল স্তরের মানুষেরাই আসেন। কারণ এই সকল সমস্যা বর্তমানে সর্বস্তরের মধ্যেই ব্যাপক হারে সংক্রামিত হচ্ছে।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনার আবিষ্কৃত Metal Tablet কি এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম? Metal Tablet কীভাবে এই সমস্যাগুলির প্রতিকার করে?

অমৃতলাল : গবেষণার পর্যায়ে এ ধরনের case গুলিতে Metal Tablet প্রয়োগ করে প্রচুর সুফল আমি দেখেছি। কারণ একটি খাঁটি stone কেবলমাত্র একটি গ্রহকেই প্রতিকার করতে পারে। আর এই Metal Tabletটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে জাতকের নয়টি গ্রহকেই প্রয়োজন অনুসারে প্রতিকার করে। মানুষের জীবনে গ্রহ এবং জন্মকালীন ছকের বারটি রাশি বা ঘর পৃথকভাবে এক-একটি দিক নির্দেশ করে। এই বারটি ঘর এবং নয়টি গ্রহের অবস্থান ও strength-এর প্রকারভেদে ব্যক্তি বিশেষ এক-একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এবার সমস্যার আশু সমাধান দরকার, Metal Tabletটির ভেতর সেই নির্দিষ্ট Metal-এর পরিমাণ বিচার করে যদি বেশি দেওয়া হয়, তাহলে সেই নির্দিষ্ট সমস্যার আশু সমাধানও হয়। কাজেই এই Metal Tabletটির দ্বারা যে কোন সমস্যার প্রতিকার করা সম্ভব। এছাড়া খাঁটি stone-এর তুলনায় Metal Tabletটির মূল্য অনেক কম যা সাধারণের পক্ষে সহজ ক্রয়সাধ্য।

ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে বয়সে প্রবীণ না হয়েও অমৃতলাল বহু অসাধারণ সফল ভবিষ্যদ্বাণী ও পথনির্দেশ দিয়ে জ্যোতিষ জগতে যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ও করে চলেছেন, এছাড়া পাশাপাশিভাবে তাঁর আবিষ্কৃত Metal Tablet সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যাগুলি যেভাবে প্রতিকার করে চলেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অতুলনীয়। তিনি আরও বিভিন্ন বিষয়ে আমার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যতে তা লেখার ইচ্ছা রইল।

—শ্যামল ভট্টাচার্য

([illegible]k)

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা – ৬

স্বামী সুবোধানন্দের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী, অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের অন্যতম স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ), তথা সুবোধচন্দ্র ঘোষের উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ার বাড়িতে ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন হয়েছিল; তবে ঠাকুরের শ্রীচরণে সুবোধচন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণের পরে নয়, এমনকি সুবোধচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পরেও নয়, তারও অনেক পূর্বে, অর্থাৎ কামাপুকুরে ঠাকুর যখন প্রথম জীবনে বাস করতেন এবং ঠাকুরের নিজের বয়স ছিল ১৬/১৭ বছর তখন। ছাত্রাবস্থায় সুবোধচন্দ্র প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে যান, সেদিন তাঁব পবিচয় জানতে পেরে ঠাকুর নিজেই সুবোধচন্দ্রেব কাছে তাঁর বাড়িতে পূর্বে গমনাগমনের কথা জানিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে একটি প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "সেদিন ঠাকুর সুবোধকে বলিয়াছিলেন, 'যখন কামাপুকুরে ছিলুম, তোদের 'সিদ্ধেশ্ববী মন্দিরে, তোদের বাড়ীতে কতবার গেছি। তুই তখন জন্মাসনি।' [স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (২য় ভাগ)-স্বামী সুবোধানন্দ প্রসঙ্গ]।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম অবস্থায় কামাপুকুরে থাকাকালীন সেই অঞ্চলের পরিচিত কিছু বাড়িতে ঠাকুরের গমনাগমন করা স্বাভাবিক; কিন্তু কী উপলক্ষে সুবোধচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই সেই বাড়িতে তিনি যেতেন, তা এখন জানবার কোন উপায় নেই। তবে সুবোধচন্দ্র ছিলেন ঠনঠনিয়ায় 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবক শংকব ঘোষের অন্যতম প্রপৌত্র এবং ঠনঠনিয়ার ঐ মন্দিবে মাঝে মাঝেই ঠাকুর 'সিদ্ধেশ্বরী মাতাকে গান শোনাতে যেতেন; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ঐ মন্দিবের সুবাদেই সেবক-ভক্ত শংকর ঘোষের বাড়িতে তিনি যাতায়াত কবে থাকতে পারেন। অবশ্য দক্ষিণেশ্বরে চলে যাওয়ার পর ঠাকুর আর শংকর ঘোষ বা সুবোধচন্দ্রের বাড়িতে আসেননি। পববর্তীকালে সুবোধচন্দ্র ঠাকুরের কাছে দীক্ষালাভ করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুরেব দেহরক্ষার পর তিনি 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন এবং 'স্বামী সুবোধানন্দ' নামে অভিহিত হন; গুরুভ্রাতাদের কাছে তিনি ছিলেন 'খোকা মহারাজ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে স্বামী সুবোধানন্দের জন্মস্থানের পৈতৃক বাড়ি--'২৩নং শংকর ঘোষ লেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আদিতে ঐ বাড়ির নমবর ছিল '২৩'; কিন্তু পরবর্তীকালে কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক বাড়িগুলির নতুনভাবে সংখ্যা নিরূপণের সময়, ঐ বাড়ির বর্তমান পরিবর্তিত নমবর হয়েছে '৪১'; আর নতুন সংখ্যানুযায়ী ২৩ নং বাড়িটি এখন কলোয়ারদের ব্যবসাকেন্দ্র। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এই সঠিক তথ্য না জানার ফলে, প্রচলিত গ্রন্থগুলির বিবরণ অনুযায়ী অনেকেই বর্তমান ২৩নং শংকর ঘোষ লেনে স্বামী সুবোধানন্দের ভদ্রাসন দর্শন করতে গিয়ে নিরাশ হন। প্রকৃতপক্ষে, ঠনঠনিয়ার একটি বিরাট অংশ জুড়েই শ্রীশংকর ঘোষের কয়েকটি বাড়ি ছিল এবং তাঁর বংশধরগণ এখন নানা বাড়িতেই বাস কবছেন। শংকর ঘোষের অতি প্রাচীন বাড়িটি-২৩নং শংকর ঘোষ লেনের নতুন ঠিকানা : ৪১নং শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা--৯; বর্তমানে এই অঞ্চলে যে বিরাট বাড়িটি শংকব ঘোষের বাড়ি বলে আপাতত পরিচিত, সেই বাড়িরও পুরাতন নমবরের বদলে, বর্তমান নমবর-'১২/এ', এবং এই বাড়িতেও শংকর ঘোষের বংশধরগণ বাস করেন; এই বাড়ির চেহারাই প্রমাণ করে যে, এটি পরে নির্মিত। এছাড়া পার্শ্ববর্তী বেচু চ্যাটারজি স্ট্রিটেও শংকর ঘোষের আরেক বাড়িতে তাঁব বংশধরগণ বাস করেন। এঁরা সবাই পালা ক্রমে ঠনঠনিয়ার 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবার অধিকারী।

পথ নির্দেশ : উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলে বিধান সরণি থেকে পূর্বমুখে শংকর ঘোষ লেন। এই রাস্তায় ঢুকে সামান্য এগিয়ে গেলেই বামদিকে এই বাড়ি-৪১নং শংকর ঘোষ লেন, কলি--৯। এই বাড়ির প্রায় পাশেই, বামদিকে একই সারিতে বিদ্যাসাগর মশায়ের 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' এবং 'বিদ্যাসাগর কলেজ'। ৪১ নং বাড়িটি দোতলা এবং অতি প্রাচীন। বাড়ির প্রবেশপথের বাম দিকের রোয়াকে একটি ছোট দোকান- বাড়ির ভেতরে ছোট একটি উঠান–উঠানের সামনে স্থিত কিছু একতলা ঘর–একপাশে একটি ছাপাখানা। উঠানের বামদিকেই দোতলা বসতবাড়ি। এই বাড়িতেই স্বামী সুবোধানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে এখানে শংকর ঘোষের অন্যতম পৌত্র কৃষ্ণদাস ঘোষের বংশধরগণ বাস করেন। কৃষ্ণদাসেরই এক পুত্র স্বামী সুবোধানন্দ। অবশ্য বর্তমান বাসিন্দারা সঠিক অবগত নন–এই বাড়ির কোন ঘরে স্বামী সুবোধানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বা ঠাকুর কোথায় এসে বসতেন। □

স্বামী সুবোধানন্দের বাড়ি / আলোকচিত্র :

ঈদ-উদ-জোহা – ত্যাগের উৎসব

মহম্মদ ইয়াসিন আখতার

ঈদের খুশির আমেজ যেতে না যেতেই এগিয়ে আসে আর এক ঈদ। অবশ্য এই ঈদ ঠিক খুশির বা আনন্দের উৎসব নয় বরং বলা যেতে পারে ত্যাগের (Sacrifice) উৎসব।

আরবি জিউলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব।

এই উৎসবকে কুরবানীও (কোরবানী) বলা হয়। উৎসবটাকে বা কার্যটাকে কোরবানী বলা হয় আর যে পশুটিকে জবাই করা হল বা যে পশুটিকে কোরবানী দেওয়া হল তাকে বলা হয় কুরবান। কুরবান কথার অর্থ আত্মত্যাগ।

এবার আমরা ঈদ উল জোহা বা বকরঈদ বা কোরবানীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা কী সে সম্বন্ধে একটু জেনে নিই।

মহান করুণাময় আল্লাহ হজরত ইবরাহীমকে (আঃ) শুধু একবারই পরীক্ষা করেননি, বেশ কয়েকবারই অগ্নিপরীক্ষা করেছিলেন। আর প্রত্যেকবারই পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। বারই ইবরাহীম (আঃ) কৃতকার্য হয়ে নিজের যোগ্যতা এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আল্লাহ হজরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কোরবানী দেওয়ার জন্য স্বপ্নাদেশ দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ইবরাহীম (আঃ) একশো উট কোরবানী দিলেন। সেই সময় কোরবানী কবুল হওয়ার একটি বিশেষ নিদর্শন ছিল। কোরবানী দাতা জবাই করা পশুটি একটি খোলা মাঠে বা কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিত। কিছুক্ষণ পর আসমান (আকাশ) থেকে একটি আগুনের হলকা এসে ঐ জবাই করা পশুকে ভস্মীভূত করে দিত। আর যে সকল কোরবানী কবুল (গ্রহণ) হত না, সেই সব জবাই করা পশু পড়ে থাকত, আগুন স্পর্শ করত না। হজরত ইবরাহীমের (আঃ) জবাই করা উটগুলি পড়ে রইল। আল্লাহ পাক তাঁর কোরবানী কবুল করলেন না। পরের রাত্রে হজরত ইবরাহীম (আঃ) আবার স্বপ্ন দেখলেন। আবার একশো উট কোরবানী দিলেন, কবুল হল না। এভাবে তিনদিন তিনশো উট কোরবানী দিয়েও কবুল হল না। হজরত ইবরাহীম (আঃ) ভাবলেন হয়ত কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু ত্রুটিটা কি তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

চতুর্থ রাত্রে আল্লাহ স্বপ্নে তাঁকে আবার আদেশ দিলেন 'ইবরাহীম পৃথিবীতে তুমি সব থেকে বেশি যাকে ভালবাস, তাকেই আমার নামে কোরবানী দাও।' এবার হজরত ইবরাহীম (আঃ) ঐ আদেশের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন। প্রাণাধিক পুত্র ইসমাইলকেই তিনি কোরবানী দিতে বলছেন।

হজরত ইবরাহীম (আঃ) মনে মনে ঠিক করলেন তাই হবে। আমি ইসমাইলকে কোরবানী দেব। কিন্তু তার আগে ছেলের মতামত তো জানা দরকার। কারণ ইসমাইল ছোট ছেলে। ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে না পেরে যদি সে ভয় পায় এবং যদি রাজি না হয় তাহলে তিনি আল্লাহর দরবারে অবাধ্য বলে পরিগণিত হবেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবেন।

তাই তিনি ইসমাইলকে ডেকে বললেন ইসমাইল আজ রাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি দেখলাম আমি যেন তোমাকে আল্লাহর নামে কোরবানী করছি। বালক ইসমাইল বললেন আব্বা, এ স্বপ্নের কারণ কী উত্তরে হজরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন আল্লাহ পাক তোমাকে একান্ত আপন করে নিতে চান।

শুনে বালক ইসমাইল বললেন আব্বা দেশের বুকে এত বালক থাকতে আল্লাহ পাক যখন আমাকে পছন্দ করেছেন তখন আমার কাছে এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কী হতে পারে। ইসমাইল রাজি হয়ে গেলেন। উপযুক্ত সময়ে হজরত ইবরাহীম (আঃ) এসব কথা নিজের স্ত্রী বিবি হাজেরাকে বললেন। পুত্রপ্রাণা হাজেরার মাতৃহৃদয় ঐ সময় কেঁদে উঠেছিল কিনা জানি না, তবে আল্লাহর আদেশের সামনে তিনি মাথা নিচু করে সব মেনে নিলেন। ছেলে ইসমাইলকে মন ভরে শেষবারের মত আদর করে গোসল করিয়ে খাইয়ে পিতার সংগে বিদায় দিলেন।

হজরত ইসমাইল পরম করুণাময়ের কাছে মোনাজাত করলেন "আল্লাহ, আমি একটি বালক মাত্র। আমার জীবন তোমার জন্য দিতে দিতে। তুমি আমাকে কবুল কর। তোমার সান্নিধ্য আমাকে দান কর।" দোয়া করে ইসমাইল মাটির উপর শুয়ে পড়লেন। হজরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার হাত পা শক্ত করে বেঁধে দিলেন যেন তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। পিতা হজরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের চোখ বেঁধে নিলেন।

পর মুহূর্তে হজরত ইবরাহীম (আঃ) চোখ বাঁধা অবস্থায় শাণিত ধারাল তরবারী নিয়ে পুত্রের পাশে গিয়ে বসলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে ধারাল তরবারী গলাতে চালাতে শুরু করলেন। কিন্তু এ কী হায়, আল্লাহ, ইসমাইলের গলা কাটে না কেন। কচি বালক গলা না কাটার তো কোন কথা নয়, তিনি আরেকবার তরবারীর ধার পরীক্ষা করে দেখলেন। না, তরবারীর ধার তো ঠিকই আছে। যে কোন শক্ত কাঠ এর দ্বারা কাটা সম্ভব। কিন্তু ইসমাইলের গলা কাটছে না কেন। তবে তবে কি এবারও আল্লাহ পাক আমার কোরবানী কবুল করবেন না। ইবরাহীম বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ঠিক এই সময় আল্লাহর নির্দেশ জারি হল,

ইবরাহীম বিচলিত হইও না, তোমার কোরবানী আমি কবুল করছি। নির্দেশ পেয়ে হজরত ইবরাহীম (আঃ) খোদার শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করলেন। বালক ইসমাইলের হাত পা এর বাঁধন খুলে দিলেন। পরে খোদা-প্রেরিত দুম্বাকে কোরবানী দিলেন।

সেই থেকে কোরবানী শুরু।

কিন্তু আজ আমাদের কোরবানী কী সত্যিই কবুল হচ্ছে। কোরবানীর শিক্ষা কী। কোরবানীর মাধ্যমে নিজ অন্তরের পশুত্বকে জবাই করাই এর শিক্ষা। ক্রোধ কাম মোহ লোভ, হিংসা ঈর্ষা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি পশুগুলি, যা আমাদের মনের মধ্যে সব সময় ঢুকে আছে এগুলিকে কোরবানী দিয়ে মনকে কলুষমুক্ত করে শুদ্ধ করাই কোরবানীর মূল কথা।

কোরবানী দেওয়া পশুর সমগ্র গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ সম্পূর্ণ গরিব মিসকিনদের প্রাপ্য, এক ভাগ আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের প্রাপ্য, আর এক ভাগ নিজের বাড়ির জন্য। কিন্তু আজ আমরা কজন এ রকম তিন ভাগ করে বিলি করি। সম্পূর্ণ অংশটাই নিজের বলে ভাবি। ভুলে যাই গরিব মিসকিনদের কথা বা পাড়া প্রতিবেশীদের কথা। কোরবানী কবুল না হওয়ার পথে এটা একটা বিরাট বাধা। এজন্য এদিকে আমাদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত। যেন তাদের প্রাপ্য অংশ আমরা ভোগ না করি।

একটি গরু বা মোষ সাত ভাগ হতে পারে, সাত জনের নামে। অর্থাৎ সাত জন মিলে একটি গরু কোরবানী দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক উপার্জনক্ষম সচ্ছল ব্যক্তির কোরবানী দেওয়া ফরজ (অবশ্যই)। উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের একদম নিজস্ব আয় থেকে তাদের কোরবানীর টাকা দিতে হবে এবং তা কোরবানী হওয়ার আগেই পরিশোধ করে দেওয়া প্রয়োজন। আর নাবালক ছেলে বা মেয়েদের (যাদের ব্যক্তিগত কোন আয় নেই) নামে কোরবানী হলে, তার টাকা পিতা বা অভিভাবক দেবেন।

প্রথম কোরবানী শুরু হয়েছিল দুম্বা দিয়ে। তাই দুম্বা বা উট কোরবানী দেওয়া উৎকৃষ্ট। কিন্তু আজ আমরা এ দেশে উট বা দুম্বা কোথায় পাব আমাদের দেশে গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া কোরবানী দেওয়া বৈধ। হাদীস বলছে – বর্তমানের সংগে সব সময় নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। কোরবানী দেওয়া পশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিখুঁত হতে হবে। গরুর শিং এক মুঠি ধরার মত হওয়া প্রয়োজন। কোরবানী দেওয়ার আগে পশুটিকে ভালভাবে গোসল করিয়ে তবেই তাকে কোরবানী দেওয়া যাবে। আর কোরবানী দেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পশুটিকে যে কোন মিষ্টান্ন দ্রব্য দিয়ে মুখ মিষ্টি করা প্রয়োজন।

কোরবানী দেওয়া পশুর বিক্রি করা চামড়ার পয়সা কেবলমাত্র গরিব মিসকিনদের প্রাপ্য। এতে কারও অধিকার থাকে না।

এইসব বিষয় যথাযথভাবে পালন করলে তবেই আমরা কোরবানী কবুল হওয়ার দাবি করতে পারি। আর তা না হলে সবই বৃথা। ঐ কোরবানীই দেওয়া হবে, কোরবানী কবুল হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

আজ আমরা কোরবানীর মূল শিক্ষা ত্যাগ থেকে দূরে সরে গিয়ে পশু কোরবানী দিচ্ছি। এখনও আমাদের মধ্যে ক্রোধ, লোভ, হিংসা রয়ে গেছে। আজও আমরা মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করছি। কিন্তু আর আমরা মানুষরূপী পশু হতে দেবত্বে পরিণতি সম্ভব হয় কেবল স্বার্থত্যাগ দ্বারা। ☐

রেড ইনডিয়ানরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াই-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে

আমেরিকা সফররত সুদীপ মজুমদার

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। সারাদিন গাড়িতে সাউথ ডাকোটার জনমানবহীন ব্ল্যাক হিলস অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি। আশা আমেরিকার রেড ইনডিয়ান আন্দোলনের প্রথম সারির ক্যারিসম্যাটিক নেতা রাসেল মিনস-এর সংগে যদি একবার দেখা হয়। সাদা চামড়ার পশ্চিমী দেশের মানুষেরা আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে আমেরিকার নানান অজানা, দুর্গম অঞ্চলকে উপনিবেশে পরিণত করার অভিযান শুরু করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ী, জলদস্যু, কৃষক ও চারচ দ্বারা নিপীড়িত মানুষের দল আমেরিকা জয় করতে শুরু করে প্রায় চারশ বছর আগে। প্রথমে তারা ডেরা বাঁধে ইসট কোসট আর ওয়েসট কোসট এর শহরগুলোতে। তারপর যতই সাদা মানুষের প্রলোভন বাড়ে ততই বেশি অভিযান শুরু হয় এই বিশাল দেশের অভ্যন্তরে।

একদিকে নিউ ইয়র্ক অন্যদিকে লস এনজেলেস। এদের দূরত্ব প্রায় কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্বের তিনগুণ। মাঝখানে অনেকগুলো রাজ্য। যেমন মিনিসোটা, সাউথ ডাকোটা, ওয়াইওমিং, মনটানা, আইডাহো, উটা ও ক্যালিফোরনিয়া। রেড ইনডিয়ানদের বাস ছিল এই রাজ্যগুলোতে। বহু বছর ধরে এক উন্নত সভ্যতার গোড়াপত্তন করে আমেরিকার এই আদিবাসীরা বাস করছিল এই রাজ্যগুলোতে। এদের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোনও কিছু ছিল না। মেয়েদের সমান অধিকার। তাছাড়া এক অভিনব গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা এরা নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত।

এদের অর্থনীতি ছিল শিকার আর ফল-পাকুড় সংগ্রহের ওপর নির্ভর। বাইসন, ঘাড়ে লোমওয়ালা মোষ, আর হরিণ শিকার ছিল এদের মুখ্য পেশা। ধরিত্রী এদের আরাধ্য দেবতা। রেড ইনডিয়ানরা বিশ্বাস করে পৃথিবী, জল, আকাশ আর বায়ু ভগবানের দান। তাই এদের নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়। সরল জীবন যাপন করে এরা তৃপ্ত। শীতকালে দারুণ ঠান্ডা। আবার গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম। কোনওরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই রেড ইনডিয়ানরা সারা বছর কাটাত। নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করত বিনিময়ের মাধ্যমে। টাকা পয়সার চল ছিল না।

কিন্তু এই সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রা হঠাৎ ধাক্কা খেল কাউ বয় আর ধাতুর খোঁজে বেরিয়ে পড়া সাদা চামড়ার মানুষের দলের কাছ থেকে। সাদা মানুষেরা তাদের সংগে নিয়ে চলে প্রলোভন, হিংসা, লুটপাট আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্যানধারণা। তখন ক্যালিফোরনিয়া অঞ্চলে গোলড রাশ শুরু হয়েছে। দলে দলে মানুষ চলছে কোদাল, ঝুড়ি নিয়ে ক্যালিফোরনিয়া অঞ্চলে সোনার খোঁজে। পথে রেড ইনডিয়ানদের বসতি। সেখানে সরল মানুষগুলোকে লুট করতে এদের দ্বিধা হয়নি। তাছাড়া বড় বড় র‍্যানচ অর্থাৎ ঘোড়া ব্যবসা করার বিশাল খামার গড়ে উঠতে লাগল। পশুর চরে বেড়াবার জন্য চারণভূমি দরকার। ক্রমেই রেড ইনডিয়ানদের জমির ওপর নজর পড়তে লাগল সাদা উপনিবেশকারীদের। ছলে-বলে, কৌশলে রেড ইনডিয়ানদের কাছ থেকে সাদা মানুষেরা ছিনিয়ে নিতে লাগল জায়গা জমি। পিছু হটতে হটতে রেড ইনডিয়ানরা পাহাড়, জংগলে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই রকমই এক আদিবাসী দল, যাদের সু ইনডিয়ান বলা হয়, এসে আশ্রয় নেয় সাউথ ডাকোটার ব্ল্যাক হিলস-এ। এককালে পুরো রাজ্যটাই ছিল ইনডিয়ানদের। কিন্তু সাদা মানুষের ছলনায় পড়ে এরা হেরে যায়। কোন কোন ইনডিয়ান নেতা অবশ্য রুখে দাঁড়ায় এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। তখন আমেরিকান তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত সাদা মানুষের গণতন্ত্র অবশ্য। কালো মানুষেরা দাস আর রেড ইনডিয়ানরা 'বর্বর' বলে মারমুখী নীতির শিকার। ইনডিয়ান যোদ্ধারা সাহসের সংগে আমেরিকান সরকারের অত্যাচারী সৈন্যদলের মোকাবিলা করতে করতে হেরে যায়। আমেরিকান সরকার অবশ্য কখনও কখনও তথাকথিত 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করে ইনডিয়ানদের সংগে। কয়েক বছরের মধ্যেই সেই সব চুক্তি নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার ভংগ করে।

ইনডিয়ানদের নেতা বিগ ফুট ঠিক করলেন অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার আমাদের জমি কেড়ে নিতে এলে প্রাণ দিয়ে আমরা নিজস্ব অধিকার রক্ষা করব। তখন কালো পাহাড় শান্ত, পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা পর্বতমালায় সু ইনডিয়ানদের বাস। আমেরিকান সরকারের নজর তখন এই পর্বতমালার ওপর। কেননা ওখানে সোনা ও আরও দামী খনিজ পদার্থের সঞ্চয় আছে।

১৮৯০ সাল। আমেরিকার সেভেনথ ক্যাভালরির বাছাবাছা সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে উনডেড নি (Wounded knee) গ্রাম। এখানেই চিফ বিগফুটএর সংগে যুদ্ধ হল আমেরিকার সৈন্যদের। নৃশংস আমেরিকান সৈন্যরা বিগফুট সহ প্রায় ৩৫০ জন নারী, শিশু ও পুরুষকে হত্যা করল। এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পতাকা ওড়াল কালো পাহাড়ে। রেড ইনডিয়ানদের কাছে উনডেড নি এর স্মৃতি এক অতীব করুণ কাহিনী। সেদিন থেকে রেড ইনডিয়ানদের পুরোপুরি ধ্বংস করার পরিকল্পনা রূপায়িত করে যাচ্ছে আমেরিকান সরকার। লোক দেখানর জন্য অবশ্য সরকার কতকগুলো অঞ্চলকে Reservation বলে ঘোষণা করেছে, সেখানে শুধু রেড ইনডিয়ানরাই থাকতে পারে আইনত।

এমনই একটি Reservation হল Pine Ridge – সারাদিন পাইনরিজে ঘুরে বেড়ালাম। রেড ইনডিয়ান যুবক, নেতা ও অন্যান্যদের সংগে কথা হল। Reservation এর জীবন কষ্টকর। কাজ নেই, জমি নেই। চাষবাস নেই। এক কথায় হতাশার জীবন। এখানেই কথা হচ্ছিল টম কুকের সংগে। রেড ইনডিয়ানদের মুখপত্র হিসাবে যে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয় টম তার সংগে যুক্ত। টমের কাছ থেকেই জানলাম যে রাসেল মিনস আজকাল কালো পাহাড় অঞ্চলে রয়েছেন। রেড ইনডিয়ানদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার চেষ্টায় রত। কালো পাহাড়ের একটা অঞ্চলে আজ থেকে দুবছর আগে Yellow thunder (হলুদ বাজ) নামে এক পাইন ঘেরা পাহাড় চূড়োয় রাসেল একটি ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য কালো পাহাড়কে আমেরিকান সরকার আর বড় বড় করপোরেশনের আগ্রাসী নীতি থেকে বাঁচান। তাছাড়া তরুণ তরুণীদের মধ্যে রেড ইনডিয়ান সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মানকে জনপ্রিয় করাও এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য। রাসেলের খোঁজে এসে পড়েছি ক্যাম্পের গেটে। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। পাহাড়ের জংগলে ঝিঁঝির ডাক। এক বিশাল রেড ইনডিয়ান বেরিয়ে এল একটা কামরা থেকে, পরিচয় জানার জন্য। কিছুক্ষণ কথা বলার পর ভেতরে যাবার অনুমতি পাওয়া গেল। মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষেধ। তখনও জানি না ক্যাম্পে রাসেলের দেখা পাব কিনা. গেরিলা যোদ্ধার মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান রাসেল। কেননা প্রায় ছ সাতবার আততায়ীর হাত থেকে বেঁচেছেন তিনি। তাছাড়া কী করে ওঁকে একটা মামলায় জড়িয়ে জেলে পোরা যায় সে ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের তৎপরতার শেষ নেই। এখনও গোটা কুড়ি মামলা চলছে ওঁর বিরুদ্ধে। কয়েক বছর জেলও খেটেছেন। কেননা রাসেল বিপ্লবী। তিনি চান তাঁর জাতির মানুষেরা আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচুক। নিজেদেরই জমিতে দাস হয়ে থাকতে তিনি নারাজ। কণ্ঠে তাঁর বিপ্লবের আহ্বান। ইনডিয়ান পূর্বপুরুষের শপথ নিয়ে রাসেল প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ইনডিয়ান মুভমেন্ট [American Indian Movement (AIM)] ঘোষণা করেছেন 'ইনডিয়ানদের স্বাধীন দেশ চাই।' 'আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী সাদা মানুষের সরকার দূর হটো।'

রাসেল এর জন্ম রিজারভেশনের মাঝে ১৯৩৯ সালে। দারুণ দারিদ্র্যে মা বাবা কাজের খোঁজে চলে যান সুদূর ক্যালিফোরনিয়ায়। সেখানে বসতিতে কাটে ওঁর ছেলেবেলা। অবাক হয়ে যেত হলিউডের কাউ বয় মারকা ছবি দেখে। জনওয়েন যখন একের পর এক রেড ইনডিয়ানকে বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেয়, রাসেল অবাক হয়ে যান সাদা মানুষের কদর্য আচরণ দেখে। ইতিহাসে রেড ইনডিয়ানদের বর্বর আর অসভ্য বলেই দেখান হয়। রাসেল এতে ক্ষুব্ধ হন। ধীরে ধীরে উনি বড় হন, আরও ভাল করে বুঝতে পারেন, রেড ইনডিয়ানদের মারকিন সরকার একেবারে উৎখাত করতে তৎপর। ক্যালিফোরনিয়ায় থাকাকালীনই ডেনিস ব্যাঙ্কস এর

নামকরা ইনডিয়ান নেতার সংগে যুক্ত হয়ে রাসেল মিনস AIM-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ঘোষণা করলেন ইনডিয়ানরা নিজস্ব স্বাধীন দেশকে ফিরে পাবার জন্য মরণপণ লড়াই করে যাবে।

মারকিন সরকার শুধু বন্দুক আর কামান দিয়েই ইনডিয়ানদের ধ্বংস করতে চায় না। কিছু কিছু নেতাকে পয়সা, প্রলোভন ও ক্ষমতা দিয়ে কিনেও নিয়েছে সরকার। কিছু সরকারি পদ দিয়ে এইসব ইনডিয়ান নেতাদের, রাসেলের মত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। ফলে আমেরিকান ইনডিয়ান আন্দোলনের মধ্যেও চিড় ধরানর চেষ্টা করেছে সরকার। বিক্রীত নেতারা ক্রমে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ক্ষমতা বাড়ানতেই ব্যস্ত থাকার দরুন ইনডিয়ানদের মধ্যে আবার ক্ষোভ বাড়তে থাকে। AIM প্রতিষ্ঠা করার পর রাসেল ইনডিয়ানদের প্রতি দমন পীড়নের ঘটনার দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে থাকেন।

উনডেড নি। এর চাইতে আর কোন ভাল জায়গা হতে পারে ইনডিয়ান আন্দোলনকে আবার নতুন করে শুরু করার? তাই রাসেল সহ প্রায় কয়েক সহস্র অস্ত্রসজ্জিত ইনডিয়ান বিপ্লবী ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি উনডেড নি গ্রাম দখল করে নেন। ৭১ দিন ধরে চলে অবরোধ। শেষে এফ বি আই ও মিলিটারি আসে ট্যাংক আর বন্দুক নিয়ে আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে। চলে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি। কয়েকজন ইনডিয়ান ও সাদা মানুষ মারা যায়। শেষ পর্যন্ত রাসেল সহ অনেক ইনডিয়ান নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। বেশ কয়েকটা মামলা ঠুকে দেওয়া হয় ওদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওই অভ্যুত্থানের খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ইনডিয়ানদের করুণ কাহিনী অন্তত একবার বিশ্বের সামনে এসে পড়ে। কয়েক বছর পরে আবার শুরু হয় মারকিন সরকারের অত্যাচার। এবার করপোরেশন আর সরকার কালো পাহাড় কিনে নিতে চান। কেননা ওখানে ইউরেনিয়াম আছে। আর যুদ্ধ ও ধ্বংসের রাজনীতিতে ইউরেনিয়াম-এর কদর খুব। পারমাণবিক বোমা বানাতে এই ধাতু লাগে। তাছাড়া সোনা তো আছেই।

ঠিক এই কারণেই রাসেল 'হলুদ বাজ' ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠিক কালো পাহাড়ের মাঝে। চুক্তি অনুযায়ী কালো পাহাড় ইনডিয়ানদের। কিন্তু এখন চুক্তি ভাঙতে সরকারের সময় লাগে না। তাই সমর্থকদের নিয়ে রাসেল 'হলুদ বাজ' ক্যাম্প পেতেছেন।

একজন তরুণ ইনডিয়ান পথ দেখিয়ে জংগলের মধ্যে নিয়ে এগিয়ে চললেন। একটা ফাঁকা জায়গায় আসতে, দেখতে পেলাম মাঝখানে আগুন জ্বলছে। চারপাশে মানুষের ছায়া। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম রাতের খাবার বানাতে ব্যস্ত ক্যাম্পবাসীরা। এদের মধ্যে ইনডিয়ান নন এমন কিছু সাদা চামড়ার মানুষও আছেন। এরা AIM এর মতবাদে ও রাজনীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। ইনডিয়ানদের সংগে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।

রাসেলের ছবি দেখেছি আগে। আধো অন্ধকারে ওকে খুঁজতে লাগলাম। ক্যাম্পের অন্যান্য ভলান-টিয়াররা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। হাত মেলালাম। দেখি একটু দূরে একটা কাঠের বেনচের ওপর বসে আছে রাসেল। কোমর পর্যন্ত চুল। মাথার পেছনে একটা রাবার ব্যানড দিয়ে গোছা করা। মাথায় AIM-এর টুপি। কাঠের আগুনের ঝলক এসে পড়েছে মুখে। সুন্দর মুখ। প্রশস্ত কাঁধ। দাঁড়ালে প্রায় ছ'ফিট। পরিচয় দিতেই উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণতার সংগে হাত মেলালেন। আমার মনে তখন হাজার প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা, দারুণ উত্তেজনা। এ যেন ফিদেল কাস্ত্রো অথবা চে গুয়েভারার সংগে গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন কিউবার আখের ক্ষেতে সাক্ষাৎকার। হাতে সময় কম। কথা শুরু হল।

রাসেল খুব ভাল ইংরেজি বলেন। ভারী গলা। কথায় রূপকের ব্যবহার আওয়াজে দৃঢ়তা। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, 'না, আর মাথা পেতে অত্যাচার সহ্য করতে আমরা রাজি নই। এমনিতেই আমরা ধ্বংসের মুখে। তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে শেষবারের মত একবার লড়াই করে আমাদের দাবি পূরণ করতে চাই। তৃতীয় দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের সাহায্য আমাদের পাথেয়। মারকিন সাম্রাজ্যবাদের মুখোসটা একবার টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাই। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর উচিত আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানান। এ ব্যাপারে আপনারা তো আওয়াজ তুলতে পারেন।'

টেপ রেকরডার-এর ৬০ মিনিটের টেপ কখন শেষ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, খেয়াল নেই। রাসেল বলে চললেন ইনডিয়ানদের ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা তাদের সত্যকারের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা। মাঝখানে একবার এক ভলানটিয়ার জানান দিয়ে গেলেন যে রাতের খাবার তৈরি। হরিণের মাংস আর রুটি। জংগলে এই খেয়েই থাকেন রাসেল আর তাব সহকর্মীরা। কখনও মাংসও জোটে না। থাকেন রেড ইনডিয়ানদের প্রথামত টিপিতে। টিপি এক ধরনের কাপড়ের টেনটের মত। কতকটা ঝাঁটা উল্টো করে রাখার মত আকার। প্রখর শীত হোক অথবা গ্রীষ্ম। এই অবস্থাতেই থাকেন 'হলুদ বাজ' ক্যাম্পের মানুষেরা। রাসেল মনে করেন বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম পরবর্তী পরিকল্পনা কী? কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাসেল আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন 'আগামী ১ অকটোবর ১৯৮৪, রেড ইনডিয়ানদের সু জাতি পাইন রিজ রিজারভেশনকে স্বাধীন দেশ হিসাবে ঘোষণা করবে। তখন আমরা সারা কালো পাহাড়-এর এলাকাকে আমেরিকা থেকে আলাদা করে একটা স্বাধীন ইনডিয়ান দেশ প্রতিষ্ঠা করব সেখানে সাদা মানুষের অত্যাচার থাকবে না।'

আমাকে চুপ থাকতে দেখে রাসেল বললেন, 'জানি, আপনি ভাবছেন কী অসম্ভব পরিকল্পনা। তাই না? আসলে আমাদের অন্য কোন পথ নেই। হয় মারকিন সাম্রাজ্যবাদের মারাত্মক নীতির শিকার হয়ে আর কয়েক বছরের মধ্যে আমরা শেষ হয়ে যাই অথবা একবার মরণপণ লড়াই করে শেষ হয়ে যাই। ইনডিয়ানরা কাপুরুষের মত মরতে রাজি নয়। জানি বাধা অনেক। আর আমাদের শক্তি সীমিত। কিন্তু একবার আবার আমরা লড়তে চাই। কেননা কালো পাহাড় চলে গেলে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পারমাণবিক যুদ্ধের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আমাদের কালো পাহাড় বাঁচানর যুদ্ধ সারা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনেরই এক অংগ। পাশ্চাত্যের 'শিল্প সভ্যতা' মানুষকে পশু করে ফেলেছে, যুদ্ধবাজ করেছে। এই তথাকথিত সভ্যতা আমাদের দাস করে ফেলেছে। আমাদের সংগ্রাম এই শিল্প সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার স্বাধীন মুক্ত মানুষের পক্ষে। লড়াই ছাড়া মারকিন সাম্রাজ্যবাদরূপী দৈত্যকে কোন মতে রোখা যাবে না। আমাদের সংগ্রামে তাই বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের অবদান অনেক।'

রাত অনেক হয়ে গেছে তখন। আমাকে অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করে হোটেলে ফিরতে হবে। কিন্তু তখনও কত কথা বাকি। রাসেল তার পুরো জীবনের কথা বলছিলেন। কী করে তিনি শত্রুকে চিনলেন আর কী করে নানান বিপদ থাকা সত্ত্বেও এই পথ বেছে নিয়েছেন। রাসেল মিনস লাকোটা জাতির মানুষ। এবং নিজেকে তিনি লাকোটা ইনডিয়ান দেশপ্রেমিক বলে অভিহিত করেন। মাটির সংগে তাঁর নাড়ির টান। প্রকৃতির মধ্যে ইনডিয়ানদের নিয়ে তিনি এক নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে না বরং প্রকৃতির আশ্রয়ে সরল ও হাসিখুশী জীবন যাপন করবে।

বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আবার উষ্ণতার সংগে করমর্দন করলেন রাসেল। 'সাবধানে যাবেন, পাহাড়ী রাস্তা। তার ওপর আবার বৃষ্টি পড়ছে। আর আপনাকে স্বাধীন ইনডিয়ান দেশে আবার আসার জন্য এখন থেকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। বিদায় বন্ধু।' □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

প্রতিবেশী রাজ্য

আসামে জনমানসে আসুর প্রভাব কি কমতির দিকে ?

গৌহাটি থেকে নিরূপমা বরগোহাঞি

আসামের বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের পিছনে যদি কোন স্বার্থবাদী মহলের বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে থাকে সে স্বার্থ প্রায় সফল হয়েছে বলতে হবে। অন্তত এটা খুব স্পষ্টভাবেই দেখা গেল যে কোন বিদেশি শক্তি আসামের সংহতি নষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ আন্দোলনে উস্কানি দিয়ে থাকে তবে সত্যি সে সংহতি এখন নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিরস্থায়ী অশান্তি জিইয়ে রাখা অন্তত কোন একটি বৃহৎশক্তির স্বার্থের জন্য খুবই প্রয়োজন। এক দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যদিকে চীন। দুই সীমান্তের এ দুটি বৃহৎ কমিউনিসট দেশের অবস্থিতি মারকিন সরকারকে মানসিক শান্তিতে থাকতে দেবে না, তাই ভারতবর্ষের এ দুই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনগণ যেন কখনও কমিউনিসট প্রভাবাধীন হতে না পারে তাই এদের জাত্যাভিমানের কড়া আফিং খাইয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ল যখন আসামের গতবারের নির্বাচনে এগার জন সি পি আই (এম) জিতে গেলেন।

আসামের জাতীয়তাবাদী দল গড়ার পিছনে ইন্দিরা গান্ধীরই হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। যদি হয়ও, ইন্দিরার সে চাল তাকে বিজয়ের তিলক পরাল—এবারের নির্বাচনে বামপন্থীরা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল। মাঝখানের প্রায় চার বৎসরব্যাপী আসামের রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করা ইন্দিরার প্রয়োজন ছিল বৈকি। আসু জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক ইন্দিরার বিজয় নিশান ওড়ানর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করল।

গত চার বৎসরে আসামে সংখ্যালঘুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু অবাক কাণ্ড যে এখনও ইন্দিরাকেই ওরা একমাত্র ত্রাণকর্ত্রী বলে ভেবে আছেন। ইন্দিরাও কিন্তু এক বিষয়ে বজ্র আঁটুনি গেড়ে রাখছেন আর তাতে সংখ্যালঘুরা স্বাভাবিক ভাবেই স্বস্তিতে আছেন। বিষয়টা হল এই যে, বিদেশি সনাক্তকরণের বর্ষসীমা ১৯৭১-ই ধরে রাখল ভারতের সরকার। আসামের আন্দোলন চললও এই বর্ষসীমা নিয়েই — আন্দোলনকারীরা প্রথমেই যদি এ সীমারেখাতে রাজি থাকতেন তাহলে গত চার বৎসরের এ রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী আন্দোলনের কোন প্রয়োজন থাকত না। মজার কথা যে এ ব্যাপার নিয়ে কাউকে বর্তমানে খুব একটা উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। যে খবরের কাগজগুলোর উস্কানিতে আসামের জনগণ আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন সে কাগজগুলোও এ বিষয়ে প্রায় নীরব। আসুও কোন গরম বিবৃতি দিচ্ছে না, আঞ্চলিক দলগুলো এখন মৃতপ্রায়, সর্বভারতীয় দলগুলোকে আসাম থেকে পায় বহিষ্কারই করা হয়েছিল, কিন্তু এখন তারা আবার আসামে সভা-সমিতি করতে শুরু করেছে। জনগণকে এসব সভাসমিতি বর্জন করার আহ্বান দিয়েও কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হল নতুন জেলা শিবসাগরের উদ্বোধন করতে মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়া যখন গেলেন তখন আসু আর গণসংগ্রাম পরিষদ শিবসাগর বন্ধের ডাক দিয়েও ব্যর্থ হল। মুখ্যমন্ত্রীর সে সভাতে দেখা গেল অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। যদিও তার এক বৃহৎ অংশকে সরকার ভাড়া করা বাসে চারদিকের গ্রাম আর চা-বাগান থেকে এনেছিলেন।

যাই হোক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সরকার তথা হিতেশ্বর শইকীয়ার বার বার ঘোষণা সত্ত্বেও কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকেও সহজে বিদেশি সনাক্তকরণ হবে না, বহিষ্করণ তো দূর অস্ত। আগে কথা ছিল ১২৮টি সমষ্টিতেই ট্রাইবুনাল গঠন করে এ কাজ শুরু করা হবে। এখন অবস্থা সাপেক্ষে শুধু কুড়িটি ট্রাইবুনালই বসবে আর প্রত্যেকটিতে ৩ জন করে বিচারপতি থাকবেন যার মধ্যে দুজন হবেন বহিঃরাজ্যের। সমস্যা হল রাজ্যের বাইরের এত বিচারপতি সহজে কী করে পাওয়া যাবে? তাই সনাক্তকরণের কাজ এখন জুলাই-র পরিবর্তে অকটোবর হতে যাচ্ছে। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে বিদেশি বাছাই-এর কাজ এত সোজা নয়। তাই আসাম আন্দোলন সম্পর্কে বলা যায় যে শেষ পর্যন্ত এটি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়াই হল।

আন্দোলনের পরোক্ষ ফল কিন্তু গুরুতর। তিন বৎসরের রক্তারক্তি ছাড়াও বর্তমানে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে শিক্ষার কথা। প্রথমে আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত অন্তত দশ বৎসর অবধি পড়াশুনা করবে না বলে আসামের ছাত্রছাত্রীরা শপথ নিল, তারপর এক বৎসরের ক্ষতিতেই ওরা সচকিত হয়ে স্কুল কলেজে যেতে শুরু করল। কিন্তু আন্দোলন অর্থাৎ 'দেশপ্রেম' করে ওরা পাঠ্যবইয়ে মনঃসংযোগ করার সময় পেল না, এ অছিলায় আসামে অভূতপূর্ব গণ টোকাটুকির প্রচলন করল, যাতে মদত দিলেন অনেক সংগ্রামী অধ্যাপক আর শিক্ষক। গত বৎসরের নকলবাজীর ঐতিহ্য এবারও ব্যাপক হারে বহন করল ছাত্রছাত্রীরা। আর যে সাহসী আর সাধু পরীক্ষক ও শিক্ষাবিদরা ওদের বাধা দিতে গেলেন তাঁরা নানা নিগ্রহ আর অপমানের মুখোমুখি হলেন। এমনকি আন্দোলনকারী অনেক শিক্ষাগুরুও একসময় এক সংগে আন্দোলন করা ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হলেন। এদিকে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ছাত্র সংস্থার প্রধান ঘাটি) বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের সংগে সংগে 'পরীক্ষা বিতাড়ন' আন্দোলনও চলতে থাকল ফলে পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে যাওয়ার দরুন এমন এক জট পাকাতে থাকল যে গত বৎসর স্নাতক হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এখনও অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। এদিকে এবার দেরি করে পরীক্ষা সমূহ হলেও কয়েকদিন পর আবার নতুন স্নাতকদল পাশ করে বেরুবে, তাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, কীভাবে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এই পেছিয়ে পড়ার সমস্যার সমাধান করবে? যাই হোক এভাবেই এরা আন্দোলনের জন্য দু দুটো শিক্ষা বর্ষ হারাল আর বর্তমানে শোনা যাচ্ছে যে আন্দোলনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এ সব কিছু মিলিয়ে আসামের ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকদের মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আসামে পড়াশুনা হবে না, এখানে থাকলে ভবিষ্যৎ ধ্বংস

হবে—তাই 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' নীতি অনুসরণ করে বিত্তবান ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েরা (আন্দোলনকারীই হোক কিংবা আন্দোলন বিরোধীই হোক) ভারতের চারদিকের শিক্ষানুষ্ঠানে স্থান পাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। এমনকি স্কুলে পড়তেও অনেকে আসামের বাইরে যাচ্ছে। এরা ভিড় করছে বিশেষ করে দিল্লিতে। কিন্তু আন্দোলনের জন্য ধনে প্রাণে সব দিক থেকে বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হল যারা গ্রামের সেই গরিব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার দিক থেকেও ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিন গুনছে।

এবার আন্দোলন হলে কী রকম জন সমর্থন পাওয়া যাবে সেটা বলা কঠিন, কারণ গতবারও আন্দোলনের নিভে যাওয়া আগুন আবার খুব জোরেই জ্বলে উঠছিল। অবশ্য তখন একটা ইস্যু ছিল, 'নো সলিউশন, নো ইলেকশন'। এবার কিন্তু সামনে জোরাল কোন ইস্যু নেই। তাই মনে হচ্ছে এবার প্রতীকী আন্দোলনের চেয়ে যেটা গত চার বছর ধরে চলে আসছে সেই গোপন হিংসাত্মক ঘটনাই বেশি চলবে। অবশ্য গত ফেব্রুয়ারি মাসের পুনরাবৃত্তি যে সহজে হবে না, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায়। যেসব জায়গায় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল সরকার সেসব জায়গায় এখনও ব্যাপক দমন চালিয়ে যাচ্ছে। এবার আরেকটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, এ টি এস ইউ (আসাম ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) আন্দোলন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং আন্দোলন বিরোধী এ এ এস ও (অল আসাম স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন) নামে অন্য একটি ছাত্র সংস্থা গঠন করেছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা 'ডিভাইড অ্যানড রুল' নীতি চালিয়ে আন্দোলন দমন করার এটি সরকারি কৌশলেরই একটি অংশ মাত্র।

আসামে আর একটি ঘটনা আন্দোলন-বিরোধীদের প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছে। অবৈধ নির্বাচন, অবৈধ সরকারের ধুয়ো তুলে আসামের আকাশ বাতাস মুখরিত করা জনতার ভিড়ে দিসপুরের জনতা ভবন এখন সরগরম। মন্ত্রী আর বিধায়কদের কাছে দর্শন প্রার্থীদের এরকম ভিড় 'অবৈধ সরকার' কথাটার সঙ্গে কোনরকম সামঞ্জস্যপূর্ণ যে নয় সেটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আসামে বিভিন্ন অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সারভিসে বর্তমানে যারা চাকরি পেয়েছেন দেখা গেল যে তাদের মধ্যে আসুর নেতৃস্থানীয় অনেক ছেলে আছে। আন্দোলনকারী নেতাদের হাতের মুঠোয় আনা এটাও একটা সরকারি চাল বলে অনেকে মনে করেন।

মোটের উপর, সরকার আন্দোলনকারীদের ছলে-বলে-কৌশলে অনেকটা বাগে আনছে। তাই এরপর আন্দোলন হলে সেটা কতদূর গড়াবে তা এখন অনেকেরই আগ্রহ আর কৌতূহলের বিষয়। গত ৬ আগসট আসুর কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে ওরা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে সর্বভারতীয় দলগুলোর সঙ্গেও আসু আলাপ আলোচনা করবে। আগে যে আসু সর্বদা সর্বভারতীয় দলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছিল সে আসুর সাম্প্রতিক এ ঘোষণা শুনে যাত্রার সংলাপ বলতে ইচ্ছে করে, 'এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।'

'আসাম সাহিত্য সভার' সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব চলল বঙ্গাইগাঁওয়ে ৫ থেকে ৭ আগসট। এবারের সভাপতি ছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক ডঃ বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য। অভিযোগ উঠছে যে সরকার সাহিত্য সভার এ অধিবেশনে কোন পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা নিজেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে বলে জাহির করা আসাম সাহিত্য সভা গণসংগ্রাম পরিষদের শরিক হয়েছিল। ফলে আসাম আন্দোলনের জোরদার সমর্থক হয়ে নিজের সম্মান তো হারালই সেই সঙ্গে সরকারের রাজরোষেও পড়ল। গত বৎসর পাহাড়ী জেলা কার্বি আংলঙের সদর শহর ডিফুতে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাতেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এমনিতে কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য সভাকে সরকার আগে বেশ মোটা ধরনের অনুদান দিত। আন্দোলনের সময় থেকে আর একটা ব্যাপার আসামের অনেক সাহিত্য প্রেমিক ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করে তুলছে। সেটি হল চিরাচরিত নীতি লঙ্ঘন করে এইসব সাহিত্য সভার অধিবেশনগুলোর বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা করার জন্য আসুর অনেক নেতাকে ডেকে আনা হচ্ছে, যাদের সঙ্গে সাহিত্যের কানাকড়িও সম্পর্ক নেই। নানা কারণে আসাম সাহিত্য সভা তার আগের জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। এদিকে বড়ো উপজাতি জনগোষ্ঠী 'বড়ো সাহিত্য সভা' নামক ওদের একটা সাহিত্য সভার কাজকর্ম বছর বছর চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। □

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার

কৈলাসহর থেকে সামন্ত দেশাই

উগ্রপন্থী তৎপরতা সমস্যাটা যখন সরকার গুটিয়ে আনতে ব্যস্ত তখনই আচমকা বন্যার ধাক্কা খেল ত্রিপুরা। আগসটের প্রথম সপ্তাহে একটানা চারদিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে, দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ক্ষেতের ধান, বাড়ি ঘর, গবাদি পশু। সরকারের পক্ষ থেকে বন্যায় ত্রিশ জনের মৃত্যু সংবাদ জানান হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ এখনও শেষ হয়নি বটে তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ রাজ্যের চলতি বছরের পরিকল্পনা বরাদ্দকে ছাড়িয়ে যাবে। দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া, পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াই, সোনামুড়া এবং উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের একমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদন বন্ধ। আসাম থেকে বিদ্যুৎ এনে রাজ্যে আলো জ্বালাতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক বন্যায় ত্রিশ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ফসলের ক্ষতি হয়েছে পঁচাত্তর হাজার হেক্টর জমির। বিধ্বস্ত হয়েছে ত্রিশ হাজার ঘর-বাড়ি। কয়েক হাজার গবাদি পশু বানের তোড়ে ভেসে গেছে। বন্যার সময় রাজ্যের বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে প্রায় তিন লাখ দুর্গত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৃষিমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেছেন : গৃহহারা মানুষকে পুনর্বাসন দিতেই কুড়ি কোটি টাকা প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে। বলা হচ্ছে এ ধরনের প্রলয়ঙ্করী বন্যা একশ বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় দেখা যায়নি।

ত্রিপুরা পাহাড়ী রাজ্য। এই রাজ্যের বনপাহাড়ের সঙ্গে নদীনালার নাড়ির টান। সাড়ে দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ত্রিপুরায় প্রায় ৫,৭৮,১০০ হেক্টর বনভূমি রয়েছে। নির্বিচারে বৃক্ষমেধ ও অরণ্যের অঙ্গহানির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক হারে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। কমছে নদীর নাব্যতা। এ অবস্থায় স্বাভাবিক বৃষ্টিতেও রাজ্যের নদীনালায় বান আসার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণে, ভূমিক্ষয় রোধে ত্রিপুরায় এখন বন সৃজনের ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। গত জুলাই মাসটা এই রাজ্যে খুব ঘটা করে বৃক্ষ রোপণের মাস হিসাবে পালিত হয়। শুধু ভূমিক্ষয় এবং নদীর নাব্যতা হ্রাসই নয়, সীমান্তের ওপারের বড় বড় বাঁধগুলোও ত্রিপুরার বিপদ ডেকে আনছে। বিশ্ব ব্যাংকের টাকায় ওপারে বড় বড় বাঁধ হয়েছে। তাতে এখন আর আগের মত তরতর করে জল নামতে পারছে না।

গত দাঙ্গার সময় দুর্গতদের ত্রাণ পুনর্বাসনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছিল ১৪ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক বন্যার পর রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু দিল্লিতে ছুটে গিয়ে ত্রাণ পুনর্বাসনে কেন্দ্রের কাছে প্রায় ১৭ কোটি টাকার দাবি জানিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ত্রাণ পুনর্বাসনে অর্থের ব্যাপারে কেন্দ্র থেকে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি মেলেনি।

আশির দাঙ্গার পর ত্রিপুরার বিপর্যস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করতে যে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবার বন্যার পরও সে রকম কর্মসূচি চাই। কিন্তু অর্থ বড় প্রতিবন্ধক। বিধ্বস্ত সেতু রাস্তা সারাতেই পরিকল্পনা বরাদ্দের এক বড় অংশ চলে যাবে। পুনর্বাসনে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এখন কেন্দ্রীয় সাহায্যই একমাত্র ভরসা। রাজ্যের মানুষও রাজ্য সরকারের দাবির সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার কীভাবে এই বিধ্বংসী বন্যার মত চ্যালেনজের মোকাবেলা করেন এটাই এখন সাগ্রহে লক্ষ্য করার বিষয়! □

শাঁওলী ফিরে এলেন

দিব্যজ্যোতি বসু

কলকাতার থিয়েটারকে অনেকদিন অনাথ করে রেখেছিলেন তিনি। থিয়েটারের স্টেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আবৃত্তি, গল্পপাঠ আর কাব্যনাট্যের আসরে আসরে। ফলে ১৯৮০ সালে ফ্রিৎজ বেনেভিক আর শম্ভু মিত্রর ছত্রছায়ায় 'গ্যালিলিওর জীবন'-এর সেই 'ভাবজিনিয়া'র চরিত্রচিত্রণকে টানা তিনবছর স্মৃতিতে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে থিয়েটার পাগল কলকাতাকে। তবে এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার শিশির মঞ্চে শাঁওলী মিত্র তাঁর 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর মধ্যে দিয়ে যেভাবে ফিরে এলেন, তা দেখে মনে হয়েছে ফিরতে হলে এভাবেই ফেরা উচিত। আর সেই ফেরার রাস্তার হদিশ বোধহয় জানা আছে শুধুমাত্র শাঁওলীর মত বিরল প্রতিভাদেরই। সেই হিসাবে সেদিনের ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা শম্ভু মিত্রকেও ফিরে পেয়েছি বলা চলে, কেননা শাঁওলীর অত্যাশ্চর্য অভিনয় সমৃদ্ধ সন্ধ্যাটির প্রযোজকও ছিলেন শম্ভু মিত্রই। তবে শম্ভু মিত্রর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া যে এ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হতে পারত না একথা শাঁওলী নিজেই অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন, দর্শকরা তো বটেই।

'নাথবতী অনাথবৎ' এই অনুপ্রাসটি অব্যর্থভাবে যাঁর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই দ্রৌপদীর কথাই এ নাটকে বলা হয়েছে, কিন্তু শাঁওলী সেই পঞ্চনাথপ্রিয়া পাঞ্চালীর কথা দর্শকদের এমনভাবে শুনিয়েছেন যে মহাভারতের দ্রৌপদীর হাহাকার, একাকিত্ব আর অবমাননা একাকার হয়ে মিশে গেছে আমাদের পুরুষপ্রধান সমাজের চালচিত্রে নির্যাতিত অজস্র দ্রৌপদীর জীবনের নির্যাসের সংগে। শাঁওলী এই কমিউনিকেশনের কাজটি করার জন্য একসংগে গেঁথে নিয়েছেন কথকতার লৌকিক আর ধ্রুপদী নৃত্যের নানান অনুষংগ। এ নাটকের মূল ভূমিকার জন্য গ্রীসের আদি অভিনেতা থেসপিসের অনুসরণে শাঁওলীও বেছে নিয়েছেন একক অভিনয়ের রীতি, অবশ্য সংগে রয়েছে জুড়ির দল। তবে এ নাটকে জুড়ির দলের ভূমিকাই সবচেয়ে দুর্বল। কেবল আংগিক বদলের জন্যই যেন তাদের উপস্থিতি, নাটক এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে তাদের পালনীয় ভূমিকা ছিল রীতিমত ভংগুর। এই জুড়িদের বাদ দিয়ে 'নাথবতী অনাথবৎ' সম্পূর্ণই শাঁওলীর একক অভিনয়-সমৃদ্ধ। একক অভিনয়ের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে এর আগেও দেখা গেছে। মহারাষ্ট্রের 'চলে'র বর্ণনা দিয়েছিলেন একাই পি এল দেশপাণ্ডে। তৃপ্তি মিত্রর 'অপরাজিতা' তো স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নাটক। কিংবা ইদানীংকালে জ্যোৎস্নাবালাবৈদ্যের 'রামায়ণ'-এ এ সীতার একক অভিনয়। কিন্তু শাঁওলীর 'নাথবতী অনাথবৎ' অগ্রবর্তী সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই ম্লান করে দিয়েছে। এ নাটকে শাঁওলী শুধু দ্রৌপদীর কথাই শোনাননি, তিনি শুধু চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই দেখাননি মহাভারতের মহান সব চরিত্রের ফাঁক ফোকরগুলি কোথায়, তিনি সরাসরি দর্শকদের প্রশ্ন করেছেন, 'বলুন তো বাবু মশাইরা, দুঃখী মেয়েটা এখন কী করে?' পঞ্চপাণ্ডব বা শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাত উপস্থিতি দ্রৌপদীর নির্যাতন কোন হেরফের ঘটায়নি, প্রয়োজনের সময় তাদের নির্লিপ্ততা যেমন দ্রৌপদীকে আঘাত করেছে তেমনি ন্যায়ের জন্য, ধর্মের জন্য একটা যুদ্ধের প্রয়োজনের কথা ভাবতে গিয়ে দ্রৌপদীকে আঘাত পেতে হয়েছে তার ধার্মিক স্বামীদের আপ্তবাক্যে কোন 'ধর্মযুদ্ধ, হয়ই না। যুদ্ধ করতে হলে অন্যায় করতেই হয়।' যে অর্জুনকে ভালবেসে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল দ্রৌপদী নিজের করে তাকে কতটুকু পেয়েছিল সে? বরং যে সমাজের জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে, সেই সমাজে এসে জ্যেষ্ঠদের কাছ থেকেই তাঁকে শুনতে হয়েছে 'ব্যক্তিগত ভালোবাসা ভুলে যাও রাজনীতির স্বার্থে', অথচ স্বর্গারোহণে অসফল হওয়ার কারণ হিসেবে সেই জ্যেষ্ঠই ব্যাখ্যান দিয়েছেন 'পাঞ্চালীর একমাত্র অপরাধ ছিল, অর্জুনের প্রতি ওর বেশি পক্ষপাতিত্ব।' ব্যাসদেব, কাশীরাম দাস আর ইরাবতী কারভের লেখা থেকে মূল বক্তব্যগুলি সেচে নিয়ে শাঁওলী নিজের ভাষায় এভাবেই উপস্থাপিত করেছেন দ্রৌপদীকে।

থিয়েটারের অন্য অর্থ নাকি কমিউনিকেশন। অভিনেতার সংগে দর্শকদের এ সেতুবন্ধন করে গল্প। একালের অন্যতম প্রখ্যাত নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকার বলেন যে 'প্রত্যেক থিয়েটারের গল্পগুলিই আগে বলা হয়ে যায়, কিন্তু ওই পুরনো গল্পকেই যে যত নতুন ও সমকালীনভাবে বলতে পারেন অভিনেতা হিসেবে সে ততখানি সার্থক।'

শাঁওলীর 'নাথবতী অনাথবৎ' দেখতে দেখতে এ কথা আবার নতুন করে অনুভব করা গেল। মহাভারতের বহুপঠিত দ্রৌপদী চরিত্রকে একেবারে নতুন রূপে দেখতে পেলেন দর্শকরা। এর জন্য ষোলআনা কৃতিত্ব শাঁওলীর। দ্রৌপদীর রাগ, দুঃখ, অভিমান, ভাব ভালবাসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রতিটি বিভংগ শাঁওলী এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা এক কথায় অভূতপূর্ব। বিশেষ করে কৃষ্ণ যখন শান্তি প্রস্তাব নিয়ে দুর্যোধনের কাছে যাচ্ছেন, তখন দ্রৌপদীর কৃষ্ণের কাছে গিয়ে ভেঙে পড়া কিংবা অন্তিম মুহূর্তে দ্রৌপদী যখন জানতে পারলেন ভীমের নিখাদ ভালবাসার কথা তখন তাঁর অভিব্যক্তি শাঁওলী যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা কলকাতার দর্শকরা কোনদিন ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। এ নাটকে যদি খুঁত ধরতে হয়, তবে পরীক্ষায় ফুল মারকস পাওয়া ছাত্রের খাতায় নম্বর কমানর কষ্ট স্বীকার করতে হবে। সেই কষ্ট স্বীকার করলে বলতে হয় এই কথকতার আসরে গানের ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জুড়িদলকে হঠাৎ করে মঞ্চের ওপর নিয়ে আসা হল কেন তাও বোঝা যায়নি। আর শকুনি দুঃশাসন, দুর্যোধন প্রভৃতির হাসির জন্য জুড়িদলকে কাজে লাগান বিসদৃশ মনে হয়েছে। তবে ধীরেন দাস ও শাঁওলী মিত্রর দেওয়া গানের সুর যথেষ্ট ভাল। আর ছিমছাম দৃশ্যপট কথকতার পরিবেশের সংগে বেশ মানানসই হয়েছে। বিশেষ করে একটা ছোট্ট স্টুলের সাহায্যে স্টেজের একেবারে বাঁদিকের উইংটি যেরকম সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা অকল্পনীয়। শেষ করার আগে শাঁওলীর কাছে একটাই অনুরোধ, নাটক শুরু হওয়ার আগ অবধি দীর্ঘ সময় ধরে অডিয়েন্সের দিকে পেছন ফিরে নাই বা বসে থাকলেন তিনি, সময়টাকে কি একটু কম করা যায় না? □

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৬৫

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
৯		■	১০			১১	■
	■	১২	■	■	■	১৩	১৪
■	■	১৫			■	১৬	
১৭	১৮		■	১৯	২০		■
২১		■	২২	■		■	২৩
■	২৪			■	২৫		

সূত্র : পাশাপাশি

১। নামী শ্লোক, তাই হোক
৪। জোর নেই গায়ে, শুধু থাকে শুয়ে
৬। অনুযোগে ভালবাসা, বেশি হলে সর্বনাশা
৭। পৃথিবীটাই, ফার্সিতে পাই
৯। উল্টে নিলে তবে, জয়ী তুমি হবে
১০। নিয়ম-কানুন মানো, আরেক নামে চেনো
১৩। ছায়া নেই বলে, সূর্য-কিরণ পেলে
১৫। প্রকার ভেদ তাই, ভেবে বলা চাই
১৬। ধাত্রী মাতা, ঘামাও মাথা
১৭। ভীরুব এটি নেই, আছে বীরত্বেই
১৯। সাগর জলে 'স্নান', ভেঙে নিয়ে পান
২১। হয় নকল করি, নৈলে মাছ ধরি
২৪। উপায় বা প্রকরণ, অন্যরূপে হেথা রন
২৫। রংগময়ী ইনি, নাটকেও চিনি।

সূত্র : ওপর-নিচ

১। শ্রীবিষ্ণু অন্য নামে, নরত্রাতা ধরাধামে
২। বুদ্ধি যদি থাকে, মাথায় পাবে একে
৩। দাদুর কাছে যাই, তবে ব্যাঙের খবর পাই
৪। ষোল আনার অষ্ট, কী পাই বলো স্পষ্ট
৫। থাকে সরলরেখার পরে, সমকোণ করে
৮। এই কথাটাই, প্রতিদিন পাই
১১। মহাপুরুষের মৃত্যু হলে, এমন কথা লোকে বলে
১২। সরসা, উল্টে পাখি ভরসা
১৪। দুধ জমে হবে, স্বাদে অম্ল পাবে
১৭। শাস্তি কিংবা সজ্জা, না পারলেই লজ্জা
১৮। শপথের আরবি, আদালতে পড়বি
২০। সূত্র এইমাত্র, ইনি রসের পাত্র
২২। সাঁঝের বেলাতে, ঘরে ঘরে হয় দিতে
২৩। বাক্য বা কথাখানি—খুঁজে দেখ, পাবে জানি।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১২ অকটোবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২৯-৯-৮৩।

সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি পাঠাতে এবং খামের ওপর শব্দশৃংখল—৬৫ লিখতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল—৬১ (সমাধান)

কা	জু	বা	দা	ম	■	গা	ম
র	স	ম	য়	■	ব	র	ণ
থা	■	■	সা	ম	বে	দ	■
লা	গ	■	রা	গ	■	খা	স
■	র	জা	■	■	আ	না	জ
ক	ম	লা	স	না	■	■	মে
খ	■	■	জ	ম	ক	■	ঝাঁ
ক	ল	মি	ল	তা	■	মো	টা

শব্দশৃংখল - ৬১-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন ক্ষমা রায় (মনবেড়িয়া, বরাকর, বর্ধমান) এবং অমর চক্রবর্তী (১/৪ বি, গাংগুলিপাড়া লেন, কলকাতা – ২)।

৫ সেপটেমবর অনুষ্ঠিত শব্দ-শৃংখল – ৬১ লটারিতে বিচারক ছিলেন মেঘনাদ ভট্টাচার্য।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

(সেপটেমবর ১৪ থেকে ২০)

মেষ : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা ভোগাবে। আর্থিক সাফল্য ও সহজে আয়বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে; মেয়েদের কর্মস্থলে দৃঢ়তার প্রয়োজন হবে। পারিবারিক ব্যাপারে মানসিক অশান্তি ও অসহায়তা। কারও ভুল পরামর্শে মেয়েদের অর্থহানি। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বৃষ : আগের অসুস্থতার জের চলবে; মেয়েদের কোন ক্ষত ইত্যাদি থেকে দ্রুত আরোগ্য। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু নতুন কোন যোগাযোগ। কর্মক্ষেত্রে কারও সহায়তায় কার্যোদ্ধার; মেয়েদের কর্মস্থলে হঠাৎ বদলির সম্ভাবনা। পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের মতামত প্রাধান্য পাবে। ব্যবসায়ীদের স্বল্পসল্প লাভ।

মিথুন : শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের; মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা গুরুতর আকার নেবে। আর্থিক ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত শুভ; সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি, অস্থিরচিত্ততা; মেয়েদের কর্মস্থলে সহজ অগ্রগতি। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয়ে নতুন অসুবিধে। কারো অযাচিত উপদেশে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে।

কর্কট : শরীর ভাল চলবে না। মেয়েদের শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য; ভালমতন আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোন চেষ্টায় সুফল; মেয়েদের কর্মস্থলে মানসিক উৎকণ্ঠা। ধর্মকর্মে বাধা। কর্মপ্রার্থীদের অস্থায়ী কোন যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের সাফল্য ও লাভ।

সিংহ : মানসিক উদ্বেগ অনেক প্রশমিত হবে; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ক্ষতির জের চলবে। কর্মক্ষেত্রে হতাশা ও নৈরাশ্য; মেয়েদের কর্মস্থলে সহজ অগ্রগতি। পারিবারিক অশান্তি চলবে। মেয়েদের অন্যেরা ভুল বুঝবে, ফলে মানসিক অশান্তি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কন্যা : স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি। আচমকা ব্যয় বেশ বিব্রত করবে; ভালরকম ঋণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ঘটনায় মানসিক চাপ। আইন-আদালত সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ ঝামেলা। প্রতিযোগিতামূলক কাজে কোন সন্তানের সাফল্য। ব্যবসায়ীদের লাভ।

তুলা : পেটের গোলমাল বেশ ভোগাবে; মেয়েদের স্নায়ু সংক্রান্ত রোগ বিব্রত করবে। আর্থিক সাফল্য কিন্তু সামান্য ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা ও আয়বৃদ্ধি; মেয়েদের কর্মস্থলে শত্রুরা বিশেষ তৎপর হবে। পারিবারিক ব্যাপারে কোন বন্ধুর বিশেষ সাহায্য লাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃশ্চিক : শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি; মেয়েদের আগের অসুস্থতার জটিলতা, নতুন সমস্যা। আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি; ঋণ। কর্মস্থলে চোখ-কান খোলা রেখে চলা উচিত; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কারও সহায়তা। সন্তানদের সংগে প্রচন্ড মতবিরোধ। বয়স্কদের আঘাত। ব্যবসায়ীদের লাভ।

ধনু : শরীর নিয়ে আকস্মিক ঝামেলা; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ব্যাপারে আগের কোন প্রয়াসে সাফল্যের আভাস। কর্মক্ষেত্রে নতুন ঝামেলা; অগ্রগতি ব্যাহত হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে লাভের ইংগিত। আত্মীয়-কুটুম্বের সংগে মতবিরোধ; ব্যবসায়ীদের লাভ।

মকর : শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি; মেয়েদের শরীর চলনসই। আয় বাড়বে সহজে কিন্তু অর্থহানির আশংকা। কর্মক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠার অবসান; মেয়েদের মানসিক চাপ ও অশান্তি। গৃহ নির্মাণ বা সংস্কার কাজে বাধা, ঝামেলা। ব্যবসায়ীদের নতুন প্রচেষ্টায় সাফল্যের ইংগিত।

কুম্ভ : আগের অসুস্থতাব জের চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অল্পবিস্তর উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা, অন্যের প্ররোচনায় ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন গুরুদায়িত্ব; মেয়েদের কর্মস্থলে সাফল্য ও অন্যের সহযোগিতা। পারিবারিক ব্যাপারে দূরের কোন সংবাদ বিচলিত করবে। কোন সন্তানের দুর্ঘটনার আশংকা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মীন : শরীর খুব একটা ভাল চলবে না; মেয়েদের আগের অসুস্থতার অনেক নিবৃত্তি। সামান্য আয়বৃদ্ধি; কিন্তু ব্যয়ের চাপ বিব্রত করবে। কর্মক্ষেত্রে ঢিলেঢালা ভাব বড় রকমের ক্ষতি করতে পারে; মেয়েদের কর্মস্থলে অবস্থা প্রতিকূল হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পারিবারিক মিটমাট। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।

পরিবর্তন
১৮-২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

মাফিয়ানগরী বোমবাই

ফারুক আবদুল্লা

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু

শিলাদিত্য

শারদীয় সংখ্যা ১৩৯০

কয়েকটি বিশেষ রচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দিনলিপি

চারটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
মহাশ্বেতা দেবী
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দিব্যেন্দু পালিত

একটি বড় গল্প

বিমল কর

সুপরিচিত ও সাম্প্রতিক গল্প লেখকদের পনেরোটিরও বেশি ছোট গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব গুহ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বরেন গঙ্গোপাধ্যায় রতন ভট্টাচার্য সোমনাথ ভট্টাচার্য সমরেশ মজুমদার মিহির মুখোপাধ্যায় সুধাংশু ঘোষ শিশির লাহিড়ী সতোন্দ্র আচার্য দীপালি দত্তরায় ও আরো অনেকে

সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন

অমিতাভ চৌধুরী অশ্রুকুমার সিকদার মনোজ মিত্র

দীর্ঘ কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতা

অরুণ মিত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অরুণ ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
সিদ্ধেশ্বর সেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শঙ্খ ঘোষ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ও আরও অনেকে

প্রচ্ছদ : দুর্গাচিত্র।। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তন

২১-২৭ সেপটেম্বর, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১২

দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

সম্পাদকীয়

এই মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন। সাইপ্রাস ও গ্রীসে মৈত্রীমূলক সফরের পর নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধিবেশনে তিনি যোগ দিচ্ছেন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ভাষণ দেবার জন্য আসছেন আরও কয়েকটি বড় দেশের রাষ্ট্রনায়ক। এটা প্রত্যাশিত, রাষ্ট্রসংঘের এই অধিবেশনটি একটি শীর্ষ বৈঠকের চেহারা নেবে। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এই বৈঠকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রায় ১০০টি দেশের নেত্রী হিসাবে রাষ্ট্রসংঘে তাঁর এই ভাষণ, শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়। বিগত দিল্লি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব আজ ভারতের তথা শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। জোট নিরপেক্ষতার অন্তরালেও যে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির 'অদৃশ্য সুতো'র টান অব্যাহত এবং কিছু কিছু রাষ্ট্রের সেই অদৃশ্য শক্তির হাত থেকে মুক্তি নেই, সেটি পরিতাপজনক ঘটনা হলেও নির্মম সত্য। কিন্তু ভারত এখন প্রকৃত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত। সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বারা দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমানের ভূপাতিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে করে এই জোট নিরপেক্ষতার নীতি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। ভারত এই ঘটনাকে 'দুঃখবহ' বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে বিমানটি কীভাবে সোভিয়েত আকাশ সীমার অত ভেতরে প্রবেশ করল, তা যেমন দুর্বোধ্য তেমনি আশ্চর্যজনক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্লেনটিকে যাত্রীবাহী প্লেন বলে বুঝতে না পারাটা। ভারতবর্ষ স্পষ্ট ভাষায় জানাতে দ্বিধা করেনি যে এই ধরনের ঘটনায় যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল; যেখানে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বেড়ে চলেছে, তার সংগে যুক্ত হচ্ছে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তখন এমন কিছু ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয়নি যেখানে সামান্যতম ভুল বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

প্রেসিডেন্ট রেগনের উগ্রনীতির জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ দূরে থাক, মারণাস্ত্র সম্বরণের নীতিও যথেষ্ট আন্তরিকতার সংগে পালিত হচ্ছিল না। পরমাণু বোমার বিধ্বংসী প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্ব আজ আতংকগ্রস্ত। বৃহৎ শক্তিগুলি এখন সদা সন্ত্রস্ত। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমানের উপর গুলি বর্ষণ অগ্নিতে ঘৃতাহূতি দান করেছে এবং পশ্চিমী শক্তির হাতে সবার অলক্ষ্যে একটি তীর তুলে দিয়েছে যা শান্তির আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিতে উদ্যত। ইতিমধ্যেই মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে আবার বিশ্ব জুড়ে ঠান্ডা যুদ্ধের হিমশীতল আবহাওয়া ফিরে আসছে।

এ কথা ঠিক যে দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমানের দীর্ঘসময় ধরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত এলাকার মধ্য দিয়ে উড়ে যাওয়া এবং সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করা অত্যন্ত সন্দেহজনক। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রীবাহী বিমানকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে লাগিয়ে থাকে এই অভিযোগও বহু সমর-বিশারদ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় গুপ্তচর-বৃত্তির দায়ে ২৬৯ জন নিরীহ যাত্রীকে (যাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক) হত্যা করাকে মানবিক দিক দিয়ে সমর্থন করা যায় না। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাঁরা শান্তি ও মানবিকতার সমস্ত শর্তগুলি মেনে চলার নীতিতে বিশ্বাসী তাঁদের এই আচরণ পরিতাপজনক শুধু নয়, তা ভ্রান্তিপূর্ণ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা পরিষদ কিছুদিন ধরে যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আমাদের আশা শ্রীমতী গান্ধীর সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানের পর তিক্ততার সেই পূর্বরেশ ধীরে ধীরে কাটতে থাকবে। রাষ্ট্রসংঘই আজ অশান্ত বিশ্বের কাছে একমাত্র মরূদ্যান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বৃহৎশক্তিই আজ রাষ্ট্রসংঘকে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে দিচ্ছে না। শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেয়ে অস্ত্রসজ্জা এবং ঠান্ডা লড়াইকেই তারা অধিকতর কাম্য বলে মনে করছেন।

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : বোমবাই-এর ছবি – প্রবীর মিত্র, ফারুক আবদুল্লার ছবি – সৌগত রায় বর্মন ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর ছবি – ঢাকার শাঁখারি বাজার সংঘমিত্র ক্লাবের সৌজন্যে।

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৭৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

৫ অকটোবর সংখ্যার আকর্ষণ

৫ অকটোবর পরিবর্তন প্রকাশিত হচ্ছে প্রাক-পুজো সংখ্যা হিসাবে। অর্থাৎ পুজোর ঠিক আগের সংখ্যা এটি। এ জন্য এই সংখ্যায় পুজো সংক্রান্ত নানা লেখার সমাবেশ থাকছে।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিচার : 'পুজোয় আসুন আমাদের গ্রামে'। পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামের পুজো কর্তৃপক্ষ তাঁদের গ্রামে গিয়ে পুজোর কটা দিন কাটাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গ্রামে যাবার পথনির্দেশ, থাকার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিবরণে সমৃদ্ধ থাকছে এই সংখ্যার বেশ কয়টি পৃষ্ঠা। পুজোয় পশু বলির পক্ষে ও বিপক্ষে থাকছে পাঠকদের মূল্যবান মতামত।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পর্যায়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবার লিখছেন, **বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন কি সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়া করবে?** শত্রু সম্পত্তি আইনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে লেখকের অনুসন্ধান। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল লেখক বদরুদ্দিন ওমর ও সেই সঙ্গে বাংলাদেশ মুসলিম লিগের সংগঠন সম্পাদকের একান্ত সাক্ষাৎকার। দুজনে দুই মানসিকতার ব্যক্তি। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্রিক কাঠামো নিয়ে দুজনের বক্তব্য।

পুজোয় দুর্গা প্রতিমার বৈচিত্র্য নিয়ে থাকছে মূল্যবান প্রতিবেদন। সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠবে তিনটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

তীর্থংকর ও সঞ্জীবের মৃত্যু সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের ডি আই জি, সি আই ডি স্বরাষ্ট্র দফতরকে কী রিপোরট দিয়েছিলেন? যে রিপোরট চ্যালেনজ করেন একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোরট সকলের জানা কিন্তু পুলিশের রিপোরট আজও অপ্রকাশিত, পরিবর্তন বিনা মন্তব্যে প্রকাশ করছে সেই গোপন রিপোরটটি।

পুলিশ লক আপে মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায়ই ঘটছে। এইসব মৃত্যুর পিছনে কারণ কী? পুলিশী নির্মমতা না আরও কিছু? পরিবর্তন এ সম্পর্কে প্রকাশ করছেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার।

২৬ অকটোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যপূর্ণ মননশীল রিপোরটাজ : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে।

পরিবর্তন ২৮ সেপটেমবর সংখ্যাই পুজো সংখ্যা

নবীন ও প্রবীণ উভয়ের শ্রেষ্ঠ ও নির্বাচিত রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, দুশো পাতার বই। দাম মাত্র পনের টাকা। স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপন দেখুন। প্রকাশিত হচ্ছে ২৮ সেপটেমবর।

নিবেদনমিদং

পরিবর্তনের পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি সুখবর পৌঁছে দিই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন ইউরোপ ও আমেরিকা সফর কভার করার জন্য ভারত সরকার যে সাতটি সংবাদপত্রকে মনোনীত করেছেন, পরিবর্তন তার একটি। পরিবর্তনের পক্ষে এই সম্মান যেমন গর্বের তেমনি বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি স্মরণীয় ঘটনা। ভারতবর্ষে পত্র পত্রিকার সংখ্যা পনের হাজারের মত। দৈনিক পত্রিকার সংখ্যাই নয় শতের উপর। কাজেই যেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কভারেজে সীমিত সংখ্যক সংবাদপত্রকে বাছতে হয় তখন দিললির কিছু ইংরাজি পত্রিকা ও নিউজ এজেনসির কাছেই এই সুযোগটা আসে। আঞ্চলিক সংবাদপত্রের পক্ষে সুযোগ আসাটা মুশকিল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ম্যাগাজিনের পক্ষে তো বটেই। তাই ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিন হিসাবে কেন্দ্রীয় তথ্য দফতর ও প্রধান মন্ত্রীর সেকরেটারিয়েট যখন পরিবর্তনকে বেছে নিলেন, তখন মনে হল, এটি বাংলা সাংবাদিকতারই সম্মান। পরিবর্তনের পক্ষ থেকে সম্পাদককেই প্রধানমন্ত্রীর সফর সংগী হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ২০ সেপটেমবর বিশেষ বিমানে যাত্রা শুরু করছেন। সাংবাদিকরা তাঁর সংগে একই বিমানে যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং তাঁর বিদেশনীতি নির্ধারকদের অন্যতম ডঃ অর্জুন সেনগুপ্ত তার আগেই অগ্রণী দলের সংগে রওনা হয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর সূচির মধ্যে থাকছে সাইপ্রাস, গ্রীস, ফ্রানস ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্র। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য।

আমাদের পক্ষে আপসোসের কথা যে ঠিক যখন এই গুরুত্বপূর্ণ সফরটি হচ্ছে, তখন পরিবর্তনের বিশেষ সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হবে। তারপরই পড়ে যাচ্ছে পুজোর ছুটি।

পুজো সংখ্যা বা পুজো অবকাশ সংখ্যার কাজ আমাদের আগে থেকে সেরে রাখতে হয়েছে। তাই আগামী ২৬ অকটোবর সংখ্যার আগে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে লেখা শুরু করতে পারব না। এই লেখা ধারাবাহিকভাবে শুরু হবে ২৬ অকটোবর সংখ্যা থেকে। চলবে বেশ কিছুদিন ধরে। কারণ আমরা জানি, কোন বাংলা কাগজেই প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের নানা বর্ণাঢ্য বিবরণ নিয়ে চিত্তাকর্ষক রিপোরটাজ এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং এই লেখাগুলি বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের লেখা হবে।

পুজোর পর থেকে আমরা পরিবর্তনে আরও সাম্প্রতিক ঘটনার কভারেজ দেওয়ার চেষ্টায় থাকবো। ওই ২৬ অকটোবর সংখ্যা থেকেই শুরু হবে একটি নতুন ফিচার কীভাবে দুশ্চিন্তাহীন জীবন কাটাবেন জীবনের নানা প্রতিকূলতা এড়িয়ে চলবেন সে সম্পর্কে নানা মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক আলোচনা। ডেল কারনেগির বিখ্যাত লেখাগুলির কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এগুলি হবে অনেকটা ওই ধরনের রচনা। এ ছাড়া মৈত্রী সংঘের সদস্যদের নাম ঠিকানাও প্রকাশিত হতে থাকবে প্রতি সংখ্যায়।

পরিবর্তনের আগামী সংখ্যাই পুজো সংখ্যা। প্রকাশিত হচ্ছে ২৮ সেপটেমবর। পুজো সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই। আমাদের বিশ্বাস, ন্যূনতম দামে এত সমৃদ্ধ পুজো সংখ্যা আপনি দ্বিতীয়টি নাও পেতে পারেন। আমাদের অনুরোধ পুজো সংখ্যা পরিবর্তন পড়ুন ও আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত দিন। আপনাদের প্রেরিত অভিমতগুলির মধ্যে যে তিনটি অভিমত সুলিখিত বলে মনে হবে সেগুলি আমরা প্রকাশ করব ও লেখককে ত্রিশ টাকা করে সাম্মানিক দেব।

সারকুলেশন, গ্রাহক ইত্যাদি ব্যাপারে সম্পাদককে অনেকে চিঠি লেখেন, তাঁদের অনুরোধ এ সব চিঠি সরাসরি সারকুলেশন বিভাগের প্রধানকে পাঠাবেন।

৫ অকটোবর ও ১২ অকটোবর এই দুটি সংখ্যায় আমরা বেশি করে চিত্তাকর্ষক ফিচার দিচ্ছি।

সামনে পুজো। এখন কিছুদিন আর রসকষ বিবর্জিত খবর নয়। এই দুই সপ্তাহ ধরে পড়ুন পুজো সম্পর্কিত নানা বিবরণ, কিছু নির্বাচিত আকর্ষণীয় ফিচার।

'পুজোয় আসুন আমাদের গ্রামে' এই পর্যায়ের লেখাগুলি ৫ অকটোবর সংখ্যায় এক সংগে প্রকাশিত হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিস্তৃত রেট আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগ তৈরি করছেন। সেটি ১২ অকটোবর প্রকাশিত হবে।

অলমিতি

পা. চ.

কেন বঞ্চিত ?

আমি বাঁকুড়া জেলার একজন গরিব প্রাইমারি শিক্ষক। আমার পুত্র তাপসকুমার নন্দন গত ১৯৭৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৬০৫ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। 'বিদ্যালয়-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সন্তানরা ৬০% নম্বর পেলে জাতীয় বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী'। সেইমত আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০ নভেম্বর ১৯৭৯ তারিখের বিজ্ঞাপন দেখিয়া যথানিয়মে যথাসময়ে নির্দিষ্ট ফরমে নির্দিষ্ট অফিসে দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু ৫ কাউনসিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১-এ সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, স্কলারশিপ অ্যানড স্টাইপেণ্ড সেকশনের সমস্ত কাগজপত্র, ফাইল ও রেকরড বিনষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞাপিত হয় এবং পুনরায় আমি যথানিয়মে যথাসময়ে দরখাস্ত করি।

গত ১৯৮১ সালে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পুত্রটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও মোট ৬০৫ নম্বর পাইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এ ব্যাপারে আমি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কেও জানাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন 'আপনার পত্র যথাস্থানে পাঠান হইল।' কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন উত্তর পাইলাম না।

চণ্ডীচরণ নন্দন
মেজিয়া, বাঁকুড়া।

একপেশে চিন্তাধারা

'পরিবর্তন'-এর জন্মলগ্ন থেকে আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকার তুলনায় 'পরিবর্তন'-এর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আমাকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু আজ গভীর দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিবর্তন' তার চিরাচরিত নিরপেক্ষতা বর্জন করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ একটি সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নে বুশ সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট রাজনৈতিক শক্তি সমূহের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। ভারতের কোটি কোটি নিপীড়িত, অবহেলিত, নির্যাতিত গ্রামীণ জনসাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যন্ত্রণার ইতিহাস অগ্রাহ্য করে যে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও সুবিধাভোগী উচ্চবিত্ত শ্রেণী আজ এ দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে, তাদের তথাকথিত অভাব-অভিযোগ ও বিলাসবহুল জীবনকাহিনী তুলে ধরার ব্রত নিয়ে 'পরিবর্তন' সচেতন পাঠকমন থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। চন্দ্রশেখরজীর বহু-আলোচিত ভারত-যাত্রার বিবরণ ও মোরারজী দেশাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রকাশের নামে নির্লজ্জভাবে বুশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক কংগ্রেস (ই) ও মারকসবাদী কম্যুনিসট পারটির স্তাবকতা করা হয়েছে এবং অকম্যুনিসট বিরোধী-দলের ভাবমূর্তি ধ্বংস করার চেষ্টা চালান হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল, 'পরিবর্তন' নিরপেক্ষ ও সৎ সাংবাদিকতার ন্যূনতম শর্ত অগ্রাহ্য করে পাঠকের সমালোচনা-মুখর চিঠিপত্র প্রকাশ না করার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। মোরারজীভাই তথা জনতা পারটির চরিত্র হননের ইচ্ছাকৃত উদ্যোগের প্রতিবাদে লিখিত আমার চিঠি এবং তারও আগে 'কমপানি এগজিকিউটিভদের সুখ দুঃখ' শীর্ষক প্রতিবেদন সম্পর্কে আরেকটি চিঠি প্রকাশ করা হয়নি, হয়ত কথিত চিঠিগুলোয় সম্পাদকের অবিমিশ্র প্রশংসা ছিল না বলেই! আমার সন্দেহ আছে এ চিঠিটিও সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনায় 'সমীপেষু' কলমে প্রকাশোপযোগী বিবেচিত হবে কিনা। কারণ এই চিঠিতে আমি 'পরিবর্তন'-এর ২৭ জুলাই '৮৩ সংস্করণে প্রকাশিত 'সাক্ষাৎকার' কলমের প্রতিবেদক তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুরভিসন্ধিমূলক বিবৃতিকে চ্যালেনজ জানাচ্ছি—মহারাষ্ট্রের কোথায়, কোন 'রাজকীয় হোটেলে' চন্দ্রশেখরজী তাঁর ভারত-যাত্রাকালে অতিবাহিত করেছেন, 'কর্ণাটকের চিনি ব্যবসায়ীরা' তাঁকে কোথায়, কীভাবে রেখেছেন সেকথা তিনি প্রমাণ সহ প্রকাশ করুন 'পরিবর্তনের পরবর্তী যে কোনও সংখ্যায়। তার জবাবে চন্দ্রশেখরজীর দীর্ঘ পদযাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী নির্মল ওঝা প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী দিতে প্রস্তুত আছেন।

সুপ্রতীক বাগচী
কলকাতা-১৯

সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি

২৭ জুলাই '৮৩ সংখ্যায় 'পরিবর্তনে' প্রকাশিত বিশ্বনাথ মিত্রের 'সংস্কৃতি ফ্যাশন' চিঠিটি 'সংস্কৃতি' না 'অপসংস্কৃতি'র সহায়ক তা বুঝতে একটুখানি বিভ্রান্তিবোধ করছি। সংস্কৃতির অর্থ যা সুস্থ এবং যা আমাদের শরীর তথা মনের উৎকর্ষ সাধন করে। আর অপসংস্কৃতির অর্থ যা ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনকে কলুষিত করে। এই দুয়ের ব্যবধানটি শ্রীমিত্রের কাছে মনে হচ্ছে পরিষ্কার নয়। তাই শ্রীমিত্রকে আমি মোহমুক্ত মন নিয়ে বিচার করে দেখতে অনুরোধ করছি যে, একজন শিল্পীর কণ্ঠে কবিগুরুর গান আর একজন শিল্পীর কণ্ঠে বিচিত্র 'ক্যাকফনি'-সম্বলিত ডিসকো গান—কোনটি সুস্থ সংস্কৃতি তথা সমাজ জীবনের পরিচায়ক?

অমিতাভ দত্ত
বহরমপুর, মুরশিদাবাদ

আকাশবাণীর সময়সূচী

পরিবর্তন (জুন ১-৭, ৮৩ সংখ্যায় ৪৩ পৃষ্ঠায় শিবপ্রসাদ দাসের (সিউড়ী) চিঠির ভুল উত্তর দিয়েছেন সাথী চট্টোপাধ্যায়। যে সমস্ত দেশ থেকে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার সময় সূচী ও মিটার দিললি থেকে প্রকাশিত 'আকাশবাণী' পত্রিকায় দেওয়া থাকে না। 'আকাশবাণী' (ইংরাজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায়) পত্রিকায় ভারতের শ্রোতাদের জন্য ভারতের প্রায় ৮৬টি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান-সূচী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে। কোন দেশ থেকে বাংলা ভাষায় কখন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় জানতে গেলে ভারতে ঐ দেশের রাষ্ট্রদূতের অফিসের সংগে যোগাযোগ করলে পাওয়া যাবে অথবা ঐ দেশের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। নিচে কয়েকটি দেশের অনুষ্ঠানসূচী পাওয়ার জন্য ঠিকানা দেওয়া হল

(i) B.B.C Bengali Unit.
Post Box — 3035
New Delhi — 110003.

(ii) DEUTSCHE WELLE.
German Betor Tarang
Post Box — 5211.
New Delhi — 110021

(iii) Pakistan Calling.
Radio Publication.
P.O Box 7991.
Karachi, Pakistan.

বিনয় পাল
কান্দী, মুরশিদাবাদ

ভারতবর্ষ—না ইনডিয়া?

আমাদের দেশের নাম কী? ভারতবর্ষ অথবা ইনডিয়া? পৃথিবীর এমন কোন দেশের নাম আছে কি, যে দেশের একই সঙ্গে দুটি নাম?—জানি না এ নিয়ে কারও মাথা ব্যথা আছে কিনা!

যদি প্রশ্ন ওঠে দেশবাসী কোন নামটি ব্যবহার করবে বা পছন্দ করবে? তাহলে দেখতে হয় দুটো নামের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে। কোন এক সময়ে রাজা ভরত সমগ্র দেশের এক প্রভাবশালী সু-শাসক ছিলেন, এবং তাঁরই নাম অনুসারে আজ এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। অন্য নামটি ইনডিয়া আসে কলমবাসের 'ইনডু' দেশ (হিন্দু দেশ) আবিষ্কারের প্রচেষ্টা থেকে।

আর আজ ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃংখল খুলে স্বাধীনতার ছত্রিশতম বৎসর পূর্ণ করতে চলেছে। অথচ আজও সরকারি বেসরকারি কাগজের উপর ইনডিয়া শিকড়া জল জল করছে। -কেন?

যদি বিদেশিয়ানার গরম খোলশটা খুলে 'সিলোন' শ্রীলঙ্কা হতে পারে তবে আমাদের ঐতিহাসিক 'ভারতবর্ষ' নামকে সরকারিভাবে কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা কোথায়? আমরা ভারতবাসী ভারতীয় হয়ে থাকতে চাই, ইনডিয়ান হয়ে নয়।

শ্যামাপ্রসাদ বসু
উল্লাসনগর, বোমবাই

প্রসঙ্গ ঃ ধীরেশ চক্রবর্তী

আপনাদের ২০ অকটোবর ১৯৮২ পরিবর্তনে জনৈক অময় ভট্টাচার্য লিখিত ধীরেশ চক্রবর্তী প্রসঙ্গে চিঠির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

এ এন ভট্টাচার্য
কলকাতা-২৬

অসহায় ক্যানটিন কর্মচারীর দায়িত্ব কার?

আপনারা পরিবর্তনে নানান রকম চিঠি প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন দেখে আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি। এর আগে ডাক ও তার বিভাগের ই ডি কর্মীর সমস্যা তুলে ধরেছেন। পড়ে তাঁদেব সমস্যা জানতে পারলাম। দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমবা রাঁচির টেলিকম ক্যানটিনে চাকরি করতাম। আমরা অর্ধেক ডিপারটমেনট থেকে এবং অর্ধেক ক্যানটিন থেকে মাইনে পেতাম। পাটনা ওয়েলফেয়ার ফানড থেকে শেষের ৫০ ভাগটা দিত। তারপর শুনলাম ডাইরেকটর সাউথের অফিস উঠে আসছে রাঁচিতে৷ আমরা নিয়মিত ৫০ শতাংশ প্রতি মাসে পেয়ে যাব। খুবই খুশি হলাম। ১৯৭৯তে ডাইবেকটর সাউথ-এর অফিস চলে এল রাঁচিতে। আশার আলো দেখতে পেলাম। ডিপারটমেনট থেকে চিঠি পেলাম আমাদের মাইনে ৭০', তারা দেবে এবং ৩০', ক্যানটিন দেবে। আগেব তুলনায় মাইনেও বাড়ল।

সেই আশা নিয়ে আমরা কয়েক জন ক্যানটিন কর্মচারী বিয়ে করলাম। কিন্তু আমাদের সব আশা ব্যর্থ হল। কী করে, তাই জানাচ্ছি।

আমাদের ক্যানটিনের বিবৃতি পাঠান হয় প্রতি মাসে রাঁচির ডি ই ফোনস অফিসে। ডি ই ফোনস অফিস আবাব সেই বিবৃতি পাঠায় রাঁচির ডাইরেকটর অফিসে। ডাইবেকটর অফিস আবার দীর্ঘদিন পব সেই বিবৃতিগুলো রাঁচিব ডি ই ফোনস অফিসে প্রি চেক কবার জন্য পাঠায়, আবার সেই বিবৃতি ফিরে আসে ডাইরেকটর অফিসে। এবার আরও কিছুদিন পর সেই বিবৃতিগুলো অনুমোদন করে পেমেনটের জন্য ডি ই ফোনস অফিসে পাঠায। তাবপর খোঁজ খবর নিয়ে আমরা পেমেনট আনতে যাই। তখন প্রায় বিবৃতি পাঠানর পাঁচ-ছ মাস হয়ে গেছে। আরও পুরনো পাঁচ-সাত মাসের বাকি পড়ে থাকে অফিসের এক কোণে। এইভাবে দীর্ঘদিন পর অনিয়মিত মাইনে পাবার অভিযোগে আমরা বহুবার ক্যানটিনের জেনারেল বডি মিটিং এ প্রস্তাব রাখি ক্যানটিন চেয়ারম্যান কাম ডি ই ফোনস রাঁচিব কাছে। ডি ই ফোনস সাহেব এক কান দিয়ে শোনেন অন্য কান দিয়ে বার করে দেন আমাদের এই ফালতু প্রস্তাব। সদস্যরাও এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করতে নারাজ।

এখানে তিনটি ইউনিয়ন রয়েছে। এই তিন ইউনিয়নের মধ্যে চলে রেষারেষি এবং সচিব নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এঁদের সচিব হওয়াটাই মুখ্য। ক্যানটিন যেভাবেই চলুক ক্ষতি নেই। অবশ্য প্রাক্তন সচিব বি পি সিং এবং শংকর রায়ের নানা ভাবে সাহায্য আমরা পেয়েছি এবং প্রাক্তন সচিব দীপক মুখারজি ১৯৮১ সালে ক্যানটিন থেকে আমাদের একুশ দিনের বোনাস দেন ৩০ শতাংশ।

ডি ই ফোনস সাহেবের সংগে দেখা করতে গেলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর অনুমতি পাই। 'আমরা সময় মত মাইনে পাচ্ছি না' অভিযোগ করলে তিনি বলতেন 'আপনারা যান কাজ করুন, আমি দেখছি।' দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই 'দেখছি'র পুলটিশ। অথচ আমরা নাকি স্থায়ী কর্মচারী। আমাদের কাজ করতে হয় দিনের মধ্যে ১২ ঘন্টারও বেশি। অথচ এখানের ক্যাজুয়েল কর্মচারীরা মাইনে পান প্রতি মাসের তিন তারিখের মধ্যে আব ওদের কাজ করতে হয় দিনের মধ্যে আট ঘন্টা। এ আই টি ইউ সি সি এল ৩ ডিভিশনাল সচিব দীপক মুখারজি এ ব্যাপারে আমাদের বহুবার সহযোগিতা করেছেন। আমাদেব নিজস্ব কোন ইউনিয়ন নেই।

এইভাবে মাইনে পাওয়াতে আমরা দারুণ অসুবিধায় পড়ি। শ্রী সাগিব আহমদ আমাদের প্রাপ্য ইউনিফরমের কথা জেনারেল বডি মিটিং এ তোলেন। আজও তা পাইনি। আমাদের আবাব অগ্রিম বেতন পাওয়া যায় না। মানে দেওয়াব কোন নিয়ম নেই। অথচ দীর্ঘ পাঁচ ছ মাস পর মাইনে দেবার নিয়ম আছে। নানান অভিযোগ করে যখন আমবা ক্লান্ত তখন বাধ্য হয়ে ত্যাগপত্র দিই। এব মধ্যে এ আই টি ইউ সি সি এল ৪ ডিভিশনাল সচিব সুখরাম সিং এব সহযোগিতায় দু জন ক্যানটিন কর্মচারী ডিপারটমেনটে অস্থায়ী পদে চাকরি পেয়েছেন। আব আমাদেব ভাগ্যে জুটেছে টেলিফোন একসচেনজ গেটের 'নো অ্যাডমিশন' শব্দটা। বর্তমানে আমরা চারজন ক্যানটিন কর্মচাবী সম্পূর্ণ বেকার। ডিপারটমেনটে ৭০', মাইনে ছ মাসের বাকি পড়ে আছে।

জানিনা কবে উপরওয়ালা দেব দয়ায় তা পাব। বড় অসহায় হয়ে তাই আপনাদের স্মরণাপন্ন হয়েছি। আশা করি এই সমস্যাটি ডাক ও তার বিভাগ এবং জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবেন।

মহানন্দ মোদক
কর্মচারী, রাঁচি টেলিকম ক্যানটিন
রাঁচি, বিহার

রেলমন্ত্রী চান, অন্যরা বাগড়া দেন

পরিবর্তনে প্রকাশিত 'গণি খান কাজ চান' শিরোনামটি পড়ে সত্যিই ভাল লাগল। তবে তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিখলাম।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে রানাঘাট রবীন্দ্রভবনে এসেছিলেন বর্তমান রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী তাঁর নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে। তখনও ভাবতে পারিনি যে ইনিই একদিন ভারতের রেলমন্ত্রী হবেন। এটা অবশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরই কৃতিত্ব। কেননা একসময় ভারতীয় রেলের যে কী দুরবস্থা ছিল কল্পনাই করা যায় না, বিশেষ করে শিয়ালদা সেকসনের দুরবস্থার কথাই আমরা বিভিন্ন দৈনিক পত্র পত্রিকাতে পেতাম। ঠিক সেই সময়েই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার একজন সৎ এবং কর্মদক্ষ ব্যক্তিকে রেলমন্ত্রী করে যথার্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে মাননীয় রেলমন্ত্রী ট্রেনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন রেল কর্মচারীদের উপর ব্যবস্থা নিলেন। এতে কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়েও সমগ্র জনসাধারণের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রইলেন। জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার জন্য তিনি বিভিন্ন ট্রেন চালু করেন। এ ছাড়া কলকাতার পরিবহন সমস্যা মেটানর জন্য বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য চক্ররেলের কাজে হাত দেন।

কিন্তু এখানে কয়েকটা কথা আমি না বলে পারছি না। একদিন কোন একটি ট্রেন এসে থামলে জনৈক ভদ্রলোকের কাছে টিকিট চাওয়াতে ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসেবকটিকে ধাক্কা মারেন। আর বলেন 'ট্রেনে চেকিং-এর ব্যবস্থা করতে পারে না, টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে আসব আর বিনা টিকিটের যাত্রীরা বসে আসবে?' কথাটা বলায় ভদ্রলোকটিকে স্বেচ্ছাসেবকের দল যে কী মার মারল ভাবলে খারাপ লাগে। সত্যিই তো এক শ্রেণীর টিকিট কালেকটর আজও টিকিট কাটতে গেলে প্রস্তাব দেন, আমাদের হাতে কিছু দিলে তো আমরা নিয়ে যেতে পারি। এখনও রানাঘাট-বনগাঁ, রানাঘাট-লালগোলা, রানাঘাট-গেদে লাইনে এটা সচরাচর দেখা যায়। আবার এর পাশেই দেখা যায় টিকিট না কাটার দরুন স্টেশনে ব্যাপক চেকিং-এর তৎপরতা। মহিলাদের মাথার চুল পর্যন্ত ধরে ধর্দি নিয়ে যায় তাব আমাদের মানসিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? এরপর আরেক দিনের কথা, শিয়ালদার ভাগীরথী-এক্সপ্রেস ঢোকার পর, একজন মাসিক টিকিটধারী ভদ্রমহিলাকে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক বললেন, মাসিক টিকিট ভাগীরথীতে allow হবে না। ভদ্রমহিলাটি অন্য এক Daily-Passenger কে দেখিয়ে দেওয়াতে স্বেচ্ছাসেবকটি মাসিক টিকিটটি নিয়ে ঐ যে ভিড়ের মধ্যে উধাও হলেন তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

সব শেষে আমি একটা কথা বলতে চাই যে মাননীয় রেলমন্ত্রী শিয়ালদা-গেদে লাইনের কথা যদি একটু ভেবে দেখেন তবে ভাল হয়। শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ট্রেনগুলো ভালই আছে। কিন্তু গেদে লাইনে ঢুকে ট্রেনগুলোর যেন যাওয়ার শক্তি থাকে না। এক স্টেশন যেতে ১০-১৫ মিনিট কাটিয়ে দেয়। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে দাঁড়িয়ে এক শ্রেণীর অসাধু রেল ড্রাইভার কয়লা বিক্রি করেন। অনেক সময় দেখা গেছে ট্রেনটি ফেরার সময় ট্রেনে কয়লাই থাকে না। অবশ্য জনসাধারণও এর জন্য দায়ী। কোন কোন জায়গায় ইচ্ছামত ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ট্রেনের যন্ত্রপাতি খারাপ করা হয়। ভেনডাররা মালের ঝুড়িগুলো প্রায় প্রত্যেক দরজার মুখে রাখার জন্য সাধারণ যাত্রীরা গাড়িতে উঠতেই পারেন না। ট্রেনের সংখ্যাও কম, যার ফলে ভিড়ে গাড়িতে তিলধারণের জায়গা থাকে না। তা ছাড়া গেদে সীমান্ত থেকে আগত বিভিন্ন কালোবাজারিদের দৌরাত্মের জন্য রানাঘাট ঢোকার মুখে ট্রেনটি কোন কোন দিন ২০-৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের ট্রেনে আলো না থাকার জন্য ছিনতাই তো নিত্যকালের ঘটনা।

প্রসূন বিশ্বাস বগুলা, নদীয়া

ঠাকুর বাড়ি ও বিড়লা

বিড়লা বাড়ি সম্বন্ধে প্রবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। মনে হল দুটি সংবাদ বাদ গেছে :

১) যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরদের ছিল বিলাতি কাপড়ের এজেনসি, স্বদেশী আন্দোলনে ঠাকুররা তা বিক্রি করে দেন তাঁদের কর্মচারী বিড়লাকে।

২) বিড়লা পরিবার পিলানি (রাজস্থান)র বটে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাদের দ্বিতীয় প্রেম লক্ষণীয়। কলেজ, তারামণ্ডল, যাদুঘর, শান্তিনিকেতনে অনুদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিধু চক্রবর্তী চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

অম্লমধুর

'এই যে শুনুন দাদা—
বিশ টাকা দিন চাঁদা!'
বলল এসে পটলা, পুঁটে,
ন্যাপলা, ভোলা, হাঁদা।

'বিশটা টাকাই ছাড়ুন গুনে!
চমকে কেন গেলেন শুনে?
নাম মাত্র এই চাঁদাটাই
সবার নামে বাঁধা।'

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

আসছে পুজো, ভয়েতে বুক
কাঁপছে দুরু দুরু,
চাঁদা তোলার হিড়িক বুঝি
হল আবার শুরু!

বিল নাচিয়ে বলবে হেসে,
কেমন আছেন দাদা?
মায়ের সেবক এসে গেছি,
ছাড়ুন এবার চাঁদা।

মল্লিকা সিকদার

পুজোয় যত ভক্তি বাড়ে,
খরচ বাড়ে প্যানডেলে,
চক্ষু ওঠে চড়ক গাছে,
সাঁওতালডি-ব্যানডেলে।

মাইক বাজে, লাইট জ্বলে,
ভক্ত নাচে বাজনাতে,
জনগণের পকেট ফাঁকা,
মায়ের পুজোর খাজনাতে।

সনৎ মান্না

মোদের গরব মোদের আশা,
যা করি সব ভাসা-ভাসা;
কী যাদু নেতার কথায়,
চিড়ে ভেজায়,
কুচক্রী সব কুৎসা রটায়।
কাজের নামে ঢক্কানিনাদ,
কথায় কাজে ঘটছে প্রমাদ
তবু আঁকড়ে গদি আছি খাসা।।

তৃষিত বর্মন

বনধ্ ডেকেছে বামফ্রন্ট,
ব্যাপারটা তাই সরকারি।
বিপ্লবটা দূরেই থাকুক,
ইমেজখানা দরকারি।

সত্যপ্রকাশ শ্রীবাস্তব

স্টেটবাসের স্ট্যাটাস ভারি,
জমিদারি ঝোঁক।
আটশো বাসের পিছু খাটে
বার হাজার লোক।

তাই তো বাসের পায়া ভারী,
থাকেন গ্যারেজ ঘরে,
নড়তে চড়তে পারেন নাকো,
শুধুই মাথা ঘোরে।

সরোজেন্দু মোহন ঘোষ

মিটিং করি মিছিল করি
ময়দানে আর মাঠে,
হাট-বাজারের তোলার টাকায়
মজাসে দিন কাটে।
অর্ধেক নিই ক্যাডাররা আর
বাকি নেতার গাঁটে।

মঞ্চে তারা হাত-পা ছুঁড়ে
কেবল গলা ফাটান,
মিটিং এবং মিছিল করে—
'গ্রেট ইসটারনে' ইটিং করে,
প্রগতিশীল দাদারা সব
বিপ্লবী দিন কাটান।

শমীন্দ্র ভৌমিক

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

পাঁচ মিনিট

হরতালদা'র কাজের আহ্বান

হরতালদা খুব ভাবিত হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য বারের মত এবারও বাংলা বনধ ডাকা হয়েছে। বনধের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি ও বনধের সাফল্যে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিগুলিও আগাম তৈরি করে রাখা হয়েছে, কেননা গতবারই নাকি নেতারা তাড়াহুড়োর মধ্যে বনধের সাফল্যে অভিনন্দন জানানর বিবৃতি লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বিরোধী দল তৈরি ছিল। তাঁরা বনধ ব্যর্থ করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে যে বিবৃতি দেন তা ছাপা হয়ে যায়। এ নিয়ে হরতালদাকে নাকালের এক শেষ হতে হয়। কারণ তাঁর ওপরেই তো বার্ষিক হরতাল উদযাপনের ভার। হরতালদা আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে হরতাল করে আসছেন। এখন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর রুটিনের মত হয়ে গিয়েছে। শুধু তারিখটা বলে দিলেই হল। তারপর বাকিটা হরতালদার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। এখন তো বেশ কবছর সরকার হরতাল ডাকছেন, কিন্তু আগে তো তাঁরা বিরোধী দলে ছিলেন। তখন কত ল্যাপা পুইয়ে হরতাল সফল করতে হত। গুলি লাঠি খেতে হত। একবার পুলিশের একটা টিল হরতালদার চুরোটে এসে লাগে। তাতে চুরোটের কোন ক্ষতি হয়নি। হাভানায় তৈরি খাঁটি চুরোট। এক কমরেড কিউবা থেকে কিনে এনে দিয়েছিলেন। বেশ ঘাত প্রতিঘাত সক্ষম।

এ হেন হরতালদা এবার এত বিমর্ষ কেন? না, লোকে এবার পুজোর ঠিক মুখে হরতাল চাইছে না, বলছে, হরতাল করে দেশের কোন মঙ্গল হয় না, মধ্যে পড়ে বেশ কিছু লোকজন মারা পড়ে। তা ছাড়া কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আর কতদিন চালাবে, হরতালদা, তোমার জারিজুরি আমরা সব ধরে ফেলেছি। আমরা আর হরতাল করছি না, করব না।

এই খবর পেয়ে হরতালদার চোখে ঘুম নেই। সেই সময় আমার সংগে দেখা।

বললাম, হরতালদা, এত বিমর্ষ কেন? সামনে হরতাল, এখন আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে।

হরতালদা বললেন : আর হরতাল। বহুদর্শী, আমার এবার সব প্রেসটিজ গেল। লোকে হরতালের ওপর দারুণ চটা। সবাই বলছে হরতাল করবে না। আমার বোধহয় চাকরি থাকবে না। তার মানে ব্যাক টু দি প্যাভেলিয়ন।

আমি বললাম : ও এই কথা। আচ্ছা আমার পরামর্শ যদি নেন, তা হলে মাভৈঃ

: তোমার আবার কী পরামর্শ—লে হালুয়া! হরতালদার কানে কানে পরামর্শটা দিয়ে দিলাম। শুনে ওঁর মুখ উল্লসিত হয়ে উঠল।

এরপর থেকে হরতালদা কাগজে বিবৃতি দিয়ে জনগণকে জানিয়ে দিলেন, সরকার যে হরতাল ডেকেছেন, তার সংগে তিনি আর একমত নন। এ কথা সত্যি যে এখন হরতাল করে কিস্যু হয় না। ওই দিন হরতালের বদলে রাজ্য জুড়ে কর্ম দিবস পালন করা হবে। অর্থাৎ ওই দিন কেউ কোন ছুটি নেবেন না। সবাই অন্তত একদিনের জন্য ঠিক টাইমে অফিসে আসবেন, ওই দিন কোন ওভারটাইম দেওয়া হবে না। কলকারখানা, সাঁওতালদি, ব্যানডেল সর্বত্র ওই একদিন রেটেড ক্যাপাসিটি অনুযায়ী উৎপাদন হবে। মহিলারা ওই দিন অফিসে উল বুনবেন না। পুরুষেরা দুটোর পর খেলা দেখতে যাবেন না। ছেলেমেয়েরা সবাই একদিন সমস্ত কাজ করবে। অধ্যাপকরাও অনুপস্থিত হবেন না। হরতালদার ওই ঘোষণা সর্বত্র চাউর হয়ে গেল। এদিকে দলীয় নেতারা হরতালদাকে গিয়ে আর কি। হরতালদা এমন আপনি পার্টি বিরোধী কথাবার্তা বলছেন। হরতালদার পদত্যাগও দাবি করা হতে থাকল। হরতালদা শুধু মিটি মিটি হাসতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন সবুর কর, সবুর কর, সবুরে সত্যি মেওয়া ফলল। দেখা গেল নির্ধারিত দিনে হরতালে সাকসেসফুল, ইসকুল, কলেজ, অফিস, আদালত কোথাও একটা লোকও নেই। হরতাল বিরোধীরা প্রচুর বোমা যোগাড় করে রেখেছিল। হরতালপন্থীদের উপর ফেলবে বলে। কিন্তু হরতালপন্থীদের আর বাড়ি থেকে বেরুবার দরকার হল না।

খবরের কাগজগুলো লিখল, এমন স্বতঃস্ফূর্ত বনধ আর ইতিহাসে হয়নি। হরতালদার কাজের আহ্বান ব্যর্থ হল। হরতালদা মুচকি হেসে বললেন, বহুদর্শী কী খাবে বলো!

বহুদর্শী

ভুতুড়ে ফোন ঃ ক্যাপসুল আমার কাছে

তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল উধাওয়ের পেছনে কোন রহস্য?

পিনাকী মজুমদার

সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস থেকে রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থটির শেষ পর্যন্ত হদিশ মিলেছে রাজাবাজারের একটি পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকানে। গত ৯ সেপটেমবর রাত নটা নাগাদ এই তেজস্ক্রিয়ের সন্ধান পান এ-ব্যাপারে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদলটি। গত ৫ সেপটেমবর থেকে এই দলটি রেডিয়েশন মনিটর যন্ত্রের সাহায্যে তদন্ত চালাচ্ছিলেন। এই কদিন ধরে তারা সাহা ইনসটিটিউটের ক্যামপাস তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। কিন্তু কোন হদিশ করতে পারেননি। অবশেষে ৯ সেপটেমবর বিকেলের দিকে অনুসন্ধানী দলটি যন্ত্রপাতি নিয়ে রাস্তায় নামেন। কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পরই মনিটরের কাঁটা নড়ে ওঠে। তেজস্ক্রিয়ের হদিশও পাওয়া যায় সংগে সংগেই।

তেজস্ক্রিয়ের সন্ধান পাওয়ায় স্বভাবতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ইনসটিটিউট কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষ। কিন্তু সেই সংগে পুলিশের মাথায় নেমেছে জটিল চিন্তার ভার। তারা ভেবে দেখতে চাইছেন, এ কি নেহাতই হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা? নাকি এর পেছনে রয়েছে কোন গভীর চক্রান্ত?

অনুসন্ধান পর্ব

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের সায়েনস কলেজ এবং সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস দপ্তরের পাঁচিল ঘেরা বিস্তীর্ণ চত্বরে তখন একদল ছাত্রছাত্রীর জটলা। বিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের এই ঔৎসুক্য কিন্তু তাদের পাঠ্যসূচির কোন জটিল তত্ত্বের সমাধানপর্বের জন্যে নয় - তাদের পরিচিত কয়েকজন নামী অধ্যাপক এবং শিক্ষককে গোয়েন্দার ভূমিকায় লক্ষ করেই তাদের এই চাপা ঔৎসুক্য ফুটে উঠছিল চোখেমুখে।

তদন্তকারী এই বিচিত্র গোয়েন্দা দলের হাতে ছিল না 'পুলিশ কুকুরের' গলার চেনের প্রান্তভাগ। তার পরিবর্তে তাদের হাতে লক্ষ করা গিয়েছিল বিচিত্র কিছু যন্ত্রপাতি। একজনের হাতে একটা বাকস - বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার পরিচিতি 'রেডিয়েশন মনিটর'। তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে কয়েক মিটার দীর্ঘ তার। তারের মাথায় 'মাউথ পিস'-এর মত একটা যন্ত্র বা রেডিয়েশন রিসিভার।

কিন্তু গত ৫ সেপটেমবর থেকে ৯ সেপটেমবর পর্যন্ত মোট পাঁচদিন ধরে বিচিত্র এই 'বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দা' দলের প্রায় সব রকম প্রচেষ্টাই বানচাল হয়েছে বারে বারে। রেডিয়েশন মনিটরের কাঁটায় একবারের জন্যেও সামানাতম তরংগ ওঠেনি, অবসান হয়নি চরম উদ্বিগ্নতারও।

গত পাঁচদিন ধরেই এই উদ্বিগ্নতা শুধুমাত্র ওই 'বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দা দল' কিংবা সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস কর্তৃপক্ষকেই আচ্ছন্ন করে রাখেনি - কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এবং কলকাতায় প্রায় ৭০ লাখ লোককেও শংকিত করে রেখেছে। সার্বজনীন এই শংকার কারণ, সামান্য আয়তন বিশিষ্ট একটি সিসের আধার বা ক্যাপসুল, যার মধ্যে রয়েছে সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় – রেডিয়াম-বেরিলিয়াম সোরস। গত ২ সেপটেমবর সাহা ইনসটিটিউট বিলডিংয়ের চার তলায় অবস্থিত ট্রম এসসি নিউক্লিয়ার ফিজিকস শাখার ল্যাবরেটরি থেকে এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থটি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। ইনসটিটিউট কর্তৃপক্ষ সূত্রেই জানা যায় টাকার মূল্যে এ পদার্থটি অমূল্য কিছু নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়। কিন্তু চিন্তা অন্য কারণে। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি দেহের সংস্পর্শে আসামাত্রই আগুনে পুড়ে যাওয়ার মত অনুভূতি হবে - যার পরিণতি ব্লাড ক্যানসার। কর্তৃপক্ষ সূত্রেই বলা হয়েছে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি থেকে গামা রশ্মি এবং নিউট্রনের বিকিরণ ঘটে। সুতরাং রেডিয়াম-বেরিলিয়াম সোরসের এই ক্ষুদ্র ক্যাপসুল নিয়ে চলছিল নানা দুঃশ্চিন্তা এবং আশংকা। বলা বাহুল্য, কিছুদিন আগে কলকাতারই একটি হাসপাতাল থেকে এরকমই একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ উধাও হয়ে গিয়েছিল – যার হদিশ মিলেছিল ধাপার আবর্জনা স্তূপে।

রহস্যজনক উধাও

১৯৫০ সালে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহার হাতে গড়া 'সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস' – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েনস ফ্যাকালটি চত্বরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল নিউক্লিয়ার ফিজিকস বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার প্রয়োজনে। যদিও একই চত্বরের মধ্যে অবস্থিত তবুও এই সংস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়। বর্তমানে এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। চলছে agreement between the three parties-এর ভিত্তিতে। এই তিনটি পারটি বলতে – কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচালনার জন্যে রয়েছে আট সদস্য বিশিষ্ট গভরনিং কাউনসিল। এর মধ্যে চার জনই হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত সদস্য। বাকি চারজন হচ্ছেন - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর, ভাইস চ্যানসেলরের মনোনীত একজন প্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের শিক্ষা সচিব এবং সাহা ইনসটিটিউটের ডিরেক্টর।

সাহা ইনসটিটিউটের কর্তৃপক্ষ সূত্রেই জানা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে এর সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও ওদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কোন নীতির ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা কোন চুক্তিনামা আছে কিনা, সে কথা জানাতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। তারা শুধু বলেছেন এই ব্যবস্থাই চলে আসছে এর জন্মক্ষণ থেকে। সুতরাং এই মুহূর্তে সে সব বিষয়ে বিশদ কিছু বলা যাবে না, জানাও নেই সেরকম কিছু।

সুতরাং এই পারস্পরিক সমঝোতার ফলেই সাহা ইনসটিটিউট

গ্যাস স্ট্রিটের এক পুরনো লোহার দোকানে রেডিয়াম-বেরিলিয়াম-এর সন্ধানে আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

অনেক যন্ত্রপাতি দান করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকালটিতে। এম এসসি নিউ-ক্লিয়ার ফিজিকসের ল্যাবরেটরিও বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে ওই একই বাড়ির চতুর্থ তলায়। শুধু তাই নয় – অন্যান্য অনেক যন্ত্রপাতির মতই এম এসসি নিউক্লিয়ার ফিজিক-সের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের প্রয়োজনে সাহা ইনসটিটিউটের রেডিয়াম-বেরিলিয়াম ক্যাপসুলটির ওপরই ভরসা করে থাকতে হয় ওই ক্লাসের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের।

রেডিয়াম-বেরিলিয়াম সোরস নামক এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করেছিলেন পঞ্চাশের দশ-কের গোড়ার দিকে। যার বর্তমান মূল্য বড় জোর আট হাজার টাকা। কর্তৃপক্ষের মতে এটা দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে খোলা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তবে সরকারি ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই তেজস্ক্রিয়টি গত তিরিশ বছর ধরে সংগ্রহ করেনি বা চেষ্টা করেনি। সাহা ইনসটিটিউটের তেজস্ক্রিয়টি ধার নিয়েই ক্লাস চালিয়েছে। এমনকি পরীক্ষাও গ্রহণ করে এসেছে ওটিকে নির্ভর করেই।

গত ২৯ আগসট থেকে এরকমই একটা পরীক্ষা পর্ব চলছিল এম এসসি নিউক্লিয়ার ফিজিকসের। পরীক্ষা শেষ হবার কথা ২ সেপটেমবর।

এই পরীক্ষার প্রয়োজনেই সাহা ইনসটিটিউটের এই শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থটিকে ওই সংস্থারই ইরেডিয়েশন রুম থেকে প্রতিদিন আনা হচ্ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এম এস সি নিউক্লিয়ার ফিজিকস ল্যাবরেটরিতে। পরীক্ষা শেষে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ইরেডিয়েশন রুমে।

এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি বহন করাও সহজ নয়। যেহেতু এটি দেহের সংস্পর্শে এলেই এর প্রভাবে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই এটিকে বহন করারও একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা ধাতব দণ্ডের মাথায় একটা স্ক্রু দিয়ে একটা পেতলের আধার আটকান। এই আধারের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থটিকে ঘিরে থাকে মোমের প্রলেপ। মোমের প্রলেপের চারপাশে সিসের পাত। এত কিছু ব্যবস্থা বিকিরণ প্রতিরোধ করার জন্যেই। এই অবস্থায় এটাকে বহন করার জন্যে ধাতব দণ্ডটাকে যথা সম্ভব দেহের থেকে দূরে সরিয়ে আনা নেওয়া করাই রীতি। সে রীতি বা এক বিরল প্রতিক্রিয়া জানের ছাত্রছাত্রী, প্রফেসর বা আধিকারিক শিওন সবাই।

যাই হোক, গত ২ সেপটেমবর পরীক্ষার শেষ দিনেও যথারীতি ইরেডিয়েশন রুম থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থটিকে আনা হয়েছিল ওই ল্যাবরেটরিতে। পরীক্ষাও চলেছে যথারীতি। শেষ পরীক্ষার্থী ছিলেন একজন ছাত্রী। ভাস্বতী গাংগুলি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই জানা যায় ভাস্বতী তার পরীক্ষা পুরো করেছে। অর্থাৎ রেডিয়াম-বেরিলিয়াম সোরস যথারীতি ব্যবহার করেছে।

সুতরাং এবার পরীক্ষা শেষ। তেজস্ক্রিয়টি ফিরে যাবার কথা সাহা ইনসটিটিউটের ইরেডিয়েশন রুমে। কিন্তু না। ওদিন সেটা স্বস্থানে ফিরে যায়নি। পড়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতেই। কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃপক্ষের মুখ থেকে শোনা গিয়েছে, 'চুরি যাওয়া বা উধাও হবার ঘটনা এখানে কখনও ঘটেনি। সুতরাং অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভাবা হয়েছিল পরে আনা যাবে।'

পরের দিন শনিবার। এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকালটির কোন ক্লাস থাকে না। তাই সাহা ইনসটিটিউটেরও গরজ হয়নি ওটিকে ফিরিয়ে আনার। অবশেষে সোমবার ৫ সেপটেমবর সকালে একজন অ্যাটেনডেন্ট হীরা-লাল যায় তেজস্ক্রিয়টি ফিরিয়ে আনতে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই হীরালাল অবাক। জলের বালতির মধ্যে যথারীতি ধাতব দণ্ডটা রয়েছে, কিন্তু তাতে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুলটা নেই। সংগে সংগেই খোঁজ খোঁজ .... খোঁজ। রেডিয়েশন মনিটর নিয়ে কর্তৃপক্ষ কাজে নেমে পড়েন।

ভূতুড়ে ফোন : সাক্ষী পরিবর্তন

ছোট্ট এই তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুলটির খোঁজে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা পুলিশও নেমে পড়েছেন। গঠিত হয়েছে সাতজন বৈজ্ঞানিকদের তদন্ত কমিটি। তা ছাড়াও ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ ইনসটিটিউটের হেলথ ফিজিকস থেকেও তদন্তের কাজে এসেছেন কয়েকজন। কিন্তু ৯ সেপটেমবর রাত পর্যন্ত তারা কোন হদিশই করতে পারেননি।

এদিন বেলা বারটা নাগাদ হাজির হয়েছিলাম এ ব্যাপারে বিশদ খবর সংগ্রহ করতে। তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ডঃ সুবিমল সেন যথারীতি বিবরণ দিচ্ছিলেন। পাশে ছিলেন তদন্ত কমিটিরই আরও দু জন। এমন সময় সুবিমলবাবুর টেবিলের ডানদিকে রাখা দুটি কালো রঙের টেলিফোনের একটি ঝনঝনিয়ে উঠল। সুবিমলবাবু ফোন তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল :

– আপনাদের হারিয়ে যাওয়া রেডিয়াম-বেরিলিয়ামের হাফ লাইফ ষোলশো বছর বলেছেন – এটা ঠিক নয়।

– আপনি জানলেন কী করে? আপনি কে?

– আমি তো জানবই। কারণ ওটা এখন আমার কাছে।

– সে কী! আপনি...... আপনি কে? – সুবিমলবাবু ফ্যাকাশে মুখে প্রশ্ন করলেন। অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এল – 'সেটা বললেই তো হয়ে গেল'। সামান্য সময়ের নিস্তব্ধতা। সুবিমলবাবু আবার তাড়া দিলেন – 'হ্যালো'। তারপরই ভূতুড়ে কণ্ঠে ভেসে এল একটা আশ্বাসবাণী – 'ভয় পাবেন না। ওটা কোন ক্ষতির প্রয়োজনে ব্যবহার হবে না। জন-হিতকর কাজেই ব্যবহার হবে!...... খুট'। লাইন কেটে গেল।

শুরু হল ছুটোছুটি। ডিরেকটর এম কে পালকে জানান হল। জানান হল ডি সি নরথ প্রসূনবাবুকেও। সংগে সংগে আমাকে অনুরোধ, এ কথা কাউকে জানাবেন না। বললাম – অন্তত ১৪ দিন চুপ করে থাকব।

কেন? এবং কেন?

চুপ করে থাকব, কারণ তদন্তের কাজে ক্ষতি হোক এটা কারুরই কাম্য নয়। অন্তত সাংবাদিকদের তো নয়। আর এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে ১৪ দিন পরেই। সুতরাং সেক্ষেত্রে লিখতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে – ওটা ভাঙা লোহার দোকানে গেল কী করে? কেউ চুরি করে বিক্রি করেছে? নাকি রয়েছে অন্য কোন উদ্দেশ্য?

ভূতুড়ে টেলিফোনের প্রসংগ আপাতত থাক। কর্তৃপক্ষের মতে – 'এটা যে কী হল কিছুই বুঝতে পারছি না। হারালে তো এত খোঁজাখুঁজিতে পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ......'

অসমাপ্ত বাক্যের মতই অপরি-ণত সিদ্ধান্ত। হারাবার কথাও মানতে পারছেন না, আবার চুরির কথাও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এদিকে ভূতুড়ে টেলিফোন সংলাপ কেও ভাবছেন – কেউ ঠাট্টা করছে। কিন্তু সত্যিই কি ঠাট্টা?

পুলিশ দপ্তর কিন্তু এটাকে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বলে মানতে পারছেন না। হারালে ল্যাবরেটরির জায়গায় ওটা পড়ে থাকত। এখন আশপাশে কোথাও। কিন্তু গত পাঁচদিন ধরে যেভাবে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল তাতে ওটা লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং পুলিশের ধারণা ওটা চুরিই হয়েছিল।

পুলিশের এই ধারণা যদি সঠিক হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কে এর নায়ক?

যে কোন অপরাধের কিনারা হয় মোটিভ বিচার করে। এক্ষেত্রে চুরি যাওয়া বস্তুটি এমন কিছু অমূল্য নয়। হাজার আটেক টাকা দাম। সাধারণ ল্যাবরেটরিতে কোন কাজে লাগে না। তাই চাহিদা থাকারও কথা নয়। তা ছাড়া ওটাকে সরান কোন সাধারণ লোকের কাজ নয়। কারণ না জেনে ওটাকে কেউ নিতে গেলে ওর বিকিরণের প্রতিক্রিয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হত। তা ছাড়া ওই ল্যাবরেটরিতে বাইরের লোক ঢোকাও সহজ নয় বলেই পুলিশের অভিমত। এ ছাড়াও ওর ধাতব দণ্ডটা যথাস্থানে ছিল। সুতরাং ওটা নেবার জন্যে ওই রকম দণ্ড জোগাড় করতে হয়। সেই দণ্ড হাতে করে পাঁচিল ঘেরা চত্বরের পেছনের দিকের বাড়ির চারতলায় উঠে ওটা সরানও কম কথা নয়।

সুতরাং পুলিশের অনুমান ওটা দণ্ড সমেতই সরান হয়েছিল। পরে দণ্ডটিকে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে। বস্তুটি খুব বেশি দূরও যায়নি। প্রথমে দণ্ড সমেত চুরি করে পরে ওই রকম অন্য কোন দণ্ডের সাহায্য নিতে হয়েছে। অতএব পুলিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা এটির সংগে পরিচিত কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এটাকে সরান। কিন্তু কী লাভ তার?

প্রকৃতপক্ষে এর কার্যকারিতা এবং মূল্য বিশ্লেষণ করলে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর সেকারণেই ওটাকে পাওয়া গেছে স্ক্র্যাপের দোকানে। পুলিশের মতে – এটা সরানর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

পুলিশের এই ধারণার পেছনে রয়েছে কতকগুলো ঘটনা। তারা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন ওই সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু কর্মীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে। তারা অনেকেই বর্তমান কর্তৃপক্ষকে চান না। কিন্তু বর্তমান কর্তৃপক্ষকে সরাতেও পারছেন না। সুতরাং পুলিশের মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে বর্তমান কর্তৃপক্ষকে হেনস্থা করার জন্যেই কি তেজস্ক্রিয় পদার্থটি সরিয়ে ফেলা? ভূতুড়ে টেলিফোন তাদের এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করেছে। □

রাজীব এগিয়ে আসছেন, ডঃ জগন্নাথের অপসারণ তার প্রথম প্রমাণ

অভিমন্যু সেন

গত কয়েক মাস ধরে নয়া দিললিতে গুজব চলছিল যে রাজীব গান্ধীর সব কথায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সায় দেন না। অনেকটা এই রকম রটছিল যে রাজীব গান্ধী এখনও সবকিছু বোঝবার চেষ্টা করছেন, কাজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতটাই যথেষ্ট নয়। হয়ত এর অনেক কিছুই ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিহারের শাসকদলের রাজনীতির পট পরিবর্তনের সংগে সংগে রাজধানীর বিভিন্ন নেতা ও সাংবাদিকদের কাছে রাজীব গান্ধীর ক্ষমতা ও গুরুত্ব সত্যিই কতখানি তা নিয়ে ধারণা বদলাতে শুরু করেছে।

ঠিক যে মুহূর্তে রাজীব গান্ধী সক্রিয় রাজনীতিতে এলেন তখনও সঞ্জয় গান্ধীর প্রভাব বলিষ্ঠভাবে দলের মধ্যে কাজ করছিল। ঠিক তার কিছুদিন বাদেই মানেকা গান্ধীর শাশুড়িগৃহ পরিত্যাগ করার পর সাময়িক দমকা হাওয়ার মত কংগ্রেস সংসদীয় দলে কিছু চাপা আলোচনা শুরু হয়েছিল। সঞ্জয় গান্ধীর আমলে যাঁরা সুবিধে করতে পারেননি তাঁরা রটিয়ে দিলেন যে সঞ্জয় গান্ধীপন্থী অনুগতদের রাজীব গান্ধী ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন এবং একে একে তাঁর লোক বসাবেন। অথচ যাঁরা রটালেন এসব তাঁরা বুঝতে চাইলেন না যে আক্ষরিক অর্থে যাঁরা সঞ্জয় গান্ধীর অনুগামী বলে পরিচিত তাঁদের সবাইকে তাড়ালে বা অপমান করলে সংসদীয় দলের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগত, তা যত হালকাই হোক। আর তার সুযোগ পেত মানেকা গান্ধী ও তাঁর মা অমতেশ্বর আনন্দ। বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী ও বুদ্ধিমান রাজীব গান্ধী তা হতে দেবেন কেন? তাই এই রটনাকে মোকাবেলা করে মানেকা গান্ধীর চাল ভণ্ডুল করে দিলেন বেশ কয়েকজন যুবককে কেন্দ্রে মন্ত্রী করে। এবং পরে আর কয়েকজনকে রাজীব গান্ধী কাছে টেনে নিলেন। ঠিক এই সময় দিললিতে রটে গেল যে রাজীব গান্ধীই এসব করিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। যেসময় এ ঘটনা ঘটে তখনও রাজীব গান্ধী নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের রাজনীতির কোন লাইন নিতে পারেননি এবং দায়িত্বও গ্রহণ করেননি। তবে একটু আধটু ভাবছিলেন যে মানেকার প্রথমদিকের সেনটিমেনটাল ওয়েভকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়। আসলে এই গোটা ব্যাপারটাই শ্রীমতী গান্ধীর পরিকল্পনা, যা রাজীবকে সাহায্য করেছে প্রথম দমকা হাওয়া থেকে সামলে নেবার জন্য। এবারে আনতুলে ও জগন্নাথ পাহাড়িয়া বিতাড়ন-পর্ব। এক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর সমর্থন থাকলেও সমগ্র ব্যাপারটা হল শ্রীমতী গান্ধীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত। এর মধ্যে আনতুলে গেলেন আদালতের জন্যে আর পাহাড়িয়া গেলেন হাই কম্যানডের রোষে।

অতএব এ ক্ষেত্রেও সরাসরি যে রাজীব গান্ধীর একমাত্র ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছিল তা বলা যায় না।

সম্প্রতি মাস তিনেক হল রাজীব গান্ধীকে তাঁর নিজস্ব ভাবমূর্তি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা আয়োজন শুরু হয়েছে দিললির সরকারি মহল এবং কংগ্রেস দলের ভেতরে। যদিও তিনি সাধারণ সম্পাদক এবং কয়েকটি রাজ্যের দায়িত্বে আছেন কিন্তু একথা পুরোপুরি সত্য যে, সব রাজ্যেরই ভালমন্দের ব্যাপারে সব কর্তারাই রাজীব গান্ধীর পরামর্শ ছাড়া চলেন না। এমনকি অন্যান্য সাধারণ সম্পাদকরাও রাজীব গান্ধীর সংগে পরামর্শকে খুবই মূল্য দেন। পশ্চিমবংগের ভারপ্রাপ্ত সি এম স্টিফেনকেও রাজীব গান্ধীর সম্মতি নিয়েই এ রাজ্যের ব্যাপারে কথা বলতে হয়। অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বসন্তদাদা পাতিলকে আরও একটু মজবুত করার জন্যে সেখানকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বদল হল। কিন্তু ঘোষণার আগের দিন রাজীব গান্ধীর সংগে পরামর্শ করেই তা করা হয়েছে। খালিস্তানী নেতা জগজিত সিং চৌহানকে আমেরিকান ভিসা-পাশপোরট দেওয়া এবং সেই প্রসংগে ভারতস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বারনেসের মন্তব্য নিয়ে রাজীব গান্ধী প্রথম ধিক্কার জানান এবং সেইদিনই দিললির কংগ্রেসীদের দিয়ে দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করিয়ে দেন। এরপর অকালিদের ট্রেন রোকো আন্দোলনকে বানচাল করতে সেদিন সব ট্রেন চলাচল বন্ধ করে পাঞ্জাব থেকে ট্রেনগুলো সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত সাউথ ব্লকে বসে অন্যান্য মন্ত্রীদের সংগে রাজীব গান্ধীই গ্রহণ করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী বিদেশে। বলা বাহুল্য এসবের ক্ষেত্রে কোথাও কার্যকর নির্বাহক সভাপতি কমলাপতি ত্রিপাঠীর কোন ভূমিকা ছিল না। বরং দেখা গেছে তিনি যা যা বলেছেন ঠিক ঠিক তার উল্টোটা হয়েছে। এবার তোলা যাক রাজীবের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর প্রসংগ। রাজীব গান্ধীর সোভিয়েত সফরের যে গুরুত্ব ছিল এবং যে পর্যায়ের নেতৃত্ব তাঁর সংগে কথা বলেছেন তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জোতিবাবুর ভাগ্যেও জোটেনি। এমনকি অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভাগ্যেও জোটেনা। এর ফলে এটা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠল যে রাজীবকে প্রতিষ্ঠিত করার বন্দোবস্তের যে পরিকল্পনা তা কার্যকর হতে চলেছে। নম্র স্বভাবের এই লোকটি কিন্তু ধীর ভাবে এগোচ্ছেন। প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর মত গতিশীল ও চটপট সিদ্ধান্ত নেবার মানুষ হয়ত ইনি নন। কিন্তু বেশ পরিপাটি করে অনেককে খুশী রেখে চলার পথ তিনি বেছে নিয়েছেন। সম্প্রতি যুব কংগ্রেসের ট্রেনিং ক্যামপ ও কংগ্রেসের ট্রেনিং ক্যামপ তাঁরই আইডিয়া। তবে নিন্দুকেরা বলে থাকেন যে কংগ্রেসের কোন বড় বিপর্যয়ের আগে নাকি নেতারা শিবির ডাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যেমন জরুরী অবস্থার প্রাক্কালে নরোরা শিবির ও পরবর্তীকালে বিশদফা কর্মসূচীর শিবির।

কয়েকদিন আগে দিললিতে যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সংবর্ধনা হল সেখানেও কিন্তু পুরস্কার বিতরণ করার মুখ্য ভূমিকায় কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা লোকসভার স্পিকার ছিলেন না, ছিলেন রাজীব গান্ধী। তাঁর এশিয়াডের ইমেজকে ধরে রাখার জন্য এবং সব জায়গায় তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য যে মনোভংগি নেওয়া হয়েছে এটা তারই রূপায়ণ, কোন ব্যতিক্রম নয়।

এবারে আসুন বিহারের কথায়। বিহারের ডঃ জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত ও শক্ত খুঁটির মুখ্যমন্ত্রী। একবার ললিত নারায়ণ মিশ্র জীবিত থাকার সময়ে জগন্নাথ মিশ্রকে সরিয়ে আবদুল গফুরকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের মোকাবিলা না হোক অন্তত আগুনে যেন ঘি বেশি না পড়ে তা দেখাই ছিল তখন এর উদ্দেশ্য। তার ফলে কিছু কাজ হয়েছিল। স্বয়ং জয়প্রকাশ নারায়ণ

পন্থকে সং মানুষ বলেছিলেন আর জগন্নাথ মিশ্রকে দুর্নীতি পরায়ণ বলেছিলেন। অদ্ভুত রাজ্য এই বিহার! সেখানে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনতা রাজ কায়েম করে, জয়প্রকাশজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। অথচ সেখানকার মানুষ আবার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জগন্নাথ মিশ্রকে সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত ফেরত নিয়ে এল ক্ষমতায়।

জগন্নাথ মিশ্রের সাহস কম নয়। বিহারের মত-সংস্কারবাদী জাত-পাতের রাজ্যে নিজে মৈথিলী ব্রাহ্মণ হয়ে এবং যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর মিশ্র উপাধি বর্জন করে শুধু জগন্নাথ নামে পরিচিত হলেন। বিরোধীদের আক্রমণ যতই হোক না কেন নিজে কিন্তু সাহস করে এ মোকাবেলা করতে গিয়ে সব ভাষা-ভাষীদের পঠন-পাঠনের বিষয়ে প্রস্তাব নিলেন। উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় পাঠ্যভাষা করে বিহারের মুসলমানদের মন জয় করলেন। এবং মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে মাইনরিটি ফিনানস করপোরেশন গঠন করে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। অনুন্নত শ্রেণীর জন্য মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন। আর ঠিক যখন বুঝলেন দিল্লির পৃষ্ঠপোষকতা তেমন পাবেন না তখন বিধানসভায় রাজ্যের অনুন্নত চেহারার জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করলেন। ডঃ জগন্নাথ টের পেয়ে গিয়েছিলেন, যে যাই বলুক রাজীব গান্ধী আর তাঁকে ক্ষমতায় রাখবেন না। ডঃ জগন্নাথের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ ছাড়াও কয়েকটি বিষয় কেন্দ্র ও বিশেষ করে রাজীব গান্ধী সমর্থন করেননি। প্রথমত তাড়াহুড়ো করে জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য মিশ্র উপাধি ত্যাগ করে ডঃ জগন্নাথ হওয়া দিল্লি ভাল চোখে দেখেননি এই জন্যে যে মূল সমস্যা জিইয়ে রেখে জগন্নাথ নিজের ইমেজ বানাতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত দিল্লির নির্দেশে প্রেস বিল প্রত্যাহার হচ্ছে এমন ঘোষণা করলে কেন্দ্রের নেতৃত্বের ইমেজ আরও ভাল হত সাংবাদিকদের কাছে। তা না করে জগন্নাথ নিজে থেকেই সব করলেন। জগন্নাথ যে মানেকা গান্ধীর লোকদের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখেন না এমন কোন জোরাল যুক্তি দিয়ে তিনি কখনই কেন্দ্রকে বোঝাতে পারেননি। তাঁর প্রশাসনের দুর্নীতি, সম্প্রতি ববি হত্যা রহস্য এবং আরও কয়েকটি ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ পেশ করতেন অন্যান্যদের মধ্যে বিহারের বর্তমান মন্ত্রী নাগমণি-বা। আর দিল্লিতে সংসদ সদস্যকে তেওয়ারী। সীতারাম কেশরী অথবা দিল্লিতে অর্জনাগুলোকে সাজিয়ে জগন্নাথ-বিরোধী শিবিরের শক্তিকে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী প্রথম দিকে চেয়েছিলেন যে সুপরিম কোরটের মামলায় যদি জগন্নাথ হেরে যান তাহলে আনতুলের মত তাঁকেও পদত্যাগ করতে বলবেন। কিন্তু মামলায় জেতবার পর শ্রীমতী গান্ধী মত পালটে ছিলেন। জগন্নাথের বিদায়ের মাত্র কুড়ি বাইশ দিন আগেও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীদের শ্রীমতী গান্ধী তিরস্কার করেছিলেন দিল্লিতে। বলেছিলেন একসঙ্গে গিয়ে কাজ করতে।

কিন্তু রাজীব গান্ধী ছিলেন বেপরোয়া। তিনি খবর নিয়েছিলেন বিহারের অবস্থা খারাপ – নির্বাচনে ভাল ফল করতে গেলে এখন থেকেই পরিচ্ছন্নভাবে একজন নতুন ভাল ইমেজ-সম্পন্ন লোক নিয়ে কাজ শুরু করা দরকার। কাজেই রাজীব গান্ধীর ইচ্ছাই কার্যকর হল। রাজীব গান্ধীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বুটা সিং অন্য জায়গায় পরিদর্শক হয়ে যান কিন্তু বিহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রণব বাবুকে মনোনীত করলেন। দিল্লিতে গুজব ছিল যে জগন্নাথ সহজে পদত্যাগ করবেন না এবং তাঁর লোককে দিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাবেন। এমনটা হলে কী হবে বলা মুশকিল ছিল কারণ চন্দ্রশেখর সিং মুখ্যমন্ত্রী হবার তিনদিন আগেও ডঃ জগন্নাথের পক্ষে একশ উনত্রিশ জন এম এল এ প্রকাশ্যে বৈঠক করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী প্রণববাবু জগন্নাথের খুব বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাই এক্ষেত্রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত তাঁকেই পাঠান হল পাটনায় এই অপারেশন সফল করতে। এই হল রাজীব গান্ধীর প্রথম অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিং হলেন মূলত রাজীব গান্ধীর মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী।

ডঃ জগন্নাথ সুপরিম কোরটে তাঁর রায় পরবর্তী মামলার জন্য সম্প্রতি সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন ও যোগাযোগ করছেন। অনুন্নত শ্রেণী ও মুসলিমদের বিষয়ে যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন তাকে এখন কাজে লাগাচ্ছেন। বিহারে মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় জগন্নাথের যে বদনাম ছিল কেন জানিনা ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর তাঁর প্রতি একটা সহানুভূতি জনগণের একাংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আর যাই হোক ডঃ জগন্নাথ, আনজাইয়া আনতুলে আর পাহাড়িয়া এঁরা কখনই রাজীব গান্ধীর ভাল চাইবেন না এবং সুযোগ এলেই তাঁরা আঘাত করবেন। রাজীব গান্ধী নিশ্চয়ই তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। □

বাংলা বন্‌ধে সব শরিকের সায় নেই

নিশীথ দে

বামফ্রনট ২৮ সেপটেমবর 'বাংলা বনধ'-এর ডাক দিয়েছেন। বন্‌ধ যে 'সফল' হবে সেটাও মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু বাম ফ্রনট-এর নামে বন্‌ধ ডাকা হলেও সব শরিক কি সত্যি সত্যিই বন্‌ধ-এর পক্ষে? এমনকি সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির একাংশ এবং সব জেলা কমিটি কি বন্‌ধ ডাকার পক্ষপাতী? সি পি আই (এম) গোপন সারকুলারে বলার চেষ্টা করেছেন, 'বুরজোয়ারা বন্‌ধ-এর বিরোধিতা করছেন, বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।' সি পি আই (এম)-এর একটা অংশ মনে করে মাঝে মাঝে কিছু বিবৃতি আর বন্‌ধ-এর ডাক দিলে জনসমর্থন বাড়বে না।

মোটামুটিভাবে বামফ্রনটের সব শরিকদলই কেন্দ্রে জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা এবং অর্থের দাবিও জানাচ্ছেন। কিন্তু বন্‌ধ ডাকার ব্যাপারে পুরোপুরি একমত নন।

একমত না হওয়ার কারণ, অন্য শরিকরা মনে করছেন, রাজ্যের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাকে কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি জনগণ সেটাও দেখতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রনট সরকার ছ বছরে কতটা কী উন্নয়নমূলক কাজ করতে পেরেছে সাধারণ মানুষ সেটা বিচার বিশ্লেষণ করতে চায়। জনগণকে যাঁরা সচেতন করতে চান তাঁরা নিজেরা পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটা সচেতন?

বাজারে যখন চালের কিলো পাঁচ টাকা, সরষের তেল ষোল টাকার উপর, পিঁয়াজ চার টাকার নিচে নয়, আলু ২ টাকা ২০ পয়সা -- প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশ ছোঁয়া দাম, এই পরিস্থিতিতে বামফ্রনট বা সি পি আই (এম) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি কথাও বলছেন না। শরিকরা যখন এইসব ব্যাপারে আন্দোলনের কথা তুলেছেন, সি পি আই (এম)-এর নেতারা বলেছেন, এখন আন্দোলন কী করে হবে? কার বিরুদ্ধে আন্দোলন? এ তো আমাদের সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন। সেটা তো হতে পারে না। তা হলে কংগ্রেস (ই) সুযোগ পেয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে রাজ্যের বামফ্রনট সরকারের নীতি কী? সি পি আই (এম)-এর নীতিই বা কী? ১৯৭৭ সালে বামফ্রনট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবিতে জোরদার আন্দোলনের ডাক দেন। তখন সি পি আই (এম) নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, আন্দোলন এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে, জনগণ পুরোপুরি আন্দোলনে সামিল হবে। আর সেই সুযোগে বামফ্রনট সরকার দু বছরের মাথায় পদত্যাগ করবে। তারপর নির্বাচন হলে শুধু পশ্চিমবংগে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও তার প্রতিক্রিয়া হবে।

কিন্তু ক্ষমতা এমনই জিনিস যে সি পি আই (এম) নেতারা জনগণকে বুরজোয়া গণতন্ত্রের মোহ থেকে মুক্ত করতে নিজেরাই জড়িয়ে পড়লেন। এক কথায় বুরজোয়া গণতন্ত্রের শিকার হলেন প্রগতিশীলরা।

এরপরেও কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনটা চালিয়ে গিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতির বন্যা ছুটিয়ে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলে দিয়েছেন, কেন্দ্রের সংগে সংঘাত নয়, সমঝোতা করে চলতে চাই।

হঠাৎ এখনই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্য, এক কথায় পরিস্থিতি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পশ্চিমবংগে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সারা দেশে অকংগ্রেসী দলগুলির নেতাদের সম্মেলনের পর বিভিন্ন রাজ্যের পট পরিবর্তন হচ্ছে। কংগ্রেস (ই)-র বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভায় রদবদল, মুখ্যমন্ত্রী বদল নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে.

এর উপর আছে নির্বাচনের সম্ভাবনা। হঠাৎ লোকসভার নির্বাচন হতে পারে। তার জন্য কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া তুলতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সি পি আই (এম)-এর ধারণা ছিল, আমরাই সব। লড়াই হবে সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)-এর মধ্যে। বামপন্থী শক্তি বলতে সি পি আই (এম)। আর কোন দল নেই। সি পি আই (এম)-এর কোন কোন নেতা দম্ভ করে বলেছিলেন, অন্য পারটিকে সিট ছেড়ে দিলেই তো হবে না, জিতিয়েও দিতে হবে তো।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর শিক্ষা হয়েছে, বড় রকমের শিক্ষা হয়েছে। সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটি বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছেন—না, আমরা সব নয়। বাম ঐক্যের দরকার। বাম ঐক্যের দুর্বলতার জন্যই কংগ্রেস বেশি আসন পেয়েছে। আর এস পি, সি পি আই, ফরোয়ারড ব্লক এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লকের শক্তি আছে।

পশ্চিমবংগে কংগ্রেস (ই)-এর কোন সংগঠন নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তো কিছুই নেই। অথচ সাংগঠনিক রিপোরট অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে সি পি আই (এম)-এর শুধু কৃষক সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ৫০ লক্ষের ওপর। সারা রাজ্যে পারটি সদস্য এবং গণসংগঠনের সভ্য সংখ্যা সওয়া এক কোটি। গত ছয় বছরে পারটির সংগঠন অনেক অনেক বেড়েছে। তবু কেন ইন্দিরা কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনে সতের হাজার আসন পেল? এ ভোট কি ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোট? না সি পি আই (এম)-বিরোধী, বামফ্রনট-বিরোধী ভোট? গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের ভোট কেন ভাগ হল?

সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটি বলেছেন, 'কংগ্রেস (ই) দল দেওয়াল লিখন পড়তে পারছে না।' কোন প্রতিক্রিয়াশীল দলই পারে না। কিন্তু এই রাজ্যে কি সি পি আই (এম) দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন?

সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটি চ্যালেনজ জানিয়ে বলেছেন, 'এ রাজ্যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বামফ্রনট সরকার যা করেছেন এই রাজ্যে তো বটেই দেশের অন্য কোন রাজ্যে কোন কংগ্রেস সরকার তা করতে পারেনি।' যদি তাই হয় তা হলে বিধানসভার নির্বাচনে শহরাঞ্চলে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর হাত থেকে কংগ্রেস (ই) এত আসন ছিনিয়ে নিল কী করে? জবাব হল, কায়েমী স্বার্থ একজোট হয়েছে, কংগ্রেস (ই)কে মদত দিচ্ছে। তা হলে এখন কি কায়েমী স্বার্থের লোকের সংখ্যা হঠাৎ লাখে লাখে বেড়ে গেল!

সি পি আই (এম) নেতারা বলছেন, আমরা এত কাজ করেছি যে কেউ কোনদিন করেনি। অন্য রাজ্যেও পশ্চিমবংগের বামফ্রনট সরকারের প্রভাব বাড়ছে। অন্য রাজ্যে যে প্রভাব কতটা বেড়েছে তার প্রমাণ মিলেছে ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্নাটকে। সি পি আই-সি পি আই (এম) এক জোট হয়ে লড়াই করেও আগের চেয়ে আসন সংখ্যা কমে গিয়েছে।

সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের এক বড় অংশই এসেছেন যুব-ছাত্র ফ্রনট থেকে।

আজকে শতকরা আশিটি কলেজে এস এফ আই-এর কোন সংগঠন নেই। মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন থাকলে তাঁরা জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের মোকাবিলা করতে পারতেন। ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এস এফ আই ঢুকতে পারে না।

সি পি আই (এম)-এর সবচেয়ে বড় শ্লোগান ছিল গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বামফ্রনট ক্ষমতায় আসার পর জেলা স্কুল বোরড, বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সব জায়গায় বসানো হয়েছে দলের লোক বা দলের সমর্থকদের। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতা ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হয়নি।

পুরসভাগুলির নির্বাচন করতে সময় লেগেছে চার বছর, তাও সব পুরসভা নয়। কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভার নির্বাচন কবে হবে কেউ জানে না।

ছয় বছরে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ কতটা হয়েছে? ব্যাপকহারে ভাতা বিলি করা হয়েছে। সরকারি বেসরকারি সংস্থায় বেতন বাড়ান হয়েছে ঢালাওভাবে। লোকসানের বহর বেড়েছে। এ সব ব্যাপারে যে কোন রাজ্য পশ্চিমবংগের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। কিন্তু নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি। প্রথম বিভাগে পাশ করা ছাত্র কলেজে ভর্তি হতে পারেন না। স্কুল কলেজ বাড়ছে না। বাড়ছে বেকার -- এখন ৩৬ লক্ষের ওপর।

আঠারো দফা দাবি নিয়ে বাম শরিকদেব কারও দ্বিমত নেই। আপত্তি বন্‌ধ ডাকার ব্যাপারেও নয়। কিন্তু আন্দোলন কোথায়? ধর্মঘট যেমন সব আলোচনার পর শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হয় বন্‌ধও তেমনি। একটা লাগাতার আন্দোলন চাই। তারপর বন্‌ধ।

সি পি আই (এম)-এর এই বন্‌ধ ডাকার উদ্দেশ্য কংগ্রেস (ই) বিরোধী একটা হাওয়া তোলা। যাতে একই সংগে বাম দলগুলিকে কাছে টানা যাবে এবং সেই হাওয়ায় নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যাবে। □

'পাকিস্তান আক্রমণ করলে প্রথম বোমা কাশ্মীরের ওপরই পড়বে' – ফারুক আবদুল্লা

পাঁচদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুক আব্দুল্লা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই প্রথম আগমনকে কেন্দ্র করে কলকাতা বেশ নড়েচড়ে বসেছিল। অনেকেই জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন যে হঠাৎ তাঁর কেন এই কলকাতা সফর? গ্র্যানড হোটেলের ঘরে বসে পরিবর্তনের স্টাফ রিপোরটারের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই ধরনের অনেক প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন ডাঃ ফারুক আবদুল্লা।

ভূস্বর্গের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে একটা রিকশা চলেছে। চলেছে বললে একটু ভুল বলা হবে, বরং হরি সিং হাই স্ট্রিটের ওপর রিকশাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলা চলে। সওয়ারী আর চালকের মধ্যে ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি চলছে। রাস্তা দিয়ে বাস, ট্যাকসি, প্রাইভেট কার, যে যার মত চলে যাচ্ছে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করছেন না। রিকশাওয়ালার ব্যাপার স্যাপার। হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা অলিভ গ্রিন অ্যামব্যাসাডর ঘ্যাঁচ করে এসে রিকশার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার? কী হয়েছে? ঝগড়া-ঝাঁটি কেন? আরে সওয়ারীকে দেখে তো 'পরদেশি' বলে মনে হচ্ছে? 'কেয়া হুয়া জনাব?' অ্যামব্যাসাডর মালিকের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত জিজ্ঞাসায় রিকশা-ওয়ালা একটু হকচকিয়ে যান, কিন্তু সেই পরদেশিকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই রিকশাওয়ালা নালিশ করেন 'আরে দেখিয়ে না, ইয়ে আদমী ট্যুরিসট অফিস সে ইধার ইয়ে হোটেল তক আয়া, লেকিন কিরায়া যো মাংগা, উয়ে দেনে নেহি চাহতা।' অ্যামব্যাসাডর থেকে এবার ধমক এসেছে, 'তুম চুপ করো, আপ বাতাইয়ে জনাব, কেয়া তকলিফ হো রহা হয়?' স্বজনবিহীন পরবাসে এরকম 'ফেরেসতার' মত একজনের আবির্ভাবে রিকশা-আরোহী খানিকটা ভরসা পেলেন। 'দেখুন না, আমি সবে মাত্র কালই কাশ্মীরে এসেছি, রাস্তা-ঘাট কিছুই চিনি না, ট্যুরিসট সেনটার থেকে বেরিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললাম শাহন-ওয়াজ হোটেলে যাব ও আমাকে যা ভাড়া বলেছিল এখন তার ডবল চাইছে।' এবার অ্যামব্যাসাডর থেকে নেমে এসেছেন সত্যিই দেবদূত সদৃশ চেহারার আরোহী। রিকশা ওয়ালাকে ধমক দিয়েছে 'এই অচেনা লোক দেখে যা খুশি তাই দাম চাইছ কেন? তোমার শাস্তি হওয়া উচিত'---- ইত্যাদি ইত্যাদি। রিকশাওয়ালা তো রেগে আগুন, মাঝখান থেকে ঝামেলা পাকাতে এ আবার কে এল? ফুঁসে উঠেছে সে, 'আরে যাও যাও, বিচ মে বোলনে-ওয়ালে তুম কৌন আয়া? যিতনা কিরায়া মাংগা, উতনা হী দেনে পড়েগা।' অন্যপক্ষ তখন স্বমূর্তি ধারণ করেছেন, 'তুমি জান আমি কে? তোমার বে-আইনী কাজ করার দরুন তোমার কী শাস্তি আমি দিতে পারি তুমি জান? আমার নাম শুনেছ কখনও? আমি কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।'

'জানাকাদল' বাজারে কোন এক বুধবারের সন্ধ্যা। বাজারের কেনা-কাটা চলছে পুরোদমে। হঠাৎ একটা ফেয়ার প্রাইস শপ-এর সামনে থলি হাতে নিয়ে হাজির হলেন দেবোপম চেহারার এক খরিদ্দার। গায়ে ঢিলে-ঢোলা শেরওয়ানি, মাথায় বিশাল পাগড়ি, কী চাই তার? খুব বেশি কিছু না, কিলো খানেক ডাল। ডাল মেপে খদ্দেরের থলেতে তুলে দেওয়া হল। এবার কত দাম দিতে হবে? এক কিলো ডালের জন্য দোকানী যে দাম হাঁকল তা শুনে তো খরিদ্দারের চক্ষু চড়ক গাছ। কোথায় তোমার প্রাইস লিসট? প্রাইস লিসট দিয়ে তোমার কী দরকার, তোমার দামে না পোষালে মাল ফেরৎ দিয়ে দাও, অন্য দোকান দেখ। কেন অন্য দোকান কেন? সরকার নিয়ম করে দিয়েছেন প্রাইস লিসট সব দোকানে টাঙিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু তুমি টাঙাওনি কেন? আমি আমার দোকানে প্রাইস লিসট টাঙাব কি টাঙাব না সে আমার ইচ্ছে, তুমি কোথাকার কে হে? এ ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ? আমি কে জানতে চাও? তবে দেখ, এই বলে খরিদ্দার ঝটিতি খুলে ফেলেছেন পাগড়ি। দোকানি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন, কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে অন্যায় তর্ক করছিল সে -- এ যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।

এ রকম ঘটনা আরও অনেক আছে। কখনও লালচক বাজারে, কখনও সরকারি অফিসে অফিসে, কখনও প্রধান রাস্তাগুলির মোড়ে মোড়ে ফারুক আবদুল্লা এভাবেই অতর্কিতে হাজির হন। আগে ভাগে কোন জানান দেওয়া নেই, নেই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির আগে আগে সচকিত করে দেওয়া পিঁপ-পিঁপ জিপ। উনি সরজমিন ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতায় যাচাই করে নেন ওর রাজ্যপাটের হাল। চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিগত বিদ্যা নিয়ে তিনি মাঝে মাঝেই চলে যান গ্রামে গ্রামে। সেখানে গরিব গুরবো লোকেদের

মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেন একাকার করে, তাদের অসুবিধা, অস্বাচ্ছন্দ্য, শরীর গতিকের খবর নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যন্ত্রণার উপশম করার। জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার লোকদের কাছে তাই মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা নাকি সত্যি সত্যিই 'ফেরেসতা'। ফারুক আবদুল্লা সম্পর্কে এ সমস্ত চালু গল্পগুলি ঠিক কতটা সত্যি তা যাচাই করে নেবার একটা সুযোগ পাওয়া যায় জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময়।

১৬ আগসট রাত দশটা নাগাদ দমদম এয়ার পোরটে নেমে গ্র্যানড হোটেলে এসে সেদিনের রাতটুকু কেবল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন আবদুল্লা। পরদিন সকাল নটা থেকেই প্যাকড প্রোগ্রাম। বিশ্রাম নেবার ফুরসৎ নেই। ফোন করে করে কিছুতেই আর যোগাযোগ করা যায় না ফারুক সাহেবের সংগে। শেষমেশ ১৮ তারিখ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ গ্র্যানড হোটেলের রিসেপনিসট ৪০১ নং স্যুটে ফোনের লাইনটা দিতে ভেসে এল ফারুক আবদুল্লার গম্ভীর অথচ ঈষৎ ক্লান্ত গলার স্বর। কে, কোথেকে বা কী উদ্দেশ্যে ফোন করছে জানাব পর উনি জানালেন 'আগামী কাল তো প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস'ই আছে, ওখানেই না হয় কথা বলা যাবে।' তখন বাধ্য হয়ে আমাকে জানাতে হয়েছে 'বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত নিউজ ম্যাগাজিনের পাঠকরা কিন্তু আপনাব একান্ত কোন সাক্ষাৎকারের আশা করে আর 'আমরা 'পরিবর্তন' এর তরফ থেকে পাঠকদের কাছে এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ, কাজেই 'মিট দ্য প্রেস' এব রিপোরটে আমাদের পাঠকবা সন্তুষ্ট হবেন না।' এরপর অবশ্য আর কোন অনুরোধ কবতে হয়নি। ফারুক আবদুল্লার ব্যারিটোন জানান দিয়েছে 'ওয়েল, কাম টুমরো মরনিং শারপ অ্যাট এইট থারটি।' সাড়ে আটটা কেন, পরদিন আটটা বাজার দু চার মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম গ্র্যানড হোটেলের ৪০১ নং স্যুটে। কয়েকজন সিকিউবিটিব লোক আসাব উদ্দেশ্য জানতে চাওয়ায় বললাম অ্যাপয়েনটমেনট আছে। একটু বাদেই দেখা মিলল একজন সেক্রেটারির। উনি তখন এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে আবার চলে গেলেন ভেতরে। এক মিনিটও অপেক্ষা কবতে হল না। 'আসুন ভেতরে আসুন' বলে নিয়ে এলেন ফারুক আবদুল্লার সামনে। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজতে তখনও মিনিট দশেক দেরি। একটা গাঢ় বাদামী রঙের শেরওয়ানি পড়ে সদ্যস্নান সারা ফারুক সাহেব আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আপনি একটু আগেই পৌঁছে গেছেন। অবশ্য ভালই করেছেন। আমার প্রোগ্রাম একটু চেনজ করতে হয়েছে। আমি এই নটা নাগাদ একটু গুরদোয়ারায় যাব। এটা আগে ঠিক ছিল না, কাজেই সময় আর খুব বেশি নেই। ইউ ক্যান স্টারট অন ফায়ারিং ইওর কোয়েশচেন।'

আমার প্রশ্নের বন্দুক তৈরিই ছিল, ট্রিগারে হাত লাগাতেই প্রথমে বেরিয়ে এল ফারুক আবদুল্লা সম্পর্কিত সেইসব কৌতূহল যা কিনা এযাবৎকাল একমাত্র হারুন-অল রশিদকেই মনে করাত। প্রশ্ন শুনে ফারুক সাহেব এমনভাবে হাসলেন যার একটাই অর্থ দাঁড়ায় : যা শুনেছ, তা ষোল আনা খাঁটি। মুখে বললেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি কেবল ফাইল পত্র আর ছাপার কাগজের ওপর নির্ভর করি তাহলে আর লাভ কী? আমার রাজ্যে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর তো আমারই আগে জানার কথা। আর নিজের চোখ কান যখন খোলাই আছে, তখন শুধু শুধু অন্যের ওপর নির্ভর করা কেন? শুধু ভোট আদায় করার সময় গ্রামে গ্রামে গিয়ে দু-চারটে ভাল ভাল কথা শুনিয়ে এলাম আর তারপর আর কোন খবর নিলাম না এ ধরনের মানসিকতা আমার নেই।'

'ভোটে জেতার পর উল্লসিত সমর্থকদের সংগে নাচ করার ব্যাপারেও কি আপনার এই ধরনের মানসিকতাই কাজ করেছিল?' আমার এ প্রশ্নে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর গালে কাশ্মীরী আপেলের আভা দেখা গেল। মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন আপনারা মুখ্যমন্ত্রী বলতে কী মনে করেন জানি না, তবে মুখ্যমন্ত্রী মানে যে ইমোশনলেস, কাঠখোট্টা লোক হবে সে ধরনের বদ্ধ ধাবণা আশা করি আপনাদের নেই। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি বলে কি আমার যখন যেরকম ইচ্ছে হবে সেই রকমভাবে প্রকাশ কবার স্বাধীনতাটুকু ও হারিয়ে ফেলেছি নাকি? কেউ যদি তা ভেবে থাকেন, তাহলে বলব তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। দেখুন তো রোনালড রেগানের কথা ভেবে। সিনেমার পর্দায় তাকে তো কতরকমভাবে দেখা গেছে, তাতে কি রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাকে মেনে নিতে ইয়াংকিদের কোন অসুবিধা হয়েছে? রেগানের কথা ছেড়ে দিন, অত দূরে যেতে হবে না, তামিলনাড়ু আর অন্ধ্রপ্রদেশের কথা ভাবুন, এম জি আর বা এন টি আর রূপোলী পর্দায় কতরকমভাবে কতরকম নায়িকাদের সংগে নাচ-গান করে এসেছেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে লোকের মন জয় করতে কি তাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয়েছে? আদৌ হয়নি। আসলে মুখ্যমন্ত্রী বা ওই ধরনের দায়িত্বশীল পদের অন্যতম কর্তব্যই হল জনগণের সংগে একাত্ম হওয়া, বিনা কারণে লৌহ যবনিকা সৃষ্টি করে রাখলে জনগণেব কাছাকাছি পৌঁছন যাবে কি? আর যে জনগণ তাদের অগাধ আস্থা এক জায়গায় জড় করে আমায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসিয়েছেন, তাদের কাছাকাছি পৌঁছনই আমি বড় কাজ বলে মনে করি।' 'কিন্তু কাশ্মীরের ভোটাভুটি সম্পর্কে যে কথা এখনও সর্বত্র আলোচনা চলছে যে ওখানে ব্যাপক হারে রিগিং হয়েছে সে ব্যাপারে আপনার মত কী?' এই প্রশ্ন শোনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যেন আগে থেকেই তৈরি ছিলেন, মুখস্থর মত বলে গেলেন, 'কাশ্মীরে রিগিং হয়েছে, কাশ্মীরে রিগিং হয়েছে বলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস (ই) সমর্থকরা। কিন্তু কই আমরা তো কখনও চেঁচাচ্ছিনা জম্মুতে রিগিং হয়েছে বলে। আমাদের ন্যাশনাল কনফারেনস যেমন কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চলে বিপুল ভোটে জিতেছে তেমনি কংগ্রেস (ই) তো জম্মু এলাকায় বেশির ভাগ সিটই পেয়েছে। তা হলে আমরাও তো বলতে পারি জম্মুতে রিগিং হয়েছে। আসলে জনসমর্থন ঠিক কী ধরনের হতে পারে কংগ্রেস (ই)র তা জানা নেই। তাই কাশ্মীরে আমাদের ঐতিহাসিক জয় ওরা ট্রানসফরম করতে চাইছেন রিগিং-এ। ওরা যদি আবার নির্বাচনের দাবি জানায় তবে আমি হলফ করে বলতে পারি আমরা আরও অনেক বেশি ভোটে জিতব।' আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে বেয়ারা চা ও প্রাতরাশ নিয়ে এসেছে। সেনটার টেবিলের রাশীকৃত ফুলের স্তবকগুলি সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে জলখাবার। ফারুক সাহেবকে দেখলাম যত তাড়াতাড়ি কথা বলেন, তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি খাবার শেষ কবতে পারেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম 'কেউ যদি বলেন কাশ্মীরেব অন্যতম প্রিয় ব্যক্তিত্ব শেখ আবদুল্লার ছেলে বলেই আপনি তাদের সমর্থন পেয়েছেন, আপনি কি তাদের বিরোধিতা কববেন?' একমুখ খাবার নিয়ে ফারুক সাহেব জবাব দিয়েছেন, 'বিবোধিতা কবব মানে, এটা তো সর্বৈব মিথ্যে কথা। আমার বাবা কাশ্মীরের 'চোখের মণি' ছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমি ভোট নেবার সময় তো একবারও বাবার গুডউইলকে কাজে লাগাইনি। বরং আমি বলেছি, তোমরা শেখ সাহেব কী ছিলেন, কী কাজ করেছেন বা কী করেননি তা দিয়ে যদি আমায় বিচার করতে চাও তবে ভুল করবে। আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। শেখ সাহেবের ছেলে বলে আমায় যদি তোমরা ভোট দাও, তবে আমি বলতে বাধ্য হব আমায় তোমরা ভোট দিও না, যদি ফারুক আবদুল্লাকেই তোমরা চাও তবে আমায় ভোট দিও।'

'আপনার কথার সূত্র ধরে বলা যায়, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ 'ফারুক আবদুল্লাকেই' চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সেই চাওয়ার পেছনে

যে বিশ্বাস কাজ করেছিল, তা রক্ষা করার জন্য কী কাজ করছেন?' ফারুক আবদুল্লার দীর্ঘ চোখ এ প্রশ্নে আরও যেন দীর্ঘায়িত হয়েছে। 'কাজ করছি বলেই তো ছুটে এসেছি কলকাতায়। জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। আমাদের রাজ্যে শিল্প প্রসারের প্রয়োজন এত জরুরি হয়ে পড়েছে, যে তা না হলে বেকারের সংখ্যা কমান যাবে না। আমি সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের আহ্বান করেছি আমাদের রাজ্যে শিল্প নিয়োগ করার জন্য। আর আমি এ ব্যাপারে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যকেও একই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আই ওয়ানট আওয়ার স্টেট টু বি ইনডাসট্রিয়ালাইজড। আর আমার চাহিদা থেকে উভয় পক্ষই লাভবান হবে। শিল্পপতিরা আমার রাজ্য থেকে টাকা উপায় করতে পারবেন এবং সেই টাকার ন্যায্য একটা অংশ আমাদের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আসবেন।' কিন্তু শিল্পপতিরা হঠাৎ কাশ্মীরে যেতে যাবে কেন? সেখানে সুযোগ সুবিধা কী? এ প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর আজানুলম্বিত দুই হাত এক সঙ্গে ওপরে উঠে এসেছে, 'শিল্পপতিরা যা সুবিধা চান, তা দিতে আমরা কসুর করব না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে কাশ্মীরে অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এখন কাশ্মীরে প্রায় ২০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, ১৯৮৬-৮৭ নাগাদ এই পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সালাল ও ডালহৌসিতে খুব শিগগীরই যথাক্রমে ৩৪৫ মেগাওয়াট ও ৩৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জল বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়ে যাবে। মোটামুটি বলা চলে এই শতাব্দীর শেষে যে কোন দেশের চাইতে অনেক সস্তায় কাশ্মীরে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া দিল্লির সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে আমি জম্মু ও কাশ্মীরে শিল্পপতিরা যাতে তাদের বিভিন্ন প্রকল্প তাড়াতাড়ি চালু করতে পারেন সেই সব ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থাও করে দিতে পারব। কোনরকম কোন অসুবিধাই হবে না। এ ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরে জিপসাম, বকসাইট, ম্যাগনেসাইট, লিগনাইট, গ্র্যাফাইট, কোয়ারটাইজাইট কিংবা স্যাফায়ারের মত খনিজ পদার্থ প্রচুর। এই সুবিধাকেও শিল্পপতিরা কাজে লাগাতে পারবে।' 'আপনি কি শুধু অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা রোধ করার উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এসেছেন?'

'না তা কেন? নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রেস বা মিডিয়াতে কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে যেরকম সব খবরাখবর প্রচার করা হয়েছিল তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদেরই। এ মরশুমে কাশ্মীরে পর্যটকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। আর হিসেব করে দেখা গেছে কাশ্মীরের পর্যটকদের মধ্যে সিংহভাগই বাঙালি। তাই পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকরা আবার যাতে নিশ্চিন্তে কাশ্মীরে বেড়াতে যেতে পারেন সে ব্যাপারে আমি ভরসা দিতে এসেছি বলতে পারেন।'

'কিন্তু আপনার আসার উদ্দেশ্য সত্যিই কি তাই? আপনি এখানে আসার কারণ হিসেবে যে ব্যাপারগুলি উল্লেখ করলেন, তা তো যে কোন একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে করা যেত?' এ কথায় ফারুক সাহেব একটু যেন বিরক্ত হলেন, শ্লেষাত্মক স্বরে বলে উঠলেন, 'বাঃ এই তো একজন জারনালিসটের মত কথা। আপনারা ভাবুন, ভাবুন কেন হঠাৎ ফারুক আবদুল্লা পশ্চিমবঙ্গে এলেন, জ্যোতি বসুর সঙ্গে কি এত কথা বললেন, এত কিসের দহরম মহরম? বাস, আগামীকাল আপনাদের কাগজে ছাপিয়ে দিন ইন্দিরার বিরুদ্ধে আঁতাত গড়ার জন্য কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর শলা-পরামর্শ। আপনি শুনে নিন ভাল করে, প্রয়োজন মনে করলে লিখবেন, না মনে করলে লিখবেননা। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা করা আমাদের রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য নয়। বরং কী করে কেন্দ্রের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রেখে চলা যায় আমি সেদিকে নজর দিয়ে চলি। তার মনে এই নয় যে কেন্দ্র কিছু চাপিয়ে দিতে চাইলে আমরা তা মাথা পেতে নেব। আগামী অকটোবরে কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রীদের যে বৈঠক হবে তাতে সমস্ত রাজ্যের নানান সমস্যা নিয়েই আলোচনা হবে। আশু সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করা হবে। এতে তো কেন্দ্রের কোন ক্ষতি নেই। বরং কোন একটা রাজ্য যদি দুর্বল হয়ে যায় তা হলে কেন্দ্রেরই তো ক্ষতি। আমি মোদ্দা কথা যেটা বলতে চাই তা হল চারিদিকে যাই ঘটুক না কেন, ইউ হ্যাভ টু সারভাইভ। প্রত্যেকটা রাজ্যই যদি নিজের নিজের উন্নতি ঘটানর ব্যাপারে সচেষ্ট হন তবে আলটিমেটলি গোটা দেশেরই উন্নতি হবে। সেদিক থেকে বলতে পারেন আমি Live and let live নীতিতে বিশ্বাসী।'

'কিন্তু রাজ্যগুলি যদি ক্রমাগত তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে, কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাতে কি বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না?' ফারুক সাহেব এবার আরও একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, 'এই এক নতুন শব্দ আমদানি হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। রাজ্যগুলি তাদের ন্যায্য দাবি চাইলেই বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা হবে, এ কেমন কথা? বরং বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ যদি কেউ খুঁজতে চান তা হলে তাকে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ নির্মূল করার কথা ভাবতে হবে। আপনাদের তো বদ্ধ ধারণাই রয়ে গেছে যেহেতু আমরা মুসলিম তাই আমরা বোধহয় সব সময় পাকিস্তানের দিকে ঝোল টেনে কথা বলি। কিন্তু এই অভিযোগ ১৯৪৭ সালে যখন কাশ্মীরের মুসলমানরা হিন্দু আর শিখদের বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছিল তখন তোলা হয়নি কেন? আমাদের পাকিস্তানি গুপ্তচর যারা বলেন তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আজ পর্যন্ত যে কজন পাকিস্তানি গুপ্তচর ধরা পড়েছে তাদের বেশির ভাগই হিন্দু। আমরা মনে করি কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর পাকিস্তানকে আমরা ভয়ও পাই না। আপনারা যারা এখানে নিশ্চিন্তে বসে বসে কাগজ-কলমে হাতি ঘোড়া মারছেন তারা জেনে রাখুন পাকিস্তানি আক্রমণ রুখতে হলে প্রথমে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে, প্রথম বুলেটটা আমাকেই খেতে হবে, আপনাদের কাউকে নয়। পাকিস্তান আক্রমণ করলে প্রথম বোমা কাশ্মীরের ওপরই পড়বে।এর পরেও কি বলতে পারবেন যে কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়?

'আপনার এ মনোভাব প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ কিন্তু কাশ্মীর ভারতেরই অংশ, অথচ আপনারা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আলাদা ফ্ল্যাগ করেছেন, সংবিধানের ৩৭০ ধারা কাশ্মীরকে স্পেশাল স্ট্যাটাস দিয়েছে, এসব থেকে কি কাশ্মীর সম্পর্কে ওই ধরনের ধারণা পোষণ করাটা একেবারে অমূলক হয়?' ফারুক সাহেব এবার বোধহয় একটু রেগে গেছেন। কথা বলতে গিয়ে খুব সংযত স্বরে জবাব দিয়েছেন: 'যদ্দিন পর্যন্ত হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে মিউচুয়াল ট্রাসট গড়ে না উঠবে ততদিন পর্যন্ত কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বহাল থাকবে। আমাদের মত গরিব রাজ্যে এর প্রয়োজন আছে।' কথা বলা শেষ করে ফারুক আবদুল্লা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আপনি একটু বসুন আমি একটু জামা-কাপড় চেনজ করে নিই। এক্ষুণি বেরোতে হবে।' আমি উত্তর দেবার আগেই ফারুক সাহেব পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমার কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। মুহূর্তের মধ্যে ঘননীল সাফারি স্যুট পরে বেরিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাতে একটা ছোট্ট গোলাপ। গোলাপের রঙটা কী রকম আগুনের মত। বাটনহোলে গোলাপটা সেট করতে করতে উনি বললেন, 'ও আপনি উঠে পড়েছেন, ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই থাক। আবার প্রেস ক্লাবে একটু পরেই দেখা হবে। এখন একবার গুরুদোয়ারা যেতে হবে। সি ইউ এগেইন।' বিদায় নিয়ে আসার আগে বললাম 'শুধু গুরুদোয়ারা কেন, কালীঘাটে যাবেন না?' একটু যেন থমকে গেলেন ফারুক সাহেব পরক্ষণেই স্বভাবসিদ্ধ সপ্রতিভতাকে সঙ্গী করে জবাব দিলেন, 'সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব।' □

ফারুক আবদুল্লা।

সাক্ষাৎকার : দিব্যজ্যোতি বসু

আলোকচিত্র/সৌগত রায় বর্মন

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে-২

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু

বাংলাদেশ থেকে ফিরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সংঘমিত্রের প্রতিমা আলোকচিত্র : সংঘমিত্রের সৌজন্যে

গত আগস্ট মাসে ঢাকার বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক একলাস উদ্দিনের সংগে শাঁখারি বাজার ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। শাঁখারি বাজার ঢাকার হিন্দু এলাকা। ঠিক কাশীর কেদারের গলির মত দু পাশে পুরনো অন্ধকার বাড়ি ও দোকান। কিছু দূর আসতেই ডানহাতি কালীমন্দিরের পাশে দেখলাম মাইকে হিন্দি গান বাজছে। লুংগি ও পাজামা পরা কিছু উঠতি বয়সের ছেলে বসে। সামনে টাঙান ফেস্টুন তাতে লেখা শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গাপূজা। পরিচালনায় সংঘমিত্র। একলাসকে সংগে নিয়ে ছেলেদের কাছে পরিচয় দিলাম। ওঁরা খাতির করে বসিয়ে বললেন : আজ আমাদের দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পূজো হয়ে গেল। সেই উপলক্ষে উৎসব চলছে। ওঁদের কাছে শুনলাম, ঢাকা শহরে এবার অন্তত ২৪টি সর্বজনীন দুর্গা পূজো হবে। এর মধ্যে শাঁখারি বাজারেই হবে পাঁচটি। কোতোয়ালি রোড, তাঁতিবাজার, কুলন বাড়ি, গোয়ানগর, মালকারটোলা, সদর ঘাট, বাংলাবাজার, হেমন্ত দাস রোড, মতিঝিল কলোনি, দক্ষিণ মুষণ্ডি, উত্তর মুষণ্ডি, লালবাগ ও রামকৃষ্ণ মিশনে একটি করে। নবাবপুরে ২টি ও রায়বাজারে ৩টি। হয়ত আর দু একটি নাম বাদ যেতে পারে কারণ এটা ওদের মুখে মুখে হিসেব।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দুর্গাপূজো করা নিয়ে কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তি হয় কি?

ওঁরা জবাব দিলেন, আগে হত। বাংলাদেশ হবার পর মুজিবের আমলে একবার তো বহু জায়গায় প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হল। একদল দুষ্কৃতকারী সংঘবদ্ধভাবে এসব করে গেল। সেবার বহু জায়গায় পূজো হয় নি। গত কয়েক বছর ধরে বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই পূজো হচ্ছে। গত বছর তো বিজয়া দশমীর মিছিলে স্বয়ং এরশাদ সাহেবই এসেছিলেন। আগে পূজোর সময় প্রায়ই লোডশেডিং হয়ে যেত। গত বছর সেটাও হয়নি। শুধু ঢাকা কেন, বাংলাদেশের সর্বত্র হিন্দুরা এখন নির্বিঘ্নে তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে পারছেন। দু এক জায়গায় যদি কিছু ঘটনা ঘটে তো সেটা নেহাতই স্থানীয় ব্যাপার। তবে বিজয়া দশমীর মিছিল বার করার আগে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। সেটা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার খাতিরে। অনেক জায়গাতেই পুলিশের নির্ধারিত সময়ের ভেতর মিছিল শেষ করতে হয়। শান্তি শৃংখলার যাতে বিঘ্ন না হয় তার জন্য পুলিশও সজাগ থাকে। ইদানিং বহু পূজোয় মুসলমানরাও কমিটির নানা দায়িত্বে থাকছেন বলে শোনা গেল। তবে এ বছর দুর্গাপূজোর জন্য কোন ছুটি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বিজয়া দশমীর দিন ছুটি। এ নিয়ে বাংলাদেশের কাগজে কিছু সংখ্যালঘু চিঠি লিখেছেন। একদিনের উৎসব ঈদে যদি তিনদিনের ছুটি দেওয়া হতে পারে তা হলে চারদিনের উৎসব দুর্গাপূজোয় মাত্র একদিন ছুটি কেন?

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুর সংখ্যা কেউ বলেন দেড় কোটি। কেউ বলেন দু কোটি। ১৯৮১ সালের সেনসাস রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। অনেকের আবার সে রিপোর্টের ওপর আস্থা নেই। কলকাতার মুসলমানদের নিয়ে একজন মুসলিম আই পি এস 'দি সেভেনথ ম্যান' বলে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে অমন একটা ডকুমেনটারি করলে সেটারও নাম দেওয়া যেত 'দি ফিফথ ম্যান'। সারা দেশের প্রতি পাঁচ জনের একজনই হিন্দু। প্রত্যেক শহরেই ওকালতি, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অথবা বেসরকারি চাকরিতে যথেষ্ট হিন্দু দেখতে পাওয়া যাবে। আমাকে অনেকেই বলেছেন, একজন মুসলমান মক্কেল হিন্দু আইনজীবী বা ডাক্তারের ওপর বেশি আস্থাশীল। একজন বেসরকারি পরিবহন কোমপানির মুসলিম মালিক হিন্দু অ্যাকাউনটেনটকে অবচেতন মনেই বেশি নির্ভর করেন। একজন মুসলিম অভিভাবক তাঁর ছেলেমেয়ের গৃহশিক্ষক হিসেবে তুলনামূলকভাবে হিন্দু ছেলেকেই বেশি পছন্দ করেন। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে ঢাকার সাংবাদিকতা জগতে একজন হিন্দু ছেলের কাজ পেতে কোন অসুবিধা হয় না। কলকাতার সাংবাদিকতার জগতে মুসলমান আছেন দু-এক জন মাত্র। কিন্তু ঢাকার সাংবাদিক জগতে সব হিন্দু সাংবাদিকের নাম আমি হাতে গুণে শেষ করতে পারব না। শুধু উদাহরণ হিসেবে কতকগুলি নাম দিচ্ছি। সন্তোষ গুপ্ত, জীবন চৌধুরী, কার্তিক সাহা (সংবাদ) সঞ্জীব চৌধুরী (দেশ বাংলা) মনোরঞ্জন ঘোষাল (ইত্তেফাক), সমর শিকদার (আজাদ), নিরঞ্জন চ্যাটারজি (বাংলাদেশ অবজারভার), অজিত গুহ (হলিডে), সন্তোষ বিশ্বাস (সাক্ষাৎ), সুশীল বিশ্বাস (গণশক্তি), ইন্দু সাহা (মশাল), সৌমেন দত্ত (গণকন্ঠ), কালীকিংকর মন্টু (নয়া দেশ), সুনীল ব্যানারজি, নির্মল সেন (দৈনিক বাংলা), মীনাক্ষী হালদার (অবজারভার), বাদল চক্রবর্তী (অবজারভার), দুলাল বিশ্বাস (বিচিত্রা), শান্তনু মুখোপাধ্যায় (নয়াযুগ), প্রণব রায় (দেশ বাংলা)। আমি স্বীকার করছি এ তালিকা অসম্পূর্ণ।

ঢাকা শহরে এখন হিন্দু বসতিপূর্ণ অঞ্চল – শাঁখারি বাজার, তাঁতি বাজার, ফরাস গঞ্জ, লক্ষ্মী বাজার কলুটোলা, গণ্ডেবিয়া, ফরিদাবাদ নতুন ঢাকার রায় বাজার, কেরানি গঞ্জ, শাখতা, বক্তা, দিঘির পাড়, বাগইড়, নারায়ণগঞ্জ, চাষাড়া, হুতুম্লা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক হিন্দু বাস করেন।

ঢাকা হাইকোরটের জমাট প্র্যাকটিসের অ্যাডভোকেটের মধ্যে সুধাংশু হালদার, অনিল সরকার, উমেশ রায়, অবনী চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ নরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, ডাঃ জে সি ভৌমিকের ডাক্তার হিসাবেও যথেষ্ট পসার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ষাটজন হিন্দু অধ্যাপক আছেন। ঢাকার স্বর্ণকারদের শতকরা ৫০ জন এখনও হিন্দু। বিভিন্ন জেলায় অনেক ব্যবসা, দোকান-পাট হিন্দুদের হাতে। মনে রাখতে হবে দেশ বিভাগের পর হিন্দু সমাজের যাঁরা অগ্রগণ্য তাঁরা সবাই প্রায় ভারতে চলে আসেন। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বহু শিক্ষিত হিন্দুকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ত্যাগ

করে যে-সব হিন্দু ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও বহু শিক্ষিত সংগতিপন্ন হিন্দু বাংলাদেশে ফিরে যাননি। এতকিছু সত্ত্বেও দেড় থেকে দু কোটি হিন্দু যে বাংলাদেশের মূল জীবন-প্রবাহের সংগে নিজেদের মিশিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন তা এক লক্ষ্যণীয় বিষয়। মনে রাখতে হবে প্রায় সব রাজনৈতিক দলেই প্রথম ও দ্বিতীয় সারির হিন্দু নেতা আছেন। বাংলাদেশ কম্যুনিসট পারটির নেতৃত্বে বহুকাল ধরে আছেন মণি সিং, কৃষক সাম্যবাদী দল তো নির্মল সেনেরই গড়া। ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য, আওয়ামি লিগের সুধাংশু শেখর হালদার, সাম্যবাদী দলের নেতা নগেন সরকার, সুধাংশু দত্ত প্রমুখ। বাংলার কমিউনিসট পারটির নেতা দেবেন বিশ্বাস। আওয়ামি লিগের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বহু হিন্দু নেতা আছেন। একতা পারটির নেতা শ্রীহট্টের সুরজিৎ সেনগুপ্ত তো অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা।

বাংলাদেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রচুর মুসলিম সাম্প্রদায়িক দল আছে। একটিও হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল নেই। বরং হিন্দুদের অভিযোগ, হিন্দু নেতারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত সুযোগ-সুবিধা-স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ছাত্রলিগের (রাজ্জাকপন্থী) সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন মুকুল বসু। এই প্রথম একজন হিন্দু ছাত্রলিগের সাধারণ সম্পাদক হলেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি হিন্দু ছাত্ররা যাঁরা সম্প্রদায়গতভাবে নানা বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন তাঁদের উৎসাহিত করতে পারছে না। তাঁদের বক্তব্য : 'কোন হিন্দু নেতাই হিন্দুদের জন্য আলাদা করে কিছু বলেন না। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই।'

বাংলাদেশের হিন্দুরা সংস্কৃতিগতভাবে বাংলাদেশি সংস্কৃতির সংগে একাত্ম হয়ে গেছেন। একটা বড় প্রমাণ পোশাক। দেশ বিভাগের আগে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহুলোক ধুতি পরতেন। (এখনও পশ্চিমবংগে অনেক মুসলমান ধুতি পরেন)। পাকিস্তানি আমলে মুসলমানরা স্বাতন্ত্র্য আনার জন্য পাজামা ও পাঞ্জাবির প্রবর্তন করেন। এটাই এখন বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক। হিন্দুরাও এই পোশাক গ্রহণ করেছেন। পুরোহিতও ওখানে লুংগি পরে পুজো করেন। গ্রামের হিন্দুদের পোশাক লুংগি। কিন্তু প্রাচীনপন্থী শিক্ষিত হিন্দু হয়ত ধুতি পরেন। সিলেটে দু-একজনকে দেখেছি। কিন্তু ঢাকায় ধুতি পরা কাউকে দেখলেই বুঝতে হবে তিনি ভারত থেকে এসেছেন। হিন্দু মেয়েরা অনেকেই সিঁথিতে এমনভাবে সিঁদুর দেন যাতে না বোঝা যায়। লাল টিপ অবশ্য মুসলমান মেয়েরাও পরছেন। কথায়-বার্তায় হিন্দুরাও হাত তুলে সালাম করেন, জলকে পানি বলেন এবং কথার মধ্যে বিনয়সূচক জী শব্দটি প্রয়োগ করেন। পাশাপাশি হিন্দু-বাঙালি সংস্কৃতির কিছু কিছু মুসলমানরাও গ্রহণ করেছেন। যেমন নামের ক্ষেত্রে। এখন ডাক নাম বা মুসলমানী নামের সংগে একটি অতিরিক্ত হিন্দু-বাঙালি নাম দেওয়া বাংলাদেশি মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শখ করে মুসলমান মেয়েরাও কিছু কিছু শাঁখা পরছেন। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলের ছাত্রদের বেশিরভাগই মুসলমান। ওঁদের রিডিং রুমে যাঁরা পড়তে আসেন তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান তরুণ। ঢাকা মিশনের জয়েনট সেক্রেটারি একজন মুসলমান এবং মিশনের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে সরকারি নামী-বেনামী মুসলমানেরা এসে বক্তৃতা করে যান।

টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, সাহিত্য সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রচুর হিন্দু রয়েছেন।

একজন প্রতিভাশালী হিন্দুর পক্ষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রথম সারির আসন করে নেওয়া খুব কঠিন নয়। কিন্তু সবাইতো প্রতিভাবান নয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছাত্র ও তরুণের মনে হীনমন্যতা আছে। আমি প্রায় একশ হিন্দু তরুণের সংগে কথা বলেছি তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত হতাশ। তাঁরা বলেছেন, চাকরিতে সংখ্যালঘুদের জন্য পাক আমলে যেমন সংরক্ষণ ছিল এখন তেমন সংরক্ষণ না থাকলে তাঁদের পক্ষে সরকারি চাকরি পাওয়া কঠিন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হিন্দু রাজনৈতিক নেতা বললেন : পাকিস্তানি আমলে আমরা ভাল ছিলাম। আমাদের জন্য চাকরিতে শতকরা ২২টি পদ সংরক্ষিত ছিল। ওই নেতা আমায় বললেন : বাংলাদেশ হবার পর ১১০টি এমব্যাসিতে কোথাও হিন্দু কূটনীতিক নেই। ঢাকার কোন বিদেশি দূতাবাসেও হিন্দু কর্মচারী নেই। এক্সপোরট-ইমপোরট কনট্র্যাকটরিতে লাইসেনস লাগে। কোন হিন্দু নেই সেখানে। ছটা সরকারি ব্যাংকের একটিরও ডাইরেকটর হিন্দু নন। বাংলাদেশের ২১টি জেলার ডি সি বা এস পি পর্যায়ে হিন্দু নেই। নেই কোন হিন্দু জেলা জজ। জয়েন্ট সেক্রেটারি বা তার ওপরের পদে কোন হিন্দু নেই। সামরিক বাহিনীতে বর্তমানে করনেল বা তার উপরের র‍্যাংকে হিন্দু নেই। তবে সরকারি অফিসে নিচে ও মাঝারি পর্যায়ে অনেক হিন্দু অফিসার আছেন। অনেক হিন্দু অফিসারের ধারণা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের আর ওপরে ওঠা মুশকিল। সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পশ্চিমবংগেও নেই। তবে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি। কিন্তু দু রাজ্যের সংখ্যালঘুদের মানসিকতা এক। আমার মনে আছে কলকাতায় একবার ডেনটাল হাসপাতালের আউটডোরে একজন পরিচিত মুসলমান লেখক হিন্দু নামে সাড়া দিচ্ছে বলে অবাক হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম অনেক মুসলমান নানা কারণে বাইরে হিন্দু নাম নেন। সিলেটে আমায় এক হিন্দু ভদ্রলোক বললেন, ট্রেনে তিনি সর্বদা বিজার-ভেশন করেন মুসলিম নামে। সর্বদা ভয় যদি পথে কোন গোলমালে পড়তে হয় এবং তার ফলে তাঁকে মুশকিলে পড়তে হয়। কিন্তু চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তো নাম পালটান যায় না।

সরকারের কোন নির্দেশ নেই যে হিন্দুকে চাকরি দেবে না বা প্রমোশন দেবে না। কিন্তু এটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত মানসিকতার ওপর। আবার এও হতে পারে মুসলমান মেধাবী প্রার্থীদের সংগে হিন্দুরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। তবে বি এন পির নেতা সামসুল হুদা আমাকে চাকরির-বাকরির বৈষম্য সম্পর্কে বলেছিলেন : এটা একটা জীবনের ঘটনা, যারা মেজরিটি তারা তাদের নিজেদের লোকদের চাকরি দেবে। এটা মানুষের একধরনের দৃষ্টিভঙ্গী। আসলে সংখ্যালঘুর মনোবেদনার কথা দুই দেশেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ভাল করে বোঝার চেষ্টা করেন না। বরং তাঁদের প্রতি একটা ঈর্ষা অথবা বীতরাগ একদম মনের কোণে জমে থাকে।

জগন্নাথ হলে আমি দু তিন দিন ধরে হিন্দু ছাত্রদের সংগে কথা বলে তাঁদের মানসিকতা জানার চেষ্টা করেছি। সকলের একবাক্যে বক্তব্য : আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। চাকরি-বাকরি তো পাবই না। আগে ডাক্তারি পড়তে গেলে ভাইভা ছিল না, হিন্দু ছেলেরা মারকসের ভিত্তিতে ভরতি হত। এখন ভাইভা হওয়ায় ভাল মারকস থাকলেও হিন্দু ছেলেরা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা বলেন : স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় হিন্দু ছাত্ররা ভাল ফলই করে। তাঁদের অভিযোগ, কোন কোন সরকারি অফিসারের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক। তাঁরা হিন্দু দেখলেই ভাবেন ভারতের চর। অথবা ভাবেন ভারতে চলে যাবে এরা। বিদেশে বৃত্তি যোগাড় করাও হিন্দু ছেলেদের মুশকিল। মৌখিক পরীক্ষায় ফরাক্কার কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি বাংলাদেশের নীতি সমর্থন করে ভারতের নীতির প্রতিবাদ করায় একজন পরীক্ষক বলেন আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা না ব্যাপক তা আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না। আমার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল সংখ্যালঘু মানসিকতা। তাঁরা সর্বদাই ভাবছেন তাঁদের প্রতি বৈষম্য হচ্ছে। এই বোধ থেকে আসে হীনমন্যতা। এমনকি সাম্প্রদায়িকতা বোধও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে হিন্দুদের কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন নেই। এমনকি তাঁদের হাতে কোন সাম্প্রদায়িক কাগজও নেই। এ কথা

সিলেটে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দুর্গোৎসব / দর্পণ ফটো সার্ভিস সিলেট

অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষিত বাংলাদেশি হিন্দু যদি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারেন তাহলে তাঁর চেষ্টা হয় যে কোনভাবে বিদেশে চলে যাবার নিদেন পক্ষে ভারতে অনুপ্রবেশ করার। সীমান্তে তার কাঁটার বেড়া দেওয়ার প্রস্তাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই বেশি শঙ্কিত দেখলাম। অনেক হিন্দু ছাত্র নানাভাবে ভারতে চলে আসছেন। গ্র্যাজুয়েট ছাত্র এসে ভারতে ক্লাস নাইনে ভর্তি হচ্ছেন। তবে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। দুই সম্প্রদায়ে সামাজিক মেলামেশা পশ্চিমবংগে যতটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি হয় বাংলাদেশে।

এর ফলে মুসলমান তরুণদের সংগে বহু হিন্দু মেয়ের বিয়ে হয়েছে – হচ্ছে, সংখ্যায় কম হলেও হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছে এমন ঘটনাও আছে। জগন্নাথ হলেই এমন দু একজনের সন্ধান পেলাম। তবে তাঁদের বিবাহের সময় মুসলিম নাম নিতে হয়েছে। সিলেটে একজন হিন্দু যুবক এক বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। কেউ ধর্ম ত্যাগ করেননি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কবীর চৌধুরীর মেয়ে ভারতীয় বাঙালি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে। 'ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেখানে কোন হিন্দু ছেলের ওপরওয়ালা মুসলমান কর্তৃপক্ষের সংগে হৃদ্যতা আছে সেখানে তাঁর বহু ব্যাপারে অসুবিধা হয়না। কিন্তু যেখানে একজন হিন্দু অপরিচিত সেখানেই বৈষম্য কার্যকরী হয়।' বললেন একজন হিন্দু ছাত্র। তাঁরা এটা বলতেও ছাড়লেন না যে জগন্নাথ হলের রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট সবচেয়ে কম। সব হলে একটি করে মসজিদ আছে, জগন্নাথ হলে তাঁরা একটি প্রার্থনাকক্ষের জন্য আবেদন জানিয়ে আসছেন বহুদিন ধরে। কিছু হচ্ছে না। ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নেই। জগন্নাথ হলে প্রচুর মুসলমান ছাত্র প্রতিদিনই হিন্দু বন্ধুদের কাছে আসছেন। আমি হিন্দু ছাত্রদের বলেছিলাম : হিন্দু, মুসলমান ছাত্ররা এক সংগে থাকাই তো ভাল। অনেক হিন্দুছাত্র আপত্তি করলেন। উভয়ের নিষিদ্ধ মাংস আলাদা। এতে অসুবিধা হবে। অথচ রেস্টুরেন্টে সবাই এক সংগে খাচ্ছেন। হোটেলে এক সংগে থাকছেন। এটাই হল সংখ্যালঘু মানসিকতা।

সংখ্যালঘু সমস্যা যে সব দেশে প্রবল সে সব দেশের রাষ্ট্র যদি ধর্ম নিরপেক্ষ হয়, তাহলে সংখ্যালঘুরা যেন একটি রক্ষা কবচ পান তাজউদ্দিন, নজরুল ইসলাম প্রমুখেরা এজন্যই বাংলাদেশকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র করেছিলেন। মনে আছে তাজউদ্দিন যেদিন ঢাকা এলেন সেদিন গণভবনে তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করেছিলাম, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কী ব্যবস্থা রাখছেন? তিনি বলেছিলেন, নতুন বাংলাদেশে এখন আর কেউ সংখ্যালঘু নেই। এটাই ছিল এক আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এজন্য সংখ্যালঘুরা খুব আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব, তাজউদ্দিন, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জমান প্রমুখ নেতাদের খুন করা হয়েছিল শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য? মোটেই তা নয়। উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা উচ্ছেদ। জিয়া ক্ষমতায় এসে সাম্প্রদায়িক শক্তির সমর্থন পাবার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বাদ দিলেন। বাংলাদেশ এখন শুধু খাতায় কলমে ইসলামী রাষ্ট্র নয়। কিন্তু রাষ্ট্র ভাবনায় ইসলাম অনুসৃত হবে এটা সংশোধিত সংবিধানে স্বীকৃত। এরশাদের আঠারো দফা কর্মসূচিতে আছে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হবে। র ফলে পাকিস্তান ইসলামীকরণের জন্য যা যা কর্মসূচি নিয়েছে বাংলাদেশও তাই নিয়েছে। পাকিস্তানে ইসলামিক ফাউনডেশন আছে। বাংলাদেশেও হয়েছে। এটি সরকারি সংগঠন। সরকারি ব্যয়ে ৩,৩০৬ ইমামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৩,০০০ ইমামের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবে। মসজিদকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেমিনার, মাহফিল করে ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। এরা গত ৪ বছরে ৯০০ বই ছেপেছেন ও বছরে ৩০ লক্ষ ইসলামী বই বিক্রি করছেন। সংখ্যালঘুদের জন্যও আর একটা ফাউনডেশন হবে। পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই আছে। পাকিস্তানের মত ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তনের চেষ্ট চলেছে। আরব সহযোগিতায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হল ঢাকায়। এই ব্যাংকে সুদহীন ব্যবস্থা চালু থাকবে। জাকাত ও উসার তহবিল গঠন করা হয়েছে। সরকারি ব্যয়ে অসংখ্য ধর্ম স্থানের সংস্কার হচ্ছে। টিভি ও রেডিওতে পাকিস্তানের মত প্রার্থনার সময় সূচি ঘোষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ টিভিতে পৃথকভাবে বাচ্চাদের কোরাণ-হাদিশ পাঠ শেখান হচ্ছে। পাকিস্তানেও হয়। শুধু ইসলামী বিচার ব্যবস্থা বা ইসলামী আইনের পুনঃ প্রবর্তন এখনও হয়নি। মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি।

'জগন্নাথ হল : এই কথাটি মনে রেখো'

১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের যে হীরক জয়ন্তী হয়ে গেল সেই উপলক্ষে হলের মুখপত্র বাসন্তিকায় যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৭৫। ষাট বছরের যে ইতিহাস ২৭৫ পৃষ্ঠাতেও বিস্তৃতভাবে বলা যায়নি পরিবর্তনের একটি পাতার মধ্যে তাকে ধরানো বাতুলতা। তবু বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কথা বলতে গেলেই সর্বাগ্রে জগন্নাথ হলের কথা মনে আসে। কারণ বাংলাদেশে (অবিভক্ত বঙ্গেও) হিন্দু বুদ্ধিজীবী এলাইটদের সাংস্কৃতিক জাগরণের উদ্ভব এই জগন্নাথ হল থেকেই ঘটেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মারচে পাকিস্তানি সৈন্যরা সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক নৃশংসতম গণহত্যা ঘটিয়েছিল এই জগন্নাথ হলে। গণহত্যার তালিকায় অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যুক্ত হয়েছিল জগন্নাথ হলের নাম, সেই সঙ্গে কিছু মানুষকে হত্যা তালিকার শীর্ষে রাখা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা। ওঁরা শুধুমাত্র কৃতী অধ্যাপকই ছিলেননা—ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ। যুক্তি বিশ্লেষণ ও মননের কষ্টিপাথর দিয়ে তারা যে কোন বিষয়কে যাচাই করে নিতে উপদেশ দিতেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তি তাঁদের কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না সেদিন। যেমন পারেনি মুনির চৌধুরী প্রমুখ আরও অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের। ২৫ মারচ জগন্নাথ হলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫৫ জন অধ্যাপক ও ছাত্রকে মেরে ফেলা হয়। জগন্নাথ হল, একটি হসটেল মাত্র নয়—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠভূমি। বাঙালির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯২১ সালের ১ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নে যে তিনটি হসটেল বা হল-এর পত্তন হয় তার মধ্যে জগন্নাথ হল একটি। মাঝখানে কিছুকাল তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। ১৯৫৭ থেকে আবার সে তার পূর্ব স্বাতন্ত্র্য ফিরে পায়।

জগন্নাথ হলের প্রথম প্রভোসট ছিলেন ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে তাঁর আমলেই প্রকাশিত হয় জগন্নাথ হলের মুখপত্র বাসন্তিকা। বাসন্তিকাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পত্রিকা।

১৯২৪ সালের ৪ আগসট ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার জগন্নাথ হলের দ্বিতীয় প্রভোসট নিযুক্ত হন। ১৯৩৭–১৯৪২ রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। এই জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সঙ্গে বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘ ও যুগান্তর দলের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৫৭ সালের ১ জুলাই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব জগন্নাথ হলের প্রভোসট হন। ১৯৭০ সালের ২০ এপরিল সময় পর্যন্ত তিনি জগন্নাথ হলের প্রভোসট ছিলেন। ডঃ দেব ও পরবর্তী প্রভোসট ইংরাজির অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পাক সৈনাদের হাতে নিহত হন।

জগন্নাথ হলের অসংখ্য বিশিষ্ট আবাসিকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী, মন্মথ রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু, বুদ্ধদেব বসু, ডঃ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, কবি নির্মলেন্দু গুণ, অশোক গুপ্ত, সাংবাদিক নির্মল সেন প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম মঞ্চ অভিনয় চালু হয় জগন্নাথ হলেই ১৯৪৮ সালে। জগন্নাথ হলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ হলেন নীহাররঞ্জন সরকার। জগন্নাথ কলেজের মুখপত্র বাসন্তিকায় একদা কবিতা লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বিখ্যাত বাসন্তিকা কবিতাটি – 'এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।'

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মেয়েদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। পাকিস্তানের মত প্রত্যেক অফিসে নামাজ ঘর করা হয়েছে। (যদিও খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি তাতে যোগ দেন)। রবিবারের বদলে শুক্র ও শনি ছুটির দিন ঘোষণা হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্র যে লক্ষ্যে ধাবিত হচ্ছে তার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের চিন্তা ভাবনা মিলছে না। পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর সংখ্যা অন্তত পাঁচগুণ বেশি। পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও স্কুলে ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়েছে। যে সব স্কুলে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা অল্প সেখানে হিন্দু ধর্মের জন্য আলাদা হিন্দু শিক্ষক রাখা সম্ভব নয়। কাজেই সেই সব ছাত্রদের হয় ইসলাম ধর্ম পড়তে হচ্ছে না হয় প্রাইভেটে ওই বিষয়টি পড়ে নিতে হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকার বিরাট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আমি শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিতে চান চরিত্র গঠনের উপাদান হিসাবে তাই না? তাহলে শুধু মুসলিম বা হিন্দু ধর্ম শিক্ষা না দিয়ে সমস্ত ধর্মের মানবিক আবেদন নিয়ে একটি সাধারণ নীতি শিক্ষা দিন না। শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন : আমাদের সমাজ আলোকপ্রাপ্ত নয়, শিক্ষার ভিত দুর্বল। এখানে ধর্মকে না এনে উপায় নেই।

কিন্তু ভারতে তো ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না—

ভারতে দেড়শ বছরের ওপর শিক্ষা আন্দোলন চলে এসেছে। আপনাদের দেশে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ট্রাডিশন আছে। আমরা মাত্র সবে আজ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে যাচ্ছি। তাই চাইব যাতে সামান্যতম প্রতিরোধ আসে। ধর্ম শিক্ষার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ (Cultural Identity) অব্যাহত থাকবে, নয়তো সেটা ভেঙে যাবে। দেশে অসংখ্য অননুমোদিত মাদ্রাসা আছে, আমরা সেগুলিকে একটা সিসটেমের মধ্যে আনতে চাই। তাই তাদের উপযোগী শিক্ষা না দিয়ে লাভ নেই। এটা সামাজিক দাবি। ১৬ হাজার মসজিদ স্কুলকে যদি প্রাক প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করি আমাদের সর্বজনীন শিক্ষার কাজ অনেকদূর এগুবে। বর্তমানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক। তারপর থেকে ঐচ্ছিক। সংখ্যালঘুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ, টোল ইত্যাদিও চলছে। তবে সামাজিক মূল কর্মকাণ্ড ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে সংস্কৃত চর্চা অনেক দূরে। ভারতেই যখন সংস্কৃতচর্চার এই হাল, এখন বাংলাদেশে যে ব্যাপারটি আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে তা স্বাভাবিক। তবু এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, তখনও বাংলাদেশে সংস্কৃত কলেজগুলি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে। সিলেটেও আমি সংস্কৃত কলেজ দেখে এলাম। ছাত্রসংখ্যা গুটি কয়েক। তবু চর্চা অব্যাহত।

ইসলামিক রাষ্ট্র সর্বত্র ধর্মীয় বাতাবরণ গড়ে তুলতে চায় যাতে জীবনের প্রতিটি আচরণই ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বহু স্কুলে ছেলেদের মাথায় টুপি পরে যাওয়া আবশ্যিক অথবা আকাঙ্ক্ষিত। আমার মনে আছে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে শখ করে জিন্না ক্যাপ মাথায় দিয়ে বেরিয়েছিলাম বলে মুসলমান সাংবাদিক বন্ধুরা আমায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। আজ গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় টুপি পরে

স্কুলে যায়। (আমি একে নিন্দা করছি না। কারণ পোশাক নিয়ে আমার কোন গোঁড়ামি নেই। আমি শুধু মানসিকতার ক্রমবিবর্তন বোঝাতে চাইছি)। সিলেটে আমার কাছে এক তরুণ সাংবাদিক এলেন। পুরো মৌলবির পোশাক। এসে বললেন : আমি এসেছি জানতে পেরে তিনি এসেছেন। তিনি একজন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বললেন : এখনকার আমল পালটে গেছে, সরকারে অনেকে আছেন যাঁরা বাংলাদেশ স্বাধীন হোক চাননি। তাই তাঁদের মত প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধারা একটু অসুবিধায় আছেন। সুতরাং পোশাক বা ধর্মনিষ্ঠা কারও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বহু ধর্মপ্রাণ মুসলিম আছেন যাঁরা উদার ও সহিষ্ণু আবার বহু নন প্র্যাকটিসিং, পশ্চিমী শিক্ষিত সাহেবী কেতার মুসলমান আছেন যাঁরা সাম্প্রদায়িক। হিন্দুদের মধ্যেও এমন ভাগ আছে। তবে রাষ্ট্র যদি সর্বদাই সমস্ত চিন্তার মধ্যে ধর্মকে ভিত্তি করতে থাকে তাহলে সনাতনপন্থী ও ধর্মান্ধরা প্রশ্রয় পায় এবং কাজ গুছোয়। সেই সংগে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। অথচ দেশ হয়েছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। পাকিস্তান আমলের এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার প্রকাশ ঘটছে সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউনডেশনের অনেক বইতে। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান থেকে শুরু করে এরসাদের একান্তসচিব করনেল সরিফ যত উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশির সংগে আমি কথা বলেছি, সবাইকে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আমার 'র‍্যাশনাল' বলে মনে হয়েছে। বদরুদ্দীন ওমর, কবীর চৌধুরী বা ফজলে লোহানীর মত মানুষ আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না। তাই তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টি থেকে ইতিহাসের বিচার করেন। আবার ধর্মে গভীরভাবে বিশ্বাসী লোকও তথ্যনিষ্ঠভাবে ইতিহাসকে বিচার করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ইতিহাসের পুনর্বিচারের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ইসলামিক ফাউনডেশন প্রকাশিত একটি বইতে (সংস্কৃতির রূপায়ণ, আখতার ফারুক) মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র জীবনানন্দকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বইতে বলা হচ্ছে : পরাধীনতার দুর্বহ বোঝায় জাতির অবনত মাথা যখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে মেরুদণ্ড যখন কুঁজো হয়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে তখন তাদের রবিবাবু নতুন করে মাথা নত করার স্তবক মুখস্থ করাচ্ছেন

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।'

নজরুল-এর বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেন,

বল বীর,
চির উন্নত মম শির
এ শির নেহারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।

পাক আমলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নজরুলকে বড় কবি বলে প্রচার করা হত। বহু বই প্রকাশিত হয়েছিল এ সম্পর্কে। ইসলামিক ফাউনডেশনও চেষ্টা করছেন নজরুলকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে প্রচার করার। কাজী নজরুল ইসলাম নামে বইতে হারভারড ফেরৎ আবদুল কুদ্দুস লিখেছেন 'বাংলা ভাষায় তাঁর লেখার মত লেখা আর নেই। আর কেউ এমন জোরালো ভাষায় কবিতা লিখতে পারেনি। জোরালো ভাষায় কবিতা বলতে পারেনি। এমন কবি বাংলাদেশে আর জন্মেনি।'

ইসলামিক ফাউনডেশন কম্যুনিজম-বিরোধী গ্রন্থও প্রকাশ করছেন (উল্লেখ্য ইসলাম-কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ, মোহম্মদ কুতব) অনেক প্রগতিশীল বাংলাদেশির অভিমত : বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অথবা বাঙালী জাতীয়তাবাদ যতক্ষণ না তার ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা তত দিন সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমাকে একজন শিক্ষিত হিন্দু বললেন, আজ যদি ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হয়ে যায় অথবা যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে বলা হয় হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধই রাষ্ট্রচিন্তায় রূপায়িত হবে, যদি বেতার দূরদর্শনে তিন চারবার করে কীর্তন হয়, যদি ইনডিয়ান এয়ার লাইনসের ঘোষণার আগে বলা হয় 'সিয়ারাম, সিয়ারাম'– 'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের বেল্‌ট বেঁধে নিন,' অথবা 'মা কালীর দয়ায়' আমরা ২২ মিনিটে ঢাকা পৌছব, তাহলে– ভারতের সংখ্যালঘুদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়? দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা জিম্মি ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ তো তৈরি হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে। অনেক সংখ্যালঘুর মতে বর্তমান অবস্থা স্থায়ী অবস্থা নয়। প্রগতিশীল শক্তি একদিন না একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই। সেদিন ধর্মের ব্যাপার আবার চাপা পড়ে যাবে। যেমন মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলিতে গিয়েছিল।

তবে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত সংখ্যালঘু এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি এক বাক্যে আমাকে বলেছেন শত্রু সম্পত্তি আইন যার পরিবর্তিত নাম ন্যস্ত সম্পত্তি আইন তার বিলোপ এখনই দরকার। এই আইনটি বাংলাদেশে অনর্থক সাম্প্রদায়িকতা জীইয়ে রেখেছে। হিন্দুরা মনে করছেন, এই আইনটি না তোলার কারণ শাসক দলের ওপর চাপ। স্বয়ং মুজিবর রহমানও এই আইনটি তোলেননি। এই আইনটি থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে যেসব হিন্দুরা রয়েছেন, তারা প্রধানত রয়েছেন ভিটেমাটি আর ভূসম্পত্তির টানে, এক কলমের খোঁচায় সেটি চলে গেলে আর তাদের কোন বন্ধন থাকবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই বেআইনীভাবে ভারতে চলে আসার চেষ্টা করবেন। ভারতীয় হাইকমিশনারকে আমি ঢাকায় আমার এই আশংকার কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আপনি কিছুতেই বাংলাদেশের মানুষকে ভারতে চলে যাওয়া ঠেকাতে পারবেন না। বিহারীরা চলে যাচ্ছে, যাবেও (বিহার) সমস্যা সম্পর্কে আমি বারান্তরে লিখব। হিন্দুরা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলে তাঁদের প্রবণতা হবে ভারতে চলে আসা। ভারতীয় দূতাবাসে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য অভিযোগ সম্বলিত চিঠি আসে। জানি না, ভারতের পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি দূতাবাস এমন চিঠি পান কিনা। কিন্তু পেলেও কারও কিছু করার নেই। কারণ নেহরু নুন চুক্তি যার অন্যতম শর্ত ছিল দুই দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে সংখ্যালঘুরা তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারবেন, আর সেই চুক্তির অস্তিত্ব নেই। সংখ্যালঘুদের মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলার আজ কেউ নেই। ভারতে তবু বহু সংগঠন আছে, গণতান্ত্রিক আবহাওয়া আছে কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সেসব কিছুই নেই। সংখ্যালঘুরা তাই শত্রু সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধেও সংঘবদ্ধভাবে কিছু বলতে পারছেন না। এই আইনটি সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করছি। কারণ ভারত ও বাংলাদেশ উভয় সরকারেরই বিষয়টি সম্পর্কে এখনই অবহিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে এরশাদ প্রশাসন সংখ্যালঘুদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে খুবই সতর্ক। অনেক বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক ঘটনা তাঁর দৃষ্টিতে আসায় সংগে সংগে প্রতিকার হয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে পিস মিল বা খণ্ড খণ্ড করে না দেখে সামগ্রিকভাবে দেখার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। □

ঢাকেশ্বরী মন্দির

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্কৃতি ভবন

আলোকচিত্র : সুশীল সূত্রধর

মাফিয়ানগরী বোমবাই

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

শহর বোমবের সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে স্মাগলারদের মধ্যে খুনোখুনি আর সংঘর্ষের খবর। সম্প্রতি বোমবের পুলিশ কমিশনার রিবেরো এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন কোলাবার কুখ্যাত গণিকাপল্লী। শুরু হয়ে গেছে রিবেরোকে সরানর নানা অপকৌশল। লেখক বোমবে গিয়ে বোমবের চোরাই চালান সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছেন বোমবের সাংবাদিক সলিল ঘোষ।

সিন–১/টেক–১

১১ জুন, ১৯৮৩। স্থান : এস এস জি হাসপাতাল, বরোদা। ইমারজেনসি ওয়ারড। ব্যস্ত-ত্রস্ত ডাক্তার, নারস। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামল পোরটিকোতে। শঙ্কিত ড্রাইভার কোনমতে টেনেটুনে দু'জন সদ্য আহত রোগীকে ডাক্তারদের হাতে তুলে দিয়েই এক নিমেষে উধাও। কাট।

সিন–১/টেক–২

ডাক্তারবা একজনের হাতে ও অন্যজনের গলায় বুলেটের ক্ষতচিহ্ন দেখেই চমকে উঠলেন। সংগে সংগে ইমারজেনসি অপারেশন। কাট।

সিন–১/টেক–৩

পুলিশ কমিশনার পি কে দত্ত হাসপাতাল থেকে টেলিফোনে বুলেটের আঘাত পাওয়া দুই রোগীর খবর পেলেন। স্পেশাল আই জি (ক্রাইম) মি: ইন্দারজিৎ বৈষ্ণবকে নিয়ে ছুটে গেলেন হাসপাতালে। কাট।

দুই রোগীকে এক ঝলক দেখে নেবার পরই শুরু হল প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর। মি: দত্ত ও মি: বৈষ্ণব নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করলেন। ওদের কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। হঠাৎ কেন ওদের দুজনকে অন্যেরা গুলি করবে?

শুরু হল জেরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রকাশ হল কত মারামারি, খুন-জখম, গুলিগোলা। কত মৃত্যু। কত রহস্য নেপথ্য জগতের আরো কত রোমহর্ষক কাহিনী। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এল। সাধারণ সাপ নয়, একেবারে জাত কেউটে। একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, শেষ পর্যন্ত তেরোটি কুখ্যাত চোরাকারবারী পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন একে একে। কেউ বোমবাই-তে, কেউ গুজরাতে।

এটা বোমবে চলচ্চিত্রের অমিতাভ বচ্চন, আমজাদ, রেখা অভিনীত চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নয়। সত্য ঘটনা।

বরোদা এস এস জি হাসপাতালে আহত অবস্থায় যে 'মহাপুরুষ' দুটির আবির্ভাব তারা কুখ্যাত স্মাগলার হাজী ইসমাইল ও দাউদ ইব্রাহিম।

সাংবাদিকের হাত পা কাটা

স্মাগলার দাউদ ইব্রাহিমের সংগে দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্মাগলার করিমলালার। স্মাগলিং নিয়ে দুজন হয়ে উঠেছিল দুজনের শত্রু। একজন সুযোগ পেলেই অপর জনকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছিল। এই রকমই এক সুযোগে বছর কয়েক আগে করিমলালার শিষ্য আমীর আলমাজেব খুন করে দাউদের ভাইকে। শুধু এটুকুই নয়। পত্রিকায় দাউদের দলকে সমর্থন করার জন্য করিমলালার দলের লোকেরা উর্দুভাষী সাংবাদিক ইকবালের হাত ও পা কেটে দেন। সাংবাদিক ইকবাল প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক কে এ আব্বাসের ভাইপো। এইসব আঘাতের প্রতিঘাত দেবার জন্য গোপনে গোপনে দাউদ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। আক্রোশ মেটানর এই ইচ্ছের ফলে দুদলের মধ্যে মাঝে মধ্যেই চলছিল আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ। এক সময় দুদলের এই দ্বন্দ্বকে মিটিয়ে দেবার জন্য হাজী মস্তান, রসিদ আরবা প্রমুখ সুপরিচিত স্মাগলাররাও চেষ্টা করেন। এদের হস্তক্ষেপের ফলে বছর দুয়েকের জন্য দুদলের মধ্যে গণ্ডগোল থেমে যায়। কিন্তু করিমলালার দলের হাতে এরপর হঠাৎ দাউদের ভাই খুন হয়। ফলে ধামাচাপা গণ্ডগোল আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। গত জুনের এগারো তারিখে ঐ নতুন করে শুরু হওয়া গণ্ডগোলের শিকার হন দাউদ ইব্রাহিম এবং হাজী ইসমাইল।

এবারও সেই আমীর আলমাজেব ঘাতকের ভূমিকা পালন করে।

দাউদ এবং হাজী ইসমাইলের আঘাত খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাউদ চুনাওয়ালা, লাললু যোগী প্রমুখ তেরোজন কুখ্যাত স্মাগলারই শুধু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে না, এইসব স্মাগলারদের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে বহু আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা-বারুদ।

বেআইনি কার্যকলাপ ও চোরাকারবারের জন্য কাস্টমস ও পুলিশের খাতার পাতায় পাতায় যাদের নাম তারা যে এমন নাটকীয় ভাবে একের পর এক ধরা পড়বে তা কেউ ভাবতে পারেনি।

আলো আঁধারের বোমবাই

ভিকটোরিয়া টারমিনাস। সামনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদপত্র 'টাইমস অব ইনডিয়া'র প্রাসাদোপম অফিস। ফ্লোরা ফাউনটেন, নরিম্যান পয়েন্ট, চোখ জুড়ান মেরিন ড্রাইভ, সীমাহীন আরব সাগর, দূরের নীল আকাশ। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। আছে ওবেরয় টাওয়ারস, শেরাটন, এক্সপ্রেস টাওয়ারস, ব্রেবোরন-ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, গাভাসকার, সন্দীপ পাতিল, আছেন অশোককুমার, রাজকাপুর থেকে শুরু করে আজকের অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, হেমা, রাখী, রেখা। আলোয় ঝলমল করছে সারা শহর। সম্পদ-সম্ভোগের এই তীর্থভূমিকে দেখে মনেই হয় না এই বোমবে ভারতেরই অন্যতম মহানগরী। সত্যিই বোমবে এক অনন্য শহর।

কিন্তু বোমবের পরিচয় শুধু এটুকুই নয়। আরও একটি কারণে বোমবে ভারতের অনন্য নগরী। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সৌন্দর্য কিংবা আধুনিকতার জন্য নয়, এই বোমবে মাফিয়াদের জন্য বিখ্যাত। মাফিয়া জগতের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে চোরাকারবারীর দল।

'মাফিয়া' শব্দটি ইতালিয়ান। মাফিয়া মানে সেই ধরনের মানুষ যারা যাবতীয় কুকর্মের সংগে লিপ্ত। যারা আইনও মানে না, শাসনও মানে না। স্বাধীন, বেপরোয়া।

কালো স্বর্গের দেবদূত

ভারতবর্ষের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য

৯৩০৯ মাইল ও সমুদ্র উপকূল প্রান্তরেখার দৈর্ঘ্য ৩৫৩৫ মাইল। এই সীমান্তের মধ্যেই আছে ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, চীন, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। সমুদ্রের ওপারে আছে পেটবো ডলারের তীর্থভূমি। এই সীমান্তের নানা জায়গায় স্মাগলিং চলছে। ভারতে যেসব জিনিসের চাহিদা সব চেয়ে বেশি তার অধিকাংশ জিনিসই আরব সাগরের ওপাশের কয়েকটি দেশে অত্যন্ত সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সস্তা। তাই ভারতবর্ষের পশ্চিমকূলেই স্মাগলিং করা জিনিসপত্রের আমদানী সবচেয়ে বেশি। আগে কলকাতাই ছিল ভারতের বৃহত্তম বন্দর। ১৯৬০ সালের পর থেকে বোমবাই ভারতের প্রধানতম বন্দর হয়ে পড়েছে। পশ্চিম উপকূলের মহারাষ্ট্র, গুজরাতের নানা জায়গায় আরও ছোটখাটো বন্দর আছে। বোমবের দুটি বিমান বন্দরও ভারতের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বিমান বন্দর। এই বন্দরগুলির জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করছেন ও শত শত কোটি টাকার আমদানি রপ্তানি চলছে। এবং তাবই অন্তরালে চলছে স্মাগলিং। পশ্চিম উপকূলের মহারাষ্ট্র-গুজরাতের অন্যান্য ছোটখাটো বন্দবগুলির আশেপাশে রাতের অন্ধকারে আরব সাগরের ওপারের দেশগুলি থেকে আসে কত অসংখ্য বোট। এই এক একটি বোটে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার জিনিসপত্র বেআইনিভাবে নিয়মিত আসছে। পশ্চিম উপকূলের এইসব গুরুত্ব ও সুযোগ সুবিধে আছে বলে এবং ভাবতের সবচেয়ে উন্নত ও বিত্তশালী মহানগরী বলে বোমবাইকে বলা যায় স্মাগলাবদের মক্কা মদিনা।

পাচার : কী ও কেন ?

রাতের অন্ধকাবে কাস্টমস পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে অথবা তাদের লালসা চরিতার্থ করে বিদেশ থেকে বেআইনিভাবে শুধু জিনিসপত্র আমদানী-ই হয় না, এদেশ থেকেও বহু জিনিস বিদেশে পাচার হয়। এই পাচার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রুপো। মধ্যপ্রাচ্য এবং উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে যেমন সোনা আসে তেমনি ভারত থেকে যায় রুপো। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৪৫ ভাগ (৭০ হাজার টন) রুপোই ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারতে যেমন সোনার চাহিদা, সোভিয়েত বা আমেরিকায় শ্বেত ধাতুর প্রয়োজন ঠিক তেমনি বেশি। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি রুপোর দর ছিল ২৩৬৭ টাকা। তখন ভারতে প্রতি কেজির দর ছিল ১৯৫৮ টাকা। ১৯৮০ সালে হঠাৎ রুপোর দর আকাশচুম্বী হয়। সে সময় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি রুপোর দর হয় ১৪ হাজার টাকা এবং তখন ভারতে প্রতি কেজি রূপোর দাম ছিল ৬৫০০ টাকা। স্মাগলিং করা সোনার পরিবর্তে এদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পাচার হয় রুপো।

রুপোর মতই পৃথিবীর ৪৫ শতাংশ আফিং উৎপন্ন হয় ভারতে। কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশে দশ কিলোগ্রাম কাঁচা আফিংয়ের দাম চার-পাঁচ হাজার টাকা। রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই দশ কিলোগ্রাম আফিং থেকে উৎপন্ন হয় এক কিলোগ্রাম হেরোইন। এই এক কিলোগ্রাম হেরোইনের দাম তিন লক্ষ টাকা। এবং পশ্চিম উপকূলের গুপ্তপথে বিদেশে পাচার হবার প্রাক্কালে বোমবের সুবিখ্যাত বান্দ্রা অঞ্চলের রাস্তায় এরই দাম হয় পঁচিশ লক্ষ টাকা। নির্ভরশীল সূত্র অনুসারে প্রতিবছর পাঁচ হাজার কেজি হেরোইন বোমবে থেকে বিদেশে পাচার হয়। এবং প্রতিবছর ১৫ কোটি টাকা আমরা পাই

রুপোর বা আফিংয়ের মত ব্যাপক হারে না হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দ্রব্যটি ভারত থেকে পাচার হয় তা হল ইউরেনিয়াম। এই আণবিক যুগে ইউরেনিয়ামের চাহিদা এবং ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু ভারতের মত মাত্র কয়েকটি দেশেই এই মহামূল্যবান ধাতুটিই পাওয়া যায়। মজার কথা কোন দরিদ্র বা অনুন্নত দেশ নয়, পৃথিবীর অত্যন্ত ধনী, উন্নত এবং ভাবী ৫ বর্তমান আণবিক শক্তি সম্পন্ন দেশগুলিতেই এই ধাতুর চাহিদা। অত্যন্ত শক্তিশালী দেশগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত থেকে ইউরেনিয়াম বিদেশে পাচার হয়। ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় যে এ ব্যাপারে ভারত সরকারও প্রকাশ্যে কিছু বলেন না।

পৃথিবীর সব দেশেই কম বেশি কয়লার প্রয়োজন। কিন্তু খুব স্বাভাবিক কারণেই এই খনিজ সম্পদটি সর্বত্র পাওয়া যায় না। কয়লার ব্যাপারে আমরা অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছি। প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রে ছাড়াও আরব সাগরের ওপারের নানা দেশে ভারতীয় কয়লার ব্যাপক চাহিদা

স্মাগলিং : ধরা পড়ে ক'জন ?

এত স্মাগলিং হচ্ছে অথচ ধরা পড়ছে ক'জন স্মাগলার ? দেখা যাক হিসেবটা। ১৯৮০ সালে ১৮৯৮ জন, ১৯৮১ সালে ২৭১৩ জন এবং ১৯৮২ সালে ২২৬৬ জন স্মাগলার ধরা পড়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের হাতে।

স্মাগলিংয়ের অপরাধে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস এবং এয়ার ইন্ডিয়া ১৯৮০ সালে ১০ জনকে, ১৯৮১ সালে ২২ জনকে এবং ১৯৮২ সালে ৭ জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আছে। চীনে প্রচুর কয়লা হয়। কিন্তু সে দেশ থেকে পাচার করা প্রায় অসম্ভব বলেই ভারতীয় কয়লার চাহিদা এত বেশি। শত শত লরি বোঝাই কয়লা নিত্য পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানে। পশ্চিম উপকূলের নানা ঘাটিতে বোট বোঝাই স্মাগলিং করা জিনিস-পত্র এনে এদের অনেকেই ফিরে যায় কয়লা নিয়ে। ঠিক একইভাবে পাচার হচ্ছে চিনি ও দেশি মদ। আরও কত রকম জিনিস যে পাচার হচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ভারতীয় উপমহাদেশের সব দেশেই পানের জনপ্রিয়তাও উল্লেখ্য। পাকিস্তানে কোটি কোটি লোক পান খান এবং এদের কাছে ভারতীয় পানের জন-প্রিয়তা প্রায় অবিশ্বাস্য। পশ্চিম উপকূলের কচ্ছ ও দক্ষিণ গুজরাতের নানা জায়গা থেকে ভারতীয় পান পাচার হয় পাকিস্তানে। পাঞ্জাব বসেই এই রপ্তানি বন্ধ করে দেয় এবং পেঁয়াজ প্রভৃতির দাম রাতা রাতি কমে যায়। এই রপ্তানি নিষেধ আজও আছে। কিন্তু ভারতীয় শাক

বিলাস হোটেল ওবেরয় টাওয়ার্স

অতঃ কিম

শত শত কোটি টাকার চোরা-কারবারীর ব্যবসার সংগে লিপ্ত ব্যক্তিরা যেমন শক্তিশালী তেমন ই বেপরোয়া। অর্থই এদের এক মাত্র উপাস্য দেবী। এরা পরোয়া করে না পুলিশ, কাস্টমস, নিয়ম কানুন, আইন-শৃংখলার বন্ধন। খুন, জখম এদের নিত্যকর্ম। বেশ্যালয় এবং বেআইনি মদের আড্ডাই এদের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র এবং এই সমস্ত ব্যবসাতেই এরা বহু অর্থ বিনিয়োগ করে। মহানগরী বোমবের দিক্ দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে এর প্রমাণ।

বেশ্যাবৃত্তি পৃথিবীর আদিমতম পেশা। কোথাও লুকিয়ে, কোথাও প্রকাশ্যে এই ব্যবসা চলছে। আমাদের দেশে অতি ছোটখাটো শহর ও গঞ্জগুলিও এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। তবে বোমবে শহরে যে ব্যাপক হারে বেশ্যাবৃত্তি চলছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। দিন, দিনই এর সংখ্যা বাড়ছে এবং গ্র্যান্ট রোডের প্লে হাউস বা পিলা হাউসে খাঁচায় বন্দী বেশ্যাদের দিয়ে ব্যবসা করানর বদলে বহুতল বাড়ির মনোরম পরিবেশে এই ব্যবসা আজ দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। বোমবে পুলিশ, সংবাদপত্র ও নানা মহল ভাল করেই জানেন বহুতল বাড়ির চার/পাঁচ লক্ষ টাকা দামের ফ্ল্যাটে পাঁচতারা হোটেলের বিলাস বাসনের পরিবেশে যে বেশ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছে তার নায়ক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এই স্মাগলাররা। এই বেশ্যালয়গুলিতে শুধু স্মাগলাররাই নিত্য যাতায়াত করেন তাই নয়, সরকারি, বেসরকারি মহলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপ্যায়ন পর্যন্ত করাও হয়। কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্রও এখানে লুকিয়ে রাখা হয়। গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কুরলার কল্পনা টকিজের সামনে একটি বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে বোমবে পৌরসভার কর্মীরা ৫৪ টি সটের বস্তা ভর্তি পাঁচ কোটি টাকা দামের দশ হাজার বিদেশি ঘড়ি পান।

স্মাগলিং : ধরা পড়ে কত টাকা ?

চোরাচালান করা সোনা ধরা পড়ে ১৯৮০ সালে ৮৩ লক্ষ টাকা, ১৯৮২ সালে ১৪ লক্ষ টাকা। চোরাচালানীর কাপড়-চোপড় ধরা পড়ে ১৯৮০ সালে ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, ১৯৮১ সালে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮২ সালে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। কাস্টমসের হাতে চোরাচালানের ঘড়ি ধরা পড়ে ১৯৮০ সালে ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, ১৯৮১ সালে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮২ সালে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

বোমবের বর্তমান পুলিশ কমিশ-নার মিঃ রিবেরো এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে নিত্য অভিযান চালিয়ে বহু রাজনৈতিক দলের অনেক নেতারই বিরাগভাজন হয়েছেন। এমনকি কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যে এই জনকল্যাণকামী ও দুঃসাহসী পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবি করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বোমবের প্রতিটি সংবাদপত্রের পাতায় এই মাফিয়াদের বেআইনি কার্যকলাপের কাহিনী এখন নিত্য প্রকাশিত হয় এবং তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় এই সমস্যাটি কী গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। মজার কথা প্রতিটি সংবাদপত্রই পুলিশ কমিশনার মিঃ রিবেরোর এই দুঃসাহসিক উদ্যমকে স্বাগত জানিয়েছেন। মিঃ রিবেরোর এই উদ্যম সার্থক হলে মাফিয়া নগরী বোমবের খ্যাতিতে নিশ্চই ভাটা পড়বে। কিন্তু সেই শুভদিন কি কোনদিন আসবে ? □

আলোকচিত্র : প্রবীর মিত্র

সীমান্ত দিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় পান চলে যায় পাকি-স্তানে। হিন্দি ফিলমের ভিডিও এবং লতা মংগেশকরের জনপ্রিয় গান-গুলিও চোরাপথে নিত্য চলে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে পাকিস্তান ও পারস্য উপকূলের নানা দেশে।

পাচার হওয়া জিনিসপত্রের তালিকা এখানেই শেষ নয়। নানা-রকম যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে বহু রকমের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস-পত্র এবং নানারকম খাদ্যসামগ্রী ভারত থেকে বিদেশে পাচার হয়। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি। বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য ইন্দিরা সরকার ব্যাপক হারে শাক-সব্জি ও বিশেষ করে পেঁয়াজ পারস্য উপ-কূলের নানা দেশে রপ্তানী করে বলেই পেঁয়াজের দাম সেই সময় প্রতি কেজিতে আট/দশ টাকায় পৌঁছে যায়। জনতা সরকার গদিতে

সব্জি, পেঁয়াজের চাহিদা অন্য দেশগুলিতেও মোটেই কমেনি বলে বোট বোঝাই হয়ে গুজরাত মহা-রাষ্ট্রের সীমান্ত থেকে আরব সাগরের ওপারে চলে যাচ্ছে।

স্বর্ণরাজ্য নরিমান পয়েন্ট, অধিকাংশ গাড়িই স্মাগলারদের

সাক্ষাৎকার

'টেলিভিশন কোন দুর্বল মাধ্যম নয়' শৈলেন্দ্রশংকর

'আগামী দু তিন বছরের মধ্যেই আমরা ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ জন লোকের ঘরে ঘরে টেলিভিশন পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করব' - দিল্লির দূরদর্শন কেন্দ্রে বসে দূরদর্শনের ডিরেকটর জেনারেল শৈলেন্দ্রশংকরের মুখ থেকে এ ধরনের আশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে মনে পড়েছিল মাত্র মাস খানেক আগেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এইচ কে এল ভগত টেলিভিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'This electronic media will reduce the world to a tribalised global village' টেলিভিশনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই দুই মহারথীর কাছ থেকে এরকম সন্তোষজনক সমাচার পাওয়াতে স্বভাবতই এই 'ইডিয়ট বকস' দুর্নামের ভাগীদার ইলেকট্রনিক যন্ত্রটির জন্য দুশ্চিন্তা বা আশংকার খানিকটা উপশম হয়। কিন্তু এই আশ্বাস তো পুরোপুরি ভবিষ্যতের পাওনা, বর্তমানের চাওয়া পাওয়া হিসেব মেলাতে বসলে টেলিভিশন আমাদের কতটুকু কী দেয়।

ঠিক এই প্রশ্নই রেখেছিলাম শৈলেন্দ্রশংকরের কাছে। সমবার আর ধোসা দিয়ে তড়িঘড়ি লানচ সেরে গোলাপি ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে তিনি জবাব দিয়েছেন 'টেলিভিশন কী দিচ্ছে, কতটুকু ইমপেস করতে পারছে তার প্রমাণ তো আজ দেশে ঝুপি ঝুপিপ গুলোতেও টেলিভিশনের অনুপ্রবেশ থেকেই অনুমান করা যায়। আমোদ-প্রমোদের আকর্ষণেই হোক আর শিক্ষালাভ করার তাগিদেই হোক, টেলিভিশন এখন রীতিমত হাউস হোলড নেম। দূরদর্শনের ডিরেকটর জেনারেলের এ কথায় একটু স্বন্দ্ব লাগল। পালটা প্রশ্ন করলাম 'ব্যাপারটা সত্যিই কি তাই - ভারত-বর্ষের গণমাধ্যমগুলির মধ্যে রেডিও বা বেতার যেরকম ভাবে সংবাদপত্র বা অন্যান্য মাধ্যমগুলিকে পিছনে ফেলে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে, টেলিভিশনের পক্ষে কি তা সম্ভব হয়েছে - অথচ রেডিও যে কারণে জনপ্রিয়, টেলিভিশনের পক্ষেও সেইসব কারণ তো বটেই, উপরি আরও বহু প্লাস পয়েনট ছিল যার দরুন রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা কি হয়েছে -'

শৈলেন্দ্রশংকর : ওভাবে তুলনা করলে চলবে না। টেলিভিশন তো এখনও রীতিমত কৈশোর পর্যায়েই রয়ে গেছে। অন্যান্য দেশে যে ভাবে টেলিভিশনের অগ্রগতি ঘটেছে, আমাদের এখনই সে পর্যায়ে পৌঁছতে একটু সময় তো লাগবেই। আজ রেডিওর পক্ষে যেখানে পৌঁছন সম্ভব হয়েছে, চেষ্টা করলে টেলিভিশন সেখানে পৌঁছতে পারবে না একথা কি বলা যায় সাধারণ বিচারে টেলিভিশনের আরও অনেক বেশি জনগ্রাহ্য হয়ে ওঠার কথা। এটা ঠিকই। তবে টেলিভিশনের প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও একটা বড় প্রশ্ন। একটা ছোট্ট ট্রানজিসটর যে খরচায় একজন কৃষক তার 'ক্ষেতি' করার সময়ও সংগে রাখতে পারেন, একটা টেলিভিশন কি এখনও সেরকমভাবে সুলভ হয়ে উঠতে পেরেছে আর আমার ধারণা আমাদের দেশে তা কখনই সম্ভব হবে না, তবুও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব এই ইলেকট্রনিক মাধ্যমটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনপ্রিয় করে তোলা যায়। এই প্রসংগে বলা যায় যে সম্প্রতি টেলিভিশনের সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬৮ কোটি টাকার বিশেষ প্ল্যান অনুমোদন করেছেন। এই প্ল্যান অনুসারে ১৯৮৪র শেষ অবধি আরও ১৩২টি নতুন ট্রানসমিশন সেনটার গড়ে তোলা হবে। এই প্ল্যান কার্যকর করার জন্য ইতোমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। ১৯৮৪র পর মোটামুটিভাবে টেলিভিশনকে আরও অনেক বেশি ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

পরিবর্তন : এইখানে একটা ব্যাপার ভেবে দেখার আছে। টেলিভিশনকে আরও বেশি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ট্রানসমিশন সেনটার গড়ে তোলা হল, কিংবা রঙিন টেলিভিশনের জন্য আরও ৬৮ কোটি টাকা খরচ করা হল সেটাই বড় কথা নয়। এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে টিভি যে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সেরকম গ্যারান্টি কি দেওয়া যাবে অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি টি ভির অনুষ্ঠানগুলি আরও বেশি মনোগ্রাহী না হলে এর 'ইডিয়ট বকস' দুর্নাম ঘোচানো যাবে কি ?

শৈলেন্দ্রশংকর : টিভিতে এখন যেসব প্রোগ্রাম দেখানো হয় সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়। তবুও ভাল প্রোগ্রাম দেখানো হয় বলেই 'উই ক্যান নট সিট কমপ্লেইসেনটলি।' নতুন ট্রান-সমিশন সেনটার গড়ে তোলা বা ৬৮ কোটি টাকা খরচ করে রঙিন টিভির সম্প্রসারণের মধ্যেও নিরন্তর চেষ্টা রয়েই যায় যাতে প্রোগ্রাম ভাল করা যায়, তাই 'ইডিয়ট বকস' বলার পেছনেও যথার্থ কোন কারণ নেই। এখনকার প্রোগ্রাম যথেষ্ট উঁচু দরের। আমরা চেষ্টা করি যাতে আমোদ প্রমোদের সংগে সংগে শিক্ষামূলক প্রোগ্রামও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। বোমবাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, শ্রীনগর প্রভৃতি কেন্দ্রে তো স্কুল কলেজের সিলেবাস ওরিয়েন-টেড প্রোগ্রামও প্রচুর করা হয়।

পরিবর্তন : কিন্তু প্র্যাকটিকালি দর্শকদের মতামত বিচার করলে দেখা যায় যে টিভির আকর্ষণ বলতে এখনও প্রধানত শনি-রবিবারের ছায়াছবি, বুধবারের চিত্রহার বা বিশেষ বিশেষ ফুটবল ম্যাচ বা ক্রিকেট টেসটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

আমার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই শ্রী শংকর উত্তেজিত ভাবে জবাব দিয়েছেন : কে বলেছে আপনাকে টিভির আকর্ষণ কেবল সিনেমা, গান আর খেলাধূলায় সীমাবদ্ধ। আমরা সারভে করে দেখেছি বিজ্ঞান বিষয়ক ফিচারগুলিও বেশ জনপ্রিয়। তাছাড়া কুইজ, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলিও যথেষ্ট দর্শক টানে।

পরিবর্তন : আপনার সারভে অনুযায়ী ব্যাপারটা হয়ত সত্যি কিন্তু আমি পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা

থেকে বলতে পারি, টিভি এখনও মূলত আমোদ-প্রমোদের উপকরণই হয়ে রয়েছে।

শৈলেন্দ্রশংকর : একথা কেন বলছেন জানিনা। তবে কলকাতার 'কুইজ' প্রোগ্রাম কিন্তু এত বেশি সমাদৃত যে আমরা খুব অল্প দিন পর পরই ঐ 'কুইজ' অন্যান্য সেনটারে টেলিকাসট করতে বাধ্য হই।

পরিবর্তন : প্রতিদিন বাধ্যতামূলক যে ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম টেলিকাসট করা হয়, তার মান সম্পর্কে দর্শকরা কি সন্তুষ্ট ?

শৈলেন্দ্রশংকর : আমাদের সারভে অনুযায়ী ন্যাশনাল প্রোগ্রাম যথেষ্ট জনপ্রিয়। আর জনপ্রিয় হবে নাই বা কেন, প্রত্যেক অঞ্চলের ভাল ভাল বাছা বাছা প্রোগ্রামই তো এই ন্যাশনাল প্রোগ্রামে দেখান হয়। (পশ্চিমবঙ্গের যে সব দর্শক রাত্রি ৮-৩০-এর সময় জাতীয় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিভিশন সেটের নব বন্ধ করে দেন, তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রী শংকরের বক্তব্যগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করে নেবেন)।

পরিবর্তন : প্রত্যেক অঞ্চলের বাছা বাছা প্রোগ্রাম দিয়েই যদি জাতীয় অনুষ্ঠান করা হবে, তবে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা বা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে অনবরত অভিযোগ করা হচ্ছে কেন যে জাতীয় প্রোগ্রামে এইসব রাজ্যগুলি অবহেলিত হয়ে আছে ?

শৈলেন্দ্রশংকর : আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ সবের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়ে গেছে। না হলে যাঁরা রেগুলার ন্যাশনাল প্রোগ্রাম দেখেন তাঁরা কখনই এই ধরনের অভিযোগ তুলতে পারেন না। এই অভিযোগ নিয়ে অবশ্য কেন্দ্র-রাজ্য পর্যায়ের এক বৈঠকও হয়ে গেছে। বৈঠকে স্থির হয়েছে রাজ্যগুলির এই অভিযোগ কতটা যথার্থ তা খতিয়ে দেখা হবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যগুলির কাছে আরও বেশি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হাই কিংবা লো পাওয়ারের ট্রানসমিটার বসাবার জন্য রাজ্যগুলি যেন পছন্দসই জায়গা ঠিক করে নেন, তা হলে টি ভি ট্রানসমিশন সম্প্রসারণের কাজটা তাড়াতাড়ি করা যাবে। আর এ ব্যাপারে রাজ্যসরকারগুলি যদি সহযোগিতা না করে তা হলে টি ভি সম্প্রসারণের ব্যাপারটা ক্রমশই পিছিয়ে পড়বে। আর ন্যাশনাল প্রোগ্রামে পাঠাবার জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে আরও বেশি করে উন্নতমানের অনুষ্ঠান প্রযোজনা করার অনুরোধও করা হয়েছে। তারা স্থানীয় নানান অনুষ্ঠান যত বেশি চিত্তাকর্ষক করে পরিবেশন করতে পারবেন, ততই বেশি করে ন্যাশনাল প্রোগ্রামে জায়গা করে নিতে পারবেন। জোর জবরদস্তি করে, হৈ চৈ, স্লোগান আর অভিযোগ করে তো কিছু হবে না। ভাল প্রোগ্রাম প্রোডিউস না করতে পারলে, ন্যাশনাল প্রোগ্রামে জায়গা পাওয়া যাবেনা।

পরিবর্তন : অর্থাৎ ন্যাশনাল প্রোগ্রামে এখন যে সব অনুষ্ঠান দেখান হয়, সেগুলো আপনার মতে যথেষ্ট সন্তোষজনক ?

শৈলেন্দ্রশংকর : সন্তোষজনক তো বটেই। তবে তার মানে এই নয় যে আমরা এতেই খুশী হয়ে চুপ করে বসে থাকব। কনটেনট আর কোয়ালিটি বাড়ানর জন্য সবরকমের চেষ্টা আমরা করে যাব, তবে এর জন্য রাজ্য সরকারগুলিরও উচিত স্থানীয় দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির ওপর নজর দেওয়া।

পরিবর্তন : বাংলাদেশ, আমেরিকা বা অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য দেশের মত টেলিভিশনকে কমারশিয়ালাইজ করার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

শৈলেন্দ্রশংকর : না, এখনই সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই। আর আমার মনে হয় আমাদের দেশে তার কোন প্রয়োজন হবে বলে মনেও হয়না।

পরিবর্তন : একটা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারলে টি ভি র সার্বিক মানের অনেক উন্নতি করা যেত না কি ?

শৈলেন্দ্রশংকর : আপনি বার বারই টি ভির মান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন কেন বুঝতে পারছি না। তবে আপনার প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিতে গেলে বলতে হয় প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ মানোন্নয়নে সাহায্য করে ঠিকই। তবে আমাদের দেশে এখনই তা নিয়ে না ভাবলেও চলবে।

পরিবর্তন : টি ভি প্রোগ্রামে সেনসরশিপ কতটা কার্যকর ?

শৈলেন্দ্রশংকর : টি ভির প্রোগ্রাম সিলেকট করার সময় সেনসরের কথাটা মাথায় রাখতেই হয়। কেননা টিভির দর্শক হচ্ছে পরিবারের সবাই, এবং একসঙ্গে। ফলে নজর রাখতে হয় সেকস, ভায়োলেনস বা কুরুচিপূর্ণ কোন প্রোগ্রাম যেন টেলিকাসট না করা হয়।

পরিবর্তন : বাজারচলতি হিন্দি সিনেমার কথা বাদ দিলেও, টিভিতে কমারশিয়াল বা বিজ্ঞাপন দেখানোর অছিলায় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা কিংবা স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদির কুরুচিপূর্ণ প্রদর্শন হয়, সে ব্যাপারে কোন আপত্তি সেনসর বোরড করেন না কেন ?

শৈলেন্দ্রশংকর : কমারশিয়াল বা বিজ্ঞাপনের ব্যাপার আলাদা। তবে কোন অ্যাডভারটাইজমেনট স্ট্রিপই অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ হলে তা দেখান হয় না। আপনি পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন, কিন্তু এটাতো জাতীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত, এ নিয়ে তো আপত্তির কিছু থাকতে পারেনা। রাস্তাঘাটে হাঁটতে, পত্র-পত্রিকা ওলটাতে গিয়েও তো সব বয়সের লোকেরাই এইসব বিজ্ঞাপন আকছার দেখছে। শুধু টি ভি তে দেখানো হলেই আপত্তি হবে কেন ? (টি ভি তে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেখানোর সময় যেসব পাঠকের বৈঠকখানায় ঝুপ করে নেমে আসে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া তাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেবেন দূরদর্শনের ডিরেকটর জেনারেলের এই ব্যাখ্যা)।

পরিবর্তন : গণমাধ্যম হিসেবে টি ভি যে অনেক শক্তিশালী একথা যদি মেনে নিই, তাহলে টি ভি তে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন আর পত্র পত্রিকা কিংবা রাস্তাঘাটের হোরডিং এ সাজান বিজ্ঞাপনের তফাৎ যে আছে এটা নিশ্চয়ই মানবেন।

শৈলেন্দ্রশংকর : বিজ্ঞাপন কিন্তু দুই জায়গাতে একই। সেখানে কোন হেরফের নেই।

পরিবর্তন : সবশেষে আর একটা প্রশ্ন করতে চাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার টি ভি ট্যাকস হিসেবে ৫০ টাকা করে যে কর ধার্য করেছেন, তা কি টি ভির জনপ্রিয়তা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব স্কিমের কথা বললেন তার পরিপন্থী হবে না ?

শৈলেন্দ্রশংকর : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০ টাকা করে ট্যাকস ইমপোজ করেছে না কি ? জানিনা তো! আমার কাছে এরকম কোন খবর এখনও আসেনি। তবে তাঁরা যদি মনে করেন ট্যাকস বসানো দরকার, তাঁরা তা বসাতেই পারেন। সেটা তাঁদের দায়িত্ব। আমরা তো জ্যোতি বসুকে বলতে পারিনা, এটা করবেন না, ওটা করবেন না। আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সর্বাঙ্গীন একটা সাহায্য আশা করব। আমরা ওঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইনটারফেয়ার করতে পারি না। তবে ৫০ টাকা ট্যাকস বসানর জন্য টি ভির জনপ্রিয়তা কমে যাবে বলে যারা মনে করে তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে টেলিভিশন কোন দুর্বল মাধ্যম নয়। □

সাক্ষাৎকার : দিব্যজ্যোতি বসু

একান্ত সংবাদ

অশোক মিত্র এখন বলেছেনঃ বেকারভাতা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা

বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র নিজেই এখন বলতে শুরু করেছেন, বেকারভাতা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া আর কোন কাজ হয়নি। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে সাপের ছুঁচো গেলার মত। বেকারভাতা একেবারে বন্ধ করতেও পারছেন না, আবার চালু রাখাও বিপদ। তবে ডঃ অশোক মিত্র বেকারদের বসিয়ে বসিয়ে আর ভাতা দেবেন না।

ইতিমধ্যে বেকারভাতা বাবদে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে খরচ হয়েছে ৬২ কোটি টাকার বেশি। প্রতি বছরই বেকারভাতার তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। বেকারভাতা চালু হয় ১৯৭৮ সালে। তখন বেকার ভাতা পেতেন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার জন। এ বছর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দু বছরে বেকারভাতা প্রাপকের সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এমপ্লয়মেনট একসচেনজে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা এখন ৩৬ লক্ষ।

বেকারভাতা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বেকারভাতা প্রাপকদের তালিকা থেকে এক হাজারেরও বেশি 'ভুয়ো বেকারে'র নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে এখনও তদন্ত চলছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, অন্তত আর চার হাজার 'ভুয়ো বেকার'-এর নাম তালিকায় আছে। ব্যাংকের মাধ্যমে বেকারভাতার টাকা দেওয়া হয়। ব্যাংকগুলিও হিসাব দিয়েছে, চার কোটি টাকা পড়ে আছে। ব্যাংক থেকে বেকাররা টাকা তুলছেন না। এখানেও সন্দেহ, কয়েক হাজার 'বেকার' আদৌ বেকার নন। ধরা পড়ার ভয়ে এ'রা ব্যাংকে আসছেন না। বেকারভাতা প্রকল্পে দুর্নীতির সঙ্গে এমপ্লয়মেনট একসচেনজের কিছু লোকও জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

বেকারভাতা প্রকল্প নিয়ে অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র সরকারি অফিসার এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। ১৯৭৮ সালে বেকারভাতা চালু করে ডঃ মিত্র 'বৈপ্লবিক পদক্ষেপ' বলে মন্তব্য করেছিলেন। ডঃ মিত্র গর্ববোধ করে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম বেকারভাতা চালু করা হল। আর এ কৃতিত্ব বামফ্রনট সরকারের। এখন সেই অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র বলছেন, 'বেকারভাতা চালু রাখা নিয়ে আমাদের সিরিয়াসলি ভাবতে হবে, ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে হবে।'

তাহলে কী হবে? বেকারভাতা প্রকল্প কি বাতিল করা হবে? তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে বামফ্রনট সরকারের মুখে চুনকালি পড়বে। ডঃ মিত্র অফিসারদের বলেছেন, আপনারা ভাবুন। কিছু একটা উপায় বের করতে হবে যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। স্ব-নিয়োগ, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান বা ওইরকম কিছু একটা কর্মসূচি তৈরি করতে হবে। ধরা যাক বেকারভাতা হিসাবে রাজ্যসরকার দিলেন এককালীন আঠের শো টাকা, তার সঙ্গে কিছু টাকা ব্যাংক ঋণ দিল। বেকার যুবককে কোন একটা ব্যবসায় নামান যেতে পারে। তাহলে বেকারভাতাও রইল আবার দেখান গেল বেকারদের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বেকারভাতা প্রকল্প আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থায় পাঠান হয়েছিল। সংস্থার কর্মকর্তারা প্রকল্পটিতে চোখ বোলাতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন, এরকম প্রকল্পের ঝুঁকি একটি রাজ্য সরকার নিলেন কী করে? রাজ্য সরকার কি বরাবর ভাতা দিয়ে যেতে পারবেন?

এখানে কোন কোন মহল থেকে দাবি তোলা হয়েছে, কলকারখানার ধর্মঘটী শ্রমিক কর্মচারীদের ভাতা চালু করা হোক। দাবি উঠেছে লকআউট বা ক্লোজার চলাকালীন এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সরকারকে ভাতা দিতে হবে।

অন্য কোন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মত বেকারভাতা নেই। কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য বীমা আছে। বেকারদের জন্য বীমা আছে। বেকারভাতা পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম। পরে অন্ধ্র, পানজাব, গুজরাট, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ত্রিপুরা, কেরালায় এবং সবশেষে আসামেও বেকারভাতা চালু করা হয়েছে। তবে ঢালাও নয়। কোথাও স্কুল ফাইন্যাল পাশ, স্নাতক বা কাজ জানা বেকারকে ভাতা দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে শিক্ষিত বেকাররা সাময়িকভাবে বেকার ভাতা পাচ্ছেন। মহারাষ্ট্রে আছে এমপ্লয়মেনট গ্যারানটি স্কিম।

অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র বেকার ভাতার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীদের তিনবার চিঠি লিখেছেন। কেন্দ্র একেবারে বাতিল করে দেননি। প্রত্যেকবারই জানিয়েছেন বিবেচনা করা হচ্ছে। দিল্লিতে সেপটেমবর মাসে রাজ্য শ্রমমন্ত্রীদের সম্মেলনেও পশ্চিমবঙ্গের বেকারভাতা প্রকল্প নিয়ে কথা হবে।

বেকারভাতা বামপন্থী দলগুলির দীর্ঘদিনের দাবি—'হয় কাজ দাও না হয় বেকারভাতা দাও।' ১৯৭৮ সালের বাজেটেই প্রথম বেকারভাতা বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তখন নিয়ম করা হয়, এমপ্লয়মেনট একসচেনজে যাঁদের নাম এক নাগাড়ে অন্তত পাঁচ বছর তালিকাভুক্ত আছে, বয়স ১৮ থেকে ৫৮ বছর এবং যাঁদের পরিবারের মাসিক আয় পাঁচশো টাকার বেশি নয় তাঁরা বেকারভাতা পাবার অধিকারী। তবে প্রাপকদের আদালত থেকে এফিডেবিট করাতে হবে। প্রত্যেককে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংকে অ্যাকাউনট করতে হবে।

ওইসময় ঠিক হয়, যাঁরা বেকার ভাতা পাবেন কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রত্যেকে বেকারভাতা পাবেন মাসে ৫০ টাকা। তিন বছর এই ভাতা দেওয়া হবে।

১৯৮২ সালে দ্বিতীয় বামফ্রনট সরকারের আমলে শ্রম দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত বেকার ভাতার ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্নীতির অভিযোগ পান। প্রবীরবাবুই বেকারভাতার ব্যাপারে পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করেন। আগে ছিল বয়স ১৮ থেকে ৫৮ বছর। অর্থাৎ বেকার হিসাবে নাম লেখান হয়েছে বয়স যখন ১৩ বছর। প্রবীরবাবুর নির্দেশে বয়স ঠিক করা হয় ২৩ থেকে ৪০ বছর। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর। পারিবারিক আয় পাঁচশো[illegible] বেশি নয় এবং কোথাও চাকরি করেন না—এই সার্টিফিকেট দেবেন স্থানীয় এম এল এ। বেকারভাতা প্রাপকের সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হ[illegible] সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উপর।

তাছাড়া ব্যাংকগুলিতে প্রতি মাসে রিপোর্ট দিতে হবে কত [illegible]

বিমান

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

বেকারভাতার টাকা নেননি।

এদিকে মন্ত্রী বেকারভাতা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার নির্দেশ দেন। অভিযোগ, এমন অনেকেরই বেকারভাতা প্রাপকের তালিকায় নাম আছে যাদের পরিবারের আয় দু তিন হাজার টাকা। স্বামী চাকরি করেন ছাব্বিশ শো টাকা মাইনের, স্ত্রীর নামে বেকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এমন বহু নাম আছে যাঁদের ঠিকানায় ওই নামে কোন লোক নেই, কোনদিন ছিলও না। কিন্তু নিয়মিতভাবে ব্যাংক থেকে বেকারভাতা টাকা তোলা হয়েছে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোন প্রকল্পে পারট টাইম কাজের জন্য ডাকা হলে বেকারভাতা প্রাপককে কাজ করতে হবে। অবশ্য তার জন্য অতিরিক্ত দুশো টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। বাস্তবে দেখা গিয়েছে শতকরা দশজনও এই কাজে যোগ দেননি। খোঁজ নিয়েও দেখা গিয়েছে, এঁরা অন্য জায়গায় কাজ করছেন।

ইতিমধ্যে ব্যাংকগুলি আর বেকারভাতা দেবার জন্য অ্যাকাউনট করতে রাজি নন। অর্থমন্ত্রীকে ব্যাংকের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন এতে ব্যাংকের কাজ বেড়েছে কিন্তু কোন আয় বাড়েনি। প্রায়ই বেকারভাতা প্রাপকরা ব্যাংকে এসে হামলা করেন। রাজ্যের ৩৩টি ব্যাংকের মাধ্যমে বেকারভাতা বিলি করা হয়।

শ্রম দফতরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অভিযোগ করেছেন, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাছ থেকে কোনরকম সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালে বেকারভাতা দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার, ১৯৭৯-৮০-তে ২ লক্ষ ১২ হাজার, ১৯৮০-৮১ সালে ২ লক্ষ ৭১ হাজার, ১৯৮১-৮২-তে ২ লক্ষ ৫ হাজার, ১৯৮২-৮৩-তে ২ লক্ষ ১৬ হাজার এবং চলতি বছরে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার।

ইতিমধ্যে তিন বছর ভাতা যাঁরা পেয়েছেন অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের বেকারভাতা বন্ধ করা হয়েছে তাঁদের একটা বড় অংশ দাবি তুলেছেন, চাকরি না দিয়ে বেকারভাতা বন্ধ করা চলবে না। □

বই-এর খবর

শরৎচন্দ্র বিধবাবিবাহ দেননি কিন্তু বিধবাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল : রাধারানী দেবী

১৩১৪ সালে ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পাঠকসমাজ যেভাবে শরৎচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানালেন এর আগে তেমনটি আর কোন বাঙালি লেখকের ভাগ্যে জোটেনি। চলতি কালের বিরুদ্ধ সমালোচকরা বলেন শরৎসাহিত্যে ধার নেই, সারও নেই। আজও কিন্তু শরৎচন্দ্রই বেসট সেলার।

অবহেলিত, অত্যাচারিতের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতার শেষ ছিল না। তাঁর মনটি ছিল বালকোচিত। জীবনের দু একটি ঘটনা সে তত্ত্বই প্রমাণ করে।

শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় কোথাও বিধবা বিবাহ দিতে না পারলেও বিধবাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। 'আমার বৈধব্য আসে তের বছর আট মাস বয়সে। এর পর আমার সঙ্গে স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের যে বিয়ে হয়, তাতে শরৎদার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আমাদের নতুন সংসার রচনায় শরৎদার উৎসাহের সীমা ছিল না।

একবার খুব মজা হয়েছিল। শরৎদা তিনটে মস্ত ইলিশ নিয়ে শোভাবাজারে যাচ্ছিলেন একজনকে ইলিশ খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরুবার পথে তাঁকে পাকড়াও করলেন শিশির ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাংকুর আতর্থী, চারু রায়, মায়া রায়, গিরিজাকুমার বসু ও তমাললতা বসু। ওঁরা ইলিশ সমেত শরৎদাকে নিয়ে এলেন আমাদের লিলুয়ার 'দেবালয়ে।' বাগানে উনুন পেতে রান্না। কলাপাতা কেটে বিকেলে হৈ-হৈ করে পঙক্তি ভোজন। দারুণ কেটেছিল দিনটা।

আমাদের বিয়েতে 'কল্লোল' গ্রুপকে বলা হয়নি, তবু খবর পেয়ে খুশি হয়ে ছুটে এসেছিলেন 'কল্লোলে'র অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেন্দ্রবাবু ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। দেব পরিবারের যাঁরা প্রধান তাঁরা প্রত্যেকেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

শরৎদা বার্মা থেকে কলকাতায় এলে উঠতেন শিবপুরের খুরুট রোডের একটি পতিতা পল্লীতে, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে আর চিৎপুর রোডে। খুরুট রোডেই ছিল তাঁর প্রধান আস্তানা। তিনি ওদের ক্রেতা হয়ে আনাগোনা করতেন না। ওরাও শরৎদাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসত।

একবার শরৎদা ভাগলপুর থেকে নিরুপমা দেবীর ছোট্ট একটা চিঠি পেয়ে নিরুদ্দেশ হন। চিঠিতে লেখা ছিল ---- এখানে যোগাযোগ কখনও আর রাখবেন না। আপনি দূরে চলে যান।

জীবনের সত্য প্রায়ই অপ্রিয় হয়ে থাকে। আজ এমনি একটি অপ্রিয় সত্য বলতে হচ্ছে, হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন জীবনসঙ্গিনী।

শরৎচন্দ্রের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে অনেক কাল্পনিক কথা কেউ কেউ লিখেছেন। উদ্বিগ্ন সাহিত্যিকদের অনুরোধে আমার স্বামী শরৎদার জীবনী লেখায় হাত দেন।

শরৎদার লোকান্তরের দশ বছর বাদে বৃন্দাবনে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে আমাদের দেখা হতে তিনি হু-হু করে কেঁদে বলেছিলেন – তোমরা কত আদরের জিনিস। তোমরা শরৎদার রাধু-নরেন।

শরৎদার মনের মধ্যে নিরুপমার যে ভাবমূর্তি ছিল, নায়িকাদের তেমনি করেই এঁকেছেন। শরৎদা বোধহয় আমাদের দেশে প্রথম লেখক, যিনি শুধু লেখার জোরে জীবনে গাড়ি, বাড়ি করেছিলেন।'

শরৎচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন তাঁর জীবৎকাল থেকে চলে আসছে। গোপালচন্দ্র রায় যদিও হিরন্ময়ী দেবীকে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী বলে প্রচার করেছেন এবং নানা যুক্তি দিয়েছেন কিন্তু তাতে সত্যকেই বিকৃত করা হয়েছে।

লেখিকা বলেছেন, 'শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনও কোনও বিরুদ্ধতা দেখিনি, যদিও কবি শরৎচন্দ্রের কাছে আঘাত পেয়েছেন যথেষ্ট।' □

শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প/
রাধারানী দেবী
আনন্দ পাবলিশারস প্রা. লি
কলকাতা—৯

প্রবীর ঘোষ

ভারতের তৃতীয় দক্ষিণ মেরু অভিযান হবে আরও বড়

নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার

ডকটর সৈয়দ জাফুর কাসিম

সমুদ্র জলে আছে কম করে ষাট প্রকারের প্রয়োজনীয় পদার্থ। জাপান এখন সমুদ্র জল থেকে তুলছে ইউরেনিয়াম। পৃথিবীর স্থলভাগে যা আছে তা সব কিছুই পাওয়া সমুদ্রতলবর্তী ভূখণ্ডে। 'তফাৎ এই, যে, ওগুলো জলে ঢাকা', বলেছিলেন সমুদ্র উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ডকটর সৈয়দ জাফুর কাসিম। 'পরিবর্তনের' সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছিলেন। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে নয়া দিললিতে, তাঁর অফিস কামরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সাউথ ব্লকের ১১১ নম্বর ঘরে।

আমাদের কথাবার্তার প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্যদের দক্ষিণ মেরু অভিযান।

'সীমিত লক্ষ্য নিয়ে ২১ জন সদস্য সহ প্রথম অভিযান গোয়ার মারসাগোয়া বন্দর থেকে দক্ষিণমেরুর দিকে রওনা হয়েছিল ১৯৮১ সনের ৬ ডিসেম্বর। অবশ্য এই ২১ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আগেই। কাউকে কাশ্মীরের গুলমার্গে একটি আরক্ষা সংস্থায়। কাউকে বা সমুদ্র জলযানে, যাতে অভিযানের সদস্যরা অভিজ্ঞ হন, অত্যন্ত শীতে থাকার অভিজ্ঞতায় ও সমুদ্র-গমন অভিজ্ঞতায়।'

যাত্রাপথ ছিল গোয়া থেকে দক্ষিণমেরু। জাহাজ 'পোলার সারকল।' নরওয়ে দেশ থেকে ভাড়া নেওয়া, যে-জাহাজ বরফ কেটে এগোতে পারে। এরা দক্ষিণ মেরুতে নামলেন ১৯৮২-র ৯ জানুয়ারি। অবশ্য তিনবার অসফল হয়েছিল অবতরণ প্রচেষ্টা। চারদিকে বরফের পাহাড়। তখন পথ দেখায় ভারতীয় নৌবাহিনীর হেলিকপটার। তারা উড়ে যেত পোলার সারকল থেকে, জানাত জাহাজ কোন দিকে এগোবে। অবশেষে তিনবারের চেষ্টায় জাহাজ এল দক্ষিণ মেরুর এমন এক স্থানে যেখানে তারা নামতে পারবেন। নামলেনও। দক্ষিণ মেরুতে প্রথম অভিযান ছিল ১০ দিনের। ফিরে এলেন ১৯৮২-র ২২ ফেবরুয়ারি।

ডকটর কাসিমের কথায়: 'দক্ষিণ মেরু যেন এক ভারজিনল্যানড। কোথায় পাহাড়-পাথর। অধিকাংশ স্থান চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা,—গরমে তা গলে যায়। সেই সঙ্গে আছে ভাসমান আইসবারগ। কোনটি কোনটি প্রায় কয়েক কিলোমিটার গভীর। ওখানকার আবহাওয়ায় মালিন্য নেই। জমি, পাথর, বরফ, জল সবই সম্পূর্ণ মালিন্যহীন। যেমন সূর্য থেকে আসা কসমিক রশ্মি রয়েছে অমলিন। সেজন্য এখানে মিলছে বৈজ্ঞানিকদের কাছে আশাপ্রদ পরীক্ষার বস্তু। প্রাণী-জগতের মধ্যে আছে পেংগুইন এবং সিল মাছ।'

আমরা যে ফিলমটিতে অভিযান সংক্রান্ত ঘটনা দেখলাম, তাতে প্রমাণ হল এরা নির্ভয়ে মানুষের কাছে আসে।

কাসিম জানালেন, 'এই অমলিন স্থান বলেই অনেক দেশ অনেক প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে দক্ষিণ মেরুতে। আমরা আরম্ভ করেছি মাত্র।'

পরিবর্তন : স্যার, সেদিন আমরা ইনডিয়া ইনটারন্যাশনাল সেনটারে দক্ষিণ মেরু অভিযান নিয়ে আপনার ভাষণ শুনলাম। চলচ্চিত্রও দেখলাম। সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু বলবেন কি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই দুটো অভিযান কেন, কী উদ্দেশ্যে?

কাসিম : 'দক্ষিণ মেরু নিয়ে অনেক উন্নত দেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছিল, এখনও করছে। ভারত সরকার ও আমাদের দফতরও স্থির করল, আমরাও করব। আমাদের দক্ষ বৈজ্ঞানিকরা রয়েছেন, যন্ত্রপাতিও আছে। বিশেষত, ঐ স্থানে আমাদের নিরীক্ষার বিশেষ বিষয় (অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে) মৌসুমী বায়ু নিয়ে।

আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা একদিকে জানাচ্ছে হিমালয়ের বরফ রাজ্যের প্রভাব, অন্যদিকে দক্ষিণমেরুর চিরস্থায়ী বরফ রাজ্য, যেখানে ছয় মাস ক্রমাগত সূর্যের আলো, অন্য ছয় মাস সূর্য-আলোহীন অন্ধকার। দুই অভিযানে আমরা জেনেছি যে, ভারতে কখন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হবে। অথবা আদৌ হবে না। এর অনেকটা নির্ভর করে ঐ সুদূর দক্ষিণ মেরুর বরফ রাজ্যের উপর।'

পরিবর্তন : কেন? কী আশ্চর্য!

কাসিম : না, বৈজ্ঞানিকদের কাছে আশ্চর্য নয়, ঐ দক্ষিণ মেরুর অতি শীতল অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মে আকাশে ওঠে অনবরত বাষ্পসহ-বাতাস। মেঘের আকার নিয়ে ঐ বাতাস, বৈজ্ঞানিক কারণেই উড়ে আসে ভারতের দিকে, মৌসুমী সময়ে। ছোট করে বলতে গেলে, ঐ দক্ষিণ মেরুর বাষ্প-বাতাস,—দীর্ঘপথে নানা প্রভাব মিলিয়ে আসে আমরা যাকে বলি মৌসুমী বৃষ্টি, যা দেয় আমাদের ধান-চাল, গম, বাজরা, এবং অনেক রকমের ডাল। এসবই আমাদের অর্থনীতির কাঠামো। আমাদের দেশীয় বিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে যে, আমরা দক্ষিণ মেরুতে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এখন সক্ষম। শুধু মৌসুমী বায়ু নিয়ে নয়,—ভূতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, সমুদ্রের প্রাণী-বিজ্ঞান, সূর্যকিরণ, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি বিষয়ও আছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা উন্নত দেশ থেকে খুব পিছিয়ে নেই।

[illegible] অভিযানে তোলা রঙিন মুভি দেখালেন ডকটর কাসিম। দেখালেন ও ব্যাখ্যা করলেন আরো অনেক স্লাইড। নীল রঙ যে কতটা নীল হতে পারে, বিস্ময়কর নীল হতে পারে, দক্ষিণ মেরুর সমুদ্র তার পরিচয়। নির্ভয়ে মানুষের মত হেঁটে মানুষের কাছে আসে পেংগুইনরা দল বেঁধে। সিল মাছ আসে নির্ভয়ে একেবারে হাতের কাছে। মাটি, জমি, পাথর, পাহাড়, ঝর্ণা, হ্রদ আছে, ঘাসও আছে। আছে চারদিকে ভাসমান বরফ, আইসবারগ। এক একটি যেন এক মাইল লম্বা। পোলার সারকল যখন বরফের ভিতরে ঢোকে (আইসবারগ নয়), তখন মনে হয় যেন বরফের দুটো দ্বীপ দুপাশে দুই ভাগ হয়ে গেল। বরফ কাটিয়ে কাটিয়ে পথ এগোয় জাহাজ।

মাটির তলা থেকে পাওয়া নানান জিনিসের পরীক্ষানিরীক্ষা

ডকটর কাসিম আরও জানালেন, 'প্রথম অভিযানের দশদিন দক্ষিণ মেরুতে থাকার সময়, আমরা সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর। গোয়া থেকে দক্ষিণ মেরুর সমুদ্রজল দূষণ পরীক্ষার জন্য, কসমিক রশ্মীর নিরীক্ষা, হিমবাহের পরীক্ষা, সমুদ্রজলে উপর থেকে সমুদ্রতল অবধি শৈত্য পরীক্ষা, রসায়ন ও মাইক্রোবায়োলজি, সবই ছিল প্রথম অভিযানের নিরীক্ষার বিষয়। দক্ষিণ মেরু দেশে আছে প্রচুর সম্পদ। ওখানে হঠাৎ করে আবহাওয়া বদলে যায়। হঠাৎ আসে প্রবল ঝড়, তুফান, কিংবা হঠাৎ শুরু হয় তুষারপাত।'

মুভিতে দেখলাম, দক্ষিণ মেরুর হঠাৎ আসা তুফান, কয়েক সেকেনডে উড়ে গেল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের তাঁবু। অনেকে ঐ ঝড়ের মধ্যেই দৌড়ে গিয়ে উদ্ধার করে জাহাজে নিয়ে এলেন মূল্যবান যন্ত্রপাতি। সকলের পোশাকাদি টকটকে রঙের, যাতে দূর থেকে দেখা যায়। ক্যামপের সামনে বরফে লাল রঙ দিয়ে খুব বড় বড় করে লেখা ভারতীয় অভিযানের নাম, যেকোন উড়োজাহাজ তা পড়তে পারবে উপর থেকে।

ডকটর কাসিম বললেন, 'দ্বিতীয় অভিযানে (এই বছরের গ্রীষ্মে) ছিল ৯টি সংস্থা থেকে ২৮ জন লোক। নেতৃত্বে ছিলেন ভি কে রায়না। প্রথমটার ছিলাম আমি নিজে। উদ্দেশ্য: দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের জীবন্ত প্রাণীসমূহের নিরীক্ষা। যেমন 'ক্রীল' (অত্যন্ত ছোট চিংড়ি মাছের মত, জলে, শ্যাওলার মত ভেসে থাকে মাইল মাইল জুড়ে) হাজার হাজার টন ক্রীল সমুদ্রে ভাসছে। প্রোটিনে ভরা। তিমিরা ক্রীল খেয়ে মেরু সমুদ্রে বড় হয়। ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলিও ভাবছে কী করে ক্রীলকে মানুষের খাদ্য পর্যায়ে আনা যায়। আরো বিষয়, যথা: নতুন জিনিসের খনিজতত্ত্ব; অত্যধিক ঠাণ্ডায় মেরুতে বসবাসের নানান সমস্যা এবং ঐ আবহাওয়ায় বাস কালে ভারতীয়দের জন্য কী ধরনের ওষুধপত্র ও খাদ্যবস্তুর বিশেষ প্রয়োজন হবে। কেননা আমরা একটি স্থায়ী স্টেশন করতে যাচ্ছি দক্ষিণ মেরুতে। নানান ধরনের জীবাণুর পরীক্ষা ও পরিবেশ অনুধাবনও ছিল দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য। স্থায়ী স্টেশনের জন্য কিছু ব্যারাক এই অভিযানে তৈরি হয়েছে।'

তিনি বললেন, আমাদের তৃতীয় অভিযান আরো বড় হবে।

নয়া দিল্লির বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত পরিষদের ডাইরেকটর জেনারেল ডকটর সিধু হায়দরাবাদে গত ২৩ জুলাই বলেছেন, এই বছরের অকটোবরে যাবে তৃতীয় অভিযান, এবং সদস্য সংখ্যা অন্যগুলোর তুলনায় তিনগুণ বেশি হবে। এতে এই প্রথম থাকবে দু'জন মহিলাও। এবার একটা প্রধান কাজ হবে স্থায়ী স্টেশনের জন্য আবাসন তৈরি করা, যাতে লোকেরা কিছুটা আয়াসে থাকতে পারে।

ডকটর কাসিম জানালেন আমাদের সেনা দফতর সহায়তা করছে এতে। তারপর মেরুতে শীতকালের মোকাবিলা করার সমস্যা। ডাক্তার, হাসপাতাল, যথেষ্ট খাদ্যবস্তু ও জ্বালানি সংরক্ষণ, অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করা, সংবাদাদি আদান-প্রদান এবং এরোপ্লেন, হেলিকপটার নামার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সব অভিযানের বৈজ্ঞানিক কাজ চলতেই থাকবে।

পরিবর্তন: ভারতের অভিযানগুলো প্রমাণ করে যে, ভারত, ১৯৫৯ সনের দক্ষিণ মেরু আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য। বর্তমানে ১৪টি রাষ্ট্র এর সদস্য, যাকে বলা হয় অ্যানটারটিক ক্লাব। ভারত কি তার সদস্যপদ-প্রার্থী?

কাসিম: প্রস্তাবটা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। কী সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হবে, আমার পক্ষে বলা কঠিন। সদস্য পদের জন্য ভারত আবেদন জানালে ঐ আন্তর্জাতিক সমিতি খুঁটিয়ে দেখবে ভারতের যোগ্যতা আছে কিনা সিদ্ধান্ত সমিতির হাতে। কিন্তু দুনিয়ার কাছে আজ পরিষ্কার, যে, ভারত দক্ষিণ মেরু নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্যদিকে অনেক কাজ করেছে ও করবে। আমাদের স্থায়ী আবাসনটা সম্পূর্ণ হোক। দেখা যাবে, ক্লাবের সদস্য ভারত হবে কি হবে না।' □

আলোকচিত্র: লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

গবেষকরা শিবির [illegible] আপ্যায়ন জানাচ্ছে

পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা এবং জেল প্রশাসন

গোবিন্দ মুখোটি

পুলিশ শব্দটি ইউনিফরম পরিহিত এমন এক ব্যক্তির ধারণা আমাদের সামনে হাজির করে যে উগ্র, দুর্নীতিপরায়ণ, অসৎ এবং উস্কানি অথবা উস্কানি ছাড়া – বস্তুত উস্কানি ছাড়াই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে।

এমন ধাবণা কেন হয় ·

কাবণ দেশেব স্বাধীনতাকামী জনগণেব আকাঙ্ক্ষা কঠোবভাবে দমন করার জন্য ১৮৫৭ব সিপাহী বিদ্রোদের পর বস্তুত উপনিবেশবাদী প্রভুদের হাতে তৈরি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পুলিশ আইনের নিগড়ে সে বাঁধা। সাদা সাহেবেব স্থলাভিষিক্ত হয়ে স্বদেশি সাহেবরা আবও খাদ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ইত্যাদিব দাবিতে সচ্ছলতব জীবনযাপনের দাবিদার জনগণকে দমিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য পুলিশকে একই নির্মম কাজে লাগালেন। অথচ পরাধীনতার সময়ে পুলিশের উগ্রতার শিকাব তারাও হয়েছিলেন।

'ইনডিয়ান একসপ্রেস'–এব ১৯৭৭ সালের ১৫ আগসট সংখ্যায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং লিখেছিলেন, '১৮৬১ খৃস্টাব্দের পুলিশ আইন মোতাবেক মূল কাঠামোগত ও সাংগঠনিক যে গন্ডির মধ্যে পুলিশ কাজ করে তা এখনও চলনসই। যদিও ঔপনিবেশিক শাসনকে সংহত ও চিরস্থায়ী করার মনোভাবে চালিত হয়ে বৃটিশ শক্তি যেসব নীতি ও কর্মসূচী নিত তাতে দেখত যাতে পুলিশসহ সব প্রশাসনিক সংস্থাগুলি এই পথে এগোতে সাহায্য করে। সন্দেহ নেই, পুলিশকে বক্ষণাবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও দমনপীড়নের কাজগুলি সমাধা করার জন্য বলা হয়েছিল। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণে পুলিশ ভয় দেখান ও শাস্তি দেবার এক সবকাবি শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হল। জনগণের বন্ধু, পবামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক বলে পুলিশকে যেমন ভাবা হয়েছিল বাস্তবে সে তা হল না।

নুরানি বলেছেন, 'পুলিশেব কাজে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সবকাব ও উচ্চকাঙ্ক্ষী মুখ্যমন্ত্রীরা লক্ষ্য করেছেন পুলিশমন্ত্রীরা নিজেব খেয়াল খুশি মত কাজ কবেন। প্রতাপ সিং কায়বোঁ এবং বকসি গুলাম মহম্মদেব সেই অতীত দিনগুলিব কথাই ধরা যাক। তাঁদের খেয়ালখুশির এই উদাহরণগুলিই কেন্দ্রে চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সরকার গঠনে সহায়ক হয়েছে।'

এলাহাবাদ হাইকোরটের প্রাক্তন বিচারপতি এবং কারা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমুল্লা বিচারক থাকাকালীন ছয়ের দশকের প্রথম দিকে লিখেছিলেন, 'খবতীয় দায়িত্ব নিয়ে বলছি ভারতীয় পুলিশবাহিনী নামে খ্যাত সংগঠিত গোষ্ঠীটির অপরাধের যে প্রমাণ আছে তার কাছাকাছি যাবার মত সারা ভারতে এমন কোন একক বেপরোয়া গোষ্ঠী নেই।'

এর কোন পরিবর্তনও হয়নি। কেননা তাঁর আগেকার বক্তব্যের কুড়ি বছর পর কারা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীমুল্লা ঘোষণা করলেন 'অপরাধ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে, অপরাধী ও তথাকথিত আইন রক্ষকদের মধ্যে বেশ ভাল রকমের যোগসাজস। পশাসন যতক্ষণ না এই যোগসাজস ছিন্ন করতে পারছে ততক্ষণ অপবাধ কমাব কোন সম্ভাবনাই নেই।

শ্রীমুল্লা বলেছেন, 'কারাগারে এখন নির্দোষ অপবাধীব সংখ্যা উল্লেখ্য বকম বেড়ে গেছে।' তাঁব প্রশ্ন, 'সবকাব কি এটা উপলব্ধি কবেন না যে, পুলিশবাহিনীই আমাদেব নাগরিকদেব দুর্নীতি ও তাদেব ওপব নৃশংসতাব জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী · আইনবক্ষকদেব কাছ থেকে যতটা নিরাপত্তা আশা কবা হয় নাগবিকরা ততখানি নিবাপত্তা পান না।'

অতীতে পুলিশী নৃশংসতা এবং এখনও প্রত্যেক দিন যা ঘটে চলেছে তাব অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন : অত্যাচাব কবে বাজনকে মেবে ফেলা, ভাগলপুবে অন্ধ কবে দেওয়া, প্রকাশ্য দিবালোকে মায়া ত্যাগীকে ধর্ষণ এসব সহজেই মনে পড়ে।

মানবিক অধিকাব প্রতিষ্ঠাব যাবতীয় আন্দোলন দমন কবাব জন্য এবং বিবোধী বাজনীতিকদেব হেনস্থা করাব জন্য প্রশাসন পুলিশকে দমননীতির কাজে লাগায়। যারা সরকারি নীতি সমর্থন করে না তখনই সেইসব নির্দোষদের পুলিশ নিয়মিত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে। সে সময় বিচার বিভাগের কাজ কী ·

বিচার বিভাগেব ভূমিকা বোঝার আগে আমাদের আইনের ভূমিকার কথা ভাবতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে কেন অপরাধ আইনের সৃষ্টি হয়েছে ? কার সুবিধার্থে ? মূলত সব আইনই তৈরি

গোবিন্দ মুখোটি / আলোকচিত্র : সৌগত রায়বর্মন

হয়েছে রাজা, সম্রাট, সভাসদ, স্থানীয় রাজা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ—এক কথায় ক্ষমতাবানদের জন্য। মোটামুটি বলা যায় সব আইনের ধারাগুলিই ক্ষমতাবানদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তৈরি।

এটা মূলত ব্যক্তি এবং সম্পত্তিকেন্দ্রিক। সম্পত্তি অথবা যারা সম্পত্তির মালিক সেই শ্রেণীর হাত থেকে সমাজ বা নাগরিকদের রক্ষা করার কোন সমবেত প্রচেষ্টা নেই।

ধনী এবং ক্ষমতাবান, পুঁজিপতি, বৃহৎ শিল্পপতি, দুর্নীতিবাজ ও চোরাচালানীরা অর্থনীতিকে পঙ্গু করে মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে – লক্ষ লক্ষ লোককে ক্ষুধা ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ধরনের লোকদের কোন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এবং ছোট ছোট গোষ্ঠীর অপরাধও খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। আমলা ও সরকারি সংস্থার ম্যানেজারদের অপরাধের জন্য বিচার হয় না, অথচ তাদের জন্য সারা দেশের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাস্তিদান প্রথা এখন পুরনো হয়ে গেছে। তথাকথিত অপরাধের দিকেই আমরা নজর দিই কিন্তু তার আড়ালে প্রকৃত কারণগুলি খুঁজে দেখি না। কেন হত্যার ঘটনা ঘটে? সমাজতান্ত্রিক সমাজে চুরির ঘটনা ঘটে কেন? সত্যিই যদি সমাজটা সমাজতান্ত্রিক হয় তা হলে এমন সব অপরাধ ঘটবে কেন? আর মৌল প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে ত্রুটিটা কোথায় লুকিয়ে আছে? প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শাসকশ্রেণী যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাহলে সাধারণ ক্ষুধার্ত নাগরিক বেপরোয়া হয়ে ক্ষুধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অধিকতর ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এক মুঠি অন্ন নিয়ে নেয়। এটা কি অপরাধ? সাধারণ আইনের চোখে হয়তো তাই। এই তথাকথিত অপরাধের জন্য একজন অনশন গ্রস্ত ক্ষুধার্ত মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, সে সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শাসকশ্রেণী বিলাসব্যসনে ডুবে থাকে। সাধারণ অপরাধী নাগরিকদের মত তারাও সমান অপরাধী। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দেশপ্রেমিক রূপে গণ্য হয়, কেউ বা জনগণের হাতে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

বিচার বিভাগের সদস্যরা একই সমাজ, একই প্রবণতা, একই সংস্কার, যৎসামান্য বেতনের জন্য একই হতাশাবোধ নিয়ে আসেন। এমন সামান্য বেতন এবং সদাসর্বদা রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও অত্যাশ্চর্য ভাবে কেউ কেউ ঠিক ঠিক রায় দেন। তা সত্ত্বেও, এ কথা আমেরিকাতেও বলা হয় যে, গরিব-বড়লোকের লড়াইতে বড়লোক সব সময়ই তার টাকার জোরে জেতে। কথাটা আমেরিকাতে সত্যি হলে ভারতে তার চেয়েও বেশি সত্যি। আমরা বিচার বিভাগের বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেছি। জনগণের বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তা অবশ্য যৎসামান্য। সুপরিম কোরটের জনৈক বিচারপতি তাঁর রায়ে পরিষ্কার বলেছেন, 'এমন কি উচ্চতর ক্ষেত্রেও বিচার ব্যবস্থা শ্রেণী প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়।'

শ্রীমুল্লা বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর রিপোরটে বলেছেন, 'মানুষের মনে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটা উজ্জ্বল ধারণা থাকা উচিত ততটা নেই।' তিনি মনে করেন, 'বিচার ব্যবস্থা যদি অপরাধ-আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আরও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নেয় তাহলে এটা শুধু এই আইন সম্পর্কে শ্রদ্ধাই বাড়াবে না, নিজস্ব ব্যবহার প্রণালী থেকে এটা যেভাবে বিচ্যুত হয়েছিল তার থেকে পুনরায় তাকে কার্যকর করার দিকে নিয়ে আসা যাবে।'

তিনি বলেছেন, 'আজকের সমাজে নৈতিকতাকে যারা সত্যিকারের বিপর্যস্ত করে তুলছে সেই অপরাধীরা জেলের বাইরে আছে, ভেতরে নয়।' তিনি বিচারব্যবস্থাকে পুলিশের প্রতি এমন ব্যবহার করতে বলেছেন যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তারা আইনের রক্ষক, আইনভঙ্গকারী নয়। তিনি বলেছেন, 'বিচারব্যবস্থা কি এতই অজ্ঞ যে তারা জানেন না, অপরাধ মামলাগুলিকে পুলিশ বিরাট আকারে বানিয়ে তুলছে এবং প্রকৃত বিচারের কাছে তারা দিনের পর দিন যে মিথ্যা নথি রাখছে তার থেকে সত্য খুঁজে বের করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে?'

তিনি বলেন, 'অপরাধীদের সঙ্গে সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মানবিক পদ্ধতি নিতে পারলে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে বাতিল কিন্তু এখনও প্রযুক্ত ভীতি প্রদর্শন ও নৃশংসতার পদ্ধতি প্রয়োগের দরকার হয় না। বন্দীদের জেলে পাঠান হয় শাস্তি দিয়ে। শাস্তি দেবার জন্য নয়।'

দমদম, তিহার ও অন্যান্য জেলের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার পর জেল প্রশাসন সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। □

(লেখাটির বক্তব্য পুরোপুরি লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে সম্পাদকীয় বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই।)

গ্যাস সরবরাহের সোভিয়েত পাইপ লাইন শেষ হওয়ায় তেলের ক্ষেত্রে মারকিন প্রভাব কমবে

শ্যামল বসু

সোভিয়েত ইউনিয়নের 'এই শতকের পরিকল্পনা' (প্ল্যানিং অব দ্য সেনচুরি)। ৪ লক্ষ কিউবিক মিটারের গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। সাইবেরিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ অবধি পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের এই পাইপ লাইনটি কেবল আধুনিক জীবনের প্রয়োজনই মেটাবে না, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও নতুন করে গড়ে তুলবে। ইতোমধ্যেই তার ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ১৯৮৫ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তেল উৎপাদক দেশ হিসেবে পরিচিত পাবে। ৬০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের মালিক এই দেশটি। ৫০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপ লাইন তৈরি করতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কম বেগ পেতে হয়নি। অধুনিক প্রযুক্তির এক দৃষ্টান্ত এই গ্যাস পাইপ লাইন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে, আমেরিকার কয়েকটি সহযোগী দেশ এখন গ্যাস পাইপ লাইনের বিষয়ে সোভিয়েতের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যেটা আমেরিকা কোনমতেই ভাল চোখে দেখছে না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এই প্রকল্প সার্থক হতে চলেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের সাম্প্রতিক মতান্তরের কথা।

আমেরিকা 'ওপেক' বা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে সাধারণভাবে যে চুক্তি করেছিল, তা ছাড়া আরও একটি বিশেষ চুক্তি করতে চেয়েছিল। সৌদি আরবের সঙ্গে এই বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষমও হয়েছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী সৌদি আরবের আমেরিকাকে কেবল ডলারের বিনিময়ে তেল বিক্রি করার কথা ছিল। এই ডলারের পরিবর্তে কোন সোনার হিসেব চলবে না। আমেরিকার ডলার আবার আমেরিকার ব্যাংকেই ফিরে আসবে। পৃথিবীর যে কোন দেশকেই ডলারের বিশেষ মূল্য দিতে হবে। এই চুক্তিকে সমর্থন জানাতে পারেনি জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি।

পৃথিবীর সব দেশেই তেলের চাহিদা আছে, সে দেশ যতই উন্নত হোক না কেন। কেবল আমেরিকাই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ যারা কখনই তেলের অভাবের জন্য অসুবিধা বোধ করেনি। এই তেলের বাজারকে নিজের আয়ত্তে রেখে সারা পৃথিবীর ওপর নির্বিচারে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিল। কখনও কখনও এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জোটের মধ্যে যেসব রাজ্যগুলি ছিল তাদেরও হেনস্তা হতে হল। প্রসঙ্গত বলা যায় পোল্যানডের 'ওয়ালেসা'কে দাবার ঘুঁটি করে একতরফা বিশেষ অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেও পিছপা হয়নি। নিজের সঙ্গে সৌদি আরবের চুক্তি তাই নষ্ট করতে রাজি নয়। আমেরিকা আর ডলারের আধিপত্যের ফলে সারা বিশ্বে তেলের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হল। আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করত যেসব দেশ তারাও আমেরিকার ওপর অসন্তুষ্ট হল। আমেরিকা তখন তার তেল ভাণ্ডারের আধিপত্য নিয়ে ইচ্ছামত চুক্তি ও ব্যবহার করতে শুরু করল।

এ কথার সমর্থনে আমেরিকার সাম্প্রতিককালের কাজকর্মের ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে। পোল্যানডের ঘটনায় যে অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত আমেরিকা একতরফাভাবে ঘোষণা করেছিল, তাকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মেনে নিতে পারেনি। আবার মারকিন-ইজরায়েল আঁতাতও আমেরিকার অর্থনৈতিক সহযোগী দেশগুলির মনঃপুত ছিল না। ডলার রাজনীতিতে আমেরিকার নিজের অস্তিত্ব রাখতে গেলে দরকার অবশ্যই একটি যুদ্ধের পটভূমি। তাই ভিয়েতনামের পর কেবলমাত্র আরব দেশগুলি ও পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি ভূখণ্ডে আমেরিকার এই 'যুদ্ধ-অর্থনীতির' পটভূমি না রেখে কোন উপায় নেই। আবার একদিকে তারা যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করছে, অন্যদিকে নিজের দেশের যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমতা রাখার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য দেশের মানুষের চাহিদার সঙ্গে সমতা আনার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বহির্বিশ্বে আমেরিকার সঙ্গে যেসব দেশের গাঁটছড়া বাঁধা ছিল তাদের সঙ্গেও আমেরিকা চেষ্টা করছে সম্পর্ক বজায় রাখার।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পেটরো ডলারই যে মার খেতে পারে, আমেরিকা এ ধারণা কিছুদিন আগেও করতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে তৈলক্ষেত্রে একচ্ছত্রাধিপতি হতে চলেছে। আধুনিক পর্বে আপাতদৃষ্টিতে বড় যুদ্ধ হবে না। যে যুদ্ধ হয় তার ভিত্তি দেশি ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কণ্ঠ রুদ্ধ করার ও শক্তিশালী দেশের আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই শতাব্দীর পরিকল্পনা যে আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের বাজারকেও ক্ষুণ্ণ করতে চলেছে তার জন্যই তার এত আক্ষেপ।

আন্তর্জাতিক সমঝোতার সোভিয়েত ইউনিয়ন এই গ্যাস পাইপ লাইন নিয়ে খুব ধীরেই এগিয়েছে। ১৯৬৮ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে তেল সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। প্রথমে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে আগামী ২০০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গেও। ১৯৮০ সালে এই সব দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৭০০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহ করেছে। এদের প্রয়োজন ও পরিকল্পনাগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর কেড়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের দম্ভ দেখাতে গিয়ে আমেরিকা এখন নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছে। এবং এমন অবস্থার কথা সে নিজেও কখনও ভাবতে পারেনি। ☐

সোভিয়েত পাইপ লাইন বসান হচ্ছে

চিকিৎসা

অ্যালগে ঃ প্রোটিনের নতুন সূত্র

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বায়োমাস প্রোটিনের জন্যে এখন যেটি প্রধান সূত্র সেটি হল অ্যালগে (algae)। এর প্রয়োজনীয়তা শুধু প্রোটিনের জন্যেই নয়, জ্বালানি এবং সারের কাজের তার প্রয়োজন আছে। সিউয়েজের পরিচালন ব্যবস্থাতেও অ্যালগের ভূমিকা যথেষ্ট। কারণ অ্যালগের উৎপাদন সিউয়েজ থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকে। সুতরাং অ্যালগের সংগ্রহণের মাধ্যমে সিউয়েজের ডিসপোসালও সম্ভব হচ্ছে।

অ্যালগেতে প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট। শতকরা প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগের মত হবে। সেটাও আবার কোন ধরনের অ্যালগে তার উপর নির্ভর করে। নীল গ্রিন অ্যালগেতেই প্রোটিনের পরিমাণ সবচাইতে বেশি। তাতে না হলেও প্রায় পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টি শতাংশ পরিমাণে প্রোটিন বর্তমান থাকে। সে তুলনায় গ্রিন অ্যালগেতে প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। সেখানে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন শতাংশের বেশি প্রোটিন থাকে না।

অ্যালগে যে কেবল প্রোটিনেরই একমাত্র সূত্র তা নয়। এতে আছে অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন-সি, টকোফেরল এবং অন্যান্য। বি কমপ্লেকস ভিটামিনও এতে আছে।

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান তারা হচ্ছে ভেলিন, লিউসিন, ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন, সিসটিন, ট্রিপটোফেন, মেথআয়োনিন, থ্রিয়োনিন ইত্যাদি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, অ্যালগেতে লাইসিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষায় জানা গেছে যে অ্যালগেতে লাইসিনের পরিমাণ প্রায় পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি। অন্য খাদ্যতে লাইসিন তত পরিমাণে বর্তমান থাকে না। সুবিধাটা হল এই যে, যেসব খাদ্যে লাইসিনের অভাব আছে তাদের সংগে অ্যালগের ব্যবহার চালালে, সেই অভাবও আংশিকভাবে পূরণ করা সম্ভবপর। অ্যালগেতে শর্করা বা কারবো হাইড্রেট, লিপিড, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড, ফাইবারও বর্তমান আছে। নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় ছয় থেকে আট শতাংশের মত হবে। শর্করার পরিমাণও এতে দশ থেকে পনের শতাংশের মত হবে। লিপিড এবং ফাইবারের পরিমাণ দুই থেকে আট শতাংশের মধ্যে থাকে। ভিটামিনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। ভিটামিন-সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় আটত্রিশ শতাংশ থেকে চল্লিশ শতাংশের মধ্যে থাকে।

বিভিন্ন কারণে ওষুধ হিসেবেও অ্যালগের ব্যবহার চালানো যেতে পারে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে অ্যালগে কোলেসটেরলের মাত্রা নামিয়ে দিতে পারছে। সুতরাং যাদের কোলেসটরল বেশি তারা অ্যালগের ব্যবহারও করতে পারেন। এইভাবে থ্রমবসিস এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হতেও পারে।

ভিটামিন এবং ক্যারোটেনয়েড উপাদানও অ্যালগেতে আছে বলেই অ্যালগের প্রতি দৃষ্টি এখন আরও বেশি। অ্যালগেকে পশুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। জাপানি বিজ্ঞানীরা বাণিজ্যিকভাবে কয়েকটি অ্যালগের উৎপাদন চালাতেও সমর্থ হয়েছেন। প্রযুক্তিবিদ্যাটি হল নিউট্রিয়েনটের সাহায্যে কালচারিং। সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে জানা যায় ইউরিন, বায়োগ্যাস অ্যাফলুয়েনট এবং বোনমিলকেও নিউট্রিয়েনট হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

গবেষণায় জানা গেছে সামুদ্রিক লবণ থেকেও অ্যালগের কালচারের জন্যে কয়েকটি মাইক্রোনিউট্রিয়েনট পাওয়া যায়।

এখন পর্যন্ত অ্যালগের কালচারিং উন্নত দেশগুলিতেই বেশি করে সীমাবদ্ধ আছে। তার কারণ হল এই যে, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের জন্যে খরচটা এখন পর্যন্ত খুবই বেশি। সে ভার অনেক উন্নতিশীল দেশগুলির পক্ষে সমালানো দায়। সুতরাং প্রযুক্তির আরও উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সকল দেশের পক্ষেই এক্ষুনি বাণিজ্যিক আকারে সিউয়েজ থেকে অথবা অন্য সূত্র থেকে অ্যালগের উৎপাদন চালানো সম্ভব নয়।

মহীশূরের সেনট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসারচ ইনসটিটিউট বিভিন্ন সূত্র থেকে অ্যালগের উৎপাদনের প্রযুক্তি বিষয়ক নানা কাজে কিছুটা কাজও শুরু করেছেন। ইনদো-জারমান চুক্তিতেই সে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৭৬ সালেও ভারতে সিউয়েজ থেকে অ্যালগের উৎপাদন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা চালানো হয়। উদ্দেশ্য, যাতে অ্যালগের সাহায্যে প্রোটিন ঘাটতি কমানো যায়। অ্যালগের উৎপাদন কেমন হবে তাও বিভিন্ন শর্তের উপর নির্ভর করে। তাপাংক, হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশন এবং লাইটের উপরও অ্যালগের উৎপাদন কেমন হবে তা নির্ভর করে। অপটিমাম শর্ত নিরূপণও একটি কাজ।

কালচারিংয়ের চেয়েও ড্রায়িংয়ের খরচ বেশি। অথচ ড্রায়িং না হলেই নয়। কেননা অ্যালগেতে জলীয় অংশের পরিমাণ প্রায় নব্বই থেকে ছিয়ানব্বই শতাংশের মত। তা ছাড়া ড্রায়িং না করতে পারলে সেলগুলি ভাঙাও যায় না। সেটা দরকার। না হলে অ্যালগেকে হজম করাও শক্ত।

ড্রায়িং দুভাবেই সম্ভব। সান ড্রায়িং আর ড্রামড্রায়িং। সানড্রায়িং সস্তা কিন্তু অসুবিধা হল এই যে এর জন্যে খোলা জায়গায় বিছিয়ে রাখলে নানা দূষিত জিনিসও মিশে যেতে পারে। ড্রামড্রায়িংয়ে খরচ বেশি। সুতরাং আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন আছে যাতে অ্যালগের ব্যবহার সকলের পক্ষে সম্ভব হয়।

প্রোটিনের জন্যে বৈজ্ঞানিক জগতে যে আলোড়ন চলছে, অ্যালগের সাহায্যে তার পূরণ নিয়ে যে কথা উঠেছে তা সম্পূর্ণভাবে সফল হলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। ভারত ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, সুইডেন, ফ্রানস, নরওয়ে, জারমানি ইত্যাদি দেশে এ নিয়ে বহু গবেষণা চলছে। □

দ্বিতীয় রামচন্দ্রন মন্ত্রিসভা তিন বছর পেরোল, কেন্দ্রের সংগে বিরোধ কি বাড়বে?

• বিশেষ প্রতিনিধি

এম জি রামচন্দ্রন দ্বিতীয়বারের জন্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হবার পর অল ইনডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনাত্রা কাঝাগাম সরকার তিন বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পা দিল। গতবার তাঁকে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন বিধানসভা নির্বাচন করতে হয়েছিল কেন্দ্রের নির্দেশে। ১৯৮০ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর জনতা দলের ছত্রভঙ্গ অবস্থা হয় এবং কংগ্রেস (ই) নতুন করে ক্ষমতায় ফিরে আসে। এই সময় দেশের কয়েকটি রাজ্য সরকার ভেঙে দিয়ে নতুন করে জনতার রায় দেবার জন্য আহ্বান জানান হয়।

রামচন্দ্রন তামিলনাড়ুতে জনতার রায় নিয়েই আবার ফিরে এলেন। চলচ্চিত্র জগৎ থেকে রামচন্দ্রন রাজনীতির জগতে আসার পর অনেকেই তাঁর সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে যে ঝড়ঝঞ্ঝা তিনি পেরিয়ে এসেছিলেন তা জানলে এমন সন্দেহ কারোর থাকত না।

১৯৬৭ সাল থেকে দাবিড় মুনাত্রা কাঝাগাম তামিলনাড়ুতে প্রথম অকংগ্রেসী শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন মুখ্যমন্ত্রী হন করুণানিধি। করুণানিধি ক্ষমতালাভের শুরু থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং প্রকারান্তরে তামিল জাতিসত্তার কথাও বলতে থাকেন। এভাবে বছর পাঁচেক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরই ১৯৭৩ সাল নাগাদ করুণানিধির একচ্ছত্র আধিপত্য কিছুটা খর্ব হয়। কারণ রামচন্দ্রন একটি বিকল্প শক্তি হিসাবে ডি এম কে-র মধ্যেই করুণানিধির স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকেন। অন্যদিকে আর একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন নেদুচেঝিয়ান। নেদুচেঝিয়ান আবার রামচন্দ্রনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, করুণানিধিকেও একই সংগে পরিত্যাজ্য বলে মনে করতেন।

করুণানিধির সংগে লড়াইতে পেরে না উঠে রামচন্দ্রণ দল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নতুন দল সারা ভারত আন্না দ্রাবিড় মুনাত্রা কাঝাগাম গড়লেন। দ্রাবিড় জাতিসত্তার প্রথম প্রবক্তা আননাদুরাই এর নামে খোদিত হল এই নতুন দলটি। নেদুচেঝিয়ান কিন্তু রয়ে গেলেন পারটিতে। এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদে করুণানিধি সংগী পেলেন আর এক নেতা সেজিয়ানকে। লোকসভায় তিনি বিবৃতি দিলেন, ডি এম কে জরুরি অবস্থা মানে না। ক্ষমতাসীন একটি দলের পক্ষে কেন্দ্রের এই সরাসরি বিরোধিতা সংবিধানকেও বিপন্ন করে তুলেছিল। অন্যদিকে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল কে কে শাহ ১৯৭৬ সালে ৩১ জানুয়ারি একটি গোপন রিপোর্ট দিলেন যে, ডি এম কে সরকার রাজ্যে কুশাসন, দুর্নীতি এবং শৃংখলাহীনতার চূড়ান্ত করে ফেলেছে। যা কিছু এখন হচ্ছে সবই দলীয় স্বার্থে। তাছাড়া সংবিধান মত এই সরকার পরিচালিত হচ্ছে না বলেও রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যপাল অভিযোগ করেছিলেন।

এই গোপন রিপোর্ট এবং পারটির অন্তর্গত বিরোধ ডি এম কে সরকারকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দিল। তার ওপর রামচন্দ্রনের অবিরত সংগ্রামও এই সরকারের পতন ডেকে আনল। ফলে পতনের পর করুণানিধি এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইত্যাদির অভিযোগে তদন্ত কমিশন বসান হয়েছিল।

করুণানিধির পতনই সে সময় রামচন্দ্রণের উত্থানের সুযোগ করে দেয়। তামিলনাড়ু বিধানসভার নতুন নির্বাচনে এ ডি এম কে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। অন্যদিকে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ৩৯টি আসনের মধ্যে এ ডি এম কে পায় ১৮টি। করুণানিধির ডি এম কে পায় মাত্র একটি আসন। সারা উত্তর ভারতে যখন জনতা দলের অপ্রতিহত গতি তখন সে দল এখানে মাত্র ৩টি আসন দখল করতে পেরেছিল। বরং কংগ্রেস ১৪টি আসন পেয়েছিল সেই দুঃসময়ে।

১৯৮০ সালে সারা ভারতের রাজনৈতিক ছবি বদলে যায়। কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময় যে সব রাজ্যে কংগ্রেস (ই) ভাল ফল করেছিল সেই সব অকংগ্রেস (ই) রাজ্য সরকারগুলি ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন করা হয়। তাতে অনেক রাজ্যেই কংগ্রেস (ই) ক্ষমতা দখল করে কিন্তু তামিলনাড়ুতে রামচন্দ্রন তাঁর দুর্গ অক্ষত রাখতে সমর্থ হন। তবে লোকসভা নির্বাচনে তিনি তাঁর দলের পক্ষে ফল মোটেই ভাল করতে পারেননি।

এই নির্বাচনে ডি এম কে এবং কংগ্রেস (ই)র মধ্যে সমঝোতা হয়। সমঝোতার শর্ত ছিল, নির্বাচনে জিতলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধিকেই করা হবে। রাজ্যের ফল ভাল হয়নি কিন্তু লোকসভায় এই নির্বাচনী সমঝোতা সুফল দিয়েছিল। সেখানকার ৩৯টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৭টিই তারা দখল করে নেয়।

তাবে এ ডি এম কে এই সময় খুবই আর্থিক কষ্টে ভুগছিল। ডি এম কে কিংবা কংগ্রেস (ই)র মত কোন পারটি ফানড তাদের ছিল না। যৎসামান্য টাকার সবটাই রামচন্দ্রন নিজে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এর ওপর ছিল পুলিশ এবং প্রশাসনের মধ্যে মতান্তর। পুলিশ এবং প্রশাসন মহলের অনেকেই ধরে নিয়েছিল করুণানিধিই বুঝি আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ফিরে আসছেন। ফলে রামচন্দ্রনের প্রতি আনুগত্য একেবারেই কমে গিয়েছিল। রামচন্দ্রনের নির্বাচনী এলাকাতেই এই বিপদ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন অরুপপুকোটটাই-তে। সেখানে রয়েছে বিরাট পুলিশ কলোনি। স্বাভাবিক কারণে তার অনেকাংশ ভোটই গেছে ডি এম কে-র ঝুলিতে। তা সত্ত্বেও রামচন্দ্রন জিতেছিলেন।

দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় বসে রামচন্দ্রন অতঃপর কয়েকটি গঠনমূলক কাজের দিকেই ঝোঁক দিলেন। এই ঝোঁক এবং কিছুটা সার্থকতা এমনকি এই তিন বছরে সেখানকার রাজনৈতিক চরিত্রও বদলে দিয়েছে। যে ডি এম কে-কংগ্রেস (ই) সমঝোতা তাঁকে বেশি বেকায়দায় ফেলতে পারত তা কার্যত অকেজো হয়ে গেছে। ঐ সমঝোতার কোন বাস্তব অস্তিত্বই এখন আর নেই। বরং কংগ্রেস (ই) এ ডি এম কে র দিকেই বেশি ঝুঁকছে। অন্যদিকে ডি এম কে চাইছে কংগ্রেস (ই) কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে নির্বাচনী মোর্চা করতে। রামচন্দ্রন তিরুপত্তুর বিধানসভা আসনে সম্প্রতি কংগ্রেস (ই) প্রার্থীকে জিততে সাহায্য করেছেন।

গত তিন বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ তামিলনাড়ুকে অনেকখানি পংগু করে দিয়েছে। বিশেষত ভয়াবহ খরা এবং সেই সংগে মারাত্মক জলাভাব। এই খরার ফলে চাষ বাসের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬২.৮১ লক্ষ হেকটর। তার মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ২৪.৩৬ লক্ষ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য খরার ফলে একদিকে যেমন সেচযোগ্য জমিগুলি শুকিয়ে উঠেছে তেমনই অন্যান্য বৃষ্টি নির্ভর জমিগুলিও ফুটিফাটা হয়ে গেছে।

শিল্পোদ্যোগে অবশ্য তামিলনাড়ুর অবস্থা খারাপ নয়। সিমেনট উৎপাদনে এই রাজ্য সারা ভারতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। এছাড়া আছে ২১০টি কাপড়ের কল। এখানে বৃহৎ সরকারি শিল্প সংস্থাও কম নয়। এর মধ্যে নিয়েভেলি লিগনাইট পেরামবুরে রেলগাড়ির কোচ, হিন্দুস্থান ফটো ফিলম, হিন্দুস্থান টেলিপ্রিনটার, মাদরাজে তৈল শোধনাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চিরস্থায়ী খরার হাত থেকে বাঁচার জন্য রামচন্দ্রন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামা রাও র সংগে সম্প্রতি নদীর জল নিয়ে এক চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু উপযুক্ত জলের অভাব এতদিন বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ঘাটতি তৈরি করেছে। ফলে ঐ সব বড় বড় শিল্পগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। তার জন্য রাজ্যের আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে বিপুল।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের অকংগ্রেস (ই) রাজ্যগুলি যে দক্ষিণী পরিষদ গঠন করেছে তাতে রামচন্দ্রনও অন্যতম নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিজয়ওয়াড়ায় বিরোধী সম্মেলনে তাঁর দলও যোগ দিয়েছে। এগুলি কেন্দ্রের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়েছে।

দেখা যাক সার্থকভাবে দ্বিতীয়বারের জন্য রামচন্দ্রন তামিলনাড়ুর সরকার চালিয়ে আসার পর এই রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট কাটানর জন্য ভবিষ্যতে কী পদক্ষেপ নেন। □

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ-পরিক্রমা—৭

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুরনিবাসী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ তদানীন্তন বাংলা গভরমেনটের অ্যাসিসট্যানট সেকরেটারি ও ডেপুটি ম্যাজিসট্রেটের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশত তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যান্য স্থানেও ঠাকুরের সংগে মিলিত হতেন। ঠাকুরের গৃহী ভক্তদ্বয় রামচন্দ্র ও মনোমোহন মিত্রের তিনি ছিলেন মেসোমশাই।

১৪ নং বেচু চ্যাটারজি স্ট্রিট

একদা মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দোৎসবে ব্রাহ্ম ভক্তগণসহ কেশবচন্দ্র সেনও যোগদান করেন এবং রাজেন্দ্র মিত্রও যোগদান করেন। সেইদিনই কেশবচন্দ্র রাজেন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করেন তাঁর বাড়িতেও অনুরূপ আনন্দোৎসবের আয়োজন করার জন্য। রাজেন্দ্রনাথ সেইমত ব্যবস্থা করায় ঠাকুর তাঁর বাড়িতে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে শুভাগমন করেন। এই সম্পর্কে কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে : 'রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ি ঠনঠনে বেচু চাটুজ্যের গলি। মনোমোহনের বাড়িতে উৎসবের দিন শ্রীযুক্ত কেশব রাজেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন, আপনার বাড়িতে এইরূপ একদিন উৎসব হয়, বেশ হয়। রাজেন্দ্র আনন্দিত হইয়া তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। আজ শনিবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ খৃস্টাব্দ, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। আজ উৎসব হইবে স্থির হইয়াছে। খুব আনন্দ – অনেক ভক্ত আসিবেন – কেশব প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণও আসিবেন। .... এইবার ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে আসিলেন। রাজেন্দ্র পুরাতন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোস্বামী বাটীর প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ করিতেছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত – কেশব এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।' (কথামৃত – ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট অংশ)

প্রসংগত উল্লেখ করা দরকার যে, রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে আসার পথে, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরকে 'বেংগল ফটোগ্রাফারের স্টুডিও'তে আনেন এবং তাঁর একটি ফটো তোলেন। স্টুডিওর একটি নকল থামের ওপর হাত রেখে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুরের সমাধি হলে, সেই সময় তাঁর ফটো তোলা হয়; এই ফটোতে ঠাকুরের পরিধানে ধুতি, কালো কোট, চটি জুতা প্রভৃতি আছে।

রাজেন্দ্রনাথের বাড়িতে সেদিন ঠাকুরের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, নৃত্য, গীত ও মুহুর্মুহু সমাধিতে এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাড়ির একতলার প্রাংগণে আনন্দোৎসবের পর ঠাকুরকে বাড়ির দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি সুন্দর কারপেটের আসনে তাঁকে বসিয়ে ভোজন করান হয়; ভক্ত মনোমোহনের মা সেদিন ঠাকুরকে পরিবেশন করেন। যে ঘরে ঠাকুরকে ভোজন করান হয়, সেই ঘরের সম্মুখের দালানে কেশব প্রভৃতি ভক্তেরা আহার করেছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ির ঠিকানা : ১৪ নং বেচু চ্যাটারজি স্ট্রিট, কলকাতা ৯।

পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণিতে অবস্থিত ঠনঠনিয়া কালী বাড়ির অপর প্রান্তে পূর্ব দিকে বেচু চ্যাটারজি স্ট্রিটে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই রাস্তার ওপর ডানদিকে এই বাড়ি। ঠাকুরের আগমনের সময় এটি দোতলা ছিল, বর্তমানে তিনতলা বাড়ি। রাজেন্দ্রনাথের বংশধরগণই এখন এই বাড়িতে বাস করেন। □

আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

শারদীয়

খেলার আসর

১৩৯০

খেলাধুলোর পত্রিকা অবশ্যই! কিন্তু যারা খেলাধুলোর থেকে দূরে তাদের জন্যও অনন্য পুজোবার্ষিকী

১৯৫৩ সালের ২৫ নভেম্বর ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফুটবলের একটি যুগের অবসান হয়। কী ঘটেছিল সেদিন? প্রখ্যাত সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লানভিলের রচনা 'হাংগেরি সেদিন ফুটবলের ব্যাকরণটাই বদলে দিয়েছিল।' মূল্যবান তথ্যনির্ভর রচনা।

ফুটবল নিয়ে আকর্ষণীয় একটি রুদ্ধশ্বাস রহস্য কাহিনী লিখেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায় – শিল্ড ফাইনাল ও নাকভাঙা মূর্তির রহস্য।

পিটার থঙ্গরাজকে নিয়ে লিখেছেন হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার ফুটবলে তরুণ প্রতিভার অভাব নেই, তবুও বুড়োদের জায়গা অটুট থাকছে। কেন? লিখেছেন সুভাষ দত্ত। চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা কয়েকজন ফুটবলারের অন্যদিক, ভিন্ন প্রতিভা নিয়ে।

ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে সন্দীপ দত্তের লেখা।

ক্রিকেট নিয়ে তিনটি অনবদ্য রচনা লিখেছেন রাজন বালা, সুব্রত সরকার ও অলোক দাশগুপ্ত। দিল্লির রোশেনারা ক্লাব এবং মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাব নিয়ে দুটি তথ্যবহুল রচনা রঘুনাথ রাও এবং পি এন সুন্দরেশনের। প্রয়াত রাখাল ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত রচনার বিষয় 'বাংলার ক্রিকেটের আদি কথা।' ঢাকার প্রতিনিধি আব্দুল তৌহিদের ইতিহাস-নির্ভর রচনা 'ঢাকার নবাববাড়ি ও তখনকার খেলাধূলা।'

থাকছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের সোনার ছেলে কার্ল লুইসকে নিয়ে প্রদীপ বিজয়কর, বিজয় হাজারেকে নিয়ে দাত্তু ফাড়কর এবং বিলি জিন কিংকে নিয়ে অনিরুদ্ধ ঘোষের রচনা।

অতুল মুখার্জি লিখেছেন পিছিয়ে পড়া আফ্রিকাও আমাদের থেকে খেলাধূলায় অনেক এগিয়ে। চিরঞ্জীবের মজার স্মৃতিকথা – প্রথম ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি, মোহন বাগানের একটি সভা এবং ----। ক্রীড়ানুরাগী কলকাতা – লিখেছেন পবিত্র দাস।

দিব্যেন্দু পালিতের
নতুন ধরনের উপন্যাস

ইয়াসিন, ইয়াসিন

এবারেও থাকছে ছড়া ও কার্টুন। লিখেছেন এবং এঁকেছেন অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, ঊষা ভৌমিক, দীনবন্ধু আঢ্য, লাহিড়ী, আলি, রাজা প্রমুখ।

তা ছাড়া অমিয় তরফদার, অরুণ মুখার্জি, পাহাড়ী রায় চৌধুরী, শংকর নাগ দাস, অচিন্ত্য হাজরা ও অচিন্ত্য রায়ের তোলা মনমাতানো ছবি।

১৬০ পৃষ্ঠার বই। দাম ১২ টাকা

বেরোচ্ছে পুজোর অনেক আগেই

এজেন্টরা সার্কুলেশন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭২

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কারমাটারে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের স্বপ্ন আজও সফল হয়নি

গৌরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর রেল স্টেশন, আগেকার কারমাটার

বিদ্যাসাগরের 'বাংগালা' বাড়ি

বিহারের নানা স্থানে বহু বাঙালি মনীষী স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বাস করেছেন। সেই স্মৃতিবিজড়িত স্থান-গুলিতে যাতে মনীষীদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষিত হয় তার জন্য 'বেংগলি অ্যাসোসিয়েশন, বিহার' বা বিহার বাঙালি সমিতি নানাভাবে চেষ্টা করছেন। কারমাটারে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষার্থে এই সমিতি 'কেন্দ্রীয় বিদ্যাসাগর স্মৃতি-রক্ষা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। দ্বারভাঙার বিভূতিভূষণ মুখো-পাধ্যায় এই কমিটির সভাপতি এবং পাটনার শিবদাস সিংহ এই কমিটির সম্পাদক। এই কমিটির দীর্ঘকালের নিরলস প্রচেষ্টায় কারমাটার রেল স্টেশন নাম পরিবর্তন করে হয়েছে 'বিদ্যাসাগর'। আর স্থাপিত হয়েছে 'বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়' বিদ্যা-সাগরেরই কারমাটারস্থিত বাড়িতে। বিদ্যাসাগর কারমাটারে থাকার সময় এই বাড়িটি করেছিলেন।

অসংখ্য আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু বান্ধব, আশ্রিত উপকৃতদের মাঝে থেকেও বিদ্যাসাগর আজীবন অন্তরে অন্তরে ছিলেন একা। সংগীহীন সৈনিকের মতই সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন অপবি-মেয় অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রামে সাহায্য করা দূরে থাক, একমাত্র ভগবতী দেবী ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে আন্তরিক সমর্থনও করেননি। বস্তুত, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে থেকে মাঝে মাঝে এত কদর্য ব্যবহার পেতেন যে, শেষটায় নির্বিকার চিত্তে আর সহ্য করতে পারতেন না। সেই জন্য অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন। চলে যেতেন কারমাটারে।

সাঁওতাল পরগণা জেলায় কার-মাটার বলে (বিদ্যাসাগর 'কর্ম্মটাঁড়' বলতেন)। এক রেল স্টেশন ছিল। তখন ছিল ইসট ইনডিয়া রেলওয়ে কোমপানির আমল। রেল স্টেশনের পাশেই ছিল 'কর্ম্মটাঁড়' গ্রাম। বিদ্যাসাগরের সময় সাঁওতাল পর গণা ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। বংগ ভংগের ফলে বাংলা থেকে ছাঁটাই করে সাঁওতাল পরগণাকে বিহারের সংগে যুক্ত করা হয়। এই কারমা টারেই বিদ্যাসাগর একটি বাগান এবং বাগানের পাশে একটি 'বাংগালা' বাড়ি নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন।

যে জমির ওপর বাগান ও 'বাংগালা' বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন তার পরিমাণ ছিল আট একর। জমির পশ্চিম ও উত্তরে বাগান এবং দক্ষিণ-পূর্ব ঘেঁষে 'বাংগালা' বাড়ি বাড়িটি একতলা এবং রান্নাঘরসহ মোট এগারখানি ঘর।

বাড়ির দক্ষিণ পূর্ব কোণে ছিল আগাগোড়া ইঁট বাঁধান একটি সংকীর্ণ কূপ। কূপের নিচের ব্যাস তিন ফুটের বেশি হবে না। বর্তমানে ভগ্ন এবং জল শূন্য হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যাসাগর এই কূপের জল পান করতেন।

বাড়ির উত্তর পূর্ব দিকে চার বর্গফুট পরিমাণ চুন-বালি দিয়ে বাঁধান ইঁটের একটি বেদি। এই বেদির ওপর বসে বিদ্যাসাগর গল্প করতেন তাঁর প্রিয় প্রতিবেশী সাঁওতালদের সংগে। তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনতেন। অন্তরের অকুণ্ঠ স্নেহ বর্ষণ করতেন তাদের ওপর। 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি' চারপাশে সংযোজন করে বেদিটিকে আরও বড় করেছেন। মূল বেদিটি অবশ্য মধ্যস্থলে অবিকৃত করেই রাখা হয়েছে।

'বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ে'র প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেন বললেন, 'আমি আমার বাবার কাছে এবং তৎকালীন বৃদ্ধদের কাছে ছেলেবেলায় শুনতাম, বিদ্যাসাগরের অবর্তমানের পর জমি ও 'বাংগালা' বাড়ি বেশ কয়েক বছর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল। তখন বাড়ির দরজা-জানালা চুরি যায়। আর জমির দক্ষিণে গড়ে ওঠে এক দেশি মদের ভাঁটি। ভাঁটিওলা জমির উত্তর থেকে ভাঁটিতে মাতালদের যাতা-য়াতের সুবিধের জন্য জমির মাঝ বরাবর এক রাস্তা চালু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তা কায়েমও হয়ে যায়। ফলে জমিটি পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়।'

বিদ্যাসাগর তাঁর শেষ 'উইল'-এ 'যার পর নাই যথেচ্ছাচারী এবং কুপথগামী এই অভিযোগে পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করেননি। পরিবর্তে পৌত্র শ্রীপ্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তরা-ধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দেহত্যাগের পর নারায়ণচন্দ্র পুত্রের বিরুদ্ধে হাই কোরটে মামলা করেন এবং জয়লাভ করে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তির উত্তরা ধিকার লাভ করেন। তার কয়েক বৎসর পর তিনি কারমাটারের জমি ও 'বাংগালা' বাড়ি বিক্রি করেন।

জমি ততদিনে দুভাগ হয়ে গেছে। মাঝে মদের ভাঁটিতে যাওয়ার পথ। পথের পশ্চিমদিকের অংশ বিক্রি করেন বিহারীলাল সাবরাফ নামক জনৈক মাড়োয়ারীকে। পশ্চিমদিকের ঐ জমিতে বিহারীলালের উত্তরাধি-কারীগণ গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করছেন।

পূর্বদিকের জমির প্রায় এক একর পরিমাণ জমি বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর কারমাটারবাসী জনৈক ভৃত্যকে দান করে গিয়েছিলেন। সেই ভৃত্যের উত্তরাধিকারী পরে জমিটির বন্দো-বস্ত দেয় অন্য এক ব্যক্তিকে। সেই বন্দোবস্ত গ্রহণকারীর বংশধররাই এখন বাস করছে সেই জমিতে ঘর-বাড়ি করে। সুতরাং মদের ভাঁটির রাস্তার পূর্বদিকের অবশিষ্ট তিন একর পরিমাণ জমি নারায়ণচন্দ্র বিক্রি করেছিলেন জনৈক বাঙালি নৃসিংহ দাস মল্লিককে। এই জমির উপরেই রয়েছে বিদ্যাসাগর নির্মিত 'বাংগালা' বাড়ি, কূপ এবং বেদি।

বিহার বাঙালি সমিতির অন্ত-র্ভুক্ত 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি' ঐ 'বাংগালা' বাড়ি, কূপ এবং বেদি সহ তিন একর পরিমাণ জমিটি চব্বিশ হাজার টাকায় নৃসিংহ দাস মল্লিকের উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ক্রয় করেছেন। নৃসিংহ দাস মল্লিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। তাঁরা বিদ্যাসাগর নির্মিত 'বাংগালা' বাড়ি কূপ এবং বেদিটি নিশ্চিহ্ন করেননি।

বিদ্যাসাগরের বাড়িসহ জমি ক্রয় করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা খুব কঠিন সমস্যা ছিল। কিন্তু 'বিদ্যা-সাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি' এই উদ্দেশ্যে এক অভিনব পন্থা অনু-সরণ করেছিলেন। তারা এ জন্য বিদ্যাসাগরের বিশেষ আকার বিশিষ্ট এক ফটো-কুপন ছাপেন। ঐ ফটো-কুপন তাঁরা বিশেষভাবে বিহারনিবাসী বাঙালিদের কাছে বিক্রি করেন এক টাকা মূল্যে। এইভাবে তাঁরা প্রায় কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। বাকি অর্থ সংগৃহীত হয় সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা ও এককালীন দানের মাধ্যমে।

'বাংগালা' বাড়ির দরজা জানালা ছিল না, তাই নতুন করে দরজা জানালা বসাতে হয়েছে। নৃসিংহ দাস মল্লিকের সময় থেকে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন দারো-য়ান রাখা হয়েছিল। জমি ও বাড়ি যখন 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি' ক্রয় করে তখনও জনৈক দারোয়ান ছিল। সেই দারোয়ানকেই বহাল রাখা হয়েছে এখনও। সামনে তিনখানি ঘর ছাড়া বাকিগুলি সেই দারোয়ানই সপরিবারে ব্যবহার করেন। সেই সংগে হয় ভুট্টার চাষ।

গত ১৯৭৬ সালের ৩ মে বিদ্যাসাগরের 'বাংগালা' বাড়িতে 'বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (এ স্থলে বাংলা ও সাঁওতাল ভাষাভাষী) ছেলেমেয়েদের জন্য। 'গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়' রূপে 'বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়' বিহার সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃতিও পেয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত। অথচ, এই কারমাটারেই খৃস্টান-মিশনারি পরিচালিত একটি ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিদ্যালয় সরকারি অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে।

কারমাটারের চারিদিকে রয়েছে অনেক গ্রাম। উত্তরে মাইল খানেকের মধ্যেই তেলকিয়াবাদী ও চাব ঘাবা। বাঙালি গ্রাম। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে রয়েছে ব্যাবগারডি, নদুয়াডি, জেবপাহাড়ী, ফয়বাডি এবং খোঁড়া সাবো। এইগুলি প্রধানত সাঁওতাল গ্রাম। এই গ্রামগুলিতেই বিদ্যাসাগর যেতেন কারমাটারে এসে। কখনও যেতেন সাঁওতালদের আহ্বানে, আবার কখনও যেতেন তাদের রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে। সুখে দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতেন গিয়ে।

'বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়'-এর ২৯ জন সাঁওতাল ছাত্রছাত্রী আসে ব্যাবগারডি গ্রাম থেকে। বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক শ্রী গণেশচন্দ্র সোরেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। বাড়ি নদুয়াডি গ্রামে। সবেমাত্র স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন। অল্পবয়সী যুবক। খুব আবেগপ্রবণ আর বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও। বললেন, আমাদের গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে শুনেছি, বিদ্যাসাগর সবচেয়ে ভালবাসতেন আমাদের। কাপড়-চোপড়, খাবার দাবার, দুহাতে উজাড় করে দিতেন।

সাঁওতালরা লেখাপড়া জানতেন না। তাই বিদ্যাসাগর তাঁর 'বাংলো' বাড়িতে একটা 'রাত পাঠশালা' খুলেছিলেন সাঁওতালদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। আর নিজেই সেই 'রাত পাঠশালা'য় লেখাপড়া শেখাতেন সাঁওতালদের ছেলেবুড়ো সবাইকে সমান যত্নে।

বিদ্যাসাগর যখন কারমাটার আসতেন এবং থাকতেন সেখানে, তারপর শতবর্ষেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তিনি 'রাত পাঠশালা' করে যাদের লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন আজ শত বর্ষের অধিক সময় পরে সেই সাঁওতালদের লেখাপড়া বিশেষ অগ্রসর হয়নি। তবু 'বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়'-এ বেশ কিছু সাঁওতাল ছেলেমেয়ে আসে লেখাপড়া শিখতে। আর আসেন শ্রী গণেশচন্দ্র সোরেন তাদের লেখাপড়া শেখাতে। □

বিদ্যাসাগর জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন

বিধবা বিবাহ আজও জনপ্রিয় হল না কেন?

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পর ১২৮ বছর অতিক্রান্ত হল। কিন্তু তবু বিধবা বিবাহ বাঙালি হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় হচ্ছে না কেন? অথচ এখনও যাঁরা বিধবা বিবাহ করছেন দাম্পত্য জীবনে তাঁরা কোন অংশে অন্যের থেকে অসুখী নন। পরিবর্তন এ সম্পর্কে সংগ্রহ করেছে কিছু সামাজিক অভিমত।

বহু বাদানুবাদ, আবেদন-নিবেদন ব্যবস্থাপক সভায় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৫৫, ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। আইন পাশ হবার পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রূপ করে একটি কবিতা রচনা করেন:

শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্মাণকারক
যাঁরা সবে হতে চান, বিধবা তারক
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে?

গুপ্ত কবির ইঙ্গিতটি লক্ষ্য করার মতন। বাঙালি চরিত্রের বাক্যবিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন যে কেবল কথাই সার হবে। কাজ হবে না কিছু।

'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।'

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাই তিনি 'সীমা ছেড়ে নাহি যাবে সাগরের ঢেউ' এই কথা বলে বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করেই লিখলেন,

'সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন,
তবে বুঝি হতে পাবে বিবাহ ঘটন।'

সাগরের ঢেউ সীমা লঙ্ঘন না করলেও বিদ্যাসাগর কথার সীমা লঙ্ঘন করে কাজে বিধবা বিবাহ ঘটালেন জুলাই মাসে আইন পাশ হবার পর ছমাসের মধ্যে। তিনি উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় প্রথম বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

বিধবা বিবাহের আইন পাশ হবার পর যাঁরা বিধবা বিবাহে উদ্যোগী হতেন ও বিবাহ করতেন তাঁদের সকলকেই যে কী ভয়ানক সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হত রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা তা জানতে পারি।

বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার কর্মের আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর কি হঠাৎ অনুভব করেছিলেন? আসলে বিদ্যাসাগর পরোক্ষে প্রত্যক্ষে নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর (রামমোহন ও তাঁর আত্মীয় সভা, ডিরোজিও, ইয়ংবেংগল, তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি) চিন্তাচেতনা থেকে এই নতুন collective situation-এর প্রেরণা পেয়েছিলেন।

আর করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগরের চারদিকে ছিল এই সমাজের কুপ্রথা বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা, যার অবশ্যম্ভাবী ফল সমাজে বহু নারীর অকাল বৈধব্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজ, ১৯৮৩ তে এই অত্যাধুনিক অতি আলোকিত সমাজে বিধবাবিবাহ ঠিক কতটা ফলপ্রসূ? বিধবাবিবাহ করতে বা দিতে ছেলেমেয়ের বা মা বাবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কতখানি?

প্রখ্যাত এক সমাজ সেবিকা বললেন, সামাজিক সংস্কার নেই ঠিকই, কিন্তু মানসিক সংস্কার বেশ জোরাল।

এই সূত্রেই কথা হচ্ছিল রতনলাল মুখারজির সঙ্গে। বিয়ের কথা হচ্ছে। মেয়েটি দেখতে শুনতে কেমন বলতে গিয়েই প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা আপনি তো একটা বিধবা-বিবাহও করতে পারেন। এ বিষয়ে কোন সংস্কার আছে? — না সংস্কার থাকবে কেন? এ যুগের ছেলে আমরা, আমার মা বাবা যদি চান তা হলে কোন আপত্তি নেই। আপনি মা-বাবাকে বোঝাতে পারেন। দেখুন মা বাবা কিংবা পরিবারের কেউই এটা ঠিক পছন্দ করবেন না। আমি তাঁদের বিরুদ্ধে যেতে চাই না।

রতনবাবুর প্রৌঢ়া পিসিমা বেশ রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তোমারই বা অমন অলক্ষুণে অল্পপেয়ে কথা কেন? কোন দুঃখে আমার সোনার চাঁদ ছেলে বিধবা বে করতে যাবে? কেন ওর কি কনে জুটছে না। আঁ?

আমার মনে পড়ে গেল সেই ছড়াটি:

'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।'

কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম।'

শান্তিপুরের তাঁতিরা 'বিদ্যাসাগর পেড়ে' নামে এক রকমের শাড়িতে এই গানটি খোদাই করে দিতেন।

শোভাদির কথাও আমার মনে পড়েছিল, অনেককাল খবর পাইনা, কেমন আছে আমাদের শোভাদি শুনেছি ওর স্বামীও নাকি মারা গেছেন কোন এক অ্যাকসিডেন্টে। তারপর কি শোভাদি বিয়ে করেছেন?

ভাবতে ভাবতে বেহালা। শোভাদির বাড়ি। বাড়িতেই ছিলেন। শোভাদিকে দেখে আমি তো বেশ অবাক। কোনদিন এত সাজগোজই করতে দেখিনি। বাড়িতে কেউ নেই, সকাল থেকেই খুব একলা, আলমারিটা গোছাতে গিয়ে বিয়ের বেনারসী খানা পেলাম। তেমনই নতুন, আঁচলে এখনও ধান-দূর্বার গন্ধ।

দরজায় বেল বাজতে দ্রুত শাড়ি পালটে শোভাদি আবার তেমনি নিরাসক্ত।

শোভাদির বয়স এখন ঠিক ৩২ ৩৩। পাঁচ বছর আগে দু বছরের ছেলে রেখে ওর স্বামী মারা গেছেন। ইচ্ছে করলে শোভাদি বিয়ে করতে পারতেন।

শোভাদি বলেছিলেন বিয়ে করার কথাই তিনি ভাবেননি, এখন বড় একা লাগে – শ্বশুর বাড়িতে মাথার ওপর ছাতটা হারাতেও আমার ভয়। ছেলে মানুষ করতে হবে। তবু মাঝে মাঝে এত অসহায় মনে হয় নিজেকে। নিজে লেখাপড়াও তেমন শেখেননি, মাত্রই বি এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাই সকলের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করতেই হবে।

শোভাদির সব সময় ভয়। কেউ যেন কিছু বলতে না পারেন, তাঁর সন্তানের সেজন্য যেন কোন ক্ষতি না হয়। স্পষ্ট বোঝা যায় শোভাদি যদি বিয়ে করতেন তা হলে এই অসহায়ত্ব তাঁর কেটে যেত।

শোভাদি না হয় অল্প শিক্ষিত অসহায় মহিলা, শ্বশুরবাড়ির মেজাজ মর্জি বুঝে তাঁকে চলতে হবে। কিন্তু মাধুরী মিত্র, অত লেখাপড়া জানা ভাল চাকরি করেন তিনিই বা তেইশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বিয়ে করলেন না কেন?

মাধুরী বলেছেন, আমার বিয়ের দু বছরের মধ্যে আমার স্বামী মারা যান। আমি তখন সবে একটা চাকরিতে ঢুকেছি, কত স্বপ্ন, দুজনের রোজগার, সুখ-সাচ্ছন্দ, তা সবই তো গেল, এখন এই দিনগত পাপক্ষয়। বিয়ে? কে করবে? তা ছাড়া আমার মা-বাবাও চান না। আমার পরের বোনগুলোর এখনও বিয়ে হয়নি। আমি বিয়ে করলে তাদের বিয়ে হওয়া মুশকিল। তবে কি জানেন, কেউ যে আমাকে বিয়ে করবে সে সম্ভাবনাও নেই। যতই প্রগতিবাদী বলে চেঁচামেচি করিনা কেন বিধবাকে বিয়ে করা এখনও যথেষ্ট সাহসের অপেক্ষা রাখে।

হেসে বলেছিলেন মাধুরী, শ্বশুর বাড়িতে, বাপের বাড়িতে আমার খুব সুনাম, আমি সাদা শাড়ি পড়ি, মাছ মাংস ছুঁইনা, আমার কোন পুরুষ বন্ধু নেই, এত সুনাম, অবশ্য ভয়ও থাকে। যদি ওদের নাম ডোবে।

বৈধব্যকে স্বীকার না করে বিয়ে করেছেন তৃষ্ণা সেন। দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে স্বামী মারা গেলে কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটা চাকরিও জোগাড় করি, কিন্তু একলা বাড়ি ভাড়া করে থাকার মতনও সাহস ছিল না। শ্বশুর বাড়িতে তেমন কেউ ছিল না, বাপের বাড়ির সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এই পরিস্থিতিতে সুশান্তর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। ভালবেসে। আইনের জোর, ভালবাসার জোর দুইই আমার আছে। আমরা সুখী স্বামী-স্ত্রী। প্রথমদিকে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, এখন তারা আসে। আমার স্বামীর টাকা পয়সা যথেষ্ট, সে সুযোগটা তারা ছাড়বে কেন?

একটা কথা একেবারে স্পষ্ট, বিধবা বিবাহ যেখানেই ঘটেছে ভালবাসা তার একমাত্র কারণ। পাত্রপাত্রীর বাবা-মার উদ্যোগে নয়।

এর কারণটা কী?

উত্তরে বেশির ভাগ বয়স্কা মহিলাদের মতামত হল, খুব কম বয়সে বিধবা হলে বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকে, এখন তো পঁচিশের আগে মেয়েদের বিয়েই হয় না। দু বছর কি চার বছর ঘর করে বিধবা হলে ৩০-৩২ বছর বয়স হয়ে যায়। যথেষ্টই বয়স, তখন কি বিয়ের সময় থাকে? বিশেষত দুটি ছেলে মেয়ে থাকলে?

আসলে যুগ পরিবর্তনটা অনেকেই নিজের জন্য কামনা করেন। অন্যের ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ মেনে নিতে পারেন না।

এখন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রায় সব ঘরেই মেয়েরা লেখাপড়া শিখে একটা চাকরির অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিয়ের পিঁড়িতে যখন বসে তখন বয়সতো একটু হবেই। তা ছাড়া সময় তো পালটে গেছে। কোন মেয়ে কুড়িতে বুড়ি হয়? কুড়ি বছর বয়সে কলেজের গন্ডি ছাড়ারই সময় হয় না, কলেজ বা ইউনিভারসিটি জীবনের রঙিন আবেগ তখনও জড়িয়ে থাকে অনেক মেয়ের জীবনে। সময়কে বিচার করে দেখারই বিশেষ প্রয়োজন। ৩০-৩২ বছর বয়সে ছেলেরাই এখন বিয়ে করতে সাহস পায় না। সেজন্য অনুপাত মত মেয়েদেরও বিয়ের বয়স বেড়ে যায়।

এ ছাড়াও অনেক গৃহস্থ পরিবারের গুরুজনদের সোজাসুজি মত হল, বিধবার সন্তান থাকলে বিয়ে তাঁরা অনৈতিকতা বলেই মনে করেন। এ ক্ষেত্রে পরিবারের ছেলেদের তাঁরা বিধবা বিয়ে কী করে করতে বলবেন? তবে কেউ যদি ভালবেসে বিয়ে করে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাতে আপত্তি কেন হবে?

যেমন রিনা কাকিমা বললেন, তোর কাকার সঙ্গে আমার তো কোন কালে বিয়ে হয়েছে, তা এখনও কোন শুভ কাজে আমার মুখ দেখেনা, আমি নাকি খুঁতো। আমার বিধবা বিয়ে হয়েছে তো তাই। তাই বাড়ির বিয়ে, পৈতে অন্নপ্রাশনে আমরা কখনও যাইনা। তোর কাকুই যেতে দেয় না।

হ্যাঁ, বিধবা এখনও অমঙ্গল-অশুভের প্রতীক। বিধবাকে কোনরকম শুভ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। যদি নবদম্পতির অকল্যাণ হয়।

এইসব ছোট ছোট সংস্কারের জীবাণু এখনও হিন্দু সমাজের ঘরে ঘরে প্রচ্ছন্নভাবেই রয়ে গেছে। তা একটু নজর করলেই বোঝা যায়। এ বিষয়ে বহু সমাজসেবক ও সমাজসেবিকার মতামত হচ্ছে, বিধবা বিবাহ নিয়ে কোন সংস্কার নেই যদি তা স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। বিধবার প্রচুর অর্থ, বাড়ি, গাড়ি আছে তার যদি বিবাহের বয়স না থাকে তো সেখানেও কোন অন্তরায় হয় না।

অথচ খুব প্রভাব প্রতিপত্তিশালী দুজন অভিভাবকের সঙ্গে সেদিনই কথা হল, তাঁদের দুজনের দুটি তরুণী বিধবা কন্যা রয়েছে। বছর পাঁচেক হল স্বামী হারিয়েছেন দুজনেই। কোন সন্তান-সন্ততির দায়ও নেই। উভয়েরই পরিবার প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিতে চান কিন্তু বিয়ের যোগ্য পাত্র তাঁরা পাচ্ছেন না। এমনকি খুব সাধারণ পাত্রও তাঁরা পেলেন না। আর কবে বিয়ে হবে? কথা হল তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গেও, ওঁরা বললেন, মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বহু শিক্ষিত ছেলেই বলে কিন্তু কাজে দেখা যায় না। আসলে সব ছেলেরই মনের মধ্যে গোপন ইচ্ছা সালংকারা কুমারী কন্যা বিবাহ করা।

সত্যি বলতে কি, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা কুসংস্কার বর্জন করে বিধবা বিবাহে মদত যুগিয়ে ছিলেন তাঁরা নিজেরাও বিধবা বিবাহ করতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হননি। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা বিবাহ করেছিলেন। অবশ্য রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী নিজেই খুব বিদুষী মহিলা ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সেই চিঠিটির কথা মনে পড়ে। চিঠিটি লিখেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে 'আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকটে মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।'

বিধবা বিবাহের প্রবর্তন বিদ্যাসাগর যে তাঁর জীবনের কত বড় মহৎ কাজ বলে মনে করতেন এই চিঠিটাই আমাদের কাছে প্রমাণ করে। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, এই সংস্কারকর্ম তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন আবার প্রাণান্ত স্বীকারেও পিছপা হননি। এ ব্যাপারে নিন্দাকে বিদ্যাসাগর নিন্দা মনে করেননি, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেননি এবং প্রতিবাদীদের কোন কটূবাক্যে কর্ণপাতও করেননি। চতুর্দিক থেকে বর্ষিত কটূক্তির মধ্যে তিনি 'ভূধরসম নিশ্চল' হয়ে অবিচলিত চিত্তে তাঁর সংকল্প কাজে পরিণত করেছেন। কথা ও কাজের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেননি। প্রতিবাদীদের অজস্র কটূবাক্য দুর্বৃত্তদের প্রাণসংহারের চেষ্টা সব বিফল করে বিদ্যাসাগর সমাজের ভাল করার চেষ্টাই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দাক্ষিণাত্যে প্রায় বাংলাদেশের মতনই বিধবা বিবাহের প্রস্তাব প্রবল সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে দাক্ষিণাত্য থেকে বহু আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে এসেছিল। আবেদন পত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানকার ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরাও বাংলাদেশের পন্ডিতদের মতন দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বভারতীয় আন্দোলন বলে মনে হয়।

আন্দোলনের প্রয়োজন কবেই ফুরিয়েছে, সব কাজ তিনি নিজ হাতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আমাদের বাংলা তথা ভারতই বা তেমন করে অংশ নিয়ে ভয় পাচ্ছে কেন?

আসলে অর্থনৈতিক মুক্তিই সমাজক্ষেত্রে প্রকৃত মুক্তির পথ তৈরি করে। যে দেশের মেয়েরা এখনও জানেনা বিয়ের পর শাশুড়ি-স্বামীর দয়ার ওপর আদৌ তারা জীবিত থাকবে, নাকি পিতৃগৃহ থেকে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আনতে পারেনি বলে পুড়ে মরবে – সে দেশের বিধবাদের পুনর্বিবাহ তো দূরের কল্পনা। মেয়েরা সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। তার আগে বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। □

কলকাতায় "চিন চিনিয়া" রোগ

আমাদের ছোটবেলায় কলকাতায় একবার "ঝিনঝিনিয়া" রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। হঠাৎ পা-টা ঝিনঝিন করে উঠলো, তারপরেই পতন, তারপরেই মৃত্যু।

রোগটা সত্যি হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে গুজবটা ছড়িয়েছিল জম্বর। টালা থেকে টালিগঞ্জ এখানে লোক মরেছে, ওখানে পাঁচটা ডেডবডি দেখা গেছে, এই ধরনের কথাবার্তা।

কলকাতায় এখনকার "চালু" রোগ কি? এক তো পেটের রোগ যাকে লোকে বলেন, ক্যালকাটা স্টমাক। আর আছে শ্বাসজনিত রোগ। হাঁপানী, কাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া উঁকি মারে। আর এক সময় এনকেফ্যালাইটিস প্রাণে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া চিন্ চিন্ রোগ – সে কথায় পরে আসছি। শরীরং ব্যাধিমন্দিরম। রোগের কারণ দেহ। অর্থাৎ দেহ কমজোরী হলে রোগ বাসা বাঁধে আর এই দেহটা কমজোরী হয় নানাকারণে। দারিদ্র্য, পুষ্টির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা এই সব আর কি।

শহরটার বরাবরই দুর্নাম ছিল। আগে অনেকে ওটাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী না বলে বিশ্বের রাজধানী বলতেন। অবশ্য "কলেরা রাজধানী"। আজ সেই দুর্নাম গেছে কারণ সি এম ডি এ এবং কর্পোরেশনের যৌথ প্রচেষ্টায় জলের সাপ্লাই ভাল হয়েছে। তেমনি অধিকাংশ বস্তী শুধু জল নয়, পাকা স্যানিটারী পায়খানা, নর্দমা, রাস্তা ইত্যাদির সুযোগ পাচ্ছে।

তাহলেও কলকাতার নিন্দায় কলকাতার অসুখটাকে এখনও অনেক বড় বেশি ব্যবহার করেন শহরে হাঁটতে গেলে জঞ্জাল, হকার ভিড় ইত্যাদি তো আছেই আর আছে উনুন, কারখানা এবং গাড়ির ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস। কাজেই স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও শহরটাকে ছেড়ে চলে যাওয়া তো যায় না। কারণ এখানেই আমাদের বাস। এখানেই আমাদের ভবিষ্যৎ।

গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা উন্নয়নে একটা বিরাট কর্মকান্ড যে চলছে (আস্তে আস্তে হচ্ছে বলে অনেকে বলেন কূর্মকান্ড) সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। সি এম ডি-এ প্রায় ২০টি রাস্তা চওড়া করেছে ব্রীজ বানিয়েছে চারটি, উড়ালপুল দুটি, সাবওয়ে একটি, নতুন রাস্তা দুটি এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের সাপ্লাই বাড়াবার জন্য নতুন জল কল. জমা জল বার করবার জন্য নিকাশী ব্যবস্থা আর বস্তীতেও বেশ কিছু কাজ হয়েছে, সে কথা সকলেই জানেন।

যেটা জানেন না সেটা হল যে কলকাতাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন শহর বানাবার দুঃস্বপ্ন বা দুঃসাহস কারও নেই। যা আছে তার মধ্যে দিয়েই ভালর দিকে এগোতে হবে।

নতুন তিনটি উপনগরী হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে অনেক রাস্তা ঘাট, নর্দমা আর জলের ব্যবস্থা হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠা শহরটা এখন একটু পরিকল্পনার মুখ দেখছে।

এগুলি যেমন আশার কথা। তেমনি আশার কথা হল যে এই কলকাতা শহরের ভাবী নাগরিকরা অর্থাৎ যাদের বয়স অল্প, তারা এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহশীল।

ট্রাম বাসের টিকিট রাস্তায় না ফেলে তারা পকেটে রাখে, বাপ-মাকে বলে জঞ্জালটা যখন তখন যেখানে সেখানে না ফেলতে আর নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী বেশ কিছু গাছ তারা লাগিয়েছে।

সমস্যা সব বড় শহরেই আছে। বোম্বাই-এর বস্তী সমস্যা যেমন প্রকট, তেমনি মদ্রাজের জলকষ্ট। কলকাতাতেও অনেক সমস্যা আছে বলেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা। আর চেষ্টা আছে বলেই শহরময় খোঁড়াখুঁড়ি। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা নেই এবং জনবহুল এলাকায় কাজ করতে হচ্ছে বলেই কাজের শ্লথ গতি। সেটা বুঝতে হবে – না বুঝে সমালোচনা করা ঠিক নয়। অনেকেই এটা বুঝতে চান না – তাঁরা বোঝেন না যে কলকাতার অনেক সমস্যার জন্য দায়ী আমরা কলকাতা বাসীরাই। তাঁরা জানেন না যে দীর্ঘদিন অবহেলার পর আজ অনেক জায়গায় কাজ আরম্ভ হয়েছে বলেই এত জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি।

কলকাতা শহরটা একদিনে তৈরী হয় নি বা একদিনে খারাপ হয় নি। একদিনে ভালও হবে না। তবে ঝিনঝিনিয়া রোগের মত না হলেও আর একটা রোগ আস্তে আস্তে আমাদের সবাইকে আক্রমণ করছে। চতুর্দিকে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এর থেকে মুক্তি নেই।

আমাদের সবারই মনের মধ্যে কলকাতার জন্য একটু ভালবাসা "চিন্ চিন্" করে উঠছে।

একটা অবিশ্বাস্য ফিরিস্তি

মহানগরীতে সি এম ডি এ, কলকাতা কর্পোরেশন, সি আই টি এবং অন্যান্য সংস্থার প্রচেষ্টায় যে সব কাজ হয়েছে তার একটা ফিরিস্তি।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি।

নতুন রাস্তা
ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস
বারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে

রাস্তা চওড়া
ডায়মণ্ডহারবার রোড, শরৎ বসু রোড, গুরুসদয় রোড, ব্রাবোর্ণ রোড, আচার্য, জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড, রামমোহন সরণি, সুবোধ মল্লিক রোড, গড়িয়াহাট রোড, সৈয়দ আমীর আলী এভিনিউ, মানিকতলা মেন রোড, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড ইত্যাদি।

সেতু নির্ম্মাণ/সংস্কার
বিজন সেতু, অরবিন্দ সেতু, যতীন দাস সেতু, কালীঘাট সেতু,

উড়ালপুল
শিয়ালদা
ব্রাবোর্ণ রোড

সাবওয়ে
হাওড়া

জল
পলতার শক্তি বৃদ্ধি, গার্ডেনরীচ, হাওড়া (এছাড়া বিস্তৃত এলাকায় নতুন পাইপ বসানো)

জল নিকাশী ব্যবস্থা
সারা মহানগরী জুড়ে

বস্তি উন্নয়ন
প্রায় দু'হাজার বস্তির ২০ লক্ষ লোকে স্যানিটারী পায়খানা, জল, রাস্তা এবং নর্দমার সুযোগ পাচ্ছেন।

নতুন উপনগরী
বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী ও পূর্ব কলকাতা সমাপ্ত প্রায়।

মিউনিসিপ্যাল এলাকা উন্নয়ন
৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার জন্য সাহায্য পাচ্ছেন। আর শতাধিক অঞ্চলও এই সাহায্য পাচ্ছেন।

বিবিধ
এছাড়া আছে প্রায় তিন হাজার হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি, কয়েকটি নতুন হাসপাতাল, প্রায় ২০টি চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রায় ৬০০ প্রাথমিক স্কুল নির্মিত বা মেরামত।

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

মেয়ে! বাসন্তী গুপ্তর মেয়ে শ্রাবন্তী গুহ ! দু চোখ জলে ভরে উঠল পাষাণপ্রতিমার।

জানলে কী করে বাবা ?

কান দেখে।

কেন পাখা ঘুরিয়ে মাথার কাপড় খুলতে বলেছিল ইন্দ্রনাথ, এবার তা বোঝা গেল।

মা-মেয়ে দু জনেরই কান বাইরের দিকে বার করা—মাথার সঙ্গে লেপটান নয়। খাড়া কান জন্মসূত্রেই আসে। তা ছাড়া চোয়ালের গড়নও একরকম।

টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল সাদা ব্লাউজে।

আমার কর্মফলে আমি ভুগছি। আর কাউকে জড়াতে চাই না। মেয়ে তো আর ফিরে আসবে না।

শ্রাবন্তী নামটা আপনার দেওয়া নয়, ঠিক কিনা ?

নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বাসন্তী গুপ্ত। কঠিন হয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথের স্বর।

তা হলে আপনি জানলেন কী করে যে আপনারই মেয়ে খুন হয়েছে ? কাগজে তো ওর ছবি ছাপা হয়নি।

বিষণ্ণ চোখে তাকাল প্রৌঢ়া। কণ্ঠস্বর ক্লান্ত।

চিঠি লিখে মেয়ে যে আমাকে জানিয়েছিল নাম পাল্টে শ্রাবন্তী গুহ হয়েছে আর চল্লিশ হাজার টাকা জমিয়েছে।

শুনে যেন ইলেকট্রিক শক খেল তিন বন্ধু। শ্রাবন্তী গুহর ফ্ল্যাটে চল্লিশ হাজার কেন—চল্লিশটা টাকাও তো পাওয়া যায়নি।

(চলবে

বাঙালি মেয়ে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন শতবর্ষ আগে

শ্যামলী বসু

এই প্রবন্ধ বাঙালি সমাজকে মনে করিয়ে দেবার জন্য যে, ভারতে নারী শিক্ষায় বাঙালি মেয়েদের স্হান ছিল সবার আগে। অথচ স্বাধিকার অর্জনে বাঙালি মেয়েরা এখনও পিছিয়ে কেন ?

১৮৮৩ সালের ১০ মারচের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব এক বিশেষ কারণে স্মরণীয়। সেই বছরেই যুগ্মভাবে স্নাতক হবার বিরল কৃতিত্ব দেখালেন বেথুন ফিমেল স্কুলেব দুই বাঙালি ছাত্রী খৃস্ট ধর্মাবলম্বিনী চন্দ্রমুখী বসু এবং ব্রাহ্মিকা কাদম্বিনী বসু।

সমাবর্তন ভাষণে উপাচার্য এইচ জে বেনলডস বলেন 'ভাবতের শিক্ষাব ইতিহাসে দুই ছাত্রীর স্নাতক উপাধিলাভ এক যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত।' অবশ্য এই দুই বাঙালিব এই বিরল গৌরব শুধু ভারতেব ইতিহাস নয়, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসেই ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পাবে, কারণ তখনো ইংলনডেব মেয়েদেবও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের সুযোগ মেলেনি।

এব আগে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠায় ছদ্ম হতাশায় খেদোক্তি করেছিলেন এক বাঙালি কবি 'আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো ব্রতধর্ম করত সবে,' এক বেথুন এসে শেষ কবেছে আর কি তাদের তেমন পাবে,' ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেবে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,' তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলিতি বোল কবেই কবে।'

চন্দ্রমুখী আব কাদম্বিনী বিবি সাজেননি বটে, কিন্তু বিলিতি বোলে বিশেষ পাবদর্শিনী ছিলেন। কাদম্বিনী প্রথম মহিলা, যিনি 'গ্র্যাজুয়েট অফ বেংগল মেডিকেল কলেজ' উপাধি লাভ করে উচ্চতর ডাক্তারি শিক্ষার জন্য গেলেন বিলেত। ইংরেজিতে এম এ পাশ করে চন্দ্রমুখী বেছে নিলেন শিক্ষকতার পথ, বেথুন স্কুল থেকে কলেজ বিভাগ আলাদা হলে, তিনি হলেন বেথুন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা।

কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী যে পথের পথপ্রদর্শিকা হলেন সেই পথ ধরে এগিয়ে ছিলেন বেথুন কলেজের আরো ছাত্রী। তাঁদের মধ্যে কবি কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, তেজস্বিনী সমাজসেবী সরলা ঘোষাল, (দেবী চৌধুরাণী), অবলা বসু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তবে বাঙালি তথা ভারতীয় মেয়েরা যে গোলাপবিছানো পথে এগিয়েছেন আদৌ তা নয়। পড়াশোনা শিখলেই যে বৈধব্য সুনিশ্চিত, শাখি পড়ানোর মত একথা শেখানো হত তাদের। পুরুষপ্রধান সমাজের ভ্রূকুটিশাসন আর কঠোর নিয়মবিধির চাপে কয়েকশতক ধরেই এ দেশের মেয়েদের জীবন ছিল পংগু, জড়। সহমরণের চিতায় পোকার মত পুড়ে মরা, কৌলীন্য প্রথার বলি হয়ে জীবন যন্ত্রণা সহ্য করা, অথবা অকাল–বৈধব্যের জ্বালায় জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকাই ছিল যেন এ দেশের মেয়েদের সাধারণ উত্তরাধিকার। কিন্তু উনিশ শতকের রেনেসাঁসের আলোয় যখন জীবনকে শুদ্ধ করে, সংস্কার করে নিতে এগিয়ে এলেন বাঙালি মনীষীরা, তখন তাঁরা বুঝলেন, দেশের বিরাট একটা অংশ অশিক্ষার অন্ধকারে, সামাজিক অবিচারের শিকার হয়ে থাকলে সে দেশের সামগ্রিক উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। রাজা রামমোহনের নির্ভীক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে রদ হল বীভৎস সতীদাহ প্রথা, সহৃদয় বিদ্যাসাগরের আন্তরিক উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। কৌলীন্য প্রথার অবিচাব নিয়ে রংগ ব্যংগ ঝলসে উঠল রামনারায়ণের নাটকে। একটি দুটি করে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল দেশে। বংগ মহিলা বিদ্যালয় আর বেথুন স্কুল পরে এক হয়ে গেলে বেথুন স্কুল থেকেই ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কাদম্বিনী বসু। এই একটি মেয়ের জন্যেই ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুলে কলেজ ক্লাসের পত্তন। একশো বছর পরে সে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা হাজারের ওপর। চন্দ্রমুখী কাদম্বিনীর স্নাতক উপাধি লাভের ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালনে ব্রতী হয়েছেন বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীবৃন্দ। এই প্রসংগে কিছু কথা বললেন বেথুনের বর্তমান অধ্যক্ষা ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি। প্রথম অধ্যক্ষা চন্দ্রমুখীর মত ডঃ ত্রিপাঠিও বেথুনেরই প্রাক্তনী। ডঃ ত্রিপাঠি দৃঢ়ভাবে জানালেন 'এ শুধু স্মরণোৎসব নয়, একশো বছরের আগে এদেশের মেয়েরা যে নতুন পথে এগিয়েছিলেন, আজকের মেয়েরা যেন হাজার বছর ধরে সেই পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে।'

ডঃ ত্রিপাঠি আরো জানালেন, 'এখনো দেখেছি কলেজের শতকরা আশিটি মেয়েই ঘর সংসার করাই শ্রেয় মনে করে, কুড়ি জনকে বলতে পারি 'কেরিয়ারিসট।' তারা তাদের শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা নানাভাবে কাজে লাগাতে চায়, সর্বদিক থেকেই জীবনে স্বাবলম্বী হতে চায়। তাদের এই উৎসাহ আমাব খুব ভাল লাগে।' একটু থেমে অধ্যক্ষা বললেন –'দেখ, এই একশো বছর ধরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বেথুন কলেজ যথেষ্ট বড় ভূমিকা নিয়েছে। এ কলেজের মেয়েরা রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই পথ প্রদর্শন করেছে। কৃতী ছাত্রীদের কত নাম বলব · তাদের জন্য আমবা রীতিমত গর্বিত।' এরপব একটি সুচিন্তিত মন্তব্য কবলেন শ্রীমতী ত্রিপাঠি। 'দেখ, জনসংখ্যা বাড়ার সংগে শিক্ষিতদেরও সংখ্যা বাড়ছে, কর্মক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে তীব্র প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতা আর ভিড় কমাবার জন্যে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের নতুন দিগন্তেব সন্ধান করা প্রয়োজন, কর্মক্ষেত্রের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

এবার এদেশেব মেয়েদের সাধারণ অবস্থার একটু পর্যালোচনা করা যাক। গত একশো বছরে দেশ বিভিন্ন দিকে অনেক এগিয়েছে। এসেছে স্বাধীনতা, বেড়েছে জন সংখ্যা। সাক্ষবতাব সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৮১র সেনসাস রিপোরটে দেখা গেছে পশ্চিমবংগে মেয়েদের সাক্ষবতার হার ৩০.৩৩%। আবার এই ত্রিশ ভাগেব ৫৫.২৬% শহরের মেয়ে, গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের হার ২২.০১%। বিশাল দেশের জনসংখ্যাব তুলনায় এ হিসাব আদৌ আশাপ্রদ নয় এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। অথচ মেয়েরা পড়াশোনা এবং জীবিকাব সন্ধানে পুরুষদের সমান প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫০–৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা ছিল চোদ্দ, বর্তমানে সেই হার সাঁইত্রিশ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মেয়েদের সাক্ষরতার সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে উচ্চশিক্ষার্থী মহিলাদের সংখ্যা। প্রশাসন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা, সব বিষয়েই পুরুষদের সমান বা তাদের থেকে বেশি যোগ্যতা আর দক্ষতা দেখিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিতা। নিজেদের অধীত বিদ্যা যোগ্যতার সংগেই কাজে লাগিয়ে সমাজে নিজেদের মর্যাদা এবং জীবন যাত্রার মান বাড়িয়েছে। মেয়েদের চাকরি করার ফলে কিছু পবিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত হয়েছে, পরোক্ষে তাদের দ্বারা সমাজসেবাও হচ্ছে, তবে এখনো শতকরা কুড়িটি মেয়েই কেরিয়ারিসট, নেহাৎই পবিবাবেব প্রয়োজনে কাজ কবতে এগিযে এসেছে কোন কোন মেয়ে। মাসখানেক আগেও এক ইংরেজি সাহিত্যে এম এ, সরকারি চাকুরিবতাকে বিয়ে প্রসংগে বলতে শুনেছি 'বিয়ের পর কেন কাজ করব, স্বামী কি আমাকে খাওয়াতে পরাতে পারবে না' এই কথার পিছনে তাব যে যুক্তিই থাক, আধুনিক মানসিকতাব কোন ছাপই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে এখনো যে শতকরা আশি জন মেয়ে ঘরসংসার করাই শ্রেয় মনে করে একথাটিও মনে রাখবার মত। সাধারণ মানের ছাত্রীরা যে বিয়ের অপেক্ষায় থেকে বিয়ের বাজারে কিছুটা দর বাড়াবার জন্যে পড়াশোনা চালিয়ে যায় – কথাটা অস্বীকার করা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইসব মেয়েদের জীবন চিরকালের গতানুগতিক ছকে ফেলা। বিয়ে, সংসার, সন্তান, শাড়ি, গয়নার গল্প, সিনেমা পত্রিকা আর পরচর্চায় অবসর বিনোদন। ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াবার জন্যেও মাসে দেড়শো টাকা দিয়ে রাখতে হয় টিচার; সময় অর্থ আর এনারজির চরম অপব্যয়। কিন্তু এই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। শহর বা মফঃস্বলের যে মেয়েরা পড়াশোনায় আগ্রহী, পরিবার থেকে নিতান্ত তেমন বাধা না এলে লেখাপড়ার শেষে তাদের ডিগ্রি ডিপলোমা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের পাশপোরট হিসাবে লাগাতে ইচ্ছুক। বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির দিনে, জীবনযাত্রা যখন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, তখন 'জীবনের অংশীদার'দের এই সহমর্মিতা আর সমঝোতার মনোভাব প্রশংসার দাবি রাখে।

নবম দশম

২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার আকর্ষণ

প্রচ্ছদ কাহিনী
সুন্দরী মিরিক

চারদিকে সবুজ পাহাড়, ঘন ঝাউ-পাইনের অরণ্য। মাঝে রূপসীর মত শুয়ে আছে পাঁচ একর ব্যাপী এক নিথর উপত্যকা—সুন্দরী মিরিক। শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং থেকে খুব কাছেই এই পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের কাছে অতিরিক্ত আকর্ষণ। উপত্যকার সবুজ বনভূমি জেগে থাকে সর্বদা রামধনু রঙে রাঙান ফুলে, পাহাড়ী পাখির মিষ্ট কলকাকলি আর নিস্তরঙ্গ কাকচক্ষু প্রাকৃতিক হ্রদকে সঙ্গী করে। আবহাওয়া মনোরম, মনোরম মিরিকের সবকিছুই। রূপসী উপত্যকা মিরিক, তার মানুষ আর প্রকৃতিকে নিয়ে মিষ্টি-মধুর প্রচ্ছদ কাহিনী।

বিশেষ আকর্ষণ
মাধ্যমিকের প্রথম একুশ

এবারে থাকছে ১৯৮৩-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম স্থানাধিকারী ছাত্রদের ঘরোয়া সাক্ষাৎকার।

এছাড়া সাম্প্রতিক সংবাদ, বিদ্যালয় সংবাদ, বুদ্ধির খেলা, এবং জবাব সহ সমস্ত নিয়মিত বিভাগ।

অথীত বিদ্যাকে অর্থকরী উপার্জনের কাজে লাগিয়েছিলেন একশো বছর আগে যে দুই মহিলা, সে যুগের পরিবেশে তা নিতান্তই দুঃসাহসিকতা। সনাতন রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের মেয়েদের কাছে পুরুষদের মত বাইরের জগতে বেরিয়ে কর্মসংস্থান করা তো আকাশকুসুম দেখার মতই, কারণ স্কুল-কলেজে পড়ারই অনুমতি মেলেনি তাদের। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের যে কটি শিশুকন্যা এবং বালিকা বেথুন বা ব্রাহ্ম গারলস স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল, এগার-বার বছর বয়স হলেই তাদের পাত্রস্থ করে নিশ্চিন্ত হতেন অভিভাবকেরা। পড়াশোনা করতে সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্ম এবং খৃস্টান ধর্মাবলম্বী বাঙালি পরিবারের মেয়েরা। স্বাধীনভাবে জীবিকার সন্ধানেও তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী।

একশো বছর পরের ছবিটি একটু আলাদা। এখন খবরের কাগজে 'পাত্রপাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের কলমে 'চাকুরিতা, শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন প্রায়ই নজরে পড়ে। এর পিছনে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক হালচালের বড় ভূমিকা থাকলেও পুরুষশাসিত সমাজের মানসিকতাও যে কিছুটা বদলেছে সে পরিচয়ও স্পষ্ট। শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা স্ত্রী বা বধূ বর্তমানে পরিবারের সম্পদ। তবে কর্মস্থলে পুরুষের সমানই দায়িত্ব পালন করলেও এর ওপরেও কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব চাকুরিজীবী মেয়েদের ওপর এসে পড়ে। সব্যসাচীর মত একই সংগে কর্মক্ষেত্র আর সংসারের দায়িত্ব। দ্রুত হাতে সংসারের কাজ সেরে বাসে ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে ছুটতে হয় অফিসে। তারপর সারাদিন কর্মস্থলে খাটাখাটুনির পর আবার একদফা বাদুড়ঝোলা হয়ে ভিড়ের চাপে পিষ্ট, ক্লান্ত মহিলা যেইমাত্র বাড়ির চৌকাঠে পা দিচ্ছে, প্রত্যাশায় উন্মুখ সংসার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।

ছোট ছেলেমেয়ে চাইবে মাকে, বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ি চাইবেন কর্তব্যপরায়ণা বধূকে; সংসারের কাজের লোক উনুন ধরিয়ে বসে থাকে—কখন বৌদি রাতের খাবার তৈরির নির্দেশ দেবেন।

কর্মক্লান্ত ছেলে অফিস থেকে ফিরলে স্নেহময়ী জননী অবশ্যই ব্যস্ত হয়ে সামনে ধরেন চা আর জলখাবারের থালা। কিন্তু কজন কর্মক্লান্ত বধূর কপালে জোটে এমন আপ্যায়ন ? এক বান্ধবীকে ম্লান হেসে বলতে শুনেছি 'একই অফিসে কাজ সেরে, স্বামী আর আমি একই বাসে ভিড় ঠেলে বাড়ি ফিরি। কিন্তু দেখ, স্বামী বাড়ি ফিরেই ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে 'রিল্যাক্স' করেন, আর আমি ? হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে ছুটি হিটারে চায়ের জল চাপাতে।'

আই টি ডি সি-র ইনসট্যানট রিজারভেশন বিভাগের অফিস অ্যাসিসট্যানট শিখা সিংহ জানালেন, শ্বশুর বাড়িতে তার জায়গাটি যথেষ্ট সম্মানের। শিখা সেখানে একজন কর্মরতা, উপার্জনশীলা বধূ মাত্র নন, সংসারের প্রায় সব বিষয়েই পরিজনেরা তার ওপর নির্ভর করেন।

শ্রীমতী হাজরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী। একটি স্কুলের সংগে অনেকদিন যুক্ত আছেন। কাজে যোগ দিয়েছিলেন সংসারের তাগিদে নয়, নিজেরই উৎসাহে। বললেন—'কাজের মধ্যে পেতাম মুক্তির স্বাদ। ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় মোটা অংকের কোন খরচ মেটাতে পেরে রীতিমত আনন্দ পেয়েছি।'

মেয়েদের কাজের প্রসংগে একটি বাস্তব দিক প্রায়ই অবহেলিত থেকে যায়। লেখাপড়ার আলোক না পেলেও, লোভনীয় অংকের উপার্জন না হলেও 'কাজের মেয়েটি' না হলে যে কোন গৃহস্থ সংসার এখনো অচল। গৃহস্থ সংসারে কাজের লোক হিসাবে যেসব মেয়েরা আসে তাদের সিংহভাগই আসে অজ পল্লীগ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এদের অক্ষর পরিচয় করাতে চাইলেও এরা সে প্রচেষ্টায় কৃচিৎ সায় দেয়। বরং সমগ্র ব্যাপারটাকেই ঠাট্টা অথবা সন্দেহের চোখে দেখে। তবে পড়াশোনা করতে না চাইলেও অনেকেই শহুরে জীবনের বিলাস, চাকচিক্য আর আড়ম্বরে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

যেসব মেয়েরা পড়াশোনা করার সুযোগ পায় তারা অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাজের মধ্যে। তবে পুরুষপ্রধান সমাজ মেয়েদের কোন সাধু প্রচেষ্টা বা উদ্যমকে সব সময়ই প্রীতির চোখে দেখেনি। 'বারো হাত কাপড়েও যাদের কাছা কুলোয় না' এমন নিকৃষ্ট প্রাণী জীবনে কতখানি মর্যাদা পেয়েছে তাদের কাছে? তাই প্রথম যুগের শিক্ষয়িত্রীরা তাদের কাছে ছিলেন 'মাসটারনী।' বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটের চাপে পরিবারে উপার্জনশীলার অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেন না। কোন কোন বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষাগত প্রাধান্য মেনে নিতে হয়। সাধারণভাবে পুরুষ নারীকে সেবিকা, ভোগ্যপণ্য হিসাবেই দেখেছে, এই অভ্যস্ত মনোভাব কাটিয়ে উঠতে তাদের সময় লাগছে। তাছাড়া, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ভাবটাই স্বাভাবিক। তাই এখনো ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বিয়ে প্রভৃতি বিষয়ে 'পেটার ফ্যামিলিয়াস' পুরুষ অভিভাবকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এমনকি এখনো দেখা যায় শিক্ষিতা স্ত্রী বা মেয়ের জীবিকা নির্বাচন পুরুষের অনুমোদন সাপেক্ষ। এক সুযোগ্যা মহিলা সাংবাদিককে সর্বক্ষণের কাজ ছেড়ে ফ্রিল্যানস কাজ করতে দেখেছি, কেবলমাত্র তার স্বামীর পছন্দ নয় বলে। এ প্রসংগে গ্রুপ থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অধ্যাপিকা কাজল চৌধুরী বললেন, 'মেয়েরা যে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এখনো সর্বাংশে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারেনি, এর জন্যে মেয়েদের মানসিকতা কিন্তু অনেকখানি দায়ী। কারণ ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা শিখেছে, জেনেছে পরনির্ভরতা। তাছাড়া তারা যে বাইরের কর্মজগতে এখনো যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে না তার জন্যে দায়ী পরিবেশ। পুরুষেরা মেয়েদের যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখে না, মেয়েদের জন্যে সহজে জায়গা ছেড়ে দিতেও রাজী নয়।'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম দুই মহিলা বিচারপতির অন্যতমা শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর কথা প্রসংগে বলেছিলেন 'আইনের প্রফেশন প্রধানত মেল ডমিনেটেড প্রফেশন, প্রথমে তো কাজের অসুবিধা হবেই। তবে কাজে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা আর উৎসাহ দিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম ব্যবহারজীবী হিসাবে, সিনিয়রদের সহৃদয়তাও তখন পেয়েছি।'

এখন দেখা যাচ্ছে এ দেশের মেয়েরা 'প্রথম মহিলা বিচারপতি', 'প্রথম মহিলা রাজ্যপাল' ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের পাতা ছেড়ে জীবন প্রবাহে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের সংগে। শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, দক্ষতা আর নিষ্ঠা দিয়ে পেয়েছে স্বীকৃতি, পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। আইনও কিছুটা সহৃদয় মেয়েদের প্রতি। ১৯৫৫ র পর হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, অথবা হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট, মেয়েদের যথেষ্ট সুবিধা এনে দিয়েছে। কিন্তু লোভী, ধূর্ত পুরুষের কাছে শিক্ষিতা অশিক্ষিতা নারীর কোন প্রভেদ নেই। নারীর 'নারীত্ব' এখনো তার বড় শত্রু। □

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতীয় শ্রমিকরা কি দলে দলে দেশে ফিরতে বাধ্য হবেন ?

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে চাকরি নিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ রুজি রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে গত দশ বছরে মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়াবাসীদের চাকরির সুযোগ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাদের সমীক্ষায় বলেছে প্রায় ২০ লক্ষ লোক এই সূত্রে এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন। উপসাগর অঞ্চলের দেশগুলিতে এবং লিবিয়ায়, ১৯৭৩ সালের নভেমবর মাস থেকে তেলের দাম বাড়ার পর সবচেয়ে বেশি বিদেশি মানুষ গেছেন। এশিয়ার অতি গরিব বা অতি বড়লোক দুধরনের দেশ থেকেই সেখানকার নাগরিকরা চাকরির জন্য গেছেন।

চাকরির জন্য গেলেও এই মানুষরা যে সব দেশে গেছেন সেখানে শ্রম দিয়ে তাদের আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। যে সব দেশ থেকে চাকরির জন্য লোকজন গেছেন সে দেশগুলি হল পাকিস্তান, উত্তর ইয়েমেন, দক্ষিণ ইয়েমেন, মিশর জরডন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং সুদান। যেসব দেশে এই বিদেশি শ্রমিকদের আগমন ঘটেছে সে দেশগুলি হল : সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, সৌদি আরব, কুয়াএত, কাতার, এবং বাহেরিন। সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে গেছেন ২ লাখ ৫০ হাজার, সৌদি আরবে ১ লাখ ২০ হাজার, কুয়াএতে ১ লাখ, কাতারে ৪৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার, বাহেরিনে ৫০ হাজার।

মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি খুঁজতে যাওয়া মানুষদের মধ্যে ভারতের ২ লাখ ১৪ হাজার, আফগানিস্তানের ২ লাখ, পাকিস্তানের ৫ লাখ, ইয়েমেনেরও তাই, মিশরের ৩·৫ লাখ, জরডনের ১ লাখ ৫০ হাজার, দক্ষিণ কোরিয়ার ৬০ হাজার বাংলাদেশ এবং সুদানের ৫০ হাজার করে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার অবশ্য আগেই বলেছিল এই বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যপ্রাচ্য গমন সাময়িক ঘটনা মাত্র। তাদের মত, 'তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার কোন দরকার নেই।'

বিদেশে চাকরি করতে যাওয়া এশিয়রা এবার সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হবেন। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যাতে ভারতের উপকার কিছু অন্যদিক থেকে তার কয়েকটি ব্যাপারে অপকার হবে। কী সেই ঘটনা ?

অরগাইনেজশন অব অয়েল একসপোরটিং কানট্রিজ বা ওপেক (ও· পি· ই· সি) গত ১৪ মারচ তাদের লনডন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতি ব্যারেলে তারা সর্বোচ্চ ৩৪ এবং সর্বনিম্ন ২৯ পাউনড দাম কমাবে। এর ফলে প্রতি ব্যারেলে ভারতের বাঁচবে ৪০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে। এছাড়া ওপেক সংশ্লিষ্ট দেশগুলি ১৯৮৩ সালের বাকি সময়টা প্রতিদিন ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন করবে, তার বেশি নয়। কারণ বাজারে তেল বাড়তি হয়ে পড়ছিল ফলে দামও কমে যাচ্ছিল।

তেল আমদানীর জন্য ভারতের গত ৩ বছরে বৈদেশিক ব্যয় বেশ বাড়ছিল। ১৯৭৯-৮০ সালে ২,৫৬২·৯৯ কোটি টাকা বেড়ে ১৯৮০-৮১ সালে দাঁড়িয়েছিল ৫,৮১৩·২০ কোটি এবং ১৯৮১-৮২তে তা কিছুটা কমে হল ৫,৭৯২ কোটি টাকা। ১৯৭৯ সালে ওপেক তেলের দাম ১২৫ শতাংশ বাড়িয়ে দেবার জন্যই এই বাড়তি খরচ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওপেক প্রস্তাবিত তৈল-উৎপাদন সীমিত হয়ে গেলে অনেক দেশেই কর্মীর সংখ্যা কমে যাবে। পশ্চিম এশিয়ার এশিয়, বিশেষত ভারতীয় শ্রমিকরা ১৯৮২র প্রথম থেকেই সেটা কিছুটা আঁচ করেছিলেন। কারণ ঐ সময় থেকেই কুয়াএত, আবুধাবি, এবং আর কয়েকটি তৈল রপ্তানিকারক দেশ বিদেশি শ্রমিকদের একটু একটু করে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। তাছাড়া ভিসা দেবার সংখ্যাও কমে আসছিল।

কুয়াএতে বড় বড় ঠিকাদার কোমপানিগুলির মধ্যে ইনজিনিয়ারিং প্রজেকটস ইনডিয়া বা ই পি আই রীতিমত বিরাট একটা সংস্থা। তারা শহর এবং অন্যান্য প্রকল্প তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু গত বছরের প্রথম দিক থেকেই তারা কাজ শেষ করে ফেলে এবং অফিস-প্রকল্প একটু একটু করে গুটিয়ে নিতে থাকে। এছাড়া রয়েছে ইরাক ও ইরানের মধ্যে ২৮ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ বিবদমান ঐ দুটি দেশই তৈল উৎপাদক দেশগুলির প্রথম সারিতে পড়ে।

ই পি আই তাদের কাজ গুটিয়ে নেওয়ার ফলে এই সংস্থার অনেক শ্রমিকই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য সংস্থায় কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন তাদের মধ্যে অনেকেই আবার দেশেও ফিরে আসছেন। কারণ ভারতীয় সংস্থাটির কাজ ছেড়ে অন্য সংস্থায় কাজ নেওয়ার ফলে তাদের দীর্ঘস্থায়ী কোন সুবিধা হয়নি।

ইরাক-ইরান লড়াই শুরু হয়েছিল ১৯৮০র সেপ্টেমবর থেকে। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কয়েকটি আরব দেশ ইরাককে প্রতি মাসে প্রায় ১০ কোটি পাউনড করে সাহায্য দিয়েছে বলে শোনা যায়। এর পর এখন তেলের দাম কমে যাওয়ায় সেই অতিরিক্ত খরচের ওপর আরও চাপ পড়েছে। ফলে সেই সাহায্যকারী আরব দেশগুলি এখন বিদেশাগত শ্রমিক ও শ্রমসংস্থার সঙ্গে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হতে আর বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তা ছাড়া তারা ঘোষিত কোন বিধান জারী না করে মৌখিক ভাবেই ঐ শ্রমিকদের দেশে ফিরতে বলছে।

এরপর আছে অন্যান্য দেশ থেকে আসা শ্রমিকদের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের তীব্র প্রতিযোগিতা। ফিলিপিনস, তাইল্যানড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান এবং চীন থেকে শ্রমিকরাও কর্মদক্ষতায় কম যান না। এই প্রতিযোগিতার ফলে সকলেরই চাকরির সুযোগ কমে যায়, উৎপাদিত দ্রব্যের মান বাড়লেও মজুরি ভীষণ কমে যায়। তাছাড়া আগে বহিরাগত কর্মীরা একতরফা ভাবে মজুরির শর্ত আরোপ করতেন কিন্তু এখন আরও অনেক দেশ থেকে শ্রমিক আসার ফলে মজুরির শর্ত এখন বিপরীত ভাবে নির্ধারিত হচ্ছে।

ভারতের মজুর সরবরাহকারী এবং উন্নয়ন ঠিকাদার সংস্থাগুলি জাপানি ও ইওরোপীয় ঠিকাদার সংস্থাগুলির কাছে প্রতিযোগিতায় ক্রমশই পিছু হটছে। কারণ জাপানি ও ইওরোপীয় সংস্থাগুলি তাদের দেশের বিশেষ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুবিধার জন্য প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে। জানা গেছে, মোটামুটি ভাবে ভারতীয় ঠিকাদার সংস্থাগুলি মধ্যপ্রাচ্যে বিনিয়োগ করেছে আড়াই হাজার কোটি টাকার মত। কিন্তু ইরাক, কুয়াএত, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, আবুধাবি, কাতার এবং ওমানে উন্নয়নমূলক কাজে ভারতের সেই টাকা প্রায় আটকে গেছে আধা পথে। তার ওপর ওমানে আবার নিয়ম করা হয়েছে বহিরাগত কোন শ্রমিকের বয়স পঁচিশের কম হওয়া চলবে না। এই নয়া নীতির ফলে ১৯৭৮ সালে সেখান থেকে ভারতীয় মজুররা যে পরিমাণ রোজগার করতেন তার চেয়ে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ মজুরি কমে যাবে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সম্প্রতি আরবিকরণের ধুয়া উঠেছে। এতেও বহিরাগত মজুর, বিশেষত ভারতীয় মজুররা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সব আরব মজুরই এখন স্বদেশে এসে উন্নয়নে শরিক হচ্ছেন অথবা আরবদের মধ্য থেকে মজুর তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।

সারণি ১

পাশপোরট অফিস	আবেদনের সংখ্যা	পাশপোরট অনুমোদিত
আহমেদাবাদ	৬০,০৩০	৫৬,৪৬৯
বাঙ্গালোর	৩২,৭৮৮	৩৩,৯৬৯
ভূপাল	১৩,৫৩৬	১৫,৩৩৯
ভুবনেশ্বর	২,৭২৬	২,৮৪৮
বোমবে	২,১২,৪০৩	১,৯৮,৪৮৯
কলকাতা	২৪,৮৩৭	২৬,৯৬৭
চণ্ডিগড়	৫২,৮৪৯	৫০,৪৩২
কোচিন/এরনাকুলাম	৭৪,১৩৯	৭২,১০৪
নয়া দিললি	৬৭,৬৪১	৬৫,৫৭১
গৌহাটি	১,৯৮৯	১,৭৭৩
হায়দরাবাদ	৫৫,৯৩৪	৫৬,৮৯৮
জয়পুর	৪৫,৮০৯	৪৪,৫৩৮
জলন্ধর	৭৩,৩১৫	৭১,৯২৬
কোঝিকোড়	৪৯,১৮৫	৪৯,৬৮১
লক্ষ্ণৌ	৭৩,৫০২	৯০,৮৮২
মাদরাজ	৯৫,২৬৫	৯৫,০৮৫
পাটনা	৮,৮৯৪	৭,৭২৫
শ্রীনগর	৫,৪৬৩	৫,৬৭০
মোট	৯,৫০,৩৫৫	৯,৪৬,৩৬৬

আগেকার আবেদনপত্র কিছু কিছু এই সময় বিবেচনা করে অনুমোদিত হয়েছিল।

তার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয়দের। যেখানেই নতুন নতুন আরব মজুরদের নিয়োগ করা হচ্ছে সে সব জায়গাতেই ভারতীয় মজুরদের চাকরি চলে যাচ্ছে। এই অবস্থার ফলে ভারতের কর্মী নিয়োগকারী সংস্থাগুলি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির জন্য আবেদনপত্র খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিচ্ছে।

ভারতের এরকম ছোট বড় কর্মী নিয়োগকারী সংস্থা আছে প্রায় ৭ হাজারটি। কিন্তু গত দুবছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে তাদের সেই ব্যবসা বেশ কমে আসছে। ১৯৮০ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে কেরলের কোচিনে যে আঞ্চলিক পাশপোরট অফিসটি খোলা হয়েছিল সেখানকার সূত্রে সম্প্রতি জানান হয়েছে যে, গত কয়েক মাসে ভারত থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলে চাকরি করতে যাওয়া লোকের সংখ্যা কমে গেছে ১৯৭৯ সালের পর থেকে এই সংখ্যা কমে শতকরা ৫০ ভাগের মত। কোঝিকোড এবং কোচিনের আঞ্চলিক পাশপোরট অফিসে ১৯৭৭ সালে পাশপোরট দেওয়া হয়েছিল ১ লাখ ৭০ হাজার জনকে। একমাত্র কোচিনেই দেওয়া হয়েছে ১ লাখ লোককে। ১৯৭৮ সালে এই দুটি অফিস থেকে ৩ লাখ লোকের বাইরে যাবার পাশপোরট ইস্যু হয়েছিল। ঐ বছর এই দুই অফিসই সারা ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ পাশপোরট ইস্যু করেছিল।

শুধু তাই নয়, সারা দেশ থেকেই বিদেশে চাকরি পাওয়া মানুষ পাশপোরটের জন্য বেশি সংখ্যায় আবেদন করতে থাকায় নতুন নতুন পাশপোরট অফিস খোলা হতে থাকে। ১৯৭৮-৭৯ সালে এরকম নতুন পাঁচটি অফিস খোলা হয়। কিন্তু এরপর দেখা যায় পাশপোরটের জন্য আবেদপত্রের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ১৯৭৮ সালে যেখানে ১০ লাখ ৪৫ হাজার ৮৯৪ জন পাশপোরটের জন্য আবেদন করেছিলেন, পরের বছর দেখা গেল ৮ লাখ ৭৪ হাজার ১৭৫ জন আবেদন করেছেন।

১৯৭৮ সালের আগসট মাসে তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভারমা সংসদে জানান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, লেবানন, ওমান, এবং তুরস্ক থেকে ১৯৭৫-১৯৭৭ এর মধ্যে ৮৫৪ জন ভারতীয় চাকরি খুইয়ে বিদেশে বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাদের সকলকে এখন ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।' ১৯৭৮ সালের ২৭ আগসট তেহেরান থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হল, 'বেআইনী কর্মনিয়োগ কয়েকটি সংস্থা ইরানে চাকরি দেবার নাম করে যে ভারতীয়দের এনেছিল তাদের মধ্যে ১৩০ জন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দেশে ফিরে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন।' জানা গেছে ১৯৭৮-এর ২০ থেকে ২৭ আগসট তেহেরানের ভারতীয় দূতাবাস আশঙ্কা করেছিল যে ভুয়া কর্মনিয়োগ দালাল সংস্থাগুলি কর্তৃক আনীত ভারতীয়দের ভিড়ে দূতাবাস ভরে যাবে। সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে এদের দূতাবাসে আসার কথা ছিল।

এই ভুয়া দালাল সংস্থাগুলি চাকরি দিয়ে বিদেশে যাবার নাম করে যে ব্যবসা চালাচ্ছিল তা রীতিমত উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে ওঠে। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্বেগের শরিক হয়েই আইন করেন যে, দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে নিয়োগের ব্যাপারে যে এজেনসি সংস্থাগুলি কাজ করছে তাদের ব্যাপারটি মূলত নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক। এই জন্যই এমপ্লয়মেনট অ্যানড ট্রেনিং দপ্তরের ডিরেকটর জেনারেলের অধীনে ওভারসীজ এমপ্লয়মেনট সেল নামে একটি শাখা গঠন করা হয়। এর কাজ হচ্ছে, বেসরকারি কর্মনিয়োগ সংস্থার কাজকর্মের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

এই আইনের পর ঠিক হল কোন বেসরকারি সংস্থা বা গোষ্ঠী যদি কোন ভারতীয়কে বিদেশে চাকরি দিয়ে নিয়ে যান তবে শ্রমমন্ত্রকে তার নাম অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া যে সব শ্রমিক যাবেন চাকরির শর্তাবলী তার পক্ষে থাকা চাই এবং কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের অনুমতি তাতে থাকা চাই।

এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২২ সালের ইনডিয়ান ইমিগ্রেশান অ্যাক্ট আবার চালু করা হল। ভারত সরকার পুরোপুরি এই আইন মেনে চলার দিকে একটা ঝোঁক দিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ভারতীয় মজুরদের অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে আখের ক্ষেত বা তামাকের ক্ষেতে লাগিয়ে দেওয়া হত। এই দেশান্তর গমনের জন্যই এখন ভারতের বাইরে কোন কোন দেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রাধান্য। সেই দেশান্তর গমনের কালেই ইনডিয়ান ইমগ্রেশান অ্যাকট তৈরি হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রথম আইন ১৮৩৭ সালে। তখন কিন্তু শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করাব কোন আইন ছিল না। ১৯২২ সালে আবার নতুন আইন হল। এই আইন আবার সংশোধিত হয়েছে ১৯৩৮ এবং ১৯৪০ সালে।

১৯৭৬-৭৭ সালে রিপোরট অব দ্য প্রোটেকটর অব ইমিগ্র্যানটস-এ বলা হল: ভারত থেকে উপসাগরীয় দেশগুলিতে কাজের জন্য নিয়ে আসা দুর্নীতিপরায়ণ চক্রটি যথেচ্ছ দুর্দশার মধ্যে শ্রমিকদের ফেলে দেয়। তাঁবুর মধ্যে প্রচণ্ড গরমে তাদের বসবাস করতে হয় এবং দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। অথচ এদের খেতে দেওয়া হয় যৎসামান্য। রিপোরটে একথাও বলা হয়েছে, কোন একটা প্রকল্প শেষ হয়ে যাবার পর এমনও হয়েছে যে, কর্মনিয়োগকারীরা শ্রমিকদের কোন টাকা না দিয়েই গা ঢাকা দিয়েছে এবং তার জন্য ঐ সব শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হয়েছে।

ইনডিয়ান ইমিগ্র্যানট অ্যাকট, ১৯২২, এর উদ্দেশ্য ছিল এই বিপুল শ্রমশক্তির অপচয় বন্ধ করে জাতীয় ভাবমূর্তি বিদেশে উজ্জ্বল করা। যারা শ্রমিকদের বিদেশে নিয়ে যেতে চায় তাদের কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক থেকে ৪৫ দিন আগেই লিখিত অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। যে এজেনসি সংস্থাটি বিদেশে ভারতীয়দের কাজ করাতে নিয়ে যাবে সে ছাড়া অন্য কোন সংস্থা তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। এছাড়া যেখানে কাজ করতে নিয়ে যাবার কথা সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত একটি ফরম পূরণ করতে হবে। নিরাপত্তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও তাদের জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে। ইমিগ্রানট ফি-র সামান্য অংশ কেটে নিয়ে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে শ্রমিকরা ভারতে ফেরার পরই সেটা দেওয়া হবে।

কিন্তু আইনকানুনের কোন রকম তোয়াক্কা না করেই এখনও পর্যন্ত বেআইনী শ্রমিক পাচার চলছে। ঠগবাজরা এই ব্যবসা থেকেই বেশ দুপয়সা কামিয়েও নিচ্ছে। এক একদল শ্রমিকের জন্য এজেনসি সংস্থাগুলির যা খরচ করার কথা তার অনেকটাই তারা বিদেশে চাকরি করতে যাওয়া শ্রমিকদের কাছ থেকেই নিয়ে নেয়। নিয়ম হচ্ছে, এজেনসি সংস্থাকে শ্রমিকদের জন্য পুরো বেতন দিতেই হবে, সেই সঙ্গে তাদের দেশে ফেরার টাকাও দিতে হবে। কিন্তু সেরকম খুব কমই শ্রমিকের ভাগ্যে। বরং এইসব হতভাগ্য শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে

সারণি ২

পাশপোরট অফিস	আবেদনের সংখ্যা	পাশপোরট অনুমোদিত
আহমেদাবাদ	৭১,৮৬৪	৬৯,১৮১
বাঙ্গালোর	৫০,৭৮১	৪৭,৫৯৩
ভূপাল	১৫,২২৮	১৫,৬২৭
ভুবনেশ্বর	৭,৯২১	৭,৭৯৩
বোমবে	২,৬১,৫১৬	২,৫৭,৭৪৪
কলকাতা	৩২,০৬৮	৩৫,২৭৪
চণ্ডিগড়	৮১,৬০৪	৭৬,০৪২
কোচিন/এরনাকুলাম	১,৪৭,০৭৩	১,৩৭,৮৭৫
নয়া দিললি	৮৮,২৮৬	৮৯,৩৩২
গৌহাটি	২,১১৪	২,১৯৩
হায়দরাবাদ	১,০৩,৬৭১	৯০,১৮৬
জয়পুর	৬৪,৮১৬	৬১,৩২২
জলন্ধর	১,২৬,৯৮৫	৯৮,২৩৬
কোঝিকোড়	১,০৭,৪৯৪	৮৩,২০৩
লক্ষ্ণৌ	৮১,০২৯	৭৪,৪৫৫
মাদরাজ	২,০৮,৮৫৭	১,৮৫,৬৩১
পাটনা	১৫,০৩১	১৬,০২২
শ্রীনগর	৬,৮৩৬	৫,৮৫০
মোট	১৪,৭৩,১৭৪	১৩,৫৩,৫৫৯

এখানে আগেকার আবেদনপত্রগুলিও বিবেচনার জন্য ধরা হয়েছিল

আনার জন্য ভারত সরকারকেই প্রায় ২০ লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে। অনেকে বলেছেন, ইনডিয়ান ইমিগ্রেশান অ্যাকটের জন্য বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। ফিনানসিয়াল টাইমস অব লনডন-এর প্রতিবেদক মাইকেল ক্যাসেল ১৯৭৮ সালের ১৬ অকটোবর লিখেছিলেন, 'ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যারা ছুটি কাটাতে সাপ্তাহিক রাতের ফ্লাইটে ওমানের মাসকাট থেকে বোমবের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর যাবে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ভারত সরকারের আইনকানুন মানবে।'

পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কোন কোন ঠিকাদার সংস্থা ভারত সরকারের আইন-কানুনে বিরক্ত হয়ে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার শ্রমিক অনুসন্ধান করছে। একশ্রেণীর ঠিকাদার বলতে শুরু করলেন যে, ১৯৭৬ সাল থেকেই নাকি ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা ক্রমশ কমে আসছে। আসল কারণ হচ্ছে, ঐ সময় থেকেই মূলত বিদেশে চাকরি করতে যাওয়া শ্রমিকদের সম্পর্কে ভারতে নানা আইনকানুন হয়।

ভারতের যে সব শ্রমিক বিদেশে চাকরি করতে যান মূলত তারা আসেন পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, তামিলনাড়ু এবং কেরল থেকে। যারা নিয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছে চাকরির জন্য আসেন, দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকেই দক্ষ শ্রমিক, শতকরা ৬০ ভাগ তো বটেই। নিয়োগকারী সংস্থা চাকরি করতে আসা লোকজনদের সরকারি নীতি বুঝিয়ে দেয় এবং বিদেশে চাকরি করতে যাবার সুখ সুবিধাও বুঝিয়ে বলে, যেমন বিনা পয়সায় বাসস্থানের ব্যবস্থা, থাকার জায়গা থেকে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি। তবে নিযুক্ত হবার পর ভারতীয় কর্মীদের মাইনে শতকরা ১০ ভাগ দেশে পাঠাতে হবে। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। যে শ্রমিকরা ভারতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতেন তারা যখন বিদেশে গিয়ে হতাশ ও অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়ান তখন ঐ নিয়োগকারী সংস্থা হয়ত দেশে ফিরে আরও কিছু নতুন শ্রমিক খুঁজতে ব্যস্ত রয়েছে। ভারতের নতুন নিয়মকানুনের জন্য অনেকেই মনে করেন, এসব পরিস্থিতি প্রায়শই তৈরি হচ্ছে। কেননা ভারতীয় মজুর যখন নিয়মশৃঙ্খলে বাধা তখন অন্যদেশের একজন হয়ত পুরনো কাজ ছেড়ে কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে অবাধে।

নিয়মের এই কড়াকড়ি নিয়ে লোকসভাতেও আলোচনা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৩ আগসট বিরোধীদের এরকম এক অভিযোগের উত্তরে তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভারমা বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার দিকে নজর রাখা এবং শ্রমিকদের মর্যাদার বিষয়টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী।" নিয়োগকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং মজুরদের জীবনযাপনের দুরবস্থার কথা তিনিও স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল, এই সব বেনিয়ম দূর করার জন্যই সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে।

ঐ কমিটির নাম ছিল শঙ্করণ কমিটি। ১৯৭৮ সালের ১৪ মে সেটি গঠন করা হয়। ঐ বছরেরই ১০ আগসট শঙ্করণ কমিটি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোরট পেশ করে। রিপোরটে সরকার কর্তৃক সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করার নীতি বাতিল করে দেওয়া হয়। এতে মোটামুটিভাবে বলা হয়েছিল, পশ্চিম এশিয়ায় সরকার যদি সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করে তবে শ্রমবিরোধের নানা ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়বে এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে কোটা নির্ধারণের জন্য দাবি উঠবে। তবে ইরান ভারত সরকারের কাছে সরাসরি শ্রমিক নিয়োগের অনুরোধ জানিয়েছিল বলে সে দেশের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ভিন্ন হতে পারে, কমিটি এমন সুপারিশও করেছিল।

১৯৭৯ সালের ডিসেমবর মাসে তেলের দাম সংশোধন করা হয়েছিল। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় মজুররা মজুরি নীতি সংশোধনে সোচ্চার হল। সেই সঙ্গে ভারতীয় মজুরদের পাশপোরট করার পরিমাণও বেড়ে যায়। পাশপোরটের জন্য আবেদন ও পাশপোরট ইস্যু করার একটি হিসাব দেওয়া হল :

সারণি ১-এ ১৯৮০ সালে পাশপোরট আবেদনপত্রগুলি অনুমোদনের হিসাব দেওয়া হয়েছে। ১৯৮১ সালের সেই একই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেওয়া হল (সারণি-২)।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক উপসাগরীয় দেশ সৌদি আরব, ইরাক এবং লিবিয়ায় মজুরির হার কী সে সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। যেমন, কুয়াএতে একজন দক্ষ শ্রমিককে দেওয়া হয় ১৫০ কুয়াএতি দিনার (কে ডি), অদক্ষ মজুরকে দেওয়া হয় ৭০ কে ডি। সরকারের কোন কোন প্রতিনিধি কর্মক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন, অদক্ষ মজুরদের ক্ষেত্রে ৭০ কে ডি সাধারণত দেওয়া হয় না। কেননা তাদের বিনা পয়সায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই অজুহাতে নিয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের বঞ্চিত করে। এবং এ ঘটনা সর্বত্র।

এই একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত এশিয় শ্রমিকরা তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে যে ভাবে কাজ করে এসেছেন সেভাবে মোটেই লাভবান হননি। মজুরির হার একটা আছে বটে। নিজের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে সে মজুরির হারেও আবার তারতম্য দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশে টাকার দাম কম বলে ধরে নেওয়া যায় ভারতীয় মজুররা বেশি মজুরি পাচ্ছেন তাদের চেয়ে। ফলে দেশে মজুরির একাংশ পাঠিয়ে সকলেই সমান সাচ্ছল হচ্ছেন না।

ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আবার বঞ্চনা একটা বড় ব্যাপার। এ বঞ্চনা ভারতীয় নিয়োগকারী সংস্থাগুলি যেমন করেছে তেমনই করেছে কর্মক্ষেত্রের দেশগুলিতে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগী সংস্থাগুলিও। একই কাজ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তানী, ফিলিপিনস, তাইল্যানড প্রভৃতি দেশের মজুররা প্রকাশ্যেই কম মজুরি পেয়েছেন কিন্তু জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মজুররা বেশি মজুরি পেয়েছেন এমন নজিরও আছে।

যাই হোক, তেলের দাম কমার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলক্ষেত্রে মজুরের সংখ্যা কমবে এটা অবধারিত। কারণ তেলের দাম কমানর নীতি যেমন নেওয়া হয়েছে তেমনই উৎপাদন কমানর নীতিও নেওয়া হয়েছে। যদি উৎপাদন কমান হয় তবে স্বাভাবিক কারণে শ্রমিকের সংখ্যাও কমান হবে। কারণ ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি প্রথম কোপ মারবে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মজুরদের ওপরই। তার কারণ এখানকার নিয়োগকারী সংস্থাগুলি ভারত থেকে মজুর নিয়ে গেছে কিন্তু কার্যত কাউকেই সেখানে থিতু করতে পারেনি। তাদের অত্যধিক লোভই এর জন্য দায়ী। পরবর্তী কালে ভারত সরকার যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এখন সে সব বিধিনিষেধের ওপর অনেকেই দোষারোপ করছেন।

দোষারোপ যারা করছেন তারা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে কথা বলেননি মোটেই। নিয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে একা ফেলে পালিয়ে যেত। ফলে বাধ্য হয়ে বিদেশ বিভুঁইতে এই সব মজুররা হয় ভিক্ষা করতে বাধ্য হতেন না হয় ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে ভিড় করতেন দেশে ফেরার আবেদন জানাতে।

সচ্ছলতার স্বপ্ন বিদেশে গিয়ে খুব যে একটা রঙিন হয়েছে একথা বলা যায় না। এখন যারা ফিরে আসবেন তাদের ভাগ্যের খুব একটা হেরফের সে ক্ষেত্রে হবে বলে মনে হয় না। কারণ সচ্ছলতার স্বপ্ন তো আগেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গেছে। দেশে ফিরলে বরং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোন না কাজ জুটিয়ে নেওয়া যাবে। অসহায় অবস্থায় এখানে একা কেউ তাকে ফেলে পালাতে পারবে না অন্তত। □

পরিবর্তন

পুজো সংখ্যা ১৩৯০

পরিবর্তন পুজো সংখ্যা মানেই গতানুগতিক ধারার কিছু ব্যতিক্রম। পরিচ্ছন্ন মননশীল এক শারদ উপহার। এই বছরের পুজো সংখ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং আমরা দাবি করতে পারি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ বছরের পুজো সংখ্যাকে আমরা আরো সমৃদ্ধ করার মত শক্তি অর্জন করেছি। এবারের পুজো সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সূচি দেওয়া হল। বিস্তৃত বিজ্ঞাপন পরে দেওয়া হবে।

শারদীয় পরিবর্তন ১৩৯০

প্রবন্ধ ও ফিচার

ডাইনীরা আজও আছে

বিশ্বের বিচিত্র ডাইনিদের রোমহর্ষক কাহিনী। সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা যা উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক।

প্ল্যানচেটে যে সব আত্মারা এসেছিলেন

প্ল্যানচেট, এই পরাবিদ্যা সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক তথ্য।

অভিশপ্ত চম্বলের পথে-বিপথে

পরিবর্তন প্রতিনিধির লেখা, চম্বল ঘুরে এসে তথ্যনিষ্ঠ রচনা।

উধাও মেঘলোকে

পাইলটদের জীবন নিয়ে লেখা এক অনুপম কাহিনী।

আমি ও কয়েকজন অসাধারণ ব্যাংক ডাকাত

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের লেখা কয়েকজন ব্যাংক ডাকাতের কাহিনী যাদের মধ্যে ছিলেন অগ্নিযুগের একজন বিপ্লবীও। এই লেখার সঙ্গে অনন্ত সিংহের ওপর আর একটি রচনা।

বাংলাদেশের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা সিলেট এবং বিচিত্র সেখানকার মানুষ। সম্প্রতি সিলেট সফর করে এসে লেখা এক মননশীল রম্য কাহিনী। লিখেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

দুটি গল্প

লিখেছেন দুই জনপ্রিয় কথাশিল্পী **যাযাবর** ও **শংকর।**

পুজো সংখ্যার একটি মাত্র উপন্যাস যা বছর মধ্যে হারিয়ে যাবার নয়। শক্তিশালী লেখিকা **কবিতা সিংহের** কলমে উনিশ শতকের অন্দরমহলের অন্তরঙ্গ কথাচিত্র—

মোমের তাজমহল

বিনোদন পর্যায়ে থাকছে **শত্রুঘ্ণ সিনহার** সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার ও হিন্দি নাটকের ওপর এক সুদীর্ঘ সমীক্ষা। একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—**আলেকজাণ্ডার বাঙালির ভয়ে ভারত ছেড়েছিলেন।**

একটি সরস রচনা: **বোংগীয় বিকোলপো বেবোস্থা সোমিতি।** এ ছাড়া বারলিনের যে বাড়িতে স্তালিন, চারচিল, ট্রুম্যান জারমানির ভাগ্য নির্ণয় করেছিলেন তারই অনুপম কাহিনী। লিখেছেন **চিরঞ্জীব।** সেইসঙ্গে দুই প্রতিষ্ঠিত লেখকের কলমে দুটি অনবদ্য রচনা কমলা ফিরে এসো এবং ভারতীয় সুন্দরীর গুপ্তচর বৃত্তি।

প্রকাশিত হবে সেপটেমবরের শেষে

২০০ পাতার বই। দাম ১৫ টাকা

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২

সৃজন-এর 'নারসিং হোম'

গত ৬ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় শিশির মঞ্চে সৃজন নিবেদিত 'নার্সিং হোম' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এই সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই নাটকটির মূল ঘটনা। আধুনিক জগতে শোষণের জাল কতখানি বিস্তৃত, পরিচালক তাই দেখাতে চেয়েছেন।

'নার্সিং হোমের' একটি দৃশ্য। আলোকচিত্র : অজয় দত্তগুপ্ত

শহরতলির একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে এই নাটকটির কাহিনী। এক সচ্চরিত্র হেডমাস্টার সারা জীবন তিল তিল করে নিজের শ্রম, অর্থকে নিঃশেষিত করে যে স্কুলটিকে দাঁড় করালেন, সেই স্কুলেরই কতিপয় শিক্ষকের স্বার্থপরতায় তা নিমেষে নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হল। শিক্ষাই যে শিক্ষকের জীবনের ব্রত এই আদর্শ থেকে কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক বিচ্যুত হয়ে আরও বেশি রোজগারের আশায় তারা যে প্রাইভেট টিউশানির রাস্তা বেছে ছিলেন তা যেমনই গর্হিত তেমনিই নীতিহীন। আজকের শিক্ষাজগতের চরম অব্যবস্থা, বিশৃংখলা যেভাবে প্রতিটি স্কুলের শিক্ষকদের মন বিষিয়ে দিচ্ছে, জঘন্য কাজে লিপ্ত করছে তাও এই নাটক থেকে বাদ যায়নি। প্রাইভেট টিউশানি করার ফলে কিছু শিক্ষকের অবস্থা বেশ সচ্ছল, আর তারাই এই ছোট জায়গাতে মাতব্বর। তাদের প্রাইভেট টিউশানির প্রেরণা ও উদ্দীপনা হচ্ছেন তাদের সহধর্মিণীরা। এই প্রাইভেট টিউশানির ধরন-ধারণ যে কত নোংরা তা এই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। প্রাইভেট শিক্ষকরা যেন প্রাইভেট নার্সিং হোমের এক একজন রক্তপিপাসু ডাক্তার যাদের মনে দয়া, মায়া, প্রেম শব্দগুলো অনুপস্থিত। সুতরাং যে সব ছাত্রদের টাকার জোর আছে, তারাই ঐ সব শিক্ষা নেবার অধিকারী, বাকিরা নয়।

নানা দিক থেকে 'নার্সিং হোমের উপস্থাপনা বেশ মনোরম। তবে বেশ কিছু শিল্পীর সংলাপ উচ্চারণ বেশ জড়ান। সংস্কৃত পন্ডিত মশাই হিসাবে চিনু গোস্বামী, আদর্শবান শিক্ষক হিসাবে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চোখে পড়ার মত। তবে নাটকটি যে রকম উঁচু সুরে বাঁধা ঐ রকম গাঢভাবে কোন চরিত্র দানা বাঁধতে পারেনি। কয়েকটি ঘটনার জন্য পরিবেশ তৈরি হয়েও পুরোপুরি ঘটনাগুলির রূপায়ণ ঘটেনি। মঞ্চে শিক্ষকদের কমনরুম ভারতবর্ষের ম্যাপ ছাড়াও অন্যভাবে বোঝান যেত। চিরাচরিত নতুনের দিকে ডাক বোঝাতে গিয়ে যে তরণীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এরও পরিবর্তন কি সম্ভব ছিল না· তবুও পরিকল্পনাতে নতুনত্ব ছাড়াও মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণতা যে 'সৃজন' বহন করতে পেরেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবহসংগীতে (চন্দন রায়চৌধুরী) আরও একটু মনোযোগী হতে পারতেন, আলোকসম্পাতে কণিষ্ক সেন যথাযথ।

সাহানা ঘোষ

বৃসটলের রামমোহন স্মরণসভায় শুভ্রা মুখারজি ব্রহ্ম সংগীত পরিবেশন করতে যাচ্ছেন

বৃসটলের ভারতীয় সংস্থা ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজা রামমোহন রায়ের ১৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে ২৪ সেপটেমবর। এ বছর বৃসটলের এই সংস্থা মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশনের জন্য ভারত থেকে শ্রীমতী শুভ্রা মুখারজিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রাজা রামমোহন রায় কমিটির কর্তাব্যক্তিরা এ বছরের শুরু থেকেই খোঁজ করছিলেন এমন একজন শিল্পীকে যিনি রাজা রামমোহন রায়ের লেখা ও সুর দেওয়া ব্রহ্মসংগীতের সুগায়িকা। এই সংস্থা সেই শিল্পীর খোঁজ পেয়ে গেলেন লনডনে বসেই।

এ বছর জুন মাসে লনডনের কমনওয়েলথ ইনসটিটিউটে রবীন্দ্রনাথের ওপর সেমিনার হচ্ছিল। লনডন থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সেই সময় শ্রীমতী শুভ্রা মুখারজি তাঁর সংস্থা 'গীতাঞ্জলি'কে নিয়ে সেখানকার কয়েকটি অনুষ্ঠানে নৃত্যসংগীত পরিবেশন করতে গিয়েছিলেন। লনডনের কমনওয়েলথ ইনসটিটিউটের এই সেমিনারে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের আমন্ত্রণও ছিল। সংগীত পরিবেশনের পর রাজা রামমোহন রায় কমিটির কর্তাব্যক্তিরা এসে ধরলেন শ্রীমতী মুখারজিকে। তাঁরা ইতোমধ্যে জেনে গেছেন যে, তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিজের লেখা ও সুর দেওয়া ব্রহ্মসংগীতের সুগায়িকা। সুতরাং সেখানেই তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন আগামী ২৪ থেকে ২৭ সেপটেমবর বৃসটলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

দিললি থেকে শ্রীমতী শুভ্রা মুখারজির সংগে যাচ্ছেন নীলিমা সান্যাল ও সুধীর চন্দ (সংগীত শিল্পী)। শ্রীমতী মুখারজি জানালেন, এতদিন এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের লেখা ও সুর দেওয়া ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হত। এবার তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের সংগে রাজা রামমোহন রায়ের লেখা ও সুর দেওয়া ব্রহ্মসংগীতই পরিবেশন করবেন।

তরুণপ্রকাশ গংগোপাধ্যায়

উদ্গাতার সংগীতানুষ্ঠান

১৬ জুলাই '৮৩ বিধানমঞ্চে 'উদ্গাতা' নিবেদন করলেন 'বাংলার শিশুসংগীত' ও 'উত্তর ভারতের ভক্তিগীতি' শীর্ষক দুটি সংগীতানুষ্ঠান।

প্রযোজনা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে বলা যায় দুটি অনুষ্ঠানেরই অভিনবত্ব আছে। শিশুশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় 'বাংলার শিশুসংগীত'। বাংলার বহুল প্রচলিত কিছু ছড়াকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয় 'বাংলার শিশুসংগীত'। বাংলার ছড়ার নিজস্ব একটা যে ছন্দপ্রধান সুর বর্তমান এখানে তার অভাব বিশেষভাবে বোধ হয়। শিল্পীরা কিন্তু তাদের অনুষ্ঠানকে সহজাত ক্ষমতা ও দক্ষতার মাধ্যমে গানে নাচে ভরিয়ে তোলে।

সমবেত গানগুলি সুসংহত এবং তাতে অনুশীলনের ছাপ ছিল স্পষ্ট। দুটো হারমোনিয়ামের আওয়াজে গানের বহু কথা চাপা পড়ে যায়। শিশুদের অনুষ্ঠানে কোন একজন শিশুশিল্পী ভাষ্য

পাঠে অংশগ্রহণ করলেভাল লাগত।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় 'উত্তর ভারতের ভক্তিগীতি'। সূচনা হয় মুকুন্দরামের 'চণ্ডী বন্দনা' দিয়ে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবীর, মীরাবাঈ, নানক, সুরদাস প্রভৃতি রচয়িতাদের গানও যেমন ছিল, কিছু লোকায়ত গানও তেমনি অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। সমবেত গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সমবেত গানে পুরুষ কণ্ঠ ছিল খুবই দুর্বল। একক গানে গৌরী মিত্র, মঞ্জুশ্রী গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চঞ্চল চক্রবর্তী প্রশংসার দাবি রাখেন। ললিতা ঘোষের সংগে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ স্বরচিত সুরে একটা কবীরের ভজন গেয়ে শোনান। অংশুমান রায়ের 'সত্যপীরের গান' এবং বাউলগান অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। প্রণব বড়ুয়ার অসমীয়া গানটির পরিবেশন বেশ স্বতঃস্ফূর্ত। রুমিতা ভট্টাচার্য ও মিনতি রায়ের কণ্ঠ দুটি যথেষ্ট সুরেলা। দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদারের গানে ভক্তিরসের স্পর্শ লাগে। একক গানে দুটি হারমোনিয়ামের ব্যবহার যথেষ্ট শ্রুতিকটু। যন্ত্রশিল্পীদের কাছে মাইক না থাকায় তাঁদের উপস্থিতি ঠিকমত বোঝা যায়নি। তা সত্ত্বেও চন্দ্রকান্ত নন্দী, দুর্বাদল চ্যাটার্জি, গোপাল চ্যাটার্জি, মানিক মজুমদার যথাযথ সহায়তা করার চেষ্টা করেন। তবের মধ্যে সুরের প্রতিধ্বনি অনেকাংশে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভাষ্যপাঠে প্রসেনজিৎ দত্ত এবং মানসী মজুমদার তাঁদের কর্তব্য যথারীতি পালন করেন। দুটি অনুষ্ঠানেরই সংগীত পরিচালনা করেন দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার। সকলের সহায়তায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রণীর ভাড়াটে চাই নাটকের একটি দৃশ্য

দক্ষিণ কলকাতার অগ্রণী সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল বেদগানের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী অংশে ছোটদের আবৃত্তি এবং বর্ণাঢ্য নাচ সকলের মন জয় করে নেয়। সমাপ্তি পর্বে ছিল ওই দিনের প্রধান আকর্ষণ সংস্থার সভ্যবৃন্দের দ্বারা অভিনীত নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটক। নির্দেশনায় ছিলেন আশিস মজুমদার। সুনির্দেশিত এই নাটকে অভিনয়ে সকলেই সুসংবদ্ধ এবং আন্তরিক। আশিস মজুমদার, প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিম গুহঠাকুরতা, রুনু গুহঠাকুরতা, পরিতোষ গুহঠাকুরতা, গৌতম শ্রীবাস্তব, কাকলি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্ত গুহঠাকুরতা, মঞ্জরী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুলক দাস, স্বপ্না নন্দী, অসীম দাসমুন্সী, সঞ্জয় বসু, শ্যামলী গুপ্ত প্রমুখ সকলেই স্বীয় অভিনয়ে দীপ্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী।

রীতা গুহ ঠাকুরতা

মেঘমল্লারের 'শ্যামা'

গত ২২ জুলাই দমদম নাগের বাজারের মেঘমল্লার গোষ্ঠী কলামন্দিরে (বি) নিবেদন করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্য নাট্য। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন রুবি রায় এবং সংগীত পরিচালনায় সুব্রত সান্যাল।

নৃত্যাংশে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় শ্যামাবেশী শ্রাবণী মিত্রের কথা। শ্রাবণীর অভিনয় অভিব্যক্তি এবং নাচের মুদ্রা মাত্রা প্রশংসার্হ। সে তুলনায় বজ্রসেনের ভূমিকায় মানসী মুখার্জি কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট। 'উত্তীয়'র চরিত্রে সুদক্ষিণা রায় যথাযথ। সখীদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে দীপা পোদ্দারকে। কোটাল চরিত্রে পরিচালিকা নিজে আরো সংযত হলে ভাল হত। তাঁর পোষাক রুচিসম্মত হয়নি। নৃত্যশিল্পীদের মেকআপও দৃষ্টিনন্দন হয়নি।

সংগীতাংশে সুব্রত সান্যালের ভরাট গলার দরদী গানগুলি মনোগ্রাহী। সংগীত ও যন্ত্র শিল্পীদের এত ছোট জায়গায় বসতে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা স্বচ্ছন্দ হতে পারেননি। অনেকেই ঠিক মত মাইক পাননি যার জন্য উত্তীয় এবং শ্যামার গানগুলি শ্রুতিমধুর হয়নি। তদুপরি মাইকের অত্যাচারে শ্রোতারা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আলোক সম্পাতের ব্যর্থতা এবং দুই দৃশ্যের মাঝের 'গ্যাপে' বেশি সময় নেওয়ায় নৃত্যনাট্যটি কখনও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। অথচ শিল্পীদের মধ্যে আন্তরিকতার তো অভাব ছিল না।

ঊষা ভৌমিক

শরতায়তনের 'কলঙ্কিত মন্ত্রী'

একটি নাট্যদল যখনই নাটক মঞ্চস্থ করতে যায়, তখনই দর্শক এবং সমালোচক অবশ্যই তাদের কাছ থেকে একটি ভাল নাটক প্রত্যাশা করেন। একটু মনোনিবেশ, অনুশীলন হয়ত একটি ভাল নাটক উপহার দিতেও পারে। অ্যামেচার গ্রুপ বলেই তারা কোন মনোনিবেশ অথবা অনুশীলন ছাড়াই নাটক মঞ্চস্থ করবেন তা তো হতে পারে না। অধিকাংশ নাট্যদলের মত দোষগুণ নিয়ে গত ২৭ জুলাই 'শরতায়তন' মিনারভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন একটি নাটক 'কলঙ্কিত মন্ত্রী'। নাট্যকার 'শ্রী অপ্রিয়'।

নাটক শুরুর আগে মঞ্চে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটি প্রতিকৃতির ওপর আলো ফেলে, নেপথ্য সংগীতের সংগে 'শরতায়তন' তাদের অনুষ্ঠান শুরু করলেন। এই শরৎ বন্দনাটির কথা বা সুর কিছুই পরিষ্কার হল না, মাইকের গণ্ডগোলে। এর পরেই শুরু হল নাটক। নাটকের মূল ঘটনা একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রী ও একজন বারবনিতাকে কেন্দ্র করেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঐ রাজনৈতিক নেতাটি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হতে পারে না। তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর অনেক বছর পর যখন ঐ নেতাটি যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার মত, ক্ষমতাশালী মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত, তখন হঠাৎ তার প্রাক্তন প্রেমিকার দেখা পেয়েছেন। সৎ এবংআদর্শবান মন্ত্রী তখন তার প্রেমিকা, যে এখন পতিতা, তাকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে যেতে চান। ফলস্বরূপ সমাজে তার নামে কলংকের রটনা। কিন্তু তিনি নির্ভয়ে সব তাচ্ছিল্য এবং বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে, এমনকি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়েও তার প্রেয়সীকে বরণ করে নিলেন।

এই ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে আরও বিভিন্ন দৃশ্য ভিড় করে এসেছে। যেমন 'গণেন' নাম্নী এক লোভী ও অসৎ রাজনৈতিক নেতা, যে মাঝে মাঝেই অট্টহাস্য করে ওঠে, রাজনৈতিক নেতার চেলা, মন্ত্রীর উচ্ছৃংখল ছেলে, এমনকি একটি দৃশ্যে আলোর কারসাজির সংগে উত্তেজক নাচ-ও।

এই নাটকটি দেখে কিন্তু কয়েকটি জিনিস কিছুতেই পরিষ্কার হল না। যেমন মন্ত্রীর ভূমিকায় অভয় ভট্টাচার্যের ঠোঁটে লাল রঙ লাগান কেন? বা মন্ত্রী যদি সত্যিই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন তাহলে তার পরদিনই কি তার পক্ষে সম্ভব বিছানায় উঠেবসে বা ঘরে পায়চারি করে বেড়িয়ে দর্শনার্থীদের সংগে কথা বলা? তিরিশ বছর আগেও মন্ত্রীর যুবক অবস্থায় কী করে প্রৌঢ় অবস্থার মতই ভুঁড়ি এবং ফোলা ফোলা মুখ থাকে? আর নাট্যকারও বোধ হয় জানেন না, এখন কোন রাজনীতিবিদ, তা তিনি যতই অসৎ হোন না কেন, প্রকাশ্য রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় নাচেন না। নাটকটিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ দিয়ে সমাজ এবং রাজনীতি সম্পর্কে উপদেশমূলক কিছু কিছু কথাবার্তা শোনানো হল। এবং প্রায় শেষে নাটকের নায়িকা দীপার ভূমিকায় উমা দাসের কণ্ঠে শোনান হল, নারীর কাছে স্বামীই সব।

অভিনয়ে সবাই যথাসাধ্য চেঁচিয়ে, গলা-হাত-পা কাঁপিয়ে, এবং রংগ রসিকতা করে আসর মাত করার চেষ্টা করেছেন। মঞ্চে কখনও জোরাল এবং কখনও অল্প আলো ফেলা হয়েছে। আবহসংগীত নাটকটির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাটকটি পরিচালনা করেছেন শ্রীবাবু। সংগীত পরিচালনা অভয় ভট্টাচার্যের এবং আলোকসম্পাতে ছিলেন ফণিবাবু।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বহু গুণে গুণী এ বিহনে কেমনে কাটানু কাল ভাবেন রাঁধুনী

প্রেস্টীজ-এর প্রেশার প্যান

এর নকল বেরিয়েছে। সাবধান। নকল থেকে বিপদ হতে পারে।

হাল্কা ভাজুন | **মুচমুচে করে ভাজুন** | **সাঁতলান** | **প্রেশারে রাঁধুন**

আপনি এতে নরম, কড়া যেভাবে খুশী ভাজতে পারবেন। কষে নিন, সাঁতলান কিম্বা ফুটিয়ে নিন। তারপর বাস ঢেকে দিন আর হয়ে গেলো রান্না। চটপটে গৃহিণীর জন্যে প্রেস্টীজের চটজলদি প্রেশার প্যান। একাই একশো। কি নিপাট নিপুণ ব্যবস্থা। ভাপা ইলিশ, ফুলকপি দিয়ে গলদা চিংড়ি, এইসব জিভে-জল-আনা খাবার যা শুধুই ভাপে বা প্রথমে ভেজে নিয়ে তারপর রান্না করতে হয় তা মাত্র কয়েক মিনিটে হাজির করার জন্য। আপনার রান্নাঘরের জন্যে এমন একটি সরঞ্জামের জন্যেই তো আপনি এতদিন অপেক্ষা করছিলেন।

ঢাকনা ছাড়া অবস্থায় আপনার এই চাঁবেদার পুরু ধাতুর চাদরে তৈরী ফ্রাইং প্যান— একটু তেলের ছিটেয় মাছ, মাংস, সব্জী ভাজায় পারদর্শী।

লাগিয়ে দিন প্রেস্টীজের ঢাকনা—তখন ইনি আর এক ওস্তাদ। এঁচড়ের ডালনা? মাত্র কুড়ি মিনিট। কষা মাংস- পঁচিশ মিনিট। আলুর দম—আরো কম সময়ে। শুধু যে আরো অনেক কিছু করার জন্যে আপনার সময় বাঁচছে তা নয়, জ্বালানীর সাশ্রয়ও ঢের।

দেখুন কতো ঝামেলা বাঁচালো আপনার। এ কড়ায় ভাজা, ঐ প্যানে ফোটানো, সেই প্রেশার কুকারে রান্না করা—এইসব সাতসতেরো ঝঞ্ঝাট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। প্রেস্টীজ প্রেশার প্যান একাই একশো মুস্কিলের আসান।

এই প্রেশার প্যান তৈরী করলেন প্রেস্টীজ। যাঁরা ভারতে প্রথম এবং সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত প্রেশার কুকার তৈরী করেছেন এবং উদ্ভাবন করেছেন এক অনন্য গাসকেট রিলিজ সিস্টেম প্রেশার কুকারকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করার জন্য।

প্রেস্টীজ প্রেশার প্যান। আপনার রান্নার পদে পদে থাকবে হামেহাল হাজির।

<u>এবার দেখুন অর্ধেকেরও কম দামে কিভাবে আপনি একটি প্রেশার প্যান পেতে পারেন।</u>

সাবাশী দিন নিজেকে কারণ একটি প্রেস্টীজ প্রেশার কুকার তো আপনার আছেই।

আর সেই জন্যেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একটি সাধারণ পুরু প্যানের দামে প্রেস্টীজের প্রেশার প্যান। শুধু প্যানটি কিনুন, ঢাকনা ছাড়াই। আপনার প্রেস্টীজ কুকারের ঢাকনাটি খাপসই বসে যাবে আপনার প্রেস্টীজ প্রেশার প্যানের ওপর। ফলে এ এক দারুণ লাভজনক সওদা। কারণ আপনার প্রেস্টীজ নির্মাতারা আন্তরিকভাবে জানেন যে আপনি অবশ্যই চাইবেন আপনার শ্রমার্জিত অর্থের বিনিময়ে আরো ভালো জিনিষ।

আর যদি আপনার প্রেস্টীজ প্রেশার কুকার না থাকে তাহলে

এই হলো সুযোগ এক বিরাট সুবিধা নেওয়ার। আমরা এখন আপনাকে দিচ্ছি দুটি অপূর্ব রান্নার সরঞ্জাম— ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ প্রেশার কুকার যেহেতু এতে আছে অনন্য গাসকেট রিলিজ সিস্টেম এবং চাকলাকর প্রেশার প্যান— একটির দামের ওপর সামান্য কিছু দিয়ে। দুটিতেই একই ঢাকনা সুতরাং আপনার সাশ্রয় হবে দেড়শোরও কিছু বেশী টাকা।

Prestige PRESSURE PAN

উল্কা

maa(S)PP 1 Ben c 82

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৬৬

১	২		৩	■	৪	৫	
■		■	৬				■
৭		৮		■	৯		১০
	■		■	১১	■	১২	
১৩	১৪		■	১৫			
■		■	১৬		■	১৭	
১৮			■	■	১৯	■	
২০		■	২১				

সূত্র : পাশাপাশি

১। বিরাম নেই, শুধু চলছেই

২। 'বক' এর পর থাকে, পায়রার ডাকে

৬। ঐশ্বর্যতে ভরা, আমাদেব ধরা

৭। বাস্তব তো নয়, কল্পনায় রয়

৯। লিখতে চাও? লেখনী নাও

১২। বড় জন্তু নয়, শুয়োর পেলেই হয়

১৩। গমনশীল তাই, এই পৃথিবী পাই

১৫। পাপড়ি যদি শত, তবে পদ্ম কী হয় – ক' তো?

১৬। মধু চায় তো চাক, মৌমাছিও থাক

১৭। চলার উপায় নাই গো, পাহাড় আমি তাই গো

১৮। ভাদর মাসের বাদল, পেলে কথার আদল

২০। সাধুর কাছে গাজির আছে

২১। পাই মনের আনন্দ, নাই তাতে দ্বন্দ্ব

সূত্র : ওপর-নিচ

২। পরিশ্রম চাই, এর '–' নাই

৩। বকের মুখে 'ত', তবে কী হয় ক'

৪। ধার যদি নিতে চাও, 'গচ্ছিত' রেখে যাও

৫। ভীষণ মুখ তাই, ছয় অক্ষরে পাই

৭। 'কাকের ডাক' আর 'তিন ফুট' যোগে যা পাই, তা লিখতেই লাগে

৮। নিযুক্ত ইনি, ব্যাপৃতও জানি

১০। রাজহাঁসের মত, চলন নিয়ত

১১। শুনিয়ে গান, রক্ত চান

১৪। হাতির দাঁত চান? মহামূল্যবান

১৮। শহরের গাড়ি, কিংবা হয় বাড়ি তাতেও যদি সন্দ, পাবে ফুলের গন্ধ

১৯। আপন নন ইনি, কে হন তবে তিনি?

সমাধান প্রকাশিত হবে ২ নভেম-বর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ৫.১০.৮৩।

সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনের ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নমবরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল—৬২ (সমাধান)

হা	প	■	ক্ষ	ণ	প্র	ভা	■
ল	দ্বা	■	ভ	■	ভা	■	ম্যা
বা	■	উ	■	জা	ত	পা	ত
ক	রি	ৎ	ক	র্মা	■	ব	জ
ল	■	পা	ট	নী	■	লো	■
■	খা	ত	ক	■	ক	পি	ল
মা	মা	■	জে	■	মা	কা	ল
স	র	■	লা	ই	■	সো	না

শব্দশৃঙ্খল ৬২ র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন মল্লিকা সিকদার (বেলঘরিয়া পুলিশ কোয়ারটার, এল ৮/৭, কলকাতা-৫৬) এবং মুক্তা দত্ত (ব্লক টি, ফ্ল্যাট ৪, সাহাপুর গভঃ হাউজিং এসটেট কলকাতা-৩৮)।

শব্দশৃঙ্খল—৬২ র লটারিতে বিচারক ছিলেন আলো মিত্র।

ঘোষণা

৬৩-র সমাধান ৫-১০-৮৩; ৬৪ র ১২-১০ ৮৩ এবং ৬৫-র ২৬ ১০-৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

সেপটেমবর ২১ থেকে ২৭

মেষ : পেট সংক্রান্ত গোলমাল ভোগাবে; মেয়েদের মানসিক অবসাদ। আর্থিক ক্ষেত্রে মোটা লাভের ইংগিত। কর্মস্থলে অপ্রত্যাশিত তৎপরতায় কোন সমস্যার সমাধান; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে দলাদলি বাড়বে। কোন গুণী বা সাধু সংসর্গে আনন্দ। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

বৃষ : শারীরিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন; মেয়েদের শরীর ও মন দুইই ভাল চলবে। আর্থিক ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। কর্মস্থলে কোন সুখবর পেতে পারেন; মেয়েদের নতুন পরিবেশে চমৎকার অগ্রগতি। পারিবারিক কোন প্রচেষ্টায় সাফল্যের মুখে বাধা। ব্যবসায়ীদের ভালরকম লাভ।

মিথুন : শরীর আগের চেয়ে ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি। আয় বাড়লেও ব্যয়ের চাপে সঞ্চয় মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নিজ আদর্শে দৃঢ় থাকা প্রয়োজন; মেয়েদের কর্মস্থলে সংগঠনমূলক কাজে সাফল্য। পুরনো কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের আভাস। ব্যবসায়ীদের না-লাভ-না-ক্ষতি।

কর্কট : গলার কোন রোগ উপেক্ষার নয়; মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি। নতুন কোন সমস্যা আর্থিক কোন পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে। কর্মক্ষেত্রে মতাদর্শ প্রশংসিত হবে; মেয়েদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংগে মতান্তর। কোন সন্তানের বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা। মেয়েদের বন্ধুজনের সংগে বিরোধ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

সিংহ : শরীর ও মন ভাল চলবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা ও নৈরাশ্য। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা ও অন্যের সাহায্য লাভ; মেয়েদের কর্মস্থলে বান্ধবীর দ্বারা ছোটখাট ক্ষতি। পারিবারিক সমস্যা জটিল হবে। সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে নতুন ভাবনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কন্যা : শারীরিক ঝামেলা এড়ান যাবে না, মেয়েদের শরীর আগের থেকে ভাল চলবে; আয় এবং ব্যয়ে সমতা রাখা অসম্ভব; কোন ঋণের জন্য অসম্মান। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা তৎপর হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে চিন্তাধারার পরিবর্তন। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরাজয় ও ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

তুলা : শরীর ভাল যাবে না; মেয়েদের শরীরও তথৈবচ। কোন বকেয়া অর্থ আদায়ে আর্থিক ক্ষেত্রে সাচ্ছল্য। কর্মক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে; মেয়েদের কর্মস্থলে অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কোন ভাই-বোনের সংগে পুনর্মিলন। ভ্রমণে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন।

বৃশ্চিক : চর্মরোগ বেশ বিব্রত করবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ; আকস্মিকভাবে পাওনা অর্থ আদায়। কর্মক্ষেত্রে কোন দায়িত্ব অস্বীকারে ক্ষতির আশংকা; মেয়েদের কর্মস্থলে ভুল বোঝাবুঝি। স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের নতুন যোগাযোগ।

ধনু : আগের অসুস্থতার আংশিক নিবৃত্তি; শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফললাভে বাধা। কর্মক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলুন; মেয়েদের কর্মস্থলে আচমকা কোন পরিবর্তন। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা। বয়স্কদের দূরযাত্রা। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

মকর : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের চলাফেরায় সাবধানতা প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ও সৎ ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে চিন্তাধারার পরিবর্তন, মেয়েদের কর্মস্থলে ঝুঁকি নেওয়া থেকে সাবধান। পারিবারিক কোন প্রয়াসে সাফল্য। মেয়েদের ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কুম্ভ : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ও ঋণ। কর্মক্ষেত্রে কারও ভুল পরামর্শে ক্ষতির আশংকা, মেয়েদের কর্মস্থলে কারও অশোভনমূলক আচরণ ব্যথিত করবে। কোন বন্ধুর সহায়তায় পারিবারিক কোন কার্যোদ্ধার। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : শরীর মোটামুটি চলবে, মেয়েদের শারীরিক অবস্থার আংশিক উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে চাপ ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে কোন পরামর্শ পরিকল্পনা সমাদর পাবে; মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট ঝামেলা। স্ত্রীর জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা। মেয়েদের বিশেষ লাভের ইংগিত। ব্যবসায়ীদের সময় ক্রমশ অনুকূল।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন: ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ২৭-২১৬৯, ২৭-৩০১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

PARIBARTAN 21—27 September 1983 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 2.50

পরিবর্তন

য় আসুন
লি চাই ন
া-শিল্প

পরিবর্তন

ংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন

রহস্যের পুলিশ রিপোর্ট

৬-১২ অক্টোবর [illegible] বর্ষ ৬ সংখ্যা ১৪
দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে [illegible] পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

পরিবর্তন

সম্পাদকীয়

জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের চরম দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। এই কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে সরকার শুধু 'চরম মুমূর্ষু রোগী' ছাড়া অন্য রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি স্থগিত রেখেছেন। এবং বহু রোগীকে হাসপাতালগুলি থেকে ডিসচারজ করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বহু রোগীর জরুরি অপারেশনের কেসও স্থগিত রাখতে হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় কী ধরনের সংকট চলছে এই হাসপাতালগুলিতে। আর এই সংকট মুহূর্তে চলছে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তার ও মন্ত্রীদের বক্তৃতার লড়াই। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রথম দিনে বিধানসভায় তোলা একটি মুলতুবি প্রস্তাবের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ওদের কোন দাবিই নেই, ওরা রাজনৈতিকভাবে বিরোধী।' আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, হাসপাতালগুলিতে অবস্থা স্বাভাবিক ছিল।

হাসপাতালগুলির আউটডোর প্রায় বন্ধ, জরুরি অপারেশন স্থগিত, বেডগুলি খালি - এ যদি হাসপাতালের স্বাভাবিক অবস্থা হয় তা হলে অস্বাভাবিক অবস্থা কী হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। একে এই রাজ্যের হাসপাতালগুলি চরম দুর্দশার সম্মুখীন, তদুপরি জুনিয়ার ডাক্তারদের এই আন্দোলন ঘিরে যদি সরকার ও ডাক্তারদের মধ্যে বক্তৃতার লড়াই চলতে থাকে তবে রাজ্যের সংকটাপন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি দূরে থাক, অচিরেই চরম অবনতি ঘটবে। রোগগ্রস্ত সাধারণ মানুষ, যাদের সীমিত সামর্থ্যের জন্য হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার সংগতি নেই, তাদের স্বার্থেই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত।

তা ছাড়া এই আন্দোলন প্রসংগে রয়েছে সরকারের তরফ থেকে দেওয়া পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীর মতে যদি জুনিয়ার ডাক্তারদের কোন দাবিই না থাকবে সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কী করে বলেন যে 'জুনিয়ার ডাক্তারদের মূল দাবিগুলি সরকার ইতিমধ্যেই পূরণ করেছেন। তাঁদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।' আর 'ওরা রাজনৈতিকভাবে বিরোধী' বলে ওদের কোন দাবি থাকতে পারে না, এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রীতিসম্মত? ওদের যদি কোন দাবি না থাকে তবে সরকার কীভাবে ওদের দাবি পূরণ করেন?

জুনিয়ার ডাক্তারদের এই সপ্তাহব্যাপী কর্মবিরতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখারজি দাবি করেছেন, কলকাতা ছাড়া রাজ্যের অন্য কোন হাসপাতালে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। প্রতিক্রিয়া না হয়েই রাজ্যের হাসপাতালগুলি যে চরম অব্যবস্থার মধ্যে চলছে তাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ হাসপাতালমুখী হতে ভয় পান, আতঙ্কিত হন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থা তো রীতিমত আশংকাজনক। যেখানে প্রতি এক হাজার মানুষ পিছু একজন ডাক্তার প্রয়োজন, সেখানে বর্তমানে রয়েছে প্রতি ১৭,০০০ জনের জন্য একজন ডাক্তার। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি, তাঁরা গ্রামে যেতে চান। কারণ গ্রামের লোক সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সরকারি বক্তব্য হল, ইতিমধ্যে ১,৫৪৫ জন ডাক্তারকে জেলা ও গ্রামের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কাজ করার জন্য নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ৫১০ জনের বেশি ডাক্তার এখনও পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি। সুতরাং জুনিয়ার ডাক্তারদের কথায় ও কাজে ফারাক আছে। তদুপরি হাসপাতালগুলিতে প্যারালাল আউটডোর চালিয়ে ওরা বিশৃংখলার সৃষ্টি করছেন এবং ওদের আন্দোলন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে ওদের সংগে আলোচনার জন্য আর কোন বৈঠকে বসাই যায় না। তদুপরি হাসপাতালে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ওরা পরোক্ষে 'হাসপাতাল বিল'কে আহ্বান জানাচ্ছেন। আবার জুনিয়ার ডাক্তাররা বলছেন সরকার ডাক্তারদের ওপর হাসপাতাল বিল চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এই বাদানুবাদে-কর্মবিরতিতে-বিশৃংখলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নিরীহ রোগীরা। সরকার এবং জুনিয়ার ডাক্তার দুপক্ষই চান সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। সুতরাং এই ব্যাপারটাকে প্রেসটিজ ইস্যু না করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করাই বাঞ্ছনীয়।

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি পাহাড়ী রায়চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
(পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ফ্ল্যাট ১২১১
নতুন দিল্লি ১১০০০১. ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

১২ অকটোবর সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাইপ্রাস ও গ্রীস সফর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এবারের বিদেশ সফরের সংগী পরিবর্তন-সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মননশীল রিপোরটাজ – সাইপ্রাস ও গ্রীস সফরের দ্বিতীয় পর্ব। এতে থাকবে এই দুটি দেশ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য। আর থাকবে সফরকালীন অনেক সুখপাঠ্য টুকিটাকি যা অন্য কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সেই সংগে থাকবে প্রচুর দৃষ্টি-নন্দন আলোকচিত্র।

বাংলার বাইরে দুর্গোৎসব

বাংলার বাইরেও বাংলার মত ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুজো। তেমন কয়েকটি পুজোর বিবরণ। সেই সংগে থাকবে কলকাতার প্রাচীনতম সর্বজনীন পুজো সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ লেখা।

পুজোয় ভ্রমণ

পুজো-অবকাশে অনেকেই বেরিয়ে পড়েন ঘর ছেড়ে দেশ দেখতে, তীর্থ করতে। তাঁদের জন্য কয়েকটি লেখা।

আর 'জনমত' পর্যায়ে থাকবে 'পুজোয় বেলেল্লাপনা বন্ধ হোক'।

তা ছাড়া ডঃ কামাল হোসেনের সংগে সাক্ষাৎকার।

গত আগসট মাসে ঢাকায় বিভক্ত আওয়ামি লিগের হাসিনা গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ডঃ কামাল হোসেনের এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন পরিবর্তন-সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার।

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা ৭২

নিবেদনমিদং

অসংখ্য পুজো-সংখ্যার ভিড়ে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম 'শারদীয় পরিবর্তন' প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি সেই সংখ্যাটি আপনারা ইতোমধ্যে হাতে পেয়েছেন এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সংখ্যাটিকে আপনাদের মনের মত করে সাজাতে আমরা কী ধরনের পরিশ্রম করেছি। আপনাদের সন্তুষ্টিতে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

১২ অকটোবর প্রকাশিত হবে পুজোবকাশ সংখ্যা। এই সংখ্যার জন্য আমরা আপনাদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করেছি। পেয়েওছি অনেক।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'এবার পুজোয় আসুন আমাদেব গ্রামে' শিরোনামে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ। এই পর্যায়ের সব চিঠি প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত। এছাড়া 'দুর্গাপুজোয় ধর্মের নামে বেলেল্লাপনা নিষিদ্ধ হোক' এই ব্যাপাবেও আমরা আপনাদেব মতামত চেয়েছি। নির্বাচিত পত্রগুলি প্রকাশিত হবে ১২ অকটোবব।

মেয়েদের পোশাকের শালীনতা নিয়ে আপনাদেব মতামতও আমরা যথাসময়ে প্রকাশ কবব। তবে যত চিঠি আমরা পেয়েছি সবই কিন্তু ছাপা সম্ভব হবে না। আপনারা ইতোমধ্যে নিশ্চযই জেনেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীব এবারের গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরের সংগী ছিলেন পরিবর্তনের সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আমরা আপনাদের জানিয়েছিলাম যে, শ্রীমতী গান্ধীর এই তাৎপর্যপূর্ণ সফরেব বিস্তারিত বিবরণ সমেত ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর মননশীল প্রতিবেদন ২৬ অকটোবর সংখ্যা থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি, ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের পাঠান প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ের বিবরণ এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল। তবে এই প্রতিবেদন মূল লেখার সূচনা মাত্র। এই চিত্তাকর্ষক প্রতিবেদনটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করছি। কারণ পরিবর্তনই পূর্ব ভারতের একমাত্র সংবাদ সাপ্তাহিক যাতে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের বিস্তারিত বিবরণ নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রেরিত সংবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হল। পাঠকদের জন্য এটুকু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। —

ঊষা ভৌমিক

বামফ্রনটের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই)-র হাতে মালমশলা তুলে দিচ্ছে ফ্রনটের লোকেরাই

নিশীথ দে

বামফ্রনট সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী কংগ্রেস (ই) নেতাদের হাতে মালমশলা তুলে দিচ্ছেন বামফ্রনটেরই এম এল এ এবং বিভিন্ন জেলার নেতারা। সব কিন্তু সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে নয়, অন্য শরিকদলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও যাচ্ছে। তবে কংগ্রেস (ই) এইসব মালমশলা কাজে লাগাতে পারছে না।

সি পি আই (এম) এর একটি গোষ্ঠী দলের দু তিন জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অন্য হাত দিয়ে কংগ্রেস (ই) র হাতে মাল মশলা তুলে দিচ্ছেন।

পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বাম ফ্রনটের নয়া শরিক পশ্চিমবংগ সোস্যালিসট পারটির চেয়ারম্যান বিমান মিত্র যে সব অভিযোগ করেছেন তা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিধান সভায় কংগ্রেস (ই) নেতা সুব্রত মুখারজি 'তথ্য প্রমাণ' দিয়ে অভিযোগ করেছেন। সুব্রতবাবু এসব 'তথ্য প্রমাণ' পেলেন কোথা থেকে -বিমানবাবু অভিযোগগুলি লিখেছেন সাত পাতা। তার সংগে তদন্তের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন বামফ্রনটের চেয়ারম্যান সরোজ মুখারজিকে। সুব্রতবাবু হাতে পেয়েছেন সেই সাত পাতা অভিযোগ এবং সরোজবাবুকে লেখা চিঠি। পশ্চিমবংগ সোস্যালিসট পারটির নাম ছাপা প্যাডে টাইপ করা। প্রতিটি পাতায় বিমান মিত্র র সই, পরিষ্কার কালি দিয়ে নাম সই করা। কোন ফোটো কপি বা জেরকস নয়। সুব্রতবাবু কোথা থেকে পেলেন হয় সরোজবাবু নিজে দিয়েছেন, না হয় বিমানবাবু দিয়েছেন।

এর পিছনে সি পি আই (এম)-এর হাত নেই - নিশ্চয় আছে। সি পি আই (এম) এর কয়েকজন যুব নেতা সুযোগ খুঁজছেন কী করে যতীন চক্রবর্তী এবং একজন এম পি কে বেকায়দায় ফেলা যায়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কো অরডিনেশন কমিটির দু তিনজন নেতাও আছেন এর পিছনে। মাল-মশলা তাঁরাও যুগিয়েছেন।

আর এস পি নেতারা পূর্তমন্ত্রী যতীন বাবুর ব্যাপারে তদন্ত চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রাজি হননি। তদন্তের কথা তুলতেই জ্যোতি বাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। জ্যোতিবাবু নাকি এমন কথাও বলেছেন, তাহলে অন্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আসে তার সবই তদন্ত করতে হয়।

প্রথম যুক্তফ্রনটে ফরোয়ারড ব্লকের মৎস্য দফতরের মন্ত্রী ভক্তি ভূষণ মন্ডলের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) সুপরিকল্পিতভাবে অভিযান করেছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদবাবু বেশ কয়েকবার ফরোয়ারড ব্লক নেতাদের ডেকে বলেছিলেন, ভক্তিবাবুকে আপনারা সরিয়ে নিন, অন্য কাউকে আপনারা মন্ত্রিসভায় পাঠান। ভক্তিবাবুর বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) দুর্নীতির অভিযোগ তুলেও যখন কায়দা করতে পারল না, তখন গোপন চক্রান্তের অভিযোগ আনল। প্রমোদবাবু বললেন, ভক্তি মোড়ল যে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেটা কি মাছের সন্ধানে - কিছু 'তথ্য-প্রমাণ' ফরোয়ারড ব্লক নেতাদের হাতে তুলে দিলেন।

বিধানসভার নির্বাচনে ভক্তিবাবুকে হারাবার জন্য সি পি আই (এম) তলে তলে কংগ্রেস (ই)কে মদত দিয়েছিল। ভক্তিবাবু বার বার তাঁর দলের কাছে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু কিছু হয় নি। দলের রাজ্য কমিটিতে ভক্তিবাবুর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু নিজের জেলা বীরভূমে তাঁর পায়ের তলায় মাটি আছে। ভক্তিবাবুর সমর্থক অন্তত পাঁচজন এম এল এ।

'তন্তুজ'-এর দুর্নীতি নিয়ে সি পি আই (এম) নেতা পান্নালাল মাজির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে বিধানসভায় তোলপাড় হয়েছে। ভক্তিবাবু মন্ত্রী থাকাকালীন এ ব্যাপারে তদন্ত করিয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপার তিনি জানতেন। বিধানসভায় যখন কংগ্রেস (ই) নেতা সুব্রত মুখারজি 'তথ্য প্রমাণ' হাজির-করলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এই তদন্তের রিপোরট করা হয়েছে।

বিধানসভায় তখন ভক্তিবাবু নিজের আসনে চুপচাপ বসে। সব শেষে তিনি শুধু বলেছিলেন, তদন্তের রিপোরট আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

ভক্তিবাবু নিজে হাতে সুব্রতবাবুকে পান্নাবাবুর বিরুদ্ধে মালমশলা জুগিয়ে দেননি। কিন্তু যাঁরা সুব্রতবাবুকে দিয়েছিলেন, ভক্তিবাবুকে তাঁরা খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ফরোয়ারড ব্লকের নেতারাও জানেন, ভক্তিবাবু ছেড়ে দেবার লোক নন। নেহাৎ শরীরটা ভেঙে গিয়েছে। নইলে তিনি অনুগামীদের নিয়ে প্রকাশ্যে নেমে পড়তেন।

সি পি আই (এম) এর নিজেদের মধ্যেও লড়াই জমে উঠেছে। সলট লেক-এ জমি বিলি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সি পি আই (এম)-এর এক প্রবীণ মন্ত্রী দলের আর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মাল মশলা সরবরাহ করেছিলেন। তিনি সরকারি নথিপত্রের নকল পর্যন্ত যোগাড় করে দিয়েছেন। সেই মন্ত্রী আবার প্রবীণ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে টেনডারে গলদের অনেক অভিযোগের 'তথ্যপ্রমাণ' ফাঁস করে দিলেন।

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী সুধীন কুমার এর বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ উঠেছিল। সি পি আই (এম) এর একটি গোষ্ঠী সুধীনকুমারের অপসারণ চেয়েছিলেন। জ্যোতিবাবু রাজিও হয়েছিলেন। জ্যোতিবাবু প্রভাস রায়কে খাদ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা বুঝে প্রভাসবাবু খাদ্য দফতরের মত গুরুত্বপূর্ণ দফতর এর দায়িত্ব নিতে রাজি হননি।

আর এস পি র স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা স্বজন পোষণের অভিযোগ ওঠেনি। কিন্তু ননীবাবু যে কত 'অপদার্থ' সেটা প্রমাণ করার জন্য কো অরডিনেশন কমিটি এবং সি পি আই (এম)-এর কিছু লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন। যে কারণে প্রমোদবাবু একবার বলেছিলেন, স্বাস্থ্য দফতর বলে কোন দফতর আছে তা মনেই হয় না।

আর এস পি নেতারা বললেন, ফ্রনটের বৈঠকে স্বাস্থ্য দফতর নিয়ে আলোচনা হোক। সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন প্রমোদবাবু বললেন, শুধু স্বাস্থ্য দফতর নিয়ে আলোচনা হলে লোকে বলবে সি পি আই (এম) আর এস পির বিরুদ্ধে লেগেছে।

অথচ অন্য দফতর নিয়েও আলোচনা হল না। হাসপাতালে চোর গুন্ডা, সাট্টা জুয়া, মদ এবং মস্তানের রাজত্ব চলছে বলে সি পি আই (এম)-এর লোকেরা অভিযোগ তুলে ননীবাবুকে হেয় করতে চাইলেন। ননীবাবু গোপনে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন, কোন হাসপাতালে যদি বে আইনি কাজ কারবার চলে তা বন্ধ করার জন্য বহুবার পুলিশের সাহায্য চেয়েছি। এটা পুলিশ দফতরের কাজ। আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব কার - স্বাস্থ্য দফতরের না স্বরাষ্ট্র দফতরের - স্বরাষ্ট্র দফতর তো মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। এর পর সি পি আই (এম) এর নেতারা আর হাসপাতালের ভিতর সাট্টা জুয়া, মদের আড্ডা, গুন্ডা মস্তানদের দৌরাত্ম্য নিয়ে কোন কথা তোলেননি।

আসল উদ্দেশ্য ছিল ননীবাবুর হাত থেকে স্বাস্থ্য দফতরের মত বিরাট একটা দফতর কী করে হাতানো যায়। ননীবাবুর বিরুদ্ধে হাসপাতালে অরাজকতা নিয়ে অনেক মালমশলা বিরোধীদের হাতে তুলে দিয়েছে সি পি আই (এম) এর লোকেরাই। কিন্তু আর এস পি যতবার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন কোন সময় সি পি আই (এম) নেতারা রাজি হননি।

রাজি না হওয়ার কারণ হল তাতে ননীবাবুর চেয়ে অনেক বেশি ঝামেলায় পড়তে হবে সি পি আই (এম) এর মন্ত্রী, অনেক এম এল এ এবং নেতাকে। কোন মন্ত্রীর স্ত্রীকে ভাল হাসপাতালে বদলি করা, কোন মন্ত্রীর আত্মীয়াকে মফস্বল থেকে কলকাতায় আনা হয়েছে, কোন নেতার সেকেনড ডিভিশনে পাশ করা ছেলেকে কীভাবে মেডিক্যালে ভরতি করা হয়েছে, বেআইনিভাবে বদলি রদ ইত্যাদি ফাঁস হয়ে যাবে। সি পি আই (এম) এর দুই এম এল এর লড়াই এর কারণে একটা সরকারি হাসপাতাল হল না-এর নেপথ্য কাহিনী ফাঁস হলে কি সি পি আই (এম)-এর সুবিধে হবে?

আজ পর্যন্ত পূর্তমন্ত্রী প্রশান্ত শূর-এর বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোন মন্ত্রী বা এম এল এর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী রাজি হননি। কারণটা কী - কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে? □

অম্লমধুর

ইনস্যাট পাঠিয়েছে স্বর্গের দ্বারে–
দশভুজা এসো মাগো ক্যাপসুল-
কারে।।
মর্ত্যতে মেট্রো এবারেও হল না–
পাতালপুরীর রাজ যমরাজে বোলো
না।।

এক গা গহনায় সাজিও না অংগ–
রাহাজানি-ছিনতাইয়ে ভরে গেছে
বংগ।।
দশহাতে অস্ত্র, সবই তো ব্যাকডেটে -
একহাতে পেটো নিও, নানচাকু
আপডেট।।

ফোলডিং ছাতা নিও–সর্বদা বৃষ্টি–
বংগের সব আজ অতি অনাসৃষ্টি।।
শাড়ি পরে আর নয়, ম্যাকসি ও
চুড়িদার–
বংগ-দুহিতা আজ অবাঙালি জুড়ি-
দার।।
পারিজাত সেনট এনো, হেথা দুর্গন্ধ–
জঞ্জাল জমছে পুরসভা বন্ধ।।
মোটামুটি মনে রেখো এটা কলিযুগ–
ত্রেতা বা দ্বাপর নহে, কেবলই
হুজুগ।।

প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজোর সময় বোনাস পেয়ে
কিনতে হবে টি-ভি,
গয়নাও চাই–হুকুম দিলেন
প্রাণেশ্বরী বিবি।
হুকুম পেয়ে বলেন সাহেব,
টি-ভি এবং গয়না–
বোনাস বাবদ পাঁচশো টাকায়
এসব কিছুই হয় না।
গিন্নি তখন বলেন শেষে–
তোমার সাথে আড়ি,
কাল সকালেই যাব চ'লে
আমার বাপের বাড়ি।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

তাক কুড়া কুড় তাক –
পুজো মানেই পাঁচ জ্বালাতে
প্রাণটা পুড়ে খাক!
চাই বাহারি-রকমারি,
নতুন জুতো-জামা-শাড়ি।
না যোগালে বউ-ছেলে-মেয়ে,
থাকবে কি নির্বাক?
এক নাগাড়ে বাক্যি-বাণ
ছোটাবে ঝাঁক ঝাঁক।

অসীমা সান্তারা

কন্যা নিলেন পুজোয় শাড়ি,
ম্যাকসি, মিডি আর শালোয়ার।
পুত্র নিলেন বেলবটম জিন,
হিরো জামা কী জমাদার।
গিন্নি মার সিল্ক টাংগাইল,
সংগে নতুন আরও দু'চার।
কর্তাবাবু? শয্যা নিলেন–
বিসর্জনের নেই দেরি আর।

কাশীনাথ সেন

গিন্নি ধরান পুজোর ফর্দ,
ছাড়তে চান না ঠাট।
বাড়ির বাবুর নাভিশ্বাস,
পকেট 'গড়ের মাঠ'!

* * * * *

লোডশেডিংয়ের ব্যাপারটা যা
চলছে দিনে-রাতে;
দুর্গা যেন আসেন এবার
টর্চ ধরে এক হাতে।

খোঁড়াখুঁড়ির গোলোকধাঁধায়
এই আঁধারির মর্তে,
মা না পড়েন খন্দে-কাদায়
পা না ভাঙে গর্তে!

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ মিনিট

বাঁশের বেড়া ও ওভারড্রাফট

এক সময় ক্রিকেটে উইকেট কিপিং করতেন বলেই নাকি পাড়ায় এখন ওঁর নাম উইকদা। তবে উইকদা কিন্তু মোটেই উইক নয়, সুস্থ সবল গাট্টাগোট্টা। সব সময় ক্রিকেটের পরিভাষায় কথা বলেন। সেদিন বাজার যাওয়ার পথে উইকদার সংগে দেখা। বললাম, উইকদা কোন খবর আছে? উইকদা বললেন, লুজ বল, লুজ বল।

আমি : কে দিলে?

উইকদা : রাজ্যের অর্থমন্ত্রী।

আমি : কোন মাঠে?

উইকদা : বিধানসভায়।

আমি : বিধানসভায়?

উইকদা : হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিধানসভায়। কিস্যু খবর রাখ না। আর বিরোধী দলের ব্যাটসম্যানগুলোও হয়েছে তেমনি। এরকম লুজ বল পেয়েও খেলতে পারল না।

আমি : উইকদা একটু খোলসা করে বলবেন?

উইকদা : অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কলকাতা আসার জন্য রাস্তার ধারে যে বাঁশের বেড়া দিতে হয় তাতে নাকি রাজ্য সরকারের অনেক টাকা খরচ হয়।

আমি : এটা লুজ বল হবে কেন? এটার কি লাইন অ্যানড লেংথ ঠিক নেই?

উইকদা : লাইন লেংথ ঠিক থাকলে কি আর লুজ বল বলি? প্রথম কথা হচ্ছে, সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসা উপলক্ষে কি রাজ্য সরকার বাঁশ বাঁধার ব্যবস্থা করেন? আর দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার কি এমন কোন ফরমান জারি করেছেন যে ওদের মন্ত্রীরা কলকাতায় এলে রাশিয়া সফরের খরচ প্রসংগে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে ওভারড্রাফট। আর সেই প্রসংগে এটা অর্থমন্ত্রীর অ্যাডভানস গাওনা।

আমি : কী বলছেন, বাঁশের সংগে ওভারড্রাফটের কী সম্পর্ক? আর অ্যাডভানস গাওনাই বা কী?

উইকদা : অ্যানটিসিপেশন থাকলে তো বুঝবি বলটা অফ-এ যাবে, না উইদিন দ্য স্টামপস থাকবে। শোন, রাস্তায় বাঁশ বাঁধতে হবে? এই তো সেদিন প্রণব মুখুজ্জে এল, গণি খান এল – কলকাতার কোন রাস্তায় বাঁশ বাঁধা হয়েছিল শুনি?

আমি : কোন রাস্তায় বাঁধা হয়েছিল বলে শুনিনি আর দেখিওনি।

উইকদা : বাঁশ বাঁধা হলে তো দেখবি! কোথাও বাঁধা হয়নি।

আমি : তাহলে হঠাৎ বাঁশের কথা কেন উঠল?

উইকদা : উঠেছিল মুখ্যমন্ত্রীর এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রত্যেকের প্রত্যেকবার কলকাতা আসা উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে বাঁশের বেড়া বাঁধা হবে। আর রাজ্য সরকার বারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কলকাতা আসতে আহ্বান জানাবেন। কারণ মন্ত্রীরা যত বেশি আসবেন তত বেশি বার বাঁশ বাঁধা হবে, রাজ্যের তত বেশি লাভ। আসলে বাঁশ বাঁধা হবে একবারই, দেখান হবে দফায় দফায়। আর প্রত্যেক দফায় বাঁশের দাম এবং বাঁধার মজুরি বাবদ বেশ কিছু টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুদান চাওয়া হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ দফতর যাতে বাগড়া না দেয় এবং বিরোধী দল যাতে হৈ চৈ না করে তার জন্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় আগেভাগে গাওনা গেয়ে রাখলেন।

আমি : কিন্তু ওভারড্রাফটের কথাটা খোলসা হল না।

উইকদা : এই বাঁশের অনুদানের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে বাধ্য, কারণ বাঁশ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জন্যই কিনেছেন। দফায় দফায় কেন্দ্রের অনুদান আসবে বাঁশ বাবদ। আর রাজ্য সরকার সেই টাকা খরচ করবে প্রয়োজন মত। রিজারভ ব্যাংকের কাছে হাত পাততে হবে না। ওভারড্রাফটের অংক বাড়বে না। বাবা, এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর তো আবার ডাবল বাউনস।

আমি : ডাবল বাউনস আবার কী?

উইকদা : একে ঝানু ইকনমিস্ট, তায় মারকসিসট। ডাবল বাউনস বোঝা যার-তার কর্ম নয়।

আমি : আপনি বুঝলেন কী করে?

উইকদা : অ্যানটিসিপেশন, বুঝলি। অনেক দিন উইকেট-কিপিং করেছি তো। অ্যানটিসিপেশনটা উইকেট-কিপারের মূলধন।

নির্মল বিশ্বাস

সত্যিই দেখে-দেখে অবাক

সুপার ৭৭৭

নতুন! অধিক শক্তিশালী

নতুন অধিক শক্তিশালী
সুপার ৭৭৭ ডিটারজেণ্ট বার

এর শ্রেষ্ঠতার দাবি কেবল জোরদারই নয়, সেই দাবির অঙ্গীকারও বর্ণে-বর্ণে পালন করে।

এখন নতুন সুপার [illegible] বজেণ্ট বারে আমি পাচ্ছি সবচেয়ে অধিক সাদা কাচা। এর ডিটারজেণ্ট ফর্মূলা আগের থেকে [illegible] ভাল হওয়া [illegible] দরুন, আগের চেয়ে অধিক ফেনা হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল চলে। এ সবের জন্যেই [illegible] এটা অন্য সব ডিটারজেণ্ট বার বা সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল।
ব্যবহার [illegible] আপনিও দেখে-দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন।

Shilpi DM 2 83 Ban

শ্রীমতী গান্ধীর পররাষ্ট্রনীতির সামনে এখন চ্যালেনজ, একটু ভুল হলেই বিপত্তি

অভিমন্যু সেন

অনেকদিন বাদে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন। ভাগ্যিস সংসদ বন্ধ, তা না হলে শ্রীমতী গান্ধীকে একহাত নিতেন বিরোধীরা। শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থক, তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা যাই বলুন এবারটা সামলাতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর তরফে জোরদার কোন সাফাই গাওয়া সম্ভব হয়নি।

আসলে কংগ্রেস সংসদ সদস্যদের চিরকালই সংসদের শুরুতে আর শেষে একটা ভাষণ দিয়ে থাকেন দলনেত্রী। এটা একটা প্রথা হয়ে চলে আসছে। সেনট্রাল হলের এই সভায় হাজিরা খুব একটা খারাপ থাকে না। এখানে শ্রীমতী গান্ধী যা বলেন তার সংক্ষিপ্তসার ও প্রয়োজনীয় অংশ সাংবাদিকদের কাছে পরিবেশন করা হয়। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদকের কাজ হল সেই সংবাদ পরিবেশন করা। আসল ব্যাপার হল যে, একই সময়ে আবার এবার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের শিক্ষণ শিবির চলছে। সেখানেও তাঁকে ভাষণ দিতে হয় মাঝে মাঝে। এই দুটো সভা চলাকালীন সময়ের কিছু আগে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে সিন্ধ, বালুচিস্তান এবং কিছু পরিমাণে পাঞ্জাবে বিক্ষোভ শুরু হয় সেখানকার সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে। এবারকার বিক্ষোভ নিঃসন্দেহে গণঅভ্যুত্থানের মত। সামরিক বাহিনীর বেয়নেটকে পরোয়া না করে যেভাবে লোকেরা মরেছে তা থেকে এটা যথার্থভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এমনকি আমেরিকার ভয়েস অব আমেরিকা ও লনডনস্থ বিবিসি এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছে যা থেকে এটা আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে। এবং একথাও বলা যায় না যে এর পরিণামে জিয়া শাসকগোষ্ঠী বহাল তবিয়তে থাকতে পারবেন কিনা। ঘটনা যাই হোক এই আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এর প্রতি যা নিপীড়ন তাকে 'গণতন্ত্রের প্রতি দমননীতি' এমন একটা মন্তব্য শ্রীমতী গান্ধী করে ফেলেন। তিনি ঠিক কতটা গভীরতা নিয়ে বলেছেন তা বিচার্য নয়, কিন্তু সংবাদপত্রে প্রেস ব্রিফিং যা হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট যে পাকিস্তানের এই অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি আছে। সংগে সংগে এই ঘটনাকে নিয়ে আরব দেশগুলোতে ফলাও করে খবর ছাপা হল—পাকিস্তানের জিয়া আন্দোলনকারীদের ভারতের দালাল এই কথা না বললেও আন্দোলনে বিদেশি হাত আছে একথা বললেন বেতারে, টেলিভিশনে, সংবাদপত্রে। শ্রীমতী গান্ধী জিনিসটির গুরুত্ব বাজিয়েই দেখতে চান আর সামলেই নিতে চান এই বিষয়ে আমাদের বিদেশ দফতর, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো যখন এর প্রতিবাদের বিবৃতির সাফাই গাইলেন তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে এবং তার আগেই দেশের বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী শ্রীমতী গান্ধীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্য এর জন্য যে শ্রী বাজপেয়ীর কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে এবং মুসলিম দুনিয়ায় কিছু আধিপত্য বেড়েছে তা নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে অপ্রস্তুত করার পক্ষে এ প্রতিবাদ ভীষণ কাজ করেছে দেশে-বিদেশে।

কাশ্মীরে কোন ধরনের টেনশন হলে চিরকালই এদেশের আমরা অনুমান করে নিই পাকিস্তান করাচ্ছে—পাকিস্তানেও সীমান্তে বা সীমান্ত প্রদেশে গোলমাল হলে সেখানকার শাসকগোষ্ঠী ধরে নেন ভারত করাচ্ছে।

কিন্তু এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য ও পরবর্তীকালে তার অধিকার নিয়ে কিছুটা জল যে ঘোলা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। খান আবদুল গফফর খান বা সীমান্ত গান্ধী ভারতে তো বটেই নেহরু পরিবারেরও বিশেষ ঘনিষ্ঠ জন। পিতৃব্যের সম্মান পেয়ে থাকেন তিনি। তাঁর গ্রেফতারেও চিন্তিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মুক্তির জন্য পাক সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন মানবতার কারণে। পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী মহল এবং বাংলাদেশের ভারত-বিরোধী শিবিরে এই নিয়ে আওয়াজ উঠেছে যে জরুরী অবস্থার সময় ভারতের গান্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকেও তো অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী জেলে পুরেছিলেন। কই সেদিন তো অন্য দেশ থেকে তাঁর মুক্তির জন্য কেউ চাপ দেয়নি। একমাত্র পশ্চিমী দেশগুলোর কয়েকটি সংবাদপত্র ছাড়া সরাসরি কোন সরকারি প্রশাসন ভারতের জে. পি. আন্দোলন নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। এক্ষেত্রে সীমান্ত গান্ধীর প্রশ্নেও শ্রীমতী গান্ধীর ব্যাকুলতা পাক প্রশাসকদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এর মাশুল কে দেবে এখনও কেউ জানেনা।

দ্বিতীয় ঘটনা হল কোরিয়ান এয়ার লাইনার প্লেন যা ধ্বংস হল সোভিয়েতদের দ্বারা, সে প্রসংগে বিশ্ব যখন তোলপাড় তখনও শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু সরাসরি কোন মন্তব্য করতে পারেননি। বরং প্রথমাদকে ভারত সরকারের মনোভাব পুরোপুরি সোভিয়েতদের পক্ষেই ছিল—যেন সোভিয়েত দ্বারা ধ্বংস হওয়াও যা ভারতের দ্বারা ধ্বংস হওয়াও তাই। শেষটায় যখন সোভিয়েত স্বীকৃতি মিলল এবং দুঃখ প্রকাশ হল তখনই শ্রীমতী গান্ধীর সরকার থেকে অনেক অনেক দেরীতে এ বিষয়ে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করা হল। যদিও একে নিন্দা প্রকাশ বলা যায় না।

তাহলে কি আমাদের মৈত্রীটা এত বেশি মজবুত যে আমরা ন্যায়-অন্যায়ের মানবিক প্রশ্নে আন্তর্জাতিক মর্যাদার ক্ষেত্রে আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করতে পারিনা - না কি আমাদের বিদেশ দফতর এত জিলেপির মধ্য দিয়ে কাজ করছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে সত্য সংবাদ ও তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে যথাসময়ে ওয়াকিবহাল করতে পারছেন না? এ বিষয়ে গভীরভাবে বিচার করার সময় এসেছে। ন্যাম চেয়ারপারসন শ্রীমতী গান্ধীর এতদিনের দারুণ পারফরমেনসের রেকর্ডে এই দুটো কাজ কিন্তু ভীষণ ভাবে তাঁকে অসুবিধায় ফেলেছিল। এবারে তাঁর বিদেশ সফরের সময় এই ঝক্কি তাঁকে পোয়াতে হবে।

বিরোধীরা সংহত ও সংযত না থাকায় এ সব বিষয়ে ঝড় তোলার অবকাশ কম। তবে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে আরো একটু সাবধানে চলার সময় এসেছে এখন এই জটিল পরিস্থিতিতে। ভুলে গেলে চলবে না যে আসাম, পাঞ্জাব এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। নিশ্চিত করেই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এই দুটি ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর ইমেজ খর্ব হওয়ায় মাশুল দিয়ে যাকে শহীদ হতেই হবে তিনি হলেন বিদেশ মন্ত্রকের পি ভি নরসিমহা রাও। □

সাইপ্রাসে ইন্দিরা : সারা দেশে উৎসবের মেজাজ, হাজার হাজার মানুষের উল্লাস

নিকোসিয়া ২১ সেপটেমবর : ঝকঝকে শহর নিকোসিয়ার তিরিশ মাইল দূরে রয়েছে ছোট্ট শহর লারনাকা। এখানকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গতকাল এয়ার ইনডিয়ার স্পেশাল বোয়িং বিমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে নামল, তখন সমস্ত শহরই যেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ভেঙে পড়েছে বিমান বন্দরে। সমস্ত দ্বীপ জুড়েই এক উৎসবের চেহারা। স্কুলে স্কুলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শ্রীমতী গান্ধীর যাবার রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে ভারত ও সাইপ্রাসের পতাকা নাড়ছিল।

দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান এশিয়া-ইওরোপের ঠিক মাঝখানটিতে। ভূমধ্যসাগরের ওপর ভেসে থাকা এই ছোট্ট রাষ্ট্রটি গ্রীক ও তুরকি ভাষাভাষী লোকরাই শাসন করে। তুরস্কের ঠিক দক্ষিণে হলেও অধিবাসীদের মধ্যে গ্রীকদের সংখ্যা বেশি। গ্রীকরা তাদের মূলরাষ্ট্র গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের সংযুক্তির দাবি জানিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। এই দাবি-আন্দোলনের নাম এনোসিস।

দুপুর প্রায় বারটার সময় প্রখর রোদের মধ্যে সিপ্রিয়ট সামরিক বাহিনী গারড অব অনারের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বাগত জানাল। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি স্পাইরোস কিপ্রিয়ানু। তিনি বললেন, সাইপ্রাস ও ভারত বহু ক্ষেত্রেই সমভাবাপন্ন। দুটি দেশই বৃটিশ অধিকারে ছিল এবং দুটি দেশই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।

এখানকার ইতিহাস খুবই পুরনো। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে প্রস্তরযুগেও এখানে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। খৃস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে গ্রীকরা প্রথম এখানে আসে। তার পর থেকে দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে সাইপ্রাসে বারবার বিদেশি আক্রমণ ঘটেছে। গ্রীকদের পর আসে ফিনিশিয়রা, খৃষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ নাগাদ। ফিনিশিয়দের পর আসিরিয়া, মিশর এবং পারস্য ক্রমান্বয়ে এদেশটি অধিকার করে ভোগ করতে থাকে। আলেকজানদার মৃত্যুর দশ বছর আগে একে গ্রীক অধীনে নিয়ে আসেন। কিন্তু ৩২৩ খৃস্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর সংগে তা আবার মিশরি অধিকারে চলে যায়। খৃস্টপূর্বাব্দ ৫৮-য় হয় রোমান উপনিবেশ।

রোমান উপনিবেশের সময়ই সাইপ্রাসে প্রথম মুসলমানদের আসা যাওয়া শুরু হয়। এরা আসতেন মূলত উত্তর আফরিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ১১৯১ সালে দেশটি এক ফরাসি পরিবারের হাতে চলে যায়। গী দা লুসিগনা ছিলেন এই পরিবারের কর্তা। পরিবারটি প্রায় সাড়ে চারশো বছর দ্বীপটি শাসন করেছিল। তারপর নানা হাত ঘুরে সাইপ্রাসের অধিকার বর্তায় তুরকিদের হাতে। এই সময়ই ব্যাপকভাবে তুরকিরা সাইপ্রাসে এসে বসবাস করতে থাকে।

১৮৭৮ সালে তুরকিরা এ-দেশের শাসনভার তুলে দেয় বৃটিশের হাতে। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশ পক্ষের বিরুদ্ধে গেলে বৃটিশরা সাইপ্রাসে এসে পাকাপাকি ঘাঁটি গেড়ে বসে। বৃটিশদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য এই সময় থেকেই সিপ্রিয়টরা দেশের মধ্যে প্রবল গণ আন্দোলন শুরু করে। গ্রীক ভাষাভাষীরা সেই সময়ে একে গ্রীসের সংগে 'এনোসিস' বা একীকরণ দাবি করতে থাকে। অন্যদিকে স্বাধীনতা-যোদ্ধারা ই ও কে এ নামে একটি গোপন গেরিলা সংগঠনও গড়ে তোলে এবং বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।

শ্রীমতী গান্ধী বিকালে যখন নিকোসিয়ার মিউজিয়াম অব ন্যাশনাল স্ট্রাগল পরিদর্শন করেন তখন বৃটিশ শাসনকালের অত্যাচার ও শহীদবরণের ফটোগুলি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। সাইপ্রাস এবং ভারত দুটি দেশই বৃটিশের বিভেদনীতির বলি হয়েছে। দ্বীপ-রাষ্ট্রের ২০ শতাংশ তুরকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীকদের শান্তি ও মৈত্রীর মধ্যেই বসবাস করছিলেন, কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর তারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার দাবি জানাতে থাকে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিও ছিল।

১৯৬০ সালে সাইপ্রাস বৃটিশের কবজা থেকে বেরিয়ে আসে। এ সময় গ্রীস, তুরস্ক, গ্রেট বৃটেন এবং সাইপ্রাসের উভয় পক্ষের নেতারা চুক্তি করেছিলেন যে সাইপ্রাসকে দুটি ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করা হবে না এবং তা গ্রীস বা তুরস্ক কারোর সংগেই যুক্ত হবে না, স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সে চুক্তি তুরস্ক মানেনি।

১৯৭৪ সালে তুরস্ক সাইপ্রাসের উত্তর দিকে আক্রমণ চালায় এবং তুরকি সিপ্রিয়টদের একাংশের সাহায্য নিয়ে দেশের ৬ শতাংশ ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ছ হাজার লোকের প্রাণদানের বিনিময়ে এই অধিকার কায়েম করে তারা। অধিকৃত অঞ্চলের হাজার হাজার গ্রীক অত্যাচারিত হয়, অনেকে তাদের মধ্যে এখনও নিখোঁজ। প্রায় দুলক্ষ গ্রীক অধিবাসী ঘরছাড়া হয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। অবশ্য অনেককেই এখন নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। তুরস্কের যুক্তি ছিল, সে সময় গ্রীক ভাষাভাষী সামরিক অফিসাররা যে ক্যু দেতা করেছে তাতে তুরকি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাদের রক্ষা করার জন্য

তুরকি সিপাহি সান্ত্রী নিয়ে সাইপ্রাস আক্রমণ করে বসে।

নিকোসিয়া যাবার পথে শ্রীমতী গান্ধী তুরকি অধিকৃত অঞ্চলে পাহাড়ি চেক পোসটগুলিতে তুরকি পতাকা উড়তে দেখেছেন। যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা জুড়ে রাষ্ট্রসংঘ-বাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে ঠিক ভারতের কাশ্মীরের সংগে তুলনা করা যায়। কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হানাদাররা ঢুকে পড়ে এবং এখান কার বৃহৎ একটি অংশ দখল করে নেয়। সেই দখল এখনও তারা বজায় রেখেছে।

সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি স্পাইরোস কিপ্রিয়ানু (৫১) আরচবিশপ ম্যাকা রিওসের সহকর্মী এবং দেশের অন্যতম স্বাধীনতা যোদ্ধা। এখানে ম্যাকারিওস সম্পর্কে কিছু বলা যাক। ম্যাকারিওস ছিলেন সাইপ্রাসের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নমবর নেতা। ১৯৫৯ সাল থেকেই তিনি অবিসংবাদিতভাবে সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি পদে বসেন। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই তিনি ছিলেন স্বাধীনতা ও প্রগতির ভাবমূর্তির মতন।

সাইপ্রাসে চুক্তি অনুযায়ী নিয়ম হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন গ্রীক সম্প্রদায় থেকে এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন তুরকি সম্প্রদায় থেকে। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য তুরকি সম্প্রদায় থেকেই নেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল। এছাড়া তুরকিরা ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের এমনকি আলাদা কমিউনাল চেমবারও আছে। চেমবারই ঐ ব্যাপারগুলি পরিচালনা করে।

আরচবিশপ ম্যাকারিওস ১৯৭৪ সালের ১৫ জুলাই এক সেনা-অভ্যুত্থানে পদচ্যুত হন। অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছিল সাইপ্রাস ন্যাশনাল গারড। অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন নিকোস জিওরজিয়েডস স্যামসন। তিনিই রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেন এবং সিপ্রিয়ট চারচের প্রধান হন বিশপ গেনাদিওস। এরা গ্রীসের সংগে সংযুক্তির পক্ষে প্রচার চালাতে থাকে।

ঠিক এর পাঁচদিন পরই তুরসকের নৌ ও বিমানবাহিনী তুরকি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার নামে সাইপ্রাসের উত্তর সীমান্ত জুড়ে আক্রমণ চালায়। তুরসক দাবি জানাতে থাকে গ্রীসের মদতে যে ৬৫০ জন সামরিক অফিসার এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তাদের সাইপ্রাস থেকে সরিয়ে নিতে হবে। সংকট এমনই তুংগে ওঠে যে গ্রীসের সেই সময়কার সামরিক শাসনও উলটে যায়। সাত বছর ধরে এই গোষ্ঠীটি গ্রীস শাসন করছিল।

সংকট কাটাবার জন্য গ্রীস, তুরসক, বৃটেন এবং সাইপ্রাসে দুটি ভাষাভাষী সম্প্রদায় জেনেভায় আলোচনা করতে শুরু করেন। এতে জয় হয় ম্যাকারিওসেরই। তিনি ১৯৭৪ সালের ৭ ডিসেমবর আবার সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৭ সালের ৩ আগসট তাঁর মৃত্যুর পরই স্পাইরোস কিপ্রিয়ানু রাষ্ট্রপতি হন। পরের বছর সারা দেশব্যাপী মধ্য-বর্তী নির্বাচনের ডাক দেন তিনি এবং নির্বাচনে জিতে আরও পাঁচবছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদ লাভ করেন।

তিনি আগাগোড়াই দেশে মৈত্রী ও অখন্ডতার জন্য সংগ্রাম চালা চ্ছিলেন। সাইপ্রাসের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে আছেন কিপ্রিয়ানু। এ ব্যাপারে সাইপ্রাসের কাছে ভারতের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। কারণ ভারত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা এবং সাইপ্রাসের পক্ষে বিশ্বজনমত সে অনেকখানি প্রভাবিত করতে পারে।

শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সাইপ্রাসের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রিক অখন্ডতা রক্ষায় যাবতীয় সমর্থনের নিশ্চয়তা দেন।

গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা সত্ত্বেও এই দ্বীপ-রাষ্ট্রের অর্থনীতি ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। শহর এবং গ্রামগুলি বেশ পরিকল্পিত-ভাবে সাজান-গোছান। আধুনিক জীবনের সবরকম সাজসরঞ্জাম এখানে পাওয়া যায়। পূতিগন্ধ কদর্যতার কোন চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। গত দুদশক ধরে মানুষরা বহু সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিকই, অধিবাসীদের চোখেমুখে কিন্তু সুখের চিহ্নই বেশি নজরে পড়ে।

মূলত কৃষিভিত্তিক দেশ সাইপ্রাসে উন্নয়নের হার ১৩.৬ শতাংশ। মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এখানে বেকার। ন্যূনতমই বলা যায় তাকে। দেশটিকে আগে 'তামার বাণী' বলা হত। কিন্তু এখন তামার খনি থেকে এদের উপার্জন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালেও সারা পৃথিবীর ৩৫ শতাংশ তামা এখান থেকে রপ্তানি হত। এখন তা দাঁড়িয়েছে বড়জোর ৪ শতাংশে। অর্থনীতি মূলত এখন দাঁড়িয়ে আছে পর্যটনশিল্প এবং বিদেশে বসবাসকারী সিপ্রিয়টদের পাঠান টাকাকড়ির ওপর ভরসা করে। □

গ্রীস : ইন্দিরার-জন্য সোনার পদক

এথেনস, ২৩ সেপটেমবর : বৃহস্পতিবার সকালে সাইপ্রাস থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এয়ার ইনডিয়ার স্পেশাল বোয়িং বিমানে উড়ে এলেন গ্রীসে। এখানকার বিমানঘাটিতে তাঁকে স্বাগত জানালেন গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী আনদ্রিজ জি পাপান্দ্রু। গারড অব অনারের মধ্যে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন দু দেশের দুই প্রধানমন্ত্রী।

বিমানঘাটি থেকে হোটেলে যাবার পথে গাড়ির কোন শোভাযাত্রা ছিল না। দুপাশে গ্রীস দর্শনার্থীদের তেমন ভিড়ও দেখা যায়নি, যেমনটি দেখে-ছিলাম সাইপ্রাসের লারনাকা থেকে নিকোসিয়া যাবার পথের দুদিকে।

বিমানঘাঁটিতে অভ্যর্থনার জন্য ইন্দিরাকে স্বর্ণপদক দিচ্ছেন এথেন্সের মেয়র

সাইপ্রাসে শ্রীমতী গান্ধীর সফর উপলক্ষে একটা উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। গ্রীসে তেমন উচ্ছ্বাস বিশেষ কোথাও চোখে পড়ল না। জনৈক ভারতীয় মুখপাত্র এ প্রসংগে বলে-ছেন, গ্রীসে এদিন কোন ছুটি ছিল না, সে কারণে রাস্তায় রাস্তায় বেশি ভিড় দেখা যায়নি।

তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। শ্রীমতী গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য বিমানবন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত তাঁর গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে যাবে সে কথা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। দেশের মধ্যে নানা রাজনৈতিক কারণে বিদেশি অতিথিদের জন্য এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে তারা বাধ্য হয়েছে।

শতাব্দী-প্রাচীন হোটেল গ্রানদে ব্রেতাগনে-তে তোলা হল শ্রীমতী গান্ধীকে। অভিজাত এই হোটেলটি কনসটিটিউশন স্কোয়ারের ওপরেই। প্রধানমন্ত্রীর সংগে সফর-রত অন্যান্য লোকজন ও নিরাপত্তা-রক্ষীরা জায়গা পেলেন লাগোয়া হোটেলগুলিতে।

এথেনসে পৌঁছেই দুদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং পাপান্দ্রু পারস্পরিক বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিক সহযোগিতা নিয়ে কথা-বার্তা বলতে শুরু করেন বলে ভারতীয় মুখপাত্র জানিয়েছেন।

ভারত এবং গ্রীস দুজনেই দুজনের বন্ধু। কিন্তু কূটনৈতিক পর্যায়ে পরস্পরের খুব কমই সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এই তো সেদিন মাত্র এথেনসে একটি ভারতীয় দূতাবাস খোলা হয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে খোলা হলেও এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন বৈদেশিক কর্মী সেখানে কাজকর্ম চালাচ্ছেন। বলা যায় এই কাজ কনসুলার ধরনের মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর এই দুই প্রাচীন দেশকে আরও

কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারবে বলেই মনে হয়।

গ্রীসে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে রুটিন সফর বলা যায়। এ দেশের প্রধানমন্ত্রী পাপানদ্রু গ্রানদে ব্রেতাগনে হোটেলে ইন্দিরার সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। পরে সিটি হল এ শ্রীমতী গান্ধীকে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা জানান হয়। গ্রীসের রাষ্ট্রপতি কনসতানতিন কারমানলিস এই সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

কনসতানতিন কারমানলিস আগে গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এ দেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য তাঁর অবদানে অনেকেরই শ্রদ্ধা আছে। ১৯৬৭ সালের এপরিল মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তখনকার তরুণ রাজা দ্বিতীয় কনসতানতাইন নির্বাসিনে যেতে বাধ্য হন। করনেল পাপানদ্রুপুলাস ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রীসকে 'প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। করনেল জরজ পাপানদ্রুপুলাস সেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন। কিন্তু বসাই সার হল। কয়েক মাস পরেই আর এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি পদচ্যুত হলেন। এই সামরিক অভ্যুত্থানকে 'করনেলদের শাসন' বলা হত। এরা ছিল সাংঘাতিক অত্যাচারী। তাদের স্বৈরশাসন দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনীতিকদের ধ্বংস করে দিল। দুরমুশ করে দিল মানবাধিকারের সামান্যতম দাবিটুকুও।

১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসে সেনা-অভ্যুত্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছিল গ্রীসের এই করনেলদেরই মদতে। তারা চেয়েছিল সাইপ্রাসের গ্রীক ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে গ্রীসের সংগে জুড়ে নিতে। কিন্তু তুরস্ক ব্যাপারটাকে চ্যালেনজ হিসেবে নেয় এবং তারাও সাইপ্রাসের উত্তর সীমান্ত জুড়ে সেনা সমাবেশ ঘটায়।

এমন ঘনঘোর অবস্থায় গ্রীসে গণতন্ত্রের আন্দোলন তুংগে ওঠে। সাধারণ মানুষ দাবি জানাতে থাকেন, একদা—প্রধানমন্ত্রী কারমানলিসকে নির্বাসিত অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হোক। মানুষের এই দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় ঐ অত্যাচারী করনেলরা এবং কারমানলিস দেশে ফিরে এসে গণতন্ত্রের হাল ধরেন।

১৯৭৪ সালের নভেম্বরে কারমানলিস দেশে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দেন। তাতে ৫৪ শতাংশ ভোট পড়ে তার পক্ষে। তিনি শাসনভার হাতে তুলে নেন। অতঃপর দেশের রাষ্ট্রপতিত্ব তাঁরই ওপর বর্তায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন পাপানদ্রু।

হোটেলে রাষ্ট্রীয় ভোজসভা এবং সিটি হল এ নাগরিক সংবর্ধনা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। খুব আগ্রহ ভরেই তিনি এই স্থান দেখে ফিরে আসেন।

এথেনসে আসার আগে নিকোসিয়ায় শ্রীমতী গান্ধী এবং সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি কিপ্রিয়ানুর যুগ্ম সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। বেশ ঘরোয়া পরিবেশে এই সাংবাদিক সম্মেলন হয়। তবে ইন্দিরাই এখানে যেন পুরো জায়গাটি দখল করে নিয়েছিলেন। বিশেষত শ্রীলংকা সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য তো রীতিমত আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাই নয়, ভারতীয় নাগরিকরাও শ্রীলংকার দাংগায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর মতে সে দেশের সমস্যার সমাধান না করলে নরমপন্থীরাও চরমপন্থী হয়ে উঠবেন।

গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, এই আন্দোলনের সমালোচকরা বলে বেড়ান যে, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন নাকি বিশেষ একটি শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু এ-মন্তব্যের আদৌ কোন ভিত্তি নেই। গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলি স্বাধীনভাবেই আলাপ-আলোচনা করে এবং তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়। কোন কোন দেশ এ আন্দোলনের উপনিবেশ-বিরোধী তৎপরতাকে সমর্থন করে, কিন্তু যখন অর্থনৈতিক প্রশ্ন ওঠে তখন উভয় শিবিরই একজোট হয়ে যায়।

এথেনসে এখন পুরো বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। ১৯৬০ সালে যখন এখানে এসেছিলাম তখন এ বসন্ত পাইনি। তার মধ্যে তেইশ বছরে অবশ্য গ্রীসের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীদের মধ্যে সেই গৃহযুদ্ধের সামান্যতম চিহ্ন এখন আর কোথাও নেই। এমনকি সাত বছরব্যাপী সামরিক শাসনের রেশও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে কনসতানতিন কারমানলিসের নেতৃত্বে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। গত অকটোবরের সাধারণ নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীরা জিতেছে এবং গ্রীস আবার নাটোর সদস্যপদও ফিরে পেয়েছে।

ইওরোপের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও গ্রীসের উন্নয়নের হার বেশ দ্রুত বাড়ছে। গত কয়েক বছরেই তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচণ্ড গতিতে এগোচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়নের হার ৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছে ৪০১৪ মারকিন ডলারে। দোকান-পাট-বাজার সব সময়ই ক্রেতাদের ভিড়ে যেন গম গম করছে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা রীতিমত বেড়েছে বলেই মনে হয়।

এথেনসে প্রধানমন্ত্রীকে যে সংবর্ধনা জানান হল তার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র আধ ঘন্টা। এখানে ইন্দিরাকে উপহার দেওয়া হল একটি সোনার পদক। পদকের চেনটিও ছিল সোনার। মানবতার প্রতি সেবার জন্য ইন্দিরাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পদকটি পরার পর প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে যখন তিনি বেরিয়ে এলেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য সিটি হল-এর বাইরে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। ইন্দিরাও তাদের দিকে কয়েকবার এগিয়ে গেলেন হ্যানডশেক করার জন্য। ভিড়ের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী গান্ধী অজানা সৈনিকদের সমাধিস্তম্ভে ফুলের স্তবক দিতে গেলেন। পারলামেনটের সামনেই রয়েছে এটি।

আজ দু দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বিষয়ে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে দু দেশের মধ্যে জাহাজি, পরিবহন, মাছের চাষ, যোগাযোগ এবং নির্মাণ বিষয়ে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির মেয়াদ ৩ বছর। পরে এ ব্যাপারে সমীক্ষার জন্য একটি ভারত-গ্রীস যৌথ কমিটিও স্থাপন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

সারা গ্রীসের আবহাওয়া এখন ঝলমলে। এসময়ই এথনসে আসতে শুরু করেছেন সারা পৃথিবীর পর্যটকরা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে অ্যাকরোপলিস। শহরের যে কোন জায়গা থেকে এই অ্যাকরোপলিসকে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় গতকাল রাত্রে তাই বলেছিলেন, বহু পথ পেরিয়ে এখানে এসেছি অ্যাকরোপলিস দেখবার জন্য। সত্যিই অ্যাকরোপলিস প্রসংগে এ কথা বলা যায়। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি দেখতে পাওয়া মানে এক সত্যিকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। ◻

ইন্দিরাকে স্বাগত জানাচ্ছেন গ্রীসের রাষ্ট্রপতি

এবার পুজোয় আমাদের গ্রামে আসুন

পুষ্করাজ পুরের, দুর্গা প্রতিমা / আলোকচিত্র : রবি কাবরাজ

এবার পুজোয় পরখ করুন 'ভজরাম খিচুড়ি'

গ্রামের নাম পানিতর, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। গ্রাম থেকে সীমান্ত দুই কি মি। নাম ঘোজাডাঙা সীমান্ত। কলকাতা থেকে ৭৯ নমবর প্রাইভেট বাসে ইটিন্ডাঘাটে যেতে হয়। দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। বাস সব সময়ই পাওয়া যায়। ভাড়া ২ টাকা। যেতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা, কলকাতা থেকে স্টেটবাসেও বসিরহাটে যাওয়া যায়। ভাড়া ৪ টাকা। বসিরহাট থেকে ইটিন্ডাঘাট রিকশাতেও যাওয়া যায়। ভাড়া ২ টাকা, ইটিন্ডাঘাটে গিয়ে ইছামতী নদী পার হতে হয় খেয়ায়, ভাড়া ১০ পয়সা। ওপারে ইটিন্ডা। সেখান থেকে পনিতর ৩ কি মি। রাস্তা ভাল, রিকশা ভাড়া ২ থেকে আড়াই টাকা, গ্রামে হিন্দু-মুসলমানেব বাস আধাআধি। পানিতর গ্রামের বর্ধিষ্ণু বাড়ি 'বিশ্বাস বাড়ি'। এ বাড়ির কাছেই সার্বজনীন পূজোমণ্ডপ। পূজোমণ্ডপে ভিত ও পাকা দেওয়াল আছে, কিন্তু ছাদ নেই। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। সুতরাং পূজোমণ্ডপে পূজোব সময় রাত্রে হ্যাজাক জ্বালাতে হয়। এই পূজো ৫০ বছরেরও বেশি পুবনো। একচালার প্রতিমা, চালকুমড়ো বলি ও নিষ্ঠা সহকারে পূজো আরতি দেখবার মত। এখানে প্রতিবার অষ্টমীর দিনে রান্না কবে বাতে গরিব-দুঃখীদের খাওয়ান হয়। চাল, গম ও যে কোন রকম তরিতরকারি এক সংগে রান্না করে খিচুড়ি করা হয়। নাম 'ভজরাম খিচুড়ি'। 'ভজরাম খিচুড়ি' তৈরি হচ্ছে ৫০ বছর ধরে। দুর্গাপুজোয় বিশেষত অষ্টমীর দিন গ্রামের বাসিন্দা, বাইরে চাকুরীরত, বাব সারত সবাই গ্রামে এসে জমায়েত হন। ভজবাম খিচুড়ির জন্য চাল ডাল, তরিতরকারি যোগাড় করা জলে ধোয়া, কুটনো কাটা সব করেন গ্রামের ছেলেবা ও বড়বা। এমনকি রান্নাও করেন গ্রামের মানুষ। রাতে ৮টার পর খাওয়া আরম্ভ হয়, চলে রাত ১১/ ১১.৩০ মিঃ অবধি। হিন্দু-মুসলমান সবাই এক পংক্তিতে বসে খায়। এই যজ্ঞের জন্য যে যা পারেন দান করেন। চাল, ডাল ও তরিতর কারি বিভিন্ন ঘর থেকে সংগ্রহ করা হয়, বাকিটা কেনা হয়। এখানে পূজোয় যে আনন্দ পাওয়া যায় কলকাতার কোন পুজোয় আমি সে আনন্দ খুঁজে পাইনি। কলকাতার পূজোর অপচয় বন্ধ করে এরকম গ্রাম্য পূজোপলক্ষে দরিদ্রের সেবা কবায় আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়।

আপনাকে ও পবিবর্তনের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, আসুন না, দেখে যান সত্যিকারের পুজোর আনন্দ কাকে বলে। বিনাব্যয়ে থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধে হবে না। অষ্টমীর দিন সকাল ১১/ ১২টায় এসে পবের দিন সকাল ১১/ ১২টায় কলকাতায় ফিরে যাবেন, যোগাযোগ করবেন।

তৃপ্তিশেখর দত্ত রায়
৮/১/১ সি বীবপাড়া লেন
কলকাতা-৭০০০৩৮

সবারে করি আহ্বান

কলকাতার পূজো মানে যখন ভিড়, হৈ-চৈ, প্রচন্ড একটা অতিকায় হুজুগ, তখন আসুন আমাদের মফস্বল শহর রঘুনাথগঞ্জে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী পাবেন, ঘাসের ডগায় শিশির, বুনো মাটির গন্ধ, শিউলি-কাশ, পাকা ধান; ঢাকের আওয়াজ ..... সব পাবেন। টাটকা ইলিশ আপনার ব্যাগে ভরে নিতে পারেন। মুরশিদাবাদের নিজস্ব সংস্কৃতি 'আলকাপ' গান শুনতে পাবেন। এখান থেকে দু ঘণ্টায় নবাব প্যালেসে যেতে পারেন।

কলকাতার ময়দানে যখন ভোরের ওজন গ্যাস নিতে অনেকে ব্যস্ত থাকেন, ঠিক সেই সময় মানে ঠিক ছটায় নরথ বেংগল স্টেট বাস গুমটি থেকে একটা আঠার টাকার টিকিট কিনে উঠে পড়ুন। দুটোয় রঘুনাথ গঞ্জে।

বাস থেকে নামলেই কয়েকটা ছোট হোটেল পাবেন। চব্বিশ ঘণ্টায় দুটো মিল ধরে পনের থেকে কুড়ি টাকা চারজ। হাওড়া থেকে ট্রেনে জংগীপুর রোড স্টেশন, পরে রিকশায়ও আসতে পারেন। ট্রেনে পনের টাকা, রিকশা এক টাকা। কাছেই ফরাক্কা। ব্রিজ, থারমাল স্টেশন উপরি আকর্ষণ। পুজো হয় শহরে গোটা কুড়ি। শুদ্ধাচারে। ঢাক আছে, বাংলা প্যাটারনের মায়ের মুখ পাবেন, মাইকে ডিসকো পাবেন না। অসুরের বুকে ঘামতেল পাবেন, ঘণ্টারতি শুনবেন। এ শহরের চেয়ে মাইল দুয়েক দূরে গদাইপুর গ্রামে 'পেটকাটি' নামে দুর্গা আছেন। বড় প্রাচীন জাগ্রতা এই মায়ের থানে যে কোন পাগল লোককে এনে ফেললে তিনি ভাল হন। গংগায় নৌকো চড়া এ শহরের বাড়তি আকর্ষণ। প্রচুর টাটকা মাছ পাওয়া যায়। চমচম বিখ্যাত। দাদাঠাকুরের শহর রঘুনাথগঞ্জ। এখানে এসে যে কোন প্রয়োজনে বিবেকানন্দ সরণির বিবেকানন্দ ক্লাবে যোগাযোগ করতে পাবেন। মুরশিদাবাদের সিলক শহরের কাছেই মিরজাপুরে তৈরি হয়। এখানকার ভেড়ার লোমের কম্বল বিখ্যাত। আসুন না এবার আমাদের শহরে, মুরশিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে।

রতন রায়
২২ সি আর অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭২

'পুজোর ছুটি কাটান আন্দুল-মৌড়ি গ্রামে'

আসুন না, কলকাতার কাছেই তো আমাদের গ্রাম আন্দুল মৌড়ি। পুজোর বন্ধে এবারে এখানেই বেড়াতে আসুন। হাওড়া স্টেশন হতে ট্রেনে ২৫ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন আন্দুল স্টেশন। অথবা এক ঘণ্টার মধ্যে মোটরে বা ৬১ নং বাসে এসেও আন্দুলে নামতে পারেন।

এখানে সরস্বতী নদীতীরে প্রথমেই দেখুন আন্দুল রাজপ্রাসাদ। অনুপম শিল্পচাতুর্যের এটি একটি নিদর্শন। সে যুগের বিখ্যাত উকিল রামচরণ রায় পলাশী যুদ্ধের আগে ইসট ইনডিয়া কোমপানির দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইনিই এই রাজপাট গড়ে তোলেন। দিল্লির বাদশাহ

শাহ আলম রামচরণের পুত্র রামলোচনকে 'রাজা' খেতাব দান করেন। দ্বিতীয় রাজা কাশীনাথ রাজপ্রাসাদের একদিকে চতুর্দশ শিবমন্দির বেষ্টিত অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় রাজা রাজনারায়ণ সৃষ্টি করেন রাজদরবার ও জলসাঘর। এই জলসাঘরেই লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক আহম্মদ খাঁ, বারাণসীর জয়করণ মিশ্র প্রভৃতি ছিলেন প্রধান সংগীত কলাকার।

রাজপ্রাসাদের অপরদিকে দেখুন দুর্গা দালান। এই দালানে এখনও প্রতি বছর সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব হয়। রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমার গঠনে সেই পৌরাণিক যুগের ধ্যানধারণা আজও বজায় আছে। দেবীর বাহনের আকৃতিতে দেখবেন সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন ভিন্নতর জীবের ইংগিত। পূজোর পক্ষকাল পূর্বে কামানধ্বনির মধ্যে দিয়ে পূজোর বোধন ঘোষণা করা হয়। আবার দূরদিগন্তপ্রসারী গুরু গুরু কামান গর্জনের মধ্যেই মহানবমীর সন্ধি পূজো, অসুর মহিষের বলিদান ও প্রতিমা বিসর্জনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

রাজবাড়ির কাছেই পাবেন আন্দুলের প্রাচীনতম জমিদার দত্ত চৌধুরীদের বাড়ি। কলকাতা হাটখোলার দত্ত বংশ এরই একটি অংশ। নবাবী আমলে এঁরা 'চৌধুরী' খেতাব পান। সম্রাট জাহাংগীরের ছেলে যুবরাজ খুরম (পরে সম্রাট শাহজাহান) তাঁর বজরা নিয়ে এককালে সরস্বতী নদীপথে আন্দুলে এসে দত্ত বংশের বৈষয়িক বিবাদের মীমাংসা করেছিলেন। দত্তচৌধুরী পরিবারের দুর্গা দালানের উন্মুক্ত অংগনে কীর্তন মহোৎসবে মাতোয়ারা হয়ে নিত্যানন্দের সংগে শ্রীগৌরাংগদেব এককালে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। সেদিন গ্রামবাসীরা আনন্দে সেই ধূলা অংগে মেখেছিল। আনন্দের সেই ধূলা বা ধুল থেকে তখন হতে গ্রামের নাম রাখা হয় আন্দুল। এরপর জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্ত প্রেম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের সংগে নীলাচল যাত্রা করেন। এই মহিমান্বিত দত্তবাড়ির সুদীর্ঘকালের দুর্গোৎসব আজও বহাল আছে, দেখে যান।

এবার আন্দুল দক্ষিণ পাড়ায় আসুন। এখানে সুপ্রাচীন ভট্টাচার্য বংশের দুর্গোৎসব দেখুন। এই বংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন 'আগমতত্ত্ববিলাস' গ্রন্থ প্রণেতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ। এই বংশের সাধক ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর নবদ্বীপের তর্কসভায় জয়ী হয়ে আন্দুলের খেতাব আনেন 'দক্ষিণ-নবদ্বীপ'। ভৈরবী চরণের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডী আসন ও সিদ্ধেশ্বরী শংকরী মন্দির আজ তীর্থক্ষেত্র। ঐ মন্দিরে দেখুন সিদ্ধেশ্বরী মায়ের জীবন্ত মূর্তি।

একটু এগিয়েই পাবেন আর এক প্রাচীন জমিদার মল্লিকদের সেই বিখ্যাত 'গোলাপবাগ'। বিরাট বাগানের মধ্যে এক অপূর্ব সরোবর ও একে ঘিরে গোলাপের কুঞ্জ। না, এটি ঠিক প্রমোদ কানন নয়। আসলে এটি ছিল দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার এক গোপন ঘাঁটি। সিপাহী বিদ্রোহে পূর্বাঞ্চল শাখার অধিনেতা নানা সাহেবের আস্তানা ছিল এই বাগানে ভূগর্ভ কক্ষে। এই গোলাপবাগে দুর্গা প্রতিমা দেখুন।

এর পরই এলেন পাশেই মহিয়াড়ী বা মৌড়ি গ্রামে। এখানে প্রথমেই পাবেন গুরুদাস স্মৃতি মন্দিরে দুর্গোৎসব। গ্রামখানি এককালে ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে তালদীঘির ধারে সর্বজনীন দুর্গোৎসব দেখুন।

মহিয়াড়ী গ্রামে বদান্য জমিদার কুণ্ডু চৌধুরী পরিবারের বসত বাড়ি। ব্যবসা বাণিজ্য থেকেই এঁদের বিরাট জমিদারী গড়ে ওঠে এবং 'চৌধুরী' খেতাব পান। এই বংশের অন্যতম প্রধান পুরুষ রামকান্ত কুণ্ডু কোমপানি আমলে বিলাতের চেশায়ার থেকে লবণ আমদানি করতেন। কুণ্ডুদের জমিদারী দশ আনা, চার আনা ও দু আনা, এই তিন তরফে বিভক্ত। এই তিন তরফের বিরাট বাড়িগুলি তাই বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। দশআনি বাবুদের বৃহৎ পূজোর দালানটি শ্বেতপাথরে বাঁধান। দালানের মাঝখানে দেখুন, বিরাট প্রতিমা। তবে দুর্গা নয়, এটি হরগৌরী মূর্তি। প্রতিমার রূপায়ণে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকলেই আছেন, কিন্তু মধ্যস্থলে মহাদেবই প্রধান।

চারআনি বাবুদের পূজোর দালানে দেখবেন, একদিকে রুপার সিংহাসনে সোনার রাধা ও কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ। অপরদিকে হরগৌরী প্রতিমা। দুআনি বাবুদের জোড়া মন্দিরে পাবেন দারুময় জগন্নাথ দেবের মূর্তি।

এই গ্রামে নবাবী আমলের আর এক জমিদার রায়েদের বাড়ি। এই পিরালী রায় বংশ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেরই এক শাখা। এঁদের দুর্গোৎসবও দেখতে পারেন।

শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়
মহিয়াড়ী (মহেশভবন)
পোঃ আন্দুল-মৌড়ি
জেলা — হাওড়া

বসিরহাট মহকুমার প্রায় চারশ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো

পশ্চিমবংগের উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাটের পাশেই গ্রাম দণ্ডীরহাট। দণ্ডীরহাটের পূজোই মহকুমার সর্বাধিক প্রাচীন পূজো।

কথিত আছে, দণ্ডীরাজার নামানুসারেই এই গ্রামের নাম দণ্ডীরহাট। এক সময়ে দণ্ডীরাজা (সঠিক নাম জানা যায় না) দণ্ডী ধারণ করে সন্ন্যাসী হয়ে কাশী চলে যান। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান কন্দর্প মিত্র নামে একজন গ্রামবাসীকে। কন্দর্প মিত্র একদিন বসিরহাটের নদী ইছামতীতে ভ্রমণ করতে করতে একটি নৌকোয় পান ৯/১০ বছরের বালক ভবানীদাস বোসকে। তাকে বাড়িতে এনে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন। পরে তারই সংগে তাঁর মেয়ে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দেন। পূজোর শুরুও এই ভবানীদাস বোস থেকে।

এক সময় পূজো হত জাঁকিয়ে। শুধু নৈবেদ্যর জন্য তখন ১৬ মন চাল লাগত। কারণ এই পূজোর ষষ্ঠীতে ১৬, সপ্তমীতে ২৭, অষ্টমীতে ৫৬, সন্ধিপূজোয় ১৬, নবমীতে ৯৮ খানা ছাড়াও কালী, লক্ষ্মী, নারায়ণ, চণ্ডী ও পঞ্চদেবতার নৈবেদ্য থালা সাজাতে হয়। বর্তমানে এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে দু'মণে।

বসু পরিবারের একজন মহাদেব বাবুর স্ত্রী নমিতা বসুর মতে 'এই দুর্গা প্রতিমার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মা দুর্গার দুখানা হাত স্বাভাবিক। বাকি আটখানা দশ থেকে বার ইঞ্চি মাত্র লম্বা। ছোট হাতগুলিতে অস্ত্রধারণ করা সম্ভব হয় না, তাই সেগুলি কাঠামোর ওপরেই রাখা হয়।'

কারণ জিজ্ঞাসা করতে মহাদেব বাবুই বললেন, 'সম্ভবত স্বপ্নাদেশ পেয়ে ৭/৮ পুরুষ আগে থেকে এ রকম হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, প্রতিমার চালচিত্রও স্বাভাবিক বা গোলাকার নয়। চালচিত্রের উপরিভাগ তিনটি ত্রিকোণাকার।'

তান্ত্রিক মতেই এ পূজো। পুরনো নিয়ম মেনে বোধনদিনে, সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজো ও নবমীতে প্রতিদিন একটি করে পাঁঠা ছাড়াও নবমীর দিনে অতিরিক্ত ২টি আখ ও ২টি কুমড়ো বলির রীতি আছে।

কলকাতার এসপ্লানেড থেকে হাসনাবাদগামী একসপ্রেস বাসে অথবা শ্যামবাজার খালধার থেকে ৭৯-সি প্রাইভেট বাসে দণ্ডীরহাট (আমতলা)। যথাক্রমে দুই ও আড়াই ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে হেঁটে বা রিকশায় প্রায় দেড় কিলোমিটার মত পথ গিয়ে এ পূজো দালান। 'দণ্ডীরহাট নগেন্দ্রকুমার উচ্চশিক্ষা নিকেতন'-এর গায়ে।

কার্তিকচন্দ্র ঘোষ
শিকড়া কুলীন গ্রাম
চব্বিশ পরগণা

বীরভূমের সুরুল সরকারবাড়ির দুর্গাপুজো আজও আকর্ষণীয়

দুর্গাপুজোর সময় যারা বোলপুর, বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতন যাবেন, তাঁরা শ্রীনিকেতন থেকে আর একটু এগিয়ে আসুন না সুরুল গ্রামে। সুরুলের সরকারবাড়ির পুজো আজও পশ্চিমবাংলার প্রাচীন দুর্গাপুজোর অন্যতম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বর্ধমান শহরের দক্ষিণদিকে বাঁকা নদীর তীরে নীলহর গ্রামের সরকার বংশের উত্তরসূরী ব্রজবল্লভ ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং মৃণ্ময় মন্দিরে দুর্গাপুজো প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে এই সরকারবাড়ির দুর্গাপুজো দুটো। একটি বড়বাড়ির, অপরটি ছোটবাড়ির। যাদবেন্দু সরকার বড়বাড়ির ও মাধবেন্দ্র সরকার ছোটবাড়ির।

বড়বাড়ির দুর্গাপুজোর আগে এই সরকারবাড়িতে একক দুর্গোপুজোর সূচনা হয়েছিল ২৩৩ বছর আগে ১৭৫৭ সালে।

বলে রাখি সুরুল গ্রামের প্রাচীন নাম কৃষ্ণনগর তথা সুরুল, সুরুল্যা, শুরুলিয়া। অনুমান করা হয় এখানে শালবনপূর্ণ থাকায় এই গ্রামের নাম ছিল শহরুল। পরে শহরুল থেকে সুরুলে রূপান্তরিত হয়েছে। কারুর কারুর মতে ভারতচন্দ্র সরকার (ঘোষ) এর পূর্বপুরুষরা রাজ সরকারের সরবরাহকারীর কাজ করতেন বলেই তাদের পদবী সরকার হয়।

বীরভূমবাসীর গৌরব সুরুলের দুর্গাপুজো। বর্তমানে এই গ্রামে দশটি দুর্গাপুজো হয়।

এই বাড়ির দুর্গাপুজোর বৈশিষ্ট্য হল চতুর্দোলায় চড়ে দেবী মন্দিরে প্রবেশ করেন। অষ্টমীর দিন পাঁঠা এবং নবমীর দিন চালকুমড়ো বলি হয়। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন এই পুজো দেখতে। তিনদিন ধরে যাত্রাগান এবং নবমীর দিন সাঁওতালি নৃত্য হয়। এই পুজো উপলক্ষে এখানে একটি ছোট মেলাও বসে।

বিশ্বদেব ভট্টাচার্য
সুরুল, বীরভূম

অশোকনগরে 'গণেশজননী'র পূজো

এবার পূজোয় বাংলার জনগণকে আমাদের পারিবারিক অভিনব শারদীয় পূজো দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ঠিক গ্রাম নয়, আবার ইট পাথরে গড়া পুরোপুরি বিবর্ণ শহরও নয়। কলকাতা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে আপনাদের সবার পরিচিত। সবুজে ঢাকা আধা শহর, নাম অশোকনগর। শিয়ালদা থেকে হাবড়া-বনগাঁ রেল লাইনে অশোকনগর স্টেশন। সেখান থেকে বাসে চেপে চলে আসুন ৮ নং ওয়ারডে, 'পুলিশ ফাঁড়ি স্টপেজ'। নৈহাটি থেকেও ৭৩ নং বাসে সোজা এসে নামা যায় অশোকনগর পুলিশ ফাঁড়ি স্টপেজে। ওই স্টপেজের গায়েই যে বাড়িতে প্রথম ঢাকের বাদ্যি শুনবেন সেই হল গন্তব্যস্থল। ঠিকানা যতীন্দ্রনাথ ধরের বাড়ি, ২৫৬/৮, অশোকনগর, ২৪ পরগণা।

এই পূজোর বৈশিষ্ট্য হল মা দুর্গা এখানে দশভূজা নন, দ্বিভূজা। মার দশপ্রহরণধারিণী মূর্তি এখানে নেই। মা এখানে শান্ত, সমাহিত, বরদায়িনী, গণেশজননী। প্রতিমার গড়নে বৈশিষ্ট্যগুলি হল, – মা গণেশ জননী গণেশকে কোলে নিয়ে সিংহের ওপর বসে আছেন। এখানে সিংহও হিংস্ররূপে নেই, সংযত বাহনরূপেই তাঁর আবির্ভাব। গণেশ জননীর ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দাঁড়িয়ে তাদের নিজ নিজ বাহনদের নিয়ে। কার্তিক এই দৃশ্যে অনুপস্থিত, কারণ তখনও নাকি কার্তিকের জন্মই হয়নি। আরেক ধাপে, ডাইনে বসে আছেন বাবা ভোলানাথ, আর বাঁয়ে মহাদেবের চেলা নন্দী।

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের চিত্রকোট গ্রামের কাশীনাথ ধরের স্বপ্নে পাওয়া এই গণেশজননী পূজিত হয়ে আসছেন বংশপরম্পরায়। কাশীনাথ তৎকালীন সেরেস্তাদার হিসাবে সরকার থেকে মুনসী উপাধি পেয়েছিলেন।

ষষ্ঠীর দিন এখানে বোধন আর দশমীতে তার বিসর্জন। সাত্ত্বিক শুদ্ধাচারে চারদিন নিরামিষাশী থেকে মার পূজা করেন ধর পরিবারের বংশধরেরা। বর্তমান পরিস্থিতিতেও দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা এই ধর পরিবারের লোকেরা পূজোর সময় একত্রিত হন, এ যেন এঁদের এক অলিখিত পারিবারিক অনুশাসন। পঞ্জিকার 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত' মতকেই এঁরা মেনে চলেন।

স্বপ্নে পাওয়া পূজিত গণেশ জননীর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেই এই নিবন্ধ শেষ করছি। দুর্গার শান্তমূর্তি গণেশজননী। তার পূজোপদ্ধতিতেও কিছু হেরফের হবে নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় সেই নব পূজো পদ্ধতি – মা নিজেই স্বপ্নে তাঁর নির্দেশ দিলেন তাঁর ভক্তকে। কাশী মুনসীকে বলে দিলেন – কাশীতে অমুক জায়গায়, অমুক ব্রাহ্মণের কাছে পাওয়া যাবে এই পূজোর পুঁথি। তখনকার দিনের দুর্গম রাস্তা পার হয়ে জমিদারের লোক কাশীর ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন গণেশজননী পূজোর পুঁথি।

আসুন না একবার, এই অভিনব দুর্গোৎসব দেখে যান।

মানবেন্দ্র কুমার ধর
৪০ এফ ব্লক, কল্যাণী, নদীয়া

আসুন মালিয়াড়া গ্রামে

এবার পূজোয় আমাদের পল্লী গ্রামে (মালিয়াড়া, জেলা বাঁকুড়া) আসতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের গ্রামে আসার পথনির্দেশ হল (১) হাওড়া কিংবা শিয়ালদা রেল স্টেশন থেকে সকালের যে কোন মেল, একসপ্রেস কিংবা প্যাসেনজার ট্রেন ধরে দুর্গাপুর (বর্ধমান জেলা) স্টেশনে নামুন। ভাড়া ১৪ টাকা ৫০ পয়সা। দুর্গাপুর স্টেশনের বাইরে বাস স্ট্যানডে আসুন। বাস দুর্গাপুর-বাঁকুড়া ভায়া মালিয়াড়া বাস সারভিসে চেপে পড়ুন। ভাড়া ১ টাকা ৮০ পয়সা। মালিয়াড়া গ্রামে নেমে পড়বেন। নিম্ন বর্ণিত ঠিকানায় খোঁজ করবেন। (অবশ্য পত্র পেলেই বাস স্ট্যানডে থাকব।)

(২) দূর পাল্লার বাস সারভিস C. S. T. C) কলকাতা থেকে পুরুলিয়া ভায়া মালিয়াড়া সকাল সাড়ে নটায় ছাড়ে। মালিয়াড়া আসে বেলা ৩টায়। কলকাতা হইতে সাঁওতালডি ভায়া মালিয়াড়া বেলা ১২টায় ছাড়ে। মালিয়াড়া পৌঁছায় বিকেল ৫টা। ভাড়া ১৬ টাকা ৮০ পয়সা।

রাষ্ট্রিয় পরিবহন অনুসন্ধান অফিস, ফোন নং : ২৩-১৯১৬

দুর্গোৎসবে দেখার বিষয় : প্রথম যখন দুর্গাপূজো হয় সেই থেকেই

তাহেরপুর-বাদকুল্লার দুর্গাপূজো

শিয়ালদা-লালগোলা লাইনের রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর স্টেশনের মধ্যবর্তী তাহেরপুর ও বাদকুল্লা স্টেশন সংলগ্ন গ্রাম। প্রতি বছর দুর্গাপূজোয় জাঁকজমকের জন্য এই গ্রাম দুটির যথেষ্ট সুনাম আছে। তাহেরপুর মূলত উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রাম। জনসংখ্যা হাজার কুড়ি মত। বেশিরভাগই কৃষিজীবী মানুষ। গ্রামের মোট দুর্গাপূজোর সংখ্যা কুড়িটি। আশপাশের পনের কুড়িটি গ্রামের মানুষের কাছে দুর্গাপূজো বলতে তাহেরপুরের দুর্গাপূজোই আসল। এখানকার সবচেয়ে বড় পূজো ডায়মনড ক্লাবের। তাহেরপুর স্টেশনের ধারেই রেলবাজারে এঁদের পূজো হয়, আনুমানিক ব্যয় বার থেকে পনের হাজার টাকা। পূজোর চারদিন কৃষিজীবী মানুষ এখানে আনন্দে মেতে ওঠে। আনন্দে মেতে ওঠে আশপাশের গ্রামের মানুষও। নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এখানকার পূজো দেখতে আসেন। এখান থেকে অল্প দূরেই বীরনগর বা উলায় রয়েছে জোর বাংলা মন্দির। বীরনগরের পোড়া মাটির অলংকরণযুক্ত বহু প্রাচীন মন্দির ও বিশাল বিশাল প্রাচীন বাড়ির জংগলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ এক উজ্জ্বল অতীতের নীরব সাক্ষী – যা দেখবার মত। শিয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেনজার বা কৃষ্ণনগর গামী ট্রেনে এখানে আসতে সময় লাগে দু ঘণ্টা পনের মিনিট। এ ছাড়া কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেন বা বাসেও এখানে আসা যায়। তাহেরপুরে কোন হোটেল নেই, তবে কৃষ্ণনগরে থাকার প্রচুর ব্যবস্থা রয়েছে। তাহেরপুর বাজারে প্রদীপ পাঠক, অনিল রায়, নারায়ণ দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রয়োজনীয় সব সাহায্য পাওয়া যাবে।

বাদকুল্লা : তাহেরপুর থেকে বাদকুল্লার দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলো মিটার। কৃষ্ণনগর থেকে দশ কিলো মিটার। বাদকুল্লার দুর্গাপূজো গোটা নদীয়া জেলায় বিখ্যাত পূজো। কৌলিন্য বা প্রাচীনত্বে নয় এখানকার পূজো বিশাল মণ্ডপসজ্জায়, চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জায়, অপূর্ব সুন্দর দেবী প্রতিমায় এবং জনসমাবেশের জন্য বিখ্যাত। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন পূজো বাদকুল্লা পূর্বপাড়া বারোয়ারি। এখানে সবসুদ্ধ পূজোর সংখ্যা চল্লিশটি। এর মধ্যে বাড়ির পূজো রয়েছে ছটি। বড় আকারের পূজো হয় ১২/১৩টি। বাদকুল্লা রেল স্টেশনের সামনে থেকে যে পাকা সড়কটি চলে গেছে সোজা গ্রামের দিকে, পূজোর চারদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা তা ভরে থাকে মানুষের মিছিলে। ওই সময় দৈনিক কুড়ি হাজার বা তারও বেশি লোক বাইরে থেকে বাদকুল্লার দুর্গাপূজো দেখতে আসে। পূজোর চারদিন ধরে ট্রেনগুলি বাদকুল্লা স্টেশনে বেশি সময় ধরে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও জেলা কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ বাস চালান।

সুতরাং এবার বাদকুল্লার দুর্গা পূজো দেখার জন্য পরিবর্তনের সকল পাঠক পাঠিকাদের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বাদকুল্লার দুর্গাপূজোর সমিতিগুলি। অভ্যাগতদের প্রয়োজনে সব রকমের সাহায্য পাওয়া যাবে উল্লিখিত ক্লাবগুলির কাছ থেকে।

পৃথ্বীজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
২ রামদাস সরকার লেন
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বাদকুল্লার দুর্গাপূজার একটি মণ্ডপের বাইরের দৃশ্য

সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'র গ্রামে আসুন

কলকাতার গা ঘেঁষে দক্ষিণ ২৪ পরগণার একেবারে পাঁচ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে আমাদের গ্রাম বোড়াল'। গড়িয়া বাস টারমিনাস থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার। স্টেট বাস ৫/৬,এস ৭/ এস ১৪/ গড়িয়া মিনি বাস, বেসরকারি বাস ৮০ এ/ ৮০ বি/ ২১৮/ ৪৫ নং বাসেও গড়িয়া চলে আসতে পারেন। ট্রেনে গড়িয়া স্টেশন থেকেও আসতে পারেন। গড়িয়া তালতলা থেকে রিকশায় (ভাড়া ১.২৫ পয়সা।) কিংবা পিচ রাস্তা ধরে সতেজ ঘন সবুজ গাছের সারি দু পাশে রেখে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসুন বোড়াল গ্রামে।

গ্রামে এসেই আপনি সরাসরি বসুদের বাড়িতে (মাঝেরপাড়া, ঋষি রাজনারায়ণ প্রাইমারি স্কুলের কাছে) এই লেখকের বা গৃহকর্তা তুলসীচরণ বসুর খোঁজ করুন। ঘরোয়া পুজোর পবিত্র ও শান্তিময় পরিবেশ এখানে পাবেন। প্রখ্যাত দয়রাম বসু বংশের হরিমোহন বসুর তৃতীয় পুত্র তুলসীচরণ বসু ১৯৪১ সালে বসু বংশের প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুজো আবার শুরু করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পুজো উপলক্ষে আসেন। সেই অবধি ৪২ বছর ধরে বসুদের দুর্গা মণ্ডপে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সংগে দুর্গোৎসব হয়ে আসছে। একই কাঠামোর মধ্যে মা দুর্গাসহ অন্যান্য দেবদেবীরা রয়েছেন।

পুজো উপলক্ষে নাম সংকীর্তন হয়। পুজোর ক'দিন গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষ একত্র হন। ঘরোয়া পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গ্রামের অন্যান্য প্রায় গোটা আষ্টেক রঙ বাহারী বারোয়ারি পুজো মণ্ডপগুলি দেখে নিন। এর ফাঁকে বোড়ালের প্রাচীন ইতিহাস একটু আধটু জেনে নিন, সেই সংগে গ্রামের দর্শনীয় স্থানগুলিও দেখতে শুরু করুন।

প্রথমেই চলে আসুন পূর্ব পাড়ায় ত্রিপুরসুন্দরী মন্দিরে। গ্রামের সব চেয়ে প্রাচীন সভ্যতা এখান থেকেই শুরু। ত্রিপুরসুন্দরীর এখানে অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। গ্রামদেবী বলে সর্বাধিক পরিচিত। মন্দিরের আশপাশ অঞ্চলের মাটির নিচে থেকে স্কন্দ, কুষাণ যুগ থেকে আরম্ভ করে মৌর্য, গুপ্ত পাল ও সেন আমলের বিচিত্র সব পুরা বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানীয় ও কলকাতার মিউজিয়ামে নিদর্শনগুলি রক্ষিত আছে।

গ্রামের বকুল মাঠ অঞ্চল থেকে সিকি কিলোমিটার হেঁটে গেলেই গোপাল দত্তের পুজো মণ্ডপে শতবর্ষ উত্তীর্ণ দুর্গোৎসব দেখতে পাবেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের সংগে বোড়াল গ্রামের পরিচয় তো আগেই হয়ে গেছে। ছবিতে দেখা সেই চোখ জুড়ান কাশবন এর পথ বেয়ে এই শরতে আপনারাও চলে আসুন বোড়াল গ্রামের দুর্গাপুজো উপভোগ করতে।

মধু বসু
ঋষি রাজনারায়ণ বসু রোড
পোঃ ও গ্রাম বোড়াল
২৪ পরগণা
পিন ৭৪৩৫০৫

আরম্ভ হয়েছে আজও চলে আসছে যদিও জমিদারী চলে গেছে।

রাজা দামোদর নারায়ণ, রাজা রাজনারায়ণ, রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্মিত প্রতিমার দুর্গোৎসব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সমানভাবে চলে আসছে। গ্রামের ভিতরে আরও ১৯টি দুর্গা প্রতিমা বড় ও ছোট নানা মূর্তির হয়ে থাকে। কিন্তু পাঁঠা বলিদান, কিছু কুমড়ো বলিদান ও সরিষা, মাসকলাই বলিদান হয় রাজবাড়ির কামান (ছোট) তোপধ্বনির সংগে সংগে। তাকে 'ক্ষ্যান' বলে। বাস্তবে না দেখলে বোঝান মুশকিল। আপনাদের সংগে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাব। থাকবার স্থান বন্দোবস্ত করব। পল্লীরীতি অনুযায়ী খাবার নিশ্চয় বন্দোবস্ত করব। তখন পুজোর ছুটি খুব আনন্দের হবে।

আমরা একজন দশম শ্রেণীর ও একজন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। আপনারা এলে সৌভাগ্য মনে করব। আশা করি বঞ্চিত হব না।

শ্রী প্রীতিজিৎ রায়
শ্রী অরিজিৎ রায়
মালিয়াড়া, বাঁকুড়া

গ্রামের নাম রাঙামাটি

আসুন আমাদের গ্রামে। দুর্গাপুর থেকে ১৮ আর পানাগড় থেকে মাত্র ৪ মাইলের পথ। পথ সম্বন্ধে বলতে গেলে রামায়ণের এক টুকরো বলতে হয়। যখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঋষি বিশ্বামিত্রের সংগে আশ্রমে যাচ্ছিলেন তখনও যেরকম দুটো পথ সামনে ছিল যার একটি কণ্টকময় ও অপরটি কুসুমাস্তীর্ণ, আমাদের গ্রামে যাবার পথও সেরকমই দুটি। এক পথ ধরে দুর্গাপুর থেকে আড়াই ঘণ্টায়, আর অন্য পথে পানাগড় থেকে আধ ঘণ্টায়। এই আধ ঘণ্টার পথে আছে নানান বাধা, তবে বাধা ডেঙাতে গেলে ভারী মজা। রিকশায় দুমাইল এসে দামোদর নদের ধার। এই অংশটা দামোদর নদের সবচেয়ে চওড়া অংশ। এখন যদিও এক তৃতীয়াংশ মজে গেছে। মাঝে চরের ওপর গড়ে উঠেছে লালবাবার আশ্রম। বুনো কুল আর কাশ গাছের ঝোপ। চারিদিকে কাশ ফুলের সংগে শরতের উড়ো গন্ধ। চোরা বালি। কোথাও হাঁটু জল কোথাও কোমর অবধি। নদীর ধার থেকে অনেকটা উঁচুতে রাঙামাটি গ্রামের চটি দেখা যায়। গ্রামের বাসিন্দারা অধিকাংশই গরিব। তবুও দুর্গাপুজো হয়। তিনটে পুজো আগে হত। গ্রামের লোকেরা উপার্জনের তাগিদে শহরমুখী হও যায় পুজো কমে গেছে। এখনো দুটো একটা গাংগুলিদের অন্যটা চাটুজ্যেদের। বহু পুরনো পুজো। গ্রামের বাউরি, বাগদী, মধ্যবিত্ত সকলেই এই পুজোয় ভাগীদার হন চারদিন ধরে। ধূপধুনোর গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। প্রত্যেকদিন ঘুম ভাঙে সানাইয়ের সুরে। ঢাকীরা আসে অনেক দূর দূর থেকে। ইদানিং বাউরিরা ব্যানড পার্টি করেছে। ওরাই বাজায়। গাংগুলি বাড়িতে নিরামিষ বলি হয়। চাটুজ্যেদের পাঁঠা। আগে শুনেছি মোষ বলি হত। তিনদিনই বলি হয়। সন্ধ্যায় আরতি ধুনুচি নাচ। খাওয়া দাওয়াটাও আন্দাজ করে নিন। দশমীর দিন সবচেয়ে আনন্দ ঘাড়ে করে প্রতিমা বিসর্জন। বাউরিদের লাঠিখেলা। চার দিকে মশাল। মাঝরাত্রি পর্যন্ত অফুরন্ত আনন্দ। কোলাকুলি। তারপর সোনামুখির খাসমণ্ডা আর ম্যাচা সন্দেশ।

পুজো শেষ। ফিরবার সময় গামছা আর তাঁতের শাড়ি কিনে বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়েতে ছোট ট্রেনে চেপে শালি নদীর ওপর দিয়ে সোনামুখির গভীর জংগলের মাঝখান দিয়ে বাড়ি ফিরবেন। নিমন্ত্রণ রইল। অবশ্যই আশায় থাকব।

তরুণ চক্রবর্তী
রাঙামাটি, বাঁকুড়া

মফস্বলের পুজো

আমাদের গ্রামের নাম রাজবলহাট জেলা হুগলী। গ্রাম না বলে এটাকে মফস্বলই বলা চলে। প্রায় ৩০ হাজার অধিবাসী পরিপূর্ণ এই গ্রামটি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর বাংলার বিভিন্ন পালপার্বণ এখানে আড়ম্বরের সংগে পালিত হয়। স্বাভাবিকভাবে এ গ্রামের দুর্গোৎসবও গ্রামবাসী ও অন্যান্যদের কাছে এক আকর্ষণের বস্তু। এখানে আছে যেমন বহু বছরের সুপ্রাচীন জমিদার বাড়ির দুর্গোৎসব, তেমনি আছে অসংখ্য বারোয়ারি পুজোর মেলা। গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই পড়বে ৩০০ বছরের পুরনো শীলবাটীর ঐতিহ্যময় দুর্গোৎসব। এ পুজোয় যেমন আছে সুপ্রাচীন কালের সনাতন আচার অনুষ্ঠান, তেমনি আছে আধুনিক কালের আলো ও বাজনা বাদ্যের সমারোহ। দু পা এগোলেই পড়বে রাজবলহাটের ব্যবসায়ী সমিতির সার্বজনীন দুর্গোৎসব। জাঁকজমক পরিপূর্ণ এ পুজোমণ্ডপ

সবসময় দর্শক সমাগমে গমগম করে। তারপর সোজা এলেই পড়বে মনসাতলার সার্বজনীন পুজো-মন্ডপ। তারও পরে দীঘিরঘাট সার্বজনীন পুজোমন্ডপ। এ ছাড়া রয়েছে আরও অনেক পুরনো সার্বজনীন পুজো যাদের এখানে উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তবে সবচেয়ে পুরনো পুজোমন্ডপটি আপনি পাবেন একটু পাশেই। অর্থাৎ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্মস্থান গুন্টিয়া গ্রামে। ওখানে অনেকগুলি সুপ্রাচীন দুর্গোৎসবের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হল চক্রবর্তী বাড়ি ও দে বাড়ির দুর্গোৎসব। প্রায় ৪00 বছরের পুরনো। আড়ম্বরের বাহুল্য না থাকলেও সনাতন হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যে এই পুজো মন্ডপ দুটি আজও সরগরম।

তবে দুর্গোৎসবের সময় সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল দেবী রাজবল্লভী মাতার উৎসব। পুজোর চারদিন দেবী রাজবল্লভীর পুজো মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমীতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় সন্ধি-পুজো। প্রাচীনকালের জলঘড়ির পল, দন্ড অনুসারে নির্দিষ্ট হয় সন্ধিক্ষণ আর এ সন্ধিক্ষণ অনুসারেই বিভিন্ন পুজোমন্ডপে সন্ধিপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে আসার জন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হল (১) হাওড়া-তারকেশ্বর গামী ট্রেনে হরিপাল স্টেশনে নেমে ১0 নং বাসে রাজবলহাট।

(২) বাবুঘাট থেকে রাজবলহাটগামী একসপ্রেস বাস।

(৩) বাবুঘাট থেকে উদয়নারায়ণ একসপ্রেস বাসে উদয়নারায়ণপুর, পরে ১0 নং বাসে রাজবলহাট।

(৪) বাবুঘাট থেকে আঁটপুরগামী একসপ্রেস বাসে আঁটপুর, পরে ১0 নং বাসে রাজবলহাট।

অনন্ত দেব কুন্ডু
রাজবলহাট, হুগলী

বড়োগ্রামে আসুন

এবার পুজোয় আমাদের গ্রামে বেড়াতে আসুন। আগাম আমন্ত্রণ জানালাম। শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এই গ্রাম্য পরিবেশে কাটিয়ে যান পুজোর দু তিনটি দিন। নতুন পরিবেশ ভালই লাগবে।

গ্রামের নাম বড়া। পোশাকী নাম বড়ডাহা। মুরশিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অধীন। শিয়ালদা লালগোলা লাইন ধরে আসুন বহরমপুর। হাওড়া-আজিমগঞ্জ লাইন দিয়ে এলে নামবেন খাগড়া ঘাট রোড স্টেশনে। এ ছাড়া কলকাতা থেকে বহরমপুরে আসার সরকারি, বেসরকারি অনেক বাস আছে। সবগুলিই ছাড়ে এসপ্লানেড থেকে। বহরমপুর তো এলেন, তারপর? ইচ্ছা করলে বহরমপুরে একটা রাত বিশ্রাম নিয়েও আসতে পারেন। সেখানে ট্যুরিসট লজ আছে। আছে কয়েকটি ভাল ভাল হোটেল। চার্জ মডারেট।

সকালে উঠে বহরমপুর থেকে সিউড়ি অথবা সাঁইথিয়াগামী যে কোনও বাসে উঠে নামবেন ডাঁলোয়া ব্রীজ স্টেশনে। বাসে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। এরপর মাইল তিনেক হাঁটা পথ।

গ্রামে ঢুকতেই কানে আসবে কাঁসর, ঘণ্টা, ঢাকের আওয়াজ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হৈ চৈ। সুকুমার ঠাকুরের বাড়িতে উঠুন সবাই এক ডাকে চেনে। গ্রামের পুরনো পুজো এখানেই। প্রায় দুশো বছরের পুজো। আর একটা পুজো চালু হয়েছে বছর দশেক। গ্রামের পুজো। মাটির ঘর বাড়ি। মন্দিরও মাটির। দেবীর অঙ্গে শোলার সাজ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলে রাখি। কাছেই বেলগ্রাম। সেখান থেকে রিকশা করে ফলেশ্বর যাওয়া যায়। ফলেশ্বরে আছে শিব মন্দির। গ্রামে ২/৪ দিন কাটিয়ে ফেরার পথে ফলেশ্বর যেতে পারেন। বেলগ্রাম থেকে যাওয়া যায় মহাপ্রভু নিত্যানন্দর জন্মস্থান বীর চন্দ্রপুর। সেখান থেকে সোজা তারাপীঠ। তারা মাকে দর্শন করে আসুন রামপুরহাট। সেখান থেকে বাস বা ট্রেন ধরে আবার কলকাতা। আমাদের গ্রাম থেকে রামপুরহাট হয়ে কলকাতা ফিরতে আপনার খরচ হবে দুশো টাকার মত।

আমন্ত্রণ জানালাম। আসছেন তো? আমরা কিন্তু অপেক্ষা করব।

শান্তনু ঠাকুর
বহরমপুর, মুরশিদাবাদ

'শাল-মহুয়ার গন্ধে পুজো কাটান'

শহর থেকে দূরে রাঙামাটির বীরভূমের এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে। নাম দুবরাজপুর। কলকাতা থেকে মাত্র ২00 কিলোমিটারের পথ। দুবে রাজার রাজত্বকালে ছিল জঙ্গলে ভরা এক গন্ডগ্রাম। তাই আজও মৌজার নাম আছে জঙ্গল দুবরাজ-পুর। এখন শুধু নামই আছে, কিন্তু জঙ্গল নেই। শাল ও মহুয়ার মাঝামাঝি শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ। উত্তর-পশ্চিমে বিহার সীমান্তের 'তরণী পর্বতমালা' দূর থেকে হাতছানি দেয়।

এখান থেকে ছ মাইলের মধ্যে শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর ধাম। বার মাইলের মধ্যে বৈষ্ণবতীর্থ জয়দেব কেঁদুলি। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তারাপীঠ এবং তিরিশ মাইলের মধ্যে শান্তিনিকেতন। বাসের যোগা-যোগ আছে। আর আছে দুবরাজ-পুরের বিখ্যাত 'মামা-ভাগনে' পাহাড়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই পাহাড়ের ডাকনাম পাহাড়ে-শ্বর। প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থরে থরে সাজান পাথরের ছোট বড় চাঁইগুলি দেখে মনে হবে কেউ যেন সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

আগে প্রচুর আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, তমাল গাছে সারা পাহাড়টি ঢাকা ছিল। বর্তমানে জ্বালানীর জন্য অনেকে কেটে নিয়ে পালিয়েছে। তবু এখনও প্রচুর গাছপালা আছে। এই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত পাহাড়ে-শ্বরের শিবমন্দির, মামা-ভাগনে, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসী নিবাস ও অনেক গুহা। দুবরাজপুর রেল স্টেশনের দক্ষিণের গ্রামে প্রতিমা পুজো হয় এগারটি। নব পত্রিকা পুজো হয় পাঁচটি। সব থেকে প্রাচীন নব পত্রিকা (পাতি দুর্গা) পুজো হল ব্রাহ্মণ পাড়ার চামুন্ডা মায়ের পুজো। অষ্টমীর দিন বলিদা-নের সঠিক সময় নির্ঘণ্টের জন্য আজও একটি জলপাত্রে তরঙ্গ দেখা দেয় — এবং সেই মুহূর্তে মায়ের বলিদান সম্পন্ন হয় এবং ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অন্যান্য পুজো মন্ডপগুলির বলিদান হয়ে থাকে। গ্রামে প্রায় দেড়শ বছরের আগে থেকে দুর্গা পুজো শুরু হয়েছে এবং তা আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে।

এগারটি প্রতিমার মধ্যে সাতটি হল চালি দুর্গা প্রতিমা। বাকি চারটি হল আধুনিক সাজসজ্জায় পাহাড় পর্বতে সাজান দুর্গা প্রতিমা। এগু-লিতে থাকে নানারকম আলোর চকমকানি, জাঁকজমক প্যানডেল।

পুজোর কদিন এদের মন্ডপে মন্ডপে চলে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা গানের আসর। এগারটি পুজোর মধ্যে তিনটি হল পারি বারিক। বাকি আটটি হল বারোয়ারি বা সর্বজনীন। এর মধ্যে কোনটি পাড়ার পুজো আবার কোনটি ক্লাবের বা সমিতির পুজো।

আমাদের এখান থেকে দু মাইল পশ্চিমে হল খগেশ্বর নাথের শিব মন্দির। আর দু মাইল পূর্বে হল হেতমপুরের রাজবাড়ি ও বহু দিনের পুরনো কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। এরই কাছাকাছি যশপুর-কৃষ্টনগর গ্রামে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের এক ছোট মেলা বসে এবং ২0/২৫টা প্রতিমা নিয়ে মিছিল হয়। আমাদের এই গ্রামে কলকাতা থেকে সরাসরি মোটর ও বাসরুট, ট্রেন পথে আসা যায়। এসপ্লানেড থেকে সরকারি বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে ছটায় আর একটি বেলা সাড়ে এগারটায়। একটি সিউড়ি কলকাতা ভায়া দুবরাজপুর বক্রেশ্বর। আর একটি ভায়া দুব-রাজপুর সিউড়ি। ভাড়া হল ১৭ টাকা ৭0 পয়সা। বাসে সময় লাগে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। মোটরে আরো কম সময় লাগে। পথ নির্দেশ হল জি টি রোড ধরে বর্ধমান হয়ে পানাগড়ে এসে ইলামবাজার দুবরাজপুরের পথ ধরতে হবে। হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে প্যাসেনজার বা

একসপ্রেস ট্রেনে অন্ডাল অথবা সাঁইথিয়া স্টেশনে নামতে হবে এবং অন্ডাল সাঁইথিয়া ব্রানচ লাইনের ট্রেনে চড়ে দুবরাজপুর রেল স্টেশনে নামতে হবে। উভয় দিক থেকে এখানে ট্রেনে আসা যায়। রাত্রিবেলা মোগলসরাই প্যাসেনজার ট্রেনের সংগে দুবরাজপুর সিউড়ি সাঁইথিয়ার জন্য একটি কামরা জুড়ে দেওয়া হয় হাওড়া থেকে। সেই কামরায় চড়লে এখানে সরাসরি আসা যায়। পয়লা সেপটেমবর থেকে হাওড়া সিউড়ি দুবরাজপুর ভায়া অন্ডাল 'ময়ূরাক্ষী একসপ্রেস' ট্রেন চালু হচ্ছে। হাওড়া থেকে প্যাসেনজার ট্রেনের ভাড়া ১২ টাকা ৫0 পয়সা। একসপ্রেস ট্রেনের ভাড়া ১৭ টাকা ৫0 পয়সা। সময় লাগে পাঁচ ঘন্টা। এখানে থাকার জন্য মাড়োয়ারী ধর্মশালা আছে। পাখা লাইট ও জলের সুব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া আছে স্কুল। এখানেও থাকার ব্যবস্থা আছে। হালকা বিছানাপত্র আনলেই হবে। কোন অসুবিধা হবে না। যোগাযোগ করবেন দুবরাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ভূপানন্দ মহারাজ অথবা থানার তরুণ ও সি শ্রীশান্ত মিত্রর সংগে। আর তা ছাড়া আমি তো আছিই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ কবিরাজ
পোঃ দুবরাজপুর, জেঃ বীরভূম

মাখালতোড়ে বিজয়া দশমীতে এখনও শংখচিল আসে

শহর তথা কলকাতার পুজো দেখে যাঁরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদেরকে আমাদের গ্রামে এবার দুর্গাপুজো দেখতে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মুরশিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমার মধ্যে আমাদের এই গ্রাম। গ্রামের নাম মাখালতোড়। কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামে আসা খুবই সহজ। কোনরকম কষ্ট হয় না। হাওড়া থেকে উত্তরবংগ, আসাম এবং বিহারগামী কয়েকটা ট্রেনে এখানে আসা যায়। নামতে হবে সালার স্টেশনে। সময় লাগবে বড় জোর ৫ ঘণ্টা। অবশ্য একসপ্রেস ট্রেনে চাপলে সময় অনেক কম লাগবে। সকালের দিকে হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে ব্যানডেল এলে 'নলহাটী-ব্যানডেল' প্যাসেনজার, অথবা শিয়ালদা থেকে ৭ টার সময় 'বাজার সৌ' প্যাসেনজার ট্রেনে চাপলে সবচাইতে সুবিধা হয়। ঠিক সময়ে পৌঁছান যাবে। ভাড়া পড়বে ১১ টাকার মতন। স্টেশনে নেমেই অনেক রিকশা পাওয়া যাবে। আমাদের গ্রাম পর্যন্তই এই রিকশা যায়। তিন মাইল রাস্তা। ভাড়া নেবে তিন টাকা মতন। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করে আমার নাম অর্থাৎ সুব্রত কুমার মুখোপাধ্যায় বললেই সকলেই ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। অতিথিদের কোনরকম অসুবিধা হবে না।

আমাদের এই গ্রামটি ছোট হলেও সাজান। রাস্তাও ভারি সুন্দর। বৃষ্টির জলে কোন কাদা হয়না। বালিতে পরিপূর্ণ থাকে রাস্তাগুলো। শান্তিপূর্ণ গ্রাম। প্রত্যেকের সংগে সম্পর্ক বন্ধু ও আত্মীয়ের মতন। এ গ্রামে মোট তিনটে দুর্গাপুজো হয়। প্রথমটি হয় আমাদের মুখারজি পরিবারে পাঁচ শরিকের। দ্বিতীয়টি সরকারদের এবং তৃতীয়টি বারোয়াড়ি পুজো। তবে সব চাইতে পুরনো বলতে আমাদের পুজোকে বোঝায়। এটি আনুমানিক চারশ বছরের পুরনো কৌলিক পুজো।

আমাদের এই দুর্গাপুজোর বেশ কতকগুলো বিশেষ আকর্ষণ আছে: যেমন সপ্তমীর দিন সকালে পুকুর থেকে ঘটের সংগে 'দোলা' আগমন। এটি নাকি সিদ্ধিদাতা গণেশের কলা বউ। এর পর আছে মহাঅষ্টমীর পুজো। অর্থাৎ সন্ধিপুজো। দেবীর চণ্ডীমন্ডপে বেশ থমথমে ভাব থাকে। নিচে সকলে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উপরে কেবল একটি প্রদীপ জ্বলে। আগে ঘড়ির প্রচলন ছিল না, তাই কথিত আছে দক্ষিণের বাজনা শুনে অর্থাৎ বর্ধমানের মহাবাজার দুর্গাপুজোর বলির বাজনার শব্দ শুনে আমাদের বলি হত। সেই প্রচলন আজও চলে আসছে। চোখে না দেখলে এর সত্যতা যাচাই করা যায় না। আগে আমাদের এই পুজোতে সপ্তমী, মহাঅষ্টমী এবং নবমীতে পাঁঠা এবং মোষ বলি হত। কয়েকবার নাকি বলিতে বিঘ্ন ঘটেছিল। তাই কাশীর পন্ডিতদের থেকে বিধি এনে পাঁঠা, মোষ বলি নিষিদ্ধ করে পাঁঠার বদলে চালকুমড়ো এবং মোষের বদলে আখ বলি দেওয়া হয়।

এরপর আছে নবমীর দিন বিকালে বড় বড় বেদেরা সাপ নিয়ে হাজির হয় এখানে এবং তাদের যতরকম সাপের খেলা আছে দেখায়। আর আছে দশমীর দিন দুপুরে দোলা বিসর্জন। দোলা বিসর্জনের পর সকলকে কাঁচা হলুদ খেতে দেওয়া হয়। তারপর সকলে মিলে 'হরি-হরি বোল' এই বলে চিৎকার করা হয়। কিছুক্ষণ পর একটি শংখচিল এসে হাজির হয়। প্রবাদ এই চিলটিতে চড়ে নাকি মা দুর্গা স্বর্গে চলে যান। এরপর গ্রামের মোড়ল এ বছরের রবি শস্যের দাম বলে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তারপর রাত্রিতে মহা ধুমধামের সংগে নানারকম বাজনা বাজিয়ে একই সংগে তিনটি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। ভারি সুন্দর লাগে এই নিরঞ্জন দেখতে। সবশেষে চলে বিজয়া উৎসব। বিজয় দশমীর সকালে 'কুমারী পুজা'ও এ গ্রামের দুর্গাপুজোর বড় আকর্ষণ। এমনিভাবেই শারদীয়া দিনগুলো খুশিতে আর আনন্দে কেটে যায়। জনপ্রিয়তার দিকে আমাদের এই ছোট্ট গ্রামের শীর্ষস্থানে নাম না থাকলেও উৎসবের দিকে তাতে কোন ত্রুটি হয় না। চোখে না দেখলে তা উপলব্ধি করা যায় না। তাই সকলকে জানাই আসার জন্য আমার আন্তরিক আমন্ত্রণ।

সুব্রত কুমার মুখোপাধ্যায়
মাখালতোড়, মুরশিদাবাদ
ভায়া সালার

আসুন সুন্দরবনের ভান্ডারখালিতে

আমরা সুন্দরবন অঞ্চলের অজ পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা। বাঙালির মহোৎসব দুর্গাপুজো আমাদের এখানে প্রতি বছরই হয়ে থাকে। আপনারা যান্ত্রিক সভ্যতার দানে শহরে প্রতি বছরই সাড়ম্বর, জাঁকজমকপূর্ণ ঝলমলে প্যানডেলের পুজো দেখে দেখে অভ্যস্ত। আলোর রোশনাই, পটকা আর রেকরড-ক্যাসেটের আওয়াজে শহরের প্যানডেলগুলো থাকে মুখর। প্রতি বছর এই একঘেয়ে পুজো দেখার চেয়ে এবার পুজোয় আসুন না আমাদের এই তপোবনের মত শান্ত, সৌম্য সুন্দরবনের গ্রাম্য পরিবেশের মাটিতে।

এবার জানাই গ্রামে আসার নির্দেশাবলী ও যোগাযোগের ঠিকানা। এসপ্লানেড থেকে 'একসপ্রেস' অথবা শিয়ালদা থেকে ইছামতী প্যাসেনজার-এ সরাসরি হাসনাবাদে আসুন। সেখান থেকে নদীপথে লনচ যোগে সরাসরি চলে আসবেন ভান্ডারখালিতে। ভাড়া লাগবে একসপ্রেসে ৫.৬0 টাকা, ইছামতী প্যাসেনজারে ৪.৮0 টাকা এবং লনচে লাগবে ২.৭৫ টাকা। এখানে এলে সুভাষ গুপ্ত মহাশয়ের সংগে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান হচ্ছে।

সুমিতা দাস
ভান্ডারখালি, ২৪ পরগণা

'ধরমপুরের পুজোয় হুল্লোড় নেই'

একেবারে গাঁয়ের হৃৎপিন্ডে এসে, তার শ্বাসযন্ত্রে কান রেখে যদি কোন শহুরে মানুষ পুজো দেখতে চান, তা হলে আসুন ধরমপুর গ্রামে। গ্রামের নাম ধরমপুর। দুটি মাত্র দুর্গাপুজো গ্রামে। একেবারে সেকেলে গাঁয়ের পুজো। মূর্তিও পুরনো আমলের। কলা গাছ দুপাশে, পটের চালি, পশু বলি, দশমীর গঙ্গাজোটা, এইসব। অবশ্য দেখার চোখ নিয়ে এলে দেখবেন আপনার দুপাশে অজস্র মানুষ, যারা বাউল গান গায়, মনসা গান, গাজন গান, ভাদু গান, পটের গান গায়। জমিদারীর অবশেষ দেখবেন। তবে ধরমপুরের সেই বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আপনাকে দেখাতে পারব না, গল্প শোনাতে পারব। কারণ পুজো হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই পুজো বীরভূমের একমাত্র। শোনা যায় কাশী, মুরশিদাবাদ এবং বংশবাটী ছাড়া এ পুজো আর কোথাও নেই।

হাওড়ায় ট্রেন, সকাল ৭টার কাছাকাছি 'বরৌনী' এবং ১১টার কাছাকাছি 'দানাপুর'। একেবারে রামপুরহাটের টিকিট কিনুন, ১৩ টাকার মত নেবে। শিয়ালদা, বর্ধমান থেকেও অন্য উপায়ে আসা যায় রামপুরহাট। রামপুরহাট থেকে ভায়া নলহাটী রুটের যে কোন একটি বাস ধরে তেজহাটীতে নামুন। বাস ভাড়া ৬0 পয়সা, ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর বাস। এরপর রিকশা করে কুবুমগ্রাম আসুন তিন টাকা দিয়ে। আর উপায় নেই, পাক্কা দু মাইল মেঠো পথে হাঁটতে হবে আপনাকে। সত্যি-গাঁয়ের পুজো দেখতে হলে আসুন এখানে।

আদিত্য মুখোপাধ্যায়
ধরমপুর পোঃ বরলা,
বীরভূম

পুজোয় পশুবলি

'বলি যদি দিতেই হয়, পাঁঠা কেন, বাঘ-সিংহ ধরে দিক না'

এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ১ অকটোবর ১৯৭৮ এর 'পরিবর্তনে'র কথা, যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ভবদেব পুরোহিতের সাক্ষাৎকার। তিনি পশুবলি, এমনকি নরবলিকেও সমর্থন করেছিলেন। হ্যাঁ, কালিকা পুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাঁর জানা থাকায় তাঁর তো সমর্থন করারই কথা। কিন্তু আমার স্বল্প সামর্থ্যের মধ্যে শাস্ত্র পুরাণ ঘাঁটতে গিয়ে মনের গোড়ায় ধন্দ লাগল, কারণ দেখলাম শাস্ত্রে যেমন বলি প্রথার সমর্থন আছে, তেমনি আবার বিরোধিতাও আছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে দেখলাম বিবেকানন্দও এই দ্বন্দ্বের ধন্দটা লক্ষ্য করেছেন।

কিন্তু 'সবই বেদে আছে' বলে নির্বিচারে শাস্ত্র মেনে নেওয়ার দিন চলে গেছে। আমাদের যুক্তি কী বলে। প্রথমেই তো খটকা লাগে যখন দেখি জগজ্জননীর সামনে তাঁর নিরীহ সন্তানকে বলি দেওয়া হচ্ছে। মা কি কখনও সন্তানকে মেরে ফেলতে পারেন। এখানে বলি প্রথার সমর্থকরা বলে উঠবেন যে সেই পশুর তো দেবলোকে গমন হয় তাই তার লাভ বৈ লোকসান তো হয় না! চমৎকার কথা! তাহলে তো নিরীহ ছাগটাকে বলি না দিয়ে নিকটতম আত্মীয়কে বলি দিলেই হয়। তার স্বর্গপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত ভাবেই ঘটবে তখন। আবার একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে শাস্ত্রে তো বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া অনেক কিছুকেই বলি দিতে বলা হয়েছে, তা সেগুলোকে বাদ দিয়ে গোবেচারী ছাগলটাকে বলি দেওয়া হয় কেন? এর পেছনে কি মানুষের সুবিধাবাদী মনোভাব তথা রসনাতৃপ্তির ইঙ্গিত মেলে না?

পশুবলির বিরুদ্ধে যখন আমার যুক্তিগুলোকে খাড়া করার চেষ্টা করছি, সেই মুহূর্তে তন্ত্রের একটি অধ্যায়—মানস যাগের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল আমার মন। সেখানে যা বলা হয়েছে, তার ক্ষীরটুকু হল, 'আপন অন্তরস্থ ষড়রিপুকে বলি দাও।' সেখানে বলা হয়েছে মানসবলির কথা। মানুষের অন্তরের পশুকেই বলি দিতে বলা হয়েছে সেখানে। আরও চমকালাম তখন, যখন হাদিস বা কোরান খুলে দেখলাম 'কোরবাণী' পশুহত্যা নয়। (আরবী কুরব-নৈকট্য—আল্লার নিকটে যাওয়ার উপায় বা পথ আলংকারিক অর্থে)। আরও একটা তথ্য জানিয়ে রাখা এখানে ভাল যে শাস্ত্রে উল্লিখিত 'অজবলি'র 'অজ' মানে 'ছাগ' নয়, 'বীজ' শস্য বা 'ওষধি'। একটা ক্ষুদ্র বীজ যদি বলি দিতে চান কেউ, তো দিতে পারেন। কিংবা সুদীন কুমার মিত্র যেমন কালীপুজোর দিন উৎসুক ব্যক্তিদের নিয়ে ব্লাড ব্যাংকে 'আত্মরুধিরদান' করে আসেন, তেমনি যে কেউ এই 'সর্বজনীন বলিদানে' উৎসাহিত হলে খুশী হব।

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল যে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভাইপো অনাথকৃষ্ণদেব 'দুর্গা পূজায় বলি ও জীববলি' নামে বলিপ্রথা বিরোধী এক সুন্দর বই প্রকাশ করেছিলেন ১৩১৬ সালে। বইটি সৌভাগ্যক্রমে আমার সংগ্রহে আছে।

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা

পশুবলির বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন

ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যত অনাচার, অবিচার চলছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস প্রথা এই পশুবলি। ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত যখন এই পৃথিবী, যখন মানুষ চাঁদে যায়, টেস্ট টিউব বেবি তৈরি করে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা বিষয়ে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করে, তখন ধর্মের নামে পশুবলি হয় এই ভারতে এখনও।

বেদান্তবাদের মূল সুরে সুর রেখে যদি বলা যায়, ভাবা যায়—এ পৃথিবীর সব প্রাণীই করুণাময়ের সৃষ্টি, তবে সেই করুণাময়ের কাছে তাঁরই সৃষ্ট সন্তানকে বলি দিয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য পালিত হয়। জেনে বুঝেও আমরা অষ্টমী অথবা নবমীর সকালে ছাগ শিশু বলি দিয়ে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে কার পুজো করি। অনেকে বলেন এগুলো ধর্মীয় আচার। তাদের জানা উচিত-এ আচার নয় অনাচার, পাপাচার ভ্রষ্টাচার। আসুন সবাই এই প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠি এক যোগে।

রতন রায়।
কলকাতা—৭০০০৭২

পশুবলির বিরুদ্ধে শ্রী রায়ের গর্জনের সংগে গলা মিলিয়েছেন আরও অনেকে। তাঁদের সবার জেহাদ আলাদা আলাদা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। এঁরা হলেন স্বপন কুমার আদিত্য (কলকাতা—৬৭), কান্ত সরকার (বীরভূম), শামসুল হক (মেদিনীপুর), দেবযানী দাস (কলকাতা—১৯), রবীন্দ্রনাথ দে (বীরভূম), বরুণ কুমার ঘোষাল (বেলঘরিয়া), সুব্রত কুমার মুখোপাধ্যায় (মুরশিদাবাদ), অসীম ভাওয়াল (কোচিন) প্রমুখ।

মানুষের দাঁত তুলে নিলে পশুবলি বন্ধ হয়ে যাবে।

দেবদেবীর পুজোর বিশেষত শক্তিপুজোর অংগ হিসেবে পশুবলি ব্যাপারটি আমাদের দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। পশুবলি অবশ্য মানবিক কারণে মেনে নেওয়া শক্ত। উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, এর বহিরংগ নিষ্ঠুরতা, অকারণ প্রাণহানি, মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে।

আবার এই পশুবলিকে পুজোর অংগের ছদ্মবেশ পরিয়ে অনেকে আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে সেই বিখ্যাত গল্পটি স্মর্তব্য। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জিগ্যেস করলেন—'এবার আপনাদের পুজোয় বলি বন্ধ হল কেন?' উত্তরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বললেন 'দাঁত পড়ে গেছে......'। অর্থাৎ দন্তহীনতাজনিত মাংস আহারে অক্ষমতাই সেই গৃহস্থের বাড়িতে বলি বন্ধের কারণ।

অনেক বাড়িতে পশুর বিকল্প হিসেবে লাউ, চালকুমড়ো ইত্যাদি বলিরও প্রচলন আছে। এগুলিতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। অর্থাৎ বলির উদ্দেশ্যও সাধিত হয়, প্রাণহানিও হয় না। পশুবলি যে কোন সহৃদয় বিবেকবান ব্যক্তির কাছেই একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার।

রূপশ্রী দত্ত
কলিকাতা- ৭০০০১৩

শ্রীমতী দত্তর চিঠির মধ্যে রসনাতৃপ্তির জন্যই পশুবলির প্রচলন করা হয়েছে বলে যে ব্যংগাভাস করা হয়েছে, চাঁদপাড়া (২৪ পরগনা) থেকে অমর সাহা, কলকাতার সল্ট লেক সিটি থেকে অনুপ কুমার দত্ত এবং বর্ধমান থেকে অশোক কুমার ভকতও ঠিক একই রকমভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে চিঠির মাধ্যমে বক্রোক্তি করেছেন। চিঠিগুলির বক্তব্য একই রকম হওয়ায় আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হল না।

পুজোয় পশুবলি মূর্খের বিধান

'পুজোয় পশুবলি দিতে হবে'—কথাটা কে বলেছে? হাজার হাজার

বছর আগে যখন আমাদের ধর্মের নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, তখন এই নিয়মগুলো নিশ্চয়ই মানুষই করেছিল। সেই যুগের সংগে যদি আজকের যুগের তুলনা করা হয়, তাহলে কি বলা যায় না যে তখনকার মানুষেরা মূর্খ ছিল? তাহলে আমরা কেন সেই যুগের সব নিয়ম মেনে নেব? সেই যুগের মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নরবলি বা পশুবলির প্রয়োজন থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পশুবলির কি কোন প্রয়োজন আছে? কেউ কি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবেন পূজোয় পশুবলির উপকারিতা কী?

নরবলির মত পশুবলিও জঘন্য অপরাধ। ধর্মের নামে এধরনের অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

উৎপল ধর
তুরা, মেঘালয়

পশুবলি দেবতার সামনে অন্যায়

'এই কি উচিত নীচ স্বার্থ, নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা, চিররক্তপানে মত্ত হিংস্র প্রথা' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক বিসর্জন এ ত্রিপুরার রাণী গুণবতী যখন সন্তান কামনায় দেবীর কাছে একশত ছাগ বলি দিতে চান তখন রাজা গোবিন্দ মাণিক্য রাণীর উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলেছিলেন। এবং তারপর তাঁর রাজ্যে পশুবলি তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে রাজপুরোহিত রঘুপতির সংগে তাঁর মতের অমিল দেখা দিল, শুরু হল রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। পরিশেষে রঘুপতিও সেই সত্যকে অনুভব করতে পারলেন যে-প্রেম হিংসার পথ ধরে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয় 'যেখানে ভালবাসা, সেখানে রক্তপাত চলে না।'

সুতরাং পুজোতে 'পশুবলি' কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমর্থন করবেন না। যদিও এই প্রথা বহু যুগ ধরে প্রচলিত একটা অন্ধ অবৈজ্ঞানিক লোকাচার মাত্র। পুরনো দিনের বহু কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিঁড়ে প্রকৃত সত্য আজ মানুষ উদঘাটিত করছে। এখনো কোন কোন জায়গায় এই কুৎসিত প্রথা চালু আছে হয়তো। কিন্তু আগামী দিনে ঐ প্রথা লোপ পেতে বাধ্য। কারণ এখন মানুষ এসব বিষয়ে ভাবতে শিখেছে। বাস্তবকে চিনতে শিখেছে।

এখন প্রসংগক্রমে এ প্রশ্নটি হয়তো অনেকের মনে উদয় হতে পারে যে, পশুহত্যা না করে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে **যুক্তিপূর্ণ কথা। কিন্তু তাই বলে একটা নিরপরাধ পশুকে অনর্থক হত্যা করে মাটিকে রক্তে রাঙিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং পশুবলিকে মানুষের একটা অমানবিক কাজ বলে গণ্য করা যায়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের মত।**

শাস্ত্রে নাকি বলে আমাদের মধ্যে যে ছটি রিপু রয়েছে সেগুলোকে দমন বা উৎসর্গ করার জন্য নাকি পশুবলি দেওয়া হয় মায়ের কাছে। তাতে কি সত্যিই আমাদের রিপুগুলো দমিত হয়? অহেতুকই আমাদের একটা মিথ্যে অজুহাতে একটা অবলা নিরীহ জীবকে হাড়িকাঠের মধ্যে মাথা গুঁজে দিতে হয়। সমস্ত জীবের যিনি মা (বিশ্বমাতা) তিনি কি শুধুই মানুষের মাতা? পশুদের নয়? পশুরা কি জীব নয়? যদি সবার মাই তিনি হন তাহলে সন্তানের রক্তপানে তিনি কি সত্যিই আগ্রহী?

জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'মানুষ'। এই মানুষই মানুষকে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে খুন (বলি) করে। শত্রুতা মানুষের সংগে মানুষের থাকতেই পারে। কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই একটা পশুর সংগে মানুষ শত্রুতা করে তাকে বলি দিতে পারে না। বলি দেওয়ার অধিকার তার নাই। যদি মাংস খাওয়াটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাজারে তো কসাই রয়েছেই, শুধু শুধু দেবতার সামনে এই অন্যায় কেন

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুর্শিদাবাদ

পশুবলি মহাপাপ

আমি পূজোয় পশুবলি সমর্থন করি না, কারণ বেদ কিংবা পুরাণে কোথাও দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলির কথা উল্লেখ নেই। কোন এক সময়ে সমাজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় (তন্ত্র উপাসক) নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জনাই পূজোয় পশুবলি প্রথা চালু করেছিলেন। আজও সেই ট্রাডিশন কোথাও কোথাও চলছে। পূজোয় পশুবলি প্রথা যে স্থানেই চালু থাক তা বন্ধ করা মানবিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের একান্ত উচিত। কারণ পশুবলি মানেই তো সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অধর্ম আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া, প্রশ্রয় দেওয়া হিংসাকে। একটা জীবন্ত পশুকে বধ করে দেব দেবীর চরণে নিবেদন করলেই দেবতার কৃপালাভ করা যায় না। কারণ এই বিশ্বের **সমস্ত জীবকুলকে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন—একথা সকল ধর্মীয় মানুষ বিশ্বাস করেন। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে হত্যা করা মানেই তো মহাপাপ করা। যারা (মহামূর্খ) ক্ষমতার অহংকারে মত্ত হয়ে উচিত অনুচিত বিবেচনা না করে ধর্মের দোহাই দিয়ে পূজোয় পশুবলি দেয়, আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তাদের কখনও ক্ষমা করেন না। রামায়ণ মহাকাব্যে আমরা জানতে পারি দশরথপুত্র অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র** সভাসদগণকে বলেছিলেন 'নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি। ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম।' অর্থাৎ যাতে সত্য নেই তা ধর্ম নয়, যাতে ছল আছে তা সত্য নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

দীপক বসু
চাকদহ, নদীয়া

এত রক্ত কেন?

পূজোয় পশুবলি আমাদের ধর্মীয় সংস্কারের এক নিষ্ঠুরতম অধ্যায়। শাস্ত্রে শাক্তমতে দেবী আরাধনায় বলির নিয়ম আছে ঠিকই। তবে তা কোন পশুবলি নয়। অন্তরের আসুরিক শক্তি ও ষড়রিপুকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু সেই শাস্ত্রের মহান উদ্দেশ্যকে পশুবলিতে রূপান্তরিত করার সূক্ষ্ম প্রয়াস এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, আজও পুজোর অংগাংগী অনুচ্ছেদ হিসাবে পশুবলি বিদ্যমান। অথচ পশুবলির এই নিষ্ঠুর নিয়মকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

আমরা যে মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করি, তিনি সর্বজীবের নিয়ন্ত্রা, মানুষ থেকে কীটাণুকীট সবই তাঁর সৃষ্টি। সেই বিশ্বজনীন মা কি সত্যই তাঁর সন্তানের রক্তে পরিতৃপ্তা হন? নিছক নিজেদের রসনা পরিতৃপ্ত করার মানসেই ভক্তির ঘরে আমাদের এই ভাঁড়ামি।

দেবীর আরাধনা মানুষের ভক্তি, প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিকেই জাগরিত করে। পক্ষান্তরে পশুবলি অনুষ্ঠান সেই সুস্থিত মানসিক উন্মেষের পরিপন্থী। পূজো অনুষ্ঠানে আবালবৃদ্ধবনিতার চোখের সামনে যখন মহা সমারোহে পশুবলি দেওয়া হয় তখন ভয়ে অনেক ছেলেমেয়েকে মূর্চ্ছা যেতে দেখেছি। দেখেছি ছোট ছোট শিশুদের ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বাবামাকে জড়িয়ে ধরতে। এইভাবে একটি শুভ আনন্দের সামাজিক অনুষ্ঠানকে নির্দোষ রক্তে সিক্ত করে তোলা কি সমর্থনযোগ্য?

তাই ঘৃণা হয় তাদের উপর, যারা নিজেদের স্বার্থে পূজো উপলক্ষে এখনও পশুবলিকে জিইয়ে রাখতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাসের ছোট মেয়ে হাসি মন্দিরের সিঁড়িতে পশুবলির রক্ত দেখে যেমন করে রাজাকে জিগ্যেস করেছিল 'এত রক্ত কেন?' ঠিক সেইভাবে একই প্রশ্ন যতদিন না আমাদের মনে উচ্চারিত হচ্ছে ততদিন হয়তো এই নিষ্ঠুর প্রথা রদ করা সম্ভব নয়।

পীযূষ কান্তি চন্দ্র
নিমপুরা, খড়গপুর

পশুবলির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে পীযূষ কান্তি চন্দ্রর মত একই বক্তব্য রেখেছেন আরও অনেকে। শুধু তাই নয় শ্রী চন্দ্রর মত অন্যান্য আরও যারা তাঁদের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' থেকে 'এত রক্ত কেন' লাইনটি ব্যবহার করেছেন তাঁরা হলেন হুগলির মগড়া থেকে দেবাশিস পান, নদীয়ার বিল্বগ্রাম থেকে কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট থেকে শিবদাস নন্দী, নয়া দিল্লি থেকে প্রতীক দেব, অনামিত্র রায়, আসামের গৌহাটি ও মালিগাঁও থেকে যথাক্রমে রুচিরা ব্যানারজি ও অংশুমান চক্রবর্তী প্রমুখ।

পূজোয় পশুবলি সত্যিই মর্মান্তিক

যারা তন্ত্র সাধনায় বিশ্বাসী অর্থাৎ যারা কিনা তান্ত্রিক তারা তাদের শাক্ত-পূজোয় পশুবলি দিয়ে থাকেন। বৈষ্ণব সাধকদের সংগে কথা বলে দেখেছি তারা বলি বাদ দিয়ে শাক্তপূজোর রীতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। তন্ত্র সাধনায় পশুবলিকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার পশ্চাৎপট একটিই—মায়ের পূজায় রক্ত ও সুরার প্রয়োজন ভিত্তিক। তান্ত্রিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম যারা দুর্গা শক্তির আরাধনা করেন তারাও প্রয়োজন ভিত্তিক মোষ, পাঁঠা ইত্যাদি বলি দিয়ে থাকেন। বলি না হলে মায়ের পূজো নাকি অসার্থক হয়। আমার মনে হয় এর পশ্চাতে কাজ করে বংশানুক্রমিক এক দৈবিক প্রেরণা। ভাল মন্দের মাপকাঠিতে সে বিচার করা সাধারণ ধর্মান্ধ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। হয় না বলেই এই আধুনিক প্রগতির যুগেও বলি আছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মানসিকতা বলির বিপক্ষে; একটি অবলা জীবকে পুকুর কিংবা গঙ্গায় স্নান করিয়ে হাড়িকাঠে ফেলা এবং তখন তার প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ এবং আর্তচিৎকার সব মিলিয়ে দৃশ্যটি যে, করুণ সেই বলির পশুর রক্ত এবং মাংস তৎক্ষণাৎ মাকে উৎসর্গ

করা হয়। মহাপুজোয় মহা অংগ এই বলি। পশুবলির আগে আমরা আখ, কুমড়া ইত্যাদি বলি দিয়ে থাকি। সেই বলিতে কারো দুঃখ কষ্টের অভিব্যক্তি থাকে না। কিন্তু পশুবলির মর্মান্তির দৃশ্যটির কথা ভাবলেই অস্বাভাবিক এক ব্যথায় মনটা ভরে যায়। জানি না মায়ের কী ঐকান্তিক বাসনা চরিতার্থ হয়। কিন্তু আমরা সবাই যদি মায়ের সন্তান হই তাহলে সেই মায়ের কেন এত রক্তপিপাসা? আর সেই রক্ত তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ধর্মান্ধ মানুষেরই বা এত কেন উন্মাদনা? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তাহলে রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামীজীর ভাষায় জীবের প্রতি প্রেম ভালবাসার অভিব্যক্তি কোথায়? ঈশ্বরকে সেবায় চূড়ান্ত লক্ষ্যে বলিদান কি করতেই হবে? আমার মনে হয় এর কোন অর্থ নেই। তাই ধর্মবিশ্বাসী হয়েও আমি পশুবলিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারি না।

বিপ্লব সেনগুপ্ত
কাঁচরাপাড়া

বিপ্লববাবু চিঠিতে পশুবলির হিংস্রতায় যেভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, সেই একই অনুরণন ধরা পড়েছে রাজারহাট, ভাতেন্ডার দেবদুলাল রায়, মেদিনীপুর, গড় ময়না গ্রামের সুশান্ত কুমার মাইতি, বাঁকুড়ার ওন্দা গ্রামের শ্যাম কিংকর চৌধুরী, শিলচরের সুমিতা পাল ও বর্ধমান বৌয়াইচণ্ডীর গৌরহরি দিকপতির চিঠিতে। সবার চিঠি আলাদা করে প্রকাশ করা গেল না, কিন্তু একেক জনের চিঠি অপর জনের চাইতেও যেন বেশি করুণ করে লেখা হয়েছে।

'কুসংস্কার থেকেই পশুবলি'

বর্তমানে মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলে গণ্য করা হয় কিসের ভিত্তিতে? মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি বেশি, মানুষের দ্বারাই রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষই দিন রাত্রি, চন্দ্র-সূর্যের রহস্য আবিষ্কার করেছে। মানুষের দ্বারাই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই জন্যই কি মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? যে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ সবচেয়ে বেশি, যে মানুষ অবাধে অপ্রয়োজনে নৃশংসভাবে পশুহত্যা করে চলেছে, নিজেদের মধ্যেই হিংসা বিদ্বেষ মারামারি করে মরছে সেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিগণিত হয় কিভাবে?

যদিও রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু কুসংস্কার আমাদের সমাজ থেকে উঠে গেছে, তবে আজও নৃশংস পশুবলি প্রথা আমাদের সমাজে চলে আসছে। দেব-দেবীরাই মানুষ জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। সকল জীব তাঁদেরই সন্তান। তাঁরা কি চান যে তাঁদের পুজোর জন্যে তাঁদেরই সন্তানকে বলি দেওয়া হোক? তাঁরা নিশ্চয়ই তা চান না? অথচ দেবদেবীকে খুশি করে পুণ্য অর্জনের জন্যই মানুষ পশুবলি দিচ্ছে। এতে যে পুণ্যের বদলে পাপ জমা হচ্ছে এই কথাটা তারা কল্পনাও করতে পারছে না। এতেই বোঝা যায় মানুষ আজও ঘোর অন্ধকার কুসংস্কারের মাঝে ডুবে আছে। অবলা পশু যারা বিনা কারণে কারো কোন ক্ষতি করে না তাদেরকেই ধরে বলি দেওয়ার প্রথা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। অবিলম্বে এই পশুবলি প্রথা উচ্ছেদের জন্য এমন একজন মনীষীর প্রয়োজন যিনি মানুষকে সকল কুসংস্কারমুক্ত করে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে পারেন।

আশিস সরকার
নগাঁও, আসাম

আশিস সরকারের মত কুসংস্কার থেকে উদ্ধারের জন্য একজন মনীষীর তাগিদ অনুভব না করলেও, পশুবলি প্রথা যে কুসংস্কার থেকেই এসেছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট মত জানিয়েছেন বাঁকুড়া থেকে দীপক মন্ডল, কলকাতা–২৯ থেকে প্রহ্লাদ ঘোষ, করিমগঞ্জ থেকে বন্দনা দেবী ও কাছাড় থেকে রতীশ ধর।

পশুবলি দেওয়ার অর্থ ঈশ্বরকে বলিদান

পুরাণে কথিত আছে রাজা সুরথ স্বর্গগমনের অভীপ্সায় পশুবলি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বর্গে যেতে পারেননি। মাঝপথেই সেই মৃতদের প্রেতাত্মা রাজা সুরথকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আসলে এটা একটা কুসংস্কার মাত্র। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পুজোয় পশুবলির পেছনে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, পুজোয় বলিদান করলে মৃত পশুদের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে চার্বাক প্রভৃতি দার্শনিকরা বলেছেন–প্রতি মানুষই তো স্বর্গে যেতে ইচ্ছুক। স্বর্গগমনের বাসনায় যুগ যুগ ধরে মানুষ তপস্যা করে আসছে। পুজোয় বলি দিলে যদি মৃত পশুরা স্বর্গে যায় তবে ঐ ব্রাহ্মণরা তাদের পিতা-মাতাকে কিংবা প্রিয়জনদের বলি দিয়ে কেন স্বর্গে পাঠায় না?

আসলে বলিদান প্রথা ব্রাহ্মণ্যবাদের একটা ষড়যন্ত্র। সকল জীবই পবিত্র ঈশ্বরের আধার। তাদের মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দর বিরাজমান। জীবকে বলি দেওয়ার অর্থ ঈশ্বরের এক ক্ষুদ্র অংশকে বলি দেওয়া। অনেকে মোহের বশে দেবদেবীর কাছে মানত করে যদি সেই বিপদ থেকে মুক্তি পায় তাহলে সে পাঁঠা কিংবা অন্য কোন জীব বলি দিয়ে তাঁকে পুজো দেবে। এবং দেয়ও তাই। কিন্তু সব জীবের মধ্যে যদি ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করে থাকেন তাহলে জীব হত্যা মানে শিব হত্যা। কোন দেবদেবী কোনদিন নিজেদের হত্যা করার অনুমতি দিতে পারেন না। সকল জীবের মধ্যে তাঁরাই বিরাজ করছেন। সুতরাং তাঁরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন না। তাই পুজোয় বলিদান প্রথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

কল্যাণ মন্ডল
সাহাপুর, ২৪ পরগণা

বলি প্রথা মানা যায় না

বর্তমানে নরবলির পরিবর্তে পশুবলি হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বর্বর বলি প্রথা কিছুতেই মানা যায় না। শাস্ত্রের দিক থেকেও বলি সমর্থন করা যায় না। কারণ–শাস্ত্রে আছে 'যত্র জীব তত্র শিব।' ঈশ্বর মঙ্গলময়। দয়ার সাগর। তার কাছে জীব বা শিবের হত্যা কেন? সৃষ্টি মাত্রই অমৃতের কণা। বলির নামে সেই অমৃতের কণা ধ্বংস করা হবে কেন?

মধু বর্মন
হিংগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা

পশুবলির সপক্ষে

অভিধানিক অর্থে বিভিন্নতা থাকলেও 'বলি' শব্দটি আমাদের কাছে যে অর্থে দ্যোতনা আনে তা হল দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত ও হন্তব্য বা হত পশু। ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে দেখা গেছে সেইসব পশুই বলির জন্য গৃহীত, যেগুলি তুলনামূলকভাবে নিরীহ এবং খাদ্য। বলি-সমর্থকরা বলেন, এটা আসলে দেবতার কাছে মানুষের পশুত্বকে হত্যা করার প্রতীক। হত্যাকারীর খড়গাঘাতে নিরীহ পশুর জীবনান্তিক আর্তনাদ এবং রক্তস্নাত দেবাঙ্গনে যে তামসিক দৃশ্য সূচিত হয়, সেখানে বস্তুত পশুত্ব ধ্বংস হয় না। আসলে মানুষের রসনা চরিতার্থ করার চেয়ে বলির আর কোন মহিমা দান আজ মূর্খতা।

ব্যাপকতর অর্থে বলি হতে পারে যে কোন মানুষ, পশু-পাখি, মাছ ও ফল-ফুল। দেবোৎসর্গই প্রধান বিচার্য। কুমড়া বা বেগুন বলি দেবার প্রথা আমাদের দেশেই আছে। বৈজ্ঞানিক বিচারে সকলেই নীচ। কিন্তু প্রকৃত বিচার্য হল বীভৎসতা বা নিষ্ঠুরতা যা মানুষের নান্দনিক বোধকে পীড়িত করে। নরবলির বীভৎসতা মহিষবলি বা পাঁঠাবলির চেয়ে অনেক বেশি। আবার হাঁস মুরগী বলি বা মাছ বলিতে অভ্যস্ত আমাদের চোখে বীভৎসতা ক্রমশ সহনীয় হয়ে আসে। এবং আমাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রকৃতপক্ষে নির্ভর এরই উপর।

পৃথিবীতে যে কোন মূল্যবোধই আপেক্ষিক। এবং জৈব-প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যেহেতু অধিকাংশ পশুর সংগে মানুষের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক এবং যেহেতু পশু মাংস আমাদের রসনাকে তৃপ্তি দেয় তখন পশুবলির বিরুদ্ধাচারণ করা হল মানুষকে এক অর্থে বঞ্চিত করা। পুজো হল এক-একটি সামাজিক উপলক্ষ। আমরা দরিদ্র মানুষ এইসব উপলক্ষেই একটু সুখাদ্যের জন্য লালায়িত হই। মানুষ তো!

প্রবীর সরকার
পূর্বপুটিয়ারী
২৪ পরগনা

পুজোয় পশুবলির প্রয়োজন আছে

বিয়েবাড়িতে অন্যান্য উৎসবে আমরা মাংস রান্না করে খাই। সেখানে আমাদের বিবেক বাধা দেয় না। যদি জীব হত্যা করে মাংস খেতে বিবেকে না লাগে তবে একটা উৎসবের সময়েও যে বিবেকে লাগবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মাংস যখন বলির মাংস হয় তখনই প্রতিবাদ ওঠে কারণ ধর্ম নামে একটা সংস্কার আছে বলে। এই পূজা বা ধর্মীয় ব্যাপারগুলিকে আর পাঁচটা উৎসবের মত নিছক উৎসব হিসাবে মেনে নিতে অনেকেই পারেন না বলে। আমি ধর্মীয় উৎসবটাকে নিছক উৎসব হিসাবে মনে করি। তাই, জীবহত্যা করে মাংস যদি খেতে পারি বা কসাইয়ের দোকানে মাংস বিক্রি যদি সমর্থন করতে পারি তবে বলি বা বলির মাংস খাওয়াকেও সমর্থন করতে আপত্তি কোথায়? পশু হত্যা হচ্ছে, আমরা জীব হয়ে আরেক জীব খাচ্ছি–এটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা। হ্যাঁ, বলি সমর্থন করি আমি। খালি পাঁঠা বা মোষ বলি নয়, গরু-শুয়োর ইত্যাদি পশুবলি দেওয়া হলেও সেই বলির মাংস খেতে রাজি আছি আমি–কারণ মাংসটা খেতে ভালবাসি। বলি হলেই বা ক্ষতি কি!

দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তী
কলকাতা–৩৩

মাটির প্রতিমা নয় ঃ অন্য প্রতিমা, অন্য শিল্পী

শুভ জোয়ারদার

প্রতি বছর মহাপুজোর প্রস্তুতি পর্বে মৃৎশিল্পের একটি শাখা প্রতিমাশিল্প নিয়ে রুজি-রোজগার করেন দেশের কয়েক হাজার কুমোর। এছাড়াও বারো মাসে তের পার্বণ, আমাদের নানান পুজোতে আরো কিছু প্রতিমা তৈরি হয় কুমোর পাড়ার প্রচলিত ঘরানার বাইরে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, লোকরুচি আর চারুকলার নিখুঁত রসায়নে প্রতিমা তৈরি করে গত দু দশক ধরে যেসব শিলপী বাজারে বেশ হৈ চৈ ফেলেছেন, তাঁরা কিন্তু কেউই কুমোরের ঘরে জন্ম নেননি। বিষয়টিকে নিয়ে বহুদিন ধরে অনুসন্ধানরত এই নিবন্ধের লেখক নিজেও এককালে ভিন্নছাঁদের কিছু প্রতিমা তৈরি করেছেন। কুমোর পাড়ার বাইরে লোকশিল্পের এই ঐতিহ্যময় ধারাটি নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা কিছু প্রতিভাবান শিল্পী ও তাঁদেব পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক শিল্প কর্মগুলি নিয়ে অল্পবিস্তর বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনটিতে।

কুমোর পাড়ার বাইরে যাঁরা প্রতিমা তৈরি করেন, তাঁদের শিল্প কর্মগুলি নিয়ে কলাসমালোচক বা আরটের বোদ্ধারা ইদানিং বেশ একটা আলোচনা শুরু করেছেন। মৃৎশিল্পী হিসাবে জাত কুমোর যারা, তারা ছিলেন এবং থাকবেনও। কিন্তু কুমোর পাড়ার কারিগর না হলেও যেসব শিল্পী কিছুটা পেশাতে আর কিছুটা নেশাতে প্রতিবছর আপন আপন শিল্পভাবনার স্বকীয়তায় বেশ কিছু ঠাকুর তৈবি করেন, সত্যি কথা বলতে কি তা দুচোখ মেলে অপলকে দেখবার মত। এর কারণ হল, কুমারটুলির পালদের থেকে শেখা লোকায়ত কারিগরি দক্ষতার সংগে এঁরা নিপুণভাবে মিশিয়েছেন আধুনিক চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যেব ছন্দ। কুমোরদের সংগে এদের মূলগত তফাৎ শুধু বিষয়-বৈচিত্র্যে নয়, আঙ্গিকেও। কুমোররা পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া সহজাত শিল্পপটুত্বকে মূলধন করে প্রধানত জীবিকার প্রশ্নে প্রতিমা তৈরি করেন। এমনকি অরডার না পেলে অন্য কোন মাটির কাজেও হাত লাগান এরা। এইসব শিল্পীরা কিন্তু প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র শিল্প-সৃষ্টির তাগিদেই হাতে মাটি নিয়ে প্রথাগত শিল্পমাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ব্যাকরণগত শিল্প-শিক্ষাকে মূলধন করে। এখানে পেশার চেয়ে নেশা বা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারটাই প্রধান। পরে মাধ্যমটিতে দখল এসে গেলে নেশা আর পেশা অবশ্য এক হয়ে যায়।

বাংলার প্রতিমা-শিল্প ব্যাপারটা পুরোপুরি লোকশিল্পের ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। শৈশব অবস্থা থেকে ক্রমশ পরিণত হওয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যমের পুনরায় আপন সৃষ্টিকর্তা বা উৎসের কাছে ফিবে আসাটা স্বাভাবিক। ৫০-এর দশকে শুরু করে, বিশেষ করে ৭০ এর দশকের প্রতিমা তৈরিতে প্রভাবিত হয়েছেন কুমোর ও অ-কুমোর মৃৎশিল্পীরা, শিল্প-আবর্তনের সূত্র অনুসারে। প্রথাগত শিল্পীদের থেকে অ প্রথাগতরাই এর দ্বারা বেশি প্রভাবিত। কারণ তাঁরাই প্রাথমিকভাবে পয়সার কথা ভাবেন না এবং নানান কিসিম একসপেরিমেনটে সদাই উৎসাহী।

ইদানিং মৃৎশিল্পে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্প প্রয়োগ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিষয়টা এমন এক জায়গায় পৌছে গিয়েছে যে, ব্যাপারটা আর নিছক খড়-মাটি-রং সাটিনের ঠাকুরের মধ্যে আবদ্ধ নেই। হালেবিড বা হোয়েশল রীতিব ভাস্কর্য দেখার অবিকল্প তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছু মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তি দেখে। সনাতন একচালা বা পটরীতির টানা টানা চোখের প্রতিমা ৫০ এর দশকের কিছু আগে ভেঙে ভেঙে স্বাধীন কাঠামোতে হয়েছে 'আরটের ঠাকুর'। কুমারটুলির জি পাল মশাই প্রথম কুমোর পাড়ার প্রথা ভেঙে প্রতিমাকে 'আধুনিক' করে তুলেছিলেন ৪০ দশকের গোড়ার দিকে। ইনি আমাদের প্রথম উপহার দিয়েছেন 'পুতুল পুতুল' ভাব ছেড়ে দেবীর 'মানবী' সদৃশ মুখ। আর চালচিত্রের হরপার্বতীর রানিং পট অংকন বাতিল করে নাটকের সেটের ধরনে ত্রিমাত্রিক-জ্যামিতিক মণ্ডন আলিপন হাজির করে রমেশ পাল মশাই এক সময়ে যথেষ্ট আধুনিক ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এর পরে ৬০ এবং ৭০-এর দশকে প্রতিমা শিল্পকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করেছে সারা ভারতে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক প্রস্তরমূর্তিগুলি এবং মন্দির স্থাপত্য। কুমারটুলির এন সি পাল এই ধারায় প্রথম পথিকৃৎ। এই সময়ে আমরা বেলে পাথর, কাদাপাথর, মারবেল বা গ্রাফাইট পাথর এমনকি কাঠ খোদাই-এর এফেকটেও আদতে মাটির মূর্তি দেখেছি। আর যে শিল্পরীতিটি আধুনিক প্রতিমা তৈরিতে মদত যুগিয়েছে, তা হল-অবন ঠাকুর তথা নন্দলাল বসুর অনুসৃত খাঁটি ভারতীয় চিত্রশ রীতি। বলাই বাহুল্য এর সবকটা প্রকাশই পরে আমরা বেশি দেখতে পেয়েছি, নবাগত প্রথাবিহীন শিল্পীদের শিল্পকর্মতে। আর এক দল শিল্পী পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে এতটা এগিয়েছেন যে মাটি ছেড়ে তারা বাঁশ, বেত, সোলা, টেরাকোটা, নারকেল ছোবড়া, তার, পাট কাগজমন্ড ইত্যাদি অনুষঙ্গে মনোনিবেশ করেছেন। এদের মধ্যে অনন্ত মালাকারের সোলার, অমল-কারকের বাঁশ ও ঝিনুকের, 'কর্মীবৃন্দের' বেতের, নারকেল ডাঙা নরথ রোডের জনৈক তার-শিল্পীর তারের ও পুবীর ব্যাপারীর নারকেল ছোবড়ার কাজ সত্যিই যাদুঘরে চিরকালীন সংরক্ষণের বস্তু। এতৎসত্ত্বেও মৃন্ময়ীমূর্তির কদর কিন্তু মোটেই কমেনি, যদিও শিল্পীরা ভিন্ন মাধ্যমে তাঁর রূপ সার্থকভাবেই দিতে পেরেছেন। আর একটা কথা, সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে যে প্রতিমা মূর্তিগুলি সরকার, নানা সংগঠন, আপামর জনসাধারণ এবং সর্বশেষে শিল্পগবেষক সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে, সেগুলির সবকটাই লাগাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাব ফল এবং ভাস্কর্যের ছন্দসুষমায় নন্দিত। অর্থাৎ বর্ণবহুল বাহারী শরীর আর সাটিন কাপড় ছেড়ে আমাদের চোখ এখন নরম একরঙা পাথুরে মূর্তির ধাঁচে প্রতিমা দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছে।

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে খড়দহের শিববাটি পাড়াতে ললিত দাস নামে এক ভদ্রলোককে দেখেছি ভাস্কর্যের ধরনে একরঙা দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করতে। প্রতিমা শিল্পের পীঠস্থান কুমারটুলির কারিগরদেরও দেখেছি ললিতবাবুর স্টুডিওতে এসে টেকনিকাল টিপস বা নো-হাউ নিয়ে আলোচনা করতে। তাঁর তৈরি প্রতিবছরের প্রতিমাতে থাকত নতুন নতুন ভাস্কর্যরীতির মৃন্ময় অনুবাদ।

আর একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ রীতিতে ঠাকুর গড়তেন। তবে শংকরবাবু শুধু সরস্বতী মূর্তিই গড়তেন এবং সেটা নিজ স্কুলের জন্য। কলকাতা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের এক মফস্বল টাউনের স্বভাব শিল্পীদের প্রতিমা যে সে সময়ের শিল্পরসিক ও জাতকুমোরদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল, তা আব কারোর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিমা তৈরির মৌল উপকরণ বাঁশ, কাঠ, খড়, সুতালিদড়ি, মাটি– এগুলো গ্রাম বাংলার সর্বত্রই সুলভে পাওয়া যায় বলে বাংলার কোণে কোণে পেশাদার প্রতিমা শিল্পীদের থেকে স্বভাব শিল্পীদের সংখ্যা বড় কম নয়। আর এদেব মধ্যে যে কয়েকজনের কাজ নির্দিষ্ট শিল্পকর্মটিতে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে তারা হলেন, শালকিয়ার অমল কারক, মানিকতলা স্ট্রিটেব বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারটুলির অলক সেন, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের অশোক ভট্টাচার্য, কাঁকুড়গাছির মিন্টু আচার্য, বনগ্রাম রেল বাজারের সুশীল সরকাব, পাতিপুকুরেব সুনীল পাল, বেলঘরিয়ার প্রবীর ব্যাপারী, মানিকতলা খাল ধারের অশোক বিশ্বাস ইত্যাদি নামী এবং নাম-নাজানা কয়েকশ শিল্পী। বলাই বাহুল্য সকলের কাজ এবং সৃজনক্ষমতাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া এ প্রতিবেদনে সম্ভব নয়।

মাটি ও মাটি ছাড়া ভিন্ন উপকরণে যে শিল্পী এবং শিল্প সংগঠনটি প্রতিমা তৈরি করে কয়েক বছরের মধ্যেই বাজারে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন, তাঁদের কাজকর্ম বা শিল্পমনস্কতার অল্পবিস্তর পরিচয় এবারে একটু তুলে ধরছি। শিল্পবোধ ও নিরলস অভ্যাস একজন মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা এদের কাজ না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। শিল্পরসিক যে কেউ একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন কলকাতার নামকরা আরটের ঠাকুরগুলি তৈরি করেছেন এইসব কুমোর পাড়ার বাইরের কারিগররা। মাটি ছাড়া অন্য উপকরণে কেউ কেউ বেশ কয়েবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা আবার মাটিতেই ফিরে এসেছেন। কারণ শিল্পীর শেষ অস্ত্র আঙুল, মাটির বুকে যেমন অবাধে আলপনা আঁকে, অন্য মাধ্যমে বুঝি তেমন সড়গড় নয়। এই সমস্ত অ-কুমোর শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই শিল্পশিক্ষার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন 'আরট-কলেজের' চৌহদ্দির মধ্যে। মূলত শখ আর তৃপ্তির কারণে সারা বছরে এক-আধটা কাজ নিয়ে এরা নাম করেন প্রতিমা তৈরি করে যে শিল্পী শুধু মাত্র বিদগ্ধ শিল্পরসিকদের নয়, খোদ কুমোর পাড়াতেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছেন, তিনি হলেন উত্তর কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলের বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনডিয়ান আরট কলেজের ছাত্র ৩৯ বছরের এই অকৃতদার যুবকটি মৃৎশিল্পের মাধ্যমকে এত সহজেই দখল করেছেন যে, অবনীন্দ্রনাথের ওরিয়েনটাল আরট, দক্ষিণ ভারতীয় চোল শিল্প বা উত্তর-পূর্ব ভারতের গান্ধার শিল্পের ভাস্কর্য-সুষমা অবলীলায় ছাপ ফেলেছে এর কাজের মধ্যে। পর পর কয়েকবার মাটির প্রতিমাতে ঝিনুক, মুক্তো, নানান জাতের পাথর বা কাঠের ফাইবারের বিরল এফেকট ইনি গোটা শিল্পকর্মতে এমন একটা মাত্রা যোগ করেছেন যে, সাধারণ মানুষ থেকে বিদগ্ধ শিল্পরসিক পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বিস্ময়ে মুগ্ধ হন, সেই অপূর্ব দেবীমূর্তি দেখে।

দক্ষিণ কলকাতার একটি খ্যাতনামা ক্লাব কয়েক বছর ধরে একটি অভিনব ব্যাপার করে চলেছেন। মৃৎশিল্পীদের পরিশ্রম আর পটুত্ব এবং চিত্রপটশিল্পীদের অঙ্কন-পরিকল্পনার মিশেলে এরা শিল্পরসিকদের কাছে বেশ কিছু মূর্তি হাজির করেছেন। নীরদ মজুমদার, শর্বরী রায় চৌধুরী, মীরা মুখোপাধ্যায়, শানু লাহিড়ী, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি বিখ্যাত আঁকিয়েদের উদ্ভাবনী শৈলী আর মূলত জাতকুমোর প্রফুল্ল পালের আঙুল তুলির কারিগরিতে আমরা যে প্রতিমাগুলি পেয়েছি, তা বলাই বাহুল্য, কুমোর পাড়ার ঘরানার থেকে ভিন্ন ছাঁদের। অবশ্য একথা ঠিক যে, এই সিরিজের মূর্তিগুলির মধ্যে ভাস্কর্যের থেকে চিত্রশিল্পের আবেদন বা রসটিই মুখ্য। তবে ক্লে মডেলিং-এর আদি চেহারা বাংলা প্রতিমা শিল্পে যে এর ফলে বেশ একটা ধ্রুপদীআনার মেজাজ এসে গিয়েছে সে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নেই। অভিজাত রীতি ও লোকরীতির দুই ধারাকে একটি কাঠামোতে সার্থকভাবে মিশ্রণের ব্যাপারটিতেই এর অভিনবত্ব।

কর্মীবৃন্দের বাঁশের তৈরি প্রতিমা: সালারজং যাদুঘরে

কুমোর পাড়ার প্রচলিত রীতি আর উপকরণের বাইরে এই দশকে যতগুলি প্রতিমা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে উত্তর কলকাতার ডোমপাড়া অঞ্চলের 'কর্মীবৃন্দে'র কথা না বললে বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে না। যদিও এদের শিল্পকর্মটি মৃৎশিল্পের আওতায় পড়ে না, তবুও প্রাচীন ভারতের মন্দির স্থাপত্যের মত ধ্রুপদী শিল্পটিকে এরা বাংলার আর এক লোকশিল্প বাঁশ-বেতের উপকরণে এতই সাবলীলভাবে উপস্থিত করেছেন যে দেখলে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। যদিও বাঁশ বেতের কারিগরদের নিয়ে তৈরি সমবায় ধাঁচের এই সংগঠনটি প্রতিমার থেকে এ যাবৎ প্রতিমার মণ্ডপই বেশি তৈরি করেছেন, তবুও সম্পূর্ণ বাঁশ অথবা বেতকে কেটে, ছুলে, খোদাই করে এবং কোথাও কোথাও জুড়ে যে অপূর্ব দেবীমূর্তি এরা কয়েকবার তৈরি করেছেন তা ইতোমধ্যেই আপামর জনসাধারণ শিল্পরসিক ও সংবাদপত্রের শিল্প-সমালোচকদের কাছে ব্যাপকভাবেই সমাদৃত হয়েছে। এদের শিল্পপটুত্বে টানটান বেশ কিছু কাজ ও প্রতিমা স্বদেশের ও বিদেশের যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এবছরেই এদের করা সম্পূর্ণ বেতের তৈরি একটি পূর্ণ উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমা সুদূর আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। 'কর্মীবৃন্দ' একটি সমাজ-কল্যাণকর সমবেত প্রয়াস মাত্র। তাই কোন ব্যক্তিবিশেষের শিল্প নৈপুণ্যে নয়, একটি গোষ্ঠীর কলা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এদের প্রতিটি শিল্পসৃষ্টিতে। সংগঠনের নেতা জীবনকৃষ্ণ ঘোষালের অভিভাবকত্বে আর বেতারশিল্পী সুনীল পাত্রের শিল্প নির্দেশে প্রায় ৫০/৬০ জন লোকশিল্পী অনুক্ষণ কাটারি, ছুরি আর নরুন নিয়ে অবলুপ্তপ্রায় এই শিল্পধারাকে টিকিয়ে রাখতে কর্মরত আছেন এই কর্মযজ্ঞাগারে। স্থানীয় অঞ্চলে এরা 'ডোম' বলে অভিহিত কিন্তু তার জন্য কারোর শ্রদ্ধা কুড়োতে অসুবিধা হয় না।

'কর্মীবৃন্দে'র তৈরি বেতের প্রতিমা

সনাতন ধারার বাইরে কিছু করার এই প্রয়াসগুলি আখেরে কোন দিকে যাচ্ছে–ইতি না নেতির দিকে, সে বিচারের ভার আমরা নিতে পারি না। এ দায়িত্ব বর্তাবে আগামীকাল বা কলা-ইতিহাসের ওপর। আমরা শুধু দেখতে পারি লোকরুচির প্রেক্ষাপটে তা কতটা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হচ্ছে। তবে মূর্তিশিল্পের প্রচলিত গতি থেকে বেরিয়ে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এই ঝোঁকটির উৎস খুঁজতে গেলে এর বিজ্ঞানসম্মত অনিবার্য দিকগুলির কথা আমাদের ভাবতেই হয়। বেশি সন্ধানসুলুকের দরকার নেই, একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে এই ধবনের ঝোঁককে অবিরাম উৎসাহ দিয়ে চলেছেন মূলত পশ্চিমবঙ্গের কিছু বারোয়ারি পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। প্রতিমা-তৈরি মাধ্যমটিতে স্বভাবিক দখল থাকার কারণে অনেক শিল্পীর হয়ত সাহস, আত্মপ্রত্যয় বা ঝুঁকি নেবার মানসিকতা আছে। কিন্তু সেগুলি হাতে কলমে নামানর জন্য যে আর্থিক সহযোগিতার দরকার সেটা শিল্পী পাবেন কোথায়, কেউ তাকে পৃষ্ঠপোষকতা না করলে? □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

জমিদার বাড়ির প্রতিমা থেকে রমেশ পাল ঃ দীর্ঘ কাদামাটির পথে অনেক লড়াই

অরূপ বসু

খন্ড বাংলার দুঃস্বপ্ন তখনও কেউ দেখেনি। দুর্গা পূজা হত মূলত জমিদারদের বাড়িতে বাড়িতে। ইংরেজের মোসায়েবি করে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা বাঙালিদের উঠোনে দেবীপক্ষের ঘট সবে বসতে শুরু করেছে।

আষাঢ়ের রথের চাকায় চক্কর লেগেছে। গম্ভীর ফ্যাকাসে আকাশ। কর্দমাক্ত পথ ঘাট। সেই কাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে গরুর গাড়ি দুয়োরে এসে দাঁড়ায়। ছোটকর্তার কাছে হাতজোড় করে নিজের পরিচয় দেন পাল মশাই। পরদিন থেকে শুরু হবে কাঠামো বাঁধা।

প্রতিমা নির্মাণে চিরকালীন বন্দোবস্ত এই পালেদের সংগে। তিনমাস জমিদার বাড়ির ভাত। আর বাকি ন,মাস ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, হাওড়া ও নদীয়ায় নিজের ঘরে দারিদ্রের দাওয়ায় জমিদারের দয়ার দিন গোনা।

তখন কৃষ্ণনগরের পালেরা হাত পা ছড়াচ্ছে নদীয়ায়। মাটির শরীরে ভাষা বোনায় তাদের হাঁকডাক সবচেয়ে বেশি। 'এর অবশ্য কারণ আছে', আমাকে কথাটা বলেছিলেন গোরাচাঁদ পাল, 'গংগা মোহনার এঁটেল ও বেলে মাটিতে মায়ের শরীর যত সুন্দর করে বাঁধা যায়, অন্য কোন মাটিতে তা হয় না। ভারতে তো দূরের কথা, পৃথিবীতে এমন মাটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঐ জন্য কৃষ্ণনগরের মত মডেলিং আর কোথাও পাবেন না।' যুক্তিটা অকাট্য না হলেও ভাববার মত।

মাটি ছাড়াও, কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের একটা মৌলিক গুণ আছে, তা হল বাস্তব দৃশ্য নির্ভর কাজের গতিপ্রকৃতি।

মডেল শব্দটা তখন কোট প্যানট ছেড়ে কাদা মাখেনি। লোকে বলে পুতুল। এই পুতুল বানিয়েই বচ্ছর কাটত পালেদের। আর সে ব্যাপারে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের হাতে ছিল যাদুর ছোঁয়া।

দুর্গা প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপারে পালেরা কিন্তু ছিল হাত পা বাঁধা। গর্বিত ধনাঢ্যের সামনে মূর্খ ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রতিমার যে রূপ বর্ণনা করতেন, অচ্ছুৎ পালেদের দুরন্ত আঙুল মাটির বুকে তাকেই মূর্ত করত।

তখন একচালির ঠাকুর হত

সিংহবাহিনীর বাঁ পা অসুরের কাঁধে। সিংহের থাবার তলে মহিষ। দেবীর চোখ আকর্ণ বিস্তৃত। বাঁশ পাতার মত ভুরু। থুতনি আমের কুশির মত। টিয়া পাখির ঠোঁটের মত নাক। ইত্যাদি। কার এমন সাহস আছে যে এর অন্যথা করে!

দেবী কিংবা দেবী বাহনের অংগ হানির ব্যাপারে পুরোহিতরা ছিলেন খুবই কঠোর। জমিদারের নির্দেশে তাঁরা আবরণ উন্মোচন করে প্রতিটি অংগ, প্রতিটি প্রত্যংগের নিখুঁতত্ব পরখ করতেন। পরখ করতেন দেবীর স্তন ষোড়শীর ন্যায় উদ্ধত কিনা। মত পার্থক্যে দেবী তখন তপ্তকাঞ্চন, শিউলিবৃন্ত, কিংবা অতসীপুষ্পবর্ণা। এই বর্ণ মেলানোতেই কৃষ্ণনগরের কারিগরদের কৃতিত্ব নিখুঁত ব্যালানসে।

ব্যালানস বলতে বোঝায় দুর্গার সব হাতের মধ্যে সমান ব্যবধান। লক্ষ্মী, সরস্বতী কিংবা কার্তিক গণেশের সমদূরত্বে অবস্থান। ব্যালানস মানা খুব কঠিন বলেই এখন তা আর মানা হয় না।

এত ধরা বাঁধার মধ্যেও শিল্পী মনের ছাপ থাকত চালির গঠনে, দৃশ্যরচনায়, বর্ণের বৈভবে। চালির গায়ে নকল গাছে সত্যিকারের সোনার পাতা, ফুল, ফল লাগিয়ে দিতেন কোন কোন জমিদার।

নগর কলকাতা স্বাস্থ্যবান হবার সংগে সংগে, বিদেশ বিভুঁই থেকে জমিদাররা ছুটে এসে গড়ে তুলতে থাকেন বৈভবের বসত। সেটা হয়ত অন্য অধ্যায়, অন্য প্রসংগ। তবু একথা ঠিক যে তখন থেকেই দুর্গা পুজো কলকাতায় উঁকিঝুঁকি মারছে। ডাক পড়ছে দেশ গাঁয়ের কুমোরদের।

ভাগীরথীর চেয়ে বেগে ছুটছে সময়। বাবুদের পুজো যখন শহরেই হবে, কুমোররাও কাঁহাতক দৌড়ঝাঁপ করতে পারে! বাঙালিবাবুদের বনেদি পাড়ার কাছেই গড়ে উঠল কুমোরদের নিজস্ব পল্লী কুমোরটুলি। শহরের এই পতিত অঞ্চলে অল্প ভাড়ার ঘরে বোঝাই করা থাকত মায়ের মুখের ছাঁচ। তখন রথের দিনে কাঠামোয় হাত পড়ত, মহালয়ায় শরীর গড়া শেষ।

তিরিশের দশকের গোড়ায়, কলকাতার দুই নামজাদা শিল্পী জি পাল ও এন সি পাল। জি পাল সাগর পারের ডাক শুনে কুমোরদের সমাজে অচ্ছুৎ হয়েছিলেন। কিন্তু এন সি পাল সে ঝুঁকি নেননি।

অচ্ছুৎ শিল্পীকে যখন জমিদাররা ডাকবেই না, তখন ঝুঁকি নিতে ভয় কীসের? প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কুমোরটুলির বারোয়ারি পুজোয় জি পাল প্রথম প্রথাবিরুদ্ধ প্রতিমা গড়লেন। একচালির বদলে পৃথক পৃথক ঠাকুর। প্রতিমা নির্মাণে দেখা গেল রিয়ালিজমের ছোঁয়া। পশুগুলোকে দেখে মনে হল যেন জংগল থেকে বেরিয়ে এসেছে। গণেশের পায়ের কাছে ইঁদুর বা শিবের গায়ে জড়ান সাপও যে প্রতিমার এক একটি প্রয়োজনীয় অংগ, জি পালই প্রথম তা দেখালেন। কাদা ঘাঁটা মানুষদের শিল্পীর স্বীকৃতি এনে দিলেন।

সেদিন সবচেয়ে বেশি সাহস পেয়েছিলেন হয়ত এন সি পাল। পরের বছরই তিনি অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকরণে প্রতিমা বানালেন। প্রতিমা নির্মাণের জগতে ওরিয়েনটাল আরটের শুরু সেই থেকে।

পরবর্তী শিল্পীরা 'চন্ডীর' বর্ণনা অনুসারে প্রতিমা নির্মাণ করতে শুরু করলেন। শিল্পীদের ভাষায় 'চন্ডী' হল ধ্যান। এই ধ্যান অনুসারী প্রতিমা ইনডিয়ান আরট বলে শিল্পী মহলে স্বীকৃত হল।

ইনডিয়ান আরট কিংবা ওরিয়েনটাল আরট সব ধরনের ঠাকুরকেই বলা হত আরটের ঠাকুর। আর একচালির ঠাকুরকে 'বাংলা ঠাকুর বলা হত।

বিনয়-বাদল দিনেশ বাগে অনেকেই এক সশস্ত্র রাজপুরুষের মূর্তি দেখেও দেখেন না। এই মূর্তির নির্মাতা জি পাল। প্রতিমা নির্মাণের জন্য তিনি একটি ইনসটিটিউশন গড়েছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজের শিল্প ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। হঠাৎ মারা যাওয়ায় জি পালের অনেক আশাই অপূর্ণ থেকে যায়।

রাজেন মল্লিকদের বাড়িতে তখন পাথরের অসংখ্য মডেল। পুরুষানু

ক্রমে সেসব সংস্কার করতেন অধর পাল। পুত্র যতীনকে তিনি জি পালের কাছে প্রতিমা শিল্পরীতি রপ্ত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

কুমোরটুলির ঠাকুর বানানর জন্য এন সি পাল ডাক পেয়েও পিছিয়ে যান। দায়িত্ব নেন যতীন পাল। দর্শকরা খুঁজে পায় জি পালের হাতের নিখুঁত ছোঁয়া যতীন পালের ঠাকুরে।

সেটা ১৯৫০ সাল। প্রতিমা শিল্পের যুগ সন্ধিক্ষণ। জি পালও কখনও দেবীর মুখের গঠনে কোন পরিবর্তন আনতে সাহস পাননি। 'চণ্ডী'র পৌরাণিক বিশ্লেষণ, অবন ঠাকুর ও নন্দলালের শৈল্পিক চেতনা এবং যৌক্তিক পারিপার্শ্বিকতা তরুণ শিল্পী রমেশ পালকে দেবীর রিয়ালিসটিক মুখ বানাতে সাহস যোগায়। কথা প্রসংগে একবার রমেশবাবু বলেছিলেন, 'শরীর' অনুসারে মুখ হবে না, মুখ অনুসারে শরীর হবে। রমেশ পাল প্রতিমা শিল্পকে রাতারাতি অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব এনে দেন।

ঠাকুরের পেছনে এখন আর চালির প্রচলন নেই। শোলার সাজেরও এখন রমরমা বাজার। চালির বদলে ফ্রেমের ব্যবহার কিংবা শোলার অলংকরণ, সবই রমেশ পালের অবদান।

১৯৫৩ সালে একই সংগে রমেশ পাল ইনডিয়ান ও অরিয়েনটাল আরটের ঠাকুর বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ফায়ার ব্রিগেডে ঐতিহাসিক বরাভয়দায়িনী ও সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে (তখন সেনট জেমস স্কোয়ার) হিমালয়কন্যা যে একই শিল্পীর সৃষ্টি তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। কী আভরণে, কী নিরাভরণে তিনি হয়ে উঠলেন সব্যসাচী। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, দেবীমূর্তি নির্মাণে অত্যন্ত সজাগ থাকায় তাঁর সৃষ্ট পশুচরিত্রে রিয়ালিজিমের যথেষ্ট ফাঁক থেকে যায়।

এই ফাঁক পূরণ করেন ষাটের দশকে গোরাচাঁদ পাল। সদর্থে রিয়ালিসটিক ঠাকুর যে কী তা তিনিই নির্মাণ করে দেখান। তাঁর সৃষ্ট প্রতিমার চরিত্র খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেকটি মডেল এখানে সজীব। বিশেষত পশুচরিত্র সৃষ্টিতে তিনি জি পালকে স্মরণ করিয়ে দেন। যদিও তিনি জি পালের কাজ দেখেননি।

দেশ বিভাগের পর ছিন্নমূল যেসব শিল্পী এপারে এসে ঘর বাঁধেন গোরাচাঁদ পাল তাঁদেরই একজন। তখনও ওদিকের শিল্পীরা কল্কে পাননি। রমেশ পাল ফরিদপুরের হলেও তাঁর লেখাপড়া, কাজ কারবার এপারেই। তিনি এই ধরনের সংকীর্ণতার মধ্যেও নিজেকে বিশেষ জড়াতে চাননি।

ওদিকের কাজ ছিল মূলত বাংলা গড়নের ঠাকুর। প্রথমদিকে গোরাচাঁদ পালও এর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু শিল্পী বলেই বোধ হয় প্রতিমা নির্মাণে বিবর্তনের ধারাটি বুঝে নিতে তাঁর দেরি হয়নি।

সম্ভবত ১৯৬২ ৬৩ সালে কুমোরটুলির মডেল প্রদর্শনীতে একটি মুচি বানিয়ে তিনি আসর জাঁকিয়ে বসেন। গোরাচাঁদ পাল কাজ শেখেন পূর্ববংগে মামার কাছে। হাত পাকান কলকাতায়। ধ্যান-ফ্যান অত শত বোঝেন না। শুধু বোঝেন, প্রতিমা কীভাবে নির্মাণ করলে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অসুর ও মহামায়ার যুদ্ধ বর্ণনাকে নানাভাবে ধরে রাখাই তাঁর লক্ষ্য। এমনকি উপযুক্ত মঞ্চ পরিকল্পনাও তাঁর নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। রমেশ পাল যেমন শোলার অলংকারের প্রচলন করেন, গোরাচাঁদ পাল তেমনই করেন কাগজ ও রাংতার অলংকারের প্রচলন। বহুবর্ণ এইসব অলংকার শিল্পী নিজেই বানান।

গোরাচাঁদ পালের আগে কেউ এতটা নিখুঁত পশুচরিত্র গঠন করতে পারেননি। তিনি সত্যেন পোদ্দারের চিত্রের অনুকরণে বর্ণমহিষ বা বাইসনের ব্যবহার করেন। এখন মহিষের চেহারা বর্ণনায় যে কোন শিল্পী তাঁকে অনুসরণ করছেন। আমেরিকান সিংহের ছবির বই দেখে নানা ভংগিমায় সিংহ তৈরি করেন। সিংহ যে মুখব্যাদান করলে চোখ বুজে আসে, জিভ উল্টে যায়, মাংসপেশীর স্তরবিন্যাস ঘটে তা তিনিই প্রথম দেখালেন।

আরও অনেক ব্যাপারে গোরাচাঁদ পাল পথিকৃৎ। দুর্গা প্রতিমার রিলিফের কাজ তাঁর হাতেই প্রথম। কেবল একটিমাত্র রঙের ব্যবহারে দুর্গা প্রতিমা যে কতটা দর্শনীয় হতে পারে তাও তিনি প্রথম দেখিয়েছেন। কখনও ধূসর, কখনও হালকা সবুজ, কখনও বা বিস্কুট রং।

দুর্গা প্রতিমার সংগে অন্যান্য দেব দেবী, পশুচরিত্র কে কোথায় থাকবে তার একটা নির্দিষ্ট ফরম আছে। এমনকি দেবীর ভংগিতে, অস্ত্র সজ্জায় পর্যন্ত। এ সবকিছুকে এলোমেলো করে দিলেন গোরাচাঁদ পাল। নিয়ে এলেন রণাংগনের সামগ্রিক বিশৃংখলা। কখনও প্রস্তর খণ্ড হাতে ধাবমান অসুর। কখনও বা সাঁতরে পালাচ্ছে অসুর। কখনও সিংহকে মহিষ আক্রমণ করেছে। আবার কোথাও অসুরকে গণেশ। উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ স্পোরটিং ক্লাবে একবার রাজ প্রাসাদে তিনি এই রণাংগনের উপস্থাপনা করেন। তখন লক্ষ্মী সরস্বতীকেও রণোন্মত্তারূপে দেখা গিয়েছিল। এর প্রত্যেকটি রূপ সৃষ্টিতে তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন, প্রাসাদের ভাঙা চোরা অলিন্দেও তা ধরা পড়ে।

অসুর নির্মাণে কখনও তিনি রোমান গ্ল্যাডিয়েটর, কখনও গ্রীক যোদ্ধাকে অনুকরণ করে সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। অথচ যতদূর জানি ফরম ভাঙার প্রথম দুর্বল প্রচেষ্টা রমেশ পালের হাতেই। অসুর সাধারণত দেবীর বাঁদিকে থাকে। রমেশ পালই প্রথম ডানদিকে অসুরকে বসান। হিমালয়-কন্যার রূপ কল্পনায় রমেশ পাল যে অসুর বানান, তার সংগে ইটালীয় মডেলের হুবহু মিল ছিল।

যা হোক দুর্গা প্রতিমার বিবর্তনে গোরাচাঁদ পাল সবচেয়ে বড় বিবর্তক। তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত।

দুর্গা প্রতিমার বিবর্তনে আর একটি ধারার সূচনা করেন চিত্রকররা। পঞ্চাশের দশকে তেইশ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসবে নন্দলালের স্কেচকে মৃন্ময়ীতে রূপান্তরিত করেন। দুই ভাই যতীন ও জিতেন পাল। বিক্ষিপ্ত হলেও বিবর্তনের এই ধারা আজও কিছু কিছু শিল্পীর কাজে বর্তমান। গৌরীবাড়ি সর্বজনীনে তরুণ শিল্পী অনিল পাল সত্যেন পোদ্দারের চিত্রানুসারে গতবারও মূর্তি বানিয়েছেন।

সত্তরের দশকে আর এক বিবর্তন আনেন দক্ষিণ কলকাতার বকুল বাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব। বিশ্ব-বন্দিত বাঙালি চিত্রকর ও ভাস্করদের দিয়ে মাটি ঘাঁটার কাজ করান হয়। নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, মীরা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চিত্রকর ও ভাস্করেরা এই ধারার সার্থক সূত্রধর।

বক্তব্যের দিক থেকে বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন সত্তরের দশকে অশোক গুপ্ত। বাগবাজারের কাছে জগৎ মুখারজি পারকে রিলিফের সাহায্যে লাল ও সবুজ রঙের ব্যবহারে তিনি চলমান জীবন যন্ত্রণার রূপক করে তুলেছেন দেবী মূর্তিতে। অসুর এখানে শোষক, আর দেবী শোষিতের বরাভয়। যা সূর্যের মত সত্য ও সতেজ, যা অনন্ত ও অবিনশ্বর। যার স্ফুরণ শোষিতের সামগ্রিক তেজে। সিংহ অভারতীয়। তাই দেবীর বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাঘ, সূর্য কিংবা প্রস্ফুটিত গোলাপ। শোনা যায়, ভাস্কর সুনীল পালই নাকি বক্তব্যমুখী এই ধারার প্রবর্তক।

সুনীল পাল থেকে নীরদ মজুমদার কেউই প্রতিমা শিল্পের বিবর্তনে বলিষ্ঠ কোন সংযোজন নয়। কেননা প্রতিমা শিল্প হচ্ছে ইমেজ মেকিং। যার গোড়ার কথা ফারসট রিপ্রেজেন্টেশনস, দেন ক্যারেকটর, দ্যাট ইজ টোটাল ইমেজ।

তবে একথা ঠিক, পৃথিবীর কোন শিল্পই কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকেনি চিরকাল। প্রতিমা শিল্পও থাকছে না। পালেরা ছাড়াও আজ এই শিল্পলোকে অলোক সেন, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্যের মত জ্যোতিষ্কের উদয়।

এন সি পালের বংশধররা ইতিহাস থেকে মুছে গেছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘদিনের কারিগর কালী পালের যে মূর্তিটি রবীন্দ্রকাননে পুরস্কৃত হয়েছিল, তা কি এন সি পালের ওরিয়েনটাল আরটেরই ধারা নয়? প্রায় পনের বছর যাবৎ অসুস্থ শিল্পী যতীন পাল মাটি ধরেননি। অথচ আমরা জানি আশি ও একাশিতে কলকাতার সেরা ঠাকুর যতীন পাল নির্মিত বালীগঞ্জ কালচারের দুর্গা প্রতিমা। যতীন পালের নামে ঠাকুর বানান আসলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র গণেশচন্দ্র পাল।

প্রায় দশ বছর হল কুমোরটুলিতে পা রাখেননি গোরাচাঁদ পাল। অথচ তাঁর ঠাকুরের গঠন শৈলীর তো কোন হেরফের হয়নি। গৌরচন্দ্র পাল ও নারায়ণ পালের হাতে বাবার কাজ হুবহু বসে গেছে। এ হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা। পুঁথিগত বিদ্যা এখানে নিষ্ফল।

সেকালে রামচন্দ্র কিংবা একালে তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ, সবাই শারদীয়ার অর্চনকালে দেবীর মহালক্ষ্মী রূপকে বেছে নিয়েছেন। যুদ্ধ তখন শেষ। শূলবিদ্ধ অসুর। ত্রিলোক প্রসন্ন। বরাভয়দায়িনী দেবী, আভরণ-বিভূষিতা, হেমবর্ণা দেবী ক্ষৌমবসনা। চোখে মুখে যুদ্ধ শেষের শান্তি। আবার সন্তান হননের ব্যথা। চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীর এই মূর্তি রূপায়ণ খুবই কঠিন। সব শিল্পীই তাই দেবীর রণরঙ্গিনী রূপ বেছে নিয়েছেন। একটি মাত্র মূর্তি ছাড়া গোরাচাঁদ পালও এর ব্যতিক্রম নন। ব্যতিক্রম একজনই, তিনি হলেন রমেশ পাল। তিনি সর্বদাই তাঁর সৃষ্ট মৃন্ময়ীতে শৌর্যে সুন্দর, সাহসে স্নিগ্ধ মাকে ধরার চেষ্টা করেছেন।

সদর্থে রমেশ পাল ছাড়া 'চণ্ডী' বর্ণিত দেবী মূর্তি কেউই গঠন করতে পারেননি। গোরাচাঁদ দেবীকে মানবী করেছেন। রমেশ পাল করেছেন মানবীকে দেবী। দুধারার বহমানতাও এখন সম্ভবত একধারায় এসে মিশছে। □

আপনার মণিবন্ধের নতুন মণি—টাইমস্টার!

টাইমস্টার ঘড়ি। যেন একের চেয়ে আরেক সরেস এক একটি মণি। তা সে ডে-ডেট অটোমেটিকই নিন বা অন্য কোনো টাইমস্টার ঘড়ি। আধুনিক, আকর্ষণীয় ডিজাইন, স্টাইল—রোল্ড গোল্ড, ক্রোম আর স্টীল। আপনার জন্যে, ওঁর জন্যে, আর আপনার ওনার জন্যে। প্রত্যেকের সাধ্যে কুলোয়, প্রতি হাতের শোভা বাড়ায়। আপনার টাইমস্টার ডিলারের কাছে যান—গিয়ে দেখুন। ভরসা ক'রে কিনে ফেলুন, আর গর্বের সঙ্গে পরে বেড়ান—টাইমস্টার।

টাইমস্টার

OBM/8045-BN

একান্ত সংবাদ

শ্লীলতাহানির অভিযোগ ও কো-অরডিনেশন কমিটির তিন নেতা

শ্যামল বসু

ধর্ষণেব চেষ্টা করার অভিযোগে মুরশিদাবাদ জেলা কো-অরডিনেশন কমিটির তিনজন নেতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও (Departmental Proceedings) করা হয়নি। মুরশিদাবাদ জেলা রেজিশট্রেশন বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর মহিলাকর্মী শ্রীমতী বকুলরাণী বিশ্বাস ১৯৮০ সালে একটি দরখাস্ত করেন তখনকার জেলাশাসকের কাছে। তিনি অভিযোগ করেছিলেন বহরমপুর রেজিসট্রি অফিসের কেরানি শক্তি কুমার দত্ত, মুহুরি কনককান্তি রায় এবং নাইট গারড সন্তোষ কুমার হালদার তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তখনকার জেলা শাসকের নির্দেশে ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে বহরমপুর সাব ডিভিশানাল জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেটের কোরটে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৪২, ৩৫৪, ৫০৬ এবং ৭৫১ ধারায় একটি মামলাও দায়ের করা হযেছিল। (মামলার নমবর GR 678/80). মামলাটি এখনও বিচারাধীন। উল্লেখযোগ্য শক্তি দত্ত, কনক রায় এবং সন্তোষ হালদার রাজ্য সরকারি কো-অরডিনেশন কমিটির সক্রিয় সদস্য ও শক্তি দত্ত একজন জেলাস্তবের নেতা।

রাজ্য সরকারের West Bengal Service (Classification Control Appeal) Rules 1971 অনুসারে (মরাল টারপিটিউড) শ্লীলতাহানি, অসচ্চরিত্রতার জন্য অভিযুক্ত কোন কর্মচারীকে সংগে সংগে সাসপেনড করা হয়। এছাড়া যদি কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা চালু হয় তবে মামলা চালু থাকার সময় ঐ অভিযুক্ত কর্মচারী সাসপেনড হয়ে থাকবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ১৯৮২ সালের ১৪-৬-৮২ তারিখ অবধি কোন সাসপেনড করার আদেশ দেওয়া হয়নি। ১৪-৬ ৮২-র ডিসট্রিকট রেজিসট্রার, মুরশিদাবাদ, এক নির্দেশে [মেমো নমবর ১০৮২(৩) ডি আর] জানান "Whereas I am satisfied that a criminal proceeding is pending against (1) Sakti Kumar Dutta, Clerk Berhampur S.R.O. (2) Kanak Kanti Roy, Mohurrir, Berhampur S.R.O. (3) Sri Santosh Kumar Haldar Night G. Berhampur S.R.O. to the Court of Chief Judicial Magistrate Berhampur u/s 561 Cr. P.C. (Rape Case)

And now in excercise of power conferred upon me under rule 7(3)(c) of the W.B. Services (Regulation Control And Appeal) Rule 1971.

I do hereby place above persons under suspension till the disposal of the afforsaid Case."

এই নির্দেশনামার একটি কপি

বকুলরাণী বিশ্বাস

মুরশিদাবাদের ট্রেজারি অফিসেও গেল। 'সাসপেনড' করার এই নির্দেশকে ঐ তিন কর্মী গ্রহণ করলেন না। অফিসে যথারীতি আসতে লাগলেন। রাজ্য কো-অরডিনেশন কমিটির মুরশিদাবাদ জেলা শাখা কর্মবিরতির আন্দোলনও করলেন। তাদের দাবি ঐ সাসপেনড করার আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। রেজিসট্রাব সাহেবও ঐ তিন কর্মীর ওপর থেকে সাসপেনশন আদেশ প্রত্যাহার করতে রাজী ছিলেন না। তিনি তখন ঐ কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিলেন। এরপর ১ জুলাই তারিখে বিভাগীয় মন্ত্রী মনসুর হাবিবুল্লার হস্তক্ষেপ ঘটল। একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানান হল যে মাননীয় মন্ত্রী ওই সাসপেনশন আদেশ তুলে নিয়েছেন। পরবর্তী নির্দেশ আসছে। টেলিগ্রামটির প্রেরক ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল, রাইটারস বিলডিংস, কলকাতা। ১-৭-৮২ তারিখের নির্দেশেও ঐ টেলিগ্রামটিকে ব্যাখ্যা করে বলা হল :

'Hon'ble Minister (law) has been pleased to direct that the order of suspension of Sri Sakti Kr. Dutta, clerk, Sri Kanak Kanti Roy, Mohurrir and Sri Santosh Kumar Halder, Night Guard, all employees' of Berhampur Sadar Joint Office, be withdrawn' এবং এই সংগে মন্ত্রীর অনুরোধ যে ট্রেজারি অফিসকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে তারা যেন সাসপেনড পিরিয়ডের বেতন ও ভাতাও ঐ তিনজন কর্মীকে দিয়ে দেন।

ডিসট্রিকট রেজিসট্রার বিমল ব্যানারজি এই নির্দেশনামায় স্বভাবতই অসুবিধায় পড়লেন। তিনি এই তিনজনকে সাসপেনশন আদেশ দেবার আগে ১০ জুন ১৯৮২ তারিখে ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল অব রেজিসট্রারের সংগে কথা বলে প্রয়োজনীয় অনুমতিও নিয়ে এসেছেন। ইতোমধ্যে টেলিগ্রাম আর মন্ত্রীর নির্দেশের জোরে শক্তি দত্ত, কনক রায় আর সন্তোষ হালদার তাদের বেতন নিয়ে নিয়েছেন। এবার বিমল ব্যানারজি মন্ত্রীর নির্দেশ দেবার অথরিটিকে চ্যালেনজ করলেন। তিনি ১২৩০ ডি আর (এম) ৫-৭-৮২ তারিখের নোটে মুরশিদাবাদ ট্রেজারি অফিসকে বেতন দেওয়া থেকে নিরস্ত হবার নির্দেশ দিলেন। সেই সংগে ইনসপেকটর জেনারেল অব রেজিসট্রেশনকে জানালেন, হয় তাঁর আদেশ ধার্য থাক নতুবা তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। অতঃপর জেলা রেজিসট্রার বিমল ব্যানারজি অবশ্যম্ভাবী রূপেই বদলি হলেন। বহরমপুরের রেজিসট্রি অফিসে রাইটারস বিলডিংস-এর আদেশ গিয়ে পৌঁছল। যেখানে বলা হল 'the undersigned is directed by the order of the Government to say the Governor has been pleased in terms of Rule 22(1)(c) of the W.B.S. (Classification Control Appeal) Rules 1971 to set aside the suspension order by the District Registrar Murshidabad......',

শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে শক্তি দত্ত, কনক রায় আর সন্তোষ হালদার পুরোপুরি অব্যাহতি পেয়ে গেলেন। আর মামলা ? শোনা যাচ্ছে এ ব্যাপারে পুলিশের ফাইনাল রিপোরট তৈরি হয়ে গেছে। এর পরেও প্রশ্ন থেকে গেল ঐ তিন অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় তদন্তও হল না কেন ? কেবলমাত্র মন্ত্রীর সুনজরের ভিত্তিতেই কি এ জাতীয় অভিযোগ খারিজ হয়ে যায় ? সাধারণত ধর্ষণের অভিযোগ থাকলে পুলিশের ফাইনাল রিপোরট ব্যাপারটি চলে না। এ ক্ষেত্রে পঞ্চাশ দশকের বিখ্যাত চিত্ত দাস ও সন্ধ্যারাণীর মামলা থেকে শুরু করে ইদানিং কালের সুপরিম কোরটের সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুযায়ী বহু মামলা বা অভিযোগের প্রধান বিবেচ্য হল সংশ্লিষ্ট মহিলাটির স্বীকারোক্তি। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম বড় দৃষ্টিকটু। যেখানে মহিলাটির লিখিত স্বীকারোক্তি আছে সেখানে এ জাতীয় স্বজনপোষণের নীতি সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয় কি ? □

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

শহর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য মাইনে দিয়ে ওড়ান হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

পশ্চিমবঙ্গে মফস্বলের কুড়িটি শহরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আট কোটি টাকা অনুদান দিতে চান। টাকা নিয়ে কেন্দ্র সাধাসাধি করছে কিন্তু প্রকল্পের অভাবে রাজ্য সরকার ছ কোটি টাকা নিতে পারছেন না। হাতে আর দেড় বছর সময়। এর পরে আর টাকা পাওয়া যাবে না। অথচ রাজ্যের নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী প্রশান্ত শূর বলে যাচ্ছেন, টাকার অভাবে ছোট ছোট শহরের উন্নয়ন করা যাচ্ছে না।

সি এম ডি এ এলাকার বাইরে ছোট এবং মাঝারি শহরগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা করেছেন। এতে কেন্দ্র দেবেন আট কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারকেও আট কোটি দিতে হবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির।

কাগজে-কলমে দেখানর জন্য ২০টি পুরসভাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার দিয়েছেন সাকুল্যে ৪১ লক্ষ টাকা। কিন্তু দেবার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের সমপরিমাণ।

ইতোমধ্যে অভিযোগ জমতে শুরু করেছে, নগর উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে বরাদ্দ কেন্দ্রের টাকা নিয়ে নয়-ছয় চলছে। উন্নয়নের টাকার কোন হিসাব নেই। যে সব কাজ করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে আদৌ তা করা হয়নি। এ পর্যন্ত ইউটিলাই-জেশন সারটিফিকেট পাওয়া গিয়েছে মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকার।

কেন্দ্রের এই প্রকল্প চালু হয় ১৯৮০ সালে। ১৯৭৯ সালের ২০ ডিসেমবর কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ দফতর একটি গাইড লাইনও পাঠান। তাতে পরিষ্কার বলা হয় ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোরট অনুসারে যে সব শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষ সেই শহরগুলির উন্নয়নের কর্মসূচি নিতে হবে। প্রতিটি শহরের জন্য খরচ করা হবে এক কোটি টাকা পর্যন্ত। কেন্দ্রের অনুদানের পরিমাণ হবে ৪০ লক্ষ টাকা।

এই কর্মসূচিতে প্রথম টাকা দেওয়া হয়েছে খড়গপুর পুরসভাকে। এঁরা পেয়েছেন ৩৫ লক্ষ টাকা। খড়গপুর পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, যে সব কাজ হয়েছে বলে রিপোরট দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। অনেক কাজ আদৌ হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অফিসার সরজমিন তদন্ত করে গিয়েছেন।

১৯৮১-৮২ সালে ৯টি এবং ১৯৮২-৮৩ সালে আরও ১০টি পুরসভাকে অর্থাৎ মোট ১৯টি শহরকে এই প্রকল্পে আনা হয়। ১২টি শহরে কোন কাজই শুরু হয়নি। বাকি ৮টি শহরে টাকা খরচ হয়েছে বলে জানান হয়েছে কিন্তু কাজের কোন নমুনা নেই।

এই প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পুরসভা এবং নগর উন্নয়ন দফতরেরও বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই। দফতরের দুই মন্ত্রীর মধ্যেও এ সব ব্যাপারে তেমন আলোচনা হয় না। সচিব এবং বিশেষ সচিবের মধ্যে সম্পর্ক মধুর নয়।

মহাকরণে অভিযোগ এসেছে, পুরসভা কর্তৃপক্ষ নগর উন্নয়নের টাকায় ঠিকাদারদের বিল পেমেনট করছেন এবং দ্বিতীয় বর্ষ-পূর্তি উৎসবে খরচ করা হয়েছে।

কেন্দ্রের এই প্রকল্পে বড় রকমের কোন কাজ হবে না। তবে রাস্তার উন্নয়ন, পারক, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি কাজ করার কথা।

পুরসভা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শৈলেন সরকার মালদহ জেলা বিশেষ করে তাঁর নিজের নির্বাচন কেন্দ্র ইংলিশবাজারের উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত। মালদহে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। শৈলেনবাবু অন্য পুরসভা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না।

এই প্রকল্প অনুযায়ী কোথায় কতটা কাজ হয়েছে, কত টাকা খরচ হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোরট প্রতি ছ মাস অন্তর কেন্দ্রীয় পূর্ত এবং গৃহনির্মাণ দফতরের কাছে পাঠানর কথা। কিন্তু রাজ্য সরকার তা পাঠাননি। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কোন রিপোরট দেননি। অথচ এই রিপোরট না পেলে পরের কিস্তির টাকাও বরাদ্দ করা হবে না। কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দফতর সেই রিপোরট পাওয়ার পর সরজমিনে তদন্ত করবেন।

এ ছাড়াও যেসব শহরে ওই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ হচ্ছে সেই শহরগুলি সম্পর্কে সমীক্ষার জন্য কতকগুলি তথ্য চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা পাঠান হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প কার্যকর না হওয়ার কারণ কী? কে দায়ী? রাজ্য পুরসভা দফতর না সংশ্লিষ্ট পুরসভা? পুরসভা দফতরের একজন পদস্থ অফিসার বললেন, কেউই দায়ী নয়। সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিতে অভিজ্ঞ লোকের অভাব, যাঁরা গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর অফিসারদের এই প্রকল্পের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। অফিসাররা গাড়ি আর আরদালি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ট্যুরে। বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং ওভার-সিয়ারদের বুঝিয়ে দিয়ে এলেন কীভাবে টাকাগুলো কাজে লাগান যায়। কিছু না হোক অন্তত নর্দমাগুলো পাকা করা, পানীয় জলের জন্য কয়েকটা টিউবওয়েল বসান। মাঠের চারদিকে রেলিং দেওয়া ইত্যাদি কয়েকটি কাজ যাতে করা যায়। পুরসভা দফতরে এ ব্যাপারে কাজ কিছুই এগোয়নি কিন্তু মোটা টাকা ট্যুর বাবদে খরচে হয়েছে।

রাজ্য পুরসভা দফতরের কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানর কথা যে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার কত টাকা অনুদান দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা জানাননি। ১৯৮০-৮১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেয়েছে শুধুমাত্র খড়গপুর পুরসভা—১০ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার এই পুরসভাকে অনুদান দিয়েছেন ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৮১-৮২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেয়েছে ৯টি পুরসভা। মেদিনীপুর ৬ লক্ষ, বাঁকুড়া ৯ লক্ষ, কালিমপং ২০ লক্ষ, পুরুলিয়া ১০ লক্ষ, ইংলিশবাজার সাড়ে ১৩ লক্ষ, কোচবিহার সাড়ে ১৫ লক্ষ, তারকেশ্বর ১০ লক্ষ, কৃষ্ণনগর ১৮ লক্ষ এবং সিউড়ি ১৮ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার মেদিনীপুরকে ৬ লক্ষ এবং তারকেশ্বরকে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। ১৯৮২ ৮৩ সালে রাজ্য সরকার কোন পুরসভাকে একটি পয়সাও অনুদান দেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেয়েছে ১০টি পুরসভা—বহরমপুর ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার, বিষ্ণুপুর ২০ লক্ষ, বালুরঘাট ১৫ লক্ষ, জলপাইগুড়ি ৪ লক্ষ, শিলিগুড়ি ৬ লক্ষ, দারজিলিং ১০ লক্ষ, রায়গঞ্জ ৪ লক্ষ, বসিরহাট ১০ লক্ষ, রাণাঘাট ১০ লক্ষ এবং কাটোয়া সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। ১৯৮৩ ৮৪ সালে রাণাঘাট (দেড় লক্ষ টাকা) ছাড়া কোন পুরসভা একটি পয়সাও পায়নি। চলতি বছরে রাজ্য সরকারেরও কোন অনুদান নেই। □

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে–৩

বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে

বাংলাদেশ থেকে ফিরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা সকলে একবাক্যে আমাকে বলেছিলেন, শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করলে বহু হিন্দুকেই বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে। কারণ এর ফলে তাঁরা অনেকেই ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন ও হবেন। হিন্দুরা চাকরি বাকরিতে তেমন সুবিধা করতে পারছেন না। ওই সম্পত্তিটুকুর মায়ায় তাঁরা এতদিন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাননি। শেষে এই সম্পত্তিটুকুতেও যদি হাত পড়ে তাহলে আর কিসের মোহে তাঁরা বাংলাদেশে পড়ে থাকবেন। তাছাড়া রুজিরোজগারের পথও তো বন্ধ। গত আগস্ট মাসের শেষে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিমা রাও বাংলাদেশ ঘুরে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করলে ভারতে আবার উদ্বাস্তু আসা শুরু হবে।

সামরিক প্রশাসক এরশাদ সাহেবও বলেছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে শত্রু সম্পত্তির ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। যেসব শত্রু সম্পত্তি এখন লিজ দেওয়া আছে লিজ গ্রহীতাদের কাছেই অপশান দেওয়া হবে তাঁরা সেগুলো কিনে নেবেন কিনা। যদি না কেনেন, তাহলে সেগুলি সাধারণের মধ্যে বিক্রি করে দেওয়া হবে। আমি নিজে এই আদেশ দেখিনি। তবে সিলেটের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী আমায় এই কথা জানান। আমার ইচ্ছা ছিল স্বয়ং এরশাদ সাহেবের মুখ থেকে এ ব্যাপারে সঠিক সরকারি সিদ্ধান্তের কথা জানব। কিন্তু তাঁর অধস্তনেরা তাঁর সংগে আমায় দেখা করতে দিলেন না। নিজেরাও কোন কথা সঠিকভাবে বলতে পারলেন না। শুধু এরশাদের একান্ত সচিব লেঃ কঃ শারীফ আমায় বলেছিলেন : ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছেন তা নয়। এটা আইনের প্রশ্ন। এর সমাধান সহজে হবার নয়। শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবি তুলেছেন পনের দলের মোরচা। দাবি তুলেছেন ছাত্ররাও। কিন্তু এই দাবি কখনও তীব্র হয়ে উঠছে না। কারণ এই ব্যাপারটির সংগে বহু লোকের কোটি কোটি টাকার স্বার্থ জড়িত। মুজিব এই আইনটি বাতিল করবেন সব ঠিকঠাক করে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর মনোভাব বদলে ফেলেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংগে দ্বন্দ্বে তো স্বয়ং শেখ সাহেবও পেরে ওঠেননি।

শত্রু সম্পত্তি আইন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিন যুদ্ধের সময় তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ শত্রুকে কেউ যদি টাকা দেন সেটা আটকাবার জন্য এবং শত্রুর (অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক) ফেলে যাওয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই আইন। এই আইন ওইসব পরিত্যক্ত শত্রু সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বোরড হয়েছিল। শত্রু সম্পত্তি বলে চিহ্নিত সম্পত্তি যদি কোন পাকিস্তানি নাগরিকের ভোগ দখলে থাকে তাহলে তা বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভরনর মোনায়েম খান পূর্বপাকিস্তান এনিমি প্রপারটি (ল্যানড ও বিলডিংস) অ্যাডমিনিসট্রেশন ও ডিজপোজাল অরডার জারি করেন। তাতে বলা হয় এ ডি সি রেভিনিউ অ্যাসিসট্যানট কাসটোডিয়ার হিসাবে শত্রুর সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বা অন্যকে লিজ দিয়ে দিতে পারবেন।

এই অরডারের বিরুদ্ধে হাইকোরটে প্রথম মামলা করেন বরিশাল কাউখালির আনন্দমোহন কুণ্ডু। তিনি পাওয়ার অব অ্যাটরনি নিয়ে ভারতে চলে যাওয়া এক হিন্দুর চালের কল চালাতেন। তাঁর ওপর যখন নোটিশ আসে তখন কুণ্ডু মামলা করেন এই বলে যে, তিনি যুদ্ধের আগে থেকে বায়নাপত্র অনুযায়ী সম্পত্তি ভোগদখল করছেন। কী করে এটা শত্রু সম্পত্তি হয়। মামলায় কুণ্ডু জিতে যান। ১৯৭৪ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে হয় ৪৬ নং আইন অর্থাৎ অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি

আইন। তাতে প্রত্যেক মহকুমায় ওই সম্পত্তি পরিচালনার জন্য পাঁচজনের কমিটি হয়। ওই আইন অনুসারে নতুন করে আর সম্পত্তি নেওয়া হয় না। তবে যেটা নেওয়া হয়ে গেছে তার ম্যানেজমেন্টের ভার দেওয়া হয় কমিটিকে। ঠিক হয়, সম্পত্তি ফেলে ভারতে চলে গেছেন এমন কেউ ইচ্ছা করলে ভারতে বসেই ওই সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারবেন। ওই টাকা নন রেসিডেন্ট খাতে জমা হবে। মুজিবের সময় এই শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের জন্য তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর একটি বিল করেছিলেন। কিন্তু তা কার্যকর করতে পারেননি। ইতিমধ্যে দেশে ক্যু হয়। জিয়াউর রহমান এসে পুবনো আইন বাতিল করে ১৯৭৬ সালে নতুন অরডিন্যানস করেন। ১৯৬৯ সালে এক নং অরডিন্যানসের পুনঃপ্রবর্তন করে নতুন করে শত্রু সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিধান দেওয়া হল। প্রত্যেক থানায় দুজন তহশীলদারকে ভার দেওয়া হল অনাবাসিকদের সম্পত্তি খুঁজে বার করার জন্য। তাঁদের কোন নির্দিষ্ট বেতন নেই। যেমন সম্পত্তি খুঁজে দেবেন তার এক চতুর্থাংশ তিনি কমিশন পাবেন।

এর ফলে সেই থেকে সারা দেশ জুড়ে 'ডাইনী শিকার' শুরু হয়ে গেছে। তহশীলদাররা সমস্ত হিন্দুর সম্পত্তি দেখিয়ে বলছেন এটা অনাবাসিকদের সম্পত্তি। এটি সরকারে বর্তাবে। বাংলাদেশে অধিকাংশ সম্পত্তিই ছিল একান্নবর্তী পারিবারিক সম্পত্তি। দুই ভাই ভারতে চলে এসেছেন, তাঁদের এক ভাই বাংলাদেশে রয়ে গেছে। এখন বলা হচ্ছে তোমার অন্য ভাইদের সম্পত্তি ন্যস্ত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। আদালতের রায় আছে ৬৫ সালের যুদ্ধের আগে কেউ ভারতে গিয়ে থাকলে তার সম্পত্তিই শুধু নেওয়া যাবে। বহু হিন্দু কিন্তু তার অনেক পরে ভারত গেছেন। কিন্তু তহশীলদার জাল খাতা তৈরি করে বলছে আমার খাতায় লেখা উনি ৬৫ সালের আগে ভারত গেছেন।

তারপর ১৬ ঘণ্টার নোটিশে ন্যস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ধরুন একজন হিন্দু একটি তিন ঘরের বাড়িতে বাস করছেন। ছুটির আগের দিন বিকেলে তাঁকে নোটিশ ধরান হল যে তাঁর দু ভাই ভারতে। অতএব আইন মোতাবেক দুই ভাই-এর দুটি ঘর এখন সরকারে ন্যস্ত হবে। পরদিন আদালত ছুটি। তিনি আদালতে যেতে পারবেন না। ১৬ ঘণ্টা পরে দেখা যাবে সরকারি লোক এসে দুটি ঘর থেকে টান মেরে সব জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছেন এবং সেখানে একজন তাঁদের পছন্দসই ব্যক্তিকে লিজ গ্রহীতা হিসাবে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। অথচ আদালতের রায় আছে পারটিশান ছাড়া কোন সম্পত্তি নেওয়া যাবে না। ওপরের ঘটনা চূড়ান্ত একটি ঘটনা। বহুক্ষেত্রে ভোগদখলকারীকেই ন্যস্ত সম্পত্তির লিজ দেওয় হয়। এমন বহু হিন্দু আছেন যাঁরা তাঁর ভাই শ্বশুর, কাকা, জেঠা এমনকি বন্ধুর সম্পত্তি যা তিনি ভোগদখল করছিলেন (সম্পত্তির মালিকরা ভারতে) সেগুলি সরকারে ন্যস্ত হবার পর সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে আছেন। এখন শোনা যাচ্ছে ৩১ ডিসেমবরের মধ্যে সেগুলি বিক্রি হয়ে যাবে। অবশ্য বিক্রির ব্যাপারে ভোগদখলকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কিন্তু বহু গরিব ও মধ্যবিত্ত হিন্দু কেনার টাকা যোগাড় করতে পারবেন না, ভোগ দখল হয়ে যাবে।

অপারেশন বরগা নামে পশ্চিম বংগে যেমন বাড়াবাড়ির অভিযোগ পাওয়া গেছে, শত্রু সম্পত্তির ক্ষেত্রেও সেই একই অভিযোগ। মৃত বাবাকে বলা হয়েছে উনি ভারতে চলে গেছেন। তাই তার সম্পত্তি ন্যস্ত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বিগ্রহকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—ওয়ারিশানদের কোন অধিকার নেই। আমি সিলেটে থাকতে থাকতে শুনলাম, ওখানে বসবাসকারী একজন প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর সিনেমা হল শত্রু সম্পত্তি হয়ে গেল।

১৯৭৭ সালের ২৩ মে জিয়াউর রহমান একটি সারকুলার জারি করেন (সারকুলার নং ১এ-৪/৭৭-১৫৬) ওই সারকুলারেই তহশীলদারদের উপর ভার দেওয়া হয় ঘুরে ঘুরে শত্রু সম্পত্তি খুঁজে বার করার জন্য। ওই সারকুলারের চতুর্থ অংশের ৩২নং ধারায় বলা হয় প্রত্যেক থানায় সারকেল অফিসার রেভিনিউর অধীনে একটি করে সেল গঠন করা হবে। ওই সেলে থাকবেন একজন বা দুজন তহশীলদার। এই থানা তহশীলদাররাই ন্যস্ত সম্পত্তি খুঁজে বার করবেন, সেগুলোর হিসাব রাখবেন, লিজ প্রস্তাব বিবেচনা ও নবীকরণের ভার তাঁদের ওপর। (ধারা ৩৩) এই কাজের জন্য তহশীলদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। (may be suitably rewarded as decided by the Government)।

সম্প্রতি এই প্রতিবেদন লেখার সময় সংবাদপত্র পড়লাম এই শত্রু সম্পত্তি সেখা নাকি বাতিল করা হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে এরশাদ একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের যবনিকা টানলেন। কিন্তু ১৯৭৭ সাল থেকে গত ছ বছরে অসংখ্য হিন্দু সম্পত্তি তহশীলদাররা এই ভাবে ন্যস্ত সম্পত্তির অধিকারে নিয়ে এসেছেন। আমাকে আওয়ামি লিগের প্রাক্তন এম পি সুধাংশু শেখর হালদার জানান, ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের শত্রু সম্পত্তি সংক্রান্ত ৬ লক্ষ মামলা আদালতে ঝুলেছিল। একমাত্র যাদের সরকারে প্রভাব আছে তাঁরা ছাড়া খুব কম সংখ্যালঘুই তহশীলদারদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে অবিভক্ত হিন্দু সম্পত্তি রাখতে পেরেছেন। শত্রু সম্পত্তির মধ্যে শুধু যে বাড়িঘর বাস্তুজমি পড়ছে তা নয়। পড়ছে-কৃষিজমি, পতিতজমি, দোকান, গুদাম, বাগিচা, পুকুর, বিল, ডাঙা। এছাড়া শত্রুসম্পত্তির মধ্যে যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি। ধরুন, একজন হিন্দুর পূর্বপাকিস্তানে একটি ব্যবসা ছিল। ব্যবসাটি ভাইকে বা বন্ধুকে বা নিকটআত্মীয়কে দিয়ে যদি তিনি ভারতে চলে যান, তাহলে সেটি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি যাকে দিয়ে গিয়েছেন সেই হস্তান্তর বা দান আইনত বৈধ না হলে (আইনত বৈধ প্রমাণ করা মুশকিল, অন্তত ব্যয়সাপেক্ষ দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার) ওই সম্পত্তি ন্যস্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং সরকার ওই সম্পত্তি পছন্দমত কাউকে লিজ দিয়ে দেবেন।

শত্রু সম্পত্তি আইন সংখ্যালঘুদের মধ্যে এমন আতংক সৃষ্টি করেছে যে, তাঁরা নতুন করে খুব কমই বাড়িঘর তৈরি করছেন বা সম্পত্তি করছেন। কারণ তাঁদের আশংকা সম্পত্তি করলেই তো চোখ বুঁজিবার পর সরকার নিয়ে নেবে।

দু নমবর হল অনেক ব্যক্তিই এখন থেকে নিজের সম্পত্তি উইল করে যাচ্ছেন।

প্রায় সকলেই চাইছেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভারতে কিংবা বিদেশে পাঠিয়ে দিতে। গত কয়েক বছরে বহু তরুণ সংখ্যালঘু বেআইনীভাবে ভারতে চলে এসেছেন। মাধ্যমিক পাশ করার পর অথবা শিক্ষা সমাপ্ত করার পরই ভারতে চলে আসার উপযুক্ত বয়স বলে তাঁরা মনে করছেন। বাংলাদেশ থেকে বি এ পাশ করে ভারতে এসে ক্লাস নাইনে ভরতি হয়েছে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য এমন উদাহরণও আমার কাছে আছে। অনেকে মনে করছেন শত্রু সম্পত্তি আইন জিয়া আরও কঠোরতর করেছিলেন সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়নের জন্য। তাঁর সেই প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে ফলবতী হচ্ছে। একজন সংখ্যালঘু নেতা বলেন : জিয়াউর রহমান তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় অন্তত ২০০ জায়গায় বলেছিলেন, শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করা হবে অথচ তা হয়নি। ১৯৭৮ সালে খুলনায় সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই আইন বাতিল করবেন।

ওই সংখ্যালঘু নেতা আমাকে জানিয়েছিলেন : বরিশালের শংকর মঠকেও শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। বরিশালের ডেপুটি কমিশনার এই নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু করতে পারেননি।

শত্রু সম্পত্তি আইন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করছে। সংখ্যালঘুরা এর ফলে মনে করছেন তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু শত্রু সম্পত্তি তাঁদের কাছেও এক অস্বস্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শত্রু সম্পত্তি বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের সংসদেও বহু প্রতিবাদ উঠেছে। ১৯৮০ সালের ৫ জুন আওয়ামি লিগের সদস্য সুধাংশু শেখর হালদার শত্রু (ন্যস্ত) সম্পত্তি আইন বাতিল করার জন্য একটি বেসরকারি বিল এনেছিলেন। বিলটি জিয়া সরকার বাতিল করে দেন। (হালদারের তৎকালীন ভাষণ দ্রষ্টব্য) নানাদিক দিয়ে প্রত্যাখ্যাত সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। সনাতন ধর্ম মহামণ্ডল, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি প্রভৃতি হিন্দু সংগঠন এখন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। গত ২৬ জুলাই যশোরের মাগুরাতে যে সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলন হয় সেখানে ৩০ হাজার হিন্দু এসেছিলেন। সেখানে হিন্দুদের সমস্যার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। আমার মতে এইসব ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক সমস্যার কথা তোলা এক বিপজ্জনক প্রবণতা। যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে কোনদিন বাংলাদেশে মুসলিম জামাতি ইসলামির মত পালটা উগ্রপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলও গড়ে উঠতে পারে।

শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে সংখ্যালঘুদের সমস্যাগুলি যদি জাতীয় প্রেক্ষাপটে অবিলম্বে বিচার না করা হয় তাহলে একটি দেশের বহু কষ্টার্জিত নবলব্ধ স্বাধীনতার উপরই নিদারুণ আঘাত আসবে -যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এরশাদ সাহেব হয়ত এটি উপলব্ধি করতে পারছেন।□

‘যাঁরা সেক্যুলার, প্রগতিশীল ও কমিউনিসট তাঁরা এখন নব্য সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্যবস্তু’ : বদরুদ্দিন ওমর

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব মুছে গেছে কিনা – সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনিশ্চয়তার কারণ কী – এখন প্রগতিশীল আন্দোলনের গতি প্রকৃতি কী এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে পরিবর্তন হাজির হয় ঢাকায় বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের কাছে। বর্তমান সাক্ষাৎকারটিতে বদরুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য কোন সম্পাদনা ছাড়াই প্রকাশ করা হল।

পরিবর্তন : সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা এখন আর সমস্যা নয়, বলা হয়ে থাকে যে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়নি। এটি সত্যি প্রশংসা করার মত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখনও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে, চাপা ভীতি আছে। অনেকেই তাই মনে করছেন সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশ থেকে লোপ পায়নি। এ বিষয়ে আপনার কী মত?

বদরুদ্দিন : আসলে এখানে যে জিনিসটা দেখতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা তো আছে নিশ্চয়ই, তবে সাম্প্রদায়িকতা বৃটিশ আমলে যেভাবে ছিল, অথবা পাকিস্তান আমলে যেভাবে ছিল সেভাবে আছে কিনা, যেমন পাকিস্তান আমলে দেখা গিয়েছিল যে যাদেরকে বলা হয় শোষক কি শোষিত এদের মধ্যে ধরেন, বাংলাদেশি মুসলমানদের শোষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্য ছিল। শোষক শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। এটা একটা দ্বন্দ্ব এই ভাবে ছিল, যাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। পাকিস্তানি আমলের পর থেকে একটা জিনিস দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িকতার চিন্তা, বিশেষত যারা চিন্তা ভাবনা করত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী যারা প্রগতিশীল চিন্তা করত, এমনকি মুসলিম লিগের মধ্যেও যে একটা অংশ ছিল যারা খুব একটা গোঁড়া ছিল না তাদের চিন্তার মধ্যেও একটা পরিবর্তন এল, যেটা আমরা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখলাম ১৯৪৮ সালে। এর কারণ বৃটিশ আমলে যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল সেটা অপসারিত হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলে দেখা গেল জমির মালিক যারা ছিলেন, প্রথাগত সুদের কারবারি যারা ছিলেন, তাদের অধিকাংশ এখান থেকে চলে গেলেন। তাদের বদলে মুসলমান জোতদাররা ছ ইঞ্চি, ন ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি দাড়ি নিয়ে সুদ খেতে লাগলেন, যদিও সুদ খাওয়া মুসলমান ধর্মে নিষিদ্ধ। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যে একটা দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বটা থেকে গেল ঠিকই, কিন্তু আগে তার যে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল সেটা কেটে গেল – সেজন্য রাজনীতি যেটা একটা পরিকাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার সেখানে এর প্রতিফলন হতে থাকল যেটা আমরা ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ডিকমিউনাইলেজেশন হতে দেখলাম। বাংলাদেশ পর্যন্ত এভাবে আসা গেল। বাংলাদেশ হবার পর দেখা গেল এক নতুন ধরনের সাম্প্রদায়িকতার উত্থান হয়েছে। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য ধরনের ভাষাগত সংখ্যালঘু যারা উর্দুতে বা চাকমারা যারা অন্য ভাষায় কথা বলেন তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য হচ্ছে। এ ধরনের সমাজে যারা সংখ্যালঘু থাকে তাদের বিরুদ্ধে একটা বৈষম্য হয়। আমি কিছুদিন আগে যারা রেডিও, টি ভির পলিসি নির্ধারণ করেন তাঁদের একজনকে বলছিলাম, এখানে বাংলাদেশ হবার পরে, আপনারা অনেক কিছু বলছেন, বাংলাদেশ হবার পর উর্দু গান তুলে দিলেন, উর্দু গান শুনতে হলে ইনডিয়াতে যেতে হয়। বা এখানে যারা উর্দু গজল গান, যেমন রুণা লায়লা তাদের উর্দুতে গাইতে হলে ইনডিয়াতে যেতে হয়। এরকম বৈষম্য এখানে আছে। যারা অবাঙালি তাদের ওপর আছে, যারা অমুসলমান তাদের ওপর আছে, এটা ঠিকই। এখনকার সাম্প্রদায়িকতা সেটা কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে আসছে না। আসছে হতাশা থেকে। এটা ঠিক আগেকার দিনের মত সাম্প্রদায়িকতা নয়। এর টারগেটও আলাদা। আগে টারগেট ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। ৭১ সালে দেখলাম আর একধরনের সাম্প্রদায়িকতা - অবাঙালিরা ছিল তার টারগেট। এখনকার টারগেট হল কমিউনিসট, প্রগতিশীল, র‍্যাডিক্যাল বা যারা সেক্যুলার চিন্তা করে এমন কেউ বাংলাদেশের এই নব্য সাম্প্রদায়িকতার টারগেট। যেজন্য দেখা যায় যে এখানে মারশাল ল এর আমলে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু দেখা গেল এরা ওয়াজ করছে, বড় বড় জনসভা করছে, ধর্মীয় জনসভা করছে তখন তারা তার মধ্যে রাজনীতির কথা বলে বিষোদ্গার করছে, চীনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্যবাদ বা যে কোন ধরনের র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। আগেকার মত শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বলছে না। সেটা যে একেবারে চলে গেছে তা নয়, তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সাম্প্রদায়িকতাটা এখন যেটা আসছে সেটা মূলত গভীর হতাশা থেকে আসছে। যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি পংগু হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে গেছে, তারা জনগণের সামনে কোন কর্মসূচি দিতে পারছে না। জনগণ আশা করেছিল বাংলাদেশ হলে যেমন পাকিস্তান আমলে আশা করেছিল পাকিস্তান হলে অনেক কিছু পাব। তেমনি বাংলাদেশ হলে তারা আশা করেছিল অনেক কিছু পাব। কিন্তু পায়নি। এখন তাদের সামনে রাজনৈতিক কর্মসূচি হাজির করার মত কোন পারটি নেই, কোন নেতা নেই। এই অবস্থাটার জন্য দেখা যাবে সাম্প্রদায়িকতার চরিত্রটা অনেকখানি বদলে গেছে।

পরিবর্তন : সংখ্যালঘুদের অনেকের সংগে কথা বলে দেখেছি, তাদের মন এখনও আশংকামুক্ত নয়। তারা মনে করছেন তাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তারা অসহায় বোধ করছেন। এই আশংকা কি মনস্তাত্ত্বিক, না এর পেছনে কোন সংগত কারণ আছে?

বদরুদ্দিন : খুবই সংগত কারণ আছে। তবে একটা জিনিস আপনি এখানে লক্ষ্য করবেন, যারা অমুসলমান বা সংখ্যালঘু তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা রয়েছে কিন্তু আপনি দেখবেন এই অনিশ্চয়তা সংখ্যাগুরুদের মধ্যেও আছে। যে গভীর হতাশার কথা বললাম যার থেকে জন্ম নিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, সেটাই এর কারণ। আজ একটা গরিব লোককে দেখবেন, যে দিন আনছে দিন খাচ্ছে, যার জীবিকার নিশ্চয়তা নেই তার মধ্যে যে নিরাপত্তার অভাব বোধ রয়েছে, যে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে তার মধ্যেও সেই নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। এখানে সে টাকা বিনিয়োগ করবে কি করবে না, বিদেশে নিয়ে যাবে কিনা, গেলেও কোথায় টাকা রাখবে, কীভাবে রাখবে এই চিন্তায় তারা মশগুল। নিজেদের ছেলেদের তারা বিদেশে পড়াচ্ছে। নিজেরাও বিদেশে বাড়ি-ঘর করে রাখছে, যাতে এখানে একটা কিছু হলে সেখানে চলে যেতে পারে। এই যে নিরাপত্তার একটা সামগ্রিক আবহাওয়া এটা রয়েছে।

সংখ্যালঘুরা মনে করতে পারেন সংখ্যাগুরুদের এখন এই অবস্থা, তাতে সংখ্যালঘুদের অবস্থা তো আরও খারাপ হবেই।

পরিবর্তন ঃ বাংলাদেশ যখন তৈরি হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র-গঠনের অন্যতম সোপান বলে অভিহিত করা হয়েছিল, আদর্শ বাংলাদেশ রাষ্ট্র-গঠনে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান কতখানি হওয়া উচিত?

বদরুদ্দিন ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের একটা চরিত্র। আমাদের দেশে – ভারতে, পাকিস্তানে যে ধরনের রাষ্ট্র আছে সেখানে নানা ধরনের জনগণের মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব আছে এগুলো সরকারি ক্ষমতায় যারা থাকেন তাঁরা সরকারিভাবে হয়ত ঘোষণা নাও করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা নানাভাবে এটাকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। এখানে দেখুন মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে তারপর দেখা গেল, আমি নিজেও দেখেছি, মাথায় টুপি দিয়ে তিনি মাদ্রাসাতে গেলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকবে তিনি বললেন। এখন মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকবে এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন। এখন মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকা মানে, ওর বেসটা আপনি রেখে দিচ্ছেন। ওইসব কুসংস্কার এ সমস্ত ধর্মীয় নানারকম রাজনৈতিক চিন্তা আপনি বজায় রেখে দিলেন। তারপর টেলিভিশনে যেটা প্রথম দিকে বন্ধ ছিল পরে দেখা দিল খোদা হাফেজ অমুক তমুক টেলিভিশন আরম্ভ করে দিল, রেডিও আরম্ভ করে দিল। আমি বলি শেখ মুজিবরের উত্তরাধিকার আসলে শেখ হাসিনা কিংবা মণি সিং আর কেউ নয়, তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী জিয়াউর রহমান। মুজিবর রহমান যে নীতি অনুসরণ করছিলেন তার ডেভলপমেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশনে দেখতে পাবেন পাঁচবার আজান হচ্ছে। নানারকম ধর্মের কথাবার্তা শুনতে পাবেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লেখা আছে কোরাণের বাণী। পাকিস্তান আমলে তারা তো সাহসই করত না। এই লিখনে পাছে বাঙালিরা কী বলে, তাই খোদা হাফেজ বলে ছেড়ে দিত। আর একটা রিলিজিয়স প্রোগ্রাম হত। তাতে বেদ পড়া হত, কোরান পড়া হত। এখন কিন্তু ওরা বেপরোয়া হয়ে গেছে।

পরিবর্তন ঃ এর কারণ কী? কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই কি রাষ্ট্রযন্ত্রকে এভাবে ধর্মপ্রচারে লাগান হচ্ছে?

বদরুদ্দিন ঃ ব্যক্তি তো নিজের শ্রেণীর অধীন। জিয়ার কথাই ধরুন, তাঁর সাফল্য এটাই যে তিনি জনগণের জন্য কাজ করছেন এটা লোককে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর তিনি মারা পড়লেন, এবং অন্য কতকগুলো কাজ করতে পারলেন না। এটাতে তাঁর ব্যক্তিগত দোষ নেই, এখানে যে শ্রেণীগত দুর্বলতা বাংলাদেশের শাসকদের-শোষকদের চরিত্রে রয়েছে সেটার কারণেই এগুলি ঘটেছে।

পরিবর্তন ঃ ধর্মকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে –

বদরুদ্দিন ঃ ধর্মকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে এতে ব্যক্তিগত ফায়দা তারা পেতে পারে, কিন্তু শ্রেণীগতভাবে এদের টিকে থাকার জন্য আজ জনগণের মধ্যে যে কুসংস্কার, অনগ্রসরতা রয়েছে সেগুলিকে সামনে না নিয়ে এলে তারা সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাকে প্রতিহত করতে পারছে না। এজন্য আমরা মনে করি আজ একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তারা তাদের প্রচারমাধ্যমের মধ্য দিয়ে অবিরাম জনগণের ওপর বোমাবর্ষণ করে চলেছে, যত রকম স্ববিরোধিতা আছে, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, সেগুলিকে অন্যদিকে পরিচালনার চেষ্টা করছে। এটা তারা যৌনতা দিয়ে করতে পারে, অপরাধ দিয়ে করতে পারে, এটা ধর্ম দিয়ে করতে পারে। সেভাবেই তারা করতে পারে।

পরিবর্তন ঃ আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম তখন সেখানে অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী দুঃখ করছিলেন যে যখন দুই পাকিস্তান একসঙ্গে ছিল তখন প্রগতিশীল যা কিছু চিন্তা তা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসত। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ায় আমরা আমাদের প্রগতিশীল অংশকে হারিয়েছি, তার ফলে পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলন দানা বাঁধছে না। আমি বলতে চাইছি, আপনাদের প্রগতিশীল আন্দোলনের একটা উত্তরাধিকার আছে। এত বড় উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও এখানে ধর্মকে এবং কুসংস্কারকে রাষ্ট্রযন্ত্রের নানাভাবে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরাট গণ আন্দোলন বা আপনি যেটা বললেন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেটা হতে অত দেরি হচ্ছে কেন?

বদরুদ্দিন ঃ দেরি হচ্ছে এইজন্য যে প্রথমত আগে রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক ছিল, যে কোন গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেতেই হত, সরাসরি তার সঙ্গে লড়াই করতে হত। পাকিস্তানের আমল থেকে সেই ধরনের ফাইট হচ্ছে আসছে। আর আসছে বলেই শুধু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় রাজনৈতিক কোন দল দাঁড়াতে পারবে না। অনেকে বলেন, ইন্দোনেশিয়া করব, হ্যান করব, ত্যান করব, এখানে যতই হোক না, রিলিজিয়নকে তারা ওইভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার হচ্ছে। মাদ্রাসা মক্তব ছড়িয়ে পড়ছে। বিদেশিরা সৌদি আরবিয়া, লিবিয়া এরা পয়সা দিচ্ছে। জনগণ যে বলছেন, প্রতিরোধ করতে পারছে না, জনগণের এই প্রতিরোধ করার অক্ষমতা যেটা দেখলে হবে না যে শুধু সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল অকেজো হয়ে গেছে তারা কোন সংগ্রামের মধ্যে যেতে পারছে না। কেন, এ প্রশ্নে পরে আসছি। সাধারণভাবে ধরুন, আজ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আজকে মজুরির সমস্যা দেখা দিচ্ছে, আজ গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, এগুলোর বিরুদ্ধেও তো রাজনৈতিক দল কিছু করছে না। তা হলে শুধু যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ছে না তা নয়। এ গুলোর বিরুদ্ধেও যে সংঘবদ্ধ হবে, লড়াই হচ্ছে না। সেহেতু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও হচ্ছে না। যে মুহূর্তে ওই সংগ্রাম হবে, যেমন ধরুন গত ফেব্রুয়ারি মাসে শহরে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, অমনি যেসব মৌলবি-মোল্লারা টুপি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা টুপি খুলে পকেটে রাখল, না হয় ভেগে গেল। অন্য ধরনের লোকেরা সামনে চলে এল। যে কদিন আন্দোলন হল ওইসব মৌলবিদের সামনে দেখা যায়নি। আসলে এটা হচ্ছে এখানে যদি কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে তা হলে এটা হবে।

পরিবর্তন ঃ মুজিব থেকে শুরু করে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যখনই প্রয়োজন হয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দিয়ে গিয়েছে। যখনই সাম্প্রদায়িক শক্তি আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছে তারা ভয়ে পালিয়ে গেছে আপনার কি তাই অভিমত?

বদরুদ্দিন ঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবং পরের দিকে মুজিবর রহমান সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছিলেন এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরাও তার প্রতিবাদ করেছিলাম। এটা তিনি কেন করেছিলেন, যখনই তাঁর জন সমর্থন কমে যেতে লাগল তখন তিনি এমন একটা দ্বন্দ্ব ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন যে পাকিস্তানিদের তিনি বললেন মাওড়া, অবাঙালি, তাদের তাড়িয়ে দিলে বাঙালি রাজ কায়েম হবে। যেমন জিন্না বলেছিলেন, হিন্দুদের তাড়িয়ে দিলে মুসলমান রাজ কায়েম হবে। তারপর দেখা গেল, সব তো গেল, মূল সমস্যার তো কোন সমাধান হল না।

পরিবর্তন ঃ এ কথা কি ঠিক নয় যে যাঁরা কমিউনিসট বা ওই ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত?

বদরুদ্দিন ঃ আমি তা স্বীকার করি না। যেমন ধরুন আমি বলব, যুগান্তরের শংকর ঘোষকে একবার বলেছিলাম বাংলাদেশে দেখেছিলাম হিন্দু নামধারীরা সব মসকোপন্থী হয়ে গেলেন, মুসলমানেরা হলে চীনপন্থী। আমি উপলব্ধি করলাম যে ইনডিয়া একটা ফ্যাকটর। ভারত-বিরোধিতা যারা করছিলেন তারাই চীনা-পন্থী হয়ে গেলেন। ইনডিয়াকে যখন বাংলাদেশ সরকার গ্যাস দিতে চেয়েছিল তখন তার বিরোধিতায় প্রথমে নামল জামাতে ইসলামি। তারপর নামল বামপন্থী কিছু দল। বলল : জান দেব, গ্যাস দেব না। আমি তার বিরুদ্ধে লিখলাম এটা সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়, গ্যাস বিক্রি ইনডিয়াকে করবে কি কোন চুলোয় করবে, কোন প্রগতিশীল দলের তা এক্তিয়ার হতে পারে না। ইনডিয়ার সঙ্গে আমার বিরোধ থাকতে পারে, ইনডিয়াকে অন্য কারণে সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু ইনডিয়াকে তুমি গ্যাস দেবেনা এটা হতে পারে না। যারা গ্যাস বিক্রির বিরুদ্ধে কথা বলছিল তারা জামাতে ইসলামির সঙ্গে নামল। তারপর কোথায় তালপট্টি, কোথায় কি, এককালে যারা পিকিংপন্থী ছিলেন, তারা অনেকে এখন পিকিং-পন্থী নেই, কিন্তু আচরণটা অমন রয়ে গেছে। তারা ইনডিয়াকে অপোজ করছে ওর ভিত্তিতে। ইনডিয়া গভরমেনট একটা প্রতিক্রিয়াশীল সরকার। ইনডিয়ান পিপল তাকে রেসিসট করে, আমরাও করি। সেদিক থেকে না করে, ইনডিয়ান পিপল বলে যে একটা জিনিস আছে, যারা ফাইট করছে ফর সোস্যালিজম, ফর ডেমোক্রাসি, তাদের সাথে যে একটা যোগ, সেই যোগটা থেকে বামপন্থীরা জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সেজন্য তাদের যে ভারতবিরোধী স্ট্যানড তার কোন প্রগতিশীল ভিত্তি নেই।

পরিবর্তন ঃ তাহলে এখানে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন বা প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে বাংলাদেশের মানুষের কী কী করণীয় আছে -

বদরুদ্দিন ঃ সেটা করতে হলে যদি মনে করেন সাম্প্রদায়িকতাকে

বিচ্ছিন্নভাবে দেখবেন তাহলে কিন্তু হবে না। এখানে যদি কোন প্রগতিশীল আন্দোলন হয়, ধরুন আজ যদি ল্যানড নিয়ে, ওয়েজ নিয়ে, কালচারাল কোন ব্যাপার, যেমন ডেমোক্র্যাটিক রাইট নিয়ে যদি কোন মুভমেনট হয় তখন কিন্তু তার ফলেই এই সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা, রাজনীতি অনেকটা চলে যাবে। ১৯৭১ সালে দেখেছি মুভমেনটের সময় সাম্প্রদায়িকতা চলে গেছে।

পরিবর্তন : কিন্তু ওই চলে যাওয়াটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেই মুভমেনট শেষ হয়ে যাচ্ছে অমনি সাম্প্রদায়িক চেহারাটা বেরিয়ে পড়ছে, এটা কেন হচ্ছে

বদরুদ্দিন : এটা হচ্ছে, তার কারণ আসলে যেভাবে একটা সংগ্রাম পরিচালনার দরকার, যেভাবে শিক্ষিত করাব দরকার, তা হয়নি। তা না করে সামনে যখন একটা সমস্যা এসে গেল তখন তার চাপে পড়ে অসাম্প্রদায়িকতাব কথা বলা হচ্ছে। যেমন মুজিবর রহমান, তিনি কোনদিন অসাম্প্রদায়িক লোক ছিলেন না, তাঁর চিন্তা যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক ছিল। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাতেও সেসব কথা বলতেন তিনি। কিন্তু রাজনীতিব চাপে যেমন তিনি কোনদিন অ্যানটি আমেরিকান ছিলেন না, অবস্থার চাপে তাঁকে একটা অ্যানটি আমেরিকান স্ট্যানড নিতে হয়েছিল। সেজন্য এখানে যে বিশেষ অবস্থাব সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জনগণেব মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনা সাময়িকভাবে এল। যতখানি সচেতন হওয়া উচিত ততখানি সচেতনতা ছিল না। এ জন্য কমিউনিসটদেরও আমি দায়ী কবি। এটা একটা লাইভ ইস্যু, অথচ এটাকে সেভাবে ফাইট করা হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার এখানে কোন বিশ্লেষণ হয়নি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে সংগঠিত হয়নি। বাইরের আঘাতটা যখন এসে পড়েছে তখন তাকে প্রতিহত কবার মত ক্ষমতা এখানে তত্ত্বগতভাবে বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাবও নেই।

পরিবর্তন : আপনার কথা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে এমন একটা রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আসা দরকার, যারা সম্পূর্ণ তত্ত্বগতভাবে, নীতিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতায় বিশ্বাস করে এবং সমস্ত জনগণকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করে তুলতে চায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলেরা এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে না। তার ফলে অনেকের মধ্যে হতাশা দেখা দিচ্ছে। কারণ জাতির মধ্যে একটা বড় ধরনের অংশ আছে যারা মুক্ত বুদ্ধিব মানুষ। তাদের মধ্যে হতাশা এসে যাচ্ছে। একটা বড় রকমের বিপ্লব ছাড়া কি এর মধ্যে আশু সমস্যার সমাধান আছে?

বদরুদ্দিন : দেখুন, আমি নিজে সাম্প্রদায়িকতাব বিরুদ্ধে অনেক লিখেছি। কিন্তু আজ যদি বেরিয়ে শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলি, তা হলে কোন কাজ হবে না, আসলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে যদি জনগণের সামগ্রিক সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম, তার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। জনগণের জন্য যাঁরা দাঁড়াবেন তাঁদেব সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটা স্ট্যানড নিতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা করব আর জনগণের জন্য দাঁড়াব, এ দুটো এক হতে পারে না। কারণ সাম্প্রদায়িক ভাব পক্ষে দাঁড়ান মানেই জনগণকে বিভ্রান্ত করা। শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে, মুসলমানের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া তা নয়, বাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচি যদি জনগণেব সামনে উপস্থিত না কবা যায়। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া কিছুতেই এই সমস্যাব সমাধান সম্ভব নয়।

পরিবর্তন : আপনি যে পথেব কথা বলছেন, সেই পথে কিছুটা এগিয়েছে এমন কোন রাজনৈতিক দল কি বর্তমানে বাংলাদেশে আছে

বদরুদ্দিন : আমি পরিচিত দল গুলির কথা বলছি। যেমন আওয়ামি লিগ, জাসদ বা ন্যাপ এদের কারও ক্ষমতা নেই এ ধরনের কর্মসূচি দেওয়ার। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারেব জন্য ১৫ দল হয়েছে, এর দ্বারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে বলে মনে কবি না। জিয়াউর রহমান একবার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধাব করে গিয়েছিলেন। পার্লামেনট হল। দেখা গেল পার্লামেনটের কোন ক্ষমতা নেই। সেখানে হাতাহাতি হচ্ছে। লাইসেনস পারমিট চলছে। এবারও তাই হবে। গণতন্ত্র করতে হলে বাস্তব কর্মসূচি নিয়ে জনগণেব কাছে যেতে হবে। জনগণের কাছে যেতে না পারার জনাই এই ভাঙন হচ্ছে।

পরিবর্তন : বাংলাদেশের অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ আছে শত্রু সম্পত্তি আইন সম্পর্কে। এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

বদরুদ্দিন : কেন এটা চালু রেখে দেওয়া হয়েছে তা তো বুঝতেই পারছেন। ওদেরই সাঙ্গোপাঙ্গরা সম্পত্তি দখল করে আছে। মুজিব একবার জমির সিলিং করতে চেয়েছিলেন, তখন বড় বড় জমির মালিক তাতে বাধা দেন। □

সাক্ষাৎকার : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শত্রু সম্পত্তি নয়, মৃত্যু সম্পত্তি — সুধাংশু শেখর হালদার

এই আইনটি একটি স্বাধীন দেশের জন্যে – যে দেশের এত জনবহুল জনসংখ্যায় পূর্ণ একটি দেশের মধ্যে মাত্র দেড় কোটি লোকের উপরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। ১৯৬৫ সালে যে আইনকে Defence of Pakistan Rule বলে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ ঘটেছিল সেই যুদ্ধ সংঘটনের নামে তৎকালীন পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি রক্ষার নামে যে Defence of Pakistan Rule এর আন্ডারে Section 182-র বলে "The East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal order, 1966" যেটা সেই সময় জারি করা হয়, সেই জারির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালে যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য ছিল সম্পত্তি রক্ষা করা। পরবর্তী আমলে, আজ পর্যন্ত যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে সম্পত্তিকে গ্রাস করা। যুদ্ধ নাই পাকিস্তান নাই, ভারতবর্ষ শত্রু নাই, ভারতবর্ষের সাথে ২৫ বছরের মৈত্রীচুক্তি অবস্থান করছে। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ সংঘটন করে আমরা বাংলাদেশ কায়েম করেছি অথচ শত্রু সম্পত্তি থেকে মুক্ত হতে পারি নাই।

দেড় কোটি লোকের মানবিক অধিকার, শাসনতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, মৌলিক অধিকার, জন্মগত নাগরিক অধিকারকে ব্যাহত করে আজকে এই আইনটি দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রতিদিন এই আইনের কবলে শুধু একমাত্র দেড় কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই নয়, আজকে সমস্ত সম্প্রদায়, আজকে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছে, সেই সম্পত্তিও আজকে সংখ্যালঘু সম্পত্তি নামে অভিহিত করে তা গ্রাস করা হচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সব আইন আছে তা Proclamation of Independence and Laws Continuance Enforcement Order এর বিরোধী হয়ে থাকলে তা আইনবলে টিকে থাকতে পারে না। Laws Continuance Enforcement Order এ আছে :

"The laws contrary to the independence cannot exist as an existing law."

মাননীয় স্পীকার, আপনি দেখতে পারেন ১৫২ ধারায় "existing law" এর অর্থ constitution এর definition এ তা দেওয়া আছে। তদুপরি, আমরা তবুও তৎকালীন সরকার স্বাধীনতার পর পরই President's Order 29 of 1972 করে যে সমস্ত সম্পত্তি নেওয়া হয়েছিল custodian এর under এ সেটা শুধু বাংলাদেশ সরকারেই রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তৎপরবর্তীকালে। কখনও কোনরূপে কোন আইনের দ্বারা এই রকম সম্পত্তি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে পারে না। Defence of Pakistan Rules শেষ হয়েছে 16th February, 1969, তারপরেও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাসখন্দ declaration এর পরে কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি রূপে অধিগ্রহণ করা উচিত ছিল না। আজকে প্রতিটি Court থেকে বিভিন্নরূপে judgement দেওয়া হচ্ছে। অথচ সেইসব judgement আজকে ১১২ ধারা যদি শাসনতন্ত্র থেকে উল্লেখ করি তাহলে দেখব যে "All authorities, executive and judicial, in the Republic shall act in aid of the Supreme Court." তাও করা হচ্ছে না। আজকে যে আইন করা হচ্ছে, সেই আইনের নামে, আপনি লক্ষ্য করুন, আমি দেখাচ্ছি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আজকে আমার সম্পত্তি থেকে Enemy Declaration এর মাধ্যমে আমাকে হচ্ছে। প্রতি থানায় দু জন করে তহশীলদার থাকবেন। সেই তহশীলদারের কোন remuneration নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা জানা যায় না। আজকে Lands and Buildings Department এ যারা আজকে কর্মরত, এইসব শত্রুসম্পত্তির যারা আজকে employee, তারা আজকে Government Servant না। অথচ তাদের আজকে সেখানে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে। আজকে 25% of entire property valuation তহশীলদারের হাতে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা নজীরবিহীন। এবং একমাত্র যে কোন তহশীলদার যদি নোটিশ দিয়ে একে শত্রু সম্পত্তি বা Vested Property করে, তাহলে তাকে রোধ করার দায়িত্ব একমাত্র বাংলাদেশ সরকারের।

আমি বলছি যে, তৎকালীন আমলে ২৩.৫.৭৭ তারিখে এক Circular করে দিয়ে এমন করেছে যে, যখনই তহশীলদার কোন সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি বলে Declare করবে, তার উপরে সারকেল অফিসার, তার উপরে এস ডি ও, তার উপরে অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার (রেভিনিউ), তারপরে ডিভিশনাল কমিশনার, তারপরে জয়েন্ট সেক্রেটারি, তারপরে সেক্রেটারি, এতটা পথ পার হয়ে এসে আজকে কারও সম্পত্তি রক্ষা করার বা Enemy declaration থেকে মুক্ত করার কোন উপায় নেই। এবং আজকে এই যে অধ্যাদেশ যে, circular এর কথা আমি উল্লেখ করছি, ২৩ মে ১৯৭৭ তারিখের সেই circular অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। শনিবার দুপুর বেলা ২টার সময় অফিস বন্ধ হয়ে যায়। পরওয়ানা জারি করে দুপুরবেলা, শনিবার দুটার পরে। রবিবারে কারও কোন কিছু করার থাকেনা। অতএব রবিবারে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এই আইনের বলে। আজ আমি Constitution এর যে সব ধারার কথা বলছি, আপনি লক্ষ্য করবেন, According to Article 19 (1) 'The state shall endeavour to ensure equality of opportunity to all citizens.'

Equality before law, More to Article 26টা যদি স্বাভাবিকভাবে আপনার কাছে Place করি তাহলে দেখতে পাবেন যে, কী রকম অগণতান্ত্রিকভাবে আজকে এই আইনের দ্বারা সম্প্রদায়ের লোককে কীভাবে গৃহহারা করা হচ্ছে, পথে বসান হচ্ছে।

আজকে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকার জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এখানে রয়েছেন। আমি জানিনা মাননীয় স্পীকার, একজন সদস্যও এমন আছেন কি না, যার কাছে তার এলাকার কোন লোকের কাছ থেকে এই আবেদন আসেনি যে, আমাকে আমার বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজকে যদি কেউ oppose করেন আমি তার কাছে মানবিক আবেদন জানাব তার নির্বাচনী এলাকায় যদি তিনি এমন একজন লোকও পান যেখানে শত্রু সম্পত্তির ছোঁয়াচ লাগেনি, তাহলে আমি আমার মেম্বারশীপ ত্যাগ করব। আজকে এমন একটা আইন, যেটা প্রকৃত আইন রূপে টিকতে পারে না, সেই আইনটাকে সরকার introduce করেছেন, implement করেছেন। শুধু তাই নয়, আজকে বাংলাদেশ একটা independent state, তার যে international relationship অন্য দেশের সাথে রয়েছে সেটাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। আমি ভারতবর্ষে যাব, আমার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হবে। সিলেটের অর্ধেক লোক লনডনে রয়েছে। তাদের সম্পত্তি তো শত্রু সম্পত্তি হয় নাই। আমার জন্মের পরে, আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমি সম্পত্তির মালিক হব along with other co-sharer, সেখানে আমার অন্য co-sharerরা পৃথিবীর যে কোন জায়গায়ই থাকুন না কেন, the proverb is that the ownership runs with the property not with the man. আজকে কেউ ভারতবর্ষে গেলে তার সাথে বাংলাদেশের কোন স্থায়ী সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

আমি আরও জানাচ্ছি, আজকে সরকার এটার দিকে লক্ষ্য করছেন না, এইসব তহশীলদাররা শত্রু সম্পত্তি করার নামে তহশীল অফিসে বসে সমস্ত রেকরডপত্র খুঁজে যেখানেই হিন্দুর নাম দেখেছে অমনি সেটা কেটে দিয়ে লিখে রেখেছে অধিকারী ভারতবাসী অথবা ভারত সম্রাট। আজকে এক পঞ্চমাংশ লোক এইদেশে সংখ্যালঘু, এই এক পঞ্চমাংশ লোকের সমস্ত সম্পত্তি আজকে ভারতীয় নাগরিকত্বে পরিণত করা হচ্ছে এবং এইভাবে তারা এই দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই সরকারের প্রতি আমি আবেদন জানিয়ে বলছি যে, আমার এই বিল গ্রহণ করা উচিত। আমার এই বাংলার সম্পদ ভারতের নাগরিকের হতে পারে না, ভারতের মালিকানায় যেতে পারে না। আজকে আমার বহু বন্ধু জানেন, বহু বন্ধুকে ভোটের ব্যাপারে সকল শ্রেণীর নাগরিকের কাছে যেতে হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই তখন বলেছিলেন যে, শত্রু সম্পত্তি আমরা রাখব না। অথচ আজকে সামান্য একটা অধ্যাদেশের বলে, যেখানে Protection

এর কথা। অথচ সেই Protection এর নামে আজকে ঢাকা শহরের প্রতিটি লোক জানেন, আজকে Leader of the House যিনি ওখানে বসে আছেন, তিনি নিজেও জানেন, তিনি নিজেও বহু মামলা পরিচালনা করেছেন। আজকে হাউসে বহু মেম্বার lawyer আছেন, এমনকি বহু মন্ত্রীও lawyer আছেন, আজকে Land Reforms and Land Administration-এর যিনি মন্ত্রী আছেন তিনিও আইনজীবী, পূর্বে যিনি ছিলেন তিনিও আইনজীবী ছিলেন। কাজেই এ সমস্ত আইনজীবীরাই বুঝেন যে, কীভাবে আজকে একটা অন্যায় আইনকে চাপিয়ে দিয়ে, মাননীয় স্পীকার, আজকে সমস্ত লোককে এবং অত্যন্ত গরিব লোকদেরকে পথে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, আমার যেটা আবেদন, ১৯৬৫ সন থেকে শুরু করে আজকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৫ বছর পরে আমি সকলের কাছে এই মানবিক আবেদন নিয়ে এসেছি যে, কী অন্যায় করেছে এই দেড় কোটি লোক, এদেশে যার জন্য তাদেরকে '৪৭ সন থেকে অপমান হতে হচ্ছে। আমি শত্রু, আমার বাড়ি থেকে আজকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমার বাবার দেওয়া সম্পত্তি যুগ যুগ ধরে আমি যা ভোগ করছি, আমি মালিক অথচ একজন তহশীলদার একমিনিটে আমাকে আমার মালিকানাহীন করে পথে বসিয়ে দিচ্ছে।

আমি আজকে Separate ঘটনাগুলি উল্লেখ করছি না। Separate ঘটনা উল্লেখ করলে দেখতে পাবেন আজকে আমার দেবতা, সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার দেবতা পর্যন্ত সদাশয় সরকারের হাতে বিপর্যস্ত। সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি করা হচ্ছে। Religious Endowment Act বলে, 'a deity is a minor, he cannot leave', এ সম্পর্কে আমাদের হাই কোর্টের বহু decision আছে। Justice B. A. Siddique র decision ছিল, 'A deity is a minor, he cannot leave the country, her property cannot be taken over as an enemy property.' শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের decision 31 D. L. R. 'বিনয়ভূষণ'-এর কেস সেখানে decided হয়েছে, No property can be touched until and unless it has been separated or it has been partitioned. তার পরবর্তীকালে বলা হয়েছে, যুদ্ধের প্রয়োজনে সম্পত্তি গ্রহণ করা। কাজেই যদি যুদ্ধ না থাকে কী প্রয়োজনে সম্পত্তি গ্রহণ করেছে?

আমি আজকে আপনার কাছে আবেদন রাখছি, যুদ্ধ নাই, কী প্রয়োজনে সম্পত্তি রক্ষা করতে হচ্ছে। আমার সম্পত্তি আমি রক্ষা করতে পারছি না? আমার সম্পত্তি আজকে Land Administration Department কী কারণে রক্ষা করবে? কারণ ছিল যুদ্ধ। যুদ্ধ যখন নাই, সম্পত্তি আমার নিতে পারে না। অথবা আমার Hindu law যতক্ষণ পর্যন্ত আছে transfer of property Act যতক্ষণ পর্যন্ত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাননীয় স্পীকার আমার সম্পত্তি কি করে যায়? আমার Hindu law কে যদি repeal না করেন, Muslim law, Hindu law সব কিছু যদি repeal না করেন if all are alive, তাহলে আমার right কোথায় যাবে? আর সব যদি repeal করে দেন তবে আমার কোন কথা নাই।

International relations অনুসারে আমি বলছি আজকে ভারতবর্ষ শত্রু, Declare করুন। ভারতের নাগরিকের সম্পত্তি যেতে পারে, আমার সম্পত্তি কী করে যাচ্ছে? আমি আজ এখানে আছি। আজকে আমেরিকানবাসী, আজকে ইংল্যান্ডবাসী, আজকে সুইজারল্যান্ডবাসী আরও লক্ষ লক্ষ লোক বাংলার বাইরে আছে। কারও সম্পত্তিকে touch করা হচ্ছে না। অথচ একজন লোক যদি পাসপোর্ট করে ভারতে যায় তার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি করা হচ্ছে। সাধারণ লোক আজকে বলছে এই দেড় কোটি লোকের সম্পত্তি animals property, তারা enemy বলতে পারছে না। আজকে তারা animals এর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেছে এই দেড় কোটি লোক। যারা বাংলায় বলছে তারা বলছে এটা শত্রু সম্পত্তি নয় এটা মৃত্যু সম্পত্তি। রেহাই নাই তহশীলদারের হাত থেকে। কাজেই আজকে আমি যেটা বলতে চাই, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চাই, এই দেড় কোটি লোককে পথে বসাবার এই সরকারের কোন অধিকার নাই।

মাননীয় স্পীকার, আপনি বিখ্যাত ব্যারিস্টার। আপনি অনুধাবন করুন এই আইন ১৯৬৫ সাল থেকে, আপনি Court-এর resolution গুলো অনুধাবন করুন, যে আইন বর্তমান আছে সে আইনে কাউকে জমি থেকে তাড়াতে পারে না। অথচ প্রতিদিনের ঘটনা আপনি জানছেন, আপনি শুনছেন, আমরা আহত হচ্ছি, আমার Community আজকে পথে বসতে চলেছে। এর জন্য আমার আবেদন আছে। আজকে একজনে বাধা দিতে পারে কিন্তু তার নিজের ভাই, মা-বোন যদি পথে বসত তাহলে উনি কী করতেন? আজকে কোন বিধবা নিরাপদে নাই।

মিসটার স্পীকার, আমি শেষ করছি। একজন বিধবা সন্তান নিয়ে এখানে ছিল। সন্তানটি লেখাপড়া শিখে যখন বড় হয়ে গেল, সন্তান কলকাতায় চলে গেল। বিধবা এখানে বসে আছে। Hindu law অনুসারে বিধবা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনে কেউ সম্পত্তি নিতে পারবে না। কিন্তু সে সম্পত্তি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আজকে আমার দেবতা নিরাপত্তাবিহীন। বিধবারা নিরাপত্তাহীন। আজকে আমাদের অস্তিত্ব নিরাপত্তাহীন। আমি আবেদন করব, সমস্ত জাতির স্বার্থে, যাতে সুরাহা হতে পারে। এক পঞ্চমাংশ সম্পত্তি যাতে এই অবস্থায় ফেলা না হয়। তার জন্য আবেদন করব। যে সব দ্বিজাতিতত্ত্ব থিওরিতে এসব উচ্ছেদ একদিন করা হয়েছে, আজ তা বর্তমান নাই, আজকে 'equal oportunity of the law to everybody' অতএব আমি আবেদন করব আপনি আমার বিলটি গ্রহণ করে যাতে এই জগদ্দল পাথর থেকে মুক্তি পেতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।

শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (সংসদ নেতা) :

মিঃ স্পীকার, এখানে বলারও scope খুব কম। তার কারণ হচ্ছে যে, এই আইনটি ১৯৭৪ সালে হয়েছে। আমি এইটুকু বলতে পারি যে এই আইনটি under রিভিউ। অতএব এর বেশি আলোচনা আমি করতে চাই না। উনি যে pointটা দিলেন সেই পয়েন্টটা already বিবেচনাধীন আছে।

জনাব ডেপুটি স্পীকার :

একজন বলার পর আর কোন বলার scope নাই। Hon'ble Minister, there is no scope, I refer you to rule 74 (2) Leader of the House has already spoken.

(বাধা প্রদান)

আমি ভোটে দিচ্ছি।

'১৯৭৪ সনের ৪৫ সংখ্যক আইন বাতিলকরণ সম্পর্কে আনীত একটি বিল [১৯৭৪ সনের ৪৫ সংখ্যক আইন বাতিল বিল, ১৯৮০] উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।'

[ভোট গ্রহণের পর 'না' জয়যুক্ত হয়েছে]। □

'দ্বিজাতিতত্ত্ব একটি বাস্তব নীতি : বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোকই চায় ইসলামিক রিপাবলিক' : মোহাম্মদ জামির আলী

বাংলাদেশ মুসলিম লিগের (সবুর গ্রুপ) সংগঠন সম্পাদক মোহাম্মদ জামির আলীর সঙ্গে পরিবর্তনের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল। মুসলিম লিগ মুজিবের সময় নিষিদ্ধ হয়। বহু নেতা কারারুদ্ধ হন। এখন লিগ আবার পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং তাঁদের পুরাতন নীতি থেকে সরে আসেননি। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় মুসলিম লিগের মুখপত্র কিষাণ পত্রিকার অফিস ঢাকাতে।

পরিবর্তন : আপনার দল মুসলিম লিগ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, একদিন এরাই ছিল শাসক দল। এই দল এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল কিসের জন্য

জামির আলী : মূলত পাকিস্তান আন্দোলন যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল, পাকিস্তান হওয়ার পর সে আদর্শ, উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বিশেষ করে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারিনি। এ জন্য কিছুকালের জন্য মুসলিম লিগ শিথিল হয়ে পড়েছে। আশা করি আবার আগামী দিনে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

পরিবর্তন : দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর পাকিস্তান গড়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশ নতুন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লিগের কি প্রয়োজন আছে, না প্রয়োজন ফুরিয়েছে

জামির আলী : কায়েদ-ই আজম মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব একটি বাস্তব তত্ত্ব ছিল, এটা বাংলাদেশ হবার পর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা একটি পৃথক পরিবেশ ও পৃথক ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আমরা দুটি জাতি। বাংলাদেশেও আমরা সেইভাবে আছি। তা ছাড়া বাংলাদেশ আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন। বঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এ অঞ্চলের লোকেরা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, আদর্শগত কোন কারণে নয়।

পরিবর্তন : বাংলাদেশের আন্দোলনে মুসলিম লিগ সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়নি, এর কারণটা কী ছিল.

জামির আলী : ইংরাজিতে একটা কথা আছে once a patriot is always a patriot. সেদিন পাকিস্তানের সীমায় পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অতীতে ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলিম লিগের আদর্শ তার কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই আদর্শ রক্ষা করা লিগ কর্মীরা ইমানি দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেমবর পর্যন্ত ওই সংগ্রামে কোন লিগ কর্মী দলগতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

পরিবর্তন : তা হলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে আপনাদের যে আদর্শগত বিরোধ ছিল তা থেকেই গেছে, তাই নয় কি

জামির আলী : বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে আদর্শগত বিরোধ ছিল না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যই বাংলাদেশের লোক লড়াই করেছে।

মোহাম্মদ জামির আলী

অর্থনৈতিক মুক্তির জনাই সংগ্রাম গড়ে উঠেছে। যেদিন বাংলাদেশ সৃষ্টি হল সেদিন অতীতে আমরা যেমন দেশপ্রেমিক ছিলাম আজও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য মুসলিম লিগ অতীতের মত কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবর্তন : আপনারা পাকিস্তানের সঙ্গে এখন কী রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে চান -

জামির আলী : পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আমরা মুসলিম চেতনায় উদ্দীপিত বিধায় পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকবে, তার মানে এই নয় আমাদের সঙ্গে ভারতের বৈরিতা থাকবে। আমরা ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব চিরকাল কামনা করব, আমাদের ওপর প্রভুত্ব নয়।

পরিবর্তন : বাংলাদেশকে ইসলামি রিপাবলিক করাই কি আপনাদের আদর্শ -

জামির আলী : বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ লোকই এটা কামনা করে। বিশেষ করে ইসলাম যে সনাতন ধর্ম, এ ধর্মে সকল ধর্মের সহাবস্থান আছে। এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান আমরা পরিপূর্ণ শান্তির সঙ্গে বাস করে এসেছি। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর দেখা গেছে হিন্দু ভাইদের দুর্গাপুজো, কালীপুজো দোল উৎসব করতে সামরিক শাসনের সহায়তা নিতে হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এটা করতে হয়নি। কারণ ইসলাম কখনও অন্য ধর্মের ওপর জোর আরোপে বিশ্বাস করে না। আজও তেমনি করে হিন্দু ভাইদের বন্ধু হিসাবে, ভাই হিসাবে গ্রহণ করে অতীতের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ রূপায়ণের জন্য বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাই। তবে ইসলামিক রিপাবলিক মানে এই নয় এখানে অন্য কোন ধর্ম বাস করতে পারবে না।

পরিবর্তন : যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল তার একটা ভিত্তি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা। ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হলে সেই আদর্শ লঙ্ঘিত হবে না -

জামির আলী : এ প্রশ্নের সমাধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভোটে হয়ে গেছে। ৭২ সালে যে চার মূল নীতির ওপর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটা এদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে লোকে প্রত্যাখ্যান করে গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের ইনসাফের যে রাজত্বের ওয়াদা জিয়াউর রহমান সাহেব করেছিলেন, সেটা ম্যানডেটের মাধ্যমে লোকে সমর্থন করেছে। ১৯৫২ সাল থেকে যে সংগ্রাম শুরু হয় তা চার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও এ চার নীতি ছিল না। ১৯৭২ সালে হঠাৎ করে এ চার নীতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শেখ মুজিবর সাহেবের দল এই চার নীতি প্রণীত করেছেন। এই চার নীতি গণমানসের 'মূল নীতি' ছিল না, যদি তা থাকত তা হলে ১৯৭৮, ১৯৭৯ ও পরবর্তী পর্যায়ে বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচনে সেটা হয়তো মানুষ বানচাল করে দিতে পারত। তা না করে সাধারণ মানুষ রায় দিয়েছে যে তারা এটা করবে না।

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন এর পেছনে ভারতের চাপ ছিল

জামির আলী : অনেকের তাই ধারণা। আমারও নিজের ধারণা। ভারতের তিন মূল নীতির সঙ্গে আর একটি মূল নীতি যোগ করে চালিয়ে দেবার জন্য একটা ক্যাপসুল তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই ক্যাপসুল 'জনগণের' স্বীকৃতি পায়নি।

পরিবর্তন : আপনি তা হলে বলছেন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না।

জামির আলী : এটা বাস্তব সত্যি কথা। ধর্মনিরপেক্ষতার যে রূপ মানুষ দেখেছে সেরূপ কখনই মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। মুসলিম লিগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন যে কোন সংখ্যালঘু ভাই ইনটারমিডিয়েট পাশ করলে তাকে যে বৃত্তি দেওয়া হত, তাতে তার খরচ করেও বাড়ি পাঠাবার মত কিছু উদ্বৃত্ত থাকত। এখানে বাংলাদেশ হবার পর ধর্মনিরপেক্ষতার যাঁতাকলে সংখ্যালঘুরাই সবচেয়ে নিষ্পেষিত হয়েছে, যে কারণে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতায় শতকরা ৮৫ জন বিশ্বাস করে না। ইসলামি আদর্শে তা উদ্দীপিত ও দীক্ষিত। তারা বিশ্বাস করে ইসলামে সকল ধর্মের সহাবস্থান আছে।

পরিবর্তন : আপনাদের সময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে কোটা নির্দিষ্ট ছিল। বাংলাদেশ হবার পর সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। আপনি কি মনে করেন সংখ্যালঘুদের চাকরির

ব্যাপারে কোটা আবার প্রবর্তন করা হোক?

জামির আলী : শুধু চাকরি নয় সংখ্যালঘুরা সংসদে-যাতে ভাল করে তাদের দাবিদাওয়ার কথা বলতে পারে তার জন্য পারলামেনটে তাদের আসন সংরক্ষিত থাকা উচিত। বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের সংখ্যানুপাতিক কোটা রাখায় মুসলিম লিগ বিশ্বাসী।

পরিবর্তন : সংখ্যালঘুদের মধ্যে শত্রু সম্পত্তি আইন নিয়ে ক্ষোভ আছে। বিরোধীরা সবাই এই আইনের অবসান চান। আপনার দল কি এই আইনের অবসান চাইবেন?

জামির আলী : বাংলাদেশের যিনি নাগরিক তাঁর সম্পত্তিকে মুসলিম লিগ শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করবে না। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক তিনি যে গোত্রের অধিবাসী হন না কেন তার সম্পত্তিকে শত্রুর সম্পত্তি বলে মুসলিম লিগ ঘোষণা করবে না।

পরিবর্তন : আপনি বললেন যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে মনে বিশ্বাস করে যে, এখানে ধীরে ধীরে ইসলামিকরণ কায়েম হোক। তা হলে ১৪ ফেব্রুয়ারি আরবি ভাষাকে আবশ্যিক করার বিরুদ্ধে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এমন বিক্ষোভ করল কেন?

জামির আলী : এটা মূলত জনগণের রায় ছিল না। আমাদের ছোট ভায়েরা যারা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তারা এটা ঠিক বুঝতে পারেনি। এদেশে আমরা যারা বসবাস করি আমাদের সকলকে আরবি কোরান হাদিশ পড়তে হয়। এ কারণে আমরা সবাই আরবি পড়ে থাকি। আরবিকে বাধ্যতামূলক কথাটা শিক্ষামন্ত্রী যে দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছিলেন, সেই দৃষ্টিকোণের ভুল ব্যাখ্যা করে ছাত্ররা মনে করেছিল তারা বুঝি বাংলা ইংরাজি শিখতে পারবে না, শুধু মাত্র আরবিই শিখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি হিন্দুদের যেমন সংস্কৃত শিক্ষা প্রয়োজন, মুসলমানদেরও তেমনি ফরজ, তারা বাধ্যতামূলকভাবে যেন আরবি শেখে। যে আন্দোলন হয়েছিল, সেটা নগরাভিত্তিক, সেটা মাইক্রোস্কোপিক জনগণের রায় ছিল।

পরিবর্তন : এ কথা কি সত্যি আপনারা বর্তমান সামরিক শাসনকে সমর্থন করছেন?

জামির আলী : গণতন্ত্রকামী কোন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কখনও কোন গণতন্ত্রহীন দেশে বসবাস করতে পারে না। আমরা সেদিক থেকে কোনক্রমেই ব্যতিক্রম নই। তবে দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য সাময়িক ভাবে জাতীয় বাহিনীর দেশে অবস্থান করার প্রয়োজন। চিরকালের জন্য আমরা সেটা কখনও অনুমোদন করি না।

পরিবর্তন : বর্তমান প্রশাসনের কাজকর্মকে আপনারা সমালোচনা করেন না সমর্থন করেন?

জামির আলী : আমি আগেই বলেছি, আমরা আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের আদর্শের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচি কেউ যদি গ্রহণ করেন তা হলে তিনি ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন তা হলে আমরা তার বিরোধিতা করি। জনগণের অকল্যাণকর বিরোধী কোন কর্মসূচি বর্তমান সরকার গ্রহণ করলে আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হানাব।

পরিবর্তন : এই সরকার জনগণের বিরুদ্ধে কোন কাজ করছেন এটা কি আপনার মনে হয়েছে?

জামির আলী : এখনও পর্যন্ত এমন কিছু দেখতে পাইনি যা কল্যাণকর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে।

পরিবর্তন : আওয়ামি লিগের সংগে আপনাদের মৌলিক পার্থক্য কোথায়?

জামির আলী : মৌলিক পার্থক্য হল, ওরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, আমরা করি না, এ ছাড়া কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

পরিবর্তন : আচ্ছা, আপনারা অনেকেই বাংলাদেশ চাননি, বিহারীরাও চায়নি। কিন্তু আপনাদের মত অনেক রাজনৈতিক দলও তো সেদিন বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। তা হলে আপনারা যদি আজ মূল জনপ্রবাহের সংগে এক হয়ে যেতে পারেন, তা হলে বিহারীরা কী অপরাধ করলেন? তাঁদের মানবতার কারণে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?

জামির আলী : বিহারীরা যদি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব চেয়ে থাকে তা হলে মানবিক কারণে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত। আর যারা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব চেয়েছে পাকিস্তানের উচিত তাদের গ্রহণ করা। মুসলিম লিগ ক্ষমতায় এলে যারা বাংলাদেশের নাগরিক হতে চাইবে সবাইকে নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া হবে। □

সাক্ষাৎকার :
পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীব-তীর্থংকরের মৃত্যু : রাজ্য সরকারের গোপন রিপোরটে কী ছিল ?

শ্যামল বসু

সঞ্জীব-তীর্থংকরের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে এখনও জনচিত্ত তোলপাড়। পশ্চিমবংগ সরকারের ডি আই জি সি আই ডি এ সম্পর্কে যে রিপোরটটি রাজ্যসরকারকে দেন তা কোথাও এতদিন প্রকাশিত হয়নি। পরিবর্তনের পক্ষ থেকে শ্যামল বসু এই রিপোরটটি সংগ্রহ করেছেন। আমরা কোন মন্তব্য ব্যতিরেকেই জনস্বার্থে রিপোরটটি পকাশ করলাম।

ব্যারাকপুরের দুটি তরুণ তীর্থংকর দাসশর্মা ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। সাধারণত এ জাতীয় কোন মৃত্যুর কিনারা করতে গেলে সময়টা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যত দিন যাবে মৃত্যুর কারণগুলোও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সঞ্জীব-তীর্থংকরের মৃত্যুর ৭২ ঘণ্টা পরে তাদের দেহ দুটি বেওয়ারিশ লাশ বলে দাহ করা হয়ে গিয়েছে। ওদের বাড়ির লোক মৃত্যুর খবর পেলেন প্রায় ১৬ দিন পর। মৃত্যুর কারণ সম্ভবত এই সময়ের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

রাজ্য সরকার তার তদন্ত শেষে রায় দিয়েছেন, এটি আত্মহত্যা। আর কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকা তাঁদের নিযুক্ত বেসরকারি গোয়েন্দা দিয়ে তদন্ত করে জানিয়েছেন এটি একটি হত্যার ঘটনা। এই বিভ্রান্তির ভিত্তিতেই এখন মামলা চলছে কলকাতা হাইকোরটে। মামলার বিচার্য বিষয় সঞ্জীব তীর্থংকরের মৃত্যুর কীভাবে তদন্ত হওয়া উচিত · কিন্তু তাতে সঞ্জীব তীর্থংকরের মৃত্যুর রহস্যের কি সমাধান হবে ·

তার চেয়ে এই আপাত অন্ধকারের জগত থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা বিভ্রান্তিমুক্ত করা যাবে যদি ঐ বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোরটকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সত্যিই কীভাবে পরীক্ষা করেছেন তা দেখা যায়।

রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল অব পুলিশ রিপোরটটির ওপর যে মন্তব্য করে রাজ্য পুলিশের ডিরেকটর জেনারেলকে দিয়েছেন সেইটির বাংলা অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা হল। এতে গোপন রিপোরটের যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার নিচে তথাকথিত সাক্ষীদের নাম আছে এবং সেই সংগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে গোপন রিপোরটের অনুসরণে।

পরিশেষে বলা যায়, এটি প্রকাশ করার অর্থ কোনভাবেই ভারতের বিচার ব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা বা কোন ন্যায়ালয়ের প্রতি অসম্মান প্রকাশ নয়। এটির উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তির পর্দা সরিয়ে স্পষ্ট করে সব কিছু দেখার সুযোগ দেওয়া। রিপোরটটিতে (মেমো নম্বর ৭৪৭২/এম পি এস) বলা হয়েছে :

প্রাক্তন ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল অব পুলিশ ও 'সিক্রেট আই' নামক গোয়েন্দা সংস্থার ডিরেকটর দেবব্রত ধরের লেখা সঞ্জীব তীর্থংকর মৃত্যু রহস্য সম্পর্কিত রিপোরটটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ১২-৫-৮৩ ও ১৮-৫-৮৩ তারিখে বেরোয়। শ্রীধর তাঁর রিপোরটে দাবি করেন তিনি এই মৃত্যু রহস্যের পর্দা উন্মোচন করতে পেরেছেন। তাঁর মতে এটি একটি সুপরিকল্পিত খুনের ঘটনা। শ্রীধর তার রিপোরটে দেখিয়েছেন যে এই দুই কিশোর একটি অবাঙালি পরিবারের সংগে জড়িয়ে পড়ে। কীভাবে তাদের খুনের পরিকল্পনা করা হয় ও কীভাবে তাদের একটি গাড়িতে করে তুলে নিয়েগিয়ে হত্যা করা হয়। এমনকি একটা স্কেচ এঁকেও দেখান হয়েছে কোন পথ দিয়ে এই দুই কিশোরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

২। শ্রী ধরের রিপোরটে তাঁর কাছে যাবতীয় তথ্য আছে বলে দাবি করায় রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর ২৪ ৫ ৮৩ তারিখে তাঁকে গত ২৬ ৫ ৮৩ তারিখে ভবানী ভবনে হাজির হবার নির্দেশ পাঠান। নোটিশটিতেও বলা হয় দুই কিশোরের মৃত্যু রহস্যের সমাধানে পুলিশকে সহায়তা করার জন্য পুলিশের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর যেন তিনি সঠিকভাবে দেন ও তাঁর কাছে যা তথ্য আছে তাও যেন পুলিশকে জানান।

৩। ২৬ ৫ ৮৩ তারিখে শ্রী ধর ভবানীভবনে আসেননি। তার পরিবর্তে তিনি তাঁর একজন কর্মচারী সুধীর কুমার দেকে একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। শ্রী ধর তাঁর চিঠিতে লেখেন যেহেতু তাঁর রিপোরটটি শ্রী দের করা তদন্তের ওপর নির্ভর করে তাই তিনি শ্রী দেকে নির্দেশ দিয়েছেন ক। সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে, খ। সমস্ত সাক্ষীর নাম এবং ঠিকানা জানাতে, গ। কোন সাক্ষী কী কী ঘটনার স্বপক্ষে কী কী প্রমাণ দিয়েছেন তাও জানাতে।

৪। সুধীর দে একটি 'মেমো অব এভিডেনস' সাক্ষীদের নামের ও কোন কোন ঘটনার সপক্ষে তারা প্রমাণ রাখতে পারবেন তার তালিকা পেশ করেন। এটিতে তার স্বাক্ষর করা আছে। যখন তদন্তকারী ইনসপেকটর তাঁকে ঐ তালিকার ভিত্তিতে জেরা করতে চান এবং ঐ সাক্ষীদের কাছে নিয়ে যেতে চান তখন শ্রী দে সেই জেরার উত্তর দিতে বা সেই সাক্ষীদের কাছে যেতে অসম্মত হন। তিনি লিখিতভাবে জানান অসুস্থতার দরুন তিনি যেতে পারছেন না। তিনি শ্রী ধরের সংগে আলোচনা করে অন্য একটি দিন ধার্য করবেন বলেও কথা দেন। এছাড়া তিনি লিখিতভাবে জানান ১ ৬ ৮৩ তারিখে তিনি ১টার সময় কনট্রোলিং ইনসপেকটরের সামনে উপস্থিত থাকবেন। কনট্রোলিং ইনসপেকটর অথবা অন্য কোন সি আই ডি অফিসারের কোন সুযোগ হয়নি যে শ্রীদেকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

৫। এরপরই 'সিক্রেট আই' এবং তাঁর সুনাম বিপন্ন দেখে শ্রীদেবব্রত ধর গল্প ফেঁদে বসলেন যেশ্রী দে'কে জেরার সময় দু'জন সি আই ডি অফিসার ভয় দেখিয়েছেন ও শ্রী দেকে নানা রকম মানসিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করলেন শ্রী দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছবি তোলা হয়েছে এবং তাঁকে ভয় দেখান হয়েছে ইনডিয়ান পেনাল কোডের ১০৩ ধারা অনুযায়ী ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শ্রী দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ না করলে তিনি আর কোনভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত নন।

৬। ৩১ ৫-৮৩ তারিখে শ্রী ধর পুলিশের ডাইরেকটর জেনারেল এবং ডি আই জি সি আই ডি কে জানালেন যে, এই মৃত্যু রহস্যের ঘটনাটি এখন বিচার বিভাগের অধীনে। ইনডিয়ান পেনাল কোডের ৫০০ ধারায় কলকাতার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিসট্রেটের কোরটে একটি মানহানির মামলা চলছে, কাজেই তাঁর পক্ষে এখন কোনভাবেই গোয়েন্দা দপ্তরকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তিনি আরো জানালেন তাঁর সহকর্মী শ্রী দেকে আইনের পরামর্শ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত বিষয়টির বিচার চলবে ততদিন কোন তথ্যপ্রমাণ এখন গোয়েন্দা দপ্তরকে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে তিনি শ্রী দুর্গা ফায়ার ওয়ারকসের মালিক ৫১ নম্বর ক্যানিং স্ট্রিট নিবাসী **শ্রী এস কে নারুলা** শ্রীধর ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে একটি মানহানির মামলা করেছেন।

এটা নিশ্চিত যে শ্রী ধরের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রী দে সি আই ডির কনট্রোলিং ইনসপেকটর এবং সাক্ষীদের সম্মুখীন হতে চাননি।

৭। এ প্রসংগে জানান দরকার শ্রী ধরের কর্মচারী সুধীর কুমার দে ২৪ পরগণা জেলায় পুলিশের একজন সাব-ইনসপেকটর ছিলেন। ১৯৭২ সালে তাঁকে কর্তব্যে ফাঁকি, অসদাচারণ এবং নিয়ম না মেনে চলার জন্য চাকরি থেকে সাসপেনড করা হয়। পরে সমস্ত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৭৫ সালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

৮। সুধীর কুমার দে যে সমস্ত সাক্ষীর নাম ও তথ্য-প্রমাণের তালিকা (Memo of Evidence) দিয়েছিলেন সেগুলির একটি জেরকস কপি এই সংগে দেওয়া হল। এই

তালিকায় যে সমস্ত সাক্ষীর নাম দেওয়া আছে তাদের প্রায় সবাইকেই কনট্রোলিং ইনসপেকটর এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট সি আই ডি খুব ভালভাবে জেরা করেন। জেরার সময় তাঁরা সকলেই শ্রী ধর ও শ্রী দের দেওয়া তথ্য অস্বীকার করেন। সাক্ষীদের মধ্যে বেশির ভাগই জানান যে শ্রী দে তাদের কাছে নিজেকে একজন সি বি আই অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে ছিলেন। কাউকে কাউকে আবার বলেছিলেন যে তিনি পি বি আই (প্রভিনশিয়াল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন) এর লোক। ডাঃ পি কে সরকার নামক এক ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন তিনি একসটেনশনে থেকে সি বি আই এর কাজ করছেন। এভাবে মিথ্যা বলে শ্রী দে নিজেই নিজেকে ইনডিয়ান পেনাল কোডের ১৭০ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় করে তুলেছেন।

৯। শ্রী ধরের পক্ষে শ্রী দের দেওয়া 'সাক্ষ্য ও প্রমাণ তালিকা' অনুযায়ী আমার মন্তব্য এখানে দেওয়া হল :

১। আমবরা নিবার রোড, ব্যারাকপুরে ক্যাপটেন রায়ের বাড়িতে জড়ো হয় এবং সঞ্জীব শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে খাবার দিয়ে তিনজনে ক্যাপটেন রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে ও কাছের গলিতে সঞ্জীব কমলের সংগে এবং তীর্থংকর বিশালের সংগে কথা বলে।

ক। কেনী বা সুরজিৎ রায়

খ। ক্যাপটেন রায়ের কন্যারা ও স্ত্রী।

ঠিকানা ১ এবং ২ নমবর আমবরা নিবার রোড; ব্যারাকপুর।

গ। প্রসেনজিৎ বৈশ্য ঠিকানা পোরট ক্লেয়ার রোড, ব্যারাকপুর।

মন্তব্য

ওপরের সমস্ত সাক্ষী অর্থাৎ কেনী বা সুরজিৎ রায় (ক্যাপটেন সুখেন্দু রায়ের পুত্র), মীরা রায় (ক্যাপটেন রায়ের স্ত্রী), মধুমিতা ও সুস্মিতা রায় (ক্যাপটেন রায়ের কন্যাদ্বয়), ঠিকানা ৮/১ আমবরা নিবার রোড, থানা টিটাগড়। প্রসেনজিৎ বৈশ্য (বাবার নাম প্রভাস চন্দ্র বৈশ্য), পোরট ক্লেয়ার রোড, থানা টিটাগড়। এঁরা প্রত্যেকেই অস্বীকার করেন যে সেদিন তীর্থংকর ও সঞ্জীবকে তাঁরা বিশাল ও কমলের সংগে কথা বলতে দেখেছিলেন। এ প্রসংগে একথাও বলা যায় বিশাল এবং কমলের বাবা যশপাল কুমার ক্যাপটেন রায়ের প্রতিবেশী। তীর্থংকর, সঞ্জীব এবং প্রসেনজিৎ ক্যাপটেন এস রায়ের বাড়িতে ঘনঘন যাতায়াত করত। ক্যাপটেন রায়ের ছেলে কেনী ওদের বন্ধু ছিল।

২। তীর্থংকর এবং সঞ্জীব পোরট ক্লেয়ার রোডে ডঃ দিলীপ চ্যাটারজির বাড়ির দরজায় সাইকেল রেখে দিয়ে চিড়িয়ার মোড়ের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। ক। গৌতম সেনগুপ্ত খ। মিহির মজুমদার, পোরট ক্লেয়ার রোড।

মন্তব্য

গৌতম সেনগুপ্ত (পিতা গোপাল সেনগুপ্ত) এবং মিহির মজুমদার (৫৫ টেলিফোন একসচেনজ এর কর্মী)কে জেরা করে জানা যায় যে সঞ্জীব তার নিজের বাড়ির সামনে সাইকেল রেখে তারপর তীর্থংকরের সংগে হাঁটতে হাঁটতে চিড়িয়া মোড়ের দিকে যায়। তারা কেউই দৌড়য়নি। সঞ্জীবের আত্মীয়া শ্রীমতী জয়ন্তী চ্যাটারজিও একথা সমর্থন করেন।

৩। দুটি বালক (তীর্থংকর ও সঞ্জীব) কে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে যেতে দেখা যায়।

ক। নব ঘোষ, ঘোষপাড়া ব্যারাকপুর।

নবকুমার ঘোষ (পিতার নাম প্রয়াত মোহন লাল ঘোষ) ১৮, ঘোষপাড়া, টিটাগড়, নেহেরু চেসট ক্লিনিকের কেয়ার টেকার কাম ক্লাবক। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন ২১-৩-৮৩ বিকাল ৫ ৩০ মি তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এবং তারপর আর তিনি বাড়ি থেকে বেরোননি। লেভেল ক্রসিং গেট নমবর ১৫ কখনই তার বাড়ির থেকে দেখা যায় না। তাই কখনই সঞ্জীব বা তীর্থংকরকে লেভেল ক্রশিং পার হতে তিনি দেখেননি। তিনি আরও জানান যে গত এপ্রিল মাসের শেষদিকে সুধীর দে তার সংগে অফিসে দেখা করেন এবং এই মৃত্যু রহস্য সমাধানে তাকে সাহায্য করতে বলেন।

৪। সন্তান দলের একটা জমকালো এবং বড় মিছিলের সংগে তীর্থংকর এবং সঞ্জীবকে আমবরা নিবার রোডের দিকে হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল।

ক। গোপাল শা, এস এন ব্যানারজি রোড, ব্যারাকপুর।

মন্তব্য

গোপাল সাউ (পিতা প্রয়াত হরিলাল সাউ) ঠিকানা, শান্তি বাজার, শীতল সাহার বাগান) থানা টিটাগড়, এস এন ব্যানারজি রোড আর আমবরা নিবার রোডের মোড়ে পানের দোকান। জেরার সময় বলেন যে কখনই তিনি সঞ্জীব ও তীর্থংকরকে মিছিলের সংগে হেঁটে যেতে দেখেননি। গত এক মাস আগে শ্রী দে তার সংগে দেখা করে জানতে চান যে তিনি সঞ্জীব ও তীর্থংকরকে মিছিলের সংগে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন কি না? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে তিনি সঞ্জীব ও তীর্থংকরকে চেনেন না।

৫। মিছিলটি যাওয়ার সময় স্নেহে কাউর ফুচকা খাচ্ছিলেন, সেই সময় ওদের দেখেন।

ক। নারায়ণ মাহাত এস এন ব্যানারজি রোড, ব্যারাকপুর।

মন্তব্য

নারায়ণ মাহাত একজন ফুচকা ওয়ালা। সাধারণত তিনি গোপাল সাউ র পানবিড়ির দোকানের সামনেই বসেন। তাকে জেরার জন্য পাওয়া যায়নি। তবে এ প্রসংগে একটি কথা জানান দরকার যে ঐ অঞ্চলে শ্রীমতী স্নেহে কাউর বলে কোন মহিলা নেই। অবশ্য যশপাল কুমারের স্ত্রীর নাম স্নেহ কুমার, আছেন। সুধীর দে হয়ত যশপাল কুমারের স্ত্রীর কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

৬। একটি নীল রঙের ভ্যান (নমবর WBV 9014) চন্দনপুকুরের কাছে বারাসত রোডে অপেক্ষা করছিল। ভ্যানটির মুখ ছিল রেলওয়ে লেভেল ক্রশিং গেট নমবর ১৫ র দিকে। ঐ সময় ৫/৬ জন ছেলে যাদের মধ্যে সঞ্জীব, তীর্থংকর, বিশাল, কমল ছিল তারা এসে ওঠে এবং ভ্যানটি মুখ ঘুরিয়ে বারাসতের দিকে চলে যায়।

ক। বাদল গোমই, পাইপরোড, ভট্টাচার্য পাড়া, ব্যারাকপুর।

মন্তব্য

বাদল গোমই (পিতা বিপিন গোমই) ৪৬ বছর বয়সের একজন রিকসাচালক। তিনি সঞ্জীবের বাবা দিলীপ চট্টোপাধ্যায়কে 'ডাক্তার বাবু' বলে চেনেন। সঞ্জীবদের প্রতিবেশীও বটে। তিনি কোন ঘটনা জানেন না বলায় সুধীর দে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেন। যদি তিনি এরকম কোন ঘটনা জানতেন তবে ডাক্তারবাবুকে নিশ্চয় জানাতেন। তিনি আরও জানান শ্রী দে তাকে যাদবপুরের একটা কারখানায় চাকরি দেবেন বলে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করে নেন।

৭। সাদা রঙের একটি আমবাসাডর (নমবর WMB 9353) কে শালবনাতে শ্রী দুর্গা ফায়ার ওয়ারকসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ঐ গাড়িতে সঞ্জীব ও তীর্থংকরকে জোর করে তোলা হয় এবং তারপর ৫টা নাগাদ গাড়িটি বি টি রোডের দিকে চলে যায়।

ক। কেশব কারক

খ। দুর্গাপদ রায়

শালবনা, থানা বারাসত

মন্তব্য

কেশব চন্দ্র কারক (বয়স ১৪, পিতার নাম জীবন কৃষ্ণ কারক) ঠিকানা জামতাগড়, শালবনা, স্থানীয় স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র। সে এরকম কোন ঘটনা দেখেছে বলে অস্বীকার করে। সে বলে, গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সে যখন শালবনাতে রাস্তার ধারে দুর্গাপদ রায়ের সংগে দাঁড়িয়ে ছিল তখন সুধীর দে এসে তার নাম ঠিকানা জিগ্যেস করেন, এছাড়া আর কিছু জিগ্যেস করেননি। দুর্গাপদ রায় (৭১) পিতা প্রয়াত শ্রীকৃষ্ণ রায়, ঠিকানা জামতাগড়। ইনি একজন নিরক্ষর মানুষ। তিনি দুটি ছেলেকে জোর করে গাড়িতে তোলার কোন ঘটনা জানেন না। তাকে সুধীর দে সাদা আমবাসাডর দেখেছে কি না জিগ্যেস করলে জানান, এ গ্রামে দুটো সাদা গাড়ি আসে, অজিত কুমার পাঁজার, অন্যটা শ্রী দুর্গা ফায়ার ওয়ারকস-এর মালিক জানকী দাস নারুলার। শ্রী নারুলার গাড়ি প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এখানে থাকে। কারণ উনি শনিবার কারখানার শ্রমিকদের বেতন দেন। শ্রীরায় ইংরাজি জানেন না। তাই নমবর বলতে পারেন না।

৮। একটা নীলরঙের ভ্যান (নমবর WBV 9014) প্রায়ই স্নেহে কাউরের বাড়িতে আসত এবং কখনও কখনও রাতে ঐ গাড়ি করে কোকেন, আফিং ও মদ পাচার হত।

ক। ডাঃ পি কে সরকার ও অন্যান্য, আমবরা নিবার রোড, ব্যারাকপুর।

মন্তব্য

আগেই বলা হয়েছে আমবরা নিবার রোডে স্নেহে কাউর বলে কেউ থাকেন না। একমাত্র স্নেহ কুমার (যশপাল কুমারের স্ত্রী) বলে একজন থাকেন। ডাঃ পি কে সরকার, ইনডিয়ান অরডিনানস ফ্যাকটরির একজন অবসরপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার। তিনি জানান, তিনি যশপাল কুমারের একজন প্রতিবেশী এবং তিনি এরকম কোন কথা শ্রী দে কে বলেননি। এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, তিনি এইটুকুই বলেছিলেন মাঝে মাঝে একটা ম্যাটাডোর ভ্যান শ্রী কুমারের বাড়িতে আসে—হয়ত ফ্যাকটরির কাজেই আসে। এ প্রসংগে কনট্রোলিং অফিসারকে লেখা ডাঃ সরকারের একটি চিঠি এইসংগে দেওয়া হল।

যশপাল কুমারের আর একজন প্রতিবেশী পঞ্চানন রায় (২৮), পিতা রামচন্দ্র রায়, একটি ইলেকট্রিকাল কনট্রাকটরের কর্মী। তিনিও এরকম কোন ঘটনার কথা অস্বীকার করেন।

৯। স্নেহে কাউরের সেরকম আয়ের উৎস না থাকা এবং সে অনেকদিন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরও বেশ বিলাসিতার মধ্যে থাকে। এটা কী করে সম্ভব? এর থেকে মনে হয় সে

কোন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে।

ক। ডাঃ পি কে সরকার, আমবরা নিবার রোড

খ। ক্যাপটেন এস রায়, আমবরা নিবার রোড

গ। মিথুন ভট্টাচার্য, আমবরা নিবার রোড

মন্তব্য

এটি যশপাল কুমার প্রসংগে বলা হয়েছে। যশপাল কুমার কমল ও বিশালের বাবা।

ডাঃ পি কে সরকারের কথা জানান হয়েছে যে তিনি এ জাতীয় কোন মন্তব্য করেননি। ক্যাপটেন (অবসরপ্রাপ্ত) শরদিন্দু রায় (৬৫) টিটাগড় স্টিলের সিকিউরিটি অফিসার। মিথুন ওরফে প্রসূন ভট্টাচার্য (পিতার নাম পরিতোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য) ব্যারাকপুর গভরমেনট হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

এঁরা সকলেই যশপাল কুমারের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। সি আই ডি অফিসারের জিজ্ঞাসার জবাবে এঁরা সকলেই অস্বীকার করেন যে এই রকম কোন উক্তি তাঁরা করেছেন। শ্রীকুমারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানেন না বলেই তারা মন্তব্য করেছেন।

শ্রী দে স্নেহে কাউর বলতে স্নেহ কুমারকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আমি জানি, যশপাল কুমার শ্রী দুর্গা ফায়ার ওয়ারকসে চাকরি করেন। তিনি মাসে ১২০০ টাকা মত বেতন পান। এ ছাড়া হোসিয়ারি জিনিসপত্র থেকে তার মাসে ৪০০-৫০০ টাকা আয় হয়। শ্রীকুমার দু কামরার একটি ফ্ল্যাটে বাস করেন। তার প্রাত্যহিক জীবনেও চোখে পড়ার মত কোন বিলাসিতা নেই।

১০। সঞ্জীব ও তীর্থংকর বিশাল এবং কমলের বাড়িতে এসে কিছু বেআইনি এবং আপত্তিকর জিনিস পত্র দেখে স্তম্ভিত ও দুঃখিত হয়ে চলে গিয়েছিল।

ক। কেনী বা সুরজিৎ রায়, আমবরা নিবার রোড

খ। প্রসেনজিৎ বৈশ্য, পোরট ব্লেয়ার রোড

মন্তব্য

কেনী এবং প্রসেনজিৎ দুজনেই তীর্থংকর এবং সঞ্জীবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কেনী আবার কমল ও বিশালের প্রতিবেশী। তারা বলে সঞ্জীব এবং তীর্থংকরের ঐ বাড়িতে যাওয়া সম্পর্কেই তারা কিছু জানে না। তারা শ্রীদের কাছে এরকম কোন মন্তব্য করেছে বলেও অস্বীকার করে।

১২। সন্তান দলের আকর্ষণীয় মিছিলের আয়োজন করেছিলেন :

১। রবীন্দ্র আচার্য ইস্টারন রেলওয়ের গার্ড, এস এন ব্যানারজি রোড, এস ডি পি ও অফিসের বিপরীতে। ২। শ্রী হরিহর চ্যাটারজি, ইনসপেক্টর অব পুলিশ ফারসট ব্যাটেলিয়ান, লাটবাগান।

মন্তব্য

রবীন্দ্র আচার্য (পিতা সতীশ চন্দ্র আচার্য, ১০৩/৫ অডারলি বাজার, থানা : ব্যারাকপুর)-কে জেরা করলে জানা যায় যে ২৭-৪-৮৩ তারিখে শ্রী দে শ্রীআচার্যের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি (শ্রী আচার্য) সঞ্জীব, তীর্থংকরকে ২১ ৩ ৮৩ তারিখে মিছিলের সময় দেখেছিলেন কি না। শ্রীআচার্য জানান তিনি তীর্থংকরকে চেনেন না, তবে সঞ্জীবকে চিনতেন। কিন্তু সেদিন সঞ্জীবকে তিনি দেখেননি। তিনি আরও জানান যে তিনি ঐ মিছিলের আয়োজক ছিলেন। মিছিলটি বালক ব্রহ্মচারীর সন্তান দলের মিছিল ছিল। ২১ ৩ ৮৩ মিছিলটি লাট বাগান থেকে বেলা ৫টা নাগাদ শুরু হয়। চিড়িয়া মোড়, এস এন ব্যানারজি রোড, বেলওয়ে গেট, ১৪ ওলড ক্যালকাটা রোড দিয়ে আনন্দপুরী রোডে গিয়েছিল। আনন্দপুরী রোডের কালীতলার ময়দানে পৌঁছেছিল সাড়ে ছটার সময়। ৫০০০ লোক জমায়েত ছিল। সেখানে বালক ব্রহ্মচারী প্রায় পৌনে আটটা অবধি ভাষণ দেন এবং আটটা পঞ্চাশ নাগাদ সভা ভেঙে যায়। শোভাযাত্রার প্রথম দিকে ২৫/৩০ জন বয়স্কা মহিলা ছিলেন। তাঁদের কেউ গলায় মালা দেননি অথবা কোন রকম 'নাচ' হয়নি।

১২। সঞ্জীব ও তীর্থংকরের হারানর ডায়েরি (নমবর ১১৬৯) টিটাগড় পুলিস স্টেশনে ২২ ৩-৮৩ তারিখে করা হয় ০০-৩০ মিঃ।

ক। অমল কুমার দাসশর্মা, পোরট ব্লেয়ার রোড, ব্যারাকপুর।

খ। দিলীপ চ্যাটারজি, পোরট ব্লেয়ার রোড, ব্যারাকপুর।

মন্তব্য

তীর্থংকরের বাবা, শ্রীঅমল দাসশর্মা, দু'বার দুটি ছেলে হারানর জন্য ডায়েরি করেন টিটাগড় পুলিশ স্টেশনে। একবার ২১ ৩ ৮৩ তারিখে ২৩ ৩০ মিঃ (অর্থাৎ রাত ১১টা ৩০ মিঃ) নমবর ১১৬৯ এবং অপর একটি নমবর ১১৯৭ তারিখ ২২ ৩ ৮৩ (বেলা ১২টা ৩৫মিঃ এ)।

১৩। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে :

(ক) সরোজ ঘোষদস্তিদার, পোরট ব্লেয়ার রোড, ব্যারাকপুর

(খ) তপন ঘোষ, এস এন ব্যানারজি রোড, ব্যারাকপুর

(গ) ডাঃ পি কে সরকার, আমবরা নিবার রোড, ব্যারাকপুর

(ঘ) অসীম চট্টোপাধ্যায়, আমবরা নিবার রোড, ব্যারাকপুর

(ঙ) সুধীর ঘোষদস্তিদার, কনজার-ভেনসি ডিপার্টমেনট, ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য।

মন্তব্য

জেরার সময় এইসব সাক্ষীরা কোন ঘটনাই জানেন না বলে জানান এবং এ বিষয় কোন কথা বলেছেন বলে অস্বীকার করেন।

১৪। ব্যারাকপুরে কমল কুমার বেসরকারিভাবে বুকিং ক্লারকের কাজ করত।

(১) ডাঃ পি কে সরকার

(২) পঞ্চানন দে

মন্তব্য

ডাঃ পি কে সরকার এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেছেন বলে অস্বীকার করেন।

ব্যারাকপুর রেল স্টেশনের স্টেশনমাস্টার জানান কমল কুমারের অনেক বন্ধু আছে যারা শিয়ালদা ডিভিশনে অস্থায়ীভাবে কমার্শিয়াল ক্লারকের কাজ করেন, কিন্তু তিনি কখনই কমল কুমারকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যারাকপুর রেল স্টেশনে বুকিং ক্লারকের কাজ করতে দেননি।

পঞ্চানন দের খোঁজ চলছে। এ নামে কাউকে পাওয়া যায়নি।

১৫ (ক)। কলকাতা, শালবনা, ব্যারাকপুর, খড়দা, রিষড়া, পান্ডুয়া ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় সমাজবিরোধীরা এই হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত। এর মধ্যে কিছু অবাঙালি এবং উচ্চপদে আসীন বাঙালিও আছেন।

মন্তব্য

দেবব্রত ধর ও তাঁর প্রতিষ্ঠান 'সিক্রেট আই'-এর মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে সি আই ডি অফিসাররা দরজায় দরজায় অনুসন্ধান চালিয়ে এ জাতীয় কোন নাম বা হদিশ পায়নি।

১৫ (খ)। এই আততায়ীদের নাম ঠিকানা জানা গেছে তবে তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগে নাম ঠিকানা দেওয়া সম্ভব নয়।

মন্তব্য

শ্রীধর দাবি করছেন তিনি আততায়ীদের নাম ঠিকানা জানেন। অথচ তিনি তা জানাতে প্রস্তুত নন। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। তিনি কেন পুলিশকে সাহায্য করতে চাইছেন না তাও বোঝা যাচ্ছে না।

১৬। পান্ডুয়ার ঐ হত্যায় যারা সাক্ষী ছিলেন তাদের নাম ঠিকানা যোগাড় হয়েছে। সেটা দিতে কিছুদিন সময় লাগবে।

মন্তব্য

আনন্দবাজারে প্রকাশিত রিপোর্টে শ্রীধর দাবি করেছেন ব্যারাকপুর থেকে পান্ডুয়ায় সঞ্জীব ও তীর্থংকরকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হল এবং হত্যা করা হল সেসব তিনি জানেন। অথচ এখনও তিনি সাক্ষীর তালিকা তৈরি করতে পারেননি।

এ থেকে বোঝা যায় যে শ্রীধর সাক্ষ্যপ্রমাণ তৈরি করছেন। তিনি এ কাজ করেছেন দুটি কারণে — এক তাঁর প্রতিষ্ঠান 'সিক্রেট আই'কে পরিচিত করানর জন্য। দুই, তিনি রাজ্য সরকার, বিশেষ করে পুলিশ বিভাগকে হেয় করতে চাইছেন।

শ্রীধর এবং শ্রীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

স্বাক্ষর : বি কে সাহা
ডেপুটি ইনসপেক্টর অব পুলিশ
সি আই ডি
পশ্চিমবঙ্গ

মেমো নম্বর [illegible] (I) M P S.
dt. [illegible]

শ্রী রথীন সেনগুপ্ত, হোম সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিং কলকাতা-১ [illegible] অবগতার্থে।

ডি ডি আই, বরাহনগরকে লেখা ডাঃ পি কে সরকারের চিঠি

বিষয় ব্যারাকপুরের সঞ্জীব ও তীর্থংকরের অস্বাভাবিক মৃত্যু

আপনার আদেশের (২৭ ৫ ৮৩) পত্রের উত্তরে জানাতে চাই যে একজন বৃদ্ধ লোক, বয়স প্রায় ৬০ বছর আমার বাড়িতে এলেন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন সুধীর কুমার দে সরকার। তিনি একজন সি বি আই অফিসার যিনি এখনও একস [illegible] বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি পরোক্ষ অস্বাভাবিক [illegible] বিষয়ে [illegible] জানালেন।

আমার পাশের দরজার বাসিন্দা যশপাল কুমার শ্রী দুর্গাপদ রায়ের ভাড়াটে। আমার যতদূর জানি যে তিনি দু কামরার ফ্ল্যাটে বাস করেন এবং তাঁর ছেলেরা আমার পরিচিত। শ্রী দে সরকার পীড়াপীড়ি করাতে আমি বলেছিলাম উনি শ্রী দুর্গা ফায়ার ওয়ারকসে চাকরি করেন। কখনও কখনও একটা মোটর ভ্যান ওর বাড়িতে আসে। তার রং অথবা নম্বর আমি কিছুই জানিনা। আমি শ্রী দে সরকারকে কখনও বলিনি যশপাল কুমার [illegible] তৈরি করেন বা কোকেন, আফিম, [illegible] কি বিদেশি মদ নিয়ে কিছু করেন।

পাঞ্জাবের সমস্যা পাঁচ মিনিটেই সমাধান করা যায়! ডঃ সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামী

নতুন দিললির পুরানা কিল্লা রোডে ডঃ সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামীর ছোট্ট ছিমছাম সরকারি বাংলোর অন্দর মহলে ঢুকলে মনে হয় বুঝি কোন গবেষক বা শিক্ষাবিদের ঘরে এলাম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছোট্ট বসার ঘরের চারদিকেই দেওয়াল আলমারিতে বই ঠাসা। টেবিলে লেখার কাগজ ছড়ান। দু-একটা বই এর পাতা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে খাপখোলা কলম রাখা আছে। ডঃ স্বামী ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, বিনয়ী। অথচ নম্র স্বভাবের এই মানুষটি যে কীরকম স্পষ্ট বক্তা তা সংসদে এবং সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য শুনলেই বোঝা যায়। শুনে আনন্দ পেলাম যে, মানুষটির পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে, শ্রদ্ধাও আছে। থাকবেই বা না কেন? পশ্চিমবঙ্গ থেকেই তো তিনি সমাজ সচেতন হয়েছেন, রাজনীতি সচেতন হয়েছেন।

ডঃ সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামী

৪৩ বছর বয়স্ক সুন্দর চেহারার মানুষটির জন্ম তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে। দিললি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট এবং আমেরিকার হার-ভারড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। শিক্ষা শেষে তিনি হারভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। এরপর দেশে ফিরে এসে দিললির ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজিতে যোগ দেন। তিনি একদিকে যেমন লোকসভার সদস্য তেমনি সদস্য লনডনের ইনটারন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ডঃ স্বামী ছিলেন জনসংঘের সংগে। জনতা পারটি গঠনের পর এই পারটিতেই তিনি যোগ দেন। ১৯৭৪ সাল থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। ১৯৭৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। আজ পর্যন্ত লোকসভার সদস্যই তিনি আছেন। এছাড়া তিনি ইনডিয়ান পাবলিক আনডারটেকিং কমিটিরও সদস্য।

ডঃ স্বামীর রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষা জীবনের রেকরড অনেক বেশি। অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাঁর লেখা তিনটি বই আছে: ১ ইকনমিক গ্রোথ অব চায়না অ্যানড ইনডিয়া, ২. ইনডিয়ান ইকনমিক প্ল্যানিং - অ্যান অলটারনেটিভ অ্যাপরোচ, ৩ ল্যানড ম্যানেজমেনট ইন ইনডিয়া। এছাড়া তাঁর ১২৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামীর শখ নতুন নতুন ভাষা শেখা এবং বই পড়া। একদিকে রাজনীতি আর অন্যদিকে শিক্ষার কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী তিনি। চীনের অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর পড়াশোনা করতে তিনি বিশেষ উৎসাহ পান। প্রায় নিয়মিত ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখেন। সংবাদপত্রে তাঁর লেখা পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত। অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাজনীতিতে সমজ্ঞানী এরূপ মানুষের কাছে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হয়। তাই আন্তর্জাতিক বিষয়, অর্থনীতি এবং জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়ের প্রশ্ন ভান্ডার নিয়ে হাজির হয়েছিলাম তাঁর দিললির বাড়িতে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন তিনি।

পরিবর্তন : সম্প্রতি আমেরিকা ও চীন সহ অনেক দেশ আপনি ঘুরে এসেছেন। নিশ্চয়ই এইসব দেশে নিছক ভ্রমণের জন্য যাননি। আমেরিকায় উচ্চস্তরের রাজনীতিকদের সংগে দেখাও করেছেন। ভারতের প্রতি আমেরিকার মনোভাবের কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা আপনি দেখেছেন কি, নাকি আমেরিকা আগের মতই পাকিস্তানের দিকে ঝোল টেনে যাবে?

সুব্রাহ্মনিয়ম : আমি প্রথমে বলতে চাই যে, আমেরিকার বৈদেশিক নীতি হল তার জাগতিক স্বার্থের ভিত্তিতে। যে সকল দেশ তাঁদের জাগতিক স্বার্থের পক্ষে, আমেরিকা সেই সব দেশকেই বন্ধু বলে মনে করে। আর যারা পক্ষে নয়, তাদের আমেরিকা বন্ধু বলে মনে করে না। আমরা স্বভাবতই আমেরিকার জাগতিক স্বার্থের অংশীদার হতে পারি না, যেমন হয়েছে পাকিস্তান এবং ইজরায়েল। কেননা আমাদের দেশ একটি বৃহৎ দেশ। আমরা নিজেদের ক্ষমতায়ই নিজেদের বলীয়ান মনে করি। পাকিস্তান এবং ইজরায়েলের সংগে আমেরিকার যে সম্পর্ক আছে আমাদের সংগে তা হতে পারে না। সুতরাং আমেরিকার বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

তাছাড়া যখনই শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় থাকেন, তখনই ভারতের সংগে রাশিয়ার বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়। আর সেটাই হল আমেরিকার কাছে বিশেষ সমস্যা। বৈদেশিক নীতিতে আমেরিকা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। প্রথমত, যারা তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, যারা স্বাধীনভাবাপন্ন, যেমন চীনদেশ। তৃতীয়ত, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে আছে। আমেরিকা মনে করে ভারতবর্ষ এই বৈদেশিক নীতির তৃতীয় ভাগে।

গত বছর শ্রীমতী গান্ধী যখন আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন, তখন আমেরিকা মনে করেছিল, এবার বুঝি শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সোভিয়েত প্রীতির সংশোধন করবেন। আমেরিকা এ-ও আশা করেছিল যে, শ্রীমতী গান্ধী খোলাখুলি আফগানে রুশ সৈন্য সমাবেশের কঠোর সমালোচনা করবেন এবং আফগান থেকে রুশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার কথা বলবেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী আমেরিকা সফরকালে কিংবা সফরের পরেও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। সব দেখে শুনে আমেরিকার ধারণা হয়েছে ভারত সোভিয়েতের দিকেই ঝুঁকে আছে। সুতরাং আমেরিকার বৈদেশিক নীতিতে ভারতের প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই নেই বলে মনে হয়।

পরিবর্তন : আপনি কি মনে করেন, আমেরিকার ব্যক্তিগত পুঁজি আরো বেশি করে ভারতে আসার সম্ভাবনা আছে?

সুব্রাহ্মনিয়ম : আমি মনে করি যে, আমেরিকার ব্যক্তিগত পুঁজি ভারতে নিয়োগের কিছু চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ঐ পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত। সেদিক দিয়ে ভারতে আছেন বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ। আমেরিকার আছে পুঁজি। সুতরাং সুযোগ আছে শুধু একটাই যে, ভারতের কারিগরি এবং আমেরিকার পুঁজি এই দুই মিলিয়ে কোন তৃতীয় দেশে শিল্প বাণিজ্য সংস্থা সংগঠিত করা।

পরিবর্তন : নিকট ভবিষ্যতে এই রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা আছে কি?

সুব্রাহ্মনিয়ম : এই সমঝোতা সকল সময় নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর। আমার মনে হয় শ্রীমতী গান্ধী রাশিয়ার সংগেই থাকতে চান। সুতরাং যতদিন তিনি রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে থাকবেন, ততদিন আমেরিকার সংগে সমঝোতা হবার সম্ভাবনা নেই

পরিবর্তন : শ্রীমতী গান্ধীর সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝোঁকবার কারণ কী?

সুব্রাহ্মনিয়ম : ঠিক জানি না। হয়ত শ্রীমতী গান্ধী মনে করছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশি বিশ্বস্ত এবং বন্ধুভাবাপন্ন। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এসবই তাঁর কথা। তিনিই ভাল বলতে পারবেন। আমি জানি না, উনি কেন এখুনি বলতে পারছেন না, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হোক।

পরিবর্তন : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর বিরুদ্ধে আমেরিকার সাংবাদিক সেমুর হারশ তাঁর লেখা বইতে যে অভিযোগ এনেছেন তার জন্য আপনি ভারত এবং আমেরিকা দুই দেশেই আইনগত ব্যবস্হা নিচ্ছিলেন, তার কী হল? আমেবিকায় যে ভারতীয় আইনজীবী মোরারজি দেশাই-এর সপক্ষে আদালতে দাঁড়াচ্ছেন তাঁর প্রতি আপনার আস্হা আছে কি?

সুব্রাহ্মনিয়ম : হ্যাঁ, শিকাগো আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত শ্রী হারশ এবং তাঁর পুস্তক প্রকাশকের প্রতি নোটিশ জারি করেছিলেন। সেই নোটিশে সাক্ষ্য প্রমাণের দলিলপত্র নিয়ে হারশকে আদালতে উপস্হিত হতে [illegible] হয়েছিল।

আমেরিকায় যে ভারতীয় আইনজীবী মোরারজি দেশাইয়ের পক্ষে আদালতে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁর প্রতি আমার আস্হা আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি, ঐ ভারতীয় আইনজীবীকে আমি ঠিক করিনি। মনুভাই প্যাটেল, যিনি জনতা পারটি এবং রাজ্যসভার সদস্য, তিনিই ঠিক করেছেন। সেই সময় মনুভাই শিকাগোতে ছিলেন। আমার অবশ্য মনে হয়েছিল যে, আমাদের একজন আইনজীবীর প্রয়োজন। আমি বলেওছিলাম, আমেরিকার একজন ভারতীয় থেকে সেখানকার আইনজীবীই নিয়োগ করা হোক। কিন্তু মোরারজি দেশাই সেই সময় মনে করলেন, ভারতীয় আইনজীবীকেই ঠিক করা হোক। কিন্তু আমার মনে হয়, মোরারজি দেশাই এটা ঠিক করেননি। কারণ যে ভারতীয় আইনজীবীকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁর কাজের রেকরড ভাল নয়। এখন আমি মোরারজি দেশাই এর লোকের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, একজন আমেরিকান আইনজীবীকেও নিয়োগ করা হয়েছে।

আমার আমেরিকা যাবার এবং আইনগত ব্যবস্হা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রমাণ করা যে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এমন কোন প্রমাণপত্র নেই যার দ্বারা বলা যায় মোরারজি দেশাই সি আই এ র সংগে জড়িত ছিলেন। আমি আমার নিজের সন্তুষ্টির জন্য আমেরিকায় গেছি। সেখানে কিসিংজার (আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী), ময়নিহান (বর্তমান সেনেটর) এবং আরো অনেকের সংগে কথা বলেছি। এঁরা প্রত্যেকেই হারশের লেখার বিরোধিতা করে বলেছেন, সি আই এ-র সংগে মোরারজির কোন সম্পর্ক ছিল না। এইসব থেকে আমার ধারণা হয়েছে, হয় হারশ মোরারজি দেশাইর বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ-এ দিয়েছেন, নয়ত কারো প্ররোচনায় বাধ্য হয়েছেন মোরারজি সম্পর্কে এমন কথা লিখতে। মূল প্রশ্ন হল, লেখক শ্রী হারশের হাতে সঠিক প্রমাণ আছে কিনা? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এটা খুব সহজেই প্রমাণিত হবে, হারশের হাতে কোন প্রমাণপত্র নেই।

পরিবর্তন : আমেরিকার 'মাস-মিডিয়া' এই মামলার বিষয়ে কতখানি সতর্ক বা সক্রিয়?

সুব্রাহ্মনিয়ম : আমেরিকার 'মাস-মিডিয়া' এখনই এই মামলার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না। এছাড়া হারশের লেখা বইটি মূলত কিসিংজারকে নিয়ে এবং প্রায় পুরোটাই কিসিংজারের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ নিয়ে লেখা। মোরারজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রসংগত। কিন্তু মামলায় যদি হারশ হেরে যান এবং কোন প্রমাণপত্র উপস্হিত করতে না পারেন, তখনই 'মাস-মিডিয়া' এই ব্যাপারে সজাগ বা সক্রিয় হবে।

পরিবর্তন : মোরারজি দেশাই সম্পর্কে হারশের এইরূপ লেখার পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল কি?

সুব্রাহ্মনিয়ম : উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে? আমি যে আপনাকে এই সাক্ষাৎকার দিচ্ছি, বলুন না, এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কি? হয়ত হারশের এমন কোন বন্ধু আছেন যিনি মোরারজি দেশাইকে দেখতে পারেন না। হারশ হয়ত তাঁকে খুশি করার জন্য লিখেছেন। আমি মনে করি না যে, ভারত সরকার এর সংগে সরাসরি লিপ্ত আছে। ভারত সরকার হারশকে এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেয়নি। কিন্তু ভারত সরকার হারশকে সহায়তা করেছে ১৯৭১ সনের বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দলিলপত্র দিয়ে। হারশ তাঁর বইতে এই দলিলপত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমেরিকাস্হ তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা যে গোপন তারবার্তা (Secret code cable) দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭১ সনের বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়, তার হুবহু উদ্ধৃতি হারশের বইতে আছে। অথচ এ রকম গোপন তারবার্তা ফাঁস করে দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা হতে পারে।

পরিবর্তন : আপনার সম্প্রতি বিদেশ সফরকালে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করেছেন কি? যেমন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে সে বিষয়ে বা জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির প্রতি পাশ্চাত্য দেশগুলির অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে? জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বকে পাশ্চাত্য দেশগুলি কী চোখে দেখছে?

সুব্রাহ্মনিয়ম : পাশ্চাত্য দেশগুলি বরং খুশি যে, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর পরিবর্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছেন। অথচ সত্যিকথা বলতে কী, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুধু বক্তৃতাই করে যায়। কাজের কাজ কিছু হয় না। এমনকি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি জোট বেঁধে কাজ করে না। রাষ্ট্রপুঞ্জে আনা যে কোন প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে তাদের জোট নেই। জোট নিরপেক্ষ

আন্দোলন আর কিছুই নয়, শুধু তারা একজন আর একজনের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে পরিচিত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশগুলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কারণ তারা রাষ্ট্রপুঞ্জে একজন আর একজনের বিরুদ্ধেও ভোট দেয়। এমনকি অনেকে নিরপেক্ষও নয়। যেমন কিউবা, আফগানিস্তান। এখন বিশ্ব অর্থনীতির প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি যে, এক্ষেত্রে আমি তাৎপর্যপূর্ণ কিছু দেখতে পাইনি। আসল কথা হল, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে কাজ করা উচিত। তাদের উচিত, নিজেদের কাঁচামাল একত্রিত করে কাজে লাগান। উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে বিশ্বের বাজারে তাদের উৎপাদনের কাঁচামালের দাম একইরকম রাখে তবেই উন্নত দেশগুলির সংগে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে দরদাম করতে পারবে। বিশ্বের বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলির যদি একত্রিত হয়ে দরদাম করার ক্ষমতা না থাকে, তবে উন্নত দেশগুলি থেকে সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই।

পরিবর্তন : শ্রীলংকায় যা হচ্ছে আপনি তা ভাল করেই জানেন। এ বিষয়ে আপনি কিছু মন্তব্য করবেন কি?

সুব্রাহ্মনিয়ম : হ্যাঁ, আমি জানি যে, শ্রী লংকার পরিস্থিতি খুব খারাপ। শ্রীলংকার জনসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ হল তামিল। ১৯৫৬ সালে শ্রীলংকা সিংহলি ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। শ্রীলংকা সরকার এমন ভান করছে, যেন তামিল ভাষার কোন অস্তিত্বই নেই, যেন সব তামিলরাই বিদেশি। আসলে সিংহলিরা এসেছে বাংলা ওড়িশা থেকে আর তামিলরা তামিলনাড়ু থেকে। তারা সকলেই ভারতীয় ছিল। বস্তুত শ্রীলংকা সৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা থেকে। শ্রীলংকা আগে হংকং-এর মতই রাজ্য ছিল। সেই দিক থেকে শ্রীলংকার ভারতেরই একটা অংগরাজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু এখন, তারা স্বাধীন সার্বভৌম। সুতরাং আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু সিংহলিদের উচিত তামিলদের সংগে একটা সমঝোতায় আসা। শ্রীলংকায় তামিলরা যে আলাদা হয়ে যেতে চায় তার জন্য দায়ী সিংহলিরা। হঠাৎ সিংহলি ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হল কেন? কেন তামিলভাষাকেও করা হল না? অথচ জয়বর্ধনে এক সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তামিলকেও রাষ্ট্রভাষার অন্তর্গত করা হবে। অথচ তিনি তা করলেন না। এমনকি এখন দূরদর্শন থেকেও তামিল ভাষাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে। এমনকি সৈন্যবাহিনীও আয়ত্তের বাইরে।

শ্রী লংকার ব্যাপারে ভারতের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আমি মনে করি তা মেনে নেওয়া দরকার।

পরিবর্তন : আমরা এখন জাতীয় প্রশ্নে আসছি। আগামী সংসদীয় নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি কি একত্রিত হয়ে একটা ফ্রন্ট গঠন করবে? নাকি কয়েকটা দল মিশে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস (ই)র একটি বিকল্প দল গঠন করবে

সুব্রাহ্মনিয়ম : বিরোধী দলগুলির মিলে মিশে কাজ করার সমস্যাই হল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, আদর্শগত কোন বাধা নেই। বি জে পি ও জনতার মধ্যে কি আদর্শগত তফাৎ আছে? বি জে পি গান্ধীবাদ সমাজবাদের কথা যেমন বলে, জনতারও একই আদর্শ। চৌধুরী চরণ সিং-এর লোকদলও তাই বলে। এমনকি বহুগুণার দলের সংগে বৈদেশিক নীতিতে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল আদর্শে কোন পার্থক্য নেই। জগজীবন রামের সংগেও আদর্শের কোন ফারাক নেই। আদর্শগত কোন বাধা নেই একটা বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করার বা মিলে মিশে কাজ করার।

আমি প্রস্তাব করেছি বিভিন্ন পারটিতে কে নেতা হবেন তা নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হোক। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমাদের বিরোধী দলগুলিতে পঞ্চান্ন বছর বয়সের ওপরে সকলেই নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা ঠিক করার বিরোধী। তাঁরা তখনই নির্বাচন চান যখন তাঁরা বোঝেন তাঁরা জিতবেনই। অন্যথায় তাঁরা নির্বাচনে যাবেন না। তাই মনে হয়, বিরোধীদের একত্রিত হতে সময় লাগবে।

পরিবর্তন : শ্রীমতী গান্ধী কি অন্তবর্তী নির্বাচনের ডাক দেবেন?

সুব্রাহ্মনিয়ম : শ্রীমতী গান্ধীর মনের কথা কেউ জানেন না। তবে আমার মনে হয়, অন্তবর্তী নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা নেই।

বরং আমি এ কথা বলতে পারি, শ্রীমতী গান্ধী অন্ধ্রপ্রদেশে রামারাওএর সরকার এবং করনাটকে জনতা সরকারকে ভুলচুক করার জন্য আরো সময় দেবেন। অন্যথায় এখনই নির্বাচন হলে অন্ধ্র ও করনাটকে তিনি ঠাঁই পাবেন না। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীর অন্তবর্তী নির্বাচন ডাকার পেছনে কোন যুক্তি নেই।

পরিবর্তন : আপনি জনতা পারটির সভাপতির পদে প্রার্থী হবেন?

সুব্রাহ্মনিয়ম : ঠিক এখুনিই বলতে পারছি না। মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় পারটির বাস্তব অবস্থা কী দাঁড়ায় তা দেখে শুনে বিবেচনা করতে পারি। হাতে এখনও সময় আছে। আমি মনে করি, জনতা পারটিকে পরিচালনা করার যোগ্যতা আমার আছে। আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমার একমাত্র অপরাধ, আমার বয়স। আমার বয়স মাত্র ৪৩। আমার অন্যান্য সহকর্মীরা আমার চেয়ে অন্তত পনের বছরের বড়। আমাদের দেশের ঝোঁকই হল, কম বয়সীদের উচ্চপদের দায়িত্ব না দেওয়া। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমি যদি সভাপতি পদের প্রার্থী হই তবে পারটি কর্মীদের থেকে ব্যাপক সমর্থন পাব।

পরিবর্তন : পাঞ্জাব পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

সুব্রাহ্মনিয়ম : পাঞ্জাবের সমস্যা অতি সাধারণ। পাঁচ মিনিটে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। এখন শুধু দুটো সমস্যাই আছে। এক চণ্ডীগড়, দুই নদীর জলবন্টন। সরকার খুব সহজেই এই দুই সমস্যার সমাধান করতে পারে। সরকার চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের হাতে তুলে দিতে পারে এবং ফাজিলকা হরিয়ানাকে দিয়ে দিতে পারে। হরিয়ানাকে ১০০ কোটি টাকা দিতে পারে নতুন রাজধানী তৈরির জন্য। আমার মতে এটাই সমাধানের পথ। আর জলবন্টন সমস্যা নিয়ে অকালি দল তো বলছেই যে, এটা সুপরিম কোরটের বিচারকদের দ্বারা গঠিত এক ট্রাইবুনালের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। সুতরাং এটাও একটা সমাধানের পথ।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দিকে হিন্দু ভোট টানবার জন্য এই সাধারণ সমস্যাকে জিইয়ে রাখবেন। নইলে পাঁচ মিনিটে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সমাধান চাইছেন না। তিনি চাইছেন ভোট।

পরিবর্তন : চৌধুরী চরণ সিং আমায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ভিনদ্রেনওয়ালা জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীমতী গান্ধীরই সৃষ্টি। আপনিও কি তাঁর সংগে এক মত?

সুব্রাহ্মনিয়ম : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, তবে জওহরলাল নেহরু নন। ভিনদ্রেনওয়ালা শ্রীমতী গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর সৃষ্টি। এটা ঘটনা যে দল খালসা গঠিত হয়েছিল চণ্ডীগড়ের কংগ্রেস (ই) ভবনে ১৯৮০ সালে। সুতরাং কংগ্রেস (ই) এই পারটি গঠন করেছিল।

পরিবর্তন : আপনি কি পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট সরকার কিংবা সি পি এম পারটির কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবেন?

সুব্রাহ্মনিয়ম : পশ্চিমবংগের রাজনীতি থেকে কমিউনিসটদের সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনতা পারটি সেখানে দুর্বল। জনতা পারটি সেখানে সক্রিয়ভাবে কমিউনিসটদের বিরুদ্ধে লড়তে পারছে না। সেই হেতু জনসাধারণ জনতা পারটিতে আসছেন না। আমরা যদি বিভিন্ন সঠিক রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে পশ্চিমবংগের কমিউনিজমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারি তবে কমিউনিসটদের সরান সম্ভব নয়। কারণ সি পি এম এর গুন্ডারাজনীতির সংগে কংগ্রেস (ই) গুন্ডারাজনীতির কোন পার্থক্য নেই। আমাদের এখন উচিত কমিউনিসটদের বিকল্প একটা অকমিউনিসট ফোরাম গঠন করা। অবশ্যই তা বিকল্প গুন্ডাফোরাম হবে না। জনতা পারটি এই ফোরাম গঠনে আহ্বায়ক হতে পারে। কিন্তু জনতা পারটি এ প্রশ্নে দ্বিধান্বিত। আমার প্রস্তাব হল কমিউনিসট বিরোধী ফোরাম গঠন করে সেই ফোরামের মাধ্যমে পশ্চিমবংগে সি পি এমের সংগে আদর্শগত লড়াই চালান হোক। অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে পশ্চিমবংগের কমিউনিসট কার্যকলাপ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা হোক।

একটি প্রশ্নের উত্তরে ডঃ স্বামী বললেন, ...'দেখুন আমি বাংলার সংগে বিশেষভাবে যুক্ত। আমি বাংলায় ছিলাম। সেখানে পড়াশুনা করেছি। সত্যি কথা বলতে কী বাংলায় থাকাকালীন আমি প্রথম রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন হই। বাংলাই সামাজিক সমস্যার দিকে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। সুতরাং পশ্চিমবংগের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমি বাংলাকে বিশেষ পছন্দ করি। কিন্তু আমি দুঃখ পাই যখন দেখি বাংলা কমিউনিসট শাসনের অধীনে। []

সাক্ষাৎকার :
তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা—৮

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহভাজন গৃহী-শিষ্য ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলের বাড়িতে ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন হয়েছিল। ঈশানচন্দ্র এ জি বেংগল অফিসের 'সুপারিনটেনডেনট' ছিলেন এবং তাঁর প্রতিটি পুত্রই কৃতবিদ্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালচন্দ্র ছিলেন জেলা ম্যাজিসট্রেট, মধ্যমপুত্র শ্রীশচন্দ্র ছিলেন জেলা জজ, আর কনিষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন গাজীপুরের সরকারি অফিসার। ঈশান চন্দ্র পরম ধার্মিক, পরম দয়ালু এবং পরম দাতা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিত-রূপে পরিগণিত হন। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" গ্রন্থের বিভিন্নভাগে ঈশানচন্দ্রের সংগে ঠাকুরের অন্তরংগতা এবং তাঁর বাড়িতে আগমনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়–২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সাল (কথামৃত–৩য় ভাগ, সপ্তম খণ্ড–প্রথম পরিচ্ছেদ), আর দ্বিতীয় আগমন–২৫ জুন, ১৮৮৪ সাল (কথামৃত–১ম ভাগ, একাদশ খণ্ড–প্রথম পরিচ্ছেদ)। এর আগে বা পরেও ঠাকুর ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে আগমন করেছিলেন কিনা, তা এখন আর জানার উপায় নেই।

ভাগ্যবান ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুর কত ধর্মপ্রসংগ করেছেন, ভক্তগণের সংগে মিলিত হয়েছেন, নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) গান শুনেছেন, কীর্তনীয়াদের গান শুনেছেন, ঈশানচন্দ্রের পরিবার-বর্গের সংগে আলাপ করেছেন, আবার আহারাদিও করেছেন–এসব কাহিনী সবিস্তারে কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে বসে ঠাকুর তাঁকে যেসব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

'শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)–সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে, সে বীরভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে, সে তো আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই–তার আর বাহাদুরী কি? সে যদি আমায় না ডাকে, সকলে ছি ছি করবে। আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে–বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে, সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।'......'গোলেমালে মাল আছে–গোল ছেড়ে মালটি নেবে।' (কথামৃত–১ ভাগ, একাদশ খণ্ড–সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

প্রসংগত : উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই পরম দানবীর ঈশানচন্দ্র মুক্ত হস্তে সবাইকে অকাতরে দান করার ফলে অবশেষে দেনাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাতেন, শেষ জীবনে ভাটপাড়ায় গংগাতীরে গিয়ে কুটির নির্মাণ করে তিনি নির্জন সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

ঈশানচন্দ্রের বাড়ির ঠিকানা : ১৯, কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা–৯, পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণি থেকে (কলেজ স্ট্রিট মারকেটের কাছে বাটার দোকানের সংলগ্ন) পূর্বদিকে কেশব সেন স্ট্রিটে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই বামদিকে বড় রাস্তার ওপরই এই বাড়ি। বাড়িটি বহুকাল আগেই বিক্রয় হয়ে গেছে, তাই ঈশানচন্দ্রের বংশধরেরা কেউই এখন এখানে বাস করেন না। বর্তমানে একটি পাঞ্জাবি প্রতিষ্ঠান (চ্যারিটেবল ট্রাসট) এই বাড়ির মালিক এবং বাড়িটির বর্তমান নাম–'অরোরা সমাজ ভবন'। বাড়ির সম্মুখের দেওয়ালে ঠিক ফটকের মাথায় হিন্দিতে এই নামটি খোদাই করা আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবাদিতে বর্তমানে বাড়িটি সর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। বিরাট দোতলা বাড়ি, ভেতরের বড় উঠোনের সামনেই বড় বৈঠকখানা, মেঝেগুলি সব পাথর দিয়ে বাঁধান, বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে দোতলায় যাওয়ার জন্য মূল্যবান কাঠের বড় সিঁড়ি। এই বৈঠকখানাতেই ঠাকুর এসে বসতেন বলে 'কথামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত এখানে এখন প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। 'ঠাকুর এ বাড়িতে এসেছিলেন'–শুধু এই স্মৃতিকথাই এখন সার। □

১৯, কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা–৯

আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

দেবনাথকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল ইন্দ্র। দিতেই ফের সহজ হয়ে বসল বাসন্তী গুপ্ত।

কণ্ঠস্বর গাঢ় করে তোলে ইন্দ্রনাথ।

মাসিমা, আমার আর কোন স্বা
নেই। আমি চাই একটা নিষ্পা
মেয়ের খুনের বদলা নিতে। কিন্
আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয় ঐ পুলিশকে ----

আচমকা বলে উঠে পরক্ষণেই সামলে নিল প্রৌঢ়া।

না, না, পুলিশকে নয়। কী হবে বাবা জল ঘোলা করে? সে তো আর ফিরবে না।

গভীর শ্বাস নিল ইন্দ্রনাথ।

চলুন আমাদের সংগে। পুলিশ কিছুই জানতে পারবে না—আমি জানাব না।

মৃগাংকর বাড়িতে কবিতার পরিচর্যায় প্রৌঢ়াকে রেখে ইন্দ্রনাথ এল সেই বিশেষ ঘরটিতে, যে ঘরে সোফার পেছনে মাথা রাখার জায়গায় লুকোন আছে মাইক্রোফোন—তার গেছে পাশের ঘরে টেপ রেকরডার পর্যন্ত।

বাসন্তী গুপ্তকে এনে বসান হল সেই সোফায়। কাঁদতে কাঁদতে যে কাহিনীটি সে বলল, তা বটতলার উপন্যাসের মত আজগুবি, চটকদার রোমাঞ্চ-কাহিনীর মত লোমহর্ষক ----

(চলবে

রাজ্যের পুলিশ লকআপগুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা আবার বাড়ছে

বিশ্বজিত রায়

গত ১৪ আগস্ট হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার লকআপে শচীন ঘরামী (২৪) নামে এক যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। তার দুদিন বাদেই সংবাদপত্রে লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে রাখাল মণ্ডল নামে আর এক বন্দীর মৃত্যুর খবর বেরোয়। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহলেরই টনক নড়েছে। পুলিশের বক্তব্য এ দুটিই আত্মহত্যা। কিন্তু যেসব যুক্তি তারা দিচ্ছেন তা নিতান্ত সংগতিহীন, হাস্যকর। লক্ষণীয়, উচ্চ পর্যায়ের কোন পুলিশ কর্তা এ নিয়ে বিবৃতি দেননি। স্বরাষ্ট্রসচিব রথীন সেনগুপ্ত ব্যস্ত মানুষ। ছুটির দিনেও রাইটারসে বসে ফাইল পরিষ্কার করছিলেন। লকআপে হত্যার ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ভেবে দেখি, এ ব্যাপারে কিছু বলব কিনা।' লকআপে বন্দীমৃত্যু যে কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেই উদ্বেগজনক। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি মৃত্যু ঘটল, অথচ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আজও কোন বিবৃতি দিলেন না।

এদিকে জগৎবল্লভপুর থানার মানুষ স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তারা বলেছেন, নিরীহ জনসাধারণের উপর পুলিশী প্রতাপ বড়েই চলেছে অথচ এলাকার মাস্তান দাদাদের সংগে তাদের দহরম মহরম চলেছে অবাধে। এমনকি কাগজের সম্পাদকীয়তে এইসব অভিযোগ তুলে ধরাও হয়েছে। বস্তুতপক্ষে লকআপে হত্যার অভিযোগ পশ্চিমবাংলায় নতুন কিছু নয়। সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেইসব অভিযোগের বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে জনমতকে যথাযথ মূল্যই দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী বিচারপতি হরতোষ চক্রবর্তী এবং বিচারপতি শর্মা সরকারের দায়িত্বে দুটি এমার জেনসি একসেস তদন্ত কমিশনও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কমিশন দুটি শেষ পর্যন্ত কাজ করতে পারেনি। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসাররা কমিশনের এক্তিয়ারের প্রশ্ন তুলে আদালতে গেলেন। এবং ইনজাংশন পেলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষে লোকসভা সদস্য অমল দত্ত কমিশনগুলোর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা আর সুপ্রিম কোরটে যাননি। এ ভাবে বহুরকম চাপ আসতে থাকে সরকারের উপর। প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ পুলিশ। বড় বড় অফিসারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে এইসব বাহিনীর মনোবল এবং শৃংখলা ভেঙে পড়বে আর তাতে সরকারের কর্মসূচি পালনে ক্ষতি হতে পারে এই আশংকায় ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হল। এমনকি বিচারপতি চক্রবর্তী ও শর্মা সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকার কোন বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করলেন না।

সেই ট্র্যাডিশন

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে শ্যামপুকুর থানায় নকশালপন্থী বলে অভিযুক্ত যুবক সমীর ভট্টাচার্যর মৃত্যু হয়। সেই সময়কার ও সি সুশীল রায়চৌধুরী এবং কনস্টেবল লালন এ ব্যাপারে অভিযুক্ত হন, কিন্তু সব দায় থেকে মুক্তি পান। সেই শ্যামপুকুর থানাতেই ৪-৯-৮২-তে পিটিয়ে মারা হল নিরীহ বৃদ্ধ গৃহশিক্ষক শ্রীদাম নাগকে। এবং অবশ্যই মিথ্যা সন্দেহে। এরকম ঘটনা ইদানিং ক্রমশ বাড়ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরেই ১৮-৮-৭৭-এ খোদ লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে শচীন সরকার নামে এক বন্দীর মৃত্যু ঘটে। এবং তারপর থেকে একটার পর একটা মৃত্যু হয়েই চলেছে। কলকাতা থেকে দূরে কোথাও হলে হৈ চৈ হবার সুযোগ কম। ২০-৯-৭৭-এ নিউ আলিপুর থানায় মারা যান কোন্নগরের নস্কর।

কথায় বলে পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। দুলাল মণ্ডল মারা গেলেন এন্টালি থানায়, ৮০ সালে। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানায় কমল ঠাকুর মারা গেলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আশ্বাস দেন দ্রুত তদন্ত চালিয়ে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে, হয়নি। এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন থেকে চিঠি পাঠায়। পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (পি ইউ সি এল)-এর পক্ষ থেকে একটি অনুসন্ধানী টিমের রিপোর্টে জানা যায় যে কালিপুর সাহেব আলিনগরের নন্টু শেখকে পুলিশ কল্যাণী থানায় ২৮-১২-৮১-তে পিটিয়ে মেরেছে। পুলিশের কথামত সেটা আদৌ আত্মহত্যা ছিল না। ৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার লকআপে মারা যান শ্রীমন্ত ঘোষ। স্বরাষ্ট্র সচিব সে সময় তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। জেলার মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (আর এস পি) ২২-১০-৮২-তে মহাকরণে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ঐ থানাতেই কয়েক মাস আগে একজনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। ৮২-র মাঝামাঝি নাগাদ কুচবিহারের মেখলিগঞ্জে জনপ্রিয় তরুণ ডি ওয়াই এফ কর্মী গিরীন দত্তকে পুলিশ লকআপে পিটিয়ে মারে। মে মাসে মারা যায় সরকারি কর্মচারী খগেন দত্ত শিলিগুড়ি থানায়।

কটুয়া আইন

লকআপে কেউ মারা গেলেই সেটা খবর হবার যোগ্য হয়। কিন্তু লকআপে মারধোর, অত্যাচার তো প্রাচীন প্রথা হিসাবে আমরা মেনেই নিয়েছি। আর মারধোরটা অনেক সময় এমন ভয়াবহ হয়ে যায় যে দুর্বল বা ভীতু বন্দী সেটা সহ্য না করতে পেরে মারা যায়। মেরে ফেলার জন্যও যে মারা হয় না, তা নয়। তবে সেটা বড় কথা নয়। যেখানে জবানবন্দী বা স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে বন্দীর উপর কোনরকম অত্যাচার বা প্রলোভন দেখান আইনবিরুদ্ধ সেখানে হত্যা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, সেটা নিতান্ত গৌণ বিষয়। বিশ্ব মানব অধিকার সনদের ৫ নং ধারায় স্পষ্টভাবে লকআপে বা জেলে বন্দী নির্যাতনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারত সরকারও এই সনদে স্বাক্ষর দিয়েছে।

তাছাড়া ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির (সি আর পি সি) ১৬৩ (১) ধারাতেই সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে, কোন ভাবেই জবানবন্দী নেওয়ার নামে বন্দীর উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চলবে না। সুপ্রিম কোরটও বারবার নির্যাতন-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন।

টালিগঞ্জে বিটিটি নামে একটা বাড়ি আছে। এটি একটি টরচার চেম্বার। ৯-৩-৮২-তে মেডিকাল কলেজের দ্বিতীয় ইয়ারের ছাত্র দীপংকর সরকারকে সেখানে ঝুলিয়ে মারা হয়। অভিযোগ তিনি নকশাল।

পন্থী। একই অভিযোগে দক্ষিণেশ্বরের পিনাক বিশ্বাসকে সেখানে পেটান হয় ৮১ সালের সেপটেমবর মাসে। এরকম পাঁচজন একটা প্রেস কনফারেনস ডেকেছিলেন প্রেস ক্লাবে. অত্যাচারের বিবরণ জানিয়ে তারা বলেন, পুলিশ ন মাসেও তাদের চারজশিট দিতে পারেনি, যদিও ব্যারাকপুর, বারাসাত, বসির হাট কোরটে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন।

৮১-৮২ তে এই অবস্থাটার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নদীয়ায় শান্তিপুর কৃষ্ণনগরে আজিজুল হক-নিশীথ ভট্টাচার্য গোষ্ঠীর নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায়। ৬ ফেবরুয়ারি '৮১ তে মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কড়া হাতে উগ্রপন্থীদের দমন করার হুকুম দিলেন। শান্তিপুরের বাহাদুরপুর গ্রাম। ৬০-৭০ ঘর রাজোয়ারি সম্প্রদায় এখানে বাস করেন। জীবিকায় ক্ষেতমজুর। পুলিশের মতে এরা সবাই নকশাল। তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের জনমজুর অর্জুন বাজোয়ারাকে পুলিশ এমন মার মারে যে পরে নিজেরাই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঐ এলাকার পঞ্চায়েতের সি পি এম সদস্য (বাবলা পঞ্চায়েত ৫ নং ব্লক) কেনারাম রাজোয়ারাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ভয়ংকর পেটায়। বিশ বছরের জোয়ান ছেলে কালু সাঁতরার পায়ের নখ তুলে নেওয়া হয় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। কৃষ্ণনগরের শক্তিনগরে থাকেন কার্তিক সরকার। দর্জি। অভিযোগ নকশাল, পন্থীদের ইউনিফরম বানিয়ে দেন কার্তিক। ধরে নিয়ে যাবার সময় মাকে অশ্লীল খিস্তি খেউড় করে পুলিশ, ভাইকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। কার্তিককেও লক আপে খুব মারে। ১৮ মে '৮২-তে গ্রেপ্তার হন ইউ বি আই টিভোলী পারক শাখার কর্মী আশিস দত্ত চৌধুরী। সি পি এম পরিচালিত ব্যাংক ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী আশিসও চড় চাপড়ের হাত থেকে রেহাই পাননি। তামিলনাড়ুতে বন্দীহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় এম জি রামচন্দ্রনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানর পরিণামে এ পি ডি আর এ-র একজন সদস্য সৌমিত্র ঘোষ আলিপুর থানার জনৈক ইনসপেক্টরের লাঠির শিকার হন। তারিখ ১৫-১০-৮২। পুলিশ কমিশনারকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

লক আপের হালহকিকৎ

পুলিশ রেগুলেশন অব বেংগলের ৩২৭ (ক) ধারা অনুসারে পুলিশ লক আপে বন্দী পিছু ৩৬ বর্গফুট জায়গা থাকার কথা। কিন্তু ৩৬ দূরে থাক, ৬ বর্গফুট জায়গা পেলেই বন্দীর সৌভাগ্য বলা যায়। ফলে কোনদিন লোক বেশি হলেই লাগে জায়গা নিয়ে কামড়াকামড়ি। ফলশ্রুতি ডান্ডা। জানোয়ারের মত মানুষগুলো গাদাগাদি হয়ে থাকে নোংরা, আলোবাতাসহীন দুর্গন্ধযুক্ত ঘরে। 'রেগুলার খদ্দের' অবশ্য এ ব্যাপারে ভাবলেশহীন। একই ঘরে শোওয়া, খাওয়া, পায়খানা, পেচ্ছাব সব। কোথাও কোথাও আবার ভেতরে পায়খানা পেচ্ছাবখানা নেই। তেমন দরকার পড়লে কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আইন অনুযায়ী লক আপে থাকার কথা থানার সেনট্রির চোখের সামনে।

সাক্ষাৎকার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিধানসভা খুলে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। স্বরাষ্ট্র সচিব রথীন সেনগুপ্ত প্রথম দিন জানালেন, 'ভেবে দেখি এ ব্যাপারে কিছু বলব কিনা'। দ্বিতীয় দিন জানালেন 'আমি এখন খুব ব্যস্ত। তা ছাড়া ফোন করে আসবেন। আমাকে তো তৈরি হয়ে নিতে হবে।' দু সপ্তাহ ধরে ঘুরছি, কবে নাগাদ কথা হতে পারে, জানতে চাইলে বললেন, বলতে পারছি না। স্পষ্ট কথায়, তিনি এড়িয়ে গেলেন। আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকে নোটবই বের করছি তখনও পর্যন্ত তাঁর প্রসন্নমুখ। লক আপে মৃত্যুর প্রশ্ন শুনেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঘরে তখন ডি আই জি এনফোরসমেনট বসেছিলেন।

আইন ও বিচারমন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লাহর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় খুব অলপ চেষ্টাতেই। কথা বলেছেন হালকা মুডে। তাঁর মোদ্দা কথা, 'কাউকে লক আপে নিয়ে গেলে আমারও ভাবী কষ্ট হয়! নরক।'

প্রশ্ন : বামফ্রনট আসার পরেও পুলিশ এবং জেল লক আপে বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হয়েছে। জেলের মত পুলিশ লক আপের ব্যাপারেও কোন বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ কি দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : না, সে রকম কোন নির্দেশ দেওয়া যায়নি। তবে অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনালের নকশালরা এসেছিল এইসব ব্যাপারে কথা কইতে। তা আমি বলে দিয়েছি, আমিও তোমাদের সংগে আছি। আমিও জেল, লক আপ রিফরম চাই।

প্রশ্ন : আপনি স্পিকার থাকা কালীন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী কিছু লক আপ মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন, মনে আছে?

উত্তর : ধুর, অ্যাসেমব্লি থেকে চলে এসেছি। ওসব কি আর মনে থাকে? এটা যারা তুলেছে, ওদের কাউকে তুলতে বলুন।

প্রশ্ন : '৭৭-এর পর জেল রিফরম কমিটির মত কোন লক আপ রিফরম কমিটি হয়েছে কি?

উত্তর : না, ঐসব কমিটি-টমিটি হয়নি। তবে আমরা কিছু প্রস্তাব করেছিলাম।

প্রশ্ন : কী প্রস্তাব?

উত্তর : এই লাইট দিতে হবে, ফ্যান দিতে হবে। তা ফ্যান দিলে তো আবার মুশকিল, লটকে থাকবে।

প্রশ্ন : আপনি '৭৭-এর পর লক আপে গেছেন?

উত্তর : খ্যাপা নাকি? মন্ত্রী হবার পর কেউ লক আপে যায়?

প্রশ্ন : না, মানে আমি দেখার কথা বলছিলাম।

উত্তর : দেখব আবার কী? দেখার কী আছে? নিজেরা যা ভোগ করে এসেছি, নরক। শেষবার ছিলাম '৭৬ এ, পারক স্ট্রিট থানায়। কী গরম! রাতে ঘুমুতে পারিনি এক ফোঁটা।

প্রশ্ন : তা হলে লক আপ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিচ্ছেন না কেন?

উত্তর : বাজেট পারমিট করলেই হবে।

প্রশ্ন : বিগত সত্তর দশকে এই একই বন্দী নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগে আপনারা কয়েকটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করেছিলেন, তাদের কী হল?

উত্তর : সেসব কোথায় চাপা পড়ে গেছে আমি জানিনা বাবা! আমার টারমে সেসব কিছু হয়নি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নেই। রাজ্য পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের মতে, 'সেটা হয়ত কচুয়া করার সুবিধার জন্য'।

মানুষের জন্য খাঁচা :

রাজ্যের বেশির ভাগ থানাই বৃটিশ আমলের তৈরি। ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে, অপরাধও বেড়েছে। থানার সংখ্যা বাড়লেও থানার বাড়িগুলোর সংস্কার প্রায় হয়নি বলা চলে। অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দীদের জন্য আইনমাফিক ব্যবস্থা দূরে থাক এমনকি পুলিশ কর্মীদের অনেকেই যে ধরনের পরিবেশে থাকেন, কাজ করেন, তা নিতান্ত অমানবিক। উদাহরণ, হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার কনসটেবলরা থাকেন থানা এলাকার বাইরে একটা মেসে। শহর উন্নয়নের ধাক্কায় বর্তমান থানা বাড়িটির কিছু অংশ ভাঙা পড়েছে। নতুন বাড়ি করার প্ল্যান দশ বছর ধরে পড়ে আছে। মহিষাদল, তমলুক, নন্দীগ্রাম থানার হালও তথৈবচ। মফস্বলে কোন ভাড়া বাড়ির এককোণে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে কাজ করতে হয় ডিউটি অফিসারকেই। সেখানে বন্দীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন জেলার এস পি-রা আই জি-র দপ্তরে থানা বাড়িগুলোর সংস্কার এবং নতুন বাড়ি তৈরির প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন বলে জানা গেছে। এবং সেসব জরুরি ফাইল পড়ে আছে দিনের পরে দিন। অন্ধ্র বা কনটিকে এ ব্যাপারে আই জি-ই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিন্তু এ রাজ্যে ব্যাপারটা পূর্ত দফতর এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের ফাইল ঠেলাঠেলির ব্যাপার। জাতিপুঞ্জের বাসস্থান সমস্যা সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই প্রসংগে তাদের সমীক্ষাজাত ফলাফল জানিয়ে বলেছেন, 'নেহাৎ দৈহিক আশ্রয়ের প্রয়োজনেই মানুষ একটি ঘর খোঁজে না। একটু আলো হাওয়া জল, হাত পা ছড়িয়ে আরাম, এ সবের জন্য আকুতি মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। এ সবের অভাবের মানসিক প্রতিক্রিয়া সমাজের প্রতি মনোভাবকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। আর দশটা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের চেয়ে তার বিধ্বংসী শক্তি কম নয়।'

লোকচক্ষুর আড়ালে নারকীয়, হাজতগুলির অবস্থা সম্পর্কে ইদানিং কাগজে লেখালেখির ফলে অনেকেই জানতে পেরেছেন, সাতাত্তরের পরেও জেলগুলোর অবস্থা একই আছে। কিন্তু পুলিশ লক আপ, কোরট লক আপগুলো সকলের চোখের সামনে থাকলেও তাদের সম্পর্কে লোকে ততটা মাথা ঘামায় না। ক্ষমতাসীন বামপন্থী সরকার লক আপগুলোকে অন্তত আইনমাফিক মানবিক করে তোলারও কোন উদ্যোগ নেয়নি। ফলে নতুন গড়ে ওঠা সলট লেক বা লেক থানার মত আধুনিক থানাগুলোতেও লক আপগুলো মানুষ রাখার একটু ভাল গুদাম মাত্র। অথচ আইনমাফিক লক আপ বন্দীরা নেহাৎ অভিযুক্তমাত্র। কয়েদি বা সাজাপ্রাপ্তদের কথা ছেড়েই দিলাম, বিচারাধীন বন্দীদের নাগরিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার তো প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অথবা আই জি, কমিশনারের থেকে কম থাকার কথা নয়। অথচ ইচ্ছামত আলো হাওয়া জল উপভোগ করার নিতান্ত প্রাকৃতিক অধিকারটুকু থেকেও তাদের কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে

আদালতের চোখের সামনেই কোরট লক আপ, শিয়ালদা পুলিশ কোরটের দোতলা লক আপটার ভেতর এক একদিন ৫০ ৬০ জনের বেশি বন্দী গাদা করা হয়। সকালে দশটার সময় প্রিজন ভ্যান থেকে নামার পর দুটো থেকে থানাওয়ারি ডাক শুরু হয়। বেশির ভাগ সময়ই বন্দীকে ম্যাজিসটেটের সামনে হাজির করার কষ্টটুকু পুলিশ আর করে না, কোরট ইনসপেকটর বন্দীর ওয়ারেনট পেশ করেন। পরবর্তী হাজিরার দিন তাতে লিখে দেন। জামিন পেলে তার হাজারো ফ্যাকড়া চুকিয়ে, নাজিরখানা থেকে রসিদ নিয়ে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা ছটা। এই দীর্ঘ সময়টা বন্দীদের এক ঠেঙে বকের মত দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়। লাইট, ফ্যান থাকার কথা। নেই। পায়খানা দুটো এবং পেচ্ছাবখানা চারটে থাকার কথা। নেই। গুমোট দুর্গন্ধ। ব্যাংকশাল কোরটের লক আপটা বড়। পায়খানা পেচ্ছাব করার জায়গা ভাল। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরে ভেতরে পানীয় জল নেই। আলিপুর লক আপের অবস্থাও একই রকম। পনের ফুট লম্বা, ছ ফুট চওড়া, তাতে পঞ্চাশ ষাট জন বন্দী। বাথরুম নেই। মেদিনীপুরেও তাই। ব্যারাকপুরে বাইরে জল থাকে। দশ পয়সা ভাঁড় জল। প্রাকৃতিক কৃত্যের জন্য কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে যায়। তাও সিপাই সাহেবের মর্জি। ফলে ঘরের মধ্যেই সব।

সাক্ষাৎকার

পুলিশি অত্যাচার : নাগরিক অধিকার

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত এপরিল মাসে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় নাগরিক অধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিষ ভট্টাচার্যের একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। দেবাশিষবাবুও নিজেও একজন সাংবাদিক। লক আপ সম্পর্কে তিনিও বহু লেখালেখি করেছেন।

প্রশ্ন : লক আপে মৃত্যু রোধে আপনাদের বক্তব্য কী -

উত্তর : আমরা মনে করি, সর্বপ্রথমে বামফ্রনট সরকারের উচিত এমন সারকুলার জারি করা, যাতে পুলিশ হাজতে অত্যাচারের ফলে কোন বন্দী মারা গেলে সংগে সংগে থানার ও সি কে সাসপেনড করা যায়। কেন না আইন অনুযায়ী বন্দীকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব তারই। এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে পুলিশ আইন (১৮৬১) সংশোধন করতে হবে যাতে হাজতে বন্দীর মৃত্যুর জন্য দায়ী অফিসারদের বা অফিসারের চাকরি যাবে। এ ছাড়া হয়রানি কমাতে আমাদের প্রস্তাব, কেউ যদি নিতান্ত সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার হয়ে হাজত ভোগ করে এবং পরে নির্দোষ প্রমাণিত হয় তবে পুলিশকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আপনিই দেখুন না, মেদিনীপুর সাব জেলে ১৭ ২০ বছর ধরে এক একজন বন্দী বিচারাধীন ছিল। পরে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। এরকম ঘটনা অনেক আছে। পরিবর্তনেই তো রিপোরটটা বেরিয়েছিল। সুপরিম কোরট তো তা নিয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে কঠোর তিরস্কার করেছেন।

প্রশ্ন : এ নিয়ে আপনারা রাজ্য সরকারের সংগে কথা বলেছেন, তার কতদূর এগোল -

উত্তর : আমরা তো মুখ্যমন্ত্রীর সংগে বারবার দেখা করে বলেছি। নির্দিষ্ট ঘটনা জানিয়েছি। তদন্তের অনুরোধ করেছি। তাঁকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। কিন্তু ব্যাপারটা ঐ মেমোরানডাম ডেপুটেশন পর্যন্তই দাঁড়িয়ে আছে। জেলের ব্যাপারে আইনমন্ত্রীকে বলেছি আমরা ভেতরে ঘুরে দেখতে চাই। উনি এখনও পারমিশন দেননি।

মামাবাড়ির ভোজ

বন্দীদের খাওয়া দাওয়া জোটে কেমন? মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা দু বেলা মিলের বরাদ্দ বেড়ে সরকারি দাক্ষিণ্যে এখন সাড়ে তিন টাকা দাঁড়িয়েছে। এতে আজকালকার বাজারে টিফিন ছাড়ুন, দু বেলা খাওয়া জোটাও কি সম্ভব? দেওয়ার কথা ৩০০ গ্রাম রুটি বা ভাত এবং ৪০০ গ্রাম তরকারি, ১০ গ্রাম চিনির চা, সপ্তাহে দু দিন মাছ, একদিন মাংস। সকালে মাখন পাউরুটি, চা। এর উপরে টেনডার ডাকা হয়। সবচেয়ে কম দামে যে বন্দোবস্ত করবে বলে জানায় তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। এইসব আইনমাফিক ঠিকই থাকে, পায় ধরাবাঁধা কনট্রাকটর। সকালে ওষুধের ছিপির মাপে খুরিতে ট্যালটেলে চা, দুপুরে ভাত একশ গ্রামের বেশি নয় কখনই, জোলো ডাল, কুমড়োর ঘাঁট। কোরটে থাকলে বিকালে ঐ খুরির চা আর লেড়ো বিসকুট। রাতে রুটি পাঁচ-ছটা, ঘাঁট। হাজতে মানুষ তাই খায় পরম পরিতৃপ্তিতে। অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না। যথানিয়মে বছরে কয়েকবার ইনসপেকসন হয়, বন্দীরা আইনমাফিক সুযোগসুবিধা পাচ্ছে কিনা দেখতে এসে তদন্তকারীরা লক আপের ধারে কাছেও যান না। ঠিকাদারের পেলব আপ্যায়নে প্রীত হয়ে কাগজপত্র সই করে তিনি ফিরে যান। মফস্বলের থানায় বন্দী রাখার যেনতেন ব্যবস্থা থাকলেও কিন্তু বন্দীকে খাদ্য জোগানর কোন ব্যবস্থা নেই। ভরসা, কাছে পিঠের দোকান। যেদিন যেমন বন্দী জোটে সেদিন তেমন অরডার। এই খাইখরচের বিল যাবে এস পি হয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে। সেখান থেকে বিল পেমেনট হতে হতে আঠার মাস। এ নিয়ে থানা অফিসারের দৌড়দৌড়ি চলে।

কেস কানেকশন

আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বন্দীকে কোরটে হাজির করার কথা। ৬০ দিনের মধ্যে চারজশিট দেওয়ার কথা। কিন্তু পুলিশও আইনের ফাঁক খুঁজে কাজ করতে জানে। গ্রেপ্তারের পর থানার জাবদা খাতায় বন্দীর নামই তোলা হয় না কয়েক দিন। গ্রেপ্তার হয়েছে, প্রমাণ কোথায়? বেশি চাঁচামেচি করলে গায়েব। ৯০ দিনে চারজশিট দিতে পারলে কলকাতা তথা রাজ্য পুলিশ স্কটল্যানড ইয়ারড হয়ে যেত। অথচ নিয়মমাফিক চারজশিট না এলে আদালতে হৈ চৈ হতে পারে। তাই কাউকে আটকাতে চাইলে চাই কেস কানেকশন। জামিন পেতে না পেতেই আরেকটা কেসে গ্রেপ্তার। আইন বাঁচাতে এক থানায় নয়, বিভিন্ন থানার নামে। ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং ধারা অনুযায়ী, বিনা বিচারে আটকে রাখা চলবে না। তাই এই ধারাবাহিক ব্যবস্থা।

অত্যাচার কি অন্যায়?

প্রশ্নটা এর আগেও উঠেছে। সাধারণ মানুষ একজন শিক্ষিত মার্জিত মধ্যবিত্ত অথবা একজন রাজনৈতিক কর্মীকে পুলিশ লক আপে পেটালে পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু 'সমাজবিরোধী' তথা রকবাজ মস্তানকে পেটালে আমরা হয়ে উঠি দ্বিধাগ্রস্ত। পুলিশ তো এদের মারছে আমাদের ভালর জন্যই। এরা যে কাউকেই ভয় পায় না। সাধারণ মানুষ এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েও মুখ খুলতে সাহস পায় না। এই অবস্থায় পুলিশ এদের না পেটালে এরা যে আরো বেড়ে যাবে। এদের আটকে না রাখলে সাধারণ নাগরিকের চলাফেরাই যে দায় হয়ে উঠবে। আইন যাই থাক না, থারড ডিগরি মেথড বাস্তবের দিক থেকে অনিবার্য এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, এ জাতীয় মধ্যযুগীয় ধারণা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এমনকি বহু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও এর সংক্রমণ থেকে মুক্ত নন।

এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের একজন অতি উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উচ্চ শিক্ষিত, অধ্যাপকসুলভ ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ সৌজন্যবোধ। কিন্তু তিনিও একই সুরে বলে উঠলেন, 'কোন মস্তান আপনাকে যখন ক্ষুর দিয়ে পেঁচাবে, তখন তার বিরুদ্ধে ভয়ে কেস করতে পারবেন না আপনি। জামিন পেয়েই সে আবার চড়াও হবে আপনার উপরে, তখন আপনি দুষবেন পুলিশকে। পুলিশ ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে জামিন আটকানর যথেষ্ট আইন আমাদের হাতে নেই, সুতরাং কেস কানেকশানে আটকাতে হয়। তখন আপনিই আবার বলবেন, পুলিশ প্রিভেনটিভ ডিটেনশন চাইছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে।' এরপর খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আসলে কী জানেন, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ ক্রমশ দুর্বলচেতা হয়ে পড়েছে। কেউ সাক্ষ্য দিতে আসে না, মাস্তানদের ভয়ে। সমগ্র সমাজ যেখানে নপুংসক সেখানে পুলিশই একমাত্র শক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে, উচিত কি অনুচিত সেটা পরের কথা।' কিছুদিন আগের এক সাক্ষাৎকারে পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোম বলেছিলেন 'গত দশ বছরে পারবাতও আইন কানুন চোর ডাকাতকেই সাহায্য করেছে।' উপরোক্ত অফিসারও বললেন 'যথেষ্ট আইনি ক্ষমতা যদি না দেন, তবে বেআইনি কাজ তো পুলিশ করতে বাধ্য।' সোজা কথায়, পুলিশের হাতে যথেষ্ট প্রিভেনটিভ আইন যথা মিসা, নাসা জাতীয় আইন না থাকায় অপরাধ দমন কঠিন হয়ে পড়েছে বলে পুলিশ মহলে ধারণা। কিন্তু তা কতটা সত্যি? অতীতের অভিজ্ঞতা কী বলে? সমস্ত প্রিভেনটিভ তথা নিবারণমূলক আইনের শিকার হয়েছেন কজন চোর, ডাকাত, চোরাকারবারি আর কতজন রাজনৈতিক কর্মী তার অনুপাতটা আজ একটা শিশুও জানে। মানুষ ভয়েসাক্ষ্য দিতে আসে না, এটা অনেকাংশেই সত্যি। কিন্তু কেউ সাক্ষ্য দিতে এলে যথাসময়ে মস্তানদের ডেরায় খবর পৌঁছে যায়। এটাও সত্যি। এমনকি অনেক সময় পুলিশ এফ আই আর পর্যন্ত করতে দেয় না।

সোনার ডিম

পোবট, বড় বাজার বা মুচিপাড়া, কাশীপুর থানায় টানসফার নিয়ে চলে পুলিশের মধ্যে তদবির তদারক, প্রতিযোগিতা। এসব কথা সবাই জানে। পুলিশের ক্রাইম রেজিসটার অথবা কাগজের হিসেব অনুযায়ী নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, বেহালা, বারাসাত, কাশীপুর, বেলঘরিয়া ইত্যাদি বহু অঞ্চলই এখনও সমাজবিরোধীদের কবলে। নবদ্বীপে মুড়ি মুড়কির মত বোমা পড়ে। পুলিশ কি এদের চেনে না, না জানে না? কলকাতার এক সিনেমা হলে এই তো সেদিন এক সাহসী যুবক অজয় সাউ মহিলাদের সম্মানহানির প্রতিবাদ করলে প্রকাশ্যে মস্তানরা তাকে ছুরি মারে। চিৎপুরের রেল ইয়ারডে সিমেনট নিয়ে নয় ছয়, বেনেপুকুর পারক সারকাসে চোলাও মদের কারবার, হাওড়ায় ছোটছোট কারখানা মালিকদের ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া, শালিমার ওয়ারডের ওয়াগন ভাঙা, শিলিগুড়ি হংকং মারকেট ইত্যাদির কথা কি পুলিশ জানে না? থানাওয়ারি তদন্ত হলে সবই জানা যাবে। এ ব্যাপারেই পুলিশ রাজনৈতিক চাপ এবং মস্তানদের দলীয় আশ্রয়দানের কথা তুলবে। এবং সেটা অত্যন্ত ন্যায্য কথা। কিন্তু তার ব্যবস্থা তো ভিন্নভাবে হওয়ার কথা। মিথ্যে কেসে ঝুলিয়ে রেখে, কচুয়া করে তার সমাধান হবে না। পুলিশকেও নিরপেক্ষ হতে হবে।

২৪ মারচ, ৭৮ এ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন কংগ্রেস আমলে যেসব মাস্তান [illegible] করা হয়েছে। জোর করে চাঁদা আদায় এখন হচ্ছে না। কতটা দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়েছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই। যদিও সকলেই সমাজবিরোধীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দানের বিরুদ্ধে তবু বাস্তবে তার রূপায়ণ হয়নি। পুলিশও এই ব্যাপারটি থেকে বাদ নয়। তারাও বিভিন্ন কারণে মাস্তান পোষে।

পুলিশের ভেতরে বাইরের দুর্নীতি নিয়ে এত বিশদ লেখার কারণ এটা নয় যে যত দোষ নন্দ ঘোষ। যে দেশের শাসনব্যবস্থাই এক কথায় বলা যায় কনট্রাকটর রাজ, মন্ত্রীরা (যেমন কুয়ো অয়েল ডিল) যেখানে কোটি কোটি টাকা নয় ছয় করছে, তাবড় তাবড় দাদারা সবাই যেখানে প্রাইভেট আরমি পোষে, অন্যান্য সরকারি অফিসেও যেখানে ঘুষের রাজত্ব সেখানে পুলিশের দিকে শুধু আঙুল তোলার কোন মানে নেই। কিন্তু পুলিশ যখন নিবারণমূলক আইনের দাবি জানায়, অত্যাচারের পেছনে নৈতিকতা হাজির করার চেষ্টা করে, তখন তা খন্ডন করতেই এসব কথা লিখতে হয়।

চারজশিট রহস্য

সি পি এম নেতা সরোজ মুখার্জির বক্তব্য অনুযায়ী এই রাজ্যে বামফ্রনটের প্রথম পাঁচ বছরে দলের কর্মী মারা গেছেন ৪২৫ জন। দ্বিতীয় দফায় ১৫০ জনের বেশি। অন্যান্য দলের কর্মীদের কথা ছেড়েই দিলাম, পুলিশ এদেরই কটা কেসে চারজশিট দিতে পেরেছে? শিয়ালদা কোরটে ১০০টা কেসে দশজনেরও চারজশিট হয় না। ৩২৩/৩২৪ ধারাতে কেস দিতেই পুলিশ বেশি আগ্রহী। খাটতে কম হয়। কয়েকদিন আগে আদালতে পুলিশকে মিথ্যা রিপোরট দেওয়ার জন্য ভর্ৎসনা করলেন হাওড়া জেলা জজ। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এক ব্যক্তিকে খুঁজে না পাওয়ায় পুলিশ লিখে দিয়েছে, লোকটা মরে গেছে। সেই লোকই জলজ্যান্ত এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন। অথচ পুলিশ নাকি সঠিক চারজশিট তৈরির জন্যই আসামীকে তাদের হাতের মধ্যে রাখে। মারধোরও নাকি সেজন্যেই।

মারধোরের প্রসঙ্গে প্রবীণ অফিসারের বক্তব্য, 'সায়েনটিফিক ইনভেসটিগেশন এদেশে সম্ভব নয়। সাক্ষী নেই। মারধোর না করলে মুখ খোলান যায় না। অপরাধের পর কঠিনতম কাজ হল স্বীকারোক্তি দেওয়া। অধিকাংশ অপরাধীই এটা দেয় না। আর হাত দেখতে যখন জানি না তখন বলপ্রয়োগ করতেই

হয়। একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, বিলেত আমেরিকার লোকে কি দলে দলে এসে সাক্ষী দেওয়ার জন্য হত্যে দেয়? না সেখানকার বন্দুকবাজরা রবারের গুলি ছোড়ে। যে লোকে তাদের ভয় পায় না? তা ছাড়া কচুয়াই যেখানে শেষকথা, সেখানে অতসব শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের পুলিশে এনে (ফরেনসিক, ডি ডি এনফোরসমেনট ইত্যাদি ব্রানচ করার) দরকার কি? তাদের জায়গায় দলে দলে কচুয়া স্পেশালিসটদের এনে বসালেই তো হয়! এদেশে শারলক হোমস বা এরকুল পোয়ারোর মাপের বুদ্ধি নিয়ে অপরাধের কিনারা করা বোকামী আর জেমস বনডের লাফ ঝাঁপ বাঙালি কলিজায় কুলোবে না সুতরাং মেজাজ এখনও বেশিরভাগই বৃটিশ আমলের দারোগা। বৃটিশ আমলের পুলিশ আইন (১৮৬১) যা কিনা সাম্রাজ্য রক্ষায় নিবেদিত, তাই হচ্ছে আজও পুলিশের অবলম্বন। সেই অনুযায়ী, সাধারণ নাগরিক হল মব, ক্রাউড, রাশ নামে অবয়বহীন মাংসপিণ্ডমাত্র। শহরের বস্তিগুলো হচ্ছে শয়তানের কারখানা। শিক্ষা, বিত্ত, পোশাক বংশমর্যাদা ইত্যাদি দিয়ে ভদ্রলোক ছোটলোকের নির্ধারিত হয়। বেকারী হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল আর অশিক্ষিত গরিবরাই এর জন্য দায়ী। ছোট লোকের ছেলেপিলেরাই অপরাধী হয়। অপরাধ ওদের মজ্জাগত। ডাণ্ডাই হচ্ছে ওদের একমাত্র ওষুধ ইত্যাদি ধারণা তৈরি হয়ে আছে। সমাজজীবনে, অর্থনীতিতে, মানসিকতায় যত কমই হোক না, যে পরিবর্তন ঘটছে তার ছাপ কিন্তু পুলিশ বাহিনীর মূল্যবোধে আজও পড়েনি। অপরাধের সংগে সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্কের কথা, অপরাধীদের সংশোধনের নানা মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক প্রকল্পের কথা, তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কথা বিভিন্ন সেমিনারে আলোচিত হয় কিন্তু থানা কোরট জেল লক আপগুলো আজও মধ্যযুগের অন্ধকারে। বন্দীর নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকার সেখানে নেহাৎ কেতাবী বিষয়, বিদ্রূপ এবং উন্নাসিকতাই তার প্রাপ্য। উল্লেখযোগ্য, পুলিশের লোকেরাই প্রায়ই অভিযোগ করেন, আপনারা শুধু আমাদের খারাপ দিকটাই দেখেন। ঠিকই! যে অফিসার এইমাত্র একজন যুবককে নির্মম প্রহার করলেন, কোয়াটারে ফিরে তাঁর মত স্নেহশীল পিতা আর নেই। যিনি কচুয়া স্পেশালিসট তিনি যে ভাল কবিতা লিখতে পারেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আসলে এটা মূল্যবোধের প্রশ্ন। পুলিশ অপরাধীদের ভাবে ভিন্ন গ্রহের জীব। অপরাধীর জীবনের অন্যান্য দিক, তার সামাজিক উৎস, বিভিন্ন প্রভাব, অপরাধের কারণ গভীরভাবে জানতে বুঝতে হলে দরকার পরিবর্তিত মূল্যবোধ উপলব্ধি করা। এক জনসভায় জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'আমার কাছে খবর আসে থানায় গরিব লোক কোন অভিযোগ নিয়ে গেলে তাদের থানায় ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং তাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করা হয়। পুলিশের খাতায় অনেক ভাল লোকের নামও সমাজ বিরোধীদের তালিকায় আছে। হয়ত আমার নামও আছে। আমি পুলিশকে বলেছি খাতা ছিঁড়ে ফেলতে।' ছয় বছর পরেও অবস্থাটা কিন্তু পাল্টায়নি। উল্টে ঘটছে একের পর এক লক আপে মৃত্যু। বিরোধী দলের নেতা থাকাকালীন শ্রী বসু এহেন মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করতেন সব সময়। আজ কিন্তু তিনি এসবের নিন্দা করে একটা বিবৃতি পর্যন্ত দেন না। সব শেষে একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই পর্বের ইতি টানা যাক। কয়েকদিন আগেই ভবানীপুর থানায় জনৈক চন্দন চক্রবর্তীকে পুলিশ পিটিয়ে আধমরা করেছে তার বাড়িওলার পক্ষ নিয়ে। গত ১৬ জুলাই থানার ও সি অজিত ঘোষ চন্দনকে ডেকে পাঠান থানায়। কনসটেবলের হাতের চিরকুটে লেখা ছিল, উইদাউট ফেল। চন্দন থানায় হাজির হলে অন্যান্য অফিসাররা বলেন বড়বাবু না আসা পর্যন্ত থানা থেকে বেরোনো চলবে না, বাড়িওয়ালাকে বাড়ির খাসদখল না দিলে চন্দনকে নাকি উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। কিছুক্ষণ পরে বড়বাবুর আবির্ভাব। অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ফরমান দেন তিনি, এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলতে পারবে না। জামিন নিয়েও রেহাই পাবে না। চন্দনের সংগে ছিলেন আইনজীবী বন্ধু অমিতাভ ঘোষ। তিনি এইসব কথায় আপত্তি জানালে, ও সি রক্তচক্ষু হয়ে বলেন, 'ওকালতি করবে আদালতে গিয়ে'। এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে চন্দনকে কিল, চড়, লাথি মারতে শুরু করেন। অমিতাভকে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়া হয়। আধমরা চন্দন লক আপে সারা রাত পড়ে থাকেন। সকালে কোমরে দড়ি দিয়ে আলিপুর আদালতে হাজির করা হয় তাকে। আদালতে তিনি জামিন পান। যদিও পুলিশ জরুরি অনুসন্ধানের প্রয়োজনে আপত্তি জানিয়েছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য চন্দন চক্রবর্তী রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসার। এর আগে তিনি ৭৪ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্পেশাল পুলিশের অফিসার ছিলেন। □

শ্যামা নৃত্যনাট্যের সংগীতশিল্পীরা : বাক্জেশ্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও ছন্দা দাশগুপ্তা
আলোকচিত্র : সুবীর চাটার্জি

সুরলোকের শ্যামা

'তাপসিনী'র মোটামুটি মঞ্চ সাফল্যের পর সুরলোক আবার প্রথাসিদ্ধ রবীন্দ্রনাট্য শ্যামাতে ফিরে গেলেন কেন - কিছু বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল বলেই কি · কোন রবীন্দ্রতত্ত্বজ্ঞ 'তাপসিনী' দেখে বলেছিলেন, 'এরপর হয়ত ভাষাতত্ত্বও কোনদিন মঞ্চস্থ হবে'। কিন্তু কোন নবীন সাংস্কৃতিক প্রয়াস বা একসপেরিমেনটের পিছনে এমন সমালোচনা তো থাকবেই। তাতে উত্তীর্ণ হতে পারাটাই শিল্পীর গুণ।

সুরলোকের শ্যামার যা আকর্ষণীয় ছিল তা হল গানের অংশ। বজ্রসেনের গানগুলি গেয়েছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। বয়স এই শিল্পীর কণ্ঠকে আরও গাঢ় করেছে। শ্যামার গানগুলি ছন্দা দাশগুপ্ত গেয়েছেন যথেষ্ট দরদ দিয়ে। তিনিই সুরলোকের নেত্রী এবং সমগ্র অনুষ্ঠান প্রযোজনার দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

নৃত্যাংশে বজ্রসেনের ভূমিকায় অসিত চট্টোপাধ্যায়কে তরুণ ধীরোদাত্ত নায়কের ভূমিকায় বেমানান লাগে, নয়তো তাঁর নৃত্যাংশ যথেষ্ট পরিণত। অতিথি শিল্পী শক্তি নাগ কোটালের ভূমিকায় সেদিন জমাতে পারেননি। অথচ তিনি এই ভূমিকায় কিংবদন্তী। শ্যামার ভূমিকায় গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়কে আজও ভাল লাগে।

দৃশ্যসজ্জার মধ্যে কোন আড়ম্বর ছিল না, অথচ আর একটু পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জা যথাযথ হত।

বিশেষ প্রতিনিধি

'রবীন্দ্র-সংগীত নির্ঝর'

অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'রবীন্দ্র-সংগীত নির্ঝর'। নামের মধ্যে সুরের ঝর্ণাধারা বইয়ে দেবার একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিতও বুঝি ছিল। তাই 'অনুষ্ঠাতা' সংস্থার কর্ণধাররা শিল্পী নির্বাচনও করেছিলেন গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেন, বিভা সেনগুপ্তা, সন্তোষ ঠাকুর প্রমুখদের দিয়ে। ২৬ জুনের রবিবারের সেই সকালে রবীন্দ্রসদনে উপস্থিত দর্শক শ্রোতারাও সদাস্নাত ছিল খুশির ঝর্ণাধারায়, কেননা ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগেই ২৫ জুনের রাত বারটায় ভারতীয় ক্রিকেট দল সারা দেশের মানুষকে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের স্রোতে অবগাহন করিয়েছিল। তাই ওই অনুষ্ঠানে গীতা ঘটকের গানে অতি নাটকীয়তা সত্ত্বেও শ্রোতা বিরক্ত হয়নি, তার সুরেলা স্বরকেই মেনে নিয়েছিল বিশুদ্ধ পরিবেশনের পরিবর্তে। 'আজি বাজিলো কাহার বীণা' গানে 'মধুর সুরে'র মীড় গীতা ঘটক এত দীর্ঘ, প্রলম্বিত করে মেলে ধরছিলেন যে দর্শকদের বিরক্তি হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। কিংবা 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে'র মত গানে অতি নাটকীয়ভাবে 'তুমি যদি না দেখা দাও' লাইনটি বেতার নাটকের কুশীলবদের মত করে উচ্চারণ করা, এ সবের বিরুদ্ধেও কোন গুঞ্জন ওঠেনি। তবে 'আমি তোমায় আবার' কিংবা 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' গাওয়ার সময় শিল্পীর আন্তরিকতা সত্যিই অনুভব করা যাচ্ছিল। এ দিনের অনুষ্ঠানে সত্যি সত্যিই শ্রোতাদের রবীন্দ্রসংগীত পিপাসা মিটিয়েছেন অর্ঘ্য সেন। তাঁর দরাজ গলায় 'আমি কী গান গাব যে' কি রকম মিথ্যে মনে হচ্ছিল। ওই সুর, ওই কণ্ঠ দিয়ে তিনি যা খুশি তাই গাইতে পারেন। ওর গলায় 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো' শোনা যেমন অভিজ্ঞতা, তেমনি 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'র মত পরিস্থিতির সংগে মানানসই গান শোনাও এক আশ্চর্য অনুভূতির বিষয়। তবে ওঁর সংগে তবলায় যিনি সাহায্য করেছিলেন সেই বিপ্লব মণ্ডলের কথা না উল্লেখ করলে খানিকটা বলা বাকি থেকে যায়। বিভা সেনগুপ্ত এ দিন গাইলেন 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান'। শিল্পীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও যদি তাই হয়, তবে শ্রোতারা তার সুর আর মননের সংযোগকারী পরিবেশনার জন্যও তৈরি থাকবেন।

সন্তোষ ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীত কদাচিৎ শোনা যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁকে বেশ অনেকদিন পর গাইতে শোনা গেল। তাঁর 'আজি ঝর ঝর মুখর' বা 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' শ্রোতাদের প্রত্যাশা মিটিয়েছে। অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে ছিলেন বীণা শ্রীমল, সলিল মিত্র (বেহালা), রমেশ চন্দ্র (দিলরুবা) ও রূপেন ঘোষ (খোল আর তবলা)।

দিব্যজ্যোতি বসু

একটি সার্থক সন্ধ্যা

রবীন্দ্রসদনে ২০ আগস্ট 'শুভেন্দ্রম' এবং 'বক্তব্য' গোষ্ঠীর বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল।

পাঁচমেশালী চটুল হিন্দি গান তথা প্রমোদ উপকরণ নয়, আমাদের একান্ত নিজস্ব, পুরাতনী, নজরুল, গজল এবং তার সংগে কিছু মার্জিত আধুনিক গান পরিবেশন করলেন নবীন ও প্রবীণ শিল্পীরা।

প্রথম পর্বের প্রথম শিল্পী ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, শিল্পীর এটিই প্রথম স্টেজ অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য এই নবীন শিল্পীকে সাধারণের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। তাঁর পরিবেশিত চারটি গানের মধ্যে 'তোমার মহাবিশ্বে', 'ওমা তোর' এবং 'পথ জুড়ে ঐ' গানের কথা ও পরিবেশনার গুণে মনকে ভরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় শিল্পী জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় নিজের সুর ও কথায় ছ'টি গান শোনালেন। তাঁর গানের প্রতিটি শব্দের ব্যবহার মনকে নাড়া দেয়। পরিবেশনের গুণে শব্দকেও ব্যঞ্জনাময় করে তোলেন তিনি। আধুনিক গান মানেই উদ্ভট অর্থহীন কিছু শব্দ যে নয় তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন এই শিল্পী। 'নিমাই নিমাই', 'তোমার সংগে', 'আলোয় আলোয়', 'ও বাউল', 'কী কথন বলে' এবং 'ও মাঝিরে' প্রভৃতি করুণরসাশ্রিত গানগুলি পরিবেশনের গুণে একটা বিষাদের সুর ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রোতাদের মধ্যে। এখানেই শিল্পীর সার্থকতা। সংগে তবলাবাদক বিপ্লব মণ্ডলও অনেকখানি কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।

এই পর্বের শেষ শিল্পী সুকুমার মিত্র। নজরুলগীতিতে একটি বিশিষ্ট নাম সুকুমার মিত্র। তিনি বেছে নিয়েছিলেন রাগাশ্রয়ী তিনটি নজরুলগীতি ও দুটি গজল। 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর' তিনি যখন শেষ করলেন তখন শ্রোতাদের মন কিন্তু শূন্য নয় পরিপূর্ণ অর্থাৎ সুরে কাজ নিবেদনের সতর্কতায় সার্থক হয়ে উঠেছিল।

বাংলা গানের ঐতিহ্যকে সার্থকভাবে ধরে রেখেছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম শিল্পী ছিলেন তিনিই। ব্রহ্মসংগীত টপ্পা এবং ভক্তিমূলক মিলিয়ে মোট নটি গান পরিবেশন করেছিলেন। শ্রোতাদের সংগে বৈঠকী মেজাজে একাত্মতায় তিনি অনবদ্য অদ্বিতীয়।

অনুষ্ঠানে পরিবেশিত টপ্পা 'কি গুণ করেছে', ভক্তিমূলক 'মা তোর চোখের' অথবা দাদরা তালে 'আমার হৃদ মাঝারে' কানে এখনও বাজে। সবশেষে গাইলেন 'টাকা মাটি মাটি টাকা', গম্ভীরা জাতীয় গান।

রাধাকান্ত নন্দীর সংগতও অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করার মূলে। আসরের শেষ অনুষ্ঠান আবৃত্তি। শিল্পী পরিচালক ও অভিনেতা দিলীপ রায়। ঐদিন তিনি যে তিনটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন তার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'উখাড়িব' উল্লেখযোগ্য। কথোপকথন ঢঙে ও ব্যক্তিত্বময় কণ্ঠস্বরে উচ্চারণের গুণে গ্রাম বাংলার চাষীর রূপটি চমৎকার ফুটিয়েছিলেন তিনি।

সৈকত হাজরা

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল–৬৭

১	২	■	৩		৪	■	৫
৬				■	৭		
৮		■	৯	১০	■	■	
	■	১১	■	১২	১৩	১৪	
■	১৫		১৬	■	১৭		■
১৮		■	১৯	২০		■	২১
২২		২৩	■		■	২৪	
	■	২৫					■

সূত্র : পাশাপাশি

১। থাকার জায়গা ৩। সব থেকে ভাল (অভিনেতা) ৬। ইংরেজি আনন্দ ও বাংলার প্রদীপের সমন্বয় ৭। পানির শেষ বা নিচ ৮। পেতে পারেন, খেতেও পারেন ৯। পাতলা ১২। ভীষণ যুদ্ধ ১৫। সদ্‌বংশে জাত মেয়ে ১৭। সঞ্চয় ১৮। মূল্য ১৯। রূপো ২২। সম্মানদাত্রী ২৪। লজ্জা ২৫। বিয়ের পর যে ঘরে যায়।

সূত্র : ওপর-নিচ

১। এক রকমের তেজী পাখি ২। বেদের টীকাকার ৩। ছোট পাথর ৪। ইচ্ছে ৫। যা নেভে না ১০। নিদ্রা ১১। রাজার অধীন জনগণ ১৩। থানায় থাকে ১৪। লক্ষ্মীদেবী ১৫। সুন্দর মানসিকতা ১৬। বিদ্যুতের পথ ১৮। দুরন্ত ২০। দামী পাথর বা বিষ ২১। শরীর ২৩। রাজা মন্ত্রীর খেলা ২৪। মালা।

সমাধান প্রকাশিত হবে ৯ নভেম্বর সংখ্যায়। সমাধান পাঠানোর শেষ তারিখ ২০-১০-৮৩।

সমাধানপত্রের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃংখল আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃংখলের নম্বরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

ভ্রম সংশোধন

শব্দশৃংখল ৬৬-র 'সূত্র : পাশাপাশি'তে '২' এর পরিবর্তে '৪' পড়তে হবে।

শব্দশৃঙ্খল–৬৩ (সমাধান)

শব্দশৃংখল ৬৩-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন এ কে

শ	ব্দ	শৃ	ঙ্খ	ল	■	সা	জ
শ	■	জ	■	হ	ল	ধ	র
ক	থা	■	বি	মা	■	ক	দা
■	লা	ঘ	ব	■	বো	■	■
ভা	■	■	র	বি	বা	স	র
স্ব	ভা	ব	■	র	■	■	ঘু
তী	র	■	আ	স	র	■	প
■	ত	স্রা	ন্তু	■	পা	■	তি

দাশগুপ্ত (৫৩৭, পর্ণশ্রী পল্লী, বেহালা, কলকাতা-৬০) এবং সুমন বিশ্বাস (৮৪/ এল/৪, বীণা রোড, জামশেদপুর-৭)।

শব্দশৃংখল-৬৩-র লটারিতে বিচারক ছিলেন নন্দদুলাল চৌধুরী।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

অকটোবর ৫ থেকে ১১

মেষ : শারীরিক ঝামেলা চলবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ মন্দা; বেশ কিছু ঋণ। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি; মেয়েদের বড় রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার আশংকা। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। মেয়েদের আকস্মিক প্রাপ্তি-যোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃষ : শরীর মোটামুটি সুস্থ থাকবে; মেয়েদের ছোটখাট আঘাত। আর্থিক ক্ষেত্রে বড় রকমের ক্ষতির আশংকা। কর্মক্ষেত্রে ভাল কোন পরিবর্তন; মেয়েদের কর্মপদ্ধতি ও তৎপরতায় প্রশংসালাভ। পারিবারিক ব্যাপারে প্রায় সকলের সংগে মতান্তর। মেয়েদের নিকটজনেরা ভুল বুঝবে। ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি।

মিথুন : শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক চাপ চলবে, তবে কোন বন্ধুর সাহায্যে খানিক স্বাচ্ছল্য। কর্মক্ষেত্রে অন্যের মতামত এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা/ক্ষমতা লাভ। পারিবারিক কোন বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে অতিরিক্ত লাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কর্কট : আগের অসুস্থতার জের চলবে; মেয়েদের শারীরিক ভোগান্তি চলবে। আর্থিক সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা, স্বীকৃতি সত্ত্বেও লাভ বিশেষ হবে না; মেয়েদের পরিস্থিতি জটিল হবে। কোন সন্তানের আচরণে পারিবারিক অশান্তি। ধর্মকর্ম হবে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

সিংহ : দাঁত সংক্রান্ত গোলমাল ভোগাবে; মেয়েদের অর্শ বা ঐ জাতীয় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা; প্রচুর ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে কোন কঠিন দায়িত্ব পালনে তৎপরতার অভাবে ক্ষতি; মেয়েদের অবস্থা প্রতিকূল হবে। স্ত্রীর জন্য বিশেষ উদ্বেগ। দূর ভ্রমণযোগ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন।

কন্যা : শারীরিক ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। ব্যয়ের চাপ অনেকটা সামলান যাবে; সামান্য আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কারও পরামর্শে কোন অবস্থার পরিবর্তন; মেয়েদের ছোটখাট ক্ষতি। পারিবারিক কোন ব্যাপারে মানসিক চাপ ও অশান্তি। কর্মপ্রার্থীদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মলাভের যোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

তুলা : শরীর মোটামুটি; মেয়েদের ব্যথা-বেদনা কাবু করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে সাফল্য ও নতুন উদ্যম; মেয়েদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন আকস্মিক বিপর্যয়। বয়স্কদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়। গৃহাদি বদল হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

বৃশ্চিক : পেটের গোলমাল ভালমত ভোগাবে; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা অর্থহানির আশংকা। কর্মক্ষেত্রে পুরনো কোন ব্যাপারে নতুন করে অশান্তি; মেয়েদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সুযোগ। ধর্মকর্মে প্রচুর ব্যয়। মেয়েদের দীর্ঘদিনের কোন প্রয়াসে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের আর্থিক উন্নতি।

ধনু : শরীর ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে। মেয়েদের হঠাৎ বড় রকমের অস্ত্রোপচার। আর্থিক ব্যাপারে জটিলতা, নৈরাশ্য। কর্মক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠা। মেয়েদের বিশেষ কোন প্রচেষ্টায় সুফল। কোন সন্তানের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা। মেয়েদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মকর : শরীর সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন, মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা ভোগাবে। আর্থিক চাপ কমবে; আয় বৃদ্ধির সহজ সুযোগ। কর্মক্ষেত্রে নিজ মতাদর্শ প্রশংসিত হবে; মেয়েদের সহজ অগ্রগতি। পারিবারিক কোন সম্পত্তি হাতছাড়া হবার আশংকা। সন্তানদের বন্ধুরা ক্ষতি করবে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার সামান্য হেরফের।

কুম্ভ : শরীর ভাল চলবে না; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে আচমকা প্রাপ্তিযোগ। কর্মস্থলে কারও পরামর্শ সুখের হবে; মেয়েদের অতীত কোন বিরোধ মিটমাট হতে পারে। কোন সন্তানের বিবাহ ব্যাপারে নতুন সমস্যা। দূরের কোন সংবাদে আনন্দ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : মানসিক উৎকণ্ঠা। উত্তেজনা সংতাহভর চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্র আশাব্যঞ্জক নয়। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন জটিলতা দূর হয়ে যাবে। পারিবারিক সব ক্ষেত্রেই অশান্তি। আত্মীয় কুটুম্বের সংগে বিশেষ মনোমালিন্য। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৪০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাইপ্রাস
ও গ্রীস সফর

বাংলার বাইরে দুর্গোৎস
প্রাচীনতম সর্বজনী
পুজোয় ভ্রম

সম্পাদকীয়

জীবন-সংগ্রামে সংগ্রামী মানুষের জীবনে অবকাশ বড় কম। মননে-চিন্তাতে শুধু সংগ্রাম। সে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠার, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার এবং জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছে। এই জটিল আবর্তে, অভাব-অনটনের টানাপোড়েনে সাধারণ মানুষের জীবন আজ সমস্যা-জর্জর, কণ্টকিত। সেই সমস্যা ঘিরেই চলছে মানুষের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষ ক্লান্ত,অবসাদগ্রস্ত। তাই কর্মক্লান্ত মানুষ চায় একটুখানি অবকাশ, যে অবকাশে থাকবে না কোন দুর্ভাবনা, থাকবে না কোন উত্তেজনা। তবে সেটা কর্মহীনতার বিশাল অবকাশ নয়। কারণ কর্মহীনতার বিশাল অবকাশ মানুষের মানস-ক্ষেত্রকে শয়তানের কারখানায় পরিণত করে। কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনে যদি একটু অবকাশ না মিলত জগতে অনেক মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হত না। অবকাশের যথাযোগ্য ব্যবহার সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার ফলে মানুষ আজ অধিগত করেছে। তাই নিরবচ্ছিন্ন কাজে ক্লান্ত মানুষের নতুন সৃষ্টির জন্যও চাই অবকাশ।

বাঙালি জীবনে কয়েকটি দিনের অবকাশ 'অরুণ আলোর অঞ্জলি' নিয়ে আসা শরতে, যখন শারদ লক্ষ্মীর অনুপম রূপশ্রী চারিদিকে এক আকুল উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ছাপিয়ে যায়, যখন ধরিত্রীর রূপ-লাবণ্য এবং বনভূমির বর্ণাঢ্যতা মানুষের মনকে উন্মুখ করে তোলে, এই রূপ, সৌন্দর্যের মাঝে বাজে ছুটির বাঁশি। 'স্থলে জলে আর গগনে গগনে/বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে।' সেই বাঁশি যেন ছুটির বাঁশি, পূজাবকাশে বেরিয়ে পড়ার বাঁশি। সেই অবকাশে কেউ দেখিতে যান পর্বতমালা, দেখিতে যান সিন্ধু। কিন্তু গ্রামে বড় একটা কেউ যান না। শহুরে মানুষের গ্রামে যাওয়ায় যেন রয়েছে এক ধরনের উন্নাসিকতা যার ফলে রচিত হয়েছে গ্রামের মানুষের সংগে শহুরে মানুষের এক ধরনের ব্যবধান। কিন্তু শহুরে মানুষের একথা ভোলা উচিত নয় যে 'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই।' আর এই দেশের জনসংখ্যার আশি-শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। একদিন এই গ্রামগুলিই ছিল প্রাচুর্যে ভরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী সংক্রমণে গ্রামগুলি আজ হতশ্রী। আজ সেখানে নেই ঐতিহ্যপূর্ণ কুটির-শিল্প, নেই সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা। তার বদলে সেখানে রয়েছে অনশন, স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল মৃত্যু ও অশিক্ষা। পল্লীর প্রাণরসে উজ্জীবিত শহরগুলি আজ গ্রামকে দেখে অন্য এক চোখে।

শারদ উৎসবের অবকাশে তাই সবারই প্রয়োজন গ্রামে যাওয়া – প্রকৃতিকে দুচোখ-ভরে দেখতে এবং গ্রামের মানুষগুলিকে প্রাণভরে বুঝতে, গ্রামের মানুষের সংগে ভাবনার আদান-প্রদান করতে, ব্যবধান কমাতে এবং গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে শরিক হতে। গ্রাম এবং শহরের বৈষম্য দূর করে গ্রামগুলির হতশ্রী ফেরান প্রয়োজন, সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা আনা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও গ্রামের মানুষের আজ আকুল আর্তি 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,/ চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।'

পরিবর্তন

১২-১৮ অক্টোবর ১৯৮৩, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১৫

দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : ইন্দিরা গান্ধীর রঙিন ছবি – অশোক বসু

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০
ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

২৬ অকটোবর সংখ্যার আকর্ষণ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে

রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশন সেরে ফিরে এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর নিউ ইয়রকে যাবার পথে তিনি গিয়েছিলেন সাইপ্রাস, গ্রীস, ফ্রানস। এসব দেশের সরকার ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন ব্যাপক সংবর্ধনা। শ্রীমতী গান্ধীর এবারকার ইওরোপ ও রাষ্ট্রসংঘ সফরে অন্যতম সঙ্গী ছিলেন পরিবর্তন-এর সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন প্রধানমন্ত্রীর এই বিদেশ সফরকে। তারই অন্তরঙ্গ ও আলোকসন্ধানী কথাচিত্র।

সেই সঙ্গে থাকছে শ্রীমতী গান্ধীকে রাষ্ট্রসংঘ-প্রদত্ত পুরস্কার পপুলেশন অ্যাওয়ারড সম্পর্কে তথ্য এবং প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কারপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানের বিস্তৃত ও একান্ত বর্ণনা, যা এদেশে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

সঙ্গে থাকছে

অন্যান্য আকর্ষণীয় লেখা এবং নিয়মিত ফিচার।

জরুরি ঘোষণা

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, নভেমবর মাস থেকে পরিবর্তনে আমরা নিয়মিত শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন নেব বলে ঠিক করেছি। পরিবর্তনে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুবিধেগুলো সর্বপ্রথম ভেবে দেখুন :

১। দৈনিক সংবাদপত্রের চেয়ে পরিবর্তনে বিজ্ঞাপনের হার অনেক কম।

২। দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের আয়ু মাত্র একটি দিন। পরিবর্তনে এক সপ্তাহ। এক্ষেত্রে আমাদের পাঠক সংখ্যা সর্বাধিক।

বিজ্ঞাপনের হার

চাকুরি চাই : তিন লাইন পর্যন্ত ন্যূনতম ১৮ টাকা। অতিরিক্ত প্রতি লাইন ৬ টাকা।

পাত্র-পাত্রী : তিন লাইন পর্যন্ত ন্যূনতম ২৪ টাকা। অতিরিক্ত প্রতি লাইন ৮ টাকা।

অন্যান্য শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রতি লাইন ১৬ টাকা। বকস নমবরের জন্য অতিরিক্ত হার লাগবে। অন্তত দু সপ্তাহ আগে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা করুন বা লিখুন :

বিজ্ঞাপন অধিকর্তা,
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড,
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২
ফোন : ২৭ ২১৬৯, ২৭ ৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬ ১৬৮০, ২৬ ১৬৮১

নিবেদনমিদং

পরিবর্তন ১৫ জুন সংখ্যায় প্রবাসীর চিঠি পর্যায়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই চিঠি পাঠকদের মধ্যে কী ধরনের সাড়া জাগিয়েছিল সেটা চিঠিটির লেখকের উত্তর থেকেই বোঝা যাবে :

'গত ১৫ জুন' '৮৩ সংখ্যার 'প্রবাসীর চিঠি' বিভাগে 'নরওয়েতে বাঙালিরা কেমন আছেন' আমার এই চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর' ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি। পরিবর্তনের সম্মানিত গ্রাহকরা জানতে চেয়েছেন নরওয়েতে পড়াশুনা করার বিস্তারিত বিবরণ এবং নরওয়েতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি খুবই দুঃখিত এই জন্যে যে এখানকার বাঙালি সমিতির সেই ক্ষমতা নেই যে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ভারত থেকে নরওয়েতে আসার বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমিত। আর যারা নরওয়েতে পড়াশুনা করার জন্য আসতে চান তাদের অনুরোধ করছি, কলকাতায় নরওয়ের একটা ছোট কনসুলেট অফিস আছে SAS অফিসের ভিতরে। সেখানে বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। সময়ের অভাবে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে লিখতে পারলাম না। আশা করি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

রূপজ চৌধুরী
অসলো, নরওয়ে
২১-৯-৮৩

আমাদের 'সমীপেষু' বিভাগটি যে কত জনপ্রিয় এবং পাঠক সমাজ এ বিষয়ে কতটা উৎসাহী, এই চিঠি তারই প্রমাণ।

ঊষা ভৌমিক

অলিম্পিক কোচ জিম ও'ডোহার্টি বলেন:

"শক্তি আর স্ট্যামিনা গড়তে কমপ্লান® অদ্বিতীয়!"

প্রখ্যাত অলিম্পিয়ান জিম ও'ডোহার্টি ভারতসমেত, সারা জগতেই প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়দের জোরদার কঠিন প্রতিযোগিতার জন্য ট্রেনিং দেন। তাঁর মতে চ্যাম্পিয়নরা মাটি ফুঁড়ে জন্মায় না, তাদের তৈরী করতে হয়। আর বিজয়ী হতে গেলে যেমন জোরালো ইচ্ছাশক্তির দরকার, তেমন-ই জোরালো দৈহিক শক্তিরও দরকার।

"সাঁতারু, অ্যাথলেট আর বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের আমি নিয়মিত কমপ্লান দেয়ার পরামর্শ দিই" বলেন জিম ও' ডোহার্টি। "কমপ্লান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ সম্পন্ন এক সম্পূর্ণ আহার, যা সুস্থ-সবল শরীর গড়ে ও স্ট্যামিনা বাড়ায় আর অতি সহজেই হজম হয়।"

অভিজ্ঞ জিম ও' ডোহার্টির মতামতটি আপনিও মানুন। আপনার বাচ্চাদেরও সর্বাঙ্গীন, সুস্থ-সবল বাড়ের জন্য প্রতি দিন কমপ্লান দিন। কমপ্লান পাওয়া যায় চমৎকার স্বাদ-গন্ধে, যা বাচ্চারা দারুণ ভালবাসে।

Glaxo
Complan
COMPLETE PLANNED FOOD

কমপ্লান®—সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GLC.9-2317 BN

গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস—ফ্রনটেও অনৈক্য বাড়ছে

নিশীথ দে

যত দিন যাচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা গ্রামে অরাজকতাব শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছে। সমস্যাটা জটিলতব হচ্ছে যোগ্য-নেতৃত্বের অভাবে। গ্রামে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিপন্ন। বামফ্রনটের শরিকদলগুলির ঐক্য টিকে আছে সেইসব জায়গায়, যেখানে কোন দলের একার শক্তিতে চলা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের নেতৃত্ব পঞ্চায়েতের ব্যাপারে আরও উদাসীন।

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বসে বামফ্রনট নেতারা বিরোধ-নিষ্পত্তি করছেন। কিন্তু নিচের তলার কর্মীরা চলছেন কোথাও নিজেদের খেয়ালে, কোথাও জেলা কমিটির পরামর্শ মত। সব জেলা নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বকে মানছেন না। আবার রাজ্য নেতৃত্বও জেলা বা স্থানীয় কর্মীদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না।

কংগ্রেসের তো রাজ্য নেতৃত্বের সংগে জেলা নেতৃত্ব, জেলার সংগে ব্লক বা গ্রামাঞ্চলের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন। জেলা নেতৃত্ব নিচের তলার কর্মী বা নেতাদের চেনেন না। অনেক জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তা নিজের জেলাতেই থাকেন না।

বামফ্রনটের ছোট শরিক দলের কর্মীরা তো এখন প্রশ্ন তুলেছেন, বামফ্রনটের ঐক্য বজায় রাখাটা মন্ত্রীদের গদি বজায় রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নেতাদের মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে, বিধানসভা-লোকসভায় সিট পাওয়ার জন্য আর কতদিন নিচের তলার কর্মীরা খুন হবেন, ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাবেন?

বামফ্রনট ক্ষমতা দখলের পর যেমন সব শরিকদলেরই সমর্থক সদস্য বেড়েছে তেমনি কমেছেও অনেক। সি পি আই (এম)কে রুখতে কংগ্রেসে ভিড় বেড়েছে। কংগ্রেসের দিকে জনগণ আসছে, কিন্তু নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। প্রদেশ কংগ্রেস এবং জেলা কংগ্রেসে নতুন অ্যাডহক কমিটি যাদের নিয়েই হোক না কেন কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি গ্রামের মানুষের আস্থা বাড়ছে না। গ্রামের মানুষ আঁকড়িয়ে ধরছে ব্যক্তি বিশেষকে যাঁরা সি পি এমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এগিয়ে যেতে পারেন। অধিকাংশ জেলায় যুব কংগ্রেস নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেখানে জেলা কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। এই সব যুব নেতাদের মদত দেওয়ার বদলে বিরোধিতা করছেন। এমন ঘটনাও আছে যেখানে কংগ্রেসের কোন কোন নেতা সি পি আই (এম)-এর সংগে গোপনে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস সমর্থকদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন—নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করার কৌশল।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিপদে আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে কে হলেন তা নিয়ে গ্রামের লোক বিশেষ মাথা ঘামান না। দুর্দিনে প্রদেশ কংগ্রেসের কোন নেতা এসে পাশে দাঁড়াবেন এটাও আশা করেন না। প্রদেশ কংগ্রেসের কেউ নির্যাতিত হলে কিংবা কোন এম এল এ আহত হলে প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা ছুটে যান। কিন্তু গ্রামের পর গ্রাম লুঠ হয়, গৃহস্থ বধূরা নির্যাতিত হন, মেয়েদের মর্যাদা ধুলোয় লুটোয় তখন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা খবরের কাগজের রিপোরটারদের ডেকে বিবৃতি দিয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামাঞ্চলে খুন-সন্ত্রাস-লুঠতরাজ চলছে অবাধে। জমিতে চাষ বন্ধ, মজুর বন্ধ, বিরোধীদের এক ঘরে করা হচ্ছে। এমন অবস্থা কখনও হয়নি।

প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রনটের আমলে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে। ছাত্র এবং যুবকদের একটা বড় অংশ শহর ছেড়ে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সিদ্ধার্থশংকর রায়, আবদুস সাত্তার, পূরবী মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি, সুব্রত মুখারজি প্রভৃতি অনেকেই গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। অসহায় মানুষের মনোবলকে চাংগা করেছেন।

সেদিনও কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়া ছিল, গোষ্ঠী লড়াই ছিল। কিন্তু খুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এখন কংগ্রেসের গোষ্ঠী লড়াইটাই সবচেয়ে বড় কথা। তার চেয়েও বড় কথা হল অনেক জেলা কংগ্রেস এবং প্রদেশ কংগ্রেসেরও অনেক নেতাকে গ্রামের মানুষ চোখে দেখেননি।

মেদিনীপুর বিরাট জেলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট অবদান। সেই জেলায় কংগ্রেসের কোন জেলা অফিস নেই। জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী থাকেন কলকাতায়। সাধারণ সম্পাদক পাঁচজন, যে যার ইচ্ছামত মিটিং ডাকেন। এক পক্ষ মিটিং-এ যান, আর এক পক্ষ অনুপস্থিত। জেলা কংগ্রেসের একজন সাধারণ সম্পাদক অজিত খাঁড়া। ভদ্রলোক প্রাথমিক শিক্ষক। নিজেই গ্রামছাড়া, খুন হবার ভয়ে দু বছর ধরে মেদিনীপুর শহরে বাস করছেন।

মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে খুন-সন্ত্রাস চলছেই। মাঝে মাঝে প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি এবং সুব্রত মুখারজি গ্রামে যান, মিটিং করেন, মিছিল-বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। তাতে আর কিছু না হোক গ্রামের যুবছাত্ররা উৎসাহিত হচ্ছেন। ৬৭—৬৯-এর ছাত্র যুবনেতা সমীর রায় কলকাতা শহরে বসে রাজনীতি করা ছেড়ে দিয়ে নিজের জেলা মেদিনীপুরে বসে আছেন। সমীর বাবু কিন্তু জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বেব কাছে এখনও অচ্ছুৎ। অথচ সমীরবাবু গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের মনোবলকে চাংগা করে তুলছেন। জেলার যুবছাত্রদের অন্তত ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন, কিন্তু জেলা কংগ্রেসের গোষ্ঠী লড়াই, নিষ্ক্রিয়তা চলছেই।

তবে এটা মেদিনীপুর নয়, সব জেলাতেই এক অবস্থা। প্রশ্ন হল, তবু কংগ্রেস পঞ্চায়েতে এত আসন পেল কী করে? লোকে কংগ্রেস বলে ভোট দেয়নি, ভোট দিয়েছে খুন-সন্ত্রাস-হামলাবাজি-দুর্নীতি-দলবাজির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রার্থীকে, যাঁরা রুখে দাঁড়াতে পারেন। যাঁরা প্রোটেকশান দিতে পারেন তাঁদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

খুন-সন্ত্রাস-দলবাজি নিয়ে বামফ্রনটের শরিকদলের মধ্যেও বিরোধ চলছে। বামফ্রনট শরিকদলের কর্মী সমর্থকরাও রেহাই পাচ্ছেন না। বিরোধ বেড়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে। শেষ পর্যন্ত বামফ্রনট শরিকরা সবাই স্বীকার করেছেন, কোন জেলাতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসন নিয়ে ফ্রনট হয়নি।

কিন্তু ফ্রনট না হওয়ার ফলে কী পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে? প্রমাণ হয়েছে কোন একক দল নয়, সামগ্রিকভাবে বামফ্রনটই শক্তি। নির্বাচনী ঐক্য না হওয়ার সুযোগ নিয়েছেন বামফ্রনট-বিরোধী প্রার্থীরা। তবে বামফ্রনটের দলীয় শক্তিও যাচাই হয়েছে। সব শরিকদলই বিশেষ করে সি পি আই (এম) অন্তত রাজ্য নেতৃত্ব জনগণের কাছে ঘোষণা করলেন, ভাঙা ঐক্য জোড়া লাগানর জন্য তাঁরা উদ্যোগী হবেন এবং কংগ্রেস যাতে পঞ্চায়েত দখল করতে না পারে তার জন্য অন্য শরিকদের নিয়ে বোরড গঠন করবেন। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে দশটি সিটের মধ্যে হয়ত সি পি আই (এম) পেয়েছে ৫টি, কংগ্রেস ৪টি এবং ফরোয়ারড ব্লক ১টি। এখানে সি পি আই (এম)-এর লোক হবে প্রধান আর ফরোয়ারড ব্লকের লোক হবে উপপ্রধান। এই নীতি কি সর্বত্র পালিত হয়েছে? মোটেই না। শুধু সি পি আই (এম) নয়, কোন শরিকদলই সেই উদারতা দেখাতে পারেনি। ভাঙা হাঁড়ি এত তাড়াতাড়ি কি জোড়া লাগে? তার ওপর ক্ষমতার স্বাদ। কেউ কি আর ভাগ দিতে চায়?

ক্ষমতার স্বাদই বামফ্রনটেব অনৈক্য ডেকে এনেছে। বীরভূমে দলের এম এল এ এবং কয়েকজন দলীয় সদস্য কংগ্রেসকে সমর্থন করায় ফরোয়ারড ব্লক নেতৃত্ব তাঁদের সাসপেনড করেছেন। পুরুলিয়া এবং গোঘাটে পঞ্চায়েত কর্মকর্তা নির্বাচনে ফরোয়ারড ব্লককে কংগ্রেস সমর্থন করে। সে জন্য ফরোয়ারড ব্লকের জেলা পরিষদ সদস্য মৃণাল ঘোষকে পারটি থেকে বের করে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। কংগ্রেসের সমর্থনে ফরোয়ারড ব্লকের লোক সহসভাপতি হয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থনে তো সি পি আই (এম)-এর লোক প্রধান হয়েছেন—তার জন্য কিন্তু ফরোয়ারড ব্লকের নেতাদের সাহস হয়নি বড় শরিকের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার। আর এস পি নেতারা আর যাই হোক কংগ্রেসের সংগে মিতালি যেমন মেনে নেন না তেমনি সি পি আই (এম)-এর হামলাবাজিও বরদাস্ত করেননি। তাঁরা অন্তত প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর এস পি কর্মীরা অন্তত অসহায় বোধ করেন না।

প্রশ্নটা হল খুন-সন্ত্রাস-হামলাকারীরা কংগ্রেস সমর্থক হলে রুখে দাঁড়াতে হবে। আর যদি তারা সি পি আই (এম) বা কোন বামপন্থী দলের সমর্থক হন তাহলে তাদের সংগে কি হাত মেলাতে হবে? এই নীতির ফলে বামফ্রনটের শরিকদলগুলির সমর্থকরা সরে যাচ্ছেন। সরে যাচ্ছেন সি পি আই (এম)-বিরোধী শিবিরে। □

তোকে প্রকাশ্যে
ভালবাসি… তাই আমি
একঘরে

পদ চাই
তাই
পদযাত্রা

তুই মা অন্তর্যামী,
বাইরেটা দেখে
বিচার
করিসনে মা

আর একটা
চান্স দে মা

ম্লমধুর

কে বলেছে কয়লা নেই!
খাদের মুখে এসো,
বে-লাইনে এলেই পাবে
মুচকি তখন হেসো।
দেখবে তোমার হাসির দাম
ডবল হয়ে ফিরবে,
ঠিক সময়ে তোমার দ্বারে
ট্রাকটি গিয়ে ভিড়বে।

প্রবীর দাস

বাবু বলেন, বৎস
খাইতে নিষেধ মৎস,
বৎস বলে, কত্তা
আপ যে আহার করতা!
বাবু বলেন, মূকখু
বাবুর বিচার করলে পাবি
কপাল ভরে দুকখু।

শেখর আহমেদ

রেকের অভাবে চলে না রেল
যাত্রীরা তাই রেকলেস
রেকলেসদের ঠ্যাঙায় পুলিশ
বাঁচায় রেলেরই ফেস।

* * * * * *

বিধান সভা,
নিদান সভা,
কী দান দেবে তুমি?
কাঁদন দেব,
াজন দেব,
াব তিন হাত ভূমি।

রমা বসু

মিশন রোতে চলছিল ষোষ
সকাল তখন আটটা
যেকোন দিন দেখতে পাবেন
ব্যাপারটা নয় ঠাটটা।

কর বাড়ছে
দর বাড়ছে
কারণ অশোক মিত্র।
ঘর মেলে না
বর মেলে না,
এই তো সমাজচিত্র।

নির্মল বিশ্বাস

লক্ষ টাকায় মন ভরে না
তাই তো কোটি চাই যে চাই
লক্ষপতি একটি টাকায়
দশটি টাকায় স্বর্গ পাই।
লটারি জুয়ায় বাজি ধরি
এসপার হয় ওসপার
স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থাকে
লাভের লাভ দশ কাবার।

মুক্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

দেশোদ্ধারে আছি মেতে,
আয় রে নিয়ে ধামা –
বাড়ি গাড়ি করতে হবে,
যত পারিস কামা।

নিশীথ চৌধুরী

ফুটপাতের এক হ্যাংলা শিশু
কইল আমায় হাসিয়া
শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে
মাথায় ঘুঁটের বস্তা নিয়ে
এ কলকাতা আসছে বছর
দুঃখে যাবে ভাসিয়া।

শুভাশিস হালদার

পা বাড়াও, জোট বাঁধো

সে যুগে শরৎকাল ছিল রাজাদের মৃগয়ার কাল। একালে রাজাও নেই, মৃগয়াও নেই। সে রাম সে অযোধ্যা সব গেছে। তবু শরৎ ঋতু আসে। নিয়ে আসে শারদীয় উৎসব। দেবী শক্তিরূপিণী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব আয়োজন বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত তার চেয়ে বড় আয়োজন অন্য কিছুতেই নেই। দক্ষিণায়নে শক্তির আরাধনা প্রশস্ত নয়, তাই শরতেই দুর্গার অকালবোধন হয়। এ ব্যাখ্যা শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিকের। বাঙালির সাধারণ সমাজ দুর্গোৎসবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মাতৃপুজোর রূপে। 'মা দুর্গা'র আবাহনে। কন্যার মতই পিত্রালয়ে তাঁর সহজ স্বাভাবিক অনুপ্রবেশ। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই এ উৎসব সর্বস্তরের মানুষের প্রাণ সংগমের পুণ্য তিথি। কয়েক যুগ আগেও এই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছার মিলনস্রোতে উজ্জীবিত হত বাঙালি। অথচ এখন সে কথা রূপক কাহিনীর মত।

উৎসবের এক বিশেষ আঙ্গিক হল সংস্কৃতির প্রাণসঞ্চার করা। জাতির ঐতিহ্য তার সংস্কৃতিগত মানে। দুঃখের বিষয়, বিগত বছরগুলিতে 'ফিল্ম হিট' কিছু 'পপ-সং' বা ডিস্কো-র জোয়ারে উচ্ছ্বসিত ড্রাগতে ঘড়ি, ঈষৎ (কেউ বা পুরোদমে) মত্ত, বিকৃত নাচ ভঙ্গিতে বহু যুবকের সংখ্যাই পুজোমণ্ডপে বেশি দেখা গেছে। পুজোপ্রাঙ্গণে তো বটেই, এমনকি আলোকোজ্জ্বল রাস্তাতেও পুজোর কদিন শ্লীলতার সীমারেখা এতদূর নেমে যায় যে উদ্দভাবে পথ চলা, কী ছেলে কী মেয়ে, উভয়েরই সমান অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ নাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকাও কম নয়। উচ্ছৃঙ্খল পোশাকের ডিজাইন ও স্বাধীনতার অপব্যাখ্যায় সুযোগসন্ধানী পুরুষেরা দলভারী করেছে। সংগে সংগে আছে সামাজিক পেষণে বিবর্ণ যুব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান নেশার চাহিদা। নেশার মত সামগ্রী বস্তু আর হয় না। পেটে গেলে স্তরীর লালিদার সংগে ভবদীয় ব্রজমোহনবাবুর ভাষার এবং ব্যবহারের কোন ফারাক থাকে না।

কিন্তু এত সব বিচারের সাক্ষ্যে আরও একটা কথা থাকে। এই সমস্ত বেলেল্লাপনা, হুল্লোড়বাজী করছে আমাদেরই ছেলে-মেয়ে, দাদা ভাই কিংবা বোনেরা। এ সমস্যা নিতান্ত আমাদের বাঙালির ব্যক্তিগত। তাই নিন্দার পাশাপাশি নোংরামির বিরুদ্ধ আন্দোলনে কাঁধ মিলাবার জন্য প্রত্যেকের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন রাখছি।

সুব্রত রায়

বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭৮

ফিলমি তারকার অনুকরণে প্রতিমা

শহরতলী বা তার আশেপাশে বেশিরভাগ পুজো কমিটিতেই দেখতে পাবেন প্রবীণরা পুজোয় দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন নবীনদের হাতে। এই নবীনদের হাতে পুজোর দায়িত্ব পড়াতে বেশিরভাগ পুজোই কেমন শ্রীহীন আর ম্যাড়মেড়ে হয়ে পড়েছে।

কোন পুজো কমিটি তাঁদের দুর্গাঠাকুরের 'অসুরের মুখ তৈরি করান আমজাদ খানের মুখের আদলে, কোন কমিটির অরডার মা সরস্বতী মুখ ঠিক যেন রতি অগ্নিহোত্রীর মত দেখতে হয়, মা লক্ষ্মীর গ্ল্যামার ঠিক যেন রেখার মত হয় -- এ বছর হয়ত দেখতে পাবেন সরস্বতীকে দেয়া হয়েছে শ্রীদেবীর রূপ আর কার্তিকের রূপ হয়েছে কমল হাসানের মত। এ তো গেল প্রতিমা নির্মাণের বৈচিত্র্য – প্যানডেলের কথা শুনবেন? তাতেও দেখতে পাবেন অনুকরণের প্রয়াস।

একটু বেশি রাতে প্রতিমা দর্শনে গেলে দেখতে পাবেন মায়ের ভক্তদের চোখ লাল - -. কারুর কারুর নতুন জামা-প্যান্ট রাস্তার ধুলোকাদায় মাখামাখি। কোথাও কোথাও দেখতে পাবেন ওয়েসটারন মিউজিকের রেকরড চালিয়ে উদ্দাম নৃত্য চলছে মণ্ডপের ভিতর।

বেশির ভাগ উদ্যোক্তাদের দেখবেন পুজোর সাতদিন আগে থেকেই ওনারা বাড়ি যাবার সময় পান না। ক্লাবে কিংবা হোটেলেই খাওয়া দাওয়া সারেন। বলা বাহুল্য ঐ পয়সাটা আপনার আমার পকেট কাটা পয়সা থেকেই খরচ হয়ে থাকে। অথচ প্রত্যেক পুজো কমিটিরই 'সুভেনীর'-এ যে আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখান হয়ে থাকে সেটা একেবারেই 'আগমার্ক'। – 'ভেজাল প্রমাণে ১০০১ টাকা পুরস্কার।'

এগুলো বন্ধ করবে কে? আমার মনে হয় - স্থানীয় অধিবাসী ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগেই এটা সম্ভবপর হতে পারে। নচেৎ আমরা যেই তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকব।

অশোককুমার চক্রবর্তী

কলকাতা ৫৩

পুজো না হলে কী হয়?

দুর্গাপুজো হচ্ছে হিন্দুদের পবিত্র পুজো। কিন্তু হিন্দুদের এই দুর্গাপুজোকে নিয়ে আজ গোটা দেশে চলেছে অতি বাড়াবাড়ি। চলেছে দুর্গাপুজোর নামে অরাজকতা, ভণ্ডামি, গুণ্ডামি, ইতরামি, সুরাপান, জোরজুলুম করে পথ ঘাট থেকে অন্যায়ভাবে জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করা। বিশেষ করে দেশের তরুণ সমাজের একটা বিরাট অংশ আজ উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাই পুজোর সময় পুজোমণ্ডপে, পথে ঘাটে সর্বত্র মদের ছড়াছড়ি। আগেকার দিনে যে কোন পুজোমণ্ডপগুলিতে ঢাকের বাদ্যযন্ত্রে, ধূপের গন্ধে পুজোমণ্ডপগুলিতে একটা সুন্দর পবিত্র ভাব জেগে উঠত কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি পুজোমণ্ডপে অশালীন হিন্দী গান, ডিসকো নাচের প্রভাব। তাই সমাজের প্রতিটি চেতনাশীল মানুষের কাছে আবেদন দুর্গাপুজোয় ধর্মের নামে যে বিশৃংখলা ও অপবিত্রতা দেখা দিয়েছে তা কঠোর হাতে দমন করতে এগিয়ে আসুন। এ ধরনের পুজো না হলে কী হয়?

প্রীতিতোষ বণিক

করিমগঞ্জ, আসাম

দুর্গোৎসব না মদনোৎসব?

ধর্ম হল যা সত্য শিব ও সুন্দরকে ধারণ ও বহন করে, মানুষকে প্রগতির পথে উত্তরণে সাহচর্য যোগায়। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে যখন প্রাচীন চিন্তা বা পন্থা আর সামঞ্জস্য রাখতে পারে না তখন তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং তা পরিত্যাজ্য। ইতিহাস তাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। বাঙালির কাছে যে দুর্গোৎসব, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এক রোমাঞ্চকর সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক অনুভূতি নিয়ে আসার কারণে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পেয়েছিল আজ আর তা ঠিক অনুরূপভাবে নাড়া দেয় না, বরঞ্চ বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবজাত আহার-বিহার, ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করার একটা সুযোগ হিসেবে হাজির হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙেপড়া ও গড়পড়তা শিল্প বিকাশের সংগে ব্যক্তিগত ধনী পরিবারের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বারোয়ারি বা বারো ইয়ারী পুজোর প্রচলন হয়েছে। যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ এখন আমাদের কাছে 'সেকেলে' অথচ একালের কোন বিকল্প মূল্যবোধ আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, তাই যে কোন একটা ছল ছুতো (দুর্গাপুজো তার মধ্যে অন্যতম) পেলেই আধুনিক মূল্যবোধ অন্বেষণ ও রূপায়ণে ব্যর্থ যুব ও তরুণ সমাজ এক বিকট উল্লাসে, আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আত্মহননের তাণ্ডব নৃত্য করে, আর তার মধ্যে দিয়ে নিজেদের আদিম ও অসংগ লিপ্সাকে চরিতার্থ করে।

ধর্ম যে 'আত্মানং বিদ্ধি'র স্বার্থপ্রণোদিত তাকে আমরা অনেক আগেই ভাতের হাঁড়িতে এনে ফেলেছি, এখন আমরা টানতে টানতে এনে ফেলেছি 'বিস্তারা পর'। অথচ দুর্গাপুজো আমাদের জাতীয় উৎসব এবং ধর্মাচরণের সংগে যুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে রাষ্ট্রযন্ত্রও নবযুগের এই সব ধর্মগুরু ও চেলাচামুণ্ডাদের যে কোন প্রকার কাজ -- তা সে পুজোর নামে চাঁদার জুলুম, পুজোর উপকরণ হিসেবে ডিসকো ও পপ গানের তারস্বরে প্রচার, মাদকদ্রব্যের মাত্রাজ্ঞানহীন ব্যবহার, প্রতিমা নিরঞ্জনের অবধারিত অংগ হিসেবে দৈহিক

ভঙ্গির উৎকট প্রদর্শন ইত্যাদি যাই হোক না কেন – নীরব দর্শকের মত সহ্য করে যাচ্ছে।

সুতরাং যতদিন না শ্রেয়তর বিকল্প মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারছি ততদিন ভারতবর্ষের যুগ পালিত, বহু প্রজ্ঞাবান সিদ্ধিযুক্ত মানুষের অবদানে পুষ্ট যে মূল্যবোধ যা মানুষ হিসেবে বাঁচতে শেখায়, অন্যায়, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়, যার সামগ্রিক পরিচিতির নাম ভারতীয় সংস্কৃতি, তার সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে না। এমন সমস্ত আচরণ, চিন্তা, কর্মপ্রচেষ্টা যার শিরোনাম 'বেলেল্লাপনা' তা রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু যেহেতু আইন প্রণয়নই সমস্যার সমাধান নয়, তাই চাই সুস্থ সংস্কৃতির পরিপোষক নীতির প্রচার, অনুশীলন, সংগঠন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ। তবেই আমরা দেবতাকে প্রিয়, প্রিয়কে দেবতা করতে পারব।

রামকুশল বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরুলিয়া

পুজোর নামে বুক কাঁপে

বেশ কয়েকবছর ধরে লক্ষ করছি যত দিন যাচ্ছে পুজো অর্চনার রূপ ও ভঙ্গিমা কি রকম যেন বদলে যাচ্ছে। আজকাল পুজোয় উদ্যোক্তাদের অন্তরের ভাবভক্তির যতটা না গভীরতা থাকে তার চেয়ে বেশি বাইরের জাঁকজমক চাকচিক্যটাই প্রকট হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে বারোয়ারি পুজোগুলির উন্মত্ততা ক্রমশ চরমে উঠছে। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই পথে ঘাটে শুরু হয়ে যায় জোর জুলুম করে চাঁদা আদায়ের হিড়িক। দাবি মত চাঁদা দিতে না পারলেই জুটবে নানা কটূক্তি ও লাঞ্ছনা। এতে বেশি বিপর্যস্ত ও অসহায় বোধ করতে হয় সাধারণ আয়ের মানুষকে। তাই এখন পুজোর নাম শুনলে আনন্দ হওয়া তো দূরের কথা ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। পুজোর নামে চাঁদা আদায়ের এই জুলুমবাজি বন্ধ হওয়া দরকার। শুধু কি এটুকুই? আরও আছে। প্যানডেল ও আলোর চোখ ধাঁধানো নানা কায়দাকানুন ছাড়াও আজকাল আবার দেখছি প্রতিমার গঠনরীতি নিয়েও চলেছে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা। দর্শকদের চমকে দিতে চাল, ডাল, তিল, জব থেকে শুরু করে কাঁচ, পেরেক, পুঁথি, বাতাসা ইত্যাদি কতরকমের জিনিস দিয়ে যে ঠাকুর গড়া চলেছে তার ঠিক নেই। পুজোর নামে শিল্পের দোহাই দিয়ে এসব কি হচ্ছে? এতে দেবীর অধ্যাত্ম মহিমা কি কলুষিত হচ্ছে না?

পুজোর কদিন আমাদের সবচেয়ে অতিষ্ঠ করে তোলে মাইক। দিন রাত আজেবাজে হিন্দি গানের উৎকট চেঁচানি প্রাণমন একেবারে জেরবার করে তোলে। শহরের দিকে পুজোর সময় মাইক বাজানোর ব্যাপারে নানা বিধি-নিষেধ থাকলেও গ্রামের দিকে এসবের কোন বালাই থাকে না।

ঠাকুর দেবতা মাত্রেই আমাদের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু বিসর্জনের সময় 'বিপিনবাবুর কারণ সুধা'য় জারিত হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহকারে মা দুর্গার ভক্তরা যেভাবে নাচন-কোদন করেন দেখে মনে হয় এ আমরা কোথায় চলেছি? পুজোর নামে এ ধরনের চ্যাংড়ামি কি বন্ধ হবে না?

সুব্রতকুমার করণ
বাওয়ালী, ২৪ পরগণা

দুর্গাপুজোর 'ভক্তি' এখন 'ভয়ে' পরিণত হয়েছে

পুজো বা উৎসব থেকে যে প্রেরণা মানুষ পেতে চায় তা হল সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, কলুষতার স্তর ভেদ করে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের পরিবেশে উত্তরণের মানসিক প্রশান্তি। অথচ, এই নির্মল প্রশান্তির বদলে পুজোর সঙ্গে যে অশান্তি আজ একটা বিরাট জায়গা করে নিয়েছে তা হল 'বেলেল্লাপনা' কথাটি।

'বেলেল্লাপনা' কথাটির অভিধানগত অর্থ হল – 'উচ্ছৃঙ্খল ইতরজনের মত আচরণ' (চলন্তিকা)। অর্থাৎ, সুস্থ আচরণের বদলে রুচি বিকৃতিজনিত দৌরাত্ম্য, যা 'ভক্তি-ভাবনা'র বদলে 'ভীতি তাড়না'য় হয় রূপান্তরিত। এই রুচি বিকৃতির প্রকাশও তাই মোটামুটিভাবে দেখতে পাই – চাঁদার জুলুমে, ভাষার প্রয়োগে, পুজো প্যানডেলের জৌলুষে, মাইকের দাপটে, আলোর অপরিমিত অপচয়ে। এগুলির দাপট হল আর্থিক সংগতির প্রকাশ। সংস্কৃতিহীনতার প্রকাশ আরও নগ্নভাবে ঘটে যখন দেখি কোন রূপালি পর্দার নায়ক নায়িকার আদলে প্রতিমার মুখাবয়ব গঠন করা হয়, প্রতিমার সাজ সজ্জায় উগ্র আধুনিকতার প্রলেপ লাগানো হয়। আর, সর্বোপরি প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে লরিতে, রাজপথে শোভাযাত্রায়, নদীর ঘাটে অঙ্গভঙ্গি করে, শিস দিয়ে, বাজি পুড়িয়ে উদ্দাম তান্ডব নৃত্য গীত পরিবেশন। এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীর কাছে এই পুজোর কটা দিন সমার্থক হয়ে উঠে বেপরোয়া 'স্বাধীনতা'য় – কুরুচিপূর্ণ পোশাকের বাহারে আর যথেচ্ছ বিহারে।

তাই, আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের, ভাই বোনদের এই গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে রক্ষা করে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বোধে গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই সক্রিয় জনমতগঠন। পাশাপাশি সরকারী কর্তাব্যক্তিদেরও একটু নড়েচড়ে বসতে হবে। যাবতীয় রুচি-বিকৃতিজনিত, অসাংস্কৃতিক, সমাজবিরোধী কাজে যারা লিপ্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তিদানে এগিয়ে আসতে হবে। আর, এর দ্বারাই ভারতবর্ষের সামনে পশ্চিমবঙ্গবাসী তার উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে অনেকখানি সফল হবে।

জয়ন্ত রায়
নরদান অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৩৭

বারোয়ারি পুজো না কমালে বেলেল্লেপনা বন্ধ হবে না

দুর্গাপুজোয় ধর্মের নামে শুরু হয়েছে বেলেল্লেপনা। পুজোর নামে এ লাম্পট্য অবিলম্বে রোধ করা উচিত।

এ বেলেল্লেপনার জন্য প্রথমেই দায়ী করা যায় যুব সমাজকে। পুজোতে রোমিও যুবকদের লাম্পট্য বন্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে উচিত বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেওয়া। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে একটা পাড়াতে তিনটে চারটে করে দুর্গাপুজো হচ্ছে। আর প্যানডেলে প্যানডেলে চলে রোমিওদের দৌরাত্ম্য, অশ্লীল নৃত্য, মদ-জুয়া আর যৌন-কাতরতার উদগ্র প্রকাশ। দিন দিন যত পুজোর সংখ্যা বাড়বে সাধারণ মানুষ, চাকরিজীবী, ব্যবসাদার এঁরা পড়বেন ফাঁপড়ে। ধার্মিক উদ্যোক্তারা চাঁদার বিল হাতে নিয়ে দাঁড়াবে। জনগণ এই দুর্মূল্যের বাজারে কতজনকে খুশি করবে! চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বা পরিমাণ কম হলে আর এক ধরনের বেলেল্লেপনা শুরু হয়ে যায়। কোন কোন সময় ওদের ঐ বেলেল্লেপনার শিকার হতে হয় জীবন দিয়ে। সুতরাং বারোয়ারি পুজো অনেক স্থানে বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং নতুন করে অনুমতিও না দেওয়া উচিত।

দুর্গাপুজোয় নতুন পোশাক পরা হিন্দুদের সনাতন রীতি। কিন্তু ইদানিং মহিলারা (বিবাহিতারাও) যে ধরনের কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরে দেবী দর্শনে যায় (নাকি রোমিও দর্শনে?) তাতে সত্যিই প্যানডেলে বসা বা রকে বসা যুবকদের উত্তেজিত করা হয়। সিনেমার নায়িকাদের অনুকরণে ঐ রকম অশ্লীল পোশাক না পরে কি পুজো দেখা যায় না? এতেও দুর্গাপুজোর পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
বেলডাঙা, মুরশিদাবাদ

দাদা-দিদিরা মানুষের মত ব্যবহার শিখুক

দুর্গাপুজো আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই পুজোর আনন্দে মেতে ওঠে।

কিন্তু এত বড় একটা পুজোয় আগেকার দিনের শুচিতা ও ভক্তি বজায় আছে কি? এখন আড়ম্বরের অভাব নেই, বরঞ্চ বেড়েই চলেছে। মণ্ডপ সজ্জা ও আলোর রোশনাই চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এখন সজ্জাটাই বড়, দেবতার যাই হোক না কেন।

যাই হোক সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু যে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান জগদ্বিখ্যাত সেই পুজোয় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতা কী করে জনসাধারণ সঠিক বলে মেনে নিচ্ছে? মন্দির চত্বরে নেশা-ভাঙ সুরাপান তো চলেই। আর চলে মাইকে হিন্দি গানের গোঙানি। তা ছাড়া আছে রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে-গলিতে ব্যভিচার ও অশ্লীল ব্যবহার। অনেকে বলবেন যৌবনের জোয়ারই এ জন্য দায়ী। কিন্তু মানুষ তো আর পশু নয়। কুপ্রবৃত্তি দমনের বা লাগাম টানার শক্তিও তো মানুষকে দেওয়া হয়েছে। উদ্দামগতিতে না চলে রয়ে-সয়ে চলতে পারলেও তো সমাজের পক্ষে সেটা হবে একটা বড় রকমের লাভ।

পুজো শেষ হল। এল বিজয়া দশমী। সকলের মনই তখন বেদনা-বিধুর। মা চলে যাচ্ছেন, মাকে বিদায় দিতে যাচ্ছি দলে দলে গঙ্গার ঘাটে। তখন যা দেখি তা হল সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার। লরিতে লরিতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে সে যা বিদায়ের দৃশ্য! তাও আমাদের বরদাস্ত করতে হয়।

তাই অনুরোধ দাদা-দিদিরা মানুষের মত ব্যবহার করতে শিখুক।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস
দেশপ্রাণ শাসমল রোড
কলকাতা-৩৩

পথে যে দিন থেকে নেমেছে, দেবীর পুজো আর পুজো নেই

দেবীকে যেদিন থেকে পথে টেনে আনা হয়েছে, সেদিন থেকেই ধর্মের নামে এই বেলেল্লাপনার শুরু। আজ বোধহয় তা ষোলকলায় পূর্ণ।

প্রথমেই বলি চাঁদার কথা। প্রত্যেকেই জানেন যে পুজো এলে সাধারণ গৃহস্থের চাঁদার জুলুমের ভয়ে 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা হয়।

পুজোর কদিন মাইকের কথা আমরা সবাই জানি। দিনের কথা ছেড়ে দিলাম। নিয়ম একটা আছে বটে যে রাত দশটা না সাড়ে দশটার

ভারতবর্ষে বর্তমান যোজনা খাতে লগ্নি হবে এক লক্ষ কোটি টাকা

দেশে পরিকল্পিত ভাবে যত বেশি লগ্নি হবে দেশ ততই এগোবে। উৎপাদন বাড়াতে বাড়াতে একদিন এমন একদিন আসবে যখন আমাদের আর বিদেশ থেকে কোন জিনিস আমদানী করতে হবে না। বরং উদ্বৃত্ত থেকে রফতানি করে উদ্বৃত্ত টাকায় দেশ আরও এগোবার কথা ভাবতে পারবে। এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন টাকার। কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছেন বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে টাকা আনার। এই বৈদেশিক টাকার প্রয়োজন অনেক কম হবে যদি দেশের মানুষ নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কথা ভাবেন। শুধু দশ কোটি মানুষ যদি প্রতি মাসে গড়ে একশ টাকা করে সঞ্চয় করেন তাহলে চার বছরের মধ্যে সরকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা পেয়ে যেতে পারেন।

পিয়ারলেস এই ভাবনা মাথায় নিয়েই প্রত্যেকের দরজায় দরজায় হাজির হচ্ছে। যার ফলে আজ এক কোটি বিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে সঞ্চয় করছেন। এবং সরকার আজ পর্যন্ত পেয়েছেন তিনশ কোটি টাকার ওপর। কিছু দিনের মধ্যেই এই টাকার পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাবে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে সরকারের ঘরে আরও বেশি করে সঞ্চয় করুন। যাতে দেশের এবং আপনার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনে একজন এখন পিয়ারলেসের মাধ্যমে সঞ্চয় করছেন।

ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

(স্থাপিত ১৯৩২)

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

P/BEN/2/83

পরে মাইক বাজান নিষিদ্ধ, কিন্তু থানার বা পুলিশ ফাঁড়ির কাছেও দেখেছি রাত বারটার সময়ও মাইক বাজছে।

পুজোর সময় রাত বারটার পর থেকে বারোয়ারি পুজোর প্যানডেল-গুলিতে বা প্যানডেলের পিছনে যে সব অপকর্ম হয় তা আজ রীতিমত ওপেন সিক্রেট।

হরি দাস
পুরুলিয়া

ধর্মের নামে নোংরামো

আজ শহর-গ্রাম নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই দুর্গোৎসবের মহান ঐতিহ্য ও চিরন্তন মাধুর্য বহুলাংশেই কলঙ্কিত, কলুষিত। পাড়ায় পাড়ায় এক শ্রেণীর দুর্বিনীত যুবকের নেতৃত্বে আয়োজিত 'সর্বজনীন দুর্গাপুজো'কে কেন্দ্র করে চলেছে বল্গাহীন অত্যাচার ও নৈরাজ্য, যার প্রধান শিকার পাড়ার দরিদ্র-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শান্ত ভদ্র মানুষেরা। তাই, চাঁদার জুলুম ও অন্যান্য হয়রানির ফলে সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ দুর্গাপুজোর যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে অশালীন হুল্লোড় ও চূড়ান্ত বেলেল্লাপনা। বলা বাহুল্য, এই সব কদর্যতার আর্থিক রসদ সংগৃহীত হয়ে থাকে পাড়ার সন্ত্রস্ত গরিব মধ্যবিত্ত মানুষকে শোষণের মাধ্যমে। দুর্গাপুজোর ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় সব আচার অনুষ্ঠানই হয়ে গেছে গৌণ এবং তার পরিবর্তে স্থান নিয়েছে লাউডস্পিকারে হুল্লোড় মারকা হিন্দি-বাংলা গানের অবিরাম চিৎকার, যুবা-কিশোরদলের পানোন্মত্ত উল্লাস ও ম্যাকসি মিনি লোকাট পরিহিতা তরুণীদের অর্ধ নগ্ন প্রদর্শনীর উগ্রতা। বিসর্জনের দিনে বর্ণাঢ্য আলোয় সুসজ্জিত শোভাযাত্রার উন্মত্ততা রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া ক্র্যাকার বাজির আওয়াজ ও অশ্লীল নৃত্যভঙ্গি সমন্বিত দৃশ্যপট তো ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর ব্যভিচারের এই সব কার্যকলাপই চলে দুর্গাপুজোর ধর্মীয় উপলক্ষটুকুকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দুর্গাপুজোর মত বাঙালি জীবনের প্রধানতম উৎসবকে কেন্দ্র করে এই সব ঘটনার প্রভাব সামাজিক দিক থেকে সুদূর প্রসারী। সুতরাং, সামাজিক সুস্থতা ও নৈতিকতাবোধের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং দুর্গাপুজোর মহান ঐতিহ্যকে অবিকৃত রাখার জন্য এই সব বেলেল্লাপনাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। একমাত্র সমষ্টিগত উদ্যোগের ফলেই বন্ধ হতে পারে এই অবক্ষয়ী প্রবণতা। প্রয়োজনবোধে, এক্ষেত্রে আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগও কাম্য। মোটকথা, যেভাবেই হোক, বন্ধ করতে হবে এই অশিষ্টাচার এই নোংরামি।

ভব রায়
বর্ধমান

দুর্গাপুজো। প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন কবে হবে?

দুর্গাপুজো বাঙালির অন্যতম প্রধান জাতীয় উৎসব। আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও আবেগের প্রাণবন্ত প্রকাশ এখানে থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু, আনন্দের নাম করে আমরা কী করছি তার দিকে ফিরে তাকাবার সময় এসেছে। জুলুমবাজী করে লোকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, লাউডস্পিকারের অবিরাম গর্জন, পথচলতি মানুষজনের মাঝে বোমা ফাটানো, মেয়েদের প্রতি অশ্লীল দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো কী জাতীয় আনন্দ! আবাল বৃদ্ধবনিতার মধ্যে যখন গান আসে, হাসি আসে, প্রাণ আসে, তখনই হয় উৎসব। কিন্তু এখনকার উৎসবে সেই মেজাজটা কোথায়? সর্বজনীন উৎসব আজ পরিণত হয়েছে এক জঘন্য নাক্কারজনক তাণ্ডবলীলায়। দিগভ্রষ্ট যুব সমাজের উদভ্রান্ত খেয়ালীপনার দাম দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, তাদের আনন্দ, হাসি, গানের স্বাভাবিক প্রকাশকে অবদমিত রেখে। কিন্তু এমনটা হতে দেওয়া উচিত নয়। মাতৃদেবীর আরাধনায় যে ভক্তির ভাবটুকু থাকা প্রয়োজন, তা থাকছে না। তাই প্রবীণ যারা তারা প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারছেন না এই উৎসবে। তারা মেনে নিতে পারছেন না ধর্মের নামে এই অনাচার। নষ্ট হচ্ছে পুজোর সর্বজনীনতা, ভাব বিশুদ্ধতা। তাই সময় এসেছে এ নিয়ে ভাববার। সর্বজনীন আনন্দের এই অভাবকে দূর করতে হবে। কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে, দুর্নীতিদমনে এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের। শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে এই বিশৃঙ্খলার। দুর্গাপুজোকে গড়ে তুলতে হবে বাঙালির জাতীয় আনন্দ, সংহতি ও ঐক্যের এক সার্থক ভাবমূর্তিরূপে।

তমাল কুমার
৪-এ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড
কলকাতা-১৪

পুজো মানেই চাঁদার রুদ্ধশ্বাস আক্রমণ

দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো। পুজোর কটা দিন সমস্ত বাঙালি ভেদাভেদ ভুলে আনন্দে ডুবে যায়। এত বড় জাতীয় উৎসব ভারতে বিরল। কিন্তু বর্তমান ধর্মীয় উৎসবের প্রেক্ষাপট বড় করুণ। পুজো যত এগিয়ে আসে আনন্দের পাশাপাশি চাঁদা নেবার শ্বাসরুদ্ধ আক্রমণের কথা মনে পড়ে যায়। গায়ের জোরে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে কোথাও কোথাও প্রচণ্ড মারধরের খবর আমরা প্রাক-পুজোয় স্বাভাবিকভাবে পড়ে থাকি। একটি ছোট উদাহরণ দিই। এমন এক কেষ্টবিষ্টু গতবছর একজনকে বলছিল – 'এতবড় পুজো করছি চাঁদা দেবেন না মানে? আপনি জানেন এ পাড়ায় কার কত রোজগার আমরা জানি?'

ভদ্রলোক বললেন – 'ভাল কথা। কার কত রোজগার যখন জান, কার কত খরচ সেটা তোমরা জান। আর এতবড় পুজো তোমাদের তো আমি করতে বলিনি।'

উত্তর এল – 'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না। শালা বাপ দেবে।' মত্ত যুবকটির কথা আমার মনে পড়ে। আমি সবাইকে দোষ দিচ্ছিনা। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই ধর্মের নামে আজ এই হচ্ছে অবস্থা। তারপর সুরাপান। হাতে গোনা যায় যে, কটি প্যানডেলে শুদ্ধতা রক্ষা হচ্ছে। চাঁদার একটি বৃহৎ অংশ মদ্যপানে খরচ করা হচ্ছে। তারপর দশমীর দিন সীমাহীন পটকার শব্দ। পটকা না বলে ছোটখাট বোমার শব্দ বলাই ভাল। আধুনিক ডিস্কো যুগ চলছে। সুতরাং পাঠক বুঝতেই পারছেন মায়ের ভাসান মানে মদমত্ত উদ্দাম নৃত্য এবং বোমার শব্দ। এইভাবে একদিন পুজো শেষ হয়। কিন্তু আমরা বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। কিন্তু এই বেলেল্লাপনার প্রশ্ন তুললেই আপনি শুনতে পাবেন 'দাদা পুজো তো বছরে একবার। আনন্দ করব না?'

বিপ্লব সেনগুপ্ত
কাঁচড়াপাড়া

দুর্গা মূর্তির ভঙ্গিও অনেক জায়গায় যৌন আবেদনময়ী হচ্ছে

রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র অশুভ শক্তি রাবণের পরাজয়ের জন্য অকালে পুজো করেছিলেন, দেবীর তুষ্টার্থে। শরৎকালীন এই পুজোই অকালবোধন, শারদোৎসব। বাঙালির ঘরের প্রধান উৎসব। কিন্তু বর্তমানে পুজোতে ধর্মের ভাব ও ভক্তি উঠে গেছে। পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই কর্মহীন অলস মস্তিষ্কের কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায়। সংগে সংগে বাড়ে চাঁদার জুলুম। শান্তিপ্রিয় মানুষ এই ঘটনায় হন দিশেহারা। মানীর মান হয় পর্যুদস্ত। এই সময় রাহাজানিও প্রকট হয়। দুর্গাপুজোর মত বড় পুজো এখন যুবক-যুবতীদের রংগমঞ্চ। স্থান বিশেষে বাড়িচাপা, খুন, ছিনতাই রাহাজানির স্থান হয়ে থাকে এই রংগমঞ্চ।

বিরাটাকার পৌরাণিক ঐতিহাসিক প্যানডেলের আলো ঝলমল, কান ঝালাপালা পরিবেশে দেবী হয়ে ওঠেন গৌণ। দেবী মূর্তিতে খড়কুটো, মাটি, ডাকের সাজ, বিশাল চালি বিস্তারিত প্রসাদ সামগ্রী এখন পুরনো ব্যাপার। ইদানিং দুর্গা মানে ডিসকোরানী মূর্তির স্তন, কোমর, ঠোঁট। ভঙ্গি যেন উগ্র যৌন আবেদনময়ী। এখন দুর্গাপুজো মানে ডিসকো ড্যানসার বাজিয়ে মায়ের সামনে লাফালাফি করা। পাড়াপড়শী দিবারাত্র এই গান শুনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পুজোর কটা দিন ভদ্রঘরের মেয়েদের পথে চলাও দায় হয়ে ওঠে। সবচেয়ে মারাত্মক দেবীর বিসর্জন উৎসব। এই সময় এক শ্রেণীর যুবক মদ খেয়ে মায়ের সামনে অংগভংগি করে লাফালাফি করে। প্রাণহীন দেবীকে সবই সহ্য করতে হয়। এ সমস্ত দৃশ্য পূর্বে শহরে দেখা গেলেও এখন সর্বত্র। 'ধর্মের নামে এই বেলেল্লাপনা' আর কতদিন চলবে?

অমর সাহা
চাঁদপাড়া

পুজোর নামে প্রহসন আর কদ্দিন চলবে?

বারোমাসে তেরো পার্বণের মধ্যে দুর্গাপুজোই বাঙালির শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। আগে অধিকাংশ বনেদি অবস্থাপন্ন বাঙালি পরিবারেই দুর্গাপুজোর প্রচলন ছিল। এর মধ্যে থাকত আন্তরিকতা। বাড়ির মায়েরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে দেবী পুজোয় নিজেদের নিয়োজিত করতেন। কোন কোন বাড়িতে এরই সংগে চলত কুমারী পুজো। তখন অনেক বাড়িতেই পুজো উপলক্ষে নাচ-গানের আসরও বসত। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই আনন্দ শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করত না। কিন্তু এখন আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ও অন্যান্য কারণে বাড়ির পুজোর সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অপর পক্ষে দিনদিন বেড়ে চলেছে সর্বজনীন বা বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা। এখন পুজো মানেই 'অপূর্ব প্যানডেল ও দারুণ আলোকসজ্জা' বোঝায়। অনেক ক্ষেত্রে পুজোর আচার-অনুষ্ঠানও ঠিকমত মানা হয় না। পুজোর পরেই চলে ঘটা করে বিসর্জন দেওয়া নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এর সম্পূর্ণ ধাক্কাটাই কিন্তু সামলাতে হয় এলাকার সাধারণ নাগরিকদের। কোন কোন ক্ষেত্রে দাবিমত চাঁদা দিতে অপারগ হওয়ায় অনেককে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত সহ্য করতে হয়। অনেক পুজো মণ্ডপে পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে মায়ের আগমন ঘটে। প্রতিমা

আবরণ উন্মোচন করতে আসেন কোথাও বা মন্ত্রী, কোথাও বা বড় বড় রাজনৈতিক নেতা। চাঁদার জুলুমের ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেও অনেক ক্ষেত্রেই কোন ফল পাওয়া যায় না। মন্ডপে প্রতিমা আগমনের সংগে সংগেই শুরু হয়ে যায় মাইকের তান্ডব। সকাল থেকে শুরু হয়ে চলে গভীর রাত অবধি। উদ্যোক্তরা একবারও ভেবে দেখেন না আশেপাশের বাড়ির অসুস্থ কোন রুগীর কথা অথবা ছোট ছোট শিশু বা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কথা। পুজোর পুরেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা। ছাত্র ছাত্রীদের প্রশ্ন এই ভাবে কি পড়াশুনা করা যায়? দুর্গাপুজোর আনন্দ আজ নিরানন্দে পরিণত হতে চলেছে। আমার প্রশ্ন পুজোর নামে প্রহসন কি এই ভাবেই চলবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

গৌরাংগ রায় চৌধুরী
কসবা, কলকাতা-৪২

ভেকধারী ধার্মিকদের শাস্তি চাই

দুর্গাপুজো। এই একটি মাত্র শব্দেই এই অনাস্বাদিত আনন্দের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে সমগ্র বাঙালি জাতির মনে। কিন্তু এই পুজোকে কেন্দ্র করে যখন নিয়মের অনিয়ম ঘটে তখন পুজো কি আর পুজো থাকে? স্বাভাবিক কারণেই বিষাদের ঘনঘটা নেমে আসে অনেকের মনে।

পুজোকে ব্যবসার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে কয়েক বছর যাবৎ আমাদের সমাজে তথাকথিত সমাজসেবীরা ধর্মের নামে কী বিচিত্র বেলেল্লাপনা শুরু করেছে ভাবতে অবাক লাগে। ভাবতে অবাক লাগে আমরা কি সত্যি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মনীষীদের বংশজাত?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন – 'ধর্মাচারণ করবে মনে, বনে আর কোণে।' কেউ কি ঠাকুরের এসব কথা মেনে চলেন? আমরা দেখি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাহ্যিক আড়ম্বরে মেতে ওঠে অনেকেই। পথে-ঘাটে, এখানে-ওখানে, মন্দির-মণ্ডপে বেলেল্লাপনা শুরু করে। জোর করে পুজোর নামে চাঁদা আদায় করা কোন নতুন খবর নয়। অথচ এসবই আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে ধর্মের নামে।

কেবল শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান করলেই ধর্মপালন করা হয় না।

কে শোনে সৎ বাক্য, বইয়ের লেখন – ওসব সেকেলে। এসব থোড়াই কেয়ার করে নিত্য নতুন গজিয়ে ওঠা সর্বজনীন পুজো কমিটির গণ্যমান্য কর্তাব্যক্তিরা যখন নির্দিষ্ট অংকের দুর্গাপুজোর বিলটি ধরিয়ে দেয় কোন অফিস কেরানিকে কিংবা ছাপোষা কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে তখন তাদের চোখে সরষের ফুল দেখা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। আর ঘরে যদি যুবতী মেয়ে থাকে তবে এইসব তথাকথিত ভদ্রবেশধারী রোমিওদের খপ্পরে পড়তেই হবে তাকে। ভাবুন ব্যাপারখানা। এক দিকে বিষাদের ছায়া, অন্যদিকে পুজোর নামে বেলেল্লাপনায় মত্ত বেশ কিছু মানুষ। পুজোর কদিন মদের ফোয়ারা উঠবে। মেয়েদের উত্যক্ত করবে। গায়ে চড়াবে রঙ-বেরঙের শার্ট।

ধর্মের নামে আমরা আর ভন্ডামি দেখতে চাই না। চাই না পুজোকে কেন্দ্র করে ধর্মের নামে অধর্ম। আজকাল সর্বজনীন পুজো মণ্ডপে এক শ্রেণীর যুবক যে বিকৃত রুচির পরিচয় দিচ্ছে এটা কি সুস্থ মানসিকতা? ধর্মের নামে এসব বেলেল্লাপনা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের নামে অন্যায় করলেও সেটা অন্যায়ই। এর জন্য অবশ্যই শাস্তির প্রয়োজন।

কার্তিক দত্ত
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা

পাঁচ মিনিট

প্রেস কনফারেনসে শ্রীদুর্গা

প্রেস কনফারেনসে এসেছিলেন মা দুর্গা। কনফারেনসটা ডেকেছিলেন সাংবাদিকরাই। শ্রীমতী দুর্গার এবারের জারনিটা নাকি খুব ভাল ছিল না, তাই খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এবার তাঁর আগমন দোলায়। মানস সরোবরের কাছে হঠাৎ দোলা ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ায় তাঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর আহত। তাই মা দুর্গা আগেভাগে সাংবাদিকদের জানিয়ে দিলেন তাঁর ফ্যামিলি মেমবারদের একটির বেশি প্রশ্ন করা চলবে না। খবরটা শুনে সাংবাদিকরা একটু মুষড়ে পড়লেন। একজন সাংবাদিক মিনমিনে গলায় মা দুর্গাকে মিনতি করলেন, প্রত্যেককে অন্তত দুটি করে প্রশ্ন করার অনুমতি দিন।

মা দুর্গা রাজি হলেন না। বললেন – নো নো, ওই একটাই, প্রথম কথা, আমরা সপরিবারে অসুস্থ, আর দ্বিতীয় কথা, আমি এখন সাংবাদিকদের ভাল চোখে দেখি না। কারণ আমরা যা বলি তারা লেখে তার উল্টো। বিদেশের ব্যাপার জানি না, আমি এদেশের ঠাকুর, তাই এদেশের সাংবাদিকদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। আমায় নিয়ে আপনারা প্রায়ই ব্যংগ করেন।

মা দুর্গার কথা শুনে সাংবাদিকরা একবারে চুপসে গেলেন। এতদিন সাংবাদিকরাই ইনটারভিউ এর ব্যাপারে আপারহ্যানড নিত আর ইনটারভিউই-রা প্রশ্নবাণে অভিমন্যুর মত জর্জরিত হত।

যাই হোক শর্ত মেনে নিয়ে একজন জবরদস্ত সাংবাদিক শ্রীদুর্গাকে প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা ম্যাডাম, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যখন নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন চলছে, তখন আপনি দশ হাতে দশটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান কেন?

মা দুর্গা বললেন- ওয়ানডারফুল কোয়েশ্চেন। দেখুন, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই যে নন্-আগ্রেশন প্যাকট বা নন আরমামেনট প্যাকট এসব আই ওয়াশ। ভেতরে ভেতরে সব দেশই ঘোড়েল। কিন্তু ভারতই একমাত্র অহিংসার দেশ। এদেশ মারপিট পছন্দ করে না। তাই এদেশের সব অস্ত্র-শস্ত্রই টিনের। আমার হাতে যে দশটা অস্ত্র দেখছেন এগুলোও টিনের। আমরা যে রাবণযজ্ঞে বিশ্বাসী নই তারই প্রতীক এই টিনের অস্ত্র। এসব শুধু সাজসজ্জার খাতিরে।

একজন সাংবাদিক এবার মা লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করলেন–পশ্চিম বংগের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার কারণ কী?

মা লক্ষ্মী চুল, শাড়ি ঠিক করে ঝাঁপি সামলে বললেন–এ প্রশ্ন আমাকে কেন? আমি কি ফিনানস মিনিসটার? আপনারা আজেবাজে খাতে টাকা খরচ করবেন, কথায় কথায় ভরতুকি দেবেন, কথায় কথায় লোকের মাইনে বাড়াবেন, এসব কী হচ্ছে? গত দশ বছর আগে স্কুল মাসটারদের যা মাইনে ছিল এখন তার তিন গুণ .....

মা লক্ষ্মীর কথা শেষ হবার আগেই মা সরস্বতী ফোঁস করে উঠলেন, -সবাইকে ছেড়ে অমনি স্কুল মাসটারদের ধরা হল কেন? আমাকে অপদস্থ করার জন্যেই কি? লক্ষ্মী বললেন– মোটেই না, যা বাস্তব তাই বলছি। মা সরস্বতী বীণাটা পাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এরপর তুমুল তর্কাতর্কি এবং চেঁচামেচির মধ্যে সাংবাদিকরা দু চারটি কথা উদ্ধার করতে পারলেন। যেমন সরস্বতী বলছেন- শিক্ষাখাতে খরচা হলেই তোর পিত্তি জ্বলে যায় আমি জানি রে লক্ষ্মী। তখন তোর ঝাঁপিতে টান পড়ে। -আর কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে দুনিয়ার গুষ্টি সুদ্ধু লোককে ডেকে খেলা দেখালি, ভালমন্দ গেলালি, মদের ফোয়ারা ছোটালি, তার বেলা? যত রাগ শিক্ষাখাতে টাকা খরচে। এবার লক্ষ্মীর গলা শোনা গেল রাখ রাখ তোর শিক্ষা। ঐ তো সব টুকে পাশ করা গ্র্যাজুয়েট, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, ঐ তো সব ছাত্ররা রাতদিন বোমবাজি করছে মাসটার ঠ্যাঙাচ্ছে। এক ফোঁটা 'রেডিয়াম' যারা যত্ন করে রাখতে পারে না, চলে যায় কালোয়ারের দোকানে, তাদের মুখে শিক্ষার বড়াই মানায় না।

কালোয়ার কথাটা কানে যেতেই গণেশ শুঁড় উঁচিয়ে ছুটে এলো, বললে–আমার ডিপারটমেনট নিয়ে কোন কথা বলবে না। সরস্বতী বললেন- হ্যাঁ হ্যাঁ তোদের ভাই রোজের তো যত ব্ল্যাক মানি আর জাল জুয়াচুরির ব্যাপার। আর আমার বাহারা কে কোথায় এক আধটা কোয়েশ্চেন টুকে লিখলো কি একটু রেডিয়াম চুরি গেল সেগুলিই এখন বড় করে দেখানো হচ্ছে . . .।

সাংবাদিকরা বেজায় ঘাবড়ে গেল। কার্তিক ছুটে এসে জোড় হাতে বললে অনিবার্য কারণবশত আমাদের প্রেস কনফারেনস এখানেই শেষ করা হল।

সাংবাদিকরা 'কনফারেনস হল' থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন মা দুর্গার সিকিউরিটি সিংহ এবং মহিষাসুর মাঠের ওপর বসে আছে। মহিষাসুরের একটা হাত সিংহের কাঁধে। সাংবাদিকরা এ দৃশ্যে অবাক। স্বর্গের একজন মাফিয়া নেতার সংগে একজন সিকিউরিটি অফিসারের এরকম দহরম মহরম কী করে হল?

এক সাংবাদিক সোজাসুজি মহিষাসুরকে প্রশ্ন করলেন আমরা জন্ম থেকে দেখে আসছি সিংহ আপনার কনুই কামড়ে ধরেছেন আর উরুতে থাবা বসিয়েছেন, কিন্তু এখন দেখছি মিঃ সিংহ এবং আপনি একেবারে হরিহর আত্মা। এটা কী করে সম্ভব হল?

আকর্ণ হেসে মহিষাসুর বললেন ব্যাপারটা আপনাদের মর্তে অসম্ভব হলেও আমাদের স্বর্গে সম্ভব। অর্থাৎ এটা এখন একটি স্বর্গীয় ব্যাপার। তবে এটা লিখবেন না, অফ দি রেকরড।

সৌরেন মিত্র

প্রাচীনতম সর্বজনীন

বংশী মান্না

কলকাতার প্রাচীনতম সর্বজনীন দুর্গাপুজো কোনটি তা নিয়ে নানা জনের নানা মত। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, বর্তমানে কলকাতার চারটি সর্বজনীন পুজোর ব্যবস্থাপকগণ প্রত্যেকেই নিজেদের পুজোকে প্রাচীনতম বলে দাবি করেছেন। সেগুলি হল, বলরাম বসু ঘাট স্ট্রিটের ভবানীপুর ধর্মোৎসাহিনী সভা (বাংলা সন ১৩১৭ সালে শুরু), পটলডাঙা শ্রীশ্রী শারদীয়া মহাপুজো (শুরু ১৩২০) বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব (শুরু ১৩২৫) এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতি সার্বজনীন দুর্গোৎসব (শুরু ১৩৩২)।

'কলকাতার চালচিত্র' বইতে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন যে ইংরাজি ১৮৬০ সালের (বাংলা ১২৬৭ সাল) পর কলকাতা শহরে বারোয়ারি পুজোর প্রচলন হয়। তখন সাধারণত জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শীতলা ইত্যাদি দেবীর বারোয়ারি পুজো করা হত।

বারোজন ইয়ার বন্ধু মিলিত হয়ে বারো ইয়ারি পুজো করার এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল কলকাতার বাইরে, সেখান থেকে এই প্রথা কলকাতায় আসে এবং ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকে। কারণ তখন কলকাতায় হুজুগে মানুষ ছিল প্রচুর। পরবর্তী কালে এ ধরনের পুজো শুধু বারোজন ইয়ারের মধ্যে সীমিত রইল না, জনসাধারণের মধ্যে থেকে বহু ব্যক্তিই এই হুজুগে মেতে উঠলেন। তখন ফারসি থেকে আগত শব্দ 'ইয়ার' শব্দটিও নানা কারণে পরিত্যক্ত হল। তার বদলে তৎসম শব্দ 'সর্বজনীন' কথাটি বারোয়ারি পুজোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে লাগল। সিমলা ব্যায়াম সমিতির কর্মকর্তাদের দাবি যে তাঁদের পুজোর প্রবর্তক সিমলা পাড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী অতীন্দ্রনাথ বসুই 'মাতৃভূমির শৃংখল মোচনে যুবকদের প্রাণে অনুপ্রেরণা ও সাহস দানের উদ্দেশ্যে' প্রথম এদেশে সর্বজনীন মাতৃপুজোর প্রচলন করেন।

বলরাম বসু ঘাট স্ট্রিটের এবং পটলডাঙার দুর্গাপুজোগুলি কার্যত সর্বজনীন এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতির আগে প্রচলিত হলেও সেগুলির নামে 'সর্বজনীন' শব্দটি কোনদিনই ব্যবহৃত হয়নি আজও হয় না। আবার বাগবাজার সর্বজনীনের উদ্ভব সিমলা ব্যায়াম সমিতির আগে ১৩২৫ সালে হলেও, ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সিমলার দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার পরের বছর পর্যন্ত এর প্রাচীনতম নাম ছিল 'নেবুবাগান বারোয়ারি', ১৩৩৪ সালে সে নাম বদল করে বাগবাজার সর্বজনীন করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বারোয়ারি ও সর্বজনীন শব্দ দুটি সমার্থক হলেও সিমলা ব্যায়াম সমিতিই সবচেয়ে আগে নিজেদের পুজোকে সর্বজনীন বলে আখ্যাত করে। কিন্তু শুধু নামে কী আসে যায়!

বলরাম বসু ঘাট স্ট্রিটে আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে যে সর্বজনীন দুর্গাপুজো প্রচলিত হয়েছিল বারোয়ারি দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে সেটিই প্রাচীনতম। তখন আদি গংগার খাল দিয়ে ব্যবসার পণ্য ও যাত্রী দুই ই প্রচুর যাতায়াত করত। শহর কলকাতায় ব্যবসায়িক পণ্য নামান ওঠানর প্রধান ঘাট ছিল বলরাম বসুর ঘাট। সে ঘাটের আশে পাশে বসবাসকারী মানুষরা একত্র হয়ে বাংলা ১৩১৭ সালে (ইংরাজি ১৯১০ খৃস্টাব্দে) সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করলেন যে সভার প্রধান কাজ ঘাটের খোলামেলা জায়গাটিতে প্রতিবছর দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পুজো এবং মাঝে মাঝে কীর্তন, পাঠ, কথকতা, পাঁচালী গান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

পরে ধর্মোৎসাহিনী সভাকে সরকারি রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মকর্তা বাছাই করার ব্যবস্থা ও তার স্থায়ী অফিস হয়েছে তেত্রিশ বলরাম বসু ঘাট স্ট্রিটের রায় বাহাদুর বাড়ি। বরাবরের পুজোর জায়গা ঘাটের উত্তরপ্রান্তে এখন ৪০ ফুট বাই ৩৫ ফুট আকারের প্রশস্ত পাকা পুজো মণ্ডপ, [illegible] করা থামের ওপরে ২০ ফুট উঁচুতে তার ছাদ। পূর্ব দিকে হরিশ চ্যাটারজি স্ট্রিটের ওপর পাশাপাশি একজোড়া শিবমন্দির, দক্ষিণে জগন্নাথ মন্দির, পশ্চিমে মহাষষ্ঠীর বিল্ববরণের জন্য একটি প্রাচীন শীর্ণ বেল গাছ পার হয়ে ধাপে ধাপে আদি গংগার বুকে নেমে গেছে ঘাটের বিয়াল্লিশটি সিঁড়ি, যার মধ্যে এখন গোটা বার সিঁড়ি জেগে আছে বাকি সবগুলো গংগার পলিতে চাপা পড়ে গেছে। চুয়াত্তর বছর ধরে প্রতিবছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত এ পুজোর বৈশিষ্ট্য অনাড়ম্বর শুদ্ধাচার।

এখানে আজও জনসাধারণ যে যেমন পারেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুজোর চাঁদা দেন। গত বছর সুদূর বরোদা থেকে এক অমলবাবু যেমন পাঁচ টাকা পাঠিয়েছিলেন, তেমনি বেদাবাটীর বিউটি, আসানসোলের প্রীতি, মনোহরপুকুরের [illegible] ইত্যাদি অনেকে এক টাকা করে চাঁদা দিয়েছেন। সভার আটেশ জন আজীবন সদস্য চাঁদা এককালীন ২৫১ টাকা) ও ১২০ জন সাধারণ সদস্যের (চাঁদা বার্ষিক ৬ টাকা চাঁদাই আয়ের প্রধান উৎস। কালী ঘাট মন্দিরের বাঙালি সানাইবাদক হীরালাল ও তার চারজন সংগী এবং পাঁচখানা ঢাক ও কাঁসি নিয়ে এই বনেদী অনাড়ম্বর পুজোর অনুষ্ঠান চলে। একই মৃৎশিল্পী বছরের পর বছর একচালা প্রতিমা গড়ে থাকেন আজও মহাষ্টমীর দিন পুজো প্রাংগণে সর্বসাধারণকে মায়ের ভোগ-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় এখানে ভক্তরা প্রণামী হিসেবে মাকে প্রচুর শাড়ি দেন। পুরোহিত ও চারজন কাজের লোকের মধ্যে কিছু শাড়ি দেওয়ার পরও গত বছর প্রায় দুশো শাড়ি বেশি ছিল। সেগুলি বরাবরের মত সর্বসমক্ষে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে এভাবে প্রণামী পাওয়া মোট প্রায় আট হাজার টাকার সোনা এবং রুপোর গহনা বিক্রি করে ব্যবস্থাপকরা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত করেছেন। এ ছাড়া পুজোর বাসন-কোসনও আছে খাতা দফা। প্রণামী পাওয়া চাল ডাল থেকে আরম্ভ করে শাড়ি, গহনা মায় চাঁদা পর্যন্ত প্রতিটির দাতা ও পরিমাণের তালিকা পরের বছরের স্মারক পুস্তিকায় ছাপা হয়। এমন সুন্দর নিখুঁত পরিচালন ব্যবস্থার ফলে বছরের পর বছর এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে পুজো সম্পন্ন হয়ে এসেছে। আর আগামী বছর পুজো হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালনের জন্যে সগর্বে অপেক্ষা করছেন এই সর্বজনীনের ব্যবস্থাপকরা। □

ধর্মোৎসাহিনী সভার প্রতিমা

সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমা

ঐতিহ্যময় বাগবাজার সর্বজনীন

বংশী মান্না

কলকাতা শহরের প্রাচীনতম বারোয়ারি দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বাগবাজার সার্বজনীনের পুজো। এই সর্বজনীনের উদ্ভবের পিছনে আছে একটি সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত প্রতিবাদের ঘটনা। আজ থেকে সত্তর বছর আগেকার কথা। সর্বজনীন দুর্গাপুজো কী বস্তু অধিকাংশ লোকেই তা জানতেন না। কয়েকজন রাজা, জমিদার ও ধনীর বাড়িতেই তখন দুর্গাপুজো হত। সে উপলক্ষে নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, উৎসব-অনুষ্ঠান সবই হত, কিন্তু তাতে একমাত্র নিমন্ত্রিত ধনী ব্যক্তিরাই আদর-আপ্যায়ন পেতেন, জনসাধারণ সেখানে ছিলেন অবাঞ্ছিত দর্শক। সেই সময়ে নেবুবাগানের কয়েকজন যুবক মহাষ্টমীর দিনে একজন ধনীর বাড়িতে অঞ্জলি দিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে তাঁরা একটি বারোয়ারি দুর্গাপুজো করা স্থির করেন যেখানে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ থাকবে অবারিত। সেই সিদ্ধান্ত মত বাংলা ১৩২৫ সালের (ইংরাজি ১৯১৯) সেই যুবকদল ৫৫ বাগবাজার স্ট্রিটের মাঠে 'নেবুবাগান বারোয়ারী' নামে এক দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন। পর পর পাঁচ বছর ধরে সেই একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে পুজো বিখ্যাত হয়ে উঠল। এদিকে সেই পুজোস্থলের মাঠটির মালিক সেখানে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলেন। তখন ষষ্ঠ বছরে পুজোস্থল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পশুপতি বোস লেনের মোড়ে। পরের বছর কাঁটাপুকুর লেনের মাঠে, তার পরের বছর কালীবাড়ির মাঠে এবং নবম বছরে কুলতলার মাঠে এসে এ বারোয়ারির নাম বদল করে করা হল 'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব'। সেই সংগে নিয়মমাফিক নির্বাচন করে কর্মকর্তাদের বেছে নেওয়ার রীতি প্রচলিত হল এবং বাগবাজার এলাকার সর্বস্তরের মানুষ এই দুর্গোৎসবকে নিজেদের পুজো বলে গ্রহণ করল।

১৩৩৬ সালে পুজোর সংগে যোগ করা হল একটি স্বাস্থ্য প্রদর্শনী। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ শহর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখতে নাগরিকদের মধ্যে প্রচার ও জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করল। তখন থেকে পুরসভা নিয়মিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং এক সময় পুজো কমিটিকে এ জন্যে বছরে ১,২০০ টাকা করে অর্থ সাহায্যও করেছে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরের বছর স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর সংগে যোগ করা হল শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক প্রদর্শনী এবং ১৩৩৭ সালে এর নাম আবার বদল করে বর্তমানের নাম 'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী' করা হল।

ইতিমধ্যে পুজোর জায়গা আবার বদল করে বুড়োশিবতলার মাঠে সরিয়ে আনা হয়েছে এবং পুজো অনুষ্ঠানের সংগে ১৩৩৫ সালে যোগ করা হয়েছে বীরাষ্টমী উদ্‌যাপন, ব্যায়াম প্রদর্শন, লাঠি ও ছোরা খেলা এবং সমবেত কুচকাওয়াজ। ছেলে-মেয়েদের ব্রতচারী পরে এর সংগে যোগ করা হয়।

১৩৩৭ সালে পুজোস্থল শেষবারের মত বদল করে বর্তমানের পুরসভার মেটাল ইয়ারড মাঠে আনা হল এবং এর স্থায়ী অফিস হল পুজোস্থলের পাশের হরনাথ হাই-স্কুলে। ইতিমধ্যে এই সর্বজনীন শহরের আকর্ষণীয়তম উৎসবের রূপ নিয়েছে। ঐ বছরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন এবং সেই বছর থেকে শুরু হল নিখিল বংগ বীরাষ্টমী উৎসব পালনের রীতি। এই উপলক্ষে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য, ধর্ম ও স্বদেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হত, তেমনি প্রতিদিন এক হাজার করে দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থাও হত।

ক্রমে বাগবাজার সার্বজনীন আরও বড় এবং সংগঠিত রূপ নিল। অভিজ্ঞ তরুণদের সুষ্ঠু পরিচালনার ফলে চারদিনের দুর্গোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠানের মেয়াদ বাড়িয়ে এগার দিন এবং পরে ১৩৭৫ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময় সেই সময়কে আরও বাড়িয়ে পনের দিন স্থায়ী করা হয়।

এই বারোয়ারি পুজোয় বিভিন্ন সময়ে বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম যুগের সংগঠক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি এর প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৩৪৫ সালে (১৯৩৮-৩৯) পুজো কমিটির সভাপতি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এ অঞ্চলের অধিবাসী সাংবাদিক মোহিত মৈত্র একসময় এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন। বিখ্যাত নট জহর গাংগুলিও এর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তিনি বহু বছর প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকতেন। চারণকবি মুকুন্দ দাস এই দুর্গোৎসবের সময় এখানে এসে থাকতেন ও দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান পরিবেশন করতেন, ইংরেজ সরকার একবার তাঁকে এখান থেকেই গ্রেপ্তার করেছিল। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন এই দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। বাগবাজার পল্লীর অধিবাসী অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকার কর্ণধার শিশিরকুমার ঘোষ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও অশোককুমার সরকার সকলেই

প্রত্যক্ষভাবে কোন না কোন সময় এই দুর্গোৎসবের সংগে জড়িত ছিলেন। তুষারকান্তি ঘোষ ও প্রফুল্লকান্তি ঘোষ বহুবার দুর্গোৎসবের নানা কমিটির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নেবুবাগান পল্লীর ভূতনাথ মুখারজি মাত্র দশজন বন্ধুকে সংগে নিয়ে ১৩২৬ সালে যে ছোট্ট বারোয়ারি দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন, সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর ধরে সেই দুর্গোৎসব একটানা সুদিনের মুখই যে দেখে এসেছে তা কিন্তু নয়। প্রথম যুগের পরিচালক নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল (বাগবাজারের দাদাঠাকুর) যে অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগঠনের দায়দায়িত্ব বহন করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আর্থিক দায়। তাঁর অনুপস্থিতিতে এক বছর পরিচালকগণ জনসাধারণের কাছে এক পয়সা দু'পয়সা করে ভিক্ষে করে নিরঞ্জন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, অর্থাভাবে সেবার পুরোহিতের দক্ষিণাও দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই প্রথম যুগে সাধারণ মানুষের সর্বজনীন পুজো সম্বন্ধে ধারণা ছিল না। আর সমস্যা ছিল যে কোন পুরোহিত সর্বজনীন পূজা করতে রাজি হতেন না। পুজোর এগার বছরের মাথায় সেবার কলকাতা বা আশেপাশের কোন পুরোহিতই এই সর্বজনীন পুজোর পুরোহিত হতে রাজি হলেন না। শেষে দাদাঠাকুরের বিশেষ চেষ্টায় বাগবাজার স্ট্রিটের দীননাথ ভট্টাচার্য পুরোহিত হতে সম্মত হন। এর জন্য পরে তাঁকে অন্যান্য পুরোহিতদের হাতে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

প্রথম থেকে এখানকার প্রদর্শনীর চালাঘর তৈরি করা হত বাঁশ ও হোগলার সাহায্যে। বাংলা ১৩৪৭ সালে এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের ফলে সম্পূর্ণ প্রদর্শনীটি ও মন্ডপের একাংশ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু প্রতিমার কোন ক্ষতি হয়নি। সেই থেকে চালাঘর তৈরিতে টিনের শিট ব্যবহৃত হত, আজকাল ত্রিপলও ব্যবহার করা হচ্ছে। অগ্নিকান্ডের মাত্র দু'বছর পরে ১৩৪৯ সালে (ইংরেজি ১৯৪২ খৃস্টাব্দে) অষ্টমী পুজোর দিন এক প্রচন্ড সাইক্লোন এই সর্বজনীনের প্রদর্শনী ও মন্ডপ তছনছ করে দেয়। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে শহরে হিন্দু-মুসলমান দাংগার জন্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় এই সর্বজনীনের উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানগুলি করা সম্ভব হয়নি। আর এই দাংগার কারণে পরের বছর ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে পুজো করাই সম্ভব হয়নি, সে বছর পুজো বন্ধ ছিল।

সুযোগ্য সংগঠকদের উৎসাহে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতার পর এক বছর বন্ধ থেকে পুজো আবার চালু হল। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল পুরসভার অংশগ্রহণ ও নিয়মিত বার্ষিক ১,২০০ টাকার অর্থ সাহায্য। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে এই সর্বজনীনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী, বীরাষ্টমী ও বস্ত্র বিতরণের সংগে স্থানীয় কুড়িটি স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী মোট একশ ষোল জন ছাত্র-ছাত্রীকে নানারকম পুরস্কার দেওয়া হয়। তা ছাড়া মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত প্রতিদিনই মণ্ডপে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছিল এবং এই উপলক্ষে প্রথম বিশেষ স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশ করেন জয়ন্তী কমিটির সম্পাদক আকাশবাণীর সুনীল গংগোপাধ্যায়। আবার এই উৎসবকে উপলক্ষ করে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছিল। বাগবাজারেরই দুই পাড়ার অধিবাসীদের মধ্যে শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় অশান্তি হতে পারে আশংকা করে দশমীর দিন শোভাযাত্রা ছাড়াই তড়িঘড়ি করে পুজোর ঘট গংগায় বিসর্জন দেওয়া হয়, ওদিকে প্রতিমা মন্ডপেই থেকে যায়। পরের দিন ঐ দুই পাড়ার মাতব্বররা মিটমাট করে নেন এবং শোভাযাত্রা করে প্রতিমাটি বিসর্জন দেওয়া হয়।

এমনি নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব পঁয়ষট্টি বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে আজ এটি বিখ্যাত তা হল পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ পুজোর পরিবেশ, বিশাল সুপরিসর মন্ডপ ও প্রদর্শনী, সুশৃংখল অনুষ্ঠান পরিচালন ব্যবস্থা এবং বাংলা পট গড়নের সুন্দর প্রতিমা ও তার চমৎকার ডাকের সাজ। প্রতিমার শিল্পী জিতেন পাল এখন যে বাংলা পট গড়নের প্রতিমা করে থাকেন বরাবরই কিন্তু এই গড়নের প্রতিমা হত না। আগে এখনকার মতই একচালা প্রতিমা হত তবে গড়ন ছিল বাস্তবধর্মী। কুমারটুলির ভাষায় আরটের ঠাকুর। শিল্পী নন্দলাল বসুর প্রভাবে বাংলার সনাতন পট শিল্পের ধারায় বাগবাজারের প্রতিমার বর্তমানের গঠনভঙ্গিটি নেওয়া হয়েছে। এখন সৌম্য মহান এই মাতৃমূর্তি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক পরম আকর্ষণীয় শিল্পকীর্তি। □

আলোকচিত্র : লেখক

আন্দামানে দুর্গাপুজো । আলোকচিত্র : সত্যজিৎ দাস

বাংলার বাইরে দুর্গোৎসব

আন্দামানে দুর্গাপুজোয় অবাঙালিদেরই উৎসাহ বেশি

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মূল ভূখণ্ড থেকে জলপথে প্রায় ১২৫৫ কিলোমিটার। এখানকার অধিবাসীদের মূল ভাষা বলতে কিছু নেই। সব প্রাদেশিক ভাষাই এখানে প্রচলিত, তবে বাঙালির সংখ্যা বেশি হওয়ায় বাংলা ভাষার চলটাই এখানে বেশি। আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার। বাঙালিদের প্রধান সংস্থা হল 'অতুল স্মৃতি সমিতি'। এখানেই আন্দামানের সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজো হয়।

পোর্ট ব্লেয়ারে প্রায় দশটার মত পুজো হয়। পোর্ট ব্লেয়ার ছাড়াও আন্দামানের অন্য দ্বীপে যেমন ডিগলিপুর, লিটিল আন্দামান, রঙ্গত, কামরোটায় পুজো হয়। এখানকার মূর্তি সাধারণত বড় মাটির তৈরি। সাজসজ্জা আধুনিক কালের হলেও কিছু পৌরাণিক স্পর্শ রয়ে গেছে। অন্যান্য জায়গার মতই মাইকে হিন্দি চলচ্চিত্রের গান আর ঢাকের ড্যাম কুড় কুড় বাজনা একই সঙ্গে শোনা যায়।

পোর্ট ব্লেয়ারের দুর্গাপুজো শুধু বাঙালিদেরই নয়, সমস্ত আন্দামান নিকোবরবাসীদের বললেও ভুল হবে না। দুর্গাপুজোর মহাঅষ্টমীর দিনে সমস্ত ধরনের, সমস্ত জাতের মানুষ একই সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করে।

পুজো দেখার সুবিধার জন্য প্রচুর বাস, ট্যাক্সি রয়েছে। ভিড নেই বললেই চলে। রাস্তায় লোক জনের ভিড় খুব কম। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে যাতায়াতের জন্য রয়েছে ছোট ছোট নৌকো।

অন্যান্য সমস্ত পুজো থেকে 'অতুল স্মৃতি সমিতি'র পুজো একটু আলাদা ধরনের। পোর্ট ব্লেয়ারের বাঙালিদের কেন্দ্রস্থল এই অতুল স্মৃতি সমিতি। পুজোর আগে থেকে প্রামের ছেলেরা তৎপর হয়ে কাজে লেগে যায়। পুজোর দুই তিন দিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় নাটক ও যাত্রার প্রতিযোগিতা।

আর একটা আশ্চর্যের বিষয় এখানকার বেশির ভাগ পুজোর উদ্যোক্তারাই কিন্তু অবাঙালি।

সরোজ কুমার পানডে
পোরট-ব্লেয়ার, আন্দামান

নাগাল্যানডের দুর্গাপুজো

নাগাল্যানডের রাজধানী কোহিমাতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালি, সরকারি, আধা সরকারি কর্মচারী, প্রত্যেকেরই মিলন স্থল হচ্ছে এখানকার দুর্গাবাড়ি।

কোহিমাতে প্রথম দুর্গাপুজো হয় ১৯৬৩ সালে। তখন পুজোর জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না। ১৯৭৪ এ শ্রী জে বি জাসোকির সহায়তায় কোহিমা পি ডবলিউ ডি (P.W.D.) থেকে এক খণ্ড সরকারি জমি পুজো মণ্ডপের জন্য দেওয়া হয়। এমনিভাবে দুর্গাপুজো, অন্যান্য পুজো ও সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল দুর্গাবাড়ি।

১৯৭৫ সালে সরকার প্রদত্ত জমিটি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ওই বছরই প্রথম দুর্গাবাড়িতে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে প্রত্যেক বছরই এই দুর্গাবাড়িতে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুজো পালন করে আসা হচ্ছে। প্রত্যেক বছর পুজোর দিনগুলো এই পাহাড়ী রাজধানীতে বাঙালি হৃদয় ভক্তির প্লাবনে শান্তির আরাধনায় মগ্ন থাকে। নবমীর দিন যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় তাকে এখানে 'বড়াখানা' বলা হয়। নিমন্ত্রিতরা সেদিন উৎসাহভরে 'বড়াখানা'য় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কোহিমা দুর্গাবাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো ছাড়াও কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজোও নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে।

কোহিমা ছাড়াও নাগাল্যানডের অন্যতম প্রধান শহর হল ডিমাপুর। ডিমাপুর কালীবাড়ি এখানকার বাঙালিদের মিলন ক্ষেত্র।

১৯৫৬ সালে ডিমাপুর কালীবাড়ির জন্য ১০০ ফুট x ১০০ ফুট জমি কেনা হয় ইমফলবাসী দ্বিজমনি সিং শর্মার কাছ থেকে মাত্র তেরশ টাকা দিয়ে। এরপর থেকে সেই জমির ওপরই প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়িতে প্রত্যেক বছরই দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে আসছে। আজ এই শহরে কম করে প্রায় ৪০টার মত দুর্গাপুজো প্রত্যেক বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

নাগাল্যানডের সাতটি জেলা। কোহিমা, ফেক, মককচং, তুয়েনসাং, জুনবটো, ওখা ও মণ। আজকাল প্রত্যেক জেলা সদরেই দুর্গাপুজো হচ্ছে। কিপরে, ডিমাপুরের মত মহকুমা শহরগুলিতে তো বটেই ছোট ছোট অন্যান্য শহরগুলিতেও দুর্গাপুজো হচ্ছে।

দীনেশ লাল রায়
শিলচর, আসাম

গরবিনী গোরবির দুর্গোৎসব

মধ্যপ্রদেশে গোরবি এক অখ্যাত গ্রাম। বিন্ধ্য পর্বতের শাখা প্রশাখায় ঘেরা শান্ত পরিবেশ। কোল ইন ডিয়ার ম্যাপে গোরবি একটুখানি জায়গা পেয়েছে মাত্র। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে এখানে কয়লা তোলা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। তাই শ্রমিকের প্রয়োজন খুবই সীমিত। স্বল্প সংখ্যক অফিসার সামান্য কিছু কর্মচারী আর শ্রমিক নিয়ে প্রায় এক বর্গ মাইল মতন জায়গায় গড়ে উঠেছে গোরবির কলোনি। এদের প্রয়োজন মেটাতে কিছু ব্যবসায়ী আর খনির কাজে এখানে প্রায় পনের কুড়িটি বাঙালি পরিবার বাসা বেঁধেছে।

এই কয়েক ঘর বাঙালিদের উৎসাহেই গোরবিতে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

কিন্তু প্রান্তর-বর্জিত এই দেশে পুজোর আয়োজন করা খুব সহজ নয়। এখানে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। সামান্য জিনিসের জন্য ছুটতে হয় ২০০ কিলোমিটার দূরে।

এখানে আসাও যেন এক দক্ষযজ্ঞ। কলকাতা থেকে বার দুই ট্রেন বদল করে শাখা লাইনের রেল স্টেশনে আসতে হয়। কোন রেলের কুলি আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে না। ভাগ্যবানের বোঝা নাকি ভগবানে বয়। তাই আপনাকে ভগবানের অবতার হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। স্টেশন চত্বর পার হলে মিলবে না একটা গরুর গাড়িও। চরণ যুগলই একমাত্র ভরসা।

তবুও মহা সমারোহে এখানে দুর্গাপুজো হয়। একজন বাঙালি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন। গত বছরে তুলো দিয়ে নতুন ধরনের দুর্গা প্রতিমা গড়া হয়েছিল। অকুণ্ঠ প্রশংসা হয়েছিল প্রতিমার। নতুন করে উৎসবে জোয়ার এসেছিল। পুজো মণ্ডপ সাজাবার ভার পুরুষদের। মণ্ডপ সজ্জা গৌরবির তুলনায় খুবই উচ্চাঙ্গের। আলোর রোশনাই আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। এখানে লোডশেডিং পাবেন না। কয়লা খনির কাজ এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ না করেও ইচ্ছে মত বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। মহিলারা পুজোর কাজে সানন্দে এগিয়ে আসেন। নৈবেদ্য সাজান থেকে ভোগ রাঁধা সবই তাঁরা করেন। পুজোর নিষ্ঠাবান পুরোহিত ব্রাহ্মণ আসেন বারাণসী-ধাম থেকে। পুজো হয় নিখুঁত শাস্ত্রসম্মতভাবে। ঢাকের বাদ্যে, শঙ্খ-ঘন্টার সুমধুর সংগীত ধ্বনিতে, ধূপধুনোর গন্ধে, পুরোহিতের বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে মধুর পরিবেশে সবার মন এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরে যায়। মাতৃপুজো হয় সার্থক। 'বিল্ব পুষ্পাঞ্জলি' মায়ের চরণে নিবেদন করে বাঙালি যেন নতুন করে মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষা নেয়।

সারা দিনরাত্রি ধরে চলবে প্রতিমা দর্শন। পুজোর কদিন সবাই ভেদাভেদ ভুলে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। এ যেন 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'।

পুজোর কদিন ধরে হবে রাম লীলা। স্টেজ বেঁধে ত্রিপল টাঙিয়ে সবাইকে আহ্বান করা হয় রাম লীলায়। রামলীলায় মহিলা অভিনেত্রীর স্থান নেই। সেই পুরনো ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলে আসছে। ভাবতে অবাক লাগে দেহাতী স্ত্রী-পুরুষ এখনও রাম-সীতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ও প্রণামী দিয়ে দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে।

হৈ-চৈ আর আনন্দের মধ্যে দেখতে দেখতে কেটে যায় পুজোর দিনগুলো। বিজয়া দশমীর দিনে মেয়েদের সিঁদুর খেলা সাঙ্গ হলে কাছাকাছি এক পাহাড়ী নদীতে হয় প্রতিমা বিসর্জন। ঢাকের বোলে বিসর্জনের করুণ সুর ফুটে ওঠে।

জীবানন্দ ঘোষ
৫৬/২ এ গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা-৭০০০১৯

ডিগবয়ে নেপালীরাই দুর্গাপুজো শুরু করেন

তৈলনগরী ডিগবয়। নানা ভাষাভাষীর বাস। কিন্তু পুজোর আনন্দে সমস্ত সম্প্রদায় যেভাবে মেতে ওঠে, একটা সম্মিলিত ক্ষুদ্র ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি যেন আমরা দেখতে পাই।

এখানে বাঙালি সম্প্রদায়ের আধিক্য হেতু দুর্গাপুজোর প্রকোপও খুব বেশি। শহরের তুলনায় পুজোর সংখ্যাটা এত বেশি যে, কেউ কেউ দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে ডিগবয়কে গৌহাটির সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

ডিগবয়ের অধিকাংশ দুর্গাপুজোই প্রধানত বাঙালি সম্প্রদায়ের দ্বারাই পরিচালিত, কিন্তু ডিগবয়ে প্রথম দুর্গাপুজো প্রচলনের মূল হোতা হল নেপালী সম্প্রদায়। ১৯৩৯ সালে ইংরেজরা শিলং থেকে একটি গুরখা রেজিমেনট আনিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সমস্ত গুরখা সৈনারা 'শক্তি দেবী দুর্গা'র আরাধনা করেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। এরাই ১৯৩৯ সালে ডিগবয়ে রিফাইনারি পাড়ায় প্রথম দুর্গাপুজো করেন। এরপর ১৯৪২ সালে গঠিত 'নেপালী ঠাকুরবাড়ি কমিটি' আজও স্থায়ীভাবে পুজোটি চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৪৫ সালে এই কমিটি স্থায়ী মন্দির গড়ে ও ১৯৫৪ সালে স্থায়ীভাবে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া নেপালী সম্প্রদায় 'এগরিমেনট লাইন' অঞ্চলে একটা দুর্গাপুজো করে থাকেন।

সমস্তিপুরে দুর্গাপুজোর পঞ্চাশ বছর

উত্তর বিহারের অন্যতম প্রধান শহর সমস্তিপুর। সমস্তিপুরের বাঙালিদের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর এবার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয়েছে জানুয়ারি মাস থেকে। অন্যান্য বছরের মত এবারেও নির্বাচন পদ্ধতিতে পুজো কমিটি তৈরি হয়েছে। চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে বাঙালীদের কাছ থেকে। চাঁদার হার একটু বাড়ানো হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের পক্ষে অবশ্য একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বাঙালিদের পুজো ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পুজো হয়। রেল-প্রধান এই শহরে রেল কর্মচারীদের আয়োজিত দুটি পুজো হয় – গলফ ফিল্ড রেলওয়ে কলোনি ও ডি এস কলোনিতে। এ ছাড়া আছে দুর্গাস্থানের পুজো। বহুদিন থেকে হয়ে আসছে শাস্ত্রসম্মতভাবে ও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী প্রতিমা তৈরি করা হয়।

দ্বারভাঙা মহারাজার ডেউড়ীর পুজোও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টমী ও নবমীতে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। অজস্র ভক্ত এই বলিদান উপলক্ষে পুজো প্রাঙ্গণে এসে ভিড় করে।

সমস্তিপুরে বাঙালিদের প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজো আরম্ভ হয় ১৯৩৪ সালে। যে বছর বিহারে ঐতিহাসিক ভূমিকম্প হয়। প্রয়াত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির মাঠে এই পুজো হয়েছিল। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বাঙালিদের তৈরি বেংগলি হিন্দু থিয়েটিকাল হলে হয়ে আসছে। সেই সময় পুজোয় প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রায়বাহাদুর গণিবাবু, প্রয়াত উমাপতি রায়, প্রয়াত রামকৃষ্ণ সরকার, এবং আরও অনেকে ছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ওকালতি বা ডাক্তারী সূত্রে সমস্তিপুরে এসেছিলেন এবং পরে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

সমস্তিপুরে সুবর্ণ জয়ন্তী পুজো কমিটির সভাপতি হরিনাথ বসু একমাত্র লোক যিনি প্রথম বছর থেকে আরম্ভ করে এই পঞ্চাশ বছরের পুজোয় উপস্থিত রয়েছেন। সেকালের ও একালের পুজোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তখন পুজোর দিকটাই ছিল প্রধান, আড়ম্বর ছিল কম। ডাকের সাজে প্রতিমা তৈরি হত। দ্বারভাঙা থেকে শিল্পী আসত। এখন নবদ্বীপ বা কুমারটুলি থেকে মৃৎশিল্পীরা আসেন। প্রতিমার ব্যাপারে এখন আবটের প্রাধান্য বেশি।

আগে এখানে স্থানীয় লোকেরাই পুজোর সময় নাটক করতেন। এখনকার মত তখন কলকাতা থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসতেন না। পুরুষেরাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তাঁদের অভিনয়ও এত সুন্দর হত যে কিছু বোঝবার উপায় থাকত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এখন স্থানীয় চারটি নাটকের ক্লাব, অগ্রদূত, নাট্যপরিষদ, এন টি জি, অগ্রদূত গোষ্ঠী পুজোর চারদিন নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। আগে বাঙালির সংখ্যা কম ছিল তাই পাত পেড়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানর বন্দোবস্ত ছিল। এখন এই সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়াতে কয়েক বছর ধরে ভোগ খাওয়ান সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ বছর চেষ্টা করা হচ্ছে ভাল করে ভোগ খাওয়ানর।

এবার পুজোয় সপ্তাহব্যাপী নাট্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। কলকাতার নাট্য সংস্থাগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও আবৃত্তি, গল্প ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হচ্ছে।

নবদ্বীপের শিল্পী গুরুদাস পাল প্রতিমা গড়বেন। কলকাতা থেকে ডেকরেটর আনান হচ্ছে।

সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে এসে সমস্তিপুরের বাঙালিরা এ কথাই স্পষ্ট করে প্রমাণ করলেন ধর্মীয় উৎসব পালন করাই শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর উদ্দেশ্য নয়। এর মধ্যে জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনও যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকে।

শংকর ভট্টাচার্য
কাঁকড়বাগ কলোনি, পাটনা

এরপর ডিগবয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয় ১৯৪১ সালে। এর কয়েক বছরের মধ্যেই দুর্গাবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানেও বর্তমানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত দুর্গামূর্তির পুজো হয়। এ ছাড়া দুর্গাপুজো হয় তেমন অন্যান্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হল ডিগবয় কালীবাড়ি, গৌরাঙ্গ মন্দির, রাধা-গোবিন্দ মন্দির ইত্যাদি। প্রধানত চল্লিশ দশকেই ডিগবয়ে দুর্গা পুজোর ব্যাপকতা দেখা যায় এবং উত্তরোত্তর সেটা আজও বেড়েই চলেছে।

ডিগবয়ে দুটো পুজো সম্পূর্ণ অসমীয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত, একটি খুব পুরনো পুজো 'বাপাপুং বস্তি' ও অপরটি 'নব জ্যোতি'। এ ছাড়া তেল কোমপানির অফিসারদের পরিচালিত পুজো হল 'ফ্রেনডস পুজো কমিটি'। ডিগবয়ে দুটো সাবেকী ঘরোয়া পুজো রয়েছে 'গুপ্ত কুটির' ও 'হরিপদ করের পুজো'। এ ছাড়া অন্যান্য পুরনো পুজোগুলো হল রিফাইনারি পাড়া, স্টেশন পাড়া, মধ্য পাড়া, পুজো ফিলড, নিউ সেটেলমেনট এরিয়া, মুলিয়াবাড়ি বস্তি ইত্যাদি।

পুজো উপলক্ষে এখানে পাড়ায় পাড়ায় নাটক, জলসা ইত্যাদির বেশ ব্যাপকতা দেখা যায়। তবে আগে 'যাত্রা গানেরই' বেশি প্রচার ছিল। এ ব্যাপারে 'নিউ সেটেলমেনট এরিয়া' ছিল সর্বাগ্রে তবে আজকাল বেশির ভাগ পুজো প্যানডেলেই বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। দু একটি জায়গায় বিজয়া সম্মেলনীও খুব আকর্ষণীয় হয়।

রতন বড়ুয়া
ডিগবয়, আসাম

বিলাসপুরের দুর্গাপুজো

মধ্যপ্রদেশের মধ্যে অন্যতম বাঙালি প্রধান শহর হল বিলাসপুর। এখানে ১৯৩৫ সালে বাঙালি সমিতির ব্যবস্থাপনায় প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়। ১৯৪৩ পর্যন্ত সমগ্র বিলাসপুরে এই একটি মাত্র পুজো অনুষ্ঠিত হত। প্রথম পুজো জগমল ব্লকে এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে হিন্দি কন্যাশালার পেছনে এবং ১৯৪৬ সালে সমিতির নিজস্ব ভবনে পুজো শুরু হয়। ১৯৫৫ থেকে সমিতি শিল্প সংস্কৃতির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনী মন্ডপে জলসা, সিনেমা, ভক্তিমূলক গানের আসর, ম্যাজিক ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। বর্তমান বছরের পুজো সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্ত ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক অসিত বরণ হাটি জানালেন এবার দুর্গাপুজোর আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। শহরের বাঙালিরা ১৯৪৯-এ 'মিলন মন্দির' এর মাধ্যমে দুর্গাপুজো শুরু করেন ব্যারিসটার প্রয়াত সুশীল মিত্রের বাড়িতে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পুজো সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ থেকে ৫৫ সাল অবধি রায়বাহাদুর রাঘবেন্দ্র রাও এর বাড়িতে এবং ১৯৫৬ সাল থেকে পুজোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা ভবনে সম্পন্ন হচ্ছে। পুজো উপলক্ষে মিলন মন্দিরের সভ্যরা বাংলা ও হিন্দি নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন। দিলীপ ভট্টাচার্যের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও অনেকের সহযোগিতায় ত্রিভাষায় একটি সাহিত্য পত্রিকা দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাঙালি সমিতি থেকেও অনুরূপ পুজো বার্ষিকী মাঝে মাঝে বের হয়ে থাকে।

১৯৪৪ সালে শুরু হয় বিলাসপুর 'বান্ধব সমিতি'-র দুর্গাপুজো। প্রায় প্রতিবছর মন্ডপ সজ্জার নতুনত্ব দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে ভক্তিমূলক গানের আসর, ধুনুচি নৃত্য প্রতিযোগিতা, ঢাকি বাদ্য প্রতিযোগিতা, যাত্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত আরও একটা পুজো আছে, সেটা হল ডাঃ প্রাণরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের পুজো। দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে চলছে। শুরু করেছিলেন একক প্রচেষ্টায়, এখন আশেপাশের অনেক সজ্জন ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন।

শহরের ওপাশে আরপা নদী ডিঙিয়ে যে অঞ্চল তার নাম সাবকান্তা। সেখানে প্রায় ১০০ ঘর বাঙালি বাস করেন। তাঁরা ১৯৬৮ সালে 'প্রগতি সংঘ'-র মাধ্যমে দুর্গাপুজো শুরু করেন। পুজোর ক'দিন বাঙলা ও হিন্দি নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান, ধুনুচি নৃত্য প্রতিযোগিতা, মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। শিশু ও কিশোররা তাদের উপযোগী অনুষ্ঠানে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

১৯৫৭ সালে তারবাহার কনসট্রাকশন রেল কলোনির বাসিন্দারা শুরু করেন দুর্গাপুজো। গত বছর রজত জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। এবারও আনন্দময়ীর আগমনের আয়োজন ভালভাবে এগিয়ে চলেছে।

১৯৬০ সালে লোকো কলোনির বাসিন্দারা শুরু করেন দুর্গাপুজো।

সিনেমা শো, ধুনুচি নৃত্যের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। বাংলো ইয়ারড (সিগন্যাল অফিসের সামনে) ১৯৮২ সালে শুরু করেন এবং প্রথম বছরেই সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ধুনুচি নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং সিনেমা শোর ব্যবস্থা থাকে।

দুর্গাপুজো মূলত বাঙালিদের পুজো। কিন্তু বিলাসপুরের পুজো আজ আর বাঙালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রায় ৯০টির মত পুজো হচ্ছে একমাত্র শহর ও তার আশে পাশে। এর মধ্যে কিছু পুজোর মন্ডপসজ্জা অত্যন্ত সুন্দর। কাপড়ের কাজ, কাগজের কাজ, লাইটের কাজ দেখবার মত। মশানগঞ্জের সর্বজনীন দুর্গোৎসব, গোলবাজার ও দয়ালবন্ধের পুজোর মন্ডপসজ্জা অত্যন্ত উঁচু মানের। উৎকৃষ্ট মন্ডপসজ্জা, প্রতিমা ইত্যাদি বিষয়ে পুরস্কার দেবার বন্দোবস্তও আছে।

নারায়ণ সেনগুপ্ত
বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ

বিশাখাপত্তনমে বাঙালি সংঘের দুর্গাপুজো

আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে কিছু বাঙালি পশ্চিমবাংলা থেকে প্রায় এক হাজার কি মি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে পাহাড় সমুদ্র দিয়ে ঘেরা এই বিশাখাপত্তনমে আসেন রুজিরোজগারের সন্ধানে। বাঙালির স্বভাবসুলভ ধারাকে বহন করে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বাঙালি সংঘ'। দিনের শেষে সবাই মিলে অবসর বিনোদন ছাড়াও ধীরে ধীরে সংঘে অনুষ্ঠিত হতে থাকল বাঙালির 'বার মাসে তের পার্বণ' অনুষ্ঠান।

আজ থেকে প্রায় ৫২ বছর আগে বাঙালি সংঘ প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। সেই ঐতিহ্য আজও গর্বের সঙ্গে বহন করে চলেছে বাঙালি সংঘ। পুজোর দুমাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্ব। সংঘের সদস্যরা শুরু করে দেন নাটকের মহলা। মনে হয় নাট্যামোদী সদস্যরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে মায়ের আগমন বার্তার জন্য। শিশুশিল্পীদের মধ্যেও পড়ে যায় সাজ সাজ রব। দর্শক পরিপূর্ণ 'টাউন হলে' পুজোর সময় চলে বিচিত্রানুষ্ঠান।

বিশাখাপত্তনমে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় টাউন হলে। বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে বিখ্যাত 'লাইট হাউস'-এর পাশেই এর অবস্থান। প্রতিমার মণ্ডপসজ্জা থেকে শুরু করে রূপসজ্জা সবই করেন বাঙালি সংঘের সদস্যরা।

পুজোর কটা দিন টাউন হল ঢাক, কাঁসরঘন্টা, শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনিতে মুখরিত, পুরোহিত ঠাকুরের মন্ত্রধ্বনি ও ধূপধুনোর গন্ধে আমোদিত—মনে হয় এখানকার অধিবাসীরা হয়ত বাংলাদেশেই রয়েছেন।

পঞ্চমী থেকে শুরু হয় সংঘের নানান অনুষ্ঠান। দুপুরে পংক্তিতে বসে মায়ের ভোগ সহকারে খিচুড়ি খাওয়া এক বিরাট আনন্দানুষ্ঠানের মতই। সেই পংক্তিতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত—অপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চ নিচ, বাঙালি-অবাঙালির কোন ভেদাভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায় নাট্যকুশলীদের মধ্যে। রাত্রি নটায় শুরু হয় নাটক।

এইভাবেই কেটে যায় এখানের বাঙালিদের সারা বছরের সঞ্চিত এই মূল্যবান কটা দিন। তারপর এক সময় এসে যায় বিজয়া দশমী।

বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে গোটা ভাইজাগ শহর পরিক্রমা করে বিখ্যাত 'রামকৃষ্ণ বিচে' প্রতিমা নিরঞ্জন দিয়ে বাঙালি সংঘের সদস্যরা আবার ফিরে আসেন সেই 'টাউন হলে'। শুরু হয় 'বিজয়া সম্মেলনী'। বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানায় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পরিশেষে বাঙালি সংঘের দেওয়া মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সবাই ফিরে যান নিজেদের বাড়ি।

এ বছর বাঙালি সংঘের আনন্দ অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে আছে পঞ্চমীতে শিশুশিল্পীদের নৃত্যনাট্য—'মেঘদূত'। ষষ্ঠীতেও শিশুদের নাটক—'এক ধামা আলু'। নাটক 'সমর্পণ' অনুষ্ঠিত হবে সপ্তমীর রাতে। অষ্টমীর রাতে অভিনীত হবে—'রণদুন্দুভি'। নবমীতে অভিনীত হবে 'শ্রীমান নাবালক।'

নিখিলেশ ভট্টাচার্য
বিশাখাপত্তনম

চন্দ্রপুরায় পুজোর চার দিন চাঁদের হাট বসে

চন্দ্রপুরা আদি পূজা মণ্ডপ, সন্দীপন ঘোষ দস্তিদার

বিহার রাজ্যের গিরিডি জেলার মধ্যে চন্দ্রপুরা অবস্থিত। ডি ভি সি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই ছোট্ট কলোনির নামই চন্দ্রপুরা।

১৯৫৯ সাল থেকে এখানে দুর্গা পুজো পালন করা হচ্ছে। তখন অবশ্য মাত্র একটা পুজোই হত, এখন এই চন্দ্রপুরায় দুর্গাপুজোর সংখ্যা সাত। কলকাতা বা তার আশপাশ থেকে ভাল শিল্পী এনে প্রতিমা তৈরি করান হয় এবং পশ্চিম বাংলার নদীয়া বা বাঁকুড়া জেলা থেকে ঢাক আনা হয়। প্রত্যেক জায়গায় স্থায়ী মন্ডপ আছে, তবুও মন্ডপের ভিতরে এবং বাইরে সুন্দরভাবে সাজান হয়। কিন্তু এখানে সবচেয়ে আনন্দ এবং ধুমধাম হয় এখানকার পুরনো পুজোতে। লোকে এই পুজোকে 'আদি মন্ডপের পুজো' বলেই জানেন। প্রত্যেক বছর এই পুজো প্রাঙ্গণে ছোটখাট মেলা বসে। চন্দ্রপুরার লোকেরা এখানকার অন্য কোন মন্ডপে পুজো দেখুক বা না দেখুক, এই আদি মন্ডপের পুজো তারা দেখবেনই। এ বছর (১৯৮৩ সাল) রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এই 'আদি পুজো কমিটি' একটু বেশি উৎসাহী।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, এই তিনদিন এখানে আরতি, শঙ্খ প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা গান-বাজনা বা জলসার আয়োজন করা হয়।

তিনদিন আনন্দোৎসবের পর দশমীর দিন সকাল থেকেই এখানকার মানুষের মনে বিষাদভাব ফুটে ওঠে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এয়োতীরা মা দুর্গাকে বরণ করেন। তারপর মা দুর্গাকে ট্রাকে তুলে নিয়ে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা বের করেন। রেকরডের গান এবং ঢাকের তালে তালে স্থানীয় ছেলেরা নাচতে নাচতে শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে চলেন। দিনের আলো যত শেষ হতে থাকে শোভাযাত্রাও ধীরে ধীরে কাছের দামোদর নদীর দিকে এগিয়ে যায়। এবং অন্ধকার নামার পর মা দুর্গাকে আগামী বছরের আহ্বান জানিয়ে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়।

প্রভাস দে
চন্দ্রপুরা, গিরিডি,
বিহার

ওড়িশার সম্বলপুর পুজোর কদিন ভবানীপুর, বিডন স্ট্রিট হয়ে যায়

ওড়িশার সম্বলপুর পুজোর মধ্যে সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানার ঢঙে, রঙে, সাজ-পোশাকে যে দুর্গাপুজো হয়, তা এখানকার কালীবাড়িতে। যদিও বাঙালিদের জন্যই নামাঙ্কিত। তবুও 'বেহেরা', 'মহান্তি' এরাও এই বাঙালি কালীবাড়ির পুজোয় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে। সপ্তমীতে কলা বৌয়ের স্নান, অষ্টমীতে সন্ধিপুজো কিংবা নবমীর ঢাকের কাঠির আওয়াজ, ধূপধুনোর গন্ধ একেবারে কলকাতার তেইশপল্লী বা বিডন স্ট্রিট পুজোমন্ডপকে মনে করিয়ে দেবে।

স্থানীয় ওড়িয়া বাসিন্দাদের দুর্গাপুজো কিন্তু একটু আলাদা। সপ্তমীর দিন পর্যন্ত প্যানডেল সাজান হতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মূর্তির মুখ না খুলেই অষ্টমীর সকালে পুজো শুরু হয়। সম্বলপুরের বেশ কয়েকটা জায়গায় বড় বড় মূর্তি হয়। গোলবাজারের মোড়, সানসড়কের প্রতিমা, মোদী পাড়া, বুড়ারজা, মহান্তিপাড়া, স্টেশন রোড, বড়সড়কের পুজো বেশ উল্লেখযোগ্য। সম্বলপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সম্বলেশ্বরী দেবী দুর্গার মূর্তি, পুজোর সময় মহানদীর পাড়ে সম্বলেশ্বরী মন্দিরে প্রচুর জাঁকজমক সহকারে পুজো হয়। অষ্টমী, নবমীতে বলি হয়। সম্বলী মায়ের শরীরে পুরনো সিঁদুর উঠিয়ে নতুন সিঁদুরের প্রলেপ, নতুন কাপড়-চোপড়, গয়না পরান হয়। হাজার বছরের প্রাচীন, কিংবদন্তিসম্পন্ন পাথরের দুর্গামূর্তিতে নবজীবন প্রতিষ্ঠা হয়। পুজোর কদিন ঠিক কলকাতার কালীপুজোর মত বাজী পোড়াবার ধুম লেগে যায়। তা ছাড়া বিরাট বিরাট রাবণ বানিয়ে দশমী বা দশেরার দিন আগুন লাগান হয় দুষ্টের দমনের প্রতীক হিসেবে।

সব শেষে বিজয়া দশমীর মিষ্টি, ঘুগনি আর সিদ্ধির সরবতও বাদ যায় না কয়েকজন স্থায়ী বাসিন্দাদের কল্যাণে সম্বলপুরের দুর্গাপুজো এখন অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

দীনেন চক্রবর্তী
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড,
কলকাতা—৪০

চন্দ্রশেখর আজাদ সমিতির দুর্গাপুজো
আলোকচিত্র : রামানন্দ ঠাকুর

রাঁচিতে পুজোর চার দিন

প্রায় একশ বছর আগে একটা ছোট্ট মাটির চালাঘরে যে দুর্গাপুজোর শুরু হয়েছিল, রাঁচি শহরের সেই দুর্গাবাটিতে আজ অত্যন্ত জাঁকজমকের সংগে দুর্গাপুজো পালন করা হয়। শহরের মেন রোডের ওপরই এই দুর্গাবাটি আজ স্বভাবতই আয়তনেও অনেকখানি বেড়েছে। প্রতিটি ঠাকুরের আলাদা মন্দির হয়েছে। এখানে দুর্গাপুজো ছাড়াও বাসন্তী পুজো ও লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, শিব, মদন গোপাল ইত্যাদির পুজো হয়ে থাকে। এ ছাড়া এখানে বারমেসে কালীপুজো হয়। এখানকার দুর্গাপুজোয় আধুনিকতা আর বিলাসিতার প্রাচুর্য নেই, যেমন নেই সারকুলার রোডের সামনে বর্ধমান কমপাউনডের 'ভান মন্দিরে।' এখানের পুজো দেখে গ্রাম বাংলার কথা মনে পড়ে যায়। ষষ্ঠীর দিন থেকেই এখানে পুজোর জাঁকজমক শুরু হয়। চারিদিকে ঢাকের শব্দ, ধূপধুনোর গন্ধে ভরে যায় পুজোর মন্ডপ। পুরুলিয়া থেকে ঢাকীরা আসেন এখানে বাজাতে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই কটা দিন মন্দিরে হাজার হাজার দর্শকের ভিড়। যদিও এখানে দর্শকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া এখানকার মূর্তি প্রতিযোগিতা আর প্যানডেল প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে কয়েকটি ক্লাব। যেমন 'বিহার ক্লাব', 'বকরী বাজার', 'চন্দ্রশেখর আজাদ সমিতি', 'বাস ডিপো', 'চারচ রোড', 'চিররি বাজার' এই কটি মূর্তির জন্য শিল্পী আসে কলকাতা থেকে। 'বকরী বাজার' এর মূর্তি এবং প্যানডেল দর্শনীয়। 'চিররি বাজারে' মূর্তি প্রতিবছর নতুন নতুন সাজে সাজান হয়। এখানকার কারুকার্য দর্শনীয়। ব্লেড মসুরদাল, চাল, ইত্যাদি দিয়ে মূর্তি তৈরি করা হয়। 'চন্দ্রশেখর আজাদ সমিতি'র মূর্তি তৈরি করেন কলকাতার মাখন পাল। এ ছাড়া 'বাস ডিপো'তে কৃত্রিম জলপ্রপাতের ভাসমান মূর্তি দর্শনীয়। এরপর রইল ডোরেনডার 'বীণাপাণি' ও 'নেপাল হাউস' ক্লাবের পুজো। কাটাটুলি, ডেংরাটুলি, গাড়িয়াখানা, রাতু রোড, হীনু, ধুবুয়ার সেকটর টু র মূর্তিও বেশ সুন্দর। এ ছাড়া রাতু মহারাজার দুর্গাপুজো বহুদিনের পুরনো, রাঁচি থেকে আট দশ কিলোমিটার দূরে মহারাজার রাজভবন। ওখানে রাজা খোদ নিজের হাতে মোষ বলি দিতেন। এখনও ওখানে মোষ বলি দেওয়া হয়। এর পর আছে রাঁচি পাগলা গারদের ভেতরকার পুজো। এখানে একজন রোগীই প্রতিবছর মূর্তি তৈরি করে থাকেন। মোট কথা পুজোর চারদিন বাংলাদেশ থেকে এত দূরে থেকেও বাংলাদেশের ছোঁয়াচ পুরোপুরি অনুভব করা যায়।

সুনীল কুমার মোদক
রাঁচি, বিহার

পাটনায় বাঙালি অবাঙালি মিলেমিশে দুর্গাপুজো করেন

পশ্চিমবাংলার ঠিক ঘরের পাশের প্রতিবেশী হল বিহার। বিহারের রাজধানী পাটনা। এখানে প্রায় দু থেকে আড়াই হাজার দুর্গাপুজো হয়। পাটনার পাইকারী বাজার মারুফগঞ্জে (MARUFGANJ) যে দুর্গাপুজো হয়, যাঁর নাম 'বড়ি দেবী' তাঁর আভিজাত্য এখানে সর্বজনবিদিত। 'বড়ি দেবী' বিসর্জনের আগে অন্য কোন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। অনেকেই এখানে ফুলের পরিবর্তে টাকা পয়সা হাতে নিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ব্রাহ্মণ আসেন শ্রীরামপুর থেকে। তবে মূল পাটনা শহর ও পাটনা সিটির মাঝামাঝি যে দুর্গাপুজো হয় সেটাই পাটনার মধ্যে সব থেকে প্রাচীন--পায় দেড়শ বছর বা তার থেকেও কিছু পুরনো। নাম 'ছোটি দেবী' বা 'ছোটি পাটান দেবী' অথবা 'ছোট পাটানেশ্বরী'। শোনা যায় সে সময় পাটনার মুষ্টিমেয় যে কজন বাঙালি ছিলেন তাঁদেরই চেষ্টায় এই পুজো পচলিত হয়েছিল। অবশ্য আজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায় দায়িত্ব থেকে বাঙালিরা সরে এসেছেন। এখন যেসব দুর্গাপুজো বহুদিন ধরে পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : ১। শুবদান পুজো অনুষ্ঠান সমিতির পুজো, লংগরটুলি, পাটনা--৪। এটা তাদের ৯০তম বছর। ২। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রায় ৩০ বছরের পুজো। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম রোড, পাটনা-১৬। ৩। পাটনা কালীবাড়ি, ইয়ারপুর, পাটনা--১। এঁরা ৪৪ বছর ধরে দুর্গাপুজো করছেন। ৪। জককনপুর দুর্গাপুজো সমিতি। জককনপুর, পাটনা-১। এখানে প্রায় ৩০ বছর ধরে পুজো হচ্ছে। ৫। মিঠাপুর দুর্গাপুজো কমিটি, মিঠাপুর, পাটনা-১, প্রায় ২৭ বছরের পুজো। ৬। পি এন্ডি ডি কোয়ারটারস, পাটনা গয়া রোড, পাটনা-১। ১৯৩০ থেকে পুজো হচ্ছে। ৭। টেলিগ্রাফ কোয়াটারস বা আদালতগঞ্জ কোয়ারটারস, পাটনা গয়া রোড, পাটনা-১, ১৯৩২ থেকে পুজো চলেছে। ৮। 'আর' ব্লক (R Block) পাটনা--১, পুজো হচ্ছে ১৯৪০ থেকে। ৯। গর্দানী বাগ, পাটনা--২ এর পুজো হচ্ছে ১৯৪৫ থেকে। ১০। গ্যাট লাইব্রেরি বা ঠাকুরবাড়ির পুজো ১৯৩০ থেকে। গর্দানীবাগ রোড নং--৮, পাটনা--২।

ওপরের সবকটি পুজোই প্রবাসী বাঙালিদের উৎসাহ এবং পরিচালনায় হয়ে থাকে। তবে প্রথম পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের পুজো শুধুমাত্র বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত। অন্যগুলি বাঙালি ও অবাঙালিরা মিলেমিশে করে থাকেন। এ ছাড়া গোবিন্দ মিত্র রোড, লংগরটুলি সবজিবাগ রোডের সংযোগস্থলে, বিড়লা মন্দির, পুরনো জককনপুর কিংবা অশোক রাজপথে অবাঙালি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় যেসব দুর্গাপুজোগুলি হয় সেগুলিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃহত্তর পাটনার আরও একটি দুর্গাপুজোর কথা না বললে এই লেখার অংগহানি হবে। দানাপুর কানট্ বাজার এলাকায় প্রায় ৫০-৫৫ বছর আগে ওখানকার প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী প্রয়াত পি সি বোসের প্রচেষ্টায় বহু বাঙালির আগ্রহে দুর্গাপুজো শুরু হয়। এই পুজো আজও দানাপুর সেনানিবাস এলাকায় বাঙালি ও অবাঙালি সকলে মিলেমিশে করে চলেছেন।

অমরেন্দ্রনাথ ধর
পাটনা, বিহার

রাংগাপাড়ায় দুর্গোৎসব

দরাং জেলার শান্ত এবং নিভৃত এক জনপদ রাংগাপাড়া। গৌহাটি যাবার মেন লাইনের রাঙিগয়া জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদল করে ব্রানচ লাইনের দিকে গেলে কয়েকটা স্টেশন পেরুলেই রাংগাপাড়া। মফস্বলের একটা স্টেশন। ২৪ ঘন্টায় মাত্র কয়েকটি তেজপুর প্যাসেনজার ট্রেন চলে। সামান্য এবং অখ্যাত স্টেশন হলে কী হবে, ছোট শহরটি আসামের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

এখানে যেদিকেই তাকাবেন, দেখবেন দিগন্তবিসারী চা বাগানের নিঃসীম সবুজ বিস্তার। এই বাগানগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এক বিশাল জন বসতি।

প্রতিবছর এখানেও বাংলার বাইরে মহাধুমধামে শারদীয় মহাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার নামী নামী প্রবীণ শিল্পীরা এখানে প্রতিমা গড়েন নিপুণ হাতে। শারদীয় দুর্গাপজোর উৎসব সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার আনে।

এখানকার পাঁচটা চা বাগানের প্রত্যেকটাতে একটি করে পুজো হয়। বাগানের প্রান্তে যেখানে ফ্যাকটরি তার প্রাংগণ জুড়ে এক সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ টাঙান হয়। তৈরি হয় মন্ডপ। কলকাতা থেকে ডেকরেটর এসে তৈরি করেন সেই মন্ডপ। চা বাগানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রতিটি কর্মী এবং মজুরেরা এসে জড়ো হন চাঁদোয়ার নিচে। পদমর্যাদার ব্যবধান ভুলিয়ে দেয় শারদোৎসবে।

পুজো উপলক্ষে চা বাগানের মন্ডপে দেখান হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সচিত্র ইতিহাসের প্রদর্শনী। কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত হয়

স্থানীয় শিল্পীদের গান, আবৃত্তি, নাচ দিয়ে ভরা বিচিত্রানুষ্ঠান।

দশমীর দিনে সানাই-এর করুণ রাগিণীতে বিদায়ের সুর বাজতে থাকে। এয়োস্ত্রীরা সিঁদুর দিয়ে মাকে বরণ করেন। তারপরই সবকটি বাগানের প্রতিমা তেজপুর হাই ওয়ের মোড়ে সমবেত হয়ে আলোকোজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য শোভা-যাত্রা করে চলে যায় মিছামারী পেরিয়ে গভ্রু নদীর তীরে। কিন্তু প্রতিমা জলি ভাসানের সংগে সংগে থেমে যায় ঢাক ও কাঁসির আওয়াজ। শুধু সানাই-এর দীর্ঘ আর করুণ বিলাপে যেন সহস্র মানুষের হাহা-কারের আর্তনাদ বাজতে থাকে।

দরাং জেলার এই দুর্গোৎসব দেখলে মনে হবে শারদীয় মহাপুজো শুধু বাঙালির নয়, শুধু বাংলাদেশের নয় – এ উৎসব সমগ্র ভারতবাসীর।

জয়নাল আবেদীন
বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া

চারটি দিনের প্রতীক্ষায় প্রবাসী বাঙালি

আসামে গৌহাটির পর ডিব্রুগড় শহরে সবচেয়ে বেশি দুর্গাপুজো হয়। তাই বাংলার বাইরে থেকেও এখানকার প্রবাসী বাঙালিরা দুর্গা-পুজোতে মাতোয়ারা হয়ে পড়েন। ডিব্রুগড়ে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজোকে শুধুমাত্র বাঙালির জাতীয় উৎসব হিসেবে গণ্য করলে ভুল হবে, কারণ অসমীয়াসহ অন্যান্য ভাষাভাষী লোকেরা পূর্ণোদ্যমে এই উৎসবে যোগদান করে থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ত্রিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি এখানে কৃষ্ণনগর থেকে দুর্গামূর্তি আনিয়ে পুজো করা হত। তখন স্থলপথের সুবিধা ছিল না তাই দেবীমূর্তি জলপথে নিয়ে আসা হত। আজও বিশেষ করে বাড়ির পুজোয় কৃষ্ণনগর থেকে কারিগর আনিয়ে মূর্তি তৈরি করান হয়। তবে সেটা ব্যয়সাপেক্ষ।

আসামের রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন ক্রমশই এই অভ্যাস কমে আসছে। দুর্গাপুজোর জাঁকজমক অনেকটা কমে আসে। তাই ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল অবধি দুর্গাপুজো বিশেষ জমজমাট রূপ ধারণ করতে পারেনি। আশা করা যায় এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় দুর্গাপুজো কিছুটা জমজমাট হবে।

ডিব্রুগড়ে সবচেয়ে পুরনো পুজো কার্তিকপাড়ায় হত। পুজো করতেন পূর্ববংগ থেকে আসা ডিব্রুগড়ে একমাত্র পন্ডিত। তারপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল এবং বাড়ল দুর্গাপুজোর সংখ্যাও। এখন বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সংগঠন, কালীবাড়ি ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মারোয়াড়ী দুর্গাপুজো, ইনডিয়া ক্লাবের পুজো ও কালীবাড়ির পুজো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি ভাবে ডিব্রুগড় শহর এবং তার আশে পাশে এখন শ দেড়েক দুর্গাপুজো হয়।

ষষ্ঠীর দিন থেকেই শুরু হয় চারিদেকে উৎসবের রেশ। ঢাকে কাঠি পড়ার সংগে সংগে সপ্তমীর ভোর থেকে লেগে যায় শিউলী ফুল কুড়োবার ধুম। গানে বাজনায় চারিদিক সরগরম হয়ে ওঠে।

বিকেল হতেই শুরু হয় প্যানডেলে প্যানডেলে লোক সমাগম। আরতি প্রতিযোগিতা চলতে থাকে পুরো দমে। পুজোর সংগে সংগে চলতে থাকে বিভিন্ন সংগঠন আয়োজিত নাটক জলসা ইত্যাদি।

দেবী বিসর্জন এখানে দেখবার মত। সারিবদ্ধভাবে একটার পর একটা গাড়ি এগিয়ে যেতে থাকে ব্রহ্মপুত্রর দিকে। উন্মাদনায় উদ্ভা-সিত বাঙালি তরুণেরা আরতি করতে করতে দেবী বিসর্জনের পথে এগিয়ে যায়। বিসর্জন পর্ব শেষ হয় রাত প্রায় ৮টায়।

তারপর চলে পরস্পরের আলি-ংগনের পালা। তাও যায় শেষ হয়ে। এর পর থাকে আবার এক বছরের জন্য প্রতীক্ষা।

বিপুল বাগচী
ডিব্রুগড়, আসাম

কুয়ারির পথে

অশ্রুময় গুহঠাকুরতা

বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্রাংক স্মাইত কুয়ারি গিরিপথ থেকে হিমালয়ের দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন যে, হিমালয়ের এরূপ বিশাল নয়নাভিরাম দৃশ্য অন্য কোন স্থান থেকেই দেখা যায় না।

সেই কুয়ারির গিরিপথে যেতে হলে পর্বতারোহী হবার প্রয়োজন নেই। আমি-আপনিও ঘুরে আসতে পারি। প্রয়োজন শুধু ইচ্ছার এবং কয়েকটা দিন পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পথপরিক্রমা করার মানসিক প্রস্তুতি। এ পথের দু পাশে ছড়িয়ে আছে অবিকৃত হিমালয়ের পর্যাপ্ত সৌন্দর্য সম্ভার।

কুয়ারি যেতে গেলে প্রথমে আমাদের হাওড়া থেকে লক্ষ্মৌ-এ যেতে হবে। সেখান থেকে রাতের বেলায় নৈনিতাল একসপ্রেসে চেপে পরদিন ভোরে কাঠগুদাম। তবে কাঠগুদামে না নেমে এক স্টেশন আগে হলদোয়ানিতে নেমে পড়লে সুবিধাই হবে। কারণ এখান থেকেই কুমায়ুনের সব বাস ছাড়ে এবং কাঠগুদাম হয়ে পাহাড়ের পথ ধরে উঠতে শুরু করে। সেই জন্য হলদোয়ানিতে নামলে বাসে জায়গা পেতে সুবিধা হবে। বাস স্ট্যানডও স্টেশনের কাছেই।

এবারে বাসে চেপে পাহাড়ে উঠতে থাকবেন। বাঁদিকে নৈনিতালের পথ আরও উপরে উঠে গেছে। আমরা এগিয়ে যাব সোজা ভালওয়ালির আপেলবাজার ছাড়িয়ে, গরম পানিতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে অপরাহ্নে আলমোড়া। এখান থেকে বাস নেমে যাবে সোমেশ্বর উপত্যকায়। তারপর উঠবে বিখ্যাত কৌশানি পাহাড়ে। ত্রিশূল নন্দাঘুন্টির এবং আরো অসংখ্য শুভ্র তুষার শৃংগরাজির মহান রূপ দেখতে দেখতে নেমে যাবেন গরুড় উপত্যকায়। সেখান থেকে গোয়ালদামে বাস পৌঁছবে সন্ধ্যায়।

বাস স্ট্যানডের ঠিক উপরেই জিলা পরিষদের বিশ্রামগৃহ। আগে থাকতে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে আর একটু এগিয়ে চলুন, পূর্ত বিভাগের বাংলো পাবেন - গাছপালা ঘেরা বাজারের কোলাহল হতে দূরে অথচ ৫-৭ মিনিটের পথ। সুন্দর পরিবেশ। আর যদি ওর পাশেই বনবিভাগের দুকামরা বিশিষ্ট লগ হাউসে জায়গা পেয়ে যান তাহলে হয়ত আপনি আর গোয়ালদাম ছেড়ে নড়তে চাইবেন না।

গোয়ালদামে বাস থামলেই বীর সিং অথবা কেদার সিং-এর লোক আপনার খোঁজ করবে। কারণ আসার মাস দেড়েক আগে নিশ্চয়ই আপনি দেবলের বিখ্যাত গাইড বীর সিং অথবা ওয়ান গ্রামের কেদার সিংকে চিঠি লিখে গাইড বা কুলির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ওদের ঠিকানা : বীর সিং, গাইড, পোঃ এবং গ্রাম দেবল, জিলা চামোলি, উত্তরপ্রদেশ এবং কেদার সিং, গাইড, পোঃ এবং গ্রাম ওয়ান, চামোলি, উত্তরপ্রদেশ।

ওরাই আপনার মালপত্র বাসের মাথা থেকে নামিয়ে বাংলোতে নিয়ে যাবে। আর আমাদের কোন চিন্তা নেই। পথের সারথি পেয়ে গেছি তাই কাল ভোরেই পদযাত্রা শুরু করতে কোন অসুবিধা নেই।

গোয়ালদাম হল কুমায়ুন এবং গাড়োয়ালের সংযোগস্থল। এখান থেকে বাসে চেপে আপনি, সোজা চলে যেতে পারেন গাড়োয়ালের কর্ণপ্রয়াগে, আবার হাঁটা পথে, কাল আমরা যে পথে যাব, যে পথ ধরে চলে যাওয়া যায় বিখ্যাত রূপকুণ্ড হেমকুণ্ডে। এখান থেকে হাঁটা পথে আমাদের কুয়ারি পৌঁছতে লাগবে আট দিন। খাবার-দাবার গোয়ালদাম থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল। এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। বিশেষ করে আলু, আটা ইত্যাদি দেবলে, ওয়ানে বা রামনিতেও পেয়ে যাবেন। সেই জন্য ইচ্ছা করলে রামনি পর্যন্ত অর্থাৎ দিন চারেকের খাবার এখান থেকে নিয়ে বাকি পথটুকুর জন্য রামনি থেকে নিলে ওজন কমে এবং কুলি খরচ বাঁচে। তবে সেক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে একটু উদার দৃষ্টিভংগি থাকলে ভাল। যেখানে যা পাব তাই খাব এই মানসিকতা নিয়ে যেতে পারলে কোন অসুবিধা নেই।

পরদিন খুব ভোরে উঠে পরুন। নন্দাঘুন্টি ত্রিশূলের শীর্ষে প্রথম অরুণ চুম্বন রাঙিয়ে উঠতে দেখুন। তারপর যাত্রা হোক শুরু। বাজারের পাশ দিয়েই খাড়া উৎরাই পথ নেমে গেছে সোজা পিন্ডার গংগা অবধি। তবে আজকাল জিপের রাস্তা হয়েছে - অনেক ঘুরে দেবল পর্যন্ত যাওয়া যায়। কী দরকার চলুন হেঁটেই যাই। শুধু তো উৎরাই। আজকাল অনেক দোকান হয়েছে প্রথম উৎরাইটা নামার পরেই, পথের দু পাশে। এখানেই প্রাতরাশ সেরে নিন। ভয় নেই গরম জিলিপি থেকে শুরু করে ডিমের কারি সবই পাবেন। তারপর নেমে চলুন হুড়মুড় করে। ঘন্টা আড়াইয়ের মধ্যেই দেখতে পাবেন সুন্দরী পিন্ডার গংগাকে। ঝোলাপুল পার হয়ে উঠে আসুন। ছোট্ট গ্রাম নন্দকেশরি। ঢোকার মুখেই চায়ের দোকান। ঘুমন্ত শান্ত গ্রাম। ছোট একটি নন্দাদেবীর মন্দির আছে। বেশ রোদ এখন, তাই এতটা পথ হেঁটে আসুন, চায়ের দোকানে একটু বিশ্রাম করি, ছায়ায় চা সহযোগে, তারপর এগিয়ে চলুন। পথ এবারে কিছুটা চড়াই। দেবলের বাংলোতে এসে পৌঁছতে এক ঘন্টাও লাগবে না। দারুণ সুন্দর এই বাংলোর অবস্থিতি। পিন্ডার এবং কোয়েল গংগার সংগমের উপরে। আকাশ কৃপা করলে দূরে ত্রিশূলের চূড়াও দেখতে পাওয়া যাবে। আপনার নিশ্চই মনে হবে এখানে দু একটা দিন কাটিয়ে মনের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনি। থাকার কোন অসুবিধা নেই। একটু উপরেই বেশ জমজমাট বাজার। সব কিছুই পাওয়া যায়। আর বীর সিংকে গাইড হিসাবে যদি নিয়ে থাকেন তা হলে বুকিং ছাড়াই থাকতে পারবেন। বীর সিঙেরই গ্রাম এটা, প্রতিপত্তিও খুব

বাংলোর প্রাংগণে বান্না বান্না করে দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক তারপর অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলুন বেরিয়ে পড়ি। আজ আমরা পিলখাড়া পাসের নিচে রাত কাটাব

পাহাড়ী পথটি গ্রাম ছাড়িয়ে এঁকেবেঁকে উঠে চলেছে, তবে বিশেষ চড়াই নেই। তবে পথ কিছুটা বেশি এবং দিনের শেষে পথ চলা তো তাই মনে হবে যে পথ আর ফুরোবে না। তবে চলতে থাকলে সে যত ধীরেই চলুন না কেন পথ এক সময় ফুরোবেই। সন্ধ্যার মুখে পৌঁছে যাবেন পিলখাড়া পাসের নিচে। সংগের কুলিকে পাঠিয়ে দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসটারমশাইয়ের কাছে, স্কুলে থাকার অনুমতি নেবার জন্য। তারপর গুছিয়ে বসুন সারাদিনে আজ বেশ হাঁটা হয়েছে

খুব ভোরে উঠে পড়ুন। তারপর পিলখাড়া পাসের মাথায় উঠে আসুন। দূরত্ব সামান্যই তবে একটু চড়াই আছে। কিন্তু ভোরের শীতল হাওয়ায় দেখতে দেখতে এ পথটুকু চলে আসবেন। পাসের উপর বিশাল এক ওক গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর গোড়ায় বসুন। পাশের চায়ের দোকানী সবে ঘুম ভেঙেছে উনুনে আগুন দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে চা তৈরি হয়ে যাবে। গতরাতের তৈরি রু আপনার সংগেই আছে, তাই দিয়ে প্রাতঃরাশ করে নেবেন। চা হ হতে তাকিয়ে দেখুন কীভাবে নব সূর্যের রাঙা আভা ধীরে ধী গাছের মাথায় মাথায় পাহাড়ে শীর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে।

পাস পেরিয়ে এবারে নাম অবশ্য খুব বেশি নয়। তারপর একটা গ্রাম পার হয়ে এসে থামবে বগড়িগড়ে। এটা অবশ্য কোন নয়, ছোট একটি লালার দোক আছে, চা পকোড়া পাওয়া য এখান থেকে আবার উঠে চ মান্দোলি গামের দিকে। এখন পথটা অনেক ভাল হয়ে গেছে, হ কিছুদিনের মধ্যে গাড়িও চ পারে। আগে এখান থেকে

চড়াই ভেঙে মান্দোলি পৌঁছতে হবে। বগড়িগড় থেকে একটা পথ চলে গেছে খপলুতাল, বেগনতাল, ব্রহ্মতাল। সেখান থেকে ওয়াণ গ্রামে নেমে আসা যায়। অপূর্ব এইসব হ্রদ হিমালয়ের গভীরে।

যাক আজ আমরা মান্দোলি গ্রামে গিয়েই থাকি। বেশ বড় গ্রাম। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিক চিকিৎসালয় সবই আছে। স্কুলবাড়িতে রাত কাটান যায়। কিন্তু আমার মতে, চলুন না আর একটু কষ্ট করে একেবারে লোহাজং পাসের মাথায় উঠে পড়ি। মান্দোলি থেকে সামান্য দূর তবে চড়াই আছে। তা থাক, ধীরে ধীরে হাঁটলে এক ঘন্টারও কম সময়ে পৌঁছে যাবেন, দুতিনটে দোকান আছে, থাকা খাওয়া দুই ই পাবেন। তা ছাড়া আজকাল একটি বিশ্রামগৃহও তৈরি হয়েছে। সুতরাং কোন ভাবনা নেই। কিন্তু এই কষ্টটুকু করে এখানে থাকতে আপনি যে আনন্দ পাবেন তার তুলনা হয় না। চারিদিক খোলামেলা। দূরে ত্রিশূল। একটি বড় গাছে ছোট বড় ঘন্টা বাঁধা, বাতাসে টুংটাং বাজছে। গ্রামের ভিড়ের মধ্যে না থেকে এই নিরালা সুন্দর জায়গাটিতে থাকতে আপনার ভাল না লেগেই পারে না।

কাল ভোর ভোর রওনা হয়ে চলুন রূপকুণ্ড যাবার পথের শেষ গ্রাম ওয়ানের দিকে। লোহাজং থেকে প্রথমেই ভীমবেগে নামতে হবে। তারপর নামা ওঠা করতে করতে বিরাট ওয়াণ গ্রামের নিচে এসে পৌঁছবেন, নীল গংগার তীরে। গ্রামের একেবারে মাথার উপরে ডাকবাংলো। ওক গাছের ছায়ায় আত্মমগ্ন। এর কাছেই ঝর্না। বৃষ্টি তুষারপাতের দেবতা লাটু মহারাজের মন্দির। কিন্তু এবারে আমরা নাই বা গেলাম ডাকবাংলোতে। গেলে কাল আবার অনেকটা নেমে তারপর ওয়ান পাস বা কুকিনা খালের পথে যেতে হবে। তার চেয়ে গ্রামের নিচের দিকে কোন গ্রামবাসীর খালি ঘর বা দোকান ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দিই। তা হলে কাল এখান থেকেই কুকিনা খালের দিকে যেতে পারব।

কুকিনা খালের উচ্চতা বেশি নয় বোধহয় সাড়ে ন' হাজার ফুটের মত হবে। ভোরবেলায় বেরিয়ে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন পাসের মাথায়। পাস থেকে অপর দিকে নেমে যেতে হবে ভীমবেগে। গিয়ে পড়বেন একটি সুন্দর সবুজ প্রান্তরে। সেই প্রান্তর পেরিয়েই কনোলের ডাকবাংলো। লোকালয় নেই। সেই নির্জন বাংলোতে বসুন। চৌকিদার দু এক ঘন্টার জন্য খুলে রেখে দেবে। রান্না করতে থাকে। ইতোমধ্যে চায়ের মগ হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারটা বারান্দায় টেনে এনে বসুন। বাঁদিকেই দেখবেন আকাশ ছোঁয়া কুকিনা খালের পাহাড় প্রাচীর। ডানদিকে লাদারিংড়া পাহাড়। তার ওপরেই ব্রহ্মতাল। কনোলের অনেক নিচে বয়ে চলেছে বিরেহি গংগা, তার ওপরেও একটা সুন্দর বাংলো আছে — সিতেল বাংলো।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিন তারপর চৌকিদারকে কিছু বকশিশ দিয়ে নেমে চলুন তরতর করে। তবে সাবধান। যদি বৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই পড়বার ভয়। দারুণ পিছল হয়ে যায় এই জংগলের পথ। তবে যদি রোদেভরা দিন পান তা হলে চলুন মনের আনন্দে ছায়ায় ছায়ায়। মাঝে মাঝে বনের ফাঁকে ফাঁকে ত্রিশূলের বিশাল রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবে। হয়ত ত্রিশূলের কোলে কালো ছায়া ছায়া রূপকুণ্ডের আভাসও বুঝতে পারবেন। পরের বারে না হয় ও পথে যাওয়া যাবে। ভয় পাবেন না। এখান থেকে ভয়ানক দুর্গম মনে হলেও আসলে কিন্তু তত দুর্গম নয়। আরও কিছুটা নামলে মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সুতোল গ্রাম চোখে পড়বে নন্দাকিনির অপর পারে।

এক সময়ে নেমে আসবেন নন্দাকিনির তীরে, রূপগংগা এবং নন্দাকিনির সংগম স্থলে। রূপগংগার সৃষ্টি রূপকুণ্ড থেকে। এখানে একটু বসা যেতে পারে। সুতোল গ্রাম তো প্রায় এসেই গেছি। গাছের ছায়ায় বসুন। বিকেলের সোনাগলা রোদে নন্দাকিনি আর রূপগংগার মিলন চোখ ভরে দেখুন।

ছোট্ট পুলটা পার হয়ে পথ উঠে গেছে সুতোল গ্রামের দিকে। দুচারটে চায়ের দোকানও পেয়ে যাবেন। তবে গ্রামটি দারুণ নোংরা গরু মোষের জন্য। তাই আমরা এ গ্রামের বাড়িতে থাকব না। তার চেয়ে আর একটু কষ্ট করে চলুন গ্রামের উপরে স্কুলবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই। কালকের পথও ওদিক দিয়েই। স্কুলটিকে ঘিরে ছোট্ট বাগান গাছপালা ঘেরা, নিরিবিলি শান্ত। ঠিক যেন ছোট্ট একটি বনবিভাগের বাংলো। মাস্টারমশাই সাদরেই আহ্বান জানাবেন। শহরের লোক। চাকরির খাতিরে এখানে এসে রয়েছেন। তাই বাইরের লোক এলে খুশী হন। রাতে মাস্টারমশাইকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ জানান। মাস্টারমশাইও আপনাকে চিনিবিহীন চা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন।

পরদিন কিন্তু আর গড়িমসি নয়। যত ভোরে সম্ভব উঠে পড়ুন। আজকের পথ দীর্ঘ। বেশ চড়াই উৎরাইও আছে। গতরাত্রের তৈরি খাবার চা সহযোগে খেয়ে নিয়ে ত্রিশূল শীর্ষে প্রথম আলোর পরশে রাঙা হয়ে ওঠা দেখে নিয়ে রুক স্যাক তুলুন পিঠে। ওঠানামা করতে করতে শেষে একটা পাসের ওপরে এসে পড়বেন। যদিও ঠিক প্যাস বলে মনে হবে না, নাম গাঁওয়াড়খানা। এ পর্যন্ত ত্রিশূল আপনার সংগে সংগেই ছিল। কিন্তু এবারে হারিয়ে ফেলবেন। এর পর একটু সরল পথে এগিয়ে নামতে শুরু করুন। পথে একটি গাঁ পাবেন। কাকরিও পেয়ে যেতে পারেন। আরও নেমে তারপর ওঠা, এই চড়াইয়ের শেষে ঘাসে ঢাকা সুন্দর একটি মাঠ, ভেড়া চড়ছে। প্রায় বারোটা বাজে। এখানে রান্না করে খেয়ে নেওয়াই ভাল। কিন্তু পানীয় জল নেই এখানে। তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে আরও কিছুটা এগিয়ে চলুন। সরু পথের একপাশে একটি ছোট্ট জলধারা পাবেন। পথের উপরেই রান্নার ব্যবস্থা করুন, উপায় কী। সব সময়ে তো মনের মত জায়গা পাওয়া যায় না।

যদিও আকাশ থেকে এখন আগুন ঝরছে কিন্তু তবুও উঠতেই হবে। বিশ্রামলোভী শরীরটাকে টেনে নিয়ে রোদ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ুন শেষ দুপুরে পৌঁছে যাবেন নিঝুম আলা গ্রামে। মনে হবে কোন দৈত্য বুঝি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে গ্রামটিকে। ছোট্ট গ্রাম 'আরু' অর্থাৎ পিচ ফলের গাছের ছায়ায় নিদ্রামগ্ন। গাছ গুলি ফলভারে অবনত। এই দুর্ধর্ষ গরমে ওই টক মিষ্টি ফলগুলির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই আপনার জিবে জল এসে যাবে। একটা বড় ছায়াচ্ছন্ন গাছের নিচে বসুন। কুলিকে পাঠিয়ে দিন গ্রামের মধ্যে যদি কাউকে পেয়ে কিছু ফল কিনে আনতে পারে।

আজ আমাদের রামনি পৌঁছনর কথা। আকাশে বিকেলের রং ধরতে শুরু করেছে। আমরা এসে পৌঁছব পটেরগাঁও গ্রামের নিচে। এখান থেকে পাঁচ কি মি রামনি। গ্রামের লোকেরা আপনাকে বলবে কেন মিছিমিছি পাঁচ কিলোমিটার বেশি ঘুরবেন। বরং পটেরগাঁওতে রাত কাটান তারপর দিন সকালে এই গ্রামের মাথার ওপরে সোজা উঠে যান, পেয়ে যাবেন সেমখরক। রামনি গেলেও সেই তো সেমখরকে আসতেই হবে, মাঝে থেকে কিছুটা বেশি হাঁটতে হবে। অবশ্য রামনির পথে চড়াই কম। আর পটেরগাঁও থেকে বুক সমান চড়াই ভেঙে উঠতে হবে। তবে সময় কম লাগবে।

কিন্তু কথা ছিল যে রামনি থেকে বাকি পথের জিনিস কিনতে হবে। পটেরগাঁও ছোট্ট গ্রাম কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু চিন্তা নেই, গ্রামের লোকেরাই হদিস দেবে দুই কিলোমিটার দূরে ঘুনি গ্রামে একটা লালার দোকান আছে। সেখানে সব কিছু পাওয়া যাবে। সুতরাং গ্রামে থাকার ব্যবস্থা পাকা করে চলুন কুলিকে নিয়ে সামান্য দুই কিলোমিটার গিয়ে আগামী পথের জিনিসপত্র কিনে আনি। তা ছাড়া পাটেরগাঁওয়ের অতিথিবৎসল লোকেরাও আলু বিনে দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

ভোর হয়ে গেছে। এবারে চলুন নাক বরাবর চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করি। আজ আমাদের সেমখরক পেরিয়ে একেবারে বিরেহি গংগার তীরে নেমে ঝিঁঝিঁ গ্রামে পৌঁছতে হবে। অবশ্য গ্রামের লোকেরা আপনাকে বলবে, 'কই ফিকির মত্ কিজিয়ে, বাব বাজেকা অন্দর মে আপ ঝিঁঝিঁ পৌঁছ যায়েংগে।' কিন্তু খবরদার ওদের কথার উপর নির্ভর করবেন না। ওরা যা সময় বলবে তাকে তিন দিয়ে গুণ করে হিসেব করবেন না হলেই মরেছেন।

ঝিঁঝিঁ দূরে থাক সেমখরক পৌঁছতেই এগারটা বেজে গেল। এটা আসলে একটা পাস। এখান থেকে দূরে হিমালয়ের তুষার শৃংগগুলির কিছুটা অংশ চোখে পড়বে, এবং কুয়াবিতে আপনার জন্য কী দশা অপেক্ষা করে আছে তার একটা আভাস পাবেন। এর পর নেমে চলা। সে কী নামা, নামা আর নামা। প্রতি মুহূর্তেই মনে হবে এই এসে পড়লাম। কিন্তু গ্রামের কোন চিহ্নই দেখতে পাবেন না। ওরা বলেছেন ১২টা। তা, দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছন যাবে। কিন্তু কোথায় কী। শেষে দেড়টা নাগাদ আর না পেরে বনের ছায়ায় ঝর্ণার পাশে সবুজ ঘাসের ঢালে মোট নামান। কুলিকে আগুন জ্বালতে বলুন রান্নার জন্য। প্লাস্টিকের সিট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন চায়ের অপেক্ষায়। কী অপার শান্তি, কী গভীর নীরবতা। প্রকৃতির কোলে যেন বহু শতাব্দীর পর নতুন করে আশ্রয়লাভ করেছেন।

হঠাৎই হয়ত দেখবেন একটি পাহাড়ী ছেলে আর একটি মেয়ে বিরাট বিরাট দুই বোঝা পিঠে নিয়ে নেমে আসছে। আপনার সংগে কিছুটা দূরত্ব রেখে বসে বিশ্রাম নেবে। এই দুর্গম পাহাড়ে নতুন লোক দেখে আড়ে-আড়ে তাকাবে। ওদের চা খেতে ডাকুন। জানতে পারবেন, ওরা সদ্য বিবাহিত। মেয়ের বাড়ি থেকে কনেকে নিয়ে বর চলেছে নিজের বাড়িতে। নতুন

বৌয়ের পিঠে অতবড় বোঝা কেন? মেয়েটি তার নতুন পোশাকের অঞ্চলে মুখ ঢেকে ওপাশ ফিরে ফিক ফিক করে হাসবে। ছেলেটি বিপন্ন মুখে বলবে যে, মেয়ের বাড়ির সকলেই এখন মাঠের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আর তাব নিজের বাড়িতে বুড়ো বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাই সংসারের সব জিনিসপত্র নিয়ে দুজনে চলেছে।

অনেকক্ষণ বিশ্রাম হয়েছে, আর নয়। এবারে চলুন ওঠা যাক। সন্ধ্যের আগে পৌঁছতে হবে গ্রামে। নইলে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল হবে।

বিকেলবেলায় এসে পৌঁছে যাবেন ঝিঁঝি গ্রামে। প্রথম সম্পন্ন চাষীর বাড়িতেই আশ্রয় পেয়ে যাবেন। উঠোনে পশমের বোনা কারপেট বিছিয়ে দেবে তারপর গৃহস্বামী আপনার পরিচয় নেবে। দোতলায় একটা ঘব ছেড়ে দেবে আপনাকে। হয়ত একটু দুধও জোগাড় করে-আনবে। চা তো পাবেনই। ভোরে উঠে ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করুন। গ্রামের কাছেই একটি পুল ছিল বিরেহি গংগার উপবে। ভেঙে গেছে অনেকদিন হল, হয়ত এখনও সারান হয়নি। তাই আমাদের বিরেহি ধরে অনেকটা নেমে যেতে হবে তারপর গ্রামবাসীদের তৈরি পাথর আর গাছের ডালের পুল পার হয়ে জংগলের মধ্যে দিয়ে দারুণ চড়াই ভেঙে উঠতে হবে। পুরাতন পুলটা থাকলে এই কষ্টের হাত হতে রেহাই পাওয়া যেত।

চড়াই, শুধু চড়াই। হঠাৎ পথের বাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। বাঁদিকে অনেক নিচে বিরেহি গংগা আর দূরে গোলাকৃতি বিরেহিতালের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাবে। ওই শুকনো হ্রদের একপাশে মৈথানা পাহাড়, তার শরীরে বিশাল ক্ষত নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে। এই পাহাড়েরই একটা বিরাট অংশ ধসে পড়ে বিরেহি গংগায় একটি বাঁধের সৃষ্টি হয় এবং বিরেহিতালের জন্ম হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর সেই জলরাশি বাঁধ ভেঙে আবার মুক্ত হয় এবং নিচের দিকের গ্রামগুলি ধ্বংস করতে করতে প্রচণ্ড গতিতে বয়ে চলে। বিরেহিতালেরও জলরাশি সে সময় শুকিয়ে যায়।

এবারে আমরা এসে পড়েছি পানা গ্রামের মাথার উপরে কালিয়ে-ঘাটাতে। এখানে বিশ্রাম এবং খাওয়া সেরে আবার পথে নামুন। আজ আমাদের সার্তোলি পৌঁছতে হবে। কালিয়াঘাটা অঞ্চলটির মধ্যে দিয়ে চলতে বেশ ভালই লাগবে। মাঝে মাঝে মনে হবে যেন মানুষের তৈরি রক গারডেনের মধ্য দিয়ে চলেছেন।

কালিয়াঘাটা ছাড়িয়ে আবার চড়াই শুরু হবে। বন জংগলের মধ্য দিয়ে পথ। এ পথ একটা পাহাড় টপকে অপর দিকে নামিয়ে দেবে। ঘন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে নামতে হবে। ভালই লাগবে। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের রাঙা আলো বনের মধ্যে আলপনা আঁকবে। কিছু নাম না জানা পাখির কূজন। এই বনের শেষেই বেশ বড় সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রায় সমতল একটি ঢাল। আমরা সার্তোলিতে পৌঁছে গেছি। সেই মাঠের ধারে ধারে ছোট ছোট খুপরি। মেষপালকরা আশ্রয় নিয়েছে। তিব্বত সীমান্তে নিতি গিনিবর্তের কাছ থেকে এরা শত শত ভেড়া নিয়ে কুয়ারি অতিক্রম করে এসেছে এবং যাবে কোটম্বার পর্যন্ত। প্রতি বছরই ওদের এই আসা যাওয়া। সেপটেম বরের গোড়ায় ওরা ওই উচ্চ চারণভূমি থেকে নামতে শুরু করে আবার মে মাসে ধীরে ধীরে ফিরে চলে। প্রথম ভেড়ার দল কুয়ারি অতিক্রম করাব পবেই কুয়ারিব পথ খোলে এবং লোকে যাতায়াত করতে শুরু করে।

সবুজ নরম ঘাসের গালিচায় গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। মেষপালক দের সংগে আলাপ করুন। কুলি চায়ের জল চাপাক। তাব পর তাঁবু খাটান। মন আজ আনন্দে ভরপর। এতদিনের পথ চলাব শুভ পরিণতি হবে কাল। কালই আমরা কুয়ারি গিরিপথের উপর পা রাখব।

পরদিন যত ভোরে পারেন উঠে পড়ুন কারণ আজই শেষ চড়াই এবং শেষ সংগ্রাম। প্রথমে সার্তোলি থেকে নেমে যেতে হবে বেশ খানিকক্ষণ। আপনি কিছুটা অবাকও হবেন, বিরক্তও। এই শেষ দিনেও আবার নামাচ্ছে। তার অর্থই হল যতটুকু ওপরে উঠেছিলাম এত কষ্ট করে তা হারাতে হচ্ছে এবং এই চড়াই আবার উঠতে হবে। এ পথের এটাই বৈশিষ্ট্য। আমরা মোটামুটি হিমালয়কে দক্ষিণ থেকে উত্তরে অতিক্রম করছি তাই এই ওঠা নামা। আরও নেমে চলুন। এসে পড়বেন ডুমবিটিয়া। তারপরে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। ওই ঝর্ণা পার হলেই আপনি পা রাখবেন পিলকুণ্ঠা রেনজে। এই রেনজের মাথার উপরেই হল কুয়ারি পাস। এবারেই আপনার শেষ সংগ্রাম শুরু হল। এবারে খাড়া চড়াই, চড়াই শুধুই চড়াই। হ্যাঁ, কষ্ট একটু হবে কিন্তু সান্ত্বনা এই যে এবারে আব কোথাও নামা নেই। আপনি যতটুকু উঠছেন ততটুকুই কুয়ারির কাছে চলে আসছেন। আজই আপনার স্বপ্নের কুয়ারিতে পৌঁছে যাবেন। তাব উত্তেজনা আপনার পথকষ্ট ভুলিয়ে দেবে। উঠতে উঠতে, বিশ্রাম নিতে নিতে এক সময়ে এসে পৌঁছবেন ডাকোয়া-নিতে। সুন্দব ক্যামপিং গ্রাউনড। ত ছাড়া কয়েকটা বড় গুহা আছে। অনায়াসে এই গুহাতে রাত কাটান যায়। অনেকে এখানেই রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে কুয়াবি যায়। কিন্তু আমরা তা কবব না। কারণ সাধারণত সকালবেলাতে হিমা-লয়ের আবহাওয়া ভাল থাকে। বেলা বাড়তে থাকলেই মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। তাই এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে কুয়ারি পৌঁছতে পৌঁছতে যদি চাবিদিক মেঘে ঢেকে যায় তা হলে এতদিনেব সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ চলার পরেই আচমকা ঠিক আপনার মাথার উপবে কুয়াবি পাসকে দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যাবেন। সেই সার্তোলি ছাড়ার পর দু একবার বহু দূর থেকে দেখেছিলেন কুয়ারি পাসকে কিন্তু তারপর থেকে সারাদিনই আমাদেব চোখের অন্ত রালে ছিল। এখন হঠাৎই এত কাছে দেখতে পেয়ে আনন্দে বিস্ময়ে আপনি চমৎকৃত হয়ে পড়বেন। এব পর আর শ্রান্তির কথা মনেই থাকবে না। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আপনি পা রাখবেন কুয়ারি পাসেব উপব তখন গোধূলির রং ধরতে শুরু করেছে দিগন্তবিস্তৃত মেঘেব গায়ে। শুধুমাত্র দুনাগিরির চূড়াটি শেষ সূর্যের কিরণে অগ্নিশিখাব মতন জ্বলছে। আপনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবেন। তারপর অপরদিকে শ খানেক ফিট নেমে গুহায় আশ্রয় নিন। মনে মনে প্রার্থনা করুন যেন পর দিন সকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে।

কুয়ারি থেকে হিমালয়

দারুণ উত্তেজনায় রাতে আপনার ঘুম হবে না। মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে বাইরে দেখতে চাইবেন আকাশের অবস্থা। শেষে আর ধৈর্য ধরতে না পেরে রাত থাকতেই উঠে পড়বেন। স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করবেন। তারপর পুবের আকাশ যখন একটু হালকা বলে মনে হবে তখনই বেরিয়ে পড়বেন। ডান ধারের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করুন, পাহাড়টার মাথায় যে বড় পাথরটা রয়েছে সেখানে বসুন। আপনি পাস থেকে অন্তত তিন শ ফিট উপরে আছেন। দৃষ্টিব বাধা কোথাও নেই। শেষ রাতে উন্মুক্ত জায়গায় প্রায় ১২,৭০০ ফিট উপরে (কুয়ারি ১২,৪০০ ফিট) বেশ ঠান্ডা লাগবে। তবে এখন এ সব ছোটখাট ব্যাপার আপনার নজরেই পড়বে না।

এখন রাতের অন্ধকার আব নেই। দিনের আলোও ফোটেনি। দিন এবং রাত্রি যেন একটা মহাসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই মুহূর্তের একটা অপূর্ব ব্যঞ্জনা আছে। চাবিদিক নিথব নিস্তব্ধ, সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন এক মহান সম্ভাবনাব প্রতীক্ষায় উন্মুখ। একটা নতুন প্রভাতেব জন্মলগ্ন আসন্ন। আলো আঁধারেব নিশ্চল স্বন্দ্বে কালেব প্রবাহ যেন থমকে রয়েছে। উন্মুক্ত আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস উন্মুক্ত বিশ্বচরাচর। হঠাৎ যেন সেতারে ঝংকার উঠল। কেদার শীর্ষ প্রথম আলোর পবশে হয়ে উঠল রক্তিম। সমস্ত আকাশে বাতাসে এক অশ্রুত প্রভাত রাগিণী বেজে উঠল ললিত রাগে, নতুন প্রভাতকে স্বাগত জানিয়ে। সূর্যের দীর্ঘ রশ্মিগুলি যেন তুলি দিয়ে দ্রুত রং মাখিয়ে যেতে লাগল একের পর এক তুষার শীর্ষগুলিব গায়ে গায়ে। আবিরের রঙে রাঙা হয়ে উঠল দিগন্ত। রাত্রির অবসানে নতুন প্রভাতের জন্ম হল। এই অবিস্মরণীয়, অপূর্ব ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা কজন।

ধীরে ধীরে সূর্য দিগন্ত ছেড়ে আকাশ পানে যাত্রা শুরু করে। গাঢ় নীল আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে শুভ্র তুষারাচ্ছাদিত শিখররাজি – কেদা-রনাথ, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, মানা, কামেট, হাতি পর্বত, ঘোড়ি পর্বত, দুনাগিরি এবং আরও অসংখ্য শৃংগ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি দ্যুতিময় হীরক হারের মতন অর্ধ দিগন্ত জুড়ে। এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখেই ফ্র্যাংক স্মাইত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যে কোন মানুষই অভিভূত হবেন। ☐

আলোকচিত্র : লেখক

নতুন প্যাকে
নতুন করে
এই মুখখানিই
দেখুন ফিরে

শিঙার

কক্সবাজার : সমুদ্রস্নানের উল্লাস, ঝাউবনের সরোদ

বিশেষ প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম থেকে ৯৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সৈকতনগরী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যনিবাস কক্সবাজার অবস্থিত। কক্সবাজারের মূল আকর্ষণ ৭৫ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমি। সোনালি বালি, কোথাও কোথাও ঝাউগাছের সারি, আদিগন্ত বিস্তৃত ঘননীল সমুদ্র আর সমুদ্রের সমান্তরালে প্রায় ৬০ মাইল লম্বা সবুজ পাহাড়শ্রেণী মিলে এর নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে করেছে রোমানটিক, রহস্যময় এবং অবশ্যই আকর্ষণীয়।

এখানকার পরিবেশ সমুদ্র-স্নান ও সাঁতারের জন্য খুবই উপযুক্ত। কারণ এ এলাকায় হাঙরের উৎপাত নেই। সকালে যখন পাহাড়শ্রেণীর আড়াল সরিয়ে সূর্য ওঠে তখন সমুদ্র আর বেলাভূমি সোনালি রঙে মেতে ওঠে। একটু পরেই সমুদ্রের ঢেউগুলো রূপোলি উষ্ণীষ পড়ে আদিগন্তজুড়ে চোখ ধাঁধান নাচ জুড়ে দেয়। এদিকে সমুদ্রের গর্জনের সংগে তাল মিলিয়ে ঝাউগাছ করুণ সুরে আবহসংগীত রচনা করতে থাকে।

শোনা যায় দুর্ভাগা মোগল যুবরাজ শাহ সুজা বারমা পালিয়ে যান এ পথ ধরেই। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি কিছুদিন অবস্থানও করেছিলেন এখানে। মোগলযুগের পরে জায়গাটা পর্যায়ক্রমে আরাকানি ও ত্রিপুরিদের হাতে শাসিত ও শোষিত হয়েছে। এরপরে পরতগিজরা দখল নেয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ নিজেদের দখল পোক্ত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ অঞ্চলে বারমা থেকে বৌদ্ধ শরণার্থীরা এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার জনৈক ক্যাপটেন কক্সকে (Capt. Cox) এদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থাদি করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। পরে এই বসতি এলাকা তাঁর নামানুসারে কক্সবাজার নামে পরিচিত হয়।

কক্সবাজারে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব দেখা গেলেও হিন্দু এবং মুসলিম প্রভাব কম নেই। বর্তমানে জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান এবং সমাজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। তবে উপজাতীয় বৌদ্ধ যারা রাখাইন বা মগ নামে পরিচিত, তারা এ এলাকার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ জৌলুশ ও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এদের তৈরি বর্ণাঢ্য সুতি ও সিলক কাপড়, চুরুট, সখের মনোহারি দ্রব্য এখনও পর্যটকমাত্রকেই আকর্ষণ করে। তবে বর্তমান

অধুনাতক চাপ ও সমতলবাসাদের আধিপত্যের কারণে উপজাতীদের জীবন নানা চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একটু বা কোণঠাসাও হয়ে পড়েছে তারা।

মহকুমা শহর কক্সবাজার মূলত পর্যটনশিল্পকে ভিত্তি করে খ্যাত হলেও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি বড় কম নয়। এ এলাকা দেশের লবণ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র, সামুদ্রিক মাছ ধরা ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণ আরেকটি বিকাশশীল শিল্প। চিংড়ির চাষ, পানের 'বরজ' ইত্যাদিও এখানকার ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা। সামুদ্রিক মাছের সূত্রে এখন কক্সবাজার পুরো শুকনো মৌসুম জুড়ে (বস্তুত সেপটেমবর থেকে মারচ পর্যন্ত ৭ মাস) দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের ভিড়ে জমজমাট থাকে।

ঐতিহ্যবাহী হোটেল সায়েমান ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের থাকার প্রধান কেন্দ্র। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রয়েছে ৫টি হোটেল, কয়েকটি কটেজ ও রেসট হাউস। প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য রেখে কটেজ ও হোটেলগুলোর নাম রাখা হয়েছে উপল, প্রবাল, তটিনী, লাবণী, তন্ময়, তনিমা, তপতী ও তরংগ। পর্যটনের আবাসগুলোর সুবিধা—খাবারের বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছে করলে নিজেদের রান্নার ব্যবস্থাও করতে পারেন কটেজে। পৃথিবীর সব পর্যটন কেন্দ্রের মত কক্সবাজারে নিত্যাব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি এমন বলা যাবে না।

সমুদ্রকে পুরোপুরি উপভোগের জন্যে সবরকম আয়োজন এখনও নেই। কেবল সৈকত-ছাতা (বিচ আমব্রেলা) আর জীপে সৈকত পরিক্রমার ব্যবস্থা রয়েছে। বলতে গেলে প্রকৃতি ব্যতীত পর্যটকদের আকৃষ্ট করার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি। তদুপরি স্থানীয় অধিবাসীদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পর্যটকদের রুচি ও চাহিদা মেটান সবসময় সম্ভব হয় না। বিদেশি পর্যটকদের প্রিয় সূর্যস্নানে বা দেশি বা বিদেশি মহিলা পর্যটকদের সমুদ্র উপভোগে অনেক সময় বিব্রত হতে হয়। বর্তমান সরকার এসব দিকে অবশ্য নজর দিচ্ছেন।

সমুদ্র ছাড়াও বৌদ্ধ প্যাগোডা ও কেয়াং দর্শন, পাহাড়ী অরণ্য পরিভ্রমণ, পাখি শিকার ইত্যাদির জন্যেও কক্সবাজার অনেকের প্রিয় স্থান।

কীভাবে আসবেন : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে স্থল পথে ২৬১ মাইল, চট্টগ্রাম থেকে ৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত এই সৈকত নগরী। বিমানের চট্টগ্রাম কক্সবাজার নিয়মিত ফ্লাইট ছাড়াও চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা কক্সবাজার সংযোগ ফ্লাইটও রয়েছে। একইভাবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসেরও নিয়মিত সারভিস আছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটে নিয়মিত নানা ধরনের বাস যাতায়াত করে।

আশেপাশে দর্শনীয় স্থান : কক্সবাজার যেমন তেমনি সমুদ্রকেন্দ্রিক আরও আকর্ষণীয় স্থান আশেপাশেই রয়েছে প্রচুর। ৯ মাইল পূর্বে রামু বৌদ্ধ কৃষ্টির জন্যে প্রসিদ্ধ। কেয়াং (বুদ্ধ মন্দির) প্যাগোডা, মঠ ইত্যাদি ঘুরে দেখতে এবং সোনাসহ বিভিন্ন ধাতুতে তৈরি বুদ্ধমূর্তিগুলো দেখতে দেখতে প্রাচীন বৌদ্ধযুগে ফিরে যায় মন। বাঘখালি নদীর তীরে যে মন্দির তাতে ১৩ ফুট উঁচু যে বুদ্ধমূর্তি আছে সেটাই এ অঞ্চলের ব্রোনজনির্মিত সর্ববৃহৎ বুদ্ধমূর্তি।

সোনাদিয়া : কক্সবাজারের বিপরীতে উপকূলবর্তী এই ছোট দ্বীপ যাযাবর পাখির স্বর্গ। দ্বীপের পশ্চিমাংশের বালুকাময় সৈকত শামুকের জন্যে বিখ্যাত।

মহেশখালি : স্পিডবোটে উত্তর পশ্চিমে ৬ মাইল গেলে পাহাড়ের ওপর এই দ্বীপে পৌঁছন যাবে। পাহাড়ের ওপর প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো আদিনাথের মন্দির বিখ্যাত তীর্থস্থান।

হিমছড়ি : ১১ মাইল দক্ষিণে হিমছড়ির প্রাকৃতিক দৃশ্য অবিস্মরণীয়। পিকনিক এবং পাখি শিকারের জন্যে এ অঞ্চল আদর্শ। বাঁশঝাড় এবং আমগাছ পাশে রেখে কক্সবাজার বিচ থেকে জীপে হিমছড়ি চলে আসা যায়। এখানে পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার দৃশ্য সবার জন্যেই এক বিরল অভিজ্ঞতা।

টেকনাফ : কক্সবাজার থেকে ৫৭ মাইল দক্ষিণে নাফ নদীর পশ্চিম তীরে এই ছোট পাহাড়ি শহর অবস্থিত। নাফ নদী বাংলাদেশ ও বারমার সীমান্ত। নদীর অপর পারের বারমা এলাকা এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। পথে অনেকক্ষণ ধরে নদী সংগে থাকে। এখানকার নদীতে নৌকোয় ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতাই আলাদা। তীরটা পাহাড়ে বলে নদী অনেক নিচে। দুপাশে ঘন বন। একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে বারমা। লোক বসতির চিহ্ন কম। এখানে কিছুদিন আগেও বরমি জিনিসপত্র পাওয়া যেত – স্যানডেল, কাপড়, চুরুট ইত্যাদি। কিছুকাল অবৈধভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশ সমূহের প্রস্তুত চীনামাটির তৈজসপত্র সুলভে পাওয়া গেছে।

সেন্ট মার্টিন : গভীর সমুদ্রের সত্যিকার স্বাদ নিতে হলে আসা চাই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। পথে দেখবেন সবরকম সামুদ্রিক প্রাণী। বিশেষ করে ডলফিন, উড়ুক্কু মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি। ভবিজ্ঞানী ও সমুদ্র বিজ্ঞানীদের জন্যে এ স্থানের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। □

নীল সাগরের বুকে সোনালী স্বপ্ন : লাক্ষাদ্বীপ

কুমার অজিত দত্ত

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮২। বিকেল সাড়ে চারটা। অবশেষে আমাদের জাহাজ 'এম ভি ভারতসীমা' কোচিন হারবার অর্থাৎ উইলিংডন দ্বীপ ছেড়ে এগিয়ে চলল মাঝদরিয়ার দিকে। এবং ব্যাকওয়াটারগুলোকে পেছনে রেখে প্রবেশ করল আরব সাগরের মূল স্রোতে। এখানে আরব সাগরের রং একেবারে ঘন নীল। শীতের সময় আরব সাগর মোটামুটি শান্ত থাকে. জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে দিগন্ত ও সাগরের মিলন লক্ষ্য করছিলাম। বিশাল এই সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অব্যক্ত আবেগে চোখে জল এসে গিয়েছিল। শরীর ও মন গভীর প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আমরা কেবিনে ফিরে এলাম। চারতলা বিশিষ্ট জাহাজটা যেন ছোটখাট একটা আধুনিক হোটেল। সাপার সেরে রাতের সাগর দেখার জন্যে পুনরায় জাহাজের ছাতে উঠে এলাম। সাগরের গর্জন ছাড়া কিছুই চোখে এল না। চারদিকে শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

'লাক্ষা' মানে একরকম লোহিত বর্ণের নির্যাস বিশেষ। এই নির্যাসই লাক্ষাদ্বীপ উৎপত্তির মূল উপাদান। দ্বীপের ক্লাসিফিকেশনে লাক্ষাদ্বীপকে প্রবাল দ্বীপের দলে ফেলা যায়। সাগরগর্ভে যে অংশের উত্তাপ ৬৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি, অসংখ্য প্রবালকীটের দেহ নিঃসৃত রস বালি, কাদা ও অসংখ্য মৃত প্রবালকীটের শক্ত দেহের সংগে মিশে গিয়ে স্তরে স্তরে শিলার রূপ নিয়ে, জমতে জমতে একদিন সাগরের ওপরে ভেসে ওঠে। লাক্ষা দ্বীপের জন্ম এভাবেই হয়েছে। আন্দামানের মত লাক্ষাদ্বীপের কোথাও মাটি, বনাঞ্চল বা পাহাড় নেই। শুধু বালি, হলুদ রঙের বালি। এই হলুদ বালি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য নারকেল গাছ, মাঝে মাঝে দু একটা কলা,পেঁপে গাছ।

লাক্ষাদ্বীপ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন টেরিটরি। এই ইউনিয়ন টেরিটরি মোট ২৭টি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে দশটিতে মানুষের বসবাস রয়েছে, বারটি জনবসতিশূন্য আর বাকি পাচটি সংলগ্ন ক্ষুদ্র দ্বীপ। যে দশটি দ্বীপে মানুষের বসবাস রয়েছে সেগুলো হচ্ছে - এনদ্রুত, মিনিকয়, কাভারাত্তি, কদমত, আগাত্তি, আমিনি, কাল্পেনি, কিলটন, চেতলাত ও বিত্রা। এই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্বীপগুলো আরব সাগরের বুকে কেরলের পশ্চিম উপকূলে ২০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এবং প্রত্যেকটি দ্বীপের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ১১ থেকে ৩০৮ কিলোমিটার। এইসব দ্বীপের জলবায়ু ও আবহাওয়া পশ্চিম উপকূলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সমতুল্য।

লাক্ষাদ্বীপের লোকসংখ্যাও নগণ্য। সমগ্র লাক্ষাদ্বীপের লোকসংখ্যা ৪০ হাজারের মত। সবচেয়ে বড় দ্বীপ এনদ্রুতের লোকসংখ্যা সাড়ে ছ হাজার আর সবচেয়ে ছোট দ্বীপ বিত্রার লোকসংখ্যা ১১০। সমগ্র লাক্ষাদ্বীপের আয়তন ৩২ বর্গ কিলোমিটার। এনদ্রুতের আয়তন ৪.৮ বর্গ কিলোমিটার আর বিত্রার ০.১ বর্গ কিলোমিটার। লাক্ষার ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন সব দ্বীপগুলোতে আদিবাসীরা একপ্রকার দ্বীপান্তরিত হয়েই জীবনযাপন করেন।

লাক্ষাদ্বীপের আয়ের সিংহভাগই আসে নারকেলের শুকনো শাঁস, নারকেলের ছোবড়া, শুকনো মাছ ও টিনড ফিশ থেকে। এবং এগুলিই লাক্ষার অধিবাসীদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন।

লাক্ষার সরকারি অফিস, স্কুল জুনিয়র কলেজ ও টিনড ফিশ ফ্যাক্টরিতে মেইন ল্যানডের অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয়রাই বেশির ভাগ কাজকর্ম করেন। স্থানীয় দ্বীপবাসীরাও রয়েছেন কিছু কিছু। দ্বীপে সব কিছুই সরকারি তত্ত্বাবধানে চলছে। সেখানে প্রাইভেট বলে কিছু নেই। শিক্ষাদীক্ষা দ্বীপবাসীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিনামূল্যে গ্রহণ করার সুযোগ পান। সরকারি কর্মী ও শিক্ষকরা নির্ধারিত বেতনের বাইরেও অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। সরকারি পরিচালনায় সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপগ্রহ যোগাযোগ কেন্দ্র (satellite earth station), হাসপাতাল, সিনডিকেট ব্যাংক, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, হাই স্কুল, জুনিয়র কলেজ, পোস্ট অফিস ইত্যাদি রয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই জাহাজের ছাতে এসে দাঁড়ালাম। পূব আকাশ লাল হয়ে এসেছে। একসময় এক লাফে সাগরের বুকে আগুন লাগিয়ে উঠে এল নবীন সূর্য। সে এক চোখ জুড়ান দৃশ্য। কারগো সুপারিনটেনডেন্ট এসে খবর দিল ২.৩ ঘন্টার মধ্যে আমরা মিনিকয় দ্বীপের কাছাকাছি যাচ্ছি। মিনিকয় দ্বীপের দিকে যাবার পথে নাম না জানা দুটি ক্ষুদ্র দ্বীপ চোখে পড়ল।

প্রায় আটটা নাগাদ আমাদের জাহাজ নোঙর তুলল প্রায় মাঝ সাগরে। লাক্ষার দ্বীপগুলোর চার পাশে সাগরের পৃষ্ঠে বা নিচে দু তিন মাইল জুড়ে প্রবাল নির্মিত বড় বড় কঠিন শিলা বা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। সেজন্যে কোন জাহাজ দ্বীপের জেটিতে এসে নোঙর তুলতে পারে না, মাঝসাগরেই নোঙর তোলে। ওখান থেকে লনচে করে জেটিতে আসতে হয়। লনচে সাগর ভ্রমণ, সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সাগরের জল কোথাও নীল, কোথাও সবুজ। (আসলে সাগরের জল নীল বা সবুজ নয় সাগরের তলদেশ নীল বা সবুজ।) চারদিকে শুধু নীল আর সবুজের খেলা। সাগরের জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে যে রোদ আমাদের গায়ে এসে পড়ছে তাও নীল। আমাদের শরীরও নীল হয়ে গেল। সাগরের টলটল জলের ভেতরে পরিস্কার দেখা যায় প্রবাল শিলা বা প্রবাল প্রাচীরগুলোকে। মিনিকয় দ্বীপের জেটিতে এসে যখন পৌছলাম তখন প্রায় দশটা।

দ্বীপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সায়গল

মিনিকয় দ্বীপে নেমে সরকারি সার্কিট হাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম মিনিকয়ের গ্রামগুলো পরিদর্শন করতে। তার আগে সৌভাগ্যবশত লাক্ষাদ্বীপের অ্যাডমিনিসট্রেটর উমেশ সায়গলের সংগে আমাদের পরিচয় ও করমর্দন হয়েছে। তিনি একই জাহাজে মেইন ল্যানড থেকে কাভারাত্তি ফিরছেন।

আয়তনে এনদ্রুতের পর মিনিকয়ের স্থান। দশটি গ্রাম নিয়ে মিনিকয় দ্বীপ। নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামগুলো গড়ে উঠেছে। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। লাক্ষাদ্বীপের সাংস্কৃতিক আদিবাসী বলতে এরাই। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপগুলোর আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংগে এই দ্বীপের আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির কোন মিল নেই। (মিনিকয় ছাড়া অন্যান্য দ্বীপগুলোর আদিবাসীরা দক্ষিণ ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং মালয়ালাম ভাষায় কথা বলেন। অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষরা এক সময় দক্ষিণ ভারত থেকেই এখানে এসে নয়া বসত গড়ে তুলেছিলেন। এবং এরা সবাই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।) মিনিকয়ী সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। এরা 'মাহল' ভাষায় কথা বলেন। 'মাহল' ভারতীয় কোন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না। পৃথক রাষ্ট্র মালদ্বীপ পুঞ্জের ভাষা ও সংস্কৃতির সংগে মিনিকয় আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতির মিল রয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

গ্রামের বাড়িগুলো বেশির ভাগ কাঠ দিয়ে তৈরি। যারা অবস্থাপন্ন তাদের বাড়িগুলো খোদাই করা কাঠ দিয়ে সাজান রয়েছে। টালির ব্যবহার খুব বেশি। প্রবাল শিলা দিয়েও কেউ কেউ বাড়ি তৈরি করেছে। কোন কোন বাড়ির স্থাপত্য অনেকটা জাহাজের মত। সাগর যে এদের জীবনে ওতপ্রোত, এটাই তার প্রমাণ। যেহেতু লাক্ষাদ্বীপে বাঁশ গাছ উৎপন্ন হয় না সেহেতু এখানে কোন বাঁশের বাড়ি নেই। নারকেল পাতার বেড়া তৈরি করায় মিনিকয়ীরা ভীষণ নিপুণ। লাক্ষার অন্যান্য দ্বীপগুলোর মত মিনিকয়েও গরিব নেই। সবাই মোটামুটি সচ্ছল। তবে শিক্ষিতের হার এদের মধ্যে খুব কম। লেখাপড়া শেখার প্রবণতাও নেই। মিনিকয়ীরা গোঁড়া মুসলমান। প্রতিটি গ্রামে একটি করে মসজিদ রয়েছে।

মিনিকয়ী মহিলারা সোনার অলংকার পরতে খুব ভালবাসেন। অবশ্য খুব রক্ষণশীলা। নৃত্য গীত বা কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া মিনিকয়ী মহিলাদের পক্ষে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নৃত্য গীতের অনুষ্ঠানে কেবল মিনিকয়ী পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। মিনিকয়ী পুরুষরা 'লাওয়া' ও 'কলকল' লোকনৃত্যে খুব পারদর্শী। মিনিকয়ী মহিলাদের পোশাক অনেকটা আরবী মহিলাদের পোশাকের মত। মাথায় এক টুকরো কাপড়ের আচ্ছাদন থাকে। পুরুষদের পোশাক আমাদের মতই। মিনিকয়ী পুরুষরা নৌ-চালনাতেও খুব দক্ষ।

রাম্মেদ গ্রামের হোসেন মানিক ও কুদেহি গ্রামের মোহম্মদ মুদিনের বাড়িতে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলাম। হোসেন মানিক ও মোহম্মদ মুদিনের ঘরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

মিনিকয়ীরা আমাদের মত খাট পালং ব্যবহার করেন না। কাঠ দিয়ে তৈরি উঁচু বেদির মত জায়গায় ওরা বিছানা পাতেন। দোলনাখাটও ব্যবহার করা হয়। মিনিকয়ী সংস্কৃতির আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কন্যার বিবাহের পর কন্যাকে দান করা শয্যার তোষকটা পিত্রালয়েই থেকে যায়। এবং সেই তোষক সযত্নে রক্ষিত হয়। হোসেন মানিকের বাড়ির একটি বিশেষ স্থানে আমরা এ রকম ছ খানা তোষক স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে দেখলাম। এই ছ'খানা তোষক এই নির্দেশ করে যে, সে বাড়ির ছয় কন্যার বিবাহ হয়েছে। মোহম্মদ মুদিনের দুই বোন আমাদের দেখে যে কোথায় লুকোল খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরাও নাছোড়বান্দা। ওদের রান্নাঘর থেকে ধরে নিয়ে এসে ফটো তুললাম। মোহম্মদ মুদিনও আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন। মোহম্মদ মুদিন কুদেহি গ্রামের একমাত্র গ্র্যাজুয়েট।

মিনিকয়ের প্রতিটি গ্রামে একটি করে ভিলেজ হাউস ও মসজিদ রয়েছে। ভিলেজ হাউসগুলোর কাজ হল গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা। মিনিকয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে আন্তর্জাতিক জলপথ। প্রায় চারশ বছর আগে থেকে মিনিকয়ের বাতিঘরটি আলো দেখিয়ে আসছে সাগর ভাসা জাহাজী নাবিকদের। মিনিকয়েই স্যাটেলাইট আরথ স্টেশন, একটি টিনড ফিশ ফ্যাক্টরি, সিন্ডিকেট ব্যাংক, একটি হাসপাতাল, পোস্ট অফিস ইত্যাদি রয়েছে।

বিকেল চারটা নাগাদ আবার লনচে করে ফিরে এলাম জাহাজে। সারারাত্রির জন্য আবার সাগরের বুকে ভাসা।

পরদিন সকাল। কাভারাত্তি এসে পৌঁছলাম। কাভারাত্তি লাক্ষা ইউনিয়ন টেরিটরির হেড কোয়ার্টার অর্থাৎ রাজধানী। কাভারাত্তির আয়তন ৩.৬ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৬,১০৪। এখানে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং গেস্ট হাউস, টুরিস্ট হোম, বড় হাসপাতাল, একটি জুনিয়র কলেজ রয়েছে। সারা লাক্ষাদ্বীপে জুনিয়র কলেজ বলতে একটাই। (প্রতিটি দ্বীপে জুনিয়র ও সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং হাই স্কুলও রয়েছে।) লাক্ষাদ্বীপে স্থল পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনও পড়ে না। কয়েকটি সরকারি জীপ এবং জুনিয়র কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি মিনিবাস রয়েছে। এই মিনিবাসে চড়েই আমরা কাভারাত্তির বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরু সরু বাঁধান রাস্তা। কাভারাত্তিতে একটি এগরিকালচারাল ফারম রয়েছে।

কাভারাত্তির উজরা মসজিদ

এখানে মেইন ল্যানড থেকে মাটি ও সার এনে শাকসবজি ফলান হয়। (লাক্ষাদ্বীপে ফল কিংবা ফুল ফলাতে হলে মেইন ল্যানডের মাটির প্রয়োজন হয়।) সম্প্রতি কাভারাত্তিতে সাগর তরংগ বা জোয়ার ভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট আরথ স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। কাভারাত্তিতে 'উজরা' নামে ছয়শত বছরের প্রাচীন একটি মসজিদ রয়েছে।

এরপর আমাদের যাত্রা কালপেনি দ্বীপের উদ্দেশে। কালপেনিতে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। কালপেনির আয়তন ২.৩ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২,৬০০। এখানে নারকেল গাছগুলো প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নারকেল গাছগুলোও ছোট ছোট। যখন আমরা কালপেনিতে ঢুকলাম, ওপরের আকাশ দেখতে পেলাম না। অসংখ্য কচি সবুজ নারকেল পাতা আকাশটাকে ছেয়ে আছে। এখানকার আদিবাসীরা নারকেল কাঠ ও প্রবালকীটের শিল্পদ্রব্য তৈরিতে নিপুণ। এখানে সরকারি পরিচালনায় একটি হ্যানডিক্রাফট ইনডাসট্রি রয়েছে। নারকেলের মদ তৈরিতেও কালপেনির আদিবাসীরা ওস্তাদ। এখানে গেঞ্জি তৈরি করার জন্য ছোটখাট একটি হোসিয়ারি রয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। কালপেনিকে আর সময় দেওয়া গেল না। ফিরে এলাম জাহাজে। লনচে করে ফিরে আসার সময় দেখলাম দূরে কালপেনির লাইটহাউস জ্বলে উঠেছে। আলোর হাতছানি ঘুরছে চারিদিকে।

লাক্ষাদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে বোঝায় সাগরের সোনালী বেলাভূমি ও তার পাশে অসংখ্য নারকেল গাছের সারি। বেলাভূমির হলুদ বালিগুলোকে সূর্যের প্রখর আলোতে মনে হয় রাশি রাশি সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল। সেই সোনালী বালুকাবেলায় ফণা উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীল সাগরের দুরন্ত ছোবল। বিস্তীর্ণ সোনাবেলা আর নারকেলবীথির জন্য বিখ্যাত বাংগারাম দ্বীপ। লাক্ষার এই লোকবসতিশূন্য দ্বীপটি বিদেশি টুরিসটদের কাছে স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। বাংগারামে বিদেশিদের জন্য পাঁচখানা টুরিসট কটেজ রয়েছে। এই দ্বীপে ভারতীয় টুরিসটদের প্রবেশ নিষেধ।

সাগরের লেগুন অর্থাৎ উপহ্রদ লাক্ষাদ্বীপের আরেকটি অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সাগরের কোন বিস্তীর্ণ অংশে প্রবাল-শিলা জমতে জমতে সাগরপৃষ্ঠের কাছাকাছি চলে আসে এবং কোথাও কোথাও প্রাচীর বা বলয়ের আকার ধারণ করে। সেইসব অংশে সাগরের জল, মূল স্রোতের সংগে যোগাযোগ থাকলেও, অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সাগরের এই আবদ্ধ জলকেই বলে লেগুন। মিনিকয়, কদমত ও কাভারাত্তির একেবারে কাছেই রয়েছে এই সব লেগুন। বাংগারাম দ্বীপটি লেগুনের মাঝখানেই অবস্থিত।

কাভারাত্তির কাছেই বিত্রা থেকে ছোট পিত্তি নামে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে যাওয়া যায়। কাভারাত্তি থেকে লনচে যেতে হয়। এই দ্বীপটি পক্ষীনিবাস বলে বিখ্যাত। নানা রকমের সামুদ্রিক পাখি এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ।

আমাদের জাহাজ মুখ ঘুরিয়েছে কোচিনের দিকে। এবার ফিরে যাবার পালা। লাক্ষা সরকারের পরিবহন বিভাগের বেঁধে দেওয়া তিনদিনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাক্ষার সব দ্বীপগুলো সফর করা একেবারে অসম্ভব। □

প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাস, গ্রীস, ফ্রানস হয়ে রাষ্ট্রসংঘে

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও থারটি সিকস চৌরঙ্গি লেন

নিকোসিয়া, ২১ সেপটেমবর : মাননীয় অতিথি হিসেবে সাইপ্রাসের প্রতিনিধিসভায় বক্তৃতা দিতে ঢুকলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ঢোকার সংগে সংগে প্রতিনিধিরা তাঁকে তুমুল হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানালেন।

বক্তৃতা দিতে উঠলেন শ্রীমতী গান্ধী। বক্তৃতা প্রসংগেই তিনি বললেন, 'আমাদের মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'

সাইপ্রাসে প্রধানমন্ত্রীর আজকের সারা দিনটিই ছিল কর্মব্যস্ততায় ঠাসা। এতটুকু অবসর নিতে পারেননি। সকালবেলা প্রায় দেড়-ঘণ্টা মোটরে যাবার পর তিনি যে পাহাড়ে পৌঁছন সেখানে রয়েছে জাতির পিতা আরচবিশপ ম্যাকারিওসের স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধে ফুলের স্তবক রেখে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি সেই সৌধের সামনে। আরচবিশপের বাড়ি ছিল ছবির মত সাজান এই থোরোনিতেই।

আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কর্মসূচি জওহরলাল নেহরুর নামে খোদিত একটি রাস্তার উদ্বোধন করা। নিকোসিয়ায় সংসদের সামনেই রয়েছে জওহরলাল নেহরুর নামাঙ্কিত এই রাস্তাটি। রাস্তার ফলকে হিন্দি ভাষায় জওহর নেহরু মার্গ কথাটিও খোদিত করা হয়েছে। এখানে মহাত্মা গান্ধীর নামেও আর

একটি রাস্তা রয়েছে।

নিকোসিয়ায় ভিড়ভাট্টা বেশি নেই। অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র দেড় লাখ। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীকে দেখার জন্য কোথাও জনসমাবেশের বিরাম ছিল না। অবশ্য তার মধ্যে অনেকেই ছিল স্কুলের ছেলেমেয়ে। তারা সব জায়গাতেই ভারত ও সাইপ্রাসের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এদের উৎসাহ এমনই আন্তরিক ছিল যে কোথাও কোথাও দেখলাম পুলিশের কবডন ভেঙে অনেকে হ্যানডশেক করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার দিকে ছুটে আসছে। শ্রীমতী গান্ধী তাদের অনেকের সংগে হাত মেলানোর জন্য এগিয়েও যাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে।

এখানকার কাগজগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর সফর বেশ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। প্রথম পাতাতেই শ্রীমতী গান্ধীর একাধিক ছবি দেওয়া হয়েছে, খবরও থাকছে বেশ বড় করে। রঙিন টেলিভিশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃত খবব দেখান হচ্ছে। এমনকি তাঁর সফর উপলক্ষে টি ভি তে এদিন দেখান হল '৩৬ চৌরঙ্গি লেন' ছবিটি।

সাইপ্রাস সরকার প্রধানমন্ত্রীর সফরসংগীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও সমান নজর রেখেছে। সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ২২ জন এই সফরের সংগী হয়েছেন। তাঁদের সকলকেই রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে গণা করা হচ্ছে। হিলটন হোটেলের একটি অংশ প্রেসরুম হিসেবে ব্যবহার করার চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন এরা।

প্রধানমন্ত্রীর সংগে সফর করার জন্য দূরদর্শন, আকাশবাণী এবং সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলি ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে সাতটি সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন হিন্দুস্থান টাইমস, ইনডিয়ান একসপ্রেস, ন্যাশনাল হেরালড, পি টি আই, ইউ এন আই, ডেকান ক্রনিকল এবং পরিবর্তন-এর সাংবাদিকরা। সারা ভারতে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে পরিবর্তন-ই একমাত্র এই সুযোগ পেয়েছে। □

সাইপ্রাস : এক নজরে

রিজোকারপাসো
লেফকোনিকো
নিকোসিয়া
ফামাগুস্তা
লারনাকা
ট্রোডো পর্বত
ভূমধ্যসাগর

রাষ্ট্রীয় নাম : সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র। গ্রীক নাম : সাইপ্রিয়াকি দিমোক্রেটিয়া। তুর্কি নাম : সিবরিস কুমহুরিইয়েতি।

আয়তন : ৩,৫৭২ বর্গ মাইল

জনসংখ্যা : আনুমানিক ৬৩৫,০০০ (বৃদ্ধির হার ০.৮ শতাংশ)

রাজধানী : নিকোসিয়া

মুদ্রা : সাইপ্রাস পাউনড

ভাষা : গ্রীক, তুরকি, ইংরেজি

ধর্ম : গ্রীক অরথোডকস, মুসলিম

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য

প্রধান উৎপাদন : মদ, জুতো, বস্ত্র, সিমেনট, অ্যাসবেসটস

প্রাকৃতিক সম্পদ : তামা, অ্যাসবেসটস, জিপসাম, নুন

রপ্তানি : অ্যাসবেসটস, তামা, রেসিন

আমদানি : যন্ত্রপাতি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, পেটরোলিয়াম, খাবার-দাবার

সাইপ্রাসের ব্যবসা প্রধানত বৃটেন, সৌদি আরব, ইতালি, গ্রীস, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, লেবানন এবং লিবিয়ার সংগেই চলে।

পর্যটক ইন্দিরা

অজ্ঞাত সৈনিকদের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য

এথেনস, ২৪ সেপটেমবর : আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেন এক আগ্রহী পর্যটক। পরম আগ্রহ নিয়ে তিনি গ্রীসের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। অ্যাক্রোপোলিস দেখার জন্য এসময় পৃথিবীর আরও অনেক পর্যটকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা উত্তেজনা। সকলেই আবিষ্কার করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদেরই মত একজন দর্শক। শুক্রবার বিকেলের পর্যটকরা তাই আলাদা একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন।

শ্রীমতী গান্ধী এদিন সালোয়ার-কামিজ পরেছিলেন। সাধারণত

অ্যাক্রোপোলিস-এর সামনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

এমন পোশাক তিনি পরেন না, তবে খাড়া পাহাড়ে ওঠার সুবিধার জন্য এমন পোশাক খুব উপযোগী হয়েছিল। নৃতাত্ত্বিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন তৈরি মিউজিয়মটিও তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন। এখানে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলিকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সরকারিভাবে নানা চেষ্টা চরিত্র হয়েছে, সেটাও লক্ষ্য করার মত।

বিদেশি বিশিষ্ট অতিথিদের সুবিধার জন্য অনেক সময় যেমন সাধারণ দর্শকদের কোন কোন জায়গায় ঢোকা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়, গ্রীস সরকার শ্রীমতী গান্ধীর জন্য তেমন অবশ্য করেনি। ফলে সাধারণ পর্যটকরা গ্রীক পুরাকীর্তি দেখার সংগে সংগে পৃথিবীর এক বিশিষ্ট নেত্রীকেও এক লহমায় দেখে নেবার সুযোগ পেলেন।

শুধু সুযোগই নয়, কোন কোন পর্যটক এমনই রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন যে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে হ্যানডশেক করার জন্য অনেকে একেবারে কাছাকাছি চলে আসেন। অনেকে আবার ঝটপট তাঁর ছবি তুলতেও শুরু করে দেন। এক সময় তিনি মৃদু হেসে বলেই ফেললেন, এ তো দেখছি এখানে এসব দেখতে আসার মূল ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াল ছবি তোলা

শ্রীমতী গান্ধী গ্রীসের সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের জবাব বেশ দক্ষতার সংগেই দিয়েছেন। তবে বি বি সি র সংবাদদাতার আফগানিস্তানে রুশ সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নটি ছাড়া আর কারোর কোন অপ্রীতিকর প্রশ্ন ছিল না। বি বি সি-র সংবাদদাতা রুশ সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বিষয়ে ইন্দিরার মতামত চেয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তার উত্তরে বললেন, আমরা যে কোন দেশের মাটিতে বিদেশি সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিরোধিতা করেছি। আফগানিস্তানও পৃথিবীর বাইরে নয়। আফগান সরকারই এই সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানিয়েছিল। এখন তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে।

আর একটি প্রশ্ন ছিল : ভারত যদি পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার না ই করবে তাহলে পরীক্ষা চালাল কেন? শ্রীমতী গান্ধী সংগে সংগে উত্তর দেন, আদর্শগত এবং বাস্তব উভয় কারণেই আমরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হচ্ছি। তবে আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়ম রক্ষা করেই শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক পরীক্ষা চালান হয়েছে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরেই গ্রীসে ভারতের রাষ্ট্রদূত আর বি

ভারত-গ্রীস দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মুহূর্ত

অয়োরা শ্রীমতী গান্ধীর সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এতে গ্রীসের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীর সংগে পরিচিত হবার জন্য। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আনদ্রিজ স্তি পাপানদ্র ও সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত ছিলেন। বলা যায় অতীতের ঐতিহ্যবাদী এক বিরাট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নক্ষত্র সমাবেশ হয়েছিল এই ভোজসভায়। খ্যাতিমান গায়ক ডায়োনিসাস সাবালাপোলাসের সংগে কথা বলছিলাম এক ফাঁকে। তিনি বললেন, ভারত তাঁর স্বপ্নের দেশ এবং একদিন তিনি ভারতে নিশ্চয়ই গান গাইতে যাবেন। গ্রীস তার প্রাচ্যের শিকড় দ্রুত হারিয়ে ফেলছে দেখে তিনি রীতিমত মর্মাহত। তাঁর মতে, মন এবং মননের দিক থেকে গ্রীস কখনই পাশ্চাত্য-অনুসারী নয়, বরং তা প্রাচ্যের।

বহু আমন্ত্রিত অতিথি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহ দেখান। এই ভোজসভায় এক ফরাসি দম্পতি আমার কাছে জানতে চাইলেন, শ্রীমতী গান্ধীর সংগে তাঁরা হ্যানডশেক করতে পাববেন কিনা। এক গ্রীক দম্পতি তো আমাকে বলেই বসলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা শ্রীমতী গান্ধীকে দেখতে চায়, পরদিন থিয়েটারে কি তাঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে?

শনিবার দিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গ্রীসের আর একটি পুরাকীর্তি দেলফি দেখতে গিয়েছিলেন। পারনাসুস পাহাড়ের নিচে রয়েছে এই অবিস্মরণীয় দেলফি। এখানেই রয়েছে অ্যাপোলোর মন্দির। গ্রীক পৌত্তলিকতার যুগে অ্যাপোলো ছিলেন সূর্যদেবতা। কাব্য, সংগীত, নিদান এবং তীরন্দাজীর তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত দেবতা। □

গ্রীস : এক নজরে

রাষ্ট্রের নাম : ডেমোক্রাতিয়া তিস ইলাদোস।
রাজধানী : এথেনস।
জনসংখ্যা : আনুমানিক ৯৭ লাখ।
জনবৃদ্ধির হার : আনুমানিক ০.৭ শতাংশ।
ভাষা : গ্রীক।
রাষ্ট্রপ্রধান : রাষ্ট্রপতি।
ধর্ম : গ্রীক অবথোডকস।
প্রধান খনিজ : আকরিক লোহা, বকসাইট, দস্তা, সিসা, রুপো, ম্যাংগানিজ।
প্রধান কৃষি : গম, শাকসবজি, আলু, আঙুর, বারলি, মেইজ, তুলো, অলিভ তেল।
উৎপাদন : বস্ত্র, পেটরোলিয়ম, জাহাজ, ইস্পাত।
আমদানি : মাংস, কয়লা, তেল।
রপ্তানি : তামাক, ফলমূল, তুলো।
জাতীয় সংগীত : এথনিকোস হিমোস (স্বাধীনতার জয়গান গাই)।

ফ্রানসে ইন্দিরা : রাষ্ট্রপতি মিতেরাঁ নিজেই স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন

প্যারিস, ২৫ সেপটেমবর : আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্যারিসে এসে পৌঁছলেন। ফ্রানসে অবশ্য এটা তাঁর রাষ্ট্রীয় সফর নয়। ফরাসি রাষ্ট্রপতি এইচ এন মিতেরাঁ-র বিশেষ আমন্ত্রণে নিউ ইয়রকে যাবার পথে তাঁর এই যাত্রা-বিরতি। বিমানঘাঁটিতে নামার সংগে সংগে তাঁকে গারড অব অনার দেওয়া হয়। ফরাসি মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য বিমানঘাঁটিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য এসেছিলেন।

রবিবার, তাই প্যারিস শহর একেবারে শুনশান। জ্বলজ্বলে সূর্যালোক যেন ভারতীয় অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য তৈরিই ছিল। সন্ধ্যেবেলা রাষ্ট্রপতির সংগে দেখা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ঠিক দরজার মুখটিতেই দাঁড়িয়েছিলেন।

প্যারিসের ভারতীয় কূটনীতিকরা শ্রীমতী গান্ধীর এই সফরে খুবই আশান্বিত। তাছাড়া দুই নেতার মধ্যে আলোচনাও বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ফরাসি সাহায্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে আছে। দুটি দেশ নানান ব্যাপারে খুব কাছাকাছি এসেছে। এর মধ্যে আছে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক দিক। শক্তি, পরিবেশ, রেলওয়ে, মহাকাশ গবেষণা এবং পর্যটন তো আছেই।

প্যারিসের ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র আমাকে বললেন, ভারত এবং ফ্রানসের মধ্যে বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দুটি দেশই বেশ কয়েকটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, পারস্পরিক বোঝাপড়াও পরিষ্কার। ধাতুবিদ্যা, টেলিকম্যুনিকেশন, শক্তিবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিক ব্যাপারে অনেকগুলি চুক্তি দুদেশের মধ্যে আগেই হয়েছে। ভারত-ফ্রানস যৌথ কমিটি এবং কয়েকটি কার্যনির্বাহক গোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্যে প্রত্যেক বছর আলোচনায় বসে। আলোচনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নয়া দিলি আর প্যারিসে বসে। ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি ভারত-ফরাসি যৌথ কমিটির পরবর্তী আলোচনা-সভা বসবে সম্ভবত প্যারিসে। এ প্রসংগেই বলা যায় ১৯৮০ সালে ভারত ও ফ্রানসের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি ৪২ লাখ ৬৭ হাজার ফ্রাংক। ১৯৮২ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৭৯৭ কোটি ১৭ লাখ ৬৫ হাজার ফ্রাংকে।

মিতেরাঁ

শ্রীমতী গান্ধী

ইদানীং ফ্রানস সূক্ষ্মতম আধুনিক যন্ত্রপাতির একটা বড় উৎস। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস আর টেলিকমিউনিকেশনের কথা তো আগেই বলা দরকার। ফ্রানসের সরকারি সংস্থা সি আই টি-আলকাতেল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা গড়ে তুলছে গোণ্ডায়। খুব শীঘ্রই আরও দুটো কারখানা তারা গড়ে তুলবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই তিনটে কারখানা শেষ হলে ভারত টেলিকমিউনিকেশন পদ্ধতি পুরোপুরি করায়ত্ত করতে পারবে। শুধু তাই নয়, হয়ত তা বাইরেও রপ্তানি করতে পারবে বলে অনেকের বিশ্বাস।

ফ্রানস ওড়িশায় নির্মীয়মাণ বিশাল আলুমিনিয়াম কারখানাতেও সহযোগিতা করছে। অয়েল অ্যানড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের বিভিন্ন কাজেও ফ্রানসকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা গেছে। এ ছাড়া কয়লা খনিতে আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ, জীবাণু নিরোধক টিকা তৈরির প্রকল্প, বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্র তৈরি এবং সমুদ্রবিজ্ঞানে সহযোগিতার জন্য ফরাসি সাহায্য নিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে।

১৯৮২ সালের নভেমবর মাসে ফরাসি রাষ্ট্রপতি মিতেরাঁ-র ভারত সফরের সময় ভারত-ফ্রানস অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিষয়টি অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছিল, কেননা এ সময় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে দুদেশের মধ্যে আলোচনা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। সূক্ষ্মতম আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ভারতের ক্রমবর্ধমান দাবি এবং তা স্বীকরণের ক্ষমতা মেনে ফ্রানস ন্যূনতম শর্তের ভিত্তিতে সরবরাহে স্বীকৃত হওয়ায় আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরে ভারত ফ্রানস আর্থিক সহযোগিতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

ভারতের সংস্কৃতির কয়েকটি ব্যাপারে ফরাসি জনগণ বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত এবং নাচও রয়েছে। ১৯৮৫-র সেপটেমবর থেকে ১৯৮৬ র মারচ মাস পর্যন্ত ফ্রানসে একটি ভারত উৎসব করার জন্য ভারত এবং ফ্রানস উভয় সরকারই একমত হয়েছে। এই উৎসবে ধ্রুপদী শিল্প, বয়নশিল্প, লোকশিল্প এবং সমসাময়িক চিত্রশিল্প ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ব্যাপার এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া উৎসব চলার সময় ভারতের কয়েকটি শ্রাব্য শিল্পও অনুষ্ঠিত হবে।

এবার জানাই জি. আর. এস.* কিভাবে নতুন প্রেস্টীজকে একমাত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রেশার কুকার করে তুলেছে

নতুন

প্রেস্টীজ

গাসকেট রিলিজ সিস্টেম

Patent pending

১০০% নিরাপদ

Prestige
PRESSURE COOKER

জি. আর. এস. কি ?
গাসকেট রিলিজ সিস্টেম এমনই এক অভিনব উদ্ভাবিত ব্যবস্থা যার ফলে প্রেশারে রান্না করা জল গরম করার মতোই নিরাপদ হয়ে গেছে। ঢাকনার রাবার গাসকেটের ওপরে খাঁজ থাকার ফলে ভাপ যখন বিপদসীমায় পৌঁছায় তখন তা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে। জি. আর. এস. ব্যবস্থা নতুন প্রেস্টীজকে একমাত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রেশার কুকার করেছে।

কি ভাবে তা কাজ করে ?
সব প্রেশার কুকারই তাড়াতাড়ি রান্নার জন্যে ভাপের সাহায্য নেয়। কখনো কখনো প্রয়োজনের তুলনায় ভেতরে বেশী ভাপ তৈরী হতে পারে। সাধারণ অবস্থায় ঢাকনার ওপরের ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। এই ফুটোটি যদি খাবার জমে আটকে যায় তবে কুকার ফেটে যেতে পারে।

হঠাৎ কোনও কারণে ভাপের চাপ বৃদ্ধি পেলে নতুন প্রেস্টীজ-এর জি. আর. এস. ব্যবস্থার ফলে রাবার গাসকেটটি বেড়ে যায় এবং তা খাঁজের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে ভাপ বের হয়ে যেতে দেয়—সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে।

?

জি. আর. এস. কেন অত্যাবশ্যক ?
যখন আপনার সেফটী প্লাগ পাল্টাচ্ছেন তখন হয়তো আপনি নকল প্লাগ কিনতে পারেন। বিপদের মুহূর্তে এটি কাজ করবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি আসল বা নকল সেফটী প্লাগ চিনতে পারবেন না। কেন সম্ভাবনার শিকার হবেন ? জি. আর. এস. কখনো কাজে ব্যর্থ হয় না।

*গাসকেট রিলিজ সিস্টেম

জি. আর. এস. সাধারণ রান্নার প্রণালীর ব্যাঘাত করে না।

একেবারেই নয়।

আপনাকে যা করতে হবে তা হ'লো, ভাপ একবার বেরিয়ে গেলে একটি চামচের সাহায্যে রাবার গাসকেটটি খাঁজে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে খাঁজটি পরিষ্কার করে নিয়ে ফের ব্যবহার করা।

এমন একটি কুকার যা একটি ছোট বাচ্চাও চালাতে পারবে—জি. আর. এস. নতুন প্রেস্টীজকে এমন ভাবেই তৈরী করেছে।

TTK উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেশার কুকার প্রস্তুত করেছে

maa(S) TTP 3 Ben c 82

ভারত-ফ্রানস সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান কর্মসূচি অনুযায়ী কয়েকটি বিষয় রূপায়ণেও তৎপরতা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে আছে ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রবর্তন, নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে সহযোগিতা, যাদুঘর সংক্রান্ত বিদ্যা ইত্যাদি। একই কাঠামোর মধ্যে দুই দেশের বই পরস্পরের ভাষায় অনুবাদ করার এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে।

আগামী দুবছরের মধ্যে নতুন নতুন ক্ষেত্রেও এই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এটাও জানা দরকার। জরজ পঁপিদু সেন-টারে এবছরের প্রথম দিকে তিন মাস ধরে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল তা রীতিমত সফল হয়েছে এটা সকলেই জানেন। ফ্রানসে একটিমাত্র সংগঠন এত দীর্ঘ দিন ধরে বিদেশি চলচ্চিত্র আর কখনও দেখাননি।

তবে ফ্রানসের সংগে সম্পর্ক তৈরিতে ভারতের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ প্রতিরক্ষা প্রশ্নটি ঘিরেই। ভারত সরকার ১৯৮২ সালে প্রতি-রক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফ্রানসের সংগে একটি বোঝাপড়ার চুক্তি করেছে। ফ্রানস থেকে ভারতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র-পদ্ধতি, প্রতিরক্ষা দক্ষতা এবং প্রযুক্তি সরবরাহে সহযোগিতার জন্য দুই সরকার তাদের একান্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে এই চুক্তিতে। ফলে দুটি দেশই এখন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি খুঁজে দেখছে এবং গত বছর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ব্যাপারে দু দেশের মধ্যে যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য রকম বেড়েও গেছে। আবার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, মিরেজ ২000 বিমান সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি-স্বাক্ষর। এর মধ্যে বিমানের ডিজা-ইন এবং বিমান সরবরাহ দুই-ই আছে। সেই সংগে আছে তার রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিরও শিক্ষা। এছাড়া মহাকাশ কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সহযোগিতার বিষয়টি রয়েছে। চুক্তির ফলে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসাররা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ফরাসি প্রতিরক্ষা স্কুলগুলিতেও যেতে পারবেন বলে ঠিক হয়েছে। নয়া দিললির ন্যাশনাল ডিফেনস কলেজে ইতোমধ্যে ফরাসি বিমান-বাহিনীর একজন অফিসার একটি পাঠক্রমও চালাচ্ছেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর টেসট পাইলটরা এবং ফ্লাইট টেসট ইনজিনিয়াররা ফরাসি বিমানবাহিনীর শিক্ষাপ্রতি-ষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। প্রতিরক্ষা নিয়ে আরও নানা ব্যাপারে আলোচনার জন্য এবং

মঞ্চে: শ্রীমতী গান্ধী ও ফরাসি রাষ্ট্রপতি মিতেরাঁ

সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য উভয় দেশেই বড় বড় অফিসাররা পারস্পরিক যাতায়াত অব্যাহত রেখেছেন, এটা লক্ষ্য করা গেছে। দু দেশের বিমানবাহিনী প্রধানরাও পরস্পরের দেশে ঘুরে গেছেন।

প্রতিরক্ষা কর্মীরা ছাড়াও ভারতের গবেষণা ও উন্নয়ন সংগঠন এবং নির্মাণ সংস্থাগুলির অনেক বিজ্ঞানী ও ইনজিনিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য নতুন উৎপাদনে প্রযুক্তিগত পরামর্শ, উচ্চতর প্রযুক্তি কৌশল আয়ত্ত করার জন্যও ফ্রানস ঘুরে গেছেন। এই সংস্থাগুলির মধ্যে আছে অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপ মেনট এসট্যাবলিশমেনট, গ্যাস টার বাইন রিসারচ এসট্যাবলিশটমেনট, হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড, আই এন এ এস ইনটিগ্রেশন অরগানাইজেশন এবং টারমিনাল ব্যালিসটিক রিসারচ অরগানাইজে-শন ইত্যাদি। সকলেই জানেন, সেনাবাহিনীর হাতে আধুনিক সর-ঞ্জাম সব সময়ই থাকা চাই এবং তার জন্য দরকার প্রতিনিয়ত আধুনিকতম প্রযুক্তি এবং সরঞ্জামের সংযোজন। ভারত ও ফ্রানসের সহযোগিতা সেদিকেই লক্ষ্য রেখে গড়ে উঠছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী দিন গুলিতে তা বাড়তেই থাকবে। ফলে আমাদের দেশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে ক্রমেই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে।

ফ্রানসের নিজের অর্থনীতিই খুব খারাপ অবস্থায় আছে। আপাত-দৃষ্টিতে অবশ্য সেটা বোঝা যায় না। তেইশ বছর আগেকার আমার দেখা প্যারিসের তুলনায় এ একেবারে নতুন শহর। বহু পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, আর গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। গাড়ির সংখ্যা প্রচন্ড রকম বেড়ে গেছে। কিন্তু ফরাসি জনগণ বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে মোটেই সুখী নন। প্রায় কুড়ি লাখ মানুষ বেকার। আয়করের হার সারা পৃথিবীর মধ্যে এখানেই সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসেন বৃটেন থেকে, তারপরই ছিল ফরাসি পর্যটকদের স্থান। প্রতিবছর প্রায় ৬ হাজার ফরাসি ভ্রমণকারী আসতেন এদেশে। কিন্তু ফরাসি সরকার সম্প্রতি বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কড়াকড়ি করেছেন তাতে ভারতে ফরাসি পর্যটক আসার সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

প্যারিসে শ্রীমতী গান্ধী এবং প্রেসিডেনট মিতেরাঁ-র মধ্যে পার-স্পরিক সম্পর্ক নিয়েই মূলত আলো চনা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক-দের ধারণা, ফ্রানসের সংগে সম্পর্ক দৃঢ় করে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সোভিয়েত নির্ভরতা প্রসংগে সমা-লোচনার ধার অনেকটা ভোঁতা করে দিতে চান। ফরাসি প্রেসিডেনটের সংগে আলোচনায় শ্রীমতী গান্ধী একটি ফ্রেনচ-ইনডিয়া ইনসটিটিউট গঠনের ব্যাপার নিয়েও কথা বলে-ছেন।

ফরাসি রাষ্ট্রপতির সংগে কথা বলার সময় বিকাশশীল দেশগুলিকে অধিকতর আর্থিক সাহায্য দেবার নীতিটি বোঝাতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। ফরাসি রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন বিশ্বব্যাংকের মারফৎ ফ্রানস বিকাশশীল দেশগুলিকে সাহায্যের নীতি চালিয়ে যেতে দায়বদ্ধ এবং তার নিজের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও এরকম সাহায্য সে প্রায় ১৭ শতাংশ বাড়িয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘে ইন্দিরা

শ্রীমতী গান্ধীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে আর একবার বোঝা গেল। বিশ্বের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশের নেতারা তাঁর নেতৃত্বে পুনরায় আস্থা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। নিকারা গুয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন, তাঁর নেতৃত্ব গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন-কে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে। প্যালেসটিন লিবারেশন অরগানাই জেশনের জে এল তারাসি বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর দূরদর্শী এবং ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্ব তুলনাহীন।

২৬ সেপটেমবর রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে সমস্ত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশের নেতাদের উপস্থিতিতে এই আন্দোলনের প্রধান হিসাবে শ্রীমতী গান্ধী মঞ্চের ওপর গিয়ে বসেন। তাঁর পাশে বসে ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিংহ রাও। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণ, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তিস্থাপন, মধ্য আমে রিকার ঘটনাবলি এবং ইরাক ও ইরানের মধ্যেকার বিরোধ সংক্রান্ত প্রসংগগুলি তোলেন। রাজনৈতিক এইসব প্রসংগের পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে তিনি আগামী বিশ্বের, বিশেষ করে উন্নয়নকামী দেশগুলির যথার্থ আর্থিক পথ সুগম করার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মূল প্রশ্নটি তোলেন। দিললির গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ সম্মেলনে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। গুরুত্ব পূর্ণ কর্তব্য হিসেবে তিনি উন্নয়ন-কামী দেশগুলির মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার ওপরও জোর দেন।

রাষ্ট্রসংঘের ৩৮তম সাধারণ পরিষদসভায় একটি অ-সাধারণ ব্যাপার ছিল যে আগে থেকে এখানে কোন আলোচ্যসূচি তৈরি করে রাখা হয়নি। দিললির শীর্ষ সম্মেলনে যেগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল সেগুলিকে কেন্দ্র করেই এখানে আলোচনা শুরু হয়। এখানে কোন প্রস্তাব নেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চিন্তার আদানপ্রদানের কথাই এখানে শুধু ভাবা হয়েছে।

রেগনের সংগে

শ্রীমতী গান্ধীর এবারের সফরের আর একটি সার্থক দিক হচ্ছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রেগ-নের সংগে ফলপ্রসূ আলোচনা। সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবার জন্যে রেগন ২৬ সেপটেমবর নিউ-ইয়রক এসেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী এখানকার ওয়ালডোফ হোটেলে তাঁর সংগে বহুক্ষণ আলাপ-আলো-চনা করেন। আলোচনার সময় মারকিন পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি অব স্টেট জে সুলজ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর উইলিয়ম ক্লারক এবং রাষ্ট্রসংঘে মারকিন প্রতিনিধি প্রমুখ। ভারতীয় পক্ষে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নরসিংহ রাও, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা জি পার্থসারথি, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পি সি আলেকজেনদার এবং পররাষ্ট্রসচিব রাসগোত্র। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, রাষ্ট্রপতি রেগন প্রধানমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎ কারের ইচ্ছাপ্রকাশে আনন্দিত হয়েছেন।

এতেই বোঝা যায়, রেগন গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলন শক্তিশালী আন্দোলন বলেই মনে করেন। রেগন মনে করেন, এই সাক্ষাৎকার আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থা বাড়াবে এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করবে।

শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রী রেগন দুজনেই আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই আলোচনার ফল ভালই হবে। মারকিন রাষ্ট্রপতি অস্ত্রসজ্জা কমা-নর ওপর জোর দেন। শ্রীমতী গান্ধীও আশা প্রকাশ করেছেন, বিশাল শক্তি ও প্রভূত সম্পদশালী মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিবেকের দ্বারা চালিত হবে এবং উত্তেজনা ও অস্ত্রসম্ভার কমিয়ে এক সুখী পৃথিবী গড়ে তুলবে। □

রাষ্ট্রসংঘে ইন্দিরা : অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, অত্যাচার, অসাম্যের বিরুদ্ধে অনুন্নত পৃথিবীর কণ্ঠস্বর

রাষ্ট্রসংঘ, ২৮ সেপটেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়েছেন। এটি ৩৮তম অধিবেশন। সাধারণ পরিষদে রোনালড রেগনের বক্তৃতার পর শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণও কূটনীতিবিদ ও সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দর্শকদের আসন ছিল কানায় কানায় ভর্তি। প্রেস বক্সের অবস্থা তথৈবচ। বিভিন্ন প্লেনারি সভার নিয়ম হচ্ছে, হয় সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান বক্তৃতা করবেন না হয় প্রতিনিধিদলের নেতা বক্তৃতা করবেন। সাধারণ পরিষদের প্লেনারি সভায় অন্য যেসব রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোনালড রেগন, কেপভার্দের রাষ্ট্রপতি অ্যারিসটাইডিস মারিয়া পেরেইরা, নিকারাগুয়া প্রজাতন্ত্রের সামরিক শাসনসংযোগ রক্ষাকারী প্রশাসক কম্যানডার ড্যানিয়েল ওরতেগা সাভেদ্রা, মরক্কোর রাজা হুসেন, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী য়ু বুজিয়েন। এঁরা সকলেই ২৭ সেপটেম্বর বক্তৃতা দিয়েছেন।

নবম প্লেনারি অধিবেশনের প্রথম বক্তাই ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। বক্তৃতার সময় গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বনেতৃত্বের যেন নক্ষত্র সমাবেশ ঘটেছিল। উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মাইকা স্পিলজাক প্রমুখ। বিকেলের প্লেনারি অধিবেশনে এসেছিলেন মিশরের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হুসনি মুবারক।

প্লেনারি অধিবেশন এমন একটি মঞ্চ যেখানে কোন বাধা ছাড়াই বক্তারা তাঁদের খোলাখুলি মতামত জানাতে পারেন। বক্তৃতাগুলি সাধারণত লিখিতই হবার কথা, কিন্তু যে কেউ তাৎক্ষণিক বক্তৃতাও দিতে পারেন। এখানে এমন নিয়মও আছে যে বিভিন্ন প্রতিনিধি বক্তৃতা শেষ করার পর তাঁদের অভিনন্দন জানানর জন্য সকলে হ্যানডশেক করতে এগিয়ে আসেন। কোন অভ্যাগত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হলে তারা এমন বিশ্বাস রাখেন যে শান্তি, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে জাতিতে জাতিতে কোন মতানৈক্য নেই। ব্যক্তিগত স্তরে বিভিন্ন দেশের আগত প্রতিনিধিরা কোন অবিশ্বাস বা ঘৃণা প্রকাশ করেন না। বড় জোর যুদ্ধরত দুটি জাতির প্রতিনিধি দু জন হয়ত নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করেন না কিংবা অতি ঠান্ডা ব্যবহার করেই মুখ ঘুরিয়ে নেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলির সংসদে যেমন কদাকার দৃশ্য দেখা যায় মাঝে মাঝে, তেমন ছবির কথা কেউ এখানে আশংকা করেন না।

এ হিসেবে প্লেনারি অধিবেশনে বেশ আক্রমণাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের সংবাদদাতারা প্রেস বক্সে তাই রেগন, শ্রীমতী গান্ধী অথবা মিতেরাঁ যতক্ষণ বক্তৃতা করেন ততক্ষণ বসেই ছিলেন। নানা বিতর্কিত প্রসংগ উঠছিল। প্রেস বক্সে টিভি সারকিট আছে। প্রেস অফিস বা বিভিন্ন প্রতিনিধিরা প্রেসকে তাঁদের বক্তৃতার কপি ধরিয়ে দেন।

মারকিন রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা কূটনীতিক মহল এবং সংবাদজগতের রীতিমত দৃষ্টি কেড়েছে। নিউ ইয়রক টাইমস প্রথম আধপাতা ছাড়াও রেগনের পুরো বক্তৃতাটি ছাপতে তিন পাতা নিয়ে নিয়েছে। সেখানে কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধিদের সামনে দেওয়া বক্তৃতাটি নিউ ইয়রক টাইমসে বেরোয়নি। মারকিন রাষ্ট্রপতির সংগে শ্রীমতী গান্ধীর একান্ত আলোচনার খবর অবশ্য কয়েক লাইন বেরিয়েছে এই কাগজে।

রেগনের এই বক্তৃতা অস্বাভাবিকভাবে নরমই ছিল বলা যায়। যেসব দেশের সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আছে তাদের তা এক-দশমাংশে কমিয়ে আনা উচিত। কথাটা বেশ আশ্চর্যের। রেগনের বক্তৃতাকে যদি খণ্ড খণ্ড করে দেখা হয় তবে আলাদা একটা খণ্ডের মানে দাঁড়াবে, রেগন প্রশাসনের পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে একজন প্যাসিফিসট যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তিনি বললেন :

অস্ত্র প্রকৌশল এতদূর এগিয়েছে যে তাতে শান্তি এখন দূর অস্ত। আজকের দিনে পারমাণবিক অস্ত্র-নিয়মে আরও ভয়ংকর বিষয়ের আগমন ঘটছে। পারমাণবিক যুদ্ধ কখনই জেতা যায় না এবং কখনই সে যুদ্ধে নামা উচিত নয়। আমি মনে করি, বিভিন্ন সরকার যদি যুদ্ধ প্রতিরোধ করে তা হলে কখনই যুদ্ধ হবে না। রাষ্ট্রসংঘের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ-নীতির মত আর কোন নীতিতে আমি এতখানি আস্থাশীল নই।

বক্তৃতার অন্য অংশগুলিতে রেগনকে চিনে নেওয়া যায়। বক্তৃতায় অবশ্য কটু কথা কিছু বলেননি কিন্তু অস্ত্র প্রতিযোগিতা চাগিয়ে তোলার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যথারীতি এক হাত নিয়েছেন তিনি। বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের অস্ত্রের মজুত-হিসেব পুরোপুরি লুকোচ্ছে। নতুন আবিষ্কৃত একটি রাডার এবং নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্র (আই সি বি এম) সোভিয়েত সম্পর্কে রীতিমত শঙ্কিত করে তুলেছে।

রেগন গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ কয়েকটি দেশের বিষয়ে বললেন, 'সোভিয়েত ছত্রছায়ায় ওরা ছদ্ম-গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ।' মারকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর দেশগুলিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভাগ করার মিথ্যা নীতিকে মানে না। বাস্তবের দিক থেকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এরকম ব্যাপার অস্বীকার করে। এই দেশ কোন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব তো দেয়ই না, তেমন নীতিতে বিশ্বাসও করে না। 'গণতন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই, যারা নিজেদের স্বাধীন বলেও মনে করে সেই প্রাচ্য হচ্ছে কেন্দ্রশাসিত এক সাম্রাজ্য। আমি বলব সেই কেন্দ্রটি হল মস্কো।'

সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনলাম। নব্বই মিনিট ধরে বক্তৃতা দিলেন। বললেন, পারমাণবিক অস্ত্র জমা হয়ে আছে দুই বৃহৎ শক্তিরই হাতে। নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চলা

সত্ত্বেও পারমাণবিক অস্ত্রের ভয় দেখান কিন্তু চলছেই। তিনি নিরস্ত্রীকরণের জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর বক্তৃতায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম একবারও করেননি তিনি, কিন্তু আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যের উপস্থিতির প্রসংগ তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম করে নিন্দে করলেন এবং এটা যে আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়মের বাইরে সেটাও জানিয়ে দিলেন। আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সেনা সরিয়ে নেবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ও জানাবার দাবি রাখলেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখনই মারকিন রাষ্ট্রপতির আসন্ন এপরিলে চীন সফরের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এই সফরের ওপর বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশেষত তাইওয়ান নিয়ে সম্প্রতিকালে মারকিন-চীন সম্পর্ক একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এ অবস্থায় সফরটির গুরুত্ব তো থাকতেই পারে।

এখানে শ্রীমতী গান্ধীর বহুপ্রতিক্ষিত বক্তৃতাটি ছিল রীতিমত বুদ্ধিদীপ্ত। বক্তৃতার ভাষা ছিল যেন সাহিত্যের অংশ। তবে বক্তব্যের মূল বিষয়টি তা কখনই ক্ষুণ্ণ করেনি। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভয়াবহ অস্ত্র-প্রতিযোগিতার পেছনে দুই বৃহৎ শক্তিকেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সরাসরি সে আক্রমণ করেননি, ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। বললেন, 'নিরাপত্তার নামে দানবিক অস্ত্রপদ্ধতি গ্রহণের প্রতিনিয়ত অন্বেষণ চলছেই। ভারত এবং অন্যান্য গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলি স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে সাধারণভাবে সার্বিক নিরস্ত্রীকরণই প্রকৃত কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা এনে দিতে পারে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি মানবতার কাছে দায়ী। যেকোন পরিস্থিতিতেই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিক না কেন তার আগে প্রথম পদক্ষেপ হবে নিরস্ত্রীকরণের জন্য আলোচনায় বসা এবং সমস্ত রকম পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করা।'

শ্রীমতী গান্ধী নানা প্রজ্বলন্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বক্তব্য রেখেছেন দক্ষিণ আমেরিকা ও নামিবিয়ার জাতিভেদ তত্ত্ব, পশ্চিম এশিয়ার সংকট, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শান্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন হুংকার এবং প্যালেসটিনীয় জনগণের চরম দুর্দশা নিয়ে।

বক্তব্যে আফগানিস্তান প্রসংগও ছুঁয়ে গেছেন তিনি। বললেন, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে কুয়েলার-এর সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী

আফগানিস্তানের জটিল পরিস্থিতিও এই দ্বৈত নীতির ভিত্তিতেই মিটে যেতে পারে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে, 'দুর্বলরা যেমন দুর্বল নয়, শক্তিমানও তেমন শক্তিমান নয়। গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার মূল নীতি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং গঠনমূলক সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটান। এই আন্দোলনে পারস্পরিক হানাহানির কথা অস্বীকার করা হয়। এর অস্ত্যার্থক দিক হচ্ছে অন্য জাতির প্রতি সরকারি গঠনপদ্ধতি নির্বিশেষে বন্ধুত্বের ইচ্ছা। সরকারের পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যাপার। 'মানবিক মূল্যবোধের' উন্নয়ন ব্যতিরেকে যে বস্তুগত প্রগতি সম্ভব নয় সে ব্যাপারটির ওপর জোর দেন। তিনি বলেছেন, নতুন' অর্থনৈতিক সূত্র অর্থনীতি, সমাজ বা সংস্কৃতির ধারায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। সব কিছু নিয়েই এই অর্থনৈতিক সূত্র এমনকি তার চেয়েও বড়। 'আমরা নতুন এক আন্তর্জাতিক মানবিক সংজ্ঞা তৈরি করব, যেখানে সমবেদনার দ্বারা চালিত হবে শক্তি, যেখানে সমগ্র মানবতার কল্যাণেই নিয়োজিত হবে জ্ঞান ও সামর্থ্য।'

অধিবেশনে মেরুন রঙের সুন্দর একটি শাড়ি পরে এসেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। তরুণতর আর উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি যখন অধিবেশনকক্ষে ঢুকলেন তখন ১৫৮টি দেশের উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাঁকে উল্লাসে অভিনন্দিত করলেন।

এই অধিবেশন উপলক্ষে বোমবাই-এর কোমপানি মহেন্দ্র অ্যানড মহেন্দ্র নিউ ইয়রক টাইমস-এ পুরো পৃষ্ঠার এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। জিত পল এই কোমপানির মালিক। বিজ্ঞাপনে শ্রীমতী গান্ধীর একটি ছবি দেওয়া হয়েছে। সংগে রয়েছে টমাস জেফারসনের একটি উদ্ধৃতি, 'সমস্ত জাতির সংগে বাণিজ্য এবং সৎ বন্ধুত্ব কারোর সংগে গাঁটছড়া বাঁধা বোঝায় না।' শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কেও এই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, '১৯৬৭ এবং ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে হেরে যান কিন্তু ১৯৮০ সালের নির্বাচনে জনগণই আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনে অধিষ্ঠানে। ভারতে তাঁর উদ্দেশ্য হল, সামাজিক ন্যায়-বিচারের সংগে সংগে উন্নয়নকে বিকশিত করা, বিশ্বের জন্য তিনি চান জাতিতে জাতিতে শান্তি, মৈত্রী ও অসাম্যের অবসান।'

তাঁর বক্তৃতার দিন ভারতীয়রা দলে দলে রাষ্ট্রসংঘের বাইরে এসে ভিড় করেছিলেন। কয়েকজন খালিস্তানপন্থী শিখ অবশ্য জড়ো হয়েছিলেন প্ল্যাকারড আর তাঁর একটি কুশপুত্তলিকা নিয়ে। সবাই যখন তাঁকে সম্মান দেখাতে উদগ্রীব তখন এই মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন এসেছিলেন তাঁর মাথা হেঁট করিয়ে দেবেন বলে।

তবে স্থানীয় পুলিশ ব্যাপারটায় বিশেষ আমল দেয়নি। রাষ্ট্রসংঘের সামনে এমন ঘটনা আকছার ঘটেই থাকে।

পর দিন, ২৯ সেপটেমবর হোটেল হেমসি-তে শ্রীমতী গান্ধী ভারতীয় সাংবাদিকদের সংগে বসেছিলেন। ভারতীয়দের উদ্যোগে এখানে অনেকগুলো কাগজ বেরোয়। প্রেস কনফারেনসে, সেই সব কাগজের প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন হয়েছিল হৃদ্য পরিবেশে। স্থানীয় ভারতীয় সংবাদ জগৎ শ্রীমতী গান্ধীর কাছাকাছি আসতে পারলেন এই সুযোগে। তাঁরা নানা সাময়িক প্রসংগ তুলেছেন তাঁর কাছে। সেই সংগে অবশ্য তাঁর স্বাক্ষরও সংগ্রহ করেছেন সবাই। কেউ কেউ তো ভিজিটিং কারডটাই বাড়িয়ে দিয়েছেন। সানন্দে সবাইকে স্বাক্ষর দিয়েছেন ইন্দিরা।

বিব্রত করার মতন প্রশ্নও উঠেছিল এখানে। যেমন, 'সব সভ্য দেশই যখন কোরীয় বিমান গুলি করে নামানর নিন্দে করেছে তখন ভারত নীরব কেন?' শ্রীমতী গান্ধী বললেন, 'আগে আমাকে বলুন 'সভ্য' কথাটির অর্থ কী?' ঐ সাংবাদিক তখন বললেন, 'যারা মানবাধিকার মেনে নেয়'। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, 'তারা নিজের দেশের একই ঘটনায় কিন্তু নিন্দে করবে না। পাকিস্তানে, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এমনকি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে যখন মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত তখনও এই একই সমালোচনার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। যখন ভারবাহী প্রশ্নটি আপনি রেখেছেন তখন ভারবাহী উত্তরও আপনার পাওয়া উচিত।'

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সত্য জানতে চান। অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে কয়েকটি কোমপানির শেয়ার হস্তান্তরের সমস্যা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব ক্ষেত্রেই নবাগতদের ব্যাপারে এরকম প্রতিরোধ খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এটা এমন মারাত্মক কিছু নয়। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভারতে যা ঘটছে তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখুন এবং নানা অক্ষমতা সত্ত্বেও তাদের সার্থকতার প্রশংসা করুন।

শ্রীমতী গান্ধী এদিন কুড়িটি জাতির প্রধান ও উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা শুরু করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য নেতা হলেন কানাডার রাষ্ট্রপতি ত্রুদো। অন্যদের মধ্যে ছিলেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী, সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি, নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপ্রধান, যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং পেরুর প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ।

এই আলোচনায় নতুন এক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি গ্রহণ করার কাজটিতে সকলেই সায় দিয়েছেন। ব্রেটেনউড কনফারেনসের পর যে আন্তর্জাতিক কর্মধারা তৈরি হয়েছিল, সকলেই মনে করেন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কেননা এর মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেক পালটে গেছে। এখন এই কর্মধারাকে এমনভাবে চালাতে হবে যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আপসের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিকভাবেই উপকৃত হতে পারে। □

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে -

অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে সাম্প্রদায়িক শক্তি দাঁড়াতে পারবে না ঃ ডঃ কামাল হোসেন

বাংলাদেশের বিগত প্রেসিডেনট নির্বাচনে আওয়ামি লিগের প্রার্থী ছিলেন ডঃ কামাল হোসেন। সে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি বলেই সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত শক্ত হয়েছে। গত আগসট মাসে ঢাকায় পরিবর্তনের সংগে এক সাক্ষাৎকারে এই অভিমত দেন ডঃ কামাল হোসেন। ডঃ হোসেন এখন বিভক্ত আওয়ামি লিগে হাসিনা গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা। পেশায় ব্যস্ত অ্যাডভোকেট এই সাক্ষাৎকারটি দেন তাঁর মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার অফিসে।

পরিবর্তন ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে যে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হয়েছে, আপনি কি মনে করেন তা গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ না এর তেমন কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই ·

ডঃ হোসেন ঃ আমরা পনের পারটি মিলে আমাদের যে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া দরকার তা তুলে ধরেছি। এখন শুধু ঘরোয়া রাজনীতি আমরা ভোগ করছি। দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে আমাদের পূর্ণ রাজনৈতিক কাজকর্মের অধিকার থাকা উচিত।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু বাংলাদেশে ৭0টির ওপর রাজনৈতিক দল, এত রাজনৈতিক দল যেখানে সেখানে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হলেও এত বহুবিভক্ত ও বহুমুখী দল নিয়ে কীভাবে গণতন্ত্র বজায় রাখবেন?

ডঃ হোসেন ঃ এখানে যখনই নির্বাচন হয়েছে তখন দেখা গেছে কাগজে এত দল থাকতে পারে কিন্তু ৩0 বছরের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করেন দেখবেন সংসদে পাঁচ ছটির বেশি দল কখনও প্রতিনিধিত্ব করেনি। ৫0টি দল নির্বাচিত হয়েছে স্থায়ী সরকার গঠন করা যাচ্ছে না এমন অবস্থা কখনও হয়নি।

পরিবর্তন ঃ বাংলাদেশে গণতন্ত্র যে টিকছে না, হঠাৎ গণতন্ত্র অবসান হয়ে একটার পর একটা ক্যু হচ্ছে, এটা পাকিস্তান আমলে যেমন হয়েছিল ঠিক বাংলাদেশ আমলেও তাই ঘটছে। এর কারণ কী? বাংলাদেশের লোকেরা রাজনৈতিক সচেতন ও প্রকৃতপক্ষে বেশি দলও নেই আপনি বলছেন তা হলে এটি ঘটছে কেন?

ডঃ হোসেন ঃ জনগণের কাছে যদি মতামত চাওয়া যায় তা হলে তারা নিশ্চয়ই বলবে গণতন্ত্র। সেই ৫৪ সালে যখনই এই প্রশ্ন এসেছে তখনই তারা রুলিং পারটিকে অপসারিত করে বিরোধী দলকে জয়ী করেছে। ১৯৭0 সালে তারা ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। যখনই নির্বাচন হয় তখনই বাংলাদেশের জনগণ রায় দেয় তারা গণতন্ত্রের পক্ষে। তারা যে গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয় এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখেন, এটি ভিত্তিহীন।

পরিবর্তন ঃ অনেকে বলেন বংগবন্ধু গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার বিশেষ ব্যবস্থা করেননি। তাঁর দুর্বলতাই তাঁর শোচনীয় পরিণাম ডেকে এনেছে। তাঁর নীতির মধ্যে অনেক ভুলত্রুটি ছিল। শক্ত হাতে তিনি শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আপনি কি এ ব্যাপারে একমত?

ডঃ হোসেন ঃ এটা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। জনগণ তো ৭0-এর নির্বাচনে, ৭৩-এর নির্বাচনে রায় দিয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফিরে বংগবন্ধু দায়িত্ব নেন সরকারের, সে অবস্থার মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করে গণতান্ত্রিক সংবিধান দেওয়া হল। রেকরড টাইমের মধ্যে একটা সাধারণ নির্বাচন দিয়ে ৭৩-এর ৭ মারচ আমরা জনগণের কাছে গেলাম। যারা বংগবন্ধুকে হত্যা করল, হত্যা করেও তারা বলেছে আপনি বোধহয় জানেন কিনা, বিদেশি সাংবাদিকেরা যখন জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরা কেন হত্যা করলে তখন তারা বলেছিল বংগবন্ধুকে হত্যা না করলে তিনি আমাদের জনগণের সামনে দাঁড় করালে জনগণ আমাদের ছাড়ত না। এর দ্বারা প্রমাণ কতখানি জনসমর্থন ছিল। তিনি একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন।

পরিবর্তন ঃ আমরা শুনেছি বংগবন্ধুকে শোচনীয়ভাবে হত্যা করার পর জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর জনসাধারণ মিছিল করেছিলেন। বংগবন্ধুর হত্যার পর এটা হতে দেখিনি। আমরা ভেবেছিলাম জনসাধারণ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়বেন। তা তো হল না। এর কারণ কী?

ডঃ হোসেন ঃ বংগবন্ধু হত্যা একটা জঘন্য ঘটনা। গোটা পরিবারকে হত্যা করা হল, মানুষ একটা শক-এর শিকার হল। কেউ কল্পনা করতে পারেনি এমন একটা ঘটনা স্বাধীন বাংলার মাটিতে ঘটতে পারে। সেই শক থেকে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সালে হাসিনা যখন ফিরে আসে তখন মানুষের চাপা মনোভাব আবার প্রকাশ পেল, যেভাবে বংগবন্ধুকে মানুষ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঠিক সেইভাবে শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানায়। এতেই আপনি জনসাধারণের মনোভাব বুঝতে পারবেন।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু যখন নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণকে মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পেলেন তখন তারাই তো আওয়ামি লিগকে পরাজিত করলেন তাই না?

ডঃ হোসেন ঃ আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চেয়েছিলাম। প্রহসন হয়েছে। নির্বাচনে সব রকমের বিধি লংঘন করা হয়েছে। অসংখ্য বাধার মধ্যেও যে ফলাফল হয়েছে তাতে সাধারণের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা উল্লেখযোগ্য।

পরিবর্তন ঃ আগামী নির্বাচন, যার প্রস্তুতি চলছে, তা যদি সামরিক প্রশাসন পরিচালনা করেন তা কি নিরপেক্ষ হবে বলে মনে করেন?

ডঃ হোসেন ঃ প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমাদের দলের যে জনসমর্থন আছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু আপনাদের দলে যে ভাঙন ধরছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক ঘটনা, তাতে কি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না?

ডঃ হোসেন ঃ এটাকে ভাঙন বলা ভুল হবে। দলের বর্ধিত সভায় দলের ঐক্য প্রমাণিত হয়েছে। বর্ধিত সভায় প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত নিলেন তার বিরুদ্ধে কিছু কর্মকর্তা শৃংখলাভংগ করেন। তার বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪৯-

এর মধ্যে ৩৫ জন কার্যনির্বাহিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পারটির মধ্যে ভাঙন হলে ভোটাভুটি হয়। তখন বোঝা যায় বিভেদ আছে। এখানে একজনও বিরোধিতা করেননি। অতএব দলের ভাঙন ঠিক নয়। অবশ্য পারটির কারও কারও বিবৃতিতে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কাজকর্মে পারটির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তবে পারটির মধ্যে ভাঙনের কোন লক্ষণ দেখছিনা। বিশ্বাস করি.পারটি ঐক্যবদ্ধভাবে আছে। যখনই রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হবে তখন যে জনগণ আমাদের সংগে আছে আমাদের পাবলিক মিটিং-এর উপস্থিতি দেখে যাচাই করতে পারবেন।

পরিবর্তন : তা হলে কি এটা ঠিক নয় যে, বাকশালের প্রশ্নে আপনাদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়? তা হলে বাকশালের কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই।

ডঃ হোসেন : এগুলো বিভ্রান্তি সৃষ্টি। গত নির্বাচনে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি আমাদের বহু দলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ৭৮ সালেই সিদ্ধান্ত নিই। আমরা জেনারেল ওসমানির পক্ষে সব বিরোধী দল সমর্থন দিয়েছিলাম। জেনারেল ওসমানি প্রতিশ্রুতি দেন তিনি নির্বাচিত হলে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে সংশোধন করে বদলান হবে। ১৯৭৮ সাল থেকে আমাদের দল বলেছে আমরা বহুদলীয় ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাই। তবে বাকশালের যে কর্মসূচি ছিল যেমন মহকুমাগুলিকে জেলা করা ইত্যাদি কর্মসূচি আমরা আওয়ামি লিগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাই না। বংগবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিও বহাল রেখেছি। এর সংগে গণতন্ত্রের কোন বিরোধ নেই। আমরা মেজরিটি পেলে সংসদে তা বাস্তবায়িত করতে পারব।

পরিবর্তন : আপনাদের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও বর্তমান সামরিক সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মধ্যে তফাৎ কোথায়? মূল লক্ষ্য তো এক।

ডঃ হোসেন : বিচ্ছিন্নভাবে কিছুর মূল্যায়ন করা উচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সারা দেশে গণতন্ত্র চালু না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু কিছু কাজকে আমাদের নীতির সংগে তুলনা করলে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

পরিবর্তন : আওয়ামি লিগ নেতাদের মধ্যে বর্তমান মতানৈক্যের পেছনে কিছু বাইরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কি কাজ করছে বলে আপনার ধারণা?

ডঃ হোসেন : দেখুন, এইভাবে বলা শক্ত। আমরা জানি, যারা আমাদের মংগল চায়না দেশের মংগল চায় না, তারাই বিভেদ চাইছে, এইটুকু বলতে পারি।

পরিবর্তন : বংগবন্ধু হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তি হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ আছে। আপনার সরকার ক্ষমতায় এলে কি তাদের শাস্তি বিধান করবেন?

ডঃ হোসেন : এটাতো আমাদের কর্মসূচির মধ্যে আছেই। আইনের চোখে যে কেউ অপরাধী বলে বিবেচিত হবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। জিয়াউর রহমানকে আমরা বার বার বলেছি, আপনি একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আপনার আগে যিনি রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন তাকে যারা হত্যা করল তাদের যদি প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন তা হলে আপনাকেও এ ধরনের ঘটনার শিকার হতে হবে। আজকেও আমরা মনে করি, দেশে যদি স্থিতিশীলতা আনতে চাই তা হলে এ ধরনের অপরাধকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।

পরিবর্তন : আমাকে একজন নেতা বললেন, আজ যদি বাংলাদেশে ভোট নেওয়া হয়, তা হলে শতকরা ৮৫ জনই ইসলামিক রিপাবলিকের পক্ষে ভোট দেবে আপনার কী মত?

ডঃ হোসেন : অসম্ভব। এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। এখন থেকে নয় আগে থেকেই প্রমাণিত হয়েছে বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক নয়। তারা ধর্মপরায়ণ, কিন্তু রাজনীতিতে তারা ধর্মকে আনতে চায় না। ৪৭ এর আগে অন্য পটভূমিতে মুসলিম লিগের পতাকাতলে মানুষ যে সংঘবদ্ধ হয় তা কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে নয়। তখন হিন্দু জমিদারের ব্যাপার ছিল। শোষণ থেকে মুক্তির জন্য জনসাধারণ মুসলিম লিগের পতাকাতলে আসে, কোন কম্যুনাল লাইনে নয়। তার পরে পরেই দেখা গেল, কোন সাম্প্রদায়িক দাংগা আমাদের মধ্যে হয়ইনি। যেটুকু ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের মানুষ রুখে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম বাঁচাও ইত্যাদি। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সংবিধান জনগণ গ্রহণ করেছে। পরে যেসব গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ইস্যু সামনে আনার চেষ্টা করেছে তারা কেউ নির্বাচনে সামনে আসতে পারেনি। অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে সাম্প্রদায়িক ইস্যু নিয়ে কেউ সুবিধা করতে পারবে না এই চ্যালেনজ সব সময় নিতে পারি।

পরিবর্তন : দেখুন, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সংবিধান থেকে তারপরে বাদ দেওয়া হয়। এখন আপনারা যে ১৫ দল এক সংগে লড়াই করছেন তাঁরা কি একমত যে গণতন্ত্র ফিরে এলে আবার তারা ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিতে সমর্থন করবেন?

ডঃ হোসেন : ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতির ব্যাপারে সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে জাতীয় ঐকমত্যের একটা ভিত্তি আমরা পেতে পারি।

পরিবর্তন : আপনাদের ১৫ দলের কার্যক্রমের মধ্যে আছে শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করা। আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনও আইনটা রেখে দিয়েছিলেন বলে অনেকে ক্ষুব্ধ। এই শত্রু সম্পত্তি আইন প্রত্যাহারের জন্য কতখানি চেষ্টা করছেন? আপনারা কেন তোলেননি?

ডঃ হোসেন : এটা একটা জটিল ব্যাপার। আগে থেকে হয়ে আসছিল। আমাদের সময় এটার একটা সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যে আইনটা এল এটাতে আরও জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। বর্তমান শত্রু সম্পত্তি আইনে বহু লোক হয়রানি হয়েছেন। এই আইনের মৌল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

পরিবর্তন : যে ১৫ দল এখন লড়ছেন সেটা কি একটা রাজনৈতিক মোরচা? পরে কি আপনারা এক সংগে লড়বেন?

ডঃ হোসেন : ১১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।

পরিবর্তন : নির্বাচন হলে তো রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হবে।

ডঃ হোসেন : আমরা বলছি আগে সার্বভৌম সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন হক। তাদের অধিকার থাকবে সংবিধান সংশোধনের।

পরিবর্তন : আদালত যে বিকেন্দ্রীকরণ করা হল, এতে তো ভালই হল সাধারণ মানুষ সুবিচার পাবে। কিন্তু আইনজ্ঞরা ক্ষুব্ধ কেন?

ডঃ হোসেন : হাইকোরটে মাত্র শতকরা একভাগ মামলা আসে। নিম্ন আদালতে বিচার পেতে সময় লাগে কারণ ক্যাডার পোসট ৪৭ সাল থেকে ভরতি হয়নি। তবে হাই কোরটে বিচারের জন্য যে পরিবেশ, বইপত্র, লিগ্যাল অ্যাসিসট্যানস দরকার সেগুলো জেলায় কোথায়? বরং ঢাকা থেকে আইনজ্ঞ নিয়ে গিয়ে বিচার করতে হলে মামলা তো ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। সুপরিম কোরটকে টুকরো টুকরো করে মানুষের ক্ষতি হবে। এ নিয়ে সুপরিম কোরট একটা স্মারক তৈরি করে সরকারকে দিয়েছে। □

সাক্ষাৎকার : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহারে থাকা উচিৎ
সব কটি পুষ্টিকর উপাদান ঠিক ঠিক পরিমাণে...

সেরেল্যাক
একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার —যা অত্যন্ত সুস্বাদু।

যখন আপনার বাচ্চার বয়েস প্রায় চার মাস আর সে শক্ত খাবার খেতে তৈরী তখন, সেরেল্যাক সম্বন্ধে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। প্রতিবার সেরেল্যাক খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে জেনে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।

অর্থাৎ, শক্ত আহারের মাধ্যমে বাচ্চার যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান, প্রোটীন ও ক্যালোরী পাওয়া উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূর্ণ পুষ্টির জন্যে আপনাকে আর অন্য কোনও খাবার দিতে হবেনা।

পুষ্টি ও স্বাদে ভরপুর সেরেল্যাকে আছে গমের আটা, মালাইদার দুধ ও চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ।

সেরেল্যাকে আছে শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটীন, প্রাণচঞ্চল শক্তির জন্যে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট আর সুস্থ-সবল বেড়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকমের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাকে সেরেল্যাক দিন!

সেরেল্যাক তৈরী করে নেওয়া কি সোজা! শুধুমাত্র আগে ফোটানো কুসুম-গরম জল ঢালুন! মিশিয়ে নিন, নাড়ুন আর খেতে দিন।

Nestlé Cerelac
instant wheat milk cereal

সেরেল্যাক®
এতে দুধ মেশানো আছে

SAA:FSL/C/2670 BEN R

NESTLÉ.

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

বাসন্তী গুপ্ত রাহুর দশাতেই মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলাতেই হারিয়েছিল মা-বাবাকে। ভাইবোন কেউ নেই। চামড়ার কাজ, ছুঁচের কাজ করে পেট চালাচ্ছিল কোনমতে।

এমন সময়ে শুরু হল ছেচল্লিশের দাঙ্গা। সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

বন্দে মাতরম!

আল্লা হো আকবর!

বাসন্তীর বয়স তখন চৌত্রিশ। কলুটোলায় ধর্ষিতা হতে হতে বেঁচে গেল সুমন্তর জন্যে।

কী করে যাব, সুমন্ত ? ওরা যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে!

ওদের লিডার তো আমার বন্ধু ---- বন্ধুত্বের জোর হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের অনেক ওপরে। এস।

কিন্তু সাগর দত্ত লেন বিলকুল ফাঁকা। একজন গুণ্ডাও নেই।

আশ্চর্য! এই তো একটু আগেই হল্লা শুনছিলাম ---- দরজা ভাঙছিল ----

এরই নাম বন্ধুত্ব। উঠে এস।

লম্বা চওড়া চেহারা সুমন্তর। চোখ দুটো কটা। গুণ্ডাদের খপ্পর থেকে বাসন্তীকে নিয়ে পালিয়ে এল রহস্যজনক পন্থায়।

বিয়ে হয়ে গেল দু জনের। বাচ্চা এই শ্রাবন্তী। আদর করে নাম রাখা হল শ্রাবণী। ওরা তখন দিল্লিতে।

(চলবে)

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ-পরিক্রমা—৯

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি

নির্মলকুমার রায়

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী কালী মন্দিরের মত উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দিরের সংগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর স্মৃতি জড়িত। ঠাকুর যখন প্রথম জীবনে কামাপুকুরে বাস করতেন, তখন যেমন মাঝেমাঝেই এই মন্দিরে এসে মাকে গান শোনাতেন, পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে সকল সাধনার শেষেও, সময় বিশেষে এই মন্দিরে আসতেন ও পূজো দিতেন। এই মন্দিরের সংগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে (কামাপুকুরে থাকাকালীন) কথামৃত প্রণেতা মাসটার মশাই শ্রী মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত বলেন :

"নিত্য ঠনঠনে মা কালীর কাছে যেতেন। মাকে ভজন শোনাতেন। এসব স্থানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র তাঁর পাদস্পর্শে।" (শ্রীম দর্শন, ৩য় ভাগ—চতুর্দশ অধ্যায়)

"এসব সিদ্ধপীঠ। ঠাকুর এখানে বসে মা কালীকে গান শোনাতেন। তখন তিনি এ অঞ্চলে পূজো করতেন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে। বয়স তখন সতের আঠার। থাকতেন বড়ভাই পন্ডিত রামকুমারের সংগে বেচু চাটার্জী স্ট্রীটে।" (শ্রীম দর্শন, ত্রয়োদশ ভাগ—দ্বাদশ অধ্যায়)

কামাপুকুর ত্যাগ করে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাস করলেও, কলকাতায় এলে এই মন্দিরে আসার ঘটনা 'কথামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৩সালের ১৮ ডিসেমবর বিকালে দক্ষিণেশ্বর থেকে ভক্তসংগে ঠনঠনিয়ার কালীমন্দিরে ঠাকুরের আগমনের বিষয়ে লেখা আছে :

"শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের জন্য 'সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, 'তুমি ডাব, চিনির দাম দিবে।' বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, মণি প্রভৃতির সঙ্গে ঠনঠনের 'সিদ্ধেশ্বরী মন্দির অভিমুখে গাড়ী করিয়া আসিতেছেন। পথে সিমুলিয়া বাজার, সেখানে ডাব, চিনি কেনা হইল। মন্দিরে আসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, 'একটা ডাব কেটে চিনি দিয়ে মা'র কাছে দাও।' (কথামৃত—৫ম ভাগ, দ্বাদশ খন্ড-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ও ব্রাহ্ম-নেতা কেশবচন্দ্র সেনের অসুস্থতার খবর পেয়ে, ঠাকুর একদা তাঁর জন্যও 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার কাছে ডাব-চিনি দিয়ে পূজো দিয়েছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ নভেমবর কলকাতার 'কমলকুটীরে' অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে দেখতে এসে ঠাকুর নিজ মুখেই সেকথা কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন শ্যামপুকুর বাটীতে ছিলেন, তখনকার একটি ঘটনা:

"শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ৯টা। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধবস্ত্র এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা। মাস্টার ঠাকুরের আদেশে 'সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন; প্রসাদ হস্তে ঠাকুর অতি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া গ্রহণ ও কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিতেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাদুকা খুলিয়াছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, 'বেশ প্রসাদ'। আজ শুক্রবার, আশ্বিন অমাবস্যা, ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫। আজ 'কালীপূজা। ঠাকুর মাস্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন, ঠনঠনের 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পূজা দিবে। মাস্টার স্নান করিয়া নগ্নপদে সকালে পূজা দিয়া, আবার নগ্নপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন।" (কথামৃত—৩য় ভাগ, দ্বাবিংশ খন্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ)

ঠনঠনিয়ার যে কালীমন্দিরের সংগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

"সার্ধ শতাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতার তদানীন্তন বৃক্ষলতা-গুল্মাদি-আচ্ছাদিত এক বিজন অঞ্চলে জনৈক ব্রহ্মচারী 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মূর্তি স্থাপনপূর্বক সাধনায় রত ছিলেন। এদিকে মহানগরীর কলেবর বৃদ্ধির সংগে সংগে ঐ অঞ্চল লোকাকীর্ণ দেখিয়া ব্রহ্মচারী জগদম্বাকে জানাইলেন, 'মা, আমি তো আর এখানে থাকতে পারিনা।' ঠিক এমনই সময়ে মায়ের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট শ্রীযুক্ত শংকর ঘোষ 'কালীমাতার সেবাভার গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মচারীকে অব্যাহতি দিলেন। ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধা 'সিদ্ধেশ্বরী দেবী তদবধি ঘোষ বংশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ অঞ্চলের শংকর ঘোষ লেন এখনও সেই বংশতিলকের নাম বহন করিয়া ধন্য হইতেছে।" (স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা, ২য় ভাগ, স্বামী সুবোধানন্দ প্রসংগ)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী, অন্তরংগ পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) ছিলেন উক্ত শ্রীশংকর ঘোষের প্রপৌত্র।

মন্দিরটি উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ায় বিধান সরণি ও রাজেন্দ্র দেব লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত। শংকর ঘোষের বংশধরগণই এখন এই কালীমাতার সেবার অধিকারী। মন্দিরের সমগ্র স্থানটি শ্বেত পাথরে বাঁধান, সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা দক্ষিণ-মুখী দণ্ডায়মানা—মায়ের মূল মন্দিরের পাশেই একই সীমানার মধ্যে একটি শিবমন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেওয়ালের ওপর পাথরের ফলকে লেখা আছে—"শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির—মহাত্মা শংকর ঘোষ কর্তৃক সন ১১১০ সালে প্রতিষ্ঠিত।" মন্দির প্রাঙ্গণের বিভিন্ন দেওয়ালে নানা দেবদেবী, মহাপুরুষগণের ছবি টাঙানো আছে। তার মধ্যে ঠাকুরের অন্যতম অন্তরংগ পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দের ছবিও আছে। গর্ভমন্দিরে 'মায়ের বিগ্রহের পাশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি প্রতিচ্ছবি আছে এবং তাঁরও নিত্য অর্চনা করা হয়। □

বিনোদন

ব্রাত্যজনের মুক্ত সংগীত

রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের কাছে দেবব্রত বিশ্বাস যে মোটেই ব্রাত্যজন ছিলেন না, সে কথা আরও একবার প্রমাণিত হল গত ১৮ আগসট শিশির মঞ্চে। দেবব্রত বিশ্বাসের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'দেবব্রত বিশ্বাস মেমোরিয়াল কমিটি' আয়োজন করেছিলেন প্রয়াত এই শিল্পীর উদ্দেশে এক স্মরণ-সন্ধ্যার। এদিন উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর তোলা ডকুমেনটারি 'দেবব্রত বিশ্বাস'ও দেখান হল। সেই সংগে ইনরেকো রেকরড কোমপানি প্রকাশ করলেন এই তথ্যচিত্রের ডাবল এল পি রেকরড। ফলে অনুরাগীদের ভিড়ে শিশির মঞ্চে সেদিন 'সামাল সামাল' রব উঠেছিল। উদ্যোক্তারা ঠিক সাড়ে ছটার সময় অনুষ্ঠান শুরু করে দেন, সংগতভাবেই অডিটোরিয়ামের গেটও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে তখনও টিকিট বা কারড হাতে অধৈর্য জনসমুদ্র। 'অতিথি' মারকা সাদা কারড হাতে একবার এ গেট থেকে ও গেট ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন আমন্ত্রিত প্রেসের প্রতিনিধিরা, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি উৎপলেন্দু চক্রবর্তী নিজেও। দরজা ধাক্কাধাক্কি করে শেষমেশ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়েছে এদের।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রায়ান্ধকার মঞ্চে দেবব্রত বিশ্বাসের ছবির সামনে ধূপ, দীপ, ফুলের মালা সাজিয়ে শিল্পীর অপ্রকাশিত কিছু গান বাজিয়ে শোনানর ব্যবস্থা করা ছিল। স্মরণ বাসরের কল্যাণে শিল্পীর কণ্ঠ নিঃসৃত যে গভীর বাণী সেদিন সমস্ত অডিয়েনসে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ভুলবার নয়। এরপর ইনরেকো কোমপানির চেয়ারম্যান দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী শ্রীমতী কনক বিশ্বাসের (দেবব্রত বিশ্বাসের বৌদি) হাতে ডাবল এল পি রেকরড তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রেকরডের উদ্বোধন করলেন। এর পর দেবব্রত বিশ্বাস মেমোরিয়াল কমিটি শিল্পীর স্মৃতি রক্ষার্থে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের দুজন কৃতী ছাত্রীকে এক হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দিলেন। রবীন্দ্রভারতীর এম মিউজে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও বিশ্বভারতীতে বি মিউজে প্রথম হওয়ার সুবাদে এই 'দেবব্রত বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার' পেলেন যথাক্রমে মিতা দাস ও বুলবুল ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানে দুই শিল্পীই গান শোনালেন। মিতা দাস গাইলেন 'দিনের বেলায় বাঁশী তোমার'। মিতার গান সম্পর্কে 'পরিবর্তন'-এ এর আগেও আশা পোষণ করা হয়েছিল। মফস্বলের এই প্রতিভা

শিলাদিত্য

১৬ অক্টোবর সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ রচনা

সম্পাদক : বিমল কর

খেলার আসর

১৪ অক্টোবর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

দিল্লির নেহরু স্টেডিয়ামের বৈদ্যুতিক আলোয় খেলা হল ৮৪-র প্রি ওলিম্পিক ফুটবলের খেলা ভারত : সৌদি আরব। অলোক দাশগুপ্তর রিপোর্ট সঙ্গে অরুণ মুখার্জির ছবি।

শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক রচনা 'আমার দাদা গৌতম'। লিখছেন ফুটবলার গৌতম সরকারের সহোদরা উমা সরকার।

রেলওয়েজ থেকে সমস্ত খেলাতেই সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের অনেক খেলোয়াড় তৈরি হয়েছেন। খেলাধূলার উন্নয়নে রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী কী ভাবছেন? — একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার।

জয়পুরে ভারত : পাকিস্তানের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচের রিপোর্ট ও ছবি। এ ছাড়া দুই নবীন পাকিস্তানী ক্রিকেটার কাসিম ওমর এবং আজিম হাফিজের সাক্ষাৎকার।

জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত ওপেন অ্যাথলেটিক্সের রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গে শংকর নাগ দাসের ছবি।

লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিক্সে কি বয়কটের হ্যাটট্রিক হবে? — চিরঞ্জীবের পাঠানো রিপোর্ট।

যে খুব শীগগিরই কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত মহলে সমাদৃতা হয়ে উঠবেন সে প্রমাণ তিনি এদিনের অনুষ্ঠানেও দাখিল করলেন। তবে এত বড় আসরে গাইবার জনাই বোধহয় গোড়াতে শিল্পী তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি নিয়ে গাইতে পারেননি। তবে বুলবুল ভট্টাচার্য্র 'পথে চলে যেতে যেতে' তাঁর পুরস্কার পাওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করতে পারেনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর তথ্যচিত্র 'দেবব্রত বিশ্বাস'। তথ্যচিত্র দেখানর আগে পরিচালক দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছেন 'এই আনসেনসরড প্রিন্ট দেখে দর্শকরা টেকনিকাল খুঁত যদি পান তা অগ্রাহ্য করবেন, এর বাইরে যদি ত্রুটি কিছু পান তা হলে তা উল্লেখ করতে পারেন তবে প্রশংসার জন্য প্রশংসা, নিন্দার জন্য নিন্দা করলেই আমি খুশি হব।' পরিচালক মশাইয়ের ভরসা দেওয়া থেকেই তাই অকপটে বলা যায় তথ্যচিত্র হিসেবে 'দেবব্রত বিশ্বাস' যথেষ্ট উঁচুমানের হয়নি। ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্য চিত্র করতে গিয়ে পরিচালক অনর্থক এমন সব প্রসঙ্গ এনেছেন যা দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনের ওপর খুব বেশি আলোকপাত করে না। পরিচালক দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, কমিউনিসট পারটির কার্যকলাপ, হিটলার, স্ট্যালিন, মুসোলিনী প্রমুখ আরও অন্যান্যদের স্টিল ছবির ব্যবহার এত বেশি করেছেন তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বরং দেবব্রত বিশ্বাসের নিজের কথা '১৯৩৯-শুরু হয়ে গেছে বিশ্বযুদ্ধ। আমার চিন্তাধারা তখন একটু বামে হেলেছে' জাতীয় তথ্য অনেক বেশি কার্যকর হতে পারত। তথ্যচিত্র শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে পরিচালক দেবব্রত বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বলিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রীরায় শিল্পী সম্পর্কে এমন কিছুই নতুন বা একসক্লুসিভ মন্তব্য করেননি যা তথ্যচিত্রকে সমৃদ্ধ করে। আরও আশ্চর্য হতে হয় এ তথ্যচিত্রে ঋত্বিক ঘটকের কোন উল্লেখ না দেখে। শ্রীঘটকের বেশির ভাগ ছবির সঙ্গেই দেবব্রত বিশ্বাস যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন সে কথা কি পরিচালকমশাই জানতেন না? একইভাবে দেবব্রত বিশ্বাসের আমৃত্যু সহচর হিসেবে যে গৃহভৃত্যর কথা শিল্পীর অনুরাগীমাত্রই জানেন তারও কোনও উল্লেখ না দেখে অবাক হতে হয়। কনক বিশ্বাস বা শিল্পীর সাহচর্যে আসা অন্যান্য সংগীত শিল্পীদের অনুপস্থিতিও চোখে লাগে। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের এলোমেলো ব্যবহার তথ্যচিত্রের সম্মান রাখতে পারেনি। তবে দেবব্রত বিশ্বাসের নিজের কণ্ঠস্বর বা তাঁর সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য যা পরিচালকের আয়ত্তাধীন ছিল তা ব্যবহার করে দর্শকদের সাধুবাদ কুড়িয়েছেন পরিচালকমশাই। কারণ যাকে নিয়ে পরিচালক তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন সেই মানুষটা দর্শকদের যে কতখানি কাছের ছিল সে কথা তো নতুন করে কিছু বলার নেই, তাই ছিটেফোঁটা যাই পরিবেশন করা যাক না কেন দর্শকরা তা মাথায় তুলে নেবেন। নিয়েছেনও। পরিচালকের সাফল্য এইখানেই। **দিব্যজ্যোতি বসু**

যে পরিবারের কর্তা একটা 'দুমড়ে পড়া সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের গৌরব বয়ে বেড়ান', অবস্থার ফেরে নর-কঙ্কাল বিক্রি করেন, তাঁর একমাত্র মেয়ে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখে ক্রাচে ভর দিয়ে ল্যাংড়ার অভিনয় করে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে। এক ছেলে কারখানার লক-আউটের শিকার হয়ে বেকার, আর এক ছেলে ফুটবল পাগল — ফুটবল খেলতে গিয়ে কারটিলেজ ছিঁড়ে খেলা ছেড়ে দিয়ে খেলার কাগজ বিক্রি করে, র‍্যামপারট ভাড়া দেয়। সেই 'মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্ত্রীর অবস্থা অনেকটা মালগাড়ির এনজিনের মত — কখনও জল নেই, কখনও কয়লা নেই, আবার কখনও সিগনালই নেই।' কলকাতার বস্তিতে বাস করে যশোরের প্রাসাদের স্মৃতিচারণে উন্মুখ ছিন্নমূল হারাধন সিংহের পরিবারের এই গল্প নিয়েই 'সায়কে'র চতুর্থ প্রযোজনা 'অণুবীক্ষন'।

'অণু' মানে তো অতি সূক্ষ্ম বস্তু বা বস্তুর অংশ, কণা। বীক্ষণ মানে বিশেষভাবে দর্শন। আর যে 'অণুবীক্ষণে' দুটো মূর্ধন্য-ণ, সেটা তো অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখার যন্ত্র। কিন্তু নাট্যকার চন্দন সেনের দন্ত্য 'ন' অন্তের 'অণুবীক্ষন' কী অর্থে ব্যবহৃত?

সাজানো গোছানো দুর্বল বুনটের এই গল্পে হারাধন সিংহ এবং তাঁর পরিবারের লোকজন ছাড়া আর দুটি চরিত্র এনেছেন নাট্যকার তাঁর গল্পের বিস্তারের প্রয়োজনে। একজন হারাধনের কৈশোর আর যৌবনের সহচর নিরঞ্জন, যাঁকে সাক্ষী রেখে হারাধন স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর গৌরবময় অতীতের। আর একজন একটি সমাজসেবী সংস্থার সমীক্ষক যাঁর কাছে সিংহ পরিবারের একে একে সবাই তাদের কৃতকর্মের কথা বলেছেন অকপটে, যেমন বলেছেন 'থানা থেকে আসছি'তে ইনসপেকটরের কাছে।

হারাধন আর নিরঞ্জন দুজনেই বৃদ্ধ। কিন্তু এদের দুজনকে বৃদ্ধ বলে মেনে নিতে মনটা হোঁচট খায়। তবু 'হারাধন' তবে গেছেন মেঘনাদ ভট্টাচার্যের সপ্রাণ সাবলীল অভিনয়ে। কিন্তু দীপেন সেনের 'নিরঞ্জন' আড়ষ্ট বাচনে, অভিব্যক্তিতে। ফলে গোটা টিমের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই খাপছাড়া মনে হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সব দোষ ওঁর নয়, কিছুটা নাট্যকারের, কিছুটা নির্দেশকের।

হারাধন সিংহের মত সিংহ পুরুষ এই পরিবারের অন্তত একজনের ভয়ে তটস্থ, তিনি তাঁর স্ত্রী নীলিমা সিংহ। অথচ তিনি মুখরা নন, হাঁকডাকও নেই। অভিযোগ-অনুযোগহীন নীলিমা মূলত এই বস্তিবাসী পরিবারের শিরদাঁড়া, আর নাটকের অনেকখানি। স্বপ্না মিত্র এই চরিত্র চিত্রণে ধীর স্থির, সংযত, পরিশীলিত। অনায়াস দক্ষতায় তিনি রূপ দিয়েছেন এক সংবেদনশীল গৃহিণীকে এক স্নেহপ্রবণ মাতাকে। শ্রীমতী মিত্রের অভিনয় অবিস্মরণীয়, বস্তুত এই নাটকের মূল সম্পদ। স্বপ্না মিত্র যদি হাল হন, তবে মেঘনাদ ভট্টাচার্য এই নাটকের পাল। মেঘনাদকে ভাল লাগে তখন যখন ওঁর 'হারাধনে'র ঐতিহ্যের বেলুন চুপসে যায়, যখন ওঁর হারাধন বলেন 'আমি আসলে কিচ্ছু না, ওলড ফসিল। বড় বড় বাকি মারি'। কিংবা যখন বলেন, 'হারাধন, তুমি কঙ্কাল বয়ে বেড়িয়েছ। তুমি কঙ্কাল বেচবে না তো কে বেচবে?' আর চেনা যায় তখন যখন বেওয়ারিশ লাশ খুঁজতে গিয়ে নিজের নিরুদ্দেশ ছেলের লাশ দেখার ঘটনার কথা সমীক্ষকের কাছে বলেন। এঁরা দুজন ছাড়া পার্থ গোস্বামী (তরুণ), মুনমুন ভট্টাচার্য (দীপিকা), প্রদীপ সুর (?) (তাপস) এবং শ্যামল ঘোষ (শুভঙ্কর) নিষ্ঠা ভরে অভিনয় করে নাটকের প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

মঞ্চের ডিটেল এবং ডায়মেনসন বাস্তবানুগ, সুপরিকল্পিত। সংগীত সুপ্রযুক্ত। আলোর কাজ মোটামুটি। সব মিলিয়ে সায়কের চতুর্থ নাটক অণুবীক্ষন সার্থক প্রযোজনা, গল্পের দুর্বলতা সত্ত্বেও।

উষা ভৌমিক

শব্দশৃঙ্খল

শব্দ শৃঙ্খল – ৬৮

■	১	২	৩	৪		■	৫
৬					■	৭	
৮		■		■	৯		■
	■	১০	■	১১			১২
১৩			■	১৪		■	
	■	১৫	১৬		■	১৭	
■	১৮			■	১৯		■
২০		■	২১		■	২২	

সূত্র : পাশাপাশি

১। পাখি ? নাকি নরখাদক !
৬। দয়ালু, ভগবান
৭। শত্রুকে খুঁজুন
৮। চল্লিশ সের – কত হল ?
৯। অতি ' – ' ভাল নয়
১১। খুব শক্তিশালী
১৩। 'লবঙ্গলতা'র আগের সুন্দর বিশেষণ
১৪। পরাজয় হল তো ?
১৫। রসুন ?
১৭। শুতে হয়
১৮। অগ্নি
১৯। গম্ভীর স্বর
২০। লঙ্কার স্বাদ
২১। দড়ি আনুন
২২। হাতি হাজির

সূত্র : ওপর-নিচ

১। বলুন জলের দেবতা কে ?
২। প্রসাদ ' – ' মাত্র
৩। দাদা নয়, বড় কাটারি
৪। বিনাশ বা ধ্বংস
৫। প্রস্তুত হয়েই আছে
৬। লক্ষ্মীর বাড়ি
৭। ঐশ্বর্য
৯। এক রকমের জাতি
১০। কারোর মনে থাকে, কেউ ভাঁজে
১১। মহৎ বলেই জানি
১২। সবই কপাল
১৬। 'বরাহ' সরবরাহ করা হল
১৭। যে খায় সে
১৮। নৌকোয় আছে, আছে কুমোর বাড়িতেও

সমাধান প্রকাশিত হবে ১৬ নভেম্বর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২৭-১০-৮৩।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নম্বরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল—৬৪ (সমাধান)

সু	র	পা	ত	■	সা	গ	র
র	■	হা	ল	চা	ল	■	থ
থ	■	ভ	■	দ	■	ভা	জা
র	ব	■	হা	র	■	মা	ন
■	চ	র	ন	■	চ	ক	■
বা	ম	■	পা	গ	ল	■	দী
জা	■	ভা	তা	■	মা	জ	ন
র	সা	ত	ল	■	ন	মি	■

শব্দশৃঙ্খল ৬৪-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন সমীর রায় (১৯, জয়নারায়ণ টি পি লেন, কলকাতা-১১) এবং অসিত বরণ চ্যাটারজি (মাধবপুর, ডায়মনড হারবার, ২৪ পরগণা)।

শব্দশৃঙ্খল ৬৪-র লটারিতে বিচারক ছিলেন বাণীব্রত চক্রবর্তী।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

[অকটোবর ১২ থেকে ১৮]

মেষ : শারীরিক ভোগান্তি চলবে; মেয়েদের শরীর মোটামুটি। আর্থিক অবস্থার সামান্য হেরফের; ঋণের বোঝা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্ত বদলাতে হবে; মেয়েদের আগের অশান্তির জের চলবে। পারিবারিক কোন ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়। কোন সন্তানের ভ্রমণে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃষ : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের ছোটখাট অসুস্থতা ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা; বন্ধুদের পরামর্শে ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে বিশেষ প্রশংসা এবং অনেকের সহযোগিতা; মেয়েদের অগ্রগতি ব্যাহত হবার আশঙ্কা। পারিবারিক ক্ষেত্রে বন্ধুজনের সংগে মনান্তর। মেয়েদেব আচমকা প্রাপ্তিযোগ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মিথুন : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল মন্দয় মিলিয়ে চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ; বেশ কিছু আয়বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মানসিক উত্তেজনা; মেয়েদের মতাদর্শ প্রশংসিত হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে। মেয়েদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

কর্কট : শরীর নিয়ে নতুন ঝামেলা; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার বেশ কিছু উন্নতি। আর্থিক দুর্ভাবনা চলবে; সঞ্চয় নিঃশেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি লাভ; মেয়েদের জটিলতা বৃদ্ধি ও মানসিক অশান্তি। পারিবারিক অশান্তি চলবে। কর্মপ্রার্থীদের স্বাধীন কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

সিংহ : শরীব মোটামুটি চলবে; মেয়েদের আগের অসুস্থতার জের চলবে। আর্থিক অবস্থার আচমকা পরিবর্তন; লটারি-ফাটকায় অর্থ লাভ। কর্মক্ষেত্রে কোন সুযোগ হাতছাড়া; মেয়েদের কাজ-কর্মে বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন হবে। দীর্ঘদিনের পারিবারিক কোন প্রয়াসে সাফল্য। কুটুম্বজনের আগমনে বিশেষ আনন্দ ও লাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কন্যা : শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে না। আয় বাড়লেও নিজের ভুল-ভ্রান্তিতে বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে নিজ অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে; মেয়েদের প্রতিকূলতার মধ্যেও অগ্রগতি। কোন সন্তানের জন্য বিশেষ গর্ব। মেয়েদের ভ্রমণ। ব্যবসায়ীদের নতুন সমস্যা।

তুলা : শরীর নিয়ে নতুন ঝামেলা; মেয়েদের অস্ত্রোপচার। আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎসাহ ক্ষতি করতে পারে; মেয়েদের কর্মস্থলে মানসিক অশান্তি। মেয়েদের ভুল ভ্রান্তির জন্য পারিবারিক অশান্তি। ধর্মকর্মে প্রচুর ব্যয়। গৃহাদি বদল হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বৃশ্চিক : পেট সংক্রান্ত অশান্তি চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের। আর্থিক ক্ষেত্রে হতাশা; প্রচুর ব্যয়যোগ। কর্মক্ষেত্রে নিজ ব্যক্তিত্ব সুফল দিতে পারে; মেয়েদের ছোটখাট ক্ষতি। পারিবারিক ব্যাপারে স্ত্রীর সংগে মতান্তর। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

ধনু : শরীর ক্রমশ ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে কোন জটিলতার সহজ সমাধান; মেয়েদের দায়িত্ববৃদ্ধির সুযোগ আসবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের শোক; মেয়েদের মূল্যবান কিছু খোয়া যাবে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

মকর : শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য; আয়বৃদ্ধি ও সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও সম্ভ্রম; মেয়েদের সংগঠনমূলক কাজে সাফল্য। পারিবারিক অশান্তি ও স্বজনকলহ। কর্মপ্রার্থীদের অস্থায়ী কোন যোগাযোগ। সন্তানদের বিবাহ ব্যাপারে অশান্তি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : শারীরিক ও মানসিক অশান্তি চলবে; মেয়েদের মেয়েলি রোগ ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্র ক্রমশ শুভ; কোন ঋণ শোধ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত; মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ দোষে নতুন সমস্যা সৃষ্টি। বয়স্কদের দূর যাত্রা। পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের মানসিক উত্তেজনা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : অম্বল-অজীর্ণ খানিক বেগ দেবে; মেয়েদের পুরনো কোন রোগে ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য; ঋণ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে অসম্মান; পদত্যাগও করতে হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চলবে। স্ত্রীর একক প্রয়াসে বড় রকমের সাফল্য ও আর্থিক লাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন: ২৪-০১৯৯), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১; Telex 021-7896 IPPL IN.

রিবর্তন
অক্টোবর ১৯৮

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে

পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি, দলবাজি ও বিশৃঙ্খলা

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

একমাত্র কমপ্লান®-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩টি খাদ্যগুণ

সাধারণতঃ ১৫ বা ১৬ বছর বয়েসের মধ্যে ছেলেমেয়েরা প্রায় সর্বদিক থেকে পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও হয় বিশেষ ধরণের।

আর এই একই কারণে আপনার ছেলেমেয়েদেরও **কমপ্লান** দেওয়া চাই—এখনই! **কমপ্লান** শুধু যে প্রোটিন (২০%) যোগায় তাই নয়, এ থেকে ছেলেমেয়েরা সেরা প্রোটিন (মিল্ক প্রোটিন) পায়। এছাড়া, এতে ২২টি অন্যান্য খাদ্যগুণও আছে, যা ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখবেন, **কমপ্লান** হল সুপরিকল্পিত আহার যা ডাক্তাররাই বেশী করে সুপারিশ করে থাকেন।

কমপ্লান পাওয়া যায়— চকোলেট, এলাচ-জাফরান ও স্ট্রবেরীর মুখরোচক স্বাদগন্ধে—আর প্লেনও।

Complan

GLC.6.2416 BG (R)

বিনামূল্যে! ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা

"সারা পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে পরামর্শ"-এর জন্যে অনুগ্রহ করে ৫০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন: পোস্ট ব্যাগ নং ১৯১১৯ (কম্প্) জি-২৪৪, বম্বে-৪০০০২৫।

কমপ্লান® সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

পরিবর্তন

২ নভেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

পূজোর পর পশ্চিমবাংলা ও সর্বত্র মুক্তাংগন জলসার যে হিড়িক পড়ে ইদানিং তার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ জলসাই হচ্ছে হলের ভেতর। পশ্চিমবংগে জলসা শিল্পের এই ধারা পরিবর্তন ঘটল কেন ? জলসা-শিল্পের সমস্যা। শিল্পী ও সংগঠকদের বক্তব্য নিয়ে লেখা হয়েছে এই অভিনব ফিচারটি। এই সংগে কিছু প্রবীণ ও নবীন সংগীত ও নৃত্যশিল্পীর সাক্ষাৎকার।

পশ্চিমবংগের জলসা শিল্প—মুক্তাংগন থেকে চারদেওয়ালে বন্দী

২। দালাই লামা সকাশে ধরমশালায়। পরিবর্তনের প্রতিনিধি গিয়েছিলেন ধরমশালায় দালাই লামার সংগে দেখা করতে। এই চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকারের বিবরণ—

৩। পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘিরে যে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনার পটভূমি অনুসন্ধান করেছে পরিবর্তন। লিখেছেন পিনাকী মজুমদার।

৪। প্রধানমন্ত্রীর সংগে দেশে দেশে এই পর্যায়ের রচনার দ্বিতীয় কিস্তি।

৫। মেদিনীপুর, হুগলির গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস সম্পর্কে একটি সরজমিন প্রতিবেদন

এ ছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় ফিচার। নতুন ফিচার 'আপনার সমস্যা ঃ আপনার সুযোগ।'

নিবেদনমিদং

বিজয়ার অভিনন্দন। মাঝখানে একটি মাত্র সপ্তাহ পরিবর্তন বন্ধ ছিল পূজাবকাশের জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতকাল পাঠকদের মুখোমুখি হতে পারিনি। প্রতি সপ্তাহে নিবেদনমিদং এর মাধ্যমে পাঠকদের মুখোমুখি হওয়া এক অনাবিল আনন্দ। আমার জানা নেই, বাংলা ভাষায় আর কোন পত্রিকা আছে কিনা যেখানে সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে এমন সরাসরি যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে ; যেখানে পাঠকের ভাললাগা, ভালবাসা, ক্রোধ, অভিযোগ, অনুযোগ ও অনুরোধকে সমানভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এই তো কুড়িদিনের অনুপস্থিতিতে সম্পাদকের টেবিলে জমে উঠেছিল চিঠির স্তূপ। যতখানি সম্ভব সেগুলির উত্তর দেবার ব্যবস্থা করা হল। তবে ব্যক্তিগত চিঠির ব্যক্তিগত জবাব যাদের প্রত্যাশা, আশা করব তাঁরা সঠিক জবাবি খাম পাঠাবেন। সব চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভবও হয় না। বিশেষ করে তার যদি কোন গুরুত্ব না থাকে। অনেকে লেখকের বা শিল্পীর ঠিকানা চেয়ে চিঠি লেখেন, কিন্তু তাঁদের সবার ঠিকানা আমাদের জানা থাকে না। আবার অনেক ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁদেরই বারণ করা থাকে। তবু প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পীদের ঠিকানা অনেকে বার বার জানতে চান বলে আমরা এই নভেমবর মাসেই জলসা সংক্রান্ত একটি লেখার সংগে অন্তত পনের জন শিল্পীর নাম ঠিকানা ছাপব ঠিক করেছি।

এই সংখ্যা থেকে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘের শুভ সূচনা হল। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। আমরা ঠিক করেছি মাঝে মাঝে মৈত্রী সংঘের সদস্যদের আলোচনাসভা, বিতর্ক ইত্যাদিতে আমন্ত্রণ জানাব। মৈত্রী সংঘের সদস্য সংখ্যা এখন একশোর কিছু বেশি। আশা করা যাচ্ছে নামের তালিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু করা মাত্রই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে। এই সদস্যভুক্তির জন্য কোন চাঁদা নেই। শুধু দুটি পঞ্চাশ পয়সার ডাকটিকিটসহ ফরমের জন্য আবেদন করতে হয়। বিনা পণে বিবাহেচ্ছুদেরও পঞ্চাশ পয়সার টিকিট পাঠিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

পূজো সংখ্যা পরিবর্তন কেমন লাগল সে সম্পর্কে আমরা সমালোচনা আহ্বান করেছিলাম। আমরা ইতিমধ্যেই সমালোচনা পেতে শুরু করেছি। আরও পক্ষকাল আমরা অপেক্ষা করে তবে শ্রেষ্ঠ চিঠিগুলি প্রকাশ করব।

পরিশেষে গভীর দুঃখের সংগে জানাই পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক অপমৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখিত। পিনাকী শুধু আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরিবর্তনের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি পরিবর্তনের দফতরে এসেছিলেন অনুরোধ নিয়ে যে তাঁর এই সমুদ্র অভিযানকে পরিবর্তন যেন যথোচিত প্রচার করে। তাহলে তিনি অনেক হিতৈষী ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে সক্ষম হবেন। তিনি আমাদের প্রতিবেদক ও ফটোগ্রাফারকে সংগে নিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখান। কে জানত, তাঁর ওই বিবরণের সংগে তাঁর মৃত্যু রহস্য নিয়েও একটি প্রতিবেদন লেখাতে হবে! আমরা আশা করব পুলিশ এই রহস্যের কিনারা করতে সমর্থ হবে।

পা. চ.

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল অনন্ত প্রসাদ শর্মাকে আমরা এই রাজ্যে স্বাগত জানাই। তাঁর আগমনে সরকার পক্ষ আশংকিত এবং বলাবাহুল্য বিরোধী কংগ্রেস (ই) পক্ষ উল্লসিত। উল্লসিত পক্ষ রাজ্যপাল মহোদয় দমদম বিমান বন্দরে পা দেওয়া মাত্র তাঁকে সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং তাঁর বিচ্ছুরিত মহিমায় তাঁদের সহাস্যবদন সংবাদপত্রের কল্যাণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার দলীয় সংকীর্ণ নীতির ঊর্ধ্বে সংবিধান সম্মতভাবে রাজ্যশাসন করছেন কিনা তার উপর নজরদারি রাখার জন্যই রাজ্যপাল-পদের সৃষ্টি। তা বাদে রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবেও রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে এক ধরনের বাফারের কাজ করে থাকেন। সংবিধান অনুসারে সমস্ত সরকারি কাজকর্মই রাজ্যপালের নামে চালিত হয়। এর অর্থ ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতার উৎসই সংবিধান, যে সংবিধান দল-নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল সেই সংবিধানের অতন্দ্রপ্রহরী এবং সমস্ত দলের ঊর্ধ্বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় রাজনীতির ধারা প্রমাণ করে যে রাজ্যপালরা বহুক্ষেত্রেই শাসকদলের হাতের পুতুলমাত্র। নিয়োগকারীর অভিপ্রায় অনুসারে কর্তব্যই তাঁদের কাছে অভিপ্রেত। কেন্দ্রের রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য রাজ্যপালদের নিয়োগ করার ঘটনা অতীতে বিরল নয়,সেদিক থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী-শাসিত রাজ্যে যে কোন নতুন রাজ্যপালের আগমন আশংকার উদ্রেক করে থাকে। বিশেষ করে সেই রাজ্যপাল যদি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত শাসক দলের সক্রিয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর লোক হন।

আশংকার অন্য একটি দিকও আছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সংগে কংগ্রেস (ই)-চালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক আর যাই হোক খুব সুখপ্রদ নয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর নরম গরম, সতর্ক ও সংযত আচরণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের সংগে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রেখে চলছিলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভায় কোন কোন 'বৃদ্ধ তুর্কী' আছেন যাঁরা যে কোন মুহূর্তে আপন লেজের আগুনে লংকাকান্ড বাঁধাবার সামর্থ্য রাখেন। এমন পরিস্থিতিতে চিরকাল কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় থাকবে কিনা বলা শক্ত এবং সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক রাজ্যপাল কানে তুলো দিয়ে বসে থাকবেন কিনা, তাও গ্যারানটি দিয়ে বলা যায় না,বিশেষ করে তাঁকে কুলোর বাতাস দেবার জন্য পার্ষদদের যেখানে অভাব নেই। দ্বিতীয়ত রাজ্যপালের নিরপেক্ষ ভূমিকার মধ্যে কিছুটা নিষ্ক্রিয়তাও বর্তমান। যেমন রাজ্যপ্রশাসন যতই রসাতলে যাক রাজ্যপালকে হাসি হাসি মুখ করে বিধানসভায় অন্যের লেখা বক্তৃতা পড়ে বলতে হয় 'আমার সরকার যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা মেলা ভার।' আই সি এস বা আই এ এস রাজ্যপালদের ক্ষেত্রে এই স্ববিরোধিতা মেনে নেওয়া বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কারণ তাঁরা জন্ম হইতেই বলি প্রদত্ত। জলের মত যে পাত্রেই রাখা যায় সেই পাত্রের আকারই তাঁরা ধারণ করেন। বাবুরাম সাপুড়ের আদর্শ সাপের মত তাঁদের চোখ নেই, শিং নেই। বি ডি পান্ডে ঝানু সিভিলিয়ান। পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছেন ও হবেন। কিন্তু অনন্ত প্রসাদ শর্মার মত ভিন্ন-ধর্মী সক্রিয় রাজনীতিবিদরা যদি কখনও ভবিষ্যতে ফোঁস করেন তাহলেই মুশকিল। অবশ্য কে না জানে অসুরকে লক্ষ্য করে সাপের ফণা উদ্যত হলেও তার লেজটি থাকে দেবীর হাতে। তাঁর অংগুলি সংকেত ছাড়া উদ্যত ফণা বড় জোর ফোঁস করতে পারে কিন্তু ছোবল দেবার ক্ষমতা তার নেই।

পরিবর্তন

২৬ অক্টোবর-১ নভেম্বর, ১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১৬ ও ১৭

দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২০ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লী অফিস : সূর্যকিরণ ভবন ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ঘর ১০১২ নতুন দিল্লি ১১০০০১ ফোন : ৩১২০২৪

এবারের আলোচ্য বিষয় 'এক শ্রেণীর মহিলা কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরে চলাফেরা করেন বলেই পুরুষের বিকৃতমনস্কতা প্রশ্রয় পায়।' এ বিষয়ে বেশ কিছু মহিলা পত্রমারফৎ তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। এ জন্যে পরিবর্তন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। অবশ্য সব পত্র স্থানাভাবে প্রকাশ করতে না পারার জন্যে আমরা দুঃখিত।

পোশাক আশাক আজ আর শুধু লজ্জা নিবারণের জন্যে নয়, এটা জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির পরিবাহকও বটে। কিন্তু সব মহিলাই এ কথাটা কি বোঝেন? যেসব মহিলা বেশবাসে শালীনতার পরিচয় দেন তাঁরা হয়ত উত্তেজক পোশাক পরিহিতা সেকস-কিটিনদের কাছে পশ্চাদপদ। কিন্তু এই পশ্চাদপদতাই কিছু মহিলার কাছে গর্বের বস্তু তাঁরা ভাবেন রাহুগ্রস্ত চাঁদে গ্রহণ দেখার উত্তেজনা থাকলেও পূর্ণিমার সুষমা নেই। সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ কি শালীনতায়? প্রতিটি পত্রে লেখিকারা যেন এসব কথাই বলতে চেয়েছেন।

সমস্যাটা মনস্তত্ত্বভিত্তিক

মেয়েদের উত্তেজক পোশাকের এই আধিক্য আজকের দিনে নিঃসন্দেহে একটা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বয়ঃসন্ধিতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তির সূত্রপাত হয়। 'অহম স্ফীতি' (Ego-expansion) তাদের অন্যতম। তখন নিজেকে জাহির করবার এক প্রবণতা আর সমাজে গুরুত্ব অনুভব করবার এক মানসিকতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। যেসব ছেলেমেয়েরা নিজেদের গুণে, অর্থাৎ লেখাপড়া, খেলাধুলো, গানবাজনা বা অন্য কোনভাবে কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করতে পারে তাদের এই প্রবৃত্তি পূর্ণতা লাভ করে, আর তাদের অহম পরিতৃপ্ত হয়। এখন সহজ, স্বাভাবিক গতিতে তাদের জীবনযাত্রা প্রবাহিত হয়। কিন্তু যাদের এ ধরনের যোগ্যতা নেই, তারা অনুভব করে তারা অন্যের থেকে পিছিয়ে পড়ছে। তাদের মনে এক অভাববোধের সৃষ্টি হয়, আর এই অভাববোধ তাদের মনে হীনমন্যতাভাব জাগায়। তখন এই হীনমন্যতাবোধ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য ও অহমের পরিতৃপ্তির জন্য তারা বিকৃত পথ বেছে নেয়। তাদের মনে নিজেদের দেহকে অশোভনীয়ভাবে ও উত্তেজকভাবে অনাবৃত করবার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার একটা সহজ পন্থা হিসাবে নিজের দেহকে কাজে লাগিয়ে এরা সহজেই জয়ী হয় ও আত্মতৃপ্তি পায়। এই exhibitionism এর সূচনা হয় হীনমন্যতাবোধ থেকে।

অনেকে আবার উত্তেজক পোশাক পরে আধুনিক বা কেতাদুরস্ত হবার জন্যে, তারা যে কারো থেকে পিছিয়ে নেই তা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে।

এই সব মেয়েরা যতদিন এভাবে পিছিয়ে থাকবে ততদিন এই সহজ, বিকৃত পথকে আশ্রয় করেই তারা আত্মতৃপ্তি পাবার চেষ্টা করবে।

আর একটি প্রশ্ন, মেয়েদের এই উত্তেজক পোশাকের ফলে ছেলেদের বিকৃতমনস্কতা প্রশ্রয় পায় কি না ছেলেরা যাতে বিকৃতমনস্ক হয়ে গড়ে না ওঠে, তার ব্যবস্থা করলেই প্রশ্রয়ের প্রশ্ন উঠবে না। ছেলেদের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা গড়ে ওঠে মূলত উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে। বয়ঃসন্ধির আগে থেকেই পিতামাতা যদি তাদের সঠিক পথে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌনশিক্ষা দিতে পারেন, তা হলে তাদের চিন্তাধারা বিকৃত পথে যাবার সুযোগ পাবে না। আর বিকৃতমনস্কতা গড়ে না উঠলে প্রশ্রয়ের কোন প্রশ্নই আসবে না। তখন মেয়েদের এই অশালীনতাকে তারা এক ধরনের বিকৃতি বলেই বুঝতে শিখবে, নিজেরা বিকৃত হবে না।

অঞ্জলি দে
কলকাতা ১৪

কুরুচিপূর্ণ মানুষের শিকার

বেশ কিছুদিন আগে ব্যানডেল স্টেশন রোডে বাস ধরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনের মধ্যে বাস ধরার উৎকণ্ঠা, কারণ গন্তব্য স্থলে পৌঁছানর তাড়া। হঠাৎ দেখলাম একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোমর পর্যন্ত কালো চুলের বিনুনি ছেড়ে বেগুনি রং এর ম্যাচিং শাড়ি ব্লাউজ পরে রিকশায় চড়ে যাচ্ছে। ফরসা সুন্দর চেহারা, সুন্দর রুচি, দেহের কোন অংশ অপ্রয়োজনীয়ভাবে শাড়ি ব্লাউজের বাইরে রাখার প্রবণতা নেই।

রাস্তার প্রতিটি লোক তাকিয়ে দেখছে। আমি মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটিকে না দেখে রাস্তার লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকলের দৃষ্টি মেয়েটির দিকে, কিন্তু কারোর মুখে কোন কথা নেই, মনে হল সবাইকে নির্বাক করে মেয়েটি চলে গেল।

আর একটি ঘটনার কথা বলি ব্যানডেল স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। হাওড়া আসার তাড়া। এক ভদ্রলোক তুফান এক্সপ্রেস থেকে নামলেন, সংগে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, দুটি মেয়ে। Train journey-র ক্লান্তি আদৌ তাদের চোখে মুখে নেই। মনে হচ্ছে এই মাত্র মেক আপ নিয়ে বেরিয়েছেন। বয়স লুকান সাধারণ মাংসল দেহী, স্লিভলেস ব্লাউজ, ম্যাচিং শাড়ি, ঠোঁট রাঙান, ববকাট চুল, বলতে পারেন উগ্র আধুনিকা। এক কথায় সুশ্রী এবং সুন্দর।

মেয়ে দুটির মায়ের সংগে খুব মিল, বয়েজকাট চুল (যদিও মানিয়ে যায়, কারণ মেয়ে দুটির বয়স ১০ থেকে ১৪র মধ্যে), টেপ জাতীয় বড় ঝুলের বিদেশি স্টাইলের ফ্রক, বলতে পারেন বুকের উপরের অংশটা সম্পূর্ণ অনাবৃত। সত্যিই সুন্দর, সব দিক দিয়ে সুন্দর। পার্শ্ববর্তী দন্ডায়মান যাত্রী থেকে দূরের আবালবৃদ্ধ বনিতার দৃষ্টি দেখলাম ওদের দিকে। অধিকাংশ যাত্রীর অপ্রয়োজনীয় গতি দেখলাম ওদের পাশ দিয়ে। সেই সংগে নানাজনের মুখে নানা রকম বিদ্রূপের হাসি আর উদ্ভট সব শব্দ।

বুঝতে পারলাম উপলক্ষ ঐ এক, বিষয়বস্তুও এক। আস্তে আস্তে নিজের স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে দাঁড়ালাম।

দুটো ঘটনা, বিষয়বস্তু এক, আধুনিক মেয়ে ও মহিলা। ফারাক শুধু রুচি আর পোশাক-পরিচ্ছদের। মানুষের সহজাত ধর্ম সুন্দরকে দেখা, উপভোগ করা। এ ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত থাকতে পারে না। সুন্দরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করার দায়িত্ব তো তার যে সুন্দর। সেই সংগে সুন্দরকে কুৎসিতভাবে, নোংরাভাবে প্রকাশ করার কুফলও তার নিজেকেই ভোগ করতে হয়।

সুনিতা দাস
শান্তিপল্লী
ব্যানডেল, হুগলী

এও কি এক বিদ্রোহের প্রকাশ?

আজকের যুগে মেয়েরা ছেলেদের থেকে কোন অংশে কম নয় এ দাবি আমরা করে থাকি। শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারে আমরা সমমর্যাদাসম্পন্ন। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী সে দেশের নারী-সম্প্রদায় স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলে সেটা খুবই স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। এই স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হওয়ার মূলে আছে শিক্ষার প্রসার। আগেকার দিনে মেয়েরা লেখাপড়া জানতেন না, তাঁদের বাড়ির পুরুষরা যা বলতেন, বোঝাতেন, নির্দ্বিধায় তাই মেনে নিতেন, কোন প্রশ্ন মনে

[illegible] এখন আর তা হয় না, অর্থের পেছনে মেয়েরা যুক্তি চায়, প্রমাণ চায়। শিক্ষা প্রসারের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছু পরিবর্তন হয়েছে একথা মানতেই হবে। অনেক মেয়ে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জোরে একটা মেয়ে একটা ছেলের সমান চাকুরির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু তবু বলব ঠিক যতটা স্বচ্ছন্দে একটা ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজ সেরে বাড়ি ফেরে একটা মেয়ে তা পারে কি? রাস্তাঘাটে যে নারী-লোলুপ ক্ষুধার্ত একদল মানুষরূপী পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের অশ্রাব্য ভাষা, অশোভন অংগচালনা এড়িয়ে চলতে পারা খুবই শক্ত হয়ে পড়ছে। দিন দিন এর প্রকোপ বেড়েই চলেছে। এর পেছনে হয়ত কারণ আছে অনেক, কিন্তু কিছুটা দায়ী এর জন্যে মেয়েরাই একথা অস্বীকার করতে পারি না। এ ব্যাপারে মেয়েদের আত্মসম্ভ্রমবোধ, শালীনতাবোধ এবং সুরুচি সম্বন্ধে সজাগ হওয়া উচিত। কিন্তু আজকের মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখলে মনে হয় তাঁরা আবরুরক্ষার তাগিদে পোশাক পরেন না। কী করে শরীরটাকে পোশাকের মাধ্যমে আরও উৎকট [illegible] করেন। সভ্যতা, শালীনতা, সুরুচি যে সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে সে কথা বোধহয় তারা জানেন না। অসভ্য, অশালীন পোশাক বিকৃতমনস্ক লোকের বিকৃত কামনাকে উস্কানি দিয়ে জাগিয়ে তুলে মহিলাদের মর্যাদাহানি ঘটাচ্ছে একথা মানতেই হবে। শিক্ষা ও প্রগতির নামে পাল্লা দিয়ে চলছে এক অসুস্থ সংস্কৃতি যার ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ, সাংসারিক বন্ধন, নির্মল পারিপার্শ্বিকতা।

মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে এই যে অশান্ত ঢেউ নারীসমাজকে তোলপাড় করে দিচ্ছে এর মূলে রয়েছে কী? মহিলাদের একাংশকে দেখে মনে হয় তারা বেশি ভাবনা-চিন্তার ধার ধারেন না, হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের অন্ধ অনুকরণ করাটাকেই আধুনিকতার প্রকাশ বলে মনে করেন। তার জন্য এই স্বল্প স্বল্প বেশবাসে তার নিজের মর্যাদা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা ভাবেন না।

এরা ছাড়াও কিছু আছেন যাদের মনোরাজ্যে এ রকম দৈন্য আশা করা যায় না। তাদের শিক্ষাক্ষেত্রের ও কর্মক্ষেত্রের কৃতিত্ব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কিন্তু তথাপি যখন দেখি মহিলাটি তার শারীরিক [illegible] হয়ে, সুষমামণ্ডিত দেহবল্লরীকে আঁটোসাটো জিনসে ধরে রাখছেন তখন মনে প্রশ্ন জাগে বৈকি তবে এও কি এক বিদ্রোহের প্রকাশ?

শুক্লা কর
শিবপুর, হাওড়া ২

'সেকস-কুইন' সাজা অসুস্থতার লক্ষণ

এ কথা সত্যি যে, আজকালকার মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত ভারতীয় নারীসুলভ আচার-ব্যবহারের অনেকগুলি অভাবের মধ্যে প্রধানতম অভাব পোশাকের প্রতি এক ধরনের বিকৃত রুচিবোধ। আজকের সমাজের বেশ একটা বড় অংশই এই বিকৃতির শিকার।

যে মহিলারা এই ধরনের উত্তেজক পোশাকে আত্মতৃপ্তিতে ডগমগ হয়ে নিজেদের 'সেকস কুইন' হিসাবে জাহির করার প্রতিযোগিতায় উন্মাদ, তারা একবারও ভেবে দেখে না তাদের এই অসুস্থতা সমস্ত মেয়ে জাতটার এবং এই সমাজের কতখানি ক্ষতি সাধন করছে।

কিছু সংখ্যক মেয়ের এই ধরনের চলাফেরার জন্যই যে পুরুষত্বহীন পুরুষের নষ্টামি এ কথা আমি সম্পূর্ণভাবে মানতে নারাজ। পুরুষের [illegible] বিকৃতি ইন্ধন যোগায়। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। একজন পুরুষের জীবনে তার সবচাইতে বড় সার্থকতা তার কর্মে। কিন্তু আজ আমাদের দেশের পুরুষদের কথা চিন্তা করলে মনে হয় না কি যে ওদের এই অধঃপতনের জন্য ওদের চেয়ে অনেক বেশি দায়ী এই অসুস্থ সমাজ এবং তার ব্যর্থতা! জীবনযুদ্ধে পিছু হঠতে হঠতে ওরা আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য অনেক পুরুষমানুষ আছে যাদের সব কিছু থাকার পরেও তারা ঠিক মানুষ নয় এবং জংগলটাই যাদের একমাত্র উপযুক্ত বাসস্থান।

মেয়েদের এই যে উত্তেজক পোশাকের প্রতি স্পৃহা এটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। নকল জিনিসের কুফল। আমরা ভুলে গেছি যে এটা ভারতবর্ষ। আমরা ভারতীয়। আমরা সেই দেশের মানুষ যেখানে বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত আমাদের পথ-নির্দেশিকা। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি এবং চরিত্র হারিয়েছি। মেতে আছি ভিনদেশীয় জীবনের গতিশীল সুরের ঝংকারে।

আমাদের দেশের মেয়েদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের একটা উক্তি মনে পড়ছে। উনি তাঁর 'Our Women' প্রবন্ধে বলেছেন, 'The

ght of a woman's ambition is to be like Sita, the pure, the devoted, the all suffering!' কিন্তু আমাদের মেয়েরা কবে সেই মর্মবাণী উপলব্ধি করবে জানি না।

পাপিয়া চৌধুরী
কলকাতা-৬

পুরুষের কাছে আকৃষ্ট করা

মেয়েদের মধ্যে উত্তেজক পোশাকের আধিক্য ঘটছে, কথাটা কি ঠিক? আমার তো মনে হয় বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে সুরুচির বিকাশ ঘটছে বেশি। এখন তো ফিল্ম স্টার, টি ভি স্টার, বিজ্ঞাপনের মডেল এবং রাস্তাঘাটে হাত ঢাকা, গা-ঢাকা পোশাক, মর্যাদাপূর্ণ রং ও শাড়ির সংখ্যাই বেশি। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সত্যিই এক শ্রেণীর মহিলাদের কুরুচিকর ও লজ্জাকর পোশাকে পুরুষদের বিকৃতমনস্কতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। এই সব মহিলারা যে কোন বয়সের, অল্পশিক্ষিতা, মধ্যশিক্ষিতা ও উচ্চশিক্ষিতাও হতে পারে। অভিজাত ঘরের মহিলারাও এ ব্যাপারে বাদ যায় না। এদের কুরুচিকর পোশাক ও আচার-আচরণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রথমত: এদের মধ্যে স্বকীয়তার অভাব, অনুকরণের স্রোতে এরা গা ভাসিয়ে দেয়, এরা সাজতে ভালবাসে কিন্তু কোন সাজে তাদের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে, কোন সাজে তাদের অসৌন্দর্য সৌন্দর্যমান বলে প্রতীয়মান হবে তা তারা বুঝে উঠতে পারে না।

এখনকার মেয়েদের নানান কাজে রাস্তাঘাটে ঘুরতে হয়, তাই তারা লাবণ্য নষ্ট করে ফেলে এবং রূপচর্চারও সময় পায় না। ফলে তারা অন্যান্যদের কাছে বিশেষ করে পুরুষের কাছে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চড়া মেকআপ করে, পোশাকে স্বল্পতা এনে পরিধানে অস্বস্তি ফুটিয়ে নিজেদের আরও সস্তা ও বিশ্রী করে তোলে।

শিখা চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা ৩৭

দায়ী চলচ্চিত্র

মেয়েদের মধ্যে উত্তেজক পোশাকের আধিক্য কেন এই বিষয়ে আমি যে ব্যাপারটাকে দায়ী মনে করি সেটা হল কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র।

আজকাল আমরা প্রায়ই চলচ্চিত্রগুলিতে দেখি যে হিরো হিরোইনরা বিশেষ করে হিরোইনরা ও অন্যান্য নারী চরিত্রগুলি পর্দার সামনে উপস্থিত হয় উত্তেজক পোশাক পরে, যেন ঐ পোশাক পরলেই দর্শকদের প্রশংসা কুড়নো যাবে।

আজকের মেয়েরাও ঐ সব চলচ্চিত্র দেখে এসে হিরো-হিরোইনদের হাব ভাব, তাদের পোশাক, তাদের বাচনভঙ্গি নকল করে। এর জন্য মেয়েদের দোষ খুবই সামান্য। দোষ তাদেরই যারা এই নায়িকাদের বা অন্যান্য নারী চরিত্রগুলিকে সরু একফালি কাপড় পরিয়ে, (যা দিয়ে অংগই ঢাকা যায় না) পেটের ওপর অব্দি আঁটোসাটো উত্তেজক পোশাক পরিয়ে পর্দার সামনে উপস্থিত করান।

মানসী ব্যানারজি
গুসকরা, বর্ধমান

মেয়েরা সচেতন হলে

কেউ কেউ যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, কিছু মেয়ের কুরুচি-পূর্ণ পোশাকে পুরুষের বিকৃতমনস্কতা প্রকাশ পায় এটা একেবারে মিথ্যে নয়, আমাদের এখানে রাস্তাঘাটে দেখেছি, কোন মেয়ে ভদ্রপোশাক পরে গেলে ছেলেরা মন্তব্য করে, কিন্তু সেই মন্তব্যের মধ্যে কোন নোংরামি থাকে না, কিন্তু পোশাক রুচিসম্পন্ন না হলে ছেলেরা বাজে মন্তব্য প্রকাশ করবেই। আমি ছেলেদের কোন দোষ দিই না—কারণ কিছু পোশাক এমন কিছু মেয়ে পরে যা আমাদের মেয়েদের মধ্যেই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং এই ব্যাপারে মেয়েরা যদি একটু সচেতন হয় তা হলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়।

বীথিকা দে
মানিকপুর, মেদিনীপুর

পোশাক মোটেই মুখ্য নয়

পশ্চিমী হাওয়া এসে প্রথম আঘাত হানে মেয়েদের পোশাকে। একটা সময় ছিল যখন কোন মেয়ে ভাবতেই পারত না পুরুষের সামনে শাড়ি ছাড়া অন্য কোন পোশাকে বার হওয়া যায় কিনা।

এখন পাশকরা বা না-করা মেয়েদের জীবন ও জীবিকা, দুইয়ের তাগিদেই বাইরে বেরোতে হয়। বিরাট বারোহাতি শাড়ি এখন সামলানো রীতিমত কষ্টকর — হাঁটতে হল তাই মেয়েদের পোশাক — এল মিডি, মিনি, ম্যাকসি, সালোয়ার-কামিজ। আর তখনই প্রশ্ন আসে এ পোশাক কতখানি শালীন? আসলে রুচি শব্দটাই আপেক্ষিক। শাড়ি পরা একটি মেয়েও একেক সময় শাড়ির মর্যাদাটি ঠিকমত রাখতে পারে না। বলা যায় একটা সময় ছিল যখন অনায়াসে পুরুষ নিজেদের সুবিধায় ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর ছেড়ে কোট প্যান্টলুন ধরেছিল — আজ ঐ একই কারণে কলেজে পড়া বা চাকরি করা মেয়েদের শাড়ি ছাড়তে হয়েছে। মেয়েদের চোখে অনায়াসে যখন কোট প্যান্ট পরা একটি পুরুষ অস্বাভাবিক ঠেকে না, আজ ১৯৮৩-র শেষে তখন কেন আধুনিক পুরুষের সংগিনী হিসাবে মেয়েদের আধুনিক পোশাক একজন পুরুষের চোখে বেআব্রু ঠেকে?

তপশ্রী চট্টোপাধ্যায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অভিভাবকদেরও দায়িত্ব আছে

একটা সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে চাকরির জন্য ইনটারভিউ দিতে গেছে। পরনে চুড়িদার কামিজ। কিন্তু কামিজের উপরে বুকের মাঝখানে গোল করে কাটা ডিজাইন। অনেক প্রার্থীর মধ্যে ও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। মেয়েরাই ওর দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিল। ইনটারভিউ বোরড-এর সভ্যরাও যথাসময়ে ইনটারভিউ নিলেন। ওর মুখের দিকে তাকানর আগে দর্শকের চোখ চলে যাবে ঐ কাটা ডিজাইনের দিকে, তাই স্বাভাবিক। পরে জানতে পেরেছি ওর ইনটারভিউ যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও শুধু পোশাকের জন্য তা নাকচ হয়ে যায়।

২-৩ মাস আগে এক প্রাথমিক শিক্ষিকাকে দেখলাম বয়স কম করেও ৪৫ বছর হবে। কুড়ি বছরের নায়িকার মত করে চুল বাঁধা, ঠোঁটে কড়া লিপসটিক, অনেকখানি পেট বের করে সিনথেটিক শাড়ি পরেছে। যৌবনকে ধরে রাখবার, বয়সকে ঢেকে রাখবার এক তীব্র অথচ ব্যর্থ বিকৃত প্রয়াস। এরকম দেখে যদি ছেলে ছোকরারা কোন কুৎসিত ইঙ্গিত করে তা হলে বলার কিছু আছে কি?

কেবল যে মেয়েদের পোশাকের বেলায়ই বিকৃত-অবিকৃতের প্রশ্ন তাই নয়, পুরুষদের পোশাকের মধ্যেও রুচির পরিচয় থাকে। আমি একজন অধ্যাপককে দেখেছি যার বয়স ২৯, ডবল এম এ, গোলড মেডেলিসট, পি এইচ ডি করছেন। ধুতি, পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, হাতে ছাতা, শীতের সময় কাঁধে চাদর নিয়ে যখন চলেন মনে হয় একটা প্রণাম করি। এক্ষেত্রে জিনস বা ডিসকো ড্রেস কি ঐ শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম সৃষ্টি করতে পারত মনে?

অঞ্জনা কুন্ডু
শোনিতপুর, আসাম

বিজয়ার শুভেচ্ছা

কয়লার জন্য আরও রয়েলটি

ব্যাংকঋণ বেকারদের জন্য

দুর্গতদের সাহায্য

অম্লমধুর

আলো নেই জল নেই
গাড়ি নেই রাস্তায়
ডেয়ারির দুধ নেই
বুলি মেলে সস্তায়।

রাস্তায়, জঞ্জাল,
ভাঙাচোরা গর্ত
এই নিয়ে এখানে
থাকাটাই শর্ত।

বেশি কিছু চাইলে
থাপ্পড় সপেটা
অনুযোগ করসে
চামচের চপেটা।

*

দাও না বলে জ্বলবে না আর
চলবে না আর পাখা
বড় বড় আউড়ে বুলি
ভুলিয়ে কেন রাখা।

সকাল বিকাল ঘণ্টা ষোল
পাখা আলো নাইবা জ্বলো
আর যা বাকি রইল হাতে
বিজলি কেন রাখা।

দাও না বলে জ্বলবে না আর
চলবে না পাখা

*

নেশার ঝোঁকে গুলি
ছুটছে মুখে বুলি
নেশার ঘোরে রাস্তা ঘাটে
উড়ছে মাথার খুলি।

নেশার ঝোঁকে গাড়ি
ভাঙছে ঘর বাড়ি
নেশার ঝোঁকে মিঞা-বিবির
লেগেই আছে আড়ি।

ভয় নেই আর
ভয় নেই আর
চুল গজাবে টাকে
চুল গজানর
তেলগুলো সব
পড়ল বুঝি ফাঁকে।

তিনটে ছুঁচে
ইয়ান শিকিস্
কবল বাজি মাত
ছ' মাসেতে
কুচকুচে চুল
কী তাজ্জব বাত!

*

এ বলে সব বন্ধ করো
ও বলে সব খোলো
ওদের কথা না শুনলে
প্রাণের মায়া ভোলো।

আমরা যারা পাবলিক ভাই
এখন কী যে করি
শাঁখের করাত ঘাড়ের ওপর
তাতেই ভয়ে মরি।

বন্ধ খোলা সব কিছু তো
ওদের হাতেই চাবি
আমরা যারা বোকা হাঁদা
মুখ লুকিয়ে ভাবি।

নিতাই ঘোষ

খেলা তো নয়, তবু খেলা
একা দোক্কা তেক্কা
দেশটা জুড়ে রাজনীতি খেল
কে দেয় কাকে টেক্কা।

জয়নাল আবেদীন

রাত বিরেতে ছিল চিৎকার
চলছে শবযাত্রী,
খাটের ওপর মরা মানুষ
দিব্য আছেন চাহি,
গগনভেদী চিৎকারেতে
জুড়ি এদের নাহি।

হরদেব সাধুখাঁ

বিরোধী বন্দোবস্ত ও শ্রীমতী গান্ধী

অভিমন্যু সেন

উনিশশো চুরাশির গোড়ায় বা মাঝামাঝি লোকসভার নির্বাচন হবে কি হবে না এই নিয়ে ব্যবসায়ী মহল থেকে সাংবাদিক মহল পর্যন্ত নানা জল্পনা কল্পনা চলছে এবং সম্প্রতি দেশের বিরোধী দলগুলিই তাদের [illegible] ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে নির্বাচন এসে গেছে।

নয়া দিল্লিতে হঠাৎ ঢাকঢোল কিছু না পিটিয়েই দুটো উত্তর ভারতীয় বিরোধী দল, লোকদল এবং বি জে পি বা ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যৌথ সিদ্ধান্তে তাদের মোর্চা বা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স) ঘোষণা করেছেন এবং সংসদীয় নেতৃত্ব ও মোর্চা নেতৃত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়েছে চৌধুরী চরণ সিং ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর মধ্যে। হঠাৎ ঢাকঢোল কিছু জানতে না দিয়ে [illegible]। একটা ঘোষণা হওয়ায় সবচেয়ে বেশি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন জনতা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে চন্দ্রশেখর। তিনিও খুব তাড়াতাড়ি তাদের পাশাপাশি আর একটা যুক্তফ্রন্ট বানিয়ে ফেললেন কংগ্রেস (স), বহুগুণার ডি এস পি, চন্দ্রজিৎ যাদবের জনবাদী যুক্ত [illegible] পার্টি কংগ্রেস প্রভৃতিকে নিয়ে। দুটো মোর্চা থেকেই বাদ [illegible] পড়ে গেলেন জগজীবন রামের কংগ্রেস (জ) আর মানেকা গান্ধীর সঞ্জয় বিচার মঞ্চ। অথচ শুরুতে লোক দলের সঙ্গে জগজীবন রামের দোস্তির খবরটিই বাজারে খুব চালু ছিল। হরিয়ানা ও দিল্লির নির্বাচনে এমন একটা বন্দোবস্ত গড়েও উঠেছিল। [illegible] ভারতীয় জনতা পার্টির হিসেব মনে [illegible] বাজপেয়ীজীও একসময় চৌধুরী চরণ সিং, বাবু জগজীবন রামকে নিয়ে মোর্চা গঠন করার কথা ভেবেছিলেন। তাহলে বাবুজী বাদ পড়লেন কেন? রাজধানীর গুজব এ প্রসঙ্গে যে, বিজেপির অনেকে সন্দেহ করেন শেষ পর্যন্ত জগজীবন রাম কংগ্রেসের ইন্দিরা গান্ধীর কাছাকাছি চলে যাবেন। এমন ধারণা ব্যক্তিগতভাবে চরণ সিং প্রসঙ্গেও ছিল। কেননা শেষ পর্যন্ত বাবুজীর সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বিরোধী দলগুলোর কাছে তার পুত্র সুরেশ রাম। বলতে গেলে এখন বাবুজীর সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন সুরেশ রাম। সুরেশ রামের প্রতি আবার চৌধুরী চরণ সিং ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রচণ্ড আক্রোশ। তাই বাবুজীকে নিয়ে আর যাত্রা শুরু করা গেল না।

চন্দ্রশেখরের ফ্রন্টে বাবুজী সম্পর্কে সংশয় আছে স্বয়ং চন্দ্রশেখরের। জগজীবন রামেরও ঠিক তেমনই সংশয় আছে চন্দ্রশেখরের ফ্রন্টকে নিয়ে। এদের মত হল এরা একটা কর্মী ব্যক্তিদের নতুন টিম দেশকে দিতে চান। তাই মোরারজী ভাইকেও এরা বেশি প্রোজেক্ট করতে চান না-সেখানে বাবুজীর প্রশ্ন আসে না।

অতএব আপাতত বাবুজীর কোন গোষ্ঠী নেই। বাবু জগজীবন রাম কিন্তু একদম হাল ছেড়ে দেননি। তিনি মূল কংগ্রেসে ভজন লাল, কে সি পন্থ প্রভৃতির সংগে যোগাযোগ রাখছেন, আবার বিহারের জনতা ও লোকদল নেতাদের সংগেও যোগাযোগ রাখছেন। নির্বাচনের আগে সময় সুযোগ বুঝে তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। তা না হলে শুধু সুরেশ রাম নির্ভর হয়ে এবার আর সাসারামে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না।

এবারে আসা যাক মানেকা গান্ধীর বিষয়ে। পুনেতে নয় আগস্ট বিরোধী যুব সংগঠনের যে যুব সম্মেলন হয়ে গেল সেখানে মানেকা গান্ধী নিমন্ত্রিত ছিলেন। মানেকা গান্ধী নিমন্ত্রিত বলে শেষটায় চন্দ্রশেখর আর অরুণ শৌরী বেঁকে বসলেন। তারা কিছুতেই মঞ্চে যাবেন না। শেষটায় তাদের রাজি করান হল এই শর্তে যে মানেকা প্রকাশ্য সভা ও শোভাযাত্রায় অংশ নেবে না এবং নিলেও সেই সময় চন্দ্রশেখর মঞ্চে থাকবেন না। একসময় চন্দ্রশেখর পুনে ত্যাগ করে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আগে জানলে তিনি আসতেন না। মানেকা গান্ধীকে নিয়ে অন্ধ্রের একটি রামারাও (তেলেগু দেশম) সামান্য দুর্বলতা দেখান আর ইদানীং বোধহয় শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য ফারুক আবদুল্লা ওকে ডাকছেন। অক্টোবরে শ্রীনগর বৈঠকে আবদুল্লা ওকে ডেকে পাঠানতেঅন্যান্য বিরোধীরা খুব চটেছেন। এটা এমনও হতে পারে যে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে পরামর্শ করেই ডাঃ ফারুক আবদুল্লা মানেকাকে ডাকছেন যাতে বিরোধী জোটে আবার সংশয় শুরু হয়। কারণ দিল্লির রাজনীতিকরা একথা বিশ্বাস করতে এখনো রাজি নন যে ডাঃ আবদুল্লার সংগে শ্রীমতী গান্ধীর সম্পর্ক চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। মানেকা গান্ধীকে নিয়ে তাই বিরোধী শিবিরে উৎসাহ নেই। বেঁচে গেল বরাত জোরে চন্দ্রজিৎ যাদবের জনবাদী ও বহুগুণার ডি এস পি। এদের সংগঠন বলতে কিছুই নেই, কিন্তু নামটা আছে। বি জে পি লোকদল প্রতিভাত হল বলেই দেখাবার জন্য এদের ভাও বাড়ল। চন্দ্রশেখর ফ্রন্টে এদের কাজে লাগান হবে সি পি আই (এম) সি পি আই সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোকে কাছে টানবার জন্য। যদিও চন্দ্রজিৎ যাদব এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মূল কংগ্রেসে আসবার। চন্দ্রশেখরের ফ্রন্টে বহুগুণার অন্তর্ভুক্তিতে দারুণ আপত্তি উঠেছে সবার। নাম না করলেও যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন বহুগুণা, চন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র ভার্মা, গোরীশংকর রায়, মুরারকা প্রভৃতি বিশিষ্ট জনতা নেতৃবৃন্দ। চন্দ্রশেখরকে দলের ভেতরের এই চাপ মোকাবেলা করতে হবে।

বহুগুণাও ভেতরে ভেতরে তার কাছের মানুষদের কাছে চন্দ্রশেখরের সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। কারণ উত্তর ভারতের মাটিতে শ্রীমতী গান্ধীর পর বহুগুণাই যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য নেতা এমন ধারণা বহুগুণার এখনও বদ্ধমূল। চন্দ্রশেখর সেই ধারণা ভেঙে দেবার চেষ্টা করায় বহুগুণা শিবির খুশি নন।

এই দুটো ফ্রন্টের মধ্যে চন্দ্রশেখরের ফ্রন্টের সংগে বামশিবিরের বোঝাপড়ার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও সি পি আই দল জনতা দল প্রসংগে তাদের পুরনো মতামত এখনও পরিবর্তন করেননি, কিন্তু অন্ধ্র প্রদেশের নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সি রাজেশ্বর রাও অন্ধ্রের মাটিতে বিজেপিকে শ্রীমতী গান্ধীর দলের তুলনায় কম শত্রু মনে করেন।

সম্প্রতি মীর কাশিম দল ছেড়ে দেওয়ায় তাকে নিয়ে একটা জল্পনা চলছে সব বিরোধী শিবিরে, বিশেষ করে চন্দ্রশেখরের ফ্রন্টে। আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন শারদ পাওয়ার তাকে কংগ্রেস (এস) দলে অন্তর্ভুক্ত করতে। এখন দল নিরপেক্ষ প্রগতি-বাদী এক মানুষ অথচ ফ্রন্টের কাছাকাছি আছেন এমন মানুষ হলেন দুজন। একজন হলেন মীর কাশিম, আর অপর জন আই কে গুজরাল।

জনসাধারণের কাছে এখনো কিন্তু কোন ফ্রন্টেরই কোন ভাবমূর্তি গড়ে ওঠেনি। আর এস এস ও জনসংঘের অভিযোগ যে চৌধুরী চরণ সিং জনতা দলে ভাঙন ধরিয়ে সবকার ভেঙে দিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনিই আবার অটল-বিহারীর সংগে দোস্তি করায় জনগণের কাছে কোন বিশ্বাস-যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্যদিকে বামপন্থীদের কট্টর সমালোচক ও বহুগুণা বিদ্বেষী চন্দ্রশেখর রাতারাতি ওদের নিয়ে একটা ফ্রন্ট গড়ায় জনতা দল পুরো খুশি হয়নি। জরুরি অবস্থার সময় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নির্লোভ জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে অনেক সংগ্রাম যেমন কংগ্রেসের যথার্থ বিকল্প হয়েছিল, আজকের কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট সেই মঞ্চ নয়। ভোট ভাগাভাগি রোধ করতে এ ধরনের বন্দোবস্তে হয়ত অনেক জায়গায় কংগ্রেস বিপর্যস্ত হবে, কিন্তু দেশের মানুষের কাছে শ্রীমতী গান্ধীর বিকল্পে আর একটা মজবুত বিকল্প এর মধ্যে থেকে গড়ে তোলা যাবে এমনটা বোঝান সম্ভব নয়। সব বিরোধী দল যদি সর্বসম্মতিক্রমে শুধু চন্দ্রশেখরকে নেতৃত্ব দিয়ে তারই নেতৃত্বে বিরোধী শিবিরের একমাত্র শ্রীমতী গান্ধীর বিকল্প হিসেবে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেন তাহলে অনেকটা বেশি ভয় পেতে হত শ্রীমতী গান্ধীকে। □

আলোকচিত্র : অশোক বসু ও রাজীব বসু

রাজ্য রাজনীতির নেপথ্যে

কংগ্রেসের সংগঠন বাড়ছে না, ব্যক্তি-নেতৃত্ব জোরদার হচ্ছে

নিশীথ দে

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্যে অনেকেই দিল্লিতে ধরনা দিয়েছেন কিন্তু এ আই সি সি তাঁদের আমল দেননি। আর, এ আই সি সি যাঁদের চান তাঁরা কেউ সভাপতি হতে রাজি নন। এ আই সি সি র সাধারণ সম্পাদক সি এম স্টিফেন জনে জনে কথা বলেছেন, কোন রাস্তা বাতলাতে পারেননি। অগত্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা বলবেন তাই চূড়ান্ত।

অনেকে চেয়েছিলেন আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ই সভাপতি থাকুন। কেননা, ওঁর নেতৃত্বেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস অনেক বেশি আসন পেয়েছেন। সত্যিই কি তাই? যুব এবং কয়েকজন প্রবীণ নেতা প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় কংগ্রেস ভাল ফল করতে পারল না কেন? না, আনন্দবাবু নয় কিংবা প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের জন্য কংগ্রেস বেশি আসন পায়নি।

গত ১৯৭৭ সালে বহু এলাকায় কংগ্রেস মিটিং করতে পারেনি. লোকে ইঁট মেরেছে। মিটিং এ লোক আসেনি। '৮৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে কংগ্রেস মিটিং করতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্বাচনকেন্দ্র সাতগাছিয়ায় কংগ্রেস মিটিং করেছে এবং রাত এগারটা পর্যন্ত লোক বসে বক্তৃতা শুনেছে। এটা কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির জন্যে নয়, সি পি আই (এম)-বিরোধী ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র।

এখানে আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না। তবু বলতে হবে আনন্দবাবু একদিকে ভাগ্যবান। আনন্দবাবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে বহাল দু বছর চার মাস। অন্য কোন রাজ্যে কেউ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে এতদিন থাকতে পারেননি। অনেককে রীতিমত চড় চাপড়ও খেতে হয়েছে।

আনন্দবাবুকে হয়ত অনেক সময় কটু কথা শুনতে হয়েছে, অপমানিত হতে হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক ডাঃ গোপাল দাস নাগ কংগ্রেস অফিসে লাঞ্ছিত হয়েছেন। কয়েকবার আনন্দবাবু এবং গোপালবাবু পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অপমান হজম করে বহাল থাকতে হয়েছে।

আবদুস সাত্তারকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করার কথা উঠল। স্টিফেন সাহেব নিজে সাত্তার সাহেবকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সাত্তার সাহেব রাজি নন। প্রথমত তিনি বুঝেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের যা হাল তাতে কিছুই করতে পারবেন না। মাঝ থেকে শত্রু বাড়বে। দ্বিতীয়ত তিনি জানেন মুসলিম জনগণের কাছে দলের নেতার চেয়ে মন্ত্রীর কদর অনেক বেশি। সাত্তার সাহেব আগে মন্ত্রী ছিলেন, এখন মন্ত্রী নন। কিন্তু বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন। এই মর্যাদা ছাড়তে রাজি নন।

এখানেই সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেসের মধ্যে তফাৎ। সি পি আই (এম) নেতারা বলেন, তাঁদের পারটি চলে যৌথ নেতৃত্বে। এটা যেমন সবটা সত্যি নয়, কিন্তু এটা সত্যি সি পি আই (এম) চলে একটা নির্দিষ্ট নীতি এবং গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে। কংগ্রেস যতই গণতন্ত্রের কথা বলুক, পারটির মধ্যে গণতন্ত্রের বালাই নেই।

কংগ্রেস ভাঙার পর দক্ষ সংগঠকরা চলে গেলেন আদি কংগ্রেসে। আর অজানা অচেনা, শুধু গোষ্ঠী রাজনীতিকে চাঙ্গা করতে এমন সব লোককে ডবল প্রোমোশন দেওয়া হল যাঁরা আদৌ সংগঠক নন। অথচ তাঁরা ধরে নিলেন, কর্মকুশলতা এবং দক্ষতার জোরে এত উঁচুতে জায়গা পেয়েছেন। অন্তত দলীয় নির্বাচন হলে যাচাই হয়ে যেত কার পায়ের তলায় কতটা মাটি আছে। ১৯৭২ সালেও নির্বাচন হয়নি। সবাই মিলে কমিটি তৈরি করেছেন। ১৯৭৫ পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসগুলোর বাকস্বাধীনতা ছিল, কিন্তু তারপর থেকে এ আই সি সি র আনডার টেকিং ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করার কথা উঠল। যুব ছাত্ররা সবাই মোটামুটি রাজি। প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম – এঁদের সবাইকে একমাত্র দেবীবাবুই পারেন" একঘরে পাশাপাশি বসাতে। প্রবীণদের অনেকেই বেঁকে বসলেন, দেবীবাবু তাত্ত্বিক, উনি কী করে প্রদেশ কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে তুলবেন?

জবাবটা দিলেন আর এক প্রবীণ নেতা। এখন পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা সংগঠন গড়ার কাজ করছেন, সি পি আই (এম) এর 'মারদাঙ্গা রাজনীতি'র বিরুদ্ধে মানুষকে সামিল করছেন তাঁদের শতকরা নব্বই জনই যুব ছাত্র সংগঠন থেকে এসেছেন। আর এঁদের বেশির ভাগই দেবীবাবুর হাতে তৈরি। দেবীবাবু এঁদের সঙ্গে থেকে সেই ৬৭ থেকে ৬৯ সাল পর্যন্ত হাতে কলমে রাজনীতি করেছেন। এঁদের নিয়ে গোষ্ঠী-রাজনীতি করেননি। আসলে দেবীবাবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হলে ডবল প্রোমোশন পাওয়া নেতাদের নেতৃত্ব করার নামে কর্তৃত্ব করা ছাড়তে হবে।

তবে আসল ঘটনা হল দেবীবাবু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতিতে আসতে কিছুতেই রাজি নন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত ন্যাশনাল কমিশন অন টিচারস-এর চেয়ারম্যান। তা ছাড়া দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে, গুরুত্ব সহকারে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। যুব ছাত্র কর্মীদের কাছে 'দেবীদা'র সম্পর্কও নষ্ট হতে দেননি।

সবাই এটা বুঝতে পারছেন, কংগ্রেস অদূর ভবিষ্যতে একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জের সামনে আসছে। বিরোধীরা জোট বাঁধছে। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি আস্থার ভাব কমছে। অথচ কিছু করার নেই।

এ আই সি সি যাঁদের চাইছেন তাঁরা যে রাজি হচ্ছেন না তার কারণ একটাই। তা হল, প্রদেশ কংগ্রেসের কোন ক্ষমতা নেই। সি পি আই (এম) দলে রাজ্য কমিটির সম্পাদক তো দূরের কথা, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য করতে চাইলে অনেকেই মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে আসবেন।

কংগ্রেসের এক নেতা সি এম স্টিফেনকে বলেছেন, সি পি আই (এম) দলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর চেয়ে প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর মর্যাদা এবং ক্ষমতা কম ছিল না। বর্তমান রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্যতা নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। কিন্তু বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেসের কোন সভাপতি দলের মধ্যে কোনদিন সরোজবাবু যে মর্যাদা পান তার সিকিভাগ বা অর্ধেক ক্ষমতা ভোগ করতে পেরেছেন? কিংবা সরোজ বাবুর বিরুদ্ধে কেউ জ্যোতিবাবুর কাছে নালিশ করার সাহস পেয়েছেন? অথবা বিশৃঙ্খল আচরণ করার জন্য কেউ ইন্ধন যোগাতে সাহস পেয়েছেন?

প্রদেশ কংগ্রেসে এটা নতুন কিছু নয়, সেই ১৯৭১ সাল থেকে চলে আসছে। আবদুস সাত্তারের সঙ্গে ডাঃ জয়নাল আবেদিনের ঝগড়া, ডাঃ আবেদিনের সঙ্গে এ বি এ গণি খান চৌধুরীর ঝগড়া। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। তখন এ আই সি সি সব ব্যাপারে নাক গলাতেন না। এখন সবাই দিল্লি ছুটছেন। ছুটছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। দিল্লির ভয়ে প্রদেশ কংগ্রেস জড়সড় – এই বুঝি চাকরি গেল।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এমন কোন ফরমান জারি করতে পারেন যে প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেউ নালিশ করতে এলে তিনি শুনবেন না। নালিশ থাকলে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এ আই সি সি আলোচনা করবেন?

পশ্চিমবঙ্গে মানুষ এখন সি পি আই (এম)-এর বিকল্প চায়। সাধারণ মানুষের এই মনোভাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকার কংগ্রেস কর্মীরা কাজে লাগাচ্ছেন। তাতে কংগ্রেসের সংগঠন বাড়ছে না, ব্যক্তি-নেতৃত্ব জোরদার হচ্ছে। আর সি পি আই (এম)কে সুযোগ করে দিচ্ছে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা। □

রাষ্ট্রসংঘের অভ্যন্তরে

রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর কি নিউ ইয়রক থেকে সরে যাবে ?

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কখনও সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে টেলিফোনে হুমকি আসে বোমা দিয়ে বাড়িটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। কখনও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ফেটে পড়ে বহু শক্তিধর রাষ্ট্র মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষপুট থেকে রাষ্ট্রসংঘকে সরিয়ে আনবার জন্য সবার আগে দরকার ওই বাড়িটির ঠিকানা বদল করা। নিউ ইয়রক শহরের ইসট নদীর তীরে ইউ এন প্লাজা থেকে সরিয়ে ওই বাড়িটিকে বসান হোক জেনেভা কিংবা ভিয়েনায়। সেই দাবি আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে যখন রাষ্ট্রসংঘের গত ৩৮তম অধিবেশনে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো আসতে পারলেন না তখন। গ্রোমিকোকে বাদ দিয়ে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন তাঁর কার্যকালের মধ্যে এই প্রথম। কোরিয়ান যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংসের সংগে সংগে রুশ মারকিন সম্পর্কের আর এক দফা অবনতি ঘটেছে। মারকিন জনগণ বিক্ষুব্ধ। গ্রোমিকোর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চাননা মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার। অথচ রাষ্ট্রসংঘের সংগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রসংঘে সফররত কূটনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধান-দের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক ব্যয় এখন ১৬০৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮ হাজার ডলার। টাকার হিসাব হল এই অংকের দশগুণ। এই টাকার শতকরা ২৫ ভাগ দিয়ে থাকেন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, কারণ রাষ্ট্রসংঘের ১৫৮টি সদস্যদেশের নিজস্ব আয়ের ভিত্তিতেই চাঁদাটা ধার্য হয়ে থাকে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তাই বারবার হুমকি দেয় চাঁদার হার কমিয়ে রাষ্ট্রসংঘকে সে ভাতে মারার চেষ্টা করবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনেকেই নাকি বছরের পর বছর বহু টাকার চাঁদা বাকি ফেলে রাখে। কিন্তু একথাও ঠিক পূর্বনদীর ধারে ১৬ একর জমি জুড়ে বিরাট রাষ্ট্রসংঘ বিন্যাস গড়ে ওঠার ফলে শহর নিউ ইয়রকের গুরুত্ব আজ বিশ্বের মধ্যে অসীম।

প্রতিদিন বিমান বোঝাই করে যে অসংখ্য কূটনীতিক রাষ্ট্রসংঘে আসেন তার ফলে মারকিন যুক্ত রাষ্ট্রের বছরে আয় হয় ৭০ হাজার কোটি টাকা।

রাষ্ট্রসংঘের শতকরা ৬০ ভাগ বহন করে বিশ্বের উন্নত ১০টি রাষ্ট্র। বাকি ১৪৮টি রাষ্ট্র মিলে তুলে দেয় বাকি ৪০ ভাগ টাকা।

গত ২৭ ডিসেমবর সেক্রেটারি জেনারেল ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে দেখান হয়েছে ওই আর্থিক বছরে ১০টি রাষ্ট্রের চাঁদার অংশ কতটুকু।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র শতকরা ২৫ ভাগ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১০.৫৪ শতাংশ, জাপান ১০.৩২ শতাংশ, পশ্চিম জারমানি ৮.৫৪ শতাংশ, ফ্রানস ৬.৫১ শতাংশ, গ্রেট বৃটেন ৪.৬৭ শতাংশ, ইতালি ৩.৭৪ শতাংশ, কানাডা ৩.০৮ শতাংশ, স্পেন ১.৯৩ শতাংশ, নেদারল্যান-ডস ১.৭৮ শতাংশ।

অনেকের কাছে রাষ্ট্রসংঘের

বার্ষিক বাজেট বিরাট বলে মনে হলেও রাষ্ট্রসংঘের একজন মুখপাত্রের মতে এই বাজেট মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সারা বছর জঞ্জাল সাফ করার ব্যয়বরাদ্দ থেকে বেশি নয়। এর শতকরা ৭৮ ভাগ টাকাই খরচ হয় রাষ্ট্রসংঘের ১২১৫০জন স্টাফের বেতন দিতে। সারা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণের ভার যার ওপর সেই রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা যে কোন একটি মাঝারি ইনজিনিয়ারিং কোমপানির কর্মচারী সংখ্যার সমান।

নিউ ইয়রক শহরের পূর্বপ্রান্তে পূর্বনদীর তীরে সমান্তরাল রাস্তাটির নাম আসলে হওয়া উচিত ছিল নমবর ওয়ান অ্যাভিনিউ। কিন্তু এর নাম ইউনাইটেড নেশনস প্লাজা। লম্বভাবে এই প্লাজাতে এসে মিশেছে অনেকগুলি ছোট রাস্তা যার নাম স্টিট।

পূর্বনদীর তীরে প্রায় ১৬একরজমি জুড়ে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর, সাধারণ পরিষদ, অছি পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন দফতরের অধিবেশন কক্ষ আর সেক্রেটারিয়েট। এই পুরো বিন্যাসটির শুরু ৪২ নং রাস্তায়, শেষ ৪৬ নং রাস্তায়।

গত ২৬ সেপটেমবর থেকে ৩০ সেপটেমবর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহযাত্রী সাংবাদিক হিসাবে এই রাষ্ট্রসংঘের বাড়িটিই ছিল আমার সারাদিনের ঠিকানা। এই বিশাল ভবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আমি ঘুরে বেড়িয়েছি তথ্য ও রিপোরট সংগ্রহের জন্য। মনে রাখতে হবে সেপটেমবর মাস রাষ্ট্রসংঘের ব্যস্ততম মাস। কারণ, প্রতিবছর সেপটেমবর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয় এবং চলে ডিসেমবর পর্যন্ত। তবে যেহেতু সেপটেমবরে প্রেনারি অধিবেশনগুলি হয়ে যায় সেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা এই সময় এসে ভাষণ দেন সাধারণ পরিষদে। এবছরও এসেছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানেরা। রেগন, মিতেরাঁ, থ্যাচার থেকে শ্রীমতী গান্ধী। গোটা রাষ্ট্রসংঘ জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার যেমন কড়াকড়ি করা হয়েছিল তেমনি ১২ হাজার কর্মীদের কারও কোন অবকাশ ছিল না। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের কাজকর্ম ও অধিবেশন সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়া যাক। সাধারণ পরিষদই রাষ্ট্রসংঘের সবচেয়ে বড় সংগঠন। সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রই এর সদস্য। প্রত্যেক দেশের একটি করে ভোট। এখানে সাধারণ সংখ্যাধিক্যে সব কিছুর মীমাংসা হয়। শুধু শান্তি ও নিরাপত্তা, নতুন সদস্যভুক্তি বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রস্তাব পাশ করাতে গেলে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাগে।

সাধারণ পরিষদের কাজ হল রাষ্ট্রসংঘের নীতিনির্ধারণ, বাজেট অনুমোদন, বিভিন্ন পরিষদের স্থায়ী-অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হতে পারে কোথাও আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা, কী করে কোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করা যায়, মানবিক অধিকার কোথাও লংঘন করা হচ্ছে কিনা। সাধারণ পরিষদ মনে করলে কোন বিষয় নিরাপত্তা পরিষদকে পাঠাতে পারে আবার নিরাপত্তা পরিষদের রিপোরট বিবেচনা করতে পারে। এক কথায় সাধারণ পরিষদ এক বিশ্ব পারলামেনট।

প্রতিবছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের শুরুতে একজন করে নতুন সভাপতি নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত করা হয় ২১ জন সহসভাপতি। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদ প্রতিবছরই বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে।

সাধারণ পরিষদের গোড়ার অধিবেশনগুলি হয় মূল অধিবেশন অর্থাৎ প্রেনারি। এই মূল অধিবেশনে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরেই সদস্য রাষ্ট্রগুলি ভাষণ রাখতে পারে। রাষ্ট্রপ্রধানরা এসে প্রেনারিতে বক্তৃতা দেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। অনেক রাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠায়। এবার যেমন মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রানস, ভারত, মিশর, গ্রীস, সাইপ্রাস, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরাই এসে বক্তৃতা দিলেন। আবার চীনের পক্ষ থেকে এসেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসতে পারেননি। কেন, তা আগেই বলা হয়েছে।

এই সমস্ত ভাষণের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়সূচি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮২ সালের অধিবেশনে ১৮২টি বিষয়সূচি নির্ধারিত হয়েছিল। এইবার সাধারণ পরিষদ বিষয়গুলি পরিপূর্ণভাবে আলোচনার জন্য সাতটি কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেয়। এই সাতটি কমিটি হল প্রথম কমিটি (নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব নিরাপত্তা), বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি, দ্বিতীয় কমিটি (অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়), তৃতীয় কমিটি (সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়), চতুর্থ কমিটি (উপনিবেশ উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়), পঞ্চম কমিটি (প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত বিষয়) ও ষষ্ঠ কমিটি (আইন বিষয়)।

এছাড়া প্রেসিডেনট ও ২১ জন ভাইস প্রেসিডেনটকে নিয়ে একটি জেনারেল কমিটি রয়েছে। সাতটি কমিটির চেয়ারম্যানরাও এর সদস্য। এছাড়া প্রতিবছর নির্বাচিত সভাপতি একটি করে বাছাই কমিটিও তৈরি করেন।

কতকগুলি প্রশ্ন মূল অধিবেশনেই নির্ধারিত হয়। কমিটি তাঁদের খসড়া রিপোরট মূল অধিবেশনে পেশ করেন। তবে সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব মেনে চলা কোন সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবগুলি বিশ্বজনমতকেও প্রতিফলিত করে এবং সেহেতু সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বিশ্বজনমতেরই রায়। সেদিক থেকে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবগুলির নৈতিক মূল্য অসীম।

রাষ্ট্রসংঘের হাতে কোন সামরিক শক্তি না থাকলেও ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন রাষ্ট্রসংঘের সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে এই সংগঠনটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব অর্জন করেনি। ভাবতে অবাক লাগে নিউ ইয়রকের এই সদর দফতর থেকেই সমগ্র বিশ্বের গতিপ্রবাহকে এক মুহূর্তে উপলব্ধি করা যায়। এই বাড়ির যে কোন ঘরে, লবিতে, কাফেতে সর্বত্র যে মুখগুলি দেখা যায় তারা এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে। এক সঙ্গে গোটা বিশ্বকে আর কোথাও এমন করে দেখা যায় না।

রাষ্ট্রসংঘের এই সদর দফতরটির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এই সদর দফতর যে নিউ ইয়রকে তৈরি করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৬ সালের ১৪ ফেবরুয়ারি রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধিবেশনে। সেই অধিবেশন বসেছিল লনডন শহরে।

এখন যেখানে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর, আগে সেখানে ছিল নিউ ইয়রক শহরের কসাইখানা। জমিটি কেনা হয়েছিল ৮৫ লক্ষ ডলারে। বাড়ি তৈরি করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রানস, চীন, সুইডেন, ব্রাজিল, বৃটেন, অসট্রেলিয়া ও উরুগুয়ের শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান স্থপতি ছিলেন মারকিন স্থপতি ওয়ালেস কে হ্যারিসন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ৮৫০ কোটি ডলার ব্যয় করে ৪৫ তলার বাড়ি তৈরি হবে। কিন্তু পরে খরচ কমিয়ে নিয়ে আসা হয় ৬৫০ কোটি ডলারে। ৪৫ তলার বদলে হয় ৩৯ তলা বাড়ি। এই ৬৫০ কোটি ডলার নির্মাণব্যয়ের টাকা মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিনা সুদে ধার দিয়েছিলেন। ১৯৮০ সালের ভেতরেই রাষ্ট্রসংঘ ৬২০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন। বাকি টাকাটাও ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয় ১৯৮২ সালের মধ্যে।

অতবড় বাড়িটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল আঠারো মাসের মধ্যেই। নিউ ইয়রকের চারটি বিলডিং ফারম ওই বাড়ি তৈরির ঠিকাদারি নিয়েছিলেন। পুরনো বাড়িগুলি ভেঙে ফেলে, ২৭০ জন পূর্বতন বাসিন্দাকে নিজেদের খরচে নতুন বাড়ি তৈরি করে তাদের উচ্ছেদ করতে ও ৩১ ফুট গভীর ভিত খুঁড়তে তার আগে একবছর লেগে যায়। ১৯৫০ সালের ২১ আগসট থেকে রাষ্ট্রসংঘের

নিউ ইয়রকে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর

প্রধান দফতরের ঠিকানা হয় নিউ ইয়রক।

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসংঘের মূল দফতর তৈরি হয়েছিল সে সময়কার ৫৭টি সদস্য রাষ্ট্রের কথা ভেবে। সে সময় ৭০টি সদস্যের মত ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে সদর দফতরের সম্প্রসারণ হয়। ১২৬টি সদস্য রাষ্ট্রের স্থান সংকুলান করা হয় তখন। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলতে থাকে। ১৯৮০ সালে সম্পূর্ণ হয় আর এক দফা সম্প্রসারণ। সাধারণ পরিষদ অছি পরিষদ ও সাধারণ সম্মেলন কক্ষগুলির আসন সংখ্যা আরও বাড়ান হয়। এই নিবন্ধের লেখক যখন ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র সংঘ পরিদর্শন করেন তখন দলিল ও কাগজপত্র ছাপার আধুনিক বিভাগটি তৈরি হয়নি। এই বিভাগটি চালু হয় ১৯৮০ সালে। এর দক্ষতা রীতিমত তারিফ করার মত। প্রতিদিন অসংখ্য কার্যবিবরণী, বক্তৃতার অংশ হিসাব পত্র কর্মসূচি, বিজ্ঞপ্তি এই বিভাগ থেকে ছাপা হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলে যায় প্রতিনিধিদের কাছে ও প্রেস সেনটারে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি ডকুমেন্টই অন্তত তিনহাজার কপির মত ছাপতে হয় এবং সেগুলি সংগে সংগে বিতরণ করে ফেলতে হয়।

১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রসংঘ ভবনের দক্ষিণ পূর্ব কোণের দোতলা কাফেটেরিয়াটাও তৈরি হয়নি। এবারে গিয়ে দেখা গেল বিলাসবহুল বিশাল কাফেটেরিয়াটি যেখানে থরে থরে সাজান আছে নানারকম খাদ্য। অন্তত দুহাজার লোক কাফেটেরিয়ায় এক সংগে বসে খেতে পারেন। তবে প্রত্যেককে কিউ দিয়ে নিজের হাতে খাবার তুলে আনতে হবে এবং খাওয়া হয়ে গেলে ট্রে ও প্লেট টেবিল থেকে তুলে চলমান বেলটের ওপর রেখে আসতে হবে সেগুলি মাজার জন্য। রাষ্ট্রপ্রধান, অ্যামবাসাডর এমনকি রাষ্ট্রসংঘের দর্শকরাও এই কাফেটেরিয়ায় আসতে পারেন।

রাষ্ট্রসংঘের বাড়িগুলির বিলাস বহুল ও নয়নাভিরাম স্থাপত্যরীতি তারিফ করার মত। দেখে মনে হয় বুঝি পাঁচতারা কোন হোটেল। ৫৫০ ফুট উঁচু বাড়িটি অ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ ও মারবেল দিয়ে তৈরি। ৩৯ তলার এই বাড়ির নিচে আছে তিনটি বেসমেনট। নিউ ইয়রকে গরম পড়ে বলে বাড়িটিতে বসান আছে চার হাজার এয়ারকনডিশনিং ইউনিট। বাড়ির চারতলা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উঠে যাওয়া যায় চলমান এলিভেটরের সাহায্যে। চারতলাতেই আছে প্রেসরুম। ৩০০ সাংবাদিক আছেন যাঁরা রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী অ্যাক্রিডিটেড। এছাড়াও সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় আসেন আরও একগাদা সাংবাদিক। সাংবাদিকদের জন্য রয়েছে সারি সারি টাইপরাইটার প্রেসরুম থেকে সরাসরি টেলিপ্রিনটার বা টেলেক্সে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা। প্রতিটি সংবাদপত্র ও নিউজ এজেন্সির জন্য আলাদা আলাদা কিউবিকিলস ভাগ করে দেওয়া আছে। সাংবাদিকদের জন্য রক্ষিত বিশেষ ডেসকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় হ্যানডআউট ও বক্তৃতার কপি বিতরণ করা হয়ে থাকে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর। তাছাড়া দোতলায় আছে প্রেস কনফারেনসের জন্য নির্ধারিত ঘর। সেখানে দিনে অন্তত চারটি থেকে আটটি প্রেস কনফারেনস বা ব্রিফিং হবেই। প্রত্যেকটি ব্রিফিং এর খবর ব্ল্যাকবোরডে লেখা থাকে। তাছাড়া মাঝে মাঝে মাইক্রোফোনে বলে দেওয়া হয় অত নং ঘরে অতটার সময় অমুক দেশের প্রতিনিধি ব্রিফিং করবেন। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ বা অছি পরিষদের সমস্ত প্রকাশ্য অধিবেশনেই সাংবাদিকদের ঢোকার অবাধ অধিকার আছে। সাংবাদিকদের স্থান একেবারে পিছনের সারিতে। প্রতিটি ভাষণ সংগে সংগে ছটি ভাষায় অনুদিত হয়। ইংরেজি, ফরাসি স্প্যানিশ রাশিয়ান চীনা ও আরবি। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নির্দিষ্ট ভাষার জন্য বোতাম ঘোরাতে হয়। তবে রাষ্ট্রসংঘের সাংবাদিকরা কেউই অধিবেশন কক্ষে গিয়ে ভাষণ শোনা প্রয়োজন মনে করেন না। কারণ অধিকাংশ ভাষণই লিখিত থাকে। তার কপি আধঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রেস রুমের ভেতরে আছে রঙিন টি ভি। ক্লোজড সারকিট টি ভি মারফৎ অধিবেশনের যাবতীয় দৃশ্য রিলে করা হয় সাংবাদিকদের জন্য। তাঁরা প্রেসরুমে বসেই গোটা অধিবেশনটা দেখতে পান।

রাষ্ট্রসংঘের ভেতর সবচেয়ে বড় হল সাধারণ পরিষদের বাড়িটি। ৩৮০ ফুট লম্বা ও ১৬০ ফুট চওড়া এই বাড়ির ওপরে রয়েছে সুদৃশ্য ডোম। এই বাড়ির পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেওয়াল ইংলিশ লাইমস্টোন ও মারবেল দিয়ে তৈরি দক্ষিণদিকে রয়েছে সাড়ে তিনশো ফুট উঁচু মারবেল ফ্রেমের বিশাল আয়না। ব্যালকনিগুলিতে রয়েছে মৃদু আলোর ব্যবস্থা। লবির পাশে রয়েছে এক প্রার্থনা কক্ষ মুসলিম সদস্যদের নামাজ পড়ার জন্য। প্রার্থনা কক্ষের প্রবেশ পথে দেখা যায় মার্ক শাগাল এর ১৫ বাই ১২ ফুটের গ্লাসপ্যানেল — শান্তির জন্য মানুষের সংগ্রাম। ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রসংঘের নিহত সেক্রেটারি জেনারেল দাগ হামারশিল্ডের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

সাধারণ পরিষদ হলটি ১৬৫ ফুট লম্বা, ১১৫ ফুট চওড়া। সিলিং এর উচ্চতা ৭৫ ফুট। দোতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। গোটা পাঁচেক রবীন্দ্রসদন এক সঙ্গে জুড়লে যেমন হয় তেমনি এর আয়তন। সামনে স্টেজের মত পোডিয়াম। পোডিয়ামে বসেন সেক্রেটারি জেনারেল, সাধারণ পরিষদের সভাপতি আনডার সেক্রেটারি জেনারেল (পলিটিক্যাল) ও জেনারেল অ্যাসেমব্লি অ্যাফেয়ারস। সাধারণ পরিষদে সদস্যদের বসার স্থান তাঁদের রাষ্ট্রের আদ্যক্ষর অনুসারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের জন্য ছয়টি করে স্থায়ী আসন নির্ধারিত। এছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের অলটারনেট প্রতিনিধিদের জন্য সিনিয়র অ্যাডভাইসার ও বিশেষজ্ঞ এজেন্সিগুলির প্রতিনিধিদের জন্য ৫৭৬টি আসন নির্দিষ্ট আছে। হলের দুপাশে ১৮৭টি আসন অলটারনেটিভদের জন্য। ব্যালকনিতে ৫৩ টি আসন সাংবাদিকদের জন্য ও জনসাধারণের জন্য ২৮০ টি আসন। পোডিয়ামের পাশে ৭৬ জন সহকারী কর্মীর জন্য চেয়ার রাখা আছে। সব মিলিয়ে সাধারণ পরিষদে আসনের সংখ্যা ২২০৩। মাইক্রোফোনের ব্যবস্থায় এমন নিখুঁত করে রাখা যে কানে ইয়ারফোন না দিলে কোন কথা ভাল করে শোনা যায় না।

১৯৫২ সালের ১৪ অক্টোবর এই হলে সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। সেটি ছিল সাধারণ পরিষদের সপ্তম অধিবেশন।

সাধারণ পরিষদের এই বাড়ির মধ্যেই আছে একটি বড় কনফারেনস রুম ও চারটি ছোট কনফারেনস রুম, রেডিও ও টি ভি স্টুডিও, সাউনড রেকরড করার ব্যবস্থা, মাস্টার কনট্রোল রুম। নিচের তলায় আছে বই এর দোকান, যেখানে রাষ্ট্রসংঘের নিজস্ব বইপত্র বিক্রি হয়। আছে রাষ্ট্রসংঘের নিজস্ব পোস্ট অফিস। রাষ্ট্রসংঘের এই ডাকঘর থেকে রাষ্ট্রসংঘের নিজস্ব টিকিট দেওয়া চিঠি পোসট করলে তা সাধারণ ডাক টিকিট হিসাবেই গ্রাহ্য

হয়। রাষ্ট্রসংঘের ডাকটিকিট আর কোথাও চলে না। আছে গিফট সেনটার, সুভেনির শপ ও কফিশপ। ১৯৮৪-৮৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য চাঁদার বাইরে নিজস্ব আয় ধরা হয়েছে ২৮৪,৫৬৫,৪০০ ডলার। এই টাকা আসবে রাষ্ট্রসংঘের নিজস্ব আয়ের উৎস থেকে।

রাষ্ট্রসংঘ বছরে ২ কোটি ডলারের ডাক টিকিট বিক্রি করে। সুভেনির বিক্রি করে আয় করে ১৫ লক্ষ ডলার। গিফট সেনটারের আয় বছরে ৭ লক্ষ ডলার। রয়্যালটি বাবদ আয় ৫০ হাজার ডলার। বই প্রকাশনা থেকে আয় ২ লক্ষ ৭১ হাজার ডলার। দর্শকদের টিকিট থেকে আয় ১৮ লক্ষ ডলার। মোট আয় ২০ হাজার ৬৪৮ মিলিয়ন ডলার।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কনফারেন্স হল সাজাবার দায়িত্ব নিয়েছেন এক একটি দেশ। যেমন নিরাপত্তা পরিষদ চেম্বার সাজিয়েছেন নরওয়ের বিশেষজ্ঞ আরনেসটাইন আরনেবারগ। পূর্ব দেওয়াল জুড়ে আছে শান্তি ও স্বাধীনতার ম্যুরাল – নরওয়ের শিল্পী পার ক্রোহগ এর তৈরি। এই হলে আছে জনসাধারণের জন্য ২৩২টি আসন। সাংবাদিকদের জন্য ১১৮টি। সাধারণ পরিষদের বাড়ি ও সেক্রেটারিয়েটের বাড়িটির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে অছি পরিষদের বাড়িটি। এই বাড়িটি সাজিয়েছেন ডেনমার্ক। ডেনিশ শিল্পী ফিন জুল এর শিল্পকীর্তি ছড়িয়ে আছে অছি পরিষদের হলে। হলের মধ্যে দর্শনীয় হল পোডিয়ামের ডানদিকের দেওয়ালে ডেনিশ শিল্পী হেনরিক স্টারক এর তৈরি টিক এর নারীমূর্তি। দুটি হাত প্রসারিত। এই হলে পারিসিকের জন্য ১৬৪ ও প্রেসের জন্য ৩০টি আসন রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের চেম্বারটি অছি পরিষদ কক্ষ ও উত্তরদিকের ডেলিগেট লাউনজের মাঝখানে। এই অধিবেশন কক্ষটি সাজিয়েছেন সুইডেন।

রাষ্ট্রসংঘ বিন্যাসের দক্ষিণ পশ্চিম

[illegible] রাখবার জন্য একটা চাকরির সন্ধান করছিলেন। যুদ্ধের [illegible] প্রকাশ [illegible] একটি ফেরারীর চাকরি নেন। [illegible] ১৯৪০ [illegible] ফিরে আসেন [illegible] হন [illegible] ১৯৬৪-১৯৬৮ সালে তিনি [illegible] রাষ্ট্রদূত। তারপর [illegible] সেক্রেটারি ও [illegible] সহকারী [illegible] সভাপতি [illegible] ফেব্রুয়ারি তিনি রাষ্ট্রসংঘের [illegible] সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। এই পদে থাকার সময় তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৮১ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘ থেকে [illegible] আবার লিমায় ফিরে যান। পদত্যাগ করেন [illegible] থেকেও। সেটি ১৯৮১ সালের ৭ অক্টোবর। [illegible] তিনি [illegible] মনোনীত করা [illegible] পদে। ভেবেছিলেন [illegible] ডিপ্লোম্যাটিক [illegible] সারাজীবন কাটাবেন। আন্তর্জাতিক আইনের ওপর বইও লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু তা আর হল না। ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি ৬২ বছর বয়সে তিনি পেলেন নতুন এক কর্মভার।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের পদটির নিট বেতন বছরে ৭২ হাজার ৫০০ ডলার। গ্রস বেতন ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ডলার। এ ছাড়া তিনি পান বিনা ভাড়ায় একটি সুসজ্জিত আবাসন। সেই সঙ্গে মাসে দুহাজার ডলার করে মহার্ঘভাতা।

কোণে দাগ হ্যামারশিল্ড লাইব্রেরি। ছয়তলা এই গ্রন্থাগারটিতে চারলক্ষ বই আছে। সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিচয় পেতে গেলে এই গ্রন্থাগারটিতে আসতেই হবে। ফোর্ড ফাউনডেশন ৬৬ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন গ্রন্থাগারটির জন্য।

রাষ্ট্রসংঘ বিন্যাসের প্রবেশ পথেই চোখে পড়বে ১৫৮টি সদস্য রাষ্ট্রের পতাকা উড়ছে পতপত করে। সামনে ফোয়ারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা ৫০ হাজার ডলার চাঁদা দিয়ে এই ফোয়ারাটি করে দিয়েছে। ফোয়ারার ধারে রয়েছে প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল দাগ হ্যামারশিল্ডের ২১ ফুট মূর্তি। এটি ইংরেজ ভাস্কর বারবারা হেপওয়ার্থের তৈরি। রাষ্ট্রসংঘ ভবনগুলির পিছনে নদীর ধারে তৈরি হয়েছে মনোরম উদ্যান। সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয়েছে দুহাজার গোলাপ গাছ ১৪০টি চেরিগাছের ও ৩২টি নাতিদীর্ঘ ফলের গাছ, প্রচুর সুদৃশ্য ফারন, পিন ওক, সাইকামুর আর হনি লোকাস্ট। রাষ্ট্রসংঘ ভবনের প্রতিটি সরঞ্জাম আনা হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। অ্যাসেমব্লি ও কনফারেন্স বিলডিং এর সামনে লাইমস্টোন আনা হয়েছে বৃটেন থেকে, মারবেল দিয়েছে ইতালি। অফিস ফারনিচার আর শেলফ ফ্রান্স, চেয়ার ও ফ্যাবরিক্স দিয়েছে গ্রীস ও চেকোশ্লোভাকিয়া। কারপেট ফ্রান্স, স্কটল্যানড ও ইংলনড। টেবিল কেনা হয়েছে সুইজারল্যানড থেকে, ইনটিরিয়র ডেকরেশনের জন্য কাঠ এসেছে ফিলিপাইনস, কিউবা, গুয়াতেমালা জাইর, নরওয়ে, বেলজিয়াম ও কানাডা থেকে। আর রাষ্ট্রসংঘে কর্মরত ৩০৭৭জন বিশেষজ্ঞ নির্বাচিত হন বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র থেকে। বাকি সাধারণ কর্মীদের নিয়োগ করা হয় স্থানীয়ভাবে।

একটা জিনিস রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে এলে বোঝা যায় এখানে যা চলছে তা বহুজাতিক কর্মকাণ্ড। নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধান, নানা পতাকা। বোঝা যায় বিশ্ব রাজনীতি এখন সুস্পষ্ট কতগুলি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু মানুষে মানুষে যে কোন ভেদ আছে তা এই বাড়ির কোথাও এসে বোঝার উপায় নেই। এই বাড়ির ভেতরে পা দিলে যে কোন কট্টর জাতীয়তাবাদীও যেন আন্তর্জাতিকতার প্রাণস্পন্দন অনুভব করেন।

তাই বারবার দাবি ওঠে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে রাষ্ট্রসংঘের দফতরকে সরিয়ে নিয়ে যাবার। তবে বারবারই তা চাপা পড়ে যায়। রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে ঢুকলে সত্যিই মনে হয় এ এক আন্তর্জাতিক ভূখণ্ড। পোপের ভ্যাটিকান সিটির মত এ এক [illegible] নিউ ইয়র্ক যেন এখান থেকে অনেক দূরে। □

আলোকচিত্র : ইউ এন ফটো

রাষ্ট্রসংঘে পপুলেশন অ্যাওয়ারড পেলেন শ্রীমতী গান্ধী

নিউ ইয়রক, ৩০ সেপ্টেমর্বর : ইউনাইটেড নেশনস করেসপনডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন রাষ্ট্রসংঘ ভবনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিল। এ ব্যাপারে জনৈক মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন, সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মানে অ্যাসোসিয়েশন যেসব ভোজসভার আয়োজন করেছে এটিই তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। নিউ ইয়রকের আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ছে। একটা ভিজে ভাব সর্বত্র। কদিন ধরেই দেখছিলাম আবহাওয়া বেশ ঝকঝকে কিন্তু হঠাৎ সেই ঝকঝকে ভাবটা মুছে গেছে। প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট পশ্চিমদিকের ঘরে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পুরো ঘর ভর্তি করেই প্রায় শ দুয়েক লোক ভোজসভায় এসেছিলেন। খাওয়া দাওয়ার আগে প্রশ্নোত্তরের পালা চলে কিছুক্ষণ। সবই সেই পুরনো প্রশ্ন। শ্রীমতী গান্ধীও সেসবের উত্তর দিলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের সংগে তাঁর আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে জানালেন শ্রীমতী গান্ধী। তিনি বললেন, 'কথাবার্তা চালিয়ে কোন নাটকীয় সিদ্ধান্তে আসা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু অনেক সাধারণ বিষয় নিয়ে আমরা সোচ্চার ভাবনাচিন্তা চেয়েছিলাম। আমাদের মূল সমস্যা ছিল কী করে কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশেষ সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যায়।' সেই সংগে শ্রীমতী গান্ধী একথা জানাতেও ভুললেন না যে, এ ধরনের আলাপ আলোচনা চলতেই থাকবে। উন্নয়নের অর্থনৈতিক অসুবিধা নিয়েই মূলত এসব আলোচনা উঠেছিল। তিনি বললেন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন কারোর একার কৃতিত্ব নয়। 'গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের সম্পর্কে নিজের মত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।' একটি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ জাতি হিসাবে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শ্রীমতী গান্ধী বললেন, কয়েকটি জাতির সংগে আমাদের বন্ধুত্ব আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা তাদের সংগে সব ব্যাপারেই একমত। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ভারত কি অস্ত্র নিয়ে গবেষণা বা নিজেরাই অস্ত্রনির্মাণ জোরদার করছে? শ্রীমতী গান্ধী বলেন, আমরা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে চলেছি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা এখন কারোর ওপর নির্ভরশীল নই। 'দয়া করে ভুলে যাবেন না অতীতে পাঁচবার আমরা বিদেশি আক্রমণের শিকার হয়েছি।' এই সময় কোরীয় বিমান গুলী করে নামান এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনা বাহিনীর প্রসংগ ওঠে। শেষোক্ত প্রশ্নে শ্রীমতী গান্ধী আবার উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি জানতে চান, বার বার একই প্রশ্ন কেন তোলা হচ্ছে? একই পরিস্থিতি অন্য অনেক দেশেও রয়েছে। লাতিন আমেরিকা কয়েকটি দেশেও বিদেশি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। উভয় ক্ষেত্র সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য একটিই কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যারা অন্য দেশের এ ধরনের ঘটনা নিয়ে একেবারেই নীরব।

[illegible]

রাষ্ট্রসংঘে শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতি সার্থক হয়েছে। তাঁর অসাধারণ আকর্ষণী শক্তির প্রভাব বোঝা গেছে এখানে। যে সব নেতার সংগে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছে সকলেই তাঁর কথাবার্তায় রীতিমত মুগ্ধ।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলার শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার থেকেও এই সাফল্য বোঝা যাবে। তিনি বলেছেন, শ্রীমতী গান্ধীর এই উপস্থিতি রাষ্ট্রসংঘকে সত্যিই উৎসাহিত করবে। তাঁর মতে, যে সহযোগিতার মনোভাব এই বৈঠক হতে সাহায্য করেছে তা বজায় থাকবে এবং এর ফলে বোঝাপড়ার মনোভাব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও বাড়বে।

পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানটি হয় ট্রাসটিশিপ কাউনসিল চেম্বারে হলে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রখ্যাত চারজন ভায়োলিনবাদক ভায়োলিন বাজালেন। এই পুরস্কার দেওয়া হয় জনবিস্ফোরণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালানোর দক্ষতার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ হার কমানোর কৃতিত্বের জন্যে। এবারের পুরস্কার পেলেন পৃথিবীর দুই সর্বাধিক জনবহুল দেশের দুই ব্যক্তি। তাঁরা হলেন শ্রীমতী গান্ধী ও চীনের জন্মনিয়ন্ত্রণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জীন ঝং। পুরস্কার প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান হলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি আনাউর করিম চৌধুরী। এক সময় কলকাতায় বাংলাদেশের মিশনে ছিলেন। বিয়েও করেছেন ভারতেরই এক ভদ্রমহিলাকে।

১৯৮১ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রথম এই পুরস্কারটি দেবার কথা ভাবে। এখানে ৭১টি নামের সুপারিশ ছিল। প্রখ্যাত ব্যক্তি ও নেতারা এই সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখার পর এবারের নামদুটি বেছে নিয়েছেন পুরস্কার প্রাপক যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে।

এই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই জননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে পপুলেশন অ্যাওয়ারড দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রাপকদের বিশেষ সম্মানে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব জেভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার সংবর্ধনা সভাটির আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বক্তৃতা দেন তার পূর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া হল :

ডঃ কুয়েলার, ডঃ সালাস, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ,

আজ যে সম্মান আমাকে দিয়েছেন তাকে মহামূল্যবান বলে আমি মনে করি : এ সম্মান শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বা ভারত সরকারকেই নয়, তা হাজার হাজার উৎসর্গীকৃত প্রাণ পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনাকারী লক্ষ লক্ষ তরুণ বাবা মাকেও দেওয়া হয়েছে। সামাজিক পরিচালনা শক্তির এই দুরূহ ক্ষেত্রে ভারতের এই প্রচেষ্টা যে বিশ্বসংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে এতে তারা উৎসাহিত হবেন। তা সত্ত্বেও এর ফলে আমাদের ওপর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথাও আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। কেননা ভারত এবং আজকের অন্যতম সম্মানিত চীন মিলিতভাবে মানবজাতির একতৃতীয়াংশেরও বেশি।

১৮৮১ সালের সেনসাসে ভারতে জনসংখ্যা দেখা হয়েছিল ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ। পঞ্চাশ বছর পর আমাদের জাতীয় সংগীতে বলা হল ৩০ কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। তুলনামূলকভাবে এই বৃদ্ধি ন্যূনতম বলা যায়। তখন বৃটিশরা যাকে ভারত সাম্রাজ্য বলত তা এখন বাংলাদেশ, বারমা এবং পাকিস্তানসহ চারটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই চারটি দেশের জনসংখ্যা এখন তিনগুণ দাঁড়িয়েছে।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে জনসংখ্যা এভাবে স্থিতিশীল ছিল কীভাবে? তারপরই বা এমন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটল কেন? কারণটা খুবই সরল। অতীতের ঐ স্থিতিশীলতা ছিল অস্বাস্থ্যের কারণে। রোগ, দুর্ভিক্ষ এবং অসম্ভব মৃত্যুহারেই এটা ঘটত। ১৯১১-১৯২১ দশকে ২ কোটি লোক ইনফ্লুয়েনজায় মারা গিয়েছিলেন। ফলে ভারতের জনসংখ্যা কমে যায়। এই স্থিতাবস্থা তাই দারিদ্র্য, অসহায়তা এবং সরকারি ঔদাসীন্যের প্রমাণ মাত্র। আধুনিক সচেতন সমাজ যে স্থিতাবস্থা পেয়েছে সেটি তার উল্টো পিঠ।

১৯৩৯-৪৫ সালে যুদ্ধ শেষে কয়েকটি বড় রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপার চোখের সামনে ঘটেছে। রাজনৈতিকভাবে বলা যায় এটি উপনিবেশ পরবর্তী যুগের শুরু। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এটি পারমাণবিক যুগের জন্মকাল। নতুন অ্যানটিবায়োটিক ইত্যাদির মত কয়েকটি 'ধন্বন্তরী ওষুধে'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে নাটকীয় কার্যকারণ ঘটল। মড়ক ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নব্য স্বাধীন দেশগুলি তাদের যাবতীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেয়। বিদেশি শাসনের শেষ বছর, যখন আমরা প্রত্যেকেই প্রায় কারাগারে তখন কেবল একটি মাত্র প্রদেশ, বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে ৩৫ লক্ষ লোক মারা যান।

গত সাড়ে তিন দশকে আমাদের দেশে যথারীতি খরা হয়েছে কিন্তু দুর্ভিক্ষে কেউ মারা যাননি। খরা প্রকৃতিনির্ভর কিন্তু দুর্ভিক্ষ সব সময়ই মানুষের তৈরি। ভারতের মানুষ স্বাভাবিকভাবে গর্ব করতে পারেন যে স্বাধীনতা দুর্ভিক্ষকে শেষ করে দিয়েছে। যুগপৎ আমরা মহামারীকেও আক্রমণ করেছি। প্লেগ এবং স্মল পকস সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা লাখ লাখ থেকে হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।

এসব কারণেই জনসংখ্যা বাড়ছে, যেমনটি ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপে। ইওরোপে এসময় জন-

স্বাস্থ্য প্রকল্প বাড়ছিল এবং জনকল্যাণ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছিল। ১৮০১ সাল থেকে ১৯০১ সাল সময়ের মধ্যে বৃটেনের জনসংখ্যা দেড় কোটি থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং সারা ইওরোপের জনসংখ্যা এ সময় ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতের এই জনবৃদ্ধি অদূরদর্শিতা বা কর্তব্যহীনতা নয়, বরং জীবনদানের জন্য সরকারের এক আপ্রাণ প্রচেষ্টা বলা যায় একে।

পরিকল্পিত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার কমে গেছে। শিক্ষা এবং জীবনযাপনের মানোন্নয়ন হওয়ায় জন্মহারও কমেছে। বলা যেতে পারে গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ববোধই মৃত্যুহার কমিয়েছে এবং ব্যক্তির প্রতি গোষ্ঠীর দায়িত্ববোধের ফলে জন্মহার কমেছে। শিশুকে দিয়েই মানব সমাজের সূচনা। শিশুকে যে ভালবাসে মানব সমাজকেও সে ভালবাসে। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই আমরা বুঝেছিলাম প্রতিটি শিশুকে সম্পদ ও সুযোগের মহত্তর ভাগ দেবার জন্য পরিবার ছোট রাখতে হবে, তবেই দারিদ্র্যের সংগে সার্থক লড়াই চলবে। ভারতই প্রথম সরকারিভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত। যখন এই কর্মসূচির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয় এবং কর্মী নিয়োগ হয় তখন এটাও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে, এই কাজ করতে হবে আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রকল্পের সংগে মিলিতভাবেই। গণতন্ত্রই আমাদের রাস্তা। জনগণের সায় ও সহযোগিতা নিয়েই সরকার চলতে পারে। আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি পুরোপুরি স্বেচ্ছামূলক এবং এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির অংশগ্রহণের ওপরই আমরা বেশি জোর দিয়েছি।

১৯৫১ সালে যে জন্মহার প্রতি হাজারে ছিল ৪০ জন এখন তা কমে গিয়ে সর্বমোট দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৩৩ জন করে। যেসব রাজ্যে, বিশেষত যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি, অর্থনৈতিক প্রগতি দ্রুত এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প ভালভাবে রূপায়িত হয়েছে, সেসব জায়গায় জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। যেমন কেরলে প্রতি হাজারে ২৫.৬ জন এবং পাঞ্জাবে ৩৩.৩ জন। আমাদের লক্ষ্য ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় হার প্রতি হাজারে ২১ জনে এনে দাঁড়

করানো। সে কাজ খুব সহজ নয়। লাখ লাখ দম্পতি, যাদের মধ্যে অনেকে নিরক্ষরও আছেন, তাঁরা এই লক্ষ্যে পৌঁছনয় সাহায্য করবেন। স্বল্প আয় এবং বাড়িতে অনেক মানুষ জন থাকার জন্য দম্পতিরা জন্মনিরোধক ব্যবহার করতে পারেন না অথবা সুযোগ পান না। ফলে তাঁরা বন্ধ্যাকরণকেই বেছে নেন। এ ব্যাপারে বিরোধিতা আছে, অবশ্য অন্য দেশের চেয়ে কম। আর কারণটাও যতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। বন্ধ্যাকরণকে আমাদের সাধারণ মানুষ ভালভাবেই নিয়েছেন। ভবিষ্যতে যতটা সম্ভব ততটাই এ ব্যাপারে কাজ এগোন হবে। উন্নয়নকামী দেশে তরুণ দম্পতিদের জন্য সহজতর সরকারি পদ্ধতি দেবার চেষ্টা হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা মানব মানবীর দীর্ঘায়ত সম্পর্ককে সহজ ও বিপদশূন্য করার জন্য কার্যকর ফল দেবে। তা অবশ্যই কম খরচে, সহজ ব্যবহারযোগ্য এবং নিরাপদ হওয়া চাই। দম্পতিরা শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণই করবেন তাই নয়, ইচ্ছামত সন্তানও কামনা করতে পারবেন তার ফলে। জন্ম নিরোধক ব্যবহারের বিরুদ্ধে নীতিগত প্রশ্ন তোলা মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও আত্মমর্যাদার প্রতি অপমান। কারণ মানুষই পারে নিজের ওপর খবরদারী করতে।

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতাই আমাদের প্রধান বাধা। অবশ্য আমরা সে বাধা দূর করার চেষ্টা করছি। কৃষি ও কারুশিল্পজীবী সমাজে শিশুদের অতিরিক্ত দুটি কাজের হাত হিসাবে গণ্য করা হয়। বালকদের এভাবেই পছন্দ করা হয়। সে হিসাবে ধারণা ছিল মৃত্যু একটা সুযোগ মাত্র। শিশুদের নিয়ে অর্থ-

নৈতিকতার ব্যাপকতাও গণ্য করতে হবে। আজ এমনকি অশিক্ষিত তরুণী মায়েরাও সন্তানের ব্যাপারে উচ্চাশা পোষণ করেন এবং সে কারণে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহী। তাঁরাই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। কিন্তু স্বামী এবং শাশুড়িরাই মাঝে মাঝে সমস্যা তৈরি করেন।

বলা হয়, প্রগতিই সবচেয়ে বড় জন্মনিরোধক। কিন্তু জন্মহার কমাতে না পারলে উন্নয়নের ফল ব্যর্থ হবে। পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়ন এবং মানব মূলধন সৃষ্টিরই অন্তর্গত। জন্মহার নিম্নমুখী হলে শিক্ষা, উৎপাদনবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় বাড়বে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ পরিসংখ্যানের তোয়াক্কা করেন না, তাঁরা চলেন আবেগে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে আমরা বোঝাতে পারছি যে, এ পরিস্থিতিতে পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার, তা দরকার পুরো পরিবারের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য।

স্থির লক্ষ্য রেখে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করিনি, তা করাও হবে না। এমন ঘনিষ্ঠ একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে করা যায়ও না, আর এই ধরনের সরকারের পক্ষে তা করা অসম্ভবও বটে। কয়েক বছর আগে আমাদের স্বেচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি যখন আরও গতিসম্পন্ন করেছিলাম তখন রাজনৈতিক দলগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিকৃত প্রচার শুরু করে এবং এটিকে নির্বাচনের রাজনৈতিক বিষয় করে তোলে। বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণের দমফাটা অভিযোগ হয়েছিল তখন। পরে প্রমাণ হল সে অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। তবে একটা

বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন তা এবং সরকারেরও পরিবর্তন হয়। প্রগতিমূলক একটি জাতীয় কর্মসূচি দুর্ভাগ্যজনক এবং অন্যায়ভাবে পিছিয়ে গেল। এখন আবার আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাই আমরা। কোন কোন লোক পরিবার পরিকল্পনার ধারণাকে এখনও অবিশ্বাস করেন, মিথ্যা তথ্যও ছড়াচ্ছেন তাঁরা। শিক্ষাসংস্থা এবং সংবাদমাধ্যমগুলির উচিত সে তথ্যও খুঁটিয়ে বিচার করে নেওয়া।

মনে রাখতে হবে, ১৯৮০ সালে পৃথিবীর ৪০০ কোটি জনসংখ্যা ২০০০ সালে ৬০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে (অন্যভাবে বলা যায়, এখনকার বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ বেড়ে যাবেন আগামী দশকেরও কম সময়ের মধ্যে) উন্নয়নকামী দেশগুলিতে এবং মধ্যে ৯ শতাংশ পড়বে। এই ধরনের দেশগুলি ইতোমধ্যে জমি, খাদ্য, জল, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অভাবে ভুগছে। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভারত তার খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করে নিয়েছে। আমাদের জনসংখ্যার চেয়ে কৃষি উৎপাদনের হার এগিয়ে আছে। সব উন্নয়নকামী দেশ অবশ্য এমন অবস্থায় নেই।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অন্য সব পরিকল্পনার মতই আমার কাছে সংখ্যাভিত্তিক নয়, ব্যক্তিভিত্তিক, যেমন পুরুষ, নারী এবং শিশু। এবং তা মানব সত্য বটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন প্রতিটি শিশুই মনে করিয়ে দেয় ঈশ্বর মানুষকে আশাহত করেন নি কিন্তু পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শি[illegible] মানুষের হতাশা ও অক্ষমতার শিকার। খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ভালবাসার প্রতি তাদের ন্য[illegible] অধিকার এরা স্বীকার করেন না। শিশু হবে আনন্দের, সে বোঝা হ[illegible] না। মা ই শিশুকে বহন করে, পা[illegible] করে। আমরা তাই শুধু তাঁর স্বা[illegible] নয়, তাঁর ইচ্ছার কাছেও দ[illegible] থাকব। পরিবার পরিকল্পনা শি[illegible] প্রতি আমাদের ভালবাসার প্র[illegible] এবং মহৎ মা, মহৎ বাবা এবং ম[illegible] এক সমাজের দাবিতেই তা গ[illegible] তোলা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘকে এই পুরস্কারে[illegible] জন্য ধন্যবাদ জানাই। সমবে[illegible] শ্রোতাদের সামনে আমি প্রতিশ্রু[illegible] দিচ্ছি যে ভারত তার ওপর প্র[illegible] এই দায়িত্ব আগামী দিনেও পা[illegible] করে যাবে। □

পার্থ চট্টোপাধ্যা[illegible]

বিদেশ যাত্রার আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সংগে ইন্দিরা / আলোকচিত্র : ফটো ডিভিশন

ইন্দিরা গান্ধীর সংগে দেশে দেশে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী গান্ধীর সংগে পনের দিন ধরে তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের সংগী হয়ে ফিরে আসার পর অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন : কেমন বিদেশ বেড়ালেন? সবিনয়ে তাঁদের জানাই শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এই সফর যেমন প্রমোদভ্রমণ ছিল না তেমনি তাঁর সফর সংগীদের কাছেও নয়। সমস্ত দিক থেকে মিলিয়ে দেখলে এটি ছিল একটি বিরামহীন কর্মময় সফর। ভোরবেলা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঠাশ বুনুনি কর্মসূচি। এর মধ্যে সময় করে নিয়ে খবর পাঠান। সাপ্তাহিক কাগজ বলে আমার খবর পাঠান অতখানি শ্রমসাধ্য ছিল না। কিন্তু দৈনিক কাগজের সাংবাদিকদের পক্ষে বিশেষ করে পি টি আই ও ইউ এন আই প্রতিনিধিদের কাছে এটা ছিল তাঁদের চরম কর্মতৎপরতার পরীক্ষা। ডেড্ লাইনের দাবি পূরণ করতে গিয়ে প্লেনে বসেও তাঁদের খটখট টাইপ করে যেতে হয়েছে। দূরদর্শন ও ফিলমস ডিভিশনের সাংবাদিকরা তো অনেকদিন স্যানডউইচ খেয়েই লানচ সেরেছেন। কারণ প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান তাঁদের কভার করতে হবে। তারপর সন্ধ্যায় স্যাটেলাইট মারফৎ সেগুলি পাঠাতে হবে দিললিতে। দূরদর্শনের পক্ষ থেকে প্রযোজক গিয়েছিলেন কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোকের মা মারা গেলেন তাঁর সফরের সময়ই। কিন্তু তাঁকে তা জানতে দেওয়া হল না। কারণ তাঁর পক্ষে তখনই কাজ ছেড়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। আর এ খবর জানলে তাঁর পক্ষে কাজ করাও সম্ভব নয়। তাই আমরা যখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাশা করছি, তখন জানিও না বেচারির মা মারা গিয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধীর সংগে বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এই বয়সে তাঁর অসাধারণ কর্মশক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। সকাল থেকে রাত্রি, সব সময় তিনি সতেজ, মুখের হাসিটি সব সময় লেগে আছে। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলাম, ম্যাডাম, আপনার এই ব্যাপক প্রোগ্রামের সংগে তাল রাখতে গিয়ে আমরাই শ্রান্ত হয়ে পড়ছি। অথচ আপনার

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, এবার তো আমার প্রোগ্রাম কই তেমন হেভি নয়। আমি বুঝতে পারলাম তিনি বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর ইলেকশন ট্যুরের কথা। খবরের কাগজেই পড়া সেসব ঝটিকা সফরের কাহিনী। দিললিতে আমার আগে একজন ভারতীয় কূটনীতিকের স্ত্রী যিনি শ্রীমতী গান্ধীর গত নির্বাচনী প্রচারের সংগে জড়িত ছিলেন তিনি বলছিলেন, একই দিনে হেলিকপটারে গোটা ত্রিশেক নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়ে এসে তিনি রাত দুটোয় শেষ ভাষণটি দিলেন দিললির উপকণ্ঠে। এই বয়সে তাঁর ঋজুতা, ত্বকের মসৃণতা ও দ্রুত হাঁটার ক্ষমতা ঈর্ষা করার মত। অনেকে বলেন, তিনি যোগব্যায়াম করে দেহ সুষমা ঠিক রেখেছেন। আমি শুনলাম তিনি পরিমিত আহারী। প্লেনে তাঁর আহারের পরিচর্যা করছিলেন এমন একজন বললেন, অত অল্প খেয়ে কী করে যে তিনি বেঁচে আছেন, এটাই আশ্চর্য। ভোরে ওঠা, ব্যায়াম, পরিমিত আহার ও কিছুটা অধ্যাত্ম চিন্তা এটাই তাঁর জীবনচর্যার অংগীভূত। প্রধানমন্ত্রীর সফরের সংগী হওয়া যেমন সম্মানের তেমনি সাংবাদিকের জীবনের এক বিরল অভিজ্ঞতা। কারণ যখন প্রধানমন্ত্রী কোথাও সফরে যান তার যে উদ্যোগ আয়োজন ও নানা আনুষ্ঠানিক বিষয়, যেগুলি ভেরি ভেরি ইমপরটানট পারসনের সফরের সংগে জড়িত থাকে সেগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক।

বিদেশ সফরের উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে ছ মাস আগে থেকেই। এই ছ মাসের মধ্যে সেই সব দেশের রাষ্ট্রদূতদের সংগে ফরেন অফিসের বহুবার বৈঠক হয়। তারপর যাত্রার অন্তত মাস খানেক আগে একটি খসড়া সফরসূচি তৈরি হয়। এই সূচিতে অনেক কাটছাট করে দিন পনের আগে পাকা সফরসূচি তৈরি হয়।

বিদেশ যাত্রার মধ্যে প্রোটোকল ও নিরাপত্তার ব্যাপারটাই প্রধান। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশে যাবেন তখন তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা ও সম্মানের ব্যাপারে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটি যেন নিখুঁত থাকে। এই নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব সেই দেশের সরকারের। তবে ভারতীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর একটি বাছাইকরা টিম সর্বদা প্রধানমন্ত্রীর সংগে থাকে। এঁরাও সমান্তরালভাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এ নিয়ে উভয় দেশের নিরাপত্তা প্রধানদের মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়।

আমাদের এবারের যাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর দলে ছিলাম তাঁকে নিয়ে সবশুদ্ধ ৪৮ জন। এঁদের মধ্যে ১৪ জনকে সরকারিভাবে বলা যায় entourage এঁদের স্থান প্রধানমন্ত্রীর সংগেই। ১৪ জন ছিলেন গোয়েন্দা পুলিশ, যাঁদের আমরা প্রধানমন্ত্রীর সিকিওরিটি গারড বলতে পারি। বেসরকারি খবরের কাগজ থেকে ছিলেন সাতজন। বাকি সাতজন রেডিও, দূরদর্শন, ফোটো ডিভিশন, ফিলমস ডিভিশনের লোক। এছাড়া এই সফরকে কেন্দ্র করে আগেই অনেক অফিসার গন্তব্যস্থলে চলে গেছেন। আবার বিভিন্ন দূতাবাস থেকে কূটনীতিক অফিসারদের আনা হয়েছে। যেমন সাইপ্রাস ও গ্রীসের ভারতীয় দূতা

খাস খুব ছোট। তাঁরা বেলগ্রেডে ভারতীয় দূতাবাসের কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে এসেছিলেন।

গোপনীয় বলে নিরাপত্তা বিভাগের কারও নাম করব না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সংগে কারা কারা ছিলেন তাঁদের নাম বলতে আপত্তি নেই। এক নং তালিকায় ছিলেন রাজীবের স্ত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী, তারপর প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পি সি আলেকজান্ডার, তথ্য উপদেষ্টা এইচ ওয়াই সারদাপ্রসাদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি সি আর ঘারেখান, স্পেশ্যাল অ্যাসিসট্যানট আর কে ধাওয়ান, জয়েন্ট ডিরেক্টর এ রামমূর্তি, শ্রীমতী ঊষা ভগৎ – অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ কে পি মাথুর, প্রধানমন্ত্রীর পি এ আর কে সিকরি, প্রধানমন্ত্রীর পারসোনাল অ্যাটেনডেন্ট নাথুরাম। সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন এম কে ধর (হিন্দুস্থান টাইমস), জি এস চাওলা (ইনডিয়ান একসপ্রেস), এ কে কিদোয়াই (ন্যাশনাল হেরালড), এইচ এস রাও (পি টি আই), ইউ আর কানকুর (ইউ এন আই), আর শ্রীনিবাসন (ডেকান হেরালড) ও পরিবর্তনের পক্ষে লেখক। তথ্য ও বেতার দফতর থেকে ছিলেন আর এন চতুর্বেদী (রেডিও, জয়েন্ট ডিরেকটর), পি কে দে (ডেপুটি ডিরেকটর, ফোটো ডিভিশন), এম পি সিনহা (নিউজ রিল অফিসার), এস চৌধুরী (রেকর্ডিসট), ডি বন্দ্যোপাধ্যায় (দূরদর্শন), টি গুহ-ঠাকুরতা (ক্যামেরাম্যান), এস শ্রীনিবাসন (ইনজিনিয়ারিং অ্যাসিসট্যানট)। এছাড়া ছিলেন এয়ার ইনডিয়ার অন্তত জন দশেক অফিসার। প্রধানমন্ত্রীর যাত্রার জন্য এয়ার ইনডিয়ার একটি বোয়িং ৭০৭ যাত্রীবাহী বিমান ভাড়া করা হয়েছিল। এই ধরনের বিমানের ভাড়া ফ্লাইং আওয়ার হিসাবে ধরা হয়। এক ঘণ্টা আকাশে উড়লে ভাড়া পড়ে ৪০ হাজার টাকা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বহু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সুদৃশ্য বিলাসবহুল নিজস্ব প্লেন আছে। ভারতের এ জাতীয় কোন বিমান নেই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাঁর একটি নিজস্ব প্লেন কেনবার জন্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত গরিব দেশ। এ জাতীয় বিলাসিতা তার শোভা পায় না।

প্রধানমন্ত্রীর বিমানটির মধ্যে কোন বৈচিত্র্যই ছিল না। শুধু অভিজ্ঞ ক্রুদের নিয়োগ করা হয়েছিল। বিমানটিকে তিনটি ভাগ করা হয়েছিল। ককপিটের দিকে অনেকগুলি আসন সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কেবিন করে দেওয়া হয়েছিল। সেই কেবিনে তিনি ও সোনিয়া গান্ধী শুধু ছিলেন। তারপর পারটিশান করে প্রথম শ্রেণীর আসনগুলি দেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর দফতরের লোকদের জন্য। লেজের দিকে ইকনমি ক্লাশের আসনে ছিলেন পুলিশ, সাংবাদিক ও এয়ার ইনডিয়ার কিছু অফিসার।

প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপর্বটি বেশ অভিনব। বিশে সেপটেম্বরের সকাল আটটায় প্লেন ছাড়ল দিল্লি বিমান বন্দরের টেকনিকাল এরিয়া থেকে। এটি পালাম বিমানঘাঁটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। সংরক্ষিত এলাকা। কার পারকের পাশ নিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ঢুকতে পারে। পরে দেখলাম পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিমানবন্দরে একটি করে টেকনিকাল এরিয়া আছে। ভি ভি আই পি দের প্লেন সেখানেই নামে।

যাত্রার অন্তত দিন তিনেক আগে আমাকে দিল্লিতে আসতে বলা হয়েছিল। দিল্লিতে প্রথম দিকে অফিসাররা সঠিক বলতে পারেননি কী কী করণীয়। যত দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই তৎপরতা দেখা গেল। যাত্রার তিনদিন আগে ফরেন একসচেনজের জন্য পারমিট পেলাম। ভিসাও তাঁরা করিয়ে দিলেন। যাবার আগের দিন পাওয়া গেল এয়ার ইনডিয়ার ডামি টিকিট। আমাদের এই যাত্রায় টিকিটটি পেয়েছিলাম সরকারি খরচে। সাইপ্রাস ও গ্রীসে ছিলাম সরকারি অতিথি হিসেবে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবতীয় ব্যয়ভার আমাদের বহন করতে হয়েছিল।

যাবার আগে একবার শাস্ত্রী ভবনের পররাষ্ট্র দফতরের প্রচার দফতরে ব্রিফিং হয়েছিল। কোথায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, খবর পাঠাবার কী ব্যবস্থা হয়েছে, এমনকি সাইপ্রাসে নেমে কত নং গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল তার বিবরণ -- সমস্ত কিছুর আভাস পেয়ে গেলাম। শেষ মুহূর্তে প্রেস ফেসিলিটি অফিসার মি: সোন্ধি জানিয়ে দিলেন স্টেট ব্যাংকোয়েটে যোগ দেবার জন্য গলাবন্ধ কালো কোট অথবা লাউনজ স্যুট লাগবে। সেটা শেষ মুহূর্তে কোথায় পাব তা নিয়ে সংশয় ছিল, কিন্তু দিল্লির সদা আলাপ হওয়া এক ব্যারিসটার বন্ধু নীরেন দে একটি গলাবন্ধ কোটের ব্যবস্থা করে দিলেন। সোন্ধি সাহেব প্রত্যেককে কয়েকটি করে স্টিকার ও লেবেল দিলেন। এগুলি আমাদের লাগেজের সংগে বেঁধে দিতে হবে। লেবেলে লেখা ভিজিটস অব প্রাইম মিনিসটার অব ইনডিয়া। প্রত্যেকের নাম ছাপান লেবেলে। যাতে কারও মালপত্র অন্য কারও সংগে না মিশে যায় তার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা।

সকাল ছটার মধ্যে বিমানবন্দরে যেতে বলা হয়েছিল। গিয়ে দেখি টেকনিক্যাল এরিয়ায় সারি সারি সামিয়ানার নিচে কারনিভ্যাল বসে গেছে। এয়ারপোরটে বিদেশ যাত্রীদের জন্য যেসব ফরমালিটির ব্যবস্থা থাকে তার সবকটিই এখানে রাখা হয়েছে। যেমন ইমাইগ্রেসন, সিকিওরিটি, হেলথ, কাসটমস। সমস্ত কিছুই চেক হল। বিদেশ যাত্রীদের দুশো টাকার বিদেশ মুদ্রা দেবার যে নিয়ম আছে সেটাও পালিত হচ্ছিল। স্টেট ব্যাংক ওখানে একটি অস্থায়ী শাখা খুলে ফেলেছিল।

আমাদের জিনিসপত্র প্লেনে উঠল। প্রধানমন্ত্রী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বললেন: আপনারা এবার প্লেনে উঠে পড়ুন। প্রধানমন্ত্রীর আসার সময় হয়ে গেছে।

আমরা প্লেনে উঠলাম। জানালা দিয়ে এয়ারপোরটের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। ঘড়িতে আটটা। বেলট বেঁধে নিয়েছি। এমন সময় দেখলাম শ্রীমতী গান্ধী আমাদের আসনের দিকে আসছেন। তিনি এসে সবাইকে নমস্কার করে চলে গেলেন। প্লেনে ঘোষণা শুনলাম : We are privileged on board Annapurna to welcome our distinguished Prime Minister— Mrs. Indira Gandhi.

শুনলাম দিল্লি থেকে সাইপ্রাসের দূরত্ব ৪৮৫০ কিলোমিটার। সময় লাগবে ছ ঘণ্টা পনের মিনিট। একটু পরে প্লেন আকাশে উড়ল। প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানাবার জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যারা এসেছিলেন। তাঁরা হাত নাড়ছেন দেখতে পেলাম। আমরা চললাম – রাজেন্দ্রসংগমে দীন যথা যায় দূরতীর্থ দরশনে। □

(চলবে)

বিমানবন্দরে রাজীব ও সোনিয়া গান্ধী

বিমানে উঠছেন ইন্দিরা

আলোকচিত্র :
তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

পুলিশ ওপরওয়ালাদের মানছে না : এই বিশৃঙখল অবস্হার জন্য দায়ী কারা ?

বিশেষ সংবাদদাতা

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কখনও বলেন, অত পুলিশ কোথায় যে বললেই ছুটবে ! রাত্রে খুন ডাকাতি হলে সব সময় পুলিশ পাবেন না। জ্যোতিবাবু তারপরে বললেন, পুলিশ কড়া হলে, একটু সক্রিয় হলে সব করতে পারে, খুন জখমও বন্ধ করতে পারে।

এ কথাটা কিন্তু পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্য। অনেক অসাধ্য সাধন পুলিশ করেছে। এই তো কিছুদিন আগে তরুণ শিল্পপতি চন্দন বসুর খোয়া যাওয়া গাড়ি পুলিশই উদ্ধার করেছে।

পুলিশ কর্মচারীদের একাংশের নেতারা আবার জ্যোতিবাবুর কথায় সায় দেন না। তাঁরা বলেন উলটো কথা। পুলিশ যা আছে তাতেই কাজ চলে যায়। কিন্তু অনেক পুলিশ কর্মচারী কাজ না করে করেন দলবাজি। আর যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাজে বাগড়া দেওয়া হচ্ছে, অপমান করা হচ্ছে, বিশৃংখলাকে মদত দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই। কনস্টেবল এখন পুলিশ সুপারকে চোখ রাঙানোর 'গণতান্ত্রিক অধিকার' পেয়ে গিয়েছে।

কথায় কথায় জেলার পুলিশ সুপার ঘেরাও, পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি চলছে। একটি থানার ওসি তাঁর ওপরওয়ালার নামে ডায়েরি করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে ওসি মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু থানায় ডায়েরি নেওয়া হয়নি।

পুলিশের ইনটেলিজেন্স, সি আই ডি, প্রশাসন ও ডিসিপ্লিন বিভাগ দলবাজির দৌরাত্ম্যে উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এনফোরসমেন্ট পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার কথায় কথায় বললেন, পুলিশ প্রশাসন যে কোথায় গিয়েছে ভাবতে পারবেন না। আজকাল গোপনে হানা দিয়ে কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হানা দেওয়ার জন্য জেলা পুলিশের ওপর তলার অফিসারদের সাহায্য নিতে হয়। হানা দিতে গিয়ে এনফোরসমেন্ট বেকুব বনে গিয়েছে। আসামী ঠিক সময়ে খবর পেয়ে মাল পাচার করে দিয়েছে। কী করে খবর পেল · থানার পুলিশ জানে না, মহকুমা স্তরেও কেউ জানে না। তাহলে কে খবর জানিয়ে দিল · হয় জেলার পুলিশ, না হয় এনফোরসমেন্টের বড়কর্তাদের কেউ, তা না হলে টেলিফোনে আড়ি পেতে কেউ নির্বিঘ্নে কাজটা করে যাচ্ছে।

এটা শুধু এনফোরসমেন্টে নয়, অনেক থানায় একই সমস্যা। থানার বড়বাবু দলবল নিয়ে 'রেড' করতে বেরুবেন রাত বারোটায়। আধঘণ্টা আগে যথাস্থানে খবর পৌঁছে গেল।

আবার অনেক ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীদের সংগে লেনদেন পাকা করার জন্যও 'রেড' করা হচ্ছে। বছর পাঁচেকের মধ্যে হাওড়ায় পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের এক বড়কর্তা একজন তেল ব্যবসায়ীর গুদামে হানা দিয়ে সমস্ত ড্রাম আটক করলেন। অভিযোগ ছিল, সব ভেজাল তেল। সেই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, পুলিশ তাঁর কাছে একলাখ টাকা চেয়েছিল কিন্তু তিনি চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিলেন।

যাই হোক পুলিশ বাহিনী সেই তেলের ড্রাম কয়েকটি লরিতে করে এক জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর সেখান থেকে আবার থানায় নিয়ে এসে খোলা জায়গায় সাজিয়ে রাখা হল। আটক করা সব তেলের ড্রাম থানার বড়বাবুর হেফাজতে থাকবে যতদিন না আদালত কোন নির্দেশ দিচ্ছেন।

আটক তেল-ভর্তি ড্রামের 'সিজার লিসট' তৈরি হল। এবার হেফাজতে রাখার দায়িত্ব বুঝে নেবার পালা থানার সেই বড়বাবুর। তিনি 'সিজার লিসট' এ সই করে দেবেন এবং নিজের কাছে একটি কপি রেখে দেবেন।

ঠিক এই সময় নাটকীয়ভাবে আবির্ভাব ঘটল এনফোরসমেনট পুলিশ বাহিনীর। ওঁরা এসেছিলেন ভেজাল তেলের নমুনা সংগ্রহের জন্য। একটা ড্রাম খোলা হল - স্রেফ জল। আর একটি ড্রাম খোলা হল - সেই একই জল। ওপরে একটু আধটু তেল ভাসছে। ব্যাপার কী · সারা রাত ধরে কি পুলিশ তেলের ড্রামের বদলে জল ভর্তি ড্রাম আটক করল · না, আটক করার পর তেল অন্য কোথাও পাচার হল ·

সেই থানার বড়বাবু তখন ঘামছেন। একটা বড় ফাঁড়া কেটে গেল। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে বড়বাবুকে তেলের হিসাব বুঝিয়ে দিতে হত। কী ভাগ্যি যে তাড়াহুড়ো করে সই করেননি। শেষ পর্যন্ত সেই আটকের নাটক আর জমল না।

এনফোরসমেনটের সেই অফিসার বললেন, হাওড়ায় এত ক্রাইম কেন · রাজনৈতিক নেতাদের সংগে চোরাইচালানকারীদের অশুভ আঁতাত ভেঙে দিন, পুলিশের সংগে অশুভ আঁতাত ভেঙে যাবে। লিলুয়ায় 'স্ক্র্যাপ আয়রন' নীলাম ডাকার ব্যাপারটা তুলে দিলে ক্রাইম কমে যাবে। কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ী এটা কুক্ষিগত করে রেখেছে। এঁদের মদত দিচ্ছে পুলিশের ওপরওয়ালা এবং রেলের একশ্রেণীর অফিসার। বাইরের কেউ ঢুকতে গেলেই বিপদ। তাহলে বছর দুই তিন আগের একটা ঘটনা বলি। ছেলেটা আগে ছিল নকশাল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ জীবনযাত্রায় ফিরে এল। বিয়ে করে ছোট্ট সংসার গড়ে তুলল। ছেলেটার অপরাধ 'স্ক্র্যাপ আয়রন' নীলামের ব্যাপারে মাথা গলিয়েছিল।

মাঝরাতে একদিন দু জন পুলিশ অফিসার গিয়ে বলল, সাহেবের খুব জরুরি দরকার - আপনাকে যেতে বলেছেন। সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা ওর স্ত্রীর খুব ভাল মনে হল না, তবু ওদের সংগে ছেলেটি চলে গেল। এই আসে এই আসে করে রাত ভোর হল, সে ফিরে এল না।

ওর স্ত্রী চারিদিকে খোঁজ করলেন। থানায় থানায় ঘুরলেন। শেষ পর্যন্ত খবর পেলেন, ছেলেটিকে হাওড়া থেকে বেলঘরিয়া থানায় নিয়ে গিয়েছে। বেলঘরিয়া থেকে দমদম জেল হাজতে। ব্যাপারটা কী ? ওঁর স্বামী রাতারাতি আসামী হয়ে গেল ?

সেই একটা রাতে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। পুলিশের এক কর্তাব্যক্তি বেলঘরিয়ায় একজন সি আই ডি ইনসপেকটরকে নির্দেশ দেন, ছোঁড়াটাকে একটা ডাকাতির মামলা ঢুকিয়ে দিয়ে চালান করে দাও। সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়।

শেষ পর্যন্ত ছেলেটির স্ত্রী রাইটার্স বিলডিংসে গিয়ে একজন ডি আই জি কে সমস্ত ঘটনা জানাল। ডি আই জি খোঁজ খবর নিয়ে বুঝলেন, ছেলেটি নির্দোষ। পুলিশের একজন বড় অফিসার তাঁর পথের কাঁটা হিসাবে ছেলেটিকে সরিয়ে দিতে চান।

যাই হোক, কয়েক দিনের মধ্যে ছেলেটি মুক্তি পেল। কিন্তু সব দোষ গিয়ে পড়ল সেই সি আই ডি ইনসপেকটরের উপর। তাঁকে সংগে সংগে বদলি করা হল কোচবিহারে। অথচ এই সি আই ডি ইনসপেকটরের অতীত রেকরড খুব ভাল, খুব ভাল অফিসার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু টেলিফোনে নির্দেশ পেয়ে কাজ করেছিলেন। কোন লিখিত অরডার হাতে না নিয়ে ওপরওয়ালার কথায় বিশ্বাস করে নিতান্তই বোকামি করেছিলেন। সেই ওপরওয়ালার গায়ে আঁচড় লাগল না, আজকাল আর পুলিশে কেউ কারও কথা বিশ্বাস করে না। কারণ অনেক ওপরওয়ালা ক্রেডিট নেওয়ার সময় নিচের অফিসারদের পাত্তা দেন না। কিন্তু বেকায়দায় পড়লেই গা বাঁচিয়ে চলেন।

অধিকাংশ থানার ওসি থেকে জেলার পুলিশ সুপার মহাকরণে অভিযোগ পাঠান, ডিউটি করছে না, কথা শুনছে না, তদন্ত না করে তদন্তের রিপোরট দিচ্ছে, শৃংখলা মানছে না।

মহাকরণ থেকে পালটা অরডার গেল: টেক অ্যাকশন। কী ব্যবস্থা নেবেন পুলিশ সুপার ? জো কঙ্ক করে চিঠি দিলেও ঘেরাও হবেন, ঘরের সামনে স্লোগান চলবে, না হয় দল বেঁধে কাজ বন্ধ করে দেবে। তখন কী করবেন

বদলির অরডার, সাসপেনসন অরডার কে কতজন মানেন ? আই পি এস অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে এস পি ঘেরাও, পুলিশ লাইনে মারামারি, খুনোখুনি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনও তো দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এই তো গত ৩০ জুলাই

এর বৈঠকে এস পি, এ এস পি, ডি এস পি-দের ঘেরাও এবং অবমাননা করার অভিযোগ নিয়ে রীতিমত ঝড় বয়ে গিয়েছে।

স্পেশাল আই জি ডি এন পানডে অভিযোগ করলেন, আমি যাঁদের বদলির অরডার দিয়েছি তাঁরা অনেকেই বহাল তবিয়তে বসে আছেন। বরখাস্ত আদেশ, সাসপেনশন আদেশ কার্যকর হয়নি। পুলিশে এক শ্রেণীর কর্মচারীর হাতে অফিসাররা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এইভাবে পুলিশ প্রশাসন চলতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ঘনশ্যাম ভৌমিক বললেন, জনমুখী পুলিশ প্রশাসন গড়তে হলে পুলিশের মধ্যে শৃঙ্খলা দরকার। আজ পুলিশের মধ্যে কি শৃঙ্খলা আছে? বিভেদের বীজকে সযত্নে লালন করা হচ্ছে। একদল লোক কাজ করেন না। ডিসিপ্লিনারি কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে ভয় পান।

ঘনশ্যামবাবু নিজে সাব ইনসপেকটর থেকে ডি এস পি হয়েছেন। তিনি বললেন, বাঁকুড়ার এস পি উচ্ছৃংখলতার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন বলে ঘেরাও হলেন। কিন্তু পুলিশের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এড়াতে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিলেন। নিয়োগকর্তার শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকবে না অথচ পুলিশকে দিয়ে কাজ করান হবে, এটা কি সম্ভব? হাওড়ার এস আর পি কয়েকজনকে ট্রাফিক থেকে প্ল্যাটফরমে বদলি করেছিলেন বলে ছ সাত ঘণ্টা ঘেরাও হয়েছিলেন। তাঁর অপরাধটা কোথায়? যাঁরা বদলি হবেন তাঁদের অসুবিধা কোথায়? বাসা বদল করতে হবে না, ছেলে মেয়েদের স্কুল পালটাতে হবে না। এস আর পি শক্ত লোক, তাই সিদ্ধান্ত বদল করেননি।

পুলিশের মধ্যে বিক্ষোভের কিছু সংগত কারণও আছে। যেমন একদল লোক কাজ করছেন না, একই জায়গায় পাঁচ ছয় সাত বছর বসে আছেন। এঁদের বদলি করা হয় না বা কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অথচ পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিতে আর একদল যাঁরা ঠিকমত ডিউটি করেন তাঁদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে বদলি করা হচ্ছে। পুলিশের পদস্থ অফিসারই অভিযোগ করেছেন বিশেষ কয়েকজন নেতার পরামর্শে জেলার পুলিশ সুপার থেকে কনসটেবল স্তর পর্যন্ত বদলির তালিকা তৈরি করা হয়।

কিন্তু পুলিশ প্রশাসন যে দুর্বল হয়ে পড়েছে বা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে এটা কোন মন্ত্রী বা নেতা মানতে রাজি নন। বামফ্রনট ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৭ সালের ৭ আগসট সি পি আই (এম) নেতা প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন, পুলিশের যোগসাজস ছাড়া সমাজবিরোধীরা টিকে থাকতে পারে না। সেই বছর ১৪ নভেমবর তিনি বললেন, বামফ্রনট সরকারকে অপদস্থ করার জন্য পুলিশ ও আমলার একাংশ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

পরের বছর ২৪ মারচ বিধানসভায় বিতর্কের সময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন 'কংগ্রেস আমলের মস্তানদের শক্ত হাতে দমন করা হয়েছে।'

তা হলে এখন যাঁরা মস্তানি করছে এরা কি বামফ্রনট সরকারের আমলেই হাত পাকিয়েছে?

সে যাই হোক দুর্ভোগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। গরিব লোক, সাধারণ লোক থানায় গেলে ডায়েরি নেয় না, অভদ্র আচরণ করে, নির্যাতনও করে, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে পুলিশই সেই সমাজবিরোধীকে জানিয়ে দেয়। এরকম কয়েক হাজার অভিযোগ মহাকরণে জমা হয়েছে।

জ্যোতিবাবু নিজেই উলুবেড়িয়ায় ১৯৭৮ সালের ২৭ জানুয়ারি এক জনসভায় বলেছিলেন, 'আমার কাছে অভিযোগ আছে গরিব মানুষকে থানায় ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না, অভদ্র আচরণ করা হয়। পুলিশ থানায় ভাল লোকের নামও সমাজবিরোধীদের তালিকায় আছে। কে জানে হয়ত আমার নামও আছে। পুলিশকে বলেছি ওই তালিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে।'

সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক পুলিশ অফিসার থানায় গিয়ে একই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ডি এস পি সুপ্রসন্ন হাজরা চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডাইরেকটর জেনারেল রমেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের কাছে এক চিঠিতে অভিযোগ জানিয়েছেন, 'অনেক লজ্জা আর অনেকটা সন্ত্রস্ত হয়ে পুলিশ দফতরের কোথাও যেতে ভরসা পাই না। গত ৯ আগসট একটা সামান্য কাজে একজনকে সঙ্গে নিয়ে কসবা থানায় গিয়েছিলাম। গভীর পরিতাপের বিষয়, আমাকে ভালভাবে চেনা সত্ত্বেও ইনসপেকটর ইনচারজ অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে সামান্য দুটি কথার জবাবে যে আচরণ করলেন তা শুধু আশ্চর্যের নয়, ভদ্রতালেশশূন্য। বসতে বলা দূরের কথা, যেন দূর করে দিতে পারলেই খুশি হতেন। থানায় যাওয়া যে কত বিড়ম্বনা তা এখন বুঝতে পারছি।'

পুলিশ কি সত্যিই বঞ্চিত, অবহেলিত?

একসময় শ্লোগান ছিল 'পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার একশো বারো।' আজকে আর সেদিন নেই। পুলিশের চাকরিতে এখন সর্বসাকুল্যে সর্বনিম্ন বেতন একজন কনসটেবলের ৫২৯ টাকা ৭০ পয়সা আর একজন সাব ইনসপেকটরের ৮৭০ টাকা ৭০ পয়সা।

এরপর আছে পুলিশের জন্য আলাদা রেশন। মাথাপিছু সাত টাকা খরচ করলে ছোট্ট পরিবারের চাল ডাল সরষের তেল আর চিনিতে এক মাস চলে যায়। চাল ৬০ পয়সা কেজি, গম ৬৩ পয়সা, ডাল ৬০ পয়সা, চিনি ৭৫ পয়সা এবং সরষের তেল ২ টাকা কেজি।

গত ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের রেশনের জন্য সরকারকে ভরতুকি দিতে হত ৯২ লক্ষ টাকা, এখন বেড়ে হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। চাল আর গম আসে খাদ্য করপোরেশন থেকে। ডাল চিনি আর সরষের তেল কেনা হয় টেনডার ডেকে ঠিকাদারদের কাছ থেকে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ কর্মচারীদের দুই সংস্থার প্রতিনিধি এবং পদস্থ অফিসারদের নিয়ে কমিটি করা হয়। প্রতিটি জেলায় পুলিশ রেশনের জন্য টেনডারে মাল কেনা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। টেনডার ডাকার সময় যে নমুনা দেখান হয় পরে সররবাহ করা হয় নিম্নমানের মাল। বাজারে যে ডাল বিক্রি হয় ৬ টাকা দরে ঠিকাদারদের সেই একই ডালের দাম দেওয়া হয়েছে ৯ টাকা ৫৬ পয়সা করে।

বর্ধমানে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নবকুমার চন্দ অভিযোগ করেছেন ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগসাজসে পুলিশের কিছু লোক দুর্নীতিকে মদত দিচ্ছেন।

বর্ধমানে পুলিশ রেশনে দুর্নীতির অভিযোগে একজন ঠিকাদার এবং একজন পুলিশ কর্মচারীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে (কলকাতা বাদে) ৭০ হাজার পুলিশের মধ্যে তিন শতাংশের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। অনেক থানা বা ব্যারাকে জল নেই, আলো নেই, শৌচাগারের অবস্থা শোচনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বাসস্থানের জন্য ১৮ কোটি টাকা দিয়েছেন।

নিশ্চয় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। এমন অনেক থানা আছে যার এলাকা ২৪০ বর্গ কিলোমিটার। প্রতি দশ হাজার মানুষের শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্ব পড়ে ১৩ জন পুলিশের উপর।

এখন সমস্ত জেলায় পুলিশ লাইনে দুই পুলিশি সংস্থাকে অফিসের জন্য ঘর দেওয়া হয়েছে। দেওয়াল লিখনের প্রতিযোগিতা চলছে। এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি থানায়, পুলিশের ব্যারাকে, পদস্থ অফিসারদের অফিসের কাছাকাছি পুলিশ কর্মচারীদের সংস্থার জন্য অফিস ঘর হলে ভাল হয়। অন্তত বিজ্ঞপ্তি টাঙান পোসটার লাগান এবং নোটিশ ঝোলানর জায়গা চাই। এক কথায়, সব রকম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চাই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মহাকরণ থেকে সারকুলার পাঠান হল প্রতিটি থানায়। দুটি করে বোরড ঝুলিয়ে দাও। দায়িত্বটা থানার ওসির। কিন্তু কোথায় বোরড, কোথায় টাঙানর জায়গা?

ওপরওয়ালাদের মানে না কেন?

একটি বড় জেলার একজন পুলিশ সুপার পালটা প্রশ্ন করলেন, কেন মানবে বলতে পারেন? রাজনৈতিক নেতাদের আসকারা, মদত, সুপারিশ তো আছেই, তার ওপর আছে সরকারি নীতি, কাজের অসুবিধা, সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার অভাব, বৈষম্য ইত্যাদি।

আগে একজন পুলিশ সুপারের অনেক ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা মানে হুকুম দেবার কিংবা শাস্তি দেবার ক্ষমতা নয়। ক্ষমতা পুলিশ বাহিনীর ভাল করার। একজন সি আর পি বা বি এস এফ যে সব সুযোগ সুবিধা পায় এবং পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে পুলিশ বাহিনীর সে সব কিছুই নেই। একজন সি আর পি কে এক জায়গায় দিলে আগে গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, থাকার ভাল জায়গা, ভাল হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা চাই। আর পুলিশ বাহিনীকে ছুটতে হবে বাসে ট্রেনে। মাইলের পর মাইল হাঁটতে হবে। থাকার কোন জায়গা নেই। খাওয়ার জন্য যে পয়সা পায় তাতে হোটেলে ভালভাবে খেতে পায় না। ধরুন না, এই বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চার কিলোমিটার দূরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ডিউটি করে দু রাতের জন্য একজন পোলিং অফিসার পেয়েছেন ৬৬ টাকা। আর এঁদের সঙ্গে ডিউটি করে একজন পুলিশকর্মী পেয়েছেন ২০ টাকা। এই বৈষম্য সব জায়গায় চলছে।

আগে একজন পুলিশ সুপার পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করতে পারতেন। একজন কনসটেবল মারা গেলে পুলিশ সুপারের সুপারিশে তাঁর ছেলে বা তাঁর পরিবারের অন্য কেউ সরাসরি চাকরি পেতেন। একজন কনসটেবলকে পুলিশ সুপার নিজে হাবিলদার পদে প্রমোশন দিতে পারতেন। আজকে কোন ক্ষমতা নেই। একজন পুলিশকর্মীর সারভিস রেকরড যত ভাল হোক না কোন রকম ভাল করার ক্ষমতা পুলিশ সুপারের নেই। এরপর আছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং সুপারিশ। অমুককে এই জায়গায় পোসটিং করতে হবে, ওকে অমুক জায়গায় বদলি করতে হবে। তার জন্যে বছরের মাঝখানে একজন পুলিশকর্মীকে হঠাৎ বদলি করতে হয়। তাতে অনেক অসুবিধা হয়। ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে নতুন জায়গায় বছরের মাঝখানে কি স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব? তার চেয়েও বড় সমস্যা বাড়ি ভাড়া পাওয়ার।

এখন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, পুলিশকর্মীরা নিজের জেলা ছেড়ে যেতে চান না। নিজের জেলায় পোসটিং হলে অন্তত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াটা হয়, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই থাকে।

অধিকাংশ পুলিশকর্মী মন্ত্রী বা এম এল এ'র দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করতে চান না। অনেক এম এল এ এবং মন্ত্রী দেহরক্ষীকে ফাইফরমাস খাটান, বাজার করান।

অধিকাংশ থানায় ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। দেওয়াল থেকে চুন বালি খসে পড়েছে। দরজা জানালা ভাঙা, মেঝেতে গর্ত। থানার পুরনো রেকরডস ও ডায়েরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক থানায় বৃষ্টি হলেই জল থৈ থৈ করে।

অধিকাংশ থানায় চলছে খাটা পায়খানা। চারদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ভাঙা চেয়ার টেবিল। থানার কাছাকাছি ওসি সেকেনড অফিসারের কোয়ারটারও নেই অনেক জায়গায়।

গ্রামে আশপাশে সব বাড়িতে বিজলী বাতি জ্বলে অথচ থানায় নেই। এখন এমন অনেক থানা আছে যেখানে হ্যারিকেন জ্বলে, হ্যাজাক জ্বলে।

পুলিশের দুই সংস্থা পাল্লা দিয়ে দেওয়াল লিখছেন, পোসটারে পোসটারে ছয়লাপ করছেন। পুলিশ ব্যারাক, পুলিশ লাইন, জেলায় পুলিশ সুপারের অফিসের বাইরে এবং ভেতরে সর্বত্র পোসটার। পোসটারে পোসটারে ছয়লাপ। থানার সামনে, এস পি অফিসের গায়ে পোসটারে লেখা আছে 'কত টাকা ঘুষ দিলে ভাল পোসটিং পাওয়া যায়?'

বর্ধমানের সদর থানায় ঢুকতে চোখে পড়েছিল, হাতে লেখা বিরাট বিরাট পোসটার : 'ইনসপেক্টর ইনচারজের দুর্নীতির তদন্ত চাই। নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি লড়ছে, লড়বে।'

ইনসপেক্টর ইনচারজ শ্যামল কুণ্ডুর সংগে কথা বললাম। শ্যামলবাবু কোন মন্তব্য করতে রাজি নন।

এটা একটা থানা বা একজন ইনসপেক্টর ইনচারজের ব্যাপার নয়। সব জেলাতেই চলছে। ডাইরেকটর জেনারেলের কাছে ডেপুটেশন, পালটা ডেপুটেশন চলছে।

থানায় পুলিশ কর্মচারীদের দ্বারা অফিসাররা ঘেরাও হচ্ছে, শ্লোগান চলছে। থানার সামনে লোক জমা হয়ে যাচ্ছে।

মেদিনীপুর জেলার পদস্থ এক পুলিশ অফিসার বললেন, 'আসল সমস্যাটা কী জানেন, কাজের লোকের অভাব। পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ কী? সরকারের কোন দফতরে কাজ হচ্ছে বলুন? কোন স্কুলে বা কলেজে মাসটারমশাইরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন? অথচ পুলিশের তুলনায় সকলেরই মাইনে বেড়েছে অনেক বেশি।

সব জেলাতেই পুলিশের মূল সমস্যা অনেকগুলি – ১। প্রয়োজনের তুলনায় পুলিশের সংখ্যা কম, ২। পুলিশ ভ্যান এবং জিপের অভাব, ৩। পুলিশ ব্যারাকে এবং থানায় বাসস্থানের অভাব, ৪। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা কম এবং ৫। অত্যাধিক কাজের চাপ।

দশ বছর আগে যে থানায় অফিসার কনসটেবল নিয়ে হয়ত ছিল বারোজন, অধিকাংশ থানায় সেই সংখ্যার হেরফের হয়নি। কলকাতার থানাগুলিতে পুলিশের সংখ্যা বেড়েছে, বাড়ছে। পুলিশেরও শহরাঞ্চলের থানাগুলিতে পুলিশের সংখ্যা কিছু বেড়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। গ্রামাঞ্চলের থানাগুলি পুরোপুরি অবহেলিত। জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে তদ্বির করে আসছেন, কিন্তু কিছুই হয়নি।

থানাগুলির অবস্থা কী রকম?

ত্রিরিশ, চল্লিশ বছর কিংবা তারও আগে থানার সীমানা ঠিক হয়েছিল। পুলিশের ওপর দায়িত্ব চুরি, ডাকাতি, খুন, সংঘর্ষ – বলতে গেলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব দায় পুলিশের। শহরে কোন হাসপাতালে হয়ত কেউ মারা গিয়েছেন তার আত্মীয়-স্বজন থাকেন সেই থানা এলাকায়, এঁদের খুঁজে বের করে তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতে হবে। সমস্ত অপরাধমূলক ঘটনার তদন্ত করে নির্দিষ্ট সময়ে ওপরওয়ালার কাছে এবং মহামান্য আদালতের কাছে রিপোরট পাঠাতে হবে।

মফস্বলে প্রতিটি থানায় লোকের অভাব ছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা যানবাহনের অভাব, রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগের অভাব। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আট-দশ মাইল হাঁটা ছাড়া উপায় নেই, মাইলের পর মাইল যেতে হয় নৌকায়। থানায় যে সব গাড়ি আছে তার শতকরা নব্বইটি বলতে গেলে অচল – রাস্তার মাঝখানে ঠেলতে হয়।

রাজ্য পুলিশের একজন ডি এস পি বললেন, তাতেও আপত্তি ছিল না। কাজ বেড়েছে দশগুণ, কিন্তু ঢাল তলোয়ার বাড়েনি বরং মরচে পড়ে গিয়েছে। আগে পরীক্ষা হলে পুলিশ দিতে হত না। এত ঘন ঘন নির্বাচন ছিল না। সমবায় সমিতি, স্কুল কমিটি, বাজার কমিটির নির্বাচনেও তো পুলিশ পাঠাতে হয়। তার ওপর পারটির ডাকে মিটিং, ইউনিয়নের ডাকে সমাবেশ মিছিল তো লেগেই আছে। এখন হোমিও-প্যাথি পরীক্ষাতেও পুলিশ দিতে হয়। তারপর আছে ভি আই পি ডিউটি – জেলায় রোজই গড়ে এক-জোড়া করে মন্ত্রী আসেনই। ☐

জানতে চাই জানাতে চাই

এই বিভাগের জন্য এখন প্রচুর চিঠি আসছে। রকমারি সব প্রশ্ন। কেউ মোটা হতে চান; কেউ চান 'স্লিম' হতে। কারুর অনুযোগ, তিনি যথেষ্ট লম্বা নন। অনেকের চুল উঠে যাচ্ছে অকালে। আবার ঠিক সময়েও কারোর কারোর গোঁফ দাড়ি বেরুচ্ছে না। একটি বাজারী ক্রিম সম্পর্কে অনেক মেয়ের কৌতূহল 'এটা মেখে কি সত্যিই ফর্সা হওয়া যায়?' মুখের ব্রণ বা শরীরে বেশি লোম কত যুবতী মেয়ের অনিদ্রার কারণ। এ সবের সংগেই, একজন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র লিখেছে, পড়ার টেবিল থেকে উঠলেই সে পড়া ভুলে যাচ্ছে; আমি যদি তাকে পড়া মনে রাখার কোন ওষুধ বলে দি। তবে সবচেয়ে আমরা বেশি চিঠি পাচ্ছি তাদের কাছ থেকে, যাঁরা 'গোপন' অসুখে ভোগেন এবং বুদ্ধিমান পাঠক, আপনি আন্দাজ করে নিন, কত বিচিত্র ব্যাপারে এঁরা পরামর্শ চাইতে পারেন।

নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন ইতিমধ্যেই ওপরের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এই বিভাগে আলোচনা হয়েছে। বারে বারে আলোচনা সম্ভব নয়। কাজেই যে প্রসংগগুলোর কথা উল্লেখ করা হল, এগুলি নিয়ে পাঠকরা আর কেউ চিঠি পাঠাবেন না, অনুরোধ। এ ছাড়া মনে রাখা দরকার যেসব অসুখের ওষুধ নেই এবং শরীর সংক্রান্ত কিছু কিছু ব্যাপার (যেমন, উচ্চতা) নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানোচিত। 'গোপন' রোগীদের জন্য আমার পরামর্শ: নিকটস্থ হাসপাতাল বা ডাক্তারবাবুর চেমবারে গিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলুন। এই বিভাগে বা আলাদা পত্রালাভ সম্ভব নয়।

আশা সেন, হুগলী: বয়স ৩৭ বৎসর। ১৭ বৎসর হল বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোন সন্তানাদি হয়নি। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, আমার ফেলোপাইন টিউবের একটা মুখ জড়িয়ে আছে এবং অন্যটি বন্ধ। এই অবস্থায় আমার আর কি সন্তানাদি হওয়ার সম্ভাবনা আছে? আমার স্বামীর কোন গোলমাল নেই।

মিসেস সেন, আপনার মত রোগীদের ক্ষেত্রে যারা Tubal Block-এ ভুগছেন, অপারেশনই এদেশে একমাত্র চিকিৎসা। কিন্তু এই অপারেশনও মাত্র ২৫-৩০% ক্ষেত্রে সন্তানাদি হওয়ার ব্যাপারে কার্যকর। আপনার যা বয়স, তাতে অপারেশন কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা, সত্যি বলতে কি, আরও কম। আপনার সমস্যাটি নিয়ে আমি কলকাতার বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবেশ লাহিড়ীর সংগে কথা বলেছি। ওঁর পরামর্শ: আপনি কোন গাইনোকলজিসটকে দিয়ে Laparascopy করিয়ে আপনার টিউবের ব্লক কতটা, বর্তমান অবস্থায় অপারেশন সম্ভব কিনা, হলে কার্যকর হবে কিনা ইত্যাদি দেখে নিতে পারেন।

দেবযানী ভট্টাচার্য, কলি-৩৭: আমার ১৯/২০ বৎসরের একটি ভাই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। এদের মত ছেলেদের জন্য আবাসিক স্কুল, যেখানে হাতে কলমে কিছু শেখান হয়, কোথায় আছে? কলকাতার বাইরে হলেও আপত্তি নেই।

— জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের হাতে-কলমে ট্রেনিং এবং অন্য উপায়ে সমাজের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে আমাদের দেশে যে শহরটি ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে তা হল ব্যাংগালোর। একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, এদের জন্যই এই শহরে মোট ৩৮টি স্কুল রয়েছে। 'কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি মেনটালি রিটারডেড'র ভারতস্থ হেডকোয়ারটারও এই শহরেই হতে যাচ্ছে। ব্যাংগালোরে আপনার কোন আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তিকে এসব স্কুলে ভর্তির নিয়ম-কানুনের জন্য লিখুন।

জনৈকা পাঠিকা, শিলিগুড়ি: আমি উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই আমার হাবভাবগুলো ছেলেদের মত। শাড়ি ইত্যাদি পড়তে ইচ্ছা করে না। বান্ধবীরা 'ছেলে' বলে আমাকে খ্যাপায়। আমার মা-বাবাও তাই বলেন। আর আমারও খুব ছেলে হওয়ার ইচ্ছে। কোন উপায় আছে?

— আমার মনে হয় আপনি Transexualism-এ ভুগছেন। কেরলের রাধা, রাধাকৃষ্ণন হয়েছিল ডাক্তারী সাহায্য নিয়ে, সেইভাবে আপনিও ছেলে হতে পারেন। তবে হওয়ার ব্যাপারটি বেশ জটিল। প্রথমত, আপনাকে সাইকিয়াট্রিসটের কাছ থেকে এই মর্মে মত নিতে হবে যে, আপনার বর্তমান অসুখ ড্রাগ ইত্যাদির সাহায্যে সারান সম্ভব নয়। এরপর কোরটে গিয়ে আপনাকে এফিডেভিট দিতে হবে যে, আপনি সজ্ঞানে ছেলে হতে চাইছেন। এবার দৃশ্যপটে আসবেন প্ল্যাসটিক সারজেন। তিনি মোটামুটি তিনটি ধাপে একটি অপারেশন করবেন—যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আপাতত আপনি সাইকিয়াট্রিসটের কাছে যান।

সিরাজুল হক, বসিরহাট: কেন লম্বা জারনিতে গেলে গাড়িতে মাথা ঘোরে, গা গোলায় এবং শেষে বমি হয়। ফলে দূরে যাওয়াই মুশকিল। এর প্রতিকারের উপায় বলে দেবেন।

— আপনার motion sickness রয়েছে। গাড়িতে ওঠার আধ ঘণ্টা আগে avomine জাতীয় দুটি ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন, তা হলেই আর ওসব অসুবিধা হবে না।

শুক্লা দত্ত, বীরভূম: কয়েক বছর ধরে আমার দুই পায়ের তলায় ভীষণ চুলকায়। চুলকানোর সময় গুঁড়ো গুঁড়ো চামড়া পড়ে, কিছু লাগালে জ্বালা করে। এর চিকিৎসার ব্যাপারে লিখবেন।

— আপনার কেস-হিসট্রি অসম্পূর্ণ। ঠিক ডায়াগনোসিসের জন্য আপনার পায়ের তলাও দেখা দরকার। আপনি কোন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। যতদিন তা না হচ্ছে, আপনি Coniderm-F মলম দিনে তিনবার করে লাগান।

জনৈকা পাঠিকা, আসাম: সারা মুখে বসন্তের দাগের মত গর্ত। কী চিকিৎসা করলে মুখের চেহারা স্বাভাবিক হবে?

— এসব ক্ষেত্রে আমরা Derm-abrasion-এর পরামর্শ দিই। কোন প্ল্যাসটিক সারজনের সংগে কথা বলুন। □

উত্তর দিয়েছেন:
ডাঃ মৃণাল বসু

পূর্বাঞ্চল

সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারি বিদেশি নেপালিদের নাগরিকত্বের দাবিতে কেন্দ্রের সঙ্গেই সংঘর্ষে নামছেন

নয়া দিল্লি থেকে তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

সিকিমে আবার চরম রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সিকিমের রাজ্যপাল হোমি জে এইচ তলোয়ার খান এবং মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারির মধ্যে মতবিরোধ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজ্যপাল কোন এক সারকুলার জারি করে অফিসার দের কিছু নির্দেশ দেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও এই মর্মে পাল্টা নির্দেশ জারি করেন, সংশ্লিষ্ট অফিসাররা যেন বিভাগীয় মন্ত্রী বা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ না করেন। দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে প্রশাসন এখন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়েই রাজ্য কংগ্রেস (ই) দলের সভাপতি ও একজন সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন বিধানসভা সদস্য মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারির পদত্যাগ চাইছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সিকিম কংগ্রেস (ই) দলে যে কোন মুহূর্তে ভাঙন দেখা দিতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার দাবি তুলেছে যে, বিধান সভায় নেপালিদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং সিকিমে যে বিরাট সংখ্যক মানুষ নাগরিকত্ব পাননি তাদের আগামী নির্বাচনের আগে নাগরিকত্ব দিতে হবে। ভাণ্ডারি স্বয়ং শ্লোগান দিচ্ছেন, 'নো রিজার্ভেশন, নো ইলেকশন।

আশংকা করা হচ্ছে, কেন্দ্র যদি রাজ্যপালের দিকেই ঝোল টানে এবং আসন সংরক্ষণ ও নাগরিকত্বের দাবি নস্যাৎ করে তবে ভাণ্ডারির নেতৃত্বে একদল সদস্য কংগ্রেস (ই) থেকে বেরিয়ে অন্য কোন পারটি গড়ে তুলতে পারে। সেই পারটির নেতৃত্বে এমনকি আসামের মত একটা আন্দোলনও সংগঠিত হতে পারে।

ইতোমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী শ্রীমতী ভাণ্ডারির সম্পাদিত একটি সিকিম সাপ্তাহিকে এই বিষয়ে মৃদু হুমকি জানান হয়েছে, 'কেন্দ্র রাজ্যপালের সাহায্যে সিকিমে একটা নতুন সরকার গঠন করতে চাইছে। তবে কি ভারত সরকার সিকিমকে আসামের মত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে চায়?' চোগিয়ালপন্থী বলে ভাণ্ডারির একটা পরিচিতি আগে থেকেই রয়ে গেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কাজি লেনদুপ দোরজি চোগিয়াল হঠানর আন্দোলনে ভাণ্ডারির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান দাবিকে ভারতবিরোধী জিগির হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লেনদুপ দোরজি ইদানিং বেশ সক্রিয়ও হয়ে উঠেছেন।

অবশ্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারি বলেছেন, 'আমি সাম্প্রদায়িক নই, তাই কেন্দ্র আমাকে সরাবে না।' তিনি সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র রাজ্যপালকেই দায়ী করেছেন। তার মতে রাজ্যপালই নাকি সিকিমে ভূটিয়া লেপচাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তুলছেন। ভাণ্ডারিসহ তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য কয়েকজন সদস্য, দলের সম্পাদক সি ডি রাই, ডেপুটি স্পিকার বসনেত কেন্দ্রের প্রতি ইদানিং বেশ ক্ষুব্ধ। তাঁরা সকলেই জানালেন, যতবারই রাজ্যের সমস্যার কথা জানান হয়েছে, কেন্দ্র ততবারই ফাঁকা আশ্বাস দিয়েছে মাত্র। বাস্তবে কিছুই করেনি।'

গত ৩০ আগস্ট নয়া দিল্লির সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারি ঘোষণা করলেন যে, 'সিকিমের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী রাজ্যপাল হোমি জে এইচ তালোয়ার খান। রাজ্যপালই ক্ষমতার লোভে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন যাতে বহাল হয় তার জন্য কংগ্রেস (ই) সরকারকে সরাতে চাইছেন।' এছাড়া দিল্লির সিকিম হাউসে আমার সঙ্গে কথা বার্তা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও করেছেন যে রাজ্যপাল নাকি সিকিমের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তুলছেন। রাজ্যপাল নাকি ভাণ্ডারি মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী ও একজন এম এল এ-কে নিয়ে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীসহ রাজীব গান্ধী এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছেন।

এ কথা সত্যি, ২৫ থেকে ৩০ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারি দিল্লিতে ছিলেন। ঠিক সে কদিনই রাজ্যপাল তলোয়ার খানও ছিলেন দিল্লিতে। দুজনেই ছিলেন সিকিম হাউসে। এ কথাও জানা গেছে যে, রাজ্যপাল ঐ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারিও চেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু পারেননি। ৩০ আগস্ট রাত নটার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা না পেয়ে তিনি অরুণ নেহরুর কাছে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি 'এবং রাজ্যপালের বর্তমান কার্যকলাপ সম্পর্কে এক লিখিত অভিযোগপত্র পেশ করে এসেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারি মনে করেন, তাঁর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর যথেষ্ট আস্থা আছে। সুতরাং তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি হয়ত এ কথা জেনেও বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে, মাত্র দু বছরের কংগ্রেস সদস্য ও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারির চেয়েও দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং শ্রীমতী গান্ধীর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী হোমি জে এইচ তলোয়ার খানের ওপর প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অনেক বেশি। এর জন্যই শ্রীমতী গান্ধী সিকিমের মত একটা সীমান্তবর্তী রাজ্যে বিশ্বাসযোগ্য লোক হিসাবে তলোয়ার খানকেই রাজ্যপাল করে পাঠিয়েছেন। সুতরাং রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপে যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপের বিরোধী কোন রিপোর্ট দিয়ে থাকেন তবে এ কথা বলা যায় যে, ভাণ্ডারিকে হয়ত গদি ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজ্যপালের এবারের দিল্লি আগমন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সেই আভাসই পাওয়া গেছে।

অন্য দিকে মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারিও দিল্লিতে কংগ্রেস (ই) সাধারণ সম্পাদক সি এম স্টিফেন, শ্রীমতী রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী, অর্থমন্ত্রী

প্রণব মুখারজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি সি শেঠি প্রমুখ সকলের সংগে সাক্ষাৎ করে বিশেষ কিছু আশ্বাস পাননি। কারণ তার আগেই রাজ্যের কয়েক জন এম এল এ এবং মন্ত্রী দফায় দফায় দিল্লিতে এইসব নেতাদের সংগে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে গেছেন। এছাড়া গত জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর সিকিম সফরকালে রাজ্য কংগ্রেস (ই) সভাপতি লোডেন শেরিং এবং অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সোনাম শেরিঙ গ্যাংটকে গভীর রাতে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে দেখা করেন। সেই সময় তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থার কথা জানিয়ে গেছেন। সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের এই দুই নেতা এবং বিধানসভা সদস্য দেহন্দুল ভূটিয়া (সিকিম জাতীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান ছিলেন, সম্প্রতি তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছে) সহ কয়েকজন নেতা জুলাই মাসের পরেও দুবার দিল্লিতে এসে প্রধান মন্ত্রীর সংগে দেখা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অনাস্থা জানিয়েছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রীর দেখা পাননি। এমনকি তিনি রাজীব গান্ধীর সাক্ষাৎও পাননি। সব দেখে শুনে মুখ্যমন্ত্রীও যে বিরুদ্ধ আভাস পেয়েছেন তা তাঁর কথাবার্তায় বোঝা গেছে। শ্রী ভাণ্ডারির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, হাইকম্যান্ড যদি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে যেতে বলে তখন তিনি কী করবেন? ভাণ্ডারি উত্তর দিয়েছেন, 'আমি কংগ্রেস (ই) দলে যোগ দেবার আগেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। সুতরাং এবার সিকিমে ফিরে গিয়ে আমিও আমার কাজ শুরু করব।'

সিকিমে মূলত দুই বৃহৎ সম্প্রদায়। এক ভূটিয়া-লেপচা, দুই নেপালি। এছাড়া আছে সংঘ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়, সিডিউল কাসট। সিকিমে বরাবর দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দানা বেঁধে আছে। রাজা চোগিয়ালের আমল থেকে ভূটিয়ারা মনে করেন এ রাজ্যটা তাঁদেরই। কারণ রাজা চোগিয়াল ছিলেন ভূটিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং ভূটিয়ারা মনে করতেন, নেপালিরা সিকিমের বাইরে থেকে আসা জনসম্প্রদায়। এ রাজ্যে সেইসব 'বিদেশি'দের বসবাসের কোন অধিকারই নেই। ভূটিয়াদের সংগে আবার এ ব্যাপারে একজোট হল লেপচা, সংঘ, সিডিউল কাসটরা। দীর্ঘদিনের এই ভূটিয়া-লেপচা বনাম নেপালি সাম্প্রদায়িক সমস্যা বর্তমানে এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর জন্য যেমন বহুলাংশে দায়ী বিগত জনতা সরকার তেমনি অনেকাংশে দায়ী বর্তমান কংগ্রেস (ই) সরকার। দুই সরকারই সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭৩ সালে চোগিয়াল রাজত্বে সিকিমের শাসনব্যবস্থা চলত কাউনসিল পদ্ধতিতে। সেই সময় কাউনসিলের মোট আসন সংখ্যা ছিল ১৬। এর মধ্যে ভূটিয়া লেপচা ও নেপালি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল দু পক্ষে সমান। অর্থাৎ ৬ ভূটিয়া লেপচা, ৬ নেপালি, ১ সংঘ, ১ সিডিউল কাসট, ১ তেসঙ (Tsong) এবং একটা আসন ছিল সর্বসাধারণের জন্য। এরপর ১৯৭৪ সালে কাজি লেনদুপ দোরজির মুখ্যমন্ত্রিত্বে সিকিম কাউনসিল যখন বিধানসভায় পরিণত হল সেই সময় তার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে করা হল ৩২। তখনও ভূটিয়া লেপচা এবং নেপালি দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল সমান। অর্থাৎ ১৫ ভূটিয়া-লেপচা, ১৫ নেপালি, ১ সংঘ, ১ সিডিউল কাসট।

১৯৭৯ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার এসে সিকিম বিধানসভায় আসন ভাগাভাগিতে এক নাটকীয় পরিবর্তন আনে। সে সময় প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সিকিম রাজ্যে বসবাসকারী নেপালিরা নেপাল ও ভূটান থেকে আসা বিদেশি। সুতরাং এদের জন্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের কোন অর্থ হয় না। জনতা সরকার সিকিম বিধানসভায় নেপালিদের জন্য সংরক্ষিত ১৫টি আসনের সব কটিই বাতিল করে দেয়। জনতা সরকার সিকিম বিধান সভার আসনকে নতুনভাবে সাজিয়ে করে, ১২ ভূটিয়া লেপচা, ১ সংঘ, ২ সিডিউল কাসট আর বাকি ১৭টি আসন রাখা হল সর্বসাধারণের জন্য। অর্থাৎ যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ এই ১৭টি আসনে নির্বাচনে জিতে আসতে পারবে। কিন্তু লোকসভায় এই বিল অনুমোদনের সুযোগ তাঁরা পাননি। তার আগেই সরকারের পতন ঘটে।

এরপর ১৯৮০ সালে কংগ্রেস (ই) সরকার ক্ষমতায় এলে ৭৯ সালে জনতা সরকারের আনা সিকিম বিধানসভা বিল লোকসভায় অনুমোদিত হল। অনুমোদনের সময় তৎকালীন কংগ্রেস (ই) আইনমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, 'সরকার সিকিমের জনগণের আশা ও চাহিদার দিকে দৃষ্টি দেবে। সিকিমের জনগণের দাবি অনুযায়ী বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখবে। প্রয়োজনে নতুন নীতিও নেবে।'

সরকারের দেওয়া আশ্বাসের মধ্য দিয়ে সিকিম বিধানসভায় নেপালিদের জন্য আসন সংরক্ষণ নীতি মুছে গেল। স্বাভাবিকভাবেই নেপালিদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে তখন থেকে। এ রাজ্যে বসবাসকারী এক বিরাট সংখ্যক মানুষ আজও নাগরিকত্ব পাননি। তাঁদের জমি, ব্যবসা সবই আছে, কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা সিকিমে বসবাস করছেন। বসবাসকারী এইসব মানুষের অধিকাংশই নেপালি। এটাও একটা বড় সমস্যা। এ বছর ৪ জুন ইলেকশন কমিশন ঘোষণা করেছেন সিকিমে বসবাসকারী যাদের 'সিকিম সাব জেকট সারটিফিকেট' নেই তাঁদের জমিজমা থাকলেও তাঁরা ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

এদিকে ভাণ্ডারির নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) সরকারের দাবি এদের সকলকে নাগরিকত্ব দিতে হবে এবং ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। হয়ত এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই দাবি। তাঁদের ধারণা যে, এইসব অনাগরিক অধিকাংশ নেপালিদের ভোট ভাণ্ডারির দলবলই পাবে। সম্প্রতি সিকিম বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার লালবাহাদুর বসনেতের নেতৃত্বে বিধানসভার কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ১৯৭০ কে নির্দিষ্ট বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ কমিটির প্রস্তাব হল ১৯৭০ সালের আগে যারা সিকিমে এসেছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। ১৯৭০ সাল হোক 'কাট অব ইয়ার'। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে, সরকার অবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি সিকিমে পাঠাক। সেই কমিটিই এই সমস্যার যথার্থতা খতিয়ে দেখুক এবং স্থায়ী সমাধানের পথ বাৎলে দিক।

মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারি নিজে নেপালি। তিনি এবং তাঁর সরকারের নেপালি মন্ত্রী, বিধান সভা সদস্যরা নেপালিদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও অনাগরিকদের নাগরিকত্ব দেবার দাবি তুলেছেন। গত জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর সিকিম সফরকালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আসন সংরক্ষণ, নাগরিকত্বের দাবি জানিয়ে এক স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু এই দাবিকে ভাল চোখে দেখছে না।

এছাড়া স্বভাবতই ভূটিয়া লেপচারা ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িকতার চোখে দেখছেন। তাঁদের বক্তব্য হল মুখ্যমন্ত্রী নিজে নেপালি বলে শুধু নেপালিদের সুবিধাই দেখছেন। ভূটিয়া লেপচাদের সমস্যার দিকে তাকাচ্ছেন না। ইতোমধ্যে ভূটিয়া-লেপচা সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন মন্ত্রীসহ বারোজন বিধানসভা সদস্য (সকলে কং ই) রাজ্যপালের কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাব সাম্প্রদায়িক বলে অভিযোগ করেছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থাও জানিয়েছেন।

সিকিমে আগামী সাধারণ নির্বাচন ১৯৮৪ সালে। ঠিক তার আগেই বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ এবং নাগরিকত্বের দাবির কারণটা কী? তবে কি এই দুই দাবি পূরণ হলে যারা দাবি তুলেছেন তাদের নির্বাচনে অনেক সুবিধা হবে? আবার দাবি পূরণ না হলে তারা রাজ্যে নির্বাচন করতে দেবেন না?

অন্যদিকে ভাণ্ডারি নিজের গদি নিরাপদ করার জন্য চারদিকের খুঁটিগুলো শক্ত করে বেঁধে নিতে চাইছেন। তিনি ইতোমধ্যে একজন বিধানসভা সদস্য এবং সিকিম জাতীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান দেহন্দুল ভূটিয়াকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি চাইছেন দলের মধ্যে তাঁর বিরোধী সভাপতি লোডেন শেরিঙ এবং অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সোনাম শেরিঙের পদত্যাগ। এছাড়া বিধানসভায় অধ্যক্ষের পদত্যাগও তিনি চাইছেন। আসলে যিনি বর্তমান ডেপুটি স্পিকার তিনি ভাণ্ডারির নিজস্ব লোক। তাঁকে স্পিকারের পদে বসাতে পারলে ভাণ্ডারির সুবিধাই হবে। এক কথায় সিকিমের অবস্থা খুবই জটিল। কেন্দ্র যদি সিকিমের বর্তমান পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখেন এবং সমাধানের চেষ্টা না করেন তাহলে সিকিমের রাজনৈতিক অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে। অদূর ভবিষ্যতে সিকিমেও আসামের মত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ ভূটিয়ারা নেপালি খেদাও আন্দোলনে সামিল হতে পারেন। আবার নেপালিরা নাগরিকত্বের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনে নামতে পারেন। কিংবা বর্তমান সরকারেরই এক অংশ নেপালিদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিতে জেহাদ ঘোষণা করতে পারেন। নেপালিরাই দাবি করেন, সিকিমে এখন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ। তাঁদের মতে ভূটিয়া লেপচা মিলিয়ে শতকরা ২৩ ভাগ। তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে? ভূটিয়া-লেপচা বা অন্য সম্প্রদায়গুলো কি নেপালিদের এই মনোভাব সহজে মেনে নেবেন? □

আলোকচিত্র : লেখক

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

সুমন্ত গান-বাজনা ভাল জানত।

কিন্তু কাজ করত মোটর কারখানায়।

মেয়েকে নিয়ে এল গিটার আর তারের বাজনার লাইনে। কিন্তু পিয়ানোয় আশ্চর্য দক্ষতা জন্মাল শ্রাবণীর।

মাত্র সতের বছর বয়সে অনারস নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হল মিউজিক স্কুল থেকে।

জান মা, মিসেস পিনটো বললেন, এত অল্পবয়েসে এরকম প্রতিভা বড় একটা দেখা যায় না।

এবার যাবি মসকোর কনজারভেটারিতে।

সুমন্ত নিজে যা হতে পারেনি, মেয়েকে তাই করে তুলতে চেয়েছিল।

দু-বছরের পিয়ানো কোরস পড়ে ইনটারন্যাশনাল পিয়ানো কমপিটিশনে খেল দেখাবি—১৯৭৮-এ।

থাম তো! রূপসী মেয়ের কত জ্বালা জান? চৌপর দিন-রাত আগলাতে হচ্ছে তো আমাকেই।

কিন্তু ঈশান কোণ থেকে অকস্মাৎ ঝড় এসে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল বাসন্তীর সুখের সংসারে। একদিন অসময়ে বাড়ি ফিরল সুমন্ত। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ।

বাবা! বাবা! কী হয়েছে?

ওগো! অমন করছ কেন?

(চলবে)

আকুপাংচারের ভবিষ্যৎ কি-অন্ধকার-হয়ে আসছে?—

ডাঃ মৃণাল বসু

শক্ত অসুখ-বিসুখ নিয়ে এখন অনেকেই আকুপাংচার চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে প্রচলিত চিকিৎসায় আশানুরূপ কাজ হচ্ছে না বা কম কাজ হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, ন্যাচারোপ্যাথি ইত্যাদির পাশাপাশি আকুপাংচারও এদেশে এখন শিকড় বিস্তৃত করতে শুরু করেছে। তবে আকুপাংচারের সুবিধা হল, - যিনি এই চিকিৎসা পদ্ধতি এদেশের মাটিতে নিয়ে আসেন ও প্রোথিত করেন, যাঁরা এই বিশেষ বিদ্যায় এতদিন তালিম নিয়েছেন এবং যাঁরা এখন এর চর্চা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, এঁদের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত ডাক্তার।

১৯৫৯ সালকে এদেশে আকুপাংচারের যাত্রাবর্ষ বলে ধরা হয়ে থাকে। এই হিসাবে আকুপাংচারের বয়স এখন চব্বিশ বছর। এই স্বল্প সময়ে আকুপাংচারের অগ্রগতির খতিয়ানকে খুব খারাপ বলা চলে না। দেশের সর্বত্রই, বিশেষ করে বড় শহরগুলিতে এখন আকুপাংচার জাঁকিয়ে বসে গিয়েছে। অনেক এম বি বি এস এখন নামের পাশে লিখছেন আকুপাংচারিস্ট। এঁরা মূল লাইন থেকে সরে এসে আকুপাংচার নিয়েই আছেন। আকুপাংচার অ্যানাসথেসিয়া তো ইতোমধ্যেই শিক্ষিত ডাক্তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্ময় এবং আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কয়েকটি হাসপাতালে, নিয়মিত না হলেও রোগীকে অপারেশনের আগে অজ্ঞান করার ব্যাপারে এখন আকুপাংচার ব্যবহার করছেন। অবশ্যই সরকারি স্বীকৃতি এখনও এর জোটেনি, কিন্তু ভারতের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি আকুপাংচারকে তাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং সুলভ, সহজ অথচ কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে আকুপাংচার পেয়েছে বিপুল জনসমর্থন।

কিন্তু এই প্রসংগে উল্লেখ করা দরকার, সত্তর দশকে আকুপাংচারের যে জোয়ার এসেছিল তা এখন বহুলাংশে স্তিমিত। প্রচারের গুণে বা অন্য কোনভাবেই হোক আকুপাংচারের একটি 'সর্বরোগহর' ভাবমূর্তি এই সময় গড়ে ওঠে। বহু শিক্ষিত ডাক্তার এজন্য এদিকে ঝোঁকেন এবং ট্রেনিং নেন। এঁদের অনেকেই এখন নিজের নিজের লাইনে ফিরে গিয়েছেন। লোকেও বুঝতে শিখেছে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিরও অনেক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সব রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা এর নেই। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আকুপাংচারের ফলাফল পাশ্চাত্য চিকিৎসারই অনুরূপ।

কথা হচ্ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আকুপাংচারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ডাঃ মৃগেন গাঁতাইতের সংগে। ডাঃ গাঁতাইত বললেন, 'সম্পূর্ণ সেরে যাওয়া বলতে যা বোঝায় আকুপাংচার অনেক রোগের ক্ষেত্রেই তা করতে পারে না। সারভাইক্যাল স্পনডাইলোসিসের কথা বলি। একবার যদি এই রোগে বড় বড় অসটিওফাইট কোষ তৈরি হয়ে যায়, তাহলে তা সূচ দিয়ে আমরা নষ্ট করব কী করে - সেটা সম্ভব নয়। তবে, আকুপাংচারের সাহায্যে আমরা রোগীর ঘাড়ের ব্যথা নিশ্চয়ই কমাতে পারি, রোগের অগ্রগতিকেও এই পদ্ধতিতে কমিয়ে বা থামিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু এর বেশি নয়। হাঁপানির ব্যাপারেও একই কথা। রোগীর শ্বাসকষ্ট আকুপাংচারে কমে যায় এবং 'টান'-এর প্রবণতাও ক্রমশ কমে আসে। কিন্তু, হাঁপানি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না। যারা এসব রোগ আকুপাংচারে একেবারে সেরে যায় বলে দাবি করেন, তারা মিথ্যা দাবি করেন।'

কলকাতার অন্য আকুপাংচার চিকিৎসকদের সংগে কথা বললে আপনার কিন্তু অন্যরকম ধারণা হবে। আমাদের দেশের হোমিওপ্যাথদের মত, এঁরা চিকিৎসার সংগে সংগে প্রচারও রাখেন নিজেদের চিকিৎসা পদ্ধতির। সেটা দোষের নয়, কিন্তু নানা দুরারোগ্য ব্যাধি সারানর ব্যাপারে এঁরা যে দাবি রাখেন, তা রীতিমত অসম্ভব ও হাস্যকর। **একজন সুপরিচিত চিকিৎসকের সংগে কথা বলে আমার মনে হচ্ছিল**, আকুপাংচার বুঝি গুপ্তবিদ্যা এবং এই চিকিৎসক যেন ম্যাজিসিয়ান। তিনি গ্যারানটি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রোগ সারান। আর সেসব সর্দিকাশি নয়, শক্ত শক্ত সব অসুখ বাঘা-বাঘা চিকিৎসকও ডায়াগনোসিসের পর যেখানে অথৈ জলে পড়ে যান।

কিন্তু এসব কথা পরে। আগে একটু দেখে নেওয়া যাক আকুপাংচার কতটা বিজ্ঞান, কীভাবেই বা কাজ করে আকুপাংচার চিকিৎসকের সূচ এবং কোন কোন রোগে এর ব্যবহার সত্যি সত্যিই সুফল পাওয়া যায়।

আকুপাংচার মূলত ফলিত বিজ্ঞান। প্রাচীনকালে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তীর বা ধারালো পাথরের আঘাতে যোদ্ধাদের অনেক অসুখ, যেমন বাত, ব্যথাবেদনা কী এক আশ্চর্য উপায়ে ভাল হয়ে যেত। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে চীন দেশে কাজে লাগান হয়। চীনারা বিভিন্ন অসুখের জন্য শরীরে নানা 'পয়েন্ট' বা বিন্দু খুঁজে বার করেন। এই বিন্দুগুলিকে কতকগুলি কাল্পনিক নালী বা চ্যানেলের দ্বারা যুক্ত করা হয়। এক একটি দেহযন্ত্রের নাম অনুসারে এই চ্যানেলগুলির নাম রাখা হয়। যেমন, হার্ট চ্যানেল, লিভার চ্যানেল, স্টমাক চ্যানেল ইত্যাদি।

এখন পর্যন্ত প্রায় আটশো র মতন আকুপাংচার বিন্দু আবিষ্কৃত হয়েছে। চ্যানেলের সংখ্যা মোটামুটি চোদ্দটি। বিন্দুগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে, এগুলি আমাদের vital energy র প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বার। আর চ্যানেলগুলি দিয়ে নাকি আমাদের নানা শারীরিক প্রক্রিয়ার কাজকর্ম চলে। স্পষ্টতই, এই ভাষ্য দর্শন হিসাবে উত্তম, কিন্তু বিজ্ঞান থেকে সহস্র যোজন দূরে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, বিন্দু বা চ্যানেল বলে আদৌ কি কিছু আছে - যদি থাকে, তাহলে দেহযন্ত্রগুলির সংগে এদের সংযোগ কীভাবে ঘটছে

কিন্তু আকুপাংচারের কার্যপরম্পরাকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। কোন বিন্দুতে সূচ ফুটিয়ে একটি লোকের বেলায় যে কাজ হচ্ছে, সেই কাজ শতকরা ৭০ ৮০ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে একইভাবে বার বার সংঘটিত করা সম্ভব। এটার ব্যাখ্যা তো আর আকস্মিকতা দিয়ে করা যায় না। পশ্চিমী চিকিৎসকদের মধ্যে যারা আকুপাংচার বিরোধী, তারা বলছেন : এটা সাইকো সমাটিক। অর্থাৎ আকুপাংচারে যা কাজ হয় সেটা একান্তই মনের ব্যাপার। 'কোন রোগী যদি জানে যে, এই আকুপাংচার চিকিৎসকের সূচ গত দুহাজার বছর ধরে নানা অসুখ সারিয়ে আসছে, তাহলে তার মনে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়া হয়ই। বিশ্বাসও জন্মায়। উপরন্তু, ঐ চিকিৎসকরা কটাক্ষ করে বলছেন, আকুপাংচারের ব্যাপারে মাও ৎসে তুং এর নানা বাণীও দায়ী। এখানে আকুপাংচার চিকিৎসকদের বক্তব্য, প্রাণীদের তো আর মন নেই, কিন্তু ঘোড়া ইত্যাদির বেলায় সূচ ফুটিয়ে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে কেন - ঘোড়ারা তো আর মাও ৎসে তুং বোঝে না। এটা চীনা রসিকতা।

'An exact science'

আকুপাংচার সম্পর্কে এই মত বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার মুখপত্র 'ওয়ার্লড হেলথ' এর সম্পাদক জন ব্রানডের। তিনি ১৯৭৯ সালে চীন দেশের নানা হাসপাতাল ঘুরে

ডাঃ বিজয় বসু ও অধ্যাপক

আকুপাংচার দেখে এসে এই কথা লেখেন। অমন জাঁদরেল লেখক অ্যাডলাস হাকসলিও আকুপাংচারের সুখ্যাতি না করে পারেননি। তিনি লিখেছেন, 'The only trouble with this argument is that, as a matter of empirical fact, it happens'

তবে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা আকুপাংচারের সুফলকে স্বীকার করে নিয়ে বলছেন এটা নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন এর চিকিৎসকরা। আকুপাংচার ব্যবহারে কোন ঝুঁকি নেই এমন নয়। কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বিপজ্জনক। যেমন, গর্ভধারণের অবস্থা, টিউমার, কিছু কিছু চর্মরোগ এবং যেসব রোগীর কার্ডিয়াক পেসমেকার রয়েছে।

যেসব অসুখে আকুপাংচার কার্যকর তার একটা তালিকাও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা তৈরি করেছে। আকুপাংচার বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে এই তালিকাটি প্রস্তুত হয় ১৯৭৯ সালে। তালিকাটি যথাসম্ভব বাংলা করে নিচে দেওয়া হল (যেখানে ইংরাজি নামই পাঠকদের সহজবোধ্য বা বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়, এমন নাম হুবহু রাখা হচ্ছে) :

শ্বাসতন্ত্রের রোগ : অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস, নাকে সর্দি, অ্যাকিউট টনসিলাইটিস, অ্যাকিউট ব্রংকাইটিস, হাঁপানি (বিশেষত বাচ্চাদের এবং যেখানে ওষুধপত্র বেশি পড়েনি)।

চোখের রোগ : কনজাংটিভাইটিস, সেনট্রাল রেটিনাইটিস, মাইওপিয়া (শিশুদের), ছানি (জটিলতা ছাড়া)।

মুখের রোগ : দাঁতের ব্যথা, দাঁত তোলার পরের যন্ত্রণা, মাড়ি ফুলে যাওয়া, ফ্যারিনজাইটিস।

পরিপাকতন্ত্রের রোগ : গলনালীর সংকোচন, হিককা, পাকস্থলী ঝুলে পড়া, গ্যাসট্রাইটিস, কুনিক ডিওডেনাল আলসার (যন্ত্রণা কমায়), কোলাইটিস, বেসিলারি ডিসেনট্রি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া।

স্নায়ু ঘটিত ও পেশী অস্থি-ঘটিত ... যন্ত্রণা, ... নাল ... (তিন ... স্ট্রোকের প ... (পক্ষাঘাত জা ... নিউরোপ্যাথি, ... পেশীর দুর্বলতা (প্র ... মেনিয়ারস রোগ, মূত্রথলির দু ... বিছানায় রাতে প্রস্রাব করা, ইনটারকসটাল নিউরালজিয়া, কাঁধের গাঁটের যন্ত্রণা, সায়াটিকা, কোমরে ব্যথা, গাঁটে বাত (অসটিও আরথ্রাইটিস)।

এই সব রোগে আকুপাংচার কীভাবে কাজ করে এটা না জানা গেলেও এর প্রভাবে দেহের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে যে জৈবিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়, তা মোটামুটি সূত্রবদ্ধ করা যায়। প্রথমত, আকুপাংচার বেদনানাশক। দাঁতের ব্যথা থেকে শুরু করে প্রসবের বেদনা পর্যন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আকুপাংচারের সূচ ব্যথা কমে যায়। একটি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ১০ মিগ্রা মরফিন ও ৫০ মিগ্রা পেথিডিনে যেখানে যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা ৬০ ৮০% এবং ৪০-৫০% বাড়িয়ে দেয়, সেখানে হোকু নামক একটি বিন্দুতে আকুপাংচার করলে ৬৫ ৯০% যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

আকুপাংচারের নিদ্রাকারী প্রভাবও রয়েছে। সূচ ফোটানর পর রোগীদের ঘুম ঘুম ভাব আসে। কেউ কেউ ঘুমিয়েও পড়েন। আকুপাংচারে যে ঘুমের ভাব হয়, সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। শক প্রতিরোধ ক্ষমতা আকুপাংচারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এবং এই চিকিৎসায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ক্রমশ বেড়ে যায় বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

আকুপাংচার অ্যানাসথেসিয়া কী - এই পদ্ধতিতে দেহের দরকারি অংশের ব্যথা বেদনা শুধুমাত্র কয়েকটি বিন্দুতে সূচ ফুটিয়ে কমিয়ে ফেলা হয়, তারপর সেখানে করা হয় অপারেশন। কেবল ছোটখাট অপারেশনেই এই অ্যানাসথেসিয়া যে কার্যকর হয় তা নয়, বস্তুত মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, গলা, পেট সবকিছু অপারেশনেই আকুপাংচার অ্যানাসথেসিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে চীনে শতকরা ৩০ ভাগ অপারেশনই এই পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। এই অ্যানাসথেসিয়ায় মস্ত সুবিধা হল, প্রচলিত অ্যানাসথেসিয়ার মত এর কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই এবং এই কারণে দুর্বল এবং অন্যভাবে রোগগ্রস্ত রোগীকেও এর সাহায্যে সফলভাবে অস্ত্রোপচার করা যায়। প্রসংগত কলকাতার কয়েকটি বড় বড় হাসপাতালে (যেমন - মেডিকেল কলেজ, আর জি কর হাসপাতাল) এই অ্যানাসথেসিয়ার পরীক্ষামূলক ব্যবহারের ফলও বেশ সন্তোষজনক।

আগেই বলেছি, ১৯৫৯ সাল থেকে ভারতে আকুপাংচার শুরু হয়। এর প্রবর্তক হিসাবে যিনি একক কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হলেন ডাঃ বিজয়কুমার বসু। পাশ্চাত্য চিকিৎসার স্নাতক ডাঃ বসু চীন থেকে আকুপাংচার শিখে এসে এর প্র্যাকটিস শুরু করেন কলকাতায়। বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে তিনি এই সময় আকুপাংচার ট্রেনিংও দেন।

কিন্তু আকুপাংচার বিষয়ে সাধারণ লোক অবহিত হন আরও অনেক পরে, ষাটের দশকের শেষের দিকে। তখন কয়েকটি সংগঠন এর জোরদার প্রচারের সংগে সংগে বহু ডাক্তার মেডিকেল ছাত্র এবং নন মেডিকেল লোককে বিনা পারিশ্রমিকে আকুপাংচার ট্রেনিং দেয়। এদের মধ্যে কোটনিশ কমিটি, পিপলস রিলিফ কমিটি, শিলিগুড়ির শুশ্রূত সেবা সংস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এসব সংগঠন তখন মনে করতেন, আকুপাংচার শেখার জন্য হায়ার সেকেনডারি মানের শিক্ষাগত যোগ্যতাই যথেষ্ট। ডাক্তারি শাস্ত্রে কোন জ্ঞান না থাকলেও চলে। শিক্ষার্থী বাছাইয়ের সময় একটা জিনিসের দিকে ওরা বিশেষ লক্ষ রাখতেন। তা হল, শিক্ষার্থীর যেন জনসেবার মনোভাব থাকে এবং এই বিদ্যাকে তিনি যেন ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনের পেশা না করেন। যাই হোক, এভাবে বহু জনের আকুপাংচারে তালিম হয়। এবং কালক্রমে তাঁরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েন। আকুপাংচারও ব্যাপক পরিচিতি পেয়ে যায়।

বর্তমানে শুধু পশ্চিমবংগেই যারা আকুপাংচারকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন তাদের সংখ্যা ছয়শোর সামান্য কমবেশি হবে। এদের মধ্যে

দুশো জন ডাক্তার (এম বি বি এস, হোমিও, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি মিলিয়ে)। বাকি চারশো শিক্ষাগত যোগ্যতায় ডাক্তার নন। ডাক্তারদের ফিজ পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে। অন্যরা নেন দুই থেকে দশ টাকা।

বেশ কয়েকজন আকুপাংচার চিকিৎসকদের চেম্বার ঘুরে এবং তাঁদের সংগে কথা বলে এসে আমার মনে হয়েছে, এঁদের প্র্যাকটিসে সফিসটিকেশনের বড় অভাব। অনেক চিকিৎসকই রোগীদের মধ্যে চেম্বারে আকুপাংচারের গুণাগুণ সমন্বিত প্রচারপত্র বিলি করে থাকেন, যা সেকশন ও পাবলিক ল্যাভেটরির সস্তা বিজ্ঞাপন ও হ্যান্ডবিলের সমগোত্রীয়। আবার প্রতি সিটিং এ কত লাগবে তা নিয়েও রোগীর সংগে কন্ট্রাক্ট কেউ কেউ করেন। সংবাদপত্রে বিশেষ বিশেষ রোগের রোগীদের জন্য ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিতেও কাউকে কাউকে দেখা যায়। আকুপাংচারে সারার কোন সম্ভাবনা নেই এমন রোগের রোগীকেও কেউ কেউ স্রেফ পয়সার জন্য হাতে নেন এবং দিনের পর দিন হাতে রাখেন।

এখন ইলেকট্রো আকুপাংচারের যুগ। কোন পয়েন্টে সূচ ফুটিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দ্বারা সেখানে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে চিকিৎসার সুবিধা অনেক কিন্তু সামান্য কয়েক জনকে বাদ দিলে, বেশির ভাগ চিকিৎসকই এখনও সেই সূচকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছেন।

কথা বলতে গিয়েছিলাম ডা. বিজয়কুমার বসুর সংগে। ডা. [illegible] রোডের চেম্বারে। কিন্তু আমাদের দেখামাত্র উনি ক্ষেপে পড়লেন। এই পঁচিশ বছর আপনারা কোথায় ছিলেন? আজ এসেছেন আমার ইন্টারভিউ নিতে! [illegible] অভিমান নয় পুরোপুরি ক্ষোভ ও বিদ্রূপের গলা। আমাদের সামনে ওঁর আগেই তিনি [illegible]

সাধারণ লোকের মধ্যে আকুপাংচার প্রচার নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

ডাক্তারদের মধ্যে এর প্রচারে কেবল আমি আগ্রহী। জনসাধারণের মধ্যে আকুপাংচার বিষয়ে যে অনেক ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে, সেগুলি দূর করতে কি তিনি চান না? এর উত্তরে [illegible] আমি বললেও ওসব [illegible]

এখন আকুপাংচার ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কলকাতায় বেশ কয়েকটি প্রফেসনাল বডি গড়ে উঠেছে। তবে সবই মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটদের জন্য (হোমিওপ্যাথ এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগরিধারীরাও এর মধ্যে পড়েন)। কোরস এবং ট্রেনিং এক একটি সংস্থার এক একরকম। মান বা স্ট্যানডারডেরও নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। তবে সব কটি কোরসই বেশ ব্যয়বহুল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ র জুলাই থেকে আকুপাংচার কোরস চালু করেছে। দশ সপ্তাহ বা আড়াই মাসের কোরস। প্রতি কোরসে ফি বাবদ প্রতি ছাত্রকে এক হাজার টাকা করে দিতে হয়। এ পর্যন্ত মোট ৬টি ব্যাচে একশো আট জন ছাত্র আকুপাংচারে ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়েছেন। এবারের কোরস শুরু হয়েছে ১ আগস্ট।

১৯৮১ র নভেম্বর থেকে আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিয়ার ১২ সপ্তাহের কোরস চালু হয়েছে মৌলালী যুব কেন্দ্রে। জুলাই এ চতুর্থ ব্যাচ শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত এখান থেকে আকুপাংচার ট্রেনিং নিয়েছেন মোট ৩৭ জন। প্রতি কোরসে খরচ ৬০০ টাকা। মে-জুলাইয়ের কোরসে যারা ট্রেনিং নিয়েছেন, তাঁদের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন দুজন চীনা শিক্ষক ডাঃ ইয়ং ও প্রফেসর লু।

এ ছাড়া আকুপাংচার ট্রেনিং দেন ইনডিয়ান রিসারচ ইনসটিটিউট ফর ইনটিগ্রেটেড মেডিসিন (সংক্ষেপে, আইরিম)। এদের কার্যালয় : ৬, তালতলা অ্যাভিনিউ। শিক্ষার্থীদের জন্য এদের দু রকম কোরসের ব্যবস্থা আছে। একটি একমাসের কোরস, ফি আটশো টাকা। অন্যটি দশ সপ্তাহের, ফি ছয়শো টাকা। আইরিমের শিক্ষক ডাঃ সুব্রত পাল বললেন, ওঁদের একমাসের কোরসটিতে বেশির ভাগই অন্য প্রদেশের ডাক্তাররা ট্রেনিং নিতে আসেন। এ পর্যন্ত আইরিম থেকে আকুপাংচার শিখেছেন মোট ৬৪ জন।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অর্থাৎ অন্য রাজ্যগুলিতে আকুপাংচার কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিষ্ঠিত। গাড়ি, বাড়ি, ঠাটবাটের দিক দিয়েও ওসব রাজ্যের আকুপাংচার চিকিৎসকরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক কেতাদুরস্ত। এঁদের ফিজও নাকি বেশ বড় অংকের। সাধারণ মধ্যবিত্তদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবে ওঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি ও আকুপাংচার জ্ঞান সম্পর্কে এ রাজ্যের আকুপাংচারিসটরা সন্দেহ পোষণ করেন।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ডাঃ এ এল আগরওয়াল নামে এক আকুপাংচার চিকিৎসক স্বল্প সময়ে বিরাট অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসার ঘোরতর বিরোধী ইনি এক গোঁড়া চিকিৎসা সংস্থার প্রবর্তক। এঁর নিজের ইনসটিটিউটে এক মাসের ট্রেনিং-এ আকুপাংচারে ডিপ্লোমার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রপিছু উনি এই বাবদ ফিজ নেন ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। ওঁর আকুপাংচারের ওপর লেখা একটি বইয়ের বাজারে বেশ কাটতি।

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন বরোদার ডাঃ প্যাটেল। হোমিওপ্যাথির ডিপ্লোমা, ঘটনা চক্রে একবার হংকং গিয়ে মাত্র ৭ ৮ দিন আকুপাংচার চিকিৎসা দেখেন, এবং তারপর দেশে ফিরে এসেই খুলে বসেন বিরাট ইনসটিটিউট। এঁরা সাতদিনে আকুপাংচারে এম ডি (ডকটর অব মেডিসিন) দেন। ফি ৪৫০০ টাকা। এঁরও আকুপাংচারের ওপর লেখা একটি বই আছে।

খোদ রাজধানী দিল্লিতে আকুপাংচার প্র্যাকটিস করেন কুড়ি থেকে পঁচিশ জন। এ ছাড়া বোম্বে, হায়দরাবাদ, ব্যাংগালোর, গৌহাটি, আগরতলা ইত্যাদি শহরেও আকুপাংচার প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় তো কুড়ি শয্যাবিশিষ্ট একটি আকুপাংচার হাসপাতালই গড়ে উঠেছে।

আকুপাংচারের ওপর এখন কলকাতা থেকে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও কিছুকাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। নাম 'দি আকুপাংচারিসট'। ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত ও ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু এর যুগ্ম সম্পাদক। □

আলোকচিত্র : সমুদ্র সৈকত

কোমর কাঁধের চিকিৎসা

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ

নির্মলকুমার রায়

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি : আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত, উত্তর কলকাতার মেছুয়াবাজার অঞ্চলে 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে' কয়েকবার ঠাকুরের শুভাগমন হয়। আদি ব্রাহ্ম নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে ১৯৬১ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র পৃথকভাবে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, যার পরবর্তী নাম 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'। সমাজ মন্দিরটি ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে নির্মিত।

১৮৭৫ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সংগে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের পর থেকেই উভয়ের মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে, কেশবচন্দ্রও যেমন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন, ঠাকুরও তেমন কেশবচন্দ্রের বাড়িতে এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। এই ব্রাহ্মসমাজগুলির মধ্যে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' অন্যতম। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেশবচন্দ্র পরিচালিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পত্র পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক সংবাদগুলি প্রচারিত হয় এবং নববিধানের ভক্তেরা ঠাকুরকে অসামান্য পুরুষরূপে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। এমনকি ঠাকুরের দেহরক্ষার সংবাদে অন্যান্য ভক্তদের সংগে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভক্তরাও [illegible] এবং ঠাকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়েও উপস্থিত থাকেন। (শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সংকলিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস – সমসাময়িক দৃষ্টিতে' - গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' - গ্রন্থে এই নববিধান ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে ঠাকুরের আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা খুবই মূল্যবান।

'শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানের কথা পড়িল। রাম (ঠাকুরের প্রতি) - মহাশয়, আমার তো নববিধানে কিছু উপকার হয়েছে বলে বোধ হয় না। কেশববাবু যদি খাঁটি হতেন, শিষ্যদের অবস্থা এরূপ কেন· আমার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই। যেমন খোলামকুচি নেড়ে, ঘরে তালা দেওয়া। লোকে মনে কচ্ছে খুব টাকা ঝমঝম কচ্ছে কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি। বাহিরের লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ - কিছু সার আছে বৈকি৷ তা না হলে এত লোকে কেশবকে মানে কেন· শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না· ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে, এরকম একটা হয় না।' (কথামৃত - ২য় ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

'একজন ভক্ত - মহাশয়, নববিধান কি রকম, যেন ডাল খিঁচুড়ির মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ – কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর একটা ঈশ্বর· বলে নববিধান, নতুনবিধান, তা হবে যেমন ছটা দর্শন আছে, ষড়দর্শন, তেমনি আর একটা কিছু হবে। তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জান· ভুল এই, তারা বলে তিনি নিরাকার, আর সব মত ভুল। আমি জানি, তিনি সাকার, নিরাকার দুই ই আরও কত কি হতে পারেন। তিনি সবই হতে পারেন।' (কথামৃত ৫ম ভাগ, সপ্তম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের শুভাগমনের সম্পর্কে কথামৃত প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের উক্তি :

'ভক্তদের শ্রীম বলিতেছেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ থেকে [illegible] নিমন্ত্রণ এসেছে। আগামীকাল থেকে উৎসব আরম্ভ হবে। আপনারা যাবেন। ওখানে ঠাকুরের দৈবী স্পর্শ রয়েছে কিনা। কতবার এসেছেন এখানে। এটি একটি তীর্থ হয়ে রয়েছে। দর্শন করলে উদ্দীপন হয়। কেশববাবুকে কত ভালবাসতেন ঠাকুর। তাঁর ভিতর ঠাকুর উচ্চ উদারভাব ঢুকিয়ে দিচ্ছলেন নিজে। তাঁর জন্যই নব বিধানের ভক্তগণ 'মা মা' বলে পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন।' (শ্রীম দর্শন, অষ্টম ভাগ - ভূমিকা)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের স্থান এই 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' আজও রয়েছে। সমাজ মন্দিরে প্রবেশের জন্য দুই পাশে দুটি ফটক। বামদিকের ফটকের পাশে, পাথরের ফলকে ইংরাজিতে লেখা - 'Bharata Varshiya Brahma Mandir, 1869.' আর ডানদিকের ফটকের পাশে পাথরের ফলকে বাংলাতে লেখা আছে - 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ১৮৬৯' সমাজমন্দিরের ভেতরে উপাসনার জন্য হলঘরে, পূর্বদেওয়ালের কাছে পাথর নির্মিত সুন্দর বেদি, বেদির পিছনের দেওয়ালে একটি খোল বাদ্যযন্ত্র, প্রতি রবিবার বিকালে এখানে উপাসনা, ভজন প্রভৃতি হয়, তবে ভক্তসংখ্যা পূর্বের চেয়ে অনেক কম। হলের বাকি অংশে সারিবদ্ধ কাঠের গ্যালারি, ভক্ত উপাসকদের বসার জন্য। ভিতরমুখী দোতলার বারান্দা, রেলিং দিয়ে ঘেরা। বর্তমানে তার একটি অংশে লাইব্রেরি আছে। উপসনাগৃহের সংলগ্ন পিছনের অংশের ঘরগুলি বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। এবং ওখানকার তত্ত্বাবধায়ক ঐখানেই বাস করেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানা : ৯৫ নং কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯; পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণি থেকে (কলেজ স্ট্রিট মারকেটের কাছে বাটার দোকানের সংলগ্ন) পূর্বমুখে কেশব সেন স্ট্রিটে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই কামাপুকুর লেনের কাছাকাছি কেশব সেন স্ট্রিটের ওপরই বাম ফুটপাথে এই সমাজ মন্দির। বিপরীত দিকে রাজাবাজার থেকে কেশব সেন স্ট্রিটে ঢুকলে এটি ডানদিকে পড়ে। ☐

কাশীর ঘাটগুলি ভেঙে পড়ছে, বিদেশিদের কাছে এর কোন আকর্ষণ থাকবে তো ?

ভারতী ভট্টাচার্য

গঙ্গোত্রী থেকে নেমে এসে পুণ্যভূমি হরিদ্বার ছুঁয়ে গঙ্গা বয়ে গেছেন এই বারাণসীর কত ঘাট, কত সোপান দিয়ে। কতদিন ধরে তিনি বইছেন। তাঁর পুণ্য জল স্পর্শ করার জন্য কত মানুষ এসেছেন এখানে। স্নান করেছেন এখানকার ঘাটে-ঘাটে। ঘাটগুলি ভেঙে আবার তৈরি হয়েছে। কোন কোনটি বা পরিত্যক্তই হয়ে গেছে, তবু বারাণসীর ঘাট সারা পৃথিবী জুড়ে তার খ্যাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়ত থাকবেও।

তীর্থই ঘাট, ঘাটই তীর্থ। এই ঘাটের মাঝে কত পায়ের দাগ। কত ব্যবস্থা, কত সংযম। জীবনের পরমার্থ এরই মধ্যে জমা হয়ে আছে। এদেশের পুরনো যা কিছু পবিত্র, যা কিছু শুচিস্মিত, সবই এই ঘাটের মাঝে ভিড় করে রয়েছে। দর্শন, বেদান্ত, প্রাচীন সংস্কার, সেকালের জীবন পদ্ধতি, আসমুদ্রহিমাচল মহাভারতের জ্ঞানসাধনা, সমস্তই এই ঘাটে খুঁজে পাওয়া যায়। এ শুধু স্নানের ঘাট নয়, এ এক জাতির ইতিহাস, তাদের লুপ্ত গৌরবের অবিস্মরণীয় মহিমা।

কথাগুলি এই প্রতিবেদকের নয়, বাংলার এক কথাসাহিত্যিকের উক্তি কাশীর ঘাট প্রসঙ্গে। কাশীর ঘাট সম্বন্ধে লিখতে বসে, এর চেয়ে যোগ্য বিশেষণ মনে আসে না। এ শুধু স্নানের বা ভ্রমণের ঘাট নয়, এ একটি জাতির ইতিহাস। এই জাতীয় ইতিহাসকে সুরক্ষিত রাখা কি আমাদের কর্তব্য নয় তাই যদি হয় তবে কেন আজ বিশ্বপ্রসিদ্ধ এই ঘাটগুলির শোচনীয় অবস্থা

উত্তরবাহিনী গঙ্গার বাঁদিকে অবস্থিত সাড়ে তিন মাইলব্যাপী লম্বা স্থান ঘাটগুলি অধিকার করে আছে এবং এর কিনারা দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে বয়ে চলেছে পুণ্যসলিলা গঙ্গা নদী। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮৩৯ নাগাদ এখানকার বিশিষ্ট ঘাটগুলির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং দেশের তৎকালীন রাজা মহারাজা ও জমিদারবর্গ এগুলি নির্মাণ করেছিলেন। বারাণসীর অধিকাংশ ঘাটই এরা নির্মাণ করেন, যার ফলে অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানকার অধিকাংশ ঘাটই বাঁধান এবং মজবুত। ঘাটগুলি বাঁধানর জন্য কাশীবাসীরা আজও এইসব ধনীদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিশিষ্ট ঘাটগুলির সংস্কারসাধন করেন : মহাত্মা কুমারস্বামী কেদারঘাট, উদয়পুর মহারাণা রাণামহল ও চৌষট্টি ঘাট, হোলকার মহারাজা অহল্যাবাঈ ঘাট, বালাজী বাজী রাও দশাশ্বমেধ ঘাট, রাজা মানসিংহ -- মানমন্দির ঘাট, রাণী বৈজাবাঈ এবং গোয়ালিয়র মহারাজা সিন্ধিয়া ঘাট, নাগপুর মহারাজা ভোঁসলে ঘাট, রাজা মাধবরাও পেশোয়া-নয়াঘাট ও গণেশ ঘাট, রাণা কাশ্মিরি মল মণিকর্ণিকা মহাশ্মশান শ্রীপত রাও- পঞ্চগঙ্গা ঘাট।

সাড়ে তিন মাইলব্যাপী বিস্তারে সরকারি তথ্য অনুযায়ী মোট ৭৭টি ঘাটের অবস্থান, যার মধ্যে অসী, রাজঘাট, অস্সিঘাট, রাণীঘাট তেলিয়ানালা, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং খিড়কিয়া ঘাট বাদে সবগুলি ঘাটই পাকা ও পাথরে বাঁধান। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অসীঘাট থেকে ঘাটের বিস্তার শুরু হয়ে শেষ হয়েছে রাজঘাট পর্যন্ত এবং মালব্য ব্রিজের অপর পারে আদি কেশব ঘাট যা গঙ্গা ও বরুণার সংগমে অবস্থিত কাশীর অন্যতম তীর্থ, বারাণসীর অন্তিম ঘাট। এই ঘাট ও ঘাটের ওপর অবস্থিত সংগমেশ্বর ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করান সিন্ধিয়ারাজের দেওয়ান, ১৮শ শতাব্দীতে।

এ থেকেই জানা যায় কাশীর ঘাটগুলি নির্মাণ করেছিলেন রাজা মহারাজারা এবং এগুলি পাথরে বাঁধান হয়েছিল। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এবং প্রতি দশকে একবার করে প্রচণ্ড বন্যার তাণ্ডবে ঘাটগুলির ক্ষতি হতে শুরু হয় চল্লিশ দশক থেকে।

১৯৪৮ এর বন্যার পর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে, নদীর সমতল সমুদ্রগর্ভ থেকে ২৪৫ ফুট ওপরে উঠে যায়, ফলস্বরূপ অনেক ঘাট এবং ঘাটের ওপর নির্মিত পুরনো অট্টালিকাগুলির ক্ষতি হতে থাকে। এই সময় থেকেই কাশীবাসীদের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার প্রস্তাব যেতে থাকে।

ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, ডাঃ কে এম মুন্সি প্রমুখের ব্যক্তিগত আগ্রহে এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখের প্রচেষ্টায় সেনট্রাল ফ্ল্যাড কনট্রোল বোরড ঘাটগুলির দিকে নজর দেয় এবং ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ৯৮ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে ঘাটগুলির পুনঃনির্মাণের জন্য অনুদান দেন। এই টাকা সার্বজনিক নির্মাণ বিভাগকে দেওয়া হয়, এই বিভাগই ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করত।

দফায় দফায় এই কাজ চলে। প্রধানত অ্যাপরন লনচিং এর সিট পাইলিঙ এর কাজ করা হয়। বারবার বন্যার ফলে নদীর ধারা ঘাটগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে, ঘাটগুলি ফাঁপা হয়ে যেতে থাকে এবং যে কোন সময় ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর জন্য বড় বড় পাথর দিয়ে সিঁড়ির নিচে বোলডিং করার দরকার হয়ে পড়ে। পাঁচ দফায় এই কাজ চলে। প্রথম দিকে সার্বজনিক নির্মাণ বিভাগ কাজ করে এবং শেষের দিকে সেচ বিভাগের হাতে কাজ হস্তান্তরিত হয়। এই ব্যবস্থায় সর্বমোট ৫১টি ঘাটে অ্যাপরন লনচিং ও বোলডিং এর কাজ ১৯৮০ সাল অবধি চলে।

প্রথম দফায় ছটি ঘাটের কাজ ১৯৬৪ সালে শেষ হয় এবং ব্যয় হয় ৯.২০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় দফায় তিনটি ঘাটের কাজ ১৯৭২ সালে ১০.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শেষ হয়। তৃতীয় দফায় মোট ১৭টি ঘাটের কাজ চলে এবং ১৯৭০ সালে শেষ হয়, ব্যয় হয় ৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। চতুর্থ দফায় উপরোক্ত দুটি সরকারি বিভাগ এক সংগে

১৬টি ঘাটের কাজ চালায় এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কাজ চলে, ব্যয় হয় ৫২.৬৩ লক্ষ টাকা। পঞ্চম এবং অন্তিম পর্বে সেচ বিভাগের হাতে ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ চলে আসে এবং নয়টি ঘাটের কাজ শেষ হয় ১৯৮০ সালে, ব্যয় হয় ৪০.৯৬ লক্ষ টাকা।

এই ব্যাপক কাজের ফলস্বরূপ যদিও ঘাটগুলির অবস্থার উন্নতি হয়, তবে তা সময়সাপেক্ষভাবে। বোলডিং এর কাজ অর্থাৎ ঘাটের সিঁড়ির ভেতরে বড় বড় পাথর ভর্তি করে নদীর স্রোত থেকে ঘাটকে বাঁচানর চেষ্টা প্রতি দু-তিন বছর অন্তর করা উচিত। কিন্তু তা হয় না পয়সার অভাবে। অথচ ঘাটগুলি আবার ভেতর ভেতর বসে যাচ্ছে। দু বছর আগে ললিতা ঘাটের তলায় জল ঢুকে পড়ায় ঘাটটি ৫০ গজ ফাঁপা হয়ে বসে যেতে থাকে। গত বছর প্রবল বন্যার পর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ওই বছরই আবার পাথর ফেলে ফাঁপা স্থান ভরাট করা হয়।

অত্যধিক স্রোতের জন্য নদীর ধারা গংগার অপর পারে অবস্থিত রামনগর কিলা থেকে দিকভ্রান্ত হয়ে এপারে শহরের দক্ষিণ দিকে অসী ঘাটে এসে ধাক্কা দেয়। অসী ঘাটটি কাঁচা। এই স্রোতের ফলে একদিকে যেমন গংগার ধারাতে বহমান নোংরা পদার্থ ঘাটের কিনারে জমা হতে পারে না, অন্য দিকে তলায় তলায় ঘাটগুলিকে ফাঁপা করতে থাকে। এর ফলে বাঁধান ঘাটের তুলনায় কাঁচা ঘাটের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

কাশীর ঘাটগুলির বর্তমান অবস্থার জন্য কে দায়ী - স্থানীয় পৌরসভা, না সেচ বিভাগ - এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। ঘাটগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সেচ বিভাগের হাতে আসে ১৯৭২ সালে-এই বিভাগের একটি শাখা 'বান্ধি প্রখন্ড' (Bundhi Prakhand) বর্তমানে এই দায়িত্বে আছে। এই বিভাগের প্রধান কাজ হল প্রতি বছর বর্ষার পর অথবা বন্যার পর ঘাটগুলি থেকে পলিমাটি সাফ করা, ঘাটগুলি রঙ করা, কিনারে পড়ে থাকা বাড়ি ভাঙার আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং আবশ্যক মত মেরামতের কাজ করা। তিনটি ঘাট - শীতলা, দশাশ্বমেধ এবং প্রয়াগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যার পর পলিমাটি সাফ করার দায়িত্ব নগর মহাপালিকা বা পৌরসভার। প্রত্যহ ঘাটগুলি পরিষ্কার করা ও তা ব্যবহারউপযোগী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা পৌরসভার দায়িত্ব।

স্থানীয় নাগরিক ও বহিরাগতদের ঘাটগুলিতে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যে প্রধান হল ঘাটগুলি অত্যধিক অপরিষ্কার, গোরু মোষদের অবাধ বিচরণ এবং ঘাটের মধ্যে মধ্যে খোলা ড্রেনের অস্তিত্ব। অধিকাংশ ঘাট খাটালের রূপ নিয়েছে। গোয়ালারা অবাধভাবে ঘাটে খুঁটি পুঁতে নিজেদের গরু মোষ বেঁধে রাখে। অনেক সময় গরু-মোষগুলো অবাধভাবে ঘাটে বিচরণ করে। ফলে স্নানার্থী ও দর্শকদের সর্বদাই দুর্ঘটনার ভয় থাকে এবং বাস্তবে তা ঘটেও। পৌরসভা নিয়ম করে দিয়েছে দুপুর দুটো থেকে বিকাল চারটার মধ্যে সমস্ত পশু স্নান করিয়ে ঘাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিয়ম মানতে কারো মাথা ব্যথা নেই। শিবালা, মীরঘাট, রামঘাট ইত্যাদি ঘাটগুলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরু-মোষদের রাজত্ব চলে। ফলে ঘাটগুলি গোবরের দুর্গন্ধে ভরে থাকে।

বান্ধি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার কেদার নাথ এ বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে বলেন 'মহাপালিকাই এ বিষয়ে সর্বেসর্বা। আমরা শুধু রিপোরট করতে পারি, জানোয়ার ধরে চালান দেওয়া আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।'

জানোয়ার বেঁধে রাখার ফলে ঘাটগুলির রেলিং এবং গম্বুজগুলি ভেঙে যাচ্ছে এবং অনেক স্থানে ভেঙেও গেছে। যাদব শ্রেণীর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো নেই। গোবর-গোমূত্রে স্নানের জল নোংরা হচ্ছে, কোন প্রতিকার নেই।

কাশীর সমস্ত ভূগর্ভ প্রয়ঃপ্রণালী এসে নদীতে মিশেছে। ঘাটের কিনারে খোলা ড্রেনগুলি চারিদিকে নরক করে রাখে। উপরন্তু, ঘাটগুলির কিনারে শৌচকারীদের সংখ্যাও প্রচুর। অনেক ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে পিত্ত উঠে আসে। দু একটা ঘাটে মহাপালিকার তরফ থেকে পাবলিক ইউরিনাল নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলির ব্যবহার কমই হয়। জলের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় অবস্থা আরো শোচনীয়। মাঝেমধ্যে শৌচকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান হয়ে থাকে, তবে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় না।

গত কয়েক বছর ধরে এখানে বহিরাগত বাঙালি অ-হিন্দুরা ভিড় করছে। অধিকাংশ ঘাটে এরা মাল বহন করার কাজ করেন এবং ঘাটের কিনারেই থাকেন। প্রয়াগ ঘাটের পাশে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাটের ওপর এদের প্রধান আড্ডা। এই ঘাটটি একটি নরককুণ্ড। প্রকাশ্যে স্ত্রী-পুরুষ শিশু নির্বিচারে শৌচের লাইন পড়ে, কোন সরকারি বিধি নিষেধ নেই। ঘাটের ওপর বড় বড় হরফে মহাপালিকার হোর্ডিং টাঙান, 'ঘাটো মেঁ শৌচ মত কিজিয়ে, ইসে গন্ধা মত কিজিয়ে।'

কাশীর ঘাটের সংগে গংগা প্রদূষণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঘাটগুলির অপরিচ্ছন্নতা ও শহরের নোংরা আবর্জনা ড্রেনের মাধ্যমে নদীতে ফেলার ফলে এখানকার জলে প্রদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। শহরের আবর্জনা বা মল-মূত্র ৭১টি স্থান থেকে নদীতে মেশে। এগুলি পাম্প করে নদীতে ফেলার জন্য জল সংস্থান ঘাটের কিনারে পামপিং স্টেশন নির্মাণ করে। পামপিং স্টেশন ও ঘাটের পরিচ্ছন্নতার জন্য ১৯৬৪-৬৫তে রাজ্যসরকার ৫৪ লক্ষ টাকার একটি যোজনা তৈরি করেন। এই যোজনাতে রামনগর, অসী, হরিশ্চন্দ্র, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তেলিয়ানালা প্রভৃতি ঘাটের আবর্জনা ও মলমূত্র থেকে কৃষিসার তৈরি করার জন্য বিশেষ ধরনের কুয়ো নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭২ সালে কাজ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। পরে ১৯৭৭ ৭৮ সালে ৭৮ লক্ষ টাকার আরেকটি যোজনা তৈরি হয়। দু-চারটি কুয়ো ও পামপিং স্টেশনও নির্মিত হয়। কিন্তু তারপরেই আবার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, আর্থিক সংকট। অধিকাংশ পামপিং স্টেশন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে এবং নোংরা আবর্জনা খোলাখুলিভাবে ঘাটে জমা হচ্ছে বা নদীতে মিশছে।

এই অবস্থার জন্য কে দায়ী - কেদারনাথের মতে 'ওভারল্যাপিং জুরিসডিকশনের' জন্য কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, পরিচ্ছন্নতার ও সুরক্ষার দিক থেকে পৌরসভা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। কোন খুঁত চোখে পড়লে সেচ বিভাগের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়, দায়িত্ব যারই হোক না কেন। প্রসংগত ক'মাস আগে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী কেদার পান্ডের শেষকৃত্যে যোগ দিতে রাজীব গান্ধী এখানে আসেন। জলসেন ঘাটের ওপর খোলা ড্রেন সম্বন্ধে শ্রীগান্ধী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎকালীন পৌরসভা পরিচালক সেচ বিভাগের 'গাফিলতির কাজ' বলে উত্তর দেন। রাজ্যসরকার থেকে সেচ বিভাগের কাছে লিখিত রিপোরট চাওয়া হয়। সেই সময় রাজ্য সেচমন্ত্রী আভাস দেন ঘাটের

বিদেশি পর্যটকরা এই ঘাট দেখতে আসেন

জন্য তাঁর দপ্তর আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তারপর সমস্ত ব্যাপারটাই ধামা চাপা পড়ে আছে।

প্রতিবছর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির জন্য বরাদ্দ। কেদারনাথের মতে এই টাকা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এবং এই কারণেই ঘাটগুলিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে বোল্ডিং করা সম্ভব হয় না। তাঁর মতে, ৭ লক্ষ টাকার বার্ষিক বাজেট এ ব্যাপারে বরাদ্দ হওয়া উচিত।

অনেকের অভিযোগ সেচ বিভাগ টাকা নয় ছয় করে। তাঁরা বলেন এই ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকাতে রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। কেননা বোলডিং এর জন্য আলাদা বরাদ্দ আছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট নির্মাণের জন্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন [illegible] হয়েছিল যার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা [illegible] কথা হয়েছে। বাকি টাকা পর্যটন দপ্তর, মহাপালিকা এবং সার্বজনিক নির্মাণ বিভাগ দেওয়া হবে। প্রথম দফায় ৩০ লক্ষ টাকা সেচ দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ ঘাটটিকে বাঁধানোর কাজে ব্যয় হবে। আগামী ২৫ অকটোবর কাজ শুরু হয়ে ১৯৮৪-র এপ্রিলে শেষ হবার আশা করা হচ্ছে। পর্যটন দপ্তর এখানে পর্যটকদের জন্য একটি [illegible] নির্মাণ করবে। বারাণসীর ঘাটের [illegible] এই প্রথম।

এই ঘাটে অবস্থিত [illegible] মিশিয়ে দেওয়া হবে। কেদারনাথ জানালেন এই ঘাটের কাজ শেষ হবার পর সেচ দপ্তর বুঁদিপরকোটা ঘাটের সংস্কারের কাজে হাত দেবে।

প্রায় দুবছর আগে স্থানীয় রাজ্য পর্যটন অফিস ঘাটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার একটি প্ল্যান তৈরি করে সেচ দপ্তরের মতামত চায়। কেদারনাথের মতে তারা ওই প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন করে ২.৬০ লক্ষ টাকার একটি রিভাইজড প্ল্যান পর্যটন বিভাগকে পাঠিয়ে দেন, যা আজও ফাইল চাপা পড়ে রয়েছে।

'কাশী গঙ্গা ঘাট সুধার সমিতি' নামে একটি সংস্থা ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়। ঘাটের পুনঃনির্মাণের কাজে এই সংস্থার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য আরেকটি 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা' কাশী গঙ্গা ঘাট সেবা সমিতিও ঘাটের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য কাজ করে চলেছে। তবে এদের নিজেদের আর্থিক সংগতি না থাকার দরুন এদের প্রতি সরকারি কৃপাদৃষ্টি কদাচিৎ পড়ে।

ঘাটই কাশীর প্রাণ এবং এগুলির ধ্বংস মানে সনাতনী পরম্পরার সমাধি। স্থানীয় নাগরিকদের একাংশের আয়ের প্রধান উৎসই হল এই ঘাটগুলি। বিশেষ করে মাঝিমাল্লা, ঘাটিয়া ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের। যদিও আলাদাভাবে হিসাব থাকে না ঘাট থেকে সরকার কী পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা আয় করে থাকে, এটা ঠিক যে বিদেশি পর্যটকদের 'ভ্যারানাসি' আকর্ষণের মূল হল এই ঘাটগুলি ও গংগাবক্ষ।

কাশী গংগা ঘাট সুধার সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে ঘাটগুলিকে ওল্ড মনুমেন্ট অ্যাক্ট এর মধ্যে নিয়ে আসতে এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে স্থানান্তরিত করতে সুপারিশ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল সরজমিনে পরীক্ষা করতে এখানে আসে এবং দেশাই এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশও করেন। অন্যান্য সরকারি কাজকর্মের মত, এই পরিকল্পনাটিরও অকালমৃত্যু হয়।

স্থানীয়, বহিরাগত সবাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঘাটে যাই, হয় স্নান করতে নতুবা নিছক ভ্রমণের জন্য। ভ্রমণ করি কখনো ঘাটে-ঘাটে, কখনো গংগাবক্ষে। কিন্তু পাথরের ফাঁক থেকে, সিঁড়ির ধাপ থেকে যে আকুতি অনবরত রিনরিন করে চলেছে, তা কি আমাদের কাছে নদীর স্রোতের শব্দ বলে ভ্রম হয়, নাকি ওই শব্দ ঘাটগুলির আর্তনাদ — নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য - সাধারণের স্নানের জায়গা হিসাবেই শুধু ঘাটগুলি সৃষ্টি হয়নি, এগুলি আমাদেরই অস্তিত্ব ও সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন। দুঃখের বিষয় যা অবিনশ্বর তার দিকে আমাদের কারো নজর নেই। ভারতের অন্যান্য গৌরবের মত ঘাটও কি 'লুপ্ত গৌরব' হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে গণ্য হবে? ☐

আলোকচিত্র :
জি কে সন্তোষ

বিচিত্রা

প্যারিসের আশেপাশে

কমল দাশ

প্যারিসে সবাই যায়। শুধু ফ্রানসেব রাজধানী বলে নয়। প্যারিস প্যারিস বলে। বিশ্বেব প্রেয়সী বলে।

কিন্তু প্যাবিসেব আশেপাশে, কাছাকাছি কত যে অপরূপ জায়গা আছে, কত সুন্দর স্থাপত্য, চিত্রকলা আছে , তা দেখতে কেউ বড় একটা যায় না। শুধু সৌন্দর্য নয়, স্মৃতিতে জড়ান বন, উপবন, রাজপ্রাসাদ। তাই ঠিক করলাম যে টুরিসটের ভিড়ের বাইরে কাটাব, যাব ছুটির অবকাশে প্যারিসের আশেপাশে। রূপোলী পপলার গাছের সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাব প্যারিসকে পিছনে ফেলে।

মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি বসন্তের ইল দ্য ফ্রানসকে। আকাশে বাতাসে সোনাব আভা। সুখেব পরেই দুঃখ। সেটা যেন মনে কবিয়ে দেবার জন্য রয়েছে গ্রামেব দুই রং-এর বাড়িগুলো। এ যেন নতুন রূপে দু নয়ন দিল মুগ্ধ করে। তাই তো বিখ্যাত শিল্পী কবোট আঁকা শুরু করেছিলেন এখানকার বন ফবনতান বুকে দিয়ে। আরও অনেক শিল্পীকেও এখানকাব রূপ গন্ধ পাগল করেছিল। কবেছিল উদ্‌ভ্রান্ত। তাই তো এঁবা এখানে বসে তাঁদের চিবকালেব সব শিল্পসৃষ্টি করে গেছেন। পিসারো, রেনোয়া, মোনে। ভ্যান গগ কাছেই একটি গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

এখানে একদিকে আমরা যেমন দেখতে পাই মধ্যযুগের আরট, কালচার, স্থাপত্য বিদ্যার শেষ ও সর্বোচ্চ পবিণতি, আবাব অন্যদিকে নবযুগের আলোকোজ্জ্বল উপনগরী যাকে আমেবিকাব মানদণ্ডেব সংগে তুলনা করা যায়।

এবার আমরা ভারসাই ছাড়িয়ে সোজা গিয়ে থামলাম একটি ছোট শহরে যার নাম বামবুইলে। এখানে আছে তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌধ। টাউন হল। স্যাতো ও একটা স্বনামধন্য হোটেল। স্বনামধন্য এই জন্য যে বিখ্যাত নোবেল লরিয়েট আবনেসট হেমিংওয়ে গত মহাযুদ্ধের সময় একটা আমেরিকান সেবাদলের নায়ক হয়ে এখানে হেড কোয়ারটার গড়েছিলেন।

সত্যি কথা বলতে গেলে এর জন্যই এখানে থামা। কত জায়গাতেই তো সেই সময় আমেরিকান আরমি বসেছিল। এখন এই সময় এতদিন পবে কার বা তা নিয়ে মাথা ব্যথা? রাইটাব অব অল টাইমস যেখানে থেকে গেছেন, তা না দেখে যাওয়া যায়

এ জীবনে আমেরিকা দেখা হবে কি না জানা নেই। ওঁর জন্মস্থান দেখবাব সৌভাগ্য না হতে পারে, তাই হাতের লক্ষ্মী তো আর পায়ে ঠেলা যায় না।

চোদ্দ শতকেব স্যাতোতে দেখলাম মারী আঁতোয়ানেতেব বুদোয়া বা খাস কামবা। চতুর্থ হেনরি এবং ক্যাথারিন দি মেদিচিও অনেক সময় এখানে এসে কাটাতেন।

একটা কথা না জেনে গিয়েছিলাম। জানলে নিশ্চয়ই যেতাম না, এখানেই নেপোলিয়ান সেনট হেলেনাতে নির্বাসিত হবার আগের বাতটা কাটিয়েছিলেন।

এসব দেশে খাওয়াটা কোন বিশেষ ব্যাপার নয়। যেখানে সেখানে ভাল পবিষ্কার খাবাব ও বাসস্থান জোটে। মনে হয়, এ দেশের কথা ভেবেই বোধ হয পূর্বপুরুষরা লিখে গেছেন, 'ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হট্ট মন্দিরে।'

খেতে খেতে আমাদের মতটা পালটে গেল। মনে হল, এখানে সেখানে রাত না কাটিয়ে আবার আমরা ফিরে যাই — প্যারিস দি পিয়ারির কাছে।

নামটা পছন্দ হল না? সাকির পেয়ালা যে পূর্ণ সতত।

সেনট সা জামে এ-লে অঞ্চলে দেখলাম মিনিয়েচার ফরেসট। শুনলাম মেরি স্টুয়ারট, কুইন অব স্কটস জীবনের সব চেয়ে আনন্দের প্রথম ষোলটা বসন্ত কাটিয়েছিলেন এখানে যখন তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁর ছোটবেলার সাথী ফ্রেনচ ডফিন মানে ফরাসি যুবরাজকে।

আবার দ্বিতীয় জেমস শেষ জীবনের নির্বাসিত দিনগুলো এখানেই ছিলেন। অদৃষ্টের কী পরিহাস।

আজকে সারাদিন আমরা ছিলাম শুধু তিনজনের মধ্যেই। কোন চতুর্থের দেখাও পাইনি। অভাবও বোধ করিনি। একটা কথা আছে — টু ইজ কমপানি, থ্রি ইজ নান। তা কিন্তু ঠিক বলে মোটেই মনে হল না। এরপরে যেখানে গেলাম তার কথা, আমার মন বলছে সকলের ভাল লাগবে। 'গেস' কিন্তু কেউ করতে পারবে না, তাও জানি। স্যাতো অব লা মালমেইজঁ-এ। এটা একটা পল্লীভবন। এখানে উনিশ শতকে নেপোলিয়ান তাঁর অতি আদরের জোসেফিনকে নিয়ে থেকেছেন। তারপরে, অবশ্য কমপিয়েনি আর ফঁনতেব্লুতেও থেকে গেছেন।

তাঁর জীবনের সব চেয়ে সুখের, আনন্দের ও শান্তির দিনগুলো দেখেছে মালমেইজঁ পল্লীভবনটাই। এখানে ঢুকে মনে হল এর যেন রয়েছে মোহিনী শক্তি। মনকে মন্ত্রমুগ্ধ কবে দেয়। নেপোলিয়ানের যত মিউজিয়াম আছে, সকলের চেয়ে এটাই আকর্ষণীয়। এর অপূর্ব গোলাপের বাগান, পাথরের বেসিন এবং অন্যান্য সব ঠিক তখনকার মতই রাখা রয়েছে।

সে যুগের মধুচন্দ্রিমা কাটাবার সবচেয়ে মনোরম পরিবেশ। এ যুগেও পশ্চিম পৃথিবীতে নতুন বিয়ের পরে এই ধরনের সাজান ঘরে রাত কাটাবার রেওয়াজ আছে।

এখানে সযত্নে রাখা আছে জোসেফিনের ব্যবহৃত গাউন, অলংকার ইত্যাদি। তা ছাড়া আছে খাবার ঘর, খেলার ঘর, লাইব্রেরি। শুনলাম নেপোলিয়ানের সংগে ছাড়াছাড়ি হবার পরের দিনগুলো জোসেফিন এখানেই কাটিয়েছেন।

নেপোলিয়ান কি ভুল বুঝেছিলেন?

তাজমহলের কথা মনে পড়ে গেল। শাহজাহান তাঁর মমতাজকে অমর করে রেখে গেছেন। ইতিহাসই প্রমাণ দেয় যে মমতাজের মৃত্যুর পরও অনেক রূপসীই তাঁর অংকশায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে তাঁর মনের মণিকোঠায় একটি মাত্র প্রদীপ শিখাই ছিল জ্বলে, চিরদিনের জন্য 'মমতাজ'।

তাই তো ছেলের হাতে বন্দী হয়ে একটা ভিক্ষাই শুধু চেয়েছিলেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত যেন তিনি তাঁর প্রাণের মমতাজ যেখানে শায়িত, সেই স্থানটা দেখতে পান।'

আবার দেখি, নেপোলিয়ান যদিও জোসেফিনকে ডিভোরস করেছিলেন, তবুও শেষ পর্যন্ত দুঃখ করেছেন, 'আমি কত সব বীরকে জয় করলাম, কিন্তু জোসেফিনকে পারলাম না।'

জোসেফিনও তাঁর একক জীবন নেপোলিয়নের স্মৃতিভরা মালমেইজঁ পল্লীভবনেই কাটিয়ে গেছেন।

পণ্ডিতরা বলেছেন, 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি।' আমি বলি, মনুষ্যচরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি।

আজকে এখান থেকেই আমরা ফিরলাম প্যাবিসের দিকে। ইচ্ছে ছিল আবও দু একটা জায়গাতে যাবার। কিন্তু রাতে আমাদের সংগে খেতে বলেছি নতুন এক বন্ধুকে আমাদের হোটেলে। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে তার সংগে দেখা হয়েছিল। বেশ ভাল লেগেছিল।

শ্রীলংকার ছেলে। এখানে এসেছে আঁকা শেখার জন্য। বছর দুই হয়ে গেছে। আরও দু বছর থাকতে হবে। বাবা-মার কথা বলছিল। বড় ভাল লাগল।

এখানে এসে অনেককেই দেখেছি কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। শুধুই নিজের সত্তা, নিজ, নিজ।

আমরা এটা খুব ভাল করেই দেখেছি ইংবেজদের মধ্যে। এদেশে রাজার হালে থেকে, রাজার হালে থাকতে পারলেও কাজের শেষে ফিরে গেছে দেশে। নিজের দেশ, নিজের সত্তা ছাড়তে পারেনি বলেই আজ তারা তারাই।

আজ আমরা? সেটা হারাতে বসেছি বলেই ভয় হয়, আমাদের পরিণতি কী হবে? বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীন আমরা হব, কিন্তু আমরা যদি মানুষ না হই, সেই স্বাধীনতা অর্জন হবে অর্থহীন।' মনে হয়, সবচেয়ে বড় সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। মানুষ গড়াই বড় কঠিন ব্রত।

অনেক রাত অবধি ছেলেটার সংগে কত কথা হল। ওর দেশের ইতিহাস, আমাদের দেশের অতীত,

ওদের বর্তমান, আমাদের এগিয়ে যাওয়া। ওর শুধু একটা কথা কানে বাজে, 'আমাদের দেশ ডেভেলপিং কানট্রি, কিন্তু তোমাদের দেশ এখন ডেভেলপড কানট্রি তা সে যত পেছনের সারিতেই হোক না। কেন যে তোমরা তা স্বীকার কর না, তা বুঝি না।'

ভোরবেলা উঠেই ফনতেব্লর দিকে বেরিয়ে পড়েছি। অনেকটা পথ গিয়ে আবার প্যারিসে ফিরে আসব দুপুরের খাবার খেতে। খেয়েই উল্টোদিকে পাড়ি দিতে হবে কমপিয়েনিকে শেষ করতে। পরের দিন সকালে সাময়িকভাবে প্যারিসের কাছে বিদায় নিতে হবে। এই হচ্ছে প্রোগ্রাম।

লম্বা আশা নিয়ে সোৎসাহে তিনজনে তো আমরা তড়বড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যতই কোচটা এগুতে লাগল, মনে হল সত্যি, রূপে এই দৃশ্যের তুলনা নেই। এই সত্যিই অনিন্দিতা।

তাই তো বড় বড় শিল্পী একে বন্দনা জানিয়ে গেছেন তাঁদের তুলি দিয়ে। করোট এঁকেছেন এখানকার কত ছবি। তারপরে রেনোয়া, সিজানও এঁকেছেন। এখন রুসো আর মিলোটের বাসস্থান মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। এখানকার স্যাতো বানিয়েছিলেন সপ্তম লুই। ঠিক বানাননি, মানে আরম্ভ করেছিলেন।

এই স্যাতোতে ঢুকে একটা কথা বারেবারেই মনে হচ্ছিল, ভারসাই যদি চোখ ঝলসান হয়, তো এ তৃপ্তিদায়ক। প্রথম ফ্রাঁসোয়াই এই প্রাসাদের চেহারা পালটে দেন। নিজে শিল্পী না হলেও তার মন ছিল শিল্পধর্মী।

তিনি ইতালি থেকে দুজন নাম করা স্থপতি আনিয়েছিলেন। তাঁদের উপর দিয়েছিলেন কর্তৃত্ব একে তুলনাহীনা করবার আশায়। রাজার প্রেয়সী ডাচেস দ্য এতামপ যে এখানে থাকবেন। তাই তো এর জন্য এত তোড়জোড়। মোনালিসার ছবিটা ফ্রানসে এনে এখানেই রাখা হয়।

আবার জানলাম, তারপর দ্বিতীয় হেনরি তাঁর প্রিয়া ডায়না ডি পইটিয়েরস এখানে থাকবেন বলে তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'ডি' চারদিকে খোদাই করিয়েছিলেন।

মানুষের কত আশা। সে ভাবে, সে এসেছে থাকতে, চিরকাল থাকবে। তাই সে গোছাতেই থাকে। করে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। অজান্তে পড়ে ডাক। তৃণটুকু পেছনে রেখে সে যায় চলে। মানে তাকে চলে যেতে হয়।

এই অমোঘ নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। এটা চলে আসছে আবহমানকাল থেকে। তাও মানুষ থাকে ভুলে অথবা, থাকতে চায় ভুলে।

গাইড বললেন, রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রানী ক্যাথারিন দি মেদিচিও অনেক কিছু করেছেন প্রাসাদের জন্য। এর অপূর্ব বাগানের জন্য কৃতিত্ব সম্পূর্ণ অবশ্য আরও একজনের। পরের আর এক রাজার। মনে এল নিজের দেশের কথা। সেখানেও রাজারা কত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে গেছেন। অনেক কিছুই রয়ে গেছে, তাঁরা কিন্তু নেই।

রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে যখন ইংরেজরা নতুন দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মনের কোণেও কি ভাবনা হয়েছিল, এত যত্ন করে যা করছে তা থেকে যাবে, তারাই থাকতে পারবে না?

নিয়তি, নিয়ম।

আবার এই প্রাসাদ থেকেই আঠারশ চোদ্দতে নেপোলিয়ান তাঁর ওলড গারডদের কাছ থেকে নিয়ে ছিলেন শেষ বিদায় এলবাতে যাবার আগে। তখন এর নাম ছিল Cour de Chevat Blanc. এখন এটার নামকরণ হয়েছে Cour des Adieux.

সব ঘোরার শেষে গাইড নিয়ে গেল একটা অ্যাপারটমেনটে যেখানে নেপোলিয়ান ও জোসেফিন প্রায়ই এসে থাকতেন।

সুইডেনের রানী ক্রিসটিনার বিষয়ে যে স্বপ্নের জাল বোনা ছিল মনের মধ্যে, তার একটা কোণা যেন আরেকটা ঘরে গিয়ে হঠাৎ টান পড়ে গেল ছিঁড়ে। এখানে অতিথি হিসাবে উনি এসেছিলেন এবং তাঁর প্রিয় অমাত্য মোনালডেসকিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। মনটা কেমন যেন ধাক্কা খেল।

মেয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মা, অনেক কিছু আজ করতে হবে। মনকে বিক্ষিপ্ত কোর না। তুমিই তো আমাদের আনন্দের উৎস।'

কথাটা শুনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। একটা গত ঘটনার জন্য হাসিতে ভরা মুখগুলো দিলাম মলিন করে।

ফিরতে ফিরতে পথে প্যাকড-লানচ কিনে নিলাম। কোচে বসে চললাম খেতে খেতে। খাওয়াকে খাওয়া, দেখাকে দেখা, তার ওপর অমূল্য সময় বাঁচান, সোজা কথা?

'ফাইভ ইয়ার প্ল্যানকে কিন্তু আমরা অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছি, কী বল?' উনি বললেন।

'থ্রি-ইন-ওয়ান আইসক্রীম, আমি বলব'। – অনু চেঁচিয়ে উঠল।

আমি দুদিকেই দিলাম মাথা হেলিয়ে, অনেকটা আমাদের দক্ষিণী ভাইদের মত। কার সঙ্গে সায় দিলাম কারও বুঝবার জো নেই। দু জনেই ভাবল – তাকেই বুঝি বেশি সাপোরট করলাম।

কমপিয়েনির দিকে যেতে যেতে বারে বারেই ক্যারোটের আঁকা সুভেনির দ্য মরতোফঁতা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ভগবান আমাকে তুলি ধরবার সুযোগ দেননি। দিলেও কী হত জানি না। তবে সুন্দরকে দু চোখ ভরে দেখবার চোখ ও মন দিয়েছেন। তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শুনলাম জাঁ জ্যাক রুশো মারা গিয়েছিলেন যখন তিনি মারকুইস অব দি গিরার্দা-এর অতিথি ছিলেন। একটি ছোট্ট পপলার ঘেরা দ্বীপে তাঁর সমাধি হয়। অবশ্য পরে সেখান থেকে সরিয়ে তা প্যারিসের প্যান থিয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়।

কমপিয়েনিতে আমার আসার একটা অতি বিশেষ কারণ ছিল। আমাদের দেশের প্রায় সকলেরই কাছে একটা নাম শুধু যে জানা, তা নয়, পুণ্যও বটে – জোয়ান অব আরক। তাঁকে এখানেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল পুড়িয়ে মারবার আগে। বার শতকের এই টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সেই বীরাঙ্গনাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম, আর তার পাশাপাশি ভেসে উঠছিল আর এক বীরাঙ্গনার প্রতিকৃতি – মাতঙ্গিনী হাজরার।

এখানেই করসিকা যে ফ্রানসের অধীনে এল, তার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বলব সোনার অক্ষরে, তাই তো সে তার সব চেয়ে কৃতী সন্তানকে পেয়েছিল – নেপোলিয়ান। আবার এখানেই নেপোলিয়ান ও মারি লুইয়ের বিয়ে হয়েছিল।

তাই মনে হল এই টাওয়ার কত কিছুর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কখনও সে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছে, কখনও দুঃখে হয়েছে মুহ্যমান। ঠিক মানুষের জীবনে যা হয়। সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়। আবার দাঁড়িয়ে থাকতে হয় শক্ত পাথরের মত। এই সব সেরে আমরা যখন প্যারিসে আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম, তখন আমরা বড় ক্লান্ত অথচ বড় পরিতৃপ্ত।

সেদিন রাতে হোটেলেই রাতের খাবার খাব। কদিনের চেনা হোটেলের ম্যানেজারের অতিথি হিসাবে। এক নাগাড়ে রয়ে গেলাম তো কিছুদিন। তা ছাড়া, আবার ঘুরি ফিরে এখানেই আসব লনডনে ফিরে যাবার আগে।

সব চেয়ে বড় কথা সিজনটা। অফ সিজন অর্থাৎ টুরিসটদের সত্যিকারের আসার সময় এটা নয়। বোধ হয়, তাই আমাদের নেমন্তন্ন করলেন তাঁর অতিথি হিসাবে রাতে খেতে।

আবার মনে হয়, আমাদের নিশ্চয়ই তাঁর ভাল লেগেছিল বা ইনটারেসটিং মনে হয়েছিল। যে কারণেই হোক সেই রাতটার কথা খুব মনে আছে।

মন খুলে ভদ্রলোক কত কথাই বললেন। আর আমরাও ফ্রেনচদের যেন অনেক কাছের লোক বলে ভাবতে পারলাম।

'জান, পৃথিবীতে ফ্রেনচদের সকলেই ভুল বোঝে।'

'কেন? কারণ?'

'কারণ তো খুব সোজা। ইংরেজরা ইংরেজদের চোখ দিয়ে ফ্রেনচদের দেখাতে চেষ্টা করে, বা বলতে পার, তাদের মন দিয়ে।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

'তবে ভুল তো হবেই। ফ্রেনচরা নিজেদের অতীতকে ভুলতে পারে না। তাই তারা চায় Security বা নিশ্চয়তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদের দিকে যেন কে তাদের নিয়ে যায়। অর্থাৎ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।' স্বাভাবিক যে এই ভাগটা এভাবে বার বার ফিরে আসা ভাল লাগে না। এই পরাধীন, এই স্বাধীন। এটা যে সম্পূর্ণ ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য তা ইংরেজরা বোঝে না। ভাবে, ওরাই বুঝি রক্ষা করল।'

এর কথা বলার ভঙ্গিতে আমরা তিনজনেই হেসে বাঁচিনা।

'আর শোন, ওরা বলে ফ্রেনচরা বাইরে বাইরে ভদ্রতা দেখায়, ভেতরে মোটেই নয়। কিন্তু ভেবে দেখ, এ কথা তো সত্যি সবার জন্যই। ইচ্ছে থাকলেও কি কেউ বাইরে অভদ্রতা করে? যত দোষ, নন্দ ঘোষ।'

'সত্যিই, যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে তোমার কথাগুলো কত ঠিক', সে বলে উঠল।

'ঠিক বলে ঠিক! দেখ সাঁজে লিজির হোটেলের ওয়েটারটা বেশি টিপস না পেলে ব্যবহার ভাল করে না বা ট্যাকসি ড্রাইভাররা শরট ডিসট্যানস যেতে চায় না। অতএব কিনা ফ্রেনচরা 'মিন'। কেন – সব বড় বড় শহরেই তো এসব হয়ে থাকে, তাই না?'

'খুব ঠিক কথা', অনু বলে উঠল।

'লনডনেও তো এরকম আকছার হয়ে থাকে।'

এই রকম নানা খোশ গল্প করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। তাই ইচ্ছে না থাকলেও সভা ভঙ্গ করতে হল। []

খুনের রাজনীতির খপ্পরে কোচবিহার

কোচবিহার থেকে অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সদর হাসপাতালে আহত রাজ্য কংগ্রেস-ই সম্পাদক সন্তোষ রায়

কোচবিহারে আবহাওয়া গরম হচ্ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে। এ জেলার রাজনীতিতে কংগ্রেস- সি পি আই (এম) লড়াইএবং সি পি আই (এম)-ফরওয়ারডব্লক লড়াই নতুন কিছু নয়।পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে গোটা জেলার রাজনীতি চলে যাচ্ছে খুনের রাজনীতির খপ্পরে। মাস তিনেকের মধ্যে খুনের রাজনীতির বলি হয়েছেন অন্তত জনা দশেক মানুষ।

হঠাৎ জেলার রাজনীতিতে হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সন্তোষ রায়ের আক্রমণের ঘটনার পর থেকে। তার আগে সি পি আই (এম) নেতা গৌতম দে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।

সি পি আই (এম) এর অভিযোগ, কংগ্রেস (ই)র বিরুদ্ধে। অন্যদিকে খুনের রাজনীতির জন্য কংগ্রেস (ই) দায়ী করছে সি পি আই (এম) কে। তবে দু পক্ষই স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন।

কোচবিহার এতদিন ফরওয়ারড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি ছিল। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ ফরোয়ারড ব্লকেরহাত থেকে সি পি আই (এম) ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে সি পি আই (এম) যেমন শক্তিশালী হয়েছে তেমনি জোরদার হয়েছে কংগ্রেস (ই)।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে গোটা কোচবিহার জেলায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিনই দিনহাটার বড়-নাচিনা গ্রামের কংগ্রেস (ই) সমর্থক তারাকান্ত সরকারকে একদল দুষ্কৃতকারী বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। পরদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাতালের হাট থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায় ঘটনায় যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তারা সবাই ফরওয়ারড ব্লক সমর্থক। কংগ্রেস (ই) এই হত্যাকাণ্ডে ফরওয়ারড ব্লককে দায়ী করেছে। এরপর গত ১৭ জুন কোচবিহার সদর মহকুমার চাঁদমারী গ্রামে ফসল কাটা নিয়ে এক সংঘর্ষে ৩ জন কংগ্রেস (ই) এবং ১ জন সি পি এম সমর্থক নিহত হন।

চাঁদমারীর হরচন্দ্র বর্মন ৪ বিঘা জমির রেকরডেড বর্গাদার। জমির মালিক বিষাদু রায়। তাঁর ছেলে ধীরেন রায় স্কুলের শিক্ষক। স্থানীয় লোকের কাছে ধীরেন মাষ্টার নামে পরিচিত। ১৬ জুন লোকজন নিয়ে ধীরেন মাষ্টার হরচন্দ্রকে না জানিয়ে একতরফাভাবে সেই ফসল কেটে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে হরচন্দ্রের সমর্থক একদল সি পি এম সমর্থক ধীরেন মাষ্টারের বাড়িতে হামলা চালায়— ভাঙচুর করে এবং ধীরেন মাষ্টার যে ফসল কেটে এনেছিলেন তা জোর করে নিয়ে চলে যায়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ১৭ জুন একদল কংগ্রেস (ই) সমর্থক ধীরেন মাষ্টারের সমর্থনে একটি মিছিল বের করেন। সি পি এমের পক্ষ থেকে পালটা মিছিল বের হয়।

দুটি মিছিল মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনাস্থলেই কংগ্রেস (ই) সমর্থক জীবন রায় (৪০) এবং রমজান মিঁয়া (৪৫) নিহত হন। কংগ্রেস (ই) দলের লোকজন দৌড়ে গিয়ে জনৈক সুবল রায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সি পি এম সমর্থকরা তখন এই বাড়িটি আক্রমণ করে। শুরু হয় ভাংগচুর লুটতরাজ। সুবল বাবুর অভিযোগ, বাড়ির দোতলা থেকে তখন বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়। গুলিতে গোকুল বর্মন (২৫) নামে জনৈক সি পি এম সমর্থক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরদিন আর একজন কংগ্রেস (ই) সমর্থক সামসুল মিঞার মৃতদেহ গোসানীমারীর রাস্তায় পাটক্ষেতের মধ্যে পাওয়া যায়। পুলিশ চাঁদমারীতে পৌঁছায় বেলা দুটো নাগাদ। তখনো সেখানে উত্তেজনা। পুলিশ ৩ রাউনড গুলি চালায়। জেলা পুলিশের এস পি জ্যোতি কৃষান ডাট এবং এ এস পি এ এম খান ঘটনাস্থানে যান। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় মোট ৮ জন সি পি এম এবং ২৪ জন কংগ্রেস (ই) সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমরা যখন কোচবিহার থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে চাঁদামারীতে পৌছলাম তখন বিকেল ৫টা। আত্রাহাট থেকে চাঁদামারী ১০ কিলোমিটার। মাটির রাস্তা। মাঝে মাঝে চাঁদামারী হাটে অপরিচিত কিছু স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে সুবল রায়ের বাড়ির খোঁজ পেলাম। সুবল বাবুর ছোট ভাই কানু রায় সরকার সেদিনের ঘটনার ভয়ার্ত বিবরণ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের সব কিছু দেখালেন। ভাংগা ঘর দরজা খাট আলমারী আরো অনেক কিছু। দাদা সুবল রায় বেশ কিছুদিন থেকে ঘরছাড়া। ভানু রায় সরকারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তাদের বন্দুকটিও বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে। সুবলবাবুর বাড়ি থেকে সন্ধ্যের অন্ধকারে নিয়ে ধীরেন মাষ্টারের বাড়িতে হাজির হলাম। ধীরেনবাবু শহরে গেছেন। বাড়িতে ছিলেন তাঁর মা চাঁদবালা রায়। হরচন্দ্র বর্মন তাঁদের বর্গাদার এটা তিনি স্বীকার করেছেন। এবারই হরচন্দ্র প্রথম আইনগতভাবে বর্গা অধিকার পেয়েছেন। পেয়ে এক বিঘাতে আউশ, এক বিঘাতে পাট আর দুই বিঘাতে কাউন আবাদ করেছিলেন। গত বছর এই জমির মালিক বিষাদু (ধীরেন মাষ্টারের বাবা) রায় নিজেই আবাদ করেছিলেন। তার আগে এ জমি আবাদ করতেন সরত বর্মন। পাশের আট বিঘা জমিতে হরচন্দ্রের কাকা (রামমোহন) আধিতে চাষ করেছেন। চাঁদবালা রায়ের সংগে কথা বলে জানা গেল তাঁদের যে পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে তাতে চারজন রেকরডেড বর্গাদার আছেন। তারা শ্রীধর বর্মন, সামারু বর্মন, গিরিধর বর্মন এবং হরচন্দ্র বর্মন। ধীরেন মাষ্টারের বাড়িতে ১৬ জুন যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে তার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা দেখলাম। ধীরেনবাবু কংগ্রেস (ই) সমর্থক। তাঁর বর্গাদার হরচন্দ্র সি পি এম সমর্থক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে জেলার অন্যান্য জায়গার মত চাঁদামারীর রাজনৈতিক চিত্রটাও বেশ কিছুটা বদলে যায়। গতবার এখানকার গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ২টি আসন, অপর দিকে সি পি এম ৬টি এবং ফরওয়ারড ব্লক পেয়েছিল ৭টি আসন। কিন্তু এবার কংগ্রেস পেয়েছে ১০টি আসন সি পি এম ৪টি এবং নির্দল ১ টি। অর্থাৎ চাঁদামারী গ্রামপঞ্চায়েতে কংগ্রেসের শক্তি বেড়েছে।

রাতের বেলায় অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও নিহত জীবন রায় বা গোকুল বর্মনের বাড়ির হদিশ পেলাম না। চাঁদামারী বন্দরের পাশে হেলথ সেনটারে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। গোটা এলাকা তখনো থমথমে। বাজারের ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা খুবই কম। বাজারের উপরে একটি মাত্র চায়ের দোকানে টিম টিম করে কেরোসিন তেলের কুপি জ্বলছে। সেখানে বসে চা খেতে খেতে যাঁদের সংগে কথা হল চুক্তিমত তাঁদের নাম প্রকাশ করা গেল না। গলার স্বর এক পর্দা নামিয়ে সবাই সেদিনকার রোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দিলেন। রাত ৮টা নাগাদ আমরা শহরে ফিরে এলাম। এরপর ৩০ জুন মাথাভাংগা মহকুমার শীতলকুচি থানায় চুরির অভিযোগে দুজন কংগ্রেস (ই) সমর্থককে পিটিয়ে মারা হয়। জেলা কংগ্রেসের অভিযোগ এঁদের সি পি এম সমর্থকরা হত্যা করেছেন।

গত ৮ জুলাই দুটি পৃথক ঘটনায় দু'জন সি পি এম সমর্থক নিহত হন। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাংগা মহকুমার গেন্ড্রুগুড়ি গ্রামে। সেখানে

সি পি এমের আঞ্চলিক নেতা উকিল চন্দ্র দাস রাতের বেলায় যখন খেতে বসেছিলেন তখন পেছন থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। উকিল বাবু বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। আগে তিনি নয়ারহাট পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে উকিল বাবুকে তহবিল তছরুপের দায়ে সি পি এম দল বছর দুই আগে প্রধান পদ থেকে অপসারিত করে। তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা সহ ৬টি মামলা ঝুলছিল। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় শীতলকুচি অঞ্চলের একজন কুখ্যাত ডাকাত উকিলবাবুর বাড়িতে এসেছিল। তাঁর সংগে উকিলবাবুর কথাকাটাকাটি হয়। এ মামলায় তাকে খোঁজা হচ্ছে। জানা গেছে উকিলবাবু সি পি এমেরই জনৈক আঞ্চলিক নেতার হত্যা মামলার আসামী। কংগ্রেস (ই) র সম্পাদক সন্তোষ রায়ের মতে এটা সি পি এম দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের পরিণতি। কংগ্রেস (ই) কোন মতেই এই হত্যাকান্ডের সংগে জড়িত নয়। পুলিশ এই হত্যা মামলায় মাথাভাংগার জনৈক কংগ্রেস (ই) নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। অপর ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপলে। ঐ দিনই গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতকারী সি পি এমের স্থানীয় নেতা গৌতম দের (৫২) বাড়িতে চড়াও হয়। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। গৌতমবাবু ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সি পি এমের অভিযোগ কংগ্রেস (ই) সমর্থকরা গৌতমবাবুকে হত্যা করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন সকালে ধলপল হাটের পাশে কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের ৫টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে বাড়িগুলো সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ৭ জন কংগ্রেস (ই) সমর্থক গুরুতর ভাবে আহত হন। পুলিশ গৌতম দে হত্যা মামলায় আহত ৭ জন কংগ্রেস (ই) সমর্থক সহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে আগুন লাগানর ঘটনায় এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

সি পি আই (এম) এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ঘটনার দিন সকালে গৌতমবাবু তুফানগঞ্জের মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি অফিস থেকে ও সি কে ফোন করে তাঁর জীবনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেছিলেন যে কোন সময় তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে। কিন্তু ও সি তাঁর কথার কোন গুরুত্ব দেননি। এমনকি অন্যান্য দিন ঐ এলাকায় পুলিশী ব্যবস্থা থাকে কিন্তু সে রাতে পুলিশ টহল ছিল না। সময়মত ব্যবস্থা নিলে গৌতমবাবু খুন হতেন না বলে সি পি আই (এম) নেতাদের ধারণা। তাছাড়া ধলপল এলাকায় গত ছয় মাসে অসংখ্য ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের সুরে এই কথাগুলো বলেছেন সি পি এম দলের জেলা কমিটির সদস্য চন্ডী পাল।

ঘটনার নেপথ্যে

ধলপল হাট সংলগ্ন ৫২ বিঘা সরকারি জমির কিছু অংশ দীর্ঘদিন থেকে দখল করে যারা বাস করছিল তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছিল অনেকদিন থেকেই। এ নিয়ে অতীতে অনেকবার হাংগামা হয়েছে। গৌতমবাবু ছিলেন উচ্ছেদকারী দলের নেতা। গত বছর এ বিষয়ে একটি মামলায় গৌতম বাবুর বিরুদ্ধে পুলিশ চারজশীট দাখিল করেছিল। যাঁরা ঐ [illegible] ছেড়ে যাননি তাঁরা সবাই কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক। তাদের [illegible] গৌতমবাবুর সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল না। সি পি এম আঞ্চলিক নেতা এবং জেলা পরিষদ সদস্য চিত্তদের মতে এঁরাই গৌতমবাবুকে হত্যা করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস (ই) রাজ্য সম্পাদক সন্তোষ রায় বলেন, যাঁদেরকে সি পি এম সমর্থকরা বাড়ি থেকে টেনে বের করে মারধোর করলেন, যাঁদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হল পুলিশ তাদেরকেই গ্রেপ্তার করল। পরে যেদিন ধলপলে যাই সেদিন গৌতম দের স্মরণসভা। হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে এসে ধলপল হাটে জমায়েত হলেন। যে হাটের জমির জন্য সমস্ত জীবন লড়াই করেছেন গৌতম দে সেখানেই তাকে দাহ করা হয়েছে। হাটের পাশে নির্মিত হয়েছে শহীদ বেদী, সেখানে উড়ছে লাল পতাকা। তার তলায় দাঁড়িয়ে সি পি এম সমর্থকরা শপথ নিলেন 'রক্তের বদলে রক্ত চাই, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ'। ধলপলের সমস্ত আকাশ বাতাস তপ্ত করে বক্তব্য রাখলেন চন্ডী পাল, সংসদ সদস্য দেবেন বর্মন আরো অনেকে। গৌতম বাবুর সদ্য বিধবা স্ত্রী বকুল রাণী দে এক বছরের বাচ্চা কোলে নিয়ে সভামঞ্চে বসেছিলেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, হত্যাকারীরা সবাই তাঁর পরিচিত। অনেক অনুনয় বিনয় করেও তিনি তার স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি।

কংগ্রেস সমর্থক কর্মী কাউকে ধলপলে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবাই ঘর ছাড়া।

আবার জোড়া খুন

মাথাভাংগা মহকুমার শীতলকুচি থানার বড় খাপের চেতুয়া গ্রামে গত ১৩ জুলাই দুজন মানুষকে পিটিয়ে মারা হয়। এঁরা বাবা ও ছেলে। বাবা সুরেন্দ্র বর্মণ এবং ছেলে দ্বিজেন্দ্র বর্মণ। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এঁরা নাকি ডাকাতির সংগে যুক্ত ছিলেন। গ্রামরক্ষী বাহিনীর হাতে এরা ধরা পড়ে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে জেলা কংগ্রেস (ই) কমিটির সদস্য সন্তোষ মুখারজি ঐ দু'জনকে তাঁদের দলের সদস্য বলে দাবি করেছেন এবং তাঁর অভিযোগ এঁদের সি পি এম সমর্থকরা হত্যা করেছে।

কোচবিহার জেলার গ্রামেগঞ্জে ইদানিং ডাকাত বা সমাজবিরোধী বলে পিটিয়ে মেরে ফেলা বা অন্ধ করে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই ডাকাত বা সমাজ বিরোধী আখ্যা দেওয়ার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন কিন্তু অত্যন্ত তৎপর। গত বছর জুন মাসে কোচবিহার জেলার জোড়াইতে যে ১১ জন মানুষকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হল রাজ্যের আই জি থেকে স্থানীয় মন্ত্রী সবাই তাদের এক বাক্যে সমাজ বিরোধী বা কুখ্যাত ডাকাত বলে আখ্যা দিয়েছেন। ডি আই জি (সি আই ডি) বীরেন সাহা এই ঘটনার তদন্তে কোচবিহারে এসেছিলেন।

নিহত ১১ জনের মধ্যে ৮ জনের পরিচয় এ পর্যন্ত জানা গেছে। পুলিশের মতে এদের ৫ জন বেল ডাকাত এবং ৩ জন ঐ অঞ্চলের দাগী অপরাধী। কিন্তু বাকি তিনজন তাঁদের আজ পর্যন্ত সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাহলে মন্ত্রী পুলিশ সবাই কেমন করে আগাম বলে দিলেন ওঁরা সবাই কুখ্যাত ডাকাত। এ প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। এদিকে কংগ্রেস (ই) র তরফ থেকে ঐ ১১ জনের মধ্যে অন্তত ৩ জনকে তাদের দলের সক্রিয় সদস্য বলে দাবি করা হয়েছে।

তুফানগঞ্জে আবার সি পি এম যুব নেতা খুন

তুফানগঞ্জের বরোকোদালী গ্রামে গত ১৮ জুলাই মাঝরাতে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সুবোধ দাসকে (৩৩) একদল দুষ্কৃতকারী তার শোবার ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঘটনার পরের দিন সদর হাসপাতালে সুবোধবাবু মারা যান। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২০ জুলাই তুফানগঞ্জে ১২ ঘন্টার বনধ পালিত হয়।

ঘটনার সরজমিন তদন্তে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে যে ঐ রাতে ৮/১০ জন

দুর্বৃত্ত প্রথমে মিহির দাসের শোবার ঘরের দরজা ভাঙতে চেষ্টা করে। না পেরে ঘরের বেড়া খুলে তাঁকে ছোরা বল্লম প্রভৃতি ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আহত করে। বাড়ির লোকের আর্ত চিৎকারে অন্যান্য প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যেতে থাকে। ঐ সময় পশ্চিমবংগ এবং আসামের পুলিশ বাহিনী অন্য একটি মামলার আসামী ধরার জন্য বারোকোদালী চৌপথীতে অপেক্ষা করছিল। পুলিশের সামনে দিয়েই অপরাধীরা পালিয়ে যায়। ঐ সময় পুলিশ নাকি ৩ রাউনড ফাকা আওয়াজ করে। ১৯ তারিখে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন অফিসাররা বারোকোদালীতে পৌঁছে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁদের স্থানীয় জনসাধারণ প্রায় ৫ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন এবং ঐ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবি জানাতে থাকেন। এরপর পুলিশ প্রশাসন বাধ্য হয়ে এস আই সুবল কর্মকারকে সাসপেনড এবং তুফানগঞ্জ থানার ও সি নিমাই কুণ্ড ও এস আই গণেশ সাহাকে বদলির আদেশ দেন।

সুবল দাস বারোকোদালী অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা। বারোকোদালী অঞ্চলের মানুষ ডাকাতের হামলায় বিধ্বস্ত। প্রায় প্রতিরাতেই এখানে চুরি ডাকাতি লেগে আছে। ডাকাতরা অপরাধ করে সহজেই পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যে গা ঢাকা দেয়। পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কী? সুবলবাবু কয়েকজন কুখ্যাত ডাকাতকে ধরেছিলেন। এতে স্থানীয় সি পি এম কর্মীরা তাঁকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিলেন। সুবলবাবু এবং ঐ অঞ্চলের সমাজবিরোধীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ান। সি পি এম থেকে অবশ্য একাজ কংগ্রেস (ই) করেছে বলে বলা হয়েছে।

সন্তোষ রায়ের উপর হামলা

গত ১৭ আগস্ট রাজ্য কংগ্রেস (ই) র অন্যতম সম্পাদক সন্তোষ রায় দুপুরের দিকে কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে ধলপলে যান। সেখানে সি পি এম নেতা গৌতম দেব ইতার পরদিন যে সমস্ত কংগ্রেস (ই) সমর্থকের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখা করেন। সেখান থেকে ৭ জন সংগী নিয়ে তিনি জীপে চড়ে একজন কংগ্রেস (ই) সমর্থকের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁরা যখন আলাপ আলোচনা করছিলেন তখন সি পি এম সমর্থক বলে কথিত একদল লোক লাঠি সোটা তীর ধনুক বল্লম নিয়ে ঐ বাড়িটি ঘেরাও করে। কংগ্রেস (ই)-র অভিযোগে জানা গেছে প্রথমে তারা তিনজন কংগ্রেস কর্মীর উপর চড়াও হয়। কংগ্রেস কর্মীরা মারধোর খেয়ে পালিয়ে যায়। এরপর তারা সন্তোষ বাবু এবং তাঁর সহকারী স্থানীয় যুব নেতা মিহির গোস্বামীকে আক্রমণ করে। লাঠি সোটা লোহার রড দিয়ে মারধোর চলে। অপর দুই সংগী দুলাল দে এবং কার্তিক প্রামাণিককে একটু দূরে আর এক দল লোক মারতে থাকে। সন্তোষবাবু যখন মাটিতে পড়ে আছেন তখন আক্রমণকারীদের একজন একটি রামদা তুলে তাকে শেষ করে দিতে গেলে তার সাথী হাত থেকে রামদাটি কেড়ে নিয়ে বলে, 'জানে মারিস না তাহলে আগুন জ্বলে যাবে।

এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা সেখানেই পড়ে থাকেন। পরে খবর যায় তুফানগঞ্জ হাসপাতালে। সেখান থেকে বলা হয় তেল নেই অ্যামবুলেনস যাবে না। পরে পুলিশ গিয়ে আহতদের কোচবিহার হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত সন্তোষবাবুর সংগে কথা বলে জানা গেছে আক্রমণকারীরা, তাঁর মতে ঐ অঞ্চলের পরিচিত সি পি এম কর্মী। কংগ্রেস (ই) র পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মোট ২১ জনের নামে অভিযোগ করা হয়েছে। সন্তোষ বাবুর উপর হামলার ঘটনায় তুমুল হৈ চৈ হয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর করেন। রাজ্য কংগ্রেস (ই) দলের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দাস নাগ কোচবিহারে আসেন। সন্তোষবাবুর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে গত ১৯ আগস্ট কোচবিহারে বনধ পালিত হয়। বনধ ছিল সর্বাত্মক। হাট বাজার, অফিস কাছারী স্কুল কলেজ সমস্ত কিছু বন্ধ। কোন যানবাহন চলেনি। পুলিশ কিন্তু এ ব্যাপারে তৎপরতার সংগে ১৭জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সি পি এম জেলা কমিটির সম্পাদক বীরেন দে সরকারের মতে এ ব্যাপারে তাঁদের দলের কেউ জড়িত নেই। এটা কংগ্রেস (ই) দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি।

দলমতনির্বিশেষে সবাই এই নৃশংস আক্রমণের নিন্দা করেছেন। সন্তোষবাবুর আক্রমণকারী যেই হোক সামগ্রিকভাবে এ সমস্ত ঘটনা কিন্তু সুস্থ প্রশাসন বা আইন শৃংখলার অবনতির দিকটাই সূচিত করে বলে এখানকার সাধারণ মানুষের ধারণা। আর এটা চলতে থাকলে সেই বহুঘোষিত গৃহযুদ্ধ অনিবার্য।

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

লস এনজেলস অলিমপিকস-এর সাফল্য সম্বন্ধে অনেকেরই সংশয়

আমেরিকা সফররত সুদীপ মজুমদার

বাইরে থেকে লা কন্তে বুলেভায়ডের ওপর চারতলা ধূসর রঙের স্টিল আর কাঁচের বাড়িটা দেখলে মনে হবে না যে এর ভেতরে প্রতিটি কামরায় দারুণ উত্তেজনা, কর্মব্যস্ততা আর কাজের তাড়া। ক্যালিফোরনিয়া ইউনিভারসিটির সীমানার গা ঘেঁষে বাড়িটা। ওটাতেই লস এনজেলস অলিমপিক অরগানাইজিং কমিটির হেড কোয়াটারস, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ২৩ তম অলিমপিয়াডে অনেক। ওই বাড়িতে ঢুকতে গেলে যে বাধা প্রথমে পড়ে তা হল সিকিউরিটি চেক। অলিমপিকস শুরু হবে ২৮ জুলাই ১৯৮৪, চলবে ১২ আগসট পর্যন্ত। কিন্তু এখন থেকেই সিকিউরিটির কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে এত কড়াকড়ি দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম। পরে বুঝতে পারলাম কেন লস এনজেলস অলিমপিকস এক দারুণ উত্তেজনাময় আবহাওয়ায় আয়োজিত হতে চলেছে এবং কেনই বা এত নিরাপত্তার কড়াকড়ি।

সংগে ভারতীয় প্রেস কারড থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি কাগজে সই করতে হল এবং নিজের নাম পরিচয়পত্রসহ কোটের বাইরে ঝুলিয়ে রাখতে হল। যে কয়েক ঘণ্টা LAOOC এর সদর দপ্তরে কাটালাম এবং তারপরে বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও খেলাধুলার আসর দেখলাম তার থেকে একটা কথাই বার বার প্রমাণিত হল আমেরিকা ১৯৮৪ এর অলিমপিকসে ১৯৮০ এর মসকো অলিমপিকসের সংগে তুলনা করে সবরকমের প্রয়াস চালাচ্ছে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে টেক্কা দেওয়া যায়। খেলাধুলার আয়োজনেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা আরও পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই রেষারেষির সংগে যুক্ত LAOOC-এর দারুণ এক চিন্তা কী করে লস এনজেলসকে সন্ত্রাসবাদীদের অথবা আততায়ীর অজানা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে অলিমপিকস-এর সময় সুরক্ষিত রাখা যায়। এই বিষয়গুলো আলোচনা করার আগে অলিমপিকস এর প্রস্তুতি পর্বটা দেখা যাক।

আজ থেকে দুশ বছর আগে ১১ টি মেকসিকান পরিবার, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে লস এনজেলস নামক গ্রামের পত্তন করে। তখন জনসংখ্যা ছিল মোট ৪৪। আজ লস এনজেলস পশ্চিম উপকূলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। নারকেল গাছ, তিনদিকে পাহাড়, বিশাল স্কাইস্ক্রাপার এসব নিয়ে লস এনজেলস সুন্দর সাজান শহর। প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষের বাস। এদের মধ্যে অনেক মেকসিকান, জাপানিজ, কোরিয়ান, ফিলিপিনো পাওয়া যাবে। এটা এমন একটা শহর যেখানে ইংরেজি না বলে স্পানিশ বললে সহজেই বেশির ভাগ মানুষ বুঝতে পারে।

১৯৮৪ সালে দ্বিতীয়বার অলিমপিকস হবে লস এনজেলসে। বাহান্ন বছর আগে ১৯৩২ সালে এই শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবম অলিমপিয়াড। সে বছর ১৭ রকমের স্পোরটসে ৩৭টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল ১৪০৮ জন অ্যাথলিট নিয়ে। আগামী বছর ২১ রকমের স্পোরটস অনুষ্ঠিত হবে। ১০০টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করবে প্রায় ১০,০০০ অ্যাথলিট নিয়ে। আধুনিক অলিমপিকস বোধহয় সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান, যাতে সারা পৃথিবীর মানুষের দারুণ ইনটারেসট। প্রাচীন অলিমপিকস এর গোড়া পত্তন হয় গ্রীস দেশের অলিমপিয়ায় খৃস্টপূর্ব ৭৭৬ সালে। এবং ৩৯৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চলে। রোমের সম্রাট থিয়ো ডোসিয়াস ৩৯৪ সালে অলিমপিকস বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেন। পরে ১৮৯৬ সালে আবার আধুনিক অলিমপিকস শুরু হয় গ্রীসের এথেনসে। সে বছর ১০টি স্পোরটস এ ১৩টি দেশ ২৮৫ জন অ্যাথলিট নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। তারপর থেকে প্রতি চার বছর অন্তর গ্রীষ্মকালীন অলিমপিকস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম শুধু ১৯১৬ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ), ১৯৪০ ও ১৯৪৪ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)।

আধুনিক অলিমপিকস এর প্রথম চ্যামপিয়ান হন আমেরিকার ট্রিপল জাম্পার জেমস কনোলি। ৬ এপ্রিল ১৮৯৬ সালের প্রথম দিন, কনোলি ৪৪ ফুট ও ১১ ৩/৪ ইঞ্চি লাফ দিয়ে স্বর্ণ পদক পান। প্রথম মহিলা চ্যামপিয়ান গ্রেট ব্রিটেনের শার্লট কুপার। ইনি ফ্রানসের হেলেন প্রেভোস্টকে লন টেনিসে হারিয়ে বিজয়ী হন ১৯০০ সালের প্যারিস অলিমপিকস-এ।

অলিমপিকস পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক অলিমপিক কমিটি (IOC)। আই ও সির সদর দপ্তর সুইজারল্যানডে। বর্তমানে এর সভাপতি স্পেনের হুয়ান সামারাঞ্চ। অলিমপিকসের নিজস্ব পতাকা আছে যাতে সাদার ওপর নীল, হলুদ, কালো, সবুজ ও লাল রঙের পাঁচটি বৃত্ত একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এর অর্থ পাঁচ মহাদেশের সমন্বয় খেলার মাধ্যমে। এই পাঁচটি রং এই জন্য বাছা হয়েছে যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের পতাকায় একটি না একটি রং পাওয়া যাবে। অলিমপিকসের লক্ষ্য 'Citius, Altius, Fortius' এর অর্থ হল আরও দ্রুত, আরও উঁচু, আরও শক্ত। প্রতিটি দেশের জাতীয় অলিমপিক কমিটি আছে। আই ও সি এর জাতীয় কমিটির মাধ্যমে অলিমপিকস পরিচালনা করে। আই ও সি এর তৃতীয় উপ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ৫ বছর ভারতের অশ্বিনীকুমার।

কথা হচ্ছিল LAOOC এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচারড পেরেলম্যানের সঙ্গে। রিচারডের মাথায় দারুণ উত্তেজনা কেননা সমস্ত ব্যাপারে কাজ এখনও বাকি আর হাতে সময় কম। কিন্তু তিনি তাঁর উত্তেজনা বাইরে প্রকাশ করেন না এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন। বলছিলেন ১৯৭৬ সালে যখন লস এনজেলসকে বাছা হয়েছিল ১৯৮৪ র অলিমপিকসের জন্য তখন ক্যালিফোরনিয়া [illegible] অনেক [illegible] জানিয়েছিলেন। কেননা অলিমপিকস মানেই কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। ক্যালিফোরনিয়ার মানুষের বিশাল করের বোঝা বইতে রাজি ছিলেন না। তারা জানতেন যে ১৯৭৬ সালে মনট্রিল অলিমপিকস-এর ধারের বোঝা বইতে হবে ক্যানাডিয়ানদের ২০৩০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এই প্রদেশেরই কয়েকজন খেলাধুলায় উৎসাহী ধনী ব্যক্তি লস এনজেলসে ১৯৮৪ সালের অলিমপিকস-এর জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। সাধারণত অলিমপিকসের যাবতীয় খরচা যে দেশে খেলাধুলা

অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেদেশের সরকারই বহন করেন। কিন্তু লস এনজেলস-এর বেলায় পুঁজিবাদী মডেলে এক করপোরেশন গঠন করা হয়েছে যার নাম LAOOC। এবং এই করপোরেশন সরকারি পয়সা অর্থাৎ করদাতাদের ওপর চাপ না দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মারফৎ অলিমপিকস আয়োজন করবেন। এবং কোন রকম নতুন স্টেডিয়াম তৈরি না করে অতি কম খরচে কাজ চালান হবে। তবুও প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা খরচ হবে ১৯৮৪ অলিমপিকসে। তিনটি উপায়ে এই টাকাটা তোলা হবে। প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ২৫০ কোটি টাকা আসবে টেলিভিশন কোমপানি থেকে। আমেরিকান ব্রডকাসটিং কোমপানি (ABC) ২২৫ কোটি টাকা দিয়ে এর মধ্যেই খেলাধুলাকে সারা আমেরিকায় টি ভি ও রেডিও প্রচারের স্বত্ব কিনে নিয়েছে। দ্বিতীয় উপায় হল অফিসিয়াল স্পনসরশিপ। প্রায় তিরিশটি আমেরিকান কোমপানি নিজস্ব মালের উপর অলিমপিকস-এর ছাপ দিয়ে বিক্রি করার পরিবর্তে LAOOC কে টাকা, মালপত্র দিয়ে সাহায্য করবে। এ ছাড়া আছে টিকিট বিক্রির টাকা। প্রায় আশি লাখ টিকিট বিক্রি করে ৯০ কোটি টাকা পাওয়ার আশা করে কমিটি।

লস এনজেলস অলিমপিকস-এর কথা বলতে বলতে রিচারড পেরেলম্যান গর্বের সংগে উল্লেখ করেন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের। এই শহরে যখন ১৯৩২ সালে নবম অলিমপিকস হয় তখন প্রতিযোগীদের থাকার জন্য 'ভিলেজ' তৈরি করা হয়। সেবারই প্রথম 'ভিলেজ'-এর ব্যবহার হয়। আর এবার 'ভিলেজ' থাকবে না। বিদেশ ও স্বদেশের প্রতিযোগীরা থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে। গরমের ছুটি তখন। রিচারড বললেন যে এই ছাত্রাবাসগুলিতে আধুনিকতম ব্যবস্থা থাকবে। প্রায় দশ হাজার প্রতিযোগী ও চার হাজার অফিসিয়ালদের থাকার ব্যবস্থা হবে পুরো শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে।

শুধু তাই নয় ২১টি স্পোরটস আয়োজিত হবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্টেডিয়াম, ভেলোড্রোম অথবা নিজের স্টেডিয়ামে। দুটো স্পোরটস-এর জায়গার দূরত্ব ১৪০ মাইল পর্যন্ত হবে। এর ফলে কোনও রকম অসুবিধা যে হবে সে কথা রিচারড মনে করেন না।

কিন্তু আসল সমস্যা হল সিকিউরিটির। আমেরিকার বিদেশনীতি এতই কনট্রোভারসিয়াল যে সারা পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যারা আমেরিকান নীতির শিকার। তা ছাড়া বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলও সাধারণত এই ধরনের বিশাল আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিমপিকসে ইজরায়েলি প্রতিযোগীদের হত্যা করার পর থেকে প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদ সবচাইতে বড় বিপদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আজকাল সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ, বিপ্লব ও বিদ্রোহের আবহাওয়া। তা ছাড়া আমেরিকাতেই এমন অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে যারা এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির শিকার। ক্ষোভের শেষ নেই। দ্বিতীয়ত অলিমপিকসে যেসব দেশ যোগদান করতে আসবে তাদের কারও কারও মধ্যে হয় যুদ্ধ চলছে অথবা রেষারেষি বজায় রয়েছে। যেমন ইরান আর ইরাক। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যেও সম্বন্ধ মধুর নয়। লিবিয়া ও ছাদের (Chad) মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এসব দিক ভেবে LAOOC-এর সবচাইতে বড় মাথাব্যথা হল নিরাপত্তা।

এর ওপর প্রথমবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনালড রেগন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এদেশে রেগনের শত্রুর অভাব নেই। সিকিউরিটির ব্যবস্থা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির প্রধান এডওয়ারড বেসট। ইনি এককালে একজন তুখোর FBI এজেন্ট ছিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন সিকিউরিটি এজেনসিগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন (FBI) চায় তার হাতে সবচাইতে বেশি ক্ষমতা থাকুক। কিন্তু লস এনজেলসের পুলিশ ডিপারটমেনট মনে করে পুলিশের হাতে বেশি ক্ষমতা থাকা দরকার। কেননা পুলিশ এই শহরকে অন্যান্য সবার থেকে বেশি জানে। তা ছাড়া অন্তত ৬০টি বিভিন্ন এজেনসি ব্যস্ত থাকবে সিকিউরিটির কাজে। এদের সবার মধ্যে কো-অরডিনেশন করা সোজা কথা নয়। দলগত রেষারেষির ফাঁক দিয়ে একটা বিপদ অনায়াসে গলে যেতে পারে। তাই কোন রকম গাফিলতি যাতে না হতে পারে তার জন্য এখন থেকেই কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেছে। LAOOC-এর সদর দপ্তরে ঢুকতে যাওয়ার সময় যে ধরনের সিকিউরিটি চেক হল তার থেকেও অনেক বেশি চেক করা হবে খেলার সময়। রিচারড বললেন এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

কিন্তু এখন থেকেই রাজনৈতিক রেষারেষি ঢুকে গেছে অলিমপিকসে। LAOOC-এর সভাপতি পিটার উয়েবেরোসের কথাবার্তা থেকেই তা বোঝা যায়। ১৯৮০-এর মসকো অলিমপিকস-এর সংগে তুলনা করে পিটার বলেন যে, 'আমরা মসকোর ৫ শতাংশও খরচ করব না। এবং এক দারুণ সাকসেসফুল অলিমপিকস-এর আয়োজন করব।' ১৯৮০-র মসকো অলিমপিকসে আমেরিকা যোগদান করেনি। উদ্দেশ্য আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের উপস্থিতির প্রতিবাদ করা। আমেরিকান প্রতিযোগী ছাড়াই মসকো অলিমপিক অনুষ্ঠিত হয়। এবার অন্যান্য দেশের পালা। আমেরিকার এল সালভাদোর নীতির প্রতিবাদ অনেক দেশই করেছে। কিন্তু রিচারড অথবা পিটার কেউ মনে করেন না যে, এবার কোন প্রতিযোগী দেশ অলিমপিকস বয়কট করবে। তবুও আশংকার শেষ নেই। সোভিয়েত প্রতিযোগীরা লস এনজেলস-এর আবহাওয়ার সমালোচনা করেছেন। এই শহরের আকাশে পলিউশান। এটাও একটা প্রতিবাদের বিষয় হতে পারে। অলিমপিকস-এর যে আসল উদ্দেশ্য ছিল তা আজ প্রায় বিরল। সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানব প্রীতি বাড়ান আজ প্রায় অনুপস্থিত। খেলাধুলায় ড্রাগ-এর আবির্ভাব। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায় আমেরিকান প্রতিযোগীদের স্টেরোয়েড ও ড্রাগস ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ওষুধ দিয়ে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করে মেডেল পাওয়া অলিমপিকসের উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকান আয়োজকদের মাথায় এটাও একটা চিন্তা।

এত সব সত্ত্বেও লস এনজেলস অলিমপিকস-এর জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় ১৯৮৮-এর অলিমপিকসের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে কাজ শুরু হয়ে গেছে বহুদিন। এবং ১৯৯২-এর অলিমপিকসের জন্য বেশ কয়েকটি শহর রাজি হয়েছে। এদের মধ্যে নতুন দিল্লিও আছে। কিন্তু কোন শহরে ১৯৯২ অলিমপিকস হবে তা নির্ধারিত হবে IOC-এর পরবর্তী মিটিং-এ। এখন শুধু সবার নজর লস এনজেলস-এর দিকে। সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা টেলিভিশন আর রেডিওর মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের সংগে যুক্ত হবে। আজকের এই হিংসা আর যুদ্ধের আবহাওয়ায় অলিমপিকসের আসল উদ্দেশ্য সফল করা খুবই দরকার।' লস এনজেলস কি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে — এ বিষয়ে এখন থেকেই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। □

অ্যাকটরস ইউনিয়নের 'কুকুর'

গ্রাম্য পটভূমিকায় নাটক হলেই চরিত্রগুলির উচ্চারণে বিশেষ মাত্রা বা টানের প্রয়োগরীতির প্রয়োজন আছে কি - নাকি এতে গ্রাম্য চরিত্রগুলি বিশেষভাবে ফুটে ওঠে ?

'কুকুর'-এর মূল কাহিনী (মলয় সেনগুপ্ত) খরা কবলিত একটি গ্রাম। একদিকে বন্যা, খরা, প্রকৃতির রোষ আর অন্যদিকে দুর্নীতি পরায়ণ পঞ্চায়েত প্রধান তথা মনুষ্যসৃষ্ট অভাব। মাঝখানে সাধারণ গ্রামবাসী পিষ্ট হয় 'প্যাটে'র জ্বালায়।এর মধ্যে বাঁচার জন্য 'প্যাট মেইরো থাকা মানষি' নিজের সন্তানকে কুকুরের মত কামড়ে, কেউ বা নিকট আত্মীয়ের লাশ পাচার করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

ইদানীং গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটাই পরিবর্তিত। সেখানে ক্ষুধার তাড়নায় গ্রামবাসী 'শোল মাছে'র মত নিজের সন্তানকে গিলে খায় কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই থেকে যায়। তবু নাটকে সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ হয়ত তার পোশাক ও মঞ্চসজ্জার (বিজন রায়) জন্যই। কুকুর চরিত্রটি সব সময় অনুপস্থিত থেকেও দর্শকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাট্যকার তথা পরিচালকের কৃতিত্বের জোরেই।

মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রগুলির অভিনয় কিন্তু সবসময় চরিত্রানুগ হয়নি। এরই মধ্যে কিছুটা উল্লেখ যোগ্য সাবিত্রী (শ্রাবণী দাশগুপ্ত), যুধিষ্ঠির (অবনীশংকর দাস), সিতু খুড়োর (মলয় সেনগুপ্ত) অভিনয়।

অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, অশ্লীল কথাবার্তার আধিক্য, কোন চরিত্রের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখা অথবা সাবিত্রীর প্রসব বেদনার ঘটনা যেটি নেপথ্যে প্রচারিত তা অকারণে দীর্ঘায়িত করার ফলে শুধু শ্রান্তি-করই হয়নি, কাহিনীকেও শ্লথ করেছে।

নাটকটির শেষ দৃশ্যে যেখানে নবজাতকের কান্না হঠাৎই আছড়ে পড়ে সেই দৃশ্যটির প্রয়োগগুণ দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয়। যুধিষ্ঠিরের মত দর্শকরাও তখন ভাবতে শুরু করে উত্তরসূরীদের জন্য শুধুই কি রেখে যাব হাহাকার - ঐ সময়ের আলোর ব্যবহারও চমৎকার। □

[illegible]

১৫ সেপটেম্বর 'গীতবাণী' শিশির মঞ্চে একটি সুন্দর পরিকল্পনাপ্রসূত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান উপহার দিলেন। মঞ্চ পরিকল্পনা, শিল্পী নির্বাচন, সর্বশেষে শিল্পীদের গাওয়ার গুণে ঐ দিনের অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে উঠেছিল।

প্রথম পর্বটি ছিল নবীনদের জন্য। শিল্পীরা হলেন সুলক্ষণা মিত্র, বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়, রাধা সেনগুপ্ত, মনোজিৎ সাহা, সুচিত্রা বিশ্বাস এবং শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠ, সুর ও পরিবেশনের গুণে প্রত্যেক শিল্পীই তাঁদের সম্ভাবনার প্রমাণ রেখেছেন। বিশেষ করে সুচিত্রা বিশ্বাসের গাওয়া 'কী ধ্বনি বাজে,' শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়ের 'কে বলেছে তোমায়' এবং 'এ মোহ আবরণ' গানগুলি পরিবেশনের গুণে পূর্ণভাব ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এঁরা যে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবেন তার প্রমাণ তাঁরা রাখলেন।

দ্বিতীয় পর্বের তিন শিল্পী প্রবীণা কমলা বসু, মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায় এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেকেই চারটি করে গান শোনালেন। এই তিন শিল্পী প্রমাণ রাখলেন যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানে সম্পূর্ণভাবেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

ঐদিন অনুষ্ঠানটি সার্থক হওয়ার মূলে যন্ত্র সংগীতের অবদানও কম নয়। প্রত্যেক শিল্পীই পূর্ণ মেজাজে বাজিয়ে গেছেন।

সৈকত হাজরা

না, কোন আলো আমরা জ্বালাতে পারিনি। তাই, এত বছর পরও, 'ইনস্যাট' আকাশে ওড়ার সংগে সংগে একই সময়ের বৃত্তে আমাদের দেশে বর্ণহিন্দুদের ঘৃণার আগুনে জ্বলে পুড়ে মারা যায় ... পুরুষ, রমণী। দিনে দিনে 'চণ্ড... বেশি অর্থবহ, বেশি প্রয়ো... ওঠে আমাদের কাছে।

এই কথাটা সঠিকভাবেই বুঝেছেন 'পিপলস এডুকেশন সোসাইটি'র সদস্যরা। শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাদের নতুন পত্রিকা 'আরট অ্যানড কালচার' প্রকাশ উপলক্ষে তাই তারা গত ৩ জুলাই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য। শ্রী খান চৌধুরী পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ডামাডোলের মধ্যে 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ করার প্রচেষ্টা সার্থক হলেও, এ সম্পর্কে দু একটা কথা বলার থেকেই যায়। প্রথমত, হয়ত খুব তাড়াতাড়ি মঞ্চস্থ করার তাগিদেই নৃত্যনাট্যের পাত্রপাত্রীরা যথেষ্ট অনুশীলন করার সময় পান নি। কারণ, অনেক সময়ই দেখা গেছে, বিশেষ করে সমবেত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঞ্চে আগমনের সময়, পাত্রপাত্রীরা বড় বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। এ ছাড়া মেয়েদের সমবেত নৃত্যদৃশ্যে অনেকের পদক্ষেপেই ঠিকমত সামঞ্জস্য বজায় থাকছিল না। সময় সময় যন্ত্রসংগীত ছাপিয়ে তাদের পদশব্দ কানে বেজেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক হয়েছে সংগীত শিল্পীদের কণ্ঠস্বর। বিশেষ করে 'দইওয়ালা'র গানে অশোক ব্যানারজির কণ্ঠস্বর বড়ই স্তিমিত ছিল। তবে সবথেকে আশা ছিল মা-এর কণ্ঠে শ্রীমতী বাণী ঠাকুর এবং প্রকৃতির কণ্ঠে শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরী সম্পর্কে। কিন্তু তাঁরাও যেন পুরনো দিনগুলোর মত অভিভূত করতে পারলেন না। তবে নৃত্যে কৃষ্ণা নন্দীর নাম অবশ্যই করতে হয়। বিশেষ করে মঞ্চে যখন তিনি একা ছিলেন তখন প্রকৃতির আনন্দ, উচ্ছ্বাস, ব্যথা, বেদনা সবই যেন শুধু মুদ্রার মাধ্যমে ছুঁইয়ে দিয়ে যান আমাদের প্রাণে। তাপস সেনের আলো যথাযথ, তবু আগের মত মন টানে না।

শুধু এটুকুই বোঝা গেল না, নৃত্যনাট্যের আগে শ্রীমতী হৈমন্তী শুক্লার গান কি খুব প্রয়োজনীয় ছিল? না কি সে শুধু টিকিট কেটে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথা ভেবেই? অবশ্য শ্রীমতী শুক্লা যে জনপ্রিয় তা হাততালির বহরেই বোঝা গেল।

তবু ভবিষ্যতে সব ভুলভ্রান্তি শুধরে 'পিপলস এডুকেশন সোসাইটি'র সদস্যরা একদিন আমাদের একটি সম্পূর্ণ, সুন্দর 'চণ্ডালিকা' দেখাবেন এ আশা সহজেই করা যায়।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

[illegible]াস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্ল বর্মনের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' যাত্রা পালায় রূপান্তর করার কঠিন কাজে উদ্যোগী হয়েছেন সুশীল নাট্য কোমপানি। গত ১৯ সেপটেম্বর তাঁদের সেই উদ্যোগের ফসল পরিবেশন করলেন মহাজাতি সদনে, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। মূল উপন্যাসের প্রতি আনুগত্য রেখে শ্যামল সেনগুপ্ত রচনা করেছেন ঠাস বুনটের নাট্যরূপ। আর যাত্রার স্ক্রিপট ও নির্দেশনায় পালাটিকে জমজমাট করার দায়িত্ব ছিল শ্যামল ঘোষের।

তিতাস পারের মালো এবং চাষীদের জীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস দুঃখ-দৈন্য আর শোষণ বঞ্চনার কাহিনী নিয়েই এই নাটক। মালো যুবক কিশোর এই নাটকের মূল চরিত্র। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে চাওয়া কিশোরের সংগ্রামের বেদনা বিধুর পরিণতি নাটকের বিষয়বস্তু। এই গ্রামেরই মেয়ে বাসন্তীকে ঘিরে কিশোরের স্বপ্ন। আবার তার জীবনে এল তিতাস। দ্বন্দ্ব সংঘাতে কিশোর হারিয়ে ফেলে তার মানসিক ভারসাম্য, তিতাসকে হারিয়ে বাসন্তীকে না পেয়ে। এই বিয়োগান্তক পরিণতিতে নাটক শেষ।

মাতৃত্বের রোমাঞ্চ যা একমাত্র আপনিই অনুভব করতে পারেন...

একটি ছোট্ট প্রাণ আপনার ভেতরে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। তারপর একদিন তাকে আপনি নিজের বুকে আঁকড়ে ধরবেন, নিজের দুধ খাইয়ে বড় করাবেন। অলৌকিক কিন্তু সত্যি।

শিশুর জন্য সবার সেরা পুষ্টি

আপনার শিশু যাতে প্রথম দিন থেকেই যথেষ্ট পুষ্টিদায়ক বুকের দুধ পায়, তারজন্য আপনার গর্ভাবস্থার শেষ দিক থেকেই নিজের মধ্যে পুষ্টির ভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আর যখন আপনি বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তখন আপনার শরীরের যে পুষ্টি শিশুর মধ্যে যাচ্ছে, তাকেও পূরণ করতে হবে।

তাই গর্ভাবস্থার শেষ দিকে এবং বুকের দুধ খাওয়াবার সময় আপনার মাদার্স স্পেশাল অবশ্যই প্রয়োজন।

মাদার্স স্পেশাল—ডাক্তারদের সহযোগ

গর্ভবতী আর স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টির জন্য W H O র (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী একটি অনুপম স্বাস্থ্যকর পানীয় —মাদার্স স্পেশাল, যা আপনার শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের দুধ খাওয়াতে আপনাকে সাহায্য করে।

তাই ডাক্তাররা বলেন যে গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস থেকে শুরু করে যতদিন আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন ততদিন রোজ মাদার্স স্পেশাল দুধের সাথে মিশিয়ে খাবেন।

মনে রাখবেন...

ডাক্তাররা বলেন যে অন্তত ছ মাস বয়স পর্যন্ত আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিৎ।

মাতৃত্ব আর শিশু জন্মবিষয়ক প্রয়োজনীয় আরও আবশ্যক খবরের জন্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে "Specially for you and your baby" পুস্তিকাটির জন্য আজই লিখুন।

ঠিকানা : H.M.M. Limited
Department D,
1 Jai Singh Road
New Delhi-110001

ডাক্তারদের মনোনীত মাদার্স স্পেশাল অন্তঃসত্ত্বা এবং সদ্য মায়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির WHO-র মান অনুযায়ী (FAO/WHO-1974—Handbook on Human Nutritional Requirements') প্রস্তুত।

Mother's Special

মাদার্স স্পেশাল

মায়েদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের দুধ দিতে সাহায্য করে।

শুধুমাত্র নির্বাচিত শহরে পাওয়া যায়।

HTD-HMM 78 91R

তিতাস পারের গোকনঘাট গ্রামের মেয়েরা রাস্তা কাটা দেওয়া ঝুলের শাড়ি না পরুক, এমন উঁচু করে কাপড় নিশ্চয়ই পরত না যাতে উঁচু মঞ্চে বসতে তাদের ভব্যতার পরীক্ষা হয়। এই পালায় তিতাস পারের সব মেয়েরাই উঁচু করে কাপড় পরেছেন এবং নায়িকা বাসন্তী সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কেন - গ্রামের মেয়ে বলে বিশ্বাস করান - তা হলে প্লাক করা ভুরু, শ্যামপু করা চকচকে এলো চুল - গ্রামের মেয়েরা বুঝি এমনটি করত। যাক, বেশভূষার কথা ছেড়ে অভিনয়ের কথায় আসি। সবার আগে উল্লেখ করব রামনাথের ভূমিকাভিনেতা শ্যামল ঘোষের কথা। শ্যামল তাঁর স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয়ে পালাটিকে প্রায় একাই ধরে রেখেছেন বলা চলে। তারপর উল্লেখ করব তিতাস-বেশী কঙ্কাবতী দত্তর সংবেদনশীল মরমী অভিনয়ের কথা। তিতাসের মধ্যে বাসন্তীর সফিসটিকেশন ছিল না। বাসন্তী এবং কিশোরের ভূমিকায় যথাক্রমে পুতুল চক্রবর্তী ও সিরাজ মুখারজির নির্বাচন যথাযথ মনে হয়নি। আরও কম বয়সের শিল্পীতেই ঐ দুটি চরিত্র ভাল মানাত। কিশোরের অভিনয় কৃত্রিমতায় ভরা, বাচন এবং অঙ্গ সঞ্চালনে। বিশেষ করে দুটি হাত ব্যবহারে তার সমস্যাটা বড় প্রকট ছিল। পাগল হয়ে যেভাবে হাত দুটির ব্যবহার করেছেন, সুস্থ কিশোরও প্রায় সেভাবেই হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। পুতুল চক্রবর্তীর অভিনয় মোটামুটি। তিতাসের মায়ের ভূমিকায় ভারতী মুখারজি ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু রামনাথের মা সুতপা সেনগুপ্তর ওভার অ্যাকটিং দৃষ্টিকটু। প্রশান্ত বলের 'সুবল' এবং মলয় ভট্টাচার্যের সোনাউল্লা ভালই।

নির্দেশক শ্যামল ঘোষ এই পালায় মেলোড্রামাকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। সেটা না দিলে এই পালা আরও গতিশীল হত, মনোগ্রাহী হত। রামনাথের মৃত্যু দৃশ্যটিকে অকারণ দীর্ঘ করা হয়েছে। তিতাসের ক্ষেত্রেও খানিকটা সেই রকমই। তিতাস পারের সংলাপ অনেকের মুখেই ঠিক মত বসেনি, আবার কেউ কেউ অতি দ্রুত সংলাপ উচ্চারণ করতে গিয়ে দুর্বোধ্য করেছেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সুরের গান এবং আবহ নাটকটিকে বৈচিত্র্যে ভরে দিয়েছে। প্রভাস চন্দ্রের নৃত্য-পরিকল্পনা সুন্দর। তবে গ্রুপ থিয়েটারের নির্দেশক-অভিনেতা শ্যামল ঘোষের কাছে প্রত্যাশা যতখানি ছিল প্রাপ্তির সঙ্গে তার সাযুজ্য কম। **ঊষা ভৌমিক**

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

পরিবর্তনের পাঠক-পাঠিকারা বৃহৎ একটি পরিবারের মত। সেই পরিবারে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ঘটানই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। সে কারণে ক্রমান্বয়ে আমরা ইচ্ছুক পাঠক পাঠিকাদের নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও নেশাসহ পরিচিতি প্রকাশ করব। যাঁরা চান তাঁরা মনোমত মিত্র সেই তালিকা থেকে বেছে নিতে পারেন এবং সরাসরি চিঠি লিখে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারেন। এই সঙ্গে সদস্যের ক্রমিক সংখ্যাও প্রকাশ করা হল। কোন কারণে পরিবর্তন দপ্তরে চিঠি লিখলে সেই ক্রমিক সংখ্যাটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না, সদস্যদের কাছে এ অনুরোধও থাকল।

সলিল বিশ্বাস ☐ সদস্য ক্রম ১
পোঃ ও গ্রাম : শ্রীমপুর, জেলা : নদীয়া, ২৮ বছর, স্নাতক, ব্যবসা, সাহিত্যপাঠ।

সমরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ☐ সদস্য ক্রম ২
১০ বোসপাড়া বাই লেন, কলকাতা ৭০০০০৮, ৩২ বছর, বিজ্ঞান স্নাতক, চাকরি, ভ্রমণ পড়াশুনা আয়ুর্বেদচর্চা।

অনুপকুমার দত্ত ☐ সদস্য ক্রম ৩
বক এ এফ, ফ্ল্যাট ৪২৫ (ত্রিতল), সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ ২০ বছর, স্নাতক ছাত্র, লেখালেখি গান অভিনয় পড়াশুনা খেলাধুলো প্রকৃত বন্ধুত্বস্থাপন।

অশোককুমার চক্রবর্তী ☐ সদস্য ক্রম ৪
৩৭/১ বি এল সাহা রোড, কলকাতা ৭০০০৫৩, ৩২ বছর, ইনটারমিডিয়েট, চাকরি, গান বাংলা উপন্যাস পড়া সিনেমা দেখা বন্ধুত্বস্থাপন।

বাসুদেব বাগ ☐ সদস্য ক্রম ৫
৯৯ বি বেদিয়াপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০০৭৭, ২৮ বছর, স্নাতক, বেসরকারি ফার্মে চাকরি, ছোটগল্প ও কবিতা লেখা বন্ধুত্বস্থাপন।

প্রহ্লাদ ঘোষ ☐ সদস্য ক্রম ৬
২০/৯ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা ৭০০০২৯, ২৭ বছর, চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র, চিঠি লেখা চলচ্চিত্র খেলাধুলো।

শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আলোকচিত্র : সলিল রায়

সন্দীপ কুমার বসু ☐ সদস্য ক্রম ৭
২৮৮ পূর্ব সিঁথি রোড, ফকির ঘোষ কলোনি, কলকাতা ৭০০০৩০, ২৫ বছর, বিজ্ঞান স্নাতক, ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি খেলাধুলো।

কমলারঞ্জন ভট্টাচার্য ☐ সদস্য ক্রম ৮
৫৫/এ/১ শেঠবাগান রোড, কলকাতা ৭০০০৩০ (ত্রিতল), ৬১ বছর অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক সুপারভাইসর, সাহিত্য ধর্মবিষয়ক পড়াশুনা ভ্রমণ।

কল্লোল চট্টোপাধ্যায় ☐ সদস্য ক্রম ৯
কে/অ ডি চট্টোপাধ্যায়, ২১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১২ (৫ম তল), কলকাতা ৭০০০৭২, ১৯ বছর, ছাত্র, খবরের কাগজ পড়া বাগান করা বন্ধুত্ব স্থাপন।

বিশ্বজিৎ দাস ☐ সদস্য ক্রম ১০
২৩ এ কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা ৭০০০২৯, ২৪ বছর, বি টেক ছাত্র, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা আকাশবাণীর ফিচার লেখা ভ্রমণ।

সামসুল হক ☐ সদস্য ক্রম ১১
পোঃ ও গ্রাম : হরেকৃষ্ণপুর, জেলা : মেদিনীপুর, ২৫ বছর, হাঃ সেঃ অনুত্তীর্ণ, পোসটাল বিভাগে চাকরি, বিভিন্ন ধরনের পত্রিকাপাঠ।

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ সদস্য ক্রম ১২
বৈদ্যপাড়া, বৈদ্যবাটি, জেলা : হুগলী ৭১২২২২, ২৫ বছর, বিজ্ঞান স্নাতক, চাকরি, পড়াশুনা গান ডাকটিকিট সংগ্রহ আবৃত্তি বিতর্ক ভ্রমণ।

ফজল মামুদ ☐ সদস্য ক্রম ১৩
কে/অ জাহান হালদার, ৩ বি বি টি রোড, খালখুরা, মহেশতলা, জেলা : ২৪ পরগণা, ২৭ বছর, বিজ্ঞান স্নাতক (অসম্পূর্ণ), চাকরি, ভ্রমণ পড়াশুনা লেখালেখি। ☐

স্মরণের মণিকোঠা..থাকুক পটে লেখা

আরেকটা তোলো না... উম্‌-ম্‌-ম্‌!

জীবনের নানান স্মরণীয় মুহূর্ত ..যার নেইকো কোনও অন্ত।
আনন্দঘন মুহূর্ত, প্রেম-ভালবাসা, গৌরবক্ষণ, খুশি ও মজা ..সোনাঝরা
ক্ষণগুলি থাকুক ফটোয় বাঁধা। এমন ক্ষণ আসতে পারে যেকোনও
ক্ষণে ..ক্লিক্ করে তুলে ফেলুন ক্যামেরার সনে...হয়তো ঐ মুহূর্ত আর
আসবে না জীবনে। টপাটপ ছবি তুলুন আর অ্যালবামে ভরে রাখুন।
জীবনের সোনাঝরা ক্ষণ...চিরকালই অমূল্য রতন।

ইন্দু
INDU®

ইন্দু রোল ফিল্ম আর ব্রোমাইড

Sista's-HPF. 149 83 BEN A

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল—৬৯

■	১	২	■	৩	৪	■	৫
৬			৭	■	৮		
৯		■	১০	১১		■	
■	■	১২			■	১৩	
■	১৪			■	১৫		■
১৬			■	১৭			১৮
	■	১৯	২০	■	২১		
২২		■	২৩			■	

সূত্র : পাশাপাশি

১। অন্ধকার রজনী/কী হয় সজনী?/দুই বর্ণে কহ শুনি

৩। কটিবন্ধ/নেই সন্দ/রমণীয় ধন্দ

৬। 'নখটা যেন কুলো'/বিয়ে করতে এলো/নাকটা কাটা গেল

৮। মধ্যে 'মা' দুপাশে 'জট'/বলে ফেল চটপট/ নয় মোটে খটমট

৯। রহেণ গেল 'হে'/যুদ্ধকে কহে/বীরের পক্ষে সহে

১০। 'নতি' কয়/দুধারে 'ন' রয়/শেষ 'ন' ছেড়েও হয়

১২। মাংস কাটে/নিঠুর বটে/কাউকে বললে সে চটে

১৩। মনোহর বটে/পত্নীর জোটে/বুদ্ধি রাখ ঘটে

১৪। বেড়া দিতে লাগে/দাম রাখ আগে/মা শেষে জাগে

১৫। সই তাই সই/'হা' করে কই/উল্টে হাস হই

১৬। তেতো পাতা/খেতে যাতা/পরে লতা

১৭। দহরম সহ/পরব কী কহ/আগে পাই মহ

১৯। হাল্কা হয়/গুরু নয়/কমেও রয়

২১। খতম কিংবা শেষ/ভেবে পাবে রেশ/সূত্র নিঃশেষ

২২। ভীত হলে/একে পেলে/খাড়া চুলে

২৩। নয় দেরি/তাড়াতাড়ি/কাজ সারি

সূত্র : ওপর-নিচ

১। দিতে চাও/তো দিয়ে দাও/দেয়াটাকে বুকে নাও

২। কচু খাও/যদি পাও/পরিমাণ? তাও

৪। পাখা ধর/'হাওয়া কর'/শীত লতর

৫। 'কুল - রেশ'/'তীর - শেষ'/পাই বেশ

৬। বীর ইনি/শৌর্য মানি/শ্রেষ্ঠ গণি

৭। ফারসিতে/ভৃত্য এ/সামলায় জিনিসপত্রে

১১। বাঁশের সিঁড়ি/খাড়া করি/চালে চড়ি

১২। হাতের তলে/তালে তালে/আওয়াজ তোলে

১৩। জল আনে/পালকি টানে/তাদের ছন্দ চাই গানে

১৪। দংগল হলে/ফেলে-দাও জলে/'পাপড়ি'টা পেলে

১৫। 'সাথে কাজ' বঁধু/আম্র পুষ্প মধু/বৃক্ষও হবে সাধু

১৬। পূত বস্তু হয়/অশুচি কদাপি নয়/বিশুদ্ধতা মূর্ত বয

১৮। হৃদয় আছে/এব কাছে/মনেব মাঝে

২০। পুলিশ খায়/দুষ্টে চায়/রসাতলে সমাজ যায়

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২৩ নভেমবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠানর শেষ তারিখ ১১-১১ ৮৩।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দ শৃংখল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃংখলের নমবরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃংখল—৬৫ (সমাধান)

মা	য়	জা	দা	■	হু	র্	ল
রা	গ	■	হু	মি	রা	■	ব
স	জ	■	রী	তি	নী	তি	■
ল	■	সা	■	■	■	রে	দ
■	■	র	ক	ম	■	ধা	ই
সা	হ	স	■	সি	মা	ন	■
জা	ল	■	বা	■	গ	■	বা
■	প	দ	ভি	■	ব	জি	নী

শব্দশৃংখল ৬৫ এ জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন ফাতেমা বেগম (মৌখালি, জি আই পি কলোনী, হাওড়া ৭১১৩২১) এবং স্বপনকুমার দাস (অর্জুনপুর, কলকাতা ৭০০০৫৯)।

শব্দশৃংখল ৬৫ এ লটারিতে বিচারক ছিলেন ছবি পৈত

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

অকটোবর ২৬ থেকে নভেমবর ১

মেষ : শরীর মোটামুটি সুস্থ থাকবে; মেয়েদের শরীর নিয়ে ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ; ব্যয়ের চাপ অনেকটা কমবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য মত-বিরোধ; মেয়েদের জটিল পরিস্থিতি আয়ত্তে আসবে। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের মতামত উপেক্ষার নয়। কোন সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠা। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

বৃষ : শরীর সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হবে; মেয়েদের পেট সংক্রান্ত ব্যাপারে বড় রকমের অশান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা বিশেষ বাধার সৃষ্টি করবে; মেয়েদের কোন ব্যাপারে মানসিক চাপ। ভাই-বোনের জন্য ব্যয় ও উদ্বেগ। কর্মপ্রার্থীদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মিথুন : উঁচু জায়গা থেকে পড়ে আঘাত পাবার সম্ভাবনা। মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। অসতর্কতার দরুন বড় রকমের আর্থিক ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখা প্রয়োজন; মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন উদ্দীপনা। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের মতামত গ্রহণ না করাই ভাল। ধর্মকর্মে আকস্মিক বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কর্কট : শরীরের প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখুন; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি; ঋণের বোঝা বাড়বে। কর্মস্থলে অতিরিক্ত দায়িত্ব; মেয়েদের অন্যের পরামর্শ সুখের হবে। পারিবারিক কোন ব্যাপারে আপস কিন্তু মানসিক ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের নতুন প্রচেষ্টায় সাফল্য।

সিংহ : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অবনতি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু প্রচুর অপব্যয়। কর্মক্ষেত্রে আগের কোন ক্ষতির আংশিক পূরণ; মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ মতামত প্রশংসিত হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বিশেষ উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি।

কন্যা : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিকস্বাচ্ছন্দ্য ও সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি ও স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন বদলির ইঙ্গিত। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। কর্মপ্রার্থীদের অস্থায়ী যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

তুলা : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর সংক্রান্ত নানা জটিলতা বিব্রত করবে। আগের কোন আর্থিক সমস্যা বিব্রত করবে। কর্মস্থলে শত্রুদের তৎপরতা ব্যর্থ হবে; মেয়েদের মানসিক চাপ ও ছোটখাট ক্ষতি। দূরের কোন নিকট জনের সান্নিধ্য। ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ।

বৃশ্চিক : শারীরিক ঝামেলা চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল যাবে। আর্থিক অবস্থার সামান্য হেরফের, ঋণ। কর্মক্ষেত্রে সহজ অগ্রগতি। মেয়েদের নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা প্রয়োজন। পারিবারিক কোন ব্যাপারে নিজ আদর্শের পরাজয়; মেয়েদের বিশেষ ইচ্ছে পূরণ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

ধনু : শরীর মোটামুটি চলবে। মেয়েদের শারীরিক অবস্থার ভাল রকম অবনতি। প্রচুর চেষ্টার বিনিময়ে সামান্য আয়বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি; মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট ব্যক্তিগত ক্ষতি। স্ত্রীর পরামর্শে পারিবারিক কোন জটিলাবস্থার অবসান। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ।

মকর : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের আঘাত। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ মন্দা, বিশ্বস্তজন থেকে ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে দূর যাত্রা; মেয়েদের বিশেষ উদ্দীপনা ও অগ্রগতি। ভৃত্যদের থেকে মেয়েদের ক্ষতি। দূরের কোন সংবাদে বিশেষ উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

কুম্ভ : শরীর নিয়ে ঝামেলা চলবে; মেয়েদের আগের অসুস্থতার জের চলবে। আর্থিক টানাটানি; সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়া ঠিক হবে না; মেয়েদের মানসিক অশান্তি। সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মীন : শরীর ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন। কর্মক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে কোন সুযোগ আসতে পারে; মেয়েদের হঠাৎ বদলি। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : [illegible]), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : [illegible] Telex 021-7896 IPPL IN.

পরিবর্তন
১-৮ নভেম্বর ১৯৮৩

জলসা শিল্পে মন্দা কেন ?

পিনাকীর মৃত্যুকে ঘিরে

সম্পাদকীয়

বোমবাইতে সদ্য অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন যে সমস্ত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলার অবস্থা নাকি সবচেয়ে খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলা যে সন্তোষজনক নয় ও বিভিন্ন গ্রামে যে ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও খুনোখুনি অব্যাহত গতিতে ঘটে চলেছে পরিবর্তন তার প্রতি নির্ভীকভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দ্বিধা করেনি। শুধু তাই নয়, গত ১৮ মে পরিবর্তনে প্রকাশিত আইন শৃংখলা সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে একটি চিঠি পর্যন্ত দেন। জ্যোতি বাবু গত ৩ অক্টোবর সেই চিঠির উল্লেখ করে সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। জ্যোতি বাবু ঐ চিঠিতে পরিবর্তনে প্রকাশিত রিপোরটটিকে কখনই অসত্য বলেননি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই আইন-শৃংখলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে, কংগ্রেস (ই)-এর এই যুক্তিও আমাদের মতে সমর্থনযোগ্য নয়। বরং অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখনও মন্দের ভাল। অতি সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়েই আইন শৃংখলার অবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। পাঞ্জাবে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে হত্যালীলা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আসামে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কাছে একরকম অসম্ভব হয়েই উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই)-এর প্রতিনিধিরা হয়ত ভুলে গিয়েছেন আসামে যে একের পর এক জীবনহানির ঘটনা ঘটছে তার দায়ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বা আসামের কংগ্রেস (ই) রাজ্য সবকার এড়াতে পারেন না। কারণ সেটা ঘটেছিল রাষ্ট্রপতির শাসনে। এবং এযুগের অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় নেলীর ঘটনা ঘটে কংগ্রেস (ই) মুখ্যমন্ত্রী শাইকিয়ার আমলেই। গত ৬ অকটোবর পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবার পর থেকেও সেখানে হত্যাকান্ড থামান যায়নি। রাষ্ট্রপতি শাসনের আগেও দরবারা সিংও ছিলেন কংগ্রেস (ই) র মুখ্যমন্ত্রী। কাজেই কংগ্রেস (ই) শাসন বহাল হলেই মন্ত্রবলে সব কিছু থেমে যাবে এবং দেশে অপরিসীম শান্তি বিরাজ করবে এ যুক্তি আমরা মানতে নারাজ।

কিছুদিন আগে একজন পুলিশ অফিসার শ্রী এন এস সাকসেনা বিহারের আইন শৃংখলা সম্পর্কে লিখেছেন এই রাজ্যের রাতে কোথাও যাওয়া এখন বিপজ্জনক। ডাকাতরা বাস, ট্রাক ও গাড়ি লুঠ করছে। পুলিশ পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাচ্ছে অপরাধ কমছে কিন্তু বিরাট সংখ্যক অপরাধ পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হচ্ছে না। উত্তর প্রদেশের আগ্রা, এটোয়া, কানপুর, ঝান্সি, বান্দা, মেনপুরী আমিরপুর, ফারুকাবাদ, জালন্ধর প্রভৃতি জেলায় ডাকাতরা মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে বৃন্দাবনে সমাজবিরোধীদের উৎপাত এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে তাদের ভয়ে মন্দিরে রাতে আরতি দেখতে যাবার লোকসংখ্যাও কমে গিয়েছে। গুজরাটের পোরবন্দর এখন কার্যত অপরাধীদের দখলে। সাংবাদিকেরা মহাত্মাজির এ জন্মস্থানকে এখন অভিহিত করেন সৌরাষ্ট্রের শিকাগো। সমগ্র ভারতবর্ষেই আজ কমবেশি একই রকম অবস্থা। ১৯৬৪তে যেখানে ভারতে খুনের সংখ্যা ছিল ১১৭৪৮, ১৯৭৮ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৩১৪, ডাকাতির সংখ্যা ৫০০৭ থেকে ১৩১৯৫তে গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯৬৪ সালে ৩২৬৯৩টি দাঙ্গার ঘটনা সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নথিভুক্ত হয়। ১৯৭৮ এ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬৩৪৮৮তে। এর মধ্যে সব দল শাসিত রাজ্যের পরিসংখ্যানই রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যেখানে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটছে সেখানকার পুলিশের অপদার্থতা ও শাসকদলের রাজনৈতিক প্রশ্রয়কে আমরা চিরকালই নিন্দা করে আসছি। কিন্তু কোন অভিযোগ তোলার আগে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই) নেতারা যদি একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত হতে না পারেন তাহলে কোন দিনই সমস্যা থেকে মুক্তির আশা নেই। আমাদের বিশ্বাস শাসকদলের সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনৈতিক অভিসন্ধি আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ। রোগ নিরাময়ের আগে রোগের উৎপত্তি ও কারণ যদি না ধরা পড়ে তাহলে সে ব্যাধির আরাম কিছুতেই সম্ভব নয়।

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
(পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২
নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

২৪ নভেম্বর, ১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১৮
দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : জলসা শিল্পের রঙিন ছবি – পাহাড়ী রায়চৌধুরী
দালাই লামার ছবি – তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
পিনাকীর ছবি – এ আর চ্যাটারজি

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

পরিবর্তন

৯ নভেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

এই মাসের শেষের দিকে দিললিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কমনওয়েলথ সম্মেলন। গত বছরের ন্যাম সম্মেলনের পর ভারতবর্ষে এটি একটি দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ঘটনা। এই কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ইংলন্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ভারতে আসছেন। রাণীর এই দ্বিতীয়বার ভারত আগমন। এর আগে তিনি এসেছিলেন ১৯৬১ সালে। ইংলনডের রাণী সর্বদাই সমস্ত মানুষের কাছে বিস্ময়। দুনিয়ায় সর্বত্র রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলেও তাসের রাজা ও ইংলনডের রাজাই অক্ষত রেখে দিতে পারবেন তাঁদের অস্তিত্ব, এই প্রবচনটি যে কতখানি সত্যি সে সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে একটি তথ্যবহুল রচনা

রাণী এলিজাবেথ

সেই সংগে কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেলের সংগে পরিবর্তনের একান্ত সাক্ষাৎকার।

পরিবর্তনের দিললি প্রতিনিধির পাঞ্জাব ঘুরে এসে সরেজমিন প্রতিবেদন। পাঞ্জাবে কী ঘটছে তার সত্যনিষ্ঠ বিবরণ

রাষ্ট্রপতি শাসনে পাঞ্জাব

রাচি মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে একটি অনবদ্য চিত্তাকর্ষক রচনা।

আরও বহু আকর্ষণীয় ফিচার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নোবেল প্রাইজে রাজনীতি। নোবেল প্রাইজ নিয়ে কী ধরনের রাজনীতি হয় তার নেপথ্য কাহিনী।

নিবেদনমিদং

সব সময় আমরা নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করি। আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি, আমরা কোন আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগিনা। বাঙালি হিসাবে আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে আত্মসন্তুষ্টির বীজ। যেখানেই যান সব সময় শুনবেন, আমরা যা করছি সেটাই দারুণ, এর চেয়ে আর ভাল হয়না। অনেকদিন আগে নিউ সেক্রেটারিয়েটে এক অফিসারের ঘরে একটি লেখা দেখেছিলাম এখনও মনের মধ্যে গেঁথে আছে Even the best can be improved - যা শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত তারও উৎকর্ষ ঘটান যায়।

পরিবর্তনের পূজা সংখ্যা কেমন লাগল তার জন্য আমরা চিঠি আহ্বান করেছিলাম। বেশ কিছু চিঠি আমরা পেয়েছি। অনেকে আমাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনাগুলি আমাদের পরের বছরের পূজা সংখ্যার নীতি নির্ধারণে দারুণ কাজ দেবে। এই চিঠিগুলি আমরা ৯ নভেমবর পরিবর্তনে প্রকাশ করতে চাই। ১৯৮৪ সাল থেকে আমরা পরিবর্তনের কিছু কিছু ফিচার পালটাতে পারি। নতুন করে আমরা আবার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছি। তার আগে পাঠকদের কাছ থেকে সাজেশান চাই। কোন কোন ফিচার আপনাদের ভাল লাগছেনা, কোন ধরনের ফিচার ও লেখা আপনারা বেশি করে দেখতে চান আমাদের জানান। ১৯৮৩ সালে কার কার লেখা আপনার ভাল লাগল এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত চাই। পূজোয় ভ্রমণ তো শেষ করে এলেন, কথা ছিল, ভ্রমণের কিছু কিছু নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা আমাদের ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে জানাবেন। শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ৩০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। একটা কথা সবিনয়ে জানাই পরিবর্তনে প্রকাশিত রচনা ও ছবির জন্য সমস্ত প্রাপ্য সম্মান দক্ষিণা রচনা প্রকাশিত হবার ৯০ দিন পর থেকে যে কোন দিন দেওয়া হয়। ৫০ টাকার ওপর প্রাপ্য হলে চেকে টাকা পাঠান হয়। পুরস্কার প্রাপকরা সংগে সংগে টাকা না পাওয়ায় অনেকে অধৈর্য হয়ে চিঠি লেখেন। এজন্যই এই প্রসংগের অবতারণা। বিনা পণে বিবাহের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা পত্রের জন্য ও পরিবর্তন মৈত্রী সংঘের সদস্যভুক্তির জন্য ৫০ পয়সার ঠিকানা লেখা খাম ও অতিরিক্ত ৫০ পয়সার টিকিট (ভবিষ্যতে যোগাযোগের জন্য) পাঠাতে হয়।

সম্প্রতি আমরা বিদেশ থেকে বহু অনুরোধ পাচ্ছি পরিবর্তনের একটি বিদেশ সংস্করণ প্রকাশের জন্য। আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কয়েকমাসের মধ্যে ৯৬ পাতার পরিবর্তনের একটি বিদেশ সংস্করণ মাসে দুবার করে প্রকাশ করব। এতে থাকবে পশ্চিমবংগ ও ভারতবর্ষের খবরের ডাইজেসট। পরিবর্তন ও শিলাদিত্যে প্রকাশিত ফিচার, রিপোরটাজ, সমালোচনার এক নির্বাচিত সংকলন। শিলাদিত্য থেকে নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাসও এই সংস্করণে থাকবে। দাম হবে প্রতি কপি দশ টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। বিদেশে আপনার কোন আত্মীয় বন্ধু থাকলে দয়া করে তাঁর ঠিকানাটা আমাদের পাঠিয়ে দিন, আমরা সরাসরি তাঁর সংগে যোগাযোগ করব, তিনি পত্রিকাটির যাতে গ্রাহক হন। এই সর্বপ্রথম একটি বাংলা ম্যাগাজিনের বিদেশ সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে।

'এবার পূজোয় আমাদের গ্রামে আসুন' এই পর্যায়ের চিঠিগুলি পাঠকের মনে কতখানি দাগ কেটেছে তা জানবার জন্য আমরা খুবই ব্যগ্র। দয়া করে সংশ্লিষ্ট পত্রদাতারা আমাদের জানান ওই চিঠি পড়ে কত লোক তাঁদের গ্রামের পূজো দেখতে এসেছেন। আমাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। পরীক্ষা করার জন্য আমাদের স্টাফ রিপোর্টার চিরজ্যোতি বসু ও ফটোগ্রাফার সৌগত রায় বর্মনকে পাঠান হয় মুর্শিদাবাদের মাথালতোড় গ্রামে। সেখানে তাঁরা দেখেন পরিবর্তন পড়ে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নানা জায়গা থেকে ওই গ্রামে এসেছেন পূজো দেখতে।

১৬ নভেমবর পরিবর্তন ৮০ পাতার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। এটি বিশেষ বিবাহ সংখ্যা। এই সংখ্যায় থাকছে বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে জীবন থেকে নেওয়া নানা উপভোগ্য রচনা। যেহেতু পাতা বাড়ছে, সেহেতু শুধু এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম সামান্য বাড়ান হচ্ছে। দাম পড়বে চার টাকা। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ 'দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠি কোথায়' এই পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত। বলাবাহুল্য এই বিশেষ সংখ্যাটি সীমিত সংখ্যক ছাপা হবে। অতএব আপনার এজেন্টকে এখনই বলে রাখুন।

অলমিতি

পা. চ.

"সারাদিন সংসারের এত কাজ করেও দিনের শেষে আমি ক্লান্তবোধ করিনা—আর এই স্ট্যামিনার জন্যই আমি রোজ ভিভা খাই।"

"আমার সংসার সুন্দরভাবে চালাতে আমাকে সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু এতো আমাদের কর্ত্তব্য, তাই নয়কি? এই পরিশ্রমকে পরিশ্রমই মনে হয়না, কেননা আমার সে স্ট্যামিনা আছে, আর তা যোগায় ভিভা।
দুধ, গম ও যবের মল্ট এবং ভিটামিনে ভরপুর ভিভা দুধ বা জলে সহজেই গুলে যায় এবং হজম করাও অতি সহজ।
আর ভিভা খাওয়ার মজা, ঠাণ্ডা বা গরম যেকোনও ভাবেই পাওয়া যায়।
আমি যেভাবে সংসার চালাতে পরিশ্রম করি, তার জন্য ভিভাও পরিশ্রম করে আমার স্ট্যামিনা বজায় রাখে।"

"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা — তোমার তুলনা নেই ভিভা!"

VITAMINISED
ViVA
The Family Health Drink
BUILDS UP STAMINA

ViVA

মণ্ড (ওয়ার্ল্ড) সিলেকশন,
আমস্টারডাম ১৯৮১র রৌপ্যপদক বিজেতা।

JiL জগতজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমি

পরিবর্তন ?

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমার পূর্বে পরিবর্তনে গ্রামের মাটির গন্ধ, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং প্রাণের পরশ অনুভব করতাম। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রাণের পরশ আর অনুভূতি পাই না। প্রত্যেকটি লেখায় কৃত্রিমতার ছায়া। এত বেশি করে খুনজখমের ছবি ও রিপোর্ট ছেপে কি সমাজের খুন জখমের ব্যাধি সারান যাবে?

আমার সব থেকে দুঃখ হচ্ছে- 'পরিবর্তন' সমাজের পরিবর্তিত রূপটিকে তুলে ধরার পরিবর্তে নিজেই 'পরিবর্তন' হয়ে গেল।

সনাতন মাহাত
বিরসনগর, জামসেদপুর

বিষয় ঃ চরিত্র

১৪-২০ সেপটেমবর '৮৩ সংখ্যার পরিবর্তনে চরিত্র বিষয়ক প্রতিবেদনখানা পড়লাম। অত্যন্ত বলিষ্ঠ বিষয়। সুন্দর লাগল বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক মতামতগুলো। তবুও কয়েকজনের সাক্ষাৎকারের মতামতের উপর আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সমরেশ বসুর ভাষায়-'একজন কুমারী মেয়ে এখন নির্ভয়ে দশ বারোজন পুরুষের সংগে মেলামেশা করতে পারে' এখনও আমরা সে পর্যায়ে আসতে পারিনি। এটাকে কখনও খুব Free বলা যেতে পারে না। অসভ্যতারই বহিঃপ্রকাশ।

রাধারাণী দেবী এক জায়গায় বলেছেন-'অনেক মহৎ লোকের নারী সম্বন্ধে দুর্বলতা দেখেছি' খুব স্বাভাবিক এবং বাস্তব সত্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহৎ লোকের নারী সম্বন্ধে চরিত্রের দোষ দেখা যায়, কিন্তু এর কারণ কী? মহৎ লোকের প্রতিভা প্রকাশের ব্যাপারে এর কিছুটা প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু এটাকে কখনও সমর্থন করা যায় না।

সুপ্রিয়া দেবী বলেছেন--'পাঁচজনের সংগে বেড শেয়ার করার তুলনায় একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিককে চিট করাটা অনেক বেশি চরিত্রহীনতার কাজ'। যে মেয়ে পাঁচ জনের সংগে বেড শেয়ার করতে পারে তার কাছে থেকে নিষ্ঠাবান প্রেমিকের ভালবাসা আশা করা অমূলক।

চরিত্র বিষয়ে বলিষ্ঠ এবং বাস্তব সত্য হিসাবে যদি কেউ মতামত দিয়ে থাকেন তিনি হচ্ছেন উত্তর কলকাতার একটি বাড়ির পরিচারিকা শ্রীমতী কমলা মল্লিক।

মহম্মদ ইয়াসিন আখতার
সিউড়ী, বীরভূম

'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' মণিপুরী ভাষারই একটি ধারা

পরিবর্তন ৩১ আগসট - ৬ সেপটেমবর সংখ্যায় যীশু চৌধুরীর 'নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ ভেঙে পড়ছে, মায়াপুরে জুড়ো হচ্ছে রাজকীয় ঐশ্বর্য' রচনাটির প্রসংগে আমার কিছু প্রতিবাদ রয়েছে। ওই রচনাটির 'ওরে নেয়ে, পার হয় কি নিমাঞি?' এই অনুনামের চতুর্থ অনুচ্ছেদে লেখক এক ভুল তথ্য ব্যবহার করেছেন। পুরোহিত মদন শর্মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তিনি উল্লেখ করেছেন '.....এর মাতৃভাষা কিন্তু মণিপুরী নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। ত্রিপুরী ভাষারই একটি সংখ্যালঘু ধারা।'

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মণিপুরী নয়, এ ধরনের এক অপপ্রচার চলে আসছে বেশ ক বছর ধরে। আসলে, এ কথা অনেকেরই জানা নেই যে, মণিপুরীরা ভাষাগতভাবে দুটি আলাদা সম্প্রদায়। একটি 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' এবং অন্যটি, মিতেই মণিপুরী। এই 'মিতেই মণিপুরী'দের অনেকাংশই মণিপুরবাসী, যদিও তারা কাছাড়, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছেন। আর, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মণিপুরের বিষেণপুর, লকটাকহ্রদ-এর চারপাশে ছড়িয়ে আছেন, সংখ্যায় মণিপুরবাসীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু এরা প্রায় সবাই 'মিতেই মণিপুরী' ভাষায় কথাবার্তা বলেন। ১৭ শতাব্দী থেকে এদের উপর যে প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু হয়, যার ফলশ্রুতি, নিজেদের মাতৃভাষা পর্যন্ত ভুলে গেছেন বেশির ভাগই।

এর বাহ্য। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা সেই প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে আসেন কাছাড়, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে। এই তথ্য ইতিহাসগ্রাহ্য নিজেদের মাতৃভাষা আদায়ের জন্যে লড়াই চালাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা। ইতোমধ্যে, ত্রিপুরায়, বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হবার পর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে 'ত্রিপুরা চে' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা সংস্কৃতি দপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছেন।

আর, এ কথাও ঠিক, মিতেই মণিপুরী ভাষাকে মণিপুর সরকার রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় এবং মিতেই মানেই মণিপুরী এই সরল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে, এই গোলমেলে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়েছে।

'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' ভাষা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর। তিব্বতো-বারমিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা হচ্ছে ত্রিপুরী বা কগবরক ভাষা। সুতরাং যীশু চৌধুরী যে 'ত্রিপুরী ভাষারই একটি সংখ্যালঘু ধারা' বলে উল্লেখ করেছেন তা সত্যি নয়।

সমরজিৎ সিংহ
আগরতলা, ত্রিপুরা

শ্রীচৈতন্যের পাঁচশততম জন্মবার্ষিকী

আপনাদের ৩১ আগসট-৬ সেপটেমবর সংখ্যায় 'নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ ভেঙে পড়ছে' শীর্ষক যীশু চৌধুরীর প্রতিবেদনটি পড়লাম। লেখককে ধন্যবাদ তাঁর সুন্দর রচনাশৈলীর জন্য। তবে রচনাটিতে একটি ভুল রয়ে গেছে। প্রথমেই লেখা হয়েছে 'এবছর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচশো বৎসর পূর্তি পালিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র।' জনগণের জ্ঞাতার্থে, আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমেই এবিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে চাই।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে। আর আবির্ভাবের পাঁচশো বছর হবে ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে। তার প্রস্তুতি এখন থেকে নয়, আজ থেকে ৩০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দ বংশের দ্বাদশ পুরুষ আচার্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোরের নেতৃত্বে পশ্চিমবংগ বিধান সভার তৎকালীন অধ্যক্ষ শৈলকুমার মুখারজির পৌরোহিত্যে কালীঘাট দুধওয়ালা পারকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। সেদিন সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, 'আগামী দোল পূর্ণিমা হইতে এই উৎসবের শুভ সূচনা হউক। শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের কৃপায় ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপার করুণায় আমরা এই উৎসবে ব্রতী হলে জাতীয় সমৃদ্ধি, সংহতি, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচারে জাতিসংঘে বিশ্বজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণে এক প্রেমাদর্শের শুদ্ধ প্রেরণায় আমাদের সংকল্প সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।'—সেদিন বিভিন্ন কর্মসূচীও গৃহীত হয়েছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ ৫৩ নং আপার সারকুলার রোড কলকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত 'প্রাণগৌর' পত্রিকার ১৯৬১ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসাহীরা খোঁজ করে দেখতে পারেন।

ব্রজরাজ কিশোর গোস্বামী,
শ্রীগৌরাংগমন্দির,! কলকাতা ৪৮

শ্রীচৈতন্যের নামে

৩১ আগসট সংখ্যায় বর্তমান বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের অনেক মূল্যবান তথ্য পাঠ করলাম। এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইদানীং বহু বিদেশি মনীষীর নামে রাস্তাঘাট ও ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে, অথচ যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে, সকল মানুষই অমৃতের সন্তান সেই মহাপুরুষের নামে কলকাতায় কোন বৃহৎ রাস্তার নামকরণ হয়নি। আশা করি এ ব্যাপারটি অবিলম্বে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বলরাম দাশ কলকাতা ৩৪

মেয়েরা একটু বেশি ধর্মভীরু

১৪-২০ সেপটেমবর (১৯৮৩) তারিখ পরিবর্তনে প্রকাশিত চরিত্র বিষয়ক প্রতিবেদনখানা পড়লাম। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহাশয় তাঁর সাক্ষাৎকারে এক জায়গায় বলেছেন- 'আমি স্ত্রী পুরুষের ভেদ দেখি না। সব ধর্মস্থানেই বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারীই হলেন মহিলারা। ধর্ম বেঁচে আছে ওদের জন্য।' উত্তরে বলি আপনি সব ধর্ম বলতে যদি ইসলামকেও ধরে নিয়েছেন তাহলে বলব ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আপনার জানা নেই। ইসলাম ধর্মে শুধুমাত্র হজ বাদে কোন ধর্মস্থানেই মুসলিম মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে না। বাড়িতে মেয়েরা ধর্ম কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তবে আপনি বলতে পারেন সামগ্রিকভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা একটু বেশি ধর্মভীরু হয়।

নেহালপুরের কাশেম মণ্ডল তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন— 'কবর খুঁড়ে দেবার সময় এদের ডাক পড়ে কিন্তু এদের উপস্থিতিতে সমাধি দেওয়া হয় না। মুসলমান হয়েও মসজিদে ঢোকা নিয়ে কথা শুনতে হয়। পাঠশালাতে অন্য মুসলিম ছেলেদের গা বাঁচিয়ে বসতে হয় এদের সন্তানদের।' অসম্ভব, কবর খোঁড়ার লোকেরা মুসলিম হলে অবশ্যই তাদের উপস্থিতিতে সমাধি (কবর) দেওয়া তো দূরের কথা, কবর দিতেও তারা সাহায্য করতে পারে। মসজিদে ঢোকা নিয়ে প্রত্যেকের সমান অধিকার। এমনকি পবিত্রভাবে যে কোন ধর্মের লোক মসজিদে ঢুকতে পারে। যদি দুর্ভাগ্যবশত এগুলি হয়ে থাকে তা ইসলাম সমর্থন করে না, কখনই এটাকে সমর্থন করা যায় না।

জামিলা বুলান্দ আমতারি
সোনাতোড়পাড়া, বীরভূম

গলার 'খিচখিচ' দূর করুন...

'খিচখিচ' কি?

যখনই আপনার গলা খুশখুশ করবে, অথবা গলা শুকিয়ে যাবে —তখনই বুঝবেন যে আপনার গলায় 'খিচখিচ' এসেছে।

ভিক্স নিয়ে নিন
'খিচখিচ' দূর করুন

ভিক্স নিয়ে নিন
ভিক্স কাশির বড়িতে গলায় আরামদায়ক ৬ টি ভিক্সের ঔষধি আছে, যা 'খিচখিচ' দূর করে।

তার জন্য যখনই গলায় 'খিচখিচ' আসবে, ভিক্স নিয়ে নিন।

ভিক্স নিয়ে নিন!

throat soothing relief
VICKS cough drops
Medicated
18 COUGH DROPS

OBM/1829 BEN

আমাদের প্রতি একটু নজর দিন

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার এক নমবর ব্লকের বায দোগাছিয়া একটি খুবই প্রাচীন গ্রাম। এই এলাকার মধ্যে একটিই প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বিগত পাঁচ বছর আগেও প্রায় প্রতিদিন দুহাজার রোগীর চিকিৎসা হত। কিন্তু আজ হাসপাতাল প্রান্তরে গবাদি পশু, শূকর অবাধে বিচরণ করছে। গত পাঁচ বছর ডাক্তার নেই বললেই চলে। মুমূর্ষু রোগীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কর্মচারী বসে বসে বেতন নিচ্ছে। প্রতিবাদ করার কেউ নেই। ওষুধপত্র, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। মুমূর্ষু রোগীকে উচ্চ চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাবার কোন সুপথ নেই। কারণ মাটির রাস্তা অবহেলিত। যান বাহন কিছুই চলে না।

কংগ্রেস সরকার আশা দিয়েছিলেন, পাকা রাস্তা, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিদ্যালয় সব কিছুরই বিশেষ ব্যবস্থা হবে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের কাঁচা সড়কের একটু নজর দিয়েছেন। তাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

কার্তিককুমার মুখারজি
পূর্বস্থলী, বর্ধমান

অসম্পূর্ণ

১৪–২০ সেপটেমবর ৮৩-র 'পরিবর্তনে' শ্যামল বসুর লেখা 'আসানসোলের কয়লা চক্র' রচনাটি পড়লাম। কয়লা চক্রের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য শ্যামলবাবুকে অভিনন্দন জানাই। তার প্রতিটি Statisticsই সম্পূর্ণ এবং সঠিক। তবে আসানসোল কয়লা খনি অঞ্চলের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যে জিনিসটা না পেয়ে রচনাটি খুব অসম্পূর্ণ লাগছে তাহল এই কয়লা চক্রের পিছনে বড় বড় পুলিশ অফিসারদের মোটা টাকা ঘুষ নেওয়ার Statisticsটা।

পূণ্যশ্লোক পল উপাধ্যায়
বারমুন্ডিয়া কোলিয়ারি,
বর্ধমান

নামকরণেই ত্রুটি

পরিবর্তন ২১ সেপটেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যায় বিশেষ সংবাদদাতার 'বেকার ভাতা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে' শীর্ষক যে লেখাটি পকাশিত হয়েছে তা পড়েই এই চিঠি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে পরের বছর থেকে বেকার ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেয় তার গোড়ায়ই ত্রুটি রয়ে গেছে। কাজেই এখন বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে এবং বিভিন্ন রকম নিয়ম প্রবর্তন করেও খুব একটা সুফল হচ্ছে না বা হবে না। ত্রুটি যেটা রয়েছে তা নামকরণ নিয়ে। প্রথমেই এই ভাতা কথাটার আগে বেকার শব্দটা যোগ করা ঠিক হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত ছিল। অথচ জনসমর্থন পাওয়ার জন্য এবং বর্তমান সরকার যে বেকারদের নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করছেন তা বোঝানর জনাই বেকার ভাতা চালু করা হল। কিন্তু এইভাবে বেকার ভাতা দিয়ে কি বেকার সমস্যা সমাধান হয় না হয়েছে? যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন না, সেক্ষেত্রে একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে কতটুকু সম্ভব এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা? তাই সমস্যা সমাধান হচ্ছে না কিন্তু বেকারদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

এখনে আমার প্রশ্ন : বেকার শব্দটাকে আক্ষরিক অর্থে না দেখে অন্য দিক দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে কেন? আক্ষরিক অর্থে বেকার শব্দকে নিলে বেকার ভাতা পাওয়ার যোগ্য সবাই। এর মধ্যে কে ভাতা নিল না সেকথা স্বতন্ত্র। একটা পরিবারের মাসিক আয় হাজার টাকা হতে পারে। কিন্তু সেই বাড়িতে যদি পাঁচজন বেকার থাকে তা হলে তারা কি বেকার নন?

ভবতোষ চক্রবর্তী
হালিশহর, ২৪ পরগনা

প্রবাসীর চিঠি

জীবিকা যেখানে জীবনের সব রস শুষে নেয়

ভারতবর্ষের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার ছোট্ট জায়গা 'বাসার' যেখানে দুই বছর হল কর্মসূত্রে আগমন। 'পরিবর্তন' পত্রিকার দৌলতে একেবারেই নিজের মত করে যে অভিজ্ঞতা বাসারে থেকে অর্জন করেছি তা দিয়ে 'প্রবাসীর চিঠি' কলমটুকু ভরে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না।

এখানে আসার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা দিন পেলাম না যা আমাদের ভাল লাগার কারণ হতে পারে। ভাল লাগবেই বা কেন বলুন? 'ভোজনবিলাসী' নামে খ্যাত এই বাঙালি জাতটা মাছ বলতে অজ্ঞান, সেই মাছ এখানে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অল্প। স্থানীয় টাটকা সবজি যা পাওয়া যায় তা নেহাৎই অল্প।

আমোদ প্রমোদের কথাই যদি শুরু করি তাহলে বলব মাটির একটা সিনেমা হল আছে, তবে তা মাসের তিন-চতুর্থাংশ সময় বন্ধই থাকে। কোন নাটক, জলসা, খেলাধূলার চর্চা বা কোন টুরনামেনট হওয়া, ভাল লাইব্রেরি থাকা – কোনটাই নেই। খবরের কাগজ অনিয়মিতভাবে আসে। যখনই জানতে পারি কলকাতায় কোন ভাল খেলার টুরনামেনট হচ্ছে বা কোন ফাংশান হচ্ছে তখন খুবই খারাপ লাগে। একেকসময় মনে হয় আমরা চাকরি করতে তো আসিনি, আমাদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। মনকে সান্ত্বনা দিই এই ভেবে যে, আমাদের চেয়েও দুর্গম অঞ্চলে আমাদেরই মত অনেকে চাকরির স্বার্থে নিজেদের সমস্ত শখ বিসর্জন দিয়েছে। বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গাপুজো সেটাও আজকাল বন্ধ হয়েছে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যখন দেখি অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা এত দূরে এসে কত মিলেমিশে থাকে আর এত দূরে এসেও বাঙালিদের মধ্যে একত্ব বোধ জাগেনি। এখানকার বাঙালিদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ১। আসামের কাছাড় জেলার বাঙালি, ২। কলকাতার বাঙালি। জানি না কেন অধিকাংশ কাছাড়ের বাঙালিরা কলকাতার বাঙালিদের খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু খারাপ লাগে যখন দেখি কিছু কলকাতার বাঙালিও তাদের এই নীতিকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ 'তোমরা আমাদের এড়িয়ে চল আমরাই বা চলব না কেন' অনেকটা এই ধরনের। এইসবের জন্যই বোধহয় যখন কেউ বাসার ছেড়ে চলে যায় তার চোখে মুখে ফুটে উঠে এক স্বস্তির ভাব। বাসারের সবই খারাপ নয়, কিছু ভাল অবশ্যই আছে।

ধরুন, আপনি চেঁচামেচি, ভিড়, লোডশেডিং ভালবাসেন না, তাহলে বাসার হবে আপনার মনমত জায়গা। সেই সঙ্গে যদি আপনি সৌন্দর্যের পূজারী হন তাহলে উপলব্ধি করতে পারবেন প্রকৃতির অকৃপণ হস্তে ঢেলে দেওয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আর যারা চাকরি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গিয়ে নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন তাদের বলি, অরুণাচলের অরুণ কিন্তু অস্ত গিয়ে আপনাদের চোখে অন্ধকার ঠেলে দেয়নি বরং আপনাদের আলোর পথ দেখাবার জন্যই উদয় হচ্ছে। চাকরিতে ঢুকতে গেলে এত স্বল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থী নিয়ে প্রতিযোগিতা ভারতের আর কোন রাজ্যে আছে কিনা আমার জানা নেই। সুতরাং দেরি করবেন না, মনে রাখবেন অরুণের এক সময় অস্ত যাবারও সময় হয়।

সুশীত ঘোষ
স্টেট ব্যাংক অফ ইনডিয়া
বাসার, অরুণাচল প্রদেশ

একটি আবেদন

আমি আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। আপনাদের পত্রিকা নিয়মিত পাঠে আমি বিশেষ উপকৃত। প্রায়ই দেখি আপনারা বহু-লোকের সমস্যা আপনাদের পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। আমিও আজ সেই রকমই এক সমস্যা নিয়ে লিখছি।

আমি এক খুবই দরিদ্র পরিবার থেকে লিখছি। ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ পিতা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা মা, অবিবাহিতা ২৬ বৎসরের বেকার মেয়ে আমি এবং আমার এক বেকার দাদা, উপার্জনহীন এই চারজন লোক নিয়ে পরের সাহায্যে কোনপ্রকারে আমাদের দিন অতিবাহিত হয়। এমতাবস্থায় আজ ৮/৯ মাস যাবত আমার বাবা বিশেষ রোগাক্রান্ত (খেতে গেলেই গলায় আটকায়) বিনাব্যয়ে বহু স্থানে চিকিৎসা করে কোন ফল না পেয়ে অবশেষে বাবাকে নিয়ে ঠাকুরপুকুরে Cancer Center & Welfare Home-এ যাই। সেখানকার ডাক্তার আমার বাবাকে ভর্তি হবার নির্দেশ দেন। কিন্তু সেখানকার ব্যয়ভার বহন করা আমাদের মত উপার্জনহীন পরিবারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে আমার বাবাকে ২৪-টি Ray দিতে হবে। প্রতিটি Ray দিতে ২০ টাকা করে লাগবে। আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ঐ Centre থেকে ১৯টা Ray ফ্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু এছাড়াও দৈনিক বেড-ফি ১০ টাকা করে, বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ফি, বহুমূল্য ওষুধ পত্র দিতে হবে আমাদের।

তাই আমি এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে আবেদন রাখলাম–আমপানরা যদি কেউ দয়া করে আমার বাবার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করেন।

আরতি রায়
পি–১০ নাকতলা লেন,
কলকাতা–৭০০০৪৭

ভ্রম সংশোধন

১৯/২৬ অকটোবর পরিবর্তনের প্রচ্ছদে '১৯৮৩'-এর পরিবর্তে ১৮৮৩ ছাপা হয়েছে। এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

সেয়ানে সেয়ানে

অম্লমধুর

চাষীর নেতা রামকানাইজী
করেন না তো চাষ
মাঠের খবর রাখেন নাকো
কলকাতাতে বাস
পাটকে বলেন ক্যাকটাস
আর ধানকে বলেন ঘাস।

জয়নাল আবেদীন

শিশু নারী প্রতিবন্ধী
তিনটে বছর করলো বন্দী
ছিল যেমন রইল ভারতবর্ষ
এসেছে এক জবর ফন্দি
মুচকি হেসে বলেন ঠানদি
চুরাশিটা হোক না পুরুষবর্ষ।।

গুরুপ্রসাদ রায়

এই আছে, এই নেই
টেলিফোন যন্ত্র,
ফ্যালো টাকা দশ বিশ -
সেই হল মন্ত্র

অদীশ বর্ধন

এই মেয়েরা ভেসে না গো
মরণ পাবে ছুঁস না গো
শ্বশুর আছেন ভাসুর আছেন
আছেন ননদ শাশুড়ি
সংগে আছেন স্বামী নামক
করবে নিধন আসুরিক।

শুভাশিস হালদার

নিন্দুকে যে যা খুশি
বলুক না
বাংদিন চলছে যা'
চলুক না।
প্রকাশ্যে রাজপথে
খুন হোক,
মন্ত্রীমশাই 'চুপ'
বাঁধা চোখ।

কালামুখ

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

পাঁচ মিনিট

ডাক্তার ও দাওয়াই

ডাক্তার ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। একজন বাঙালি কবি বলিয়া গিয়াছেন, প্রেম ও ধর্ম পোহাতে পারে না বারোটার বেশি রাত্তি। অধিকন্তু যোগ হইবে, বাঙালির বিপ্লবও দুর্গাপূজা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। অন্য সময় পিঠে দুঘা পড়িলেও আন্দোলন থামে না বরং বলশালী হয়। কিন্তু ঢাকে কাঠি পড়িলে বাঙালি আন্দোলন শিকেয় তুলিয়া সারারাত্র ঠাকুর দেখিবার আয়োজন করে। সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পশ্চিমে হাওয়া বদলে যান।

তবে ডাক্তার ধর্মঘটের অবসান হওয়ায় বহুদর্শী প্রবল খুশী হইয়া কাহাকে ধন্যবাদ দিবে ভাবিয়া থই পাইতেছিল না। পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমকে? যিনি নাকি ডাক্তার পিটাইয়া ডাক্তার দিয়া ডাক্তারের চিকিৎসা করাইয়াছেন। যিনি ঔষধ দেন তিনিই ডাক্তার। যিনি লাঠ্যোষধি দেন তিনিই বা ডাক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন না কেন? সেই অর্থে নিরুপমবাবুর লাঠি দাওয়াইতে ডাক্তাররা অনুপমভাবে সিধা হইয়াছে। ধর্মঘট ভাঙিবার পিছনে ইহাই কারণ। কেহ বলেন - না, এজন্য যাবতীয় ক্রেডিট জ্যোতিবাবুর প্রাপ্য। তিনি ধর্মঘটী ডাক্তারদের 'খুনী' বলায় তাহাদের বিবেক জাগ্রত হয় এবং বিবেক দংশনে আহত হইয়া পরদিনই ধর্মঘটী ডাক্তাররা সংকল্প করেন, আর ধর্মঘট নয়, এবার হইতে যথার্থ অর্থে রোগী সেবা।

কিন্তু আমাকে সবজান্তা সাংবাদিক দাদা সব শুনিয়া বলিলেন: কিছুই খবর রাখেন না, আর কদিন ধর্মঘট চালালেই ডাক্তাররা সব বেকার হয়ে যেত - পুরো হাসপাতাল চালাত ডাঃ এম সি সি।

এম সি সি মানে? আমার প্রশ্ন।

মেমবার, কো অরডিনেশন কমিটি। জানেন না, সমস্ত প্ল্যান হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারদের বদলে ওরাই হাসপাতাল চালাবেন। সমস্ত ডাক্তার সারপ্লাস হয়ে যাচ্ছিল। সেটা জানতে পেরেইতো ডাক্তারেরা পড়ি কি মরি করে স্ট্রাইক উইথড্র করে নিলেন।

আমি বলিলাম : তা কী করে হয়?

সবজান্তা বলিলেন : হয়, জানতি পার না। ওরাও কি জানতেন? প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন ওরা কি পারবে? ডাক্তারি কি আর মনুমেন্টের নিচের গণ আন্দোলন যে সহজেই কেল্লা ফতে হবে? কিন্তু দেখা গেল ওরাই হাসপাতাল চালাচ্ছেন। রোগীদের হাসপাতালে এতদিন কেউ পাত্তা দিত না। কেঁদেককিয়ে মরে গেলেও টাকা না পেলে কেউ বেডপ্যান ধরত না, সিসটারদের পাত্তা পাওয়া যেত না। বড় ডাক্তারবাবু সেই যে রোগীকে ভর্তি করে হাওয়া হয়ে যেতেন, তারপর আর তার টিকি দেখা যেত না। কিন্তু কোন একটি হাসপাতালে এম সি সি-রা ডাক্তারবাবুর ভূমিকায় তাদের যাকে বলে যথেষ্ট 'মানবিকতার সংগে' চিকিৎসা করতে লাগলেন। রুগীরা জন্মে যা পাননি, সেই দেখা-শোনার চোটেই ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, এও বলা হল, ছুরি-কাঁচি চালাবার যাদের প্র্যাকটিস আছে দরকার হলে তারা এসে অপারেশনও করে যাবেন। কিন্তু এসব ঘটনাতেও আসল ডাক্তাররা বিচলিত হলেন না। কিন্তু বিচলিত হলেন একটি ব্যাপারে। আউটডোরের একজন রুগীকে জনৈক ডাঃ এম সি সি কাগজে কী একটা লিখে দিলেন খস খস করে। তিনি সেটা নিয়ে ডাক্তারখানায় যেতেই কমপাউনডারবাবু এক বোতল মিকশ্চার দিয়ে দিলেন। সেই এক বোতল মিকশ্চারেই তার রোগ উপশম হয়ে গেল। এ খবর বিনয়বাবু জানতে পেরে ওই রোগীকে দিয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স করাবেন ঠিক করেছিলেন। সেই প্রেসক্রিপশানের খোঁজ পড়ল। ডাক্তারখানা থেকে সেটি উদ্ধার করতে গিয়েই সকলের চোখ ছানা বড়া। প্রেসক্রিপশানটা খুব জড়ান লেখা। বোঝাই দুঃসাধ্য। খুব ভাল করে পড়ে জানা গেল, ওটা আসলে কলকাতার যে যে হাসপাতালে ধর্মঘট চলছে তার ঠিকানা, কোন ওষুধের নাম নয়।

ডাক্তাররা বুঝলেন, তারা না থাকলেও হাসপাতাল চলবে। আর রোগীর কাছে ওষুধের চেয়ে বড় হল পরিচর্যা। সেটা পেয়েই রোগীদের রোগ সেরে যাচ্ছে। আর বেশি দেরি করলে ডাক্তারদের হয়ত দরকারই হবে না। এমনিতেই তো কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথির চাপে অ্যালোপ্যাথদের বাজার ডাউন যাচ্ছে। তাই পরের দিনই ডাক্তার ধর্মঘট মিটে গেল।

বহুদর্শী

কোনো মিক্সার-এর ঘোরার
গতি প্রতি মিনিটে
১০,০০০ হ'লে তার সুরক্ষা
সম্বন্ধে আপনাকে কি
কেউ ভরসা দিতে পারে?

আমরা কিন্তু তা পারি!

মিক্সার প্রতি মিনিটে ১০,০০০ বারের বেশী গতিতে ক্রমান্বয়ে ঘুরতে থাকলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। এর নার্ভ দুর্বল হ'য়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে, মিক্সার-মোটর জ্বলে যেতে পারে বা ব্লেডগুলি আল্‌গা হ'য়ে ঘাতক অস্ত্রের মত হ'য়ে যেতে পারে। তাই, বাজারে মিক্সার দেখার আগে প্রথমেই আপনাকে খুঁজে নিতে হবে বিশ্বস্ত ব্র্যাণ্ড নাম; তবেই ঐ বিপদ এড়াতে পারবেন।

বাজাজ সেই নাম।

যা, ভারতে ২৫ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকটি নামের মধ্যে একটি। ঐ নামে প্রেরণা পায় প্রতিটি বাজাজ-উৎপাদন তথা আমাদের যাবতীয় গৃহউপকরণ, যার শ্রেণী বিভাগ দেশের মধ্যে বৃহত্তম। সবের পশ্চাতে সারাদেশে ছড়ানো আছে আমাদের ১৭টি শাখা ও ৩৫০০টি ডিলার সমন্বয়ে এক বৃহৎ নেটওয়ার্ক, চট্‌পট্‌ আফটার সেল্‌স্ সার্ভিস নিশ্চিত রাখতে! আপনার হয়ত তার প্রয়োজনই হবে না।

আমাদের গৃহউপকরণ এমনই যে, তার গুণমান, স্থায়ীত্ব বা নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো সার্টিফিকেট লাগে না—কারণ বাজাজ নামটি তো আছেই।

bajaj

আজই কিনুন, বাজাজ কিনুন

বাজাজ মিক্সার, বাজাজ প্রেসার কুকার, বাজাজ আয়রণ, বাজাজ হিটার, বাজাজ [illegible], বাজাজ [illegible], বাজাজ গ্যাস স্টোভ, বাজাজ [illegible]

পশ্চিমবঙ্গে দু বছরের মাথায় রাজ্যপাল বদল আগে কখনও হয়নি

নিশীথ দে

সি পি আই (এম) নেতারা নতুন রাজ্যপাল অনন্ত প্রসাদ শর্মাকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গিয়েছেন। রাজ্যপাল সক্রিয় রাজনীতি করতে পারেন না, করবেনও না। কিন্তু তিনি যদি সন্ত্রাস-উপদ্রুত এলাকা সফরে যান আর সাধারণ মানুষ, গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ রাজ্যপালের কাছে অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করার সুযোগ পায় তাহলেই তো যথেষ্ট। আর যাই হোক রাজ্যপালের সফর তো আটকান যাবে না।

অনন্তবাবু পশ্চিমবঙ্গকে চেনেন। রাজ্যের এমন কোন জেলা নেই যে জেলার অন্তত দশ জন রাজনৈতিক লোককে তিনি চেনেন না।

রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার পর পাঞ্জাবে শক্ত লোক দরকার। সে জন্যই অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ আমলের ঝানু আই সি এস ভৈরব দত্ত পাণ্ডেকে পাঞ্জাবে রাজ্যপাল করা হল। আর পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল অনন্ত প্রসাদ শর্মা ঝানু না হলেও রাজনীতিতে বেশ পাকা লোক। হাত পাকিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়নে।

রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ বোধ হয় এই প্রথম। বামফ্রন্টের নেতারা সবাই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, 'এবার খেলাটা শুরু হল।' কিসের খেলা? রাজনীতির? তা না তো কী। রাজনীতি করা লোক কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? বামপন্থী মহলে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে।

প্রয়াত ত্রিভুবন নারায়ণ সিংকে সরিয়ে ভৈরব দত্ত পাণ্ডেকে রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করায় বামফ্রন্ট সোচ্চারে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, 'ভাল লোক, সৎ লোক, বুড়ো মানুষ ত্রিভুবনবাবু। কেন সরাচ্ছেন?' ত্রিভুবনবাবু নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী লোক। এককালে উত্তরপ্রদেশে জবরদস্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রে জনতা পারটি ক্ষমতায় আসার পর ত্রিভুবনবাবু পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

বি ডি পাণ্ডে ১৯৮১ সালের ১২ সেপটেমবর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। একটি দিনের জন্য কোন ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য হয়নি। কোন মন্ত্রীকে ডেকে কৈফিয়ৎ চাননি, জানতে চেয়েছেন পরামর্শ দিয়েছেন। আই সি এস পদে চাকরি করার সময় বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্যপালের কাছে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগও এসেছে কয়েকশ। রাজভবন থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের প্রতিকার হল কি না জানতেও চাওয়া হয়নি।

সেদিক থেকে ত্রিভুবনবাবু অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। যেখানে তাঁর মন্ত্রীরা নিয়মনীতি মানছেন না বলে মনে হয়েছে সেখানে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি, রেড ক্রসের সভা ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছেন। গ্রামের মানুষের দুর্দিনে সাড়া দিয়েছেন, গরিব মানুষের কাছে গিয়েছেন।

বি ডি পাণ্ডেকে কংগ্রেস (ই) স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই পাণ্ডে একদিন কংগ্রেস (ই)-র চক্ষুশূল হয়েছিলেন। রাজ্যপাল পাণ্ডের বিধানসভায় ভাষণ বয়কট করেছেন, পথ অবরোধ করে নতুন নজির সৃষ্টি করেছিলেন কংগ্রেস (ই) বিধায়করা।

আসলে কংগ্রেস (ই) নেতারা বিশেষ করে সুব্রত মুখারজি অনেক দিন থেকে দিল্লিতে দরবার করেছিলেন যাতে বি ডি পাণ্ডেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ইন্দিরা গান্ধী এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

কিন্তু সুব্রতবাবুর সব দিক বজায় রইল। বি ডি পাণ্ডেও গেলেন আর যিনি এলেন তিনি সুব্রতবাবুর আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অনন্ত প্রসাদ শর্মার আপনজন সুব্রতবাবু। আই এন টি ইউ সি-তে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বে সুব্রতবাবুকে আনার মূলে অনন্তবাবু। আই এন টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অনন্তবাবু পুত্রতুল্য সুব্রতবাবুর সক্রিয় সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন থেকে অনেক প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছেন।

রাজ্যপাল পদে যোগ দেওয়ার আগে টেলিফোনে পাঞ্জাবে বসেই অনন্তবাবুর সঙ্গে সুব্রতবাবুর কথা হয়েছে। দমদম বিমান বন্দরে নেমে সবার আগে অনন্তবাবুর চোখ গিয়ে পড়ে সুব্রতবাবুর উপর।

অনন্তবাবু বিহারের লোক হলেও ছাত্রজীবন কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। ট্রেড ইউনিয়নে হাতেখড়ি হাওড়ায়। ওঁর জন্ম বিহারের সাহাবাদ জেলার গৌদাড় গ্রামে, ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেমবর। বাবা রামনরেশ শর্মা। স্ত্রী তারা দেবী। দুই ছেলে, চার মেয়ে। পড়াশোনা বেশি করতে পারেননি। কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পূর্ব রেলের সাধারণ কর্মচারী হিসাবে। হাওড়া স্টেশনে অনেকেই তাঁকে টিকিট কালেকটরের ভূমিকায় দেখেছেন। রেল শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন গড়ার কাজে সেদিন তাঁর সঙ্গে অনেকেরই আলাপ হয়েছে। অনন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হলে অন্তরঙ্গ হতে বেশি দেরি হয় না। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও ছিলেন রেল শ্রমিক কর্মচারীদের নেতা। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তখন থেকেই তাঁর আলাপ।

অনন্তবাবুর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, ভাল বাংলা জানেন। পশ্চিম বঙ্গের মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁর অজানা নয়।

অনন্তবাবুর নাম বেশি করে শোনা গিয়েছিল ১৯৭৪ সালের মে থেকে। ৮ মে সারা দেশে রেলশ্রমিক কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘট শুরু হল। তখন রেলমন্ত্রীও বিহারের লোক – প্রয়াত ললিত নারায়ণ মিশ্র। একদিকে সমস্ত অকংগ্রেসী দলের রেলওয়ে ইউনিয়নের যুক্ত সংগঠন এন সি সি আর এস অন্যদিকে 'শর্মাজীকা ইউনিয়ন।' আট দিনের মাথায় এন সি সি আর এস নড়বড়ে হয়ে পড়ল, আপাতত ধর্মঘট ভেঙে গেল। সেই বছরই অনন্তবাবুর ডাক পড়ল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় – শিল্প ও সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তখন তিনি লোকসভার সদস্য। প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত হন ১৯৬২ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে। সাতাত্তরের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। আবার লোকসভায় আসেন ১৯৮০ সালে এবং পর্যটন ও অসামরিক বিমান দফতরের পূর্ণ মন্ত্রী হন। অবশ্য মন্ত্রী হিসাবে তাঁর খুব নামডাক হয়নি। ১৯৬৮ থেকে ৭১ পর্যন্ত রাজ্যসভারও সদস্য ছিলেন। এই সময় ছিলেন বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। সেই সঙ্গে আই এন টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি।

ডাঃ চেন্না রেড্ডির পদত্যাগের পর, আট মাস আগে ১৯ ফেবরুয়ারি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হন। পাঞ্জাবে রাজ্যপাল বদল হয়ত পরিবর্তিত পরিস্থিতি বাধ্য করেছে। রাজ্যপাল বদলের দাবি ওঠেনি, কিন্তু দু বছরের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল বদল আগে হয়নি। □

আপনার মণিবন্ধের নতুন মণি—টাইমস্টার!

TIMESTAR

17 JEWELS SHOCKPROOF

TIMESTAR

17 JEWELS SHOCKPROOF

TIMESTAR

টাইমস্টার

টাইমস্টার-এর একের চেয়ে আরেক সরেস সব ঘড়ি, একেবারে ন্যায্য দামে। আধুনিক, আকর্ষণীয় ডিজাইন ও স্টাইল।
হরেক রকমের ঘড়ির সম্ভার। রোল্ড গোল্ড, ক্রোম আর স্টীল—যা আপনার পছন্দ। আপনার কাছাকাছির কোনো টাইমস্টার ডিলারের কাছে গিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসুন, ঐ সব মণিগুলি!

মনে রাখবেন : সবসময় আসল টাইমস্টার ঘড়িই কিনুন। ক্যাশমেমো আর টাইমস্টার-এর গ্যারান্টী কার্ডটি নিশ্চয়ই চেয়ে নেবেন।

OBM/2123/BN

ধরমশালায় দালাই লামা সকাশে পরিবর্তনের প্রতিনিধি

দালাই লামা

দালাই লামা, তিব্বত ও চীন : এই জট কি কখনও খুলবে ?

উপলক্ষটা ছিল সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর তিব্বত ফিরে এসে উক্তি। দালাই লামাকে আশ্বাস দিয়েছেন চীন সরকার তিনি সেখানে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু ২৪ বছর পরে দালাই লামা কি ফিরে যাবেন তাঁর জন্মভূমি তিব্বতে, যেখানে তাঁর জন্য আজও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিব্বতি জনগণ ? এই ২৪ বছরে দালাই লামা ভারতের ধরমশালায় প্রবাসী সরকার চালাচ্ছেন। ধরমশালা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তিব্বতিদের মূল প্রশাসন কেন্দ্র। সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর উক্তি সম্পর্কে স্বয়ং দালাই লামার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য পরিবর্তনের দিললি প্রতিনিধি খগেন দে সরকার ও তরুণ প্রকাশ গংগোপাধ্যায় সম্প্রতি গিয়েছিলেন ধরমশালায়। সেখানে তাঁরা দালাই লামাসহ প্রবাসী সরকারের আরও কর্মকর্তাদের সংগে দেখা করেন। দালাই লামা ও তিব্বত প্রসংগটিকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের দীর্ঘকালের সম্পর্কের প্রশ্নও জড়িত। সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর উক্তি স্বভাবতই ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান প্রতিবেদনে দালাই লামার পরিচয় ও ধরমশালার প্রবাসী সরকারের পটভূমি তুলে ধরেছেন পরিবর্তনের প্রতিবেদকেরা।

১৯৩৫-এর বসন্তকাল। স্থান তিব্বত। তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে এক হাজার মাইল উত্তরপূর্বে আমদো অঞ্চল। ওখানে এক গ্রামে (যেখানে এখনো আছে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ) একটি আপেক্ষিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবারে হয়ত পিতামাতা ও ভাইবোনদের সংগে খেলছিল একটি বছর দুয়েকের তিব্বতি বালক। অতি বুদ্ধিমান একটি বালক।

লাসা থেকে এক হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছেন তিব্বতের কয়েকজন উচ্চপর্যায়ের বৌদ্ধ পুরোহিত এবং জাতীয় পর্ষদের সভ্যরা। তাঁরা খুঁজে পেতে চাইছেন : ১৯৩৩ সালে মৃত ত্রয়োদশ দালাই লামার আত্মা কার শরীরে হয়েছে প্রবিষ্ট – অর্থাৎ তিব্বতে নতুন বোধিসত্ত্ব কে? ঐ পুরোহিতদের মধ্যে একজন ভৃত্যবেশে এ বাড়িতে এসে বলেছিল : 'আমরা চা খাব।' (সাধারণত নাকি প্রচলন, বাইরের লোকেরা এসে চা খেতে চাইতে পারে, আতিথ্যের একটা অংগ)। ভৃত্যবেশী পুরোহিত ঘরের ভিতরে গিয়ে চা-পানের বন্দোবস্ত করে এবং এদিক ওদিক দেখে।

এই দুই বছরের বালকটি দৌড়ে এসে ভৃত্যবেশী পুরোহিতের কোলে চেপে বসল। পুরোহিতের গলায় ছিল ত্রয়োদশ দালাই লামার জপমালা। বালক প্রথমেই হাত দিল ঐ জপমালাতে। পুরোহিত বললেন : 'তোমাকে আমি এটা দেব যদি বলতে পার আমি কে?' বালক : 'আপনি সেরা মঠের পুরোহিত।' লাসা থেকে আসা ঐ দলের আরো দুজন পুরোহিতের নাম করল ওই বালক কি শিশু। এবং বালক যে তিব্বতি ভাষায় কথা বলছিল, তার প্রচলন ছিল একমাত্র লাসার প্রশাসনিক ভবনে কি চত্বরে।

আমদো অঞ্চলের ঐ বালকটিই আজ তিব্বতের চতুর্দশ দালাই লামা। তাঁর প্রধান কার্যস্থান হিমাচল প্রদেশের হিমালয়ের কোলে, ধরমশালায়, প্রায় ৭000 ফিট উপরে। আমি ও আমার সহকর্মী তরুণ প্রকাশ গংগোপাধ্যায় ওখানে গিয়ে পেলাম তাঁর সাক্ষাৎকার, আমাদের সৌভাগ্য। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিব্বতি সরকারি কর্মচারীরা এখানে ওখানে টেলিফোন করে বলে দিলেন, অপরাহ্ন দুটোয় আমাদের সাক্ষাৎকার দালাই লামার সংগে, যাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব তিব্বতের ষাট লক্ষ অধিবাসীদের ওপর। পরিবর্তন এর পাঠকরা জেনেছেন নির্বাসিত তিব্বতি সরকারের কথা।

শিলিগুড়িতে একজন যুবক সাংবাদিক আমাদের ধরমশালা ভ্রমণের কথা শুনে প্রশ্ন করল : দালাই লামাও কি তাঁর উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করে যাবেন এর উত্তর হয়ত এই চতুর্দশ দালাই লামাও জানেন না। কেননা, তাঁরা বোধিসত্ত্বে বিশ্বাসী যে, মৃত দালাই লামার 'আত্মা' প্রবেশ করবে কোন একজনের দেহে এবং তাঁকে খুঁজে পেতে হবে পুরোহিতদের। তন্ত্র, মন্ত্র, দিব্যদৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে। ওটা তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থা, তার সঙ্গে কলহ করে লাভ নেই। হোক সংস্কার হোক কুসংস্কার।

যেমন, লাসা থেকে আসা ঐ সন্ধানী পুরোহিত ও অন্যান্যরা পৌঁছলেন ১৯৩৫ সালে একটি হ্রদের কাছে, পবিত্র হ্রদ, নাম লামোই লাতসো (Lhmoi Latso)। ঐ হ্রদের জলে দৃষ্টিপাতে প্রধান পুরোহিত দেখলেন সেই ছবি, একেবারে যেন সেই ছবি যে বাড়িতে বাস করছিল এই বালকটি। পুরোহিত আরো দেখেছিলেন ঐ বিখ্যাত মঠের আকৃতি, এমনকি স্থাপত্য। সত্য হোক মিথ্যা হোক, এই ছিল ১৯৩৫ সালে পুরোহিতদের বিশ্বাস ও আস্থা, তাঁদের ধর্মীয় স্থানে। সেই স্থান থেকে ওঁরা পেলেন তিব্বতিদের চতুর্দশ দালাই লামা, যে বালকের নাম ছিল সেদিন 'তেনজিং জিয়াতসো।' আজ তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ।

ভাবনায় এল কয়েকটা দিনের কথা, দালাই লামার স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কয়েক বছর আগে, ১৯৫৫ কি ৫৬। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এলেন উনি এবং পঞ্চেন লামা, নাথু-লা রাস্তা দিয়ে, গ্যাংটক হয়ে শিলিগুড়ি। কলকাতা থেকে আমরা প্রতিবেদক ও ফটোগ্রাফাররা প্রায় ১৪ হাজার ফিট নাথু-লা রাস্তায় হিমালয়ের দেশে ওঁদের অভ্যর্থনায় সামিল হয়েছিলাম। দালাই লামার বয়েস তখন একুশ কি বাইশ, ফর্সা সুদর্শন যুবক। বাগডোগরা বিমান বন্দরে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন প্রস্তুত। একটু গোলমাল লাগল, কোথায় বসবেন দালাই লামা, কোথায় বসবেন পঞ্চেন লামা। তিব্বতি মতে দালাই লামাই হলেন শ্রেষ্ঠ, তাঁর স্থান সকলের ওপরে। পঞ্চেন লামার স্থান কোথায় আমি সঠিক জানি না। কিন্তু জানি যে, তাঁর স্থান দালাই লামার ঠিক নিচে।

একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। ১৯৫০-এ চীন অধিকার করল তিব্বত দেশ স্থল-সেনা দিয়ে। তখন দালাই লামার বয়েস ষোল। চীন চাইছিল যে, দালাই লামা থাকবেন তিব্বতের ধর্মীয় প্রধান, আর পঞ্চেন লামা হবেন পার্থিব তিব্বতের (শাসন, ইত্যাদি) প্রধান। এই ভাগাভাগি দালাই লামা তথা তিব্বতিরা আজ অবধি মানেনি। তাদের কাছে এখনও দালাই লামা একমাত্র প্রধান, ধর্ম ও পার্থিব ক্ষেত্রে। পঞ্চেন লামা, যদ্দূর জানি, এখনো আছেন চীনে, এক সময় পিপলস কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর নাম আর শোনা যায় না। কিন্তু শিলিগুড়িতে ঐদিন দালাই লামার আসনকেই দেওয়া হয়েছিল পঞ্চেন লামার আসন থেকে উচ্চতর স্থানে স্থগিত সমারোহ হয়ে গেল ঠিকঠাক।

চীন ও তিব্বতের পারস্পরিক সম্পর্ক এক বিরাট ইতিহাস। সেই অবসর আমাদের কোথায়? কিন্তু আইনত তিব্বত কোনদিন স্বীকার করেনি যে, তিব্বত চীনের অন্তর্গত, ১৯১৪ সালের তথাকথিত সিমলা চুক্তি সত্ত্বেও। সেই ইতিহাসে আজ গিয়ে লাভ নেই।

বাস্তব দেখাল যে, ৭ অক্টোবর, ১৯৫০ সালে চীন বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রায় নিরস্ত্র তিব্বতকে জয় করে অধিকার করে নিল। সেদিন দালাই লামার কর্তৃত্বের কাল মাত্র ১১ বৎসরের। তখন বলা হত তিব্বতের অধিবাসীদের সংখ্যা ৭০ লক্ষ। এখন ধরমশালা বলে ৬০ লক্ষ, চীন বলে (যা উল্লেখ করেছেন ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী আমাদের সাক্ষাৎকারে, চীন-তিব্বত ভ্রমণের পর এই বছরে) এখন ১৭ লক্ষ। অন্য সাক্ষাৎকারে আপনারা জানবেন যে চীন তিব্বতের কয়েকটি অংশ তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, যেমন দালাই লামার জন্ম জেলা 'আমদো' অথবা তিব্বতি বিদ্রোহী সৈন্যদের এলাকা খাম্পা, প্রথমটি তিব্বতের উত্তরপূর্বে, দ্বিতীয়টি পূর্বে।

এই তেনজিং জিয়াতসো (দালাই লামা) একটা সমঝোতার আশায় ছিলেন প্রায় এক বছর। তারপর এলেন ভারত দর্শনে পঞ্চেন লামার সঙ্গে। তারপর ইতিহাস মোড় নিল। ১৯৫৯ সাল, মারচ মাস। লাসা ও অন্যান্য স্থানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান খাম্পা বিদ্রোহীদের পরাজয় এবং দালাই লামা ১৭ মারচ বাধ্য হয়ে চলে এলেন ভারতে, তদানীন্তন নেফা অঞ্চলের তাওয়াং হয়ে আসামে, অবশেষে দিললিতে। তখন সঙ্গে ছিল কয়েক হাজার সশস্ত্র প্রহরী। সমস্ত প্রধানদের সঙ্গে এনে ১৯৬১ সালে তিনি স্থাপনা করলেন নির্বাসিত তিব্বত সরকার হিমাচল প্রদেশের হিমালয় ধরমশালায়।

ধরমশালায় নির্বাসিত তিব্বতি সরকারের সেনট্রাল সেকরেটারিয়েটে এলে বোঝা যাবে না যে, ভারতে আছি। ভারী আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, একটা বিশাল দেশের স্বাধীন সরকারের পাশাপাশি আর একটা ছোট্ট সরকার চলছে। কী নেই এই নির্বাসিত সরকারের, ক্যাবিনেট, বিধানসভা, বিভিন্ন মন্ত্রীদের কার্যালয়, বিশাল গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, মন্ত্রী ও সরকারি কর্মীদের বাসভবন এ ছাড়া আছে সিকিউরিটি অফিস, ইনফরমেশন অফিস।

ভাবতে নির্বাসিত তিব্বতি সরকারের ক্যাবিনেটকে বলে কাশাগ (Kashag)। ক্যাবিনেট সদস্য বা মন্ত্রীদের বলা হয় ক্যালোন (Kalon)। ক্যাবিনেটের সদস্য বা মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন দালাই লামা নিজে। তিব্বতি প্রশাসনে কাশাগই হল সর্বোচ্চ। দালাই লামার অনুমতি ক্রমে কাশাগ বা ক্যাবিনেট যে কোন রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ১৯৮০ সালের পর থেকে কাশাগের অধিবেশন প্রতি কাজের দিনই বসে। প্রতিদিন বসার উদ্দেশ্য বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এবং প্রশাসনকে আরো সচল রাখার জন্য বেশি সময় দেওয়া। কাশাগের সদস্য সংখ্যা চার। অর্থাৎ তিব্বতি সরকারের মাত্র চারজন

এই বছরেই (১৯৮৩) মার্চ মাসে দালাই লামা তাঁর মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় যে চারজন মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে তিনি নতুন চারজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ হলেন জাচেন থুবতেন নাম গিয়েল (Juchen Thubten Nam Gyel)। ইনিই বর্তমান মন্ত্রিসভার নেতা। আর তিনজন হলেন, তেনজিং গেছে তেথং (Tenzin Geyche Tethong) ইনি বর্তমান স্বাস্থ্য ও তথ্য দফতরের মন্ত্রী। লবসং ধারগে (Lobsong DharGey)। ইনি বর্তমানে পালজোর (Paljor) বা অর্থ দফতরের মন্ত্রী। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী। এ ছাড়া নবনিযুক্ত মন্ত্রী হয়েছেন তাশি ওয়াংদু (Tashi Wangdu)। ইনি বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। দালাই লামা সরকারের বর্তমানে এই চার মন্ত্রী যেসব দফতরের ভার নিয়েছেন সেই সব দফতরকে তিব্বতি প্রশাসনে বলা হয় কাউনসিল। যেমন কাউনসিল ফর হোম, কাউনসিল ফর পালজোর (Finance) ইত্যাদি। দালাই লামা মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজাবার আগে যে সারকুলার দেন তাতে বলা হয়, বিদায়ী চার মন্ত্রী তাদের বয়স অধিক হবার জন্য অবসর গ্রহণ করলেন।

ভারতে আশ্রিত তিব্বতি সরকারের বিধানসভার নাম Assembly of Tibetan People's Deputies. একে ১৯৬০ সালের আগে বলা হত কমিশন অব টিবেটান পিপলস ডেপুটিস। ১৯৮২ সালের আগে বিধাসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭। ১৯৮২-র দোসরা সেপটেমবর বিধানসভার নির্বাচনের আগে দালাই লামা সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ১১ করেছেন (প্রশাসনে অর্থব্যয় সংকুলানের জন্য)। তিব্বতকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় যেমন, Domed (Amdo), Dotoed (Kham), U—Tsong (Central Tibet)। এই প্রত্যেক অঞ্চল থেকে দুজন করে নির্বাচিত সদস্যকে বিধানসভায় নেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচটি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে একজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি বিধানসভায় আসেন। বর্তমান বিধানসভায় যে পাঁচটি ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন সেগুলি হল, Nyingma, Kagyud, Sakya, Geluk, Bon. বিধানসভার সদস্যরাই চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

২৫ বছরের এবং তার ঊর্ধ্বে যে কোন মহিলা এবং পুরুষ নির্বাচনে প্রার্থী পদে দাঁড়াতে পারেন। ভোটাধিকারের বয়স হল ১৮। বিধান সভার সদস্যদের মূল কাজ হল প্রশাসনের প্রতি জনগণকে বিশ্বস্ত রাখা। বিধানসভার সদস্যরা নিজেদের নির্বাচন কেন্দ্রে ঘুরে জনগণের দুঃখ, বক্তব্য সর্বোচ্চ প্রশাসন কাশাগে জানান অর্থাৎ বিধানসভা হল প্রশাসন ও জনগণের যোগাযোগের মাধ্যম।

বিধানসভার নির্বাচনের জন্য দালাই লামা কাশাগের মাধ্যমে পাঁচ সদস্যের একটা ইলেকশন কমিটি গঠন করেন। এই ইলেকশন কমিটি আবার ভারতে এবং বিদেশে যেখানে যেখানে তিব্বতি রিফিউজি সেটলমেনট আছে, সেখানে নির্বাচনের শাখা কমিটি গঠন করেন। ধরমশালার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি এইসব শাখা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচনের পর প্রত্যেক সেটলমেনটের শাখা কমিটি তার ফলাফল কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানিয়ে দেয়।

তিব্বতি প্রশাসনে সর্বোচ্চ পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হলেন দালাই লামা। যাকে হিজ হোলিনেস বলে সম্বোধন করাই বৌদ্ধ ধর্মের রীতি। কারণ তিনিই তিব্বতি ধর্মের গুরু।

এ ছাড়া প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক এরূপ মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, সহসচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র ক্লারক, জুনিয়র ক্লারক, পিয়ন, ড্রাইভার ইত্যাদি। সরকারি কাজে পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয়। যেমন তিব্বতি, ইংরেজি ভাষায় লিখিত পরীক্ষা। এ ছাড়া অংক এবং হিসেব শাস্ত্রে বিশেষ পরীক্ষা। অবশ্য সহ সচিব পদ পর্যন্ত সব কিছুই নিয়োগ করেন দালাই লামা তার মন্ত্রিসভার মাধ্যমে। এ ছাড়া নিচের সব পদের নিয়োগ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। পদ অনুযায়ী মাসিক বেতনের পার্থক্য নাকি খুব বেশি নয়। একজন সচিব পান মাসে ৪৫১ টাকা ২০ পয়সা। এ ছাড়া বিশেষ শর্তকরা হিসেবে প্রত্যেক সরকারি কর্মীর অবসর কালীন ভাতাও আছে। যেমন সচিব মাসে অবসরভাতা পান ১৪১ টাকা। প্রত্যেক কর্মী এবং তাঁর পরিবারের থাকা খাওয়া সরকারি ব্যবস্থায় হয়। যদিও খাওয়া বাবদ লাগে মাসে ১৩০ টাকা। সরকারি মেস ব্যবস্থায় খাওয়া হয়। পরিবারের পুরুষ মহিলা সকলেই কাজ করেন ফলে অর্থাভাব হয় না।

সারা পৃথিবী জুড়ে দালাই লামার কার্যালয় ছড়িয়ে আছে। সেই সব কার্যালয়ে দালাই লামার প্রতিনিধি বিদেশে বসবাসকারী তিব্বতি রিফিউজিদের দেখা শোনা করেন। যেমন দালাই লামার কার্যালয় আছে নিউ ইয়রক, সুইজারল্যানড, জাপানের টোকিও, নেপালের কাঠমাণ্ডুতে, ভারতের দিল্লিতে। এই সব কার্যালয়ে প্রতিনিধিরা হেডকোয়ার্টার ধরমশালার সংগে সেখানকার যোগাযোগ রক্ষাকারী।

ধরমশালায় এক বিশাল গ্রন্থাগার আছে। যেখানে ২২,০০০-এর ওপর তিব্বতি পুঁথি আছে। এ ছাড়া আছে বৌদ্ধ দর্শন, ধর্ম, বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংক্রান্ত বই এবং গবেষণাপত্র। এ ছাড়া তিব্বত ও তিব্বতিদের ওপরও গবেষণাপত্র গ্রন্থাগারে সংগ্রহ আছে। গ্রন্থাগারের নাম লাইব্রেরি অব টিবেটান ওয়ারকস অ্যানড আরকাইভস। প্রতিবছর পাঁচ জন ছাত্রকে স্কলারশিপ দেওয়া হয় বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মের ওপর গবেষণা বা পড়াশুনা করার জন্য। এর জন্য এই গ্রন্থাগারের ৯৯ হাজার ৫০০ টাকার একটা স্কিম চালু আছে। এ ছাড়া সিডনি, পশ্চিম জারমানি, ওয়াশিংটন, জাপান এবং ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী থেকে স্কলারশিপ নিয়ে প্রচুর ছেলে মেয়ে এখানে গবেষণা করতে আসেন। গ্রন্থাগার চত্বরেই ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা আছে। □

খগেন দে সরকার ও তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

বাস্তব পরিবেশে আমার চীনে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না : দালাই লামা

ধরমশালায় দালাই লামার একান্ত সাক্ষাৎকার পাওয়া সহজ নয়। তার কারণ দালাই লামার কর্মসূচির মধ্যে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের অবকাশ কম। ও ব্যাপারটা সেরে নেন তাঁর তথ্যমন্ত্রী। কিন্তু পরিবর্তনকে সাক্ষাৎকার দিলেন পূজ্যপাদ দালাই লামা। তাঁর সংগে দেখা করতে হয় কড়া সিকিওরিটি পেরিয়ে। মেটাল ডিটেকটর দিয়ে তন্ন তন্ন করে সারচ করা হয় দর্শনার্থীদের। সমস্ত কিছু আনুষ্ঠানিক পর্ব সেরে আমরা এসে পৌঁছলাম দালাই লামার ঘরে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য দালাই লামা চীনে ফিরে যাবেন বলে এখন খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেদিন দালাই লামা আমাদের বলেন, তিনি চীনে ফিরে যাচ্ছেন না।

তাঁর একান্ত সচিব ও সহ-সচিব আমাদের আহ্বান করলেন আসতে, দালাই লামার কনিষ্ঠ ভগ্নী সাক্ষাৎকার করে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দুজনকে দু হাত দিয়ে হাত ধরে অভ্যর্থনা জানালেন। বলেছিলাম : আমরা বাঙালি সাংবাদিক, আমাদের সাপ্তাহিক কাগজ 'পরিবর্তন'। বাঙালিদের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে আপনাকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ 'প্রণাম'। হাতজোড় করে আমাদের প্রণাম নিলেন।

আমরা বসলাম সোফায়। তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যস্ত তার ক্যামেরা আর টেপ রেকরডার নিয়ে। আমাকে দালাই লামা ইংগিত করে জানালেন, তাঁর পাশে বসতে, হয়ত আমার মাথায় সাদা চুলের আধিক্য দেখে। তাঁর পাশেই বসলাম। তরুণ টেপ রেকরডার চালিয়ে দিয়ে একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল ক্যামেরা নিয়ে।

ঐ ঘরে লক্ষ্য করার মত মাত্র একটি জিনিস। গৌতম বুদ্ধের একটি প্রতিকৃতি দালাই লামার ডান দিকে। অন্য সমস্ত সরঞ্জাম সাদাসিধে, সহজ সরল, ঐ একটি বুদ্ধ মূর্তি ছাড়া।

অমায়িকভাবে হেসে আমাদের আপন করে নিলেন দালাই লামা এক মুহূর্তে, ৬০ লক্ষ তিব্বতিদের একমাত্র প্রতিনিধি ভারতের মাটিতে ঐ ধরমশালায়।

দালাই লামা ভাল ইংরেজি বলেন ও জানেন। উচ্চারণ খুব ভাল। আমাদের প্রশ্নোত্তর হল ইংরেজিতেই স্বভাবত। মাঝে মধ্যে দু একবার থেমে ওঁর সচিবদের সংগে তিব্বতি ভাষায় কথা বলে সঠিক ইংরেজি কথাটা বলছিলেন। কেননা, উনি যা বলবেন তার প্রতিক্রিয়া চীন, ভারত ও বিশ্বে হবে।

আমরা জানালাম ডঃ স্বামী কী বলেছেন পরিবর্তন-এর সাক্ষাৎকারে। তিব্বতবাসীরা আপনাকে ফিরে পেতে উদগ্রীব। চীন সরকারও তাই চায়। ডঃ স্বামী জেনেছেন যে আপনার 'দালাই লামা'র পদ ঠিক থাকবে, এমনকি আপনাকে চীনের সংসদের উপ-সভাপতি পদেও অধিষ্ঠিত করতে পারে। তিব্বতে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ নাকি এখন খুব ভাল। যাবেন কি

দালাই লামা : (খোলা মনে উচ্চ হাস্য) আমার মনে হয় না পরিবেশ খুব ভাল, যদিও সত্য যে গত কয়েক বছর যাবৎ তিব্বতের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পরিবেশ এখনও সন্তোষজনক নয়। তিব্বত থেকে আমাকে অনেকে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে জানায় যে তারা যথাশীঘ্র সম্ভব আমাকে ফিরে পেতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, কিন্তু বর্তমান পরিবেশে আমার ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। এমনকি কয়েকজন চৈনিক ছাত্র, যারা চীনের সরকারি সহায়তায় বিদেশে পড়াশোনা করছে, তাদের মধ্যে অনেকে আমাকে লিখেছে যে আমার পক্ষে এখন তিব্বতে ফিরে না যাওয়াই উচিত। 'I should not return in the present circumstances'

পরিবর্তন : ডঃ স্বামী বলেছেন যে তিব্বতের ১৭ লক্ষ অধিবাসী, ১২ লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় স্বাধীনতা পাওয়ার বাস্তবতা নেই, সম্ভব নয়।

দালাই লামা : বাস্তবে (তিব্বতের) জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ। চীন পরিকল্পিতভাবে তিব্বতকে ভাগ করেছে। (জানলাম তথ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যে, তিব্বতের আমদো ও খামপা অঞ্চল চীনের মতে তিব্বতের অংশ নয়, নির্বাসিত তিব্বত সরকার তা মানেন না)।

আমি বলি কি, তিব্বতের ভবিষ্যৎ - যে কোন জনগোষ্ঠী কি মানব গোষ্ঠী ('human community'), যাদের একটা পৃথক পরিচয়, সত্ত্বা আছে, তাদের নিহিত অধিকার আছে তাদের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করার। তাদের আছে পৃথক কৃষ্টি, সত্ত্বা - তারাই তাদের ভবিষ্যৎকে বেছে নেবেন। অন্যরা নয়। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর আছে এই নিহিত অধিকার। আছে।

পরিবর্তন : চীন দেশ আপনাকে দিতে চাইছে পদমর্যাদা, দালাই লামা হিসাবে এবং হয়ত চীন সংসদের উপ-সভাপতি হিসাবে। আপনি কী বলেন?

দালাই লামা : এসব কিছুর গুরুত্ব নেই। আমি গুরুত্ব দিই ৬০ লক্ষ তিব্বতিদের ওপর, কী করে হবে তাদের উপকার, তাই হল একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার নিজের ব্যক্তিগত বিষয়, আমার পদমর্যাদা, ইত্যাদির কোন গুরুত্ব নেই। নেই।

কিন্তু ভাববার কিছু আরো আছে এই সংগে। আমার ভাবনায় আছে : ৬০ লক্ষ তিব্বতি অধিবাসী এবং পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ জনগণের জন্য আমার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। (বলার সময়, ওঁর একটা mannerism ছিল, বারেবারে উনি বলতেন, 'You see', 'You see') আমাকে তাদের সকলের কথা মনে রাখতে হবে। (বেশ কয়েকবার পুনরুক্তি করলেন।)

পরিবর্তন : তাহলে আমরা জানলাম যে, তিব্বতের অধিবাসী ও পৃথিবীর বৌদ্ধ জনগণের কল্যাণে আপনি ফিরে যেতে পারেন তিব্বতে :

দালাই লামা : (কেশে, একটু সর্দি থেকে হয়ত কাশি হয়েছিল, বেশ কয়েকবার কেশেছেন)। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। (কিছুকাল আগে বৌদ্ধগয়ায় দালাই লামা বলেছিলেন যে, হয়ত ১৯৮৫ সালে তিনি চীন ও তিব্বত দর্শনে যেতে পারেন)।

আমরা আবার ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম ডঃ স্বামীর মন্তব্যে যে, তিব্বতবাসীরা স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। দালাই লামা তাঁর সচিবদের সংগে নিজের ভাষায় একটু আলোচনা করলেন। বললেন :

দালাই লামা : আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর অধিকার আছে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নির্ধারণ করার – তাদের নিজস্ব অধিকার।'

পরিবর্তন : আজ দুনিয়া এক ভবিষ্যৎ পারমাণবিক যুদ্ধের ও ধ্বংসের সম্মুখীন। বৌদ্ধ জগৎ এবং সংঘর্ষ-সম্মুখীন অন্যান্যদের জন্য আপনার বাণী কী? – Your message?

দালাই লামা : প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য সমগ্র মানবসমাজকে রক্ষা করা। আমাদের বৌদ্ধ জগৎ অনবরত প্রার্থনা করে আসছে এই জন্য। এতে আছে তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বাক্যটা শেষ না করে বললেন : দেখুন, বৌদ্ধ সম্প্রদায় দুনিয়ার সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু মাত্র প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নয় আজ। বাস্তবে আমাদের কাজ করতে হবে আমাদের প্রার্থনাকে বাস্তবায়িত করতে। আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিশ্ব-শান্তি। তার জন্য যা কিছু আমরা করতে পারি।

কিন্তু ওই শান্তি আসবে আমাদের নিজেদের অভ্যন্তর থেকে, আমাদের হৃদয় থেকে। শুধু বিশ্ব-শান্তির কথা মুখে আওড়ালেই হবে না। কাজ করতে হবে এবং প্রথমত প্রয়োজন, আমাদের নিজেদের মানসিক শান্তি। এবং ওরই মাধ্যমে আমরা তখন সক্ষম হব স্থায়ী বিশ্ব-শান্তির আদর্শে সহায়ক হতে।

পরিবর্তন : ভারত সরকার কি আপনাদের ঠিকমত সহায়তা দিচ্ছে?

দালাই লামা : আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যদিও রাজনৈতিক দিকে ভিন্ন মতামত আছে। কিন্তু ভারত সরকারের সংগে, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হৃদয়ের, আমাদের কত প্রাচীন ধর্ম-কৃষ্টি সম্বন্ধ। আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ গুরু-শিষ্যের।

পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। আমাদের কাঁধে দিলেন সাদা রঙের 'খাদা' (scarf)। □

সাক্ষাৎকার : খগেন দে সরকার

এক যৌবনময়ী নববধূ তার সমস্যার কথা শোনায় যৌবন মদমত্তাদের মুখগুলিকে, যেন ব্রণর দুর্ভাবনা থেকে বাঁচায়।

"যৌবনকাল এলে ব্রণ তো বেরিয়েই থাকে। তা পরিষ্কার করতে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবসময় ক্লিয়ারাসিল লাগান।"

"১৩ বছরের ছিলাম, আর তখন থেকেই মুখে ব্রণ বেরোতে শুরু করে…

কিন্তু আমি তার পরোয়াই করিনি—সেগুলি একটু বড় বড় হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই একদিন একটি ছেলে আমাকে দেখতে এল…

আর সে প্রথম দর্শনেই আমাকে অপছন্দ করল

আমি তো কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সামান্য কটা ব্রণ আমার এমন বাধা হয়ে দাঁড়াবে—ঐ কথাটি তখন আমি আমার এক প্রিয় বান্ধবী জয়াকে বললাম…

আর জয়ার কাছ থেকেই তখন ক্লিয়ারাসিল-এর পথ দেখলাম

তারপর আমি ক্লিয়ারাসিল, দিনে দুবার ক'রে লাগাতে শুরু করি—আর তা রোজ নিয়ম ক'রে লাগাতে থাকি। তারপর হয়েছে কি, হঠাৎ একদিন, আমার এক বান্ধবীর বাড়ীতে সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা—ছেলেটি তো দেখি আমার মুখ থেকে চোখই ফেরাতে পারে না!"

ক্লিয়ারাসিল ভ্যানিশিং মেডিকেশন আর ক্লিয়ারাসিল স্কিন কালার্ড মেডিকেশন—দুটিই অদ্ভুত তিনভাবে কাজ করে:

১। ব্রণর মুখ খোলে

২। ব্রণ পরিষ্কার করে

৩। ব্রণ শুকিয়ে দিয়ে সারিয়ে তোলে।

আর এখন আবার, ক্লিয়ারাসিল একটি নয়, দুটি!

একটি হ'ল আপনার চিরপরিচিত, ক্লিয়ারাসিল স্কিন কালার্ড মেডিকেশন, যা ব্রণ লুকিয়ে রাখে, আর তার সঙ্গে কাজও করতে থাকে…

আর অন্যটি হ'ল, নতুন ক্লিয়ারাসিল ভ্যানিশিং মেডিকেশন, যা ত্বকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে, বোঝা হয় দায়, তার সঙ্গে আবার প্রভাবও দেখায়। এগুলি হ'ল, সাজ বলতে সাজ, আবার ওষুধ বলতে ওষুধ!

ক্লিয়ারাসিল দিনে দুবার ক'রে লাগান

প্রথমে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তারপর পুরো মুখে ক্লিয়ারাসিল লাগান। ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগাবেন। ব্রণ সেরে গেলেও মাখতে থাকবেন, কারণ ক্লিয়ারাসিল ত্বকের বাড়তি তেল শুষে নিয়ে ব্রণ নিয়ন্ত্রণ করে।

Vanishing Formula
Clearasil
VANISHING MEDICATION

Clearasil

নতুন
ভ্যানিশিং মেডিকেশন

স্কিন
কালার্ড মেডিকেশন

ক্লিয়ারাসিল — বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM-8625-R BEN

তিব্বত স্বাধীন নয় – দালাই লামা চীনে ফিরে যেতে পারেন ঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী

লোকসভার সদস্য ও জনতা পারটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর সঙ্গে পরিবর্তনের প্রতিনিধি দেখা করেন তাঁর দিললির বাসভবনে, তাঁর তিব্বত সফরের ঠিক পরেই।

পরিবর্তন ঃ আপনি সম্প্রতি ঘুরে এলেন চীনদেশ ও তিব্বত, কয়েকটা বিবৃতিও দিয়েছেন। তিব্বত চীন-দালাই লামা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

স্বামী ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে তিব্বতিরা দালাই লামার প্রত্যাবর্তনের জন্য ও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি, প্রশ্ন হল : চীন সরকার কী চায়, তারা দালাই লামাকে ফিরে আসতে অনুমতি দেবে কিনা। চীনের একজন প্রভাবশালী উপ-প্রধানমন্ত্রী ওয়ান লি আমাকে বলেছেন যে, দালাই লামা ফিরে যেতে পারেন যেকোন সময় এবং চীন সরকার সব রকমের আশ্বাস দিচ্ছে। উনি বলেছেন, দালাই লামাকে আবার দেওয়া হবে 'দালাই লামা'র মর্যাদা। এবং উনি যদি আবার চীন কি তিব্বত ছেড়ে ফিরে যেতে চান (ভারতে) তিনি যেতে পারেন। চীন এই আশ্বাস দিচ্ছে।

কিন্তু একটা condition – দালাই লামাকে স্বীকার করতে হবে যে, তিব্বত চীন দেশেরই একটি অংশ। তাহলেই চীন তাঁকে গ্রহণ করবে।

পরিবর্তন ঃ অতঃপর? তিব্বতিরা দাবি করছে স্বাধীনতা, অথবা গণভোট তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থার জন্য। তার কী?

স্বামী ঃ আজ পৃথিবীর কোন সরকার তিব্বতকে স্বাধীন দেশ বলে মেনে নেয়নি। ভারত সরকারও মেনে নিয়েছে যে তিব্বত চীন দেশের একটি অংশ। তিব্বতের স্বাধীনতা কোন বাস্তব প্রস্তাব হতে পারে না। ("Not a practical possibility")। একটা এলাকা – ১৭ লক্ষ জনসংখ্যা, ১২ লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার – এরা কী করে হতে পারে সার্বভৌম স্বাধীন দেশ? কী করে হতে পারে যখন তার সীমান্ত প্রতিবেশী হল গিয়ে – চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত? (উনি ভুলে গেছেন, নেপাল এবং কিছু অংশ পাকিস্তান)। এমন এলাকা কী করে স্বাধীন থাকতে পারবে? সুতরাং, তিব্বতের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

হাঁ, আমার মতে তিব্বতে পরিস্থিতি এমন যে, দালাই লামা আজ ফিরে যেতে পারেন। এমনকি আমাকে বলা হয়েছে যে, ফিরে এলে ওঁকে চীনের পিপলস কংগ্রেসের (অর্থাৎ সংসদ) উপ-সভাপতি করা হতে পারে। আমার শোনা কথা, কোন সরকারি প্রস্তাব নয়। উনি ফিরে আসুন। যদি পছন্দ না হয় উনি আবার ভারতে ফিরে আসতে পারেন। কোন অসুবিধা নেই।

খগেন দে সরকার

ডঃ স্বামীর বক্তব্য ভুল ঃ তেনজিন গেচে

(প্রবাসী তিব্বতি সরকারের তথ্যমন্ত্রী)

ডঃ স্বামীর বক্তব্য সম্পর্কে আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাই। যে বিষয়ে ডঃ স্বামী তাঁর উত্তরে সবটা পরিষ্কার করে না বললেও একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা হল, ভারতে দালাই লামার উপস্থিতি নাকি ভারত চীন সম্পর্কের ক্ষতির খানিকটা কারণ।

একথা যেমন সম্পূর্ণ ভুল তেমনি আমরা তা বিশ্বাসও করি না। আচ্ছা ধরুন দালাই লামা তিব্বতে ফিরে গেলেন, তবেই কি ভারত এবং চীনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যে বিরোধ তা রাতারাতি মিটে যাবে? ১৯৬২ সালের যুদ্ধে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হয়ে যাবে? নাগাল্যান্ডে তারা যা করছে তাও দূর হবে? আমার মনে হয় না, দালাই লামার উপস্থিতিই ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষতির কারণ। এর পেছনে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে।

আবার মনে করুন চীন তিব্বত অধিকার করেনি। তবে তো আপনাদের আজ যে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা তা ভোগ করতে হত না। আপনাদের যে বিরাট পরিমাণ জমি চীন অধিগ্রহণ করে আছে, সে সমস্যাও থাকত না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সীমান্তে হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ করে রাখতে হত না। আজ যদি তিব্বতের রাজত্ব বজায় থাকত তবে এটুকু বলতে পারি যে, দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক থাকত।

তিব্বতিরা হিজ হোলিনেসকে কি ভীষণ শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন, ভারত থেকে তিব্বতে যে তিনজনের তিব্বতি প্রতিনিধি যায় তাঁদের নেতা ছিলেন হিজ হোলিনেস দালাই লামার বড় ভাই। প্রতিনিধি দলটি যখন লাসা (তিব্বতের রাজধানী) পৌঁছয় সেই সময় তিব্বতিরা দলের নেতা এবং দালাই লামার বড় ভাইয়ের গায়ের জ্যাকেটের কাপড় কেটে কেটে নেয় তাদের কাছে হিজ-হোলিনেসের পবিত্র স্মৃতি হিসেবে নিজেদের ঘরে রেখে দেবে বলে। এ ছাড়া প্রতিনিধি দলের তিনজনে চুল কাটবার জন্য তিব্বতি সেলুনে গেছিলেন তিব্বতিরা সেখান থেকে সেই চুল সংগ্রহ করে নেয় দালাই লামার পবিত্র স্মারক হিসেবে ঘরে রেখে দেবার জন্য। তিব্বতিরা প্রতিনিধি দলের তিনজনকেই অনুরোধ করে, তাঁদের ঘরে গিয়ে একবার আশীর্বাদ করার জন্য। প্রতিনিধি দল উত্তর দেয়, যেহেতু তাঁরা লামা নন, তাই আশীর্বাদ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিব্বতি নারী পুরুষ তা শোনেন না। তাঁরা বলেন, প্রতিনিধি দল দালাই লামার কাছ থেকে আসছেন, সেটুকুই যথেষ্ট। অবশেষে প্রতিনিধি দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ করতে বাধ্য হয়। □

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : লেখক

বাংলা জলসা শিল্প এখন রীতিমত সংকটের মুখে

কল্যাণবন্ধু মিত্র

বাংলা জলসা শিল্প এখন রীতিমত সংকটের মুখে। সংকটের একটি কারণ বাহ্যিক। হাঙ্গামার ভয়ে এখন কম জলসাই হয় মুক্তাঙ্গনে। প্রেক্ষাগৃহের চার দেওয়ালে বন্দী জলসা ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই ঘন ধন জলসা অনুষ্ঠানও কমে গিয়েছে — বড় বড় 'নাইট' বোম্বায়ের শিল্পীদের দখলে। এদের দাপটে আধুনিক বাংলা গান পৃষ্ঠপোষকও হারাচ্ছে প্রতিদিন। পরিবর্তনের পক্ষ থেকে এই সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে এক অনুসন্ধান চালানো হয়।

[illegible] কলকাতায় [illegible] উচ্চাঙ্গ সংগীতের [illegible] আসর [illegible] হয়। এই উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। যতীন্দ্রমোহন এবং সৌরীন্দ্রমোহন কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার জমিদার হরকুমার ঠাকুরের পুত্র। যতীন্দ্রমোহন সাহিত্য এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহিত্য [illegible] সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি বেশি পরিচিত। দেশীয় সংগীতের সংস্কার ও উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন।

ঐ সময়ে কলকাতায় একটি সংগীত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদেরা জলসা ও মহফিল উপলক্ষে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে থাকেন। এই সব জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিল ধ্রুপদ গান,' লিখেছেন প্রভাত কুমার গোস্বামী তাঁর 'ভারতীয় সংগীতের কথা' পুস্তকে। কলকাতা ছিল সংস্কৃতির কষ্টিপাথর। তাই এখান কার শ্রোতাদের দরবারে ছিল ভারতের প্রখ্যাত সংগীতগুণীদের নিত্য আনাগোনা। শাস্ত্রীয় সংগীতের সম্মেলনগুলির পাশাপাশি এখানেই প্রথম আধুনিক গানের রেকর্ডের, জনপ্রিয় শিল্পীদের গানের জলসার সূত্রপাত হয়েছিল।

দুর্গাপূজোর বিসর্জনের পর্ব শেষ হতে না হতেই সারা বাংলা জুড়ে শুরু হত আর এক উৎসব। পুরো শীতকালটা ছিল সে উৎসবের দখলে। শহর গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় সে কী উন্মাদনা! জলসাকে কে না ভালবাসত! সব জায়গায় জলসার নির্ধারিত দিনের প্রায় একমাস আগে থেকে শুরু হয়ে যেত তোড়জোড়। খোলা আকাশের নিচে সুরে সুরে ভরে ওঠা সে রাতগুলো অনেক দিন বিদায় নিয়েছে। জলসা হারিয়েছে তার পুরনো বৈশিষ্ট্য। কলকাতায় সে এখন চার দেওয়ালের ভেতর বন্দী। সংখ্যাতেও আগের তুলনায় অনেক কম। মফস্বলের দিকেও একই ছবি।

বাংলার জলসার সংগে আজীবন জড়িয়ে আছেন বর্ষীয়ান কৌতুকাভিনেতা অজিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৯৩০ সালের ওদিকের কথা মনে আনতে পারলেন না। তখন কলকাতায় জলসা হত কলেজ স্ট্রিটের ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট, অ্যালবার্ট হল (এখনকার কফি হাউস), ওয়াই এম সি এ র ওভারটুন হল, মহাবোধি সোসাইটি এবং স্টুডেন্টস হলে। পুজো মণ্ডপে এবং বিভিন্ন কলেজেও জলসা হত। সাহায্য সংগ্রহের জন্য জলসা হত প্রায়ই। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত 'বিরাট জলসা এক দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের সাহায্যার্থে নৃত্যগীত বাদ্যাদির অফুরন্ত আয়োজন।' এতে থাকত গান, প্রাচ্য নৃত্য, ভাব নৃত্য, যন্ত্র বাদ্য, আবৃত্তি, কমিক, স্বরানুকরণ, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কাঁচভক্ষণ। টিকিট চার আনা, আট আনা, এক টাকা। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইকনমিক সোসাইটির প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আশুতোষ হলে ১৯৩৪ সালের ১৮ এপ্রিল বিচিত্রানুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন হরিপদ রায়, অনিল বাগচি, কে এল সায়গল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল। হাস্যকৌতুকে ননী দাশগুপ্ত এবং অজিত চট্টোপাধ্যায়। যন্ত্রসংগীতে খগেন দে ও নগেন দে। ঐ বছরের ২২ সেপটেম্বর ওভারটুন হলে অনুষ্ঠিত আর একটি জলসার শিল্পী তালিকায় ছিলেন : হিন্দুস্থানী উচ্চসংগীত — ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, যামিনী গংগোপাধ্যায়, রতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীনদাস মতিলাল, বিভূতিভূষণ দত্ত, সত্যেন্দ্র ঘোষাল, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রমা বিশ্বাস, সুষমা দে, বিভাস দেবী, সবিতা গুপ্তা, পুষ্পবানী ঘোষ (ইনি 'ল্যাবনচুষ পুষ্প' নামে পরিচিতা ছিলেন)। আধুনিক বাংলা গান — শচীন দেব বর্মণ, জ্ঞান দত্ত, নরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জীবন উপাধ্যায়, সুধীর বন্দোপাধ্যায়, অনিতা বোস, অমিয়া বোস, লতিকা পাল, আশালতা মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রসংগীত — বাণীকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোপাল লাহিড়ী, মুস্তাক আলি খাঁ, খগেন দে ও নগেন দে। হাস্যকৌতুকে ননী দাশগুপ্ত ও অজিত চট্টোপাধ্যায়। টিকিটের হার পাঁচ টাকা, তিন টাকা, দু টাকা, এক টাকা, আট আনা। •

আধুনিক গানের জলসা যখন শহরের নিয়মিত উৎসবে পরিণত হল তখন পাড়ায় পাড়ায় প্যানডেল বেঁধে অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চালু হয়ে গেল। তখন খ্যাতনামা শিল্পীরা গান গাইতেন বিনা পারিশ্রমিকে। উদ্যোক্তারা তাঁদের যাতায়াতের খরচ দিতেন, জলযোগে আপ্যায়িত করতেন। একটা ফুলের মালা এবং একটা সম্মান উপহার তুলে দেওয়া হত শিল্পীর হাতে।

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে শিল্পীরা উপলব্ধি করলেন রেকরড রেডিও ছাড়া গানের জলসাও তাঁদের উপার্জনের আর একটা দিক হতে পারে। তখন থেকে তাঁরা পারিশ্রমিক নিতে শুরু করলেন। অজিত চট্টোপাধ্যায় জানালেন সে সময় শচীন দেব বর্মণ, কে সি দে, পংকজ মল্লিকের মত প্রথম সারির শিল্পীরা কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা নিতেন।

বসুশ্রীর বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মন্টু বসু বললেন — ১৯৫০-এর

নববর্ষ অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন পনের কুড়ি জন। টিকিট বিক্রি হয়েছিল সাতশ টাকার মত। সব খরচ বাদ দিয়ে লাভ হয়েছিল সত্তর-আশি টাকা।

ষাটের দশকে আধুনিক গানের জলসা বহু লোকের উপার্জনের একটা ব্যাপক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে একটা প্রকৃত 'ইনডাসট্রি' হয়ে ওঠে।

মুক্তমঞ্চ জলসার আয়োজন করায় কম ঝক্কি নেই। রাজ্যের ঝক্কাট কাঁধে বয়ে বেড়াতে হয় উদ্যোক্তা-দের। কথা হচ্ছিল বাগনান ইয়ুথ ক্লাবের তপন পালের সংগে। জলসা করতে গেলে প্রাথমিক খরচটা দিতে হয় উদ্যোক্তাদেরই। বড় শিল্পীদের বুক করা মফস্বলের উদ্যোক্তাদের পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। তাঁরা একটা অগ্রিম নিয়ে সম্মতিপত্র লিখে দেন। এর পর ডেকরেটর ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপকদের অগ্রিম মিটিয়ে তাদের সম্মতিপত্র নিতে হয়। যার জমির ওপর জলসা হবে তিনিও একটা 'নো অবজেকশন' সারটিফিকেট দেবেন। এই সব সম্মতিপত্র নিয়ে আবেদন করতে হবে আঞ্চলিক থানা এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের কাছে। কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা করপোরেশনের কাছে এবং ফায়ার ব্রিগেডের কাছে।

মহকুমা প্রশাসনকে জানাতে হবে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য – অর্থাৎ এতে টিকিট বিক্রি করা হবে কিনা – হলে কী উদ্দেশ্যে, কোন জনকল্যাণকর কাজে না নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। এই সংগে ওখানে দাখিল করতে হবে অনুষ্ঠান স্থলের নকশা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রবেশদ্বার, শৌচাগারের বন্দোবস্ত, আগুন নেভানর কাজের পক্ষে পর্যাপ্ত সুবিধা ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখবেন তারা।

একটি মহকুমা প্রশাসনের একজন কর্মী জানালেন – দর্শকপিছু চার থেকে পাঁচ বর্গফুট জায়গা রাখার কথা। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়ই এর অন্যথা হয়। কারণ উদ্যোক্তারা কখনই বিক্রয়যোগ্য টিকিটের সঠিক সংখ্যা জানান না।

পঁচাত্তর পয়সার কোরট ফি লাগিয়ে লাইসেনসের জন্য আবেদন করতে হয়। লাইসেনস ফি লাগে পাঁচ টাকা। মোট যত টাকার টিকিট বিক্রি হবে তার দশ শতাংশ মূল্য ফেরৎযোগ্য সাবধানী জমা দিতে হয়। কিন্তু একশোটা অনুষ্ঠানের মধ্যে তিরিশটার উদ্যোক্তারা এটা ফেরৎ নিতে আসেন কিনা সন্দেহ। কারণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ অনুষ্ঠানের সব আয়ব্যয়ের হিসাব মহকুমা প্রশাসনের অফিসে দাখিল করতে হয়। সে হিসাব সন্দেহমুক্ত ও যথাযথ বলে বিবেচিত হলে তবেই জমা টাকা ফেরৎ দেবার প্রশ্ন। তাই যত দিন যাচ্ছে রাজ্য সরকারের আর ডি ৮৪৩ নং খাতটি মোটা হয়ে উঠছে। কয়েকজন উদ্যোক্তা বললেন – ইনকাম ট্যাকস এড়ানর জন্য কোন শিল্পীই পুরো পারিশ্রমিকের রসিদ দেন না। তাই অতগুলো টাকার হিসেবে কিছু এদিক ওদিক করে লিখতেই হয়।

কোন অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে হলে আর এক দফা ঝামেলা পোয়াতে হয় উদ্যোক্তাদের। পরবর্তী দিনটিতে সব শিল্পীদের পাওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে। লাইসেনস রিভ্যালিডেট করাতে হয়।

উদ্যোক্তারা নিজেদের পকেট থেকে যে টাকা দেন তা প্রায়ই তাদের কাছে ফেরৎ আসে না। টিকিট বিক্রি হয় সাত আট দিন ধরে। অনুষ্ঠানের দিনই সব থেকে বেশি বিক্রি হয়। সুতরাং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানা যায় না ফাংশান মার খাবে কিনা! কাছাকাছি অঞ্চলে একই দিনে দুটি বা তার বেশি অনুষ্ঠান হলে শ্রোতার সংখ্যা প্রত্যাশিত মাত্রার অনেক নিচে নেমে যায়। শ্রোতাদের সংখ্যা যাই হোক, শিল্পীদের বাকি টাকা অনুষ্ঠানের তিন চারদিন আগে মিটিয়ে দিয়ে আসতে হয়। নইলে তাঁরা আসবেন না। 'ভাল টিকিট বিক্রি হয়নি' এই অজুহাতে বকেয়া প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর শিল্পীরা অনেক দিন এই ব্যবস্থা চালু করেছেন।

উত্তরপাড়া আইডিয়াল সোসাইটি অব ইউথ ক্লাবের সম্পাদক কাশী ব্যানারজি বললেন আগে দু

অজিত চাটার্জি

হাজার টাকায় সব হয়ে যেত। আর এখন স্টেজ মাইক্রোফোন লাইটে কুড়ি হাজার, পাবলিসিটি পাঁচ হাজার আর শিল্পী মিনিমাম তিরিশ হাজার। বলুন তো মধ্যবিত্ত শ্রোতাদের কাছে কী করে বেশি টাকা চাইব এদিকে শিল্পীদেরও ধারণা আমরা এসব ফাংশন করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছি। এক একজন শিল্পীর কাছে যা ব্যবহার পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে পরের বছর থেকে আর এসব করব না। অন্যদিকে ইমপ্রেসারিওরা অনেকের রেট বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তো ওদের মাধ্যম ছাড়া কথাই বলা যায় না শিল্পীর সংগে।

১৯৪০ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত বাংলা গানের জলসার স্বর্ণযুগ গেছে। তারপর একবার ভারত চীন আর একবার ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ এই শিল্পের গতি অনেকটা রুদ্ধ করে দেয়।

প্রথম দিকের জলসার পরিবেশ সত্যি ভোলা যায় না। আধুনিক, পল্লীগীতি, প্যারোডি, হাস্যকৌতুক, মূকাভিনয়, অরকেসট্রাতে মধ্যরাত পর্যন্ত জমজমাট হয়ে থাকত জলসা স্থলগুলি। কোন কোন জায়গায় রাত ভোর হয়ে যেত।

গানের সংগে হারমোনিয়াম তবলার বেশি কিছু বাজত না। তাতেই আসর মাত হয়ে যেত। আর গায়কদের মধ্যে পূর্ণদাস বাউল ছাড়া কেউ নেচে নেচে গাইতেন না। এর পর একটা পরিবর্তন আনলেন বোমবের শিল্পীরা বাংলার জলসার মঞ্চে। অনেক শিল্পী বিলেত নয়, বোমবে ফেরৎ হয়ে এসে নামের পাশে ব্র্যাকেটে বোমবে লিখতে লাগলেন। বসে বসে গান করার দিন চলে গেল। একগাদা বাদ্যযন্ত্রের সংগে দাঁড়িয়ে হেলে দুলে গান শুরু হল। বোমবে বা আধা বোমবেদের কান্ডকারখানায় যারা এখনও বসে গাইছেন তাদের কেউ কেউ আর শুধু হারমোনিয়াম তবলার ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না। তাদেরও এদিকে ওদিকে একজোড়া গিটার, অ্যাকোরডিয়ান, খোল, কংগো, মিক্‌, মিক্‌ এফেক্ট। নইলে বাংলা গান জমছে না।

পরিবর্তন এল আর্থিক দিকেও। বোমবের শিল্পীরা প্রথম থেকেই সাংঘাতিক অংকের পারিশ্রমিক নিচ্ছিলেন। শোনা যায় তাদের এক একজন এখন পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর হাজার এমনকি এক লক্ষ টাকাও নিচ্ছেন। এদের সংগে সংগে বাংলার শিল্পীদের চাহিদা বেড়ে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই এখন তাদের অনেকেই তিন হাজার থেকে দশ হাজার অবধি নিচ্ছেন। আর বোমবেদের সংগে পাল্লা দিতে বাংলার শিল্পীদের ঐ একগাদা 'হাত' এর জন্য খরচ অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই এখনকার চারজন শিল্পীকে নিয়ে অনুষ্ঠান করতে শুধু শিল্পীদের জন্যই লাগবে কম করে বারো হাজার টাকা, তার ওপর থাকছে হল ভাড়া, মাইক্রোফোন ইত্যাদি আনুষংগিক খরচ। তাই এখন গান-বাজনার অনুষ্ঠান সাধারণ উদ্যোক্তাদের তুলনায় অনেক বেশি করছেন বড় কমারশিয়াল ফারম ও ব্যাংকের কর্মীরা, যারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মোটা ডোনেশন পেয়ে থাকেন। সংগীত শিল্পীদের অত অরকেসট্রা শুনে আলাদা ভাবে অরকেসট্রা বাদনের চাহিদা কমে গেলেও ভি বালসারার চাহিদা রয়েছে যথেষ্টই। হিমাংশু বিশ্বাস এখন পুরোপুরি শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে চলে গেছেন। বোমবের শিল্পীদের চাহিদা জলসা জগতে সৃষ্টি করল 'কারবন কপি'দের। কিশোরকুমার ও লতা মঙ্গেশকরের গান গেয়ে বিখ্যাত হয়ে গেলেন অনেকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলা নকল করে মঞ্চে এসেছেন প্রায়

আধডজন শিল্পী। পরবর্তীকালে মহম্মদ রফি, আশা ভোঁশলে এমনকি উষা উথুপের কারবন কপিও এসে গেছে।

একজন প্রখ্যাত শিল্পী বলেছিলেন – হোটেল গায়ক-গায়িকারা এই সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করে এখন মঞ্চের শিল্পী হয়ে উঠেছেন। সংগীতজগতের কারটুনিসট ব্যংগ-গীতির মৌলিক চিন্তাভাবনার স্রষ্টা দীপেন মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতে বললেন – শ্রোতাদের সাময়িক উত্তেজনাকে মূলধন করে এখন অনেকে আশা, লতা, কিশোর, রফি হয়ে মাত করে দিচ্ছেন। কিন্তু নকল কণ্ঠ চিরদিন আদর পায় না। যে ভদ্রমহিলা প্রথম লতা মংগেশকরের গলায় গান গাইতে এলেন তার নামটা মনে আছে তো? তিনি এখন কোথায়? নাম শুনতে পান? ওর মধ্যে চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় আর মীনা মুখোপাধ্যায় সংগীত জগতে রয়ে গেলেন নিজেদের প্রতিভার জোরে, লতা-কণ্ঠী বলে নয়।

সত্যি বলুন তো, ওরা কি গান করে? বাজনার ঠেলাতেই তো অস্থির। তার ওপর শিল্পীর হাতে আবার এক মজার মাইক্রোফোন, তাতে স্বর মোটা, সরু, ঢেউ খেলান হয় কেমন! লোকে ওতেই তাজ্জব হয়। শুনতে এসেছে গান। জিগ্যেস করুন, কী রে অমুকের গান কেমন শুনলি? সে উত্তর দেবে, ওঃ কী দারুণ ডানস দিল গুরু! কিংবা, সে কী লাইট, কী বলব! গানের জলসায় গানই আউট – আলো, নাচ আর ইকো-চেমবারই সব। বুঝুন ব্যাপার টা!

দীপেন মুখোপাধ্যায়

তবু হিন্দি ফিলমি গানকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে প্রতিবছরই নতুন নতুন শিল্পী আসছেন। এমন একজন শিল্পী হলেন শম্পা চ্যাটারজি। ইকো সাউনড সিসটেম আর জনা সাতেক হ্যানডস নিয়ে মঞ্চে ওঠেন শম্পা। তিনি বললেন – শ্রোতারা বাংলা গান শুনতে চান না। তাদের চাহিদাটাই বড় কথা। উচ্চাংগ সংগীতের তালিম বজায় রেখে নিজের হিন্দি উচ্চারণ, উর্দু উচ্চারণ আরও নিখুঁত করার দিকে নজর দিয়েছেন তিনি। হিন্দি গান গেয়ে স্থায়ী যশ পাওয়া যাবে না এ কথা স্বীকার করেন তিনি। তবে জনপ্রিয়তা অর্জনে-এর বিকল্প কোন পথ নেই বলে শম্পার বিশ্বাস।

শম্পা চ্যাটারজি

একজন জনপ্রিয় শিল্পী বললেন বোমবের শিল্পীদের প্রভাবের সংগে হিন্দি গানের জনপ্রিয়তার আর একটা কারণও রয়েছে। সেটা হল পশ্চিমবংগ তথা কলকাতায় অবাঙালি বাসিন্দাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। এতে হিন্দিগানের পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। এরই সংগে আমাদের সংস্কৃতিরও পাশাপাশি চলা উচিত ছিল। কিন্তু কিছু মেরুদণ্ডহীন সংগীত পরিচালকের জন্য আজ বাংলা গান অনেক পিছিয়ে পড়েছে। ঐ সব সংগীতজ্ঞরা প্রযোজকের কথায় ওঠেন বসেন। নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকিয়ে দিয়েছেন বহুদিন।

১৯৪৫ সাল থেকে অনুষ্ঠান পরিচলনা করছি। বলছিলেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। একটা বিয়েবাড়ির ঝক্কাট সামলানর থেকে শক্ত কাজ জলসা পরিচালনা। শিল্পীদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা, বিশ্রামকক্ষের ব্যবস্থাপনা এবং মঞ্চ পরিচালনা তিন দিক এক হাতে সামলাতে হয়। এতে দরকাব হয় একদল পরিশ্রমী স্বেচ্ছাসেবকের নইলে ফাংশন একেবারে ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

সে যুগে পনের-ষোলজন শিল্পী থাকতেন, কিন্তু সারারাত অনুষ্ঠান হত না। রাত বারোটা-একটা, বড় জোর দুটো অবধি। কারণ সাধারণ শিল্পীরা কুড়ি মিনিট, বড়বা আধ ঘণ্টার বেশি গাইতেন না। শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ছিল। তারা নিজেরাই ঠিক করে নিতেন কার পরে কে গাইবেন। এখন অনেক সময় ঐ নিয়েই ওদের মধ্যে অশান্তি, ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়। শিল্পী অনুপ ঘোষালও একথা স্বীকার করলেন।

শিল্পীদের অনেক অভিযোগ উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে। অনেক জায়গায় শিল্পীকে নিয়ে আসা হয় সন্ধে ছটায়, কারণ কথা আছে তিনি সাতটা সাড়ে সাতটায় বসবেন কিন্তু তার পর থেকেই 'আর একটু দাদা, আপনাকে এখন দিলে সবাই চলে যাবে' এসব বলে তাঁকে মঞ্চে তোলা হল রাত দুটোয়। এতে শিল্পীকে স্বাস্থ্যের তথা কণ্ঠস্বরের ক্ষতিস্বীকার করতে হয়। গানের মেজাজও চলে যায়।

নির্মলা মিশ্র

উদ্যোক্তারা অনেক সময় কোন কোন শিল্পীর সংগে আদৌ যোগাযোগ না করেই তাদের নাম শিল্পী তালিকায় প্রকাশ করেন। পরে শিল্পী অসুস্থ ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হয়। এতে শিল্পীর সুনামের হানি হয়।

নির্মলা মিশ্র বললেন – একটা ফাংশন থেকে ফেরার পথে পিন্টু ভট্টাচার্যকে আর-একটা ফাংশনের দরজায় নামিয়ে দিতে গিয়ে শুনলাম পরবর্তী শিল্পীদের নামের তালিকায় আমার নামও ঘোষণা করা হচ্ছে। অথচ সেদিন ওখানে আমার যাবার কোন কথাই হয়নি। সোজা নেমে গিয়ে উদ্যোক্তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতেই ওরা তো বেসামাল।

আর এক জায়গায় বলা হয়েছিল নির্মলা মিশ্র মদ্যপান করে অসুস্থ। সেখানে আমার পরিচিত একটি মেয়ে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেই ঘোষণাকে চ্যালেনজ জানালে ক্ষুব্ধ শ্রোতারা প্যানডেলে আগুন লাগিয়ে দেন মিথ্যাভাষণের প্রতিবাদে।

গৌহাটিতে একটা অনুষ্ঠানে শুনলাম মঞ্চে বলা হচ্ছে ভি বালসারা টাকা নিয়েও আসেননি। আমি সঠিকভাবে জানতাম ওরা চুক্তিমত টাকা দিয়ে আসেননি তাঁকে। আমি সোজা মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে শ্রোতাদের সে কথা জানিয়ে দিলাম নিজের বিপদ তুচ্ছ করে।

অন্যান্য শিল্পীদের সংগে দ্বিজেনবাবুও বললেন – টাকা নিয়ে গাইতে যাইনি এরকম একবারও

ঘটেনি। বরং অনেক জায়গায় গাইবার পর বাকি প্রাপ্য টাকা পাইনি।

টাকা ঠিকমত মিটিয়ে দিলে শিল্পীরা আসবেনই। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যোগাযোগ কারীর অসাধুতার জন্যই।

এই সব কারণে কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষও অনেক কঠোর হয়েছেন। খুব সতর্কতার সংগে উদ্যোক্তাদের চরিত্র এবং আর্থিক সংগতি পরীক্ষা করে দেখা হয়। শিল্পীদেব সম্মতি পত্রের বিশুদ্ধতা যাচাই করতে বোমবাই পর্যন্ত দৌড়তে হয় গোয়েন্দা পুলিশদের।

মুক্তমঞ্চের জলসা একটা বড় বকমের ধাক্কা খেয়েছিল ১৯৬৯-এর ৬ এপরিল রাতে। ইয়ংস করনারের বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। টিকিট না পাওয়া, অবাঞ্ছিত লোকেদের চেয়ার দখল করে বসে থাকা, মাইক্রোফোনের ত্রুটি এবং মঞ্চের অব্যবস্থা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে একটা চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় অনুষ্ঠান স্থলে। কয়েকজন দর্শকের মৃত্যু হয় ছোটাছুটির সময়। একই সংগে একটা গুজব সারা ভারতকে তোলপাড় করে দেয় যে ঐ সুযোগে ওখানে মহিলাদের ওপর ব্যাপকহারে বলাৎকার করা হয় এবং ছেঁড়া শাড়ি, অন্তর্বাস লরি বোঝাই করে পাচার করা হয়।

মডারন ডেকরেটরের স্বত্বাধিকারী বিমল রায়চৌধুরী বললেন – ঐ মিথ্যে রটনাতেই জলসা শিল্প বেশ মার খেয়েছিল। ওখানে যদি কিছু ঘটে থাকে তার মাত্রা কলকাতার কোন সিনেমা শো ভাঙার পরের ঠেলাঠেলির থেকে বেশি কিছু ছিল না।

কলকাতার জলসায় গণ্ডগোল এর আগেও হয়েছিল হিন্দুস্থান পারকে। সেটা ১৯৫১ কি ৫২ হবে। বামবের স্টারদের দেখতে লোকে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ে অশান্তি বাধিয়েছিল।

ইডেনে রঞ্জি স্টেডিয়ামে বোধহয় ১৯৫৭তেই দর্শকরা কী একটা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে গানের মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এতে আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ওপেন এয়ার ফাংশনে আমাদের নিরাপত্তা কিছুই থাকে না। দু লক্ষ টাকার জিনিস ব্যবহার করে মঞ্চ তৈরি করি। লাভ থাকে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। একশো চেয়ারের দাম দু হাজার টাকা, তার জন্য একদিনের ভাড়া বড় জোর তিরিশ টাকা। টাকা না পাওয়াটাই একটা অনিশ্চয়তা, তার ওপর গোলমাল লুঠপাট হয়ে গেলে তো উদ্যোক্তাদের কারোকেই পাওয়া যাবে না।

খোলা অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবার জন্য যে প্রধান কারণগুলি দায়ী সেগুলির মধ্যে এক, নিরাপত্তার অভাব। দুই, প্যানডেল তৈরি করার খরচ, চেয়ার মাইক্রোফোনের ভাড়া বৃদ্ধি। তিন, খোলা জায়গার অভাব। কলকাতায় সব খোলা জায়গাগুলিতেই বাড়ি উঠে যাচ্ছে। পারকগুলোও বেশির ভাগ পাতালরেল আর সি এম ডি এ-র গুদামে পরিণত। রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, বিদ্যামন্দির, শিশির মঞ্চ প্রভৃতি হলগুলি পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে এবং ওখানে অনুষ্ঠান করার স্বভাবতই অনেক সুবিধে।

তবে এই হলগুলো শনি রবিবার পাওয়া খুব শক্ত। একটা অনুষ্ঠানে সাড়ে চার ঘণ্টার বেশি সময় পাওয়া যায় না। এতে শিল্পীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখার উৎপাত থেকে মুক্ত হলেও উদ্যোক্তারা অসুবিধেতে পড়েছেন। সময় এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য হলে বেশি সংখ্যায় শিল্পীদের নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। লোকে কিন্তু একসংগে অনেক শিল্পীর গান শুনতেই আগ্রহী। কাজেই বর্তমানে বাংলা গানের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ অনেকই কম। তুলনায় একক অনুষ্ঠানের চাহিদা বাড়ছে।

জলসা যতদিন চলবে ততদিন ইমপ্রেসারিওদের প্রয়োজন ফুরোবে না। বিয়েবাড়িতে রান্না করার ঝক্কি এড়াতে যেমন ক্যাটারার, জলসায় শিল্পীদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সামলাতে তেমনি ইমপ্রেসারিও। বারীন ধর, অজয় বিশ্বাসের পরে এই জগতে আর একটি নাম খুব প্রচলিত, তিনি হলেন 'তোচন'। তপন ঘোষ তার ডাক নামেই এই ক্ষেত্রে পরিচিত। ১৯৭৩ থেকে পেশাদার ইমপ্রেসারিও তোচন কলকাতা ও মফস্বল মিলিয়ে মোট ২৭৮টি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ইমপ্রেসারিওরা অনেক প্রতারণার কারণ হয়ে দাঁড়ান। আবার কোন কোন ইমপ্রেসারিওদের নামে অভিযোগ আছে মনের মত শিল্পীদল গড়ে তোলার এবং অন্য শিল্পীদের সুনামের বিপরীতে প্রচার চালানর।

প্রেক্ষাগৃহের ফাংশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় বসুশ্রী সিনেমার মন্টু বসুর। তিনি স্বাধীনতাপূর্ব যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের সুনাম বজায় রেখেছেন।

এ ছাড়া হলে বড় বাজেটের অনুষ্ঠান করে সুনাম কুড়িয়েছেন আশীর্বাদ সংস্থার সুপ্রকাশ গড়গড়ি ও রুনু ঘোষ।

অনুষ্ঠানের টিকিটের হার ১০০, ৭৫, ৫০ ও ১৫ টাকা হলেও নেতাজী ইনডোর প্রত্যেকবারই হাউস ফুল করেন এরা।

তবে একটা কৃতিত্বের দাবি সুপ্রকাশ ও রুনুবাবু করতে পারেন। তা হল এর আগে গানের জলসা করে কেউ সরকারের হাতে এত বেশি টাকার প্রমোদকর তুলে দেননি। ঠাকুরপুকুর ক্যানসার সেনটার এবং ইনডিয়ান রেডক্রশকেও এরা বহু টাকা দান করেছেন।

জলসায় পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন উত্তর কলকাতার সায়েনস ক্লাব। তারা গত ২৫ সেপটেমবর বিডন রো-এ জলসা করলেন তাদের পূর্বসূরী নবীন সঙ্ঘর

জলসা স্থলে। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন যদিও নজরুলগীতিতে সমর্পিত প্রাণ, তবুও তিনি সেদিন পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে ষাটের দশকের অনেকগুলি জনপ্রিয় আধুনিক গান গাইলেন। একটা হারমোনিয়াম ও তবলার সহযোগিতায় কণ্ঠের যাদু খেলিয়ে মাত করলেন তিনি আগের মতই। পুরনো দিনের গান এখন অনেক জনপ্রিয় হচ্ছে। তার সামনে বর্তমানের অন্ত:সারশূন্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। তবু আমাদের এখানে বর্তমান প্রজন্মকে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংগীত সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়ার প্রয়াস নেই সরকারি বা বেসরকারি কোন মহল থেকেই।

ইতিমধ্যে আলোচিত বিষয়গুলিই আমাদের কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেয় যে খোলা জলসা আবার চালু করতে হবে এটা নিছকই আবেগের কথা। ঘনিয়ে ওঠা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও আইন শৃঙ্খলাজনিত অনিশ্চয়তাকে অতিক্রম করা এযুগে সম্ভব একথা কে জোর দিয়ে বলতে পারবেন?

কাজেই আশাবাদী হতে পারা গেল না উপসংহার বাক্যটি লিখতে গিয়ে। বেদনার সংগেই বলতে হচ্ছে ওপেন এয়ার ফাংশনের সেই সুরে সুরে ভরা রাতগুলো নিছক স্মৃতিচারণের বিষয়বস্তু হয়ে অতীত হয়ে থাকবে, বর্তমানে আর ফিরবে না।

বাংলা জলসা শিল্পের সংকট নিয়ে বিভিন্ন শিল্পী কী ভাবছেন, পরিবর্তনের প্রতিনিধির কাছে তাঁদের বক্তব্য

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

বাংলা গানের জলসা কমে গেলেও হিন্দি গানের আসর তো পুরোদমেই চলছে। হিন্দি গান মাত্রই বাজে এ কথা ঠিক নয়। তবে তরুণ প্রজন্মের কাছে চটুল গানগুলোই কদর পেয়ে আসছে। এতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, অনেক জায়গাতেই হিন্দি গানের ভক্তরা নামী শিল্পীদের গানেও বাধা সৃষ্টি করেন - বাংলা গান শুনব না বলে হাততালি দিয়ে শিল্পীকে গান থামাতে বাধ্য করেন। বরাবর আধুনিক গাইলেও আমার রবীন্দ্র সংগীতের ইমেজটাই বড় হয়ে ছিল। বাংলা পপ গানের যুগের আগেই 'যৌবন তরংগে দেয় দোল কার অংগে'র মত গানও করেছি। পরবর্তীকালে দেখছি ভাল সুরকারের অনুপস্থিতিতে বাংলা গানের কথায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ফলবতী হচ্ছে না। নতুন গান রেকরড করাও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

আগে শ্রোতাদের আগ্রহ ও ধৈর্য সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। প্রত্যেক শিল্পীর গানের সংগে তাঁরা একাত্ম হয়ে যেতেন। শিল্পীর গুণগত বিচারই ছিল প্রধান মাপকাঠি। এখন শিল্পীর সম্বন্ধে আগে আলোচিত হয় পারিশ্রমিকের অংক। যা গান চালু আছে তাই সকলে শুনতে চায়। নতুন গান শোনার সময় তাই অনেকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

আগের যুগের চাহিদা ছিল কোয়ালিটি - শিল্পী চার পাঁচখানার বেশি গান গাইতেন না। এখনকার যুগ চায় কোয়ানটিটি - শিল্পী ঘন্টার পর ঘন্টা গেয়ে চলেন।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা গান এখন যে সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে এর তুলনীয় কোন সময়ের কথা মনে পড়ে না। মানুষেরা তাদের প্রাত্যহিক সমস্যার মোকাবিলা করতেই দিশাহারা। গানবাজনা শুনতে যে মানসিক প্রশান্তির দরকার তা এ যুগে দুর্লভ হয়ে উঠেছে। যে কোন দেশের শিল্পকে রক্ষা করার দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের ওপরেই বর্তায়। বাংলা গানের ক্ষেত্র এভাবে বিলীন

হয়ে যেতে দেখেও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কোন সরকারই কিছু করছেন না এটা খুবই পরিতাপের বিষয়।

উৎপলা সেন

রেডিও বা রেকর্ডের থেকে জলসাতেই শ্রোতা এবং শিল্পীর যোগাযোগটা অনেক নিবিড় হত। সেখানেই আমরা প্রকৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করতাম। জলসার সংখ্যা কমে গিয়ে এই যোগাযোগটা ক্ষীয়মাণ হয়ে যাচ্ছে।

পূর্ণদাস বাউল

অনুপ ঘোষাল / আরতি মুখোপাধ্যায় : আভিজিৎ বসু

হিমাংশু বিশ্বাস

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৫২-৫৩তে বাংলা গানের বিক্রি কমে গিয়েছিল। তখন বোম্বের ফিল্মের গানের সুরে বাংলা কথা বসিয়ে রেকর্ড করতে হচ্ছিল। তারপর আবার আধুনিক অ-ফিল্মি গানই প্রাধান্য পেল। বোম্বের শিল্পীরা আমাদের বিপন্ন করছে এটা ঠিক নয়। আমরা বিপন্ন আমাদের নিজেদের জন্যই। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন গড়ার প্রয়াস সাতবার ভণ্ডুল হয়ে গেছে, কারণ একসংগে বসে ক্যারম খেলবেন এমন চারজন বাংলা গানের শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

পূর্ণদাস বাউল

আসাম এবং উত্তরবংগেই বেশি অনুষ্ঠান করতাম। জলসা কমে যাওয়ার বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা তো একটা কারণ বটেই। তাছাড়া উৎসাহী উদ্যোক্তাদের সংখ্যাও কমে গেছে। সবাই এখন খেলায় মশগুল। উপার্জনের ক্ষেত্রের চরম প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থেকে অনেকেরই গানের নেশা চলে যাচ্ছে।

অনুপ ঘোষাল

জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে উদ্যোক্তাদের শোষণ করাটা ঠিক নয়। তবে যেখানে অন্য শিল্পীরা ভাল টাকা নেন সেখানে আমি কম নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হব কেন?

ভি বালসারা

অনুষ্ঠানের মোট সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে কোন অসুবিধা হচ্ছে না আমার। কারণ পঞ্চান্ন বছর এক নাগাড়ে বাজাবার পর এমনিতেই আমি কম সংখ্যায় ভাল মানের অনুষ্ঠান করতে চাই। যুব সম্প্রদায় ডিসকো পপ ছাড়া কিছু চায় না এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। শিল্পী যদি ভাল গান ঠিকমত পরিবেশন করতে পারেন তাহলে তা গ্রহণ করার মত শ্রোতা এখানে আছেন।

হিমাংশু বিশ্বাস

আগেকার অরকেস্ট্রা কী হৃদয়গ্রাহী ছিল তা আপনারা দেখেছেন। শিল্পীদের মঞ্চের উপর উপস্থিতি এবং সুর পরিবেশনে ছিল প্রকৃত হারমনি। এখন কে কত জোরে বাজাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। ইলেকট্রনিক বাদ্য গাঁক গাঁক করে কানের পর্দার দফারফা করে দেয়। মাধুর্য ও পরিমিতিবোধ পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়েছে অরকেস্ট্রা থেকে।

সাক্ষাৎকার : কল্যাণবন্ধু মিত্র

নিরাপত্তার অভাবেই শিল্পীরা খোলা অনুষ্ঠানে গাইতে ভয় পান — সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

পরিবর্তন : অনেক প্রখ্যাত শিল্পীই এখন খোলা অনুষ্ঠানে গাইছেন না, এর কারণ কী?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : খোলা প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আগে তো কোন অসুবিধা ছিল না। পরে এমন একটা সময় এল যখন অনেক শিল্পীই এসব অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করতে লাগলেন। দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীদেরও মর্যাদা রক্ষা করার মত সামর্থ্য থাকছে না কর্মকর্তাদের — তারা শারীরিক বা মানসিকভাবে সুস্থ থাকছেন না মোটেই। ফলে অনেক জায়গায় শিল্পীরা অসম্মানিত হয়েছেন। নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে তাই প্রবীণ শিল্পীরা অনেকেই খোলা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন।

পরিবর্তন : এটা একটা কারণ হতে পারে তবে একমাত্র কারণ নয়। বিপুল সংখ্যক গুণমুগ্ধদের কথা চিন্তা করে যেখানে সুনাম আছে এমন কিছু খোলা অনুষ্ঠানে যো' দেওয়াটা আপনাদের কর্তব্য, ন কি?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : চার দশ বিস্তৃত শিল্পীজীবনে তো বহুবা আমার গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। হ্যাঁ, খোল অনুষ্ঠানে গাইতে আরও কি অসুবিধা আছে একথা ঠিক। একট হলের ভেতর যে মাত্রায় স্বরক্ষেপণের প্রয়োজন হয় খোলা অনুষ্ঠানে তার থেকে প্রায় কুড়ি গুণ জোর পড়ে গলায়। এটা ACOUSTICS এর বিষয়। উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের এই অতিরিক্ত পরিশ্রমই এক সময় ক্লান্তি এনে দেয়। খোলা অনুষ্ঠান আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। সেখানে আমাদের উত্তরসূরীরা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে চলেছেন। যেদিন তাঁরা আমাদের পর্যায়ে পৌঁছবেন সেদিন দেখবেন এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁরাও এধরনের অনুষ্ঠান থেকে অব্যাহতি চাইবেন।

খেলার আসর

৪ নভেম্বর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান বাঁ-হাতি ল্যারি গোমস। কেমন খেলোয়াড় গোমস। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার। কানপুরের প্রথম টেস্ট রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন অলোক দাশগুপ্ত। এছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ম্যানেজার রামচরিত্তির রিখির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এ সংখ্যায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর ছেলেবেলার কথা জানা যাবে। প্রি-ওলিম্পিক ফুটবলের সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত তিনটি ম্যাচের রিপোর্ট থাকছে। কলকাতার চলছে রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার রিপোর্ট, সঙ্গে ছবি।

আর মাত্র ন-মাস পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে শুরু হচ্ছে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা। বিশ্ববাসী তাকিয়ে রয়েছেন এই ক্রীড়াযজ্ঞের দিকে। কিন্তু লস এঞ্জেলেসবাসীরা কী ভাবছেন? সদ্য লস এঞ্জেলেস থেকে ফিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করছেন চিরঞ্জীব।

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগও থাকছে।

পরিবর্তন : জলসা এখন অনেক কমে যাচ্ছে। অনেকে এর কারণ হিসাবে আপনাদের পারিশ্রমিকের অংককেও দায়ী করছেন। এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : শিল্পীদের পারিশ্রমিকের অংকটা যদি জলসার উদ্যোক্তাদের প্রয়াসের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হত তাহলে বহুদিন আগেই সব গানের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু দেখছেন নিশ্চয় প্রায় প্রতিদিনই গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাহলে শিল্পীরা নিশ্চয়ই তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন আর সে অংকটা উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই অলাভজনক হচ্ছে না।

পরিবর্তন : এটা কি ঠিক যে আপনি স্বনির্ধারিত পারিশ্রমিকের চেয়ে কম অংকে কোন অনুষ্ঠানে যেতে চান না?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : এটা একেবারে ভুল কথা। আসলে অনেক দিনই আমি খুব কম সংখ্যক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। সারা বছরে পাঁচটা কি ছটা আধুনিকের অনুষ্ঠান করি। আর এর মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে অংশগ্রহণ করা চ্যারিটি শোগুলোও রয়েছে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

পরিবর্তন : উদ্যোক্তারা কি সরাসরি আপনার সংগে কথা বলতে পারেন, না কোন ইমপ্রেসারিও র মাধ্যমে আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : আমার সংগে বেশির ভাগ উদ্যোক্তাই তো সরাসরি যোগাযোগ করেন। কারোর মাধ্যমে আসতে হবে কেন? বছরে কম করে একশ পঁচাত্তরটা অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য অনুরোধ আসে। তার মধ্যে থেকে পাঁচ ছটা বেছে নিই।

পরিবর্তন : গানের জলসায় বোমবে শিল্পীদের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। আপনি কি মনে করেন বাংলা গানের শিল্পীরা এর ফলে বিপন্ন হচ্ছেন?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে এ ধরনের বিপন্নতার সম্মুখীন হতে হয়নি। পশ্চিমবংগে আমি বাংলা গান ছাড়া অন্য গান গাই না।

বোমবে শিল্পীদের কথা যখন উঠলই তখন এ প্রসংগে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। আপনি জানেন বোধহয় আমার শিল্পীজীবনের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ উচ্চাংগ সংগীতের সাধনায় সমর্পিত। সেই সংগীত পরিবেশনের জন্য সারা ভারতের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে যোগ দিতে হয় আমাকে। সেসব উচ্চাংগ সংগীতের আসরে কিন্তু তথাকথিত বোমবে প্লেব্যাক শিল্পীদের অংশ নিতে দেখা যায় না। তাদের উচ্চাংগ সংগীত ফিলমি গানেই সীমাবদ্ধ।

সাক্ষাৎকার : কল্যাণবন্ধু মিত্র

বাংলা গান ক্রমেই গভীরতা হারাচ্ছে – বনশ্রী সেনগুপ্ত

পরিবর্তন : আধুনিক বাংলা গান এখনও কি পুরনো জনপ্রিয়তা বজায় রেখে চলেছে?

বনশ্রী : না, ছোটবেলায় দেখেছি সুন্দর কথায় সহজ সুর বসিয়ে গান তৈরি হত। খুব ভাল লাগত। সবার অন্তরে পৌঁছে যেত সে সব গান। তাতে কখনও থাকত রাগের ছোঁয়া, কখনও বা ভাটিয়ালির মিষ্টি সুর। পরের যুগে দেখছি বাণীর মধ্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা হচ্ছে। কেউ কেউ অনেক উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ করছেন যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুরের নতুনত্ব আনতে অনেক বিদেশি সুরের অনুপ্রবেশ ঘটছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সে সুর হয়েছে বাণীর সংগে সংগতিহীন। আসলে সবাই চাইছেন ভাল একটা কিছু তৈরি করতে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেটা সঠিক না হওয়ায় বাংলা গান ক্রমে গভীরতা হারাচ্ছে এবং শ্রোতামন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

পরিবর্তন : এই পরিস্থিতির জন্য তাহলে গীতিকার সুরকাররাই দায়ী?

বনশ্রী : এ ধরনের সমস্যায় পুরো দায়টা ওদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আসলে ওরা বুঝতে পারছেন না কোন গানটা শ্রোতারা

বনশ্রী সেনগুপ্ত : আলোকচিত্র : সুজিত রায়

গ্রহণ করবেন। শ্রোতারাও মনে হয় স্থিরচিত্তে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না।

শ্রোতারা যে কী চান সেটা জানা কিন্তু মোটেই সহজ কাজ নয়। আজ তারা চাইছেন ডিসকো গান, কালই চাইবেন সুন্দর মিষ্টি গান। আমি দেখেছি, আজ যে ডিসকো গান খুব হিট করল কিছুদিন পরে ঠিক তার মত একটা গান সুপার ফ্লপ করল। খুব ভাল একটা গান হয়ত চললই না। আবার একটা অতি সাধারণ মানের যেমন তেমন গান বিক্রিতে সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল। এ যুগে শ্রোতাদের চাহিদা বিচার করা খুবই দুরূহ। এখন দেখা যাচ্ছে শ্রোতারা পুরনো দিনের গান শুনতে খুব উৎসাহ দেখাচ্ছেন। এতে আমাদের কাছে বাংলা গানের অতীত স্বর্ণযুগের পুনর্মূল্যায়নের একটা সুযোগ এসেছে।

পরিবর্তন : আপনি ডিসকো গাইছেন কি

বনশ্রী : ডিসকো হল সহজ সরল ছন্দের গান, যার সংগে সবাই সহজে নাচতে পারে। চলচ্চিত্রের চাহিদা অনুযায়ী কিছু পপ জাতীয় গান করেছি। কয়েকটি হালকা ছন্দের গানও করেছি। তবে যেটাকে ঠিক ডিসকো বলে সে গান এখনও গাইনি আমি।

পরিবর্তন : এখন লঘু সংগীতের

ক্ষেত্রে কী ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া উচিত?

বনশ্রী : এটা শক্ত প্রশ্ন। আমার আগের উত্তর থেকে নিশ্চয় বুঝেছেন যে এর মূলভিত্তি শ্রোতাদের চাহিদার সঠিক নির্ণয়েব ওপর নির্ভরশীল। ভাল গান ও সুর এবং তাতে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার মত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সংযোজনের প্রয়াসটাই ঐ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এগুলো কিন্তু গীতিকার ও সুরকারদের এক্তিয়ারে রয়েছে। শিল্পী হিসাবে আমি লঘু সংগীতের উন্নতির জন্য তাদের প্রয়োজনীয় যে কোন কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

পরিবর্তন : বাংলা গানে ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্য প্রভাব এবং বোম্বের অনুকরণ কতটা সমর্থন করেন?

বনশ্রী : বাংলা গানের নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। আছে অনেক বৈচিত্র্য। তবে আমার মনে হয় প্রয়োজনে সুরসৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সংগীতের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই সেটা বাংলা গানের স্বঐতিহ্যকে বজায় রেখে। আর বোম্বের অনুকরণের কোন সার্থকতা দেখি না - দুটো ধারা একেবারেই আলাদা।

পরিবর্তন : যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি কী মত পোষণ করেন?

বনশ্রী : আধুনিক গানে যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। তবে একটা পরিমিতি বোধ থাকা উচিত। গানকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যন্ত্রসংগীতকে নয়।

সাক্ষাৎকার : স্বাতী মিত্র

একজন বিলীয়মান সংগীত তারকা রবীন মজুমদার

'সংগীত তারকা' অর্থাৎ সিংগিং আরটিসট। এককালে বাংলা ছায়াছবিতে এই সিংগিং আরটিসটদেরই ছিল প্রাধান্য। সায়গল, কানন দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অসিতবরণ, উমাশশী, পংকজ মল্লিক, রবীন মজুমদার এঁরা ছিলেন সেই সংগীত তারকা। সেকালের সংগীত তারকাদের কীভাবে গান গাইতে হত ছবিতে সে সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেছেন অতীতের সংগীত তারকা রবীন মজুমদার। এক সময় রবীনবাবু গেয়েছেন প্রচুর জলসায়।

রবীন মজুমদারের প্রথম ছবি 'শাপমুক্তি' - ১৯৩৮ ৩৯-এ রিলিজ হয়েছিল। বললেন, 'বাংলার বধূ বুকে তার মধু' - অতবড় গান, ডিউরেশন ৬৩০ ফিট (সাত ইনটু নম্বুই), থিম সং, ফেমাস অজয়দার লেখা, কী ছন্দ। আর দারুণ সুর দিয়েছিলেন অনুপম ঘটক।

: আচ্ছা, তখনকার ফিল্মের গানে বৈচিত্র্য কেমন ছিল, সংগীত পরিচালকদের কৃতিত্ব কেমন দেখেছেন?

: অসাধারণ। অনুপম ঘটক ছন্দ ভাগ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন হাত নেড়ে 'বনে নয় মনে রঙের আগুন' - বড়ুয়া সাহেব বলে দিয়েছেন, এভাবে গাও।

: তখন আর কোন কোন গায়ক প্লে ব্যাক রেকর্ড করে খ্যাতি পেয়েছেন?

: সুপ্রভা সরকার, যূথিকা রায়, ভবানী দাস। আমার তখন একখানা non-film রেকরড বেরিয়েছে। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে নীতিন বসু মহাশয় 'প্লে ব্যাক' পদ্ধতি চালু করেছিলেন সর্বপ্রথম।

: তখন কীভাবে 'টেক' হত?

: ট্রলির ওপর চলেছে অরকেসট্রা। আরটিসট গাইতে গাইতে যাচ্ছে, সংগে সংগে 'জোন' মাফিক ক্যামেরা চলছে। গোড়ায় প্রথমে রেকরড হল, তারপর প্লে ব্যাক আর লিপিং বা ঠোঁট মেলান গান সিনক্রোনাইজড হয়ে 'পিকচার নেগেটিভ' ও 'সাউনড নেগেটিভ' ডেভলপ করা হল।

: আচ্ছা, নন সিংগিং স্টারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কী ছিল?

: গাইয়ের মুডকে ফলো করতে হবে। আগে শুনেছিলেম একটা কথা, আমার গানের আদি গুরু কাশীর বিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় অমর ভট্চাযের কাছে। আমাদের প্রিয় অমরদা। মূকাভিনেতা প্রিয় যোগেশের শ্বশুর মহাশয়। ছিদাম মুদি রোলে থাকতেন। দুর্গাদাস তো গান জানতেন না, চন্ডীদাস করছেন তিনি। 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া' গেয়ে চলেছেন চন্ডীদাসের ভক্ত বেশে কৃষ্ণচন্দ্র দে। দেবকী বসুর হিট ছবি। উমাশশী ছিলেন।

(সত্যিই অসিতবরণ, কানন দেবী, সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, পংকজ মল্লিক, রবীন মজুমদার এঁরা নায়ক গায়ক হয়ে যখন বাংলা ছবি করেছেন তখন অনেকটা সুবিধে হয়েছিল। এখন নায়ক গায়ক মঞ্চে থাকলেও ছবিতে নেই।)

: আচ্ছা রবীনদা আপনি এক সময় 'সায়গলকণ্ঠী' বলে খুব পরিচিত ছিলেন। অন্তত খাদে গলা গেলেই সায়গলের ভাব আমরা কানে পেতুম। 'কবি'র গানগুলো তো বটেই! 'এই খেদ মোর' ও 'আমার মনের মানুষ'।

: হয়ত অবচেতনে ছিল সায়গল। অবশ্য ভীষণ ভালবাসতেন আমায়। হেমন্ত একদিন 'কবি' দেখে এসে বললেন, 'কী কান্ড করেছেন! অপূর্ব!' অনিল বাগচীর সুর পরিচালনা, অমন আর হবে না।

: কোন ছবি করে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন?

: আনডাউটেডলি 'কবি'। দিনের পর দিন তারাশংকর আমায় বুঝিয়েছেন, দেবকীদা গাইড করেছেন। আরো অনেক ছবি করেছি। আঞ্চলিক বাহে ভাষায়, রংপুরে থাকার জন্য সুবিধাজনক দখল ছিল, পোলিয়া পালে ভাষায় 'সর্বহারা' ('দুখীর ইমান' নাটকের চিত্ররূপ) ছবি করেছি। এসব ছবি সত্যজিৎবাবু, চিদানন্দবাবু সংগ্রহশালায় রেখেছেন।

: কোন কোন মিউজিক ডাইরেকটরের কাছে কাজ করে শিক্ষা ও আনন্দ পেয়েছেন?

: বিশেষভাবে শিখেছি রবীন চাটুজ্জের কাছে। How to throw voice before the microphone - এটা fundamental point - মাইকের সামনে কেমন করে গাইতে হবে এটা আমায় রবিদা শিখিয়েছেন। আজ শব্দযন্ত্র তো দোষ ঢেকে গুণ ছড়াচ্ছে। আমরা মেকানিক্যাল ডিফেক্টকে ভেদ করে গলা দিয়ে গান করেছি। তখন তো

'ইনডাকটার' ছিল না।

(ভাবলুম বলি, 'রবিনদা' আপনাদের গলা ছিল সোনার তারের, আজ ভোঁতা আওয়াজ টিভিও আর ইকো চ্যানেলের কৃপায় মাঝে মাঝে দেখি কাগজের গোলাপ হয়ে ফুটছে।)

: রবীন চট্টোপাধ্যায়ের কোন গান আপনার গলায় হিট হয়েছিল ·

: 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' গানটা শুনে বলেছিলাম রবিদাকে এ কি একটা সুর হয়েছে : 'অ আ ক খ' সুর। রবীন চাটুজ্জে, রবিদা বললেন [illegible] 'পথম' ব্যবহার করেছি কটা গানে আজ বলে দে। ত্রিসপ্তক 'কন্ট্রোল' করে গাইবি কী করে শোন, তুই বললি 'অ আ ক খ' সুর দেখিস আমার পরেও এই গানের জন্য লোকে তোকে মনে রাখবে। I stopped and asked myself — a day will come when the statement will be true. সত্যি আজ রবিদা নেই, কিন্তু তাঁর কথা সত্যি হয়েছে। রেকরড রিলিজ হয়েছে ১৯৪৩ এ, আজও বিক্রি হচ্ছে, হবে এখনও রয়্যালটি পাই। রেকরড মুছে ভেঙে ফেলা উচিত ছিল তো। কিন্তু হয়নি, সে ঐ রবীন চাটুজ্জের মত সুরকারের গান বলেই।

আর একজন ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, খুব 'কাসটিডিয়স' ছিলেন, নোটেশন একেবারে পারফেক্ট রাখতে হবে, গায়কীর এদিক ওদিক করা চলবে নেই। ফিলম সঙ কী করে গাইতে হয় শিখিয়েছেন। আর বলব নচিকেতা ঘোষের কথা। আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর বাড়িতে রেখে আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। জীবনে ভুলব না তাঁর কথা।

: আজকালকার বাংলা গান কেমন লাগে ·

: কখনও কখনও বড় ওয়েসটারনাইজড -- তবে বিরোধ হয়ত নেই।

: আপনি কি মনে করেন বাংলা গানের ঐতিহ্য আমরা বিসর্জন দিচ্ছি

: তা হয়ত ঠিক নয়, তবে কথা ও সুরের সংগতি, রবীন্দ্রনাথ যেটার ওপর জোর দিয়েছেন, Tune must go along with the composition জ্যাগলারি, গিমিকস এগুলো যেন লিরিককে নষ্ট না করে।

সাক্ষাৎকার :

কৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা গানের বাইশ জন ব্যস্ত শিল্পীর ঠিকানা

১। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
১৪৬/ডি/৬১৩, লেক গারডেনস; কল : ৭০০০৪৫

২। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
৬, শরৎ চ্যাটারজি অ্যাভিনিউ; কল : ৭০০০২৯

৩। মান্না দে
৯, মদন ঘোষ লেন; কল : ৭০০০০৬

৪। আরতি মুখোপাধ্যায়
৩৭/১, হিন্দুস্থান রোড; কল : ৭০০০২৯

৫। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
৫২/১/১, কলেজ স্ট্রিট; কল : ৭০০০৭৩

৬। শ্যামল মিত্র
৮৮, ওয়েডার বারন রোড; কল : ৭০০০২৯

৭। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫/১৭ এ, পদ্মপুকুর রোড; কল : ৭০০০২০

৮। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও

৯। উৎপলা সেন
১২ এ, সাউথ এনড পারক; কল : ৭০০০২৯

১০। নির্মলা মিশ্র
১৩৬, পিয়ারীমোহন রায় রোড; কল : ৭০০০২৭

১১। ভূপেন হাজারিকা
৭৭ বি, গলফ ক্লাব রোড; কল : ৭০০০৩৩

১২। বনশ্রী সেনগুপ্ত
১ এ, সাদারন অ্যাভিনিউ; কল : ৭০০০২৬
৩২/৩ টি, গড়িয়াহাট রোড সাউথ; কল : ৭০০০৩১

১৩। অনুপ ঘোষাল
জয়জয়ন্তী, ফ্ল্যাট নং ৩ এ, ২, ম্যানডেভিলা গারডেনস; কল : ৭০০০১৯

১৪। অংশুমান রায়
২৩/এ/১/১, নাকতলা লেন; কল : ৭০০০৪৭

১৫। পিন্টু ভট্টাচার্য
৩৬ বি, হরিশ চ্যাটারজি স্ট্রিট; কল : ৭০০০২৬

১৬। হৈমন্তী শুক্লা
১৪/৫, ডবলু আই বি এন ফেজ টু, গলফ গ্রীন; কল : ৭০০০৪৫

১৭। অরুন্ধতী হোমচৌধুরী
২৩৮, বি টি রোড; কল : ৭০০০৩৫

১৮। শক্তি ঠাকুর
৬/২৮, নেতাজী নগর; কল : ৭০০০৪০

১৯। উৎপলেন্দু চৌধুরী
১২৬, লিনটন স্ট্রিট; কল : ৭০০০১৪

২০। অমর পাল
২৭/১৪, কে এম নস্কর রোড; কল : ৭০০০৪০

২১। শ্রাবন্তী মজুমদার
লিভিং সাউনড রেকরডিং অ্যানড পাবলিসিটি সারভিস
২/২, হো চি মিন সরণি; কল : ৭০০০১৬

২২। স্বপনা চক্রবর্তী
বেলা কুটির, সিউড়ী, বীরভূম। □

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ-তে যোগদানকারী ব্যক্তির নাম, ক্রমসংখ্যা, ঠিকানা, বয়স, নেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল :

প্রদীপকুমার তালুকদার □ ক্রম ১৪
কে/অ নরেন্দ্রকুমার তালুকদার, রবীন্দ্রনগর, পোঃ রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০৬, জেলা দার্জিলিং। ২৬ বছর, উচ্চতর পড়াশুনা গান, স্নাতক, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি।

পীযূষ দেব □ ক্রম ১৫
'আশীর্বাদ', বেরুবাড়ি, উদয়পুর, গোপীনাথনগর, গৌহাটি ৭৮১ ০১৬, আসাম। ২১ বছর, টেনিস ক্রিকেট গান সাহিত্য হাস্যকৌতুক চলচ্চিত্র সবসময় খাওয়া, ছাত্র

সুনীলকুমার সরকার □ ক্রম ১৬
রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ফটকগোড়া চন্দননগর ৭১২ ১৩৬ হুগলি ৪১ বছর, লেখালেখি বাগানচর্চা, স্নাতক/সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা সাংবাদিক।

কমলকান্তি ঘোষ □ ক্রম ১৭
কে/অ মিতালী সাইকেল স্টোর্স নগর বোঙ্গাইগাঁও, পোঃ বোঙ্গাইগাঁও ৭৮৩৩৮০, গোয়ালপাড়া, আসাম। ২২ বছর, সিনেমা দেখা পড়াশুনা গান, স্নাতক, ব্যবসা।

অনুপ দাস তালুকদার □ ক্রম ১৮
রিজওনাল ইনজিনিয়ারিং কলেজ, শিলচর ৭৮৮০১০, আসাম। ২০ বছর, ভ্রমণ ছবি তোলা বন্ধুত্ব গান হাস্যকৌতুক, ইনজিনিয়রিং ছাত্র।

তপন কুমার প্রামাণিক □ ক্রম ১৯
হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ সায়েনস হোসটেল, পোঃ প্রফুল্লনগর, হাবড়া, ২৪ পরগণা। ২০ বছর, সংগঠন গড়া, বায়ো সায়েনসের ছাত্র।

সুজিতময় ভট্টাচার্য □ ক্রম ২০
পোঃ খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা ৭৯৯২০১, ত্রিপুরা। ২৩ বছর, বন্ধুত্ব স্থাপন চিঠিপত্র লেখা, ছাত্র।

অমরেন্দ্রনাথ ধর □ ক্রম ২১
পিয়ারলেস বিলডিং, এগজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১ বিহার। ২৬ বছর, ছবি তোলা পড়াশুনা লেখালেখি আঁকা, উল্লেখ নেই, চাকরি।

মাতৃত্বের রোমাঞ্চ যা একমাত্র আপনিই অনুভব করতে পারেন...

একটি ছোট্টো প্রাণ আপনার ভেতরে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। তারপর একদিন তাকে আপনি নিজের বুকে আঁকড়ে ধরবেন, নিজের দুধ খাইয়ে বড় করবেন। অলৌকিক কিন্তু সত্যি।

শিশুর জন্য সবার সেরা পুষ্টি

আপনার শিশু যাতে প্রথম দিন থেকেই যথেষ্ট পুষ্টিদায়ক বুকের দুধ পায়, তারজন্য আপনার গর্ভাবস্থার শেষ দিক থেকেই নিজের মধ্যে পুষ্টির ভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আর যখন আপনি বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তখন আপনার শরীরের যে পুষ্টি শিশুর মধ্যে যাচ্ছে, তাকেও পূরণ করতে হবে।

তাই গর্ভাবস্থার শেষ দিকে এবং বুকের দুধ খাওয়াবার সময় আপনার মাদার্স স্পেশাল অবশ্যই প্রয়োজন।

মাদার্স স্পেশাল—সত্যিকারের সহযোগ

গর্ভবতী আর স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টিসংক্রান্ত W H O র (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার) নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী একটি অনুপম স্বাস্থ্যকর পানীয়—মাদার্স স্পেশাল, যা আপনার শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের দুধ খাওয়াতে আপনাকে সাহায্য করে।

তাই ডাক্তাররা বলেন যে গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস থেকে শুরু করে যতদিন আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন ততদিন রোজ মাদার্স স্পেশাল দুধের সাথে মিলিয়ে খাবেন।

মনে রাখবেন . . .

ডাক্তাররা বলেন যে অন্তত ছ মাস বয়স পর্যন্ত আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিৎ।

মাতৃত্ব আর শিশু জন্মবিষয়ক প্রয়োজনীয় আরও আবশ্যক খবরের জন্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে "Specially for you and your baby" পুস্তিকাটির জন্য আজই লিখুন।

ঠিকানা : H.M.M. Limited
Department D,
1 Jai Singh Road
New Delhi-110001

ডাক্তারদের মনোনীত মাদার্স স্পেশাল অন্তঃসত্ত্বা এবং সদ্য মায়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির WHO-র মান অনুযায়ী (FAO/ WHO-1974—Handbook on Human Nutritional Requirements') প্রস্তুত।

মাদার্স স্পেশাল

মায়েদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের দুধ দিতে সাহায্য করে।

শুধুমাত্র নির্বাচিত শহরে পাওয়া যায়।

একান্ত সংবাদ

প্রশান্ত শূর কলকাতা পুরসভা নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করছেন

বিশেষ সংবাদদাতা

কলকাতা পুরসভার নির্বাচন কবে হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে বাধাটা কোথায়? নাকি ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার ভয়েই পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর নিজেই চান না নির্বাচন হোক।

কলকাতা পুরসভার সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে ১৯৬৯ সালে। গত তের চোদ্দ বছরে চারবার বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতা পুরসভা স্বায়ত্ত্বশাসনে ফিরে আসতে পারল না। কংগ্রেস আমলে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন নিয়ে অনেকবার কথা উঠেছে। কিন্তু নির্বাচন করতে নেতারা সাহস পাননি। ভয় ছিল, হয় বামপন্থীরা কলকাতা পুরসভা দখল করে নেবে, আর না হয় কংগ্রেসীদের মধ্যেই লাশ পড়বে।

গত ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বামফ্রন্ট নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিল, মন্ত্রিসভা গঠনের এক বছরের মধ্যে কলকাতাসহ সমস্ত পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবেই। পঞ্চায়েত নির্বাচন মোটামুটি এক বছরের মধ্যেই হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের ৮৬টি পুরসভার নির্বাচন হয়েছে ১৯৮১ সালের ৩১ মে। কিন্তু কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হল না।

পুরমন্ত্রী প্রশান্তবাবু এক এক সময় এক একরকম যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমে বললেন, পুরসভাগুলিকে সরকার কুক্ষিগত করে রাখতে চান না। স্বায়ত্ত্বশাসন বজায় রাখতে চান। কংগ্রেসীরা জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে চান না বলেই এতদিন নির্বাচন হয়নি। কলকাতা পুরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করে জনস্বার্থমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।

এরপর প্রশান্তবাবু বললেন, কলকাতার পুরসভার আইন সেকেলে হয়ে গিয়েছে। নতুন করে আইন করা হবে। যাতে কলকাতা পুরসভা সবদিক থেকে স্বয়ম্ভর হয়। নতুন আইনে কলকাতা পুরসভা হবে কলকাতার জন্য 'মিনি মন্ত্রিসভা'। প্রায় ছশো পৃষ্ঠার নতুন 'কলকাতা পুরসভা আইন' রচনায় কেটে গেল আরও একবছর।

নতুন আইনে কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত সদস্যদের হাতে **আর্থিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক ক্ষমতা দেওয়া হবে।** মন্ত্রিসভার ধাঁচে হবে 'মেয়র ইন কাউনসিল'। মেয়র হবেন 'ক্ষুদে মুখ্যমন্ত্রী', ডেপুটি মেয়র সহকারী, কাউনসিলের সদস্যরা 'ক্ষুদে মন্ত্রী'। প্রত্যেকের হাতে বিভিন্ন বিভাগের ভার থাকবে। 'মেয়র ইন কাউনসিলে'-এর সদস্যরা কেউ অন্য কোন চাকরি বা ব্যবসা করতে পারবেন না। পুরসভার তহবিল থেকে বেতন, ভাতা, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি পাবেন। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা মোটর গাড়ি, চালক, পেট্রল সবই পাবেন। মোটামুটিভাবে কলকাতা পুরসভার মেয়র একজন পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা পাবেন। প্রত্যেক নির্বাচিত কাউনসিলার মাসিক ভাতা ছাড়াও মিটিং এ যোগদানের জন্য আলাদা ভাতা পাবেন। পুরসভার বাজেটে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা থাকবে। পুরসভা কর সরকারী অনুদান, মোটর ভেহিকলস ট্যাকস, লাইসেন্স ফি প্রভৃতি ছাড়াও বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে।

বিধানসভায় এই আইন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠান হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেতে সময় লাগে প্রায় এক বছর।

রাষ্ট্রপতি নতুন আইনে সম্মতি দিয়েছেন। ছমাস ছেড়ে দুবছর গড়িয়ে গেল। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হল না। প্রশান্তবাবু মাঝখানে বললেন কলকাতা পুরসভারও নির্বাচন হবে নিজস্ব ভোটার তালিকা নিয়ে। বিধানসভার ভোটার ২১ বছরে করা হয়। পুরসভার ভোটে ১৮ বছর করা হয়েছে। বিধানসভার ভোটার তালিকা নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। পুরসভার ভোটার তালিকা এমনভাবে করা হবে যাতে কোন কথা না ওঠে।

ভোটার তালিকা তৈরি করার জন্য আলাদা করে অফিসার-কর্মী নিয়োগ করা হল। কিন্তু নির্বাচনের নাম গন্ধ নেই।

গত ছবছরে বাম ফ্রন্টের বৈঠকে অন্তত দশদিন কলকাতা পুরসভার নির্বাচন নিয়ে কথা উঠেছে। চারবার নির্বাচন করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

সি পি আই (এম)-এর রাজ্যস্তরে পুরসভা সম্পর্কে একটি সাব কমিটি আছে। সাব কমিটি থেকেও পুরমন্ত্রীকে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন করার জন্য কয়েকবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সাব কমিটি প্রশান্তবাবুর সিদ্ধান্ত বাতিলও করেছেন। এখন শোনা যাচ্ছে আগামী বছর এপ্রিল মাসে পুরসভা নির্বাচন হতে পারে। কোন সরকারি সিদ্ধান্ত হয়নি। অর্থাৎ পুরসভা দফতর বা কলকাতা পুরসভায় নির্বাচন নিয়ে কোন তোড়জোড় নেই।

সি পি আই (এম) নেতারা কি চান যে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হোক এটা ঠিক স্পষ্ট নয়। তার কারণ এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই পার্টির মধ্যে মতবিরোধ চলছে। প্রশান্তবাবু যা চান পার্টি তা চান না। আবার পার্টি যেভাবে নির্বাচন করতে চাইছেন তাতে প্রশান্তবাবু সায় দিতে পারছেন না। প্রশান্তবাবু চান, নির্বাচিত সদস্যরা পুরসভার দায়িত্ব নিন, কিন্তু পুরমন্ত্রীর ক্ষমতা যেন কিছুটা থাকে।

৮২ সালের গোড়া থেকে পুরমন্ত্রী ও পার্টির মধ্যে লড়াই চলছে দেড়বছর মাঝখানে পুরমন্ত্রী হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন কলকাতা পুরসভা এলাকায় বামফ্রন্টের অবস্থা খুব ভাল নয়। নির্বাচন হলে পুরসভা প্রশাসন পুরমন্ত্রী এবং পার্টির হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। সুতরাং নির্বাচন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আবার ভাবনা চিন্তা শুরু হল। কৌশল খোঁজা হল যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। পুরমন্ত্রী প্রশান্তবাবু নতুন প্ল্যান দিলেন, শুধু কলকাতা পুরসভার একশোটা ওয়ার্ড নিয়ে নির্বাচন হলে হবে না। আশপাশের ছটা পুর এলাকাকে কলকাতা পুরসভার মধ্যে আনতে হবে। তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। বামফ্রন্ট কেন, সি পি আই (এম) একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।

এই ছটা পুরসভা হল-উত্তরে বরানগর, দক্ষিণ দমদম এবং সল্টলেক, আর দক্ষিণে যাদবপুর, দক্ষিণ শহরতলি (বেহালা) এবং গারডেন রিচ। এই ছটার মধ্যে পাঁচটা পুরসভায় সি পি আই (এম) ক্ষমতাসীন। সল্ট লেক এলাকাতে নতুন পুরসভা গঠনের প্রস্তাব আছে।

পার্টির নেতারা প্রথমে বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বাগড়া দিলেন পাঁচ পুরসভার সি পি আই (এম) নেতারা। পার্টির নেতাদের বোঝালেন, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ছটি পুরএলাকায় পার্টির যে প্রভাব আছে তা চলে যাবে। উপরন্তু জনসাধারণের ওপর কর এর বোঝা বেড়ে যাবে। ভিন্ন এলাকা বলে অবহেলিত হবে, সুযোগ সুবিধা কিছুই পাবে না। আসল কথাটা তারা বলতে পারলেন না যে এই সব পুরএলাকার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা কমে যাবে।

প্রশান্তবাবু উঠে পড়ে লাগলেন। এদিকে পাঁচটির মধ্যে তিনটি পুরসভায় কলকাতা পুরসভার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পুরসভায় প্রস্তাব নেওয়া হল। প্রশান্তবাবু তাতেও দমে গেলেন না। শেষ পর্যন্ত পাঁচ পুরসভার নেতাদের চাপে পার্টি নতি স্বীকার করলেন। তবে কিছুটা রফাও হল। উত্তরের তিনটিকে বাদ দেওয়া হল। ঠিক হল যাদবপুর, দক্ষিণ শহরতলি এবং গারডেন রিচকে কলকাতা পুরসভায় আনা হবে।

এই তিনটি পুরসভাকে কলকাতায় আনতে হলে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর অন্তত ছ মাস সময় দিতে হবে নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য। তাহলে ওয়ারডের সংখ্যা বাড়বে ৪১টি। অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার তখন কাউনসিলারের সংখ্যা হবে ১৪১। এরপরেও যে সি পি আই (এম) গরিষ্ঠতা পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। বিধানসভার গতবারের নির্বাচনে দেখা গিয়েছে ১০০টি ওয়ারডের মধ্যে কংগ্রেস (ই) বেশি ভোট পেয়েছে ৪৪টিতে। আর তিনটি পুরসভার বাকি ৪১টি আসনের মধ্যেও তের থেকে সতেরটি আসন কংগ্রেস পেতে পারে। সুতরাং আগামী এপ্রিলে যে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। []

নবম দশম

বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা

'রচনায় যোগ দাও – ছাত্রবৃত্তি জিতে নাও'

শুধু কি বৃত্তি। তার সংগে আছে বই কেনার জন্য বিশেষ অনুদান, প্রশংসাপত্র এবং সারা বছর ধরে বিনামূল্যে পাক্ষিক 'নবম দশম' আর নবম দশম মানেই তো পরীক্ষায় সাফল্য এবং কৃতিত্ব।

ইত্যাদি প্রকাশনীর উদ্যোগ

অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য 'সারা বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা'। কোন প্রবেশমূল্য নেই – এতে পশ্চিমবংগের যেকোন স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই কেবল যোগ দিতে পারবে।

বিষয় : 'জাতীয় সংহতি'

নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের ভারতবর্ষে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা কিভাবে সম্ভব ? তোমার বক্তব্য এক হাজার শব্দের মধ্যে গুছিয়ে লেখ। ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পিঠে লিখবে। এক বিচারকমণ্ডলী সমস্ত রচনাপত্র পরীক্ষা করে নম্বর দেবেন। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম দশজনকে 'ক', পরবর্তী পঞ্চাশ জনকে 'খ' এবং তারও পরের পঞ্চাশজনকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা হবে। প্রতিটি সফল প্রতিযোগীর নাম, স্কুলের নাম এবং ঠিকানা ইত্যাদি প্রকাশনীর সমস্ত পত্রিকায় ছাপানো হবে।

বৃত্তির পরিমাণ

'ক' বিভাগের ১০ জন পাবে ১৪০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ১০০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান 'খ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১২০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ৮০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান, 'গ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ৬০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান।

কলকাতায় একটি বিশিষ্টজন সমাবেশে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে প্রশংসাপত্র এবং বই কেনার জন্য এককালীন অনুদান। বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতি তিনমাস অন্তর স্কুলের ঠিকানায় সমানভাবে ভাগ করে পাঠানো হবে আর পাক্ষিক 'নবম দশম' পাঠানো হবে বাড়ির ঠিকানায়।

দেরি না করে রচনা লেখ আর এই ফর্ম পূরণ করে তার সংগে গেঁথে পাঠাও।

জাতীয় সংহতি রচনা প্রতিযোগিতা

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

নাম .... বয়স ....

শ্রেণী .... রোল নম্বর ....

বাড়ির ঠিকানা ....

পিতা/অভিভাবকের নাম ....

পেশা .... মাসিক আয় ....

স্কুলের নাম ....

ঠিকানা ....

উপরোক্ত ঘোষণা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। আমি এই প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মানতে বাধ্য থাকবো এবং বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মানবো।

অভিভাবকের স্বাক্ষর .... ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর ....

মনে রেখো রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩। এর পর প্রাপ্ত রচনা যত ভালই হোক বিবেচিত হবে না। খামের ওপর বড় হরফে 'নবম দশম বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা' লিখে দিও। তার তলায় লিখবে ইত্যাদি প্রকাশনীর ঠিকানা।

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দুই

সাইপ্রাসের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর লারনাকাতে শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ বিমান অন্নপূর্ণা এসে থামল স্থানীয় সময় বেলা বারটায়। দিল্লিতে তখন বেলা দুটো। ঠিক এক ঘন্টা আগেই প্লেনে লাঞ্চ দিয়েছিল। প্লেনের ভিতর যতক্ষণ ছিলাম তখন এয়ার ইনডিয়া কর্তৃপক্ষ আমাদের আতিথেয়তার কসুর করেননি। প্লেনে উঠতেই একপ্রস্থ নাস্তা অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট সারভ করা হয়েছিল। ফলের রস, ফল ক্ষুধাবর্ধক, দই, কেপর ওমলেট, গ্রিলড সসেজ, আলু ভাজা, ব্রেড রোল, বাটার, জ্যাম কফি এবং চুর্পাড় ভর্তি পছন্দসই তাজা ফল। কিন্তু খাদ্যের চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল একটি করে সুদৃশ্য মেনু কারড। প্রত্যেকটি কারডের ওপরে আধুনিক বিখ্যাত শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে বহুবর্ণ রঞ্জিত ছবির রিপ্রোডাকশন। যেমন ব্রেকফাস্টের মেনুতে ছিল সি ডি মিস্ত্রীর সীতা স্বয়ম্বর। লাঞ্চের মেনু কারডের ছবি ছিল এ এ রায়বার গ্রামের কুয়া। এটাও ক্যানভাসে তেল রঙের ছবি। এইভাবে আরো ছ'টি মেনু কারড সারা যাত্রাপথে আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল। প্রত্যেকটি কারডের ছবি চিরকালের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখে দেওয়ার মত। আমার নিজের ধারণা এক একটি কারড ছাপার ব্যয় দশ থেকে পনের টাকার কম নয়। প্রত্যেকটি কারডের প্রথম পাতায় লেখা ছিল 'বিমান পর ভারত কী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী উপস্থিতি সে সম্মানিত এয়ার ইনডিয়া।' সেই সঙ্গে এই হিন্দি বাক্যটির ইংরাজি বয়ান।

আমাদের লাঞ্চের মেনুতে ছিল নবাবী খানা। আক্ষরিক অর্থেই নবাবী। প্রথমেই কাবি মটন শাহী লাহ, রাইস পোলাও স্পাইসড ভেজিটেবলস দই, রুমালি রুটি, পাঁপর, পিকল, মিকসড সালাদ সুজির পুডিং, চিজ বিসকুট, ফল, কফি বা চা। সব শেষে পুদিনা চকলেট বা মিন্ট চকলেট যার মধ্যে মেনথল দেওয়া আছে বলে পর্বের গুরুপাকের পর মুখশুদ্ধির কাজ করে।

লারনাকা নামবার আগেই আমাদের প্রত্যেককে গাড়ির নম্বর বলে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আমরা যেন নেমেই সোজা আমাদের নিজেদের গাড়ি চিনে নিয়ে উঠে পড়ি কারণ কনভয়ের সঙ্গে আমাদের গাড়ি যাবে। সাইপ্রাসে ও গ্রীসে শ্রীমতী গান্ধীর স্টেট ভিজিট। যখন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আসেন তখন তাঁর অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যবস্থা হয় প্রোটোকলের বিধি অনুসারে। [illegible] অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। আগে থেকে গোটা ব্যাপারটা, সফররত রাষ্ট্রপ্রধানকে লিখে দেওয়া হয় তাঁকে কী করতে হবে। শ্রীমতী গান্ধীকেও আগে থেকে লিখে দেওয়া হয়েছিল। সেই লিখিত বিধি অনুসারেই [illegible] শ্রীমতী গান্ধীকে সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপ্রধান কিপ্রিয়ানু [illegible] সেই প্রাসাদের [illegible] জানাই।

লারনাকা বিমান বন্দরে প্লেন থামার পর সাইপ্রাসে ভারতীয় হাইকমিশনার এইচ কে মহাজন ও সাইপ্রাস সরকারের চিফ অব প্রোটোকল বিমানের ভেতর ঢুকলেন। তাঁরা দুজনে শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে নামলেন। সিঁড়ির নিচে সর্বাগ্রে দাঁড়িয়েছিলেন সস্ত্রীক কিপ্রিয়ানু। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। এইবার সফররত রাষ্ট্রপ্রধানের পালা, অভ্যর্থনাকারী রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে তিনি দলের অন্যান্যদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে প্রোটোকল অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী সোনিয়া ও তিনজন সিনিয়র সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। এবার প্রেসিডেন্ট কিপ্রিয়ানু তাঁর বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর দলটি এগিয়ে গেল সাইপ্রাসের বিশিষ্ট নাগরিকরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেদিকে। সিনিয়রিটি অনুসারে পরিচয় [illegible] নাগরিকদের [illegible] অনুগমন। এখানেও নিয়ম [illegible] সাংবাদিক এই যাত্রায় সুযোগ

সাইপ্রাস : সৈকত

পেলেন। অষ্টম ব্যক্তি থেকে বাকি দের আর একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল প্রেসিডেন্টের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।

এরপর গারড অব অনার। শ্রীমতী গান্ধী গারড অব অনার নিতে গেলেন প্রেসিডেন্টের এ ডি সি ও সাইপ্রাস সরকারের চিফ অব প্রোটোকল তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। প্রেসিডেন্টও গেলেন। তবে দুই রাষ্ট্রপ্রধান কে কোনদিকে দাঁড়াবেন তাও প্রোটোকলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। প্রধানমন্ত্রী দাঁড়াবেন প্রেসিডেন্টের ডান দিকে। দুজনে পতাকাদণ্ডের কাছে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী দু থেকে তিন পা পিছিয়ে পতাকাদণ্ডকে বাও করবেন। সে সময় দু দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হবে ব্যানডে। রাষ্ট্রীয় সফরের অনেক আগে থেকেই সেই দেশের পতাকা ও জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি যোগাড় করা হয়। তারপর ব্যানডে দীর্ঘদিন ধরে চলে অনুশীলন।

জাতীয় সংগীতের পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী গারড অব অনারের প্রথম সারি পরিদর্শন করতে গেলেন। পরিদর্শনের শেষে প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী গান্ধীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন সাইপ্রাস সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের। সাইপ্রাসের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মহাজন পরিচয় করিয়ে দিলেন হাই কমিশনের স্টাফ ও সাইপ্রাসের ভারতীয় নাগরিকদের তিনজন প্রতিনিধির সংগে। প্রধানমন্ত্রী এবার তাঁর ডেলিগেশনের সমস্ত সদস্যদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সমস্ত উৎসবটি রুটিনমাফিক তবে দেখতে খারাপ লাগে না। এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের জন্য আগে থেকে রিহারসাল হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সফর না হলে এসব অনুষ্ঠানের কোন বালাই থাকে না। রাষ্ট্রীয় সফর ছাড়াও আধা রাষ্ট্রীয় সফর বা বেসরকারি সফরেও কোন রাষ্ট্রপ্রধান আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ওই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অতিথিকে রিসিভ করতে আর এয়ারপোরটে যান না। তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠান। যেমন ফ্রানসে ও ইংলনডে শ্রীমতী গান্ধীর সফর ছিল বেসরকারী। তবু ফ্রানসে তাঁর সরকারি প্রোগ্রাম ছিল। প্যারিস এয়ারপোরটে সেনাবাহিনী তাঁকে গারড অব অনার দিল বটে তবে মিতরো স্বয়ং এয়ারপোরটে আসেননি। লনডন ও নিউ ইয়রকে একজন সরকারি অফিসার এসেছিলেন। বৃটেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সফর হলেও প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট সর্বদা এয়ারপোরটে হাজির হন না। কারণ সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা খুবই ব্যস্ত। তাঁদের অত সময় কোথায়। এমনকি থ্যাচার এলেন নিউ ইয়রকে। রেগন এয়ারপোরটে গিয়ে তাঁকে রিসিভ করেননি। তবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছোটবড় সমস্ত দেশ নির্বিশেষে যত রাষ্ট্রপ্রধান আসেন তাঁদের রিসিভ করেন। দিললিতে গত বছর ন্যামের সময় জৈল সিংজী ও শ্রীমতী গান্ধী দুজনে মিলে আশি নব্বই জন রাষ্ট্রপ্রধানকে পালাম বিমান বন্দরে রিসিভ করেছিলেন। ন্যামে প্রত্যেকটি দেশকে যেভাবে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং প্রোটোকলের খুঁটিনাটি বিষয় পালন করা হয়েছিল তার তুলনা নেই।

দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছোট্ট করে দুটি ভাষণ দিলেন। তারপর কনভয় এগিয়ে চলল।

সাইপ্রাসে এয়ারপোরট থেকেই অভ্যর্থনার বহর ছিল যথেষ্ট উষ্ণ। দুই দেশের পতাকা হাতে করে স্কুলের ছেলেমেয়ে ও কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এয়ারপোরটে এসেছিল। ওইদিন ও শ্রীমতী গান্ধীর ফেরার দিন সমস্ত স্কুলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ছাত্রছাত্রীদের বাসে করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

লারনাকা থেকে সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়ার দূরত্ব প্রায় ২৯ মাইলের মত। লারনাকা ভূমধ্যসাগরের উপসাগর লারনাকা বে'র তীরে। গোটা সাইপ্রাসের মানচিত্রটা একটি কুমীরের মত। কুমীরের সামনের পা যেদিকটায় সেদিকটাতেই লারনাকা। আর নিকোসিয়া হল উত্তরে কুমীরের বুকের কাছে। গোটা পৃথিবীর মাপে সাইপ্রাসের আয়তন একটি বিন্দুর মত। মাত্র ৩৫৭২ বর্গ মাইল এর এলাকা। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ এলাকাই আবার তুর্কীদের দখলে। লোক সংখ্যা মাত্র সাড়ে ছ লক্ষ।

সাইপ্রাসের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে রাস্তার দুধারে উষ্ণ অভ্যর্থনার কথা বলে নিই।

নিকোসিয়াতেই আগে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিল। কিন্তু এখন সেই বিমানবন্দরটির খুব কাছাকাছি এলাকা তুর্কীদের হাতে চলে যাওয়ায় বিমানবন্দরটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সংগে গড়ে

লারনাকাতে জনতার ভিড়

তোলা হয়েছে নিরাপদ জায়গায় লারনাকা এয়ারপোরট। লারনাকা ও সন্নিহিত এলাকাগুলি আগে গ্রাম ছিল। এয়ারপোরট হবার পর থেকেই ২৯ মাইল সড়ক তৈরি হয়েছে। হাইওয়ের ধারে গ্রামগুলি দ্রুত শহরে পরিণত হয়েছে। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। আমরা কনভয়ের সংগে যেতে যেতে দেখতে পেলাম দেওয়ালে দেওয়ালে ছাপান পোস-টারে শ্রীমতী গান্ধীর ছবি। প্রায় মাইলখানেক অন্তরই মোড়ে মোড়ে স্কুলের ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়েছে, হাতে প্ল্যাকারড। তাতে লেখা 'ওয়েলকাম টু আওয়ার ট্রু ফ্রেনডস।' শ্রীমতী গান্ধী একটি লালপাড় শাড়ি পরেছেন। তিনি খুব খুশি ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে।

গোটা সাইপ্রাস দ্বীপটি বন্ধুর। পাহাড়ী উঁচু নিচু জায়গা। ক্যারিবিয়ান বা পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মত অত সবুজও নয়। পর্যটন থেকে এই দ্বীপের মোটা টাকা আয় হয়। বছরে সাড়ে তিন লক্ষ পর্যটক আসেন এখানে। এ জন্য ওইটুকু দ্বীপে ৮৫৭১ শয্যা আছে হোটেলে। কিন্তু ঐতিহাসিক কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব একটা আহা মরি কিছু নয়। আমি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মাস পাঁচেক ছিলাম। ভারতের কার নিকোবর দ্বীপেও গিয়েছি, সাইপ্রাসের চেয়ে ওসব দ্বীপের সৌন্দর্য আরও ভাল। তবু সাইপ্রাসে পর্যটকরা যে বেড়াতে আসেন তার একটা বড় কারণ সাইপ্রাস মধ্যপ্রাচ্য ও ইওরোপের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি থেকে খুব দূরে নয়। যেমন বেইরুটের দূরত্ব মাত্র ১২৮ মাইল, কায়রো ৩৪৪ মাইল, এথেনস ৫৮৮ মাইল, রোম ১২৬০ মাইল, ফ্রাংকফুরট ১৬৪৮ মাইল, প্যারিস ১৮৬৩ মাইল, লনডন ২০৪৬ মাইল। নিকোসিয়াতে টিভির পাঁচটি চ্যানেল। তার মধ্যে সিরিয়া ও লেবানন স্টেশন অতি সহজেই ধরা যায়।

এত ঝড় ঝাপটা সত্ত্বেও সাইপ্রাসের অর্থনীতি কিন্তু খুবই ভাল। ১৯৬০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন মাথাপিছু ১৬৪ সাইপ্রাস পাউনড। এখন সেটা দাঁড়িয়েছে মাথাপিছু ১২১৭ পাউনডে। যেদিকে তাকাই নতুন নতুন বাড়ি। ১৯৬০ সালে একটাও বাড়ি তৈরি হয়নি। এখন বছরে সাত হাজার করে বাড়ি উঠছে। ওই বছর একটাও ইউনিভার সিটি ছাত্র ছিল না। এখন প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ২০টি করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র। যদিও সাইপ্রাসের এখনও কোন নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সব ছাত্রকে বিদেশে পড়তে যেতে হয়। চারিদিকে গাড়ির ছড়াছড়ি। প্রতি সাতজন লোকের একজনের গাড়ি আছে। আগে ছিল কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি। এখন জাতীয় উৎপাদনের বেশির ভাগটা আসে ম্যানুফাকচারিং, কনসট্রাকশান ও পাইকারি ব্যবসা থেকে। এর পরের স্থান কৃষির।

আমার মতে ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যকে ভাগ করেছে সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও পরিচ্ছন্নতা। ইওরোপের যেখানেই যান, তারা যত গরিবই হক আপনি দেখবেন সর্বত্র ঝকঝকে তকতক করছে। সব কিছু ছিমছাম সাজানগোছান। মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে আমি যাইনি। বেইরুট, কায়রো, তেহরান প্রভৃতি শহরে গিয়েছি। সর্বত্র একটা অগোছালভাব। পশ এলাকা যেমন আছে তেমনি ঘিঞ্জি নোংরা এলাকার অভাব নেই। এই পরিস্থিতি আফগানিস্তান, পাকিস্তান হয়ে ভারত পর্যন্ত প্রসারিত। তবে কলকাতা থেকে অন্য যে কোন জায়গায় গেলে মনে হয় নরক থেকে স্বর্গে এসেছি। কলকাতার মত এত এলোমেলো নোংরা, বিশৃঙ্খল শহর এখন আর দুটি নেই।

সাইপ্রাসের অধিবাসীরা এখন গ্রীক। তারা ইওরোপের মানুষ। সৌন্দর্যবোধ তাদের সহজাত। চেহারাও খুব সুন্দর। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের ভারতীয়দের অনেকের চেহারায় গ্রীক প্রভাব এত বেশি যে একজন সুদর্শন উত্তর ভারতীয় ও গ্রীকের মধ্যে চেহারার কোন তফাৎই নেই। তবে গ্রীকরা ধবধবে ফরসা। ওদের মুখে লালচে ভাবটা কম।

আমরা যেতে যেতেই দেখতে পাচ্ছিলাম সাইপ্রাসের উন্নয়ন কাজ কী প্রচন্ড গতিতে চলছে। একটু দূরেই লারনাকা শহর। নতুন সুপার মারকেট তৈরি হচ্ছে। নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে লারনাকা এয়ারপোরট তৈরি হয়। তারপর থেকেই এদিকটার উন্নতি শুরু। শহরে আসতেই কনভয় থেমে গেল। দুপাশে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে শ্রীমতী গান্ধীকে দেখার জন্য। কী ব্যাপার? শুনলাম শহরের মেয়র শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর আবার মোটরকেড এগিয়ে চলল নিকোসিয়ার পথে। দুদিকে সুন্দর সুন্দর একতলা বাড়ি। সামনে পিছনে ছোট ছোট অরচারড। সাদা চুনাপাথর ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। এমনকি চুনের রঙে গাছের রঙও সাদা হয়ে এসেছে। এই চুনাপাথর বিছান মাঠ মাইলের পর মাইল। ছোট ছোট টিলা। টিলার ওপরে সংগীন ধরে সিকিওরিটি গারড চারিদিক নজর রাখছে। এই ধূসর প্রান্তরে অলিভ ছাড়া কোন গাছ চোখে পড়ল না। প্রান্তরে চরছে ভেড়ার পাল আর অলিভ গাছের ছায়ায় বসে বুশ শার্ট প্যান্ট পরা রাখাল ছেলে জিরিয়ে নিচ্ছে। মাঠ পেরিয়ে চলে গেছে টেলিগ্রাফের তার। অনেকক্ষণ চলার পর দেখলাম পথ নির্দেশিকায় লেখা ডালি ৫ নিকোসিয়া ১৯ অর্থাৎ ১৯ মাইল।

ডালি একটা ছোট গ্রাম। গ্রামের ছেলেমেয়েরা হাতে ফুল আর অলিভ গাছের ডাল নিয়ে ঘন ঘন নাড়ছে আর শ্রীমতী গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এটা কোন স্পনসরড ব্যাপার নয়। বেশ বোঝা গেল গ্রামের ছেলেরা নিজেরাই এসব করছে।

লিমাসো নিকোসিয়া হাইওয়ে ধরে চলার সময় আমাদের গাইড বললেন : ওই দেখুন যেসব উদ্বাস্তু এসেছেন তুর্কী অধিকৃত এলাকা থেকে ওগুলো তাদের বাড়ি সব সরকারি খরচে তৈরি। উদ্বাস্তুদের জন্য এমন সুন্দর বাড়ি আর কোন দেশে তৈরি হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

(চলবে)

তামিল দেশে দীপাবলী

এস কৃষ্ণমূর্তি

বাংলার দুর্গাপুজোর মত তামিল দেশের সর্বপ্রধান উৎসব হচ্ছে দীপাবলী। দীপাবলী পড়ে কার্তিক (তামিলদের 'আইপ্পশি') মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে, অর্থাৎ কালীপুজোর ঠিক আগের দিন। এই উৎসবটা উত্তর ভারতের দেওয়ালির সমপর্যায়ের হলেও তামিল দেশে সারি সারি দীপ জ্বালিয়ে এটা পালন করা হয় না। নতুন কাপড়, মিষ্টি, আতসবাজি পোড়ান এগুলি হল দীপাবলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং দেখা যায় যে দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর বৈশিষ্ট্য দীপাবলী উৎসবের সংগে জড়িত।

প্রত্যেকটি উৎসবের মত দীপাবলীরও একটি পৌরাণিক ঐতিহ্য আছে। দ্বাপর যুগের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা নরকাসুর দেব মানুষদের নির্যাতন করত। তার নির্মম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা ভগবান কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। ভগবান তাঁদের অভয় দেন এবং নরকাসুরবধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তিনি রথে আরোহণ করে নরকাসুরের সন্ধানে যান। তাঁর মহিষী সত্যভামা স্বয়ং রথের সারথ্য করেন। নরকাসুর এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষে নরকাসুর মারা যায়। কিন্তু মরবার আগে নরকাসুরের জ্ঞানলাভ ঘটে। সে তার পাপাচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে একটি বর ভিক্ষা করে। লোকে যেন তার মৃত্যুদিবসে আনন্দোৎসব পালন করে, এই হল তার প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন 'তথাস্তু'। তারপর থেকেই দীপাবলী উৎসবের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা এই যে আনন্দোৎসবের মধ্যেও রাজনৈতিক ঝড়ের আবির্ভাব ঘটেছিল এই শতকের চল্লিশের দশকে।

যাঁরা আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষকে প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনা বলে মনে করেন তারা তামিল দেশের জনমানসের সংগে পরিচিত নন। কারণ এই সংঘর্ষটা তামিল দেশে এখনও একটা জ্বলন্ত সমস্যা। এই সমস্যার উদঘাটন হয়েছিল দ্রাবিড় আন্দোলনের হাতে। দ্রাবিড় আন্দোলনকারীরা আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক আখ্যানগুলির নতুন ব্যাখ্যা করল। তাদের মতে তারা নিজে দ্রাবিড়জাতিভুক্ত এবং ব্রাহ্মণরা ও উত্তরভারতবাসীরা আর্যদের বংশধর। দ্রাবিড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল এই আর্যদের অত্যাচার থেকে দ্রাবিড়দের মুক্তি সম্পাদন করা।

দ্রাবিড় আন্দোলনকারীরা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নরকাসুরবধেও একটি অভিনব ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছিল। তাদের মতে রাজা নরক ছিলেন একজন পরাক্রমশালী এবং বুদ্ধিমান দ্রাবিড় শ্রেষ্ঠ। তিনি বেদপুরাণকে আমল দেননি। ষড়যন্ত্রকারী আর্য-ব্রাহ্মণরা তাকে কোনমতে ভোলাতে পারেনি। ফলে তাদের দ্রাবিড়াশোষণ অচল হয়ে জীবিকোপার্জনের পথ বিপদগ্রস্ত হয়। বিপন্ন আর্যরা তাদের নেতা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। কৃষ্ণ তাদের অভয়দান করেছিলেন বটে কিন্তু নরকের পরাক্রমের কথা ভেবে বুঝতে পারলেন যে কোনদিন সোজাসুজি যুদ্ধ করে নরককে বধ করা যাবে না। তিনি তার মহিষী সত্যভামাকে তার রথের সারথির স্থানে বসিয়ে নরকের অভিমুখে গেলেন এবং তাকে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। কৃষ্ণ জানতেন যে ভদ্রতার মূর্তরূপ নরক কোনো অবস্থায় একজন মহিলার উপর আক্রমণ করবেন না। কৃষ্ণের প্রত্যাশা বাস্তব হয়েছিল। কৃষ্ণের রথে সত্যভামাকে দেখে নরক যুদ্ধ করতে ইতস্তত করছিলেন। এই সুযোগে আড়ালে থেকে কৃষ্ণ নরকের উপর অস্ত্র চালনা করে তাকে বধ করেছিলেন।

সুতরাং, দ্রাবিড় আন্দোলনকারীদের মতে দীপাবলী হল ষড়যন্ত্রের হাতে বীর্যের অবনতির স্মৃতিচিহ্ন। অতএব সেটা হল দুঃখের দিন। উৎসবের দিন নয়। এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দীপাবলীর আগে দেওয়ালে দেওয়ালে 'দীপাবলী দুঃখের দিন। দীপাবলী পালন করবেন না' বলে পোসটার মারা হত।

কিন্তু আন্দোলন জনমানসে সাড়া জাগায়নি এবং কালক্রমে মিইয়ে যায়। কারণ মানুষমাত্রই আনন্দ-প্রবণ। সে এই নিরানন্দ নীরস জীবনের হাত থেকে আনন্দের কয়েকটি ক্ষণ কেড়ে নিতে আগ্রহী। সুতরাং উৎসবের আকর্ষণ তার কাছে দুর্নিবার। অনেক কষ্ট সহ্য করে, এমনকি ঋণ করেও উৎসব পালনে সে তৎপর। সুতরাং কালক্রমে দীপাবলী-বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়।

এই উৎসবের সর্বপ্রধান অংগ হল সূর্যোদয়ের অনেক আগেই তৈলস্নান। জনসাধারণের বিশ্বাস এই স্নানে গংগাস্নানের পুণ্য লাভ করা যায়। সুতরাং তৈলস্নানের পর লোকেরা নতুন কাপড় পরে বন্ধুদের এবং আত্মীয়দের সংগে দেখা করে এবং জিগ্যেস করে 'গংগাস্নান হয়েছে?' স্নানের পর নতুন কাপড় পরা হয় এবং নানারকম মিষ্টান্ন খাওয়া হয়।

দীপাবলী ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়। তারা নতুন কাপড় পরে বন্ধু-বান্ধবদের সংগে ঘুরে বেড়ায় এবং মনের আনন্দে আতসবাজি পোড়ায়।

আতসবাজির কথা উঠলে সংগে সংগে মনে পড়ে শিবকাশীর কথা। তামিলনাড়ুর দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত এই ছোট শহরটি গত কয়েকটি দশকের মধ্যে আতসবাজি উৎপাদনে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। শিবকাশীর ঘরে ঘরে আতসবাজি তৈরি করা হয়। শিবকাশীর আতসবাজির উচ্চ মান সর্বজনস্বীকৃত এবং সেটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও অন্য দেশে প্রচুর মাত্রায় বিক্রি হয়।

নববিবাহিত দম্পতির পক্ষে বিবাহোত্তর প্রথম দীপাবলী একটি বিশেষ তাৎপর্য রাখে। এই দীপাবলীকে বলা হয় 'তালাই দীপাবলী'। এই দিনে নতুন জামাইকে শ্বশুরের ঘরে নিমন্ত্রণ করে তার আপ্যায়ন করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জামাই নতুন কাপড়ের সংগে আংটিও উপহার পায়।

এই শতাব্দীর গোড়ায় তালাই দীপাবলীর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট ছিল। সে সময় কমবয়সী ছেলেমেয়েদের বিয়ে হত। বরের বয়স হত পনের ষোল, বউ-এর দশ বারো। সুতরাং বিয়ের পর নববধূ বাপের বাড়িতে থাকত। তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে মেয়েদের পড়াশুনা হত না এবং হলেও বরবধূর মধ্যে পত্রবিনিময় ছিল একটি অভাবনীয় ব্যাপার। সুতরাং তালাই দীপাবলীই ছিল নববিবাহিতদের যোগাযোগের প্রথম সুযোগ। এই মিলনের অনেক স্বপ্ন নিয়ে ছেলে তার শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হয়—কিন্তু হায়, ভালবাসার রাস্তা কণ্টকময়। ছেলে তার বৌ এর সংগে নিভৃতে মিলিত হবার জন্য ছটফট করে কিন্তু তার মনের অবস্থা না বুঝে তার শ্বশুর সংসারের নানা কথা বলে তাকে বিরক্ত করে, পড়শি এসে তার সংগে আড্ডা জমায় এবং নাছোড়বান্দা শালা তাকে আতসবাজির জন্য পীড়াপীড়ি করে। এতগুলো বাধা অতিক্রম করে ছেলে যখন তার প্রেয়সীকে একা পেয়ে যায় তখন তার কী আনন্দ, কী উল্লাস!

অনেক তামিল পত্রিকা দীপাবলী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। আগে এগুলিতে প্রকাশিত গল্পগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হত তালাই দীপাবলীতে নবদম্পতির রসঘন কার্যকলাপ।

হায়, আজকালকার অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে তালাই দীপাবলীর রোমানস বিদায় নিয়েছে এবং পত্রিকাগুলির বিশেষ দীপাবলী-সংখ্যাও তাদের অভ্যস্ত খোরাক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। □

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

সেলসম্যানের লাভ লোকসান

চিন্ময় সেনগুপ্ত

আমাদের পাড়ার সুদর্শন দুর্দান্ত ফুটবল খেলে। পাড়ার ছোট টুরনামেনটে বা বাইরে মফস্বলে সুদর্শন যখন টিম নিয়ে খেলতে যায় তখন তার খেলা একটা দেখার মত ব্যাপার। কিন্তু আজও এই সুদর্শন সেকেনড ডিভিশনে খেলতে পেল না। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, প্রতিযোগিতা যত গুরুত্বপূর্ণ হয় সুদর্শনের খেলার মান যেন ততই নেমে যায়। অন্যদিকে, অভিজিৎও ভাল খেলোয়াড়। তার বেলায় ঠিক উল্টোটা ঘটে। স্নায়ুর চাপ ছাড়া সে ভাল খেলতে পারে না। খেলা যত কনটেসটেড, অভিজিৎ তত বেশি উজ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ। মনে হয় সংকটই যেন তাকে আরও বেশি শক্তি যোগায়। এরকম একই পরিস্থিতিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার প্রচুর উদাহরণ আমার, আপনার অনেকেরই জানা।

আমাদের বান্ধবী সুলেখা এক কথায় চারমিং। বন্ধুরা মিলে তার বাড়ি বেড়াতে গেলে সে খুব আকর্ষণীয় কথাবার্তা বলে, হৈ চৈ করে। আমরা ভাবি, এত প্রাণশক্তি মেয়েটা পেল কোথায়? অথচ একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা ওর বোন সুগতা বেশ চুপচাপ। সেদিন পল্টুর দাদার বিয়েতে গিয়ে দেখি সেই সুগতাই দারুণ উৎসাহে চেনা অচেনা সবার সংগে মিশে আনন্দে মেতে আছে। ওদিকে সুলেখা এক কোণে চুপ করে বসে। মুখে কথা নেই।

শুধু খেলার ব্যাপারে, মেলামেশার ব্যাপারেই নয়, জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে একই পরিস্থিতিতে সুদর্শন, সুলেখা, অভিজিৎ, সুগতারা বিপরীত আচরণ করছে। যে স্নায়ুর চাপ সুদর্শনের কাছে সংকট, তাই অভিজিতের কাছে উদ্দীপক। আবার ঘরোয়া আড্ডা যে সুলেখার কাছে মেলামেশার সুবর্ণ সুযোগ, সামাজিক সমাবেশ তারই কাছে রীতিমত সংকটের ব্যাপার।

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে পার্থক্যটা জন্মসূত্রে পাওয়া কোন গুণ বা দোষের উপর নির্ভর করছে না। নির্ভর করছে সংকটকালে তাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার ওপর। সংকটের মজাটাই হল যে, আমরা যদি পরিস্থিতির সংগে ঠিকভাবে বোঝাপড়া করতে পারি তবে সেই সংকটই আমাদের অপূর্ব শক্তি দেয়। নতুন বোধ, নতুন ক্ষমতা এনে দেয়। সংকট তখন হয়ে দাঁড়ায় একটা দুর্দান্ত সুযোগ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটি যদি যথার্থ না হয় তবে সেই সংকটই আমাদের বিহ্বল করে তোলে। আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা, দক্ষতা, সংযম কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

আসলে সংকটময় পরিস্থিতিকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি তারই ওপর নির্ভর করছে সেটা সুযোগ না দুর্যোগ। খেলাধুলায়, ব্যবসাতে, লেখাপড়ায় যাঁরা এই সংকটের প্রেরণায় সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন সংকটে কীভাবে উদ্দীপ্ত হতে হয়।

তা হলে দেখা যাক, সংকটকে সুযোগ করে নিতে আমাদের কিং-কর্তব্য। এ প্রশ্নের উত্তরে মনোবিজ্ঞান তিনটি উপায় নির্দেশ করেছেন:

১। সুস্থ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সংকট যখন উপস্থিত নেই তখন, সেই সংকট কল্পনা করে তা কাটিয়ে ওঠার অভ্যাস করা।

২। সংকটে বিহ্বল না হয়ে বরং আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।

৩। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংকটের যথার্থ মূল্যায়ন করা।

কল্পিত সংকটের মুখোমুখি : শ্যাডো বকসিং

সংকটে পড়ে আমরা অনেক কিছুই তাড়াতাড়ি কোন রকমে শিখতে পারি কিন্তু ভালভাবে শিখে উঠতে পারি না। যে লোকটা সাঁতার জানে না, হঠাৎ তাকে জলে ফেলে দিন, হয়ত দেখবেন সে হাত-পা ছুঁড়ে, জল খেয়ে কোনক্রমে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠল। কিন্তু এভাবে চ্যামপিয়ান সাঁতারু সে কখনোই হতে পারবে না। কোনক্রমে সাঁতরিয়ে বাঁচবার কায়দাটা তার মনে এমন ভাবে দাগ কেটে যায় যে, সেই নির্দিষ্ট কায়দা ছেড়ে উন্নতমানের সাঁতার শিখতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। যার ফলে কোন বিপদের মুখে যদি দীর্ঘপথ সাঁতার দিয়ে পার হতে হয় তখন সেই সংকট তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

মনঃসমীক্ষক এডওয়ারড টোলম্যান গবেষণা করে দেখেছেন যে, সংকটকালে শিক্ষা কখনই আশানুরূপ হয় না। কিন্তু কল্পিত সংকট মোকাবিলার অভ্যাস করলে যখন সত্যিকার সংকট উপস্থিত হয় তখন দক্ষতার সংগে তার সম্মুখীন হওয়া যায়।

শিক্ষার্থী দমকল কর্মীর আগুন লাগা বাড়ি থেকে পালাবার সঠিক পথটি খুঁজে নিতে কিছু সময় লাগে। বোধহয় আগুন যদি না থাকত তাহলেও তার একই সময় লাগত। এক্ষেত্রে সংকটের বিহ্বলতায় তার সুস্থ চিন্তা ব্যাহত হয় এবং সে যে কৌশলে কোন রকমে বেরিয়ে এল, মুক্তির সেই পন্থাটি দৃঢ়ভাবে শিখে রাখে। ফলে যদি বাড়িটা অন্য বাড়ি হয় কিংবা পরিস্থিতি সামান্য পরিবর্তিত হয়, তবে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে তার খুবই অসুবিধা হয়। এ জন্যই শিক্ষার্থী ফায়ারম্যানদের সুস্থ পরিস্থিতিতে মুক্তিপথ সন্ধানের 'ফায়ার ড্রিল' অভ্যাস করান হয়। এ রকম কয়েকবার অভ্যাসের পর আশা করা যায় যে, তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও একইরকমভাবে সফল হবে।

আসল কথা, মনে যখন কোন চাপ থাকে না, তখনই মানুষ অধিকতর দক্ষতার সংগে শিখতে পারে এবং তারই ফলে সংকট এলে সহজে তা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই 'স্যাডো বকসিং' বা কল্পিত সংকটের সংগে লড়াই-এর অভ্যাস বহু ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা, বক্তা, শিক্ষক, ব্যবসায়ীকে প্রভূত সাহায্য এনে দিয়েছে।

প্রসংগত চেনা-জানা এক সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের কথা বলি। সে বেচারীর একটা অসুবিধা ছিল যে, যখন কোন ক্রেতা কোন জিনিসের সমালোচনা করত, ঠিক তখনই সে তাকে আশ্বস্ত করার ভাষা খুঁজে পেত না। কিন্তু অরডার না পেয়ে ফিরে আসার পথে সে দিব্যি ভেবে উঠতে পারত কীভাবে ট্যাকল করলে অরডারটি পেত। এই দুরবস্থায় সে 'শ্যাডো বকসিং'-এর আশ্রয় নিল। কল্পনায় একের পর এক ক্রেতার সংগে সে কথাবার্তা শুরু করল, নানা ক্রেতা নানা রকমের সমালোচনা করলেন, সে-ও নানাভাবে খুব দৃঢ়তার সংগে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে লাগল। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল, এই অভ্যাসটা ম্যাজিকের মত কাজ দিয়েছে। সেল টারগেটে সে তো পৌঁছলই, উপরন্তু আশাতীত বিক্রি দেখিয়ে একটা প্রমোশন পেয়ে গেল। আমি একাধিক কৃতী ছাত্রকে জানি যারা পরীক্ষার অনেক আগে থেকে প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করে ঘড়ি ধরে উত্তর দেবার অভ্যাস করে। তাদের দেখেছি পরীক্ষার মাত্র কদিন আগেও নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনার সংগে এটা ওটা করে চলেছে।

আসলে, এই 'শ্যাডো বকসিং' অভ্যাসের ফলে 'আমি নিশ্চয়ই সফল হব', এই রকম একটা মনোভাব তৈরি হয় যা বিরূপ পরিস্থিতিতে শুধু প্রেরণাই দেয় না, প্রায় অনিবার্যভাবে সাফল্য এনে দেয়।

সংকট যেন একটা চ্যালেনজ

মনস্তাত্ত্বিক হেডফিলড লক্ষ্য করেন যে সংকটের সময় সাধারণ মানুষ অসাধারণ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভ করে। তিনি বলেন যে, প্রতিটি বিপদের অভিজ্ঞতাই উদ্দীপকের মত কাজ করে আমাদের কোন না কোন শক্তির সন্ধান দেয়। যদি সংকটকে চ্যালেনজ বলে গ্রহণ করি, তাহলে সেই শক্তিই আমাদের বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে।

একটা আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়েই সংকটের সম্মুখীন হওয়া দরকার। মনে মনে মূল লক্ষ্যটি স্থির রাখতে হবে। সমাগত সংকটে তাই ভাবতে হবে, আমি কী করতে চাইছি, আমি কী করতে চলেছি। ভাবব না, এই সংকটে আমার কী দুর্গতি হতে চলেছে। মনোবিদ প্রেসকট লেকি

বলেন, জীবনে উত্তেজনা তো অনিবার্য। এবং আমরা যেমন চাইব উত্তেজনাটি সেইমত রূপান্তরিত হবে। সমস্যা জয় করতে চাইলে সেই উত্তেজনাই আমাদের শক্তি দেবে, সমস্যা এড়িয়ে যেতে চাইলে সেই উত্তেজনাই দেবে ভয়, দুর্ভাবনা ইত্যাদি। ওই চাওয়াটাকে আয়ত্তে রাখাই আসল কথা।

অনেকে মনে করেন, উত্তেজনা হল আশংকা বা দুশ্চিন্তারই নামান্তর। মানুষের অক্ষমতারই একটা প্রকাশ। কিন্তু যে কোন স্বাভাবিক মানুষ সংকটের মুহূর্তে উত্তেজনা বা অস্বস্তি বোধ করবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উত্তেজনাকে লক্ষ্য অভিমুখী করে তোলা যায়, ততক্ষণ এটা না ভয়, না দুশ্চিন্তা, না সাহস, না দুর্বলতা, কোন কিছুই নয়। আবেগের একটা স্রোত মাত্র। এটা অতিরিক্ত শক্তিরই একটা প্রকাশ, যা নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়।

বহু মুষ্টিযোদ্ধার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, লড়ায়ের আগে তাঁরা এমন বিহ্বল হয়ে পড়েন যে তখন তাঁরা না পারেন বসতে, না স্থির হয়ে থাকতে। কিন্তু এই উত্তেজনাকে তাঁরা কখনই আশংকা বলে ভাবেন না। উপরন্তু জবরদস্ত আক্রমণের প্রেরণা হিসেবে কাজে লাগান। অভিনেতা মাত্রই জানেন যে কোন সিরিয়াস অভিনয়ের আগে এই উত্তেজনা কত দরকারী। অনেকে ইচ্ছে করেই নানাভাবে নিজেকে উত্তেজিত করে তোলেন। বহু পাকা বেস্তুড়ে রেসের মাঠে বাজি ধরেন সেই ঘোড়াটির উপর যেটি দৌড়ের আগে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত। ট্রেনাররাও জানেন যে-ঘোড়াটি দৌড়ের আগে চঞ্চল হয়ে উঠল সেটি অপেক্ষাকৃত ভাল দৌড়বে।

অনেকের আবার এমন স্বভাব যে তারা এই সংকটের উত্তেজনাকে নিজেদেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় মন প্রাণ ঢেলে দেয়। সংকটে উত্তেজনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু যতটুকু উত্তেজনার প্রয়োজন, অবাস্তব ভিত্তিহীন দুশ্চিন্তায় তার চেয়েও বেশি উত্তেজিত হলে সেই বাড়তি উত্তেজনাটা থেকেই যায়, যা উপকারের চেয়ে অপকারই করে বেশি।

বারট্রানড রাসেল এই বাড়তি উত্তেজনাকে প্রশমিত করবার একটা উপায় বলেছেন যা তিনি নিজের উপর বহুবার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে সংকট এলে খুব মন দিয়ে, চিন্তা করে, ভেবে দেখতে হবে যে, এই সংকটের ফলে আমাদের সবচেয়ে খারাপ কী ঘটতে পারে। এবার সংকটটি যে এমন কিছু সর্বনাশা নয় এই ভাবনার সপক্ষে কিছু যুক্তি খুঁজে নিতে হবে। এই রকম যুক্তি সব সময়েই থাকে কেননা সংকট যত গভীরই হোক না কেন তা কখনো কারও জীবনে প্রলয় ঘটাতে পারে না। এইভাবে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে উত্তেজনা অসম্ভব রকম কমে যাচ্ছে।

সংকটের সঠিক মূল্যায়ন

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তুচ্ছ সংকট অথবা কল্পিত দুর্ভাবনা নিয়ে আমরা এত বেশি কাতর হয়ে পড়ি যে, ঐ সামান্য ব্যাপারটাই আমাদের কাছে একটা জীবন মরণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বহু সেলসম্যান কোন একটা অরডার পাওয়া নিয়ে এমন বিহ্বল হয়ে ওঠে যেন সেটা না পেলে তার অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেকে ইনডারভিউ দেওয়ার আগে অসম্ভব আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে এই সংকটগুলি আদৌ কোন জীবন-মরণ সমস্যা নয়। এক একটি সংকট এক একটি সুযোগ, যা গ্রহণ করলে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, না করলেও পিছিয়ে পড়ব না। যেখানে আছি ঠিক সেখানেই থাকব। যেমন, ঐ সেলসম্যানটির পক্ষে সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে? সে হয় অরডারটি সংগ্রহ করে কৃতকার্য হবে অথবা অরডারটি পাবে না। কিন্তু না পেলে তার অবস্থার বিশেষ কোন অবনতি হবে কি? যে লোকটি ইনডারভিউ দিতে চলেছে তার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সে হয় কাজটি পাবে, নয়ত পাবে না। না পেলে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তাই তার আতঙ্কটা একেবারেই অর্থহীন।

মুশকিল হল সংকটের প্রতি এই ভিত্তিহীন মনোভাবটির সামান্য পরিবর্তন করলে কত যে সুফল পাওয়া যেতে পারে আমাদের অনেকেরই তা জানা নেই। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, একজন সেলসম্যান তার রোজগার দ্বিগুণ করতে পারে যদি সে, 'এর ওপরই সমস্ত নির্ভর করছে' এই ভাবনা পরিবর্তন করে 'আমার সবটাই লাভের, ক্ষতির কিছুই নেই' এই মনোভাবটি আয়ত্ত করতে পারে।

মনে রাখা দরকার, কোন সংকটই মারাত্মক নয়। সমস্ত সংকটের সমাধান আমাদের নিজেরই হাতে। কল্পিত সংকটকে কাটিয়ে ওঠার অভ্যাস করে, তাকে একটা চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করে এবং তার পজিটিভ মূল্যায়ন করে প্রতিটি সংকটকেই আমরা এক-একটি সুবর্ণ সুযোগ করে তুলতে পারি। □

পিনাকীর মৃত্যুকে ঘিরে

পিনাকী মজুমদার

ভাগ্য, কপাল এবং জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ – 'সাপুড়ের মৃত্যু সাপের হাতে, জেলের মৃত্যু জলে।' দক্ষিণ কলকাতার ৩৮ বছরের সুঠামদেহী পিনাকী চ্যাটারজি সাপুড়ে কিংবা জেলে নন, জলপ্রেমী। ভালবাসা ছিল তার অগাধ, জল এবং জংগলের সংগে। বন্ধু-বান্ধব এমনকি সুন্দরী স্ত্রী শিউলির কাছেও রসিকতা করে বলতেন – 'মেয়েদের সংগে প্রেমে এক সময় ক্লান্তি আসে, কিন্তু জল এবং জংগলের সংগে প্রেমে ক্লান্তির কোন অবকাশ নেই। এ প্রেম শুধু কাছে টানে, গভীর থেকে আরও গভীরে।'

সুতরাং ২০ মারচ ১৯৪৬ সালে জন্মান সুদর্শন, দীর্ঘদেহী পিনাকী চ্যাটারজি মাত্র আটত্রিশটা ঋতুচক্রের অবকাশে অসংখ্য বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করলেও তার নিখাদ প্রেম আপ্লুত হত শুধুমাত্র সমুদ্রের নীলাভ জলের উদ্দাম হাতছানিতে এবং আদিম অরণ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কুটিল চোখের ইশারায়। তবু এই জল-জংগলপ্রেমী পিনাকীর অদৃষ্ট সম্পর্কে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, ওর সেই সুঠাম সুদর্শন দেহটি নিষ্প্রাণ অবস্থায় পাওয়া যাবে গংগার প্রায় নিস্তরংগ জলে।

ব্যতিক্রম হলেও, সর্বজনীন ধ্যান ধারণাও সময় সময় ভুল প্রমাণিত হয়। পিনাকী চ্যাটার্জির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ঘটনার একদিন পর অর্থাৎ ২৬ সেপটেমবর অবশেষে পিনাকীর মৃতদেহ হাওড়া ব্রিজের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। ওর পরনে তখন শুধুমাত্র একটা হাফ প্যানট। হাত ঘড়িটি তখনও পিনাকীর মর্মান্তিক পরিণতির সংগে একাত্ম হয়ে থমকে দাঁড়ায়নি, চলছিল ঠিকঠাক – 'টিক টাক টিক টাক ...।'

পিনাকীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং পুলিশের সন্দেহ ও সংশয়ের সূত্রপাত সাঁতারে ওর দক্ষতার কথা বিবেচনা করেই। কিন্তু সেই সংশয় এবং সন্দেহ ক্রমশ ধারণায় পর্যবসিত হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই। ময়না তদন্তের রিপোরটের ভিত্তিতেই পুলিশের এই ধারণার জন্ম। এই রিপোরটের এক জায়গায় বলা হয়েছে – 'Death was due to the effects of injuries on the neck and its structures as described — ante mortem in nature — the injuries are not inconsistent with manual compression of throat. The drowning of the body is not antemortem.'

ময়না তদন্তের এই রিপোরটের ভিত্তিতেই পুলিশের ধারণা জন্মায় যে, পিনাকীর মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত নয়, তাকে খুন করা হয়েছে। আর এ ধারণার সংগে সংগেই খুনির হদিশ পাক না পাক খুনের মামলা চালু করে থাকেন পুলিশ দপ্তর। সেই সংগে চলে অপরাধীকে ধরার তৎপরতা। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। খুনের সম্ভাবনার আভাস পেতেই পুলিশ দপ্তর সি আর পি সি-র ৩০২ ধারা এবং ২০১ ধারার মামলা চালু করেছিলেন, চালা ছিলেন একটানা জিজ্ঞাসাবাদ।

জিজ্ঞাসাবাদ, তদন্ত এবং গ্রেপ্তার

যে কোন অপরাধের তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদের শুরু অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু থেকে। খুনের ঘটনার ক্ষেত্রে তাই জিজ্ঞাসাবাদের প্রাথমিক ধকলটা এসে পড়ে মৃতদেহের ওপরই। মৃতদেহের সপক্ষে পুলিশের জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে ময়না তদন্তের রিপোরট। তাতে সন্তুষ্টি না ঘটলে জটিলতর প্রশ্নের উত্তরটিও আসে মৃতদেহের কাছ থেকেই। সে ক্ষেত্রে 'ভিসেরা রিপোরট' নামে এক জটিল ডাক্তারি পরীক্ষার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আর তারপরই তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদের জাল ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণের ওপর।

পিনাকী চ্যাটার্জির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোরট ইতোমধ্যেই হস্তগত। ভিসেরা রিপোরটও আসার অপেক্ষায়। সেই সংগে শুরু হয়েছে ওদিন ঘটনার সময় অন্যান্য যারা পিনাকীর সংগে ছিলেন তাদের একটানা জিজ্ঞাসাবাদ।

পুলিশি সূত্রেই জানা গিয়েছে, ওদিন সকালের দিকে পিনাকী বেরোবার জন্যে ছটফট করতে থাকেন। এতে অবাক হননি স্ত্রী শিউলি কিংবা বাড়ির অন্যান্যরা। তাদের মতে পিনাকীর চরিত্র এরকমই। মাঝে মাঝেই হাঁফিয়ে উঠত শহরের বাঁধাধরা জীবনে। তখন বন্ধু বান্ধব যাকেই হাতের সামনে পেতেন তাকে নিয়েই কোথাও বেড়িয়ে পড়তেন।

সুতরাং গত ২৪ সেপটেমবর সকালে পিনাকীর দেওয়া বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবে তার স্ত্রী শিউলি উৎসাহ না দেখালেও পিনাকী কিন্তু দমেন না। কাছাকাছি এলাকার এক বন্ধু এবং বন্ধু-স্ত্রীর সংগে এদিন নৌবিহারের আয়োজন আগেই করা ছিল। পিনাকী তাদের সংগে যোগাযোগ করেন। জানতে চান, 'কী, তোমরা রেডি তো? আমার চাঁদ সদাগরও কিন্তু রেডি।'

বন্ধুটির জানা ছিল আগামী নভেমবরের মাঝামাঝি পিনাকীর ইন্দোনেশিয়া একসপিডিশনের প্রস্তুতির কথা। জানা ছিল, সেই প্রয়োজনেই পিনাকী সামান্য কিছু টাকায় একটা পুরনো নৌকো কিনে রিমডেলিংয়ের কাজ চালাচ্ছেন জোর কদমে। আদর করে তার নাম রেখেছেন 'চাঁদ সদাগর'। এবং ইতোমধ্যেই বন্ধু বান্ধবের অনেককেই সেই চাঁদ সদাগরে চাপিয়ে

গ্রায়াল প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। উপরি পাওনা হিসেবে তারা উপভোগ করেছে গংগাবক্ষে চাঁদ সদাগরের মধ্যে খানা-পিনা, নাচগান, হৈ-হুল্লোড়।

এ সব সত্ত্বেও সেই বন্ধুটি বা তার স্ত্রী কিন্তু সেদিন ওর নৌবিহারে সংগী হতে পারেননি। বলেছিলেন – 'সরি, আজ ভীষণ কাজ আছে। অন্য দিন যাব।'

পিনাকী সামান্য হতাশ হলেও আশা ছাড়লেন না। পিনাকীর বন্ধু-ভাগ্য বা বন্ধু সংখ্যা তিনি নিজেও গুণে বলতে পারতেন না। সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই তার বন্ধুত্বের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। তবু সেদিন তিনি কাছের মানুষদেরই চেয়েছিলেন। তাই ফোন তুলে নিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন এককালের কলেজের বান্ধবী অমৃতা মৈত্রর সংগে।

অমৃতা এবং পিনাকী দু'জনেই ফিজিওলজির ছাত্র ছিলেন একসময়। তবে পড়াশুনোয় অমৃতা পিনাকীর চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র। বয়স এবং শিক্ষাক্ষেত্রের এই সামান্য ব্যবধান পিনাকী এবং অমৃতার মধ্যে বন্ধুত্বে কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। দাঁড়ায়নি অমৃতার তৎকালীন প্রেমিক দেবব্রত মৈত্রর সংগে বন্ধুত্বেও। যদিও তার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কারণ দেবব্রতবাবু অমৃতার চেয়ে বয়সে অন্তত আট-নয় বছরের বড়। উনি ছিলেন অমৃতার সহপাঠী।

পুলিশের কাছে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য এসে পৌঁছেছে সেই সূত্রেই জানা গেছে – দেবব্রত মৈত্র খুবই সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। স্নাতক হবার পর স্বাভাবিকভাবেই পড়াশুনো চালাতে পারেননি। নেমে পড়েছিলেন রুজি-রোজগারের পথে। বছর আষ্টেকের মধ্যে দেবব্রতবাবু কিছু টাকা সঞ্চয় করে ফেলেন। আর তার ওপর ভরসা করেই আবার নতুন করে পড়াশুনোয় ঝুঁকে পড়েন। ফিজিওলজিতে এম এস-সি ক্লাশে ভর্তি হন। সুতরাং অমৃতার চেয়ে দেবব্রতবাবু বয়সে অন্তত আট বছরের বড় হয়েও অমৃতার সহপাঠী হয়েছিলেন। হয়েছিলেন সহপাঠী থেকে ওর প্রেমিকও।

বয়সে বড় এবং বান্ধবীর প্রেমিক – এ দুটি অন্তরায় সত্ত্বেও পিনাকীর সংগে দেবব্রতবাবুর বন্ধুত্বে ভাঁটা পড়েনি। এম এসসি পাশ করার পর দেবব্রতবাবু আবার রুজি-রোজগারের পথ ধরেন। পিনাকী ডক্টরেট হন। কিন্তু এরই মধ্যে দামাল ছেলে পিনাকী 'দামাল অভিযাত্রী পিনাকী চ্যাটারজিতে' পরিণত হয়ে যান রাতারাতি। সেটা ১৯৬৯। ডিউককে সংগে নিয়ে 'কনৌজী আংরে' নামের নৌকোতে ভেসে যান আন্দামানের উদ্দেশে। বহু শঙ্কা এবং প্রতিকূলতাকে জয় করে অবশেষে আন্দামানের কূলে তাদের নৌকো পৌঁছতে পেরেছিল। ফলে রাতারাতি সংবাদপত্রগুলির শিরোনামে চলে এসেছিলেন 'ডিউক পিনাকী।'

* * * * * *

দুঃসাহসিক এই অভিযানের সাফল্য 'জীবন-সাফল্যের' ডালি হয়ে অচিরেই হাজির হয়েছিল পিনাকীর সামনে। বিভিন্ন নামকরা কোম্পানি উচ্চপদে তাকে নিয়োগ করার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল। ইতোমধ্যে ডক্টরেট হয়ে গেছেন। তাছাড়াও তার মূলধন – সুদর্শন চেহারা, ভরাট কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ 'জাত এগজিকিউটিভ' হবার সব কটি গুণের সুসম সমন্বয়। সুতরাং অনেক চিন্তাভাবনার পর পিনাকী শেষ পর্যন্ত স্যানডোজ কোম্পানিতে সিনিয়র এগজিকিউটিভ হয়ে যোগ দিলেন।

কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে পিনাকীর জীবনের অসংখ্য ঘটনা প্রবাহ। পিনাকীর সংগে ঘনিষ্ঠ যারা, তারা এক বাক্যেই বলে থাকেন – 'পিনাকীর মাত্র আটত্রিশ বছরের জীবনটা ছিল কমপ্লিট একটা এপিসোড। ঘাত, প্রতিঘাত – অসংখ্য ঘটনার বিচিত্র সন্নিবেশ।'

ঘনিষ্ঠজনদের এ ধরনের মন্তব্যের পেছনে রয়েছে পিনাকীর বিচিত্র কর্মকাণ্ডের অসংখ্য টুকরো টুকরো ঘটনা। --- বছর দশেকের পিনাকী। সাইকেল চেপে হুটহাট ছুটে বেড়ায় যত্রতত্র। একদিন খেয়াল চাপল সিঁড়ির ওপর দিয়ে সাইকেল চালাবে। চালাল। ফল যা হবার তাই হল। মাথা-টাথা ফেটে একাকার। --- বছর পনেরর পিনাকী। হঠাৎ মাথায় চাপল বকসিং। শুরু হল বকসার হবার প্রচেষ্টা। হলও চটপট। নামও পেল কিছু। কিন্তু তার বিনিময়ে দেহে নিতে হয়েছিল অসংখ্য চোট, প্রতিঘাতও দিয়েছিল অনেককে। --- দামাল ছেলে পিনাকী শুধু বকসিংয়েই সন্তুষ্ট রইল না। শুরু হল কুস্তি। কুস্তির পর সাঁতার, নৌকো বাইচ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য নৌকো বাইচেই বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে। তখন ও চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র। ফিজিওলজিতে অনারস। অনারস ক্লাস করতে যেতে হত সায়েন্স কলেজে। ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র থাকাকালীনই নৌকোবাইচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কে রিপ্রেজেন্ট করে। এম এসসি পড়ার সময় ভারতকে। এরই ফাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর পর দু'বার দুর্লভ সম্মান 'ব্লু' হয়েছে। রঙিন করেছে প্রেমের জীবনকেও। পিনাকী তখন এম এসসি-র ছাত্র। দক্ষিণ কলকাতারই কালীঘাট অঞ্চলের মেয়ে শিউলি তখন সবে হায়ার সেকেনডারি দিয়েছে। দারজিলিং গিয়েছিল বেড়াতে। পিনাকীও তখন দারজিলিংয়ে। আলাপের সূত্রপাত ওখানেই। সেই আলাপকে সুদৃঢ় করেছে অন্য একটি সূত্র। শিউলির এক বৌদি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজির অধ্যাপিকা। পিনাকী তার ছাত্র। সুতরাং এরই সুবাদে শিউলির বাড়িতে আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা।

শিউলির সংগে এই ঘনিষ্ঠতা কিন্তু পিনাকীকে ঘরমুখো করেনি। এ দাবি করেছেন শিউলি নিজেই। তিনিই জানিয়েছেন – '১৯৬৯ সালের আন্দামান অভিযানের পর ১৯৭১ সালে পিনাকী আর একটা বিচিত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়েন, যে অভিযানের কথা আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি।' ---

---- ১৯৭১ সাল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানে তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। সেই মুক্তিযোদ্ধাবাহিনীর কয়েকজন নাম করা নেতার তখন যাতায়াত শিউলিদের কলকাতার বাড়িতে। পিনাকীর সংগেও তাদের পরিচয় ঘটেছিল। ওদেশের সমস্যার কথা এতদিন পর্যন্ত ছিল ওর ভাসা-ভাসা ধারণামাত্র। নেতাদের সান্নিধ্যে সেই ধারণা পিনাকীর মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করেছিল সবার অজান্তেই। ফলে পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা হয়েও পিনাকী চুপ করে থাকতে পারেনি ওপার বাংলার মরণ-পণ সংগ্রামে। কাউকে কিছু না জানিয়েই চুপিসাড়ে ঢুকে পড়েছিল 'ওদেশে'। মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে নিয়েছিল। ফিরে এসেছিল দিন কুড়ি বাদে। ওর একটি হাত তখন গুলিবিদ্ধ। আঘাত দেহের অন্যত্রও।

* * * * * *

অবশেষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা। শিউলিকে দেওয়া কথার মর্যাদা রাখতে দামাল ছেলে পিনাকী চ্যাটারজি বিয়ের টোপর পড়েছিল। সেটা ১৯৭৩ সাল।

পিনাকীর জীবনের ঘটনাচক্র বিয়ের পরও থমকে দাঁড়ায়নি। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যানসেলর সত্যেন সেন পিনাকীকে বোমবে থেকে ডেকে পাঠালেন। পিনাকী তখন স্যানডোজ কোম্পানির সিনিয়র এগজিকিউটিভ। সত্যেন সেনের চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন পিনাকী। তখন সত্যেনবাবুই প্রস্তাব দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগ দেবার জন্যে। মাইনের হিসেবে স্যানডোজ কোম্পানির চাকরির চেয়ে এ চাকরিতে তিন ভাগের এক ভাগ। তবু সত্যেন সেনের একান্ত স্নেহধন্য পিনাকী চ্যাটারজি এ চাকরি নিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেননি। এক কথায় স্যানডোজ ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পরই পিনাকী চ্যাটারজি 'স্পোরটস মেডিসিনকে' পোসট গ্র্যাজুয়েট কোরস হিসেবে চালু করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সংগে সংগেই সফলতা পাননি। সিনডিকেটের কিছু সদস্যের বিরোধিতার ফলে সাময়িকভাবে বানচাল হয়ে যায় সে প্রচেষ্টা। পিনাকী কিন্তু দমেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে পিনাকীর প্রচেষ্টা আংশিক সফল হয়। ১৯৭৭ সালে এম এস সি ফিজিওলজিতে স্পেশাল পেপার হিসেবে স্পোরটস মেডিসিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পিনাকীর বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সীমা কিন্তু এখানেই আবদ্ধ থাকেনি। এরই ফাঁকে বোমবে থেকে ডুবুরির ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলেন। ট্রেনিংয়ের পর বন্ধুদের কাছে সাফাই গেয়ে বলেছিলেন – 'জলের সংগে একাত্ম হতে গেলে জলের গভীরে যেতে হয়। ওপর ওপর ভাসলেই চলে না। তাই ডুবুরির ট্রেনিংটা নিয়ে এলাম।'

'আসলে, যে কোন জিনিসের সংগে একাত্ম হয়ে যাওয়াটাই ওর চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য।' – এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার ঘনিষ্ঠরা। আর সে কারণেই পিনাকী শুধু জলের গভীরেই অনুপ্রবেশ করেনি। আকাশের সীমারেখাতেও ছড়িয়ে দিয়েছিল নিজেকে। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই ফ্ল্যাইং ট্রেনিং নিতে শুরু করেছিলেন। এমনও দিন গেছে, পিনাকী বাড়ি থেকে বেরোবার সময় স্ত্রী শিউলিকে বলে এসেছে পাইকপাড়া যাবে। কিন্তু বিকেলের দিকে ট্রাংককলে পিনাকীর কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে - 'শিলু, আমি ফ্ল্যাইং করে আগরতলা চলে এসেছি। আজ আর ফিরব না। কাল ফিরব। চিন্তা করো না।'

শিউলির চিন্তা যে হত না, তা নয়। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের ফাঁকে মানুষটিকে ভালমতই চিনে নিতে পেরেছিলেন। তাই অকপটে বলেছেন – 'আসলে ও নিজেই জানত না পরের মুহূর্তে ও কী করবে।' সে কারণেই শিউলির চিন্তা হলেও কখনও অনুযোগ

জানাত না এর জন্যে। আর পিনাকীও তার একমাত্র পুত্রসন্তানের দায়িত্বটা স্ত্রী শিউলির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে হুটহাট বেড়িয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।

সুতরাং গত ২৪ সেপটেমবর সকালে পিনাকীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ছটফটানি শিউলির কাছে এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। পিনাকীও স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে অমৃতার কাছে টেলিফোনে প্রস্তাব রেখেছিলেন – কী, যাবে নাকি আজ চাঁদ সদাগর একসপিডিশনে?

পিনাকীর এ প্রস্তাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপিকা অমৃতা প্রায় সংগে সংগেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন – 'এক মিনিট ধর।' তারপর স্বামী দেবব্রতকে ডেকে জানিয়েছিলেন পিনাকীর দেওয়া প্রস্তাবের কথা। বর্তমানে একটি ওষুধ কোমপানির ম্যানেজিং ডিরেকটর দেবব্রত মৈত্র লুফে নিয়েছিলেন প্রস্তাবটা। দেবব্রতবাবুর ইচ্ছেটা মুহূর্তের মধ্যে অমৃতা রিলে করে দিয়েছিলেন টেলিফোনে – 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা দুজনেই যাব। -- হ্যাঁ, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেড়িয়ে পড়ছি। ও কে!'

২৪ সেপটেমবর তারিখের চাঁদ সদাগর অভিযানের, এই প্রস্তুতিপর্ব এবং টেলিফোন সংলাপ জানা গেছে পিনাকীর ঘনিষ্ঠ মহল এবং পুলিশের কাছে দেওয়া অমৃতার বিবৃতির সূত্র থেকেই। এ দিনের অভিযান সম্পর্কে আরও তথ্য এসেছে পুলিশের কাছে। -- -পিনাকী যখন বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন ঠিক তখনই তার বাড়ির কাজের লোক এসে ঘরে খবর দেয় নিচের তলায় বসার ঘরে একজন অপেক্ষা করছেন। পিনাকী নেমে আসেন। মিনিট পনের পর আবার ওপরে যান। শিউলিকে বলেন – 'মিসটার রায় এসেছেন। ওকেও নিয়ে যাচ্ছি।'

শিউলি সে মুহূর্তে মিসটার রায় সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কারণ মিসটার রায়ের নাম পিনাকীর মুখে দু'চার বার শুনেছেন মাত্র। আলাপ তো দূরের কথা, চোখেও দেখেননি কখনও। পরিচয় হিসেবে শুনেছিলেন সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের একজন অফিসার তিনি। ব্যাস, এটুকুই!

পকৃতপক্ষে পিনাকীর সংগে মিসটার রায় তথা রঞ্জিত কুমার রায়ের পরিচয়ও দীর্ঘদিনের নয়। পিনাকীর ঘনিষ্ঠ এক প্রাণের বন্ধু এ কথা জানিয়েছেন। স্ত্রী শিউলি দেবীও সমর্থন করেছেন এ কথা। তাদের সূত্রেই জানা গিয়েছে মাস ছয়েক আগে পিনাকীর এক বান্ধবী তথা দক্ষিণ কলকাতার একটি সিনেমা হলের মালিকের স্ত্রী পূর্ণিমা দত্ত সুন্দরবনের ওপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্যে আউটডোর শুটিংয়ে যান সজনেখালিতে। যাবার আগে পূর্ণিমা দত্ত প্রস্তাব দিয়েছিলেন পিনাকীকে ওর সংগী হতে। বাঘের মুখ থেকে হরিণের ঠ্যাঙ ছিনিয়ে আনা পিনাকী, বাঘের মুখ থেকে অবলীলায় স্যালাইভা জোগাড় করা পিনাকী এক মুহূর্তে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন এ প্রস্তাবে। ছুটে গিয়েছিলেন পূর্ণিমার সংগে সজনেখালিতে। আর সেই সময়ই পরিচিত হয়েছিলেন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসার রঞ্জিত রায়ের সংগে।

মাত্র ছ'মাসের মধ্যে রঞ্জিতবাবুর সংগে পিনাকীর হৃদ্যতা জন্মেছিল অনেকটাই। পিনাকীর ঘনিষ্ঠমহল এ দাবি করেছেন। যাই হোক, সেই রঞ্জিতবাবুই সেদিন সকালে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন পিনাকীর বাড়িতে। কিন্তু কেন? তবে কি তার আসার কথা আগে থেকেই পিনাকী জানতেন?

পুলিশের কাছে দেওয়া রঞ্জিতবাবুর বিবৃতি অনুযায়ী - রঞ্জিতবাবুকে সজনেখালি থেকে ট্রানসফার করার কথা হচ্ছিল। রঞ্জিতবাবু চাইছিলেন না তাকে ট্রানসফার করা হোক। এই ট্রানসফার রদ করার জন্যেই নাকি রঞ্জিতবাবু ধরেছিলেন পিনাকীকে। পিনাকীর সংগে ওপর মহলের যথেষ্ট খাতির। পিনাকীও নাকি ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। রঞ্জিতবাবুর ওদিনের আগমন সেই উপলক্ষেই। সুতরাং তার দেওয়া এই বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, রঞ্জিতবাবুর আসার খবর পিনাকী আগের মুহূর্তে জানতেন না। পুলিশি সূত্র থেকেই জানা যায় - রঞ্জিতবাবুর সংগে মৈত্র দম্পতির কোন আলাপ ছিল না। ওদিনই ওদের প্রথম আলাপ হয় - মিডলম্যান সেই পিনাকী।

এ ছাড়া ওদিনের নৌঅভিযানে আরও দু'জন উপস্থিত ছিল চাঁদ সদাগরে। পিনাকীরই স্টাফ মাঝি সুলেমান এবং তার ছেলে শাহজাউদ্দিন। সুলেমান মাস ছয়েক হল পিনাকীর কাছে কাজ করছিল। চাঁদ সদাগর পিনাকীকে কিনিয়েও দিয়েছিল এই সুলেমান মাঝি। এর আগে সুলেমানের রুজি-রোজগার বাঁধা ছিল পিনাকীরই এক বন্ধুর কাছে।

সুতরাং ২৪ সেপটেমবরের চাঁদ সদাগর অভিযানে পিনাকীর সংগী এই পাঁচ জন। বেলা সাড়ে দশটা বাজতেই পিনাকীর প্রস্তুতিও শেষ। সামান্য জল খাবার খেয়ে পিনাকী আগের দিনের ভাঙা পোশাকটি পরে প্রস্তুত হয়ে নেয়। তারপর আর দশটা সাধারণ দিনের মত স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীকে বলেন – 'শিলু, আমি বেরোচ্ছি। আজ আর বাইকটা নেব না। হাতের ব্যথাটা কমেনি।'

এরপর পিনাকী নিচের ঘরে বসে থাকা রঞ্জিতবাবুকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আর এটাই পিনাকীকে শেষ দেখা। এরপর বেলা আড়াইটে নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের কাছে গংগার ওপর চাঁদ সদাগরকে টাল মাটাল করতে দেখা যায়। তারপরই নদীর পাড়ে দাঁড়ান একটি নৌকোর মাঝিরা শুনতে পান কয়েকজনের আর্তনাদ। পুলিশের কাছে সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তখন গংগা ছিল শান্ত। নৌকোটা টাল মাটাল করছিল কূল থেকে বড়জোর আড়াইশো মিটার দূরত্বে। এ দৃশ্যে একটি নৌকো ওদের উদ্ধার করতে যায়। তিন জনকে ওরা উদ্ধার করে। তার মধ্যে একজন মহিলা। পুলিশের কাছে উদ্ধারকারী এক মাঝি বলেছে. - উদ্ধার করার সময় ওদের কেউই বলেনি যে আরও একজন 'বাবু' জলে পড়ে গিয়েছে।

ঝড়-তুফানের মধ্যে সমুদ্র পাড়ি দেবার মত করে তৈরি চাঁদ সদাগর ২৪ সেপটেমবর বেলা আড়াইটের সময় গংগার প্রায় নিস্তরংগ জলে টাল মাটাল করে উঠল। তিন জন সংগী জলে হাবুডুবু খেলেন এবং অন্য মাঝিদের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমেই এলেন বেলঘরিয়া থানায়। ওই থানার সূত্রেই জানা যায় ওখানে এসেই উদ্ধারপ্রাপ্তরা পিনাকীর খোঁজ শুরু করেন। থানার সূত্রেই জানা যায় - জল থেকে উঠে আসা অমৃতা মৈত্রর চোখের চশমাটি তখনও চোখেই রয়েছে। এ ছবি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। যাই হোক এরপরই শুরু হয় পিনাকীকে খোঁজার পালা। অবশেষে একদিন পর অর্থাৎ ২৬ সেপটেমবর পিনাকীর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল গংগার জলে।

* * * * * *

পিনাকীর মৃত্যু হল। শুরু হল একটানা জিজ্ঞাসাবাদ। প্রায় দিন-পনের ধরে পুলিশের মুখে শোনা গেল একটাই কথা – কোন 'ক্লু' পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাসে তখন উড়ো খবরের ছড়াছড়ি। পিনাকীর বাড়িতে এবং শিউলির বাপের বাড়িতে ভুতুড়ে টেলিফোন আসতে শুরু করল। তাতে অনেকেই সম্ভাব্য খুনির নাম ধাম বলতে শুরু করলেন। কোন একজন উপদেশ দিলেন – 'পিনাকীর মৃত্যু তদন্তের জন্যে যেন শিউলির তরফ থেকে কোন তদ্বির করা না হয়।' এ সব টেলিফোনের খবরও পুলিশের কাছে যথা সময়ে পৌঁছে গিয়েছে। আর তারপরই আচমকা গত ৮ অকটোবর রাত্রে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ মৈত্র দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেন।

মৈত্র দম্পতিকে গ্রেপ্তার করার দিনই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায়। ওদিন নৌকোর মাঝি সুলেমানকে পুলিশ ব্যাংকশাল কোরটে নিয়ে আসে। ছুটির দিনের অস্থায়ী প্রধান মেটরোপলিটান ম্যাজিসট্রেট বি পি দাশগুপ্তর কাছে সুলেমান একটি বিচার বিভাগীয় জবানবন্দি দেয়। সেই জবানবন্দি এখনও সিল করা রয়েছে। আর তার ঘণ্টা দুয়েক পরই পুলিশ মৈত্র দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেন। পরের দিন গ্রেপ্তার হন নৌকোর অপর সংগী রঞ্জিত রায়ও।

গ্রেপ্তার পর্ব শেষ হলে আদালতে পুলিশ অভিযোগ আনেন : 'গত ২৪ সেপটেমবর পিনাকী তার তিন সংগীকে নিয়ে বেলা সাড়ে এগারটায় আউটরাম ঘাটের কাছ থেকে নৌকা ছাড়েন। তখন ছিল ভরা জোয়ার। রঞ্জিত রায়, পিনাকী, অমৃতা মৈত্র এবং দেবব্রত মৈত্র সবাই নৌকায় মদ খান। মদ ঢেলে দেন রঞ্জিত রায়।' আদালতে পুলিশের আরও অভিযোগ, তারা তদন্তে জানতে পেরেছেন - মদ খেয়ে পিনাকী নৌকোর কেবিনের ছাদে বসেন। তার পরনে ছিল শুধু একটা ছোট প্যানট। হাতে ঘড়ি। অধ্যাপিকা অমৃতা মৈত্রও ছিলেন ওই কেবিনের ছাদে। তার স্বামী দেবব্রত মৈত্র নৌকোর পাটাতনের ওপর বসে ছিলেন। পিনাকী এক সময় অমৃতাকে কাছে টানেন। তারা দু'জনে খুব কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হন। তখন অমৃতার স্বামী দেবব্রত মৈত্র উঠে দাঁড়ান। তারপর পিনাকী, অমৃতা এবং দেবব্রতর মধ্যে উত্তপ্ত তর্কাতর্কি শুরু হয়।'

পুলিশের অভিযোগ, হঠাৎ দেবব্রত মৈত্র দু'হাতে পিনাকীর ঘাড় ও গলা টিপে ধরেন। অমৃতা পিনাকীকে একটা ঘুষি মারেন। পিনাকী 'উঃ' বলে কাতরে ওঠেন। ওই গোঙানির শব্দ করেই পিনাকী নৌকোর কেবিনের ছাদের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে যান। পড়েই পিনাকী নিশ্চল।

পুলিশের অভিযোগ, 'এরপর মৈত্র দম্পতি নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে আলোচনা করেন। এবং নৌকাটি

দক্ষিণেশ্বরের ঘাটের কাছে যেতেই দেবব্রত ও অমৃতা নৌকার একটি দিকে দৌড়ে যান। তাতে নৌকা কাত হয়ে পড়ে। এরপর মৈত্র দম্পতি, রঞ্জিত রায় এবং মাঝি সুলেমান ও তার ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়। পিনাকীর খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

আদালতে পুলিশের এই অভিযোগের ভিত্তিতে পরিষ্কার করেই বোঝা যায়, পুলিশ পিনাকীর মৃত্যুর ব্যাপারে সোজাসুজি মৈত্র দম্পতিকে দায়ী করছে। সোজাসুজি অভিযোগ তুলেছে 'দেবব্রত মৈত্র গলা টিপে পিনাকীকে খুন করেছেন।' পুলিশের এই অভিযোগ কতটুকু সত্য তা বিচার করার দায় অবশ্যই মহামান্য আদালতের। সুতরাং তার সত্যতা বিচারে যাচ্ছি না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মৈত্র দম্পতির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলার পেছনে কী যুক্তি এবং তথ্য রয়েছে? খুনের মোটিভই বা কী?

অভিযোগ কেন?

মৈত্র দম্পতিকে গ্রেপ্তারের মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে পিনাকীর মাঝি সুলেমান একটা বিচার বিভাগীয় জবানবন্দি দেয়। তারপরই মৈত্র দম্পতি গ্রেপ্তার এবং গ্রেপ্তারের পরই আদালতে পিনাকী হত্যার বিবরণ ছায়াছবির মত পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। এ ঘটনা বিচার করলে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং সাক্ষ্য হাতে না থাকলে পুলিশের পক্ষে আদালতে এভাবে সোজাসুজি অভিযোগ তোলা সম্ভব হত না। সে ক্ষেত্রে মাঝি সুলেমান বা তার ছেলের পক্ষেই সম্ভব এ ঘটনার আনুপার্বিক বিবরণ দেওয়া। কেননা পুলিশের হাতে ধৃত মৈত্র দম্পতি এবং রঞ্জিত রায় ছাড়া ওরাই ছিল সেদিনের সহযাত্রী।

পুলিশের এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে দেবব্রতবাবু খুন করতে গেলেন কেন? পুলিশ এই খুনের যে বিবরণ আপাতত আদালতে দিয়েছেন তাতে মনে করা যেতে পারে – মদ খাওয়া অবস্থায় পিনাকী অমৃতাকে কাছে টানে। ঘনিষ্ঠ হয়। সেই দৃশ্যে দেবব্রত হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে গলা টিপে ধরেছিলেন। অমৃতাও স্বামীকে সমর্থন করে ঘুঁষি মেরেছিলেন। তার পরই মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশের ভাষায় এটা grave and sudden provocation. এ অপরাধের শাস্তি কিছুটা লঘুও বটে। তবে কি পুলিশ দপ্তর মৈত্র দম্পতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেই ক্ষান্ত হবে?

তদন্তের মোড় ঘুরছে?

আদালতে মৈত্র দম্পতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে পুলিশ কি সেই পথেই চলছে? নাকি তাদের তদন্তের গতি অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে? – এ প্রশ্ন তুলেছেন পিনাকীর কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাদের এই ধারণার পেছনে রয়েছে কিছু কিছু অতীত ঘটনা যা পুলিশকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। তাদেরই দু-একজন বলেছেন, নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পুলিশ বর্তমানে ভিসেরা রিপোর্ট এবং অন্যান্য দু-একটি বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন।

এই প্রতিবেদনটি লেখার দিন চারেক আগে পিনাকীর চেয়ে বয়সে কিছু বড় পিনাকীর এক বন্ধু পুলিশের কাছে কিছু নতুন দিক তুলে ধরেছেন।

সেই সংগে পুলিশের কাছে খবর এসেছে - মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে পিনাকী মাঝে মাঝেই চোখে ঝাপসা দেখত। মাথাটা ঘুরে উঠত। বলা বাহুল্য, পিনাকীর দেহের ওজন ছিল ৮৫ কিলোগ্রাম। উচ্চতা ছিল ৬ ফুট হাফ ইঞ্চি। (যেখানে তদন্তের রিপোর্টে লেখা হয়েছে ওজন ৭০ কিলোগ্রাম, উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। এটা ঠিক নয় বলে দাবি করেছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।) সুতরাং ওই রকম সুঠাম দেহে এ ধরনের উপসর্গ খুব স্বাভাবিক নয় বলেই গোয়েন্দারা ভাবছেন।

এদিকে পুলিশের কাছে আরও কিছু খবর তুলে দিয়েছেন পিনাকীর সেই বয়সে বড় বন্ধুটি। এই বন্ধুটির সংগে পিনাকীর আলাপ ১৯৭৭ সাল থেকে। সে সময় পিনাকী একটি বিস্কুট কোমপানির ডিলারশিপ নিয়েছিলেন। পিনাকী ১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেবার পর থেকেই কিছু 'সাইড বিজনেস' করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথমে ওষুধের ব্যবসায় নামেন। পরে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে একটা দোকান ঘর নিয়ে বিস্কুটের ডিলারশিপ খোলেন। এই ব্যবসার সূত্রেই বয়স্ক বন্ধুটির সংগে পিনাকীর হৃদ্যতা জন্মায়।

এই বন্ধুটি পুলিশের কাছে বলেছেন, ১৯৭৯ সাল নাগাদ তিনি দেবব্রত মৈত্রকে প্রথম দেখেন। দেখেন পিনাকীর দোকানেই। আলাপও হয়। এর কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সকাল বেলা পিনাকী বন্ধুটিকে বলেন - 'আজ আর অফিস যেতে হবে না। চলো ঘুরে আসি।'

ভদ্রলোক রাজি হয়ে পিনাকীর বাইকে চেপে বসেন। পিনাকী এক বোতল মদ কেনেন। সেটা নিয়ে চলে যান সোজা দেবব্রত মৈত্রের ফ্ল্যাটে। সেই ভদ্রলোক জানিয়েছেন - সেদিনই প্রথম তিনি অমৃতাকে দেখেন। ওদিন ওরা চারজনই এক সংগে বসে মদ খান। আলাপ আলোচনাও চলতে থাকে। ইতিপূর্বে দেবব্রতবাবুর সংগে বেশ কয়েকবার সেই ভদ্রলোকের দেখা হয়েছে পিনাকীর দোকানে। সুতরাং মন খুলেই আড্ডা দিচ্ছিলেন।

আড্ডা এবং পান ভোজনের মধ্যেই দেবব্রতবাবু এক সময় সেই ভদ্রলোককে বলেন, – 'মিসটার ----, আমার একটা পারমিট আছে রেকটিফায়েড স্পিরিটের। দেখুন তো স্পিরিটটার কোন ভাল খদ্দের পান কিনা!' – বয়স্ক বন্ধুটি এ অভিযোগ জানিয়েছেন পুলিশের কাছে আমার কাছেও। তিনি আরও বলেছেন – 'দেবব্রতবাবুর ঐ কথায় আমি বলি – রেকটিফায়েড স্পিরিট কোন কাজে লাগে তাই জানি না। খদ্দের খরব কী করে?

বয়স্ক বন্ধুটি জানিয়েছেন – দেবব্রতবাবুর এ কথায় তিনি খুব একটা উৎসাহ দেখান না। এড়িয়ে যাবার জন্যেই বলেন – দেখি, খবর পেলে জানাব।

বয়স্ক বন্ধুটি পুলিশের কাছে আরও বলেছেন – এ ঘটনার কিছুদিন বাদেই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ছিল। ওইদিনে পিনাকী তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন। তখন আউট্রাম ঘাটে কণ্টিকী নামে একটি ভাসমান রেস্তোরাঁ ছিল। কণ্টিকীর মালিকও পিনাকীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওই রেস্তোরাঁতেই ওরা সারাটা দিন কাটাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। ফলে ওদিন কণ্টিকী জনসাধারণের জন্যে খোলা ছিল না।

এ দিনের এই জমায়েতে হাজির ছিলেন দেবব্রত এবং বয়স্ক বন্ধুটিও। যথারীতি খানাপিনা চলার সময় দেবব্রতবাবু নাকি ওই ভদ্রলোককে বলেছিলেন 'কী মিসটার --, ওই ব্যাপারটার কিছু করতে পারলেন?'

ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন – 'না দাদা, ওরকম কোন পারটির সংগে আমার কোন যোগাযোগ নেই, সরি।'

তিনি আরও জানিয়েছেন – পূর্ণ সূর্যগ্রহণের দিন কণ্টিকীতে আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল।

কণ্টিকীর নিচের তলায় একটা জায়গায় পিনাকী আর দেবব্রতবাবু বসে ড্রিংক করছিলেন। ওপরের ডেকে অন্যান্যরা ছিলেন। হঠাৎই পিনাকীর উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে বয়স্ক বন্ধুটি এবং আরও দু'একজন ছুটে যান। গিয়ে দেখেন পিনাকী উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। দেবব্রতবাবুও উত্তেজিত। বয়স্ক বন্ধুটি পিনাকীর কাছে জানতে চান – 'কী হয়েছে?'

পিনাকী এ কথায় নিজেকে সামলে নেন, সহজভাবেই বলেন 'ও কিছু না।'

এ সব তথ্যের ভিত্তিতেই পুলিশ এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। এ কথা আকারে ইংগিতে পুলিশের এক মুখপাত্র স্বীকারও করেছেন। তারা এখন কতকগুলো জিনিস পরপর মিলিয়ে দেখছেন। সেগুলো : পিনাকীর চোখে অন্ধকার দেখা, দেবব্রতবাবুর রেকটিফায়েড স্পিরিটের পারমিট, দেবব্রতবাবুর সংগে পিনাকীর বচসা প্রভৃতি; ভিসেরা রিপোর্টের জন্যেও পুলিশ উন্মুখ হয়ে আছেন। পুলিশের এক মুখপাত্র কোন কিছু বলতে অস্বীকার করলেও, বলেছেন – 'খুনের প্রকৃত মোটিভও খুব শীঘ্রই প্রকাশ করতে পারব।' এখন শুধু দেখার পালা – পুলিশি তদন্ত কোন দিকে যায়। □

ঢেউয়ে ভেসে ইন্দোনেশিয়া

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কথায় বলে ভেতো বাঙালি। তবু, সবাই কিনা জানি না, কিছু কিছু বাঙালি রাঁধে এবং চুলও বাঁধে। তেমনি একজনের নাম পিনাকী চ্যাটারজি। তিনি অন্য বাঙালিদের মত ভাত-মাছও খান, আবার স্রেফ পালতোলা নৌকোয় চেপে সাত সমুন্দুর তের নদী পাড়িও দেন। কাজেই ভাত খেলেই যে ভীতু হয় এমন কথা বোধহয় আর বলা যাবে না।

বাঙালিদের ভেতো এবং ভীতু এই দুই অপবাদ ঘোচানর জন্যই বোধহয় পিনাকীবাবু এবার উত্তাল ঢেউ-এর বুকে বেছে নিয়েছেন এক দীর্ঘ পথ। পালতোলা নৌকোয় চেপে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে সোজা ইন্দোনেশিয়া। সাগরের বুকে এত বড় পাড়ি এর আগে কখনও দেননি তিনি। এই পাড়ির প্রস্তুতি চলছে এখন কলকাতার গংগার ধারে; জলপুলিশের আস্তানার কাছে। কলকাতার হৈ-চৈ, প্রচার, উৎসাহ, অবজ্ঞা সবকিছুর থেকে আড়ালে নিঃশব্দে এই জলযাত্রার প্রস্তুতিতে পিনাকীবাবুর সংগে হাত মিলিয়েছেন আরও চারজন দুঃসাহসী মানুষ -- রথীন মুখারজি, ছোটন বোস, শেখ সুলেমান এবং রবি মিস্ত্রি। যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসছে এই মুখগুলো তত হয়ে উঠছে প্রতিজ্ঞায় কঠিন। সমস্ত দিনরাত তাদের পরিশ্রম এবং দৃঢ়তা মিশিয়ে তারা তৈরি করে চলেছেন সেই স্বপ্নের নৌকো, যাতে চেপে পাড়ি দেবেন সাগরের পথে।

পিনাকীবাবুর সংগে সেদিন গিয়েছিলাম তাদের এই প্রস্তুতিপর্ব দেখতে। ছ ফুট লম্বা বিজ্ঞানের অধ্যাপক পিনাকী চ্যাটারজির চুলে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে লক্ষ্য করলে হয়ত দু একটা পাকা চুল দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু মন এবং শরীরের দিক দিয়ে এমন সতেজ এবং উজ্জ্বল বাঙালি এখন আর চোখে পড়ে না। তার সঙ্গীদের মধ্যে রথীন মুখারজিও তার মতই লম্বা এবং সুদেহী। দেখলেই বোঝা যায় রথীনবাবুর চওড়া বুকেও সাহস অনেকখানিই ধরে। তুলনায় ছোটন বোস এবং শেখ সুলেমান অনেক রোগা-পাতলা, উচ্চতায় তারা পিনাকীবাবু বা রথীনবাবুর কাঁধ ছুঁতে পারেন না। কিন্তু সাগরের উত্তাল ঢেউ তাদেরও কিছু কম চেনা নয়। এই ছিপছিপে শরীরের ভেতর তারা ধরেন বাঘের সাহস। রবি মিস্ত্রি এই প্রথম সুদীর্ঘ জলযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই, কিছুটা দ্বিধা তার আছে, যদিও সাহসী মানুষদের সংস্পর্শে তা কাটিয়ে উঠছেন ধীরে ধীরে। পিনাকীবাবুর এটা হবে পঞ্চম সমুদ্র-অভিযান। '৬৯ সালে 'কাহেশজী আংরে' নামে একটা ছোট্ট নৌকোয় চেপে সংগী ডিউককে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি আন্দামানের পথে। সফলও হয়েছিলেন। তারপর আরও অনেকবার জলে ভেসেছেন তিনি। তবে সব অভিযানকে ছাপিয়ে এবারের এই ইন্দোনেশিয়া যাওয়া -- কারণ এত দীর্ঘ জলযাত্রায় পিনাকীবাবুও আগে জাননি। রথীনবাবু, ছোটনবাবু এবং শেখ সুলেমান তিনজনেরই এটা তৃতীয় জলযাত্রা। এর আগে তারাও সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আর ঝড়কে মোকাবিলা করেছেন শক্ত হাতে, কিন্তু এত বড় সমুদ্রযাত্রা তাদেরও এই প্রথম। পাঁচজনের এই দলে একমাত্র নতুন মুখ রবি মিস্ত্রি।

বারবার এভাবে সমুদ্রে ভাসতে যান কেন? কী এর উদ্দেশ্য? প্রশ্ন করতে পিনাকীবাবু বললেন, 'সমুদ্রকে জানাতে চাই। সাধারণ মানুষকে সমুদ্র সম্বন্ধে আরও বেশি করে সজাগ করতে চাই বলেই তো বার বার সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাই। সমুদ্রের বুকে এই যে এত সম্পদ লুকোন রয়েছে, তার প্রচন্ড প্রয়োজনীয়তা রয়ে গিয়েছে আমাদের জীবনে। তাকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারি আমরা। সেই সম্পদকে আহরণ করে আনতে হলেও তো সমুদ্রকে জানতে হবে, সমুদ্রের কাছে যেতে হবে। আর এছাড়া ধরুন, সমুদ্রকে পরিবহনের একটা পথ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি আমরা। তার জন্যও তো সমুদ্রকে নতুন করে জানার, নতুন নতুন পথ বের করার প্রয়োজন রয়ে গিয়েছে।'

দিনের আলোয় সমুদ্রের বড় ঢেউ, আর রাতের অন্ধকারে কালো জলের ভেতর ফসফরাসের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে আমরা যারা অহেতুক ভয় পেয়ে যাই, আমাদের সেই অহেতুক ভয়ও ভাঙিয়ে দিতে চান পিনাকীবাবু। তার ইচ্ছে আছে আরও বেশি লোককে সমুদ্র সম্বন্ধে উৎসাহী করায়, সমুদ্র-অভিযানের বিষয়ে আরও সক্রিয়ভাবে তাদের অংশগ্রহণ করানোয়। এ জন্যে একটি 'সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউশন' গড়ে তুলতেও তিনি আগ্রহী। যেখানে সমুদ্র-অভিযানের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় শেখান হবে। 'অবশ্য এখনই কিছু উৎসাহী ছেলে এসে যোগ দিচ্ছে আমাদের সংগে' -- জানালেন পিনাকীবাবু।

এই নভেম্বরেই পিনাকীবাবুরা ইন্দোনেশিয়ার পথে সমুদ্রে ভেসে পড়তে চান। আর ডিসেম্বরের মাঝামাঝিই পৌঁছে যেতে চান ইন্দোনেশিয়ায়। নভেম্বরে সমুদ্রে ঝড়-বৃষ্টির আশংকাটা কম থাকে আর উত্তুরে হাওয়ার সাহায্য পাওয়া যায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিই পৌঁছে যেতে চান, কারণ ডিসেম্বরের শেষে আবার একটা ঝড় বৃষ্টির আশংকা থাকে। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তারা প্রথমে বরমার কোন বন্দরের গা ঘেঁষে সেখান থেকে নিকোবরের কোন বন্দরের পাশ দিয়ে তারা পৌঁছতে চান ইন্দোনেশিয়ার প্রথম যে দ্বীপটি পড়বে তাতেই। তারা আশা করেন সাভাং-এ গিয়ে পৌঁছবেন তারা। এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাদের বাহন একটি পালতোলা নৌকো। আধুনিক যন্ত্রপাতি বলতে দিকনির্ণয়ের জন্য একটি কমপাস আর খবরাখবর পাঠাবার জন্য একটি ট্রানসমিটার সেট। কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই দাঁড় বেয়ে তারা গিয়ে পৌঁছবেন ইন্দোনেশিয়া। মাঝখানে কোথাও থামবেন না।

এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ইন্দোনেশিয়া বেছে নিলেন কেন? উত্তরে পিনাকীবাবু জানালেন, 'প্রাচীন ভারতের লোকগাথা বা ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাব বহু আগে ঐসব দেশগুলোর সংগে ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে একটা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। আমি উড়িষ্যা থেকে কলকাতার উপকূল অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে, কথা বলে, বিভিন্ন কাহিনী শুনে বোঝার চেষ্টা করেছি কীভাবে তখন সমুদ্রপথে যাত্রা করত। বলা যায়, সেই থেকেই ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার প্রেরণা পাই।'

পিনাকীবাবু এই অভিযানে একটি নতুন গবেষণা করতে চান। আমাদের উপকূল অঞ্চলে এমন অনেক মাঝি আছেন, যারা সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। কিন্তু তারা ভীষণভাবে কুসংস্কার আর পুরো আচার্য বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের শিক্ষক পিনাকীবাবু তাদের ঐসব কুসংস্কারগুলো ভেঙে দিয়ে তার সংগে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটাতে চান। তাই তিনি তার যাত্রার সংগী করে নিয়েছেন দক্ষিণ বংগের শেখ সুলেমান আর রবি মিস্ত্রিকে। ওদের অভিজ্ঞতা আর নিজেদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা মিশিয়ে তিনি এই অভিযান করতে চান। তার ধারণা, এই ধরনের প্রচেষ্টা সফল হবেই।

এই অভিযানে মোটামুটি সময় লাগবে পঁয়তাল্লিশ দিন। মোট খরচ হবে পনের থেকে কুড়ি হাজার টাকার মত। না, কোন সরকারি সাহায্যের হাত তাদের দিকে এগিয়ে আসেনি। সরকারি আমলাদের পরামর্শমত পিনাকীবাবুরা অনেকবারই তাদের প্ল্যান সরকারি দপ্তরে জমা দিয়ে এসেছেন। তারপর কোন অজ্ঞাত সরকারি নিয়মেই সেসব আবার ফাইলবন্দী হয়ে ধুলো চাপা পড়ে গেছে। পিনাকীবাবুরা আর সরকারি সাহায্যের দিকে মুখ চেয়ে অনন্তকাল বসে থাকার কথা ভাবেননি। বন্ধুবান্ধব, উৎসাহী মানুষজনদের থেকে টাকা জোগাড় করে, নিজেরাও টাকা দিয়ে অভিযানের কাজে নেমে পড়েছেন। তাই প্রত্যয়ে দৃঢ় এই মুখগুলো বলতে পারে, 'আমাদের অভিযান হচ্ছে -- হবেই।' ☐

বাঁদিক থেকে রবি মিস্ত্রি, রথীন মুখারজি, পিনাকী চ্যাটারজি, ছোটন বোস ও শেখ সুলেমান

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে পরিবর্তনের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

আমেরিকার চিঠি

শিকাগো শহরে পুলিশের পাহারা গাড়িতে একদিন রাতে

আমেরিকা সফররত সুদীপ মজুমদার

মাইক আর বব সবে রাতের শিফট শুরু করতে এসেছে। দু'জনেই শিকাগো শহরের পুলিশ ফোরসের পুরনো অফিসার। প্রায় বছর পনেরো কাটিয়ে দিয়েছে পুলিশের চাকরিতে। বব এর পূর্বপুরুষরা ইটালির সিসিলি থেকে এসেছিল। মাইকের জারমানি থেকে। গত দু'বছর ধরে বব আর মাইক জুটি শিকাগো পুলিশে নাম করেছে। মাইকের একটা বিরাট অপারেশন হওয়ার দরুন একটু ঝুঁকে হাঁটার অভ্যাস হয়ে গেছে। বব-এর বিশাল চেহারা, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, মাথায় কোঁকড়ান চুল। মুখে প্রায় সব সময়ই মারলবরো সিগারেট।

আকাশী নীল রঙের জামা আর নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট। বুকে পুলিশের ব্যাজ। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলবার। বড় টরচলাইট। মাথায় টুপি। ওরা দুজনে ডিউটি শুরু করার আগে রিপোরট করতে এল। সেখানেই ওদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন শিকাগো পুলিসের এক লেফটেন্যানট। 'ইনি ভারতীয় সাংবাদিক। আজ রাতে তোমাদের সংগে পাহারা গাড়িতে ইনি ঘুরে বেড়াবেন। আমাদের পাহারা আর অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দেখতে চান। একটু খেয়াল রেখ'। সিনিয়ার অফিসারটি বব আর মাইককে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেন।

বব এর মুখ চলছে। দাঁতের ফাঁকে চিউইং গাম আর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে তারপর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বলল, 'তাহলে চলুন, আজ রাতে আপনাকে শিকাগোর অন্য একটা রূপ দেখিয়ে আনি।'

আগে থেকেই শুনেছি শিকাগো শহরে অপরাধীদের দৌরাত্ম্যের কথা। বিশেষত দক্ষিণ আর পশ্চিমের শহরতলি এলাকাগুলোতে। আমাদের পাহারা গাড়ি পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত গরিব অঞ্চলগুলোতেই বেশির ভাগ সময় কাটাবে। গাড়িতে পেছনের সিটে বসলাম, মাইক গাড়ি চালাচ্ছে। বব পাশে বসে ওয়ারলেসে কনট্রোল রুমের সংগে যোগাযোগ রাখছে। এলাকাটা কেমন যেন নিঝুম। কোন কোন রাস্তায় বাড়ি নেই। দারিদ্র্যের ছাপ বাড়ির বাইরের দেওয়ালে। পলেস্তারা খসে পড়ছে। সামনে আবর্জনা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোকরাদের জটলা। পুলিশের গাড়ি দেখেই বিয়ারের বোতল পেছনে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

মনে মনে ভাবছি, 'কই, কোনও গোলমাল তো চোখে পড়ল না।' ঠিক এমনি সময়ে বব আস্তে করে মাইককে কী যেন বলল, ওয়ারলেসের ঘড় ঘড় আওয়াজে বোঝা গেল না। ওদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু মাইক ততক্ষণে গাড়ির ছাদের লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর সাইরেন বাজান শুরু করে দিয়েছে। একটু ঠিক হয়ে বসেই দারুণ জোরে গাড়ি ছোটাল। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া সব দাঁড়িয়ে গেল। দারুণ বেগে পুলিশের গাড়ি ছুটল। সিটটাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। দরজা খুলে এক লাফে বব বেরিয়ে পড়ল। পেছনে পেছনে ছুটলাম। বাড়ির সামনে জটলা। দরজায় আওয়াজ দিতেই এক মহিলা খুলে দিলেন, মহিলার চুল আলুথালু। পরনের ট্রাউজারসটা ছিঁড়ে ফালাফালা। গায়ের জামাটাও ছেঁড়া। চোখ ফোলা। চেহারা ফ্যাকাসে। এক হাতে একটা দুধের বাচ্চাকে কোনমতে আঁকড়ে ধরে আছেন। অন্য হাতে লজ্জা বাঁচাতে ছেঁড়া কাপড়ের ফালি দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা করছেন। কথায় বুঝতে পারলাম, স্বামী মারধোর করেছেন। এবং এখন স্বামী অন্যান্য বন্ধুদের সংগে বেসমেনটে বসে মদ খাচ্ছে আর খালি শাসাচ্ছে। ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখলাম আর গোটা তিনেক বাচ্চা ভয়ার্ত চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

বব হাঁক দিল স্বামীকে বেরিয়ে আসার জন্য। টলতে টলতে বেরিয়ে এল স্বামী, শান্ত অথচ কড়া গলায় বব ধমক দিল তাকে এবং বলল যে আর যেন কোন রকম নালিশ শুনতে না হয়। মহিলাটিকে আশ্বাস দিয়ে বব গাড়ির দিকে ফিরে চলল। ওয়ারলেসে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিয়ে বলল 'শান্তি ফিরে এসেছে।' অবাক হলাম। ওই পরিবারটাতে কি সত্যি সত্যিই শান্তি ফিরে এসেছে? আমার মাথায় তখন হাজার প্রশ্ন। অবস্থাটা বুঝতে পেরে বব নিজের থেকেই বলল 'এই ধরনের কেসকে আমরা পারিবারিক কলহ বলে থাকি, আমাদের মোট সময়ের তিন ভাগের এক ভাগ কাটে এই ধরনের অশান্তি পোয়াতে। আমরা এও জানি যে, পুলিশের পক্ষে এই ধরনের সমস্যা মেটান সম্ভব নয়।'

সেদিন রাতে যা দেখলাম তা আমেরিকার অপরাধ তালিকার অন্যতম প্রধান সমস্যা। নারী নির্যাতন বা স্ত্রীর ওপর স্বামীর অত্যাচার। এটা এমন এক ধরনের অপরাধ যা সাধারণত পুলিশের কাছে রিপোরট হয় না। কতকটা চক্ষুলজ্জায়, কতকটা নারীর অসহায় অবস্থার দরুন। কিন্তু এদেশে নারী নির্যাতনের সমস্যা এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে এ নিয়ে জনসাধারণ দারুণ সোচ্চার। বিভিন্ন এজেনসির কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করার পর দেখা গেছে যে, আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ৬০ লাখ নারী পারিবারিক বিশেষত স্বামীর দৈহিক অত্যাচারের শিকার হয়। এবং প্রায় ২000 থেকে ৪000 স্ত্রী স্বামীর অত্যাচারে মারা যায়। নারীদের সব চাইতে বড় বিপদ পুরুষের অত্যাচার সহ্য করা। নারী নির্যাতন সব দেশেই রয়েছে। ভারতের মত দেশে এই ধরনের অত্যাচার যদিও অনেকের জানা কিন্তু পুলিশের কাছে রিপোরট খুব কমই হয়। এদেশে নারী জাতি অত্যাচার আর সহ্য না করতে পেরে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে ওঠে। তাই সরকারি তথ্যে এই ধরনের নির্যাতনের উল্লেখ দেখা যায়।

আমেরিকায় অপরাধের সংখ্যা ও চরিত্র অন্যান্য দেশের থেকে একটু আলাদা। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন (FBI) সবে এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। তার থেকে দেখা যায় যে, অপরাধের হার গত বছর সামান্য কমেছে। কিন্তু নিউ ইয়রক গোটা দেশে সব চাইতে অপরাধপ্রবণ শহর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ছিনতাই, ডাকাতি, চুরি, বিভিন্ন দলের মধ্যে মারামারি, ড্রাগ পাচার, ধর্ষণ এবং আরও অনেক হিংসাত্মক অপরাধের জন্য নিউ ইয়রক পৃথিবীর অন্যতম অপরাধপ্রবণ শহর হিসাবে দুর্নাম অর্জন করেছে।

সারা আমেরিকায় প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায় ৯৯০১টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু নিউ ইয়রকের বেলায় এই সংখ্যাটি আরও অনেক বেশি। এই শহরে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায় গত বছর ৯৮১৯টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এখানে কয়েকটা রুটে পাতাল রেল সারা দিন রাত চলে। কিন্তু রাত বেশি হলে পাতাল রেল স্টেশনগুলো নিঝুম হয়ে যায়। তখন যাত্রীরা ছিনতাইবাজদের সহজ শিকার হন। আমেরিকান বন্ধুরা সব সময় আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যাতে বেশি রাতে পাতাল রেলে চলাফেরা না করি। আর যদি কখনও ছিনতাইবাজের কবলে পড়ি তাহলে যেন সংগে সংগে টাকা, ঘড়ি ওদের হাতে তুলে দিই। নতুবা বিপদ। কদিন আগে লস এনজেলসে ছিলাম। একদিন রাতে রেস্তোরায় খেয়ে এক যুগোশ্লাভ সাংবাদিক বন্ধুর সংগে হোটেলে ফিরছি। রাস্তায় এক নির্জন জায়গায় হঠাৎ গোটা তিনেক যুবক কোথা থেকে উদয় হয়ে পথ আটকাল। ওদের হাতে ছুরি। মুখে অশ্রাব্য ভাষা। বুকটা কেঁপে ওঠা সত্ত্বেও সাহস দেখিয়ে এগিয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় একটা গাড়ির আলো এসে পড়াতে ওরা সরে গেল। সে যাত্রা বেঁচে গেলাম।

কিন্তু একজন সাধারণ আমেরিকান সব সময় অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে বাঁচতে পারে না। মহিলাদের অবস্থা আরও খারাপ। ধর্ষণ যে সংখ্যায় বেড়েছে তার থেকে বিশেষজ্ঞরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কোনও মহিলার সারা জীবনে ধর্ষিতা হবার সম্ভাবনা দশের মধ্যে এক। ১৯৮১ সালে সারা আমেরিকায় ৯৯,১৪৬ টি ধর্ষণের ঘটনা রিপোরট হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে ধর্ষিতা মহিলারা এখনও পুলিশের কাছে সব সময় নালিশ করেন না। পুরো ধর্ষণের সংখ্যার মাত্র দশ ভাগের এক ভাগই বিভিন্ন এজেনসির কাছে রিপোরট হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ধর্ষণ কোনও মানসিক বিকারের ফল নয়। পুরুষ নারীজাতির ওপর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ধর্ষণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, পুরুষপ্রধান সমাজে নারীকে পণ্য হিসাবে দেখা হয়। তাছাড়া সাহিত্য, ফিলম এবং ছবিতে যৌনতাকে কদর্য করে দেখানর প্রবণতা যে সমাজে বেশি সেই সমাজে নারীজাতির অবস্থা এরকম হতে বাধ্য।

একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দেখা যাক। [illegible]

শহরের স্বনামধন্য ডাক্তার এডওয়ার্ড ফ্রাঙ্কলিন জ্যাকসনের প্র্যাকটিস অন্যান্যদের ঈর্ষার বিষয়। ডাক্তার জ্যাকসন বিবাহিত ও দুই সন্তানের পিতা। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। রোগীদের কাছে তিনি ভগবানের মত। কিন্তু কদিন আগে তিনি স্বীকার করেন যে গত চার বছরে ২২ জন মহিলাকে তিনি ধর্ষণ করেন ও আরও অন্তত দশজন মহিলা তার বিকৃত যৌন ক্ষুধার শিকার হয়। আপাতত ডাক্তার জ্যাকসন পুলিশ হেপাজতে। কিন্তু অনেকে ভাবতেও পারে না যে এমন একজন ডাক্তার এধরনের জঘন্য অপরাধ করতে পারেন।

শুধু তাই নয়, সাধারণ পুরুষ নারী-নির্যাতন থেকে এক ধরনের আনন্দ পেয়ে থাকে। সেন্ট লুইস শহরে চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে এক নির্জন ঝরনায় স্নান করতে যায়। দুটি যুবক তাকে আক্রমণ করে আর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ধর্ষণ করে। পাশে অন্তত তিনজন পুরুষ দাঁড়িয়ে বাহবা দেয়। শেষ পর্যন্ত একটি বালক পুলিশকে খবর দেয় ও মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়।

সমাজে ধর্ষিতা মহিলাকে সহানুভূতি দেখানর বদলে আরও দোষ দেওয়া হয়। নারীর ওপরেই দোষ চাপানর চেষ্টা হয়। তাছাড়া পুরুষপ্রধান পুলিশ, কাছারি, আমলাতন্ত্র নারীর বেদনা বুঝতে পারে না। তাই অনেক মহিলাই এইধরনের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যান। সব চাইতে বীভৎস হল পরিচিত পুরুষ কখনও বা অতি আপন জন দ্বারা ধর্ষিতা হওয়া। এই ধরনের ঘটনাগুলো কদাচিৎ রিপোরট হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে পারিবারিক ধর্ষণ বহুল পরিমাণে সংঘঠিত হয়।

আমেরিকায় আর এক ধরনের বিকৃত অপরাধের প্রচলন আছে। তা হল শিশু নির্যাতন। গত বছর প্রায় ৬০ লাখ শিশু পুরুষ অথবা পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। এক ধরনের মানবরূপী পশু আবার দাবি রেখেছে যে, শিশুদের সংগে বয়স্ক পুরুষদের যৌন সম্পর্ককে বেআইনী বা অস্বাভাবিক মনে করা উচিত নয়।

এই ধরনের অপরাধ দ্বারা এক বিকৃত সমাজের চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। একদিকে পারিবারিক হিংসা ও নারী নির্যাতন অন্যদিকে সমাজে প্রকাশ্যে হিংসাত্মক কাজকর্ম। সব মিলিয়ে আমেরিকান সমাজ এক দারুণ সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। পুলিশ দ্বারা যে এই ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তা এক রাতের শিকাগো পাহারা গাড়ির অভিজ্ঞতা থেকে আরও ভাল বোঝা গেল।

দুর্দশাগ্রস্ত এক মহিলার সাহায্যের আবেদনে পুলিশ গিয়ে শুধু স্বামীকে ধমকে দিয়ে এল। ফলস্বরূপ স্বামীটি যে আরও হিংস্র হয়ে উঠবে না এর গ্যারানটি কিন্তু পুলিশ দিতে পারে না। একই অসহায় অবস্থার মধ্যে মহিলাটি রইলেন।

সেদিন রাতে শিকাগোয় পাহারা দিতে দিতে সমাজের এমন একটা দিক দেখতে পাওয়া গেল যা সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। রাত গভীর হতেই রাস্তায় বেশ্যার দল নেমে পড়ল। মোড়ে মোড়ে পাড়ার গুণ্ডাদের জটলা। প্রায় মাঝরাত নাগাদ একবার মেসেজ এল একটা বিশেষ রাস্তায় যেতে। সেখানে পৌঁছে দেখি রাস্তার মাঝে এক মাঝবয়েসী মানুষ পড়ে রয়েছে। সারা শরীরে রক্ত মাখামাখি। হয়ত কোন ছিনতাইবাজ আঘাত করে পালিয়েছে। অন্য এক বাড়ি থেকে আবার এক নির্যাতিতা মহিলার চিৎকার। দুই দলের মারামারি থামাতে ছুটতে হল আর একবার। গোটা দশেক মেসেজ পেয়ে ছুটতে হয়েছিল চারদিকে। বব আর মাইকের জন্য অবশ্য ওটা একটা অপেক্ষাকৃত শান্ত রাত ছিল। ওদের কাছে অপরাধকে কোনমতে রুখতে পারাটাই কাজ। কিন্তু অপরাধ যে কারণে সংঘটিত হয় তার প্রতি পুলিশের কোন খেয়াল নেই।

নিউইয়রক পুলিশের প্রাক্তন চিফ অ্যানথনি ইবাজার সংগে কথা হচ্ছিল। একেবারে নিচের থেকে কাজ করে ওপরে উঠেছেন। তাছাড়া পড়াশোনা করার অভ্যাস আছে তাঁর। ইবাজা বললেন যে অপরাধের কারণ সমাজে। অর্থনৈতিক কারণে ঐশ্বর্যের অসম বণ্টনের ফলে অপরাধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুলিশ তো আর সমাজবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানী নয়। ওদের কাজ হল অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল যে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি আর অজস্র টাকা এবং পুলিশ দিয়ে অপরাধকে সমাজ থেকে নির্বাসিন দেওয়া যেতে পারে না। পুরো সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সেই সংগে মূল্যবোধ বদলানর দরকার। তবেই হয়ত হিংসা আর অপরাধের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব। □

খবর খবর

দুধের বদলে

কলকাতা ও তার আশে পাশে কয়েকটি অঞ্চলে 'মিলটোন' নামে দুধ আর বাদামের এক বিশেষ পানীয় রাজ্য সরকারের ডেয়ারি ও পোলট্রি ডেভলপমেনট করপোরেশন ২ নভেম্বর থেকে বাজারে ছাড়ছেন। সরকারের দাবি : তেষ্টার আরাম, সেই সংগে পুষ্টির ব্যবস্থাও থাকছে একই বোতলের মধ্যে।

মহীশূরের সেনট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসারচ ইনসটিট্যুট-এর আবিষ্কার করা এই বিশেষ 'ক্যান ড্রিংক' কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের 'খাদ্য ও পুষ্টি' প্রকল্পের আওতাভুক্ত। সারা দেশের কয়েকটা জায়গায় এই 'মিলটোন' প্লানট বসানর চেষ্টা চলছে। পূর্বভারতের হাওড়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই কারখানা। পরিবর্তনকে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানান : আপাতত ৫000 লিটার করে একটি শিফটে উৎপাদন করা হবে। বর্তমান অবস্থায় ১৫00 লিটার রাজ্যের বিভিন্ন পুষ্টি প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের দুধের বদলে বিক্রি করা হবে। দেশে দুধের চাহিদা যখন বাড়তির দিকে তখন দুধ যোগানের অভাব মেটাবে এই মিলটোন।

শ্যামল বসু

মেদিনীপুর ও হুগলীর বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাস চলছে

পারবর্তন নিউজ ব্যুরো

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মেদিনীপুর এবং হুগলীর বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠ-পাট, খুন-হামলাবাজি এখন প্রায় নিত্যকার ঘটনা। বহু পরিবার নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বাস করছেন।

মেদিনীপুরের কেশপুর আর হুগলীর গোঘাট খানাকুল বলতে গেলে অরাজকতার কবলে। জোর-জুলুমের রাজত্ব চলছে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিয়ে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামাঞ্চলে দাংগা-হাংগামা বেড়ে গিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে জমিতে মজুর বন্ধ, ধোপা নাপিত-পুরোহিত বন্ধ এবং মুদির দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এখন পারিবারিক ঝগড়া, গ্রামের দু দলের রেষারেষি দুই রাজনৈতিক দলের লড়াই-এ দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় টাঙি-বল্লম-তীরের দাপটে গ্রামাঞ্চল সন্ত্রস্ত।

শুধু গোঘাট থানায় মজুর বন্ধের ফলে অন্তত হাজার বিঘা জমি অনাবাদী পড়ে আছে। মেদিনীপুরের প্রায় অর্ধেক গ্রামে মজুর বন্ধ নিয়ে চাষ ব্যাহত হচ্ছে।

বেসরকারি হিসাবে চার বছরে মেদিনীপুরের কেশপুরে অন্তত ৭০ জন এবং গোঘাটে বারো জন খুন হয়েছে। পুলিশ ক্যামপ-এর সংখ্যাও বাড়ছে কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না।

হামলাকারীরা কি সবাই গ্রামেরই লোক? অনেকেই অভিযোগ করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশের জেলা থেকে টাকা দিয়ে লোক এনে হামলা চালান হচ্ছে। কখনও বা হাতে তেরঙা ঝান্ডা, কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি – শুনলে মনে হয় হামলাকারীরা কংগ্রেস সমর্থক। কিন্তু আদৌ তা নয়। এ এক নতুন কৌশল।

কেশপুরের সি পি আই (এম) নেতা জামসেদ আলির খুনি কারা: জামসেদ আলি খাওয়া-দাওয়া সেরে সি পি আই (এম)-এর অফিসের বারান্দায় হাত ধুচ্ছিলেন। পুলিশেরই এক কর্তা বললেন, জামসেদ আলি সি পি আই (এম) অফিসের সামনেই খুন হন এবং অফিসের ভিতর রক্তের দাগ দেখা গিয়েছে। পুলিশ ছ জনকে গ্রেফতার করেছে - এঁরা সি পি আই এবং কংগ্রেসের লোক। এরপর ইদরিশ নামে আর একজন কয়েকদিনের মধ্যেই খুন হলেন। পুলিশের সন্দেহ, ইদরিশের খুন জামসেদের খুনের বদলা। ইদরিশের খুনের ব্যাপারে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা সবাই সি পি আই (এম)-এর লোক। জামসেদের খুনের ব্যাপারে সি আই ডি তদন্ত করছে।

জেলার এক পদস্থ পুলিশ অফিসার বললেন, কেশপুরে কংগ্রেস এবং সি পি আই (এম) দুই দলের মধ্যে লড়াই চলছে। কিন্তু বিরোধ যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক। একদল কংগ্রেসের আশ্রয় নিলে আর একদলকে সমর্থন করে সি পি আই (এম)। কেশপুরে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হাংগামা চলছে তিন চার বছর ধরে। বড় রকমের হাংগামা চলছে বছর খানেক ধরে। অনেক জায়গায় পুলিশ ক্যামপ বসেছে। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। মাঝে মাঝে ধরপাকড়ও হয়।

মেদিনীপুরে: কেশপুরের গ্রামাঞ্চলে এখন কেউ কারোকে বিশ্বাস করে না। খবরের কাগজের লোক শুনলে মুখ খুলতে চায় না। অন্তত পনেরোটা গৃহস্থ বাড়ি দেখেছি একদম ফাঁকা – মানুষজন নেই। ছেলে বউ নিয়ে ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কয়েক শো বিঘা জমি অনাবাদী – মজুরের অভাবে চাষ হয় না।

রীতিমত সন্ত্রাস চলছে আমড়াকুচি গ্রামে। জমিতে চাষ করা নিয়ে বিবাদ। গত বছর কংগ্রেস সমর্থক জনা দশ বারো কৃষক পরিবারকে নিজেদের জমিতে চাষ করতে বাধা দেওয়া হয়। তাঁরা পঞ্চায়েতের কাছে দরবার করলেন। কিন্তু কিছুই হল না। দিন মজুর বন্ধ করে দেওয়া হল। শহর থেকে কংগ্রেস নেতারা গেলেন। মিটিং হল। কৃষক পরিবারগুলি ঠিক করলেন, এ বছর চাষ বন্ধ রাখা হবে। জমি অনাবাদী রইল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমড়াকুচি থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন। দিনমজুরদের বেশ কিছু লোক সি পি আই (এম) থেকে কংগ্রেসের দিকে চলে এলেন। আবার অনাবাদী জমিতে চাষ শুরু হল। এর কয়েকদিন পরেই হামলা শুরু হল। কংগ্রেস সমর্থক চারজন কৃষকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

কেশপুরের সব গৃহস্থ বাড়ির পিছনেই পুকুর আছে। গ্রামবাসীরাই অভিযোগ করলেন, একদল লোক আগুন লাগায় আর একদল পাহারা দেয় যাতে পুকুর থেকে কেউ জল তুলে আগুন নেভাতে না পারে।

এর আগে পঞ্চমী গ্রামে ১০টা বাড়ি পোড়ান হয়েছে। গ্রামের লোক অভিযোগ করলেন, বাড়ির মেয়েদের শাসান হয়, কথামত না চললে 'পঞ্চমী করে দেব।' এই পঞ্চমী গ্রামেও সি পি আই (এম) পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুবিধা করতে পারেনি।

সি পি আই (এম) সমর্থকরাও অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেসী রাজত্বে এমনকি ১৯৭৭ থেকে '৮২ পর্যন্ত কংগ্রেসের রজনী দলুই যতদিন এম এল এ ছিলেন, সি পি আই (এম) সমর্থকদের ওপর বেপরোয়া হামলা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কংগ্রেস সমর্থক আকবর আলি মল্লিক বন্দুক থেকে গুলি চালিয়েছে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর।

জবাবটা দিলেন জেলা কংগ্রেসের যুবনেতা সমীর রায় -- সরকার বন্দুকের লাইসেনস দিয়েছে বাড়িতে সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। হীরেন রায়ের ভাগ্নে এবং আকবর আলি মল্লিকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মুদিখানার দোকান লুঠ হয়। গুলি না চালালে গোটা গ্রাম লুঠ হত, আকবরকে খুন হতে হত। আর গুলিতে তো কেউ আহত হয়নি। থানা থেকে পুলিশও প্রায় সংগে সংগে গিয়েছিল, তাই মানুষ প্রাণে বেঁচেছে।

সমীরবাবু অভিযোগ করলেন, মেদিনীপুরের ব্যাপক এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর কেশপুর, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, দাঁতনের মোহনপুর এবং খড়গপুর লোকাল, ভগবানপুর, নয়াগ্রাম ও সুতাহাটার বেশ কিছু গ্রাম পুরোপুরি সন্ত্রাসের কবলে।

দাশপুরের নাড়াজোলে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন কংগ্রেসের লোক। পুলিশের সামনে প্রধান এবং বহু কংগ্রেস সমর্থককে মারধর করা হয়। পনেরোজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

কেশিয়াড়িতে চার বছর কংগ্রেস কোন মিটিং করতে পারেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসী জনসভায় বক্তৃতা দিতে গেলে সি পি আই (এম)-এর লোকেরা হামলা করে।

কেশপুরে দুই কংগ্রেস কর্মী সি পি আই (এম) এর হাতে খুন হয়। ছোট ভাইকে মারা হয় টাঙি দিয়ে। বড় ভাই-এর পেটে বিষের তীর বিদ্ধ করা হয়েছে।

মোহনপুরে ৬৫ বছরের একজন বৃদ্ধ খুন হয়েছেন সি পি আই (এম) এর লোকের হাতে। মাড়োতলার দিবেন্দু ভুঁইঞাকে ডেবরার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শয্যা থেকে তুলে এনে খুন করে মৃতদেহ যথাস্থানে রেখে আসা হয়।

ডেবরা, কেশিয়াড়ি এবং কেশপুরে একজনকেও গ্রেফতার করা হয়নি। ইদানীং জামসেদ আলি খুন হওয়ার পর পুলিশ কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর অন্তত এক হাজার হামলাবাজির ঘটনা ঘটেছে।

মাদপুরের অজিত মাইতি আমার কাছে অভিযোগ করলেন, মাদপুর-মুকসুদপুরে হামলা লেগেই আছে। স্কুলের শিক্ষক কিংকর পাল খুন হলেন। তাঁর তরুণী বধূ আর বাচ্চা মেয়ে আজ অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। ওদিকে বাঁশবাসী অঞ্চলে তো প্রায় প্রতিদিন ঘেরাও চলছে - 'কংগ্রেস করা চলবে না।'

বাঁশবাসী, চমকাগ্রাম, শ্যামচকে এবং সমস্ত কেশপুরে কংগ্রেস সমর্থকদের বাড়িতে ধোপা-নাপিত বন্ধ, জমিতে মজুর বন্ধ। ইদানীং জুলুম চলছে - টাকা দিতে হবে, তার সংগে ধানও দিতে হবে।

কেশপুরেই 'বয়কট আন্দোলন' সবচেয়ে জোরদার – পুকুর থেকে জল নেওয়া বন্ধ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বন্ধ। এমনকি মুদি দোকান থেকে জিনিস কেনাও বন্ধ।

সি পি আই (এম) নেতা জামসেদ আলি খুন হওয়ার পর কেশপুর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। তবু অন্তত দুশো পরিবার আজও গ্রাম ছাড়া। আমড়াকুচি গ্রামে চলছে নিস্তব্ধতা।

স্কুলের শিক্ষক অজিত খাঁড়া ১৯৭৯ সাল থেকে গ্রাম ছাড়া। অজিতবাবু অভিযোগ করলেন, প্রথমে তাঁর জমিতে চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালের ২৮ মে কেশপুরে একদল লোক স্কুলের ভিতর ঢুকে অজিতবাবুকে তুলে নিয়ে যায়। 'গণ আদালতে' বিচার করে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

জামসেদ আলির খুনি কারা?

সি পি আই (এম) এর জেলা কমিটির নেতারা সরাসরি এই খুনের জন্য দায়ী করেছেন কংগ্রেস (ই)-কে। কংগ্রেস (ই)-র লোকেরা পরিকল্পিতভাবে জামসেদকে খুন করেছে। কংগ্রেস (ই) কেশপুরে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে কংগ্রেস (ই)-র যুব নেতা সমীর রায়ের বক্তব্য হল: জামসেদ আলি খুন হয়েছেন সি পি আই (এম) অফিসের ভিতরে বা সামনে। কেশপুরে এমন কোন কংগ্রেসের ছেলে নেই যার বুকের পাটা এত শক্ত যে সি পি আই (এম) অফিসের ধারে কাছে যেতে পারে এবং জামসেদের মত নেতাকে খুন করতে পারে। এই খুনের সংগে সি পি আই (এম)-এর লোকেই জড়িত। বেশ কিছুদিন ধরে জামসেদের সংগে ওদের পারটির অপর এক নেতার ঝগড়া চলছিল।

জামসেদ আলি খুনের ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য নির্দেশ গিয়েছে রাইটার্স বিলডিংস থেকে। কিন্তু অন্যান্য খুনের তদন্ত চাপা পড়ে যাচ্ছে। মেদিনীপুরের গ্রামের মানুষ আতংকে দিন কাটাচ্ছে।

গোঘাট-খানাকুল সন্ত্রাসের কবলে?

হুগলীর গোঘাট থানা এলাকায় অশান্তি চলছে বছর পাঁচেক ধরে। এতদিন লড়াইটা চলছিল মূলত সি পি আই (এম) এবং ফরোয়ারড ব্লকের সংগে। বিরাশির বিধানসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সংগে সি পি আই (এম)-এর সংঘর্ষ প্রায় নিত্যকার ঘটনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গোঘাট-খানাকুলে রীতিমত সন্ত্রাস চলছে।

কথায় কথায় লুঠ পাট, দাংগা হাংগামা, জমিতে মজুর বন্ধ, মিছিল-ঘেরাও লেগেই আছে।

গোঘাটের অশান্তি নিয়ে সি পি আই (এম) এবং ফরোয়ারড ব্লকের মধ্যে অনেক বৈঠক হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিরোধ কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছে। গোঘাটে ফরোয়ারড ব্লকের নেতা মৃণাল ঘোষ তাঁর দলের নেতাদের কাছে এক নাগাড়ে অভিযোগ করেছেন সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সি পি আই (এম)ও মৃণালবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ফরোয়ারড ব্লকের রাজ্য নেতৃত্ব মৃণালবাবুকেই ধমক দিয়েছেন যাতে তিনি সি পি আই (এম) এর সংগে বনিবনা করে চলেন।

গোঘাট ফরোয়ারড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি। গোঘাটকে দখলে আনার জন্য সি পি আই (এম) গত চার বছর ধরে মরীয়া হয়ে লড়ছে। ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃণালবাবু এবং আর একজন ফরোয়ারড ব্লক প্রার্থী জেলা পরিষদে নির্বাচিত হন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোঘাটকে দুটি ব্লকে ভাগ করা হয়। তা সত্ত্বেও মৃণালবাবু এবং তাঁর সমর্থক একজন নির্বাচিত হন। সি পি আই (এম) এর দুজনও জিতেছেন। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত ফরোয়ারড ব্লকের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আরামবাগ মহকুমায় এখন লড়াইটা দাঁড়িয়েছে সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে। সি পি আই (এম) চাইছে ফরোয়ারড ব্লক তাঁদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিক। ফরোয়ারড ব্লকের রাজ্যস্তরের নেতারা চাইছেন বাম ঐক্যের স্বার্থে মৃণালবাবু এবং তাঁর অনুগামীরা সি পি আই (এম)-এর সংগে সমঝোতা করে চলুক। কিন্তু মৃণালবাবু রাজী নন। তিনি সি পি আই (এম) এর হামলাবাজির মোকাবিলা করতে অনেক দূর এগিয়েছেন। আর পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়।

মৃণালবাবু তাঁর দলের কাছে সি পি আই (এম) এর হামলাবাজি সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দলীয় নেতারা মৃণালবাবুকেই দায়ী করেছেন। এদিকে মৃণালবাবু অভিযোগ করেছেন, সি পি আই (এম)-এর লোকেরা শুধু ফরোয়ারড ব্লক বা কংগ্রেসের লোক নয়, তাঁর ওপরও হামলা চালাচ্ছে। তিনি স্কুলের শিক্ষক। কোন কারণ না দেখিয়ে প্রায় দু বছর তাঁর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বামফ্রন্টের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, পঞ্চায়েতের তিন স্তরে ফ্রন্টের যে শরিক সবচেয়ে বেশি আসন পাবেন তাঁদের সদস্যকে প্রধান বা সভাপতি কিংবা জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাধিপতির পদ ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্য শরিকদল যাঁরা দ্বিতীয় স্থানে থাকবেন তাঁরা একটি আসন পেলেও সহকারীর পদ দেওয়া হবে। হুগলীর জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাধিপতি হয়েছেন সি পি আই (এম) এর লোক। ফ্রন্টের ফরমুলা অনুযায়ী সহসভাপতির পদ ফরোয়ারড ব্লককে দেওয়ার কথা, কিন্তু দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে ফরোয়ারড ব্লক সদস্যরা সভা থেকে ওয়াক আউট করেন।

সি পি আই (এম) জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বলাই ব্যানারজি কথায় কথায় বললেন, যাঁরা কংগ্রেসের সংগে হাত মিলিয়ে সি পি আই (এম)-এর বিরোধিতা করেন তাঁদের আমরা সহসভাপতির পদ ছেড়ে দিতে রাজি নই। এটা আমরা আমাদের পারটির রাজ্য নেতৃত্বকেও জানিয়ে দিয়েছি। আরামবাগ মহকুমার গরিব মানুষ সি পি আই (এম)-এর দিকে আসছে। ফরোয়ারড ব্লকের মৃণালবাবুরা এটা মেনে নিতে পারছেন না। তাই মৃণালবাবু প্রফুল্ল সেনের আশীর্বাদ নিয়ে কংগ্রেসকে সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে মদত দিচ্ছেন।

তবে এখন আর শুধু মৃণালবাবু নন, গোঘাট থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য ফরোয়ারড ব্লকের শিবপ্রসাদ মালিকও সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। শিবপ্রসাদবাবু কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছেও সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

খুন, লুঠ, নারী ধর্ষণের অভিযোগ

শিবপ্রসাদবাবু অভিযোগ করেছেন, 'গোঘাট থানায় আইন-শৃংখলা বলে কিছু নেই, জনজীবন বিপর্যস্ত। পুলিশের ডাইরেকটর জেনারেল থেকে গোঘাট থানা – সকলকেই বারবার জানান সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। নির্বিচারে হত্যা, লুঠতরাজ, নারী ধর্ষণ, জোর করে চাঁদা আদায় গোঘাটের শান্তিপ্রিয় জনগণের নিত্যসংগী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'গত ৯ সেপটেমবর সি পি আই (এম) নামধারী কয়েকজনের নেতৃত্বে একদল সমাজবিরোধী ফরোয়ারড ব্লকের কৃষককর্মী অশ্বিনী মান্না ও অধীর মণ্ডলকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে এবং একটি বাড়িতে তালাবন্ধ করে আটকে রাখে। পাশের গ্রাম লক্ষ্মীপুরে ফরোয়ারড ব্লকের কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে ২০ সেপটেমবর বামফ্রন্টের ব্রিগেডে সমাবেশ এবং ২৮ সেপটেমবর বাংলা বন্ধ-এর সমর্থনে তখন একটা মিছিল যাচ্ছিল। মিছিলে দুজনের আটকের খবর আসে। কৃষককর্মীরা ঘরের তালা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করে।

'এরপর দিঘড়া গ্রামে সি পি আই (এম) এর লোকেরা কৃষকদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালায়। শীতল মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে অ্যাসবেসটস ভেঙে দেয় এবং সোনা রূপার গয়না, হাত ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। নিমাই রায়ের বাড়ির খড়ের চাল ভেঙে দেয়, তাঁর স্ত্রীর হাতের সোনার শাঁখা এবং কানের দুল ছিনিয়ে নেয় ও এক মন ধান লুঠ করে। ঘরের আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, কাঁসা পিতলের বাসন লুঠ করে। শীতল চৌধুরীর বাড়ি ভেঙে তছনছ। ধান ঝাড়া মেশিনও ভেঙে দিয়েছে। নিরাপদ কুণ্ডুর বাড়ির অ্যাসবেসটস, দরজা জানালা ভেঙে পাঁচ বস্তা ধান ও দুটি সাইকেল নিয়ে যায়। দুলাল কুণ্ডু, মুকুন্দকিশোর মান্না, গোবিন্দ চৌধুরীর বাড়িতেও লুঠপাট হয়েছে। সমাজবিরোধীদের হাত থেকে বাড়ির মেয়েরাও রেহাই পায়নি। গ্রামের মানুষের আজ আর কোন নিরাপত্তা নেই।'

শিবপ্রসাদবাবু অভিযোগ করেছেন, 'মহকুমা শাসকের সামনেই আমি নিজে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিগৃহীত হয়েছি।'

দিঘড়া গ্রামে সমাজবিরোধীদের আক্রমণ এবং পুলিশের একাংশের

নির্যাতনের প্রতিবাদে সি পি আই (এম)-এর কৃষক সভার ডাকে ২৫ সেপটেমবর এক জনসভা হয়। সি পি আই (এম) নেতারা নির্দিষ্ট করে কোন অভিযোগ করেননি। তবে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস (ই) এবং ফরোয়ারড ব্লকের হামলাবাজি চলছে বলে অভিযোগ করেন।

গত ২৩ সেপটেমবর খানাকুল থানার পাঁচটি গ্রামের প্রায় পাঁচশো লোক আরামবাগ মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে ধরনা দেন। তাঁদের অভিযোগ, সি পি আই (এম) বাইরে থেকে লোক নিয়ে গিয়ে পরপর তিনদিন ধরে কিশোরপুরের পাঁচটি গ্রামে লুঠপাঠ, মারদাংগা করে। বাড়ির মেয়েদের উলংগ করে পরনের কাপড় চোপড় নিয়ে চলে যায়। হামলাকারীদের তীর নিক্ষেপে বহু লোক আহত হন।

জেলা পরিষদ সদস্য বিভূতি রায়ের নেতৃত্বে আশ্রয়হীন প্রায় পাঁচশো নারী-পুরুষ-শিশু মিছিল করে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এক স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য এই হামলাবাজি চালান হয়েছে।

অভিযোগ কবা হয়, পঞ্চায়েতের বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থী রামপদ ঘোড়ুইকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে হামলা করা হয়। হামলার সময় ব্যাপকভাবে তীব ছোঁড়া হয়। অন্যদিকে প্রতিরোধের জন্য রামপদ-বাবুর স্ত্রী স্বর্ণলতা ঘোড়ুই এবং তাঁর দুই ছেলে ইট ছুঁড়তে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত টাঙি-বল্লম নিয়ে চড়াও হয়ে সর্বস্ব লুঠ করে। একটি ফল-ফুলের বাগানও তছনছ করা হয়েছে। গোয়ালঘর ভেঙে দেওয়া হয়। গরু-বাছুরও তীরবিদ্ধ হয়। দুজন বৃদ্ধাকে উলংগ করে সারচ করে দেখতে চায় যে কোন সোনাদানা লুকান আছে কিনা।

আরামবাগ থেকে এস ডি পি ও পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে হাংগামাকারীরা পালিয়ে যায়। ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়। কিন্তু তবুও সেদিন অন্তত পঞ্চাশটি পরিবার নিরাপত্তার অভাবে গ্রামে ফিরতে পারেনি।

বেংগাই-এর অভয় মণ্ডল বললেন, আজ তিন বছর গ্রাম ছাড়া। বউ-ছেলে নিয়ে আরামবাগ শহরে ঘরভাড়া নিয়ে বাস করছেন। সাড়ে বারো একর জমি অনাবাদী।

গোঘাট-খানাকুলের গ্রামের মানুষের এখন একটাই প্রশ্ন, জন্মভূমিতে স্বাধীনভাবে বাস করার অধিকারও কি আমরা পাব না? □

ধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা – ১১

স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম অন্তরংগ পার্ষদ এবং বিশ্ববিখ্যাত মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীর বসতবাড়িতে ঠাকুরের মাঝে মাঝে শুভাগমনের কথা কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তাব মধ্যে কয়েকটি স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন-"পরমহংস মশাই আমাদের গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, নরেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে খুঁজিতে আসিতেন; কিন্তু কখনো বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করেন নাই, বাস্তায় অপেক্ষা করিতেন। তিনি বাড়ীর একটু কাছে আসিলে, অনেক সময় আমি অগ্রসর হইয়া যাইতাম। আমায় বলিতেন, 'নরেন কোথায় - নরেনকে ডেকে দাও।' আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া দাদাকে সন্ধান করিয়া ডাকিয়া দিতাম। অনেক সময় পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন।" (শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান" - পরমহংস মশাই ও নরেন্দ্রনাথ প্রসংগ)। ঠাকুরের অন্যতম অন্তরংগ পার্ষদ ও স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) বলেন – "একদিন ঠাকুর নরেনদের বাড়িতে গিয়েছিলেন নরেনকে দেখতে। সংগে ছিলাম।" (স্বামী অদ্ভুতানন্দের "সৎকথা" – স্বামীজী প্রসংগ)। কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন–"(ঠাকুর) সিমুলিয়া নরেন্দ্রদের বাড়ীতে, এসে ছিলেন।" (শ্রীম–দর্শন, পঞ্চদশ ভাগ–দ্বাবিংশ অধ্যায়)।

স্বামী বিবেকানন্দের যে বাড়িতে ঠাকুর তৎকালীন নরেন্দ্রনাথের, খোঁজে যেতেন, সেই গৌরমোহন মুখারজি স্ট্রিটের প্রসিদ্ধ বাড়িটির, পুরাতন চিত্র এইরকম – "বাড়ীখানি প্রাচীন রীতিতে অনেক জমি জুড়িয়া বেশ বড়লোকের উপযুক্তরূপেই নির্মিত হইয়াছিল। বাড়ীর ভিতরে দেড় বিঘা জমি ছিল এবং আশেপাশে অনেক জমিতে 'রেওয়াত' ছিল। দক্ষিণমুখে নেপালশালের প্রস্তুত সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার দিয়া ভিতরে ঢুকিলে দেখা যাইত এক প্রশস্ত প্রাংগণ। প্রাংগণের পূর্বে পশ্চিমফুকুরী–অর্থাৎ ঘষা গোল ইঁটের থামের উপর পাঁচটি খিলানযুক্ত ঠাকুর-দালান। ঠাকুর-দালানের দোতলায় দক্ষিণ দিকে বড় হল ঘর। উহাদের উত্তরদিকের ঘরটিকে 'বড় বৈঠকখানা ঘর' আর দক্ষিণদিকের ঘরটিকে 'ঠাকুরঘর' বলা হইত। নীচের দক্ষিণদিকের ঘরের নাম ছিল 'বোধন ঘর'। তাহার পর বাহিরের উঠানের পশ্চিমে চকমিলানো দালান ও গোয়ালঘর। অন্দরমহলের দুই-দিকে দুইটি প্রাংগণ এবং পশ্চাৎ-ভাগে কানাচ বা অন্দরমহলের মহিলাদের ব্যবহারের জন্য পুকুর ছিল। এই বাড়ীর বাহিরে ২ নং গৌর মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে চারিকাঠা জমির উপর রামমোহন দত্তের অশ্বশালা ছিল। বৈঠকখানা ঘরে তৎকালীন প্রথানুসারে দেওয়ালগিরি, বেল-লণ্ঠন ও হাঁড়ির-লণ্ঠন সাজানো ছিল। তাছাড়া নানা প্রকারের চিত্র দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করিত।' (স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" - প্রথম খণ্ড, বংশ পরিচয় প্রসংগ)। এই বাড়ির ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন - "নরেন্দ্রনাথ এমন গৃহে জন্মেছিলেন, যে গৃহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে তৎকালীন সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি কোন-না-কোন সময়ে পদার্পণ করেছেন।" (ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত "স্বামী বিবেকানন্দ" – ৫ম পরিচ্ছেদ)।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই বাড়িতেই স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর মধ্যমভ্রাতা জ্ঞান তপস্বী মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কনিষ্ঠভ্রাতা বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু সকলেই অবিবাহিত থাকায় তাঁদের নিজস্ব বংশধর কেউ নেই। বর্তমানে তাঁদের ভগ্নীদের বংশধরেরা এই বাড়িতে বাস করেন। কিন্তু বাড়ির প্রাচীন চিত্রের সংগে বর্তমান বাড়ির অনেকাংশে মিল নেই। জ্ঞাতিবিরোধের ফলে এবং বহুকাল যাবৎ মোকদ্দমার ফলে যদিও স্বামীজীর অংশে বাড়ির সম্মুখভাগ দখলে আসে, কিন্তু জ্ঞাতিগণ পিছনের অংশ ও পাশের কিছু অংশের অধিকারী হন এবং সেগুলির কিছু অংশ বিক্রয়ও করা হয়, আবার কিছু অংশ পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করা হয়। কিন্তু স্বামীজীর বাড়ির অংশটি, পনের ৪ কাঠা জমিসহ ঠিকই থাকে। বাড়ির ভেতরে ঠাকুর ঘর, বৈঠকখানা, পুকুর, গোয়াল ঘর প্রভৃতির এখন আর অস্তিত্ব নেই। এমনকি, স্বামীজীর ভূমিষ্ঠ হবার স্থানটুকুরও অস্তিত্ব নেই। বাড়ির সদরে ডান দিকের অংশে মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় বাস করতেন–সেটি এখন "মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি" কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। বাড়ির পাশে যে ৪ কাঠা জমিতে অশ্বশালা ছিল, সেই ২ নং গৌর মোহন মুখারজি স্ট্রিটে বর্তমানে একটি ছাপাখানার কাজ হয়। ভেতরের বাড়িতে স্বামীজীর ভগ্নীদের বংশধরগণ বাস করেন, কিন্তু সংস্কারের অভাবে বাড়িটি এখন শ্রীহীন। স্বামীজী ও তাঁর দুইভাই–মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের জন্মদিনগুলি এখনো এখানে পালিত হয়। বহু ভক্ত নর-নারী এবং স্বামীজীর গুণমুগ্ধ বিদেশীয়গণ মাঝে মাঝেই এই বাড়ি পরিদর্শনে আসেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি

বাড়ির ঠিকানা : ৩নং গৌরমোহন মুখারজি স্ট্রিট, কলকাতা–৬ বাড়িতে প্রবেশ পথের ঠিক ওপরের দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা আছে– "স্বামী বিবেকানন্দের মাতা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর বাসভবন"বাড়িটি বর্তমানে সরকার অধিগ্রহণ করেছেন।

পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার হেদুয়া (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) ও বিবেকানন্দ রোডের মাঝামাঝি বিধান সরণির পশ্চিমে একটি সরু গলি; গলিতে ঢোকার মুখেই বড় রাস্তাব ওপর 'চাচার হোটেল'; এই হোটেলের পাশেই পশ্চিমমুখী গৌর মোহন মুখারজি স্ট্রিট-এই গলিতে ঢুকে সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই বামদিকে সেই ৩ নং বাড়ি। □

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য হাজরা

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোলারিস

ডাক্তার এলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় তখন পাশ ফিরতেও পারছে না সুমন্ত।

"ফাইলেরিয়াল হাইড্রোসিল, এখুনি অপারেশন দরকার।"

আঃ! উঃ! আর যে পারছি না!

ডাক্তার নিজেই ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতাল থেকে অ্যামবুলেনস এল। স্ট্রেচারে চাপিয়ে সুমন্তকে নিয়ে যাওয়া হল।

অপারেশন হওয়ার পরেই জানা গেল চাঞ্চল্যকর সেই তথ্য। স্ত্রী-কন্যার চোখে এতদিন ধুলো দিয়ে এসেছিল সুমন্ত।

সুমন্তবাবু হিন্দু? কিন্তু ওঁর অঙ্গহানি ঘটান হয়েছে যে মুসলমানি প্রথায়!

সে কী! ও তো পূর্ববঙ্গের মানুষ। তিন কূলে কেউ নেই! সুমন্ত মুসলমান?

অপারেশন সাকসেসফুল হল। কিন্তু নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ছদ্মবেশী মুসলমান। কলুটোলার রক্তগঙ্গার মাঝ থেকে বাসন্তীকে উদ্ধার করে আনার রহস্য পরিষ্কার হল এত দিনে।

স্টেনজ। ঘা শুকিয়ে আসার আগেই আপনার স্বামী চলে গেছেন। বাড়ি যাননি?

না। পালিয়েছে।

এই প্রবঞ্চনার চাইতে ধর্ষিতা হওয়াও যে ভাল ছিল, ঠাকুর!

বুক ভেঙে গেল বাসন্তীর। হিঁদুয়ানি তার অস্থিমজ্জায়। একজন প্রবঞ্চক, শঠ, প্রতারককে দেহমন সমর্পণ করেছিল।

এমনটি হবে জেনেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল প্রবঞ্চক। সে-ও ভালবেসেছিল।

মা গো, তুমি আর আমিই তো ছিলাম তার জগৎ। তাই তো সত্যি কথাটা ফাঁস করতে পারেনি আদ্দিন।

(চলবে

ওয়েসট বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশন

আমলাচক্রের হাতে

শ্যামল বসু

পশ্চিমবঙ্গের চিনির কারখানা তিনটি। একটি ব্যক্তিগত মালিকানা, অন্য দুটি ওয়েসট বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশনের অধীনে। তার একটি আহমেদপুরে, অন্যটি বেলডাঙায়। ওয়েসট বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশন তৈরি হয় ১৯৭৩ ৭৪ সালে আহমেদপুরের চিনির কারখানা ন্যাশনাল সুগার মিলকে অধিগ্রহণ করে। ২ কোটি টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়ে এই করপোরেশনের যাত্রা শুরু! বর্তমানে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার ওপর লোকসান দিয়ে করপোরেশন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের চিনি তৈরি একছটাকও বাড়েনি, বরং এই সম্ভাবনাময় শিল্পটিকে যেন যত্ন করে অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী করে রাখার চেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে যতটা চিনির প্রয়োজন তার শতকরা ৮০ ভাগই বাইরে থেকে আনতে হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে চিনি তৈরি করার যে সম্ভাবনা আছে তাতে করে রাজ্যের চাহিদার ৫০ ভাগই মেটান সম্ভব। আর তা সম্ভব বর্তমান করপোরেশনের আওতায় কাজকর্মগুলো কেবল একটি বিশেষ সরকারি কর্মচারী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারলে।

এবার সরাসরি দেখা যাক এই বিশেষ আমলাচক্রের মধ্যমণিটি কে। মধ্যমণি এই সংস্থার সেক্রেটারি কাম কনট্রোলার অব অ্যাকাউনটস। ডাবলু এম বি ১৪৭৫ নম্বর অ্যামবাসাডার গাড়িটিকে সকাল বিকেল দুবার শিয়ালদহ স্টেশনে দেখা যাবে। দেখা যাবে বারাসাত থেকে আসা ডেইলি প্যাসেনজার কান্তিরঞ্জন দাসকে সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশনের অফিসে নিয়ে আসার আর শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য। এই কান্তিরঞ্জন দাসই ওয়েসট বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশনের সেক্রেটারি কাম কনট্রোলার অব অ্যাকাউনটস। ইনি ১৯৭৬ সালে এই সংস্থায় আসেন। এর আগে তিনি ৪ ৫ মাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফারমাসিউটিকাল ও ফাইটো কেমিকাল করপোরেশনের চিফ অ্যাকাউনটেনট হিসেবে কাজ করেছিলেন। এখানে কাজে যোগ দিতে গিয়ে সেখান থেকে কোন রিলিজ অর্ডারও দাখিল করেননি। কোমপানি আইন অনুযায়ী এই জাতীয় পদে চাকরি করার যোগ্যতা হিসেবে যা ধরা হয় তা হল কোমপানি সেক্রেটারিশিপ অথবা কোন চারটারড অ্যাকাউনটেনট ই এই পদে আসতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডিশনাল রেজিসট্রার অব কোমপানি গত ১৯ মারচ ১৯৮৩ সাল অবধি চিঠি দিয়েও শ্রীদাসের যোগ্যতার সমর্থনে কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাননি। শ্রীদাসের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রকৃত প্রমাণের জন্য সম্প্রতি রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকেও গত ১৪ জুন ১৯৮৩ তারিখে ইনসটিটিউট অব চারটারড অ্যাকাউনটেনটসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন সদর্থক উত্তর সেখান থেকে পাওয়া যায়নি। ৭৬ সালে চাকরিতে ঢোকার পর আজ ৮৩ সালেও যার সারটিফিকেট পাওয়া গেল না সেই দাস সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন বীরভূমের এম পি শরদীশ রায় – ২০ আগসট ১৯৮০তে লেখা একটি চিঠিতে প্রথমে এই সংস্থার তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিরেকটরকে এবং ৯ অকটোবর ১৯৮০তে তখনকার চেয়ারম্যান ও সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে। বামফ্রনটের চেয়ারম্যান হিসেবে স অভিযোগের প্রতিলিপি প্রমোদ দাশগুপ্তও পেয়েছিলেন। জনৈক নিত্যানন্দ পানকে নিয়োগ করে কয়লার সরবরাহ চুক্তি ও নিম্নমানের কয়লা দেবার অভিযোগ তুলে এই দাস সাহেবের কার্যকলাপ বীরভূমের জেলা ম্যাজিসট্রেটকে দিয়ে পরীক্ষা করানর দাবি তুলেছিলেন ডঃ শরদীশ রায়। পরবর্তীকালে জনসমক্ষে সে রিপোরট প্রকাশ পায়নি। কেবল একটি ভিজিলেনস এনকোয়ারি চালু হয়। কিন্তু ভিজিলেনস ইনসপেকটর আসল কাগজপত্র খুঁজতে গিয়ে যার দ্বারস্থ হন তিনি স্বয়ং কান্তিরঞ্জন দাস ও তার সহকর্মী ওই আহমেদপুর কারখানার একজন অফিসারের কাছে – যিনি ঐ কারখানার পারচেজ ও স্টোরস ডিপারটমেনটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর দাস সাহেবের বিশ্বাসভাজন। যথারীতি আসল বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভিজিলেনস ইনসপেকটর আর পি রায় পেলেন না। 'দীর্ঘমেয়াদী' দেরির মধ্যে দিয়ে সকল সত্য সূত্র দাস সাহেবের নির্দেশে যে নষ্ট করা হয়নি এমন কথা বীরভূমের চিনিকলের সাধারণ শ্রমিকও হলফ করে বলতে পারবেন না। ডঃ শরদীশ রায়ের অভিযোগ যে সত্য ছিল তা বীরভূমের জেলা শাসকের রিপোরট দেখলেই পাওয়া যাবে। সাধারণত এ জাতীয় ক্ষেত্রে যে সব সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাদের স্বাভাবিকভাবে কাজে যোগদান বন্ধ করা হয়। কিন্তু এই দাস সাহেবের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অতএব প্রমাণ লোপাট খুব অস্বাভাবিক নয়।

এরপর আরও বেশ কয়েক দফা অভিযোগ জানা যায় দাস সাহেবের বিশেষ কর্মক্ষমতা স্বজনপোষণ এবং বিশেষভাবে আহমেদপুর সুগার মিলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। তবে তার মধ্যে সামান্য কয়েকটা এখানে দাখিল করলেই চলবে। এর যে কোন একটি ধরে টানলেই জটের মধ্যে থেকে সব কিছু প্রকাশ হতে পারে। যেমন -

ঐ কারখানায় ১৯৮২ সালের শুরুতে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়। ম্যানেজার তার কাজকর্মে শ্রীদাস ও তার অন্যতম সহকর্মী সত্য মজুমদারের বিরাগভাজন হন। ম্যানেজারের অপরাধ ছিল:

ঐ কারখানায় তিনি যোগ দেওয়ায় অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে আখ পরিবহনের খরচ ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা -- সেটা কমিয়ে ১৯৮২-৮৩তে খরচ করেছেন ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

১৯৮১ ৮২ সালে ২৩০ টাকা টন হিসাবে গ্রোথ সেনটার থেকে মেন গেটের কাছে আখ পৌঁছন অবধি ১২০০ টন ঘাটতি। ১৯৮২-৮৩ সালে সেটা কমে আসে ৬০০ টনে।

১৯৮১-৮২ সালে ট্রানজিট লস বা পরিবহন জনিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মত। অথচ নতুন ম্যানেজারের আমলে ১৯৮২-৮৩ সালে ঐ বাবদে কোন ক্ষতি হয়নি। শ্রীদাস ও তার অনুচরদের বিরাগভাজন হতে এই ম্যানেজারটির বেশি সময় লাগল না। এবার দাস সাহেব প্রথম চাপ দিলেন চিনিকলের উৎপাদনের সময় একান্ত প্রয়োজনীয় চটের বস্তা না পাঠিয়ে। আখকলে চটের বস্তা শ্রীদাসই নিজে অ্যাকাউনটস ডিপারটমেনট থেকে টাকার অঙ্ক না বসান চেক নিয়ে গিয়ে সরকারি ন্যাশনাল জুট মিল থেকে কেনেন। এবার নয়, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই এটি চলছে। এজন্য তিনি কখনও টেনডার নেন না। কারণ ন্যাশনাল জুট মিল সরকারি অধিকৃত সংস্থা। তাই টেনডার নেবার প্রয়োজন আছে বলে দাস সাহেব মনে করেন না। চটের বস্তা সরকারি আর বেসরকারি যাই হোক না কেন তা দালালের মাধ্যমে বিক্রি হয়। দালাল যে পয়সাটা পান সেটার হিসেবটা কি আর দাস সাহেবের অজানা? আর তাছাড়া ব্যাংকের চেকে টাকার অংক না লিখে কোন সরকারি সংস্থা থেকে নেওয়া হয় এমন নমুনা বোধহয় কারোর জানা নেই।

আখ মাড়িয়ে চিনি তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চটের ব্যাগে ভর্তি করতে হয়। সাধারণত নভেমবর থেকে মারচ পর্যন্তই কারখানায় চিনি তৈরি করা হয়। বছরে অর্থাৎ সিজন হিসাবেই কারখানার উৎপাদন হিসাব করা হয়।

মোটামুটিভাবে যে পরিমাণ আখ কেনা হয়ে থাকে তার শতকরা ৯ ভাগ মত চিনি উৎপাদন করা যায়। তাই চটের ব্যাগের প্রয়োজনটা আখ কেনার সময়ই বোঝা যায়। চিনি কারখানার যে কোন অদক্ষ কর্মীরও এই ধারণা আছে। কিন্তু ১৯৭৬ সাল থেকে সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশন কাজ করেও 'পারচেজ' ও 'অ্যাকাউনটস' এর সর্বময় কর্তা ১৯৮৩ সালেও প্রয়োজন ও গুরুত্বটা বুঝতে পারেননি। মরশুমের মাঝখানেই অর্থাৎ ২২ ডিসেমবর ১৯৮২ রাত ৮ ৩০ মিঃ থেকে ২৫ ডিসেমবর ১৯৮২ সকাল ৮ ৩০ মিঃ পর্যন্ত বস্তার অভাবেই কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত অথবা নিছক উদাসীনতার দায়ে দাস সাহেবকে অভিযুক্ত করলেন আহমেদপুর কারখানার ম্যানেজার। দাস সাহেব তার কোন উত্তর দিতে পারেননি।

এই বিশেষ শ্রেণীর আমলার ইচ্ছে মত চলার দরুন আবার জানুয়ারি ৮৩ র ১৬ তারিখ থেকে টানা বারো দিন প্রায় ৬০০০ বস্তা চিনির উৎপাদন ব্যাহত হয়। কেবল উৎপাদন ব্যাহত করেই চিনি শিল্পের চরম

সর্বনাশ করেই ক্ষান্ত নন দাস সাহেব। দাস সাহেব আখ চাষীদের থেকে শুরু করে নিজের অফিসের ৫২ জন কর্মচারীর উৎপাদনমুখী মানসিকতা নষ্ট করার নেশায় মেতেছেন। নিজের সুবিধার জন্য কয়েকটি জায়গায় যেমন স্বজনপোষণ করছেন তেমনি সাধারণ কর্মীদের প্রমোশন, বেতন-কাঠাম যা কোনভাবেই এই সেক্রেটারি কাম অ্যাকাউনটস কাম পারচেজ অর্থাবটি কাম গডফাদার দাস সাহেব সহ্য করতে পারছেন না। ইনি নিজে যে প্রোমোশন লিসট তৈরি করেছেন, যে বেতন কাঠাম ঠিক করেছেন কিছু কর্মীকে সে সুযোগও দেওয়া হয়েছে, তারপরে তিনি জানান সবটাই বেআইনি। রাইটারস বিলডিং থেকে নিজের অফিস পর্যন্ত সকল কর্মীদের তিনি হুমকি দিয়ে বেড়ান – আগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর বিরুদ্ধে তিনি 'ক্রিমিনাল কেস করার সুযোগ খুঁজছেন।'

এখন প্রশ্ন, এই কেলেঙ্কারির নায়ক এখনও কী করে বহাল তবিয়তে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। ডঃ শর্বদীশ রায়ের মতন এম পি, শশাংক শেখর মন্ডলের মতন এম এল এ, বীরভূমের জেলা শাসক আর এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত শতকরা ৯০ ভাগ কর্মীই যাকে চক্রান্তকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিনতে পেরেছেন তাকে কেন বামফ্রন্ট কমিটি অথবা বিভাগীয় মন্ত্রী চিনতে পারলেন না। সরকারি কর্মচারী হিসেবে এই আমলাটির ব্যক্তিগত ও নিকট আত্মীয়ের যে সম্পত্তির হিসেব সেটি কেন দেখা হয় না কেন দেখা হয় না সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনটের গাড়ি দিনের পর দিন মানিকতলা ভি আই পি রোডের সি আই টি বিলডিং তৈরির তদারকির কাজে দেখা যাবে। ভিজিলেনস ইনসপেকটর আর পি রায়কে জনস্বার্থে তদন্তের জন্য কাগজপত্র খুঁজতে গিয়ে কেবল হয়রানি কেন হতে হবে। বেনামা ভেড়ি, ইটভাটার মালিক বলে এই ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগটাই বা কেন উঠবে না। রাইটারস বিলডিং এর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের স্পেশাল অফিসারের কাছে এই দাস সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফাইল, তদন্তের নির্দেশ দিনের পর দিন কেন চাপা পড়ে থাকবে। বিভাগীয় মন্ত্রী স্বয়ং তদন্তের নির্দেশ দিলেও সে নির্দেশ তাঁর দপ্তর কেন মানবে না।

ব্যক্তিগতভাবে না দেখলেও একথা বলা যায় এই সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশন আদতে এক শ্রেণীর আমলার শোষণের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি তরফের জনপ্রতিনিধিদের কারো কোন মাথাব্যথা নেই। সেক্রেটারির কথা শুনবেন মন্ত্রী আর সেক্রেটারি শুনবেন তাঁর বিশেষ সেলের স্পেশাল অফিসার নামক ব্যক্তির কথা। দাস সাহেবরা ঠিক মত আঁতাত রেখে যাবেন এ জাতীয় রাইটারসের আমলাদের সংগে। অতএব কার আর মাথাব্যথা থাকবে। বিধানসভায় উত্তর দেবার জন্য সেক্রেটারির নোট শিট যেমন সর্বস্ব তেমন জনসাধারণকে 'কেয়ার' না করার মনোভাব নেবেন রাজ্য সরকার। বিরোধী নেতাদের প্রসংগ এখানে অবান্তর। কেননা কোন বিরোধী নেতা আজ পর্যন্ত সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশনের কোন খবরই রাখেন না, আর রাখলে তিনি অবশ্যই কোন না কোনভাবে সরকারের কাছে জবাবদিহি চাইতেন। কেবলমাত্র আহমেদপুর নয়, সারা পশ্চিমবাংলার চিনি উৎপাদন ক্ষেত্রে এই সংস্থার ভ্রান্ত নীতি বারংবার কেবল টাকা অপচয় ছাড়া কিছু করছে না একথা পরিষ্কার হত। ১৯৮০ ৮১ থেকে পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে আরও দশটি আধুনিক চিনিকল ও ২০টি মিনি চিনিকল করার সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে এই সংস্থা। বেলডাঙার মিলকে আরও পংগু করার সকল হাতিয়ারই করেছে। বেলডাঙা খাতে ৪২ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এক টুকরো আখ নিয়েও কেউ ছিবড়ে করতে পারেননি। আই আর সি আই এর গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বারবার বাধা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে 'দাস সাহেবের' চক্র। কেবল ওষুধ নয়, যে অ্যালকোহলের জন্য পশ্চিমবাংলার জীবনদায়ী ওষুধ উৎপাদন বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই ৮০ লক্ষ লিটার অ্যালকোহল প্রাপ্তির সম্ভাবনাকেও নির্মূল করে দিয়েছেন এই রাইটারস ও দাস চক্রের আমলারা। জেনেশুনে বিষ পান করার মত পশ্চিমবংগের সাধারণ মানুষকে কেবল ধোঁকা দিয়ে বিষ পান করাচ্ছেন ওয়েসট বেংগল সুগার ইনডাসট্রিজ ডেভলপমেনট করপোরেশন নামক সংস্থার পরিচালকরা। এ চক্রের কাছে রাজ্যের বামফ্রনট ও বিরোধী দল সবাই পর্যুদস্ত। □

এখানে ওখানে

দুটি চিন্তার প্রকাশ : সাংবাদিকতা ও ইতিহাস

সংবাদপত্র আমাদের রোজকার জীবনের সংগে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যার ফলে সে পায় আটপৌরে ব্যবহার। সংবাদপত্রের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আছে, সাংবাদিককেও সে কতগুলো বিশেষ রঙে বর্ণে দেখতে চায় কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা বা পরস্পরের মতামত জানার সুযোগ সাধারণত মেলে না। একটা অপ্রকাশিত ক্ষোভ যেমন পাঠকের মনে থেকে যায় তেমনি সাংবাদিকও বুঝতে পারেন না তার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা। সাংবাদিক আর পাঠক আত্মীয় পরিজন অথবা বন্ধুর পরিবেশে কখনও কখনও মুখোমুখি হলেও সাংবাদিক যখন পাঠকের দরবারে সরাসরি দাঁড়ান তখনই একমাত্র সময় যখন পাঠকের ভাবনা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই জাতীয় একটি অনুষ্ঠান ৩১ জুলাই হয়ে গেল বহরমপুরের গ্র্যানট হলে। আয়োজন করেছিলেন বহরমপুরের সাময়িকপত্র গণকণ্ঠ ও কিছু স্থানীয় সাংবাদিক।

এদিন সাংবাদিক ও সমাজ বিষয়ে আলোচনা করলেন পরিবর্তনের সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে সংবাদদাতা ও সমাজজীবনের সংগে তার যোগ নিয়ে আলোচনার শুরু করলেন। তিনি বলেন সাংবাদিক সমাজের মধ্যে থেকেও সমাজ থেকে নিজের অস্তিত্ব আলাদা রাখেন। কেননা তিনি যা দেখবেন সেই দেখার মধ্যে যেন কোন রকম প্রভাব কাজ না করে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পুত্র স্বামী স্ত্রী পিতা মাতা প্রেমিক প্রেমিকা হিসেবে নিজেকে চিনতে চাইবেন না। তিনি নিজেকে কোন দলীয় বা গোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ করবেন না অথচ তাকে সব কিছু নিয়েই চলতে হবে। রাজনীতি, লোকপ্রিয়তা, চলচ্চিত্র এমনকি কোন ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম বোধগুলোকেও আড়াল করে চলতে হয়। তাই সংবাদ সর্বজনীন হতে পারে না।

সমাজজীবনের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন—কালোকে কালো আর সাদাকে সাদা বলার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের সব লেখার মধ্যেই সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে। সমাজ যদি চায় নৈতিক মূল্যবোধ ঠিক রাখার জন্য বিশেষ কোন কাজ বা পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে সাংবাদিকও সেই ছবিই মানুষের সামনে তুলে ধরবেন।

সমাজের মধ্যে থেকেও সমাজের অংশ নয় অথচ সমাজকে নিয়েই কাজ করাটা সাংবাদিকের কাজ। যদি সমাজের অধিকাংশ লোক কাঠিগতভাবে প্রকাশে কোন কোন বিষয়ে আপত্তি তুললেও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি হল সেই সব যেগুলিতে তিনি আপত্তি করে থাকেন। সংবাদপত্রের বিষয় পাঠকদের কাছ থেকেই গ্রহণ বর্জন হয়। এখানে পাঠকের দায়িত্বটাই বেশি। তিনি কোনটা পড়বেন আর কোনটা পড়বেন না এটা তাঁর একান্ত নিজস্ব বিষয়। কিন্তু তার পছন্দের প্রতিফলন হয় সমাজের ওপর। আর সংবাদপত্র তাই বহন করে থাকে।

গত ৬ সেপটেম্বর কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হলে শরৎচন্দ্র বসুর ১৪৩ম জন্মদিনে বক্তৃতা করলেন ডঃ ইরফান হাবিব। ৫২ বছর বয়স্ক আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ইরফান এক বিতর্কিত নাম। কিছুদিন আগে তিনি তাঁর বিশেষ চিন্তার জন্য সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিলেন। আধুনিককালের ইতিহাস রচয়িতার সুযোগ ও চিন্তা ভাবনা কীভাবে ভাবা যেতে পারে সেই বিষয় ডঃ হাবিব আলোকপাত করলেন। আজকের দিনে ইতিহাস কেবল রাজকাহিনী নয়, কোন চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য নয় বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে উজ্জ্বল করে দেখাও নয়। সেই সংগে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি সমাজজীবন সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিধি সবকিছুকেই আলাদা আলাদা করে দেখা দরকার। প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশদ বিশেষণের মধ্যে দিয়েই কোন একটি বিশেষ কালের ইতিহাসকে চিনে নেওয়া যাবে। এযাবৎকাল যে সব শিক্ষালয়ে পাঠ্য ইতিহাস বই আছে সবগুলোই মূলত অভিজাত শ্রেণীর গল্প। আর তার সংগে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণ। কিন্তু বাস্তবে ঐতিহাসিকের কোন বিশেষ শ্রেণী বা ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হবার সুযোগ নেই। ইতিহাসে যে কোন চিন্তা ভাবনা শ্রেণীনিরপেক্ষ। ঐতিহাসিক বা সার্থক ইতিহাসের রচয়িতাও তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কালের ঘটনাকে লক্ষ্য করবেন। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল-৭০

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭			■	
৮		৯	■	■	১০	১১	
■	■	১২		■	১৩		■
১৪	১৫		■	■	১৬		১৭
১৮		■	১৯	২০		■	
	■	২১				■	
২২			■		■	২৩	

সমাধান সূত্র : পাশাপাশি

১। ঈশ্বর ৪। শিউলি ফুলের ঋতু ৬। পথিক ৭। জোনাকি ৮। নজর ১০। আচমকা চমক ১২। বিগত ১৩। লও ১৪। সৌন্দর্য ১৬। আপদ ১৮। খরচের উল্টো দিক ১৯। শুকোনো আমের টুকরো ২১। রাষ্ট্রীশ্রেষ্ঠা ২২। সাধারণ জন বা নিচু ২৩। করী

সমাধান সূত্র : ওপর-নিচ

১। ভরপুর ২। গভীর ৩। আঙুলের ডগায় দেখুন ৪। পদ্মে বাস করেন এমন দেবী ৫। নাগ বা ছুতোর ৯। ভজন গানের জন্য বিখ্যাত সাধক ১১। রিহারসাল ১৪। অস্বাভাবিক জোরাল কণ্ঠস্বর ১৫। ববিমামা দেয় ' ' ১৭। একটি খুশি মত নদী-এই নামে নতুন ট্রেনও চালু হয়েছে ১৯। সহানুভূতি বা বিস্ময় প্রকাশক শব্দ ২০। রাজহাঁস ২১। মরণশীল।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৩০ নভেমবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১৭-১১-৮৩।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃংখল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃংখলের নমবরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃংখল—৬৬ (সমাধান)

অ	ক্ষি	র	ত	■	ধ	ক	ম
■	ক	■	ব	সু	ন্ধ	রা	■
কা	ল	নি	ক	■	ক	ল	ম
দ	■	র	■	ম	■	ব	রা
জ	প	ত	■	শ	ত	দ	ল
■	ল	■	চা	ব	■	ধি	প
বা	দ	র	■	■	প	■	ম
স	ন্ত	■	ম	মো	র	ঞ্জ	ন

শব্দশৃংখল ৬৬-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন বি ঘোষ (এডুকেশন ডিপার্টমেনট, রাইটার্স বিলডিংস কলকাতা-১) ও শ্যামল কুমার নায়ক (কে এফ এস ডবলিউ লিঃ, কুমারধুবি, ধানবাদ, বিহার)। শব্দশৃংখল ৬৬র লটারিতে বিচারক ছিলেন মনীষা ভট্টাচার্য।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

নভেমবর ২ থেকে ৮

মেষ : শরীর ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক অশান্তি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম ফলপ্রসূ হবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে অতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি, মেয়েদের কর্মস্থলে বড় রকমের মতবিরোধ। পারিবারিক কোন পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কোন সন্তানের কর্মলাভ। মেয়েদের কিছু উপরি লাভ। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বৃষ : পেট সংক্রান্ত গোলমাল ভাবনা চিন্তায় ফেলবে, মেয়েদের শরীর চলনসই। বড় রকমের আচমকা ব্যয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা বিশেষ প্রয়োজন হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে হঠাৎ অচলাবস্থা। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

মিথুন : শরীর চলনসই; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। আগের আর্থিক ক্ষতির জের চলবে। কর্মক্ষেত্রে কোন অচলাবস্থা কেটে যেতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট ক্ষতি। পারিবারিক কোন ব্যাপারে বিশেষ দৃঢ়তার প্রয়োজন হবে। মেয়েদের প্রেম প্রণয় ব্যাপারে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কর্কট : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল মন্দয় মিলিয়ে চলবে। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে কোন মতামত প্রভাবিত করতে পারে; মেয়েদের বিভাগীয় বদলি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ উৎকণ্ঠা। ছোটখাট ভ্রমণ। ব্যবসায়ীদের অল্প লাভ।

সিংহ : পেটসংক্রান্ত গোলমাল চলবে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ব্যাপারে সামান্য ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তা উদ্বেগ; মেয়েদের কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। পারিবারিক কোন সমস্যা সমাধানের ইংগিত। কর্মপ্রার্থীদের কোন প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কন্যা : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের চর্মসংক্রান্ত রোগ ভোগাবে। আয় বৃদ্ধিতে আকস্মিক বাধা। কর্মক্ষেত্রে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবসান; মেয়েদের একক প্রচেষ্টায় সাফল্য। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন বিরোধের অনুকূল অবসান। মেয়েদের বিশেষ ইচ্ছে পূরণ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

তুলা : শরীর নিয়ে ছোটখাট অশান্তি; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ বাড়তি আয়। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোন দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ, মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন অশান্তি। কোন প্রিয়জনের আকস্মিক বিয়োগ। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যমে সাফল্য।

বৃশ্চিক : শরীর মোটামুটি চলবে মেয়েদের আগের কোন রোগে নতুন করে ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি; প্রচুর ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে কোন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা; মেয়েদের কোন ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য ও প্রশংসা। পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন অশান্তি। ব্যবসায়ীদের বিশেষ মন্দা।

ধনু : শরীর নিয়ে নাজেহাল হতে হবে; মেয়েদেরও শরীর সংক্রান্ত ঝামেলা থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও আচমকা ব্যয় হবে প্রচুর। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যাপার এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল; মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ মতামত প্রাধান্য পাবে। সন্তানদের সহজ বিবাহযোগ। মেয়েদের বড় রকমের ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি।

মকর : শরীর ভাল চলবে, মেয়েদের আগের অসুস্থতা নিয়ে ভোগান্তি। আর্থিক মন্দা চলবে, কিছু ঋণও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে ব্যর্থতা; মেয়েদের নতুন সুযোগ বা পরিবর্তন। ধর্মকর্মে বাধা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কুম্ভ : শারীরিক অবস্থার আংশিক উন্নতি; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন; অল্পস্বল্প আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ সুখের হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে আবার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন। কোন বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান কিছু প্রাপ্তি। মেয়েদের সাংসারিক অশান্তি। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : শরীর ও মন কোনটিই ভাল চলবে না; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক টানাটানি ও ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, মেয়েদের কোন ব্যাপারে বিশেষ সংযম প্রয়োজন হবে। কোন সন্তানের বিশেষ সম্মান, কৃতিত্ব। ভাইয়ের সংগে মনান্তর। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোনঃ ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

এখনো এক জানাশোনা ভাল সেলাই কল আরো ভাল গড়নে হাজির!

নতুন মেরিট সিঙ্গার ভ্যারাইটি

②
④
①
③

মেরিট সিঙ্গার ভ্যারাইটি—জগতের ঘরে-ঘরে চিরকালই মহিলাদের একান্ত প্রিয় সেলাইকল। এখন এই পরিচিত গড়নের সেলাইকলের মধ্যে এমন সব অভিনব সুবিধার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যার ফলে **সর্বাধিক সুবিধে, সেরা সাশ্রয় ও চমৎকার সেলাইয়ের আনন্দ পাওয়া যাবে।**

এর অভিনব নতুন গুণগুলো দেখুন:

1. **ড্রপ ফীড ডিজাইন**—ফলে সেলাইয়ের কাপড়টিকে অতি সহজেই দরকারমত সঠিক সরানো-বসানো যাবে, অথচ কাপড় বিন্দুমাত্র কুঁচকে নষ্ট হবে না। তাছাড়া এমব্রয়ডারি প্লেট ব্যবহারের দরকারও পড়বে না।
2. **ক্লিপ ওপেন স্লাইড প্লেট**—যার ফলে, ববিন-কেসটিকে চট্‌পট্ বার করা ও ঢোকানো যাবে।
3. **ওপেন টাইপ শাট্‌ল রেস**—ফলে, সুতো জট পাকিয়ে গেলে, চট্‌পট্ খুলে দিতে সাহায্য করবে। কোনও স্ক্রু-ড্রাইভারের দরকারই লাগবে না। নিজের হাতেই পরিষ্কার করতে ও দেখাশোনা করতে পারবেন।
4. **হাতের পাশে থ্রেড কাটার**—ফলে প্রতি সময়ে কাঁচির দরকারই পড়বে না।

মেরিট সিঙ্গার ভ্যারাইটি কিনতে, আরো কিছু জানতে চান?

হাঁ, এর সঙ্গে পাচ্ছেন পুরো ৫ বছরের গ্যারান্টী মানে জগত প্রসিদ্ধ সিঙ্গারের সুদীর্ঘ ১২৫ বর্ষাধিককালের সুনিপুণ অভিজ্ঞতা।

সুবিধেজনক হায়ার-পারচেজ স্কীম। বিক্রীর পর সুনিপুণ সেবা-ব্যবস্থা। আর বলাই বাহুল্য, জীবনভোর চমৎকার সেলাইয়ের আনন্দ।

ইণ্ডিয়ান সিউইং মেশিন কোং লিঃ
(ইউ.এস.এ'র দি সিঙ্গার কোম্পানির সহযোগী সংস্থা)
২০৭, বি. এন. রোড, বম্বে ৪০০ ০০১

মেরিট* সিঙ্গার ভ্যারাইটি

সিঙ্গার*—যাদের সবার দৃষ্টি... ভাল থেকে আরো ভালর সৃষ্টি

* দি সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক

CHAITRA-SM-540 B BEN

PARIBARTAN 2—8 November 1983 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 2.50

পরিবর্তন

রানী এলিজাবেথ

মানসিক হাসপাতাল

সম্পাদকীয়

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমর্থক ছটি ক্যারিবিয়ান দেশের সাহায্য নিয়ে ছোট্ট দ্বীপ গ্রেনাডার ওপর বর্বরের মত যে আক্রমণ চালিয়েছে তাকে নিন্দা করার মত ভাষাও আমাদের জানা নেই। এই বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত। এমনকি, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে এতদিন যারা অনেক বিষয়ে সমর্থন করে এসেছে সেই ফ্রান্স, সুইডেন, পশ্চিম জারমানি, বৃটেনের মত ইওরোপীয় দেশগুলোও এ ঘটনায় দুঃখিত। মারকিন প্রেসিডেন্ট রেগনের নিন্দায় তাই আজ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত মুখর। মনে হয় সামনেই দিললিতে যে কমনওয়েলথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই সম্মেলনেও এই একই সুর ধ্বনিত হবে। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক - কারণ গ্রেনাডা কমনওয়েলথের সদস্য। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর অধিকাংশ যদিও মারকিন সমর্থক, তবু, আশা করা যায় অন্তত এই একবার তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবেন। ইতোমধ্যেই কেউ কেউ মুখর হয়ে উঠেছেনও। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মারগারেট থ্যাচার তো এ ঘটনার সরাসরি নিন্দা করেছেন। কমনওয়েলথ বা জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো যদি এখনও এই মারকিনী বর্বরতার বিরুদ্ধে এক হতে না পারে তাহলে তাদের এতদিন ধরে বলে আসা সমস্ত আদর্শের কথাই অক্ষমের আস্ফালন বলে ধরতে হবে।

এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তার আভাস অবশ্য গ্রেনাডার জনপ্রিয় কৃষ্ণাংগ প্রধানমন্ত্রী মরিস বিশপ আগেই দিয়েছিলেন। দিললিতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সময়ই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবের অভিযোগ তুলেছিলেন। মরিস বিশপ সেদিন তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক সাংবাদিককেই আকৃষ্ট করেছিলেন। এই সাংবাদিকদের ভেতরে পরিবর্তনের বর্তমান সম্পাদকও ছিলেন। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রেনাডার প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের সেনাবাহিনীর একাংশ বিদেশি মদতে তাঁর বামপন্থী সরকারের পতন ঘটানর চেষ্টা চালাচ্ছে এই অভিযোগও তোলেন। কিন্তু সেদিন কেউ ভাবতেও পারেননি তাঁর এই অভিযোগ এত তাড়াতাড়িই সত্যি হয়ে উঠবে। তবে একটা ঘটনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র কেন গ্রেনাডার ওপর আক্রমণ চালাতে গেল? একটা বিষয় তো মারকিন সরকার ভালভাবেই জানত যে, গ্রেনাডার ওপর হামলা চালালে, আর যাই হোক, বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যাবে।

আরো আশ্চর্য লাগে যখন আমরা দেখি এই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনে। রাশিয়ার পক্ষ থেকে তাও আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দুই বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর চুক্তি অনুযায়ীই পরিস্থিতি সামাল দিতে রুশসৈন্য আফগানিস্তানে ঢুকেছে। কিন্তু আমেরিকা তার এই আচরণের সপক্ষে কী যুক্তি দেবে? এমনকি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই দেশের তেমন কোন গুরুত্বও নেই। কাজেই সব দেখেশুনে একটা কথাই মনে হয়, মারকিনী বিদেশ নীতির বড় বড় কথাগুলি ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। রেগন হয়ত গ্রেনাডায় এই যুদ্ধ বাধিয়ে নিজের দেশে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে চাইছেন, কিন্তু আসলে যে তিনি ছায়ার সংগেই লড়ছেন, এ কথা তাঁকে কে বোঝাবে?

পরিবর্তন

৯-১৫ নভেমবর/১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১৯

দাম ২.৫০, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি : বৃটিশ তথ্য দফতরের সৌজন্যে

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট)
কলকাতা ৭০০০৭২

দিললি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২,
নতুন দিললি ১১০০০১. ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

বিশেষ বিবাহ সংখ্যা

পরিবর্তনের ১৬ নভেমবর সংখ্যা বিশেষ বিবাহ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ৮০ পৃষ্ঠার এই সংখ্যার মূল্য হবে চার টাকা। তবে গ্রাহকদের কোন বর্ধিত মূল্য দিতে হবে না।

এই সংখ্যায় থাকবে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বহু সুলিখিত প্রবন্ধ। যেমন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিয়ের প্রথা ও লোকাচার, রেজিসট্রি বিয়ে, কালীঘাটের বিয়ে, ভালবাসার বিয়ে, বিয়ের ভোজ: সেকাল ও একাল, বিবাহে জ্যোতিষ, বিয়ের আগে ডাক্তারি পরীক্ষা কি বাঞ্ছনীয়, পাত্রপাত্রী নির্বাচন সমস্যা, কালো মেয়ের বিয়ের সমস্যা, মুসলিম বিবাহ। সেই সংগে নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ – দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠি কোথায়? সবশেষে থাকছে কতকগুলি প্রশ্ন যার উত্তর আপনি নিজেই দেবেন এবং নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার বিবাহিত জীবনে আপনি কতখানি সুখী?

প্রতিটি বিবাহিত দম্পতি ও যাঁদের বিয়ে হচ্ছে ও হবে তাঁদের এই সংখ্যাটি সংগ্রহে রেখে দেবার মত। অজস্র সুখী দম্পতির ছবি।

নিবেদনমিদং

কোন কোন পাঠক চিঠি লিখছেন পরিবর্তন বড় কমারসিয়াল হয়ে যাচ্ছে। কারণ পরিবর্তনে আগে বিজ্ঞাপন কম থাকত এখন বিজ্ঞাপন বেশি থাকছে। একথা ঠিক, পরিবর্তনে বিজ্ঞাপন আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। পরিবর্তন যাতে বিজ্ঞাপন না পায় তার জন্য নানা মহল থেকে অপপ্রচার চালান হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা ব্যক্তিগত খাতিরে বিজ্ঞাপন দেন না। তাঁরা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন। একটা টাকা খরচ করলেও তার যৌক্তিকতা আছে কিনা বিচার করে নেন। তাঁরা নিজেরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন বাংলা ভাষায় 'ম্যাস ম্যাগাজিন' বা পপুলার ম্যাগাজিন বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র পরিবর্তন। পৃথিবীর যেখানে বাঙালি সেখানেই এক কপি না এক কপি পরিবর্তন আপনি চোখে দেখবেন। এছাড়া পরিবর্তন এখন সর্বসমাদৃত ম্যাগাজিন যার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোন চ্যালেনজ হয়নি। বলতে নেই, এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন আদালতে একটি মামলাও এখনও পরিবর্তনের নামে হয়নি। আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীন বা তথ্যপ্রমাণহীন কোন কিছু ছাপি না। আমাদের বক্তব্যের কোথাও কিছু ভুল বা ত্রুটি থেকে গেলে আমরা সংগে সংগে প্রতিবাদপত্র ছাপিয়ে থাকি। পৃথিবীতে এমন কোন সংবাদপত্র নেই, যেখানে কোন না কোন খবরের প্রতিবাদ হয় না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে সুপ্রিম কোরট সকলেই পরিবর্তনে প্রকাশিত খবরের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন। এইতো সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবংগের আইন শৃংখলা নিয়ে সংবাদপত্রের রিপোরট উদ্ধৃত করে পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে একটি চিঠি দিলেন। তাতে উল্লেখ করলেন পরিবর্তনে প্রকাশিত একটি রিপোরটের। এসব কারণে বিজ্ঞাপনদাতারা এখন ক্রমশ পরিবর্তনকে তাঁদের মাধ্যম করতে তৎপর হচ্ছেন। সেই সংগে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রাণপাত পরিশ্রম। কিন্তু এমনিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসংগতভাবে শতকরা, ২০ ভাগ বিজ্ঞাপন ব্যয় পর্যন্ত আয়কর থেকে ছাড় না দেবার যে নীতি নিয়েছেন তাতে বিজ্ঞাপন শিল্পের নাভিশ্বাস উঠছে। পত্র-পত্রিকাও বন্ধ হবার মুখে! এই পরিস্থিতিতে আমরা যে গড়ে ১৫ পাতা করে বিজ্ঞাপন পাচ্ছি এটা শুধু আমাদের সুনাম ও প্রচার সংখ্যার জন্য। এই দুর্লভ বিজ্ঞাপনের বাজারেও আমরা গত কয়েক সংখ্যায় একটি দুটি বা ততোধিক বিজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান করেছি।

পাঠকরা জেনে রাখুন, প্রথম প্রেস কমিশন সুপারিশ করেন যে সংবাদপত্রের শতকরা ৪০ ভাগ জুড়ে থাকবে বিজ্ঞাপন, ৬০ ভাগ থাকবে অন্যান্য যাকে বলে এডিটরিয়াল ম্যাটার। কিন্তু বহু বড় বড় কাগজে দেখবেন এর চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞাপন থাকে। আমরা কিন্তু কখনও শতকরা ৪০ ভাগ পাতা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করিনি। তবু পরিবর্তনে ১৫/১৬ পাতা বিজ্ঞাপন হয়ে গেলেই অনেকে উষ্মা প্রকাশ করে চিঠি লেখেন। আর সংবাদপত্র কমারসিয়াল না হলে তা চলবে কী করে? এই প্রবল দুর্মূল্যের বাজারে ফোটো কমপোজ করা অফসেটে ছাপা একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় কত হতে পারে বহু পাঠকের তা ধারণা নেই। আমাদের স্টাফদের বেতন ছেড়েই দিলাম, কী পরিমাণ টাকা আমরা প্রতিবছর শুধু সংবাদ সংগ্রহের জন্য ব্যয় করে থাকি তা দেখলে অনেক দৈনিক পত্রিকা লজ্জা পাবে। তবু আমরা পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বিজ্ঞাপন ১৮ পাতার বেশি হলেই আমরা আনুপাতিক হারে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দেব। যদিও বিজ্ঞাপন কম থাকলে আমরা পৃষ্ঠা সংখ্যা কমাই না। আমরা শীগ্গি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন নিতে শুরু করছি। দৈনিক কাগজের চেয়ে স্বল্প ব্যয়ে আপনি এখন পরিবর্তনে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। খরচ পড়বে প্রায় অর্ধেক। তবে লাভ হবে অনেক বেশি। পরিবর্তন একজন কেনেন দশজন পড়েন, দৈনিক কাগজের আয়ু কয়েক ঘণ্টা, তারপর ঠোঙা। কিন্তু পরিবর্তনের পুরনো কপি কি আপনি প্রাণ ধরে সের দরে বিক্রি করতে পারবেন? একজন পাঠক চিঠি লিখে বলেছেন পরিবর্তন হল 'লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া।' এটি এখন শুধু একটা ম্যাগাজিন নয় – এটি একটি 'মুভমেনট।' জনগণই আমাদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। পাঠকদের কাছে অনুরোধ করব তাঁরা যেন সমস্ত বিষয়টি সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করেন।

পা. চ

বাড়ন্ত বাচ্চাদের

ফ্যারেক্স

কারণ ফ্যারেক্স, বাচ্চাকে সব দিক থেকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলার জন্যে অনেক বেশী পুষ্টিকর শক্ত আহার!

আপনার বাচ্চার বৃদ্ধির জন্যে ফ্যারেক্স প্রোটিনে ভরপুর।

বাচ্চাকে প্রোটিন-হীনতা থেকে রক্ষা করার জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্র্যাণ্ড করা শক্ত আহারে প্রোটিনের পরিমাণের হার এবং শক্ত আহার তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করে দিয়েছে। শক্ত আহার ফ্যারেক্স—নির্দেশ মত তৈরী করলে প্রোটিনে ভরপুর থাকে, যা আপনার বাচ্চার বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

ফ্যারেক্সে সুস্থ রক্তের জন্যে বাড়তি আয়রণ আছে।

"মায়ের শরীর থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আয়রণ নিয়ে শিশু জন্মায়, কিন্তু জন্মের পর এই জমা করা আয়রণ ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। যদিও দুধ আহার হিসেবে ভালো, তবে তা সম্পূর্ণ আহার নয়, কারণ তাতে আয়রণ থাকে না। এই জন্যে শিশুর এমন শক্ত আহারের প্রয়োজন যাতে আয়রণ আছে।"

— ডাঃ সুভাচ চ. আর্য্য

আপনার বাচ্চার রক্ত, সংক্রমণ প্রতিরোধ শক্তি, সাধারণ স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধির জন্যে আয়রণ একান্ত প্রয়োজন। আর এইজন্যেই ফ্যারেক্সে অন্য যেকোনো ব্র্যাণ্ড করা শক্ত আহারের চেয়ে বেশী আয়রণ আছে।

আপনার বাচ্চার দাঁত আর হাড় গড়ে তোলার জন্যে ফ্যারেক্সে সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস আছে।

আপনার বাচ্চার দাঁত ও হাড় ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্যে চাই ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস। কিন্তু এগুলি একসঙ্গে ২:১ হারে থাকলে তবেই বাচ্চার শরীরে সব'চয়ে ভালোভাবে কাজে লাগে। ফ্যারেক্সে এই একান্ত প্রয়োজনীয় দুটি উপাদানই এই আদর্শ হারে আছে এবং আপনার বাচ্চার হাড় যে বেশী সুস্থ এবং দাঁত বেশী মজবুত হবেই—তা নিশ্চিত করে তোলে।

আর ফ্যারেক্স কত সহজে হজম হয়।

ফ্যারেক্স, আপনার বাচ্চার কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে—বিশেষ প্রক্রিয়ায় আগে থাকতে রান্না করা থাকে।

FAREX

ডাক্তাররা খাওয়াতে বলেন

ফ্যারেক্স(র)

গ্ল্যাক্সোর তৈরী

CASGLF-40-234 BEN

শারদীয় পরিবর্তন ১৩৯৩

শারদীয় পরিবর্তন : পাঠক-পাঠিকার অভিমত

ভালয় মন্দয়

'শারদীয় পরিবর্তন' সম্পর্কে [illegible] কিছু বক্তব্য।

[illegible] দেবীর দৃষ্টিতে [illegible]' প্রকাশ সুন্দর, যেন [illegible] দিশারী। সংক্ষিপ্ত [illegible] সুবোধ্য ও সুখপাঠ্য [illegible] ঘোষের বাখা [illegible] ছন্দোময় [illegible] প্রসাদ গুপ্ত ও লাহিড়ীর [illegible] উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

[illegible]

[illegible] চট্টোপাধ্যায় সিলেট [illegible]

[illegible] গল্পটি ভালই লাগল, [illegible] নামগুলো অমন [illegible] বাঞ্ছনীয়। [illegible] তিনি [illegible] কী আমু [illegible] পড়ে। [illegible] ছাড়া - 'এল টি সি'র [illegible] নিজের বাড়ি পর্যন্ত যাত্রা [illegible] সম্ভব যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াবার [illegible] 'এল এল টি সি'র প্রয়োজন [illegible] এই 'ট্রিপ্স' এর দিকে ইদানীংকার লেখকদের অসতর্কতা লক্ষণীয়।

শংকর তাঁর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে 'বাবওয়েল সায়েব' এর মত এক অবিশ্বাস্যরকমের ভাল ইংরেজ চরিত্র উপহার দিয়েছেন। তবে, তাঁর ফিচারধর্মী গল্পটিতে এত বেশি 'ডাইগ্রেশন' আমার মতে অবাঞ্ছনীয়।

উষা ভৌমিক রচিত রম্যরচনাটি রসালো হয়েছে বটে, তবে, 'পি পি এচ' সম্পর্কে উনি প্রশ্ন করেছেন 'এটা কি ভাগলপুর থেকে পাওয়া কোন ডিগরি' - এটা অনুচিত কেননা সর্বভারতীয় স্তরে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত, সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প বিজ্ঞানের পীঠস্থান-ভাগলপুরের নাম লেখকের মনে উদিত হল কীভাবে বিশেষ করে নধর শরমা যখন ছাপরা জেলার লোক?

হাবিব আহসান সেই বস্তা পচা 'প্লানচেট' পর্ব নিয়ে লিখতে গেলেন কেন 'প্লানচেট' যে আসলে প্লেন চিট [illegible] বহুদিন যাবৎ প্রমাণিত হয়েছে।

কিরণশংকর মৈত্রের 'কমলা ফিরে এসো' কাহিনীটি মর্মস্পর্শী, কিরণ বাবুর কৃতিত্ব এখানেই [illegible]। তিনি আগাগোড়া যা কিছু লিখেছেন [illegible] Yellow Journalism এরই পর্যায়ে পড়ে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'যাঁরা বাঁ হাতে লেখেন' নিবন্ধটি পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট হলে বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘায়িত।

বিক্রমাদিত্য লিখিত 'ভারতীয় সুন্দরীর গুপ্তচরবৃত্তি', পাঠকদের কাছে চাঞ্চল্যকর মনে হবে ঠিকই তবে রূপসীর ছবি এমন ও ভঙ্গী হয়ে মুদ্রিত হল কেন?

বিজ্ঞাপনের বানানগুলি পরবর্তী কালে সংশোধন করে নিলে ভাল হবে। ফুড করপোরেশন অব ইনডিয়ার 'দূর্গা' আসলে 'দুর্গা' হবে। Radu' আসলে 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' নয়, 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী'।

দিলশাদ খান সম্পর্কিত লেখাটি বড় প্রচারধর্মী হয়ে গেছে।

বাঙালির ভয়ে আলেকজান্ডারকে ভারত ছেড়ে যেতে হয় - এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি এত বেশি অনুমান নির্ভর যে, শেষ পর্যন্ত এটা কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

সংকর্ষণ রায়ের 'সমুদ্রতলের গুপ্তধন' আলোচ্য সংখ্যার সর্বাধিক মূল্যবান ও তথ্য সমৃদ্ধ রচনা। বিজ্ঞান এখানে এমনই সরস শৈলীতে উপস্থাপিত যে, মনে হয় রম্যরচনা পড়ছি।

'অভিশপ্ত চম্বল', 'মুঝে জীনে দো', 'চম্বল কী কসম', 'চম্বল কী রানী' ও 'ফুলন দেবী' র পর আবার পুরনো মদ নতুন বোতলে ভর্তি করে পরিবেশন করা কেন?

ভূত প্রেত, ডাইনী, ডাকাত, বেশ্যা বিষয়ক 'পরিবর্তন' এর প্রয়োজন তার tradition ভেঙে দিয়ে রীতিমত পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হওয়া। এটি আমার সবশেষ মন্তব্য।

অমলকান্তি বিশ্বাস
দুর্গাপুর ৪

শারদ পরিবর্তন বৈশিষ্ট্যে অনন্য

'পরিবর্তন' শারদীয় সংখ্যা আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। স্বল্প মূল্যের এই শারদ অর্ঘ্য অগণিত পাঠকবর্গের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হয়েছে। লেখাগুলি সুপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক এবং মননশীল। প্রচ্ছদ এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব অতুলনীয়। সব মিলিয়ে শারদ সম্ভারটি মনোজ্ঞ, সুন্দর।

ফিচারগুলি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিদ সংকর্ষণ রায় বিরচিত 'সাগরতলের গুপ্তধন' পড়ে সমুদ্রের তলার খনিজ সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন-কানুনের অনেক অজানা তথ্য আমরা জানতে পারি। দেশ-বিদেশের ডাইনীদের বিচিত্র কার্যকলাপের ওপর রোমহর্ষক লেখাটি মনে শিহরণ জাগায়। প্লানচেট সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক রচনাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দিব্যজ্যোতি বসুর 'অভিশপ্ত চম্বলের পথে-বিপথে' লেখাটিতে বেশ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ আছে। বিভীষিকাময় চম্বলের ওপর তথ্যনিষ্ঠ ফিচারটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। মুকুতা মুখোপাধ্যায়ের 'উধাও মেঘলোকে' পাইলটদের দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা আছে। ব্যোমযান এবং চালকদের সম্পর্কে লেখিকার অন্বীক্ষণ গুণোৎকর্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে। জননায়ক স্তালিন, চারচিল এবং ট্রুম্যানের ওপর চিরঞ্জীবের ফিচারটি রাজনীতির বিশ্বস্ত দলিল। তথ্যাদি এবং দুষ্প্রাপ্য ফটো এর বাড়তি আকর্ষণ। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার তপেন্দ্র মোহন চক্রবর্তীর ব্যাংক ডাকাতির ওপর লেখাটি ততটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কাহিনী বর্ণন এবং প্রয়োগরীতি যথোপযুক্ত নয়। তুলনামূলকভাবে পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি আকর্ষক। গুপ্তচরবৃত্তির ওপর বিক্রমাদিত্যের লেখাটি মোটামুটি। দেবেশ দাশের ঐতিহাসিক ফিচার এবং ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের মনস্তাত্ত্বিক ফিচার বেশ ইনটারেসটিং।

সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জেলা সিলেটকে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করেছেন। বিকাশ ও বৈচিত্র্যে লেখক দুঃসাহসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ সহকারে সিলেট জেলার মানুষদের কথা ব্যক্ত করেছেন। চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ, জেলার অপার্থিব সৌন্দর্যের বর্ণনা - সবই লেখকের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ভ্রমণ কাহিনীটি যেন অন্তর্দর্শন।

লেখিকা কবিতা সিংহের 'মোমের তাজমহল' উপন্যাসটি ততটা রসস্নিগ্ধ হয়নি যতটা আশা করে ছিলাম।

বারওয়েল সায়েবের স্মৃতিচারণকে মূলধন করে শংকর এক অসাধারণ গল্প উপহার দিয়েছেন, গল্পটি পড়তে ভাল লাগে এবং বহুক্ষণ তার রেশ থেকে যায়। নিমাই ভট্টাচার্যের 'তীর্থযাত্রা' গল্পটি মর্মস্পর্শী। রুচি এবং রসের পরিচয় সুস্পষ্ট। যাযাবরের গল্পটিও ভাল, গল্পটির ভাষা ও লিখনরীতি স্বচ্ছন্দ। উষা ভৌমিকের রম্যরচনাটিতে যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক থাকলেও শ্লেষ বা রূপকের অন্তরালে সমাজব্যবস্থাকেই কশাঘাত করেছে। কিরণশংকর মৈত্রের 'কমলা ফিরে এসো' মনকে ভাবায় এবং চেতনাকে বিদ্ধ করে।

কলকাতার হিন্দি-নাট্য ওয়ার্ল্ডা-

বলেন, এগুলো লেখাটি নিঃসন্দেহে হিন্দি নাটকের নিতান্ত বিস্তার ঘটেছে। জনপ্রিয় চিত্রতারকা শত্রুঘ্ন সিনহা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের সাক্ষাৎকারটি মনে দাগ কাটে।

স্বপনকুমার আদিত্য
কলকাতা-৬৭

পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে

শারদীয় পরিবর্তন অন্যান্যবারের মত এবারও পড়লাম। পত্রিকাটি বরাবরই চিত্তাকর্ষক, তদুপরি শারদীয় সংখ্যা যেন আলাদা যাদু মাখান। অনেক মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে। ভাষার কারিগরি ছাড়া এবং গল্প-প্রবন্ধের আলোচনা না করেও মোদ্দাকথায় বলতে গেলে – শারদীয় সংখ্যাটি হয়েছে অনন্য।

তবে একটা বিষয়ে সামান্য না আলোচনা করলে মন প্রবোধ মানছে না। 'কমলা ফিরে এসো' প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। সাংবাদিক অশ্বিনী সারিন সারা দেশের সামনে গণিকাবৃত্তি ও মেয়েদের জীবনে তার অভিশাপের চিত্র তুলে ধরতে অনেক পরিশ্রম করে কমলাকে কিনে এনেছেন। কিন্তু সারিন মশায়ের কাজ শেষ হবার পর কি কমলার খোঁজ রাখা কর্তব্য ছিল না? কমলা এভাবে হারিয়ে গেল কেন?

আশিসরঞ্জন নাথ
কাছাড়, আসাম

একটি ফুলের তোড়া

প্রথম শ্রেণীর যে কোন পত্রিকারই চারটি 'এফ'-এর গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। Free, Frank, First and Forward. এই চারটি গুণই পরিবর্তনে আছে। যে দামে 'শারদীয় পরিবর্তন' আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা তো একটি ফুলের তোড়া। নানারকম ফুলে সুগন্ধের বন্যা – রঙ-এর মেলা। এক কথায় পুজো সংখ্যা 'পরিবর্তন' অনবদ্য।

একটি বলিষ্ঠ নাটক যেমন সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়, আমি মনে করি, ঠিক সেই কারণেই যথার্থ team spirit and work না হলে একটি পত্রিকাও সফলতার শীর্ষে উঠতে পারে না। পরিবর্তনের team work চমৎকার। শিল্প নির্দেশক নিতাই ঘোষ থেকে আরম্ভ করে সবার বেলাতেই এ কথা প্রযোজ্য। বরাবরই লক্ষ্য করে আসছি, পরিবর্তন ক্লান্তিকর ও ধারাবাহিক গতানুগতিকতা এবং সস্তা ও অশালীন রচনা পরিহার

থেকে বিরত। এ জন্য সবারই অভিনন্দন প্রাপ্য।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, একজন সৎ সম্পাদক সমানভাবে সাংবাদিক তো বটেই, একজন সুসাহিত্যিকও বটে। সম্পাদনায় ও সাংবাদিকতায় সাহিত্য পুরোপুরি না এলেও তা অনেকটা।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্রামপুর, মধ্যপ্রদেশ

নতুনত্ব সবকিছুই

পরিবর্তন শারদীয় সংখ্যাটির জন্য দারুণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। মাত্র পনের টাকার বিনিময়ে এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও মূল্যবান সংখ্যা হাতে পেয়ে আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না, সংখ্যাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বিষয়সূচির বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব – সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে ফিচারগুলির নির্বাচন যে কোন পাঠককেই খুশি করবে। এ পর্যায়ের প্রতিটি লেখাই যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বহু অজানা তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ। ভাল লাগল কিরণশঙ্কর মৈত্রের 'কমলা ফিরে এসো' কাহিনীটিও। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনী 'সিলেট ডাইরি' তাঁর সুনিপুণ কলমে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্বচ্ছন্দ ভাষা ও ভঙ্গিতে তিনি আমাদের অনেক কিছুর সংগেই পরিচয় করে দিয়েছেন। ঊষা ভৌমিকের 'বোংগীয় বিকোলপো বেবোস্থা সোমিতি' বেশ সানন্দে উপভোগ করা গেল। এর বাইরের অন্যান্য রচনাগুলিও সুখপাঠ্য। সামগ্রিকভাবে, অসংখ্য পূজো সংখ্যার ভিড়ে 'পরিবর্তন' তার স্বাতন্ত্র্যটুকু দারুণ উজ্জ্বলতার সংগে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পাঠক হিসাবে আমরা খুশি।

সুব্রতকুমার করণ
বাওয়ালী, ২৪-পরগণা

শারদীয় পরিবর্তন সবার শীর্ষে

এবারের শারদীয় পরিবর্তন এক নতুনত্বের স্বাদে ভরা। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সব কটি ছবি এবং লেখা অভূতপূর্ব হয়েছে। ১৫ টাকার বিনিময়ে শারদীয় পরিবর্তন হাতে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। লেখাগুলির মধ্যে কোন লেখকের লেখা সবচেয়ে ভাল বলব ভেবে পাচ্ছি না। আসলে সত্যি কথা বলতে কি – সব লেখাগুলিই এত সুন্দর হয়েছে যে একটি অন্যটিকে বাদ দিয়ে নয়। অনেকগুলো শারদীয় পত্রিকা হাতে এসেছে – তার মধ্যে শারদীয় পরিবর্তন সবার শীর্ষে।

এবারের শারদীয় পরিবর্তনকে যাঁরা সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন (সম্পাদক, লেখক-লেখিকা, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও পরিবর্তনের সকল কর্মী) এবং যাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই দূর পল্লীর ক্ষুদ্র গ্রাম হরেকৃষ্ণপুর থেকে আমার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। আর পরিবর্তনের সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সেখ শামসুল হক
হরেকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর

স্বল্পমূল্যে অমূল্য

হাঁ, যা ঠিক করেছিলাম ঠিক তাই-ই করেছি। ঠিক করেছিলাম আগে 'শারদীয় পরিবর্তন' কিনব, তারপর অন্য শারদীয়ার মধ্যে কোনটা কিনব ঠিক করব। পত্রিকাটি কিনে অর্ধেকের বেশি পড়েও ফেলেছি, না না, আমি আর অন্য কোন শারদীয়া কিনব না, ওটাই পড়ব, বারবার পড়ব। শুধু একটু ইতস্তত বোধ করছি এত স্বল্পমূল্যে অমন অমূল্য পত্রিকা ক্রয় করে। আপনাদের আন্তরিক সাধুবাদ।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৪

ধন্যবাদ

পরিবর্তন-এর শারদীয় সংখ্যা পড়লাম। পূজোর বহু পূর্বেই আমাদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিবর্তন-এর শারদীয় সংখ্যা স্বল্পমূল্যে হয়েছিল এক অমূল্য পত্রিকা।

যেমন আকর্ষণীয় তার প্রচ্ছদ তেমনি আকর্ষণীয় তার লেখাগুলি। এক কথায় উক্ত সংখ্যাটি পড়ে মনে ছবির মত দাগ কেটেছে। সর্বশেষে পরিবর্তন কর্তৃপক্ষকে জানাই পূজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোহাঃ মাসুম আকতার
কলকাতা-১৪

এক ঝলক তাজা অকসিজেন

শারদীয় 'পরিবর্তন' পাঠক পাঠিকার মনোভূমিতে এক ঝলক তাজা অকসিজেনের আশ্বাস বহন করে এনেছে। আমরা প্রাণভরে সেই হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারি, মন খুলে বলতে পারি সুস্থ সংস্কৃতি চেতনা

এখনও বাঙালির জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি। এমন একটি সুন্দর সর্ববয়সোপযোগী সুরুচিসম্মত শারদীয় সংখ্যার জন্য মন তৃষিত হয়ে থাকে। 'পরিবর্তন' সেই তৃষ্ণারই শীতল শান্তি।

পরিবর্তনের একমেবাদ্বিতীয়ম্ উপন্যাস 'মোমের তাজমহল' এক কথায় অনবদ্য। শতবর্ষের অলিন্দ থেকে দেখা সে যুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এক বিশ্বস্ত দলিল।

দুটি ছোট গল্প পরিবর্তনেরই উপযুক্ত। শংকরের বিদেশি সাহেব চরিত্রটি তো আজ বহুবছর ধরেই বাঙালি পাঠকের সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। যাযাবরের গল্পটিও নিটোল মুক্তাবিন্দুর মতই অনন্য। প্লানচেট, ডাইনী প্রসংগ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। সাংবাদিকের তথ্যনিষ্ঠা ও রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা উদঘাটন অবলম্বনে প্রতিবেশী মারাঠী সাহিত্যের এক অসাধারণ নাটকের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন কিরণশংকর মৈত্র। সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'সিলেট ডাইরি' এক স্বাদু ভ্রমণকাহিনী। চিত্রধর্মিতা ও অননুকরণীয় বর্ণনাভংগি রচনাটিকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। শ্রীহট্টের বিগত এবং বর্তমান দিনগুলি যেন ছবির মত আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই। এর সংগে মিশেছে উপভোগ্য রম্যরচনাসুলভ বৈঠকি আমেজ। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিটি রচনাই বৈচিত্র্য ও সৌকর্যে মনোহারী।

সাময়িকপত্র যখন আদর্শ শিক্ষকের মত তার ঐতিহ্য ও মান অনুযায়ী এক শ্রেণীর লেখককুল সৃষ্টি করে একটি পত্রিকাগোষ্ঠী গড়ে তোলে, তখন তা হয় সার্থক ; সন্দেহ নেই, পরিবর্তনও সেই পথেই চলেছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালির সীমিত ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এমন একটি ছিমছাম শারদ সংখ্যা একান্ত বাঞ্ছিত।

রূপশ্রী দত্ত
কলকাতা ১৩

বিশেষ আকর্ষণীয়

পরিবর্তন, শারদীয় ১৩৯০ সংখ্যা আমাদের মত পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত হয়েছে। মহামূল্যবান এই সংখ্যা। বলিষ্ঠ লেখকদের লেখার মধ্য দিয়ে অজানাকে জানা ও অদেখাকে দেখার স্পৃহা পাঠকদের মনে সঞ্চার লাভ করেছে।

আমাদের দিব্যচক্ষু খুলে দিলেন শারদীয় পরিবর্তন, যা এতদিন আমাদের ধারণার বাইরে ছিল, লোকচক্ষুর অন্তরালেও যে একটা জগৎ আছে, তা আমাদের উপহার দিয়েছেন মুকুতা মুখোপাধ্যায়-এর 'উঁধাও মেঘলোকে', হাবিব আহসান; 'প্লানচেটে যে সব আত্মারা এসেছিলেন', পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'সিলেটের ডাইরি' এবং 'ডাইনীরা আজও আছে'-সুভাষ সমাজদার।

নতুনভাবে জ্ঞানের প্রসার লাভ ঘটেছে, সংকর্ষণ রায়ের 'সাগরতলের গুপ্তধন', 'আলেকজান্ডার ভারত ছেড়েছিলেন বাঙালির ভয়ে', দেবেশ দাশ এবং 'যাঁরা বাঁ হাতে লেখেন', ডাঃ বিশ্বনাথ রায়।

বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে, সচরাচর যা ঘটে থাকে, সেই সত্যের অধিকারী কিরণশংকর মৈত্রের কাহিনী 'কমলা ফিরে এসো'। 'ভারতীয় সুন্দরীর গুপ্তচর বৃত্তি' বিক্রমাদিত্য-সাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

দিব্যজ্যোতি বসুর 'অভিশপ্ত চম্বলের পথে বিপথে' দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করা পাঠক সমাজকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে।

ঔপন্যাসিক শংকর আবার আলোড়ন সৃষ্টি করলেন কত অজানাকে অবলম্বনে দীর্ঘ তিরিশ বছর পর, স্মরণীয় গল্প 'বারওয়েল সায়েব' মনে থাকবে অনেকদিন। এরপরই নাম করতে হয়, 'মোমের তাজমহল' ঔপন্যাসিক কবিতা সিংহের।

সবজমিন তদন্তে, 'সেদিনের ব্যাংক ডাকাতি এবং অনন্ত সিংহ' এর পরিচয় দিয়ে তপেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী সত্যতার দিকে ঝুঁকেছেন এবং পরিবর্তনকে সংসাহস যোগাতে সচেষ্ট হয়েছেন। অজ্ঞতাকে আলো দেখিয়ে নিঃসন্দেহে বলতে পারি নিরপেক্ষতা পরিবর্তনের ধর্ম, তা যথাযথ পালন করেছেন।

বিশিষ্ট চিত্রতারকা এবং পরিচালক শত্রুঘ্ণ সিনহা দর্শকের কাছে চোখের মণি ছিলেন, এখন পাঠকের সামনে সফল নায়কের পরিচয় দিলেন। আর একজন মর্মভেদী উচ্চাংগ সংগীতশিল্পী ওস্তাদ দিলশাদ হোসেনের জীবনকাহিনী, গভীরভাবে সংগীত রসিকদের কাছে রেখাপাত করেছে।

এ ছাড়া, ছড়া, পটাসডামের বাড়ি, গল্প, চরণাগত, তীর্থযাত্রা, থিয়েটার যথাযথ। ঊষা ভৌমিকের রম্যচরনা, 'বোংগীয় সিকোলপো বেবোস্থা সোমিতি' সমস্ত বাঙালি সমাজকে, এমনকি ধসে পড়া পশ্চিমবংগ সরকারকেও টনক নড়িয়েছে পংগু শাসন ব্যবস্থাকে চাংগা করতে এরকম ব্যংগচিত্রের প্রয়োজন।

শেষ থেকে শিল্প উপদেষ্টা ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শিল্পী নিতাই ঘোষের তত্ত্বাবধানে পরিবর্তন শারদীয় ১৩৯০ সংখ্যা একটি বিশেষ আকর্ষণীয় পত্রিকা হিসাবে গণ্য হয়েছে।

তপন চক্রবর্তী
লালপুর, রাঁচী

নতুন যুগের সূচনা করলেন

কোন বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা করবার আগে সমালোচকদের প্রধান কর্তব্য হয় সেই বিষয় সম্পর্কে কিছু ত্রুটি খুঁজে বের করা। কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৮৩ সালের পরিবর্তন শারদীয় সংখ্যাকে কেউ যদি সমালোচনা করার চেষ্টা করেন তাহলে তা ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানর নামান্তর হবে। সেইহেতু একটি উপন্যাস, তিনটি গল্প, একটি ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা, থিয়েটার, সিনেমা, সংগীত ছাড়া আরও নানারকম আকর্ষণীয় সরঞ্জাম দিয়ে 'পরিবর্তন' যে তার শারদীয়ার সোনার সংসার সাজিয়েছেন তার সম্পর্কে এমন কোন কটু মন্তব্য করে সোনার সংসারের বাতাবরণ ভারী করবার মত দুঃসাহস আমার নেই।

শংকর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর কোন গল্প বা উপন্যাস ভাল লাগে না এমন বাঙালি খুব কমই আছেন। বর্তমান সংখ্যায় লেখা তাঁর 'বারওয়েল সায়েব' এই সত্যটিকেই আরও একবার প্রমাণিত করবে। কবিতা সিংহের উপন্যাস বললেই আমরা ভাবতে পারি একটা নিটোল গল্পের কথা। তাঁর 'মোমের তাজমহলে' তিনি অতীত দিনের বনেদি পরিবারের গৃহবধূদের দুঃখের একটি সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন। নিমাই ভট্টাচার্য ছোট গল্প লিখেছেন বটে তবে তিনি গল্পের শেষের দিকে এসে বাজিমাত করে ছেড়েছেন। তবে যাযাবরের কাছ থেকে আরও ভাল কিছু পাবার আশায় ছিলাম। এর পর অন্যদিকে চোখ ফেরান যাক। বাঙালির মত কৌতূহলপ্রিয় জাত আর আছে কিনা জানি না। অতএব চম্বলের ডাকাতদের সম্পর্কে বাঙালিদের মনোভাব যে কীরূপ তা বলাই বাহুল্য। দিব্যজ্যোতি বসু বাঙালিদের এই কৌতূহল মেটাবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন 'অভিশপ্ত চম্বলের পথে-বিপথে'। তবে মন কাড়ার মত রচনা লিখেছেন বটে কিরণশংকর মৈত্র। তাঁর 'কমলা ফিরে এসো'-তে ভারতের এক কলংকজনক অধ্যায়ের সংগে ইনডিয়ান এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা অশ্বিনী সারিনের এক দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী মুনিয়েছেন। এইরকমই বহু কথা লেখা যায় চিরজীবের, 'পটসডামের বাড়ি'কে নিয়ে। যাই হোক প্রত্যেকটি লেখা সম্পর্কে ভাল, ভাল আর ভাল ছাড়া আর কোনও কথাই আমার কলমে আসছে না। শেষ পর্যন্ত এত ভালর শেষ কথাটা বলে শেষ করব।

বাঙালি মানসের খোরাক যোগাবার মত কোন পত্রিকা পশ্চিমবংগে ছিল না বছর পাঁচেক আগে। তারপর আসে 'পরিবর্তন' পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে। বাংলা সাংবাদিকতায় তাঁরা একটি নতুন যুগের সূচনা করলেন আর তার মধ্যে দিয়েই বাঙালি পেল তার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

মধুসূদন কবিরাজ
কালনা, বর্ধমান

একটি প্রতিবাদ

আমি পরিবর্তন পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আপনাদের ১৩৯০ এর শারদীয় পরিবর্তনে বিজ্ঞপ্তি নামে Wyssen Skyline Cranes Co Ltd C/o Teen Action International দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পড়ে খুবই মর্মাহত হলাম। বিজ্ঞাপনের ভাষায় মূর্তিপূজো অন্যান্য জঘন্যতম অপরাধের সমতুল্য। মূর্তিপূজো কোন সম্প্রদায়ের নিন্দনীয় হতে পারে কিন্তু যদি অন্য কোন সম্প্রদায়ের কাছে সেটা ধর্ম বিশ্বাস হয়, তবে কারুর ধর্ম বিশ্বাস আহত হয় এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে কিনা, বিশেষ করে যদি সেই পত্রিকা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের না হয়! আমি আরো আশ্চর্য হলাম শারদীয় পূজো উপলক্ষে প্রকাশিত শারদীয় সংখ্যায় এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন যা কিনা অধিকাংশ পাঠকের ধর্ম অভিমানকে আহত করে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বলে এবং হিন্দু ধর্ম পরমত সহিষ্ণু বলেই তার ধর্ম অভিমানকে আঘাত দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন বিজ্ঞাপন ধর্মবিশ্বাসকে আহত করে তবে বিজ্ঞাপন মারফৎ অর্থাগমটাই কি শুধু বিচার্য হবে? অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মমতকে আহত করে এরকম বিজ্ঞাপন কি আপনারা ছাপতেন? আমি জানি এই পত্র আপনারা ছাপবেন না। আপনার সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে যদি এই পত্র ছাপেন তবে বাধিত হব।

অশোক কুমার বসু
জেলরী, সুরগুজা

সেরা চিঠির জন্য ৩০ টাকা সাম্মানিক পাবেন অমলকান্তি বিশ্বাস

মন্ত্রীরা তো রিপোরট দিয়েছেন – তারপর ?

নিশীথ দে

বামফ্রনটের চেয়ারম্যান সরোজ মুখারজি সমস্ত মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, আপনারা নিজেদের দফতরের কাজ কতদূর কী করলেন, কোথায় কিসের অসুবিধা হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কারা দায়ী ইত্যাদি সবিস্তারে বিবৃত করে অবিলম্বে রিপোরট দিন। সরোজবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী রিপোরট দিতে হলে সব কাজ বন্ধ করে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে।

যাই হোক মন্ত্রীরা সবাই যার যেমন মনে হল তেমনি রিপোরট দিয়ে দিলেন। সরোজবাবু তাঁর সংগে চেয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের দফতরের সংগে যুক্ত কতগুলি কমিটি আছে এবং সেই কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সংখ্যা কত? কতগুলি পদ শূন্য আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় সরকারের মনোনীত (নমিনি) সদস্য সংখ্যা কত তার পূর্ণ তালিকা। এই তালিকা বা সদস্য সংখ্যা কোন মন্ত্রীই দেননি, মানে দিতে পারেননি। কোন মন্ত্রীর দফতরে এই রকম কোন তালিকা নেই। অবশ্য কোন মন্ত্রী নিজে রিপোরট তৈরি করেননি, করেছেন তাঁর সি এ এবং প্রাইভেট সেকরেটারি।

আসল ব্যাপার হল সি পি আই (এম) নেতারা মন্ত্রীদের কাজের রিপোরট নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নন। তাঁরা চাইছেন কমিটির তালিকা এবং বিভিন্ন সংস্থায় সরকারের মনোনীত সদস্য তালিকা। তা হলে বেরিয়ে আসতো কোন মন্ত্রী কোন দলের কত লোককে ঢুকিয়েছেন আর কত লোক ঢোকানো যায়।

সি পি আই (এম) এর একটা ধারণা ছিল, অন্য দলের মন্ত্রীদের দফতরের কমিটিতে তাঁদের দলের লোক বেশি নেই। অথচ সি পি আই (এম) দলে বিভিন্ন সরকারি কমিটির সদস্যপদের দাবিদার অনেক। কাউকেই ঠেকাতে পারছেন না। একবার পারটি থেকে নিয়ম করে দেওয়া হল কোন এম এল এ বিধানসভার দুটির বেশি কমিটিতে থাকতে পারবেন না। তাতেও সব এম এল এ কে তো কমিটি মেমবার করা গেল না। আর শুধু এম এল এ তো নয়, রাজ্য কমিটি থেকে ব্রানচ কমিটির সদস্য সবাই সরকারি কমিটির সদস্য হয়ে সরকারি ক্ষমতা ছিটেফোঁটা হলেও ভোগ করতে চান।

যাই হোক খুঁজে পেতে দেখা গেল, সাকুল্যে ১৫৭টি সরকারি কমিটি আছে। আর প্রায় সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যান সরকারি গাড়ি পান। এর বাইরে আধা সরকারি, যেমন তন্তুজ, খাদি বোরড প্রভৃতি সংস্থা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত সংস্থা আছে যেমন, ন্যাশনাল টেক্সটাইল করপোরেশনে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছেন, দিল্লি-বোম্বাই যাচ্ছেন, খানাপিনা চলছে। যদিও ওই সংস্থার লোকসান বছরে কোটি কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের পরিচালিত একটি কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীরা 'পুজো আগাম' চেয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের টাকা নেই। কিন্তু একজন ডিরেকটর (সরকার মনোনীত) পুজোয় দলবেঁধে দারজিলিং বেড়াতে যেতে চাইলেন সরকারের ভরতুকির টাকা ভেঙে।

বামফ্রনট ক্ষমতায় আসার পর বহু স্কুল-কলেজ, সমবায় সমিতিতে অ্যাডমিনিসট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে – সবই পারটিরই লোক। রাজ্যে এত সমবায় সমিতি আছে যেখানে রাজ্য সরকারের মনোনীত সদস্য সংখ্যা ৫৬ হাজারের মত।

মন্ত্রীদের কাছে কমিটির তালিকা পেয়ে সি পি আই (এম) নেতারা একটু হতাশ হয়েছেন। সব কমিটিতেই সি পি আই (এম)-এর লোক আছে। এই হিসাব চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই। কেননা, তাহলে দেখা যাবে সি পি আই, মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লক, আর সি পি আই, পশ্চিমবঙ্গ সোসালিসট পারটি ন্যায়ভাবেই কমিটির কিছু সদস্যপদ চাইতে পারেন। অগত্যা এ ব্যাপারটা এখানেই ইতি।

এবার তাহলে মন্ত্রীদের কাজকর্মের রিপোরট নিয়ে আলোচনা করতে হয়। আগেই ঠিক হয়েছিল প্রত্যেক মন্ত্রীর রিপোরট নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনা বৈঠকে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সি পি আই (এম)-এর শৈলেন দাশগুপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দলের একজন নেতা।

সরোজ মুখার্জি

এর পর আরও দুমাস কেটে গিয়েছে – সবাই চুপচাপ। ধামাচাপা লাইনই একমাত্র পথ। প্রথম বামফ্রনট ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রনটের প্রয়াত চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত সমস্ত মন্ত্রীর কাছে ছয় মাসের কাজকর্মের রিপোরট চেয়েছিলেন। অনেকে রিপোরট দিয়েও ছিলেন। প্রায় সকলেই অজুহাত দেখিয়েছিলেন, আমলাদের অসহযোগিতা। সেবারও অধিকাংশ মন্ত্রীর রিপোরট নিয়ে আলোচনা হয়নি। একদিন বামফ্রনটের জরুরী বৈঠক ডাকা হল খাদ্যদফতরের কাজকর্ম আলোচনার জন্য। সবাই হাজির। দেখা গেল শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীমশাই নিজেই এলেন না। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হল, জরুরী মিটিং-এ এলেন না কেন? মন্ত্রী বললেন, কী করব আটকে গেলাম। আগে তো জানতাম না মাঠে সেদিন বড় খেলা ছিল।

বামফ্রনটের নেতারা এবারে ভেবেছিলেন আলোচনাটা হবে। কেননা উদ্যোগ নিয়েছেন জ্যোতিবাবু নিজে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে জ্যোতিবাবু নিজেই বলেছিলেন, অন্তত ছ মাস অন্তর একটা রিভিউ হওয়া দরকার। দ্বিতীয় বামফ্রনট মন্ত্রিসভার কাজে জ্যোতিবাবু নিজে মোটেই খুশি নন। এটাও তিনি বারবার বলেছেন, মন্ত্রীরা উন্নয়নমূলক কাজের দিকে নজর দিচ্ছেন না। কর্মচারীদের মাইনে বাড়াচ্ছেন, ভাতা, দান-খয়রাত করছেন। এভাবে চলতে পারে না।

ইদানিং জ্যোতিবাবু মন্ত্রীদের কাজে নিজে হস্তক্ষেপ করছেন, যেটা আগে কোনদিন করেননি। পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর সারকুলার দিলেন, কলকাতা বাদে সমস্ত পুরসভার কর্মী গতবারের মত এক মাসের বেতন ও ভাতা পুজো একসগ্রাসিয়া হিসাবে পাবেন। অর্থাৎ বেতন ভাতা মিলিয়ে দেড় হাজার টাকাও পেতে পারেন। অকটোবর বাবদ বিভিন্ন পুরসভাকে সাকুল্যে সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া হল। পশ্চিমবংগে এমন কোন পুরসভা নেই যাঁরা সরকারি অনুদান ছাড়া নিজেদের কর্মীদের বেতন দিতে পারেন। অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রর সংগে প্রশান্তবাবুর সম্পর্ক অনেক দিন থেকেই খারাপ। অশোকবাবুই ব্যাপারটা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনলেন।

জ্যোতিবাবু সংগে সংগে প্রশান্তবাবুর সেই সারকুলার বাতিল করে নতুন সারকুলার জারি করার নির্দেশ দিলেন, সমস্ত পুরসভা কর্মী পুজো একসগ্রাসিয়া একই হারে পাবেন, যেমন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা পান। অর্থাৎ কমপক্ষে ২০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা।

প্রশান্তবাবু পড়লেন বেকায়দায়। অসুস্থতার ভান করে চলে গেলেন হাসপাতালে। এদিকে নতুন সেই সারকুলার অমান্য করে কুড়িটি পুরসভার (অধিকাংশ চেয়ারম্যান সি পি আই (এম) দলের) চেয়ারম্যানরা প্রশান্তবাবুর সারকুলার অনুযায়ী এক মাসের বেতন-ভাতা পুজো একসগ্রাসিয়া দিয়ে দিলেন। বাকি পুরসভার কর্মীরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট ও পুজো একসগ্রাসিয়া বয়কট করলেন। এই তো অবস্থা।

মন্ত্রীরা যে রিপোরট দিয়েছেন তাতে মোটামুটিভাবে সবাই বলেছেন তাঁদের দফতরের কাজ আগের চেয়ে ভাল, উন্নতি হচ্ছে। তবে 'কিন্তু' আছেই। যেমন টাকার অভাব। অর্থদফতর প্ল্যান খাতেও টাকা দিচ্ছেন না। ফাইল পাঠালে বড্ড ঝামেলা করে। তারপর আছে, কাজের লোকের অভাব। সরকারি কর্মচারীরা কাজ করেন না।

একজন মন্ত্রী তাঁর রিপোরটে বলেছেন, তাঁর কার্যত কিছু করার নেই। কেননা যে কাজই তিনি করতে চান না কেন তিন চারজন মন্ত্রীর দফতরের পূর্ণ সহযোগিতা চাই। ওই মন্ত্রীরা তাঁকে সহযোগিতা করছেন না।

আর, অভিযোগ অর্থদফতরের বিরুদ্ধে। অনেক মন্ত্রীই বলেছেন অর্থদফতর এত কড়াকড়ি করছে যে কাজ করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে বামফ্রনটে নয়, পারটিতে আলোচনা হওয়া দরকার।

মোটামুটিভাবে ফ্রনটের অন্য শরিকরা ধরে নিয়েছেন, মন্ত্রীদের রিপোরট ধামা চাপা পড়ে গেল। এখন একটি মাত্র কাজ হবে, কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়ান, যায় কী করে। আর নতুন কমিটি তৈরি করে অথবা পুরনো কমিটিতে যে সব আমলা চেয়ারম্যান আছেন তাঁদের সরিয়ে পারটির খুব নেতাদের বসান যায় কি না। □

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

অম্লমধুর

বৈষ্ণবীয় বিনয় নিয়ে
বলেন বরের কর্তাগণ –
আমরা এখন সৎ হয়েছি,
নিচ্ছি না এক কাঁচা পণ
কিন্তু মেয়ের জন্যে দেবেন
কয়েক ভরি স্বর্ণ, আর
খাট-পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল
রঙিন টিভি চমৎকার।
এতেও যদি আপত্তি হয়
বুঝুন মেয়ের কী সংকট,
কেমন করে থাকবে সুখে?
অতএব এই বিয়েই 'নট'।

শেখর আহমেদ

বউ তো পটের বিবি,
সন্ধ্যে হলেই সেজেগুজে
দেখতে বসে টিভি!
শাশুড়ি তখন তার,
বুড়ো হাড়ে সামাল দেন
হেঁসেল ও সংসার।

বিধবা মা বয়সকালে
বরের দাসী হন,
নতুন বউ নয়নমণি
মাথায় চড়ে রন!
এই নীতির follower
হালের পুত্রগণ।

অসীমা সান্তারা

ঠিক চৌরাস্তায়
বাস, মিনি, ম্যাকসি
দাঁড়াবেই দাঁড়াবে
খালি সব ট্যাকসি।

পেছনে সারি সারি
জমবে এসে গাড়ি
নেই কোন ভ্রূক্ষেপ
যেন তার জমিদারী।

হাতখানা বাড়িয়ে
চেয়ে আছে দাঁড়িয়ে
লরি ঠ্যালা রিকসা
না যায় পালিয়ে।

জ্যামজট হোক না
এই লরি রোক না
নেই কোন মাথা-ব্যথা
কুছ থোড়া ছোড় না।

নিতাই ঘোষ

বঙ্গ শর্মা এলেন,
পাঞ্জাবে পান্ডে।
ভ্যাবাচাকা লাগে সব
এলোমেলো কান্ডে।
ম্যাডামের হাতে ঘোরে
যাদুকরি দন্ড,
রাজ্যের গাল ফুলে
হল গলগন্ড।

প্রণতি বর্মা

মন ভোলাতে খরিদ্দারের
দোকানীদের কতই ঢং,
উচ্ছে পটল করলা-তে
করেন তাঁরা দেদার রং।
ময়রাদাদাও মিষ্টিতে তাঁর
ফলান রঙের বাহার,
মন্দ ভেবেও বেশতো সবাই
করছি তাই-ই আহার।

সুব্রত কুমার করণ

রাজভবনে আলু পাবো
রাইটারসে কী?
এই দেখ না তোমার জন্য
বেগুন রেখেছি।

টেন্ডার দেবেন সি এম ডি এ
লালদীঘিতে কী?
বড় বড় রুই কাতলা
ছেড়ে রেখেছি।

স্মিতা বিশ্বাস

ওগো, আলু কোথা যাও
কোন বিদেশে?
বারেক ফিরাও মুখ
মুচকি হেসে,
কেন হিমঘরে যাও,
গগনে উঠিছে 'ভাও',
এমন রামের রাজ
আছে কোন দেশে?
এক টাকা দরে এসো
বাজারে হেসে।।

তৃষিত বর্মন

দাম বাড়ছে সব জিনিসের
কমছে দর কীসে?
দর কম মনুষ্যত্বের
রাজনীতিরই বিষে!
আজব না এসব খবর,
হীরে ফেলে কাচের কদর
করছে সবাই ঠাট বাড়াতে
হারিয়ে শুধু দিশে।
তাই ক্রমশই ন্যায়-সততা
যাচ্ছে ধুলোয় মিশে।

•

পেটে কিছু নাই থাক,
পোশাকের জেল্লায়
অনেকেই ডাঁট মেরে
বড় মুখে চেল্লায়!
হাল জেনারেশনের
নেই কোন নিষ্ঠা,
ফাঁকতালে পেতে চায়
সমাজে প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বপ্রিয়

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

পাঁচ মিনিট

সালামি কমিশন

অতি সম্প্রতি রাইটারস বিলডিংস এর গেটে এক সাধারণ পুলিশ কর্মীর একটি ভুলকে কেন্দ্র করে পুলিশ প্রশাসনে তুলকালাম কান্ড শুরু হয়ে গেছে। ভুলটা নাকি খুব মারাত্মক–ভুল 'সালামি'। অর্থাৎ ওপরওয়ালাকে দেখে বুট, বন্দুক এবং হাতের মিলিত ঐকতানে খটাস করতে গিয়ে কোথায় যেন তাল-লয় গুলিয়ে ফেলেছে। ফলে সালামির সময় বন্দুকের জারক, হাতের অ্যাংগল এবং বুটের আওয়াজ ঠিকঠাক হয়নি। ওপরওয়ালা ভাবলেন পুলিশটি বেয়াদপ। তাই শায়েস্তা করার জন্য টিফিন আওয়ারে একজন জাঁদরেল অফিসারের কমানডে তাকে আধঘন্টা ধরে অ্যাটেনশান স্ট্যানড অ্যাট-ইজ করতে হল, খট-খট-খটাস করে সালামির পারফেকশানের জন্য বন্দুকের জারক, হাতের অ্যাংগল এবং বুটের আওয়াজের কসরৎ করতে হল। এতে পুলিশটির নাভিশ্বাস উঠে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় সে ছাড়া পেল। কিন্তু ব্যাপারটা মেটেনি।

এই বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হল সেটা জানার জন্য কয়েকজন সমাজ-সচেতন মানুষের সংগে কথা বলেছি। সবার কাছে একই প্রশ্ন রেখেছি – পুলিশের সালামিতে ভুল, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? এই প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মী, ডাক্তার এবং রিটায়ারড পুলিশ অফিসার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি বিচার করে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। বক্তব্যের ফুল টেকসট স্পেসের অভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই নির্যাসটুকু নিবেদন করি।

ছাত্র : পুলিশটি কবিতায় অনুপ্রাণিত। তবে সেটা আধুনিক কবিতা নয়, বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতা। ওপরওয়ালা ওর সামনে দিয়ে যাবার মুহূর্তে ওর মনে পড়েছে 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' তাই ওর ভুলটা স্বেচ্ছাকৃত। বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশেও জানাতে চেয়েছে 'আমি অনিয়ম উচ্ছৃংখল/আমি দলে যাই যত বন্ধন, নিয়ম কানুন শৃংখল।'

ব্যবসায়ী : বিদ্রোহ-টিদ্রোহ বাজে কথা মোশাই। পুলিশের হাতের এখন দুটো মুদ্রা। একটা মুদ্রা নেওয়ার মুদ্রা আর একটা হাত মুঠো করার। কামাই-এর মুদ্রা আর কায়েম-এর মুদ্রা। এক শ্রেণীর পুলিশ প্রতিনিয়ত হাত পাতে আমাদের মত ব্যবসায়ীদের কাছে, আর অপরাধীদের কাছে। আর এক শ্রেণীর পুলিশ হাত মুঠো করে 'দিতে হবে' 'দিতে হবে' আর 'চলবে না' 'চলবে না' করে। সুতরাং সালামির মুদ্রা ওদের কেউ কেউ ভুলে গেছে এটা ধরে নিতে পারেন।

ডাক্তার : স্পনডিলাইটিস এর ব্যথা কারো কারো হাতেও হয়। ওই পারটিকুলার পুলিশটির ওই রোগ আছে কিনা সেটা না জেনে কোন কমেনট করা ঠিক নয়।

রাজনৈতিক কর্মী : আগে জানা দরকার ওই পুলিশটি কোন পারটি করে। যদি আমাদের পারটির সক্রিয় কর্মী হয় তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে চট করে কিছু বলা যাবে না। যা বলার নেতারা বলবেন। তবে একটা কথা বলতে পারি, সালামির মত সামন্ততান্ত্রিক প্রথা কোন গণতান্ত্রিক দেশে থাকা উচিত নয়। ব্যাপারটা হিউম্যান রাইটস কমিশনে রেফার করা উচিত।

রিটায়ারড পুলিশ অফিসার : হিউম্যান রাইটস-এর ব্যাপার নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ, সাড়ে আট পাউনড ওজনের থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে আট ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা কতটা মানবিক? কিন্তু তার আগে দেখতে হবে সারভিস কনডাকট রুলে ভুল সালামির জন্য কী পানিশমেনট রয়েছে। টিফিন আওয়ারে কোন পুলিশকে এভাবে খাটানর ডিসক্রিশান কনট্রোলিং অফিসারের আছে কিনা তাও দেখতে হবে। এই ভুল সালামি নিয়ে পুলিশ বাহিনীতে যাতে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি না হয় তার জন্যে অবিলম্বে একটা কমিশন গঠন করা উচিত।

প্রশ্ন করলাম, কাকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা উচিত? রিটায়ারড পুলিশ অফিসার জবাব দিলেন – কেন, আমার মত একজন রিটায়ারড পুলিশ অফিসারকে! আর কমিশনের নাম হবে 'সালামি কমিশন'। আমি বললাম- তথাস্তু।□

নির্মল বিশ্বাস

ভারত সফরে আসছেন রানী এলিজাবেথ

রাজ্যাভিষেকের পর রানী এলিজাবেথ, ডিউক অব এডিনবরো, প্রিন্স চার্লস ও প্রিন্সেস অ্যান

দিব্যজ্যোতি বসু

দীর্ঘ বাইশ বছর পর বৃটেনের মহারানী এলিজাবেথ (দ্বিতীয়) আবার আসছেন ভারত সফরে। তবে তাঁর এবারকার ভারত সফর শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবেই নয়, সেই সংগে তিনি পালন করবেন এক গুরুদায়িত্ব। নভেমবরের ২৩ তারিখ থেকে নয়া দিললিতে শুরু হচ্ছে কমনওয়েলথ সম্মেলন। স্বভাবতই কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রানীই এ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। আর সেজন্যই সম্মেলন শুরু হওয়ার দিনকয়েক আগেই তিনি স্বামী প্রিনস ফিলিপের সংগে দিললি চলে আসছেন। তবে ১৯৬১ সালে রানী যেরকম টানা তিন সপ্তাহ ধরে দিললি, কলকাতা, বোমবে, বারাণসী, মাদ্রাজ, ব্যাংগালোর বা আমেদাবাদ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবার আর সেভাবে ঘোরার সময় পাবেন না, এবার ভারতে কাটাবেন মাত্র দশদিন — ১৭ থেকে ২৬ নভেমবর পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার হায়দরাবাদ আর পুণেতে ঘুরে আসবেন ওঁরা।

বৃটেন, ভারত আর কমনওয়েলথ — এই তিনটে নাম অবলীলায় পাশাপাশি দাঁড় করানর মত স্বাভাবিক পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে ১৯৪৭-এর পর থেকেই। বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য স্থাপন কিংবা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য দুর্জয় সংগ্রামের পুরনো প্রসংগে অনেক আগেই শান্তির প্রলেপ লাগিয়েছে কমনওয়েলথ। এখন এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে যে ভারতে বিনিয়োগকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃটেনের লগ্নীর সবচেয়ে বেশি (মোট বিনিয়োগের পরিমাণের শতকরা ৩৫ ভাগ); বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে সাহায্যের জন্য ১৯৮২-৮৩তে বৃটেন ভারতকে দিয়েছে ১৭১.৬ কোটি টাকা। বিশ্ব ব্যাংক, রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বা ইউরোপিয়ান কমিউনিটিগুলির মাধ্যমে ভারতে যে সব সাহায্য পাঠান হয় তার সিংহভাগেও বৃটেনেরই অংশ। অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার ক্রমিক উত্তরণে ভারত আর বৃটেন যেমন পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, তেমনি সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যতাও এই দুই দেশের মৈত্রীবন্ধনকে আরও দৃঢ় করেছে। ১৯৮২-র জুলাইয়ে লনডনে 'ইনডিয়া ফেসটিভ্যাল' বা ১৯৮৩-র ২৫ জুন লরডসের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটের বিশ্বজয়ের সংগে সংগে মাঠভাঙা খুশীর বন্যায় ভেসে আসা বৃটনদের উচ্ছল উপস্থিতি কিংবা ১৯৮১-র মেলবোর্ন সম্মেলনের পর কমনওয়েলথ সম্মেলনের ভেনিউ হিসেবে দিললিকে নির্বাচিত করা দেখলে দু দেশের মেলবন্ধনের ধারণা সম্পর্কে প্রত্যয় বাড়ে। এর ওপর তো আছে বর্তমান রানী এলিজাবেথের মহিমান্বিত উপস্থিতি।

১৯২৬ সালের ২১ এপরিল লনডনে রানী এলিজাবেথ (২য়) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর বাবা ছিলেন ইয়রকের ডিউক। কাজেই রানী এলিজাবেথের জন্মের কথা মনে করতে আমরা যেরকম সবিশেষ ধুমধাম বা রাজকীয় আসর-অনুষ্ঠানের কথা মনে করি সেরকম কিছুই ঘটেনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল বৃটেনের রাজ পরিবারের এই শিশুর আবির্ভাবকে। শিশুর যখন পাঁচ সপ্তাহ বয়স তখন বাকিংহাম প্যালেসের চ্যাপেলে নিয়ে গিয়ে মেয়ের নাম রাখা হল এলিজাবেথ আলেকজান্দ্রা মেরি। ঐ সুময় আদরের মেয়েকে নিয়ে ইয়রকের ডিউক আর ডাচেস থাকতেন লনডনের ১৪৫ পিকাডিলির বাড়িতে। এর কয়েক বছর পর ওঁরা চলে আসেন রিচমনড পারকের হোয়াইট লজের আরামদায়ক আশ্রয়ে।

এলিজাবেথ মেরি যখন ছ বছরের তখন ইয়রকের ডিউক আর ডাচেস উইনডসর গ্রেট পারকের রাজবাড়িতে চলে আসেন। ১৯৩৬ সালে এলিজাবেথ মেরির যখন দশ বছর বয়স তখন তার বাবা বৃটেনের রাজসিংহাসনে বসলেন। ইয়রকের ডিউক আর ডাচেস তখন পরিচিত হলেন রাজা ষষ্ঠ জরজ আর রানী এলিজাবেথ (এলিজাবেথ বাওয়েস লিয়ন) হিসেবে। শোনা যায়, রাজা ষষ্ঠ জরজ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখনও কেউ সঠিকভাবে জানতেন না যে এই রাজপরিবারের পদবী ঠিক কী বা আদৌ কোন পদবী আছে কিনা। তবে বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা ছিল যে যদি কোন পদবী থেকেও থাকে তা কোন একটা জারমান পদবী দিয়েই চিহ্নিত হবে। কেননা, ১৭০১ সালের সেটলমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে স্টুয়ারটের স্কটিশ হাউসের রোমান ক্যাথলিক সদস্যদের হাত থেকে রাজমুকুট তুলে দেওয়া হয় প্রথম জেমসের নাতনি রাজকুমারী সোফিয়ার জারমান প্রোটেসট্যানট উত্তরাধিকারীদের হাতে। পরবর্তীকালে রানী অ্যানের মৃত্যুর পর রাজকুমারী সোফিয়ার বড় ছেলেই রাজা জরজ (প্রথম) হিসেবে রাজসিংহাসনে বসেন। রাজা জরজ (প্রথম) ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই জারমান ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জরজের রানীরাও জারমানির সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ছিলেন। এমনকি রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামীও জারমান ছিলেন। ফলে এই পরিবারের উত্তরসূরীরা যে কোন জারমান পদবীই গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চলাকালীন রাজা পঞ্চম জরজ ঘোষণা করে দিলেন যে তাঁদের পরিবার উইনডসর হিসেবেই পরিচিত হবেন। সেই থেকে এই নামই চলে আসছে।

রানী এলিজাবেথের (২য়) বয়স যখন মাত্র তিন বছর

তখন তাঁর ছোট বোন রাজকুমারী মার্গারেট জন্মগ্রহণ করেন। এলিজাবেথ তখন মায়ের তত্ত্বাবধানে ঘরে বসে বসেই লেখাপড়া শিখছেন। কেননা রানী এলিজাবেথ (১ম) মনে করতেন অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা এমন কিছু অবশ্যিক জরুরী নয়। কাজেই ছোটবেলায় রানী এলিজাবেথ (২য়) অংকে বেশ কাঁচা থাকা সত্ত্বেও ওঁর মা এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাননি। বরং শিক্ষা যাতে সবদিক দিয়েই একটা সুস্থ স্বাভাবিক শৈশব উপভোগ করতে পারে সেদিকে রানী এলিজাবেথের (১ম) ছিল প্রখর দৃষ্টি। তিনি জোর দিতেন শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে। ফলে ছোটবেলায় যত খুশী খোলা হাওয়ায় আর সবুজ ঘাসে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন রানী এলিজাবেথ (২য়)। ১৯৩৬-এ যখন রাজ সিংহাসনের উত্তরসূরী হিসেবে এলিজাবেথকে মনে করা শুরু হল তখন ঠিক হল ওঁর পড়াশুনার লেভেলটা আরও একটু বাড়ান দরকার। শুরু হল সাংবিধানিক ইতিহাস ও আইনের ওপর পড়াশুনা। সেই সংগে কলা ও সংগীতের ওপরও বিশেষ দৃষ্টিপাত। আর খেলাধুলা তো রক্তেই রয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়া আর সাঁতারে রানী এলিজাবেথের (২য়) বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেছে। ওঁর বয়স যখন মাত্র ১৩, তখন লনডনের বাথ ক্লাবে সাঁতারে চিলড্রেনস চ্যালেনজ শিলড জিতে নিয়েছিলেন। শখের থিয়েটার কিংবা গাইড হিসেবে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতেও রানী এলিজাবেথের (২য়) ভীষণ ঝোঁক ছিল।

একটু বড় হওয়ার সংগে সংগেই বিভিন্ন পাবলিক ফাংশানে যোগ দেওয়া শুরু করেছিলেন রানী এলিজাবেথ (২য়)। ১৯৪০ সালের অকটোবর মাসে যখন ওঁর মাত্র ১৪ বছর বয়স তখন বি বি সি থেকে ছোটদের একটা অনুষ্ঠানে বৃটেন ও কমনওয়েলথের শিশুদের উদ্দেশ্যে উনি প্রথম বেতার ভাষণ দেন। ১৯৪২ সালে ওঁকে গ্রেনাদিয়ার গার্ডসের কর্নেল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ওই বছরই জন্মদিনের দিন উনি রেজিমেনট পরিদর্শনে বের হন। ওটাই ছিল ওঁর প্রথম পাবলিক এনগেজমেনট। এরপর আস্তে আস্তে আরও নানান রকম অফিসিয়াল কর্তব্য বা দায়দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন তিনি। বিশেষ করে যুব ও শিশুদের সম্পর্কে নানান ব্যাপারে ওঁকেই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হত। হ্যাকনের 'কুইন এলিজাবেথ হসপিটাল ফর চিলড্রেন' কিংবা 'ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন' সংস্থাগুলির প্রেসিডেনট পদের দায়িত্ব ওঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল। এছাড়াও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অফিসিয়াল ট্যুরে রাজা ও রানীকে সঙ্গ দিতেন তিনি। ১৮ বছরের জন্মদিনে ১৯৪৪ সালে ওঁকে রাজ্যের কাউনসেলরের পদে অভিষিক্ত করা হল। রাজা তখন ইটালিতে যুদ্ধে ব্যস্ত এবং রাজ মুকুটের উত্তরাধিকারী হিসেবে ওই সময় রানী এলিজাবেথ (২য়) বেশ কিছু রাজকীয় সিদ্ধান্তও নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে রাজকুমারী এলিজাবেথকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর অকজিল্যারি টেরিটোরিয়াল সারভিসের সাব অলটার পদেও নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত রাজকুমারী জুনিয়র কমানডারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে রাজকুমারী এলিজাবেথ দক্ষিণ আফরিকা ভ্রমণে গেলেন রাজা ও রানীর সংগে। এই ভ্রমণের সময়েই ওঁর ২১ তম জন্মদিনে উনি এক বেতার ভাষণের মধ্যে দিয়ে কমনওয়েলথের সেবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার কথা ঘোষণা করলেন।

দক্ষিণ আফরিকা সফর শেষ করে ফেরার পরই রাজকুমারীএলিজাবেথের সংগে লেফটেন্যানট ফিলিপ মাউনটব্যাটনের বিয়ের কথা ঘোষণা করা হল। তৎকালীন লেফটেন্যানট বা বর্তমানের এডিনবারগের ডিউক ফিলিপ মাউনটব্যাটনও কিন্তু একজন যথার্থ রাজপুরুষ। উনি ছিলেন গ্রীসের রাজকুমার প্রিন্স অ্যানড্রুর ছেলে। সম্পর্ক খুঁজতে গেলে দেখা যায় এলিজাবেথ আর ফিলিপ পরস্পরের ভাই-বোন। এরা দুজনেই রানী ভিকটোরিয়ার বংশধর। ছোটবেলা থেকে দুজনের পরিচয়, ক্রমে ঘনিষ্ঠতার রূপ পায়। বিয়ের দিন ঠিক হল ১৯৪৭-এর ২০ নভেম্বর। বৃটেনের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বিয়ে – যথেষ্ট ধুমধাম যে হবেই এ তো জানা কথা। তা ছাড়া রাজকুমারী এলিজাবেথের বিচক্ষণতায় রাজা ষষ্ঠ জরজ একটু বেশি মাত্রায় মুগ্ধ ছিলেন, একটু যেন বেশি স্নেহের চোখে দেখেন তিনি এই মেয়েকে। ফলে ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন করা হল ওয়েসটমিনসটার অ্যাবিতে। সেদিনকার সেই উৎসব ১৯৭৭ সালেই রজতজয়ন্তী বর্ষ পার করে দিয়েছে। রাজকুমারী এলিজাবেথের প্রথম সন্তান প্রিনস চারলস (বর্তমানে প্রিনস অব ওয়েলস) জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৮-এ। প্রিনসেস অ্যানের জন্মও রাজকুমারী এলিজাবেথের সিংহাসনের বসার আগেই ১৯৫০ সালে। ১৯৫২ সালে রাজকুমারী এলিজাবেথ বৃটেনের রানী হিসেবে দায়িত্বভার পেলেন। তাঁর সিংহাসনে বসার ঘটনাটা একটু চমকপ্রদ।

বিয়ের পর থেকেই রাজকুমারী এলিজাবেথ স্বামীকে সংগে নিয়ে ফ্রানস, গ্রীস, কানাডা ইত্যাদি নানান জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ১৯৫২ সালে মালটা ভ্রমণ করে সবে ওঁরা ফিরেছেন – কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে আছে। ইতিমধ্যে রাজা ষষ্ঠ জরজ আবার অসট্রেলিয়া নিউজিল্যানড সফরে বেরোবেন। সফর নিয়েও বাবার সংগে চলছে নানান পরামর্শ। হঠাৎ রাজা পড়লেন অসুস্থ হয়ে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন টানা বিশ্রাম দরকার। এদিকে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। কী করা যায়? অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, না সফর বাতিল করা হবে না, রাজা যেতে না পারলেও রাজকুমারী যাবেন সফরে। সংগে থাকবেন স্বামী এডিনবারগের ডিউক ফিলিপ মাউনটব্যাটেন। সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে তো আগেই আলোচনা হয়েছিল, তবু শেষ মুহূর্তের কিছু উপদেশ নিয়ে রাজকুমারী এলিজাবেথ তৈরি হয়ে নিলেন বিদেশ যাত্রার জন্য। যাত্রা করে সবে কেনিয়া পৌঁছলেন, মাঝ রাস্তায়ই খবর পেলেন বাবা মারা গেছেন এবং তাকে শীগগিরই ফিরে যেতে হবে – সিংহাসন তো খালি পড়ে থাকবে না।

ফিরে এলেন দেশে, চোখের জল মুছে প্রস্তুত হয়ে নিলেন সিংহাসনে বসবার জন্য। ১৯৫৩-র ২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজকুমারী এলিজাবেথ অভিষিক্ত হলেন রানী এলিজাবেথ হিসেবে। যেখানে ওঁদের বিয়ে হয়েছিল সেই ওয়েসটমিনসটার অ্যাবিতেই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

রানী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার পর থেকে বৃটিশ রাজতন্ত্র নানান পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। বৃটিশ সমাজ এবং সমস্ত বিশ্বের নিরিখেই এই পরিবর্তন ঘটেছে বলা যেতে পারে। বেশ অনেকগুলি অংগরাজ্য ইতিমধ্যে স্বাধীন হওয়ায় তারা আর সরাসরি বৃটিশ শাসনভুক্ত থাকেনি, বরং কমনওয়েলথের সদস্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য কমনওয়েলথের প্রধানতম হিসেবেই রানী এলিজাবেথ (২য়) রয়েছেন এবং অনেকগুলি সদস্য রাষ্ট্র রানীকেই রাজ্যপ্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বাধুনিক প্রগতির জন্য রাজ পরিবার এবং স্বয়ং রানীও বিশ্বের নানান রাষ্ট্রের সংগে আগের চাইতে অনেক দ্রুত ও কার্যকরীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছেন, পারছেন যোগাযোগ স্থাপন করতে। বৃটেনে টেলিভিসনের জনপ্রিয়তার দরুন রানী ও রাজপরিবার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছেন। রানী এলিজাবেথ তাঁর পূর্বসূরীদের তুলনায় সাধারণ মানুষকে অনেক কাছে টেনে নিয়েছেন। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের লোকের সংগে রাজপরিবারের মেলামেশার ফলে রাজপরিবার ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার বন্ধ অর্গল খুলে গেছে। এমনকি রাজ পরিবারে বিয়ে, জন্মদিন বা অন্যান্য জয়ন্তী উৎসবেও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আজ আর কোন অসম্ভব ঘটনা নয়। বৃটেনের লোকেদের ধারণা বাকিংহাম প্যালেস বা অন্যান্য রাজপ্রাসাদ আর নিছক কোন বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়, সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সংগে তার গাটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। বিশেষ করে রানী এলিজাবেথের (২য়) উদারনীতিক মনোভাবের দরুন সাধারণ মানুষ ওঁকে চিহ্নিত করেন শুধু "Her Britannic Majesty" হিসেবে নয়, বরং অনেক বেশি "Sincere, hard-working, very honest daughter of a very honest man"-এর মত আপনজন হিসেবে।

আসলে প্রথাগতভাবে 'মনারকি' বা রাজতন্ত্র শিরোপা লাগান থাকলেও কার্যত বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রেরই জয়জয়কার। সে অর্থে রানীর ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, সত্যি কথা বলতে কি শাসনমূলক কোন ক্ষমতা রানীর হাতে প্রায় নেই বললেই চলে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা পুরোপুরি পারলামেনটের অধীনে। তবে নিয়মতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের দৌলতে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সংযোগ রাখতে হয় রানীর সংগে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব অবশ্য স্বয়ং রানীর। হাউস অফ কমনসের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল তাদের নেতা হিসেবে যাঁকে নির্বাচিত করেন তাঁকেই রানী প্রধানমন্ত্রী হয়ে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানান। যদি কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয় কিংবা দলনেতা নির্বাচনে অক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে রানী নিজেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ইচ্ছেমতন যে কারও সংগে আলোচনা চালাতে পারেন। রানী যখন লনডনে থাকেন তখন প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন তাঁর সংগে প্রধানমন্ত্রীর বাধ্যতামূলক বৈঠক বসে। অন্যান্য মন্ত্রীদের সংগেও তাঁর যোগাযোগের সুযোগ রয়ে গেছে। ক্যাবিনেটের সমস্ত কাগজপত্র রানী পরীক্ষা করেন। এ ছাড়া ক্যাবিনেটের কার্যক্রম আগাম জানান হয় রানীকে। বিভিন্ন বিদেশি ও কমনওয়েলথ অফিস থেকে পাঠান চিঠিপত্র, তার, জরুরী বার্তার কপিও রানীকে দেখান হয়ে থাকে। পারলামেনটের প্রতিদিনকার গতিবিধিও তাঁর গোচরে আনা হয়। কমনওয়েলথ দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বৃটেনে এলে অতিথি সেবার দায়িত্ব নেন স্বয়ং এলিজাবেথ। প্রতিবছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ৩০,০০০ লোককে তিনি বিভিন্ন রাজকীয় প্রাসাদে আপ্যায়িত করেন। এই ধরনের আপ্যায়ন অনুষ্ঠানের তিনটে হয় বাকিংহাম প্যালেসে। অন্য একটি হয় এডিনবারগের হলিরুড হাউসে।

রানী এলিজাবেথের (২য়) প্রাত্যহিক জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তাঁকে সারাটা দিন কাটাতে হয়। খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন তিনি। স্বামীর সংগে একসংগে বসে প্রাতরাশ সারার পর রানী খবরের কাগজ পড়তে বসেন। এরপর শুরু হয় তাঁর চিঠির উত্তর দেবার পালা, অবশ্য সেই সংগে নানান জায়গায় তাঁর নিজের প্রয়োজনেও চিঠি লিখতে হয়। এই চিঠি লেখার পর্বকে

রানী ভিক্টোরিয়া

রানী এলিজাবেথ

ভিকটোরিয়া (১৮১৯ ১৯০১) স্বামী : প্রিনস অ্যালবারট ওরফে প্রিনস কনসরট (স্যাকস কোবারগ ও গোথা'র রাজকুমার)

সপ্তম এডওয়ারড (১৮৪১ ১৯১০).
স্ত্রী : রানী আলেকজানদ্রা (ডেনমারকের রাজকুমারী)
(১৮৪৪ ১৯২৫)

আরও তিন ভাই ও চার বোন

রাজকুমারী অ্যালিস (১৮৪৩ ১৮৭৮)
স্বামী : হেসের গ্রানড ডিউক লুই

আরও দুই ভাই ও চার বোন

রাজকুমারী ভিকটোরিয়া (১৮৬৩ ১৯৫০)
স্বামী : মিলফোরড হ্যাভেনের মারকুইজ

পথ্রম জর্জ (১৮৬৫ ১৯৩৬)
স্ত্রী : রানী মেরি (টেকের রাজকুমারী) ১৮৬৭ ১৯৫৩)

আরও দুই ভাই ও তিন বোন

অষ্টম এডওয়ারড
(১৮৯৪ ১৯৭২)
স্ত্রী : ওয়ালি সিম্পসন

ষষ্ঠ জর্জ (১৮৯৫-১৯৫২)
স্ত্রী : রানী এলিজাবেথ
(বর্তমান রাজমাতা)

মেরি
(১৮৯৭ ১৯৬৫)
স্বামী হেয়ারউডের আরল
দুই ছেলে

হেনরি
(১৯০০-১৯৭৪)
স্ত্রী : লেডি অ্যালিস,
মনটাগু ডগলাস স্কট

জরজ
(১৯০২ ১৯৪২)
স্ত্রী : গ্রীসের
রাজকুমারী মেরিনা

প্রিনস জন
(১৯০৫ ১৯১৯)

রানী এলিজাবেথ (২য়)
(জন্ম ১৯২৬) স্বামী :
এডিনবারগের ডিউক ফিলিপ

রাজকুমারী মারগারেট
(জন্ম ১৯30) স্বামী :
স্নোডনের আরল অ্যানটনি

রাজকুমার উইলিয়াম
(১৯৪১ ১৯৭২)

রিচারড (জন্ম : ১৯৪৪)
স্ত্রী : বৃজিৎ ভন দুয়ারস

আরও দুই ভাই ও এক বোন

রাজকুমারী অ্যালিস
(১৮৮৫-১৯৬৯)
স্বামী: গ্রীসের রাজকুমার অ্যানড্রু

প্রিনস চারলস
(১৪ ১১ ৪৮)
স্ত্রী : লেডি ডায়না

প্রিনসেস অ্যান
(১৫ ৮ ৫0)
স্বামী : ক্যাপটেন
মারক ফিলিপস

প্রিনস অ্যানড্রু
(১৯ ২ ৬0)

প্রিনস এডওয়ারড
(১0 ৩ ৬৪)

এডওয়ারড
(১৯৩৫)

রাজকুমার মাইকেল
(১৯৪২)

আলেকজানডার
(১৯৭৪)

রাজকুমারী আলেকজানদ্রা
(১৯৩৬)

চার বোন

ফিলিপ (১৯২১)
স্ত্রী : রানী এলিজাবেথ
(২য়)

ডেভিড
(৩ ১১ ৬১)

লেডি সারা
আরমসট্রং জোনস
(১ ৫ ৬৪)

লেডি ডাভিনা
উইনডসর
(১৯ ১১ ৭৭)

জরজ

লরড
নিকোলস
উইনডসর

জেমস ওগিলভি

মারিনা ওগিলভি

উইলিয়ম

পিটার ফিলিপস (১৫ ১১ ৭৭)

লেডি হেলেন উইনডসর

একটি বিশাল অধ্যায় বলা যেতে পারে। প্রতিদিন কত যে অগুনতি চিঠি আসে তার কোন সঠিক হিসেব নেই। তবে রানীর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি চিঠিরই জবাব দেওয়া হয়ে থাকে। অফিসিয়াল জরুরী চিঠি ছাড়াও বেশির ভাগ চিঠিই আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। এর মধ্যে আবার অধিকাংশই রানীর কাছে ব্যক্তিগত অসুবিধা বা সাহায্যের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করেন। কোন কোন চিঠি থাকে সরকারি মহলের বাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করানোর আবেদন জানিয়ে। প্রত্যেকটি চিঠিই যথাযোগ্য সরকারি মহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পত্রলেখকরা যথাযথ সুবিচার পান। বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় পরিজনদেরও অজস্র চিঠি আসে। সেগুলির প্রত্যেকটির জবাব রানী নিজে হাতেই দেন।

এরপর অফিসিয়াল কাগজপত্র পরীক্ষা করেন এবং রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্ক ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করেন। তারপর নানান অ্যাপয়েনটমেনট, ফাংশান, কিংবা কোন বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন, ইত্যাদি নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি একদিনে বাইরের পাঁচজন লোকের সংগে কথা বলেন বা দেখা করেন। অবশ্য বিদেশের কূটনীতিবিদরা দেখা করতে এলে তিনি তাঁদের আগে সুযোগ দেন।

সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সংগে দেখা করার পরও তাঁর আরও এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য সময় দিতে হয়। এরা হয়ত কেউ রানীর ছবি আঁকতে চান কেউ চান ফটোগ্রাফ তুলে রাখতে। এ ধরনের সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রায় রোজই থাকেন। অবশ্য এদের সংগে দেখা করার আগে তিনি স্নান বা প্রসাধন সেরে নেন। এরপর খানিকটা সময় যায় হেয়ার ড্রেসার বা ড্রেসমেকারদের সংগেও। তবে সারাদিনের ব্যস্ততার মধ্যে নিজের পরিবারের লোকজনদের সংগে রোজই কিছুটা সময় কাটান।

পরিবারের লোকজন বলতে রানী এলিজাবেথের স্বামী এডিনবারগের ডিউক ফিলিপ মাউনটব্যাটেনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এদের চারটি সন্তান।। প্রিনস চারলস আর প্রিনসেস অ্যান রানী সিংহাসনে বসার আগেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬0 সালে জন্মগ্রহণ করেন প্রিনস অ্যানড্রু, আর রানী এলিজাবেথ ও প্রিনস ফিলিপের চতুর্থ পুত্র প্রিনস এডওয়ারড জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬৪তে। রানী এলিজাবেথের (২য়) মা অর্থাৎ ৮৩ বছরের রাজমাতা এলিজাবেথও রানীর সংগেই থাকেন। এঁরা ছাড়া রাজ পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক সদস্য হলেন প্রিনসেস অ্যানের স্বামী ক্যাপটেন মারক ফিলিপ প্রিনস চারলসের স্ত্রী লেডি ডায়না। রানীর বোন প্রিনসেস মারগারেট ও স্বামীসহ তাঁর ছেলেমেয়েরা। রাজ পরিবারের নবতম সদস্য হল প্রিনস চারলস আর লেডি ডায়ানার শিশুপুত্র প্রিনস উইলিয়াম।

পরিবারের এইসব সদস্যদের সংগে উজ্জ্বল সম্পর্ক রানী এলিজাবেথের জীবনকে মানবী হিসেবে আরও উজ্জ্বলতর করেছে। একথা শুধু কোন দার্শনিকই নয়, একজন সাধারণ মানুষও স্বীকার করবে, কিন্তু রাজপ্রাসাদের এমন আরও অনেক সম্পদ আছে যা রানী এলিজাবেথের মানবী জীবনকে রাজকীয় ঔজ্জ্বল্যে ঢেকে দিয়েছে। রানী এলিজাবেথের সংগে অবিচ্ছেদ্য সেইসব সম্পদগুলি সম্পর্কে অপার কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। রানী এলিজাবেথের প্রধান অপরিহার্য যে সম্পদ তা হল নানান রত্নশোভিত রাজমুকুট। এ ছাড়া অন্যান্য সম্পদগুলি হল রত্নখচিত তরবারি, হীরে জহরতে মোড়া রাজদন্ড, সোনার তৈরি ঈগল পাখির আকারের তৈলপাত্র, অভিষেক অনুষ্ঠানে তেল লাগানর জন্য রত্নময় চামচ, অভিষেকে ব্যবহৃত আংটি আর সোনার ব্রেসলেট। রাজা বা রানীর বিশাল সম্পত্তি পরিমাপ করতে যাওয়া এক হারকিউলিয়ান টাসক ছাড়া কিছুই নয়। তবে রাজপরিবারের সদস্যরা সিভিল লিসট অ্যাকট অনুসারে সেনট্রাল ফানড থেকে কে কত আর্থিক সম্মানদক্ষিণা পান সেই তালিকার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে:

১। রানীর সিভিল লিসট -- ৩,২৬0,২00 পাউনড।
২। রাজমাতা এলিজাবেথ ২৮৬,000 পাউনড।
৩। এডিনবারগের ডিউক --- ১৬0,000 পাউনড।
৪। প্রিনসেস অ্যান --- ১00,000 পাউনড।
৫। প্রিনসেস মারগারেট - - ৯৮,000 পাউনড।
৬। প্রিনস অ্যানড্রু -- ২0,000 পাউনড।
৭। প্রিনস এডওয়ারড -- ২0,000 পাউনড।

(প্রতি বছরে)

রাজপ্রাসাদের এ সমস্ত জৌলুশ বা প্রতিপত্তি ছাড়িয়ে রানী এলিজাবেথ কিন্তু বারেবারেই দৃষ্টিপাত করেছেন বাইরের গদাময় জগতের দিকে। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্বকে তাই তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেন। সেই কর্তব্যবোধের তাগিদেই তাই আবার দীর্ঘ বাইশ বছর পর ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখছেন। যুদ্ধের করাল গ্রাস ক্রমশ পৃথিবীতে যখন ছায়া ফেলছে, তখন নয়া দিল্লির কমনওয়েলথ সম্মেলনে রানী এলিজাবেথ (২য়) নতুন কোন আশ্বাসের বাণী বহন করে আনতে পারেন কি না আগামী দিনে সেটাই দেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। □

কমনওয়েলথ সম্মেলন ১৯৮৩

বিজ্ঞানভবন আলোকচিত্র : তরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়া দিললি থেকে খগেন দে সরকার

'Some in light and some in darkness/ That, the kind of world we mean / Those you see are in the light part./ Those in darkness don't get seen' — বারটোলট ব্রেখটের 'থ্রি পেনি অপেরা' থেকে এই আলো-আঁধারি ঘেরা দিগদর্শনের কথা শোনাচ্ছিলেন কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েটের সেকরেটারি জেনারেল শ্রীদ্যাং রামফল। অবশ্য ১৯৮৩ র মে মাসে হল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে রামফল এই প্রসংগ টেনে এনেছিলেন ঘৃণ্য ক্রীতদাসপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে। অথচ ব্রেখটের এই উক্তির যথার্থতা কিন্তু কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির কথা বিবেচনা করলেও আশ্চর্যজনকভাবে উপলব্ধি করা যায়। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলিতে যদিও কোথাও ক্রীতদাসপ্রথা এখন আর চালু নেই, কিন্তু সেখানে এখন ধনী আর দরিদ্রের ফারাকটা ভীষণভাবে চোখে পড়ে। একদিকে শিল্পসমৃদ্ধ, ধনী, পুঁজিবাদী দেশের রমরমাভাব, অন্যদিকে উন্নতিকামী ও অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলির নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা ব্রেখটের এই আলো-আঁধারির কথাই মনে পড়িয়ে দেয় না কি? তবে ভারতবর্ষের মত উন্নতিকামী দেশ যখন কমনওয়েলথ সম্মেলনের দায় দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছে, তখন বাধ্য হয়েই ভাবতে হয় তা হলে কি সত্যিই হাওয়া বদল হচ্ছে?

অবশ্য শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করার আগে আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। কমনওয়েলথ সম্পর্কে অফিসিয়াল কাগজপত্রে বলা হয়ে থাকে যে, এ হল পারস্পরিক সহযোগিতা আর সমভাব নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত এক সংঘ বা অ্যাসোসিয়েশন। ৪৭টি স্বাধীন রাষ্ট্র আর ১00 কোটি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহমর্মিতা এই কমনওয়েলথের মূলধন। প্রত্যেক মহাদেশেরই জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে বিভিন্ন ধরনের জনগণই এই কমনওয়েলথের সদস্য। গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রের বিচারে রাষ্ট্রসংঘের পরেই এর স্থান। বিগত শতাব্দীতে যখন এমন একটাও মহাদেশ বাকি ছিল না, যেখানে বৃটিশরা তাঁদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেনি, তখন মনে করা হত বৃটিশ শাসনের জয়পতাকা বোধহয় কোনদিনই অস্তমিত হবে না। কিন্তু তা হয়নি, আস্তে আস্তে বৃটিশ শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে কানাডা, অসট্রেলিয়া, নিউজিল্যানড বা দক্ষিণ আফরিকা। দক্ষিণ আফরিকা ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। এই নিজেদের মুক্ত করার প্রয়াস, বা স্বাধীন বলে ঘোষণা করার কাজে ক্রমশ এগিয়ে এসেছে বহু পরাধীন রাষ্ট্র। ১৯৩১ সালে বৃটিশ সরকার ও এই সব স্বাধীন দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপন করা হল এবং এরা প্রত্যেকেই বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন ভারত, পাকিস্তান বা তারপর শ্রীলংকা স্বাধীন হল তখন পরিস্থিতি খানিকটা বদলাল। জওহরলাল নেহরু ও সংবিধান রচয়িতারা ঠিক করলেন ভারতবর্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। ফলে এই গণপ্রজাতন্ত্রী হওয়ার সুবাদে বৃটিশ কমনওয়েলথের বদলে পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্যতার প্রতীক হিসেবে শুধু 'কমনওয়েলথ' হিসেবে চিহ্নিত হল এই সংগঠন। এই পদক্ষেপের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, বৃটেন ধনী দেশ হলেও তার কোন অধিকার নেই কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব করার। কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই সমান অধিকারে বলীয়ান।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশবাদ যতই পিছনে হঠেছে, কমনওয়েলথের অগ্রগতি ততই এগিয়ে গেছে। ১৯৮১ সাল অবধি কমনওয়েলথের সদস্য ছিল ৪৪টি দেশ। বর্তমানে আরও তিনটি দেশ নিজেদের স্বাধীন করে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭ এ। উপনিবেশ বিলুপ্তীকরণের গতি আজও অব্যাহত আছে, তবু আজও হংকং জিবরালটার, ব্রুনেই, কোকো দ্বীপ, ফকল্যানডের মত আরো অন্তত বিশটি দ্বীপ বা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয় 'associated states' বা 'dependencies' হিসেবে।

প্রতি দু বছর অন্তর কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলি বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির রাজধানীতে সম্মিলিত হন। সম্মেলনে বিশ্বের যাবতীয় সম্ভাব্য বিষয় বা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন, বক্তৃতা দেন, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্তের কথা নথীভুক্ত করেন, সেইমত নানান ঘোষণা করা হয় এবং সবশেষে ঘোষণামত কাজ শুরু করার অংগীকার করা হয়। ১৯৭১ এ সিংগাপুর, ১৯৭৩ এ অটোয়া, ১৯৭৫ এ কিংসটন জামাইকা, ১৯৭৭ এ লনডন, ১৯৭৯তে লুসাকা আর ১৯৮১তে মেলবোর্নে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর এ বছর কমনওয়েলথ সম্মেলন ডাকা হয়েছে নয়া দিললিতে। ২৩ নভেমবর থেকে নয়া দিললির বিজ্ঞানভবনে শুরু হবে এ সম্মেলন। স্বাভাবিকভাবেই দিললিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সুন্দরী দিললির সৌন্দর্য আরও বাড়াবার জন্য লাগান হচ্ছে নানান প্রসাধনের প্রলেপ।

তবে কমনওয়েলথের ব্যাপার নিয়ে ভারতবর্ষে কিন্তু নানা মুনির নানা মত। ভারতের বহু বামপন্থী দল এক সময় চেয়েছিলেন কমনওয়েলথ থেকে ভারত বেরিয়ে আসুক। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে তত সোরগোল নেই। সোরগোল যে নেই তার একটা বড় কারণ বোধহয়, এই সংগঠন তার ৪৭টি সদস্য দেশের অধিবাসীদের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে বেশ গঠনমূলক কাজকর্মে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

কয়েক মাস আগে 'পরিবর্তনে'র সংগে কমনওয়েলথ সেকরেটারি রামফলের এক সাক্ষাৎকারে ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন কোন 'ওয়েলথ'গুলি 'কমন' - হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন সেকরেটারি সাহেব যে, এই সাধারণ সম্পদগুলি হল মেধা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সর্বোপরি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব। রামফলের এই কথাগুলি যথার্থই সত্যি। আর এই সহযোগিতার ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে ১৯৬৫ সালে লনডনে কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েট গড়ে তোলার পর থেকেই। সম্ভাব্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই উন্নতিবৃদ্ধির ব্যাপারে এই সংগঠন তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছেই, তাছাড়া রাষ্ট্রসংঘ, ইউনেসকো, ফুড অ্যানড এগরিকালচারাল অরগানাইজেশন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্যকারী সংস্থাগুলির সংগে সহযোগিতার ব্যাপারে কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েট বেশ অগ্রগণ্য। এ যেন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যমন্ত্রকে ব্যুরোক্র্যাটরা যে ধরনের কাজ করেন অনেকটা সে ধরনেরই কাজ, তবে তফাৎ হল কমনওয়েলথ সেকরেটারিয়েটকে মাথা ঘামাতে হয় বিশ্বের ৪৭টি

[illegible]

স্বাধীন দেশ নিয়ে।

এই সংগঠন কী ধরনের সহযোগিতামূলক কাজকর্ম করে তা খানিকটা খতিয়ে দেখা যাক। রপ্তানি বাজার, খাদ্য উৎপাদন ও গ্রামোন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, যুব, মহিলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণ মাধ্যম ও যোগাযোগ ইত্যাদি নানান বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হয়। এ ছাড়া বাণিজ্য, বিপণন, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য নানান কমিটি ও সাবকমিটি রয়েছে। এই সব কমিটিগুলিকেই কমনওয়েলথ ফানড থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। কমনওয়েলথ ফানডটি অবশ্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন সদস্য দেশ ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে।

কোন সদস্য রাষ্ট্র যদি কোন ব্যাপারে সেই রাষ্ট্রের জনগণের উন্নতির জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের কাছে আরজি জানায়, তবে সেক্রেটারিয়েট থেকে পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা ও যথাযথ সাহায্যের জন্যই ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকেও কাজে লাগান হয়। এই 'খতিয়ে দেখা হয়' বা বিশেষজ্ঞকে 'কাজে লাগান হয়' কথাগুলি যত সহজে বলা যায়, তত সহজে কিন্তু করা সম্ভব হয় না। তবু সেক্রেটারিয়েট যেভাবে কাজ করেন, তা দেখে মনে হতে পারে এ বোধহয় যত সহজে কথা বলা হয়েছে তত সহজেই কার্যোদ্ধারও হয়েছে।

যেমন, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সেক্রেটারিয়েট ঠিক করলেন অমুক জায়গায় অমুকভাবে শিল্প স্থাপন করা দরকার। অতএব অমুক বিশেষজ্ঞকে কাজে লাগান প্রয়োজন। ব্যস হয়ে গেল যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় কাজকর্ম। রপ্তানির ব্যাপারেও তাই — কী কী জিনিস কোন কোন জায়গায় যাবে এবং গেলে উভয় দেশই উপকৃত হবে এটাই হবে বিচার-বিবেচনার বিষয়। এজন্য সেক্রেটারিয়েটের তরফ থেকে বিভিন্ন দেশে ট্রেড ফেয়ারের বন্দোবস্তও করা হয়। এভাবেই চিনি ব্যবহারের জন্য ত্রিনিদাদ টোবাগোতে সেক্রেটারিয়েট থেকেই সুগার মিল গড়ে তোলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মালটাতে গড়ে তোলা হয়েছে হাল্কা কারিগরী শিল্প। নিউ গিনি ও ফিজিতে কাঠ ও টোগোতে সামুদ্রিক আগাছা বা লতাপাতা নিয়ে শিল্পস্থাপন করা হয়েছে। আফরিকার বোতসোয়ানা-লেসোথোতে ভোজ্য তেল ও চামড়া, সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে গ্রামীণ শিল্প, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেশিন টুলস ও রাসায়নিক সার ইত্যাদির ব্যাপক হারে শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের যে খুঁটিনাটি কত দিকে নজর থাকে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যখন চোখে পড়ে যে, সিংগাপুরে শ্রমিকদের শেখান হচ্ছে রাবার থেকে কী করে উন্নত জাতের জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। সিচিলিস দ্বীপের ধীবররা যাতে আরও বেশি করে মাছ ধরতে পারে তার জন্য উন্নতমানের আনুষঙ্গিক জিনিসের ব্যবহার শেখান কিংবা ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলিতে কলা আরও কত বেশি করে পুণ্যমজাত করা যায় এ নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করতে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ভোলে না।

জিমবাবোয়ের ডাক্তারি ছাত্রদের ভারতবর্ষে এসে শিক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা, আফরিকার উন্নতমানের কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তানজানিয়ায় ব্যবহার করার বন্দোবস্ত করা কিংবা ভারতে ক্ষুদ্র সেচের উন্নতি করা ও জামাইকায় শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তবে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যখন দেখা যায় ইংলনডের একটা স্কুলের ছাত্ররা তানজানিয়ার মূক ও বধির স্কুলের ছাত্রদের কাছে আসছেন ঘুড়ি কী করে বানাতে হয় সে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিনিবেশের ব্যাপারেই অবশ্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসেন।

১৯৮১ সালে কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্য কানাডা, অসট্রেলিয়া, নিউজিল্যানডের মত চারটি দেশ ছিল উন্নত দেশ। বাকি ৪০টিকে উন্নতিকামী বলা হয়। এই ৪০টি দেশের মধ্যেও আবার অর্থনৈতিক ফারাক রয়ে গেছে। যেমন সিংগাপুর, ভারত, মালয়েশিয়ার অবস্থা অন্যান্যদের তুলনায় ভাল বলা যায়। তবে ১৪টি দেশের আর্থিক সীমা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যাদের ঠিক উন্নতিকামীও বলা যায় না, বলা ভাল অনুন্নত দেশ। বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ গরিব দেশই কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত

১৯৬৫ সালে গঠিত কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কানাডার কূটনীতিবিদ আরনলড স্মিথ। কমনওয়েলথের প্রধান হিসেবে রানী এলিজাবেথ (২য়) এই নির্বাচনের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে নির্বাচিত হন শ্রীরামফল। ১৯৮০ সালে আগামী পাঁচ বছরের জন্য শ্রীরামফলই পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। উনি এর আগে গায়ানার পররাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন অনেকটা নির্জোট সম্মেলনের ধাঁচেই চালান হয়। এবারে নয়া দিল্লির সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য আসছেন বৃটেনের রানী এলিজাবেথ (২য়)। সম্মেলনে যা হবার সবই হবে — বৈঠক, বক্তৃতা, সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা - সবই। কিন্তু ফল? □

কমনওয়েলথ অনেক আন্তর্জাতিক সমস্যারই সমাধান করে ফেলবে : রামফাল

১৯২৮ এ রামফালের জন্ম বৃটিশ গিয়ানায়। তিনি ১৯৫০-এ লনডনের কিংস কলেজ থেকে এল এল বি ও ১৯৫২ য় এল এল এম পরীক্ষায় সম্মানজনকভাবে উত্তীর্ণ হন। এর-পর হাভারড ল স্কুলের সংগে গগেনহাম ফেলোশিপ নিয়ে তিনি একবছর জড়িত ছিলেন। দেশে ফিরে, ১৯৫২ থেকে ৫৮ তিনি দেশের আইন বিভাগে চাকরি করেন। ১৯৫৮-তে ওয়েসট ইনডিজ-এর ফেডারেল সরকারের 'লিগাল ড্রাফ-টসম্যান' হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৫৯ এ আবার বৃটিশ গিয়ানায় ফিরে এসে সলিসিটর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে আবার ফেডারেল সরকারের সহকারী অ্যাটরনি জেনা-রেল হিসেবে যোগ দেন। পরে ফেডারেল সরকার ভেঙে গেলে তিনি কিছুদিন জ্যামাইকায় ওকালতির কাজ করেন।

বৃটিশ গিয়ানা স্বাধীন হবার কিছু আগে তিনি অ্যাটরনি জেনারেল হয়ে এখানে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পরে এখানকার সংবিধান রচনাতে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৭-তে তিনি দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৭২-এ পররাষ্ট্র দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী ও পরে ১৯৭৩-এ মন্ত্রী হিসাবে বিচার বিভাগের দায়িত্বও নেন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্যও রামফালের ঐকান্তিক চেষ্টা রয়েছে। পশ্চিম জারমানির প্রাক্তন চ্যানসেলর উইলি ব্রানটের নেতৃত্বে গঠিত 'কমিশন অন ইনটারন্যাশনাল ডেভলপমেনট'-এর সদস্য হন তিনি। চার সন্তানের জনক, বর্তমান বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এই রামফালের সংগে 'পরিবর্তনে'র সাক্ষাৎকারটিই এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবর্তন : কমনওয়েলথ দেশ-গুলোর ভেতর কোন সম্পদ সর্ব-রাষ্ট্রগ্রাহ্য? কমনওয়েলথকে কি আপনি খুব সময়োপযোগী মনে করেন?

রামফাল : নিশ্চয়ই, কমনওয়েলথ খুবই সময়োপযোগী। বিশেষ করে বিশ্বের নানা প্রান্তে যে ধরনের সব ঘটনা ঘটছে, তাতে এটা আরও সময়োপযোগী হয়ে উঠছে। আর যদি বলতে হয় কমনওয়েলথ দেশগুলোর ভেতর, সাধারণ সম্পদ কী, তাহলে সুনাম আর পারস্পরিক সমঝোতা এ দুটো নামই প্রথমে করব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ বা অর্থনৈ-তিক ব্যাপারে যখন অন্ধের মত সমাধানসূত্র খুঁজে বেড়াতে হয়, তখন কমনওয়েলথ দেশগুলোর এই পার-স্পরিক সহযোগিতা একটা শুভ লক্ষণ। ভবিষ্যতে হয়ত অনেক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানই কমনওয়েলথ করতে পারবে।

পরিবর্তন : কমনওয়েলথে তো উন্নত এবং উন্নতিশীল দুরকমের দেশই রয়েছে। কমনওয়েলথে উন্নত দেশগুলো, যেমন গ্রেট বৃটেন, অসট্রে-লিয়া, নিউজিল্যানড বা কানাডা এরা কি উন্নতিশীল দেশগুলোর প্রতি অন্য কোন রকমের আচরণ করে? বা কমনওয়েলথের ভেতরে এই উন্নত দেশগুলোর কোন আলাদা গোষ্ঠী আছে কি?

রামফাল : না না, এই ধরনের মনোভাব উন্নত দেশগুলোর ভেতর নেই। তারা আলাদা কোন গোষ্ঠী তৈরি করেছে এ কথা বলাও ভুল। হয়ত কিছু কিছু ব্যাপারে তারা এক হতে পারে। কমনওয়েলথের ভেতরে যেসব গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশ আছে তারাও তো কিছু ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। তেমনি কমনওয়েলথের উন্নত দেশ-গুলোও, কিছু কিছু ব্যাপারে, যেমন, 'উত্তর-দক্ষিণ' প্রশ্নে হয়ত এক। আসলে এই সবকটা দেশই তো শিল্পোন্নত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। কাজেই, খুব স্বাভাবিক তারা সবাই শিল্পোন্নত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরবে। তারা গোষ্ঠী তৈরি করে বাধার সৃষ্টি করছে এ কথা বলা খুবই ভুল, বরং, তার ঠিক উল্টোটাই। যেমন, ১৯৭৭-এ যখন যৌথ তহবিল নিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তখন অসট্রেলিয়ার ম্যালকম ফ্রেজার নিজে উদ্যোগী হয়ে মাইকেল ম্যানলির সংগে আলোচনা চালিয়ে এই অবস্থা দূর করেন।

পরিবর্তন : দিল্লিতে যে কমন-ওয়েলথ সম্মেলন হতে চলেছে সেটা বিশ্বশান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে কতখানি সফল হবে বলে আপনি মনে করেন? এটা কি মসকো বা ওয়াশিংটনকে কোনরকমভাবে প্রভাবিত করতে পারবে? এ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

রামফাল : মসকো বা ওয়াশিংটন-কে কেউ প্রভাবিত করতে পারবে কি না এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বৃহৎ শক্তিরা যে রাজনীতি করে তার বৈশিষ্ট্যই, হচ্ছে বিশ্ব মতামতকে কোন গুরুত্ব না দেওয়া। ঠিক এখন সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র। পারমাণ-বিক যুদ্ধ যদি কখনো হয় তাহলে যে ঐ দুই বৃহৎ শক্তিই শুধু ধ্বংস হবে তা নয়, সমস্ত পৃথিবীই এর কুফল ভোগ করবে। তাই আমাদের সকলেরই উচিত নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অবশ্য সাধারণ মানুষ এই সমস্যাটাকে এখন বেশ ভালভাবে বুঝতে পারছে। আমে-রিকাতে তো সেখানকার সাধারণ মানুষ এখন তাদের সরকারের এই নীতির সমালোচনাও করছে।

পরিবর্তন : জোট-নিরপেক্ষ দেশ গুলির প্রধান হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা কী রকম মনে করেন?

রামফাল : শ্রীমতী গান্ধী এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁকে আমি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তাঁর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে আমি বেশ কিছুদিন কাজ করার সুযোগও পেয়েছি। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি ইতো-মধ্যেই বেশ ভাল ভূমিকা নিয়েছেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি নেহরু, নাসের এবং টিটোর মতই একটা জোয়ার আনতে পেরে-ছেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান আসন্ন কমনওয়েলথ সম্মে-লনের চেয়ারম্যান এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকা ইতিহাসে জায়গা করে নেবে। □

বিশেষ প্রতিবেদন

কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে দলীয় কোন্দল কি আরো বেড়ে গেল?

বোমবাই থেকে ফিরে তরুণ প্রকাশ গংগোপাধ্যায়

সম্প্রতি বোমবাইতে অনুষ্ঠিত এ আই সি সি (ই)-এর অধিবেশনকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস (ই)-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস (ই)-এর এই দলীয় কোন্দল নতুন কোন ব্যাপার নয়। দলের অভ্যন্তরে কোন্দল মহারাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরেই ছিল, আজও আছে। তবে এবারের এ আই সি সি (ই) কে কেন্দ্র করে এই কোন্দল চরমে উঠল। কংগ্রেস অধিবেশন কোথায় হবে, কে দায়িত্ব নেবেন, কেন্দ্রের কাছে কে সুনাম অর্জন করবেন – এই নিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস (ই)-এর বিভিন্ন নেতা এবং গোষ্ঠীর মধ্যে এবার জোর প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছিল। ফলে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কমা তো দূরের কথা, বরং তা বেড়েই গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রতিযোগিতার দৌড়ে জয়লাভ করলেন বোমবাই আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মুরলী দেওরা।

মুরলী দেওরার পক্ষে এই জয়লাভ অবশ্য খুব একটা সহজে হয়নি। এই প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি নরেন্দ্র কামবলে। নরেন্দ্র কামবলে চেয়েছিলেন প্রথানুযায়ী এই অধিবেশনের দায়িত্ব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির হাতেই দেওয়া হোক। কিন্তু এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র কামবলের মধ্যমণি হওয়াকে আটকাতে মুরলী দেওরা উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তবে এই দুই নেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব থেকে ফাঁপরে পড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বসন্তরাও দাদা পাতিল। বসন্ত দাদা পাতিল মনে মনে কাকে সমর্থন করছিলেন সেটা অবশ্য পরিষ্কার বোঝা যায়নি। তবে এই অধিবেশনে মুরলী দেওরা, নরেন্দ্র কামবলে এবং বসন্তদাদা পাতিল এই তিন নেতার দোবাফেরা দেখে একটা জিনিসই বোঝা গেল যে, এরা [illegible], পরস্পরের বন্ধু নন কেউই।

বোমবাই-এ এই অধিবেশন শুরু হওয়ার অনেক মাস আগে থেকেই নতুন দিল্লিতে কংগ্রেস অফিসে মুরলী দেওরা, নরেন্দ্র কামবলে এবং মুখ্যমন্ত্রী বসন্তদাদা পাতিলের যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এদের তিনজনের মধ্যে দেওরা [illegible] পেরেছিলেন। কংগ্রেস অফিস থেকে [illegible] ঘোষিত হবার আগেই মুরলী দেওরা নিজে থেকে বসন্তদাদা পাতিলকে সংগে নিয়ে অধিবেশনের জায়গা, সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকী করেছিলেন।

এসব ছাড়াও, এই ফাঁকে মুরলী দেওরা দিল্লিতে রাজীব গান্ধী এবং কংগ্রেস হাইকমানডের অনেক নেতাদের সংগেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, যা নরেন্দ্র কামবলে করতে পারেননি। মুরলী দেওরার এই তৎপরতার জন্যই শেষ পর্যন্ত এ আই সি সি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিবেশনের যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয় বোমবাই আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটির হাতে। স্বভাবতই এর ফলে অধিবেশনের মধ্যমণি হয়ে বসেন আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মুরলী দেওরা।

অধিবেশনের দুদিনই নরেন্দ্র কামবলেকে চুপচাপ থাকতে দেখা গেছে। তিনি সারাক্ষণই মঞ্চের ওপর কমলাপতি ত্রিপাঠীর পাশে বসে ছিলেন। বসন্তদাদা পাতিল কেও দেখা গেছে মঞ্চের পেছনদিকে শুকনো মুখে বসে থাকতে। দিনের শেষে বসন্তদাদা ঐ মঞ্চের ওপরেই তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

আবার এদেরই পাশে অধিবেশনের দুদিনই মুরলী দেওরাকে দেখা গেছে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করতে। কখনও শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ডেকে কথা বলেছেন, কখনও রাজীব তাঁর কাঁধে হাত রেখে আলোচনা করেছেন। বোমবাই শহরে এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে যা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে তার জন্য সকলেই মুরলী দেওরার নাম করেছেন। অন্যদিকে অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বসন্তদাদা পাতিল ছিলেন শুধুমাত্র নাম কা ওয়াস্তে।

এই প্রতিযোগিতার খেলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং একদা শ্রীমতী গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত এ আর আনতুলের অবস্থা কেমন? মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস (ই) সূত্রের খবর যে, আনতুলে যেহেতু একজন অমারাঠি এবং মুসলমান, তাই মহারাষ্ট্রের জনগণ আনতুলেকে মেনে নেয়নি। এমনকি, মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতাও আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনারা কি পশ্চিমবাংলায় একজন অবাঙালি মুখ্যমন্ত্রীকে মেনে নিতে পারবেন? শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু আনতুলে সম্পর্কে অন্য ধরনের মতামত পোষণ করেন। তিনি চাইছেন কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লাকে মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেসে আনতুলের মত একজন মুসলিম নেতা নেতৃত্বের প্রথম সারিতে থাকুন। তিনি অধিবেশনে ভাষণ দেবার সময়ও জোর গলায় বলেছেন, কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক এবং একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল। এমনকি তিনি গত ১৯ অকটোবর, কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবার আগের দিন, বোমবাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় আনতুলেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেকেও পাঠিয়েছিলেন।

বোমবাই অধিবেশনের সময় আনতুলেকে মঞ্চে দেখা গেছে। তিনি ভাষণও দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে অসাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছেন। ভাষণ দেবার সময় আনতুলে নিজেকে ভারতের একমাত্র মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী বলে জাহির করতেও ভোলেননি। অবশ্য শ্রীমতী গান্ধী সংগে সংগেই তাঁকে শুধরে দিয়ে বলেছেন, এর আগে কেরালা, কাশ্মীর, বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশেও কংগ্রেসের মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য আনতুলে এসবের ফাঁকে ফাঁকে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতেও কসুর করেননি। দলের হাইকমানডকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি শ্রীমতী গান্ধী ও দলের প্রতি নিজের আনুগত্যও প্রকাশ করেছেন। তবু, এত কিছু করা সত্ত্বেও আনতুলের দিকে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের কাউকে খুব একটা দেখা যায়নি। তবে, রাজনৈতিক মহলের মতে শ্রীমতী গান্ধী নাকি আনতুলেকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে স্থান দেবেন। তার পেছনের কারণ, মুসলিম জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা

এবং সেই সঙ্গে বামফ্রন্টের আত্মকলহের মোকাবিলা করা।

এবার দেখা যাক, মহারাষ্ট্রকেই এই অধিবেশনের জন্য মনোনীত করা হল কেন? এই অধিবেশন তো অন্য কোন জায়গায়, এমনকি দিল্লিতেও হতে পারত। এর পেছনে কারণ অবশ্য একটা আছে। তা হল, শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস অধিবেশন করিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এখানকার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে আবার চাঙ্গা করে তোলা। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস কমিটির অবস্থা এখন এমন যে, তাকে শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

কিন্তু মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস অধিবেশন করে এখানকার প্রদেশ কমিটিকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। কারণ, চাঙ্গা হওয়ার বদলে এখানকার কংগ্রেস কমিটি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস দল চার ভাগে বিভক্ত। এর চারটি বিন্দুতে আছেন বসন্তদাদা পাতিল, নরেন্দ্র কামবলে, মুরলী দেওরা এবং আনতুলে। এই চারজনের ভেতরে সম্পর্ক এখন এমন তিক্ত যে, অধিবেশন চলাকালীন একজন আরেকজনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন, পাশাপাশি বসেছেন, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির সময় এটা নয়, সমস্ত ঝগড়াঝাটি ভুলে গিয়ে নিজেরা একতাবদ্ধ হন। কিন্তু কথা হল, শ্রীমতী গান্ধীর এই উপদেশ মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কতটা শুনেছেন? □

শিবাজী পার্কে জনসভায় শ্রীমতী গান্ধী

আলোকচিত্র : লেখক

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা রাজীবের কাছে আমল পাননি

বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত এ আই সি সি অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেক কংগ্রেসী নেতা যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এমনকি তাঁরা অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজীব গান্ধীর সঙ্গে এক বৈঠকের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। ঘন্টা পনের মিনিটের এই বৈঠকে তাঁরা রাজীবের সামনে তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগও পেশ করেছিলেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে যেটুকু জানা গেল, তা হল এই বৈঠক বিশেষ কোন ফল দেয়নি। প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের পেশ করা অনেক অভিযোগই রাজীব গান্ধী মেনে নেননি। আবার প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাজীবের তোলা অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারেননি প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা। এ ছাড়াও আরেকটা আশ্চর্যের বিষয় হল, রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী, আবদুস সাত্তার এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আনন্দগোপাল মুখারজি এই সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ অবশ্য একটা দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে, সভা চলার সময় এদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর আবদুস সাত্তার তখন অসুস্থ হয়ে বোম্বাই-এর যশলোক হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় ছিলেন।

ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। একদিকে আবদুস সাত্তারের মত বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা যখন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন, ঠিক তখনই প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা তাঁকে বাদ দিয়েই রাজীবের সঙ্গে বৈঠক করছেন। অবাক হবার মত ঘটনা আরো আছে। তুহীন সামন্ত, গৌতম চক্রবর্তীর মত নেতারা, এমনকি সাংবাদিকরাও আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে, রাজীব পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। তবুও গণি খান চৌধুরী বা আনন্দগোপাল মুখারজির মত নেতাদের কানে এ খবর একবারও পৌঁছায়নি? প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসীর ব্যাপারটিও অদ্ভুত। তিনি সেদিন সকালে অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পরই মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন!

অবশ্য এই সভায় সবাই যে নিরাশ হননি তা মনে হয় না। সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রণব মুখারজিকে তো বেশ হাসিখুশীই দেখাচ্ছিল। সম্মুখানন্দ হলের তিনতলায় একটি ঘরে এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংবাদিকরাও বেশ কৌতূহল নিয়ে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, কী এমন গোপন আলোচনা চলছে তা জানবার জন্য। সভার শেষে প্রণব মুখারজি যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তাঁকে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি একটা কথারও উত্তর না দিয়ে আঙুল তুলে গোপাল দাস নাগকে দেখিয়ে দেন।

গোপাল দাস নাগ অবশ্য আসল কথা কিছুই বলেননি: আসল কথা বেরোল অন্য একজন নেতার মুখ থেকে। তিনি জানালেন, তাঁদের দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসকে মজবুত করার জন্য প্রদেশ কমিটিকে ঢেলে সাজান উচিত। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় কংগ্রেসের প্লেনারি সেশন হবে। তার আগেই কংগ্রেসের সংগঠন মজবুত করতে না পারলে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হবে। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর অত্যাচার সম্পর্কেও তারা নাকি রাজীবকে অবহিত করেছেন।

তাদের প্রথম দাবির উত্তরে রাজীবও নাকি প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন - সংগঠনকে মজবুত করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস নিজেই কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না? নতুন কমিটি করলেই কি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে? আর বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগের উত্তরে তিনি নাকি সরাসরিই তাদের প্রশ্ন করেছেন - আপনাদের ভেতর কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলুন?

সভায় উপস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা নাকি রাজীবের কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। আরও জানা গেছে, এই সভায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রাজীবের কাছে আবেদন করেছিলেন, এবার সংগঠনের দায়িত্ব তরুণদের হাতে দেওয়া হোক। কিন্তু প্রণব মুখারজি নাকি সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেছিলেন; বলেছিলেন, এর আগে তো তরুণ নেতাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেখা গেছে কোন লাভ হয়নি।

বোম্বাই এর অধিবেশনে নেওয়া প্রস্তাব সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভও দেখা গেছে। গোপাল দাস নাগ, সুব্রত মুখারজি, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতারা বলেছেন, এই প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের কথা বলা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু কথা এতে থাকা উচিত ছিল বলে ওরা জানিয়েছেন। কিন্তু তারা এ বিষয়েও রাজীবের কাছ থেকে কোন আশাব্যঞ্জক উত্তর পাননি।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনের ভোটার তালিকাও নাকি তৈরি হয়ে গেছে বলে জানা গেল। অথচ এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতারা কিছু জানেন না বলে জানালেন। তাঁরা নাকি এই বিষয়েও রাজীবের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, তালিকা প্রস্তুতকারীদের অধিকাংশই নাকি কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোক। এরা নিজেদের খেয়ালখুশী মত তালিকা প্রস্তুত করছেন। পুজোর ছুটির সময় অনেকেই বাইরে বেড়াতে যান। গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এদের দেখা না পেয়ে, অনেকের নামই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন তালিকা থেকে। যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তারা অধিকাংশই নাকি কংগ্রেস সমর্থক। এই অভিযোগের উত্তরে রাজীব কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠান।

অধিবেশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসীর ভাষণ। অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজনৈতিক প্রস্তাবের ওপর আলোচনার শুরুতেই শ্রীমতী গান্ধী প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসীর নাম ঘোষণা করেছিলেন। সদস্যদের হাততালির ভেতর তিনি ভাষণ দিতে ওঠেন। বেশ আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। নিজের আবার কংগ্রেস (ই)-তে ফিরে আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সন্তান ভুল করতে পারে কিন্তু তার জন্য মা তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না।

অবশ্য সবকিছু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই অধিবেশনের পরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে কোন্দল কিছুই মিটল না, বরং তা আরো বেড়ে গেল। কয়েকজন প্রবীণ নেতার অনুপস্থিতিতে এই কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গড়ার কথা উঠিয়ে নিজেদের ঝগড়াকে নিজেরাই কি বাড়িয়ে দিলেন না আবার? সামনের ডিসেম্বরেই কলকাতায় কংগ্রেসের প্লেনারি সেশন হতে চলেছে। প্লেনারি সেশনের গুরুদায়িত্ব এরা কীভাবে সামলাবেন তা তখনই বোঝা যাবে। এখানকার প্রদেশ কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েছে না কমেছে . এখন ডিসেম্বর অবধি অপেক্ষা করে সেটাই দেখার।

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁকের মানসিক হাসপাতাল

শিবেশ ঘোষাল

রাঁচী থেকে সাত মাইল দূরে পাহাড়ঘেরা একটা ছোট্ট শহর কাঁকে। এখানেই আছে সম্পূর্ণ মানসিক অ্যা ভাব কারণেই কিছু অসহায় মানুষ, যারা সকলের অবহেলা আর অবজ্ঞার পাত্র, তাদের জন্য একটা সাময়িক আবাসস্থল। এখানে তারা পায় পরিচর্যা, পায় সাহচর্য, পায় চিকিৎসা। আবাসস্থলটি আর কিছু নয় – সেটি হল কাঁকের মানসিক হাসপাতাল। মানসিক হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কাঁকেকে নির্বাচিত করা হয় কিন্তু অনেক বছর আগে। যখন কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল, সেই সময়। সরকারিভাবে এখানে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯১৮ সালে।

এই হাসপাতালের গোড়া পত্তনের ঘটনাও কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদ যখন দেখা দেয়, অর্থাৎ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীদের যুগে, সেই সময় অনেক শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী নিরাপত্তার অভাব বোধ করত। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এসে এই ভারতের মাটিতে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে, এই ভয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর মধ্যে মানসিক রোগ দেখা দিতে শুরু করে। সেই সময়, প্রকৃতিপ্রেমী ইংরেজরা কাঁকেকে তাদের আরোগ্য আশ্রম গড়ে তোলার জায়গা হিসেবে নির্বাচন করে। আম জাম কাঁঠালের গাছে ভরা বনানীর ফাঁকে তারা গড়ে তোলে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। সরল, সুঠাম চেহারার আদিবাসী মহিলা পুরুষরা হয় তাদের ফাই-ফরমাশ খাটবার লোক। এখন এই হাসপাতালের ৭৫ ভাগ কর্মচারীই আদিবাসী।

ধীরে ধীরে যখন ভারতীয়দের মধ্যে মানসিক রোগের প্রভাব বাড়ল, তখন ভারতীয়দের জন্যও আলাদা করে এখানে হাসপাতাল খোলা হল। এই 'ইনডিয়ান মেনটাল হাসপাতাল'কেই এখন বলা হয় রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালা। কিংবা আরো সহজ করে রাঁচীর পাগলা গারদ।

শুধু সাধারণ নয়, বহু বিখ্যাত পরিবারের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির চিকিৎসা হয়েছে এই হাসপাতালে। বিশ্বখ্যাত এই হাসপাতালে বহু বিখ্যাত চিকিৎসকও কাজ করেছেন। এখনও বহু বিদেশি । গী, বিশেষ করে ইওরোপিয়ান এ াসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ছাড়া প্রায় ৪০-৪৫ বছর ধরে এই হাসপাতালে আছেন এমন রোগীও আছে। আবার, অনেকের পরিবারের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। সুস্থ হয়ে এই হাসপাতালেই কোন বিভাগে কাজ নিয়েছেন। এই হাসপাতালেই তারা খান, থাকেন।

কাঁকের হাসপাতাল দুটো এখনও সুন্দর। এর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এখনও লোককে আকৃষ্ট করে। যদিও রাঁচী শহর এখন আতংক নগরী। এখানে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি তার সংগে সংগে ভেঙে পড়েছে আইন শৃংখলা। রাঁচী থেকে কাঁকে যেতে রিকশায় লাগে ৫ টাকা। আর অটো রিকশায় একজনের একদিকের ভাড়াই দুটাকা। কিন্তু সন্ধ্যার পর এখানে যাওয়ার জন্য যানবাহন পাওয়া দুঃসাধ্য।

কাঁকের মানসিক হাসপাতাল এত পরিচিত কেন : এ প্রশ্ন অনেকেই করে। এর কারণ শুধু ভারতেই নয় বিশ্বেরও একটি প্রাচীনতম মানসিক হাসপাতাল এটি।

কাঁকের এই হাসপাতাল ছবির মত সাজান। ইওরোপিয়ান ধাঁচে ছোট বড় বাড়ি। চারদিকে বাগান। সাধারণ লোকের হাসপাতাল সম্বন্ধে যা ধারণা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেন স্বাস্থ্যনিবাস। কিছু দিনের জন্য মনমেজাজ ভাল করতে স্বেচ্ছায় এখানে নির্বাসন নেওয়া যেতে পারে। কাঁকের এই হাসপাতালের সীমানা শেষ হলেই টেগোর হিল। মোরাবাদী পাহাড়ের ওপর রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৈরি করিয়েছিলেন এক সুন্দর বাড়ি। এখন ভগ্নপ্রায়। কিন্তু নাম সেই থেকে হয়ে গেছে টেগোর হিল।

এর পর আসা যাক এখানকার চিকিৎসাপদ্ধতির কথায়। হাসপাতালের ভেতরে আছে টেনিস, ব্যাডমিনটন, টেবিল টেনিস খেলার নিয়মিত ব্যবস্থা। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আবার সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। আছে বিরাট লাইব্রেরি। মাঝে মধ্যে রোগীদের শহরে নিয়ে যাবার জন্য নিজস্ব বাস। হাতের কাজ, পেইনটিং, ড্রইং, সেলাই ইত্যাদির সুবিধা। অর্থাৎ মানসিকভাবে রোগীদের সুস্থ রাখার সব রকম উপকরণ। এ ছাড়া আছে অতি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা।

অবশ্য কাঁকের মানসিক হাসপাতালে যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, রাঁচীর হাসপাতালে তা পাওয়া যায় না। তবুও আগের তুলনায় রাঁচীর হাসপাতালেও সুযোগ সুবিধা এখন অনেক বেড়েছে। কাঁকের হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতেই ১৯২৫ সালে রাঁচীতে এই হাসপাতালটি খোলা হয়। রাঁচীর এই হাসপাতালে অধিকাংশ রোগীই বাঙালি। তার একটা বড় কারণ অবশ্য পশ্চিমবংগ সরকারের এখানে বেশ কিছু সিট রিজারভ করা আছে।

এই হাসপাতালে এমন অনেক রোগীও আছে যাদের আত্মীয় স্বজনের কোন খোঁজখবর নেই। তারা হাসপাতালের কর্মচারীদের বাড়িতে থাকা খাওয়ার বদলে ফাইফরমাস খাটে। চিরটাকাল এখানেই থেকে যায়। বাঙালি রোগীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্যই এই হাসপাতালের বহু অবাঙালি কর্মচারী ভাল বাংলা জানেন। রাঁচীর মানসিক হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ ভগত তো খুবই ভাল বাংলা বলতে পারেন।

কাঁকের হাসপাতালে প্রবেশের বিষয়ে ভীষণ কড়াকড়ি। কড়াকড়ি ফটো তোলাতেও। অবশ্য এর পেছনে জাতীয় নিরাপত্তা বা ঐ জাতীয় কোন কারণ নেই। কারণ নিতান্তই মানবিক।

কাঁকে মেনটাল হাসপাতালের সর্ব প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন বারকলে হিল। তিনি ছিলেন একই সংগে কঠোর ও কোমলের সংমিশ্রণ। স্থানীয় লোকদের সংগে একাত্ম হতে পেরেছিলেন তিনি। স্থানীয় লোকেরাও তাঁকে ভালবেসেছিল। তাঁর পরবর্তীকালে ডাঃ ডেভিস এখানকার সুপারিনটেনডেন্ট হন। তিনি একজন আদিবাসী মহিলাকে বিয়ে করেন। মিসেস ডেভিসই এখন এই হাসপাতালের সর্বেসর্বা। □

রাঁচির মানসিক হাসপাতাল

রাঁচিতে অসুস্থ অবস্থায় নজরুল যেখানে থাকতেন

'মাদকাসক্তি মানসিক রোগের একটি কারণ' — ডাঃ শ্রীধর শর্মা

ডাঃ শ্রীধর শর্মা বর্তমানে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রির ডাইরেক্টর। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বহুবার বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ১৯৮০ সালে পেয়েছেন ডাঃ বি সি রায় অ্যাওয়ার্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অব সাইকিয়াট্রি ইন ইনডিয়া। এ ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থাও তাঁকে তাঁর অবদানের জন্য পুরস্কৃত করেছেন।

নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ডাঃ শর্মার সঙ্গে পরিবর্তনের প্রতিনিধি একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। বিষয় ছিল মানসিক রোগের কারণ কী এবং এদেশে কেনই বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাক্ষাৎকারটিই এখানে তুলে দেওয়া হল।

ডাঃ শ্রীধর শর্মা

পরিবর্তন : বর্তমান বিশ্বের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার কী কী কারণ বলে আপনি মনে করেন?

ডাঃ শর্মা : মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার কারণ বহু। এটা জেনেটিক কারণ হতে পারে। তবে আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার সব থেকে বড় কারণ বায়োকেমিক্যাল। এ ছাড়া আছে সামাজিক ও মানসিক কারণ। তবে মানসিক কারণগুলোও বহু ক্ষেত্রে নির্ভর করে বায়োকেমিক্যাল কারণের ওপর। যেমন, ডায়াবেটিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের পরে, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে, মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। আজকাল বেশ বেশিই দেখা যায় যে কোন বড় রকমের রোগের পরে বয়স্ক ব্যক্তিরা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

পরিবর্তন : আচ্ছা, মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার ব্যাপারে বয়সটাও কি একটা বড় কারণ?

ডাঃ শর্মা : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বিশেষ বয়সের পরে কিছু ধরনের রোগ আছে যা পুরোপুরি সারে না। কারণ তখন শরীরের অবগানগুলো ঠিকমত কাজ করে না। তার জন্যই তো আমরা আজকাল মনে করি বায়োকেমিক্যাল কারণই মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার সব থেকে বড় কারণ।

পরিবর্তন : সাধারণ মানুষের ধারণা যে বুদ্ধিজীবীরাই মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

ডাঃ শর্মা : বাজে কথা। এরকম কেস খুব কম। যারা বায়োকেমিক্যাল দিক থেকে কোন না কোনভাবে দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু কেস আসে। আসলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই নিজের জীবনে হতাশা আসে, ডিপ্রেশন আসে — তার থেকেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানসিক রোগ দেখা দেয়।

পরিবর্তন : আচ্ছা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বোধই কি কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক রোগের কারণ?

ডাঃ শর্মা : 'নিরাপত্তার অভাব' শব্দটা বড়ই রিলেটিভ বিষয়। যেমন, জংগলের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় প্রয়োজন ছাড়া, অর্থাৎ বাঁচবার জন্য যেটুকু দরকার, তা ছাড়া সবাই বেশ নিরাপদ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। মানুষ সবসময়ই একে অপরকে নিজ নিজ প্রভাবে রাখতে চায়। এমনিতে কিন্তু সাধারণভাবে পশুপ্রাণীদের ক্ষেত্রে পাগলামি দেখা যায় না যদিও আমরা বলি পাগলা ঘোড়া, পাগলা হাতি। আসলে পশুদের ঐ চঞ্চলতা দৈহিক। বিশেষ করে সেকসের ব্যাপারে এবং সন্তান স্নেহের ক্ষেত্রে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে মানুষ অনেকাংশেই আজ পশুদের থেকেও নিকৃষ্ট।

পরিবর্তন : আচ্ছা হীনমন্যতা কি মানসিক রোগের কারণ?

ডাঃ শর্মা : হীনমন্যতা মানসিক রোগের লক্ষণ, কারণ নয়।

পরিবর্তন : আচ্ছা, আজকাল তো মানসিক রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই না?

ডাঃ শর্মা : হ্যাঁ, মানসিক রোগের বৃদ্ধির হার আজকাল বেশি।

পরিবর্তন : যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেশি পরিমাণে মাদকাসক্তিই কি তার কারণ?

ডাঃ শর্মা : অত্যধিক মদ্যপান এবং ড্রাগস নেওয়া দুটোই মানসিক রোগের একটা কারণ। তবে ড্রাগস আরো খারাপ। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সামান্য মদ্যপান করলে অনেক ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধি বেশি খোলে। কাজে কুশলতা আসে। তবে এ বিষয়ে ভেবে দেখার আছে যে, সেই ধরনের মানুষেরা কী জাতীয় অ্যাল কোহল পান করেন।

পরিবর্তন : আমাদের দেশে মানসিক রোগ যে এত বৃদ্ধি পাচ্ছে এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

ডাঃ শর্মা : হ্যাঁ, বৃদ্ধি তো পাচ্ছেই। তবে বৃদ্ধির হার পশ্চিম দেশেও বেশি। তবে এই বৃদ্ধি রোধ করার ব্যবস্থাও আছে। আমরা এখনও এই বৃদ্ধির হার বুঝবার জন্য তৈরি নই।

পরিবর্তন : আচ্ছা, শোনা যায় যে সমাজবাদী দেশগুলোতে মানসিক রোগের হার অনেক কম।

ডাঃ শর্মা : কোন দেশই মানসিক রোগ এবং এর সমস্যা থেকে একেবারে মুক্ত নয়।

পরিবর্তন : আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি কি আমাদের দেশে মানসিক রোগ বৃদ্ধির একটা কারণ?

ডাঃ শর্মা : শিক্ষাপদ্ধতি সরাসরি নিশ্চয়ই দায়ী নয়। তবে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার জন্য কিছুটা দায়ী। কারো সঠিক শারীরিক-মানসিক চাহিদার দিকে নজর না রেখে জোর জবরদস্তি করে যে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় তা নিশ্চয়ই ত্রুটিপূর্ণ। সেটা অনেক মানসিক ক্ষতি করে।

পরিবর্তন : পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কারা বেশি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়?

ডাঃ শর্মা : উভয় সেকসই সমান সমান। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিধবা হওয়া এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে অত্যধিক বিকৃতচিন্তার কারণে অনেক সময় মানসিক রোগ দেখা দেয়। উভয় সেকসেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

পরিবর্তন : মানসিক রোগ বা রোগীদের সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোন মতামত আছে কি?

ডাঃ শর্মা : বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে সাংবাদিকদের প্রতি আমার মাত্র একটাই অনুরোধ। সাধারণ মানুষকে এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলুন। সাধারণ মানুষের সচেতনতায় মানসিক রোগের সংখ্যা নিশ্চয়ই কিছুটা কমবে। এ ছাড়া আরো বলার আছে যে, মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের যথার্থ মর্যাদার সংগে সমাজে গ্রহণ করা উচিত। অনেকক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা না পাওয়ার জন্য তারা আবার রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা উচিত নয়। □

সাক্ষাৎকার : শিবেশ ঘোষাল

আলোকচিত্র : কিসলে

১৯১৮ সালে তৈরি কাঁকে হাসপাতাল

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে চরম অরাজকতা • শ্যামল বসু

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে চরম অরাজকতা চলছে। পশ্চিমবংগ, ওড়িশা, সিকিম নিয়ে প্রায় ৪৩ টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ করা হয় কলকাতার বিধান-নগর (সল্ট লেক) অফিস থেকে। এখানকার অধিকর্তা পূরনচাঁদ বার বার প্রমাণ করছেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থায় তিনি বেহাল। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির যে কোন একটিতে গেলেই পরিচালন ব্যবস্থার অপদার্থতা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব বর্তমান অবস্থায় সাধারণ মানুষের কাছে অপরিসীম। এই রাজ্যেই প্রায় হাজার ১২ ছেলেমেয়ে এখানে পড়াশুনা করে। এদের শতকরা ৯৮ জনের বাবা-মা কেন্দ্রীয় সরকার অথবা এমন কোন সংস্থায় চাকরি করেন যেখানে বিভিন্ন রাজ্যে বদলী হতে হয়। এসব স্কুলে বছরের যে কোন সময় ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা দূরে থাক, ন্যূনতম যে শিক্ষার পরিবেশ তাও এই বিদ্যালয়গুলিতে নেই। ইতিপূর্বে পরিবর্তনের পাতায় (৯ মার্চ ১৯৮০) ব্যারাকপুর এয়ার ফোর্স সংলগ্ন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অধ্যক্ষ গণপতিরামের কেলেংকারী প্রকাশিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও খুব একটা কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে তিনি আছেন। প্রোমোশনটা হয়নি কিন্তু চাকরিটা বহাল আছে। চাকরির নিরাপত্তা থাকুক আপত্তি নেই, কিন্তু অসদাচরণের জন্য যখন কোন শাস্তি পেতে হয়না তখন আর পাঁচ জনে সেই সুযোগ নেবেন না কেন? ঠিক এইভাবেই কলকাতা রিজিয়ানের অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার পূরনচাঁদের হুকুম তামিল করতে নারাজ এক শ্রেণীর অধ্যক্ষ।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের সাংগঠনিক অবস্থাটা জেনে রাখা দরকার। এই বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যক্ষই সর্বেসর্বা। তিনি এবং যে সংস্থার সংগে জড়িত থাকে এই বিদ্যালয়গুলি, সেই সংস্থার প্রধান ও এডুকেশন অফিসার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা হয়। যেমন এয়ার ফোর্সের এলাকায় কোন স্কুল থাকলে তার মূল উপদেষ্টা হন বা চেয়ারম্যান হন গ্রুপ ক্যাপটেন অথবা সামরিক মর্যাদায় যিনি সবচেয়ে ওপরে থাকেন তিনি। এর সংগে এয়ার ফোর্সেরই কোন স্কোয়াড্রন লিডার হয়ত এডুকেশন অফিসারের দায়িত্বে থাকেন। অতএব স্কুলের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ অধ্যক্ষ নিজেই দেখাশুনা করে যেটি ঠিক বুঝবেন সেইটিই অনুমোদন করিয়ে নেবেন স্থানীয় কমিটির কাছ থেকে। পরীক্ষা বা অন্য কিছু রুটিন কাজের জন্য তাদের যোগাযোগ করার দরকার রিজিওনাল অফিসার যিনি অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার। এই বিদ্যালয়গুলি সংগত কারণেই লোকালয় এলাকার বাইরেই থাকে। যার ফলে রিজিওনাল অফিসারের সংগে যে যোগাযোগ তা সব সময় সম্ভব হয় না। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের নির্ভর করতে হয় স্থানীয় অধ্যক্ষের মতামতের ওপর। বর্তমানে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে যেগুলি জনপদের বাইরে সেখানে অধ্যক্ষদের মধ্যে একটা শ্রেণী এই ব্যবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করছেন।

কলাইকুণ্ডার এয়ার ফোর্সের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শ্রীমতী শেফালী মাইতি একজন শিক্ষিকা। পদটি অস্থায়ী। স্থায়ী সম্ভাবনায় চাকরিটি পেয়েছিলেন শ্রীমতী মাইতি। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এস ডি আগরওয়াল তার কাছে চাকরি স্থায়ী করে দেবার জন্য ৪000 টাকা খরচ করার কথা বলেন বলে অভিযোগ। শ্রীমতী মাইতির ঐ স্কুলে চাকরি পাকা হবার সংবাদ ছিল একটি চিঠিতে। ঐ চিঠি অধ্যক্ষ এস ডি আগরওয়ালা মারফৎ পাঠিয়েছিলেন এ সি পূরনচাঁদ। চিঠিটি ডাকে না দিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের অপর শিক্ষক মতিলাল বাগের হাত দিয়ে পাঠান হয়। শ্রীবাগ শ্রীমতী মাইতির চিঠিটি শ্রীআগরওয়ালাকে দেন। সেপটেম্বর ১৪ তারিখে অধ্যক্ষ আগরওয়াল শেফালী মাইতিকে বেলা ১টার কিছু পরে ডেকে পাঠান নিজের ঘরে। কলাইকুণ্ডা থানায় শ্রীমতী মাইতির লিখিত আবেদন থেকে দেখা যায় অধ্যক্ষ আগরওয়াল ও মতিলাল বাগ দুজনেই শ্রীমতী মাইতির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। এবং খবর পেয়ে শ্রীমতী মাইতির স্বামী জলধর মাইতি ছুটে আসেন। শ্রীমাইতিও ঐ বিদ্যালয়েরই শিক্ষক। অধ্যক্ষ আগরওয়াল ও মতিলাল বাগ দুজনেই তখন শ্রী ও শ্রীমতী মাইতিকে শারীরিক নির্যাতন করেন। শ্রীমতী মাইতির জামা কাপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় থেকে স্থানীয় শিক্ষকরা অধ্যক্ষ আগরওয়ালের আচরণের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ জানান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কলকাতার অ্যাসিসটেন্ট কমিশনারের কাছে। শিক্ষক শিক্ষিকারা দাবি তুললেন অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক কিংবা কলাইকুণ্ডা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হোক। দাবির সমর্থনে শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলের মধ্যে রিলে অনশন করলেন। ছাত্র ছাত্রীদের কারোর জানতে বাকি রইল না তাদের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের আচরণ।

অধ্যক্ষ আগরওয়াল

এটা একটা ঘটনা। এমন ঘটনার নজির পাওয়া যাবে পানাগড়ের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রূপচাঁদের আচরণেও। শিক্ষকরা তাঁর বিরুদ্ধে সকলের সামনে অভিযোগ আনেন অবৈধভাবে এল টি সি (ভ্রমণ ভাতা) নেওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে টাকা নেওয়ার। অধ্যক্ষ রূপচাঁদ এবার একজন শিক্ষক শ্রীযাদবকে মদত দিলেন কে কে সাহাকে মারধর করার জন্য। শ্রীযাদব স্কুলের ছাত্রীর শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত। স্কুলে তিনি সাসপেনড।

ভুবনেশ্বরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় একজন শিক্ষিকা সেখানকার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। হাসিমারা বীণাগুড়ির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়েও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমে আছে। মোট কথা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রেও সুস্থভাবে শিক্ষার পরিবেশ নেই।

খোদ রিজিওনাল অফিসও কলংকমুক্ত নয়। এখানে এড হক অ্যাপয়েনটমেনটের ছুতো করে শিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষয়িত্রীদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। টাকা পয়সার লেনদেন করে অবৈধভাবে ট্রানসফার করাও হয়। দায়িত্বপূর্ণ কাজে অবহেলার কথা তো না ধরলেও চলবে। কিন্তু রিজিওনাল অফিসের ত্রুটির জন্য সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁদের শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের পর স্পর কালিমা লেপনের পরিবেশ তাদের মানসিক ক্ষতি করছে। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি কেউ চিন্তা করেন তবে এই স্কুলগুলির প্রতিটি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ তার তদন্ত করে কঠোরভাবে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে অন্য জায়গাগুলোয় যারা তুঘলকী রাজত্ব মনে করে স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে তারা ভয় পেতে পারে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় অভিযোগ তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সংযত হবেন আর অধ্যক্ষ বা অন্য কেউ যারা এই অপরাধ কর্মে লিপ্ত হন তাদের প্রবণতাও কমবে। জল ভাতের মত শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠছে। এগুলোর ফয়সালা না করলে সবচেয়ে বেশি অপরাধী হবে তারাই, যারা সমস্যাগুলোকে জিইয়ে রেখে কিশোর কিশোরীদের জীবনের মূল্যবোধগুলো নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করছে। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ তে যোগদানকারী ব্যক্তির নাম এবং ক্রমান্বয়ে সদস্য ক্রম, ঠিকানা, বয়স, সখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল:

পরেশনাথ রায় □ ক্রম ২২
গ্রাম ও পোঃ কুরমুন, বর্ধমান। ২০ বছর, বন্ধুত্ব স্থাপন, ছাত্র।

প্রবীর কুমার দে □ ক্রম ২৩
জে ই (এ ই এম ডি) বোংগাইগাঁও থারমাল পাওয়ার স্টেশন, পোঃ মালাকাঠি ৭৮৩৩৬৯, আসাম। ২২ বছর, লেখালেখি মনস্তত্ত্বচর্চা বন্ধুত্ব স্থাপন, ইলেক ইনজিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা, চাকরি।

লতিকা মুখোপাধ্যায় □ ক্রম ২৪
কে/অ ক্ষীরোদ মোহন মুখোপাধ্যায়, গ্রাম ও পোঃ হীরাপুর (সন্ধ্যা কুটীর), বর্ধমান। ২৬ বছর, বই পড়া, বাকি বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই।

অমিতাভ ভট্টাচার্য □ ক্রম ২৫
কে/অ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, রামপদ কলোনি, পোঃ ও জেলা পুরুলিয়া ৭২৩১0৩। ২0 বছর, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পড়া এবং যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান, বি এস সি, উল্লেখ নেই।

বিশেষ প্রতিবেদন

সাহিত্য 'নোবেলে' রাজনীতি

রাজেন্দ্র আগরওয়ালা

সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবারের দুপুরে স্টকহোমের অষ্টবিংশ শতাব্দীর নয়নাভিরাম রয়াল প্লেসে মিলিত হন কয়েকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। একে অপরের প্রতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেই সুইস অ্যাকাডেমির লাইব্রেরী কক্ষে তাদের আলোচনায় বিষয় শুরু করেন। বর্তমান বৎসরের সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি। আলোচনারত ব্যক্তিদের, যারা সুইডেনের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও আলোচক, সাহায্য করেন লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ। তুলে ধরেন বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক, যাতে উপযুক্ত সাহিত্যকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা সম্ভব হয়। ক্রম পর্যায়ের সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় ১০০ জনের বিস্তৃত তালিকা থেকে সর্বাঙ্গীণ বিচারে পাঁচজন সাহিত্যিকের নাম সুইস অ্যাকাডেমির নিকট সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত হয়। আইনত অ্যাকাডেমি এদের প্রস্তাব মানতে বাধ্য না হলেও অধিকাংশ সময়ই পাঁচজনের একজন এবং প্রস্তাবিত নাম সমূহের শীর্ষস্থ ব্যক্তি এই সম্মানের অধিকারী হন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে সারা বৎসর ধরে চলে নানা বৈঠক ও আলোচনা। প্রত্যেক বৎসর অ্যাকাডেমির সচিব হাজারেরও অধিক বিদ্যান ও পূর্ব বৎসরের পুরস্কার বিজয়ীদের পুরস্কারের নিমিত্তার্থে নাম প্রস্তাবের অনুরোধ জানান। এ ব্যতীত সুইডিস ও বিদেশি এক বিরাট সংখ্যক সাহিত্যিককে লেখকদের মূল্যায়নের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়, এবং এদের প্রস্তাবের মাধ্যমে তৈরী হয় প্রায় ১০০ জন সম্ভাব্য সাহিত্যিকের এক প্রাথমিক তালিকা। এই সূচিতে অন্তত দুই তিন বছর অপেক্ষা করার পরেই অধিকাংশ সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার লাভে সক্ষম হন। সমিতির বক্তব্য মতে কোন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না এবং তারা আন্তর্জাতিক সংগঠন ও দূতাবাস সমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত চাপের নিকট নতি স্বীকার করেন না। সংবাদপত্রের ন্যায় প্রচার মাধ্যম তাদের বিভ্রান্ত করতে অক্ষম অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার সম্পূর্ণ রূপে নিরপেক্ষ।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সকলেই বিশেষভাবে এশিয় আফ্রিকার সাহিত্যপ্রেমীরা সন্দিহান। পর্যবেক্ষকদের মতামত অনুযায়ী সাহিত্য নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, মুখ্যরূপে পুরস্কার প্রদানের প্রভাব বিস্তার করেন মাত্র দুই জন। এই দুই ব্যক্তির প্রথম হলেন ডাঃ লুন্ড কুইস্ট ও ডাঃ অস্টারলিং। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী সদস্যদের ৩ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হয়, অবশ্য যে কোন সদস্য পুনর্বার নিযুক্তির জন্য বিবেচিত হতে পারেন। এই সুযোগ নিয়ে ৯৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ অস্টারলিং ১৯১৯ সন থেকেই এই সমিতির সদস্য ও ৭৫ বৎসর বয়স্ক ডাঃ লুন্ড কুইস্ট ও ১৫ বৎসরের ঊর্দ্ধে এই পদে আসীন। ডাঃ অস্টারলিং-এর বিরুদ্ধে মুখ্য অভিযোগ তিনি গ্রীক, স্প্যানিশ ও পোলিশ লেখকদের বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন এবং তার প্রয়াসের ফলেই প্রতিবৎসর প্রাথমিক তালিকায় গ্রীক, পোলিশ ও স্প্যানিশ লেখকদের নাম বিশেষ ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে বিতর্ক বর্তমান থাকলেও কোন বিশেষ অভিযোগ সরাসরি করা সম্ভব নয়। বিজয়ীদের মধ্যে অধিকাংশই যোগ্য ব্যক্তি তবে অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্যতর ব্যক্তি এই সুযোগে বঞ্চিত হয়েছেন এবং সমস্ত নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানা করা হয়নি। বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছেন এশিয় আফ্রিকা মহাদেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায়। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট প্রমাণ সম্ভব। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত পুরস্কারবিজয়ীদের সংখ্যা ৭৯ কারণ, ১৯১৪, ১৮, ৩৫, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৯ সালে কাউকেই পুরস্কার দেওয়া হয়নি। অপর দিকে ১৯০৪, ১৭, ৬৬ এবং ৭৭ সালে দুইজন সাহিত্যিককে যুগ্মভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৭৯ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে ৬৩ জনই ইউরোপবাসী, ৮ জন উত্তর আমেরিকা ও ৪ জন দক্ষিণ আমেরিকার নাগরিক। মাত্র একজন অস্ট্রেলিয়ান ও ৩ জন এশিয় মহাদেশের নাগরিক এই সম্মান অর্জন করেছেন। নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠার ১২ বৎসর পর এশিয়ার প্রথম নোবেল পান ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে মাত্র দুইজন এশিয়ার সাহিত্যিক – ইজরাইলের স্মেওয়েল এসানানকো ১৯৬৩ সালে ও জাপানের ইয়াসুনারী কাবাবাতা ১৯৬৮ সালে। নোবেল পুরস্কার প্রদানে বৈষম্য কেবল এশিয় কিংবা আফ্রিকা মহাদেশের সংগে হয়নি বরং অনেক ভাষাও অবহেলিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় রচনার জন্য পুরস্কারবিজয়ীদের সংখ্যা সর্বাধিক ১৬ জন, ফরাসী ভাষায় লেখকদের সংখ্যা ১২, জার্মানে ১০, স্প্যানিশ ভাষায় ৮ জন, ইটালী ভাষায় ৫ জন এই পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন। সুইডিস ভাষায় নোবেল বিজয়ীদের সংখ্যা ৬ এবং অপর দিকে অবহেলিত রূশ ভাষায় মাত্র ৪ জন এই সম্মান পেয়েছেন। ডেনিস ও নরওয়েজিয়ান ভাষায় পুরস্কার বিজয়ীদের সংখ্যা তিন জন করে। দুর্ভাগ্য বশত নোবেল প্রতিষ্ঠার ৮১ বৎসর পরেও বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা চীনের কোন লেখক বা কোন হিন্দি লেখক এই সুযোগ পাননি। ইউরোপ বাদে অন্য যে সকল সাহিত্যিকরা এই সুযোগ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশের রচনা ইউরোপীয় ভাষায়, অন্যথায় অনুবাদের পরেই তারা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছেন। উত্তর আমেরিকার যে ৮ জন সাহিত্যিক নোবেল পেয়েছেন তাদেব ৭ জনের ভাষা ইংরাজী।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে আলফ্রেড নোবেল জাতি, রাষ্ট্র ও ভাষা নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের জন্য পুরস্কার প্রতিষ্ঠা করলেও আজ তা সাধারণের নিকট ইউরোপের পুরস্কার রূপে পরিচিত কারণ পুরস্কার বিজয়ীদের ৮০ শতাংশই ইউরোপবাসী। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে নোবেল পুরস্কারের উপর অধিকার কি কেবল শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের? এশিয়, আফ্রিকা মহাদেশে পুরস্কাব বিজয়ীদের পরিচিত করতে ও পুরস্কার নিরপেক্ষ প্রমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্যই কি দীর্ঘ অন্তরালে অন্যান্য মহাদেশের সাহিত্যিকদেব সম্মান দেওয়া হয়? আসলে বিতর্কের বীজ অনেক গভীরে।

১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেমবর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হলে জানা যায় নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠার অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ চিরকুমার বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড দান করে গেছেন এই পুরস্কারের জন্য। কিন্তু বিত্তশালী আলফ্রেডের আত্মীয়স্বজনেরা তার এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। তাই তারা দাবি করলেন আলফ্রেডের অর্থের অংশ। অবশ্য আদালতের রায়ে তাদের দাবি অগ্রাহ্য হয়। প্রতিষ্ঠা হয় নোবেল পুরস্কারেব। অবশ্য পুরস্কার বণ্টনের দায়িত্ব আলফ্রেড স্বয়ং প্রদান করেছিলেন সুইডেনের সংস্থার উপর। অবশ্য শান্তি পুরস্কারের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব বর্তায় নরওয়ের অ্যাকাডেমির হাতে।

তবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বণ্টনের পবিত্র কর্তব্য সুইডিস অ্যাকাডেমির হাতে ন্যস্ত হলেও বেঁকে বসেন সমিতির দুই সদস্য হেন্স ফোরসোল ও কারল গুস্তাফ। তাদের মতে সমিতির পক্ষে এত বৃহৎ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কারণ আলফ্রেডের ইচ্ছা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে সমিতির কর্তব্য পরায়ণতায় ব্যাঘাত ঘটবে। কারণ আলফ্রেড তার উইলে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

....It is my express wish that in awarding the prizes no consideration shall be given to the nationality of the candidates, so that the most worthy shall receive the prize whether he be a Scandinavian or not' (2)

অবস্থা শেষে এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছয় যে অনেকে মনে করলেন হয়ত

শেষে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া কোনদিনই সম্ভব হবে না। কিন্তু সুইডিস অ্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব কার্ল ডেভিড এর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। বিতর্কের অবসান ঘটানোর আশায় তিনি বলেন,

'The whole donation will be forfeited as far as literary awards are concerned, and by that very act the leading men of letters throughout Europe will be deprived of the opportunity to enjoy the financial rewards and the exceptional recognition for their long and brilliant literary careers which Nobel had in mind. A storm will blow up, a storm of indignation.

পুরস্কার প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে নিশ্চিতভাবে যোগ্য কাজ করেছিলেন কার্ল ডেভিড। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত আলফ্রেড নোবেলের ন্যায় জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশের গন্ডী ত্যাগ করে তিনি নিরপেক্ষ হতে পারেননি। তার বক্তব্যেই তার ইউরোপিয়ানদের প্রতি দুর্বলতার প্রভাব স্পষ্ট। অন্যথায় কেবল মাত্র ইউরোপীয় লেখকেরা আর্থিক পুরস্কারে বঞ্চিত হবেন, এ দুঃখ কেন? নোবেল পুরস্কার যদি ইউরোপিয় সহ সমস্ত রাষ্ট্রের লেখক সাহিত্যিকদের জন্য তাহলে অন্যান্যরাও নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু কার্ল ডেভিড এ সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে পারেননি।

(২)

অবশেষে ধার্য হয় যে ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীদের ধারণা ছিল যে প্রথম বৎসর পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লিও টলস্টয় ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেন না। আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত জল্পনা কল্পনাই নিরর্থক প্রমাণিত হয়। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে বিজয়ী রূপে ফরাসী কবি সুলি প্রুডহোমের নাম ঘোষিত হয়। স্বভাবতই বিশ্ব বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচন্ড সমালোচনা হয়। পুরস্কার প্রদানকারী রাষ্ট্র সুইডেনের ৪২ জন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এর বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ জানান।

কিন্তু নোবেল সমিতি সপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে লিও-টলস্টয়ের নাম যথাবিহিতভাবে প্রস্তাবিত না হওয়ার ফলেই তাকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়নি। কিন্তু সমিতির বক্তব্যর অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় পরবর্তী বৎসরেই। ১৯০২ সালে আলফ্রেড জনসন টলস্টয়ের নাম নিয়মমত প্রস্তাব করলেও পুরস্কার বিজয়ী হন জার্মান ঐতিহাসিক থিওডর মমসন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই ধার্য হয় যে সুইডিস অ্যাকাডেমি তাদের কর্তব্য অবহেলা করছেন অর্থাৎ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার নিরপেক্ষ নয়। টলস্টয় নোবেল পুরস্কারে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দায়ী নোবেল ফাউনডেনস-এর সচিব ওয়ারসেন। নোবেল সমিতির সদস্য অস্টারলিং-এর মতে। 'Academy could have of course repaired the damage the next year by honouring Tolstoy who by that time had been nominated in due form."

নিশ্চিতভাবে ওয়ারশেন মহাশয় টলস্টয়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তার মহান সাহিত্যিক প্রতিভাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি তার বিতর্কিত দর্শনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। লেখকের পরিচয় তাঁর সাহিত্য। ধর্ম, সমাজ সম্পর্কে তার বক্তব্য সম্পর্কে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার বিজয়ের গৌরব অর্জনের জন্য কোন লেখকের চিন্তাধারা নোবেল সমিতির সদস্যদের মনঃপূত হতে হবে এ ধরনের চিন্তা করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। কেবল বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরাই নোবেল সমিতির এই দুর্ভাগ্যজনক বক্তব্যকে টলস্টয়ের প্রতি অবহেলা বলে মনে করেননি, স্বয়ং নোবেল সমিতির সদস্য অস্টারলিং তার প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন,

"His critical estimate on Tolstoy in 1902 committee report correctly assessed both his merits and faults, though with great emphasis on the latter".(5)

একদিকে বিতর্ক লিও টলস্টয় বঞ্চিত হওয়ার কারণে, অপর দিকে ১৯০২ সালে নোবেল সাহিত্যে পুরস্কার বিজয়ী থিওডর মমসনকে কেন্দ্র করে। কারণ থিওডর মমসনের পরিচয় একজন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রূপে। এবং নোবেল সমিতিও তার পুস্তক "হিসটরি অব রোমের" জন্য এ সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু বিতর্কের বিষয় ইতিহাস কি সাহিত্য? আলফ্রেড নোবেলের উইলে উল্লিখিত বক্তব্য মতে পুরস্কার দেওয়া হবে 'লিটারেচারের' ক্ষেত্রে। কিন্তু লিটারেচারের মানে যদি ইতিহাস হয় তবে তার পরিধি বিজ্ঞাপন সাহিত্য অবধি বিস্তৃত হতে পারে। কারণ বিদেশে বিজ্ঞাপনের বক্তব্যকেও লিটারেচাররূপে গণ্য করা হয়। তবে এ বিতর্ক নোবেল সমিতিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে পুনরায় ইতিহাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘটনা ঘটে। এ বৎসর পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল। আলফ্রেড নোবেলের একটি শব্দ লিটারেচারের পরিধি পরবর্তীকালে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আজ অবধি চারজন দার্শনিককে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। যদিও দর্শনকে সাহিত্য রূপে গণ্য করা যায় কি না এ বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেনি। ১৯০৮ সালে দর্শনের জন্য পুরস্কার পান রুডলফ ইউকেন, ১৯২৮ সালে হেনরী বার্গসন, ১৯৫০ সালে বারট্রানড রাসেল,১৯৬৪ সালে ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে। ইতিহাস দর্শনের সাথে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার হস্তক্ষেপ করেছে নাটক ও নাট্য সাহিত্যে। ১৯১২ সালে প্রথম কোন নাট্যকারকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ঐ বৎসর পুরস্কার পান জার্মানীর হ্যাপ্টম্যান। পরবর্তীকালে আরো চার নাট্যকার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। তারা হলেন যথাক্রমে জ্যাক্বিয়েনটো বেনাভেনট ১৯২২, লুইজী পিরেনডেলো ১৯৩৪, গ্যাডস্টোন ও' নিল ১৯৩৬ ও জর্জ বার্নার্ড শ।

নাটক, ইতিহাস, দর্শন কোন দিনই পূর্ণরূপে সাহিত্যের পরিভাষায় আসতে পারে না। ১৯২৮ সালে দর্শন সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য হেনরী বার্গসন ঐ পুরস্কার পেলে এন্ডর অস্টারলিং স্বয়ং স্বীকার করেন,

"......It was one of the rare occasions when the purely literary line was abandoned."

দ্বিতীয়ত যদি দর্শনের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া সম্ভব তবে ভারতীয় দার্শনিক ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে পুরস্কার বঞ্চিত করা হয় কেন? কেবল ভারতীয় নয়, বঞ্চিত হয়েছেন অনেক ইউরোপীয় দার্শনিক ঐতিহাসিক, নাট্যকার। অবশ্য অনেকেই লিটারেচার সম্পর্কিত নোবেল সমিতির পরিভাষা মেনে নিয়েছিলেন। তবে সকলেই একমত যে যদি দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সাহিত্য হয় তবে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানও নিশ্চিতভাবে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য। কিন্তু ১৯৩৬ সালে পুনরায় বিতর্কের ঝড় দেখা যায়, ঐ বৎসর সাহিত্য পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত হয় সিগমন্ড ফ্রয়েডের নাম। সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রতিভা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এবং তার প্রস্তাবক ছিলেন রোমাঁ রোলাঁর ন্যায় বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ফ্রয়েডকে পুরস্কার বঞ্চিত করায় লিটারেচার শব্দের অর্থ আজও অজ্ঞাত রয়ে গেল। কেবল সিগমেন্ড ফ্রয়েডই নয়, বিশ্বের সর্বাধিক বিত্তশালী পুরস্কার বঞ্চিত হয়েছেন গোর্কী, গ্রাহাম গ্রীন, অসকার ওয়াইলডের ন্যায় অনেক বিশ্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপিয়ান সাহিত্যিক। গোর্কি সম্ভবত এ কারণেই বঞ্চিত হন যে তিনি বিদ্রোহী জনবাদী লেখক ছিলেন। গ্রাহাম গ্রীন সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং কোন রূপ আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। উক্ত বক্তব্যে কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ লেখকের আর্থিক প্রয়োজনীয়তাই যদি নোবেল পুরস্কারের মাপদন্ড হত তবে জর্জ বার্নার্ড শ কোনদিনই মন্তব্য করতেন না:

"The money is like a life belt thrown at a swimmer who has already reached the shore."

অবশ্য পরবর্তী কালে গ্রাহাম গ্রীন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লুন্ড কুইস্ট বলেন 'তিরিশ বৎসর পূর্বে আমি তার সাহিত্য কর্মে প্রভাবিত হয়েছিলাম। দি পোয়েম অ্যানড গ্লোরি ছিল তার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। কিন্তু বর্তমানে তার সাহিত্যের স্তর ক্রমশ পড়ে যাচ্ছে।'

এধরনের বক্তব্যে বক্তা স্বয়ং জড়িয়ে পড়েছেন। কারণ যদি গ্রাহাম গ্রীনকে যোগ্য ব্যক্তি মনে করতেন তবে তাকে পূর্বেই এ পুরস্কার দেওয়া হয়নি কেন? নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে অনেক সাহিত্যিকেরই স্তর পরবর্তী কালে পড়ে গিয়েছিল। আবার অনেকেই অতঃপর সাহিত্য জগতে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারেননি। অবশ্য এ প্রসংগে আমি পুনরায় ফিরে আসবো। তবে গ্রাহাম গ্রীন যদি কোন কালে পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন এবং সে সময় তাকে পুরস্কার না দিয়ে নোবেল সমিতি নিশ্চিতভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি, এ বক্তব্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অসকার ওয়াইলড প্রসংগে মন্তব্য করা হয় তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে। কারণ সমকামিতার অভিযোগে ১৮৯৫ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি জীবনের দুটি বৎসর এ কারণেই জেলে অতিবাহিত করেন। কিন্তু প্রশ্ন সাহিত্যের সংগে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের তুলনা কেন: সাহিত্যের ইতিহাস ও আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত অনেক সাহিত্যিকের জীবনেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে যা সমাজ মেনে নিতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত কবি বায়রন তার বিমাতার কন্যা অর্থাৎ ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মপাসাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শতাধিক নারীর সংগে তার শারীরিক সম্পর্ক ছিল।

১৯৮৩ সালের নোবেল পুরস্কার

শান্তির জন্য

এ বছর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পোলানডের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা লেখ ওয়ালেসা। ১৯৮০ সালে কয়েক মাসের যে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে পোলানড সরকার শ্রমিকদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার অধিকার স্বীকার করে নেয় সে আন্দোলনের নেতা ছিলেন ৪০ বছর বয়সী লেখ ওয়ালেসা। শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়ালেসা প্রচুর ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তারই স্বীকৃতি হিসাবে তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। ওয়ালেসা বন্দর এলাকার একজন বিদ্যুৎ মিস্ত্রি।

সাহিত্য

সাহিত্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বৃটিশ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম গোলডিং। গোলডিং এর বর্তমান বয়স ৭২ বছর। গোলডিং এর জীবনের প্রথম উপন্যাসটিই জনপ্রিয়তম এবং সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। তাঁর উপন্যাসগুলির মাধ্যমে তিনি এযুগের মানবিক অবস্থাকে আলোকিত করেছেন নতুন তাৎপর্যে। তারই স্বীকৃতি হিসাবে তিনি পেলেন নোবেল পুরস্কার। উইলিয়াম গোলডিং রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'দি স্পায়ার', 'ফ্রি ফল', 'পিংকার মারটিন', 'ডারকনেস ভিজিবল', 'রাইটস অব প্যাসেজ'।

অর্থনীতি

৬২ বছর বয়স্ক মারকিন অর্থনীতিবিদ জেরারড দেব্রু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার এবং সামগ্রিক ভারসাম্যের তত্ত্বকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। জন্মসূত্রে ফরাসি জেরারড দেব্রু ক্যালিফোরনিয়ার বারকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চাহিদা ও যোগানের টানাপোড়েনেই ভারসাম্য আসে, অ্যাডাম স্মিথের এই তত্ত্বকেই জেরারড আরো পরিশীলিত করেন। জেরারড দেব্রু মারকিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন ১৯৭৫ সালে।

ভেষজ

মারকিন জেনেটিকস বিজ্ঞানী শ্রীমতী বারবারা ম্যাকক্লিনটক ভেষজে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ৮১ বছর বয়স্কা এই অধ্যাপিকা গতিশীল জিন উপাদান আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পেলেন। আজ থেকে ৩০ বছর আগে ভুট্টা গাছের কোষে তিনি গতিশীল জিনঘটিত পদার্থের সন্ধান পান। ভাইরাস-বাহিত নানা রোগের গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর এই কাজ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যায় এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভব মারকিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর এবং অপর এক মারকিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলিয়াম ফাউলার। 'কীভাবে নক্ষত্রগুলির জন্ম হয় এবং নক্ষত্র গঠনের উপাদান কী, এই বিষয়ে গবেষণার' জন্যই এই দুই বিজ্ঞানীকে যুগ্মভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডঃ চন্দ্রশেখর ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ সি ভি রমনের ভাগ্নে। তিনি বর্তমানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভব দ্বিতীয় মারকিন বিজ্ঞানী যিনি 'নোবেল' পেলেন। এর আগে ১৯৬৯ সালে এই পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ হরগোবিন্দ খুরানা।

উইলিয়াম ফাউলার ক্যালিফোরনিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক। 'ব্রহ্মাণ্ডে রাসায়নিক পদার্থগুলির গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক বিক্রিয়াসমূহের তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণের' জন্য এই পুরস্কার পেলেন।

রসায়ন

'অধ্যাপক টাউবে অজৈব রসায়নে সমকালের সবচেয়ে সৃজনশীল কর্মীদের অন্যতম। বিশেষ করে ধাতব যৌগে ইলেকট্রন স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কাজের' জন্যই তাঁকে এ বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক হেনরি টাউবে ১৯১৫ সালে কানাডায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬২-তে স্ট্যানফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

সংকলন : পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

নারী মুক্তির যুগে সুইডেনের ন্যায় প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সাহিত্যিক, লেখকদের শাসনাধীন পুরস্কার সম্পর্কে নারী বিরোধী মনোভাব সম্পর্কিত অভিযোগ সর্বাধিক দুঃখজনক। ১৯৭৪ সাল অবধি নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিকদের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়। ১৯০১–৭৪ সালের মধ্যে পুরস্কার পেয়েছেন মোট ৭১ জন এবং এদের মধ্যে লেখিকাদের সংখ্যা মাত্র ৬, অর্থাৎ পুরস্কার বিজয়ী পুরুষদের সংখ্যা ৬৫। মোট পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা শতকরা হারে মাত্র ৮.৪। যে ৬ জন নারী এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, তারা হলেন, সুইডেনের সালমা ল্যাগারফ (১৯০৯), ইটালির গ্রাজিয়া (১৯২৭), নরওয়ের সিগরিও আনডসেট (১৯২৮), আমেরিকার পারল বাক (১৯৩৬), চিলির গাবরিয়েলা মিশত্রাল (১৯৪৫) ও পশ্চিম জার্মানীর নেলী সুইস (১৯৬৬)।

পুরস্কারের তালিকায় মহিলাদের অভাব বোধ করেছেন অনেকেই। কারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারী কোনদিনই পুরুষদের তুলনায় পেছিয়ে ছিল না। কিন্তু নোবেল সমিতিতে পুরুষদের প্রাধান্য থাকার ফলেই মহিলারা সুবিচার পাননি।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন নোবেল সমিতির সদস্যদের কি পুরস্কার গ্রহণের অধিকার আছে? কারণ যারা বিচারক তারা কি নিজেদের নাম নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পেরেছেন? সমিতির প্রাক্তন কিংবা পদেআসীন থাকাকালীন সদস্যরা পুরস্কার গ্রহণ করেছেন এমন ঘটনা নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকবার ঘটে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯১৬ সালে। পুরস্কার বিজয়ী হন সুইডেনের কবি ও ঔপন্যাসিক কারল হিভেনস্টন। অনেক ক্ষেত্রেই নোবেল সমিতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠলেও তারা কোন একটি কারণ দেখিয়েছেন যদিও তা মেনে নেওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমান পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ভিত্তিপূর্ণ। পুরস্কার প্রাপ্তির মাত্র ৪ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯১২ সালে কারল হিভেনস্টন সমিতির বারজন সদস্যর একজন রূপে বিবেচিত হন এবং তাকে

পুরস্কার প্রদানের কারণ রূপে উল্লেখ করা হয় যে, সুইডেনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই তাকে এ সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বক্তব্যটি নোবেল সমিতি কর্তৃক হিডেনস্টনকে পুরস্কার প্রদানের সময় প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লেখিত হয়

'In recognition of his significance as the leading representative of a new era in our literature.' (6)

প্রথমত কোন দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দাবি করলেই কি সে দেশের সাহিত্যিককে সম্মান দেওয়া হবে? তাহলে অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দাবি অগ্রাহ্য হয় কেন? এবং সমিতির সদস্যদের স্থান বিচারকের আসনে দেশ জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে তাদের স্থান। কিন্তু তারা কি নিজের মানসিকতায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতে পেরেছেন? সম্ভবত নয়, যদি তারা সত্য সত্যই নিরপেক্ষ হতেন তাহলে "in our literature" কথাটি কোনদিনই উল্লেখ করা হত না। নোবেল সমিতির সদস্যরা নোবেল পুরস্কারের নিমিত্তে বিবেচিত হতে পারেন না, তার প্রমাণ সমিতির অপর সদস্য এরিক কারলফেনট। ১৯১৯ সালে তার নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়। কিন্তু তিনি পদে আসীন থাকার কারণে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করায় অন্য কোন সাহিত্যিককে ঐ বৎসর পুরস্কার দেওয়া হয়নি। ১৯৩১ সালে এরিক পদত্যাগ করেন এবং পুনরায় তার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় তিনি সম্মান পান।

১৯৭৪ সালে নোবেল পুরস্কার যুগ্মভাবে পান নোবেল সমিতির দুই সদস্য এনইড জোনশন ও হেনরি মাটিনশন। এরিক কারলফেনটের বক্তব্য তাদের প্রভাবিত করেনি। নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তারা সে সময়ের মত সমিতির কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এর ফলে নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই।

আলফ্রেড নোবেলের উইলে উল্লিখিত বক্তব্য মতে পুরস্কার দেওয়া হবে পূর্বতন বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যিককেই পুরস্কারের আশায় দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা করতে হয়েছে। চিলির কবি পাবলো নেরুদা পুরস্কার পান ১৯৭১ সালে যদিও তার কবিতা ১৯৫০ সালেই সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল এবং ১৯৫১ সালে তার নামও প্রস্তাবিত করা হয়। ১৯২০ সালে পুরস্কার পান কারল স্পিটলর তার গ্রন্থ 'ওলিম্পিক স্প্রিং'-এর জন্য যদিও পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৯০০-১৯০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। 'দি পিজেনটস' গ্রন্থের জন্য রেমনট ১৯২৪ সালে পুরস্কার পান, যদিও গ্রন্থটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। 'বাডেন ব্রুকস' গ্রন্থের লেখক থমাস মার্নকে আরও অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়। ১৯০১ সালে বাডেন ব্রুকস প্রকাশিত হওয়ার ২৮ বৎসর পরে তিনি নোবেল সমিতির সহানুভূতি পান। এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কারণ অধিকাংশ লেখককে কোন পুস্তকের জন্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র জন্য নোবেল পুরস্কার পান এটি ভুল ধারণা, তিনি তার কবিতার জনাই এ সম্মান পান বলেই নোবেল সমিতি নিজেদের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। আজ অবধি যে ৮ জন সাহিত্যিককে কোন এক বিশেষ পুস্তকের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় তারা হলেন:

Theodor Mommsen—A History of Rome—1902, Carl Spittler—Olympic Spring—1920, Krut Hamsun—Growth of the Soil-1920, Wladyyslaw Reymout—The Peasants—1924, Thomas Mann—Budden Brooks—1929, John Galsworthy-The Forsyte' Saga—1932, Martin Du Gard—Ses Thifault—1937, Ernest Hemingway—The Old Man & the Sea—1954.

(৪)

নোবেল পুরস্কার কি পুঁজিবাদে বিশ্বাসী পুরস্কার কিংবা কমিউনিসট বিরোধী? রাজনীতি বিষয়ক বিতর্কটি নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে সর্বাধিক তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিচায়ক যা নোবেল পুরস্কারকে সম্পূর্ণ রূপে রাজনীতি প্রেরিত বলে মনে করতে বাধ্য করেছে। অবশ্য কমিউনিসট ও সমাজতন্ত্র বিরোধী বক্তব্যটি ভিত্তিহীন নয় বরং যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। টলস্টয়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তা পুনরায় দেখা দিল ১৯৩৩ সালে যখন প্রবাসী রুশ সাহিত্যিক পুরস্কার বিজয়ী বলে ঘোষিত হন। রুশ সরকার বিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন ও ফ্রানসে বসবাস আরম্ভ করেন। প্রবাসী সাহিত্যিক ইভান বুনিন সম্বন্ধে একটা কথাই বলা যায় যে তার অনেক আগেই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সম্ভবত রুশ লেখক হওয়ার জন্যই তিনি দীর্ঘদিন এ সম্মানের জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হন।

আরনেস্ট হেমিংওয়ে

পাস্তরনাক

বুনিনের নিজের ভাষায়—

"I had to wait a long time however before I acquired a certain repute. This was due to a number of occasions. I kept aloof from politics and never in my writings touched on anything connected with them; I belonged to no literary school, calling myself neither a defendent, a symbolist, a romantic, nor a realist, I assumed no false mask and wanted no gaudily tinted banner".(7)

বক্তব্যে নিজের রুশ নাগরিকত্বকে তিনি সরাসরি দায়ী না করলেও তিনি যে কারণের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন তা রাশিয়ার বিরোধিতা। রুশ ত্যাগ করার পরেই তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, রাশিয়ার নাগরিক হবার জন্য তিনি অবহেলার পাত্র হন। তিনি রুশ বিরোধী বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার পর ১৯৫৮ সনে রুশবাসী সাহিত্যিক বোরিস পাস্তরনাককে পুরস্কারের জন্য সম্মানিত করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের প্রথম ঘটনা এই প্রথম। তবে অনেকেই মনে করেন যে রাসিয়া সরকার পাস্তরনাককে পুরস্কার প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি। একথা সত্য যে পাস্তরনাকের নাম ঘোষিত হলে এবং তিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন মনে করে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ হয়। এমনকি রুশ লেখক সংঘ এক প্রস্তাব গ্রহণ করে পাস্তরনাকের সদস্য পদচ্যুত করেন। কারণ তারা মনে করতেন যে নোবেল পুরস্কার কমিউনিসট বিরোধী ও 'ডাঃ জিভাগো' পুস্তকে পাস্তরনাক রুশ সরকারের সমালোচনা করার জন্যই এই পুরস্কার পাচ্ছেন।

পাস্তেরনাকও এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হন যে তাকে রাজনৈতিক কারণে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। কারণ ১৯৩৩ সালে তার নাম প্রস্তাবিত হলেও তিনি এ সম্মান পাননি। ১৯৫৪ সালে তার উপন্যাস ডাঃ জিভাগো রাশিয়ায় প্রকাশিত না হওয়ায় চোরা পথে পাণ্ডুলিপিকে ইটালি প্রেরণ করা হয় এবং ইটালি হতেই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'তাই ১৯৫৮ সালে তিনি পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হলেও ৫ নভেমবর ১৯৫৮তে প্রাভদা পত্রিকায় জানান যে তিনি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে তার পুরস্কার রাজনৈতিক কারণে।' এ প্রসঙ্গে চাঞ্চল্যকর মন্তব্যটি করেন রোবার্ট পেনি:

"Writers arise! If you are Russian, if you're American, no matter what grind out an anti-Russian potboiler and get it translated into Swedish, and you're in. You get the Noble prize and the big boodle.' (10)

চেকফ গোরকির ন্যায় সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার না পাওয়ায় নোবেল পুরস্কারের বিরুদ্ধে সরাসরি রুশ বিরোধী হওয়ায় অভিযোগ আনা হয়। প্রসঙ্গে ইরভিন ওয়ালেসের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

"Seven Russians in sixty years in five categories, and not one of them, a clean-cut award. It's not just anti-communism. It's plain anti-Russianism"

"Ivan Bunin & Borish Pasternak, two Russian in sixty years. Even think who lived and work in Russia in those sixty years We all know about Tolstoy being turned down nine times. But what about Chekhov and Andreyev and

Artsybashev and Maxim Gorky who was around till 1936. Nothing." (11)

বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ও জনসংখ্যার দেশ বৃহত্তম রাষ্ট্রের কোন লেখক আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কারের যোগ্যরূপে বিবেচিত হননি। তাই লু সুনের ন্যায় মহান লেখকও এ সম্মানে বঞ্চিত। অথচ চীন সম্পর্কে তার রচনার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন পারল এস বাক যার বিরুদ্ধে চীনের বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন করার অভিযোগ উল্লেখযোগ্য। কারণ তার সাহিত্যে চীনের কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি নির্যাতন-এর কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। অত্যাচারে বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা ও শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবিক চরিত্র অনুপস্থিত। তাই অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মতে তার পুরস্কার সাহিত্যের নয়, বরং রাজনীতির দান। এ ধরনের অনেক কারণে নোবেল পুরস্কার পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক কিংবা কোন চাপের নিকট নোবেল সমিতি নতি স্বীকার করেনি, এ ধারণাও ভ্রান্ত। ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের লেখক জনপারস নোবেল পুরস্কার পেলে তার শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নানান সমালোচনা হয়। এবং স্বয়ং নোবেল সমিতির সদস্যগণ স্বীকার করেন যে দাগ হ্যামার-শিলড কর্তৃক চাপ সৃষ্টির জন্য নোবেল সমিতি তাকে পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে রাজনীতির জন্য দায়ী কেবলমাত্র নোবেল সমিতির সদস্যরা নয়, বরং অনেক দেশ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিনের ক্ষেত্রে রাশিয়া সরকারে আচরণ দুঃখজনক। একই রূপে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে সুইডিস নাট্যকার স্ট্রিনডবার্গ মন্তব্য করেন "The anti-Nobel prize is the only one I, would accept" মার্কসবাদী দার্শনিক জাঁ পল সাঁত্রেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নোবেল পুরস্কারকে আলুর বস্তা রূপে আখ্যায়িত করেন। তবে তিনি তার রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্যই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(৫)

এবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের জাতীয়তা সম্পর্কিত বিতর্কে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৯০৭ সালে এ সম্মান অর্জন করেন অ্যাংলো ইনডিয়ান কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং। বোম্বাই শহরে জন্ম গ্রহণ করেন কিপলিং তার জীবনের প্রথমটার অধিকাংশ দিনই কাটান ভারতে। এবং তার কবিতার অধিকাংশই ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারি ইংরেজদের সম্পর্কে। তাই কিপলিং এর নোবেল পুরস্কারে ভারতেরও দাবি আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কারে বিজয়ী প্যাট্রিক হোয়াইট এ সম্মানের যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে অস্ট্রেলিয়ার লেখক বলে বর্ণনা করা হয়। প্যাট্রিক হোয়াইটের জন্ম ও শিক্ষা দীক্ষা ইংল্যানডে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি রয়েল এয়ার ফোরসে যোগদান করেন ও মধ্যপ্রাচ্যে যান। তার রচনা 'হেপি ভেলি' ও 'দি লিভিং অ্যানড দি ডেড' এ সময়েই প্রকাশিত হয়। তাই প্যাট্রিক হোয়াইটের নোবেল পুরস্কারে অসট্রেলিয়ার না হয়ে ইংল্যানডের হওয়া উচিত। শ্যামুয়েল বার্কলেকে আইরিশ বলে উল্লেখিত করা হয়। যদিও এ সময়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্যারিসে বসবাস করেছিলেন অর্থাৎ যদি জন্মস্থান ও লেখকের পূর্বজীবনই প্রধান তবে কিপলিং-কে ভারতীয় বলে উল্লেখ করা উচিত।

বিংশ শতাব্দির নাট্যকার জর্জ বারনাড শ-কে গ্রেট ব্রিটেনের লেখক রূপে অভিহিত করা হলে আইরিশ নাগরিক সমাজ এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানান। বস্তুত লেখকের জাতীয়তা সম্পর্কে নোবেল সমিতি কোন স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেননি।

যে কোন পুরস্কারের অর্থ, হচ্ছে নবীণ লেখকদের উৎসাহ দান এবং আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল নোবেল পুরস্কার প্রতিভাবান নতুন লেখকদের পক্ষে আশীর্বাদ হতে পারত। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে পুরস্কারে বিজয়ীদের গড় বয়স ষাটের অধিক। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপ্তির এক দুই বৎসরের মধ্যেই লেখকের মৃত্যু ঘটে। নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে এশিয়ান বিশেষ ভাবে ভারতীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আজ অবধি কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথই এ সম্মান পেয়েছেন। সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন, প্রেমচাঁদ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নাম বঞ্চিতদের তালিকায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার পান তাঁর গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করে এবং তাঁর নাম প্রস্তাবক ছিলেন একজন বৃটিশ লেখক লনডন অ্যাকাদেমির সদস্য টমাস মুর। এ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ বিদেশি লেখকদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারবিজয়ী হলেও এ প্রসঙ্গে নোবেল সমিতি উঁচু মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। ১৯১৩ সালেও রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সংগে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক এমিলা ফগেটের নামও চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবেচিত হয়। সমিতির অধিকাংশ সদস্যই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সমিতির সদস্য হিভেনস্টন যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রসংগে নিজের বক্তব্য রাখেন। "I read them with great emotion, and I can't recall having seen for decades anything comparable in lyric poetry. It was a rare experience which I can compare only to the pleasure of drinking from a fresh clear spring....Now that we have finally discovered an idealistic writer of really great stature, we should not pass him by.

হিভেনস্টনের বক্তব্যে সন্তুষ্ট কিংবা বাধ্য হয়ে নোবেল সমিতি চূড়ান্ত পর্যায় রবীন্দ্রনাথের নাম মনোনীত করে। অবশ্য নোবেল পুরস্কার প্রদান কালে রবীন্দ্রনাথ প্রসংগে হারেলড জারন যে মন্তব্য করেন তা বাস্তবিকই দুভার্গ্যজনক।

"The anglo-Indian poet"

"Because of his profoundly sensitive fresh & beautiful verse, by which with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words a part of the literature of the West.(12)

রবীন্দ্রনাথকে অ্যাংলো ইনডিয়ান কবি বলে উল্লেখিত করার কারণ কি? কারণ রবীন্দ্রনাথ যে জন্মে জাত ভারতীয়, ভারতীয় পিতামাতার সন্তান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অপরদিকে অ্যাংলো ইনডিয়ান সম্পর্কে যে কোন প্রচলিত সংজ্ঞাই রবীন্দ্রনাথ প্রসংগে অযৌক্তিক। কিন্তু তবুও হঠাৎ তিনি নোবেল সমিতির দর্পণে অ্যাংলো ইনডিয়ান হলেন তা রহস্যাবৃত। দ্বিতীয়ত লিটারেচার অব ওয়েস্ট বলতেই বা কী বোঝান হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণ রূপে ভারতীয় দর্শন ও জীবন সম্পর্কে। পাশ্চাত্যের কোন ছায়া তার কবিতায় আছে এরূপ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের পরম শত্রুও মনে করেননি।

যাই হোক রবীন্দ্র পরবর্তীকালে কোন ভারতীয় লেখকই এ পুরস্কার পাননি। কারণ নোবেল সমিতির নিকট অনুবাদ করার কোন ব্যবস্থা নেই। 'সমিতির সদস্য লুন্ডকুইস্ট ভারত ভ্রমণে এলে এক হিন্দি লেখককে জানান যে তার জীবনের ইচ্ছা কোন ভারতীয় লেখককে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা কিন্তু ইংরেজীতে তাদের রচনা অনূদিত না হওয়াই মুখ্য সমস্যা। (13) তবে প্রশ্ন নোবেল সমিতির নিকট পুরস্কার প্রতিষ্ঠার আশি বৎসর পরও এরূপ কোন ব্যবস্থা নেই কেন? নোবেল পুরস্কার যখন সমস্ত ভাষার লেখক সম্প্রদায়ের জন্য তবে অনুবাদের ব্যবস্থা না রেখে নোবেল সমিতির পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অসম্ভবপ্রায়। ভারতীয় লেখকদের পুরস্কার বঞ্চিত হবার কারণ যে রবীন্দ্র পরবর্তীকালে কোন ভারতীয় ব্যক্তি নোবেল পুরস্কারের জন্য কোন লেখকের নাম প্রস্তাবের অধিকার রাখেন না। সমিতির নিয়মানুযায়ী যারা নাম প্রস্তাবের অধিকার রাখেন সে যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোন ভারতীয় আসেন না। স্বাভাবিক ভাবেই সমিতির নিকট ভারতীয় লেখককে তুলে ধরা এক সমস্যা। বস্তুত ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশে প্রচারের দায়িত্ব আমাদের করতে হবে। বিদেশে ভারতীয় সাহিত্য প্রচারের দায়িত্ব মুখ্য রূপে ভারতীয় দূতাবাসসমূহের। কিন্তু এনিয়ে তারা কোন চিন্তা ভাবনা করেন এরূপ মনে হয় না।

এশিয়া দেশসমূহে নোবেল পুরস্কারের সম্পর্কে সকলেরই ধারণা পালটাতে আরম্ভ করেছে। এবং তৎসংগে ইউরোপেও নোবেল পুরস্কারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। জন স্টেইবেক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হলে আমেরিকায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং অনেক সংবাদ পত্র নোবেল সমিতির উক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানায়নি। উইলিয়ম ফকনারের ন্যায় বিশিষ্ট সমালোচক পুরস্কারবিজয়ী লেখককে সাহিত্যিক না বলে সাংবাদিক রূপে অভিহিত করেন। এ প্রসংগে শোনা যায় নোবেল সমিতির বিবেচনা স্বয়ং লেখকের আশার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ তিনি কোনদিনই এ পুরস্কারের আশা করতে পারেননি। ১৯৩০ সালে সিংকলেয়র লুইস নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হলে গীলবার্ট কীথ, যে বি প্রীস্টলি তীব্র প্রতিবাদ জানান। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করে স্বয়ং লুইস স্বীকার করেন,

"there were other American writers who were equally if not more qualified for and deserving the prize."

বিতর্ক হয়ত এমন এক পর্যায় দাঁড়াবে যে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার না পাবে এশিয়ানদের নিকট মর্যাদা, না ইউরোপীয়দের নিকট। এবং নোবেল পুরস্কারের মূল্য যে কোন দেশের সাহিত্যে পুরস্কারে মতই একটি বিশেষ গন্ডিতে আবদ্ধ থাকবে। ☐

বিশেষ রচনা

ভারতবর্ষে বিপ্লব কি আসন্ন?

জহর সেন

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে 'বিপ্লব' কথাটি বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। দেশি এবং বিদেশি সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদরা এই বিরাট জনসংখ্যার দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। বিশেষত এখানকার অপরিসীম দারিদ্র ও শোষণের পরিপ্রেক্ষিতেই এ প্রশ্নটি এসেছে। বস্তুত বিপ্লবের চেষ্টাও হয়েছে কয়েকবার। তবে তা ছিল তেলেঙ্গানা বা কাকদ্বীপের মত আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ। নকশালপন্থীরা সারা ভারতেই বিপ্লবের নিজস্ব তত্ত্বও ছড়াতে পেরেছিলেন। এমনকি জয়প্রকাশজীও নিজের আন্দোলনকে বলেছিলেন 'সর্বাত্মক বিপ্লব'। কিন্তু তার সামান্যতম স্পর্শ আপামর মানুষের মনে লাগেনি। তাহলে সেই সত্যিকারের সার্বিক বিপ্লব কবে হচ্ছে? আদৌ সম্ভাবনা আছে কি? সে প্রসঙ্গেই এই তথ্যনির্ভর আলোচনা।

ফরাসি বিপ্লবের উত্থালগ্নের সেই বহুশ্রুত ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সম্রাট ষোড়শ লুইকে একজন প্রাসাদরক্ষী প্রথামত অভিবাদন করেননি। অবাক হয়ে ফরাসি সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি বিদ্রোহ? প্রাসাদরক্ষীর উত্তর : না, এটা বিপ্লব। আমরা জানি না, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পার্থক্য প্রাসাদরক্ষীর জানা ছিল কি না। একজন বরেণ্য ঐতিহাসিকের মতে সমাজ যখন হাই-জামপ দেয়, তখন বলি বিদ্রোহ এবং যখন লং-জামপ দেয়, তখন বলি বিপ্লব। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীন ভারতেও আমরা বেশ কয়েকবার হাই-জামপ দেখেছি। কিন্তু লং-জামপ? এই নিয়েই যত তর্কবিতর্ক। ভারত স্বাধীন হবার এক বছর পরেই তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পারটি মনে করেছিল ভারতে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত। সত্তরের দশককে যারা মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তারাও ভেবেছিলেন ভারতে বিপ্লব এসে গেছে।

প্রশ্নটা নতুন করে তুলেছেন একজন নেহরু-অনুরাগী কানাডীয় মেগাস্থিনিস। তিনি হলেন 'এনভয় টু নেহরু' গ্রন্থের লেখক এসকট রিড। কানাডার হাই কমিশনার রূপে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে বিদায় নেবার সময় তিনি এদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ তৈরি করেছিলেন। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি তিনি সেই বিবরণের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এই বিবরণ ও তার পুনর্মূল্যায়ন স্বাধীন ভারতবর্ষের আলো আঁধারকে উন্মোচিত করেছে।

আঁধারের রূপ

১৯৫৭ সালে এসকট রিড ভেবেছিলেন ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে জওহরলাল নেহরু তাঁকে বলেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু নয়, স্থাণু। তাঁর মনে হয়েছিল এদেশের গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু মানুষকে কর্মবিমুখ করেছে। নেহরু সরবে প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষ গো-হত্যা বা বানর-হত্যাকে মহাপাপ মনে করে। রিড প্রশ্ন তুলেছেন : এই মানসিকতা থাকলে অগ্রগতি কী করে সম্ভব? সদাসহিষ্ণু মনোভাব মানুষকে ক্লীব করে তুলেছে। জঘন্যতম অপরাধ মানুষ নীরবে মেনে নেয়। সব শ্রেণীর মানুষ এক নিষ্ক্রিয় জড়ত্ব ও নিস্তেজ তামসিকতায় নিমগ্ন। সামন্ততন্ত্রের দাপট এখনও অব্যাহত। দুর্নীতি সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ন্ত্রী। দরিদ্র কৃষক ক্ষুধার্ত, পুলিশের হাতে নির্যাতিত এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমলাবাহিনীর দ্বারা শোষিত। এই হল ভারতে আঁধারের রূপ।

আলোকের নিশানা

আলোকের সন্ধানও আছে বৈকি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভারতবর্ষ অনেক বেশি প্রকৃতিদত্ত অখণ্ডতা পেয়েছে। বৃটিশ আমলে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, শাসনযন্ত্র ইত্যাদি মারফৎ ঐক্যবোধ পরিপুষ্ট হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল ঐক্যসূত্র সম্বন্ধে ভারতবাসী সচেতন। এসব উত্তরাধিকার স্বাধীন ভারতবর্ষের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ করেছে।

স্বাধীন ভারতে প্রথম দশ বছরের অগ্রগতিও উপেক্ষণীয় নয়। অনেক সামাজিক ক্ষত দূর হয়েছে। সামাজিক অর্থে জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ অপসৃয়মাণ, যদিও এখন জাতিভেদ প্রথা রাজনৈতিক তাৎপর্য অর্জন করেছে। নারীর সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। বিদ্যালয়গামী ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। দশ বছরের রাজনৈতিক কৃতিত্বও অভাবনীয়। পাঁচ শত দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি জাতীয় ঐক্যের পথে এক অনন্য পদক্ষেপ। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির বিন্যাস সাধিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কুশলতা অবিসংবাদিত। জাতীয় সরকারের ভিত্তি গণসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সব হল তাঁর ১৯৫৭ সালের ভাবনা-চিন্তা।

১৯৮০-র ভাবনা

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে এসকট রিড হতাশায় কাতর হয়েছেন। গ্রামীণ ভারতের শতকরা চল্লিশ ভাগ দারিদ্র মানুষের অবস্থার বিন্দুম
উন্নতি ঘটেনি। বরঞ্চ তাদের দুর্গ
আরও বেড়েছে। এখন কৃষক আর
বেশি ক্ষুধার্ত, পুলিশ আরও বে
উৎপীড়ক এবং সরকারি কর্মচা
আরও বেশি দুর্নীতিপরায়ণ। জ
সংখ্যা বৃদ্ধির হার ভীতিপ্রদ, অথ
কর্মনিয়োগের ক্ষেত্র সীমিত। ব
মাঝারি এবং ছোট কল কারখান
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৬.৫ মিলিয়
কিন্তু গ্রামীণ কুটির শিল্পে নিযু
লোকের সংখ্যা ৪৫ মিলিয়ন। এম
তারতম্য বজায় থাকলে বেকারত্বে
অবসান অসম্ভব। একটি সরকা
বিবরণে বলা হয়েছে প্রাথমিক স্তর
লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, এমন ছাত্র
সংখ্যা শতকরা আটচল্লিশ, আ
একটি বিবরণের হিসাবমত শতক
ষাট। মোট জনসংখ্যার বিপুল ভা
শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত
দুর্নীতির সুদীর্ঘ বাহু শাসনযন্ত্র
নীতিভ্রষ্ট করে রেখেছে। অর্থপ্র
লাইসেনস ও পারমিটদানে সরকা
খামখেয়ালিপনা মাত্রা ছাড়ি
গেছে। দৈনন্দিন সরকারি কা
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অকার
অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিতাই বে
চলেছে। এসব সত্ত্বেও ভারতবর্ষে
অবস্থা সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল
কারণ, সাধারণ নির্বাচনগুলি অবাধ

খাঁটি বিদ্রোহভাজা
কচুরী
বিরোধীদের
প্রচারে ভুলবেন না

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন র্যন্ত রাজনীতিতে সেনাবাহিনী স্তক্ষেপ করেনি। এখানে এখনও কোন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেনি। কৃষি ও শিল্পের সন্তোষজনক বকাশের ক্ষেত্র অনুকূল, জাতীয় ংহতিচেতনা সুদৃঢ়।

বিপ্লবের সম্ভাবনা

ভারতবর্ষে বিপ্লব বা সশস্ত্র াণঅভ্যুত্থান কি আসন্ন? কোথাও কি এর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে? ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শহর ও গ্রামের দরিদ্র ানুষ সংগঠিত শ্রেণী ভিত্তিক আন্দোলন যদি গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে তারা অর্থনৈতিক বকাশের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে। কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে অর্থ-নৈতিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ানুষ বিপ্লবের পথে পা বাড়াবে। াণ চোপরা লিখেছেন, দরিদ্রের াতে জমি হস্তান্তর না হলে বা মি হস্তান্তর ফলপ্রসূ না হলে পাঁচ ছরের মধ্যে এক বিরাট বিস্ফোরণ টবে ('এ ব্রেভ নিউ প্ল্যান–বাট ইল ইট ওয়ার্ক?' ইন্টার-াশনাল ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ১৯৭৮/৩–৪)। ভি কে আর ভি রাও মনে করেন যে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ন্যায় বিচার ও জনহিতৈষী প্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব, শ্রেণী বিরোধ ও জাতি বিদ্বেষ। এর অবসান না হলে সমগ্র দেশ এক অরাজক অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হবে ('দি সিডস অব র‍্যাডিকল চেইঞ্জ প্রাগুক্ত) ফ্রানসাইন ফ্রানকেল বলেছেন যে রাজনৈতিক দলগুলি যদি গ্রামে কর্মী পাঠিয়ে শ্রেণী-সংগঠন গড়ে না তোলেন, তাহলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের কোন সম্ভাবনাই আশা করা যায় না ('ইনডিয়াজ পলিটিকাল ইকনমি ১৯৪৭–৭৭ : দি গ্র্যাজুয়াল রেভোল্যুশন,' প্রিনসটন, ১৯৭৮)। ফোর্ড ফাউনডেশনের ডগলাস এনশমিংগার গ্রামীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে সংগঠনপ্রবণতা লক্ষ্য করে খুশি হয়েছেন (ইনডিয়ান একসপ্রেস, মারচ-এপরিল ১৯৭৯) আর এইচ ক্যাসেন সতর্ক করে বলেছেন ভারতের গ্রামে গ্রামে দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা না হলে, শুধুমাত্র অত্যাচারী শাসনদণ্ড দিয়ে অসন্তোষ স্তব্ধ করা যাবে না। এর মানে এই নয় যে দু'এক দশকের মধ্যে বিপ্লব অনিবার্য। কোন নির্ভরযোগ্য বিকল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশায় উদ্বেলিত না হলে মানুষ বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দেবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে কোন নির্ভরযোগ্য বিকল্প আদৌ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না ('ইনডিয়া : পপুলেশন, ইকনমি, সোসাইটি', ম্যাকমিলান, ১৯৭৮)। এসব বুদ্ধিজীবীদের মতামত অনুধাবন করে এসকট রিড উদ্বিগ্ন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা একটু অন্য ধরনের। তিনি মনে করেন ভারতে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্র কোন না কোনভাবে সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে। তাদের সুযোগ–সন্ধানী প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ।

বিপ্লব ঘটল না কেন?

রিড প্রমুখ কূটনীতিবিদ এ প্রশ্ন তোলেন নি। প্রশ্নটি মারকসবাদীদের। নীতিগতভাবে মারকসবাদীরা বিশ্বাস করেন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতবর্ষের মারকসবাদীরাও কি এই প্রত্যয়ে নিবেদিত–প্রাণ? এদেশে অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিপ্লব ঘটছে না কেন, তা নিয়ে তাঁদের অনেকেই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনজনের মতামত এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

সত্তরের দশকে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের অগ্নিগর্ভ অবস্থার উপর আলোকপাত করে লনডনের 'দি লেফট রিভিউ' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে প্রবন্ধগুলি 'একসপ্লোশন ইন এ সাব-কনটিনেনট' (পেংগুইন, লনডন, ১৯৭৫) শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সংকলিত একটি প্রবন্ধ হল মেঘনাথ দেশাই লিখিত 'ইনডিয়া : এমারজিং কনট্র্যাডিকশনস অব স্লো ক্যাপিটালিসট ডেভেলপমেনট'। প্রবন্ধের শুরুতে দেশাই বলেছেন যে নিদারুণ দুর্গতি সত্ত্বেও তা প্রতিকারের জন্য মানুষ নানা কারণে বিপ্লবমুখী হচ্ছে না। ধর্মীয় বিরোধ এখানে মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে। সাধারণ মানুষ এক শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যবস্থার জোয়ালে বাঁধা পড়ে আছে। সেক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সমাজবিন্যাস এখনও টিকে আছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অতি আধুনিক কলাকৌশল আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিধর ও কার্যকর।

প্রবীণ মারকসবাদী পণ্ডিত হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের আক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত করছি। 'মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ, ন চ ধূমায়িতং চিরং–সর্বদা নিজের মনের মধ্যে ধোঁয়া ঘুরতে থাকার চেয়ে মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠা অনেক ভাল। মহাভারতের এই কথা অনেকের মনে আসবে। আমাদেরও চেতনায় বিদ্রোহের প্রদীপ্তি আসবে – কিন্তু কবে? এ প্রশ্নের উত্তর আজও নেই। মান্ধাতাপন্থী ভারতবর্ষে তাই আজ পর্যন্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। যে ক্লৈব্য পরিহার করার সমুজ্জ্বল মন্ত্র অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছিলেন 'কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, তা হয়ত আজও অশ্রুত। খণ্ড, ক্ষুদ্র অথচ বহ্নিমান সাহসিকতার বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সাম্প্রতিক বিবরণীতে, কিন্তু সংহত, ব্যাপক, গভীর জাগৃতি ঘটেনি।' এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, 'হয়ত ভবিতব্যে আস্থা, নিয়তিকে অবাধ্য, অকাট্য জেনে সর্বদা স্বীকার করা আর সনাতন সমাজের নিগড়ে নিজেকে বেঁধে রাখার নিত্যকর্মপদ্ধতিতে বহু যুগ ধরে অভ্যস্ত থাকার এটা ফল।' ('কলকাতা নিয়ে', পরিচয়, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৬)

অনুরূপ ভাবনা উচ্চারিত হয়েছে এ আর কামাথ লিখিত 'এসেইজ অন সোসাল চেইনজ ইন ইনডিয়া' গ্রন্থে। অধ্যাপক কামাথ পুনেতে গোখেল ইনসটিটিউট অব পলিটিকস অ্যানড ইকনমিকস-এর জয়েনট ডিরেকটর। তিনি নিজেকে প্রকৃত মারকসবাদী মনে করেন। তিনি বলেছেন, সমাজ বিশ্লেষণের যে আদিকল্পই আমরা ব্যবহার করি না কেন, ভারতবর্ষে শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি সুদূর স্বপ্নমাত্র। এর কারণ অগণিত মানুষের মন থেকে ধর্মের আত্যন্তিক প্রভাব নির্মূল করা সহজসাধ্য নয়। এদেশে প্রগতিবাহী শক্তি এখনও দুর্বল। যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী সুসংগঠিত না হচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ না হচ্ছে, ততদিন বৈপ্লবিক সমাজ-রূপান্তর অসম্ভব। ফলে এখনও দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে ব্যাপক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে।

সমাজের হাই-জামপ ও লং-জামপই পরিত্রাণের একমাত্র পথ, একথা বহু অগ্রচারী চিন্তাবিদ মানেন না। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা এখানে আলোচ্য নয়। তবু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রান্তসীমার সমাজ থেকে আবির্ভূত ইতিমুখী নেতৃত্বের দীপ্যমান সম্ভাবনার বার্তা শুনিয়েছেন অরুণ শৌরি। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'পরিবর্তন' পত্রিকার এ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যায় একটি জ্যোতিষ্মান শিরোনামে– 'তবু আশা জেগে রয়'। □

সেরা শেভিং-এর আনন্দ!

প্রতিদিন··· দিনের পর দিন শেভিং-এর ঝামেলা থেকে আপনার রেহাই নেই।

তাই, এই নিরানন্দময় ব্যাপারটিকে আনন্দময় করে তুলতে আপনার চাই — স্পর্শে আর ঘ্রাণে কোলোনের স্নিগ্ধ সজীবতা!

হ্যাঁ, কোলোনের স্নিগ্ধ সজীবতা দিয়েই সেরা শেভিং হয়···গোদরেজের এই তো পরিচয়!

Godrej Menthol Mist LATHER SHAVING CREAM

আপনার পছন্দের জন্যে মেন্থলও পাবেন

rich foam

গোদরেজ শেভিং ক্রীম

আপনার সুপ্রভাতের সুরভিত আনন্দ!

CASGS-161-244 BEN

পাঞ্জাবে হিংসাত্মক ঘটনার দায়িত্ব কোন শিখ নেতাই নিতে চাইছেন না

পাঞ্জাব ঘুরে এসে তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

গত পনের মাস আগে শুরু হয়েছিল অকালি দলের আন্দোলন। পনের মাস কেটে যাওয়ার পরও এই আন্দোলন স্তিমিত হয়নি বা পুরো-পুরি দমন করা সম্ভব হয়নি এই আন্দোলনকে। বরং এই সময়ের মধ্যে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের হিংসাত্মক মনোভাব গড়ে উঠেছে—ঘটেছে অনেকে খুন জখম-লুঠতরাজের ঘটনা, ঘটেছে অনেক অন্তর্ঘাত। এই আন্দোলনের জেরস্বরূপ প্রাণ হারিয়েছেন বহু লোক। তবু এই আন্দোলনের জঙ্গী মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নানা মহল থেকে চেষ্টা চালান হয়েছে কথাবার্তা, আপস আলোচনার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে প্রশমিত করার—পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনার। আলোচনা অনেক হয়েছে এবং অধিকাংশ আলোচনাই ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি মহল, আন্দোলনকারী ও অন্যান্য রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক নানা মহল থেকেই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে অনেক রকম। তবু আন্দোলন যে পথে, যে ভাবে চলছিল তার থেকে একচুলও সরে আসেনি।

পাঞ্জাবে এই ক মাসে প্রায় দুশোটার মত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। খুন হয়েছেন প্রায় ৩৫ জন নিরংকারী, ৪০ জন হিন্দু এবং ১৮ জন পুলিশ কর্মচারী। খুন হওয়া পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে আছেন একজন ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেল, তিনজন সাব-ইনসপেকটর এবং পাঁচজন ইনসপেকটর। ছজন হেড কনসটেবল এবং চারজন কনসটেবল। পুলিশের প্রাথমিক রিপোরটে বলা হয়েছে এর সবকটিই উগ্রপন্থী শিখদের কাজ।

এইসব হিংসাত্মক ঘটনায় শুধু যে পুলিশ বা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ মারা গেছেন এ মনে করাও ভুল। নিহত হয়েছেন শিখেরাও। পুলিশেরই প্রাথমিক রিপোরটে বলা হয়েছে ৩০ জন শিখ এইসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আর এই ২০০ হিংসাত্মক ঘটনার মধ্যে আছে প্রায় ৫০টি বোমা অথবা গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা। এর মধ্যে আবার দুটো ছোঁড়া হয়েছিল পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দরবারা সিংকে লক্ষ্য করে। সৌভাগ্যবশত ঐ দুটো ঘটনাতেই দরবারা সিং বেঁচে যান। এসব ছাড়াও চণ্ডিগড়, লুধিয়ানা, দিললিতেও অনেক জায়গায় বোমা এবং গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। শুধু বোমা গ্রেনেড ছোঁড়া অথবা খুনজখমের ঘটনা নয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই পনের মাসের ভেতরে দুটো বিমান ছিনতাই-এর ঘটনাও ঘটেছে। দুটি প্লেনকেই ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি প্লেনের ছিনতাইকারী অমৃতসর এয়ারপোরটে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এর সংগে যোগ হয়েছে দিললিতে দোকান লুঠ, গ্রামে-গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে লুঠপাটের ঘটনাও।

পাঞ্জাবের এই ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখবার জন্যই গত ১২ থেকে ১৭ অকটোবর অমৃতসর, চণ্ডিগড়, লুধিয়ানা, ভাতিণ্ডা প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে এলাম। এই সফরের সময় বিভিন্ন জায়গায় অকালি দলের বিভিন্ন নেতা এবং কর্মীদের সংগে কথা বলে বুঝতে পারলাম, আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে এসে অকালি দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আন্দোলন এখন চরমে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখতে পেলাম সারা পাঞ্জাব জুড়ে এখনও চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সেখানকার সাধারণ মানুষ কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারেই নিরুত্তাপ। তাদের অকালি আন্দোলন সম্পর্কে কোনরকম মাথাব্যথাই নেই। কারণ, গত পনের মাসে প্রকাশ সিং বাদল, সুরজিৎ সিং বারনালা, বলবন্ত সিং এবং রবি ইন্দার সিং-এর মত মধ্যপন্থী অকালি নেতারা দিললিতে আপস-আলোচনা চালিয়েও শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারেননি। তাই এখন অকালিদেরই অনেকে ভাবছেন আন্দোলনের পথ কী হওয়া

পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন সমর্থন করি : লঙ্গোয়াল

পরিবর্তন : পাঞ্জাবের বর্তমান অবস্থার সমাধানের উপায় কী?

লঙ্গোয়াল : সরকার যদি আনন্দপুর সাহিব-এর উত্থাপিত দাবিগুলো মেনে নেন তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

পরিবর্তন : পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

লঙ্গোয়াল : রাষ্ট্রপতি শাসনকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সেই সংগে পাঞ্জাবকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা মেনে নিতে পারছি না। দরবারাকে সরালেই সমস্যার সমাধান হবে না। সরকারকে আমাদের দাবিগুলোও মেনে নিতে হবে। তবে একথা ঠিক দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু লোককে সরান হয়েছে।

পরিবর্তন : পাঞ্জাবে শিখ-হিন্দু সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? উগ্রপন্থী আন্দোলন সম্পর্কেই বা আপনার মতামত কী?

লঙ্গোয়াল : কংগ্রেস (ই)-ই এখানে হিন্দু আর শিখদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করছে। উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। কংগ্রেস (ই) যেসব অঞ্চলে প্রাধান্য পাচ্ছে সেখানেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটেছে।

পরিবর্তন : রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

লঙ্গোয়াল : আমরা রাজ্যের হাতে স্বায়ত্তশাসন এবং আরো ক্ষমতা চাই। বিদেশ নীতি, প্রতিরক্ষা এবং বিদেশি মুদ্রা ছাড়া অন্য সব ক্ষমতাই রাজ্যের হাতে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

পরিবর্তন : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

লঙ্গোয়াল : শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সমর্থকরা আমাদের ঠকিয়েছে। কাজেই আমাদের ধর্মযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় হবে আরো জঙ্গী। রেল রোকো এবং কাম রোকো আন্দোলনের সাফল্যের পর যাতে আমাদের ভেতর কোন ধরনের আত্মসন্তুষ্টি না এসে পড়ে তার জন্যই আমাদের আরো জঙ্গী আন্দোলন করা দরকার।

সাক্ষাৎকার : তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শিখরা বরাবরই হিন্দুদের রক্ষা করেছে : ভিন্দ্রনওয়ালে

অন্যতম অকালি নেতা ভিন্দ্রনওয়ালের সংগে পরিবর্তন-প্রতিনিধির এই একান্ত সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছে গুরু নানক নিবাসে। সাক্ষাৎকার নেবার সময় সশস্ত্র শিখ আন্দোলনকারীরা পরিবর্তন-প্রতিনিধি ও ভিন্দ্রনওয়ালেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন।

পরিবর্তন : পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন ঘোষণা করা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

ভিন্দ্রনওয়ালে : সরকার একমাত্র পাঞ্জাবকেই উপদ্রুত অঞ্চল বলে মনে করে কেন? আসাম, উত্তর প্রদেশ, হায়দরাবাদ, দিল্লি সবখানেই তো গন্ডগোল লেগে আছে। সেখানে তো এরকম কিছু করা হল না। তার কারণ একটাই, সরকার চায় শিখদের দমিয়ে রাখতে। দেখুন যখন প্রায় ১৫০ জন শিখ পুলিশের গুলিতে মারা গেল তখন পাঞ্জাবকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হল না, অথচ যখন মাত্র কিছু শিখ বা হিন্দু মারা গেল তখনই পাঞ্জাবকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হল।

পরিবর্তন : আপনাদের একটা দাবি ছিল যে, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দরবারা সিংকে তাঁর পদ থেকে সরান হোক। তিনি তো এখন সরে গেছেন। এখন কি আপনারা আপনাদের আন্দোলন থামাতে রাজি আছেন?

ভিন্দ্রনওয়ালে : যখন ১৫০ জন শিখ গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তখন দরবারাকে সরান হয়নি। কিন্তু যখন কিছু শিখ-হিন্দুকে বাসে খুন করা হল তখনই দরবারাকে সরান হল। এটাকে তো আমাদের দাবি মেনে নেওয়া বলে না।

পরিবর্তন : সন্ত্রাসবাদীদের দমনের জন্য যদি পুলিশকে স্বর্ণমন্দিরের ভেতর ঢুকতে হয়, তবে তা কি আপনি সমর্থন করবেন?

ভিন্দ্রনওয়ালে : পুলিশ প্রবেশ করতে চাইলে তখনই তার উত্তর দেব।

পরিবর্তন : পাঞ্জাবে যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

ভিন্দ্রনওয়ালে : শি[illegible]দিনই সন্ত্রাসবাদী [illegible] হিংসার প[illegible] কিন্তু শিখে[illegible] ঠিকমত আদায় ক[illegible]

পরিবর্তন : পাঞ্জা[illegible] হিন্দুদের ভেতর যে সম্পর্ক বিষয়ে আপনার কী ধারণা?

ভিন্দ্রনওয়ালে : এখানে শিখেরা সবসময়ই হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। যখন ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী চরণ সিং বাজপেয়ীদের মত হিন্দু নেতাদের কারাগারে ভরেছিলেন, তখন কিন্তু কোন হিন্দু এখানে প্রতিবাদ জানায়নি। অথচ সমস্ত শিখ এর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। এই স্বর্ণ মন্দির থেকেই সেই বিক্ষোভের জন্ম হয়েছিল। প্রায় ৪০ হাজার শিখ কারাবরণ করেছিল। কিন্তু এখন, একজন হিন্দুও আমাদের দাবি সমর্থন করছে না। এটা খুবই দুঃখের।

পরিবর্তন : অকালি দলের বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং আন্দোলন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

ভিন্দ্রনওয়ালে : ওরা সকলেই তো সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে রাখতে চান, কোন বড় রকমের ঝুঁকি [illegible]ওয়ার সাহস ওদের নেই। বরং [illegible]পাল্টা কথা বলে ওরা এক[illegible] আন্দোলন সম্পর্কে ভ্রান্ত [illegible]রণার সৃষ্টি করছেন, অন্যদিকে [illegible]ন্দোলনকারীদেরও ক্ষতি কর[illegible]ছেন।

সাক্ষাৎকার : তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

উচিত-হিংসার না অহিংসার?

শিখদের দুই প্রধান রাজনৈতিক নেতা হলেন অকালি দলের দুই সন্ত-সন্ত জারনাইল সিং ভিন্দ্রনওয়ালে এবং সন্ত হরচান্দ সিং লংগোয়াল। সন্ত হরচান্দ সিং হলেন আকালি দলের প্রধান। তিনি নিজেকে অহিংস আন্দোলনের অনুগামী বলে দাবি করলেও, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারেননি এবং সেই পথ থেকে শিখদের ফেরাতেও পারেননি। অপরদিকে ভিন্দ্রনওয়ালে দাবি আদায়ের জন্য পুরোপুরি সন্ত্রাসের পথই পছন্দ করেন। লংগোয়াল এবং ভিন্দ্রনওয়ালের মধ্যে এই মতপার্থক্য এখন খুব পরিষ্কার। লংগোয়াল দাবি করেন যে, তিনিই একমাত্র সন্ত। এমনকি লংগোয়াল একথাও বলেছেন ভিন্দ্রনওয়ালে অকালিদলের সদস্যই নন। মৃদুভাষী, শান্তস্বভাবের লংগোয়াল যা বলেন, ভিন্দ্রনওয়ালে তার ঠিক উল্টো কথাই বলেন। লংগোয়াল বলেন, হিন্দু, মুসলিম, শিখ সকলেরই পাঞ্জাবে বসবাস করার অধিকার আছে। অথচ ভিন্দ্রনওয়ালে বলেন, হিন্দুরা শিখদের ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। তাই অকালিদের আন্দোলন সব সময় অহিংসার পথে নাও এগোতে পারে। কারণ শিখদের গুরু অবিচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ভিন্দ্রনওয়ালে দাবি করেন, এইজন্যই শিখরা অস্ত্রের পূজারী।

দুই সন্তের এই পরস্পরবিরোধী উক্তি এবং পাঞ্জাব সমস্যা কেন সমাধান করা যাচ্ছে না, এর কি-ই বা কারণ, এসব জানতেই গত ১৩ অকটোবর গিয়েছিলাম স্বর্ণমন্দিরে দুই সন্তের সন্দর্শনে। আমার পথ প্রদর্শক ছিলেন একজন শিখ যুবক, যিনি এই দুই সন্তেরই ইনটারপ্রেটর হিসেবে কাজ করে থাকেন। এই শিখ যুবক এক সময় কলকাতার একজন ট্যাকসি চালক ছিলেন। এই যুবকটির সংগে স্বর্ণমন্দিরে ঢুকেই আমার প্রথমে যা মনে হল তা হল, এ কি কোন মন্দিরে ঢুকছি, না কোন দুর্গে ঢুকছি? প্রত্যেকটা দরজায়, প্রত্যেকটা ঘরের সামনে স্টেনগানধারী অকালি স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারা। এদের কোন ছবি আমাকে তুলতে দেওয়া হয়নি। স্বর্ণমন্দিরে ঢুকেছিলাম সকালে, যখন রোদ পড়ে স্বর্ণমন্দিরের চুড়ো চকচক করছিল। ছিলাম একেবারে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

পুকুরের ঠিক মাঝখানে ৬৭ স্কোয়ার ফুট চাতালের ওপর এই স্বর্ণমন্দির অবস্থিত। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে তৈরি এই মন্দির। এখানকার পুকুরের আয়নার মত পরিষ্কার জলকে বলা হয় অমৃত। এখানে স্নান করে পুণ্যলাভ করার জন্য প্রতিবছরই দলে দলে পুণ্যার্থী আসেন। ১৮৭৩ সালে উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথও এখানে এসেছিলেন তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংগে। এই পাঞ্জাবকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অনেক কবিতাও লিখেছেন। স্বর্ণমন্দিরের এই পরিষ্কার পুকুরের পাড়ে বসেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গলা মেলাতেন শিখ ভজন গাইয়েদের সংগে।

স্বর্ণমন্দিরে ঢোকার সংগে সংগে আমার সামনে একজন আর পেছনে একজন বন্দুকধারী পাহারায় লেগে গেল। স্বর্ণমন্দিরকে ঘিরে আছে ২২৮টি ঘর আর ১৮টি বড় হল ঘর। সন্ত ভিন্দ্রনওয়ালে এখানে থাকেন না। তিনি থাকেন মন্দির থেকে বেরিয়ে মন্দির এলাকার মধ্যেই গুরু নানক নিবাসে। এই গুরু নানক নিবাসে ঘরের সংখ্যা ৬৬। সন্ত ভিন্দ্রনওয়ালে থাকেন তিনতলার একটা ছোট্ট ঘরে। তাঁর ঘরে আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। খুব ছিমছাম। চৌকির ওপর একটা তোশক। মাথার কাছে গুরু গোবিন্দ সিং এর একখানা ছবি। আরেকদিকে গুরু নানকের ছবি।

গুরু নানক নিবাসে ঢোকার মুখে কড়া পাহারা ছোট পুলিশ চৌকির মত। সেখানে নিরাপত্তারক্ষীদের অফিস। সেখান থেকেই ফোন করে জানান হল আমার আগমনের কথা। সেখান থেকে কড়া পাহারায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল দোতলায় অল ইনডিয়া শিখ স্টুডেনটস ফেডারেশনের সভাপতি অমুক সিং-এর ঘরে। সেখান থেকে আবার ফোন করে সন্ত ভিন্দ্রনওয়ালের ঘরে খবর পাঠান হল। সেই একইরকম কড়া পাহারায় আমাকে পাঠান হল সন্তের ঘরে। সন্তের ঘরে যাওয়ার পথে চোখে পড়ল বারান্দার দুধারে সারবন্দীভাবে দাঁড়ান বন্দুকধারী প্রহরীর দল।

আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম সন্ত ভিন্দ্রনওয়ালে তখন খাটের ওপর আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। আমাদের দেখেই বলে উঠলেন, বলুন, কী জানতে চান? যেন প্রস্তুতই ছিলেন

সংবাদপত্রের লোকদের সংগে কথা বলার জন্য। আমরাও আমাদের ইনটারপ্রেটয়ের মাধ্যমে তাঁর সংগে কথাবার্তা চালালাম। পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে তাকে নানা প্রশ্ন করলাম। তিনিও উত্তর দিলেন। গুরু নানক নিবাসের পাশেই শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির বাড়ি। এরই দোতলায় থাকেন সন্ত লংগোয়াল। ভিন্দ্রনওয়ালের মত একই কড়া পাহারা ডিঙিয়ে দেখা করেছিলাম তাঁর সংগে। তাঁর কাছেও প্রশ্ন রেখেছিলাম, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

তবে এদিন স্বর্ণমন্দির ঘুরে এবং সন্ত ভিন্দ্রনওয়ালের সংগে কথাবার্তা বলে এটুকু বোঝা গেল যে শিখ স্টুডেনটস এবং ইয়ুথ ফেডারেশনের নেতারা এখন খোলাখুলি সন্ত হরচান্দ সিং লংগোয়ালের কাজকর্মের বিরোধিতা করছেন।

তবে অকালি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি সবাই খুশি নন। অকালি ফেডারেশনের আত্মগোপনকারী নেতা কানোয়ার সিং যাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তাঁর সংগে আমি এবং ট্রিবিউনের সাংবাদিক সতিন্দর সিং দেখা করি। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি অকালি তখতের জাঠেদারের কাছে আবেদন জানিয়েছি যে অকালিদের ত্যাগ এবং দাবি সম্পর্কে যে নিন্দামূলক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য কৈফিয়ত চাওয়া হোক। অবশ্য শিখদের মোর্চা সম্পর্কে তিনি বলেন, মোর্চা কিছু আদায় করতে পারেনি ঠিকই, তবে শিখদের মনে আশা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। কানোয়ার সিং আমাদের সংগে কথোপকথনেব সময় তাঁর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের দাবির কথাও জানিয়ে দিতে ভুললেন না।

কানোয়ার সিং-এর এই দাবির প্রতিধ্বনিই করলেন অল ইনডিয়া শিখ স্টুডেনটস জেনারেল ফেডারেশনের সেক্রেটারি হরমিন্দার সিং সান্ধু। স্বর্ণমন্দিরের ভেতর অস্ত্রে সুসজ্জিত ছাত্রযোদ্ধাদের সংগে বসেছিলেন হরমিন্দর সিং। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম অকালি নেতৃত্বের প্রতি শিখ ছাত্র ফেডারেশনের কি আস্থা আছে? উত্তরে তিনি জানালেন, অকালি নেতারা শিখদের দাবির যে ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দিতে চাইছেন, শিখ ছাত্র ফেডারেশন তার বিরোধিতা করে। তাদের মূল লক্ষ্য হল স্বতন্ত্র শিখ রাষ্ট্র।

হরমিন্দর সিং-এর সংগোযে ছাত্র যোদ্ধারা বসেছিলেন তাদের সকলেরই বয়স কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। তারাও হরমিন্দরকে সমর্থন করলেন।

কানোয়ার সিং এবং হরমিন্দর সিং দুজনেই ভিন্দ্রনওয়ালের অতি বিশ্বস্ত। যাকে বলে ডান আর বাঁ হাত।

সরকারের পক্ষ থেকে আরেকজনকে ধরে দেবার জন্যও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি হলেন ন্যাশনাল কাউনসিল অব খালিস্তানের নেতা বলবন্ত সিং সান্ধু। তার সংগেও আমি এবং ট্রিবিউনের সতিন্দর সিং স্বর্ণমন্দিরের বাইরে দেখা করেছিলাম। তিনি যখন কথা বলেন তখন কোনরকম প্রশ্ন করা যায় না। তিনি যা বলবেন তাই শুনে যেতে হবে। তিনি বললেন, গত এক বছরে অকালি মোর্চা নির্দিষ্ট করে বলেনি কে শত্রু। এই মোর্চা এইভাবে চলতে থাকলে হতাশার সৃষ্টি করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। তাঁর আরও বিশ্বাস আর এক বছরের মধ্যেই জনগণ 'খালিস্তান জিন্দাবাদ' বলে ধ্বনি তুলবে।

ভিন্দ্রনওয়ালে, লংগোয়াল থেকে শুরু করে আমি যত শিখনেতাদের সংগে কথা বলেছি তারা কেউই সোজাসুজি বর্তমানের এইসব হিংসাত্মক কার্যকলাপের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চাননি। একমাত্র 'বাবর খালসা দল' স্বীকার করেছেন তারাই এইসব হিংসাত্মক ঘটনাগুলি ঘটিয়েছেন। এই দলের সংগে জড়িত সদস্যের বয়স বছর কুড়ি-একুশের মত। পুলিশ এখন এই দলের সদস্যদের খুঁজছে। আমি এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে এদের সন্ধান পাই। এমনকি এদের আস্তানাতেও যাই। দরজা-জানালা বন্ধ একটা ঘরে ছোট্ট একটা আলো জ্বলছিল। ঘরে ঢোকা মাত্রই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। এদের মধ্যে তিনজন মধ্যবয়সী, বাকি পাঁচজন যুবক। ওরা জানালেন প্রতিটা অ্যাকশনের পর ওরা প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিয়ে আসেন। আমি তাদের কাছে একটা প্রচারপত্র চাইলে তারা দিলেন। বললেন—লিখবেন, আমরাই সব অ্যাকশন করি। আরো বললেন, আমরা কারো নাম করতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই যে আমাদের কাজের বাহবা পান আরেকজন। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। বুঝলাম, ওরা ভিন্দ্রনওয়ালেকে ইংগিত করতে চাইছেন। সেই ঘরের মৃদু আলোয় ওদের দেওয়া প্রচারপত্র খুলে মেলে ধরলাম চোখের সামনে। দেখলাম লেখা আছে, 'গোলি চলতে রহেগি......'। □

আলোকচিত্র : তরুণ প্রকাশ গংগোপাধ্যায়

বাদশা খান ঃ আবার নেকড়ের মুখে সেই অপরাজেয় মানুষ

মনকুমার সেন

'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুল গফফর খান আবার বন্দী। লোক-হৃদয়ের মুকুটহীন সম্রাটের পায়ে পুনরায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের সামরিক শাসন। নজরবন্দী তিনি।

অবশ্যই পাকিস্তানে বাদশা খানের এমন পুরস্কার এই প্রথম নয়। বৃটিশের পুরো শাসনে যিনি পনের বছর কারাবাসে ছিলেন, পাকিস্তান তার জন্মের আঠার বছরের মধ্যেই পনের বছর গফফর খানকে কারান্তরালে রেখেছে। বার বার করেছে অন্তরীণ, নজরবন্দী, বহিষ্কার। এই এক বছর আগেও আফগানিস্তানে নির্বাসিত জীবন যাপন করে স্বদেশে ফেরার সংগে সংগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, পুনঃ-পুনঃ উচ্চারিত সেই জীর্ণ কুৎসা – তিনি নাকি তাঁর নিজ অঞ্চলে পাঠান উপজাতিদের উস্কাচ্ছেন পাক সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁর নিজ ভাষাভাষী 'পাখতুন' (বা 'পশতু' ভাষাভাষী পুশতুন)দের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন, নতুবা 'যে বিপর্যয় পাকিস্তানের সামনে, তাতে তারাই প্রথম ভেঙে পড়বে।' তিনি নাকি আরও বলেছিলেন আফগানিস্তানের যে যুদ্ধ তা আসলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে যারা ঐশ্লামিক যুদ্ধ বলছে তারা আমেরিকাকেই মদত দিচ্ছে।

বলার প্রয়োজন করেনা আমেরিকার বিরুদ্ধে এই অপবাদ পাকিস্তানের প্রশাসনের পক্ষে প্রীতিকর হয়নি। ৯২ বছর বয়সের 'বৃদ্ধ' বাদশা খান সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রের দাবিদার জিয়া-উল-হক সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। ৩৫ বছর বয়সের পাকিস্তানে দেশের সরকার কম করে কুড়ি বছর তাঁকে কোন না কোন রূপে জনতার আড়াল করে রেখেছেন। অ্যামনেসটি ইনটার ন্যাশনাল যাঁকে বছর কয়েক আগে 'শ্রেষ্ঠ বন্দী' রূপে বিশ্বের বিচারসভায় তুলে ধরেছেন, বিপুল বিদেশি অস্ত্র সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল পাক সরকারের পক্ষে তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করা সহজ নয়। দেশের অভ্যন্তরেও জনমত ক্রমেই জাগ্রত। বৃটিশের বুলেটের মুখোমুখি হয়েছে যে পাঠানজাতি গান্ধীজীর নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, তাদের মরণজয়ী পণের সামাল দেওয়াও স্থূল অস্ত্র সম্ভারের সাধ্য নয়।

প্রতিবেশী দেশের এই টালমাটাল ও পীড়িত মানসিকতার পরিস্থিতিতে ভারত স্বভাবতই বিচলিত, উদ্বিগ্ন। এ উদ্বেগ শুধুই একটি মানুষের লাঞ্ছনার জন্য নয়, একটি প্রতিবেশী দেশের 'অভ্যন্তরীণ' অস্থিরতার জন্যও ভারত তত চিন্তিত নয়। যদিও এই অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপেই প্রতিবেশী দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকেও কিছুটা মলিন করতে পারে। ভারতের উদ্বেগ এক 'অন্য মানুষ'-এর জন্য, যে অন্য মানুষটি সকল দেশের সকল মানুষের স্বাধিকারের সংগ্রামকে ৭০ বছর ধরে ভাষা দিয়ে চলেছেন। আজকের ভারত যে অকুণ্ঠিত স্বাধীনতার অধিকারী, তার জন্য 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ'-এর নেতা 'পাঠান জাতির জননায়ক' বাদশা খানের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তার আদর্শ-ভূমি ছিল এই প্রদেশটি। একদিকে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য, অন্যদিকে বৃটিশ প্রশাসনের শোষণ ও অকথ্য নির্যাতন, এই দুই অভিশাপের পংককুণ্ড থেকে যে শান্তি সৈনিক সত্যাগ্রহী ভ্রাতৃযুগল প্রদেশটিকে তার সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাকে সংগ্রামী ভারতের প্রথম সারিতে তুলে এনেছেন, তাঁরা হলেন ডাঃ খান সাহেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা খান আবদুল গফফর খান। মুসলিম লিগ এবং বৃটিশ আমাদের বিস্তর প্রলোভন ও প্রশ্রয় সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্ভেদ্য জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের দুর্গে তার সাম্প্রদায়িক দন্তস্ফুট করতে পারেনি কোন দিন। তার সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভক্ষণ তৈরি করলেন একদিকে বড়লাট ওয়েভেল, অন্যদিকে ভারত-ভাগ পরিকল্পনার স্থপতি শেষ বড়লাট মাউনটব্যাটেন। যেখানে অন্য সমস্ত প্রদেশে আইনসভা বা আইনপরিষদের সদস্যগণের রায়ই চূড়ান্ত কে ভারতে থাকবেন আর কে পাকিস্তানে যাবেন -- উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত প্রদেশের বেলায় সেক্ষেত্রে মুসলিম লিগের আবদার মেনে নিয়ে বড়লাট তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতৃত্বকে দিয়ে অন্য সূত্র স্বীকার করিয়ে নিয়ে সীমান্তে জারী করলেন 'গণভোট'-এর আদেশ। ভোটের বিষয় 'ভারত না পাকিস্তান'। অথচ মাত্র এক বছর আগেই ঐ প্রদেশে জনমতের বিপুল রায়ে খান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, – নির্বাচিত বিধায়কগণ প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় লিগের ধর্মীয় দেশভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী। লিগের মর্জি পূরণ করা ছাড়া এখানে গণভোটের ছলনার কোন যুক্তি সংগত কারণ ছিল না। লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কৌশল এবং নানা প্রদেশ থেকে গোঁড়া ধর্মীয় প্রচারক এনে তাদের দিয়ে 'গণভোট'-এও জনগণের স্বাধীন কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা ইতোপূর্বেই পাকা করা হয়েছিল। বড়লাট নির্বাচিত মন্ত্রিসভা খারিজ করে দিয়ে নিজ হাতে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন, আর সেই সুশাসনে জনগণ 'পাকিস্তানের পক্ষে' রায় দিলেন। 'গণনাটোর' এমন সংস্করণ বুঝিবা মধ্যযুগের ইতিহাসেও দুর্লভ।

মনে রাখা দরকার সীমান্ত গান্ধীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে গান্ধীজীর সপক্ষেই সেদিনের ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব যে অংগীকার করেছিলেন, তার দিন ফুরিয়ে যায়নি। সাড়ে ছ ফুট সৌম্যকান্তির এই আকাশ ছোঁয়া ব্যক্তিত্ব ছিল যে উত্তাল জনসমুদ্রের শিরোনাম, তার ই তরংগে ভেসে গেছে দুর্দান্ত বৃটিশ।

পাকিস্তানে বিশ বছরের কারাবাস যাঁর পুরস্কার, তাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'কৃতজ্ঞ চিত্তের অভিবাদন' জানিয়ে বলেছেন তিনি হচ্ছেন সেই জাতের, সেই মাপের মানুষ 'সকল দেশই যাদের দেশ।' কবি প্রার্থনা করেছেন সত্যবোধে প্রেমের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত এমন মানুষের প্রভাবে 'শতধা-বিদীর্ণ দুর্ভাগা দেশের আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিদ্বেষ' অপনীত হউক।

দীনবন্ধু অ্যানড্রুজের ভাষায় – বাদশা খান হচ্ছেন, 'মানুষের মধ্যে রাজা।' ভারত এই রাজার পক্ষে নিঃসন্দেহে, কেননা মানুষের স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে স্বাধীন ভারতই আফরো-এশীয় বন্দীশালার নিষ্ঠুর দরজা খুলে দিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পরিবেশে দাঁড়িয়ে গান্ধী বললেন, ইংরেজ শাসক তুমি বিদায় হও, কংগ্রেস-লিগের হাতেই ছেড়ে দাও

তাদের বিবাদ-মীমাংসার ভার। দেশে আসুক বিশৃঙ্খলা তাতে তোমার মাথাব্যথা নিষ্প্রয়োজন, তুমি বিদায় হও। দরকার হলে লিগের হাতেই শাসনভার ছেড়ে দাও, তবু দেশের ওপর থেকে বিদেশি শাসকের বোঝা আর একদিনও সহনীয় নয়। কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা? ভাগাভাগি করে যতটা পাওয়া যায় এ ব্যাপারে কংগ্রেস-লিগ উভয়ে একমত। আর এই ঐকমত্যই দিল বড়লাটকে এক নতুন সমাধানের ঝলক। বাদশা খানের বরাবর সুচিন্তিত অভিমত, হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগিকে পাকাপাকি করার জন্যই এই দেশভাগ পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনা কোন না কোন প্রকারে দুটি দেশের মধ্যে দেওয়াল করবে স্থায়ী, আর মধ্যস্থতা বা মোড়লির বহু প্রতীক্ষিত অবকাশ দেবে বাইরের তৃতীয় শক্তিকে। মাউনটব্যাটেন কী নির্ভুল হিসেবই না করেছিলেন!!

মাউনটব্যাটেন অ্যাটলি মন্ত্রিসভার কালসীমা পর্যন্তও না অপেক্ষা করে ছুটে বিলেতে গিয়ে অনুমোদন করিয়ে আনলেন তাঁর ভারত-ভাগ পরিকল্পনা। গান্ধীজী প্রাণপণে তাতে বাধা দিলেন, কিন্তু ভোটে জিতে গেলেন দেশ ভাগের সমর্থক তাঁর চিরদিনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী-সাথীরাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এল ওয়ারকিং কমিটির এই প্রস্তাব, গান্ধীজী বললেন দেশ ভাগের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কথা সকলেই জানেন, কিন্তু আজ তিনি এই আর্জিই জানাচ্ছেন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক। ওয়ারকিং কমিটি কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংস্থা, এই সংস্থার সিদ্ধান্ত যদি অধিবেশন বাতিল করে দেয়, তা হলে তা হবে তাদের প্রতি অনাস্থার সামিল। তখন তাদের পদত্যাগ না করে উপায় থাকবে না। আজকের এই দুর্দিনে তেমন সম্ভাবনাকে গান্ধীজী অত্যন্ত বিপজ্জনক বলেই মনে করলেন। তাই জোর দিয়েই বললেন, যত অপ্রীতিকরই হোক, ওয়ারকিং কমিটির প্রস্তাবটি যেন তারা প্রত্যাখ্যান না করেন।

দেশের এই ভাগাভাগি ভেতরে ভেতরে তাঁর আত্মাকেও ভাগ করে ফেলেছিল, বেঁচে থেকেও তিনি সেই সংকটে যে মানুষটির জন্য অন্তর্বেদনায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি হচ্ছেন এই সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান।

কী ভয়ংকর আবদার চাপিয়ে দেওয়া হল এক আদর্শ সেনাপতি ও সত্যাগ্রহের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তির মাথায়। গান্ধীজীকেই যাঁরা একান্তে ঠেলে দিয়েছিলেন, সীমান্ত গান্ধীর কথা ভাববার মত অবসর তাঁদের কোথায়? মর্মবেদনা ও অপমানে মুহ্যমান বাদশা খান ওয়ারকিং কমিটির সীমান্ত প্রদেশের গণভোট প্রস্তাবে স্তম্ভিত হলেন।

মওলানা আজাদ গান্ধী ও বাদশা খান

বেদনায় ও বিস্ময়ে অভিভূত বাদশা খান কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বললেন, 'তাহলে এখন থেকে আপনারা আমাদের পাকিস্তানী রূপে গণ্য করবেন?' গান্ধীজীকে বললেন, 'আজ এক ভয়াবহ অবস্থায় সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের সামনে, জানিনা আমরা কী করব।'

গান্ধীজী বললেন, 'অহিংসায় হতাশার কোন স্থান নেই। আপনার এবং খুদাই-খিদমৎগার ['খোদার সেবক সংঘ' – বাদশা খান সংগঠিত সীমান্তের পূর্বতন সশস্ত্র বিপ্লবী মানুষের সংগঠন]দের এখন পরীক্ষার সময়। আপনারা ঘোষণা করতে পারেন পাকিস্তান আপনাদের গ্রহণের অযোগ্য এবং চূড়ান্ত বিপদের মুখোমুখি হতে পারেন। 'করব, না হয় মরব' এই যাঁদের জীবনের ব্রত, তাদের আবার ভয় কী?'

কতকটা যেন আপন মনেই গান্ধীজী এসময় বললেন, 'আমি পরিষ্কার দেখছি আমরা ভুল পথে চলেছি। এক্ষুনি হয়ত এর পরিণাম সম্পূর্ণরূপে আমরা অনুভব করতে পারছি না, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা হলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।' বললেন 'বাদশা খানের ক্লেশ আমি সহ্য করতে পারি না। তাঁর অন্তর্বেদনা আমার হৃদয়ে মোচড় দেয়। তবু আমি চোখের জল ফেলিনি, কেননা তা হত ভীরুতা, আর বীর পাঠানও তাতে ভেঙে পড়তেন।' আবার বললেন 'হতে পারে ওঁরাই ঠিক, আমিই শুধু অন্ধকারে হাতড়ে মরছি। কী হবে না হবে তা দেখবার জন্য আমি হয়ত বেঁচে থাকব না, কিন্তু যে অশুভের আশঙ্কা আমার মনে তা যদি সত্য হয় আর ভারতের স্বাধীনতা হয় বিপন্ন, উত্তরকাল জেনে রাখুক সেই কথা ভেবে এই বৃদ্ধ মানুষটি কী মর্মযন্ত্রণা পেয়েছে। এ কথা যেন না বলা হয় দেশভাগে গান্ধীর সম্মতি ছিল। কিন্তু আজ প্রত্যেকেই স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য, অতএব কোন উপায় নেই।'

৩ জুনের ঘোষণার পূর্বে ওয়ারকিং কমিটির বৈঠকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। সর্দার প্যাটেল এবং চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর জোর সমর্থনেই 'গণভোট'-এর প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। বাদশা খান স্তম্ভিত। এক মুহূর্তে তাঁর সমস্ত জীবনের স্বপ্ন ও তপস্যা যেন গুঁড়িয়ে গেল। কমিটিকে তিনি বললেন 'জীবনভর আমরা পাখতুনরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি, স্বাধীনতার জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠাবোধ করিনি, আর আজ আপনারা আমাদের ত্যাগ করলেন, আমাদের নিক্ষেপ করলেন নেকড়ের মুখে?' চরম বেদনার বোঝা বুকে নিয়েও দৃঢ়ভাবে বললেন, 'হিন্দুস্তান বনাম পাকিস্তান' প্রশ্নে আমরা একবছর আগেই সাধারণ নির্বাচনে অভ্রান্তরূপে আমাদের রায় দিয়েছি। সারা বিশ্ব আমাদের এই বক্তব্য জানে। এখন ভারতও যখন আমাদের অস্বীকার করছে তখন আমরা হিন্দুস্তান পাকিস্তান নিয়ে গণভোট করব কেন, গণভোট যদি হতেই হয় তা হবে 'পাখতুনিস্তান বনাম পাকিস্তান' প্রশ্নে।'

পরবর্তীকালে সীমান্ত গান্ধী তাঁর জীবন ও সংগ্রামের কথায় লিখেছেন, 'ওয়ারকিং কমিটির গণভোটের সিদ্ধান্ত যেন সমস্ত পাঠানজাতির ওপর মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমার পাশেই বসে ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, আপনাদের এখন মুসলিম লিগে যোগদান করাই শ্রেয়।'

বাদশা খান লিখেছেন, 'মুসলিম লিগ বরাবর ধ্বংসের কাজ করেছে, আর আমি আমার সারা জীবন উৎসর্গ করেছি সেবার কাজে। ---- আজ এক মুহূর্তের নোটিশে আমি আমার মত ও পথ বদলাতে পারি না।'

গান্ধীজীরই পরামর্শে বাদশা খান মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গেও দেখা করেছেন, কথা বলেছেন। তাঁর অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা ছিল সুস্পষ্ট: পাকিস্তানের মধ্যেই পাঠান জাতিকে তার ন্যায়সংগত মর্যাদা ও অধিকার দিন। বলা বাহুল্য, জিন্নার দিক থেকে কোন সাড়াই বাদশা খান পাননি।

বাদশা-জিন্না বৈঠকের ব্যর্থতা বাপুকে মর্মাহত করল। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটিও সেদিন ঘুমোতে পারলেন না, রাতের শেষ অন্ধকারেই শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন, অস্ফুটে বললেন – 'আজ আমার ১২৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আজও যে আমি বাদশা খানের ভাল না ভেবে পারছি না। অগণিত পাঠানের তিনি মুকুটহীন রাজা। এমন পৌরুষের কখনও পরাজয় হতে পারে না।' □

আলোকচিত্র: লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর কলম

হোমিও চিকিৎসা

আবহাওয়ার জন্য যে সমস্ত রোগ আমাদের শরীরে আসে তার মধ্যে ব্রংকাইটিস (অ্যাকিউট) অন্যতম। সচরাচর হঠাৎ ঠান্ডা লেগে গিয়ে, কি কোন ড্যামপ বা স্যাঁত-সেঁতে ঘরের মধ্যে থাকার ফলে ঠান্ডা লেগে ব্রংকাইটিস রোগ হয়। আবার টনসিলাইটিস, ফ্যারেনজাইটিস রোগের মত কিছু রোগের পরের ধাপে এই রোগ দেখা যায়। কেমিক্যাল ফ্যাকটরিতে কোন বিশেষ ধরনের গন্ধও এই রোগের কারণ হতে পারে। যারা তুলোর আঁশ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তাদেরও ব্রংকাইটিস হবার সম্ভাবনা আছে।

শ্বাস যে নালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে যায় সেই নালীকে ব্রংকাস বলা হয়। এই নালীর মধ্যে ইনফেকশন হয়। শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেই এই রোগ বেশি দেখা যায়।

ব্রংকাইটিস হয়েছে কি না বোঝা যাবার সাধারণ কতগুলো লক্ষণ আছে। বুকের মধ্যে একটা চাপ ভাব থাকবে, বুকের মাঝখানে হাড়ের পিছনে একটা টাটানি ব্যথা অনুভব করা যাবে। শ্বাসকষ্ট হবে। ঘনঘন কাশি তার সংগে জ্বর থাকবে। জ্বরটা ১00 থেকে ১0১ ডিগরির মধ্যে থাকবে। বুকের মধ্যে হাত দিলে একটা সাঁই সাঁই শব্দ অনুভব করা যাবে। সাধারণভাবে চিকিৎসা না করলে দশ দিন থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ভুগতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে কমবে। গোড়ার দিকে শুকনো কাশি। কোনরকম কফ বেড়বে না পরে আস্তে আস্তে তরল হয়ে যাবে।

এই অসুখ অবহেলা করাটা ঠিক নয় অন্তত শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে। তিন সপ্তাহের বেশি চললে নিশ্চয় করে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া উচিত। এর যত আগে পারা যায় ততই ভাল।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে। তবে যাই করা হোক প্রাথমিক স্তরে নিজে ওষুধ খেলেও ডাক্তারের সংগে পরামর্শ করা দরকার।

অ্যাকোনাইট ন্যাপ-৩0 খুব শুরুতে কাজ দেবে। ৩0 এর নিচে হলেও চলবে। যদি নাক দিয়ে জল পড়ে, অস্থিরতা দেখা যায়, জল পিপাসা বেশি হয়। মুখ চোখ লাল হয়, কাশি থাকে জলপিপাসা কম থাকে আর সেই সংগে মাথাব্যথা। তবে বেলে-ডোনা ৩0 দিলেও ভাল। এ ছাড়া 'ব্রায়োনিয়া এ এল বি ৩0' ব্যবহার করা যেতে পারে যদি শুষ্কতা বেশি থাকে। ভিজে স্যাঁত-সেঁতে ঘরের জন্য যদি অসুখ করে তবে ডাল-কামরা-৩0। প্রথম দু এক দিনের মধ্যে আর একটি ওষুধ IPECAC-30 দেওয়া যেতে পারে। কাশির সংগে যদি গা বমি ভাব থাকে তবে ফেরামফস ৩0 অথবা ৩ একস বা ৬ একস খাওয়া যেতে পারে। গালের হাড় দুটি যেখানে লাল মুখটা ফ্যাকাসে সেখানে এই ওষুধ কাজ দেবে। এ ছাড়া হেপার সালফ ৩0 হলদে কফ উঠলে বা দু তিন দিন বাদে যখন কফ তরল হতে শুরু করেছে তখন দেওয়া যেতে পারে। শীত-বোধও থাকে এ সময় বুকে টাটানি ব্যথা করে।

গরমে ব্যথা কমছে না অথচ রুগীও হাওয়া চাইছে, ঘন কফ উঠছে জল তেষ্টা নেই সেক্ষেত্রে পালসেটিলা ৩0 খুব কাজের।

তবে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে ডাক্তার দেখান ভাল। এ রোগে সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই আর চাই পুষ্টিকর খাদ্য। □

নবম দশম

বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা

'রচনায় যোগ দাও – ছাত্রবৃত্তি জিতে নাও'

শুধু কি বৃত্তি! তার সংগে আছে বই কেনার জন্য বিশেষ অনুদান, প্রশংসাপত্র এবং সারা বছর ধরে বিনামূল্যে পাক্ষিক 'নবম দশম' আর নবম দশম মানেই তো পরীক্ষায় সাফল্য এবং কৃতিত্ব।

ইত্যাদি প্রকাশনীর উদ্যোগ

অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য 'সারা বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা'। কোন প্রবেশমূল্য নেই – এতে পশ্চিমবংগের যেকোন স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই কেবল যোগ দিতে পারবে।

বিষয় : 'জাতীয় সংহতি'

নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের ভারতবর্ষে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা কিভাবে সম্ভব - তোমার বক্তব্য এক হাজার শব্দের মধ্যে গুছিয়ে লেখ। ফুলস্কাপ কাগজের এক পিঠে লিখবে। এক বিচারকমণ্ডলী সমস্ত রচনাপত্র পরীক্ষা করে নম্বর দেবেন। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম দশজনকে 'ক', পরবর্তী পঞ্চাশ জনকে 'খ' এবং তারও পরের পঞ্চাশজনকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা হবে। প্রতিটি সফল প্রতিযোগীর নাম, স্কুলের নাম এবং ঠিকানা ইত্যাদি প্রকাশনীর সমস্ত পত্রিকায় ছাপানো হবে।

বৃত্তির পরিমাণ

'ক' বিভাগের ১০ জন পাবে ১৪০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ১০০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান, 'খ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১২০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ৮০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান, 'গ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ৬০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান।

কলকাতায় একটি বিদ্বজ্জন সমাবেশে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে প্রশংসাপত্র এবং বই কেনার জন্য এককালীন অনুদান। বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতি তিনমাস অন্তর স্কুলের ঠিকানায় সমানভাবে ভাগ করে পাঠানো হবে আর পাক্ষিক 'নবম দশম' পাঠানো হবে বাড়ির ঠিকানায়।

দেরি না করে রচনা লেখ আর এই ফর্ম পূরণ করে তার সংগে গেঁথে পাঠাও।

জাতীয় সংহতি রচনা প্রতিযোগিতা

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

নাম .... বয়স ....

শ্রেণী .... রোল নম্বর ....

বাড়ির ঠিকানা ....

পিতা/অভিভাবকের নাম ....

পেশা .... মাসিক আয় ....

স্কুলের নাম ....

ঠিকানা ....

উপরোক্ত ঘোষণা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। আমি এই প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মানতে বাধ্য থাকবো এবং বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মানবো।

অভিভাবকের স্বাক্ষর ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

মনে রেখো রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩। এর পর প্রাপ্ত রচনা যত ভালই হোক বিবেচিত হবে না। খামের ওপর বড় হরফে 'নবম দশম বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা' লিখে দিও। তার তলায় লিখবে ইত্যাদি প্রকাশনীর ঠিকানা।

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে

নিকোসিয়ায় প্রেসিডেন্ট কিপরিয়ানুর সংগে আলোচনার প্রাক্কালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

তিন

নিকোসিয়াতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল হিলটন হোটেলে। লারনাকা থেকে শহরে ঢোকার মুখেই কেনেডি আভিনুতে এই বিরাট হোটেল। প্রাচীন নিকোসিয়া ছিল একটি দেওয়াল ঘেরা শহর। কিন্তু এই শহরটির ভেতরেও তুরকি সৈন্য ঢুকে পড়েছে এবং শহরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে রেখে দিয়েছে। ঠিক বারলিন শহর যেমন দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি। গ্রীকদের হাতে নিকোসিয়া শহরের যেটুকু আছে সেটুকু তারা খুব ছিমছামভাবে রেখে দিয়েছে। ঝকঝকে তকতকে শহর, নতুন,নতুন বাড়ি। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে পেডিয়ুস নদী। প্রাচীর ঘেরা পুরাতন নিকোসিয়া শহরের বাইরে নতুন শহর ছড়িয়ে পড়েছে। হিলটন হোটেল এই প্রাচীরের বাইরে। হোটেলের সামনে বিরাট বাগান। সেই বাগানের গেট থেকেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। অবশ্য এজন্য অন্যান্য পর্যটকদের কোন অসুবিধা হয়নি। হোটেলের আটতলায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকারি সহযাত্রীদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছিল। এর মধ্যে চারজন পেয়েছিলেন চারটি সুইট। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, পি সি আলেকজান্ডার ও সারদাপ্রসাদ। এ ছাড়া ঐ তলাতেই বসান হয়েছিল একটি কনট্রোল রুম যেটা বলা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ভ্রাম্যমাণ সেক্রেটারিয়েট।

সাইপ্রাসে এসে একটি জিনিস মনে হল, জোর যার মুলুক তার এই নীতিটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে শক্তিশালী। পাকিস্তান যে কাশ্মীরের আধখানা নিয়ে নিল, ইজরায়েল যে প্যালেসটাইন দখল করে বসে রইল, চীন যে এখনও গায়ের জোরে ভারতের বেশ কিছু এলাকা রেখে দিয়েছে, এ নিয়ে যত চেঁচামেচিই হোক না কেন, কারুরই তাতে কর্ণপাত না করলে কিছু এসে যায় না। ১৯৭৪ সাল থেকে তুরকিরা এই দ্বীপটির প্রায় অর্ধেক অধিকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজধানী নিকোসিয়াকেও তারা অর্ধেক করে কেটে নিয়েছে। একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর গত ন' বছর ধরে একটি দখলদারি বিদেশী রাষ্ট্রের পতাকা উড়ছে। অথচ এতবড় একটা অন্যায়ের কোন প্রতিকার হল না। এই লেখা যখন লিখছি তখন গ্রেনাডার ওপর মারকিনী আক্রমণের খবর পেলাম।

ছোট ছোট রাষ্ট্রের ওপর শক্তিমান ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসীনীতি যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে কোন চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

নিকোসিয়াতে ভারতীয় প্রেসকে দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন এ কে মুখারজি। সুদর্শন অল্পবয়সী এই বাঙালি তরুণ বেলগ্রেড ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব। প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে এসেছেন। এই সফরে ভারতীয় দূতাবাসের বেশির ভাগ অফিসারদের ভূমিকা দেখেই হতাশ হয়েছি। ব্যুরোক্র্যাসির আবরণ ভেদ করে তাঁদের প্রসন্ন মুখ কদাচ চোখে পড়েছে। দু-একজন ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওই একজন এ কে মুখারজি। ভদ্রলোকের কর্তব্যনিষ্ঠা শুধু নয়, প্রফেশনাল কাজকর্ম যে কত নিখুঁত তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল লারনাকা এয়ারপোরটে প্লেন থেকে নামতেই, যখন তিনি প্রত্যেক সাংবাদিককে একটি করে টাইপ করা মোটা ফাইল উপহার দিলেন। তাতে সফরসূচি থেকে প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে কে কোথায় দাঁড়াবে তার নিখুঁত নকশা আঁকা। সবশেষে সাইপ্রাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অবশ্য এটা থেকে সাইপ্রাসের চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের বিস্তৃত কোন বিবরণ জানা যায় না। সেটা জানতে হয়েছিল আর পাঁচটি পুস্তিকা পড়ে। খৃস্টজন্মের ১৩০০ বছর আগে ম্যাসিনিয়ান গ্রীকরা মূল ভূখন্ড থেকে এই দ্বীপে এসেছিল বাণিজ্য করতে। অবশেষে দ্বীপটির প্রেমে পড়ে যায় তারা। সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে। সেই থেকে গ্রীকরা সাইপ্রাসের অধিবাসী। খৃস্টজন্মের প্রায় চারশ বছর আগে সাইপ্রাস জয় করেন আলেকজানডার দি গ্রেট। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সাইপ্রাস পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চতুর্থ শতাব্দী থেকে সাইপ্রাস বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহ হৃদয় রিচারড ধর্মযুদ্ধে সাইপ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে দিয়ে দেন ফরাসিবাজ গাই দা লুসিগনানকে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত চলে ফরাসি আধিপত্য। ১৪৮৯ সালে সাইপ্রাস আবার ভেনিসিয় রাজত্বের সংগে যুক্ত হয়। ১৫৭১ সালে তুরকি অটোমান সম্রাট সাইপ্রাস দখল করে নেন।

মূল গ্রীক ভূখন্ড ও গ্রীক দ্বীপগুলিকে তুরকি সাম্রাজ্যের অধীনে কাটাতে হয়েছিল প্রায় তিনশ বছর। অমন পরাক্রান্ত গ্রীক জাতি তিনশ বছর ধরে তুরকিদের দাস হয়ে রইল। বিধির কী নির্বন্ধ! ১৮২১ সালে গ্রীসে তুরকিদের বিরুদ্ধে বড় রকমের অভ্যুত্থান ঘটে। গ্রীসের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে যায় জাতীয় সংগ্রাম। সাইপ্রাসের গ্রীকরাও এই মুক্তিযুদ্ধে সমান অংশ নেয়। এই যুদ্ধে তাদের প্রচন্ড আত্মত্যাগ করতে হয়। বহু সাইপ্রাসবাসী গ্রীক মৃত্যুবরণ করেন। এই স্বাধীনতাযুদ্ধে গ্রীক বিশপদের ভূমিকা ছিল খুব বড় রকমের। তাঁরা বিধর্মীদের হাত থেকে দেশরক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এতে তুরকিদের রাগ গিয়ে পড়ে বিশপদের ওপর। অনেক বিশপকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান হয়।

১৮৩০ পর্যন্ত সাইপ্রাস অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সে সময় রাশিয়ার জারের ভয়ে তুরস্ক সম্রাট জড়োসড়ো। বৃটিশরা বলে সাইপ্রাসটা আমাদের দিয়ে দাও, তার বদলে রাশিয়া কখনও তোমাদের আক্রমণ করলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। গ্রীকদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাইপ্রাসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯২৫ সালে তো ঘোষণাই করা হয় যে সাইপ্রাস পাকাপাকিভাবে বৃটিশ উপনিবেশ। ১৯২৩ সালের লুসানে সন্ধি অনুসারে সাইপ্রাসের ওপর সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে তুরস্ক।

সাইপ্রাসের ওপর বৃটেনের এই প্রভুত্বকে গ্রীকরা মেনে নেয়নি। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে, তবে ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু হয় আর্চ বিশপ ম্যাকারিওসের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম। এই সংগ্রাম চলেছিল চার বছর। কিন্তু এই চার বছর ধরে এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার বহু চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন বৃটিশরা সব উপনিবেশেই যা করেছে তা সাইপ্রাসেও করল।

অর্থাৎ দেশটাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করার চেষ্টা করল। তুরকি শাসনের সময় থেকে গ্রীসে কিছু সংখ্যক তুরকি বাস করছিল। তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার শতকরা বিশভাগের মত। বৃটিশরা এবার বলতে শুরু করল, স্বাধীনতা দেবার আগে মাইনরিটি তুরকিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও আমাদের দিতে হবে। ইংরেজরাই যেমন অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লিগকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তারাই সাইপ্রাসে তুরকিদের ক্ষেপিয়ে দিল। তারাও বলতে শুরু করল স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের লাভ কী হবে, সেই তো গ্রীকদের অধীনে আমাদের থাকতে হবে। এটা হবে গ্রীক স্বাধীনতা। ঠিক যেমন মুসলিম লিগ বলত স্বাধীনতা এলে, তা হবে হিন্দু-স্বাধীনতা। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু মুসলমানে দাংগা হয়েছিল, সাই প্রাসেও তেমনি শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাংগা। তুরকিরা বলল, দেশ বিভাগ না করলে স্বাধীনতা চাই না। আমরা বৃটিশ অধীনে থাকব।

কিন্তু সাইপ্রাসের স্বাধীনতা কামীরা স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। সেই সংগে দেশ বিভাগকে তাঁরা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তুরকিদের সংগে যে কোন আপস রফা করতে তাঁরা রাজি হলেন। ১৯৬০ সালের ১৬ আগসট সাইপ্রাস স্বাধীন হল। তার আগে জুরিখ ও লনডনে গ্রীস, তুরস্ক, বৃটেন ও সাইপ্রাসের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল সাইপ্রাস অখণ্ড থাকবে, তবে শাসনক্ষমতায় গ্রীক ও তুরকিদের প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। ঠিক হল, সংবিধান অনুসারে সাইপ্রাসের প্রেসিডেনট হবেন সর্বদাই একজন গ্রীক। তাঁকে ভোট দেবে শুধু গ্রীক নির্বাচকমণ্ডলী। আর ভাইস প্রেসিডেনট হবেন একজন তুরকি। তিনি নির্বাচিত হবেন শুধু তুরকিদের দ্বারা। ভাইস প্রেসিডেনটকে ক্ষমতা দেওয়া হল হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের এবং সেই সংগে মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি ভেটো প্রয়োগ করলে তা নাকচ হয়ে যাবে। মন্ত্রিসভা কীভাবে গঠিত হবে তাও বলে দেওয়া হল। দশজনকে নিয়ে গঠিত হবে মন্ত্রিসভা। এর মধ্যে চারজন হবেন তুরকি। এই চারজন তুরকি সাইপ্রুইট মন্ত্রীকে মনোনীত করবেন তুরকি ভাইস প্রেসিডেনট। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ অর্থাৎ পারলামেনটে গ্রীক ও তুরকিদের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হল। বলে দেওয়া হল, সংবিধানের মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তন ঘটান যাবে না। অন্য ধারার সংশোধন করতে গেলে আলাদা আলাদা করে গ্রীক ও তুরকি সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। দেখা গেল ৩৫ জন গ্রীক সদস্য ও ৮ জন তুরকি সদস্য আলাদা আলাদা করে পুর বিল বা কোন অর্থ বিলকে যুগপৎ সমর্থন করলে তবেই তা আইনে পরিণত হবে। অর্থাৎ ৩৫ জন গ্রীক সদস্য যদি সমর্থন করেন ও ৮ জন তুরকি সদস্য যদি বিরোধিতা করেন তাহলে সেই বিল আর পাশ হতে পারবে না।

বিচারব্যবস্থাতেও নিরপেক্ষতা-বজায় রাখতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হল। সুপরিম কোরটের প্রধান বিচারপতি ও হাই কোরটের প্রধান বিচারপতি কেউই গ্রীক বা তুরকি হবেন না। বেঞ্চের সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ হলে তাঁরা কাসটিং ভোট দিয়ে নীতি নির্ধারণ করবেন সাব্যস্ত হল।

ভারতবর্ষের সংগে ওখানকার রাজনৈতিক অবস্থার যে এত মিল তা দেখে অবাক লাগে। বৃটিশ আমলে গ্রীক ও তুরকি সাইপ্রুইটরা একসংগে এত বছর বাস করে এল কেউ তা নিয়ে কোন অভিযোগ তোলেননি। অথচ স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়েই যত বায়নাক্কা। পাওনা-গণ্ডার যত চুলচেরা হিসাব। ইংরেজরা যেমন ভারতকে জোড়া দিয়েছে নিজেদের প্রশাসনিক স্বার্থে, তেমনি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে দেশকে ভাগ করেছে। সাইপ্রাসেও ঘটেছে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

সাইপ্রাসে বহু চেষ্টা করে দেশ বিভাগ রদ করা গিয়েছিল বটে, কিন্তু ক্ষমতা বিভাগ রদ করা গেল না। গ্রীক সাইপ্রুইট ও তুরকি সাইপ্রুইটদের মধ্যে পুরসভার প্রশাসনও বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হল। সাইপ্রাসের পাঁচটি শহরে গ্রীক ও তুরকিদের জন্য আলাদা আলাদা পুরসভা করা হল। সিভিল সারভিসের শতকরা ৩০টি পদ সংরক্ষিত করে রাখা হল তুরকিদের জন্য এবং পুলিশ ও সেনা বাহিনীতে শতকরা ৪০টি আসনই দেওয়া হল তুরকিদের।

সংবিধানের নানা অসংগতি দূর-করার জন্য ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেনট আরচবিশপ ম্যাকারিওস তেরটি সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেন। এতেই তাঁর কাল হল। তুরকিরা মনে করল এটা তাঁদের অধিকার সংকোচ করার চেষ্টা। সাইপ্রাসের ভেতর গজিয়ে উঠল তুরকি সন্ত্রাসবাদী দল, এক কথায় টি এন টি। পিছনে ছিল তুরস্কের মদত। তুরকি ভাইস প্রেসিডেনট ঘোষণা করলেন, সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র বলে এখন আর আদপে কিছু নেই। তিনি, মন্ত্রিসভার তিনজন তুরকি সদস্য ও তুরকি সরকারি অফিসাররা একযোগে পদত্যাগ করলেন। টি এন টিদের দমন করার জন্য সরকারি পুলিশ ও মিলিশিয়া তখন অভিযান চালাচ্ছে। বলা বাহুল্য অনেক সন্দেহভাজন তুরকিদের ধরপাকড় চলছে। হত্যা ও প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠেছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

তুরকি সাইপ্রুইট নেতাদের অনেকে ঘোষণা করলেন গ্রীকদের সংগে আর থাকা যাবে না। সাইপ্রাসের পারটিশান চাই।

১৯৬৪ সালে সাইপ্রাসে ছড়িয়ে পড়ল রক্তক্ষয়ী দাংগা। লনডনে বসল দাংগারোধের জন্য বৈঠক। উদ্যোক্তা বৃটেন। তাঁদের প্রস্তাব এখনই সেখানে তৃতীয় দেশগুলি থেকে শান্তিরক্ষাকারী সৈন্যদল পাঠান হোক। সাইপ্রাস সরকার তাতে রাজি হননি। গণ্ডগোল আরও তীব্র হয়ে উঠল। তুরকি জংগী বিমান উড়তে দেখা গেল সাইপ্রাসের আকাশে। বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল তুরকি সৈন্যদের। ১৯৬৪ সালের আগসট মাসে ১০০ গ্রীক সাইপ্রুইট নিহত হলেন তুরকিদের হাতে ওই বছর রাষ্ট্রসংঘে উঠল সাইপ্রাসের প্রশ্ন। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ সাইপ্রাসে পাঠাল সেনাবাহিনী। প্রথমে পাঠান হয়েছিল তিন মাসের জন্য। কিন্তু এমনই পোড়াকপাল সে দেশের আজও সেখানে রাষ্ট্রসংঘের সেনাবাহিনীকে পাহারা দিতে হচ্ছে। তুরস্ক বারবার হুমকি দিচ্ছিল সাইপ্রাস আক্রমণের। ১৯৬৫ সালের ১৮ ডিসেমবর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রস্তাব নেয় রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী সাইপ্রাসের সার্বভৌমত্ব যেন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। কোন বাইরের রাষ্ট্র যেন তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে।

১৯৭৪ সালে জুলাই মাসে সাইপ্রাসের ক্ষমতা দখল করে এক গ্রীক মিলিটারি জুনতা। আরচবিশপ ম্যাকারিওস ক্ষমতাচ্যুত হন। তুরস্ক এই সুযোগে সাইপ্রাস আক্রমণ করে। তুরস্কের ছুতো ছিল গ্রীক সামরিক জুনতার আক্রমণের ফলে সাইপ্রাসের সংবিধান ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং সংবিধানসম্মত-ভাবে তুরকি সাইপ্রুইটদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তুরস্ক এই সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছে। তুরকি সৈন্যরা সাইপ্রাসের প্রায় ৪০ ভাগ এলাকা দখল করে ফেলে। সামরিক শাসনের অবসান ও ম্যাকারিওসের নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের ২৯তম অধিবেশনে সাইপ্রাস সম্পর্কে আর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সর্বসম্মতিক্রমে। ৩২১২ নং ওই প্রস্তাবে বলা হয় তুরস্ককে সাইপ্রাস থেকে দ্রুত সৈন্য অপসারণ করতে হবে। সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদও অনুমোদন করে।

কিন্তু তুরস্ক সে প্রস্তাবে কান দেয়নি। রাষ্ট্রসংঘকে কলা দেখিয়ে তুরকি সৈন্যরা সাইপ্রাসের ওপর তাদের অধিকার কায়েম করে। তুরকি অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে গ্রীকদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রীকদের শাসনাধীন এলাকা থেকে তুরকিরা চলে যায় তুরকি এলাকায়। তুরকিরা তাদের অধিকৃত এলাকায় গণভোট করে। ১৯৭৫ সালের ১৩ ফেবরুয়ারি তুরকি অধিকৃত এলাকায় গঠিত হয় 'টারকিশ ফেডারেটেড স্টেট'।

অধিকারের পর তুরকি প্রশাসন যেনতেনপ্রকারেণ তুরকি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। তারা তুরস্ক থেকে তুরকিদের নিয়ে আসে অধিকৃত সাইপ্রাসে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে। তৈরি হয় নতুন নতুন তুরকি উপনিবেশ। উদ্দেশ্য গ্রীক জনসংখ্যার অনুপাতে তুরকি সংখ্যা-লঘু জনসংখ্যার পরিবর্ধন ঘটান। ১৯৭৭ পর্যন্ত ৫০ হাজার তুরকিকে অধিকৃত তুরকি এলাকায় বসবাসের জন্য নিয়ে আসা হয়। তুরকি আক্রমণের আগে সাইপ্রুইট তুরকিদের জনসংখ্যা ছিল ১২০,০০০।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭ ও ১৯৭৯ সালে গ্রীক ও তুরকিদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের জন্য কতগুলি বিষয়ে দুই গোষ্ঠী ঐকমত্যে আসেন। কিন্তু আজও সে সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। এপর্যন্ত সাইপ্রাস সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নানা প্রস্তাব ও দলিলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯টির মত।

সাইপ্রাস সমস্যার যে করুণ মানবিক দিকটি চোখে পড়ে সেটি হল তুরকি অধিকৃত এলাকায় বহু গ্রীকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালান হয়েছে। বহু গ্রীক নিখোঁজ হয়েছেন। উদ্বাস্তু হয়েছেন দুলক্ষ মানুষ। মানবাধিকার কমিশন এই নির্যাতনের ওপর একটি ডকুমেনট প্রকাশ করেছেন।

তুরকি অধিকারের ফলে সাইপ্রা-

লের কয়েকটি নতুন বন্ধ করে দিয়ে নতুন সড়ক তৈরি করতে হয়েছে। যেমন নিকোসিয়া-মরফু প্রধান সড়কটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে। নিকোসিয়া-লারনাকা, নিকোসিয়া-অ্যাসট্রোমিরিটিস রাস্তা দুটি তুরকি অধিকৃত এলাকা এড়িয়ে যাতে যেতে পারে তার জন্য ওই দুই পথে অনেকগুলি বাইপাস তৈরি করতে হয়েছে। অধিকৃত এলাকায় পড়ে গেছে সাইপ্রাসের সবচেয়ে ভাল লাইমস্টোন কোয়ারিটি, এর ফলে রাস্তাঘাট তৈরির কাজে বাধা পড়েছে। ১৭১টি প্রাইমারি স্কুল পড়ে গেছে অধিকৃত এলাকায়। সব মিলিয়ে শতকরা ৩৮টি স্কুল বাড়িই পড়েছে তুরকি এলাকায়। আটটি টেকনিকাল স্কুলের দুটো পড়েছে অধিকৃত এলাকায়। এছাড়া ছোটখাট শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য কেন্দ্রের বেশ কিছুই হারাতে হয়েছে সাইপ্রাসকে এই তুরকি অধিকারের ফলে। তার ওপর বিরাট অবমাননা, অসম্মান, লোক ক্ষয়, বৈরীতা সমস্ত কিছু মিলিয়ে সাইপ্রাসের অবস্থা আর যাই হোক খুব সুখপ্রদ নয়। ভারতবর্ষের সংগে এই অবস্থার যথেষ্ট মিল থাকলেও ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, তার ক্ষয়ক্ষতি সামলাবার শক্তিও যথেষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে সাইপ্রাসে ঘুরলে মনেই হবেনা ওরা এমন একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে আছে। যদিও অধিকৃত এলাকা থেকে সাইপ্রাস মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগই পেত, তবু সেই এলাকা হাত ছাড়া হয়ে যাবার পরেও সাইপ্রাস তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করেছে। ১৯৬০ সালের তুলনায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে। কৃষির উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। রফতানি বেড়েছে শতকরা ৮৯ ভাগ। যদিও এখনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি-রফতানির ভারসাম্যে ঘাটতি আছে।

ওইটুকু দেশে ১৪টি দৈনিক কাগজ বার হয়। এর মধ্যে ৯টি গ্রীক ভাষায়। ২০টি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয়। তুরকি অধিকারের ফলে সাইপ্রাসের শতকরা ৩৬ ভাগ বাড়ি অধিকৃত এলাকায় চলে যায়। এখন চলছে ব্যাপকভাবে গৃহ নির্মাণের কাজ। সরকারের লক্ষ্য ১৩ হাজার বাড়ি তৈরি করা। এর মধ্যে ন হাজার বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। সরকার থেকে বাড়ি তৈরির জন্য জমি ও ঋণ দেওয়া হচ্ছে সহজ শর্তে। শুধু উন্নয়ন নয়, খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও চলছে। তৈরি হয়েছে সাইপ্রাস থিয়েটার অরগানিজেশন বা থোক। এঁরা ছোটদের নাটক করেন নিকোসিয়া শহরে। ওদের আর একটি ইউনিট সারা দ্বীপ ঘুরে ঘুরে থিয়েটার দেখায়। এছাড়া গ্রীস মূল ভূখণ্ডের মত প্রাচীন মুক্তাংগন থিয়েটারও খুব জনপ্রিয়, চারটি প্রাচীন শহরে মুক্ত মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় হয়।

—খেলাধুলোর উন্নতির জন্য ওঁরা সাইপ্রাস অ্যাথলেটিকস অরগানিজেশন (কোয়া) বলে একটি সংগঠন করেছেন। এঁরা খেলাধুলোর সংগঠনগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন সম্প্রতি এরা তিন কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুল তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। এঁরা যে স্টেডিয়াম করবেন সেখানে দর্শক সংখ্যা থাকবে এক লক্ষের মত।

* * * * * * *

নিকোসিয়ায় পৌঁছবার দিনই সাইপ্রাসের বিদেশমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেনট কিপরিয়ানুর সংগে প্রেসিডেনট প্যালেসে ইন্দিরাজীর বৈঠক। আমরা প্রেসিডেনট প্যালেসে গিয়ে খবরটা শুনলাম। বলা বাহুল্য কিপরিয়ানুকে অপদস্থ করার জন্যই বিদেশমন্ত্রী নিকোস এ রোলানডিস পদত্যাগের এই সময় বেছে নিয়েছিলেন। আমার মতে এটা তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় নয় - সংকীর্ণ রাজনীতি। এই পদত্যাগপত্র তিনি পেশ করেন প্রেসিডেনটের সংগে তাঁর মতবিরোধ হচ্ছিল বলে। সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের প্রশ্নেই এই বিরোধ। বিদেশমন্ত্রী মনে করছিলেন, প্রেসিডেনট কিপরিয়ানু এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট নন।

সাইপ্রাসে কিপরিয়ানুর যে দল এখন শাসন ক্ষমতা চালাচ্ছে তার নাম ডেমোক্র্যাটিক দল। রোলানডিস এই দলের সদস্য। মিডল টেমপল থেকে পাশ করা ব্যারিসটার তিনি। এ ছাড়াও তিনি একজন শিল্পপতি।

প্রেসিডেনট কিপরিয়ানুও লনডনের গ্রেস ইন থেকে পাশ করা ব্যারিসটার। তাঁর বয়স ৫১। আরচবিশপ ম্যাকারিওসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি। লনডনে তাঁর সেক্রেটারির কাজ করতেন। কিন্তু বৃটিশ বিরোধী কাজকর্মের জন্য তিনি ১৯৫৬ সালে লনডন ছাড়তে বাধ্য হন। গ্রীসে গিয়ে সাইপ্রাস মুক্তি আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত সাইপ্রাস এথনারকি সংগঠনের সংগে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৯ সালে আরচবিশপের সংগেই তিনি সাইপ্রাসে ফেরেন। ১৯৬০ সালে সাইপ্রাসের স্বাধীনতার পর তিনি প্রথম বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু গ্রীসের সামরিক সরকার সাইপ্রাসের আভ্যন্তারীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিল। এর প্রতিবাদে কিপরিয়ানু রাজনীতি ছেড়ে আইন ব্যবসায় চলে যান। ১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসে ক্যু ও তুরকি আক্রমণের পর তিনি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসেন। ১৯৭৬ সালে তিনি গঠন করেন ডেমোক্র্যাটিক পারটি। ১৯৭৭ সালে আরচবিশপ ম্যাকারিওসের মৃত্যুর পর (৩ আগসট) তিনি হন অস্থায়ী প্রেসিডেনট। ১৯৭৮ সালের প্রেসিডেনট নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেনট নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালের সংবিধান অনুসারে সাইপ্রাস প্রেসিডেনট-শাসিত দেশ। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন প্রেসিডেনট। প্রেসিডেনট মনোনীত করেন মন্ত্রিসভার সদস্যদের। তবে তাঁদের সকলকেই সংসদ সদস্য হতে হবে তার কোন মানে নেই। সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫। বহু দল শাসিত সাইপ্রাসের সংসদে কিন্তু কিপরিয়ানুর দল ডেমোক্র্যাটিক পারটির সংখ্যাধিক্য নয়। সংসদে একক। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মসকোপন্থী 'আকেল' - সদস্য ১২। এর পর পশ্চিমঘেঁসা র‍্যালির সদস্য ১১। সমাজ তন্ত্রী এডেক এর সদস্য ৩। এ ছাড়া আরও তিনটি দলের প্রতিনিধি আছে। আকেল ও ডেমোক্র্যাটিক দল একসংগে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করেছে। □

(চলবে)

হাজার হাজার গৃহিণীরা যা মানে...
স্বস্তিক পপুলার সম্পর্কে অমিতা-ও তাই জানে...

"হ্যাঁ, সাশ্রয় আমি চাইতাম বটে, তবে সঙ্গে কোয়ালিটিও।
আর স্বস্তিক পপুলার একদম তাই। এর দাম অন্যান্য নামকরা
ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে কতো কম অথচ কাচা হয় কি দারুণ!"

নীল রঙের স্বস্তিক পপুলার নানান গুণে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার:

- এটি স্প্রে-ড্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চটপট গুলে যায়।
- এতে অপটিক্যাল হোয়াইটেনার মেলানো থাকার দরুন কাপড় বেশী পরিষ্কার ও ধবধবে চমৎকার ধোয়।
- এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খরা জলেও ধোয়া খুবই সহজ।
- এটি স্বস্তিক এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ।
- ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাবেন।

স্বস্তিক
পপুলার
ডিটারজেন্ট পাউডার

সবচেয়ে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম

১ কিলো কেবল ১০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

Shilpi DM 17/83 Ben.

কালীপদ ঘোষ বা দানা কালীর বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য কালীপদ ঘোষের উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সংগে কালীপদ ঘোষের খুব ঘনিষ্ঠতা থাকায়, প্রথম জীবনে দুজনেই খুব উচ্ছৃংখল প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয়ে আসার পর দু জনের জীবনেই আমূল পরিবর্তন আসে এবং দুজনেই ঠাকুরের কৃপালাভ করে ধন্য হন। দানবীয় প্রকৃতির জন্য, স্বামী বিবেকানন্দ কালীপদকে 'দানা কালী' বলতেন এবং এই নামেই তিনি রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ২৩ ডিসেমবর সকালে, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কালীপদকে ঠাকুর বিশেষ কৃপা করেছিলেন, তার উল্লেখ করে কথামৃত প্রণেতা মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন : "কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতন্য হও।' আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন এবং বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।'" (কথামৃত – চতুর্থ ভাগ, একত্রিংশৎ খণ্ড – প্রথম পরিচ্ছেদ)

ভক্তপ্রবর কালীপদ ঘোষের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা এই রকম : "ইংরাজী ১৮৮৪ অব্দের প্রথমভাগে গিরিশচন্দ্রেরই সহিত তিনি (কালীপদ ঘোষ) শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসে তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া জীবন ধন্য করেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবারে কালীপদবাবুর যে ঘরে তাঁহাকে উপবেশন করান হয়, সেই ঘরে দেব-দেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়।" (স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ" – কালীপদ ঘোষ প্রসংগ)

কালীপদ ঘোষ, তথা 'দানা কালী'র যে বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল, তার ঠিকানা : ২০ নং, শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা-৪, বাড়িটি পূর্বে যৌথভাবে ব্যবহৃত হত, পরে এই বাড়িটি তিন ভায়ের (কালীপদ, তারাপদ এবং শিবপদ) মধ্যে ভাগ হয় এবং ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানটি শিবপদ ঘোষের অংশে পড়ে। বাড়িতে প্রবেশ করলেই ভিতরে বড় উঠান, উঠানের ডানদিকে অনাচ্ছাদিত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে রাস্তার দিকে যে ঘরটি, সেই ঘরে এবং সম্ভবত তার পাশের ঘরেও ঠাকুর পদার্পণ করেছিলেন। পাশের ঘরের ভেতরের বারান্দার দেওয়ালে লেখা আছে : "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তবর কালীপদ ঘোষ (দানা)কে কৃপা করে এই গৃহে ১৮৮৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে শুভ পদার্পণ করেন।" বর্তমানে শিবপদ ঘোষের বংশধর এই বাড়িতে বাস করেন, বাড়িটির বিশেষ কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি। দোতলার ঘরে এখনো সেই তৈলচিত্রগুলি টাঙান আছে, কেবলমাত্র 'মহিষমর্দিনী' দুর্গার প্রতিকৃতিটি এখন বাড়ির উঠানের সামনে একতলার পুজোর ঘরে রক্ষিত আছে যেখানে প্রতিবছর শারদীয়া দুর্গাপুজো হয়। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে শ্যামপুকুর বাটীতে যখন অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য বাস করছিলেন, সে সময় ৬ নভেমবর কালীপুজোর রাত্রে, কালীপদ ঘোষের বাড়ি থেকে সুজির পায়েস করে ঠাকুরের সেবার জন্য পাঠান হয়েছিল, তাই আজও সেই পুণ্যময় স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিবছর কালীপুজোর রাত্রে শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের 'বরাভয় মূর্তি' পুজো উপলক্ষে কালীপদ ঘোষের বংশধরগণ সেই প্রথা বজায় রেখেছেন।

পথ নির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণির ওপর অবস্থিত প্রখ্যাত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে পশ্চিম মুখে যে রাস্তাটি শ্যামপুকুরে প্রবেশ করেছে, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই বামদিকে 'শ্যামপুকুর লেন', এই গলিতে ঢুকে সামান্য একটু এগুলেই বামদিকে এই '২০ নং' বাড়ি। □

কালীপদ ঘোষের বাড়ি / আলোকচিত্র : [illegible]

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

এক আঘাতেই চুরমার হয়ে গেল মিথ্যের প্রাসাদ। বাসন্তী কিন্তু সিঁদুর মুছল না।

বার বছর পথ চেয়ে থাকব তার। এর মধ্যেও যদি জোচ্চোরটা ফিরে না আসে তো শাঁখা-সিঁদুর পরা ছেড়ে দেব।

বালিশে মুখ লুকিয়ে, মেঝেতে লুটিয়ে, দিন কয়েক একটানা কেঁদেছিল শ্রাবণী। ভন্ড হোক, প্রতারক হোক, তবু তো বাবা।

এক ফোঁটা বয়স থেকে তোকে হাতে ধরে পিয়ানো শিখিয়েছিল। আরো অনেক স্বপ্ন ছিল। শ্রাবণী, ভন্ড সে নিজের কাছে – তোর কাছে নয়।

ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছিল শ্রাবণী। ছোট্ট থেকেই ওর মন খুব নরম - দেহও পলকা। হারটের ব্যামো ন' বছর বয়স থেকে।

তাই ভয় পেলাম মেয়ের অত কান্নাকাটি দেখে। সামলে নিলাম নিজেকে। মাস কয়েকের মধ্যে আবার ঘুরতে লাগল সংসারের চাকা, ভাঙা রইল শুধু একটা দাঁত।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল এর দিন কয়েক পরে।

কী?

অনারস সমেত গ্র্যাজুয়েট হওয়া, আর এত কম বয়েসে – সবার ভাগ্যে হয় না। তার ওপর যদি পিয়ানিসট তরুণী আর রূপবতী হয় –

তা হলে তো সোনায় সোহাগা – কিন্তু ঘটনাটা কী?

(চলবে)

একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে বাড়ছে আত্মহত্যার হিড়িক

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

প্রেসিডেন্ট রেগনের 'সাপ্লাই সাইড ইকনমি'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার অতিরিক্ত ইনফ্লেশনকে আয়ত্তে আনা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটান। বর্তমানে ইনফ্লেশন আয়ত্তে এসেছে, অর্থনৈতিক অবস্থাও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে, কিন্তু ইনফ্লেশন হ্রাসের চেষ্টার দরুন দেশের শিল্প-ব্যবসার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। ১৯৮১ সালের জুলাই থেকে যে 'রিসেশনের' সূচনা হয়েছে, তার অনিবার্য ফলশ্রুতি, চূড়ান্ত বেকার সমস্যা।

একদিন ছিল যখন আমেরিকানরা বিশ্বাস করত, কর্মখালি বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়ে পছন্দমত কোথাও আবেদনপত্র পাঠালে অথবা দেখা করলে চাকরি পাওয়া যাবে। আজ সেই বিশ্বাস আর এতটুকু অবশিষ্ট নেই। রিসেশনের ফলে শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সারা আমেরিকার শিল্প-উৎপাদনের কেন্দ্রভূমি পেনসিলভানিয়ার ইস্পাত অঞ্চল থেকে মিশিগানের মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র, ইলিনয়ের মেশিন টুলের কারখানা থেকে মিনেসোটার লাল আকরিক লৌহ খনি পর্যন্ত সর্বত্র জাতীয় শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষের সম্ভাবনা ম্লান হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সরকারি চেষ্টার ফলে রিসেশনকে অতিক্রম করা হয়ত বা অনেকখানি সম্ভব হবে, দেশের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটবে, কিন্তু মধ্যপশ্চিম আমেরিকার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে এবং বালটিমোর থেকে আলাসকা পর্যন্ত শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে আগের অবস্থা ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ। কয়েকবছর আগে এ দেশের গাড়ি নির্মাণ কারখানাগুলি প্রতিবছরে ১২০ লক্ষ মোটর গাড়ি নির্মাণ করত। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৬০ লক্ষে এসে পৌঁছেছে। ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে আর কখনও কি ৬৫০,০০০ কর্মীর চাকরি হবে? U. S. Steel Co এর বিশাল কর্মভার গ্রহণ করতে আসছে British Steel Company. এতদিন পর্যন্ত U. S. Steel এর কর্মীরা বিদেশি Finished Steel এর আমদানি বন্ধ রাখার জন্যে কোমপানির সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। কোমপানির আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে নিজেদের বর্ধিত বেতনের অংশ কোমপানিতে নিয়োগ করেছে। আজ তাদের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কারণ U. S. Steel British Steel এর সঙ্গে মিলিতভাবে Semi finished Steel আমদানি করবে এবং নতুন ধরনের কারখানায় নতুন ব্যবস্থাপনায় কাজ শুরু করবে।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারির হিসাব অনুসারে আমেরিকায় বেকার লোকের সংখ্যা ১২০ লাখ। বড় বড় শহরগুলির মধ্যে নিউ ইয়রক শহরে মারচ মাসে বেকারত্বের হার বেড়ে গিয়ে হয়েছে শতকরা ১১ ভাগ অর্থাৎ ফেবরুয়ারির হিসাব ৯.১% এর থেকে বেশি। গত পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৮৩ সালের মারচ মাসে নিউ ইয়রক শহরে বেকার সংখ্যা সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪,০০০-এ পৌঁছেছে। নিউ ইয়রক স্টেটে বেকারত্বের হার জানুয়ারি ফেবরুয়ারি ৮.৮% এর তুলনায় বেড়ে গিয়ে মারচে ৯.৩%-এ পৌঁছেছে। মোট বেকারের সংখ্যা ৭৪৫,০০০। নিউ জারসি স্টেটে মারচে বেকারের সংখ্যা ৩০৩,০০০।

আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে তেলের খনি অঞ্চলে রিসেশনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। পেটরোলিয়ামের মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য লাভের অংশ আগের মত অবশিষ্ট থাকছে না, সেই কারণে On-Shore drilling-এর কাজের গতিও মন্দীভূত। ফলে drilling সংক্রান্ত ব্যবসাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের পেটরোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলি অর্থের ঘাটতির জন্যে কাজকর্মের সম্প্রসারণ স্থগিত রেখেছে। এই সম্প্রসারণের প্রস্তুতির জায়গা ছিল আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের টেকসাস, লুইসিয়ানা ইত্যাদি স্টেট। সেখানেও বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। পেটরোলিয়াম পরিশোধন কেন্দ্রগুলি সীমিত লোক সংখ্যার দ্বারা পরিচালনার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীর চাকরি শেষ হয়ে গেছে। যারা মধ্যপশ্চিমের শিল্পাঞ্চল থেকে চাকরির সন্ধানে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়েছিল তাদের অবস্থার কোন তারতম্য হয়নি।

রিসেশনের প্রধান শিকার এই শ্রমিক সম্প্রদায় এককালে ছিল আমেরিকার শিল্পসাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি বিশেষ। আজ তাদের কারখানা বন্ধ, কাজ নেই, হয়ত বা চিরজীবনের মত উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানার ফ্লোরে একের পর এক দুঃসংবাদ আসে। আবার একটি মিল বন্ধ হয়ে গেল। আবার বৃদ্ধি পেল বেকারের সংখ্যা। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে যখন পেনসিলভানিয়া স্টেটের ব্রাডক শহরে U. S. Steel তাদের Edgar Thomson Works বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছিল, এই রকমই দুর্ভাবনার ছায়া নেমে এসেছিল সেখানে। কারখানাটি আমেরিকার মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত। সে সময় যে শ্রমিক মাসে ২ হাজার ডলার রোজগার করেছে, আজ বেকার অবস্থায় সে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে মাসিক ৬০০ ডলারের বেকার ভাতায় সংসার চালাচ্ছে। বাড়ি ভাড়া গ্যাস, বিদ্যুতের খরচ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে এ দেশেও ভালমত খাওয়ার সংস্থান হয় না। চাকরির সঙ্গে যুক্ত মেডিকেল সুবিধাও আর নেই। ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্য বীমা করবার সামর্থ্য নেই। নতুন চাকরির সম্ভাবনা এখনও অনিশ্চিত।

আমেরিকায় কোনদিন কারখানার চাকরির অভাব হবে কে জানত। এ দেশের শিল্প সমৃদ্ধির মূলে ছিল মধ্যপশ্চিম অঞ্চলের শহরগুলি। এখানে অ্যানড্রু কারনেগি [illegible] নির্মাণ করেন, এখানেই হেনরি ফোর্ড 'অ্যাসেম্বলি লাইনের' প্রবর্তন করেন এবং দৈনিক ৫ ডলার পারিশ্রমিকে কর্মীদের [illegible] সাধিত করেন। আধুনিক শিল্প সভ্যতার পীঠস্থান ছিল এই অঞ্চল। সেই শিল্পসভ্যতা নিয়ে এসেছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। লৌহ আকর ভর্তি মালগাড়ি আর পর্যাপ্ত বেতনের স্থায়ী চাকরির দৌলতে শ্রমিক শ্রেণী উন্নীত হয়েছিল মধ্যবিত্তের পর্যায়ে। সেখানে আজ বিষণ্ণ জীবনযাত্রার ছায়া। নিস্তব্ধ কারখানা, বন্ধ দোকানপাট, বেকার ভাতার লাইনে দাঁড়ান [illegible] মুখগুলিতে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারী

মারকিন বেকারত্বের হার: ৯ এপরিল ১৯৮৩ পর্যন্ত

সাময়িক নিয়োজিত
মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ
১১.০
১০.৫
১০.০
৯.৫
৯.০
৮.৫
৪.০
১০.১%
১৯৮২
৮৩

চাকুরিরত (১০ লক্ষ হিসাবে)
বেকার (১০ লক্ষ হিসাবে)

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর বাহিনীর ১৬ লক্ষ ৬৪ হাজার সদস্য সহ

ছাপ। ব্র্যাজকের কারখানায় ৪,৪০০ কর্মীর বদলে মাত্র ৬০০ জনের চাকরি আছে। জনসংখ্যা ২৫,০০৫ থেকে এসে ঠেকেছে মাত্র ৬,০০০-এ। অনেকেই চাকরির সন্ধানে অন্যত্র চলে গেছেন। লোকবল অভাবে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম অচল। স্কুল বন্ধ, লাইব্রেরি উঠে গেছে। বড় রাস্তাগুলি জন বিরল। একের পর এক শিল্পাঞ্চলগুলির প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

মিশিগান স্টেটের ফ্লিনট শহরে 'জেনারেল মোটরের' ২০,০০০ কর্মী বরখাস্ত হবার ফলে সরকারি হিসাবে বেকারের হার ২৪.৬%। বেসরকারি মতে বেকারত্বের হার ৪০% মত। ইলিনয়ের রকফোরড মেশিনপত্র তৈরির কারখানাগুলি অন্যান্য বড় কারখানাগুলির কাছ থেকে ১৭,০০০ ম্যানুফ্যাকচারিং কাজ হারিয়েছে। ১৯৬৬ সালে সেখানে মাত্র ৫০ জন বৈকার ভাতা গ্রহণ করত, আজ ২৩,০০০ লোকের চাকরি নেই। ১৯৮১ সালে এই সব অঞ্চলের ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র থেকেই ৮৬,০০০ লোক বেকার হয়েছে। কমবয়সী ছেলেদের চাকরি চলে গেছে সব থেকে আগে। ফ্লিনট এর 'জেনারেল মোটর ওয়্যার হাউসিং সেনটারে' ১৮ বছরের বেশি চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলে তবেই চাকরি বজায় থাকছে। 'শেফিল্ডে ম্যানুফ্যাকচারিং' কারখানায় ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে ছাঁটাই হবার সম্ভাবনা। অথচ আগে এই অবস্থা ছিল না। শ্রমিকরা একই কারখানায় বংশপরম্পরায় কাজ করেছে। আজ সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ইনডিয়ানা থেকে ওহায়ো পর্যন্ত কোথাও চাকরির বাজার আশাপ্রদ নয়। দীর্ঘদিন বেকার থাকার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। হাতে অফুরন্ত সময় অথচ অর্থ নেই। বাড়ির ঋণের অর্থ পরিশোধ, সংসারের যাবতীয় খরচ, গাড়ির খরচ, গাড়ির বীমা, চিকিৎসার খরচ, কী বাদ দেওয়া সম্ভব? সাচ্ছল্যের দিনে এরা ঘণ্টা পিছু অন্ততপক্ষে ১২ ডলার রোজগার করে, ওভার টাইম করে ইচ্ছে মত শখ, শৌখিনতা করেছে। আজ কাজের ক্ষমতা আছে, বয়স আছে অথচ সুযোগ নেই। অনেকে পারট টাইম কাজ নিয়েছে। বাকি সময়টা কেউ কেউ গিরজায় কাজ করছে। এ ছাড়া আছে ওয়েলফেয়ারের খোঁজ খবর করে বেড়ান, ইউনিয়ন হলে গিয়ে 'খাদ্য ব্যাংকে' সাহায্য করা। অনেক শহরে দাতব্য খাদ্য ব্যাংক খোলা হয়েছে; দুঃস্থ পরিবারকে মাসিক হিসাবে ডিম, টিনের তরকারি, চিজ, হ্যাম-বারগার ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকানদের কাছে খাদ্যের প্রাচুর্য এখন অজানা নয়। আজ অনেকে বিপাকে এরা দলে দলে খাদ্য ব্যাংকে সাহায্য নিতে আসছে, গিরজা আয়োজিত 'সুপ কিচেনে' খেয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়া আছে সরকার প্রদত্ত ফুড স্ট্যামপ দিয়ে সুপার বাজার থেকে খাদ্য কেনা। একজন বেকার অসুস্থ শ্রমিক বলেছে, 'শিশুরা ডিপ্রেশন', 'রিসেশন' বোঝে না, শুধু বোঝে খিদের কষ্ট।' যে দিন তাদের খাবার জোটাতে পারব না, সেদিন চুরি করব। পকেট মারব।' আমেরিকানদের স্বভাবে অহংকার, আত্মবিশ্বাস মজ্জাগত। সম্মানে বাধে বলে সহজে সরকারি বা ব্যক্তিগত দান নিতে চায় না। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, পরিবারের মুখ চেয়ে Salvation Army র দেওয়া পুরাতন পোশাক পরিচ্ছদ, বেকার ভাতা, সরকারি ফুড স্ট্যামপ, বেসরকারি 'সুপ কিচেনের' দাক্ষিণ্য – হাত পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় কী?

মানসিক অবসাদ, কাজ না পাবার হতাশা, প্রাত্যহিক আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে এদের অনেকেরই শরীর, মন ভেঙে পড়ছে। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, মানসিক বৈকল্যও সেরম প্রভাব বিস্তার করছে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ১৯৩০ সালে আমেরিকায় যে বড় 'ডিপ্রেশন' হয়েছিল তার চেয়েও এবারের 'রিসেশনের' সামাজিক ফলাফল অনেক খারাপ হয়েছে। লোহা, ইস্পাত, কাঁচ, রবার, গাড়ি তৈরির কারখানা, জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র, বাড়িঘর নির্মাণের কোমপানিগুলির মন্দা অবস্থার দরুন ক্রমশ বেকার শ্রমিকরা মানসিক নৈরাশ্যে আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ ১৯৩০ সালে বেকারত্বের হার ছিল ২৫% (এবারে সে তুলনায় মাত্র ১০.৩%), সে সময় ছিল না এত রকম সরকারি সাহায্য, ওয়েলফেয়ার, ফুড স্ট্যামপ অথবা সোসাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা। কিন্তু মানুষের একটি বড় সম্বল ছিল আশা। শ্রমিকরা বিশ্বাস করত, এ অবস্থা নেহাৎই সাময়িক, আবার সুদিন আসবে। এবারের রিসেশনে শ্রমিকদের নৈরাজ্যের একটি প্রধান কারণ চাকরি ক্ষেত্রে টেকনোলজি কাল পরিবর্তনের ঢেউ, শিল্প ব্যবসার গঠনমূলক দিকটির আমূল রূপান্তর এবং তার স্থায়িত্ব। ফলে যারা আগে ভাল রকম অর্থ উপার্জন করত, তাদের পক্ষে নতুন ধারার কর্মজগতে স্থান সংকুলানই সমস্যা হয়ে উঠছে। ঠাঁই না পাবার আশংকা থেকে এবারের রিসেশনে নৈরাশ্য ব্যাপারটি এরকম গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। সরকারি হিসাবে জানা গেছে, ১০ লাখ ৮০ হাজার লোক চাকরির আশাই পরিত্যাগ করেছে। মিশিগানের এক বেকার মহিলা বলেছেন, 'আমাদের সুখের দিন আর কখনও ফিরবে না।' তাঁর বাড়ি নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে, এগার বছরের মেয়েকে নিয়ে এবার তাঁকে সরকারি আশ্রয়ে চলে আসতে হবে। আর্থিক অনটন থেকে নিজের ওপর আস্থা হারানর দুঃখ, অযৌক্তিক অপরাধবোধ, দুশ্চিন্তা এদের নিত্য সংগী।

যাদের চাকরি বজায় আছে, তারাও নৈরাশ্যের প্রভাব এড়াতে পারছে না। কাজ করার আগ্রহ, খরচ করার উৎসাহ যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। 'সুপ কিচেনে' পাশাপাশি বসে থাকা বেকার স্কুল মাসটার, বেকার ঝাড়ুদার অথবা বেকার শ্রমিকদের পরিবেশন করতে করতে কলেজের ছাত্রদের মনেও সংশয় জাগছে, পাশ করে চাকরি পাব তো? আশংকার কারণ মিথ্যে নয়। ইনজিনিয়ারিং ছাত্রদের পাশ করে বেরিয়ে ভাল চাকরির সুযোগ আর আগের মত নেই। ১৯৮১ সালে একজন ইনজিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট Campus Interview থেকেই একসংগে অন্তত ৩/৪টি পছন্দমত চাকরি পেত। এখন প্রতিযোগিতা এত বেশি যে একটি চাকরি পাওয়াই কঠিন।

সম্প্রতি ডেট্রয়েটে Community Mental Service Director দের যে জাতীয় আলোচনা সভা বসেছিল, সেখানকার খবরে জানা গেছে আমেরিকায় বেকার সমস্যা-জনিত পারিবারিক অশান্তির হার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দাম্পত্য কলহ, স্ত্রীকে প্রহার, সন্তানদের ওপর দৈহিক অত্যাচার, নৈরাজ্য, আত্মহত্যার প্রবণতা, অতিরিক্ত মদ্য পান, অনিদ্রা রোগ, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, বিভিন্ন উপসর্গের সূত্রপাত হয়েছে। মানসিক চিকিৎসার ব্যাপারে তৎপর আমেরিকানরা বেকার অবস্থায় স্বাস্থ্য বীমার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না। সাম্প্রতিক কংগ্রেশনাল বাজেটের রিপোরট অনুযায়ী ১৯৮২ সালে ১১০ লক্ষ লোক চাকরি সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবীমা হারিয়েছে। সমীক্ষায় জানা গেছে যদি ১% বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, সেই অবস্থা থাকলে আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পায় ৪.১%, হত্যার হার বৃদ্ধি পায় ৫.৭%, রাজ্যের মানসিক চিকিৎসালয়ে পুরুষ রোগী ভর্তির হার বৃদ্ধি পায় ৪.৩%। বিবাহ বিচ্ছেদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমেরিকার রিসেশন ভারতীয় সমাজে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ রিসেশনের প্রধান শিকার শ্রমজীবী

সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রফেশনাল ভারতীয়দের কোন সংযোগ নেই। চিকিৎসকদের অবস্থা বরাবরই ভাল। Food Processing Industries এবং ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলির অবস্থা খুবই ভাল থাকায় সংযুক্ত ভারতীয় কর্মীরা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হননি। শুধু শিল্পব্যবসা কেন্দ্রগুলি গবেষণা এবং সম্প্রসারণের ব্যয় সংকোচ করার ফলে গ্রান্ট বন্ধ করে দেওয়ায় স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় বিসায়েন্স বিজ্ঞানীরা চাকরি হারিয়েছেন।

কোন কোন ইনজিনিয়ারিং কোম্পানির হাতে কাজকর্ম কম থাকার ফলে কিছু সংকোচন, হাত বদল, স্থান বদলের জন্যে অন্যান্য আমেরিকানদের মত কিছু সংখ্যক ভারতীয় ইনজিনিয়ারও ছাঁটাই হয়েছেন, বদলি হয়ে অন্যত্র গেছেন অথবা সপ্তাহে ৫ দিনের পরিবর্তে ৪ দিন কাজ করছেন। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বড় বড় করপোরেশনগুলি নতুন প্ল্যানট বা উৎপাদনের জন্যে অর্থ নিয়োগ স্থগিত রাখায় এঁদের চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তবে ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের মধ্যে যাঁরা ছাঁটাই হয়েছেন তাঁদের একটি বিশেষ শ্রেণীর কথা আলোচনা করা যাক।

এই বিশেষ শ্রেণীকে বলা হয় Job Shopper। নিউক্লিয়ার প্ল্যানট কনসট্রাকশন কোম্পানিগুলি (যাদের এখন প্রায় মন্দা অবস্থা) জব শপারদের চাকরির উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। 'নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশনে' বা N.R.C নিউক্লিয়ার ইনডাসট্রিতে প্রচলিত কমপিউটার প্রোগ্রামে প্রস্তুত পাইপ সাপোরট ডিজাইনে বেশ কিছু ত্রুটি আবিষ্কার করে। তার ফলে N.R.C. থেকে নিয়ম জারি করা হয় যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যানটের নিরাপত্তার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত পাইপ সাপোরট ডিজাইনকে নতুন করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সংশোধন করতে হবে। তখন নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানিগুলির স্বল্প সময়ে এই কাজ করবার জন্যে বিরাট সংখ্যক প্রফেশনাল লোকবল দরকার হল। প্রচুর উপার্জনের সম্ভাবনা দেখে বহু ভারতীয় ইনজিনিয়ার স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দলে দলে জব শপার হলেন। সমস্যায় পড়ল অন্যান্য ডিজাইন ও কনসট্রাকশান কোম্পানিগুলি। 'পাওয়ার' এবং 'কেমিক্যাল প্রসেসে' কাজের লোকের অভাব হল। তারাও বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত অর্থের লোভ দেখিয়ে জব শপারদের ডাকতে লাগল। বড় কোম্পানিতে স্থায়ী চাকরির সম্মান, সুযোগ, নিরাপত্তা, উন্নতির সম্ভাবনা — সব কিছু তুচ্ছ করে মোটা অংকের লাভের আশায় অনেক ভারতীয় ইনজিনিয়ার জব শপার হয়ে চলে গেলেন টেকসাস, ক্যালিফোরনিয়া, সাউথ এবং নরথ ক্যারোলাইনার বিভিন্ন অংশে। বর্তমানে নিউক্লিয়ার প্ল্যানটে পাইপ সাপোরট-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জব শপাররা ১৯৮২ সালের সেপটেমবর বা অকটোবর নাগাদ ছাঁটাই হয়ে গেছেন। নতুন চাকরির বাজারও অনুকূল নয়। বড় বড় ইনজিনিয়ারিং কোম্পানিতে নতুন করে লোক নিচ্ছে না। ফলে এঁরা অনেকেই দীর্ঘদিন বেকার আছেন। Job Shopping এ যাবার জন্য সিভিল ও মেকানিকাল ইনজিনিয়ার ছাড়া অন্যান্য শাখার ইনজিনিয়াররাও স্বল্প দিনের কোরস নিয়ে ঐসব চাকরিতে ঢুকে পড়েছিলেন। জগা খিচুড়ি অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁদের অবস্থা এখন আরও সংগীন। এদিকে অঢেল ডলার নিয়ে ঘুরে বেড়ানর সময় নানা স্টেটে বড় বড় বাড়ি কিনেছেন। তার বাকি ঋণ শোধ, নিজেদের স্থায়ী একটি চাকরি, সবই একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রেসিডেনট রেগন আপাতত রিসেশনের প্রতিরোধ নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত। ওয়াশিংটনের খবর, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তে আসছে। কমারস বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকট বার্ষিক হারে, ১৯৮৩ সালের প্রথম তিন মাসে ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। রেগন সরকারের চেষ্টায় ৯.৬ বিলিয়ন ডলারের 'জব বিল' সেনেটের অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার ধার্য হয়েছে Public Works এবং Community Service সংক্রান্ত চাকরির জন্যে। যে অঞ্চলে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি, সেখানে চাকরির জন্যে ধার্য হয়েছে ২.১ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া ওয়াশিংটন ডি সি এবং ২৭টি স্টেটে বেকার ভাতা বর্ধিত করার জন্যে ধার্য হয়েছে ৩ বিলিয়ন ডলার। ৮০০ মিলিয়ন ডলার ধার্য করা হয়েছে সোসাল সারভিসের জন্যে, যার এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করা হবে মানবিকতার কারণে, যেমন বেকারদের আশ্রয়, খাদ্যের সংস্থান ইত্যাদি।

এপরিল মাস থেকে গাড়ির তেলের দাম গ্যালন পিছু ৫ সেনট করে বর্ধিত করা হল। এর ফলে সরকার বছরে ৫ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত লাভ করবে। সেই অর্থ নিয়োগ করা হবে হাইওয়ে এবং বড় বড় সেতু সংস্কারের কাজে। কনসট্রাকশনে চাকরি পাবে ২৫০,০০০ জন লোক।

২০০টি ব্যবসা কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ৬০% ক্ষেত্রে চাকরির সংখ্যা বর্ধিত করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের ডিসেমবরে ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিকদের বেকারত্বের হার ছিল ১৪.৮%, ১৯৮৩ সালের মারচে তা পৌঁছেছে ১২.৮%-এ। তিন মাসে ১৩০,০০০ শ্রমিক কাজ পেয়েছেন। 'জেনারেল মোটর কোম্পানি' ২১ হাজার কর্মীকে ফিরিয়ে আনছে। নতুন ধরনের সরকারি জব ট্রেনিং প্রোগ্রামে শিক্ষিত হয়ে অনেকে চাকরি পাবে। তবে এই পরিবর্তন সহজ হবে না। যারা বিশেষ কাজে দক্ষ ছিল, তাদের পক্ষে নতুন কাজ শেখা, যেমন কমপিউটার ট্রেনিং নেওয়া এবং তারপর চাকরি পাওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আগের অভিজ্ঞতার দাম নেই, নতুন চাকরিতে উপার্জন কম থাকবে, জীবনযাত্রার মানও হবে উপার্জন অনুযায়ী। বিরাট সংখ্যক বেকার কর্মীকে এক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য ক্ষেত্রের উপযুক্ত করে তোলা এবং চাকরি দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনা কত দিনে ফলপ্রসূ হবে কে জানে। বর্তমানে এ দেশে চাকরিবিহীন অবস্থায়ই ৩১.৮ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্যসীমা অথবা তার নিচের সারিতে নেমে এসেছেন। আমেরিকার ইতিহাসে দারিদ্র্যের হার বর্ধিত হয়ে প্রায় রেকরড সংখ্যায় পৌঁছেছে।

বেকার সমস্যার সামান্যই উন্নতি ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্তত ১৯৮১ র মাঝামাঝি থেকে যে হারে বেকার সংখ্যা মাসে মাসে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই অবস্থাকে রোধ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যবসার হার বেশ উন্নত হয়েছে। রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, ১৯৮৩-র শুরুতে এই ব্যবসায়িক অগ্রগতির মূলে এবং ১৯৮৪ সালে তা অব্যাহত রাখার জন্যে একটিই কারণ থাকবে, সেটি হল ব্যাংকের সুদের হার নিচু রাখা। এঁরা মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার জন্যে আরও অন্তত এক বছর সময় দরকার। এ কারণে ১৯৮৩ সালের উন্নতির গতি মন্থর থাকবে।

মারকিন সমাজ মূলত আশাবাদী এবং পরিস্থিতির পুনরুদ্ধারের জন্যে সক্রিয় সহযোগিতায় বিশ্বাসী। এই ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাস নতুন নয়। তবে এবারের রিসেশনে আমেরিকার শ্রমিক সমাজ যা হারিয়েছে, তার যথার্থ ক্ষতিপূরণ কখনও হবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর কারোর জানা নেই। □

টেলিফোন বাজছে, বাজুক

চিন্ময় সেনগুপ্ত

বহুদিন পর আজ এই রবিবারের সন্ধ্যায় একটা নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ মিলেছে সুধাময়ের। বিকেলের আগেই সুমনা পাঁচ-বছরের রিন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ওর বাপের বাড়ি চন্দননগরের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্মীর মা-ও রাতের রান্না শেষ করে চলে গেছে। এখন এই সময়টা সুধাময় একা। আজ বহুদিন পরে একা। একেবারে নিজের মত।

তাজ্জব কাণ্ড! ঠিক এই সময়ই ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনটা সত্যি সত্যি বেজে উঠল। সুধাময় ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর মুখ বিকৃত হল। আর কি সময় ছিল না ফোন করবার?

ভাবলেন, যে-ই ফোন করুক এভাবে কিছুক্ষণ বাজতে দিলে তিনি ঠিকই বুঝে নেবেন ফোন কেউ ধরছে না। নো রিপ্লাই। এবং স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ফোনটি রেখে দেবেন। কিন্তু টেলিফোনটা সেই বেজেই চলল। ক্রমাগত। একটানা। অক্লান্ত।

এবার চিন্তিত হলেন সুধাময়। এমনও তো হতে পারে এটা চন্দননগর থেকে একটা ট্রাংককল। সুমনার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে ...... বাথরুমে স্লিপ খেয়ে মাথা ফেটেছে রিন্টুর...... শ্বশুর মশায়-এর সেকনড স্ট্রোক, কিংবা... ...।

আরামের আসন ছেড়ে এবার বাধ্য হয়েই উঠে পড়েন সুধাময়। ফোন তোলেন। হ্যালো......। সরি, রং নামবার!

ননসেনস বলে সশব্দে ফোনটা রেখে দেন সুধাময়। মুখভরা বিরক্তি নিয়ে চেয়ারে এসে বসেন। মেজাজটা অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে গেছে। কিছুই ভাল লাগছে না আর। কিচ্ছু না।

এইভাবে শুধু সুধাময় নন, আমি আপনি সকলেই এক অকারণ টেলিফোন বেজে ওঠার মত নানা বহিরাগত উৎপাতে সাড়া দিয়ে মনের শান্তি নষ্ট করি। আর তার রেশটা বহুক্ষণ নিজের মধ্যে বয়ে বেড়াই।

মানুষের এই বিরক্ত, অশান্ত মন নিয়ে মনঃসমীক্ষকেরা বহু চিন্তা করেছেন। নানা পরীক্ষা, নানা পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করেছেন আমাদের প্রশান্ত মন অশান্ত হওয়ার পিছনে মৌলিক কারণগুলি নিয়ে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক অশান্তির কারণ হল, পরিস্থিতি-পরিবেশের বিরক্তিকর সংকেত বা উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া। যেমন সুধাময় সাড়া দিলেন ফোনের ডাকে। এই সাড়া দেওয়াটা আমাদের ক্রমশ একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় এবং অবলীলায় আমরা সাড়া দিই, সেই প্রতিবেদনের কোন অর্থ থাক বা না থাক।

এভাবেই অনেকে অচেনা লোককে বড় ভয় পায়। অনেক সময় শৈশবে পিতামাতা শিশুকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়ায় এমনটা হয়। অজ্ঞাতলোককে এড়িয়ে চলাটা শিশুদের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনে আসে, খুবই কাজে লাগে। কিন্তু অনেকে এটাকে স্থায়ী অভ্যাস করে তোলে। তখন যেকোন অচেনা লোকের উপস্থিতিতে সে অস্বস্তি বোধ করে, যদি জানাও থাকে যে লোকটি বন্ধু হিসেবে এসেছে। আগন্তুক তখন টেলিফোন রিং-এর মত উত্তেজকের (Stimulus) কাজ করে। আর অভ্যাসবশত প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় এড়িয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া। অনেকের ক্ষেত্রে এই উত্তেজক আবার বদ্ধ জায়গা বা খোলা জায়গা, ভিড়, অফিসের বড় সাহেব ইত্যাদি।

গত কয়েক দশকে ট্রাংকুইলাইজার ওষুধগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সব ওষুধ বিরক্তিকর, অস্বস্তিকর দুর্ভাবনা থেকে মনকে সরিয়ে ঘুম এনে দিচ্ছে। মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনছে। এরা কি পরিস্থিতি বা পরিবেশ পাল্টে দিচ্ছে? মোটেই না। যে-সমস্ত উদ্দীপক আমাদের অশান্ত, অস্থির ও বিরক্ত করছে তারা ঠিক তেমনই রয়েছে। ট্রাংকুইলাইজার শুধু আমাদের প্রতিক্রিয়া সেইবারের মত দারুণভাবে কমিয়ে দিচ্ছে।

মনোবিদরা বলছেন, এজাতের অপ্রিয় উত্তেজনায় সাড়া দেবার তাড়া থেকে আমরা মনকে ছাড়া দিতে পারি, যদি প্রতিবেদনে তৎপর না হয়ে নিশ্চিন্ত, নির্বিকার থাকা অভ্যাস করি।

টেলিফোন সংকেতের মত যে-কোন বিরক্তিকর উদ্দীপনার পাল্লায় পড়ে ইচ্ছে করলে আমি, আপনি, সুধাময় নিজেদের বলতে পারি, টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছে কিন্তু আমার সেটা ধরতেই হবে এমন কোন দিব্যি দেওয়া নেই। ওটা যেমন বাজছে, বাজুক।

তবু এই প্রতিবেদনের অভ্যাসটা পুরনো। তাই প্রথমটায় সংকেতটি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে অসুবিধে বা অস্বস্তি হতেই পারে। বিশেষ করে, যদি সংকেতটি অপ্রত্যাশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনটা একটু বিলম্বিত যদি করতে পারি, তাহলেও আমরা সেই একই ফল পাব। রেগে গেলে দশ পর্যন্ত গোনার একটা রীতি আছে। ধীরে ধীরে গুনতে পারলে এ বিলম্বে সত্যি খুব কাজ দেয়। ক্রোধ প্রশমিত হয়। আসলে সেই সময় দেহ-মন যদি ঐ গোনা-গুনতির বাহানায় শিথিল করতে পারা যায়, তবে রেগে ওঠবার জন্য যে উত্তেজনা দরকার সেটা জমাট বাঁধতে পারে না। বহিরাগত সংকেতে ও উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার বেলাতেও তাই।

সংকেত যাই হোক, তাতে সবেগে-আবেগে সাড়া দেবার জন্য মনটা যখনই তৎপর হয়ে ওঠে তখনই মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়। কেননা প্রতিক্রিয়ামাত্রই উত্তেজনা। এই উত্তেজনা কমিয়ে আনতে পারলে বা পরিত্যাগ করতে পারলে আমাদের চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করার সাধ্য আছে কার?

সুধাময় বলবেন, সবই তো বুঝলাম, উত্তেজনা যাবে কী করে?

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলছে, মনের বিশ্রাম অভ্যাস কর। বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেছে, যতক্ষণ মানুষ পেশীগুলোকে শিথিল করে রাখতে পারে ততক্ষণ এই শিথিলতার মধ্যে নিজেকে ক্রুদ্ধ, ভীত, চিন্তিত, বিপন্ন বলে ভাবার কোন উপায় থাকে না। এই পেশীর বা দেহের বিশ্রাম মানেই মনের বিশ্রাম, অর্থাৎ একটা প্রশান্ত মনোভাব। সার্থক বিশ্রামই হল প্রকৃতির নিজস্ব একটি স্বাভাবিক ট্রাংকুইলাইজার যা মানুষ ও তার বিরক্তিকর উদ্দীপকের মধ্যে একটা পর্দা টেনে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াকে বশীভূত করতে পারে।

বেশ। তাহলে মনের বিশ্রাম নেব কী ভাবে?

এ প্রসঙ্গে, একটি তরতাজা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ সহজ পদ্ধতির কথা বলি।

এই পদ্ধতিতে বিশ্রামের জন্য একটু কল্পনাপ্রবণ হতেই হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'মনের বাগান বাড়ি'-র মত অত আয়োজনের প্রয়োজন নেই। কল্পনায় একটা ছোট্ট আরাম-ঘর গড়ে নিতে পারলেই চলবে। সে ঘরের দেওয়ালের রঙ হবে নয়নাভিরাম। হালকা সবুজ অথবা হলদে। ঘরে খুব সুন্দর করে সাজান থাকবে কিছু প্রিয় দৃশ্যের ছবি। সাগর ভাল লাগলে সাগরের, নদী ভাল লাগলে নদীর কিংবা পাহাড়ের, যার যেমন ইচ্ছে। থাকবে আপনার প্রিয় আরাম কেদারাটি, তার পাশে ছোট্ট টুলের ওপর দু-চারখানা প্রিয় বই বা অন্য কোন প্রিয় সামগ্রী। সামনের ছোট্ট জানালা দিয়ে উপভোগ করা যাবে বাইরের উদার প্রকৃতিকে। হতে পারে কল্পনা-প্রসূত, তবু ঘরের সব খুঁটিনাটি কিন্তু মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে আঁকা থাকা চাই। আবছা বা অস্পষ্ট হলে চলবে না। সংসারের কিংবা কাজের ঝামেলায় যখনই ক্লান্ত, বিরক্ত লাগবে, তখনই নিজের এই মনের আরাম-ঘরে দু'দণ্ড বিশ্রাম নেওয়া যাবে। তখন কল্পনা করতে হবে একটি একটি করে সিঁড়ি পার হয়ে আপনি সেই ঘরের সামনে এলেন, দরজা খুললেন, ভেতরে ঢুকলেন। অনুভব করলেন অভ্যন্তরের স্নিগ্ধ নির্জন পরিবেশ। তারপর সেই প্রিয় কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তাকালেন বাইরের প্রকৃতির দিকে। হাতে তুলে নিলেন প্রিয় লেখকের লেখা প্রিয় বইটি।......আপনার এই আরাম-ঘরটি বড় নিরাপদ। এখানে কিছুই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। এখানে ভাবনা-চিন্তার কোন অবকাশ নেই। দুর্ভাবনাগুলো একটি একটি করে আসার পথে সিঁড়িতে ছেড়ে এসেছেন। এখানে কোন সিদ্ধান্ত নেবার নেই। কোন তাড়া নেই। কোন অশান্তি নেই।

সুধাময় বলবেন, এটা এক ধরনের এসাকেপিজম হচ্ছে না কি? এক ধরনের পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা?

নিশ্চয়ই, কোনটা পালিয়ে বাঁচা নয়? প্রকৃতির দেওয়া ঘুম—সে-ও তো সারাদিনের ঝামেলার থেকে পলায়নের একটা আয়োজন। তাই বৃষ্টিতে ছাতা ধরা বৃষ্টির থেকে পলায়ন, চোখ খারাপে চশমা পলায়ন, শরীর খারাপে ওষুধ পলায়ন, নিজের একটা বাড়ি তৈরি—বাড়ি ভাড়া আর বাড়িওয়ালার অশোভন আচরণ থেকে পলায়ন, এইভাবে ছুটি নেওয়াটাই এক ধরনের পলায়ন।

বাইরে নানা উত্তেজকের অত্যাচার থেকে স্নায়ুতন্ত্রের কিছুটা অব্যাহতি চাই, পালিয়ে থেকে, সরে দাঁড়িয়ে রক্ষা পাওয়া চাই। শুধু তাই নয়, আবেগের জন্য, প্রতিরক্ষার জন্য, দেহের যেমন বিশ্রামের প্রয়োজন, মনেরও প্রয়োজন ঠিক ততটাই।

এই বিশ্রাম উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তার ক্লেশ থেকে আমাদের পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। এতে জমিয়ে-রাখা মনের আবেগ দূর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মনে নেমে আসে একটা প্রার্থনীয় প্রশান্তি। যে প্রশান্ত অনুভূতির প্রভাব আমাদের পরবর্তী কাজেকর্মে এসে পড়ে।

এছাড়া, আরাম-ঘরে মনের এই বিশ্রাম, একটা কাজ থেকে অন্য কাজে কিংবা একটা চিন্তার থেকে অন্য চিন্তায় যাওয়ার সময় আগের কাজের বা চিন্তার রেশটিকে মুছে ফেলতে সাহায্য করে।

এই পুরনো ভাবাবেগ মুছে ফেলা একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। সুধাময় যখন ফোন তুলে দেখলেন, রং নাম্বার, তখন সেই ঘটনাপ্রসূত বিরক্ত মনোভাব, অস্বস্তি, আবেগ, তিনি কিন্তু মুছে ফেলতে পারলেন না। মনে মনে সেই বিরক্তিকে বয়ে আনলেন। যে সুখাসনে থেকে, যে পরিবেশে প্রসন্নমনে ভাল কিছু পড়তে বসেছিলেন, অতঃপর ঠিক সেখানেই বসে সুধাময় বিরক্ত, অশান্ত, ক্রুদ্ধ বোধ করতে লাগলেন। সুধাময়ের মনে যদি একটি আরাম-ঘর থাকত তাহলে কিন্তু এরকমটা হত না। সেই ঘরে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে শান্ত মনে আবার নিজের পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারতেন।

ক্যালকুলেটার বা ইলেকট্রনিক কমপিউটারে নতুন অংক শুরু করতে হলে আগের অংকের হিসেবটা মুছে নিতে হয়। না হলে পুরনো অংকের রেশ নতুন অংকে এসে পড়ে। ফলে হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়।

মনের আরাম-ঘরে একটু বিশ্রামে এই মুছে ফেলার কাজটা হয়। কর্ম, পরিস্থিতি বা পরিবেশ পরিবর্তনের সময় এই বিশ্রাম বিশেষ কাজে দেয়। তখন নতুন উদ্যমে নতুন কর্ম বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায়। এই বিশ্রামের অভাবেই কর্মস্থলের অসন্তোষ, উত্তেজনা, হতাশা আমরা অনেক সময় বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসি। স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি। অনেকে শোয়ার পর বিছানাতেও তাদের সারাদিনের নানা অভিযোগ বয়ে নিয়ে যায়। আবেগের দাপটে তারা তখনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার চেষ্টা চালিয়ে যায়, যদিও সমস্যা সমাধানের সময় সেটা নয়। সারাটা দিন ধরে আমাদের নানা মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। যখন আমরা উপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছি, যখন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছি বা যখন কোন স্বার্থগত ব্যাপারে কথা বলছি বা ভাবছি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বা পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটা পট-পরিবর্তন দরকার হচ্ছে। কেননা একটি ক্ষেত্রের মনোভাবের জের অন্য ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেলে তা কার্যকর হবে না।

এক বিদেশি কোমপানির পরিচালকেরা একবার লক্ষ্য করলেন যে, বাইরে থেকে ফোন এলে অফিসের কর্মরত অনেক কর্মী অত্যন্ত রাগতভাবে ফোন তুলছেন, উত্তেজিত হয়ে কথার উত্তর দিচ্ছেন। ওদিকে যিনি ফোন করেছেন তিনি ভাবছেন, কী ব্যাপার! হঠাৎ এত চটে উঠবার কারণ কী? এই কোমপানিটি তখন সমস্ত কর্মীদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন প্রত্যেকবার ফোন তুলবার আগে পাঁচ সেকেন্ড সচেতনভাবে অপেক্ষা করে তারপরে হাসিমুখে ফোনটি ধরেন।

মাঝের এই পাঁচ সেকেন্ড আর কিছুই নয়, মনকে বিশ্রাম দেওয়ার, পুরনো কাজের ক্লান্তি বা ব্যস্ততার মানসিক চাপ মুছে ফেলার একটা অবসর মাত্র। কোন কাজে মনোনিবেশ করবার আগে ও পরে এ-ধরনের প্রশান্ত সময় কাটানর অভ্যাস করলে, প্রথমত, যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নামছি তার জন্য থাকে একটা সুস্থ মানসিক প্রস্তুতি। দ্বিতীয়ত, সেই কাজ সমাপ্ত হলে মনকে যে সামাজিক পরিবেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাতেও সে যোগ দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। অনেক সময় আমরা নানা বিরূপ পরিস্থিতি, প্রতিকূল পরিবেশ আপন মনে কল্পনা করে ভাবের আবেগে তাতে সাড়া দিই। একে তো নানা বিরক্তিকর উত্তেজক আমাদের চারপাশে আছেই, তার ওপর আবার নানা কল্পিত দুশ্চিন্তার ভার মনের ওপর চাপিয়ে দিই। অর্থহীন ভাবনায় আমরা এত ভাবিত হয়ে পড়ি যেন কোন অঘটন ঘটেই বসে আছে। এইসব কল্পিত দুর্ভাবনার ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, তাদের আদৌ কোন গুরুত্ব না দেওয়া। সর্বোপরি, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা। কোন রকম উত্তেজনা না রেখে পরিস্থিতিটি সম্যক বিবেচনা করে জানতে হবে তার প্রিয়-অপ্রিয় সত্যগুলি কী কী। তারপর অবিলম্বে সেই সত্যগুলির আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। এই তৎপরতা থাকলে আর দুশ্চিন্তার মনগড়া কল্পনার কোন সুযোগ আমরা পাব না। □

অরূপ বসু

'প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এক-বার না একবার বিরাট শূন্যতা আসে। যদি সে সেই শূন্যতা অতিক্রম করতে না পারে তবে সে ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়।' ডান-হাতের চেটোতে মুখ মুছে তানপুরাটা সরিয়ে রাখলেন অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায় (আসল নাম অজিত)। পরনে ডোরা কাটা লুঙ্গি, সাদা গেঞ্জিতে পানের দাগ। একরাশ কোঁকড়ান চুল। আলমারিতে 'শাজা-হান', কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথের বই, সংগীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার এবং কয়েকটা পাণ্ডুলিপি।

বছর পাঁচেক আগেরই কথা। নান্দীকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নতুন দল নান্দীমুখ গঠিত হয়েছে। নতুন নাটক 'পাপপুণ্য' (তলসতয়ের পাওয়ার অব ডারকনেস অবলম্বনে রচিত) নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে। তলসতয় সম্বন্ধে দিনরাত পড়া-শোনার ফাঁকে গান লিখছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গান জানাটা ভাল, অভিনয়েরই অংগ। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তখন প্রায়ই যেতাম তাঁর সি আই টি রোডের ফ্ল্যাটে। জীবনের কতরকম ঘটনার কথা বলতেন। এত সুন্দর করে গুছিয়ে জীবনের ঘটনা বলতেন যে প্রত্যেক ঘটনাকে এক একটি গল্প মনে হত।

রাণীগঞ্জের কাছে ছোট্ট গাঁ কেঁদা। ওখানেই পৈতৃক বাস। ওখানেই জন্ম (৩০ সেপটেমবর, ১৯৩৩)। তবে কেঁদাকে তেমন মনে পড়ত না অজিতদার। মনে পড়ত রামনগর, ইসকোর কোলিয়ারি। বাবা কাজ করতেন সেখানে।

'তখন চারপাশে খুব পিকেটিং, স্ট্রাইক হচ্ছে। স্কুলের মাসটার রজনীবাবু বলতেন, ইংরেজ আমাদের প্রভু। তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অন্যায়। তোমরা উচ্ছন্নে যাবে। আমরা হুড়মুড় করে তাব কাছে ছুটে যেতাম।'

বাবা অনেক নাটকে অভিনয় করতেন। বাবার এক বন্ধু প্রবোধ-বিকাশ চৌধুরীর সৌখিন নাটকের দল ছিল। তিনি ঠিক করলেন 'টিপু সুলতান' করবেন। অজিত তখন কলেজে পড়ে। বাবার সংগে নাটকে নামল। পেশোয়ার ভূমিকায়। অজি-তের জীবনে সেটাই প্রথম নাটক। সেটা সম্ভবত ১৯৪৯ সাল।

১৯৫১ সালে কলকাতায় এলেন। মাথা থেকে নাটক উবে গেছে। সেখানে দুটো জিনিস বাসা বেঁধেছে। রাজনীতিবিদ আর লেখক হবার স্বপ্ন। বাবা বললেন, বেশ। ছেলের স্বপ্ন সফল করাব জন্য টাকা পাঠাতেন বাবা। কোনদিন অজিতের কোন খেয়ালে বাধা দেননি। শুধু বলতেন, নির্মোহ হবার চেষ্টা কর।

একজন কেরানি হয়েও অজিতের সমস্ত ভাবনাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিতেন তাঁর বাবা। অজিতের ধারণা সেজন্যই সে অজিতেশ হতে পেরেছে।

বিপ্রদাস স্ট্রিটের ষোল টাকার একখানা ঘরে থাকতেন অজিত। পরে উঠে গেলেন পাতিপুকুরের বস্তিতে নয় টাকার একখানা ঘরে। রাতে সেখানেই লিখতেন কবিতা, দিনে পারটির মিটিং।

১৯৪৭ সালে যোগাযোগ ছিল আর সি পি আই-র সংগে। ১৯৪৯ সালে কলেজে ঢুকে যোগ দিলেন ফরওয়াবড ব্লকে। ১৯৫১ সালে যোগ দিলেন কমিউনিসট পারটিতে।

অজিতেশ বলতেন, 'কলকাতায় এসে বুঝলাম আই এসসি না দিয়ে ভুল করেছি। মধ্যবিত্ত সমাজে চাবুক ঘোরানর জন্য ডিগরি বড় বেশি জরুরী।'

আই পি টি এ-র আঞ্চলিক শাখাগুলোর পারফরমেনস দেখে বড় বেশি দুঃসহ মনে হত।

১৯৫৬ সালে কমিউনিসট পারটির পাতিপুকুর লোকাল কমিটির তত্ত্বা-বধানে একটি নাট্যোৎসব হল। অজিত তাঁর প্রথম অনুবাদ নাটক পান্থশালা (চেকভের অন দ্য হাই রোড অবলম্বনে) মঞ্চস্থ করলেন। ছবি বিশ্বাসের বিচারে 'পান্থশালা'ই শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে বিবেচিত হল। তারপর অজিতের মৌলিক নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আলাদা গোষ্ঠী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

নাটক ও রাজনীতির পাশাপাশি ইংরেজির শিক্ষক হিসেবেও দমদম অঞ্চলের লোক তাঁকে ভালবাসতে শুরু করেছে। পড়ান তখন বাগুই-আটির দেশবন্ধুনগর স্কুলে। কিন্তু একবার নয়, দু-দুবার শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিলেন। ১৯৬০ সালে 'নান্দীকার' গঠন করলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন সেনগুপ্ত, রাধারমণ তপাদারদের নিয়ে। তখন থেকে অজিত 'অজিতেশ' নাম নিলেন। কমিউনিসট পারটি ছাড়-লেন ১৯৬৭ সালে। অভিনয় তখন পেশা হতে শুরু করেছে।

তপন সিংহ এ সময় 'অতিথি' ছবি তৈরি করার কথা ভাবছেন। কালী ব্যানারজি একদিন তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন অজিতেশকে।

'অতিথি' ছবিতে একটা ছোট্ট রোলের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রে অজিতেশের পদসঞ্চার।

'অতিথি' দেখে এসে অজিতেশ হতাশ গলায় বলেছিলেন, 'ইস আমাকে এত খারাপ দেখতে।' ঠিক করেছিলেন চলচ্চিত্রে আর অভিনয় করবেন না। ততদিনে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' দেখে তপন সিংহ, অরুন্ধতী দুজনেই 'হাটে বাজারে' ও 'ছুটি'তে অভিনয় করার জন্য অজিতেশকে অনুরোধ করে-ছেন। শেষপর্যন্ত অজিতেশ অনু-রোধ ফেরাতে পারলেন না।

দুটি ছবিরই চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। 'ছুটি' আসতে কয়েকদিন বাকি। খবব এল আসানসোলে বাবা ভীষণ অসুস্থ।

অজিতেশ ছুটলেন আসান-সোলে। ডাক্তাব দেখান হল। জানা গেল আর বেশিদিন নেই। আস্তে আস্তে সেবাযের মত বাবা সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। অজিতেশকে নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে বেরোতেন। অজিতেশ অবাক চোখে বাবাকে দেখতেন, আশ্চর্য, মানুষটা জানেও না যে তাঁর পকেটে মৃত্যুর চিঠি।

বাপ আর ছেলে স্টেশনের কাছে একটি খাবাব দোকানে একদিন ঢুকেছে। দেয়ালে সিনেমার পোসটার 'ছুটি'।

'জান, ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা আমি'-অজিতেশেব কথায় বাবার চোখ দুটো বড় হল, 'তা'লে তো দেখতে হয়।'

দুদিন বাদে বাড়িব সবাই মিলে 'ছুটি' দেখল। অজিতেশ ট্রেনে উঠলেন। বাবা মাথায় হাত রাখলেন, কোন চিন্তা নেই।

কলকাতায় আসার পরদিনই অজিতেশের বাবা মারা যান। মাঝরাতে অতর্কিতে কেউ যেন তাঁব মাথায় আঘাত করল। তিন ভাই, তিন বোন, খুড়তুতো ভাই বোন, মা কাকিমা, এক পয়সা আয় নেই অজিতেশের।

তপনদা বললেন 'হাটে বাজারে'

রিলিজ হতে দে, বাজারদর কোথায় যায় দেখ। এখন কোন ছবি হাতে নিস না। 'উপেনদা উপায় নেই। যে করে হোক মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করতেই হবে।'

'আলেয়ার আলো' ছবিতে সৌমিত্র বাবার ভূমিকায়ও বাজি হয়ে গেলেন। 'হাটে বাজারে'ও 'ছুটি' জোড়া ছবির খ্যাতি প্রচুর কাজ পাইয়ে দিতে লাগল। বিজ্ঞাপনে গলা দিলেন। কালী ব্যানারজি একটি হিন্দি ছবির কনট্রাকট পাইয়ে দিলেন। ফলে প্রত্যেক ভাই-বোন পোসট গ্র্যাজুয়েট, জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর অজিতেশ হয়ে উঠেছেন নাটকের অপরিহার্য অস্তিত্ব, চলচ্চিত্র ও যাত্রার প্রয়োজনীয় সম্পদ। নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক দায় পালন করার পর এভাবে অজিতেশ মা এবং কাকিমাসহ ভাই বোনদের রেখে চলে গেলেন গত ১৩ অকটোবর, সপ্তমীর রাতে।

'তিন পয়সার পালা', 'শের আফগান', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'বীতংস', 'নটী বিনোদিনী', 'নানা রঙের দিন', 'ভালমানুষ', 'শাহী সংবাদ' (সব নান্দীকার), 'পাপপুণ্য', 'তেত্রিশতম জন্মদিবস' (নান্দীমুখ), - ব্রেখট, তলসতয়, হ্যারলড পিনটার কোথাও কখনও তৃপ্তি পাননি। সর্বত্রই অতৃপ্তি, অস্থিরতা। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সেতুবন্ধন', 'হে সময় উত্তাল সময়' - এর মত মৌলিক নাটক লিখেও তৃপ্তি পাননি।

মৌলিক নাটকের অভাবের জন্য দুঃখ করে বলতেন, 'আমরা নাটক করতে পারি। লিখতে পারিনা। ও দায়িত্বটা লেখকদের। ওনারা নাটক লেখেন না। লিখলেও প্রকাশকরা প্রকাশ করবেন না। নাটক কেনে কজন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর নাটকই মৌলিক নয়।'

অজিতেশ চেয়েছিলেন এদেশে ব্রেখট ধারা বয়ে যাক। সেদিক থেকে তিনি সফল। একমাত্র সৌমিত্র তাঁর আগে ব্রেখটের একটি নাটকের সংগে বাঙালি দর্শককে পরিচিত করিয়েছিলেন।

তাঁর মতে যাত্রা ইমোশন। থিয়েটার ব্রেন। যাত্রার সংমিশ্রণে থিয়েটার একটা দেশিয় চরিত্র পেয়েছে। সিনেমাতে অভিনয় করার স্কোপ অনেক কম।

গ্রুপ থিয়েটারে প্রফেশনালিজম আনার জন্যই তিনি 'নান্দীমুখ' গঠন করেছিলেন।

চিত্রনাট্য রচনাতেও অজিতেশের হাত যে কাঁচা ছিল না তার প্রমাণ নতুন পাতা, বন জ্যোৎস্না, কলকাতা ৭১ এর 'প্রতিদিন প্রতিরাত' ও প্রথম প্রতিশ্রুতি। তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও কবিতার বই 'যখন যেমন ভাবনা' ও 'সংরক্ত চিত্রমালা' কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত পাঠকদের হাতে পৌঁছবে। যা পৌঁছবে না তা হল একটি উপন্যাস। বারবার ভেবেও যা হয়ত অসমাপ্ত রেখে গেছেন।

অজিতেশকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার জীবনের সেরা অভিনয় কি 'লালমোহন'? মাথা নেড়ে বলেছিলেন - 'না, সেরা অভিনয় করিনি, করব।' শিল্পীর সেই চিরন্তন অতৃপ্তিই পেছনে ফেলে গেলেন অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়। ☐

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল — ৭১

১	২	৩		৪	■	৫	
৬			■	৭			■
	■	৮	৯		■	১০	১১
১২	১৩			■	১৪		
■		■	১৫			■	
১৬		১৭		■	১৮	১৯	
	■		■	২০			■
	■	২১			■	২২	

সূত্র : পাশাপাশি

১। বেদের অন্ত,/ জ্ঞান অনন্ত ৫। বোধহয় জান তুমি,/ প্রাচীনকালে সিন্ধুতীরে এদের জন্মভূমি ৬। প্রকৃষ্ট বা উৎকর্ষ হয়,/ চরম প্রাপ্তি সুনিশ্চয় . ৭। কাষ্ঠপাদুকাখানি,/ পুরনো আমলে জানি ৮। মাথার ঠিক নেই,/ তার ফলে এই ১০। সুগ্রীবের ভাই/ রামে ছাড়ে নাই ১২। টাটকা একেবারে,/ বলি বারেবারে ১৪। তাসের দেশের দল/ গোলামের বল ১৫। মোটা সোটা তাইতো/ পুষ্ট শরীর পাই তো ১৬। বিদ্যুৎ ঝলকায়,/ বিস্ময় মানি তায় ১৮। তারে ছড়ের টান,/ সুরে ভরে প্রাণ ২০। চুলের বাহার বুঝি,/ সিংহকে পাই খুঁজি ২১। ইট যদি চাও, সাধুভাষা নাও২২। শরীরের কথা,/ পাবে দেখ হেথা।

সূত্র : ওপর-নিচ

১। সমীপে আনীত/ কৃত উপবীত ২। নিজের নয়,/ কেবা হয়? ৩। তিক্ত পত্র,/ স্থিত অত্র ৪। অধিকার পেলে,/ তবে এটি মেলে ৫। তুষার পাহাড়!/ কীবা কব আর ৯। সিদ্ধিদাতা গণপতি,/ তাঁর প্রতি রেখো মতি ১১। ক্রীড়াবিলাস দেবতার,/ মনুষ্য কী বোঝে তার? ১৩। 'সকর্মের' আগে/ 'নানা' অর্থে লাগে ১৪। সাধক মুসলমানে ভিখারির বেশ,/ অন্য অর্থে অভিধানে মিষ্ট বিশেষ ১৬। চাঁড়াল সাধুভাষে/ হেথায় দাঁড়াল এসে ১৭। 'কাক' আর 'কই' মিশে/ চিরুনিটা পাই শেষে ১৯। হরিয়াল পাখি/ এইখানে দেখি ২০। সায়েবের পিঠে/ খেতে লাগে মিঠে

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৭ ডিসেমবর্ সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২৪-১১-৮৩।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নমবরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল — ৬৭ (সমাধান)

বা	সাং	■	উ	স্ব	ম	■	অ
জ	ম	দী	পং	■	ত	লা	মি
পা	ম	■	জ	ঘু	■	■	বাঁ
খি	■	প্র	■	ম	হা	ম	প
■	স্ত্রী	ভা	তা	■	ভ	মা	■
দা	ম	■	র	জ	ত	■	কা
মা	ম	দা	■	হ	■	হা	মা
দ	■	বা	স	র	ষ	র	■

শব্দশৃঙ্খল ৬৭-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য (৫৮২,সূর্যনগর, শিলিগুড়ি ৭৩৪৪০৬) এবং রূপা ভট্টাচার্য ('লালবাড়ি', নন্দপল্লী, 'এ' ব্লক নৈহাটি, ২৪ পরগণা)। শব্দশৃঙ্খল — ৬৭-র লটারিতে বিচারক ছিলেন ইতিকণা মণ্ডল।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

নভেমবর ৯ থেকে ১৫

মেষ : শরীরের দিকে তীক্ষ্ন নজর প্রয়োজন; মেয়েদের শরীর আগের থেকে ভাল চলবে। আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন; ভাল রকম সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে নানা জনের ঈর্ষার পাত্র হবার আশংকা; মেয়েদের কোন ব্যাপারে নিজ মতাদর্শের পরাজয়। পারিবারিক অশান্তি। মেয়েদের অন্যের পরামর্শে অর্থহানি। ব্যবসায়ীদের অল্প লাভ।

বৃষ : আগের কোন রোগ ভোগাবে; মেয়েদের শরীর মোটামুটি ভাল চলবে। আর্থিক দুর্ভাবনা; ঋণ। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনায় বিশেষ মানসিক চাপ; মেয়েদের আগের কোন ভুল ভ্রান্তিতে ক্ষতি। পারিবারিকব্যাপারে অন্যের ওপরে ভরসায় নিরাশ। কোন সন্তানের দীর্ঘদিনের প্রয়াসে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন।

মিথুন : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর বেশ ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত শুভ। কর্মস্থলে মানসিক দুর্বলতা এড়িয়ে চলা প্রয়োজন; মেয়েদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন। দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বিরোধ। মেয়েদের দৃঢ় ব্যক্তিত্বে কোন ব্যাপারে সুফল। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কর্কট : হঠাৎ শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা; মেয়েদের মেয়েলি রোগ ভোগাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য। কর্মস্থলে অন্যের মতামত ভেবেচিন্তে গ্রহণ করতে হবে; মেয়েদের পরিস্থিতিতে সামান্য প্রতিকূলতা। কর্মপ্রার্থীদের স্বাধীন কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য। গৃহের সংস্কার বা বদল। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যমে ব্যর্থতা।

সিংহ : অম্বল-অজীর্ণ ভীষণ বেগ দিতে পারে; মেয়েদেরও পেট সংক্রান্ত অশান্তি। আর্থিক অচলাবস্থা কিন্তু ব্যয়ের চাপ এড়ান মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে আগের থেকে সাবধানতা প্রয়োজন, নচেৎ বড় রকমের ক্ষতির আশংকা; মেয়েদের কর্মস্থলে পাওনা-প্রাপ্য আদায়ে বাধা। স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের সচ্ছলতা।

কন্যা : ছোটখাট অসুস্থতা চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কোন প্ররোচনা বা গুজব ক্ষতি করতে পারে; মেয়েদের কর্মস্থলে যে কোন ব্যাপারে বিশেষ প্রশংসা লাভ। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বয়স্কদের কিছু অতিরিক্ত প্রাপ্তি। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

তুলা : লিভার সংক্রান্ত অসুখ খানিকটা কাবু করবে; মেয়েদের গলার রোগে ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি ও লাভ। কর্মক্ষেত্রে নানান ব্যাপারে দূরযাত্রা, মেয়েদের ঊর্ধ্বতন কারও সহযোগিতা লাভ। পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন মতাদর্শে কার্যসিদ্ধি। কোন সন্তানের সম্মান। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃশ্চিক : সর্দি-কাশি ও জ্বর বেশ ভোগাবে; মেয়েদের রক্তপাত। আর্থিক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থাগম কিন্তু ব্যয়। কর্মস্থলে মানসিক অশান্তি ও নিরুৎসাহতা; মেয়েদের আচমকা ছোটখাট উন্নতি। স্ত্রীর সংগে প্রবল মতবিরোধ। প্রেম প্রণয়ে মেয়েদের লাভ। ধর্মকর্ম হবে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন।

ধনু : শারীরিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন; মেয়েদের শরীর মোটামুটি ভাল চলবে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু বড় রকমের ক্ষতির ইংগিত। কর্মক্ষেত্রে অপরের ঘটনায় মাথা না ঘামানই ভাল। মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ ব্যক্তিত্বে কাজ হাসিল। বন্ধুজনের সংগে মতবিরোধ। মেয়েদের ছোটখাট লাভ। দূর-ভ্রমণ হতে পাবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মকর : শরীর হঠাৎ ভোগাতে পারে; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক মন্দা কেটে যাবে; আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সংগঠনমূলক কাজে নতুন প্রচেষ্টা; মেয়েদের কর্মস্থলে সুখবর। পারিবারিক কোন ব্যাপারে চিন্তাধারার পরিবর্তন। গুণীজনের সান্নিধ্যে মেয়েদের আনন্দ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন।

কুম্ভ : শরীর ভাল চলবে· মেয়েদের হঠাৎ অস্ত্রোপচারের আশংকা। আর্থিক ক্ষেত্রে সামান্য সচ্ছলতা। কর্মক্ষেত্রে কোন সংবাদ বিচলিত করবে; মেয়েদের কর্মস্থলে কারও ভরসায় নিরাশা। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয় কুটুম্বদের আগমনে আনন্দ ও বিষাদ। মেয়েদের কোন ব্যাপারে মানহানি। ব্যবসায়ীদের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

মীন : শরীর খুব একটা ভাল চলবে না; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে নানান প্রতিকূলতায় মানসিক চাপ। মেয়েদের কর্মস্থলে নিজের দোষে সমস্যার সৃষ্টি। পারিবারিক ক্ষেত্র অশুভ; সন্তানদের কারও কর্মলাভের ইংগিত। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন: ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

বিশেষ
বিবাহ সংখ্যা

পরিবর্তন

১৬-২২ নভেম্বর ১৯৮৩

পরিবর্তন

১৬-২২ নভেম্বর, ১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২০
দাম ৪ টাকা, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ৩৫ পয়সা

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৮

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের রঙিন ছবি : সৌগত রায় বর্মন

পরিবর্তন ২৩ নভেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীমতী গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে পরিবর্তন প্রকাশ করছে একগুচ্ছ বিতর্কমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা: ভারতীয় মাবকসবাদী কমিউনিসট পারটির নেতা ই এম এস নামবূদিরিপাদ ও ভারতীয় জনতা পারটির নেতা এল কে আদবানির সংগে পরিবর্তনের সাক্ষাৎকার। এই দুই বিরোধী নেতার চোখে শ্রীমতী গান্ধীর মূল্যায়ন। সেই সংগে শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে লেখা একটি চিত্তাকর্ষক ফিচার। এটি লিখেছেন শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, যিনি খুব কাছ থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে দেখেছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী কী করে সারা দেশের খবর সংগ্রহ করেন সেই প্রসংগে চমকপ্রদ তথ্যবহুল রচনা।

আজকাল সম্মোহন পদ্ধতি ও বিহেভিয়ার থেরাপি করে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে। এসম্পর্কে একটি তথ্যবহুল রচনা:

বিহেভিয়ার থেরাপি ও সম্মোহন

★

সম্প্রতি গণিকাপল্লী থেকে অভিযোগ উঠেছে যে একশ্রেণীর রাজনৈতিক মস্তান গণিকাপল্লীতে গিয়ে উৎপীড়ন চালাচ্ছে। গণিকাবৃত্তি বহুকাল আগেই আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু এই হতভাগিনীদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য কেউই আমল দেননি। বরং তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজ এখনও তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে পরিবর্তনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

★

বিখ্যাত ই এন টি স্পেশালিসট ডঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়ের সংগে পরিবর্তনের সাক্ষাৎকার।

এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার।

নিবেদনমিদং

পরিবর্তনের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম পাতাবৃদ্ধি ও আনুপাতিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হল। বিবাহ মানবসমাজের প্রাচীনতম ইনসটিটিউশন। বর্তমান সংখ্যায় বিবাহের সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই সংখ্যাটি সকলের সংগ্রহে রেখে দেওয়ার মত হবে।

ডিসেমবরের শেষে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন হবে। এই কলকাতা শহরেই ১৮৮৩ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দুবছর আগে প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। এই রাজনৈতিক সম্মেলন থেকেই কংগ্রেসের ধ্যান ধারণার সূত্রপাত। এই বিশেষ বছরটিকে স্মরণে বেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও কংগ্রেস আন্দোলনে বাংলাব অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন রচনায় সমৃদ্ধ পবিবর্তনের একটি বিশেষ সংখ্যা ডিসেমবর মাসে আমবা প্রকাশ করছি। ১৯৮৪ সালেও আমবা নিয়মিত পাঠকদেব পত্রবিতর্ক প্রকাশ কবে যাব। জানুয়ারি, ফেবরুয়াবি ও মাবচ এই তিনমাসেব পত্রবিতর্কের বিষয় আমরা অগ্রিম ঘোষণা করছি। প্রত্যেকটি বিষয়েব ওপব রচনা জমা দেবার শেষ তারিখ ধার্য করা হল। তারপব আমরা আব ওই বিষয়েব ওপর কোন লেখা প্রকাশ করতে পাবব না।

জানুয়াবির বিষয় - 'বাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা না দিলে জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।' মোট ৭৫০ শব্দে লেখাটি জমা দেবার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেমবব ১৯৮৩।

ফেবরুয়াবি - 'স্কুল কলেজে পড়াশুনোর পরিবেশ নেই।' ৫০০ শব্দের লেখাটি ১৫ জানুয়াবী ১৯৮৪ব মধ্যে দপ্তরে পৌছান চাই।

মাবচ - 'গ্রাম আজও উপেক্ষিত।' ৭৫০ শব্দের লেখাটি ১৫ ফেবরুয়ারী ১৯৮৪-র মধ্যে দপ্তরে পৌছন চাই। প্রত্যেকটি বিষয়েব জন্য ৩০ টাকা করে দুটি পুরস্কাব দেওয়া হবে। প্রকাশিত হওয়াব তিন মাসের মধ্যে এই টাকা মনি অর্ডারে পুরস্কাব প্রাপকদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়।

অলমিতি

পা. চ.

সম্পাদকীয়

রঘুবংশের সপ্তম সর্গে রঘুরাজের সংগে ইন্দুমতীর বিবাহের এক সুন্দর বর্ণনা আছে : নববধূর হাত ধরে রাজপুত্রকে আরও উজ্জ্বল দেখাল, কাছের অশোকলতার পল্লবকে সহকারতরু যেন নিজের পল্লবে জড়িয়ে নিল। বরের মণিবন্ধ রোমাঞ্চিত হল, কনের হাতের আঙুল ঘেমে উঠল - পরস্পরের পাণিস্পর্শের মধ্য দিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁদের মনোগত অনুরাগ যেন সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল।

আমাদের বিবাহ শুধু দুই নরনারীর মিলন মাত্র নয়। আমাদের বিবাহ দুই নরনারীর সহবাসের কোন চুক্তিমাত্র নয়। আমাদের দাম্পত্য শুধু যৌথ জীবন ধারণ মাত্র নয়। আমাদের বিবাহ আমাদের কাছে এক সৃজনাত্মক কর্মধারারই শুভ রচনা। সমাজ, সংসার ও জীবনের কলরব-মুখরিত কঠোর বাস্তবতার প্রাংগণে আর এক দ্বৈত সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি। আমাদের বিবাহ ধরণীর স্বর্গখেলনা নয়, তা পূর্বনির্ধারিত, বিধাতার অভিপ্রেত। প্রকৃত অর্থেই আমাদের বিবাহ হয় স্বর্গে। তা জন্মান্তরের বন্ধন। ধূলার ধরণীতে বরবধূর মিলন যেন নাটকে নির্ধারিত কোন দৃশ্য সম্পাত। আমরা অপেক্ষা করি এক নাটকীয় মুহূর্তের জন্য যখন জন্মান্তরের প্রিয়া বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খোলে দ্বার। বার বার হারিয়ে, বার বার পাওয়ার এই অলৌকিক আনন্দই ভারতীয় বিবাহের দর্শনতত্ত্ব।

বিবাহিত জীবনের মূল লক্ষ্য সুখ - প্রকৃত দাম্পত্য-সুখ ব্রহ্মস্বাদের মত, তা অব্যক্ত, অনির্বচনীয়। শুধু অনুভবের সামগ্রী। কিন্তু দাম্পত্যসুখের সংজ্ঞা নিয়ে এখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গরমিল। পশ্চিমের মতে যৌন সুখই সুখী দাম্পত্যজীবনের চাবিকাঠি। বৃহৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট পরিবারই একমাত্র সুখী পরিবার। কিন্তু ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের আর এক নাম গার্হস্থ্য। সেখানে শুধু পরিবার নয় পরিজনের সুখও গার্হস্থ্য সুখের অবিচ্ছেদ্য অংগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নববধূ কবিতায় যে কথা বলেছেন:

রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি বল এই কথা, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।'

বিচ্ছেদ, দুঃখ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হয় দাম্পত্য জীবনের সুখের সোনা।

এখন আকাশে তুলোর মত হালকা মেঘ। তার ফাঁক দিয়ে প্রকাশমান বিরাট বিশাল নীল আকাশের চন্দ্রাতপ। ঘাসে ঘাসে শিশিরের মুক্তো ছড়িয়ে। শহর ছাড়ালেই ভেসে আসে নবীন ধানের সুবাস। রিক্ততার ছায়া সরে গিয়ে উন্মোচিত হয় যৌবনবতী পৃথিবী। জন্মান্তরের প্রেয়সীকে খুঁজে নেবার এই তো প্রকৃত সময়। কালিদাস ঋতুসংহারে বলেছেন: অত্যন্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল - বিবিধ গুণে রমণীয়, রমণীকুলের চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন অঢেল পাকা শালিধানে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এখন বকের মেলা। এই হেমন্তকাল সর্বদা তোমাদের সুখপ্রদান করুক।

বিবাহিত ও নববিবাহিত প্রতিটি দম্পতির কাছেই এই মধুর হেমন্তকালে আমাদের প্রার্থনা - 'সংসারে তব নামুক অমৃতলোক'।

নারী রহস্যময়ী

উকিলের বউ
WITH APOLOGY

দারোগার বউ
ABSOLUTE SECURITY

আউট অব ফোকাস

পুত্রার্থে প্রিয়তে...

পাশ্চাত্যের প্রেরণাদাত্রী

অম্লমধুর

সব কত্তাই সব গিন্নীর
হাড় মাস করে কালো।
সব গিন্নীই সব কত্তার
করে আছে ঘর আলো।

সব কত্তাই ভালো কত্তা
নিজের কত্তা ছাড়া।
নিজের গিন্নী কেমন যেন
'অন্য নজর কাড়া।

বর কম -
পণ নিমূনা
আমি খাঁটি কমিউনিস্ট।

টিভি ফ্রিজ
না থাইকলে
অগো মাইয়ারই কষ্ট।

খাট সোফা
বাবারা দেয়
কওন লাগেনা তো পষ্ট।

যদি বাবা
দেয় নগদ
কমুম নাকি আমি নষ্ট -
আমি খাঁটি কমিউনিস্ট।

নির্মল বিশ্বাস

কলি যুগের নব্য যুবক
ডিসকো নাচি ডিসকো গাই
করলে বিয়ে নিজেই করি
বাপের কথা শুনি থোড়াই।

সৈকত হাজরা

আমি ঘটি আর
বৌটা বাঙাল
তবু দুজনে
প্রেমের কাঙাল
নিত্য দিনই সন্ধে সকাল
লেগেই থাকে ঝগড়া।

উনি ভালবাসে
চিংড়ি ইলিশ
আমি শুতে চাই
নরম বালিশ
খাবার কিম্বা শোবার সময়
উল্টোটি হয় বখরা।

বিয়ে করে দেখ
বোয়ের হাজার বায়না
আমি যেটা চাই
উনিতো সেটাই চায় না।

ধার করে কিনি
ফ্রিজ টি ভি আর গয়না
তবুও বোয়ের
মন কেন ঘরে রয় না

বাবে বাবে শুনি
সংসারে সুখ পায় না
তাই সে কখনও
বাপের বাড়িতে যায় না।

নিতাই ঘোষ

বরাভরণ বরশয্যা
সবই দেওয়া হল,
গয়নাগাটি, টি ভি, ফ্রিজ
তবুও মেয়ে মলো।

সুধীরকুমার রায়

বিয়ের যুগ্যি আছে মেয়ে,
বিজ্ঞাপন দি পাত্র চেয়ে:
পত্র লিখে পাত্র জানান
মাইনে ভাতায় সাতশত পান
উপরি, প্রতি মাসে,
দেড় দুহাজার উপরি আসে।
পেলে এ বর শিবের বরে
কী কাম জজম্যাজিস্টরে।

শুভেন্দু পালিত

রকমারি শাড়ি চাই
চাই টি ভি গয়না
ধার করে সব দিই
তবু মন পাই না।

ফ্ল্যাট বাড়ি বেষারেষি
স্ট্যাটাসটি রাখতে
গিন্নীর আব্দার
রাখি শুধু বাঁচতে।

প্রীতম দে চৌধুরী

এবারের জনমত-এর বিষয় 'দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠি কী'? পাঠক পাঠিকার কাছে আমরা যে মতামত আহ্বান করেছিলাম তার আশানুরূপ সাড়া আমরা পেয়েছি। প্রায় সকলেই তাঁদের মতামতে একটা কথাই জানাতে চেয়েছেন যে, দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠিটি আছে দম্পতির হাতেই কিন্তু সে চাবির ব্যবহারিক দিকটা অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে অর্থনৈতিক, ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব, সামাজিক ইত্যাদি কারণে।

চিঠিগুলি পড়ে যদি কোন দম্পতি তাঁদের চাবিকাঠিটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তবে সে আনন্দ আমাদেরও। স্থানাভাবের জন্য আমরা চিঠিগলির অংশ-বিশেষ প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবি-কাঠি কী?

একটু হাসি, একটু চোখের জল

সুখী দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি কী-এক কথায় বলা যায় না। জীবনের জটিলতা থেকে দাম্পত্য জীবন তো আর মুক্ত নয়! তাই বিভিন্ন দম্পতির কাছে এটা ভিন্ন ভিন্ন। খেয়ে - না খেয়েও অনেক দম্পতিকে মিলেমিশে বেশ ঘর করতে যেমন দেখেছি তেমনি আবার গাড়ি বাড়ি, গয়নাগাটির প্রাচুর্যের মধ্যেও অনেককে দেখেছি শুধু ঝগড়া করতে। আসলে 'সুখ'ই বা কী? এটা কি পার্থিব না মানসিক, না দুইই?

আমার অল্প দিনের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি - স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব বা মিত্রতাই সুখী দাম্পত্য জীবনের পূর্ব শর্ত। আর, বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচন্দ্রের মতে, 'বিচার মিলনা হী মিত্রতা কী পহলা সরত্ হ্যায়' – এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

আর একটা কথা- একটানা সব জিনিসই একঘেয়েমি লাগে। মাঝে মাঝে একটু আধটু 'মাইলড' ঝগড়ার প্রয়োজনও আছে। নয়কি? একটু বিচ্ছেদ একটু মিলন, - তবে না জমবে দাম্পত্য - জীবন।

হেমেন রায়
জিনজিয়া, আসাম

ফাঁকি নয়

একজন অন্যজনকে আড়াল বা ফাঁকি দিয়ে বা অজান্তে কোন কিছুই করা উচিত নয়। উভয়ের মধ্যে প্রচুর ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া মায়া, স্নেহ, প্রীতি ও বাৎসল্য প্রেম থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেহ কোন ব্যাপারে যেন ভুলক্রমে উত্তেজনা সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

রঙ্গলাল গায়েন
বুকিং অফিস, আসানসোল, বর্ধমান

পতিই অধিপতি! কেন?

যে কথাটা কোন-কথার অপেক্ষা রাখে না, তা হল সুখ ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। বিশেষত দাম্পত্য জীবনে এটা সাপেক্ষ, কেননা দ্বি-পক্ষীয়। 'যদিদং হৃদয়ং তব....' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ দুটো জীবন জুড়ে দিলেও জোড় সব সময় মেলে না, 'কলমা' অনেক সময় কলম বাঁধতে পারে না। পারে না কারণ গড়ের অংক ভাগ দিয়ে মেলান যায়; কিন্তু এ জীবনের অংক দুই দিয়ে ভাগ দিলে গড়গড় করে গড়িয়ে যায় না – অনেক সময় গড়িয়েও যায়। 'বেটার হাফ' এমন হাঁফ ধরিয়ে দেয় যে সেই হাঁপানির টানে কেউ সটান তিলক কাটা বৃন্দাবনে, আবার কেউ বা হিমালয়ের গহন বনে!

আসলে যুগ পালটেছে -- মন পালটায়নি। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের এমন কতকগুলি ধারণা আমাদের রক্তে বয়ে চলেছে যা নিউটনের গতিসূত্রের মতই অমোঘ অথচ অভ্রান্ত। সেই গতির বাঁধনেই যত দুর্গতি। জীবনটা যে মুহূর্তে সাত পাকে জড়িয়ে গেল, ভোগ দখলের ক্ষেত্রটাও কিন্তু সেই মুহূর্তেই শুধু চিহ্নিত হল তাই নয়, সীমিত হল। সাম্রাজ্য বিস্তারের অভীপ্সায় অনেক পথ রক্ত পিচ্ছিল হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। বিবাহোত্তর জীবনে সেই লালসায়, অনেক 'গৃহদাহ' কিংবা 'বিষবৃক্ষ' হতে দেখা গেছে। মানবজীবন ইতিহাস তার দলিল।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অব-স্থানগত সুবিধার জোরে অনেক সময় স্বামী যে জোর খাটাতে পারে, স্ত্রী তা পারে না। আমরা ভুলে যাই 'শ্রীচরণেষু'-র যুগ পেরিয়ে তারা শ্রীচরণে 'সু'র যুগে প্রবেশ করেছে। দাম্পত্য সাম্রাজ্যে পতিই অধিপতি – এ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে সঙ্গিনী যে সংগীন হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্যের কী? যা গত তার সব কিছু সরিয়ে ফেলতে আমরা উদ্যত, তার ফলে আজ আমরা দুর্গত।

শ্যামলবরণ দে
খাঁটুরা, ২৪ পরগণা

ছোট পরিবার

সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি হল পারস্পরিক বোঝা-পড়া, সমঝোতা। দাম্পত্য জীবনকে সুখবহ করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যে কোন পরিস্থিতি, পরিবেশে মানিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সহনশীল হতে হবে। ক্রোধ আর হিংসাকে দমন করতে হবে, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, বিশ্বাস আর সম্প্রীতির মিলন সেতু গড়তে হবে। সন্দেহ প্রবণতাকে বর্জন করে উদারমনা হতে হবে। সর্বোপরি – 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার' -- পরিবার-পরিকল্পনার এই শাশ্বত শ্লোগা-নের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আনন্দময় জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে।

স্বপনকুমার আদিত্য
কলকাতা ৬৭

দৈহিক তৃপ্তি-অতৃপ্তি

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীরা যদি পুরুষের বাধ্য হয় তা হলে সুখ অনেক বেশি সম্ভব। দাম্পত্য জীবনে যৌন অতৃপ্তিও অনেক সময় অশান্তি আনে। উপযুক্ত যৌন জ্ঞানের অভাব এবং শারীরিক অক্ষমতা এর মূলে কাজ করে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত যৌনজ্ঞান লাভ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণই একমাত্র সুখ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, দরকার দম্পতির মধ্যে ভালরকম বোঝাপড়া। সীমিত পরিবারও দাম্পত্য জীবনে সুখের আকর।

গৌরহরি দাস
ময়না, মেদিনীপুর

যৌথ প্রয়াস

দাম্পত্য জীবনে স্বামী এবং স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকারবোধকে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখাতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন উভয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য। দাম্পত্য জীবনে সুখের আবহাওয়া তৈরি করতেও উভয়ের আন্তরিকতা এবং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়ার চেষ্টা থাকাটাও অত্যন্ত জরুরী, দাম্পত্য জীবনে সুখ হল স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই পর-স্পরের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতার যৌথ প্রয়াসের ফসল।

সমরেন্দ্র ভৌমিক
দক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণপুর,
মেদিনীপুর

প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষার

আমার মনে হয় বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে সুখ পেতে হলে

বিয়ের চলতি সমস্ত প্রথা তুলে দিয়ে, তাদের গোত্র আর বংশের বিচার পাশে রেখে প্রাধান্য দেওয়া উচিত অন্য আর একটি বিষয়ের ওপর। এ জন্য তাদের একটু বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। বিয়ের আগে তাদের উভয়ের পুরো শরীর পরীক্ষা করে, উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করে বিয়ের সম্মতি নিয়ে বিয়ে ঠিক করা প্রয়োজন। কেননা উভয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শরীরের রক্ত ঠিক থাকলে তাদের ছেলে-মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্মাবে। আর তা না হলে উভয়ের মধ্যে একজন সুস্থ আর অপরজন অসুস্থ হলে তাদের উভয়ের মধ্যে কখনই দাম্পত্য জীবনে সুখ আসতে পারে না।

মহম্মদ ইয়াসিন আখতার
সোনাতোড় পাড়া,
বীরভূম

মানসিক বৈষম্য নয়

উভয়ের মধ্যে যদি বোঝাপড়া থাকে, তবে স্বর্গ নেমে আসবে ধরায়। সুখ আষ্টেপৃষ্ঠে জায়া ও পতিকে শান্তির চূড়োয় পৌঁছে দেবে। শান্তির নীড় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ফুটপাত নয়। দাম্পত্য জীবনে সুখের জন্য এমন জমি থাকবে যার মাটি হবে ত্যাগে পরিপূর্ণ। ভাল বাসা, মায়া, ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ উর্বর সারে ভরে উঠবে গৃহস্থের মন্দির। উভয়ের মানসিকতা এক বিন্দুতে মিলে তৈরি হবে সংপৃক্ত দ্রবণ। স্ত্রীর স্বাধীন চিন্তার যথাযোগ্য মর্যাদাও দিতে হবে। স্ত্রী অবশ্যই উৎপাদনের সামগ্রী হবে না। অন্যদিকে নারীদের সংকীর্ণতা বিস-র্জন দিয়ে স্বামীর মানসিকতায় গড়ে তুলতে হবে নিজেকে। দূর করতে হবে মানসিক বৈষম্য। দৈহিক তৃপ্তিও দাম্পত্য জীবনের অন্য এক দিক।

কেকা দে
জঙ্গীপুর
মুরশিদাবাদ

সুপ্রিয়া হতে গেলে

সুখী দাম্পত্য জীবন ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ। পূর্ব জন্মের অনেক পুণ্যের ফলে নারী-পুরুষ একটি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে পারে। সুখী দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব, ত্যাগ, বিশ্বাস, সহানুভূতি, উদারতা ও অফুরন্ত ভালবাসার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব অনেক বেশি। স্ত্রী শুধুমাত্র স্বামীকে ভালবাসলেই চলবে না, সেই সংগে স্বামীর মা, বাবা, ভাইবোন আত্মীয়স্বজন সবাইকে আপন করে কাছে টেনে নিতে হবে। নিজের ছেড়ে আসা মা বাবা ভাইবোনদের মত ওদেরও ভালবাসতে হবে। যে স্ত্রী শ্বশুর-বাড়ির সবার প্রিয় হন তিনিই স্বামীর সুপ্রিয়া অর্থাৎ স্বামী সোহাগিনী হন।

স্বামীকে কোন সময় শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, আর্থিক অসচ্ছলতা, বংশ এসব নিয়ে খোঁটা দেওয়া উচিত নয়। স্বামীর অক্ষমতা দুঃখ, ব্যথা, সমস্যা, অপমানকে নিজের মনে করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

দীপ্তা পুরকায়স্থ
করিমগঞ্জ, আসাম

বোঝাপড়া চাই

পরিবর্তিত যুগের যুগপ্রভাবে অর্থ কৌলিন্যের শৃংখলে দাম্পত্য জীবন কোথাও বন্দিত আবার কোথাও নিন্দিত। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গৃহসজ্জা, ইমপোর্টেড গাড়ি, আর 'বার' সহ তরল পানীয় আজকের দিনে দাম্পত্য জীবনের মধুময় সম্ভাবনাকে করেছে নিষ্প্রভ ও অনিশ্চিত। অপরদিকে নগ্ন দারিদ্র্য সমাজের একটি বৃহত্তর অংশকে দাম্পত্য প্রেমের সার্থকতার উত্তরণে বাধা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। সংঘাত ও সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাম্পত্য জীবনের সৈনিকগণ পর্যুদস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। সুখের চাবিকাঠি আজ হাতছাড়া। আজকের আলোচনা এদের জন্য নয়। ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরীক্ষা দিয়ে শুরু করতে হয় পথযাত্রা। কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে কুসুমাস্তীর্ণ পথের সন্ধান করতে হয়। তার জন্য দরকার দুটি জীবনের এক সুন্দর বোঝাপড়া।

মনোজকুমার মাইতি
নয়াপুট, মেদিনীপুর

সুখের চাবি – 'সহ্য'

বিবাহের পরে যেহেতু মেয়েরা স্বামীর বাড়িতেই আসে এবং এটাই যখন আমাদের দেশের নিয়ম তখন স্বামীর বাড়িকেই (শ্বশুরবাড়ি) আপন করে নিতে হয় বেশি। তাই বলে বাপেরবাড়িও নিশ্চয়ই ফেলনা নয়। কারণ সেখানেই সে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। ধরা যাক স্ত্রীর বাপেরবাড়িতে কোন কারণে স্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্য থাকতে হবে। কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ির ইচ্ছা নয় যে তাদের পুত্রবধূ বাপেরবাড়ি যাক। এক্ষেত্রে স্বামীর উচিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে যতটা সম্ভব স্ত্রীর পক্ষে মত দেওয়া। কারণ তিনিই পারেন তার মা ও বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে। এ কর্তব্য তারই। বিষয়টা যেহেতু গুরুতর এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে তাদের মেয়েকে বিবাহ করে তিনিই নিয়ে আসেন তাই স্ত্রীর সুখ সুবিধা স্বামীকেই দেখতে হবে।

স্ত্রীকেও তেমনি স্বামীর দিকটা দেখতে হবে। স্বামীর পছন্দ অপছন্দের বিচার করে তার কাজ করা উচিত। এতে হয়ত কোন কোন সময় তাকে তার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে গেলে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, অনেক অপ্রিয় ব্যাপার সহ্য করতে হয়।

রবীন মিত্র
কলকাতা-৮১

মানিয়ে নেওয়া

স্বামী ও স্ত্রী দুইটি পৃথক পরিবারে পৃথক পরিবেশে মানুষ হয়ে বিবাহের পর একসংগে বসবাস করে। উভয়েই যদি সজাগ থাকে যে, তাহাদের পথ ও মত এক না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তার জন্যই দরকার উভয়ের মানাবার ও স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা অর্জন, তা হলে সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

ক্ষমতা কিন্তু উভয়কেই অর্জন করতে হবে। তবে তার মধ্যে স্ত্রীরই এই ক্ষমতাগুলি বেশি প্রয়োজন।

গীতা দে
কলকাতা-৬

দুজনের গড়া জগতে অন্যের প্রবেশ কেন?

একটি নারী এবং একটি পুরুষ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবার সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন কতজন তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ংগম করেন জানি না, তবে এটুকু বুঝি একটি হৃদয়ের সংগে অপর একটি হৃদয়ের মিল সেদিনই সম্পূর্ণ হয় যেদিন একে অপরের প্রতি সমান দরদী হয়ে ওঠে। ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটি চরিত্র কখনই একরকম হয় না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন তারা একে অপরের পরিপূরক হতে চায় তখন উভয়কেই হয়ত কিছু অভ্যাস বা ইচ্ছার

আট হাজার টাকার সংগে 'বুলেট'- প্রবাসে কন্যাদায় সমস্যা

[illegible]

রকমফের ঘটাতে হয়। এটা যদি খুশীমনে তাঁরা মেনে নেন তাহলে অনেক সহজে জীবনটা মধুর হয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে একটা রীতি প্রচলিত আছে যখনই কোন দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রায় সকলেই মহিলাটিকে বিশেষ করে উপদেশ দেন মানিয়ে নিতে। যেহেতু অপর পক্ষ পুরুষ অতএব তার মতামতে ভুল থাকলেও সেটা নির্বিবাদে মেনে নেওয়াই উচিত কিন্তু এখানেই হয় মুশকিল। কষ্ট করে মানিয়ে নেওয়া আর পরম আদরে কাছে টেনে নেওয়ার মধ্যে যে তফাৎ সেটা এঁরা বুঝতে চান না, যা থেকে একটা অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন বিবাহসূত্রে পাওয়া অধিকার বলে স্ত্রী তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অতএব তিনি যা খুশি করতে পারেন কিন্তু তাঁর এই ভুল ধারণায় একটি মন যা কিনা খুশীর রাগিণীতে বেজে ওঠার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল তাতে অকস্মাৎ ঘা খেয়ে সুর কেটে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে উঠতে তা আবার নষ্ট হয়ে যেতে বসে পারিপার্শ্বিক বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পাল্লা দেবার মনোভাবে। এর শিকার হন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা। এই রোগে একবার ভুগতে শুরু হলে তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে না করলে পরে খুব মুশকিল হয়ে পড়ে।

সুখী দম্পতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, এই নির্ভরতা আসে অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা থেকে। এই নির্ভরতাই সুখী জীবনের চরম তৃপ্তি। দুজনের গড়ে তোলা এই সুন্দর জগতে অন্য কারুর প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অনেক সময়ে দেখা যায় কোন কারণে দুজনের ভুল বোঝাবুঝি হলে তৃতীয় চতুর্থ শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ বোঝাতে এসে বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করতে শুরু করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে দিয়ে যান। নিজেদের ভুল নিজেরাই বোঝার এবং শোধরানর চেষ্টা করা উচিত।

শুক্লা কর
শিবপুর, হাওড়া-২

প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য

জীবনযাপন এক শিল্পকর্ম। বিবাহিত জীবনযাপন করার জন্য প্রয়োজন আরও গভীরতর শিল্পবোধ। আমাদের ভারতীয় সমাজে যেখানে বিবাহ প্রেমজ নয় সেখানে সমঝোতাই হল দাম্পত্যের ভিত্তি। দুটি সম্পূর্ণ অচেনা নরনারীকে একটা ধর্মীয় তথা লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্র বসবাসের ছাড়পত্র দিয়ে সমাজ তাদের কাছে দাবি করে অনেক কিছু। এই ধরনের বিবাহিত জীবনে প্রেম আসে পরে, আগে আসে যৌন জীবন। এক্ষেত্রে অনেক সময় বিবাহিত জীবন একটা জটিলতার মুখোমুখি আসতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিবাহ পরবর্তী প্রেমও গভীরতর হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন রচনা করছে, আর প্রেমজ বিবাহের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রেম কখন বাষ্পীভূত হয়ে গেছে পড়ে আছে পারস্পরিক দোষারোপে তিক্ত দাম্পত্যের অকেজো বাঁধনটুকু।

বর্তমান সমাজ জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের আজকের জীবনকে এত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে যে মধ্যবিত্ত জীবনে প্রেম একটা বিলাসিতা বলে মনে হয়। কিন্তু অভাবের থেকে অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে অভাববোধ। অনেকক্ষেত্রেই অভাবের সংসারে পারস্পরিক দোষারোপ অশান্তি আরও বাড়ায়। যা নেই তার জন্য হাহুতাশ না করে যা আছে তাকেই মনের মাধুরী দিয়ে সুন্দর করে তোলা যায়। তা না করে ক্রমাগত অভিযোগ কটূক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ নষ্ট তো করেই সন্তানের জীবনে এর প্রভাবও অপরিসীম। যা আমার নাগালের বাইরে তার জন্য দুঃখ করলে জীবনের যন্ত্রণা বাড়ে বই কমে না। আবার অনেক স্বামী নিজের অক্ষমতা ঢাকতে অহেতুক তাঁর স্ত্রীকে দোষী করেন। অপরের স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করেন, প্রতি পদে নিজের স্ত্রীকে ছোট করেন এইভাবে তিক্ত হয়ে ওঠে দাম্পত্য জীবন। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাই জীবনের যন্ত্রণাকে কিছুটা মেনে নিয়ে দুজনের সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহৃদয় মনোভাব দিয়ে অভাবের সংসারেও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। এখানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য।

মনীষা ভট্টাচার্য
কলকাতা-১৯

সুখের বীজ আছে হৃদয়ে

আজকের ধূসর সমাজে পণপ্রথা, বধূহত্যা, পত্নী উৎপীড়ন প্রভৃতি অসামাজিক নিষ্ঠুর ক্রিয়াকর্মের মাঝখানে সুখী দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া সত্যই দুষ্কর। স্বামী স্ত্রীর অন্তর্লীন ভালবাসা, একে অন্যের পরিপূরণের মানসিকতা আজ স্বপ্নের মত ক্ষণস্থায়ী। তাই বিয়ের পরে দুটি হৃদয়ের মিলনের সম্ভাব্য সফলতা সম্বন্ধে সবাই যেন কেমন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অথচ দাম্পত্য জীবনের সুখের মহীরুহ ছোট বীজের আকারে বিবাহিত নারী পুরুষের হৃদয়ের ভেতরেই প্রচ্ছন্ন থাকে। ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যাক।

সুখী দাম্পত্য জীবনের স্থায়ী সুখ নির্ভর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। সমস্যাটা কিন্তু ওইখানেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিবাহের পরেই বোঝাপড়া নামক অলীক বস্তুটি প্রায় সংসার থেকেই বিলুপ্তপ্রায়। ফলে বিবাহের সুখের ঘরে অসুখের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘটে। এর কারণও আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংসারে পুরুষই প্রধান অথচ স্ত্রী শিক্ষা ও নারী প্রগতির যুগে আজকাল নারীরাও পিছিয়ে নেই। ফলে শুরু হয় দুই মানসিকতার সংঘাত।

স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মনে আসে লেলানড কার্টার উডের কথা। তিনি তাঁর লেখা বিবাহ বিষয়ক বইতে লিখেছেন, 'বিয়েতে সাফল্য নির্ভর করে সঠিক লোক খুঁজে বার করার উপর। বিয়ে কোন সমস্যা নয়। সমস্যা উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্বাচনে।'

পীযূষকান্তি চন্দ্র
নিমপুরা, খড়্গপুর ৪

কোন ফরমুলা নেই

এর কোন ফরমুলা নেই। সুখী দাম্পত্য জীবন কথাটাই আপেক্ষিক। শাড়ি গাড়ি-গয়না? বাড়ি-ফ্রিজ-টিভি - ভাল চাকরি-স্বাধীন জীবনযাত্রা-কলহবিহীন নিস্তরঙ্গ জীবন? প্রত্যহ চরম পুলকলাভ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা'র মত লোকোত্তর দিব্য দাম্পত্য জীবন - কোনটাকে সুখী দাম্পত্য জীবন বলা যায় — কোনটার অভাবেই বা জীবন অসুখী ভাবা যায়?

দুটি নরনারী পরস্পরকে অবলম্বন করে জীবন যাত্রা পথ পাড়ি দেবে এবং সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দেশ-জাতি ও নিজেদের প্রয়োজন মত সন্তান সৃষ্টি করবে, বিবাহের এটাই উদ্দেশ্য। কিন্তু দুটি নর-নারীর মধ্যে নির্ভরতা আসবে কী করে? তার তো অগণিত উপাদান। আধুনিক বিজ্ঞান, কোটি কোটি কোষ যার দ্বারা এই পঞ্চভৌতিক দেহ তৈরি তাকেও বিভাজন করে ক্রমপর্যায়ে 'জিন' ক্রমোজমকেও এ ব্যাপারে দায়ী করে, সেখানে সুখী জীবনের চাবিকাঠি তৈরি করে বিয়ের রাতেই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া যায় কি?

তবে এটা ঠিকই বিয়ের ন্যূনতম ও প্রাথমিক শর্ত হল জীবনসাথীকে সুখী করার সর্বাঙ্গীন প্রয়াস। প্রয়াস যদি আন্তরিক হয় এবং সে বিচারের সামান্যতম ক্ষমতা যদি দম্পতির থাকে, তাহলে, তাদের জীবনযাত্রা সহজ ও সরল হবেই। এই সহজ সরল পথ দুজনার বহু ইচ্ছাপূর্তির উপায় হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এটাই সুখী দাম্পত্য জীবনের সংজ্ঞা বলা যায়। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কেন? সেটাই নিবেদন করি।

ধরা যাক একটি দম্পতি। সচ্ছল, সহৃদয় আন্তরিকতায় দুজনায় পরস্পরের সহমর্মী। কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে তাঁরা নিঃসন্তান। এই সন্তানহীনতা একান্তভাবেই তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এক্ষেত্রে এঁদের মর্মদাহ কি যেকোন অসুখী দম্পতির থেকে কম? এঁদের বুভুক্ষু মাতৃত্ব/পিতৃত্ব পরিতৃপ্ত হবে কোন চাবিকাঠিতে?

কল্যাণকৃষ্ণ ঘোষ
ডি এল ভবন, বারাণসী

স্ত্রী যদি বন্ধু হয়

আমাদের সমাজে সবদিকে একটা অস্থিরতা বাড়ছে। আমরা ক্রমশ এসটাব্লিশমেনটের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি, বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। তার বহিঃপ্রকাশ যে ঘটছে না তা নয়। অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি অশান্তির রোষবহ্নি — ভাঙচুরে কিংবা হানাহানিতে রূপ নিচ্ছে। সামাজিক সংস্কারও এর ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পায়নি। সেই অগ্নিসাক্ষী করা বিয়ের বাঁধন মেনে নিয়ে শাখাসিঁদুর অক্ষয় রাখতে এখন সবাই পাগল নয়, মনের মিল না হলে যান্ত্রিক বাঁধন টুটে গেলে ক্ষতি কী? তাই দেখতে পাচ্ছি একদিকে বিয়ের রাজ্যে সামাজিক সংকট। দাবি দাওয়া না মেটাতে পেরে বহু মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না — তাদের মা বাপ অর্থনৈতিকভাবে পংগু, বরপক্ষের খিদে মেটান তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। অন্যদিকে শিক্ষিতা স্ত্রী এবং স্বামীরা যখন তখন বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করে বসছেন।

পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীকে যদি পণ্য হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। স্ত্রীকে মনে করতে হবে নিজের বন্ধু হিসাবে।

অমর দাশ
কলকাতা-৬

কালো হাত

'দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠি কী?' — চাবির অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি কোন দম্পতির হাত দেখতে পাইনি, দেখেছি কতকগুলো লোমশ কুৎসিত কালো হাত, যে হাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নাস্ত। অথচ নির্বোধের মত আমরা চাবি খুঁজে বেড়াচ্ছি স্বামী-স্ত্রীর হাতে। ভারতবর্ষের সত্তরভাগ মানুষের বসবাস গ্রামে, এছাড়া শহরের দশভাগ মানুষের অবস্থাও তথৈবচ। এই আশিভাগ মানুষ, পেটের দায়ে যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, কলমের খোঁচায় তাদের সুখের রাস্তা দেখানর ভাষা আমার জানা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সুখের নীড় বানাতে যে অর্থের প্রয়োজন, যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে প্রয়োজন কে মেটাবে? কালির আঁচড়ে দাম্পত্য চরিত্রের উপর আলোকপাত করা সহজ। কিন্তু লাভ কী তাতে?

শেখর ভট্টাচার্য
মধ্যপ্রদেশ

সুখের চাবি তিনটি

দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবিকাঠি বলতে সাধারণত তিনটি জিনিস বোঝায়। ১। সহনশীলতা, ২। মানিয়ে নেওয়া ও ৩। ত্যাগ। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কোন স্বামী স্ত্রীরই এই ব্যাপারটিকে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। ধরুন আপনার বাড়িতে আপনার বন্ধুরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। স্ত্রী সামান্য ভুল করে বসল। আপনার কিন্তু তখন সবার সামনে স্ত্রীকে অপমান করা বা ওঁদের সামনে ভুল ধরিয়ে দেওয়া একেবারে উচিত নয়। আপনি আপনার স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে বলুন। এদিকে স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি তাই করতে হবে।

সুনীল কুমার মোদক
রাঁচি বিহার

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে

নারীকে হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে প্রিয়া ও অর্ধাঙ্গিনী উভয় রূপেই যথাযথ প্রকাশ ঘটাতে হবে। আমরা জানি: সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। নারী যদি 'পরপুরুষেষু গোষ্ঠী লীলাসু' হয় তবে সে গৃহধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় ও গৃহদাহের সৃষ্টি করে। তেমনি পুরুষও পরস্ত্রীতে গোষ্ঠী লীলাসু হলে দাম্পত্যজীবন কণ্টকাকীর্ণ হয়।

বিপ্লব বিশ্বাস
করিমপুর, নদীয়া

বৌ কে রোজ একটু তোষামোদ করুন

ডাঃ রেমনড করসিন নামক এক মনস্তত্ত্ববিদ বলেছেন, সুখী দাম্পত্য জীবনের অন্যতম চাবিকাঠি হল সমঝোতা। যেমন, তুমি ওটা করো না, আমিও ওটা করব না অর্থাৎ তুমি পাড়া বেড়ান ছাড়, আমিও সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছি।

জেনে রাখুন স্ত্রীরা তোষামোদ প্রিয়। রোজই খানিকটা তোষামোদ করে স্নেহপ্রকাশ করুন, আখেরে লাভই হবে। তাছাড়া সময় ঠিক করে রোজ এক সংগে মিলে বাড়ির কাজ বা রান্নার কাজ করুন।

সরোজেন্দ্র মোহন ঘোষ
কলকাতা ৭৩

কবিতা বনিতা চৈব

দম্পতিরা বর্তমানে খুবই সমাজ সচেতন। বিবাহের পরই কম সন্তান সন্ততির প্রতি নজর বর্তমানে উল্লেখযোগ্য। অধিক সংখ্যক সন্তান বর্তমানে অকাম্য হলে দাম্পত্য জীবনে সুখ অনেকখানি অনুভূত হয়। কিন্তু প্রত্যেক দম্পতির জীবনে সুখের সংজ্ঞা একইরকম হবে এ ভাবা অন্যায়। একটা প্রবাদ আছে — কবিতা বনিতা চৈব স্বয়ম্ সুখমাগতা — অর্থাৎ কবিদের কবিতা এবং স্ত্রী যখন আপনা থেকে আসে তখনই সুখের। এখানে অবশ্য কিছু বিতর্কিত তথ্য তুলে ধরা যায়। স্ত্রী যদি আপনা থেকে আসে (কবিদের) তবে তার সুখ ধরে রাখার ধারাবাহিকতার কোন সংজ্ঞা নেই। মানবিক জীবনে সুখের অনুভূতি কতখানি তীব্র তা অনুভূত হতে পারে অ-সুখের কিঞ্চিৎ স্পন্দে। স্ত্রী কিংবা স্বামীর দৈহিক সম্পর্কসাধন মুখ্য পরিচয় নয় বা থাকা উচিত নয়। দৈহিক আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পাশাপাশি দুটি প্রাণ কাছাকাছি আসে। পরস্পরের প্রতি মমত্ব বাড়ে, বাড়ে ভালবাসা, আসে অনুরাগ, সর্বোপরি এক অদৃশ্য গ্রন্থিবন্ধন।

বিপ্লব সেনগুপ্ত
কাঁচড়াপাড়া

অ্যাডজাসটমেনট

আমার স্থির বিশ্বাস হল সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি অ্যাডজাসটমেনট, অর্থাৎ একে অপরকে মানিয়ে নেওয়া। যদিও কথাটা যত সহজে বলা যায় তা প্রতিপালন করা অনেক দম্পতির কাছে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমি বলেছি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে অ্যাডজাসটমেনট থাকলে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে।

স্বামী যদি মুখরা স্ত্রীর সবদোষ ক্ষমা করে দিয়ে তার সংগে ভাল ব্যবহার করেন তাহলে দাম্পত্য জীবনে সুখ আসবেই।

আমার স্ত্রীকে সুন্দরী বলা চলে। তার সামনে আমাকে বড় বেমানান লাগে। আমরা দুজনে যখন সিনেমায় কিংবা কোথাও বেড়াতে যাই তখন বেশ বুঝতে পারি রাস্তার লোকে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে — ভূতের গলায় মুক্তোর মালা। এবং আমি আরও লক্ষ্য করেছি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোন সুন্দর পুরুষ মানুষ দেখলেই আমার স্ত্রী চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি স্ত্রীর সংগে কোন বিতর্কে যাইনি। আমি জানি তাতে অশান্তি হত। বরং আমি তাকে ভালবাসা দিয়ে আমার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, এবং তাতে সুফল পেয়েছি।

দীপক বসু
হাবরা, ২৪ পরগণা

মূলসূত্র

সহজ সাবলীল বিবাহিত জীবনের মূলসূত্র বা চাবিকাঠি প্রথমেই সুস্থ বর কনে নির্বাচন। বিবাহিত জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন — প্রাক মধ্য ও উত্তর। প্রাক নির্বাচনে হবে ১। পূর্ব পরিচিত ২। সমমর্যাদা সংগতিসম্পন্নতা ৩। সমপ্রকৃতি। মধ্যকালীন বিচার্য হবে ১। সমপ্রবৃত্তি ২। সমতুষ্টি ৩। সমপ্রীতি। উত্তরকালীন কার্য হবে ১। সমব্যথী ২। সেবাপরায়ণতা ৩। সহাগুণ।

বাসন্তী দত্ত
শিলিগুড়ি

কর্তব্যই চাবিকাঠি

২০-৩০ বছর আগে যে নারী তার পরম পুরুষকে বিবাহসূত্রে লাভ করত তাকে তারা ইহকাল পরকাল বলে মনে করত।

আজকাল নারী আর তেমনটি নেই। নারী প্রগতির যুগে অতটা আশা করাও ঠিক নয়। তারা এখন প্রায় পুরুষের সমকক্ষ। বিবাহ-বিচ্ছেদে তারাও পিছিয়ে নেই। তবু বলতেই হয় এসবের মূলে রয়েছে অস্থির চিত্ত ও সহাশক্তির অভাব।

পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, ধৈর্য, স্থির বুদ্ধি নিয়ে সমাজ সংসারের কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেই রয়েছে সুখী দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি।

পুলককুমার দেব
চাকদহ, নদীয়া

সফল মিলন

আজকাল নরনারী উভয়েই শিক্ষিত ও নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সচেতন।

দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে পারে নিম্নলিখিত শর্তগুলি:

১। সার্থক যৌনমিলন। ২। পারিবারিক ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। ৩। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। ৪। স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র। ৫। মধুর হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। ৬। স্বামী স্ত্রীর বাড়ির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সমতা ৭। বিবাহ তথা যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধের অবসান। ৮। পরস্পরের ভাললাগাকে গুরুত্ব দেওয়া। ৯। অযথা উত্তেজনা এড়ান ও ছোটখাট ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার বা উদারতা। ১০। অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতা থাকা। ১১।

কিছুটা স্বাধীনতা প্রদান ইত্যাদি।

নীরদ কুমার বিশ্বাস
কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

স্ত্রী করুণার পাত্রী নয়

দাম্পত্য জীবন সুখী ও সুন্দর করা নির্ভর করে স্বামী স্ত্রীর যৌথ ভূমিকার উপর। এটা একপাক্ষিক ব্যাপার নয়।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাসই হল দাম্পত্য সুখের অন্যতম ভিত্তি। অকারণে উত্তেজিত হয়ে কোন ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ না জানা পর্যন্ত স্বামী বা স্ত্রী কেউ কাউকেই অবিশ্বাস করতে পারবেন না। একবার অবিশ্বাসের বিষ মনে ঢুকলে তা মন থেকে দূর করা প্রায় অসম্ভব।

পরস্পরের প্রতি মর্যাদা ও সহানুভূতি দাম্পত্য সুখকে মধুর করে। যদি কেউ তার স্ত্রীকে না মর্যাদা দেয় তবে সেই ব্যক্তিও স্ত্রীর কাছ থেকে মর্যাদা প্রত্যাশা করতে পারেন না। স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি থাকাও প্রয়োজন। স্ত্রীকে কখনই করুণার পাত্রী বলে মনে করা চলবে না। অনুরূপভাবে এই কথাগুলো স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শান্তনু পাত্র
ময়না, মেদিনীপুর

একাত্ম হওয়া

স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক একে অন্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া কিছুই নয়। একটি অপরিচিত পরিবেশে বৌ হয়ে যাওয়া, ধীরে ধীরে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে জীবনসাথীর সংগে একাত্ম হয়ে বাস করা সত্যিই অবাক ব্যাপার। যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সে পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা, তাই স্বামী যেমনই হন না কেন স্ত্রীর বংশমর্যাদা, শিক্ষা, এই অহংবোধকে তুচ্ছজ্ঞান করে স্বামীকে স্বামীর মর্যাদা দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করার দায়িত্ব স্ত্রীর। স্বামী যেন বোকেন স্ত্রী তাঁকে নিয়ে অসুখী নন। স্বামীরও কর্তব্য স্ত্রীকে তাঁর মনের মত করে গড়ে তোলা।

ঝর্ণা মুখারজি
দুর্গাপুর-৫

'সহানুভূতি' চাবিকাঠি

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ। তাই মানুষের হাঁটা, চলাবলা সব-টুকুতেই আছে সুশৃংখলার একটা নিয়মানুবর্তিতা। সামাজিক নিয়মে, বাঁচার তাগিদে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মানুষ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে ও ঘর বাঁধে সুখী জীবনের আশায়। সামাজিক নিয়মে নরনারীর জীবনের যে বন্ধন তাকেই আমরা বলি দাম্পত্য জীবন। দুটি বিপরীতধর্মী জীবন একত্র মিলিত হয় কেন? একমাত্র সুখের আশায়।

দাম্পত্য জীবনে সে সুখ আসবে পরস্পরের মধ্যে ত্যাগ, নিষ্ঠা, ধৈর্য সহানুভূতি থাকলে।

শিখারানী কুন্ডু
সাদিখাঁর দেয়াড়,
মুরশিদাবাদ

একে অপরকে বুঝুন

স্বামী যদি স্ত্রীকে না বোঝে, স্ত্রী যদি স্বামীকে না বোঝে, তাহলে দাম্পত্য জীবন কখনই সুখের হতে পারে না। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই যদি নিজ নিজ প্রয়োজনকে বড় করে দেখে, উভয়েই যদি আত্মস্বার্থে লিপ্ত হয়, তাহলে দাম্পত্য জীবন বড় অশান্তির হয় এবং তার বিষময় ফল তাদের সন্তানদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।

তাই, সহধর্মিণীকে হতে হবে সহমর্মিণী, স্বামীকে হতে হবে সহমর্মী। তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবেই হবে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ কুন্ডু
সাদিখাঁর দেয়াড়,
মুরশিদাবাদ

সুখের ঘরে বাসা বাঁধতে

সামাজিক কারণে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী, স্বামী স্ত্রী হয়ে ঘর বাঁধে এবং অনিবার্যভাবেই সুখ প্রথম বাসা বাঁধে শরীরে। এক্ষেত্রে অতৃপ্তি কিন্তু সুখের অন্তরায়, এর প্রতিফলন অবশ্যই মনের উপর পড়বে। পরবর্তী পর্যায়ে আসছে ব্যক্তিসত্তা। একজনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সুখ হয়ত আসে তবে তা এক-জনেরই। এক্ষেত্রে চাই সমঝোতা পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যের মনকে বোঝাবার জন্য স্বচ্ছ মানসিকতা।

সমীর পতিতুন্ডী
শান্তিনিকেতন পাঠচক্র, বোকারো

সঠিক পাত্রপাত্রী নির্বাচন

এদেশে বহুসংখ্যক দম্পতিই সামাজিক অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পেতে তাদের অসুখী দাম্পত্যজীবনকে কোনরকমে বয়ে চলে।

সংসারে সমস্যা নানা প্রকারের। এইসব সমস্যার সমাধান আইন করে বা বিধিবন্ধ কোন নিয়ম মেনে দূর করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন স্বামী স্ত্রীর অ্যাডজাস্টমেন্ট।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুখী দাম্পত্যের জন্য বয়সের একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখাই বিধেয়। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী অন্ততপক্ষে ৫-৬ বছরের ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয় একথা বহুজনগ্রাহ্য, জীববিজ্ঞানও তাই বলে। দাম্পত্য জীবনের বড় অংশ যে যৌন জীবন একথা মানতেই হয়।

প্রথমেই যেটা প্রয়োজন তাহল সঠিক পাত্র পাত্রী নির্বাচন। এই প্রাথমিক নির্বাচনটিতে গলদ থাকলে দাম্পত্যজীবনের ভবিষ্যৎটি হয়ে দাঁড়ায় ভিত্তিহীন বৃহৎ প্রাসাদের মত।

স্নিগ্ধা রুদ্র
সুন্দরনগর, বিহার

সংক্ষেপে

ত্যাগ স্বীকার করতে হবে; এক্ষেত্রে একজনকে অন্যের তুলনায় বেশি করতে হয় তাও ভাল।

সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়
সিউড়ি, বীরভূম

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বলছে - বিবাহ হল দুটি নরনারীর মিলন দেহে প্রাণে ও আত্মায়।

হেনা মান্না
পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান

নবদম্পতির বিবাহিত জীবনে সুখী হবার চাবিকাঠি প্রধানত রোমান্টিক মন, নিবিড় সান্নিধ্য, অসীম মমত্ববোধ আর দেহমনের সুস্থতা।

জিতেন চন্দ
কলকাতা ৪২

আমাদের দেশে দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরে মূলত অর্থনৈতিক কারণে। সুতরাং স্বামীর রোজগারের দিকটা স্ত্রীকে দেখতে হবে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
বেলডাঙা, মুরশিদাবাদ

বিবাহের ঠিক পরেই তো একজনের সমস্ত দোষগুণ - অপরজন জানতে পারেন না, পরে প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে উভয়েরই মেনে নেওয়ার পালা।

অনিল ঘোষ
শ্যামসায়র, বর্ধমান

স্বামীকে ভালবাসার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

নন্দিতা দাশগুপ্ত
বালি, হাওড়া

আমি কী পেলাম, কী পেলাম না, এই হিসাব না কষে যদি ভাবতে পারি আমি কী দিয়েছি, কতটুকু দিতে পারিনি তাহলেই - -।

অমলকান্তি বিশ্বাস
দুর্গাপুর-৪

শিক্ষার আলো প্রবেশ করা চাই, ভালমন্দ অন্যায় বিচারের ক্ষমতা চাই।

সিরাজুল ইসলাম
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা

চাই প্রগতিশীল আধুনিক দৃষ্টিভংগী।

চম্পা মজুমদার
বারাসাত, ২৪ পরগণা

উভয়েরই প্রয়োজন নিজেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে একে অপরকে জানানো।

ভুবন সরকার
আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে অন্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রয়োজন।

সমরেন্দ্র গোস্বামী
হবিবপুর

স্বামীগৃহের পরিবেশ প্রত্যেক স্ত্রীকে মানিয়ে নিতে হয়।

বন্দনা দেবী
কায়স্থগ্রাম আসাম

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত প্রধান মন্ত্রীর সংগে দেশে দেশে রচনাটি এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ২ নভেম্বর সংখ্যায় 'পিনাকী চ্যাটারজির মৃত্যুকে ঘিরে' প্রচ্ছদ কাহিনীর ৪১ পাতায় 'জলযাত্রী পিনাকী' বলে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তা পিনাকী চ্যাটারজির নয়। ভুলবশত অন্যের ছবি ছাপা হয়েছে।

ওই লেখাতে পিনাকী চ্যাটারজির নৌকার নাম চাঁদ সদাগর' লেখা হয়েছে। ওর পারিবারিক সূত্র থেকে বলা হয়েছে নৌকার নাম 'সোনা সদাগর'। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

ভারতের নানা রাজ্যে বিবাহের বিচিত্র রীতিনীতি

অশোক কুমার কুণ্ডু

বিষয়কে কেন্দ্র করেই বিয়ে। অর্থাৎ অবাধ যৌন মিলন ঘটলে কে পাবে পূর্বসূরীর সম্পত্তি এই বিরাট জিজ্ঞাসাটি থেকেই মানব সভ্যতায় বিয়ের ঘটনা। অর্থাৎ সমাজ-স্বীকৃত সন্তান, পত্নী ও সংসার। সভ্যতার অনেকটাই উন্নতি ঘটেছিল সমাজে বিয়ের অনুশাসন পরিবর্তিত হবার পর। অবশ্য বিয়ের অনেক আচার অনুষ্ঠান আজ বদলেছে, বিদায় নিয়েছে অনেক কিছু, নতুন করে এসেছেও কিছু। এ রূপান্তরগুলি অবশ্যম্ভাবী।

পূর্বসূরীদের বিবাহ-বৈচিত্র্যের ও জীবন-যাপনের এমন অনেক কিছু মিশে আছে আমাদের আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে, যেগুলি শুনলে অনেক সভ্য মানুষ অবাক হবেন। আবার উত্তরপ্রদেশের কিছু আদিবাসীদের মধ্যে ছেলে বা মেয়ের বয়ঃসন্ধির পর তার বিয়ের আগে অক্ষত চরিত্র পরীক্ষা করেন ঐ আদিবাসীদের মোড়ল

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান। শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান' এ থেকে কি একথা মনে আসতে পারে, বর বিয়ে করতে গেলে একই পিতার সমস্ত কন্যাগুলিকে বিয়ে করতেন 'ময়নামতীর গান' থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাজা হরিশচন্দ্র যখন গোপীচন্দ্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন তখন তিনি 'অদুনার বিয়া দিয়া পদুনা করিল দান' অর্থাৎ একটি মেয়েকে নয়, অন্য মেয়েগুলিকেও দান করেন। এবং এখনও আমাদের সমাজে শালীদের নিয়ে ছোটখাটো ঠাট্টা গুলিতে একই প্রচ্ছন্ন চিত্র দেখতে পাই।

একই সঙ্গে বৌ ও শালীকে বিয়ে করার রীতিকে 'শালীবরণ' বলে ঠিক এর উল্টোটি হচ্ছে দেবরণ। দেবর বৌদির উপর দেবরের অধিকার। এ লোকাচারের কিছু অংশ এখনও প্রাচীন [illegible] দের মধ্যে আছে

বিবাহ [illegible] [illegible] [illegible]

সঙ্গে [illegible] পারত। সে যুগে [illegible] স্ত্রীলোকদের কখনও ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত না, [illegible] কুমারী অবস্থায় কোন নারীর কোন পুরুষের কাছে [illegible] ছিল না। [illegible]

[illegible] পার্থক্য [illegible] এমনকি এক

পরিবারের সংগে অন্য পরিবারের।

আমরা এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিয়ের লোকাচারগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখব। আমরা দক্ষিণ ভারত থেকে যাত্রা শুরু করতে পারি। আমরা এই বিবাহ বৈচিত্র্যে যে লোকাচার ও অন্যান্য সামাজিক দিকগুলি দেখব সেগুলোকে একটু সাজিয়ে নিতে চাই, না হলে বিভিন্ন রাজ্যের বিয়েগুলির নানান জটিল ও সূক্ষ্ম আচার ব্যবহারে পথ হারাব। বিবাহ বৈচিত্র্যের এই দৃশ্যপটগুলি আমরা সাজিয়ে নিলাম এইভাবে:

এক : নির্বাচন। অর্থাৎ মেয়ে দেখা ও ছেলে দেখা।

দুই : বিয়ের শোভাযাত্রা। ছেলে বা মেয়ে যখন বিয়ে করতে বের হয় এবং যখন বিবাহ মন্ডপে পৌঁছায়।

তিন : বিবাহ মন্ডপে কীভাবে বিয়ে হয়।

চার : বিয়ের শেষে কীভাবে বিদায় জানায় ও কীভাবে দুজনের পুনরাগমন ঘটে।

তামিলনাড়ু : ভাগ্নীই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল পাত্রী

দক্ষিণ ভারতে বিয়ের কথা বলার আগে জানিয়ে রাখি ...দের বিয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্নী হচ্ছে সব থেকে ভাল পাত্রী অর্থাৎ কোন পাত্রের দিদির মেয়ে যদি বিবাহযোগ্য হয় তবে মামা ভাগ্নীরই বিয়ে হয়। এমনকি এ বিয়েতে কন্যা জন্মের পর বাগদত্তা হয়ে থাকে। এরকম বিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মাদ্রাজ ও কর্ণাটকে দেখা যায়।

বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেলে পাত্রীর বাড়ি থেকে লোক যায় আগে কথা বলে পাত্রের বাড়ির লোকজনের সংগে। এক্ষেত্রে কিছু মানুষ আছেন যারা ঘটকের ভূমিকায় অংশ নেন। অনেক সময় প্রাথমিক কথাবার্তার পর পাত্রী পক্ষের গ্রামের ব্রাহ্মণ গিয়ে দ্বিতীয় বার কথা বলেন। বিয়ের ... অবশ্যই ঠিকুজি কোষ্ঠী মেলান হয়। শুভদিন ধার্য হয়। চূড়ান্ত কথা বা পাকা দেখার দিন দুপক্ষের বাবা-মা ও ব্রাহ্মণ এবং গণ্যমান্য আত্মীয়রা হাজির থাকেন। মেয়ে দেখা বা ছেলে দেখার ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামতের কোন মূল্য নেই। বিয়ের আগে তারা পরস্পরকে দেখতেও পায় না। সমগ্র বিয়েটা চলে পাঁচ সাত অথবা তিন দিন ধরে। যদিও এই দীর্ঘমেয়াদী-কমে তিন দিনের অনুষ্ঠানই বর্তমানে গ্রহণযোগ্য। বিয়ে করতে বর আসে মেয়ের বাড়িতে। বরযাত্রী দলে আত্মীয়স্বজনের সংগে মামাও থাকেন। দক্ষিণ ভারতের সব বিয়েতেই মামার ভূমিকা অবধারিত। বরযাত্রী কনের গ্রামে ঢোকার সময় কনের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে তাদের আমন্ত্রণ জানায় কন্যাপক্ষের একদল মহিলা। এ অনুষ্ঠানকে তামিল ভাষায় বলে 'জানবাসম'। তারপর পুরো দলটিকে এনে বসান হয় বিবাহ মন্ডপ ও কনের বাড়ির কাছেই কোন আলাদা ঘরে। সেখানে দুপক্ষের ব্রাহ্মণ পাত্রপাত্রীদের পরিচয় দেন উপস্থিত মান্য ব্যক্তিদের সামনে। যদি ঐ সময় কেউ কোন রকম আপত্তি তোলে তবে বিয়ে স্থগিত থাকে। এবং অনুসন্ধান চলে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত না হলে ঐ লোকটিকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

নীচেদারতম / তামিলনাড়ু

সাধারণের সামনে যখন দুপক্ষের ব্রাহ্মণ পরিচয় করায় তখন পাত্র পক্ষের ব্রাহ্মণ একটি নারকেল ফাটিয়ে তার জল সবাইকে বিতরণ করেন পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। এই অনুষ্ঠানটির নাম তামিল ভাষায় 'নীচেদারতম'।

এর পর বিয়ের লগ্ন আসে। তার আগেই বর ও বরের বাবা মা বিবাহ বেদিতে (ছাঁদনাতলা) এসে বসেন। যেখানে বিয়ের জন্যে বর অপেক্ষা করছে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় লগ্ন এলে কন্যাপক্ষের পুরোহিত আবেদন করেন কন্যাকে বিবাহ বেদিতে আনার জন্যে। বরের মামা সম্মতি জানায়। কনেকে এনে বসান হয় তার বাবার কোলে বরের বাঁদিকে। এ অনুষ্ঠানের নাম 'আংগলপট্টম'।

এখন শুরু হল বিয়ের মন্ত্রপাঠ। মাঝে বর কনের হাতে ফুল (শুধুমাত্র লাল গোলাপ ফুলই ব্যবহৃত হয়), নারকেল, আতপ চাল, সুপারি দেয়। তারপর দুজনে হাত ছুঁয়ে সেগুলি হোমাগ্নিতে ছুঁড়ে দেয়। এ অনুষ্ঠানের নাম 'কাইসেরতল'।

ঠিক এ সময়েই ঘটে একটি মজার ঘটনা। বর ছাঁদনাতলা থেকে উঠে পড়ে রাস্তায় বের হয়, পথচারীদের ডেকে বলে 'বিয়ে করব না, বিয়ে করার অনেক ঝামেলা ইত্যাদি......' এবং 'আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব'। তখন কনের বাবা ও কনের ভাই বা দাদা রাস্তা থেকে বরকে বুঝিয়ে আনেন বলে 'সংসার করা পবিত্র কাজ ইত্যাদি ....'। এবং ঐ বাত্রে বৃষ্টিহীন, তাপহীন জনপদ থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে বরকে নিয়ে আসে, আবার বিবাহ মন্ডপে বসায়। এটা নেহাতই একটা মজার ব্যাপার।

আম্মিমিন্দিতল / তামিলনাড়ু

বিয়ের মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি শেষ হলে গ্রামের মেয়েরা বরণডালা নিয়ে নবদম্পতিকে বরণ করে। বরণডালায় থাকে আতপ চাল, হলুদ, কুমকুম (সিঁদুর) ও জ্বলন্ত প্রদীপ। এসময় ছেলের দিদি বা বোন কনের কাপড় বদলে ছেলের বাড়ির দেওয়া লালপেড়ে শাড়ি (বেনারসীও হতে পারে) পরায়। তারপর দুজনে হোমাগ্নির চারপাশে ঘোরে তিন বার। এর পর আরও কিছু মন্ত্রপাঠ। তখন দুজনেই মৃত আত্মীয়দের আশীর্বাদ চায় ও সাতপাকে ঘোরার মত একটা অনুষ্ঠান হয়। হোমাগ্নির ছাই ও নারকেল তেল মিশিয়ে তিলকের ফোঁটা পরান হয় বরকে। তারপর বর মংগলসূত্র পরায় কনের গলায়। মংগলসূত্রের রং হলুদ। এবং ঐ সুতো পাক দিয়ে তৈরি করে রাখে কনের বাড়ির এয়োতিরা। বিবাহিত ও কোন জীবিত সন্তান আছে এরকম এয়োতিরা (রজস্বলা সময় বাদ দিয়ে) ঐ সুতো তৈরি করে রাখেন। মংগলসূত্রে তিনটি গেরো দেওয়া হয়। বর দেয় দুটো এবং বরের দিদি বা বোন দেয় একটা। এই মংগলসূত্র কনে সারাজীবন পরে থাকে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হবার পর 'আম্মিমিন্দিতল'। পাথরের ওপর কনে ডান পা রাখে ও বর একটা রুপোর আংটি পরিয়ে দেয় পায়ের মধ্যম আঙুলে। দক্ষিণ ভারতে অবিবাহিত মেয়েরা সিঁদুর (কুমকুম) পরে সিঁথিতে। এটা ওরা পরে অংগসজ্জা হিসাবে। কিন্তু বিবাহিত দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা চেনা যায় মংগলসূত্র ও পায়ের আংটি দেখে।

এই আংটি পরানর পর বরের শালা (কনের দাদা বা ভাই) এক বাটি ভাজা ভুট্টা খেতে দেয় বরকে। বর তা পয়সা দিয়ে কিনে নেয় শালার কাছ থেকে। বিয়ে শেষ হলে বর চলে যায় তার গ্রাম থেকে আসা বরযাত্রীদের দলে। কনে তার ঘরে ঢোকে।

পরদিন সকালে বরকনে ফিরে আসে। বাবা মা বিদায় দেয়। এখানে ঐদিন আলাদা করে কোন অনুষ্ঠান হয় না। বরের বিয়ের পোশাক ধুতি। গায়ে একটা উত্তরীয়র মত সাদা চাদর গোছের থাকে। বর যে কোন যানে চড়ে যায়। গরুর গাড়ি বা আধুনিক যানেও যেতে পারে। বর কনেকে নিয়ে যখন ফিরে আসে ঘরে (বরের বাড়িতে) তখন উঠোনে নবদম্পতিকে অভ্যর্থনা করে বরের মা, মাসি ও বয়স্ক মহিলারা। বরণডালা নিয়ে এ অভ্যর্থনা চলার আগে বর তার মাসিকে ডেকে (মাসি বা অন্য কোন বয়স্ক মহিলা) বলে 'আমি বৌ এনেছি'। বিয়ের তৃতীয় দিন থেকে এরা একসংগে থাকে।

নিকটআত্মীয় যথা যে কোন

পক্ষের বাবা-মা মারা গেলে বিয়ে বন্ধ থাকে। পাত্রের বাবা-মা কেউ মারা গেলে বিয়ে এক বছর পিছিয়ে যায়। কনের বাবা মা মারা গেলে এক মাস পরে আবার দিন স্থির করে বিয়ে হতে পারে।

অন্ধ্রপ্রদেশ : নিতবর নিতকনে আংটিখেলা, কড়িখেলা

বোনের বা দিদির মেয়ে অর্থাৎ ভাগ্নী থাকলে সে পাত্রীই এ রাজ্যে ও এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পাত্রী এবং তার সংগে ঠিকুজি কোষ্ঠী মিললে তো সোনায় সোহাগা। তবে ঠিকুজির প্রসংগটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারেই। অনেক ক্ষেত্রে ভাগ্নী জন্মাবার পর মামার সংগে বিয়ের ব্যাপারটা শৈশবেই ঠিক হয়ে থাকে।

পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর কোন ভূমিকা নেই। অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের নির্বাচনই চূড়ান্ত।

চূড়ান্ত নির্বাচনের দিন দুপক্ষের পুরোহিত উপস্থিত থাকেন ও দুপক্ষের বাবা মা ও অভিজ্ঞ আত্মীয়। চূড়ান্ত নির্বাচন পাত্রের বাড়িতেই হয়। অনেক ক্ষেত্রে কনের বাড়িতেও হয়। চূড়ান্ত নির্বাচনের দিন পাত্রপক্ষ থেকে মেয়েকে সাধ্যমত সোনার গয়না (কম করে আংটি) ও কাপড় দেওয়া হয়। ঐ দিনই 'লগ্ন পত্রিকা' দেওয়া হয়। লগ্ন পত্রিকা পাঠায় পাত্রপক্ষ। কুলপুরোহিত ঐ লগ্ন পত্রিকা, মিষ্টি, নারকেল নিয়ে কনের ঘরে পৌঁছে দেয়। 'লগ্ন পত্রিকা' হচ্ছে আধুনিক ভাষায় কাগজপত্রে চুক্তি, দিনক্ষণ, বরযাত্রী, লগ্ন সব লেখা থাকে। কন্যাপক্ষের পুরোহিত তা পাঠ করে কনের পক্ষের সকলকে শোনায়। ঐ লগ্ন পত্রিকার একটি কপি ফেরত আসে বরের বাড়িতে। লগ্ন পত্রিকাতে বিয়ের সমস্ত প্রোগ্রাম ছকে দেওয়া থাকে। ফাইনাল বা পাকা দেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ থেকেও ছেলেকে [illegible] বোতাম বা আংটি দেওয়ার রীতি আছে।

এদের বিয়ে হয় সূর্যাস্তের পর। সমস্ত বিয়ের অনুষ্ঠানটি চলে পাঁচ অথবা তিন দিন ধরে। এদের গায়ে হলুদের মত কোন আলাদা অনুষ্ঠান নেই। তবে বিশেষ তিথি ধরে বর ও কনেকে স্নান করানর ব্যবস্থা আছে। মাদ্রাজে বিয়ের বেদি থেকে বরকে উঠে চলে যেতে দেখেছিলুম আমরা, এবং বর বলেছিল 'আমি সন্ন্যাসী হব'। এখানে এই একই অনুষ্ঠান হয় বিয়ের আগের দিন বরের বাড়িতে। বরকে যখন বিয়ের জন্যে তৈরি করা হয় বিভিন্ন লোকাচারের মাধ্যমে তখন বর রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে পথচারীদের বলে 'আমি কাশী যাব'। তারপর বরের বাবা ও গুরুজনরা তাকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনে ঘরে ও বিয়ের উপযোগিতা বোঝায়।

বিয়ের আগে দিনেরবেলায় (যে দিন সূর্যাস্তের পর বিয়ে হবে) বরকে স্নান করান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানকে বলে 'পেললি কড়ুক'। পেললি শব্দের অর্থ বিয়ে, কড়ুক শব্দের অর্থ ছেলে। এই অনুষ্ঠানে বরের সংগে একটি বাচ্চা ছেলেকেও সাজান হয়। কতকটা বাঙালিদের নিতবর সাজানর মত।

একই রকম অনুষ্ঠান হয় কনের বাড়িতে। যা তেলেগু ভাষায় 'পেললি কুতুরু'। পেললি শব্দের অর্থ বিয়ে, কুতুরু শব্দের অর্থ মেয়ে বা কন্যা। কনেকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরান হয়। ঐ কাপড়ের পাড় লাল রঙের হবে। কনের সংগে আর একটি বাচ্চা মেয়েকে সাজান হয় কতকটা বাঙালি বিয়ের নিতকনের মত।

এদের বিয়েতে বিবাহ বেদিতে বসার আগে ছোট একটি অনুষ্ঠান হয়। বরের মামা কনের আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় চোপড় দেয়। তারপর বরকে নিয়ে যাওয়া হয় বিবাহ বেদিতে। বিবাহ বেদিতে বরের বাবা মা উপস্থিত থাকে। লগ্নের সময় হলে 'বরপুজো' শুরু হয়। ঐ সময়ে কনের মা ও বরের মা-এর যৌথ সম্মতিতে কনেকে ছাদনাতলায় আনা হয়। বরের বাঁদিকে বসান হয়। দুজনের মাঝে থাকে একটা কাপড়ের দেওয়াল। কেউ কারুর মুখ দেখতে পায় না। অথচ দুজনেই তখন বিয়ের মন্ত্র পড়ে চলেছে। মন্ত্রের পাঠ শেষ হলে কনে কাপড়ের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বরকে মিষ্টি খাওয়ায় (জিরে ও গুড়ের তৈরি মিষ্টি)। তারপর কাপড়ের দেওয়াল সরিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের মূল অংশ শেষ হলে দুজনে একটা সোনার টুকরোকে সুতো দিয়ে বেঁধে দুজনের গলায় পরায়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'বাসিকম'।

এর পর আছে মূল অনুষ্ঠান, মংগলসূত্র বাঁধা। পুরোহিত (কন্যাপক্ষের) হাতে একমুঠো আতপ চাল ও মংগলসূত্র হোমাগ্নিতে ছুঁইয়ে তা উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে দেন। মংগলসূত্র ও চাল সবার হাতে ঘুরবে। সবাই নবদম্পতির সুখ শান্তি কামনা করবে। তারপর ঐ মংগলসূত্র বরের হাতে আসবে। বর ঐ মংগলসূত্রে তিনটে গেরো দিয়ে পরিয়ে দেবে কনের গলায়। তখন সবাই ফুল ছুঁড়বে নবদম্পতিদের দিকে। এ সময় খুব জোরে বাজনা বাজবে। সাধারণত বাজনা জোরে বাজানর কারণ ঐ সময় কোন কু শব্দ যেন কারুর কানে না আসে। যথা হাঁচি, কাশি ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানটিকে তেলেগু ভাষায় বলে 'মংগলাক্ষীশীতলম'।

এর পর বরকনের কিছু খেলা আছে। বাঙালিদের কড়ি খেলা বা আংটি খেলার মতন। একটা পাত্রে কিছু হলুদ মাখান চাল থাকবে পুরোহিত নারকেল খোলা দিয়ে তিনবার মেপে দুজনের হাতে দেবে। বর ও কনে দুজনেই এ চাল পরস্পরের মাথায় ঢালবে। এখনই শেষ বিয়ের প্রধান অংশ।

এর পর বরকনের আর একটি খেলা হয়। যা তেলেগু ভাষায় বলে 'নাগবল্লী।' এক কলসী জলে একটা সোনার আংটি ফেলে দেওয়া হয় বর কনে দুজনের প্রতিযোগিতা চলে কে ঐ আংটি তুলতে পারে। যে আগে তুলবে আংটির মালিক সে হবে।

ছেলের গ্রামে নববিবাহিতদের বরণ করবে মহিলারা। সাধারণত বয়স্ক মহিলারাই। কিন্তু ছেলের ঘরে ঢোকার আগে বন্ধ দরজায় টোকা মেরে কনে তার শাশুড়িকে ডাকবে 'কে আছো দরজা খোলো আমি ও মোহনকৃষ্ণ (যদি ধরে নেওয়া হয় স্বামীর নাম মোহনকৃষ্ণ) এসেছি।' এই প্রথম ও শেষ বার কোন স্ত্রী তার স্বামীর নাম মুখে আনে। তখন বরের বাড়ির সবাই বেরিয়ে আসে। বরের বাড়ির গৃহদেবতার পুজো হয় ও বরকনের গাঁটছড়া বেঁধে গোটা গ্রাম ঘোরান হয়।

এদের বিয়েতে বরের বাড়িতেই বিবাহ মণ্ডপে 'এড়ু আড়গুলু' বা সাতপাকে ঘোরান হয়। বিবাহ-বেদির সামনে হোমাগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বর। তাকে কেন্দ্র করে ঘোরে মেয়েটি। সপ্তম পাকে মেয়ে ছেলের গলায় মালা পরায়। বিয়ের তিনদিন পরে বর কনে আবার কনের বাড়িতে আসে এবং এখানেই শুরু করে দাম্পত্যজীবন।

দুপক্ষের কোন নিকট আত্মীয় মারা গেলে বিয়ে স্থগিত হয়। তবে ছেলের বাড়ির বাবা-মা কেউ মারা গেলে এক বছর পরে আবার দিন নির্বাচন করে বিয়ে হয়। মেয়ের বাড়ির বাবা-মা র কেউ মারা গেলে এক মাস পরে আবার দিন স্থির করে বিয়ে হতে পারে।

কেরল : কনের ভাই বরের পা মুছিয়ে দেয়

এদের সমাজেও মামা ভাগ্নীর বিয়ে হয়। যদি এরকম যোগাযোগ না ঘটে তবে সাধারণভাবে পাত্র পাত্রীর খোঁজ চলে। বিয়ের জন্যে প্রফেশন্যাল লোক বা ঘটক থাকে যারা সুপাত্রীর খোঁজ এনে দেয়। তারপর দুপক্ষের অভিভাবকের কথাবার্তা চলতে থাকে কুলপুরোহিত নিয়ে। এবং এ বিয়েতেও অভিভাবকের মতামতই চূড়ান্ত। সেখানে পাত্র-পাত্রীর কোন ভূমিকা থাকে না। তবে বিয়ের আগে ঠিকুজি কোষ্ঠী মেলানর ব্যাপারটা অবশ্যই আছে।

ফাইনাল সিলেকশনের পরেই দুবাড়িতে ঘটা করে লক্ষ্মীদেবীর পুজো হয় এবং দুবাড়ির প্রসাদ বিনিময় বিয়ের একটি অংগ বলে ধরা হয়, প্রসাদ নিয়ে যায় দুবাড়ির ব্রাহ্মণ। এসময় ছেলের বাড়ি থেকে মেয়েকে কাপড় ও সোনার গহনা (ক্ষমতানুযায়ী) পাঠান হয়।

এদের সমাজে ছেলেরাই বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে যায় মেয়ের গ্রামে। ছেলে সাদা ধুতি পরে এবং যে কোন যানে চড়ে বিয়ে করতে যায়। কনের বাড়ি দূরে হলে বরযাত্রী দল বিয়ের আগের দিন কনের গ্রামে পৌঁছে যায়। কনের বাড়ি থেকে দূরে কোন স্থানে ওদের থাকার জায়গা করা হয় এবং সে খরচ বহন করে বরপক্ষ। এদের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয় শুধু ঐ জাতের লোকেরাই। অন্য কোন জাতের বিশেষত নিচু জাতের লোকেদের কখনই নিমন্ত্রণ করা হয় না। সামাজিকভাবে নিচু জাতের কোন পরিবার ধনে মানে নামী

ইউকোপ্ল্যান—কিন্তু কথাটার মানে কী?

আপনার ব্যাংক আপনাকে কী চোখে দেখে?

PASS

একজন আনাড়ি ভদ্রলোক?

একজন অভিজ্ঞ সাংসারিক?

সুদের হার সমান হলেও সব ব্যাঙ্ক কিন্তু এক নয়। আসলে আপনার সংগে ব্যবহারের মধ্যেই তাদের তফাংটা বোঝা যায়।

ইউকোব্যাঙ্ক কর্মীরা গ্রাহকদের সংগে কথা বলেন ইউকোপ্ল্যানের মাধ্যমে। অর্থাৎ কী করে আপনার জমা টাকা আরো দ্রুত বাড়িয়ে তোলা যায় সে বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের লক্ষ্য।

ইউকোপ্ল্যান আপনার সঞ্চয় দ্রুত বাড়িয়ে তোলার এক অনন্য উপায়। জমানো টাকা একাধিক পরিকল্পনায় সুদে-আসলে কেমন করে বাড়ানো যায়, ইউকোব্যাঙ্ক তারই সন্ধান।

মাসে ১৫০ টাকা জমা দিলে কত দ্রুত আপনার সঞ্চয় বাড়তে পারে তা পাশের সারণী থেকে দেখে নিন।

যে ব্যাঙ্ক আপনাকে সত্যিকারের লাভজনক পরামর্শ দেবে তাঁদের কাছেই আসুন। সঞ্চয় করতে হলে ইউকোব্যাঙ্কের ইউকোপ্ল্যানই সবার সেরা।

ইউকোপ্ল্যান

সঞ্চয় এক। সুদ অনেক।

আমানত (টা:)	মেয়াদ	মোট আয় (টা:)
১৫০ টাকা	৩৬ তম মাসের শেষে	৩,৩৬৬.৪০
প্রতি মাসে	৭২ তম মাসের শেষে	৫,১৬২.২০
১২০.মাস ধরে	১২০ তম মাসের শেষে	১৭,২২৮.৪০
মোট		২৫,৭৫৭.০০

সুদের হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুযায়ী পরিবর্তন সাপেক্ষ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

UCO/CAS-128/83 BEN

মহারাষ্ট্র : বিয়ের পরেই মেয়ের নাম পালটে যায়

প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর অভিভাবকরাই নির্বাচন করেন পাত্র-পাত্রী। কুলপুরোহিত অবশ্যই মিলিয়ে নেন ঠিকুজি কোষ্ঠী। তারপর চূড়ান্ত নির্বাচনের সময় দুপক্ষের অভিভাবকের সামনে বর-কনে পরস্পরকে দেখে নেয়, যদিও তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই অর্থাৎ অভিভাবকের নির্বাচনকে মেনে নিয়েই দেখাদেখি। তারপর এদের ভাষায় 'বচন সুপারি' অনুষ্ঠান। কন্যা-পক্ষের লোকেরা বরকে আশীর্বাদ করে অর্থাৎ পাকা কথা। তখন বরের বাড়িতে পাঠান হয় সুপারি, নারকেল মিষ্টি। কন্যা পক্ষই আগে বরকে আশীর্বাদ করে। ঠিক একইভাবে বরপক্ষের লোকরা কনেকে আশীর্বাদ করে যার নাম 'সাখর পুড়া'। মেয়েকে সাধ্যমত কাপড় ও গহনা দেওয়া হয় লগ্ন দিনক্ষণ স্থির করার সময়।

কনের বাড়িতে বিয়ের আগে সমস্ত গ্রামকে জানান দেওয়া হয় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যার নাম 'শ্রীমান্ত ওযাগনিস' বা লেড়কি পুজো। কিছুটা বাঙালিদের আইবুড়ো ভাতের মতো। পাঁচ অথবা সাতজন মহিলা বিয়ের ৩ দিন আগে এ অনুষ্ঠান করে।

বিয়ের দিন কন্যাপক্ষের লোকরা ছেলেকে নিতে আসে বিয়ে করতে যাবার জন্যে। ছেলেকে নিয়ে যায় হাতি অথবা টাংগাতে চড়িয়ে। সংগে যায় বরযাত্রী। সমস্ত খরচ কন্যা পক্ষের।

ছেলে বরযাত্রীদের নিয়ে যখন কনের গ্রামে পৌঁছায় তখন বিবাহ-বেদিতে ঢোকার আগে সাধারণভাবে অন্যান্য বিয়ের মতই পাঁচ অথবা তিন জন এয়োতি বরণডালা নিয়ে বরকে স্বাগত জানায়। তারপর বর গিয়ে বসে বিবাহ বেদিতে। 'মংগলাষ্ট' অর্থাৎ বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। বিয়ের বেদিতে কাপড়ের পর্দার দুদিকে বরকনের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদিও পাকা দেখার দিনে এরা দুজন দুজনকে দেখেছিল। কাপড়ের পর্দা ধরে থাকে দুপক্ষের দুজন পন্ডিতজী। বিয়ে দিনে বা রাতে যে কোন সময়েই হতে পারে সেটা ব্রাহ্মণের নির্দেশ মত। বিবাহ মন্ডপে হোম হয়। ঐ হোমের ছাই ও ঘি মিশিয়ে টিপ পরায় পরস্পরকে কাপড়ের পর্দার দুদিক থেকে, তখনও মুখ দেখাদেখি হয় না। এবং এই অনুষ্ঠানের পর কনে একবার বরের কান মলে। তারপর মালা বদল। সবই কিন্তু ঐ কাপড়ের পর্দার আড়ালে। তারপর কনের ভাই বা দাদা এসে কাপড়ের পর্দা সরিয়ে দেয় আর এ কাজের জন্যে বরকে গুনে দিতে হয় মোটা টাকা কনের ঐ ভাইকে। তারপর বরকনেকে সিঁদুর (কুমকুম) পরায়। মংগলসূত্র পরায় বাম হাতে। বিবাহ বেদির মূল অনুষ্ঠান এভাবেই শেষ হয়। তার পর বিবাহ বেদি থেকে উঠে ওরা ঘরের মধ্যে এসে বসে পরস্পরকে এঁটো খাওয়ায়।

এই সময়ে সমস্ত এয়ো মেয়েরা এবং কনে নিজে বরের চেহারা, পোশাক বরের দোষগুণ নিয়ে ছড়া বানায় ও গায়।

বিয়ের পরদিন হয় 'বিদা' বা বিদায় অনুষ্ঠান। ছেলের খরচে এবার নববিবাহিতদের আনা হয় ছেলের গ্রামে। ছেলের ঘরে ওরা এলে লক্ষ্মীপুজো হয়, তারপর গৃহদেবতার পুজো হয়। এবং এ সময়ে বর তার পছন্দ মত বৌ এর একটি নাম দেয়। যে নামে পরবর্তী কালে বৌকে সে ডাকে। ছেলের ঘরে যে দিন ওরা ফেরে পরদিন আবার বাসি লক্ষ্মীপুজো হয়। এবং পরদিন সূর্য ওঠার আগে হাতের মংগলসূত্র খুলে নতুন মংগলসূত্র পরান হয়। আর তখন উপস্থিত পুরুষরা কুলো (বাঙালিরা যাতে করে ধান চাল পরিষ্কার করে) বাজান হয়। কুলো বাজান মানেই বিয়ে শেষ। এদের ফুলশয্যা বরের ঘরেই হয় বিয়ের ২ দিন পরে।

গুজরাট : বিয়ের আগে দুবাড়িতেই গণেশপুজো

গুজরাটিরা ধর্মভীরু জাত। এদের বিয়েতে ধর্মের সমস্ত অনুশাসনই বর্তমান ও বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই গণেশের পুজো হয়।

পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কিন্তু এদের সমাজে পেশাদারি ঘটকের উপস্থিতি নেই। সাধারণত পাত্রী পক্ষের লোকরাই পাত্রপক্ষের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর কোন ভূমিকাই নেই। বিয়ের দিনই ওরা পরস্পরকে প্রথম দেখতে পায়। অনেক সময় পাত্রপাত্রী চেনা জানা আত্মীয়ের মধ্যে হয় তবুও বিয়ের আগে পরস্পরকে দেখার কোন সুযোগ পায় না।

বিয়ের আগে 'দায়েজী' বলে একটা অনুষ্ঠান আছে। এ অনুষ্ঠান চূড়ান্ত নির্বাচনের পরেই হয়। দুপক্ষ দুপক্ষের আত্মীয়স্বজনকে কাপড় মিষ্টি পাঠায়। ছেলের বাড়ি থেকে মেয়েকে পাঠান হয় সোনার গয়না ও কাপড়। গুজরাটিরা নিরামিষাশী তাই এদের সমস্ত অনুষ্ঠানেই খাবার হিসেবে থাকে ভাত, ডাল, চাপাটি (রুটি), তরকারি, লাড্ডু ইত্যাদি।

বিয়ের চারদিন আগে মেয়ের বাড়ি থেকে চারজন লোক 'লগ্ন পত্রিকা' নিয়ে ছেলের বাড়িতে আসে। লগ্নপত্রিকায় লেখা থাকে পাত্রপাত্রীর পরিচয় ও বিয়ের দিন ক্ষণ। ছেলের বাড়িতে ঐ পত্রিকা পুজো করে তিলক লাগিয়ে রেখে দেওয়া হয়। বিয়ের দিন বরযাত্রীরা ঐ পত্রিকা সংগে করে আনে ও বিয়ের আসরে ঐ পত্রিকা পাঠ করে শুরু হয় বিয়ের মূল অনুষ্ঠান।

বিয়ের আগের দিন দু বাড়িতেই গণেশপুজো হয়। ঐ পুজোতে জ্বলে প্রদীপ, এবং এই প্রদীপ বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'গণেশ ঘরে' জ্বলতে থাকে। গণেশ প্রতিষ্ঠা ও পুজোর পর থেকে পাত্রপাত্রী পরে 'মিন্ডল', গুজরাটে পাওয়া এক রকমের ছোট্ট ফল। তা শুকিয়ে নিয়ে তার মাঝে ফুটো করে নানা রকম রঙিন সুতো দিয়ে হাতে বাঁধা হয়।

এসব অনুষ্ঠানের পর বিয়ের দিনে বর বিয়ে করতে আসে ঘোড়ায় চড়ে। কনের গ্রামে কনের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা ঘরে এই বরযাত্রী ও বরের থাকার ব্যবস্থা হয়। এই অস্থায়ী আবাসকে এরা বলে 'জানবাস'। বিয়ের দিন এই জানবাসে কন্যা পক্ষের নাপিত বরকে স্নান করায়।

তারপর কন্যাপক্ষের মহিলারা বরকে নিয়ে যায় 'লগ্নমন্ডপে' বা বিবাহ বেদিতে। এদের বিয়ে হয় দিনের বেলা। বর ঘোড়ায় চড়ে যায়। পরনে থাকে স্যুট ও কোমরে থাকে তরোয়াল। এসময় বরের মাথার ওপর দুদিক থেকে দুজন লোক কাপড় মেলে ধরে। বরযাত্রীরা এগিয়ে চলে বিবাহ মন্ডপের দিকে।

বর যখন কনের বাড়িতে এসে যায়, তখন যথারীতি বরণ করা হয়। গুজরাটিদের লগ্নমণ্ডপ (বিবাহ বেদি) অন্যান্য রাজ্যের থেকে আলাদা। চারকোণায় চারটে বাঁশ পোঁতা থাকে। বাঁশের গায়ে জড়িয়ে বাঁধা হয় কচি খেজুরপাতা। মন্ডপের মাঝে একটা ছোট্ট গর্তে থাকে চাল, মুগডাল (গোটা দানা) ও পয়সা। ঐ গর্তেও একটা বাঁশ পোঁতা হয়। এই মাঝখানের গর্তে পোঁতা বাঁশটিকে বলে 'মানকস্তম্ভ'। লগ্নমন্ডপ বা বিবাহ বেদিকে এরা অনেক সময় 'চৌরিমন্ডপ' বলে। বিবাহ বেদির চারকোণে চারটে বাঁশের পাশে পিতলের ঘড়া (৭টা করে) সাজিয়ে রাখা হয়। সাতটা ঘড়ার মধ্যে সব থেকে বড়টিকে রাখা হয় মাটিতে। তার ওপর আর একটু ছোট একটি ঘড়া, এভাবে পরপর সাতটি। গুজরাটিদের সমস্ত সম্প্রদায়েরই

[illegible]

বিবাহ বেদিতে ... জায়গাতো ঘোরানো হয়। লগ্নমণ্ডপে বর ও কনে চেয়ারে বসে। কনের অঙ্গে থাকে 'পানেতর' (সাদা শাড়ি ভিতরে পাড়) ও 'চুন্দরি' (লাল কাপড়ের ওপর বুটি, বাইরে পাড়)।

বিবাহ বেদিতে বরকে আগে এনে বসান হয়। তারপর কনেকে এনে (সঠিক লগ্নে) পুরোহিত 'গগন পত্রিকা' পাঠ করে ওদের দু হাত মিলিয়ে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন। তারপর 'হবন' বা হোম হয়। এর পর 'ছেড়াছেড়ি' বা গাঁটছড়া বাঁধা হয়। অতঃপর মন্ত্রপাঠের পর দুজনে হোমাগ্নির চারদিকে চারবার ঘোরে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'চারফেরা'। তিনবার প্রদক্ষিণের সময় কনে আগে ও বর পিছনে থাকে। শেষ পাকে বর সামনে ও কনে পিছনে থাকে। তারপর হয় 'সপ্তপ্রতিজ্ঞা'। পুরোহিত ওদের দিয়ে ৭টা প্রতিজ্ঞা করায়। এগুলি গার্হস্থ্য জীবনের পরস্পর পরস্পরকে সুখী করার প্রতিজ্ঞা।

মূল বিবাহ অনুষ্ঠান এভাবেই শেষ হয়। তারপর দুজনে আলাদা ঘরে বসে থাকে। এবং এ সময়ে গণেশের পুজো হয়। তারপর বরের মা কনের হাতে 'খড়খড়ি' (সাদা চুড়ি) পরিয়ে দেন।

এর পর বর চলে যায় 'জানবাসে'— অর্থাৎ যেখানে বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। জানবাসে কয়েক ঘণ্টা থাকার পর বর কনের বাড়িতে আসে এবং ঐ দিনই বৌকে সংগে নিয়ে চলে আসে নিজের বাড়িতে।

গুজরাটি বিয়েতে গানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই চূড়ান্ত নির্বাচনের পর থেকে নানান ধরনের গান গাওয়া হয়। মেয়েরাই গান গায়। বর যখন বিয়ে করতে আসে তখন গাওয়া হয় 'লগ্নগীত'। তারপর বর কনের বাড়িতে এসে পৌঁছালে গাওয়া হয় 'বিবাহগীত'। দুজনে যখন বিদায় নিয়ে চলে আসে তখন গাওয়া হয় 'বিদাগীত'।

ছেলে বা মেয়ের বাড়িতে নিকট আত্মীয় কেউ মারা গেলে বিয়ে এক মাস স্থগিত থাকে। 'লগ্নমণ্ডপ' বাঁধার পর মেয়ের বাড়িতে কেউ মারা গেলেও বিয়ে বন্ধ হয়। তবে বর বিবাহবেদিতে এসে পৌঁছানর পর যদি কেউ মারা যায় তবে বিয়ে বন্ধ হয় না ঠিকই কিন্তু সে বিয়েতে আনন্দ অনুষ্ঠানগুলিতে শোকের ছায়া নামে।

গুজরাটে আজকাল গণবিবাহ খুব জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রধানত গরিব সম্প্রদায়ের (এক সংগে ২৫/২০ জোড়া পাত্রপাত্রীর) বিয়ে হয়। উত্তর গুজরাটে ঊঝায় কিছু সমাজে এই [illegible] পাওয়া যায়।

ওড়িশা : পাত্রী দেখতে গেলে টাকা দিতে হয়

এদের বিয়েতে অন্যান্য রাজ্যের মতই অভিভাবকের ভূমিকা মুখ্য। ওড়িশার বিয়ের লোকাচারগুলির সংগে বাঙালিদের বিয়ের লোকাচারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত ইত্যাদি।

পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এদের সমাজে জামাইবাবুর (দিদির স্বামী বা বোনের স্বামী) একটা ভূমিকা থাকে। মেয়ে দেখতে পাত্র পক্ষের লোকরাই আসে যায়। পাত্রী পছন্দ হোক বা না হোক কনে দেখার সময় কনেকে সামান্য টাকা (সম্মান স্বরূপ) দিতে হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঠিকুজি কোষ্ঠীর ভূমিকা অন্যান্যদের বিয়ের মতই থাকে। মেয়ে পছন্দ হলে 'কন্যা স্বীকৃতি' অনুষ্ঠান করা হয়। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে সোনার গয়না ও কাপড় দেওয়া হয়।

পালকি থেকে খৈ ছড়ানো

নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর কোন ভূমিকা নেই। এদের নির্বাচন অনেকটা একতরফা। অর্থাৎ পাত্রপক্ষ যদি পাত্রী নির্বাচন করে তবে ধরেই নেওয়া হয় যে, এ বিয়ে হচ্ছে। এবং তারপর পাত্রীপক্ষের লোকরা ছেলেকে দেখতে আসে। তখন পাত্রী পক্ষের নাপিত কাপড় মিষ্টি নিয়ে আসে ছেলের বাড়িতে।

পাত্রীকে চূড়ান্ত নির্বাচনের পর স্থির হয় দিন, লগ্ন, কতজন বরযাত্রী আসবে ইত্যাদি। বিয়ের আগের দিন মেয়ের বাড়িতে 'অধিবাস' অনুষ্ঠান হয়। অধিবাস অনুষ্ঠানে গ্রামের এয়োতি (৫ জন) কনের মাথায় শূন্য কলসীতে আম্রপল্লব দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। গ্রামবাসীরা সেই কলসীতে একটু একটু করে জল ভরে দেয়, সেই জলে কনেকে স্নান করান হয়। বাড়ি দূরের গ্রামে হলে কন্যা পক্ষের ১০-১২ জন লোক এসে ছেলেকে বরণ করে বিয়ের আগের দিন। এদের মধ্যে একজন থেকে যায় বরের সাথিকে। বিয়ের দিন সে বর ও বরযাত্রীদের নিয়ে যায় কনের গ্রামে। বরের সংগে থাকে নিতবর, একটা ছোট ছেলেকে বরের মত করে সাজান হয়।

বরযাত্রীদের সংগে বর যখন কনের গ্রামে ঢোকে তখন বরযাত্রী ও বরকে থামিয়ে 'পথবরণ' করা হয়। তারপর বিয়ের আসরে বরকে আনা হয়। বিয়ের আসরে বরপক্ষের নায়েক (ঠিকুজি বিশারদ), নাপিত, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ (ছেলের বাড়ির ও মেয়ের বাড়ির) উপস্থিত থাকে। এখানে নাপিত, নায়েক, পণ্ডিতদের প্রণামীর খরচা পাত্রপক্ষের।

বর বাঙালি বরের মতই ধুতি পরে ও গায়ে থাকে উত্তরীয়। মেয়ে পরে শাড়ি। ঐ শাড়ির প্রান্তে ও বরের উত্তরীয়র সংগে গাঁটছড়া বাঁধা হয়।

বিয়ের মূলমন্ত্র পাঠ শেষ হলে হয় শুভদৃষ্টি। তারপরই হোমাগ্নিতে কনের ছোট ভাই খৈ ছড়ায়। এবং ঐ খৈ পোড়ানীকে (কনের ভাই) বর পক্ষ সম্মানস্বরূপ কাপড় দেয়। তারপর গাঁটছড়া বেঁধে সাতপাকে ঘোরান হয় তখন বরকে ঠাট্টা-সম্পর্কীয় মানুষেরা যথা শালী ও শালারা মিষ্টির ঢেলা ছুঁড়ে মারে। এ অনুষ্ঠানকে 'হুড়া মারা' বলে।

বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শেষ হলে বিবাহ বেদি থেকে একটা ঘরে বর কনে এসে বসে এবং কড়ি খেলা হয়। সকালে বর ওখান থেকে চলে আসে বরযাত্রীদের কাছে। বরযাত্রীদের কনের বাড়ি থেকে দূরে কোথাও থাকার জায়গা হয়। সকালে নবদম্পতিদের বিদায় জানান হয়। পালকি করে ফিরে আসে দুজনে। পালকিতে যখন দুজনে ওঠে তখন ঐ পালকিটিকে সাতবার ঘোরান হয় বাসি বিবাহ বেদির চারদিকে। পালকি চলতে শুরু করলে কনে চলন্ত পালকি থেকে খৈ ছড়ায়। নিজের গ্রামের সীমানা পার হলে আর খৈ ছড়ায় না।

ছেলের বাড়িতে যখন ওরা পৌঁছায় তখন ৫ জন এয়োতি ওদের অভ্যর্থনা করে। এবং যে ঘরে ওরা ঢুকবে বলে ঠিক করা হয় সে ঘরে বরের অবিবাহিত বোনেরা দরজা বন্ধ করে টাকা চায়। এটাকে 'দুয়ারাগিডমারা' বলে। কনে ওদের খুশি করে টাকা দেয়, তারপর দরজা খোলা হয়। ঐ ঘরে গৃহদেবতার পুজো হয়। পরদিন সূর্যোদয়ের আগে পুরোহিত সমস্ত জিনিস নবদম্পতির দুজনে কাজের কোন পুকুর বা নদীতে ফেলে দিয়ে আসে। বিয়ের চতুর্থ দিন ফুলশয্যা হয় বরের বাড়িতে।

বিহার : দুটি মেয়ের মধ্যে কোনটি আসল কনে ?

এদের সমাজের একদল প্রফেশনাল মানুষ আছেন যারা ঘটক। এটা এই সম্প্রদায়ের একটা পারট টাইম প্রফেশন। এরা ব্রাহ্মণ বা নাপিত হন। বিয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজের মত ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখার রেওয়াজ আছে। এবং বিয়ের আগে মেয়েকে দেখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ছেলে যদি মেয়ে দেখতে চায় এবং মেয়েকে যদি বিয়ের আগে দেখে নেয় তবে তাকেই বিয়ে করতে হয়।

চূড়ান্ত নির্বাচনের পর মেয়েকে সামান্য টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। এ অনুষ্ঠানকে বলে 'ছেকার'। মেয়েপক্ষের অভিভাবক কুলপুরোহিতের সামনে কথা দেওয়া হয় 'ছেকার' অনুষ্ঠানে।

পাত্র পছন্দের সময় চূড়ান্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলেকে আশীর্বাদ করে ছেলের কপালে টিপ দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য সোনার আংটিও দেওয়া হয়, যদি সাধ্যে কুলোয়। ছেলেকে চূড়ান্ত নির্বাচনের দিন অর্থাৎ 'ছেকার'এর দিন একটি পাত্রে সাজিয়ে দেওয়া হয় মিষ্টি, নারকেল, হলুদ, ধান, দূর্বাঘাস। তখনই লগ্নের সময়, দেনাপাওনা, বরযাত্রীর সংখ্যা সমস্ত ঠিক করা হয়।

বিয়ের ৩ দিন অথবা পাঁচ দিন আগে থেকে কনে ও বরকে প্রতিদিন হলুদ মাখিয়ে স্নান করান হয়। পাঁচজন বিবাহিত মহিলা কনে ও বরকে হলুদ মাখিয়ে স্নান করায়। এবং বিয়ের দিন এঁরা স্পেশাল গেস্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

বিয়ের দিন নাপিত এসে ছেলের নখ-চুল কেটে যায় ও ছেলেকে আলতা পরায়। বরের বাড়ি থেকে ছোট কলসীতে করে জল পাঠান হয় কনের বাড়িতে বিয়ের দিনে। ঐ জলে কনেকে স্নান করান হয়। বিয়ের তিন দিন আগে থেকে কনে এলো চুলে থাকে ও এই তিন দিন সে ঘরে বসে হর পার্বতীর পুজো করে।

বর বরযাত্রী নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে করতে আসে। বরযাত্রীদের সংগে বরের বড়ভাই ও মামা অবশ্যই আসেন। বিয়ের দিন আগে বরযাত্রীরা কনের গ্রামে এসে পৌঁছায়। ওদের থাকা খাওয়ার জায়গা হয়।

বর যাচ্ছে বিয়ে করতে/গাড়োয়াল

কনের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে। এ সম্প্রদায়ের বিয়ে হয় রাত্রে।

বিয়েব নির্দিষ্ট সময়ে বরযাত্রীর দল থেকে কন্যাপক্ষের পাঁচজন এয়োতি বরকে বরণডালা নিয়ে (বরণডালায় থাকে দূর্বা ঘাস, ধান, গোটা হলুদ, জ্বলন্ত প্রদীপ, কলা, পান, সুপারি) বরকে বরণ করে নিয়ে আসে বিবাহ বেদিতে। বর পালকিতে চড়ে আসে। পালকি থেকে বরকে আমন্ত্রণ জানায় কনের দাদা বা কাকা। বরকে কোলে করে নিয়ে আসে এবং বিবাহ বেদিতে বসায়। তখনও কনে হর-পার্বতীর পূজো করছে। ঐ পূজোর কদিন কনের পাশে থাকে একটি বাচ্চা মেয়ে।

বাচ্চা মেয়েটি ও কনেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। যখন বর বিবাহ বেদি থেকে উঠে ঐ ঘরে আসে তখন বরকে বলা হয় 'তোমার বৌ কোন মেয়েটি চিনে নাও'। এটা নিতান্তই একটা মজা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে বর ঠকে যায়। ঠকার পরেও কিন্তু সঠিক পাত্রীর সংগেই বরের বিয়ে হয়। এর পর বরযাত্রীদের তরফ থেকে কনেকে আমন্ত্রণ জানান হয় বিবাহ বেদিতে আসার জন্যে।

ইতোমধ্যে বরকে বিবাহ বেদিতে একবার পাচকের ভূমিকায় নামতে হয়। মন্ত্রপাঠের কিছু অনুষ্ঠানের মাঝ পথে বরকে হোমের আগুনে পায়েস রাঁধতে হয়। পায়েস রান্না শেষ হলে বরকনে দুজনে হাত ধরাধরি করে ঐ আগুনের চারদিকে সাতবার ঘোরে। তারপর কনের হাতে খৈ সমেত একটা কুলো দেওয়া হয়। ঐ কুলো থেকে খৈ পড়বে হোমাগ্নিতে। তারপর কনে বিবাহ বেদিতে পিঁড়ির ওপর বসবে। তখন বর কনেকে গোলাপী সিঁদুর পরাবে। এসময় বরপক্ষের তরফ থেকে একটা সিঁদুর কৌটো দেওয়া হয়। যে সিঁদুর কৌটো কনে বিবাহের পর সারাজীবন ব্যবহার করে। এভাবে প্রায় সকাল হয়ে যায় এবং মূল বিবাহ সূর্যোদয়ের আগেই শেষ হয়।

বিয়ের এই মোট তিন দিনের অনুষ্ঠানে (বরযাত্রী বিয়ের দুদিন আগে এসেছে ও বিয়ের একদিন, মোট তিনদিন) যদি মংগল, শনি-ও বৃহস্পতিবার পড়ে তবে ঐ দিনগুলিতে কোন বিয়ের অনুষ্ঠান হয় না।

বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে অর্থাৎ বিবাহ বেদিতে এদের একটি ছোট্ট ও মজার অনুষ্ঠান আছে যা 'ঘুংঘাট' নামে পরিচিত। সাধারণত প্রায় সব রাজ্যেই ভাসুর (বরের বড় দাদা) কোনদিন ভাইয়ের বৌকে স্পর্শ করে না। এ সম্প্রদায়ের বিয়েতে বিবাহ বেদিতে 'ঘুংঘাটে'র সময় ভাসুর একটা ভাঁজ করা শাড়ি (বরপক্ষকেই সংগে আনতে হয়) কনের মাথায় ঢাকা দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে। এই একবারই ভাসুব ভাইয়ের বৌ-এর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে।

মূল বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হলে পরদিন বিদায় পর্ব। এদিন পালকিতে করে নবদম্পতি ফেরে ছেলের ঘরে। বরপক্ষের তরফ থেকে এক সের (বেতের বোনা পাত্র) ধান নিয়ে যাওয়া হয় ও বিদায় পর্বে ঐ এক সের ধান কনের হাতে দেওয়া হয়। কনে তার মার আঁচলে ঐ এক সের ধান দিয়ে পিছন ফিরে না তাকিয়ে স্বামীর সংগে চলে আসে পালকিতে চড়ে। যেন মা-বাবার সব ঋণ শোধ করে সে চলে আসছে।

বরের গ্রামে নবদম্পতিকে অভ্যর্থনা করে পাঁচ অথবা সাতজন এয়োতি। কনে ও বর পালকি থেকে নেমে ঘরে ঢোকার আগে মাটিতে পা দেয় না। বাঁশের বোনা ঝুড়ি বা চুপড়ি দেওয়া হয় দুজনের প্রতি পদক্ষেপে। ওরা তখন ঐ ঝুড়ি বা চুপড়িতে পা দিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢোকার পর গৃহদেবতার পূজো হয় তারপর বৌ-এর হাতে আমপচতা বেঁধে দেয় স্বামী।

ঐ ঘরে থাকে এক হাঁড়ি মিষ্টি (আটা গুড় আর ক্ষীরের তৈরি)। যার মুখটি শক্ত করে ঢাকা থাকে। মিষ্টি তৈরি করে রাখে ছেলের মা। মেয়েকে ঐ হাঁড়ির ঢাকা খুলতে হয় এবং ঐ মিষ্টি সে সকলকে দেয়।

বিয়ে করতে যাবার দিন বরের ঘরে যে পূর্ণ ঘট বসান হয়েছিল এদিন ঐ বাসি জলে বরকনে স্নান করে। কনের হাত থেকে আমপাতা খুলে দেওয়া হয় ও এদিন ফুলশয্যা বা 'সুহাগ রাত' অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের শুরু।

এদের বিয়ের লোকাচারের মধ্যে বিয়ে বন্ধ থাকে যদি বরের সম্পর্কের কোন আত্মীয় মারা যায়। বরের কেউ মারা গেলে এক বছর বিয়ে বন্ধ থাকে। কনের কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধশান্তির পর আবার বিয়ে হতে পাবে দিন ক্ষণ স্থির করে।

উত্তরপ্রদেশ : সন্তান না হলে মেয়ে আর বাপের বাড়ি যায় না

পাত্র পাত্রী নির্বাচন বা 'পসন্দ' এ অভিভাবকের ভূমিকাই প্রধান। এদের বিয়েতে কোন রকমেই বিয়ের আগে বর কনের দেখাদেখি হয় না। ঠিকুজি কোষ্ঠী মেলান হয় অবশ্যই। চূড়ান্ত নির্বাচনের দিন অবশ্যই দু বাড়িতে ঘটা করে গণেশপূজো করে। চূড়ান্ত নির্বাচনের দিন পাত্রপক্ষের তরফ থেকে মেয়েকে দেওয়া হয় শাড়ি ও সোনার আংটি। অনেক সময় পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ২ ৩ বছর পরেও বিয়ে হয়।

চূড়ান্ত নির্বাচনের পরই পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীপক্ষকে দেওয়া হয় 'শা-পাট্টা'। 'শা পাট্টা' একখণ্ড তুলোট কাগজ। এই তুলোট কাগজে বরের বংশ পরিচয়, নিবাস, বিয়ের পুরো অনুষ্ঠান, লগ্ন ইত্যাদি লেখেন পাত্রপক্ষের ব্রাহ্মণ। ঐ 'শা-পাট্টা' হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ বিবাহ নিশ্চিত। ঐ তুলোট কাগজে থাকবে সিঁদুর দিয়ে আঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন।

এর পর 'বরাত'। বরাত দিয়ে বিয়ে করতে যাবার দিনটি। এদিন বরকে দই ও হলুদ মাখিয়ে স্নান করান হয়। একই দিনে কনেকেও এভাবে স্নান করান হয়। পাত্র পরে আচকান। সাদা বা কালো রং পোশাকে থাকে না। গাঢ় যে কোন রঙের পোশাক পরে বর। ছেলে পালকি বা ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে আসে। অন্য একটা ঘোড়ায় থাকে বরের মামা। বরযাত্রীরা সবাই পরে লাল তিলক। বরযাত্রীরা যখন কনের গ্রামে পৌঁছাবে, কনের বাড়িতে ঢোকার আগে একজন এয়োতি জল ভর্তি ঘট নিয়ে দাঁড়াবে। তখন ঐ অবস্থায় পুরোহিত আর একবার গণেশপূজো করবে। তারপর কনের পক্ষের একজন এয়োতি সমস্ত বরযাত্রীদের গোলা সিঁদুরের টিপ পরাবে ও এজন্যে সে টাকা পাবে। এদের বিয়েতে দুধের তৈরি কোন মিষ্টি ব্যবহার করা হয় না। শাঁখ বা

উলুধ্বনি দেওয়া হয় না।

বরযাত্রীদের সংগে আনা হয় বরডালী। বিরাট বিরাট থালায় ফল, সবজি, নারকেল, মিষ্টি, লাড্ডু থাকে। এই বরডালীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বরের বাড়ির বনেদী মানা। যখন বরডালী কন্যাপক্ষের মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তখন ঐ মহিলাদের প্রত্যেককে টাকা দেন বরপক্ষরা।

এর পর বর আসে বিবাহ বেদিতে। বেদিতে বর বসার আগে বরপক্ষের ব্রাহ্মণ সাধারণের বরের পরিচয় দেন। তারপর মেয়েকে বেদিতে আনা হয় ও বিবাহের মূল কাজ শুরু হয়। মন্ত্রপাঠের পর মেয়ের সংগে ছেলের গাটছড়া বাঁধা হয়। এদের সাতপাকে বাঁধা অনুষ্ঠানটি একটু বৈচিত্র্যময়। বিবাহ বেদির চারদিকে সাতটা প্রদীপ জ্বলবে। কনের ভাই বা দাদা কনের আঁচলে 'লায়া' (খৈ) দেবে। বর কনে দুজনে বিবাহ বেদির চারদিকে সাতবার ঘুরবে। আর হোমাগ্নিতে দুজনে খৈ ছুঁড়ে ছুঁড়ে পোড়াবে। প্রতিবার ঘোরার পর একটি করে প্রদীপ নিভিয়ে উল্টে রাখবে। সপ্তম পাকে শেষ প্রদীপ নিভিয়ে বর কনের মালা বদল হবে। এদের বিয়ে হয় রাত্রে।

বিবাহ বেদিতে এদের পুরনো দিনে গোদান অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু এখন গরুর দাম বাবদ কিছু টাকা কনের বাবা দেন বরের মামাকে। যখন গোদান অনুষ্ঠান ছিল তখন বিবাহ বেদিতে গরু আনা হত। এবং সে গরুকে পূজো করা হত। আর সেই গরুকে কেন্দ্র করে নবদম্পতি তিন বার ঘুরত। তারপর সমস্ত উপস্থিত মানুষ বর কনে ও গরুকে কেন্দ্র করে তিনবার ঘুরত। এই গোদান পর্ব শেষ হলে বিবাহের মূল অনুষ্ঠান শেষ হয়।

তারপর বিবাহ বেদি থেকে বর কনে উঠে এসে একটা ঘরে বসবে ও পরস্পর পরস্পরকে ঝুটা (এঁটো) খাওয়াবে। এদের বিবাহিত মহিলাকে চেনা যায় নাকে নথ দেখে। এই নথ মেয়েকে পরান হয় বিয়ের দিন যখন মেয়েকে দৈ ও হলুদ মাখিয়ে স্নান করান হয়। বলা দরকার যে, ঐ নথটি আসে ছেলের বাড়ি থেকে।

বিয়ের পরদিন বিদায় পর্ব। এদের বিদায় পর্বটি ভারতের বিবাহ বৈচিত্র্যের এক মর্মান্তিক পর্ব। কনে এক বাটি চাল নিয়ে মার আঁচলে দিয়ে ডুলিতে উঠবে। ডুলিতে ওঠার পর মেয়ে আর পিছন ফিরে তাকাবে না নিজের ঘরের দিকে। ডুলি চলতে থাকবে। বর যাবে ঘোড়ায়। তখন মেয়ের সংগে মেয়ের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। যদিও কেউ আসে তবে সে বরের গ্রামে ঢুকবে না। বরের গ্রামে নবদম্পতি ঢোকার সংগে সংগে কন্যা-পক্ষের ঐ শেষ আত্মীয় একা ফিরে যাবে নিজের গ্রামে। এমনকি কনে পিছন দিয়ে তাকে দেখবেও না।

বর কনে যখন বরের ঘরে আসে তখন এদের শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠান হয়। পরদিন এদের 'সুহাগ রাত' বা ফুলশয্যা। মেয়ে কিন্তু বাপের বাড়িতে আর যাবে না যতদিন না কোন সন্তান হয়। মেয়ের শরীর খারাপ বা কোন জরুরী দরকার পড়লে মেয়ের কোন আত্মীয় মেয়েকে দেখতে পারে বরের গ্রামের সীমানার বাইরে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে।

পাঞ্জাব ঃ বিয়ের নাম আনন্দকার্য

শিখদের বিবাহ রীতির সংগে জড়িয়ে আছে গুরুদুয়ারার (এদের উপাসনালয়) প্রধান পুরোহিতের আশীর্বাদ। যে কোন শুভ কাজ বা আনন্দ কাজের প্রতি পদক্ষেপেই চাই গুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা। বিয়েতেও তাই।

এরা বিবাহ অনুষ্ঠানকে বলে 'আনন্দকার্য'। বিয়েতে অভিভাবকদের মতামতই চূড়ান্ত। সাধারণত ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। পাত্রপাত্রীর বয়সের ফারাকটা তাই দুচার বছরের মধ্যেই থাকে। বিয়ের পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ মেয়েকে প্রথমে নির্বাচন করে। মেয়ে নির্বাচিত হলে তারপর পাত্রী ছেলেকে দেখতে আসে। এদের বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর দেখাদেখি এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। পাকা দেখার পর পাত্রীকে কিছু টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। চূড়ান্ত নির্বাচনের দিনকে বলে 'কোড়মাই'। এদিন গুরুমন্দির থেকে প্রসাদ আনান হয়।

বিয়ের আগের দিন কনের বাবা একটি কাগজে গুরুমন্দিরের পুরোহিতকে দিয়ে লেখাবেন কন্যার পরিচয়, কতজন বরযাত্রী আপ্যায়ন করার ক্ষমতা তার আছে, কোন লগ্নে বিয়ে হবে ইত্যাদি; লিখে পাঠান হবে বরের বাড়িতে।

এদের বিয়ে হয় সকালে। তবে সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময়ে লগ্ন থাকলে সেই লগ্নে বিবাহ হতে পারে। সাধারণত সকালের লগ্নটিকেই এরা বেছে নেয়।

তাই বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় বা রাত্রে বর ও বরযাত্রীরা এসে পৌঁছায় কনের গ্রামে।

বর পরে কমলা রঙের পাগড়ি, চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে 'প্যারনা' (একফালি কাপড়) আর কোমরে ছুরি।

বর ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যায়। অন্যান্য বিবাহের মত বর ও বরযাত্রীদের বরণ করে কনের বাড়ির মহিলারা। তখন এই মহিলারা 'গুরুবাণী' র বিশেষ অংশগুলি গেয়ে শোনায়। দুপক্ষের দেখা হয়। সেই সংগে বর কনেরও মুখ দেখাদেখি হয়। এই 'মোলাকাত' বা মিলন অনুষ্ঠানের পর হালকা খাওয়া দাওয়ার পর্ব। তারপর শুরু হয় 'আনন্দকার্য'। মন্দিরের ধর্মীয় গুরুকে প্রণাম করে দুজনে। এদের বিয়ের মূল অনুষ্ঠান ঐ মন্দিরেই। ঐ মন্দিরের বেদিতে থাকে শিখ ধর্মগ্রন্থ। যা ওদের ভাষায় 'গুরু গ্রন্থ'। এই গুরু গ্রন্থের সামনে বর কনেকে পাশাপাশি বসান হয়। কনে বরের বাঁদিকে বসবে।

'আরদাস' বলে এদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে যা মূল বিবাহ অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগেই হয়। ধর্মগ্রন্থ বা গুরুগ্রন্থের সামনে বর কনের পরিচয়, বয়স, নাম ধাম সমস্ত কিছু বলেন মন্দিরের পুরোহিত। তারপর সকলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। এই সময়ে একজন বয়স্ক মানুষ একটা 'ফতোয়া' পাঠ করেন যাকে এদের ভাষায় বলা হয় 'হুকুমনামা'। এই রীতি আমরা মুসলমান বিয়েতে দেখতে পাই।

'হুকুমনামা' পাঠের সময় বর কনে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। বাদবাকিরা বসে থাকে। এবং 'হুকুমনামা' যিনি পাঠ করেন তিনিও দাঁড়িয়েই পাঠ করেন।

হুকুমনামাটা এই রকমের যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'মীরপুর গ্রামের হরচাঁদ সিং এর মধ্যমপুত্র শ্রী আজ আনন্দকার্যে পীরনাত গ্রামের কিষণ সিং এর কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী কে বিয়ে করতে চায় আমরা এদের শুভকাজের জন্য গুরুজীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি'। এর পরই বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। মন্ত্রপাঠ এবং ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ পড়া হয়। যেগুলিতে থাকে বিবাহিত জীবন সম্পর্কে উপদেশ। তারপর ছেলের গায়ে যে 'দালি' বা উত্তরীয় থাকে সেটির একটা অংশ কনের হাতে দেওয়া হয়। সমস্ত কাজগুলি করেন পুরোহিত। তারপরই গুরুজী বা মূল পুরোহিত শিখ ধর্মের বিবাহ সম্পর্কে কিছু উপদেশ শোনান বর কনেকে।

এখন মূল বিবাহ প্রায় শেষ। তখন বর কনে দুজনে শিখগুরুকে চারবার প্রদক্ষিণ করে। ছেলে আগে ও মেয়ে পিছনে থাকে। একবার করে ঘোরার পর একটা করে মন্ত্র

উচ্চারণ। চারবার প্রদক্ষিণ শেষ হলে উপস্থিত আত্মীয়স্বজনরা 'আনন্দ সাহের' (ধর্মগ্রন্থের) বাণী কীর্তন করে গায়। গানগুলিতে বিয়ের আনন্দ ও জীবনের মঙ্গলের দিকের কথা বলা হয়। দু একটি গানের লাইন উদাহরণ হিসেবে দিচ্ছি, 'বিয়া হয়ে মেরে বাবুলাল' বা 'পূর্বী আশাজী মনকো মেরে নাম'।

বিয়ের সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ। এবার আবার সেই হুকুমনামা (যেটি বিয়ে শুরুর আগে পাঠ করা হয়েছিল) পাঠ করা হয়। এবং কড়াই প্রসাদ' (মন্দিরে রান্না ভোগ যা সুজির মত) সকলকে বিতরণ করা হয়। তারপর ঐ দিন সূর্যাস্তের আগেই দুজনকে 'বিদা' বা বিদায় জানান হয়। বিয়ের আগে ও বিদায় পর্বে এদের কোন উপহার দেওয়া নেওয়া হয় না। বৈষয়িক আদান প্রদান সব কিছু বিয়ের পরই।

রাজস্থান : নাপিত বৌ ছাড়া বিয়ে অচল

রাজস্থানের বিয়েতে প্রাথমিক নির্বাচনের দায়িত্ব কুলপুরোহিত ও কুলোনাই (নাপিত)। এই কুলোনাই বা নাপিত উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর খোঁজ আনে। তারপর কুলপুরোহিত অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখে আসেন। এবং চূড়ান্ত নির্বাচনের সময় দাউজি (জ্যাঠামশাই), মামা বাবা এবং দাদু কথা বলেন। দাদু ও দাউজি বা জ্যাঠামশাই না থাকলে মামা ও বাবা কথা বলেন।

পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়ের বাড়ির লোকেরাই প্রথমে ছেলের বাড়িতে আসেন। ছেলেকে দেখার পর পাত্রীপক্ষ মেয়ে দেখার জন্য পাত্রপক্ষকে আমন্ত্রণ করে।

রাজস্থানের বিয়েতে নির্বাচনের পর প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানেই পাত্র পাত্রীর উপস্থিতি অন্য সমস্ত রাজ্যের বিবাহ অনুষ্ঠানের থেকে বৈচিত্র্যময়।

চূড়ান্ত নির্বাচনের পরই মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয় ছেলের বাড়িতে। মেয়েকে আনে ছেলের বাড়ির নাপিত বৌ। নাপিত বৌকে এরা বলে 'তাইজী'। পাত্রের বাড়িতে পাত্রীকে তিলক পরান হয়। তিলক পরায় ছেলের দাদী (ঠাকুমা) পিসি বা ছেলের দিদি বা বোন।

মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে আনার অনুষ্ঠানটির নাম 'আনবৃজ মুহূরত'। ব্রাহ্মণ পুঁথি পত্র দেখে দিন নির্বাচন করে। তারপর 'তাইজী' (নাপিত বৌ) বিরাট ডালায় করে পাঁচ রকমের ফল নিয়ে যায় মেয়ের বাড়িতে। এর মধ্যে হয়ত প্রচ্ছন্ন ভাবে এই বাসনাই লুকিয়ে থাকে মেয়ে ফলবতী হোক'।

পাত্রীকে তিলক পরানর পর সে ফিরে যায় নিজের বাড়িতে। পাত্র পক্ষের ব্রাহ্মণ বৌ ও নাপিত বৌ (তাইজী) পাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে আসে নিজের বাড়িতে। তখন উপহার হিসেবে পাঠান হয় কমপক্ষে পাঁচটি লাড্ডু ভর্তি খুমচা (বড় বড় পাত্র)। লাড্ডু ভর্তি খুমচার ওপর নির্ভর করে ছেলের বাড়ির অর্থ নৈতিক ক্ষমতা।

নির্বাচনের পর হয় ওপরের ঐ অনুষ্ঠানটি। এটি প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি 'তিলক সেরমন'।

কন্যাপক্ষের সমস্ত আত্মীয় চলে আসে ছেলের বাড়িতে। ছেলের বাড়িতেও পাত্রপক্ষের সমস্ত আত্মীয়দের ডাকা হয়। 'মিলনী' বা মিলন উৎসব। মেয়ের বাড়ি থেকে ফল ও মিষ্টি পাঠান হয়। ছেলের জন্যে এ দিন কন্যাপক্ষ দেয় সোনার জিনিস, কাপড় ইত্যাদি। ছেলের নিকট আত্মীয়দেরও কন্যাপক্ষের তরফ থেকে কাপড় দেওয়া হয়। এদিন ছেলেকে তিলক পরান হয়। খুব ঘটা করে গণেশজীর পুজো হয়। এদিনই 'কুমকুম পত্রিকা' তৈরি করে সর্বসমক্ষে পাঠ করা হয়। কুমকুম পত্রিকায় বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানটি লেখা থাকে। ছেলেকে তিলক পরানর পর থেকে এয়োতি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ধর্মীয় গান গায়।

এই দিন অনুষ্ঠানের শেষে দু একদিনের মধ্যেই কনেকে ছেলের বাড়ি থেকে পাঠান হয় গয়না ও কাপড়। এই উপহার পৌঁছানর পর মেয়ের বাড়িতে বিবাহের গান গাইতে থাকে মহিলারা। গান গাইতে গাইতে গৃহস্থালীর কাজ করে মহিলারা।

বিয়ের ৭ দিন আগে ৭ জন এয়োতির (যাদের স্বামী ও সন্তান জীবিত) সুপারির গণেশ বানায় ছেলের বাড়িতে। একটা ছোট ছেলেকে গণেশ সাজান হয় এবং পুজো করা হয়।

এর পরের অনুষ্ঠান 'তেলবান চড়ানা'। দুপক্ষের বাড়িতেই এই অনুষ্ঠান হয়। একটা থালায় মেহেদি পাতা বাটা, হলুদ, দূর্বাঘাস নিয়ে ছেলেকে স্নান করায় নাপিত ও অন্যদিকে কনেকে স্নান করায় নাপিত বৌ। এ সময় বেশ ঘটা করে একটা খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান হয়। রাজস্থানী বিয়েতে মূল বিবাহের আগের অনুষ্ঠানগুলিতেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা ঘটা করে হয়।

এরপর অনুষ্ঠান হয় 'মেল' বা মিলন। মেয়ের বাড়ি থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসে ছেলেকে বিয়ে করতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। বরকে সাজায় ছেলের পিসেমশাই।

রাজস্থানের বর। আলোকচিত্র : [illegible] গাঙ্গুলী

এদের বিয়েতে নাকি বরকে সাজাবার অধিকার একমাত্র পিসেমশাইয়ের বা মামার। বর ধুতি কুর্তা পরে একটি ঘোটকীর পিঠে চড়ে বিয়ে করতে যায়। ঘোড়াটিকে সাজান হয় এবং পূজো করা হয়। ঘোড়ায় গণেশ ও হনুমানজির ছবি থাকে। গৃহদেব তাকে প্রণাম করে বর চলে যায় বিয়ে করতে। বরযাত্রীদের শেষজন হাতে করে নিয়ে আসে একটি বড় নিম গাছের ডাল। কনেদের গ্রামে ঢোকার পর ঐ নিম ডালটিকে গ্রামের পথে পুঁতে দেওয়া হয়।

কনের বৌদি, কাকীমা বরকে অভ্যর্থনা করবে। ঘরে ঢোকার আগে গণেশজির পূজো হয় ও দরজার এ পাশ থেকে কনে বরকে মালা পরায়। মেয়ের মা মংগলারতি করবে। তারপর বর ঘরে ঢোকে ও বিবাহ বেদিতে বসে।

বিয়ের রাতে মেয়েকে বর লাল টিপ এবং রাজস্থানী চুড়ি পরায়। চুড়ির রং লাল অথবা সবুজ হয়। রাজস্থানে 'মনিহার' সম্প্রদায়ের একদল মানুষ আছেন যারা 'লাখের চুড়ি' তৈরি করে। এটাই এ সম্প্রদায়ের মুখ্য জীবিকা। বিয়ের দিন ঐ সম্প্রদায়ের বৌরা এসে কনের বিয়ের মন্ত্রপাঠ শেষ হলে 'লাখের চুড়ি' পরায়। এটাই বিবাহিত রাজস্থানী মহিলার চিহ্ন। সারা জীবন এই লাখের চুড়ি কনের হাতে থাকে।

ছেলের বাড়ি থেকে কনের জন্যে আসে 'চুনরী' কাপড়। ছেলের দাদু না হবৌকে বিবাহ বেদিতে ঐ কাপড় দেন ও কাপড়ের কিছু অংশ দু ভাঁজ করে মেয়ের মাথা ঢেকে, তারপর মেয়ের হাতে মেন্দীপাতা (মেহদী পাতা) বাটা লাগিয়ে দেন। মেয়ের বাড়িতে মূল বিবাহ অনুষ্ঠান এই খানেই শেষ। পরদিন সকালের কোন একসময়ে বরযাত্রীরা ফিরে আসে নবদম্পতিকে নিয়ে ছেলের বাড়িতে।

পাত্রের বাবা অথবা মা মারা গেলে এক বছরের জন্যে বিয়ে স্থগিত থাকে। মেয়ের বাড়িতে কেউ মারা গেলে যদি নির্দিষ্ট বিবাহের দিনের আগে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যায় তবে বিয়ে হতে পারে। না হলে ছ মাস পরে বিয়ে হয়।

মেঘালয় ঃ দেমেচি প্রথমে ছাওয়ারি যায় ছেলে দেখতে

মেঘালয়ে গারো সম্প্রদায়ের বিবাহ বৈচিত্র্য অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এদের ভাষায় 'দোকাসিয়া' মানে বিয়ে। প্রথমে 'দেমেচি' মানে কন্যা পক্ষের তরফ থেকে 'ছাওয়ারি' মানে পাত্রের বাড়িতে ছেলে দেখতে আসে। অনেক ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর নিজেদের নির্বাচনেও বিয়ে হতে পারে। দুজন দুজনকে পছন্দ করে থাকলে বাড়িতে ছেলে ও মেয়ে পৃথকভাবে অভি ভাবককে জানিয়ে দেয় তাদের সংগী নির্বাচনের কথা। অথবা বিশেষ সামাজিক উৎসবে অনেক জমায়েতের ভিড়েও পাত্র পাত্রী পছন্দ করে অভিভাবক বা পাত্র পাত্রী নিজেরা।

এ অঞ্চলে চাষ শুরুর আগে (জুম প্রণালীতে যে চাষ হয়) হয় 'ওয়ানগালা' উৎসব এবং ফসল তোলার সময় হয় 'জামেগাম্পা'র উৎসব। এ উৎসবের মধ্যেও পাত্র পাত্রী নির্বাচন করা হয়। এই দুটি উৎসব চলে সাত আট দিন ধরে। যে সম্প্রদায়ের বিবাহের কথা লিখছি সে সম্প্রদায়ে বিয়ের পর ছেলে মেয়েরা মায়ের পদবী নামের সংগে যুক্ত করে।

এই সম্প্রদায়ে তিন ধরনের বিয়ে আছে।

১। জিকাবিযা · পাহাড়ী অঞ্চলের বসতি ঘন নয়। গ্রামের বাড়িগুলি ছড়ান ছেটান। প্রায় প্রতি গ্রামে থাকে একটা 'ব্যাচেলর হাউস'। সেখানে কাজকর্মের শেষে গ্রামের অবিবাহিত ছেলেরা রাত্রে থাকে। ঘরটিকে ওদের ভাষায় বলে 'নোক'। সেখানে গ্রামের সব অবিবাহিত ছেলেরা (এদের ভাষায় কপানটি) থাকে। উদ্দেশ্য গ্রামের রাত পাহারা দেওয়া। এবার ওখানের কোন অবিবাহিত ছেলে যদি তার গ্রামের বা অন্য গ্রামের কোন অবিবাহিতা মেয়েকে ভালবাসে তবে ঐ অবিবাহিতা মেয়েটি ঐ 'ব্যাচেলর হাউসে' এসে সাত আটদিন ছেলেটির সংগে রাত কাটায়। এরপর যদি ছেলেটির মেয়েটিকে ভাল লাগে তবেই বিয়ে হয়। এবং ভাল লাগলে দুজনে ঐ ঘর থেকে বিছানা ও অন্যান্য জিনিস পত্র নিয়ে সোজা চলে যায় ছেলের ঘরে। এ ভাবে চলে আসার পরই দিন ও সময় নির্বাচন করে উৎসব হয় ও সবাইকে জানান হয় এদের বিয়ের কথা।

২। ছাওয়ারীস্কা বা ছাওয়া রিস্কা — এই পদ্ধতির বিয়েতে দক্ষিণ ভারতের মত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের প্রসংগ আসে। এ ধরনের বিয়েতে রক্তের সম্পর্ক আছে এ রকম পাত্র পাত্রীদের বিয়ে হয়। সাধারণত বোনের বা দিদির ছেলেই সুযোগ্য পাত্র। অর্থাৎ মামা ভাগ্নীর বিয়ে। এক্ষেত্রে অনেক পাত্রীর অভিভাবক শৈশবেই বিয়ের কথা পাকা করে রাখেন। কনের মায়ের দিক থেকেই প্রস্তাবটা আসে।

তারপর মেয়ের বিয়ের বয়স হলেই তাকে ছেলের বাড়িতে নিয়ে এসে নির্বাচিত পাত্রের সংগে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যদি সে অবস্থায় পাত্রী রাজী না হয় তবে তাকে ধরে এনে বিয়ে দেওয়া হয়। 'রীস্কা' শব্দের অর্থ ধরে আনা। অনেক ক্ষেত্রে পাত্র বিয়ের বয়েসে পৌঁছলে নির্বাচিত পাত্রীকে বিয়ে করতে না চাইলে ছেলেকেও ধরে এনে পূর্ব নির্বাচিত পাত্রীর সংগে বিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ের সময় ছোট একটা অনুষ্ঠান হয়, যাকে এদের ভাষায় 'দেকাকনিয়া' বলে। একটি পুরুষ ও স্ত্রী মুরগি ওদের বিয়ের উৎসবকে মনে রেখে কাটা হয় এবং সেই মুরগির পেট থেকে যতটা খাবার বের হয় তার ওপর নির্ভর করে এদের পরবর্তীকালের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি। এ অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকটা আদিমভাব ছবি ফুটে ওঠে।

৩। 'নখবোম ওনবিকা'। বিধবা বিয়ে এদের সমাজে স্বীকৃত। কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তাকে বিয়ে করে ঐ বিধবার দেবর। এমনকি বিধবার যদি কোন বিবাহ যোগ্য মেয়ে থাকে তবে ঐ দেবর দুজনকেই অর্থাৎ মা ও মেয়েকে বিয়ে করে। হয়ত পারিবারিক সম্পত্তি বাইরের লোকের হাতে যাতে না চলে যায় সে জন্যেই এই ব্যবস্থা।

মণিপুর ঃ মশালের আগুনে খই পোড়ান হয়

মণিপুরে এই গোষ্ঠীর বিয়ে দুরকমভাবে হয়। অভিভাবকের পছন্দমত পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে তারপর বিয়ে। অথবা পছন্দ করা পাত্রীকে বাড়ির অনুমতি না পেয়ে বিয়ে করতে পারলে দুজনে পালিয়ে গিয়ে কোন মন্দিরের পুরোহিতকে সামনে রেখে মালা বদল করে বিয়ে।

যখন অভিভাবকের নির্বাচনের মাধ্যমে বিয়ে হয় তখন বংশ পরিচয় ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলান হয়। বিয়ের প্রস্তাব পাত্র পক্ষের তরফ থেকেই আগে আসে। মূল অনুষ্ঠানের 'ওয়ারেইপত' অর্থাৎ চূড়ান্ত নির্বাচন। এদের ভাষায় ওয়া শব্দের অর্থ কথা, রই শব্দের অর্থ শেষ, পত শব্দের অর্থ জিনিস। এ সময় কুলদেবতার পূজো হয়। এবং দুপক্ষই দুপক্ষকে দেয় উপহার। এর মধ্যে কাপড়, সোনা ও মিষ্টি দেওয়া হয়।

চূড়ান্ত নির্বাচনের পর 'হেইজিং পত' অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র মেয়ের বাড়িতেই হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের সমস্ত খরচটি চলে পাত্রপক্ষের টাকায়। পাত্র পক্ষের আত্মীয় ও কন্যা পক্ষের আত্মীয়রা আসে এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানে

এরপর মিছিল দিয়ে ছেলে বিয়ে করতে আসে কনের বাড়িতে। বরযাত্রীদের দলে একদল লোক নাম সংকীর্তন করতে করতে চলে। নাম সংকীর্তনের মধ্যে থাকে রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহের ঘটনা। ছেলে পরে ধুতি, মাথায় পাগড়ি। সমস্ত পোশাকের রং হয় সাদা। বরযাত্রী-দের সংগে ছেলের বাড়ির পুরো হিতও যায়। পাত্র চাতিতে চড়ে যায়। এ দিনই মেয়েকে কাপড় গয়না দেওয়া হয়। বর বিয়ে করতে যাবার সময় কোন কথা বলে না।

বর যখন কনের গ্রামে পৌঁছয় তখন ওদের অভ্যর্থনা করে তিনজন মহিলা। মহিলাদের হাতে থাকে তিনটি জ্বলন্ত মশাল। মশালের আগুনে খৈ ছড়ান হয়। সাধারণত কনের কাকীমা, বৌদি ও মা বরকে বরণ করে ও বিবাহ মন্ডপে নিয়ে যায়।

বিবাহ মন্ডপে ছেলে বসার পর কনেকে এনে বরের বাঁদিকে বসান হয়। তারপর বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়ে যায়। সাতপাকে বাঁধা অনুষ্ঠানে কনে বরকে কেন্দ্র করে সাতবার ঘোরে। প্রতি পাকে বরের মাথায় ফুল দেয়। শেষ পাকে হয় মালা বদল। এ সময় উপস্থিত মহিলারা রাধা কৃষ্ণের মিলন পর্বের অংশগুলি থেকে গান গায়। তারপর গাটছড়া বাঁধা হয়।

বিয়ের পরদিন বর একলা ফিরে আসে গ্রামে। তারপর বরের ঘর থেকে লোক পাঠান হয় বৌকে আনার জন্য। সাধারণত পালকিতেই আসে বৌ। এবং কন্যাপক্ষ থেকে কোন মহিলা প্রতিনিধি।

বিবাহিত মণিপুরী মহিলাকে চেনা যায় ওদের পোশাক দিয়ে। এদের মহিলারা পরে লুংগির মত একফালি কাপড়। বিয়ের পর ঐ লুংগি ওরা বুক ঢেকে পরে। অবিবাহিত অবস্থায় কোমর থেকে পরে। বিয়ের পর মেয়েরা চুল উল্টে বিনুনি বাঁধে। বিয়ের পাঁচদিন পর বর কনে ছেলের বাড়িতে আসে এবং 'মাংগানীচবা' হয়। অর্থাৎ নব দম্পতিকে স্বাগত জানান হয়।

ত্রিপুরা : পানখিলি দিয়ে বিয়ের সূচনা

ত্রিপুরার বিয়েতে অন্যান্য রাজ্যের বিয়ের মতই অভিভাবকদের ভূমিকাই প্রধান। সেই সংগে আছে ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলানর ব্যাপার। প্রফেশনাল ঘটকও এদের সমাজে আছে।

সাধারণত মেয়ের তরফ থেকেই ছেলে দেখতে আগে আসে। চূড়ান্ত

... দিন পর্বের শেষ হয়। প্রথমে পানখিলি অনুষ্ঠান। মেয়ের বাড়িতেই এ অনুষ্ঠান হয়। এদিন কনেকে নিয়ে পাঁচজন এয়োতি ঘটে আমপাতা নিয়ে কাছের কোন পুকুর বা নদী থেকে জল ভরে আনে। মেয়ের মা কুলোতে নেয় ধান, দূর্বা ও সিঁদুর। ঘটে জল ভরতে যাবার সময় মেয়েরা গান গায় এবং নাচে। এদিন কনের স্নান শেষ হলে কনেকে সিঁদুর পরান এয়োতিরাই।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হল, ছেলের বাড়ি থেকে আসা অলংকার ও কাপড় পরান হয় মেয়েকে।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে দুপক্ষের তরফ থেকে দুপক্ষের বাড়িতে লোক এসে আশীর্বাদ করে যায়।

এদের বিয়ে হয় রাত্রে। বর-যাত্রীদের সংগে ছেলের বাবা আসে। বর ধুতি পাঞ্জাবি পরে পালকিতে চড়ে আসে। পরিচিত পদ্ধতিতেই বরকে বরণ করে বয়স্কা মহিলারা। তারপর বিবাহ বেদিতে বরকে নিয়ে বসান হয়। বিবাহ বেদিতে কাপড়ের দেওয়ালের একদিকে বর, অন্যদিক থেকে কনের মা বরকে আংটি পরায়, মিষ্টি মুখ করায়। বিবাহ বেদিতে কাপড়ের দেওয়ালের ওপাশে বরের বাঁদিকে বসান হয় কনেকে। পুরো বিবাহ বেদিকে বলা হয় 'কুঞ্জ'। এ সময় বরের মুখ না দেখে কনে কাপড়ের ওপাশ থেকে বরকে মালা পরায়। তারপরই কাপড়ের আড়ালটুকু সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় মন্ত্রপাঠ।

মূল বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে সাতপাকে বাঁধা। এ সময় বর চেয়ারে বসে থাকে ও কনে সাতবার ঘোরে। উপস্থিত সবাই ওদের দুজনের দিকে ফুল, দূর্বাঘাস ও ধান ছোঁড়ে। প্রতি পাক ঘোরা শেষ হলে কনে বরকে একটি করে ফুলের মালা পরায়। শেষ পাক ঘোরা হলে শুভদৃষ্টি ও মালা বদল হয়।

তারপর দুজনে বিবাহ বেদি ছেড়ে আসে বাসর ঘরে। বাসর ঘরে কড়ি ও আংটি খেলে দুজনে। দুজনে আলাদা বিছানাতে বসে ও সকালে যারা ঐ বিছানা তোলে তারা বর পক্ষের তরফ থেকে 'বিছানা তোলানীর' টাকা পায়।

পরদিন বাসি বিয়ের একটা অনুষ্ঠান হয়। এই বাসি বিয়ে আমরা অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার বাঙালি পরিবারের মধ্যে দেখতে পাই।

এরপর দিন বর বৌ ফিরে আসে ছেলের বাড়িতে। ওদের অভ্যর্থনা করে ছেলের মা। এবং ছেলের বাড়িতেই মূল বিয়ের তৃতীয় রাত্রে হয় ফুলশয্যা।

আসাম : বিয়ের দু দিন আগে কনেকে সিঁদুর পরান হয়

এই গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটকের প্রাথমিক নির্বাচন শেষ হলে পাত্র পাত্রীর অভিভাবকরাই চূড়ান্ত নির্বাচন করেন। সাধারণত বর পক্ষের তরফ থেকেই মেয়েকে দেখা হয় আগে। অভিভাবকরা চূড়ান্ত পাত্রী নির্বাচনের দিন কিছু খাবার জিনিস, তাম্বুল (পানের মশলা) ও পান নিয়ে যায়। ঐ দিন মেয়েকে সোনার আংটি দেওয়া হয়। বিয়ের দিন, লগ্ন, বরযাত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি স্থির করে নেওয়া হয়। তবে এদের বিয়েতেও ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলানর একটা ব্যাপার আছে।

বিয়ের দুদিন আগে বরের মা বা মাসি অথবা মাতৃস্থানীয়া কেউ কনের বাড়িতে গিয়ে সিঁদুর কৌটো, সোনার হার (অর্থনৈতিক ক্ষমতানুযায়ী) দিয়ে আসে এবং ঐ দিনই কনেকে সিঁদুর পরিয়ে আসে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'খাড়ুমণি'।

এদের বিয়েতে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান আছে। বিয়ের দিন ছেলেকে গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করানর পর বাকি হলুদ, অড়হর ডালের কিছু গোটা দানা, তাম্বুল, পান, মিষ্টি ইত্যাদি একটা পেটিকায় করে মেয়ের বাড়িতে পাঠান হয়। ঐ হলুদ মাখিয়ে মেয়েকে স্নান করান হয়।

বিয়ে হয় রাত্রে। সন্ধ্যার মুখে বরযাত্রী বের হয়। কনের গ্রাম দূরে হলে বরযাত্রী আরো আগে বের হয়। ওরা কনের গ্রামে যখন ঢোকে তখন ওদের অভ্যর্থনা করে কন্যা পক্ষের বয়স্কা মহিলারা। তারপর বরকে নিয়ে গিয়ে বিবাহবেদিতে বসান হয়। পুরোহিতের নির্দেশ মত মেয়েকে আনা হয় বিবাহ বেদিতে এবং বরের বাঁদিকে বসান হয়। দুজনের মাঝে থাকে কাপড়ের দেওয়াল। কেউ কারোর মুখ দেখতে পায় না। এ অবস্থায় পর্দার দুপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে হয় মালাবদল। মালা গলায় দিয়ে কনে পর্দার ওপাশ থেকে বরের পায়ে মাথা ছোঁয়ায়। এর পর শুরু হয় মূল বিয়ে। তখন কাপড়ের দেওয়াল সরিয়ে নেওয়া হয়। মন্ত্রপাঠ শুরু হয়। এক বিশেষ সময়ে কনের আঁচলে খৈ (অসমীয়া ভাষায় লাজ) দেয় কনের ভাই বা দাদা। কনে তার আঁচল থেকে তিন বার ঐ খৈ হোমাগ্নিতে দেয়। হোমাগ্নির ছাই ও ঘি মিশিয়ে দুজন দুজনকে টিপ পরায়। এ সময়ে বর কনেকে সিঁদুরের টিপ পরায়।

বিবাহের মন্ত্র ইত্যাদি শেষ হলে দুজনে বিবাহ বেদি থেকে উঠে একটা ঘরে চলে আসে। তারপর আংটি খেলা শুরু হয়। একটা চালের হাঁড়িতে একটা সোনার আংটি থাকে এবং দুজনের মধ্যে যে আগে খুঁজে পায় সেই হয় আংটির মালিক। তারপর দুজনে মিলে সম্মানীয়দের প্রণাম করে।

রাত কেটে গেলে বর ও কনে ফিরে আসে বরের বাড়িতে। এদিন কনে বরের বাড়িতে কিছু খায় না। খাবার দরকার পড়লে প্রতিবেশীদের কোন বাড়িতে খায়। ঐদিন সন্ধ্যার আগেই কনে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। বিয়ের তৃতীয় দিনে কনে আবার বরের বাড়িতে যায় এবং বরের বাড়িতেই ফুলশয্যা হয়।

পাত্র বা পাত্রী পক্ষের কেউ নিকট আত্মীয় মারা গেলে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি শেষ হলে একমাস পরই আবার বিয়ে হয়। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

মাত্রা স্ফুটনাঙ্ক পার হয়ে
আপনার 00° সে. অধিক হয়ে
গেলে কোনো প্রেসার কুকারের
সুরক্ষা সম্বন্ধে আপনাকে কি
কেউ ভরসা দিতে পারে?

আমরা কিন্তু তা পারি!

তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্ক পার হ'লেই অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ট্যাম্পার খুলে গিয়ে প্রেসার কুকার ফাটতে পারে, যা আঘাত ঘটাতে পারে। তাই, বাজারে প্রেসার কুকার কেনার আগে প্রথমেই আপনাকে দেখে নিতে হবে বিশ্বস্ত ব্র্যাণ্ড নাম, তবেই ঐ বিপদ এড়াতে পারবেন।

বাজাজ সেই নাম।

যা, ভারতে ২৫ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকটি নামের মধ্যে একটি। ঐ নামে প্রেরণা পায় প্রতিটি বাজাজ-উৎপাদন তথা আমাদের যাবতীয় গৃহউপকরণ, যার শ্রেণী বিভাগ দেশের মধ্যে বৃহত্তম। সবের পশ্চাতে সারাদেশে ছড়ানো আছে আমাদের ১৭টি শাখা ও ৩৫০০টি ডিলার সমন্বয়ে এক বৃহৎ নেটওয়ার্ক, চটপট আফটার সেল্‌স্ সার্ভিস নিশ্চিত রাখতে! আপনার হয়ত তার প্রয়োজনই হবে না।

bajaj

আমাদের গৃহউপকরণ এমনই যে, তার গুণমান, স্থায়ীত্ব বা নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো সার্টিফিকেট লাগে না—কারণ বাজাজ নামটি তো আছেই।

bajaj

আজই কিনুন-বাজাজ কিনুন

[illegible] মিক্সার, বাজাজ প্রেসার কুকার, বাজাজ [illegible], বাজাজ হিটার, বাজাজ [illegible], বাজাজ ওভেন, বাজাজ গ্যাস স্টোভ, [illegible]

Heros-BE-738 BEN

বাঙালি বিয়ের আচার বিচার

বিনতা রায়চৌধুরী (সাহা)

প্রবাদ আছে লাখ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয় না। ঠিক তেমনই লাখ আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও বুঝি বাঙালি বিয়ে হয় না। দুটি মনের জোড় মেলাতে ছোট ছোট কত ক্রিয়াকাণ্ডর যে প্রয়োজন হয় তা ধারণা করা যায় না। আবার বিভিন্ন দেশভেদে এইসব নিয়মের কতই না পার্থক্য রয়েছে। মূল বিয়ের অনুষ্ঠানটুকুর আগে পরে অজস্র এইসব রীতিবিধি বিয়ের আনন্দ আর জৌলুস বাড়িয়ে দেয় শতগুণ। মজার কথা এসব নিয়মকানুনগুলো অনবরত পাল্টে যাচ্ছে। এক রীতির সংগে অন্যরীতি মিলে তৈরি হচ্ছে নতুন নিয়ম, নতুন আচার।

বাঙালি বিয়ের আচার অনুষ্ঠান তো দুচার বছরের পুরনো ব্যাপার নয়। বেশ কয়েকশ বছর আগে লেখা কাব্যগুলোতে এর উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ রয়েছে কালিদাসের কুমার সম্ভবে উমার বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায়। অষ্টাদশ শতকের এক কবি লিখেছেন 'স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা।' সুতরাং বাঙালি বিয়ের আচার অনুষ্ঠানগুলো রীতিমত ঐতিহ্যবাহী।

একথা সত্যি যে কালের যাত্রার ধ্বনির সংগে সংগে এর ভংগীও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যেমন পাকাদেখা বলে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। এখন সেই পাকাদেখার অনুষ্ঠান আর আলাদা করে হয় না। দুপক্ষের কথাবার্তা হয়ে গেলে সরাসরি হয় আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের মূল্য অপরিসীম। এটা প্রায় ছোটখাটো একটা বিয়ের মতই পালন করা হয়। বাগদানের মত, আশীর্বাদ হয়ে গেলে দুপক্ষই জানবে বিশেষ কোন অঘটন ঘটে না গেলে ঐ বিয়েই স্থির। এখনকার দিনে সময় ও অর্থ সংকুলানের কথা চিন্তা করে অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই বিয়ের দিনই আশীর্বাদ হয়।

বিয়ের আগে আছে আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান। এটা হবে বিয়ের আগের দিন দুপুরবেলা। সাধারণত পাত্র-পাত্রী দুজনেই পালন করে এটা। বিয়ের আগে আইবুড়ো অবস্থায় শেষ অন্ন গ্রহণ আর কি। এর পর তারা বাড়িতে আর ভাত খাবে না। এমন কোন মেয়ে বোধহয় নেই যে আইবুড়ো ভাত খাওয়ার আগে মা-বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারে। জীবনের পটপরিবর্তনের আগে বিদায়ের বাঁশীর মত সেই অনুষ্ঠানটি বড় দাগ কাটে মেয়েদের মনে।

বিয়ের দিনটিতে ভোরে শাঁখ বেজে ওঠে। জেগে ওঠে বর-কনে। হ্যাঁ, সেদিন তাদের এই বিশেষ নামটিতেই নির্দেশ করা হয়। মাত্র দুটি শব্দের এই নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে বাড়ি তোলপাড় হয়ে যায়। সূর্য ওঠার আগেই মায়েরা নির্দিষ্ট ঘটিতে জল ভরেন উলুধ্বনি দিয়ে। বিয়েতে এই জল যে কত রকমভাবে কাজে লাগান হয়, ভাবতে অবাক লাগে। সকালে হয় কনের 'দধি-মংগল' অনুষ্ঠান। কনের শুভদিন শুরু হয় দই চিঁড়ে খেয়ে। নান্দীমুখের আগে সে আর কিছু মুখে দেবে না। একটু বেলা হলে শুরু হবে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান। বরের গায়ের হলুদই আগে হয়। বিয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। বরের গায়ে দেওয়া হবে তেল হলুদ ছোঁওয়ান হবে চন্দন। হলুদ মাখিয়ে তাকে চান করান হবে কলাতলায়। এসব কার্য করবেন পাঁচ এয়োরা মিলে। অর্থাৎ পাঁচজন অভাবে তিনজন সধবা মহিলারাই এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অধিকারিণী। এখানেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষ হয় না কারণ কনের বাড়ির এয়োরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন কখন বরের বাড়ির ঐ নির্দিষ্ট তেল হলুদ এসে পৌঁছবে। হ্যাঁ, বরের গায়ে ছোঁওয়ান ঐ হলুদেই কনের গায়ে হলুদ হবে। এসবই কিন্তু হবে পাঁজির সংগে সময় মিলিয়ে। যতই আধুনিকা হোন, বিয়ের ব্যাপারে বাঙালি মায়েরা ভীষণ পাঁজি পাংচুয়াল। আর যে মেয়ে সারাদিন ম্যাকসি শালোয়ার পরে ঘুরে বেড়াত, গুরুজনের উপদেশ শোনা মনে করত সময়ের অপচয় সেই মেয়েই যখন বাঙালি কনে হয় তখন কেমন ভোরবেলাতেই লাল শাড়ি পরে হাসিমুখে বয়স্কদের হাজার রকমের নিয়ম নির্দেশ মেনে চলে।

স্নানের পর এদেশীয়দের একটি

বিশেষ আচার হল 'হাঁড়ি-মুগলি' খেলা। অবশ্য প্রথমেই বলে রাখি সব নিয়ম কিন্তু সবার মধ্যে নেই। এই হাঁড়ি মুগলি খেলাটি বেশ মজার। বাড়ির বৌ মেয়েরা চারটি ছোট্ট সুদৃশ্য মাটির হাঁড়িতে করে চাল ভরে আনবে। বর ও কনে (যে যার বাড়িতে) বসবে মাঝে। অন্যরা চাল ছড়িয়ে দেবে মাটিতে। বর কনে সেই চাল কুড়িয়ে হাঁড়িতে তুলবে আর মনে মনে একে অপরের নাম উচ্চারণ করে সরা চাপা দেবে। একটি স্মারট মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি চাল কুড়িয়ে হাঁড়ি ভরে খটাস করে সরা চাপা দেওয়ার সংগে সংগে এক প্রৌঢ়া চেঁচিয়ে উঠলেন 'এই, এই কী করলি।'

'কেন, কী করলাম?' 'সরা চাপা দেওয়ার সময় শব্দ হল

> এমন কোন মেয়ে বোধ-হয় নেই যে আইবুড়ো ভাত খাওয়ার আগে মা বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারে।

কেন?' '[illegible] কী হয়েছে?' '[illegible] শব্দ হলে নাকি সারা দাম্পত্য জীবনই ঝগড়া হবে।' 'বাপরে কী নিয়ম' [illegible] কনের কাতরোক্তি। আর এক আত্মীয়ার সরস উত্তর 'এতেই এই! এখনও তো সারাদিন পরের দিন পড়েই রয়েছে।' সত্যি নিয়মের যেন শেষ নেই।

দুপুরে কনের বাবা কিংবা দাদা (নিজস্ব পরিবারের কেউ) বৃদ্ধি করবেন, এটা হল পিতৃমাতৃকুলের সাত পুরুষকে জল দেওয়ার নিয়ম। তারপর কন্যাকে পিতার পাশে বসিয়ে নান্দীমুখ করান পুরোহিত মশাই।

নানা হইচইয়ের মধ্যে কেটে যায় সারাটা দিন। কনেকে বান্ধবীরা সাজিয়ে তোলে মনের মত করে। বরও কিন্তু এই দিনটিতে সাজ নামক ব্যাপারটি থেকে মুক্তি পায় না। যে ছেলে মুখে কোনদিন পাউডার ছোঁয়ায়নি সেই পাউডার চন্দন চর্চিত সুরভিত হয়ে মাথায় টোপর পরে বিবাহ যাত্রার জন্য তৈরি হয়। কোন কোন বাড়িতে নিয়ম আছে যাত্রার আগে ছেলে একটি চাল দুধের পাত্র স্পর্শ করবে। সেই চাল দুধই ফুটিয়ে রাতে ছেলের মা খাবেন। যাত্রার আগে রীতি অনুযায়ী মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় যাচ্ছ? আগে ছেলে বলত, তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি। এখন যুগ পালটেছে, পালটেছে মন, পালটেছে দৃষ্টিভঙ্গি। তাই পুত্র এখন বিনম্র ভাবে উত্তর দেয়, তোমার জন্য লক্ষ্মী আনতে যাচ্ছি।

কোন পরিবারের নিয়ম রয়েছে বর যাত্রার আগে মাড়ভাজন খাবে। আবার দেখা গেল, বর ও বরযাত্রীর গাড়ি ছাড়ার সময় দ্রুত পদে একটি মেয়ে এসে বরের গাড়ির পিছনের চাকাতে এক কলসী জল ঢেলে দিল। এটা নাকি নিয়ম, দিতেই হয়। একজন বলল—কী ভাগ্যি—তুই দিলি, আমরা তো ভুলেই গেছিলাম। ভুলে গেলে কোন মহাভারতই অশুদ্ধ হত না, তবু হাজার আচারের মধ্যে এটাও একটি এবং অবশ্যপালনীয় রূপে কথিত।

কারও কারও নিয়ম আছে বর যাত্রা করে গেলে তার মা দইয়ের মধ্যে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকবেন, যতক্ষণ না ছেলের

> সলজ্জ চারিচোখের মিলন, যার নাম শুভদৃষ্টি। আর সমুদ্রের মত গভীরতা হৃদয় নিয়ে হয় মালাবদল।

বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে খবর আসবে। সত্যি, বাঙালি বিয়ের ধন্য রীতি নীতি। উদগ্রীব কনের বাড়িতে বরের শুভ পদার্পণে আলোড়ন ওঠে। শুরু হয় বাঙালি বিয়ের বিখ্যাত বরণ অনুষ্ঠান। প্রথমে কনের মা, তারপর অন্যসব বয়োজ্যেষ্ঠারা একে একে বরণ করেন বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। এই সময়কার স্ত্রী আচারগুলি মনে রাখার মত।

তবে একটা কথা, বাঙালি বিয়ের নিয়ম অনুষ্ঠান মনোহর কিন্তু বড়ই কড়া। ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

বর আর বরযাত্রী আপ্যায়নের কিছুক্ষণ পরেই পাঁজির সময় মিলিয়ে বরকে নিয়ে যাওয়া হয় ছাঁদনাতলায়। আরম্ভ হয় বিবাহ অনুষ্ঠান। কিছু পরে কন্যাকে নিয়ে আসা হয় পিঁড়েতে বসিয়ে। সাত পাকের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন। কনের পিঁড়ি ধরে বরের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করান হয়। মনে রাখতে হবে, এই সময় কনে যেন ভুলেও বরের মুখ না দেখে ফেলে। একটি পানপাতা দিয়ে কনের চোখ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় অনেকক্ষেত্রে। অবশ্য কোন মেয়ে যদি সবার অলক্ষ্যে আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটু [illegible] সে বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন [illegible] কিনা নিয়ম নেই।

তারপর সলজ্জ চারিচোখের মিলন, যার নাম শুভদৃষ্টি, আর সমুদ্রের মত গভীরতা হৃদয় নিয়ে হয় মালাবদল। [illegible]

অনুষ্ঠান হল সম্প্রদান। মংগলঘটের উপর বরের হাত ও কনের হাত মংগলসূত্রে বেঁধে দেন পুরোহিত। কনের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় (প্রায়শই পিতা) সম্প্রদান করেন কন্যাকে। মন্ত্র উচ্চারিত হয়, এতদিনের স্নেহের পাত্রীকে তুলে দেন পাত্রের হাতে।

তারপর পাত্র কনের ডান হাতটি দুহাতে ধরে পাণিগ্রহণ করে। সে তুলে নেয় নবপরিণীতার সমস্ত জীবনের দায়িত্ব। বর কনে দুজনের মুখেই উচ্চারিত হয় সর্বজনবিদিত সেই মহামন্ত্র 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।' এরপর পুরোহিত মশাই যজ্ঞের আয়োজন করেন। বরকনের চারহাত মিলিত হয়ে খই অর্পিত হয় হোমাগ্নিতে। অগ্নি সাক্ষী করে বরকনের সীমন্তে সিঁদুর রাঙা করে দেয়। কারও নিয়মে সিঁদুর দান হয় আংটি দিয়ে কারও কুনকে দিয়ে, কেউ আবার সিঁদুর পরায় দর্পণ দিয়ে। তারপর লজ্জাবস্ত্র দিয়ে কনের মাথায় ঘোমটা টেনে দেয় বর। মুহুর্মুহু শাঁখ বেজে ওঠে উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে বিবাহবাসর। ঠিক এই অনুষ্ঠানটিই পূর্ববংগীয়দের মধ্যে পালিত হয় বিয়ের পরের দিন যার নাম বাসী বিয়ে। বিয়ের পর বয়োজ্যেষ্ঠদের সহায়তায় পুরোহিত কনের বেনারসীর প্রান্তে আর বরের জোড়ে গিঁট বেঁধে দেয়। এর মধ্যে থাকে পঞ্চফল। অষ্টমংগলে এই গিঁট খোলা হবে। পঞ্চফল ভাসিয়ে দেওয়া হবে জলে। এ সমস্ত শেষ হলে বহুক্ষণ ধরে চলবে চাল খেলা আর কড়ি খেলা। কারও কারও নিয়মে কলাতলায় দুধ পুকুরে চলবে আংটি খেলা। অর্থাৎ একটি ছোট্ট পুকুর বানিয়ে সেটা দুধ জলে পূর্ণ করা হবে। সেখানে কনে আংটি লুকিয়ে রাখবে, বর খুঁজে বের করবে। খেলাটা নিঃসন্দেহে সামান্য তবে মজাটা অনেক। অনেকের মধ্যে আবার সিঁদুর পরান নিয়ম বিয়ের পরদিন ভোরবেলায়, বাসী বিছানায় ঘুম থেকে উঠে বিছানা না ছেড়েই এই শুভকাজ সম্পন্ন করার বিধি। আজকাল একটি মজার নিয়ম তৈরি হয়েছে। বিয়ের পরদিন বরকনে শয্যাত্যাগ করার আগেই কনের বৌদি বোনেরা এসে বলবে 'চটপট ৫০০ টাকা দিন তো।' —'কেন?' বরের আমতা আমতা উত্তর। সংগে সংগে সপ্রতিভ জবাব- 'বাবে, শয্যা তোলার টাকা দেবেন না।' এটা হল বিয়ের নতুন আচার। ৫০০ হোক ২০০ হোক যাই হোক বরের দিতেই হবে। শয্যা তোলার টাকা না বলে ট্যাকস বললেই বোধহয় ভাল হয় এটাকে। বিয়ের পরদিন চান করতে হয় কলাতলায় পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। এক পিঁড়িতে দুজনেই দাঁড়ায়, হাঁড়িতে ভরা সেই বিশেষ জলটি ঢেলে দেওয়া হয় বরের মাথায়। এমনভাবে ঢালা হবে যাতে সেই জলই কনের মাথায় পড়ে তাকে সিক্ত করে দেয়। এবার পিঁড়ি থেকে নামার সময় বর কনে পিঁড়ির নিচে রাখা ছোট্ট দুটো সরা পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভেঙে দেবে। দাম্পত্য জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করার প্রতীক এটা।

এরপর আর কতক্ষণ সানাইতে ক্রমাগতই বেজে চলে সানাইয়ের বিদায়ী বাথার সুর। সমাজের নিয়মে কনের পিতৃগৃহ রাতারাতি হয়ে ওঠে পরগৃহ। নববধূ স্বামীর হাত ধরে চলে আপনার ঘরে নতুন জীবন শুরু করতে। তখন কনের ঝাপসা দৃষ্টি দেখে কি দেখে না একের পর এক চলে বরণ আর আশীর্বাদের পালা। যাত্রার মুখে একটি নিষ্ঠুর ও অর্থহীন আচার পালিত হয় বাঙালি বিয়েতে। কনে তার মায়ের আঁচলে তিনমুঠো চাল আর টাকা ফেলে দিয়ে বলে, তোমাদের সব ঋণ শোধ করে দিয়ে গেলাম। হায় রে কন্যা। সে জানে না সে কী বলছে। তারপর রীতি অনুযায়ী মা চলে যাবেন মেয়ের সামনে থেকে। মেয়ের যাওয়ার দৃশ্য দেখার নিয়ম নেই মায়ের।

কম্পিত হৃদয়ে বধূ এসে প্রবেশ করল শ্বশুর ঘরে। কানে সাবধানী স্বর ভেসে এল প্রথমে বাঁ পা রাখ বৌমা। অবশ্যই নগ্ন পায়ে কাঁখের জলভরা ছোট কলসী নিয়ে ঘরে ঢুকবে বধূ। কথায় বলে, কারও আনন্দ কারও নিরানন্দের কারণ হয়। কারণ এক বিয়ে বাড়িতে কনে প্রবেশ করার পরই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। সে বাড়িতে নাকি নিয়ম আছে জ্যান্ত একটা ল্যাটামাছ কন্যাকে হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকতে হবে বরণের সময়। একেই তো প্রিয়জনের বিচ্ছেদে তখন মন ব্যথায় ভরে আছে, তারপর এই জ্যান্ত মাছ হাতে চেপে ধরার নির্দেশ তার কাছে আচার না হয়ে অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উপায় নেই। তার চোখের জলের জন্য সে বাড়ির দীর্ঘ দিনের প্রচলিত আচারকে নতুন করে বিচার করার উৎসাহ কারও নেই।

অত্যন্ত সুখের কথা হৃদয়বিদারক এই অনুষ্ঠানটি অনেক বাড়িতেই নেই। মাছকে শুভ মনে করায় সেসব ক্ষেত্রে একবার মাছ স্পর্শ করতে হয়, এই মাত্র।

কোন বাড়িতে নিয়ম আছে কনে শ্বশুরঘরে পা দিয়ে উনুনের কড়াই থেকে উপচে পড়া দুধের দৃশ্য দেখে বলবে- আমার শ্বশুর স্বামীর ঐশ্বর্য ও গৌরব যেন এমন করেই উপচে পড়ে।

এগুলো হয়ে গেলে বরকনে যখন ঘরে ঢুকতে যাবে সেখানেই এক বিরাট বাধা। দরজা বন্ধ। কনের

[illegible] বরের বাড়িতে দোরধরা। বরের ভাইয়েরা দরজা বন্ধ করে রাখবে। যতক্ষণ না টাকা দেবে বর ততক্ষণ রইল দরজা বন্ধ। কনের ঘর্মাক্ত অবসন্ন পীড়িত মুখের দিকে চেয়ে বরের পকেটে হাত দিতেই হয়। কী করা।

এরপর চিত্রিত পিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে মুখে মিষ্টি দেবেন মা। দুধে-আলতায় পা ডোবাবে কনে। বরণ করে ঘরের লক্ষ্মী তুলে আনবে সবাই।

একটু পরে হাঁড়িতে করে বিশেষ জল (বিয়ের দিন ভোরে মা যে জল ভরেছেন) আনা হবে। তাতে ছেড়ে দেওয়া হবে ময়নামুনি (বরকনের টোপরের ভাঙা অংশ)। হাত দিয়ে জল ঘোরাবেন এয়োরা যদি সে জল ঘুরতে ঘুরতে ময়নামুনি জোড় বেঁধে যায় তাহলে চারপাশে খুশীর বন্যা বয়ে যাবে, কারণ অমনি করেই তাদের জীবন নাকি এক হয়ে থাকবে চিরকাল। ঠিক এই নিয়মটা আর একবার করা হয় কনের বাড়িতে বিয়ের আগের মুহূর্তে।

কে না জানে, বিয়ের পরদিন কালরাত্রি। সে রাতে বর কনে পরস্পর কারও মুখ দেখবে না। হয়ত কিছু হবে না, তবু এই বিধি চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। যুক্তি নয় প্রথারই প্রাধান্য এখানে।

বিয়ে গেল, গেল বাসী বিয়ে। তার পরদিন বৌভাত। দুপুরে কনে স্নান সেরে নতুন শাড়ি পরে মৃদুপায়ে এসে দাঁড়াল। বরের হাতে একটি থালা ধরা, তাতে রয়েছে পঞ্চব্যঞ্জন আর ঘিভাত, তার সঙ্গে একটি নতুন কাপড়। বর সেই থালা দুহাতে তুলে দিল কনের হাতে, বলল—'তোমার সারা জীবনের ভরণ পোষণের ভার নিলাম। শাঁখ বেজে উঠল ঘনঘন। উলুধ্বনিতে ভরে গেল ঘর। কোন কাগজ কলম নেই, সই নেই। বহুজনের সামনে সারা-জীবনের জন্য স্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের স্বীকৃতি দিল স্বামী। ওখানেই বাঙালি বিয়ের আচার বিধির জিত। এর মূল্য যে কোন আইন প্রমাণের ঊর্ধ্বে। এরপর সলজ্জ বধূ মাথায় ঘোমটা টেনে সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে নিজের হাতে পরিবেশন করবে ঘি ভাত, শেষ হবে বৌভাত অনুষ্ঠান।

সন্ধ্যের পর শুরু হয় অতিথি অপ্যায়নের পালা। সুসজ্জিতা কনে সমস্ত অতিথিদের অভিনন্দন গ্রহণ করবে। ধীরে ধীরে বাড়বে রাত। বিদায় নেবে আপ্যায়িতের দল। এগিয়ে আসবে জীবনের বরণীয় পরমক্ষণ ফুলশয্যা। ফুলশয্যার প্রারম্ভে কয়েকটি স্ত্রী আচার পালন করার নিয়ম আছে। ফুল সাজান নতুন [illegible] কনেকে। লজ্জারাঙা কনের মুখটি তুলে একজন বলল—অত লজ্জা কী? এস, আর একবার মালা পরাও। হ্যাঁ, ফুলশয্যার বিশেষ ফুলের সাজ থেকে দুটি মালা নিয়ে আবার মালাবদল করবে ওরা। আবার জল আসরে হাঁড়িতে করে। ময়নামুনির জোড় মেলান হবে। তারপর সব আচাররীতির সমাপ্তি ঘটিয়ে এয়োস্ত্রীরা বিদায় নেবে। বরকনের সামনে শুধু অপেক্ষা করবে তারা ভরা রাত আর কম্পিত হৃদস্পন্দন ধ্বনি।

বাঙালি বিয়ের আচার অনুষ্ঠান এখানেই প্রায় শেষ। অষ্টমঙ্গলের (বিয়ের আটদিন পর) গিঁট খোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই।

যখন একটা গাছ পোঁতা হয় তখন পালিত হয় বনমহোৎসব। অনেক আচার বিধি মেনে এই অনুষ্ঠান [illegible] করা হয়। বিয়ে তো বনমহোৎসবেরই নামান্তর। একটি বাগান থেকে একটি ফুলের চারাকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় আর একটি বাগানে। তার লাগি এত কোলাহল এত আয়োজন। এত বাধা – এত আনন্দ। পরেরটুকু তো ভাগ্যদেবীর হাতে। তবে সকলেই তো চায় সদ্যরোপিত গাছটি নতুন বাগানে ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠুক। তাই এত আয়োজন, এত উলুধ্বনির অনাস্বাদ আনন্দ। □

বিয়ের জন্য ক্ষীরের পুতুল

ক্ষীরের তৈরি নৌকাবিলাস

প্রগনসায় সানাইয়ের সুরে কার না মন উন্মনা হয়? বিয়ের বাসরে কেবল বর-কনের মনই রঙিন প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়ায় না, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী সকলেই তখন রংগলোকের অভিযাত্রী। অবশ্য সব রসের শেষে সকলের তৃপ্তি হয় মিষ্টিমুখে। কিন্তু সেই মিষ্টিতেও থাকতে পারে রোমানস, শিল্পী-মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত হতে পারে মহার্ঘ্য মিষ্টি-বিচিত্রা। ছানা, মাখনে, ক্ষীরে তৈরি হয় দৃষ্টিনন্দন, হৃদয়-হরণ শোভন-সুন্দর সব পুতুল উপহার।

এইসব ক্ষীরের পুতুল যেন নানা নাটকের নায়ক-নায়িকা। পুরাণ কাহিনী কিংবা জীবনের নানা ঘটনা রূপায়িত সন্দেশের অঙ্গ-বিন্যাসে। শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন, যমুনার জলে নৌকাবিলাস, প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের প্রেম নিবেদন, বুড়োবুড়ির রংগরস, বাসরঘরে বর-বউয়ের মিষ্টি সংলাপ অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রযানও নানান দৃশ্যে মিষ্টিরূপ নেয়। বিয়ের তত্ত্ব তালিকায় এমনি সব উপঢৌকন যেমন উঁচুমানের রুচি প্রকাশ করে তেমনি বিশেষ মর্যাদাও ফুটে ওঠে। এই মিষ্টি উপহার পাঠান হয় কেবল বনেদি বাড়িতে নয়, হালে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই রেওয়াজ চালু হয়েছে। আর শুধু বিয়ে বৌভাতে নয়, অন্নপ্রাশনে, নাম-করণে, জন্মদিনের উৎসবেও এর হাজিরা নজরে পড়ছে।

এককালে বনেদি বাড়ির সাবেকি রেওয়াজ ছিল ক্ষীরের তত্ত্ব পাঠান। যে যত বড় দরের মানুষ সে তত বড় মাপের তত্ত্ব পাঠাত। বড় মানুষি মেজাজটাও এতে প্রতিফলিত হত। তার পর একসময় তাতে পড়ল শিল্পীর হাত। কারিগরের কারিকুরির পর মিষ্টি শুধু মুখ-মিষ্টি হয়ে রইল না, সে হয়ে উঠল মিষ্টি-মনের সৃষ্ঠু বিকাশ।

কলকাতার কোনও কোনও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি কারবারি পরিবার এই উপহার তৈরি করে আসছেন চার পুরুষ ধরে। তবে এখন দিন বদলেছে। বদলেছে মানুষের রুচিও। একসময় যা ছিল রাজ-রাজড়ার আভিজাত্য, এখন তা হয়ে উঠেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কালচার। যদিও একালে পঁচিশ-ত্রিশ কিলোর ছানার তত্ত্ব তৈরি হয় কম, কিন্তু পনের-কুড়ি কিলোর ছানার তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে হামেশাই। তার দামও কম নয়। কম করেও হাজার তিনেক টাকা। নিচের দিকে পাঁচ কিলোতেও হয়। খরচ পড়ে শ পাঁচেকের মতন।

ক্ষীরের এই পুতুল বড় সাইজে প্রায় মানুষ প্রমাণ হয়। ছোটখাট লরি বা টেমপোয় করে নিয়ে যেতে হয় বয়ে। সেইসব গাড়ি হয়ে ওঠে ঠাকুর ভাসানের মত জনদৃষ্টি আকর্ষণকারী এক একটা চলমান যান। যেন জীবন্ত সব নয়নাভিরাম দৃশ্য তার ভিতরে।

ইদানীং নামকরা কয়েকটি মিষ্টির দোকানে ক্যাটালগ রাখা হয় এইসব মিষ্টি পুতুলের নমুনা দেখানর জন্য। অ্যালবামে ছবি সাজান থাকে পর পর। বাসর ঘরের দোলনায় বরকনে, সখী পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের নৌকা-বিলাস, সাগরে ছুটন্ত নৌ-জাহাজ অথবা হরেকরকম কাহিনী সম্বলিত ঘটনার চিত্র। অ্যালবাম দেখে সেইসব ছবি বিভিন্ন ব্যক্তির বায়না মত কায়াময় এবং শিল্পীমনের মাধুরী মিশিয়ে তা মায়াময় হয়ে ওঠে। মাটিতে নয়—রচিত হয় ক্ষীর, ছানা অথবা মাখনে এই প্রীতি-উপহার। কলকাতার অনেক [illegible] কেতা এই ক্ষীরের পুতুল [illegible] পুরনো দিনের জের টেনে তত্ত্বপ্রীতি [illegible] হয়ে মঙ্গল অনুষ্ঠান মধুময় করে তুলছে।

কৃষ্ণ দেবনাথ

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

বিয়ের আগে ডাক্তারি পরীক্ষা করান সুখী বিবাহের বড় সোপান

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর ডাক্তারি পরীক্ষা · সে আবার কী · কথাটা উঠলেই দুপক্ষ মারমার কাটকাট করে উঠবেন ; বরপণ নেব, ফ্রিজ, টিভি এক গা গয়না, পারলে একটা আমবাসাডারও যৌতুক হিসেবে নিতে পারি, কিন্তু আমার ছেলেকে ডাক্তার পরীক্ষা করাব কেন · আমার ছেলে কি কানা, খোঁড়া না যক্ষ্মা কুষ্ঠয় ভুগছে ·

কথাগুলো কন্যাপক্ষও হয়ত বলবেন ; হয়ত বলবেন আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা দিচ্ছি, মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখী করার জন্যে, আপনি কেন মাঝখান থেকে বাগড়া দিচ্ছেন

বিয়ের আগে কুষ্ঠিবিচার হয়, পালটি ঘর কিনা দেখা হয়, কুলীন কিনা দেখা হয়, তারপর সাড়ম্বরে বিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু বছরখানেক পরে নব দম্পতি যখন একটু পুরনো হয়ে যান, যখন বাস্তব সংসারের মুখোমুখি হন, তখনই নানারকম সমস্যা এসে দাঁড়ায়। তখন বাধ্য হয়ে ডাক্তার বাবুর কাছে যেতে হয়। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে নানারকম অসুখ স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে আবিষ্কার করেন। অনেক রোগের চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ এবং অধিকাংশ সময়ে স্বামী স্ত্রী ধৈর্যের বাঁধন হারিয়ে ফেলেন। এ সমস্যা শুধু স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, অভিভাবিকা, অভিভাবকরা তখন মঞ্চের বাইরে চলে গেছেন। এখনও পাত্রপক্ষ নিরপরাধিনী বউকেই দোষারোপ করেন বেশি। সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করা হয় বাঁজা বলে। পরিবার কল্যাণ হচ্ছে বলে তো আর একদম বাচ্চা হবে না, এ কথা কেউ বলেননি। কথায় বলে বংশরক্ষে।

এই ধরনের দম্পতিকে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখেন অনেকক্ষেত্রেই বধূর কোন দোষ থাকে না। স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁর বীর্যে শুক্রকীট নেই, থাকলেও খুব কম থাকে এবং সেই শুক্রকীটগুলি সুস্থ সবল নয়। শুক্রকীটগুলিকে সতেজ সবল করে তোলার জন্যে অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করতে হয়। এই পরীক্ষাটা যদি বিয়ের আগে করে নেওয়া হয়, তাহলে ছেলেকে সুস্থ করে অনায়াসে বিয়ে দেওয়া যায় আর সে বিয়ে হয় সবচেয়ে সুখের। একটা বিষয়ে বলতে পারি, আজকালকার ছেলেরা কিন্তু এ বিষয়ে অনেক সচেতন হয়ে গেছেন।' প্রবন্ধ লেখকের কাছে কম করে দু থেকে তিনহাজার পাত্র এসে বলেছেন, বাড়িতে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে, আপনি সব পরীক্ষা করে জানিয়ে দিন আমি বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে সুখী করতে পারব কিনা।

পরীক্ষায় দেখা গেছে অনেকে নির্দোষ, অনেকের সামান্য দোষ আছে। তিন চার মাসের চিকিৎসায় তাঁরা ভাল হয়ে গেছেন, তারপর তারা বিয়ে করে সুখী হয়েছেন।

ছেলেদের আর একটা সমস্যা ফাইমোসিস। একটা কেস হিস্ট্রি বলছি। তাতে বুঝতে সুবিধে হবে। খুব বড় লোকের বাড়ির ছেলে, বাপ নেই। মা আছেন। তিন ভাই। বড় ভাই মেজ ছোটকে ছেলের মত মানুষ করেছেন এবং তাঁদের একান্নবর্তী সংসার। ছোট ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব উঠতেই সে বেঁকে বসে বলল বিয়ে করবে না। নিরুপায় হয়ে বড় ভায়েরা একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে গেলেন এবং সেই জ্যোতিষী বললেন, কোন রোগের আতংক ও বিয়ে করতে চাইছে না। তোমরা একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাও। সেই জ্যোতিষী তিনভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি প্রাথমিক কথাবার্তা শুনে বললাম, আপনারা বাইরে যান, আমি শুধু ওর সংগে কথা বলব।

বড় দুভাই বেরিয়ে গেলেন। ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করতেই সে কেঁদে কেটে একসা হয়ে বলল, আমার পুরুষাংগ খুব ছোট। আমি অনেক ডাক্তারের (অবশ্যই হাতুড়ে) কাছে গোপনে গিয়েছি, তাঁরা বলেছেন আমার নাকি ভীষণ যৌনব্যাধি হয়েছে এবং সেইজন্য পুরুষাংগ ক্ষয়ে গেছে। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটি কমপ্লিট ফাইমোসিসে ভুগছে। যেহেতু লিংগশীর্ষ চর্ম একদম খোলেনি, সেইজন্যে লিংগের বৃদ্ধি হয়নি। আমি পরামর্শ দিলাম ফাইমোসিস অপারেশন করিয়ে নেবার জন্যে। আমারই নির্ধারিত সারজেনকে দিয়ে ওঁরা অপারেশন করিয়ে নিলেন এবং চারমাসের মধ্যেই তার লিংগদৈর্ঘ্য স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন বীর্য পরীক্ষা করে স্বাভাবিক দেখে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হল। ছেলেটি বিয়ে করে ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার করছে। অতএব ফাইমোসিস আছে কিনা ছেলের বিয়ের আগে অতি অবশ্য দেখে নেওয়া দরকার এবং থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা করিয়ে বিয়ে দেওয়া উচিত।

আনডিসেনডেড টেসটিস একটি জন্মগত রোগ, তার মানে জন্ম থেকেই অন্ডগ্রন্থিদ্বয় অন্ডকোষের মধ্যে প্রবেশ করে না। কারুর কারুর কুঁচকির কাছে ইংগুইনাল ক্যানালে থেকে যায়, কারুর বা পেটের মধ্যে থেকে যায়। কারুর একদিকের অন্ডগ্রন্থি ওপরে থেকে যায়, কারুর বা দুদিকের গ্রন্থিই নামে না। ডিম ফোটাবার জন্যে যেমন একটি বিশেষ উত্তাপের প্রয়োজন, কমবেশি হলে চলবে না, তেমনি অন্ডগ্রন্থির মধ্যে শুক্রকীট জন্মানর জন্যে একটা বিশেষ উত্তাপের প্রয়োজন, যে উত্তাপ অন্ডকোষের মধ্যে তৈরি হয়, অথচ শরীরের মধ্যে হবে না। সেইজন্যে অন্ডগ্রন্থি অন্ডকোষের মধ্যে না নেমে এলে শুক্রকীট উৎপন্ন হবে না এবং শুক্রকীট উৎপন্ন না হলে সন্তানসৃষ্টি হবে না। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত আনডিসেনডেড টেসটিস পরবর্তীকালে ক্যানসারে রূপান্তরিত হতে পারে। সেইজন্যে বিয়ের অন্তত ছ মাস আগে আনডিসেনডেড টেসটিস আছে কিনা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া একান্তভাবে দরকার। যদি এ ধরনের রোগ থাকে বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ছেলের বিয়ে দেওয়া উচিত।

আর একটি সমস্যা সাইকোসোমাটিক ফিয়ার কমপ্লেকস। এই কমপ্লেকস থেকে পাত্রের উপচেতন মনে ভীতির সঞ্চার হয়, সে স্ত্রীকে সংগম জীবনে সুখী করতে পারবে না। এই ধরনের কমপ্লেকস তৈরি হয় প্রধানত দুটি কারণে। একটি কারণ, খুব ধনীর ছেলে প্রাকবিবাহ জীবনে বহু নারীর সংগে মেলামেশা করেছে এবং রাত্রিযাপন করেছে। হঠাৎ তার মনে হল কোন একটি বিশেষ রমণীর সান্নিধ্যে এসে সে যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছে। বিবাহ করার পর মস্তিষ্কের চেতনস্তর সদাসর্বদা পীড়িত করে · একটি সুন্দর নিরীহ নারীর জীবন সে ধ্বংস করতে চলেছে। ফলে তার চেতনস্তরের চাপ (Stress), উপচেতন ও অবচেতন মনের যৌন উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে দেয়, ফলে স্বামী-স্ত্রী কেউ সুখী হন না। আর একটি কারণ পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে অঢেল বরপণ, যৌতুক গয়না ইত্যাদি নিয়ে ঘটা করে বিয়ে দিলেন। পাত্রী অতিরিক্তমাত্রায় যৌতুকসম্ভার নিয়ে যখন শ্বশুরালয়ে আসে, তখন তার মনের উপচেতন স্তরে একটা সুপিরিয়র কমপ্লেকস জেগে ওঠে, প্রায় একই সংগে পাত্রের মনে ইনফিরিয়র কমপ্লেকস জাগতে আরম্ভ করে, ফলে ছেলেটি যৌনজীবনে মেয়েটির কাছে কিছুতেই সার্থক হয় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যাঁরা গরিবের ঘরের মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পুত্রবধূ করে আনেন, তাঁদের ছেলেরা বেশি সুখী হয়, কারণ- পাত্রপক্ষের মহানুভবতা মেয়েটির মনে ভক্তির সঞ্চার করে। পাত্রের মনে সুপিরিয়র কমপ্লেকস গড়ে ওঠে। কিছুদিন পরে মেয়েটির মনে ভক্তি থেকে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং স্বামী-স্ত্রী সারাজীবন সুখে ঘরসংসার করতে পারেন।

আজকের যুগে প্রাকবিবাহ চিকিৎসা পরীক্ষায় ছেলেদের অতি অবশ্য পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার কোন যৌনরোগ আছে কিনা। বিশেষ করে সিফিলিস, গনোরিয়া।, এর মানে এই নয় যে ছেলেরা যেখানে সেখানে গিয়ে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে এই রোগ বাধিয়েছে। কোন মেয়ের

ঠোঁটে যদি সিফিলিসের ঘা থাকে, তাকে চুমু খেলেও এই রোগ ঠোঁটের ভেতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবে। তাছাড়া ইনোসেনট ইনফেকশন বলে একটা কথা আছে। আমি যদি একটি সিফিলিস গনোরিয়ার রোগীকে পরীক্ষা করে সেই যন্ত্রপাতি বা গ্লাভস ভালভাবে স্টেরিলাইজ না করে, আর একজনকে পরীক্ষা করি, তাহলে দ্বিতীয়জনকে প্রথমজনের রোগে আক্রান্ত করে দিই, সে বেচারির একান্ত অজ্ঞাতে। এ ছাড়া সেলুনে কামানর সময় এ ধরনের ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ ইনফেকশন হয় ভিজে ব্রাশ থেকে। আমার আগে যিনি কামিয়ে গেলেন, তার গালে হয়ত সিফিলিসের ঘা ছিল। যে ব্রাশ দিয়ে তার গালে সাবান ঘষা হয়েছে, সেই ব্রাশ দিয়ে আমার গালেও সাবান ঘষা হল। সিফিলিসের জীবাণু ভিজে জায়গায় বেঁচে থাকে, তাই ব্রাশের মধ্যে গজগজ করছে ট্রিপানোমা প্যালাইডাম অর্থাৎ সিফিলিসের জীবাণু। আমার গাল ভর্তি সাবানের সংগে ওই জীবাণু, তারপর কোন কারণে যদি গাল কেটে গেল কি ছড়ে গেল, অথবা চোখে লাগল সংগে সংগে জীবাণুগুলো সেখানে বাসা বেঁধে ফেলল। তারপর শরীরের মধ্যে বহাল তবিয়তে অবস্থান শুরু করে দিল। আমি প্রাথমিক ভাবে জানতেও পারলাম না আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল। যখন জানলাম, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অতএব বিয়ের আগে ব্লাড টেস্ট করিয়ে নেওয়া একান্ত দরকার।

ব্লাড টেস্টের কথায় আসতে ব্লাডগ্রুপিং এবং আর এইচ ফ্যাকটর পরীক্ষা করে নেওয়ার কথা এসে পড়ে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। স্ত্রী যদি আর এইচ নেগেটিভ হন, স্বামী যদি আর এইচ পজিটিভ হন, তাহলে প্রথম সন্তানটি বেঁচে গেলেও পরবর্তী সন্তানগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এখন খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে, আর এইচ নেগেটিভ মায়ের এই ইনজেকশন নিলে স্বাভাবিক সন্তান হয়, যদি আগে থেকে মায়ের আর এইচ জানা থাকে। মায়ের আর এইচ নেগেটিভ জরায়ুস্থ সন্তানও যদি আর এইচ নেগেটিভ হয়, তাহলে সাধারণত কোন ক্ষতি হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু জরায়ুস্থ সন্তান যদি আর এইচ পজিটিভ হয়, এবং মা যদি আর এইচ নেগেটিভ হন, তাহলেই গোলমাল। এ অবস্থায় পাত্রীর ব্লাডগ্রুপিং এবং আর এইচ ফ্যাকটর আগে থেকে জানা একান্ত দরকার এবং মেয়েটির কাছে সদাসর্বদা লেখা থাকবে, তার ব্লাডগ্রুপ এবং তার এইচ নেগেটিভের কথা, কারণ কখন যে দরকার হয়ে পড়বে, কেউ বলতে পারেন না।

মৃগী (Epilepsy) এমন একটি রোগ যাকে লুকিয়ে কখনো বিয়ে দেবেন না। অনেকে মৃগীকে হিসটিরিয়া বলে চালিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। এতে বিয়ে উৎরে যেতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষ যদি প্রমাণ করতে পারেন বিয়ের আগেই পাত্র অথবা পাত্রীর মৃগী ছিল এবং এই রোগ লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছেন, তাহলে আদালতের বিচারে ডাইভোর্স পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। একই আইন প্রযোজ্য হবে, উন্মাদ এবং যৌনরোগের ক্ষেত্রেও।

কিছুদিন আগে এক বিচারকের রায় পড়ছিলাম। স্ত্রীর অ্যাট্রফিক রাইনাইটিস নামক একটি রোগ আছে। এই রোগে নাকের ভেতরের হাড় শুকিয়ে যায় এবং পচে যায়। ভীষণ দুর্গন্ধ বার হয়। এবং এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। স্বামীর অভিযোগ তিনি কিছুতেই দুর্গন্ধের জন্য স্ত্রীর কাছে যেতে পারেন না এবং সেইজন্য তিনি ডাইভোর্স চেয়েছেন। মহামান্য বিচারক সর্বদিক বিচার করে স্বামীর ডাইভোর্স প্রার্থনা অনুমোদন করেছেন।

তবে ডাক্তার হিসেবে জানা দরকার এই রোগ কি মেয়েটির বিয়ের আগে থেকেই ছিল? এই রোগ লুকিয়ে কি বিয়ে দেওয়া হয়েছিল? বিয়ের পর যদি এই রোগ হয়ে থাকে, স্বামী কি সেই রোগের চিকিৎসা করিয়েছিলেন? আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগের খুব ভাল চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং শতকরা ষাট থেকে সত্তর শতাংশ রোগী ভাল হয়ে যান। এও জানা চাই, মেয়েটি কি চিকিৎসা করতে অসম্মত হয়েছিল?

ডাক্তার হিসেবে বলা কর্তব্য, এ ধরনের যদি কোন রোগ থাকে, তাহলে সারিয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত নিয়ে বিবাহ দেওয়া উচিত।

কুষ্ঠ এবং যক্ষ্মা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কুষ্ঠ এবং যক্ষ্মা রোগকে সারিয়ে নিয়ে অনায়াসে স্বাভাবিক পাত্রপাত্রীর মত বিয়ে দেওয়া যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি পাত্রীর কুষ্ঠ হয়েছিল, সেই কুষ্ঠ সারিয়ে পাত্রপক্ষকে জানিয়ে, তাদের সম্মতি নিয়েই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এখন সুখী দম্পতি। একটি কন্যার জনক জননী। যক্ষ্মার বেলাতেও তাই। রোগী বা রোগিনীকে সম্পূর্ণ সারিয়ে নিয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত নিয়ে বিয়ে দিলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই জীবনযাপন করতে পারে।

যাদের শ্বেতী আছে, তাঁরা কি বিয়ে করবেন? শ্বেতী অর্থে আমি এখানে বলতে চাচ্ছি ভিটিলিগো (Vitiligo)। এ রোগের কারণ এখনও বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি, তবে মা কি বাবার শ্বেতী থাকলেই যে ছেলেমেয়ের শ্বেতী হবে তার কোন মানে নেই। মা এবং বাবা দুজনেরই শ্বেতী আছে, মানে একজন শ্বেতী পাত্রীর সংগে একজন শ্বেতী পাত্রের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সন্তানের শ্বেতী হয়নি।

অতএব সবদিক চিন্তা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলে, ছেলেমেয়েরা বেশি সুখী হবে। ফ্রিজ, টি ভি, অ্যামবাসাডর পাওয়ার চেয়ে বরং সেটাই বেশি দরকার।

এইবার দেখা যাক বিয়ের আগে আমরা যে প্রথাগুলি পালন করি, তার সংগে চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্পর্ক কতখানি। আমরা ভাইবোনে বা সগোত্রে বিয়ে দিতে চাই না, এর অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণ হল খুব কাছাকাছি ধারার রক্ত যৌন জীবনে মিশ্রিত হলে ইনসেসট রোগের উৎপত্তি হয়। ছেলেমেয়ে রুগ্ন হয়, অনেক সময়ে বিকলাংগ হয়। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন ভাবে ভাইবোনে বিয়ে করে পাপ হয়েছে আর সেই পাপের ফলে রোগ হচ্ছে। মনের মধ্যে একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস সৃষ্টি হয় এবং সেই যন্ত্রণায় সারাজীবন ভুগতে হয়।

এবার পাত্রপাত্রী চয়ন। আগে পাত্রপক্ষ পাত্রীকে দেখতে যান, পরে পাত্রীপক্ষ পাত্রকে দেখেন। কেন পাত্রীকে দেখা হয়? তাকে পরীক্ষা করার জন্যে? তার আই কিউ দেখার জন্যে? মোটেই না। পাত্রী দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখে পাত্রপক্ষের মনে হল মেয়েটি তাদের ভারি আপনজন। ফ্রয়েডের থিয়োরি পার হয়ে হ্যাভলক অ্যালিস এবং মেনডেল থিয়োরিতে আছড়ে পড়ল পাত্রপক্ষর উপচেতন মন। মেয়েটির চোখ, চুলের বিন্যাস, ভুরু ঠোঁট, হাসি, কথাবলার ঢং, কোনটা না কোনটা পাত্রপক্ষের মাতা, মাতামহী, পিতামহী বা কারুর মত। কারুর মনে হল মেয়েটির হাসিটা যেন তার মায়ের মত, কারুর মনে হল মেয়েটির ঠোঁট নাড়া ঠিক তার বোনের মত। অর্থাৎ নিজের প্রিয়জনের সংগে মিলে যাওয়ার জন্যেই মেয়েটিকে পছন্দ হয়, সুন্দরী বা অসুন্দরী হওয়ার জন্য নয়। মেয়েটিও ভাবে, ছেলেটির কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ঠিক তার বড়দার মত। মনের এই ক্রিয়াবোধ থেকে দুজন দুজনের কাছাকাছি এসে যায়। এবং তারপরই যথারীতি সুখী দাম্পত্য জীবন। □

কালীঘাটে কম খরচের বিয়ে

সঞ্জয় সিংহ

কালীঘাটের মন্দিরেব সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে প্রথমে নামলেন বছর ত্রিশ বত্রিশের এক ভদ্রমহিলা। পোশাকে-আশাকে বেশ আধুনিকা। অবিবাহিতা। এর পর গাড়িটা লক করে সংগী কেতাদুরস্ত বছর চল্লিশেকের এক ভদ্রলোক, মহিলাটিকে সংগে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে হাসিহাসি মুখে দুজনেই মন্দির থেকে বেবিয়ে এলেন। ভদ্রমহিলাব মাথায় টকটক করছে লাল সিঁদুর। পাশ থেকে একজন পাণ্ডাব গলা পেলাম, অপর এক পাণ্ডাকে তিনি বলছেন, 'যাঃ, পঁচিশ পয়সায় হুলো হয়ে গেল।' কালীঘাটের বিয়েকে পাণ্ডারা 'কোডে' বলে হুলো। অর্থাৎ ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা মাত্র পঁচিশ পয়সায় জীবনের এক বড় কাজ সেরে ফেললেন।

একটু এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের পুব দিকের ফটক দিয়ে ঢুকে, প্রথমেই একটা ডালাব দোকান পড়ল। ওখানে কয়েকজন পাণ্ডা বসে ছিলেন। ওঁদের মধ্যে থেকে আলাপ জমালাম সুনীত চৌধুরীর সংগে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কালীঘাটে পাণ্ডাগিরি করছেন। কালীঘাটের বিয়ে নিয়ে জিগোস করলাম, কালীঘাটে কি শুধু বিয়ের মাসেই বিয়ে হয়? সুনীতবাবু বললেন, 'না, না, শুধু বিয়ের মাস কেন, এখানে প্রায় প্রতিদিনই বিয়ে লেগে আছে। এমনকি মল মাসেও বিয়ে হয়।'

এখানে কারা বিয়ে করতে আসেন?

সুনীতবাবুর উত্তর, 'সব শ্রেণীর মানুষই আসেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরিব সবাই। তবে কাছে পিঠের চেনাজানা লোক, যারা গোপনে বিয়ে সারে তারা যান দক্ষিণেশ্বরে; কিংবা তারকেশ্বরে। ওখানেও এখানকার মত বিয়ে হয়। তবে কালীঘাটের বিয়ের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি, তাই কলকাতা ও তার আশপাশের লোকেদের ভিড় এখানেই। অনেকে আসে বাড়ির অমতে অজ্ঞান্তে পালিয়ে বিয়ে করতে, আবার কখনো কোন গ্রামের মেয়েকে ফুসলে এনে বা তুলে নিয়ে এসেও এখান থেকে বিয়েটা করে সটকে পড়ে। আবার দেখেছি, বাড়িতে কাজ করে একটা মেয়ে, সেই বাড়ির বাবু পছন্দমত ছেলের সংগে এখান থেকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে হয়ত বিয়েথা দিতে গেলে কিছু অসুবিধা ছিল। আবার কখনো-বা মেয়ে বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেছে, ব্যাপার গোলমেলে, তাই তাড়াতাড়ি প্রেসটিজ বাঁচাতে মেয়ের বাড়ির আত্মীয়, বাবা মা নিজেরা এসে, অথবা পাত্র পাত্রী নিজেরাই বিয়ে করে গেলেন। অবশ্য আজকাল অনেকেই স্থানাভাব, বিয়ের নানা ঝামেলা এড়াতে এখানেই কাজটা সেবে যান। তবে এটুকু বলতে পারি, দিনে দিনে কালীঘাটে বিয়েব সংখ্যা বেড়ে চলেছে।'

সুনীতবাবুর কথা শেষ না হতে হতেই, চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক পাণ্ডা বলে উঠলেন, 'এছাড়া অনেকে বিয়ে রিনিউ করাতে আসেন। অবশ্য এটা হিন্দুস্থানীদের মধ্যেই প্রচলিত আছে।' আসল ব্যাপারটা কী? 'হিন্দুস্থানী দম্পতি-দের পাঁচছটা ছেলেমেয়ে হয়ে যাবাব পর ওবা এখানে এসে মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, নতুন করে বিয়ে করে মানে বিয়েটা রিনিউ করে নেয।'

কালীঘাটের বিয়েতে খরচ কত হয় জানতে চাইলাম সুনীতবাবুর কাছ থেকে। সুনীতবাবু জানালেন, 'দেখুন মিনিমাম খরচ পঁচিশ পয়সা। একপাতা সিঁদুরের দাম। এইরকম বিয়েতে পাত্র-পাত্রীদের পাণ্ডা পুরোহিত কিছু লাগে না। নিজেরাই মায়ের সামনে সংকল্প করে, বা মায়ের পায়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে নিজেরাই সিঁদুর পরে নেয়। এখানে আসল বিয়ে করতে যার যেরকম ক্ষমতা সে সেরকম খরচ করে। মিনিমাম পঁচিশ টাকা থেকে পাঁচশ, হাজার অবধি খরচ হতে পারে। আবার অনেকে আমাদের মাধ্যমে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে খুবই সংগত ভাবে খরচ বেড়ে যায়।'

বিয়েটা কি মা কালীর সামনেই হয়?

'না, বিয়েথা, উপনয়ন কোনটাই মায়ের মূর্তির সামনে হয় না। মায়ের সামনে পাত্র-পাত্রীরা হয়তো সংকল্প করলেন বা শপথ রাখলেন, মা আমরা দুজন জীবনে কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ওই যে দেখছেন ষষ্ঠীতলা, শিবতলা, মনসাতলা, ওই যে ওদিকে পশ্চিম দিকে যে দালান দেখছেন, ওখানে বিয়ে হয়।' তবে অনুসন্ধান করে জানা গেল, অনেক সময় 'সাটে'ও কাজ সারা হয়। সাটে মানে চুপিসারে। এই চুপিসারে কাজ সারতে পাণ্ডা ও পুরোহিতদের মোটা রকম দক্ষিণা পাব্বুনী দিতে হয়। এছাড়া পারটি বুঝে, 'বার' খাইয়ে নামকাওয়াস্তে মন্ত্র পড়ে, বিয়ে সেরে দেওয়া হয়। কালীঘাটেব মন্দিরে খুব যাতায়াত আছে, এমন একজনের কাছ থেকে শুনলাম, 'ভুল উচ্চাবণে অনেক সময় বিয়েব বদলে শ্রাদ্ধের মন্ত্রও পড়া হয়।' তবে 'সাটে' বিয়ে সারতে গিয়ে, পাণ্ডা বা পুরোহিতদেব অনেক ঝক্কিও পোয়াতে হয়।

শুধুমাত্র মন্দিব চত্বরেই নয়, মন্দিরেব কাছাকাছি একটি রাস্তায় কয়েকটি বাড়ি আছে সেখানেও বিয়ে হয়। ওইসব বাড়িতে সদ্যবিবাহিতরা যাতে রাত কাটাতে পারে তার ব্যবস্থাও আছে। অনেক সময় দেখা যায়, ট্যাকসি থেকে পাত্র পাত্রী দুজনে কিংবা কখনও দুএকজন আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবীসহ নামল। পাত্র পাত্রীর পরনে সাধারণ পোশাক। তারপব পছন্দমত পাণ্ডা ধরে ওইসব ডালাব দোকানেব কোন একটাতে ঢুকে গেল। পাত্রেব হাতেব অ্যাটাচি থেকে বেরুল জোড়-বেনারসী। কিছুক্ষণেব মধ্যে বিবাহ পর্ব সেবে একটু মিষ্টিমুখ করে, পাণ্ডা পুরোহিতদের 'ন্যায্য পাওনা' মিটিয়ে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

সুনীত চৌধুরীকে জিগোস করে ছিলাম, এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরে কালীঘাটের বিয়ে নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা মনে পড়ে?

একটু ভেবে সুনীতবাবু বললেন, 'দেখুন কালীঘাটের বিয়ে মানেই তার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা থাকেই। তবে একবার এক সাহেবকে একটা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করতে দেখেছি। আবার দাঁত পড়ে গেছে থুড়থুড়ে এমন দুই বুড়োবুড়িকেও বিয়ে করতে দেখেছি।' ☐

কলকাতায় রেজিসট্রি বিয়ের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে

সঞ্জয় সিংহ

ধর্মতলার উপর মট লেন পোসট অফিসের পেছনে এক মহিলা ম্যারেজ অফিসারের চেমবার থেকে বেরুলেন এক সদ্য বিবাহিত দম্পতি এবং তাঁদের কয়েকজন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবী। ওঁরা এখন যাবেন একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয়। পাত্রের সংগে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলাম। সুতরাং আমার কাজ শুরু করে দিলাম। পাত্রটিকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনাদের নিশ্চয় লাভ ম্যারেজ '

হ্যাঁ, পুরোপুরিই লাভ ম্যারেজ তবে এটা সেমিফাইনাল।

তার মানে

সপ্রতিভ এই সদ্য বিবাহিতের উত্তর 'ফাইনাল হবে মন্ত্রোচ্চারণ করে নিয়েব দিন। কারণ আমার গার্জেন মা এই বিয়ের ব্যাপার জানেন না, যদিও বাড়ির অন্য সবাই জানেন। এই দেখুন, আমার সেজদা আছেন জামাইবাবু রয়েছেন। আর ওবও দাদা এসেছেন, ওর বাড়িতে শুধু ওর বাবা জানেন না।'

প্রশ্ন করলাম, 'তবে এরকমভাবে বিয়ে করলেন কেন

ব্যাপারটা সিকিওর করে রাখলাম।

আপনাদের পরিচয় কবে থেকে -

আমরা একই পাড়ায় থাকতাম, দুজনে দুজনকে ছোটবেলা থেকে চিনি। তবে প্রেমের সূত্রপাত কবে থেকে ঠিক মনে নেই।

এবার নবপরিণীতার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়লাম, 'আপনার মনে আছে '

মিষ্টি হেসে বললেন, 'এগজ্যাক্টলি মনে নেই, তবে আজ থেকে ১২ ১৩ বছর আগে।

আজ এই মুহূর্তে কেমন লাগছে

- নিজেকে খুব অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল, খুব রোমাঞ্চও লাগছে।

কর্তাটিকে বললাম, ফাইনাল করে হবে -

- একটা বাড়ির চেষ্টা করছি। আমাদের বেশ বড় ফ্যামিলি। ঘরের বড্ড অভাব। ব্যবস্থা একটা হয়ে গেলেই, সেরে ফেলব।

মেয়েটি এবার নিজের থেকেই বলল, 'তবে আইনত আজ থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

শুধু এই দুজনই নয়, আজকাল এইরকম হাজার হাজার তরুণ তরুণী, যুবক-যুবতী, নির্ঝঞ্ঝাটে অল্পখরচে বিয়ে সারতে ম্যারেজ রেজিসট্রি অফিসের শরণাপন্ন হচ্ছেন। হিন্দু ম্যারেজ ল অনুসারে এইরকম বিবাহকে বলা হয় 'স্পেশাল ম্যারেজ'। ১৮৭২ সালে এই স্পেশাল ম্যারেজ বা রেজিসট্রি ম্যারেজ চালু হয়। তখন এইরকম বিবাহকে বলা হত 'তিন আইনের বিয়ে'। তারপর ১৯৫৪ সালে এই স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাকটকে সংশোধন করে নতুন আইন প্রচলন হল। সরকারি উদ্যোগে রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ম্যারেজ অফিস গড়ে উঠল। এখন এই কলকাতায় প্রায় ছাব্বিশ সাতাশটি ম্যারেজ রেজিসট্রি অফিস আছে। এই নতুন আইন অনুসারে পাত্রের বয়স ২১ এবং পাত্রীর ১৮ বছর হতে হবে। এছাড়া এই নতুন আইনের বিভিন্ন ধারায় ম্যারেজ অফিসার কারা হতে পারেন, তাদের যোগ্যতা কী হতে পারে, কীভাবে বিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

রেজিসট্রি বিয়ে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম ম্যারেজ অফিসার বিপুল চন্দ্র রায়ের চেমবারে। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটনের সংযোগস্থলে বিপুল বাবুর চেমবার। উনি জানালেন, ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের থারটিন এবং সিকসটিন ধারা অনুযায়ী এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৩ ও ১৬র মধ্যে তফাৎ একটাই। ১৩ ধারা অনুযায়ী যারা অবিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক, ডিভোরসি তাঁরা বিবাহ করতে পারেন। আর ১৬ ধারাতে যাঁরা বিবাহিত অনেক দিন আগেই, যেমন ধরুন দশবছর কি পাঁচ বছর কিংবা একমাস আগে, একমাসের মধ্যে নয় কিন্তু, তাঁরা প্রয়োজনে সেই বিয়ে রেজিসট্রি করাতে পারেন। কিন্তু এই বিয়েতে অর্থাৎ এই ১৬ ধারা অনুযায়ী বিয়ে করতে গেলে কতকগুলি ব্যাপার পরিষ্কার জানাতে হবে, কোথায়, কবে, কোন তারিখে বিয়ে হয়েছে ইত্যাদি। তবে এই দুটো ধারাতেই প্রোহিবিটেড রিলেশান শিপের মধ্যে বিয়ে চলবে না। এই রকম প্রোহিবেটেড রিলেশানশিপের সংখ্যা ৩৭টি। যেমন কেউই নিজের মামাতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ভাই বা বোনকে বিয়ে করতে পারবে না, সৎবাবা বা মাকে বিয়ে করতে পারবে না, ইত্যাদি ৩৭ রকম সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ।'

কীভাবে আপনারা রেজিসট্রি বিবাহ দেন -

বিপুলবাবু বললেন, 'প্রথমে একটা নোটিস দিতে হয় ম্যারেজ অফিসারের কাছে। এই নোটিশে পাত্র পাত্রীর নামধাম, বর্তমান বয়েস সব উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া একটা ডিক্লারেশানও দিতে হয়। আমরা ওই ফিল আপ করা নোটিশ ফরমের সংগে ডিক্লারেশানটা মিলিয়ে দেখে নিই, সব ঠিক আছে কিনা। খতিয়ে দেখি, পাত্রপাত্রী প্রোহিবিটেড রিলেশানের মধ্যে পড়ে কিনা। এখন ওই নোটিশ ফরমে একটা ডেট বা তারিখ দিতে হয়, সেটা যে ডেটে ম্যারেজ অফিসারের কাছে সাবমিট করা হল, সেই ডেট দিয়ে। তারপর এর ঠিক ৩০ দিন বাদে এবং নব্বই দিনের মধ্যে তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে করে ফেলতে হয়। নব্বই দিন পেরিয়ে গেলে কিন্তু আবার নতুন করে নোটিশ দিতে হবে। তবে এই নোটিশ দিয়ে অনেকেই ৩০ দিন আর অপেক্ষা করতে চান না। অনেকেই অনুরোধ করেন, ও মশাই, কিছু বেশি টাকা দিচ্ছি, ব্যাকডেট দিয়ে করে দিন না, তখন তাঁদের বোঝাতে হয়, কনভিনস করাতে হয়।'

প্রশ্ন করি, নোটিশ দিয়ে ৩০ দিন অপেক্ষা করতে হয় কেন -

উত্তরে বিপুলবাবু বলেন, 'নোটিশ দিলেই যে বিয়ে করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যারা নতুন বিয়ে করতে আসছে তারা অনেকেই ইয়াং, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ঠিক করে ফেলল বিয়ে করবে, কিন্তু এই ৩০ দিনে ভেবে দেখার একটা সুযোগ পেল। তারপর নিজেদের মধ্যে একট অ্যাডজাসটমেনটের প্রশ্ন আছে।'

শিয়ালদহের প্রাচী সিনেমার ডানদিকে ১২৫ নমবর এ পি সি রোডে শ্রীমতী অনিতা বাগচীর অফিস। এই প্রসংগে শ্রীমতী বাগচী বললেন, 'এই তিরিশ দিন সময়টা অবিবাহিত ও অবিবাহিতা যাঁরা বিয়ে করতে আসছেন তাঁদের কাছে খুবই মূল্যবান। কারণ নবীন বয়সে রঙিন স্বপ্নে বিভোর চোখে এবং প্রেমের উচ্ছ্বাসে হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বৈকি।' তবে শ্রীরায় এবং শ্রীমতী বাগচী দুজনেই স্বীকার করলেন যে, ১৬ নং ধারা অনুযায়ী যাঁরা রেজিসট্রি বিয়ে করতে আসছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই নোটিশ দেবার ব্যবস্থাটা তুলে দেওয়া উচিত। কারণ হিসাবে শ্রীমতী অনিতা বাগচী বললেন, 'এই দেখুন সেদিন একজন প্রৌঢ় দম্পতির বিয়ে রেজিস্ট্রি করালাম। এঁদের বিয়েতে সাক্ষী দিলেন তাঁদের বড় মেয়ে জামাইরা। ওদের বিয়ে রেজিসট্রি করাতে হল, কারণ ওঁদের পাশপোরটের জন্য ম্যারেজ রেজিসট্রেশন সারটিফিকেট দরকার। ওঁরা ওঁদের আমেরিকা প্রবাসী ছেলের কাছে যাবেন। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা তো লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। আমি তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে বললাম, লজ্জা কী - কবিগুরু তো বলেছেন - নতুন বিবাহ বাঁধ আবার চিরপুরাতন মোরে। এসব ক্ষেত্রে নোটিশের যে কী প্রয়োজন বুঝি না।' তবে হিন্দু ম্যারেজ আইন অনুসারে একদিন বা দুদিনের নোটিশেও বিয়ে হয়। তবে সেক্ষেত্রে কোরটে গিয়ে বিয়ে করতে হয় এবং সাক্ষী হিসাবে পাত্র ও

পাত্রীর রক্তের সম্পর্ক আছে এমন দুজনকে দুপক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে হয়। তবে অনেকেই কোরটে গিয়ে জীবনের মধুরতম এক অধ্যায়কে জুড়তে চান না বলে ম্যারেজ অফিসারের অফিসে যান। একজন ম্যারেজ অফিসার বলছিলেন, 'কোরটে প্রাইভেসিও থাকে না। তাই অনেক ম্যারেজ অফিসার আছেন, যাঁরা বেশি চারজ নিয়ে, কোরট থেকে কোরট রেজিসট্রারকে আনিয়ে সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করে বিয়ে দেন। অনেকক্ষেত্রে ব্যাপারটা বে আইনি হয়ে যায়।'

কথায় কথায় বিপুল চন্দ্র রায় জানালেন, 'এই রেজিসট্রি বিয়েতে যাঁরা বিয়ে করতে আসছেন বা করে গেলেন তাঁদের তো সব নির্ঝঞ্ঝাটে মিটে গেল। কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠানটাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে আমাদের বেশ ঝামেলা পোয়াতে হয়। প্রথমত, ধরুন, নোটিশ দেওয়ার পর ওই নোটিশ ফরম কপি করে পিজন ব্লুকে তুলে সিরিয়াল করে রাইটারস বিলডিংসে জুডিসিয়াল ডিপারটমেনটে চালান করে ফি জমা দিতে হয়। একদিনে কুড়ি টাকার বেশি ম্যারেজ রেজিসট্রারের কাছে যেন ফি জমা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নামধাম সব ঠিক আছে কিনা, সই সাবুদ ঠিকঠিক জায়গায় হয়েছে কিনা চেক করে না নিলেই পরে কোন গোলমাল হলে, সব ব্যাপারটাই 'ইনভ্যালিড' হয়ে যাবে। তারপর আছে উটকো ঝামেলা। যেমন অনেকেই বয়স ভাঁড়িয়ে বিয়ে করতে আসে। কয়েক বছর আগে ঘটনা, নোটিস দেবার তিরিশদিন বাদে, অ্যাপয়েনটমেনট করে নির্দিষ্ট দুটি ছেলেমেয়ে তিনজন সাক্ষী নিয়ে বিয়ে করতে এল। আমার তো মেয়েটির মুখ দেখেই মনে হল, এর বয়স কিছুতেই আঠার হতে পারে না। বড় জোর চোদ্দ কী পনের, বারথ সারটিফিকেটের বদলে এরা রেডিও লজিসটের সারটিফিকেট এনেছে। যদিও বারথ সারটিফিকেট না থাকলে অনেকে অ্যাডমিট কারড বা রেডিও-লজিসটের সারটিফিকেট আনে। তবুও আমার সন্দেহ হল। আমি বিয়ে দিতে অস্বীকার করলাম। ছেলেটি ও তার সংগীরা প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করল। কেন বিয়ে দেবেন না, আপনি বিয়ে দিতে বাধ্য ইত্যাদি বলে। তারপর জেরা করতে জানলাম, মেয়েটির বয়স পনের। ছেলেটি ওর প্রাইভেট টিউটর বাড়ির অমতে বিয়ে করতে এসেছে প্রায় ৮০ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ রেডিওলজিসটকে ১০০ টাকা ফি দিয়ে ওই সারটিফিকেট বার করেছে। মেয়েটি তো নাছোড়বান্দা, আমার পা ধরে বলে, আমাদের বিয়ে দিন, না হলে আমি আত্মহত্যা করব। তখন আমি ছেলেটিকে বোঝালাম, মশাই করছেন কী, আপনার বয়স তো পঁচিশ ছাব্বিশ। আপনি যে নাবালিকা হরণের কেসে পড়ে যাবেন। যাই হোক, অনেক বোঝাবার পর তারা চলে গেল। আবার আরেক বার, একজন শিক্ষিত বাঙালি ব্যাংক চাকুরে যুবক একজন শিক্ষিতা নন-বেংগলি যুবতীকে বিয়ে করবে বলে নোটিশ দিয়ে গেল। ৩০ দিন বাদে বিয়ের দিন ধার্য হল। মেয়েটির বাড়ি বেশ পয়সাওয়ালা। এবং মেয়েটির দাদা বেশ নামকরা অ্যাডভোকেট। বিয়ের সাতদিন আগে, সেই অ্যাড-ভোকেট দাদা এক সন্ধ্যেবেলায় আমার এই চেমবারে এসে হাজির। প্রথমে অনুরোধ, এ বিয়ে যে করে হোক আপনি বন্ধ করুন মিঃ রায়। কারণ ওই ছেলেটির স্ট্যাটাসের সংগে আমাদের স্ট্যাটাসের হেল অ্যানড হেভেন ডিফারেনস। এ বিয়ে হবে না। আমি তাঁকে অনেক বোঝালাম। উনি তো কিছুই শুনলেন না। পরে আবার দুদিন বাদে এলেন। এবার দশ হাজার টাকা আমাকে ঘুষ হিসাবে অফার করলেন। আমি বললাম, দেখুন আপনি একজন অ্যাডভোকেট হয়ে কেন এরকম করছেন? আমাকে দশ লাখ টাকা দিলেও, আমি এ বিয়ে বন্ধ করতে পারব না। ভদ্রলোক কোন কিছুই শুনতে চাইছেন না। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, দেখুন, আপনি যদি এবার না যান, আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপর ভদ্রলোক বিয়ের ঠিক আগের দিন চেমবারে এলেন। বললেন, আমি এই দুদিন ধরে ভেবে দেখলাম, ইউ আর রাইট মিঃ রায়। বলে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে গেলেন। এখন সেই দম্পতি বেশ সুখেই আছে।'

আজকাল রেজিসট্রি ম্যারেজের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে উঠছে। এর কারণ হিসাবে শ্রীমতী অনিতা বাগচী বললেন, 'বর্তমানে আমাদের শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি মানুষের মধ্যে সংস্কারের বিধি নিষেধও শিথিল হয়ে আসছে। তারপর একটা বিয়ে দিতে গেলে নানা ঝক্কিঝামেলা, স্থানাভাব এবং অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে। তাই ছিমছাপ পরিবেশে এইরকম স্বল্প খরচে বিয়ের প্রচলন বাড়ছে। এছাড়া ছেলেমেয়েরা আজকাল অবাধ স্বাধীনতা পাচ্ছেন, ফলে খুব সহজেই পরস্পর পরস্পরকে জেনে নিয়ে, ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে নিচ্ছেন।'

প্রশ্ন করলাম, স্বল্প খরচ বলতে কত বোঝাচ্ছেন?

মৃদু হেসে বললেন, 'দেখুন, অ্যাকচুয়ালি ফরম ফি এবং ম্যারেজ ফি বাবদ টাকা খুবই সামান্য লাগা উচিত। কিন্তু আমরা যার যেরকম এসট্যাবলিশমেনট কসট সেরকম নিয়ে থাকি। কারণ একটা অফিস চালাতে গেলে এবং সরকারি যা সব ফরমালিটিস তা বজায় রাখতে গেলে ওই রেজিসট্রি ফি বাবদ টাকা নিতে হয়। তাও সব মিলিয়ে পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে থাকে। কারুর এর থেকে একটু বেশি, কেউ বা এর থেকে এই কম রেটে বিয়ে দিয়ে দেন।'

শ্রীমতী অনিতা বাগচী, তার স্বামীর মৃত্যুর পর, ১৯৬৮ সাল থেকে স্বামীরই প্রতিষ্ঠিত এই অফিসে নিয়মিত বসেন। বাংলায় এম এ পাশ এই মহিলা বছরে গড়ে ১৫০০ বিয়ে দেন। গত ১৯৮২ সালে উনি ১৪২৯টি বিয়ে দিয়েছেন। ১৯৮০র আগসট অবধি দিয়েছেন ৭৯৮টি বিয়ে। উনি বললেন, 'অধিকাংশ ছেলেমেয়েই ভালবাসা করে রেজিসট্রি বিয়ে করতে আসেন। তবে বর্তমানে বহু বাবা-মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও অনেক সময় বিয়ে দেন। হয়ত সেরিমনিটা পরে করেন। অনেকে আবার এখানেই শাঁখা সিঁদুর মালা নিয়ে আসেন। অনেকে আমাদের বাড়িতেও নিয়ে যান। সেখানে খাওয়া দাওয়া সবই হয়। তবে মুখ্য অনুষ্ঠান থাকে ম্যারেজ রেজিসট্রেশন।'

এর জন্যে নিশ্চয় একস্ট্রা ফী লাগে?'

এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে শ্রীমতী বাগচী বললেন 'হ্যাঁ, তা তো লাগেই।' সাধারণত কনভেনস হিসাবে প্রতি কিলোমিটারে ১৫ টাকা করে ম্যারেজ অফিসাররা নিয়ে থাকেন।

শ্রীমতী বাগচী আরো জানালেন, 'আজকাল ইনটার-কাসট ম্যারেজও খুব হচ্ছে। তাছাড়া হিন্দুমুসলমানে বা হিন্দুক্রিসটানেও বিয়ে হচ্ছে। এই তো সেদিন প্রখ্যাত একজন বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের ভাই-এর সংগে একটি হিন্দু মেয়ের বিয়ে হল। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মা-বাবা থেকে আত্মীয় স্বজন সবাই উপস্থিত থেকে খুব আনন্দ করেই বিয়ে সম্পন্ন হল। এছাড়া আজকাল বিদেশি বা বিদেশিনীকে বিয়ে করা প্রবণতাও খুব বাড়ছে।'

–এইসব বিয়েও কি স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাকট অনুযায়ী হয়?

হ্যাঁ। একমাত্র ধরুন মুসলমানের সংগে মুসলমান, বা ক্রিসচানের সংগে ক্রিসচানের মধ্যে বিয়ে না হলে সব ক্ষেত্রেই ওই ৩০ দিনের নোটিশ দিয়ে বিয়ে করার যে রীতি নীতি আছে তা পালন করতে হয়।' এই কথা বলতে গিয়ে অনিতা দেবী বললেন, '১৯৭০-৭১ সাল। চারিদিকে তখন খুবই গন্ডগোল চলছে। এইসময় আমেরিকান এক যুবক ডেভিড আর নেলসনের সংগে এই বাংলাদেশের মেয়ে অশোকা চক্রবর্তীর বিয়ে দিলাম। বিয়ের পর আমি নেলসনকে বললাম, তুমি তোমার দেশের শ্বেতাংগিনীদের ছেড়ে এই শ্যামলাবরণের অশোকাকে পছন্দ করলে কেন? উত্তরে নেলসন বলল, দেখ তোমাদের এখানে খুনোখুনি এবং হানাহানি চলছে ঠিক কথা, কিন্তু তোমাদের মেয়েরা বড় শান্ত আর মিষ্টি, পৃথিবীর আর কোথাও এমন মেয়ে আমার চোখে পড়েনি।'

বিভিন্ন ম্যারেজ অফিসারদের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম এত ঝামেলা সহ্য করে, খুব একটা পয়সাও যে এঁরা পান তা নয়, তবে কেন এঁরা ম্যারেজ অফিসার হন। উত্তরে প্রায় সবাই একই কথা বলেছেন যে, 'হাজার হলেও এটা একটা সোশ্যাল ওয়ারক। একটা সম্মানের কাজ।' শ্রীমতী অনিতা বাগচীকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই কাজ কেমন লাগে? উনি বললেন, 'ভীষণ ভালো লাগে। হাজার হলেও দুটো জীবনকে জুড়ে দিচ্ছি এক পথে, তবে অনেকসময় ওই মিলন সুখের হয় না। বহু মেয়েই এসে কান্নাকাটি করে। তখন তাদের সান্ত্বনাও দিতে হয়। 'বিপুল চন্দ্র রায় বললেন, 'আজকাল রেজিসট্রি বিয়ে যেমন বেড়েছে, তেমনি ডিভোরসও হচ্ছে। আমাদের ক্লায়েনটের মধ্যে হয়ত দুএকজন এসে বলে ডিভোরস করব। আপনার সাহায্য চাই। তখন তাঁদের সবিনয়ে বলি, কোরটে যান, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের কাজ দুটো জীবনকে জুড়ে দেওয়া, জোড় ছাড়িয়ে দেওয়া নয়। আমাদের কাজ গড়া, ভাঙা নয়।' □

বিয়ের আসল ব্যাপার পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

শ্যামলী বসু

বিধাতার বিধান যাই হোক না কেন, ছেলেমেয়ের বিয়ের বয়স হলে বাবা-মা চিন্তিত হন, উদ্বিগ্ন হন, বিশেষ করে মেয়ের বাবা। মেয়ের বয়স যত বাড়ে, তত বাড়ে বাবা-মার দুশ্চিন্তা। একটি সৎপাত্রের সন্ধান চাই, মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে। কে দেবে সুপাত্রের সন্ধান · ছেলের বাবা মাও সুপাত্রীর খোঁজ করেন। কোথায় পাবেন সন্ধান -, সেটাই সমস্যা।

এক সময় যাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিবাহযোগ্য পাত্র পাত্রীর বিশদ বিবরণ আর খবরাখবর সরবরাহ করতেন, তারা ছিলেন ঘটক বা 'প্রফেশনাল ম্যাচ: মেকার'।

এরপর পাত্রী দেখার পর্ব। বরপক্ষকে পরিপাটিভাবে আপ্যায়িত করে জরি দিয়ে খোঁপাবাঁধা, বেনারসি জড়ান বার তের বছরের মেয়েটি কম্পিত পায়ে ঘরে ঢুকত পানের ডিবে হাতে নিয়ে। নামধাম আর চারুপাঠ অবধি বিদ্যার পরিচয় দিয়ে, দুচারটি কারপেটের ছবি কিংবা আসনে হাতের কাজের নমুনা দেখিয়ে মেয়ে দেখার পর্ব শেষ। তার পরের ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি অভিভাবকদের হাতে। অর্থাৎ দেনা-পাওনা, বংশগরিমা ইত্যাদি বিষয়ে সন্তুষ্ট হবার পরে দুই পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের আয়োজন।

১৯৪৭ সালকে যদি সীমারেখা বলে ধরা যায়, তাহলে বলা যেতে পারে, বিয়ের সম্বন্ধ করার ব্যাপারে বংশ মর্যাদার প্রশ্ন দুপক্ষের কাছেই খুব বড় ছিল, বিশেষ করে বংশের বড় ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে। অর্থাৎ, বল্লালী কৌলীন্য প্রথার অনুসরণ। তারপর বংশের অন্যান্য ছেলের জন্যে সুশ্রী পাত্রীর সন্ধানে ম্যালেরিয়া সমাকীর্ণ অজপাড়াগাঁয়েও যেতে হত। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল এইভাবেই কলকাতার বনেদি বাড়ির বৌ হয়ে এসেছিল। আর সে যুগেও একগুঁয়ে আধুনিক ছেলে ছিল। তাই সমাপ্তির অপূর্ব কিংবা আঁধারে আলোর সত্যেন্দ্রর মত ছেলেদের বিয়ের আগে একবার মেয়ে দেখিয়ে নেওয়া শ্রেয় বলে মনে করতেন তাদের মায়েরা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশের মেয়েদের জীবন থেকে পর্দাপ্রথা, অশিক্ষার অভিশাপ অনেকখানিই ঘুচে গেল। শিক্ষা, স্বাধীন উপার্জন আর ব্যক্তিস্বাধীনতায় মেয়েরা হয়ে উঠল পুরুষদের সমান। তাছাড়া সমাজ, রাষ্ট্র আর অর্থনৈতিক জীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতও আমাদের চিরাচরিত রীতিনীতি অনেকটাই বদলে দিল। বর এবং কন্যাপক্ষের চিরাচরিত সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যবস্থার সমান্তরালে সমাজে চালু হল প্রেম ঘটিত বিবাহ বা লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজের অনিবার্য পরিণতি হল অসবর্ণ বিবাহ। অভিভাবকদের সম্মতির অপেক্ষা না করে প্রেমজ বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে লাগল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে।

বর্তমান সমাজে দুরকম বিয়ের চল আছে, পাত্র-পাত্রীর নিজের পছন্দ মত প্রেমঘটিত বিয়ে, আর অভিভাবকদের উদ্যোগ ও নির্বাচনের ভিত্তিতে সম্বন্ধ করে বিয়ে। আবার সম্বন্ধ করা বিয়ের ব্যাপারেও প্রধানত তিনটি ধারা অনুসৃত হয় – খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, বিবাহ সংযোগকারী প্রজাপতি প্রতিষ্ঠান মারফৎ, অথবা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের দেওয়া সম্বন্ধ থেকে। সেকালের ঘটক ঠাকুরদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন আর বিবাহ সংঘটনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এছাড়া পরিবারের বন্ধুবান্ধব, আর মামি, খুড়ি, জেঠিরা তো আছেনই। উপযুক্ত মাসতুতো দেওর কিংবা ভাগ্নের জন্যে এরা উৎসব বাড়িতে বিবাহযোগ্যা সুশ্রী মেয়েদের

জরিপ করেন।

তবে এধরনের সম্বন্ধের যোগান দেওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে আত্মীয়দের মধ্যেই রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি হয়, যদি না সে বিয়ে সুখের হয়। বৌকে শাশুড়ির পছন্দ না হলে, বা ছেলের সংগে বৌ এর যদি বনিবনা না হয়, অথবা দানসামগ্রী যদি মনের মত না হয় তাহলে সে সম্বন্ধের যোগানদাতাকে পাত্রপক্ষের কাছে বেশ দুচার কথা শুনতে হয়। আবার শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের অযত্ন বা অনাদর হলে, মেয়ের অভিভাবকও যথেষ্ট অনুযোগ আর বকাবকি করে সম্বন্ধকারী ব্যক্তির উদ্দেশে। এই জন্য এখন আত্মীয়স্বজনও সম্বন্ধের ব্যাপারে গা বাঁচিয়ে কথা সম্বন্ধে।

কথায় বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। কথাটি সত্যি হলে লাখ কথার অন্তত হাজার কয়েক কথা ব্যয় হয় পাত্র-পাত্রী খুঁজে নিয়ে বিয়ে স্থির করতে। আর ছেলেমেয়ের বিয়েতে অভিভাবকদের প্রাথমিক উৎসাহ থাকলেও মনে কিছুটা সংশয়, কিছুটা দ্বন্দ্ব থাকে বইকি। পাত্রীপক্ষ ভাবেন ছেলের স্বভাব চরিত্র কেমন? মদ্যপ কিনা, নারী ঘটিত দোষ আছে কিনা। চাকরির উন্নতি এবং প্রসপেক্ট কেমন? এছাড়া বংশ, পরিবার, বাড়িগাড়ি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন তো আছেই। আবার অনেক পরিবারে কোষ্ঠীর বিচারেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অপর দিকে পাত্রপক্ষেরও অনেক চিন্তা। মেয়েটির স্বভাব চরিত্র না জানি কেমন। ভাবী বৈবাহিক মেয়েকে গা ভরা গয়না আর ঘর ভরা দানসামগ্রী দিতে পারবে তো? পাত্রী একমাত্র মেয়ে হলে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হিসাবে লোভনীয় হলেও সতর্ক পাত্রপক্ষ বিবেচনা করে একমাত্র মেয়েটি অতিমাত্রায় আদুরে বা একগুঁয়ে কিনা। তাহলে সংসারে অশান্তি হবার সম্ভাবনা। এর ওপর ছেলের মায়ের মনে চিরকালের গোপনভীতি, বিয়ে হলে ছেলে পর হয়ে যাবে না তো। এ পক্ষও কোষ্ঠীর মিলের ওপর জোর দেন মাঝে মধ্যে। সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার আরো একটি সমস্যা আছে। এখনো পশ্চিমবংগের পুরনো পরিবারে পূর্ববংগীয় পরিবারের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে দারুণ অনীহা। তেমনি পূর্ববংগের পরিবারেও পশ্চিমবংগীয় পাত্র, বিশেষ করে পাত্রীর অনুপ্রবেশ অনেকেই পছন্দ করে না। তবে অসবর্ণ বিয়ের মত প্রেমঘটিত বিয়েতে পূর্ববংগ পশ্চিমবংগের বিভেদটাও মেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে সম্বন্ধ করে বিয়ে স্থির করলেও অভিভাবকেরাও আজকাল কিছুটা উদারমনা। বয়স্ক, শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের পছন্দ অপছন্দের দাম দেন তাঁরা।

সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেলে প্রথম কথা পাত্রী নির্বাচন। এ পর্বে প্রাথমিক নির্বাচনটা ছবি মারফৎই হয়ে থাকে। তার পর পাত্রপক্ষের আগমন পাত্রী দেখার জন্যে। একসময় এ ব্যাপারটা পাত্রীপক্ষের কাছে প্রায় অগ্নিপরীক্ষার সমান ছিল। কোন আয়োজনে খুঁত থাকলেই পত্রপাঠ বাতিল হবার সম্ভাবনা। বর্তমান সমাজব্যবস্থার আর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলেও মেয়ে দেখানর প্রশ্নটা কিছুতেই এড়ান যায় না। কারণ, আগেকার দিনের মত বার তের বছরের পাত্রী নয়, এখন মেয়েরা শিক্ষিত, বয়স্থা, কেউ কেউ চাকুরিরতাও বটে।

অতএব মেয়ে দেখানর ব্যবস্থা হয় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে, গংগার ধারে বা কোন আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে, যেখানে মেয়ে কিছুটা সহজ হতে পারে। রূপোর টাকা বাজিয়ে নেবার মত করে পাত্রীর চুল খুলিয়ে চুলের দৈর্ঘ আর গায়ের চামড়া ঘষে গায়ের রঙের ঔজ্জ্বল্য যাচাই করে যে পাত্রপক্ষ, তারা কিন্তু এখন পাত্রীর মনে বিরক্তি আর অসন্তোষ ছাড়া কোন ছাপ ফেলতে পারে না। সুখের কথা এই যে এমন পাত্রপক্ষের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। মেয়ে দেখানর পর্ব ভাবী বধূর মনেও চাপ দেয়। অনেক সময় নিজেকে এমন 'শো পিস' করে তোলায় তার আপত্তি।

এর ওপর পাত্রপক্ষের দাবি-নিখুঁত রূপবতী মেয়ে চাই গান, নাচ, বাজনা, সেলাই লেখাপড়া সব কিছু জানা পাত্রপক্ষের কথা শুনে পাত্রীপক্ষ ব্যংগ বা আক্ষেপ করে বলে 'তাহলে তো কুমোরটুলিতে পাত্রী অর্ডার দিতে হয়।' মধ্যবিত্ত ঘরের বিবাহযোগ্যা এক মেয়ে তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠেছে, 'এত সব সারটিফিকেটের দরকার কী বলুন তো? মধ্যবিত্ত সংসারে কোন কাজে লাগে এগুলো? সেলাই জানার দরকার তো বোতাম বসাতে আর রিপু করতে। আর লেখাপড়ার সারটিফিকেট দরকার, যদি সংসারে কিছু আয় বাড়ান যায়, তাই না?' তাছাড়া এখনো পাত্রী নির্বাচনে মেয়ের গায়ের রঙ নিয়ে বেশী কথা ওঠে। শ্যামলারঙের পাত্রী এখনো প্রাথমিক নির্বাচনে বাতিলের দলেই।

আবার মেয়ে দেখতে এসে উদ্ভট সব প্রশ্ন করে মেয়েকে বিব্রত করা হয়। একটি কৌতুক নাটিকার কথা মনে পড়ে যায়। পাত্রের মা পাত্রীকে ইংরেজি বানান জিজ্ঞাসা করবেন। অনারস্ গ্র্যাজুয়েট হলে 'শোপেনহাওয়ার,' আর পাশ গ্র্যাজুয়েট হলে 'শোফার'ই যথেষ্ট।

বলাবাহুল্য, দেখেশুনে সম্বন্ধ করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে গেলে মেয়ের অভিভাবককেই বিব্রত হতে হয় বেশি। অথচ মেয়ে দেখাবার কোন বিকল্প নেই।

এই প্রশ্ন রেখেছিলাম এক মেয়ের বাবার কাছে। ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে চিন্তিত মুখে বললেন, 'আমি মোটামুটিভাবে পাত্র নির্বাচন করে তবেই মেয়ে দেখাব, কারণ পাত্রপক্ষেরও নির্বাচনের প্রশ্ন থাকবে। দেখাবার ব্যাপারে মেয়ে যদি সহজ না হতে পারে তাহলে বাইরে কোথাও, কিংবা আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িতে মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। হাঁ, যদি বার বার মেয়ে দেখান হয় বা মেয়ের নিজের কোন পছন্দ থাকে, তবেই সে দেখানর বিষয়ে আপত্তি করবে, নইলে আপত্তি কিসের?'

পাত্রের স্বয়ং পাত্রী দেখতে আসার কথা জানিয়ে এক আধুনিক মনা বরকর্তা হাসিমুখে বলেছেন পাত্রীর বাবাকে 'দেখুন, আমার ছেলের মেয়ে দেখতে যাবার কারণ, এই সুযোগে আপনার মেয়েটিও আমার সুপুত্রটিকে একবার দেখে নেবে তো।'

এখন দেখা যাচ্ছে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারেও সম্বন্ধ করে বিয়ে স্থির করার পর বর কন্যার মধ্যে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে যে, বিয়ের আগে পাত্রপাত্রী ঘরের পর্দা, সোফা ঢাকার কাপড় এক সংগে পছন্দ করছে। সেই সংগে সিনেমা, গাড়িতে ঘোরা, রেস্তোরাঁয় খাওয়া তো আছেই। একদিক থেকে দেখলে মেয়েরাই এ ব্যবস্থায় সুফল পাচ্ছে বেশি। ভাবী

বর আর শ্বশুর বাড়ির পরিজন ভীতি কেটে গিয়ে, মেয়ে সহজভাবে পা দেয় শ্বশুরবাড়িতে।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন তো সম্বন্ধ করে বিয়ের একটা বড় মাধ্যম। এখন পাত্র-পাত্রী চেয়ে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের বয়ানেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে চাকুরিরতা, উপার্জনশীলা পাত্রী বাঞ্ছনীয়, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে উচ্চপদস্থ অফিসার পাত্রের জন্য চাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, কেতাদুরস্ত পাত্রী। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের কনভেনটে পড়া পাত্রীর জন্যেও চাওয়া হয় আই এ এস অথবা কভেনেনটেড অফিসার। আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল পাত্র-পাত্রী পছন্দে 'কাস্ট অ্যানড ক্রিড নো বার।' প্রেমঘটিত বিয়ের মত সম্বন্ধ করা বিয়েতেও অভিভাবকেরা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছেন।

সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিবাহ সংযোগকারী প্রজাপতি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। 'বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের প্রতিষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন।' একথা জানালেন ডালহৌসিপাড়ার একটি প্রজাপতি প্রতিষ্ঠানের অফিস সুপারিনটেনডেনট বনানী তরফদার : 'কারণ আগে একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়ের জন্য আত্মীয় স্বজনেরাই সম্বন্ধের যোগান দিতেন, সে সুযোগ এখন কোথায়? তাছাড়া, ঘটকদের দিনও গত। তাই মনের মত পাত্র পাত্রীর খোঁজে অভিভাবকেরা এখানে আসেন।' আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে বনানী জানালেন 'পাঁচ টাকা রেজিসট্রেশন ফি ও মাসিক একটা সামান্য অংকের দক্ষিণার বিনিময়ে আমরা অভিভাবকদের পছন্দ মত পাত্রপাত্রী বেছে নেবার সুযোগ করে দিই।'

এই প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের ভিড় কেমন বাড়ছে বা বিয়ের যোগাযোগে এরা কতটা সফল সে ছবি অফিস সুপারিনটেনডেনট তুলে ধরলেন একটি পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে। ১৯৮০ সনে এঁদের যোগাযোগের মাধ্যমে বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৫২, ১৯৮১তে সেই সংখ্যা ৯৭৮, ১৯৮৩ সনে সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে।

সম্প্রতি ছেলেমেয়ে বা নিকট আত্মীয়ের বিয়ে হয়েছে এমন কয়েকজন অভিভাবকদের সংগে কথা হচ্ছিল। কিছুদিন আগে ছোটছেলের বিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতী নিশা বসু। পাত্রী নির্বাচনে তাঁর কী সমস্যা ছিল সে প্রশ্নের উত্তরে বেশ সরলভাবে শ্রীমতী বসু জানালেন 'আমার তো মেয়ে নেই, তাই চেয়েছি পুত্রবধূ যেন আমার কাছে মেয়ের মতই সহজ হয়ে থাকে। এটাই আমার বড় চাওয়া। অবশ্য পাত্রী পছন্দ করার সময় চেয়েছি যেন ভালবংশের মেয়ে হয়। সে মেয়ে লেখাপড়া গান বাজনা জানবে, তার জানা বিদ্যাটা যেন ব্যবহারিক জীবনেও কাজে লাগে। আমার বড় বৌমাও স্কুলে চাকরি করে। আমি সবসময় সপ্রতিভ আধুনিকা মেয়ে পছন্দ করি।' এই 'আধুনিকা' কথাটা আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রীমতী বসু বললেন 'তবে আধুনিকা বলতে উগ্র সাজসজ্জা আর মেকআপ করা আধুনিকা আমার পছন্দ ছিল না।' এছাড়া পাত্রী নির্বাচনে আর কিছু চাওয়ার ছিল না নিশা বসুর, এমনকি বেশ সুন্দরী, ফর্সা মেয়ে, তাও নয়।

গত ৭ জুলাই বড় মেয়েকে সুপাত্রস্থ করেছেন করনেল ও শ্রীমতী ঘোষ। না, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা তেমন চিন্তিত ছিলেন না। তাঁদের মেয়েকে অনায়াসে সুন্দরী বলা যায়। লেখাপড়ায় ভাল, ডাক্তার, তার ওপর মিলিটারি অফিসার। কাজেই মেয়ের যে ভাল বিয়ে হবে এ ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার প্রশ্ন শুনে করনেল ঘোষ মৃদু হেসে বললেন 'সম্বন্ধ করেই মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল আমাদের। তবে, এ বিষয়ে আমরা কোন গোঁড়ামি দেখাইনি। কিন্তু যেভাবে মেয়ে মানুষ হয়েছে, সেই রকম সোসিও ইকনমিক গ্রুপের মধ্যে বিয়ে না হলে যে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না, এইরকম একটা গাইড লাইন দিয়েছিলাম তাকে।'

–সম্বন্ধ করেও অসবর্ণ বিয়েতে আপনাদের কোন আপত্তি ছিল না?

আমার কথা শুনে হাসলেন করনেল ঘোষ। 'দেখুন, অসবর্ণ, স্ববর্ণ এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, কাজেই আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। পাত্রপক্ষ (ভট্টাচার্য) কোন দিনও এ ব্যাপারে কোন কথাই তোলেননি। আর তাছাড়া মেয়ে ডাক্তার, ছেলে ইনজিনিয়র, দুজনেই মিলিটারি অফিসার, কৃতী ছাত্রছাত্রী ছিল, কাজেই তারা একই বর্ণের তাই না? কথা প্রসংগে করনেল ঘোষ জানালেন, দুপক্ষের অভিভাবকই ছেলেমেয়ের প্রাথমিক পরিচয়ের পর তাদের সম্মতি নিয়েই বিয়ে স্থির করেছিলেন।

৭ জুলাই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল আরো এক নবদম্পতি। এক্ষেত্রে পাত্রী ব্রাহ্মণ, পাত্র কায়স্থ। না, সম্বন্ধ করে এদের বিয়ে হয়নি। জানালেন এক নিকট আত্মীয়। ছেলে এবং মেয়ে দুজনে একই অফিসে কাজ করত। তাদেরই পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে অভিভাবকেরা বিয়ে ঠিক করেন। মহিলা আরো জানালেন, পাত্রী বেশ সুশ্রী, এম এ পাশ, গানের ডিপ্লোমা আছে। পাত্রী হিসেবে তো রীতিমত বাঞ্ছনীয়। তাই পাত্রপক্ষও কোন আপত্তি করেননি। ডাক্তার গাংগুলি ছোটমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ৪ আগসট। কী করে এ সম্বন্ধ পেলেন? ডাক্তারবাবু উত্তর দেবার আগে তার স্ত্রী সানন্দে বলে উঠলেন 'বলব কী ভাই, এ সম্বন্ধ বাড়িতে বসেই পেয়ে গেছি। বরপক্ষ কর্তাকে বললেন, শুনেছি, আপনার একটি ফর্সা সুন্দরী মেয়ে আছে–। এইভাবেই যোগাযোগ হল। আমাদেরও সম্বন্ধটি বেশ পছন্দ হল। হ্যাঁ, কোষ্ঠীর মিল নিয়ে বরপক্ষ প্রশ্ন তুলেছিলেন, তা পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠীও মিলে গেল। বিয়েও স্থির করে ফেললাম, এই আর কি।'

পাত্র নির্বাচন করতে গিয়ে 'কন্যা বরয়তে রূপম, মাতা বিত্তম, পিতা শ্রুতম্‌' এই প্রবাদটিকেই পছন্দের মাত্রা আর সংজ্ঞাবলে ধরা হয়েছে বারবার। তবু বিবাহিত জীবন স্থায়ী এবং সুখের যাতে হয়, সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া দরকার। বন্ধুত্ব যেমন সমান পর্যায়ে হওয়া উচিৎ, বিয়েও তেমন সমান পরিবারের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মেয়ে বেশি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, এই ভ্রান্ত আশায় অনেক অভিভাবক ধনী পরিবারে মেয়ের সম্বন্ধ করতে যান। উপযুক্ত দান-সামগ্রী, পণ-যৌতুক দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েও শেষ রক্ষা হয় না। দেখা যায় মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যাশিত সম্মান পায় না। তার অভিভাবককেও ধনী বৈবাহিকের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয়। কেবল অর্থের দিকটাই নয়, রুচি, শিক্ষা, মানসিকতার দিক থেকেও পাত্র এবং পাত্রীর পরিবার সমান না হলে, নববিবাহিত জীবনে নেমে আসে অশান্তি আর জটিলতার ছায়া। আবার অনেক সময় পাত্রী পছন্দের ব্যাপারে অভিভাবকেরা নিজেদের পছন্দের গুরুত্ব দেন বেশি, ফলে মনের মত 'জীবনসংগী' না পেয়ে পাত্রও জীবনে সুখী হতে পারেন না।

সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার-দায়িত্ব অনেক। প্রেমঘটিত বিয়েতে বর-বধূ অন্তত অভিভাবকের পছন্দ বা নির্বাচনের গলদ ধরে দোষারোপ করতে পারে না, কিন্তু দুপক্ষ যেখানে সম্বন্ধ করে বিয়ে স্থির করে, সেখানে এ সম্ভাবনা প্রবল। তবু, সম্বন্ধ করে চেনাজানা পরিবারের মধ্যে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া অভিভাবকের পছন্দ। কারণ, পাত্র পাত্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর পাওয়া যায়। নয়ত অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারে মেয়ে বা ছেলের বিয়ে দেওয়ার অনেক বিপদ।

মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে অভিভাবক যেমন ভাবেন তাঁর আদরের মেয়েটি বিয়ের পরে বধূ-নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হবে না তো?

তেমনি বরপক্ষের এক অভিভাবকও গম্ভীর মুখে জানালেন 'বধূনির্যাতনের ওপর রাজ্যসভায় সংশোধনী বিলের কথাটা পড়েছেন তো? এবার থেকে পাত্রপক্ষকেও বৌ আনার বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হতে হবে। কার মনে কী আছে কে জানে। শেষে, বৌ-এর কিছু হলে ছেলেকে নিয়ে টানাটানি–পরিবারে হাংগামা, এসব কে চায় বলুন? □

ব্যংগচিত্র : লাহিড়ী

তুমি কি জেনেছ সংসারপথে কত কণ্টক আছে,
ওহে সাহসিকা, অভিসারে তব তমসা কি ব্যাপিয়াছে?
কৌতুকময়ী প্রকৃতি দুজনে টানিয়াছে পলে পলে,
পুরুষে নারীতে ঘটায়েছে মিল অদৃশ্য মায়াবলে।
এ মায়া চকিতে পারিত মিলাতে, ছিঁড়িতে পারিত ডোর,
রোগ শোক জরা, রমা প্রকৃতির কত তাণ্ডব ঘোর
ঘিরিছে মানুষে যদি বা চকিতে মিলিত পরশ তার,
তুমি বা কোথায় আমি বা কোথায় বিচ্ছেদ-পারাবার!

নিয়তি / সজনীকান্ত দাস

বলেন নি তো মা যে তোমায়
বিধির গুণ পাওয়া
বাদাম তেলের বিন্দু কটি
লাবণ্যেরই ছোঁয়া

অয়েল অফ অ্যামণ্ডস্
আপনার
ত্বকের পরিচর্যায় অদ্বিতীয়

emami
COLD CREAM
with
OIL OF ALMONDS

ইমামী
কোল্ড ক্রীম

ভালবাসার বিয়ে

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

নরনারীর মিলনকে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতিতে আবদ্ধ করতে গিয়েই বোধহয় বিবাহের সূত্রপাত। ধর্ম ও সমাজবন্ধনের মধ্যে নরনারীর নিবিড় শরীরী প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিকে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের অংগীকার এমন এক সৌন্দর্য দান করতে পারে যা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে শ্বেতকেতু নরনারীর ভালবাসা ও সমস্তরকম কামনাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার বিধান দিয়েছিলেন। এই বিধান কার্যকর করতে গিয়ে বিবাহকে কল্যাণ ও ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক যুগ পেরিয়ে আজ এই জেট যুগেও বিবাহ সমান আকর্ষণীয়। তবে সময় আর যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে বিবাহের এখন মূল শেকড় কিন্তু পাত্রপাত্রীর ভালোবাসার মধ্যে নিহিত। এ কথা বলার অর্থ এই যে মেয়ে পুরুষের স্বাধীন চলাফেরা, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ তাদের নিজস্ব প্রবণতার ওপর নির্ভর করছে।

এখন অনেক অভিভাবকও ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার প্রাথমিক পর্বটুকুও অন্তত ছেলেমেয়েরাই ঠিকঠাক করুক এটাই চাইছেন। বলতে গেলে গত পঁচিশ বছরে হাওয়া অনেকটাই পালটে গেছে! বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় ছিল না একথা শুনলে এখন কেউ বিশ্বাস করবে? আর একটা সবচেয়ে বড় বিষয় হল এই ভালোবাসার বিয়েতে চিরাচরিত কতকগুলো পুরনো কথা অথবা সংস্কারের মোটেই প্রাধান্য নেই। লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না বাতিল করে ভালোবাসার বিয়ে এক কথাতেই সম্পন্ন হল। কারণ ভালোবাসার মানুষটিকে একেবারে নিজের করে পাওয়ার জন্যে যেটি প্রয়োজন তার নাম প্রেম। কে যে কখন কাকে কেমন চোখে দেখল, কেনই বা মনে হল ওই চোখ ওই হাসি আমার কতজন্মের চেনা, ওকেই আমি সারাজীবন ধরে চেয়ে এসেছি। সুতরাং পেতে হবে। কেন এই ভালোলাগা, এমন করে শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা রক্ত দিয়ে চাওয়া তা জানেন একমাত্র প্রেমের দেবতা। কারণ যাকে যে ভালোবাসে তার চোখের সামনে একটাই রঙিন কাঁচ। সেটা হল ভালোবাসার চশমা।

এই ভালোবাসার জোরেই অষ্টম এডওয়ারড সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর প্রিয়তমাকে পেতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ক্লাসিক কাব্য সাহিত্য শিল্পের মূল টান ভালোবাসায়। অমন যে একটা তাজমহল, ওটা তো প্রেমেরই প্রাসাদ।

আর সেই সংগে অসংখ্য বীজ বাতাসে বহন করে ছড়িয়ে পড়ছে এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। কারণ প্রেম জিনিসটাই ভীষণ ছোঁয়াচে। আর এই প্রেমের কোন বয়স নেই। তবে আমি শুধু প্রেম ভালবাসার বিয়ের কথাই বলব। কারণ এই অঘ্রাণ মাসেই আমার পরিচিত মহলে গোটা বার বিয়ে হল। ভালবাসার বিয়ে।

ভালবাসার বিয়ে? কেমন এই ভালবাসার বিয়ে? তার ধরন ধারণ আচার আচরণ চিরাচরিত বিয়ের থেকে কি আলাদা? কিছুটা নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। কারণ এ বিয়েতে অভিভাবকদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলান নেই। দেনাপাওনার খাতা তৈরি হয় না। আবার গোত্র বর্ণ মিল অমিলের প্রশ্নও পাত্রপাত্রীর কাছে খুব গৌণ।

প্রখ্যাত এক কবি ভালবেসে বিয়ে করেছেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এক তরুণীকে। তাঁর মত, ভালবাসার ব্যাপারে বয়স কোন অন্তরায় নয়। এখানে সুখ শান্তি সবটাই নির্ভর করে মনের ওপর। যাকে তিনি এমন করে চাইলেন সেখানে বয়স তাঁদের মধ্যে কেন সীমারেখা টানবে?

আমি জিগেস করেছিলাম, কখন কীভাবে আপনার মনে হল এই রমণীই আপনার জীবনে সর্বাধিক জরুরি? কবি বললেন, ওকে দেখার পরই একটু চেনাজানার পর মুহূর্ত থেকেই আমি যেন কেমন বদলে যেতে লাগলাম, অগোছালো মানুষটা আমি নিজেকে গুছিয়ে ফেললাম কবিতা দিয়ে। কবিতা আসতে লাগল ফুল ফোটাবার সুখের মতন, [illegible] রাত কেটেছে যখন ওর মুখের দিকে তাকিয়েই আমি লিখে গেছি। পরে ভেবেছি আমার এই প্রাপ্তি এই আনন্দ, কিন্তু ও আমার কাছে কী পেল? ও কী বলল জানেন? বলল, এই কবি এই কবিতাই তো আমাকে পূর্ণ করেছে, আমাকে সার্থক করেছে।

জনপ্রিয়া এক অভিনেত্রী চোখের জল মুছে বললেন, প্রেমের জন্যেই আমি সব ত্যাগ করেছি, একে যদি কেউ মোহ বলে থাকেন তো মোহই, কিন্তু প্রেম আমার কাছে অমৃতের মতন। এই প্রেমের জোরেই আমার উত্তরণ।

শিল্পী সাহিত্যিকদের কথা থাক। ওঁরা আর পাঁচজনের মতন নয়। ওঁদের দেখা, ওদের মান অভিমান বেদনা সুখ শান্তি সম্ভাবনা বেশ অনেকটাই আলাদা। অনুভূতির তীব্র আবেগে ওরা জ্বলছেন, নিভছেন আবার নিজেকে শেষ করে দিতেও হৃদয় তেমন করে কাঁপে না! ওরা একটু বেশি প্রেমিক।

সাধারণে যাঁদের সাদাসিধে গৃহস্থ বলেন, আমি তাঁদের দিকে তাকাই।

আলাপ হল মহিমবাবু আর ওঁর স্ত্রী মনোরমা বিশ্বাসের সংগে। মহিমবাবুর বয়স পঞ্চাশ। মনোরমা পঁয়তাল্লিশ, বিয়ে হয়েছে পঁচিশ বছর। অসবর্ণ বিবাহ।

মনোরমা বললেন, দুজনে দুজনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি। সুখী নিশ্চয়ই। কিন্তু বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। চোখের পাতা ভিজে উঠল। আমি অবাক, ভালবেসে বিয়ে করে ভাল আছেন, কিন্তু কান্নাকাটি কেন?

ওঁর অগোছালো কথাবার্তা থেকে জানা গেল, বিয়েটা তো রেজিস্ট্রি করে হয়েছিল, সাতপাক, উলুধ্বনি, ধানদূর্বা, আশীর্বাদ কোনটাই মেলেনি। শ্বশুর বাড়ির আদর যত্ন কোনটাই তাই পাননি। এখনও সেই না পাওয়ার বেদনাটা মাঝে মাঝেই তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে।

নিজের পঞ্চদশী কন্যাটিকে দেখিয়ে বললেন, আমি কিন্তু কখনও মেয়ের বিয়ে এমন করে দেব না, দেখে শুনে দানপত্র করে বিয়ে দেব।

হাওয়া ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, আমার কিন্তু আপনাদের প্রাক-বিবাহের গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে। পঁচিশ বছর আগে ভালবেসে বিয়ে করার মতন মনের জোর তো পেয়েছিলেন।

মেয়েকে রান্নাঘরে চা করতে পাঠালেন মনোরমা। আঁচলে মুখ মুছলেন। ওরা তখন এক পাড়াতেই থাকতেন। প্রতিবেশী হিসেবে চেনাশুনোও ছিল। মনোরমার বাবা

[illegible]। বাড়িতেই গামছা চাদর ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করতেন। মহিম কিনতে-টিনতে এলে কেন জানি মনোরমার পয়সা নিতে ইচ্ছে করত না। সবসময়ই মনে হত এত পরিচিত আপনার জনের কাছে কি হাত পেতে পয়সা নেওয়া যায়? তারপর একটু একটু করে কবে কখন ভালবাসা হল। দিনক্ষণ ঠিক তাঁদের মনে নেই। ভীষণ ইচ্ছে করত সবসময় মহিমের সংগ পেতে। তার সংগে গল্প করার দারুণ আগ্রহ। কিন্তু সেটা তো কলকাতা শহর নয়, মফস্বল। সর্বত্র চোখ। ফিসফিস, গুজগুজ। চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র। এমনি করেই দুটো বছর কাটবার পর ওদের বিয়ে হল। সুখী সংসার। কিন্তু ওই যে শংখধ্বনি, ফুলেভরা শুভরাত্রির বিশেষ আয়োজন তাঁদের তো নিজে হাতেই রচনা করতে হয়েছিল। সে দুঃখ থেকে এখনও রেহাই পেলেন না।

স্বাতী ও শুভাশিস সেন। বিয়ে হয়েছে এক বছর। ওদের বয়স বত্রিশ এবং আঠাশ। বলাই বাহুল্য ভাল বাসার বিয়েও। ওদের বিয়েটাও বেশ মজার। স্বাতী আবার শুভাশিসের দাদার ছাত্রী। সপ্তাহে তিনদিন পড়তে আসতেন। আর এই তিন দিনের জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন শুভাশিস। একদিন সাহস করে চিঠি লিখে ফেললেন। সংগে সংগে উত্তরও। প্রায় জেট প্লেনের গতিতে ওঁদের প্রেম। পরিণতি বিয়েতে।

স্বাতী শুভাশিস দুজনই হৈ হৈ করে বললেন, উঃ, কী চিঠিই যে লিখেছিলাম ওই কয়েকমাসে আপনাকে কী বলব। শুভাশিস বললেন তাও যদি আমার নিজের ছাত্রী হত, আমি কিন্তু মোটেই বিয়ে করতাম না। কারণ আমি মনে করি শিক্ষক ছাত্রী সম্পর্ক ভাইবোনের মতন অথবা পিতাপুত্রীর সমান। স্বাতী [illegible] বললেন, তোমাকে বিয়ে করতে আমার ভারী বয়েই গিয়ে ছিল।

এই প্রসংগে মীনা মুখোপাধ্যায় আর তপন মিত্রর বিয়ের কথাটা না বলে পারছি না। বিয়েটা আমার একেবারে চোখের সামনে ঘটেছে তুবড়ি ফাটাবার মতন আওয়াজ করে। সমস্ত পাড়া প্রতিবেশী ওদের বিয়ে নিয়ে যেরকম আলাপ আলোচনা নিন্দেমন্দ করেছে তা আর বলার নয়। অবশ্য ব্যাপারটা বেশ গোলমেলেই। মীনা তপন দুজনেরই বয়স বছর কুড়ি। সবে কলেজে ঢুকেছে। কলেজেই জানাশুনো। ভাললাগা, ভালবাসা। তার শেষ নিষ্পত্তি বন্ধু বান্ধবের সামনে মালাবদল। বিয়ের পর কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়া। বন্ধু বান্ধবের বাড়ি। কিন্তু কদ্দিন আর এভাবে চলে! একদিন দুজনেই বাড়ি ফিরল। কিন্তু রাস্তা বন্ধ। তপন বাড়ির ছোট ছেলে। মাথার ওপর বড় বড় দাদা দিদি, কারুরই বিয়ে হয়নি। সেই ক্ষোভে মা বাবা সক্কলের সংগে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল তপনের। অবশেষে জায়গা হল মীনার বাবার দয়ায়। তাঁর বাড়িতেই। বাপের নরম মন মেয়ের জন্য কেঁদে উঠল। মেয়ে ভুল করে এমন একটা কাজ করেই ফেলেছে। তা বলে তিনি তো আর জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন না।

কয়েকদিন আগে শুনলাম এই হায়ার সেকেনডারির বিদ্যেতেই ওদের দুজনের চাকরি হয়েছে। একেবারে সরকারি চাকরি।

মীনা তপন মিষ্টি খাওয়াতে এসে বলল, এরকম মিরাকল কারও কখনও শুনেছেন এই বাজারে দু দুজনের চাকরি - কী করে হল বলুন তো: আমাদের ভালবাসার জোরে।

সত্যিই ওদের ভালবাসা দেখার মতন। এত কষ্ট এত দুঃখ এত [illegible] কিন্তু কেউ কাউকে কখনও একমুহূর্তের জন্যে ছেড়ে যায়নি। সেই জন্যেই ঈশ্বর সম্ভবত এমন করে দয়া করলেন প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওঁর পাত্রপাত্রীকে।

তপন অবশ্য যাওয়ার আগে আমাকে বলল, আমাদের যা ঘটার তা ঘটেছে। কিন্তু কেরিয়ার তৈরি না করে বিয়ে করাটা কোন ছেলে মেয়েরই উচিত কাজ নয়।

দুই প্রেমিক প্রেমিকা হাসতে হাসতে চলে যায়। আমার অমনি মনে পড়ে সেই কণিকাদি আর বীরেনদার কথা। ছেলেবেলায় ওঁদের কত চিঠি যে আমাকে বয়ে দিতে হয়েছে তা আর বলার নয়। তবে চকলেট চিকলেটের একটা মোটা রকম ঘুষ আমার কষ্ট পুষিয়ে দিত।

আমাদের গোটা কলেজ স্ট্রিটের রোমিও জুলিয়েট বলতে ওঁদেরই বোঝাত। আমার তো মনে হয় একেবারে খুব ছোট্টবেলা থেকে ওদের প্রেম। প্রায় দেবদাস পার্বতীর মতন। তবে কণিকাদি বীরেনদার বিয়োগান্তক নাটকের পাত্রপাত্রী নয়। ওদের মিল হয়েছিল। বিয়ে করে সুখে শান্তিতেই আছেন।

এই তো মাস দুই আগে দেখা। খুব হৈ চৈ মুড়ে বীরেনদা ছেলে মেয়েদের নিয়ে হুল্লোড় করছিলেন। বরং কণিকাদিকেই কেমন ফ্যাকাশে মুখে দেখলাম। হাসছিলেন। কিন্তু হাসিটা চোখ পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছিল না। কেমন বানান হাসি।

আমি জিগেস করলাম, কণিকাদি, তোমার শরীর খারাপ এত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন

কণিকাদি বললেন, না রে, এমনি। সত্যিই তোর বীরেনদাকে নিয়ে আমি খুব সুখে আছি। কিন্তু মাঝে মাঝে সব কেমন একঘেয়ে লাগে। সেই তো আর পাঁচটা মেয়ের মতন জীবন কাটাচ্ছি। ঘর সংসার, বাঁধাধরা চাকরি, ছেলেমেয়ে, [illegible]। জানিস, তোর বীরেনদার গায়ে এখন আর সেই চন্দনফুলের গন্ধটাও নেই, উড়ে গেছে। এখন শুধু তেলমশলা সংসার সংসার গন্ধ। আমার এসব ভাবলেই বুকের মধ্যে বড্ড কষ্ট হয়।

আমি তো জানি বড্ড রোমানটিক মনের মেয়ে ছিলেন কণিকাদি। বিয়ের পর আমাদের ডেকে ডেকে বলতেন, একটা নৌকো করব, তার মধ্যে একটা ঘর। জিনিসপত্র এই একটু আধটু। সারা পৃথিবীটা তোদের বীরেনদা আর আমি ভেসে বেড়াব, সে কীরকম একটা জীবন হবে বল তো - আর তোদের বীরেনদা তো তাই চায়।

কণিকাদির সেই স্বপ্ন সত্যি হতে পারেনি। বিয়ের পর বীরেনদা ঘোরতর সংসারী হয়ে গেছেন। বাড়ি করেছেন, গাড়ি কিনেছেন। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো নিজে দেখিয়ে দেন। কণিকাদির শাড়ি গয়না স্বচ্ছলতার দিকে বীরেনদার প্রখর নজর।

বিয়ের আগের সেই সমুদ্রযাত্রার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন বীরেন দা।

আসলে বিয়ের আগে এরকম অনেক স্বপ্ন ভাবালুতা থাকেই। পরে দৈনন্দিন সংসারের হিসেব পত্র লোক লৌকিকতায় মন ভীষণ সতর্ক সন্ধানী হয়ে ওঠে। অত যে গভীর ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন, তাও ছিন্ন করে চলে যায় যে যার মতন। কিন্তু এর কারণ কি শুধুই অপ্রেম না, বোধকরি একমাত্র কারণ নয়। অন্যকে বোঝা ও নিজেকে বোঝানোর যথাযথ দায়িত্ব দুপক্ষই ঠিকঠাক বহন করতে পারে না বলেই ক্ষোভে দুঃখে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই যে ক্ষোভ যন্ত্রণা এও কি প্রেম নয় - এও তো একরমভাবে প্রেমেরই প্রকাশ। □

ভালবাসার বিয়েঃ বিয়ের পর ভালবাসা

মহুয়া ভট্টাচার্য

ছেলেটি আর মেয়েটির প্রেম দীর্ঘদিনের। মেয়েটি স্কুলে পড়াত, ছেলেটি কলেজে। তার মধ্যেই চলত রাজনীতি চর্চা। ৭০-এর দশকে ধরপাকড় চলছে। ছেলেটি উধাও। মেয়েটি জানে ওর প্রেমিক কোথায় আছে। পুলিশ এসে উত্যক্ত করতে লাগল মেয়েটিকে। ক'দিন বাদে মেয়েটিকেও পাওয়া গেল না। ১৬/১৭ জন ছেলে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরপর ধর্ষণ করল। এরপর রাজনীতির হাওয়া বদলাল। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। মেয়েটি ও ছেলেটি দুজনেই ফিরল। রাস্তাঘাটে মেয়েটিই তখন আলোচ্য বিষয়। অবশেষে ওদের বিয়ে হল। ফুলশয্যার রাতে ছেলেটি চমকে উঠল মেয়েটির পিঠে কতকগুলি আঁচড় দেখে। জিগ্যেস করল, এগুলি কী করে হল? মেয়েটি বলল, কেন তুমি জানো না? ছেলেটির বমি হতে লাগল, শরীরের মধ্যে কেমন করতে লাগল। পরপর রাত এইভাবেই কাটতে লাগল। ছেলেটি যখনই মেয়েটির কাছে আসতে চাচ্ছিল, ঠিক তখনই ওর স্ত্রী ধর্ষিতা এ কথাটা ও ভুলতে পারছিল না। আর তখনই মানসিকভাবে অস্থির হতে লাগল। মেয়েটি একটা চিঠি লিখল ছেলেটিকে। তারপর উধাও হয়ে গেল। ছেলেটির বন্ধু ছেলেটিকে নিয়ে গেল

এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে। মনোবিজ্ঞানী ছেলেটিকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন :

প্র : আপনার স্ত্রীকে কেন ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?

উ : আমরা কোথায় এ খবর জানার জন্য।

প্র : মেয়েটিকে পরপর যখন ধর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন মেয়েটি এত অত্যাচার সহ্য না করে বলে দিতে পারত।

উ : পারত।

প্র : তখন আপনারা তাকে কী বলতেন ?

উ : বেইমান।

প্র : মেয়েটি এত সয়েও বলল না কেন ?

উ : আমাকে ভালবাসে বলে।

গল্পটা এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। গল্পটার লেখক চলচ্চিত্রকার উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। তাঁর সংগেই কথা হচ্ছিল কী রকম বিয়ে সুখের হয়, সম্বন্ধ করে বিয়ে, না ভালবাসার বিয়ে ? সুখ ? উৎপলেন্দু হাসলেন। এই রকম সমাজ ব্যবস্থায় সুখ আমরা মেয়েদের বলি মেয়েমানুষ। আগে মেয়ে পরে মানুষ। এই সমাজে মেয়েরা একটা পণ্যদ্রব্য ছাড়া আর কী যেখানে ভালবাসা নেই, প্রেম নেই, সেখানে বিয়ে আবার কী ? শুধু রাতের সুখের জন্য ? আমরা মেয়েদের শরীরটাকে ভিত্তি করেই সুখের কথা ভাবি। তাই বিয়ের রীতিটা এই রকম। এই যে পণ দেওয়া, কনে দেখা, পান, সুপুরি কলা ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই এই জৈবিক সত্যটা স্পষ্ট। এর সংগে প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। মেয়েটির মন অর্থহীন ও তুচ্ছ। আসলে কী জানেন, আমরা ফিউডাল সমাজে বাস করছি এবং আমরাও মনে প্রাণে ফিউডাল। তাই এই সমাজে মেয়েরা কখনও বান্ধবী হতে পারে না। বউকে কতকগুলি প্রসাধন ও পণ্যদ্রব্য উপহার দেওয়া ছাড়া আর কী সুখ দিতে পারি ? কোন সম্মান ? অনেকে আমাকে নেমন্তন্ন করেন সিনেমা দেখার জন্য। কারডে লেখা থাকে মিঃ চক্রবর্তী। কেন মিসেস চক্রবর্তী কী করেছেন ? সে কথা তাদের মনেও থাকে না। রাজনীতির নেতারা অনেকবার দায়িত্ব নিয়েছেন -- মেয়েদের নিরাপত্তা, মেয়েদের সম্মান, মেয়েদের প্রতিষ্ঠা সব দেবেন। কিন্তু ওরাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছেন মেয়েদেরকে। মেয়েরা ধর্ষিতা হলে তাদেরই বেশি সুবিধা হয় রাজনৈতিক জট পাকাতে। মেয়েদের মিছিলের আগে এগিয়ে দিয়ে নেতারা থাকেন পেছনে। তাতে নিরাপত্তা রক্ষা হয়। উৎপলেন্দু বললেন, না, একটাও ভাল প্রেমের ছবি এদেশে তৈরি হয়নি। হিন্দি সিনেমার Sex, violence, পোশাক এদেশের সমাজটাকে নষ্ট করছে। সেই সংগে বিজ্ঞাপন, T. V., Family Planning, Contraceptive সমাজকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যাতে সুস্থ একটা সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, ছেলেমেয়ে সুস্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। মনের অবদমিত প্রশ্নের উত্তর এ সমাজ দেয় না। শুদ্ধতার মিথ্যে ভণিতা এদেশের ছেলেমেয়েকে আরও বিপথে নিয়ে যায়।

একটু মুচকি হাসলেন। একট গল্প শুনবেন -জেনি মারকস এর নাতনী তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা কী করে হলাম ? একটু থামলেন, আমরা হলে কী বলতাম ? আকাশ থেকে পড়েছ, কিংবা হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি ইত্যাদি। কিন্তু মেয়েটির মা তার কাছে কোন কিছু লুকালেন না। জন্মরহস্য সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললেন [illegible] [illegible] কিছুর ব্যাখ্যা করলেন। তখন দেখা গেল মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে ও মাকে জড়িয়ে ধরেছে—মা, তোমার এত কষ্ট হয়েছিল আমার জন্য।

– শিশু সুন্দরভাবে মানুষ হলে জীবনের মূল্যবোধ পাল্টাবে। তখন প্রেমের মূল্যবোধ তৈরি হবে। আমরা স্বামী স্ত্রী প্রেমিক হতে পারব। আর সুখ তখনই আসবে।

অসম্ভব, শেষ কথা বলা অসম্ভব। কাউকে জানলাম না, বুঝলাম না, বিয়ে করলাম সেটাই বা কেমন করে সম্ভব ? আবার বাঙালি মধ্যবিত্তের এই শাশ্বত রীতি মিথ্যে বলে উড়িয়েই বা দিই কী করে ? তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন এ দেশের এক খ্যাতনামা উজ্জ্বল তরুণী। শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি সব দিক থেকেই প্রগতিশীল, সেখানেই ছবি তুলতে এসেছিলেন হাংগেরির এক ভদ্রমহিলা। তাঁর খুব পছন্দ হল ভারতীয় তরুণীটিকে। তিনি বাণিজ্য দূতাবাসে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। মেয়েটি সংগে একটি দেহরক্ষী চাইলেন। হাংগেরির মহিলাটি খুব অবাক হলেন। এর পরে ভারতীয় মহিলাটি যখন সম্বন্ধ করে বিয়ের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন, তখন হাংগেরির মহিলা আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কী! আমি তো দেখছি আপনার মায়ের সংগে আপনার মতের কোন পার্থক্য নেই। গল্পটা বললেন কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের প্রযোজক পংকজ সাহা। বললেন এদেশের মেয়েরা এখনও নির্বন্ধে বিশ্বাস করে। মায়েরা ভাবতেন স্বামী স্ত্রীর এই মিলন জন্মজন্মান্তরের। এখনকার ছেলেমেয়েরা ভাবে এ বিয়ে পূর্বনির্ধারিত আগেই স্থির ছিল। তাই বিয়ের পর অনেক ঝড় ঝাপটা মাথার ওপর বয়ে গেলেও তারা বিচ্ছেদের জন্য কোরটে ছোটাছুটি করেন না। মেনে নেন, এটাই নির্বন্ধ ছিল। সবই ভাগ্য। এ চিন্তা আমাদের অবচেতন মনের স্বীকৃতি।

লক্ষ কথা, হাজার কেনাকাটা সহস্রবার এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াত, হাজার জনের হাজার জিজ্ঞাসা সব সামলিয়ে বর টোপর পরে এল বিয়ে করতে—এ বলল, এস বাবাজী, সে বলল আসুন জামাইদা, তারা বলল জামাইবাবু কেমন আছেন ? তারপর শুরু হল হাসি ঠাট্টা, তামাশা কুৎসিত আকার ইংগিত। এর পর কনে নিয়ে ফেরার সময় বুড়ো বুড়ি বাচ্চাকাচ্চার কান্নাকাটি সম্বন্ধ বিয়ের এই যে শাশ্বত রীতি সবটাই বড় জঘন্য ও বিরক্তিকর বললেন কলকাতা রেডিওর সহকারী বার্তা সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী। তাঁর মতে লাভ লোকসানের বিয়ের [illegible] ম্যারেজ অনেক বেশি [illegible]। [illegible] সমাজ ছিল গ্রামভিত্তিক, [illegible] পরিবারগুলি নিজেদের ভাল করে চিনতেন। এখন জীবনযাত্রা হয়ে গেছে শহরভিত্তিক। দেশ ভাগের পর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সুতরাং কারোর পরিবারের খবর কেউ রাখেন না। এখন পরিচয় হয় চাকরির মাধ্যমে, অন্য রাজ্যে বসবাস করতে গিয়ে, ভিন রাজ্যের ভিন দেশের ভিন স্বভাবের মানুষের মধ্যে। তাই পরিবার-কেন্দ্রিক বিয়ে না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিয়ে হওয়া অনেক সুখের।

আর পাঁচটি বাঙালি মেয়ের মতই উজ্জ্বল তন্বী তরুণী ইন্দ্রাণী মুখারজি। লম্বা একটা বিনুনি, ছটফটে। বাসের ভিড় ঠেলে ছুটতে ছুটতে ঢোকে কলেজে। এম এ পাশের পর জুনিয়র টিচারস ট্রেনিং নিচ্ছে। কিন্তু তার সজল চোখের কম্প্র ছায়ায় সম্বন্ধ বিয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সমর্থন ঝরে পড়ল। বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। এখন ও থাকে দিল্লিতে, আমি কলকাতায়। কারণ ? জিগ্যেস করতেই জানলাম ওরা একসংগে থাকলেই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ে, হাসপাতালে পাঠাতেই হয় দুজনকেই। তাই মা আমাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। জানলাম হাতে নাকি বৈধব্যযোগ আছে। মাকে জিগ্যেস করেছিলাম, বিয়ে দিলে কেন ? মা বললেন, ছেলেটার হাতেও স্ত্রী বিয়োগ আছে। ভেবেছিলাম একসংগে হলে যদি কাটাকাটি হয়ে যায়। কিন্তু দুজনকে নিয়েই টানাটানি হয়। তারপর ? জানতে চাইলাম – জ্যোতিষীর গণনায় বলা হয়েছে দশ বছর ছাড়াছাড়ি থাকলে এই ফাঁড়াটা কেটে যাবে। আমরা তাই আলাদা থাকি। প্রায় রোজই চিঠি লিখি আমরা ট্রাংকলে কথা বলি। ৬ বছর হয়ে গেছে, আর মাত্র চার বছর বাকি। এর পর একসংগে থাকব।

ভারতে সম্বন্ধ বিয়ে আছে বলেই অনেক অভাগা বিয়ের সুযোগ পান - নতুবা সকলেই কি লাভ ম্যারেজ করতে পারে ? বিশেষ করে সে যদি কুরূপা ও গরিব হয় তার ভালবাসার কথা কে জানবে ? সে ক্ষেত্রে এখনও আমরা অরক্ষণীয়ার যুগেই পড়ে আছি। □

নবম দশম

বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা

'রচনায় যোগ দাও – ছাত্রবৃত্তি জিতে নাও'

শুধু কি বৃত্তি। তার সংগে আছে বই কেনার জন্য বিশেষ অনুদান, প্রশংসাপত্র এবং সারা বছর ধরে বিনামূল্যে পাক্ষিক 'নবম দশম' আর নবম দশম মানেই তো পরীক্ষায় সাফল্য এবং কৃতিত্ব।

ইত্যাদি প্রকাশনীর উদ্যোগ

অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য 'সারা বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা'। কোন প্রবেশমূল্য নেই - এবং পশ্চিমবংগের যেকোন স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই কেবল যোগ দিতে পারবে।

বিষয় : 'জাতীয় সংহতি'

নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের ভারতবর্ষে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা কিভাবে সম্ভব - তোমার বক্তব্য এক হাজার শব্দের মধ্যে গুছিয়ে লেখ। ফুলস্কাপ কাগজের এক পিঠে লিখবে। এক বিচারকমণ্ডলী সমস্ত রচনাপত্র পরীক্ষা করে নম্বর দেবেন। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম দশজনকে 'ক', পরবর্তী পঞ্চাশ জনকে 'খ' এবং তারও পরের পঞ্চাশজনকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা হবে। প্রতিটি সফল প্রতিযোগীর নাম, স্কুলের নাম এবং ঠিকানা ইত্যাদি প্রকাশনী সমস্ত পত্রিকায় ছাপানো হবে।

বৃত্তির পরিমাণ

'ক' বিভাগের ১০ জন পাবে ১৪০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ১০[illegible] টাকার বই কেনার জন্য অনুদান, 'খ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১২[illegible] টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ৮০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান, 'গ' বিভাগের ৫০ জন পাবে ১০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ও ৬০ টাকার বই কেনার জন্য অনুদান।

কলকাতায় একটি বিশ্বজ্জন সমাবেশে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে প্রশংসাপত্র এবং বই কেনার জন্য এককালীন অনুদান। বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতি তিনমাস অন্তর স্কুলের ঠিকানায় সমানভাবে ভাগ করে পাঠানো হবে আর পাক্ষিক 'নবম দশম' পাঠানো হবে বাড়ির ঠিকানায়।

দেরি না করে রচনা লেখ আর এই ফর্ম পূরণ করে তার সংগে গেঁথে পাঠাও।

জাতীয় সংহতি রচনা প্রতিযোগিতা

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

নাম -- বয়স ----------------

শ্রেণী -- রোল নম্বর ----------------

বাড়ির ঠিকানা --

পিতা/অভিভাবকের নাম --

পেশা -- মাসিক আয় ----------------

স্কুলের নাম --

ঠিকানা --

উপরোক্ত ঘোষণা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। আমি এই প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মানতে বাধ্য থাকবো এবং বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মানবো।

অভিভাবকের স্বাক্ষর   ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

মনে রেখো রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩। এর পর প্রাপ্ত রচনা যত ভালই হোক বিবেচিত হবে না। খামের ওপর বড় হরফে 'নবম দশম বার্ষিক বৃত্তি প্রতিযোগিতা' লিখে দিও। তার তলায় লিখবে ইত্যাদি প্রকাশনীর ঠিকানা।

পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই

বঙ্গীয় মুখার্জি (২৫) একাদশমান সুশ্রী কর্মে নিপুণা পাত্রীর পাত্র চাই। বক্স আজকাল, কলি- ৯

বঃ কায়স্থ (২৫) ১৫০ সেমিঃ বি এ সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর জন্য চাই। বক্স (ক) ৮, আজকাল,

বঙ্গীয় ব্যানার্জি বি এ, বি টি (৩৪) গৌরবর্ণা সুমুখশ্রী ৫'-৩" র নিকটস্থ ব্যাংক, এল

পাত্রী চাই

বৈষ্ণব/অসবর্ণা পাত্রী চাই

পাত্র ৩০ বঃ কেঃ সঃ সংস্থায় কর্ম (১৫০০) নিজস্ব বাড়ি। স্নাতক/পাঠ প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য শ্রীমতী সরলা দাস, এ/২৩, নারায়ণ, কলি - ৪৭

(৬৫০) ৫ ফুঃ ৬ ইঃ গৌরবর্ণ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান পাত্রী চাই। বক্স (ক) ১(কলি ৯

১৭/৫'-৮") বি ই (সিভিল)

পাত্রী সংবাদ

কলিকাতায় বাড়ি সুন্দরী ম্যাট্রিক পাশ

কাগজের বিয়ে

রাজেন্দ্র আগরওয়ালা

ঠিক কোন সময় সংবাদপত্রে কিংবা পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন মারফৎ পাত্রপাত্রী নির্বাচন প্রথা চালু হয়, বলা সম্ভব না হলেও এটা ঠিক যে আজকের দিনে এই ব্যবস্থা ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে। যে কোন বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় পরিশিষ্টে চোখ রাখলেই এরকম শতাধিক বিজ্ঞাপনের উপর নজর পড়বে। অবশ্য কোন পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপনের মাত্রা নির্ভর করে পূর্ণরূপে তার প্রচার সংখ্যা ও পাঠক শ্রেণীর উপর। সংবাদপত্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক পত্রিকাও এদিকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিশেষভাবে হিন্দি পত্রিকা। মাত্র ৫০ কিংবা ৬০ টাকা ব্যয় করে ঘরে বসে শতাধিক পাত্র অথবা পাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের এই আধুনিক মাধ্যম তাই অনেকের নিকট সমাদৃত।

দুর্ভাগ্যবশত আজকের প্রগতিশীল যুগেও এপ্রথা খুব কম পরিবারই গ্রহণ করেছেন, তবে মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। ঘটক কিংবা আত্মীয় স্বজনদের উপর নির্ভরতাও সেকারণে অনেকটা কমছে।

বিজ্ঞাপনের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে শিক্ষিত পরিবারের লোকেরাই এরূপ বিজ্ঞাপন দেন, কারণ সংবাদপত্র সর্বদা শিক্ষিত মনেরই মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষাই একমাত্র মানদন্ড নয়, বরং বলা যেতে পারে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় এবিষয়ে অধিক আগ্রহী।

বিংশ শতাব্দীর নবম দশকে যখন চারদিকে প্রগতিশীলতার পতাকা পূর্ণ উদ্যমে উড়ছে, প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন ভেঙে গুঁড়িয়ে মানুষ যখন বাস্তবমুখী হচ্ছে, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে, তখন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষজনই সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতীতকে পেছনে ফেলে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বাকিরা আজও মূক দর্শক মাত্র।

অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে পাত্র চাই বিজ্ঞাপনই অধিক মাত্রায় দেখা যায়। অনেক পাত্রীই চাকুরিরতা এবং সকলেই মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৪৮% পাত্রীই গ্র্যাজুয়েট, ১৬% পোস্ট গ্র্যাজুয়েট।

বস্তুত অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান একটি সমস্যা এবং অনেকেই পণপ্রথার জন্য দিশেহারা। কারণ পণের মাত্রা নির্ভর করে পাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর।

একটি জিনিস সহজেই অনুমেয় যে অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর বাবা কাকারা জীবিকায় ব্যস্ত। সমস্ত শ্রেণীর লোকেরই ব্যস্ততা আগের তুলনায় যথেষ্ট বেড়েছে। এবং অনেকে তাদের সন্তানদের সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময়ও বিশেষ পান না। অনেক ক্ষেত্রেই মায়েরাও আপন সোসাইটি, কালচার, পারটি ইত্যাদি নিয়েই বেশি সময় দেন। সাংসারিক সমস্যা গৌণ। তাই নিত্যদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাত্র কিংবা পাত্রী সন্ধানের মত সময় তারা করে উঠতে পারেন না। যথাসময়ে আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য না নিয়ে সংকীর্ণ গন্ডি ছাড়িয়ে অনেকেই সংবাদপত্রের মতন বহুল প্রচারিত মাধ্যমকে আপন করে নিতে চাইছেন।

পাত্রদের উপর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ৩৮% পাত্র গ্র্যাজুয়েট, ১৮% পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং ৩২% ইনজিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি। এধরনের উচ্চ শিক্ষিত অধিকাংশ যুবকই চিরাচরিত প্রথাবিরোধী। বাবা ছেলে বা মেয়ে দেখে এলেন এবং এক কথায় বিবাহের ব্যবস্থা কোন শিক্ষিত ছেলে বা মেয়ে মানতে রাজি নয়। সকলেই চায় মনের মত সঙ্গী তাই সর্বশেষ মাধ্যম সংবাদপত্র, কারণ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে প্রত্যুত্তরে কয়েকশত চিঠি আসা স্বাভাবিক ঘটনা। এমনকি কতকগুলি ক্ষেত্রে চিঠির সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। বাড়িতে বসে একসঙ্গে এতগুলো পাত্র অথবা পাত্রীর সন্ধান পেয়ে অনেকেই নানা অসুবিধার হাত থেকে মুক্তি পান।

সমস্যা কেবল একধরনের নয়, অনেক পাত্রই আজকের দিনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে এবং একাপ বাস্তবিকই প্রগতিশীল হওয়ায় এমন পাত্রী খোঁজেন যার সঙ্গে তার মতের মিল হবে। সংবাদপত্র সেই খোঁজায় সাহায্য করে।

যাদের বেতন খুব বেশি নয় একাপ অনেকেই চাকুরিরতা পাত্রী খোঁজেন তবে সমস্যা মুখ্যত এই যে চাকুরিরতা পাত্রী অবশ্যই নিজ অঞ্চলের হবে, যাতে উভয়ে একই স্থানে বসবাসও করতে পারেন। হঠাৎ বাকলেও কাজটি সহজেই সম্ভব নয়।

পরিচিত এক ভদ্রলোক বোলপুরের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তিনি ঐ অঞ্চলেরই চাকুরিরতা শিক্ষিকাকে বিয়ে করতে চাইলেন। বন্ধুবান্ধব কেউই বিশেষ সাহায্য করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন এই উল্লেখে যে তার অঞ্চলেই শিক্ষিকা পাত্রী চাই। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ১১টি চিঠি পেলেন। এর মধ্যে তিনজন পত্র লেখিকা ছিলেন বোলপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ভদ্রলোক আর পত্রালাপ করলেন না, বরং তিনজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেই মনের মত একজনকে পছন্দ করে নিলেন।

এত সহজে আশা পূর্ণ হওয়ায় ভদ্রলোক স্বাভাবিকভাবেই খুশি এবং আজকে তিনি পরিচিত সকলকেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যুক্তি দেন।

আবার যারা জাত, ধর্ম মানেন না তাদেরও উপযুক্ত সম্বল সংবাদপত্র, কারণ আত্মীয় স্বজনদের তো কথাই নেই, কারণ তারা প্রথমেই বিরুদ্ধে দাঁড়ান, আবার ঘটকেরাও কোন এক বিশেষ জাতির ছেলে মেয়েদের নিয়েই ব্যস্ত।

প্রবাসী অর্থাৎ বাংলার বাইরে বসবাসকারীর নিকট সংবাদপত্র উপযুক্ত ঘটক। নিকটবর্তী অঞ্চলে বাঙালি পরিবারের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগ কম, কিন্তু প্রয়োজন হয় বাঙালি পাত্র বা পাত্রীর। অনেক বহির্বঙ্গবাসী সেই অঞ্চলেরই বসবাসকারী বাঙালি পাত্রী চান উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। পরিচিত ভদ্রলোক আহমেদাবাদে বসবাস করেন। কিন্তু কলকাতা বা বাংলার অন্য কোন স্থানে দূরত্বের জন্য মেয়ের বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক। স্বাভাবিভাবেই তিনি নিকটবর্তী অঞ্চলে পাত্রের সন্ধান করেন। আবার এই ধরনের পরিবার যখন পাত্রীর প্রয়োজন অনুভব করেন, ঐ অঞ্চলেরই পাত্রীকে প্রধান্য দেন যে তাদের ভাষার

সংগে পরিচিত হবার সংগে সংগে স্থানীয় ভাষা অনুধাবনে সক্ষম। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্র ও বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশ হতে প্রকাশিত অনেক হিন্দি পত্রপত্রিকায় বাঙালি পাত্র পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপনের আধিক্য লক্ষণীয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার বিজ্ঞাপন বড়ই বিচিত্র। মাত্র কয়েকদিন আগেই সংবাদপত্রের পাত্রপাত্রী কলমে নজর পড়ল এই ধরনের এক বিচিত্র বিজ্ঞাপনের ওপর। পাত্রী পক্ষের আবার পাত্রকে অবশ্যই মারকসবাদে বিশ্বাসী হতে হবে। আর দুটি বিজ্ঞাপনে দেখা গেল পাত্রীকে আকাশবাণীর সংগীত শিল্পী এবং পাত্রকে আবশ্যিকভাবে আকাশবাণী কিংবা দূরদর্শনের শিল্পী হতে হবে। বেকার সমস্যা এক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করেছে। উচ্চশিক্ষিত, ভালো অর্থ উপার্জনকারী এক পাত্রী শিক্ষিত বেকার যুবককে বিবাহ করতে চেয়েছেন, উচ্চমাধ্যমিক পাশ বেকার যুবক I. A S. I P. S কিংবা সমপদে আসীন যুবতীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। অপরদিকে পদার্থবিদ্যায় পোসট গ্র্যাজুয়েট যুবক আমেরিকার নাগরিক এমন বাঙালি মেয়েকে বিবাহ করতে চান।

এধরনের বিজ্ঞাপন বিচিত্র বলে মনে হলেও বাস্তবিকই কি বিচিত্র? বাস্তবে এধরনের বিজ্ঞাপন দাতাদের কোনরূপেই বিচিত্র মনোভাবের লোক বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। সবক্ষেত্রেই যে পাত্রীকে পাত্রের তুলনায় কম শিক্ষিত বা সমান শিক্ষিত হতে হবে এমন বাধাবাধকতা কেন? আবার যুবককেই যে উপার্জনশীল হতে হবে এই ধরনের কোন যৌক্তিকতা নেই। বাস্তবে যদি চাকুরিরতা, সু উপার্জনশীল মেয়েরা বেকার যুবককে বিবাহ করতে এগিয়ে আসে তা হলে নিশ্চিতভাবে ভারতের বেকারসমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। যুগ যুগ ধরে স্বামী উপার্জন করছে ও স্ত্রীপরিবারকে তত্ত্বাবধান করছে এমন অবস্থার পরিবর্তন দরকার আছে। নারীরা যদি স্বাধীনভাবে সমাজে বেরিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শেখেন আর পুরুষ সমাজ যদি নিজের অহংবোধকে ত্যাগ করে নারীকে নিজের সমকক্ষ স্থান দেন তবেই নারী মুক্তি আন্দোলনের সার্থকতা। এইধরনের বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়াস কেবলমাত্র পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ একদিকে এই ধরনের প্রস্তাবে যারা আগ্রহী তারা সংবাদপত্রকে নিজের সহযোগী হিসাবে পাবেন, অপরদিকে এইরূপ বিজ্ঞাপন অনেক নবাযুবক যুবতীকে আকৃষ্টও করবে। ফলে প্রগতিশীল চিন্তারও প্রসার ঘটবে।

সাধারণভাবে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বকস নমবর মারফৎ। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরদাতা বিজ্ঞাপনদাতা সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ না জেনেই পত্র লিখে থাকেন। এইজন্য অসংখ্য পত্র লেখক অনাবশ্যক শ্রম ব্যয়ে বাধ্য হন। উদাহরণস্বরূপ কোন পাত্রের ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট পাত্রী প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞাপনে এইরূপ উল্লেখ না করায় কম শিক্ষিত অনেক পাত্রী পক্ষই তাদের চিঠি পাঠান। এই রূপ আর একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করছি। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, যারা সকলেই কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সুউপার্যী ইনজিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন, তৎসংগে পাত্রীর ফটো পাঠানর আবেদনও করা হল। যথাসময়ে অসংখ্য পত্র এল। সেই সংগে অসংখ্য ছবিও। কিন্তু মনোমত পাত্রীর বাদে অন্য ছবিগুলি অবশ্যই ফেরৎ দেওয়া উচিত। কারণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছে নিজের ছবি রাখতে কোন মেয়েই রাজী হবেন না, বাবা মা বা তার পুরোপুরি বিরুদ্ধে। □

সেকালে বিয়ের পাকা দেখাতেই একশো রকম পদ খাওয়ান হত

গৌরী দে

সেকালের ভোজন-

বিলাসী সুখী মানুষের কাছে এ এক চরম দুঃসময়। কোথায় সেই টাকায় চারটে পদ্মা বা গঙ্গার ইলিশ, আর কোথায় বা সেই নীল দাড়াওয়ালা চার আনা সেরের বড় বড় গলদা চিংড়ি। এসব আর কদিন আগের কথা? পঞ্চাশ বছর? তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি, ধনীদের কথা বাদ দিলেও সাধারণ ঘরে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় থাকত দু-তিন ধরনের মাছ। গরিবের ঘরেও মোটা ভাত কাপড়ের বড় একটা অভাব হত না। আর যদি কোন না কোন সম্পর্ক ধরে কোন ধনীর আত্মীয় হওয়া যেত তবে তার সারাজীবন সপরিবারে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যেত সেই ধনী গৃহেই। কিছুদিন আগেও লোকে বলত বাঙালি খেয়ে আর খাইয়ে ফতুর। তা, সে যুগে সুখটা ছিল বটে। তাই আজকের পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষজনকে আপশোস করে বলতে শোনা যায় 'আহা—! কী ছিল সে সব দিন। আর কি সে সময়টা ফিরে আসবে?' যা যায় তা কি আর ফিরে আসে? আসে না। এখন কোথায় বা সেই সদ্য তোলা, পুকুরের জ্যান্ত মাছ, আর কোথায় বা ক্ষেতের টাটকা শাক-সব্জি? তবু বাঙালির জীবন যাত্রায় পূর্বপুরুষদের 'ট্রাডিসান' বজায় রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াস চলেছে।

বিয়ের ব্যাপারটাই ধরা যাক। বেশ কয়েক যুগের মধ্যে এর অনুষ্ঠানগত আচার, রীতিনীতি বা প্রথার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়না। বিশেষ করে বিবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে আত্মীয় ভোজনের ব্যাপারটা। আর আজও, সে যুগের সঙ্গে এ যুগের

এক অকল্পনীয় অর্থনৈতিক ব্যবধান

ঘটা সত্ত্বেও বিবাহ অনুষ্ঠানে ভোজ বন্ধ হয় নি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। যদিও বিবাহ যোগ্য পুত্রকন্যার পিতা মাতার কাছে আজ এটি রাতের দঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এর আর প্রয়োজন কোথায়? সে গ্রামও নেই, সে মানুষও নেই। সুতরাং সমাজচ্যুত হওয়া বা লোক-নিন্দা বা একঘরে হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে? এর একটি মাত্র কারণ, বাঙালির জন্মগত সংস্কার। 'যা আমার বেলা হয়েছে, যা সবার বেলা হচ্ছে, তা আমার পুত্র কন্যাদের বেলাই বা হবে না কেন?' অতএব পিতা ধার দেনা করে সন্তানকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না করে ভোজের আয়োজন করেন। বাঙালি চিরকাল ভোজনপ্রিয়। সুতরাং একটু ভালমন্দ খাবার সুযোগ এলে নেহাত অখুশি হয় না অপর পক্ষ। কিন্তু এসব ভোজকে ভোজ বলেই মনে করেন না সেকালের মানুষরা। তাঁদের পেট ভরলেও মন ভরে না। না আছে গলদা চিংড়ির মালাইকারি, না আখনীর জলে সেদ্ধ সরু চালের ভুরভুরে গন্ধওলা পোলাও, যাতে মুঠোমুঠো ছড়িয়ে দেওয়া হত বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, ক্ষীর, ছানা। তাছাড়া কোথায় আর সেই কব্জি ডুবিয়ে খাবার অঢেল ব্যবস্থা। এঁদের কথা শুনতে শুনতে রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম, জানতে হবে কী ছিল সেই সব দিনগুলিতে।

সে যুগের খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাত্র ৬০ বছরের ব্যবধানে খাদ্য তালিকা ও খাদ্যমূল্যের যে ব্যবধান লক্ষ্য করলাম তা রীতিমত গল্পকথা বলে মনে হয়। তবে কল্পকাহিনী যে নয় তার প্রমাণ দিল কয়েকটি পুরনো হিসেবের খাতা, একটি ডায়রীর কয়েকটা পাতা, আর ৭০ বছর আগের এক বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত একটি রুমাল। কালের ভারে কিছুটা ম্লান তবে সে যুগের স্বাচ্ছন্দ্যের গৌরবে আজও দীপ্ত। এছাড়াও রয়েছে কয়েকজন বৃদ্ধবৃদ্ধার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রমাণ, হিসাবের খাতা। ১৯১৭ সালের আগে চালের মন ছিল আট আনা, আর ধানের মন ছআনা। ১৯১৭ সালে সেইদাম বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে বারো আনা আর দশ আনা। ছেলেদের সব চেয়ে দামী বুট জুতো ২৷৷-টাকা জোড়া। দামী

ধনেখালি শাড়ি একজোড়া ৪ টাকা চার আনা। দ্বিতীয় প্রমাণ, ডায়রীতে লেখা ছিল ১৯৫০ সালের এক দুর্গাপূজায় এক গৃহস্থের রীতিমত খরচ হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীর সারা বছরের শাড়ি ধুতি ছাড়া দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ের চারটি করে জামা প্যানট শারট আর ছয় জোড়া জুতোয় মোট খরচ হয়েছে ৬০্। শারটের পাশে লেখা ছিল ২্ করে চারটি শারট কেনা হল। জামাকাপড় নয়, আমার নজর ছিল খাদ্যের ওপর, তাই দেরি না করে ফিরে আসা যাক সেই ঐতিহাসিক রুমালের কথায়। যার বয়স সত্তর আর জন্ম, ১নং সুকিয়া স্ট্রিট নিবাসী স্বর্গীয় স্যার ডাঃ কৈলাস চন্দ্র বসুর গৃহের এক পাকাদেখার ভোজে। আজকাল ক্যাটারাররা টিস্যু পেপারে তৈরি একধরনের ন্যাপকিন দিয়ে থাকেন নিমন্ত্রিতদের। যেটি শুধু ন্যাপকিন নয়, তাদের বিজ্ঞাপনও বলা যায়। সাদা কাগজে লাল ছাপার অক্ষরে তাতে লেখা থাকে ক্যাটারিং এজেনসির নাম ধাম। এই রুমালটি কিন্তু ঠিক সে ধরনের নয়। এটি যেন সাদা লংক্লথের ওপর লাল অক্ষরে ছাপা ইংলিশ বা চাইনিজ হোটেলের মেনুকারড। রুমালটির চারধার মুড়ে বিডিং করা হয়েছে। তার ধার বরাবর লাল ছাপায় ফুললতাপাতার নকশার কাজ আর ঠিক মধ্যিখানে ক্রমিক নম্বর দিয়ে পর পর সাজান একটি খাদ্য তালিকা। যে তালিকার সব কটি খাদ্যই নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করা হয়েছিল রুপোর থালা বাটি গ্লাসে। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, তালিকার শেষ সংখ্যাটি। সংখ্যা ছিল ১০০। অর্থাৎ পাকা দেখায় ১০০ রকমের রান্না করা হয়েছিল। রান্নাগুলি কেমন হয়েছিল বা কতটা লোভনীয় দেখতে হয়েছিল জানিনা। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান মনে হয়েছিল প্রত্যেকটি পদের পরিচিতির অভিনবত্ব। একটি পদ যেন এক একটি ধাঁধা। ইংরাজি বাংলা সংস্কৃতের মিশ্রণে সৃষ্ট এইসব হেঁয়ালীভরা শব্দগুলির সমাধানের চেষ্টায় দারুণ উত্তেজনা অনুভব করেছি। সেই সংগে শ্রদ্ধা না করে পারিনি সৃষ্টিকারকের পাণ্ডিত্য আর রসানুভূতিকে। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যাক। যেমন 'গোধূমচূর্ণ পেটিকা,' মানে ময়দার লুচি। 'শ্রীনন্দনন্দনীয়' মানে রাধা বল্লভী, 'গুণহীনীয়ানি'–বেগুণী, 'ঝর্ঝরিত ভর্জিতালু'–ঝুরো আলু ভাজা, 'সগর্ভপটোলিকা'–পটলের দোলমা, 'চিত্ততস্কর'–মনোহরা সন্দেশ, 'জম্বীর বার্ত্তা'–লেবু সন্দেশ, 'বাকাবটিকা'–রাবড়ি, 'ক্যানিংগ জায়া' লেডিকেনি, 'কৃষ্ণজম্বু'–কালোজাম, 'লঙ্কীজম্বীরম'–কমলা লেবু, 'বিকম্পমূলাম'–বাদাম,.....এইরকম ৯০০টি পদ। কিন্তু একটা লোক কি এতরকম খাবার খেতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। তবে, অর্থনৈতিক সমস্যা বিজড়িত আজকের মানুষ যদি বলেন, ব্যাপারটার মধ্যে কোন গৌরব থাকা উচিত নয়, এটি কমপ্লিট ওয়েসটেজ আর লোক দেখান বাড়াবাড়ি, তাহলে এঁদের দোষ দেওয়া চলে না। কারণ এঁরা কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন, ১৯১৪ সালে আলুর সের ছিল ৪ পয়সা, একমন দই-এর দাম ছিল ২, টাকায় ৩৫ সের দুধ, মাংসের সের সাতআনা, বড় গলদা চিংড়ির সের ১৪ পয়সা, জ্যান্ত রুইকাতলার সের পাঁচ আনা। তারপরে ১৯৩৩ সালেও টাকায় ৩টে মুরগি পাওয়া যেত। আধ ধামা মুড়ির দাম ছিল ৬ পয়সা, ১ টাকায় পাওয়া যেত ৬৪টা রসমুন্ডি, যার সাইজ এখনকার আট আনার রাজভোগের থেকেও বড়। কমলা লেবুর জোড়া ছিল ৪ পয়সা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ১০০্ বেতনের বাবুরা সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। অথবা ২০০্ বেতনের বাবুদের বিলাসিতা আর শ্যামপেন ছিল একচেটিয়া। আর ৪০০/৫০০ টাকার বাবুরা তো রীতিমত ধনী। অবশ্য তাঁদের থেকেও ধনী ছিলেন জমিদাররা। অথবা ছোটখাট রাজারা। এঁদের কর্মহীন অখন্ড অবসর কাটত মদ, বাঈজী, তাস পাশায়। তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ে যেত বেরাল বা পুতুলের বিয়েতে অথবা পায়রা উড়িয়ে।

সেকালের বারবাড়ি থেকে অন্দর মহলের রান্নাঘরে একবার উঁকি দেওয়া যাক। চিরকালের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল 'বউ হেঁসেলের আলো'। কিন্তু সেকালের রান্নাঘরে সবস্তরের বৌঝিদের দেখা পাওয়া গেল না। কেন গেল না সেকথায় পরে আসছি, তার আগে খুঁজে পেতে যেখানে তাদের পেলাম সেখানেই প্রশ্ন আর উত্তরের পালাটা সেরে নিলাম। অবশ্য সে যুগের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা সম্বন্ধে তাঁদের চেয়ে বেশি খবর দিতে পেরেছিলেন পুরুষরা। যাঁদের কাছে নারী ছিলেন সামান্য একটা শাড়ি বা গহনার মতই, তার বেশি কিছু নয়। শুনলাম সে যুগে সাধারণ ঘরেও ডাল ভাত চচ্চড়ি ছাড়াও দু-তিনরকমের মাছ হতো। আর জমিদার বাড়িতে? সে কথা শোনা যাক স্বয়ং স্মৃতিরাণী বোসের কাছেই। শোভাবাজার রাজবাড়ির নাতবৌ ৬৮ বছর বয়স্কা এই মহিলা স্মৃতি ভান্ডার উজাড় করে দিলেন। স্মৃতিদেবীর কথায় বুঝতে পারলাম কেন সব রান্নাঘরে নারীদের খুঁজে পাওয়া যেত না। জমিদার বাড়ির বৌঝিরা রান্না করতেন না। করলেও শখ করে একটা আধটা। কিন্তু গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের বৌঝিদের ঢেঁকিতে চাল ভাঙা থেকে শুরু করে ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, কাপড় কাচা, রান্না করা সব কাজই করতে হত। অবশ্য শহরের মেয়েরা একটু বিবি ছিলেন।

স্মৃতিদেবীর কথায় ফিরে আসা যাক। উনি বললেন – 'আমাদের বাড়ি ১২-১৪ জন লোক সব কাজ করত। আমরা, মানে বৌঝিরা কেবল তাস, সেলাই, গল্প, আড্ডা, আর বায়সকোপ দেখে কাটাতুম। অবশ্য আমার শাশুড়ি অনেক আচার করতেন।'

হঠাৎ একটু উৎসাহ দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'রান্না না করলেও, কী খেতেন তা তো মনে আছে।' খিলখিল করে হেসে উঠে উনি বললেন, 'নিশ্চয়ই, সে সব কি ভোলা যায়। এই ধর, নিরামিষ রান্নাই তো হত চার পাঁচ রকম। তারপর চার পাঁচ রকম মাছ। এ ছাড়া বাড়ির গরুর দুধ, ছানা, ক্ষীর, পায়েস, সন্দেশ, পানতুয়া – সব বাড়িতে তৈরি হত।' একটু বাধা দিয়ে বললাম 'এসব রান্না রোজ হত?' আমার গলার স্বরে বিস্ময় লক্ষ্য করে উনি বললেন – 'আরো আছে, চাটনি বা আচার। আর রাতে লুচি নয় ভাত, তখন রুটির চল ছিল না।' স্মৃতিদেবী হঠাৎ কী ভেবে বললেন, 'এই লুচি নিয়ে কিন্তু হুলস্থুল ব্যাপার হত মাঝে মধ্যে।' উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করলাম 'কী রকম বলুন তো?' উনি বলতে লাগলেন 'সেকালের কর্তাদের তখন দারুণ মেজাজ। তাঁদের দাপটে চাকর লোকজন সবসময় থরহরি কম্প। সেকালের জমিদার বাড়ির রীতি অনুযায়ী খাবার সময় ছিল খুব বেলায় আর খুব রাতে। তাস খেলে গভীর রাতে বাবু বারবাড়ি থেকে যেই অন্দর মহলে এলেন, খবর অমনি পৌঁছে গেল হেঁসেল বাড়িতে। ঠাকুরকে তুলল ঘুম থেকে। ময়দা মাখা, লেচি কাটা, তৈরি উনুন, সব রেডি। বাবু খেতে বসলে একখানি করে গরম ফুলকো লুচি নিয়ে ছুটবে ছোকরা একটা বাউন, সেই একতলার হেঁসেল থেকে দোতলার অন্দরে। ইতিমধ্যে যদি লুচি ঠান্ডা হয়ে যায়, বাবু রাগ করে পাত ঠেলে উঠে পড়বেন। আর শাস্তি স্বরূপ ছোকরা ঠাকুরের টিকিতে বেঁধে দেবেন সেই ঠান্ডা লুচি। ঠাকুর তখন ভয়ে কাঁপছে, চাকরিটা বুঝি যায়।'

সত্যি! কী ছিল সে সব দিন! কোথায় গেল সেইসব লোকজন আর কর্তাদের দাপট? আরও একটা ব্যাপার ছিল, তা হল বরপক্ষের দাপট। সেযুগের বিয়ের একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছিলেন, জোড়াসাঁকো নিবাসী, প্রতাপ ঘোষের বংশধর রঞ্জিত কুমার ঘোষ। বিখ্যাত 'আটাকাটি' বইতে পড়েছিলাম সে যুগের অর্থাৎ ১৮৮২ সালে, পাত্র একটু দরের হলেই পাত্রপক্ষ হাঁকতেন ২০০০ হাজার টাকা নগদ, সোনার ঘড়িচেন। সোনার বাটি গ্লাস আর রুপোর দান। কন্যাপক্ষরা কেবল পড়ে পড়ে মার খেতেন সে যুগে। রঞ্জিতবাবু কিন্তু কথাটা পুরোপুরি স্বীকার করলেন না। ওঁর বক্তব্য ছিল কন্যাপক্ষের আর্থিক সাচ্ছল্য অথবা কন্যা রাজ রাজড়ার ঘরে জন্ম নিলে, কন্যাপক্ষ বিয়ের রাতেই পাত্রপক্ষের মাথা নিচু করিয়ে ছাড়তেন। রীতিমত কৌতূহল অনুভব করেছিলাম এই কথায়।

সেকালের পাত্রপক্ষের পদে পদে মাথা উঁচু করে চলার দম্ভ কন্যাপক্ষের মনে যে জ্বালা ধরাত তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল তাদের উঁচু মাথা নিচু করার এক অভিনব কৌশল। বিয়ের রাতে বরযাত্রীরা এলেন বর নিয়ে। সেকালের নিয়ম অনুসারে গাড়ি থেকে বরকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত দোতলার নাচঘরে বা অন্য নির্দিষ্ট ফুলের সিংহাসনে। এবার পিছনে আসবেন বরযাত্রীর দল। সদরের বিরাট সিংহদুয়ার বন্ধ করে খুলে রাখা হত দরোয়ান যাবার ছোট দরজা। সুতরাং কন্যাপক্ষের বাড়িতে পদার্পণ মাত্রেই মাথা নিচু হল,

> মিলনে সে আনে ঈর্ষার জ্বালা, বিরহে দহন করে;
> স্পর্শনে করে অবশ এ তনু, দর্শনে প্রাণ হরে,
> পেলেও তাহারে নাহি সুখ, আর গেলেও সে নাহি সুখ–
> এ কি বিচিত্র বল্লভ মোর ভরে আছে সারা বুক!
>
> 'অমরু', 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা
> সম্পাদনা : অবন্তী সান্যাল

তারপর তাঁরা দরজা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন উঠোনে। সেখানে খুব নিচু করে টাঙান হয়েছে সামিয়ানা। বাধ্য হয়ে সকলকে মাথা নিচু করে পার হতে হল উঠোন। এরপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওঁবা যাবেন দোতলার নাচঘরে। সিঁড়ির দুধারে ফুলপরীদের মত একদল বালক বালিকা দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকত এক একটি পাত্র। বরযাত্রীদের সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা করার জন্যে তারা প্রথমে ছিটিয়ে দিত গোলাপ জল, তারপর গলায় পরাত ফুলের মালা, তারপর চন্দন তিলক, হাতে দিত ফুলের তোড়া আর কাঠিতে তুলোয় মাখান আতর। কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটির প্রতিটি সদস্য ও সদস্যা মাথায় খাট, সুতরাং বাধ্য হয়ে তাঁদের গ্রহণ পর্ব চালাতে গিয়ে প্রতিপদক্ষেপে মাথা নিচু করতে হত। অথচ আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা গৌরবের। অতএব অভিযোগ করার কোন সুযোগই পেতেন না বরযাত্রীরা।

আবার একবার বিবাহ বাসর ছেড়ে যাওয়া যাক ভোজন পর্বে। রঞ্জিতবাবু জানালেন তখন অনেক রকম ফল পাওয়া যেত যেমন গাব, কেসুর, তুঁত, পীচ, লকেট ফল ছাড়াও আর একরকম ফল ছিল যার নাম ছিল 'মাংগোস্টিক'। নানারকম চাটনি ছিল, তার মধ্যে একটি অতি সুখাদ্য চাটনি ছিল মেন্তার চাটনি।

'কিন্তু সে সব খাঁটি জিনিসও নেই, আর সে বামবাক্তও নেই।' খুব দুঃখ করে বললেন শ্রীমতী মণিমালা নাগ। বয়সটা ছয়ের কোটায়। জীবনে দেখেছেনও অনেক। বললেন 'দেশ স্বাধীন হয়ে আর কী হল বরং আগেই ছিলুম ভাল। জানো আমরা ছোট বেলায় টাকায় তিনটে ইলিশ মাছ খেয়েছি। কী স্বাদ তার। আর দেখ আমার নাতি নাতনীদের প্রাণভরে মাছ খাওয়াতে পারি না। ৩০/৪০ টাকা করে ইলিশ আর কত কিনব ৭০ দামের গলদা চিংড়িই বা কটা খাওয়াব। আর আমাদের কালে সরষের তেলের সের ছিল চার আনা — তার কী ঝাঁঝ! এক ফোঁটা গায়ে দিলে চোখমুখ জ্বালা করত।' হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন উনি — 'মাছ মাংসের কথা বাদ দাও, এখন একটু নিরামিষ খাই, তা পোস্ত কিনতে গেলেও ভাবতে হয়। যে পোস্তের দাম ছিল তিন আনা — আজ তার দাম ২৮। কী খাব বলতে পার?' কলকাতা শহরে যিনি বেশ কয়খানা বাড়ির মালিক তাঁর মুখে যদি এই বিলাপ, তবে নিম্নবিত্তদের কী খেয়ে দিন কাটে?

উত্তরটা দিলেন একালের বধূ সুধাময়ী হালদার। স্বামী বই বাঁধাইয়ের কাজ করেন। তাই থেকে ছটি পেট চালাতে হয়। ছেলেমেয়েরা সবাই নাবালক। কিছু না দেন, একটু দুধ তো দিতে হবে। আর এইটুকু জোগাড় করতেই তাঁকে একটা বাড়িতে রান্নার কাজ নিতে হয়েছে। মাসে একবার মাংস বা সপ্তাহে একদিন মাছ হল তো অনেক। নয়ত বেশির ভাগ দিন ভাতে ভাত। কয়লার অনেক দাম। তাই কাঠের জ্বালে রান্না করা। তা ভাতও তেমন। সোডা দিয়ে সেদ্ধ করলে একটু নরম হয় আর আলু ২ করে কিলো আলু আর কজন কিনতে পারে ওদের ঘরে — অথচ বেশিদিন আগের কথা নয়। সুধাময়ী দেবী গল্প শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ির কাছে। সে কালে নাকি শ্বশুর মশাইকে ২ টাকার বাজার করতে একটা ধামা নিয়ে বাজার যেতে হত।

রেনুকা দাস কিন্তু একালের নন, সেকালের। তাঁর স্বামী কাজ করতেন ট্রাম কোমপানিতে। টালার কাছে একটু মাথাগোঁজার মত একটা পাকা ঘর ছিল নিজেদের। দেশেও ছিল কিছু জমি জমা। আজ তাঁকে পরের বাড়ি কাজ করে খেতে হয়। বললেন 'জানো মা, আমার স্বামীকে কোমপানি থেকে জলখাবার দিত। সে এত খাবার যে একজনে খেতে পারে না। আমার ঘরে তক্তাপোষের তলায় সারসার খাবার জমা হত। রস গোল্লা, লেডিকেনি, দরবেশ, কচুরি, নিমকি, যত খেয়েছি তত বিলিয়েছি। তখন কি খাবার অভাব ছিল — তবে মাছটা রোজ হত না বটে কিন্তু যেদিন হত দুতিন রকম তো বটেই। আর আজ ....

সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত গ্রামবাসীরা কিন্তু শহরের হাল চাল, বাবুয়ানা, মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। এদের বিবাহ ভোজের আয়োজন ছিল সাদামাটা। লোক লৌকিকতার বালাই নেই, খাওদাও চলে যাও। পেটভরা ভাত মাছ ডাল তরকারি পায়েস মিষ্টির অঢেল ব্যবস্থা। সারাদিন বড় বড় হান্ডায় ভাত ডাল ফুটছে। কোন বাড়ির কর্তার নিমন্ত্রণ মানে তার অতিথি আত্মীয় সবার নিমন্ত্রণ। অতএব সারা দিনভরে চলেছে খাওয়া দাওয়া।

তবে কোন শুভকাজে মাংস বা মুরগি হত না। সে গ্রামেই বা কি আর শহরেই বা কি। তাছাড়া মুরগি তো একেবারে অস্পৃশ্য ছিল। ব্রাহ্মণদের কাছে তো বটেই, কায়স্থরাও কম যেত না। অথচ এখন আর বিয়ে বাড়িতে এসব বাদ বিচার করা হয় না শহরের মধ্যে।—সে যুগের খাওয়া দাওয়া নিয়ে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া গেল। কিন্তু সে যুগের মত এযুগেরও স্তরভেদ আছে। তাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যেও পার্থক্য আছে। বিশেষ করে সেই বিবাহ ভোজের ট্র্যাডিসান যখন চলে আসছে তখন এযুগের ভোজ সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগা আশ্চর্য নয়। এজন্যে এক সন্ধ্যায় দুই ভোজ বিশারদের সংগে সাক্ষাৎ করলাম। আজকাল বিবাহভোজে অনেকেই ক্যাটারার-দের ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। সুতরাং গরিব বড়লোক সবার বাড়ীতেই তাঁদের আনাগোনার অভিজ্ঞতা। এঁদের মধ্যে একজন 'রিজ ক্যাটারারের' মালিক, শংকর বোস। প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করে ছিলাম— 'আমরা দেখেছি, সে যুগের ধনীরা ১০০ রকম পদ করতেন পাকা দেখায়, এখনকার ধনীরা কতরকম পদ করে থাকেন?' শংকর বোস জানিয়েছিলেন — 'প্রথমত, এখন পাকা দেখার জন্যে আলাদা করে অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ হতে চলেছে, দ্বিতীয়ত এ যুগে গরিব বড়লোক সকলেই ১২ থেকে ১৫ রকম পদের মধ্যেই ভোজের আয়োজন করেন। তফাৎটা থাকে 'কোয়ালিটির'। —অর্থাৎ খাদ্যমূল্যের। ঐ দামী খাবারের ওপরই নির্ধারিত হয় মালিকের ঐশ্বর্যের পরিমাণ। ধরা যাক, কোন ধনীর গৃহে ১৫ রকমের রান্নার আয়োজন করা হল। কিন্তু সেই সব পদগুলির প্রত্যেকটিকে বলা যায় কস্টলি আইটেম। যেমন মাটন বা চিকেন বিরিয়ানী, টিকি ভেটকি, ক্রীম [illegible] অথবা [illegible] ফ্রাই, রাশিয়ান স্যালাড, যার জন্যে প্রত্যেক প্লেট পিছু খরচ পড়ে ৩ টাকা করে। চিকেন তন্দুরী, পোনামাছ অথবা চিংড়ি মাছ, আলুবখরার চাটনি ...' মাঝপথে থামিয়ে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আলুবখরা কি দামী?' একটু অবাক হয়ে উনি বললেন, 'নিশ্চয়—, ৮০ কিলো। এতে, ১০০ জন লোকের জন্যে ১০০ খরচ হয়। এরপর আছে সাবুর পাঁপড়, একটাকা দামের সন্দেশ, রাজভোগ। আর আছে আইসক্রীম। প্রত্যেক কাপের জন্যে খরচ পড়ে ৩ টাকা। সবশেষে ফ্রুট স্যালাড। সব চেয়ে দামী আইটেম। প্রত্যেক প্লেটের জন্যে খরচ হয় ৭ টাকা।' বেশ অবাক হলাম সব শুনে, জিগ্যেস করলাম, 'তাহলে প্রত্যেক প্লেটের জন্যে কত খরচ পড়ছে?' উনি বললেন —'তা, ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা পার প্লেট পড়ছে।' বড়লোকদের বাড়িতে মোট অতিথি সংখ্যা সাধারণত ৫০০ থেকে ৮০০ পর্যন্তও হয়, অর্থাৎ শুধু খাওয়াতেই খরচ পড়ছে ২৫ থেকে ৪০ হাজার! অথচ সেকালের ১০০ টি পদের জন্যে মাথাপিছু ৫ টাকাও খরচ হত কিনা সন্দেহ। পূর্ব অভিজ্ঞতার সদ্য সঞ্চয় থেকে হঠাৎ একটি টুকরো ছিটকে বেরিয়ে এল। বললাম 'স্যার কৈলাস চন্দ্র বসুর বড় নাতনী ৮২ বছরের বৃদ্ধা শ্রীমতী পরিমল দের কাছে শুনেছিলাম, ১৯৪০ সালে ভাল ভাদুয়া ঘি-এর দাম ছিল দশ আনা সের, এখন কত?' শংকর বোসের বয়সটা তিনের কোটা পার হয়নি। সুতরাং কথাটা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, 'বলেন কী, দশ আনা সের — মানে মাত্র ৬২ পয়সা — এখন তো ভাল ঘি আমরা কিনি ৪০ টাকা কেজিতে।'

পঞ্চাশ টাকা প্রত্যেক অতিথির জন্যে খরচ করতে পারেন আর কজন? বেশির ভাগই তো মাঝা মাঝি নয় সাধারণের পর্যায়ের মানুষ। সেই সাধারণ থেকে মাঝা মাঝির কথা বললেন 'রেনবো ক্যাটারারের' মালিক শুভাশিস মল্লিক। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'সব চেয়ে কম বলতে কত কমে আপনারা খাবার দিতে পারেন?' উনি একটুও না ভেবে বললেন— '৩০ টাকা। এর কম আর হয় না।' বললাম — 'অর্থাৎ কমদামী খাবারের তালিকা তো? কী কী থাকবে তাতে?' উনি জানালেন —'রাধা

স্বামীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুটিছ আসিয়া আমার পায় —
মন বসেছিল অন্য কোথাও, কিছুদিন তরে ?—কি দোষ তায় ?
পতির বিহনে সতী নাহি বাঁচে, এই কথা আজো সকলে কহে—
আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে,—দোষ তো আমার, তোমার নহে।

ভাবক দেবী/হাজার বছরের প্রেমের কবিতা
সম্পাদনা : অবন্তী সান্যাল

বন্দাভী, আলুর দম, ছোলার ডাল, ফ্রায়েড রাইস, মাংস, ফ্রাই, প্লেন স্যালাড, প্লেন পাঁপড়, সাধারণ চাটনি, সন্দেশ, রসের একটি মিষ্টি আর দই।' 'অর্থাৎ ১২ রকম পদ হচ্ছেই কিন্তু পোনামাছের বদলে ফ্রাই! তবে কি পোনামাছের দাম বেশি পড়ে?' সোজাসুজি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুভাশিসবাবু একটু অঙ্ক কষে বোঝালেন ব্যাপারটা। বললেন 'পোনামাছের কিলো ৪০্। আর সাধারণ ঘরে ২০০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে অতিথির আয়োজন থাকে। ৩০্ করে হলে ২০০ লোকের জন্যে যেখানে খরচ হচ্ছে ৬ হাজার সেখানে পোনা মাছ দিলে আরো ৫ টাকা পাত পিছু বেশি পড়বে। অর্থাৎ ৬-এর জায়গায় হয়ে যাবে ৭ হাজার। আবার যদি চিকেন দিতে হয় তবে আরো বেশি। কেননা বাজারে এক একটা মুরগীর দাম ১৫ টাকা। এরপর কিন্তু আর সস্তা থাকছে না।' শুভাশিসবাবুকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলে উঠলাম 'তাহলে ক্যাটারিং বেশ লাভজনক ব্যবসা বলুন?' উনি উদাসীন ভাবে উত্তর দিলেন, 'এককালে ছিল, কিন্তু জিনিসপত্রের এত দাম বেড়েছে এখন, তাতে লাভ থাকে কতটুকু? থাকার মধ্যে মস্ত দায়িত্ব, চিন্তা আর শারীরিক পরিশ্রম। তার ওপর রয়েছে বয়দের জন্যে খরচ, ন্যাপকিনের খরচ, সোপপেপার ... এবার হিসেব করুন! তারপর কী মনে পড়তে বললেন – 'দাঁড়ান আরো আছে। এখন রান্নার ঠাকুরের রোজ কত জানেন? ৩০ টাকা, আর জোগাড়ে ২৫্। আবার বিরিয়ানী করতে গেলে বাবুরচি রাখতে হয় - ওদের রোজ ১০০ টাকা।'

অথচ আশুতোষ দেবের জ্যেষ্ঠ-পুত্রবধূ শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছিলেন, তিনি ১৯৩৮ সালে রান্নার ঠাকুরকে দিতেন ৮ টাকা, ঝিকে ৪ টাকা, মেথরানীকে ১ টাকা।

কিন্তু এ যুগের এই টাকার খেলায় বিয়ে বাড়ির চেহারাটা কি সেকালের চেয়ে আরও ঝলমলে হয়ে উঠেছে? না, ক্যাটারারদের ইংলিশ, বাংলা ও মুসলমানী রান্না সে যুগের রান্নাকে লজ্জা দিতে পেরেছে? প্রশ্নটা করেছিলাম রায়বাহাদুর ডাঃ গোপাল চন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী অণিমা মিত্রকে। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ইতোমধ্যে তিনি অনেক বিয়ে দিয়েছেন, দেখেছেনও অনেক। কিন্তু...... নাঃ তাঁর আমলের বিয়ে বাড়ির সংগে আজকের অনেক তফাৎ। এযুগের সবটাই আরটিফিসিয়াল –। বাইরের জাঁকজমক চোখ ধাঁধাতে পারে, মন ভরায় না। সেকালের বিয়ে বাড়ির সেই প্রাণচঞ্চলতা এখন কোথায়? কোথায় সেই জমজমাটি ভাব? সেই ভোরের আলো ফোটার সংগে সংগে নহবতের সুরের গভীর মূর্ছনা। সকলের মন উদাস করে দিত। কী যে যাদু ছিল সেই সুরে! বেলা বাড়ার সংগে সংগে কাজের ব্যস্ততার সংগে সানাইয়ের সুর মিলিয়ে শুরু হয়ে যেত হাঁক, ডাক, হৈ চৈ। ভেতরের রান্নাবাড়িতে বা দালানে গোল হয়ে বসত একদল বৌঝি কুটনো কুটতে। পাশেই একটু বয়স্কদের দল শুরু করত কোণাকোণ। পান সাজতে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য - কেউ দিচ্ছে চুন, কেউ খয়ের, কেউ সুপুরি, কেউ মিষ্টি মশলা...... সব কিছু দিয়ে পান সাজার মত সব বয়সের মেয়েদের মধ্যে চলত নানা ধরনের ঠাট্টা, হাসি, সরসতা দিয়ে সাজান আদিরসাত্মক রসিকতা। অল্প বয়সী বৌদের খিল খিল হাসি, বয়স্কাদের ফোগলা দাঁতের মুচকি হাসির ফাঁকে রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ শোনা যেত। অন্যদিকে বার বাড়িতে কর্তাদের হাঁকডাক। উঠোনে সে একদল জোগাড়ের বড় বড় বঁটিতে মাছ কাটা, ওদিক থেকে মশলা পেষার দুমদুম শব্দ। ক্যাটারিং-এর যুগে এসব প্রায় লুপ্ত। তখন বাড়িতেই বসত মিস্টির ভিয়ান-সেই ভাল ঘিয়ের তৈরি গরম পানতুয়ার স্বাদ এখন কোথায়? সবচেয়ে ভাল লাগত বিয়ে বাড়ির গরম লুচি আর মুড়োর ডাল। ভাদুয়া ঘি-এর লুচি আর পুকুর থেকে সদ্য তোলা রুইকাতলার মুড়ো দিয়ে রান্না ডালের সে স্বাদ আর কোনদিন পান নি অণিমা দেবী। আজকাল ক্যাটারিং অনেক ঝমেলা দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় ওদের রান্নাও মডারন ধরনের, লোকবলের অভাবে পানও আজকাল দোকান থেকে আসে। হয়ত তার স্বাদ সে যুগের চেয়ে ভাল, কিন্তু দল বেঁধে কাজ করার সেই আনন্দটা আজ আর নেই। ☐

> বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার
> অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার!
> কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
> 'কাজল-লতা'টি ধরে আছে হাতে,
> করমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই – অলংকার!
> শুনেছি সে রূপ চমৎকার!
>
> মিলনোৎকণ্ঠা/প্রেমের কবিতা
> মোহিতলাল মজুমদার

জ্যো[illegible] চোখে

বিয়ের ফুল কখন ফুটবে ?

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী

নর ও নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে দেশের আবহাওয়া (Climate), অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic condition) এবং সাংসারিক অবস্থা (Domestic condition) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণত পুরুষের ক্ষেত্রে ১৫/১৬ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১১/১২ বৎসর বয়সে যৌনভাবাবেগের উদয় হয়। বিংশ শতাব্দীর আগে নর ও নারীর দেহে যৌনভাবাবেগ উদয় হবার আগেই বিবাহ হত। যুগের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এবং যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে আমাদের জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা সমস্ত কিছুরই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে মেয়েদের আঠারো এবং ছেলেদের একুশ বছরের কমে বিবাহকে 'Child Marriage Restraint Act' অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ধরা হয়।

প্রায় বেশির ভাগ অভিভাবকদের সমস্যা ও দুশ্চিন্তা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে কবে হবে ? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিভাবকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, ছেলে শিক্ষিত, বড় চাকুরে, অথবা মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিত তবুও পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বছরের মধ্যে তাদের বিবাহ হচ্ছে না দেখে তারা হতাশ হয়ে বলছেন 'আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই, সবই অদৃষ্ট, সবই বিধাতার ইচ্ছা'। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে 'Hanging and wooing go by destiny' – জীবনের কোন কিছুকেই accident বলা যায় না। সব কিছুই Pre-destined বা পূর্বনির্দিষ্ট এবং একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমেই জানা সম্ভব জীবনের মূল ঘটনা সকল।

বিবাহের সময় নির্ণয়ের আগে দেখা দরকার বিবাহ আদৌ হবে কি না। যে সকল যোগে বিবাহ হচ্ছ তার আলোচনা করছি।

বিবাহ হবার যোগ

১। যখন সপ্তমস্থান, সপ্তমপতি এবং শুক্র বলবান হয়ে কেন্দ্র/কোণে অবস্থান করে।

২। দ্বিতীয় স্থান, দ্বিতীয়পতি এবং বৃহস্পতি যখন কেন্দ্র কোণে বলবান থাকে।

৩। দ্বিতীয়পতি দ্বিতীয়ে, সপ্তম পতি সপ্তমে এবং শুক্র একাদশে।

৪। দ্বিতীয়পতি তৃতীয়ে অথবা চতুর্থে, সপ্তমপতি কেন্দ্রস্থ এবং বৃহস্পতি লগ্নে।

৫। সপ্তমপতি শুক্রের গৃহে এবং শুক্র লগ্নপতি বা শুভগ্রহের নক্ষত্রে।

৬। সপ্তমপতি কেন্দ্রস্থ, লগ্নপতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে এবং শুক্র দ্বিতীয়ে।

৭। সপ্তমপতি বলবান, লগ্নপতি ও দ্বিতীয়পতির মধ্যে শুভ সম্পর্ক হলে।

বিবাহ কোন বয়সে

বিবাহের বয়সকে সাধারণ ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১। অল্প বয়সে বা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ (৩০ বছরের মধ্যে)

২। দেরিতে বিবাহ (৩০ বছরের পরে)।

সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে বিবাহ যে বয়সেই হোক না কেন কোষ্ঠী বিচারকালে দশান্তর্দশা এবং গোচরের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

অল্প বয়সে বা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ

১। যদি সপ্তমভাব এবং সপ্তম-পতিকে কোন শুভগ্রহ যথাক্রমে বৃহস্পতি, শুক্র শুভগ্রহযুক্ত বুধ পূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করে। সপ্তমপতি বা শুক্রকে শুভগ্রহের নক্ষত্রে থাকতে হবে। এই সূত্রটি আমি বহু কোষ্ঠীতে প্রয়োগ করে অদ্ভুতভাবে মিলতে দেখেছি।

২। লগ্নপতি ও সপ্তমপতি পরস্পর খুব কাছাকাছি থাকলে।

৩। সপ্তমপতি তুংগী (তুংগীবংশের মধ্যে) অথবা স্বগৃহী হয়ে কেন্দ্রস্থ এবং সপ্তমে বৃহস্পতির দৃষ্টি।

৪। চন্দ্র বলবান হয়ে সপ্তমে, বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ এবং সপ্তমপতি দ্বিতীয়ে অথবা চতুর্থে।

৫। শুক্র ও সপ্তমপতি নিজ নবাংশে এবং লগ্নে বৃহস্পতি।

৬। লগ্নপতি ও সপ্তমপতির একত্রে অবস্থান বা ক্ষেত্র বিনিময় হলে।

৭। লগ্নপতি সপ্তমে এবং শুক্র লগ্নে।

৮। শুক্র ও চন্দ্র উর্বর সৃজনীশীল

রাশিতে থাকলে (বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, ধনু ও মীন রাশিকে সৃজনীশীল রাশি বলে। ()

৯। শুক্র দ্বিতীয়ে এবং সপ্তমপতি একাদশে স্থিত হলে।

১০। শুক্র চন্দ্রযুক্ত হয়ে লগ্ন, পঞ্চম, দশম বা একাদশে থাকলে।

১১। শুক্র স্বক্ষেত্রাদি গুণযুক্ত হয়ে কেন্দ্রস্থ এবং সপ্তমপতি কেন্দ্র বা কোণে থাকলে।

১২। দ্বিতীয় ও সপ্তমপতি একাদশে।

১৩। লগ্ন, দ্বিতীয়পতি ও সপ্তমপতি দ্বিতীয়ে।

১৪। শুক্র সপ্তমপতি যুক্ত হয়ে কেন্দ্রকোণস্থ হলে।

১৫। দ্বিতীয়পতি ও একাদশপতির একত্র অবস্থান বা ক্ষেত্র বিনিময় যোগ।

১৬। শুক্র এবং বৃহস্পতি দ্বিতীয়, সপ্তম এবং একাদশে থাকলে

১৭। লগ্ন, দ্বিতীয় বা সপ্তমে শুভগ্রহ থাকলে।

১৮। লগ্নপতি ও সপ্তমপতি পরস্পর তৃতীয় একাদশ, সম সপ্তম বা পঞ্চম নবমে থাকলে।

১৯। লগ্ন ও চন্দ্রের দ্বিতীয়, সপ্তম ও একাদশে শুভগ্রহের প্রভাব থাকলে।

২০। লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম বা একাদশে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে।

অল্প বয়সে বিবাহ প্রসঙ্গে দুটি রাশিচক্র বিশ্লেষণ করছি।

।। রাশিচক্র ১।।

জন্মবৃত্তান্ত ১ মারচ ১৯৫৭, সময় ৫টা ২০ মিনিট সকাল, জন্মস্থান, কলকাতা, বিবাহের তারিখ -- ২৪ মে ১৯৭৮

এই জাতিকার বিবাহ হয় মাত্র ২১ বছর, ২ মাস ২৩ দিন বয়সে। এর জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা কী দেখা যাক। কুম্ভ লগ্নে জন্ম। লগ্নে রবি, বুধ, চন্দ্র ও শুক্র, তৃতীয়ে মঙ্গল, চতুর্থে কেতু, অষ্টমে বৃহস্পতি, দশমে শনি ও রাহু। সপ্তমপতি রবি এবং বিবাহ কারক শুক্রগ্রহ লগ্নে অবস্থান করে সপ্তমস্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করছে। দ্বিতীয় ও একাদশপতি বৃহস্পতির দ্বিতীয়স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ও একাদশপতি বৃহস্পতি সপ্তমপতি রবির নক্ষত্রে অবস্থিত। সুতরাং সপ্তমস্থান, সপ্তমপতি, শুক্র এবং কুটুম্বপতির শুভ অবস্থান এবং দৃষ্টির ফলে জাতিকার অল্পবয়সে বিবাহ সম্ভব হয়েছে। তখন জাতিকার বৃহস্পতির মহাদশায়, কেতুর অন্তরদশায়, শনির প্রত্যন্তর্দশা চলছিল। সপ্তমপতি রবি এখানে শনির গৃহে থাকায় শনির মধ্যে বিবাহ কিছুটা কারকতা আমরা পাই। বিবাহ ঠিক সময় মতই হয়েছিল।

।। রাশিচক্র ২।।

জন্মবৃত্তান্ত : ২৭ আগসট ১৯৫২, সময় রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিট, জন্মস্থান : কলকাতা, বিবাহের তারিখ : ২৮ ফেবরুয়ারি ১৯৭৯। জাতকের মেষলগ্ন, লগ্নে বৃহস্পতি, চতুর্থে বুধ ও কেতু, পঞ্চমে রবি, শুক্র, ষষ্ঠে শনি, সপ্তমে চন্দ্র, অষ্টমে মঙ্গল এবং দশমে রাহু। সপ্তমপতি শুক্র পঞ্চমে পঞ্চমপতি রবিযুক্ত। লগ্নপতি অষ্টমে হলেও স্বক্ষেত্রে অবস্থিত। সপ্তমে চন্দ্র, সপ্তমপতি শুক্র এবং সপ্তমভাবের ওপর লগ্নস্থ শুভ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়ায় অল্প বয়সে জাতকের বিবাহ হয়েছে।

বিলম্বে বিবাহযোগ

জ্যোতিষের সূত্র অনুযায়ী বিলম্বে বিবাহযোগের নির্দেশ আলোচনা করছি।

১। শনি ও রাহু সাধারণত বিলম্বে বিবাহ ঘটায়। শনি বা রাহু সপ্তমস্থানে, সপ্তমপতি অথবা শুক্রের সঙ্গে যুক্ত বা দৃষ্ট হলে বা সপ্তমপতি ও শুক্র শনিযুক্ত বা শনির নক্ষত্রে থাকলে।

২। সপ্তমপতি পাপগ্রহের নক্ষত্রে অবস্থান করে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে অবস্থান করে অশুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্টিপ্রাপ্ত হলে।

৩। লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তমে শনি থাকলে

৪। বিবাহকারক গ্রহ শুক্র এবং সপ্তমপতি স্থির রাশিতে অবস্থান করলে।

৫। সপ্তমপতি বক্রী হলে বা সপ্তমে পাপগ্রহ থাকলে।

৬। লগ্ন বা চন্দ্রের অষ্টমে শনি এবং সপ্তমপতি ষষ্ঠ বা দ্বাদশে অবস্থান করলে।

৭। সপ্তমপতি দুর্বল হয়ে রবির দীপ্তাংশের মধ্যে থেকে শুভদৃষ্টি না পেলে বিলম্বে বিবাহ হয়।

এ প্রসঙ্গে দুটি রাশিচক্র আলোচনা করছি।

।। রাশিচক্র ৩।।

জন্মবৃত্তান্ত : ২১ আগসট ১৯৩২, সকাল ৮টা ৫ মিনিট, জন্মস্থান - কলিকাতা

জাতকের বিবাহ হয় ৩৭ বছর বয়সে। এর জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা কী? কন্যালগ্নে জন্ম, লগ্নের পঞ্চমে বক্রী শনি, ষষ্ঠে রাহু, সপ্তমে চন্দ্র দশমে মঙ্গল ও শুক্র, একাদশে বক্রী বুধ ও দ্বাদশে রবি, বৃহস্পতি ও কেতু। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় সপ্তমপতি বৃহস্পতি দ্বাদশে কেতুর নক্ষত্রে দ্বাদশপতি রবি ও কেতু যুক্ত। সপ্তমস্থানে আবার বক্রী শনি ও রাহুর দৃষ্টি আছে। এই সকল যোগের ফলে জাতকের বিবাহ হয় বিলম্বে।

।। রাশিচক্র ৪।।

জন্মবৃত্তান্ত : ৭ই জানুয়ারি ১৯২৪, বিকেল ৪টে ১২ মিনিট, জন্মস্থান : কলিকাতা

এই জাতকের বিবাহ হয় ৪৪ বছর বয়সে। মিথুন লগ্নে জন্ম। তৃতীয়ে রাহু, পঞ্চমে শনি, ষষ্ঠে বৃহস্পতি, সপ্তমে রবি, অষ্টমে চন্দ্র, বুধ ও বক্রী শুক্র, নবমে কেতু। সপ্তমপতি বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানে অষ্টমপতি শনির নক্ষত্রে অবস্থিত। সপ্তমপতি বৃহস্পতির উভয়পার্শ্বে পাপগ্রহের সমন্বয় হয়েছে। সপ্তমস্থান পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত। চন্দ্রের সপ্তমস্থানে শনির প্রভাব আছে। এই সকল কারণের জন্যই জাতকের বিলম্বে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে।

চিরকুমার যোগ

যে সকল যোগে জাতক বা জাতিকার বিবাহ হয় না তার আলোচনা করছি।

১। লগ্ন, চন্দ্র ও শুক্র এই তিনটির সপ্তমভাব ও ভাবাধিপতি যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত না হয়ে পাপপীড়িত হয় এবং সপ্তমে যদি সপ্তমপতি, শুক্র, ও চন্দ্রের দৃষ্টি না থাকলে জাতক বা জাতিকা চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকে।

২। সপ্তমে শনি পাপপীড়িত হয়ে থাকলে, সপ্তমপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে স্থিত হয়ে দুর্বল হলে বিবাহ হয় না।

৩। সপ্তমপতি শনিযুক্ত এবং সপ্তমে কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকলে বিবাহ হয় না।

৪। লগ্নপতি, চন্দ্র, শুক্র ও সপ্তমপতি দুঃস্থানগত হয়ে পাপপীড়িত হলে বিবাহ হয় না।

৫। সপ্তমে রবি ও শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকলে

৬। পাপগ্রহের রাশিতে সপ্তমভাব হলে এবং সেখানে ক্ষীণ বা পাপপীড়িত চন্দ্র অবস্থান করলে।

৭। দুই বা ততোধিক পাপগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়ে রাহু সপ্তমভাবে থাকলে।

৮। মঙ্গল ও শনির সপ্তমে চন্দ্র ও শুক্র থাকলে।

৯। লগ্ন, সপ্তম ও দ্বাদশে পাপগ্রহের সমাবেশ ঘটলে স্ত্রী বিহীন জীবন কাটাতে হয়।

১০। লগ্ন, সপ্তমপতি ও শুক্র একত্রে যদি মিথুন, সিংহ, কন্যা বা ধনু রাশিতে অবস্থান করলে।

এখানকার প্রত্যেকটি সূত্র আমার পরীক্ষা করা।

বিবাহের বয়স নির্ণয়ের উপায়

বিবাহের বয়স নির্ণয় বিভিন্নভাবে করা যায়। এখানে যে পদ্ধতিগুলিকে গবেষণা করে সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি, সেগুলিই এখানে আলোচনা করব।

গোচর অনুযায়ী বিবাহের কাল নিরূপণ

১। লগ্নপতির গ্রহ যে নবাংশে থাকবে, সেই নবাংশপতির ক্ষেত্রে অথবা সপ্তমপতি এবং শুক্রের ক্ষেত্রে কিংবা লগ্ন থেকে কেন্দ্রে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের গোচর গমনের সময় বিবাহ হবে।

২। লগ্ন বা চন্দ্র থেকে গোচরে বৃহস্পতি চন্দ্র রাশিতে, তার পঞ্চম, সপ্তম বা নবমে থাকলে এবং ঐ সময়ে দশান্তর্দশায় বিবাহ সূচক হলে বিবাহ হবে বলে মনে করতে হবে।

৩। শুক্র ও সপ্তমপতি যে নবাংশ রাশিতে বা ত্রিকোণে বৃহস্পতির সঞ্চারে বিবাহ হতে পারে।

৪। শুক্রের ক্ষেত্রে গোচরে চন্দ্র ও বৃহস্পতি আসলে বিবাহ হতে পারে।

৫। সপ্তমপতির ক্ষেত্রে চন্দ্র বা বৃহস্পতির আগমনে বিবাহ হতে পারে।

৬। লগ্ন, চন্দ্র বা শুক্রের সপ্তম-ভাবকে বৃহস্পতি দৃষ্টি দান করলে।

৭। শুক্রের অষ্টবর্গ চক্রের যে রাশিতে ৫ বা ততোধিক রেখা থাকে ঐ রাশিতেই বিশেষত. ঐ রাশি যদি রাশিচক্রের চন্দ্র ও শুক্রস্থিত রাশির ত্রিকোণ রাশি হয়, বৃহস্পতির সঞ্চারে বিবাহ সম্ভব।

[illegible] ও একাধিপত্য শোধনের পর শুক্র-গ্রহস্থিত রাশির সপ্তমে যত সংখ্যা থাকবে ঐ সংখ্যার সংগে শুক্রের অষ্টবর্গে ত্রিকোণ ও একাধিপত্য শোধনের আগে যে রেখা থাকবে ঐ দুই রেখার সংখ্যা গুণ করে গুণফলকে ২৭ দিয়ে ভাগ করে যা অবশিষ্ট থাকবে ঐ সংখ্যা দ্বারা যে নক্ষত্র হয়, ঐ নক্ষত্রে বৃহস্পতির সঞ্চারে বিবাহ সম্ভব। যদি অবশিষ্ট শূন্য হয় তাহলে শূন্যকে ২৭ ধরতে হবে। প্রসংগত জানিয়ে রাখি যে শুক্লপক্ষে জন্ম হলে অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে গণনা করতে হবে এবং কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র থেকে গণনা করতে হবে।

গ্রহের অংশ কলা থেকে বিবাহের সময় নির্ণয়

১। সপ্তমপতি গ্রহ বা লগ্নপতি গ্রহের স্ফুটরাশির ডিগ্রী মিনিটাদি যোগ করে যে রাশির ডিগ্রী মিনিটাদি পাওয়া যাবে, সেই রাশির ডিগ্রী মিনিটাদিতে গোচরে যখন বৃহস্পতি গমন করবে তখন বিবাহ হবে।

২। সপ্তমপতি ও চন্দ্র যে নক্ষত্রে আছে সেই নক্ষত্রের অধিপতি গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি যোগ করে যে রাশি ও অংশ পাওয়া যাবে সেই রাশিতে তার পঞ্চম, সপ্তম বা নবম স্থানে বৃহস্পতির সঞ্চারে বিবাহ সম্ভব।

[illegible] শুক্রের স্ফুটরাশ্যাদি যোগ করে যে রাশি অংশ পাওয়া যাবে সেই স্থানে বৃহস্পতির গোচরে আসলে বিবাহ হবার সম্ভাবনা আসে।

দশান্তর্দশার মাধ্যমে বিবাহ নির্ণয়

বিবাহের সময় নির্ণয়ের গবেষণা করে দেখেছি রাহু ও শুক্রের দশান্তর্দশায় বিবাহের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। শুক্র বিবাহের কারক ও রাহুকে বিবাহের ঘটক হিসাবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে যে দশান্তর্দশায় সম্ভব তার আভাস দিচ্ছি।

১। সপ্তমপতি গ্রহের অবস্থিত রাশির নবাংশপতি গ্রহ, তারপরে চন্দ্র, শুক্র এবং সপ্তমপতি গ্রহের মধ্যে যে গ্রহ বলবান হবে, সেই গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ হবে।

২। শুক্র থেকে সপ্তমপতি, লগ্ন থেকে অষ্টমপতি গ্রহের এবং সপ্তমপতি যুক্ত ও সপ্তমস্থ-গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ হতে পারে।

৩। লগ্নস্ফুট ও চন্দ্রস্ফুট, লগ্নপতি-স্ফুট চন্দ্রস্ফুট অথবা লগ্নস্ফুট ও দশমস্ফুটের গড় নির্ণয় করে সেই রাশ্যাংশ থেকে নবমপতি অথবা ঐ নবমপতির সংগে যে গ্রহের দৃষ্টি সম্বন্ধ বা অন্য কোন সম্বন্ধ রয়েছে [illegible] নবমস্থানে অবস্থিত গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ হতে পারে। গড় গণনার সাধারণ নিয়ম দেখান হচ্ছে।

লগ্নস্ফুট – চন্দ্রস্ফুট – ২ অথবা লগ্নস্ফুট – দশমস্ফুট – ২। এই দুই স্থানেই গড় (average) নির্ণয় করতে হবে।

৪। শুক্র যে রাশিতে সেই রাশিপতির – দশান্তর্দশায় বিবাহ সম্ভব।

৫। দ্বিতীয়পতি, সপ্তমপতি ও একাদশপতির সম্বন্ধ বিশিষ্ট গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ সম্ভব।

৬। সপ্তমপতি যুক্ত বা সম্বন্ধ বিশিষ্ট গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ সম্ভব।

৭। লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তমস্থ গ্রহের দশান্তর্দশায় বিবাহ সম্ভব। □

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার
চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গ তেলের গুণ তো বুঝছেন।

প্রমিস
লবঙ্গ তেল দিয়ে তৈরী অদ্বিতীয় টুথপেস্ট

আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে ?

সত্যি!
প্রমিসের মত
এমন টুথপেস্ট তৈরী করার
কথা আগে কেউ
ভাবেনি কেন?

CLOVE OIL
The unique toothpaste with time tested
Promise
for healthier teeth and gums fresher breath

প্রমিস

- দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
- মুখে আনে সুস্বাদ, আর
- দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বালসারার উৎপাদন

সুগন্ধ নিঃশ্বাস, ঝকঝকে দাঁত
প্রমিস-এর গুণে আজ
চারিদিক মাত।

CHAITRA-BLS-453-R BEN

সবাই ফরসা চাইলে কালো মেয়ের গতি কী হবে ?

চারলস নিউটন/ধ্রুব রায়চৌধুরী

কয়েক বৎসর আগে একজন নিগ্রো গবেষক ভারতের এক নামকরা সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখেন, 'খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় বিভিন্ন রকম ছবি এবং বিজ্ঞাপনে দেখান হয় যে, ভারতীয় মডেলরা খুব ফরসা। পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন লক্ষ করলেও দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপনদাতা চান পাত্রী যেন অবশ্যই ফরসা হয়। যেসব নায়িকারা একটু ময়লা, তারাও পাউডার মেখে পর্দায় খুব ফরসা হয়ে যান।

'আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ভারতীয় ছাত্ররা কায়দা করে নিগ্রো ছাত্রদের এড়িয়ে চলে এবং সাদা চামড়ার ছাত্রদেরই পছন্দ করে। ভারতে আফরিকার ছাত্ররা যেভাবে থাকে তার সংগে তুলনা করা যেতে পারে কোয়ারিনটাইনের। আর তাদের সংগে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাতে একজন নিগ্রো ছাত্রের ভাষায় চোখে জল এসে যায়।'

সত্যি কথা বলতে কি দক্ষিণ আমেরিকায় যারা 'বর্ণবৈষম্য' নীতি চালু করেন তারা ভারতবর্ষে তাদের জাতভাইদের খুঁজে পাবেন। তবে ব্যাপারটা এই যে, তারা দুটো রঙের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, আর এখানে এক রঙের ভেতরও মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

ফরসা চামড়ার প্রতি এই আকর্ষণের কথা ভেবে দেখলে ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি বর্ণ সচেতন জাতি বলতে হয়। এই লিউকোডার্মা কমপ্লেকস আরও শোচনীয় হয় যখন আমরা দেখি যে, সমাজের সব চেয়ে উঁচু মহলের মানুষ অর্থাৎ বড় বড় নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরাও এর বাইরে নন। এমনকি ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাও বাদ যান না। স্বাধীনতার কয়েক মাস আগে দিল্লির ইম্পিরিয়াল হোটেলে আয়োজিত এক বড়দিনের নৈশভোজে আমি গিয়েছিলাম। ভোজসভার আয়োজন করেন স্যার জে পি শ্রীবাস্তব, খাদ্য দপ্তরের প্রধান এবং ভাইসরয়ের এগজিকিউটিভ কাউনসিলের একজন সদস্য। ভোজসভায় স্যার জে পি লক্ষ্য করেন যে খুব ফরসা এবং সুন্দরী একটি মেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে একজন ভারতীয়র সংগে নাচছেন। তিনি নিজে বেশ ফরসাই, তবু একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন 'মেয়েটির সংগে নাচছে ঐ কালো লোকটি কে?' শুনে আমি রীতিমত রেগে গিয়েছিলাম।

মোটামুটি অভিজ্ঞ সাংবাদিকরাও এই আওতার বাইরে পড়েন না। দিল্লির এক নামকরা দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকমণ্ডলীর জনৈক ব্যক্তির কথা বলা যাক। একবার তিনি তাঁর পরিচিত একজনের ছবি দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'অমুক বাবু কালো হলে কী হবে, সব জায়গায় নাক গলান চাই।'

কারোর কথা বলতে গিয়ে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা না বলে অনেকেই তার বর্ণনা দিতে পারেন না। 'ক' বাবু 'কালো, বেঁটে, সামান্য ট্যারা', 'খ' বাবুর 'মাথায় টাক, দাঁত উঁচু, পেটটি বেশ বড়' 'গ' বাবুর 'পাতলা ঠোঁট, ডান হাত ভাঙা.....' এইভাবেই বর্ণনা করা হয় আরো অনেককে। রঙের ব্যাপারেও সেই একই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। খুব কালো না হলে 'শ্যামবর্ণা' আর একটু পরিষ্কার হলেই ফরসা।

মেয়েদের ক্ষেত্রে ফরসা রঙ হলে তো বিয়ের বাজারে খুব সুবিধা। সৌন্দর্য এখানে মাঝারি রকম ফরসা কিংবা ফুটফুটে ফরসার সমার্থক। একবার আমি একটি সুন্দরী নিগ্রো মেয়ের কথা বলেছিলাম। মেয়েটি লনডনের এক জনপ্রিয় মডেল, শুনে আমার এক বন্ধু বলল, 'সুন্দরী নিগ্রো' কথাটাই পরস্পরবিরোধী।

আমার কাছে একবার একটি মেয়ে খুব গর্ব করে বলেছিল যে, তার বোন 'একেবারে ফুটফুটে ফরসা।' কিন্তু আমি ঐ মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, খুব খারাপ লেগেছিল ওর ভবিষ্যৎ ভেবে, কারণ মেয়েটি 'অ্যালবিনো'।

এমনকি এও জানা যায় যে, বাবা মায়েরাও নিজেদের ছেলেমেয়ের সংগে আলাদা ব্যবহার করেন তার গায়ের রঙের ভিত্তিতে। ফরসা বাচ্চাটিকে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সবাইকে দেখান হয়, কিন্তু ময়লা বাচ্চাটি সবসময় বাড়িতে চাকরবাকরদের কাছে থাকে।

এ জে টয়েনবি তাঁর এ স্টাডি অফ হিস্টরি বইয়ে লিখেছেন, 'ভারতে এখন জাতিভেদ প্রথা বর্ণবৈষম্য নীতির ভিত্তিতে খুব কমই আলোচিত হয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে 'জাতি' বোঝাবার জন্য হিন্দুরা ব্যবহার করত 'বর্ণ' শব্দটি – অর্থ রঙ এবং আসলে জাতিভেদ প্রথা বর্ণবৈষম্য নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

কিন্তু আমেরিকায় শুধু নানা দেশের লোকই আছে তা নয়, নানা রঙের লোকও আছে। যেমন খুব ফরসা, হলদেটে ফরসা, কালো, 'রেড' এবং বাদামী। হলিউডের প্রশংসা করতে হয় এই জন্য যে কয়েক দশক আগে বাদামী চামড়ার নায়ক ভারতীয় 'সাবু' (এলিফ্যানট বয় হিসাবে বিখ্যাত) অনেক বিখ্যাত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পল রোবসন এবং তাঁর সহকারী নিগ্রোরা বিখ্যাত মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। এখনও আমেরিকায় সিডনি পয়টিয়ারের মত কালো চামড়ার নায়কের জনপ্রিয়তা যে কোন সাদা চামড়ার নায়কের থেকে কোন অংশেই কম নয়। কারোর কারোর থেকে হয়ত বেশিই হবে। সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে। কালো চামড়ার কোন অভিনেতা অভিনেত্রীকে তাদের আসল রূপে কি দেখান হয়; অর্থাৎ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভারতে কালো মানুষ থাকেই না।

বেশির ভাগ ফটোগ্রাফার আমাদের এই জাতীয় আসক্তির কথা জানেন। তাই তারা ছবি কমবেশি ডেভেলপ করে নায়ক নায়িকাদের বেশি ফরসা দেখান।

সন্তানসন্ততিহীন মা বাবারা অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চা নিতে চাইলে প্রথমেই বলেন যে 'বাচ্চাটি যেন ফরসা এবং সুন্দর দেখতে হয়।' অথচ সবাই জানেন যে পশ্চিমী দেশগুলোতে অনেকে এশিয়ান এবং আফরিকান বাচ্চা দত্তক নেন। এবং তাদের গায়ের রঙ কিংবা চেহারা আলাদা করে দেখা হয় না।

ফরসা চামড়ার প্রতি এই অস্বাস্থ্যকর আকর্ষণ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, কিছুদিন আগের স্টেটসম্যান পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল '...... প্রেস লিমিটেড স্মারট ফরসা ট্রেনি চায়।' এটাই বোঝা গেল যে কালো হলে স্মারট হওয়া যায় না। দক্ষিণ আফরিকার কোন কাগজে এই রকম বিজ্ঞাপন ছাপার কথা চিন্তা করা হবে কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় টাইপিসট এবং স্টেনোগ্রাফার চাই – অবশ্যই ফরসা এবং সুন্দরী হতে হবে। সাজানর জিনিস হিসাবে তারা তাদের চায়, যোগ্যতার ব্যাপারটা কিছুই নয়।

পাত্র–পাত্রী বিভাগে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে পাত্রীর ফরসা হওয়া সবচেয়ে জরুরী। এই ধারণার ফলে কালো মেয়ের মা-বাবা অনেক সময় কায়দা করে মেয়ের বিয়ে দেন। আমার এক বন্ধু অকসফোরডের গ্র্যাজুয়েট, এখন এখানে এক কলেজের অধ্যাপক। বিয়ের ব্যাপারে সে প্রচলিত রীতিই মেনে নেয়। কিন্তু পরে লক্ষ্য করে যে, প্রথমে সে যে মেয়েটিকে দেখেছিল সে ফরসা এবং সুন্দরী ছিল, কিন্তু যার সংগে তার বিয়ে হয় সেই মেয়েটি কালো এবং আদৌ সুন্দরী নয়। কিন্তু মেয়ের মা-বাবা বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের চেনা জানার পরিধিও বেশ বড়, তাই কোন রকম প্রতিবাদ করা যাবে না।

খবরের কাগজের সম্পাদকেরা যদি ঠিক করেন যে, তারা এমন কোন কথা লিখবেন না যাতে কারো গায়ের রঙ বা চেহারার কথা বলা হয়, তাহলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রঙের মানুষ আছেন – ফরসা, আদি বাসিন্দা বা 'ইনডিয়ান', নিগ্রো, মংগোলিয়ান দেশ থেকে যাওয়া বিদেশি, মেটিজো বা সংকর জাতি। গায়ের রঙের কথা এরা কেউই আলাদা করে ভাবেন না। সবাই সেখানে ব্রাজিলিয়ান, আরজেনটাইন বা চিলির অধিবাসী বলেই নিজেদের পরিচয় দেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও নানা জাতির লোক আছেন, দেশের দুই প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের চেহারা এবং গায়ের রঙে যথেষ্ট ফারাক, কিন্তু তারা সবাই নিজেদের সমান বলেই ভাবেন। সবাই সোভিয়েতবাসী।

পৃথিবীতে যদি শুধু কালো কিংবা শুধু ফরসা লোক থাকত তাহলে বড় একঘেয়ে হয়ে যেত সব কিছু। এই বৈচিত্র্য আছে বলেই এখানে নিজস্ব গুণই গায়ের রঙের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমান সমাজে বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

পদ্মা খাস্তগীর

ইসলাম ধর্মীয় যারা তাদের ক্ষেত্রে বিবাহ অথবা 'নিকা' কোন সংস্কার নয়, এক চুক্তিগত ব্যাপার, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল সন্তান উৎপাদন ও সেই সন্তানদের বৈধতা দান করা। এই বিবাহের অধিকার এবং কর্তব্য এই চুক্তিগত সম্বন্ধের উপর অধিষ্ঠিত। যে কোন ইসলাম ধর্মীয়, যিনি বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌছেছেন, তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন। অবশ্য যিনি নাবালক এমনকি যাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে তাঁরাও অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন। নিজের অনুমতির বিরুদ্ধে কোন বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে সেই বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হয়। বিবাহের জাতক অথবা জাতিকা বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌছেছেন কিনা তা নির্ভর করবে তথ্য ও সাক্ষ্যর উপরে। সাক্ষ্যর অভাবে ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হলে জাতক অথবা জাতিকা সেই বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌছেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতীয় সাবালকত্ব আইন ১৮৭৫ সালের ইসলাম ধর্মীয়দের বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইসলাম ধর্মীয় মহিলা যিনি ১৮ বছরের নিম্নবয়স্কা, তিনি স্বয়ং অভিভাবক ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। হেদায়াতে বলা হয়েছিল যে পুরুষের ক্ষেত্রে ১২ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৯ বৎসর সর্বনিম্ন বয়ঃসন্ধিক্ষণের বয়স হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

বিবাহ অথবা নিকার প্রধান অংগ, বিবাহের প্রস্তাব একজন উত্থাপন করবেন। বিবাহের পাত্র অথবা পাত্রী অথবা তার তরফে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন ও সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অন্য পক্ষের তরফ থেকে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর সামনে যাঁরা ইসলাম ধর্মীয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের প্রস্তাব এবং তার সমর্থন একই সময়ে হবে। কোন লিখিত অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, এই বিবাহের উত্থাপন অথবা সমর্থন কোন বিশেষ আকারে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু সাধারণ জীবনে কিছু না কিছু ধর্মানুষ্ঠান হতে পারে। মহান ধর্মপ্রাণেরা নিকা অথবা বিবাহকে তাঁর সুন্নত হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং সুন্নতের যে ধর্মীয় এবং সামাজিক গুরুত্ব আছে তারা বিবাহকে সেইরূপ গুরুত্ব দেন। সুতরাং বিবাহ চুক্তিগত ব্যাপার এবং বিবাহের আনুষ্ঠানিক কোন ব্যাপার না থাকলেও ইসলাম ধর্মীয়দের জীবনে বিবাহকে শুধুমাত্র চুক্তিগত ব্যাপার বলে লঘুত্ব দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষে মুসলমান বিবাহকে 'সাদি' 'বিয়া' অথবা 'খান আবাদী' হিসেবে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। বিবাহ জীবনের অংগ। 'মুতা' বিবাহ যা এক বিশেষ সময়ের জন্য চুক্তিগতভাবে হয়ে থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে 'অস্থায়ী বিবাহ' বলে গণ্য করা হয়। মুসলিম আইনের যে বিশেষ বিশেষ সমর্থক যেমন হানাফি, সাফি ও ইসমাইলি মতবাদ আছে তাঁরা কিন্তু এই অস্থায়ী বিবাহকে সমর্থন করেন না। কিন্তু ইতনা আসারী মতবাদীরা এই অস্থায়ী বিবাহ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন, তবে ভারতবর্ষে তাঁদের সমর্থক খুবই কম। অস্থায়ী বিবাহ এখন নেই বললেই চলে। যে ক্ষেত্রে বিবাহের অনুমতি না নেওয়া হয় অথবা প্রতারণার দ্বারা বিবাহের সম্মতি আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে তিনি বিবাহের পরে তাকে মেনে নিতে পারেন প্রকাশ্যভাবে অথবা অপ্রকাশ্যে সহবাসের মাধ্যমে। অবশ্য বলপূর্বক সহবাসের দ্বারা কিন্তু সেই বিবাহকে মেনে নেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না। বিবাহের জাতক জাতিকা যিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে অক্ষম সেখানে বিবাহের অভিভাবক বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেন। যিনি নিজে বিবাহ করতে অক্ষম তিনি অন্যের বিবাহের অভিভাবক হতে পারেন না। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, খুল্লতাত, মাতা, পিতামহী, মাতামহী, মাতামহ ভগিনী, পিতার ভগিনী, মাতার ভ্রাতা, মাতার ভগিনী যে কেউ বিবাহের অভিভাবক হতে পারেন হানফি মতবাদ অনুযায়ী। কিন্তু সাফি বা ইতনা আসারী মত অনুযায়ী শুধু পিতা ও পিতামহ নাবালকের বিবাহের অভিভাবক হতে পারেন। ইসলাম ধর্মের বিবাহে কোন কন্যা দানের অনুষ্ঠান নেই। সেক্ষেত্রে বিবাহের অভিভাবকের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পন্ন হয়, অভিভাবকের মধ্যস্থতায় বিবাহের পরেও যেক্ষেত্রে নাবালক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় বিবাহের পরে সে ক্ষেত্রেও তার মতদান করতে পারেন।

ইসলাম ধর্মানুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হলে সেই বিবাহের পাত্র ও পাত্রী ভারতীয় সাবালক আইন লংঘন করলেও সেই বিবাহ অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু Child Marriage Restraint Act, 1929 যা ১৯৭৮ সালে সংশোধিত হয়েছে, সেই আইন সর্বভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং ইসলাম ধর্মীয়রা সেই আইন দ্বারা পরিচালিত হবেন। এই সংশোধিত আইনের মতে যে কোন পুরুষ ২১ বছরের নিচে এবং যে কোন মহিলা ১৮ বছরের নিচে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলে সেই বিবাহকে এই আইনের বলে Child Marriage অথবা নাবালক বিবাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। আদালত এই বিবাহের পূর্বে নাবালক বিবাহ আদালতের হুকুমনামা দ্বারা বন্ধ করতে পারবেন এবং যাঁরা এই আইন লংঘন করবেন তাদের কারাবাস ও জরিমানার ব্যবস্থাও করতে পারবেন। শুধু যাঁরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন তাঁরা নয়, বিবাহের অভিভাবক এমনকি যিনি বিবাহ সম্পন্ন করছেন যেমন কাজী ওয়াকিলও দণ্ডনীয় হবেন। কিন্তু বিবাহ এই আইন লংঘন করে সম্পন্ন হলেও সেই বিবাহ যদি ইসলাম ধর্মীয় আইন অনুযায়ী হয় সিদ্ধ তাহলে সেই বিবাহ অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে না।

বিবাহ অথবা নিকায় খিটবা অথবা মাগনী অনুষ্ঠানে বিবাহ অথবা নিকার দিন মাহের (DOWER) কী পরিমাণে লেনদেন হবে প্রভৃতি ঠিক হয়। এই মাগনী হওয়ার ফলে যেটা হিন্দুদের মধ্যে আশীর্বাদ অথবা পাকা দেখা হিসেবে গণ্য হয়, ফলে কোন আইনগত অধিকার স্থাপিত হয় না। সুতরাং এই মাগনী অথবা খিটবা ভংগ হলে শুধু যে দানসামগ্রী আদান প্রদান হয় তা ফেরত দেওয়া হয়। বিবাহের দিন সাক্ষীদের সামনে ওয়াকিলের সম্মুখে বিবাহের সম্মতি গ্রহণ করে কাজী সাহেব অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ সাক্ষীদের সামনে কন্যার কাছে জেনে নেন সেই বিবাহে তার মত আছে কিনা। যিনি নিজে পাঠ করেন তিনি বরের কাছ থেকে তাঁর মত গ্রহণ করে নেন কন্যার অভিভাবক এবং সাক্ষীদের সম্মুখে। বিবাহের মন্ত্র হিসেবে মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরান থেকে খুটবা নিকা পাঠ করা হয়। তার পরে সমবেত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, অভিভাবক নবপরিণীত দম্পতির সুখের জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা জানান। অবশ্য বিবাহের খানা (ওয়ালিমা) সব সময়েই প্রস্তুত থাকে। মুসলমান ধর্মীয় আইনে এই বিবাহ চুক্তিকে লিখিতভাবে রাখবার কোন আইন বা কানুন নেই। মৌখিক বিবাহ আইনসিদ্ধ। কিন্তু কাজী সাহেবরা প্রায় সবসময়ই, যেসব বিবাহ তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাঁরা নিজস্ব উদ্যোগে লিখিতভাবে রাখেন যা তাঁরা বিবাহের দম্পতির, বিবাহের অভিভাবক, সাক্ষী এবং নিজেরা সহিসাবদ করে রাখেন এবং তা হতে নিকানামা তৈরি করেই দুই পক্ষকে দিয়ে দেন। ভারতবর্ষে কোন লিপিবদ্ধ আইন নেই যার বলে মুসলমান বিবাহকে registration করতে বাধ্য করা যেতে পারে। আসাম, বাংলা, বিহার, ওড়িশাতে যে কোন পক্ষ এই বিবাহকে ইচ্ছাকৃতভাবে রেজিসট্রি করতে পারেন।

বিবাহ তিন প্রকারের। বৈধ (সহি) অবৈধ (বাতিল) অথবা ফাসিদ (irregular - অনিয়মিত)। সাক্ষীর অভাবে বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে না, - শুধু অনিয়মিত বলে

বিবেচিত হবে।

এক মুসলমান পুরুষ এক সংগে চার বার দার পরিগ্রহণ করতে পারেন। যদি পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেন, চার স্ত্রী থাকাকালীন সেই বিবাহ অবৈধ হবে না, তবে অনিয়ম মাফিক হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু মুসলমান মহিলা স্বামী থাকতে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষের সংগে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন না। তিনি যদি স্বামীর জীবদ্দশায় ও বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হয়ে অন্য কোন পুরুষের সংগে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন তবে সেই বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে। এমনকি তিনি ভারতীয় ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হবেন এবং সেই অবৈধ বিবাহের সন্তানেরা জারজ হবেন এবং পরে তাদের বৈধ সন্তান বলে স্বীকৃতি দেওয়া চলবে না।

মুসলমান মহিলারা স্বামীর সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন ভারতবর্ষে Muslim Marriage Dissolution Act-এর দৌলতে।

স্বামী নিজের খুশি মত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেন আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে অথবা দুজনে উভয়ের সম্মতি ক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত না হয়ে। তাছাড়া আদালতের সাহায্যে তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। স্ত্রী কিন্তু স্বামীর অমতে তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন না যেখানে না তারা চুক্তিগতভাবে সেই শর্তে অধিকার করে থাকেন বিবাহের পূর্বে অথবা পরে। অবশ্য আদালতের মারফৎ স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

স্বামী 'তালাক' দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। উভয়ের সম্মতিতে যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাকে 'খুল্লা' বলা হয় – আর যা চুক্তিগতভাবে সম্পন্ন হয় তাকে মুবারত বলা হয়। যে কোন মুসলমান স্বামী যিনি সুস্থ মস্তিষ্কের ও যিনি বয়োসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেন যে কোন সময়ে, কোন কারণ না দর্শিয়েই।

তালাক লিখিত বা অলিখিত দুভাবেই হতে পারে। তালাক উচ্চারণের কোন বিশেষ নিয়ম নেই। মাত্র মুখ থেকে এই কথা নিঃসৃত হলে, যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার কোন উদ্দেশ্য না-ও থাকে তাহলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। স্ত্রীর উপস্থিতিতে তালাক উচ্চারণ করতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। তার নাম উল্লিখিত হলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

লিখিতভাবে যাকে তালাকনামা বলা হয়, সেক্ষেত্রে পূর্বের তালাককে লিপিবদ্ধ করা হয় অথবা সেই তালাকনামার দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটান হয়, সেই তালাকনামা কাজী অথবা স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন সাক্ষীর সামনে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। তালাক তিন প্রকারে দেওয়া হয়। যার ফলও ভিন্ন। স্বামী আবার এই তালাক দেওয়ার ক্ষমতাকে অন্যের উপর দিতে পারেন। যিনি স্বামীর হয়ে তালাক দেবেন। এমনকি স্ত্রীর ওপরেও সেই ভার ন্যস্ত করতে পারেন।

Muslim Marriage Dissolution Act 1939 এর দৌলতে স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ না করলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। স্বামীর মুখ থেকে তালাক কথাটি বেরিয়ে এলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। যদিও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের পীড়াপীড়িতে অথবা অযথা পিতার নির্দেশে তা করে থাকেন। মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে যদি তিনি তালাক স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন সে ক্ষেত্রেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে। এমনকি হাস্যকৌতুক করে উচ্চারিত হলেও।

আবার দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে চার মাস যাবৎ বিরতি থাকলেও কোন শপথ নিয়েও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। যাকে 'ইলা' বলা হয়। আবার যে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে তাঁর মাতা অথবা নিকট কোন আত্মীয়া বলে সম্বোধন করেন সে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী অনুতাপ অথবা অনুশোচনা না করা পর্যন্ত নিজেকে স্পর্শ করতে অপারগ হতে পারেন। অনুশোচনা না করলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এই বিবাহ বিচ্ছেদকে 'জিহার' বলা হয়। পূর্বে ইসলাম পরিত্যাগ করলে বিবাহ সহজাতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, কিন্তু Muslim Marriage Dissolution Act-এ বলে, স্ত্রী ধর্মান্তরিত হলেই বিবাহ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত হলে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

Dissolution of Muslim Marriage Act ১৯৩৯ সালে প্রবর্তিত হয় যার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানর অনেক সুখ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে, যেমন যেক্ষেত্রে স্বামীর চার বছর ধরে কোন খোঁজ খবর না পাওয়া যায়, যেক্ষেত্রে স্বামী দু বছর কাল পর্যন্ত স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে অপারগ, স্বামী সাত বৎসর পর্যন্ত কারাবাসে অভিযুক্ত, বিনা কারণে দাম্পত্য কর্তব্য পালনে স্বামী বিমুখ, স্বামীর নপুংসকতা, স্বামীর মস্তিষ্কের বিকৃতি, অত্যাচার, তাছাড়া ইসলাম ধর্মীয়দের নিজস্ব আইনের বলেও স্ত্রী স্বামীর সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হবেন। ইসলাম ধর্মীয় নিজস্ব আইনে খোরপোষের যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, ভারতীয় ফৌজদারী আইনের Criminal Procedure Code-এর ১২৫ ধারায় যে খোরপোষের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে না, উপরন্তু যদি সেই নিজস্ব আইন দ্বারা ভরণপোষণ দেয়া না হয় তবুও আদালত ১২৫ ধারা অনুযায়ী–৫০০/- টাকা সর্বোচ্চ হারে খোরপোষের ব্যবস্থা করতে পারবেন। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে স্ত্রী 'ইদ্দত' কালীন সময় পার হয়ে গেলে আবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন। 'ইদ্দত' বলতে তিন মাস কাল স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পরে অথবা স্বামীর মৃত্যুর পরে চারমাস সংযমে থাকবেন, ভবিষ্যতে তাঁর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে যাতে কোন বাদ বিসংবাদ না ঘটে। অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় কিংবা স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকেন তাহলে সন্তানের জন্মগ্রহণের পরে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে চারমাস দশদিন সংযমে থাকতে হবে।

তাছাড়া নিকট আত্মীয়র সংগে অথবা বিবাহসূত্রে যে আত্মীয়তা হয় সেক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই আত্মীয়ের সংগে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাছাড়া আবার পালিত পরিবারেরও কয়েক ক্ষেত্রে আত্মীয় এবং আত্মীয়ার সংগে বিবাহ নিষিদ্ধ। আইনসিদ্ধভাবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং তাঁর প্রাপ্য টাকা (DOWER) স্বামীর কাছে দাবি করতে পারেন কিন্তু তাঁর দিক থেকে তাঁর স্বামীর প্রতি আনুগত্য থাকা দরকার, স্বামীর দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা প্রভৃতি। অবৈধ বিবাহ বিবাহ হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং বিবাহ সংক্রান্ত কোন অধিকার স্থাপিত হয় না এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা জারজ হিসাবে গণ্য হয়।

আইনসিদ্ধভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে কি হয়নি, যেক্ষেত্রে সাক্ষী সাবুদ নেই সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর একত্র স্বামী স্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল ও স্থায়ীভাবে বসবাস, স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে স্বামী নিজ সন্তান গণ্য করে মেনে নিলে তাছাড়া স্বামী যেখানে তাঁর স্ত্রীকে বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে মেনে নেন সেক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হবে তাঁরা নিশ্চয়ই আইনসিদ্ধভাবে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। □

আলোকচিত্র : রাজীব বসু

আপনারা কতখানি আদর্শ দম্পতি ?
নিজেরাই নিজেদের নির্বাচিত করুন

দাম্পত্য জীবনে সুখ এক অবিমিশ্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। তা অবাঙমানসগোচর। কিন্তু তবুপ্রচলিত কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা থেকে আপনি নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন আপনারা কতখানি আদর্শ দম্পতি। আপনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরে একটি করে টিক দিন। প্রত্যেকটি টিকের একটি করে মান বা ভ্যালু দেওয়া আছে। পরে মানগুলি যোগ দিন। ফলাফল শেষে দেখুন।

১। আপনারা কি প্রতিবছর বিবাহবার্ষিকী পালন করেন ? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

২। স্বামী-স্ত্রী একত্র নিমন্ত্রিত হলে দুজনেই কি একসংগে নিমন্ত্রণে যান ? (ক) হ্যাঁ (খ) মাঝে মাঝে যাই (গ) কখনই যাওয়া হয় না।

৩। আপনার স্ত্রী/আপনার স্বামী কি আপনাকে উপহার দেন ? (ক) হ্যাঁ, নিয়মিত (খ) মাঝে মাঝে (গ) উল্লেখ করার মত কিছু নয়।

৪। আপনার স্ত্রী/স্বামীর প্রতি আপনি মানসিক দিক থেকে কতখানি নির্ভরশীল ? (ক) অনেকখানি (খ) যৎসামান্য (গ) একদম নয়।

৫। আপনি কি সুযোগ পেলেই অন্যের কাছে আপনার স্বামী/স্ত্রীর প্রশংসা করেন ? (ক) হ্যাঁ (খ) তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয় (গ) না।

৬। আপনি কি আপনার স্ত্রী/স্বামীর জন্মদিনের কথা মনে রাখেন এবং ওইদিন কোন বিশেষ উপহার দেন ? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

৭। আপনি কি আপনার ছেলেমেয়েদের কাছে আপনার স্ত্রীর/স্বামীর নিন্দা করেন ? (ক) না (খ) হ্যাঁ।

৮। আপনাদের কি মনে হয় পুনবায় বিবাহের সুযোগ পেলে আপনার বর্তমান স্বামী/স্ত্রীকেই আবার বিবাহ করবেন ? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

মান :

প্রশ্ন ১ ক - ১০, খ - ০
প্রশ্ন ২ ক - ১০, খ - ৫, গ - ৩
প্রশ্ন ৩ ক - ১০, খ - ৮, গ - ০
প্রশ্ন ৪ ক - ১০, খ - ৭, গ - ৫
প্রশ্ন ৫ ক - ১০, খ - ৬, গ - ০
প্রশ্ন ৬ ক - ১০, খ - ৫
প্রশ্ন ৭ ক - ১০, খ - ২
প্রশ্ন ৮ ক - ১০, খ - ৫

উত্তর : ৭০ ৮০ হ্যাঁ, আপনারা নিঃসন্দেহে আদর্শ দম্পতি। ৬০--৬৯ আপনার দাম্পত্য জীবন মোটামুটি। ৬০ এর নিচে আপনার দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। □

আলোকচিত্র : সলিল রায়

জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলনে কার লাভ হল?

শ্যামল বসু

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে এ রাজ্যের ডাক্তাররা, বিশেষত তরুণ ডাক্তাররা, বেশ কয়েকদিন ধরে ধর্মঘট ডেকেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা জগতে এর ফলে এক অরাজকতার অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ধর্মঘটী এবং ধর্মঘটবিরোধী উভয়পক্ষই সমস্যার সমাধানের চেয়ে বরং পরস্পরকে পেশি প্রদর্শন করাটাই বেশি পছন্দ করছিলেন।

সে ধর্মঘট আপাতত মিটেছে। এখন ঠাণ্ডা মাথায় এর ফলাফল নিয়ে ভাবতে বসলে দেখা যাবে রাজনৈতিক কয়েকটি প্রশ্নই এর থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র, আর কিছু নয়। একথা সত্যি কলকাতার মত শহরের হাসপাতালগুলিতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ই সি জি এক্সরে বা রক্ত পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতিমত তা হয়ত এবার হবে। আর গ্রামাঞ্চলের হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কথা না তোলাই ভাল। সেখানকার রোগীরা প্রত্যেকটি হাসপাতালকেই মনে করেন মৃত্যু ফাঁদ।

এর সঙ্গে আছে রোগীদের জন্য সরবরাহ করা পথ্য এবং ওষুধপত্রের অবস্থা। ধর্মঘট মিটে যাবার আগে যার যে অবস্থা ছিল এখনও তাই ই আছে। সরকারি মহলের বক্তব্য, এত তাড়াহুড়ো করে এসব সমস্যার সমাধান করা যায় না। সব কিছু ঠিকঠাক করতে সময় লাগবে।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন এবং কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে পূজোর আগে পর্যন্ত বহু ঘটনা ঘটে গেছে, বহু অঘটনও ঘটেছে। হাসপাতালগুলির সুপার ঘেরাও কোন নতুন ঘটনা নয়। গত কয়েক বছরে এদৃশ্য সাধারণ মানুষ খবরের কাগজের পাতায় বহুবার দেখেছেন। কিন্তু হাসপাতালের মধ্যে পুলিশের লাঠি চার্জ এটা একেবারে নতুন ব্যাপার বলা যায়। তরুণদের প্রতি প্রবীণ মন্ত্রীর বেয়োনেট-এর হুমকিও নতুন। আর সেই সঙ্গে আছে ডাক্তারদের কর্মবিরতির জন্য কয়েকজন রোগীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনাও। হাসপাতালে এমন কি জরুরী চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না!

এ-আন্দোলন মূলত ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের। পরে তাঁদের সঙ্গে হেলথ সারভিস এবং ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণ ডাক্তাররাও এসে যোগ দেন। আন্দোলন তখন তুঙ্গী অবস্থায় ওঠে এবং সরকার পক্ষ হয়ে পড়ে চূড়ান্ত রকম বিপর্যস্ত।

আন্দোলন সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে এ রাজ্যের ডাক্তাররা অন্তত বৃহত্তম দল সি পি আই (এম) এর সঙ্গে নেই। দলের ছাত্রমঞ্চ স্টুডেনটস ফেডারেশন অব ইনডিয়াও ডাক্তারি ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

জুনিয়র ডাক্তারদের ছিল ১৮ দফা দাবি। এর মধ্যে বেতন এবং ভাতা বাড়ানর প্রসঙ্গও রয়েছে। কিন্তু ১৮ দফা দাবি যে মূলত অর্থনৈতিক দাবি এমন মনোভাব সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে প্রচার করতে পারেনি রাজ্য সরকার কিংবা সি পি আই (এম) দল। যদিও সুযোগ তারা কম পাননি। আবার 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট' ব্যাপারটিও জনসমর্থন পায়নি। অথচ জুনিয়র ডাক্তাররা ৪ অক্টোবরের পর থেকে ঐ বিষয়টির ওপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন এবং আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রাজ্যের তরুণ ডাক্তাররা এর আগে গত বছর এবং বর্তমান বছরের প্রথম দিকে দফায় দফায় নানা আন্দোলন করেছিলেন। সে সব আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এবারের কর্মবিরতি এবং আন্দোলনে সাধারণ মানুষ গোড়ায় ততটা সমর্থন জানাননি। সি পি আই (এম) দলগত ভাবে যখন এটিকে প্রেসটিজ ইস্যু করে তোলে তখনই সমর্থনের একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। বলা যায়, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নয়, আন্দোলন বিরোধীদের অতি উৎসাহ মানুষের মনোভাব কর্ম বিরতির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

উপরে বাঁদিকে : আন্দোলনে জুনিয়র ডাক্তাররা

আন্দোলনের বিরোধিতায় সি পি আই (এম) মহিলা সমিতি

ইমারজেনসি বিভাগ বয়কট করার ফলে আর জি কর বা এন আর এস-এর সামনে আর্ত রোগী এবং উদ্বিগ্ন আত্মীয় পরিজনের যে ভিড় জমে ওঠে তা দেখে সাধারণ মানুষ ধর্মঘটী জুনিয়রদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। বিকসায় বসে থাকা বা মুমূর্ষু মাটিতে শুয়ে/থাকা রোগী বা আত্মীয় পরিজনের কাতর আবেদনেও সাড়া দেননি ধর্মঘটী তরুণ ডাক্তাররা। বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালে মরণাপন্ন কচি বাচ্চাটিব নাকে পর্যন্ত কেউ অকসিজেনের নলটি ধরে দিয়ে তার প্রাণ বাঁচাননি, একথা সত্যি। আর এই নিদারুণ সত্যের স্বরূপ কী সে কথা পত্রিকার করে সাধারণ মানুষের কাছেই বলার দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে এইসব তরুণ ডাক্তারদেরই।

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে পুলিশ জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর লাঠি চালিয়েছে। তাতে কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন বলেছেন, আমরা চাইনি বিনা চিকিৎসায় কোন রোগীর মৃত্যু হোক অথবা কেউ চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যান।

অথচ পরবর্তীকালে দেখা গেল এমন কয়েকজন হঠকারী ডাক্তার আন্দোলনের নেতা হয়ে গেলেন যাঁদের জন্য ক্ষতি হয়েছে অনেকখানি। চিকিৎসা জগতের তো বটেই, স্বয়ং ডাক্তারদেরও সেটা হয়েছে। ঐ আহত ডাক্তার মন্তব্য করেছিলেন, হাজার হাজার রোগী যে এভাবে বিনা চিকিৎসায় অসহায় হয়ে পড়বেন একথা অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমার কখনও মনে হয়নি।

এই আন্দোলন যে এত ভয়াবহ হবে এটা জুনিয়ার ডাক্তাররাও আগে থেকে অনুমান করতে পারেননি। বস্তুত এ আন্দোলন তাদেরও কিছুটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।

হাসপাতালে সুচিকিৎসার পরিবেশ গড়ে তোলার দাবিগুলি সম্পর্কে কারোর কোন অনীহা, বিরোধিতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর আমলা আর কিছু

[illegible]		
[illegible] কলেজ হাসপাতাল	[illegible]	[illegible]
স্টেট হাসপাতাল	[illegible]	[illegible]
জেলা হাসপাতাল	[illegible]	[illegible]
মহকুমা হাসপাতাল	[illegible]	
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র [illegible]		[illegible]
সাবসিডিয়ারি হেলথ		
সেন্টার	[illegible]	[illegible]
গ্রামীণ হাসপাতাল	[illegible]	[illegible]
মোট সংখ্যা	[illegible]	[illegible]

অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে 'নয়া অভিজ্ঞ' কিছু ডাক্তারই বিষয়টির বিরোধিতা করে চলেছেন। এরা কেউ সরাসরি সামনে আসেন না, আড়ালে আবডালে থেকে আড়কাঠি নাড়েন। বর্তমান জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের নেতৃত্বকেও তারাই প্রভাবিত করে ফেলতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশেষ করে সি পি আই এর একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা সরকার বনাম জুনিয়ার ডাক্তারের অচলাবস্থা মেটাতে জ্যোতিবাবুকে সাহায্য করেছিলেন। এই নেতা বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে দেখতেও গিয়েছিলেন। যদিও সি পি আই-এর এককভাবে কোন সক্রিয় আন্দোলন করার ক্ষমতা এ ব্যাপারে নেই তবুও ঐ অসুস্থ নেতাটির ব্যক্তিগত প্রভাব ডাক্তার মহলের এক

চিকিৎসকের সংখ্যার হিসাব (১৯৮[illegible])
[illegible]
[illegible] ১৯৮০।
[illegible]
[illegible] ২,৫৮০।
[illegible] করতে পারেন না : [illegible]
[illegible] হাসপাতালে বেড পিছু ৪২৫ জনের চিকিৎসা সম্ভব। [illegible] ক্ষেত্রে বেড পিছু ২১০৫ জনের চিকিৎসা [illegible]।

অংশকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করেছিল। সেই সঙ্গে বলা যায়, বামফ্রন্টের অপর শরিক দল আর এস পি ও ফয়সালায় রীতিমত সাহায্য করেছিল। রাজ্য সরকারকে পদত্যাগের হুমকি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কাবু করতে পারেনি। আর দুতরফেরই মুখরক্ষা করা সমঝোতা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৬০,০০০ বেডের জন্য ডাক্তারের সংখ্যা ৭,০০০ হাজারের মত। এছাড়া প্রত্যেক বছর বাড়ছে ৭৫০ হিসেবে গড়ে ১,৪০০ এর মত জুনিয়ার ডাক্তার আর ইনটার্নির সংখ্যা। গড়ে বছরে ৩ কোটির মত লোক হাসপাতালগুলির বহির্বিভাগের চিকিৎসার সুযোগ নেন। এর মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক কলকাতার হাসপাতালগুলির বহির্বিভাগে আসেন। বছরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ইনডোরে ভর্তি হন।

ভারতের জনস্বাস্থ্য		জনসংখ্যার শতকরা ভাগ
দারিদ্র্য সীমার নিচে	:	৪৭ ভাগ
৫ বছরের নিচে শিশু		
ও মা [illegible] ভুগছেন		৫০ ভাগ
অপুষ্টিতে ভুগছেন	:	৬৮ ভাগ
পুষ্টির অভাবে অন্ধত্ব	:	৪০,০০০ প্রতিবছরে
শিশুমৃত্যুর গড় হার	:	১২৯ প্রতি হাজারে

কলকাতার হাসপাতালগুলিতে বছরে গড় হিসেবে ৬ লক্ষ ৭০ হাজারের মত রোগী ইনডোরে চিকিৎসার সুযোগ পান।

সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির প্রাথমিক দায়িত্বে থাকেন যারা তারা মেডিকেল অফিসার বলে পরিচিত। এর ওপরে সিনিয়র তার ওপরে ক্লিনিকাল টিউটর ডেমোনস্ট্রেটর। এর উপরে থাকেন রেজিস্টার যারা পদমর্যাদায় রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান বা রেসিডেন্ট সারজেন। এই সঙ্গে প্রায় সমান দায়িত্ব নিয়ে কিছু পার্ট টাইম ডাক্তারও থাকেন। এই স্তরের ওপর অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর, প্রফেসর এবং সুপার। সুপারই হচ্ছেন হাসপাতালে কাজকর্মের সর্বময় কর্তা। হাসপাতাল পরিচালনার জন্য এরা সকলেই ওয়েস্ট বেংগল হেলথ সারভিসের আওতাভুক্ত। এঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের হাসপাতালে পুরো সময়ের ডিউটি। বাইরে পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করার অধিকার এঁদের নেই।

রাজ্য সরকারের প্রস্তাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ প্রতি ১,০০০ মানুষ পিছু হেলথ গারড-এর পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ প্রতি ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার জন পিছু একজন সুপারভাইজার। প্রতি ৩০ হাজার লোক পিছু সাবসিডিয়ারি হেলথ সেনটার, প্রতি ১ লাখ জনপিছু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কথা আছে। এই পদগুলিতে রাজ্য সরকারের ৬টি কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস থেকে পাশকরা ডাক্তাররা চাকুরি করবেন। অন্য পদগুলিতে রাজ্য সরকার ট্রেনিং দিয়ে কিছু লোক নিয়োগ করবেন। রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক অবস্থাতেই যাতে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেক্ষেত্রে কিছু ওষুধপত্রও রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে আঞ্চলিক স্তরে ব্যবহার করবেন।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এখন কী বলছেন ?

পৃথিবীর কোন দেশের হাসপাতালই [illegible] নয়; সব জায়গাতেই কোন না কোন ঘাটতি দেখা যায়। একথা বলেছেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র। বর্তমান সরকারি হাসপাতালগুলির যে অবস্থা চলছে তার কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন সরকারি হাসপাতালগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই ওষুধ চুরি করা হত। এই চুরির পিছনে ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কিছু কর্মচারীও জড়িত আছেন। যারা চুরিচক্রের সঙ্গে জড়িত তাদের সংখ্যা বেশি না হলেও, প্রভাব অনেক বেশি। অন্যান্য ডাক্তার বা হাসপাতালের বেশির ভাগ কর্মচারীর উদাসীনতার সুযোগ এরা নিয়ে থাকেন। কিছুদিন আগেই নীলরতন সরকার হাসপাতালে 'গজ ব্যানডেজ' খরচের হার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে অনেক কম লাগছে। কয়েক মাস আগে ৭০ ব্যাগ গজ ব্যানডেজ পাচার করার অভিযোগে নীলরতন সরকার হাসপাতালে একটি চক্র ধরা পড়ে। তারপর থেকে এই খরচের হার কমেছে। এছাড়া ওষুধের ব্যাপারে হাসপাতালগুলিতে একশ্রেণীর ডাক্তারের চক্রান্তে ঠিক ওষুধ ঠিকমত ব্যবহার করা হয় না। জুনিয়র ডাক্তার হাউসস্টাফরা একসংগে বেশ কিছু ওষুধ নিজেদের স্টকে রেখে দিতেন। রিটারন বা কোন হিসেব দেবার রীতি এদের মধ্যে ছিল না। যার ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার করার দিনও পার হয়ে যেত। হাসপাতালের কাছাকাছি ওষুধের দোকানগুলি থেকে কখনও ঐ ব্যাচ নম্বরের ওষুধ বিক্রি হতে দেখলেও হাবারার পক্ষে অবাক হওয়ার কারণ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ হাসপাতালে ঠিক সময়মত স্টোর চেকিং, ইনডেনটিং ডিসট্রিবিউশন পরীক্ষা করার সুযোগ না থাকায় প্রয়োজনের সময় ওষুধের অভাব হওয়া অসম্ভব নয়।

ডাঃ জনার্দন দাসকে নিয়ে একজনের অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছিল। রাজ্য সরকারকে এই কমিটি যে রিপোরট দিয়েছিলেন তা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার গত জুন মাসে একটি

বিজ্ঞপ্তিতে জানায় নির্দিষ্ট ১০৭ রকমের জীবনদায়ী ওষুধ যে কোন রোগীর প্রয়োজনে হাসপাতালের কাছের দোকান থেকে অথবা বাজার থেকে সরাসরি কেনা যাবে। যে সমস্ত মেডিকেল অফিসার দায়িত্বে থাকবেন তারাই একাজ করতে পারবেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় কোন অনুমতি নিতে হবে না। এছাড়া ২১২ টি বিশেষ ধরনের ওষুধও কিনতে পারেন যেকোন সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বশীল মেডিকেল অফিসাররা।

এই ব্যবস্থার ফলে সরকারি হাসপাতালে রোগীর কোন প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব হবে না। তবে এই ওষুধ কাকে কী জন্য দেওয়া হল তার হিসেবটা অবশ্যই দাখিল করতে হবে। রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন এটুকু কষ্ট যে কোন জনদরদী কর্তব্যপরায়ণ চিকিৎসকের করার অসুবিধা নেই। হাসপাতালের অব্যবস্থার আর একটি কারণ হিসেবে রাজ্য সরকারের মুখপাত্র জানান গত বছর পনের ধরে হাসপাতালের 'নার্সিং ভাগিযে' প্র্যাকটিস করাটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যে মেডিকেল অফিসারের সারাদিনে ২৪ ঘণ্টাই সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কাজ করার অংগীকার থাকে তিনি ৮ ঘণ্টাও সে কাজ করতে অনীহ। এঁদের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষক ডাক্তারও আছেন যারা হাসপাতালে যাতায়াতের পথে বেআইনি ভাবে পয়সা নিয়ে প্র্যাকটিস করেন। আর তার খেসারৎ হিসেবে হাসপাতালে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। বর্তমানে ৪টি বেড পিছু ১ জন ডাক্তার বরাদ্দ। কিন্তু আগে ৪০টি বেড পিছু একজন ডাক্তার বরাদ্দ থাকলেও যে ট্রিটমেনট সাধারণ মানুষ পেতেন, আজ তা পান না, ঠিক এই কারণেই।

পেসমেকার কোমপানির এজেনসিও নেন কেউ কেউ। এর ফলে ডাক্তারি প্রফেশনের প্রতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে। সাধারণ মানুষের অবস্থার সুযোগ নিয়ে ডাক্তারি ছদ্ম-গাম্ভীর্যের মধ্যে পড়ে রোগীর আত্মীয়রা বেহাল।

বর্তমানে পশ্চিমবংগে সরকারি চিকিৎসকরা নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউনস যা পান তা ভারতের যে কোন রাজ্যের চেয়ে গড়ে বেশি। সারা ভারতের নন প্র্যাকটিসিং ভাতা ৫00 টাকা। পশ্চিমবংগে ৭00 টাকা। গত জুন মাসে রাজ্য সরকার সরকারি ডাক্তারদের হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসা না করার এক বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশে যে বেতন ভাতা কাঠামো তা হল সর্বনিম্ন মাসিক ১৭00 ১৮00 টাকা আর সর্বোচ্চ ৪000 টাকার কিছু বেশি। এই প্রস্তাবই মধ্যবয়সী ডাক্তারকুলের এক অংশকে আঘাত করে। তাঁরা এ আদেশকে হাইকোরটে চ্যালেনজ করলেন। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে তারাও শর্তাধার করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক হাত দেখে নিলেন।

যারা হাসপাতালের দায়িত্বে তারাই যদি ঠিক সময়টুকু হাসপাতালে হাজিরা দিতে বা থাকতে না চান তবে আর কী হবে?

আন্দোলনের রাজনীতি

এবারের জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনে সি পি আই (এম) নিজের তৈরি ফ্রানকেনসটাইনের আঘাতেই কাবু হয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন জোরদার করা কিংবা মদৎ দেবার পিছনে যারা, তারা হলেন এক শ্রেণীর সরকারি ডাক্তার যারা সরকারি বেতনও নেন আবার বাইরে প্র্যাকটিসও করেন। এদের স্বার্থে প্রথম ঘা দিয়েছিল বামফ্রনটের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য। তিনি এদের বিরাগভাজন হলেন। বামফ্রনটের আদর্শমতে তিনি কমিউনিটি মেডিকেল সারভিস করেছিলেন। তিন বছরের এই কোরস থেকে ডাক্তার যারা বেরবেন তাদের গ্রাম-অঞ্চলে যাবার কথা। গ্রামের প্রাথমিক চাপটা এদেরই সামলাবার কথা। বেশির ভাগ চিকিৎসা যাতে প্রাথমিক স্তরেই হয়ে যায় তার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ধাঁচে এই বেয়ারফুট ডকটরস পরিকল্পনা। চূড়ান্তভাবে আপত্তি তুললেন আই এম এ। আপত্তি তুললেন সেই বিশেষ ডাক্তারগোষ্ঠি যারা গ্রামের মানুষকে শহরের হাসপাতালের 'ক্যাচ'-এর মাধ্যমে নিজের চেম্বার অবধি নিয়ে আসতে পারেন। কিছু সুস্থ চিন্তার চিকিৎসকের চেষ্টায় সে আন্দোলন দানা বাঁধল না। সেদিন সমান তালে সি পি আই (এম) প্রভাবিত ডাক্তার বলে যারা পরিচিত তারা মদত দিয়েছিলেন বিরোধীদের। এরপর আর এস পি র মন্ত্রী আরো এক ধাপ এগিয়েছেন। তিনি নন প্র্যাকটিসিং রুল জারি করার চেষ্টা করেছেন। নীতিগতভাবে এটি

ডাঃ দেবাশীষ দত্ত বলছেন

'ডাক্তারদের আন্দোলন পুরোপুরি ন্যায্য'

সম্প্রতি হাসপাতালে ধর্মঘট নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক উঠছে। ডাক্তারদের কি ধর্মঘট করা উচিত? প্রশ্নটা এককভাবে ছুঁড়ে দিলে সবাই নিশ্চয়ই একস্বরে বলবেন, 'না'। কিন্তু ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সিদ্ধান্তটা এত সরল হবে না। ধর্মঘট কেন হল? এই ধর্মঘটের জন্য দায়ী কে?

জুনিয়র ডাক্তাররা দীর্ঘ দু বছর ধরে হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবনদায়ী ওষুধের নিয়মিত সরবরাহ, ২৪ ঘণ্টা একস-রে, ই সি জি, ব্লাড ব্যাংক চালু করা, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, জাতীয় ঔষধনীতি (যাতে ওষুধের দাম কম হয়), পাশ করা ডাক্তারদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামে চাকরি, ন্যূনতম ন্যায্য ভাতা, ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা নির্ধারণ, হাসপাতাল বিল বাতিল করা ইত্যাদি দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন। ১৬ বার স্মারকলিপি পেশ, ৫ বার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সংগে আলোচনা, ১ বার মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলোচনা কোন সমাধান আনতে পারেনি। ৭-৮টি প্রতিবাদ মিছিল, কালা দিবস, দাবি দিবস পারেনি উপরোক্ত ন্যায্য দাবি সম্বন্ধে সরকারকে বিন্দুমাত্র সচেতন করতে। এমনকি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সংগে হেলথ সারভিস অ্যাসোসিয়েশনের ডাক্তাররাও আলোচনা করে বুঝেছিলেন যে সরকার দাবিগুলি নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তাও করেনি। দাবিগুলি শুধুমাত্র জুনিয়র ডাক্তারদের সমস্যাই প্রতিফলিত করে না। আজ পশ্চিমবংগের হাসপাতালগুলির যে শোচনীয় অবস্থা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসার আকাঙ্ক্ষাকেও প্রতিফলিত করে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকলেন।

ফলে শুরু হল কর্মবিরতি। গত ৮ এপ্রিল ওষুধ ও যন্ত্রপাতির অভাবে সরকারি নির্দেশে এন আর এস হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার পর ৭ অকটোবর সরকারি উদাসীনতা ও দমননীতির কবলে পড়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধসে পড়ল।

দীর্ঘ দিনের গাফিলতি আড়াল করে সরকার হঠাৎ রোগীর কষ্টে মায়াকান্না শুরু করলেন। শুরু করলেন পিংকি নামে একটি মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু দুঃখের কথা সরকারি অপপ্রচার ব্যর্থ করে পিংকির আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা ধর্মঘটী ডাক্তারদের হাতে তুলে দিলেন স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদপত্র। তাতে স্পষ্ট করে তারা জানালেন পিংকি বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ভর্তিই হয়নি। সরকারি মতে কিন্তু পিংকি বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ডাক্তারদের ধর্মঘটের ফলে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে ভর্তি হয়েছিল ইউনাইটেড নারসিং হোমে।

অপপ্রচার চলল জুনিয়র ডাক্তাররা নাকি বহুজাতিক সংস্থার চর। কারণ হিসেবে বলা হল, এক - তারা প্যারালাল আউটডোর এর যে ওষুধ দিচ্ছে তা বহুজাতিক সংস্থাগুলি যোগাচ্ছে এবং দুই, এই সব ডাক্তাররা হাসপাতালে বিকল্প ওষুধ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ব্র্যানডের ওষুধের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই ডাক্তার হয়ে নিজেই জানেন ডাক্তাররা ফিজিসিয়ানস স্যামপেল কী করে পায় এবং ডাক্তারদের কাছ থেকে সেগুলো সংগ্রহ করলে তার পরিমাণ কতটা দাঁড়ায়।

আমাদের আন্দোলন সরাসরি সমস্ত বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে। আমাদের দাবি বৈজ্ঞানিক ঔষধনীতি প্রণয়ন করা যাতে জীবনদায়ী ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ সুনিশ্চিত হয় এবং তার জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রস্তুত করা যায়।

অপপ্রচার চলছে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সামাজিক অন্যান্য পেশার মত ডাক্তারদের মধ্যেও কেউ কেউ বিশেষ রাজনীতি করেন, তবে যদি এই আন্দোলন কোন বিশেষ রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হত তা হলে বোধ হয় এই ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভবপর হত না।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরও জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর মানুষের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সচেষ্ট রইলেন। তিনি অভিযোগ আনলেন এন আর এস এ নাসিমা খাতুন নামে এক মহিলাকে প্রসবের সময়ে নির্যাতন করা হয়েছে। এমনকি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনলেন। ঘটনাটি কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক। নাসিমা খাতুন প্রথম সন্তান প্রসব করার সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন, ফলে ডাক্তারের ঐ সময়ের নির্দেশগুলি শুনছিলেন না। প্রসবের সময় কোন রকম ব্যথা কমানর ওষুধ দেওয়া যায় না। ডাক্তারকে তাই রোগীর নিজের স্বার্থেই ধমক দিতে হয়। শ্রীমতী খাতুনের forceps delivery হয়। পরে তার বাচ্চা হবার রাস্তা সেলাই করার সময়ও তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন, ব্যথা কমানর ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও। ডাক্তারকে জোর করে রোগীকে ধরে সেলাই করতে হয়। এগুলি যদি নির্যাতন হয় তবে ডাক্তারদের ভবিষ্যতেও এরকম নির্যাতন চালিয়ে যেতে হবে রোগীর স্বার্থেই। □

বামফ্রন্টের মিটিং-এ এবং মন্ত্রিসভায় সবাই সমর্থন করলেও সি পি আই (এম) তার শরিকদলের এই প্রাধান্য বাড়তে দিতে অরাজী। প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় থেকেই রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের কর্মচারীদের মধ্যে দুটি সংগঠন। একটি জয়েনট কাউনসিল এবং অন্যটি নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল পারসোনেল নামে কাজ শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের মোট কর্মচারী সংখ্যা তিন লক্ষ ৭৫ হাজারের মত। তার মধ্যে এক লক্ষের কিছু বেশি এই স্বাস্থ্য দপ্তরের আওতায়। রাজ্য সরকারি কর্মচারী কো অবডিনেশনের প্রভাব একদিকে যখন কমছে তখন অন্যদিকে আর-এস পি প্রভাবিত জয়েনট কাউনসিলের সংগঠন জোরদার হয়ে উঠছে। বেতন বাড়ান আর ভরতুকি দেবার অর্থনীতি নিয়ে রাজ্য অর্থদপ্তর যে ভাবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাইয়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছেন তার সুফল সি পি আই (এম)-এর ফেডারেশন যতটা পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক ছোট শরিক হয়ে আর এস-পি বেশি পেয়ে যাচ্ছে। ক্ষুব্ধ ডাক্তারদের এই পটভূমিকাটি ব্যবহার করল সি পি আই (এম)। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে বিশৃংখলা শুরু হল। বিক্ষোভে নামল ডাক্তারদের মদতে ছাত্ররা। ৮০ সালের ডিসেমবর মাসে বাঁকুড়ার মেডিকেল কলেজে তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে ননী ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন। ছাত্রছাত্রী দিয়ে তাঁকে সেদিন ঘেরাও করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এমনকি রাতে সার্কিট হাউস ঘিরে বিক্ষোভ ও হাংগামাও হয়েছিল। মাথায় হেলমেট পরিয়ে তখনকার জেলা শাসক ননী বাবুকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর পৌঁছে দেন। মন্ত্রীর নিজের গাড়িটি ফেলে চলে আসতে হয়েছিল। এইসব ঘটনার মূল উদ্যোক্তা বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন না, ছিলেন সেখানকার জেলা কমিটির একজন অন্যতম সম্পাদক। এই ভদ্রলোকের ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় ডাক্তারির ছাত্র হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল। সেই

কমিটি

যদি কোন রোগীর হাসপাতালে মৃত্যু সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকে যেমন ঠিকমত চিকিৎসা করা হয়নি, ভুল চিকিৎসা হয়েছে অথবা কোন কারণে হাসপাতালের কোন কর্মচারী অর্থাৎ ডাক্তারদের উদাসীনতায় মৃত্যু হয়েছে, তবে রোগীর আত্মীয়-বন্ধুরা সেই হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাছে লিখিতভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার আবেদন জানাতে পারেন। সরকারি স্ট্যানডিং ডেথ এনকোয়ারি কমিটি তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন। এই কমিটিতে সরকারি-বেসরকারি ডাক্তার ও অন্য পেশারও প্রতিনিধি আছেন। যদি কোন সরকারি হাসপাতালে তদন্তের আবেদন করার সুযোগ না থাকে, তবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান যাবে।

এ ছাড়া ডাক্তারি পেশায় আছেন এমন কোন ডাক্তার, তিনি সরকারিই হোন আর বেসরকারিই হোন, তাঁর বিরুদ্ধে চিকিৎসা-পেশার আচরণগত ত্রুটি অথবা কোন প্রকার ইচ্ছাকৃত অবহেলা, ভুল চিকিৎসার অভিযোগ থাকলে রোগী বা রোগীর আত্মীয়বন্ধুরা প্রমাণসহ ওয়েসট বেংগল মেডিক্যাল কাউনসিল, লায়নস রেনজ, কলকাতা ১ ঠিকানায় যোগাযোগ করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা সেকরেটারি, ওয়েসট বেংগল মেডিকেল কাউনসিল, ৮ লায়নস রেনজ, কলকাতা ১, ফোন ২২ ২৬৭৪।

ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায় বলছেন

'রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখাটা অন্যায়'

রাজ্য সরকারের প্রথম দায়িত্ব রোগের কারণ নির্মূল করা। অবশ্যই সেই সংগে বর্তমানে যে চিকিৎসার সুযোগ আছে তাকে যতটা পারা যায় আধুনিক এবং উপযোগী করে তোলা। যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাজ্যের একশ্রেণীর লোকের কাছেই চিকিৎসার সুযোগ থাকা। অন্য আর একটা বড় অংশ শহরের হাসপাতালের দামী মেশিন কেনার জন্য গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার সুযোগকে কোণঠাসা করা।

আমাদের দেশে সবে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সরকারি অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করা হয়নি। তবে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি প্রতি হাজার জন পিছু হেলথ গারড থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালগুলি পর্যন্ত কয়েকটি ধাপে প্রিভেনটিভ মেজার নেবার জন্য। আমাদের দেশে যা ওষুধ আসে বা উৎপাদন হয়, তাতে শতকরা ২০ ভাগ লোকের চিকিৎসা সম্ভব। বাকি ৮০ ভাগ লোকের জন্যও ভাবতে হবে। এ হিসাব হাতি কমিটির রিপোর্টের। রাজ্য সরকার ওষুধের অব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত। যা ওষুধ পাওয়া যায় তাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারাটাই প্রাথমিক লক্ষ্য। ৮৩ সালের জুন মাসে আমরা কিছু ওষুধ কেনার জন্য হাসপাতালের সুপার ও ডাক্তারদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছি। এর ফলে হাসপাতালে ওষুধ না থাকলেও কোন রোগীর ওষুধের অভাব হবার সুযোগ নেই। তাই জুনিয়ার ডাক্তার অর্থাৎ হাউস স্টাফ ও ইনটারনিরা বিক্ষুব্ধ। ওদের দাবি ওদের স্বার্থে। এবং মূলত অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। ওরা জানেন এই সীমিত ক্ষমতায় রাজ্য সরকারের পক্ষে যা সম্ভব তা আমরা করেছি, করছি।

কয়েকদিন আগে জনৈক ভদ্রমহিলা শ্রীমতী দাশমুন্সীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নীলরতন সরকার হাসপাতালে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল তার ফলশ্রুতিতে শ্রীমতী দাশমুন্সীর দুই ছেলেকে শ্মশান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে যখন এন আর এস এর দরজায় পুলিশ বসিয়ে দেওয়া হল ডাক্তারদেরই নিরাপত্তার জন্য, তখন ওরা আপত্তি তুললেন, হাসপাতালের দরজায় পুলিশ কেন

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর মধ্যে বহুদেশীয় আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির সাহায্য ধর্মঘটীরা পেয়েছেন। না হলে ওদের প্যারালাল ইমারজেন্সিতে অত ওষুধের বাকস কোথা থেকে এল। ইতিপূর্বে

স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায় / আলোকচিত্র : অভিজিৎ রায়

বিধানসভায় আমি বহুবার মালটিন্যাশনাল কোমপানিগুলির অপচেষ্টার কথা বলেছি। রাজ্য সরকার অন্তত হাসপাতালের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের আলাদা মোড়কে কেবল হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য ওষুধ কেনবার কথা ভাবছেন। এ ওষুধগুলো যাতে খোলা বাজারে কেউ না ব্যবহার করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছেন। এর ফলে হাসপাতালে ওষুধ চুরি অন্তত কমবে। এ বিষয়গুলি নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কারো স্বার্থে আঘাত আসে তবে কী আর করা যাবে।

হেলথ সারভিসের ডাক্তারদের আগে থেকেই ৯ দফা দাবি ছিল। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে তারাও সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড় অন্যায়টা হয়েছে কোন রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখাটা। এটা ডাক্তারি শাস্ত্রের প্রফেশনাল এথিকসের বাইরে। ◻

মদতের পরিণতি যে কত ভয়ানক তা সি পি আই (এম) ভাবেনি। আজ জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেদিন যারা সি পি আই (এম) এর মদত পেয়েছিল তারাই বিক্ষুব্ধ। তাদের আন্দোলন দমানর জন্য বামফ্রন্টের রাজ্য স্তরে কোন মিটিংও সি পি আই (এম) করেনি।

হাসপাতালের রাজনীতিতে একটা বড় অংশ এর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। এদের একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করেন গৌর ঘোড়ুই নামে বোম্বের দত্ত সামন্তের মত জনৈক প্রফেশনাল ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। সি পি আই (এম) এই ঘোড়ুই এর ইউনিয়নকে ভেবেছিল বর্তমান ডাক্তার আন্দোলনে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু ঘোড়ুই সি পি আই (এম)-এর মদতে আর ভুলছেন না। এই জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সি পি আই (এম) অন্তত সেটি বুঝতে পেরেছে। তেমনি যে ডাক্তারদের সেদিন সি পি আই (এম) সমর্থন করেছিল আজ যখন দেখল বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই আর এস পি র তৈরি করা নন-প্র্যাকটিসিং রুল চালু করতে চলেছে তখন আর তাদের পক্ষে সি পি আই (এম) সেক্সে থাকা সম্ভব হল না। সি পি আই (এম) এর পক্ষে নন-প্র্যাকটিসিং ইস্যুটাকেও আটকিয়ে রাখা গেল না। ইতোমধ্যে হাইকোরটে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাই এখন সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ডাক্তাররা কীভাবে আন্দোলন করবেন তার নকশাটা এখন তৈরি করে নিচ্ছেন। ◻

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

শ্রীরামকৃষ্ণ পদ পরিক্রমা ২৩

কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নেপালী সন্তান বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরের বাসভবনে বহুবার ঠাকুরের শুভাগমন হয়। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে ঠাকুর 'কাপ্তেন' বলে ডাকতেন। তিনি নেপালের রাজার উকিল ছিলেন এবং রাজার প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতায় বাস করতেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং ঠাকুর তার সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। এমনকি পরম অনুরাগী কাপ্তেনকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর অনেক ভক্তের বাড়িতেও যেতেন। কাপ্তেনের বাড়িতে ঠাকুর কয়েকবার আহারাদিও করেছেন। কাপ্তেনের স্ত্রীও ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন।

কাপ্তেনের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। তার মধ্যে কয়েকটির বিবরণ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হল।

ভক্তদের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি: "কলকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে গিছলাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল। কাপ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি প'রে আরতি করে। একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে—তারপর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। আবার কর্পূরের আরতি। সে সময়ে কথা কয় না। আমায় ইসারা ক'রে আসনে বসতে বললে।" (কথামৃত ৪র্থ ভাগ বিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ)

"ওর বাড়ীতে ল'য়ে গিয়ে কত যত্ন। বাতাস করে—পা টিপে দেয় আর নানা তরকারী ক'রে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়ীতে পাইখানায় বেহুস হ'য়ে গেছি। ও তো খুব আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে পা ফাঁক করিয়ে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা করলে না।" (কথামৃত ১ম ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ)

"কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম: তার বাড়ী হ'য়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, গাড়ীভাড়া দাও। কাপ্তেন বল্লে যে ওরাই (রামেরা) দেবে।" (কথামৃত ৪র্থ ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

এই প্রসঙ্গে কথামৃত প্রণেতা মাস্টার মশাই শ্রী মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত বলেন "উপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসতেন। খুব ভক্তিমান সেবক। কখনও নিজ বাসভবনে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে আদরে ভোজন করাতেন। ইনিই কখনও বলতেন, আ রে, বাঙ্গালী মাণিক কো (ঠাকুরকে) নহি পয় চানতা।" (শ্রীম দর্শন পঞ্চদশ ভাগ, দ্বাবিংশ অধ্যায়)

ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ) বলেন "শ্যামপুকুরে নেপালের রাজদূত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—ঠাকুর যাকে 'কাপ্তেন' বলতেন—তাঁর বাড়ীতে গেলেন। দুয়ারে গাড়ী থামলে তিনজন উপরে উঠে গেলাম। তাঁর বাড়ীর সকলে এসে প্রণাম করলেন। ঠাকুর সেখানে একটু বরফজল খেলেন। তিনি বরফ খেতে বড় ভালবাসতেন।" (স্বামী অখণ্ডানন্দ রচিত "স্মৃতিকথা")

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রখ্যাত গৃহী শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত বলেন, "উপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন এবং প্রতিমাসে পরমহংসদেবকে বাটীতে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী দ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করাইতেন। পরমহংসদেব একটু পরিষ্কার স্থানে শৌচক্রিয়াদি সমাধা করিতেন। উপাধ্যায় সেইজন্য বাটীর ছাদের উপর তাম্বু খাটাইয়া তন্মধ্যে পাইখানা নির্মাণ করিয়া রাখিতেন। পরমহংসদেবের ভোজন হইলে উপাধ্যায় সস্ত্রীক তাঁহার সেবা করিতেন।" (শ্রীরামচন্দ্র দত্ত রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত")।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কলকাতায় কাপ্তেনের নিজস্ব বাড়ি ছিল না, শ্যামপুকুরের যে বাড়িতে তিনি বাস করতেন, সেটি কলকাতার শোভাবাজার-রাজবাড়ির দেব বংশের। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঐ রাজবাড়ির প্রখ্যাত রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র শ্রীযতীন্দ্র দেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন বলে কথামৃত গ্রন্থের ৫ম ভাগ সপ্তদশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের উত্তর কলকাতার বাড়ি / আলোকচিত্র : অচিন্ত্য হাজরা

কাপ্তেনের যে বাড়িতে ঠাকুর যাতায়াত করতেন, তার ঠিকানা ২৫ নং, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা ৪. এই বাড়িরই উপরতলার একটি অংশে কাপ্তেন বাস করতেন এবং ঠাকুর সেই অংশেই যেতেন। বর্তমানে শোভাবাজার রাজবাড়ির দেব পরিবারের লোকই এই বাড়িতে বাস করেন। বিরাট তিনতলা বাড়ি ভেতরে কয়েকটি বাগান, মাঝে আবার ঘর দালান প্রভৃতি; সামনের অংশে যেমন বাড়িতে প্রবেশ পথের প্রধান দরজা, বাড়ির পেছনের শেষ অংশেও পশ্চিমদিকে একটি বিরাট ফটক। বাড়ির সমগ্র এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কারুকার্যমণ্ডিত বাড়িটি পূর্বের বনিয়াদি চিহ্ন বহন করে পূর্বাবস্থায় দণ্ডায়মান।

পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণির ওপর অবস্থিত প্রখ্যাত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে পশ্চিম মুখে যে রাস্তাটি শ্যামপুকুরে প্রবেশ করেছে, সেই রাস্তায় কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই বামদিকে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ওপরেই উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত, উত্তরমুখী এই ২৫ নং প্রাসাদ। ☐

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি দলবাজি এখন আরো বেড়েছে

নিশীথ দে

জমি ভাগে দেওয়ার প্রথা আছে। চটকলে 'ভাগাওয়ালা' পদ্ধতি আছে। কিন্তু স্কুলে মাস্টারি প্রথা বোধ হয় বামফ্রন্টের আমলেই প্রথম চালু হয়েছে। বামফ্রন্টের শরিকরা অনেক দিন থেকেই এ সব নিয়ে অভিযোগ করে আসছেন। সি পি আই মেদিনীপুর জেলায় সি পি আই (এম) এর কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন। লোকসভার সি পি আই সদস্য নারায়ণ চৌবে নাম ধাম দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে অভিযোগ করেছেন, সি পি আই (এম) এর একজন জেলা পরিষদের সদস্য স্কুলে মাস্টারি করেন। মাসে সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে নেন। কিন্তু কোনদিন স্কুলে যান না। একজন শিক্ষিত বেকার যুবক তাঁর নামে সেই স্কুলে মাস্টারি করেন। সেই বেকার যুবক পান মাসে একশো টাকা। আগে পেতেন ৭৫ টাকা। জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হবার পর ২৫ টাকা মাইনে বাড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এ অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কিছুই হয়নি।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা চালু করেছেন। বামফ্রন্টের শরিকরা সবাই এখন রাজি ছিলেন না, কিন্তু সস্তায় হাততালি নেওয়ার জন্য সমর্থন করার লোভ সামলাতে পারেননি। সমস্ত জেলায় স্কুল বোর্ড ভেঙে দেওয়া হল। বামফ্রন্ট সরকার প্রায় সমস্ত শিক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা স্কুল বোর্ড গঠন করলেন। ছ বছরের মধ্যে রাজ্য স্তরে বা জেলা স্তরে স্কুল বোর্ডের কোন নির্বাচন হল না। বিভিন্ন স্কুলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে খেয়াল খুশি মত। এমন স্কুল আছে যেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে কোন শিক্ষক বা শিক্ষার সংগে যুক্ত লোক পাওয়া যায়নি, আবগারি দফতরের লোককে বসাতে হয়েছে।

এই সরকার মনোনীত স্কুল বোর্ডই শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যবিধাতা। স্কুলের জন্য গ্রান্ট, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে আগেও দুর্নীতি দলবাজি ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে

দিন কয়েক আগে বামফ্রন্ট এর এক শরিকদলের অফিসে গিয়েছিলাম। দু জন যুবক চিঠি নিয়ে ঢুকলেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছেন। এখন পারটির নেতারা না বললে তো চাকরি হবে না।

পারটির নেতা জিগেস করলেন, আপনার নাম কি প্যানেলে আছে নম্বরটা বলুন। যুবক দুটি একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। নেতা তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন, আপনি আমাদের পারটির অমুকের সংগে দেখা করুন।

রাজ্যে সরকারি কাগজ বলছে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৫০ হাজারের মত, শিক্ষকের সংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষের বেশি। প্রতিটি জেলাতেই দেখা গিয়েছে স্কুল নেই, ছাত্র ছাত্রী নেই কিন্তু শিক্ষক আছেন। তারা মাইনেও পাচ্ছেন।

অনিয়ম দুর্নীতি, দলবাজি শুধু শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নয়, স্কুলের সরঞ্জাম, ছাত্র ছাত্রীদের বই, স্লেট পোশাক ইত্যাদি নিয়েও।

অধিকাংশ জেলা স্কুল বোর্ডে সি পি আই (এম) একক গরিষ্ঠ। সরকারি বেসরকারি চাকরি হোক না হোক প্রতি বছর স্কুলগুলিতে বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ চলছেই। সরকারি সারকুলার অনুযায়ী সব কি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় মোটেই না। জেলা স্কুল বোর্ড কি নিয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? অন্তত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষক যাঁরা কোন রাজনীতিতে নেই তাঁরা বিশ্বাস করেন না। সবটাই চলে পারটি অফিস থেকে।

এ বছরও জেলায় জেলায় কয়েক হাজার শিক্ষক (প্রাথমিক) নিয়োগ করা হল। ইন্টারভিউ এর চিঠি পাঠান হল পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক দুমাস আগে। যারা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে বসেছিলেন তাঁদেরও বেশ একটা বড় অংশ পঞ্চায়েত নির্বাচনে নেমে পড়লেন। কাজ দেখে পারটির লোকেরা প্রার্থীদের প্যানেল তালিকা তৈরি করে ফেললেন।

ইন্টারভিউ হল পুজোর আগে। কোন কোন জেলায় একদিনে তিন চার হাজার প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। একদিনে এত ইন্টারভিউ নেওয়া কি সম্ভব

এরপর শুরু হল পারটি অফিসে অফিসে তদ্বির। আসল প্যানেল তৈরি হবে পারটি অফিসে। বামফ্রন্ট শরিকদলগুলির জেলা স্তরে শিক্ষক ফ্রন্টের নেতাদের বৈঠক বসল। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নীতি ঠিক করতে হবে। এক নেতা প্রস্তাব করলেন, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নিয়োগ করা হোক মেরিট অনুযায়ী।

সংগে সংগে একজন বললেন, মেরিট কী করে বিচার হবে? ইন্টারভিউ এর সময় তো শুধু নাম বাপের নাম এইটুকু জিগেস করা হয়েছে। তাহলে মার্কস অনুযায়ী ঠিক হোক।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, বাকি শতকরা ৫০ ভাগ বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে ভাগ হবে। যার যেমন কোটা। এই কোটা নিয়েও শরিক দলের মধ্যে বিরোধ। যেমন কোন কোন জেলায় সি পি আই (এম) এর সুপারিশে পাঁচশো শিক্ষক চাকরি পেয়েছেন। অথচ আর এস পি না ফরোয়ার্ড ব্লকের দশ জন করতেও পারেনি।

আর আগের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সত্যি সত্যিই নির্দলীয় প্রার্থী নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সব কি শুধু হাতে? কোন প্রমাণ নেই অভিযোগ প্রতিটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেতে বিশেষ একটি শিক্ষক সমিতির সদস্য হতে হয়েছে, তার সংগে নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

এটা গেল শিক্ষক নিয়োগ। এর স্কুলে পোস্টিং নিয়ে দলবাজি। যে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম, বাড়ির কাছাকাছি, পিচ রাস্তার ওপর সেই সব স্কুলে পোস্টিং হবেন [illegible] নেতার স্ত্রী, বোন, ভাইপো, [illegible]নেরা। এমন বহু অভিযোগ আছে, আদৌ স্কুলে যান না, কিন্তু মাসের মাইনে ছাড়াও কনটিঞ্জেনসি বাবদে ২৫ টাকা করে পান।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা রাজনীতির কবলে পড়ে কী অবস্থা হয়েছে। শিক্ষা খাতের শতকরা ৯৪ ভাগ খরচ হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতা বাবদে। বাকি শতকরা ৬ ভাগ দিয়ে শিক্ষার কতটুকু উন্নতি হতে পারে।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরের শেষে অর্ধেক বই পৌঁছোয় না। স্লেট, খাতা, পাঁউরুটি দেওয়ার কথা। অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী খাতা-স্লেট, পায় না। পাঁউরুটি খেয়ে অসুখ করে। এখন রাজ্য শিক্ষা বিভাগ দুপুরে খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। পাঁউরুটির যোগান দেয় এমন সব বেকারি যেগুলো আগে ছিল না। বামফ্রন্ট এর রাজত্বে নতুন হয়েছে।

তফসিলী আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য সরকার পোশাক দেবার ব্যবস্থা করেছেন। জামার মাপ নেওয়া হল যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আর জামা স্কুলে এল, সেই মেয়ে তখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছে। জামা গায়ে ছোট হল, ফেরৎ চলে গেল।

বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে রীতিমত দলবাজি চলছে। বিশেষ একটি সমিতির সদস্য না হলে নির্বিঘ্নে মাস্টারি করা দুষ্কর ব্যাপার। চাকরির দায়ে অনেক কট্টর কংগ্রেসি সমিতির খাতায় নাম লিখিয়েছেন। যাঁরা পারেননি তাঁদের অনেককেই বদলি হতে হচ্ছে দূরে, নয়ত স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে নিছক হয়রানি চলছে। □

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘের যোগদানকারী পাঠকের নাম এবং ক্রমান্বয়ে সদস্য-ক্রম ঠিকানা বয়স সখ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল:

রতীশ ধর □ ক্রম ২৬

লখিপুর এন এ ই পি, ফুলের তাল, কাছাড় ৭৮৮১০৬, আসাম। ২০ বছর, পড়াশুনা ও সাহিত্য সমালোচনা করা, স্নাতক, চাকরি।

কল্যাণ ভট্টাচার্য □ ক্রম ২৭

পি ৮২, ব্লক 'বি', লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৮৯। ৩৭ বছর, সাহিত্য পাঠ এবং দেবব্রত বিশ্বাসের গান শোনা, ইংরাজিতে এম এ পরীক্ষার্থী, চাকরি।

কালীসাধন রায় □ ক্রম ২৮

পানচেত ড্যাম, ডি ভি সি স্কুল, পানচেত ড্যাম, ধানবাদ, বিহার। ৫৫ বছর, গল্প লেখা, গান শোনা, নাটক দেখা ও ফুটবল, বি এ বি এড, শিক্ষক।

শংকর সেনগুপ্ত □ ক্রম ২৯

হাটন রোড, আসানসোল, বর্ধমান। ৩৩ বছর, ভ্রমণ ও সমাজসেবা, স্নাতক, চাকরি।

রত্ন-ধারণ নয়, ধারণাই ভাগ্য গড়ে

চিন্ময় সেনগুপ্ত

একটাই কাজ : কেউ বলছেন, না ভাই, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। কেউ বলছেন, আরে, এ তো আমার কাছে নস্যি। এইভাবে আমরা প্রত্যেকেই নিজের সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা বা চিত্র নিয়ে জীবনে চলেছি। এই ধারণাকেই এ যুগের মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন, 'Self-image' অর্থাৎ আত্মচিত্র বা আত্ম প্রতিমা।

ধারণা বা আত্মচিত্র কিন্তু কখনই রাতারাতি তৈরি হয় না। আমাদের অতীত সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা এবং শৈশব থেকে অপরে আমাদের প্রতি কীরকম আচরণ করেছেন তার ইতিহাস এইসব স্মৃতি থেকেই ধীরে ধীরে এই চিত্রটি তৈরি হয়।

উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। প্রচলিত শিক্ষার প্রতি একান্ত বিরূপ রবীন্দ্রনাথের কবি ও গীতিকার হিসেবে আত্মচিত্র তৈরি হচ্ছে কীভাবে -

১৮৭৫ সাল মেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক ছাপা হচ্ছে। পণ্ডিত রামসর্বস্ব জোরে জোরে পড়ে প্রুফ সংশোধন করছেন। পাশের ঘরে ১৪ বছরের রবীন্দ্রনাথ। রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশ উপলক্ষে পাণ্ডুলিপিতে একটি বক্তৃতা ছিল। গদ্য ও জায়গায় খুব বেমানান বুঝে রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর থেকে রামসর্বস্বের ঘরে এলেন। বললেন, এখানে গদ্য রচনা কিছুতেই জোর বাঁধতে পারে না। এই বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ গানটি এ অংশের জন্য রচনা করে দিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আনন্দে, বিস্ময়ে সেটি গ্রহণ করলেন।

কবি একবার মাঘোৎসবে (১২৯৩) অনেকগুলি গান তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে একটি গান 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। দেবেন্দ্রনাথ তখন চুঁচুড়ায়। তিনি সেখানে যুবক রবীন্দ্রনাথ ও তার জ্যোতিদাদাকে ডেকে পাঠালেন এবং সে সময়ের রচিত সব কটি গান কবিকে গাইতে বললেন। কোন কোন গান দু'বারও গাইতে হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম বাজালেন। গান গাওয়া শেষ হলে মহর্ষি বললেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানত এবং সাহিত্যের আদর বুঝত তাহলে কবিকে তো তারা পুরস্কার দিত। কিন্তু রাজার দিক থেকে যখন তার কোন সম্ভাবনা নেই তখন সে কাজ তাঁকেই করতে হবে। এই বলে তিনি একটি পাঁচশ টাকার চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

এইভাবে কৈশোরে যৌবনে রবীন্দ্রনাথের একটি আত্মচিত্র তৈরি হতে লাগল। এরপর অনুকূল পরিবেশ এই আত্মচিত্রটিকে লালন ও এর পুষ্টিসাধন করে চলল এবং রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বকবি হলেন।

নিচের ক্লাসের একটা পরীক্ষায় একটি মেয়ে ইংরেজিতে ৮৮ পেয়েছে। সেই থেকে মা, আত্মীয় পরিজনের সংগে দেখা হলেই সেই ৮৮ র গল্প করেন। কিন্তু আত্মচিত্র শুধু এইটুকুতেই তৈরি হবে না। এতে চিত্র রচনার সূচনা হতে পারে, এই পর্যন্ত। এই ৮৮-নম্বর নিয়ে যদি দিনের পর দিন ইংরেজি শেখার আয়োজন এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবাসবার সুযোগ অভিভাবক রচনা করে দেন এবং এর সংগে যদি ঐ মেয়েটি শ্রম ও নিষ্ঠার সংগে ইংরেজি শিখে চলে তাহলেই তার এই নির্মীয়মাণ আত্মচিত্র জীবনে একটা সার্থক তার রূপ পেতে পারে। হয়ত মেয়েটি জীবনে ঐ নিচের ক্লাসে ৮৮ পাওয়ার বীজটিকে চর্চার দ্বারা মহীরূহে পরিণত করে একদিন ইংরেজি ভাষার সুপণ্ডিত বলে পরিচিত হতে পারে।

কিন্তু এর উল্টোটাও সমানভাবে সত্যি।

অসুস্থতার জন্যই হোক বা মনোযোগের অভাবেই হোক, একটি ছেলে নিচের ক্লাসে অংকে ফেল করল। ব্যাকুল বাপ মা খুঁজে পেতে অংকের ভালো প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করলেন। সেই প্রাইভেট টিউটরের কাজ হল নিয়মিত পড়াতে আসা এবং ছেলের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যে অংক সে পারে না। শৈশবে কৈশোরে এই যে অংক না পারার চিত্র তৈরি হল এবং যে চিত্রটিকে পরিবেশ সযত্নে লালন করে পুষ্ট করে দিল, সেটি সারাজীবন ছেলেটির সংগে রয়ে গেল! কালে দেখা যাবে যে, সংসার জীবনে বিশ টাকা খুচরো খরচের হিসাব মেলানর সময়ও মনটি তার সন্দিগ্ধ। বোধ হয়, যোগে ভুল হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন, এই যে আত্মচিত্রের কথা বলা হল, এটার আমূল পরিবর্তন করা যায় কি এই প্রশ্ন নিয়ে হালফিলের মনোবিদরা প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

এ-নিয়ে মনোবিদ শিক্ষক লেকি (Prescott Lecky) হাজার হাজার ছাত্রের উপর পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর অনেক পরীক্ষার মধ্যে দু একটির খবর বলছি।

একটি ছাত্র ১০০ শব্দের মধ্যে ৫৫টি শব্দের বানান ভুল করত। তার আত্মচিত্র পালটে দিয়ে বছর দু'য়ের মধ্যে দেখা গেল স্কুলে সঠিক বানান লেখার [illegible] শ্রেষ্ঠ ছাত্র।

একটি মেয়ে [illegible] সাহিত্য পড়ে [illegible] স্কুল কাউনসেলার [illegible] বৈঠক হওয়ার পর সে [illegible] পেতে পারল।

পরীক্ষকমণ্ডলী এক [illegible] বলেছিলেন যে, ইংরেজি তার হবে না। তার আত্মচিত্র পালটে দিয়ে দেখা গেল যে পরের বছরই সে ইংরেজি সাহিত্য পড়ে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পেল।

মনোবিদ ম্যাকসওয়েল মলজ ও দেখলেন আত্মচিত্র সার্থকভাবে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে যে মানুষ অপরিচিত জনের ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইত না, সেই বক্তা হিসেবে জীবিকার্জন শুরু করল।

আত্মচিত্র নিয়ে যাঁরা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেছেন তাঁরা দেখেছেন দেহ সৌষ্ঠবে কোন গ্লানি অনেক ক্ষেত্রে আত্মচিত্রকে অদ্ভুতভাবে গৌরবান্বিত করে তুলেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঐ দৈহিক গ্লানির সচেতনতা চিত্রটিকে বিকৃত করেছে।

এক কলেজের ছাত্রের গালে একটা মস্ত কালো দাগ ছিল। এ ধরনের বিশ্রি দাগ মুছে ফেলার জন্য রোগীরা হামেশাই প্লাসটিক সার্জেনের কাছে ছুটে যায়। অথচ ঐ দাগই ছিল ছাত্রটির অহংকারের বস্তু যার জন্য সে ছাত্র সমাজে খুব খাতিরও পেত। আসলে ছেলেটি ছিল নাম করা মল্লযোদ্ধা। তাই মল্লযুদ্ধের কালো দাগটাকে সে একটা মেডেলের মতো গণ্য করত।

আবার মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে কারো ভাবনা তার কান দুটো বেশ বড়ো, কারো দুর্ভাবনা তার নাকটা লম্বা। তাই নিয়ে এরা সব সময় এক ধরনের হীনমন্যতার শিকার হয়ে আছে।

এখন দেখা যাক আত্মচিত্র কীভাবে আমাদের সুখ-দুঃখ, সাফল্য, অসাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। কীভাবে ভাগ্য গড়ে।

জীবনকে সুখী, সার্থক এবং শান্তিপূর্ণ করবার একটা অনির্বাণ অভিপ্রায় সব জীবের মধ্যেই আছে। মানুষের মধ্যে তা আছে প্রকট হয়ে। এজন্য কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে আমাদের মন তা রচনা করে চলেছে। এই মনই মস্তিষ্ক আর স্নায়ুমণ্ডলীকে পরিচালিত করে আমাদের ঐ লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমাদের জন্য মন এই যে লক্ষ্য রচনা করছে তার মূলে রয়েছে আমাদের নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা অর্থাৎ আত্মচিত্র। এই আত্মচিত্রই যখন সার্থক, তখন বিচিত্র অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা সফলতা, সুখ ও শান্তির দিকে এগিয়ে যাই। আর যখন নএর্থক তখন জীবনে কেবলই পিছিয়ে পড়ি, অসাফল্য, দুঃখ আর হতাশার শিকার হই।

কিন্তু নএর্থক আত্মচিত্রকে কীভাবে সার্থক চিত্রে রূপান্তরিত করা যায় সে সম্পর্কেও হালফিলের মনোবিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে এমারসনের কথা 'There are no great and no small' - অর্থাৎ বড় ছোট ব'লে কোন ব্যাপার নেই, জীবনে সব ছোটরাই বড় হতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রত্যেকের ভেতরেই একটি স্বয়ংক্রিয় সৃজনী ব্যবস্থা (Creative-mechanism) আছে যা আমাদের প্রতিনিয়ত সুখ ও সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। জীবনটাকে আকাঙ্ক্ষিত সফলতা দিয়ে সুখী ও সার্থক করতে হলে এই স্বয়ংক্রিয় সৃজনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে সচেতন হতে হবে। এরপর নতুন ভাবে চিন্তার, কল্পনার এবং স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। এই নতুন চিন্তা হবে সফলতার চিন্তা। এই কল্পনা হবে সাফল্যের কল্পনা। এই স্মরণ করা হবে জীবন পরিক্রমায় যেখানে যতটুকু সাফল্য পেয়েছি শুধু তাই স্মরণ করা।

এই ভাবে নতুন চিন্তা, কল্পনা ও স্মরণের অভ্যাসে আমাদের সার্থক ও বাস্তবানুগ আত্মচিত্রটি তৈরি হবে। তখন জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমাদের অন্তর্গত সৃজনী ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের সাফল্য, সুখ ও শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। □

'বিহারে কংগ্রেসের শেকড় খুব মজবুত নয়' — ডঃ জগন্নাথ

বিহারের বহুবিতর্কিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ এসেছিলেন রাঁচিতে। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার পর এই তাঁর প্রথম রাঁচিতে আগমন। ওই দিন তাঁর কাছে পরিবর্তনের পক্ষ থেকে একটি সাক্ষাৎকার চাওয়া হয়েছিল। ডঃ জগন্নাথ সানন্দে পরিবর্তনের পক্ষ থেকে রাখা সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর সংগে পরিবর্তনের এই একান্ত সাক্ষাৎকারটিই এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবর্তন : রাজনীতিতে প্রবেশের সংগে সংগেই আপনাকে বিহারের মত একটি সমস্যাসংকুল রাজ্যের নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। এমনকি জনতা সরকারের সময় আপনিই ছিলেন বিরোধীপক্ষের নেতা। অথচ এখন আপনি মুখ্যমন্ত্রীও নন, এমনকি দলের প্রাদেশিক সভাপতিও নন। এ অবস্থায় আপনার কেমন লাগছে

ডঃ জগন্নাথ : খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। নিজেকে দায়মুক্ত মনে হচ্ছে। আমার কাঁধে এখন কোন বাড়তি ঝামেলা নেই। এখন থেকে শুধু একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীর মত কাজ করতে চাই।

পরিবর্তন : এত বিতর্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে আপনাকে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে হল।

ডঃ জগন্নাথ : খুব কম লোকেরই কিন্তু এমনভাবে জনতার দাবির কাছে মাথা নিচু করার সৌভাগ্য হয়। আমি অন্তত এ বিষয়ে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে করি।

পরিবর্তন : আপনাকে সরানর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। মোটা অংকের ওভারড্রাফটের দায় রাজ্যের কাঁধে এসে পড়েছিল। বলা হয়েছে আপনি নাকি অনেক আনপ্রোডাকটিভ স্কিম নিয়েছিলেন।

ডঃ জগন্নাথ : এই সবই বাজে প্রচার। এই বছরের জুন মাস পর্যন্ত এ রাজ্যের ওভারড্রাফটের পরিমাণ ছিল শূন্য। মাত্র দেড় মাসে এই সংখ্যা ৮২ কোটি টাকা হয়েছে। তবে এ বছরের শেষ দিকে রাজ্যের বকেয়া করগুলি আদায় হয়ে গেলেই এ সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

আর আনপ্রোডাকটিভ স্কিমের কথা বলতে গেলে বলতে হয় রাজ্যগুলো তো কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, এ সবই ওয়েলফেয়ার স্টেট। কাজেই আর্থিক লাভের বদলে সাধারণ মানুষের মুখ চেয়ে কিছু কিছু এরকম স্কিম নিতেই হয়।

পরিবর্তন : আপনি একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী। তবুও আপনার বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি বহু অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার কী মতামত

ডঃ জগন্নাথ : আমি তো অনেকবারই বলেছি এসব নিছক অপবাদ। আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করতে পারবে না। এসব অপবাদ খুব সুপরিকল্পিতভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছে।

পরিবর্তন : আপনি নিজে হয়ত দুর্নীতিমুক্ত। কিন্তু আপনার মন্ত্রিমন্ডলীর অনেকের বিরুদ্ধে তো দুর্নীতির অভিযোগ ছিল।

ডঃ জগন্নাথ : এটাও একটা ষড়যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে। শুধু আমাদের নামেই দোষারোপ করা হচ্ছে। দুর্নীতি তো সারা দেশেই আছে।

পরিবর্তন : ১৯৮০-র নির্বাচনে আপনার মন্ত্রিসভায় এমন অনেক সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন যাঁদের চাল চলন, আচার আচরণ অনেক সময়ই ভদ্রতার সীমা লংঘন করে গেছে। আপনার কি মনে হয় না এরাও আপনার দুর্নামের জন্য অনেকটা দায়ী।

ডঃ জগন্নাথ : একটা কথা আমাদের মেনে নেওয়ার দরকার আছে যে গত দশ-পনের বছরে আমাদের মূল্যবোধ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মানবতা, বিচারধারা, অনুশাসন, চরিত্র সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসব তারই ফল।

পরিবর্তন : এই অবক্ষয়ের কারণ কী

ডঃ জগন্নাথ : তা আমি বলতে পারব না। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী আছেন তাঁরাই এর কারণ খুঁজে বের করবেন।

পরিবর্তন : তবুও একজন অর্থশাস্ত্রের শিক্ষক এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনার একটা মতামত তো আছে।

ডঃ জগন্নাথ : একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলতে পারি যেভাবে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটছে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। এই পতন সর্বস্তরেই হচ্ছে। রাজনীতিতে, শিক্ষায়, এমনকি সাংবাদিকতায়। সবাই রাতারাতি চমক দিয়ে বড় হতে চাইছে।

পরিবর্তন : আচ্ছা, চন্দ্রশেখর সিংকে রাতারাতি মুখ্যমন্ত্রী করা এবং আপনার সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ান দেখে মনে হচ্ছে চন্দ্রশেখর সিংকে কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী বানান হয়েছে আর আপনাকে পার্টির নিচুস্তরের সংগঠন মজবুত করার ভার দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটা সত্যিই কি তাই

ডঃ জগন্নাথ : না, না এরকম কোন কিছু করা হয়নি।

পরিবর্তন : চারদিকের অবস্থা দেখেশুনে মনে হচ্ছে নির্বাচন খুব তাড়াতাড়িই হবে। ভোটার লিস্টও তৈরি হয়ে আছে।

ডঃ জগন্নাথ : আমাদের দল সব সময়ই নির্বাচনের জন্য তৈরি থাকে।

পরিবর্তন : পূর্বাঞ্চলে বিহার এক সেনসিটিভ রাজ্য। পাশে পশ্চিমবংগে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আছেন। ওদিকে আসামও সমস্যাসংকুল রাজ্য। এই অবস্থায় যদি আগামী নির্বাচনে বিহার আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তা হলে আপনাদের দলকে কি ভয়ংকর সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে না

ডঃ জগন্নাথ : হ্যাঁ, খুবই ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই জন্যে আমি বার বার পার্টি মিটিং-এ বলেছি এ রাজ্যে সমস্ত দলাদলি বাদ দিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এমনিতেই বিহারে কংগ্রেসের শেকড় খুব মজবুত নয়। প্রতিবারই খুব অল্প ব্যবধানে কংগ্রেস এখানে জিতে এসেছে। এসব কথা চিন্তা করেই পার্টি সংগঠনকে আরও মজবুত করার জন্যই বিহারে অন্তত সমস্ত ঝগড়াঝাটি বাদ দিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত।

পরিবর্তন : আচ্ছা আপনি কি মনে করেন এবার নির্বাচন হলে প্রার্থী মনোনয়নে অনেক ঝাড়াই-বাছাই হবে

ডঃ জগন্নাথ : এ বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করব না।

পরিবর্তন : এ রাজ্যে ভূমি সংস্কারের বিষয়টা খুব একটা সফল হয়নি। এর কারণ কী?

ডঃ জগন্নাথ : ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে আমি সবথেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছি আদালতের কাছ থেকে।

পরিবর্তন : কারা আদালতের সাহায্য নিয়েছেন?

ডঃ জগন্নাথ : ভূস্বামীরা — যাদের জমি আমি সিলিং করতে চেয়েছি। এদের বিরুদ্ধে আমি আইনগত ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলাম। এমনকি সাতটা পরিবারকে আমি ভূস্বামী বলে চিহ্নিত করেছিলাম। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আমি সরকারি অফিসারদেরও নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু এরা এতই শক্তিশালী যে সব সরকারি অফিসারই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভয় পান। অথচ এদের অধীনে এক হাজারেরও বেশি জমি বেনামে আছে।

পরিবর্তন : আপনি প্রেস বিল এনেছিলেন কি আপনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য। প্রেস বিলে আপনি 'ব্ল্যাকমেইলিং' শব্দটার ওপর জোর দিয়েছিলেন। আপনাকে কি ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল

ডঃ জগন্নাথ : হ্যাঁ। আমাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছিল, এটাও সত্যি কথা।

পরিবর্তন : যারা করছিল তারা কারা

ডঃ জগন্নাথ : তাদের কারুর নাম বলব না। তবে প্রেসেরও কিছু কিছু লোক ছিল।

পরিবর্তন : আপনি যদি আবার রাজ্যের নেতৃত্বে ফিরে আসেন আপনার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে

ডঃ জগন্নাথ : এরকম প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দেব না। □

সাক্ষাৎকার : শিবেশ ঘোষাল

বেংগল অ্যাসোসিয়েশনের সাধ্য সীমিত তবু সংস্কৃতির জন্য লড়াই তাদের চলছে

নয়া দিলি থেকে খগেন দে সরকার

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিছুটা রসিকতা করে একটা কথা চালু আছে। তা হল, যেখানেই তিনজন বাঙালি একত্রিত হবে, তাদের একটি কালীবাড়ি, একটি থিয়েটার ক্লাব ও চারটি রাজনৈতিক দল থাকবেই। এতে সংযোজন করা উচিত একটি পাঠশালার হিসাবও। দিল্লিবাসী বাঙালিদের পক্ষে এই প্রবাদ কতখানি ঠিক খাটে জানি না।

এখানেও অনেক ক্লাব আছে (অন্তত গোটা ৪০) আছে থিয়েটার ক্লাব এবং একাধিক কালীবাড়ি ও বিদ্যালয়। তারা সংস্কৃতিমূলক অনেক কাজও করেন এবং দুর্গাপুজো তো করেনই। পরবর্তীকালে সমস্যা দাঁড়িয়েছিল অতএব বাঙালি প্রতিষ্ঠানকে একটা ছাতার তলায় কী করে একত্রিত করা যায়। স্থানীয় বাঙালিদের চিন্তায় সমস্যাটা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও একই বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলেন বোঝা যায়। অবশ্য প্রাথমিকভাবে বিধানচন্দ্র চেয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রের রাজ্য কর্মচারী ও প্রভাবশালী বাঙালিদের একত্রিত করতে। ডাঃ রায়ের প্রস্তাব মতই ১৯৫৮ সালে গঠিত হল বেংগল অ্যাসোসিয়েশন। সেই সংস্থাটির পরিচয় দেওয়া যাক। স্থানীয় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব আছে অনেক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু বেংগল অ্যাসোসিয়েশন একটু অন্য প্রকারের। বলা অনুচিত হবে না, আজ রাজধানীর প্রায় তিন লক্ষ বাঙালির এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। অনেকটা federated body বলা যেতে পারে। ব্যক্তিও সদস্য হতে পারেন কিন্তু জোর দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানগতভাবে সদস্য করার দিকে। এর এখন affiliated সদস্য আছে। তার মধ্যে তেত্রিশটি আঞ্চলিক ক্লাব, কয়েকটি থিয়েটার ক্লাব এবং আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মোটামুটি বেংগল অ্যাসোসিয়েশন সক্ষম হয়েছে বাঙালি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার অবশ্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় সহযোগিতায়। অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব কমিটিতে নির্বাচনের মাধ্যমে আজ্ঞলিক ক্লাব, থিয়েটার ক্লাব ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

গত প্রায় ২৫ বছরে অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কারা ছিলেন, তার তালিকা নিলেই পরিষ্কার হবে এই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, ডক্টর ত্রিগুণা সেন, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখার্জি প্রমুখ এর সভাপতি হয়েছেন। এখন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি এ সি গুপ্ত এই পদে অধিষ্ঠিত। সার্থকভাবে সঙ্গে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন গত ১৫ ২০ বছর অবনী লাহিড়ী। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাস্তবে কার্যকর হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে অফিস ঘর দিয়েছেন তিন নম্বর হেইলি রোডের বঙ্গভবনে। সেখানেও আজ স্থান অকুলান।

প্রতিষ্ঠানের সংবিধান অনুসারে অনেক মূল্যবান কাজ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলি। কাজের ব্যাপারে অবশ্য জোর দেওয়া হয় বাঙালি সমাজের সংস্কৃতির দিকে। তারপর শিক্ষা ক্ষেত্রে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক কয়েক বছরের কথা ধরা যাক।

মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্রদের ওঁরা দেন স্টাইপেন্ড, প্রত্যেক বছর ২০ ২৫ জনকে। স্কুলে ও কলেজে পড়ার জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে এই সংস্থা। আটটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও এঁদের সদস্য। তার মধ্যে এখন মাত্র চারটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ও অন্য চারটি মিশ্রভাবে বাঙালি অবাঙালিদের জন্য। শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি, বাংলা, ইংরাজি এই তিনটি ভাষাই। সম্প্রতি সমস্যা দেখা দিয়েছে, ঐ শেষোক্ত চারটি এই সব বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অনেকের পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের পাঠান ইংরাজি হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়ে। এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে বাংলা ভাষা মাধ্যমের জন্য আরও প্রভাব বিস্তার করার সেই সঙ্গে প্রয়োজন অর্থেরও। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকতর সহযোগিতার কথা তো উঠবেই।

সংস্কৃতিমূলক কাজে অ্যাসোসিয়েশন সক্রিয়। গান, বাজনা, নাটকের সপ্তাহ পালন ইত্যাদি। গেল দুই বছরে আমি দেখেছি ও শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নামকরা শিল্পীরা একত্রিত হয়েছেন এক মঞ্চে এই রাজধানীতে। তা ছাড়া আছে গান, নাচ, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা প্রত্যেক বছরে। যমুনা নদীর ওপারে রয়েছে জাহাংগীরপুরী কলোনি। কয়েক হাজার মুসলমান বাঙালি পরিবার সেখানে কষ্টেসৃষ্টে পেয়েছেন মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেখানে অনেক সমস্যা নিয়েও এঁরা চালান একটি বিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা, বন্যা অন্য প্রদেশে, প্রাকৃতিক হত্যালীলা গুজরাটেও। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠান অন্য ভাষা-ভাষীদের প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় রাজধানীর রাস্তায় নেমেছেন টাকা পয়সা তোলার জন্য

১৯৭১ এর বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সাহায্য করার জন্য অ্যাসোসিয়েশন অনেক কাজ করেছে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে এরা এক সময় স্বদেশি সংগীতের প্রতিযোগিতা ডেকেছিলেন। যেখানে এসেছিলেন শুধু বাংলাভাষীরা নয়, এসেছেন সুদূর হিমাচল, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু প্রদেশের প্রতিযোগীরাও। গত ২৩ বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি আর কোন ভাষা ভাষী সংস্থা এইভাবে একত্রে এগিয়ে আসার উৎসাহ দেখাতে পারেনি। তা ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের ছবির উৎসব, লোক সংগীত বা রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এসেছেন নামকরা শিল্পীরা ভারতের নানা জায়গা থেকে।

অ্যাসোসিয়েশনের নিজের সমস্যা অনেক আছে। অফিস ও অন্যান্য কাজের জন্য নিদারুণ স্থান সংকুলান তার মধ্যে একটি। দরকার টাকা পয়সারও। পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এ ব্যাপারে কেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না অন্তত, এই রাজধানীতে বাংলা ভাষায় যাকে অধুনা বলা হয় অপসংস্কৃতি সেটা যে আজও আসেনি তা মনে রাখা দরকার। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে অন্তত প্রয়োজন এমন একটি স্থায়ী জায়গা যেখানে নানা ভাষী ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হতে পারে।

এই সব কাজ হাতে নেওয়া যে কত মুশকিলের সে কথা জানেন যারা বাস্তবে কাজ করতে নেমেছেন। হল ভাড়া, ঘর ভাড়া, থাকা খাওয়ার জায়গা, যাতায়াতের বন্দোবস্ত, স্থায়ী কর্মচারী ইত্যাদি সমস্যায় আর্থিক সমাধান তো অবিলম্বেই দরকার। সকলেরই জানা যে, সংগঠনের কাজ তুড়ি মেরে হয় না সীমিত শক্তিতে অ্যাসোসিয়েশন যা করেছে রাজধানীর বাঙালি সমাজে তার তুলনা নেই। অথচ এখানে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের একটি প্রশাসনিক শাখা, এরা কী করে বাঙালিদের এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা সংগত ভাবেই রাখা যায়। []

আলোকচিত্র : সংগতী

তৃতীয় নব যুবা চলচ্চিত্র উৎসব বিশৃঙ্খল ভাবে শুরু হল

দিব্যজ্যোতি বসু

'চিলড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভাল–' ঠিক শিশুদের জন্যই নয়। বরং বলতে হবে নব যুবাদের জন্য। কেননা এখন কোন শিশুই নিজেদের আর 'শিশু' পরিচয়ে আবদ্ধ রাখতে চায়না, তাতে করে ক্রমশ বেড়ে ওঠা বা গ্রোয়িং শব্দের দোলাচলতা নাকি ঠিক ধরা পড়ে না, তাই ওদের পরিচয় নব যুবা বা নিও-ইয়ুথ হিসেবে – যেখানে বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি আর উদ্দীপনার একটা স্পষ্ট আভাস মেলে। সমগ্র বিশ্বে এখন ছোটদের জন্য চলচ্চিত্র তোলার প্যাটারনেও এখন এই মানসিকতারই ছোঁয়াচ লেগেছে। তাই দশদিনব্যাপী (৪ নভেমবর থেকে ১৩ নভেমবর) চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আসর কলকাতায় বসেছে তার নাম তৃতীয় আন্তর্জাতিক নব যুবা প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসব (থারড ইনটারন্যাশনাল নিও ইয়ুথ কমপিটিটিভ ফিল্ম ফেসটিভাল)।

শুক্রবার সকাল দশটায় নিউ এমপায়ার মঞ্চে এই চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী মল্লিকার্জুন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি বিভাগে মোট ১৫১টি ছবি দেখান হবে। এর মধ্যে আবার ৬৬টি ফিচার ফিলম, বাকীগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কার্টুন বা পাপেট ফিলমও এই তালিকায় রয়েছে। কমপিটিশন, ইনফরমেশন ও মারকেটিং ডিভিশনের আলাদা আলাদা ছবিগুলির মধ্যে কমপিটিশন ডিভিশনের ছবিগুলির মধ্যে সেরা ছবি হিসেবে 'স্বর্ণ হস্তী' পুরস্কারের যোগ্য ছবিটি নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন দেশের সাতজন সদস্যের জুরি বোরড গঠন করা হয়েছে। চিত্র পরিচালক তপন সিংহর নেতৃত্বে এই জুরি বোরডের অন্যান্য সদস্যরা হলেন চীনের শ্রীমতী ওয়াং জুনঝেং, চেকোস্লোভাকিয়ার মারিয়া রেনেজোভা, যুক্তরাজ্যের ম্যাট ম্যাককারথি, আমেরিকার এইথ হবলে, স্পেনের প্রিমিতিভো রডরিগে গর্নভিলো। জুরি বোরডের সপ্তম সদস্য হলেন ভারতের কে এল খান্দপুর। তবে নব যুবা চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হল বিভিন্ন দেশের অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের জুরি হিসেবে অংশগ্রহণ। এমনিতে প্রায় ১৫০জন ছেলেমেয়ে এই চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন, তাদের মধ্যে ১০ জন ভারতবর্ষের ও ৫ জন বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে জুরি হিসেবে রাখা হয়েছে। এরা তিনটি ছবিকে ক্রমিক মান অনুযায়ী 'জ্ঞানদীপ' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করবে। দশ দিনের এই উৎসবে যে সব ছবি দেখান হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওয়ালট ডিজনির স্টুডিওয় তোলা 'ফকস অ্যানড দি হাউনড,' চেক ছবি 'ইনকমপ্লিট একলিপস,' হাঙ্গেরির 'নাইস গ্রিন গ্রাস,' সোভিয়েত রাশিয়ার 'লাসট ব্যাড মারক' ও 'আই ডোনট ওয়ানট টু গ্রো আপ, নেদারল্যানডের 'থ্রি ইজ এ ক্রাউড'।

নিউ এমপায়ার মঞ্চে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলার সময় সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই এত বেশি পরিকল্পনার অভাব ফুটে উঠেছিল যে যা দশদিনব্যাপী এই উৎসবের সুষ্ঠু কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হবার কথা ছিল যথাক্রমে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী এইচ এল ভগত ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর। অনিবার্য কারণে তাঁরা আসতে পারেননি। এই ব্যক্তিবিশেষের রদবদল সম্পর্কে উৎসব কর্তৃপক্ষের করার কিছু ছিল না, এ কথা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের আন্তর্জাতিক মিলনমেলায় সময়ানুবর্তিতা আর সামঞ্জস্যের যে অভাব ফুটে উঠেছিল তা রীতিমত বিরক্তিকর। কথা ছিল দশটার সময় অনুষ্ঠান শুরু হবে। কিন্তু কলকাতা দূরদর্শনের সুন্দরী ঘোষিকা যখন অনুষ্ঠান শুরু করার কথা ঘোষণা করলেন তখন ঘড়িতে বাজে পৌনে এগারোটা। স্তোত্র পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। তবে শ্রীতমা গোপের হিন্দি-ঘেঁষা সংস্কৃত উচ্চারণ স্তোত্র পাঠের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দিয়েছে। এর পর অভ্যর্থনী ভাষণ দিলেন চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটির চেয়ারম্যান ভি শান্তারাম। তিনি বলেন কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত এই চলচ্চিত্র উৎসব পৃথিবীর অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্র উৎসব হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই স্বীকৃতি দিয়েছে ইনটারন্যাশনাল সেনটার অফ ফিলমস ফর চিলড্রেন অ্যানড ইয়ং পিপল। তিনি বলেন এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব বিশ্বের ১৮ কোটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ও

উন্মেষের পক্ষে সহায়তা করে। গ্রামে গ্রামে চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটির ছবি দেখানোর জন্য তিনি বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে 'ভ্রাম্যমাণ গাড়ি'র জন্যও আবেদন জানান। বিভিন্ন ভাষায় এই ধরনের ছবি তৈরি করার ওপরও সোসাইটির যে নজর আছে তিনি সেকথাও জানান। তবে এই ধরনের আন্তর্জাতিক উৎসবে চেয়ারম্যানের ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বারে বারে যেরকম বিভিন্ন পয়েনট ভুলে যাচ্ছিলেন, ফলে উৎসব অধিকর্তা আর ভি মোহরে তাকে বারেবারে যেভাবে নানান পয়েনট মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তা দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে। তবে সবচেয়ে হাস্যকর এক একজন বক্তার বক্তৃতা শেষ হবার পরই শান্তারাম সাহেব যেভাবে মাইক টেনে নিজে টুকরো টাকরা কথা বলছিলেন তা অনুষ্ঠানকে লঘু করেছে।

মাল্যদানের পালা তো আরও বিশৃংখলতার মধ্যে শেষ হয়েছে। ও অন্যান্য বরেণ্য অতিথিদের মালা পরানোর জন্য পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের জাতীয় পোশাকে সজ্জিত 'নব-যুবা' সদস্যদের মঞ্চে ডেকে নেওয়া হল। ঘোষণা করা হল মাল্যদান করা হবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে, দেখা গেল মালা পরানো হল [illegible] পরে জোড়হাতে নমস্কার করছেন চেকোস্লোভাকিয়ার মারিয়া বেনেজোভা। তপন সিংহকে মালা দিতে এসে অরুণাচল প্রদেশের কিশোরী মেয়েটি মালা পরিয়ে গেলেন প্রভাস ফাদিকারকে। আর মাংগলিক প্রদীপে কী তেল দেওয়া হয়েছিল কে জানে? মন্ত্রী মল্লিকার্জুন প্রদীপ জ্বালানোর সংগে সংগেই যেভাবে মঞ্চময় ধোঁয়া জমে উঠল তাতে তড়িঘড়ি প্রদীপ নিবিয়ে ফেলা ছাড়া গতি ছিল না। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস তাঁর বক্তৃতায় ছোটদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে অবহেলার কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন বামফ্রন্ট সরকার গত ছবছরে যে পঁচিশটি ছবি প্রযোজনা করেছেন তার মধ্যে মাত্র ৭টি ছোটদের জন্য তৈরি। তিনি আফসোস করেন যে আমাদের দেশে যত চলচ্চিত্র তৈরি হয় তার মাত্র শতকরা ১ ভাগ ছবি ছোটদের উদ্দেশে নির্মিত। তবে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন এই উৎসবে ওঁর নিজের উপস্থিতিকে 'It is really glorified for me' বলে উল্লেখ করলেন তখন বিদেশি অতিথিদের তো বটেই, উপস্থিত সকলেরই বোধহয় আশ্চর্য হওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীও ভাষণ দিলেন ছোটদের ছবির জন্য আরও অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উৎসব অধিকর্তা আর ভি মোহরে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রানসিস ফোবড কোপলার 'ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন রিটারনস' ছবিটি দেখান হয়। 'নিও ইয়ুথ'দের জন্য তৈরি সার্থক ছবি। রবারট ডালভার পরিচালনায় কিশোর অ্যালেক ও তার কাল ঘোড়ার কাহিনী 'নিও ইয়ুথ'দের তো বটেই, অ্যাডাল্টদেরও মনের মত ছবি হয়ে উঠেছিল। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে 'ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন।'□

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোলারিস

একদিন মুখে মুখে খবর গিয়ে পৌঁছল একটি নাচ গানের গোপন আসরে। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে নাকি ছেলে ছোকরা জড়ো হয় সঙ্গিনী সহ নৃত্যগীতের অভিলাষে। নির্দোষ প্রমোদকানন।

পিয়ানো যিনি বাজাতেন, তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। শ্রাবণী যদি ঘণ্টা তিনেকের জন্যে হাজিরা দেয় তো......

ফরটি রুপিজ পার আওয়ার......

ঘণ্টা পিছু চল্লিশ টাকা!

টাকার অংকটা কম নয়। কিন্তু পরিবেশ : তাকিয়ে দেখল শ্রাবণী। ভালই তো। পাতালঘর। রাস্তার লেভেল থেকে কয়েক ধাপ নিচে। আগাগোড়া এয়ারকনডিশনড। দরজা মোট আটটা। মেঝেতে লাল কারপেট, দেওয়ালে লাল পেনট, কড়িকাঠে লাল-বসনা সুন্দরীদের ফ্রেসকো। দেওয়াল-জোড়া বড় বড় আয়না-শিশমহল কায়দায়।

লাল মারবেল পাথরের টেবিল ছড়ান ঘরময়। মাঝখানে ডাকটিকিটের মত চৌকোনা নাচের জায়গা—চকচকে কাঠের

(চলবে)

নিম অন্নপূর্ণা

NOTHING
IS REAL TO
US BUT HUNGER
Kakuzo Okakura

সেই প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধার আগ্রাসনে গরিব গেরস্থ ৬ নম্বর লোক বৃজ আর তার স্ত্রী প্রীতিলতার শহর কলকাতার লক্ষ লক্ষ নাম-গোত্রহীন বুভুক্ষু মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার আগে ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকার ছবি 'নিম অন্নপূর্ণা।' এইটুকু বললে চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রতি বোধহয় অবিচার করা হবে, কারণ ক্ষুধার সর্বগ্রাসী চেহারার নিপুণ চিত্রায়ণ সত্ত্বেও নিম অন্নপূর্ণা শুধু ক্ষুধার ছবি নয়। কলকাতায় কেউ না খেয়ে মরে না – এই সবল বিশ্বাসে বৃজর মত একদিন যারা সব হারিয়ে কলকাতায় এসেছিল এবং যে 'অন্তঃপ্রবাহ' আজও অব্যাহত, প্রথম এবং শেষ দৃশ্যের প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, সেই মানুষদের শহরে টিকে থাকার সংগ্রামকে শ্রী দাশগুপ্ত চিত্রিত করেছেন অতুলনীয় দক্ষতায় (স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রে যা অচিন্তনীয়)। নিম অন্নপূর্ণা তাই অন্য অর্থে সামাজিক দলিল।

চলচ্চিত্রের 'বৃজ'র একটা অতীত আছে। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত, নিম্নবিত্ত থেকে সর্বহারায় পরিণত মানুষের অতীত ইতিহাসের মতই যা প্রাচীন এবং বৈচিত্র্যহীন। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল বৃজ -- তারপর ছোট্ট একটা স্কুলে মাস্টারের কাজ করেছিল কিছুদিন --- একদিন আকাল নেমে আসে সেই গ্রামে স্কুল উঠে যায় বাবা-মা মরে যায় --- বর খেদানো বোনটাকে নিয়ে শহুরে বাবুরা উধাও হয় --- ঘুরতে ঘুরতে বৃজ চলে আসে আসানসোলে - কারখানায় কাজ হয় বৃজর - তারপর প্রীতিলতার সংগে বিয়ে - বাচ্চা হয়, পাঁচ বছর পর আবার বাচ্চা হয় ---- একদিন হঠাৎ অনেকের সংগে কাজ চলে যায় বৃজর।

বৃজ শুনেছিল কলকাতার কথা : কলকাতায় কেউ না খেয়ে মরে না, কলকাতার বাতাসে টাকা উড়ে বেড়ায়, তাই দু বছর আগে একদিন সপরিবারে কলকাতায় চলে এসেছিল বৃজ।

দু বছরেও বৃজ কোন কাজ জোটাতে পারেনি। ঠোঙা বিক্রি করা পয়সায় আর প্রতিবেশীর কাছ থেকে আটা-পয়সা ধার করে আধপেটা খেয়ে বৃজদের দিন কাটে। তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকি। বস্তির মালিক ওদের ঘর থেকে বার করে দেয়নি, তবে একই বাড়ির অন্য অংশ ভাড়া দিয়েছে একজন বৃদ্ধ মুমূর্ষু ভিখিরিকে। ভিখিরি, অথচ রোজ দাড়ি কামায়, কফ-জড়ানো গলায় গান গায় – অতীতের জনপ্রিয় গান, যে গান একদিন বৃজর সহকর্মী প্রীতিলতার বাবাও গাইত, আর কাশে। বৃদ্ধের উপস্থিতি প্রীতিলতার কাছে অস্বস্তিকর, কারণ তা প্রীতিলতাকে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি রিক্তা প্রীতিলতা প্রাণপণে বাঁচাতে চেয়েছিল মধ্যবিত্তের শেষ সম্বল অহমিকা এবং আত্মসম্মানবোধকে। পারেনি। এক চরম মুহূর্তে ক্ষুধার্ত স্বামী-কন্যার জন্য ছিনিয়ে এনেছে অর্ধমৃত ভিখিরির চালের বস্তাটাকে, বহুদিন পর স্বামীকন্যাকে পেট পুরে ভাত খেতে দেখে তৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু অপরাধবোধে সেই অন্ন নিজে গিলতে পারেনি।

চলচ্চিত্র মৌলিক মাধ্যম নয়, অন্য সমস্ত মাধ্যম থেকে অকৃপণভাবে নিয়ে, আত্মসাৎ করে চলিত ছবি চলচ্চিত্র হয় – এই উক্তির যথার্থতা মেলে নিম অন্নপূর্ণা ছবিতে। সমালোচনায় প্রথমেই আসে কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার কথা। কমলকুমার মজুমদারের কাহিনীর একটা নাটকীয় পরিণতির দিকে শ্বাসরুদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত চলচ্চিত্র বোধ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভংগি দিয়ে উপস্থিত করেছেন অনায়াস ভংগিমায়। কাহিনী এগিয়েছে দ্রুতগতিতে। ছিয়ানব্বই মিনিট সময়ের মধ্যে তিনি দর্শককে নড়ে চড়ে বসার সময় দেননি। চাপা কামনা ও যৌনতা এ ছবির অংগ জুড়ে, তবু দর্শককে সুড়সুড়ি দিতে বুদ্ধদেব কোথাও স্থূলতার আশ্রয় নেননি। এর পরই আসে অভিনয়ের কথা : মণিদীপা থেকে জয়িতা - নিম অন্নপূর্ণায় সব মুখই অপরিচিত, তাই বুঝি প্রীতিলতা মণিদীপা রায় নয় প্রীতিলতা প্রীতিলতাই, লতি জয়িতা সরকার নয়, লতি লতিই। ভাত খাওয়ার দৃশ্যে মণিদীপার ভয়, আতংক এবং শ্বাসরোধকারী বিবমিষা দর্শকের বহুদিন মনে থাকবে।

কলকাতাবাসী বা জীবিকার প্রয়োজনে কলকাতায় যাদের নিত্য আসা যাওয়া 'বস্তি' শব্দটা তাদের কাছে নতুন নয়, কিন্তু বস্তিবাসী মানুষের দুর্দশার কথা জানাটা বোধহয় খুব সহজসাধ্য নয়। এই অজানাকে জানানর কৃতিত্বে ছবির পরিচালকের পরই যার স্থান তার নাম কমল নায়েক, নিম অন্নপূর্ণা ছবির ক্যামেরাম্যান। নিম অন্নপূর্ণা ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ সংগীত - শব্দহীন মুহূর্ত-যে ছবিকে নতুন ব্যঞ্জনা দিতে পারে দেবাশিস দাশগুপ্ত তা প্রমাণ করেছেন। পুরনো দিনের জনপ্রিয় গানের ব্যবহার চিত্রনাট্যকে দিয়েছে নতুন ডাইমেনশন।

কলকাতার দর্শক এ ছবি নেয়নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে মানবিক দলিল হিসাবে নিম অন্নপূর্ণার পুনর্মূল্যায়ন হতে বাধ্য।

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপীয় স্টাইলের অনুকরণে বেল আপনার জন্য এনেছে নতুন ব্রা

বেল-এর নতুন "নন্-স্লিপ" ব্রা বাড়িয়ে তোলে আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ আর নিখুঁত ভাবে ধরে রাখে আপনার যৌবন!

বেল-এর নতুন 'নন্-স্লিপ' ব্রা

নাম করা বেল ফ্রন্ট-ওপেন ব্রার প্রস্তুত কারকের নতুন উপহার। বেল-এর নন্-স্লিপ ব্রা এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে সব রকম ধকল সইতে পারে। কাপ দুটির নীচে একটি লাইক্রা ফিতে আছে যা এই ব্রা-কে জায়গামত ধরে রাখে এবং যার ফলে এটি নীচের দিকে নেমে যায় না বা উপর দিকেও মুড়ে থাকে না।

এই লাইক্রা টেপটি বিশেষভাবে তৈরী যার ফলে কিছুদিন পরার পর অন্যান্য ব্রার ইলাসটিকের মত এটি আলগা হয়ে যায়না, এমনকি বারবার কাচার পরও ফিতের ইলাসটিকটি অবিকৃত থাকে। লাইক্রা হল বিশ্বখ্যাত ডুপন কম্পানীর উৎপাদন।

বিনা খরচে বাড়ীতে বসে ডেলিভারী নিন

(১) নূন্যতম তিনটি অথবা তার বেশী ব্রায়ের জন্য সাইজ, স্টাইল এবং দাম উল্লেখ করে লিখলে আমরা আপনাকে ভিপিপি যোগে ব্রা পাঠিয়ে দেব এবং প্যাকিং ও পোস্টিং-এর সমস্ত খরচ আমরা বহন করব।

(২) অপছন্দ হলে অব্যবহৃত অবস্থায় ৩০ দিনের মধ্যে পাঠালে পুরো টাকা ফেরত পাবেন।

(৩) ডাকযোগে আমাদের জানালে আমরা আপনাকে নিকটবর্ত্তী বেল-এর ডিলারের নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দেব।

ব্যাক-ইউ | ব্যাক-ক্রশ

চাররকম ব্যাকক্রশ টাইপেরও পাওয়া যায়। স্ট্র্যাপের পজিশনকে দুভাবে রেখেই এই ব্রা পরা যায় —সোজাভাবে ও ক্রশভাবে বা আড়াআড়ি ভাবে।

বেল-এর ব্রা পাওয়া যাচ্ছে ১৫০০ দোকানে।

ছবিতে দেখান স্পাইকা ইলাসটিক টেপের 'বিমল পলি-য়েস্টার ক্রোম' যা মাদুরা কোটসের পলিয়েস্টার সুপার সিন দিয়ে জোড়া দাম—ব্যাক ইউ ২৩ ২৫ টাকা, ব্যাক ক্রশ ২৫'০০

বেল এর আরো নানারকম 'নন্-স্লিপ' ব্রা পাওয়া যায়।

	ব্যাক-ইউ	ব্যাক-ক্রশ
কটন টেপসমেত 'অরবিন্দ পপলিন'	১০'০০	১১'০০
ইলাসটিক টেপসমেত 'সেঞ্চুরী ওয়াস এন ওয়ার'	১৬.২৫	১৭.৫০
ইলাসটিক টেপসমেত 'বিমল পলিয়েস্টার রুবিয়া'	১৯'২৫	২১'২৫'
লাইক্রা টেপের (ব্রায়ের উপযোগী মোলায়েম ও লিমিটেড স্ট্রেচের) বিমল পলিয়েস্টার	২০.০০	২২ ৫০

belle 'নন্-স্লিপ' ব্রা

ইউরোপীয় স্টাইলের অনুকরণে তৈরী।
বেল অর্গানাইজেশন। P3 ।৫৪/বি,
সুবারবান স্কুল রোড, কলিকাতা-৭০০০২৫।

ARTIG-127

উড়িশা, বিহার এবং উত্তরপূর্ব ভারতে ডিসট্রিবিউটর, ডিলার, বুকিং এজেন্ট এবং 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' আবশ্যক

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল — ৭২

সূত্র : পাশাপাশি

১। বাতে মশা, দিবে [illegible] ৩। ভীমের হাতে ৫। অন্য ৭। চিঠিপত্র ৯ আসক্তিশূন্য ১১। মৃতদেহ ১৩ মুনাফা ১৪। খড়ি ১৬। শতসহস্র ১৮। মেদ বা চর্বি ২০।সিধে ২২। গাছ ২৪। ক্রোধ ২৬। নুন ২৮। ঈশ্বরের আবেক রূপ ৩০। অন্তর ৩২। মজার ব্যাপার ৩৩। অভয়

সূত্র : ওপর-নিচ

১। বাগানের কারিগর ২। শিশির মুখ আটকাতে লাগে ৪। চাহিদা ৫। পরাজয় ৬। কপালের শিরা ৮। একরকম শারদীয় ফুল ১০। নিচ ১২। কাঁড়া গোলক ১৪। চোখের মাথা কে খেয়েছে ১৫। বলো! ১৭। কাটা ঘা ১৯। বেদ ব্যাখ্যাতা ২১। বার্ধক্য ২৩। লাইন টানতে ইংরেজি আইন ২৫। বেশনে পাবে ২৭। স্বামী ২৯। চিহ্ন ৩১। নতুন

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১৪ ডিসেম্বর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১-১২-৮৩।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃংখল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃংখলের নম্বরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল — ৬৮ (সমাধান)

শব্দশৃংখল ৬৮ র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন গোবিন্দ চন্দ্র রায় (সেনট্রাল ব্যাংক অব ইনডিয়া, বাগডোগরা, দারজিলিং) এবং বাসুদেব চক্রবর্তী (রেসকোর্স কোয়ারটার, হেসটিংস, কলকাতা ২২)।

শব্দশৃংখল - ৬৮ র লটারিতে বিচারক ছিলেন বিনতা রায়চৌধুরী।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

নভেমবর ১৬ থেকে ২২

মেষ : শারীরিক অবস্থার সামান্য হেরফের; মেয়েদের শরীর ভাল যাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে সাময়িক মন্দা। কর্মক্ষেত্রে কোন ক্ষমতার অপব্যবহার হবে ক্ষতি. মেয়েদের মানসিক অশান্তি। পারিবারিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বয়স্কদের কারও অসামাজিক আচরণ বাধিত করবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃষ : শারীরিক অশান্তি চলবে। মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ব্যাপারে কারও পরামর্শে প্রচুর ক্ষতি, কর্মক্ষেত্রে প্রতি প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলা প্রয়োজন, মেয়েদের সাময়িক উদ্বেগ। সন্তানদের সংগে পারিবারিক ক্ষেত্রে মতবিরোধ অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা মেয়েদের বিচলিত করবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মিথুন : শরীর ভোগাবে মেয়েদের পেট সংক্রান্ত গোলমাল। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু প্রচুর ব্যয়। কর্মস্থলে কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে আচমকা প্রাপ্তিযোগ। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে নতুন ঝঞ্ঝাট, অশান্তি। প্রেম প্রণয় ব্যাপারে মেয়েদের আশাভংগ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কর্কট : শারীরিক অবস্থার খানিক অবনতি, মেয়েদের আগের কোন অসুস্থতার বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ। কর্মস্থলে কোন কৌশল বদল করতে হবে, মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে আগের কোন ঘটনার জের চলবে। বন্ধুজনের সংগে মতবিরোধ। কোন দুর্নীতিজনের সান্নিধ্যে আনন্দ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

সিংহ : শরীর ভাল চলবে না; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক অবস্থার অবনতি ঋণ। কর্মক্ষেত্রে চিন্তাধারার পরিবর্তন; মেয়েদের নিজ তৎপরতায় কোন সমস্যা সমাধান। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সংবাদ বিচলিত করবে। কোন সন্তানের জন্য গর্ব। ব্যবসায়ীদের লাভ

কন্যা : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য, দ্রুত আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে নিজ বিচার বুদ্ধির আলোকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অবস্থা নিজ অনুকূলে থাকবে। গৃহাদি নির্মাণ শুরু হতে পারে। সন্তানদের কারও সহজে কর্মলাভ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন।

তুলা : শারীরিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন; মেয়েদের শারীরিক ভোগান্তি চলবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে; সৎকাজে ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে কাজে-কর্মে নতুন উৎসাহ মেয়েদের কর্মস্থলে কোন খবর উৎসাহিত করবে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ধর্ম কর্মে আকস্মিক বাধা. ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বৃশ্চিক : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন। আর্থিক ক্ষেত্রে টানাটানি চলবে। কর্মক্ষেত্রে ছোট খাট ব্যাপারেও সমান গুরুত্ব ও মনোযোগ দেওয়া উচিত; মেয়েদের মানসিক অশান্তি। পারিবারিক অশান্তির জের চলবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

ধনু : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক ঝামেলা। আচমকা ব্যয় নাকাল করবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের ব্যর্থ প্রয়াস; মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ঘটনায় মানসিক চাপ। কোন অনুজের জন্য উদ্বেগ। মেয়েদের নিজ দোষে সমস্যা সৃষ্টি। ব্যবসায়ীদের নতুন প্রচেষ্টায় তৎপরতা।

মকর : শারীরিক ভোগান্তি চলবে; মেয়েদের আকস্মিক রক্তপাত। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, আয় বাড়বে তবে ব্যয়ও বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন উৎসাহ কিন্তু কোন বন্ধু জনের সংগে বিরোধ। পারিবারিক কোন সুখবরে আনন্দ। সন্তানদের কারও দুর্ঘটনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কুম্ভ : শরীর মোটামুটি চলবে মেয়েদের শারীরিক ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে জটিলতা; বেশ কিছু ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে; মেয়েদের কর্মস্থলে কাজে-কর্মে ঢিমে তালে ভাব ক্ষতি করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আগের কোন ঘটনার জের চলবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মীন : মানসিক চাপ সপ্তাহ জুড়ে চলবে; মেয়েদের স্নায়ু সংক্রান্ত গোলমাল। আর্থিক ব্যাপারে মন কষাকষি, সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুতা, গুপ্তচর ক্ষতি করতে পারে। মেয়েদের কোন ঘটনায় মানসিক চাপ। পারিবারিক ক্ষেত্রে দূরের আত্মীয়-স্বজনের জন্য উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

ইত্যাদি প্রকাশনার আরো তিনটি অসাধারণ পত্রিকা

খেলার আসর

হেমন্ত
মুখোপাধ্যায়

নন্দমার্গ ও তাণ্ডবনৃত্য।

মাদ দাশগুপ্ত : প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : গোঞ্জালভিস

কোত্থেকে আবির্ভূত হয় লাল বিকিনি পরা বারমেড। হাতের ট্রেতে সুরার সরঞ্জাম। দুই টেবিলের সংকীর্ণ পরিসর দিয়ে ইচ্ছে করেই নিতম্ব ঘষে দিয়ে যায় তরুণ বন্ধুদের ঘাড়ে কাঁধে-মুখে-পিঠে।

খটকা লাগল শ্রাবণীর। হপ্তাখানেক পরে লক্ষ করল শুধু অকালপক্ক ছেলে নয় সুবেশ প্রৌঢ়দেরও আবির্ভাব ঘটছে পাতাল কক্ষে।

বিদ্যুৎরেখার মতই তারা দরজা দিয়ে উধাও হচ্ছে ভেতরে – পেছনে পেছনে কোন না কোন চটুলা কিশোরী বা তরুণী।

অবনীশের সংগে আলাপ ঘটল তখনি। প্রথম থেকেই ছেলেটিকে দেখেছিল শ্রাবণী। ঘরের কোণে বসে থাকত চুপচাপ। একদৃষ্টে চেয়ে থাকত তার পানে।

তোয়াক্কা করেনি শ্রাবণী। পুরুষদের লালা ঝরা হ্যাংলা চাহনিতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এ-ছেলেটির চোখ তো তার দেহ লেহন করছে না – যেন তার সংগীতকে তারিফ করছে। দুই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

আস্তে আস্তে আকৃষ্ট হল শ্রাবণী। চোরা চাহনি দিয়ে দেখল, ছেলেটির মুখের কমনীয় শ্রী; গভীর, বাঙ্ময়, সুন্দর চোখের অসীম মায়া।

এ চোখ তো কালো হরিণ-চোখকেও লজ্জা দিতে পারে ---

সম্পাদকীয়

কলকাতায় এক দিকে কারল মারকস মৃত্যু-শতবার্ষিকীর নামে সরকারি রাজসূয় যজ্ঞ, অন্যদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একাত্মতা মহাযজ্ঞ। ময়দান লালে লাল, অন্যদিকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার জুড়ে গৈরিক। এই লাল-গৈরিকের বসতি দেখে তরলমতি ব্যক্তিরা টিপ্পনি কাটতে পারেন 'এ তো বড় রংগ যাদু এ তো বড় রংগ'। কিন্তু আমরা ব্যাপারটিকে এত জলবৎ তরলং দেখতে পারছি না বলে দুঃখিত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় ছ বছরে বামফ্রন্ট শাসন প্রচ্ছন্নভাবে নিরীশ্বর মারকসীয় ভাবধারা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সত্ত্বেও পশ্চিমবংগবাসীর মন থেকে ধর্মের প্রভাব বিন্দুমাত্র মুছে ফেলতে পারেনি। এই যে গত ছ বছর ধরে এত প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রচার, নাটকে-যাত্রায় 'প্রগতিশীলতার' ঢক্কা-নিনাদ, দলীয় ও সরকারি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে অবিরত 'অপসংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু কামান গর্জন, তা যেন ভস্মে ঘি ঢালা। আসলে ভারতবর্ষ তার শাশ্বত সনাতন চিরন্তন ধারা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রভাব এখনও জনমানসে আগের মতই প্রবল। ভারতবর্ষের জনমানসের এই চিরন্তন হৃদস্পন্দনটি যদি কেউ উপলব্ধি না করতে পারেন এবং ধর্মের নামে অসংখ্য মানুষের জমায়েত দেখেই নারভাস হয়ে অসংলগ্ন উক্তি করতে থাকেন, তাহলে তাকে প্রলাপ বলা যায়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আকালি দল, জামায়েত ই ইসলাম প্রভৃতি দলগুলি এই ধর্মকেই তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটি সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান। নীতিগতভাবে ধর্মসংঘ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলার থাকতে পারে না। ধর্মে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, আমরা তাঁদের দলে নই।

পছন্দমত ধর্ম-আচরণের স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ধর্মকে যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করা হয় সেখানেই আমাদের ঘোরতর আপত্তি —ধর্মের মহান আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য সেখানে অদৃশ্য হয়ে শোষক শ্রেণীর নখদন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম ধর্মের মধ্যে রাজনীতিকে নিয়ে এসে দেশের মানুষকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে প্ররোচিত করেছিল কারা? কারা আজ দেশ বিভাগের জন্য দায়ী? পাঞ্জাবে আবার ধর্মের জিগির তুলে বিচ্ছিন্নতার ইন্ধন যোগায় কারা? কারাই বা কাশ্মীরকে, উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়? এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে যদি শিখ, খৃস্টান ও মুসলমানরাও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য শপথ গ্রহণ করেন তাহলে আমরা তাঁদের স্বাগত জানাব। সুতরাং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেশব্যাপী একাত্মতা যজ্ঞ আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ কিন্তু ওই মঞ্চ থেকে যদি হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রবল প্রতিবাদ না জানিয়ে পারব না। ভারতবর্ষ কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য নয় – 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর' অর্থে শুধু হিন্দুর স্পর্শ বোঝায় না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভারততীর্থ কবিতার কদর্থ করেছেন এবং যা এক প্রকৃত মহামিলন যজ্ঞে পরিণত হতে পারত, তা শুধু তাঁরা একটি 'হিন্দু যজ্ঞে' পরিণত করেছেন। তাঁরা দৃষ্টি প্রসারিত করে সর্বধর্মের মানুষকে যদি প্রকৃত ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তাহলেই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁদের আশীর্বাদ জানাবে।

পরিবর্তন

৩০ নভেমবর ৬ ডিসেমবর ১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২

প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : অর্ধেন্দু রায়

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ১২১২ নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন

৭ ডিসেমবর সংখ্যার আকর্ষণ

এখনও ভারতবর্ষে জাদু চর্চার পুরোভাগে বাঙালি। বাঙালি জাদুকরেরাই সর্বপ্রথম এদেশে আধুনিক জাদু চর্চার সূত্রপাত ঘটান। বাঙালির জাদু চর্চা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন অজিত কৃষ্ণ বসু। ৭ ডিসেমবর প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর লেখা

বাঙালির জাদু চর্চা

সেই সংগে ম্যাজিকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাদুকর পি সি সরকারের (জুনিয়র) একান্ত সাক্ষাৎকার। দিললির প্রখ্যাত বাঙালি জাদুকর করুণাশংকরের সাক্ষাৎকারও এই সংখ্যার আকর্ষণ ঃ

বাঙালির ম্যাজিক

আর একটি বিতর্কিত রচনা লিখেছেন চিরঞ্জীব। বিষয় ঃ ক্রিকেট। না, ক্রিকেট-সাহিত্য নয় – ক্রিকেট-প্রশস্তি নয়। ক্রিকেটের বিরুদ্ধে তীব্র বুলেটের মত অগ্নিবর্ষী অথচ তথ্যবহুল রচনা। সেই সংগে ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার – যিনি বলেছেন, ক্ষমতা থাকলে ক্রিকেট বন্ধ করে দিতেন।

ক্রিকেট ঃ কর্মনাশা ক্রিকেট

বিদেশি ভাষা চর্চার জন্য ইদানিং আমাদের দেশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল লেখা

বিদেশি ভাষা শিখতে চান?

এ ছাড়া 'ইন্দিরা গান্ধীর সংগে দেশে দেশে'।

দিললি থেকে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সরজমিন রিপোরট।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রথযাত্রার সরজমিন প্রতিবেদন।

এবং অন্যান্য নিয়মিত ফিচার।

নিবেদনমিদং

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন পরিবর্তন কভার করেছিল। আনন্দ সংবাদ, দিললিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলন কভার করার জন্যও পরিবর্তন অনুমতিপত্র পেয়েছে। সেদিন একজন বলছিলেন, আচ্ছা, আপনারা এই যে সব সিরিয়াস বিষয় কভার করেন, এসব কি কেউ পড়ে? ওই প্রশ্নকর্তার দোষ নেই, অধিকাংশ লোকের ধারণা, আমাদের দেশের পাঠকেরা সিরিয়াস বা জ্ঞানগর্ভ কিছু পছন্দ করেন না। তাঁরা সরলমতি। অত্যন্ত ভুল ধারণা। আমাদের দেশের নিরক্ষর জনসাধারণ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গীতার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। শিক্ষিত পাঠকদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমরা দেড় বছর আগে পরিবর্তনের চরিত্র যখন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছিলাম, তখন অনেকে ভয় পেয়েছিলেন। সারকুলেশন কমে যাবে বলে তাঁদের ভয় ছিল। কিন্তু দেখা গেল, সারকুলেশন বাড়তেই থাকল। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে পরিবর্তন জায়গা করে নিল। অথচ গ্রামের সাধারণ মানুষও পরিবর্তনকে ভালবাসলেন।

আমাদের দুজন পাঠক চিঠি লিখেছেন, আমরা পুজো সংখ্যা সম্বন্ধে পরিবর্তনে পাঠকদের চিঠি ছাপিয়ে নিজেদের ঢাক নিজেরা বাজাচ্ছি। দেখুন, ভাল জিনিসেরই প্রচার দরকার হয়। বার বার প্রমাণ দাখিল করতে হয়। দুধ ফিরি করে বিক্রি করতে হয়। মদের জন্য বিজ্ঞাপন লাগে না। প্রচারের দরকার হয় না। তাছাড়া আমরা কাউকে বলিনি, আমাদের প্রশংসা করেই শুধু লিখুন। আমরা বলেছিলাম, পুজো সংখ্যা কেমন লাগল লিখুন। শতকরা ৯৯ জন পাঠক পাঠিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন। আমাদের এখন কী করা উচিত? যেহেতু প্রশংসা আছে সেহেতু সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলা উচিত? যখন দূরদর্শনে বা অন্য দৈনিক পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যা সমালোচনার নামে গোষ্ঠীদের পিঠ চুলকোন হয়, পরিবর্তনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় না, তখন তো ওই সব ব্যক্তিরা সেখানে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানান না? আমরা সম্পূর্ণভাবে পাঠক-পাঠিকার মতামতকে গুরুত্ব দিই। এ ব্যাপারেও আমাদের মেজরিটির মতকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯৮৪ সাল থেকে নতুনভাবে পরিবর্তনকে সাজাবার আবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এমন সমালোচনা করুন, যা আমাদের উপকারে আসে। ভারতবর্ষের কোন কাগজে এমন একটা কলম দেখান যেখানে এইভাবে পাঠকদের সংগে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা আছে।

পরিবর্তন বিনা পণে বিবাহেচ্ছু তরুণদের আবেদন বিনামূল্যে ছেপে এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে এই কথাটা দূরদর্শনে এক সাক্ষাৎকারে কথা প্রসংগে বলেছিলেন বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগির। তাঁর বক্তব্য রেকরড করা হল। কিন্তু দেখা গেল টেলিকাসটের সময় 'পরিবর্তন' নামটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এটা কি কণ্ঠরোধ নয়? পরিবর্তন সামাজিক দায়িত্ব পালন বা ভাল কাজ করলেও তার নাম উল্লেখ করা হবে না? গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের সংগে জড়িত অনেক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই পরিবর্তন নামটি শুনে আঁৎকে উঠছেন। পরিবর্তনের কোন ব্যক্তির নাম নিউজে এলেও তাদের নাম পরিহার করা হচ্ছে। যাকে বলে ব্ল্যাক আউট। কিন্তু তবু পরিবর্তনের দুর্বার গতিকে তাঁরা রোধ করতে পারছেন না। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সচেতন থাকুন, প্রতিষ্ঠানবদ্ধ ও গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার রাজ্যে পরিবর্তন যে খোলামেলা হাওয়াটুকু আনতে চেষ্টা করছে সেটা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। প্রদীপ জ্বালালেই শুধু হয় না, তাকে জ্বালিয়ে রাখার মত ক্ষমতা অর্জন করাটাই বড় কথা। আপনারা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বলেন, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার কথা বলেন, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা বলেন। কিন্তু এসব কথা মুখে বললেই হবে না, যাঁরা এই সব আদর্শ রূপায়িত করতে যাচ্ছেন তাঁদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে হবে।

২১ ডিসেমবর কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় গত একশ বছরে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদান, কংগ্রেসের বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সংখ্যায় লিখছেন। এই সংখ্যার পাতা বাড়বে। দাম হবে চার টাকা।

আমাদের বিশেষ বিবাহ সংখ্যার চাহিদা পূরণ করা যায়নি। সেজন্য জানাই বিশেষ কংগ্রেস শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্য আগে থেকে এজেনটরা অরডার না দিলে পরে কপি দেওয়া সম্ভব হবে না।

পা. চ.

অলিম্পিক কোচ জিম ও'ডোহার্টি বলেন:

"শক্তি আর স্ট্যামিনা গড়তে কমপ্লান® অদ্বিতীয়!"

প্রখ্যাত অলিম্পিয়ান জিম ও'ডোহার্টি ভারতসমেত, সারা জগতেই প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়দের জোরদার কঠিন প্রতিযোগিতার জন্য ট্রেনিং দেন। তাঁর মতে চ্যাম্পিয়নরা মাটি ফুঁড়ে জন্মায় না, তাদের তৈরী করতে হয়। আর বিজয়ী হতে গেলে যেমন জোরালো ইচ্ছাশক্তির দরকার, তেমন-ই জোরালো দৈহিক শক্তিরও দরকার।

"সাঁতারু, অ্যাথলেট আর বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের আমি নিয়মিত কমপ্লান দেয়ার পরামর্শ দিই" বলেন জিম ও' ডোহার্টি। "কমপ্লান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ সম্পন্ন এক সম্পূর্ণ আহার, যা সুস্থ-সবল শরীর গড়ে ও স্ট্যামিনা বাড়ায় আর অতি সহজেই হজম হয়।"

অভিজ্ঞ জিম ও' ডোহার্টির মতামতটি আপনিও মানুন। আপনার বাচ্চাদেরও সর্বাঙ্গীন, সুস্থ-সবল বাড়ের জন্য প্রতি দিন কমপ্লান দিন। কমপ্লান পাওয়া যায় চমৎকার স্বাদ—গন্ধে, যা বাচ্চারা দারুণ ভালবাসে।

Glaxo Complan

GLC.9-2317 BN

কমপ্লান®–সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

সমীপেষু

কাঁটাতারের কাঁটা

গত ২৭ সেপ্টেম্বর এর পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর আলোচনাগুলি পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। আশা করি আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে এমন মনোজ্ঞ ও সুপাঠ্য নিবন্ধ আরো পড়তে পারবো।

বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনাটা অদ্ভুত। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন, এ উদ্ভট পরিকল্পনা তাঁদের মাথায় এল কী করে? বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের দিকে তাকালে এমন দ্বিতীয় নজির সম্ভবত মিলবে না। আমি মনে করি এই পরিকল্পনা শুধু উদ্ভট নয় আমাদের জাতীয় মর্যাদা হানিকরও বটে। কাঁটাতারের নির্মম খোঁচায় কলঙ্কিত ও রক্তাক্ত হবে জাতীয় ইতিহাস। সুতরাং এই পরিকল্পনা যাতে কার্যকর না হয় সেটাই আমরা চাই।

সুদীর্ঘ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে অযথা মোটা টাকা বেরিয়ে যাবে। আর এই টাকা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পকেট থেকে সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুলে নেবেন কোন সন্দেহ নেই। শুধু এই পরিকল্পনা রূপায়ণে খরচ হবে তা নয়, এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচও পড়বে প্রচুর। যখন প্রতিরক্ষা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার মাইলের পর মাইল লোপাট হয়ে যাচ্ছে তখন এই কাঁটাতার লোপাট হয়ে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার।

হেনা মান্না
পোর্টব্লেয়ার, আন্দামান

ভুল তথ্য

পরিবর্তন (৭-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা ৫. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি প্রবন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। প্রবন্ধে প্রতিটির যে ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে তা ভুল। লেখক কেবল 'শ্রীমদ্দর্শন' গ্রন্থের উল্লেখ করে ঠিকানাটির সূত্র [illegible] দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর কোন প্রামাণিক গ্রন্থ আছে কিনা সম্ভবত তাঁর জানা নেই। এইরূপ প্রবন্ধে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ জড়িত, বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এই প্রসঙ্গে প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করে জানাতে চাই যে ঐ গ্রন্থের ঠিকানাটি পৃথক। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন কাম্যাপুকুর লেনের একটি বাড়িতে থাকতেন, তবে একা নয় সঙ্গে আরও দুজন ব্রাহ্মভক্ত একত্রে বাস করতেন। তাঁরা হলেন শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত এবং ত্রৈলোক্য সান্যাল। ত্রৈলোক্যবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে বহুবার এসেছেন। একথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যবাবু 'অতীতের ব্রাহ্ম সমাজ' নামে একটি বই লেখেন। ঐ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ আছে। ঐ পুস্তকে (পৃষ্ঠা ৫৩) তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা তিনজন একত্রে ২৮ নং কাম্যাপুকুর লেনে (২৫ নং নয়) বাস করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেখানে কয়েকবার শুভাগমন করেছেন। সুতরাং ২৫ নং কাম্যাপুকুর লেনের পরিবর্তে ২৮ নং কাম্যাপুকুর লেন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিমলকান্তি দাস
হাওড়া ১

বিষয় ঃ বিদ্যুৎ

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সমস্যায় বারাকপুর থানার অন্তর্গত মণিরামপুরের গৃহস্থরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে ফলস্বরূপ আমরা শুনতে পাই বিদ্যুৎ রেশনিং এর সংশোধনী ধারা ও প্রস্তাবের কথা। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এতকিছু করার পরও বারাকপুর থানার অধীন মণিরামপুরের তামাম এলাকা প্রতিদিন সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত্রি নটা দশটা পর্যন্ত লোডশেডিং হবেই হবে। এ ছাড়া সকাল দুপুরে তো লোডশেডিং আছেই।

ভাবতে অবাক লাগে এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক পার্টি বা সংগঠন প্রতিকার করা দূরে থাক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখায়নি। অথচ মিটার ঠিকই উঠছে।

মণিরামপুর বাসিন্দাদের সন্ধ্যার পর শ্মশানের অন্ধকার দূর করবার জন্য পলতা জলকল থেকে কি সামান্য বিদ্যুৎ দেওয়া যায় না?

টিটাগড় সি ই এস সি পাওয়ার হাউস থেকে কি মণিরামপুর বাসীদের বিদ্যুৎ দেওয়া যায় না? অনুসন্ধান করে জানা গেছে টিটাগড় সি ই এস সি থেকে বারাকপুর ইলেকট্রিক সাপলাই এর বিদ্যুৎ নেবার ব্যবস্থা আছে।

অজয় রায়চৌধুরী
মণিরামপুর, বারাকপুর

প্রবাসীর চিঠি

আ মরি বাংলা ভাষা

.. কিছুদিন আগে পরিবর্তনের পাতায় জনৈক 'প্রবাসীর পত্র' পড়েছিলাম। তিনি খুব সুখে শান্তিতে আছেন। কিছুরই অভাব নেই তাঁর সুদূর প্রবাস জীবনে - এ কথাই জানিয়েছেন।

আমি জানি প্রবাসী বাঙালিদের অনেকের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক বাঙালিত্বের অভাব।

আমার এক অতি পরিচিত পরিবার এখানে বিশ বছর যাবৎ আছেন। এঁরা এককালে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। এদেশে আসার পর (বলা বাহুল্য চাকরি সূত্রেই আসা) ক্রমে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষা, শুদ্ধ বাংলা এবং স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে এক অপূর্ব মিশ্র ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছেন। অবশ্যই বাড়িতে পারিবারিক সীমার মধ্যে। বিশুদ্ধ বাংলা বা সাহিত্য-সুলভ মার্জিত বাংলার সঙ্গে পরিচয় একেবারেই নেই। কারণ পত্র পত্রিকা, গল্প উপন্যাস কিছুই ও বাড়িতে পড়ার রেওয়াজ নেই। পড়ার মধ্যে দেখা গেছে ইংরাজি সিনেমা সাময়িক আর হিন্দি ফিল্মি উপন্যাস পকেট বুক ধরনের, যা রেলওয়ে বুক স্টলে সহজলভ্য। ছেলেমেয়েরা স্থানীয় ভাষা বা ইংরাজি মাধ্যমে পড়াশুনা করেছে। কর্তা-গিন্নির এক কণা আগ্রহ নেই বাংলা পড়ার বা শুদ্ধ বাংলা বলার। ঘরে বাইরে প্রয়োজন যখন পড়ে না। তখন আর দরকার কি - এই মনোভাব। ছেলেমেয়েদের এঁরা ইংরাজিতে কথা বলতে উৎসাহ দেন। নিজেরা বাড়িতে বসেও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলতে ভালবাসেন। সন্তানরা ভুল বাংলা বললে সংশোধন করার চেষ্টা কদাচ করেন। অন্যে দেখিয়ে বা শুধরে দিলে রাগ করেন, বিরক্ত হন।

এ রকম বাঙালি পরিবার প্রবাসে বিস্তর। তুলনায় যাঁরা বহুকাল থেকেও মাতৃভাষা বজায় রেখেছেন চলনে, বলনে, আচারে, ব্যবহারে। বাংলা ভাষা চর্চা চেষ্টা করে চালু রেখেছেন দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও - তাঁদের সংখ্যা বিরল। প্রশ্ন হচ্ছে এমন কেন হবে? প্রবাসী বাঙালিদের জীবনে মাতৃভাষার এমন নিদারুণ অবস্থা অধিকাংশরাই দেখেও দেখেন না। অথচ একটু সচেতন হলে, সামান্য চেষ্টা রাখলে বাংলা ভাষার, বাঙালিত্বের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটে না।

জগৎ দেবনাথ
নাসিক, মহারাষ্ট্র

কমপিউটর এবং চাকরির সুযোগ

ব্যাংক কর্মচারীদের দুটি সংগঠন এ আই বি ই এ এবং এন সি বি ই এর সঙ্গে আই বি এ এর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকে কমপিউটর বসান হচ্ছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে দীর্ঘদিনের হাজার হাজার শূন্য পদ পূরণ করা বন্ধ রাখা হয়েছে। সম্ভবত সরকার/ম্যানেজমেন্টের নির্দেশেই ব্যাংকিং সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড চাকরি প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করছে না। যদিও পরীক্ষা ফি বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। সরকার ম্যানেজমেন্ট সব সময়ই কম খরচে বেশি মুনাফা পেতে চায়। কিন্তু দুটি কর্মচারী সমিতিও এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। মাত্র একটি নতুন সংগঠন বি ই এফ আই ব্যাংকে কমপিউটর বসিয়ে চাকরির সুযোগ নষ্ট করার প্রতিবাদে একদিন ধর্মঘট করেছে এবং বিভিন্ন রকম আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কমপিউটর প্রতিরোধের আন্দোলনকে বি ই এফ আই তাদের সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেও ঘোষণা করেছে।

শহীদ সরকার
কল্যাণী, নদীয়া

আগামী ২০০০ সালে

হিসাব করতে গিয়ে খেয়াল হল বিংশশতাব্দীর আয়ু আর দেড় যুগও নয়। অর্থাৎ আর কয়েকটা আঙুল মাপা বছর পেরলেই আমরা একুশ শতকে, পরিভাষায় যাকে বলে প্রগতি শতকে, পৌঁছব। হয়তো সে শতকে মানুষ চাঁদে আস্তানা গড়বে। অন্য সৌরমণ্ডলে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে। হয়তো খাদ্যাভাব থাকবে না। যানজট থাকবে না। মানুষের সমৃদ্ধি বাড়বে। সুখ বাড়বে। কিন্তু ভয় হয় সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতির কথা ভেবে। সভ্যসমাজের দৃষ্টান্তে যেভাবে ঐতিহ্য ভুলে মানুষ উচ্ছৃংখল বে আবরু হয়ে পড়ছে

তাতে সন্দেহ হয় সেই সুসভ্য ভাবী শতকে সমাজ বলে কিছু থাকবে কি না। নিজেদের সম্পূর্ণ-প্রকাশ করবার সদিচ্ছায় হয়ত মহিলারা নগ্ন হয়ে বন্য প্রাণীর মত বিচরণ শুরু করবে। আর কয়েকটি হিংস্র, প্রলুব্ধের নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে সমাজবন্ধন।

না, এ কেবল আমার সন্দেহ নয়। সমাজবিজ্ঞানীদেরও বক্তব্য। ইদানিং যুবসম্প্রদায় ভীষণ রকম স্যাডিস্টিক হয়ে উঠেছে। আর তালে তাল মিলিয়ে শরীর দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন মহিলারা। সমস্ত পোশাকের মুখ্য প্রয়াস যাকে যতখানি দেহভঙ্গির কুৎসিত প্রকাশ জনসমক্ষে ঘটান যায় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

বিজ্ঞানের প্রগতি আমাদের সুখ দিতে পারবে। কিন্তু ঐতিহ্যহীন রিপুসর্বস্ব কতগুলো জীবের মধ্যে সে সুখ কোন শান্তি আনতে পারবে কি? নারী প্রগতির জন্য ভুয়ো ফ্যামিনিস্ট ধ্বজা উড়িয়ে যে সমস্ত মহিলারা 'কাট ইওর কোট একরডিং টু ইওর বেলি' শুরু করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সমাজের যাবতীয় অশালীন ঘটনার অর্ধেক দায় নিজেদের কাঁধে নেবার সাহস দেখাবেন হিসাবে কথা নিজেদের ঐতিহ্যের চিন্তা করবেন।

আল্পনা বিশ্বাস
কলকাতা-৪২

ভ্রম সংশোধন

২৩ ২৯ নভেম্বরর সংখ্যার 'পরিবর্তন' এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় পত্রিকার মূল্য অনবধানবশত Rs. 2.25 ছাপা হয়েছে। প্রকৃত মূল্য Rs. 2.50,

সম্পাদক

এবার পুজোয় মাখালতোড় গ্রামে বিশেষ পরিবর্তন

হাজার হাজার টাকা মনসবদারির প্যানডেল কিংবা অগুনতি লোক-জনের উৎসাহ আর ক্লান্তির সহগামিতা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। ছিল না নানান ছাঁদে, নানান ঢংয়ে তৈরি করা দুর্গাপ্রতিমা। পোশাক আশাক, সেন্ট আতরের বৈচিত্র্য আর ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ শহুরে পুজোর চালচিত্রও ছিল না। আর ছোট্ট ছোট্ট টুনির আলোয় অমিতাভ বচ্চনের মারপিট করতে করতে টেবিলের কোণায় ধাক্কা লেগে পড়ে যাওয়ার মত আলোকসজ্জা তো দূরের কথা, গোটা গ্রামটার ভেতর এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে বিজলী বাতির আলো এসে পৌঁছেছে। তবুও এবারকার দুর্গা পুজোয় মুর্শিদাবাদ জেলার মাখাল তোড় গ্রামের অধিবাসীদের হাস্যোজ্জ্বল আলো শহরের বিজলী বাতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। কেননা এবারকার শারদীয় উৎসব মাখাল তোড় গ্রামে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। 'পরিবর্তন' পত্রিকায় 'এবার পুজোয় আমাদের গ্রামে আসুন' ফিচার পড়ে যে অতিথিরা মাখাল তোড়ে পুজো দেখতে গেছেন তাঁদের ঘিরেই গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এসেছে অনাবিল আনন্দের বিজলী ছটা।

সালার জংশন থেকে তিন মাইল ভেতরে আশ্চর্য রূপসী গ্রাম এই মাখালতোড়। প্রাক দুর্গাপুজোর ধারা-বর্ষণ গাঁয়ের পথে কাদা ফেলতে পারেনি। সবুজ ধানের ক্ষেত, শরতের কাশবন আর নানান রঙে ছোপান মাটির বাড়িগুলি গ্রামের রূপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ গাঁয়ের পুজোর বিশেষত্বের খবর জানিয়ে পরিবর্তনের ১ অকটোবর সংখ্যায় চিঠি লিখেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সুব্রতবাবুর ওই চিঠির মাধ্যমে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মাখালতোড়ে পুজো কাটিয়ে গেলেন বেশ কয়েক জন শহুরে ভদ্রলোক। শহরের জাঁকজমক আর হৈ হল্লা এঁদের ক্রমশই ক্লান্ত করছিল। একটু পরিবর্তনের জন্য হাঁপিয়ে উঠে ছিলেন। কলকাতার সল্ট লেক থেকে এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইনজিনিয়ারিং এর ফোরথ ইয়ারের ছাত্র অমিতাভ সান্যাল, সিউড়ি থেকে এলেন কবি অধ্যাপক কবিরুল ইসলাম, সুকুমার দত্ত ও এস মান্নাকে সঙ্গী করে। ষষ্ঠীর দিন সকালবেলা কলকাতা থেকে মোটরবাইকে চেপে সটান হাজির হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো কেমিসট্রির অধ্যাপক ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মরগ্যানাইট কোমপানির অন্যতম গবেষক ডঃ শিবেন ঘটক। গ্রামবাসীরা ওদের পেয়ে যারপরনাই খুশী। প্রায় চারশ বছরের পুরানো পুজো গাঁয়ের মুখার্জিদের বাড়িতে। এই চারশ বছরের ইতিহাসে এমনটি কখনও হয়নি যে, শহর থেকে অজ্ঞাত, অপরিচিতরা গাঁয়ের পুজোয় এভাবে সামিল হয়েছে। আরও দুটি পুজো হয় এই গ্রামে। মুখার্জিদের বাড়ির লাগোয়া গ্রামের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবার সরকার বাড়ির পুজো, অন্যটি গ্রামের বারোয়ারি পুজো।

অতিথিদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত গ্রামের লোকেরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিলেন। সিউড়ির অতিথিদের ভার নিলেন গ্রামের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ও স্কুল শিক্ষক বৈদ্যনাথ সাহা। মোটর বাইকের আরোহীদের আদর আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করা হল সরকার বাড়িতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার ও সঙ্গী সোমনাথ রায় বর্মনের দেখভালের দায়িত্ব নিলেন গ্রামের ত্রিধারা পত্রিকার সম্পাদক রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রামের পুজোর পরিবেশটাই অন্যরকম। ষষ্ঠীর দিন দোলায় চড়ে কলাবৌর আগমন থেকে শুরু করে দশমীর দোলা বিসর্জনের পর শঙ্খচিলের আগমন পর্যন্ত প্রত্যেকটি আচার অনুষ্ঠানই অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে পালন করা হয়। মহাষ্টমীর অঞ্জলি বা সন্ধিপুজো তো আছেই। এখানে আবার নবমীর দিন বেদেদের সাপ খেলান বা রাত্রে ভাদু গানের আসরও শহুরে লোকেদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ। এখানকার ঢাকের বাদ্যির কথা সবিশেষ উল্লেখ্য কারণ এই এলাকার ঢাকীদের কুশলতা সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। দশমীর দোলা বিসর্জনের পর উড়ে আসা শঙ্খচিল তো এক পরম আশ্চর্যের বিষয়। প্রত্যেক বছরই নাকি ওই সময় শঙ্খচিল আসে। দোলা বিসর্জন দেওয়ার সময় 'হরি হরি বল' ডাক দেওয়ার সংগে সংগে শঙ্খচিলটি উড়ে আসে। গ্রামবাসীদের ধারণা 'মা দুর্গা এই শঙ্খচিলে চড়ে স্বর্গে চলে যান।'

শহরের অধিবাসীরা মাখাল তোড়ে পুজো কাটাতে এসেছেন শুনে আশ-পাশের গ্রাম থেকেও বেশ কয়েকজন আমন্ত্রণ নিয়ে হাজির হয়েছেন তাদের গ্রামে ঘুরে যাবার জন্য। ওইসব গ্রামের পুজোতেও কিছু না কিছু উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ রয়ে গেছে। তার মধ্যে কাগ্রামের মোষবলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাখালতোড় গ্রাম থেকে ৯ মাইল দূরে এই গ্রামে রামদুলাল ব্যানার্জি ও কমল চ্যাটার্জির উদ্যোগে যে পুজো হয় সেখানে দেবী দুর্গাকে শক্তির উৎস হিসেবে অর্চনা করা হয়ে থাকে। তাই পাঁঠা, ভেড়া, মোষ ইত্যাদি পশুবলির বন্দোবস্ত। সে এক বীভৎস অভিজ্ঞতা। এখানে পুজোর চারদিনে মোট ২১টা পাঁঠা, ৯টা ভেড়া আর ১ টা মোষবলি দেওয়া হয়ে থাকে।

শহর ছেড়ে গ্রামে পুজো দেখতে এসে অতিথিদের সবচেয়ে যা স্মরণীয় বলে মনে হয়েছে তা হল গ্রামবাসীদের আন্তরিক ব্যবহার। মাখালতোড় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা যেভাবে অতিথি আপ্যায়নে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তার স্মৃতি অতিথিদের অনেক দিন পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হবে।

দিব্যজ্যোতি বসু

আলোকচিত্র : সোমনাথ রায় বর্মন

জ্যোতিবাবু এখন থেকে আইন-শৃঙ্খলার রিপোরট নেবেন পারটির কাছ থেকে, পুলিশের কাছ থেকে নয়

নিশীথ দে

সি পি আই (এম)-এর রাজ্য নেতৃত্ব নিচের তলার পারটি নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন 'লুঠপাট, ডাকাতি, ঘর পোড়ান প্রভৃতি কাজের সংগে সি পি আই (এম)-এর লোক জড়িত বলে পুলিশ রিপোরট দিচ্ছে। সি পি আই (এম)-এর লোক এসব করে না। সুতরাং এ রিপোরট প্রচারিত হলে প্রতিবাদ জানাবেন, মামলা ঠুকে দেবেন।' সি পি আই (এম) নেতাদের কথা হল, 'অপরাধমূলক কাজের সংগে জড়িত করার আগে পুলিশ বা খবরের কাগজের কোন কোন রিপোরটার স্থানীয় পারটি বা জেলা কমিটির সংগে যোগাযোগ করে যাচাই করার চেষ্টা করেন না। সি পি আই (এম)-এর লোক কিনা তা সি পি আই (এম) ছাড়া কে জানবে? বিভিন্ন খুনের ঘটনাতেও সি পি আই (এম)কে অন্যায়ভাবে জড়ান হচ্ছে। সি পি আই (এম) খুন-খারাপির বিরুদ্ধে।'

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও বলা হয়েছে, স্থানীয় পারটির কাছে যাচাই না করে কোন কোন পুলিশ আমাদের পারটিকে জড়িয়ে রিপোরট পাঠায় তাদের দিকে নজর রাখবেন।

অর্থাৎ এখন থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোরট নিতে হবে পারটির কাছে, পুলিশের কাছে নয়। তবে যে কোন ব্যাপারে পুলিশ কংগ্রেস (ই) বা বামফ্রন্টের কোন শরিক দলের নাম জড়িয়ে রিপোরট দিতে পারবে। তার জন্যে ওই সব দলের কাছে সত্যি-মিথ্যা যাচাই করতে হবে না। সমাজবিরোধী যা আছে সব কংগ্রেস (ই) এবং অন্য দলে। সি পি আই (এম)-এর সওয়া এক লক্ষ সদস্য - সবাই ধোয়া তুলসী পাতা। 'লুঠ, দাংগা-হাংগামা সি পি আই (এম) করে না'।

বেশিদিন নয় বাঁকুড়ার কুলকুটা গ্রামে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে নৃশংস হত্যার অভিযোগ তুলেছিলেন জ্যোতিবাবুরই এক মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য। ননীবাবু সরজমিন তদন্ত করে এসে কুলকুটা গ্রামে গোস্বামীদের বাড়িতে হামলা এবং ৭৬ বছর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবদেব গোস্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বলে জ্যোতিবাবুর কাছে রিপোরট দেন। সমস্ত ঘটনা নিয়ে জ্যোতিবাবুর সংগে আলোচনাও করেন।

ননীবাবু এক গোপন চিঠিতে জ্যোতিবাবুকে লিখেছিলেন, 'সি পি আই (এম)-এর কর্মী-সমর্থকদের অনেকে যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আপনার সংগে যে যৎসামান্য কথা হয়েছে তাতে এমন ধারণাই আমার হয়েছে যে আপনিও মনে করেন আপনাদের অনেক লোক এই ঘটনায় জড়িত।'

সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্ব বলছেন, তাঁরাই বলতে পারেন কে তাঁদের দলের লোক আর কে নয়। মালদহের মালোপাড়ায় যে হত্যাকান্ড সংগঠিত হয় তা নিঃসন্দেহে নৃশংস। সি পি আই (এম) দাবি করলেন, যে ১৩ জন খুন হয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের দলের লোক। দুদিন পর সি পি আই দাবি করলেন, ১৩ জনের মধ্যে ৩ জন তাঁদের দলের লোক। কোনটা সত্যি?

যে তের জন খুন হন তাঁদের মধ্যে ৭৬ বছরের বৃদ্ধ এবং ১৩ বছরের বালকও আছেন। অথর্ব বৃদ্ধও পারটির কাজ করতেন? সি পি আই (এম)-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স না হলে পারটি সভ্য হওয়া যায় না। তাহলে কি পারটির গঠনতন্ত্র না মেনে ১৩ বছরের ছেলেকে পারটি সদস্য করা হয়েছিল?

অন্য পারটির লোক খুন হলে বা আহত হলে সি পি আই (এম) নেতারা বলে দেন, ও তো সমাজবিরোধী। আর না হয় বলেন নিজেদের দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারিতে খুন হয়েছে। অকাট্য যুক্তি! পশ্চিমবংগে আজ পর্যন্ত সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে বহু খুন, দাংগা-হাংগামা, লুঠপাটের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কোনদিন সি পি আই (এম) নেতারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি।

অথচ বাস্তব ঘটনা হল, অন্য পারটি নয় সি পি আই (এম)-এরই একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছেন। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এটা ঘটছে।

আসল কথা হল, সি পি আই (এম)-এর একশ্রেণীর কর্মীর মধ্যে অরাজনৈতিক কাজকর্মের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। তার মূল কারণ, কর্মসূচির অভাব এবং ক্ষমতার মোহ।

কিন্তু পারটির নেতারা এ সব স্বীকার করেন না। পারটির নেতারা যদি কখনও ব্যর্থতা খুঁজে পান তা হলে ব্যাখ্যা দেন, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং সচেতনতার অভাব। পারটির সব লোকাল কমিটি মারকসবাদ-লেনিনবাদী বই দূরের কথা, পারটির দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'ও পড়েন না। এটা 'পারটি চিঠি'তেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

সি পি আই (এম)-এর সবচেয়ে জোরাল অস্ত্র হল প্রচার। সেই অস্ত্রের ধার নাকি এখন কমে আসছে। সি পি আই (এম)-এর পারটি চিঠিতে প্রায়ই বলা হচ্ছে - 'পারটি সভ্যরা ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রচারের উপযুক্ত জবাব দিতে পারছেন না। ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা তাদের প্রচারে জনমনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে অথবা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা করছে, সব সময় তার সঠিক জবাব এ ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই দুর্বলতার কারণ হল, শিক্ষিত করতে পারা যায়নি। হয় প্রচার পুস্তিকাগুলি তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি, নতুবা নিজ উদ্যোগে পড়ে কর্মীরা তা আয়ত্ত করেননি।'

ইন্দিরা কংগ্রেস এমন একটা দল যাদের অস্তিত্ব বেশি করে টের পাওয়া যায় নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হলে। ইন্দিরা কংগ্রেসের অফিস বেশির ভাগ সময় খাঁ খাঁ করে, টেলিফোন ধরারও লোক থাকে না। সেই ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের প্রচারে সি পি আই (এম) নাজেহাল?

মূল প্রশ্ন হল, সি পি আই (এম)-এর রাজনীতি। 'ইন্দিরা গান্ধীর সংগে জ্যোতিবাবুর সমঝোতা', 'কেন্দ্রের সংগে বামফ্রন্ট সংঘর্ষে যেতে চায় না', 'সি পি আই (এম) ইন্দিরার সংগে সহযোগিতা করে চলতে চায়' - এ সব প্রচার কারা করছে? ইন্দিরা কংগ্রেস?

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার সময় সি পি আই (এম) নেতারা হুংকার দিয়েছিলেন, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, চলবে। মাঝখানে বলতে লাগলেন, বামফ্রন্ট সরকারের বার্থতার জন্য দায়ী কেন্দ্র। কেননা, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আর সীমিত অর্থ। এখন বলছেন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস চাই।

মূল শত্রুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শিকেয় উঠেছে। জোরদার করা হচ্ছে, কীভাবে রাজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ যে কোন ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এবং সংগে সংগে সি পি আই (এম) নেতারা স্বীকার করতে শুরু করেছেন বিপ্লবের দরকার নেই, সংসদীয় রাজনীতির পথেই ক্ষমতা দখল সম্ভব। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র এখন সি পি আই (এম)-এর রাজনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

যখন বাজারে আলুর দাম তিন টাকা, বেগুন পাঁচ টাকা, সরষের তেল কুড়ি টাকা, সি পি আই (এম) তখন কলকাতার জনজীবন অচল করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মিছিল করল, কনভেনশন হল। যুদ্ধের বিপদ নিশ্চয় আছে। কিন্তু আলুর দাম তিন টাকা হল কেন? যদি এর জন্য কেন্দ্র দায়ী হয় তা হলে সেটাও জনগণকে বলুন।

সি পি আই (এম) এখন ক্ষমতাসীন দল শুধু নয়, ক্ষমতালিপ্সুরাই দলে ভারি। পারটির ছোটখাট নেতা এবং কর্মীরা বুঝতে পারছেন, রাজনীতিটা সুবিধাবাদের পথ ধরেছে। আর এ পথে টেনে নিয়ে চলেছেন ই এম এস-জ্যোতিবাবুরা। পারটিতে এ সব নিয়ে আলোচনাও চলছে। কিন্তু কিছু করা যাচ্ছে না। যাঁরা রুখে দাঁড়াতে পারতেন তাঁরা মন্ত্রী না হলেও সরকারি ক্ষমতার কিছু সুখ ভোগ করছেন। সাধারণ কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মসূচি না পেলে অরাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়বেনই। □

যুদ্ধ আসছে!
যুদ্ধ আসছে!!

যুদ্ধ আসছে!
যুদ্ধ আসছে!!

VOTE FOR CONG

ভোট যুদ্ধে কংগ্রেসকে জয়ী করুন

সি.পি.এমকে ভোট দিন

VOTE FOR C.P.M.

অম্লমধুর

হাওড়াতে ঐ ধড় পাওয়া যায়,
হাত-পা শিয়ালদহে;
মুণ্ডুটা তার মিলছে না হায়।
ব্যাপার সহজ নহে!

চললে খেলা মুণ্ডু কাটার,
হারিয়ে গেলে পরে,
সত্যি, শেষে মিলবে তা আর?
জুড়বে কে কার ধড়ে?

**

শ্বশুর-বাড়িতে ঘর করতে
বৌদিরা সন্ত্রস্ত;
দেওর, ননদ, শাশুড়ী যে
ধরবে কখন অস্ত্র!

কোন প্রহরে চালায় প্রহার
স্বামী, ভাসুর, শ্বশুর।
খুনের নেশায় প্রাণ নিতে আর
করছে নাকি কসুর?

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্ত্রী যখন বেরোন কোথাও
সংগে পুলিশ-আমলা,
প্রাণটি তাঁর সুরক্ষিত
যতই বাধুক হামলা।

আমরা সব চুনোপুঁটি
নেইকো প্রাণের দাম,
গুণ্ডা পথে ধরলে ছুরি
জপি রাম নাম।

সুব্রতকুমার করণ

তেলের বিজ্ঞাপন দেখে
মাথায় দিলাম তেল।
কমাস যেতে সর্বনাশ
মাথা যেন বেল!

এখন আর চুল পড়ে না
হয় না মাথায় খুসকি,
সত্যি-মিথ্যা সমান-সমান
বিজ্ঞাপনের দোষ কী?

মল্লিকা সিকদার

ওয়াগন ভাঙি যখন তখন
ভয়টা কীসের শুনি
মাস পোয়ালে বখরা আধা
পুলিশকে দিই গুনি।

পুলিশ বলে চিন্তা কীসের
ভাগ দিয়ে যাস মোটা
আমরা আছি সামাল দিতে
পারিস যত ফোটা।

**

পুলিস যদি সহায় হয়
করতে কুকাজ কীসের ভয়,
পুলিস তুমি কখন কার
যে দেয় বখরা তখন তার।

অজিত চৌধুরী

এতো বড় রংগ যাদু
এ তো বড় রংগ
যত কিছু সৃষ্টি ছাড়া
নামটি তার বংগ।

রাজভবনে আলু বিক্রি:
পাচ্ছে বড় হাসি
এ রাজ্যে থাকা দায়
হব কাশীবাসী।

মুনমুন সরকার

স্বামীটিকে ছাড়লে কেন
কও তো আমায় বোন:
বোন বলল, কারণটা আজ
বলছি তবে শোন।
নাক ডাকাতো স্বামী, আমার
আসত না ঘুম চোখে,
সহ্য করতে না পেরে আব
ছেড়ে এলুম ওকে।

কালিদাস ভট্টাচার্য

একমুঠো ভাত না থাক পেটে
না থাক গায়ে বস্ত্র
উন্নত দেশ গড়তে হলে
কিনতে হবে অস্ত্র।

**

চর্বি-ভেজাল বলেই এখন
বনস্পতি খাই না
সেই সুবাদেই সর্ষে তেল
ষোল টাকায় পাই না।

**

মাস্টারিটা চাকরি এখন
টুইশনটা ব্রত –
ব্রতছাড়া জীবন ধারণ
কখনো সংগত:

বাসুদেব মন্ডল
চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন

অভিমন্যু সেন

২০ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনার খবর সংবাদপত্রে বের হয়েছিল। কেউ বলেছিলেন এই অধিবেশনে রাজীব গান্ধীকে তুলে ধরা হবে এবং তাঁরই রাজনৈতিক অভিষেক হবে এই অধিবেশনে। আবার কেউ বলেছিলেন, অধিবেশন থেকে নির্বাচনের হাওয়া তুলে দেওয়া হবে, বলতে গেলে নির্বাচনের ঢেক বেজে উঠবে। বোমবাই-এর বড় কাগজগুলোতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আবদুল রহমান আনতুলের প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে, ওয়ারকিং কমিটিতে তাকে আমন্ত্রিত সদস্য করায় তার মর্যাদা আরও বেড়ে গেল এবং তিনি এখন একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ লোক।

এসব খবরের যে কোন ভিত্তি ছিল না তা নয়, তবে সত্যি কথা বলতে গেলে এর কোনটাই বোমবাই অধিবেশনে প্রতিভাত অথবা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রথমত রাজীব গান্ধীকে নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত কোন বাড়াবাড়ি দেখা যায়নি। মঞ্চ নিয়ন্ত্রণ করেছেন স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী। প্রায় সবকটি ঘোষণা ও মাঝে মাঝে বক্তাদের সময়সীমা সীমিত করে দেবার কাজটাও তিনি করেছেন। রাজীব গান্ধী তবু নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর পরেই মূল ক্ষমতার উৎস সেই সুবাদে তিনি না চাইলেও তার পাশে ঘুরঘুর করেছে অনেকে। একবার বিভিন্ন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ নেতাদের সংগে যৌথভাবে এবং কয়েকটি রাজ্যের কর্মকর্তাদের সংগে পৃথকভাবে তিনি আলোচনায় বসেছিলেন। এক্ষেত্রেও যে সভাগুলো হয়েছে কোথাও তাকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। গৌহাটি কংগ্রেসে জরুরী অবস্থার সময় যেভাবে সঞ্জয় গান্ধীর অভিষেক হয়েছিল তার কোনটাই কিন্তু বোমবাই কংগ্রেসে চোখে পড়েনি। তার মানে কি রাজীব গান্ধীর কোন গুরুত্ব ছিল না· নিশ্চয়ই আছে। তবে এখনও তাঁর সব কথা ও পরামর্শকে শ্রীমতী গান্ধী পুরোপুরি মেনে নেন, এমনটা মেনে নেবার কারণ নেই। সঞ্জয় গান্ধীর ক্ষেত্রে যেটা অতি দ্রুত হয়েছিল এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। বলা যেতে পারে এটাই রাজীব গান্ধীর নিজস্ব কালচার। যাকে প্রবীণ ও নবীন কংগ্রেসীরা শ্রদ্ধার সংগে মেনে নিয়েছে বা নিচ্ছে ভয় বা ভীতিতে নয়। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হলেও রাজীব গান্ধীর টিকে থাকার পক্ষে এই সৌজন্যবোধ এবং ধীরগতিই তার বাড়তি পাওনার পুঁজি হিসেবে বেড়ে যাবে অনেকের কাছে।

শ্রীমতী গান্ধী ও রাজীব

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্যও যেসব কথা বলা দরকার বা প্রস্তাবের বয়ানে রাখা দরকার তার কোন বিশেষ কিছু নজরে পড়েনি। তবে নির্বাচনী বন্দোবস্ত গড়তে গেলে যে ভাবে রাতারাতি পারটির আলস্য কাটিয়ে একটা সাড়া জাগাতে হয় তার কাজ কিন্তু পুরো দমেই চলেছে। শ্রীমতী গান্ধী যদিও কুরুক্ষেত্রে মাত্র কদিন আগে জনসভায় বলেছেন যে, তিনি নির্বাচনের কথা বলছেন না, সব মিথ্যে এবং সেজন্যই তার দল সম্মেলন করছে ইত্যাদি। কিন্তু এটা সত্য কথা যে আঞ্চলিক সম্মেলনগুলো করে দলকে মজবুত করে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য তার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে তা হল নির্বাচনী প্রস্তুতি। কারণ কংগ্রেসীরা যে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য সম্মেলন করছে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। প্রতিটি সম্মেলনেই সাংগঠনিক দুর্বলতা ধরা পড়েছে। কোথাও না কোথাও একটা করে শক্তিশালী গোষ্ঠী অখুশী থাকছে। বোমবাই কংগ্রেস অধিবেশনেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভোসলে গোষ্ঠী এবং স্বয়ং দাদাপাতিল গোষ্ঠীকেও অখুশী দেখা গেছে। সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা হয়নি। শ্রীমতী গান্ধীর দুটো বড় কৃতিত্ব। প্রথমটা হল তিনি দক্ষ প্রশাসক এবং দ্বিতীয়টি হল দক্ষ আন্তর্জাতিক নেত্রী। তাঁর ব্যর্থতা হল যে তিনি জাতীয় কংগ্রেস দলের সবচেয়ে দুর্বল সংগঠক। এই চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যেক রাজ্যে।

তৃতীয়ত মীরকাশিমের দলত্যাগের ফলে সংখ্যালঘু মানসিকতার ওপর আঘাত পড়তে পারে ভেবে ছুঁচো গেলার মত আন্তুলেকে সামান্য জায়গা দেওয়া হলেও শ্রীমতী গান্ধীর তরফে তাকে নিয়ে কোন মাতামাতি ছিল না। এবং এককভাবে যাতে এই দায়িত্ব ও গুরুত্ব আনতুলে না পান তার জন্য বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আব্দুল গফুরকেও স্থান দেওয়া হয়। আন্তুলের অনুগামীরা সাময়িক খুশী হলেও আপাতদৃষ্টিতে খুশী হবার কোন কারণ নেই।

বোমবাই কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় ঐক্যের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা যথার্থ, কিন্তু অনৈক্যের জন্য যেসব শক্তিকে দায়ী করা হয়েছে সেখানে আগামী নির্বাচনের জন্য আগাম হাতিয়ার তৈরি করা হল কয়েকটি বিরোধী দলের জন্য। প্রথম দিনের অধিবেশনে রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনায় আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর ও ফারুক আবদুল্লার সরকার। বলা বাহুল্য এক তরফা ফারুক আবদুল্লা সরকারের এই সমালোচনা বিরোধী জোটের চন্দ্র শেখর গোষ্ঠীকে বেকায়দায় ফেলেছে এবং চরণ সিং অটল জোটকে উৎসাহিত করেছে। অধিবেশনের মুসলিম সদস্যদের সবাই কিন্তু একে উপভোগ করতে পারেননি। শ্রীনগরে ক্রিকেট খেলার মাঠের অসভ্যতা হল অমার্জনীয় ও নিন্দনীয়, তার সব দোষটাই এমনভাবে আবদুল্লা প্রশাসনের কাঁধে গিয়ে পড়েছে যে, উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় বিরোধী জোটের যুক্তফ্রন্টকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

প্রারম্ভিক ভাষণের উল্লেখযোগ্য হল যে সভানেত্রী শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে, তার পুত্র ও তাকে নিয়ে যেসব চাটুকারিতা ও স্তাবকতা করা হয় তার কাছে তা অসহ্য হয়ে উঠেছে। এসব তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু কংগ্রেসীরা মনে করেন এটা ভদ্রতার খাতিরে উনি বলেছেন, তবে যদি চাটুকারিতা না করা হয় তাহলেই বরং কংগ্রেস নেতাদের বিপদ বাড়বে।

বোমবাই অধিবেশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পশ্চিমবংগ পরিস্থিতি নিয়ে এবং দল হিসেবে সি পি আই (এম)-এর ভূমিকা নিয়ে সামান্যতম উল্লেখ প্রস্তাবে ছিল না। ওয়ারকিং কমিটিতে পশ্চিমবংগের প্রণববাবুও এসব বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাননি নিশ্চয়।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে চিরকালই বাম দলগুলোর সংগে বোঝাপড়া কংগ্রেসের ছিল। ১৯৬৯ সালেও বামদলগুলোর সাহায্যেই কয়েকমাস কেন্দ্রীয় সরকার টিকে ছিল কিন্তু তার জন্য পশ্চিমবংগ পরিস্থিতি আলোচনা করতে বাধেনি। এবারেই তার ব্যতিক্রম হল। কংগ্রেস কর্মীদের মনেও আশংকা জাগছে তাহলে কি কংগ্রেস সি পি আই (এম) বোঝাপড়া হতে চলেছে· এ ঘটনা ঘটে গেলে পশ্চিমবংগে দুদলেরই ক্ষতি। সি পি আই (এম) দলের ক্ষতি সামান্য। তাদের কিন্তু আদর্শবাদী কট্টর মারকসবাদীরা কোণঠাসা হবেন অথবা দল ছাড়বেন। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষতি ব্যাপক হবে কারণ এরা মার খেয়েছে, ফলে দলের অস্তিত্বের শেকড়েও টান পড়তে পারে। কাশ্মীরে ন্যাশন্যাল কনফারেনসের সংগেও তামিলনাড়ুতে ডি এম কে বা এ ডি এম কে র সংগে পুরো বোঝাপড়া গড়তে গিয়ে যে সর্বনাশ কংগ্রেস দলের হয়েছে সেই সর্বনাশ পশ্চিমবাংলাতেও হবে।

তবে অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে মাত্র। ঝড় উঠবে কিনা এক্ষুণি জোর করে বলা যায় না। ☐

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন।

Colgate
DENTAL CREAM
Colgate
STOPS BA

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য
ফরমুলা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে
রাখে তাজা, নির্মল...
দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত,
সুস্থ-সবল।

দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে :

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়।

কোলগেটের রাশি-রাশি ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে
এই ক্ষয় সৃষ্টিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে,
দাঁতকে পরিষ্কার, ঝকমকে রাখে।

ফলাফল : তাজা, নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা
আর সুস্থ-সবল দাঁত।

প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না।
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূরে রাখুন ... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন !

GKBE 882 86 BN

এর তাজা মিণ্টি স্বাদ... সত্যিই চমৎকার!

হেমন্তকুমার ঃ বাংলা গানে বজ্রকণ্ঠ বজ্রসেন

যুগ বদলায়, রুচি বদলায়, কিন্তু সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে সুরের আকাশে যিনি আজও জ্বলজ্বলে শুকতারা সেই হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতার অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবার ফিরে এসেছেন গানের রাজ্যে। কিংবদন্তীর নায়কের সমগ্র সংগীতজীবনের পরিমাপ করার জন্যই এই বিশেষ প্রতিবেদনের অবতারণা।

সন্ধ্যা সেন

কবে কোন বিস্মৃত দিনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান প্রথম শুনেছিলাম সে খবর আজ বলতে পারব না। যুগের সংগে সংগে মানুষের বেশভূষা, রুচি প্রকৃতি, যাকে বলে Taste and Temperament, এর কত পরিবর্তন দেখলাম। কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা যেন স্থির যৌবনের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রসংগেই মনে পড়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কানন দেবীর একটি মন্তব্য

'হেমন্তবাবুকে বরাবর একই রকম দেখলাম। যখন এ লাইনে প্রথম এলেন হাফশার্ট-পরা, হাসিমুখ, নম্র, ভদ্র, শান্ত। তারপর একদিন তিনি হয়ে উঠলেন ইনটারন্যাশন্যাল ফিগার। জনপ্রিয়তা, অর্থ, প্রতিপত্তি সবেরই শিখরে। কিন্তু বেশভূষা, আড়ম্বড়হীনতা, স্বভাব-ব্যবহারের অমায়িক মধুরতায় সেই এক মানুষ। এতটুকুও পালটাননি।'

ঐ একই কথা বলা যায় তাঁর গানের সম্বন্ধেও। শিল্পীজীবনের প্রথমযুগে তাঁর গাওয়া 'পরদেশী কোথা যাও', 'কথা কোয়োনাকো', 'মনে হোলো তুমি এলে যেন' 'রজনীগন্ধা ঘুমাও আজি রাতে' – সংগীতরসিক মহলকে চমকে দিয়েছিল – মুক্তকণ্ঠের অতিশয্যবিহীন আশ্চর্য আবেদনে। আজ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে গাইছেন। তব তিনি ফুরিয়ে যাননি সমাজের উঁচুমহল থেকে সাধারণ মানুষ অবধি তাঁর সর্বশ্রেণীর অনুরাগীদের কাছে। এমনকি, আজকের দিনে বাংলা-গানের এই অবক্ষয়ের যুগেও শ্রোতাদের হেমন্ত-মুখীনতায় এতটুকুও ভাঁটা পড়েনি, যদিও চলতিকালের অন্তঃসারশূন্য লাউড মিউজিকের অপ্রতিরোধী প্রবাহ তাঁর গানকে স্পর্শও করেনি। এ নজির আধুনিক গানের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। এমনকি রবীন্দ্রসংগীত, যেখানে একান্তভাবেই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর প্রাচুর্য রয়েছে, সেখানেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুষ্টিমেয় সেই কজনেরই অন্যতম, যাদের রেকর্ডের সবচেয়ে বেশি চাহিদা। কি গ্রামোফোন কোমপানি, কি পাবলিক-ফাংশন, 'কমার্শিয়াল সাকসেসই' যেখানে মুখ্য ব্যাপার, সেখানেও

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের [illegible] রিত হয় সম্ভ্রমভরে। এই [illegible] রেকর্ড বিক্রীর আলোচনা [illegible] গ্রামোফোন কোমপানির [illegible] ব্যানার্জি বলছিলেন, [illegible] হলেন চিরদিনের স্টার। [illegible] 'লস' এর প্রশ্ন উঠতেই [illegible] আবার গোঁড়া রবীন্দ্রিক [illegible]

তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছসিত, কারণ 'Hemanta knows his limitation'. এর কারণ কী? তাঁর স্বচ্ছ অনায়াসপ্রবাহী কণ্ঠ, সুস্পষ্ট উচ্চারণ, আবেগ, রঙিন মনের সরস প্রকাশ, গানের নানামুখীন বৈচিত্র্য। কিন্তু কণ্ঠ, আবেগ, রং, রস তথা সকল ধনে ধনী হয়েও অনেক বড় শিল্পী একটা সময়ের পর ফুরিয়ে যান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে আজও ফুরিয়ে যাননি তার কারণ তাঁর সদাজাগ্রত, সদা-সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত মন, প্রবহমান শিল্পীব্যক্তিত্ব, যা তাঁকে কোন বিশেষ ধরনের গানের মধ্যে সীমিত থাকতে দেয়নি। আরও একটি বস্তু হল তাঁর dynamic সংগীতচিন্তা, যা আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে জানে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগে গানের আলোচনায় বসেছি একাধিকবার। সর্বপ্রথম বোধহয় বছর দশেক আগে। সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর প্রাণখোলা সবল স্বীকৃতিতে। কোন বড় কথা নয়, অকপট উত্তর এল আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবে, 'আপনার এই বিরাট আয়তনের শিল্পীজীবনের Inspiration কোথায়'

'Inspiration কিছু না' - একটি বালিশ কোলের ওপর তুলে নিয়ে মজলিশী ভংগিতে বসে বললেন হেমন্তবাবু 'স্রেফ লোককে খুশী করা, এবং এটা একতরফা। মন সায় দিলেও করতে হবে, সায় না দিলেও করতে হবে। না পারলেই বাস, হয়ে গেল।

পাল্টা প্রশ্ন করি - 'কখনও চিত্রগ্রাহী আর্সেনি মন সায় না দিলেও অপরের ফরমায়েশে কোন গান গাইতে?'

'আমরা বনে বসে তপস্যা করি না, মানুষের সমাজে মানুষকে গান শোনাই। তাদের স্বীকৃতি পাওয়াতেই আমাদের সার্থকতা, না পাওয়াটা ব্যর্থতা। এই কথাটাই সব সময় মনে রাখতে হয়। সংগীত-চিত্রগ্রাহীর কোন প্রশ্নই ওঠে না। নিজের ভালোলাগা, মন্দলাগার চেয়ে অপরকে ভালোলাগানোর দিকেই চিত্তনিবেশ করতে হয়।

সংগীত জগতে কী করে এলেন

সেও এক মজার ব্যাপার। প্রথমে গান ছিল নেশা। হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলাম গান ছাড়া অন্য কিছুই আমার জীবনের পেশা হতে পারে না।

আমাদের চার ভাই এক বোনকে মানুষ করেছেন। ওরই মধ্যে ধারদেনা করে বাড়িও করেছিলেন। ছেলে পাশ করে ভাল চাকরি করবে এইটেই সবায়ের আশা ছিল। ছেলে গাইয়ে হবে এটা কেউ ই চাইতেন না। ভাবতেও পারতেন না। কারণ, গানকে তখন কেউই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। হালকা আমোদের উপকরণ হিসেবেই গণ্য হত। গান গাওয়া মানেই বকে যাওয়া এইরকম একটা মনোভাবই তখনকার অভিভাবকদের মধ্যে ছিল। যাই হোক, এখান থেকে ওখান থেকে গান তুলে একটু আধটু গাইতাম নিজের আনন্দের জন্যই। প্রথম বাইরে গাওয়া স্কুলের এক ফাংশনে। তখন ফোরথ ক্লাশে (এখনকার ক্লাশ সেভেন) পড়ি। প্রতিবছর বেনারস যেতাম। সেখানে মাসতুতো বোনেরাও আসত। গংগার ঘাটে সবাই মিলে বসতাম। ওরা গান শুনতে চাইত। তখন লাল হলদে কাগজে লেখা দেশাত্মবোধক গান বিক্রি হত। সেইসব গানে সুর দিয়ে এখান ওখান থেকে তোলা গানের সুর লাগিয়ে খুব মৌজ করে গাইতাম। গংগার ঘাট, বিকেলের পড়ন্ত আলো, উদাস পরিবেশ সব মিলে মনের মধ্যে কেমন একটা আবেশ জাগত। আমার বয়স তখন দশ থেকে বারোর মধ্যে।

তারপর দেশে সুরু হল স্বদেশী আন্দোলন। সেই সময়ই ঐ রকম সব গান বানিয়ে সুর দেবার চেষ্টা চলত। গান বানাত আমার সহপাঠী নামকরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুর দিতাম আমি। তখন সেকেন্ড ক্লাশে পড়ি। লেজার পিরিয়ডে সর্বদাই গান গাইতাম। সেকেন্ড স্যার জানতে পেরে আমার রাস্টিকেট করে দেন আর কি। অনেকের চেষ্টা ও কষ্টে তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল হল।

গানের ক্ষেত্রে সুভাষ ছিল আমার মস্ত সহায়। সে সবসময় চাইত আমি বাইরে গাই। আর গানে মস্ত বড় একটা কিছু হয়ে উঠি। আমি কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনোদিনই খুব বড় একটা কিছু আশা করিনি। ওর ওসব আইডিয়াকে অবাস্তব কল্পনা বলেই ভাবতাম। একদিন সুভাষ আমার সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে রেডিওতে নিয়ে গেল। তখন আকাশবাণীর নাম ছিল প্রাইভেট ব্রডকাস্টিং কোম্পানি।

জীবনে কখনও এত নার্ভাস হইনি। আমি পরিবেশের চাহিদায় কাজ করি। ফলাফলের জন্য ভাবিনি। কিন্তু নার্ভাস হয়েছিল সুভাষ। কারণ, এ রকম ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের সেই প্রথম।

যাই হোক তারপর হঠাৎই একদিন বাড়িতে একটা কার্ড এল রেডিওতে প্রোগ্রাম করবার সময়, তারিখ, বার সব কিছু দিয়ে। যত দূর মনে পড়ে ১৯৩৬ সাল সেটা। আনন্দ যতখানি হয়েছিল ভয় হয়েছিল তার চেয়েও বেশি। বাবা তো রেগে আগুন। মা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে ঠান্ডা করলেন।'

প্রথম রেডিও প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ পেয়ে রোমাঞ্চের চেয়ে ভয়ই হয়েছিল বেশি শুনে তো আমি তাজ্জব বনে গেলাম। রেডিও প্রোগ্রাম এখনকার উঠতি শিল্পীদের এর জন্য কত কষ্টই না করতে হয়, আর এই দুর্লভ সুযোগ অনায়াসে পেয়েও বাংলা গানের এক ভাবী রূপকারই শুধু নয় যুগনায়ককে ভাবতে হয়েছিল কীভাবে অভিভাবকদের অনুমতি আদায় করে যথাসময়ে রেডিও স্টেশনে পৌছান যায়। এই স্ট্রাগল ও টেনশন প্রথম থেকে ছিল বলেই কি সেদিনের কিশোর যখন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হলেন তখনও নিজের সম্বন্ধে এমন নিরুচ্ছ্বাসী ও সংযত? হঠাৎ চমক ভাংগল শিল্পীর আত্মগত স্মৃতিচারণে:

'প্রোগ্রাম তো পেলাম। কিন্তু তার পরে চিন্তা হল কী গান গাইব। কমল দাশগুপ্তর একটা গান ছিল 'তোমার হাসিতে জাগে নবীন প্রাণের বাসন্তিকা'। সেই গানের সংগে ছন্দ মেলান একটা গান লিখল সুভাষ। আমি তাতে সুর দিয়ে গাইলাম 'আমার গানেতে এলে নবরূপী চিরন্তনী, বাণীময় নীলিমায় শুনি তব চরণধ্বনি।' এ ছাড়া পাড়ার নিবারণবাবুর (মুখার্জি) কাছে শেখা ভাটিয়ালীও গেয়েছিলাম।

রেডিও প্রোগ্রামের Impact হল দারুণ। সুভাষের আনন্দ আর ধরে না। বলল "You have brain and strength, try to make the best use of them. আমি তো পিছনে আছিই।'

এরই মধ্যে এক ফাঁকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিট পেলাম। God helps those who help themselves এই প্রবচন আমার জীবনে কী দারুণভাবে সত্যি হয়ে উঠল দেখো? বাবার এক বন্ধু, শ্রীযুক্ত শান্তি বসু চেলো বাজাতেন। তিনিই এলেন যেন আমার সংগীতজীবনের দিশারী হয়ে। তাঁরই সাহায্যে কলমবিয়া কোম্পানির শৈলেশ দত্তগুপ্তর সংগে যোগাযোগ হল এবং শৈলেশ দত্তগুপ্ত এবং মিঃ সরকার আমার একটি রেকরড করালেন। গান দুটির রচয়িতা নরেশ্বর ভট্টাচার্য, ট্রেনার ও সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত। পনেরদিনের মধ্যেই রেকরড বেরোল। তখন দুমাস অন্তর চারটে করে রেকরড বেরোত। আর রেডিওতে কনট্রাক্ট হত একসংগে পাঁচটা প্রোগ্রামের। তার মধ্যে একটার পেমেনট হত ৫ টাকা, বাকি চারটে অনারারি। রেকরড ও রেডিওতে গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে অর্থ, যশ দুই ই আসতে লাগল। প্রথম রেকরডের জন্য পাওয়া কুড়ি টাকা সম্মান-দক্ষিণা। মার হাতে এনে দিতেই তাঁর চোখে বইল অশ্রুগংগা। তারপর প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে মা-বাবার হাতে দেওয়া সুরু করতে বাড়িতে রোজগেরে ছেলে বলে নাম হল। তখন বরফ গলতে লাগল। তাঁরা আস্তে আস্তে সদয় হলেন গান বাজনার ওপর।'

'প্রথম রেকরডের গানদুটির প্রথম চরণ মনে আছে?' - শিল্পীর স্মৃতিচারণে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করি।

'নিশ্চয়ই। 'জানিতে যদি গো তুমি পাষাণে কি ব্যথা আছে' এবং 'বল গো বল মোরে' -- আমার শুধু প্রথম রেকরডই নয়, প্রথম যুগের যাকে বলে হিট গান। তারপরের হিট গান হল 'কথা কোয়োনাকো শুধু শোনো' (কথা -- অমিয় বাগচি, সুর হেমন্ত)। পরের নাম করা গান হল 'ফেলে আসা দিনগুলি মোর' ও 'পথের শেষ কোথায়'। 'সাত নম্বর বাড়ী' ও 'প্রিয়বান্ধবী' ছায়াছবির গান। এই প্রিয়বান্ধবীতেই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে নাম হল। নন ফিলম সঙের স্মরণীয় জনপ্রিয় গান দুটি হল 'পরদেশী কোথা যাও' ও 'ব্যথা যমুনার দুই তীরে।' কর্মজগৎ যখন এইভাবে গড়ে উঠছে, ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু তখনই সত্যিকারের সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে।'

গানের তালিম ও জীবন-সংগ্রাম

'কয়েকটা রেকরড করার পর আমি আরো ভাল করে গান শিখতে চাইলাম। সেই সময় ফণীভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে দেড় বছরের

[illegible] মেয়ানজ খাঁর কাছে কিছু দিন তালিম নিতে না নিতেই তাঁর মৃত্যু হল, সংগে সংগেই আমার শিক্ষা পর্বের ইতি।'

প্রশ্ন করি – 'ইতি কেন বলছেন? নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাছে নিয়মিতভাবে শেখা না হলেও অজস্র সুরকার ও সংগীত পরিচালকদের সংস্পর্শ-জনিত অভিজ্ঞতা-শিক্ষাটাও কি কিছু কম?'

'তা বলতে পার। তা ছাড়া সংগ্রামমন্থর জীবনের বিপরীতমুখী তাগিদও যেন আমায় গানের দিকে প্রবল শক্তিতে ঠেলে দিল।

'ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সেকেনড ইয়ার অবধি পড়ে থারড ইয়ারে পড়া-শোনায় ইস্তফা দিলাম। এর পর কিছুদিন শরটহ্যানড টাইপ রাইটিংও শিখেছিলাম। একটু আগেই বললাম না জীবন সংগ্রামের শুরু তখন থেকেই। ভবানীপুর থেকে পায়ে হেঁটে কোথায় শ্যামবাজার, কোথায় টালিগঞ্জ যাওয়া-আসা। একটাকা জোড়ার একজোড়া ধুতি ছিল। তাই দিয়েই চলছিল। শৈলেশদার বাড়ি রোজই যেতে হত এবং যাওয়া আসার ট্রামভাড়াটা (তখনকার দিনের চারপয়সা) তিনিই দিতেন। এই প্রসংগেই উল্লেখযোগ্য একটা সংবাদ হচ্ছে এই যে, শৈলেশদাই আমায় প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের দিকে নিয়ে গেলেন। একদিন গিয়ে দেখি একটা বই দেখে শৈলেশদা গান তুলছেন। গানের কথা, সুর, চরিত্র সবই অন্য গানের চেয়ে আলাদা ধরনের। সেই হল আমার রবীন্দ্র-সংগীতের সংগে যথার্থ পরিচয়। স্বরলিপি দেখে গান তোলার শিক্ষাও সেই প্রথম। তারপর যখন একটু আধটু করে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে সুরু করলাম অনেকেই আমায় ছোট পংকজ বলে ডাকতে সুরু করল। সেই শুনে খুব inspired feel করতাম, অন্তরের সুপ্ত ক্ষোভও অনেকটা শান্ত হত।'

প্রশ্ন 'ক্ষোভ কীসের? Inspired ই বা feel করলেন কেন?'

'ক্ষোভ – ক্লাসিকাল তালিমের ঘরানার শীলমোহর ছিল না বলে। Inspired – পংকজ মল্লিক মহাশয় আমার কাছে পুরুষ কন্ঠের আদর্শ ছিলেন। তাঁরই আলোর-প্রতিবিম্বন পড়েছে আমার গানে। সেই অভিনব আত্মপরিচয়ের আলাদা একটা রোমাঞ্চ ছিল আমার কাছে।

যাই হোক, রবীন্দ্রসংগীত প্রথম গেয়েছিলাম মস্ত বড় একটা আদর্শের তাগিদে। রবীন্দ্রনাথ অত বড় একটা নাম! তারপর থেকে যত গাই অনুভব করি এ গানের রহস্য মাধুর্যের কোন কূলকিনারা নেই।'

'রবীন্দ্রসংগীতের প্রসংগে পরে আসব। তার আগে বলুন কীভাবে জীবনের Struggle আপনাকে গানের দিকে ভিড়িয়ে দিল?'

'এই সময় অজয় ভট্টাচার্যর সংগে পরিচয় হল। তিনিই আমায় নিয়ে গেলেন সংগীত পরিচালক হরি-প্রসন্ন দাসের কাছে। প্রথম প্লে ব্যাক করি 'নিমাই সন্ন্যাস' এ। গ্যাসট্রিক আলসারের যন্ত্রণা নিয়ে রোজ দু তিনবার করে দীর্ঘ পথ হেঁটে যাতায়াত করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মনটা হতাশায় ভেঙে পড়ত। দুনিয়াটাকে বড় নিষ্ঠুর আর অকরুণ মনে হত। কী যে লক্ষ্য তা ঠিক [illegible] পারতাম কি না [illegible] না। শুধু যে চিন্তাটি আমায় কাজের দিকে অহর্নিশ ঠেলে দিত সেটি ছিল এই – থামলে হবে না, চলতে হবে।

নিমাই সন্ন্যাস ছবিতে 'কাঁহা কানু কহি' – সবাই নিল। প্রিয় বান্ধবী সাত নমবর বাড়ী এইসব ছবির প্লে-ব্যাকে গেয়ে মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলাম। এই সময়ই 'পূর্ব্বরাগ' – অর্ধেন্দু মুখারজি, হেমেন গুপ্তর 'অভিযাত্রী' ও পশুপতি চাটারজির 'প্রিয়তমা'র Music Director হিসেবেও নাম হল। প্রথম সংগীত পরিচালনার সুযোগ দিয়েছিলেন অর্ধেন্দু মুখারজি 'পূর্ব্বরাগে'। তার পর হেমেন গুপ্তর 'ভুলি নাই', অর্ধেন্দু মুখারজির 'সন্দীপন পাঠশালা' অজয় করের 'জিঘাংসা' (আরও কী কী ছবি মনে পড়ছে না) – এসবের আশাতীত সাফল্যে নিজের ওপর একটা আস্থা এল।

কিন্তু এই আস্থাই টলমল করে উঠল বোমবের অধ্যায়ে। ১৯৫১ সালের মারচ মাসে হেমেন গুপ্ত হিন্দি 'আনন্দমঠ' করবেন বলে আমায় বোমবাই নিয়ে গেলেন। ১৯৫১–৫৪ সাল আমার জীবনে যেন রক্তক্ষরা, দুর্দ্দৈবের অধ্যায়। কলকাতার নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা এখানে কোথায় হারিয়ে গেল। মিঃ এস মুখারজি (ফিল্মিস্থান) এমনভাবে আমায় treat করতেন, এত বকাঝকা করতেন যেন আমি কিছুই জানি না, বুদ্ধিহীন এক মহামূর্খ। নিজেকে তখন বড় হীন মনে হত। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসত। ভাবতাম দূর ছাই, এই অসহ্য অপমানের সঙ্গে আপস করে কাঁহাতক থাকা যায়? তার চেয়ে কলকাতাতেই ফিরে যাই।

একদিন মিঃ মুখারজিকে এ সংকল্পের কথা আমার স্ত্রী বেলা জানাল। ভাগ্যিস জানিয়ে ছিল! নৈলে মানুষটার ঐ রুক্ষ, কঠিন আবরণের আড়ালের স্নেহকোমল দরদী চিত্তটির খবর আমার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত। আমার কথা শুনে উনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দৃঢ়তার সংগে বললেন 'আমি যেতে দিতাম। কিন্তু এখন তোমায় আমি কিছুতেই ছাড়তে পারিনা, যতক্ষণ না অন্তত একটি ছবি হিট হয়। your defeat is my defeat.

অমন নির্মম, দুর্মুখের অন্তরে রয়েছে আমার জন্য এত বিশ্বাস, এত স্নেহ! এত কাছে থেকেও তো কোনদিন বুঝতে পারিনি? আবেগে চোখে জল এসে গেল।

এর পরই 'নাগিন' ছবিটা হিট। সে যে কী হিট কল্পনা করা যায় না! 'নাগিনে'র রেকরড সেল আজও

এ[illegible] হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

জন্ম : [illegible]
[illegible] : বেনারস
বাবার নাম : স্বর্গীয় কালিদাস মুখোপাধ্যায়
মায়ের নাম : স্বর্গীয়া কিরণবালা দেবী
[illegible] ব্যানারজি অ্যাভেনিউ
[illegible]
[illegible] – নীলিমা [illegible]
বিবাহ : ১৯৪০ সালে
স্ত্রীর নাম : বেলা মুখোপাধ্যায়
ছেলের নাম : জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়
মেয়ের নাম : রানু মুখোপাধ্যায়
পুত্রবধূর নাম : মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

কেউ ভাঙতে পারেনি। একটা রেকরডের দুলাখ সেল! বাঙালির ছেলে বোমবের মারকেট ক্যাপচার করবে এটা কেউ ই চাইত না। তাই এত বাধাবিপত্তি। আর মিঃ মুখার জির জেদ 'হিট' করতেই হবে। কেন এর সাফল্য, কী বৃত্তান্ত বুঝতে পুরো দুবছর সময় লেগেছিল।'

'কেন?'

'নাগিনীর বাঁশীর সুরের সংগে গানের সুরের মিলনটা এমন সুন্দর হয়েছিল যে, শুনলেই কানে লেগে যেত। তারপর অনেক ছবি ফ্লপ করল। ফ্লপ, ফ্লপ, ফ্লপ। তারপর হঠাৎই নেকসট টারনিং হল বিশ সাল বাদ।'

ছায়াছবির প্রযোজক

'প্রডিউসার হওয়ার ইতিহাসটা?'

'খুব সোজা' মৃদু হেসে হেমন্তবাবু বললেন, 'গানের পথ বেয়ে জীবনে স্বীকৃতি পেলেও নিজের গানের ওপর খুব বেশি আস্থা আমি কোনদিনই রাখতে পারিনি। শুধু তখনই নয়। এখনও সব সময় মনে হয় এ বছরের গানই আমার শেষ গান। এর পরে আর হিট করবে না। এই কারণেই চিত্র প্রযোজনায় মন দিই। 'নীল আকাশের নীচে' বেশ হিটই করল। কিন্তু সাফল্যের চরম যাকে বলে সেটা হল 'বিশ সাল বাদ' ছবিতে।

অনেক ছবি ফ্লপ করল। কত আশা-ভংগ, মনস্তাপ, ভরাডুবি। কিন্তু আমি একটি দিনও বসে থাকিনি, একটি মুহূর্তও নষ্ট করিনি। সব সময় মনে হত, নাই বা হলাম বড় প্রোডিউসার, ছোট প্রোডিউসারও তো আছে। সত্যিকারের ভাল ছবি সব সময় নাও যদি হয়, স্টান্ট পিকচারও তো হতে পারে। তবে 'বিশ সাল বাদ' ছবি করার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। অনেক ছবি করার পর মন রুখে উঠল বোমবে থেকে ডিফিট নিয়ে যাব? এ হতেই পারে না। তাই এতে হাত দিলাম। বীরেন নাগ এতেই প্রথম পরিচালক, বিশ্বজিৎ প্রথম হিরো আর ডায়ালগ রাইটার ছিলেন দেব কিষণ। সবাই বাধা দিয়েছে। বলেছে, এটা পাগলামো। অযোগ্যের হাতে ক্ষমতা দিলে ভরাডুবি কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ আলাদা। আমি বলেছি, ডিরেকটর হিসেবে যাকে নিয়েছি পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে দিতেই হবে। নৈলে তার কাছ থেকে সত্যিকারের কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। মাঝে একটা ছবি শুরু করার পর কয়েক রিল করেই বন্ধ করে দিতে হল।'

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণতার মেঘকে যেন জোর করে উড়িয়ে দিতে চাইলেন হেমন্তবাবু। 'এরপর 'কোহরা'। বিশ্বজিৎ হিরো। 'আবার একটু থেমে সামনের আকাশে জমেওঠা একখন্ড মেঘের দিকে চেয়ে অনামনস্কভাবে বলে চললেন যেন আপনমনেই 'এ লাইনের কিছুই বোঝা যায় না। যে কোন ডিপারট মেনটে একবার যার নাম হয়ে গেল তার ভাল মন্দ সব কাজই ভাল। আবার নাম হয়নি, এমন লোক খুব ভাল কাজ করলেও সহজে কল্কে পায়না।'

বিদেশে জনপ্রিয়তার কারণ

'রবীন্দ্রসংগীতের প্রসংগে আসি বার আগে আপনার সাগর পারের সংগীতমহলের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই। কেন ওরা আজ ভারতীয় সংগীত নিয়ে এভাবে মেতে উঠেছে? এ সম্বন্ধে রবিশংকর কী বলেছিলেন

ভারতীয় সংগীতের মৌলিকতা পৃথিবীর সবরকম সংগীতকে গ্রহণ করেও ক্লাসিকাল এবং ফোক মিউজিকে নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখার মর্যাদামন্ডিত ঐতিহ্য ওদের মুগ্ধ করে।

পন্ডিতজী বলেছেন অবশ্যই ধ্রুপদী সংগীতের কথা স্মরণ করে। আপনি তো ওদেশে শুনিয়েছেন ফিল্মসং এবং ভারতীয় মহলে রবীন্দ্রসংগীত। আমাদের মডারন গান ওদের এত ভাল লাগবার কারণ কী? ওদের গানে তো এর চেয়ে অনেক বেশি স্টানট আছে?'

'স্রেফ নতুনত্ব। আর কিছুই না। এক সময় ওরা রোমান সংগীত নিয়ে মেতেছিল। আজ ওদের ইনডিয়ান মিউজিক ভাল লাগছে। এই আর কি। তবে তুমি যেটা বলছ সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বলা যায়, আমাদের গানের মেলডি, গভীরতা ওদের মনকে এমন করে টানে।'

পূর্বসূরীদের জনপ্রিয়তা

হেমন্তবাবুর সংগীতজীবনের ওপর এক ঝলক চোখ বোলালেই হৃদয়ংগম করা যায় দুটি বস্তু। পয়লা নমবর, ওঁর প্রথম জীবনের নন-ফিল্ম সঙের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। দু নমবর, সংগীত পরিচালক, প্রযোজক এবং ইদানীং নতানাট্যের সংগীত-পরিচালক রূপেও সুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা, শ্রোতাদের রুচির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর একটা তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছে। এ ছাড়াও যে বৈশিষ্ট্যটি তাঁকে স্থিতধী করেছে সেটা হল, এ জগতের হালচাল সম্বন্ধে তাঁর একরকমের দিব্যদৃষ্টি সৃষ্টি করেছে। এই দিব্যদৃষ্টি ফলেই যে বোধটা তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত সেটি হল এই যে, বাজারে কাজের মেয়াদ সাংগ হলে মানুষকে সরে যেতেই হবে। কোন জায়গাতেই চিরদিন রাজত্ব কেউই করতে পারে না। এবং সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তের জন্য তিনি মনকে সবসময় প্রস্তুত রাখেন। সেইজন্যই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সবসময় স্টেডি, অনুত্তেজিত। এই ব্যালানসড মনটি তাঁর গানেও প্রতিবিম্বিত।

'আপনি যখন প্রথম গানের জগতে এলেন তখন গানের ট্রেনডটা কী ধরণের ছিল -' আমার প্রশ্ন।

'তখন একদিকে ছিল বৈঠকি আসর; সেটা ছিল একান্তই ধনী গৃহের ব্যাপার। সেখানে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, তথা উচ্চাংগসংগীতের আসরে শুনতেন উচ্চাংগসংগীত শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু শ্রোতা। এত বেশি পাবলিক ফাংশনের ছড়াছড়ি তখন ছিল না। মাঝে মাঝে ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে গানের ফাংশন হত, যেগুলির বেশির ভাগেরই উদ্যোক্তা ছিলেন ছাত্র সমাজ। সেখানে শোনা যেত, ভীষ্মবাবু, পংকজ মল্লিক, মৃণাল কান্তি, শচীন দেব বর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র দের গান।

নিউ থিয়েটারস নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছায়াছবির মাধ্যমে উঁচু মানের বাংলা গান দিয়ে সাধারণ মানুষের রুচি গড়ে তোলার অধ্যায়ে তখন একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করলেন পংকজ মল্লিক ও রাইচাঁদ বড়াল। তখন থেকে ফিলম মিউজিক একটা মস্তবড় স্থান নিল আধুনিক গানের ক্ষেত্রে। শচীন দেব বর্মন, পংকজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে এঁরা ফিলম, নন-ফিলম দুটি ক্ষেত্রেই এক একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে শচীন দেব বর্মন কিংবা কৃষ্ণচন্দ্র দের গুণীমহলেও যথেষ্ট সমাদর ছিল তাঁদের ধ্রুপদী সংগীতের পটভূমিকা দিয়ে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করবার উল্লেখ্য ভূমিকার জন্য।

পংকজ মল্লিকের জনপ্রিয়তা ছিল খুব ব্যাপক। ফিলমের মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীতের সংগে সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার গৌরবও তাঁরই প্রাপ্য। পংকজ মল্লিক একাধারে কমপোজার, শিল্পী দুই ই হওয়ায় তাঁর সংবেদনশীল কবি মনের সংগে সংগীতরসিক শ্রোতার মনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠাটা সহজ হয়েছিল। শিল্পী হিসেবে তখন কানন দেবী, সায়গলের চাহিদাও দারুণ। নন ফিলম সঙ এ মৃণালকান্তি, সন্তোষ সেনগুপ্তও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন।

এঁদের সকলের গানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও আমার হিরো ছিলেন পংকজ মল্লিক। বলিষ্ঠ উচ্চারণ, আবেগ, শাস্ত্রজ্ঞান, পান্ডিত্য সব মিলিয়ে ওঁর ব্যক্তিত্ব আমার মনকে প্রবলভাবে টানত। আমার গানের ওঁর প্রভাব যথেষ্ট ছিল, সে কথা আগেই বলেছি।'

'কৃষ্ণচন্দ্র দে, পংকজ মল্লিক, শচীন দেব বর্মন, সায়গল, কানন দেবী – এঁদের পরের যুগকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর যুগ বলা চলে -' - আমি প্রশ্ন করি।

'তা বলতে পার'।

'আপনাদের ত্রয়ী যুগের এবং তার আগের যুগের লিডিং সুরকার ও গীতিকার ছিলেন কারা - মানে আধুনিক গানের ক্ষেত্রে -'

'কাজীসাহেব (সুরকার গীতিকার দুই), কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, কালিপদ সেন, রবীন চ্যাটারজি, প্রণব রায়, নরেশ্বর ভট্টাচার্য (আমাদের যুগে)। তার আগের যুগে হিমাংশু দত্ত, শৈলেন রায়, বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য। মোটামুটি এঁরাই।

এই প্রসংগেই একটা কথা বলা আমার কর্তব্য। সারা ভারতে অরকেসট্রার প্রথম প্রচলন করেন রাইচাঁদ বড়াল। ফিলম মিউজিকে আবহসংগীত বলতে এখন যেটা বোঝায় তার অবতারণা প্রথম রাইবাবুই করেছেন।

কাজীদার গানের কমপাস খুব বড় ছিল, সুরের বৈচিত্র্য, আবেগ সবদিক দিয়েই। কাজীদার গান আমি রেকরড করিনি। তবে রেডিওতে অনেক গেয়েছি, 'সেদিন বলেছিলে সে ফুলবনে,' 'মেঘলা নিশিভোরে' – এইরকম সব গান, সব মনে নেই।

কালীদারও (কালীপদ সেন) সুরকার হিসেবে একটা পারসোনালিটি ছিল।

হরিপ্রসন্নবাবুর ওয়েসটারন মিউজিকের শিক্ষা, জ্ঞান দুই-ই ছিল। পিয়ানোও বাজাতেন ভারী সুন্দর। রবীন্দ্রসংগীতের ধারণাও ছিল অসাধারণ।

কমল দাশগুপ্তর সুর দেওয়া থেকে শেখান অবধি সবকিছুই খুব মেথডিক্যাল ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করে ফেলতে পারতেন। কাওয়ালি গজল, ঠুংরী, ফোকসঙ, সবরকম গানই ছিল তাঁর নখদর্পণে। বাংলা, হিন্দী দুটো ভাষাই তাঁর ভাল জানা ছিল। সেইজন্যই কোন কথা ও ছন্দে কোন সুর লাগবে সেটার জন্য তাঁকে এতটুকুও ভাবতে হত না। এ ব্যাপারটা যেন আপনা থেকেই ঘটে যেত। ওঁদের দু ভায়ের সুরে (কমলদা ও সুবলদা) অনেক হিট সং করেছি, জানি জানি একদিন' 'কি তনা দুখ ভুলায়া মধুবন'।

অনুপম ঘটক ছিলেন খুব স্টাই

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম

প্রথম [illegible] গান : ১৯৩৫ সালে – আমার গানেতে এল নবরূপী চি[illegible], কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম [illegible] : কলম্বিয়া কোম্পানিতে, ১৯৩৭ সাল, ডিসেমবর। [illegible] তুমি। কথা : নরেশ্বর ভট্টাচার্য। সুর : শৈলেশ দত্তগুপ্ত

প্রথম [illegible] : নিমাই সন্ন্যাস, ১৯৪০ সালে

প্রথম সংগীত পরিচালক রূপে ঐতিহাসিক সাফল্য : নাগিন, ১৯৫৪ সালে

উত্তমকুমারের কণ্ঠে প্রথম প্লে-ব্যাক : শাপমোচন ছবিতে ১৯৫৪ সালে

প্রথম সংগীত পরিচালনা : পূর্বরাগ ছবিতে ১৯৪৭ সালে

প্রথম চিত্র-প্রযোজনা : নীল আকাশের নীচে, ১৯৫৯

চিত্র প্রযোজক রূপে ভারতব্যাপী খ্যাতি : বিশ সাল বাদ, ১৯৬২

সংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম হিরো এবং আদর্শ : পংকজ মল্লিক

প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের রেকরড : পথের শেষ কোথায় (প্রিয় বান্ধবী) - ১৯৪৩

প্রথম নন-ফিলম রবীন্দ্রসংগীতের ডিসক : কেন পান্থ এ চঞ্চলতা, আমার আর হবে না দেরি, ১৯৪৪

লাইজড সুরকার। ওঁর সুরে এবং হীরেন বসুর কথায়, 'মেঘ মেদুর বরষারে', 'প্রিয়ার প্রেমের লিপি।'

সলিল ও নচিকেতা প্রসঙ্গ

'আপনার সংগীতজীবনে সলিল চৌধুরী এবং নচিকেতা ঘোষেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।'

'আমার বহু হিট গানের সুরকার ওরা।

Thank you for reminding me that chapter. 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' তো তখন আকাশে বাতাসে ছড়ান। এবং আজও মডারন গানের আসরে ঐ গান আমার গাইতেই হয়। ওটা সলিলের নিজের রচনা ও সুর। আগের শান্ত, কাব্যময় যুগের স্বপ্ন, পরে ধূসর কর্কশ রুক্ষতায় হারিয়ে যাবার নির্মম কাহিনী খুব সংবেদনশীল হয়েছিল সলিলের ভাষা ও সুরের মিলনে।

তাছাড়া সুকান্তর 'অবাক পৃথিবী' থেকে 'রাণার' কবিতার যে সুর দিয়ে এমন মর্মস্পর্শী গানে রূপান্তর ঘটান যায় সে অভিজ্ঞতাও তো আমাদের হল সলিলের দুঃসাহসিক experimentation-এর জন্যই। বলতে গেলে সুকান্তকে ও নতুন করে জাগাল মানুষের মনে।

আর এক সৃষ্টিশীল সুরকার নচিকেতাও। ওঁর সুরে 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে' এবং 'মেঘ কালো আঁধার কালো' (কথা গৌরীপ্রসন্ন) সবাই খুব নিয়েছিল।

'আমার মনে আছে নচিদার মরদেহ নিয়ে মহাযাত্রার সময়ে ঐ রেকরডটি বাজাতে বাজাতে আমরা সবাই চলেছিলাম।'

'রাইট। নচি খুব স্মারট, প্রখর বুদ্ধি ও রসবোধসম্পন্ন কমপোজার। জীবনের সব রূঢ়তাকে মেনে নিয়েও ওঁর সুরের অমন রোমানটিক মাধুর্য অল্পই দেখা যায়। সুধীনের কথা ও সুরে বৈদগ্ধ্য ছিল। প্রোগ্রাম না থাকলেও রেডিওতে তখন রোজ আড্ডা দিতে যেতাম। পংকজদা, রায়দা, কালিদা সব্বাই আমায় খুব ভালবাসতেন। রেডিও অফিস নিজের ঘরবাড়ির মত হয়ে উঠেছিল। সে সব যে কী আনন্দের দিন গেছে। তখনকার যুগের atmosphere ছিল আলাদা।'

হেমন্ত, প্রতিমা, আরতি, কানন দেবী ও সুচিত্রা মিত্র

কালজয়ী কিছু হিট রেকরডের তালিকা

১। চাঁদেরে স্মরিয়া শিউলি, রজনীগন্ধা ঘুমাও ঘুমাও (১৯৪১)
২। আমার বিরহ আকাশে, কথা কোয়ো নাকো (১৯৪৩)
৩। আকাশে দুটি তারা, পরদেশী কোথা যাও (১৯৪৩)
৪। সেদিন নিশীথে, জানি জানি একদিন (১৯৪৩)
৫। আমার আর হবে না দেরি, কেন প্রাণে এ চঞ্চলতা (১৯৪৪)
৬। মোর ব্যথা যমুনার দুই তীরে, বাদল মেঘের ছায়ায় (১৯৪৫)
৭। হে নিরুপমা হে নিরুপমা, প্রাঙ্গণে মোর (১৯৪৬)
৮। স্বপন ঘুমে, মনে হল তুমি এলে (১৯৪৬)
৯। তোমায় গান শোনাব, আমার গোধূলি লগন (১৯৪৭)
১০। কথা ছিল তোমার মালা, তোমার পায়ের কাছে (১৯৪৭)
১১। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, চক্ষে আমার তৃষ্ণা (১৯৪৯)
১২। আকাশ মাটি ঐ ঘুমালো, আমি তো তোমারি ওগো (১৯৪৯)
১৩। গাঁয়ের বধূ (১৯৪৯)
১৪। ধিতাং ধিতাং বোলে, পথে এবার নামো (১৯৪৯)
১৫। চলে যায় মরি হায়, কেন যামিনী না যেতে (১৯৪৯)
১৬। মেঘ কালো আঁধার কালো, ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন (১৯৪৯)
১৭। দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক, পথ হারাবো বলেই (১৯৫৮)
১৮। কে তুমি বসি' নদীকূলে, জল বলে চল (১৯৬০)

রেকরডের কভার / প্রতাপ বসু

১৯। ঠিকানা (১৯৭০)
২০। দিনের শেষে (১৯৭১)
২১। পুরানো সেই দিনের কথা (১৯৭৫)

(গ্রামোফোন কোমপানির পি কে ব্যানারজির সৌজন্যে)

'কী আমার আছে যার জন্য মানুষের এত ভালবাসা আমি পেতে পারি?' – হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

'এখন ফিলমই হল সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম। ফিলমে গাইবার সুযোগ পাওয়াটাই এখনকার উঠতি শিল্পীদের স্বপ্ন। কিন্তু একটা ফিলমে আর কতজন সুযোগ পেতে পারে? কত গানই বা দেওয়া যায়? তার ফলে সত্যিকারের প্রতিভা অনেকসময় সত্যি করেই ব্যাকগ্রাউনডে চলে যায়। আগে রেডিও একটা মস্তবড় জনসংযোগ মাধ্যম ছিল। এখন রেডিও কজন শোনে? সবাই-ই তো বিবিধভারতী খুলে বসে আছে। তার ফলে Echo of the hit songs ছাড়া নতুন কিছুই শোনা যায় না।'

কিন্তু ইদানীং আপনার পুরনো গানগুলির এল পি ডিসকের চাহিদা দেখে মনে হচ্ছে একদিন সবাইকেই ফিরতে হবে সমে। যেসব গানে চিরায়ত সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে, মানুষের সৌন্দর্য পিপাসু মন শেষ পর্যন্ত সেইখানেই আশ্রয় চায়।

'সেটা বুঝবেন যাঁরা এ নিয়ে চিন্তা করেন। আমি যে আজও থেমে যাইনি আমার সার্থকতা সেইখানেই।'

নিজেকে সবচেয়ে বেশি সার্থক মনে হয়েছে কবে?

'বাইরে যখন গিয়েছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে ফিজিতে গিয়ে আনন্দে মন ভরে উঠেছিল যখন দেখেছিলাম নাগরিক সভ্যতার বাইরের এলাকার মানুষও আমার গান শুনে সত্যিকার খুশি হয়। অডিটোরিয়মে গিয়ে দেখি মাত্র পাঁচহাজার লোকের অ্যাকোমোডেশন। দেখলাম গেট বন্ধ। বাইরে দুহাজার লোক স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি দৌড়ে গিয়ে গেটে ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে বললাম – গেট খুলে দাও। আমি মুষ্টিমেয় কয়েকজন এলিটকে গান শোনাতে আসিনি। আমার গান জনসাধারণের গান। খোল গেট। ওরা সংগে সংগে যেই না গেট খুলে দিল হুড়মুড় করে জলস্রোতের মত জনস্রোত যেন ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আনন্দ ভোলবার নয়। আমার গান তাহলে পৃথিবীর নিভৃততম প্রান্তের অতি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছেছে - এর চেয়ে বড় পাওয়া শিল্পীর জীবনে কী হতে পারে?

আর একবার। জামাইকাতে আমার প্রোগ্রামের পর এক কিশোর সলাজমুখে বিনম্রভাবে জানাল তার বাবা বৃদ্ধ, অসুস্থ। দূর গ্রামে থাকেন। তাঁর বড় সাধ আমাকে একবার দেখবার। ছেলেটির করুণ নম্রতা দেখে বড় মায়া লাগল। গাড়িতে করে গেলাম তার গ্রামে। প্রায় ১ ঘণ্টার রাস্তা। ওর বাড়ি যেতেই বৃদ্ধ পিতা লাঠি ধরে বাইরে এসে আমায় দেখে আনন্দে নির্বাক। চোখে জল, মুখে হাসি। বহুক্ষণ বাদে বললেন 'আপনি সত্যিই এলেন আমায় দেখা দিতে? এ আমি ভাবতেও পারিনি।' সেদিন হুহু করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল। বারবার মনে প্রশ্ন জাগছিল, কী আমার আছে যার জন্য এত মানুষের এমন পাগলের মত ভালবাসা আমি পেতে পারি?

অতীতস্বপ্নে আত্মহারা হেমন্তবাবুকে কেমন যেন অবাস্তব দেখায়।

'আপনার সংগীতজীবন চার দশকেরও বেশি হয়ে গেল' - নীরবতা ভংগ করি আমিই, 'কিন্তু এখনও আপনার ফ্যানফেয়ারের প্রচণ্ডতা এতটুকুও কমেনি। এর কারণ কী - আপনি বিভিন্ন যুগের রুচিকে স্টাডি করে নিতে পারেন বলে -

'স্টাডি করে নিতে পারি কিনা জানি না, তবে আমি কোন একটা বিশেষ রকমের গান বা সুরের মধ্যে থেমে যাইনি। আগের যুগের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের সুরে যেমন গেয়েছি পরের যুগে আমার অনুজপ্রতিম সতীনাথের (তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই), শ্যামল (ক্লান্ত চাঁদের নয়নে ঘুম), প্রতিমা ব্যানার্জির সুরেও গান গেয়েছি' –

'আর একটা কথাও আমার মনে হয়েছে, এ সম্বন্ধে আরতির (মুখারজি) সংগে আমি একমত। আপানার গান সবাই সম্ভ্রমভরে শোনেন আপনি Lyric-conscious আরটিসট বলে।

'শুধু Lyricই নয় Melody conscious হেমন্তবাবু দৃঢ়স্বরে বলেন। ভাল সুর পেলেই আমি গান গাইতে রাজি। সুরকার নামী কি অনামী সে প্রশ্ন আমার কাছে গৌণ। এ বিষয়ে কোনরকম prejudiceকে আমি আমল দিই না।

'এখনকার শিল্পীরা প্রায় সকলেই শি[illegible] সু কণ্ঠ [illegible]াইবার পরিধিও বেশি[illegible]। [illegible] মনে দীর্ঘস্থায়ী আবেদন [illegible] তেমন কোন গান শোনা [illegible] কেন?'

প্রথমত কথা[illegible] দ্বিতীয়ত এখনকার যুগের [illegible] বেশি ফাস্ট। কোন কিছু [illegible] ভাববার, চিন্তা কর[illegible] তাতে মনোযোগ দেবার [illegible] তখনকার দিনে এন টি[illegible] গানের টেক হবার আগে পনের [illegible] ধরে রিহারসাল চলত। কে[illegible] জায়গার সুর বা কথা, শিল্পী অথবা আশেপাশের শ্রোতাদের, বিশেষজ্ঞদের এবং সংগতিয়াদের কানে বা মনে না লাগলে সুরকার বা গীতিকার বারবার সেটা পালটাতেন। সে সম্বন্ধে সেটের আর পাঁচজনের মতামত চাইতেন। আর এখন? সুরটা কোন নামকরা শিল্পীকে নিয়ে রেকরড করিয়ে দেবার কথা। শিল্পীর নামের জোরে প্রথমটা চলে গেল তো! তার পর থিতিয়ে গেল তো কার কী এসে গেল? অল টোটাল লস না হলেই হল।'

'এখন আগের মত আরটিসট তৈরি হচ্ছে না কেন?

'এর প্রথম এবং প্রধান কারণ, কোন আরটিসটের সংখ্যাধিক্য। কমারশিয়াল ফিলমে তাদের Accomodate করা যাচ্ছে না। তৈরি করাটা অনেক পরের কথা। অনেক তৈরি এবং প্রতিষ্ঠিত আরটিসটেরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ রেকরড কোমপানিগুলির ব্যবসায়িক সাফল্য-সর্বস্ব দৃষ্টিভংগির কারণে। আগে বছরে অন্ততঃ এক একজন আরটিসটের ছখানা করে রেকরড হত, তার মধ্যে যদি তিনটি কি চারটে লস-[illegible] তালিকায় পড়ে বাকি দুটির [illegible] সে ক্ষতিপূরণ ঘটত। এখন [illegible]জার সময় একখানি করে [illegible] যদি লেগে গেল ভাল, না [illegible]স। যোগ্য শিল্পীও [illegible]লিকায় এসে গেলেন। [illegible]কে কীভাবে কাজে [illegible] করা যায় সে [illegible] risk নিতে [illegible]। এভাবে চললে [illegible] হবে কী করে? [illegible]মপ্রেরণা পাবেন কোন [illegible] □

'আমার মন রবীন্দ্র সংগীতের দিকে ঝুঁকেছে পংকজ মল্লিকের গান শুনেই' – হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রথম যুগে রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে অনস্বীকার্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে পংকজ মল্লিক, সায়গল ও কানন দেবীর। ছায়াচিত্রের পথ বেয়ে মানুষের প্রাণের দ্বারে না পৌঁছালে এ গানের সংগে জনসাধারণের চিত্তের অন্তরংগতা ঘটত না।

এঁদের পরের যুগে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কবির গানের দুর্বার স্রোতের মাতনে সকল শ্রেণীর মানুষকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার কৃতিত্ব তাঁর।

অথচ রাবীন্দ্রিক বলতে সচরাচর যা বোঝায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ঠিক তা নন। তবু রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের পুরোভাগে এঁর স্থান। তিনি গান তাঁর নিজস্ব ঢঙে। সাদামাটা সহজ সরল ভংগিতে। সুরের কারুকার্যের মনোহারিত্ব নয়। কায়দার বংকিম ঠাটের চলনও নয়। একেবারে সোজাসুজি মনের সামনে এসে দাঁড়ান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাছে এসে বসেন আপন অধিকারের শক্তিতেই। কলিং বেল টিপে আগমন বার্তা ঘোষণা নয়, ড্রয়িংরুমে বসে প্রতীক্ষাও নয়। একেবারে বিনা ভূমিকায় অন্দর মহলে প্রবেশ। এ যেন তাঁর সহজাত আলোর মতই। অন্যান্য গানকে যতখানি স্পষ্ট করে তোলেন ঠিক ততখানিই স্বচ্ছ করে তোলেন রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবাণীকে। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য তাঁর অতিরিক্ত কোন সচেতনতা নেই – নেই কোন দুরূহ প্রয়াস। আবেগ বা অনুভব তো সকল শিল্পীর মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুভবের স্বরূপটি কী? কোথায় তিনি অনন্য?

এ সম্বন্ধে হেমন্তবাবুর বক্তব্য: আমি ভাল গান গাইতে চেয়েছিলাম। সে যার গানই হোক। কোন সুরকার অথবা গীতিকারকে আমি সামান্য বলে মনে করি না। কারণ সকলের সৃষ্টির (সেটা এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক) জন্ম, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকেই। তবে গাইবার আগে ভাল করে বুঝে নিতে হবে যাঁর গান গাইছি তাঁর প্রকাশ ভংগির বৈশিষ্ট্য কোথায়? কোন গান দিয়ে তিনি কী বলতে চান? এবং কীভাবে?

আমার মন রবীন্দ্রসংগীতের দিকে ঝুঁকেছে পংকজ মল্লিকের গান শুনেই। আর এই কারণেই তাঁকেই আমার রবীন্দ্রসংগীতের গুরু বলা যায়। নিউ থিয়েটারসে যোগ দেবার পর পংকজদার সংস্পর্শে এসেই বুঝলাম রবীন্দ্রসংগীত কী জিনিস। কত অতলস্পর্শী এর ভাব। তাঁর আগে রবীন্দ্রসংগীত গাইয়েদের গন্ডি সত্যিই খুব সীমিত ছিল, সমাজের অতি বিদগ্ধ মহলের ছোট পরিসরে। একটি বিশেষ গোষ্ঠি কবির গানকে Monopolized property-র মত আগলে রাখতে চাইতেন। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে যেন প্রচন্ড প্রতিবাদের মত রুখে দাঁড়ালেন পংকজ মল্লিক।

কবি তাঁর গানের সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা সত্ত্বেও পংকজবাবুকে 'দিনের শেষে' গানে সুর দেবার এবং ছায়াচিত্রে এ গান ব্যবহার করবার অনুমতি দিলেন কেন? কারণ তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রতিভাকে চিনেছিলেন। পুরুষকণ্ঠের ওজস, বলিষ্ঠতা, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। প্রবাহ যা আগে ছিল না – তাই দি… যেন রবীন্দ্রসংগীতে নতুন করে প্রা… প্রতিষ্ঠা করলেন পংকজদা, – তাঁ… একার ব্যক্তিত্বে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পংক… মল্লিককে রবীন্দ্রসংগীতের যুগস্রষ্ট… নিশ্চয় বলা যায়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁ… মত পরিবর্তন করতে যতখা… অন্তর্দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণার মধ্যে দি… যেতে হয়েছে ঠিক ততখানিই বিরু… মতামতের আঘাত পংকজদাও সহ… করেছেন। এঁদের সংগ্রামের দা… ভাবীকাল দিয়েছে। আজ রবীন্দ্র সংগীতের বন্যা কূলপ্লাবী। জাতি… জীবনে এত বড় সাংস্কৃতিক বিপ্ল… কিছুতেই ঘটত না যদি কবির গা… জনমানসের দ্বারে না পৌঁছে একট… গোষ্ঠির মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। এ… প্রসংগে আর একটা কথাও মনে রাখ… দরকার।

ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের গুরু হলেও রবীন্দ্রনাথ গুরুগিরি মনোভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না। কোন বিশেষ বৃত্তে আবদ্ধ থাকলে জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে না। এই মুক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি অনুভব করেছিলেন আরো এগনো দরকার – And it i… for the non-technical an… unsophisticated people. সেই জনাই রবীন্দ্রসংগীতে জীবনের প্রতিটি দিকই এমন মর্ম-ছোঁওয়া।

রবীন্দ্রসংগীত যিনি গাইবেন তাঁকে মনে রাখতে হবে এ গানে কথার স্থান সবার ওপরে। সেইজন্যই আমি কথার perfection-এর ওপর চিরদিন জোর দিয়েছি।

শান্তিনিকেতনী অথবা রাবীন্দ্রি… কথাগুলিতে আমি মোটেই বিশ্বাসী নই। কোন বিশেষ গায়কী বিশে… শিল্পীকে মানায় তাঁর নেচার ব… টেমপারমেনটের সংগে খাপ খাওয়া… দরুন।

পংকজ মল্লিক / অশোক বস

দেবব্রত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি / সুধীর চাটার্জি

সচিত্রা মিত্র হেমন্ত ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার যদি কিছু জনপ্রিয়তা হয়েই থাকে তার কারণ এই যে, রবীন্দ্রসংগীতে আমি অন্যান্য গানের মতই সহজ হতে চেয়েছি। Expression-এ যাতে কোনরকম আড়ষ্টতা না থেকে স্বাভাবিক হয় সেই চেষ্টাই করে থাকি। হয়ত সেই জন্যই সবাই আমার গান একটু আধটু ভালবাসেন। আর একটা কথা আমি মনে রাখি যে গান দিয়ে আমি কথা বলছি।

আমার বিরুদ্ধে রাবীন্দ্রিক মহলের অনেকেরই অভিযোগ এই যে, আমি কোন গুরুর কাছে গান শিখিনি। এর উত্তরে এই কথাই বলব আত্মপ্রকাশের দুর্বার তাগিদে আমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধারে গুরু ও পথদ্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছি। আমি ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু ঐ একটি মানুষকে অনুধাবন ও আয়ত্ত করেই গানের মধ্যে কোথায়, কীভাবে classical dignity আনতে হয় সেটা অজান্তেই রপ্ত হয়ে গেছে। এটা আমার কোন সচেতন প্রয়াসজাত বস্তু নয়। কখনও আমার রেকরড নিয়ে বিশ্বভারতীর সংগে কোন বিবাদ ঘটেনি। কারণ আমার ওপর তাঁদের এ বিশ্বাস আছে যে স্বরলিপি নির্দিষ্ট গানকে আমি কখনও স্থানচ্যুত করব না। আর এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর কঠোরতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ রবীন্দ্রসংগীতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য এই নিয়মবদ্ধতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নইলে রবীন্দ্রসংগীত ও নিধুবাবুর টপ্পাতে কোন তফাৎ থাকে না।

কিন্তু সংগে সংগে এ কথাও বলব স্বরলিপি সামনে রেখে গান গাইবার [illegible] আমি চেষ্টাই [illegible] পাশ্চাত্য সংগীত স্বরলিপিনির্ভর। কারণ স্বরলিপির মধ্যেই modulation, লয় ও গতির ইঙ্গিত সবই বাঁধাধরা। কিন্তু আমাদের দেশের গান ভাবপ্রধান এবং আবেগনির্ভর। এই ব্যাপকতা অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায় স্বরলিপি দেখে গাইলে। আমি স্টেজে যখন গাইতে বসি সামনে বই খোলা থাকলেও কখনও দৃষ্টি যায় না। রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরে যেটুকু প্রবেশ করতে পেরেছি তার মূলে আছে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির অবদান। এই ফাঁকে এই কথাটিও জানান দরকার রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যগুলিই আমার সুর রচনারও প্রেরণা (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সুরের আগুন ২য় খণ্ডে আছে)। রবীন্দ্রনাথের এইসব গানের ইংগিত ও পথরেখা [illegible] আমি [illegible] পেয়েছি যে তাকে কোন [illegible] সমালোচনা আমায় আর [illegible] পারবে না। আমি দেখেছি আমার এই নিরামহীন খোঁজায় [illegible] রিকতাকে সকল শ্রেণীর শ্রোতা কতখানি দাম দিয়েছে। আর কী বলব? এই তো আমার রবীন্দ্র সংগীত গাইবার ইতিহাস, দর্শন।

রবীন্দ্রনাথের এই [illegible] সৃষ্টিকে হেমন্তবাবু যেভাবে অনুভব করার সাধনা করেছেন, সেটাও রীতিমত সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। রাবীন্দ্রিক না হয়েও রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের পুরোভাগে এই জন্যই তাঁর স্থান। □

সন্ধ্যা সেন

আলোকচিত্র : লেখিকা

অবাক হয়ে শুনি

পন্ডিত রবিশংকর : Simplicity of expression-এর একটা অবশ্যম্ভাবী আবেদন আছেই। কারণ তার মধ্যে কোন pretension নেই। এই অকৃত্রিম আত্মবিভোর এবং স্বচ্ছন্দ পরিবেশনাই হেমন্ত বাবুর গানের প্রধান আকর্ষণ।

ওস্তাদ আলি আকবর : যে কোন শিল্পের প্রকাশভঙ্গি, তার পরিসর ছোটই হোক আর বড়ই হোক, তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন শিল্পীর মনের মধ্যে সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। হেমন্তবাবুর achievement এইখানেই। তিনি জানেন তিনি কী বিষয় নিয়ে গাইছেন এবং তার ওজন কতটুকু।

ডাঃ সুনন্দা পট্টনায়ক : হেমন্তবাবুর যে কোন ধরনের গান শুনলেই আমার মনে হয় শুধু সেই গান নয় তাঁর শ্রোতাদের সংগেও তাঁর একটা understanding আছে, যার জন্যই তাঁর গানের communicative power মনকে সোজাসুজি ছুঁতে পারে। আর এক সম্পদ তাঁর উচ্চারণ। শ্রোতারা যে দিকেই তাকিয়ে থাকুন প্রতিটি কথা কানে ঢুকবেই স্পষ্ট হয়ে। এইখানেই তাঁর জিত।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় : আমি হেমন্তদার গানের ভক্ত। কারণ তাঁর গাওয়ার আন্তরিকতা নিখাদ। তিনি যখন যে গানই গান সে গান তাঁর নিজের কথা হয়ে ওঠে বলেই মনকে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এবং যথার্থভাবে গাইবার একাগ্রতা যে কোন মানুষেরই শ্রদ্ধার বস্তু।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য : হেমন্তদা জানেন কোন পরিবেশে কী গান গাইতে হয়, কীভাবে কোন কথা বলতে হয়, কোথায় কীভাবে চলতে হয়, তাঁর এই পরিমিতিবোধকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।

ডঃ পান্না সেন (মুখোপাধ্যায়) : ওঁর গাওয়া 'লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে' আজও আমি কোথাও বাজলে কান খাড়া করে শুনি। ওঁর গান বা কণ্ঠ সম্বন্ধে এই কথাই বলব যে অমন আওয়াজ আমি কোথাও শুনিনি।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় : ওঁর যে গুণটি আমায় টানে সেটা হল Innocent Voice, যাকে বলে কণ্ঠের সরলতা। কোন প্যাঁচপোঁচ, কায়দা দেখানর বাহাদুরি নেই। এই জিনিসটিই ওঁর নিজস্ব। মানুষটাও অবিকল তাই। সেইজন্যই রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক, যে গানই উনি গান চুপ করে শুনতে হয়।

শঙ্খ ঘোষ : কোন কোন গায়কগায়িকার স্বর আমাদের নিয়ে যায় যেন প্রাকৃতিকতার মাঝখানে, গ্রামীণ মুক্তিতে। আর, আরেকরকম স্বর আছে, যাকে মনে হয় প্রগাঢ়ভাবে নাগরিক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শুনে আমি এই দ্বিতীয় ধরনের স্বাদটি পাই। গাম্ভীর্যের সংগে মাধুর্যকে মিলিয়ে তাঁর স্বর একদিন আমাদের অল্প বয়সের নিকটসংগী হতে পেরেছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটবেলায় প্রথম যখন হেমন্তবাবুর আধুনিক গান শুনলাম শুধু মুগ্ধই হলাম না, মনে হয়েছিল উনি যেন আমাদেরই আবিষ্কার। তারপর আস্তে আস্তে রবীন্দ্রসংগীত থেকে শুরু করে অন্যসব গান শুনতে শুনতে বুঝলাম গানের জগতে উনি এক ব্যক্তিত্ব। □

'হেমন্তর এখনও বয়স হয়নি, সে অনেকদূর যাবে'

সন্তোষ কুমার ঘোষ

১৯৩৭-৩৮ সালে হেমন্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এখন ভাবতে গেলে অবাকই লাগে হেমন্ত ঐ সময় যাদবপুরে ইনজিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল। আমিও তখন যাদবপুরে পড়ি। ওর থেকে বোধহয় এক বছরের সিনিয়র ছিলাম। সেই সময় লেখালেখির সূত্রে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, পরে ঘনিষ্ঠতা। আমাদের আবার দুটো সংঘ ছিল তখন। একটা কল্যাণ সংঘ, আরেকটা দুর্বার সংঘ। ভবানীপুরের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আড্ডা বসত, কখনও কোন পাইস হোটেলে, কখনও কোন লাইব্রেরিতে। আমাদের আড্ডায় সেই সময় যারা ভিড় জমাত তাদের মধ্যে হেমন্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জগৎ দাস, রমাকৃষ্ণ মৈত্র আরও অনেকে ছিল। আড্ডায় আমরা সবাই নিজেদের লেখা পড়তাম। হেমন্ত কিন্তু সেই সময় বেশ ভাল গল্প লিখত। 'দেশ' সমেত নানা পত্রিকায় ওর গল্প বেরিয়েছে তখন। সেই আড্ডাতেই জানাজানি হয়ে গেল হেমন্ত গান গাইতে পারে। আড্ডায় আমাদের গান শোনাত হেমন্ত। গাইতে বললেই গাইত। আধুনিক গানই তখন গেয়ে শোনাত ও আমাদের – 'তোমারে চাহিয়া প্রিয় বুঝিনু বিফল চাওয়া' – এইরকম আরো অনেক।

হেমন্তর প্রথম গায়ক হিসেবে রেডিওতে প্রবেশ কিন্তু সুভাষের লেখা কিছু গান গেয়ে। ওর জনপ্রিয়তা তখন যে একটু একটু করে বর্ষার জলের মত বাড়ছে তা টের পেতাম। তখন যে অল্পস্বল্প হিংসেও হত না এমন নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমার 'কিনু গোয়ালার গলি'তে যে গলির বর্ণনা দিয়েছি, ওরকম একটা গলিতেই আমি তখন থাকতাম। হেমন্তরা আমার বাড়িতে এলে বসতে দেবার জায়গা ছিল না তখন। কাছাকাছি পারকে ওদের নিয়ে বসতে হত। হেমন্ত তখন আরো রোগা ছিল, লম্বা তো বরাবরই, টান টান হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়ত পারকের ওপরেই।

হ্যাঁ, এই বন্ধুত্ব যে একটানা ছিল তা নয়। কেননা আমাকে মাঝখানে বেশ কিছুদিন বিহারে আর পরে দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল। আর ওদিকে হেমন্ত বেশিরভাগ সময় বম্বেতে। তবে যখনই দেখা হয়েছে, লক্ষ্য করেছি, সাফল্য ওকে কোন ব্যক্তিগত অহংকার দেয়নি। যেমন রোজগার করেছে, তেমনি খরচও করেছে। অনেকদিন পরে একবার তো ও আর সুভাষ কোন কাগজ বের করা যায় কি না এ প্রস্তাব নিয়ে বার দুই তিন আলোচনা করে গেল আমার সঙ্গে। ওদের কাগজ অবশ্য বেরোয়নি, কিন্তু হেমন্তর ঐকান্তিকতা ষোলআনার জায়গায় আঠেরআনা লক্ষ্য করেছি।

এ তো গেল মানুষটার কথা। এবার ওর গানের কথায় আসি। গানের ব্যাপারে ওর সম্পর্কে আমার পুরাণের সেই তুলনাটাই মনে পড়ে – যার এক পা আধুনিক গানের মর্তে, দ্বিতীয় পা হিন্দি গানের পাতালে আর তৃতীয় পা রবীন্দ্রসংগীতের দ্যুলোকে। হেমন্তর মুখে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শুনি বোধহয় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে। গানটা ছিল 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে, দোলাও দোলাও দোলাও।' গানটা [illegible] রেকর্ডও করেছিল।

আধুনিক গানের আমি খুব অনুরাগী নই। তবে ওর জনপ্রিয়তার অনেক গান লোকের মুখে মুখে ফিরেছে, এখনও ফেরে। 'পরদেশী কোথা যাও' – এইসব গান। ওর জনপ্রিয়তার রকেট একেবারে আকাশ ফুঁড়ে যায় বোধহয় সলিল চৌধুরীর সুরকিত্তিক গান গেয়েই। 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', সুকান্তর 'রানার' – এইসব গান। হিন্দি গানে হেমন্তর নাম এখন হয়ত আর প্রথম সারিতে আসে না, তবে একদিন এসেছিল নিশ্চয়ই। 'নাগিন' ছবির গানগুলো তো দস্তুরমত হিট। 'না মাঙে সোনা চাঁদি, মাঙে দরশন দেবী তেরি' – এখনও নিশ্চয়ই অনেকের কানে বাজছে। কিংবা আরেকটা গান, নাগিনের নয় অবশ্য, 'ফুলোঁ কি হার, লে লো রূপ কি সিংগার' – এই গানটায় আবার হেমন্ত জিভ মুচড়ে করে সিটিও বাজিয়ে ছিল। সেই সময় বহির্বঙ্গে গেলেই রেকর্ডে দুটি বাঙালির নাম দেখা যেত – জগমোহন (জগন্ময় মিত্র) আর হেমন্তকুমার (পদবী-বর্জিত)।

রবীন্দ্রসংগীতে হেমন্তর জায়গা বরাবরই অবিচল। ঐ কণ্ঠের কত যে নকল হল, কিন্তু অমনটি আর হল না। চার, সাড়ে চার দশক ধরে পুরুষকণ্ঠে প্রায় একাধিপত্য – ভাবা যায়! এছাড়া ওকে আই পি টি এ-র আসরে গান গাইতে শুনেছি – সুচিত্রা, জর্জ বিশ্বাস এদের সঙ্গে। এখনও নতুন কোন নৃত্যনাট্যের রেকরড বের হলে নারীকণ্ঠের যদি বা বিকল্প আছে, পুরুষকণ্ঠে তো দেখি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হেমন্ত। দৃষ্টান্ত দেখুন – চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা এইসব। সুচিত্রা, কণিকা দুজনের সঙ্গেই ওর জুটি, এমনকি, লতা, কানন দেবীর সঙ্গেও। তবে দু তিন বছর আগে ধর্মপত্নী বেলার সঙ্গে হেমন্ত 'ও আমার চাঁদের আলো' ডুয়েটে গেয়েছে। সে গানটিও উৎরেছে চমৎকার। অর্থাৎ শেষমেষ সেই স্বকীয়াই সেরা। এখনও এখানে ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হয় – সেই ধুতির ওপরে শারট। খালি কি গলার ওর এই পোশাকেরও যে কত নকল হল!

সবশেষে আমার নিজের একটা ঘটনা বলি। বছর কয়েক আগে বম্বেতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিছুটা অনাচার করেই হয়ত। খবর পেয়ে পরদিন সকালে হেমন্ত আসে। বলে 'সন্তোষ, আর কেন! অনেক তো বয়েস হল।' হেমন্ত ছেলেমানুষ, তাই জানে না। বয়স হয় না, বয়স যায়। হেমন্তর এখনও হয়নি, সে আরো অনেকদূর যাবে। □

তেল বিক্রি করে মধ্যপ্রাচ্য অগস্ত্যের মত সারা দুনিয়াকে শুষে নিচ্ছে

সন্তোষ ঘোষ

মধ্যপ্রাচ্যের ৯টি আরব দেশ – সৌদি আরব, কুয়েৎ, ইরাক, কাতার, বাহরিন, ওমান, সংযুক্ত আমিরশাহি (ইউ এ ই), আলজেরিয়া আর লিবিয়া পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ পেটরোলের জোগান দেয় আর পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেলের খনি আছে এখানে। ইরানকে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিম এশিয়াতেই সবশুদ্ধ চার হাজার কোটি ব্যারেল তেল মজুত আছে। সৌদি আরব একাই অ কমিউনিসট দেশের শতকরা ২০ ভাগ তেল সরবরাহ করে, আমেরিকার শতকরা ১৭ ভাগ আর ফ্রানস এবং জাপানের শতকরা ৪০ ভাগ তেল। তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর একটা সংস্থা আছে, সংক্ষেপে ওপেক (অরগানাইজেশন অব পেটরোলিয়াম একসপোরটিং কানট্রিজ)। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব আর ভেনেজুয়েলা ছাড়াও সদস্য আলজেরিয়া, লিবিয়া, কাতার, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, ইকুয়েডার আব সংযুক্ত আমিরশাহি (ইউনাইটেড আরব এমিরিটাস) সবশুদ্ধ ১৩ জন। এরা সবাই মিলে পৃথিবীর শতকরা ৮৫ ভাগ তেল জোগান দেয় এবং পৃথিবীর সংরক্ষিত তৈল ভাণ্ডারের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আছে এসব দেশে। ১৯৮০ সালের এক হিসাবে প্রকাশ, তেল রপ্তানিকারী দেশগুলির সংস্থা ওপেকের সদস্যদের দৈনিক উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ ব্যারেল। এর মধ্যে সৌদি আরব একাই উৎপাদন করেছে দৈনিক ৯৫ লক্ষ ব্যারেল। একং ব্যারেল হচ্ছে ৩২ গ্যালন। এক গ্যালনে সাড়ে চার লিটার।

তেলেব দাম হঠাৎ বাড়ার ফলে তেল বা পেটরোলের এখন আরেক নাম তরল সোনা। কিন্তু তেলের দাম বাড়ান এবং তেলকে অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করাব চিন্তা আরবদের মাথা থেকে আসেনি। এর মাথা ছিলেন ২৪ বছর আগে তৎকালীন ভেনেজুয়েলার খনিমন্ত্রী পেরেজ আলফানজো, যিনি এককালে রাজনৈতিক কারণে আমেরিকায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন যে পশ্চিমী শক্তিরা ভেনেজুয়েলা বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে অতি সস্তায় তেল নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের উন্নতি করার জন্যে। কাজেই এসব দেশের উন্নতির উপায় তেলের দাম বাড়ান এবং তেলের উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণ করা। ১৯৬০ সালে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক আর কুয়েত ভেনেজুয়েলার সংগে যোগ দিয়ে বাগদাদে 'ওপেক' গঠন করে।

তেলের দাম তখন ব্যারেল প্রতি দু ডলারের বেশি ছিল না। ওপেকের প্রথম তেরো বছরে দাম সামান্যই বাড়ে। ৭০ দশকের প্রথমে লিবিয়ায় করনেল গাদাফি এসে সামান্য দাম বাড়ান – আড়াই ডলার। ১৯৭৩ সালের অকটোবর মাসে ইজরায়েলের সংগে আরবদের যুদ্ধের পরে আমেরিকার সংগে আরবদের সম্পর্ক খারাপ হয় এবং তেলকে একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা চিন্ত করা হয়। ইরানের শাহ তখন আমেরিকার বন্ধু ছিলেন। তবু দেখলেন ইরানের উন্নতি করতে হলে তেলের দাম বাড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। তিনি আড়াই ডলাব থেকে দাম বাড়ান ব্যারেল প্রতি ১১.৬৫ ডলার। তারপরই দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। পশ্চিমী শক্তিরা এবং বিশেষ করে আমেরিকা ব্যাপারটা পছন্দ করেনি, কাজেই অনেকে শাহবিরোধী আন্দোলনকে মদত দিতে থাকে এবং শাহের পতনের মুখে মারকিন সামরিক উপদেষ্টারা চুপচাপ বসেছিলেন। যা হোক চুক্তিমত তেলের দাম বাড়ানর ব্যবস্থা হলেও পাঁচ বছরে দাম বাড়ল তিনগুণ। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি ইরানের বিপ্লবের পরে তেলের দাম গিয়ে দাঁড়ায় ব্যারেল প্রতি ২৩.৫০ ডলার। ১৯৮০ সালে হল ৩২ ডলার আর ইরান-ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে তেল সংগ্রহ ও মজুত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তখন তেলের দাম হয় প্রায় ৪১ ডলার প্রতি ব্যারেলে। শেষে দামের একটা রফা হয় ৩৫ ডলারে যদিও অনেকে ৩৭ ডলারে বিক্রি করেছে। সৌদি আরবের তেলমন্ত্রী শেখ জাকি ইয়েমেনি আর দাম না বাড়িয়ে তেলের উৎপাদন কমাবার প্রস্তাব দেন, কেননা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে, পশ্চিমী দেশগুলো তাদের জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে চলেছে। অনেক দেশ তেল আবিষ্কার করছে, অনা ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করছে কিংবা তেলের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে গত দু বছরে তেলের দাম কিছুটা কমেছে। অনেক দেশ আর আগের মত তেল বিক্রি করতে পারছে না। তেলের দাম এখন ব্যারেল প্রতি ২৯ থেকে ৩০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অনেকের ধারণা ২৫ ডলারে নেবে যাবে দাম।

পৃথিবীতে প্রতি সেকেনডে ৩০ হাজার ব্যারেল পেটরোল ব্যবহার হয়, তার মধ্যে ১০ হাজার ব্যারেল লাগে শুধুমাত্র আমেরিকায়। আমেরিকার বড় বড় তেল কোমপানি পৃথিবীর তেলের বাজারের শতকরা ৪০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। তেলের ব্যাপারটা আছে তিন স্তরে। তেল উৎপাদন, তেল পরিশোধন এবং তেল সরবরাহ। আমেরিকা আর কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ এই তিন স্তরেই নানা দেশে টাকা ঢেলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর ব্যাংক হয়ে যায় আমেরিকা। আরব দেশের অনেক শেখ তখন কাঁচা টাকার লোভে তেলের খনি ইজারা দিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা ও আর কয়েকটা দেশকে। অবশ্য পরে বিভিন্ন দেশে সামরিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এবং তেলের দাম বাড়ার সংগে সংগে তেলকে জাতীয়করণ করা হয়।

তেল উৎপাদন করতে প্রচুর টাকা লাগে আর লাগে উন্নত ধরনের টেকনোলজি। তেলের খনিতে ৫ ব্যারেল তেল থাকলে উঠিয়ে পাওয়া যায় এক ব্যারেল। তারপর অপরিশোধিত তেলকে শোধন করার ব্যাপার আছে। এখনও অনেক আরব দেশে রিফাইনারি বা শোধনাগার তেমন নেই। আর তেল সরবরাহের ব্যাপারে পৃথিবীতে কুয়েত ছাড়া আর কেউ বিশেষ এগিয়ে আসেনি। আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় কোমপানিগুলো শেয়ার না পেলে টাকাও ঢালতে চায় না। টেকনোলজিও ব্যবহার করতে দেয় না। অবশ্য এখন বিশ্ব ব্যাংক তেল উৎপাদনের জন্য টাকা ধার দিচ্ছে অনেক অনুন্নত দেশকে।

কাজেই আরব দেশগুলো তেলের দাম বাড়ালেও পশ্চিমী তেল কোমপানিগুলোই লাভ করছে বেশি। ১৯৭৯ সালে আমেরিকার তেল কোমপানিগুলো তেল কেনা বেচার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে মুনাফা করেছিল ৩৪২ কোটি ডলার আর মারকিন দেশের কলকারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এসব দেশে নানা ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি করেছিল ৮৯৫ কোটি ডলার। মুনাফা ও জিনিসপত্র বিক্রি ছাড়া ১৯৭৯ সালে কয়েকটি আরব দেশে আমেরিকা অর্থ বিনিয়োগ করেছিল ৮৫০ কোটি টাকা। তেলের ব্যবসায়ে পৃথিবীর ২৬টি বড় মারকিন তেল কোমপানি ১৯৭৯ সালে শুধু মুনাফা করেছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। তেলের দাম যেমন বেড়েছিল এদের মুনাফার পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বেড়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে তেল বিক্রি করে প্রচুর টাকা আসার সংগে সংগে নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সত্তর দশকের শেষে বার্ষিক জনপ্রতি আয় ছিল সৌদি আরবের ২৪০০ ডলার, সংযুক্ত আমির শাহির ২৭০০ ডলার, লিবিয়ার ২১০০ ডলার এবং অন্যান্য দেশেও জনপ্রতি ১০০০ ডলারেরও বেশি। নতুন করে কলকারখানা, রাস্তাঘাট বাড়িঘর তৈরি, স্কুলকলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, এয়ার পোরট নির্মাণ সব কিছুতেই বিশেষজ্ঞ দরকার, শ্রমিক দরকার, যন্ত্রপাতি মালমশলাও দরকার। দলে দলে লোক গেল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিংহল, থাইল্যানড, ফিলিপাইন, কোরিয়া, চীন থেকে। মিশর, সিরিয়া, সুদান, ইয়েমেনের আর প্যালেসটাইনের শ্রমিকরা ছড়িয়ে পড়ল এই সব দেশে। বস্তুত অনেক দেশের অর্থনীতি এখন নির্ভর করছে শ্রমিকদের পাঠান বিদেশি মুদ্রা থেকে। ভাবতের বৈদেশিক বাণিজ্যে খুব সুবিধা হচ্ছে না এখন, এখন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান জোগানদার ভারতীয় শ্রমিক। কুয়েত বাহরিন এসব দেশে স্থানীয় লোকদের চেয়ে বিদেশিদের সংখ্যা বেশি।

এসব দেশ দ্রুত উন্নতি করতে চেষ্টা করলেও আপাতত তেল ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলেছে। উত্তর আফরিকার আরবিভাষী দেশে আছে এক ধরনের লোহা, তামা, সিসা আর ফসফেট। সৌদি আরবে আছে সোনার খনি, অনেকের ধারণা রাজা সলোমনের সোনার খনি এখানেই ছিল। ইউরেনিয়াম আছে লিবিয়া, সুদানে, তামা আছে জরডনে, ইয়েমেনে, সৌদি আরবে, রুপো আছে উত্তর আফরিকায়, গন্ধক আছে ইরাক ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে, আলজেরিয়ায় প্রচুর গ্যাসও পাওয়া গিয়েছে। কৃষিকার্যে ওমান, ইরাক, জরডন আর লেবানন বেশ সফলতা অর্জন করেছে।

আর্থিক উন্নয়নের সংগে সংগে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়েছে, এখন প্রত্যেকের গাড়ি চাই, টেলিভিশন চাই, নতুন ধরনের খাবার-দাবার চাই -.সবই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। যেসব উন্নত দেশের তেল নেই যেমন ফ্রানস, ইতালি, পশ্চিম জারমানি ও জাপান - তাদের দেশে তৈরি জিনিসপত্রে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার ভর্তি। পূর্ব ইউরোপ, চীন ও অন্যান্য দেশের জিনিসও পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে আছে। অনেকের ভয়ও আছে গদি যাওয়ার, কাজেই দেশরক্ষার জন্যে অনেক খরচ করতে হয়। অনেক দেশ তেল বিক্রি করে যা পায় অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র কিনতে তার চেয়ে বেশি খরচ করে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি, তবে তেল তুলে ও বেচে ঘাটতি বাজেট পূরণ করার ইচ্ছা। এদিকে পশ্চিমী দেশগুলো তাদের জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের দাম বাড়িয়ে চলেছে, কোথাও মডেলের সামান্য হেরফের করে। আরব দেশের এক তেলমন্ত্রী তাই বলেছেন, আমরা তেলের দাম যত গুণ বাড়িয়েছি, বিদেশিরা তাদের জিনিসপত্রের দাম তার চেয়ে বেশি গুণ বাড়িয়েছে। তবে অনেক আরব দেশের লোকের ব্যবসায়ী বুদ্ধি বেশ ভালই। তারা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকটি ক্ষেত্রে তেমনি ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়েছে, বিভিন্ন কোমপানির শেয়ার কিনেছে, বাড়িঘর হোটেল কিনেছে। আমেরিকার দু-একটি ব্যাংক ও অনেক প্রতিষ্ঠান চলছে আরব শেখেদের টাকায়।

তেলের হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে গরিব দেশগুলোর। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অনেকটাই চলে যায় এই তেল কিনতে। কাজেই অনেক দেশ তেলের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। চীনদেশে গাড়ির ব্যবহার কম। ব্রাজিলে অ্যালকোহল দিয়ে গাড়ি চলছে, দক্ষিণ আফরিকা এক জারমান পদ্ধতিতে কয়লা থেকে তেল বের করেছে, পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়া আর আলজেরিয়া থেকে জ্বালানি গ্যাস আমদানি করছে। গত কয়েক বছরে নানা দেশে তেল উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। ভারতেও তেল আবিষ্কার হয়েছে, পশ্চিমবংগে তেলের সন্ধান চলছে। ইংলনডের 'নরথসী'তে তেল পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকা তেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, নানা দেশ থেকে তেল কিনে মজুত করেছে।

এর ফলে গত দু বছরে তেলের চাহিদা আগের চেয়ে কমে গিয়েছে। অনেক আরব দেশ তেলের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে দামের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল, কেননা তেলের দাম কমে ব্যারেল প্রতি ২৯ কি ৩০ ডলারে এসে পৌঁছেছে। তবে অন্য কয়েকটি দেশের মতে দাম কমলেও উৎপাদন বাড়িয়ে একই আয় দরকার উন্নয়নের জন্যে। এমনিতেই ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে এ দু দেশের তেলের উৎপাদন অনেক কমে গিয়েছে। গতবছর এ যুদ্ধের ফলে পারস্য উপসাগরে তেল ভেসে জল দূষিত করলে জলকষ্ট দেখা দেয়, তখন বোতলের জল বিক্রি হয়েছে তেলের দামের চেয়ে বেশি।

দাম ঠিক রাখতে হলে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হোক এই প্রস্তাবে ইরান ও অন্য কয়েকটি দেশের আপত্তি। কোন দেশ বাৎসরিক কত উৎপাদন কববে এ নিয়ে ওপেকের ভেতর মতবিরোধ। ইরান অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্যে কম দামে তেল বিক্রি করছে এ অভিযোগ অনেকে করেছে।

অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, সেই সংগে বেকারত্ব। মধ্যপ্রাচ্যের সংগে এসব দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক।

কিন্তু অন্যান্য দেশে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল আর আবিষ্কার না হয় কিংবা উৎপাদন না বাড়ে তাহলে আবার মধ্যপ্রাচ্যের তেলের চাহিদা বাড়বে, পশ্চিম দেশগুলোকে তাদের জিনিসপত্র অস্ত্রশস্ত্রের দাম বাড়িয়ে হোক আর অন্যভাবেই হোক তাদের তেল কিনতে হবে। ১৯৯০ সালে নরথসী, আলাসকা, ভেনেজুয়েলা ও রাশিয়ার অনেক জায়গায় তেলের খনিতে আর বিশেষ তেল থাকবে না। অন্যদিকে আরব দেশের অনেক জায়গায় বহু বছর ধরে তেল থাকবে, যেমন সৌদি আরবে প্রায় ১০০ বছর আর ইরাকে ৫০ বছর, তেলের উৎপাদন কমালে আরো বহু বছর। ১৯৭৯ সালের এক বিশেষজ্ঞের একটি রিপোরটে প্রকাশ যে উৎপাদন খরচ ব্যারেল প্রতি আরব দেশে ৪ ডলার, মেকসিকো উপসাগরে ৩-৫ ডলার, ক্যালিফোরনিয়ায় ৪-৭ ডলার, নরথসীতে ৬-১২ ডলার এবং আলাসকায় ১২-১৫ ডলার। জমির ভেতর থেকে তেল তুললে ব্যারেল প্রতি ২০-৩০ ডলার, অন্য গভীর জায়গা থেকে তুলতে গেলে ২২-২৫ ডলার, কয়লা থেকে ৩০-৪০ ডলার এবং জৈবিক পদার্থ থেকে তেল বের করলে ব্যারেল প্রতি ৭৫-৯০ ডলার পড়ে। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর পৃথিবীকে নির্ভর করতেই হবে।

কিন্তু এই শতাব্দীর শেষে তরল সোনা মধ্যপ্রাচ্যকে কোথায় নিয়ে যাবে এ প্রশ্ন সকলের। □

পাঁচ মিনিট

অথ ঐক্য রহস্য (স্বপ্নে প্রাপ্ত)

সুব্রত মুখারজির সংগে অশোক সেনের ঝগড়া মিটে গেছে। দুজনে প্রেসের কাছে স্টেটমেনট দিয়েছেন এ আই সি সি প্লেনারি অধিবেশনের সাফল্যের জন্য তাঁরা হাতে হাত ধরে লড়াই করবেন। অভ্যার্থনা কমিটির মিটিঙের শেষে অশোক সেন ও সুব্রত মুখারজি এক যৌথ ইস্তাহার বিলি করেন। সমস্ত খবরের কাগজ গত পনের দিন ধরে প্রথম পাতায় ওঁদের ঝগড়ার খবর বড় বড় হরফে ছাপছিল। মিটমাটের খবরও তারা ব্যানার হেড লাইন করে ছাপে। কিন্তু খবরের কাগজগুলো এই মিটমাটের খবরে যারপরনাই দুঃখিত। কারণ কাল থেকে বিরোধ নেই, তার অর্থ বাজার ডাল। খবরের কাগজের রিপোরটাররা তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, সত্যি ঐক্য হয়েছে কিনা।

অশোক সেন বললেন : আমাদের ঐক্য এখন সিমেনটের মত অভেদ্য।

জনৈক সাংবাদিক : মিঃ সেন, আপনাদের এত ঘনঘন ঐক্য, ঘনঘন ঝগড়া হয় কি করে?

সেন : এটাই আমাদের বিউটি। গণতান্ত্রিক পারটিতে এমন হয়। শতপুষ্প বিকশিত হওয়া আর কি।

সাংবাদিক : আচ্ছা, আপনি মাঝে মাঝে ডুব মারেন, মাঝে মাঝে ভুস করে ভেসে ওঠেন – এটাও কি গণতান্ত্রিক ব্যাপার?

সেন : অফকোরস। গণতন্ত্র বলেই তো ডুবছি আর উঠছি। নয় তো একবার ডুবলে একেবারে তলিয়ে যেতাম।

একজন সাংবাদিক সুব্রতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সুব্রতবাবু, কি নিয়ে আপনার সংগে বিরোধ বাধে?

সুব্রত : বলার দরকার আছে কিছু? সবাই তো দেখছেন। তবে পুরনো কাসুন্দি বেশি ঘাটতে চাই না। এখন আমাদের ঐক্যের জন্য ফাইট করতে হবে।

সাংবাদিক : আপনাদের এখন প্রোগ্রাম কি?

সেন : এক সংগে এগিয়ে চলা। আমার বাহিনী কাল থেকেই কাজে নেমে পড়ছে।

জনৈক সাংবাদিক : আচ্ছা মিঃ সেন, একথা কি সত্যি যে আপনি দিললি থেকে অভ্যর্থনা সমিতি পরিচালনা করবেন? সেটা কি করে সম্ভব?

সেন : দিললিতে বসে যদি গোটা ইনডিয়া শাসন করা যায় তাহলে ওয়েসট বেংগল কেন করা যাবে না? ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তো একমাত্র অধিবেশনের সময় ছাড়া আমার আর আসারই দরকার পড়বে না। আমার সুব্রত সোমেন ভাইরা একসংগে মিলেমিশে সব করবে। এতো।ছেলে ছোকরাদেরই কাজ।

বহুদর্শী এই সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর মনে ভীষণ খটকা। সুব্রতবাবুর বিপ্লব। পালটা অভ্যার্থনা সমিতি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। গরম গরম বক্তৃতা। হঠাৎ কোন যাদুবলে তার অবসান?

এর উত্তর পাবার জন্য তিনি সবজান্তা দাদার বাড়ি গেলেন। সবজান্তা দাদা পাইপ মুখে দিয়ে কী একটা পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। একটু ট্যারা চোখে তাকিয়ে বললেন, কি বহুদর্শী কী খবর?

বললাম : দাদা, হঠাৎ কংগ্রেস ই-এর অভ্যার্থনা সমিতি নিয়ে এই গোলমাল মিটে গেল কি করে? চারিদিকে ঐক্যের স্রোত বহে যাচ্ছে এর কারণ কী? কী করে এই অঘটন সম্ভব হল? সবজান্তা দাদা পাইপে সুখ টান মেরে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন : কিছুই খবর রাখ না। দিললিতে ম্যাডাম দুজনকে ডেকেছিলেন জান?

আমি বললাম : না।

: কিছুই খবর রাখ না। ম্যাডাম ডেকে দুজনকে খুব মোলায়েম করে বললেন : চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমরা যদি ঝগড়া না মিটিয়ে নাও –

আমি বললাম : বুঝেছি, তাহলে কংগ্রেস অধিবেশন অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে –

: আঃ, তাহলে তো মিটেই গেল। ওঁর নাম, ম্যাডাম। ভদ্রমহিলার এক কথা। কলকাতায় এখন কথা দিয়েছেন, কলকাতাতেই হবে। উনি বললেন : তোমরা ঝগড়া না মেটালে আমি জ্যোতিবাবুর ওপর এ আই সি সি করার ভার দিয়ে দেব। জ্যোতিবাবুকে আমি হিনটস দিয়েছি। উনি বলেছেন, কোন অসুবিধে হবে না ম্যাডাম, সহযোগিতার যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তখন আমাদের সবরকম বৈপ্লবিক শক্তি দিয়ে সহযোগিতা করে যাব। এখন আমাদের কারল মারকসের মৃত্যু শতবার্ষিকী চলছে। বলেন তো প্যানডেলের বাঁশ খুলব না – ওই বাঁশ দিয়েই –

এরপর আর ঐক্য না হয়ে পারে?

বহুদর্শী

প্রফুল্ল সেন কি রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন?

বিশেষ সংবাদদাতা

মাঝে মাঝে কত কী শোনা যায়। প্রফুল্ল সেন, আরামবাগে নিজের গ্রামে গিয়ে কাজ করছেন, গঠনমূলক কাজ। কখনো শোনা যায়, শয্যাশায়ী। কখনো বা খবর আসে প্রফুল্ল সেন অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন সত্যাগ্রহ করছেন। কিন্তু সত্যিই প্রফুল্ল সেন কী করছেন এখন? তিনি কি রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন?

কলকাতায় মিডলটন স্ট্রিটের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সারাদিন নানান লোকের আনা-গোনা। চলাফেরার ক্ষমতা ফিরে পেলেই প্রফুল্লবাবু চলে যান আরামবাগ মায়াপুরে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বের হয়, বিবৃতি বের হয়। প্রফুল্ল সেনকে নিয়ে রাজনীতির বাদ প্রতিবাদ চলে।

বেশ কিছুদিন যেন ভাটা পড়ে গিয়েছে। একবার প্রফুল্ল সেন বলেছিলেন, আত্মজীবনী লিখবেন। তাহলে কি আত্মজীবনী লেখা নিয়ে ডুবে আছেন? অনেকদিন চৌরঙ্গিতে জনতা পারটির (পুরনো কংগ্রেস ভবন) অফিসে যান না। জনতা পারটির সভাপতির পদ তিনি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই এক বছর আগেই তো বিধানসভার নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তাহলে!

একদিন মিডলটন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। সাক্ষাৎপ্রার্থী অনেক। বেশির ভাগই রাজনীতিতে অচেনা মুখ। কেউ বা গিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নিতে। কেউ বা গ্রামে অত্যাচারের কাহিনী শোনাতে।

এ কথা সে কথার পর রাজনীতিতে পালাবদল, জনতার নতুন জোট, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন নিয়ে কথা উঠল।

ভেবেছিলাম হয়ত বলবেন, এ রাজ্যে জনতা সি পি আই (এম) সমঝোতা সম্ভব নয়। কিন্তু এসব প্রশ্নের ধার দিয়েই গেলেন না। বর্ষীয়ান নেতা, গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বললেন, না, না, হবে না। আগামী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী গরিষ্ঠতা পাবেন না। নির্বাচনে ভোটাভুটি হবে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে। আর — তুমি কী বলছ — যুক্তফ্রন্ট — চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে জনতা, লোকদল, ডি এস পি, রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট — এ ফ্রন্ট তো ক্ষমতা দখলের লোভে একজোট হয়েছে। এদের পক্ষে গরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, ইন্দিরা গান্ধীকেও কেন্দ্রে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়তে হবে। অবশ্য তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। আর চন্দ্রশেখরের ফ্রন্ট কংগ্রেস (ই)-র বিকল্প হতে পারে না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ইন্দিরার ভেতরে ভেতরে একটা সমঝোতা হচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। ইতস্তত করছিলাম প্রশ্নটা করব কিনা। প্রফুল্লবাবু নিজেই বললেন, তুমি তো জিগেস করবে জনতা পারটির লোক হয়ে এ সব কী বলছি। তাহলে কি রাজনীতি থেকে ছুটি নিয়েছি? না, রাজনীতি ছাড়িনি। বরং বেশি করেই রাজনীতি করছি। তবে জনতা পারটি করি না। কোন পারটির রাজনীতি নয়। দলহীন গণতন্ত্রের রাজনীতি করছি। এখানে ওখানে মিটিং করছি, ঘরোয়া আলোচনায় দলহীন গণতন্ত্রের কথা বলছি। অনেকে হাসছেন, উপেক্ষাও করছেন। আবার বহু লোক উৎসাহিত করে চিঠি লিখছেন, বলছেন, ভারতের পক্ষে এটাই এখন প্রয়োজন! আমার সমস্ত মন এখন দলহীন গণতন্ত্রের চিন্তায় ডুবে আছে।

দেখলে মনেই হয় না, প্রফুল্লবাবুর মনের বয়স বেড়েছে। শরীর আর স্বাস্থ্য ৮৮ বছরের ভারে একটু নুয়ে পড়েছে। ব্যর্থতা, হতাশা, হাহাকার প্রফুল্লবাবুর মনকে ছুঁতে পারেনি। এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। কিন্তু রংটা পুড়ে গিয়েছে, শরীরটা শীর্ণকায়। ফর্সা রং, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য আর নেই। মাঝে মাঝে বিছানা নিতে হয়। হাসপাতাল নারসিং হোমে গিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু বার্ধক্যের বিড়ম্বনা তাঁকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে না। ষাট পঁয়ষট্টি বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। কাকডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। প্রাতঃভ্রমণে ছেদ পড়ে না।

প্রফুল্লবাবু নিজেই বললেন, এই প্রেসারটা একটু গোলমালে ফেলে দেয়। শুয়ে থাকলে ১৫০/৯০। বসে থাকলে উঠেই হাঁটতে পারি না। উঠে একটু দাঁড়াতে হয়। হুশ করে প্রেসারটা নেমে যায় — ১০০/৭০।

এই বয়স, শরীরের ওপর বার্ধক্যজনিত ব্যাধির অহরহ উপদ্রব সত্ত্বেও প্রফুল্লবাবুর স্মৃতিশক্তি এতটুকু কমেনি। সারাদিন একের পর এক লোক আসছে। এতটুকু বিরক্তি নেই। কথা পেলে যেন ক্লান্তি ভুলে যান। রাজনীতির লোক আসা কমে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছবি যেন চোখের সামনে ভাসছে। ত্রিশ চল্লিশ বছরের উত্থান পতনের ইতিহাস, বড় বড় পরিসংখ্যান সব মুখস্থ, কণ্ঠস্থ। ভাবনা চিন্তার কোন ভার নেই ওঁর কাছে। এখন মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছেন। নতুন করে সব কিছু ভাবছেন। বই-এর পোকা হয়ে গিয়েছেন। টয়েনবি, থিয়োডর রোজ্যাককে নিয়ে ডুবে আছেন। গান্ধীজীকে নিয়ে গভীরে চলেছেন।

কথায় কথায় বললেন, এখন আমি খুব 'ইকোলজি' নিয়ে পড়ছি। আমি 'ইকোলজি'র বাংলা করেছি 'বাস্তববাদ'। কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছি। হ্যানড বিল ছাপিয়ে আমার এই দলহীন গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। তবে মুখে বললে তো হবে না, এর জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। প্রশাসন এবং অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ চাই। মহাত্মাজীর গ্রামভিত্তিক স্বরাজ এর স্বপ্নকে রূপ দিতে হবে। সমস্ত গ্রামকে খাদ্যে, বস্ত্রে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে, জ্বালানির (গোবর গ্যাস) ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে একটা 'কমিউনিটি ফরেস্ট' থাকবে — কুড়ি বিঘা জমি হলে ভাল হয়। এ সবের মালিক হবে গ্রামবাসী সবাই। বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ছোট কলকারখানা করতে হবে। গ্রাম হবে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। সুমেকার বলেছিলেন, 'স্মল ইজ বিউটিফুল'।

গোবর গ্যাস-এর কথা সবাই শুনতে চায় না। কিন্তু মিথেন গ্যাস থেকে রান্নাবান্না, আলো জ্বালান, নদী থেকে জলও তোলা যায়। চীনে মাও সে তুঙ বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছিলেন। ভারতে এ পর্যন্ত গোবর গ্যাস হয়েছে ৮৫ হাজার। আর চীনে বায়ো গ্যাস (গোবর গ্যাস জাতীয়)-এর সংখ্যা ৭২ লক্ষ, ওরা আরও ৩০ লক্ষ বাড়াতে চাইছে।

গান্ধীজী বলেছিলেন, ভূমি দিতে হবে ভূমিগোপাল-কে অর্থাৎ পঞ্চায়েতকে। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একজন করে সেই জমিতে কাজ করবে। ফসল যা হবে সবাই ভাগ করে নেবে। ভারতকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই কর্মপন্থাই নিতে হবে। আমাদের গ্রামে যেমন ধনেখালি, রাজবলহাট, শান্তিপুরে তাঁতিরা কাপড় তৈরি করছেন একশো/একশো কুড়ি সুতোর। গ্রামের মানুষের জন্যে তো নয়, কলকাতায় চলে যাচ্ছে বড়-লোকদের জন্যে। এই পদ্ধতিতে ধনবৈষম্য দূর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালে আমাদের রাজ্যে তাঁত ছিল ৪০ হাজার, ১৯৬৬তে দাঁড়াল ১ লক্ষ ৬০ হাজারে। আর ১৯৮২তে বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার। আরও আট লক্ষ তাঁত হতে পারে। তাহলে আমরা বস্ত্রে স্বাবলম্বী হতে পারি।

কিন্তু আমরা মানে এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি গ্রাম-স্বরাজের কথা ভাবতে পারি? অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। এখন টেরিকট পলিয়েসটার, ডিসকো, পপ, ইনস্যাট-এর যুগের শেষ লগ্ন। কিন্তু আজও প্রফুল্লবাবুর চোখের সামনে শান্ত, সবুজের ফরাস, নীলাভ আকাশ, সংযত সংবেদনশীল মানুষ ভেসে উঠছে। বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন কিন্তু হার মানতে যেন তার মানা। বললেন, এই তো রামনগরে একটা কর্মিসভা করলাম। সেখানে সবাই উৎসাহিত হল গ্রামস্বরাজ গড়ার কর্মপন্থায়। রাধানাথ ঘোষ নামে একজন লোক তো সঙ্গে সঙ্গে দু বিঘা জমি দিতেও রাজি হয়ে গেলেন।

গ্রামকে ভালবেসেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজনীতিতে এসেছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়েছিলেন আরামবাগে। বিধ্বংসী বন্যায় আটকে পড়লেন। বন্যার্তদের উদ্ধার আর সেবাকার্যে ডুবে গিয়েছেন তখন। ভুলে গিয়েছেন তাঁকে বিলাত যেতে হবে। বড় চাটারড অ্যাকাউনটান্ট হয়ে স্যুট বুট টাই পরা সাহেব হতে হবে। বিরাট ফারমের মালিক হবেন তিনি। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে হবে। গাড়ি বাড়ি কত কী — প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছে। পৈত্রিক নিবাস খুলনা জেলায়। কিন্তু প্রফুল্লবাবু বলেন, আমি হুগলী জেলার লোক, ভারতবর্ষের মানুষ।

বন্যার্তদের সেবা করে যখন ফিরলেন তখন প্লেনের টিকিট বাতিল। অনেক দিন আগে সে প্লেন চলে গিয়েছে। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাবার অনেক ভরসা তাঁর ওপর। সব ব্যর্থ, সব ব্যর্থ। না, ব্যর্থ নয়, প্রফুল্লবাবু যেন আরামবাগের মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলেন।

'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান পাপ' — রবীন্দ্রনাথের এই বাণী বোধ হয় তরুণ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আরামবাগই হল কর্মকেন্দ্র। বাবা রুষ্ট হলেন, ছেলের বিলাত যাওয়া মাটি হল বলে। আর প্রফুল্লবাবু আরামবাগের মাটিকে প্রণাম করে শুরু করলেন নতুন জীবন গড়ার কাজ।

প্রফুল্ল সেন। আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

সেদিন থেকে সব অতীত হয়ে গেল। কলেজ টিমে নাম করা ক্রিকেট এবং হকি খেলোয়াড় ছিলেন। ডান পায়ের মালাইচাকি ভেঙেছিলেন ক্রিকেটের বলে আর হাতের কবজি ভাঙল হকিতে। ব্যাডমিন্টনেও পাকা খেলোয়াড়। তারপর ছিল বড় পড়া আর তাস খেলার নেশা। সংগী পেলেই তাস নিয়ে বসে যেতেন, তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লিতে যেতেন বেশির ভাগ ট্রেনে। প্লেনে সময়টা যেন হুশ করে চলে যায়। ট্রেনে সারা রাত বই পড়া যায়।

সময় পেলেই হিসাবের খাতা নিয়ে বসতেন, খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও চাহিদার হিসাব। ১৯৫২ সাল থেকে ৬৭ পর্যন্ত খাদ্য দফতর ছিল তাঁরই হাতে। লেভি সংগ্রহে আজ পর্যন্ত কোন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের রেকরড ভাঙতে পারেননি। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কথা উঠল কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন সেদিন আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখার্জি সবার আগে বলে উঠলেন, কে হবে মানে প্রফুল্লদাই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রফুল্লদা গালাগাল খেলেন আর মুখ্যমন্ত্রী হবেন অন্য কেউ। হতেই পারে না।

প্রফুল্লবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ১৯৬২ সালের ৯ জুলাই। মাত্র ৪ বছর ৭ মাস মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। রীতিমত ঝড় বয়ে গিয়েছে। চীনের ভারত আক্রমণ, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃত্যু, রাজ্যে কংগ্রেস দলে ভাঙন, বাংলা কংগ্রেসের জন্ম, ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন, পাকিস্তানের আক্রমণ, প্রচণ্ড খাদ্য সংকট, ধর্মঘট, বন্ধ, গণছুটির ধাক্কায় প্রশাসনে প্রায় অচল অবস্থা। রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম। কেরোসিনের অভাবে গ্রাম বাংলা অন্ধকার। চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। কেন্দ্র থেকে চাল গমের যোগানও তখন কমিয়ে দেওয়া হল। সংকটের পুরো সুযোগ নিল বিরোধীপক্ষ।

প্রফুল্লবাবু মানুষকে খাদ্যাভ্যাস বদল করার উপদেশ দিলেন। কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। বোধ হয় কাঁচকলাই তাঁর কাল হল। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আরামবাগের পথে ঘাটে দেওয়াল লেখা ছিল : 'কাঁচাকলার অনেক দাম প্রফুল্ল সেন ফিরে যান।'

প্রফুল্ল সেন হেরে গেলেন। জয়ী হলেন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী এবং বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অজয় মুখার্জি। সেদিন কলকাতা এবং শহরতলিতে লাইটপোস্টে কাঁচকলা আর কানা বেগুন ঝুলতে দেখা গিয়েছি। রাজভবনে প্রফুল্ল সেনের কোয়ার্টারের চারদিকে কাঁচকলার ছড়াছড়ি। আরামবাগে সেদিন অপদস্থ হয়েছিলেন প্রফুল্লবাবু। ধিক্কার জানিয়েছিল আরামবাগের গান্ধী প্রফুল্ল সেনকে।

তবু প্রফুল্ল সেন আরামবাগকে নিজের জীবন থেকে আলাদা করেননি। নির্বাচনী উত্তেজনা কমতে না কমতেই প্রফুল্লবাবু ছুটলেন আরামবাগ। আবার মানুষের মধ্যে মিশে গেলেন। আরামবাগে তখন এমন কোন পরিবার ছিল না যাঁদের অন্তত এক জনকে তিনি চেনেন না। কেন এই পরাজয়? সরজমিনে তদন্ত করেছেন প্রতিটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে। ১৯৬৯ সালে সেই প্রফুল্ল সেন মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার জয়ী হয়ে এলেন। কিন্তু তখন কংগ্রেসের ভিত আরও আলগা হয়ে পড়েছে।

কংগ্রেস ভাঙল, রাজ্য জুড়ে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। প্রফুল্লবাবু অনড়, অটল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে অন্য একটি রাজ্যে রাজ্যপাল করতে চেয়েছিলেন, রাজি হননি। প্রফুল্লবাবু নিজে আর মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হতে চাননি।

প্রফুল্ল সেনকে পশ্চিমবংগের মানুষ অনেক খেতাব দিয়েছেন – দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী, কাঁচকলা মন্ত্রী, জোতদার-মহাজনের প্রতিনিধি, প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থের দালাল, কখনো শোনা গিয়েছে তিনি স্টিফেন হাউস কিনেছেন, কখনও বা রটে গেল সুইস ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা জমিয়েছেন।

১৯৭৫ সালে দেখা গেল ভোলপাল্টে কাউকেও প্রফুল্ল সেনের দেলা। একা মানুষ, তবু দিন চলা ভার। যাঁরা তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী নন, তাঁদের সাহায্য তিনি নেন না। তাঁর সারা জীবনের সবচেয়ে বড় সংগী, তাঁর বিশ্বাস, গান্ধীবাদের প্রতি বিশ্বাস।

জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর সাধারণ মানুষ শুধু নন, বামপন্থী নেতারা, সি পি আই (এম)-এর বিপ্লবী নেতারাও প্রফুল্লবাবুকে চিনলেন। সবার আগে প্রফুল্ল সেন 'স্বৈরতন্ত্রে'র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযান শুরু করেছিলেন।

কথায় কথায় প্রফুল্লবাবু বললেন, জরুরী অবস্থার সময় একদিন প্রমোদবাবু-জ্যোতিবাবু এলেন আমার কাছে। কোথায় বসতে দিই! দুজনে মেঝের উপর মাদুরে বসে পড়লেন। ওঁরা বললেন, প্রফুল্লবাবু, আপনিও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এমন অবস্থা তো কখনও দেখিনি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করছেন। মানুষ আপনার নেতৃত্ব চাইছে। সেদিন জ্যোতিবাবুদের বললাম, বেশ তো, আপনারা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলনে নামতে না পারলে গোপনে দেওয়ালে-দেওয়ালে পোসটার দিন না। তাঁতে ওরা বললেন, না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না, ব্যাপকভাবে হামলা শুরু হবে। আমাদের হাজার হাজার ছেলে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় আছে, নিজেদের পাড়ায় ঢুকতে পারছে না।

প্রফুল্লবাবু আজীবন কমিউনিস্ট বিরোধী, গণ তন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও কোনদিন কমিউনিসটদের সংগে কোন ব্যাপারে হাত মেলান তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই প্রফুল্ল সেন চীন ভারত যুদ্ধের সময় কমিউনিসটদের ব্যাপকভাবে জেলে পুরেছেন। কমিউনিসট কর্মী ও নেতাদের উপর হামলা চালিয়েছেন।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ব্যাপারে মূল নেতৃত্ব ছিল প্রফুল্ল সেনের। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে ২ অকটোবর ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে অকমিউনিসট মন্ত্রিসভা গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনও ঘটিয়েছিলেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটা সরকারের পতন ঘটান যে অগণতান্ত্রিক তা সেদিন প্রফুল্লবাবু স্বীকার করেননি।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভাঙার পর প্রফুল্ল সেন রয়ে গেলেন আদি কংগ্রেসে। অন্যদিকে নব কংগ্রেস। ১৯৭১ সালে নব কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হল। প্রফুল্লবাবু ঘোষণা করলেন, নব কংগ্রেসই আসল কংগ্রেস। কিন্তু আদি কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রফুল্লবাবুর হয় তো নব কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। শেষ পর্যন্ত পারেননি। তবে ১৯৭১ সালে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করেছিলেন।

আবার '৭২ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করেছেন। '৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর সংগে নির্বাচনী আঁতাত করেছেন এবং নিজে সি পি আই (এম)-এর সমর্থনে আরামবাগ থেকে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। সেই প্রফুল্ল সেনই আবার ৮০ সালের নির্বাচনে সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনে নির্বাচনে দাঁড়ান। অবশ্য জিততে পারেননি। তারপর থেকে তিনি কট্টর সি পি আই (এম) বিরোধী।

জরুরী অবস্থার শেষদিকে প্রফুল্লবাবুকে সি পি আই (এম) ঘরছাড়া কর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য কাজে লাগিয়েছেন।

একবার সি পি আই (এম)-এর সংগে, আবার বিরুদ্ধে কেন? প্রফুল্লবাবু বললেন, সাতাত্তরের নির্বাচনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ইন্দিরা গান্ধী যেন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা না পায়। সে জন্য সি পি আই (এম)-এর সংগে সমঝোতা করেছিলাম। কিন্তু সাতাত্তরের বিধানসভা নির্বাচনে আমি সি পি আই (এম)-এর সংগে সমঝোতায় রাজি হইনি।

কেন রাজি হলেন না?

কমিউনিসটদের সংগে বিধানসভা নির্বাচনে সমঝোতা করার মত ইস্যু ছিল না। আমাদের জনতা পারটির সভাপতি চন্দ্রশেখর নির্দেশ দিলেন সি পি আই (এম)-এর সংগে নির্বাচনে সমঝোতা করার জন্য। আমি বললাম, দলের রাজ্য শাখার সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করব কিন্তু সমঝোতা নয়। চন্দ্রশেখর তখন পদত্যাগ করতে বললেন। তখন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। সেদিন গভীর রাত্রে মোরারজি টেলিফোন করে বললেন, না, আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে না, সি পি আই (এম)-এর সংগে সমঝোতারও দরকার নেই।

সি পি আই (এম) প্রফুল্ল সেনকে মুখ্যমন্ত্রী করে জনতা বামফ্রন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়ার প্রস্তাব তুলেছিলেন। অবশ্য আর এস পি রাজি হয়নি।

প্রফুল্লবাবু বাধা না দিলে সেদিন হয়ত জনতা পারটির সংগে সি পি আই (এম) এর সমঝোতা হত। প্রফুল্লবাবু চেয়েছিলেন, ক্ষমতার লোভ ছেড়ে জনতা পারটি মাটির সংগে যোগ রেখে চলুক, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দল হয়ে উঠুক।

জনতা পারটির ভিত এ রাজ্যে শক্ত হল না কেন? নিচের তলায় কর্মীর অভাব। মানুষ সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই)-কে বেছে নিয়েছে। 'গুন্ডার বিরুদ্ধে তো গুন্ডারাই লড়তে পারে।' ভোটাররাও পোলারাইজড হচ্ছে। আরামবাগের মায়াপুরে আমার নিজের গ্রাম বড়দংগল। যেবার আমি বিধানসভার নির্বাচনে হেরে গেলাম সেবারও নশোর মধ্যে আমি আটশো ভোট পেয়েছি। আর গত বছর বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পারটির প্রার্থী অজয় দে-র পক্ষে প্রচার চালিয়েছি। অজয় ভোট পেয়েছে মাত্র সাতটি।

প্রফুল্লবাবু আবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস করে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, ক্ষমতা দিতে হবে নিচের দিকে। তার জন্যে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন চাই। বিধানসভার এক একটি কেন্দ্রে ভোটার ১ লক্ষ ১০ হাজার। সকলের কাছে প্রার্থীর পক্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়। লোকসভার ভোটার অনেক বেশি – সাড়ে সাত লক্ষ। নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। বড় লোকদের কাছ থেকে টাকা নিতে হয়। আমি বলব, প্রত্যক্ষ নির্বাচন হোক শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখান থেকে ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে বিধানসভা-লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবেন।

সারা দেশে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিচ্ছে। এ রাজ্যে শাসক দল মারকসবাদী নয়, আঞ্চলিকতাবাদী। জ্যোতিবাবু ছ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেছেন কিন্তু কোথাও সফল নন। সব জায়গাতেই তিনি ব্যর্থ।

বার বার মনে হল প্রফুল্লবাবু কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এখনও আশা ছাড়েননি, দেশের মানুষ আবার গান্ধীজীর আদর্শে ফিরে আসবে। জীবনের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে বোধহয় তিনি বলতে চাইছেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের সাধনা। এই সাধনা ছাড়া সিদ্ধি লাভ সম্ভব নয়।

মায়াপুরে তাঁর যেটুকু সম্পত্তি ছিল – সাত বিঘে জমি আর ফসল বিক্রির নগদ তিন হাজার টাকা – সব গ্রামের গরিব মানুষকে দান করে দিয়েছেন।

সারাজীবন খদ্দরের সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন। ভেতরে ফতুয়া। এখন খদ্দরের ধুতি ছেড়ে মাঝে মাঝে পায়জামা পরেন। মনে হয়, প্রফুল্ল সেনের যেন পরিবর্তন ঘটছে। না, প্রফুল্ল সেন আগের মতই সকলের প্রফুল্লদা। □

বাঙালি- উপজাতি মিলেমিশে থাকতে চান, দাঙ্গা সংক্রান্ত সব মামলাও তাই তুলে নেবার দাবি উঠেছে

আগরতলা থেকে অমিয় দেবরায়

ত্রিপুরায় আশির জুনের দাঙ্গায় জড়িত সব আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে রাজ্যের সি পি এম প্রভাবিত বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকার সরাসরি মামলা তুলে নেবার জন্য কোরটকে বলতে পারে না। সরকারের পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার কোরটের কাছে এ মর্মে আবেদন রাখতে পারেন। কোরট আবেদন গ্রাহ্য করতে পারেন, না ও করতে পারেন।

মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই বিচারাধীন আছে। দাঙ্গার পর কংগ্রেস (ই)-এর রাজ্য দল বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছিল। বামফ্রন্ট সরকার স্পষ্টভাবেই জবাব দিয়েছিল, জাতি উপজাতির সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা উচিত হবে না। আর দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্ত বড় একটা হয়ও না। রাজনীতিগত ভাবে বামফ্রন্ট-আসামীদের মুক্তিই চাইছিল। রাজ্য বিধানসভায় উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব নিজেই খোলাখুলি বলেছেন 'সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে পারলে বামফ্রন্ট সরকার সবচেয়ে বেশি খুশি হবে।' দশরথবাবু বলেছেন, ১৯৮০ র জুনের দাঙ্গার সময়ে জাতি উপজাতির মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দূর করে পারস্পরিক বিশ্বাস যাতে আরো সুদৃঢ় হয় তার জন্যই দাঙ্গার সংগে ইতোপূর্বেই জড়িত কিছু মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

সমগ্র বিষয়টি রাজ্য বিধানসভার সাম্প্রতিক অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অবশ্য, উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, কোন মামলা চারজশিট হয়ে কোরটে গেলে তা প্রত্যাহার করার একমাত্র এক্তিয়ার আদালতেরই। বিধানসভা প্রস্তাব গ্রহণ করে আদালতকে সরাসরি মামলা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করতে পারে না। এরকম করলে এটা হবে বিচার বিভাগের ওপর এক ধরনের হস্তক্ষেপের সামিল। মূল প্রস্তাবটি এনেছিলেন নির্দল সদস্য জহর সাহা। জহরবাবু ত্রিপুরায় জাতি উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় জড়িত সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা সমীচীন বলে মনে করেন। জহরবাবু কংগ্রেস (ই)-এর টিকিট চেয়ে বিফল হলে নির্দল প্রার্থী হয়ে গত জানুয়ারি মাসের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তিনি কং (ই)-তে যোগদান করার জন্য আবেদন করেছেন।

১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় বধ্যভূমি মান্দাই সহ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সরকারি হিসাব মতেই প্রায় দেড়হাজার মানুষ খুন হয়েছিলেন। বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ-এর ঘটনাও প্রচুর। তিন লাখের ওপর নিরাশ্রয় এবং ভীত সন্ত্রস্ত নরনারী শিশু সরকারি শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী একাধিক বার বলেছিলেন ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে সমগ্র বিষয়টি রাজনীতিকভাবে মোকাবিলা করাই হবে যুক্তিসংগত। ত্রিপুরায় কিন্তু একটা বিশেষ অঞ্চলেই দাঙ্গা সীমাবদ্ধ ছিল, রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল প্রধানত জনসাধারণের চেষ্টাতেই দাঙ্গামুক্ত থাকে। দাঙ্গায় এত বেশি সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ স্বাধীনতার পরে ভারতের কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

দাঙ্গার জন্য কে দায়ী তা নিয়ে রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ছিল। স্বস্তির কথা যে রাজনীতিক দলগুলোর সম্বিৎ ফিরে এসেছে। এরা সকলেই এখন মামলা প্রত্যাহার করতেই উদগ্রীব।

দাঙ্গার জন্য ৪৬৫টি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন আছে। ২০৫টি ক্ষেত্রে পুলিশ চারজশিট দিয়েছে। তার মধ্যে ১০৮টি খুনের জন্য। বিভিন্ন অভিযোগে ১১৭০ জন অভিযুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে উপজাতির সংখ্যা ৯৩৬ জন। প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা তুলে নিয়েছে। টি ইউ জে এস একটি উপজাতি রাজনীতিক সংস্থা। শাসক সি পি এম এবং বিরোধী টি ইউ জে এস এর মধ্যে অহি নকুল সম্পর্ক। টি ইউ জে এস এর অভিযোগ : পুলিশ সি পি এম দলের অনেক আসামীকে ছেড়ে দিয়েছে এবং বেছে বেছে টি ইউ জে এস এর কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। একথা বলেছেন টি ইউ জে এস এর নেতা এবং বিধানসভা সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

এক সময় আসামীদের রাখার মত আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে জায়গা ছিল না। শহরের এক পাশে অস্থায়ী জেল খুলতে হয়েছিল। অতঃপর বিধানসভায় সব দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুনের দাঙ্গার মামলার ইতি টানতেই হবে। কংগ্রেস (ই) তো বলেই দিয়েছে রাজ্য সরকার যদি এদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা না করেন তবে দল সারা রাজ্যে আন্দোলনে নেমে পড়বে। টি ইউ জে এস এর সংগে রাজ্য কংগ্রেস (ই)র সম্পর্ক কিছুদিন আগেও তিক্ত ছিল। প্রধান কারণ রাজ্য কং ই ত্রিপুরায় সংবিধানের ষষ্ঠ তপসিল চালুর বিরোধী। ষষ্ঠ তপসিল চালু করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হয়। টি ইউ জে এস জানে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই তাদের দাবি মেটাতে পারেন। টি ইউ জে এস নেতৃবৃন্দ কয়েকবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে টি ইউ জে এস-কং-ই এর মধ্যে নির্বাচনী আঁতাত হয়েছিল। আশা করা যায় শাসক বামফ্রন্টের মত এখন কংগ্রেস (ই) এবং টি ইউ জে এস-ও এ ঘটনা সংক্রান্ত সব মামলাগুলি প্রত্যাহারের দাবিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে যাবে। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

আসুর ক্রিকেট খেলা বয়কটের ডাক আসামবাসী প্রত্যাখ্যান করল

গৌহাটি থেকে নিরুপমা বরগোহাঞি

হিতেশ্বর শইকীয়া নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও আসামের অত্যন্ত সংকটময় সময়ে যে অমিতশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে Man of the nation পদবী দেওয়াটা সত্যিই উপযুক্ত হয়েছে। এ আই সি সি-র গত বোমবাই অধিবেশনে ওঁর সরকারের কাজ কর্মকে প্রশংসা করা হয়েছে – যেটা এর আগে নাকি এ আই সি সি কোনদিন কারো ক্ষেত্রে করেনি।

চার বছরের আন্দোলন বিধ্বস্ত আসামে শইকীয়া রাজনীতির যে খেলা খেলে চলেছেন তাতে প্রতিপক্ষ আসু আর গণসংগ্রাম পরিষদকে যে কায়দায় কাবু করে এনেছেন তার প্রমাণ অনেক ঘটনার মাধ্যমে ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমে এ কৃতিত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে ছলে বলে কৌশলে তিনি আন্দোলনের অনেক সক্রিয় কর্মীকে ইন্দিরা কংগ্রেসের অনুগত করতে সমর্থ হয়েছেন। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আসুর বহিষ্কৃত উপ-সভাপতি নুরুল হোসেন পর্যন্ত এ কথা বলেছেন - 'আসুর কোন কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য কোন কোন দলের প্রতি অনুগত এরকম সন্দেহ করার ভিত্তি যে একেবারে নেই সেকথা বলা যায় না।' এবারের আসামের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে অনেক আসু কর্মী উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি পেয়েছেন এমনকি পুলিশের চাকরি পর্যন্ত। সরকার কাউকে চাকরি দিয়েছেন, কাউকে ব্যবসা করার সুবিধা করে দিয়েছেন, কাউকে নগদ টাকা দিয়েছেন শোনা যাচ্ছে এভাবে নানা ধরনের ঘুষ দিয়ে আসামের বর্তমান সরকার আন্দোলনের মেরুদণ্ডে কঠিন আঘাত হানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিতেশ্বর শইকীয়া আর এক রাজনৈতিক চাল চেলেছেন সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন তার সফলতার এক প্রধান দাবিদার ছিল নব গঠিত আন্দোলন সমর্থক সরকারি আর আধা সরকারি কর্মচারী পরিষদ। এঁরা অন্যান্য অফিসে ছাড়া দিশপুরের সচিবালয়ও অচল করে দিয়েছিলেন, হাংগামা এতদূর গড়িয়েছিল যে, তখন পুলিশের গুলিতে দিলীপ চক্রবর্তী নামক সচিবালয়ের এক কর্মীও মারা যান। কিন্তু এখন আসু আন্দোলনের আহ্বানে বন্ধের ডাক দিলেও সচিবালয়ে কাজকর্ম ঠিকই চলে। গত সেপটেমবর মাসের শেষ দিকে ৩৬ ঘণ্টার যে আসাম বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল সে সময়ও সচিবালয়ের কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক।

কয়েকদিন যাবৎ আর একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে যে, মুখ্যমন্ত্রী আসামের যেসব জায়গায় সফর করতে যান সেসব জায়গায় 'অবৈধ' সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কট করার আহ্বানে স্থানীয় বন্ধের ঘোষণা করা হলেও এখন তা আর সফল হচ্ছে না। গত ২৭ অকটোবর হিতেশ্বর শইকীয়া উত্তর কামরূপের নলবাড়ী শহরে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস করতে যাওয়ার সময়ে আসু আর গণসংগ্রাম পরিষদ সেখানে বন্ধ আর নলবারী শহরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে দুঘণ্টার নিষ্প্রদীপ কার্যসূচীরও আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু ২৭ তারিখে কী হল? আসাম আন্দোলনের বিরাট সমর্থক ইংরেজি দৈনিক 'আসাম ট্রিবিউনে'র ভাষায় - 'Addressing a largely attended public meeting at Nalbbari, in spite of the Nalbari Bandh Call, the Chief Minister claimed that normal situation in the state was restored .... '। আসাম আন্দোলনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ যেসব জেলায় তীব্ররূপ ধারণ করেছিল তার মধ্যে একটা হল কামরূপ জেলা। এখন সেসব জায়গায় সরকার কঠোর হস্তে আন্দোলনকারীদের দমন করে চলেছে - ফলে পুলিশের অত্যাচারও নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কামরূপের এক জায়গায় পাঠশালাতে নাকি আন্দোলনবিরোধী লোকের (যাদের বেশির ভাগই বামপন্থী অথবা বামপন্থী সমর্থক) কাছ থেকে আন্দোলনকারীরা জরিমানা হিসাবে যত টাকা পয়সা উশুল করেছিল সেসব এখন ফিরিয়ে দিচ্ছে। কয়েকদিন আগে পুলিশ নলবারী অঞ্চলের নিরঞ্জন তালুকদার নামক সি পি এমের নির্বাচনের সময় নিখোঁজ হওয়া এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। আর নিরঞ্জনের হত্যাকারী বলে আসুর এক নেতৃস্থানীয় যুবকের স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান আসু আগের মতই দু একটা প্রতীকী কার্যসূচী চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছে যদিও আগের মত আর জনগণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ওদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলও মাঝে মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। গত ২৩ আর ২৪ সেপটেমবর গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আসুর যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পরিস্থিতি নাকি এতই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, কয়েকজন সদস্যের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। তবু সে অধিবেশনে ওরা বিভাজনকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। এমনকি আসুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক জয়নাথ শর্মা (যার ভাই মংগলদৈ এ নির্বাচনের সময় অনেক অধিবাসীকে গুলি করে মারার পর শেষে নিজেও তাদের হাতে নিহত হয়েছিল; আর এস এসের সংগে সক্রিয় সম্পর্ক আছে বলে যার বিরুদ্ধে 'ইনডিয়া টুডে'তেও লেখা হয়েছিল) যখন অভিযোগ করছিলেন যে আসুর সহকারী সম্পাদক ভরত নরহ আর কয়েকজন গত ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে নির্বাচনী আঁতাতের জন্য রাজীব গান্ধী আর রাজেশ পাইলটের সংগে দিল্লিতে গোপন আলোচনা চালাচ্ছিল, তখন ওঁকেও বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবুও এটা ঠিক যে আসুর মধ্যে কিছুটা ভাঙন দেখা দিয়েছেই। ওই অধিবেশনেই আসুর উপ সভাপতি নুরুল হোসেনকে আসু থেকে বরখাস্ত করা হয়। নির্বাচনের সময় যখন আসুর সভাপতি প্রফুল্ল মহান্ত জেলে ছিলেন তখন নুরুল হোসেনই সভাপতি হিসেবে কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাপক দাংগার পরে হোসেন আসুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বাছ বিচারের অভিযোগ আনায় আর কয়েকজন মুসলমান সদস্যকে নিয়ে আলাদা সভা করার অপরাধে প্রথমে সাসপেনড করে শেষে ওঁকে বরখাস্ত করা হল।

আসু আর সরকারের মধ্যে একটা ব্যাপারে এখন টানাপোড়েন চলছে। ১ ডিসেমবর গৌহাটিতে ওয়েসট ইনডিজ আর ভারতীয় দলের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হবার কথা। আসামে আগে কখনও এ ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারই প্রথম হবে। আসু সে খেলা বয়কট করার আহ্বান জানাল বিদেশি সমস্যার সমাধান না হলে জনগণ যেন সে খেলা দেখতে না যান। কিন্তু আসামের আপামর জনসাধারণ এবার আসুর আহ্বান মানতে রাজি নয়। খুব সম্ভবত এই প্রথম আসুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আসামবাসী এমনভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। ফলে আসু কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে ওদের আহ্বান প্রত্যাহার করল সে শর্তগুলোর একটা হল, সে খেলাতে 'অবৈধভাবে' নির্বাচিত হওয়া বিধায়ক আর মন্ত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নাকি প্রথমে রাজিও হয়েছিল। কিন্তু আসাম সরকার তাতে রাজি হবে কেন। [illegible] স্টেডিয়ামকে ঢেলে সাজানোর জন্য সরকার ২৫ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে, সে টাকা [illegible] চলছে, এ অবস্থায় এ সি এ মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। অবশেষে গত ৩০ অকটোবর একটা মিটিং ডেকে তার পরেই এ সি এ সংবাদপত্রে ঘোষণা করল যে, ওরা খেলার মধ্যে কোন রাজনীতিকে ঢুকতে দেবে না। 'The meeting categerically stated that no agreement had been made by A C A with any 'political' or other groups, nor had any conditions been imposed on the A C A, as reported in a section of press; for the conduct of the match. Certain questions were raised by the AASU and necessary clarifications were given on the points... (The Assam Tribune, Nov. 1).

এ ঘোষণার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এর আগে মন্ত্রী, বিধায়ক এঁদের ঢুকতে না দেওয়ার আসুর কোন প্রস্তাব এ সি এ মেনে নিলেও সরকারের চাপে পড়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে আসুর শর্তাবলী নিয়ে আসাম মন্ত্রিসভার এক বৈঠক বসেছিল অকটোবর মাসে। সেখানে নাকি এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আসুর তিনটে শর্তের একটাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রয়োজনবোধে ক্রিকেট খেলার পরিচালনা আর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করবে। বোঝাই যাচ্ছে সরকারের এ ধরনের চাপের মুখে পড়েই এ সি এ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এ ক্রিকেট খেলা নিয়ে আসু আর সরকারের মধ্যে যে টাগ অব ওয়ার চলছে তাতে এখন পর্যন্ত হিতেশ্বর শইকীয়ারই জয় হয়েছে। এরপর আসু তার পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটা সময়ই বলতে পারবে। □

প্রেসার কুকারে রান্না করাটা যদি রপ্ত ক'রে নেন, তবে আপনার গ্যাস দ্বিগুণ সময় চলবে।

"কিন্তু আমি তো প্রেসার কুকারেই রান্না করি", হয়তো সব সময় করেন না। কিম্বা হয়তো আরো সঠিকভাবে প্রেসার কুকার ব্যবহার করতে পারেন।

যেমন ধরুন, আপনি যদি কুকারে সেপারেটার বসিয়ে ভাত, ডাল, আর তরকারি তিনটে একই সংগে রাঁধেন, তবে অনেকটা জ্বালানী বাঁচাতে পারবেন। আর আপনার পুরো রান্নাটাই হয়ে যাবে কয়েক মিনিটে।

প্রেসার কুকারে রান্না হলে জ্বালানী বাঁচে।

প্রেসার কুকারে রান্নাটা হয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর কম খরচে। প্রেসার কুকারে রাঁধুন; শুধু তাতেই দেখবেন জ্বালানী খরচ ৩০% কমে গেছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে প্রেসার কুকারে রান্না করে ভাতের বেলায় ২০%, ভিজানো ডালের বেলায় ৪৬% এবং মাংসের বেলায় ৪২% জ্বালানী বাঁচে। এছাড়া সময় আর পয়সার সাশ্রয় তো বটেই।

ঢাকনা দিয়ে তাপের অপচয় বন্ধ করুন

যে বাসনে রান্না করবেন তার মুখে ঢাকনা দিলেই ভাল।

এতে তাপ পাত্রের মধ্যেই থাকে। তাতে রান্নাও চটপট হয় আর ১৫% জ্বালানী কম লাগে।

ছড়ানো ও চ্যাপটা ধরণের বাসন ব্যবহার করা ভাল।

রান্নার বাসনের বাইরে যদি আঁচ বেরিয়ে যায় তবে তাপটা পাত্রে ঠিকমত লাগে না। অতএব জ্বালানীর বাজে খরচ হয়। চ্যাপ্টা ও ছড়ানো পাত্র আঁচটা পুরোপুরি পায়, রান্নাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ছোট বাসনে রান্না করতে

HTD-PCR-8056-A BEN

হলে', আঁচটা কমিয়ে দিন। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে

দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ স্টোভেই ২৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের বাসনই উপযুক্ত।

রান্নার বাসন পরিষ্কার রাখবেন

অনেক সময়েই কেটলি এবং কুকারে নূনের একটা সূক্ষ্ম স্তর লেগে থাকে। এই স্তরটা যদি ১ মিলিমিটারেরও হয়, তাহলেও বাসনের ভেতরের মাল মসলায় তাপের সঞ্চারণ কমে যাবে। এতে আপনার জ্বালানী খরচ প্রায় ১০% পর্যন্ত বেড়ে যাবে। সুতরাং সর্বদা বাসনের ভেতরটা ভাল করে মাজিয়ে নেবেন।

আমাদের পরীক্ষিত ইন্ধন সাশ্রয়ী নানান উপায়ের এই সহজ হদিশ ক'টা মেনে চলুন। এবং আরো কয়েকটা উপায়ের জন্য অপেক্ষা করুন। দেখবেন আপনার জ্বালানী, টাকা আর রান্নার সময়—কত কম লাগে। আপনার কেরোসিন স্টোভ অথবা গ্যাস সিলিণ্ডারের ওপরেও চাপ কম পড়বে, সেই সংগে সংসার খরচেও।

একটু ভেবে দেখুন।

কেরোসিন বাঁচান।
রান্নার গ্যাস বাঁচান।
কারণ তেল চিরদিন থাকবে না।

PCRA

পেট্রোলিয়াম কনজার্ভেশন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন
৩০৬, সেঠি ভবন, ৭-রাজেন্দ্র প্লেস,
নিউ দিল্লী-১১০০০৮.

সিয়ার গোপন কাজকর্ম ফাঁস করতে উদ্যোগী এক মারকিনীর সংগে কিছুক্ষণ

আমেরিকা সফররত সুদীপ মজুমদার

বছর কুড়ি আগের কথা। লুইস উলফ তখন চব্বিশ বছরের যুবক। কলেজ থেকে সবে পাশ করে বেরিয়েছে। আমেরিকা ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ সমস্যায় শুধু মাথাই গলাচ্ছে না বরং সোজাসুজি যুদ্ধে নেমে পড়েছে। কী করে সমাজতন্ত্রের প্রবল বন্যাকে রোখা যায়। পুরো ইন্দোচীনে আমেরিকান লাম্পাজাবাদের কুকীর্তি তখনও সবার জানা নেই। যুদ্ধে নামানর জন্য আমেরিকার যুবকদের নানান প্রলোভন দিয়ে ডাকা হচ্ছে। ওদের বলা হচ্ছে মারকিন স্বার্থ বজায় রাখার জন্য যুবকের 'দেশপ্রেমের' ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি লুইস বরাবরই বীতশ্রদ্ধ। তাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিল না সে। তথাকথিত সমাজসেবা করার নামে 'ইন্টারন্যাশনাল ভলানটারি সারভিস' বলে একটা সংগঠন খাড়া করেছে আমেরিকা। উদ্দেশ্য একদিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অন্যদিকে ইন্দোচীনের সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে সমাজবাদের প্রভাব সরান।

বাধ্য হয়ে লুইসকে ভলানটারি সারভিসে যোগ দিতে হল। রওনা হল লাওসের পথে। তখন লুইস জানে না যে আগামী দশবছর ও এই অঞ্চলে কাটাবে। লাওসের গ্রামে ক্যামপ পেতে লুইস কাজ শুরু করল। অন্য কয়েকজন আমেরিকান ও লাওসের বন্ধুদের সংগে। গ্রামে পরিষ্কার জল, কুয়ো খোঁড়া, রাস্তা বানান ইত্যাদি কাজে ওদের সময় কেটে যায়।

প্রথম ধাক্কা খেল লুইস কয়ের মাসের মধ্যে। আমেরিকা তখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে পুতুল সরকার মারফৎ রাজত্ব করছে ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মারণযজ্ঞ ছড়িয়ে দিয়েছে লাওস পর্যন্ত। একদিন বন্ধুদের সংগে মাঠে কাজ করছে লুইস। হঠাৎ বম্বার প্লেনের আওয়াজে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল আমেরিকান প্লেন থেকে ন্যাপাম বোমা ফেলা হচ্ছে কাছেরই এক গ্রামে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল চারিদিকে। আর্তনাদ, ঝলসে যাওয়া মানুষের শরীর, বাড়িঘর বিধ্বস্ত। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। গ্রামের মানুষ ক্রমেই লুইসের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠল। তার কিছুদিন পরে লুইসের এক প্রিয় বন্ধু এক আজব 'পথ দুর্ঘটনায়' মারা গেল। ফুটপাথ দিয়ে চলছিল ওর বন্ধু। কোথা থেকে একটা গাড়ি রাস্তা ছেড়ে ওকে চাপা দিয়ে চলে গেল। লুইস আর ওর বন্ধুরা বেশ কিছুদিন ধরে আমেরিকার নীতির সমালোচনা করছিল এবং যেসব মারকিন গুপ্তচররা ইন্দোচীনে তৎপর ছিল তাদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখছিল। বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা মারকিন বিদেশ নীতির আসল স্বরূপটা চিনতে পেরে গিয়েছিল।

লুইস আর ওর বন্ধুরা আবিষ্কার করল যে কুখ্যাত সেন্ট্রাল ইনটেলিজেনস এজেনসি (CIA) বা সিয়া যারা ইন্দোচীনে গুপ্তচর ছড়িয়ে তাদের দ্বারা যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে গুপ্তহত্যা পর্যন্ত সব সংঘটিত করে চলছিল। ভলানটারি সারভিসের কাজ ছেড়ে লুইস বেরিয়ে পড়ে সিয়ার এজেনটদের খুঁজতে। এসে পড়ে ফিলিপাইনসে। ওদেশে তখন বিশাল মারকিন ঘাঁটি। সিয়ার লোকজন ভর্তি। ক্রমে ক্রমে লুইস বুঝতে পেরে গেছে যে আমেরিকার যুদ্ধবাজনীতির সবচেয়ে ভাল এজেনট হল সিয়া। এবং সিয়া এমন একটি ভয়ংকর সংস্থা যার পক্ষে মারকিন নীতি রূপায়ণের জন্য যে কোনও জঘন্য কাজ করাই অসম্ভব নয়। প্রায় দশ বছর ইন্দোচীনে কাটিয়ে লুইস যখন দেশে ফিরে এল তখন সে কট্টর মারকিন বিরোধী যুবক। মনে মনে এক দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে, যে ভাবেই হোক সিয়ার সব কুকাজ প্রকাশ করে দিতে হবে। এদিকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হতে শুরু করেছে। লুইস তখন সাহসী, সৎ ও সিয়া বিরোধী। বন্ধু বান্ধবদের সংগে যোগাযোগের মাধ্যমে একটা সংগঠন খাড়া করার চেষ্টা করছে। কয়েক বছরের মধ্যেই সিয়ার এক এজেনট ফিলিপ আজি সিয়া ছেড়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মারকিন গুপ্তচর সংস্থাটি আসল চরিত্র প্রকাশ করে দেবার চেষ্টা করছে একটা বই এর মাধ্যমে। সিয়ার তখন মাথাব্যথা কি করে ফিলিপকে রোখা যায়। ধমক, প্রলোভন কিছুতেই কাজ হল না। ফিলিপ লুকিয়ে ইংলনডে চলে যায় এবং ওখান থেকে বইটা লেখে। নাম 'সি আই এ ডাইরি'। চাঞ্চল্যকর এই বইটির মাধ্যমে ফিলিপ সিয়ার গুপ্তচরদের আসল রূপ ফাঁস করে দেয়। লুইস আর ফিলিপের মধ্যে স্বভাবতই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। লুইস তখন তার নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিপ আর লুইস দুজনে মিলে আর একটা বই লিখল। নাম 'ডারটি ওয়ারক' (Dirty Work)। পশ্চিম ইউরোপে সিয়ার কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বইটা সিয়ার ওপরে আঘাত হানল।

তারপর থেকে সমানে চলেছে লুইস আর ওর সহকর্মীদের সিয়া বিরোধী ক্রুসেড। এখন অন্যান্য বন্ধুদের সংগে লুইস কভারট আকশন ইনফরমেশন বুলেটিন-এর মত অথরিটেটিভ ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে। বুলেটিনের উদ্দেশ্য সিয়ার সফিসটিকেটেড গোপন কুকাজগুলোকে ফাঁস করে দেওয়া। সিয়া এজেনটদের নাম প্রকাশ করে দেওয়া এবং সারা বিশ্বের বিশেষত এশিয়া, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী দেশের মানুষদের সচেতন করে দেওয়া সিয়ার আসল স্বরূপ সম্বন্ধে।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেনটের আবাস হোয়াইট হাউস থেকে আধ মাইল দূরে তেরতলা একটা পুরনো আমলের বাড়ি। তারই দশ তলায় একটা ছোট কামরায় বসে লুইসের সংগে কথা হচ্ছিল। তখন মাঝ রাত। সারা দিন নানান কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন লুইসের হাতে সময় শুধু রাতে। গত পাঁচ বছর ধরে লুইস আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একটা ম্যাগাজিন প্রকাশের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। প্রাক্তন সিয়া এজেনট ফিলিপ আজির সংগে হাত মিলিয়ে কভারট আকশন ইনফরমেশন বুলেটিন প্রকাশ শুরু করে লুইস ১৯৭৮ সালের জুলাই মাস থেকে। প্রথম সংখ্যায় ভূমিকা লিখতে গিয়ে ফিলিপ লেখে, 'Together, people of many nationalities and varying political beliefs can cooperate to weaken the CIA and its Surrogate intelligence Services striking a blow at the political repression and economic injustice. The CIA can be defeated. The proof can be seen from Vietnam to Angola, and in all other countries where liberation movements are rapidly growing strength. We can all aid this struggle, together with the strugle for socialism in the United States itself.'

সিয়ার কার্যকলাপ ও গোপন হত্যার কাজ দারুণভাবে বেড়েছে গত কয়েক বছরে। আফগানিস্তানের সরকারকে হঠানর জন্য সিয়ার চরেরা প্রায় একশ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ করেছে সেখানকার সরকার-বিরোধী দলগুলোকে। এই সরবরাহ পাচার হয়েছে পাকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি মারকিনপন্থী সরকারের মাধ্যমে। মধ্য আমেরিকায় নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সান্দিনিস্তা সরকারকে পরাস্ত করার জন্য দেশদ্রোহীদের ৮০ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে সিয়া। তাছাড়া প্রতিবেশী হন্ডুরাস ও এল সালভাদোরের প্রো আমেরিকান স্বৈরাচারী দেশগুলো থেকে গুপ্ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সিয়া, নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য কী করে সমাজতন্ত্রকে রোখা যায় আর মারকিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখা যায়। ইরানের আয়াতোল্লা খোমেইনির সরকারের পতন ঘটানর জন্য সিয়া তুরস্ক থেকে ইরান বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আফরিকায় লিবিয়ার বিরুদ্ধে সিয়া অঢেল টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিচ্ছে।

গত কয়েক বছরে সিয়ার বার্ষিক বাজেট বেড়েছে ১৭ শতাংশ হারে। বর্তমানে সিয়া দ্বারা পরিচালিত গোপন যুদ্ধের সংখ্যা ১২ থেকে ১৪। গোপন চররা যারা ছদ্মনামে অন্য দেশে ঢুকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ এর আয়োজন করে তাদের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। তাছাড়া কূটনৈতিক পরিচয়পত্র অথবা সাংবাদিকের পরিচয় নিয়ে প্রচুর আমেরিকান এজেনট সিয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সিয়ার জন্ম হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বিশ্বযুদ্ধে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে গোপন তথ্য চুরি

করার জন্য অফিস অব দি স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেস স্থাপন করা হয়। এর থেকেই সিয়ার উৎপত্তি। ধীরে ধীরে সিয়ার প্রতিপত্তি বেড়েছে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য সিয়া যে কোনও জঘন্য কাজে নামতে দ্বিধাবোধ করেনি। ভিয়েতনামে মুক্তিকামী মানুষদের বিরুদ্ধে দিয়েমের পুতুল সরকারকে সাহায্য করা থেকে আরম্ভ করে চিলির সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দেকে হত্যা করার পেছনে সিয়ার হাত রয়েছে। কিউবার বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা করার জন্য সিয়া অন্তত পাঁচ ছয় বার চেষ্টা করেছে।

সিয়া একটি অতি গোপন সংস্থা। ওয়াশিংটন থেকে কয়েক মাইল দূরে ভারজিনিয়ায় Langley Building-এ এর হেড কোয়ারটারস। খোদ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সিয়ার ডাইরেকটর নির্দেশ পায় বিভিন্ন কার্যকলাপ সংঘটিত করার জন্য। এখন সিয়ার ডাইরেকটর হলেন সত্তর বছরের কোটিপতি উইলিয়াম কেসী। কেসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে OSS-এর কাজ করেন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী কেসী প্রেসিডেন্ট রেগনের বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসাবে পরিচিত। এই বয়সেও ছদ্মনামে কমার্সিয়াল প্লেনে চড়ে কেসী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে গোপন কার্যকলাপ পরিচালনা করেন।

গোপন যুদ্ধ ও সংবোটাজের কাজ ছাড়াও সিয়া Disinformation অর্থাৎ ভুয়া খবর চালিয়ে একধরনের কমিউনিজম-বিরোধী ঠান্ডা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। লুইসের এক সহকর্মী আপাতত এই ধরনের একটি অনুসন্ধানে নিযুক্ত। স্বভাবতই তার নাম উল্লেখ করা যাবে না। কিন্তু ঘটনাটা বললেন লুইস। গত বছর ভাটিকানের পোপের ওপর এক আততায়ী আক্রমণ করে। পরে সে ধরা পড়ে। তার নাম জানা যায় আজা। ইতালির পুলিসের হেফাজতে কয়েকমাস থাকার পর হঠাৎ আজা বলতে শুরু করে যে সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার কিছু ডিপ্লোম্যাট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কে জি বি নাকি তাকে পয়সা দিয়ে পোপকে হত্যা করতে বলে। যে আজা প্রথমে কিছুই বলে না সে হঠাৎ কয়েকমাস জেলে থাকার পর গড়গড় করে গল্প বলতে শুরু করে। লুইসের মতে আজাকে সিয়ার এজেন্টরা ব্যবহার করছে সোভিয়েত বিরোধী প্রোপাগানডা করার কাজে।

সাংবাদিকদের কী করে সিয়া ব্যবহার করে তার প্রমাণও দিলেন লুইস। প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ম্যাগাজিন 'নিউজউইক' এর প্রাক্তন করেসপনডেন্ট আরনড দে বরচগ্রেভ সিয়ার জন্য আফরিকার কয়েকটি দেশে চর হিসাবে কাজ করেন। লুইস কয়েকমাস আগে বরচগ্রেভের একটা ছবি প্রকাশ করে দেয় ওদের বুলেটিনে। ছবিতে বরচগ্রেভকে রোডেশিয়ার বর্ণ-বিদ্বেষী ইয়ান স্মিথ সরকারের মারমুখী সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়া বহু আমেরিকান ও বিদেশি সাংবাদিকরা আমেরিকান এমব্যাসির অফিসিয়াল দ্বারা পরিবেশিত ভুয়া অথবা মিথ্যা তথ্যকে খবর হিসাবে চালিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন সারা পৃথিবীতে।

আমেরিকা সরকার সিয়া ছাড়াও আরও কয়েকটি অতিগোপন সংস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যাদের কাজ গুপ্তচরবৃত্তি করা। এমন একটি সংস্থার নাম হল ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেনসি। এটি সিয়ার থেকেও বেশি গোপন। এবং এর কার্যকলাপ, বাজেট, কর্মীদের সংখ্যা অনেক আমেরিকান সেনেটররাও জানেন না। দ্বিতীয়টি হল Army Intelligence Support Activity (AISA). AISA কমানডো স্টাইলের অপারেশনে নিযুক্ত। ইরানে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মীদের যখন খোমেইনির সমর্থকেরা বন্দী করে রাখে তখন AISA-এর কমানডোরা একটি ব্যর্থ অপারেশন দ্বারা ওদের মুক্ত করতে চায়। কিন্তু ভুল হবার দরুন মরুভূমিতে এক দুর্ঘটনায় AISA বেশ কিছু কমানডো মারা যায় ও পুরো অপারেশন বানচাল হয়ে যায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় সিয়া কি রকম তৎপর তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ঘটনাটি থেকে। ইউজিন জে ফ্লেগ, ৩৫ বছরের এক আমেরিকানকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনেকে জানত শিক্ষক হিসাবে। কিন্তু পাকিস্তানের মিলিটারি আদালত ফ্লেগকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় ওদেশে গোপনে অস্ত্র পাচার করার জন্য। ফ্লেগ আফগানিস্তানের তথাকথিত গেরিলাদের অস্ত্র সরবরাহ করার কাজে নিযুক্ত ছিল শিক্ষকের পরিচয়পত্র নিয়ে। কিন্তু জেল হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই হঠাৎ ফ্লেগকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং চুপিসারে পাকিস্তানের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সিয়া কি ধরনের প্রভাব রাখে পাকিস্তানের মত একটি দেশে। ভারতেও সিয়ার এজেন্টদের গতিবিধি নজরে পড়েছে সরকারের। কিছু দিন আগে এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ হয় এখানে। প্রখ্যাত সাংবাদিক সেইমুর হার্শ (Seymour Hersh) তাঁর বই 'প্রাইস অব পাওয়ার' এর এক জায়গায় উল্লেখ করেন যে প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই একসময়ে সিয়ার চর ছিলেন এবং প্রতিবছর প্রায় এক লাখ টাকা পেয়েছেন সিয়ার কাছ থেকে। দেশাই স্বভাবতই একথা অস্বীকার করেছেন। এবং তার হয়ে কয়েকজন মানহানির মামলা রজু করেছেন হারশের বিরুদ্ধে। এই ব্যাপারটি আপাতত আদালতে বিচারাধীন।

লুইস কিন্তু সিয়ার জঘন্য রূপকে কোনও মতেই 'আমেরিকান স্বার্থের' জন্য প্রয়োজনীয়, এ কথা মানতে রাজি নন। সিয়ার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম চলছে। বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া দরকার, কেননা সিয়ার কার্যকলাপের দ্বারা পৃথিবীর শুধু অন্যান্য দেশগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, বরং আমেরিকার সাধারণ মানুষও এক যুদ্ধবাজ, মারমুখী সরকারি নীতির শিকার হচ্ছে। একথা লুইসের। □

প্রমোদ দাশগুপ্ত নেইঃ সি পি আই (এম) কি সেই পারটি আছে?

নিশীথ দে

দেখতে দেখতে সেই ২৯ নভেম্বর ফিরে এল। প্রমোদ দাশগুপ্ত নেই—বেজিং থেকে আসা সেই দুঃসংবাদ বাতাসের চেয়ে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনো চোখের সামনে একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যেন বিচরণ করছে। হাতে দুই আঙুলের ফাঁকে আধ পোড়া চুরুট, অবসাদে আচ্ছন্ন একটা মানুষ চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে ভাবছেন। মনে হত, আলাদা জগতে চলে গিয়েছেন। সি পি আই (এম) শুধু একটা বড় রাজনৈতিক দল নয়, বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। আর প্রমোদবাবু সেই পরিবারের কর্তা।

সেই একান্নবর্তী পরিবার আছে, ছেলেমেয়েরা সবাই আছে। নেই শুধু সেই মানুষটি। যে মানুষটা পারটির দুর্দিনে সবাইকে আগলে নিয়ে চলেছেন, সুদিনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুর্দিনের কর্মীদের কথা সবচেয়ে বেশি করে ভেবেছেন। রাজা বিনে রাজ্য চলে যায় আর নেতার অভাবে পারটি চলবে না: নিশ্চয় চলবে। কিন্তু তবু প্রমোদ দাশগুপ্তর অভাব তো থাকবেই।

সি পি আই (এম) নেতারা প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর বললেন, আমাদের পারটি মারকসবাদে বিশ্বাসী, আমরা যৌথ নেতৃত্বে চলি।

জ্যোতিবাবুর পর কে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। পরিবর্তনের সংগে এক সাক্ষাৎকারে জবাবটা জ্যোতিবাবুই দিয়েছিলেন, 'আমরা যৌথ নেতৃত্বে চলি।' অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও 'যৌথ নেতৃত্ব' নিতে পারে।

হয়ত পারে। পারটিতে হয়ত চলে। কিন্তু যৌথ নেতৃত্বের কি ব্যক্তিত্ব থাকে, সাংগঠনিক ক্ষমতা, কোমল হৃদয়, কঠোর শৃংখলাবোধ, চেনা অচেনা সব মুখের আদল এক করে নেওয়ার ক্ষমতা, সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে পারটির স্থান, বুক দিয়ে পারটিকে ভালবাসার জন্যেই প্রেমিক হওয়া কি সম্ভব- যাঁর প্রয়োজনটা সামান্য, প্রলোভন তার চেয়েও সামান্য — এমন মানুষ সি পি আই (এম)-এর যৌথ নেতৃত্বে ক'জন আছেন।

প্রমোদবাবু রাজনীতি করেছেন হাতে-কলমে। হাতেখড়ি হয়েছিল অনুশীলন সমিতিতে। নিয়মনিষ্ঠা, সততা, সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত হওয়া, আত্মপ্রচার নয়, আত্মোৎসর্গ— এ সব শিক্ষা তাঁর অনুশীলন সমিতিতেই হয়েছিল। জীবনের যে বয়সটা সোনার চেয়ে দামী, সেই যৌবন কেটেছে ইংরেজের জেলে। কমিউনিস্ট পারটির সদস্য হয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের ৯ মে।

প্রমোদবাবুর পারটির রাজ্য সম্পাদকের পদে আসতে সময় লেগেছে পুরো তেইশ বছর। জ্যোতিবাবুর পর তিনি রাজ্য কমিটির সম্পাদক হন ১৯৬১ সালে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পলিটব্যুরোর সদস্য, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান, আরও অনেক পদের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর সরোজ মুখোপাধ্যায় রাজ্য কমিটির সম্পাদক হলেন। তখনও সরোজবাবুর দু চোখের কোলে জল। প্রমোদবাবুর বিয়োগ বেদনায় কাতর। সাড়ে চার দশকের জুটি সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত।

সরোজবাবু কমিউনিস্ট পারটিতে এসেছেন প্রমোদবাবুর অনেক আগে। সদস্য হয়েছেন ১৯৩১ সালের ৩০ সেপটেমবর। সরোজবাবু ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ডান হাত। ডঃ দত্তের সংগে থেকে সরোজবাবু বালজীবনে বহু বিপ্লবী, দার্শনিক, মনীষীকে কাছ থেকে দেখেছেন, সাধারণ মানুষকে নানাভাবে চিনেছেন। সরোজবাবু তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় যত ঘটনা আর কাহিনীকে ধরে রাখতে পেরেছেন, আর কেউ তা পারেননি।

একেবারে গোড়ার দিকে ১৯৪১ ৪২ সাল নাগাদ প্রমোদবাবু কলকাতা জেলা কমিটির সংগঠনের দায়িত্ব নেন। পারটি তখন বেআইনি। অনেকে জেলে, অনেকে আনডার গ্রাউনডে। কিছুদিন পর প্রমোদবাবুও গ্রেফতার হলেন। ১৯৪৩ সাল। ভবানী সেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক। পারটি বড় হচ্ছে। অবিভক্ত বাংলায় সরোজবাবু এবং প্রমোদবাবু ২৮টি জেলা চষে বেড়িয়েছেন।

প্রমোদবাবুকে এর পর দায়িত্ব দেওয়া হয় পারটির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকার। পি সি যোশির নির্দেশে পারটির নেতা ও কর্মীদের এই কাগজ নিয়মিতভাবে বিক্রি করতে হত। এ ব্যাপারে প্রদেশে প্রতিযোগিতা হল। তাতে প্রথম পুরস্কার পেলেন প্রমোদবাবু।

প্রমোদবাবু হঠাৎ নেতা হননি, সামান্য একজন কর্মী থেকে নেতা হয়েছিলেন। নেতৃত্বের জন্য হয়ত অনেক সময় মনে হয়েছে তিনি কর্তৃত্ব করছেন। কিন্তু পারটির কর্মী ও দরদীদের এত আপনজন কেউ হতে পারেননি। অতি বড় শত্রুও জানতেন, প্রমোদবাবু বুক দিয়ে পারটিকে ভালবেসেছেন। নিজের চেয়ে পারটিকে ভালবাসতেন বলেই তাঁর শরীরটা ভেঙে পড়েছিল।

পারটির চরম বিপদের দিনে প্রমোদবাবুর মত আর কেউ দায়িত্ব নেননি। ১৯৭১ থেকে ৭৭ - নকশাল পন্থী, 'আধা ফ্যাসিসট এবং সশস্ত্র হামলা'র মোকাবিলায় প্রমোদবাবু ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

প্রমোদবাবু প্রতিটি জেলার প্রতিটি কর্মীকে শুধু চিনতেন তাই নয়, কোন কাজে কে উপযুক্ত সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে জেলা থেকে কোন কর্মীকে এনেছেন প্রদেশে, কাউকে প্রদেশ থেকে পাঠিয়েছেন জেলায়।

সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বিমান বসু ছিলেন প্রমোদবাবুর স্নেহভাজন। প্রমোদবাবুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে পারটিকে স্থান দেওয়ার জন্য প্রমোদদা ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব।'

অনেকে বলেন, প্রমোদদা শুধু পশ্চিমবাংলার পারটির কাজ নিয়েই চিন্তা করতেন। কিন্তু সারা দেশের প্রয়োজনে এবং কর্মীবাহিনীর চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখেছি এবং ওড়িশা বিহার, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের নিচের তলার কর্মী সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য শুনেছি। এই সব রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সাধারণ পারটিকর্মীরা কীভাবে প্রমোদদার সংবাদ নিতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। সমগ্র পূর্বাঞ্চলের পারটিকর্মীদের কাছে প্রমোদদা বিশেষভাবে পরিচিত

এবং আপনজন ছিলেন। এটা সম্ভবপর হত প্রমোদদার সাধারণ পারটিকর্মীদের সম্পর্কে বিশেষ একটা দৃষ্টিভংগীর জন্য যা আমাদের পারটির অনেক নেতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

প্রমোদবাবুকে রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন প্রয়াত নেতা নিরঞ্জন সেন। নিরঞ্জনবাবু একদিন বলে ছিলেন 'আমাদের পারটির কৌশল ট্যাকটিক্যাল লাইন কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয় প্রমোদ তা সব থেকে ভাল জানে। আগের যুগের মধুদা (সুরেন ঘোষ), মাখন সেন (সুরেশ মজুমদার গোষ্ঠী) আর বর্তমান কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষের সমকক্ষ।

সত্যি সত্যিই নিরঞ্জনবাবুর এ কথার প্রমাণ মিলেছে বারবার। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও বামফ্রন্ট পরি চালনার ক্ষেত্রে প্রমোদবাবু রাজ নৈতিক কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। প্রতিপক্ষকে শত্রুকে কৌশলে পরাস্ত করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর মত জ্ঞান বুদ্ধি খুব কম নেতার ছিল।

প্রমোদবাবু বামফ্রন্টের চেয়ার ম্যান হতে চাননি। বলেছিলেন, 'চেয়ারম্যান পদের দরকার নেই। যুক্তফ্রন্টের মত একজনকে কন ভেনর করা হোক। সরোজবাবুই কনভেনর হোন।'

শেষ পর্যন্ত সরোজবাবু উদ্যোগ নিলেন। আর এস পির মাখন পাল, ফরোয়ারড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং মারকসবাদী ফরোয়ারড ব্লকের রাম চ্যাটারজি বললেন, খুব ভাল প্রস্তাব। প্রমোদবাবুকেই চেয়ারম্যান হতে হবে। প্রমোদবাবু চেয়ারম্যান হবার পর তাঁর সংগে শরিকদলের নেতাদের একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শরিকদলের নেতারা মর্যাদা পেয়েছেন।

শরিকদলের এক নেতা কয়েকদিন আগে কথায় কথায় বললেন, প্রমোদ বাবুকে দেখতাম খুব চিন্তিত। উনি সব সময় চাইতেন গরিব মানুষদের জন্য কিছু করতে হবে। নিজেকে পারটির ঊর্ধ্বে, ঠিক বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসাবে ভাবতেন। তবে যা হয়, সব সময় মানুষ যা চায় তা করতে পারে না। প্রমোদবাবুর তার জন্য একটা ক্ষোভ ছিল। প্রমোদ বাবুর পর সি পি আই (এম) চলছে যৌথ নেতৃত্বে। সরোজবাবু পারটির রাজ্য সম্পাদক। খুব ভাল লোক, সাদা সিধে মানুষ। প্রমোদবাবুকে বাইরে থেকে খুব কঠোর মনে হত। কিন্তু একবার সাহস করে তাঁর কাছে যেতে পারলে বুঝতে পারতেন, মনটা খুবই কোমল, সহানুভূতি তাঁর অফুরন্ত। আজকাল সাধারণ লোক কেউ সরোজবাবুর কাছে যেতে পারেন না, যেতে দেওয়া হয় না।

আগে শরিকদলের অনেক নেতা কেন, তাঁদের দলের মন্ত্রীদের প্রমোদ বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। সেই মন্ত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন। তাতে শরিকদল বা তাঁদের মন্ত্রীরা কেউ অখুশি হননি। অনেক সময় শরিক দলের মন্ত্রীরা নিজেরাই প্রমোদবাবুর কাছে গিয়েছেন।

প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর শরিক দলের নেতা বা মন্ত্রীরা বামফ্রন্টের বৈঠক ছাড়া সি পি আই (এম)-এর অফিসে খুব কম যান।

আর এস পি প্রথম দিকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে চায়নি। বলেছিল বাইরে থেকে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে যাবে। প্রমোদবাবু বললেন, না তা সম্ভব নয়। কেননা মানুষ ভোট দিয়েছে দলকে নয়, ফ্রন্টকে।

প্রমোদবাবু অনুরোধ করলে কোন শরিকদল উপেক্ষা করতে পারতেন না। জ্যোতিবাবু যেমন মন্ত্রীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না, অনেক সময় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেউ বললে প্রতিবাদ করতেন, তা যে দলের মন্ত্রী হোন না, ঠিক তেমনি প্রমোদবাবু অন্য শরিকদলের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। প্রমোদবাবুর পর চেয়ারম্যান হিসাবে সরোজবাবু এখনও সেই মর্যাদা পাননি।

সি পি আই (এম) দলেও ঠিক একই অবস্থা। প্রমোদবাবু পারটির কর্মীদের কাছে যে মর্যাদা পেয়েছেন তা কি কোন নেতা পেয়েছেন? প্রমোদবাবুর সংগে মতপার্থক্য হয়েছে কিন্তু তাঁরাও প্রমোদবাবুকে অস্বীকার করেননি।

পারটির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচনে প্রমোদবাবু অনেকের চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন কিন্তু রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচনের সময় কেউ দ্বিতীয় নাম প্রস্তাব করেননি, একটিই নাম প্রমোদ দাশগুপ্ত।

১৯৬১ সালে জ্যোতিবাবুর বদলে প্রমোদবাবু বর্ধমান সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন। তখন কিন্তু প্রমোদবাবু রাজি হননি। অনেকেই, বিশেষ করে বর্তমান সি পি আই (এম)-এর নেতারা অনুরোধ করলেন, সংশোধনবাদ পারটিকে শেষ করে দিচ্ছে। আপনিই পারবেন পারটিকে বাঁচাতে।

পারটির রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে কখনও সংশোধনবাদী, কখনও হঠকারী, কখনও বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলা করেছেন। বুক দিয়ে আগলেছেন পারটিকে। নতুন নতুন কর্মী তৈরি করেছেন। প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দিয়েছেন পারটিকে।

প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর এক বছরে পারটির সাংগঠনিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে?

সি পি আই (এম)-এর নিজের রিপোরটই বলছে, সব জেলাতেই গোষ্ঠী বিরোধ মাথা চাড়া দিয়েছে। জেলা কমিটি রাজ্য কমিটির নির্দেশ মানে না। লোকাল কমিটির নির্দেশ মানে না নিচুতলার কর্মীরা। ২৪ পরগণা জেলা কমিটির দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৪ জন মন্ত্রী, ২ জন এম এল এ এবং ১ জন সর্বভারতীয় কিসানসভার সম্পাদককে নিয়ে সম্পাদক মণ্ডলী। এঁদের মধ্যে দুজন অসুস্থ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য এখন নেই। তবে অতীতের কিছু উত্তরাধিকারের অস্তিত্ব রয়ে গিয়েছে। দুর্নীতিপরায়ণ লোক এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। এঁরা কয়েকজন নেতার আশ্রিত। অনেক লোকাল কমিটি জেলা কমিটির কাছে তাদের হিসাব দেয় না।

হাওড়া জেলায় সংগঠনের দুর্বলতা। জেলা সম্পাদক মণ্ডলী টীম হিসাবে কাজ করে না। জেলা কমিটির সদস্যরা নিয়মিত বৈঠকে যোগ দেন না।

হুগলি জেলা কমিটির লক্ষ্য ছিল সভ্যসংখ্যা ২৫ ভাগ বাড়ানো, বেড়েছে ১৮ ভাগ। চটকল শ্রমিকদের মধ্যে পারটির প্রভাব কমে যাচ্ছে। হিন্দি ভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ পারটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

মালদহ এবং জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি রাজ্য কমিটিকে অনেক সময় কোন রিপোরটই দেয় না। সি পি আই (এম)-এর নিজেদের রিপোরট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে পারটির সভ্য সংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু সংগঠন জোরদার হয়নি। প্রমোদ বাবু মারা যাওয়ার পর পারটির কর্মসূচির দিকে কর্মীরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দুর্নীতি, গোষ্ঠী, যৌথ নেতৃত্বের নামে কিছু লোকের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব থেকে হঠানর জন্য নোংরামি, সুবিধাবাদী আঁতাত বেড়ে গিয়েছে। পড়াশোনা কমে গিয়েছে। লোকাল কমিটির নেতারা সবাই পারটির মুখপত্র 'গণশক্তি'ও পড়েন না।

পারটির কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্য একটা পাঠ্যসূচিও তৈরি হয়েছিল। সেই পাঠ্যসূচিতে অনেকের রচনা স্থান পেয়েছে। বাদ শুধু প্রমোদ দাশগুপ্ত।

নতুন রাজ্য নেতৃত্ব প্রমোদবাবুর স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছেন। মধ্য কলকাতায় বাড়ি খোঁজা হচ্ছে স্মৃতিভবনের জন্য। কিন্তু মারকস-বাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রমোদ বাবু যে কাজ শুরু করেছিলেন তা কি এগিয়েছে? কিংবা আগের চেয়ে পারটির সংগে জনগণের সংযোগ কি নিবিড় হয়েছে?

প্রমোদবাবু একটি বিশেষ মোটর গাড়ি ব্যবহার করতেন। পারটির এক যুব নেতা বেশিরভাগ সময় সেই গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছেন। পুরনো বাড়ির দোতলায় প্রমোদবাবু যে ঘরে দীর্ঘদিন বাস করেছেন সে ঘর এক বছর ধরে নিঃসংগ। প্রমোদবাবুর নিজের হাতে সাজান গোছান ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা, বই এর আলমারি, টেবিলের ওপর রোজকার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। চায়ের সরঞ্জাম, রান্নার সরঞ্জাম, চুরুটের ছাই ফেলা অ্যাসট্রে সব পড়ে আছে। নেই শুধু সেই মানুষটি।

প্রমোদবাবু অসুস্থ ছিলেন অনেক দিন থেকেই। মাঝে মাঝে হতাশাও লক্ষ্য করেছেন অনেকে। দীঘায় যাচ্ছেন বিশ্রাম নিতে। কেউ হয়ত বললেন, সমুদ্রের জলহাওয়ায় আপনার শরীর সেরে উঠবে। প্রমোদবাবু জবাব দিলেন, 'অগস্ত্য যাত্রাও তো হতে পারে।'

কোনদিন কোন অবস্থাতে কেউ প্রমোদবাবুকে দিশেহারা হতে দেখেননি। ৭২-৭৭ সাল পর্যন্ত পারটি প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল হামলা আর সন্ত্রাসের মুখে। চীনা আক্রমণ, পাকিস্তানের আক্রমণের সময় পারটি বামপন্থীদের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কিন্তু প্রমোদবাবুর মনোবল এতটুকু ভেংগে পড়েনি। তাঁর নারভ ফেল করেনি।

মারা যাবার আগে শেষ ছয় সাত মাস ধরে কেমন যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রায়ই বলতেন, কদিনই বা বাঁচব।

তবে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নেবে ভাবতে পারেননি। প্রমোদবাবু বলতেন, 'আর তো চার পাঁচ বছর আছি। একটা নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলেই কাজ শেষ।' □

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

নবান্নে হবে ...পুজো ছড়াকাটা ...নতুন রান্নাবান্না

...কবিরাজ

আর্য সমাজে কৃষিব্যবস্থার বহুল প্রচলনে অন্নকে দেবীরূপে কল্পনা করেই অন্নলাভের উদ্দেশে নবান্ন উৎসব সংঘটিত হতে শুরু করে। শস্যের প্রতীক হল 'সতী'। অসট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় সতীর মানে হল এক মুঠো শস্য। এই সতী দেবী হচ্ছেন কৃষিদেবী ভূমিলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণা।

অথর্ব বেদে ১৯ ৭ ৪ ৫ শ্লোকে আছে গৃহের স্বামী যজমানরূপে গার্হপতি অগ্নি প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় আমাদের সুখ দিক। হে অগ্নি আমাদের দ্বারা দীপ্ত হয়ে প্রভূত ধনের দাতা হও। তোমার পরিচর্যার দ্বারা আমরা শত হিম ঋতু জীবন লাভ করব। স্থালী পৃষ্ঠভাগে দগ্ধান্ন বহিত হব। অন্নের ভোক্তা অন্নপতি রুদ্র রূপে অগ্নিকে নমস্কার। হে অগ্নি আমাদের পুত্র, মিত্র, পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে রক্ষা কর। যারা সমাজের সভ্য তারা আমাদের পুত্রাদির রক্ষা করুক। এখানে এই বহু ধন লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নবান্নের আভাস পাওয়া যায়। রন্ধনের পর দ্রব্যের ভোগ প্রথমে পশু পক্ষীদের ভোজনের জন্য কোন উচ্চ স্থানে বা ফাঁকা জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। দেবতাদের, প্রধানত স্ত্রী দেবতাদের উদ্দেশ্যেই ভোগ দেওয়া হয়। আর পুত্রমিত্র বা আত্মীয়স্বজন সহ এই উৎসব ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে হিন্দুদের প্রত্যেকটি গ্রামে প্রতিপালিত হয়। স্কন্দ পুরাণে পাওয়া যায় কাশীতে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠার কথা। এই অন্নদা বা অন্নপূর্ণা দুর্গা বা চণ্ডীর আর এক রূপ। তিনি লক্ষ্মী বা কৃষি সম্পদের দেবী। হৈমন্ত্রী ধান্য উৎপাদনের পর দেবীকে আগে প্রদান করে খেতে হয়। এই উৎসব লোকায়ত নবান্ন এবং ধর্মভিত্তিক।

প্রাচীনকালে যখন থেকে কৃষির উদ্ভব হয়, তখন থেকেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কৃষিকে কেন্দ্র করেই সমাজের স্থিতি এসেছে। পরবর্তীকালে এই নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। তখন কিন্তু ধানকাটার সময় 'মুঠ' আনা ও 'দাওন' আনার প্রচলন ছিল। এখনও কিন্তু পশ্চিমবাংলার বহু কৃষিভিত্তিক গ্রামে এই প্রচলন চলে আসছে।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে প্রথমে মাঠ থেকে এক মুঠো শস্য বা এক আঁটি ধান কেটে সাধারণ কাপড়ে বা নামাবলি কাপড়ে জড়িয়ে এনে আল্পনা দেওয়া ঘরের কোন শুদ্ধ স্থানে বা কৃষি দেবী লক্ষ্মীর আসনে রেখে এক মাস ধরে কোথাও বা পৌষ সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত প্রতিদিন পুজো করা হয়। তারপর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্ধে একটি শুভদিনে গ্রামবাসীরা গ্রামের চণ্ডী মণ্ডপে বা অন্নপূর্ণা মন্দিরে বা মনসা মন্দিরে এসে নতুন আতপ-চালের ভোগ ও পুজো দিয়ে নবান্ন উৎসব পালন করে থাকেন।

বহু পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বর্ষ শুরু হত। কৃষিকে কেন্দ্র করেই তখন নববর্ষ। কৃষিই আমাদের প্রধান জীবিকা। তাই লৌকিক সমাজে অগ্রহায়ণ মাসে এই নবান্ন উৎসব পালিত হয়। নতুন বোরো আমন বা হৈমন্তী ধান ওঠার পর অন্নপূর্ণা বা চণ্ডী বা গ্রাম্য স্ত্রী দেবীকে আগে উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামের লোক (কৃষি ভিত্তিক সমাজে) একটি পুণ্য দিনে এই নতুন ধানের চাল খাওয়ার জন্য নবান্ন উৎসব করে। তবে অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্ধে নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। প্রধানত এই উৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও গ্রাম বাংলার বহু গ্রামে গঞ্জে মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলরাও নবান্ন উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদা বা অন্নপূর্ণা পুজোর প্রচলন করেন। তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এর বর্ণনা আছে। আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে এই পুজোর প্রচলন হয়। সেখানে ঈশ্বরী বরলাভের কথা আছে অন্নদার কাছে – 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'

পুরীতে অগ্রহায়ণ মাসে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মনে হয় বাংলার নবান্ন উৎসবের থেকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের এই উৎসব প্রাচীনতর।

সেকালে বীরভূমের নবান্ন উৎসবে ভোজনের পরিতৃপ্তির প্রকাশ গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের ছড়ায় পাওয়া যায়। যেমন রামপুরহাট অঞ্চলে চাল গুলুনীর ছড়ায় বলা হত
– পেস্তা, বাদাম, কদমা কিনি –
খেড়ে লেগে লবানের চাল গুলুনী।

সিউড়ি অঞ্চলে 'লবান' আতপ-চাল সিদ্ধ করে কলা, দুধ, আখের কুচি, নারকেল কুচি দিয়ে নবান্ন হয়। তাদের ছড়ায় বলা হত -

'লবানের চাল সিদ্ধ,
খেড়ে খেড়ে হলাম হদ্দ।
'লবানে'র ভাজার উপর ছড়া
লবানের ভাজা ভুজা
আ মরি কি খেতে মজা।
কলার পাতে নোস্তা ভাজা,
আখ ভাজা, মিষ্টি ভাজা।

মেয়েরা যারা রান্না করতেন তারাও নানা তরকারী সম্বন্ধে লবানে ছড়া বলতেন –

লবানে কত করি,
হেংচা, কেচাং তরকারি।

এই নবান্ন উৎসব যৌথ সামাজিক উৎসব। এর মধ্যে প্রীতিমধুর গ্রাম্য সম্পর্ক ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আপন কৃষিজ দ্রব্য, পুকুরের মাছ, বাগানের কলা, খেতের নানা ফসল পরস্পর পরস্পরকে আদান প্রদান করে। সুখ সচ্ছল এই উৎসব করার রীতি গ্রামীণ মানুষের মধ্যে দেখা যেত। দুবরাজপুরে মোদক জাতিরা অগ্রহায়ণ মাসের একটি শুভদিনে গণেশ জননী মা অন্নপূর্ণার পুজো করে নবান্ন উৎসব পালন করে থাকেন। এই রকমভাবে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন জাতির মধ্যেও নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। নিজের নিজের সুযোগ সুবিধা মতই এটা হয়। □

তান্ডব-নৃত্য নিয়ে পুলিশ ও আনন্দমার্গীদের বড় লড়াই কি আসন্ন ?

পিনাকী মজুমদার

সুপরিম কোরটের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দমার্গীরা এবং পুলিশ দুজনেই ভেতরে ভেতরে লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ধর্মীয় অধিকারের নামে রাষ্ট্র বনাম ধর্মসংঘের এই লড়াই সেক্যুলার ভারতবর্ষে এক অভিনব ঘটনা। পরিবর্তনের প্রতিবেদন এই ঘটনারই পশ্চাদপট।

অনিবার্যভাবেই গত ২৯ অকটোবর বিকেলে লালবাজার পুলিশ ফোরসের অধিকাংশই এসে জড়ো হয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পারকের সামনে। দুপা অন্তর পুলিশের ওয়ারলেস ভ্যান, জিপ। উচ্চপদস্থ অফিসারদের চিন্তান্বিত মুখ। রাস্তার দুপাশে ঢালধারী পুলিশের ছড়াছড়ি। সেই সংগে অসংখ্য সাদা পোশাকের পুলিশ। সবারই দৃষ্টি তখন শ্রদ্ধানন্দ পারকের মধ্যেকার একটি মঞ্চের ওপর আবদ্ধ।

কলকাতা পুলিশের এদিনের এই তৎপরতা আবর্তিত হয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পারকে আয়োজিত আনন্দমার্গীদের একটি প্রকাশ্য সভাকে কেন্দ্র করেই। আনন্দমার্গীদের ভাষায় – 'সুপরিম কোরটে তান্ডব-কেসে আনন্দমার্গের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিজয় উৎসব।'

এই 'বিজয় উৎসবে'র অনুষ্ঠান তখন জোর কদমে। আনন্দমার্গের এক নেতৃস্থানীয় অবধূত শ্রদ্ধানন্দ পারকের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন। সে বক্তব্য শুনছেন গেরুয়া বসন পরা হাজার দুয়েক আনন্দমার্গী। সাধারণ পোশাকের কিছু অনুগামীও রয়েছেন ওর মধ্যে। আর এই দু আড়াই হাজার মানুষের জমায়েতকে ঘিরেই কলকাতা পুলিশের এই বিশাল তৎপরতা।

এই সতর্কতা, এত তৎপরতা, তবু ওর ফাঁক দিয়ে মাত্র দেড়শ গজ দূরেই ঘটে গিয়েছিল ঘটনাটা। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শ্রদ্ধানন্দ পারক থেকে মাত্র দেড়শ গজ দূরে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর কয়েকজন আনন্দমার্গীর হাতের মশাল জ্বলে উঠেছিল সন্ধ্যের অন্ধকার নামতে না নামতেই। কৌতূহলী পথচারীদের থমকে দিয়ে শুরু করেছিল তান্ডব-নৃত্য। এক হাতে নর-করোটি, অন্য হাতে মশাল।

মাত্র মিনিট তিনেক। মিনিট তিনেকের এই তান্ডব-নৃত্য শেষ করে ওরা যখন শ্রদ্ধানন্দ পারকের জন-সমাবেশের মধ্যে মিশে গেলেন সেই মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছিল পুলিশবাহিনী। রাস্তায় তখনও কৌতূহলী জনতা। সংবাদপত্রগুলোর ফটোগ্রাফাররা তখন কাজ শেষ করে ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকাচ্ছেন।

সুতরাং সদা-সতর্ক পুলিশবাহিনীকে সেই মুহূর্তে বোকা বনে চলে যেতে হয়েছিল। পরের দিনের সংবাদপত্রগুলোতে সবিস্ময়ে তারা লক্ষ করেছিলেন নর-করোটি এবং

মশাল হাতে আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্য তাণ্ডব-নৃত্যের সচিত্র বিবরণ। সংগে সংগেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল পুলিশের উচ্চপদস্থদের মধ্যে। শুরু হয়েছিল 'সাজ-সাজ' রব। গোয়েন্দা দপ্তর হন্যে হয়ে ওদিন সকাল থেকেই খোঁজা শুরু করলেন 'আগের দিন প্রকাশ্যে তাণ্ডব-নৃত্যকারীদের'। অবশেষে ওইদিন, অর্থাৎ ৩০ অকটোবর বেলা এগারটা নাগাদ গোয়েন্দা শাখার পুলিশ আটজন আনন্দমার্গীকে গ্রেপ্তার করলেন ওদের সদর দপ্তরের আশপাশ অঞ্চল থেকে।

তাণ্ডব-নৃত্য নিয়ে বুল-ফাইটিং

প্রকাশ্যে নর করোটি, ছুরি, আগুন প্রভৃতি নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যকে কেন্দ্র করে বর্তমানে আনন্দমার্গী এবং পুলিশের মধ্যে শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত জটিল অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় এ নিয়ে শুরু হয়েছিল ধর-পাকড়। পরবর্তীকালে মার্গী এবং পুলিশে লুকোচুরি খেলা। অবশেষে আইন আদালত।

এই জটিল অবস্থার শুরু ১৯৭৯ সাল নাগাদ। এই বছরের প্রথম দিকে আনন্দমার্গীদের একটা ধর্ম মহাচক্র অনুষ্ঠিত হয় পারক সার্কাস ময়দানে। এই অনুষ্ঠানের পর একদল আনন্দমার্গী প্রকাশ্য রাস্তায় নর-করোটি, ছুরি, আগুন প্রভৃতি নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করেন। এ সংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। আর তার পরই শুরু হয়ে যায় পুলিশবাহিনীর মধ্যে বিশেষ সতর্কতা এবং তৎপরতা। আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্যে নর করোটি, ছুরি, আগুন নিয়ে তাণ্ডব-নৃত্যকে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে পুলিশবাহিনী।

আনন্দমার্গীদের এই প্রকাশ্য তাণ্ডব-নৃত্য বন্ধ করার ব্যাপারে পুলিশবাহিনীর অনমনীয় মনোভাবের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ওই বছরের আগসট মাসে। কলকাতা পুলিশের তৎকালীন কমিশনার সুধাংশু সিনহা প্রকাশ্যে আনন্দমার্গীদের তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির আইনে ১৪৪ ধারা বলবৎ সম্পর্কে বলা হয়েছে – 'জরুরী কোন প্রয়োজনে এই ধারা একটানা ২ মাস বলবৎ রাখা যায়। সরকার প্রয়োজন বোধ করলে এই ধারাটিকে ৬ মাস পর্যন্ত রাখতে পারেন'।

সুতরাং ১৯৭৯ সালের আগসট মাসে কলকাতা পুলিশ দু মাসের জন্যেই এই ধারা বলবৎ করেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ের জন্যে আনন্দমার্গীদের এই কার্যবিধি প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল। আশা করেছিলেন দু মাস পর ১৪৪ ধারা উঠে গেলে তারা আবার তাদের 'ষোড়শ বিধি'র অন্যতম 'তাণ্ডব-নৃত্যকে' প্রকাশ্যে তুলে ধরতে পারবেন।

কিন্তু আশা এবং বাস্তবের মধ্যে থাকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। কলকাতা পুলিশ দু মাস পর ১৪৪ ধারাকে রিনিউ করলেন পরবর্তী দু মাসের জন্যে। সে দু মাসের পর আবার রিনিউ। রিনিউয়ের পর রিনিউ। এক টানা গত চার বছর ধরে চলেছে এই রিনিউ পর্ব। শেষবারের মত রিনিউ হয়েছে এ বছরে সেপটেমবরের শেষে যার মেয়াদ শেষ হবে এই নভেমবরের শেষে।

আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্যে তাণ্ডব-নৃত্য পর্ব স্বভাবতই তাই এই সময়ের মধ্যে ফলপ্রসূ হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, আনন্দমার্গীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে - 'এই সময়ের মধ্যে তাদের সাধারণ সভা-সমিতির ব্যাপারেও পুলিশ যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছে।' অভিযোগ আছে আরও – 'আনন্দমার্গীদের পেছনে গোয়েন্দা দপ্তর সব সময় ছায়ার মত অনুসরণ করছে। অকারণে বিব্রতও করছে কাউকে কাউক।'

পুলিশবাহিনীর এ ধরনের আচরণের ফলে ১৯৮০ সাল নাগাদ আনন্দমার্গীরা আদালতের বিচারপ্রার্থী হন। কলকাতা হাইকোরট সে বিচারের রায়ও দেন। আনন্দমার্গীদের তরফ থেকে জানান হয়েছে – হাইকোরটের এই রায় তাদের মনঃপূত হয়নি। অপরদিকে পুলিশের তরফ থেকে জানান হয়েছে – 'হাইকোরটে আনন্দমার্গীদের পরাজয় ঘটেছিল।' যাই হোক, এর পর ১৯৮২ সাল নাগাদ আনন্দমার্গীরা সুপরিম কোরটে বিচারপ্রার্থী হন। এরপর একটানা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে এই বিচার পর্ব। আনন্দমার্গীদের পক্ষে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট তারকুনডে – বোমবাই হাইকোরটের রিটায়ারড জজ। অপরদিকে পুলিশের তরফে সওয়াল করেছিলেন প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট ভেনু গোপাল। সহযোগিতায় ছিলেন পশ্চিমবংগ সরকারের কৌসুলি – নরনারায়ণ গুপ্ত, কলকাতা পুলিশের ডি সি স্বরূপ মুখারজি এবং আইন বিষয়ক উপদেষ্টা তথা ও সি, সি আর এস ধ্রুব গুপ্ত।

অবশেষে গত অকটোবর মাসের শেষের দিকে তিন বিচারপতি পি এন ভগত, এ এন সেন এবং পি মিশ্র রায় দেন। এই তিন বিচারপতি রায় দিতে গিয়ে চারটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। এই চারটি বিষয় হচ্ছে – ১। আনন্দমার্গীদের ছোরা, ত্রিশূল ও নর-করোটি সহ তাণ্ডব-নৃত্য তাদের আবশিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান কি না? ২। আনন্দমার্গীরা উপরোক্ত জিনিসগুলো ছাড়া প্রকাশ্য তাণ্ডব-নৃত্য করতে পারবে কি না? ৩। কলকাতার পুলিশ কমিশনার গত চার বছর ধরে ক্রমান্বয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে আনন্দমার্গীদের তাণ্ডব-নৃত্যাদি সহ সমস্ত রকম পথসভা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন, তা আইনানুগ কি না? ৪। আনন্দমার্গ ধর্মীয় সংস্থা কি না?

এক নমবর বিষয় সম্পর্কে বিচারপতিরা রায় দিয়েছেন যে, আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলতে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে বোঝায়। আনন্দমার্গীদের এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে মাত্র তের বছর ধরে। সুতরাং এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় এটা আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান কি না।

দুই নমবর বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য উল্লিখিত তিনটি জিনিস ছাড়া আনন্দমার্গের প্রকাশ্য তাণ্ডব নৃত্যে কোন বাধা নেই।

তিন নমবর বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - কলকাতা পুলিশ দীর্ঘ চার বছর ধরে ১৪৪ ধারা জারী করে যে সমস্ত বিষয় বন্ধ করে রেখেছেন তা বরাবর করা যায় না।

চার নমবর বিষয় সম্পর্কে বিচারপতিরা বলেছেন - আনন্দমার্গ কোন ধর্ম নয়। এরা শিবের উপাসনা করেন। এটা একটা ধর্মীয় সংস্থা হতে পারে।

সুপরিম কোরটের এই রায়কে কেন্দ্র করে আনন্দমার্গীদের মধ্যে আনন্দের উল্লাস বয়ে যায়। গত ২৩ অকটোবর কলকাতার প্রেস ক্লাবে তড়িঘড়ি একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় আনন্দমার্গের তরফ থেকে। আনন্দমার্গের পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি ত্রাম্বকেশ্বরানন্দ অবধূত সুপরিম কোরটের এই রায়কে তাদের জয় বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, নর-করোটি, ছুরি, ত্রিশূল প্রভৃতি ছাড়া তাণ্ডব-নৃত্য করার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। সুতরাং ছোরা, ত্রিশূল ও নর-করোটিসহ প্রকাশ্য তাণ্ডব-নৃত্য আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত না হলেও তাণ্ডব নৃত্য যে আনন্দমার্গীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান তা স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি পেল বলে দাবি করেছেন আনন্দমার্গ কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের মতে – এই রায় আনন্দমার্গকে একটি ধর্মীয় সংস্থা হিসাবে আইনসিদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছে।

এদিকে এই রায় সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের বক্তব্য অন্য রকম। তাদের মতে আনন্দমার্গের মোটেই জয় হয়নি। তবে পুলিশেরও জয় হয়নি পুরোপুরি। কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন – 'সুপরিম কোরটের রায় বলেছে আনন্দমার্গ একটি ধর্মীয় সংস্থা হতে পারে যারা শিবের উপাসনা করেন। সুতরাং পাবলিক প্লেসে নর-করোটি, ছুরি, ত্রিশূল প্রভৃতি নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করা সাংবিধানিক অধিকার নয়। তবে ১৪৪ ধারা সম্পর্কে বলা হয়েছে এই ধারা বারবার প্রয়োগ করা যায় না। আনন্দমার্গীরা এর অর্থ করেছেন যে তাদের জয় হয়েছে।'

পুলিশ দপ্তরের এই মুখপাত্রের মতে – সুপরিম কোরটে আনন্দমার্গের মোটেই জয় হয়নি। তবে একথাও তিনি স্বীকার করেন যে, ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে আর আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্যে তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ রাখা যাবে না। পালটা ব্যবস্থা হিসেবে ২৮৩ ধারা প্রয়োগ করা যায়। এই ধারায় তাণ্ডব নৃত্য বা অন্য কিছুর দ্বারা পথ অবরোধ বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু পুলিশ দপ্তর চাইছেন এমন কোন আইন খুঁজে বার করতে যার দ্বারা এ সব জিনিস একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া যায় বলে জানিয়েছেন পুলিশেরই এক উচ্চপদস্থ মুখপাত্র।

সুতরাং সুপরিম কোরটের সাম্প্রতিক এই রায়কে কেন্দ্র করে উল্লসিত আনন্দমার্গ প্রচারক সংস্থা। অন্যদিকে পুলিশ দপ্তর ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করতে না পাবার ব্যাপারে সামান্য হতাশ হলেও দাবি করছেন আনন্দমার্গের মোটেই জয় হয়নি।

পুলিশের ধারণা যাই হোক না কেন আনন্দমার্গ এটাকে তাদের জয় বলেই ধরে নিয়েছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। তার পর পরই গত ২৯ অকটোবর শ্রদ্ধানন্দ পারকে বিজয় উৎসবও পালন করেছেন। এই বিজয় উৎসব উপলক্ষেই আনন্দমার্গ পুলিশের কাছে পারমিশন চেয়েছিলেন ওইদিন প্রকাশ্যে তাণ্ডব নৃত্য করার জন্যে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে - আনন্দমার্গের এই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল 'মিছিল সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা যাবে না' - এই কারণে।

আননদমার্গের এই আবেদন খারিজ হলে বিজয় উৎসবে বাদ সাধতে পারেননি পুলিশ দপ্তর। সুতরাং বিজয় উৎসব পালিত হয়েছিল মহা সাড়ম্বরে। কিন্তু ওরই ফাঁকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রকাশ্যে মিনিট তিনেকের তাণ্ডব নৃত্যও তারা করে নিয়েছিলেন।

তাণ্ডব নৃত্য কেন ? এবং নয় কেন ?

আনন্দমার্গীদের এই তাণ্ডব নৃত্যকে কেন্দ্র করে পুলিশ এবং আনন্দমার্গীদের এই 'বুল ফাইটিং' স্বাভাবিকভাবেই এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই তাই পুলিশ দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্য তাণ্ডব নৃত্যে পুলিশের আপত্তির কারণটা কোথায় ? পুলিশ দপ্তরের এক মুখপাত্র জবাব দিয়ে ছিলেন – 'নরকরোটি, ছুরি নিয়ে প্রকাশ্যে ওরকম তাণ্ডব-নৃত্য করলে জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পথ অবরোধের ব্যাপার তো আছেই। সে কারণেই আপত্তি।'

মুখপাত্রটির এই যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলাম 'সব ধর্মের মধ্যেই তো এ ধরনের মিছিল করার রেওয়াজ রয়েছে। কোন কোন ধর্মে কৃপাণ নিয়ে মিছিল করা হয়। কোন ধর্মে লাঠি, ছোরা নিয়ে রাস্তায় নকল যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। আবার কোন ধর্মে মানুষের পিঠের চামড়ায় বঁড়শি বিঁধিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে ঘোরান হয় এগুলোও কম আতংক সৃষ্টিকারী রীতি নয়। তবে' ?

মুখপাত্রটির জবাব - 'আপনি যে ধর্মগুলোর কথা বলছেন ওগুলো প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র এক একটা ধর্ম। এবং এই ধর্মগুলির আবশ্যিক কর্মপদ্ধতিগুলি বহুদিন ধরেই চলে আসছে। সুতরাং ওগুলো ধর্মীয় কর্ম হিসেবেই পরিগণিত। কিন্তু সুপরিম কোরটের রায়ই বলছে - আনন্দমার্গ কোন ধর্ম নয়, ধর্মীয় সংস্থা মাত্র। তাণ্ডব নৃত্যও আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। সুতরাং অন্যান্য ধর্মের আবশ্যিক অনুষ্ঠানের সংগে আনন্দমার্গীদের তাণ্ডব নৃত্যকে এক করে দেখা চলে না'।

আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্যে নর করোটি, ছুরি, ত্রিশূল নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে না দেবার পক্ষে পুলিশের যুক্তি এ রকমই। এ ব্যাপারে তারা এতই অনমনীয় যে, খুব শিগগিরই তারা পালটা একটি আইনের মাধ্যমে তাণ্ডব-নৃত্য বন্ধ করতে চাইছেন। মুখপাত্রটি জানিয়েছেন নভেমবরের শেষেই জানতে পারবেন সে আইনটি কী এবং ব্যবস্থাটাই বা কী।

পুলিশের এ সব যুক্তির কোনটাই কিন্তু আনন্দমার্গ কর্তৃপক্ষ মানছেন না। তারাও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে আছেন। চাইছেন আইনের দ্বারাই তাণ্ডব নৃত্যকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে।

তাণ্ডব নৃত্য কী এবং কেন ?

১৯৫৫ সালের ৯ জানুয়ারি বিহারের জামালপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম আনন্দমার্গ আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা প্রভাত রঞ্জন সরকার ওরফে পি আর সরকার।

আনন্দমার্গের শিষ্য এবং অনুগামীর প্রকৃত সংখ্যা না জানা গেলেও ওদের ব্যাপক প্রসার আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। ওদের প্রসারের ব্যাপকতা বর্তমানে এমন আকার ধারণ করছে যে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ রীতিমত চিন্তিতও বটে।

কিন্তু আনন্দমার্গের এত প্রসার কেন ঘটছে ? কিসের মোহেই বা এত মানুষ জড়ো হচ্ছেন আনন্দমার্গে ?

পুলিশ অন্য কথা বললেও আনন্দমার্গীরা বলেন এর কারণ আমাদের দর্শন এবং আধ্যাত্মিক মতবাদ। গুরুদেবের এই দুই অমূল্য সম্পদের ওপর নির্ভর করেই লাখে লাখে লোক গুরুদেবের শিষ্য হচ্ছেন। গুরুদেবের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানবাত্মার চরম বিকাশ। শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে একটা মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে আনন্দমূর্তিজীর একমাত্র লক্ষ্য।

আনন্দমার্গীদের মতে শিষ্য এবং অনুগামীদের আত্মিক বিকাশের জন্য আনন্দমূর্তিজী 'আচরণ বিধি' দান করেন। ষোল দফা এই আচরণ বিধিকে আনন্দমার্গীরা বলে থাকেন 'ষোড়শ বিধি'।

আনন্দমার্গীরা দাবি করেন, এই বিধি পালন করলে একজন মানুষ মানসিক এবং শারীরিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় ওঠে। তাদের এই দাবির সমর্থনে তারা সেই আচরণ বিধিকে তুলে ধরেছেন। তাদের এই ষোড়শ বিধিটা এরকম। ১। প্রস্রাবান্তে জলশৌচ পদ্ধতি। ২। লিংগত্বক পরিষ্কার রাখার পদ্ধতি। ৩। সন্ধিস্থলের চুল না কাটা। ৪। কৌপিন বা ল্যাঙোটের ব্যবহার। ৫। ব্যাপক শৌচ অর্থাৎ খাওয়া, সাধনা এবং শোয়ার আগে হাত, পা, চোখ, মুখ ধোবার পদ্ধতি। ৬। স্নানের পদ্ধতি। ৭। আহার সম্পর্কে নিয়ম (নিরামিষ আহার)। ৮। উপবাস সন্ন্যাসীদের জন্য মাসে চার দিন নিরম্বু উপবাস, গৃহীদের জন্যে মাসে দুই দিন নিরম্বু উপবাস। ৯। সাধনা -- সন্ন্যাসীদের জন্যে দিনে চার বার, গৃহীদের জন্যে দিনে দু বার। ১০। ইষ্ট ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। ১১। অনমনীয় আদর্শ রক্ষা। ১২। বিশদ আচরণ বিধি। ১৩। গুরুদেবের চরম নির্দেশ মান্য করা। ১৪। ধর্মচক্র পালন করা। ১৫। শপথ (সাধনাগত)। ১৬। কীর্তন ও সেমিনার।

ষোড়শ বিধির শেষ দফায় রয়েছে কীর্তন। যে কীর্তনের একটি অংগ হচ্ছে তাণ্ডব-নৃত্য। আনন্দমূর্তিজীর বিশ্লেষণ এই রকম 'প্রায় সাত হাজার বছর আগে ভগবান সদাশিব এই তাণ্ডব নৃত্যের উদ্ভাবন এবং প্রচলন শুরু করেছিলেন এবং গত সাত হাজার বছর ধরেই শিবের অনুগামীরা এবং সাধারণ মানুষরাও এই তাণ্ডব-নৃত্যের অনুশীলন করে আসছেন। অধ্যাত্ম সাধকের মধ্যে যারা তন্ত্রাচারী সাধনার অনুশীলনকারী তারা অবশ্যই এই তাণ্ডব নৃত্যের অভ্যাস করতেন। কারণ, আধ্যাত্মিক ও মানসিক শৃঙ্খলা ছাড়াও এর অন্যতম ভাল গুণ হল, তাণ্ডব-নৃত্য মানুষের ভয় দূর করে সাহস এনে দেয়, যেটা যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।'

এই নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নৃত্যের অন্তর্হিত ভাবটাই হল নেচে এগিয়ে চলা। Pessimism-কে প্রশ্রয় দিও না, হতাশা বা নৈরাশ্যকে মনে স্থান দিও না। - নৃত্য জীবনের আনন্দের প্রতীক, হর্ষ, উচ্ছ্বাস, গতি, তেজ ও আশাবাদের অংগভাষা হল নৃত্য।'

তাণ্ডব-নৃত্যের উপকারিতা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা রয়েছে :

১। তাণ্ডব নৃত্যের দ্বারা শরীরের সমস্ত Lymphatic gland সতেজ হয়ে ওঠে। তাতে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীরের ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে এবং শরীরের সারধাতু (শুক্র) দেহে অধিকভাবে মিশ্রিত হবার সুযোগ পায়।

২। এই নৃত্য মানুষের পৌরুষকে জাগিয়ে তোলে, মানসিক ক্লীবত্ব ও কাপুরুষতা বিদূরিত করে।

৩। শরীরে ও স্নায়ুপুঞ্জে রক্ত চলাচল ধারাকে সতেজ রাখে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৪। এই নৃত্যের ফলে শরীরের অংগ প্রত্যংগ চালনায় এক অস্বাভাবিক দ্যুতি আসে।

৫। স্নায়বিক দৃঢ়তা আনে এবং দীর্ঘ যৌবনলাভেও সাহায্য করে।

৬। লঘু মস্তিষ্ক ও গুরু মস্তিষ্কের ওপরও এর প্রতিক্রিয়া হয় ফলে মস্তিষ্ক চালনশক্তি বেড়ে যায়।

৭। হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। পেটের ব্যাধি দূর করে।

তাণ্ডব নৃত্যের এই নানা রকমের উপকারিতার প্রয়োজনেই আনন্দমার্গীরা চান এর ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার। আর সে কারণেই তারা এটাকে প্রকাশ্যে করতে চান। কোন আতংক সৃষ্টির জন্যে নয়, মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনেই। এ দাবি করছেন আনন্দমার্গেরই কর্তৃপক্ষ। আর সে কারণেই তারাও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে আইনের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন 'হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম ঐতিহ্য তাণ্ডব-নৃত্যকে'। এদিকে পুলিশ দপ্তরের প্রতিজ্ঞা, নতুন আইন দিয়ে এটাকে রুখবই। এখন শুধু দেখার পালা - তাণ্ডব নৃত্য চলবে, কি চলবে না। □

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে — ৫

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

লাবনাকা থেকে দেড়ঘণ্টার মধ্যেই গ্রীসের রাজধানী আথেনসে এসে পৌঁছলাম। এয়ারপোরটে ইন্দিরাকে রিসিভ করতে এসেছিলেন প্রধান মন্ত্রী । যথারীতি গারড অব অনার হল। কিন্তু প্লেন থেকে নামার সংগে সংগেই আমাদের বলে দেওয়া হল, আপনারা ঝটপট আপনাদের প্রেস বাসে উঠে পড়ুন। এই ভ্রমণে একটা সুবিধে কোনখানে নেমে মালপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হত না। ভারতের সীমানা পেরুনর পর কাসটমস ক্লিয়ারেন সেরও আর দরকার হত না। আমরা হ্যানডব্যাগ নিয়ে নামতাম। ভারী মালপত্রগুলির গায়ে প্রত্যেকের নামের লেবেল মারা ছিল, সেটি দেখে ওগুলি যার যার হোটেলের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হত। এর ফলে মালপত্র যে মাঝে মাঝে ওলটপালট হয়ে যেত না তা নয়। নিউ ইয়রকে গিয়ে দেখি আমার ঘরে দেবাংশু ব্যানারজির লাগেজটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। চ্যাটারজি ব্যানারজি অবাঙালিদের কাছে সমার্থবাচক শব্দ। ভারতীয় দূতাবাসের এক অফিসারের এই ভুলের জন্য বেচারা দেবাংশু মুখ কাঁচুমাচু করে ঘণ্টা খানেক ঘুরে বেড়িয়েছিল। আমিও ঘরে ছিলাম না। যখন আবিষ্কার করলাম তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবাংশু সব ঘরে টোকা দিতে দিতে আমার ঘরে এসে হাজির।

আথেনসে আর আলাদা আলাদা গাড়ি নয়। একটি মিনিবাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সব সাংবাদিকের জন্য। আমরা সকলে উঠতেই গাড়ি স্টারট দিল।

১৯৬০ সালে আমি সাংবাদিকতা পড়াশোনার জন্য প্রায় বছর খানেক ইংলনড ছিলাম। বাড়ি ফেরার সময় ইওরোপের প্রায় সব দেশেই থামতে থামতে আসছিলাম। সে সময় আথেনসে কাটিয়ে গিয়েছিলাম দিন তিনেক। কারডিফে থাকতে একটি গ্রীক ছাত্রীর সংগে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির নাম পেনিলোপি· ডাক নাম ছিল পপি। তারই বিশেষ আমন্ত্রণে আরও আথেনসে আসা। মনে আছে পপি আমাকে রিসিভ করতে বি ও এ সি সিটি টারমিনাসে এসেছিল। যাবার দিন বিদায় জানাতে এসেছিল আর এক বান্ধবীকে নিয়ে। তার নাম ছিল মারিযা। আমরা একদিন এক সংগে অ্যাকরোপলিস দেখেছিলাম। একটি সিনেমাও দেখেছিলাম। ট্যুরিজমের বাসে করে ডেলফি ঘুরে এসেছিলাম একদিন। তখন আমার তেইশ

অলিম্পিয়াসের মন্দির, পেছনে লাইকাবেটাস পাহাড়

চব্বিশ বছর বয়স। চোখে মুখে রঙিন স্বপ্ন। রোমানটিকতা ভরা চোখে শুধু মুগ্ধ বিস্ময়। এয়ারপোরট থেকে শহরে ঢোকার পথে তেইশ বছর আগেকার এক সুখস্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। কিন্তু তেইশ বছরে কী দারুণভাবে পালটে গেছে শহরটি। বেশ মনে পড়ে সেবার লনডন, প্যারিস, বুদাপেসত, ভিয়েনা ঘুরে আথেনসকে মনে হচ্ছিল একটা গ্রাম। স্কাইস্ক্রেপার ছিল না বললেই চলে। এত বাড়িঘর জন বসতিও বা কোথায় ? কিন্তু এবার মনে হল শহরটা এই দু যুগ ধরে কী ভীষণভাবে নিজেকে বাড়িয়েছে। তবে শুধু কলেবরবৃদ্ধিই ঘটেনি, শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। সমুদ্রের পাশ দিয়ে মেরিন ড্রাইভ চলে গেছে। বুলেভারদ বরাবর গ্রীন বেলট। এক পাশে বড় বড় কনডোমোনিয়াম। আর অসংখ্য গাড়ির সার চলেছে। ওই তো সেই কনসটিটিউশন স্কোয়ার। যেটিকে বলা যায় আথেনসের চৌরংগী। কলকাতা চৌরংগীর মতই সামনে বিরাট চতুষ্কোণ পারক। তবে ওটা টামগুমটি বা হকারের রাজত্ব নয়। পারক জুড়ে রেস্তোরাঁ। বসার জায়গা। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা। সতেজ সবুজের বুকে কাঁচা সোনা রোদ এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। মনে আছে এই পারকে পপির সংগে আমার কয়েকটি ছবি তুলে দিয়েছিল মারিয়া বলে মেয়েটি।

শ্রীমতী গান্ধীর কনভয় কোন ফাঁকে কখন বেরিয়ে এসেছে। এয়ারপোরটে বা রাস্তাঘাটে কোন উৎসাহী লোকজন না দেখে বেশ হতাশ হলাম। একমাত্র রাস্তার ল্যামপপোসটে আড়াআড়িভাবে গ্রীস ও ভারতের পতাকা টাঙান না থাকলে বুঝতেই পারতাম না, ইন্দিরা গান্ধী এখন আথেনসে। এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম গ্রীক অফিসারদের কাছে। ওঁরা বলেছিলেন, কড়া সিকিওরিটির জন্য আমরা মাদাম গান্ধীর আগমন-সময় ও রুট পাবলিককে জানাইনি। এ কেমন সিকিওরিটি বুঝলাম না। অ্যাকরোপলিস ও ডেলফিতে তো হাজার হাজার ট্যুরিসটের সংগে মাদাম এক সংগেই ঘুরলেন। কিন্তু সাইপ্রাসের মত গ্রীসে লোক জড়ো করে বিগ শো করার কোন চেষ্টাই করেননি গ্রীক সরকার। লোকে জানতেই পারল না, কখন কোথায় তিনি যাচ্ছেন। অথচ তাঁর সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ নেই একথা তো বলতে পারি না। পাবলিক ফাংশনে তো দেখলাম, বাইরে কত লোক দাঁড়িয়ে, শুধু তাঁকে দেখার জন্য।

আমাদের থাকার জায়গা হল কনসটিটিউশন স্কোয়ারে পারকের সামনেই। এবার শ্রীমতী গান্ধী পাশের একটি পাঁচ তারা হোটেলে, আমরা পাশের এক তিন তারা হোটেলে। মিসেস গান্ধীর হোটেল গ্রানডে ব্রেটানি। আমাদের হোটেলের নাম কিং জরজ হোটেল। তার পাশে হোটেল কিংস প্যালেসে ছিল সিকিওরিটির লোকেরা। এয়ার ইনডিয়ার লোকজনেরা ছিল এন জে ইউ মেরিডিয়ানে।

ইওরোপে যে হোটেল যত পুরনো তার তত বেশি ঐতিহ্য। কিং জরজ হোটেলকে যতই হেলাফেলা করি শুনলাম এটি প্রথম শ্রেণীর হোটেলের মধ্যেই পড়ে। শ্বেতপাথরের মেঝে। পুরনো আমলের লিফট। মনে হয় মেহগিনি কাঠের একটা বিরাট আলমারির মধ্যে নিজেদের পুরে দিলাম। ওপরে ওঠার সময় মচমচ শব্দ হয়। গোটা হোটেলে একটিও অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে নেই। ওদের বয়স দেখেই হোটেলের বয়স অনুমান করা যায়। তা বাদে আমাদের সিংগল সিটেড খুপরি ঘরের দরজা খোলা বেশ মুশকিল। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধে হত। ঘরের মধ্যে একটি ডিভান পাতা। সেটাই শোবার খাট। তবে রাস্তার দিকে পারকের দিকে মুখ করা বারান্দা আছে। কাঁচের দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে অভ্যার্থনা জানাল। দূরে রোদ্দুরে চক চক করছে অ্যাকরোপলিস। আথেনসের যে কোন জায়গা থেকেই পাহাড় চূড়ার শহরের ধ্বংসস্তূপ অ্যাকরোপলিস দেখা যায়। তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে সমুদ্র।

হাতে একটু সময় ছিল। ইনডিয়ান এমব্যাসি থেকে আমাদের দেখাশোনা করছিলেন মিঃ আর এস নাথন। উনিও এসেছেন বেলগ্রেড থেকে সাময়িকভাবে। আথেনসে সবে ভারতীয় দূতাবাস হয়েছে। সাকুল্যে দশজনের মিশন। অ্যামবাসাডর আর সি অরোরা ছাড়া মাত্র দুজন অফিসার। একজন রেজিস্ট্রার আর একজন অ্যাটাচি। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন বলে অ্যামবাসাডর মশাইর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। তা নাহলে সারা বছর দিনের বেলা খবরের কাগজ পড়া আর রাতে বিভিন্ন পারটি অ্যাটেনড করা ছাড়া আর কাজ নেই।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সত্যি শহরটাকে আর চিনবার উপায় নেই। দুপাশে বিরাট বিরাট দোকানে জিনিসপত্র থরে থরে সাজান। ঝকঝকে ডবল ডেকার বাস আর ট্রলি বাস চলছে। মিনিটে মিনিটে বাস। শুনলাম সকাল আটটা পর্যন্ত বাসে চড়তে পয়সা লাগে না। এর কারণটা বেশ মজার। গ্রীসে এখন সমাজতান্ত্রিক সরকার। তাদের কথায় পরে আসছি। সমস্ত বাস সরকারি। সরকার কিছুকাল আগে ভাড়া বাড়ালেন বাসের। এ নিয়ে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। খবরের কাগজগুলো বলতে শুরু করল, বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক সরকার যদি বাসের ভাড়া বাড়ায় তাহলে আর ক্যাপিটালিসট সরকারের সংগে তফাৎটা কোথায় থাকল। আর তাছাড়া এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হবে। এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তারাই বেশি বাসে চাপে। সরকার তখন বললেন : বাপু, ভদ্রলোকের এক কথা। ভাড়া যখন

[illegible] আর কিছু করা যাবে না। তার চেয়ে একটা কাজ করছি। শ্রমিকরা তো সকাল আটটা পর্যন্ত ফারস্ট শিফটের ডিউটিতে যায়। ওই সময়টা বাসের ভাড়া লাগবে না। জনগণও যদি সকাল আটটা পর্যন্ত বাসে চাপেন তাঁদের টিকিট লাগবে না। এইভাবে বাড়তি ভাড়ার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। এতে সবাই এখন খুব খুশি।

গ্রীসের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, এখানে লোকে রাতে প্রায় ঘুমোয় না বললেই চলে। অফিস থেকে সকাল সকাল ফিরে ওরা এক চোট ঘুমিয়ে নেয়। তারপর রাত দশটা নাগাদ উঠে বেড়াতে বেরোয়। আমি রাত একটায় ঘুমোতে যাবার সময় দেখলাম প্যারকের কাফে জমজমাট। রাস্তা দিয়ে জনস্রোত। বাসে যথেষ্ট ভিড়। আবার ভোর চারটেয় ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখলাম তখনও ট্রলি বাস চলছে। আর লোকজন সকালের শিফটে হাজিরা দেবার জন্য বাস ধরতে যাচ্ছে।

রাতের ডিনারের পর দশটা নাগাদ একা একা কনসটিটিউশন স্কোয়ারের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। রাস্তা পেরিয়ে হোটেল আটিকা। নিচে লুফতহানসা ও এয়ার ফ্রানসের নিয়ন সাইন জ্বলছে। পাশেই লেখা নাইট ক্লাব। একটু এগুতে না এগুতেই এক দালাল পিছু নিল। পরিষ্কার ইংরাজিতে বলল: কোন দেশের লোক? ইনডিয়া। একটা কথা বলি, আথেনসে একদণ্ড থাকবেন না। ভীষণ পলিউশন। গ্রীস দেখতে হয়, যে কোন দ্বীপে চলে যান। তবে হ্যাঁ, আজকের রাতটা যদি উপভোগ করতে চান কোন গ্রীক সুন্দরীর সংগে, তবে আসুন আমার সংগে। না-না, পয়সার জন্য ভাববেন না। শুধু আপনি এসে পায়ের ধুলো দেবেন তাতেই আমরা ধন্য। ও কী ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়? এ দিকে, ওই যে রাস্তাটা পেরিয়ে। ও মঁসিয় বলি শুনছেন?

আমাকে নিরুৎসাহ দেখে লোকটি বোধ হয় নিজের কপালকে করাঘাত করে। বউনির সময় খদ্দের চলে গেলে যেমন মনের অবস্থা হয় তেমন আর কি। আর একটু এগুতেই আর একজনের পাল্লায় পড়ি। সে আমাকে সামনের কফি হাউসে নিয়ে যাবেই। সেখানে বিশ্বসুন্দরীরা নাকি অপেক্ষা করছে আমার জন্য। শুধু কষ্ট করে একটু যাওয়া।

এই নাছোড়বান্দা দালালটির হাত কীভাবে এড়াব ভাবছি হঠাৎ দেখি একজন ভারতীয় দুই ভারতীয় সুন্দরীকে দুহাতে জড়িয়ে প্যারকের মধ্যে হাঁটছে। একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মেয়েটিকে কেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আরে এতো আমাদের দুই এয়ারহোসটেস। আর ওই লোকটি একজন ক্রু। প্লেনে আলাপ হয়েছিল। দুঃখ করছিলেন ভদ্রলোক, দেখুন এয়ার ইনডিয়ায় উঠেই সমস্ত ভারতীয় প্যাসেনজাররা আমাদের নিন্দে করে। আমরা নাকি সাদা চামড়া দেখলে গলে যাই। বাদামিদের ইচ্ছে করে হেনস্তা করি। আর সাদাদের তোয়াজ করি। এর ওপর হোমড়া-চোমড়া ভারতীয় অফিসার হলেই তো হয়েছে। তাঁরা ভাবেন প্লেনটা ওঁদের। আমরা ওঁদের চাকর-বাকর। আমাদের হয়েছে যত ঝামেলা। আপনারা ভাবেন বেশ আছি আমরা।

ভদ্রলোক এখন ইংরাজিতে যাকে বলে হ্যাভিং নাইস টাইম। আমি একটু হেসে মেয়েটিকে উইশ করলাম। তারপর থেকে এয়ারহসটেস মেয়েটি আমার নাম জেনে গিয়েছিল। খাবারের প্লেট এনে সামনে দিয়ে বলত, ডঃ চ্যাটারজি, আপনি এবার চা না কফি খাবেন? আপনাকে ফ্রেস গ্রেপস দিই কিছু। অথবা কোন ওয়াইন নেবেন, রেড না হোয়াইট?

গ্রীসের সংগে যে ভারতের বহু পুরনো সম্পর্ক এটা গ্রীকরা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের অনেকের মধ্যেই এখনও গ্রীক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অনেকের চেহারা দেখেও ধরার উপায় নেই, গ্রীক না ভারতীয়। আলেকজানডার ভারত আক্রমণ করে এবং জয় করে তড়িঘড়ি দেশে ফিরছিলেন। পথে মৃত্যু হল বেবিলনে। কিন্তু অনেক গ্রীক সৈন্য থেকে গিয়েছিল ভারতে। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর সেনাপতিরা [illegible] রাজ্য শাসন করেছিলেন। পশ্চিম ভারতে তো গ্রীক উপনিবেশই গড়ে উঠেছিল। গ্রীকরা সেই থেকেই ভারতীয়দের সংগে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাছাড়া গ্রীক স্থাপত্য ও গ্রীক ভাস্কর্যের কদর সারা ভারত জুড়ে। আলেকজানডারকে আমরা কোনদিন পররাজ্যগ্রাসী দুর্বৃত্ত হিসাবে দেখিনি। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর বলে চিহ্নিত। ডি এল রায়ের কল্যাণে তিনি তো প্রায় বাঙালি চরিত্রেই রূপান্তরিত হয়েছেন। যিনি ভাবুক বাঙালির মত প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!'

গ্রীস দেখে আমারও বলতে ইচ্ছা করছিল, সত্যি সেলুকাস তোমার দেশও কী বিচিত্র। পাহাড় আর সমুদ্রেরা কী সুন্দর এর ভূ-প্রকৃতি। কত বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড়-পাহাড়ের কোলে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ উপত্যকা। তিনদিকেই সমুদ্র—এজিয়ান, আয়োনিয়ান ও ক্রেটান সমুদ্র। যে দিকটায় স্থলভাগ সেদিকটায় চারটি দেশের সংগে সীমান্ত। আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক। এশিয়া থেকে ইওরোপে ঢোকার তোরণই হল গ্রীস। গ্রীস থেকে ট্রেন ও বাসে করে পশ্চিম ইওরোপের যে কোন শহরে যাওয়া যায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম দুদিনেই বাসে করে পৌঁছে যাওয়া যায় লনডন। গ্রীসের আয়তন ১,৩১,৯৪৪ বর্গ কিলোমিটার। তামিলনাড়ুর চেয়ে সামান্য একটু বড়। মোট জনসংখ্যা কলকাতার চেয়ে কম। ৯৭ লক্ষ লোকের বাস গ্রীসে। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ লোক বাস করে আথেনস শহরে (২৭ লক্ষ)। আথেনস ছাড়া অন্য শহর জনবিরল বললেই চলে। যেমন থেসালনিকি শহরের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ। পিরাকুসের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ, প্যাটরেইতে বাস করে ১৫ লক্ষ মানুষ। মূল ভূখণ্ডটুকু বাদ দিলে অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত গ্রীস। তবে ৭৫টি দ্বীপে লোক বাস করে। ওইটুকু দেশে ২৯টি পর্বত। সেজন্য গ্রীসে সমভূমি নেই বললেই চলে।

[illegible] থাকার জন্য গ্রীসে শীতকালে টোরিস্ট [illegible] চালু করা যায়নি। এখন [illegible] উপগ্রহ এসে যাওয়ায় [illegible] অসুবিধে নেই।

গ্রীসের সভ্যতা খৃঃ পূর্ব ২৫০০ থেকে ৩ হাজার বছরের পুরনো। তার আগে প্রস্তর ও ব্রোনজ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রস্তর যুগ শেষ হয় খৃষ্ট জন্মের মাত্র সাত হাজার বছর আগে। এনা জানতে পিথের গান গাইছি কিনা জানিনা। কিন্তু গ্রীসের কথা উঠলেই আমার কলেজে পড়া গ্রীক ইতিহাসের কথা মনে পড়ে।

গ্রীসের মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে ক্রিট দ্বীপে প্রথম গ্রীক সভ্যতার সূত্রপাত। শুধু গ্রীক সভ্যতা বলছি কেন, ইওরোপে সভ্যতার জন্ম ওই ক্রিট দ্বীপে। খৃষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে এই দ্বীপের অধিবাসীরা প্রস্তর যুগ থেকে ব্রোনজ যুগে প্রবেশ করে। ক্রিটের বিখ্যাত রাজা মিনোস। তাঁর নামে ক্রিটের অধিবাসীদের বলা হত মিনোয়ান। ২৫০০ থেকে ১৪০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মিনোয়ান সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। Phaestus ও Knosses নামে ক্রিটের উত্তর ও দক্ষিণে দুটি সমৃদ্ধ শহর তৈরি হয় সে সময়। মাটি খুঁড়ে বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক আরথার ইভানস বার করেছেন ৩৫০০ বছর আগেকার অপরূপ স্থাপত্য, অনুপম চিত্রকলা ও সুদৃশ্য চারুকলা।

এই অপরূপ মিনোয়ান সভ্যতা খৃস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে শেষ হয়ে যায়। রাজপ্রাসাদ পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। প্রাচীন সভ্যতা কীভাবে ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে তা এক রহস্য। যেমন সিন্ধু বিধৌত সভ্যতার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এল কেন, এ রহস্যের আজও কিনারা হয়নি। কেউ বলেন, আর্যদের আক্রমণ, কেউ বলেন ভূমিকম্প। ক্রিটান বা মিনোয়ান সভ্যতার অবসানের ব্যাপারেও নানা কথা বলা হয়। কেউ বলেন, মূল ভূখণ্ড থেকে মিসোনিয়ান গ্রীকরা এসে ক্রিটানদের আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস করে দিয়ে চলে যায়। কেউ বলেন, না, ক্রিটান ও মিসোনিয়ানরা তো পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে এসেছে। তাহলে এই বিপর্যয় কেন? সেটাই এখনও ইতিহাসের বড় রহস্য। এখন আমরা যে, ঐক্যবদ্ধ একটি গ্রীক জাতিকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু একদা এক ছিল না। বলকান অঞ্চলের নানা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল তারা। আরকেডিয়ান, এচিয়ান, আয়োনিয়ান, বোয়েটিয়ান, ডোরিয়ান, ইলিরিয়ান, থ্রেসিয়ান—খৃস্ট জন্মের

চার হাজার বছর আগে এই ইন্দো-ইউরোপীয় উপজাতিরা গ্রীসে এসে বসবাস করতে থাকে। গ্রীসের আদিবাসীরা ছিল কৃষ্ণকায়। আজও দুএকটি দ্বীপে গেলে বাদামি রঙের গ্রীক আদিবাসীর সন্ধান মেলে। কিন্তু এখন তো এক ভাষা, এক জাতি এক পরিধান। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখতে পাওয়া যায় একাধিক জাতি উপজাতি মিলে এক জাতি গঠন করেছে। বৃটিশদের কথাই ধরা যাক। গল, ডেন স্যাকসন, রোমান সব মিলিয়েই না আজকের বৃটিশ। একমাত্র ভারতবর্ষে এই মিশ্রণ যেন সম্পূর্ণ হয়নি। শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে লীন হয়েছে, কিন্তু কোন দেহে - ভারতীয় জাতি, ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সংস্কৃতি বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। হাজার হাজার বছর ধরে এক সংগে থেকেও ভারতবর্ষ জাতি গঠন করতে পারল না। বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ঐক্য ছিল সেটা ধর্ম। বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের উত্তরাধিকার। কিন্তু সে উত্তরাধিকার তো আবার নিতান্তই ধর্ম ভিত্তিক হয়ে রইল। এ নিয়ে বড়জোর হিন্দু ঐক্য গড়া যেতে পারে। অথবা মুসলিম ঐক্য গড়া যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ঐক্য গড়ে তোলা মুশকিল। বৃটিশরা এদেশে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। সফলও হয়েছিল। কিন্তু যতদিন রাষ্ট্রিক ক্ষমতা বিদেশিদের হাতে ততদিন এ ধরনের ঐক্য রাখা সম্ভব। কিন্তু নিজেদের হাতে এলেই চুল চেরা হিসেব বুঝে নেওয়ার পালা যখনই ওঠে তখনই হয় বিপদ। এর ফলে একবার দেশ ভাগ হল। এখন তো আবার ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হতে চলেছে।

এক এক সময় ভাবি, ইতিহাসের প্রথম প্রত্যুষে যদি সমস্ত ভারতবাসী গ্রীকদের মত, হাল আমলের আমেরিকানদের মত সব মিলেমিশে একাকার হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হতে পারতাম। এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম – ধর্ম না হয় আলাদা হল, কিন্তু অন্তত একটা ভাষা যদি গড়ে উঠত চীনের মত, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত। কিন্তু ইতিহাস আপন স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে চলে। সেখানে কোন গায়ের জোর খাটে না, এমনকি কোন অভিপ্রায়ও নয়।

খৃঃ পূঃ ১৬০০ সালে একিয়ান গ্রীকরা মাইসেনিতে পাহাড়ের ওপর বিরাট দুর্গ-নগরী গড়ে তোলে। তাদের রাজত্ব-সীমা এক সময় মূল ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। একিয়ান রাজা অ্যাগামেমনন এশিয়া মাইনরের ট্রয় নগরী দশ বছর ধরে অবরোধ করে রেখেছিলেন। ট্রয়ের সংগে একিয়ানদের যুদ্ধ, হেলেন উদ্ধার নিয়ে হোমার তাঁর মহাকাব্য ওডিসি রচনা করে গেছেন। খৃস্টপূর্ব ৬০০ সালে গ্রীকরা স্পেন থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত উপকূলবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণ ছিল অনেকগুলি। এক নম্বর, দোরিয়ানদের আক্রমণ। দ্বিতীয়ত, গ্রীস দ্বীপপুঞ্জে জনসংখ্যার চাপ। অনুর্বর রুক্ষ জমিতে যথেষ্ট ফসল ফলে না। তাই গ্রীকরা বেরিয়ে পড়েছিল নতুন ভূখণ্ডের সন্ধানে। প্রত্যেকটি ছোট ছোট গ্রীক রাজ্য তাদের একটা জনসংখ্যাকে উৎসাহিত করত উপনিবেশ গঠন করতে। এইভাবেই একিয়ানরা একদিন গিয়েছিল সাইপ্রাসে।

প্রাচীন গ্রীস ছিল কতগুলি স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত। কখনও কখনও এদের মধ্যে এক একটি রাষ্ট্র খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এক একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চেহারাও ছিল আলাদা আলাদা, যেমন করিনথে ছিল অভিজাততন্ত্র, অ্যাটিকায় ছিল গণতন্ত্র। স্পারটায় দুশো বছর ধরে চালু ছিল গণতন্ত্র। সেই সংগে স্থায়ী সরকার। স্পারটা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রে নানা বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার বদল ঘটেই চলত।

গ্রীসের যে অঞ্চলটায় আমরা এসেছি সেটাই অ্যাটিকা অর্থাৎ আথেনস। গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় আইনের বিচার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আজকের গণতন্ত্রের যা কিছু ধ্যান ধারণা, তার উদ্ভব কিন্তু এই অ্যাটিকা রাজ্যে। খৃস্টজন্মের সাত-শো বছর আগে আথেনস রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অভিজাত শ্রেণী শাসনের পত্তন ঘটায়। তখন থেকেই রিপাবলিক ধ্যানধারণার শুরু। নজন নোবল বা আরকনের হাতে ছিল দেশ শাসনের ভার। এটিকে ক্যাবিনেট বা প্রেসিডিয়াম বলা যেতে পারে। এই নয় শাসক প্রতিবছর নির্বাচিত হতেন। নির্বাচক মন্ডলীকে বলা হত আরিওপেগাস – এর সদস্য ছিলেন শহরের অভিজাত ব্যক্তিরা।

অভিজাত ব্যক্তি অর্থে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। গরিব চাষীরা ঋণ ভারে জর্জরিত হয়ে থাকত। ঋণ যতদিন না শোধ হয় ততদিন তিনি মালিকের ভূমিদাস বা সারফ। তার উৎপন্ন ফসলের ছ ভাগের এক ভাগ তিনি উত্তমর্ণকে দিয়ে যেতে বাধ্য। যদি না দিতে পারেন তাহলে ভূমিদাস পরিণত হবে ক্রীতদাসে। আথেনসের অধিকাংশ নরনারী ছিল সারফ বা ভূমিদাস। শাসক ছিল মুষ্টিমেয় অভিজাতরা। খৃঃ পূঃ ৬০০ থেকে ৪৫০ সালের মধ্যে আথেনসে জন্মালেন এমন কজন মানুষ যাঁদের জন্য গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নতুন ইমারতের ভিত্তি তৈরি হতে পারল গ্রীসে। তাঁদের একজন হলেন আইনজ্ঞ সোলন, সংস্কারক ক্লাইসথিনিস, রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস। সোলন সমস্ত ঋণ মকুব করে ভূমিদাসদের মুক্ত করলেন। সারফরা জমির মালিক হল। লাঙল যার জমি তার হল। পেসিস্ট্রেটাস গরিব কৃষকদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা করলেন। সোলন গরীব ও বড়লোকদের জন্য একই আইন রচনা করলেন। ক্লাইসথেনিস ৫০০ লোকের একটি সংসদ করলেন। এই ৫০০ লোককে বাছাই করা হত আথেনসের সমগ্র জনসংখ্যা থেকে, লটারির মাধ্যমে। আগে জুরি ও বিচারকেরা বেতন পেতেন না। পেরিক্লিস ও এফিয়ালেটস জুরি ও বিচারকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করে তাঁদের বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে সংসদের সদস্যরাও ভাতা পেতে লাগলেন। এখন যেমন এম এল এ, এম পিরা পান। এর ফলে গরীবরাও সংসদের সদস্য হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ নিতে সক্ষম হলেন।

গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের যে চিন্তা আজ সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে তা কিন্তু হালফিলের ধ্যানধারণা নয়। গত শতাব্দীতে এই সব ধ্যানধারণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাকে তত্ত্বে রূপায়িত করা হয়েছে। কিন্তু যীশুর জন্মের আগেই গ্রীসে এই চেতনার উদ্ভব এবং সেই সময়কার সামাজিক ব্যবস্থায় যতখানি প্রয়োগ সম্ভব তার প্রয়োগও করা হয়েছে।

হোটেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বড় বড় করে নিওন সাইন জ্বলছে অ্যাটিকা সম্ভবত হোটেলের নাম। দূরে অন্ধকারে ঢাকা অ্যাক্রোপলিস। সভ্যতা সংস্কৃতি-শৌর্য বীর্য - গণতন্ত্রের পীঠভূমিতে মধ্যরাতের জ্বলজ্বলে কালপুরুষের দিকে তাকিয়ে সারা দেহে রোমাঞ্চ লাগে।

সেই গ্রীস দীর্ঘদিন ছিল পরাধীন, দীর্ঘদিন ছিল একনায়কের কবলে। আবার সেই অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে ফিরে এসেছে গণতন্ত্র।

মনে পড়ল শ্রীমতী গান্ধীর কথা। তিনি বলছিলেন : আথেনস, এই নামটার সংগেই জড়িয়ে আছে ইতিহাস। পশ্চিমী সভ্যতার পীঠস্থান এই আথেনস। কত বুদ্ধিজীবী ও মনীষী জন্মেছেন এখানে। অ্যাক্রোপলিস ও আগোরা কত বিদ্বজ্জনের লীলাভূমি। এখানে থুসিডিডেস গ্রীক সন্তানকে উজ্জীবিত করেছে শৌর্যে, উদ্বুদ্ধ করেছে প্রেরণায়। এই এথেনস – মিলটন যাকে বলেছিলেন কলা ও বাগ্মিতার মাতৃভূমি। ম্যাথু আরনলড বলেছেন – আথেনস যেন সুচারু চিন্তারই আর এক নাম, ভাবার সাম্য, গোঁড়ামি থেকে মুক্তি, মনের উদারতা, ব্যবহারের অমায়িকতা এসব কিছুই এই নগরীর অবদান। আপনারা মানবজাতিকে অনেক কিছু দিয়েছেন। □

(চলবে)

ছোট নরেনের বাড়ি

নির্মল কুমার রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত ছোট নরেনের উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুরের তেলিপাড়ার বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। ছোট নরেনের পুরো নাম – নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি ছিলেন কথামৃত প্রণেতা মাসটার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুলের মেট্রোপলিটন শাখার ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ছাত্রজীবনে ঠাকুরের সংগে ছোট নরেনের মিলন হয়। ঠাকুরের প্রধান ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম 'নরেন' হওয়ায়, ঠাকুর একই নামের এই ভক্তটিকে 'ছোট নরেন' বলে ডাকতেন। ঠাকুরের প্রতি মহা-আকর্ষণে ছোট নরেন বাড়ির ভয়কে উপেক্ষা করে ছেলেবেলাতেই স্কুল পালিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ঠাকুর তাঁকে 'শুদ্ধাত্মা' বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং তাঁকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে খুবই অস্থির হতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য বিবাহ করে ছোট নরেন সংসারী হন এবং 'অ্যাটরনি' রূপে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন।

প্রসংগত ঠাকুর ও ছোট নরেনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ মারচ দক্ষিণেশ্বরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় জানা যায় – "ঠাকুর ছোট নরেনকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন। শুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুশি হইতেছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাত যোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। কিয়ৎপরে সমাধিভংগ হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু বলিতেছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) – 'তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক একবার। আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস? – জ্ঞান, না ভক্তি?' ছোট নরেন – 'শুধু ভক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণ – 'না জানলে কাকে ভক্তি করবি? (মাষ্টারকে দেখাইয়া সহাস্যে) এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? (মাষ্টারের প্রতি) – তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে, – 'শুধু ভক্তি চাই', এর অবশ্য মানে আছে। আপনা আপনি ভক্তি আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি – বিচার করা ভক্তি। (ছোট নরেনের প্রতি) - দেখি, তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ। বুকের আয়তন; - তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস।' ঠাকুর এখনও ভাবস্থ।" (কথামৃত – ৩য় ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড – দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

এই ভক্তিমান ছোট নরেন সম্পর্কে ঠাকুরের নিজস্ব কয়েকটি উক্তি – "ছোট নরেনের পুরুষ-ভাব, – তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই।" (কথামৃত – ৩য় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড -- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

"এক-একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন – এর কুম্ভক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক-একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! কখনও বেশী! কি আশ্চর্য!" (কথামৃত – ৩য় ভাগ, চতুর্বিংশ খণ্ড – তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

"সে (ছোট নরেন) ছেলেবেলায় স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদতো। (ঈশ্বরের জন্য) কান্না কি কমেতে হয়! আবার বুদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ! আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বলে নবগোপালের বাড়ি যেদিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল, – কিন্তু 'তিনি কই' বলে আর হুঁশ নাই, – লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়! আবার ভয় নাই যে, বাড়িতে বকবে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে।" (কথামৃত – ৩য় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড – সপ্তম পরিচ্ছেদ)

৩৩/এ, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা – ৪ /

এই পরমভক্ত ছোট নরেনের বাড়িতেই ঠাকুর গিয়েছিলেন। একদা ঠাকুর তাঁর অন্যতম ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের শ্যামপুকুরে বাড়িতে উপস্থিত কালে ছোট নরেনকে দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, তাঁকে সেখানে ডাকা হয় এবং ঠাকুর তাঁকে সংগে নিয়ে তাঁর বাড়িতে শুভাগমন করেন। সেই প্রসংগে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের কাছে ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন –

"কাপ্তেনের বাড়ীতে ছোট নরেনকে ডাকলুম। বললাম, তোর বাড়ীটা কোথায়? চল যাই। – সে বললে, 'আসুন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল সংগে, – পাছে বাপ জানতে পারে।" (কথামৃত – ৩য় ভাগ, সপ্তদশ খণ্ড – প্রথম পরিচ্ছেদ)

অবশ্য, ছোট নরেনের বাড়িতে সেদিন যাওয়ার পরেকার ঘটনা আর জানা যায় না। অন্য সময়েও হয়ত ছোট নরেনের বাড়িতে ঠাকুর গিয়ে থাকতে পারেন।

ছোট নরেনের যে বাড়িতে ঠাকুর গিয়েছিলেন, তার ঠিকানা -- ৩৩/এ, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা -- ৪। বাড়ির প্রবেশ পথের বামদিকে বাহিরের দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা আছে -- 'সুরেন্দ্র ভবন'। এই বাড়িতে ঢুকেই একতলার বামদিকের অংশে ছোট নরেন বাস করতেন; বাড়ির ভেতরে ছোট একটি উঠান -- উঠানের ডানপাশ দিয়ে দোতলায় যাবার জন্য অনাচ্ছাদিত একটি সিঁড়ি, - উপরতলাতেও কয়েকটি ঘর এবং ভিতরের দিকে বারান্দা আছে। পূর্বে এই বাড়িটি একতলা ছিল। মালিক ছিলেন স্বর্গীয় সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তাঁরই প্রপৌত্রীর বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশধরগণ এই বাড়িতে বাস করেন; এই বাড়ির দোতলার একটি ঘরে নিত্য দেবসেবার ব্যবস্থা আছে। একতলার কিছু অংশে ভাড়াটিয়া আছেন।

পথ নির্দেশ – উত্তর কলকাতার বিধান সরণীর ওপর অবস্থিত প্রখ্যাত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখে যে রাস্তাটি শ্যামপুকুরে প্রবেশ করেছে, সেই রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গেলেই ডানদিকে 'রামধন মিত্র লেন'; এই লেনে ঢুকে আবার কিছুটা গেলেই বামদিকে 'তেলিপাড়া লেন'। তেলিপাড়া লেনে ঢুকে আবার কিছুটা গেলে ডানদিকে এই '৩৩/এ' নং বাড়ি। অপর প্রান্তে শ্যামপুকুর স্ট্রিট দিয়ে তেলিপাড়া লেনে ঢুকলে, বাড়িটি বামদিকে পড়বে। □

একটি সিগারেট গড়ে পাঁচ মিনিট আয়ু কমাচ্ছে

ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু বলেন, 'সিগারেট আমার শক্তি। আমার নামের বেশিরভাগ কৃতিত্বই হল এই সিগারেটের। তাই তার অপযশ করি কোন মুখে, আর ছেড়ে দেওয়ার কথাই বা ভাবি কী করে?'

এইটাই হয়ত আমাদের অনেকেরই মনের কথা। তাই দেখা যায়, সিগারেট টানতে টানতে কেউই মরণের ভয়ে কুঁকড়ে যান না। বরং স্বাস্থ্যের ভয় দেখালে তারা নানান যুক্তি তর্কের দ্বারা ধূমপান সমর্থন করার চেষ্টা করেন। ক্যানসারের ভয় দেখালে বলেন, 'মেয়েরা তো সিগারেট খান না, তাহলে তাঁদের ক্যানসার হয় কেন?' যদি হারটের অসুখের কথা বলা হয় তাহলে বলেন, 'ও তো আজকাল সবারই হচ্ছে।' বিদেশি এক রসিক বলেছিলেন, 'বুঝলাম সিগারেট খেলে গলায় কি ফুসফুসে ক্যানসার হয়, তাহলে কারো কারো মলদ্বারে ক্যানসার হয় কেন?'

আসলে ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই খারাপ, একথা কোন ধূমপায়ীকে বোঝান ভীষণ মুশকিল। কারণ ওরা সকলেই জ্ঞানপাপী। তাই এই অন্যায় অভ্যাসটি চালিয়ে যাবার জন্য ওরা সব সময়েই নিজেদের সপক্ষে প্রচুর যুক্তি খাড়া করেন। ওদের কিছুতেই বোঝান যায় না যে, সিগারেট খেয়েও অনেকে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারেন বটে, কিন্তু তা বলে সেটা কখনই নিয়ম হতে পারে না। দীর্ঘকালের গবেষণা আজ প্রমাণ করেছে যে, সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এই অভ্যাস মানুষের অবশ্যই বর্জন করা উচিত।

এত জানার পরেও আমরা অনেকেই যে সিগারেট ছাড়তে পারি না তার প্রধান কারণ, এই নেশা শরীরভিত্তিক নয়, মনভিত্তিক। আর ঠিক এই কারণেই দেখা যায় যে, হাজার অনুরোধ-উপরোধেও যে মানুষকে ধূমপান থেকে বিরত করা সম্ভবপর হয় না, সেই মানুষই একটা বড় রকমের ধাক্কা খাওয়ার পর সুবোধ বালকের মত চট করে নেশাটি ছেড়ে দিতে পারেন। একটি রোগীর কথা মনে পড়ছে। রোগীটি খুব ছোট বয়স থেকেই প্রচুর সিগারেট খেতেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে সাংঘাতিক হারট অ্যাটাক নিয়ে তিনি ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হলেন। সেখানে তিনি তার ডাক্তারের হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'আমাকে বাঁচিয়ে দিন। প্রতিজ্ঞা করছি, আর জীবনে সিগারেট ছোঁব না।'

সিগারেট যে কতখানি মনভিত্তিক নেশা এ তারই প্রমাণ। বহু হারটের বা ক্যানসারের রোগী আছেন, যাঁরা সুস্থ হওয়ার পর আর সিগারেটের নাম উচ্চারণ করেন না। এমনকি সারাদিন সিগারেট ছাড়া কোন সময়ই তাঁরা কোন অসুবিধাও বোধ করেন না। অর্থাৎ মৃত্যুর খাঁচার মধ্যে যদি কেউ প্রাণ পাখিটিকে হাতে নিয়ে একবার ফিরে আসতে পারেন, তাহলে তখন তাঁর নেশা টেশা সব ছুটে যায়। কিন্তু তার আগে ভবী ভোলবার নয়। এ যেন অনেকটা রাগী বাপের ভীতু ছেলের প্রেমে পড়ার মত ব্যাপার। সম্পত্তি হাতছাড়ার ভয়ে সুবোধ বালকের মত মাথায় টোপর দিয়ে শ্যামবাজারে না পাড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন ভবানীপুরের দিকে।

আমরা সিগারেট পান করতে চাই কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজও গবেষকদের অন্ধকারেই হাতড়াতে হচ্ছে। তবুও কতকগুলি কারণকে বিশেষভাবে গ্রাহ্য করা হয়। যেমন, ছোটরা সিগারেট ধরে বড় সাজার আকাঙ্ক্ষায়। এই কথাটিকে আবার অন্যভাবেও বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, ছেলেরা সিগারেট ধরে বিশেষ করে তার ঈপ্সিত নারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ছোটরা অনেক সময় দলে পড়েও সিগারেট ধরে ফেলে। অনেকের জীবনেই পিকনিক, পুজো প্যানডেল বা হসটেলে ধূমপানের প্রথম হাতেখড়ি হয়। পারিপার্শ্বিকতা যে এই নেশার প্রধান সহায়ক, তা বলাই বাহুল্য। যে বাড়িতে বাপ-কাকারা সিগারেট খান, সে বাড়ির ছেলেপিলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধূমপায়ী হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য এর ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, 'জন্মের পরেই আমরা মুখের মধ্যে কিছু পেয়ে থাকি। যেমন প্রথমে স্তন এবং পরে দুধের বোতল। এই পাওয়ার অভ্যাস পরে আমাদের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে আমরা কেউ কেউ ছোটবেলায় আঙুল চুষি এবং উত্তরকালে সিগারেট পান করতে চাই।'

মনোবিজ্ঞানীদের এই তথ্য কিন্তু উড়িয়ে দেবার নয়। বরং অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সিগারেট ছাড়তে চেয়ে আমরা মুখে তুলে নিই চিউইং গাম বা মশলা জাতীয় কোন বিকল্প। অর্থাৎ আবার সেই একটা কিছু চিবিয়ে কি চুষেই তৃপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা।

মনের সঙ্গে ধূমপানের যে একটা আত্মিক যোগ রয়েছে, এটা এখন প্রমাণিত সত্য। দেখা যায়, যাঁরা খুব আত্মকেন্দ্রিক তাঁরা পাইপ বা চুরুট পছন্দ করেন। আবার ঠিক বিপরীত চরিত্রের লোকেরা হলেন সিগারেট-প্রিয়। কর্মক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রচুর সিগারেট দিতে এবং নিতে হয়। তেমনি আবেগপ্রবণতাও মানুষকে অনেক সময়েই মাত্রাধিক সিগারেট পানে বাধ্য করে। ভাবনা-চিন্তায় প্রয়োজন যেমন সিগারেটের, তেমনি আনন্দ-উল্লাসেও চাই সিগারেট। সিগারেটের শক্তি অসীম। এটি যেমন মানুষকে জেগে থাকতে মদত জোগায়, ঠিক তেমনি সাহায্য করে ঘুমের আরাধনায়।

দেখা গেছে, সিগারেটের মধ্যে প্রায় ৫00 রকমের উত্তেজক উপাদান আছে। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটির নাম — নিকোটিন। এই নিকোটিনই মানুষকে নেশার ক্রীতদাস করে।

সিগারেট স্বাস্থ্যের কী জাতীয় ক্ষতি করে

অত্যধিক ধূমপানের ফলে মানুষের এনজাইনা, থ্রমবোসিস, এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। তবে নিয়মিত ধূমপান সাধারণত রক্তচাপবৃদ্ধি, ব্রংকাইটিস, মাথাযন্ত্রণা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, পায়ের পেশিতে ফিক ব্যথা, হাঁপানি, টিবি এবং দৃষ্টিক্ষীণতার মত সমস্যাই বেশি করে ঘটায়। সিগারেট যে এত ধরনের ক্ষতি সাধন করে তার প্রধান কারণ, নিয়মিত ধূমপানের ফলে শরীরে অকসিজেনের অভাব ঘটে। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে শতকরা ১·৫ ভাগ কারবন মনোকসাইড। এই কারবন মনোকসাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনকে কারবকসি হিমোগ্লোবিনে পরিণত করে। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ হল অকসিজেন বহন করা। কিন্তু হিমোগ্লোবিন কারবকসি হিমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত হলে তখন সে ওই প্রয়োজনীয় কাজটি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর যে প্রধান দুটি কারণে শরীরে অকসিজেনের অভাব হয় তার একটি হল, ফুসফুসের মধ্যে অঙ্গার-কণা জমাট বাঁধা এবং ধমনীকে কঠিন করে তুলে রক্ত সরবরাহের গতিবেগকে কমিয়ে দেওয়া। ফুসফুসে অঙ্গার জমলে অকসিজেন ফুসফুসের ভিতর থেকে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ধমনী কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ ধূমপান রক্তের কোলেসটেরল বাড়িয়ে ধমনীর ভিতর আথিরোস ক্লেরোসিসের সৃষ্টি করে।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকসিজেনের অভাব বোধ করলেই তারা বিভিন্ন রকমের জেহাদ ঘোষণা করে। পায়ে ক্রামপ হবে, মাথায় যন্ত্রণা হবে, চোখে কম দেখবে, হাত পা কাঁপবে, ঘুম কম হবে, পেটে অ্যাসিড হবে ইত্যাদি। ব্রংকাইটিস হলে কাশি, শ্লেষ্মা এবং হাঁপানি হবে। এই সব কষ্ট নিয়েও জীবন কোন রকমে চলতে পারে। কিন্তু একবার হারটে যদি অকসিজেনের অভাব হয়? রক্তাল্পতা (ইসকিমিয়া) কি অকসিজেনের অভাব হারট একদমই সহ্য করতে পারে না। তাই বেশ কিছুদিন সিগারেট চালিয়ে যাবার পর, বিশেষ করে বয়স্করা এবং যাঁদের রক্তের চাপ বেশি, তাঁরা অল্প পরিশ্রমেই প্রথমে বুক ধড়ফড় এবং পরে বুকে ব্যথা অনুভব করেন। এই ব্যথারই অপর নাম এনজাইনা।

হারাট কি ব্রেমে যে থ্রমবোসিস হয় তার কারণ, অত্যধিক ধূমপানের ফলে রক্তের অনুচক্রিকারা বেশ আঠাল হয়ে পড়ে। তখন তারা পরস্পরের সংগে জমাট বেঁধে ধমনীর ভিতরে থ্রমবাস সৃষ্টি করে রক্ত সঞ্চালন হঠাৎই বন্ধ করে দেয়। আমরা যে কখনও কখনও শুনতে পাই, কোন রোগী হঠাৎ বুক ব্যথা অনুভব করে মারা গেলেন বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে প্যারালিসিসের শিকার হলেন, এসবই ঘটে প্রধানত থ্রমবোসিসের ফলে।

যাঁরা দীর্ঘকাল সিগারেট পান করছেন তাদের কাছে অনুরোধ, লক্ষ্য করুন গলা ধরা, কাশি, বুক ধড়ফড়, মাথাযন্ত্রণা কি পায়ে ক্রামপের মত কোন অশুভ সংকেত পাচ্ছেন কিনা। সংকেত থাকলে অনুগ্রহ করে আজই, এই মুহূর্তেই, সিগারেট বন্ধ করুন। জানেন তো আজ সিগারেট ছাড়লে আপনার শরীর সম্পূর্ণভাবে দোষমুক্ত হতে সময় নেবে ১০ ১৫ বছর।

মানুষ সিগারেটের নেশা ছাড়তে পারে না কেন?

একটি সিগারেটে প্রায় ১ মিলিগ্রাম নিকোটিন থাকে। নিয়মিত সিগারেট খেলে ব্রেন সব সময়েই নিকোটিনের উত্তেজনায় আচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একটি সিগারেট মানুষকে প্রায় আধঘণ্টা কাল উত্তেজিত রাখে। কিন্তু তার পরেই রক্তের ভিতর থেকে নিকোটিনের পরিমাণ ক্রমে কমে যেতে থাকে। আর ঠিক তখনই সে আবার আর একটি সিগারেট টেনে নিজেকে চাংগা করতে চায়। নিকোটিনের নেশা এমনই আমেজদায়ী যে তার প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। নেশাগ্রস্তের মন সদাই চাইবে নিকোটিনের আশ্রয়। ফলে সিগারেট ছাড়া সে আর কিছুতেই মানসিক স্বস্তি পাবে না। আর সেই স্বস্তি পেতে শরীরকে অবশেষে তার চরম মূল্য দিতে হবে নানান ব্যাধির শিকার হয়ে।

সিগারেট কী পরিমাণ আয়ু কমায়

দেখা গেছে, ৩৫ বছরের অনূর্ধ্ব কোন ব্যক্তি যদি নিয়মিত ১-১৪টি সিগারেট পান করেন, তাহলে তার আয়ুর, ৬৫ বছর পার হবার আশা প্রায় ২২% কমে যায়। দৈনিক ১৫ ২৪টি সিগারেট ৬৫ বছর বয়সে পৌঁছবার আশা কমায় প্রায় ২৫%। দৈনিক ২৫টির ওপর সিগারেট পানে উক্ত আয়ু পাবার আশা কমে প্রায় ৪০%। জটিল হিসাবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে, একটি সিগারেট গড়ে পাঁচ মিনিট আয়ু কমাচ্ছে।

সিগারেট ছাড়া যাবে কীভাবে

মারক টোয়েন বলেছিলেন - 'সিগারেট ছাড়া কী আর এমন শক্ত কাজ! আমি তো জীবনে বহুবার সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।' সত্যি সিগারেট বহুবার ছাড়া যায়। কিন্তু একবার, চিরতরে ছাড়া যায় না। আমাদের অধিকাংশ সিগারেট ছাড়ার কথায় সংগে সংগে প্রতিজ্ঞা করে বসেন। কিন্তু পরে যখন দেখা যায় হাতে ফের সিগারেট, তখন প্রশ্ন তুললে বলেন, 'হ্যাঁ, খুব কমিয়ে দিয়েছি।'

আপনি হয়ত আবার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কথা তো হয়েছিল ছাড়ার, কমানর নয়।'

এবার মাথা চুলকে জবাব, 'হ্যাঁ, খুব চেষ্টা করছি। এখন কমিয়েছি, এর পর ছেড়ে দেব।'

না, সেই 'এর পর' আর কোনদিনই আসবে না।

সিগারেট ছেড়ে দিতে সাহায্য করে এমন কোন ওষুধ নেই। কোনও দেশের সরকারই চান না যে তার দেশবাসী সিগারেট খান। অথচ মজার কথা; সিগারেট বন্ধের প্রচার কার্যের জন্য সরকার যত খরচ করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করেন সিগারেট ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে। এ যেন সেই চোরকে চুরি করতে বলা এবং গৃহস্থকে সাবধান হতে বলার মতই ব্যবস্থা। প্রকৃত পক্ষে সিগারেট আর ছাড়ছেন কজন। বিবাহিত জীবনের হাজার লাঞ্ছনা সহ্য করেও লোকনিন্দার ভয়ে যেমন কেউ কেউ ছাড়াছাড়ির কথা ভাবতে লজ্জা পান, এও যেন প্রায় সেই রকমেরই ব্যাপার। অনেকে আবার বলেন, 'আরে বাবা, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।' একটা কিছু মানে পান, জর্দা, গুড়াকু, খৈনি, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি। তাঁদের অভিধানে এই 'একটা কিছু' হল আরও অনেক 'বড় একটা কিছুর' বিকল্প।

সিগারেট খাওয়া সাধারণ কি অসাধারণ সবার পক্ষেই এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। ঘরকুনো মানুষের সব জেনে বুঝে সিগারেট খাওয়া কোন দুঃসাহসিকের সব জেনে বুঝে পাহাড়ের চূড়ায় কি সাঁতরে সমুদ্র পারের অভিযানের মতই। কিন্তু তবুও ওই একটা কিছুকে তাঁরা বইপড়া, আড্ডামারা, সিনেমা দেখার মাধ্যমে মেটাতে পারেন না।

একবার সিগারেটকে সমর্থন করে এক বিতর্ক সভায় একটি গল্প ফেঁদে ছিলাম। এখানে পাঠকদের সেই গল্পটিকে সংক্ষেপে শোনাবার লোভ সামলাতে পারছি না।

একজন খুব সিগারেট পান করতেন। ফলে অল্প বয়সেই তাঁর করোনারি হল। সেরে উঠে তিনি ডক্তারের পরামর্শে সিগারেট ছেড়ে দিলেন। দিব্যি দিন কাটছিল। হঠাৎ ৬-৭ বছর পরে তাঁর গলায় ক্যানসার হল। তিনি প্রশ্ন তুললেন, 'আমি তো কবে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, তাহলে আমার ক্যানসার হল কেন?' ডাক্তার বললেন – 'আগে অনেক সিগারেট খেয়েছেন তো, এ তারই পরিণাম।' যাই হোক, ক্যানসারেরও চিকিৎসা হল এবং তিনি আবার সেরে উঠলেন। এর পর একদিন তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় তিনি বাসের তলায় চাপা পড়লেন। সংগে সংগে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তিনি সেখানেই মারা গেলেন। খবর পেয়েই তাঁর তিন ছেলে দৌড়ে এলেন। তাঁরা সকলেই ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'বাবা কি কিছু বলে গেছেন? কিছু কথা? কিছু তাঁর শেষ ইচ্ছা?'

ডাক্তারবাবুরা বললেন, 'না সেরকম কিছু তিনি বলে যাননি। তবে বলেছেন - এতো রকমের মৃত্যুর কারণ যখন চতুর্দিকে ছড়ান ছিল, তখন শুধু শুধু সিগারেটটা কেন কষ্ট করে ছাড়লাম!'

জানি, এই গল্পটি হয়ত অনেক ধূমপায়ীকেই তাঁর নেশা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। আমিও সেদিন গল্পটা বলেছিলাম বিতর্কে জেতার আশায়। কিন্তু আসলে রোগীটিকে দিয়ে আমার যা বলান উচিত ছিল তা এই যে, 'এই সুন্দর পৃথিবীতে আরও কিছু সুন্দর দিন কাটিয়ে যাওয়ার আশায় এখানকার প্রতিটি মৃত্যুফাঁদকে আমার ভাল করে চিনে রাখা উচিত ছিল।'

আমাদের নিজেদের জীবনকে ভালবেসে আরও বেশি দিন বাঁচার আশায় শুধু সিগারেট কেন, সমস্ত রকম নেশাকেই আমাদের বর্জন করা উচিত।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সিগারেট ছাড়ব কীভাবে? স্বাস্থ্য, সংসার, সরকার, এমনকি ধর্মের অনুশাসনেও মানুষ এই নেশা বর্জন করতে পারে না। তবে এরই মধ্যে সুখের কথা এইটুকু যে, গলার চিকিৎসক হিসাবে আজকাল অনেক রোগীকেই এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে দেখছি, ডাক্তারবাবু সিগারেট ছাড়ব কীভাবে? এর শেষ উত্তর ঘৃণায়। সিগারেটের প্রতি যদি একমাত্র ঘৃণা আনা যায়, তবেই আপনি সিগারেট ছাড়তে সক্ষম হবেন। নিজের মনের ভিতর এই ঘৃণাকে গড়ে তুলতে হবে। বুঝতে হবে যে, সিগারেট আপনার সুন্দর দেহ-মনকে তিলে তিলে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। □

শিলাদিত্য

১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা

বিশেষ রচনা : 'শনিবারের চিঠি'র জীবনকাহিনী কমলকুমার দত্ত

এই রচনাটিতে লেখক অধুনালুপ্ত বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'র দীর্ঘদিনের বহু অন্তরঙ্গ কথাকে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখ দিকপাল সাহিত্যিকদের ব্যাপারেও অন্য এক ধরনের আলোকপাত করেছেন।

সুব্রামনিয়ান চন্দ্রশেখর

রমাতোষ সরকার

সম্প্রতি নোবেল প্রাপ্ত এই বিজ্ঞানীর গবেষণার মূল ব্যাপারটা পাঠকদের কাছে সবল ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক রমাতোষ সরকার। তারার জন্ম বৃদ্ধি ও পরিণতিকে তিনি সাধারণ পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছেন এই প্রবন্ধে।

অন্যান্য প্রবন্ধ : সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প

তাপস মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের এক লেখক। তিনি তাই সোচ্চারে আলোচিত নন, অনুরণিত হৃদয়াতরঙ্গে। তাঁর লেখা ছোটগল্পের বিভিন্ন পটভূমি ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে লেখা এক হৃদ্য প্রবন্ধ।

লঘু রচনা : অথ লরি-সুভাষিত কথা

গৌরমোহন ঘোষ

সারা ভারতের লরির গায়ে মাথায় সামনে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধরনের নানা রকম সুভাষিত লেখা থাকে। সেই সব লেখার সঙ্গে লরিচালকদের জীবন নিয়ে সুন্দর এক হাসিমিশ্রিত অথচ নিঃশব্দ বেদনামাখা রচনা উপহার দিয়েছেন লেখক।

কবিতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপন্যাস : যে পায় ☐ শিশির লাহিড়ী

ভালবাসার উত্তাপ জীবনে যে পায় সেই তা বোঝে, যে পায় না সে যেমন তা বোঝে না তেমনি তাকে বোঝানোও যায় না।

গল্প : সোনার ইট ☐ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ☐ খরা ☐ চণ্ডী মণ্ডল ☐ পদাতিক ☐ খায়রুল বাসার

আজকের সমাজ সচেতন মানুষ ও মানসিকতা নিয়ে ভিন্ন স্বাদের গল্প। যার পটভূমি শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে নিবিড় গ্রামে।

ধারাবাহিক রচনা : স্বর্ণপুট ☐ আনন্দশঙ্কর

উদয়শঙ্কর রবিশঙ্কর যে ঘরানা দিয়ে বিশ্বজয় করেছেন তারই ক্রমানুবর্তী কাহিনী।

পথে পথে ☐ তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় যে সৈনিকরা তাদের জীবন তুচ্ছ করে আমাদের এই বিশাল দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করছে তাদের জীবনের বেদনা ও বঞ্চনার কাহিনী। সেই সঙ্গে হাস্যকর মিলিটারি অনুশাসন। ধারাবাহিকভাবে এ এক নতুন জগৎ। যার কথা আগে কখনো লেখা হয়নি।

কালের জার্নাল ☐ সোমদেব শর্মা

কলকাতার বর্তমান পরিবহণ সমস্যাকে কটাক্ষ করে লেখক এ সংখ্যায় পালকি ঝাঁকা খাটিয়াকে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বাতলেছেন। প্রতিটি ছত্রে শ্লেষ এবং হাসির আস্বাদ।

এ ছাড়া : বিবিধ প্রসঙ্গ ☐ মহিলা প্রসঙ্গ ☐ পুস্তক পরিচয় ☐ কবিতা ☐ আলোচনা ☐ সংগীত নাটক চলচ্চিত্র ☐ অন্য চোখে।

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে তৃতীয় বিভাগে ঃ তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার

শ্যামল বসু

প্রথম বিভাগে পাশ করেও মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা হালে পানি পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ ও পাশ বিভাগে পাশ করা ছাত্ররা কী করবে? কোন ভাল কলেজে তাদের স্থান নেই। বাজে কলেজেও বিজ্ঞান শিক্ষার দরজা তাদের জন্য বন্ধ। কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার দরজাও তাদের বন্ধ। অথচ এই সব লক্ষ লক্ষ ছেলেদের পরীক্ষায় খারাপ রেজাল টের জন্য দায়ী কি একা ওরা? অনেকেরই ধারণা এই সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় ভাল রেজাল্ট করতে গেলে প্রাইভেট টিউটর ও নোটসের পিছনে মোটা টাকা খরচ করতে হয়। লেখাপড়া নিয়েও চলছে ফটকাবাজি। হাজার হাজার তরুণের কাছে এই অবস্থা দুঃসহ। সরকারি হিসেবে ১৯৮০ সালে ৩ মারচ যে মাধ্যমিক পারীক্ষা এ রাজ্যে হয় সেখানে রেগুলার কনটিনিয়ুয়িং আনড কমপারটমেন টাল মোট ২,৭২,৭২৩ (দু লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশ তেইশ) জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৪৩ জন পরীক্ষায় বসেন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৭৯০৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৩০০৩ জন, তৃতীয় বিভাগে ৪৫৮৮৮ জন, পাশ বিভাগে পাশ করেন ১,২৬,৭৯৬ জন. কমপ্যারট-মেনটাল পেয়েছেন ৪২৩২৭ জন, বিভিন্ন করণে রেজালট প্রকাশিত হতে পারেনি ১৬৬৭ জন পরীক্ষার্থীর। কনটিনিয়ুয়িং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯ জন প্রথম বিভাগে, ৮১৭ জন দ্বিতীয় বিভাগ, ৭৫৬৩ জন তৃতীয় বিভাগে এবং কমপারটমেনটাল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাশ করেন ৩৯১৩ জন।

১৯৮১ সালে প্রথম বিভাগে পাশের হার ছিল ৫.৪৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগ ২৪.৬৮ শতাংশ, তৃতীয় বিভাগে ৩১.৫২ শতাংশ, ১৫ ০৬ শতাংশ কমপারটমেনটাল পেয়েছিলেন, অকৃতকার্য হন ২৩.২৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী।

১৯৮২ সালে এই চিত্রটি একটু অন্য রকম। এবারে অকৃতকার্যের সংখ্যা কমে আসে ১৫.৪০ শতাংশে। প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ ও পাশ বিভাগে যথাক্রমে ৬.৪৪ শতাংশ, ২৭.৬৮ শতাংশ, ২৮ ৭০ শতাংশ, ৬২.৮২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হন। এই সংগে কমপারটমেনটাল পরীক্ষার সুযোগ যারা পান তাদের হারও আগের বছরের তুলনায় বেশি ২১.৭৮ শতাংশ।

এবার ১৯৮৩ সালের হিসেবে রেগুলার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগে পাশের হার ৪.৫৮ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগ ৩০.১৯ শতাংশ, তৃতীয় বিভাগে ২১.৯৯ শতাংশ, পাশ বিভাগে ৬০.৭৬ শতাংশ। কমপারট-মেনটালের সুযোগ পেয়েছেন ২০.২৮ শতাংশ আর অকৃতকার্যের সংখ্যা ১৮.৯৬ শতাংশ।

এই হিসেবের চিত্রটা কেবল আংশিক কতগুলো শব্দ ব্যবহার হিসেবে এখানে আনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রগতির চিত্রটা ক্রমশই একটা স্থির বৃত্তের মধ্যে আটকে যাচ্ছে। সরকারি মুখপাত্ররা অবশ্য সে কথা স্বীকার করেন না। তারা বলেন শতাংশ হিসেব গুনে দেখা যায় গত তিন বছরে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যার ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। জায়গা বেশি নিয়ে এখানে আর উচ্চমাধ্যমিকের পরিসংখানে যাওয়া হল না। কিন্তু প্রশ্নটা উঠল এই বিপুল সংখ্যার ছাত্রছাত্রী যার হিসেব গড়ে বছরে পৌনে তিন লক্ষ, কেবল এ রাজ্যেই তাদের মধ্যে গড় ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতে কী করবেন? এ ক্ষেত্রে দিল্লি স্কুল বোরডের ছাত্রছাত্রীদের হিসেব ধরা হয়নি। কেবল মাত্র রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মনোনীত মাধ্যমিক শিক্ষা বোরড যে পরীক্ষা নিয়েছেন তার ফলটুকুই নেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক পাশ করে স্বভাবতই এই ছাত্রছাত্রীরা ছোটেন উচ্চমাধ্যমিক পড়ার জন্য। উচ্চমাধ্যমিকের পর স্বল্পসংখ্যক সুযোগ পান সরাসরি কলেজে ভর্তি হবার। এর মধ্যে ইনজিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ এ রাজ্যে প্রায় ১৩০০ হলে আর ডাক্তারি পড়তে পান ৭৫০ জন। এ রাজ্যে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হাতে গোনা গেলেও মোট কলেজের সংখ্যা সরকারি হিসেব থেকে পাওয়া মুশকিল। এই ঠিক সংখ্যা না পাওয়ার পিছনে কলেজের অনুমোদন, কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা, সব বিষয়গুলিই ধরতে হবে। তবে মোটামুটি ধারণাগত ভাবে যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকৃত কলেজ তার সংখ্যা শ খানেক। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রানটস কমিশনের সুপারিশক্রমে একটি কলেজে ধরা যাক ১৪০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে। এ হিসেবে মোট সুযোগ পাওয়া যাবে প্রায় দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রীর। এটা বছরের হিসেবে। তবুও রয়ে যাবে আরও ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী যাদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা শুরু হবে এই পর্ব থেকে। সাধারণভাবে বি এ, বি এস সি, বি কম পড়ার যতটুকু সুযোগ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা জেনারেল স্ট্রিমের ছাত্রছাত্রীদের আছে, ঠিক ততটুকুও বোধহয় যারা ভোকেশনাল বা বৃত্তিগত বিভাগের উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন তাদের নেই। হুগলী জেলার মামুদপুরের ছাত্র প্রবীর দাস এবছর দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। ভোকেশনাল বিভাগের পরীক্ষার্থী বলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে ১৫ দিন দেরি হয়েছে। এ দেরি সাধারণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল ঘোষণার দিন থেকে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে না হলেও আশপাশের সব কটি কলেজ প্রবীরের মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছে তাদের ভর্তির দিন পার হয়ে গিয়েছে। অবশেষে কালনা কলেজ থেকে একটা ফরম সে জোগাড় করতে পেরেছিল। কিন্তু সময় তাদেরও ফুরিয়ে যাওয়ায় সে ওখানেও ভর্তি হতে পারেনি। আজ তার কাছে বিরাট প্রশ্ন সে কী করবে? কলেজগুলোতে ভোকেশনাল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ না থাকলে তা আগেভাগেই কেন প্রবীরদের জানিয়ে দেওয়া হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সরকারি ঘোষণা নেই, তাহলে কি করে কলেজগুলো ভর্তির দিন প্রবীরদের রেজালট বেরুনোর আগে শেষ হয়ে যায়? উচ্চমাধ্যমিকে বৃত্তিগত বিভাগের ছাত্র হিসেবে পাশ করেও রাজ্যের ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনসটিটিউটগুলোতে তাদের কোন জায়গা নেই কেন? পলিটেকনিকগুলোও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য কোন বিশেষ সুযোগ রাখবে না কেন? আর চাকরি সে তো দূর অস্ত। চাকরির সুযোগ কার আছে? চাকরি কি শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া যায়? না এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতে যে ত্রুটি আছে তা এখনও আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনাহীনতায় ভুগছে? এই শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব অর্থে রাজ্যের বেকারের পরিসংখ্যানকে পুষ্ট করা ছাড়া কিছুই করে না। গত ৩৬ বছরের হিসেবে উপেক্ষায় আর অবহেলায় শিক্ষা পরিকল্পকরা গড়ে তুলেছেন কাগজে কলমে শিক্ষিত বেকারের পাহাড়। এ

শিক্ষকতা করছেন এমন একজন প্রধান শিক্ষকের। বয়সটা তার পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও পঞ্চাশ বছর বয়সী একদা আদর্শবাদী অধুনা রাজনৈতিক মুনাফালোটা শিক্ষক ইনি নন। পুরান দিনের শিক্ষকের আবেগ, আদর্শ সব কিছু দেখেও ইনি শিক্ষক হিসেবে সরকারি সম্মানও পেয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার একটি মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তরুণ অতি উৎসাহী শিক্ষকদের কটূক্তিকে তিনি সম্মানহানিকর মনে করেন। রাজনীতির চক্র থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান তাই তাঁর অনুরোধ কাগজে নাম দিয়ে কিছু লিখবেন না। তাঁর জিজ্ঞাসা এই যে ছেলেগুলো আমাদের বিশ্বাস করে, পরীক্ষা দেয়, পাশ করে। এরা কোথায় যাবে কী করবে তা আমিও ভাবি। কিন্তু ভেবে কিছু কিনারা পাই না। শিক্ষক হিসেবে আমার চাওয়া – ওদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা। আমি তাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার মূল্য তারা যেন সমাজব্যবস্থা থেকে পায় – কিন্তু পায় কই? তবে কি শিক্ষক হিসেবে আমি ঠিক মত কাজ করছি না? তবে ওরা কলেজে যেতে পারে না কেন? চাকরি পায় না কেন? রোজগার করে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে না কেন? এত কেনর সন্ধানের উত্তর হয়ত এক টাই। কিন্তু সে উত্তর কার জানা আছে?

রাজ্যের বেকারের সংখ্যা শিক্ষক মশায়ের কথা সমর্থন করে, কিন্তু উত্তর দেয় না। এ রাজ্যে '৮৩ সালের মারচ মাস অবধি নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ। সারা ভারতে দু কোটি। শিক্ষার তালিকায় পশ্চিম বংগের নাম নিম্নগামী হলেও গত ছ বছরে এ রাজ্য বেকার পরিসংখ্যানের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়। এই সংখ্যাটি একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ রাজ্যে যদি শিক্ষাব্যবস্থার রীতি ঠিক থাকে তবে রাজ্য সরকারের অপরিণামদর্শী পরিকল্পনা তরুণদের কর্মক্ষেত্রের সুযোগ নষ্ট করেছে

মালিক তারা এদের পছন্দ করছেন না। এক নজরে দেখা যায় গত ৫ বছরে গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ লোক রাজ্যের ৬৮ টি এমপ্লয়মেন্ট একসচেনজে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৪৭.৮৯ শতাংশ। স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের সংখ্যা শতকরা ২০.৫ ভাগ। শতকরা ১৮.৫ ভাগ যারা স্নাতক নন। অর্থাৎ প্রায় ৪০ ভাগ বেকারই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ। শতকরা ৮ ভাগের কিছু বেশি যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। রাজ্য এমপ্লয়মেন্ট সূত্র থেকে জানা যায় প্রতিমাসে গড়ে ৩ হাজারের মত শূন্য পদের খবর এমপ্লয়মেন্ট একসচেনজে পৌঁছায় তার মধ্যে চাকরি পান কতজন তার সঠিক হিসাব এমপ্লয়েমেন্ট থেকে পাবার সুযোগ নেই। তবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন করপোরেশনে বা স্বয়ংশাসিত সংস্থায় চাকরির জন্য শূন্য পদ ১৯৮২ ৮৩ র হিসাবে প্রায় তেইশ হাজারের মত, তার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগও চাকরি পাননি। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ২ হাজারের কিছু বেশি শূন্য পদের খবর ছিল। ঐ বছরের হিসাবে তার মধ্যে ১১০০ জনের কিছু বেশি লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৫ হাজার চাকরি খালি ছিল, তার মধ্যে দুহাজার পদও পূর্ণ করা হয়নি। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৪ হাজার লোক নিয়োগ করার কাগজে কলমে সুযোগ ছিল, সেখানে এ পর্যন্ত হাজার-পনেরশ'র বেশি লোক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তো কথাই নেই। তাদের হিসেব সঠিকভাবে সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অবশ্যই অজ্ঞাত।

অভিজ্ঞমহলের ধারণা ১৯৭২ সাল থেকেই রাজ্যে উৎপাদনমুখী

লগ্নী জমে যায় – যে লগ্নী হয় তা সি এম ডি এ পাতাল রেল কিংবা হুগলী রিভার ব্রিজের মত। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারের নিয়োগ করা কর্মীদের সুযোগ থাকলেও শিক্ষিত বেকারদের স্থায়ী চাকরির কোন সুযোগ নেই।

এবার যদি দেখা যায় স্বনির্ভর কর্মসূচীর আওতায় প্রবীর বা রমেনদের সুযোগ কতটা, দেখা যাবে সেখানেও খুব উজ্জ্বল কোন আশা অপেক্ষায় নেই। স্বনির্ভর প্রকল্পের কোন সঠিক কিংবা কাছাকাছি পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও এটা বোঝা সম্ভব কোন তরুণ হঠাৎ উদ্যমে ব্যবসায় নিযুক্তির চিন্তা করলেও মানসিকতা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা এ রাজ্যে তেমন নেই। মূল চিন্তায় যেখানে কিছু না করেও বেকারভাতা দিয়ে কিছু লোককে কেবল বেকার ছাপ দিয়েই দায় শেষ করা যায় সেখানে ৭৫ কোটি টাকা তিন বছরে বেকার ভাতা হিসেবে দেওয়া উচিত বলে রাজ্য সরকার মনে করে। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় তেমন কোন উদ্যোগ সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। ব্যাংকের বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় এইসব তরুণের সুযোগ সেখানে সামান্যই। ব্যাংকের অভিজ্ঞ ম্যানেজারদের মতে তাঁরা টাকা দিতে পিছপা নন কিন্তু অভিজ্ঞতাও তাঁদের বড় বিচার্য। অতএব সেখানেও অন্ধকার।

অন্ধকারে তারতম্য বিচার নেই। এ অন্ধকার দক্ষিণ কলকাতার এগার বার ক্লাসের একটি স্কুলের ছাত্রী মৌসুমী দাশগুপ্ত, সতের বছরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ইন্দ্রাণী বসুমল্লিক কিংবা শুভ্রা ব্যানারজিদেরও সমানভাবে হতাশার পরিণতি ভাবতে শেখায়। রমেন প্রবীরদের মত আগামী দিনগুলোতে এরাও তো সংবিধানের সব অধিকারগুলোকে পেতে চায়। মৌসুমীরা সরল মনে

প্রশ্ন করে মনের অন্ধকার দূর করার জন্য শিক্ষা, কিন্তু এর পরিণতি জানা না থাকলে কি আমরা আরও সমস্যায় পড়ব না। এদের জিজ্ঞাসার জবাবে সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজসেবী শিক্ষাবিদরা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে গত ৩৬ বছরে এ দেশে ১৩৭ টি কমিশন কেবল শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য বসেছে। তাদের রিপোরটও হয়েছে গাদাগাদা। কিন্তু কোন একটি কমিশনও গণ জীবনে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পেশাগত বা বৃত্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সরাসরি যোগসূত্রের কথা বলেননি। সব ছেলেমেয়েই গবেষণা বা উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা রাখে না। মোটামুটিভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে জীবন নির্বাহের দিকটাই তাদের বেশি আগ্রহী করে তোলে। আর সেটার দরকার অনুভব করলেও ষষ্ঠ পরিকল্পনার অন্তিমকালেও কোন স্পষ্ট ছবি রাষ্ট্রনায়করা দিতে পারেননি। যেমন পারেননি ঐ ১৩৭ টি কমিশনের একটিও। আর এরই ফলশ্রুতিতে কেবল বাঁচার জন্য শিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত ছেলেরা যদি চোর ডাকাত কিংবা 'গ্যাংস্টার' তৈরি হয় আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, রাজনৈতিক নেতারা প্রয়োজনে তাদের কাজে লাগাই। অপ্রয়োজনে অন্ধকার রাজ্যের আরো গভীরে ঠেলে দিই। আংগুল তুলে চিহ্নিত করি ওরা সমাজবিরোধী।

আর ভবিষ্যৎ সমাজবিজ্ঞানীর মতে এ রাজ্যের বিদ্যুৎ সংকটের অন্ধকারের চেয়েও নীরন্ধ্র অন্ধকার দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে।।।

আলোকচিত্র : অচিন্ত্য রায়

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় জাতপাতের সংঘর্ষে বিপর্যস্ত

বুদ্ধদেব বিশ্বাস

উত্তরপ্রদেশের জনজীবনে জাত-পাতের শিকড় অনেক গভীরে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও জাতপাতের এই দুষ্ট ক্ষত থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই সেখানে চলছে ব্রাহ্মণ, ভূমিহার, ঠাকুর ও লালাদের মধ্যে প্রভুত্ব অর্জনের লড়াই। ছাত্র, অধ্যাপক, প্রশাসন - বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি স্তরেই এ লড়াই সমান সক্রিয়; তবে মূলতঃ ছাত্রদের সামনে রেখেই জাতের গরিমা প্রতিষ্ঠার লড়াই চলে। পিছনের কুশীলব হচ্ছেন অধ্যাপক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই এর মূল উদ্দেশ্য। বাইরে থেকে রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাদের প্রয়োজনে ছাত্রদের মদত দিয়ে থাকেন। এই নেতারা কোন না কোন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রদের আর যারা কাজে লাগান তারা হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার মহল। এদের লক্ষ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা অংকের স্থানীয় ক্রয় ও বিভিন্ন রকমের নির্মাণ ও মেরামতি কাজে সিংহভাগ বসান।

৩০ আগস্টের ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ ধরণের ছাত্র রাজনীতির ফলশ্রুতি। ৩৫ দফা দাবি আদায়ের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ৫৩ তম দিনে এদিন ছাত্রদের পক্ষ থেকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উপাচার্য নিবাসের সামনে তিনটি শক্তিশালী বোমা ফাটে। ছাত্রদের যথেচ্ছ ইষ্টক বর্ষণে ২৮ জন পুলিশ আহত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তেজনা থামাতে পুলিশ ছাত্রদের ধাওয়া করে। ছাত্ররা ছাত্রাবাসগুলিতে আশ্রয় নেয়। পুলিশ রুইয়া, বিড়লা, ভাবা, রাজা রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে আশ্রয় নেওয়া ছাত্রদের প্রচণ্ড মারধোর করে। এমনকি, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসেও পুলিশ প্রবেশ করে এবং জনৈক বাংলাদেশী রিসারচ স্কলার কবীর চৌধুরী পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাকে নিয়ে মোট আহত ছাত্রের সংখ্যা ১৬। এছাড়া পুলিশ ৫২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। উপাচার্য উত্তেজক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। ছাত্রদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশকে।

৩০ আগস্টে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের পর / জগনারায়ণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের দগ্ধ গাড়ি / জগনারায়ণ

এর ঠিক পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়ালির ছুটি ঘোষণা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র অশান্তির মূলে আছে ১৯৮২-র জুলাই মাসের একটি ঘটনা। ইংরাজি পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিতে ঐদিন আরটস ফ্যাকালটির ডিন বিজয় পাল সিং-কে ঘেরাও করা হয় এবং ইংরাজি বিভাগীয় প্রধান এস এন পাণ্ডে ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হন। শৃংখলা রক্ষা কমিটি এই ঘটনার জন্য রাম ইকবাল সিং, মার্কেণ্ডেয় সিং, সুবেদার সিং ও রামেন্দ্র প্রতাপ সিং-কে দুবছর এবং অনিল তেওয়ারী ও ধনঞ্জয় ত্রিবেদীকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে।

শৃংখলা রক্ষা কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেন। বিশেষ করে রাম ইকবাল সিং এর বহিষ্কার আদেশ আর এস এস-পন্থী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকরা ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেননি। কারণ আসন্ন ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে তিনি ছিলেন সভাপতি পদে বিদ্যার্থী পরিষদের সম্ভাব্য প্রার্থী।

১০ নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদ প্রার্থী মনোজ সিনহা সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্রদের ওপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। দীর্ঘ ১২ বছর পর একজন ভূমিহার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রভাব বিস্তারের স্বার্থে ভূমিহার ছাত্ররা সর্বতোভাবে আন্দোলনের সামিল হন। একই কারণে ভূমিহার অধ্যাপক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাও ছাত্রদের মদত দিতে থাকেন।

ছাত্র ইউনিয়নের নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি ডি এস পি-পন্থী ইউথ ফর ডেমোক্রাসির রাজেশ কুমার মিশ্র ও সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস (ই)-র ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অব ইনডিয়ার অনিল কুমার শ্রীবাস্তবও আন্দোলনের অংশীদার হন। নীতি ও বিশ্বাসের কথা ভুলে শক্তিশালী ঠাকুরদের প্রভাব কমানর জন্য ভূমিহার ও ব্রাহ্মণ ছাত্রনেতারা এক ছত্রছায়ায় এসে দাঁড়ায়। পর্দার আড়ালের কুশীলবরা অবশ্য যথারীতি সক্রিয় থাকেন।

নব নির্বাচিত পদাধিকারীরা ছাত্র ইউনিয়নের দায়িত্ব পাওয়ার পর আন্দোলন নতুন গতি পায়। পরীক্ষা হল থেকে বহিষ্কৃত প্রায় দুহাজার ছাত্রকে নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার

সুযোগ দিতে হবে– ছজন ছাত্রের ওপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবির সংগে এই নতুন দাবি সংযোজিত হয়।

দাবি মানতে গররাজী হওয়ায় ১৯৮৩-র ১৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপাচার্যের ভাষণে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণানন্দ সিং, বীরেন্দ্র সিং, বিনোদ কুমার সিং, সুরেন্দ্র নাথ উপাধ্যায় ও ভগবান পাঠককে সাসপেনড করা হয়। ২৬ জানুয়ারি আরেকটি ঘটনায় ল ফ্যাকালটির প্রবীণ অধ্যাপক আর কে মিশ্র এবং অধ্যাপক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হন। এ ঘটনার জন্যও বামনদেও সিং ও রামেন্দ্র প্রতাপ সিং কে সাসপেনড করা হয়। দুটি ক্ষেত্রেই বিচারপতি রাস্তোগি তদন্ত করে দেখেছেন। ৯ জুলাই উপাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ও অনশনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। মূল দুটি দাবির সংগে আরও ৩৩টি দাবি যোগ হয়। ১৯ ও ২০ আগসট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম পর পর দুদিন ধর্মঘট পালন করা হয়। ছাত্রদের ডাকে ২৪ আগসট বারাণসী বন্ধ্ পালিত হয়। বারাণসীর ইতিহাসেও এ জাতীয় ঘটনা এই প্রথম। ৩০ আগসট পরিস্থিতি চরম রূপ নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের হাতে অধ্যাপকদের প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে অধ্যাপকদের সংগে ছাত্রদের মানসিক দূরত্ব, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের পরিবেশকে দূষিত করে দিয়েছে।

গত দুবছরে ছাত্রদের অসহযোগিতার ফলে অধিকাংশ পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ১৯৮২ সালে যখন এক-তৃতীয়াংশ পরীক্ষা গ্রহণের দিন নির্ধারণ হয়নি, তখনই ৩২টি পরীক্ষা বয়কটের ঘটনা ঘটেছে। পরিচ্ছন্ন শিক্ষাবর্ষের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ যে সব ফ্যাকালটিতে ১৯৮১-৮২ সালে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি সেখানে শিক্ষাবর্ষ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ছাত্ররা ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে

আহত বাংলাদেশী ছাত্র কবীর চৌধুরী

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী উপাচার্য স্বয়ং। তিনি একটি চক্রের সহায়তায় ছাত্রদের ন্যায্য দাবিগুলি নস্যাৎ করে চলেছেন। ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরও একই বক্তব্য।

ইউনিয়ন নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতপাতের রাজনীতির কথা স্বীকার করেন। তাদের মতে যেহেতু ইউনিয়ন ঠাকুরদের হাতছাড়া হয়েছে, তাই তারা সর্বশক্তি দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন জাতপাতের রাজনীতি সম্পর্কে ইউনিয়ন নেতারা অধ্যাপক পান্ডের প্রহৃত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এই ঘটনার জন্য প্রহৃত অধ্যাপক, যিনি নিজে ব্রাহ্মণ, চারজন ঠাকুর ছাত্রকে অভিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আরটস ফ্যাকালটির ডিন, যিনি নিজে ঠাকুর, এ জন্য দায়ী করেন দশজন ভূমিহার ও ব্রাহ্মণ ছাত্রকে।

অনিল শ্রীবাস্তব

উপাচার্য ডঃ ইকবাল নারায়ণ একজন লালা। লালারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গোষ্ঠী। উপাচার্য যখনই কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জাতপাতে বহুধা বিভক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহল থেকে চাপ এসেছে তা কার্যকর না করার। উপাচার্যের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষা, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। উপাচার্য একটু শক্ত হাতে হাল ধরতেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতপাতের রাজনীতি সম্পর্কে উপাচার্য অবহিত। তবে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোন সহজ সমাধান নেই। তাঁর মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বদলির ব্যবস্থা থাকলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অধ্যাপক নিয়োগ ও ছাত্র ভর্তি করলেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির দুর্গ হচ্ছে ৩৯টি প্রাসাদোপম ছাত্রাবাস। অন্তত ৪০ শতাংশ আবাসিক (প্রায় আট হাজার) অবৈধভাবে বাস করেন এই সব ছাত্রাবাসগুলিতে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ ছাত্রাবাসগুলি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের চুরি যাওয়া জিনিসপত্র, জেলা শাসকের শিলমোহর, এমনকি, মিনি মোরফিন প্ল্যান্টও উদ্ধার করেছে। মূলত অবৈধ আবাসিকরাই যাবতীয় গণ্ডগোলের কেন্দ্রবিন্দু। ছাত্র রাজনীতির বকলমে জাতপাতের লড়াইয়ে এরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। দীর্ঘদিন থেকে শূণ্য পড়ে থাকা লোভনীয় রেকটর পদটির জন্য অন্তত ছজন অধ্যাপক এদেরই সহায়তায় নিজেদের স্বপক্ষে কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। অন্যান্য অধ্যাপক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাও নিজেদের স্বার্থে এদের কাছে লাগান। কাজে লাগান রাজনৈতিক নেতারাও। আর এদেরই পেশীবলে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক দশ কোটি টাকার স্থানীয় ক্রয় এবং নির্মাণ ও মেরামতির কাজে মোটা অংকের ভাগ বসান।

উপাচার্য এখন শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে চান। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ অবৈধ আবাসিক মুক্ত ছাত্রাবাস। তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত বৈধ ছাত্ররা তাদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তবে ছাত্রাবাসে থাকার অধিকার পাবে (এর পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা)। যে সব আবাসিকের ঘরে বেআইনি জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপাচার্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষা হল থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি তাঁর আগের সিদ্ধান্তে অটল।

উপাচার্যের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তেই নতুন করে ছাত্র অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। আবার যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে অতি আশাবাদীও এমন কথা বলতে পারেন না। ছাত্র ইউনিয়নের সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় কর্তৃপক্ষের সংগে সমঝোতা করে কোন ছাত্র নেতা অথবা ছাত্রসংস্থা জনপ্রিয়তা হারাতে চাইবেন না। বরং জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য আন্দোলন আরও তীব্রতর করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। অন্তত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সে কথাই বলে। □

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

বাঙালি-অসমীয়া প্রশ্নে ভূপেন হাজারিকা কোন দিকে ?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণসংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা আজ প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে তিনি 'আসু'কে বিদ্রোহী সংগীত লিখে দিচ্ছেন। কিন্তু, যার উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা' অথবা 'মানুষ মানুষের জন্য', যার আদর্শ পল রোবসন, যিনি বিশ্বাস করেন বামপন্থী রাজনীতিতে, গণনাট্য সংঘের সেই প্রাক্তন সদস্যের পক্ষে কি সম্ভব কোন রাষ্ট্রবিরোধী উস্কানি দেওয়া? তাই, শ্রী হাজারিকার মুখ থেকেই সেই জবাব শুনতে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম তাঁর কাছে।

ভূপেন হাজারিকা : কতখানি প্রাদেশিক ?

প্রশ্ন : 'আসু'র সদস্যরা আপনার লেখা গান গেয়ে আন্দোলন করছে, এরকম কথা শোনা যাচ্ছে। 'অসম আমার রূপহী, আই গুনরো নাই শেষ, ভারতের পূর্ব দিশর, সূর্য উঠা দেশ' এবং 'আজির অসমীয় নিজক নিচিনিলে অসম রসাতলে যাব' – দুটি গান গেয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে আবহাওয়া গরম করছেন বলে অভিযোগ।

হাজারিকা : 'আজকের অসমীয়া যদি নিজেকে না চেনে তা হলে আসাম রসাতলে যাবে। প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন বাঙালি বিহু কাঙালি বিহুতে পরিণত হবে। এই হচ্ছে গানটির অর্থ। এখানে প্ররোচনামূলক কিছুই নেই। তাও বাঙালির বিরুদ্ধে আবহাওয়া গরম করার প্রশ্ন উঠছে কেন? রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' বা সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা বাঙালি' পশ্চিমবাংলার বিদ্রোহী বাঙালিরা গান করলে কি বলবেন – রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন? প্রফুল্লচন্দ্র রায় নানাভাবে বাঙালিদের মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেছেন, মাড়োয়ারিদের খপ্পড় থেকে বেড়িয়ে আসতে বলেছেন, তিনি কি প্রাদেশিক? আমি এসব গান লিখেছি ১৯৬০ সালে।

দেশ বা জাতিকে ভালবাসার অধিকার সবার আছে। তবে অন্যকে ত্যাগ করে বা ঘৃণা করে নয়। কলকাতা আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি, আমি এখানকার ভোটার। আসামের শংকরদেবের মত চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আমার সত্তা জুড়ে। বহুবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়' অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করে গেয়েছি।

প্রশ্ন : আর কী কী দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন বা গেয়েছেন?

হাজারিকা : ১৯৬৮ সালে লিখেছি 'নানাজাতি উপজাতি রহনীয়া কৃষ্টি, আকোয়ালি লই হৈছিল সৃষ্টি, এই মোর অসম দেশ'। গানের অর্থ নানা জাতি উপজাতি নানা রঙে ভরা কৃষ্টিকে আলিঙ্গন করে সৃষ্টি হয়েছিল এই আমার আসাম দেশ। সুর আমার দেওয়া। ৬০ সালে গেয়েছি 'মানুহে মানুহের বাবে' (মানুষ মানুষের জন্য)। '৬৩ সালে লিখে সুর দিয়েছি 'গঙ্গার সপরির ভলিতে দেখিবা লুইতর পলসো আছে, তোমারে মোরে আইয়ে কান্দিলে, একে সকুপানী মাছে।' গানটি হেমাঙ্গ বিশ্বাস বাংলায় গেয়েছেন – গঙ্গার পলিমাটির নিচে দেখবে ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি আছে, তোমার এবং আমার মা কাঁদলে একই অশ্রু ঝরে। এসব গান দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য গেয়েছি। দাঙ্গা বা বাঙালি বিতাড়নের জন্য নয়।

প্রশ্ন : শুনলাম আপনি আর হেমাঙ্গবাবু আসাম ঘুরে এসেছেন। কোথায় কোথায় গিয়ে কী দেখলেন? 'আসু'র সঙ্গে কী কথা হল? শিল্পী হিসেবে কী দায়িত্ব পালন করলেন?

হাজারিকা : ৪৪টি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় ঘুরেছি। নেলি, গহপুর, চমরিয়া, জহামারি, বিজলী, মঙ্গলপুর এলাকাগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এখনও থমথমে ভাব। শান্তি কমিটি হয়েছে। যখন যেখানে গেছি তাদেরই আশ্রয় নিয়েছি। আমরা শিল্পীরা শান্তি সমন্বয়ের সেতুবন্ধন করি। সেই সেতু ভেঙে ফেলে রাজনীতি। আবার তাকে গড়তে আমাদের প্রয়োজন হয়। সে বিষয়ে আমি সচেতন। আমি আজীবন এই কাজ করে এসেছি।

হেমাঙ্গদা ১৯৬০ সালে আমার সঙ্গে সারা আসামে ঘুরেছিলেন। এবার স্বাস্থ্যের কারণে ঘুরতে পারেননি। কিন্তু ১৪ থেকে ২২ এপ্রিল গৌহাটিতে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। 'অসমবাণী'তে

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। আমি 'হারাধন রং মন' রচনা করে আসামের সর্বত্র গেয়েছি। হারাধন বাঙালি, রং মন অসমীয়া। দুভাষাতেই গেয়েছি। সকলেই অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আমি দেখেশুনে বুঝেছি নেলি এবং গহপুরের ঘটনা সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক নয়। এর পেছনে রাজনীতির অদৃশ্য হাত রয়েছে। আমি কোনদিন অসমীয়া শ্যভেনিজিম বা বাঙালি শ্যভেনিজিমকে স্থান দিইনি। দুটোই আমার কাছে নিন্দনীয়। উগ্র অসমীয়া এবং উগ্র বাঙালি দুটোই ক্ষতিকর।

১০–২২ ফেবব্রুয়ারি যে দাঙ্গা হয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ মারা গেল, তা গ্রাম্য এলাকাতেই বেশি হয়েছে। শহুরে ও শিক্ষিত মানুষ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে। আসলে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে মানুষের মধ্যে। রিফিউজি ও গরিব মানুষদের জন্য সরকার কিছু করেননি। তাই আজ তারা জমি দখল ও বাঁচার জন্য লড়াই করছে। অর্থনৈতিক শোষণ চলছে। সাধারণ মানুষ জানেন তাঁদের একসঙ্গে থাকতে হবে। দেখেছি, একজন অসমীয়া শিক্ষক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বাঙালি ছাত্ররা অসমীয়া শিক্ষককে অভয় দিচ্ছেন। তারা আক্ষেপ ও অনুশোচনা করছেন, কেন পরস্পরকে মারা হল। সকলেই দ্রুত পুনর্বাসনের প্রত্যাশী। নাগরিকদের দাবি বরডার বন্ধ করে দেওয়া হক। অবৈধদের সরিয়ে দেওয়া হক। দাঙ্গায় বাঙালি ও অসমীয়াদের ভালবাসার ডালপালা কাটলেও শেকড় অনেক গভীরে। তাই তারা একসঙ্গে থাকতে চায়। বৃহত্তর স্বার্থেই তারা একসঙ্গে থাকতে চাইবে।

প্রশ্ন : শিল্পী হিসেবে আপনি আর কী করলেন? কোন ব্যক্তিগত সাহায্য?

হাজারিকা : বোমবের শিল্পী সংস্থার কাছে আবেদন জানাতেই বাসু চ্যাটারজি, রেখা সাবমিস, ডঃ মণি, ইকবাল মাসুদ আমার কাছে দশ হাজার মানুষের জন্য কাপড় পাঠিয়েছেন। সরকারি সাহায্য পর্যাপ্ত নয়। আমি গান গেয়ে অনুষ্ঠান করে কিছু সাহায্য করব।

প্রশ্ন : আপনি একজন লেখকও। শুনেছি কলকাতা থেকে 'আমার প্রতিনিধি' সম্পাদনা করেন। আসামের সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কী?

হাজারিকা : পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন? সাহিত্যিক কবিরা দাঙ্গাবিরোধী প্রচার করলেন না কেন? আসামে স্থানীয় সাংবাদিকরা সঠিক ভূমিকা নেননি। আমি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছি, আমরা গরম লাভার উপর দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সমন্বয় সংহতি বাহিনী গঠন করে উগ্রপন্থীদের বুঝিয়েছি দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছি।

জীবনে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছি। আর সি পি আই নেতা বিপ্লবী জ্যোতিপ্রসাদ, কবি ও গীতিকার বিষ্ণুপ্রসাদ আমার সংগীত শিক্ষাগুরু। '৪২-এর আন্দোলন করেছি। এম এ পড়ার সময় গণসংগীত, লোকসংগীত গেয়ে বেড়িয়েছি আসামের সর্বত্র। শ্রীনারায়ণ মেনন গণসংগীতের জন্য স্কলারশিপ দিয়ে নিউ ইয়র্কে পাঠিয়েছিলেন। আমার মন দিন দিন উদার হয়েছে। আমি কেন বাঙালি বিদ্বেষী হতে যাব? কলকাতার ভোটার আমি, এখানে বেশি রেকর্ড বিক্রি হয়, নিজের পায়ে কুড়ুল মারব?

পৃথিবীর সর্বত্র মেহনতী মানুষ আমাকে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাংলাদেশে শেখ মুজিবের সান্নিধ্য পেয়েছি, '৬৩ সালে মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে শচীন সেনগুপ্ত, মুলকরাজ আনন্দ এদের সঙ্গে মস্কো গিয়েছি।

শ্রীভূপেন হাজারিকার সঙ্গে নানা কথায় এটাই বোঝা গেল শুধু আসামের মাটি তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। আঞ্চলিকতাবাদ ছাড়িয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন জাতীয় চেতনায়। তাঁর কাছে সব জাতি, সব প্রাণ এক।

'গলফ ক্লাব রোডের ছোট্ট তিন কামরায় থেকে রোজ স্বপ্ন দেখেন এমন একজন মানুষকে প্রাদেশিক বলতে মন চায় না। তাঁর কথাতেই বলতে হয়, কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক তিনি হতে পারেন নি। চলে আসার আগে তাঁর মানপত্রে লেখা দেখলাম 'সুরের ভাষায় প্রদেশের সীমা পেরিয়ে সকল ভারতবাসীকে জীবনের আহ্বান শুনিয়ে আপনি জীবনশিল্পীরূপে পরিচিত হয়েছেন।' □

সাক্ষাৎকার : সত্যানন্দ গুহ

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

সুস্থির চিন্তাই স্বস্তির পথ

চিন্ময় সেনগুপ্ত

স্মৃতি বললেই মনে পড়ে যায় - 'স্মৃতি তুমি বেদনা।' অতীতে কোন ব্যাপারেই ব্যর্থ হয়নি, দুঃখ পায়নি, নৈরাশ্য আসেনি - এমন কেউ কি আছে? কেউ নেই। অতীত ব্যর্থতা, দুঃখ-শোকের অভিজ্ঞতা প্রোথিত হয়ে আছে আমাদের প্রত্যেকের অবচেতনায়। কিন্তু এসব তো কৃপণের আপন-গোপন সম্পদ নয়, যে তাদের বারে বারে খুঁড়ে বের করে নেড়েচেড়ে দেখতেই হবে। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালো বাসে!'

কথায় বলি অসাফল্যই সাফল্যের সোপান! কথাটার অর্থটা কী? অর্থ হচ্ছে অসাফল্যের সিঁড়ি ধরে উঠে আসতে হবে সাফল্যের দিকে। সিঁড়ি ধরে উঠে আসা ভুল নয়, সিঁড়ি ধরে বসে থাকা ভুল। কিন্তু প্রায়শই আমরা সেই ভুল করি। ঠকে আর দেখেই তো শিখি। একবার একভাবে চেষ্টা করি, হয়ত ভুল হয়। সেই ভুল সংশোধন করে আবার চেষ্টা করি। হয়ত আবার ভুল হয়। তখন পুনরায় সংশোধন। এইভাবে একদিন আমরা সাফল্যে পৌঁছাই। কিন্তু সেই সব অতীত ভুল ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি পথ চলতে যদি বারে বারে মনে করি, আর সেজন্য নিজেদের অপরাধী বলে ভাবি - তবে সেই ভুল, সেই হতাশাই আমাদের চরম হয়ে দাঁড়ায়। তখন বর্তমান অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। মন বলে ওঠে, আমি তো সেদিন সফল হতে পারিনি, আজকেও বুঝি সফল হব না! তখন নতুন আশা, নতুন উদ্যম নিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

তাহলে এই যে আমরা ব্যর্থতার রোমন্থনে নিজেদের ক্ষতি করছি - এই সংকট থেকে মুক্ত হই কী করে?

এ জাতীয় অর্থহীন দুশ্চিন্তার একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানসম্মত সমাধান - সুস্থির সংগত চিন্তা।

ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা অবচেতন মন ঠিক মনে রাখে। কিন্তু বর্তমান চিন্তাটি যদি সংগত, যুক্তিপূর্ণ এবং সচেতনভাবে লক্ষ্য অভিমুখী হয়, তখন ব্যর্থতার ঐ স্মৃতিগুলো আর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

সুস্থির ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তার মাধ্যমে আমরা কোন বিফলতা থেকে যেটুকু শিখবার ও জানবার তা শিখে নিয়ে, জেনে নিয়ে, ত্রুটিমুক্ত হই। কিন্তু এহ বাহ্য। পরবর্তীকালে ত্রুটির শিক্ষাগুলি শুধু মনে রাখলেই চলবে না, সেই সংগে ব্যর্থতার গ্লানির কথা নির্দ্বিধায় ভুলে যেতে হবে। দুটোই সমান প্রয়োজন। যুক্তিধর্মী মন তার সুস্থির চিন্তায় আমাদের জানিয়ে দেয় যে, জীবনের অগ্রগতির পথে অতীতের দোষ-ত্রুটি, অসাফল্য, এমনকি অপমান - এগুলি শিক্ষারই এক একটি ধাপ। অস্বীকার করে নয়, এদের অতিক্রম করেই আমাদের চরম লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে হবে। এদেরকেই চরম বলে ভাবলে চলবে না। সেই মানুষই সবচেয়ে অসুখী যে তার ব্যর্থ অতীতকে ভুলে যেতে চেয়ে সেই অতীতের কথাই বারবার স্মরণ করে, আর সেইসব ত্রুটির জন্য নিজের ওপর দোষারোপ করে।

এমনই এক অসুখী মহিলা ছিলেন আমাদের পাড়ার ছবিদি। দেখতে সুন্দরী, লম্বা, দোহারা, গৌরী। কিন্তু অদ্ভুত ঝগড়াটে, মারমুখী। গায়ে পড়ে এমনই ঝগড়া করতে পারতেন যে, স্কুলে ডেফিনিট আরটিকেল শেখার পরেই আমরা নির্দ্বিধায় তার প্রয়োগ করি ছবিদির ওপর। অগোচরে ডাকতে থাকি - দি ছবিদি!

দোষের মধ্যে দিদির নীচের ঠোঁটটি ছিল অস্বাভাবিক ফোলা। এর কারণ জানতে চেয়ে শুনেছি ছোটবেলায় একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টের ফলেই নাকি এ অবস্থা! ছবিদি বোধহয় সেই অতীতের কথা ভেবে স্মৃতিচিহ্নটি নিয়ে মনে মনে এত ভুগতেন যে বর্তমানের কোন সুখই তাঁকে খুশি করতে পারত না। পাড়ার সবাইকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। উপরন্তু কেউ তার কাছে গেলে অকারণে তার ওপর এমন চটে উঠতেন, এত চেঁচামেচি করতেন যে দ্বিতীয়বার সে আর ও-মুখো হত না। অথচ ছবিদি হয়ত মনে মনে ভাবতেন চেহারাটা বিকট বলেই তার সংগে কেউ মিশতে চায় না।

একবার তার একমাত্র প্রবাসী ভাই এসে এই সমস্ত দেখে দিদিকে প্রায় জোর করেই বিদেশে নিয়ে গিয়ে প্লাসটিক সারজারি করান।

দেহগত ত্রুটিমুক্ত হয়ে ছবিদি হাসিমুখে দেশে ফেরেন। ঠিক করেন সকলের সংগে মেলামেশা করে বন্ধুত্ব করে সত্যিকারের সোশ্যাল হবেন। কিন্তু এবারেও তার ভয় হয়। ভাবেন আজ ভাল হয়েছেন বলে সকলে কি তাঁর পুরনো সব দুর্ব্যবহার ক্ষমা করে নেবে? নিশ্চয়ই নয়। তার চেহারা স্বাভাবিক দেখে সকলেরই হয়ত মনে পড়ছে পুরনো দিনের কথা। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে ছবিদি যে-তিমিরে, সেই তিমিরে। আগের মতোই বদমেজাজী, ঝগড়াটে। অর্থাৎ সেই পুরনো ভুলটাই করে বসলেন। নিজেকে আবার তিনি গুটিয়ে নিলেন।

অবশেষে এক মনোবিদ বন্ধুর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ছবিদি মন বদলান। অসুখী অতীত রোমন্থন করা ছেড়ে দেন। অচিরেই ফিরে পান স্বাভাবিক জীবন। বন্ধু-বান্ধব, স্বজন-পরিজন। কিছুকাল পর একদিন সবিস্ময়ে 'দি ছবিদির' বিয়ের নেমন্তন্ন পাই। বিয়েতে গিয়ে দেখি পাত্রটি সেই 'দি মনোবিদ'।

বারট্রান্ড রাসেল বলেন, সঠিক কৌশলটি অবলম্বন করলেই আমরা অবচেতন মনের নানা আশংকা ও দুর্ভাবনাকে সহজেই জয় করতে পারি। তাঁর মতে, এই কৌশলটি হল অতীত কৃতকর্মের জন্য, অসাফল্যের জন্য অনুতাপ আসা মাত্র বিচার করে দেখা, কী কারণে অনুতাপ হচ্ছে। অতঃপর একটি একটি করে ভেবে দেখা, সেই কারণগুলি আজ স্মরণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত বা অযৌক্তিক। এই বিচারটি কিন্তু মনের কাছে খুব জোরাল অথচ নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে, আশংকা-দুর্ভাবনাকে একেবারে আমল না দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে- সেদিন কেন পারিনি, আজকে কেন ভাবছি আমি পারবো না?

এবারে জানতে হবে ঐ সব প্রশ্নের উত্তরে আমি যা ভাবছি সেই ভাবনার ভিত্তিতে কি কোন সত্য আছে? না কোন অস্পষ্ট ধারণার ঠান্ডা ছায়ায় বসে আমি নিজেকে নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ রাখছি?

এই পর্যালোচনার পর যদি মনে হয় এতদিন অবাস্তব, অর্থহীন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে এসেছি, নিজেকে কেবলই ছোট করেছি, তাহলে নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত বলে বোধ করতে হবে। এমনকি, নিজের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে হবে। কেননা এই অসম্মানবোধ, এই বিক্ষোভই অনেকের নিজের সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা অদ্ভুতভাবে পাল্টে দিতে পারে।

এক বৃদ্ধ চাষীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল তামাক খাওয়া সে কোনোদিনই ছাড়তে পারবে না। বৌ বহুবার বারণ করেছে, সেও বহুবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অতদিনের পুরনো অভ্যাস, সে কি ছাড়া যায়? প্রতিদিন ভোরে বৃদ্ধ হুঁকোটি নিয়ে তিনমাইল পথ হেঁটে তার ক্ষেতে এসে চাষবাস দেখাশোনা করতো। একদিন ক্ষেতে পৌঁছেই তার হঠাৎ খেয়াল হল হুঁকোটাই সংগে আনা হয়নি। তামাকের অভাবে তখন তার প্রাণ যায়-যায়! অগত্যা সে আবার বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু বুড়ো-হাড়ে আবার তিন মাইল হাঁটা কি সহজ কথা? হাঁটতে হাঁটতে সে টের পেল একটা তুচ্ছ অভ্যাস কী অপমানকরভাবেই না তাকে শাস্তি দিচ্ছে। এই অনুভূতি, এই অসম্মানবোধে বুড়োর মাথা গরম হয়ে উঠল। ক্ষেপে গিয়ে বাড়ি ফেরা থামিয়ে সে তার ক্ষেতেই ফিরে এল। এর পর আর কোনদিন সে তামাক স্পর্শ করেনি।

আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর ব্যাপারটাও প্রায় একই রকম। একবার ব্যবসায়ে তার একটা বড় লোকসান হয়। সে তখন রাত-দিন ধরে চিন্তিত হয়ে ভাবতে থাকে, ভবিষ্যতে সে কি আর কোনদিনও দাঁড়াতে পারবে? এইভাবে ভীত, চিন্তিত অবস্থার মধ্যে ধার করে সে একটা মেশিন কিনবার কথা ভাবে। কিন্তু তার স্ত্রী এ প্রস্তাবে ভীষণ আপত্তি করে। একবার ডুবেছে আবার সে স্বখাতসলিলে ডুবতে নারাজ। পরিষ্কার জানিয়ে দেয় অপদার্থ স্বামীর ওপর আর কোন ভরসাই তার নেই। সারাজীবনে যে শোধ করতে পারবে না সে ধার করতে চায় কোন সাহসে? বৌ এর এই অবিশ্বাসে, এই তিরস্কারে বন্ধুটি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। মনে মনে ভাবে সে কি এতই নগণ্য, তার ক্ষমতা কি এতই সীমিত? সে কি চিরকাল ক্ষতি বিক্ষতিকে ভয় পাওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছে? এই সমস্ত প্রশ্ন তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তখন তার হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই, ধার করবার উপায় নেই, কী পথে এগোবে তাও অজানা। কিন্তু এই অপমানকর অভিজ্ঞতার ফলে মরিয়া হয়ে একটা সাফল্যের পথ ঠিক খুঁজে ফেলে এবং বছর তিনেক বাদে দেখি বন্ধুটি ব্যবসায়ে বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

আমাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং আচরণকে পরিবর্তন করতে গেলে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার সংগে থাকা চাই

সাফল্যের জন্য একটা সুগভীর প্রত্যাশা। আশাবাদী হয়ে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে সেইসব প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে আছে।

ভাবনা আর অনুভূতি দিয়েই যেহেতু আমাদের নেতিবাচক ভ্রান্ত ধারণাগুলো তৈরি, তাই অধিকতর আবেগ আর গভীরতর অনুভূতি দিয়েই আমাদের ইতিবাচক ধারণাগুলিকে পুষ্ট, বলিষ্ঠ করতে হবে।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে এ-ব্যাপারেও সেই দুশ্চিন্তাকেই আমরা ব্যবহার করছি। শুধু তফাৎ এই যে, এখন আমাদের লক্ষ্য আর নঞর্থক নয়, সদর্থক।

সেই সদর্থক লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শুধু করণীয় হল পরিণতির ছবিটাকে বদলে ফেলা। শুভ পরিণতির অবিরাম চিন্তার ফলে সেটা আমাদের কাছে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্যে পৌঁছান সহজ হয়ে ওঠে। কেননা মানুষ সেইরকমটি হয়, যেমনটি সে ভাবে।

সুস্থির চিন্তার কাজই হল, আমাদের মনের ধারণা ও ভাবনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে, যেগুলি যথার্থ সত্য সেগুলি গ্রহণ করা এবং যেগুলি অলীক সেগুলি নির্মমভাবে বর্জন করা। তারপর প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে একটা যথার্থ অভিমত গঠন করা। ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে আসা। সাফল্য-অসাফল্যের কোন প্রমাণ না পাওয়ার আগেই 'আমি পারব না', 'আমি কী করে পারব' – এরকম যুক্তিহীন চিন্তা করলে সুস্থির মনই বলে দেয় চেষ্টা না করে দেখলে কিছুই বলা যাবে না।

মুশকিল হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন ভ্রান্ত চিন্তার দাপটে আমরা নিজেদের ছোট করি আর প্রতিকূলতাকেই বড় করে দেখি। বাধা বিপত্তিকে বিরাট করে দেখে আমরা তাদের সম্বন্ধে এত বেশি ভীত, বিহ্বল ও কাতর হয়ে পড়ি যে, প্রায়শই আমাদের পক্ষে কোন সুস্থির চিন্তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেকে আবার এমন নরম মানুষ যে সামান্য একটা পথ-চলতি মন্তব্য যেমন – 'আপনাকে কিন্তু খুব একটা সুস্থ দেখাচ্ছে না' – এতেই মাত্রাধিক মুষড়ে পড়ে। কেউ তিরস্কার করলে চোখ-কান বুজে সব দোষ মেনে নেয়। এই সমস্ত আচরণ কিন্তু হীনমন্যতারই লক্ষণ। আমাদের তো প্রতিদিনই সামনে-পেছনে কতরকম বিরুদ্ধ মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিপদেই তো আমরা আহত হচ্ছি না। ঐ সুস্থির মনটাই সায় দিচ্ছে না সেইসব মন্তব্য অকপটে মেনে নিয়ে অকারণ আহত হতে।

আর একটা কথা। 'আমি কী চাইছি না,' 'আমি কী পেতে পারি না' এ নিয়ে সুস্থির চিন্তার কোন মাথাব্যথা নেই। তার কাজ আমি কি চাই, কোন লক্ষ্যে যেতে চাই – সেটা স্থির করা। এবং সে ব্যাপারে যথেষ্ট মনোনিবেশ করা।

এছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য যা করণীয় সেই হাতের কাজটির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা এবং তার সংগে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকাও সচেতন, সুস্থির মনের অন্যতম দায়িত্ব। সিদ্ধান্তে আসার পর পরিণতি কী হবে – না-হবে তা নিয়ে সুস্থির মনের কোন দুর্ভাবনা নেই।

কিন্তু কাজটা তো মন করে না। আমরা করি। তখনই বিপদে পড়ি, যখন যেভাবে সুস্থির চিন্তাকে ব্যবহার করার কথা, সেইভাবে ব্যবহার না করে অন্যভাবে করি। এইজন্য সুস্থির চিন্তাকে সংগে নিয়ে আমাদের হাতের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করে যেতে হবে। সবচেয়ে ভাল যা ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে পরম স্বস্তিতে। □

জানতে চাই জানাতে চাই

প্রশ্ন : টেলিভিশন সেট কিনতে গেলে Solid State কথাটা শুনতে পাই। এর মানে কী আর এর লাভ কী?

আমি ইনডিয়ান মেডিক্যাল কাউনসিল ও প্রেস কাউনসিল মূলকেন্দ্রের ঠিকানা চাই, যা নিউ দিল্লিতে অবস্থিত।

জানতে চেয়েছেন কলকাতা-২৯ থেকে প্রহ্লাদ ঘোষ।

উত্তর : Solid State টেলিভিশন সেটগুলি ট্রানজিসটর সিসটেম এবং অরডিনারি টিভিগুলি ভালব সিসটেমযুক্ত।

ট্রানজিসটর সিসটেমের যা কিছু সুযোগ-সুবিধা সেইগুলি Solid State T V-তে পাওয়া যায়।

Medical Council of India, Aiwan-E Ghalib Marg, Kotla Road, New Delhi—110002.

Press Council of India, Farid Court House, Coparnicas Marg, New Delhi—110001.

প্রশ্ন : Licentiate Mechanical Engineering পাশ করবার পর Management Course-এ পড়া যায় কি? যদি যায়, ইত্যাদি.....

প্রশ্নটি করেছেন জলপাইগুড়ি গভঃপলিটেকনিক থেকে পীযূষ মিত্র।

উত্তর : ম্যানেজমেন্ট কোরসগুলি পোসট গ্র্যাজুয়েট ডিগরি অথবা ডিপলোমা। সেজন্য ন্যূনতমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট না হলে ওগুলি পড়া যায় না।

প্রশ্ন : আমার একটি ফটো তোলার দোকান আছে। সেজন্য Film-এর একটি Permit খুবই প্রয়োজন। দয়া করে কোথায় যোগাযোগ করব জানাবেন।

উত্তরপাড়া, হুগলী থেকে প্রতীপ পাল।

উত্তর : ইসট ইনডিয়া ট্রেডারস অ্যাসোসিয়েশন, ১ আরমেনিয়ান স্টিট, (মারচেনট চেমবারস বিলডিংস, দ্বিতল) কলকাতা-৭ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন : এমন কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান দিন যাতে সংসারধর্ম ও সন্ন্যাসধর্মের মিলন বর্তমান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দর সংলাপ, মিলন ও কথোপকথনের সূত্র ধরে প্রামাণ্য গ্রন্থ কী আছে? গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম জানাবেন।

প্রশ্নকর্তা – অমিয় মুখোপাধ্যায়, দমদম, কলকাতা-৭৪।

উত্তর : এ ব্যাপারে প্রামাণ্য গ্রন্থটি শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৪র্থ খণ্ড) এবং হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত গ্রন্থটিতে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাবেন। □

উত্তর দিয়েছেন :
সোমনাথ মিত্র

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ-তে যোগদানকারী ব্যক্তির নাম এবং ক্রমান্বয়ে সদস্য ক্রম, ঠিকানা, বয়স, শখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল:

বাসু ওঝা □ ক্রম ৩৬
কে/অ এস কে ওঝা, রেলওয়ে কোয়ার্টারস নং ৪৯/বি ট্রাফিক কলোনি, বর্ধমান ৭১৩১০১। ১৮ বছর, বসুত্ব ক্রিকেট খেলা, ছাত্র।

[illegible] □ ক্রম ৩৭
কে/অ [illegible] রোড, [illegible] কলকাতা ৭০০০৪৯। ২৩ বছর, দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকা পড়া, সিনেমা দেখা, বেলাধুলা, [illegible]।

[illegible] □ ক্রম ৩৮
[illegible]

[illegible] □ ক্রম ৩৯
[illegible] চাকরি।

[illegible] □ ক্রম ৪০
কে/অ [illegible] [illegible]

[illegible] আবু জাহের □ ক্রম ৪১
[illegible] পোঃ পার্বতীপুর, [illegible] পাইগুড়ি। ১৯ বছর, বিদেশি রেডিও স্টেশন শোনা, বিদ্যালয় স্নাতক, কৃষিজীবী।

অসীম ভাওয়াল □ ক্রম ৪২
কে/অ কে সি ভাওয়াল, নিউ টাউন পোঃ ও জেলা : কোচবিহার ৭৩৬১০১। ১৯ বছর, স্ট্যাম্প সংগ্রহ চিঠি লেখা, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, ছাত্র।

অতুল কুমার দে □ ক্রম ৪৩
পি ১৯, সি আই টি রোড, [illegible] কলকাতা ৭০০০০৩। ২৭ বছর, ছবি তোলা বন্ধুত্ব পত্রিকা ও বইপড়া গান শোনা সিনেমা দেখা, [illegible] চাকরি।

[illegible] □ ক্রম ৪৪
[illegible] কলকাতা [illegible]। ২৫ বছর, পড়াশুনা ভ্রমণ বন্ধুত্ব, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, চাকরি।

[illegible] □ ক্রম ৪৫
[illegible] পাড়া, পোঃ [illegible]পুর, [illegible] ১৮ বছর রেডিও শোনা, [illegible] উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, চাকরি।

[illegible] রশীদ □ ক্রম ৪৬
গ্রাম : [illegible]পুর, পোঃ শিবরামপুর, জেলা : ফরিদপুর, বাংলাদেশ। উদ্দেশ্য স্নেহ, সৌহার্দ্য স্থাপনই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

3rd ... INDIA

কলকাতায় তৃতীয় নব্য যুবা চলচ্চিত্র উৎসব ব্যর্থ হল কেন ?

দিব্যজ্যোতি বসু

সংস্কৃতির শহর কলকাতায় রদাঁর প্রদর্শনী থেকে শুরু করে তন্তুজের শাড়িমেলা কিছুই নাকি ফাঁকা যায় না। দূরদর্শনের কল্যাণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনের ক্রিকেট টেস্ট বা ফুটবল ফাইনালের চেহারাটা যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন স্টেডিয়াম বা গ্যালারিগুলির ফাঁকা অবস্থা বা অল্পভিড় দেখলে কলকাতায় হা-হুতাশ শোনা যায়, 'ইস্ খেলাটা যদি কলকাতায় হত.... ...।' বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের যশস্বী গাইয়েরা কলকাতার শ্রোতাদের সামনে গান বাজনা করে যত আনন্দ পান, দুনিয়ার কোথাও সে রকম পান না। সংবাদমাধ্যম অধ্যুষিত দুনিয়ায় এ খবর আজ সকলেরই জানা যে, কলকাতার লোকেরা 'অ্যাপ্রিসিয়েশন' ব্যাপারটা খুব ভাল বোঝে। কিন্তু কলকাতার এ হেন সংস্কৃতি সচেতনতার কড়া প্রহরা এড়িয়ে যেভাবে অনাদরে অবহেলায় 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক নব্য যুবা চলচ্চিত্র উৎসব' শেষ হল তা শুধু মাত্র আশ্চর্যেরই নয়, রীতিমত লজ্জারও। গত ৪ নভেম্বর থেকে নিউ এমপায়ার প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল এই উৎসব। আন্তর্জাতিক এ উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল ভারতের চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটি। ভারত ছাড়া আরও ৩০টি দেশ এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল। উৎসবের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল নিউ এমপায়ার প্রেক্ষাগৃহ। এখানে প্রতিদিন ৪টে শোয়ে বিভিন্ন ছবি দেখান হত। এ ছাড়া মেট্রো, গ্লোব, সোসাইটি, ওরিয়েনট, ইন্দিরা, প্রিয়া, নবীনা, মিত্রা ও রাধা সিনেমা হলগুলিতেও প্রতিদিন সকাল নটায় একটা করে প্রাতঃপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। হল মালিকরা বিনা খরচে এ ক'দিন হল ছেড়ে দিয়েছিলেন। নবীনা সিনেমা হলের মালিক তো উৎসব চলাকালীন কর্মচারীদের ভাতা বাবদ যে খরচ খরচা হল তাও নিজের পকেট থেকেই দিলেন। স্টেট ব্যাংক অব ইনডিয়া ১৫০০০ টাকা অর্থ-সাহায্য করেছেন, অর্থ-সাহায্য করেছেন ব্যাংক অব ইনডিয়া। চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যাপারে রাজ্য সরকারও কোনরকম কার্পণ্য করেননি - গ্রেট ইস্টারন হোটেলে উৎসবের কর্মকর্তা, জুরি, ডেলিগেটদের থাকার বন্দোবস্ত করা, প্রদর্শনযোগ্য ছবিগুলিকে সবরকম করমুক্ত করা, যাতায়াতের জন্য অজস্র গাড়ি আর লাকসারি কোচের আয়োজন থেকে শুরু করে, শোনা গেছে আমন্ত্রিত অতিথিদের বাহা খরচও নাকি রাজ্য সরকারই বহন করেছেন। চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটির সভাপতি শান্তা বাসের হিসেবে এই উৎসবে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য এই বিশাল আয়োজন সেই শিশু, বা নব্য যুবা বা ছোটদের ছবি দেখতে যাদের অবাধ প্রবেশাধিকার সেইসব কলকাতার প্রাপ্ত বয়স্করাও কেন উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন এ ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

৪ নভেম্বর উৎসব শুরু হওয়ার আগে উদ্যোক্তারা ২৪ অকটোবর ও ৩ নভেম্বর দু দুটো সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই জনগণের কাছে এই চলচ্চিত্র বিষয়ক সংবাদ ঠিকঠাক পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু ২৪ অকটোবরের সাংবাদিক বৈঠকের খবর পরের দিনের দৈনিক কাগজগুলিতে প্রায় চোখে না পড়ার মত করেই বেরিয়েছিল। এদিকে ৩ নভেম্বর অবধিও দৈনিক কাগজগুলোতে মাত্র একটা বিজ্ঞাপন দিয়েই উৎসবে প্রথম সপ্তাহে প্রদর্শিত ছবিগুলি সম্পর্কে জনগণকে জানান হয়েছিল। ফলে এই দুর্বল যোগাযোগের দরুন কলকাতার বেশির ভাগ লোকের কাছেই সময়মত এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ পৌঁছয়নি। অথচ ১৯৮২র ফিলমোৎসবের সময় কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই কাগজে কাগজে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু লেখালেখি শুরু হয়ে গিয়েছিল - অবশ্য কেউ কেউ হয়ত বলবেন ফিলমোৎসবের সংগে এই ধরনের 'নব্য যুবা চলচ্চিত্র উৎসবের' তুলনা করা অসমীচীন; কেননা ফিলমোৎসবে বড়দের ছবির জন্য কেন যে এত ভিড় হয় সে কথা ত একরকম ওপেন সিকরেট, সেখানে কতরকম .... .। যাক সে কথা।

এই নব্য যুবা চলচ্চিত্র উৎসবে কেন ভিড় হয়নি তা জানার আগে অবশ্য কতটা ভিড় হয়েছিল তা জেনে নেওয়া যাক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিউ এমপায়ার হলে শুধু আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য দেখান হল প্রতিযোগিতার বাইরের মারকিন ছবি 'ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন রিটারনস'। এই প্রদর্শনীতে কতটা ভিড় হল না হল সেটা ঠিক বিবেচ্য নয়। এই দিনই সকাল নটায় গ্লোব, ওরিয়েনট, মেট্রো ইত্যাদি অন্যান্য হলগুলিতেও অবশ্য বিভিন্ন ছবি দেখানর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কেমন ভিড় হয়েছিল দেখা যাক। সোসাইটিতে চেকোশলোভাকিয়ার ছবি 'ড্রাগন ডাউন দা লেন' দেখার জন্য এসেছিলেন মাত্র ১৫ জন দর্শক।

শাং-রাম ভাষণ দিচ্ছেন

চলচ্চিত্র উৎসব কাদের জন্য

মেট্রোয় [illegible] চেক ছবি 'দ্য থারড প্রিন্স' — এসেছিলেন ৮০ জন চিত্রামোদী। গ্লোবেও চলছিল চেক ছবি 'ক্রিনকারশিকো'। ১০৭ জনের বেশি দর্শক সে ছবি দেখেননি। ওরিয়েনটে বুলগেরিয়ার একটা অ্যানিমেশন ফিলম দেখতে টিকিট কেটেছিলেন ৩৯ জন। তবে ছবি শেষ হওয়ার পর হল থেকে ২০ জনের বেশি দর্শককে বেরোতে দেখা যায়নি। প্রিয়া, মিত্রা, রাধা, ইন্দিরা সব হলগুলিতেই একই অবস্থা। তবে এরই মধ্যে নবীনায় বুলগেরিয়ার ছবি 'মাবগি' দেখতে সবচেয়ে বেশি দর্শক এসেছিলেন ১৫৫ জন। পরের দিনের মরনিং শোয়েও টিকিট বিক্রির হাল ওই একই। তবে ৬ তারিখ রবিবার বলেই বোধহয় প্রথম দুদিনের মত সর্বহারা অবস্থায় এই হলগুলিকে কাটাতে হয়নি। গ্লোবে চেক ছবি 'ইনকমপ্লিট একলিপস' দেখতে হলের নশোর মত আসনে শ দুয়েক লোক এসেছিলেন। অন্যান্য হলেও ওই কম বেশি একই রকম। ব্যতিক্রম সামাইটি। কারণ এখানে দেখান হচ্ছিল 'শেক স্প্যানিয়ান বিচারকদের'। ছবিটির খ্যাতি হয়ত ইতিমধ্যে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল নিউ এম্পায়ারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখানোর ফলে। তিনশো টিকিট বিক্রি হয়েছে ওই দিন সোসাইটি হলে। একরকমই প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখাতে দেখাতে কেটে গেছে উৎসবের প্রথম সপ্তাহ। তবে তুলনামূলকভাবে নিউ এম্পায়ারে কিন্তু রোজই ভিড় হয়েছে। কারণ হিসেবে অবশ্য বলা যেতে পারে নিউ এম্পায়ারেই ছিল আমন্ত্রিত অতিথি, বিচারক ও প্রেসের লোকজনদের ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত। এ ছাড়া খুব অল্পই আসন ছিল সাধারণ চিত্রামোদীদের জন্য। ফলে তা ভর্তি হয়ে যেতে বেশি দেরি হয়নি। এর ওপর নিউ এম্পায়ার হলের অবস্থিতির জন্যও এই হলে সোয়া এগারোটা, তিনটে ও সোয়া পাঁচটা এই তিনটে শোয়েই টিকিট বিক্রির চাহিদা মোটামুটি ভালর দিকেই ছিল। কিন্তু উৎসবের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া সত্ত্বেও নিউ এম্পায়ারের সকাল নটার শোগুলি কিন্তু অন্যান্য হলগুলির মতই মার খেয়েছে। দ্বিতীয় সপ্তাহের মুখে পড়ে ভিড় একটু একটু করে যেন বাড়ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়েছে চীনের ছবি 'বাবলিং স্প্রিং' দেখার জন্য। অবশ্য দর্শকাসনের সিংহভাগই দখল করেছিলেন কলকাতাবাসী চীনারা।

প্রাতঃপ্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শকদের এই অনুপস্থিতির মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে চলচ্চিত্র উৎসবে কেন ভিড় হল না প্রশ্নের অন্যতম উত্তর। মাসখানেক ধরে পুজোর ছুটি উপভোগ করার পর সবে যখন কলকাতার স্কুলগুলি খুলতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই বসেছে এই নব্য যুবা চলচ্চিত্র উৎসবের আসর। ফলে স্কুল কামাই করে ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিতে পারেনি প্রাতঃপ্রদর্শনীগুলিতে। ওদের অভিযোগ- 'নিউ এম্পায়ার ছাড়া অন্য হলগুলোতে তো ওই একটা মাত্র সকালের শোই ভরসা। স্কুল কামাই করে সিনেমা দেখতে যাই কী করে সামনেই আবার পরীক্ষা। কেন সিনেমা শোগুলি কি সোয়া পাঁচটায় করা যেত না। সবচেয়ে ভাল হত এই উৎসব যদি আরও কিছুদিন পিছিয়ে দিয়ে ডিসেম্বরের শেষাশেষি করা হত, তাহলে আমরা সবাই ছবিগুলি দেখার সুযোগ পেতাম।' এই অভিযোগের উত্তরে উৎসব অধিকর্তা শ্রী মোহরে জানিয়েছেন, 'এই সমস্যা নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম – কিন্তু আমাদের পক্ষে উৎসব পিছিয়ে দেবার উপায় ছিল না, এর আগে বোমবে বা মাদ্রাজে যে চলচ্চিত্র উৎসব আমরা করেছি তাও ঠিক এই সময়েই হয়েছিল, ফলে এখন নতুন করে ডেট পিছিয়ে দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ত। তাছাড়া, আমরা সার্ভে করে দেখেছি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এখন এই সময়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। উৎসব কর্তৃপক্ষের এই যুক্তির কাছে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা হেরে গেছে, ফলে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামতই উৎসবের আয়োজনও করা হয়েছে। তাঁরা ভেবে দেখেননি যে পশ্চিমবঙ্গে যখন উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের রীতি অনুযায়ী করাই দরকার, সেখানে উগানডার মত নিয়ম করে কাজ চালাতে গেলে তো গোটা কাজটাই বানচাল হয়ে যায়, তাই হয়েওছে। যাদের জন্য এই উৎসবের আয়োজন, তারা কেউই তো দেখতে পেল না ছবিগুলি।

স্কুলের উপস্থিতি, পরীক্ষার পড়াকে দূরে সরিয়ে রেখে ছাত্রছাত্রীরা না হয় উপভোগ করতে পারল না এ চলচ্চিত্র উৎসব – কিন্তু সংস্কৃতির গরবে গরীয়ান কলকাতার চলচ্চিত্র বোদ্ধা, চলচ্চিত্র পরিচালক বা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ কোন পরীক্ষার পড়া করছিলেন? তাঁদের কেন সেভাবে উৎসবে যোগ দিতে দেখা গেল না। উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত একমাত্র অনিল চ্যাটারজিকেই দেখা গেল উৎফুল্লভাবে উৎসবের অংশীদার হতে। অরুন্ধতী দেবীকেও রোজ না হলেও প্রায়ই দেখা গেছে (অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ওঁর স্বামী তপন সিংহ ছিলেন জুরি বোর্ডের সভাপতি)। একদিন বাংলা ছবি 'বন্দুকবাজ' এর শোতে শ্রীলা মজুমদারকে বসে থাকতে দেখা গেছিল। এভাবে হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ এসেছিলেন, কিন্তু চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেওয়ার যে বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা উচিত (বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যাঁরা সরাসরিভাবে যুক্ত) তা কাউকেই পালন করতে দেখা যায়নি। অথচ তাঁরা যদি এ উৎসবে যোগ দিতেন তবে দেখতে পারতেন, শিখতে পারতেন কীভাবে ছোটদের জন্য, নব্য যুবাদের জন্য সার্থকভাবে ছবি তৈরি করা যায়। এ উৎসবে প্রায় ১৫১টা ছবি দেখান হয়েছে। তার মধ্যে ফিচার ফিলমের সংখ্যা ছিল ৬৬ ও বাকিগুলি শরট ফিলম। প্রতিযোগিতা বিভাগের বাবলিং স্প্রিং, থ্রি ইজ আ ক্রাউড, আই ডোনট ওয়ানট টু বি গ্রোন আপ, ইনকমপ্লিট একলিপসের মত ছবিগুলি দেখে বোঝা যায় যে শিশু বা নব্য যুবাদের জন্য ছবিগুলি ঠিক কী ধরনের হওয়া উচিত। ছবিগুলি নিয়ে বিশদভাবে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

তপন সিংহের নেতৃত্বে যে সাতজনের জুরি বোরড গঠন করা হয়েছিল তাঁরা এই উৎসবের সেরা ছবি হিসেবে 'স্বর্ণ হস্তী' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করলেন চীনের ছবি 'বাবলিং স্প্রিং।' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাত থেকে সেরা ছবির পুরস্কার গ্রহণ করলেন জুরি বোরডের সদস্যা চীনের শ্রীমতী ওয়াং জুনকেং। দ্বিতীয় সেরা ছবির জন্য নির্বাচিত হল চেক ছবি 'ইনকমপ্লিট একলিপস'। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের জন্য এ ছবি

আরও দুটি পুরস্কার পেয়েছে। বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে যুক্তরাজ্যের ছবি 'ফ্রেনড অর ফো'। শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র অভিনেতার পুরস্কারটি পেয়েছে সোভিয়েত ছবি 'আই ডোনট ওয়ানট টু বি গ্রোন আপ'-এর পাভলিক চরিত্রের খুদে অভিনেতা। খুদে অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে 'বাবলিং স্প্রিং'-এ 'ডামি' চরিত্রটিকে একেবারে নিখুঁত করে ফুটিয়ে তোলার জন্য ওয়াং শিয়া-ইন। ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশনের 'ফকস অ্যানড দি হাউনড' সেরা অ্যানিমেশন ফিলম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। 'গ্যালিভার ট্র্যাভেলস' ছবিতে সংগীত পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের সম্মান কুড়িয়েছেন অ্যানটোনিও অ্যারেটা। এগারো বছরের ব্রেজিলের খুদে পরিচালকও যুক্তিযুক্তভাবে তাঁর ছবি 'রিজেনট'-এর জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছে। একটি বিশেষ সমস্যাকে সার্থকভাবে তুলে ধরার জন্য নেদারল্যানডের ছবি 'থ্রি ইজ আ ক্রাউড'ও বিশেষ-

পরিচালক কারস্ট ভন দার মিউলেন

ভাবে সম্মানিত হয়েছে। তবে এই ছবিটি মূল পুরস্কারগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। সমাজের অত্যন্ত জরুরি একটা সমস্যাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়েও পরিচালক কোন সময়েই ছবিটির রাশ আলগা হতে দেননি। যে সব ছবি একই সংগে ছোটদের আনন্দ দেয় ও বড়দের ভাবায় সেই ধরনের ছবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'থ্রি ইজ আ ক্রাউড'। উৎসবে দেখান বেশির ভাগ ছবির মানই যথেষ্ট উচুঁদরের। তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতা বিভাগে ও প্রতিযোগিতার বাইরে যেসব ভারতীয় ছবি দেখান হল তার নিকৃষ্ট মান দেখে ভারতীয় হিসাবে লজ্জায় পড়তে হয়। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ যে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে 'কাশ্মীরা', 'ওমানাথিংগাল', 'ছেলেটা' বা 'বন্দুকবাজ' সে কথাই আর একবার মনে করিয়ে দেয়।

অবশ্য ভারতের ১৩টি রাজ্যের থেকে নির্বাচিত খুদে বিচারকরা কিন্তু 'ওমানাথিংগাল'কে তৃতীয় সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত করেছে। খুদে বিচারকদের সভাপতি কর্ণাটকের ভি প্রশান্ত যখন তাদের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিল তখন সেই তালিকায় 'ওমানাথিংগালের' নাম শুনে সবাই রীতিমত চমকে উঠেছিল। পুরস্কার নেবার সময় 'ওমানাথিংগাল'-এর প্রতিনিধি মঞ্চে এলেন তখন চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটির ভি শান্তারাম তো তাঁর স্বভাবসুলভ চপলতায় বলেই ফেললেন 'যাক, তুমিও পুরস্কার পেয়ে গেলে!' খুদেদের বিচারে দ্বিতীয় সেরা ছবির পুরস্কার পেল চীনের 'বাবলিং স্প্রিং'। আর ওদের নির্বাচনে ছবির 'জ্ঞানদীপ' পুরস্কার পেল শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ছবি 'আই ডোনট ওয়ানট টু বি গ্রোন আপ'।

পশ্চিমবাংলার মৌসুমী সাহা

[illegible]

'আমি বড় হতে চাই'-কে পুরস্কার দিল ছোট বিচারকরা

এই নিষ্প্রভ উৎসবকে জীইয়ে রেখেছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ১৫০ জন ছেলেমেয়ে এখানে একসংগে জড়ো হয়েছিল। এই খুদেদের দলের দলপতি ভি প্রশান্তের মতে এই সম্মেলন হল আর কিছুই নয় 'a symbol of integration'। প্রত্যেকটি ছবি দেখা, ছবির জন্য কত মারকস দেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা ও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালান এই সবই ভুলিয়ে দিচ্ছিল যে ওরা এখনও প্রায় সবাই স্কুলের গণ্ডীই পেরোয়নি। ভাবখানা বেশ বড়দের মত। তবে ভাব হলে কী হবে, বয়সটা তো নেহাতই কাঁচা – তাই ওদের জন্য যেরকম ভাবে সোমনাথ হলে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে ওরা ঠিক খুশী নয়। ওদের মতে 'রান্না তো মুখেই দেওয়া যায় না – ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোলের মত সাধারণ খাবারও তৃপ্তি করে খাওয়া যায়, যদি একটু ভাল রান্না হয়।' ঝালের জন্য অন্যান্য প্রদেশের বেশির ভাগই নাকি একদিনও পেট ভরে খায়নি। যেখানে শুতে দেওয়া হয়েছিল গত দশদিন ধরে নাকি সেই বিছানার বেড-কভার একবারও বদলান হয়নি। এসব দেখেশুনে পশ্চিমবংগের প্রতিনিধিরা খুব লজ্জায় পড়েছে। পশ্চিমবংগ থেকে নির্বাচিত খুদে জুরি মৌসুমী সাহা অভিযোগ করেছে, 'আমার এত খারাপ লাগছে যে কী বলব? এদের থাকা-খাওয়ার

পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা

কর্ণাটকের ভি প্রশান্ত

ব্যাপারে যেন কারও কোন নজরই নেই। কাকেই বা বলব? যাকেই বলতে যাই সেই বলে – দেখছি, দেখছি------।'

আসলে এইসব অল্পবয়স্কদের কথা মাথায় রাখার মত সময় উদ্যোক্তারা খরচ করতে বোধহয় রাজী নয়। চলচ্চিত্র যেহেতু নব্য যুবাদের জন্য, তাই নিয়মরক্ষার্থে যেন

সিকিমের শেরাপ শেরিং ভুটি

এদের নানান রাজ্য থেকে ধরে ধরে আনা। চলচ্চিত্র উৎসবে এরা নিছকই যেন একটা 'এমবেলিশমেনট'। দশদিন ধরে কিছু ছবি দেখা হল, কিছু লোকের সংগে মেলামেশা হল – ব্যস, তারপর সব শেষ। যে যার রাজ্যে ফিরে গিয়ে আবার যার যার আবর্তে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে এইসব কিশোর-কিশোরীদের মনে যে চলচ্চিত্রবোধ জেগে ওঠে, বিদেশের বহু ভালভাল ছবি দেখে তার গুণাগুণ বিচার করতে শেখার সুযোগে তাদের মনে যে চলচ্চিত্রচিন্তার উন্মেষ হয় তাকে জীইয়ে রাখার দায়িত্ব কারা নেবে? একবছর বাদে যখন আবার এই নিও ইয়ুথ চলচ্চিত্র উৎসবের আসর অন্য কোন রাজ্যে বসবে তখন এরা কোথায়? যেমন বোমবাই চলচ্চিত্র উৎসবের পশ্চিমবংগের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়া কাজরী, কুশল, সুস্মিতা, আনন্দ, সুজয়ের দল আর বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখায়নি এবারকার চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে, তেমনি হয়ত ভি প্রশান্ত বা মৌসুমীরাও ভবিষ্যতে মুখ ফিরিয়ে থাকবে এই ধরনের উৎসবের আঙিনা থেকে। চিলড্রেনস ফিলম সোসাইটি ছোটদের জন্য চলচ্চিত্র তুলতে বা ভি শান্তারামের প্ল্যান অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে ছবি দেখাবার ব্যাপারে যেরকম উৎসাহ দেখান, তেমনি আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরী বা নব্য যুবাদের মধ্যে সুস্থ চলচ্চিত্র-ভাবনা যাতে সঠিকভাবে লালন করা যায় সেদিকেও একটু নজর দিন না, তাহলে এবার কলকাতায় যেরকম হল সেভাবে ভবিষ্যতের উৎসবগুলিও ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

আলোকচিত্র:
সৌগত রায় বর্মন

শব্দশৃঙ্খল

শব্দশৃঙ্খল – ৭৪

১	২	৩	■	৪	৫	৬	■
৭			■	৮			■
	■	■	৯		■	১০	
১১	১২	১৩	■	১৪	১৫	■	■
■	১৬			■	১৭		১৮
১৯	■		■	২০		■	
২১	২২		২৩		■	২৪	
২৫		■	২৬				■

সূত্র : পাশাপাশি

১। পা দিয়ে তালে,
চড়ব আজব রেলে

৪। চেক বা ধার নহে,
অর্থ মজুত রহে

৭। সামনে রাস টানি,
গর্দভকে আনি

৮। হেথায় হাজির যিনি,
রাজ্য চালান তিনি

৯। বন্ধ জল তাই,
নদীর ধারে পাই

১০। শয্যা-বস্ত্র আদি,
গাঁটরি করে বাঁধি

১১। বিশ্বকর্মা, সূত্রধর,
ছিদ্রকারী; নাগবর

১৪। একই রকম মনে হয়,
অন্য অর্থে ইচ্ছা কয়

১৬। মাল সামনে আনি,
দেখি বাগান খানি

১৭। পতিহীনা ইনি,
শুভ্রবেশা জানি

২০। এক অর্থে শক্তি পাবে,
অন্য বুঝলে মাঠে যাবে

২১। সাপলাই নিতে এসে,
শূকর পেলাম শেষে

২৪। পেতল কিংবা মাটি,
বড় জলের ঘটি

২৫। হল অধীনতা,
দুই অক্ষরে তা

২৬। জীবনানন্দের নদী,
বলতে পার যদি

সূত্র : ওপর-নিচ

১। নীল শূন্যতায়,
উড়ে চলে যায়

২। কাগজের ছবি নিয়ে,
চারজনা খেলি গিয়ে

৩। নিতে যদি চাও
লাভ হবে তাও

৪। ছোটলোক একেবারে,
এক শব্দে ধরি তারে

৫। ঐরাবতের ছেলে,
চলে হেলে দুলে

৬। বত্রিশটি ভাই,
মুখের মধ্যে পাই

১২। মহতের গুণ জানি,
উদারতা বলে গনি

১৩। জলের শব্দ শুনি,
গোলমালের ধ্বনি

১৫। টাকা পয়সার ভাণ্ড,
তিন অক্ষরের কাণ্ড

১৮। কাজকর্মে ব্যাঘাত হলে,
বিরক্ত হয়ে লোকে বলে

১৯। জনগণের ভালর তরে,
শাসক 'দণ্ড' ধরেন করে

২০। কথা কথায় 'বয়া',
শুদ্ধ ভাষায় কওয়া

২২। সোনা দানা মাপতে লাগে,
মনের মাঝে বিলাস জাগে

২৩। 'রা' নাহি দেন ইনি,
শ্যাম বিনোদিনী

২৪। গোপন গুপ্ত মন্ত্র,
সময় দেখার যন্ত্র

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২৮ ডিসেমবর সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫-১২-৮৩। সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দ-শৃঙ্খলের নমবরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল–৭০ (সমাধান)

ভ	গ	বা	ন	■	শ	র	ত
মা	হী	■	খ	দ্যো	ত	■	ক্ষ
টি	ন	ক	■	■	দ	ম	ক
■	■	বী	ত	■	ল	হ	■
বা	হা	র	■	■	বা	না	ই
জ	মা	■	আ	ম	শি	■	হা
খাঁ	■	ম	হা	রা	ণী	■	ম
ই	ত	রু	■	ল	■	হা	তী

শব্দশৃঙ্খল–৭০ এর জন্যে কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন অনিল কুমার দত্ত (কে সি অফিস, পীড়র গাড়ী, সুখাডালী, বাঁকুড়া) ও সেবা দে (৪৬/১০, বেচারাম চাটারজি রোড, কলকাতা-৩৪)।

শব্দশৃঙ্খল -৭০ এর লটারিতে বিচারক ছিলেন শ্যামলী বসু।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

নভেমবর ৩০ থেকে ডিসেমবর ৬

মেষ : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি। আর্থিক অশান্তি; প্রচুর ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন; মেয়েদের কোন ব্যাপারে আপস। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সন্তানের উন্নতির ইংগিত। হঠাৎ ধর্মকর্মের যোগ। ব্যবসায়ীদের আগের কোন প্রচেষ্টায় সাফল্যের আভাস।

বৃষ : শারীরিক অবস্থার ধীরে উন্নতি; মেয়েদের পুরনো কোন রোগের জের চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য পূরণ। কর্মক্ষেত্রে ঘটনার গতি নতুন দিকে মোড় নেবে। মেয়েদের কর্মস্থলে পরিবেশ ঘোরাল হতে পারে। পারিবারিক কোন ব্যাপারে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মিথুন : শারীরিক ব্যাপারে নতুন কোন উৎপাত; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ব্যাপারে মানসিক উৎকণ্ঠা। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কারও পরামর্শে লাভ; মেয়েদের কর্মস্থলে জটিলতা দূর। পারিবারিক নানান ব্যাপারে শান্তি থাকবে। কোন সন্তানের জন্য উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি।

কর্কট : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল যাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের চাপ কমবে। কর্মক্ষেত্রে সংযম প্রয়োজন হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ গুণে সমাদৃত। দূরের কোন সংবাদে দুঃখ; কোন নিকটজন বিয়োগ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

সিংহ : শারীরিক ভোগান্তি চলবে; মেয়েদের শরীর নিয়ে উৎপাত। আর্থিক জটিলতা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধিতে কার্যোদ্ধার; মেয়েদের কর্মস্থলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রীতির প্রসার। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ প্রবল হবে। ব্যবসায়ীদের সামান্য আয় বৃদ্ধি।

কন্যা : শরীর সামান্য ভোগাবে; মেয়েদের ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি। অতিরিক্ত অর্থের প্রত্যাশায় বিশেষ ক্ষতি। কর্মস্থলে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নৈকট্য। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ইংগিত। পারিবারিক কোন কুৎসা ক্ষতি করবে। ভ্রমণ ব্যাপারে শেষ মুহূর্তে বাধা। ব্যবসায়ীদের সামান্য ক্ষতি।

তুলা : নিজ দোষে শারীরিক ভোগান্তি; মেয়েদের শরীর ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে। আর্থিক ঝামেলা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত অগ্রগতির ইংগিত; মেয়েদের কর্মস্থলে সুপরিবেশ বজায় থাকবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়েদের আচমকা প্রাপ্তিযোগ। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বৃশ্চিক : পেট সংক্রান্ত গোলযোগ; মেয়েদের দাঁত সংক্রান্ত ভোগান্তি। ব্যয়ের চাপ সামান্য কমবে। কর্মস্থলে কোন উদ্দেশ্য পূরণ; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে মানসিক অস্থিরতা। প্রিয়জন বিয়োগের আশংকা। মেয়েদের অপরের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

ধনু : স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন; মেয়েদের দ্রুত শারীরিক উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে ঝামেলা বাড়বে; নৈরাশ্য। কর্মস্থলে কোন অযাচিত উপদেশে কান না দেওয়া উচিত; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অসম্মান। কোন বন্ধুর পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা সমাধান। ব্যবসায়ীদের আগের কোন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে।

মকর : শরীর অনেকটা ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক ঝামেলা থাকবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। এবং সেই সংগে সঞ্চয়ও। কর্মস্থলে শত্রুরা সাময়িক নিষ্ক্রিয় থাকবে; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সুযোগ। কোন পারিবারিক প্রয়াসে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : মোটামুটি চলবে শরীর; মেয়েদের নতুন করে শারীরিক ঝামেলা। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা। কর্মস্থলে অন্যের ঈর্ষার পাত্র হবার আশংকা; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা বিচলিত করবে। কোন অনুজের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা কেটে যাবে।

মীন : মানসিক দুর্বলতা বিশেষ ক্ষতি করবে; মেয়েদের শরীর নিয়ে নানান ঝামেলা। আর্থিক দুর্ভাবনা বাড়বে। কর্মস্থলে কারও কুনজরে পড়বার আশংকা; মেয়েদের নিজের দোষে সমস্যা সৃষ্টি। পারিবারিক অশান্তি চলবে। ব্যবসায়ীদের নতুন যোগাযোগ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন: ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-১১৬১, ২৭-৩৩১৬ ২৪-১৬৫৫ ২৪-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN

ভাব তো
হয়েই গেল —

তুমি একেবারেই বাচ্চা। এতদিনেও বুঝলে
না?

বুঝেছি সবই। কিন্তু তাতে আমার কী?

উৎসুক হল

মেয়ের চাহিদা।
বল তো

ধ্রুপদী নৃত্যে বাঙালি

গ্রাম বাংলা : আজকের মুখ

নির্বাচনপ্রার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে খরচের সীমা বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রামকৃষ্ণ ত্রিবেদী যে বৈপ্লবিক একটা সংস্কার করে ফেলেছেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। বর্তমানে একজন বিধানসভা প্রার্থী সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ও লোকসভা প্রার্থী সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা খরচ করার আইনত অধিকারী। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভবিষ্যতে একজন লোকসভা প্রার্থী সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও বিধানসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভাবের ঘরে চুরি। একটি লোকসভা কেন্দ্রে অন্তত সাতলক্ষ ভোটারের কাছে পৌঁছতে ন্যূনতম কত টাকা লাগতে পারে তা কোন ব্যক্তিরই অজানা নয়। পোসটার, হ্যানডবিল, জনসভা, জিপ, বিভিন্ন নির্বাচনী অফিসের ভাড়া, অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের জন্য প্রতিদিন চা-জলখাবার – এক কথায় একটি নির্বাচনে দাঁড়ান মানে মাস দেড় দুই ধরে রীতিমত মচ্ছব। খুব কম করেও একটি লোকসভা নির্বাচনের জন্য অন্তত ছ'সাত লাখ টাকা খরচ করা প্রয়োজন। যাঁরা বিভিন্ন নির্বাচন দেখেছেন, তাঁদের ধারণা আছে, কী পরিমাণ টাকা এক একজন প্রার্থী খরচ করে থাকেন। তবু মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা আমাদের কদাচ শ্রুতিগোচর হয়নি। তাহলে দশহাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় বৃদ্ধির অনুমোদন করে দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের আত্মপ্রসাদ কেন? আমাদের প্রশ্ন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত খরচ তদারক করার ব্যাপারে আয়কর বিভাগের মত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কোন দফতর আছে কিনা, থাকলে তারা কতখানি সক্রিয় এবং তাঁদের অতীত রেকরড কী? দ্বিতীয়ত প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের ওপরেই বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে, দলের ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অ্যাকাউনট থেকে যত খুশি খরচ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন প্রার্থী দেড়লাখের বেশি খরচ করতে হলে তিনি তার টাকা দলকে দিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন। দলের বকলমেই প্রয়োজন মত টাকা খরচ হবে। এর ফলে অসুবিধায় পড়বেন নির্দল প্রার্থীরা। তাহলে নির্বাচন ভূমি থেকে নির্দলদের হটানই কি সরকারি নীতির উদ্দেশ্য?

ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু নির্বাচন এদেশে প্রথমত টাকার খেলা। দ্বিতীয়ত বহুক্ষেত্রে নির্বাচনের জয়-পরাজয় নির্ভর করে প্রার্থীদের অপকৌশলের ওপর। রাজনৈতিক দলগুলির অবাধ টাকা তোলার ওপরে কোন বিধিনিষেধ নেই। যে দল শাসন ক্ষমতায় যায় অচিরেই সে দলের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া বাঁধা থাকে। যাঁদের জীর্ণ বাড়িতে অফিস ছিল তারা রাতারাতি অট্টালিকা বানিয়ে ফেলে। যাঁরা হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে ফাটা কাপে চা খেতেন তাদের নয়া আপিস ঘরের ইনটিরিয়র ডেকরেশন এবং ফারনিচার দেখলে তাক লেগে যায়। কারও শ্রী বৃদ্ধিতে নজর দেবার মত কুবুদ্ধি আমাদের নেই, তবে কিনা এই অসার খলু সংসার যে টাকার খেলা এই সার সত্য বহু রাজনৈতিক দলই হৃদয়ংগম করেছেন।

আর অপকৌশল : ভারতীয় নির্বাচনে ক্রমশ এটি নির্বাচনী বৈতরিণী পারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। বশম্বদ পোলিং অফিসারদের সাহায্যে ব্যালটে কারচুপি, গায়ের জোরে বুথ দখল, সংঘবদ্ধভাবে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, ভোটের আগে সরকারি চাল-গম, টেসট রিলিফ, বিদেশি সাহায্য প্রতিষ্ঠানের পাউরুটি, গুঁড়োদুধ, কম্বল দান, প্রতিপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন করে তার মনোবল ভেঙে দেওয়া এসবই এখন নির্বাচনের অপরিহার্য অংগ হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন কিন্তু এ সম্পর্কে নীরব। তবু তার মধ্যে মন্দের ভাল মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন যে ভোটের আগে ব্ল্যাকমেল স্বরূপ তড়িঘড়ি করে শাসক দলের কোন প্রকল্পের শিলান্যাস করা, শাসকদলের নেতাদের ভোটের সময় সরকারি গাড়ি, বিমান চড়া ও সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে নানাভাবে ব্যবহার করা অন্যায়। এগুলি বন্ধের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা তিনি খতিয়ে দেখবেন।

তবে যতদিন পর্যন্ত না নির্বাচন প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার [illegible]য়ের একটা অংশ সরকার থেকে বহন করা না হবে এবং মুখ্য নির্বাচনী অফিসার ও রিটারনিং অফিসারদের বিচার বিভাগ থেকে না নেওয়া হবে এবং নির্বাচনের আগে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি না করা হবে ততদিন নির্বাচন কিছুতেই অবাধ হবে না।

[illegible]
প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২ নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

পরিবর্তন বিশেষ সংখ্যার সূচি

পুরনো বহু ছবি। এছাড়া আরও লেখা
৮০ পাতার বই। দাম চার টাকা।

একটি শুভ সংবাদ দিয়ে এবারের নিবেদন শুরু করি। পরিবর্তন বিনাপণে বিবাহের জন্য তরুণদের যে আহ্বান জানিয়েছিল তাতে সাড়া দিয়ে যাঁরা আবেদন করেন তাঁদের মধ্যে দুজনের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। এই দুজনের একজন হলেন ভরত সিমলাই। তাঁর সংগে শ্রীমতী চিনু রায়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আর একজন বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত। তিনি রেজিস্ট্রি করে রুবি দাসকে বিবাহ করেন।

এঁরা দুজনেই পরিবর্তনের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। পরিবর্তনও তাঁদের দাম্পত্য জীবনের শুভ যাত্রা পথে স্বাগত জানাচ্ছে। আমরা আগেও বলেছি, আজও বলছি ১৯৮৪ সালের মধ্যে আমরা এক সহস্র তরুণ চাই, যারা বিনাপণে বিবাহের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করবে। আগামী প্রজাতন্ত্র সংখ্যায় আমরা বিনাপণে বিবাহেচ্ছু তরুণদের আর এক কিস্তি নাম প্রকাশ করব। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিরাই শুধু করমের জন্য আমাদের দফতরে আবেদন করবেন, সংগে ঠিকানা লেখা ৫০ পয়সার টিকিট যুক্ত খাম পাঠাতে ভুলবেন না।

আগামী সংখ্যার পরিবর্তন বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ৮০ পাতার বই, কাজেই দাম বাড়াতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এই বিশেষ সংখ্যার দাম হবে চার টাকা। কিন্তু এতে থাকবে একশ বছরের জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা আপনি রেফারেন্স হিসাবে সংগ্রহ করে রাখতে পারবেন। অনেকে চিঠি লিখেছেন পরিবর্তনের দাম আমরা যেন আর না বাড়াই। না, পরিবর্তনের আর মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবার কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। আমরা জানি মধ্যবিত্তরাই আমাদের বেশিরভাগ পাঠক। মাসে দশ টাকা ব্যয় করাটা তাঁদের পক্ষে অনেকখানি। কিন্তু পরিবর্তন থেকে তাঁরা চিন্তার খোরাক, মনের খোরাক পান বলে এই দশটাকা ব্যয় তাঁদের জীবনযাত্রার অংগ হয়ে গেছে। কিন্তু বিশেষ সংখ্যা করতে গেলে একটু পাতা বেশি দিতে হয়। আর বেশি পাতা দিলেই সামান্য দাম না বাড়িয়ে উপায় থাকে না! তবে আমাদের সামনে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের আর কোন আশু পরিকল্পনা নেই। বই মেলা উপলক্ষে আমরা এক বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করছি, কিন্তু দাম বাড়বে না। ২৮ ডিসেম্বর ফ্যাশন সংখ্যার দামও বাড়ছে না।

২৮ ডিসেম্বর রূপচর্চা ও ফ্যাশন সংখ্যায় প্রকাশের জন্য পুরুষের চোখে নারী ও নারীর চোখে পুরুষের কী আদর্শ পোশাক হওয়া উচিত এ নিয়ে চিঠিপত্র আহ্বান করেছিলাম। প্রচুর চিঠি পেয়েছি আমরা। আমরা নির্বাচিত চিঠিগুলির প্রত্যেক লেখককে পারিশ্রমিক দেব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু চিঠির বক্তব্য পরিস্কার নয় এবং বিষয়বস্তু অগোছালো। আমরা তাই শুধু কিছু নির্বাচিত রচনাই প্রকাশ করছি। ১৯৮৩ সালের সেরা বাঙালির মনোনয়ন পত্র ইতিমধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি। আপনার সুচিন্তিত ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করুন। আবার বিষয়টি জানাচ্ছি – ১৯৮৩ সালে কোন বাঙালি পশ্চিমবাংলার জনজীবনে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন? আমরা গোটা দেশ ও গোটা বিশ্ব নিয়ে ভাবছি না – শুধু পশ্চিমবংগের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে যিনি এবছর এমন একটা কিছু করেছেন যাতে সকলে তাঁর নাম মনে রাখতে পারে এমন কেউ হলেও চলবে। মনে রাখবেন, মনোনয়ন পাঠাবার শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর।

অলমিতি,
পা. চ.

আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

পুজোর ছুটিতে

লক্ষ্মৌ বেনারস ভ্রমণ

কলকাতায় আনন্দে দুর্গাপুজো কাটিয়ে ১৭ অক্টোবর সোমবার একাদশীর দিন রাত্রে হাওড়া থেকে ট্রেনে সপরিবারে রওনা হলাম লক্ষ্মৌ। পরদিন বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমরা লক্ষ্মৌ স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে রিকশায় গেলাম নিকটেই চারবাগ অঞ্চলে কাবেরী লজ নামক একটি হোটেলে। দৈনিক পঞ্চান্ন টাকা ভাড়ায় ত্রিতলের একটি ঘর আমাদের দেওয়া হল। পরদিন অর্থাৎ উনিশ তারিখ বুধবার দুপুরে হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে সদলবলে রিকশায় আমরা গেলাম মাইল দেড়েক দূরে বিধানসভা মার্গ অঞ্চলের একটি বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে। কয়েকটি লক্ষ্মৌচিকন শাড়ি, পাঞ্জাবি, কুর্তা কিনে সেগুলি ভি পি যোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে সন্ধ্যায় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। কুড়ি তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় একটা টাঙা ঠিক করে আমরা দর্শনীয় স্থান দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বারাণসী বাগ চিড়িয়াখানায়। বিরাট একাকা নিয়ে নির্মিত এই চিড়িয়াখানার প্রধান আকর্ষণ বন্ধনমুক্ত হিংস্র জন্তু। তাছাড়া ছোট ট্রেনে চেপে সমগ্র অঞ্চলটি ঘুরে দেখার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখান থেকে এক এক করে গেলাম বড় ইমামবাড়া, ছোট ইমামবাড়া, পিকচার গ্যালারি, রেসিডেন্সি শহিদ মিনার, গৌতম বুদ্ধ পারক, স্পাব পারক ও সবশেষে বুলবুলিয়া। সন্ধ্যা সাতটায় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। একুশ তারিখ শুক্রবার সকাল আটটায় ট্রেনযোগে আমরা রওনা হলাম বেনারস। বেলা ৩টায় বেনারস পৌঁছে সোজা চলে গেলাম সিগরা রোডে ভারত সেবাশ্রমসংঘের আশ্রমে। সেখানে তিনতলায় আমাদের থাকবার জন্য স্বামীজীরা একটা ঘর ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে দুদিন বিশ্রাম নিয়ে ২৪ তারিখ সোমবার সকালে সংঘ নিযুক্ত পুরোহিতের সংগে আমরা গেলাম প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখানে স্নান সেরে নৌকা সহযোগে হরিশ্চন্দ্র ঘাট, কেদার ঘাট, ললিতা ঘাট, মানসরোবর ঘাট, মাতৃঋণ মন্দির দেখতে দেখতে আমরা এলাম পঞ্চগংগা ঘাটে। এখানে নৌকা থেকে নেমে ওপরে উঠে আমরা দর্শন করলাম লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও ত্রৈলংগস্বামীর আশ্রম। আবার নৌকায় উঠে আমরা নামলাম মণিকর্ণিকা ঘাটে। এখানে নেমে মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানের পাশ দিয়ে সরু গলি পথে আমরা গেলাম বিশ্বনাথ মন্দিরে। সেখানে পুজো দিয়ে গেলাম পাশেই অন্নপূর্ণা মন্দিরে। সেখান থেকে রিকশায় বেলা বারোটা নাগাদ আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। ছাব্বিশ তারিখ বুধবার বেলা এগারটায় বাসযোগে আমরা গেলাম সারনাথে। চাইনিজ টেমপল, জাপানিজ টেমপল, প্রাচীন অবশেষ, ধামেকস্তূপ, জৈন মন্দির, মিউজিয়াম, আকাশবাণী ও সারংগনাথ প্রভৃতি দর্শন করে সন্ধ্যায় আমরা ফিরে এলাম, পরদিন বৃহস্পতিবার রিকশায় আমরা গেলাম বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি, বিড়লা মন্দির, হরিশ্চন্দ্র মহাশ্মশান ও ঘাট দর্শনে। এর মধ্যেই টুকিটাকি কিছু জিনিসও অবশ্য কিনেছিলাম। ২৯ তারিখ শনিবার সকাল দশটায় একটি মোটরে আমরা যাত্রা করলাম মুগলসরাই স্টেশন অভিমুখে। সেখান থেকে বেলা বারোটায় ট্রেনে চেপে পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম।

গৌরাংগ রায়চৌধুরী
কলকাতা-৪২

মর্মান্তিক ভ্রমণ

হাওড়া থেকে পুরী কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলা গেলেও যেতে যেতে শরীরের কলকব্জা আধখানা খুলে গেল। অদেখা সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে বাঁধাধরা নিয়মকে হেলায় পিছনে ফেলে আমরা ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ও তিনজন প্রফেসর অনিয়মে মেতে উঠলাম। সেদিনও সূর্যোদয় দেখার পর আমরা সবাই মিলে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর আমরা থামলাম। ক্লান্ত দেহে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমাদের এক বন্ধু বলে উঠল 'দ্যাখ দ্যাখ আমি কীরকম বালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।' দুর্দান্ত ডানপিটে আর দুষ্টুমির রাজা বন্ধুটির যে এটা নতুন একধরনের মজা তা নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহ রইল না। ওর দিকে লক্ষ্য না রেখেই আমরা গালগল্পে মশগুল হলাম। হঠাৎ দেখি ও প্রায় আধখানা ডুবে গেছে। যত উঠতে চেষ্টা করছে তত ডুবে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের এক বন্ধু বলে উঠল 'চোরাবালি চোরাবালি'। আমাদের সংগে বন্ধুটিও কেঁপে উঠল। তারপর ক্রেন – লোকজন – চিৎকার চেঁচামেচি সব উপেক্ষা করে গত ২৫-১০-৮৩ তারিখে বালির

[illegible] ডাকাবুকো [illegible] যাবার সময় যে বন্ধুটি আমাদের নানারকম 'জোক' করে হাসিয়েছিল সে এবার সত্যি সত্যিই একটা দারুণ সত্য 'জোক' করল। এবার ফেরার পালা। যবার সময় স্বপ্ন ছিল সমুদ্রকে দেখার, অজানাকে জানার, ফেরার সময় শুধুই মর্মান্তিক স্মৃতি।

তন্দ্রা ঘোষ
কল্যাণগর, ২৪ পরগণা

পুজোর ছুটিতে গোমো

বাংলার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যখন ব্ল্যাক ডায়মনড একসপ্রেস ধানবাদে এসে পৌঁছাল তখনো জানি না আমাকে আরো কতদূরে যেতে হবে। অপরিচ্ছন্ন গোমো প্যাসেনজার গোমো স্টেশনে যখন এনে দাঁড় করাল তখন প্রায় দুপুর। পায়ে পায়ে হেঁটে পরিচিত আত্মীয়ের বাড়ি যখন আমি এবং আমার বন্ধু পৌঁছালাম তখন মেঘ রোদ্দুরের খেলা চলছে প্রকৃতির বুকে।

সকাল সাতটা। মহাসপ্তমী। একটানা ঢাকের আওয়াজ কিংবা মাইকের আর্ত চিৎকার এখানে কোথাও নেই। গোমো শহরটাতে আছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আমার অবস্থান রেল কোয়ার্টারে। একটু হাত বাড়ালেই দিগন্তবিস্তৃত পাহাড় আমি স্পর্শ করতে পারি। খোলা জানলা দিয়ে পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় কোন এক মন্দিরের কিয়দংশ সূর্যের রূপালী আলোয় চকচক করছে। ওপরটায় পুঞ্জপুঞ্জ সাদা মেঘে ঢাকা পাহাড়ের বুক। এরই মাঝে সোনালি আলোয় কোথা থেকে ভেসে এল ঢাকের আওয়াজ। কলকাতা এবং কাঁচরাপাড়ার মুখটা চকিতে আমার মনে ভেসে উঠল। অনেক দূরে আছি আমি। পাহাড়-বেষ্টিত নির্জন গোমো শহরে পুজোর দিন কাটছে আমার।

টুকু, সঞ্জয়, গোপাল, মংকা আমাদের নিয়ে গেল পাগলাবাবার মন্দিরে। কোন একদিন এই সাধক পাগলাবাবার নির্দেশে কোন এক রাজা এক রাতে এই মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। রাজার অনুরোধে পাগলাবাবা বলেছিলেন নাকি, যদি রাজা এক রাতে মন্দির করে দিতে পারেন তাহলে তিনি নাকি সেখানে অবস্থান করতে পারেন। পাগলা বাবার কথামত রাজা নাকি তাই করেছিলেন। ছোট ছোট লাল পাথরে রাস্তা সর্বত্র। বাঙালি মুখও কম নেই এখানে। অবশ্য অবাঙালিই বেশি। পাগলাবাবার ভগ্ন মন্দিরটি বিশাল জায়গা জুড়ে। কিছুই নেই মন্দিরে এখন। কেউ কেউ আসে। মনের প্রার্থনা জানিয়ে চলে যায়।

[illegible] আসছে সামনে। লাল কাঁকরের রাস্তা বেয়ে একটা পুজো প্যানডেলে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে কলকাতার মত তীব্র প্রতিযোগিতা নেই। বেশ ভাল লাগল। কখন যে অন্ধকার হয়ে গেছে খেয়াল নেই। নিস্তব্ধ অন্ধকারে এখন গোমো শহর ডুবে গেছে।

বিপ্লব সেনগুপ্ত
শহিদনগর, কাঁচড়াপাড়া

পুরী : নীল সাগরের ঢেউ

বইয়ে পড়া সেই পুরীর সমুদ্র সৈকত, মন্দিররাজি, গুহাচিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য আর ভাস্কর্য প্রত্যক্ষ করলাম এই সেদিন পুজোর ছুটিতে।

আমরা দুই বন্ধু কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম ১৮ অকটোবর পুজোর দুদিন বাদে। সমুদ্রতীরের হোটেলেই পরের দিন আশ্রয় নিয়েছিলাম। হোটেল এখানে পর্যাপ্ত। যাই হোক পরদিন সকালে কনডাকটেড টুরের বাসে করে বেরিয়ে পড়লাম কোণারকের সূর্য মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তখন শরতের সকালের রোদ ঝিকমিক করে হাসছে। আর ঠিক তখনই দূর থেকে শরতের শিশির স্নাত কোণারক আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। কোণারককে প্রত্যক্ষ করলাম। তারপর আরও কতকি। খন্ডগিরি-উদয়গিরির অপূর্ব গুহা ভাস্কর্য - যা ওড়িশার শিল্পমালার এক অনুপম নিদর্শন। তারপর সারাদিন পর রাত ৯টা নাগাদ ফিরে এলাম আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে।

পরদিন সকালে চিল্কায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য। শ্রান্তিতে ঘুমই ভাঙেনি অনেক বেলা পর্যন্ত। এমনকি সকালের চায়ের সময়ও তখন কেটে গেছে। তাই আমরা দুজন স্নান করে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পুরীর আশপাশকে ভাল করে দেখার জন্যে। আঠারো-নালা, মার্কণ্ডেশ্বর মন্দির ইত্যাদি আরো অনেককিছু দেখার পর বিকালে এলাম পুরীর সমুদ্র সৈকতে। তখন পড়ন্ত বেলা। মরিচীমালী পশ্চিমাকাশে তার বর্ণালীছটার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে বালুকাময় তটভূমিকে দান করেছে এক অনুপম সৌন্দর্য। সমুদ্রের ঊর্মিমালার বুকে আর তটভূমির শাড়ির আড়ালে সূর্যের লুকোচুরি খেলার সেই বিচিত্রতা দেখে আমার মনে হয়েছিল প্রকৃতির ঐ দৃশ্য বোধ হয় লিওনারদো দা ভিনচির মোনালিসার হাসির বিশেষত্বকে হার মানাতে পারে।

[illegible] সৌন্দর্যভান্ডার। মোটকথা [illegible] বেড়ান সম্ভব হয়নি। তবুও যা উপলব্ধি করলাম তা সত্যিই মনে রাখার মত। যা এক কথায় অনির্বচনীয়।

কল্যাণ মণ্ডল
পূর্ব খেজুরবেড়িয়া, ২৪ পরগণা

বাঘের দেশ সুন্দরবনে

এপারে ভারত ওপারে বাংলা দেশ। কালিন্দীর পশ্চিমতীর ঘেঁষে ভারত সীমান্ত দিয়ে সুন্দরবনের 'ভটভটি'র স্পিড কমিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি আমরা। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্থানীয় হরিপদ মণ্ডল। সমসের নগরের শেষ প্রান্তে এসে লোকালয় শেষ হয়েছে। কোথাও জনচিহ্ন নেই। শুধু হল সুন্দরবন। সামনেই দেখতে পেলাম সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের কার্যালয়। পিছনে গহন অরণ্যানী। শুনলাম ঐ বনের প্রথম অংশই 'কড়েখালী'র বন। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর এগিয়ে দক্ষিণ পাশে একটা নদী বেঁকে চলে গেছে - নাম 'ঝাড়া'। ঝাড়া নদীর দুই পাশে হেঁতালের বন। বন না বলে তাকে উদ্যান বলাই ভাল। কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। দুই-একটা বানর নদী থেকে কি যেন ধুয়ে নিয়ে খাচ্ছে। জিগেস করাতে হরিবাবু জানালেন – 'কেওড়া', ওরা নাকি 'কেওড়া' ধুয়ে খায়। মাঝে মাঝে মাটির চাঁই সমেত হেঁতালের ঝাড় নদীতে এসে পড়েছে। কিছুদূর গিয়ে 'ঝাড়ানদী' ভাগ হয়ে গেছে দুই ভাগে -- মরা ঝাড়া ও ফোড়া ঝাড়া। আমরা মরা ঝাড়া দিয়ে 'রায়মংগল' হয়ে একটা ছোট নদী দিয়ে ঢুকলাম গভীর জঙ্গলে। নদীর বামপাশে 'ডাবরে' নেমে টাইগার প্রকল্পের মিষ্টি জলের পুকুরের পাড় বরাবর এগিয়ে চললাম। পুকুরের চারিপাশে [illegible] হরিণেরা এসে ছোলা আর খাবার জল খেয়ে যায়। হরিণের পদচিহ্নও তার সাক্ষ্য বহন করছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল বাঘের থাবা বেশ কয়েক জায়গায়। আতঙ্কে শিউরে উঠল শরীর। কোন কোন থাবার ওপরে পড়ে আছে সাদা পাউডার। জানলাম কিছুদিন আগের ব্যাঘ্র গণনার নিদর্শন। বুকের মধ্যেটা ভয় ভয় করছিল। পুকুরের পশ্চিমপাশে রয়েছে একটা টাওয়ার। সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেকটা উঠেই পাটাতন। যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ অনুমান ২০×২৫ ফুট। বাঘও নাকি ওখানে ওঠে। আরও ওপরে ছাদবিহীন একটা ঘর।

তারপর আবার ভটভটিতে সামনে এগিয়ে 'হরিখালী' নামে এক বনের সংগে পরিচিত হলাম। তারও সামনে 'ছায়া' নামে আরেক বনভূমি। মাঝ নদীতে আমরা। বহুদূরে - ধোঁয়ার মত দেখা যাচ্ছিল ঘন বৃক্ষরাজি। জানলাম ওটাই 'তালপট্টির চর'। যেটা নিয়ে ভারতের সংগে বাংলাদেশের গোলমাল চলছে। B. S. F.-এর কড়া প্রহরাও ওখানে আছে। আর বেশি সামনে নয়। ফিরে এলাম আমাদের যাত্রাস্থলে।

পলাশ মিত্র
সাহাপুর, ২৪ পরগণা

৩০ টাকা পুরস্কার পাবেন
মহঃ জাকির হোসেন

ভ্রম সংশোধন

২৩ নভেম্বর '৮৩ সংখ্যায় সমীপেষু বিভাগে 'বেদের কথা অমৃত সমান' পত্রটির লেখিকা চৈতালি ঘোষ। অনবধানবশত পদবীটি ঘোষ প্রকাশিত হওয়ার জন্যে আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

রুগ্ন শিল্পের সবল মালিকেরা

রুগ্ন শিল্প মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য বামফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে আর এস পি লিমিটেড ও এফ বি লিমিটেড নামক দুই সংস্থার সাবেক মালিকেরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি এফ বি লিমিটেডের প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠীর শ্রীযুক্ত হরিলাল ঘোষ বহুদর্শীকে বলেন, এই প্রগতিশীল সিদ্ধান্তের জন্য আমরা বামফ্রন্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান সরোজ মুখারজি ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জ্যোতি বসুকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। উফ, ওঁরা যে এতখানি আমাদের জন্য চিন্তা করেন সেকথা ভাবতে গিয়েই আমার চোখ জলে ভরে আসছে। এতদিন আমরা সি পি আই (এম)-এর আনডারটেকিং হয়ে থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সেই অভিজ্ঞতা আমাদের এখন যথেষ্ট কাজে লাগবে।

বহুদর্শী : আচ্ছা মিঃ ঘোষ, সরকারি মানে সি পি আই (এম) আনডারটেকিং-এ থেকে আপনারা কী কী শিক্ষালাভ করলেন?

শ্রী ঘোষ : অনেক। প্রথমত ধরুন ইউনিভারসিটিগুলিতে নৈরাজ্য দূর করে কীভাবে সমমর্মী লোকদের দিয়ে সুশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া কলেজ সারভিস কমিশনের মাধ্যমেও কীভাবে উপযুক্ত লোক বাছাই করা যায় সে ব্যবস্থাও তাঁরা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ইউনিভারসিটি ও কলেজগুলিতে একটা প্রগতিশীল আবহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া কলেজ পরিচালনা কমিটিতে রেশনের দোকানের মালিক থেকে প্রাইমারি স্কুল টিচার সবাইকে রেখে উচ্চশিক্ষাকে আমরা সাধারণের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে আসতে শিখেছি। এ সবের ফলে আমাদের কারখানা লোকসান কাটিয়ে এখন লাভের মুখ দেখছে। কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে। এখন আমরা ওঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে নিজেরাই একলা চলতে পারব।

আর এস পি লিমিটেডের প্রাক্তন মালিক মিঃ এইচ ডি পালের সঙ্গে বহুদর্শী দেখা করে। বহুদর্শী জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা মিঃ পাল, ফ্রন্টের এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই আপনারা খুশি।

: কোন সিদ্ধান্ত?

: এই যে রুগ্ন শিল্প প্রাক্তন মালিকদের হাতে ফেরত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার আপনারাই তো মালিক হবেন। মানে, আপনাদের আর আনডারটেকিং হয়ে থাকতে হবে না। জ্যাকিদারও ভয় কেটে যাবে, মানে, কবে হাত থেকে হাতছাড়া চলে যায়, তার জন্য রাতে ঘুম হয় না ভদ্রলোকের। এই যে দেখুন ননীবাবুর হাত থেকে কেমন স্বাস্থ্য দফতর নিয়ে নেওয়া হল –

মিঃ পাল বললেন : আমরাই তো বলে আসছি যে রাষ্ট্রায়ত্ত করে আমাদের কোম্পানির কোন উন্নতি হয়নি। যে উদ্দেশ্যে আমাদের কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় তা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা দাবি রাখছি আমাদের কোম্পানিকে আবার আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

বহুদর্শী : সেই সিদ্ধান্তই তো নেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা কী নিজেরাই কোম্পানি চালাতে পারবেন? শেয়ার বাজারে আপনাদের শেয়ারের এখন যা রেট তখনও কী তা থাকবে বলে আপনি মনে করেন?

মিঃ পাল বললেন : সে কথার এখন জবাব দেব না। ফেরলে আমাদের প্রাক্তন শেয়ার হোলডারদের যে মিটিং হচ্ছে সেখান থেকে ফিরে এসে জবাব দেব। □

বহুদর্শী

অম্লমধুর

সাধুর হাতে বন্দুক দেখে
শয়তানেরা লুকোয় মুখ
জননেতার কেনা-বেচা
উলুখাগড়ায় শুকোয় বুক

কুমার মুখোপাধ্যায়

জল জল করে মাটি হয়ে গেল
এমন ছুটির দিনটি
সকাল থেকে লাগিয়ে লাইন
বালতি ভরল তিনটি।

এক বালতি চান করতে
আর একটি জল খেতে
রইল হাতে এক বালতি
লাগবে আসতে যেতে।

নিতাই ঘোষ

চালে কাঁকর গমে পাথর
চিনি থাকে ভিজে,
টাকা নিয়ে রেশন গিয়ে
চমকে উঠি নিজে।
না নিলেও কারডটা ল্যাপস
তাই নিতে হই বাধ্য,
ঘৃণা ভরে রাগটা করে
যতটুকু সাধ্য।

অশোক সেন

থাকলে চালু টিভি
নড়েন না তো বিবি
খোশ মেজাজে মৌজ করে
পান চিবিয়ে যান।
কর্তা তখন রান্নাঘরে
কাজের ঠেলায় ঘর্ম ঝরে
অস্ফুটে কন ঘন ঘন
হায়রে ভগবান!

মল্লিকা সিকদার

ভূত চাপিতং স্কন্ধে মম
পুত নাচিতং ডিসকো
মুই ঝুলিতং বাসে বাসে
বউ চড়িতং রিসকো
মেয়ে লিখিতং গোপন চিঠি
না জানিতং কিসকো।

শুভাশিস হালদার

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
টাকা দেবে জাপানি,
তাতেই হবে চক্ররেল
মাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
শুনিয়ে বাণী গণি খান
মালদা হয়ে দিল্লি যান।

প্রদীপ দাস

তেল উঠেছে তেইশে
কোথাও বা নেই সে!
ঘিতে নাকি চর্বি,
ভাব বসে কী করবি!

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

হাসপাতালে এক বিছানায়
থাকবে রুগী দু'জন
কিন্তু মশাই দুইটি রুগী
না হয় যদি সুজন!
দু'জন যদি কামড়াকামড়ি
করেই বসে শেষে,
বলুন দেখি সেই ঠেলাটা
সামলাবে কে এসে?

কালিদাস ভট্টাচার্য

পঞ্চায়েতে টাকার অভাব তবু কর্মকর্তাদের ভাতা বাড়ছে

নিশীথ দে

টাকার অভাবে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত তেমন কোন কাজ করতে পারছে না। এদিকে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান থেকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি - সহসভাধিপতিদের মোটা টাকা ভাতা বাড়ানর তোড়জোড় হচ্ছে। এঁরা এত কাজ করছেন যে চাকরি বাকরি করতে পারছেন না, সংসার অচল হবার উপক্রম।

এদিকে সরকারি টাকা খরচের হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে খরচের হিসাব অডিট করেন পঞ্চায়েতের একসটেনশন অফিসাররা। অ্যাকাউনট্যানট জেনারেল অফিস কর্তৃপক্ষ এখন থেকে নিজেদের লোক দিয়ে অডিট করাতে চান। কিন্তু বামফ্রন্ট মন্ত্রীরা রাজি হতে পারছেন না। পঞ্চায়েতের অডিটের ব্যাপারটা হাত ছাড়া করতে রাজি নন। তাতে হয়ত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হবে। অথচ অ্যাকাউনট্যানট জেনারেলের যুক্তি হল, কেন্দ্রীয় সরকার আই আর ডি পি, এন আর ই পি প্রভৃতি কর্মসূচি বাবদ পঞ্চায়েতকে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত ইউটিলাইজেশন সারটিফিকেট হয়ত পাঠাচ্ছে। কিন্তু অডিট রিপোরট বাদ দিয়ে শুধু ইউটিলাইজেশন সারটিফিকেটের কী মূল্য আছে? কেন্দ্রীয় ভাবে কোন হিসাব মেলান যাচ্ছে না।

অডিটের ব্যাপারে ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত দফতরের সংগে অ্যাকাউনট্যানট জেনারেল অফিসের কর্মকর্তাদের কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। এ জি বেংগল চাইছেন, এগজামিনার অব লোকাল বডিজকে দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব অডিট করাবেন। এটা বন্ধ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। সম্প্রতি জেলা পরিষদগুলির অডিট রিপোরটে পুকুর চুরি ধরা পড়েছে।

১৯৭৮ সালের নির্বাচনে তেরটি জেলা পরিষদ ছিল পুরোপুরি সি পি আই (এম)-এর দখলে। এবার সে চেহারা পালটে গিয়েছে। মালদহ জেলা পরিষদ সি পি আই (এম)-এর হাত থেকে কংগ্রেস (ই) ছিনিয়ে নিয়েছে। অন্যান্য জেলা পরিষদেও কংগ্রেস (ই) অনেক বেশি শক্তিশালী। কয়েকটি জেলা পরিষদে সি পি আই (এম) ক্ষমতা দখলে রাখতে বামফ্রন্টের অন্য শরিক আর এস পি এবং ফরোয়ারড ব্লকের সংগে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছে।

ফ্রনট শরিকদের সংগে হাত মেলানর ফলে ক্ষমতা দখলে এসেছে ঠিকই কিন্তু তাতে সি পি আই (এম)-এর কোন সুবিধা হয়নি। সুবিধা হয়েছে কংগ্রেস (ই)-র। যেখানে আর এস পি'র লোক সহসভাধিপতি হয়েছেন সেখানে দুর্নীতি-দলবাজি নিয়ে ভেতরে ভেতরে জোর লড়াই শুরু হয়েছে। ২৪ পরগণা এবং মুরশিদাবাদ জেলায় আর এস পি দলের সহসভাধিপতিরা আগের আমলের হিসাব খতিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক গরমিল ধরেছেন। করগেটের টিন, পামপ সেট, বিভিন্ন খাতে গ্র্যানটের ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাবে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মোটর গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে।

বিদায়ী পঞ্চায়েতের কাছে আট কোটি টাকার হিসাব বাকি ছিল। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন আর হিসাব-নিকাশ চাওয়া হবে না। একটি জেলা পরিষদের পরাজিত সহসভাধিপতি তের লক্ষ টাকা আগাম নিয়েছিলেন। তিনি মোটামুটি যোগ বিয়োগ করে একটা হিসাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু অডিটর নথিপত্র ছাড়া ওই হিসাব মেনে নিতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত ওই সহসভাধিপতি খরচের কোন রসিদ বা ভাউচার দিতে পারেননি।

এ বছর পঞ্চায়েতের নির্বাচনের পর বকেয়া হিসাব নিয়ে প্রতিটি জেলাতেই গোলমাল শুরু হয়েছে। গতবার যাঁরা পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন, এবার ভোটে হেরে গিয়েছেন কিংবা প্রধান হতে পারেননি তাঁদের অনেকে বকেয়া হিসাব বুঝিয়ে দিতে চাননি। শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন করা হল, গতবারের প্রধান নবনির্বাচিত প্রধানকে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। বি ডি ও যেদিন ঠিক করবেন সেই দিনে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।

হিসাব অনেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আবার অনেকে দেননি। হিসাব বুঝে নিতে গিয়ে দেখা গেল, কাগজে কলমে সব ঠিক আছে কিন্তু আসলে গোলমাল। হয়ত ব্যাংকের পাশ বইতে দেখান হয়েছে, পাঁচ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে। ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, আগের দিনে চার হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

বকেয়া হিসাব নেওয়ার পালা সবে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এক'শোর বেশি প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ-এর অভিযোগে থানায় এজাহার লেখান হয়েছে।

নতুন প্রধান বিশেষ করে যাঁরা সি পি আই (এম)-এর লোক নন, তাঁরা পড়েছেন ফাঁপরে। হাতে টাকা নেই। নতুন কোন উন্নয়নমূলক কাজও হাতে নিতে পারছেন না।

এদিকে নির্বাচনের আগে থেকে সি পি আই (এম) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতিদের 'সাম্মানিক' বাড়ানর দাবি জানিয়ে আসছেন। সি পি আই (এম)-এর রাজ্য নেতৃত্ব এই দাবিকে শুধু সমর্থন জানাননি, মদত দিচ্ছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা এখন প্রতিমাসে সাম্মানিক পান একশো টাকা। মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে, এই অংক বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পান ১৫০ টাকা এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ২০০ টাকা। বাড়ছে সকলেরই। জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের অন্তত এক হাজার টাকা হচ্ছে। তিন স্তরের সমস্ত সদস্যদের দৈনিক ভাতা এবং রাহাখরচ বাড়বে।

পঞ্চায়েতের বাজেটে এখন যে টাকা বরাদ্দ হয় তার প্রায় সবটাই কর্মীদের বেতন-ভাতা, পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্যই খরচ হয়ে যায়। নতুন করে খরচ বাড়লে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে এবং সংগে সংগে গ্রামের লোকের ওপর পঞ্চায়েতের কর-এর বোঝাও বাড়বে।

পঞ্চায়েতই সি পি আই (এম)-এর কাল হয়েছে। পঞ্চায়েতবাবুদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কতটা সফল হচ্ছে তা দেখাব কেউ নেই। উন্নয়নমূলক কাজ বলতে এখন শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব অফিস ঘর আর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। পঞ্চায়েতের বাজেট শুধু মাইনে আর সাম্মানিক দিতেই শেষ।

কেন্দ্রীয় সরকার আই আর ডি পি এবং জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে টাকা দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে অপচয় হচ্ছে, দলবাজি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মসূচির অভাবে টাকা ফেরত যাচ্ছে।

আগের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সমস্ত পঞ্চায়েত অফিসারকে নিয়ে বৈঠক করতেন, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতেন। আগে পঞ্চায়েতের ব্যাপারে রাজ্য মন্ত্রিসভার সাব কমিটি ছিল।

এবারের নির্বাচনের পর সেই সাব কমিটি তুলে দিয়েছেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বৈঠক করার বা পর্যালোচনা করার সময় পান না। বিনয়বাবু পারটির কাজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহকারী হিসাবে কাজ করে শেষ করতে পারছেন না। □

একালে পশ্চিমবঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্য-ছিল যেন নিতান্তই দরবারী সংস্কৃতি। শুধুমাত্র 'সমঝদার' দর্শকদের মধ্যেই তার প্রকাশ ছিল সীমিত। কিন্তু এখন শাস্ত্রীয় নৃত্য ক্রমশ সাধারণের মধ্যেও নিজের স্থান করে নিচ্ছে। এমন কি হালকা মেজাজের অনুষ্ঠান দেখতে আসা দর্শকও কত্থক বা ভরতনাট্যমের রসে আপ্লুত হচ্ছেন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার অন্তরালেও ধ্রুপদী নৃত্যচর্চার বহু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। মোটামুটি ভাবে শিল্পীদের মুখ থেকে শোনা সেই সব কথারই অবতারণা এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে। সেই সঙ্গে সাক্ষাৎকার এক প্রবীণ আর এক নবীন ধ্রুপদী শিল্পীর। আর, একজন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পীর আত্মকথন নিয়েই এই গুচ্ছ প্রতিবেদন সম্পূর্ণ হ'ল।

পশ্চিমবঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যঃ জনপ্রিয়তার অন্তরালে

কল্যাণবন্ধু মিত্র

নাচ-গান হবে ভদ্রলোকের বাড়িতে? গেরস্তঘরের মেয়ে-বৌ ধেই ধেই করবে পরপুরুষের চোখের সামনে? সে যুগের মানুষ বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন না যে, তাদের উত্তরপুরুষদের মেয়েরা নাচবে প্রকাশ্যে। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানে ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার অনেক গুণী আচার্য আমন্ত্রিত হচ্ছিলেন। মণিপুরীর গুরুরা এসেছিলেন অনেকেই। নবকুমার সিং, সেনারিক সিং রাজকুমার, আতম্বা সিং প্রমুখ এখান থেকে মণিপুরীকে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের এদিকটাকে তখনকার সমাজ ভাল চোখে দেখেননি। ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্যে অংশগ্রহণের পাপে সমাজ রসাতলে যাবার জোগাড় হয়েছে এ ধরনের গেল গেল রব উঠেছিল।

তখনকার পত্র-পত্রিকা বলছে, মোটামুটি ১৯২৬-এর গোড়ার দিক থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার তাদের মেয়েদের নাচ-গান শেখাতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কলকাতার ঐ গোষ্ঠীর সকলেই যোগ দিতেন। মেয়েদেরও অপেশাদার নৃত্যশিল্পী হিসাবে মঞ্চে উঠতে দিতেন। তার পর থেকে কয়েকটি প্রগতিবাদী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে সেলাই, হাতের কাজের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষাও জুড়ে দেয়া হতে থাকল।

ঐ সময় রক্ষণশীল সমাজের ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেসব প্রশিক্ষকরা বাঙালি মেয়েদের নৃত্য কলায় দীক্ষিত করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম হল,

নরেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক। লীলা দেশাই, সাধনা বসুর অন্যতম নৃত্যগুরু নরেনবাবু এলাহাবাদের দশম নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে প্রথম বাঙালি বিচারক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নৃত্যকলায় সমর্পিত প্রাণ নরেন্দ্রচন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দান করতেন এবং ছাত্রীদের শিল্পে দক্ষ করে তোলার জন্য তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে এবং প্রতিযোগিতার আসরে। নৃত্য বিষয়ে নিজেকে আরও পরিণত করে তোলার জন্য তিনি প্রায়ই প্রখ্যাত নৃত্যগুরুদেব অতিথি করে আনতেন পটলডাঙার বাড়িতে।

কলকাতায় বরাবরই শাস্ত্রীয় নৃত্য বলতে ছিল শুধু কথক। বলছিলেন অল বেংগল মিউজিক কনফারেনসের সেযুগের অন্যতম ব্যবস্থাপক সন্তোষ দে সরকার (দাশুবাবু)। ১৯৪২ এ সম্মেলনের শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন একজন কিশোরী নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাজির করেছিলেন কলকাতার গুণী-সমাজের কাছে। এখানে সেই কিশোরী এত সমাদর পেলেন যে, তিনি কয়েক বছর পর থেকে কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। সেই কিশোরীই হলেন জয়কুমারীজী। পণ্ডিত রাম-নারায়ণ মিশ্র এবং জয়কুমারীজী দুজনে কলকাতার অনেক ছেলে-মেয়েকে কত্থক নৃত্যে পারদর্শী করে তোলেন।

তবুও নাচের ক্ষেত্র কিছুদিন আগে অবধি খুবই সংকুচিত ছিল অন্যান্য কলার তুলনায়। শোচনীয় ছিল দক্ষিণভারতীয় নৃত্যধারাগুলির অবস্থা।

গুরু গোবিন্দন কুট্টি বললেন ১৯৫৫ অবধি এখানে কথাকলির 'ক' ছিল না। তিনিই এখানে সর্বপ্রথম কথাকলির সঠিক শিক্ষাক্রম চালু করলেন।

রবীন্দ্রভারতীর নৃত্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক এন কে শিবশংকরণ জানালেন, তিরিশ বছর আগে কলকাতায় কথাকলির নামে যা-তা চলত। পঞ্চাশের দশকে গুরু গোপাল পিল্লাই দর্শকদের ঐ ধারার দিকে আকৃষ্ট করতে কথা-কলিকে লঘু করে পরিবেশন করতে শুরু করেন। বালকৃষ্ণ মেননও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সে সময় এখানকার দর্শকরা জান-তেনই না কোনটা আসল কথাকলি আর কোনটা লঘু কথাকলি। তখন কেরালা থেকে যে কেউ এসে যা দেখাতেন সেটাকেই কথাকলি বলে মেনে নিতেন সবাই। ভরতনাট্যমও সঠিকভাবে পরিবেশিত হত না। তখন এখানে ছিলেন কুচিপুড়ি ধারার শিল্পী আনন্দম।

ষাটের দশকে গোবিন্দন কুট্টি এবং কেলু নায়ার এলেন। আর এলেন ভরতনাট্যম গুরু টি কে মরুথাপ্পা পিল্লাই। ১৯৫৮তে গোবিন্দন কুট্টির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন কলামণ্ডলমের অনন্যা প্রতিভা থাঙ্কমণি কুট্টি। কলকাতায় এসে ভরতনাট্যম ও মোহিনীআট্টমের বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী থাঙ্কমণি শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৬৮তে কলামণ্ডলম ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা কলকাতার বহু ছেলেমেয়েকে দর্শকদের সামনে হাজির করেছেন। সুচিত্রা মিত্র, অভয় পাল, রীতা ঘোষ, অনিতা মল্লিক, পৌলমী চট্টোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

গুরু বিপিন সিং কলকাতায় বসবাস শুরু করেন সত্তরের দশকের শুরুতে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মণিপুরী নর্তনালয় এখানকার সাংস্কৃতিক জগতের পক্ষে একটা বড় আশীর্বাদ। কারণ গুরুজী ছাড়াও শ্রীমতী কলা-বতী দেবী ও দর্শনা জাভেরীকে গুরুর ভূমিকায় পেয়েছে এখানকার ছেলে মেয়েরা। অনেককেই বলতে শুনেছি গুরু বিপিন সিং-এর আগে কেউ বর্ণময় মণিপুরী নৃত্যকে এত মনো-রমভাবে উপস্থাপিত করেননি কল-কাতায়। শ্রদ্ধেয় বিপিন সিং, শ্রীমতী কলাবতী দেবী এবং দর্শনা জাভেরী সরাসরি অভিযোগ করলেন যে, এতদিন কলকাতায় মণিপুরী নাচের নামে একটা জগাখিচুড়ি স্টাইল চলে আসছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ ধারাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে একটা নিয়মে বাঁধলেন মণিপুরীর ছন্নছাড়া ভাবকে। এখন একদল বাঙালি ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষা-গ্রহণ করছেন যাদের মধ্যে কয়েক-জনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুশান্ত দাসের সঙ্গে আলাপ হল। চার বছর একনিষ্ঠভাবে সর্বক্ষণের শিক্ষার্থী সুশান্ত পূর্ণ শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পাবার আগে কোন মন্তব্য করতে রাজি নয়।

সত্তরের দশক কলকাতায় নৃত্য জগতে নিয়ে এসেছিল ওড়িশি নাচের হাওয়া। তখন থেকে এ পর্যন্ত কলকাতার একজন শিল্পীকেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে, তিনি সুতপা দত্তগুপ্ত। বিভিন্ন ধারার নৃত্যশিক্ষার শেষে সুতপা গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উপলব্ধি করেছেন যে, ওড়িশি, নৃত্যই তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য। তিনি গত বছর থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান করতে শুরু করেছেন।

আগে যেখানে নাচ বলতে রাবীন্দ্রিক নৃত্য, লোকনৃত্য আর নৃত্যনাট্যকেই বোঝাত, বড়জোর টুকরো টুকরো শাস্ত্রীয় নাচ মাঝে মধ্যে পরিবেশিত হত, সেখানে শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান হচ্ছে এককভাবে। এমনকি, অফিস রিক্রি-য়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানেও বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয়-নাচ গানের অনুষ্ঠান বসছে এটা আশার কথা নিশ্চয়ই। তবুও কলকাতায় শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীর সংখ্যা আশানুরূপভাবে বাড়ছে না। কে নৃত্যশিল্পী হবার যোগ্য? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণ 'যুষ্মাকমিহ সর্বাসাং রূপো-দার্যগুণাধিকম্। আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যত্তু মমাগ্রতঃ।। গুণরূপ-বিহীনায়াঃ সিদ্ধিনটাস্য নাস্তি বৈ। চার্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমনাদ্‌বিড়ম্বনম।।'

নিজে সুন্দরী হয়েও সুতপা দত্তগুপ্ত মনে করেন, নৃত্যশিল্পীর লাবণ্য প্রয়োজনীয় হলেও রূপটাই শেষ কথা নয়। একটা পর্যায়ের পর এটা গৌণ হয়ে যায়। শিল্পীর মধ্যে এর সঙ্গে প্রতিভা, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও উৎসাহের উপস্থিতিটাই বেশি জরুরী। কারোর মধ্যে রূপ আছে, নিষ্ঠা নেই। কারোর মধ্যে নিষ্ঠা আছে, প্রতিভা নেই। এছাড়া এযুগে বড় বেশি প্রয়োজন চারদিকের কোথায় কী ঘটছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা এবং ভাল যোগাযোগ। বাড়ির লোকেদের সহ-যোগিতাও দরকার। তার ওপর থাকছে অদৃষ্টের প্রশ্ন।

ঘরের মধ্যে নাচা আর মঞ্চে নাচার মধ্যে তফাৎ আছে। কারোর মধ্যে সব গুণ আছে অথচ মঞ্চভীতি

কাটল না। কারোর চোখমুখের অভিব্যক্তি বড় হলের শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় না।

শিল্পে ঠিকমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে গেলে যে পরিমাণ কঠোর পরিশ্রম করতে হয় আর জীবন যাত্রা যে মাত্রায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে তা অনেক মেয়েকেই নিরুৎসাহিত করে। এখনও বাঙালি শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে অন্য রাজ্যের সাংস্কৃতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে। দিল্লি, বোমবেতে রীতিমত লড়াই করে আমাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়।

এ ছাড়া সহশিল্পীদের বিষয়েও বড় বিব্রত থাকতে হচ্ছে। গায়কের খুবই অভাব এখানে। ওড়িশা থেকে গায়ক, বাদক আনতে এবং তাদের মহলা ও অনুষ্ঠান বাবদ দেয় খরচের পরিমাণ শুনে অনেক উদ্যোক্তাই পেছিয়ে যান।

তবু কারোর পেশাদারি শিল্পী হবার বাসনা থাকলে তাকে যে করেই হোক মাথায় বিশাল খরচের বোঝা নিতে হবে। নাচের পোশাক, সহশিল্পী, উন্নতমানের খাদ্য-তালিকা। এমনকি, প্রথম প্রথম অনুষ্ঠানের ব্যয়ের সিংহভাগ নিজেকেই হয়ত বহন করতে হবে ভবিষ্যতের সুদিনের আশায়। এর পরেও হয়ত শিল্পীর ভাগ্যে জুটবে না জনপ্রিয়তা। ব্যর্থ শিল্পীদের তালিকায় আর একটি নাম হয়ত সংযুক্ত হবে।

কত্থক শিল্পী মায়া চ্যাটারজি বললেন, নাচের ব্যাপক প্রসার ঘটলে কী হবে, প্রকৃত গুণের সুবিচার লাভের সম্ভাবনা এখন অনেক কমে গেছে। অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভা-বানরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি সুযোগ পাচ্ছেন। তার ফলে পরিণত শিল্পী হবার মত প্রতিভাধরেরা তাদের চারপাশে গড়ে ওঠা নৈরাশ্যের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী চ্যাটারজির বক্তব্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, কলকাতায় এমন একটা যুগ এসেছিল যখন থেকে উদীয়মান নৃত্যশিল্পীদের নীরবে চোখের জল ফলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এখনও সে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। শোনা যায় দু-একটি বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলনে স্থানীয় জুনিয়র শিল্পীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা দিয়ে বকস শিল্পীদের আনা হত। স্থানীয় শিল্পীরা নিতান্ত দায়ে পড়েই টিকিটের বই নিতেন পুশ সেল করার জন্য। অথবা ডোনেশন, বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে ছুটে বেড়াতেন হন্যে হয়ে। যিনি কঠোর পরিশ্রম করে শিখে আজ মঞ্চে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁর মনের অবস্থাটা এতে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। টাকা দিয়ে নেচেছেন-গেয়েছেন এমন শিল্পীদের জন্যই অন্যান্যদের সামনে মঞ্চের দরজা বন্ধ হয়ে যায় বার বার। অনেক ধনী অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এ সুযোগ গ্রহণ করে তাদের অনভিজ্ঞা মেয়ে-দের মঞ্চে তুলে বিরক্তি ও হাসি উদ্রেকের কারণ হয়েছেন অনেক-বার।

সব নৃত্যশিল্পীর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন একজন করে 'গড়ফাদার', বলছিলেন এন কে শিবশঙ্করণ। গডফাদার না থাকলে তাদের নাচ শেখার পরিশ্রমটাই মাটি হবে। জনৈকা শিল্পী শান্তস্বরে বললেন – এদেশে ভাল শিল্পী হতে গেলে প্রতিভার সঙ্গে প্রয়োজন টাকা এবং খবরের কাগজের লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটায় সব দিক থেকে যে কী ক্ষতি হচ্ছে তা বলার নয়। একেবারে বাজে নাচকে সব কাগজে ভাল বলে লিখে দিল। সাধারণ দর্শক যারা অত টেকনি-ক্যালিটি বোঝেন না তাঁরা দেখলেন তাঁদের ভাল না লাগা জিনিসকে এত ভাল বলে লেখা হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কিছু বুঝিনি।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নবীনা শিল্পী পৌলমী চ্যাটারজি বললেন – শিল্পীর প্রতিভা ছাড়া অন্তত এক-শতাংশও প্রভাব, সহায়তা ইত্যাদির একটা ভূমিকা থেকে যায়। কাজেই এসবকে একেবারে উপেক্ষা করে যাবার কোন উপায় নেই প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে। তবে যার ভেতর প্রতিভার পরিমাণ একেবারে শূন্য সে শুধুমাত্র প্রভাব, প্রতিপত্তির ওপর দিয়ে কদ্দিন আর চালাতে পারবে?

প্রবীণ নবীন কোন শিল্পীই নৃত্য সমালোচকদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন। এদের বিরুদ্ধে কয়েকজন যা অভিযোগ করেছেন তা একেবারে অমূলক নয়। সমালোচকদের অনেকেই নাচের কিছু বোঝেন না, শিল্পীর সঙ্গে পরামর্শ করে 'রিভিউ' লেখেন। সে ধরনের লোকেরা কোনমতেই নৃত্য সমালোচক আখ্যা পাবার যোগ্য নন, তাঁদের বরং নৃত্য প্রতিবেদক বলা উচিত। আর সকলেই বড় শিল্পীদের দোষত্রুটির সমালোচনা করতে ভয় পান। 'সেখানে এই দেখুন আপেল' বলে যখন একটা নাসপাতি দেখান হয় তখন যিনি আপেল নাশপাতি কিছুই চেনেন না তিনি লেখেন 'আপেল, দেখিলাম', আর যিনি ফাঁকিটা বোঝেন তিনিও লেখেন 'আহা সে কী সুন্দর আপেল'। কিন্তু জুনিয়রদের সামান্য বিচ্যুতিকে তাঁরা কেউ ক্ষমা করেন না, নির্মমভাবে সমালোচনা করেন। যাঁর কলমকে প্রভাবিত করা মোটেই সহজ কাজ নয় এমন একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক হলেন অরুণি বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক শিব-শঙ্করণের সমালোচনাও প্রশ্না-তীত। অরুণিবাবু বললেন – 'ইহা মনোরম হইল' বা 'ইহা রসোত্তীর্ণ হইল না' এই লেখাই তো সমা-লোচকদের কাজ। এদের সততা সম্বন্ধে কোন উচ্চ ধারণা নেই আমার। তবে নৃত্য সমালোচনার এত সমালোচনার পরেও মনে হয় দর্শকদের রুচি তৈরির জন্য এবং শিল্পীর পরিচিতির জন্য সমালোচ-নার একটা বিরাট ভূমিকা আছে, যদি সে সমালোচনা প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হয়। তবে এখনও পর্যন্ত কোন কাগজই শিল্প সমালোচনার জন্য বেশি জায়গা খরচ করে না।

এখন নাচ শেখার সুযোগ অনেক বেড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রখ্যাত নৃত্যগুরুদের শিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে উপচে পড়ছে ছাত্রীদের ভিড়। তবুও নিষ্ঠাভরে শিখছে এমন ছাত্রীদের সংখ্যা খুবই কম। দিল্লি, বোম-বাইতে শিক্ষার্থী ছাত্রীদের যে ধরনের নিষ্ঠা, একাগ্রতা দেখা যায় এখানের অনেকের মধ্যেই তার ছিটেফোঁটা নেই। এখানে বড় গুরুর কাছে নাচ শিখতে যাওয়াটা একটা আভিজাত্য-প্রতীক। গাল ফুলিয়ে বলা হয় আমার মেয়ে '–' র কাছে শেখে। কী যে শিখছে তা ভগবানই জানেন। কারণ এদের শিক্ষাটা উদ্দেশ্যবিহীন। অন্তত বিয়ের ইনটারভিউ বা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া কোন উদ্দেশ্য থাকে না। বরং এদের কাছে নাচের ক্লাসটা বেশ একটা সময় কাটাবার উপায়। এরা পেশাদারি শিল্পী বা প্রশিক্ষক অথবা তাত্ত্বিক

কোনটাই হবার কথা ভাবে না।

অনেক অভিভাবকের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। মেয়ে একটু ভাল নাচলেই তাঁরা আত্মহারা হয়ে ওঠেন। অনেকেই টি ভি, একক অনুষ্ঠান, নিদেনপক্ষে প্রতিযোগিতায় ভালো মেয়ের চানসের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একজন অভিভাবক তো শ্রীমতী থাঙ্কমণি কুট্টির সংগে উত্তপ্ত তর্ক করতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন যে, তিনি মনে করেন তাঁর মেয়ে যামিনী কৃষ্ণমূর্তির মতই নাচছে। কিছু অভিভাবক নিজের মেয়েকে রবীন্দ্রসংগীত, ফ্রেনচ, সাঁতার, টেনিসের সংগে নাচও শেখাচ্ছেন। আবার এমন লোকও আছেন যিনি মেয়েকে সব নাচ শেখাতে চান। গুরু বিপিন সিং বললেন -- লোকের কাছে বলা সহজ আমার মেয়ে কথাক, ভরতনাট্যম মণিপুরী, কথাকলি, ওড়িশি সব জানে। কিন্তু শাস্ত্রীয় নাচ কি অত সহজ? প্রকৃত শিল্পী হতে গেলে একটা ধারাতেই দীর্ঘদিন মনোনিবেশ করতে হবে। ভরতনাটাম শিখে এসে মণিপুরী শিখতে আসা কোন মেয়েকে ফিগার তুলিয়ে দিতে হিমসিম খেতে হয়। কারণ, তার দাঁড়াবার স্টাইলটা অজান্তেই ভরতনাট্যমের মত হয়ে যায়। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে নৃত্য তথা যে কোন শিল্পের উপযোগী একটা স্বাভাবিক চেতনা থাকে। কিন্তু সে চেতনার উন্মেষ ঘটে না পারিবারিক সহযোগিতার অভাবেই।

এখানকার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একটু তাকান যাক এবার। এখানে নৃত্য বিভাগ টিমটিম করে জ্বলছে। প্রি-ডিগরিতে ছাত্র ৫, ছাত্রী ২৮। বি এ ক্লাসে ছাত্র ১৫-এর মধ্যে ১২ জন অনুপস্থিত থাকেন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২৬। এম এ ক্লাসে ছাত্র ৫—এর মধ্যে অনুপস্থিত আছেন ২ জন এবং ছাত্রীর, সংখ্যা ২৬। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১০৫ জন ছাত্রছাত্রী এর মধ্যে আবার ১৪ জন ক্লাস করেন না!

তবে প্রভাকর পরীক্ষার জন্য উৎসাহী ছাত্রছাত্রীর অভাব নেই। সেখানে শত শত পরীক্ষার্থী প্রত্যেক বছর পরীক্ষা দিচ্ছেন। নাচ শুরু করেই সেকেনড ইয়ারের পরীক্ষা। মায়া চ্যাটারজি জানালেন – আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে গুরুর কাছে শুধু তিনতাল শিখেছি। আর আমাদের ছাত্রীরা ছ বছরের মধ্যে একগাদা তাল সমেত নাচের সব কিছু শিখে নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা পেয়ে যাচ্ছে। এতে প্রচুর ফাঁক থেকে যাচ্ছে তালিমের দিকটায়। তাই পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করা মেয়ে মঞ্চে সে অনুপাতে ভাল অনুষ্ঠান করতে পারে না। আমার মনে হয় কয়েক বছর শুধু তালিম নেয়ার পর পরীক্ষার দিকে মন দিলে এ অবস্থার উন্নতি হতে পারে। এই জন্যই উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যাও কমে এসেছে। আমার কাছে নাচ শিখতে আসা অনেক ছেলেমেয়েকে শেখাতে গিয়ে দেখি ওদের এর আগের সময়, অর্থ সব বৃথা গেছে। সব নতুন করে শিখতে হবে।

'নৃত্যের তালে তালে' প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা মীরা দাশগুপ্তা বললেন, শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা। শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

প্রভাকর পরীক্ষায় ভাল ফল করার সুবিধার কথাটা না উল্লেখ করা উচিত হবে না। এ নিয়ে আমার সংগে এলাহাবাদ প্রয়াগসংগীত সমিতির জনৈক পদাধিকারীর কথাবার্তা হয়েছিল ১৯৮২-র মারচ মাসে। ওরাই এ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ পরীক্ষা নিতে আসা পরীক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন ওঠে, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত যোগ্যতা নিয়েও হাসাহাসি হয়। কারণ, এই পরীক্ষার লিখিত পত্রটি সব পরীক্ষার্থীই বই খুলে লেখার সুযোগ পান সব কেন্দ্রেই। হাজার হাজার টাকার বাণিজ্যের ব্যাপার! না প্রয়াগসংগীত সমিতি, না চন্ডীগড় প্রাচীন কলাকেন্দ্র, না কোন স্থানীয় পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র কেউই ছাত্রছাত্রীদের টোকাটুকির ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন না বাণিজ্যের কথা ভেবেই।

আংশিক সময়ের কোরসে যখন ডিপ্লোমা পাবার এত মজার সুযোগ আছে তখন কে আর রবীন্দ্রভারতীতে পুরো সময়ের কোরসে পড়াশুনা করতে যায়? অবশ্য এরই সংগে রবীন্দ্রভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদেরও কিছু অভিযোগ আছে।

আর একদল নৃত্যশিক্ষার্থীর কথা এবার বলা যাক। এরা শাস্ত্রীয় নাচ শিখতে আসেন দুটো দিকে নজর রেখে। এক – কোন বিদেশগামী ট্রুপে ঢুকে পড়ার সুযোগ গ্রহণের জন্য এবং দুই – তথাকথিত নৃত্যনাট্যে শস্তায় বাজিমাৎ করার জন্য।

পূর্ণাংগ শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন খুব বেশিদিন হয়নি এখানে। এজন্য কুট্টি দম্পতি এবং গুরু বিপিন সিংকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ওরাঁই ধীরে ধীরে দর্শকদের চোখ তৈরি করেছেন। দূরদর্শন সম্বন্ধে লোকের অনেক অভিযোগ। তবুও কলকাতা দূরদর্শনেরও একটা ভূমিকা রয়েছে শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেদের আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে। আগের যুগে নাচের সমঝদার ছিলেন অনেকে। কারণ, তাঁরা নিয়মিত গানের সম্মেলন দেখে একটা তাল-লয়ের উপলব্ধি ও উপভোগের উপযোগী হয়ে উঠতেন। ফলে নাচ উপভোগ করতেন তারা ভালভাবেই। মাঝখানে আমাদের সেই ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে গিয়ে শাস্ত্রীয় নাচ গানের পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদারের সংখ্যা খুব কমে এসেছিল। এখানেও ঐ স্ট্যাটাস সিমবলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল 'ক্যাথাক্যালি' বা 'ক্যাটাক' দেখতে যাবার বিষয়টা। তবে এখন শ্রীশিবশংকরণের মতে - নিছক ফ্যাশানের ব্যাপারটা সরে গিয়ে এখন একটা সচেতনতা এসেছে দর্শকদের মধ্যে। এই সেদিন কলামন্দিরে ইনটারভ্যালের সময় দুজন ভদ্রমহিলা বলছিলেন, এই শিল্পীর নাচ আর দেখতে আসব না। কথাবার্তায় বুঝলাম দুজনের কেউই নাচের বোদ্ধা নয় কিন্তু তাদের বিচার অভ্রান্ত। কুড়ি বছর আগে-এ ধরনের নাচকেও আসল শাস্ত্রীয় নাচ বলে মেনে নিত লোকে।

তবে এখানে যতই লোকে বলুক যে সকলে শাস্ত্রীয় নাচের সমঝদার হয়ে গেছেন কারণ এখন অফিস ক্লাবে অবধি ভরতনাটাম, কত্থক হচ্ছে, আমি কিন্তু সে যুক্তি মানতে পারি না। এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিগত গ্ল্যামার কাজ করে। একটা ব্যাংকের রিক্রিয়েশন ক্লাবে অমিতা দত্তর নাচের সময় কানে এল 'এত সুন্দর দেখতে', 'এত ভাল ইংরিজি বলেন', 'ইউনিভারসিটিতে পড়ান' ইত্যাদি। দু-একজন বোধ হয় বললেন, 'কী দারুণ নাচেন'।

সমঝদার দর্শক চিরদিন ছিল আজও আছে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। শিল্পীরা নেহাৎই পেশার খাতিরে তাবৎ দর্শকদের রসজ্ঞ বলে সম্ভাষণ করেন। বেশির

ভাগ দর্শকই শাস্ত্রীয় নৃত্যকে এড়িয়ে চলেন, সাংখ্যাতিক বিষয় ভেবে কমপ্লেকসে ভোগেন।

দর্শক যদি রসজ্ঞই হবেন তাহলে ন্যচের সময় একেবারে গুড বয় হয়ে বসে থাকেন কেন? শিল্পী যখন দারুণ কৃতিত্ব দেখান তখন তাদের হাততালি দিতে কার্পণ্য হয় কেন? তাঁরা কি নিজেদের ভাললাগা সম্বন্ধে সংশয়াতীত হতে পারেন না? তাদের ভাললাগাটা শিল্পীর দিকে না গেলে শিল্প কি সম্পূর্ণ হবে? দক্ষিণভারতে কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে সব দর্শক একসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করেন, আবার ভাল হলে সবাই উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এখানকার শিল্পীদের এ ধরনের দর্শক সমাজ পেতে এখন অনেক দেরি। এ কথায় হয়ত অনেকের মনে আঘাত লাগবে। কিন্তু দর্শকরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন না কেন? দর্শকদের দায়িত্ব চুপ করে বসে থাকাও নয়, অমনোযোগী থাকাও নয়। শিল্পীদের ভাষ্যদানের সময় একটু মন দিয়ে শুনলে এবং একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করলে তাল, লয়, নৃত্য ব্যাকরণের কোন জ্ঞান ছাড়াই নৃত্যের সৌন্দর্য-সুষমা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে শিল্পী অমিতা দত্ত জানালেন — আমার শিল্প সব ধরনের দর্শকদের জন্যই। এটা একটা একটা ওয়াড্রোবের মত। এতে ককটেল পারটি, বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ-বাড়ি সর্বজায়গার উপযোগী পোশাক আছে। আমার দায়িত্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী পোশাক বেছে নেওয়া। এই বেছে নেওয়াটা সঠিক না হলে তার প্রতিক্রিয়ার দায়টা পুরোপুরি আমারই, দর্শকদের নয়।

দর্শকদের ভূমিকার থেকে অনেক সময় এলিটদের ভূমিকা শিল্পীর কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এরা সমঝদার। তবে সমঝদারদের তো আমন্ত্রণ করে আনতে হয়। টিকিট কেটে আসেন সাধারণ দর্শকরা। তারাই তো শিল্পীর অনুষ্ঠানের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক। তারা ছাড়া শিল্পী বা উদ্যোক্তা কারোরই অস্তিত্ব থাকে না।

প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে বাগান করার পর তাতে যদি ফুল না ফোটে তাহলে যে অবস্থায় পড়তে হয় অধিকাংশ নবীনা নৃত্যশিল্পীর অবস্থা এখন তাই। এখন দাশুবাবুর মত সংগঠক-উদ্যোক্তা কেউ নেই, যিনি দূরদূরান্ত প্রদেশের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন নতুন সংগীত ও নৃত্য প্রতিভার সন্ধানে। প্রতিভাবান নবীন শিল্পীরা সেদিন সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন দাশুবাবুদের মত সংগীত সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। অবশ্য কলকাতায় এখনও কেউ কেউ নতুনদের নিয়ে ঘরোয়া আসর বসান। এটা মন্দের ভাল। কিন্তু শিল্পীরা প্রকৃতপক্ষে বাঁধা-ধরা কজন দর্শকের কাছে ছাড়া পরিচিত হবার সুযোগ পান না। সেদিক থেকে সারস্বত সম্মেলন বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। সম্পূর্ণ নতুন শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান করাবার শপথ নিয়ে চলা শুরু করে গত ১৯ নভেম্বর এক বছর পূর্ণ করলেন এরা। সেদিন বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক ঘরোয়া মিলনোৎসবে সংস্থার তরফ থেকে অমিতাভ দাশগুপ্ত, ইন্দ্রাণী বিশ্বাস এবং শিল্পী অনিতা মল্লিক স্বার্থহীন ভাষায় নবীন প্রতিভাদের নৃত্য জগতে পৃষ্ঠপোষকতাদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করলেন। এরা রুচিশীল দর্শকদের শাস্ত্রীয় নৃত্যে আকৃষ্ট করার জন্যও বিশেষভাবে প্রয়াসী হচ্ছেন বলে জানালেন।

সারস্বতের ভূমিকা এখনও বিরাট পরিধি লাভ না করলেও এরা যা করছেন তা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এখানে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নৃত্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আয়ার, শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী আরুনডেল বা শ্রীমতী শান্তা রাও-এর মত নৃত্যবিপ্লবীর আবির্ভাব হয়ত এভাবেই হবে। সেদিন রায়া চাটার্জি আবেগের বশে বলে ফেললেন, শিল্পীদের কোন সাধারণ মঞ্চ নেই একত্রিত হবার, সংগঠিত হবার।

আমার মনে হয় এখন প্রতিভাধর শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীদের, বিশেষত যারা নতুন আসছেন তাদের জন্য একটা সমবায়ভিত্তিক সংগঠনের প্রয়োজন। এভাবে তারা অনেক সহজেই নিজেদের অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে পারবেন। একই সঙ্গে তারা তাদের সংস্থার একটি মুখপত্র প্রকাশ করতে পারেন। এতে তাদের অভাব-অভিযোগ যথাযথ-ভাবে প্রতিফলিত হবে এবং আশা করা যায় নৃত্য বিষয়ক প্রতিবেদন-গুলিও নিরপেক্ষভাবে পাঠকদের কাছে পৌছবে।

সবশেষে আবার দর্শকদের কথা বলি। ভাল দর্শক তৈরি করতে না পারলে শিল্পীদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। এজন্য তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শাস্ত্রীয় নৃত্যের উপলব্ধি সহায়ক শিক্ষাক্রম শুরু করতে পারেন দর্শকদের জন্য। এর সঙ্গে দরকার সহজ বাংলায় লেখা নৃত্যবিষয়ক বেশ কিছু বই।

আমি চাই মার্গীয় নৃত্য সকলের কাছে সমাদৃত হোক

অমিতা দত্ত

কথকের উৎপত্তি অন্যান্য ধ্রুপদী ভারতীয় নৃত্যধারার মত দেব-মন্দিরে। কিন্তু উত্তর ভারতে বিভিন্ন বিদেশী আক্রমণের ফলে কোন মন্দিরই স্থায়ী হ'তে পারেনি। তাই কথকনৃত্যশিল্পীরা বেশিদিন আশ্রয়দায়ী মন্দিরের ছায়ায় নির্ভয়ে কাটাতে পারেননি। তাঁদের বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল জনসমুদ্রের সমক্ষে। কোন কোন যুগে কয়েকজন গুণী এবং ভাগ্যবান শিল্পী পেয়ে-ছিলেন বিশেষ কোন রাজা বা বাদশাহের আশ্রয়। কিন্তু এঁদেরও পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন সাধারণ লোকের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই বহুদিন আগে থেকেই কথক শিল্পীরা তাঁদের দর্শকের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। স্থান কালের পার্থক্যের ফলে কথকেও দেখা দিয়েছে নানা ধারা, নানা নতুনত্ব।

প্রথম যখন শিল্পীরা মন্দির থেকে বের হতে বাধ্য হলেন তখন তাঁদের মনে সর্বাগ্রে রইল হিন্দু ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা। তাই তাঁরা দর্শকের সামনে পুরাণের কাহিনী, দেব-দেবীর গল্প সব জীবন্ত অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাতে লাগলেন। অভিনয়ে মাঝে মাঝে রইল গান, আবার মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ 'নৃত্ত'। এরপরে যখন কোন কোন নৃত্যশিল্পী বিশেষ সমঝদার সম্রাটের সভায় আশ্রয় পেলেন তখন সেই শিল্পী তাঁর পরিবেশ অনুযায়ী তাঁর শিল্প পেশ করতে লাগলেন। আকবরের সভায় তানসেন প্রমুখ গুণীদের মাঝে লয়কারী, তেহাই নৃত্ত-তোড়ারই প্রাধান্য দেখা দিল। অযোধ্যের নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ ছিলেন কবি এবং স্বয়ং শিল্পী। তাঁর দরবারে প্রাধান্য পেল ভাবের এবং ভাববিস্তারের। আবার রায়-গড়ের রাজা চক্রধর সিংহ ছিলেন সমঝদার পাখওয়াজ বাদক। তাই তাঁর দরবারে নৃত্যে এল পরণের প্রাচুর্য।

এইভাবে ইতিহাস থেকেই আমরা পাই যে কথক শিল্পীরা দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের নৃত্যপরি-বেশন সাজাচ্ছেন। কখনও নৃত্তের অংশ বাড়াচ্ছেন, কখনও অভিনয়ের। কোনটিই বাদ দিচ্ছেন না, কিন্তু দর্শকের মনোভাব এবং তাদের পছন্দই মনের মধ্যে আছে সর্বাগ্রে। এটাই তো স্বাভাবিক। শিল্পী যখন দর্শকমণ্ডলীর মাঝে নাচছে, তখন তাদের জয় করাটাই তো সবচেয়ে কাম্য।

প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই কোন না কোন সময় অবনতি দেখা দেয়। কথকে দেখা দিল যখন রাজা-বাদশাহদের অনুকরণে বিভিন্ন জমি-দাররা বাড়িতে 'নাচিয়ে' বা 'বাইজি' রাখতে আরম্ভ করলেন। জমিদাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমঝদার গুণী দর্শক ছিলেন না। তাঁদের খুশি করতে গিয়ে স্থূল রসের এবং বিকৃত অঙ্গভঙ্গির লক্ষণ দেখালেন শিল্পীরা। এইরকম অবনতির পথে কথক এতই অগ্রসর হল যে এই নৃত্যধারায় কোন ভদ্র পরিবারের মেয়েরা নাচত তো না-ই, এমনকি দেখতেও চাইত না। বিশেষ করে আমাদের বাংলায়। এরই মধ্যে অন্যান্য শহরে কিছু কিছু মেয়েরা কথক শিখতে এবং নাচতে আরম্ভ করল। কিন্তু এই ধারায় উচ্চবংশীয় শিক্ষিত মেয়েরা খুবই কম এগিয়ে এল।

ভারতবর্ষে এমন সময় নৃত্যের ক্ষেত্রে এল এক বিরাট জনচেতনা। রবীন্দ্রনাথ, উদয়শংকর বাঙালিদের নৃত্যের গুণ সম্বন্ধে সচেতন কর-লেন। দক্ষিণে দেখা দিল ভরতনাট্য-মের এবং কিছু দশক পরে ওড়িশায় ওড়িশির নবজাগরণ। শিক্ষিত উচ্চ-বংশজাত মেয়েরা এগিয়ে এলেন মার্গীয় নৃত্যশিল্পী রূপে। এবং দেশে-বিদেশে ভারতীয় নৃত্য সমাদৃত হল।

ভরতনাট্যমের বা ওড়িশির প্রদর্শনী রীতি কিন্তু কথকের থেকে পৃথক। পূর্বোক্ত দুই নৃত্যধারা বহুদিন ধরে দেবমন্দিরের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল। তাই সেই ধারার নৃত্যশিল্পীরা দর্শকদের চেয়ে ভগ-বানের সামনে নাচছে বলেই নিজে-দের মনে করত। দর্শকরাও ভক্তি-ভরে সব কিছু বোঝবার চেষ্টা করত। বোঝাটা দর্শকের পবিত্র কর্তব্য। বোঝানোটা শিল্পীর কাজ নয়। কখনও নৃত্যের মাঝে শিল্পী দর্শককে উদ্দেশ করে কিছু বলত না।

বলা যেতে পারে যে এই রীতিটি এই নৃত্যগুলির সমাদরে বাধা সৃষ্টি করেছে কি না। না, কারণ নৃত্যগুলি ওই ধারাতেই অভ্যস্ত। এক একটি নিবেদন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্বনির্ধারিত পাঁচ-দশ মিনিটের নৃত্যগুচ্ছ। এর মধ্যে কথা বলার সময় নেই। আর যারা বুঝত পারতো না তারা তাল-লয়ের সমন্বয়ে কিছুটা তো আলোড়িত হত এবং সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্যপ্রতিম দেহভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হত।

কথকের নিবেদন রীতি কিন্তু ভিন্ন। এতে দর্শককে সরাসরি সম্বোধন না করলে নৃত্যের সূক্ষ্ম লয়কারী এবং অভিনয় ম্লান এবং দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কথকে ভাস্কর্য অনুরূপ নৃত্যভঙ্গি নেই বরং ভঙ্গি এবং অভিনয় 'স্টাইলাইজড' না হয়ে স্বাভাবিক। কথকের বেশির ভাগ রচনাও ছোট ছোট। দর্শককে বলা হয় – 'দেখ আমি এই দেখাচ্ছি' এবং সেটা দেখা হয়। দর্শকও বোঝবার চেষ্টা করে। এতে তাদের পক্ষ থেকে 'active participation' (সক্রিয় অংশগ্রহণ) পাওয়া যায়। তারাই সমঝদার। যা বলা হয়েছে এবং যা করা হচ্ছে তার মধ্যে বৈষম্য আছে কিনা তার রায় দেওয়ার মালিক। এইভাবে তাদের নৃত্যানুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে এক অভিভূতির পর্যায় পৌঁছে যায়। বলা বাহুল্য যে এইভাবে দর্শককে নৃত্য নিবেদনের অন্তর্ভুক্ত করা কেবল কথকের দ্বারাই সম্ভব।

অথচ দুঃখের বিষয় এই যে এখন বহু নৃত্যশিল্পী ভরতনাট্যমের রীতি অনুসরণ করে কথকের গুণ সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছেন। তাঁরা দর্শককে তুচ্ছ জ্ঞান করছেন। নিজেদের বিদ্যার দম্ভে অনেক সময় দর্শককে অবাক বা হতভম্ব করার চেষ্টা করছেন, সমাচ্ছন্ন করার নয়। এতে দর্শক-দেরও এই নৃত্যের উপর অনীহা এসে যাচ্ছে।

আজকাল অনেক তথাকথিত জ্ঞানী শিল্পীরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটি বাক্য ব্যবহার করেন – 'catering to the audience.' তাঁরা এটা করতে চান না। মূর্খ দর্শকরা কী বা জানে। তারা যদি ভাল না বলে তারাই অজ্ঞ। আসল গুণী দর্শকরা নাকী কেবল প্রেক্ষা-গৃহের প্রথম দু-এক পংক্তির মধ্যেই বসেন। এবং এদের জন্যই তো নাচা।

আমার বক্তব্য হল যে, দর্শকরা যদি অতই বোকা হবে তাহলে ওদের জন্য কষ্ট করে নাচা কেন? গুণী সমঝদারদের নিয়ে ঘরেই তো নাচা ভাল। যারা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে দূর দূর থেকে আমায় দেখতে আসবে, তাদের কথা আমি নিজে কখনই ভুলতে পারি না।

এই জনসাধারণের পছন্দ এবং তার প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যাপার নিয়ে কিছু সমালোচকও কথা তুলেছিলেন।

বলেছে Times of India-র সমালোচক লিখেছিলেন 'crossing the line and going over to the audience'। আমার কথা হল এই পংক্তি বা লাইনটি কী? আত্মদম্ভে দর্শকমণ্ডলী থেকে দূরে থাকা কি কথকের রীতিসংগত?

আমি যখন ছোটবেলায় নাচ শিখতে আরম্ভ করি তখন শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান কলকাতায় এত ঘনঘন হত না। রাবীন্দ্রিক নৃত্য-নাট্যেরই ছিল প্রাচুর্য। এতে নাচার জন্য তেমন রেয়াজ বা দম কিছুরই প্রয়োজন হত না। সাবলীল নৃত্যের ক্ষমতা, সুন্দর চেহারা এবং সহজাত লাবণ্য থাকলেই এই নৃত্যে ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যেত। দু-একটি নৃত্যনাট্যের নামভূমিকায় আমিও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু এতে আমার মন ভরল না। দিনে ৭/৮ ঘণ্টা রেওয়াজ করে তিলে তিলে আমার নৃত্যসাধনাকে গড়ে তুললাম।

প্রচুর লোকেই আমায় নিরাশ করবার চেষ্টা করল। প্রথমেই তো বাঙালির মেয়ে আবার কথক নাচবে কী! ও নাচ যে বড্ড শক্ত। বাবারে কী দম আর নিষ্ঠার প্রয়োজন।' শুনেছি যে সাধারণ ভাবে মানুষকে মাংসপেশির দিক থেকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। কারো কারো খুব উদ্যম ও কর্মক্ষমতা আছে, আবার কেউ কেউ ধীরগতিতে কাজ না করলে হাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু আমি কখনই বিশ্বাস করিনি যে ভগবান সম্পূর্ণ বাঙালি জাতিকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলেছেন। আর নিষ্ঠা তো আমাদের নিজেদের মনোবলের উপর নির্ভর করছে। রেওয়াজেই দম বাড়ে আর শক্ত না হলে কেনই বা তার জন্য এত সাধনা?

বাবা-মা-র অবশ্য অন্য চিন্তা। এতক্ষণ ধরে নাচলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে না তো? আমি তাঁদের কথা দিয়েছিলাম যে মাস্টারস ডিগরি না পাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নৃত্যকে পেশা হিসেবে বেছে নেব না। এবং এম-এ-তে গোল্ড মেডেল পাওয়ার পরই আমি পুরোপুরি ভাবে পাবলিক স্টেজে নাচতে আরম্ভ করেছি।

অন্যান্য যে সব সামাজিক ঝামেলা সাধারণ বাঙালি মেয়ের নৃত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলি ভগবানের আশীর্বাদে আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি।

বহুদিন নৃত্যচর্চা করবার পর ১৯৭৬-এ আমার প্রথম একক নৃত্যানুষ্ঠান হয় কলামন্দিরের মূল প্রেক্ষাগৃহে। প্রেক্ষাগৃহে লোক হয়েছিল প্রচুর। অনেকেই হয়ত মজা দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমি আড়াই ঘণ্টা নেচেছিলাম এবং শেষ অবধি হল পরিপূর্ণ ছিল। অনুষ্ঠানের পরে অনেক লোকই আমাকে প্রশংসা করেছিল এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে আমার প্রশংসা এবং ছবি দেখে আমি খুবই উৎসাহিত হলাম। আনন্দ হল এই জেনে যে এই ধারায় আমার ভবিষ্যৎ আছে।

তারপর কয়েক বছর গেল কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। ভোর চারটেয় উঠে পাঁচটা থেকে দশটা নাচ। তারপর দুপুরে কলেজ এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ধ্যাবেলা তবলিয়ার সংগে রেওয়াজ এবং তারপর পড়া। এর মধ্যে দু একটি নৃত্যানুষ্ঠান করেছিলাম কিন্তু আমার সেই সময় পুরোপুরি নৃত্যপরিবেশনের জগতে পৌঁছতে ইচ্ছে ছিল না। ১৯৮০ সাল। ততদিনে আমি এম এ পাশ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসারচ করছি এবং পড়াচ্ছি। ঠিক করলাম নৃত্য জগতে আসতে হলে এইটিই উপযুক্ত সময়। আর দেরি করা চলে না। বিদেশে পড়তে যাওয়ার চিন্তা দূরে সরিয়ে উদ্যমের সংগে নেমে পড়লাম নৃত্যের জগতে। প্রথমদিকে দু-একটি শাস্ত্রীয় সংগীত সম্মেলন এবং বিভিন্ন 'চারিটি' অনুষ্ঠানে একক কথক নৃত্য পরিবেশন করেছি। কলকাতা থেকে কলকাতার বাইরে, দেশ থেকে বিদেশে আস্তে আস্তে আমার নৃত্যানুষ্ঠান বাড়তে লাগল। বহু গুণগ্রাহী দর্শক ও নামী শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। দেশি ও বিদেশি টেলিভিশনে এবং রেডিওতেও আমার নৃত্য পরিবেশিত হল। রেডিওতে আমি বোল ছন্দের দিকটাতেই প্রাধান্য দিলাম। লাচ্ছু মহারাজ নাচতে গিয়ে বলতেন 'আমি আপনাদের শোনাচ্ছি' এই কথাটাই মনে রেখে আমি রেডিওতে নাচতে সাহস পেলাম।

এখন ফিরে দেখলে প্রচুর জায়গায় বিভিন্ন ধরনের দর্শকমণ্ডলীর সামনে নাচের ছবি একে একে মানসচক্ষে ভেসে আসে। ডোভার লেন কনফারেন্সে গুণী সমঝদার দর্শকের সামনে নাচ, আবার বড় বড় ব্যাঙ্কের এবং শিল্প গোষ্ঠীর বিনোদন সংস্থার সামনে নিছক আনন্দ দেবার জন্য নাচ, খাজুরাহো মহোৎসবে পাঁচহাজার বিমুগ্ধ দর্শকের সামনে অনুষ্ঠান, আবার লনডনে ও নিউ ইয়রকে বিদেশিদের সামনে নৃত্য পরিবেশন।

সব জায়গায় কিন্তু আমি একটি মূলমন্ত্র অনুসরণ করে চলি। দর্শকের জন্য আমি নাচতে এসেছি, তাদের আনন্দ দেওয়াটা আমার প্রধান কর্তব্য। এই বাক্যটি অনেক সময় ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাই এটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

অনেকেই আমায় জিগ্যেস করেছেন 'আপনার নাচ দেখে জনসাধারণের কী লাভ হয়'? আমি বলি 'তারা আনন্দ পায়, তাই তারা দেখতে আসে।' 'আনন্দ' শব্দটিকে আমরা বিকৃতভাবে ব্যবহার করে তার অর্থের অধঃপতন ঘটিয়েছি। 'আনন্দ' মানুষ পায় সুন্দর ঐশ্বরিক ও পরিপূর্ণ কিছু দেখলে। তাতে মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়ে এক পূর্ণতার মধ্যে বিরাজ করে। মনে থাকে শান্তি ও মুখে খুশির ছাপ। এই ধরনের 'আনন্দ' কিন্তু কোন বিকৃত চিন্তা ধারা বা চেতনা থেকে আসতে পারে না। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে মহত্ত্বের লক্ষণ। শিল্পসাধনার মধ্যে যদি আমরা এই মহত্ত্বেরদিকে লক্ষ্য রেখে মানুষকে আনন্দ দিতে পারি তাহলেই তো আমার মতে নৃত্যের – বিশেষ করে কথক নৃত্যের – মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। যেখানে দর্শকরা লয়কারী এবং ছন্দকারী পছন্দ করেন, সেখানে তেহাই, ছন্দ-লড়ি, বোল, পরণ বেশি করে দেখাই। আবার অন্য জায়গায় গানের উপর [illegible] দর্শকের জন্য নৃত্য রচনা করেছি। আমি রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল-গীতির সংগে কথক এবং বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের – যেমন সেতার, বাঁশি, সরোদ – সংগে যুগলবন্দী রচনা করেছি। আমার নাচকে দুর্বোধ্য করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি চাই যে আমার দর্শক যেন নাচের সংগে একাত্ম হয়ে যান। এতে আমি নিজেকে কিছুটা সার্থক মনে করি।

আমার মনে সর্বাগ্রে কিন্তু এই চিন্তাই থাকে – ভগবান, নৃত্য ও দর্শক এবং এই তিনের সমন্বয়।

দর্শকের কথা ভাবতে গিয়ে আমি কথক নৃত্যকে বদলে দিচ্ছি না। কথক পরিবেশনার মধ্যে কত রত্নই তো আছে – তৎকার, চক্কর, পরণ, তোড়া, আমদ, সগনিকাস, গৎভাব, যুগলবন্দী, ঠুমরী আন্দাজ, ভাও। এর থেকে বেছে বেছেই আমি দর্শকদের দেখাই। কখনও কখনও আমি তাদের শক্ত ও দুর্বোধ্য জিনিসও দেখাই। দেখাবার আগে কিন্তু আমি তাদের সেটা বুঝিয়ে দিই। সকলে যাতে বুঝতে পারে, আনন্দ পায়।

যা দেখাব, দর্শকের কথা চিন্তা করে দেখাব। এর জন্য নাচ ছোট হচ্ছে না। নাচ ভালবাসি বলেই সকলকে তার কাছে টেনে আনতে চাই। চাই যে সকলে বুঝুক, পছন্দ করুক। মধ্যপ্রদেশ সরকারের রজত-জয়ন্তী উৎসবের সময় আমি বিভিন্ন জেলায় নেচেছি। অনেক জায়গায় মার্গীয় নৃত্যের কদর আগে ছিল না। কিন্তু আমি সরল সোজা ভাষায় বুঝিয়ে লোকেদের আমার নৃত্যের আত্মীয় করতে পেরেছি।

মার্গীয় বলেই যে দুর্বোধ্য হবে এ কথাটা ভুল। অনেকেই আমায় বলেন 'হয়ত আমি বুঝিনি। কিন্তু আপনার নাচ আমার খুব ভাল লেগেছে।' আমার বক্তব্য 'ভাল যখন লেগেছে, তখনই আমার নৃত্য সার্থক। অস্তমিত সূর্যের রক্তিম রেখাকে উপলব্ধি করতে গেলে কি সৌর জগত সম্বন্ধে জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন?'

আমি চাই যে মার্গীয় নৃত্য জনসাধারণের কাছে সমাদৃত হোক। সকলে এই নৃত্যকে ভালবাসে, দেখার জন্য ছুটে আসে। এর জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। দর্শকদের কিছুটা বুঝিয়ে, কিছুটা তাদের মন রেখে, কিছু তত্ত্বকথা আবার কিছু সুরবাঞ্জনা দিয়ে আমি সকলকে একদিন কথকের ভক্ত করব। এই আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

সাক্ষাৎকার

চিত্রেশ দাস : ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যকে বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলছেন যে শিল্পী

চিত্রেশ দাস তরুণ কথক-শিল্পী গোষ্ঠির মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল তারকাই নন, তিনি প্রতিভার দীপ্তি। উদ্দাম সৃষ্টিশীল প্রযোজনা সবকিছু মিলেই এক আন্তর্জাতিক শিল্পী। এ বছর বন ও আখেন নৃত্যোৎসবে তাঁর নাচ সমস্ত নৃত্য-রসিক সমাজকে চমকে দিয়েছে। লয়, গতি এবং দুরূহ সব তালের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম মাত্রাবিভাগে তাঁর কর্তৃত্ব ও বিশ্লেষণের অনন্যতা যার প্রসাদে ভাল হয়ে ওঠে রস, তারই অভিনব প্রকাশভঙ্গিতে ভারতীয় নৃত্যকলার অপরূপ বিকাশ ও পরিণতি দেখে তাঁরা বিস্মিত। এ ছাড়া ভিয়েনা অপেরায় ব্যালেরিনা Karl Mosl-এর উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ চিত্রেশের তরুণ মনে জ্বেলেছে নূতন প্রেরণার আলো।

কিন্তু এসব হাল আমলের ঘটনা। তার আগে কত্থক নৃত্যের ক্ষেত্রে স্বপ্ন ও কল্পনা নিয়ে নিজের শিল্পীসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে, যে নিষ্ঠুর সমালোচনা ও প্রতিকূল পরিবেশের সংগে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে হয়েছে, সে ইতিহাস কজনই বা জানেন। বাবা ও মা তথা নৃত্যগুরু প্রহ্লাদ দাস এবং নীলিমা দাস ছাড়াও যে কজন চিত্রেশের এই স্বপ্নকে ধূসর হতে দেখনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গত সুকমলকান্তি ঘোষ।

চিত্রেশ এখন আমেরিকায় আলি আকবর কলেজ অব মিউজিকে নাচ শেখান। একমাসের জন্য কলকাতায় এসেছেন কলেজের ছুটিতে। এমন তো প্রায় প্রতি বছরই আসেন। সে প্রসংগে পরে আসছি। কয়েক বছর আগে এইরকম ছুটিতে যখন এসে-ছিলেন এক ঘরোয়া আড্ডায় বসে-ছিলাম ওঁর মা, বাবা (নৃত্যগুরু প্রহ্লাদ দাস, নীলিমা দাস) ও চিত্রেশের সংগে।

চিত্রেশের সংগে এসেছিল জিমি। আলি আকবর কলেজের এক ছাত্র। সেতারে জুনিয়র স্টুডেন্ট। তখন মাত্র বছর দুয়েকের তালিমে চিত্রেশের তবলা-সংগতে বাজাল মূলতান, ঝাঁপতাল, একতাল এবং ত্রিতালেও। বাঁহাত তখনও তেমন সবল না হলেও দক্ষিণপানির বোল্ ও ছন্দ [illegible]

'আপনারা সব তৈরি হয়েই যদি ওদেশেই যেয়ে বসবাস আরম্ভ করেন এ দেশের এতবড় শিল্পের ঐতিহ্যকে বহন এবং পালন করবে কে?' -- চিত্রেশকে প্রশ্ন করি।

'এ দেশের মানুষ তো আমাদের চায় না। একটা বাঙালির ছেলে কত বিরুদ্ধ অবস্থার সংগে সংগ্রাম করে, কত স্বপ্ন দিয়ে, বুকভরা আশা দিয়ে নিজেকে তৈরি করল। ভাবল, দেখাব বাঙালির ছেলে মেহনতের কাজ করতে পারে কিনা। গুরুজীর কৃপায় করলামও। কিন্তু শেষ অবধি হলটা কী? বাংলার (উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশকে) বাইরে থেকে মিডিওকার ডানসার এসেও বাহবা দিয়ে যায়, আর বাঙালির ছেলে বলেই আমার সংগে একটু আধটু সহযোগিতার কথা কারো মনেও আসে না। ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ খাঁ সাহেবের মত দরদী হৃদয়ের আশ্রয় পেয়েছি বলে। এইখানেই পেয়েছি আমার সাধনার চরম মূল্য।'

চিত্রেশ বলেন : 'আজ আমার রক্তে নাচ, চিন্তায় নাচ, আনন্দ এবং বিশ্রামও নাচ। এমনকি কাজ বলতে [illegible] ঐ নাচকেই বুঝি। নাচ ছাড়া জীবনে কিছুই নেই। সংগে সংগে একথাও সমান সত্য যে, এমন বাবা-মা না পেলে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে পৌঁছতেও পারতাম না।

নাচ শিখলাম কবে থেকে? মনে করা শক্ত। বোধহয় প্রথম চলা শুরু হয় নাচের প্রচেষ্টা থেকেই। আগেই বলেছি মণিপুরী, ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি সবরকম নৃত্যেরই ভারত-খ্যাত শিল্পী ও গুরুরা আমাদের বাড়ি আসতেন, মাঝে মাঝে থাকতেনও। ওঁরা সবাই বাবা-মাকে খুব ভালবাসতেন। প্রখ্যাত [illegible] শিল্পী জয়কুমারী মার বন্ধু [illegible] মা চেয়েছিলেন তাঁর কাছে [illegible] প্রথম পাঠ নেওয়াতে। তখন আমার বয়স ছয় কি সাত। [illegible] বয়সেই দারুণ পৌরুষবোধ [illegible] পেয়ে [illegible] মহিলা গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে আমি মোটেই রাজি নই।

এরপর গুরু [illegible] সিং-এর কাছে কিছুদিন মণিপুরী নাচ শিখে [illegible]

মাতলাণ্ডব নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান হয়ে-ছিল।

১৯৫৩ সালে সত্যিকারের গান্ডা বাঁধা হল কথক-গুরু রামনারায়ণ মিশ্রের কাছে। চিত্রেশ বলেন, 'তখন আমার বয়স আট কি দশবছর। কলকাতার যত শিল্পী সবাই আমার গুরুজীর শিষ্য।

সত্যিকারের শিক্ষা যাকে বলে, তার শুরু তখন থেকেই। সেই ১৯৫৩ সাল থেকে শুরু করে গুরুজীর জীবনের শেষদিন অবধি (১৯৭৪ সালে তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যুর আগেও) তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি। ভোর ৪টেয় উঠে তাঁর কাছে চলে যেতাম। বেলা ৮টা, কোন কোনদিন ৯টা অবধি রেয়াজ করা-তেন। কোন [illegible]

কিন্তু ছিল না [illegible] হবে।

'চল থেটা, চল -- [illegible] ধা, কত্ তেটে [illegible] গাদ ধন্ -- [illegible] আমার অবধি একটা [illegible] হয়ে গেলে, তার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ [illegible] রেয়াজ করাতেন, [illegible] তবলা নিয়ে। আর [illegible] বোল বলতে হত প্রতিটি [illegible] ছন্দের ওজন বুঝে, সেই [illegible] আনবার জন্যে। কিন্তু [illegible] কঠোর Task master-ই [illegible] না। ৪/৫ ঘণ্টা [illegible] নিয়ে রেয়াজ করানোর [illegible] আমাদের [illegible]

আন্তরিক। তাছাড়া গুরুদের মধ্যেও গোঁড়ামির ভাবটা ক্রমশ কমে আসছে।'

আপনি দেশ ছাড়া হয়ে হঠাৎ আমেরিকাবাসী হলেন কেন? নিছক ভারতীয় নৃত্যকলা বিশ্বে প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে? না অর্থনৈতিক কারণে?

'আপনার hint বুঝেছি'। চিত্রেশ বলেন 'যদি বলি দুটো কারণেই। আমি আগেই বলেছি কথক নাচ শিখেছি। সাধ্যমত এবং সাধ্যের অতিরিক্ত রেয়াজ করেছি। কিন্তু এত করেও হলটা কি? কেউ তো একবারও ভাবলেন না বাঙালি নৃত্যশিল্পী কেন সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত হবে না? C. L. T. এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সমস্ত situation study করে দেখলাম - কিছু করবার সুযোগ না পেলে আমার এতদিনের স্বপ্ন, সাধনা, অধ্যবসায় সবই মিথ্যে হয়ে যাবে। এইরকম দ্বন্দ্বে যখন দোলায়িত চিত্ত, ঠিক সেই সময় আমন্ত্রণ এল। সেটা হল ১৯৭১ সালের সেপটেমবর, আমেরিকার Maryland University-তে Lecture demonstration দেবার। সেটাই আমার জীবনের একটা মস্ত বড় Turning Point। ওখানে যে এত Response পাব ভাবতেই পারিনি। এক বছর যে কী আনন্দে, উদ্দীপনায় কাটিয়েছি বলতে পারব না। যেখানে Show দিই ডিনি, ডিডি, ডিসির মত ব্যাপার। ফেরবার সময় হয়ে এল। মনটা খুব খারাপ। কিন্তু অসম্ভবের স্বপ্ন দেখার মত একটি প্রশ্ন বার বার মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকের মত উঁকি দিতে লাগল। এখানেই বরাবরের মত শেখাবার সুযোগ পাওয়া যায় না? তাহলে তো আমার নাচ সাগর পারেও ছড়াবে আর নিজে দাঁড়াতে পারলে এ বিষয়ে রিসারচ ওয়ারক এবং নিজের কল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিধর্মী কাজও করা যাবে। আলি আকবর কলেজ অব্ মিউজিকের খ্যাতি তখন সারা ইওরোপে। রবিজী এবং খাঁ সাহেব যে কীভাবে ওদের ভারতীয় সংগীতের রুচি গড়ে তুলেছেন এবং দিন দিন এ সংগীতের প্রতি ওদের আকর্ষণ বাড়িয়ে চলেছেন সেটা ওদেশে গিয়ে না দেখলে চিন্তা করা যায় না।

–যাক যা বলছিলাম। একদিন কপাল ঠুকে খাঁ সাহেবকে ফোন করলাম আমি ওঁর কলেজে শেখাতে চাই বলে। উনি নিজে ফোন ধরেছিলেন। বললেন 'ঠিক আছে, তুমি এসোতো তার পর দেখব কী করতে পারি।'

শোতে। উনি আমার একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলেন বিরাট gathering-এর সামনে। নৃত্য ও সংগীতে সমালোচক, শিল্পী, বিদগ্ধ রসিক সবাই ছিলেন। শো-এর শেষে খাঁ সাহেব আমায় জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে বললেন 'তুমি আমার মুখ রেখেছ'। আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনার তিনটি ঘটনার মধ্যে এটা একটা।

অপর দুটি: কলকাতায়, একবার জিলিনিম্কির বাড়িতে আমার একটি Solo programme-এর পর উদয়শঙ্কর ঠিক এমনি করে আমায় জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করেছিলেন 'তুমি তো বাঙালি: কোথা থেকে পেলে এই Showmanship? এ জিনিস তো বড় একটা চোখে পড়ে না এদেশে?'

আর একবার। আল্লারাখা খাঁ সাহেবের ছেলে জাকিরের তবলায় সংগে ধামার, এক তাল এবং রূপক তালের যেখান সেখান থেকে তেহাই চক্রধার তুলে জোর প্রোগ্রাম করেছিলাম। সেদিনও আল্লারাখা খাঁ সাহেব আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, জিতা রহ বেটা।'

থাক। তার পর?

'তার পর খাঁ সাহেবের কলেজে নৃত্যশিক্ষকের পদগৌরব লাভের দুর্লভ এবং সম্মানজনক সুযোগ এবং আজও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি।'

ওখানের অভিজ্ঞতা?

'উত্তর-ভারতীয় নৃত্যের রসে ওদের মনকে ভিজিয়ে দিতে হবে এই mission নিয়েই আমি কাজ শুরু করেছিলাম। শুধু মিশনই বলব না। এটা ছিল আমার একটা চ্যালেনজ যে আমি ওদের convince করবই। যত দিন যাচ্ছে আমি আরো আশাবাদী হয়ে উঠছি। ওদের সম্বন্ধেই শুধু নয়। নিজের সম্বন্ধেও।'

আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

'ওরা খুব বুদ্ধিমান কোন বিষয়ই না বুঝে গ্রহণ করে না। প্রতিটি নাচের বোল, Step, Theme সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। এই জন্যই যেকোন শিল্পী ওদেশে যাবেন তাঁর ভাল করে জানলেই হবে না, তাঁর বোঝাবার ক্ষমতাও থাকা চাই।

আমি আশাবাদী এইজন্য যে, ওদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছি এবং যারা শিখতে আরম্ভ করেছিল কেউ-ই মাঝপথে থেমে যায়নি। এইটেই আমার ওপর গুরুর আশীর্বাদ।'

ওখানে যত গুণী ছিলেন সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন 'হ্যাঁ, এ তৈরি বটে'। তারপর সুরদাস সংগীত সম্মেলন, সদারং সংগীত সম্মেলন থেকেও আমন্ত্রণ পেয়েছি, এবং আপনারা, মানে সাংবাদিকরাও অকৃপণ প্রশংসা দিয়ে আমায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছেন।

তারপর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের শো। কানন দেবী, অমলাশংকর আরো অনেক শিল্পী এসেছিলেন। ওঁদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন ও স্বীকৃতিতে ভরসা পেলাম যে নৃত্যকে জীবনে মূলমন্ত্র করে আমি ভুল করিনি। ঐ অনুষ্ঠানেই দেখিয়েছিলাম গত ভাওনিয়ে Train-এর বিভিন্ন পর্যায়ের গতি। এই আইটেমটি শুধু এদেশেই নয়, ওদেশেও দারুণ পপুলার। সব প্রোগ্রামেই ওটা দেখাবার অনুরোধ আসবেই।'

'ট্রেন আইটেমটিতে আপনার নিজস্ব Improvisation কী?'

'আমার আগে যাঁরা 'ট্রেন' দেখিয়েছেন তাঁরা সবাই বেলচি ও তাঁদের বোলের সাহায্যে ট্রেনের গতি ও ভাষাকে রূপ দিয়েছেন। আমি শুধু ঘুঙুরের সাহায্যেই Sound Variation সৃষ্টি করে ট্রেনের দূরাগত ধ্বনি থেকে শুরু করে, আসা, থামা, মিলিয়ে যাওয়া সবকিছু নিয়ে ট্রেনের বক্তব্যকে দর্শকচিত্তে পৌঁছে দেবার প্রয়াসী।'

'আপনার বাবার নৃত্য প্রতিষ্ঠানে তো সবরকম নাচই শেখান হয়। কিন্তু বিশেষ করে কথককেই আপনি নিজের নাচ বলে বেছে নিলেন কেন?'

'লয়কিরী, ছন্দবৈচিত্র্য, অভিনয়, ভাও সব মিলিয়ে কথককে আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ নৃত্য বলে মনে করি। তাছাড়া নাচের মধ্যে বীর বা পৌরুষভাবের দিকেই আমার প্রবণতা বেশি। এই নিরিখে কথকনৃত্য একটা বড় আকর্ষণ।'

কথককে শুধু পৌরুষ ভাবেরই বাহক বলছেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের লাস্য, যমুনালীলা, শ্রীরাধার ভাব থেকে ভাবান্তরে যাবার আধার রূপে কথকের খ্যাতি প্রবাদবাক্যেরই সামিল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। কথকে রাধাকৃষ্ণের ভাও-এ একটা Feminine Grace নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ নাচে শ্রীকৃষ্ণের লাস্যভাব যেমন আছে তেমনই আছে শিবতাণ্ডবের বীরভাব। এতে যদি থাকে চপল চরণে মঞ্জিরের রিনিঝিনি বোল, ওতে আছে মৃদংগের দ্রিমিকিভাব। আমি যাকে বলি পৌরুষের ওজস। আমার নাচ এই শিবতাণ্ডবের বোলকে আশ্রয় করে দ্রিমিকি গতিতে ধাবিত।'

কথক নৃত্যে জয়পুর ও লখনৌ ঘরানার একটিতে বোলকরণ, অপরটিতে কাব্য ও সুরের ওপরই জোর দেওয়া হয় তো? এখনও কি এ সম্বন্ধে দৃঢ়নিবদ্ধ পদ্ধতি পালন করা হয়?

'নিজ নিজ ঘরানার প্রতি সব শিল্পীরই মোটামুটি একটা আনুগত্য অবশ্যই আছে।' চিত্রেশ হেসে বলেন, 'কিন্তু এখন শিল্পীদের নাচে বৈচিত্র্য সৃষ্টির দিকে নজরটা যাওয়ায় দুটো স্টাইল প্রায়শই মিলে মিশে যাচ্ছে। যেমন ধরুন দিল্লিতেই আছেন দুই ঘরানার গুরু – কুন্দনলাল ও বিরজু মহারাজ। একই Institution-এ দুজনেই শেখান। কাজেই শিক্ষার্থীরা পরস্পরের প্রকাশভঙ্গির মিলনে একটা নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করবে, এটা খুবই

সাক্ষাৎকার: সন্ধ্যা সেন

সাক্ষাৎকার

'রাগভিত্তিক খেয়াল-ঠুংরিকে ভরতনাট্যমের নৃত্যছন্দে রূপায়িত করতে চাই' – অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওর নাচ দেখেছিলাম কয়েকটি কনফারেনসে, নৃত্যনাট্যে আরও কোথায় কোথায়। কিন্তু নানান অনুষ্ঠানের ভিড়ে সে নাচ চোখকে কয়েক মুহূর্তের জন্য আপ্যায়িত করলেও মরমে প্রবেশের পথ পায়নি, হয়ত আমারই নানামুখী কাজের তাগিদে যথাযোগ্য মনো-নিবেশের অভাবের কারণে। কিন্তু চমকে উঠেছিলাম গতবছর রবীন্দ্র-সদনে ওর নাচ দেখে। এবং সে নাচ যে সে নাচ নয়। ভরতনাট্যম। প্রাচীন এবং ট্র্যাডিশন সমৃদ্ধ এই মন্দির নৃত্যের শাস্ত্রীয় রূপে অবিচল থেকেও তার সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে ওঠবার আবেগই ওকে আমার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। লয়, নিখুঁত বিশ্লেষণ, পায়ের কাজ এসব তো অনেকেরই থাকে। কিন্তু এইসবকে মিলিয়ে এবং ছাপিয়ে যে ঝকঝকে পালিশ, – যাকে বলা যায় 'Finish' (হোক না সে যতটুকু পরিসরের) তারই মধ্যে দেখেছি এক কৃতী শিল্পীকে।

'আমাদের পরিবারটাই ছিল যেন সবরকম শিল্পকলার রংমহল।' অঞ্জনা সেদিন বলছিল। জয়-জয়ন্তীতে ওদের শিল্পীত কক্ষের রঙিন আলোছায়ার ঝিকিমিকিতে ওকে দেখাচ্ছিলও ভাল।

'আমাদের সব ভাইবোনেরই নাচ ও গানের প্রেরণা বাবা-মার কাছ থেকেই। কবি নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে ভি জি যোগ, তিমিরদা এবং তখনকার সময়ের প্রায় সব নামী সাহিত্যিক, শিল্পী সবাই ই আসতেন আমাদের বাড়ি। মা এবং বাবাও (কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য) যদিও তিনি ব্যবসায়ী – প্রকৃতিতে ছিলেন শিল্পরসিক। দুজনেই অব-সর সময়ে গান গাইতেন আর ওদের ঘিরে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আমার দু দাদা (আশিস এবং প্রীতীশ ভট্টাচার্য) শিখতেন খেয়াল, ধ্রুপদ আর দিদি (বন্দনা বসু) গাইতেন রবীন্দ্র-সংগীত। আপনি তো বহু আসরে দাদা দিদিদের গান শুনেছেন। সব-রকম গানে, সুরে, ছন্দে আমাদের বাড়ি যখন জমজমাট ঠিক সেসময় নাচ নিয়ে এলাম আমি। কেমন করে জানি না। মার কাছে শুনেছি মুখে কথা ফোটবার আগেই আমার দেহে ফুটেছিল নাচের ভাষা। যে কোন আবৃত্তি, ছন্দ, কথা কানে এলেই আমি দুলতে শুরু করতাম লক্ষ করবার মত সুসং-বদ্ধ লয়ে। দিদি অবশ্য গান শেখার আগে নাচত ও বলতে গেলে conve rted গাইয়ে। পাঁচ বছর বয়সে আমি আপন মনে নাচ তৈরি করে নাচতাম। বাড়িতে সাহিত্যিক, শিল্পী যিনিই আসতেন অত্যন্ত স্নেহভরে কৌতুকে ভ্রূভঙ্গী করে আমার সেইসব সু-রচিত নাচ দেখতেন। তখনই বাবা-মা আমায় নাচ শেখাবেন বলে মন স্থির করে ফেললেন।

এখন ভরতনাট্যম আমার নাচ হলেও আমার নৃত্যশিল্প হয়েছিল মণিপুরী দিয়ে। গুরু বসন্ত সিং-এর কাছে। আট বছরেরও বেশি দিন ধরে –

মণিপুরী শিখতে শিখতে অনেক নৃত্যনাট্যেও আমি অংশ নিয়েছি। ছোটো বড় অনেক Competiti-on-এ ফারস্ট হয়েছি 'Inter-College Compe tition, মুরারী স্মৃতি বার্ষিকীতে, এবং আরও বেশ কয়েক টিতে। এ ছাড়াও সাত বছর বয়সে Star Theatre, রং মহল, মহাজাতি সদনে মণিপুরী একক নৃত্যেও অনেক গুণীমানুষের তারিফ পেয়েছি।

এইরকমই নাচ শিখতে শিখতে, মঞ্চে নাচতে নাচতে এবং সকলের appreciation পেতে পেতেই দিনগুলো বেশ মজাতেই কাটছিল। এই সময়ই একদিন মনের ভিতর দারুণ একটা ধাক্কা খেলাম রবীন্দ্র-সদনে যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচ দেখে। সেটা বোধহয় ১৯৭১ সাল। ওঁর নাচ দেখছি। একটার পর একটা বিষয়-বস্তুর অবতারণা করছেন আর চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে এক এক ধরনের সৌন্দর্যলোক। মনে হচ্ছিল স্বর্গ থেকে কি উর্বশী নেমে এলেন? এই নাচ নেচেই বুঝি পুরাকালে উনি মুনিঋষিদের তপো-ভঙ্গ করতেন।

নাচ শেষ হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হতেই মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে তখন বড় ব্যর্থ মনে হল। এতদিন ধরে এ কী করলাম? এমন নইলে নাচ? আর এমন নানারঙা আলোর জৌলুশ ভরতনাট্যমেই বোধহয় সম্ভব। আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে উদ্যো-ক্তারা ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। দু একটা কথা বলেই যামিনীজী আমার মনের কথা যেন পড়ে নিলেন এবং উনিই পরামর্শ দিলেন থাঙ্কমণি কুট্টির কাছে ভরতনাট্যম শেখবার। আর বললেন দিল্লিতে গেলেই যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

ওঁর কথামত থাঙ্কমণি কুট্টির স্কুলে ভর্তি হলাম। এমন Trainer দুর্লভ। যেমন ছিল ওঁর স্নেহ,

আলোকচিত্র : নিমাই ঘোষ

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

তেমনই শাসন। একটু ভুলচুক হলেই এমন কঠিন তিরস্কার করতেন যে প্রায় প্রতিদিনই বাড়ি এসে কাঁদতাম। দাদারা বোঝাতেন গুরুর শাসন হল আশীর্বাদ। এত বকুনি দিতেন। আবার অল্পদিনের মধ্যেই ওঁর স্কুলে আমায় ট্রেনারও করে দিয়েছিলেন। তবু শাসনের কামাই নেই। একদিন সবার সামনে ওঁর ধমক খেয়ে আমাদের স্কুলে প্রতিষ্ঠিত ব্রোনজের এক নটরাজমূর্তির কাছে বসে কাঁদছিলাম। এমন কান্না জীবনে খুব বেশি কাঁদিনি। উনি অন্য মেয়েদের কাছে এ খবর পেয়েও কিন্তু আমায় এসে ভোলালেন না। বলেছিলেন 'কাঁদুক না। এমন কান্না ভাল। তাতে দেবতার দয়া পাবে।' গুরুর বাক্য বিফল হয় না যদি তার মধ্যে সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকে। দেবতার করুণাই জীবনে এল ঠিক তার পাঁচ মাস বাদে।

রবীন্দ্র সদনে একটা প্রোগ্রাম ছিল মোহরদির (কণিকা ব্যানারজি) এবং আমার দিদির। সেইখানেই দেখা হল শঙ্করের সংগে। মোহরদি পরিচয় করিয়ে দিলেন। গংগাটিকুরীর জমিদার বাড়ির ছেলে। সাহিত্যিক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি। উভয়েরই বনেদিবংশ। ওদের বাড়ি বংগ সাহিত্য সম্মেলন হত। এমন কোন বিদগ্ধ কবি সাহিত্যিক কিংবা শিল্পী ছিলেন না যিনি সেখানে যেতেন না। শঙ্করই প্রথম প্রস্তাব করল বিবাহের। সবাই বললেন সবদিক থেকেই এ বিবাহ হবে একেবারে রাজযোটক।'

অঞ্জনা বলে চললেন: 'দিল্লিতে Convention Hall-এ ১৯৮২ সালের ২০শে সেপটেমবর আমার Show। সে স্মৃতি ভোলার নয় নেচেছিলাম আত্মবিস্মৃত হয়ে। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার দেহের সীমাকে অতিক্রম করে আকাশ ছুঁয়ে এলাম। সে যে কী আশ্চর্য আনন্দের অনুভূতি, কী বলব? শো-এর পর যামিনী এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তারপর একদিন ওঁর বাড়ি আমায় নিমন্ত্রণ করে ধাতু দিয়ে গড়া সুন্দর একটি গণপতি মূর্তি উপহার দিলেন। আসানসোলে আমাদের নূতন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের দিন যামিনী আমার বাড়ি আসতে পেরেছিলেন, এটা আমি আমার জীবনের এক পরম লগ্ন বলেই মনে করি। মিসেস কুট্টি আমায় দুহাতে ধরে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন আমার নিজের হাতে-গড়া শিষ্যাকে তোমায় দিলাম।

এ বছর দিল্লিতে কামিনী অডিটোরিয়ামে আমার নাচের আগে Introduce করিয়েছিলেন বিরজু মহারাজ।

দুই দিকপাল শিল্পীর এই স্নেহসিক্ত সৌজন্য এতবড় প্রাপ্তি কটা শিল্পীর ভাগ্যে ঘটে? আমার জীবনবিধাতার কত বড় করুণা আমার ওপর? এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল।

আমার জীবনের স্মরণযোগ্য আর একটি ঘটনা হল গুরু থাঙ্কমণি কুট্টির কাছে নটভংগম উপহার পাওয়া। উনি একবার দেশে (দক্ষিণ-ভারত) গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কোন ছাত্রীকে দিলেন শাড়ি। কাউকে বা কানের গয়না। কাউকে মেখলা। আর সবশেষে আমায় একটি সুন্দর নটভংগম (তালবাদ্য গোত্রের সংগত যন্ত্র) দিয়ে বললেন 'তোমার শিল্পী-জীবন যেন সার্থক হয়।' এই উপহার পাওয়াটা আমার কাছে গভীর অর্থবহ ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল।

তারপর যা বলছিলাম। কামিনী অডিটোরিয়ামে আমার অনুষ্ঠান দেখার পর Hindusthan Times-এ আমার Interview বেরোল দারুণভাবে। রাষ্ট্রপতি ভবনেও আমার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন ওঁরা করেছিলেন। সেখানে আমার নাচ নিয়ে রাষ্ট্রপতি একঘণ্টা ধরে আলোচনা করলেন। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের যে গানটির ('নিরঞ্জন নিরাকার') সংগে আমার নাচ আপনি এত appreciate করেছিলেন সে নাচকে ওঁরাই National Integration বলেছেন।

এই সময়েই গুরু দক্ষিণামূর্তির কাছে তালিম নেবার সুযোগ এসেছিল। যামিনীজী আরও অনেকে বললেন গুরু দণ্ডপাণির আসল বীজ রয়ে গেছে ওঁর কাছে। তাঁর সংগে মৃদংগ বাজাতে বাজাতে উনি নৃত্যের সমস্ত অন্ধিসন্ধি জেনে গেছেন। নাচতে তো অনেকেই পারে। কিন্তু শিষ্যার ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রবণতা বুঝে শেখাতে পারেন কজন? উনি সেই দুর্লভ গুরুদের অন্যতম। স্বয়ং যামিনীজী ওঁদের ঘরাণার অনেক বিশেষ আংগিকের তালিম নিয়েছেন তাঁর কাছে। বৈজয়ন্তীমালাও ওঁর কাছে শিখেছেন অনেক ভঙ্গি ও ছন্দের রহস্য। ১৯৮৩ সাল থেকে ওঁর কাছে ট্রেনিং নিতে শুরু করলাম।

'মনে আছে এবার যখন তোমার নাচের আগে উনি এসেছিলেন আমার কাছে তোমার নাচের প্রসংগে উচ্ছ্বাসমুখর হয়ে বলেছেন 'She has natural grace and talent. I am happy to have a student of her calibre' আর যা বলেছেন, এখন বলব না। সেটা পরখ করবার সময় শীগ্গিরই আসছে।' — আমি বলি।

'সত্যি, গুরুজী এমন পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে শেখান যে মাঝে মাঝে ভাবি আমি কি ওঁর এতখানি মনোযোগের যোগ্য? উনি সকাল ছটা থেকে শুরু করে দশটা অবধি আমাকে একেবারে নিরম্বু উপবাসী রেখে শিক্ষা দেন। আমি মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে বলি 'দূর! আমার দ্বারা হবে না।' উনি কিন্তু ধৈর্যে অটল। বলেন 'হাম তুমকো কর দেংগে'

অঞ্জনার নিজস্ব ধ্যান হল রাগভিত্তিক খেয়াল ঠুংরিকে পুরোপুরি ভরতনাট্যমের নকসায় রূপ দেওয়া। ১৯৭৯ সালে পুরো ভরতনাট্যমের আংগিকে অঞ্জনার রচিত বিক্রমোর্বশী নৃত্যনাট্যের কোরিওগ্রাফীতে ছিল উজ্জ্বল সম্ভাবনার শীলমোহর। আমার ভাল লেগেছে বিখ্যাত কাজরী 'ঝুকে আই বদরিয়া শ্রাবণকী'-র ভরতনাট্যমে নৃত্যরূপ। উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষার সংগে সংগে চলেছে ওর ভাবকল্পনার প্রসারও। ও ভাবছে সুন্দর সুন্দর বাংলা ভাবসংগীতের ধ্রুপদী নৃত্যরূপ নিয়ে বাংলাভাষার মাধুর্যকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা।

সাক্ষাৎকার: সন্ধ্যা সেন

আলোকচিত্র: সংগৃহীত

ফাতেহা দোয়াজ দাহাম ঃ হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্মদিন

জয়নাল আবেদীন

মুসলমানদের প্রত্যেকটি ধর্মীয় পর্বই ইতিহাসভিত্তিক। সুদূর-অতীতে ঘটে যাওয়া এক একজন মহান ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও আদর্শ-কে স্মরণ করেই এই সমস্ত উৎসব।

মুসলিম বর্ষপঞ্জীর তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল। এই মাসের বারো তারিখটি সমগ্র মুসলিম জাহানের কাছে ফাতেহা দোয়াজ দাহাম নামে পরিচিত। ফাতেহা দোয়াজ দাহাম কথাটির অর্থ পুণ্যাহ। ঐটি ফারসি শব্দ। উক্ত তারিখে রসুলে করিম নবীবর হাবিবে কিব-রিয়া আহ্‌মদে মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লেল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরবের বন্ধ্যা মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার তেষট্টি বছর বয়সে এই দিনেই আখেরুন্নবী রসূলে করিম মদিনা শরীফ থেকে চিরবিদায় নেন। সেজন্যই মুসলমানদের কাছে দিনটির পরিচিতি ফাতেহা দোয়াজ দাহাম।

চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র ও আলো-বাতাস সৃষ্টির ন্যায় নবী-রসুলের সৃষ্টিও সৃষ্টলোকের অপরিহার্য ব্যাপার। স্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা যে মানুষ খোদার বান্দা হয়ে চলতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত কিনা। কিন্তু খোদার বান্দা হতে হলে মানুষের করণীয় কী হবে তাও তো মানুষকে জানান দরকার। যেমন, দরকার মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের বাঁচার উপযোগী পরিবেশ প্রদান। মনুষ্য বাসোপযোগী পরিবেশ তৈরি করা যেমন মানুষের কাজ নয়, তেমনি নবী-রসুলদের হেদায়েত সহ প্রেরণও মানুষের কাজ নয় এ কাজ স্বয়ং স্রষ্টার। আল্লাহ্‌ তাই আদি মানুষের সূচনা করেছেন নবীর মাধ্যমে। তারপর যুগে যুগে, দেশে দেশে অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য। এই নবীদের শেষতম প্রতিনিধি হচ্ছেন হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি আখেরী নবী অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। অনিবার্যভাবেই তাঁর পর আর কোন নবীর উম্মতও নেই।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আরব দেশ। ভারত ও আরব দুটি দেশই এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত। ৫৭০ খৃস্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন আরব দেশের মক্কা শহরে। সমস্ত আরব জুড়ে তখন অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সব ব্যাপারেই অনৈক্য। আরব দেশের মূল অধিবাসীরা ছিলেন যাযাবর অর্থাৎ তাদের থাকার সঠিক কোন জায়গা ছিল না। যখন যেমন দরকার সেভাবেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো তারা সূর্য পূজো, কখনো পাথর পূজো ইত্যাদি করতেন। এছাড়া ছিলেন বহু ইহুদী। তাদের মধ্যেও ছিল নানা রকমের ধর্মমত। ছিলেন হানিফ সম্প্রদায়। তারা ধর্ম বলে কিছুই মানতেন না। সারা আরব দেশেই তখন ন্যায় নীতি বলে কিছু ছিল না।

এই যখন অবস্থা, সেই সময়ে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা প্রেরণ করলেন তাঁর পেয়ারা দোস্ত (বন্ধু) হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে। পণ্যবাহী উটের একজন চালক হিসাবে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। অসাধারণ ছিল তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠা, ধৈর্য, পরিশ্রম, সাহস, বাস্তব বুদ্ধি, তেজ, রাজনীতিবোধ এবং সবার উপরে আল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। কুসংস্কার আর অনাচার-কে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি প্রচার করলেন নতুন আদর্শ, নতুন কথা।

হজরত 'মুহাম্মদ' ও 'আহম্মদ' দুই নামেই তিনি পরিচিত এবং দুই নামেরই সার্থকতা রয়েছে। আল্লা-হর দ্বারা তিনি চরম প্রশংসিত এবং আল্লাহকেও তিনি চরম প্রশংসা করেছেন।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রতিশ্রুত পয়গম্বর। আল্লাহতায়ালা তাঁকে পৃথিবীতে পাঠাবেন তা পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

অনুপম চরিত্র মাধুর্য, সততা ও অকৃত্রিম মানব প্রেমের অধিকারী ছিলেন তিনি। শত্রুমিত্র স্বধর্মী বিধর্মীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মিষ্টিমধুর। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

নবীবর হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে আল্লাহতায়ালা তাঁর বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'রহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির বুকে স্রষ্টার মূর্তিমান করুণা ও আশীর্বাদ।

মুহাম্মদ নারীজাতিকে দিয়েছেন পুরুষের সমান অধিকার। দাস-মুক্তির তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সকল মানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ঐশ্বরিক গ্রন্থ 'কোরান' লাভ করেন এবং অদ্যাবধি তা অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং চিরকাল তা থাকবে। তাঁর উপদেশাবলীর সংকলনকে বলা হয় 'হাদীস'।

পঁচিশ বছর বয়স থেকে নির্জন পাহাড়ে বসে দিনের পর দিন ধ্যান করেছেন তিনি একটানা পনের বছর ধরে। তার পর একদিন তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পান। আল্লাহর কোন নির্দিষ্ট রূপ বা আকার নেই। তিনি নিরাকার পরমশক্তি। এই ধর্ম চিন্তাই তিনি প্রচার করেন সারা পৃথিবীতে। প্রবর্তন করেন ইসলাম ধর্মমত। কঠোর শৃঙ্খলায়, সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলেন মুসলমান সমাজের ভিত। কোরান শরীফে তাই ধর্মীয় দর্শন এবং সামাজিক নীতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে এক থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায় না। []

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ- পরিক্রমা – ১৭

স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহীর বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর কলকাতার গৌরমোহন মুখারজি স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়ির নিকটবর্তী রামতনু বসু লেনে, তাঁর মাতামহীর বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবার পদার্পণ হয়েছে। পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়িটি স্বামীজী ও তাঁর ভাইয়েরা পেয়েছিলেন। সিমুলিয়ার দেওয়ান ভবানীচরণ বসুর পৌত্র এবং রামতনু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা-সন্তান ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বিবাহ হয়। একমাত্র সন্তান হিসাবে পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বামীজীর মাতামহী রঘুমণি দেবী এবং প্রমাতামহী রাইমণি দেবী এই বাড়িতে একত্রে বাস করার সময়েই ঠাকুরের আগমন হত স্বামীজীর (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে; কারণ, নরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পৈতৃক বাড়িতে বাস করলেও লেখাপড়া ও গান-বাজনার উদ্দেশ্যে ছাত্র জীবনে দিনের অধিকাংশ সময় এই বাড়ির দোতলায় নির্জন একটি ছোট ঘরে থাকতেন। এই সম্পর্কে জানা যায় – 'বি. এ. পড়িবার সময় নরেন্দ্র রামতনু বসু লেনের স্বীয় মাতামহীর ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয়, পরিজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে পিতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখরিত থাকিত বলিয়া তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যায় কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক, একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোন তৈজসপত্র ছিল না।' (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত – 'বিবেকানন্দ-চরিত')

এই বাড়ির দোতলায় নির্দিষ্ট একটি ছোট ঘরে, স্বামীজী যাকে 'টঙ' আখ্যা দিয়েছিলেন, স্বামীজীর গান শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধির প্রসঙ্গে জানা যায় – "গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, বক্ষে স্পন্দন নাই। ---- ক্রমে মর্মর মূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ---- গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখনও ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখন বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন, অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাবি? কদিন তো যাসনি, চল না, আবার এখনি ফিরে আসিস।' নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল, কেবলমাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন।" (স্বামীজীর সহপাঠী প্রিয়নাথ সিংহ রচিত "স্বামীজীর স্মৃতি" – উদ্বোধন, ফাল্গুন সংখ্যা – ১৩১৭ সন)

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থ অবস্থায় অবস্থানকালে স্বামীজীর মুখেই এই বাড়ি সম্পর্কে উল্লেখ আছে – "দিদিমার বাড়ীতে সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো – পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আটুপাটু করতে লাগল! – অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। তারপর বই-টই ফেলে দৌড়! – রাস্তা দিয়ে ছুট্! জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম – গায়েময়ে খড়, – আমি দৌড়ুচ্চি – কাশীপুরের রাস্তায়।" (কথামৃত – ৩য় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড – দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

এই বাড়ির বিশেষ ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন – "আমার মাতামহীর ৭ নং রামতনু বসু লেনস্থ বাড়ীতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সাধুরা প্রায়ই যাতায়াত করতেন। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত ঐ বাড়ীতে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার সেখানে এসেছেন। পরে নরেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যও তিনি এখানে আসতেন। পরবর্তী জীবনে স্বামীজীও তাঁর মাকে দেখবার জন্য এই বাড়ীতেই আসতেন। ------

এই বাড়ীতে এক সময় ব্রাহ্মপ্রচারক সাধু অঘোরনাথ বাস করতেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন মশায়ও সেখানে এসেছিলেন। রামচন্দ্রের এবং পরে নরেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থায় সেখানে অবস্থানকালে পরমহংস মশায় বহুবার এসেছেন এবং আমার মাতামহী ও প্রমাতামহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।" (ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত – "স্বামী বিবেকানন্দ", ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

স্বামীজীর মাতামহীর সেই প্রখ্যাত বাড়ির ঠিকানা : ৭ নং, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬, বাড়িটি অত্যন্ত পুরাতন এবং বর্তমানে জীর্ণ। দোতলা বাড়ি, কিন্তু উচ্চতা কম, বাড়িতে প্রবেশ করেই সদরে অতি ছোট একটি উঠানের বামদিকে দোতলায় যাবার জন্য অনাচ্ছাদিত সিঁড়ি। উঠানের মধ্য দিয়ে বামদিকে অন্দরমহলে যাবার রাস্তা, সেই অংশে আর একটি ছোট্ট উঠানের পাশ দিয়ে অনুরূপ সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় যাবার জন্য। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই দোতলার যে ছোট ঘর, সেই নির্জন ঘরেই নাকি স্বামীজী লেখাপড়া বা গান-বাজনা করতেন। এই বাড়িতে ছোট-বড় অনেকগুলি ঘর আছে এবং বর্তমানে এই বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটিয়া আছেন। এই বাড়ির বর্তমান মালিক শ্রীনিতাই মল্লিক, যিনি ভাড়াটিয়া থাকাকালীন এই বাড়িটি ক্রয় করেছেন, তিনিই সপরিবারে বাড়ির সামনের অংশে বাস করেন। বাড়ির বর্তমান অবস্থা দেখে চিন্তাই করা যায় না যে, একদা এই বাড়িটি কত ঐতিহ্যময় ছিল!

পথনির্দেশ : উত্তর কলকাতার বিধান সরণীর ওপর হেদুয়ার (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) যে কোণে বিপ্লবী বাঘা যতীনের মর্মর মূর্তি আছে, তার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ রাস্তার পশ্চিমে একটি চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে 'রামদুলাল সরকার স্ট্রিট' শুরু – এই রাস্তায় ঢুকে সামান্য এগুলেই বামদিকে 'ডবলিউ সি ব্যানারজি স্ট্রিট' এই রাস্তায় ঢুকে এগিয়ে গেলে একটি 'তেমাথা' পড়ে, এরই সোজা রাস্তাটি 'রামতনু বসু লেন'। এই লেনে ঢুকে এগিয়ে গেলেই ডানদিকে খুব সরু একটি গলির মধ্যে এই বাড়ি। গলিতে ঢোকার মুখেই বড় রাস্তার ওপর 'তরুণ স্পোরটিং ক্লাব'। এই রাস্তার অপর দিকে, বিধান সরণী ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মাঝামাঝি 'বিবেকানন্দ রোড' দিয়ে উত্তরমুখী রাস্তা এই 'রামতনু বসু লেন', ঐ রাস্তা দিয়ে এলে 'তরুণ স্পোরটিং ক্লাব' ও তার পাশের সরু গলিটি বামদিকে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে সরাসরি এখানে আসতে গেলে, গৌরমোহন মুখারজি স্ট্রিট থেকে পশ্চিমে সিমলা স্ট্রিট ও ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় সরণি বরাবর 'মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে' ঢুকে বামদিকে 'রামতনু বসু লেন'। স্বামীজীর আমলে অবশ্য এই দুটি বাড়ির মাঝখানে তখন এত বাড়ি বা এত রাস্তা ছিল না। □

৭ নং, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

আসুন শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়

কবিরুল ইসলাম

৭ পৌষ। শান্তিনিকেতনে মেলা। পৌষোৎসব। পৌষমেলা। প্রতিবছর বসে। ৭ পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা দিবসের স্মরণে এই মেলা। শান্তিনিকেতনের সবচাইতে বড় উৎসব। এই মেলা ৩-৪ দিন চলে। ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'মন্দিরে' খৃস্টোৎসবই মেলার শেষ অনুষ্ঠান : 'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে/রাজার দোহাই দিয়ে'।......

বীরভূম মেলা আর বাউলের দেশ। হেতমপুরের ছেলেরা একটা বই বের করেছে 'বীরভূমের মেলায় মেলায়।' খুব কাজের বই। শুধু মেলা নয়, একার্থে এ বই গোটা বীরভূমের গাইডবুক। এই দুয়ের যোগসূত্র হিসেবে আছে রাঙামাটি। সারা শীতকাল জুড়ে এইসব মেলা বসে কাছে, দূরে। 'কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লিতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে মেলা/মেলা, খেলা, সারা বেলা'। মেলা মেলাতে পারে, মেলা তো মিলনের জন্যে। আদান-প্রদান। ভাব-বিনিময়। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'। আর যেখানেই মেলা, সেখানেই বাউল। 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে'। শান্তিনিকেতন পৌষমেলাও বাদ নয়।

হাওড়া থেকে বোলপুরের রেলপথ দূরত্ব ১৪৫ কি মি। শান্তিনিকেতনের সুবাদে বোলপুর স্টেশনের নাম 'বোলপুর-শান্তিনিকেতন'। ভোরবেলা হাওড়াগামী একটা ট্রেন আছে, তারও নাম 'বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার'। বীরভূম থেকে কলকাতা যাবার এবং ফেরার এই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ট্রেন। তবে হাওড়া থেকে বোলপুর ভোরবেলা থেকে বিকেল পর্যন্ত ৪টে ট্রেন আছে। সকাল ৬-১৫ মি বর্ধমান লোকাল বা ৬-১০ মি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডে হাওড়া থেকে বর্ধমান। বর্ধমানে ট্রেন বদলে সেখান থেকে ৮-৩৫ মি রামপুরহাট লোকালে বোলপুর। তাছাড়া ৬-৫২ মি মুজফফরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে, ১১-৪০ মি দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, ১৬-০৫ মি বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার (১৭-১৫ মি কোলফিল্ড এক্সপ্রেসও আপনাকে বর্ধমানে বিশ্বভারতী ধরিয়ে দিতে পারে)। এবছর সম্প্রতি একটা নতুন খুব দ্রুতগামী ট্রেন দিয়েছে : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। আপাতত সপ্তাহে তিনদিন : হাওড়া থেকে ছাড়ে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার। এবং হাওড়া পৌঁছয় প্রতি সোম, বুধ, ও শুক্র বার। হাওড়া থেকে সকাল ৬-১০ মি ছেড়ে বোলপুর পৌঁছয় ৮-৩০ মি নাগাদ। মাঝখানে কোন স্টপ নেই। ননস্টপ বোলপুর। চমৎকার ট্রেন। আপনার সুবিধেমত যেকোন একটা ট্রেনে উঠে পড়ুন, সরাসরি পৌঁছে দেবে বোলপুর। আর বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন ৩ কিমি।

মেলার মাঠের পুঞ্জ-পুঞ্জ কলরব, মাইকের শব্দাবলি, দূরের অস্ফুট গুঞ্জন আপনি শুনতে পাচ্ছেন। এই শব্দের সম্মোহনই আপনাকে পায়ে-পায়ে মেলার মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

এক সময় এই মেলা বসত উত্তরায়ণ ও ছাতিমতলা-মন্দির সংলগ্ন মাঠে। পরে ১৯৬১ থেকে মেলা সরে এসেছে পূর্বপল্লীর বিশাল মাঠে। প্রথমে মেলা ছিল একদিনের। এই মেলা প্রথম বসে ৭ পৌষ ১৮৯৫, মহর্ষির দীক্ষাদিনের স্মৃতি এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ উপলক্ষে। তাই এই উৎসব একই সঙ্গে ধর্মোৎসব এবং কর্মোৎসবও।

পৌষমেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ জন সমাগম হয়, এই কারণে মেলার সময় বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থাও করা হয় প্রতিবছর। তবুও তেমন সুরাহা হয় না। মানুষ, মানুষ আর মানুষ। লক্ষ্য একটাই : চল শান্তিনিকেতন। সব রাস্তাই শান্তিনিকেতনের দিকে। মানুষ আসছে আর যাচ্ছে। যাচ্ছে আর আসছে। অশেষ। ধারাবাহিক।

কিন্তু এত লোকের থাকবার জায়গা নেই, না বোলপুর, না শান্তিনিকেতনে, না ধারে কাছে কোথাও। সর্বত্রই ঠাঁই নেই। ঠাঁই নেই। যা আছে তা দুকোটো শিশির মাত্র। বোলপুরে আছে বোলপুর লজ, আবাসিক আর আছে সাধারণ হোটেল : মহামায়া, অদ্বৈত লজ, নিন্দদা বোর্ডিং প্রভৃতি। আছে বোলপুর টুরিস্ট লজ, যা মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে। শান্তিনিকেতনে আছে পূর্বপল্লী গেস্ট হাউস এবং আরও দুটো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত গেস্ট হাউস। বলাবাহুল্য, এগুলোও সাধারণ মানুষজনের জন্যে নয়। বিশেষ করে মেলার সময় তো নয়। প্রায় সবই বহুপূর্ব থেকে নানা গোত্রের ভি আই পি-দের জন্যে বরাদ্দ, অবধারিতভাবে। তাছাড়া আছে পৌষালি আর শান্তিনিকেতন টুরিস্ট সেনটার।

বোলপুর স্টেশন ছাড়িয়ে বেশ একটু এগিয়ে চৌরাস্তা। এখানে এক স্মারকস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে রবীন্দ্রনাথের সব শেষের ইচ্ছা : 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,/আমি তোমাদেরই লোক।' তার পর আরও এগোলে বাঁ হাতে ডাকবাংলো মাঠে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি, যা বরাবরই অযত্নে আছে, আর ডান হাতে 'বিচিত্রা' সিনেমা হল। ডাকবাংলো মাঠ লাগোয়া বোলপুর টুরিস্ট-লজ। যার ঠিক উলটো দিকেই থাকেন রবীন্দ্রজীবনীকার, জীবিতকালেই কিংবদন্তীপুরুষ, প্রতিষ্ঠান প্রতিম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ডাকবাংলো মাঠ-লাগোয়া বোলপুর লজ। সেখান থেকে পূর্বপল্লীর রাস্তা ধরে সামান্য এগোলেই মেলা। মেলার মাঠ।

৬ পৌষ নৈশাহারের পর বৈতালিক দল গান গেয়ে-গেয়ে আশ্রম পরিক্রমা করে। ৭ পৌষ প্রত্যূষেও বৈতালিক হয়। এবং ভোর থেকেই সানাই বাজে পৌষ উৎসবের শুভসূচনা করে। মূল অনুষ্ঠান হয় ৭ পৌষ খুব সকালে ছাতিমতলায় ব্রহ্মোপাসনা দিয়ে। ঐ তো ছাতিমতলায় শ্বেতপাথরে খোদিত আছে মহর্ষির প্রিয় বাণী : 'তিনি/আমার প্রাণের আরাম/মনের আনন্দ/আত্মার শান্তি।' আলপনা আঁকা বেদী। ধূপ পুড়ছে। সুগন্ধ উড়ছে। মন্ত্রের ধ্বনি উঠছে। পাঠ হচ্ছে। গান আর গান। ছাতিমতলা জাগ্রত, পূত পবিত্র। সব চাইতে বেশি ভিড় হয় প্রভাতী এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে।

ছাতিমতলা থেকে বেরিয়ে মেলার মাঠের দিকে পা বাড়াবার আগে শান্তিনিকেতন একটু ঘুরে দেখে নিতে পারেন এই ফাঁকে। গৌর প্রাঙ্গণে সিংহসদন দেখবেন? তালধ্বজ মাঘের আশ্চর্য বাড়ি? তাহলে এবার 'উত্তরায়ণে' চলে আসুন : এখানে রবীন্দ্রনাথের ছোট বড় ৫-খানা বাড়ি আছে — 'উদয়ন', 'কোনার্ক', 'উদীচী', 'পুনশ্চ' এবং তাঁর শেষ বয়সের 'শ্যামলী'

[illegible]

তার পর [illegible] 'চীন ভবন', 'শালবীথি', আম্রকুঞ্জ হয়ে 'শান্তিনিকেতন গৃহে'র সামনে দুদণ্ড দাঁড়ান। এই বাড়িটাই মহর্ষি প্রথম বানিয়েছিলেন এখানে এবং নাম দিয়েছিলেন 'শান্তি-নিকেতন'। বলা বাহুল্য, এই বাড়ির নামানুসারেই 'শান্তিনিকেতনের নাম'। এই বাড়ির সামনেই রামকিংকরের একটি বহু-আয়তনিক ভাস্কর্য আছে — যা যেকোন কোণ থেকে দেখা যায় আলাদা-আলাদা বিভঙ্গে। ভাল কথা, শান্তিনিকেতনে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রামকিংকরের কাজগুলি দেখতে ভুলবেন না যেন!

এবারে বহুবর্ণ কাঁচঘর মন্দিরের সিঁড়িতে বসে একটু জিরোন। এই মন্দির মহর্ষি প্রতিষ্ঠা করেন ৭ পৌষ ১৮৯১।

আগে আগে মেলার সময় ৮ পৌষ বিশ্বভারতীর সমাবর্তন হত বিখ্যাত আম্রকুঞ্জে। কয়েক বছর থেকে আর তেমন হয় না। গেলবারও যেমন মেলার কয়েকদিন আগেই এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। ইন্দিরাজি এসেছিলেন ঐ সময়। এইভাবে সমাবর্তনকে মেলা থেকে ছিন্ন করে দিয়ে পৌষ উৎসবের অংগহানি হয়েছে, কেননা উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এই সমাবর্তন। এবারও ঐ রকমই হচ্ছে, মনে হয়।

পৌষ উৎসব অনুষ্ঠান-বহুল : তার মধ্যে আছে প্রাক্তন বর্তমান ছাত্র সম্মেলন, পরলোকগত আশ্রম-বন্ধুদের স্মৃতিবাসর, আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন, প্রাক্তন ছাত্রসংঘের বার্ষিক সভা এবং শেষ দিন ২৫ ডিসেমবর খৃস্টোৎসব।

ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে এল। মেলা খুব জমে উঠেছে। নাগরদোলা, সারকাস ভিড়ে ভিড়াক্কার। খাবার দোকানগুলো ঘিরে বাইরে-ভিতরে জটলা, ভিড় উপচে পড়ছে যেন। বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য বই-এর স্টলে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। কেনাকাটাও হচ্ছে বিস্তর। 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার তরফে মেলার কবির কবি সভা বসত প্রতি বছর। শেষ বছর-দুই যেন একটু ভাঙা-হাট হয়ে গত বছর থেকে উঠে গেছে, শুনতে মেলা কর্তৃপক্ষের অভব্য আচরণে। এবার থেকে যে আবার যথারীতি বসবে মনে হয় না। এই কবি সভাও ছিল মেলার একটা বড় টান। অনেকের কাছেই। তাছাড়া কৃষি প্রদর্শনী এবং নানারকম শিল্প প্রদর্শনী নজর কাড়ে, পকেটও হালকা হয়।

এতো গেল মেলার একটা দিক। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত বাড়ছে। এবার অন্য দিকে চলুন। মেলা কর্তৃপক্ষ দেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিবছর আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেন : মেলা [illegible]

[illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] আপনার [illegible] আপনার যা ইচ্ছে।

ইচ্ছে করলে [illegible] একটু বেশি ভিড় [illegible] আকর্ষণ।

ভিড়, দুহাতে সাঁতার কাটার মত, ঠেলে [illegible] আপনাকে এগোতে হবে। আপনার সামনে [illegible] সুবেশা সুন্দরী। ফুর ফুর করে সুগন্ধ [illegible] আপনার মাথায় উঠল। আপনি পায়ে পায়ে [illegible] এগোচ্ছেন শুধু : 'শান্তিনিকেতনে [illegible] ললিত [illegible] কবিতা [illegible] রাতের [illegible] জেগে ওঠে, ফোটে, [illegible] নিপুণ নাচের মুদ্রা নিঃশব্দ গানে [illegible] আউল-বাউল যা পারে না।'

শান্তিনিকেতন আপনার ভাল লেগে গেল। [illegible] সবার সংগে আপনিও কখন অজান্তে গাইতে [illegible] করেছেন :

আমাদের শান্তি নিকেতন
সে যে সব হতে আপন।......

আলোকচিত্র : [illegible]

বসন্তপুর বাবুরবাঁধ গ্রামে চার যুবক খুন
মালদহের মালোপাড়ার মতই নৃশংস

শ্যামল মুখারজি

নভেম্বর ১৬, বুধবার, সকাল দশটা। আমার অফিসে একটি প্রতিবেদন লিখতে বসেছি। হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। বর্ধমান শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আউসগ্রাম থানার [illegible] থেকে এক পরিচিত বন্ধু টেলিফোন করেছেন। তিনি জানালেন, ওখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে বসন্তপুর বাবুরবাঁধ গ্রামে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। প্রায় পাঁচহাজার সশস্ত্র মানুষ তীর, বন্দুক, লাঠি, টাঙি নিয়ে ওই দুটি গ্রাম ঘিরে ভয়ানক আক্রমণ চালাচ্ছে। টেলিফোনেই তিনি জানালেন [illegible] চার যুবক ইতিমধ্যেই খুন হয়েছেন। আহত অনেক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। লাইন কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন করলাম জেলা শাসকের বাংলো এবং অফিসে। কাউকে পেলাম না।

সময় নষ্ট না করে তীব্র গতিতে জিপ ছুটিয়ে ঝড়ের বেগে পৌঁছে গেলাম গুসকরায়। গুসকরা বাজারের রেল ফটক পেরিয়ে দশ কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে ঢুকে পড়লাম আউসগ্রাম থানায়। শুনলাম অফিসাররা সব ঘটনাস্থলেই আছেন। জিপের মুখ ঘুরিয়ে থানার পাশের মেঠো রাস্তা ধরে এগোলাম বসন্তপুর বাবুরবাঁধ গ্রামের দিকে।

গ্রামের মুখেই নজরে পড়ল উত্তেজিত বেশ কয়েকশ মানুষের ভিড়। আমার গাড়ি রুখে দিলেন ওরা। গাড়ি থেকে নামলাম। পরিচয় দিলাম। হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন অসহায় গ্রামবাসীরা। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আপনিই প্রথম সাংবাদিক যিনি খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন এত তাড়াতাড়ি: আপনাকে সব কিছু দেখে যেতে হবে। ঘুরে দেখতে হবে আমাদের দুঃখের করুণকাহিনী। গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটু এগোতেই কুনুর নদীর ব্রিজের পাশে দেখলাম একটি তাজা যুবকের মৃতদেহ পড়ে আছে। দেহটাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে চারটে টুকরো করা হয়েছে। চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। এত নৃশংস খুন এর আগে আমি দেখিনি। গ্রামবাসীরা বললেন, এই হচ্ছে শেখ জালসাদ (২২)। একটু এগিয়ে পুকুর পাড়ে দেখলাম থানার জিপ দাঁড়িয়ে। এর পরেই এবড়োখেবড়ো রাস্তা। জিপ ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এগুচ্ছি বাবুর বাঁধ গ্রামের দিকে। গ্রামের মুখেই রাস্তার উপরেই নামান আছে পাশাপাশি দুটি মৃতদেহ। ভাই শেখ জোরমানের (২৪) মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করছেন ওর বড় বোন হামিদা বিবি। ওকে সামলাতে গিয়ে হাউ হাউ করে বুক চাপড়ে কাঁদছেন গ্রামের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা; যুবক, যুবতী আশপাশের গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। শেখ জোরমানের মৃতদেহের পাশেই টাঙি দিয়ে চোপান আরও একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। গ্রামবাসীরা বললেন, মৃত এই যুবকের নাম আলাই শেখ(২৫)। একটু দূরে লাঠিধারী জনা পাঁচেক পলিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আউস গ্রাম থানার অফিসার-ইন-চারজ জয়নারায়ণ চৌধুরী। তার পাশেই এলাকার সারকেল ইনসপেকটার বিশ্বনাথ ব্যানারজি। বিশ্বনাথবাবু বললেন, আরও একটি মৃতদেহ আছে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ওই কুনুর নদীর জলে। আক্রমণকারীরা ওকে হত্যা করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে জলে। ওর নাম শেখ আনাম ওরফে ইসরাইল খলিফা। সেও যুবক। না, শেখ আনামের মৃতদেহ আমি দেখিনি। তখনও তাকে জল থেকে তোলার ব্যবস্থা করা যায়নি। আমাকে দূর থেকে দেখেই এগিয়ে এলেন বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের নেতা হিমাংশু রায়। আমার একটু আগেই বর্ধমান থেকে ছুটে এসেছেন তিনি। হিমাংশুবাবু বললেন, সকাল নটায় গুসকরা বাজার থেকে ট্রাংক-কল পেলাম চঞ্চলের। চঞ্চল মণ্ডল আউসগ্রামের গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। উত্তেজিত চঞ্চল টেলিফোনেই বললেন, ভোর থেকে হাজার দশেক সশস্ত্র মানুষ ওই বসন্তপুর বাবুরবাঁধ গ্রাম ঘিরে কংগ্রেসকর্মীদের বাড়ি থেকে টেনে এনে খুন করছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। আপনি কিছু একটা করুন।

হিমাংশুবাবু বললেন, যে চার যুবক খুন হয়েছেন, যাঁরা আহত প্রত্যেকেই কংগ্রেসেরকর্মী। চঞ্চল মণ্ডল বলছিলেন, গুসকরা বাজারেই খবর পেলাম ১৩ কিলোমিটার দূরে এই গ্রামে আক্রমণ চলছে। সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন করলাম আউস গ্রাম থানায়। ও সি বললেন, আমার গাড়ি খারাপ। একটু পরে যাচ্ছি। ওদের মুখেই শুনলাম, আশংকাজনক অবস্থায় আলম শেখ, স্বপন গড়াই, নলিন শেখ এবং আনোয়ার শেখকে প্রথমে স্থানীয় বননবগ্রাম হাসপাতালে, পরে [illegible]

[illegible] সংগঠন পর্যন্ত হয়েছে।

হিমাংশুবাবু অভিযোগ করলেন, আক্রমণকারীরা সি পি আই (এম)-এর লোক। এই গ্রাম কংগ্রেসের দুর্গ। ওই চার যুবক সংগঠনকে ধরে রেখেছিলেন। তাই ওদের খুন করার পরিকল্পনা চলছিল অনেক আগে থেকেই। তিন ঘণ্টা ধরে অপারেশন চালিয়ে বেছে বেছে খুন করা হল ওই চারজন কংগ্রেস কর্মীকেই। কিন্তু আজকে সকালে গোলমাল শুরু হল কেন? ওই চারজন যুবককে খুনের হাতে থেকে বাঁচাতে গিয়ে অল্প চোট খেয়ে আহত হয়েছেন গ্রামের ফজলুল হক। হাতে ব্যানডেজ। এগিয়ে এলেন, বললেন — এই সময় ধান ক্ষেতে ফসল পেকে এসেছে। কিছু কিছু ধান কাটাও শুরু হয়েছে। বরাবরই এই সময় গ্রামের যুবকরা মাঠে সারারাত ধান পাহারা দেয়। বিনিময়ে চাষীরা কিছু ধান অথবা টাকা দেয় ওদের। সেই টাকায় গ্রামের ছেলেরা হয় বনভোজন করে, না হয় ক্লাবের মালপত্তর কেনে। ক্যারাম বোরড, ফুটবল এইসব। এবারও চাষীরা ঠিক করলেন গ্রামের ছেলেরাই মাঠ পাহারা দেবে। কিন্তু হঠাৎ এখানকার বেরেনডা অঞ্চলের গ্রাম-প্রধান এসে বললেন, তা হবে না, আমাদের লোকদের মাঠ পাহারায় নিযুক্ত করতে হবে। তিনি একটি নামের তালিকা আউসগ্রাম থানাতেও পাঠালেন। গ্রামের ছেলেরা রাজি নয়। প্রধান বললেন, দেখে নেব। তারপর আজ সকালে আশপাশের উকতা, পিচকুড়ি, জয়কৃষ্ণপুর, সিলুট গ্রাম থেকে প্রচুর 'সিডিউলড' নিয়ে এসে ঘিরে ফেললেন গ্রাম। ওদের হাতে ছিল লাঠি, টাঙি, তীর-ধনুক, বল্লম। ছেলেগুলোকে বাড়ি থেকে টেনে এনে যখন মারছে তখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। বললাম, এভাবে মেরো না গো······ছেলেগুলো মরে যাবে। কেউ শুনল না। কাঁদতে শুরু করলেন গ্রামবাসী ফজলুল হক।

চঞ্চল মণ্ডল অভিযোগ করলেন, অশান্তি চলছে অনেকদিন থেকেই। গত ৫ নভেম্বর এই এলাকায় ছেলেরা বেরেনডা অঞ্চলের গ্রাম-প্রধানের অফিসে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ডেপুটেশন দেয়। কেন এই ডেপুটেশন দেওয়া হল তাই নিয়ে সি পি এম নেতারা হলেন উত্তেজিত। তার পর এ ছুতোয় নৃশংসভাবে খুন করা হল এই চারজন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীকে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসার ইন-চারজ জয়নারায়ণ চৌধুরীকে আলাদা করে ডেকে প্রশ্ন করলাম [illegible] আপনি সময়মত খবর পেয়েও পুলিশ পাঠালেন না কেন? উত্তর জয়নারায়ণবাবু শুধু বললেন, উত্তেজনা চলছিল আগে থেকেই। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। বর্ধমান থেকে ডি এম, এস পি আসছেন। যা বলার ওঁরাই বলবেন।

কংগ্রেসী নেতারা যাই বলুন সি পি আই (এম) নেতাদের বক্তব্য কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। গুসকরা থেকে জেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি সি পি আই (এম) দলের জেলা কমিটির অন্যতম নেতা এবং জেলা পরিষদ সভাধিপতি মহবুব জাহেদীর বক্তব্য নিহত যুবকরা এলাকায় সুপরিচিত সমাজবিরোধী। ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই করাই ছিল তাদের পেশা। জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে তাদের নামে অনেক কেস ছিল। এদের অত্যাচারে গ্রামের মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল বিষময়। ঘটনার আগের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার ১৫ নভেম্বর স্থানীয় কৃষকরা মাঠে ধান পাহারা দেবার জন্যে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন তাদের ওই পরিচিত সমাজ-বিরোধীরা ভয় দেখায়। ঘটনার দিন, বুধবার ১৬ নভেম্বর সকাল ৭টা নাগাদ ওই সমাজবিরোধীরা মাঠে ধান পাহারা দেবার কাজে যারা নিযুক্ত ছিলেন তাদের উপর বোমা, পাইপগান নিয়ে আক্রমণ চালায়। বোমার আওয়াজ পেয়েই কাছাকাছি এলাকার স্কুলের শিক্ষক, এলাকায় সু-পরিচিত সি পি আই (এম) নেতা জেলা পরিষদ সদস্য সুকুমার গোস্বামী আউসগ্রাম থানায় যান। থানা ইনচারজ তাঁকে বলেন, আমার গাড়ি খারাপ। একটু পরে যাচ্ছি। তখন সুকুমার গোস্বামী একাই ছুটে যান ঘটনাস্থলের দিকে গোলমাল থামাতে। ততক্ষণে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

জাহেদী সাহেব বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই। গ্রাম্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এত বড় কান্ড ঘটে গেল। গ্রামের মানুষদের রোষেই ওই চার যুবককে প্রাণ দিতে হল।

জেলা শাসক সুরজিত সিং আহ্লুওয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি বললেন, এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য সি পি আই (এম) নেতা সুকুমার গোস্বামী, পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল করিম মোল্লা সহ ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ সুপার এস রামকৃষ্ণাণ-এর নেতৃত্বে ওখানে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

[illegible] গ্রাম্য ঘটনার জের এ কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ঘটনার সঙ্গে যদি রাজনীতির কোন সংশ্রবই না থাকে তাহলে পুলিশ ৪৯ জন সি পি আই (এম) লোককে গ্রেপ্তার করলেন কেন? ওই ৪৯ জনের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সি পি আই (এম) কর্মীরাও গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ এত 'রিসক' নিয়েও সি পি আই (এম) নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারল? ঘটনা ঘটে যাবার তিন ঘণ্টা পরে আমি যখন ওই এলাকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি তখনও ওদের বারবার জিজ্ঞাসা করেছি নিহত সেখ জানসাদ, শেখ জোরমান, আলাই শেখ এবং শেখ আনাম (ইসরাইল খলিফা) সমাজবিরোধী ছিলেন কিনা? স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা — 'না ওরা সমাজবিরোধী ছিল না।' ওদের একটাই অপরাধ, ওরা ছিলেন কংগ্রেসকর্মী।

বিশিষ্ট মানুষজন মন্তব্য করেছেন, মালদহ জেলার রতুয়া থানায় মালোপাড়া গ্রামের গণহত্যার মত এই ঘটনাও নৃশংস। হত্যাকাণ্ডের এক বীভৎস নজির।

নিহত যুবকরা সমাজবিরোধী ছিলেন কি ছিলেন না, তাই নিয়ে রাজ্য জুড়ে চলছে উত্তপ্ত বিতর্ক। সি পি আই (এম) নেতা বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সরোজ মুখারজি কলকাতায় বসে বিবৃতি দিয়েছেন 'নিহতরা সবাই সমাজবিরোধী ছিলেন।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র সিং-এর বক্তব্য অন্যরকম। তিনি বলেছেন, নিহত যুবকদের মধ্যে একজন ছাড়া কারুরই নামে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এর কেস কোন দিনই ছিল না। আলাই শেখের নামে বহু আগে একটি ডাকাতির কেস ছিল। অনেকেই বলছেন ১৯৮১ সালে ওর নামে যখন ডাকাতি এবং খুনের কেস করা হয়েছিল তখন এই আলাই সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে ছিল। পরে সে সি পি আই (এম) ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কথা ধরে নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, লোকসভা সদস্য আনন্দগোপাল মুখারজি বলেছেন, পুলিশের কর্তারা যেখানে বলছেন নিহত যুবকদের একজন ছাড়া কেউই সমাজবিরোধী ছিলেন না, সেখানে সরোজবাবুর মত নেতা এই দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করলেন কী করে - আনন্দবাবু আমাকে বলেছেন, জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সি পি আই (এম) দলের সংঘাত আরও বেড়েছে এটাই এখন দিবা-[illegible] সঙ্গে [illegible]। [illegible] প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবীণ [illegible] জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন প্রামাণিক, [illegible] ছাত্র পরিষদের জেলা [illegible] অরূপ দাস এবং ছাত্র [illegible] সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী [illegible] ইসলাম। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা নুরুল ইসলাম অবশ্য [illegible] গেছেন গ্রামে। তাঁর নেতৃত্বে [illegible] কর্মীরা থানায় বিক্ষোভ [illegible] করেছেন। আনন্দগোপাল মুখার[illegible] প্রদীপ ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম [illegible] ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত [illegible] করেছেন। নুরুল সাহেব [illegible] বিচার-বিভাগীয় তদন্ত না [illegible] পর্যন্ত সরকারকে ছেড়ে কথা [illegible] হবে না।

নুরুল সাহেব আরও [illegible] সি পি আই (এম) নেতা [illegible] মুখারজির বক্তব্যের বিরুদ্ধে [illegible] হাইকোরটে মামলা দায়ের করবেন। সমাজবিরোধী না হওয়া সত্ত্বেও কেন মৃত ওই চার যুবককে সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এই [illegible] মামলার বিষয়। এই উত্তপ্ত বিতর্ক [illegible] উত্তেজনা এখনই থামবে না।

আনন্দবাবু বলেছেন, তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোরট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধীকে [illegible] জানাবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি সি শেঠি এবং অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখারজিকে অবশ্য আগেই [illegible] জানান হয়েছে।

আনন্দবাবু দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই ঘটনাকে সর্বভারতীয় ইস্যুও করে তুলতে চাইছেন।

বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার এস রামকৃষ্ণাণ-এর সঙ্গে আমি সর্বশেষ কথা বলেছি [illegible] নভেম্বর। তাঁর অফিসে বসে তিনি বললেন, এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় বসন্তপুর, এবং পাশের গ্রাম কুরমবা গ্রামে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী ওই দুটি গ্রাম ছাড়াও আশপাশের গ্রাম ঘিরে তল্লাসির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ সুপার বলেছেন, শুধু ওই ৪৯ নয়, গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও বাড়বে। উত্তেজনা আছে, থাকবেও। নেতাদের বিবৃতি পালটা বিবৃতিও চলবে এখন বহুদিন। কিন্তু মায়ের কোল খালি করে যে যুবকরা চলে গেলেন তারা আর কোনদিনই ফিরবেন না। মায়ের বুকের একটি পাঁজর আর কোনদিনই জোড়া লাগবে না, এইটাই এখন নির্মম, বাস্তব সত্যি। □

যত জোরে চালাবেন, তার থেকে দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি তেল খরচা হয়ে যাবে।

"জোরে চালালে বেশী পেট্রোল খরচ হয়। কিন্তু সেটা কি সত্যিই দ্বিগুণ"? হ্যাঁ। জোরে আর বেপরোয়া চালালে আপনার জ্বালানী খরচ ৫০% বেড়ে যায়। একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলেও তার চেয়ে দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি তেল খরচ হয়ে যাবে। এতে সত্যিই কি আপনি বেশী দূরে পৌঁছতে পারবেন ?

ধীরস্থির ভাবে চালান।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে, ধীরস্থির ভাবে চালাবার ফলে আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সময় কিন্তু খুব একটা বেশী লাগছে না।

নীচের হিসেব মত স্পীড রাখবেন। দেখবেন অনেকটা তেল বাঁচাতে পারবেন।

স্কুটার ও অটোরিক্সা ... ঘণ্টায় ৪০ কিঃমিঃ
মোটর সাইকেল ... ঘণ্টায় ৫০ কিঃমিঃ
মোপেড ... ঘণ্টায় ২০ থেকে ৩০ কিঃমি

যতটা সম্ভব কম ব্রেক কষবেন।

থামানো এবং মোড় ঘোরা সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। হঠাৎ করে ব্রেক কষলে, দুর্মূল্য তেলের অনেকটা অপচয় হবে। ব্রেক খুব বেশী টাইট রাখবেন না বা ব্রেক পেডালে পা রেখে চালাবেন না। এই অভ্যেস থাকলে জ্বালানী খরচ আরো ৫% বেড়ে যেতে পারে।

ক্লাচের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

অযথা ক্লাচ ব্যবহার করলেও শক্তির লোকসান হয়।

HTD-PCR-8057-A BEN

প্রচ্ছদ কাহিনী

গ্রাম বাংলার একাল সেকাল

সীতানাথ অধিকারী

'গাঁজা গুলি মদে চুর
তিন নিয়ে বদিপুর'

বর্ধমান জেলার বদিপুরের এই বিশেষণ সেই পুরনো জমিদারি আমল থেকে কালের স্রোতে আজও ধুয়ে মুছে যায়নি। প্রায় একশ বছর আগে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম প্রতাপশালী জমিদার নশী নন্দী বাস করতেন এই বদিপুরে। অনেকের ধারণা বঙ্কিম সাহিত্যের 'নশী-বাবু' হলেন এই নশী নন্দী।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া ছাড়িয়ে বৈঁচি স্টেশন থেকে এক ঘণ্টার পথ বদিপুর। এই বদিপুরের জমিদার বাড়ির বিবাহ উৎসবে আস্ত একটা প্যাসেনজার ট্রেন রিজারভ করা হয়েছিল সেকালে। একাধিক দিন ধরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার প্রজাসহ তৎকালীন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছেন প্রীতিভোজে। অতিথিশালায় অতিথিদের সমাবেশ,উদ্যানবাটিতে প্রমোদ ব্যবস্থা, সেরেস্তায় নায়েবদের ব্যস্ততা – সব নিয়ে বদিপুরের মত বিভিন্ন জমিদারি রাজত্ব নিয়ে সেকালের পল্লীবাংলা ছিল সরগরম।

আধুনিক কালের পঞ্চায়েত পদ্ধতির মত আগে ক্ষুদ্র জমিদার, নায়েব গোমস্তারা স্থানীয় এলাকার উন্নতি অবনতির ধারক বাহক ছিলেন। অশিক্ষার সুযোগে যেমন জমিদারি অত্যাচার চলত তেমন গঠনমূলক কাজও চলত পাশাপাশি। অত্যাচারী জমিদারও যেমন ছিলেন তেমনি প্রজাবৎসল জমিদারের সংখ্যাও খুব নগণ্য ছিল না সেকালে।

'কুমার, করছ কিহে – ইস্কুল পিতিষ্ঠা করলে গাঁয়ে আর চাকর বামুন মিলবে না যে।'

বদিপুরের নশী নন্দী সম্পর্কে পুরনো দিনের মানুষদের স্মৃতি সুখকর নয়। অনেকেরই মতে – নশীবাবুর প্রজাপীড়ন হয়ত তত উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তিনি নিজে কোন জনকল্যাণকর কাজে হাত দেননি। বরং উদারচেতা জমিদার কুমার কৃষ্ণ নন্দী চৌধুরী যখন শিক্ষার প্রসারের জন্য বদিপুরে জরজ ইনসটিটিউশন স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন নশীবাবু বলেছিলেন, 'কুমার, করছ কিহে – ইস্কুল পিতিষ্ঠা করলে গাঁয়ে আর চাকর বামুন মিলবে না যে।' এই তথ্যের বর্ণনা দিচ্ছিলেন জরজ ইনসটিটিউশন (অধুনা রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউশন) এর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ৭৮ বছর বয়সী রাখাল দাস সামন্ত। রাখালবাবুর মতে – আগেকার দিনে মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ ছিল যা এখনকার লোকেদের নেই। বিজ্ঞান ও সভ্যতা এখন মানুষকে অনেক এগিয়ে দিলেও জনসাধারণের মানবিক মূল্যবোধ ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে তাঁর ধারণা।

চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগরে যে বিখ্যাত বসুপরিবারের উল্লেখ আছে সেখানে প্রজাদের ফাঁসি দেওয়ার 'ফাঁসি ঘর' এখনো আছে। মাটির তলায় নির্মিত এই কুঠুরিতে অনেক লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের ধারণা। দোষী ব্যক্তিদের এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করতেন তৎকালীন জমিদার বাবুরা।

আগেকার দিনে গ্রামবাংলায় ডাকাত ও ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রবের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। বর্ধমানের 'সেনের ডাঙা' (বর্তমানে বাস স্টপ) নামক জায়গায় এখনো কৃষকদের লাঙলের মুখে প্রায়ই মাথার খুলি কিংবা কঙ্কাল বেরিয়ে আসে। শতাধিক বছর আগে জনবিরল জায়গাটি ঠ্যাঙাড়েদের জন্য কুখ্যাত ছিল বলে বৃদ্ধরা বর্ণনা করেন।

বন্ধ্যা স্ত্রীলোকরা বিশেষ তিথিতে মাথার চুল ছিঁড়ে পাথরের নুড়ি বেঁধে দেব মন্দিরে রাখলে সন্তানবতী হবেন – এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সহস্র মহিলা এককালে নুড়ি বেঁধে রেখেছেন। মেদিনীপুরের কেদার ভুড়ভুড়িতে বাবা চপলেশ্বরের মন্দিরের গায়ে এমন অসংখ্য নুড়ি আছে। আধুনিক কালে অন্ধ বিশ্বাসের অভাবে এই মন্দির জঙ্গলে পর্যবসিত হয়েছে। তবুও পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে এখানে আজও অনেক স্ত্রীলোক পুণ্যস্নান করতে আসেন।

পল্লীবাংলার সেকালের জীবন্ত বৈচিত্র্য আজ আর নেই। বিশাল বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ গ্রামাঞ্চলে এখনো সেই যুগের স্মৃতি বহন করছে। এখনও যে সব গ্রামে বাসযোগ্য জমিদারবাড়ি আছে সেগুলি স্কুল কলেজ কিংবা সিনেমাহলে রূপান্তরিত হয়েছে। জমিদারি পরোয়ানা হারিয়ে এই সব বাড়ির কোন কোনটির মাথায় বসেছে আধুনিক কালের টি ভি অ্যানটেনা।

বদিপুরের জমিদারবাড়ির সেরেস্তা

প্রাচীন মন্দিরগুলি ধর্মভীরু মানুষের অভাবে জংগল ও আগাছার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। গ্রামে গ্রামে ক্লাব, পারটি অফিস, উন্নয়ন কমিটি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে। রামায়ণী গান, তরজার আসর, কেস্টযাত্রা, কীর্তনের আসর – এসবের আধিক্য ম্লান করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার চিৎপুরের ক্যারিওনেট। বোমবাই-এর জমজমাট সুর ঝংকার বাজছে মাটির দুয়ারে রেডিওর স্পিকারে। লাঙলের যুগকে পিছিয়ে দিয়ে মাঠে মাঠে নামতে শুরু করেছে ট্রাকটার, পাওয়ার টিলার, স্প্রেয়ার, প্যাডি থ্রেসার।

তবুও তথাকথিত যুগ সচেতন পল্লীবাংলার বুকে ধরেছে ক্ষয় রোগ। এখনো অনেক নিষ্প্রদীপ ঘরের মেঝেয় একফোঁটা ওষুধের পাওনা বুকে নিয়ে ছটফট করে মারা যায় অসংখ্য রোগী। এখনো আগাছার মত সংখ্যায় বাড়ে ভবিষ্যৎহীন নগ্ন, অপুষ্ট শিশুর দল। এখনো অনেক তাঁতিপাড়া, মাঝিপাড়া কিংবা ডোমপাড়ায় এক কুনকে আটা গুলে, কিংবা একজাম পান্তা ভাতের আমানি গিলে সাত আট জনের পরিবার কাটিয়ে দেয় রাতের পর রাত। এদেরকে দেশের কিছু দেওয়ার নেই। বরং দেশকে এরা দিতে পারে মহামূল্যবান ভোটসম্পদটুকু। তাই তো ভোটের ঋতু এলেই এরা একদিনের সম্রাট। এই হল 'ডেভেলাপিং কানট্রি'র অন্যতম বৃহত্তম অংশের আধুনিক ইতিকথা।

'আগে আমরা ভাবতেও পারিনি – গাছের ডাব, পুকুরের মাছ বিক্রি হবে। আজকাল পুকুরপাড়ের শুশনি শাকও বিক্রি হচ্ছে।'

অর্থনৈতিক অবস্থা

জমিদারি উচ্ছেদের পর গ্রামে গ্রামে যে অর্থনৈতিক সমতা ও সার্বিক উন্নয়নের আশা করা হয়েছিল তার সাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগণ্য প্রমাণিত হয়েছে, সবুজ বিপ্লব, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সমবায় ব্যাংক, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতির পরও গ্রামের লোকেদের

অনুদান কিংবা সেমাজিক খুচরা হিসেবে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়। প্রতিটি গ্রামের অন্তত শতকরা ৮০ ভাগ লোক বিভিন্ন দিক দিয়ে ঋণগ্রস্ত। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিকে আজও কাঁসার বাসন কিংবা রুপোর গহনা ধনী এবং সুদখোর লোকেদের কাছে বন্ধক রেখে দিনপাত করতে হয়। গ্রামের যে সমস্ত জিনিস বিক্রয়যোগ্য বা ক্রয়যোগ্য বলে মনে হয়নি আজ তা বাস্তবে। রূপান্তরিত হয়েছে। জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর ভাষায়, 'আগে আমরা ভাবতেও পারিনি – গাছের ডাব, পুকুরের মাছ বিক্রি হবে। আজকাল পুকুর পাড়ের শুশনি শাকও বিক্রি হচ্ছে'।

কোন সমালোচনা ছাড়াই, আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলি অবনতির মূল কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত – জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এক একটি গ্রামে ৫০ বছরের মধ্যে জন সংখ্যা ১০গুণ ছাড়িয়ে গেছে। একটি পরিবারে ১০ বিঘা জমি থাকলে বংশ পরম্পরায় সেই জমি ৫০ বছরে অন্তত ১০ টুকরো হয়ে এক একটি সম্পূর্ণ পরিবারের ভাগে ১ বিঘা করে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত – প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গ্রামাঞ্চলের মানুষরা উৎপাদনের উপর আদৌ নিশ্চিন্ত নয়। খরা, বন্যা, ভাইরাস কিংবা শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ার ক্রমিক ঘটনা এখন আর বিরল নয়। প্রকৃতির পৌনঃপুনিক রোষে কৃষিজীবিরা নির্মমভাবে ফসললাভে বঞ্চিত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

তৃতীয়ত – দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সংগে সংগে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য আনুপাতিক হারে বাড়েনি। ফলে গ্রামের মানুষরা কৃষিপণ্যের আয় এবং জীবিকা নির্বাহের ব্যয় – এই দুই এর মধ্যে তৈরি ক্রমবর্ধমান চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ

পঁচিশ বছর আগেও গ্রামাঞ্চলে এমন একটা অবস্থান ছিল যখন কেউ ম্যাট্রিক পাশ করলে তিনি আশে পাশে গর্বের বিষয় হয়ে উঠতেন এবং অনতিবিলম্বে একটি চাকরি লাভ করতে পারতেন। এখন অনেক গ্রামেই একাধিক বেকার গ্রাজুয়েট যুবক হতাশ হয়ে লাঙল কোদাল নিয়ে শেষ জীবনটুকু কাটিয়ে দেওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠেন। শিক্ষার এই অর্থকরী ব্যর্থতা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে নিখুঁতভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। ফলে পল্লী বাংলায় শিক্ষা প্রসারের গতি ব্যাহত হচ্ছে।

জাতিভেদ দূরীকরণের সত্যতা গ্রামাঞ্চলে নিছক কেতাবি নীতি হয়ে বেঁচে আছে। তবে এখন কিছু কিছু মুসলিম পরিবারে হিন্দু ব্রাহ্মণ (অবশ্যই শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত) নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছেন এবং উল্লেখযোগ্য না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহও গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ গ্রামাঞ্চলে যেটুকু ঘটেছে তা ক্ষুদ্র সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত। অশিক্ষিত গণজীবনে যেটুকু ধারনা জন্মেছে তা সংসার চালানোর রাজনৈতিক ধারনা মাত্র। অর্থাৎ সাদামাটা অস্পষ্ট অনুভূতি। এই ধোঁয়াটে চেতনার সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণ সমর্থনের ভাগ বাটোয়ারা করে চলেছে। প্রকৃত পরিবর্তনের দায় ও সামর্থ খুব কম নেতৃত্বের আছে।

'ছেলেবেলায় দেখেছি – খুন-খারাপি হলে গোরা পুলিশের ভয়ে গাঁয়ের লোক ঘুমুতে পারত না। আজকাল খুন জখম তো মামুলি ব্যাপার!'

দাঙ্গা হাঙ্গামা ও খুনখারাপি রাজপথ ছেড়ে রাঙ্গামাটির পথে পথে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় এই সংঘর্ষের হার বেড়ে যায়। বর্ধমান জেলার কালনা থানার প্রবীণ ব্যক্তি মৃগাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'ছেলেবেলায় দেখেছি – খুনখারাপি হলে গোরা পুলিশের ভয়ে গাঁয়ের লোক ঘুমুতে পারত না। আজকাল খুন জখম তো মামুলি ব্যাপার'।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

গত ৫০ বছরে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংখ্যায় বেড়েছে কিন্তু তা বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। গ্রামে এম বি বি এস ডাক্তারের অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। যাঁরা আছেন তাঁরা অধিকাংশ হাতুড়ে এবং বাকিরা ডি এম এস। এইসব তরুণ হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করেন। কারণ হিসেবে যুক্তি দেখান – হোমিওপ্যাথিতে রোগীদের বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া ডাক্তারেরও প্রসার হয়না।

চিকিৎসা সম্পর্কে গ্রাম্য মানুষদের ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তনমুখী। যেমন কারো বসন্ত হলে কেবল শীতলা মায়ের চরণামৃতের উপর ভরসা করা হয় না। ডাক্তার দেখান হয়। সর্পাঘাত হলে হাসপাতালে পাঠান উচিত – এ ধারণা খুব ব্যাপক না হলেও মোটামুটি বাড়ছে।

তবুও গুণীন ও ওঝাদের দৌরাত্ম্য গ্রামে কম নেই। সম্প্রতি মেদিনীপুরের ইসলামপুর গ্রামে জনৈক রফিজুল হোসেনকে সাপে কামড়ালে তাঁকে বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরিয়ে কলকাতার শেঠ সুখলালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে আত্মীয় স্বজনরা মত পরিবর্তন করে বেপরোয়া হয়ে অচৈতন্য রোগীকে গ্রামে ফিরিয়ে এনে ওঝার হাতে সমর্পণ করেন। হতভাগা রফিজুল বিজ্ঞানের দোর থেকে ফিরে এসে মূর্খের হাতে প্রাণ দেন। উল্লেখযোগ্য – রফিজুল একজন শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও পল্লীবাংলায় কুসংস্কার সগর্বে রাজত্ব করে চলেছে।

জনসংখ্যা, চিকিৎসা ও সভ্যতা সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা- চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত থানার চালতাবেড়িয়া গ্রামের ওপর করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে পল্লীবাংলার সেকালের সংগে একালের একটা আনুমানিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ এতে ধরা পড়বে।

সেকালের পল্লীবাংলা পুরনো পট পরিবর্তন করে একালের পোশাকী সভ্যতায় আশ্রয় নিয়েছে। মৌলিক পরিবর্তন কিছুই ঘটেনি। গ্রামবাংলার নগ্নতাকে উপজীব্য করে অনেক গল্প উপন্যাস নাটক এমনকি চলচ্চিত্রও হয়েছে আধুনিক যুগে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাংলা আজও দৃকপাতহীন অচলায়তন ছাড়া আর কিছুই নয়। □

আলোকচিত্র : লেখক সংগৃহীত

তুলনামূলক বিশ্লেষন

গ্রামের নয়া বিত্তরা নিজেদের তৈরি দ্বীপে বন্দী

হিমাংশু হালদার

সাধারণভাবে ষাট দশকের গোড়া থেকে বা স্পষ্টভাবে মধ্য-ষাট দশক থেকে গ্রামে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীকে নয়া বিত্তবান বা নয়া বড়লোক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এই তথাকথিত নয়া বড়লোকেরা, সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে, মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায়ভুক্ত। আমাদের গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় কেমনভাবে এই শ্রেণীর উদ্ভব এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই নয়া শ্রেণীর অবদান কী তা আমাদের আলোচ্য।

১৯৫৫ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপসাধনের আগে পর্যন্ত গ্রামে বড়লোক বলতে একমাত্র জমিদারবাবুদের বোঝাত। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে গাঁতিদারদেরও বড়লোক বলে মনে করা হত। সব গ্রামেই এই রকম কোন জমিদার বা গাঁতিদার বাস করতেন না। দু-এক শ গ্রামের মধ্যে এক-আধজন জমিদার বা গাঁতিদারের বাস ছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সংগে সংগে পারিবারিক বড়লোকেদের গরিব হওয়ার কাহিনী নিয়মমাফিক ঘটনা।

তাই জমিদার-গাঁতিদার বড়লোকেরা নিঃস্ব হলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য আগের জমিদারদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি অথচ বিত্তে কম একটি শ্রেণীর আবির্ভাব হল। তারাই আজ গ্রামের নয়া বড়লোক শ্রেণী।

কারা এই নয়া বড়লোক। যাদের মোটামুটি পাকা বাড়ি আছে এবং লাখ খানেক বা লাখ দশেক টাকার বেশি গচ্ছিত আছে তাদের নয়া বড়লোক বলে ধরা হচ্ছে।

সমীক্ষা করে দেখা গেছে, কিছু সম্পন্ন ও পরিশ্রমশীল কৃষক, গ্রামের রেশন ডিলার একই সংগে বড় বাগান, ১৫ ২০ বিঘা জমির মালিক ও হাই স্কুলের শিক্ষক, চাল কলের মালিক, সরকারি ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতা ও পঞ্চায়েতের কর্তা, ইটভাটার মালিক, মেছো ঘেরীর শেয়ার হোলডার, ট্রানসপোর্টের ব্যবসাদার অর্থাৎ বাস বা লরির মালিক, সারের ডিলার, সুদের ব্যবসায়ী ও কিছু ব্যবসায়ী প্রমুখ এখন গ্রামের নয়া বড়লোক শ্রেণীর আওতায় পড়ে। এ ছাড়া, পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্মাগলিং মাল আদান-প্রদানের সংগে জড়িত এবং বর্ধমান জেলার কয়লা খনি এলাকায় অবৈধ কয়লা পাচারের সংগে জড়িত বেশ কিছু ব্যক্তি প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে। এরা রীতিমত বড়লোকও। এদের অনেকের নিজস্ব মোটর গাড়ি আছে। যদিও অবশ্য এই সব গাড়ি 'বিশেষ বিশেষ কাজে' ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চাশ দশকের পশ্চিমবাংলায় খুবই কম জনপদ গ্রাম ছিল যেখানে বড়লোকের দেখা মিলত। কিন্তু ৮০ দশকের পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে দু একজন পরিবার অবশ্যই আছে যারা বড়লোক পর্যায়ভুক্ত।

বর্তমান গ্রাম্য আর্থ ব্যবস্থায় নয়া সৃষ্টি নয়া বড়লোকেরা গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে কাজে লাগছে বা এই সমাজে তাদের কী ভূমিকা বা এদের সংস্কৃতিগত ধারণা কী এ সম্পর্কে আলোচনার আগে জমিদারশাসিত ব্যবস্থায় জমিদাররা কী ভূমিকা পালন করতেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যক।

তদানীন্তন জমিদারদের নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার সম্পর্কে অনেক কাহিনী আমাদের জানা। অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা জমিদার চরিত্রের এক দিক। পাশাপাশি এই সব জমিদারদের জনকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

জমিদারদের বদান্যতায় সেই সময় অনেক রাস্তাঘাট হয়েছিল। বিখ্যাত টাকি রোড টাকির জমিদারদের দেওয়া। সেই সময় সরকারি উদ্যোগে রাস্তাঘাট বিশেষ হত না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে যা হওয়ার হত। অবশ্য এই সব রাস্তাঘাট পিতা প্রপিতামহদের নামে হত। যেমন ভাবলার বিখ্যাত শিল্পপতি আর এন মুখার্জির নামানুসারে আর এন মুখারজি রোড হয়েছে।

এখন প্রতি গ্রামে সরকারি ব্যবস্থায় দু পাঁচটি করে জলের কল আছে। আগে এমনটি ছিল না। গ্রামের জমিদার গ্রামে বড় বড় পুকুর খুঁড়ে দিতেন। গ্রামের মানুষের জল পাওয়ার এই একমাত্র উপায় ছিল। জমিদারে জমিদারে রেষারেষির ফলে অনেক সময় শত্রুপক্ষের অনুগতদের পুকুর ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকত। এই রকম ক্ষেত্রে জিদে পড়ে প্রতিপক্ষ জমিদার হয়ত আর একটা পুকুর কেটে দিতেন। এর ফলে লাভবান হতেন সাধারণ গরিব মানুষ।

বংশের প্রধানের নামে স্কুল করা জমিদারদের ফ্যাশন ছিল। সেই স্কুলের নামে জমি দেওয়া বা স্কুলের মাস্টারদের মাহিনার সব ব্যবস্থা জমিদারদের অর্থকোষ থেকে আসত। দুর্গাপুজো বা অন্যান্য পার্বণ উপলক্ষে প্রজাদের ভূরিভোজ বা বস্ত্রদানের ফলে গরিব মানুষ উপকৃত হতেন। এটি জমিদারদের জীবনধারণের অংগ ছিল। টাউন হল, মন্দির, শ্মশানঘাট, অতিথিশালা, নাট্যমঞ্চ, লাইব্রেরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নির্মাণে জমিদারদের কাছ থেকে দরাজ হাতে সাহায্য মিলত। সাহায্য মিলত কথাটার চেয়ে বরং বলা উচিত এরাই এই সব কাজে উদ্যোগ নিতেন। এরা অনেক সময় দাতব্য চিকিৎসালয় চালাতেন।

জমিদার বড়লোকদের বাইজী সংস্কৃতির পাশাপাশি পুজো পার্বণ উপলক্ষে নাটক যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠান করা জমিদার সংস্কৃতির অংগ ছিল। এই সব অনুষ্ঠান গ্রামের সব গরিব-গুরবোরা বেশ ভালভাবে উপভোগ করত। মোদ্দা কথা, বছরের বেশ কটা দিন আহ্লাদে আহ্লাদে রমরমা করে কাটত।

তথাকথিত অত্যাচারী জমিদারদের মত এই সব নয়া বড়লোকেরা জনহিতকর কাজের সংগে নিজেকে কোন রকমে যুক্ত করেন না। গ্রামে পঞ্চায়েতের তৈরি কোন রাস্তার কাজে স্থানীয় চাঁদা বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয়, কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে তাতে এই সব বড়লোকেদের অংশগ্রহণ অকিঞ্চিৎকর। স্কুল, পাঠশালা, লাইব্রেরি ইত্যাদি কাজে এদের উৎসাহ খুবই সীমাবদ্ধ বলে জানা গেছে। অবশ্য কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনে যুবকদের হাতে রাখার জন্য স্থানীয় ক্লাবকে কিছু কিছু অর্থকরী সাহায্য করে থাকেন বটে, তবে এই সব সাহায্য কিন্তু কোন স্থায়ী চরিত্র পায় না। এমনকি, গ্রামে সরকারি উদ্যোগে নলকূপ খননের কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রি ও তার সাহায্যকারীদের এক বেলা দুমুঠো খেতে পর্যন্ত দিতে রাজি নন এরা।

বস্তুতপক্ষে গ্রামের নয়া বড়লোকেরা আত্মকেন্দ্রিক। তারা নিজের বাড়ি মোজায়েক করা মেঝে, টেলিভিশন, ফ্রিজ, ক্যাসেট-টেপরেকরডার, ফিয়েসটা ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে বেশি ব্যস্ত। এদের বেশির ভাগ ব্যক্তি শহরে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে শহরের বাসিন্দা হতে আগ্রহী। সুন্দরবন অঞ্চলের এই শ্রেণীর বড়লোকেদের শতকরা ৭০ জন ব্যক্তির শহর বসিরহাট বা কলকাতায় বাড়ি আছে।

নয়া বড়লোকেরা কিন্তু যৌথ সংসারের আদর্শে বিশ্বাসী নন। এমনকি, বুড়ো মা-বাবাকেও আলাদা রাখেন। এ জন্য বিশেষ আর্থিক দায়িত্ব পালন করেন বলে শোনা যায় না। জমিদাররা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানর ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু নয়া বড়লোকেরা ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার বিষয়ে আগ্রহী এবং সচেতন। মেয়েদের শহরের স্কুলে বা কলেজে পড়ান। হসটেলে মেয়েদের থাকার অনুমতি দেন। এমনকি আধুনিক করার প্রয়োজনে গান, বাজনা শেখান। ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় প্রচুর পরিমাণে যৌতুক নেন এবং দেন।

নয়া বড়লোকেরা সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন। এ নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামান না। বাড়িতে রবীন্দ্রসংগীতের বা নজরুলগীতির ক্যাসেট থাকলেও হিন্দি গানের প্রতি অনুরাগ বেশি। বাড়ির রেডিও সর্বদা বিবিধ ভারতীতে 'টিউন' করা থাকে। পপ বা ঐ জাতীয় চটুল গান শোনার জন মোটা টাকা খরচ করে টিকিট কাটতে উৎসাহী হলেও কিন্তু কোন উচ্চাংগসংগীতের অনুষ্ঠানের ধার-কাছ দিয়েও যান না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এরা নেতা হয়েছেন—এ সংখ্যা বিরল। এ থেকে বোঝা যায় এরা মোটেই জনপ্রিয় নয়। তবে এরা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক। এই পৃষ্ঠপোষকতা যতটা স্বার্থের প্রয়োজনে ততটা আদর্শের খাতিরে নয়। আর মজার ব্যাপার হল, খুব সহজেই এরা শাসক দলের আস্থা অর্জনে এবং নানা রকম সুবিধা আদায়ে পারদর্শিতা দেখাতে পারেন। এক কথায়, নয়া বড়লোকেরা তাদের নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে চলাফেরা করেন। এরা গ্রামে বাস করেও গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন। গ্রামের গরিব মানুষ এদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পান না। এমনকি, গরিব ছাত্ররা টাকার অভাবে ফি জমা দিতে না পারলে এরা এগিয়ে এসে ফি এর টাকা দিয়ে সাহায্য করেন না। দু-একজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই হচ্ছে সাধারণ অবস্থা। বরং এরা গরিব মানুষকে টাকা ঋণ দিলে বিনিময়ে জমি লিখে নেন। জমি ফিরিয়ে নেওয়ার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এরা বিন্দুমাত্র সময় না দিয়েই জমি নিজের নামে লিখিয়ে নেন।

এই মানসিক গঠনপ্রকৃতির কারণে গ্রামের নয়া বড়লোকেরা বেশির ভাগ মানুষের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেদের তৈরি দ্বীপে নিজেরা বন্দী। □

গ্রামের মানুষ এখনও যথেষ্ট স্বাস্থ্য সচেতন নন

স্বপনকুমার গোস্বামী

'গাঁয়ের লোক' বলতেই আগেকার গল্প-উপন্যাসে কতকগুলো স্পষ্ট ছবি ভেসে উঠত। রোগা-ডিগডিগে, হাড় বের করা, ম্যালেরিয়ার রুগী। পচা পানায় ভর্তি পুকুর, মশার ঝাঁক আর ম্যালেরিয়া এই তিন নিয়ে ছিল সেকালের গ্রামবাংলা। তারপর অবশ্য অনেক দিন কেটেছে, সময় গেছে। অনেক গ্রামে এখন পঞ্চায়েতী রাজ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ অবধি পৌঁছে গেছে। গ্রামের মানুষ এখন অনেক সচেতন। শোনা যায়, রাজনীতিগতভাবেই নাকি তারা এখন বেশি সচেতন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে? যেমন, স্বাস্থ্য - গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতা কি শরৎ-বঙ্কিমের সাহিত্যের আমল থেকে এক পা-ও এগোতে পেরেছে? এক কথায় উত্তর হল – না।

গ্রামের মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠলেও আজও স্বাস্থ্য সচেতন হয়নি। এখনও গ্রামের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত, ধনী অর্ধ শিক্ষিত মাতব্বর, নিরক্ষর চাষী, শ্রমিক – তিন শ্রেণীর মানুষজনই অসুখ-বিসুখে প্রথমে হাতুড়ে, তার পর বিজ্ঞাপনে পড়া ওষুধ, একেবারে শেষে চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসার বিধান নেয়। নিজের ট্রানজিসটর খারাপ হলে তারা মিস্ত্রির কাছে যায়, কিন্তু শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে যেতেই তাদের যত অনীহা।

কিন্তু কেন যে তাদের এই অনীহা, সেটাই বোঝা যায় না। গ্রামে গ্রামে এখন আর কিছু নাই থাক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র অন্তত একটা করে আছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধপত্র না থাকলেও অনেক স্থানেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন, যারা অন্তত মূল্যবান পরামর্শটুকু দিতে পারেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি হল, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার লোককে রোগীর স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধটি কিনতে বললেই সে তুরন্ত জবাব দেবে – 'যদি কিনতেই পারব তাহলে পাড়ার ডাক্তার কী দোষ করল? হাসপাতালে কেন ওষুধ থাকে না?' মোক্ষম প্রশ্ন, যার উত্তর স্বাস্থ্যমন্ত্রী দিতে পারছেন না।

গ্রামে অসুখ-বিসুখের প্রধান উৎস হল সেখানকার দূষিত পানীয় জল ব্যবস্থা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, যেভাবেই হোক গ্রামবাসীরা নিজেরাই দূষিত করছে পানীয় জলকে। এই দূষিত জল বাহিত হয়েই আসছে রোগ-জীবাণু। এই একটা ব্যাপারে অন্তত গ্রামবাংলা এক পা ও এগোয়নি। গ্রামে জল সরবরাহের প্রধান উৎস নলকূপ বা পাতকুয়ো। কোথাও কোথাও ইদানীং ট্যাংকের জল সরবরাহ হচ্ছে। টিউবওয়েলের জল খেলেও সাধারণ লোক এখনও পুকুরের জলেই রান্না ও বাসন ধোয়ার কাজ করে বা জামাকাপড় কাচে। কিন্তু গরমকালে যখন সব পুকুর শুকিয়ে মাত্র দু-তিনটি পুকুরে সারা গাঁয়ের লোকের ব্যবহার্য জল থাকে, তখন সেই একই পুকুরে মানুষের সংগে গোরু, মোষ, কুকুর, ঘোড়াকে চান করান, পুকুর 'গাবিয়ে' (তোলপাড় করে পাঁক ঘুলিয়ে) মাছ ধরা, পায়খানা, প্রস্রাব, জলশৌচ করা ইত্যাদি চলতে থাকে। পুকুর থেকে বালতিতে জল তুলে দূরে গরু, ঘোড়া চান করাতে বললে গরুর মালিক রীতিমত ক্রুদ্ধ হন। পুকুর-পাড়ে গণ-পায়খানা রুটিন ব্যাপার। জল দূষণের কথায় সবাই হাসে।

ইদানীং মধ্যবিত্তরা বাড়িতে পায়খানা, কল, বাথরুম করছে, কিন্তু পায়খানার কুয়োর গর্ত বা শোকপিট থেকে নলকূপ অন্তত আশি থেকে একশ ফুট দূরে করতে হয়, না হলে পায়খানার নোংরা জীবাণু-দূষিত জল নলকূপের জলে মিশে দূষিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ কথা মনে না রেখে সবাই বাথরুম, কল, পায়খানা পাশাপাশি তৈরি করে জনস্বাস্থ্যের সংকট ঘনিয়ে তুলছে। অনেকের আবার পায়খানা ব্যবহারেও আপত্তি।

এসবের ওপর আছে দারিদ্র্য ও কুশিক্ষা। গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার এটাও একটা প্রধান অন্তরায়। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার সংগে আর্থিক সংগতি জড়িত। সারা বছর পেট পুরে যে খেতে পায় না তাকে পুষ্টিকর খাবারের জ্ঞান দেওয়া চলে না। সস্তার হিন্দি সিনেমা, সস্তার নেশা, তাড়ি ও চোলাই মদ গ্রাম জীবনের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করে দিয়েছে। সপ্তাহে যেদিন হাট-বাজার বসে সেদিন তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে বসে যায় খোলাখুলিভাবে তাড়ি বিক্রির আসর। প্রতি গ্রামেই আছে মদ চোলাইয়ের দু-একটা ঠেক। ভ্যাসেকটমি অপারেশন করে টাকা পেয়ে সেই টাকায় আকণ্ঠ চোলাই গিলে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে অশিক্ষিত গাঁয়ের লোক পড়ে থাকে – এ দৃশ্য খুবই দেখা যায়। বড়দের দেখে বাচ্চারাও গোপনে হাতেখড়ি নিচ্ছে। স্কুলের কাছেও তাড়ির কলসি নিয়ে 'বেওসা' হচ্ছে।

এই সব অবস্থার মোকাবিলা করতে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল – যেগুলির কাজ 'পজেটিভ অ্যাপ্রোচ টু হেলথ'। যেমন কারও কলেরার লক্ষণ দেখা দিলে সমস্ত এলাকায় কলেরার ইনজেকশন দেওয়া, জলশোধন করা, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়ে দেওয়া প্রভৃতি যাতে তা ছড়িয়ে না পড়ে তেমনি 'হেলথ অ্যাসিসটেনট' নামক কর্মী ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করবেন, লেডি হেলথ ভিজিটর বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের 'দেখভাল' করে পালনীয় উপদেশ দেবেন ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে নানা কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত থাকলেও কাজ প্রায় কিছুই হয় না। স্বাস্থ্যকর্মীরা টি এ বিলের প্রতি যতটা সক্রিয় নজর দেন, গ্রামীণ-স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে আদৌ ততটা তৎপরতা দেখান না – এটা প্রমাণিত। তেমনি স্কুলে স্কুলে ঘুরে ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার দায়িত্ব মেডিক্যাল অফিসারের। প্রশাসনিক কাজের মধ্যে তাকে এমন জড়িয়ে পড়তে হয় যে 'স্কুল হেলথ' উপেক্ষিত থেকে যায়। অনিয়মিতভাবেও 'স্কুল ভিজিট' হয় না। অবশ্য সরকারি রিপোর্ট ও রিটার্ন ঠিকই পাঠান হয় মিথ্যা সংখ্যাতত্ত্বে পূরণ করে।

এদেরই ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে গ্রামের চেহারার যথেষ্ট উন্নতি হত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা হয়নি। উপরন্তু স্বাস্থ্য সহায়ক কর্মীর ছদ্মবেশে একদল অল্প-শিক্ষিত গ্রামবাসীকে ইদানীং সরকারিভাবে গ্রামের লোকদের হাতুড়ে চিকিৎসার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, গ্রামে বিভিন্ন এলাকায় এরা রীতিমত সরকারি অর্থে পুষ্ট হাতুড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার।

তবে কি সরকারি ব্যবস্থাপনায় গ্রামের কিছুই লাভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। আজ আর কলেরা, বসন্তে গ্রাম উজাড় হবার কথা শোনাই যায় না। মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জনগণ স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করছে। অসুখ করলে 'কলেজ' (হেলথ সেনটারগুলিকে অশিক্ষিত মানুষরা কলেজ বলে, কেন কে জানে) বা ডাক্তারখানায় যেতে প্ররোচিত হচ্ছে আপন তাগিদে। এই স্বাস্থ্যচেতনাটুকু ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষিত ও প্রকৃত স্বাস্থ্যকর্মীরা এই সব মানুষদের সাহায্য করলে তবেই কিছু ফল পাওয়া যাবে। অসুখ করলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া, শিশুদের বিনামূল্যে পাওয়া ট্রিপল অ্যানটিজেন, মায়েদের আয়রন বড়ি নিয়মিত খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুললে সুফল মিলবে।

এ ব্যাপারে জ্বলজ্বলে উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ২৪ পরগণার রায়দীঘি অঞ্চলে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় এক সমন্বয় সংস্থা রায়দীঘি উদ্যোগ পর্ষদের তরুণ-তরুণীরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধি পালন ও প্রচারের এক পরিকল্পনা নিয়েছেন। তারা আশপাশের গ্রামের সমস্ত ক্লাব, মহিলা সমিতি ও সংগঠনের সদস্যদের এই কর্মযজ্ঞে সামিল করেছেন। এরা এক একটা গ্রাম বেছে নেন। সেই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে ঘুরে তরুণীরা মহিলাদের খাদ্যের পুষ্টি বজায় রেখে রান্না, শিশু পরিচর্যা, পরিবার কল্যাণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রসূতির পক্ষে পালনীয় কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে উপদেশ দেন। অন্য দিকে যুবকরা কমপোস্ট সার তৈরির জন্য বাড়ির একপাশে গর্ত কেটে ময়লা ফেলা, যত্রতত্র মলত্যাগ না করে রাস্তার ধারে পায়খানার গর্ত খুঁড়ে দিয়ে তা নিয়মিত ব্যবহার করে মাটি চাপা দিতে জনে জনে অনুরোধ করে যাচ্ছেন। গ্রামবাসীর একাংশের প্রচণ্ড বিদ্রূপ এবং সক্রিয় বাধার সম্মুখীন হয়েও অবৈতনিক স্বেচ্ছাকর্মীরা যা করেছেন তা অনুকরণীয়। এছাড়া কাঁচে রঙিন ছবি এঁকে তা হ্যাজাকের আলোর প্রজেকটর (যা সরিক নামক সেবাসংস্থা দান করেছেন) মারফৎ পর্দায় ফেলে স্বাস্থ্য পালনের গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে স্থানীয় ছেলেরাই বক্তব্য রাখছেন। গ্রামবাসীরা হ্যাজাকের চারদিকে ভিড় করে ছবিসহ বক্তব্য শুনছেন, প্রশ্ন করছেন, এরা উত্তর দিচ্ছেন। একজন না পারলে আর একজন এগিয়ে আসছেন। এরা কেউই ডাক্তার নন। শিক্ষায় কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার করেছেন, কেউ বা কলেজ ফেরৎ, বয়সে কেউ তরুণ, কেউ প্রৌঢ়, কিন্তু বিনা ওষুধেও অপরিসীম নিষ্ঠায় এরা এমন অনেক কাজ করেছেন যা প্রাইমারি হেলথ সেনটারের বেতনভোগী কর্মীরা পারেনি বা করে না। এরা অজ্ঞ নিরক্ষর কিছু মানুষকে অন্তত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পেরেছেন। □

গ্রামের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারছে না কেন?

[illegible] দিতে পারিনি। মেয়েদের তো ইস্কুলে যেতে পারাইনি। ছোট থেকেই লোকের বাড়ি কাজে দিয়েছি। লেখাপড়া হবে কোত্থেকে? অভাবের সমসার (সংসার), কচি কচি ছেলে-দের মেয়ের কাছে রেখে লোকের বাড়ি কাজ করতে গিয়েছি। কেমন করে ওরা পড়বে? কত কেঁদেছে, বলেছে অ মা অদের মতো মোদের ইস্কুলে দিবিনি? শুনে শুধু মনের দুঃখে লুকিয়ে কেঁদেছি, কী করব? কচি কচি পাঁচটা ছেলে নিয়ে বিধবা হলুম। তিনি তো গেলেন। সব দায় যেন আমার! এই তো এখনো খেটে খাচ্ছি, দুটো মেয়ের বে দিয়েছি। বড় মেয়েকে জামাই তাই নেয় না। আমার কাছেই আছে একটা মেয়ে নিয়ে। মেজো মেয়েটা তবু খেয়ে পরে আছে। আর ছোটো মেয়েটা এখনও লোকের বাড়ি খেটে খাচ্ছে। এই আমাদের গেরামেই কত মেয়ে তবু পড়ছে, আমার দেওরঝি-ই তো পড়ছে। আমার ঘরে হলোনি শুধু পয়সার তারে। বড় ছেলেকে তবু মাসখানেক ইস্কুলে পাঠিয়েছিলুম, তা সেও আর গেলোনি। এখন পরের জমিতে চাষের কাজ করে। ছোট ছেলেটাকে তো মোটেই পাঠাতে পারিনি। এখন জন খেটে খাচ্ছে। আমাদের ঘরে ওসব হয় কি মা? লেখাপড়া বড়লোকদের ব্যাপার! ওসব গরিবদের জন্য নয়! আর আমাদের ঘরের মেয়েরা কি ও কপাল নিয়ে জম্মেছে (জন্মেছে)! তাই ছোট মেয়েটার এখন বে দিতে হবে। তা পনেরা-ষোলো বয়স তো হল! কোত্থেকে যে কী করব! দেখতে এলেই বলে কত দেবে? লোকের সাহায্য নিয়ে হয়তো দিলুম। তাতেও কি ওর কপালে সুখ হবে! চারদিকে যা অত্যাচার চলছে, মেয়েদের কপালে মা ভগবান সুখ লেখেনি! ও ব্যাটা বড় এক চোখো। লেখাপড়ার কথা জিগ্যেসা করোনি মা, বরং বলো আমরা খেতে পাচ্ছি কিনা?'

কথাগুলি বললেন ২নং চণ্ডী এলাকার সান্তেরডাঙা নিবাসী নির্মলা দেবী। আমতলা গ্রাম থেকে মাইল খানেক ভিতরে থাকেন। প্রশ্ন রেখেছিলাম মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছেন কিনা? ছোটখাট মানুষ নির্মলা দেবীর কথা শুনে মনে হল জীবন ও বাস্তব সম্পর্কে উনি ভীষণ সচেতন। দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কোন জল চোখে দেখলাম না। বরং মনে হল এটা হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার, এমনটা না ঘটলেই তিনি অবাক হতেন। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন গরিব ঘরের মেয়েদের এরকমই দশা হয়। তাই নিজের জীবনে এ ঘটনা ঘটতে হারিয়ে যাননি। ঠাণ্ডা মাথা-তেই ভেবেচিন্তে লোকের বাড়ি কাজ নিয়ে সংসার চালিয়েছেন। এখনো বাসনমাজার কাজ করছেন। এরই মধ্যে ওয়েসট বেংগল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের আমতলা শাখায় ঝাড়পোঁছের কাজ করেন। মাস গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে পান। ওনার একটাই দুঃখ, লোকে বলে 'মাসি তুমি ব্যাংকে চাকরি করো, তোমার আবার অভাব কিসের!' কিন্তু কত যে পান তা শুধু তিনিই জানেন। তবু নির্মলা দেবীর আশা যদি মাইনেটা কোনদিন বাড়ে, তবে একটু সুখ হয়। লোকের বাড়ি এখনো যে কাজটা করছেন সেটা ছেড়ে দিয়ে যতদিন বাঁচবেন শুধু ব্যাংকের কাজ-ই করবেন। কিন্তু তা কি আর হবে? নির্মলা দেবীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। অবসর সময়ে মাঠের কাজও করে থাকেন।

'ইস্কুলে যেতে ভালো লাগতো কিন্তু তবু পড়া হলোনি। প্রথম ভাগটা পড়েছিলুম। কিন্তু আর হলোনি, মা খোঁড়া। একলা বাপ চাষের কাজ করে, সকলকে খাওয়া-তেই কুলোয়নি আর পড়াবে কোত্থেকে? প্রথম যখন ইস্কুলে গেলুম বামুনদের বাড়ি থেকে সিলেট বই দিলে। বাপ তাও কিনে দিতে পারে নি! তারপর আর কী করব, বইও হলোনি, লেখাপড়াও হলোনি। ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে রান্নার তারে জ্বালোন কুড়োতুম। তার পর পাশের বাড়ি রথীন উকিলদের ঘরে কাজে লেগে গেলুম, তখন আমি এটুকখানি। সাত-আট বছর বয়স হবে। সেই থিকে নাগাড়ে ছ-বছর কাজ করে যাচ্ছি। এরা খুব ভালো। আমাকে নিজের মতো করে দেখে। এ বাড়ির গিন্নিকে আমি কাকি বলে ডাকি। কাকির মেয়ে বুলাদিও খুব ভালো। এখানে একরকম ভালো আছি। সারাদিন থাকি খাই, সন্ধ্যে হলে ঘরে যাই। তবে দুঃখু হয় যখন দেখি পাড়ায় আমার সব বন্ধুরা ইস্কুলে যাচ্ছে আর আমি ঘাটে বসে বাসন মাজছি। গরিব বলেই লেখা-পড়া হলোনি। আমার বাপের যদি পয়সা থাকতো তাহলে কি আমি লোকের বাড়ি কাজ করতুম, না লেখাপড়া ছাড়তুম? আসলে আমার কোপালে নেই, কার দোষ দোব দিদি!'

চোদ্দ-পনের বছরের লাজুক কিশোরী মাধবীর মুখ থেকে এই কথাগুলি বেরোতে অনেক সময় লেগেছিল। মাধবী কুঁতি। থাকে কৃপারামপুরে। সবাই ওকে মাধি [illegible] সবসময়ই ও যেন [illegible] একরাশ লজ্জা ওর মুখে [illegible] ছড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ও একবার [illegible] হেসেছিল। ঠিক বুঝতে পারিনি সে হাসিতে ব্যথা না বিদ্রূপ [illegible] আমাকে দেখে সবসময়ই ও মুখ নিচু করেছিল। অথচ কত সহজে ও বলে দিল 'ও ভালো আছে'। [illegible] কিশোরীর ঠোঁটে [illegible] আত্মপ্রত্যয় দেখে চমকে উঠে ছিলাম। একটা কথাই মনে হয়েছে আমাদের দেশের মেয়েদের কি ভগবান যুগের সঙ্গে জানিয়ে দেবার মত মানসিকতা দিয়েই এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল?

ছায়া খুঁদাইত। থাকে আমতলায়। বয়স বছর ষোলো। ওদের বাড়িতে ঢুকতেই দেখি একটুকরো জমিতে সবুজ আখ খেত। পাশে একটাই পুকুর। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। একটা বড় বালতি নিয়ে কত সহজে ছায়া তরতর করে নারকেল কাঠের সিঁড়ি ভেঙে পুকুরে নেমে জল ভরছিল। আমার ডাকে সাড়া দিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই উপরে উঠে এল। সাদর অভ্যর্থনায় বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে ওর সংগে গিয়ে যখন ওদের বাড়িতে বসলাম তখন আমাকে ঘিরে ছোট-বড় বিভিন্ন বয়সের অনেক মেয়ে বউ দাঁড়িয়ে। আমার প্রশ্ন শুনে ওরা অবাক হল। লেখাপড়া করে না কেন এটা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি? বিস্ময়ের সংগেই ছায়া বলে চলল তার কথা:

'ফোর পর্যন্ত পড়েছিলুম। তারপর 'বড়ির' কারবারের জন্য আর পড়া হলো না। বাড়ি থেকেই ইস্কুলে যেতে দিল না। বাবা বলল তোর মাথা মোটা, পড়ে কী হবে, কারবারে লেগে যা। দিদিদের মাথা ভালো ছিল, ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত পড়ে বিয়ে হয়ে গেছে। আমার আর পড়া হবে না। এখন যত দিন না বিয়ে হয় বড়ির কারবারে বাবাকে সাহায্য করে যেতে হবে। তারপরে একদিন বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো। লেখাপড়া আর এ জীবনে হবে না।'

ছায়াদের বাড়িরই ফরসা টুকটুকে

একটা মিষ্টি বউ আমার কাছে এগিয়ে এল। হ্যারিকেনের আলোয় তার মুখটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভিড়ের মাঝ থেকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল –

'দিদিভাই আমার কথা কেউ লিখবে না, তাই না? বিয়ে হয়ে গেছে বলে? আমার তো লেখাপড়া করার ইচ্ছে ছিল! কিন্তু কেউ কি শুনল? বিয়ে হয়ে গেল।' আমার বন্ধুরা কলেজে পড়ছে আর আমি দুটো বাচ্চা নিয়ে সংসার করছি। কেমন বুড়ি হয়ে গেছি। আট বছর হল বিয়ে হয়ে গেছে, তবু স্কুলের কথা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে। ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছিল। দাদার হাতে সংসার। সবে ক্লাস এইটে উঠেছি, দাদা বিয়ে দিয়ে দিল। বাবা থাকলে হয়তো আর একটু পড়া হতো। আসলে, দিদি, আমাদের ঘরে লেখাপড়া শেখানো মানে যাতে একটু ভালো ঘরে বিয়ে হয়। আর কিছু নয়। তবু বলছি আমার কথা যদি লেখেন তাহলে লিখবেন আমার খুব সখ ছিল পড়াশোনা করবার, কলেজে যাবার।'

সনকা হুঁদাইত (পাঁজা)। বাপের বাড়ি বিবির হাট। বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। এখন আমতলায় এসে শ্বশুর বাড়িতে সংসার করছে, নিজের পড়ার কথা ভুলে গিয়ে মেয়ের পড়াশোনার কথা ভাবছে। মেয়ের পড়ার সময় হয়েছে। পাঁচ বছর বয়স হল। সনকার ইচ্ছে মেয়েকে কিন্তু অনেক লেখাপড়া শেখাবে।

'সংসারের জ্বালায় যেন মরে যেতে ইচ্ছে করে। মুড়ি ব্যবসা দেখে বাপ বিয়ে দিয়েছিল। সুখে থাকব। কিন্তু কী হল? মদ মাতালে লোক নিয়ে সংসার। না-হলে মুড়ি ভেজে খেয়ে কত লোক তো সুখে আছে। পাকা দালান করছে। আমার কপালটাই খারাপ। দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে নিয়ে সংসার। লোকে বলে সুখী পরিবার! কিন্তু কী সুখ? বড় মেয়েটা খোঁড়া। ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল। চিকিৎসা করাতে পারিনি পয়সার অভাবে। আজ খুঁড়িয়ে চলে। লেখাপড়া শেখাতে পারিনি যে একটা কাজ করে খাবে। কেলাস টু পর্যন্ত পড়েছিল। আর পড়াতে পারিনি। একটা ছেলে, তা এই বিদ্যানগর ইস্কুলে ফাইভে পড়ছে। বুঝি তারও আর পড়া হবে না। বই কিনে দিতে পারিনি। ছেলে বলে 'মা ইস্কুলে যাবুনি, বই নেই, মাস্টার নেই।' ছোট মেয়েটার এই আট বছর বয়স হল। তাকেও ইস্কুলে দিতে পারিনি। ওর পড়া হবে না। কে খরচ দেবে? লোকে বলে গরিবের মেয়ে পড়বে কোত্থেকে? লোকের বাড়ি কাজ করছি যাতে ছেলেটার অন্তত পড়া হয়। কিন্তু তাও কি হবে? আমার কপালই মন্দ। আমার মত অভাগী পাত্তর ফ্যামিলিতে নেই। শুনলে বিশ্বাস করবে না মা আমার জাতি ভাশুর পো বিদ্যানগর কলেজের পোফেসার (প্রফেসার)। কত বড় মাস্টার! বাড়ির সকলেই একটু না একটু লেখাপড়া জানে। শুধু আমার ঘরেই হলো না। গরিব হওয়া বড় পাপের। আজ আমাদের জন্য ছেলেমেয়েগুলোর এত কষ্ট। একটা কথা বলবো, মা, আমার ছোট মেয়েটার একটা বোর্ডিং দেখে দেবে যাতে ও বিনিপয়সায় থেকে খেয়ে লেখাপড়াটা শিখতে পারে। নাহলে ওকেও যে আমার মত সারা জীবন বাসন মেজে খেতে হবে। আচ্ছা এমন বোর্ডিং কি নেই যেখানে আমার মত দুঃখী মায়ের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে?

যদি কেউ দয়া করে আমার মেয়ের পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়, আমি তার পায়ে সারা জীবন মাথা দিয়ে থাকবো। মনে করব ভগবান এখনও আছে। গেরস্ত ঘরের বউ। অভাবের জ্বালায় দেনা মেটাতে ঘর সংসার ফেলে লোকের বাড়ি কাজ করছি। ছেলেটা এখনো ইস্কুলে যাচ্ছে। ঠিকমত খেতে পায় না। খোঁড়া মেয়ে সংসার ঠিক গুছোতে পারে না। তাই ওই পা নিয়ে এখনো এক মন চালের মুড়ি মাঝে মাঝে বাপকে ভেজে দেয়। বুড়ো বাপ তাই নিয়ে কলকাতায় বেচতে যায়। কখনো সংসারে টাকা দেয়, কখনো শুধু মদ গেলে। মোটে খাটবে না মা। সময় পেলেই হল, ছিপ নিয়ে পুকুর ধারে গিয়ে বসবে। ষোলো-সতেরো বছরের খোঁড়া মেয়ে, কিছু বললেই হলো, ধরে ধরে খালি মারবে। মা হয়ে এই চোখে আর কত দেখব! তাই এক এক সময় মনে হয় এর চেয়ে একটু ফলিডল খেয়ে মরা অনেক ভাল, সব জ্বালা জুড়োয়। হাড় কটা ঠান্ডা হয়। আমি আর পারছি না মা এসব সহ্য করতে। আমার যে খোঁড়া মেয়ে। ওর কি কোনদিন বিয়ে হবে? বয়সের মেয়ে সাজতে গুজতে একটু ভালবাসে। আমি মরলে ওকে কে দেখবে? তাই মরতেও পারি না। ঠাকুর জানে আমার কপালে শেষ পর্যন্ত কী লেখা আছে। লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করো না মা। ওতে কষ্ট হয়। বরং আমার সব কথা তুমি যদি লিখে দিলে কেউ কোন উপকার করে তাহলে খুব ভালো হয়। আর আমি কিছু চাই না। দেখ না মা আমার জন্যে কিছু করতে পারো কিনা?'

দুচোখ ভরা জল নিয়ে নিজের দুঃখের কথা বললেন মলিনা দেবী (মলিনা পাত্র)। চলে আসার সময় আমার হাত দুটো ধরে চেয়ে রইলেন। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, আরও কী যেন বলতেন। কিন্তু বলা হল না গৃহকর্ত্রীর ডাকে বাড়ির ভিতর চলে যেতে বাধ্য হলেন। মলিনা দেবীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম যে বাড়িতে উনি বর্তমানে কাজ করছেন সেই বাড়িতে বসে। আমতলার এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাজ করছেন। বাড়ি মৌখালির ভিতরে বড়গগন গোদাপিরায়। আমতলা থেকে মাইল পাঁচেক ভিতরে। কাজ করতে বেরিয়েছেন বলে স্বামী বাড়িতে ঢুকতে দেন না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। বাজারে অনেক দেনা। কে শোধ করবে? মেয়ের যদি কখনও বিয়ে হয় তার জন্যেও তো কিছু যোগাড় করতে হবে। ইনটারভিউ নিয়ে চলে এসেছি, মলিনা দেবীর আশা এতে নাকি ওর উপকার হতে পারে। বার বার আমাকে বলেছেন 'আমার কথা ভালো করে গুছিয়ে [illegible] হয়!' জানি না মলিনা দেবীর সব কথা শুনে কেউ উপকার করতে এগিয়ে আসবে কিনা। এমন কতশত মলিনা দেবী গ্রামের অন্ধকার কূপে পড়ে আছেন। কারা তাদের উদ্ধার করবে? গ্রামের মেয়েরা লেখাপড়া করছে না কেন? সকলের কথা লিখলে বোধ হয় মহাভারত হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা, কুসংস্কার, উপর তলার মানুষের অবজ্ঞা, উপেক্ষা। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশক পরেও অজ্ঞানের অন্ধকারে। এর জন্য কারা দায়ী? পঞ্চায়েতের কি কোন ভূমিকা নেই এ ব্যাপারে? তাঁরা কি পারেন না নিজ নিজ গ্রামের এই খোঁজ খবরটুকু রাখতে? আমার মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা খোঁজ রেখে উপকার করতে পারেন সেই সব মানুষের যারা প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারছে না। 'পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা' দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মেয়েদের পড়াশোনা করানোর সমস্যাটা কি এই অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত সদস্যরা উপলব্ধি করবেন এবং আন্তরিকভাবে এই সমস্যা সমাধানে ব্রতী হবেন? □

আলোকচিত্র : প্রণয় দাস

মাঠে পুরুষদের সমান কাজ করেও মেয়েদের মজুরি অর্ধেক

চন্দ্রা মিত্র

আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। অনেক প্রতীক্ষা-প্রার্থনার পর বৃষ্টির ঘনঘটা। স্বস্তি। চাষের জমিতে জল জমেছে, চারিদিকে সাজ-সাজ রব। ছেলে-বুড়ো সবাই লাঙল নিয়ে মাঠে। মেয়েরাও বসে নেই। পুরুষের মতই ঘণ্টা মেপে খাটুনি। এক বুক দুঃখ — পুরো টাকা পায় না বলে। কিন্তু কাকে বলবে? কানা-ঘুষো করতেও ভয় যদি আর কেউ না কাজ দেয়! এমনই খেটে খাওয়া কয়েকজন অবিবাহিতা মেয়ে ও বউয়ের সংগে কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল। ওরা থাকে চব্বিশ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলা গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে। গ্রামের নাম কেওড়াডাঙা। ওদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম — কেন মাঠের কাজ করেন? কীভাবে এই কাজে এলেন?

'পাড়ার জুড়িরা সব একসংগে ঘুরতুম। ওরা বলত কাজে যাবি? তার পর একদিন মাঠে কাজে গেলুম। তখন দেড় টাকা রোজে কাজ করেছি। এখন বেড়ে চার টাক. হয়েছে। তবে ছেলেদের যদি দশ টাকা রোজ দেওয়া হয় আমাদের দেয় পাঁচ টাকা। ওরা যা পাবে তার অর্ধেক আমরা পাই। অবশ্য ছোট-বড়-মেয়ে-মদ্দ সবাইকে জলপানিটা সমান দেয়। জলপানি বলতে দেড়শো গ্রাম মুড়ি আর খানিকটা চানাচুর। দশ-বারো বছরের ছেলে-মেয়েরা মাঠে কাজ করলে দুটাকা আড়াইটাকা পায়। কাজের সময় বলতে সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারোটা আর বৈকাল তিনটে থেকে সন্ধে ছটা। এই সাতঘণ্টা কাজ করলে আমরা চার টাকা পাই। রোজের টাকা রোজ দেয়। ছেলেদের মত একই খাটতে হয়। তবু ছেলেদের বিড়ি, দোক্তা, পান এই সব দেয়। আমাদের শুধুই জলপানি। তবে কোন কোন মেয়ে যদি খুব ভাল কাজ করছে বলে ওরা মনে করে, ছ-টাকা পর্যন্ত দেয়। লেখাপড়া মোটে শিখিনি। যখন মাঠের কাজ বন্ধ হয় তখন বাপ ব্যাঙ ধরে। এই ভাদ্র মাস থেকে ব্যাঙ ধরা শুরু হবে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে ব্যাঙ ধরলে আবার থানায় ধরে নিয়ে যায়। আমার বাপ ব্যাঙ ধরে নিয়ে বারুইপুর, মগরাহাটে বিক্রি করে। ছোট ব্যাঙ সাড়ে তিন টাকা, বড় ব্যাঙ সাত টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। মাঠের কাজের থেকেও, দিদি, ব্যাঙ ধরা আরো কষ্ট। চোর-ডাকাতদের হাতে কখনও কখনও পড়তে হয়। কিন্তু কী করবে? কাজ না থাকলে বাপকে ব্যাঙই ধরতে হয়। আমার বাপ যখন ব্যাঙ ধরতে যায় সারারাত ভয়ে আমার ঘুম ধরে না। না-জানি কী শুনব! আমাদের বড় কষ্টের সংসার দিদি। আমার মা — এই ছটা ভাইবোন হবার পর অপারেশন করেছে। সরোজনলিনী নারী মংগল সমিতির খাটুর মোড় হাসপাতালে। অপারেশন করার পর একশো পঁচিশ টাকা আর একটা হরলিকসের শিশি পেয়েছিল। তা টাকাগুলো গেল দেনা শোধ করতে আর হরলিকসটা যেন খেয়েছিল। কিন্তু একটু কি বিরাম আছে? অপারেশনের পনেরো দিন পর থিকেই মাঠের কাজ করছে। এখন এই আমি, আমার বাপ আর মা তিনজনে মিলে মাঠের কাজ করছি। দৈনিক বোল টাকা উপায় হচ্ছে। তাই সব দিন কাজ হয়নে। শরীর খারাপ হলে কাজে হয়ত গেলুমনি। ব্যাস, টাকা বন্ধ। সোংসার মোটে চলতে চায় না। লেখাপড়া কেউ করে না। এই কদিন হল বড় ভাইটা আমাদের গেরামের একটা ইস্কুলে পড়ছে। এত কষ্ট করে খেটে খাই, কই, পয়সাটা তবু ন্যায্য দেয়? সেখানেও অর্ধেক। মেয়ে হয়ে জন্মানই পাপ।'

পূর্ণিমা পুরকাইত। ওকে সবাই টেঁপি বলেই ডাকে। বয়স সতেরো বছর। ও একটু সাজতে-গুজতে ভালবাসে। কিন্তু দারিদ্র্য যে জীবনে কত বড় অভিশাপের তা এর মধ্যেই ও ভাল করে বুঝে নিয়েছে। এও বুঝেছে প্রতিবাদ করা অনর্থক। ওরা যতই খাটুক পুরো টাকা কোনদিনই পাবে না। তাই যখন প্রশ্ন করেছিলাম — তোমরা টাকা বাড়াতে বল না কেন? তখন ও হেসে লুটোপুটি। অনেক পরে দু-চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল — 'হ্যাঁ দিদি, মেয়েরা কি কখনো ছেলেদের সমান হয়?' উত্তর দিতে হলে অনেক কিছু বলতে হয়, কিন্তু তা বোঝবার মত মানসিকতা ওর নেই। চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। 'তিনটে বাজে দিদি' বলে এক দৌড়ে হাসতে হাসতেই জলার ধারে ছুটে গিয়েছিল।

পূর্ণিমা পুরকাইত

'বাবা-মা আমাকে মাঠে যেতে দেয় না। আমি তবু মাঠের কাজে যাই। নিজের সাজ-পোশাকটা করবার তরে মাঠে যাই। পাকখেড়ে ইস্কুলে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলাম। তার পর আর পড়া হল না। বাবা বই কিনে দিতে পারেনি। আমার বাবা আমতলায় ভ্যান চালায়। বাবার উপায়েই কোন

[illegible] নিজেদের জমি নেই। মাঠের কাজে আমি নতুন। এই দশ-বারো দিন হল কাজ শুরু করেছি। আমিও চার টাকা পাই। আমাদের এখানে আর কোন কাজ নেই যে করব। তাই বাধ্য হয়ে মাঠের কাজে নেমেছি। এখানে সবাই খুব গরিব, তাই টিউশনিও জোটে না। নাহলে ছেলেদের অ-আ পড়ালে তবু পাঁচ-দশ টাকা রোজগার হত। কিন্তু সে পথ এখানে নেই। সবই আমাদের ভাগ্য। লেখাপড়াজানা দিদিদের যখন দেখি ইস্কুলে পড়াচ্ছে বা অন্য কাজ করছে তখন খুব কষ্ট হয়। এই দুবছর হল আমি পড়া বন্ধ করেছি। এ জীবনে আর পড়াশোনা হবে না।' কথাগুলি বলছিল দেবলা পুরকাইত। সতেরোর এক গম্ভীর তরুণী। খুব কম কথা বলে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বেশ মেপে মেপে কথা বলছিল। গভীর হতাশা ওর মুখটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দুচোখে চাপা ক্ষোভ। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন থেকেই সচেতন। তাই মাঠের কাজ শিখে নিতে চায়। হয়ত কপাল মন্দ হলে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে এই কাজই করে ভাত খেতে হবে। পড়াশোনা না করতে পারার দুঃখ ওকে অহরহ যন্ত্রণা দেয়। 'পুরো টাকা চাও না কেন?' উত্তরে উপহার দিয়েছিল একটুকরো বাঁকা হাসি। এর পর আর প্রশ্ন করিনি।

'আমি যখন খুব ছোট তখন আমার বাপ অসুখে মরে যায়। ভাইবোনেদের মধ্যে আমি সবার ছোট। দাদাদের বিয়ে হয়ে গেছে, দুটো দিদিরও বিয়ে হয়েছে। দাদারা সব আলাদা। আমি আমার মা আর একটা ভাইকে নিয়ে আমাদের তেনজনার আলাদা সোংসার, লেখা-পড়া কোনদিন করিনি আর হবেও না। আমি এই মাঠের কাজ করছি চার-পাঁচ বছর। তার আগে নোকের বাড়ি খাটতুম। সেই সাত-আট বছর বয়স থিকেই খেটে খাচ্ছি। মাঠে কাজ করলে দৈনিক চারটাকা পাই। অনেক কষ্ট, কিন্তু কী করব উপায় নেই। আমার মা-ও মাঠে কাজ করে। যে ভাইটা আমাদের সোংসারে আছে মাঝে-মধ্যে মাঠের কাজ করে। এই সময়টা কাজ একটু বেশি হয়, কারণ চাষের সময় তো। যতদিন না পরের ঘরে যাব এই মাঠের কাজ করেই খেতে হবে। তা সেখানে গিয়েও কি সুখ হবে? তবে আমাদের মত ঘরে দিদি এই মাঠের কাজ শিখে রাখা ভাল। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে যদি ভাত না পাই তবে এ কাজ করে দুটো ভাত খেতে পাব।"

দেবলা দলুই। বছর পনেরোর কিশোরী। লাজুক-স্বভাবের মিষ্টি মুখে একরাশ দুঃখের ছায়া। কাজ করতে করতে ও ক্লান্ত। কিন্তু তা বলে রেহাই নেই। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল এই বয়সে ও অনেক কিছু বুঝে গেছে। এত দুঃখ তবুও মুখে সবসময়ই একটুকরো হাসি লেগে। ওর হাসিটাই যে কান্না তা বুঝতে কারুর এতটুকু দেরি হবে না।

আদুর গা। পরনে একটুকরো কাপড়, মাথায় অনেকদিন তেল পড়েনি। সিঁথির সিঁদুরও আবছা। জীর্ণ কঙ্কালসার বুকে মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট শিশু। দুচোখের কোলে পিচুটি। শীর্ণ মুখে একরাশ দুঃখ। কথা বলতে গেলেই কান্না এসে সব কিছুকে থামিয়ে দিচ্ছে। তবুও আমার প্রশ্নের উত্তরে স্মৃতির ঘর হাতড়ে অনেক কথা বলে চলেন জটাই দেবী।

'বছর কুড়ি হল আমার বে হয়েছে। আমাদের সোংসারে এত অভাব ছেলনি। উঠোউঠি ক-বছর ভেসে যেতে অবস্থা খুব খারাপ। এই বছর দুই হল মাঠের কাজে নেমেছি। বাপের বাড়িতে এত কষ্ট ছেলনি। বাপ মিলে কাজ করত, খাওয়া-পরার কষ্ট পাইনি। কিন্তু দুঃখ ছিল – সতালো মা। এখন বাপও নেই, বাপের বাড়ির সাথে কোন খবরও নেই। কেউ চোখের দেখা দেখতেও আসে না। গিয়ে পড়লে অবশ্য দুটো খেতে দেয়। অভাবের সোংসার। ছ-টা ছেলে মেয়ে। এবার অপারেশন করেছি। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া তেমন জোটে না। শরীর বড্ড দুব্বল। বড় মেয়েকে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যাই। দশ-বারো বছরের একটা মেয়ে আছে, এই তার ঘাড়ে সোংসারের সব্বস্ব দিয়ে মাঠে চলে যাই। মনটা আঁকপাক করে ঘরের তরে। কিন্তু কী করব? বড় ছেলেটা বছর পাঁচেকের, টাই-ফডে একমাস বিছানায় পড়ে। ঐ ছেলে ফেলেই কাজে যাই। মন কাঁদে, কিন্তু কী করব, কাজে না গেলে ছেলের মুখে ওষুধ-পথ্যি কোথেকে দেব? ওর বাপ একলা পারেনে এতগুলো পেট চালাতে। গরিব ঘরের বউ, কষ্ট করব না এ কখনো হয়? আমাদের কষ্টেরই কোপাল।'

'আমার নিজেদের জমি। একলা লোক পারেনে। আমায় যেতে হয়। চোপর দিন খাটতে হয় না। গেলুম, খানিকটা করে দিয়ে সোংসারের কাজ করলুম আবার বৈকালে গিয়ে এট্টু করলুম। খোকার বাপ হয়ত খেয়েদেয়ে একটু রেসটো নিল, আমি মাঠে গেলুম। নিজের জমি নোক দিয়ে করার থিকে নিজে করলে নিজেরই ভাল। এ ছাড়া কাপড়ে চেকনের কাজ করি। কোনরকমে সোংসার চলে যায়। বাপের বাড়ি যখন কাপড়ে চেকনের [illegible] করতুম দিন ছ-টাকা রোজ [illegible] এখানে করলে তিন টাকা পাই। সোংসারে দু-পয়সা দিলে ভাল তাই এই সব কাজ করা। তা আমার তাতে কোন দুঃখু নেই, বরং কাজ করতে ভালই লাগে।'

বছর পঁচিশের এক মিষ্টি বউ। এক হাত ঘোমটার আড়াল থেকে আমার কথার উত্তর দিচ্ছিল। এই বয়সেই বেশ গিন্নি-গিন্নি ভাব। দুঃখ নেই বলেই মনে হল। বরং বেশ খুশি-খুশি ভাব। সংসার করতে, মাঠের কাজ করতে ওর ভালই লাগে।

কেওড়াডাঙা গ্রাম ছেড়ে জোড়া দোকান বারুইপুর রোডে এসে পড়লাম। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। আকাশ জুড়ে থমথমে মেঘ। মুহূর্তে প্রবল বৃষ্টি আসতে পারে। মাথায় একহাত ঘোমটা, হাতে কাস্তে, কোমর পর্যন্ত ভেজা কাপড় নিয়ে ধানজলা থেকে একে একে উঠে আসছিল গ্রামের চাষী মেয়ে-বউ। সবারই বাড়ি ফেরার তাড়া। আমার কথায় ওরা একটু থমকে দাঁড়ায়, কেউ বা ফিক করে হেসে ফেলে। হাসি-খোলা সাতাশব্বই বাসটা মুহূর্তের জন্য জোড়া দোকানের নির্জনতাকে মুখর করে তোলে। গৌরীপুর, দৌলতাবাদ, চণ্ডী, আলিপুর, কৈখালী, বলাখালী, একে একে সব গ্রামেই দেখি বিস্তীর্ণ সবুজ চারা ধান গাছের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রামের প্রতিটা ঘরের চাষী মেয়ে বউ। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। পারিশ্রমিক মাত্র চার টাকা। একজন পুরুষের উপায়ের অর্ধেক। □

আলোকচিত্র : নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ-তে যোগদানকারী ব্যক্তির নাম এবং ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ ঠিকানা, বয়স, সখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল:

রমা গুপ্ত □ ক্রম ৫১
৪২৮ শরৎ চট্টোপাধ্যায় রোড, হাওড়া ৩। ৫৭ বছর, লেখা বইপড়া, ম্যাট্রিক অনুত্তীর্ণ, উল্লেখ নেই।

আনোয়ার ইসলাম □ ক্রম ৫২
কলেজ রোড, সাঁইথিয়া, বীরভূম ৭৩১২৩৪। ৪০ বছর, বইপড়া, স্নাতক সমন্বয় রুরাল সারভিসে ডিপলোমা, চাকরি।

উদয়শংকর ভট্টাচার্য □ ক্রম ৫৩
রামনগর, পোঃ রামনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০২। ২০ বছর, নাটক অভিনয় আবৃত্তি গান বক্তৃতা, স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র।

মলয় মুখোপাধ্যায় □ ক্রম ৫৪
অফিস অব দ্য সাব-ইনসপেক্টর অব দ্য স্কুলস, কালনা ইস্ট সারকল, পোঃ কালনা, বর্ধমান। ২৯ বছর, বইপড়া গান খেলাধুলা সিনেমা, স্নাতক, চাকরি।

মলিন মুখে ফুটুক হাসি — ১

চিন্ময় সেনগুপ্ত

আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রায়ই দু-একজন থাকে যারা অত্যধিক স্পর্শকাতর। দল বেঁধে পিকনিকে, সিনেমায়, খেলার মাঠে, এমনকি ঘরোয়া আড্ডায় এদের সংগে কোন রকম রসিকতায় ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হয়, পাছে এরা কোন সামান্য কথায় মনে আঘাত পায় অথবা ক্ষেপে ওঠে। অর্থাৎ মনের দিক দিয়ে খুব একটা সহজ, স্বাভাবিক এরা নয়।

হাতের কাছের এই রকম একটি উদাহরণ গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা 'স্বপ্নাদি'। আমাদের ছেলেদের সামনে সব সময় ভুরুকুঁচকে তার একটা রাগী রাগী ভাব। কী কারণে, কার ওপর স্বপ্নাদির এত অভিমান, ভগবান জানেন। মেয়েবন্ধুদের সংগে হাসিমুখে কত গল্প, কত কথা। অথচ আমরা ছেলেরা কেউ কাছে গেলেই, সহসা গম্ভীর। বোধহয় পুরুষমানুষ সম্বন্ধেই স্বপ্নাদির মন এমন বিষিয়ে আছে যে তাদের কে ভাল, কে মন্দ তাদের কোনটা ভাল, কোনটা নয় এসব বিচার করবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

স্বপ্নাদির ঠিক উল্টো মানুষটি চক্রবাগানের 'বিনয়'। ওর আবার মেয়েদের ব্যাপারে অস্বাভাবিক বিরাগ। একটি মেয়েকে ভালবেসে ছিল। তার পর যখন একসংগে ঘর বাঁধবার প্রস্তাব করল তখন মেয়েটি বলল, সে কী কথা, তোমার চাকরি নেই, বাকরি নেই, আমি করব তোমায় বিয়ে, পাগল নাকি — বাসে। সেই থেকে বিনয়ের সমগ্র নারী জাতির ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা। ওদের সংগে মাখামাখি আন্তরিকতা সযত্নে পরিহার্য। মেয়েদের সংগে ওর সব ব্যবহার নেহাৎ ই ফরমাল।

এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, এদের সত্যিকারের মনের ব্যাপারটা উদ্‌ঘাটন করতে মনোবিদরা প্রচুর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন এসব মানুষের মনে এক বা একাধিক ক্ষতচিহ্ন আছে। এইসব ক্ষতচিহ্নের সচেতনতা, এদের স্বাভাবিক চিন্তাধারা, আচার আচরণ সব অস্বাভাবিক করে দিয়েছে।

মনোসমীক্ষক বারন রস্ট্র ও ল্যানড দীর্ঘকাল লক্ষ্য করে দেখেছেন যে সব পুরুষ যুবতী কর্ত্রীব্যক্তি বা বয়োজ্যেষ্ঠদের কথায় কথায় চ্যালেঞ্জ করে বসে, আগ বাড়িয়ে তর্ক করতে আসে, কাউকে পরোয়া করে না — তাদের এই [illegible] প্রকাশের অন্তরালে রয়েছে আসল মানুষটি, যে খুব নরম, স্নেহের কাঙাল, যে অপরের ওপর নির্ভরশীল হতে চায়। এইসব আচরণের পিছনে রয়েছে অতীতের কোন দুঃসহ মানসিক আঘাত কিংবা অব্যক্ত বেদনার ইতিহাস।

মনের আঘাত নিয়ে চিন্তা করবার আগে ভাবা যাক দেহের আঘাতের ব্যাপারটা। শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষত হলে সেখানে একটা চামড়ার আবরণ তৈরি হয়। ক্ষতটা শুকিয়ে গেলে দেখা যায় যে ক্ষতের ওপরের ঐ চামড়াটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পুরু এবং শক্ত।

দেহের পক্ষে এই পুরু চামড়ার আয়োজন কেন? একবার আঘাত পেয়ে দেহযন্ত্র সজাগ হয়ে এমন একটা ব্যবস্থা নেয় যাতে ও জায়গাটা আর আহত না হয়। এ জন্যই আহত স্থানটিকে স্বাভাবিক চামড়ার চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়।

মনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকম।

মনে কোন আঘাত পেলে আমরা মনটাকেও আবার আঘাত পাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য শক্ত করি। শক্ত করি কীভাবে?

চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে অর্থাৎ চারপাশের মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না সম্পর্কে আমরা উদাসীন হয়ে যাই। মনে এমন একটা পুরু আবরণ তুলে দিই যা ভেদ করে ওসব কিছুই আর মনকে স্পর্শ করতে পারে না। অর্থাৎ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি।

এই মনের ক্ষতচিহ্ন আমাদের মানসিকতাকে বিকৃত কুৎসিত করে দেয়। আহত মন নিয়ে সমাজের আর পাঁচজনকে কারণে-অকারণে আঘাত করে নিজের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দিই, নিজেও সরে থাকি। আমরা এমন মানুষ হয়ে যাই যে, অপরেও আমাদের সংগ আর পছন্দ করে না, পরিহার করতে চায়।

মনের আঘাত এমন একটা মারাত্মক ব্যাপার যে, যারা আঘাত দিল শুধু তাদের প্রতিই আমরা বিরূপ হই না সারা দুনিয়ার ওপর বিরূপ হয়ে যাই। সর্বত্র কারণে অকারণে লক্ষ্য করি একটা প্রতিকূল পরিস্থিতি। পাঁচজনের সংগে আমাদের দেওয়া নেওয়া, সহযোগিতা, সহমর্মিতা বা অনুভব উপভোগের সম্পর্ক আর থাকে না। ধীরে ধীরে নিঃসংগতা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রায় সব সময়, সব ব্যাপারেই আমাদের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। আমরা কলহপরায়ণ, উগ্র হয়ে পড়ি।

এ ছাড়া আরো দুর্বিপাক আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির আচরণে কষ্ট পেয়ে, ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথমে ব্যক্তি-বিশেষকে পরিহার করি এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকেও পরিহার করি।

নিজেকে পরিহার করার অর্থ হল যা আমাদের প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জীবন, তার সংগেও যোগসূত্রটি ছিন্ন করে দেওয়া। যেসব মানুষকে দেখা যায় সবসময় একা বা নিঃসংগ, এবং নিঃসংগ থাকতেই পছন্দ করছে, তারা নিজেরাও ভিতরে ভিতরে নিজের সংগ হারিয়েছে। নিজের স্বাভাবিক সত্তাকে তারা একটা কঠিন আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ফলে, যেমন করে কথা বলত, তেমন করে আর বলছে না। যেমন করে হাসত, তেমন করে হাসছে না। খোশ-খেয়াল আগে যা ছিল আর তা নেই। হয়ত গান করতে ভালবাসত, এখন আর গাইছে না, তাস খেলতে ভালবাসত, আর তাস খেলছে না।

অথচ আমাদের চারপাশে ভিন্ন চরিত্রের, ভিন্ন স্বভাবের এমনও অনেক মানুষ ছড়িয়ে আছে — সমাজের পাঁচজন সব সময় যাদের সংগ চাইছে, যাদের পছন্দ করছে। অফিসে, ফ্যাক্টরিতে, বাজারে সবাই তাদের সংগে মিশছে, হাসিমুখে কথা বলছে, তারাও মন খুলে সুখ দুঃখের আলাপ করে চলেছে।

দেখা যায়, সমাজের আর পাঁচজনের সংগে এদের কেমন একটা অঘোষিত সহমর্মিতা আছে। পরিচিত অমুক বাবুর বয়স্কা কন্যার সুপাত্র স্থির হয়েছে — খবরটা শুনে এদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। অমুকের ছেলে পরীক্ষায় পাশ করেছে জেনে এরা প্রসন্ন হল। অমুকের মায়ের অসুখ করেছে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হল। পাড়ার অমুক টিম ডায়মনডহারবারে খেলতে গিয়েছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন খবর নেই। সন্ধ্যার পর খবর নিচ্ছে, ওরা জিতল না হেরে এল। এই রকম নানাভাবে বোঝা যায় চারপাশের পাঁচজনের সংগে সুখ-দুঃখের, ভাল মন্দের এদের একটা যোগসূত্র আছে।

দেখা যায় যে, অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা যেটুকু এদের আছে তাই নিয়েই এরা তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। মনের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোন ক্ষোভ নেই।

এই যে পরিবেশের সকলের সংগে এদের একটা সহমর্মিতা, সকলের সব ব্যাপারে আগ্রহ — এর ফলে এদের জ্ঞানের পরিধিও বেশ বেড়ে যায়। কাছের খবরে আগ্রহ থাকার জন্য দূরের খবরে আগ্রহ বাড়ে এবং দূরও নিকট হয়ে যায়। এদের কাছেই জানতে পারা যায় কোন দেশের কেমন সমাজব্যবস্থা, কেমন শাসনব্যবস্থা। পাড়ার, তার পর দেশের এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশের খেলাধুলা, ধর্ম-অধর্ম, মহাকাশ অভিযান থেকে শুরু করে দেশের খরা-বন্যা, বনসৃজন, টাইগার প্রজেক্ট — সবের খবরই এরা রাখে।

ডাক্তার আরথার কুমস নানারকম সন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই সব মানুষের চরিত্রের রহস্য হচ্ছে, এদের মনে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, কেউ কোনদিন এদের কোন আঘাত দিয়ে এদের মনকে নিদারুণভাবে আহত করতে পারেনি।

তাহলে প্রথমে যাদের কথা বললাম সেই 'স্বপ্না', 'বিনয়' প্রভৃতির দল ছেড়ে, পরে যাদের কথা বললাম, তাদের দলে কেমন করে আসা যায়? না এসে উপায়ও নেই। কারণ, মনুষ্যজীবনটা ফিরে ফিরে বারবার হাতের কাছে এসে বলবে না, এইযে আমি এসেছি, তুমি আমাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা চল!

লক্ষ্য করা গেছে যে, মনের ক্ষত নিয়ে যারা জীবনযাপন করছে, তাদের নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা খুব দীন, হীন, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ অতি সামান্য। তাই পান থেকে চুন খসলেই তারা মনে করে মর্যাদাহানি হল। যেসব ঠাট্টা, পরিহাস, আত্মসম্মানসম্পন্ন লোকেরা হেসে উড়িয়ে দেবেন, তাতেই তারা ক্ষুব্ধ হয়। মনোবিদরা বলছেন এ সব লোকের মনটাকে শক্ত বাধা দরকার।

এই শক্ত বাধা ব্যাপারটা কী?

দেহের সংগে তুলনা করে এর একটা ধারণা করা যেতে পারে। আমাদের শরীরের ওপর একটা চামড়া আছে। আবার এই চামড়ার নিচে খুব কোমল সংবেদনশীল আর একটা স্তর আছে। উপরের চামড়াটা জীবাণুর আক্রমণ থেকে, ছোট খাট আঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

কিন্তু আঘাত জোরাল হলে ওপরের চামড়া ভেদ করে সেটা ঐ কোমল সংবেদনশীল নিচের স্তরটাকে জখম করে। যেসব মানুষ অতি অল্পে মনে আঘাত পায় তাদের মনটা নিচের কোমল স্তরের মতই সংবেদনশীল। তাদের স্বাভাবিক হতে হলে মনটা-কে ঢেকে দিতে হবে শরীরের ওপরকার স্বাভাবিক চামড়ার মত একটা সহনশীল আবরণ দিয়ে।

মনের জন্য এই আবরণ কী করে রচনা করা যায়?

এটা সম্ভব নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাটাকে উঁচু করে, বড় করে। যে মানুষের অস্মিতা বা অহংবোধ বেশ খানিকটা উঁচু ধরনের, যে নিজেকে নেহাৎ দীন-হীন, অপদার্থ, অকর্মণ্য ভাবে না, সে মানুষ একটা নির্দোষ পরিহাসে, একটা সামান্য অসাফল্যে কখনো আঘাত পেতে পারে না। নিজের সম্বন্ধে নিজের একটা উঁচু ধারণা সব মানুষেরই দরকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে। স্কুলে ছাত্রকে জানতে হবে সে ফেলনা ছাত্র নয়, খেলার মাঠে খেলোয়াড়কে জানতে হবে সে অপদার্থ খেলোয়াড় নয়, অফিসে কর্মীকে জানতে হবে সে অফিসের একটা অপ্রয়োজনীয় বোঝা নয়, গৃহিণীকে জানতে হবে যে গৃহস্থালীতে তার বেশ পটুতা আছে ইত্যাদি।

যখন মানুষের নিজের কাছে নিজের সন্তোষজনক পরিচয় থাকে, মনভরা আত্মতৃপ্তি থাকে, তখন সে ছোট-খাট অপমান, উপেক্ষা বা আঘাতে আর অস্থির হয় না। দুঃসহ হলেও সে আঘাতের দাগ অচিরেই মিলিয়ে যায়। আর পাঁচজনের মত অপরের স্নেহপ্রীতি সে অবশ্যই চায়। কিন্তু যতটা চায় তার চেয়ে অনেক বেশি প্রীতি অপরকে দেওয়ার জন্য সে ব্যাকুল। কিছু লোক তাকে তো অপছন্দ করবেই, কিন্তু তাতে তার কিছু এসে যায় না। ভরা মনে কিছু কিছু লোকের অপ্রীতি এবং অস্নেহ সে হাসিমুখেই মেনে নেয়। নিজের ছন্দে সে কাজ করে। করণীয় সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত নিজেই স্থির করে। আর জীবনযাত্রায় চারপাশে ভালবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ছড়িয়ে যায়।

কিন্তু নিজেকে নিয়ে তৃপ্তি যাদের নেই, তারা সকলের কাছে সব সময় সব ব্যাপারে প্রীতি, স্বীকৃতি, বাহবা পাওয়ার জন্য হাঁ করে থাকে। আর এসবের সামান্য কমতি হলেই তাদের মন আহত হয়।

জীবনের পথ চলতে বিভিন্ন বিচিত্র মানুষকে আমাদের সাদরে গ্রহণ করতে হবে। নির্বিচারে প্রীতির সঞ্চার ও প্রসারের গণ্ডি যদি আমরা বাড়িয়েই চলি তাহলে দেখব যে প্রীতি, ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকলের থেকে উৎসারিত হয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসছে!

দুনিয়ার মহাপুরুষদের জনগণমন-অধিনায়ক হওয়ার এটাই পদ্ধতি। জ্ঞানের শিখরে চড়ে নয়, ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে নয়, প্রীতির প্রসার ঘটিয়েই এঁরা সকলের প্রীতি আকর্ষণ করেছেন।

আরো একটা কথা। অতি সামান্য ব্যাপারে আমরা তখনই আহত হই, মন যখন উত্তেজিত, ব্যথায় বিষণ্ণ কিংবা অনাগত আশঙ্কায় শঙ্কিত। এই অবস্থায় কোন বন্ধু এসেও যদি কিছু নির্মল রসিকতা করে, আমরা হঠাৎ ক্ষেপে যাই। কিন্তু নিরুত্তাপ, নিরুদ্বিগ্ন মনে সে রসিকতাকে রসিকতা বলে গ্রহণ করতে পারি। যে আমায় নিয়ে হাসতে চাইছে, তার সঙ্গে আমিও হাসতে পারি।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যখন গা এলিয়ে বিশ্রাম করি, শরীরের পেশীগুলো যখন একেবারে ঢিলে করে দিই, তখন ভয়, দুর্ভাবনা, রাগ — এই সব নেতিবাচক মনোভাব মনে আসে না। আমরা তেমন কোন আঘাত পাই না। কেননা যে কোন মানসিক আঘাত পাওয়ার জন্য এবং পেয়ে তা ধরে রাখবার জন্য পেশীগুলোকে নতুনভাবে যথা প্রয়োজন প্রস্তুত হতে হয়, সজাগ হতে হয়। তাই যেখানে পেশীগুলোর সেই প্রস্তুতি নেই, সেখানে নেতিবাচক মনোভাবেরও প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

কিন্তু এই পেশী ঢিলে করে সর্বাঙ্গ এলিয়ে দেওয়ার অভ্যাস - এটা চর্চা সাপেক্ষ। প্রতিদিন এই অভ্যাস করলে মনে একটা প্রশান্ত ভাব আসে, তখন সেই প্রশান্তিকে সারাদিন সযত্নে রক্ষা করতে হয়। সব দেশের ঋষি-মনীষীরা এই প্রশান্তি সর্বক্ষণ বজায় রাখতে পারেন। এজন্যেই তাঁরা সদা প্রসন্ন, সদা নিরুত্তাপ।

ম্যাথু আরনল্ড একজন কৃষ্টিবান মানুষের দুটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। একটি তাঁর মিষ্টি স্বভাব, যাকে উনি বলেছেন 'sweetness'। আর একটি তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি - 'light'। এই sweetness বা সদাপ্রসন্নতা কৃষ্টিবান মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তার কারণ, তাঁরা আপন স্বভাবগুণেই, কোনরকম দীক্ষার অপেক্ষা না করে, নেতিবাচক মনোভাবের থেকে নিজেদের আলগা রাখতে পারেন এবং রাখেন। ফলে কোন ব্যক্তি, কোন পরিস্থিতি, কোন অবস্থা-বৈগুণ্য — কিছুই তাঁদের সদাপ্রসন্নতা হরণ করে মনকে আহত, তাড়িত, বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। তাঁরা 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা' জীবনযাপন করেন। ▢

জানতে চাই জানাতে চাই

প্রশ্ন : রাজবংশী ভাষার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে চাই। এমন কোন বই আছে কি যার মধ্যে এই ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, শিক্ষা-দীক্ষা, উৎসব অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। বই-এর নাম, লেখক এবং প্রকাশকের নাম-ঠিকানা জানাবেন।

শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী, বাটানগর, ২৪ পরগণা।

উত্তর : প্রামাণ্য গ্রন্থটির নাম হিসটি অব রাজবংশীজ - লেখক ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রশ্ন : আমি যদি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে চাই তাহলে গ্র্যাজুয়েট কি ওখান থেকে হতে হবে - না অন্য ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হলেও চলবে।

মধুশ্রী চক্রবর্তী, বর্ধমান।

উত্তর : না, সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে মাইগ্রেশন নিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন।

প্রশ্ন : ভারত কপিলদেবের নেতৃত্বে প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ জিতল। ওটি চার বৎসরের জন্য ভারতে থাকার কথা, কিন্তু তা না থেকে ওটি ইংল্যান্ডে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হল কেন, এরকম কিছু আইন আছে নাকি।

অমলেন্দু ভট্টাচার্য, অভয়নগর আগরতলা।

উত্তর : প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ ট্রফির ইতিহাসে এমন কোন আইন নেই, যাতে বিজয়ী দেশ চার বৎসরের জন্য ঐ ট্রফি রাখতে পারে। গতবারের বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অবশ্য চার বৎসরের জন্য রেখেছিল। অনিবার্য কারণে এবার প্রতিযোগিতার শেষে ঐ ট্রফি তিন সপ্তাহের জন্য ভারতে আনবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরে ঐ সময়সীমা বাড়িয়ে দুমাস করা হয়।

প্রশ্ন : আমি সরকারি চাকরি করি। চাকরির খাতায় নাম হচ্ছে Miss Sabi Das. আমি কোর্টে এফিডেভিট করে Miss Sabita Das হয়েছি। সরকারি কর্মকর্তারা, জানিয়েছেন একটি হিন্দি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে তিন কপি জমা দিলে নাম পরিবর্তন হবে। দয়া করে কলকাতার হিন্দি দৈনিক বিশ্বামিত্রের ঠিকানাটা জানাবেন।

সবিতা দাস, কাছাড়, আসাম।

উত্তর : দৈনিক বিশ্বামিত্র, ৭৪, লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩।

প্রশ্ন : আমি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওলড কোরসে বি এ পারট টু পরীক্ষা দিয়ে দুটি বিষয়ে Back পেয়েছি। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওলড কোরসের শেষ পরীক্ষা। এমতাবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় কী জানালে বাধিত হব।

অলকা ঘোষ, বর্ধমান।

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওলড কোরসের বিষয় পরিবর্তন না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ বছরের নতুন ডিগ্রির পাঠক্রমে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়া যাবে। এবং বিষয় পরিবর্তন করলে প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে হবে।

প্রশ্ন : Licentiate Mechanical Engineering পাশ করার পর ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় কনডেনসড বি ই পড়বার সুযোগ রয়েছে। উক্ত কলেজগুলির নাম ও ঠিকানা জানাবেন।

মৃণাল দাস, জলপাইগুড়ি।

উত্তর : কয়েকটি কলেজের নাম ও ঠিকানা জানাচ্ছি।

১। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৩২।
২। ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্‌জিনিয়ারিং, এম এস ইউনিভারসিটি, বরোদা, এম পি।
৩। এল ডি কলেজ অব ইন্‌জিনিয়ারিং, আমেদাবাদ, গুজরাট।
৪। নাগার্জুন সাগর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ, হায়দরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ।
৫। গভঃ কলেজ অব টেকনোলজি কোয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালে H.S. পাশ করি। এখন Postal Correspondence Course এ B Com পড়তে চাই। সাধারণ কলেজগুলির সঙ্গে এইসব প্রাইভেট কলেজগুলির Degree র কোন পার্থক্য আছে কি।

অনিমেষ ধর, চকবাজার, পুরুলিয়া।

উত্তর : কোন Private College ঐরূপ Degree দিতে পারে না। এবং Postal Correspondence এ B Com পড়া যায় না। প্রাইভেট কলেজগুলি কেবল কোচিং করতে পারে। ▢

উত্তর দিয়েছেন :
সোমনাথ মিত্র

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেশে দেশে — ৭

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমে দেরি করে সূর্য ওঠে। তাই ভোর ছটার সময় আথেনসে মনে হচ্ছিল বুঝি মধ্যরাত। হোটেলের জানালা দিয়ে দেখলাম আলো জ্বালিয়ে অজস্র গাড়ির সার চলেছে। বাসও চলতে শুরু করেছে এবং রীতিমত ভিড়। অন্যান্য ইওরোপীয় শহরের মত গ্রীসেও এখন প্রচুর মোটর গাড়ি।

গত চার বছরে আরও এক লক্ষ প্রাইভেট গাড়ি যোগ হয়েছে। গতকাল রাতে ভোজসভায় শ্রীমতী ভোভিদেস বলছিলেন : আমাদের গ্রীসের নব্য তরুণ তরুণীর কাছে মোটর গাড়ি চলমান জীবনের প্রতীক। তাই তাদের সব কিছু স্বপ্নকে জড়িয়ে থাকে গাড়ি। শুধু গ্রীস কেন, আধুনিক পৃথিবীর একটিমাত্র মন্ত্র মোবিলিটি — গতিশীলতা। জীবন এখন স্থাণু, নিশ্চল পর্বতের মত নয়। পর্বত এখন বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। গ্রীসে তো পশ্চিমী ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থা।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলাণ্ড প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দেখেছি মানুষের সমস্ত সঞ্চয়ের মূল লক্ষ্য একটি গাড়ি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া গাড়ির রাজ্যে এখন জাপানিদের প্রাধান্য — টয়োটা, সুজুকি, হনডা — সারা দুনিয়া জুড়ে তাদের আধিপত্য। ভারতবর্ষ কনজিউমার দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন সারা দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। ভারতে তৈরি ইনজিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিকসের জিনিসপত্র গর্ব করে লোককে দেখান যায়, একমাত্র ভারতীয় মোটর গাড়ি ছাড়া। বিদেশে গিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ভারতের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য যেটা চোখে পড়ে সেটা হল পরিচ্ছন্নতা আর মোটর গাড়ি। নতুন নতুন ঝকঝকে গাড়ি রাস্তার চেহারাই পালটে দেয়। সে জায়গায় ভারতীয় অ্যামবাসাডর, ফিয়াট দেখে মনে হয় সত্যিই কত পিছিয়ে আছি আমরা।

আথেনসে মোটর গাড়ির সংখ্যার তুলনায় অধিকাংশ রাস্তা সরু সরু। তাই ট্রাফিক জ্যাম স্বাভাবিক ঘটনা। তবে একটা সুবিধে ফুটপাথ জুড়ে হকার নেই। লোকজন ফুটপাথ দিয়েই হাঁটে। যেখান সেখান থেকে রাস্তা পার হয় না। এক এক সময় ভাবি, ইওরোপের জলবায়ুর এমন কী গুণ আছে, সেখানে জনসাধারণ আজন্ম এত শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়, একটা মোটামুটি নাগরিক আচরণবিধি মেনে চলে। গ্রীস তো বড়লোক দেশও নয়। বাইশ বছর আগেও তো

দেখেছি, তখন তারা আমার পরিচিত ছিল। কিন্তু সুন্দরতম নাগরিক সচেতনতার অভাব কোথাও দেখিনি। রাস্তায় নেমে গাড়ি অবরোধ করে ডোনটকেয়ার ভাব নিয়ে হাঁটা। যেখান সেখান থেকে রাস্তা পার হওয়া, গুঁতোগুঁতি করে বাসে ওঠা, রাস্তায় নোংরা ফেলা, পথের ধারে দাঁড়িয়ে পাঁচ আইন ভাঙা এসব ইওরোপে অচিন্তনীয়। আমাদের ন্যূনতম সৌন্দর্যবোধও নেই। শালীনতাবোধ তো নয়ই।

কিছুকাল আগে পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর একটি জোক মনে পড়ল। তিনি এটি একটি সভায় প্রকাশ্যে বলে হাসিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য আমাদের কারও লজ্জা হয়নি। সি এম ডি এ-র কাজকর্ম দেখতে নরওয়ে না কোথা থেকে এক সরকারি হোমরাচোমরা সাহেব কলকাতায় এসেছেন। তাঁকে অফিসাররা কলকাতার সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর চলে যাবার সময় সি এম ডি এ-র বড়কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন : কেমন দেখলেন স্যার? সাহেব বললেন : খুব ভাল, খুব ভাল। তবে তোমাদের একটা বড় বদ অভ্যেস বাপু। রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দাও। এ জিনিস আমাদের দেশে কল্পনাও করা যায় না।

সি এম ডি এ-র বড় সাহেব এরপর রিটারন ভিজিটে গেছেন ওসলোতে। ওই সাহেব (যিনি কলকাতায় এসেছিলেন) তাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাদের শহর খুবই ভাল। তবে কিনা, আপনাদের এখানেও অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপকম্মো করে। নরওয়েজিয়ান সাহেব তো রেগে কাঁই। কী বলছেন মশাই? কখখনো না। হতেই পারে না। সি এম ডি এ-র সাহেব একটু হেসে বললেন ওই দেখুন, বিশ্বাস না হয়। নরওয়ের সাহেব তাকিয়ে দেখেন রাস্তার ওপারে একটি বাড়ির দেওয়ালের দিকে ফিরে এক ভদ্রলোক পাঁচ আইন ভাঙতে যাচ্ছেন।

নরওয়ের সাহেব রেগে-মেগে সেই লোকটার কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে ফিরে এসে সি এম ডি এ-র সাহেবকে বললেন : মাপ করবেন, ওঁকে কিছু বলা যাবে না। উনি ইনডিয়ান অ্যামবাসাডর।

এই জোকটা খুব গৌরবের নয় বরং বেশ অস্বস্তিকর। তবু একজন মন্ত্রী প্রকাশ্যে শুনিয়েছিলেন বলে কোট করছি। তবে এই নির্মম সত্যটি আমাদের সকলের বুকে তীরের ফলার মত বেঁধা দরকার। আমরা যে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতি, মহেঞ্জো-[illegible] সাজানো নিয়েছিল, আমরা বিবেকানন্দ, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের বংশধর, আমাদের সব কিছু ভাল, এই সংকীর্ণ কূপমণ্ডূক চিন্তাধারার অবসান দরকার। আমাদের সামাজিক জীবনে আর একটু রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও শৃংখলাবোধের জন্ম দিতে অর্থব্যয়ের দরকার হয় না। আমি ওয়ারশর রাস্তায় দেখেছি, রাত দশটা – রাস্তায় ট্রাফিক নেই, বললেই চলে। অটোমেটিক ট্রাফিক লাইটের সামনে পথচারী পারাপারের জায়গায় পথচারীরা দাঁড়িয়ে আছেন কখন সবুজ আলো লাল হবে, তাঁরা পার হবেন। সবুজ আলো থাকা অবস্থায় তাঁরা পার হতে পারতেন, কেউ দেখত না, কিন্তু ডিসিপ্লিন মজ্জাগত। নাগরিক চেতনা ধমনীর রক্তধারায় স্পন্দিত। কাজেই আইন ভাঙা সেখানে আত্মপ্রবঞ্চনারই সমতুল। পোলানড না হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উন্নত সমাজব্যবস্থা তাদের অমন করে তৈরি করেছে। কিন্তু গ্রীস – সে তো এক দীর্ঘকালের পরাধীন জাতি। নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া জাতি। সেখানে জাতীয় জীবনে ন্যূনতম শৃংখলা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হল কী ভাবে?

একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। গ্রীক ভাষায় কালিমেরা শব্দের অর্থ সুপ্রভাত। রেস্তোরাঁয় গিয়ে 'সোমি' (পাউরুটি) 'আভঘো' (ডিম) আর 'সেই' (চা) খেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম।

প্রেসরুমে সেদিনের সব কাগজই এসেছে। সকালবেলা মোট পাঁচটি খবরের কাগজ বার হয়। অ্যাক্রোপলিস (২৫,৩৩৮), রিজোসপাসতিস (২৪,৯৪১), কাথিমেরিনি (১৮,৪৮৮), ইলেফথেরি নমি (১১,২৭৮) ও স্যাভগি (৫,৪৬৪)।

মজার কথা হল সকালের কাগজ বেশির ভাগ গ্রীকই পড়ে না। তারা শেষ রাতে শুয়ে আবার রাত থাকতেই উঠে কর্মক্ষেত্রে ছোটে। সকালে সময় কোথায়? সবাই কাগজ পড়ে অফিস থেকে ফিরে মৌজ করে। সেজন্য বিকেলের কাগজের প্রচার সংখ্যা অনেক বেশি। 'এথনোস' বলে বৈকালিক সংবাদপত্রের প্রচার ১,১৮.৭০২। তানিয়ার প্রচার ১,১২.৩৮৫। এর পর আপোগেভমাটিনি (৭৫,৪৪২), এলেফথেরোটিপিয়া (৪৫,৮১২), আক্রিয়ালি (৩৮,৭৪৮), এলেফথেরোস টাইপস (৩৩,১৫৩), মেসিমব্রিনি (১৬,৮৯৪), এসটিয়া (৬,১৪৬), এলেফথেরি ওরা (২,০৯৪)।

সকালের কাগজগুলিতে প্রথম পাতাতেই শ্রীমতী গান্ধীর গতকাল [illegible] ও [illegible] বিবরণ ছাপা হয়েছে।

প্রেসরুমে আমাদের ভারতীয় সাংবাদিকদের কাউকে দেখলাম না। পথে সারদাপ্রসাদকে দেখলাম। বললাম : আজ কারেন্ট প্রোগ্রাম দেখছি শ্রীমতী গান্ধী অজানা সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভে মালা দেবেন। সেই স্মৃতিস্তম্ভ কোনখানে?

উনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ওই তো দেখা যাচ্ছে। স্কোয়ারের ঠিক ওই পাশটাতে। আপনি হেঁটে চলে যান, অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে দেরি নেই। হোটেল থেকে আধ মিনিটের রাস্তা। কেনসটিটিউশন স্কোয়ারের একটি অংশে পারলামেনট ভবন। তার সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তার ওপরে পারলামেনটের গা ঘেঁষে অজানা সৈনিকদের স্মৃতিফলক। এই অনুষ্ঠানে কোন বাইরের লোককে আমন্ত্রণ জানান হয়নি। শুধু প্রেসের লোকদেরই পুলিশ করডনের ভেতর যেতে দেওয়া হল। শ্রীমতী গান্ধী তখুনি এসে পৌঁছলেন। সৈনিকেরা অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে। ব্যানডে দুদেশের জাতীয়সংগীত বাজান হল। তারপর দুজন সৈনিক এসে অলিভ গাছের পাতা দিয়ে তৈরি বিরাট মালাটি স্মৃতিস্তম্ভের ওপর রাখল। শ্রীমতী গান্ধী শুধু সেটি স্পর্শ করলেন। তারপর গারড অব অনার নিলেন। সংগে সংগে সেখানকার প্রোগ্রাম খতম। রাস্তার ওপারে কিছু পথচারী দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন অনুষ্ঠান দেখার জন্য। অনুষ্ঠান শেষ হতেই উঁকি মেরে দেখি প্রেসের বাস আসেনি। আমি ছাড়া প্রেসের কেউ নেইও সেখানে। সংগে সংগে কনভয় বেরিয়ে যাবে পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। প্রেস অ্যাটাসে নাথন বললেন, আমার গাড়িতে আসুন।

সকালবেলায় ব্যস্ত আথেনস শহর। সাইরেন বাজান সচকিত মোটর কেডের শোভাযাত্রা দেখে অনেকে দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তার দুপাশে। আমরা মিনিটখানেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। সিকিওরিটি সাতটির বেশি গাড়ি মোটর কেডের মধ্যে যেতে দেবে না। নাথন সাহেবের বোধহয় নবম বা দশম গাড়ি। তাই বিনা ট্রাফিকের ফাঁকা রাস্তা তার ভাগ্যে জুটল না।

তবু যখন পৌঁছলাম তখনও অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। ইউরোপ আমেরিকায় পুরসভা হল শহরের প্রশাসনের হর্তাকর্তাবিধাতা। মেয়রের সেখানে রাজসম্মান। আমেরিকা ও বৃটেনে সিটি হল প্রকৃতপক্ষে শহরের পয়লা নম্বরের প্রশাসন [illegible] শোনা গেল।

যে হলে শ্রীমতী গান্ধীকে সম্বর্ধনা জানান হল সেই হলটিই প্রকৃতপক্ষে কাউনসিলারদের মিটিং হল। হলটি খুবই ছোট। সাকুল্যে একশ লোকের বসার জন্য তৈরি। ভারতীয় প্রেস ও শ্রীমতী গান্ধীর সরকারি সংগীদের প্রত্যেকের নাম আসনে লেখা। শ্রীমতী গান্ধী আজ পরেছেন চওড়া পাড় রঙিন শাড়ি। মেরুন রঙের ব্লাউজ।

মেয়র গ্রীক ভাষায় ভাষণ দিলেন। একটি মেয়ে চমৎকার উচ্চারণে ইংরাজি ভাষান্তর পড়ে গেল। আমরা দুপুরের মধ্যেই ভাষণের ইংরাজি কপি পেয়ে গেলাম। মেয়রের ভাষণের অংশ ছিল বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ। তিনি বললেন : 'শান্তির দূত ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সভানেত্রী হিসাবে আপনাকে আমরা যোগ্য সম্মান দিতে চাই।

একজন বুদ্ধিজীবী, মানবতাবাদী ও মহান রাষ্ট্রনায়িকা যে আমাদের এই শহরে এসেছেন তাতে আমরা গভীরভাবে অভিভূত। এখন থেকে তাঁকে আমরা নিজের বলে মনে করব। আপনার মধ্যেকার সেই নারী নেতৃত্বকে আমরা সালাম জানাই, যে নেতৃত্ব নরনারীর মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য এনে দিয়েছে। আপনার চরিত্রের কতগুলি অসাধারণ গুণাবলি এই তথ্যই প্রমাণ করে যে গত পনের বছর ধরে ভারতবাসী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনাকেই নেত্রীপদে বরণ করেছে।'

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল মেয়র ডিমিট্রিওস বেইসের বক্তৃতায় শোনা গেল প্রকারান্তরে গ্রীসের ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিমত। তিনি বললেন, যারা দুনিয়ায় আজ বলশালী তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মত্ত। শুধু তাই নয়, অন্যকেও তারা দলে টানার চেষ্টা করছে।

সমাজতান্ত্রিক সরকারের আমলে গ্রীসের পররাষ্ট্রনীতি আজ একটা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। নীতিগতভাবে তারা ন্যাটো বা অন্য কোন পশ্চিমী জোটে থাকার বিরুদ্ধে। অথচ প্রতিবেশী রাষ্ট্র তুরস্কের আগ্রাসী নীতি তাদের জোটে থাকতে বাধ্য করছে। অথচ মজার কথা তুরস্কও এই ন্যাটোর সদস্য। এই দুই পরস্পর শত্রু রাষ্ট্রকে আমেরিকা এখনও ল্যাজে খেলিয়ে যাচ্ছে। সাইপ্রাস আক্রমণ করে দেশটাকে টুকরো করে তুরকি সাইপ্রইটদের জোর করে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করাটা একটা আন্তর্জাতিক দস্যুতা ছাড়া কিছু নয়। অথচ সারা পৃথিবীতেই এখন জোর যার মুল্লুক তার নীতি চলছে।

(চলবে)

সঞ্চয়িতার টাকা কবে ফেরত পাওয়া যাবে তা কেউ জানে না

শ্যামল বসু

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত সঞ্চয়িতা কমিশনার এন সি দত্ত সম্প্রতি (বুধবার ২৩ নভেম্বর) এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, টাকা যে কবে পাওয়া যাবে তা বলা সম্ভব নয়। এ মুহূর্তে তাঁর কাছে কেবল মাত্র ৫৮ লক্ষ টাকা আছে। আর বেশ কিছু সম্পত্তি যেমন ফ্ল্যাট সিনেমা, হল, অ্যামবাসাডার গাড়ি। সঞ্চয়িতার অংশীদারদের বেনামা বলে সঞ্চয়িতা কমিশনার দখল চাইলেও আইনের কারণেই পুরো দখল পাওয়া যায়নি। দত্ত জানান, এ বিষয়ে তিনি কলকাতা হাই কোর্টের একটি বিশেষ 'সেল' তৈরি করার জন্যও অনুরোধ করেছেন - যাতে বেনামা সম্পত্তির ফয়সলা দ্রুত করা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বিশেষ সেল কার্যকরী করা যায়নি। এর ফলে প্রায় দেড় কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান পেলেও সঞ্চয়িতা কমিশনারের কিছু করার নেই। যা পাওয়া যাচ্ছে বা সন্ধান আছে সেগুলো উদ্ধার করলেও সঞ্চয়িতার ডিপোজিটরদের টাকার কোন অংশ অদূর ভবিষ্যতে ফেরত পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও কেবল মাত্র টাকার দাবি কাগজ কলমে নথিভুক্ত করার জন্যই কমিশনার অব সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্ট, ৩৪এ ও বি, শশিভূষণ দে স্ট্রিট (চারতলা) কলকাতা - ঠিকানায় যে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে হলফনামা নিয়ে ডিপোজিট সারটিফিকেট-এর জেরকস কপির সংগে সাধারণ কাগজে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, পিতার নাম ও স্বামীর নাম, আমানতের পরিমাণ, আমানতের জন্য টাকা জমা দেবার তারিখ এবং ধরন (নগদ/চেক), যদি কোন এজেন্ট বা সাব এজেন্ট এর নাম জানা থাকে সেই নাম, আমানতকারীর উত্তরাধিকারী যদি কেউ থাকেন তাঁর ঠিকানা, আমানতকারী যদি কোন টাকা (আংশিক পেমেন্ট) নিয়ে থাকেন তার বিবরণ এবং আমানতকারীর যদি কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে তার নম্বর ও ঠিকানা সমেত আগামী ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৪-র মধ্যে রেজিস্টারড উইথ এ/ডি করে পাঠাতে হবে।

শ্রী দত্ত জানান, এর জন্য সঞ্চয়িতার লগ্নীকারীদের আবার কিছু টাকা খরচ হবে ঠিকই তবে এ থেকে তাঁদের দাবি নথিভুক্ত হয়ে যাবে। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হলফনামার কারণ হিসেবে শ্রীদত্ত বলেন যে এর ফলে অন্তত কিছুটা জাল আবেদনকারীর সংখ্যা আটকানো যাবে। প্রসংগত শ্রীদত্ত জানান সঞ্চয়িতার মালিকদের কাছে অব্যবহৃত ছাপান সারটিফিকেট থাকতে পারে, সেগুলি এক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করতে পারেন, সেজন্যই হলফনামার ব্যবস্থা।

শ্রী দত্ত জানান, ব্যক্তিগতভাবে কোন আমানতকারী যেন তার সংগে অফিসে যোগাযোগ না করেন তাতে কোন কাজ হবার সম্ভাবনা নেই।

শ্রী দত্ত প্রসংগত জানান, রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত তার জন্য কোন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেননি আর যে সব সম্পত্তির তারা দখল নিতে চান সেসব ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে যে রাজ্য সরকার নিজেই ঐ সব সম্পত্তির জন্য যেমন সিনেমা হলের ক্ষেত্রে প্রমোদকর ইত্যাদির দাবিদার। ফলে কিছু করতে হলে রাজ্য সরকারের যথেষ্ট সহযোগিতা চাই। বেনামা সম্পত্তির খবর শ্রী দত্ত পাচ্ছেন কিন্তু কতটা তার মধ্যে দখলে আনা সম্ভব সে নিয়েই ভেবে দেখা হচ্ছে। শ্রীদত্ত জানান, সঠিক কত লোক কত টাকা ডিপোজিট রেখে ছিলেন সে রকম কোন হিসেবও ওঁর কাছে নেই। তাই যা পাওয়া গিয়েছে আর গ্রাহক বা আমানতকারীদের সংখ্যা পাওয়ার পরই কীভাবে কি করা যায় তাই ভেবে দেখা হবে। এই মুহূর্তে তাই আমানতকারীদের আশ্বস্ত করার মত আমার কাছে কিছুই নেই।

রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র গত ২৫ নভেম্বর মহাকরণে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রী দত্তের আমানতের পরিমাণ ও আমানতকারীর সংখ্যা না পাওয়ার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন রাজ্য সরকার ১৩০ কোটি টাকা ডিপোজিটের তথ্য যোগাড় করে দিয়েছিলেন। আর বেনামা সম্পত্তি দখলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি ১৯৮৪-৮৫ সালের মহীশূরের রাজ্যের একটি আইন প্রণয়নের জন্য বলেছেন। তখন মহীশূর রাজ্যে জনৈক গোপাল রাও এ জাতীয় ব্যবসা করতেন। সি পি আই (এম) মন্ত্রী ঐ দেশীয় রাজ্যের আইনকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। আইনটি কী তা তিনি বলেন নি। □

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

...শিল্পীরা অনেকেই দর্শকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না। কেউ কেউ সূক্ষ্ম রসের হাসির গল্প বলে দর্শক হাসাতে পারলেন না আবার হালকা চটুলতা দিয়ে কেউ বাজার মাত করলেন। একজন নামী কমেডিয়ান তো জাতীয় সংগীত নিয়েও নির্লজ্জ রসিকতা করলেন যা শুনে মাথা হেঁট হয়ে যায়। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণাও সরস হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রদীপ ঘোষ ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। অনুষ্ঠান পরিচালনায় মধ্যে অগোছালো ভাব ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মনে হল জানেনই না এটা কী জাতীয় অনুষ্ঠান। হিমানীশ গোস্বামীর গল্প পাঠের সময় একজন দর্শক বলে উঠলেন, কিছুই বুঝলাম না। উনি রাগ করে উঠে যেতে তারাপদ রায় নাটকীয়ভাবে মঞ্চে উঠে এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন। চণ্ডী লাহিড়ী গল্প শোনালেন, গল্পের মজা কেউ ধরতে পারলেন না। পার্থ চট্টোপাধ্যায় পড়লেন রম্যরচনা। ঘোষিকা বলে গেলেন উনি 'পরিবর্তন'-এর সম্পাদক, যেন এ ছাড়া ওঁর অন্য পরিচয় নেই। সভাপতি ছিলেন অমিতাভ চৌধুরী। শ্রান্ত হয়ে তিনি স্টেজ ছেড়ে দর্শকদের আসনেই বসে থাকেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা লেখক প্রিয়দর্শী। তিনি মঞ্চের সবাইকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'প্রিয়দর্শীর নগর দর্শন' বইটি উপহার দেন।

উদ্বিগ্ন সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা নিয়ে ইদানিং বেশ আলোচনা হচ্ছে। কলকাতা থেকে দূরে বহরমপুরে 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার তরফ থেকে এমন এক আলোচনা হয়ে গেল। এই আলোচনায় গল্প পাঠ করলেন মিহির আচার্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বললেন সমাজ সাহিত্য ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে। ব্যাঙ্গালোরের সংগঠন 'মাধ্যম' কলকাতায় আর একটি আলোচনার আয়োজন করেন। বিষয় ছিল উদ্বিগ্ন সাংবাদিকতা। আলোচনায় ছিলেন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। সভাপতি ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ। □ বিশেষ প্রতিনিধি

কবিতার বই

অনুষ্ঠান করে বই প্রকাশ করা এখন এক রীতিবদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই খবর আসছে অমুক লেখক বা অমুক কবির বই এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এটা একটা ভাল লক্ষণ। কারণ এ ধরনের অনুষ্ঠান যত হয় ততই বই নিয়ে আলোচনা বাড়ে।

নির্মলেন্দু ঘোষালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেবী আসছেন' প্রকাশিত হল। সাংবাদিকতার ছাত্র এই সুবাদে দ্বারভাঙা হলে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার। ঋত্বিক মিত্র কবির একটি কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেছিলেন, যার নাম 'শব্দের সময়'।

হাসির গল্প পাঠ

ইদানিং ভূতের গল্প পাঠ, হাসির গল্পের আসর ইত্যাদি অনুষ্ঠান জনসাধারণ টিকিট কেটে দেখতে যাচ্ছেন। 'প্রমা'র পরিচালনায় রবীন্দ্র সদনে অনাবিল হাসির আসরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ দেখে খুব উৎসাহিত হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আমন্ত্রিত

পশু-চর্বি নিয়ে বিরোধী রাজনীতির এই উত্তেজনা কতদূর গড়াবে?

শ্যামল বসু

সালটা ছিল ১৮৫৭। সিপাহি বিদ্রোহের সাল হিসাবে পরিচিত। ভারতের মুক্তিচিন্তার সম্ভবত প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহের সাল। কলকাতার মহাকরণের সামনে সেদিনের বিদ্রোহের নায়ক মংগল পাড়ের স্মৃতিফলক আজও সে ঘটনাকে স্মরণ করাচ্ছে। সিপাহি বিদ্রোহের সূত্র-ঘটনা ছিল গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে বন্দুকের টোটা তৈরির অভিযোগ। আজ ১৯৮৩ সালে পটভূমিকা সম্পূর্ণ পালটিয়ে গিয়েছে। মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশি। মিল কেবল একটাতেই, তা হল ভারতের জীবনযাত্রায় পশুর চর্বি আবার সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এবার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের আমদানি নীতি অনুযায়ী ভারতে বিদেশ থেকে পশুচর্বি আনা হয়েছে। এবং এই চর্বি বেশ কিছু বনস্পতির মধ্যে মেশান হয়েছে। পশুর চর্বি ভারতে আমদানি চালু হয় ষাটের দশকে। ১৯৬৯ সালে এইটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের মারফৎ সরাসরি ব্যবহারকারী ক্রেতার জন্য আনা হয়। এটি সাবান শিল্প ও বিভিন্ন রকম ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগে। বর্তমান ঘটনার শুরু হয় বোমবাই কাসটমস ও জৈন শুদ্ধ বনস্পতি'র প্রস্তুতকারক বিনোদ-কুমার জৈনের বিবাদ থেকে। বিনোদ জৈন ৬৭০০ টন গরুর চর্বি এদেশে আনান। বোম্বাই কাসটমস এই চর্বি আনার জন্য ১.০৯ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করেন। শ্রীজৈন এছাড়া আরো ২৫000 টন গরুর চর্বি আনার জন্য বিদেশে নির্দেশ দেন। এই বিপুল পরিমাণ গরুর চর্বি দিয়ে তিনি তাঁর জৈন 'শুদ্ধ' বনস্পতি তৈরি করছেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বিহারের কয়েকজন বনস্পতি প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধেও এই চর্বি ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সরাসরি চর্বি না বলে ইংরাজিতে এটি 'ট্যালো' নামে পরিচিত। আমদানির জন্য এদেশে কেবল ভেড়ার চর্বি থেকে প্রস্তুত ট্যালোর ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া হত। সাধারণভাবে এটি অ্যানিম্যাল ট্যালো। সাবান ছাড়া, ফ্যাটি অ্যাসিড, মোমবাতি এবং গ্রিজ তৈরি করতে এই ট্যালোর প্রয়োজন হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে এই ট্যালোর আমদানির ওপর বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল। সাবান প্রস্তুতকারকরা বিদেশে মোট রপ্তানি করা সাবানের দামের শতকরা ২০ ভাগ টাকার বিনিময়ে এই ট্যালো আমদানি করতে পারতেন। অসট্রেলিয়া ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই ভারতে ট্যালো আমদানি করা হয়। সাবান, মোমবাতি, গ্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে যে ট্যালো ব্যবহার করা হয় সেগুলি ভোজ্য নয়। কিন্তু রপ্তানিকারক দেশগুলিতে বর্তমানে উন্নত মানের ভোজ্য তেল হিসেবে ট্যালোর ব্যবহারও দেখা যায়। এক্ষেত্রে ট্যালো সোয়াবিনের ট্যালো বলে পরিচিত। সম্প্রতি সরকার সমর্থিত সূত্র থেকে জানা যায় যে পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে রান্নার তেল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে দুটি ক্ষেত্রে বনস্পতির মধ্যে এই ট্যালো মেশান হয়েছে, অন্য তিনটি ক্ষেত্রে অন্য রান্নার তেলে এই ভোজ্য ট্যালো মেশান হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বনস্পতি প্রস্তুতকারকদের মতে এই ট্যালো বাজারে যে ঘি পাওয়া যায় তার সংগেও মেশান সম্ভব। ঘি এর গন্ধের জন্য ট্যালো মেশানর সুবিধা অনেক বেশি।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও সরবরাহ-দপ্তরের মন্ত্রী ভগবৎ ঝা আজাদের বক্তব্য অনুযায়ী পাঞ্জাব সরকার ৫0টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৪0৫টি বিভিন্ন রকম বনস্পতি ও ভোজ্য তেলের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করে ট্যালো ভেজালের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এর ভেতর গাজিয়াবাদ অঞ্চলের প্রস্তুতকারক জৈন শুদ্ধ বনস্পতি কোমপানির 'পিপুল' মারকা বনস্পতি অন্যতম। এছাড়া

বনস্পতিতে পশুচর্বির ভেজাল [illegible]

বনস্পতির প্রচলন ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই শুরু হয়েছিল। সালটা সম্ভবত ১৯১৯ কিংবা তার পর হবে। সে সময়ে বনস্পতি তৈরি হত বাদাম তেল থেকে। বাদাম তেলকে হাইড্রোজেনেট করে অর্থাৎ হাইড্রোজেন যুক্ত করেই বনস্পতি ঘি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

বর্তমানে বাদাম তেলের ব্যবহারের চেয়েও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেল যেমন পাম তেল, তিল তেল, সয়াবিনের তেল, রাইস ব্রেন তেল অর্থাৎ ধানের তুষের তেল, সূর্যমুখীর তেল, রেপসিড তেল ইত্যাদি [illegible] করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাম তেল ব্যবহার করতে হলে আমদানির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। একটা ব্যাপার হল এই যে, যদি কোনও সময় পাম তেলের সঙ্গে পশুর চর্বির মেশান হয় তবে বনস্পতিতে চর্বির উপস্থিতি সনাক্ত করা খুব একটা সহজ হয় না।

ভারতে প্রায় একানব্বইটি বনস্পতি ইনডাস্ট্রি বা শিল্পসংস্থা আছে। [illegible]

পারেন। কারণ পশুর চর্বির দাম উদ্ভিজ্জ ভোজ্য তেলের চেয়ে অনেক কম।

অপর কারণ হল এই যে, [illegible] বনস্পতি প্রস্তুতে পশুচর্বির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে [illegible]

ভাতিন্ডা বনস্পতি অ্যান্ড কেমি-ক্যাল মিলস-এর মালিক জনৈক নরেন্দ্রনাথ মিত্তালের সন্ধান পাওয়া যায়। মিত্তালের কোন বনস্পতি তৈরির লাইসেনস নেই। ইনি সাবান তৈরি করেন। মিত্তাল জৈন শুধু বনস্পতি কোমপানির কাছ থেকে ট্যালো কিনেছেন বলে জানিয়েছেন।

এছাড়া রাঁচীর রাজ ট্রেডিং কোমপানির কাছ থেকে ২৮৩ টিন বিফ ট্যালো বনস্পতি হিসেবে প্যাকড করা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বিহার পুলিশ এ বিষয়ে জড়িত থাকার জন্য তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আরো ৩০০ টিনের মত বিফ ট্যালো জেটমল সতানারায়ণ নামে একটি ফারম থেকে পাওয়া যায়। এগুলি 'সানফ্লাওয়ার' মারকা ভোজ্য তেলের টিনের মধ্যে ছিল।

সরকারি সূত্রে জানা যায় যে কোন ভোজ্য তেল বা বনস্পতির মধ্যে অ্যানিম্যাল ট্যালো মেশান আছে কিনা তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পদ্ধতি হল 'গ্যাস লিকুইড ক্রোমো-গ্রাফ'। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ ডাইরেকটরেট অব বনস্পতি এই পরীক্ষা চালান কেবল বনস্পতি উৎপাদক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে। অন্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাজারের দোকানে যদি ভেজাল মেশান হয় তবে এই দপ্তরের কিছু করার এক্তিয়ার নেই।

ভারত-মারকিন চুক্তি অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকে ও ষাটের দশকে ভারতে দু ধরনের ট্যালো আমদানি করা হত। তার মধ্যে একটি ছিল ভোজ্য জাতীয়। ভোজ্য জাতীয় ট্যালোর নাম সোয়াবিন ট্যালো। আর অ-ভোজ্য ট্যালোর নাম অ্যানি-ম্যাল ট্যালো। ভোজ্য ট্যালো ভারতে আনত বনস্পতি উৎপাদক সংস্থার জন্য। আর অ-ভোজ্য ট্যালো সাবান ইত্যাদি শিল্পের জন্য। ১৯৬৭-৬৮ সালে সাবান উৎপাদনেও উৎসাহ দেবার জন্য সাবান উৎপাদক সংস্থা যে পরিমাণ সাবান বিদেশে রপ্তানি করবেন তার মোট দামের শতকরা ২০ ভাগ দিয়ে তিনি তার ব্যবহারের প্রয়োজনে অ-ভোজ্য ট্যালো বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারবেন বলে নীতি ঠিক করা হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে কেবল স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের মাধ্যমেই বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত আমদানি কারক সংস্থা আমদানি করতে পারত। এই বিধিনিষেধ জনতা সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে শিথিল করে দিলেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ট্যালোর আমদানি ওপেন জেনারেল লাইসেনসের মাধ্যমে করা শুরু হল। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০-র মধ্যে ভারতে ট্যালোর আমদানি বাড়তে থাকে। ১৯৮১-৮৩ সালে ৩.৮৩ লাখ মেট্রিক টন ট্যালো ভারতে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে দু লাখ টন ট্যালো ব্যবসায়িক সংস্থা-গুলি সরাসরি নিয়ে আসে, আর বাকিটা সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন (STC) সংস্থার মাধ্যমে আসে।

গত ২৪ আগস্ট থেকে ভারতে বিফ, বাফালো, পিগ ট্যালো কোন প্রয়োজনেই আনা চলবে না বলে বিধি আরোপ করা হয়। এর পর ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩তে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জানান ১ অকটোবর ১৯৮৩ থেকে কোনরকম ট্যালোই ভারতে আনা চলবে না। সরকারি সূত্র থেকে জানা যায় এখন আর কোন বনস্পতি বা ভোজ্য তেলে ট্যালো মেশান নেই। এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে ট্যালো কেলেঙ্কারির প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি।

এখান ট্যালো কেলেঙ্কারির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। বিরাট দেশ ভারত। এখানে রয়েছে নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ। নানা রকম তাঁদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য গ্রহণের ঐতিহ্য ফলে ভোজ্য তেলে ভেজাল মেশান নিয়ে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবে জাতপাতের রাজনীতির কথা তো অজানা নয়। এই ট্যালো কেলেঙ্কারির প্রভাব যে উত্তর ভারতের রাজনীতিকে প্রভা-বিত করবে না এমন কথা ভাবা যায় না। লোকসভা রাজ্যসভাতেও এই ট্যালো নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আসর গরম করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে সংসদের উভয় কক্ষের উত্তর ভারতের প্রতিনিধিরা খুবই সোচ্চার হয়েছেন। ইতোমধ্যে ট্যালো কেলেঙ্কারির অন্যতম নায়ক বিনোদকুমার জৈন নিজেকে ভারতের রাষ্ট্রপতির বন্ধু বলে চিহ্নিত করে-ছেন। রাজ্যসভা ও লোকসভার বিরোধী সদস্যরা এটিকেও তাঁদের বক্তৃতায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়নি যে এটি মূলত জনতা আমলের আমদানি-নীতির মাশুল। দ্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে সেই ব্যব সায়ীরা যারা অসাধুতা করেছেন তারা তাদের সব বনস্পতি বা ভোজ্য তেল বাজারে বিক্রি করে নিজেদের মুনাফা ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছেন। আজকের এই উত্তেজনা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারলেও যা ঘটে গিয়েছে তাকে আর খণ্ডন করতে পারবে না।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন বর্তমান পটভূমিকায় যদি নির্বাচন আসে তার জন্যই বিরোধী দলগুলি বিশেষ করে বাবু জগজীবন রাম, এল কে আদবানীর মত প্রবীণ নেতারা বিষয়টিকে কাজে লাগাতে চান।

সাধারণ মানুষের ধম বিষয়ে যে স্পর্শকাতর মানসিকতা আছে তাকে নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক পট-ভূমিকা কিছুটা উত্তাল করা যেতে পারে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। শিক্ষিত মানুষ সমস্যাটা যেভাবে বুঝবার সুযোগ পাবেন তার ফলে যেমন জনতা সরকারের রাজনৈতিক চাল প্রকাশ পাবে, অন্য দিকে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের এই স্পর্শকাতর পর্বই আগামী রাজ-নৈতিক পটভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। প্রসঙ্গত এরই মধ্যে গত ২৫ নভেমবর পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে ভোজ্য তেল, সাবান প্রভৃতির দাম বাড়ানর জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অশোকবাবুর বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকা-রের সাম্প্রতিক আমদানি রীতির ফলেই পশ্চিমবাংলার বাজারে ভোজ্য তেলের দাম বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ট্যালো আমদানি যেমন বন্ধ করেছেন তেমন ভোজ্য তেল বেশি করে আমদানি করা। অশোক মিত্র আরো মন্তব্য করেন যে সরকার ট্যালো আমদানিকারকদের কাছ থেকে '৩০ কোটি টাকা নির্বাচন তহবিলে নিয়েছেন, তারা কি আর কিছু করবেন?' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় সর কারকে 'জোচ্চরের সরকার' বলেও চিহ্নিত করেন। □

ব্যাঙালোর টেপ আর পশুচর্বি নিয়ে বিতর্কেই বিরোধীদের দৈনাদশা প্রকাশ হয়ে পড়েছে

নয়া দিল্লি থেকে খগেন দে সরকার

সংসদের ভেতরে এবং বাইরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দল কংগ্রেস (ই)-র বিরোধিতা করার মত যদি সত্যিই কোন রাজনৈতিক দল থেকে থাকে তবে বলা যায় তারা অতি দ্রুত তাদের নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। এমনকি ইন্দিরা গান্ধী যতটুকু নির্ভরযোগ্যতা হারাচ্ছেন বলে তাদের বিশ্বাস তার চেয়েও তাদের নিজেদের এই অধঃপতন দ্রুততর। এ ব্যাপারে সম্প্রতিকালের তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যায়।

মূলত শিক্ষিত এবং খবরের কাগজ পড়ুয়া মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের কাছে নির্ভরযোগ্যতা হারানর প্রধান কারণ, খুব কম বিরোধী নেতারই তথ্যাদি পাওয়ার নিজস্ব উৎস আছে। কিছুটা পরিমাণে ব্যতিক্রম সম্ভবত ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি মন্তব্য থেকে একথা বোঝা যায় (যেমন মাননীয় দলাই লামা এবং তিব্বত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি)।

প্রয়াত জ্যোতির্ময় বসুর পর অনেক দিন কেটে গেছে। বহুদিনের পরিচয়ে আমি দেখেছি তথ্যাদি পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব একটা উৎস ছিল। এটা সত্যি, তথ্য এবং ঘটনাবলিই তাঁর কাছে এসে হাজির হত, তিনি সে সবের দিকে আগ বাড়িয়ে যেতেন না। ফলে সরকার এবং নানা মন্ত্রকের বিরুদ্ধে তাঁর আনীত অভিযোগগুলি অব্যর্থ-ভাবে প্রমাণ হয়ে যেত।

এখন কিন্তু বিরোধী নেতাদের তথ্যাদি পাওয়ার উৎস হচ্ছে দৈনিক এবং সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি। এসব পত্রপত্রিকায় খবরও কিছুটা অতিরঞ্জিত থাকে। এগুলির ওপর ভরসা করে অন্তত পারলামেনটে গলা ফাটান যায় না। তাঁদের আর একটি অস্ত্র হচ্ছে কাগজের কাছে অবিরত বিবৃতি দিয়ে যাওয়া। এমন কোন উৎস নেই যা দিয়ে তাঁরা নিজেদের সেই সব অভিযোগই আর একবার যাচাই করে দেখতে পারেন।

তিনটি ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক, যার ওপর বিরোধীরা এখন নির্ভর করে আছেন:

(১) গরু ও শুয়োরের চর্বি আমদানি : প্রকাশ, মাস দুই আগে পুলিশ একটি জায়গায় হানা দিয়ে জানতে পারে অখ্যাতনামা এক বনস্পতি প্রস্তুতকারক গরু-শুয়ো-রের চর্বি ভেজাল দিচ্ছে। ভারতের মত বিশাল একটি দেশে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার বাছবিচার খুব বেশি। ফলে এই ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের সপক্ষে বিশেষত উত্তর ভারতে বিক্ষোভ তৈরি হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্ঘাটিত তথ্যে জানা গেল জনতা সরকারই প্রথম পশুচর্বি আমদানির জন্য ঢালাও লাইসেনস দেয়। তার ফলে হাজার হাজার টন পশুচর্বি আমদানি হয়েছে। সাবান বা গ্রিজ তৈরিতেই তা কাজে লাগার কথা। কয়েকজন কিন্তু সেই সুযোগে বনস্পতিতেও তা মিশিয়ে দিতে থাকে। এ ব্যাপারে খ্যাতনামা বনস্পতি প্রস্তুতকারকদেরও কিছুই করার নেই।

সরকার কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরেছে এবং তা নিয়ে এখন আদালতে মামলা উঠেছে। ফলে বিরোধীরা এখন আর এ

[illegible]

(২) ব্যাঙ্গালোর টেপ : আয়ারাম গয়ারামের সেই সব দিন থেকেই কয়েকটি রাজ্যে অ্যাসেমব্লি মেম্বারদের টাকা খাইয়ে অন্য দলে ভিড়িয়ে আনা রাজনৈতিকভাবে এখন স্বাভাবিক ঘটনা, তা ভুলই হোক বা ঠিকই হোক। নভেম্বরের প্রথম দিকে কর্ণাটকের জনতা সহায়ক এম এল এ বৈরে গৌড়ে দাবি করেন, কর্নাটক বিধানসভার বিরোধী নেতা কংগেস (ই) সদস্য বীরাপ্পা মৈলির সংগে তাঁর কথাবার্তা টেপ করেছেন, যাতে মৈলি নাকি কংগ্রেস (ই)-তে চলে আসার জন্য গৌড়েকে ২ লাখ টাকা দিতে চান বলে বলা হচ্ছে। সংবাদপত্রের কাছে তিনি এই অভিযুক্ত টেপটি বাজিয়েও শুনিয়েছেন।

মৈলি এবং এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক সি এম স্টিফেন এর প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলছেন, টেপটি আজগুবি। ফলে বাদ প্রতিবাদে আবহাওয়া বেশ গরম। অবশ্য সেইটুকুই। কিন্তু প্রকাশিত কথাবার্তায় দেখা যাচ্ছে মৈলি কখনই গৌড়েকে টাকা দিতে চাননি, যদিও তাঁরা সম্ভাব্য দলত্যাগীদের নিয়েই কথাবার্তা বলেছেন। হঠাৎ (টেপের বক্তব্য যদি

[illegible]

[illegible] টাকার বিষয়ে কথা [illegible] করে দিয়েছেন। টাকা দেবার জন্য মৈলির কথার কোন উল্লেখ এতে নেই। টেপ রেকর্ডার ব্যবহারকারী মাত্রেই জানেন কী করে টেপের যে কোন বাক্য মুছে দিয়ে অন্য বাক্য সেখানে বসান যায়।

রাজনৈতিকভাবেও স্টিফেন দিল্লিতে অন্য একদিন যে কথা বলেছেন তা ঠিকই। তাঁর বক্তব্য, কর্নাটক বিধানসভায় হেগড়ের জনতা সরকারকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত করার যাবতীয় অধিকার বিরোধী কংগ্রেস (ই) দলের আছে। এই অধিকার সম্পর্কে কার আপত্তি আছে? ঘটনা দাঁড়াচ্ছে, হেগড়ে বিধানসভার ১৬ জন নির্দল সদস্যের ভোটের ওপর নির্ভর করেন (যাঁরা জনতা দলের সহযোগী সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন)। এঁরাই ভারতীয় জনতা পারটির সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। সহযোগী সদস্যরূপে পরিগণিত এই সব নির্দলীয়রা বেশ ভাল পদ পেয়েছেন এবং সরকারি নানা পর্ষদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এমন সব পদ টাকা এবং ক্ষমতা দুইই যোগাতে পারে। দলত্যাগের জন্য এটাই কি এক ধরনের ঘুষ নয়?

[illegible]

[illegible] ব্যাপারে কেন্দ্র একটা তদন্ত করুক। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁরই তো রাজ্য সরকারকে দিয়েই তদন্ত করানোর যাবতীয় অধিকার আছে। সেটা করছেন না কেন? জনতার ভাঁড়ারে অদ্ভুত কোন রহস্য থাকতে পারে এই ভয় সম্ভবত তিনিও যে করছেন তা এর থেকে পরিষ্কার। ফলে ব্যাপারটা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

(৩) ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী এবং জম্মুর বন্দুক কারখানা : স্পেন থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি নিয়ে জম্মুর কাছে এক বন্দুক কারখানায় সিংগল এবং ডবল ব্যারেল বন্দুক তৈরি হচ্ছে এই অভিযোগ পেয়ে পুলিশ হঠাৎ সেখানে হানা দেয়। ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী নাকি এর সংগে যুক্ত। সংসদের বিরোধীরা এ ব্যাপারে হৈ হট্টগোল শুরু করেন এবং সংসদ থেকে ওয়াক আউটও করেন। আবার বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খবরের কাগজে পত্রে মারাত্মক আক্রমণ চলে ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে। ব্রহ্মচারী নয়া দিল্লির এক প্রেস কনফারেন্সে শেষ পর্যন্ত বলেন, জম্মুর কারখানায় যে সব কাজ হচ্ছে তা পুরোপুরি আইনসম্মত। আবার চলে বাকযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি

[illegible]

[illegible] সেই বিরোধীরা কোন কিছু [illegible] করতে পারেননি। [illegible] ওয়াক আউট? কারণে [illegible] এতবার এই অস্ত্রটি প্রয়োগ [illegible] হয়েছে যে এখন এই [illegible] অস্ত্রের ধারই ক্ষয়ে গেছে। অন্য দিকে, কংগ্রেস (ই) বিচিত্র সহযোগী সমন্বয়ে তিনটি দল ভারতীয় জনতা পারটি, জনতা পারটি এবং লোকদলকে হেনস্তা করার জন্য খুব [illegible] সুযোগগুলো কাজে লাগাচ্ছে।

একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক পশুচর্বির ব্যাপার নিয়ে সংবাদপত্রে লিখতে গিয়ে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের (প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) সংগে এর তুলনা করেছেন। সে সময় বন্দুকের কার্তুজে গরু-শুয়োরের চর্বি মেশান হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এতে হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং বিদ্রোহে যোগ দেন। তিনি যদি ভেবে থাকেন এবারের পশুচর্বি সংক্রান্ত বিতর্কেও মঙ্গল পাঁড়ের মত কোন শহিদ জন্ম নেবেন তবে বর্তমান প্রতিবেদকের কৌতুক করা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকবে না। □

অয়েল অফ অ্যালমণ্ডস্
আপনার
ত্বকের পরিচর্যায় অদ্বিতীয়

emami
COLD CREAM
with
OIL OF ALMONDS

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর কলম

হোমিওচিকিৎসা

পেটব্যথার বিষয় আগে (পরিবর্তন, নভেমবর ২৩) আলোচনা করেছি। পেটে অনেক রকম কলিক পেন ওঠে। তার মধ্যে গলস্টোন কলিক অন্যতম। এবার কতকগুলি ওষুধের নাম জানাচ্ছি। এগুলি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে। গলস্টোনের জন্য যখন ব্যথা পেট থেকে শুরু হয়ে ডান দিক ধরে পিঠের যে পাখনা তার নিচের কোণের দিকে যায়, তখন চেলিডোনিয়াম (Chelidonium M) ৬.৩০ বা ২০০ শক্তির ব্যবহার করা যাবে। বেশি ব্যথা হলে কম শক্তির ওষুধ বেশিবার ব্যবহার করা উচিত। গলস্টোনের কারণে যখন সামনে ডানদিকে পাঁজরার নিচে লিভারের জায়গায় ব্যথা করে এবং সেই সংগে পিত্ত বমি হয় তখন কারডুয়াস মেরিনাস (Carduas Marianus) ৬.৩০ বা ২০০ শক্তির ব্যবহার করা দরকার। আবার এই ব্যথাই বুকের দিকে পাঁজরের নিচে লিভারের জায়গায়, যখন আস্তে চাপ দিলে ব্যথা লাগে কিন্তু বেশি চাপ দিলে লাগে, না বরং আরাম লাগে তখন চায়না (China) ৬.৩০ বা ২০০ শক্তির ব্যবহার করা যায়। আবার ব্যথা যখন লিভার থেকে পেটের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন বারবেরিস ভালগারিস (Berberis Vulgaris) ৬.৩০ বা ২০০ খাওয়ান দরকার। মনে রাখা উচিত, বেশি ব্যথা হলে কম শক্তির ওষুধ বার বার করে দেওয়া দরকার। এছাড়া লাইকোপোডিয়ামও (Lycopodium)ও একটা ভাল ওষুধ। যেসব ক্ষেত্রে রোগীর ব্যথা বিকেল চারটে থেকে রাত্রি আটটার মধ্যে বাড়ে সেসব জায়গায় লাইকোপোডিয়াম ৬.৩০ বা ২০০ শক্তি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে।

পেটব্যথার আরেক কারণ রেনাল কলিক (Renal Colic)। কিডনিতে পাথর হলে বা ইউরিটারের কারণে যদি পেটে ব্যথা হয় তাহলে দেখতে হবে ব্যথাটা কী রকম। যেমন, যদি বাঁ দিক দিয়ে ব্যথা হয় তাহলে বারবেরিস ভালগারিস (৬.৩০ বা ২০০ শক্তি) ব্যবহার করা যাবে। আবার যদি ডান দিক দিয়ে ব্যথা হয় তবে লাইকোপোডিয়াম ৬.৩০ বা ২০০ শক্তি ব্যবহার করার দরকার। এ ছাড়া যদি দুটো কিডনিই ব্যথা করে তবে ট্যাবেকাম (Tabacum) ৬.৩০ বা ২০০ শক্তি এক অব্যর্থ ওষুধ। আবার কিডনির কারণে যদি প্রস্রাবের সময় জ্বালা করে তাহলে ক্যানথারিস (Cantharis) ৬.৩০ বা ২০০ শক্তি ব্যবহার করা দরকার। এসব ক্ষেত্রেও যদি বেশি ব্যথা হয় তবে কম শক্তির ওষুধ বেশি বার খাওয়ান দরকার।

আন্ত্রিক কারণে যদি পেটে ব্যথা হয় তবে তাকে ইনটেসটাইনাল কলিক (Intestinal Colic) বলা হয়। এই ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন আমাশয়, বায়ু বা অন্য অনেক কারণেই হতে পারে। তখন সাধারণভাবে ব্যথাটা যদি সামনের দিকে জোরে চাপ দিয়ে বা দুমড়ে মুচড়ে ওপরে ওঠে তবে কোলোসিনথ (Colocynth) ৬.৩০ বা ২০০ শক্তি ব্যথার উপশম করবে। আর যদি পিছন দিক দিয়ে ব্যথাটা ওঠে তবে ডায়সকোরিয়া (Dioscorea) ব্যবহার করলে উপশম হবে।

আবার যে রোগীর ক্ষেত্রে গরম জল খেলে বা গরম সেঁক দিলে ব্যথা কমছে বলে মনে হয়, তাদের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়া ফস (Magnesia Phos) ব্যবহার করা দরকার। পেটে যন্ত্রণার সংগে যদি শীত শীত লাগে তবে পালসেটিলা (Pulsatilla) ভাল ওষুধ, আর খাওয়াদাওয়া করে যদি ব্যথার উপশম দরকার হয় তবে দিতে হবে নাকস ভোমিকা (Nux Vomica)। এছাড়া ৬.৩০ বা ২০০ শক্তির ক্যামোমিলা (Chamomilla) ওষুধটিও উপকারী। রোগী যখন ভীষণভাবে যন্ত্রণায় কাতর, তখন এই ওষুধে যন্ত্রণার উপশম হবে। যে শিশুদের পেটব্যথা করলে কোলে নিয়ে বেড়ালে কিছুটা কম যন্ত্রণা হচ্ছে বলে মনে হয় তাদের জন্য এই ওষুধ উপকারী।

কৃমির জন্য পেটের যন্ত্রণা হলে সিনা (Cina) ২০০ শক্তির বেশ কাজ করে। ছোট ছেলে একটু বদমেজাজি, নাক খোঁটে আর মিষ্টি খেতে ভালবাসে তাদের জন্য সিনা দরকার। এ ক্ষেত্রেও ক্যামোমিলা (Chamolla) বা কোলোসিনথ ব্যবহার করা যায়। গ্রানেটাম (Granatum) কৃমির জন্য একটি ভাল ওষুধ। যদি খিদে বেশি থাকে বা নাভির চারপাশে ব্যথা থাকে তবে গ্রানেটাম ভাল কাজ করবে। □

হাজার হাজার গৃহিণীরা যা মানে...
স্বস্তিক পপুলার সম্পর্কে অমিতা-ও তাই জানে...

"হ্যাঁ, সাশ্রয় আমি চাইতাম বটে, তবে সঙ্গে কোয়ালিটিও।
আর স্বস্তিক পপুলার একদম তাই। এর দাম অন্যান্য নামকরা
ডিটারজেণ্ট পাউডারের চেয়ে কতো কম অথচ কাচা হয় কি দারুণ!"

নীল রঙের স্বস্তিক পপুলার নানান গুণে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার:

- এটি স্প্রে-ড্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চট্‌পট্‌ গুলে যায়।
- এতে অপ্টিক্যাল হোয়াইটেনার মেশানো থাকার দরুন কাপড় বেশী পরিস্কার ও ধব্‌ধবে চমৎকার ধোয়।
- এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খরা জলেও ধোয়া খুবই সহজ।
- এটি স্বস্তিক-এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা ডিটারজেণ্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ।
- ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাবেন।

স্বস্তিক

পপুলার

ডিটারজেণ্ট পাউডার

সবচেয়ে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম

১ কিলো কেবল ১০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

Shilpi DM 17/83 Ben

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোস্তারিস

পুলিশের একজন বড়কর্তার কাহিনী বলল অবনীশ।

আজ পয়লা --- মালকড়ি এনেছেন ? না, কাল হানা দোব আড্ডায় ?

আছে, কষ্ট করে যাওয়ার দরকার কী ? এই নিন ---

এক-একটা আড্ডা থেকেই মাসে দশ হাজার ঘুষ ---

দূর ! আমার বিশ্বাস হয় না ---

বিশ্বাস হচ্ছে না ? সারা আমেরিকায় এই কারবার চলছে – ইনডিয়ায় হলেই অবিশ্বাস ? বেশ, দেখিয়ে দোব তোমায়।

আমাকে ভয় দেখিয়ে চাকরি ছাড়ানর মতলব ? দুষ্টু কোথাকার ---

অবনীশকে কিন্তু দেখিয়ে দিতে হল না --- তিনি নিজেই এলেন

চেন ? পুলিশ চিফ মিঃ ইকবাল ---

কী জঘন্য চাউনি ---

শ্রাবণীর বুক শুকিয়ে গেল সেই হিমেল চাউনি দেখে। সর্ব অংগে সর্প জিহ্বার বিষময় লেহন অনুভব করল, বুঝল, বিপদ এল বলে।

পরপর সাতদিন শুধু আমাকেই গিলে খাচ্ছে ---

অষ্টম দিনে এল প্রস্তাবটা – বলা বাহুল্য, তা ন্যক্কারজনক। ঘৃণায় সিঁটিয়ে গেল শ্রাবণী। হায়নার মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল মিঃ ইকবাল।

দিললির সমস্ত গুণ্ডা আর বেশ্যা আমাকে ভয় পায় –

আমি খুশি থাকলে এ আড্ডায় আর তোমাকে থাকতে হবে না। নইলে -

(চলবে)

বাঙালির জাদু-চর্চা : এখন যারা মঞ্চপতি

অজিতকৃষ্ণ বসু

জাদু সম্রাট পি সি (প্রতুল চন্দ্র) সরকারের তিরোধানের পর তাঁর সুযোগ পুত্র প্রদীপ চন্দ্র (পি সি সরকার জুনিয়র) তাঁর জাদু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। আমাদের জাদুর ভবিষ্যৎ প্রদীপের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

'যোগী জাদুকর' মৃণাল রায়ের জন্ম কুমিল্লা শহরে (বাংলাদেশ) ১৯২৬ সালে। আমি ১৯৪৮ সালে তাঁর আড়াই ঘণ্টার পূর্ণাঙ্গ জাদু প্রদর্শন দেখে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছিলাম, তিনি তখন বাংলা সরকারের খাদ্য বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী এবং শখের জাদুকর মাত্র।

তিনি পি সি সরকারের জাদু প্রদর্শন দেখেই জাদুতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে শিক্ষার সুযোগ পাননি। জাদু সম্পর্কিত কারিগরি জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ জাদু বিশেষজ্ঞ উইল গোলডসটন (Will Goldston)-এর মূল্যবান জাদু গ্রন্থাবলী থেকে।

কৈশোরেই তিনি একজন বিশিষ্ট যোগীর কাছে যোগ শিক্ষা করেছিলেন, এবং জাদুর সঙ্গে যোগের চর্চাও করে আসছেন। তাই থেকে তাঁর নাম 'যোগী জাদুকর'।

১৯৬৩ সালে তিনি দিললিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ এবং বিশিষ্ট দেশি ও বিদেশি ভি আই পি-দের উপস্থিতিতে তাঁর বিখ্যাত 'মায়ামহল' জাদুনাট্য প্রদর্শন করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনিই আমাদের সর্বপ্রথম জাদুকর যিনি তাঁর পুরো জাদু প্রদর্শনীটিকে একটি নাটকের কাঠামোতে বেঁধে পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাদুসম্রাট তাঁর 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনী নিয়ে জাপান রওনা হবার পরের সপ্তাহে যোগী জাদুকর মৃণাল রায় তাঁর 'মায়ামহল' জাদুনাট্য প্রদর্শনী নিয়ে জাপান রওনা হন এবং জাপানের নানা শহরে প্রদর্শনী সফর করে ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ফিরে আসেন বিশেষ প্রশংসা আর সম্মান পেয়ে। শুধু স্টেজের বড় বড় খেলাতেই (Illusions) নয়, হস্ত কৌশলপ্রধান জাদুতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতার প্রশংসা করেছেন অসাধারণ জাদুকর স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ রায় ('রয় দি মিসটিক') এবং সিনেমা জগতের জাদুকর সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায় নিজেও এককালে হাতে-কলমে প্রচুর জাদুচর্চা করেছেন, এবং তাঁর জাদু-প্রীতির ইঙ্গিত তাঁর পরিচালিত কয়েকটি ছবিতে সুস্পষ্ট। দূর থেকে দেখা যান্ত্রিক কৌশল-প্রধান স্টেজ ম্যাজিকের চাইতে কাছ থেকে দেখা হস্তকৌশল প্রধান ম্যাজিকই শিল্পী সত্যজিতের বেশি পছন্দ, কারণ জাদুকরের নিজস্ব কৃতিত্ব তাতেই বেশি প্রকাশ পায়।

মৃণাল রায়ের 'মায়ামহল' জাদুনাট্যটি প্রচেষ্টা হিসেবে পথিকৃতের মর্যাদা পেলেও তাতে ত্রুটি ছিল — নাটকের কাঠামোটি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। তিনি এই ত্রুটি শোধরাবার প্রয়াসী হয়েছেন এবং অভিজ্ঞ নাট্য-রচয়িতার সহায়তা নিয়ে 'ফাউসট' কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ জাদু নাটক পরিবেশনের পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর জাদুর আদর্শ এই যে, জাদু প্রদর্শন শুধু কতকগুলো তাৎপর্যবিহীন ধাঁধার প্রদর্শনী মাত্র হবে না, তাতে নাটক থাকবে, তার পিছনে কিছু বক্তব্যও থাকবে, জীবন সম্বন্ধে ভাববার খোরাকও থাকবে।

সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন আরেকজন অসাধারণ হস্তকৌশল দক্ষ শখের জাদুশিল্পী 'সু ভন' (SOO VON) — কলকাতার বিশিষ্ট ইনজিনিয়ার এবং ইনজিনিয়ারিং কারখানার মালিক সুচারু ভট্টাচার্য। শিক্ষালাভে আর শিক্ষানবিসিতে ইংলনডে অবস্থানকালে তিনি লনডনের বিখ্যাত জাদুকর সমিতি ম্যাজিক সারকল-এর সভ্য ছিলেন এবং সেখানেও ম্যাজিক দেখিয়ে প্রশংসা পেয়েছিলেন। শিক্ষিত সমাজের জাদুকরদের মধ্যে তাঁরই হাতে আমি সর্বপ্রথম পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন 'বাটি আর গুটির খেলা' (cups and balls) দেখেছিলাম, এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম। জাদু প্রদর্শনের একটি শিক্ষাপ্রদ দিক (educative value) আছে বলে তিনি মনে করেন, বড় বড় স্কুলের ছাত্রদের সম্মেলনে জাদু প্রদর্শন করে তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট রূপকথাগুলিকে ছোট ছোট জাদু নাটিকা রূপে পরিবেশন করার কথা তিনি ভাবছেন। এবং ইনজিনিয়ারিং কাজের ফাঁকে ফাঁকে এ ব্যাপারে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন।

কাছে বসে দেখাবার জাদুতে (Close-up magic) অসাধারণ শিল্পী জাদুকর এবং জাদুশিক্ষক গৌতম গুহ (জন্ম ১৯৪২)। আমাদের 'ব্যাঙ্গমা' ব্যঙ্গ-রসিক সভায় একাধিকবার জাদু প্রদর্শন করে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত জাদুর খেলা বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে।

গৌতম গুহ মুখর অথবা মূক একক অভিনয়ে সুদক্ষ। জাদু প্রদর্শনে সু-অভিনয় অত্যাবশ্যক বিবেচনা করে তিনি নাট্যাভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রভারতীতে পাঠ নিয়েছেন।

জাদুকে গৌতম গুহ পুরোপুরিভাবে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

গৌতম গুহ

আমাদের অপেশাদার জাদুকরদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের যুবক কর্মী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাছে বসে দেখানো জাদুতে (Close-up magic) তাঁর প্রদর্শন-কৃতিত্ব এবং উদ্ভাবনী শক্তি অসাধারণ। ইংলনডের সেরা জাদু প্রতিষ্ঠান সুপরিম ম্যাজিক কোমপানি থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত জাদু-মাসিক 'ম্যাজিগ্রাম' (Magigram), পৃথিবীর একমাত্র জাদু সাপ্তাহিক 'আব্রাকাডাব্রা' (ABRACADABRA) প্রভৃতি জাদু পত্রিকায় তাঁর আবিষ্কৃত বহু খেলা বিশেষ সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। জাদুমঞ্চে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং বালকপুত্রের সহযোগিতা নিয়ে জাদু প্রদর্শন করতে ভালবাসেন। তিনি মঞ্চে প্রদর্শনের পুরাতন পদ্ধতি ছেড়ে তিন-চরিত্রের একাঙ্ক নাটিকার মাধ্যমে জাদু পরিবেশনের পরিকল্পনা করছেন।

সর্বপ্রথম বাঙালি মহিলা মঞ্চ জাদুশিল্পী উমা দাশগুপ্তা। বিখ্যাত অপেশাদার জাদুকর নেত্ররোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তের সহকারিণী রূপে প্রথম মঞ্চে আবির্ভূতা হয়ে পরে তিনি স্বাধীনভাবে মঞ্চে জাদু প্রদর্শন করেছেন।

ডি পুষ্পা

মঞ্চ জাদুতে আমাদের দ্বিতীয় মহিলা জাদুশিল্পী 'ডি পুষ্পা' (শ্রীমতী পুষ্প দত্ত)। পেশাদার পুরুষ জাদুকরদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তিনি তাঁর আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী জাদু প্রদর্শনে পুরুষ জাদুকরদের প্রদর্শিত প্রায় সবগুলি খেলাই দেখিয়ে থাকেন।

পেশাদারি জাদুর ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে তিনি কয়েক বছর জাদু সম্রাট পি সি সরকারের 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীতে অন্যতমা সহকারিণী রূপে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মিশর এবং জাপান ভ্রমণ করে ফিরে এসে কিছুকাল 'যোগী জাদুকর' মৃণাল রায়ের 'মায়ামহল' প্রদর্শনীতেও সহকারিণী ছিলেন।

তারপর তিনি নিজের দল গড়ে

উত্তীর্ণ হয়েছে।

'রবিবাসর' এর কয়েকটি আসরে ঘরোয়া জাদু (Close-up magic) প্রদর্শন করে। এবং বহু জনসমাজের মাঝে জাদু প্রদর্শন করেও সে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। জাদুকে সে নেশা হিসেবেই নিয়েছে।

জাদু একটি মহান শিল্প। এই কারণেই নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন, বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু, নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর, ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ, বিখ্যাত সেতার শিল্পী এবং সংগীত শাস্ত্রী বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীরাও এই শিল্পের চর্চা করেছিলেন।

আনন্দের বিষয় আমাদের তরুণদের জাদুশিল্পে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের মধ্য থেকে ভাল শিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে। তার একটি উদাহরণ দীপক রায়। সে শুধু জাদু প্রদর্শনেই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাই নয়, তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'ম্যাজিকের ক্লাস' ছোটদের ম্যাজিক শিক্ষার একটি চমৎকার বই, যেমনটি আগে বাংলা ভাষায় আর কখনো প্রকাশিত হয়নি। □

দীপক রায়

নিয়ে 'ড্রি পুষ্পা' নামে স্বাধীনভাবে জাদু প্রদর্শন শুরু করেন। ভারতের বাইরে তিনি নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলংকাতেও তার আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী পূর্ণাংগ জাদু প্রদর্শনী নিয়ে সফর করেছেন।

আমার পরিচিত অপেশাদার জাদুকরদের মধ্যে প্রবীণ হস্ত কৌশলী জাদুকর সুশীল মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাদুর খেলা দেখিয়ে ছোটদের মনোরঞ্জন করতে তার দক্ষতা প্রশংসনীয়। কমেডি ম্যাজিক অর্থাৎ কৌতুক প্রধান জাদু প্রদর্শনেও তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে।

আমার পরিচিত কনিষ্ঠতম জাদুকর শ্রীমান দীপক রায় (জন্ম :

আলোকচিত্র :
লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

চিত্রকলা

ইন্দ্র দুগারের বর্ণোজ্জ্বল সরল পৃথিবী

আকাদেমি অব ফাইন আরটসের সেনট্রাল গ্যালারিতে ইন্দ্র দুগারের ছবির সাম্প্রতিক প্রদর্শনীতে নতুন করে অবাক হবার মত কিছু নেই। প্রবীণ এই শিল্পীর জলরঙ আর নিসর্গপ্রকৃতির ওপর যে আশ্চর্য দখল তা আরও একবার নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া, এই মাত্র। এবারের প্রদর্শনীতে গ্রামবাংলার রঙিন অবয়ব, হিমালয়ের শান্ত প্রগাঢ় পরিবেশ আর গংগার অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য নিখুঁত রূপ পেয়েছে। বারানসী, পুরী আর রাজগীরের বাড়িঘর, পাখ পাখালি, পাহাড় নদীও তুলির আঁচড়ে একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর পঁয়ত্রিশটি ছবি বিভিন্ন জায়গার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন জিয়াগঞ্জ, বর্ধমান, দারজিলিং, কলকাতা, বখতিয়ারপুর, রাজগীর, বারানসী, উদয়পুর আর পুরী। তবে এরই মধ্যে শিল্পীর পিতৃপুরুষের দেশ জিয়াগঞ্জই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সিরিজের ১৫টা ছবির মধ্যে গংগাকে ভিত্তি করে আঁকা ছবিগুলি সত্যিই চোখ জুড়োয়। তবে 'গংগা[illegible] ঊষাকাল' (ডন ওভার গংগা) ছবি[illegible] এত নীলরঙের প্রাধান্য কেন[illegible] জিয়াগঞ্জ সিরিজের শ্রেষ্ঠ ছবি বো[illegible] হয় 'ফেয়া ইনটু ইনফিনিট' – রঙ আ[illegible] বিষয়বস্তুর সুষম সমন্বয় ছবি[illegible] আশ্চর্য গভীরতা আরোপ করেছে[illegible] দারজিলিং সিরিজে সেই গতানু[illegible]গতিকভাবে কাঞ্চনজংঘাই প্রাধান[illegible] পেয়েছে – ফলত একটু একঘেয়ে[illegible] এসে গেছে। রাজগীর সিরিজে 'ত্রি[illegible] বোন' আর 'সূর্যস্নাত কুটির' ছবি[illegible] দুটো সবচেয়ে আকর্ষক। ইন্দ্র দুগা[illegible]রের সবকটা প্রদর্শনীতেই ওঁ[illegible] নিজের ছবির সরল আবেদন ছাড়া[illegible] দর্শকদের উপরি পাওনা হিসেবে[illegible] শিল্পীর বাবা হীরাচাঁদ দুগারের[illegible] ছবির রসাস্বাদ করার যে সুযোগ[illegible] ঘটে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবারের প্রদর্শনীতে ওঁর আঁকা যে[illegible] ছবিটি দেখান হচ্ছে তা দেখে বাবা ছেলেকে একই ঘরানার অনুসারী বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। এই ঘরানার মূল মন্ত্র বোধ হয় রঙের পরিমিতি আর বিষয়বস্তুর সরলতা। কে না জানে যা কিছু সরল আর স্বাভাবিক, তাই সুন্দর। □

দিব্যজ্যোতি বসু

শব্দশৃঙ্খল – ৭৬

১	২	৩	■	৪	৫		৬
৭			■	৮		■	
■		■		৯		১০	
১১		১২	■	■	■	১৩	
	■	১৪	১৫		১৬	■	
১৭	১৮	■		■	১৯	২০	
■	২১	২২		■	২৩		■
২৪			■	২৫			

সূত্র : পাশাপাশি

১। অর্জুন প্রিয়া, নারী
৪। মালা বানায় কে
৭। কন্যাপতি
৮। একরকম বাদাম
৯। চুলের গোছা
১১। পশুঘাতক
১৩। রসিক কীসের সমঝদার?
১৪। নিশ্চিত
১৭। নর্তন
১৯। গাছের ফুল, পায়ের তাল
২১। পাখি
২৩। উত্তম মধ্যম দান
২৪। কাজল চক্ষু
২৫। নিজের লোক

সূত্র : ওপর নিচ

১। জনগণ
২। বিচার বা সিদ্ধান্ত
৩। আস্কারা
৪। বাইরে সুন্দর, অন্তরে কদর্য
৫। সহজেই যে লজ্জা পায়
৬। ধবন ধাবণ
১০। স্ত্রী
১১। মনগড়া বিষয়
১২। মিষ্টি লাঠি
১৫। রান্না
১৬। নানারকম
১৮। নাকে থাকে, থাকে চোখে
২০। দিল দরিয়া
২২। কোল

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১১ জানুয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ২৯ ১২ ৮৩।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নম্বরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল- ৭২ (সমাধান)

মা	ছি	■	গ	দা	■	প	র
লি	পি	কা	■	মী	ত	রা	গ
■	■	শ	ব	■	লা	ভ	■
চ	ক	■	ল	ক্ষ	■	ব	সা
স.	হ	জ	■	ত	রু	■	য়
ম	■	রা	গ	■	ন	ব	প
খো	দা	■	ম	ম	■	জ	■
র	প	ড়	■	ব	রা	ভ	য়

শব্দশৃঙ্খল – ৭২ র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন শংকর নাথ সিংহ (হাটতলা, পুরুলিয়া-৭২৩ ১০১) এবং নন্দ দুলাল রায় (৪০ শবজি মহল, আবদালী বাজার, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা)।

শব্দশৃঙ্খল - ৭২ র লটারিতে বিচারক ছিলেন ভারতী সাহা।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

ডিসেমবর ১৪ থেকে ২০

মেষ : পেট সংক্রান্ত বড় রকমের গোলমাল ভোগাবে, মেয়েদের শরীর নিয়ে ঝামেলা চলবে। আর্থিক মন্দা, অল্প স্বল্প ঋণ। কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের ব্যর্থ প্রয়াস; মেয়েদের কর্মস্থলে নিজস্ব স্বকীয়তা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে। ব্যবসায়ীদের কোন বাধা দূর হবে।

বৃষ : শরীর ভাল চলবে, মেয়েদের চর্মরোগ নিয়ে বিশেষ ভোগান্তি। আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি কিন্তু ছোটখাট ক্ষতি। কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে বিশেষ সমাদর ও প্রশংসা; মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উদ্বেগ ও মানসিক চাপ। পারিবারিক কোন ব্যাপারে আত্মীয় স্বজনের সংগে আপস। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মিথুন : শরীর ভাল চলবে না, মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। আর্থিক অচলাবস্থার অবসান হবার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোন পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে; মেয়েদের কর্মস্থলে বাড়তি সুযোগ। কর্মপ্রার্থীদের স্বাধীন প্রচেষ্টায় সাফল্য। ব্যবসায়ীদের হঠাৎ মন্দা।

কর্কট : আগের অসুস্থতা নিয়ে ভোগান্তি, মেয়েদের শরীর খুব একটা ভাল যাবে না। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাল মতন সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ অনুকূল; মেয়েদের কোন ব্যাপারে দূর যাত্রা। আকস্মিক কোন পারিবারিক বিপদে বন্ধুজনের বিশেষ সাহায্য। ব্যবসায়ীদের ভাল মতন মন্দা।

সিংহ : শরীর ভাল যাবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি। আর্থিক ক্ষেত্রে চাপ কমবে; আয় বাড়বে নানান সূত্রে। কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চলবে, মেয়েদের কোন সিদ্ধান্তে দৃঢ় হতে হবে। পারিবারিক অশান্তির কিছুটা হ্রাস। মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক কাজে বিশেষ সাফল্য। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কন্যা : শারীরিক ঝামেলা লেগে থাকবে; মেয়েদের ছোটখাট শারীরিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি; ঝুঁকি নিলে সামান্য আয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে কোন পুরনো সম্পর্কের অবনতি; মেয়েদের সমস্ত ব্যাপারে নিজ মত প্রাধান্য পাবে। পারিবারিক ভ্রমণ। কোন সন্তানের কর্মলাভ। ব্যবসায়ীদের লাভ।

তুলা : শরীর মোটামুটি চলবে, মেয়েদের পুরনো রোগে নতুন করে ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। কর্মস্থলে অনেকের ঈর্ষার পাত্র হবার আশংকা; মেয়েদের কোন কোন মতামত গৃহীত হবে। বয়স্কদের নতুন কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে ক্ষতির ইংগিত; মনোমালিন্য। কর্মস্থলে কোন ভুল বোঝাবুঝি উন্নতিকে ব্যাহত করবে; মেয়েদের নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে হবে। দূরের কোন আত্মীয় পরিজনের সম্পত্তি লাভ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের প্রচুর ব্যয় ও ক্ষতির আশংকা।

ধনু : আচমকা শরীর খারাপ হতে পারে; মেয়েদের ভাল চলবে। আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন। কর্মস্থলে পরিবেশের ওপর নজর রাখতে হবে; মেয়েদের কিছু উপরি পাওনা। স্ত্রীর কোন রকম আঘাত বা রক্তপাতের আশংকা। পারিবারিক কোন উৎসবে হঠাৎ বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মকর : শরীর উৎপাত করতে পারে, মেয়েদের ছোটখাট অস্ত্রোপচার। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে কঠোর দৃষ্টিভংগির প্রয়োজন হলে; মেয়েদের সখ্যতা বৃদ্ধি। কোন সন্তানের জন্য গর্ব। ভৃত্যদের দ্বারা সামান্য ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে।

কুম্ভ : শারীরিক অশান্তি চলবে, মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আয় বৃদ্ধি কিন্তু হঠাৎ বড় রকমের ক্ষতি। কর্মস্থলে কোন প্রচেষ্টায় বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া যাবে, মেয়েদের মানসিক চাপ ও দ্বন্দ্ব। পারিবারিক কোন সমস্যা সমাধানের ইংগিত। দূরের কোন বন্ধুর সান্নিধ্য। ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : পেটের গোলমাল নতুন করে ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক অশান্তি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য। কর্মক্ষেত্রে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন; মেয়েদের কর্ম পরিবর্তন বা পদত্যাগের আশংকা। আত্মীয় পরিজনদের দ্বারা সুনাম ব্যাহত হবে। ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি।

· বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

যেদিন আমার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !

"মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে!"

"মানে দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা!"

"হ্যাঁ মা, দাঁতে গর্ত! আমি ওকে আমার দাঁত দেখালাম... আমার "স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা" টুথপেস্টের কথা বললাম..."

"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড, সোনা!"

"ও হ্যাঁ! বললাম তুমি বলেছ ভালো, তাই আমি ওটা ব্যবহার করি! আমারও ভালো লাগে!"

"অতিই ভালো! মাড়ি মজবুত করে, দাঁতের আয়ু বাড়িয়ে দেয়..."

"হ্যাঁ মা! মা, একটু চকলেট কেক খাই? পরে দাঁত ব্রাশ করে ফেলবো! সত্যি মা..."

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড

স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট
যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।

FOR THE GUMS

Forhan's

with active FLUORIDE to check tooth decay

331F244 BEN

পরিবর্তন
১৯-২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫

শতবর্ষের কংগ্রেস আন্দোলন ও বাংলা

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোলারিস

১(

ভাববার জন্যে দুটো দিন সময় ভিক্ষা করল শ্রাবণী। সেই রাতেই পরামর্শে বসল মা-মেয়ে আর অবনীশ।

অবনীশ, তোমার বাবা তো আই-সি-এস অফিসার - হোম মিনিসট্রিতে রয়েছেন

পুলিশকে রক্তচক্ষু দেখাতে পারবে সেই কারণেই। কাল সকালেই যান শ্রাবণীকে নিয়ে - পুত্রবধূর মর্যাদা দিতে বলুন।

কিন্তু হিতে বিপরীত হল।

কী! একমাত্র ছেলের বিয়ে দোব অ্যারিসটোক্র্যাট পসটিটিউটের সংগে

দারোয়ানকে হুকুম দিলেন পয়জার হাঁকিয়ে বাসন্তীকে ফটক পার করে দিতে ...

হ্যালো - - মি: ইকবাল?

বলুন, স্যার

ইউ নো শ্রাবণী গুপ্ত? অ্যারিসটোক্র্যাট পসটিটিউট - পিয়ানিসট?

হাঁ - হাঁ

ও কে ও কে! আমার ছেলেকে ফুসলে নেওয়ার মতলবে রয়েছে মা আর মেয়ে। নজরে রাখুন। ছেলে যদি পালায় তো আপনাকে আমি দেখে নেব

এর পরের ঘটনা খুব ছোট্ট। দিল্লি ছেড়ে পরের ট্রেনেই পালিয়ে গেল মা আর মেয়ে।

পরিবর্তন

২১-২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৫

এই সংখ্যা ৪.০০ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, অন্যত্র ৩৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : নিতাই ঘোষ

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ ফ্ল্যাট ১২১২ নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

এটিও একটি বিশেষ সংখ্যা তবে দাম বাড়ছে না। এবারের বৈশিষ্ট্য এই, সংখ্যাটি একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর নানা দিক থেকে দৃষ্টিপাত করেছে। সেটি রূপচর্চা ও ফ্যাশন। রূপচর্চা যে আসলে সৌন্দর্য চেতনারই অংগ সেই তথ্যই বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সংগে রূপচর্চার চাবিকাঠি তুলে দেওয়া হয়েছে মহিলাদের কাছে।

এ ছাড়া থাকছে শীতের ভ্রমণ নিয়ে কয়েকটি রচনা। ধর্ম পর্যায়ে থাকছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্মৃতিপ্লুত যোগোদ্যানকে নিয়ে একটি রচনা।

রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মার ওপর বিশেষ রচনা।

সম্ভাব্য বিষয়সূচি

ফ্যাশন ১৯৮৩

৪। সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাকৃতিক উপায়
৫। শরীরের কয়েকটি ছোটখাট সমস্যা তার প্রতিকার
৬। ফ্যাশন : ফরাসি স্টাইল ১৯৮৩
৭। ফ্যাশন : ইতালিয়ান স্টাইল ১৯৮৩
১০। মেয়েদের চোখে পুরুষের পোশাক
১১। শাহনাজ ভারতীয় ভেষজ থেকে প্রসাধনী বানিয়ে বিদেশ মাত করছেন
১২। কেশবতী কন্যা কীভাবে হওয়া যায়
১৩। শাড়ির ফ্যাশন

সম্পাদকীয়

ভারত-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবদৃপ্ত মুহূর্তের স্মৃতির আলোকে আমাদের বর্তমান সংখ্যাটি উদ্ভাসিত। এখন শুধু বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে মাঝে মাঝে বসিয়া ভাবি কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত উদ্দীপনা, দীপ্ত প্রাণের আবেগে জননী জন্মভূমিকে স্বর্গের অধিক গৌরবদান, দিনক্ষণ না গনিয়া, দুর্বার বাধা না মানিয়া মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততায় সেদিনের সেই আত্মবিসর্জন - তাহা কি শুধু পতঙ্গের মত অন্ধ আবেশে অগ্নিতে আত্ম-বিলোপ, না বাত্রিব তপস্যা-শেষে দৃঢ়সংকল্প তাপসের আত্মাহুতি:

আমরা আজ আত্মবিস্মৃত, আত্মঘাতীও। যে জাতি আপনার ইতিহাসকে সহজে বিস্মৃত হয়, পূর্বসূরীদের গৌরবচ্ছটায় বিকশিত হইয়াও উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে, বৎসরান্তে পূর্বপুরুষের প্রতি তিলাঞ্জলিতেও যাহাদের কার্পণ্য সে জাতি বড়ই হতভাগা। আজ বর্তমান ভারতের হর্ম্যরাজি সহস্র শহীদের কংকালের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। চোখ মেলিয়া দেখ - স্বাধীন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণার ভিতর সেই তিমিরাভিসারের যাত্রীদলের চরণচিহ্ন খুঁজিয়া পাইবে। কান পাতিয়া শোন - এখনও বাতাস হইতে বন্দেমাতরমের অনুরণন একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। দেশকে মা বলা নাকি আজ অপরাধ,, সংকীর্ণতা। উলটা রথের যাত্রায় এখন নাকি নূতন পাঁজিকা, নব বিধান। কিন্তু ইতিহাস কালের দাসত্ব করে না। সে তাহার আপন কথা আপন বিবেকের নির্দেশেই লিখিয়া চলে। কালাপাহাড়ের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সে তাহাকে সযত্নে রক্ষা করে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে। কতযুগ পরে মাটি খুঁড়িয়া অন্ধ অতীতের কবর হইতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে। পুঁথি পুড়াইয়া, পন্ডিতদের জহ্লাদের হাতে তুলিয়া দিয়া ইতিহাসকে চাপা দেওয়া যায় নাই। তাহা বংশ পরম্পরায়, জ্ঞানীদের মস্তিষ্কে, শিল্পীর মানস-লোকে, সাধারণ বিবেকবান মানুষের স্মৃতিতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে। তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস কখনই হারাইবে না। জাতি হয়ত আজ আত্মবিস্মৃত অথবা উলটারথের রশির স্পর্শে সাময়িকভাবে দিগভ্রান্ত। কিন্তু কেহ না কেহ তাহাকে বুকে ধারণ করিয়াই আছে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সত্যকে তুলিয়া দিবার আগে তাহার ছুটি নাই।

কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কোন হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়। সাময়িক সন্ত্রাস অথবা বিচ্ছিন্ন কোন অ্যাডভেনচার নয়। বিপ্লব তখনই সার্থক যখন তাহা পুঁথি হইতে বাহির হইয়া বাস্তিব মানস-লোকে প্রবেশ করে এবং তাহার মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। অসংখ্য এককের যোগফলই বিপ্লব: তাহা সাময়িক উন্মাদনা নয় - যদিও বহু ঐতিহাসিক ওই সাময়িক উন্মাদনাকেই বিপ্লব আখ্যা দিয়া বিপ্লবের এক নাটকীয় রক্তাক্ত ছবি আঁকিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাসতিল দুর্গের পতনকেই ফরাসি বিপ্লব আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু মানসিক বিপ্লবের বীজ যেখানে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয় না, সেখানে সাময়িক অভ্যুত্থান যে প্রকৃত বিপ্লবে পরিণত হয় না ফরাসি বিপ্লবই তাহার প্রমাণ।

গত শতাব্দীর ভারতীয় নেতারা এই গূঢ় সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা সময়ের সহিত দাঁড় বাহিয়া চলিয়াছেন। রাতারাতি ভেলকি-বাজি দেখাইবার সেখানে কোন সুযোগই ছিল না। বহু বিবর্তন, আন্দোলন, বিতর্ক, সংঘর্ষ, বিরোধিতার মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিয়াছিল বলিয়াই দেশ জুড়িয়া স্বাদেশিকতার এক বাতাবরণ তৈয়ার হইয়াছিল। রামমোহনের স্বাধিকার চিন্তা, বিদ্যাসাগরের মানবিকতা, স্বামীজীর মানুষ গড়ার সাধনা, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা, সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারতীয় ভাবনা, অরবিন্দের বিপ্লব চেতনা, দেশবন্ধুর সেক্যুলারিজম, নেতাজীর দেশাত্মবোধ এই সব কিছু মিলিয়া মিলাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের শতাব্দীর মহাযজ্ঞে বাংলার আহুতি। আজ বাংলার কথাই বেশি করিয়া বলিব, কেননা, ১৮৮৩ সালের বর্ষশেষে শতবর্ষ আগে সমগ্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রদীপটি এই বাংলাতেই জ্বলিয়াছিল যে। পরবর্তীকালে সেই প্রদীপ হইতে যাঁহারা মশাল ধরাইয়াছেন, তাঁহাদের পুরোভাগেই এই বাংলার সন্তান।

ভারতীয় রেনেশাঁসের জন্মভূমি এই বাংলা। ভারতের সমস্ত কিছু প্রগতিশীল চিন্তাধারার জনক এই বাংলা। স্বদেশী চেতনার উৎসভূমি এই বাংলা। কিন্তু বাঙালি কোনদিন বিচ্ছিন্নতাবাদের সংকীর্ণ আবর্তে নিজেকে গুটাইয়া লয় নাই। নির্যাতিত,, অত্যাচারিত অথবা বঞ্চিত বলিয়া মায়া-কান্না কাঁদিয়া বাঙালিস্তানের স্বপ্ন দেখে নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধেও সে পালের হাওয়া একান্তে নিজের গায়ে লাগাইবার চেষ্টা করে নাই; সে সমগ্র দেশকে একসূত্রে মিলাইবার স্বপ্নে নিজেকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পালক পিতা অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম' - এমন একটি ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন কোন কোন ঐতিহাসিক। ইহা নিতান্তই ভাবের ঘরে চুরি। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটি গঠনের পিছনে সুচতুর ইংরাজের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা। সরকারি ছত্রছায়ায় আবেদন নিবেদনের একটি 'এলিটিস্ট সংগঠন' তৈরি করা। কিন্তু ইতিহাস আপন গতিতেই অগ্রসর হয়। হিউমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কংগ্রেস অচিরেই জাতীয় আন্দোলনের পাদপীঠে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহারও অনেক আগে একজন বাঙালি তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাকে সর্বভারতীয় রূপ দিবার জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত ইন্ডিয়া লিগ ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনই ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন। জাতীয়তাবাদী সর্বভারতীয় রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সুরেন্দ্রনাথেরই হাতে।

১৮৮৩ সালের ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সেদিন একশোর বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সে সম্মেলন চায়ের কাপে তুফান তুলিবার আসর ছিল না; যে স্বাধিকার-প্রমত্ত মনোভাব উনিশ শতকের শেষার্ধ হইতে বাঙালি চিত্তকে মথিত করিয়া তুলিতেছিল যাহার প্রকাশ সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের পাতায়, সেই জাতীয় ঐক্যবোধের সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্যই সেই সম্মেলন। এই জাতীয় ঐক্যকে সংহত ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য যে একটি জনবন্ধ সংগঠনের প্রয়োজন এবং সংগঠনের সম্মুখে যে এমন একটা সুষ্ঠু কর্মসূচি থাকা চাই যাহা স্থান ও অঞ্চলের সংকীর্ণ গন্ডী ছাড়াইয়া সর্বভারতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে একই আধারে ধারণ করিতে সমর্থ, এই সহজ অথচ মূল্যবান তত্ত্বটি সুরেন্দ্রনাথ সেদিন হৃদয়ংগম করিয়াছিলেন। তদুপরি রেনেশাঁস লব্ধ, ইংরাজি শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর জীবন-জীবিকার প্রশ্নে মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নও ছিল। শিল্প ও যান্ত্রিক শিক্ষা, সিভিল সারভিসে ব্যাপকতর ভারতীয় নিয়োগ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, প্রতিনিধিমূলক সরকার, জাতীয় অস্ত্র-আইন প্রভৃতি ছিল জাতীয় সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালের কংগ্রেস নেতাদের তুলনায় বয়সেই বড় ছিলেন না, চিন্তা-ভাবনাতেও তিনি কংগ্রেসের অগ্রবর্তী ছিলেন: বস্তুতপক্ষে কংগ্রেস পরবর্তীকালে যাহা ভাবিয়াছে সুরেন্দ্রনাথ তাহা ১৮৮৩ সালেই ভাবিয়াছেন।

[illegible] প্রথম কংগ্রেস সভাপতির শিরোপা জুটিয়াছিল। তবু সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙালিরাই যে নেতৃত্বের অধিকারী উমেশচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতিত্ব লাভ তাহারই প্রমাণ। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাঙালি প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অনেকেরই চক্ষু চড়াইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে বাঙালি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার এক অপচেষ্টা হয় এবং ১৮৮৭ সালের মাদরাজ কংগ্রেসের প্রাক্কালে সৈয়দ আহমদ তো বাঙালি প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দেন।

পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসও ধীরে ধীরে আবেদন-নিবেদন মারফত রাজনীতির নিরাপদ পথ হইতে সরিয়া গিয়া সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আজ শতাব্দীর ইতিহাসের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে অহংকার নাই। আত্মগরিমা অহংকার নয়। সেদিন যদি মহারাষ্ট্রের তিলক, পাঞ্জাবের লাজপত রায় ও বাংলার বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ না থাকিতেন তাহা হইলে আবেদন-নিবেদনের নরমপন্থার ঘূর্ণাবর্ত হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করা যাইত কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসের সামনে যখনই কোন সংকট আসিয়াছে, নতুন নেতৃত্ব তাহাকে সেই সংকট হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছে। বহতা নদীর ধর্মই এই, তাহা সম্মুখে বাধা পাইলে অবরুদ্ধ হয় না, দ্বিধাবিভক্ত হইয়া আপন গতিতে সম্মুখে পথ করিয়া লয়।

এই ভাবেই কংগ্রেস ধীরে ধীরে সমস্ত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার যৌথ কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। মত ও পথের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্ক যাহাকে পলিমিক বলে তাহা কখনও কংগ্রেসিদের কাছে বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাহা হইলে অহিংস সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিলককে সমর্থন করিতেন না। অনুশীলন সমিতির পিছনেও চিত্তরঞ্জনের অর্থ সাহায্য থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাঙালিরই যে প্রাধান্য ছিল এবং বৃটিশ শক্তি বাঙালিকেই বিদ্রোহীর স্রষ্টা বলিয়া মনে করিত তাহার প্রমাণ বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেই বৃটিশ দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ দেশের বুকে বপন করিয়া যায়। পরবর্তীকালে তাহা পত্রপুষ্পে বিকশিত হইয়া ইংরাজের মনোবৃত্তির কারণ হইয়াছে। সেদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গে উল্লসিত হন। অধুনা বাংলাদেশের যে [illegible] হয়। অথচ বঙ্গভঙ্গ ছিল বাঙালির পাঁজরের উপর অস্ত্রাঘাত। আর কোন আঘাতই তাহার ক্ষতকে এত গভীর করিতে পারে নাই। আর কোন বাধা তাহাকে এতখানি ঘূর্ণায়মান করে নাই। যখন প্রবল ভূমিকম্পে অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়, তখন হর্ম্যও রাজপথে আসিয়া আছড়াইয়া পড়ে। সেই মহাত্রাসন্তি ক্ষণে বাঙালির কবি পথের ধূলায় নামিয়া বাঙালির ঘরে যত ভাইবোনকে এক হওয়ার ডাক দিয়াছিলেন।

১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লরড কারজন ব্রোডরিককে লিখিয়াছিলেন 'বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাদের চিৎকারে আমরা যদি দুর্বল হই, তাহা হইলে ভারতের পূর্বাংশে একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকেই দৃঢ় ও জোরদার করা হইবে।'

গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের অনেক আগে এই বাংলা হইতেই বৃটিশ পণ্য বয়কটের ডাক উঠে। এবং সেই আন্দোলনের আগুন অন্যান্য রাজ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির অবদান যে কী বিরাট ও সার্বিক তাহার প্রামাণ্য ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। আজও পর্যন্ত এমন কোন জাদুঘর বাংলায় নাই যেখানে এ যুগের তরুণ-তরুণীরা এক জায়গায় স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালির ইতিহাসের দিকে বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে চাহিয়া থাকিতে পারে। স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসেও এখন সারা বিশ্ব আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে।

আমরা এ কথা বলিতে চাহি না, জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র ইতিহাস। কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী একাধিকবার ভুল করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের মতাদর্শ এবং এমনকি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দায় দলের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসে যেমন বিখ্যাত ব্যক্তি আসিয়াছেন, তেমনি তাঁহাদের কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিবার চেষ্টাও কম হয় নাই। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের পর চরমপন্থীরা কংগ্রেসে অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোখলের মত নেতাও চরমপন্থীদের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পথের কাঁটা হইয়া দাঁড়ান। সুভাষচন্দ্রকে পরাজিত করার পিছনেও গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বও পুরোভাগে ছিলেন। হালে আমলের কংগ্রেসিদের উপদলীয় কোন্দল দেখিয়া যাঁহারা বিচলিত হন তাঁহারা বোধহয় অতীতের কংগ্রেস অধিবেশনে জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখিলে মূর্ছা যাইতেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস আন্দোলনই যে জাতীয় [illegible] আবিষ্কার কংগ্রেসের আদর্শ ও পতাকাতলেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করিয়াছেন। আবার আদর্শগত কারণে মূল প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অতীত ধারার সহিত মানসিক যোগবন্ধন ছিন্ন করেন নাই। সুভাষচন্দ্রের মত এত লাঞ্ছনা আর কোন কংগ্রেস নেতাকে দলের লোকদের হাতে সহ্য করিতে হইয়াছে? কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতেও গান্ধীজী ও নেতাজুর প্রতি আপন শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে ভুলেন নাই। কংগ্রেসের পতাকাকেই ভারতের মুক্তি পতাকা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বুড়িবালামের তীরে অথবা জালালাবাদ পাহাড়ে কোন পতাকা উড়িয়াছিল? বন্দেমাতরম সব বিপ্লবীরই বীজমন্ত্র ছিল। পরবর্তীকালের মারকসবাদীরাই একমাত্র নূতন ধর্মমত গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন যাহা জাতীয় আন্দোলনের মূলধারা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তিলক, অরবিন্দ হইতে সুভাষচন্দ্র সকলেই ভারতীয় অধ্যাত্মধারা হইতে জীবন-রস সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা কিছু ভারতীয়, যাহা কিছু আপন ঐতিহ্যের অনুসারী তাহা কিছুই তাঁহাদের প্রণম্য। অহিংস অথবা সহিংস, নরমপন্থী বা চরমপন্থী তাহা শুধু পথ লইয়াই তর্কের ব্যাপার। কিন্তু একই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত, একই মানসিকতায় লালিত। সেদিক হইতে ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্তরেই কংগ্রেসের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত। কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল ছিল না, তাহা ছিল একটি প্রত্যয় – একটি আত্মচেতনা।

আজ সেই রাম ও সেই অযোধ্যা নাই। তবু বহুধা বিভক্ত এক স্রোতস্বিনীর মূল ধারা এখনও কুলুকুলু রবে প্রবাহিত। কূলপ্লাবিনী নহে, তবু তাহার ক্ষীণ স্রোতধারায় এখনও শতাব্দীর কলকল্লোল। কংগ্রেসের পথিকৃৎ জাতীয় সম্মেলনের শতবর্ষ নিঃশব্দে পার হইয়া গেল – একালের বাঙালি চিত্তে তাহা কোথাও বিন্দুমাত্র অনুরণন তুলিল না। তবু তো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। কিছু মূঢ়ের অবিমৃশ্যকারিতা তাহা যে বানচাল করিতে পারিল না তাহাতে সেই রাষ্ট্রগুরুর আত্মাই শান্তি পাইবেন। কারণ সেই অসীম প্রতিভাধর রাষ্ট্রনেতার শেষ জীবন চরম হতাশার মধ্যে কাটিয়াছে। এমনকি শোকযাত্রায় যোগ দিবার মত পর্যাপ্ত লোকও নাকি পাওয়া যায় নাই। আজ জাতীয় সম্মেলনের শতবর্ষ পূর্তির ক্ষণে তাঁহার কথা যদি সশ্রদ্ধ চিত্তে কেহ স্মরণ করে তাহা হইলে জাতিই তাহার আপন দায়িত্ব পালন করিবে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সপ্ত শহীদ / দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী

বাংলাদেশে বাম- প্রগতিশীল নেতৃত্ব হিন্দুদের হাতেই

গত ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ সংখ্যা পরিবর্তন-এ সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরের পটভূমিকায় যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনের মূল বিষয় এদেশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের (একমাত্র সংখ্যালঘু হিসেবে উল্লেখ করেছেন) সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে। এ তথ্যের ভুল নিরসন ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এখানে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

এবারের শারদীয় উৎসব-এ একমাত্র ঢাকাতেই প্রায় ৯৫টি দুর্গা পুজো মন্ডপ-এর আয়োজন ছিল। এছাড়া দেশের অনত্র কমবেশি এ আয়োজন চলে আসছে সেই যুগ যুগ ধরে। কিন্তু প্রতিবেদনে মাত্র ২৪টি পুজোর কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি প্রতিবেদকের পক্ষে সব পুজো মন্ডপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কারো সাহায্য নিতে হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে সাহায্যের ব্যাপারে মোটামুটি নিরপেক্ষ ভাবাপন্ন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা সংস্থা (হিন্দু যুব কল্যাণ সমিতি, সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটি) কিংবা ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাহায্য নিলে এরকমটি হত না।

এ ছাড়া সংখ্যালঘু বলতে তিনি শুধু হিন্দুদেরকেই সনাক্ত করেছেন। অথচ সেই ১৯৪৭-এর পর থেকে এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতিতে মুসলমান হিন্দু খৃস্টান বৌদ্ধসহ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জনগণ এক কাতারে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা অর্জনের জন্য সেকালে যেমন পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, তেমনি স্বাধীনতার পর সাম্য, জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সংগ্রামে সবাই একই মিছিলের সহযোদ্ধা। সমস্যা যা রয়েছে, তা কোন গোষ্ঠীর জন্য আলাদা নয়। এখানকার আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর প্রেক্ষিতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জনগণই সে সমস্যার শিকার। উল্লেখ্য যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থাকলে এদেশের চলচ্চিত্র, নাটক, সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে ডঃ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখিত সম্প্রদায়ের এরকম উল্লেখযোগ্য আধিক্য থাকত না।

কোন কোন মহল থেকে অবশ্য সাম্প্রদায়িক উস্কানির চেষ্টা করা হয়, আবার কালের গতিতে তা চাপা পড়ে গেছে। কারণ সাধারণ মানুষ (তা যে ধর্ম বর্ণেরই হোক না কেন) [illegible] তাত্ত্বিকরা সাধারণ মানুষের [illegible] অবমূল্যায়ন করুন না কেন, বলা বাহুল্য, বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে এ পর্যন্ত বাম-প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন বেশির ভাগ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত নেতৃবৃন্দ। এবং তাঁরা জনগণের হৃদয়ে জননেতা হিসাবেই সমাসীন।

পরিসংখ্যানের ব্যাপারে এখানকার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এদেশের বাম-প্রগতিশীল, রাজনীতিতে ভূমিহীন কৃষক, খাস জমি ইত্যাদির ব্যাপারে প্রাপ্ত সরকারি সূত্রের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নীতি নির্ধারণের প্রশ্নেও এরকম সন্দেহ পোষণ করা হয়ে থাকে। তা হল, এসব সেনসাস সঠিক নয়। প্রাপ্ত সরকারি সেনসাস সঠিক বলে মনে না করলে নিজেদের (সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের) উদ্যোগে সেনসাস গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ

মুজিবরের করুণ পরিণতির জন্য তিনিই দায়ী

গত ১৪ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা পরিবর্তনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'বাংলা দেশের অভ্যন্তরে' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আমি মনে করি তা পক্ষপাত-মুক্ত নয়।

বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে যে মন্তব্য আপনি করেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। বাংলা দেশের জনগণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। শেখ মুজিবর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করে এক দলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করেই এ দেশের জনগণের মন থেকে মুছে গেছেন। তাঁর এই করুণ পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কৃতকর্মই দায়ী, অন্য কিছু না। বর্তমানে বাংলা দেশের মানুষের মনে শেখ মুজিবর রহমান আবার ধীরে ধীরে একটা আসন করে নিচ্ছেন বলে আপনি আপনার প্রতিবেদনে যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট এবং আপনার এ ধারণা কাল্পনিক। বাস্তবের সংগে এর কোন মিল নেই। এ দেশের মানুষ 'মুজিব শাসনের' পুনরাবৃত্তি চায় না। আর তাই মানুষের মনে মুজিব কোন আসন করে নিতে পারছে না। এটাই বাস্তব।

পক্ষান্তরে প্রচ্ছদে শেখ হাসিনার ছবিটা বড় করে ছাপা হল, লেঃ জেঃ এরশাদ ও খন্দকার মোস্তাক সাহেবের ছবিগুলি তুলনামূলকভাবে অতি ছোট করে ছাপিয়ে কি একটি বিশেষ ব্যক্তি বা দলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। অবশ্য শুধু শেখ হাসিনার ওপর প্রতিবেদন হলে আমার বলার কিছু ছিল না কিন্তু যেহেতু প্রতিবেদনটি 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে সেহেতু বলতে হয় প্রচ্ছদের ছবিগুলিও পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যমূলক।

আমি মনে করতাম 'পরিবর্তন' একটি প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ পত্রিকা, কিন্তু এই প্রতিবেদনে কি আমার বিশ্বাসে চিড় ধরেনি?

'বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল' এই শিরোনামে উক্ত প্রতিবেদনে যে রাজনৈতিক দলগুলির নাম দেওয়া হয়েছে তাতে মুসলিম লিগ হুদা ও সবুর নামের এখন কোন সংগঠন বাংলাদেশে নেই। মুসলিম লিগ এখন দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি বিচারপতি বি এ সিদ্দিকি ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজের নেতৃত্বাধীন (এইটি মুসলিম লিগের বৃহত্তম অংশ), যার মূল নীতি 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' প্রতিষ্ঠা এবং অপর ক্ষুদ্র অংশটি টি আলি ও এম এ মতিনের নেতৃত্বাধীন, যারা গোঁড়া ইসলাম-পন্থী বলে দাবি করে।

উক্ত সংখ্যা 'পরিবর্তনে' বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া প্রসংগে সম্পাদকীয়-এর জন্য ধন্যবাদ।

মুরতুজা আলী চৌধুরী
৯, জুবলী রোড, চট্টগ্রাম

ধরনের উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। আর তা যখন এ মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না, তখন কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?

ওবায়েদুর বাবলু
সহ সম্পাদক, দৈনিক গণকণ্ঠ
২৪/টিপু সুলতান রোড
ঢাকা-৩, বাংলাদেশ

বাংলা সাহিত্য

পরিবর্তন ১৮ ২৪ মে, ১৯৮৩ সংখ্যায় সমীপেষু কলামে দেবযানী দত্তর 'প্রবাসে বাংলা সাহিত্য' লেখাটির পরিপেক্ষিতে কিছু বলার আছে।

দেখুন, একটা বস্তু সকলের কাছে সমাদৃত ও আকৃষ্ট তখনই হয় যখন বস্তুটি সার্বিকভাবে বিকশিত হয় বা হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে যে গভীর সৃষ্টিশীল ভাব, দর্শন ও রস অন্তর্নিহিত তা পৃথিবীর যে কোন ভাষাভাষীদের কাছে পরমাকাঙ্ক্ষিত। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি তার নিজস্ব গতিতে প্রবহমান, এখানে কতটুকুই বা ভিনদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুসৃত হয়েছে। বিদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি আমাদের জানার প্রয়োজন আছে কিন্তু তা আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জগাখিচুড়ি করার প্রয়োজন আছে কি?

সাহিত্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সমাজ যেহেতু একে অন্যের সঙ্গে অংগাঙ্গিভাবে জড়িত তাই ভিনদেশি রীতিনীতি আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রায় আসার ফলে যে সংক্রামক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা লক্ষ্য করছেন না কি?

এর ফলে আমাদের চিরাচরিত সনাতনী বাঙালি ঐতিহ্য যেভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে তাও লক্ষ্য করার বিষয়।

মোহাম্মদ আলী
উত্তর নালাপাড়া, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ

পরিবর্তন ছ'টাকায় কিনতে হয়

আপনার সু-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পরিবর্তন দেরিতে হলেও নিয়মিত পড়ি। কিন্তু ইদানীংকালে দু'টো বিভাগের অভাব আমাকে বড় হতাশ করে। একজন পাঠক হিসাবে আমি অতৃপ্ত থাকি। কারণ খ্যাতনামা সাংবাদিকদের স্মৃতি জড়িত উল্লেখযোগ্য ঘটনায় অনেক অজানাকে জানতে সাহায্য করেছে — সেই সুলিখিত বিভাগটি আর এখন পরিবর্তনে নেই কেন? একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ডেটলাইনের বিশেষ রচনা ও প্রতিবেদনও কেন আর থাকছে না?

পরিবর্তনের মুদ্রণসজ্জায় ফটো অফসেট ডাই কম্পোজিশনে নতুনত্ব হচ্ছে কিন্তু অস্পষ্ট।

পিনাকী মজুমদারের ক্রাইম রিপোর্ট সরজমিন পরিবর্তন এর অন্যতম আকর্ষণ। রহস্য সন্ধানী প্রতিবেদকের এই সুখপাঠ্য রচনা নিয়মিত অবশ্যই পরিবর্তনে থাকা দরকার এ দাবি একজন সচেতন পাঠক হিসাবে নিশ্চয় করতে পারি।

পরিশেষে একটি পরামর্শ, বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পরিবর্তনের পাতায় লেখার সুযোগ দিতে আপত্তি আছে কি? আর বাংলাদেশের যশোরে আমাদের পরিবর্তনে কেন প্রতি সংখ্যা ছ'টাকায় কিনতে হয়? এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু আছে কি — যাতে পরিবর্তন ন্যায্য দামে পাঠকদের হাতে পৌঁছাতে পারে।

মিয়া আবদুস সাত্তার
প্রধান সম্পাদক, দৈনিক স্ফুলিংগ
যশোর, বাংলাদেশ

এখানকার সংবাদ চাই

অত্যন্ত জনপ্রিয় ও তথ্যপূর্ণ সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন' চড়া দামে হলেও নিয়মিত পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। যেহেতু 'পরিবর্তন' ভারত এবং বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেহেতু এখানকার কিছু উল্লেখযোগ্য সংবাদ মাঝে মধ্যে প্রকাশ করা উচিত।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সাদিপুর, সিলেট
বাংলাদেশ

পরিবর্তন কেমন পত্রিকা

গত ২, ৮ ১১-৮৩ তারিখের পরিবর্তনে মাননীয় ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন স্বীকৃত মানী ব্যক্তির নামোল্লেখ করে জামশেদপুর থেকে বাবু সনাতন মাহাত যে মনগড়া সিদ্ধান্তে অভব্য উক্তি করেছেন সেটি ঐ পত্রিকার প্রথম কলমে প্রকাশ করায় সম্পাদকের নিম্নস্তরগুণোর পরিচয় দেয়। কিন্তু কেবল কটা ভাববাচ্য বাক্য যথা মাটির গন্ধ, প্রাণের পরশ ইত্যাদি প্রয়োগেই ঐ পত্রিকা ও সম্পাদকের প্রতি দোষারোপ করা কোন যুক্তি বা প্রমাণ নয়। পক্ষান্তরে ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনার শৈলী-মাধুর্য-ভাণ্ডারে মাঝে মধ্যে বহু বিদগ্ধ জনের মানসিক সুস্বাদু জুরি ভোজের আয়োজন থাকে। এত অল্প সময়ে পরিবর্তনের অসামান্য সাফল্য প্রমাণ করে যে মত পুরী ও ... বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ... সম্পাদনা এবং তাঁদের সহকারীদের ... ও সার্থক প্রচেষ্টা। বস্তুতপক্ষে পরিবর্তন আধুনিক পত্রিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার পথপ্রদর্শকও বটে। এ সব বিষয় মাহাত মহাশয়ের অজ্ঞাত হলেও বাস্তব সত্য।

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
ধানবাদ

বাংলা চলচ্চিত্র

গত ৭ সেপ্টেম্বরের 'পরিবর্তন' (চলচ্চিত্র সংখ্যা) পড়ে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। কারণ, বাংলা চলচ্চিত্রকে আমি খুবই ভালবাসি। মহানায়ক 'উত্তমকুমার' মারা যাওয়ার পর থেকে এই তিন বছর বাংলা চলচ্চিত্র খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শিল্পী এবং চলচ্চিত্র অনুরাগীদের উচিত এগিয়ে আসা এবং এই বিপদের হাত থেকে বাংলা চলচ্চিত্রকে উদ্ধার করা।

অভিজিৎ বিশ্বাস
কোন্নগর, হুগলী

নিষিদ্ধ ইনজেকশন প্রসঙ্গে

পরিবর্তনে ২৭ জুলাই '৮৩ সংখ্যায় ডাঃ মৃণাল বসুর 'কলকাতার হাসপাতালে বিদেশে নিষিদ্ধ ইনজেকশন প্রয়োগ করা হচ্ছে' লেখাটি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য কয়েকটি তথ্য জানাচ্ছি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের অতি আধুনিক বহুদিন স্থায়ী ইনজেকশন DMPA এবং NET EN ৮০ বহু দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। DMPA 150 mg সাধারণত তিন মাস ছাড়া এবং NET EN 200 mg প্রতি ৮ সপ্তাহ ছাড়া প্রথম ৬ মাস, প্রতি ১২ সপ্তাহ ছাড়া পরে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ২.৩ লক্ষ মহিলা DMPA ব্যবহার করছেন। প্রায় ২৭৫000 জন মহিলা NET EN ব্যবহার করছেন। এটা ব্যাপকভাবে জামাইকা, থাইল্যানড, শ্রীলংকা এবং নিউজিল্যানড প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে থাইল্যানডে সামগ্রিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ DMPA ব্যবহার করে থাকেন। মেকসিকো এবং চীন দেশে মাসিক জন্মনিরোধক ইনজেকশন (প্রজেসটিন ও ইসট্রোজেন) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। DMPA এবং NET EN ব্যবহারকারীদের মধ্যে বার্ষিক গর্ভধারণের গড় শতকরা একভাগেরও কম। DMPA ব্যবহারের কুফল

হিসাবে [illegible] মাল, ওজন বৃদ্ধি ইত্যাদি। সুফল হিসাবে স্তন্যদায়ী মহিলাদের বুকের দুধ বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির ন্যায় পেলভিক ইনফ্লামেটরি অসুখের (PELVIC INFLAMETORY DISEASES) সম্ভাবনা কম। DMPA ব্যবহারের ফলে আফরিকার দেশগুলিতে SICKLE-CELL রোগ এবং GENETIC DISORDER-এর সম্ভাবনা কম থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন DMPA ব্যবহারের ফলে স্তনের ও জরায়ুর মুখের ক্যানসার হবার অতিরিক্ত কোন সম্ভাবনা নেই।

DMPA জন্মনিরোধক হিসাবে আমেরিকায় বিক্রি হয় না। কেননা আমেরিকান খাদ্য ও ড্রাগ অ্যাডমিনিসট্রেসন (USFDA) এটাকে অনুমোদন করেননি, প্রধানত চারটি কারণে: ১। DMPA ব্যবহারকারিণীদের স্তনে গোটা (NODULE) হবে না এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এখনও পর্যন্ত প্রমাণ করা যায়নি। ২। জন্মনিরোধক নিষ্ফল ক্ষেত্রে জন্মগত বিকলাঙ্গতার সম্ভাবনা থাকতে পারে। ৩। মাসিকের গোলমালের জন্য ইসট্রোজেন ব্যবহার। ৪। কেবলমাত্র DMPA-র প্রয়োজন আমেরিকাতে আছে তা প্রমাণ করা যায়নি।

গত জানুয়ারি '৮৩তে আমেরিকান FDA (খাদ্য ও ড্রাগ অ্যাডমিনিসট্রেসন) পুনরায় DMPA সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন, অনুমোদনের সপক্ষে।

১৯৮১ সালে সুইডিস ন্যাশনাল বোর্ড অফ হেলথ এবং ওয়েলফেয়ার DMPA জন্মনিরোধক হিসাবে ব্যবহারের জন্য লাইসেনস অনুমোদন করেছেন। পশ্চিম জার্মানি সম্প্রতি DMPA এবং NET EN-কে বিনাশর্তে জন্মনিরোধক হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেছেন। ১৯৮২ সালে বৃটেন যুক্তরাজ্য DMPA ব্যবহারের প্রাথমিক অনুমোদন করেছেন।

মোহনলাল সরকার
ইনডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন
বজবজ শাখার পক্ষে

আমরা কৃতজ্ঞ

আপনার 'পরিবর্তন' পত্রিকার 'শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা' নিবন্ধগুলির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি, বর্তমান বিবরণ, পথনির্দেশ এবং প্রতিটি ছবি এই নিবন্ধগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং আমাদের মত শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগামীদের অন্তরে এক নতুন উদ্দীপনের সঞ্চার করেছে। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

অরুণকুমার মুখারজি
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি কেন্দ্র, হলদিয়া

আনন্দিত

সম্প্রতি আপনাদের 'পরিবর্তন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাস্থলের বর্ণনা প্রকাশ করছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি। 'বাসুদেব অঙ্গন বৈষ্ণব সমাজের' পক্ষ থেকে আপনাদের পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্যামলকুমার গোস্বামী
সম্পাদক, 'চৈতন্য-ভারতী' পত্রিকা
নবদ্বীপ, নদীয়া

যা চাই

পরিবর্তন পত্রিকা আজ যে সার্বজনীনতা লাভ করেছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনে পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর দূরদর্শীতার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতি, খেলাধূলো, গানবাজনা, সিনেমা এবং দেশ বিদেশের খবর, বিভাগগুলি চালু রাখা এবং চালু করার প্রয়োজন।

দেবব্রত বিশ্বাস
গোরাবাজার, মুরশিদাবাদ

কাঁকের মানসিক হাসপাতাল

মানসিক হাসপাতাল সম্বন্ধে ৯ নভেম্বর সংখ্যার রচনাগুলি পড়লাম।

শুধু কাঁকের মানসিক হাসপাতালের স্থাপন, হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ বর্ণনা, রোগীদের থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু এটা কি জনসমস্যামূলক রচনা হল? না এতে মানসিক রোগীর কোন সুরাহা হবে? মানসিক রোগীর আত্মীয় স্বজনরা কীভাবে যোগাযোগ করবেন বা কীভাবে ভর্তির ব্যবস্থা করবেন, যাতে সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে এ ধরনের লেখা হলে খুব ভাল হত।

আর ডাঃ শ্রীধর শর্মার সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। শিবেশবাবু যদি প্রশ্ন করে মাদকাসক্তি থেকে কীভাবে বিরত থাকা যায় বা এতে আসক্ত হলে সাধারণ জনজীবন কতটা বেহাল হয়ে পড়ে এবং আসক্ত ব্যক্তির কতটা ক্ষতি করে ইত্যাদি জেনে লিখতেন তাহলে অনেক কাজে আসত।

দুর্গাদাস চন্দ্র
দুবরাজপুর, বীরভূম

প্রবাসীর পাতা

জামশেদপুরের বাঙালি জীবন এবং সংস্কৃতি

কসমোপলিটান শহর জামশেদপুরের কলজে হল টিসকো, টেলকো, ইনডিয়ান টিউব ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই সব কোমপানিতে চাকরি-বাকরির আশায় বাঙালিরা এসেছেন।

১৯০৪ সালে টিসকোর পত্তনে প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বোসই টাটাদের 'গুরু মহিষানী' ও অন্যান্য স্থানের লৌহপাথর ভাণ্ডারের খবর দেন। তাই এই শহরে পি এন বোসের একটা মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

কথায় আছে, বাঙালি যেখানে যায় গড়ে কালী মন্দির, ক্লাব, লাইব্রেরি, নিজের জন্য বাসগৃহ এবং প্রকাশ করে একটা সাহিত্য পত্রিকা। এই প্রবাদের সত্যতা জামশেদপুরে পাওয়া যাবে। কৌরব, উদ্দীপ্ত, কালিমাটি, সিংভূম বার্তা, গল্প মালা প্রভৃতি বেশ কিছু সাহিত্য পত্রিকা এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়। অতীতে এই শহরে 'চলন্তিকা' সাহিত্য পরিষদ সর্বত্র এক চর্চার বিষয় ছিল। 'চলন্তিকা' সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাঃ বিষ্ণু মুখারজির পিতা স্বর্গীয় ডাঃ ব্রহ্মপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একথা উল্লেখ্য যে অধুনা বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন লেখক এই শহরেরই অবদান। নাটকের জন্য একটা পৃথক পত্রিকা 'নাট্য সমাচার' এই শহরের নাট্য সচেতনতার প্রকাশ। 'বর্তিক', 'ক্যাকটাস', 'শৌভিক' ইত্যাদি বহু স্থানীয় শৌখিন নাট্যসংস্থা জামশেদপুরের সচেতন নাট্য সংস্কৃতির স্বাক্ষর এই শহরের বাইরেও রেখে এসেছেন।

স্থানীয় রবীন্দ্রকলা মন্দির (টেগোর সোসাইটি) রবীন্দ্র সংস্কৃতির কেন্দ্র। শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন ও এর বহুল প্রচার এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাঙালি সংস্কৃতিমনস্ক। স্থানীয় বেংগল ক্লাব, মিলনী, সবুজ কল্যাণ সংঘ, শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যাভবন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লেগেই আছে। উচ্চাঙ্গসংগীত, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি ছাড়াও পুজো পার্বণে এখানে যাত্রা গানের আসর বসে।

রাজনীতিতেও এখানে বাঙালিরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দু দশক আগে স্বর্গীয় মণি ঘোষ জামশেদপুর থেকে লোকসভায় নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। অনিল সেন এম এল সি ছিলেন এবং ডাঃ বিষ্ণু মুখারজিও রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন কিছুদিন।

জামশেদপুর, বিহারের খেলাধূলোর রাজধানী। ফুটবল, ক্রিকেটে অতীতে বাঙালিরা বিহারের হয়ে বহু উজ্জ্বল কৃতিত্ব রেখে গিয়েছেন। এখনও বিভিন্ন খেলায় বহু বাঙালি বিহারের প্রতিনিধিত্ব করে এই রাজ্যের গৌরব এনে দেন। ফুটবলার পি কে ও লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন-এর দিলীপ বোস জামশেদপুরে তাঁদের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্ত কাটিয়ে গেছেন। বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সেকরেটারি এই শহরবাসী প্রঃ পি সি (দুলাল) মুস্তফী।

তবে সবই সুখের নয়। শিক্ষায় অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীরা উন্নত হওয়ায় চাকরি-বাকরিতে বাঙালিদের আধিপত্য কমছে। বিহার সরকারের সাহায্য আছে ঠিকই তবে প্রাথমিক স্কুলে রাজ্য সরকার অনুমোদিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রতি বছর দেরিতে প্রকাশ পাওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ স্থানীয় বঙ্গসন্তানদের পক্ষে অসুবিধা জনক হয়ে পড়ছে।

পাটনা থেকে দূরে কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি বলেই হয়ত জামশেদপুরে খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে, কলকাতার একটা ছাপ দেখা যাবে। এবং আমরা কিন্তু সত্যিই কলকাতামুখীন, কলকাতার উত্তেজনায় এখানকার বাঙালিদের বাঙালিত্বের পারদ ওঠে নামে। কলকাতা জামশেদপুরের বড় বোন।

শ্যামল শীল
জামশেদপুর-৯, বিহার

কর্মপ্রার্থী

আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। কলকাতায় ওষুধ তৈরীর ফার্ম বা কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি চাই। বকস নং ৩

শহীদ জ্যোতি?

নিবেদনমিদং

এবারের সংখ্যাটির পর আর মাত্র একটি সংখ্যা। এরপর ১৯৮৩ শেষ হয়ে গেল। আগামী নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের।

১৯৮৩ সাল আমাদের সাফল্যের বছর, সংগ্রামের বছরও। একটি পত্রিকার সাফল্য নির্ভর করে যখন তার লেখাগুলি নিয়ে সমাজে আলোচনা হয়। পরিবর্তনের বহু লেখাই এ বছর জনসমাজে আলোড়ন তুলেছে। এই বছরই আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি এমন একটি নারী সংখ্যা যা নারী সমাজের সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই বছরই আমরা শুরু করেছিলাম পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন। গণমাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালনের অসামান্য ভূমিকা আমরা পালন করেছি। পরিবর্তনের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে মৈত্রীর সেতু-বন্ধ রচনার জন্য আমরা এই বছরই শুরু করেছি মৈত্রীসংঘ [illegible]। আমাদের যে যে বিশেষ সংখ্যা সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে আছে বিবাহ সংখ্যা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, মিষ্টান্ন সংখ্যা, চলচ্চিত্র সংখ্যা। এই বছর আমরা একান্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা, চলচ্চিত্র পরিচালক রিচার্ড অ্যাটেনবরো, মোরারজী দেশাই, রাজীব গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মানেকা গান্ধী প্রমুখের মত ব্যক্তিদের।

এই বছরই আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম পাকিস্তান বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর একটি বড় রক্তক্ষয়ী গণ্ডগোল অনিবার্য। আমরা অনেক আগে বলেছিলাম সামরিক শাসকের ধরাচুড়ো ছেড়ে এরশাদ সিভিলিয়ান হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে চান।

এই বছর আমাদের প্রতিবেদকেরা ছুটে গিয়েছেন পাঞ্জাবে, বোমবায়ে, বিহারে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে। গিয়েছেন পাকিস্তানে, বাংলাদেশে এবং [illegible]

এ বছরের সবচেয়ে সাফল্য ভারত সরকার পরিবর্তনকে জাতীয় সংবাদপত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। আমাদের দিল্লি প্রতিনিধিরা এখন ভারত সরকার-অনুমোদিত সাংবাদিক। প্রধানমন্ত্রীর দফতর পরিবর্তনকে নির্বাচিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরের সঙ্গী হিসাবে। এই বছরই আমাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লিতে খোলা হয়েছে আমাদের অফিস।

আমাদের গড় প্রচার সংখ্যা এ বছর আরও বেড়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনও। বেড়েছে দৈনন্দিন চিঠিপত্রের সংখ্যাও। প্রতি সপ্তাহে শব্দশৃংখলের সমাধানই আসে এখন ৭০০র মত। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পাদকীয় দফতরে নানা ধরনের চিঠি এসেছে ১৪ হাজারের মত। এর মধ্যে সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিয়েছেন বা লিখেছেন আড়াই হাজারের মত চিঠি। এখনও পর্যন্ত দিল্লি ছাড়া অন্য কোন শহরে পরিবর্তনের বেতনভুক স্টাফ নেই বটে কিন্তু নিউইয়র্ক, লন্ডন ভারতবর্ষের গৌহাটি, আগরতলা, পাটনা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আমাদের প্রতিনিধি আমরা ঠিক করে ফেলেছি। গত বছরটিতে পাঠক পাঠিকাদের সংগে আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে। পাঠকদের নানাবিধ সুচিন্তিত মতামত আমরা প্রকাশ করেছি।

পরিবর্তন নামের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা ক্রমাগত পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছি। ১৯৮৪ সালেও আমরা কিছু কিছু পরিবর্তন আনব। বিষয় বিন্যাসে ও আংগিকেও। তবে এই পরিবর্তন আসবে খুব ধীরে ধীরে এবং পাঠক পাঠিকাদের ঈপ্সিত পথ ধরেই।

১৯৮৪ সালের একটি আগাম খবর জানিয়ে রাখি। শব্দশৃংখল বিভাগে এতদিন আমরা দুটি পুরস্কার দিচ্ছিলাম। এখন থেকে দেব ২০ টাকা করে ৫টি পুরস্কার। এ ছাড়া আরো দশজন সফল উত্তরদাতার জন্য পাঠাব একটি করে সারটিফিকেট। আমরা নতুন বছরের গোড়া থেকে একটি সাধারণ জ্ঞানের ধাঁধার আসর খুলছি। এখানেও সফল উত্তরদাতাদের পাঠান হবে একটি করে সারটিফিকেট। যিনি দশটি সারটিফিকেট যোগাড় করতে পারবেন তিনি পাবেন একটি বিশেষ পুরস্কার। প্রতিবছর একটি অনুষ্ঠান করে এই পুরস্কারগুলি দেওয়া হবে।

নতুন বছরে মুসলমান খৃস্টান ও বৌদ্ধ সমাজ সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে প্রতি মাসেই একটি করে নিয়মিত ফিচার প্রকাশ করা হবে। এই ফিচারটির নাম হবে 'ভারততীর্থ'। সাম্প্রদায়িক ঐক্য বা একাত্মতার কথা মনে রেখেই এই ফিচার। এই ফিচারে থাকবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নানা সমস্যার কথা। লিখবেন সেই সম্প্রদায়ের লোকেরাই।

নতুন বছরের আরো পরিকল্পনার কথা আগামী সংখ্যার জন্য তোলা রইল। আজ এখানেই

অসমর্পিত,
পা.চ.

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ

নিশীথ দে

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানারজি এমন একটা যুগে জন্মেছিলেন যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে এ দেশের মানুষের তেমন কোন পরিচয় ঘটেনি। এক রাজ্যের সংগে আর এক রাজ্যের কোন আদান প্রদান ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে দেশে ঐক্য মন্ত্র এবং সহানুভূতি সঞ্চারিত করলেন। সুরেন্দ্রনাথ নব্য ভারতের রাজনীতির দীক্ষাগুরু।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। কিন্তু কংগ্রেসের জন্মের বীজ রোপণ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে। আর সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সালে কারামুক্তির পর পুনর্বার দেশের কাজে জাতির ঐক্য চেতনাবোধ সঞ্চারে প্রবৃত্ত হলেন। সে সময়ে তিনি জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তাঁর চেষ্টায় ১৮৮৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় ইনডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ পায়। পরবর্তী কালে কংগ্রেস যে প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভা, স্বায়ত্ত শাসন, শিক্ষা, শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলন করে ইনডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সেই তা আলোচিত হয়।

ইনডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১৮৮৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দেন। ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়। ঠিক এই একই সময়ে বোমবাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রথম অধিবেশন বসে. আগে কেউ জানতেন না যে দুটি অধিবেশন একই সময়ে হতে যাচ্ছে। অথচ দুটি অধিবেশনের কর্মসূচি এবং উদ্দেশ্য এক।

বোমবাই এর অধিবেশনেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উমেশচন্দ্র বোমবাইতে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় ইনডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনে দারুণ ব্যস্ত। শুধুমাত্র এই কারণেই সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি।

কলকাতা এবং বোমবাইতে যখন দুটি অধিবেশন চলছিল সেই সময় মাদরাজেও অ্যালান হিউমের উদ্যোগে একটি সম্মেলন হয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ইনডিয়ান কনফারেন্সের সকলে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন।

সুরেন্দ্রনাথ যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন, তিনি প্রত্যেকবার ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সংস্কার ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের প্রস্তাব তুলেছেন এবং যুক্তি দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ সারা জীবন যে রাজনীতিকে সম্বল করে আন্দোলন করে গিয়েছেন তার মূল লক্ষ্য ছিল সিভিল সার্ভিস সমস্যার সমাধান, স্বায়ত্ত শাসন, ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ স্বদেশী আন্দোলন, বংগদেশ বিভাগ প্রতিরোধ করা। কংগ্রেসের বাইরেও তিনি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

ইংরেজ শাসকদের প্রচারের ফলে মানুষেরা তখন বদ্ধমূল' ধারণা যে বংগদেশ ভাগ হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে সেই প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে দিলেন মানুষের ঘরেঘরে। শেষ পর্যন্ত কারজন সুরেন্দ্রনাথের অবিচল বিশ্বাস এবং সংগ্রামী মনোভাব দেখে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। বংগদেশ ব্যবচ্ছেদ বাতিল হল।

কলকাতায় ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভবন তৈরি হয়েছিল আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই। ১৮৮৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ যখন মাদরাজে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তখন ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার সংগে পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ায়। কথায় কথায় ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কথা ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ তখন ভবন নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছেন।

মহারাজা জিগেস করলেন, ভবন নির্মাণের জন্য কত টাকার দরকার এবং কত টাকা চাঁদা উঠেছে।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, দরকার ২০ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। এর মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী দিয়েছেন দু হাজার টাকা।

মহারাজা বললেন, আপনার সময়ের অনেক দাম। চাঁদা তোলার কাজে সময় নষ্ট করবেন না। বাকি ১৫ হাজার টাকা আমি দিচ্ছি।

সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের জন্য মহারাজা সংগে সংগে তাঁর হাতে পনের হাজার টাকা তুলে দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের আর একটা বড় পরিচয় বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তৃতা শুনে কেউ উঠে যেতে পারতেন না। জনসমাবেশকে জমজমাট করার জন্য সভার আগে আহ্বান জানান হত সুরেন্দ্রনাথকে। ১৮৮৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের উপর ভার পড়ল কংগ্রেসের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার। সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করতে উঠলেন। বিরাট কংগ্রেস মণ্ডপে যেন উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এল। মহিলারা গায়ের গয়না খুলে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে ৬৪ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এর মধ্যে কংগ্রেস মণ্ডপেই নগদ সংগৃহীত হল ২০ হাজার টাকা।

সুরেন্দ্রনাথ কোনদিন নিজের জন্য দূরের কথা, রাজনৈতিক কাজের জন্যও চাঁদার টাকা খরচ করেননি। ১৮৮৯ সালে বোমবাই কংগ্রেসে ঠিক হল, কংগ্রেস ইংল্যানডে এক প্রতিনিধিদল পাঠাবেন। এঁরা রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ইংল্যানডের জনগণকে বুঝিয়ে বলবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন হিউম, স্যার ফিরোজ সা মেটা, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সফিয়ুদ্দিন, আরডলি নরটম, আর এন মধোলকার এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের খরচে যাতায়াত, থাকা, সবকিছু। মাথা পিছু খরচ হবে ৪ হাজার টাকা। সুরেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। সম্পত্তি বলতে ১৩ হাজার টাকার কোমপানির কাগজ। তাও স্ত্রীর নামে। তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এলেন। স্বামীর হাতে তুলে দিলেন চার হাজার টাকা।

বিলেতে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে বহু গণ্যমান্য লোক করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন। অনেকে বললেন, ভারতীয় ব্যাপারে এমন বক্তৃতা আজ পর্যন্ত শুনিনি। এরপর বহুবার বক্তৃতা করার জন্য বিলেত থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ এসেছে।

ইংরেজরা সুরেন্দ্রনাথকে বলতেন, 'সারেনডার নট।' সত্যি, তিনি জীবনে কোনদিন কারুর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, পরাজয় স্বীকার করেননি।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষ ছিলেন

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর সূচি

১৮৮৫	ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন
১৮৯১	এজ অফ কনসেন্ট অ্যাক্ট
১৮৯২	ইনডিয়ান কাউনসিল অ্যাক্ট
১৮৯৬	বোম্বাইয়ের প্লেগ, কালান্তক দুর্ভিক্ষ
১৯০২	স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু
১৯০৫	বংগ বিভাগ, স্বদেশী ও বয়কট
১৯০৬	মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা, কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজের দাবি ঘোষণা
১৯০৯	মরলি মিনটো সংস্কার
১৯১১	দিললি দরবার, বংগভংগ রদ
১৯১২	কলকাতা থেকে দিললিতে রাজধানী স্থানান্তর
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ
১৯১৯	মনটেগু-চেমসফোরড সংস্কার, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড
১৯২০	তিলকের মৃত্যু, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের
১৯২১	প্রিনস অফ ওয়েলস এর ভারত ভ্রমণ বয়কট
১৯২২	চৌরিচৌরা র হত্যাকাণ্ড
১৯২৩	স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা
১৯২৫	দেশবন্ধুর মৃত্যু
১৯২৭	সাইমন কমিশন
১৯২৮	নেহেরু রিপোরট, কংগ্রেসের ইনডিপেনডেন্স লিগের প্রতিষ্ঠা
১৯২৯	কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতবর্ষের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা
১৯৩০	আইন অমান্য আন্দোলন, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক
১৯৩১	গান্ধী আরউইন চুক্তি
১৯৩২	গান্ধীজীর কারাবাস, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পুণা চুক্তি
১৯৩৪	আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার
১৯৩৫	ভারত শাসন আইন
১৯৩৭	প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন (আগসট), কংগ্রেস কর্তৃক ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন
১৯৩৯	ভাইসরয় কর্তৃক ভারতবর্ষের জন্য ডোমিনিয়ান স্টাটাস এর লক্ষ্য ঘোষণা, প্রাদেশিক কংগ্রেসি মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগ, ত্রিপুরি কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হিসেবে নির্বাচন এবং পরে পদত্যাগ। ফরওয়ারড ব্লক এর প্রতিষ্ঠা
১৯৪০	মুসলিম লিগ কর্তৃক পাকিস্তানের দাবি ঘোষণা
১৯৪১	সুভাষচন্দ্র বসুর জারমানিতে পলায়ন
১৯৪২	ক্রিপস মিশন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (আগসট), আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠন
১৯৪৩	সিংগাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন (২১ অকটোবর)
১৯৪৫	রেংগুন পুনরধিকার এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণ
১৯৪৬	রয়্যাল ইনডিয়ান নেভি-র বিদ্রোহ (ফেবরুয়ারি), ক্যাবিনেট মিশন, মুসলিম লিগ কর্তৃক 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা (আগসট)
১৯৪৭	মাউনটব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভাগের ভিত্তিতে ভারতের উভয় অংশকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব ঘোষণা (৩ জুন), ভারতের স্বাধীনতা লাভ (১৫ই আগসট)

সংকলক : ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

প্রাচীনপন্থী। পিতামহ ছিলেন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কঠোরভাবে ব্রাহ্মণের আচার-ধর্ম পালন করতেন। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র (সুরেন্দ্রনাথের বাবা) দুর্গাচরণকে সেকালের প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ডেভিড হেয়ারের প্রিয় শিষ্য। পরে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন। হেয়ার সাহেবের সাহায্যে তিনি শিক্ষকতা করতে করতে মেডিকেল কলেজে পড়ে ডাক্তারি পাশ করেন। পরে কলকাতার সেরা ডাক্তার হয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন বাংলা শেখার জন্য পাঠশালায় ভর্তি হন।

স্কুল কলেজে পড়ার সময় সুরেন্দ্রনাথের কোন গৃহশিক্ষক ছিলেন না। আত্মনির্ভর হয়ে ইংরেজি এবং ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'যে সকল অ্যাংলো ইনডিয়ান এবং ইউরোপীও শিক্ষক ও অধ্যাপকের নিকট আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাঁহারা বরাবরই আমার উপর সদয় ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারে জাতি বিদ্বেষের বিন্দুমাত্র আভাস বা এ দেশীয়দের প্রতি ঘৃণার ভাব আমি দেখি নাই।

ছাত্রাবস্থা হইতে আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহারই প্রভাবে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। এই দীক্ষার মূল – আমার বিদ্যাপীঠ বা স্কুল-কলেজ।'

বি এ পাশ করার পর অধ্যক্ষ জন সাইম দুর্গাচরণবাবুকে বললেন, সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সারভিস পরীক্ষার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দিন।

১৮৬৮ সালের ৩ মারচ চাঁদপাল ঘাট থেকে জাহাজে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – তিন তরুণ বিলেত যাত্রা করেন। পরের বছর ইনডিয়ান সিভিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু বয়স নিয়ে গোলমাল বাধল। আই সি এস তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় এবং পরে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৮৭৪ সালে তাঁকে আই সি এস থেকে পদচ্যুত করা হয়। পরে তিনি ব্যারিসটার হওয়ার চেষ্টা করেন। আপত্তি উঠল, সিভিলিয়ান ব্যারিসটার হতে পারেন না।

ত্রিপুরা সরকার মাসিক ৭০০ টাকা বেতনে সুরেন্দ্রনাথকে ইংলিশ সেকরেটারির পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। বেশ কিছুদিন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন।

লরড রিপন স্বদেশে ফিরে যাবার কিছুদিন আগে সুরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজ (এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) স্থাপন করেন।

১৮৭৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপনা করেছেন। ১৯১৩ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেজন্য তাঁকে প্রায়ই দিললিতে যেতে হত। অধ্যাপনার কাজে তিনি ফাঁকি দিতে চাননি, তিনি তাঁর জীবনের পরম প্রিয় শিক্ষকতা ব্রত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে সুরেন্দ্রনাথ সারাজীবন আন্দোলন করেছেন। তিনি ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত কলকাতার পুরসভার সদস্য এবং ব্যারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন তিনি ব্যারাকপুরে মণিরামপুরেও ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুবার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন ১৮৯৫ সালে পুনায় এবং ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। শুধু রাজনীতি নয় তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ছাত্রদের বয়সের সীমা বাড়ানোর দাবিতে লর্ড লিটনের সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এর সংবাদদাতা হিসাবে। ১৮৭৯ সালে তিনি নিজেই 'বেংগলি' পত্রিকা বের করেন। একটি প্রবন্ধে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয়। ইংরেজের সরকারি আদালতে প্রথম রাজনৈতিক বন্দী সুরেন্দ্রনাথ।

[illegible] সুরেন্দ্রনাথ নতুন একটি যুগের স্রষ্টা। তিনি 'মডারেট রাজনীতি' গ্রহণ করে পরবর্তী যুগের সংগে তাল রেখে চলতে পারেননি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলনের পথে এগিয়ে চলেছে সুরেন্দ্রনাথ তখন ইংরেজের শাসন সংস্কার সমর্থন করলেন। ইংরেজ শাসকরা সুরেন্দ্রনাথকে 'স্যার' উপাধি দেন। সুরেন্দ্রনাথ [illegible] মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সংগে সংগে মুক্তিকামী মানুষের ঘৃণা ও নিন্দার [illegible] হয়ে উঠলেন [illegible]

এর দু বছর পর, ১৯২৩ সালে দেশবন্ধুর স্বরাজ দলের প্রার্থী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে নির্বাচনে পরাজিত হন। সেই সংগে তিনি রাজনীতি থেকেও অবসর নেন।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায় ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর। মৃত্যু ১৯২৫ সালের ৬ আগস্ট। সুরেন্দ্রনাথের 'A Nation in making' গ্রন্থ আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস ভিত্তিক মূল্যবান দলিল।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা

জহর সেন

প্রাক কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম তারিখ (২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫) আমরা জানি। কিন্তু, জাতীয় আন্দোলন কবে শুরু হয়েছে, তা নির্দিষ্ট তারিখ চিহ্নিত করে বলা সম্ভব নয়। তবু, একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে একটি আইন জারি হয়েছিল। এই আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও আরও অনেকে সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করে ছিলেন। সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। তারা তখন বৃটিশ রাজার কাছে আপিল করেন। এই আপিলও প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষে এই পদক্ষেপ জাতীয় আন্দোলনের পথনির্দেশ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একথা সত্যি, কংগ্রেসের জন্মের বেশ কিছু আগেই জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দেশাত্মবোধক কাব্য ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় মঞ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও স্বামী দয়ানন্দের ধর্মান্দোলন এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছিল। সিপাহি বিদ্রোহ, নীলকর আন্দোলন ও হিন্দু মেলার মধ্যে দিয়ে [illegible] আকুলতা, আশা ও প্রতিজ্ঞা [illegible] হয়েছে। ছাড়াও ল্যান্ড হোলডারস সোসাইটি, বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, মাদ্রাজ [illegible] অ্যাসোসিয়েশন, বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন, বোম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, পুনা [illegible] সভা, এবং জাতীয় কনফারেন্সের মত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান তাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, [illegible]ভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী [illegible] ছিল। এই পটভূমিতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে।

জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ – ১৯৪৭

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন। তৃতীয় বিশ্বেও এই সংগঠন প্রাচীনতম। ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে কংগ্রেস সফল নেতৃত্ব দিয়েছে এবং স্বাধীনতার পর দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়েছে। ১৯৪৭ এর পর কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্র পালটে গেছে। আদি পর্বে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি : ১। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশসেবায় যারা ব্রতী, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা। ২। জাতি ও ধর্মগত সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা দূর করে জাতীয় ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ৩। ভারতের অগ্রগতির বাধাগুলি বিধিসংগত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দূর করে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন।

প্রতিষ্ঠার পর প্রায় বিশ বছর কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল খুবই সীমিত : ভারতে ও বিলেতে একই সংগে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ, ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সদস্য গ্রহণ, সামরিক ব্যয় হ্রাস করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণের ব্যবস্থা। ১৮৮৮ সালের পর কংগ্রেস সম্পর্কে সরকারি মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। ১৮৮৭ ৮৮ সালে কংগ্রেস যখন অখণ্ড ভারতীয় ঐক্যের কল্পনায় স্বপ্নাবিষ্ট সেই সময় স্যার সৈয়দ আমেদ ও লর্ড ডাফরিনের গলায় শোনা গেল ঐতিহাসিক ঘোষণা হিন্দু ও মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে কংগ্রেসের আদিপর্বের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। শিবনাথ শাস্ত্রী 'স্বদেশী ধর্ম্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ইহা বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার, বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিগণকে এক স্বদেশানুরাগ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক স্থলে আনিয়া উপবিষ্ট করিতেছে।... আমি এই ভারতীয় একতা সাধনকে কংগ্রেসের মহামূল্য কার্য্য বলিয়া মনে করি।' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১২ বা জুলাই, ১৯০৫)

১৮৯৩ ৯৪ সালে বোম্বে থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ 'নিউ ল্যাম্পস ফর ওলড' শিরোনামে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি প্রথম প্রবন্ধে লেখেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হল লেজিসলেটিভ কাউনসিলগুলির আয়তন বৃদ্ধি।

অন্য সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা বলা যায় ব্যর্থতা। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি আক্ষেপ জানালেন, 'কংগ্রেস যে আমাদের একসংগে কাজ করতে শিক্ষা দিয়েছে, তার সামান্যতম প্রমাণও দেখতে পাওয়া যায় না, আমরা অবশ্য একসংগে কথা বলতে শিখেছি, কিন্তু তা হল একেবারে ভিন্ন কথা। তৃতীয় প্রবন্ধে অরবিন্দ প্রশ্ন তুললেন, 'উদাসীন বেলসাজারের মত কংগ্রেস আর কতদিন পরস্পরের প্রশংসা গুঞ্জরিত উৎসব সভা সাজিয়ে বসে থাকবে।'

১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। তিলক, খাপার্দে এবং অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের প্রবক্তা এবং সুরেন্দ্রনাথ, মেহতা, রাসবিহারী ও গোখলে ছিলেন নরমপন্থীদের নেতা। সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্নে উভয় গোষ্ঠীর বিবাদ শুরু হয় এবং কংগ্রেস ভেঙে যায়। ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত চরমপন্থীরা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেননি। সুরাট কংগ্রেসের পরিণতি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ একবার চিঠিতে (২৩ পৌষ ১৩১৪) জগদীশ চন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন, 'এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে [illegible] পক্ষ দাঁড়াইয়াছে [illegible] চরমপন্থী মধ্যমপন্থী ও মুসলমান চতুর্থ পক্ষটি গভর্ণমেনটের প্রাসাদ বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে।... আমাদের নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না মর্লিরও নয়, কিচেনারেরও নয় আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দে মাতরম ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে [illegible] করিতে পারিব।'

১৯১৯ সালের ১৪ মার্চ রৌলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আইন পাশ হয়েছিল, গান্ধীজী নিরুপদ্রব প্রতিবাদের আহ্বান জানালেন। এটাই হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের প্রথম [illegible] দেশের জাতীয় আন্দোলনের পাদপ্রদীপে [illegible] গান্ধীজীর [illegible] আবির্ভাব [illegible] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুক্তি সংগ্রামের প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] বিস্ময়, গান্ধী [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্লেষণ করে [illegible] মার্কসবাদী নেতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়, 'এলেন গান্ধীজী, এক নিমেষে সকল [illegible] হয়ে গেল।... শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাস্তবতা বিবর্জিত [illegible] নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে মুক্ত করলেন গান্ধীজী। গণসমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন সমস্ত দেশ জুড়ে শোনা গেল। স্বাধীনতা

আন্দোলন মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক খিড়কির পুকুরে শ্যাওলার মত ভাসছিল এতদিন। এবারে গণ আন্দোলনের ঢেউয়ের সোয়ারি করে এগিয়ে চললো আন্দোলন। কোথায় ভেসে গেল মধ্যবিত্তদের সেই খিড়কির পুকুরের রাজনীতি। ভারতবর্ষের গণ আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ও স্রষ্টা হলেন গান্ধীজী।' (যাত্রী, প্রথম সংস্করণ পৌষ, ১৩৫৭)

স্বাধীনতার পর জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র ও জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর গবেষণামূলক বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। এ সব গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলি এখানে আলোচনা করছি।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

জাতীয়তাবাদ ভাবাবেগ হিসাবে যতটা স্পষ্ট, দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে ততটা সুনির্দিষ্ট নয়। এ কারণে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বহু ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতামত পোষণ করেছেন। স্বাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক হিসাবে পথিকৃৎ হলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার ও তারাচাঁদ। ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার একটি সংস্থা গঠন করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এই সংস্থার সভাপতি। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে সভাপতির সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ভারত সরকার এই বোর্ড ভেঙে দেন। তার পর তারাচাঁদের ওপর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। চারখণ্ডে তারাচাঁদ সম্পাদিত 'হিসটরি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' (দিল্লি, ১৯৬১ ৭২) প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ ৬৩ সালে ঐ শিরোনামে রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা স্বাধীনতার ইতিহাস তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। তারাচাঁদ অ মারকসীয় দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাক বৃটিশ পর্বের ভারতীয় সমাজের সার্বিক অবস্থা, বৃটিশ শাসনের গতিপ্রকৃতি এবং মুক্তি সংগ্রামের স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। হারবার্ট রিজলে, ভ্যালেন টাইন চিরল, জন স্ট্যাচি এবং ভিনসেনট স্মিথ প্রমুখ বৃটিশ ঐতিহাসিকদের মত ডঃ মজুমদার ও তারাচাঁদ উভয়েই মনে করেন যে প্রাক বৃটিশ ভারতবর্ষে জাতীয়তা বোধের অস্তিত্ব ছিল না।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে রমেশচন্দ্র মজুমদার অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে চাননি। আরও অনেক ঘটনার সূত্রে গাঁথা এটি একটি নিছক ঘটনা মাত্র, কিন্তু অসামান্য ঘটনা নয়। রাজনৈতিক মঞ্চের পাদপ্রদীপে তিনি গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র এবং জিন্নাকে স্থাপন করেছেন, কিন্তু জওহর লালকে রেখেছেন স্বল্পালোকিত নেপথ্যে। গান্ধীজীকে তিনি জাতির জনকের মর্যাদা দিতে চাননি। তাঁর মতে গান্ধীজী ব্যর্থ। কারণ, ভারত বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন, অহিংসার অলীক আদর্শ ধূলিসাৎ, তাঁর অনুগামীরা আদর্শভ্রষ্ট এবং তাঁর আন্দোলন বিপথগামী। রাজনীতিতে অতীন্দ্রিয়বাদ আমদানি করে গান্ধীজী মারাত্মক ভুল করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে তাঁর ভূমিকা ছিল নেতিধর্মী। সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকে ডঃ মজুমদার গৌরবের বিভায় ভূষিত করেছেন। ডঃ মজুমদারের মতে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের জন্য নয়, বিশ্বরাজনীতির সংকট এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের জন্যই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে ডঃ মজুমদার চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নিজস্ব পরিচয় কামনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তাঁর বিচারে পাকিস্তানের জন্ম হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি।

জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবকে তারাচাঁদ অসামান্য ঘটনারূপে অভিনন্দিত করেছেন। গান্ধীজীর ভূমিকা তিনি বৈপ্লবিক বলে মনে করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গান্ধীজীর আবির্ভাব না ঘটলে, জাতীয় আন্দোলনের সফল পরিণতি আমরা পেতাম না। তারাচাঁদ মনে করেন, হিন্দু মুসলমানের ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রাক বৃটিশ যুগের ভারতবর্ষে অজানা ছিল। বৃটিশ বিভেদনীতির ফলেই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়েছে। জিন্নার আকস্মিক উত্থান কংগ্রেসের অদূরদর্শী নীতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। হিন্দু নেতাদের উগ্র হিঁদুয়ানি মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্নতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যেতে পারে রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন চরমপন্থী আর তারাচাঁদ মধ্যপন্থী।

মারকসবাদী বিশ্লেষণ

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের মারকসবাদী ব্যাখ্যার সূত্রপাত করেন স্বয়ং কারল মারকস। ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় তিনি ভারতে বৃটিশ শাসন ও তার ফলাফল বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। বৃটিশ কম্যুনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত তাঁর ভূমিকা সমেত এই প্রবন্ধগুলি সংকলন করেন। (কারল মারকস, আরটিকলস অন ইনডিয়া, দিল্লি ১৯৪০) মারকস এঙ্গেলস চিঠিপত্রের মধ্যে অন্তত ৫০ বার ভারত প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। মারকস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক ও সৃজনশীল, এই দুই দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। ভারতীয় অর্থনীতিকে তিনি স্থাণু বলেছেন এবং বৃটিশ শাসনের গঠনমূলক অবদানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিপান চন্দ্রের মত মারকসীয় ঐতিহাসিকগণ মারকসের এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি, যদিও মারকসীয় আলোচনা পদ্ধতির প্রতি তাঁদের আনুগত্য অটুট। জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক যুক্তি ও সমাজে নতুন শ্রেণীর আবির্ভাবের সম্ভাবনার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কারল মারকস আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

ভারতীয় মারকসবাদীদের মধ্যে মানবেন্দ্র নাথ রায় সর্বপ্রথম জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'ইনডিয়া ইন ট্রানজিশন' (জেনেভা, ১৯২২, বোম্বে ১৯৭১) গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্যবসার মধ্য দিয়ে ভারতীয় বণিক শ্রেণী ও চাকুরির মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিত্তশালী হয়েছেন। নবলব্ধ অর্থ বিনিয়োগের নতুন নতুন সুযোগ তারা খুঁজছিল। এই বাস্তব পরিস্থিতির চাপে জাতীয় কংগ্রেস জন্ম নিয়েছে। মানবেন্দ্র নাথ রায়ের মতে জাতীয় কংগ্রেস ছিল বিকাশশীল দেশীয় ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নবীন বুরজোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রত্যয় এবং আশা আকাঙ্ক্ষার আভাস ফুটে উঠেছে। ১৯৪০ সালে রজনী পাম দত্তের 'ইনডিয়া টু ডে' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, বৃটিশ শোষণের ফলে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি ঘটেনি বললেই চলে, এখানে কৃষি অর্থনীতিই টিকে আছে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি অনেক তিক্ত মন্তব্য করেছেন। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ফলে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ধর্মের আবরণে তিনি শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করেছেন। রক্ষণশীল শক্তির সহযোগিতায় গান্ধীজী বিপ্লবের পথরোধ করেছেন। 'ইনডিয়া টু ডে' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তৃতীয় সংস্করণে তা একত্র করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে রজনী পাম দত্ত গান্ধীজীর পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, গান্ধীজী সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসকে মুক্ত করে বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনে চালিত করেছেন। অত্যন্ত অনগ্রসর ও নিষ্ক্রিয় জনগণকে তিনি জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মাউন্টব্যাটেন চুক্তিকে গান্ধীজী প্রকাশ্যে ধিক্কার দিয়েছেন। জীবনের শেষ পর্বে এসে নিজের নিরাপত্তার কথা এতটুকু চিন্তা না করে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছেন এবং অবশেষে একজন গোঁড়া দক্ষিণপন্থীর আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছেন। রজনী পাম দত্তের মতে গান্ধীজীর জীবনের শেষপর্ব অনুপম মহত্ত্বমণ্ডিত। এই গ্রন্থের আলোচনায় জাতীয় পরিধি আন্দোলনের সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতে বৃটিশ শোষণের চেহারা, ভূমি ব্যবস্থা, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন, মহাজনী প্রথা, রাজস্ব ও কর ব্যবস্থা, বামপন্থী আন্দোলন, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এ সবকিছুই স্থান পেয়েছে। যদিও গ্রন্থটি গবেষণামূলক নয়, তবু যুক্তিশাণিত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী রচনাশৈলীর জন্য আকর্ষণীয়।

বিপান চন্দ্র তাঁর 'দি রাইজ অ্যানড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশন্যালিজম ইন ইনডিয়া ১৮৮০ ১৯০৫' (নিউ দিল্লি, ১৯৭৪) বইতে কয়েকজন ভারতীয় নেতার অর্থনৈতিক ভাবনা চিন্তা ব্যাখ্যা করেছেন। দাদাভাই নৌরজী, এম জি রানাডে, আর সি দত্ত, জি ভি যোশী এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে ছিলেন প্রথম সারির জাতীয় নেতা। ভারতে বৃটিশ শোষণের নির্মম বাস্তব চিত্র তাঁরা উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁরা গজদন্তমিনারবাসী তাত্ত্বিক ছিলেন না। তাঁরা বিশেষ শ্রেণী বা দলভুক্ত নন। তাঁরা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিচালিত ছিলেন না। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং বৃটিশ শাসনের তথাকথিত বহু

বিবেচিত মুসলিম যে কত অসার ও কাল্পনিক, তা প্রতিপন্ন করেছেন।

সোভিয়েত ঐতিহাসিক এ আই লেভকোভস্কি মনে করেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের সংগে অংগাংগী সম্পর্কিত। [আই এম রিজনার ও এন এম গোলডবারগ সম্পাদিত 'তিলক আনড দি স্ট্যাগল ফর ইনডিয়ান ফ্রিডম' (নিউ দিল্লি, ১৯৬৬) বইয়ে প্রকাশিত বিগিনিং অব দি মাস লিবারেশন স্ট্যাগল (দি স্বদেশী মুভমেনট)]। সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ এন এম গোলডবারগ দেখিয়েছেন যে, দেশীয় ধনতান্ত্রিক শ্রেণী ছিল দুর্বল এবং বিদেশি অর্থনৈতিক স্বার্থের জালে আবদ্ধ। জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী গোষ্ঠী ছিল তাদের প্রতিনিধি। কিন্তু পাতি বুরজোয়া, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল নানা সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত, বিদেশি শাসনের দ্রুত অবসান তারা চেয়েছিল। এই শ্রেণীই ছিল চরমপন্থী রাজনীতির পরম আশ্রয়। রিজনার ও গোলডবারগের সম্পাদনাসমৃদ্ধ বইয়ে এক প্রবন্ধে ই এন কোমারোভ এবং এ আই লেভকোভস্কি দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতে ঔপনিবেশিক নিপীড়ন যখন তীব্র হয়েছে, তখনই চরমপন্থার বিকাশ ঘটেছে।

কেমব্রিজ ঐতিহাসিকদের প্রতিকল্প

ইংলনডে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ১৯৫৩ সালে গ্যালাঘার এবং রবিনসন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আফ্রিকাবাসীর সহযোগিতা নিয়েই আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিকাশ ঘটেছে। গ্যালাঘারের এই প্রতিকল্প অনিল শীলকে প্রভাবিত করেছিল। 'দি ইমারজেনস অব ইনডিয়ান ন্যাশনালিজম' (কেমব্রিজ, ১৯৬৮) বইয়ে অনিল শীল এলিট প্রতিকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কলকাতা, বোম্বে ও মাদরাজের মত প্রেসিডেনসি শহরে আমলাতন্ত্রের উৎসাহে ও আনুকূল্যে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্গশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। এই এলিট শ্রেণী প্রথমে বৃটিশ শাসকের সংগে সহযোগিতা করেছিল, কিন্তু চাকুরি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা আশানুরূপ না পাওয়ায়, তারা বৃটিশদের শত্রু হয়ে পড়ে। তাই জাতীয় জাগরণে এলিটরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থের (মারকসীয় অর্থে) প্রয়োজনে নয়, অর্থনীতির গুণগত রূপান্তরের জন্য নয়, উচ্চবর্গের স্বার্থান্বেষণের জন্যই জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল। জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি অবয়বহীন নিরাকার নিষ্প্রাণ সংগঠনরূপে অভিহিত করেছেন। কিছু আঞ্চলিক সুযোগসন্ধানী মানুষের নড়বড়ে একটি সংস্থারূপে জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র কাজ ছিল বার্ষিক তামাশার আয়োজন করা। বৃটিশ রাজের সংগে জাতীয় কংগ্রেসের লড়াই ছিল যেন দশেরার দুটি শূন্যগর্ভ মূর্তির মধ্যে নকল লড়াই।

উচ্চবর্গ প্রতিকল্প তাঁর পরবর্তী রচনায় (ইমপিরিয়ালিজম আনড ন্যাশনালিজম, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ভলিউম ৭, কেমব্রিজ ১৯৭৩) তিনি বর্জন করেছেন। হয়ত তিনি ভেবেছেন যে, শুধুমাত্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জাতীয় জাগরণ এলিট প্রতিকল্পের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পরবর্তী কালের সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার জটিলতা জাতি, ধর্ম, ভাষা, সমাজবন্ধন এবং এলিট প্রতিকল্প দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। বৃটিশ রাজশক্তি যে কাঠামো গঠন করেছিল, তার সংগে ভারতীয়রা যুক্ত হয়ে পড়ে। বিদেশি প্রভু আর ভারতীয় নেটিভ, এ জাতীয় সম্বন্ধের ধারণা অচল মনে হচ্ছিল। প্রকৃত সম্বন্ধ হল বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকের সংগে কিছু ভারতীয় পোষ্যবর্গের বন্ধন। অনিল শীলের ভাষায় প্যাট্রন ক্লায়েনট রিলেশনশিপ। সর্বভারতীয় স্তরে, প্রাদেশিক স্তরে, জেলা স্তরে, মিউনিসিপ্যালিটি স্তরে — সর্বত্রই এই সম্বন্ধের বন্ধন কার্যকর হয়েছিল। প্রভাব প্রতিপত্তি, মান মর্যাদা, ঐশ্বর্যের সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে পোষ্যকুলের রাজনৈতিক পছন্দ অপছন্দ নির্ধারিত হত। লাভ লোকসানের হিসাব, স্বার্থের তাড়না, দলীয় উপদলীয় কোন্দলে গ্রুপের থেকে শুরু করে সর্ব ভারতীয় স্তরে জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতি কলংকিত হয়ে পড়ে। এই উচ্ছৃংখল উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। এর সর্বভারতীয় ঐক্য মিথ্যা কল্পনা; এর প্রতিপত্তি শূন্য আস্ফালন; এর ইতিহাস অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংগঠন ও পাল্টা সংগঠনের জিঘাংসা কাহিনী।

রিচারড গরডন দেখিয়েছেন যে, কংগ্রেস কাউনসিলের ভোট বর্জন করেছে আদর্শগত বা নীতিগত কারণে নয়, পরাজিত হবার আশংকায় [দি কোঅপারেশন আনড কাউনসিল এনট্রি ১৯১৯ – ২০, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ভলুম ৭, ১৯৭৩]। সি এ বেইলির মতে উত্তর ভারতে জাতীয় আন্দোলন ছিল নানা জাতি ও গোষ্ঠীভুক্ত বণিক প্রধানদের কায়েমি স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মীয় উদ্যোগ থেকে তারা যে অর্থ সংগ্রহ করেছে, তার মধ্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। [পেট্রনস আনড পলিটিকস ইন নরদার্ন ইনডিয়া] ডেভিড ওয়াসবুক 'দি ইমারজেনস অব প্রভিনসিয়াল পলিটিকস : দি মাদরাজ প্রেসিডেনসি ১৮৭০ – ১৯২০' (কেমব্রিজ, ১৯৭৬) গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে ক্রমাগত ঘুষ এবং উপদলীয় কোন্দলে মাদরাজের নেতৃবর্গ মগ্ন থেকেছেন। জুডিথ ব্রাউন তাঁর 'গান্ধীজী রাইজ টু পাওয়ার : ইনডিয়ান পলিটিকস ১৯১৫-১৯২২' (কেমব্রিজ ১৯৭৩) বইয়ে গান্ধীজীকে নিপুণ সুবিধাবাদী এবং মতিলাল নেহরুকে নীতিজ্ঞানবর্জিত দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কেমব্রিজ ঐতিহাসিকদের আদি কল্প প্রতিকল্প নিয়ে বিতর্ক চলছে। জাতীয় আন্দোলনের আদর্শগত মতামত বা রাজনৈতিক কার্যসূচী তাঁদের আলোচনায় প্রাধান্য পায়নি। সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন ও সুখদুঃখের কাহিনীতে তাঁরা আগ্রহ বোধ করেননি। অনড়, অটল, স্থির সুনির্দিষ্ট কক্ষের বদ্ধশ্বাস পরিবেশে তাঁদের আলোচনা আবদ্ধ থেকেছে। তবু একথা বলা উচিত যে শ্রম নিষ্ঠা, আকার বিশ্লেষণ এবং অভিনব আলোচনা পদ্ধতির জন্য জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসচর্চায় তাঁরা নিঃসন্দেহে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছেন।

উপসংহার

মারকসবাদী বিশ্লেষণ ও কেমব্রিজ প্রতিকল্প দিয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, সংগতও নয়। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর 'দি একসট্রিমিসট চ্যালেনজ' (কলকাতা, ১৯৬৭) বইতে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, বাল গংগাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ বুরজোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক ছিলেন না। ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। ধনতন্ত্রের যুক্তি দিয়ে চরমপন্থার আদর্শচেতনা বোঝান যাবে না।

অধ্যাপক ত্রিপাঠির মতে চরমপন্থার চরিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন। পশ্চিমের আগ্রাসী জাতীয়তাবোধকে চরমপন্থীরা ভারতীয় আবরণে উপস্থিত করেছেন। আইরিশ গোরার হিঁদুয়ানি ও দেশপ্রেম ছিল সন্দেহাতীত। কিন্তু দেশের মানুষের মর্মমূলে তিনি পৌঁছাতে পারেননি। গোরা চরমপন্থীদের ব্যর্থতার প্রতীক। শক্তির মত্ততায় 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ, বিমলাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তার ফাঁকির দিকটা সহজেই ধরা পড়ল। সত্যের প্রত্যয়ে নিবেদিত নিখিলেশের বিনম্র চরিত্র ভারতীয় সাধনার প্রতীক। এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে অনেক সন্দীপ ছিলেন, কিন্তু নিখিলেশও ছিলেন। শ্রেণীস্বার্থের ছকে বা এলিট প্রতিকল্প দিয়ে তাঁদের বোঝা যাবে না। এই প্রসংগে অধ্যাপক ত্রিপাঠি টুরগেনিভের 'দি থ্রেসহোলড' গল্প উল্লেখ করেছেন। গল্পের মেয়েটি মৃত্যুবরণে অবিচলিত ছিল। কেউ তাকে বলেছে নির্বোধ, কেউ বলেছে সন্ত। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে, কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে, এমন অনেক নিঃস্বার্থ নির্বোধ সন্ত ছিলেন। রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরা তাঁদের খুঁজে পাবেন না। একমাত্র কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরাই তাঁদের চিনিয়ে দিতে পারেন। ◻

আহা! দোসা তৈরী হয়েছে কত স্বাদেভরা!
আমূল চীজ-এর কেরামতী সত্যিই অবাক করা!

১. আমূল চীজ দোসা
(১২ থেকে ১৪ টি হবে)

৫০ গ্রাম আমূল চীজ—কষা
২ কাপ চাল
১ কাপ ডাল
প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন তারপর দুটি আলাদা আলাদাভাবে মিহি ক'রে পিষে নিন।
১ পেঁয়াজ ছোট ছোট কাটা
অল্প ধনেপাতা- মিহি ক'রে কুচোন
৫-৬ কাঁচালঙ্কা- কাটা
১/২ ছোট চামচ নুন
দোসা তৈরীর জন্যে তেল, চাটনী বা সস

পেষা চাল ও ডালে নুন মেশান ও মিশ্রণটি ৮ ঘণ্টা ঐভাবেই এক ধারে রেখে দিন।

দোসা তৈরীর তাওয়া আগুনে চড়িয়ে গরম হতে দিন, তারপর তাতে হালকাভাবে তেল লাগান। মনে রাখবেন, তাওয়ায় তেল খুব বেশী লাগালে, দোসা-র মিশ্রণ তাতে ঠিকমতভাবে ছড়িয়ে পড়বে না। একটি বড় চামচ বা হাতা দিয়ে, দোসা-র মিশ্রণ তাওয়ায় ঢালামাত্র খুব তাড়াতাড়ি তাওয়ায় চারদিকে সমভাবে ছড়িয়ে দিন। এবার দোসার ধারে ধারে অল্প অল্প ক'রে তেল লাগান ও কয়েক সেকেণ্ড ওটিকে ঢেকে রাখুন। তারপর ঢাকা সরিয়ে দোসার ওপর অল্প একটু কষা আমূল চীজ, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা ও পেঁয়াজ দিয়ে দিন ও দোসাটি ভাঁজ ক'রে তাওয়া থেকে নামান। তারপর চাটনী অথবা সসের সঙ্গে গরম গরম নিজেও খান, অপরকেও খাওয়ান।

আমূল চীজ বিস্কুট
(প্রায় ১২টি হবে)

২ কাপ ময়দা
১ ছোট চামচ বেকিং পাউডার
১/২ ছোট চামচ নুন
৫০ গ্রাম আমূল চীজ—কষা
১/২ কাপ মার্গারিন
১/২ কাপ দুধ
২ বড় চামচ আমূল মাখন-গলানো

ময়দা, বেকিং পাউডার ও নুন ২-৩ বার চেলে নিন। মার্গারিন ও আমূল চীজ দিয়ে হাত দিয়ে খুব ভাল ক'রে মিশিয়ে নিন তারপর তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী দুধ ঢেলে নরম নরম ক'রে মেখে নিন। ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ ওটি রেখে দিন।

রুটি বেলার চাকির ওপর অল্প একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে দিয়ে, মাখা ময়দার ১ সে.মি. পুরু বড় রুটি বেলে নিন। খুব বেশী ধারযুক্ত বাটি বা বোতলের ঢাকনা দিয়ে ৫ সে.মি. গোলাকারের অথবা নিজের পছন্দসই আকারে ঐ পুরু রুটিটি কেটে নিন। তারপর ওটি বেকিং ট্রেতে রেখে, ওপর থেকে গলানো আমূল মাখন লাগিয়ে দিন।

ওভেন গরম করুন আর বিস্কুটগুলি (২০০ C, গ্যাসের ওপর) ১৫ মিনিট পর্যন্ত অথবা অল্প লালচে হওয়া পর্যন্ত বেক করার জন্যে রেখে দিন।

এই মুচমুচে বিস্কুট গরম গরম খেতেও যেমন মুখরোচক ঠাণ্ডা খেতেও তেমনি স্বাদের। একবার নিজেই চেখে দেখুন না!

দ্রষ্টব্য :- বিস্কুটগুলি ঠাণ্ডা হলে হাওয়া-বন্ধ ডিবেতে সাজিয়ে রাখুন। মুচমুচে স্বাদেভরা ঐ বিস্কুটগুলি সহজেই ৮-১০ দিন পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায়।

আমূল চীজ—স্বাদ মজাদার, তার সঙ্গে এটি দারুণ পুষ্টিকর আহার! ২৩% প্রোটিন, প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'এ'-র ভাণ্ডার।

আমূল চীজ
মজাদার,
যাতে রাঁধলে
দারুণ স্বাদের হয়
যে কোনো খাবার!

Amul CHEESE POWDER
Amul Processed Cheese
Amul Processed Cheese

ASP/AC-BEN 9/83

বিক্রী ব্যবস্থায় :
গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড,
পো.ব. ১০, আনন্দ ৩৮৮০০১, গুজরাত।

উমেশচন্দ্র ব্যানারজি : জাতীয়তাবাদের পিতৃপুরুষ

অশোককুমার কুণ্ডু

পরাধীন ভারতবর্ষে যে ক'জন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী স্বদেশের মুক্তির জন্যে বিভিন্নভাবে কাজ করেছিলেন, উমেশচন্দ্র ব্যানারজি তাদের অন্যতম। জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও লেখাপড়া করেছিলেন বিদেশে, ইংলনডের বুদ্ধিজীবী মানুষদের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব, এমনকি পরদেশে দেহরক্ষা – সব মিলিয়ে এই মানুষটির ব্যক্তিগত প্রোফাইলটি দেশি বিদেশির মিকসচার – এ সমালোচনা তাঁকে হজম করতে হয়েছিল স্বদেশী সংবাদপত্রের কাছ থেকেই। জন্ম কলকাতার খিদিরপুরে ১৮৪৪ সালের ২৯ ডিসেমবরে। শৈশব ও কৈশোরে পড়াশোনা ওরিয়েনটাল স্কুলে এবং হিন্দু স্কুলে। পরবর্তীকালে আইনের পাঠ নিয়েছিলেন ডবলু পি ডাউনিং এবং ডবলু এফ গিললানডারসের কাছে। এর পরে ১৮৬৪ সালে বুসতমজী জামসেদজী জিজিভাই স্কলারশিপ পেয়ে তিনি ইংলনডে গেলেন আইন পড়তে।

১৮৬৫ সালে তাঁর প্রথম স্বল্প মেয়াদি প্রবাস জীবনে তিনি ইংলনডে 'ইনডিয়ান সোসাইটি' গঠন করেন। এই সোসাইটি পরে ইসট ইনডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এর সংগে যুক্ত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তিনি বিদেশিদের কাছে ভারতবর্ষের পরাধীন দেশবাসীর আসল অবস্থার কথা বলেন। দাদাভাই নৌরজীর সাহায্য নিয়ে ১৮৮৮ সালে লনডনে ভারতীয়দের অসুবিধা সম্পর্কে ক্যাম্পেন করেন। এতে সুবিধে হয়েছিল, অনেক বিদেশি বুদ্ধিজীবী এদেশের ইংরেজদের শাসন সম্পর্কে সজাগ হন।

১৮৬৫ সালে ২৫ জুলাই লনডনে ইনডিয়ান সোসাইটির মিটিং-এ তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা। এ মিটিং-এ ভারতবর্ষে দায়িত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন করার কথা বলেন। ১৮৮৮ সালে তাঁর ক্যাম্পেন ও দাদাভাই নৌরজীর সমর্থনে বহু ইংরেজ তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালে বোমবাইয়ে প্রথম ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে প্রথম প্রেসিডেনট হয়ে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে কানাডার মত স্ব-শাসন ব্যবস্থা চালু হোক।

ইংলনডে তাঁর এই বলিষ্ঠ মতপ্রচারের ফলে সেখানকার জনসাধারণ বুঝতে পারে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার নগ্ন রূপ, শোষণ ও বঞ্চনার রোজনামচায় দিন কাটাচ্ছে ভারতীয়রা। তাঁর বক্তৃতায় ইংলনডবাসী জানতে পারে ভাইসরয়ের কাউনসিলে ভারতীয়দের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিষয়টা একেবারেই অবহেলিত। কেন না ভাইসরয়কে বিভিন্ন তথ্যের জন্যে ইউরোপীয়ন জেলা অফিসারদের ওপর নির্ভর করতে হত। এই বিদেশিরা বিদেশের দৃষ্টিতেই দেখত ভারতবর্ষের সমস্যা।

১৮৯২ সালে এলাহাবাদে সভাপতির বক্তৃতায় তিনি লেজিসলেটিভ কাউনসিলকে বড় করার অনুরোধ করেন। ১৮৯০ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানারজি এবং অন্যান্য কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে ইংলনডে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য। এই প্রচেষ্টার ফলেই ইনডিয়ান কাউনসিল অ্যাকট গড়ে ওঠে। ১৮৮৩ সালে তিনি ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখান। এ বছরই তিনি আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, পরবর্তীকালে ইংরেজ বিচারকদের হাত থেকে হাইকোর্টের শাস্তি রদ করা যাবে না। ১৮৭০ সালে স্যার জেমস এফ স্টিফেনসের ক্রিমিনাল কোডের যখন সংশোধন প্রস্তাব হয় তিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেননি। ১৮৮৮ সালে এই সংশোধনের 'ড্রাকোনিয়ন সেভারিটি' বিষয়টিকে তাঁর নরথ হ্যামপটন বক্তৃতায় বিদ্রূপ করেন।

এলাহাবাদে কংগ্রেসের প্রেসিডেনটরূপে তিনি স্যার চারলসের জুরি নোটিফিকেশনের বিরোধিতা করেন - যা বাংলার বিচারপদ্ধতির শ্বাসরোধ করেছিল। তাঁর চেষ্টায় ১৮৯৩ সালে এই নোটিফিকেশন উঠে যায়। এর পরই তিনি প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করেন বাংলার আইন ব্যবস্থার প্রসারণের জন্যে। ১৮৯৫ সালে পুনা কংগ্রেসের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, একজন বিচারক যখন কোন বিচারাধীন ভারতীয়ের কাছে তার বক্তব্য শোনে, তা শোনান হয় অন্য একজন সরকারি ইংরেজ অফিসারের অনুবাদের মাধ্যমে, ফলে বাদী বা প্রতিবাদীর কথার সত্য মিথ্যা যাচাই এখানে নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে বাল গংগাধর তিলক সমেত অন্যান্য কাগজের সম্পাদকের প্রতি আদালতের অভিযোগ, এ সমস্ত ঘটনা ইংরেজ সরকারকে দেশবাসীর ক্রম অসন্তোষের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বাংলাদেশের জনসাধারণ তিলকের মামলায় প্রিভি কাউনসিলে আবেদনের জন্যে অনেক চাঁদা সংগ্রহ করে - এ থেকে ক্রিমিনাল আইনের প্রতি সাধারণের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অমরাবতী সেসনে তিনি আবার তীব্রভাবে ১৮১৮ সালের পাশ করা ৩নং আইনের সমালোচনা করেন। এই আইনে কোন বন্দীকে বিনা বিচারে হাজতে পুরে রাখা হত। এ বছরই অমরাবতী সেসনে বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা তোলেন।

১৮৮৮ সালে আগসট মাসে তাঁর ওয়েন স্ট্রিট বক্তৃতায় তিনি এই প্রথম জোর গলায় ভারতের মাটিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের কথা বলেন। তিনি বলেন লবণ ট্যাকস হচ্ছে এক নির্লজ্জ লেভি যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শোষণ করছে। এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বদেশের মাটিতেই উপবাসী।

১৯০১ সালে ইংলনডে যাবার আগে কলকাতা কংগ্রেস সভায় উপস্থিতিই ছিল তাঁর শেষ সভা। এই সভায় তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন ইংলনডে ও ভারতবর্ষে সিভিল সারভিসের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি।

বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রখর একটি ব্যক্তিত্ব, চালচলনে সাহেবসুবো, জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের সংগে আলোচনায় আর মিটিং-এ, বক্তৃতায় - এই বিষয়গুলিকেই কটাক্ষ করেছিল ১৮৯৭ সালের ১৮ ডিসেমবরের 'বংগবাসী' পত্রিকা। তাঁকে সমালোচনা করা হয় এই বলে যে, তিনি তাঁর অর্জিত অর্থের বেশিটাই খরচ করেছিলেন বিদেশে। কলকাতার ব্যারিসটার উডরোফের মত এদেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও এই সমালোচনা তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে ম্লান করে দিতে পারেনি।

১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ সেসনে মিঃ ওয়েব নামে একজন আইরিশের নির্বাচনে বাধা দেন। তাঁর কথায় কংগ্রেসের সভাপতি হবেন একজন ভারতীয় যিনি এদেশে মানুষের প্রাণের সংগে সেতু গড়বেন। এছাড়া ক্রোডন থেকে (১৯০৫ সালে ৩ নভেমবর) তাঁর ভাইপো কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় উমেশচন্দ্রের দেশপ্রেমের কথা। প্রতি চিঠিতেই দেশবাসীর আন্দোলন সম্পর্কে তিনি আশাবাদী ও আগ্রহী।

১৯০৬ সালের ২১ জুন কংগ্রেসের পিতৃপুরুষ ইংলনডের ক্রোডনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ☐

কংগ্রেস ও প্রাক স্বাধীনতা যুগের কলকাতা অধিবেশন

ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের ৭৭তম অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ১৮৮৫ সালে অ্যালান অকটাভিয়ান হিউম নামক একজন পদস্থ ইংরাজ সিভিলিয়ানের আগ্রহাতিশয্যে এবং উমেশ চন্দ্র ব্যানারজি ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য ভারতীয়ের মিলিত চেষ্টায় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামে এই রাজনৈতিক সংগঠনটি জন্মলাভ করে। কিন্তু কংগ্রেস সৃষ্ট হওয়ার আগেও এ দেশে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কংগ্রেসের পূর্বসূরী এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল নিতান্তই স্থানিক (Local) চরিত্রের। নিজ নিজ অঞ্চলের বাইরে অখণ্ড ভারতবর্ষের সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণে এগুলি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবুও স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করতে গিয়েই ভারতবর্ষের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি এদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর তখনই এরা সকলে মিলে মিশে গোটা ভারতবর্ষের জন্যে একটা অখণ্ড ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রেরণা বোধ করে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণও দেশবাসীর মনে এই অখণ্ড জাতীয়তাবোধের চেতনা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সে আর এক কাহিনী। বর্তমান প্রসংগে আমরা আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের স্মারক হিসেবে কিভাবে প্রাক কংগ্রেসী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল এবং স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের যাবতীয় বাৎসরিক অধিবেশনগুলির কতটুকুই বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল সেই সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব করেছি।

কংগ্রেসের জন্মের অনধিক অর্ধ শতাব্দী আগে যে তথাকথিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের মাটিতে প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল তার নাম ছিল জমিদার সভা (১৮৩৭) এবং জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণই ছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এর দু বছর পরে খোদ ইংল্যানডের মাটিতেই ভারতীয় ব্যাপারে ইংরাজদের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করবার জন্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর বাংলাদেশে বৃটিশ ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন (১৮৫১) নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম গ্রহণ করে। এই সমিতি মূলত রাজনৈতিক ব্যাপারেই জনমত সংগঠন করার কাজে লিপ্ত ছিল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা ভারতীয়রা এই প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন।

অতঃপর মতিলাল ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে ১৮৭৫ সালে বাংলাদেশে ইনডিয়া লিগ নামে আরও একটি রাজনৈতিক সমিতি জন্মলাভ করে। কিন্তু এই লিগ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র এক বছর পরেই এটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েসান (১৮৭৬) নামক সংগঠনটির সংগে মিলে যায়। ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই তারিখে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (হালের কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস বাড়ি) এই অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম সভাটি আহ্বান করা হয় এবং এখানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে গোটা ভারতব্যাপী আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে – "The idea that was working in our minds was that the Association was to be the centre of an all-India movement."

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মূল সত্যটি অনস্বীকার্য। বস্তুত রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশবাসীর অভাব অভিযোগ সরকারের কর্ণগোচর করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইতিমধ্যেই আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের 'দি হিন্দু', মহারাষ্ট্রের 'পুনা সার্বজনিক সভা', বোম্বাই প্রেসিডেনসি অ্যাসোসিয়েসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সব বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগঠনগুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। অথচ দেশের তখন যে রাজনৈতিক অবস্থা তাতে করে এগুলির মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষের উঁচু মাইনের সরকারি পদগুলিতে এ দেশের লোককে নিযুক্ত করা হত না, ভারতবাসীর পক্ষে কোন রকম অস্ত্র বহন করাও নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং প্রেস আইনের বিধান অনুযায়ী এ দেশের সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। এইসব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য দেশের সর্বত্র শিক্ষিত ভারতবাসীর মন যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ইলবার্ট বিলের যে ধারা অনুযায়ী একজন ভারতীয় বিচারককে অভিযুক্ত ইউরোপিয়ানের মামলায় বিচার করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল, সেটি বানচাল করে দেওয়ার জন্য ভারতস্থ ইউরোপিয়ানগণ 'দি ইউরোপিয়ান ডিফেনস অ্যাসোসিয়েসন' নামে একটা সংগঠন গড়ে তুলে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দিল। ডিফেনস অ্যাসোসিয়েসনের দাবি ও আন্দোলনের পিছনে কোন নীতির বালাই ছিল না, তবুও একমাত্র সঙ্ঘশক্তির জোরেই তারা সরকারকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য করেছিল।

ইউরোপিয়ান ডিফেনস অ্যাসোসিয়েসনের এই অভাবনীয় সাফল্য ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথের মতে এই রকম প্রয়োজনের কথা আগেই উদিত হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে কিছু একটা করার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার জননেতাদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সকলকে এক জায়গায়

মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, জে এম সেনগুপ্ত
১৯২৮ কংগ্রেস কলকাতা

মিলিত করে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা শুরু করা বড় একটা সহজ কাজ নয়। অবশেষে একটা সুযোগ এসে গেল। সরকারের ব্যবস্থাপনায় ১৮৮৩ সালে কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু গন্যমান্য ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের সকলকে এক মঞ্চে সমবেত করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ইনডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম জাতীয় সভাটি আহ্বান করেন। এই সভা আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৮৮৩ সালের ২৮-২৯ ডিসেমবর তারিখে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই জাতীয় কংগ্রেসর বীজটি রোপিত হয় এবং সেই হিসেবে বর্তমান বছরের কংগ্রেস অধিবেশনকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই জাতীয় সভার শত বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান হিসেবে গন্য করা যেতে পারে। এক বছর পরে বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ সালের ডিসেমবর মাসে দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেনসের বৈঠক বসে। তত দিনে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সমস্ত প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই সম্মেলনের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এইভাবে ন্যাশনাল কনফারেনসের আশীর্বাদ নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হলঘরে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেমবর তারিখে বেলা ১২টার সময় উমেশচন্দ্র ব্যানারজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম বছরের অধিবেশনটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতা শহরে প্রাক স্বাধীনতা আমলে কংগ্রেসের মোট দশটি বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠক ১৮৮৬ সালে এবং শেষ বৈঠক ১৯৩৩ সালে এবং মাঝে পাঁচ থেকে আট বছরের ব্যবধানে এই শহরে প্রতিবারই বিপুল উদ্দীপনা সহকারে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় এই কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হয়। সেই হিসেবে কলকাতা কংগ্রেসের প্রতিটি বৈঠকই বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত।

অধিবেশন বর্ষ ১৮৮৬ : কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নওরোজি। প্রথম দিকের অধিবেশনগুলিতে কংগ্রেসের তরফে কোন চমকপ্রদ রাজনৈতিক দাবি উপস্থাপিত করা হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস তখনও পর্যন্ত সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। এমনকি প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-কানুন বা আলাদা সংবিধান বিধিও রচিত হয়নি। কাজেই সংগঠনের এই প্রাথমিক অবস্থায় কংগ্রেস কেবলমাত্র তার প্রাতিষ্ঠানিক চেহারাটি সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল এবং সেই সংগে দেশের শাসনবিধি ও বিচার ব্যবস্থায় কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করার জন্য সরকারের নিকট বিনীত আবেদন জানিয়েছিল। অধিবেশনের শুরুতেই কংগ্রেসের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও কংগ্রেস ভবিষ্যতে কী ভাবে কাজ করবে সে ব্যাপারেও বিস্তৃত নিয়মাবলী রচনা করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি কার্যকর করার জন্য যে কমিটি তৈরি করা হয় সেটি কংগ্রেসের সংবিধান রচনা করার কাজে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এরপর কংগ্রেসের তরফে ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন (Indian Councils Act 1861)-এর কয়েকটি ধারা সংস্কার করার জন্য দাবি জানান হয়। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি সমঝোতার সুর লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী সেই সময় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির গভরনর একটি কাউনসিলের সাহায্য ও পরামর্শ অনুযায়ী দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। কংগ্রেস এই সব কাউনসিলে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণ করবার জন্য দাবি জানায়। কিন্তু নির্বাচন কীভাবে করা হবে সে ব্যাপারে কংগ্রেসের কিছু বলার ছিল না, অর্থাৎ সরকার ইচ্ছা করলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই সকল প্রতিনিধিদের গ্রহণ না করে, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মনোনীত প্রতিনিধিদের এই কাউনসিলে প্রবেশাধিকার দিতে পারেন এবং এই রকম পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থায় কংগ্রেস কোন রকম আপত্তি প্রকাশ করেনি। আবার কাউনসিলের নির্দেশ ইচ্ছামত অগ্রাহ্য করার অধিকার সরকার নিজের হাতে রাখতে চাইলেও, কংগ্রেস এই অগণতান্ত্রিক দাবির বিরোধিতা করেনি। সরকারের এই অগণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষেধক হিসাবে, কংগ্রেস তখন কেবল এই মাত্র অনুরোধ জানায় যে, কোন কোন সময় সরকারের আমলারা যদি কিছু অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই সব অসদাচারণের প্রতিকারের জন্য বিলেতের হাউস অফ কমনসের কাছে আবেদন করা যাবে। বস্তুত কাউনসিলের সংস্কারের জন্য উল্লিখিত যে দাবিগুলির প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয় সেগুলির মধ্যে কংগ্রেসের মূলত আপস মনোভাবটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই রকম আপসমূলক প্রস্তাব কংগ্রেস যে শুধু ১৮৮৬ সালেই একবারের জন্য গ্রহণ করেছিল তা নয়। পরবর্তী তিনটি বছরেও কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে ঐ একই প্রস্তাব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কারকল্পেও কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। ১৮৭২ সালের আইন অনুযায়ী জুরিদের ক্ষমতা বিপুলভাবে সংকুচিত করা হয়। কংগ্রেস এই আইনের বিরোধিতা করে জুরিদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাছাড়া কংগ্রেসের তরফে এই অধিবেশনে বিচারবিভাগ এবং শাসনবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের জন্যও একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। মোট কথা কলকাতায় কংগ্রেসের প্রথম বারের অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল সেগুলি এ যুগের দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করলে হয়ত কিছুটা নরম ধরনের বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেকালের পরিস্থিতির বিবেচনায় এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। পশ্চিমী মনোভাব সম্পন্ন সে যুগের শিক্ষিত মানুষগুলির দৃষ্টিতে স্বদেশচেতনার সেটাই স্বাভাবিক ধর্ম – এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব খুঁজতে গেলে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অ্যানাক্রনিজম (anachronism) এর দোষ বর্তাবে।

অধিবেশন বর্ষ ১৮৯০ : এটি কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন এবং এবারের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা। এই অধিবেশনে প্রথমেই কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান ডেলিগেটদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়। প্রথম বছরের কংগ্রেস অধিবেশনে মাত্র ৭১ জন ডেলিগেট মনোনীত হয়েছিলেন, পরের বছর এই সংখ্যা প্রায় গুণেরও বেশি বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন এক পর্যায়ে আসে যে, দলের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থেই ডেলিগেটদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন দেখা যায়। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই অধিবেশনে স্থির হয় যে প্রতি দু লক্ষ মানুষের পিছু এক জন করে ডেলিগেট মনোনীত হবেন এবং [illegible] এবারের কলকাতা অধিবেশনে ডেলিগেটদের সংখ্যা সাতশো এক হাজার করার জন্য গৃহীত প্রস্তাবটিকে কার্যে পরিণত করা হয়। তাছাড়া এই বছরে কংগ্রেস চার্লস ব্রাডল কর্তৃক Indian Councils Act সংশোধন করার জন্য আনীত বিলটিও সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা [illegible] এই বিলটি [illegible] হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৯২ সালের আগে কাউনসিল ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয়নি।

অধিবেশন বর্ষ ১৮৯৬ : কলকাতা অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এই আদশ অধিবেশনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। কংগ্রেসের তরফে এইবারে কেবল বোম্বাই ও মাদ্রাজের একসিকিউটিভ কাউনসিল সমূহে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে শাসন তান্ত্রিক সংস্কাবের জন্য সরকারের কাছে মিনতি ও প্রার্থনার (prayers and petitions)-এর সাবেকি রাজনীতিটি কংগ্রেস তখনও পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেনি। সরকার বহু ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের এই সব দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তবু মোহভঙ্গ হয়নি। রাজসরকারের ন্যায়পরায়ণতায় পুরনো কংগ্রেসের এই সব মডারেট নেতারা আগের মতই আস্থাপ্রবণ রয়ে গেলেন। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি মহম্মদ রহিমৎ-উল্লা সেয়ানি এই কারণেই প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতার শুরুতেই এ কথা স্বীকার করেন যে 'ইংরেজের মত সৎ এবং শক্তিশালী জাতি সূর্যের নীচে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না' ("A more honest or sturdy nation does not exist under the sun than this English Nation.")। অবশ্য পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ (সত্তর হাজার বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এই ব্যাপক দুর্ভিক্ষের প্রকোপে প্রায় দু কোটি ভারতীয়ের অনাহারজনিত মৃত্যু হয়।) এবং বোম্বাই অঞ্চলের প্লেগ দমনে সরকারি প্রতিরোধ ব্যবস্থার বাড়াবাড়ি, কংগ্রেসের এই রাজভক্তি শিথিল করে দিয়েছিল এবং তখন থেকেই দলের মধ্যে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী মডারেট কংগ্রেসীদের বিরোধিতা করার জন্য এগিয়ে

আসেন। উত্তরকালে এঁরাই চরমপন্থী কংগ্রেসী হিসেবে পরিচিত হন এবং এঁদের সংগে মডারেটদের বিরোধ এক সময় চরম আকার ধারণ করে।

অধিবেশন বর্ষ ১৯০১ : এই বছর কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাককালে ভারত সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া পরলোক গমন করেন। মহারানী নিজে কোন দিন ভারত ভ্রমণে আসেননি এবং এ দেশের শাসন ব্যাপারে তিনি প্রকৃত নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের মতই নিস্পৃহতা অবলম্বন করেছিলেন। তবুও রানীর মৃত্যুতে ভারতবাসিগণ শোকাভিভূত হয় এবং কংগ্রেসও প্রকৃত রাজানুগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিবেশনের শুরুতেই রানীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। একই সংগে সম্রাট সপ্তম এডওয়ারডের সিংহাসনারোহনেও আনন্দ প্রকাশ করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই অধিবেশনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, এই সভাতেই মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী নিগৃহীত ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আনীত এই প্রস্তাবটির বয়ান পাঠ করলে বোঝা যায় যে কংগ্রেসের মডারেট মেজাজেও ধীরে ধীরে একটা সূক্ষ্মপরিবর্তন ঘটতে চলেছে। অধিবেশনের সভাপতি দীনশা ওয়াছা-র উদ্বোধনী ভাষণে এই পরিবর্তনের সুরটি আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। দীনশাজি সেদিনের ভাষণে সরকারকে তীব্র ভাষায় সরাসরি আক্রমণ করেন। তিনি বলেন : "Did England sit quiet while the Plantagenets were filling all the high offices to the great disadvantage of the English themselves? Was not England panperised when the Papacy was rampant and abstracted millions from it annually, as history recorded? Would England refrain from complaining, supposing that the position of India and England was today reversed'"?

সরকারের বিরুদ্ধে এত তীব্র ভাষায় সম্ভবত বিগত আর কোন কংগ্রেস অধিবেশনে এই রকমভাবে আক্রমণ করা হয়নি।

অধিবেশন বর্ষ ১৯০৬ : কংগ্রেসের ইতিহাসে দ্বাবিংশতি অধিবেশনটি নানা কারণেই বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের শিবিরে চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯০৫ সালে লরড কারজনের বংগভংগ প্রস্তাব চরমপন্থীদের মনোভাব আরও উগ্র করে তুলেছিল। তারা মডারেটদের আপসী রাজনীতির ট্রাডিসন ভেঙে কংগ্রেসকে আরো জংগী করে তোলবার আয়োজন করছিল। সরকারের অনুগ্রহের দান হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কারে তারা খুশী থাকতে নারাজ, তাদের দাবি ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এবং বংগভংগের পরিকল্পনাও বিলম্বে নাকচ করতে হবে এবং তা যদি না হয় তাহলে কংগ্রেসের তরফে স্বদেশী, স্বরাজ এবং বয়কটের অস্ত্র নিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সামিল হওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হবে। চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন বালগংগাধর তিলক এবং ১৯০৬ সালের আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থীরা তিলককেই সভাপতি করার জন্য মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু চরমপন্থীদের এই জংগী মনোভাবের মুখেও কংগ্রেসের পুরনো নেতারা তাঁদের সাবেকী মডারেট পন্থীকেই আঁকড়ে রইলেন। ১৯০৬ সালে প্রিনস অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণে এলেন, আর মডারেটরা চরমপন্থীদের আপত্তি সত্ত্বেও দেশের সেই ঘোর দুর্দিনেও প্রিনসকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব নিয়েছিলেন। আসলে মডারেটরা চরমপন্থীদের অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁদের আগেকার আধিপত্যকেই টিকিয়ে রাখতে চাইছিলেন। তিলক যাতে কংগ্রেসের সভাপতি না হতে পারেন সে জন্য তাঁদের তরফে বয়োবৃদ্ধ দাদাভাই নওরোজিকেই সভাপতি করার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরিকল্পনাই সফল হয়। দাদাভাই সভাপতি হওয়ার ফলে আপাতত এক বছরের জন্যে কংগ্রেসের ভাঙন ঠেকিয়ে রাখা গেল। কিন্তু নরম ও চরমপন্থীদের এই ক্রমবর্ধমান বিরোধ পরের বছর সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) কংগ্রেসকে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। ঐ বছর চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরবর্তী আট বছর যাবৎ কংগ্রেসে মডারেটদের একাধিপত্যই বজায় থাকে। অবশ্য ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তের অগ্রগতি ভূমিকায় চরমপন্থীরা পুনরায় দলে ফিরে আসে তবে এই পুনর্মিলন খুব অল্প দিনই স্থায়ী হয়েছিল। দু বছর পরে ১৯১৮ সালের অধিবেশনে মডারেটরা শেষবারের মত কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান।

আপাতদৃষ্টিতে ১৯০৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে মডারেটরা দাদাভাইকে সভাপতি নির্বাচিত করে জয়যুক্ত হলেও বাস্তবে কিন্তু এই অধিবেশনে চরমপন্থীদের প্রস্তাবগুলিই প্রাধান্য পায়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে এই প্রথম, কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে যুক্তরাজ্য বা উপনিবেশগুলির আদলে ভারতবর্ষও স্বায়ত্ব শাসনের লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। তাছাড়া বংগভংগ চ্যালেনজের মোকাবিলা করার জন্য এই সময় কংগ্রেসের তরফে স্বদেশী, স্বরাজ বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাবটিও অনুমোদন করা হয়। মডারেট রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি যে রীতিমত বৈপ্লবিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

অধিবেশন বর্ষ ১৯০৯ : ১৯০৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে মরলি মিনটো সংস্কারের নানা ত্রুটি ও বিচ্যুতি উল্লেখ করে কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। এ বছরের অধিবেশনেও ঐ প্রস্তাবগুলি নতুন করে আরো একবার গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া এই সভায় গান্ধী ও ট্রানসভাল অঞ্চলে বসবাসকারী তাঁর বিশ্বস্ত ভারতীয় সহযোগীদেরও অভিনন্দিত করে প্রস্তাব পাশ করা হয়। অভিনন্দনের কারণ এই যে, এঁদের মিলিত উদ্যোগের ফলেই এসিয়াবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী যে সব আইন পাশ করার জন্য ইতিপূর্বে চেষ্টা হয়েছিল ট্রানসভালের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সেগুলি রদ করবেন বলে জানিয়েছিল। এইবারের কংগ্রেস অধিবেশন আরও একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বংগভংগ ব্যবস্থা রদ করে সরকারি ঘোষণা জারি করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে বংগভংগ সিদ্ধান্তকে সরকারি আমলারা Settled fact বলে দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে জনমতের চাপে পড়ে সেই অনিবার্য সিদ্ধান্তটিও সরকার শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য বংগভংগ রদ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের পুরনো

সীমানা যে ফিরে এসেছিল এমন নয়। কিন্তু তবুও এটি ভারতবাসীর পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি বড় জয়। কংগ্রেস অধিবেশনে এই জয়ের উৎসবে বিশেষভাবে উল্লাস প্রকাশ করা হয় এবং মডারেট নেতারা এই বিজয়কে তাঁদের নীতির জয় হিসেবে ধরে নিয়ে নানা রকম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানারজি বংগভংগ রদ করার জন্য সমগ্র ভারতবাসী যে ভাবে বাংলা দেশকে সাহায্য করেছিলেন সে জন্য তাঁর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের মানুষকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন।

প্রসংগত একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমে ঠিক ছিল যে ১৯১১ র এই কংগ্রেস অধিবেশনে রামজে ম্যাকডোনাল্ড সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পত্নী বিয়োগ হওয়ার জন্য তিনি আসতে পারেননি। তখন একেবারে শেষ মুহূর্তে পণ্ডিত বিষেণ নারায়ণ ধর কে কংগ্রেস সভাপতি করা হয়। ইনি কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সেবক এবং সরকারি আমলাতন্ত্রের কড়া সমালোচক হিসেবে ইতিপূর্বেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বংগভংগ ব্যাপারে সরকারি আমলাদের সহানুভূতিহীন মানসিকতার সমালোচনা করে তিনি বিভিন্ন সময়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির প্রাসংগিকতা আজও কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে।

অধিবেশন বর্ষ ১৯১৭ : আগেই বলা হয়েছে যে ১৯১৬ সালে অ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় কংগ্রেসের দুই বিরোধী শিবিরে কিছুদিনের জন্য সমঝোতা স্থাপিত হয়। কিন্তু চরিত্র ও মেজাজে বেসান্ত নিজেই ছিলেন চরমপন্থী এবং তাঁর প্রভাবে কংগ্রেস পুনরায় চরমপন্থীর দিকে ঝুঁকতে থাকে। তিলকের দেখাদেখি ১৯১৫ সাল নাগাদ বেসান্ত নিজেও আর একটি হোম রুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে হোম রুল প্রতিষ্ঠার দাবি সোচ্চারভাবে প্রকাশ করা হয়। এই দাবির সম্মুখে মডারেটরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং কালক্রমে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯১৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষিত হয়। এই অধিবেশনে ৪৯৬৭ জন ডেলিগেট এবং ৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এটি সর্বকালের রেকরড। দর্শকদের মধ্যে প্রায় শ চারেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন যাঁদের বিগত আর কোন অধিবেশনে বড় একটা দেখা যায়নি। অধিবেশনের শুরুতেই সভাপতি অ্যানি বেসান্ত সরকারের কাছে এই মর্মে দাবি জানান যে, তাঁরা যেন অবিলম্বে বিলেতের পারলামেনটে এই মর্মে একটি বিল আনেন যাতে করে ১৯২৩ সালে কিংবা খুব বেশি দেরি হলে ১৯২৮ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমবেত দর্শক ও শ্রোতাদের তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন যে :

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে যতদিন না পর্যন্ত ইংল্যানড একথা স্বীকার করছে যে ইউরোপ এবং একই সংগে ভারতবর্ষেও স্বৈরতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের অবসান হওয়া প্রয়োজন, ততদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ কিছুতেই থামবে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্রকে কায়েম রেখে ইউরোপে তার পরাভব প্রার্থনা করা একটা চূড়ান্ত রকমের ভণ্ডামী। বস্তুত ভারতবর্ষ দুটি কারণে স্বায়ত্বশাসন দাবি করছে। প্রথমত, স্বাধীনতা যে-কোন জাতির পক্ষেই একটা জন্মগত অধিকার। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের অনুমতি ছাড়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এ দেশের গুরুতর জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।'

এই প্রথম কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন মঞ্চ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা হল 'India is demanding her Rights, and is not begging for concessions.' ইংরাজ শাসন এ দেশের পক্ষে ভাল কি মন্দ সেই কূট প্রশ্নে অবতীর্ণ না হয়ে কংগ্রেস এইবার সরাসরি ভারতের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে।

অধিবেশনে বর্ষ ১৯২০ : এই বছর কংগ্রেসের দুটি অধিবেশন বসে, প্রথমটি একটি বিশেষ অধিবেশন এবং সেটি সেপটেমবর মাসে কলকাতা সহরে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের প্রাক্কালে মনটেগু-চেমসফোরড সংস্কারের ধারাগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস শিবিরে জোর বিতর্ক হয় এবং কংগ্রেসের একাংশ এটি বর্জন করার দাবি জানালেও মহাত্মা গান্ধীসহ অপরাপর কংগ্রেসীরা এটি মেনে নিয়ে শাসকশ্রেণীর সংগে যতে আরও যোল দাবি আদায় করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এবং সর্বোপরি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) প্রভৃতি কারণে কংগ্রেসের মোহভংগ ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এইবার সহযোগিতার পথ ত্যাগ করে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের সংগ্রামের অবতীর্ণ হওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপৎ রায় তাঁরা উদ্বোধনী ভাষণে' কংগ্রেসের এই নতুন স্ট্র্যাটেজি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন

'It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary period. ....We are by instinct and tradition averse to revolutions. Traditionally, we are a slow-going people but when we decide to move, we do move quickly and by rapid strides No living organism can altogether escape revolutions in the conuse of its existence.'

এর পর ভারতের স্বাধানতা সংগ্রামের ইতিহাসে দিক পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমান অধিবেশনে তার সূচনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

অধিবেশন বর্ষ ১৯২৮ : এই অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের তরফে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান কি হওয়া উচিত সেই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে একটি বিস্তৃত রিপোরট পেশ করেন। নেহরু রিপোরটে ভারতবর্ষের জন্য 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যগণ জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নেহরু রিপোরটের এই দাবির বদলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করতে কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এইভাবে কংগ্রেস শিবিরে আবারও মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে এ ব্যাপারে সাময়িকভাবে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। অধিবেশনে গান্ধীজী প্রস্তাব করেন যে আপাতত কংগ্রেস নেহরু রিপোরট অনুযায়ী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি মেনে নিক, কিন্তু ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেমবরের মধ্যে সরকার যদি এই দাবি পূরণ না করে তাহলে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা দ্যোতক লক্ষ্য হিসেবে পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা জারি করা হবে। প্রসংগত উল্লেখ থাকে যে, সরকার এই দাবি মেনে নেননি এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসও পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে এইভাবে নেহরু রিপোরট ও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি মেনে নেওয়ায় সুভাষচন্দ্র অখুশী হয়েছিলেন।

অধিবেশন বর্ষ ১৯৩৩ : স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষে কলকাতা শহরে এটিই কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যর সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল। কিন্তু অধিবেশন (৩১ মারচ ১৯৩৩) উপলক্ষে শহরে যাওয়ার আগেই তাঁকে সপার্ষদ আসানসোল স্টেশনে নামিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সেবারের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পঞ্চাশ বছর আগের এই কংগ্রেস অধিবেশন নানা কারণেই জাতির ইতিহাসে বিশেষ রকম গুরুত্ব অর্জন করেছিল। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে গান্ধী-আরউইন চুক্তির (১৯৩১) ফলে সরকারের কাছে দেশবাসীর যেটুকু প্রত্যাশা জন্মেছিল তা অনতিবিলম্বে বার্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় লনডনের গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩২) থেকে ফিরে এসে বার্থ মনোরথ গান্ধীজী দেশবাসীকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আবারও আহ্বান জানালেন। সরকারও এ ব্যাপারে উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আসন্ন কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনটি বানচাল করে দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রথমেই কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করেন। তারপর শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড় এবং সেই সনাতন পুলিশি নিপীড়ন। দেশব্যাপী সেই সন্ত্রাসের মুখে কংগ্রেসের প্রেসিডেনট ইলেকট পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জানালেন যে, বিগত পনের মাসের মধ্যে নারী পুরুষ মিলিয়ে কংগ্রেসের প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ব্যাপক নিপীড়নের অস্ত্র প্রয়োগ করে সরকার হয়ত ভেবেছেন যে মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা কংগ্রেসকে ঠান্ডা করে দিতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তা কিছুতেই হবার নয়।

কলকাতায় কংগ্রেসের সেই ৪৭ তম অধিবেশনে ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয় এবং সেই সংগে আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য

[illegible] প্রসঙ্গত, এই প্রবন্ধের সূচনাতে কংগ্রেসের মত একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কীভাবে জন্ম নিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পট্টভি সীতারামাইয়ার মতটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী ১৮৮৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকদের উপস্থিত হতে দেখেই সেকালের নেতারা একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রেরণা বোধ করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু এই মত সর্বজন স্বীকৃত নয়। বরং অ্যানি বেসান্তের মতে ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের [illegible] সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। অন্য আর এক দলের মতে এই রকম একটি সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা সর্বপ্রথম অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের মনেই উদিত হয়েছিল। এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য হিউম ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে সরাসরি আহ্বান জানান। সব শেষে মারকসবাদী ঐতিহাসিকেরাও কংগ্রেসের জন্ম সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে কংগ্রেস [illegible] জনমনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব এতই তীব্র ছিল যে যেকোন মুহূর্তে ব্যাপক গণ জাগরণের ফলে রাজশক্তি বিপন্ন হয়ে উঠত। এই সংকটের পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের মত একটি আপসবাদী প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে সাহায্য করে রাজশক্তি এ দেশের গণ আন্দোলনগুলিকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রবন্ধ রচনায় যে সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আছে Sitaramayya, B.P. History of the Indian National congress, Vol. I, Majumdar, R.C. History of freedom Movement in India, Vols I-III, Seal A, The Emergence of Indian Nationalism, Besant, A. How India Wrought for Freedom প্রভৃতি। □

কংগ্রেস অধিবেশন : ১৮৮৫-১৯৪৭

সাল	স্থান	সভাপতি	সাল	স্থান	সভাপতি
১৮৮৫	বোমবাই	উমেশচন্দ্র ব্যানারজি	১৯১৭	কলকাতা	অ্যানি বেসান্ত
১৮৮৬	কলকাতা	দাদাভাই নউরোজী	১৯১৮	দিললি	মদনমোহন মালব্য
১৮৮৭	মাদ্রাজ	সৈয়দ বদরুদ্দীন তায়েবজী	১৯১৯	অমৃতসর	মতিলাল নেহরু
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জরজ ইয়ুল	১৯২০	নাগপুর	সি বিজয় রাঘবাচারিয়ার
১৮৮৯	বোমবাই	ওয়েডারবার্ন	১৯২১	আহমেদাবাদ	হাকিম আজমল খান
১৮৯০	কলকাতা	ফিরোজ শা মেহতা	১৯২২	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাশ
১৮৯১	নাগপুর	আনন্দ চার্লু	১৯২৩	কোকনদ	মৌলানা মহম্মদ আলি
১৮৯২	এলাহাবাদ	উমেশচন্দ্র ব্যানারজি	১৯২৩	দিললি	মৌলানা আজাদ
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নউরোজী	১৯২৪	বেলগাঁও	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৮৯৪	মাদ্রাজ	এ ওয়েব	১৯২৫	কানপুর	সরোজিনী নাইডু
১৮৯৫	পুনা	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯২৬	গৌহাটি	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৮৯৬	কলকাতা	মহঃ রহিমতুল্লা সেয়ানী	১৯২৭	মাদ্রাজ	এম এ আনসারি
১৮৯৭	আমরৌতি	সি শংকরণ নায়ার	১৯২৮	কলকাতা	মতিলাল নেহরু
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু	১৯২৯	লাহোর	জওহরলাল নেহরু
১৮৯৯	লখনউ	রমেশচন্দ্র দত্ত	১৯৩০		এই বছরে কোন অধিবেশন হয়নি।
১৯০০	লাহোর	এন জি চন্দ্রভারকর	১৯৩১	করাচি	বল্লভভাই প্যাটেল
১৯০১	কলকাতা	দীনশা ওয়াছা	১৯৩২	দিললি	রণছোড়লাল অমৃতলাল
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩৩	কলকাতা	নেলী সেনগুপ্তা
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ	১৯৩৪	বোমবাই	রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯০৪	বোমবাই	হেনরি কটন	১৯৩৫		এই বছরে কোন অধিবেশন হয়নি।
	বেনারস	গোপালকৃষ্ণ গোখেল	১৯৩৬	লখনউ	জওহরলাল নেহরু
১৯০৬	কলকাতা	দাদাভাই নউরোজী	১৯৩৭	ফৈজপুর	জওহরলাল নেহরু
১৯০৭	সুরাট	রাসবিহারী ঘোষ	১৯৩৮	হরিপুরা	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯০৮	মাদ্রাজ	রাসবিহারী ঘোষ	১৯৩৯	ত্রিপুরি	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯০৯	লাহোর	মদনমোহন মালব্য	১৯৪০	রামগড়	মৌলানা আজাদ
১৯১০	এলাহাবাদ	ওয়েডারবার্ন	১৯৪১-৪৫		এই পাঁচ বছর কোন অধিবেশন হয়নি।
১৯১১	কলকাতা	বিষেণ নারায়ণ ধর	১৯৪৬	মীরাট	জে বি কৃপালনী
১৯১২	পাটনা	আর এন মুধোলকর	১৯৪৭	.....	রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯১৩	করাচী	সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর			
১৯১৪	মাদ্রাজ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু			
১৯১৫	বোমবাই	সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ			
১৯১৬	লখনউ	অম্বিকাচরণ মজুমদার			

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জাতীয় কংগ্রেস ও স্বাধীনতা আন্দোলন

নিমাইসাধন বসু

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভূমিকা ও অবদান সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে তেমন সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই বললে বোধহয় ভুল করা হবে না। চিত্তরঞ্জন খ্যাতনামা, বিত্তশালী ব্যবহারজীবী ছিলেন। তিনি আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের গভীর স্বদেশপ্রেম ছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি বিপুল পসার, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এর পর তিনি স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতা পুরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সারা দেশ শোকমগ্ন হয়েছিল এবং তাঁর মরদেহ নিয়ে কলকাতার পথে শোকযাত্রা এক অভূতপূর্ব চিত্তস্পর্শী দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। মোটামুটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এইটুকু মাত্র পরিচয় ভারতবর্ষের মানুষ জানে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিত্তরঞ্জনের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা আজও বহুলাংশে অজানা রয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল আমাদের দেশে বরেণ্য ঐতিহাসিক চরিত্রের মানুষের প্রকৃত মূল্যায়নের চেয়েও শ্রদ্ধা জানাবার নাম করে আমরা তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করি। পূজার ছলে ভুলে থাকার যে অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ করেছেন তা নির্মম সত্য। অবশ্য দেশবন্ধুর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্য একটি কারণ আছে। সেটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন দেশবন্ধুর মানসপুত্র সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৯ সালে চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভায় স্বরাজ সাধনায় সর্বত্যাগী এই মানুষটি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার পর গভরনমেনটের কৃপায় তাঁর সংগে একই কারাগারে অনেকদিন বাসও করতে হয়েছিল। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে সংকোচ বোধ হয় পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলি। বাঙালির চিত্ত এমন করে আর কেউ জয় করতে পেরেছেন কিনা জানি না।'

অ্যালবার্ট হলের ঐ স্মরণসভায় সুভাষচন্দ্রই কিন্তু বলেছিলেন যে, কেন ও কীভাবে, কোন শক্তির বলে চিত্তরঞ্জন দেশের মানুষের মনে অনন্য স্থান করে নিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করে দেখার সময় এসেছে। দেশবন্ধুর চিন্তা ও কর্মের বিচার-বিশ্লেষণের মূলসূত্রের ইংগিতও সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে চিত্তরঞ্জন ত্যাগ হঠাৎ একদিনে করেননি। 'সারা জীবন ধরে এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেশবন্ধু খুব ভাবপ্রবণ ছিলেন। নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ ছিল না। তাঁর জীবনতত্ত্বের সংগে ভারতীয় জাতীয়তার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁর মধ্যে কতকগুলি আপাতবিরুদ্ধ বৃত্তির অপূর্ব সামঞ্জস্য হয়েছিল।' এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির কারণ বক্তা সুভাষচন্দ্র বলে নয়। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূল্যায়নের সময় সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য স্মরণ রাখলে লাভবান হবেন বলেই আমি মনে করি। শুধুমাত্র ঐতিহাসিকেরাই নয়, ইতিহাসের পাঠকেরও দেশবন্ধু ও তাঁর যুগকে বুঝতে সুবিধা হবে।

চিত্তরঞ্জনের জন্ম ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ও ইংলনডে লেখাপড়া শেষ করে ব্যারিসটার হয়ে কলকাতার হাইকোরটে ব্যবহারজীবীরূপে জীবন শুরু করেন ১৮৯৪ সালে। এর মধ্যে জাতীয় জীবনে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬), বিচার বিভাগে বর্ণবৈষম্য বিরোধী ইলবারট বিল আন্দোলন (১৮৮৩), কলকাতায় প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় অধিবেশন (১৮৮৩), জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম (১৮৮৫) এবং পরের বছর কলকাতায় অধিবেশন থেকে ১৮৯৪ এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন চরিত্র ও কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সংগে যুক্ত না হলেও তরুণ চিত্তরঞ্জনের মনে ঐ সব ঘটনার গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠছিল।

বংগভংগ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সহমর্মী ও সমর্থক। লরড কারজনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বাঙালি জাতি-বিরোধী মনোভাব ও বক্তব্যের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। এই মানসিকতা ও পটভূমিতে তিনি আলিপুর বোমার মামলায় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তী প্রায় এক দশকে চিত্তরঞ্জন জাতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় আন্দোলনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেননি। বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি প্রায় চমকপ্রদভাবে যোগদান করেন ১৯১৭ সালে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে ঐ একই বছর উত্তর বিহারের চম্পারনে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে গান্ধীজী প্রথম সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক আবির্ভাব ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। উভয়ের মধ্যে প্রথমে রাজনৈতিক দৃষ্টি ও মত পার্থক্য, পরে সহযোগিতা, অসহযোগ আন্দোলনের পরে পুনরায় মত বিরোধ এবং সর্বোপরি মতাদর্শের ও কর্মসূচীর মধ্যে গভীর মতানৈক্য থাকলেও পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা এবং দেশ ও দলের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠে একসংগে সংগ্রাম করার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গান্ধীজী ও দেশবন্ধু স্থাপন করেছিলেন তা আজও অম্লান ও অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে।

১৯১৭ সালের এপরিলে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বেংগল প্রভিনসিয়াল কনফারেনসে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন। তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করে বাংলার রাজনৈতিক কর্মীরা চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ প্রেম ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাঁর সভাপতির ভাষণ চিত্তরঞ্জনকে বাংলা তথা ভারতের সম্ভাবনাময় নেতারূপে চিহ্নিত করেছিল। ঐ ভাষণ সকল শ্রেণীর স্বাধীনতা পাগল দেশপ্রেমিক বাঙালির হৃদয় জয় করেছিল। দৃপ্ত কণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের শক্তি-উপাসনা উপহাসে পরিণত হয়েছে। বাঙালি তার আত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলে অর্থহীন, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান পালন করছে মাত্র। বাঙালির ধর্ম, বিজ্ঞান ও জীবনীশক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। পাশ্চাত্যানুকরণে মত্ত উচ্চশ্রেণীর বাঙালি সমাজকে ভর্ৎসনা করে চিত্তরঞ্জন বলেন যে দেশের সবচেয়ে বড় বিপদ হল যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-আচরণে আমরা অকারণে ইংরেজদের অনুকরণ করে 'সাহেব' হবার চেষ্টা করছি। নিজের দেশ, তার অতীত ইতিহাস, তার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কখনও চিন্তা করি না। ফলে আমাদের

রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের মানুষের মনে স্থান পায়নি, দেশের মাটিতে তার শিকড় নেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের কি সম্পর্ক আছে? তাদের চিন্তা, তাদের ভাষা আর নেতাদের চিন্তা ও ভাষার মিল কোথায়? চিত্তরঞ্জন বলেন যে 'আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে দেশের জনগণের আমাদের ওপর কোনো আস্থা নেই। আমরা ইংরাজী পড়ি, ইংরাজীতে চিন্তা করি, এমনকি আমাদের বক্তৃতাগুলিও ইংরাজী থেকে অনুবাদ করা।' চিত্তরঞ্জন সতর্ক করে দেন যে এই ধার করা ইংরাজিয়ানা দেশের মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারা নকল জিনিস চায় না। চায় আসল জিনিস – যাতে কোন ভেজাল নেই।

চিত্তরঞ্জনের ভবানীপুর সম্মেলনের ভাষণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। নিপুণ শল্য চিকিৎসকের মত তিনি অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরের দুর্বলতা অস্ত্রোপচার করে তুলে ধরে ছিলেন এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে আরোগ্যের পথ নির্দেশ করেছিলেন। কংগ্রেসের চরমপন্থীরা চিত্তরঞ্জনের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আর বিপ্লবীরা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে এক যথার্থ বিপ্লবীর সন্ধান পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব 'মডারেট' বা নরমপন্থীদের চূড়ান্ত পরাজয় সুনিশ্চিত করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, নরমপন্থীদের নেতা বলে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সম্মেলনেই চিত্তরঞ্জনের ভাষণ শুনে এ ভূমিকা লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করবেন। সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে দেরি হয়নি। কারাগারে বন্দী থাকা কালে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনের (ডিসেম্বর ১৯২১) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পরের বছরের গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু মতানৈক্য সত্ত্বেও উভয়ের মৌলিক চিন্তা দেশের মূল সমস্যা নির্ণয় ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মিল ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯) পর কংগ্রেস যে তদন্ত কমিটি গঠন করে তার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও উৎসাহী সদস্য ছিলেন চিত্তরঞ্জন। সারা ভারতবর্ষে তখন এক চরম উত্তেজনা, অনিশ্চিয়তা ও সঙ্কট। শিক্ষিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা আশা করেছিলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের যুক্তি ও ন্যায়সংগত দাবিগুলি পূরণ করবেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার প্রস্তাবিত মনটেগু-চেমসফোরড শাসন সংস্কার মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। মধ্যপন্থীরা প্রস্তাবিত সংস্কারগুলিকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবগুলি কার্যকর হলে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে। কিন্তু চরমপন্থীরা প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি সম্পূর্ণ হতাশাজনক ও বর্জনীয় বলে মত প্রকাশ করেন। বোমবাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (আগস্ট, ১৯১৮) স্বায়ত্ত শাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। এবং মনটেগু-চেমসফোরড রিপোর্ট নৈরাশ্যজনক বলে অভিহিত হয়। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের সমালোচনা উপেক্ষা করে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন 'ভারত শাসন আইন' নামে কার্যকর হয়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বের সূচনা হয়েছে। তাঁর শান্তিপূর্ণ নৈতিক আন্দোলন বা 'সত্যাগ্রহ' সারা দেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দমনমূলক 'রাউলাট অ্যাকট' – বিরোধী আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা ও পাঞ্জাবের মর্মন্তুদ ঘটনাবলী ভারত জুড়ে গভীর বেদনা ও প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ঐ নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর বেদনা ও বিক্ষোভ মূর্ত করেছেন। এই পটভূমিতে জাতীয় কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল মনেটগু চেমসফোরড শাসনসংস্কার সম্বন্ধে কোন নীতি গ্রহণ করা হবে। কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী চরমপন্থীরা অবশ্যই নতুন ভারত শাসন আইনের বিরোধিতার পক্ষপাতী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও অন্যান্য বাঙালি কংগ্রেস নেতাদেরও এই অভিমতই ছিল। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে (ডিসেমবর ১৯১৯) গান্ধীজীর ইচ্ছা ও প্রস্তাব অনুসারে প্রবর্তিত সংস্কারের জন্য মনেটগু ও চেমসফোরডকে ধন্যবাদ জানান হয় এবং কংগ্রেস নতুন শাসনব্যবস্থার সংগে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চিত্তরঞ্জন, তিলক, রামভুজ দত্ত চৌধুরী প্রমুখ নেতাদের বিরোধিতা সফল হয়নি। অমৃতসর কংগ্রেস প্রথম 'গান্ধী কংগ্রেস' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে রাজনৈতিক চিত্রের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। কলকাতায় আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (সেপটেম্বর ১৯২০) গান্ধীজী 'কাউনসিল বয়কট' ও অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন। চিত্তরঞ্জন, তিলক ও তাঁদের সমর্থকরা গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু অল্প ভোটের ব্যবধানে গান্ধীজী প্রস্তাবিত নীতিই কংগ্রেস গ্রহণ করে। মাত্র কয়েকমাস পরেই জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (ডিসেমবর, ১৯২০) চিত্তরঞ্জন স্বয়ং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার মূল প্রস্তাবটি পেশ করেন। অথচ এই অধিবেশনের পূর্বে গান্ধীজী প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের নীতি ও কর্মসূচী যাতে কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত না হয় তার জন্য চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলা থেকে এক বিরাট প্রতিনিধিদল গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐরকম অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন কেন হয়েছিল সেই নিয়ে সমসাময়িক কালে বহু তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। আজও ঐতিহাসিকেরা ঐ বিষয় বিশ্লেষণ করছেন।

বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্যা ও গান্ধী চিত্তরঞ্জন বিরোধ এবং সমঝোতার জটিল কারণগুলি বিশদ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মূল সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। সর্ব প্রথম কারণ হল যে, ১৯১৯ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনীতি ও কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অমৃতসর, কলকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসে বাঙালি প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। আর একটি বাস্তব সত্য ছিল যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে আকৃষ্ট করার এবং প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ে তোলার যে ক্ষমতা গান্ধীজীর ছিল তা অন্য কোন জাতীয় নেতার ছিল না। চিত্তরঞ্জন গণশক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর সেই ভিত্তিও ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজীর তুলনায় তাঁর প্রভাব অনেক কম ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলার প্রতিনিধিদের গান্ধী বিরোধিতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে চিত্তরঞ্জন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনিও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে গান্ধীজীর বিরোধিতা করেছিলেন। এই ব্যাখ্যা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তার অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন চিত্তরঞ্জন। প্রথমে আদর্শ ও রাজনৈতিক কৌশলের কারণে তিনি 'কাউনসিল প্রবেশ' নীতির সমর্থক ছিলেন। পরে বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজন বিচার করে তিনি মত ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করেছিলেন। যখন রাজনৈতিক পটভূমি, জাতীয় প্রয়োজন এবং আন্দোলনের লক্ষ্য ঘটনাপ্রবাহে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে সেই সময় জিদের বশে একই নীতি আঁকড়ে থাকা রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন অবস্থার প্রয়োজনে ও দল এবং জাতির স্বার্থে নিজের ভূমিকা স্থির করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাদের গান্ধী-বিরোধী মনোভাবের আর একটি কারণ ছিল: গান্ধীজী সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতা চান। কিন্তু মতিলাল নেহরুকে এক চিঠিতে বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন যে গান্ধীজীর প্রতি 'অন্ধ ভক্তি' জনসাধারণের 'চিন্তার স্বাধীনতা' নষ্ট করে দেবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ও কিছু কালের জন্য সমস্ত স্বদেশ প্রেমিক ভারতীয়রা গান্ধীজীর একনায়কত্ব মেনে নিয়েছিল।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও কর্মসূচী শুধুমাত্র চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতারাই মেনে নেননি, সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরাও সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এর কারণ গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এক বছরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে 'স্বরাজ' যদি না আসে তাহলে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হবে। গান্ধীজীর অনুরোধে বিপ্লবীরা ঐ এক বছরের জন্য তাঁদের কর্মতৎপরতা বন্ধ রাখতে সম্মত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনও গান্ধীজীর নীতি ও কর্মসূচীর সার্থকতা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর মত, পথ ও নেতৃত্ব মেনে নেবার পর চিত্তরঞ্জন যেভাবে অসহযোগ আন্দোলনে সর্বস্বত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার তুলনা নেই। চিত্তরঞ্জন প্রকৃতই দেশবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। অন্য সব কিছু ভুলে গেলেও তাঁর ত্যাগের দৃষ্টান্ত চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কংগ্রেসকে বাংলা দেশে

প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অনন্য। কংগ্রেসে গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ পদ ও মর্যাদা দিয়ে তিনি সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। সর্বসময়ের জন্য কংগ্রেসকর্মী নিয়োগ, কংগ্রেস সংবাদ পরিবেশন সংস্থা (Congress News Service), স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মহিলাদের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ও মহিলা সমিতি গঠন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের পরিকল্পনা, কুটির-শিল্পের প্রসার ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচী চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে কার্যকর করা হয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টা এবং কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমানদের সমবেত করার উদ্যোগ। ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানরা যেমনভাবে যোগদান করেছিল ইতিপূর্বে ও এর পরে আর কখনও তা দেখা যায়নি। অবশ্যই এর প্রধান কারণ ছিল খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের সমর্থন। কিন্তু অন্যতম প্রধান কারণ ছিল চিত্তরঞ্জনের দূরদৃষ্টি ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। চিত্তরঞ্জন প্রস্তাবিত হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট এর (ডিসেম্বর ১৯২৩) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হিন্দু প্রাধান্য-ভীতি ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার কারণগুলি দূর করে সম্প্রীতির ভিত সুদৃঢ় করা। জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য এই 'প্যাক্ট' অনুমোদন করেনি। প্রস্তাবিত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট এক বহু বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনকে প্রকৃত 'জাতীয়' করে তোলার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকতর সমর্থন যে একান্ত অপরিহার্য তা চিত্তরঞ্জনের মত আর কেউ উপলব্ধি করেছিলেন কিনা সন্দেহ। মওলানা আজাদ চিত্তরঞ্জনের এই ভূমিকা শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করেছেন।

চৌরিচৌরার ঘটনার পর (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে অন্যান্য দেশনেতাদের মত চিত্তরঞ্জনও ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন। এর পর কীভাবে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরুর উদ্যোগে স্বরাজ্য দলের জন্ম হয়েছিল তা অজানা নয়। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়াতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন সভাপতিত্ব করেন। এর দু'মাস আগেই দেহরাদুনে উত্তরপ্রদেশে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন যে স্বরাজ কোন শ্রেণীর জন্য নয় — স্বরাজ জনগণের জন্য। স্বরাজ্য দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনে জয়লাভ করে ভিতর থেকে আইনসভাগুলির কার্যাবলী ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অচল করা। স্বরাজ্য দল (মার্চ, ১৯২৩) কিন্তু কংগ্রেসেরই একটি শাখারূপে কাজ করতে থাকে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন জাতীয় ও দলীয় ঐক্যের একনিষ্ঠ সমর্থক। ব্যক্তিস্বার্থ বা মতানৈক্যের কারণে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি বিঘ্নিত হক এই চিন্তা তাঁর মনে কোন দিন স্থান পায়নি। তাই শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার। স্বরাজ্য দল তেমন কোন স্থায়ী সাফল্য অর্জন করেনি। চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যু স্বরাজ্য দলের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু স্বরাজ্য দল ভবিষ্যতে সংসদীয় নির্বাচন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল। সংগঠনকে গণ-ভিত্তিক করে, নির্বাচনী যুদ্ধের কৌশল নির্ণয় করে, ব্যাপক প্রচারব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করে এবং জনসেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আদর্শবাদী যুবকদের কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুভাষ চন্দ্র।

কংগ্রেসী নেতা হয়েও চিত্তরঞ্জন সকল শ্রেণীর ও সকল মতের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বিপ্লবীরাও তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন ও মনে মনে তাঁকে কাছের মানুষ, সহমর্মী বলে বিশ্বাস করতেন। চিত্তরঞ্জন ভারতবর্ষকে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশের জাতীয় আন্দোলন ও এশিয় দেশগুলির ঐক্যবন্ধনের ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বের কথা তিনি বলেছিলেন। গান্ধীযুগের অন্যতম প্রধানচরিত্র ছিলেন চিত্তরঞ্জন। গান্ধীজীর অসাধারণ চরিত্র ও অনন্য নেতৃত্বের ফলে চিত্তরঞ্জন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথাযথ স্বীকৃতি ও সাফল্যলাভ করেননি। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ভূমিকার কথা বিস্মৃত হলে জাতীয় কংগ্রেস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অধ্যায় আমাদের পক্ষে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। □

গান্ধীজী ও বাংলা

শান্তিকুমার মিত্র

বাংলা বাংলাই – বাংলা সম্বন্ধে গান্ধীজীর সুগভীর প্রত্যয়। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর, গান্ধীজী তখন দাংগাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে পরিক্রমারত। নোয়াখালির শ্রীরামপুর গ্রামে এক সাংবাদিক তাঁকে জিগ্যেস করেন, রাজনৈতিক দাবা খেলায় বাংলাকে কি পণ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না? গান্ধীজী তারই উত্তরে বলেন একথা ঠিক নয়। বাংলা বাংলাই। তাই আজ বাংলা পুরোভাগে। বাংলায়ই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরগণ বাংলাতেই জন্মেছেন – যদিও তাঁরা আমার চোখে ভ্রান্ত। একথা [illegible]নাদের আজ বুঝতেই হবে। [illegible] যদি আজ তার খেলা [illegible] খেলতে পারে, তাহলে [illegible] ভারতের সব সমস্যার [illegible] করবে। এই জন্য আমি আজ [illegible] হয়েছি। যে বাংলায় এমন [illegible] জন্মেছে, সেখানে কাপুরুষতা [illegible] কেন? প্রসংগত উল্লেখ্য, নোয়াখালি পৌঁছাবার কয়েক[illegible] গান্ধীজী জানালেন, এখানে তিনি শুধু ধ্বংসলীলা দেখতে বা মানুষকে সান্ত্বনা দিতে আসেননি, বরং স্থায়িভাবে বাস করবার জন্য, বাঙালি হবার জন্য এসেছেন। গান্ধীজী তখন থেকেই বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন।

নোয়াখালিতে তখন উপস্থিত সাংবাদিকদের একজনের সংগে পরবর্তীকালে আমার কথা হয়েছে। গান্ধীজীর আন্তরিক ঘোষণা, উক্তিতে তিনি গভীরভাবে অভিভূত। বস্তুত বাংলা ও গান্ধীজী, কিংবা গান্ধীজীর বাংলা ও বাঙালির প্রকৃতি প্রীতি বা বাঙালি সম্বন্ধে গান্ধীজীর উচ্চাশা, প্রত্যাশা, সপ্রশংস মনোভাব পর্যায়ে অজস্র সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ, সংকলন করা যায়। তবে আজকের নতুন প্রজন্মকে তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর সামগ্রিক জীবন-সাধনার অনুধ্যান প্রয়োজন বেশি। গান্ধীজীর মূল আদর্শ, নীতি না বুঝলে বাংলাপ্রসংগেও তাঁর ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায়। এটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়েই এ লেখার যা উপজীব্য, গান্ধীজী ও বাংলা, সে প্রসংগে আসি।

প্রাক কথায় আরো বলা উচিত, বাংলার সংগে গান্ধীজীর পরিচয়ের সূচনাও স্মরণীয়। ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী প্রথমবার ছ'মাসের জন্য যখন ভারতে ফেরেন, তিনি কলকাতা বন্দরে জাহাজ থেকে নামেন এবং সেদিনই ট্রেনে বোম্বাই রওয়ানা হয়ে যান। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর পরিচয় হয় এ সময়। বছর পাঁচেক পরে গান্ধীজী আবার বাংলায় এলেন কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে। বাংলার নেতাদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল, বাঙালীর চরিত্র, প্রকৃতির প্রথম পরিচয় পেলেন। সেই শুরু। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে গান্ধীজী পূর্ববংগ, পশ্চিমবংগ – বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। ১৯২৫ সালে ইয়ং ইনডিয়ায় তিনি লেখেন : বাংলার জীবনকে আমি যত দেখছি, ততই বিভিন্ন দিকে তার বিশাল সম্ভাবনা উপলব্ধি করছি। বাংলা বর্তমান কালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে দিয়েছে। পৃথিবীর মহান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুজনকে দিয়েছে বাংলা। এদেশে গায়ক আছে, তাদের অতিক্রম করা শক্ত। এখানে চিত্রকর আছে। তাদের শিল্পকলা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে আছে। আত্মত্যাগেরও এমন বৃত্তি এর রয়েছে, যার

আমার জীবনই আমার বাণী।

মো ক গান্ধী

কাছাকাছি মহারাষ্ট্রও যেতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী ভাব সম্মিলন তো ঐতিহাসিক অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' নামে অভিষিক্ত করেন। গান্ধীজী রবীন্দ্র নাথকে 'গ্রেট সেনটিনাল' অর্থাৎ মহান প্রহরী রূপে অভিহিত করেন। যথার্থই গান্ধীজীর সংগে বাংলার সম্পর্কের দুটি দিক কংগ্রেসের কাজ, চরকার কাজ, গঠনমূলক কাজ বাংলার গ্রামবাসীদের গান্ধীজীর কাছাকাছি এনে দেয় একদিকে। অন্য দিকে বাংলার তৎকালীন মনীষীদের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী বাংলাকে দেখেন। বাংলার সংগে তাঁর মনোমিলন, অন্তর মিলন ঘটে। ফলে গান্ধীজীর বাংলা দর্শন সম্পূর্ণ হয়। কাজেই নোয়াখালিতে দুর্গত মানুষদের মাঝে তিনি নিজেকে বাঙালি ভাববেন, তাতে আর বিস্ময় কি? গান্ধীজী বাঙালি মেয়েকে নাতবৌ করেছিলেন – আভা গান্ধী তাঁর বহু পরিক্রমায় নিত্যসঙ্গিনী। নোয়াখালির গ্রামে এক প্রার্থনাসভায় হিন্দিতে মীরা বাঈয়ের ভজন গাওয়া হলে গান্ধীজী বলেন, তিনি বাঙালি হতে চান এবং মনে প্রাণেই তা চান। সেজন্য একান্তে প্রার্থনা হলেও যেন বাংলায় কেবল বাংলা গানই গাওয়া হয়। ঐ ঘটনার সাক্ষী তাঁর সংগী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান গান্ধীজী শুনতে ভালবাসতেন এবং মোটামুটি বুঝতেও পারতেন, মাঝে মাঝে কোনও শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। নোয়াখালি পরিক্রমায় সংগী সাংবাদিক সুকুমার রায়ের দেওয়া বিবরণ : 'একলা চলরে' ছিল গান্ধীজীর প্রাণের সংগীত। তিনি বারবার এই গানটি শুনতে চাইতেন। 'গুরুদেবের' গান ছাড়া আর কারও গানে তত আগ্রহ ছিল না তাঁর। কেবল অতুলপ্রসাদের 'শতবীণা বেণুরবে' ছাড়া আর সবই রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হত। সুকুমারবাবু, শৈলেন চ্যাটারজি প্রমুখ সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি, সাংবাদিকদের মধ্যে কাউকে কাউকেও ঐ সব রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হত। গান্ধীজীর বাংলা পড়া ও লেখাও সংগে সংগে চলছিল। নির্মলবাবুর লেখায় পাই : বিকালের প্রার্থনা শেষ হলে গান্ধীজী লণ্ঠন নিয়ে বসতেন নোয়াখালিতে, প্রত্যহ তার কাজ হল বাংলা পড়া। নিয়মিতভাবে হাতের লেখা করতেই হবে। অবশ্য এই পাঁচ মিনিট প্রায় রোজই ১০ – ১৫ মিনিটে পরিণত হত। নোয়াখালিতে কোনও দিন তাঁর পাঠের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিনি। বিহারেও বাংলা পড়া চলেছিল এবং দিল্লিতে শেষদিন পর্যন্ত তিনি বাংলা পড়েছিলেন। অন্যত্রও অনুরূপ বিবরণ মেলে : প্রত্যহ সকালে গান্ধীজী বাংলা শিখতেন। সাংবাদিকদের মধ্যে একজন গান্ধীজীর বাংলা পাঠে সাহায্য করতেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যে গান্ধীজী অর্থ বোঝবার মত মোটামুটি বাংলা শিখে ফেলেছিলেন, নোয়াখালিতেই বহুবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে গান্ধীজী বলেন, 'এখন আমি বাঙালি এবং নোয়াখালির অধিবাসী'। নিশ্চয়ই এসব গান্ধীজীর বাংলাপ্রীতিরই নিদর্শন।

গান্ধীজীর সংগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১৫ সালে। সেটা মারচ মাস। আগের মাসেও তিনি একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, পুণায় মহামতি গোখেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে চলে যান। তখন অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। সেই প্রথমবারই শান্তিনিকেতনে এসে গান্ধীজী বলেন বাংলার এই আশ্রমে আজ আমি অত্যন্ত পরিচিত, আমি তোমাদের পর নই। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর দ্বিতীয় দফার আগমনে তাঁর প্রেরণায় ১০ মারচ স্বাবলম্বনের প্রতীকস্বরূপ আশ্রমের সব কাজ ছাত্র শিক্ষকরা নিজেরা করেন। সেই থেকে ১০ মারচ গান্ধী-পুণ্যাহ রূপে পালিত হয়ে আসছে শান্তিনিকেতনে। ১৯২৭ সালে মহীশূরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গান্ধীজীর সংগে দেখা হয়। কথায় কথায় দার্শনিকপ্রবর সংশয় প্রকাশ করেন, বাঁচার সাহস কোথায় বাংলায় ! গান্ধীজীর ত্বরিত উত্তর : 'আপনার ঐ দীর্ঘ শ্মশ্রু নিয়ে একথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রচণ্ড শক্তির আধার স্যার সুরেন্দ্রনাথ এবং কবি রয়েছেন। কবি তো এই বয়সেও (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৬) সতেরো বছরের যুবকের মতো প্রাণপ্রাচুর্যে ও উৎসাহে নৃত্য করতে পারেন। তা ছাড়া বড়দাদা (ঋষি-প্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)! আমি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন থেকে বড়দাদা প্রেরিত আধ্যাত্মিক আলোক পেয়ে থাকি। তিনি নিরন্তর আমাকে লক্ষ্য করছেন এবং আমার মিশনের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছেন।' নির্মলবাবু আচার্য নন্দলাল বসুর কাছ থেকে শোনা একদিনের কথা লিখেছেন। শান্তিনিকেতনে তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ, চোখে ভালো দেখছেন না। গান্ধীজী তাঁকে প্রণাম করতে যান। গান্ধীর মুখ একেবারে চোখের কাছে এনে দেখলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, বললেন, আমি তোমার প্রতি আস্থা রাখি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস, শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসের পরই স্থান পায়।

বাংলা প্রসংগে গান্ধীজী নানা উপলক্ষেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন এবং প্রচুর প্রত্যাশা জানাতেন। গান্ধীবাদী লেখক, গঠনকর্মী ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, বাঙালির মহত্ত্ব যেমন তাঁকে আনন্দ দিয়েছে, বাঙালির দুর্বলতায় তেমনি তিনি দুঃখ পেয়েছেন। গান্ধীজীর সেরকম কতকগুলি মন্তব্যের উল্লেখ করছি, যাদের কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যেমন, গান্ধীজী ১৯১৭ অখিল ভারত সমাজকর্মী সম্মেলনে বক্তৃতায় বলেন : আমি যদি গান শুনতে চাই, তবে অবশ্যই আমাকে বাংলায় যেতে হবে; যদি আমি কবিতা শুনতে চাই, তাহলেও আমাকে যেতে হবে বাংলায়। বাংলার মধ্যেই ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু বাংলাকে ভারতের অন্যত্র পাওয়া যাবে না। আমি কয়েকটি মারোয়াড়ী ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলার মতো শোনাচ্ছিল সেই গান। আমি তাদের বাঙালিদের সংগে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রসংগে গান্ধীজীর উক্তি : বাঙালিরা তো পাগল। দেশবন্ধু তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি জাতির কাজে ট্রাসটির হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি জানি যে, বাড়িটির জন্য কিছু দায় আছে। কিন্তু দেশবন্ধু যদি ইচ্ছা করতেন তিনি তাঁর বিরাট আইন-ব্যবসায়ে ফিরে গিয়ে এক বছরের মধ্যেই এই দায় মিটিয়ে দিতে পারতেন। আমি দুঃখ বোধ এবং অশ্রুমোচন না করে এই বিশাল অট্টালিকায় প্রবেশ করতে পারিনি। একজন দার্শনিক হিসাবে আমি জানি যে, বাড়িটি দান করে তিনি বোঝা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর বাসিন্দা হিসাবে এও আমি জানি যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এইরকম বোঝা বহন করতে খুশিই হবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিশাল বাড়িতে থাকতে আনন্দ বোধ করবে।...... আর তিনিই একমাত্র পাগল বাঙালি নন। মহান আচার্য রায় রয়েছেন। সম্পূর্ণ আত্মভোলা হয়ে তিনি মঞ্চের উপরেই একবার এই পা আবার অন্য পা দুলিয়ে নৃত্য করে থাকেন। যারা তাঁকে জানেন না, তারা বুঝতেই পারেন না যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি খাদি পাগল। তিনি তাঁর ভালবাসাকে বিজ্ঞান ও খদ্দরের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আমি এরকম অসংখ্য পাগল বাঙালির নাম করতে পারি। ইয়ং ইনডিয়ায় ১৯২১-এ গান্ধীজী লেখেন: খাদির সাফল্য বাংলায় প্রায় নেই। তবে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণের অভাবও সেখানে নেই।...... বাংলা যখন সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হবে তখন সে পিছিয়ে থাকবে না। তার সুন্দর কল্পনাশক্তি আছে। বাংলার গ্রামবাসীরা সরলতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বাংলার ছেলেরা বুদ্ধিমান এবং উদ্যমী, মেয়েরা রমণীয়, সরল এবং লাবণ্যময়ী। পুরুষ এবং নারীরা গভীর ধর্মপরায়ণ। তাঁদের বিশ্বাস উঁচু। চরকার স্মৃতি এখনও জাগ্রত রয়েছে। ১৯৩১-এ গান্ধীজীর লেখা : যৌবনে বাংলার কাছে আমি যে প্রেরণা পেয়েছিলাম, তার জন্য বাংলার কাছে আমি বিশেষ ঋণী।... বাংলায় আমার বিরুদ্ধে কোনও গোপন প্রচার চলেছে দেখতে পেলে আমি খুবই দুঃখিত হব। বাংলায় আমার অনেক মূল্যবান সহকর্মী আছে। আমি চাই, সেই সংখ্যা বাড়ুক। বাংলার যুবকদের সহযোগিতার মূল্য আমি জানি। সেই সহযোগিতা আমি চাই, চাই তাঁদের জন্য, যে-দেশকে তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের জন্য। কিন্তু হায়, তাঁদের এই ভালবাসা কখনও কখনও অন্ধভাবে অনুসৃত হয়। নিজেদের ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা যেন একজন প্রকৃত বন্ধুর সেবা অস্বীকার না করেন। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবা সদন-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে গান্ধীজী বলেন : বাংলা গোটা ভারতবর্ষকে গ্রাস করে নিলে আমি কিছু মনে করব না।......যে বাংলা রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে – যে-বাংলা চৈতন্যের পূত পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে, গংগা এবং ব্রহ্মপুত্র যে-বাংলাকে পবিত্র করেছে, সে বাংলা সম্বন্ধে সংশয় নেই। বাংলার ত্রুটি নিয়েও ইয়ং ইনডিয়ায় গান্ধীজী ১৯২০-তে স্পষ্টাক্ষরেই লেখেন, গোপনতার পাপ হল ভারতে অন্যতম অভিশাপ। অজানিত পরিণামের ভয়ে আমরা চুপিচুপি কথা বলে থাকি। এই গোপনতা বাংলার চেয়ে বেশি উৎপীড়ন কোথাও আমাকে করেনি। প্রত্যেকেই তোমার সংগে গোপনে কথা বলতে চায়। মুখ খোলার আগে তাদের কথা তৃতীয় জন আড়ি পেতে শুনছে কিনা তা দেখার জন্য বক্তার চারদিকে তাকানর দৃশ্যটি আমাকে গভীরতম দুঃখ দিয়েছে।

[illegible]
দেখেছেন, তাঁর [illegible] বিবরণে। সেখানেই তা ধরা রয়েছে, যার কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। নিশ্চয়ই এ প্রশ্নও স্বভাবতই জাগে, বিশেষ করে যে প্রজন্ম গান্ধীজীকে দেখেনি, গান্ধী-যুগ বা গান্ধীজীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করেনি, অনুভব করেনি, এখনকার পশ্চিমবঙ্গের সেই বর্তমান, নতুন প্রজন্মের জিজ্ঞাসা তো স্বাভাবিক – বাংলা কি গান্ধীজীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল, কতখানি গ্রহণ করেছিল? ত্রিশের দশকের শেষে চল্লিশের দশকের গোড়ায় কংগ্রেসের সেই পর্বে গান্ধী-সুভাষচন্দ্র মতান্তর সেকালের বাঙালির মনে বেশ কিছু বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল তো বটেই। কিন্তু ইতিহাস কখনও বলে না, গান্ধীজী বাংলায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। এখানে অবশ্য সে তর্ক বিচার অপ্রাসঙ্গিক। কেবল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালি মানসিকতার বিশেষত্বও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপে বাঙালি মানস অভিভূত। সে সব কাজের আলাদা রোমাঞ্চ; জীবনপণ, ত্যাগের মহিমারও ভিন্ন আকর্ষণ ছিল তার কাছে, বাঙালি চিরকালই রোমানটিক। কিন্তু গান্ধীজী, পটক্ষেপ যাই হোক, ক্রমেই বাংলার পল্লী মানসের অনেক অন্দরে স্থান করে নিয়েছিলেন। গ্রামবাসী, বাংলার তরুণরা তাঁর ডাকে যে উৎসাহ সহকারে সাড়া দিয়েছিল, গান্ধীজীর লেখায়ও তার সাক্ষ্য বিদ্যমান। আজকের প্রবীণেরাও তার প্রত্যক্ষদর্শী। আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতি-

[illegible]
নেতাজী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর প্রতি পোষণ করতেন। বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্রকে লেখা গান্ধীজীর চিঠিপত্রও সাক্ষী, গান্ধীজী কী স্নেহময় দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে দেখতেন। সে সব সাক্ষ্যপ্রমাণে যাওয়ার আগে আমার দেখা কিছু স্মৃতি রোমন্থন করে নিই। গান্ধীজীকে প্রথম দেখি, ১৯৪৫-এ সোদপুরে প্রার্থনাসভায়। শান্ত, শোভন, ভক্তিনম্র শ্রোতৃকুল, সামনে উপবিষ্ট পূত করুণার্দ্র গান্ধীজী, সে ছবি আজও প্রোজ্জ্বল। তাঁকে শেষ দেখি দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে, যেখানে দেশ বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় – বিষণ্ণ, ব্যথাতুর গান্ধী। দেশ বিভাগের বেদনার মূর্ত প্রতীক সে গান্ধী-মূর্তি। এ ছবিটির ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি এজন্যই যে, দেশ বিভাগে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের বাঙালী বিপর্যস্ত এবং তার দরুন বেদনা বিহ্বল। কিন্তু গান্ধীজী দেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ কালে অসহায় এবং তাঁর সে সময়কার মর্মপীড়া অপরিসীম। সেকালের পর ক'দশক অতিক্রান্ত। এখন কি এদেশে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও গান্ধী-আদর্শের মধ্যেই নতুন করে পথ সন্ধানের চেষ্টা হচ্ছে না? আজকের প্রজন্মের কাছে গান্ধী-আদর্শ নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক এবং সে গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

সে কথা যাক। গান্ধীজীর জীবনকালের কথায়ই ফিরি। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার ছাত্রদের সাড়া দেখে গান্ধীজী ১৯২১-এ লেখেন, দেশের ডাকে বাংলা যেভাবে সাড়া দিয়েছে, বাংলায় প্রতি গভীর

[illegible]
আশা করিনি। শুধু আবেদনে অথবা নিছক ভাবাবেগে কেউ যন্ত্রণা বরণ করে না। গান্ধীজী প্রবর্তিত প্রতিটি আন্দোলনে উত্তরোত্তর বাংলার সাড়া বেড়েই চলল। শহরে গ্রামে সে কী উন্মাদনা! বাংলার তরুণরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশী নির্যাতনও ক্রমবর্ধমান, সে সময় বন্দেমাতরম ধ্বনির উচ্চারণভঙ্গিতে ভক্তি, আবেগ, দৃঢ়তার সে এক অপূর্ব সম্মিলন। গান্ধী-ভাব-বন্যায় সারা ভারত উথাল-পাথাল।

১৯২৫-এ গান্ধীজী লেখেন, 'গভীর আশা নিয়ে আমি বাংলা ভ্রমণের দিকে তাকিয়ে আছি। সুন্দরতম কল্পনা আছে বাংলায়। বাংলার যুবকেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁরা আত্মত্যাগে প্রস্তুত।' গান্ধীজীর প্রেরণায় ক্রমে ক্রমে বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহু সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ রচনাত্মক কার্যেরই সূচনা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৪৪-এর শেষ দিকে হুগলি জেলার আরামবাগে দ্বারকেশ্বরের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের কংগ্রেসকর্মীরা স্বপ্ন দেখলেন, নদীতে এপার ওপার বাঁধ বেঁধে জল আটকে মাঠে মাঠে চারিয়ে দিয়ে বোরো চাষ করা হবে। কর্মীরা কোমর বাঁধলেন। সে প্রয়াস সফল হল। বোরো চাষের প্রচলন তখন থেকেই বাড়তে লাগল। হুগলির প্রখ্যাত গঠনকর্মী প্রয়াত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি, গান্ধীজী কর্মীদের উদ্যোগকে আশীর্বাদ জানান, গান্ধীজীর ডাকে বাংলার গ্রামে নীরবে বদল ঘটে গিয়েছে কতই না সেদিন। গান্ধী-সুভাষ পর্বে মাত্র এই-ই ক্ষেত্রে

ব্যাপার, তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছিল মূলত আদর্শগত। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের গান্ধী ব্রিগেড গড়েছিলেন; সর্বাধিনায়ক হিসাবে প্রথম ভাষণে, বেতারভাষণে জাতির জনক বলে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। আজাদ হিন্দ বন্দীদের উদ্দেশ করে পরবর্তীকালে গান্ধীজী যে সব কথা বলেছিলেন, তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করাও অহেতুক হবে না। গান্ধীজী লেখেন: আজাদ হিন্দ ফৌজের হিপনটিজম আমাদের ওপর জাদু সৃষ্টি করেছে। নেতাজীর নাম জাদুকরের মতো হয়ে গিয়েছে। তাঁর দেশপ্রেম কারোর চেয়ে কম নয়। তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে তাঁর শৌর্য প্রতিভাত। তাঁর লক্ষ্য ছিল উঁচু, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ...... আজ সমস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন উত্তেজনা এবং নতুন জাগৃতি দেখা দিচ্ছে। এই সুখময় পরিবর্তনের জন্য নেতাজীর কৃতিত্ব কিছু কম নয়। আমি তাঁর পদ্ধতি সমর্থন করিনি। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি নতুন আদর্শ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সেবা করেছেন।...... নেতাজী আমার কাছে আমার পুত্রের মত ছিলেন। তিনি অমাত্র বলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে বাণী ভারতবর্ষের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, তা বিবাদের মীমাংসার জন্য অস্ত্রের পথ গ্রহণ করা নয়, বরং তা হল অহিংসা, একতা, সংঘশক্তি এবং সংগঠন অনুশীলন. ...... নেতাজীর বিরাট ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ হল, তিনি সমস্ত জাতি ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি শুধু হিন্দু ছিলেন না, শুধু বাঙালি ছিলেন না, তিনি আগাগোড়া ভারতীয়। এ লেখার ইতি টানি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম সংগীত এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গান্ধীজীর দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে: 'বন্দেমাতরম' সংগীত হল ভারতমাতার প্রতি প্রার্থনা। বাঙালি ভাইদের এই গানটি এত শক্তিশালী যে, ভারতবর্ষের কোথাও তার সমান গান খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি হলেন ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের চিরদিনের সম্পদ। □

'৪৭-এর কলকাতায় মহাত্মাজীর কয়েকটা দিন

শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার ঠিক আগে, ১৯৪৭ এর আগসটের গোড়ায় তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল এক বিধ্বংসী দাংগা। এই দাংগার হাত থেকে কলকাতাও রক্ষা পায়নি। বাংলায় এই দাংগার খবর শুনে গান্ধীজী ছুটে এসেছিলেন এখানে সুদূর দিল্লি থেকে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, গান্ধীজী যখন শান্তির বাণী নিয়ে বাংলাদেশে ছুটে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ৭৮।

যেদিন গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌছলেন সেদিনটা ছিল ১৯৪৭ সালের ৯ আগসট। তাঁর যাত্রাপথ নির্দিষ্ট করা ছিল নোয়াখালি (এখন বাংলাদেশে) পর্যন্ত। শান্তির বাণী নিয়ে প্রতিদিন একটি করে নতুন গ্রামে ঘোরার ইচ্ছে নিয়ে তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। এই সময় গান্ধীজীকে খুব কাছ থেকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। অবশ্য এর আগেও আমি তাঁর সংগে অনেক ঘুরেছি। পুনের আগা খান প্যালেস থেকে তিনি তাঁর শেষ বন্দীজীবন কাটিয়ে বাইরে আসার পর তাঁর সংগে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছিলাম।

কলকাতায় পৌছনর পরই মহাত্মাজী এক প্রার্থনাসভায় সাম্প্রদায়িক দাংগা দূর করার জন্য, ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখার জন্য সবার কাছে আহ্বান জানালেন। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সংগে কথা বললেন তিনি। প্রত্যেকের কাছেই দাংগার হাত থেকে এই শহরকে বাঁচানর আবেদন করলেন মহাত্মাজী।

অবশ্য কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত গান্ধীজী নিয়েছিলেন- অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ এস সুরাবর্দির কাছ থেকে কয়েকটি বিষয়ে আশ্বাস পাওয়ার পরই। সুরাবর্দি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ এর ১৫ আগসটের পর নোয়াখালিতে যদি কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তাহলে তার জন্য সুরাবর্দি স্বয়ং দায়ী থাকবেন। এছাড়া সুরাবর্দি আরো বলেছিলেন, গান্ধীজী যতদিন কলকাতায় থাকবেন সুরাবর্দিও ততদিন তাঁর সরকারি বাসভবন ছেড়ে এসে গান্ধীজীর সংগে বসবাস করবেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর সংগে একসংগে খাবার খাবেন এবং সমস্ত সরকারি কাজকর্ম গান্ধীজী যেখানে বসবাস করবেন ওখানে বসেই দেখাশোনা করবেন এ আশ্বাসও সুরাবর্দি দিয়েছিলেন। কলকাতার বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এ ছিল একটা অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। বেলেঘাটায় হায়দারি ম্যানসন নামে একটা খালি বাড়ি এক মুসলমান ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে সেখানে গান্ধীজীর থাকার ব্যবস্থা করা হল।

১৯৪৭-এর ১৩ আগসট মহাত্মাজী সোদপুরে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রম থেকে বেলেঘাটার বাড়িতে এসে উঠলেন। মহাত্মাজী যখন বেলেঘাটার বাড়িতে ঢুকছিলেন তখন বেশ কিছু যুবক তাঁকে কালো পতাকা দেখায়। এমনকি, 'গান্ধীজী ফিরে যাও' ধ্বনিও দেওয়া হয়। এই বাড়িতে সুরাবর্দিও গান্ধীজীর সংগে থাকতে শুরু করেন। এই সময় গান্ধীজী সুরাবর্দিকে বলেছিলেন, তিনি দেখতে চান শুধু যে দাংগা বিধ্বস্ত মানুষরা স্বগৃহে ফিরে যাচ্ছে তাই নয়, তারা আবার আগের মত মিলেমিশে বসবাসও করছে।

প্রথম যেদিন মহাত্মাজী বেলেঘাটার এই বাড়িতে এসে পৌছলেন সেদিনটা তাঁর কেটেছিল চূড়ান্ত ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে। সাধারণত তিনি রাত ৯টার মধ্যেই শুয়ে পড়তেন, কিন্তু সেদিন তাঁর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সংগে কথা বলতে বলতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। সারাদিন পর যখন ক্লান্ত হয়ে গান্ধীজী বিছানায় শুতে যাচ্ছেন তখন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হতে চলেছে, এখন সবার একটু দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।

১৪ আগসট, স্বাধীনতার ঠিক আগের দিনও গান্ধীজী একইরকমভাবে ব্যস্ত থাকলেন। কলকাতার ঘটনাবলী নিয়ে সারাদিন ধরে আলাপ আলোচনা চালালেন। সন্ধেবেলা বেলেঘাটা অঞ্চলে এক প্রার্থনাসভায় যোগ দিলেন তিনি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন বয়েসের হাজার হাজার মানুষ এই প্রার্থনা সভায় এসেছিল মহাত্মাজীকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে। এই প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী সবাইকে শান্তির পথে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন। বললেন, যদি কলকাতায় আবার শান্তি ফিরে আসে, তাহলেই নোয়াখালি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও শান্তি ফিরে আসবে।

মহাত্মাজীর এই শান্তির বাণী যেন ম্যাজিকের মত কাজ করল অশান্ত কলকাতার বুকে। প্রার্থনা সভা শেষ হতে না হতেই তাঁর কাছে খবর এসে পৌছতে লাগল যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে পরস্পরকে আলিংগন করতে শুরু করেছে। ১৯৪৬ এর ১৬ আগসটে মুসলিম লিগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দেওয়ার পর হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর সম্পর্কের যে অবনতি হয়ে গিয়েছিল তা যেন কর্পূরের মত মিলিয়ে গেল। দাংগা বিধ্বস্ত কলকাতা এর আগে সরাসরি হিন্দু এলাকা আর মুসলমান এলাকায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি, কিছু কিছু অঞ্চলে খুনজখম এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, সেসব জায়গা থেকে লোকজন সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। অথচ এতদিনের এই হিংসা, বিদ্বেষ, খুনজখম সব যেন মহাত্মার উপস্থিতিতে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এই খবর এসে পৌছনর সংগে সংগে গান্ধীজীও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি আর এক মিনিটও বাড়িতে বসে থাকতে চাইলেন না। তিনি বাইরে বেরিয়ে নিজের চোখে এই আনন্দঘন দৃশ্য দেখতে চাইলেন। সেই রকমই ব্যবস্থা করা হল। অবশ্য গান্ধীজী চাইছিলেন না, তিনি যখন কলকাতার রাস্তায় বেরোবেন তখন তাঁকে সাধারণ মানুষরা চিনতে পারে। তাই একটা কাচতোলা-বন্ধ

বেলেঘাটায় ১৫ নং বাড়িতে গান্ধীজী থাকতেন। আলোকচিত্র : [illegible]

লেখক মালদহের বাসিন্দা। ১৯২৮ সালে কলকাতায় থাকতেন। সে সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। সেই অধিবেশনের স্বেচ্ছা-সেবক হিসাবে লেখকের অন্তরংগ স্মৃতিচারণ।

গাড়িতে তিনি উঠলেন। বসলেন পেছনের সিটে ঠিক মাঝখানে। তাঁর দুদিকে তাঁর দলের দুজন সদস্য এমনভাবে বসল যাতে বাইরে থেকে তাঁকে চট করে দেখা না যায়। গান্ধীজীর পেছন পেছন আরেকটা গাড়িতে আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

কলকাতার রাস্তায় সেদিন শুধু উল্লাস আর উল্লাস। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরছে, গান গাইছে, নাচছে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মনে হচ্ছিল কলকাতায় বুঝি কোন উৎসব শুরু হয়েছে।

গান্ধীজীর গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল রাস্তার ভিড় ঠেলে। কিন্তু গান্ধীজী যতই চান না কেন কেউ তাঁকে না চিনুক, একটা জায়গায় লোকজন তাঁকে ঠিক চিনে ফেলল। তারা সংগে সংগে তাঁর গাড়ি থামিয়ে তাঁকে মালা দিল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, 'গান্ধীজীর জয়' বলে চেঁচিয়ে উঠল। মহাত্মার গাড়ি ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের ভিড় জমে গেল। শেষ অবধি পুলিশকে নামতে হল ভিড় সামলাতে। অনেক কষ্টে ভিড় সরিয়ে গান্ধীজীকে যখন বেলেঘাটার বাড়িতে নিয়ে আসা হল তখন গভীর রাত।

কিন্তু সব স্বপ্নই বোধহয় ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৪ আগস্ট যে স্বপ্নময় দৃশ্য গান্ধীজী দেখেছিলেন কলকাতার রাস্তায়, তা ভেঙে যেতে দেরি হল না।

৩১ আগস্ট রাতে আবার এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। পরদিন গান্ধীজীর নোয়াখালি রওনা হবার কথা। আমি আর নির্মলকুমার বসু, যিনি তখন গান্ধীজীর সেক্রেটারির কাজ করছিলেন, বেলেঘাটার বাড়িতে বসে নোয়াখালিতে আমাদের প্রোগ্রাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ বসার ঘরে প্রচন্ড চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আমরা বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, বেশ কিছু উত্তেজিত যুবক ঘরের জিনিস ভাঙচুর করছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

গান্ধীজী তখন ঘুমোতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। হৈ-চৈ-এর শব্দে তিনিও বেরিয়ে এলেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল সে তাঁর মুখ দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় তিনি ঐ যুবকদের ধমক দিলেন। অদ্ভুত একটা দৃশ্য। কারুর মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ ঐ যুবকদের ভেতর থেকে একজন গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে লাঠি মারার চেষ্টা করল। কিন্তু সৌভাগ্য সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট [illegible] একটা ইটও কৌটো ছুড়েছিল সে সময় মহাত্মাকে লক্ষ্য করে। সেটাও মহাত্মার গায়ে না লেগে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনের গায়ে লাগল।

পরদিনই গান্ধীজী কলকাতায় শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার জন্য অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। টানা তিনদিন অনশন করেছিলেন মহাত্মাজী। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং বিভিন্ন সংগঠন মহাত্মাজীকে অনশন প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানাতে এগিয়ে এলেন, তারা তাঁকে আশ্বাস দিলেন কলকাতায় যাতে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসে তার জন্য তারাও আন্তরিক চেষ্টা করবেন। তারা এও বললেন, শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার হলে তারা জীবন দান করতেও পিছপা হবেন না। তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পরই মহাত্মাজী অনশন ভংগ করলেন। কলকাতায় আবার শান্তি-শৃংখলা ফিরে এল।

এ সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি যা কোনদিনও ভুলতে পারব না। গান্ধীজীর এই শান্তির বাণী যে কতখানি শক্তিশালী তার প্রমাণ এই সময়ই পেয়েছি। কলকাতার এই দাংগায় যারা লুঠতরাজ খুনজখম চালিয়েছিল তারা প্রত্যেকে এসে মহাত্মাজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেল। তারা একের পর এক এসে মহাত্মাজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল এরকম নারকীয় ঘটনা তারা আর কখনো ঘটাবে না। প্রত্যেকের চোখে জল, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আছে - সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! এমনকি, গান্ধীজীর পায়ের কাছে সবাই নিজেদের হাতিয়ার নামিয়ে রেখে গেল।

সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর ৪ সেপটেম্বর, ১৯৪৭ এ মহাত্মাজী তাঁর অনশন ভংগ করলেন। এর পর গান্ধীজী দিল্লি ফিরে যান, তাও আবার ট্রেনের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। আমার সৌভাগ্য সেবারও আমি তাঁর সংগী হয়েছিলাম।

৭৮ বছর বয়সে মহাত্মাজী কলকাতায় এসে যেভাবে শান্তির বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন যেভাবে মানুষের মনে আশার বাণী জাগিয়ে তুলেছিলেন তা ভাবলে এখন বেশ অবাকই লাগে। বোধহয় মহাত্মা বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। হয়ত ইতিহাস অনেক কথাই ভুলে যাবে, তবু শান্তির বাণী নিয়ে ছুটে এসে কলকাতায় তাঁর কয়েকটি দিন কাটিয়ে যাওয়ার কথা ভুলতে পারবে না। □

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন কিন্তু কলমও থামাননি

সৌরেন মিত্র

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বেশ কিছুকাল কংগ্রেসী রাজনীতির সংগে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই মানুষটি হাতির দাঁতের তৈরি মিনারবাসী সাহিত্যিক তো ছিলেনই না বরং তার বিপরীত। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। অবশ্য কলম ছেড়ে রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি কলম হারাননি। কিন্তু অনেক প্রিয়জনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

১৯১৬ সালে রেংগুন থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র প্রথমে হাওড়ার ৬ নং বাজে শিবপুর ফারসট বাই লেনে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে ওঠেন। মাস আস্টেক ঐ বাড়িতে কাটিয়ে তিনি ঐ রাস্তারই ৪ নং বাড়িতে উঠে আসেন এবং সেখানে ৯ বছর থাকেন। এর পর আরো বছরখানেক থাকেন ৪৯/৪ কালীকুমার মুখারজি লেনে গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এ বাড়িটা ছিল শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছে। এর পর ওখান থেকে চলে যান সামতাবেড়েতে।

চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবন্ধু হওয়ার অনেক আগেই শরৎচন্দ্র তাঁর সংগে পরিচিত হন। পরিচয়ের সূত্র ছিল চিত্তরঞ্জনের মাসিকপত্র 'নারায়ণ' পত্রিকা। ১৯১৮ সালের ফেবরুয়ারিতে শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' উপন্যাসের প্রকাশ। শোনা যায় উপন্যাসটির 'স্বামী' নামকরণ চিত্তরঞ্জনই করেছিলেন। এইসময় থেকেই শরৎচন্দ্রের সংগে চিত্তরঞ্জনের হৃদ্যতা। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতার মধ্যে যে অতলস্পর্শী দেশাত্মবোধ লুকিয়ে ছিল এবং তাঁর শিল্পী মনে যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তা চিত্তরঞ্জনকে মুগ্ধ করে। শরৎচন্দ্রও চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বে এমনই অভিভূত ছিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন তাঁর আচার্য হয়ে উঠেছিলেন। একবার শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দকে ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন করে ছিলেন, 'আপনার মুখে কি দেশবন্ধু ভিন্ন তাঁর আর কোন নাম আসেই না? কত লোকে কর্তা বলে, সি আর বলে, দাশ সাহেব বলে।

শরৎচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন – 'না আমার মুখে তাঁর আর কোন নামই আসে না। ঐ ত সত্য পরিচয়।'......

দেশবন্ধুর সংগে যেদিন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত মত পার্থক্য ঘটে এবং দেশবন্ধু বেশ কিছু দিনের জন্য নিঃসংগ হয়ে পড়েন সেদিনও শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর পাশেই ছিলেন।

১৯২০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। ইংরাজ নাজেহাল। উত্তাল ভারতবাসীর বুকে ইংরাজ সরকারের নখ-দন্তের শেষ শাণিত ছোবল উদ্যত। এমন সময় চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শরৎচন্দ্র। তিনি তখন হাওড়ায় থাকতেন। চিত্তরঞ্জন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির শিরোপাটি পরিয়ে দিলেন তাঁর মাথায়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর তিনি ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। অবশ্য ১৯২২ সালে একবার কংগ্রেসী রাজনীতিতে বীতরাগ হওয়ায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন কিন্তু সে পত্র গৃহীত হয়নি।

কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণের-পর তাঁর সহকর্মীরূপে আসেন শিবপুরের প্রবোধ চন্দ্র বসু, গুরুদাস দত্ত, বিজয় ভট্টাচার্য সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (ইনি 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' নামে একটি বইও লিখেছিলেন। বইটিতে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য পাওয়া যায়)। অগম দত্ত, বিভূতি হাজরা, জীবন মাইতি (ইনি পরে কমিউনিসট পারটিতে আসেন এবং হাওড়ার সি পি আই (এম)-এর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। সত্তর দশকের প্রথম দিকে উগ্রপন্থীদের আক্রমণে নিহত হন) কালোবরণ ঘোষ, অজিত মল্লিক এবং মৌড়ী ডোমজুড়, মাজু থেকে এসেছিলেন আরো অনেকে।

কংগ্রেস সভাপতি হয়ে হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় শরৎচন্দ্র গড়ে তুললেন কংগ্রেস কমিটি। সেইসব কমিটির মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার, বিলাতী জিনিস বর্জন, তাঁত, চরকা স্থাপন ইত্যাদি কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আর এসব কাজে তিনি নিজস্ব অর্থও বেশ কিছু খরচ করে ফেললেন। এই রাজনীতি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র একটা ব্যাপারে খুব মুশকিলে পড়লেন, তা হল বক্তৃতা করা। জনসভায় দাঁড়িয়ে শরৎবাবু রাজনৈতিক নেতাদের মত ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করতো পারতেন না। অথচ 'গ্রামে গঞ্জে নিরক্ষর শ্রমিক-চাষীদের কাছে বক্তৃতাই হচ্ছে প্রচারের বলিষ্ঠ মাধ্যম। তাই বেশির ভাগ জায়গায় শরৎচন্দ্র নিজের বক্তব্য লিখে নিয়ে যেতেন।

১৯২১ সালের গোড়ার দিকে চিত্তরঞ্জন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্কুল কলেজ বর্জনের আহ্বান জানালেন। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু সে সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি দেশবন্ধুর এই কাজকে সমর্থন করলেন না। ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, শিক্ষা বর্জন করলে ক্ষতি ছাত্রদের, তাতে দেশের লাভ না হয়ে ক্ষতিই হবে। এই ব্যাপারে দেশবন্ধুর সংগে তাঁর বিরোধ চরমে উঠলো। দেশবন্ধু আশুতোষের যুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভাসমিতি করে প্রচারে নামলেন, ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'Education may wait but Swaraj cannot.' তোমরা গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে এস।' দেশবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়াও মিলল। ইতিমধ্যে ৪ ফেবরুয়ারি চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর সহায়তায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফরবীজ ম্যানসন' বাড়িটিতে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নাম দিয়ে একটি জাতীয় কলেজ স্থাপন করলেন। আশুতোষ যখন এরকম একটা বাধার সম্মুখীন তখন সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি লিখে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রতিবাদের জবাবে মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইনডিয়াতে' 'দি পোয়েটস অ্যাংজাইটি' প্রবন্ধটি লিখলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সময় শরৎচন্দ্র একটু মুশকিলে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা আবার চিত্তরঞ্জন শুধু অকৃত্রিম বন্ধুই নয় রাজনৈতিক সহকর্মী। আর চিত্তরঞ্জন যা করছেন তা দেশেরই স্বার্থে। শরৎচন্দ্র নিজেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বর্জন আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তাই সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে শরৎচন্দ্রও কলম ধরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছাড়াও বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস (এ আই সি সি) কমিটিরও সদস্য হয়েছিলেন। যতদিন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন যেমন কংগ্রেসের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি তেমনি সুগভীর সামাজিক চেতনাসম্পন্ন কথাশিল্পী আন্দোলনের ধারা এবং আন্দোলন কারীদের চরিত্র লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধও হতেন। তাই ১৯২২ সালে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন – 'হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্ত কণ্ঠে বলি অন্তত এ জেলাব লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে কটূক্তি, অনেক গালাগাল শুনতে হবে। কিন্তু তবুও একথা সত্য। কেউ কিছু কোরব না। কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না .....।' '...... আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ির উপর বাড়ি গাড়ির উপর গাড়ি, আমার দোতলার উপর তেতলা এবং তার চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত থাক -- কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়েদেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে।'......

পদত্যাগপত্র অবশ্য গৃহীত হয়নি চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে। কিন্তু আরামপ্রিয় মধ্যবিত্ত মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্ষোভ তিনি বেশিদিন চেপে রাখতে পারেননি। শুধু আরামপ্রিয় মধ্যবিত্ত কেন, বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন সেদিনকার

অনেক নেতার রাজনীতির বিরুদ্ধেও। একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় দেশবন্ধু অপমানিত হলেন সেই সভার সভাপতি শ্যাম-সুন্দর চক্রবর্তীর কাছে। সেই সভায় শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। দেশ-বন্ধুর এই অপমান সহ্য করতে না পেরে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ জানালেন এবং নিজেও অপমানিত হলেন। বাড়ি ফিরে উত্তেজিত শরৎচন্দ্র আলিপুর বোমা মামলার আসামী দ্বীপান্তর ফেরত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন, 'উপীন, তুমি তো ভাই বোমা পার্টির লীডার ছিলে, আমাকে একটা বোমা তৈরী করে দিতে পার? সেখানে দেশবন্ধু-সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। উপেনবাবু বললেন, – 'বোমা – কি করবেন?'

'ঐ শ্যামু চক্কোত্তির মাথায় ছুঁড়ে মারবো। আমাকে বলে কিনা, I can't stand your face!'......

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন, এমনকি দেশবন্ধু সুদ্ধু। তখন শরৎবাবু রেগে উঠে দেশবন্ধুকে বললেন, 'হাসছেন? আপনি শুধু হাসছেন। আমাকে এমন করে অপমান করলে, তবুও হাসি আসছে আপনার? যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানী হতে হয়, তাতে আর আমি নেই – I have had enough of it and I would have none of it any more.'

দেশবন্ধু সস্নেহ হেসে বললেন – 'তাই করুন, শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন, আপনি সাহিত্যিক শিল্পী মানুষ, আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত বাধা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না।'......

কিন্তু রাজনীতি ছেড়ে দিতে পারেননি শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর কথা ভেবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেশবন্ধুকে বলেছিলেন, 'আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধা বিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্ম-রক্ষা করি কি করে?'......

গান্ধীজীর নন-কোঅপারেশন মুভমেনটের প্রধান যে দুটি নীতি অর্থাৎ বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং চরকায় সুতো কাটা, এ দুটির কোনটিতে শরৎচন্দ্রের খুব একটা উৎসাহ ছিল না। যদিও শরৎচন্দ্র চরকায় সুতো খুব ভালই কাটতে পারতেন। একবার গান্ধীজীর সামনে বসে শরৎচন্দ্রসহ অনেকেই সুতো কাটছিলেন। এমন সময় গান্ধীজী শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন – 'শরৎবাবু আপনার চরকায় বিশ্বাস নেই?'

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, – 'না, এতটুকুও না।'

গান্ধজী বললেন – 'কিন্তু আপনি তো অনেক চরকা প্রেমিকদের চাইতেও ভাল সুতো কাটছেন।'

শরৎচন্দ্র বললেন – 'আমি চরকা কাটতে শিখেছি আপনাকে ভালবাসি বলেই, চরকাকে নয়।

তখন গান্ধীজী বললেন 'কিন্তু কেন আপনি বিশ্বাস করেন না চরকার দ্বারা স্বরাজই লাভবান হবে।'

শরৎচন্দ্র একটু হেসে বললেন – 'না, আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি স্বরাজ আনবে সৈনিক, মাকড়সায় নয়।'

গান্ধীজীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তা বোঝা যায় তাঁর 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধটি পড়লে। কিন্তু পরিস্থিতি এবং পরিবেশ অনুযায়ী সেদিন কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় রকমের যে পালাবদল ঘটেছিল তার সংগে তালে তাল দিয়ে চলা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন সামনে ছোটার মানুষ, পেছু হটার নয়।

গান্ধীজীর প্রতি শরৎচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের প্রতি তিনি যে বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৯ সালে রংপুরে বংগীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে। সেই ভাষণে ('তরুণের বিদ্রোহ' নিবন্ধরূপে পরে এটি প্রকাশিত হয়) তিনি বলেছিলেন '......এমনভাবে দিন চলে যাচ্ছিল, সহসা একদিন এলো মহাত্মার আদ্রোহ– অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো তার খাদি চরকার দড়িতে। স্বরাজের তারিখ ধার্য হল ৩১ শে ডিসেমবর। এল জেলে যাবার দিন, এল আত্মত্যাগের বন্যা। মন্ত্র এল বাংগালার বাইরে থেকে, অথচ যত চরকা ও যত খাদি সেদিন বাংগালায় তৈরী হল, যত লোক গেল বাংগালার কারাগারে, যত ছেলে দিলে জীবনের সর্বস্ব বলিদান, সমগ্র ভারতবর্ষে তার জোড়া রইল না। কেন জান – কারণ বাংগালার ছেলে যতখানি তার দেশকে ভালবাসে, হয়তো পাঞ্জাব ছাড়া তার একাংশও ভারতের কোথাও খুঁজে মিলবে না। তাই 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সৃষ্টি এই বাংগলায়। এই বাংগালাতে জন্ম নিয়ে-ছিলেন স্বর্গীয় দেশবন্ধু। এদিকে ৩১শে ডিসেমবর পার হয়ে গেল – স্বরাজ এল না। কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরায় হল রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে। দেশের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশকুসুমের মত এক মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন একজন জীবিত ছিলেন, তাঁর ভয়ের সংগে পরিচয় ছিল না – তিনি দেশবন্ধু।'......

এই ভাষণে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত যে গান্ধীজীর প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও শেষের দিকে গান্ধীনীতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিলেন। আর এই হারিয়ে ফেলাটা হয়তো শুরু হয়েছিল চৌরীচৌরা হত্যা-কাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই।

১৯২২ সালের ৫ ফেবরুয়ারি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় কৃষকরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে চৌরীচৌরা গ্রামে নিরস্ত্র কৃষকদের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলি ফুরিয়ে গেলে মিছিলকারীরা থানায় ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং কিছু পুলিশকে হত্যা করে। গান্ধীজী এই ঘটনায় খুব আঘাত পান এবং আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেন। এটাই ছিল ঐতিহাসিক 'বারদৌলি হলট।' আন্দোলনের হঠাৎ এই কণ্ঠরোধে বহু আন্দোলনকারীর মত শরৎচন্দ্রও স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে-ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়কে ক্ষোভের সংগে বলেছিলেন – 'মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটান। Mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। এ মুভমেণ্ট আর রিভাইভ করবে না।' ... গোটা কতক কনস্টেবল Infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে; তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো।' ..

শরৎচন্দ্র অহিংস কংগ্রেসের ছোটখাট নেতা হলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের যে দান ছিল সে দানকে তিনি অস্বীকার করেননি। সেইসব বিপ্লবী নেতাদের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। বেংগল ভলেনটিয়ারস দলের সর্বাধিনায়ক বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শচীন সান্যাল, এ ছাড়া বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখর সংগে শরৎচন্দ্রের গভীর হৃদ্যতা ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মহানায়ক সূর্য সেন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আর্থিক সাহায্য। বহু বিপ্লবীকে তিনি অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সাহায্য করেছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিও তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। একবার শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলন হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিজয় ভট্টাচার্য, প্রবোধ বসু, অগম দত্ত, গুরুদাস দত্ত, জীবন মাইতি, গুরুদাস মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে দলাদলি হওয়ায়

সুভাষচন্দ্র নিমন্ত্রিত হলেন না। আর বিনা সুভাষচন্দ্রে কর্মী সম্মেলন, শরৎচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করেছিল তাই তিনিও সম্মেলনে গেলেন না, বললেন, 'শিবহীন যজ্ঞে প্রাণ যেতে পারিনে।'

পেছিয়ে আসার রাজনীতিতে শরৎচন্দ্র যে একটুও বিশ্বাস করতেন না তার একটি বড় প্রমাণ সেদিনকার হাওড়া পুরসভার ধাঙড় ঝাড়ুদার ধর্মঘট। হাওড়া পুরসভা তখন কংগ্রেসের কবজায়। হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র। বিজয় ভট্টাচার্য হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান [illegible] পাইন। ডাঃ বেণী দত্ত এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা পুরসভার কমিশনার। হাওড়া পুরসভার ঝাড়ুদার মেথরদের প্রতি অবিচার সেদিন চরমে। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, অগম দত্ত এবং জীবন মাইতি পুরসভার ধাঙড় মেথর কর্মীদের নিয়ে গড়ে তুললেন একটি ইউনিয়ন। শচীনন্দনবাবু ছিলেন ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা প্রেসিডেনট। কয়েক মাসের মধ্যেই এঁরা বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘটের ডাক দেন। ব্যাপারটা দাঁড়াল কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস। একদল পুরসভার শাসন ক্ষমতায়, অন্যদল বাইরে। শচীনন্দনবাবুরা শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদ চাইতে গেলেন। শরৎচন্দ্র আশীর্বাদ করে ঠাট্টা করলেন - 'এবার কি গুরুমারা বিদ্যে আরম্ভ করলে?'

বিব্রত শচীনন্দনবাবু বললেন - 'কি করবো বলুন ইউনিয়ন গড়ে তুলে ত আর পেছিয়ে আসা যায় না।' প্রশান্ত কণ্ঠে শরৎচন্দ্রের উত্তর 'না পেছিয়ে আসা চলবে না। কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। সংঘর্ষটা কি হচ্ছে সেইটেই বড় কথা, কার সংগে সেটা বড় কথা নয়।'

এই ধর্মঘটে ধাঙড় মেথর ইউনিয়নের জয় হয়েছিল। মধ্যস্থতা করার জন্যে এসেছিলেন দীনবন্ধু এন্ড্রুজ।

১৯২৫ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সংগে আরো অনেক রাজনৈতিক বন্দী মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু সাধারণ মাপের কর্মীরা পড়লেন বিপদে। এদের গায়ে বিপ্লবী ছাপ থাকার দরুন এঁরা এক রকম সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। রেগুলেশন আইন (Regulation III of 1818) ও বেংগল অরডিন্যানস আইনে ধৃত রাজবন্দীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবার কাছে তাঁরা অপাংক্তেয়। একমাত্র যাদের বাবা মা জীবিত তাড়া ছাড়া। চাকরি বাকরি পাওয়ার কথাই ওঠে না, তাই অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্রই প্রথম এগিয়ে এলেন। তিনি এই বিপ্লবী রাজবন্দীদের ফুটপাতের-জীবন সহ্য করতে পারলেন না। ঠিক করলেন এইসব রাজবন্দীদের সংবর্ধনা জানাবেন। 'দেশের জন্যে যারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে, আজকে তারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র?' এটা শরৎচন্দ্রের মত মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া মুশকিল। এইসব বিপ্লবী রাজবন্দীদের সামাজিক বয়কটের অন্যতম কারণ ছিল ইংরাজ সরকারের রক্তচক্ষু। তাদের পেছনে সব সময় পুলিশ লেগে থাকতো। যারা তাদের আশ্রয় দিত পুলিশের কোপ দৃষ্টি পড়তো তাদের প্রতিও।

শরৎচন্দ্রই প্রথম তাঁদের সংবর্ধনা জানালেন। এই ঐতিহাসিক সংবর্ধনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'হাওড়া টাউন হল'-এ। এর প্রতিক্রিয়া সেদিন গড়িয়েছিল অনেকদূর। কারণ এটা ছিল শরৎচন্দ্রের একটা চ্যালেনজ। শরৎচন্দ্র সংবর্ধনা সভায় বললেন, - 'দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্ণমেন্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র।'....

এই সংবর্ধনার পরেই সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়। দিকে দিকে বহু সংবর্ধনা সভা হল এইসব বিপ্লবী রাজবন্দীদের নিয়ে। আর এইসব সভায় রাজবন্দীরাও জনগণের কাছে দিতে লাগলেন অগ্নিময় ভাষণ, যা বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে পালাবদল ঘটাল। শুরু হল অগ্নিযুগের রাজনীতি।

কংগ্রেসের নীতি এবং ভেতরে দলাদলিতে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের প্রতি ক্রমশ আস্থা হারাতে লাগলেন। তাঁর ভেতরে জমা হয়ে উঠেছিল অসন্তোষ। একটি পুঞ্জীভূত আগ্নেয়শক্তি যেন নতুন পথে বাইরে আসার পথ খুঁজছে। এই সময় জারমানি থেকে ফিরে আসা কানাই লাল গাংগুলী, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, মুক্ত রাজবন্দী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ কুমার মিত্র, হেমন্ত সরকারপ্রমুখ সোস্যালিজম প্রচার শুরু করেছেন। এই পরিবর্তনকামী সৈনিকদল বারবার আসতে লাগলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। সেই সৈনিকদের নতুন রাজনৈতিক আদর্শ উদ্বুদ্ধ করলো শরৎচন্দ্রকেও।

এই সময় শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে হাওড়ার শিবপুরে বেশ কয়েকটি বৈঠক বসলো। বিষয়, সোস্যালিজম। বৈঠকে আসতেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ডাঃ কানাই লাল গাংগুলী, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বসু, অগম দত্ত, জীবন মাইতি প্রমুখ। এই সব বৈঠকে শরৎচন্দ্র প্রস্তাব দেন বাংলাদেশে সোস্যালিসট পারটি গঠনের। শরৎচন্দ্রের কাছে উৎসাহ পেয়ে সোস্যালিসট পারটি গঠিত হল। কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হল কলকাতার অক্রূর দত্ত লেনে। এক্ষেত্রে বলা যায় বাংলা দেশে সোস্যালিসট পারটি গঠনের প্রথম বীজ রোপণ শরৎচন্দ্রের হাতে।

শরৎচন্দ্র যতদিন রাজনীতিতে ছিলেন বারে বারেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন। পরাধীনতার চাইতে অর্থনৈতিক অসাম্যই যে ভারতীয় সমাজের আসল রোগ এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আর তাই বোধহয় শেষের দিকে সোস্যালিজমের দিকে ঝুঁকেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে বিদ্রোহী লেখক আখ্যা দিলে কিছু ভুল হবে না। তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মধ্যে তিনি তার প্রকাশও ঘটিয়েছেন, অবশ্য সামাজিক ন্যায়নীতির দিকে তাকিয়ে তা ঘটিয়েছেন পরোক্ষভাবে। কিন্তু বিদ্রোহের সোচ্চার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে।

বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন দেখতে দেখতে বিভিন্ন দলমতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। শৃঙ্খলার অভাব। চিত্তরঞ্জন তখন পরলোকে। কংগ্রেসের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র বসুর দুই দলে রেষারেষি। শরৎচন্দ্রের মন অসহ্য যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত। যদিও তিনি তখনও কংগ্রেসে আছেন। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। তিনি হাওড়া ছেড়ে চলে গেলেন পানিত্রাসে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কলকাতায় আসতেন না। পল্লী প্রকৃতির উদারতা সৌন্দর্যের মধ্যে নতুন করে জেগে উঠলো তাঁর শিল্পী মন। □

আগেকার কংগ্রেস আর এখনকার কংগ্রেসে অনেক তফাৎ : প্রমথনাথ বিশী

বাংলা সাহিত্য জগতের তো নিশ্চয়, শিক্ষা জগতেরও দিকপাল প্রমথনাথ বিশী এক সময় কংগ্রেস ভবনে নিজে হাতে বিরাট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি মাঠে-ঘাটে কংগ্রেস করেননি। কলম ছেড়ে কংগ্রেস না করলেও মনে প্রাণে সেদিনের কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস ঘেঁটে বেড়িয়েছেন। লেক গারডেনসের বাড়িতে বসে স্মৃতিচারণ করেন সেই অতীত দিনের।

ঘরে ঢুকতেই, হাতে একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র তুলে দিয়ে শেষ পৃষ্ঠার একটা খবরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখ কী লিখেছে।' পড়ে দেখলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কমিটি এই বছর শ্রী প্রমথনাথ বিশীকে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদকের জন্য নির্বাচিত করেছেন। এর আগে এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং রাজশেখর বসুর মত খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা। স্বভাবতই প্রমথবাবু খুশি, তারপর স্মিত হেসে বললেন, 'বল কী জানতে চাও: কবে থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলাম - এই তো -?'

প্রমথবাবু বললেন : 'সে কথা আজ আর গুছিয়ে বলার সাধ্য নেই। কারণ, ওটা আমার স্মৃতির অগোচরে পড়ে গিয়েছে। তবে প্রায় তিন পুরুষ ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা যুক্ত। অবশ্য তখনকার কংগ্রেস আর এখনকার কংগ্রেসের মধ্যে একটা তফাৎ রয়েছে। আমি মনে মনে কংগ্রেসকে তিনভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে গিয়ে ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস, যার ১৯৮৫তে একশো বছর পূর্ণ হবে। সেই থেকে লোকমান্য তিলকের মৃত্যু পর্যন্ত একটা ভাগ। লোকমান্যর মৃত্যু হয়েছিল ১৯২০ সালে। সেইসময় থেকে গান্ধীর আবির্ভাব। তাতে কংগ্রেসের চেহারা ও কার্যক্রম বদলে গেল। এই কংগ্রেসের সময়-ভাগকে টেনে আনা যায় ১৯৪৭ সাল অবধি, অর্থাৎ স্বাধীনতা অবধি। এটা দ্বিতীয় ভাগ। আর স্বাধীনতার পর থেকে যে কংগ্রেস সেটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল।

তখন কংগ্রেস বলতে সমস্ত দেশে একটি পারটি বোঝাত। তাতে সাধারণ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত লোক সকলেই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তখন সদস্য হতে গেলে কোন চাঁদা দিতে হত না। আমি কংগ্রেসের লোক এই কথা বললেই যথেষ্ট হত। কিন্তু পরে গান্ধীজী আসার পর কয়েকটা নিয়ম বেঁধে দিলেন, তখন আর যে কেউ 'আমি কংগ্রেসের লোক' বললে যথেষ্ট হত না। তবে এই যে মধ্যযুগে যে কংগ্রেস মানে গান্ধীজীর আমল যেটা, তার মধ্যে আবার তিনটে ধাপ আছে।

প্রমথনাথ বিশী / আলোকচিত্র : [illegible] রায়

প্রত্যেক ধাপ যদি বিচার করে দেখা যেত, তবে দেখা যাবে প্রত্যেক ধাপ দশ বছর করে। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন হল, ১৯৩০ এ আইন অমান্য এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন ৪২-এ হল বটে তবে তার সূত্রপাত ১৯৪০ এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মাধ্যমে। কাজেই ওই দশ দশ করে গান্ধীজী তাঁর মনে একটা পরিকল্পনা করে নিতেন যে তিনি যে আন্দোলন করতে যাচ্ছেন তা হঠাৎ করে কিছু করে ফেলার জন্য নয়, নিজেকে প্রস্তুত করে, দেশের মানুষদের তৈরি করে একটা বড় ধরনের আন্দোলনে নামা। নিজে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ এই যে, যেমন সত্যাগ্রহ আশ্রম করলেন আমেদাবাদের কাছে সাবরমতী নদীর ধারে। তারপর সেটা দশবছর ছিল। কারণ যখন ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করলেন: নিতান্ত শিশু বা অথর্ব ছাড়া সকলকে নিয়ে তিনি শুরু করলেন আন্দোলন, কাউকে বললেন, ঘরে ফিরে যেতে।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি কংগ্রেসের হয়ে কারাবরণ বা সক্রিয় কোন কাজকর্মে জড়িত ছিলেন ·

না, আমাকে কোনদিন কারাবরণ করতে হয়নি। তবে আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া কংগ্রেসি। এককালে যেমন কেউ খদ্দর পরলেই লোকে তাকে কংগ্রেসি বলে চিহ্নিত করত, তেমনি একসময় বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় পরাটাও কংগ্রেসি হবার অঙ্গ ছিল। তা আমার বাবা গ্রামে একটা কাপড়ের দোকান খুললেন। সেই দোকানে সব বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ে ভরতি। সবাই খাতায় নাম লিখে কাপড় নিয়ে চলে গেল পরে দাম দেবে বলে, কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় আর কোন আগ্রহই কেউ দেখাল না। শেষ পর্যন্ত দোকানটাই উঠে গেল। আমার বাবাকে বহুবার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বড় বড় আন্দোলন যেমন অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড় প্রভৃতি আন্দোলনে বহুদিন তাঁকে বৃটিশের কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছে। আর যেহেতু আমি বাড়ির বড় ছেলে, সেইজন্য সাংসারিক দায়দায়িত্ব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও মনোনিবেশ করতে হয়েছে। এর জন্য কয়েক বছর আমার পড়াশুনোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন মনে হয়েছে এর চেয়ে জেলে যাওয়াই ভাল ছিল।

আবার আমার প্রশ্ন, আজকের কংগ্রেসের মধ্যে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, সে বিষয়ে আপনার ধারণা কী :

কংগ্রেসে বহু পরিবর্তন ঘটেছে সময়ে কালের পরিপ্রেক্ষিতে। অনেকেই সেই পরিবর্তন বা বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে সরে গেছে। ধর গান্ধীজী এসে জাতপাত নিয়ে যে সব প্রস্তাব পেশ করলেন, তাতে আগেকার দিনের মানে, গান্ধীজীর আগে যাঁরা কংগ্রেসে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই সরে গেলেন। কারণ এত উদার এবং এত সাহসী হয়ে তাঁরা এগোতে বা এতদূর যেতে রাজি ছিলেন না। তবে বিগত এই ১০০ বছরের মধ্যে এমন লোক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি কোন না কোনভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এটা অনেকেই খেয়াল করেন না। যেমন

লুপ ও ট্যাব-এণ্ড

এ হ'ল আপনার ব্যবহারের জন্যে সবচেয়ে অধিক সুরক্ষিত এক স্যাপকিন…যা এর অনন্য আন্তর্জাতিক ডিজাইনের জন্যে অধিক মোলায়েম ও অধিক নিরাপদ।

এই নিন। এবার আপনার বেছে নেওয়ার জন্যে আপনার পছন্দসই স্যাপকিন লুপ রূপে, ট্যাব-এণ্ড রূপে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও পশ্চিম ইউরোপে অত্যধিক জনপ্রিয় ক্রিস্টিন হোডন ঘরানার তরফ থেকে—কম্‌ফিট।

লুপ কম্‌ফিট

লুপ কম্‌ফিট নিজের জায়গায় পুরোপুরি সুরক্ষিতভাবে বজায় থাকে। এতে এক অনন্য আমদানী করা পরত থাকে ব'লে আর্দ্রতাকে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে শুষে নিয়ে স্যাপকিনের পুরো দৈর্ঘ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং সেখানেই ধরে রাখে। সেইজন্যেই কম্‌ফিট অধিক নির্ভরযোগ্য এবং কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত থেকেও বাঁচায়।

কী আরামদায়ক!

আর লুপ কম্‌ফিট কত মোলায়েমও…না ছড়ে যায়, না হয় কোনো অসুবিধা। এছাড়া, লুপ কম্‌ফিট অতি সহজে ফেলেও দেওয়া যায়।

এবার কম্‌ফিট প্রস্তুত করছে খুব বেশী স্রাবে অধিকতম সুরক্ষা দেওয়ার জন্যে ভারতের সবচেয়ে প্রথম স্যানিটারী স্যাপকিন। দেখুন কি ক'রে?

ট্যাব-এণ্ড কম্‌ফিট

স্টে-ড্রাই কভার

ট্যাব-এণ্ড কম্‌ফিট নিরুদ্বিগ্ন মহিলারাই পছন্দ করেন। এতে একটি বিশেষ স্টে-ড্রাই কভার থাকে যা স্যাপকিন থেকে সমস্ত আর্দ্রতা টেনে নিয়ে, আপনাকে ঝরঝরে শুকনো ও আরামদায়ক অবস্থায় রাখে।

শুষে নেওয়ার পরত

এর অনন্য আমদানী করা পরত, আর্দ্রতাকে ভেতরে শুষে নিয়ে স্যাপকিনের পুরো দৈর্ঘ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং ভিজেভাবকে ধরে রাখে। এই আমদানী করা পরত বিনা বুনটের সেলুলোজ দিয়ে তৈরী ব'লে এটি শুষে নেওয়ার কাজ সঙ্গে সঙ্গে করতে পারে।

ডবল-সিওর শীল্ড (দ্বিগুণ সুরক্ষিত কবচ)

এর নীল রঙা ডবল-সিওর শীল্ড পুরো স্যাপকিনে জড়ানো থাকে, যা পাশের দিক থেকে দাগ ধরার হাত থেকে রক্ষা করার কাজে অধিক সুরক্ষা দিতে পারে।

পরীক্ষা: শুকনো হাতের চেটো

একটি ট্যাব-এণ্ড কম্‌ফিট হাতের চেটোয় রেখে কলের সরু ধারার নীচে ৬০ সেকেণ্ড পর্যন্ত রাখুন। তাহলেই দেখতে পাবেন, জলের ফোঁটা কিভাবে, স্টে-ড্রাই কভারের বাইরের ভাগকে ছেড়ে ভেতর দিকে শুষে যায়। তারপর নিজের হাতের চেটো দেখুন। অত ভিজে সত্ত্বেও শুকনো তাই না?

আর এসবই আপনি পেতে পারবেন কম্‌ফিট-এ, অতিরিক্ত কোনো মূল্য না দিয়েই। লুপ কম্‌ফিট—এর জন্যে চেয়ে নিন হলুদ পলিব্যাগ আর ট্যাব-এণ্ড কম্‌ফিট-এর জন্যে সবুজ পলিব্যাগ।

LINTAS CH COM 1 2433 BG

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ কংগ্রেসি বলবে না। তিনিও কংগ্রেসী এই অর্থে বলতেন না। কিন্তু কংগ্রেস সম্বন্ধে উল্লেখ করতেই তিনি 'আমাদের কংগ্রেস' এই কথাটি বলতেন। এতে অনেকখানি ব্যাপার বোঝা গেল। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, 'কংগ্রেস এমন একটি কাজ করছে যেটা ইংরেজী শিক্ষার সুফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি, মানে সমগ্র ভারতবর্ষকে এই যে খণ্ডবিখণ্ড, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতে এই যে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম সমাজ ভিন্ন, সমস্তকেই কংগ্রেস একীভূত করে তুলছে, এটাই সবচেয়ে কংগ্রেসের বড় কাজ।' কালীনাথ দত্ত, যাঁর লেখা থেকে আমি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই উক্তিটা করলাম, সেই কালীনাথ দত্ত একবার বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আপনি কংগ্রেসে যোগ দেন না কেন?' বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'দেখ কংগ্রেস এখন যোগ দেবার মত হয়নি। কারণ, এ এখনও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের একটা প্রতিষ্ঠান। এতে করে ঠিক আমি যেভাবে দেশকে একীভূত দেখতে চাই, সেটা হবে না।' তখন কালীনাথ দত্ত প্রশ্ন করলেন, 'কবে হবে?' তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র জোরের সংগে বললেন, 'হবেই! কারণ যে পথে কংগ্রেস ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, সে পথের পরিণাম হচ্ছে একীভূত হয়ে যাওয়া।

এখন কংগ্রেসকে ভারত সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে, কিন্তু এটা যে সরকার কী কাজ করছেন আর কংগ্রেস যে করতে যাচ্ছে, তা তাঁরা খেয়াল করে দেখছেন না। যেদিন সরকারের খেয়াল হবে, সেদিন এই পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা সংবরণ করে নেবেন। কারণ তাঁরা বুঝবেন যে এই জিনিসটার জন্য তাঁদের বিদায় নিতে হবে।' কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রর নামটা বললাম এই কারণে যে বঙ্কিম অতি সুপরিজ্ঞাত লোক, তাছাড়া সম্প্রতি 'আনন্দমঠ' নিয়ে নানা অপ্রীতিকর আলোচনা হয়েছে, তার জন্য বঙ্কিমের নামটা সহজে মনে এল। তারপর ধর জিন্না। তিনিও তো কংগ্রেসি ছিলেন। শুধু কংগ্রেসের সাধারণ লোক নন, প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গান্ধী আসার পর, খুশি মত যে সব কাজ চলছিল তা হল না এবং একটা সমস্যা হল (গান্ধীজীর সৌভাগ্য আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য) যে দুজন লোক থাকলে কংগ্রেসের চেহারা হয়ত অন্যরকম হয়ে যেত, সে দুজন খুবই তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। যেমন ১৯১৫ সালে মারা গেলেন গোখলে এবং ১৯২০ সালে মহামান্য তিলক। এখন সমস্যাটা হচ্ছে যদি গোখলে বা তিলক বেঁচে থাকতেন, তবে কী হত অবস্থাটা! তবে একটা কথা খুবই সত্যি, গান্ধীজীর যে অপ্রতিহত ক্ষমতা হয়েছিল, সেটা হত না। কারণ গোখলে বা তিলক যাঁকেই ধরা যাক না কেন, এঁরা সকলেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের প্রতিনিধিত্ব করতেন। কিন্তু গান্ধীজী এসে কংগ্রেসের সকল দরজা জানালা খুলে, নতুনভাবে দলের কর্মধারা গঠন করলেন।

কিন্তু এতে ফলাফল কী ভাল হয়েছিল?

হ্যাঁ, এতে ভালই হয়েছিল। কারণ গোখলে কখনই লড়িয়ে কংগ্রেসের কথা ভাবেননি, উনি Constitutional Congress-এর কথা ভেবেছিলেন, আর তিলকও লড়িয়ে কংগ্রেসের কথা ভাবলেও কিন্তু সমস্ত আন্দোলনকে দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দেবার কথা গান্ধীজীর মত ভাবেননি।

তার হাতিয়ার চরকা। তাঁর এই আন্দোলনের সাধারণ খসড়াটি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসে ছকে ফেলেছিলেন।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীকে প্রশ্ন করলাম, গান্ধীজীর আমল মানে ১৯২০ থেকে ৪৭, এই ২৭ বছরের পর কংগ্রেসের যে পরিবর্তন হল এবং আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল, তা কি সর্বাংশে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে?

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস হয়ে গেল আর-দশটা পারটির মত। আমার নিজের এটা ধারণা বলতে পার যে, বহু সংখ্যক দল নিয়ে গণতন্ত্র কেন, কোন তন্ত্রই চলে না। ইংল্যানডে যে গণতন্ত্র আছে সেখানে বড় দল বলতে তিনটে, আমেরিকায় যে গণতন্ত্র চলছে সেখানে বড় দল বলতে দুটি। আর আমাদের এখানে কত পারটি বা দল কেউ বলতে পারবে না। এবেলা দেখলাম এতগুলো দল, ওবেলা দেখলাম বেড়ে আরো কিছু দল হয়ে গেছে। এইরকম করে কোন উন্নতি বা কাজ করা যায় না। গান্ধীজী কংগ্রেসের নতুন রূপ দেবার জন্য যে খসড়া তৈরি করেছিলেন, তাতে হয়ত এই সমস্যার সমাধানের কথা ছিল। তবে সেটা অনুমানের বিষয়, কারণ সেটা তাঁর মৃত্যুর দিনই তিনি তাঁর সচিবের হাতে তুলে দেন, যত্ন করে রাখার জন্য। কিন্তু তাতে কী ছিল আমি জানি না, যে অল্প কয়েকজন সেই খসড়া দেখেছিলেন, এ বিষয়ে তাঁরাও কেউ কিছু বলেননি। তবে আমার মনে হয়, এত দল আর এক এক দলের উপদল নিয়ে বৃহত্তর কোন সাফল্য আশা করাই ভুল।

সাক্ষাৎকার ঃ সঞ্জয় সিংহ

আমাদের সময় কংগ্রেস যা ছিল ঃ অতুল্য ঘোষ

ডিসেমবর মাসের শেষ দিকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। এখন মুশকিল হচ্ছে 'কংগ্রেস' নামটিকে নিয়ে। এখন আর 'ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' নাম শোনা যায় না। বাংলায় যাকে বলা হত 'জাতীয় মহাসভা' বা 'রাষ্ট্রীয় মহাসভা'। কিন্তু সাধারণের কাছে ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামটিই চালু ছিল।

ধর্মাধিকরণ কংগ্রেস (ই)-কে জাতীয় মহাসভার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলা সত্ত্বেও এখনও কংগ্রেস (ই) নামটিই চালু রয়েছে। আবার কংগ্রেস (জে) এবং কংগ্রেস (এস)ও আছে।

আমি যতদিন কংগ্রেস করেছি এই রকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে বর্তমান কংগ্রেস (ই) কর্মকর্তারা ধর্মাধিকরণ তাদের পক্ষে রায় দিলেও তাদের দলকে 'ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বলতে অনিচ্ছুক? এই প্রশ্ন এই জনোই উঠছে যে এখনও কংগ্রেস (ই) নামটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং সামনে সেই কংগ্রেস (ই)-এরই পূর্ণাংগ অধিবেশন।

পূর্ণাংগ অধিবেশনেরও একটা নিয়ম ছিল। এ আই সি সি-র প্রকাশ্য অধিবেশনকে কোনদিন কংগ্রেস অধিবেশনের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। গঠনতন্ত্রেও তা ছিল না।

কংগ্রেসের কাঠামো ছিল এরকম। প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি বা মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি বা ব্লক কংগ্রেস কমিটি। সেখান থেকে প্রতিনিধি নিয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হত। আর সেই মণ্ডল কংগ্রেস কমিটিসমূহ থেকে নির্বাচিত প্রতি ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। এরাই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলে পরিচিত হতেন। এরা হতেন সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি। আর এদিকে এরাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করতেন। 'ডেলিগেটস' হিসেবে এদের কাজ ছিল বছরে একবার বা দুবার কংগ্রেসের যে অধিবেশন হত তাতে প্রতিনিধিত্ব করা। এরাই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করতেন। তখন কংগ্রেস সভাপতিকে নিয়ে ওয়ারকিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল মোট একুশ জন।

সভাপতিকে বাদ দিয়ে যে কুড়িজন, তার মধ্যে সাতজন নির্বাচিত হতেন এ আই সি সি-র সদস্যদের দ্বারা। এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রতি আটজন সদস্য আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হয়ে এ আই সি সি গঠন করতেন। বাকি তেরজনের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ এবং অন্য বারোজন মনোনীত হতেন কংগ্রেস সভাপতির দ্বারা। আর মোট ২১ জনের ওয়ারকিং কমিটি নির্বাচনের দ্বারা পারলামেনটারি বোরড গঠন করতেন।

কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী সর্বময় কর্তৃত্ব থাকত কংগ্রেস সভাপতির ওপর। তিনি আইনসভার সদস্যদের কার্যাবলী বা মন্ত্রিসভা পারলামেনটারি বোরডের মাধ্যমে পরিচালিত করতেন। সেইজন্যে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হত সেই ডেলিগেটদেরই ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব পুরো কংগ্রেস অধিবেশনের ওপর। অধিবেশনের সময় ছাড়া সারা বছর ওয়ারকিং কমিটি মারফত সংগঠন পরিচালিত হত।

স্বাধীনতার আগে মাত্র তিনজনকে নিয়ে পারলামেনটারি বোরড গঠিত হয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। স্বাধীনতার পর পারলামেনটারি বোরডের আয়তন বৃদ্ধি হয়। সেই জনোই যখন কাগজে দেখলাম এ আই সি সি-র প্রকাশ্য অধিবেশন, তখন একটু গোলমাল ঠেকেছে। আগে বছরে ৩/৪ বার এ আই সি সি-র প্রকাশ্য অধিবেশন হত। মাঝে মাঝে অবশ্য রুদ্ধদ্বার কক্ষেও হয়েছে। কাজে কাজেই এ আই সি সি র প্রকাশ্য অধিবেশন এবং 'কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে' অনেক তফাৎ। এ আই সি সি-র অধিবেশন হত এ আই সি সি র সদস্যদের নিয়ে। আর কংগ্রেসের অধিবেশন হত এ আই সি সি-র সদস্য সংখ্যা গুণিতক ৮ সংখ্যাবিশিষ্ট ডেলিগেটদের নিয়ে। অবশ্য বর্তমানে নিয়ম কী হয়েছে জানি না। অনেকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক দল হয়নি।

অনুলেখন ঃ পিনাকী মজুমদার

প্রবীণের স্মৃতিতে স্বাধীনতা আন্দোলন

বোলপুরের খেলার মাঠে শিশু-নারকেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে 'শিশু' কবিগুরু যেখানে লিখেছিলেন 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' কাব্য সেখানেই দেখতে পেলাম চার বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে যারা একদিন স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

এঁদেরই একজন হলেন রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতবাবুর জন্ম ১৮৯২ সালের ২৫ জুলাই, নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। স্বর্গীয় বাবা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্থানীয় অঞ্চলের উকিল ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক। ১৯০৮ এর ৮ আগস্ট। গিরিডি হাইস্কুলের হেডমাস্টার আইচ মহাশয় প্রথম শ্রেণীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এই ক্লাসের ছেলেরাই হল সবচেয়ে বড় — এবার এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে — টেস্টের আর মাসকয়েক বাকি, হেডমাস্টার মশাই এর মুখ গম্ভীর — ছেলেদের মুখ ততোধিক। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে ছেলেরা সব উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, কাল বাজারে বিদেশি জিনিস বয়কট সভা হয়েছিল তাতে তোমাদের যাওয়া মানা ছিল তবু জনকয়েক গিয়েছিলে, সে খবর আমি পেয়েছি। যারা গিয়েছিলে তারা কেবল দাঁড়িয়ে থাক, আর সবাই বসে পড়। জনপাঁচেক ছেলে ছাড়া সবাই বসে পড়ল। হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'যারা সভায় উপস্থিত ছিলে, তাদের শাস্তি নিতে হবে। আজ সারাদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাক – আর কাল দশ টাকা জরিমানা নিয়ে এস। দাঁড়াও সব বেঞ্চের উপরে' - ছেলেরা পর পর বেঞ্চের উপর দাঁড়াল - একজন ছাড়া - রোগা, ফরসা পনের বছরের ছেলে, মুখে জ্বলজ্বল করছে বুদ্ধির প্রখরতা। তার দিকে চেয়ে হেডমাস্টার ধমক দিলেন – 'তুমি বেঞ্চের উপর দাঁড়াচ্ছ না কেন প্রভাত?' 'স্যার এ শাস্তি আমি নিতে পারব না' - ধীর শান্তভাবে স্পষ্ট করে কথাগুলো বলল প্রভাত। অবাক বিস্ময়ে ক্লাস শুদ্ধু ছেলে তাকাল প্রভাতের মুখের দিকে। তার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। নিজেকে সংযত করে বলল 'তার মানে? বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে এ শাস্তি আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় স্যার।' এই কথা কয়টি ধরা গলায় বলে প্রভাত ক্লাসের দুধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিল; দেখল কাল যারা তার সংগে মিটিঙে ছিল প্রমোদ নৃসিংহ, সামন্ত জয়নারায়ণ, নাসেক - সবাই বেঞ্চে দাঁড়িয়ে, প্রভাতের মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

হঠাৎ হেডমাস্টার মশাই এর জোর গলার স্বর কানে এল - 'প্রভাত তুমি বুঝতে পারছ না, কী করছ তুমি। যদি শাস্তি না নাও, তবে তোমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না স্কুল থেকে নাম কাটা যাবে। আমরা সবাই আশা করে আছি তুমি আমাদের স্কুলের নাম রাখবে, স্কলারশিপ পাবে - সে সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সরকারি আদেশ অনুসারে তোমাকে শাস্তি নিতেই হবে - নইলে' 'স্যার আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। বাবা যদি বলেন মিটিঙে যাওয়ার জন্য আমার শাস্তি নেওয়া উচিত, নইলে আমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না, তাহলে আমি শাস্তি নেব, শুধু বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি বেঞ্চের উপর দাঁড়াব না।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / মোনা চৌধুরী

প্রভাতের মুখের উপরে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে রইলেন। মনে পড়ল এই ছেলেই দিন কয়েক আগে ইতিহাসের ক্লাসে পাঠ্যপুস্তকের তথ্য ভুল ধরেছিল। রেগে গিয়ে হেডমাস্টার মশাই বলে উঠেছিলেন তোমার বাবা তোমাদের মাথাটি খেয়েছেন দেখছি, তিনি না এই স্বদেশী সভার সভাপতি হয়েছিলেন তিনি আবার ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। চোখে জল ফেলতে ফেলতে প্রভাতবাবু সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন স্কুল থেকে। ঘটনাটি তিনি নগেনবাবুকে বলতেই নগেনবাবু সেদিন বলে উঠেছিলেন 'স্কুল ছেড়ে চলে আয়'। ছেলের ভবিষ্যতের কথা একটুকু চিন্তা না করে সেদিন তিনি ভর্তি করিয়ে দিলেন ন্যাশনাল স্কুলে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রভাতবাবুর শুরু হল স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ। এরপর থেকে তাঁর শুরু হয় স্বদেশী কাজ, সেই সংগে তাঁর চলছিল সমাজ সংস্কারের কাজও। জলাশয় সংস্কারের কাজও তাঁর হাতেই হয় ১৯৩৬ সালে ৩৭ সালে ইউনিয়ন বোরডের নির্বাচনে প্রবল জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ইউনিয়ন বোরডের সভাপতি হন। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী না হয়েও কংগ্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন বহুদিন। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আজও কি আপনি কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন?' উনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন 'কংগ্রেস আজ কোথায় কংগ্রেস আজ নেই। এখন সেই কংগ্রেস তো কংগ্রেস (ই)।' সেই সংগে উনি পরিষ্কার ভাবে বলে ওঠেন 'দেশকে গড়তে হলে চাই সমবায় ভিত্তিতে কাজ।' আমি প্রশ্ন করলাম 'ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কী?' উনি দৃঢ়তার সংগে বললেন 'ইন্দিরা আমার ছাত্রী ছিল। ও দক্ষ প্রশাসক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে ওর মত প্রশাসক আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।' জিজ্ঞাসা করলাম 'ইন্দিরা গান্ধীর সংগে পরবর্তীকালে আপনার কখনো দেখা হয়েছে কি?' উনি বললেন 'শান্তিনিকেতনে এসেছে বহুবার কিন্তু আমার সংগে দেখা হয়নি কোনবার। একবার আমার একটা বই ওকে পাঠিয়েছিলাম, যখন ও শান্তিনিকেতনে এসেছিল।'

প্রভাতবাবু আজ ব্যস্ত চার ছেলে ও নাতিনাতনি নিয়ে। স্ত্রী সুধাময়ী দেবী কিছুদিন আগে পরলোকগমন করেছেন। তাই সাহিত্যকে আরও আঁকড়ে ধরে তিনি ভুলতে চাইছেন শোক ও পার্থিব দুঃখকে। এযাবৎ তিনি একত্রিশটি বই লিখেছেন। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটা স্পষ্ট ক্ষোভ গুঞ্জরিত হতে দেখলাম।

তাঁর বাড়ির উল্টো দিকেই বোলপুর টুরিস্ট লজ। কংগ্রেসের ছোট বড় নেতারা এই লজে আসেন ও শান্তিনিকেতন ঘুরে যান। অথচ সামান্য শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারে কংগ্রেসের নেতাদের ভীষণ কার্পণ্য। ভূপতি মজুমদার যখন বেঁচে ছিলেন শুধু তিনি কয়েকবার এসেছিলেন। অথচ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে রাত কাটিয়ে গেছেন এই বাড়িতে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

এঁদের আর একজন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। ১৮৯৭ সালের ২৭ এপরিল জন্ম কুমিল্লা জেলার গংগাসাগর স্টেশনের অদূরে মণিয়ন্দ গ্রামে। ১৯০৫ সালের ১৬ অকটোবর প্রবোধবাবুর জীবনে স্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন ও উপবাসের ডাক দিয়েছেন। এইদিন কুমিল্লা জেলায় রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। প্রবোধবাবুর বয়স তখন আট। ওই একই মঞ্চে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশ' কবিতাটি পাঠ করেন। এর পরের বছর কুমিল্লায় হিন্দু মুসলমানের দাংগা বেধে যায়। উনি মায়ের হাত ধরে কুমিল্লা ত্যাগ করেন। সেদিন ওঁর মনে হয়েছিল গতবছর যে বাংলাদেশ কবিতাটি পাঠ করেছিলাম তা বৃথা। এরপর ১৯২১ সালে কংগ্রেসের সংগে জড়িয়ে পড়েন, গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে কলেজ বয়কট করেন। নিজেই 'ন্যাশনাল ইস্কুল' তৈরি করলেন কুমিল্লায়। পরে আবার কলেজে ভর্তি হন, তখন মনে হয় দেশকে শিক্ষিত না করলে কোন আন্দোলনই

প্রবোধ সেন / মোনা চৌধুরী

সফল হবে না। '৪২ এ রবীন্দ্রনাথের ডাক পেয়ে শান্তিনিকেতন চলে আসেন ও সেই থেকেই অধ্যাপনা, সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আজও তাই করে চলেছেন।

জিগ্যেস করেছিলাম 'কংগ্রেস সম্পর্কে আপনার মতামত কী?'

'আমার মতামত নেই, দেশের লোককে যে খেতে দিতে পারবে আমি তার দলেই আছি। আকাশে উপগ্রহ পাঠালেই দেশের লোক খেতে পাবে এমন কী কথা আছে। আমি মনে করি রামকৃষ্ণ মিশন দেশের জন্য সত্যিকার কিছু কাজ করছে। তবে পশ্চিমবাংলার জন্য যা কিছু করার তা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অতুল্য ঘোষ ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ করেছেন। এছাড়া সত্যজিৎ রায় বাংলার জন্য কিছু করার চেষ্টা করছেন।' শ্রীমতী গান্ধী সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করলে তিনি বলেন, 'ওঁর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বলতে চাই না।'

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের আর এক ব্যক্তি হলেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি ও শিল্পী, জন্ম ১৯০৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, আমতায়। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন, গান্ধীজীর ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। সতীশ দাশগুপ্তর নেতৃত্বে জেলে গেছেন প্রথমবার। এরপর আরো চারবার জেলে গেছেন। ইংরেজের শ্যেনদৃষ্টি প্রতিবারই তাঁকে দুবছর করে জেলে আবদ্ধ রেখেছে। স্বদেশী কাজ করতে গিয়ে প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ ও যতীন রায়ের সংস্পর্শে এসেছেন বহুবার। স্বাধীনতার পরও কংগ্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন বেশ কয়েক বছর। দুর্ভিক্ষ-বন্যার সময় দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন বহুবার। ৪৩-এ শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন রথীন ঠাকুরের ডাকে, ভার নিলেন শ্রীনিকেতনের পল্লী ভারতীর। এ সময় নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের সংস্পর্শে আসেন তিনি। এখানে কুড়ি বছর কাজ করার মধ্যে কিছুদিন অর্থাভাবে কাটান। তারপরে স্ত্রী স্কুল মাসটারিতে যোগ দেওয়ায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে। তার লেখা একাধিক বই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। তার আঁকা বহু চিত্র আজও শান্তিনিকেতনে সমাদৃত।

কংগ্রেস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি বলে ওঠেন – থুতু উপরে দিকে ছেটালে নিজের গায়েই লাগে, তাই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তবে আজকের কংগ্রেস আগের কমিউনিসট পারটির মত উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েছে। আগেকার কংগ্রেসি যাঁরা তাঁরা এখনো আমার সংগে যোগাযোগ রেখেছেন। কিন্তু এখনকার কংগ্রেস (ই) যাঁরা তাঁরা আমায় চিনতেই চান না।'

ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দেন 'তিনি দেশের নেত্রী শুধু নন, পৃথিবীরও নেত্রী।'

রাণী চন্দ

শান্তিনিকেতনে আর এক সন্ন্যাসিনীকে দেখে এলাম তিনি হলেন শ্রীমতী রাণী চন্দ। তাঁর স্বামী অনিল চন্দ একসময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন ও কবিগুরুর খুব কাছের মানুষ। শ্রীমতী চন্দর স্বাদেশিকতার জন্য জেল খেটেছেন ও কংগ্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন বেশ কয়েকবছর। এবার যখন জানতে গিয়েছিলাম কিছু কথা, তিনি বলেন 'বানপ্রস্থে গেছি, আমার খুঁচিও না।'

সাক্ষাৎকার : মিহির ভট্টাচার্য

'বন্দেমাতরম' বলাটাই তখন পাপ — রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সংগীত জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। এখন প্রৌঢ়, দর্শনে সৌম্য, শান্ত। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে ওঁর অভিজ্ঞতা জানতে। তাঁর জন্ম আজ থেকে প্রায় চৌষট্টি বছর আগে, কলকাতার এক বনেদী পরিবারে। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায়: বৃটিশ আমল। পুলিশ বাহিনীতে লাল-মুখোদের দাপট চলছে। তখন বন্দেমাতরম বলাটাই যেন পাপ। মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। স্কটিশ চারচ স্কুলে ক্লাস ফোর-এ পড়ি। একদিন দেখি, পাঁচসাত জন ছেলে 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ কোত্থেকে এসে তাদের ওপর লাঠি চারজ শুরু করে দিল কী নৃশংসভাবে, ভাবা যায় না। তখন বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ ছিল।

আরেকবার মনে আছে, তখন আমার বয়স খুবই কম। দাদু কোথা থেকে খবর পেলেন, আমার কাকা একটা নিষিদ্ধ বই 'দেশের ডাক' এনে নিজে পড়েছেন এবং আরো নাকি কাকে কাকে পড়িয়েছেন। কারা দাদুকে বলেছে, আমাদের বাড়ি তল্লাশি হবে, এবং সবাইকে পুলিশ ধরবে। ব্যাস, সেই রাত বারোটার সময় সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে, বিছানার তলা, লেপ-তোশক তুলে 'দেশের' ডাক খোঁজা হচ্ছে। ওদিকে ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলু ঢুলু। কাকা কিন্তু চুপচাপ বসে আছেন। বারবার জিগ্যেস করা সত্ত্বেও কিছু বলছেন না। শেষে আমাদের কষ্ট দেখে নিজেই বইটা দাদুর হাতে তুলে দিলেন। প্রথমে তো বকুনি খেলেনই, তার পর আমার মনে আছে দাদু সেই বই পুড়িয়ে দিলেন।

আপনি পরে বড় হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সংগে যুক্ত হয়েছিলেন?

না. প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইনি।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

তবে প্রায়ই সভা সমিতিতে গিয়ে গান গাইতাম। প্রথম প্রথম কাজীদা অর্থাৎ নজরুল ইসলামের সংগে সমস্ত সভায় যেতাম। কাজীদা তখন সব আগুন ঝরান গান গাইতেন। কারার ওই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল অথবা জাতের নামে বজ্জাতি। তারপর গান শেষ হলে বক্তৃতা দিতে উঠতেন, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা অন্য কোন নেতা।

আপনার সংগে কাজী নজরুল ইসলামের আলাপ কীভাবে হয়?

আমার তখন বয়স চোদ্দ পনের। সবে স্কুল ছেড়েছি। গানের জগতে পুরোপুরি না আসলেও, তবলা বাজিয়ে বেড়াই, ভেতরে ভেতরে রেওয়াজ করি। এমনি সময়ে একটা চাকরি জুটল এইচ এম ভি তে। কমল দাশগুপ্তর অ্যাসিসটেনট হিসাবে। এই এইচ এম ভি-তেই কাজীদার সংগে আলাপ।

কাজী নজরুলকে তো বৃটিশ পুলিশের কারাগারে কাটাতে হয়েছিল বহুদিন, আপনারা যে ওঁর সংগে থাকতেন, তাতে আপনাদের ওপর পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি?

না, পুলিশ আমাদের কখনও ধরেনি। তবে একবারের একটা ঘটনা মনে পড়ছে, এই বিবেকানন্দ রোডে মটরবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর বাড়িতে আমরা কয়েকজন মিলে কাজীদার কাছে গানবাজনার তালিম নিতাম। একদিন বিকেলে, তখনও গান বাজনা শুরু হয়নি, কাজীদা আমাদের সংগে কথাবার্তা বলছেন। হঠাৎ দরজার কাছে এসে কে একজন কী ইশারা করাতে কাজীদা চোখের নিমেষে ঘরের পেছন দিকের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার পরই কানে এল মস মস করে বুটের আওয়াজ। দেখি একজন লালমুখো সারজেনট। আমি একেবারে সামনে বসেছিলাম, আমাকে জিগ্যেস করল, 'এখানে কী হয়?' আমি তো সব ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম। সারজেনট আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'ডু ইউ নো কাজী নজরুল ইসলাম? ইজ হি হিয়ার?' আমরা সমস্বরে বললাম, 'কাজী নজরুলকে আমরা চিনি না, কাজী নজরুল ইসলাম বলে এখানে কেউ তো নেই।' তখন সারজেনট বিরক্ত হয়ে বলল, 'তাহলে তোমরা এখানে কী কর?' আমরা বললাম, আমরা গানটান করি, এই দেখুন বাজনা-টাজনা রয়েছে, সারজেনট কী বুঝল, কে জানে। গটমট করে ফিরে চলে গেল। আসলে তখন কাজীদার খোঁজে পুলিশ ঘুরছে।

আমার নিজেরও এক দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। ঠিক সালটা স্মরণে নেই। কলেজ স্কোয়ারে এক জনসভায় সুভাষবাবু বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ পুলিশ এল, সুভাষবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনি নেমে আসুন, আপনাকে অ্যারেসট করব।' সুভাষবাবু বললেন, 'আমার একটা কথা বলার আছে, সেটা বলে আমি নেমে যাচ্ছি, আমায় অ্যারেসট করবেন।' সুভাষবাবু চিৎকার করে সেদিন যে কথাগুলি বলেছিলেন আমার আজও কানে বাজছে। সুভাষবাবু বলেছিলেন, 'আজ আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই আমাকে অ্যারেসট করে নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু এ দুঃখ আমি ভুলতে পারব না যে একটা বাঙালির ছেলে সারজেনট হয়ে, আমাকে এ মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' এরপর সারজেনট আর মাথা উঁচু করতে পারলেন না। তিনি তার ডিউটি করলেন দেশবরেণ্য সুভাষচন্দ্রকে অ্যারেসট করে। কিন্তু মাথা তাঁর আর উঁচু হল না।

আমাকে বহু সভায়, বক্তৃতার

'তখনকার নেতারা ছিলেন দেবতুল্য'-সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

'পাঠশালে আর যাব না ভাই/ প্রাণ কেঁদেছে মায়ের তরে, যাদের মায়ের মলিন বদন/বলো কি কাজ তাদের লিখে পড়ে' – একদিন এই গান যাঁর কণ্ঠে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, একদিন কংগ্রেসের ডাকে আহূত জনসভায় এই গান গেয়ে যে কিশোর গায়ক লক্ষ মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত করেছিলেন, সেদিনের সেই কিশোর গায়ক আজকের সংগীতজ্ঞ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। একাত্তর বছর বয়সী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বি এল গাংগুলি লেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় দিনগুলির কথা শুনতে। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন, এই প্রশ্নের জবাবে সংগীতসাধকের উত্তর : যখন স্কুলে সবে ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন থেকেই বলতে পার। সাল বোধহয় ১৯২১ হবে, সারা দেশজুড়ে গান্ধীজীর ডাকে বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চলছে। বরিশালে আমাদের গ্রাম উজীরপুরেও সেই আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। তবে তখন আমাদের গ্রামের লোকেদের (যদিও আমাদের গ্রাম খুব উন্নত ছিল) মধ্যে একদল ছিল খুব ভীরু, আরেকদল বেপরোয়া। সেই সময় স্বদেশী যারা করত তাদের সম্বন্ধে বলা হত, 'স্বদেশীরা কি গণ্ডগোল আরম্ভ করেছে, আমাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেবে', এইসব বলে একটা ভয়, আতঙ্ক ছড়ান হত। আমাদের মত যারা ছোট ছেলে, তাদের বাড়ি থেকে বাইরে বেরুনো বারণ ছিল। আমার মনে আছে, একদিন আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে বাজার থেকে হৈ চৈ শুনে কৌতূহলবশত গিয়ে দাঁড়ালাম। গিয়ে দেখি দাদাস্থানীয় কয়েকজন বাজারে যে একটা বিলেতি দ্রব্য বিক্রির দোকান ছিল তার সামনে শুয়ে পড়েছে। দু-চারজন লোক দোকানে ঢুকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, আর যারা ভেতরে ছিল তারা বেরুবার চেষ্টা করছে, একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িটি দিয়ে কোনমতে একজন লোক নামতে পারে। ওই সিঁড়িটা এত ছোট যে একজন লোকও শুতে পারে না। আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। ছোট তো, তাই মজা দেখছিলাম আর কি। হঠাৎ একজন দাদা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে ওই সিঁড়িতে শুইয়ে দিল। কারণ আমি ছোট্ট, ওই সিঁড়িতে শুতে কোন অসুবিধা নেই। আমি যেন কেমন বোকার মত শুয়ে পড়লাম বিনা প্রতিবাদে। ব্যাস পথ বন্ধ হয়ে গেল। হৈহৈ শুরু হল। খানিকক্ষণের মধ্যেই থানার থেকে দারোগা কিছু পুলিশ নিয়ে এল। মারপিট ঠেলা ঠেলি শুরু হল। এমনি যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তারা পালিয়ে গেল। যারা শুয়ে ছিল তাদের উপর দিয়ে দারোগা জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে মাড়িয়ে ওই সিঁড়ির কাছে এসে, আমার হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দুই থাপ্পড় কশালে। আমি ন দশ বছরের ছেলে, স্বভাবতই কেঁদে ফেললাম। তখন দারোগা কান ধরে টেনে নিয়ে এসে বললে, তুমি মুখুজ্জে বাড়ির ছেলে, তুমি এসব কাজ করছ, এসব ছোটলোকেরা করে। দারোগা বাঙালি, আমাদের গ্রামের লোক। আমাকে চিনত। আরো দুচার থাপ্পাড় চাপড় মেরে বলল, যাও আর এস না। আমার এতদিন অবধি কোনরকম দেশাত্মবোধ বা স্বদেশী ভাব ছিল না বা বুঝতাম না, কিন্তু ওই থাপ্পড় খেয়ে মুখে বললাম বটে, না না, আর করব না। কিন্তু মনে মনে কেমন যেন জ্বলে উঠলাম, মনে মনে বললাম আমি করবই। মজার কথা কী জান, তখন যে সব পুলিশ অত্যাচার করত স্বদেশীদের উপর, পরবর্তীকালে তারাই দেখলাম, মানে স্বাধীনতার পর, পুলিশের সব বড় বড় পদে বসে গেছে। আমার মনে হয় এইজনাই দেশের ভোল পাল্টাল না।'

যাই হোক তারপরের দিনই আবার লুকিয়ে গেলাম বাজারে যেখানে মদ গাঁজার দোকানের সামনে পিকেটিং চলছে। গোলমাল হল সেদিনও, পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। দুচার ঘা লাগিয়ে হাজতে পুরে দিল। হাজতঘরে যেখানে আমাকে রাখল সেখানে চোর ডাকাতদের রাখত। সেই ঘরের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করছে সবাই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। আমি দারোগাকে বললাম, আমায় ছেড়ে দিন। এখানে থাকলে আমার বমি হয়ে যাবে। দারোগা সাহেব বলল, কেন আর একটু স্বদেশী কর। তোমার স্বদেশী দাদারা সব বাঁচাক তোমায়। যখন বিকেল চারটে পাঁচটা তখন বলল, আর করবে? তুমি কী বাড়ির ছেলে! এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। পুলিশ আমায় চিনত, কারণ খুব ছোটবেলা থেকে আমি গান গাইতাম, ইস্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলেই আমাকে গান করতে হত।

যখন ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠব, তখন আমায় স্কুল ছাড়তে হল। আমার [illegible] স্কুল না ছাড়তে হয়। কারণ তখন সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলে যারা স্বদেশী করত তাদের রাখা হত না। পুলিশ থেকেই স্কুলে খবর চলে যেত। তাই আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। এসে ভর্তি হলাম, এখন আমাদের জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, [illegible] বিজয় ভট্টাচার্যের [illegible] স্কুলে। বাবা জানতে পেরে আমায় কলকাতায় নিয়ে এলেন।

প্রশ্ন করলাম, কলকাতায় এসে স্কুলে ভর্তি হলেন না,

না, প্রথমে কয়েক বছর কোন স্কুলে ভর্তি হইনি। এইরকমভাবে যখন দুপুরগুলো কাটাচ্ছি, সেই সময় এক বন্ধু ছিল। সে আমাকে একদিন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে সন্ন্যাসী আশ্রমে এক সাধুর কাছে নিয়ে গেল। সেই সাধু হলেন স্বামী সত্যানন্দপুরী। তিনি একটা বই পড়তে দিলেন। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'দেশের ডাক', তারপর দিলেন 'পথের দাবী', আর উপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা কিছু বই। এসব বই লুকিয়ে পড়তাম। বাড়িতে পড়াশুনো করার জন্য বাবা কিছু বই কিনে দিয়েছিলেন, তার ফাঁকে পড়তাম, তারপর একদিন ধরা পড়ে গেলাম বাবার কাছে। প্রচণ্ড মার খেলাম বাবার হাতে।

আগে গান করতে হত। একবার কলেজ স্কোয়ারে আমি ও গিরীন চক্রবর্তী 'বন্দেমাতরম' উদ্বোধনী সংগীত গাই। তার পর সুভাষবাবু বক্তৃতা দিলেন। আবার কখনো কখনো শ্যামাপ্রসাদ মুখারজির সভায়ও দেশাত্মবোধক গান গেয়েছি। মনে পড়ে আমার বন্ধু প্রয়াত হরিপদ ভারতী জোর করে বহুসভায় গান গাওয়াতে নিয়ে যেত। এই রকম কংগ্রেস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে যে সব সভা হত, সেখানে পুলিশের বাধা দান, লাঠি চারজ, লোকেদের ঠেলাঠেলি, সবই দেখেছি। এইসব সভায় গান গাইতে গাইতে আলাপ হয় অনুশীলন সমিতির নেতা বিপ্লবী অনুকূল দাসের সংগে। বহুবার ওঁদের বাদুড় বাগানের বাড়িতে গেছি, অনেক কথা শুনতাম ওঁদের কাছ থেকে। তবে কোনদিনই, কাজীদার মত পুলিশ আমাদের পিছু নেয়নি।

আপনি কি শুধু সভাতেই দেশাত্মবোধক গান গাইতেন?

শুধু সভায় নয়, তখনকার দিনে সব বনেদী পরিবার, যেমন ঠাকুর বাড়ি, প্রদ্যোৎকুমারের বাড়ি, রামদুলাল সরকারের বাড়িতে গিয়ে দেশাত্মবোধক সব গান, বেশির ভাগ কাজীদার গান গাইতাম।

সুতরাং শেষ প্রশ্ন করলাম, যদিও আপনি শিল্পী, রাজনীতির লোক নন, তবু একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের অবস্থা আপনার চোখে কেমন লাগছে?

কিছুক্ষণ ভেবে রামকুমারবাবু বললেন, 'আমাদের সময়ের মত সেই সব নেতা কই? তখনকার নেতাদের মত স্বাধীনতা সচেতন, দেশপ্রেমী আজ চোখে পড়ে না, আগে নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ, অনুকূল দাসের বক্তৃতা শুনলে রক্তে যে দোলা লাগত, আজ সেরকম কথা শুনি না। আর কংগ্রেস সম্বন্ধে বলতে গেলে, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই এক বুড়োর পাঁচ ছেলে ও তাদের লাঠি ভাঙার গল্পের সারাংশ বলতে হয়, যে বুড়ো তার একটা ছেলেকে লাঠি ভাঙতে বলল, সে পট করে ভেঙে দিল। কিন্তু যখন তাকে পাঁচটা টুকরো একসংগে করে ভাঙতে বলা হয়, সে পারল না। তখন বুড়ো বলল, বাবারা সব পাঁচজনে একসংগে মিলেমিশে থেক। তা এখন তো কংগ্রেসের বহু ভাগ, টুকরো টুকরো, দ্বিধা বিভক্ত। তাই সেদিনের কংগ্রেসের সংগে আজকের কংগ্রেসের তফাত অনেক। আর দেশের কথা কীই বা বলব! দেশের অবস্থা যা, কদিনই বা বাঁচব, তাই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছি, আর কিছুই তো বলার নেই।' □

সাক্ষাৎকার : সঞ্জয় সিংহ

মারের ফলে আমার রোখ বেড়ে গেল। গোপনীয়তা এল। স্বামী সত্যানন্দ ছিলেন বিবেকানন্দর শিষ্য এবং অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। তিনি বললেন, তোমরা আর বাইরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবে না, ভেতরে ভেতরে কাজ শুরু কর। কিন্তু আমার পক্ষে তা করা মুশকিল ছিল, কারণ আমি স্বদেশী গান গাইতাম বলে সকলের কাছে খুব পরিচিত ছিলাম।

তখন আপনি কী কী স্বদেশী গান গাইতেন?

সিদ্ধেশ্বববাবু স্মৃতি চারণ করতে করতে অতীতের সেই সংগ্রাম মুখর দিনগুলিতে চলে গিয়েছিলেন, তাই উত্তরটা দিতে দিতে দু এক কলি গান গেয়ে ফেলছিলেন, 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে/এদেশ তোদের নয়। তারপর ধরো, বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'মুক্তি মোদের প্রাণের বধূ/বন্দীশালা বাসর ঘর।' বিপিন পালের 'সহে না সহে না জননী।' এ ছাড়া বন্দেমাতরম তো ছিলই। তখনকার দিনের যাঁরা নেতা যেমন প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, সাতকড়ি পতি-রায় প্রমুখ যারা ছিলেন, তাঁরা আমাকে নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় যেতেন, সভা শুরুর আগে গান করাতে। কারণ গানটান শুনে লোক জড় হত। তখন কিন্তু আমরা খালি গলায় গান গাইতাম, গলার জোরও ছিল। ১৯২৫ সালে গান্ধীজী এলেন বরিশালে। আমি তখন মাঝে মাঝেই কলকাতা থেকে বরিশালে যাই। স্টিমার ঘাট থেকে আমরা ছেলেরা ঘোড়া ছেড়ে, নিজেরাই গান্ধীজীর গাড়ি টেনে এনেছিলাম অশ্বিনী দত্তর বাড়ি অবধি। তারপর অশ্বিনী দত্তর বাড়িতে বসে আমি এবং মুকুন্দ দাস তাঁকে গান শোনাই। আমি গেয়েছিলাম 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে'। গান্ধীজী আমার গান শুনে খুব খুশি হয়ে তখনকার দিনে যা সর্বোচ্চ সম্মান, সেই সম্মান আমায় দিয়েছিলেন, নিজের হাতে খদ্দরের একটি ফতুয়া, এবং গান্ধী টুপি পরিয়ে দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন কংগ্রেসের একটি ব্যাজ। গান্ধীজীর সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই গান জানতেন, তাঁদের কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম, মেয়েরা যেটা গাইতেন 'সোনে কা হিন্দুস্থান'। আর একটা গান আমার খুব ভাল লেগেছিল, সেটা হল, 'আইয়ো ভাইয়ো মেরা খদ্দর পিন্দনকে এহি উৎসব আজ।'

আচ্ছা, আপনি তো অনেক সভা সমিতিতে গান গাইতেন, কখন কোন গোলমালের সম্মুখীন হতে হয়নি?

একটু হেসে সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন : 'হয়নি আবার। মনে আছে ১৯২৯ সালে যতীন দাস মারা গেছেন। ঠিক তার পরের বছর ১৯30 সালে তাঁর মৃত্যু তিথিতে কেওড়াতলা মহাশ্মশান ঘাটে এক সভায় গান গাইছি কাজীদার গান, 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ/নবযুগ ঐ এলো ওই/এলো ওই ... .' গান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় দেখলাম খুব ধাক্কাধাক্কি চলছে, পুলিশ আসার চেষ্টা চলছে। তখন গানটা ছিল নিষিদ্ধ। উদ্যোক্তাদের একজন এসে কানে কানে বলে দিলেন, 'সিদ্ধেশ্বর তুমি গান শেষ হলেই, এই কেওড়াতলার পেছন দিয়ে গঙ্গার পাড় দিয়ে ওই মাইসোর পারকের (এখন যেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লী হয়েছে) মধ্যে দিয়ে টালীগঞ্জ রোডে গিয়ে দেখবে একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে থাকবে, তুমি তাতে উঠে পালাবে। পুলিশ তোমায় গ্রেপ্তার করতে আসছে।' আমি তো কোন রকমে গান শেষ করেই ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ওনার কথামত পালালাম। পরের দিন শুনলাম অনুষ্ঠানের দুজন কর্মকর্তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আমার খোঁজ খবর নিচ্ছে। কারণ আমি সে সময় পুলিশের চোখে বিপজ্জনক ব্যক্তি। তারপর দৌলতপুর, বরিশাল, মেখলিগঞ্জে কিছু দিন করে কাটিয়ে গেলাম কোচবিহারে। ওখানে কলেজের ছেলেদের রিইউনিয়ানে গান গাইতে গিয়ে পড়লাম মহা বিপদে। তখন কোচবিহার এসটেটের নিয়ম ছিল কেউ বন্দে মাতরম পর্যন্ত বলতে পারবে না। ছেলেরা আমাকে দেশাত্মবোধক গান গাইতে বলায়, আমি গান গাইছি, এমন সময় পুলিশ এল। হুকুম হল আমাকে আট ঘণ্টার মধ্যে কোচবিহার ছেড়ে চলে যেতে হবে। চলে এলাম। এইভাবে ন দশমাস ফেরার থাকার পর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। কারণ পুলিশের কয়েকজন বড় কর্তা আমায় চিনতেন এবং দুএকজনের বাড়িতে আমি গানও শেখাতাম, অবশ্য ওই গান শেখানর নাম করে আমি বহু পুলিশের গোপন খবর স্বদেশীদের কাছে দিয়ে দিতাম, যেমন কোথায় কবে পুলিশ রেড করবে বা সার্চ করবে বা পুলিশ কী অ্যাকশান নিতে চলেছে ইত্যাদি। তা সেই পুলিশ অফিসাররা আমার উপর থেকে সব কেস তুলে নিলেন, তার প্রধান কারণ আমি এই যে বেশ কয়েকমাস ছিলাম না, তাতে ওঁদের ধারণা হল আমি তো কোন স্বদেশী কাজকর্মের মধ্যে ছিলাম না। তাই ছেড়ে দিলেন।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এল, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় হাত ধরে বললেন : বুঝলে তখনকার নেতারা দেশকে ভালবাসতেন। দেশের নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষ, আর বিদেশি এসে সব লুটে পুটে নিয়ে যাচ্ছে এটা রুখতে তাঁরা প্রাণপণ সংগ্রাম করতেন। নেতাগিরি করে নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে বড় করার জন্য দেশকে ভালোবাসেননি। তাঁরা সকল দেশবাসীকে আপনার জন বলে ভালবেসেছিলেন। দেশবন্ধু, নেতাজী অরবিন্দ, গান্ধীজী, তিলক, বারীন ঘোষ এঁরা সব ভগবান ছিলেন। কারণ এঁরা সুখে থাকতে পারতেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ যাতে দুটো অন্ন মুখে তুলতে পারে তার জন্য সব সুখ বিসর্জন দিয়ে এঁরা সংগ্রাম করে গেছেন। আর এখন সব উল্টে গেছে। এখন জনসাধারণ খেতে পাক বা না পাক, নেতারা ভাবেন, তাঁদের গদি, তাঁদের ছেলেমেয়ে ভাগ্নে ভাইপোরা সব ভালভাবে থাকতে পারলেই হল, এখন নেতারা শ্রদ্ধা জিনিসটা যে কী তা জানেন না কারণ সেটা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। □

সাক্ষাৎকার : সঞ্জয় সিংহ

'খেলোয়াড়রা দেশের সম্মান রক্ষায় প্রেরণা পেয়েছে' – উমাপতি কুমার।

'সেদিন বিপ্লবীদের কাজে সাহায্য করেছি' –বাঘা সোম

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জাতীয় আন্দোলনে খেলাধুলা এবং খেলোয়াড়দের অবদান কতটা।

সে সম্পর্কে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু কথা ও নানা ঘটনার সামান্য উল্লেখ থাকলেও তা নিয়ে কখনও তেমনভাবে বিস্তারিত কোন আলোচনা বা গবেষণা হয়নি। অনেক কথা আজও অজানা থেকে গেছে।

স্বদেশী বা জাতীয় আন্দোলন তখন মাতৃগর্ভে। জাতীয় আন্দোলন শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই বাংলা দেশের তরুণদের মধ্যে জাতীয়তা এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। জাতীয় এবং নানা ইওরোপীয় খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষার সংগঠন গড়ার মধ্য দিয়ে সেকালে এই যজ্ঞেরও প্রধান ধ্বনি ছিল : 'ক্রীড়া যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত কর - ইংরেজরা অপরাজেয় নয়।' এই বিশেষ ধ্বনি তরুণদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ও গতি সঞ্চার করেছিল।

পরাধীন ভারতে ইওরোপীয়ানদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে স্বদেশে প্রথম ভারতীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কলকাতা শহরে, ১৮৮৩ সালে। এ বছর তারও শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা এবং সংগঠক ছিলেন 'ক্রীড়াসম্রাট' নামে খ্যাত নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

১৮৯২ সালে শোভাবাজার ক্লাব ট্রেডস কাপ এবং ১৯১১ সালে মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে তৎকালীন দুই দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনা ইস্ট সারে ও ইস্ট ইয়রক দলকে পরাজিত করে প্রমাণ করেছিল, ইংরেজশক্তি অপরাজেয় নয়। এই জন্য বাংলা তথা সারা

উমাপতি কুমার / আলোকচিত্র : অরুণ মুখার্জী

দেশের তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে নব প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। সে কথা কোন রাজনৈতিক নেতা এবং ঐতিহাসিক কোনদিন অস্বীকার করেননি।

জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শতবর্ষ পূর্তি আসন্ন। সেকালে খেলোয়াড়রা জাতীয় আন্দোলনকে কী চোখে দেখতেন এবং তাঁরা কী ভাবতেন, সেকথা জানতে বিগত দিনের বাংলার দুই দিকপাল খেলোয়াড় উমাপতি কুমার ও তেজেশ সোমের (বাঘা) সংগে 'পরিবর্তনের' পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ করেছিলাম।

উমাপতি কুমারের জন্ম ১৮৯৮ সালে, বর্ধমানের চাগ্রামে। বাল্য জীবন কেটেছে বিহারের কিষাণগঞ্জে। যৌবন থেকেই আছেন কলকাতায়।

তিনি বললেন, কোনদিন রাজনীতি বা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি। যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের ছোট বড় সবাইকে তিনি নানা কারণে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন, সেকালে সকলেই রাজনীতি করতেন দেশের জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। দলের জন্য নয়, কাজ করেছেন দেশের জন্য। ব্যক্তি নয়, জনসমষ্টিই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ভোগ নয়, হাসিমুখে তাঁরা দেশের জন্য সব বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন সর্বত্যাগী।

বর্ষীয়ান খেলোয়াড় বেদনার সংগে জানালেন : আজকাল রাজনীতির নামে কী দেখছি? দেশ নয় – দলই সব; জনসমষ্টি নয়, ব্যক্তিই প্রধান। দেশের দশের প্রয়োজনে ত্যাগের সেই মহান আদর্শ কোথায়? বয়স হয়েছে তাই আর এসব কথা ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করি না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ বদলে গেছে।

যৌবনে প্রধানত খেলা আর খেলা নিয়ে দিন কাটিয়েছি। খেলার মাঠে ও বাইরে বড়রা নানা কাজে যে সব উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন তা মন দিয়ে শুনতাম। তাঁদের কথার মধ্য দিয়ে বুঝতাম আমরা পরাধীন। পরাধীনতার জ্বালা যে কী বেদনাদায়ক, তা বর্তমানের তরুণরা জানে না বোঝে না। বড়রা সব সময় বলতেন 'নিজেদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাঠে ইংরেজদের পরাজিত করা সম্ভব, একাজ তোমাদের প্রমাণ করতেই হবে'। সবাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করার ফল পেয়ে, সেদিন কী আনন্দই না পেয়েছি। আর মনে মনে বড়দের সংগে ভেবেছি, সামনের ঐ দুর্গে কবে জাতীয় পতাকা উড়বে, দেশ স্বাধীন হবে। বড়রা বলতেন 'জোর কদমে এগিয়ে চল, স্বাধীনতা আসবে।' সকলেই খেলার মাঠে দেশের ও জাতির সম্মান রক্ষার জন্য খেলেছেন। তাঁরাও প্রাণ মন ঢেলে ভাল খেলে দুর্ধর্ষ ইংরেজ দলকে পরাজিত করে তরুণদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছেন। ব্যাপক অর্থে একাজও জাতীয় আন্দোলনকে শক্তি যোগাতে সাহায্য করেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে।

উমাপতিবাবু প্রশ্ন তুললেন, আজকাল খেলার মাঠে খেলার নামে কী হচ্ছে? কোথায় গেল ভ্রাতৃত্ব ও দেশাত্মবোধ! হামেশাই কলকাতা দিললি, বোমবাই, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে যে সব ঘটনা ঘটছে তা অতীতে ছিল অকল্পনীয়। খেলার মাঠেও আজকাল বহুক্ষেত্রে ত্যাগের পথ ছেড়ে ভোগের নীতি অনুপ্রবেশ করেছে। খেলার মাঠেও দেশ ও দল থেকে ব্যক্তির স্বার্থকে বড় করে দেখার প্রবণতা বাড়ছে, বাড়ছে কলহ, ঘটছে বহু নিন্দনীয় ঘটনা। যা খেলার মান উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। দেশের স্বার্থে এসব কাজ বন্ধ করতেই হবে। তবেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ দূষণ মুক্ত হবে। খেলার মাঠকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।

তিনি বললেন, সেকালে এপার বাংলার খেলোয়াড়দের সংগে রাজনীতির তেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলেও, ওপার বাংলার খেলোয়াড়দের সংগে রাজনীতির যোগাযোগ ও গভীর সম্পর্ক ছিল। ওপার বাংলার কোন খেলোয়াড়ের কাছে যাও, অনেক কথা জানতে পারবে।

প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক বাঘা সোম ওপার বাংলার মানুষ। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে, ময়মনসিংহ শহরে।

আপনি কি রাজনীতি করেছেন?

বাঘা সোমের উত্তর : রাজনীতি করা সম্পর্কে তোমারা কী বোঝ, তা জানি না। অতীত দিনের যে সব ঘটনার সংগে যুক্ত ছিলাম, তেমন কয়েকটি ঘটনার কথা শোন, তার মধ্যে তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়ত খুঁজে পাবে।

বাবা পুলিশের বড় অফিসার ছিলেন। বড়দাও পুলিশে কাজ করতেন। মামাত বড়দাদার ভাই ছিলেন বিপ্লবী দলের নেতা, তিনি বহু বছর জেল খেটেছেন, আন্দামান কারাগারে ছিলেন। বাঘাদার বাল্য জীবন ও যৌবন কেটেছে ঢাকায়। তার পর আসেন কলকাতায়, এখন এই শহরেই। তিনি প্রথমে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে আসেন রেলওয়েতে।

তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ করতে করতে যা বলে গেলেন তা হল : ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক রাইটার্স বিলডিংস-এর অলিন্দ যুদ্ধের তরুণ নায়ক বিনয়, বাদল ও দীনেশ-এর শেষোক্ত দুজনের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং যোগাযোগ ছিল। এঁরা রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেও ভাল হকি খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনেশ ছিলেন ১৯১১ সালের আই এফ এ শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের অন্যতম খেলোয়াড় কানু রায়ের নিকট আত্মীয়। এদের মৃত্যু সংবাদ শুনে সেদিন মানুষ-বাঘের চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে ছিল। সেদিন থেকেই তিনি মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছিলেন। তার পর–

ঢাকার বাড়িতে একদিন রাতে দেখেন পুলিশ তাঁদের বাড়ির চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। সবাই বিস্মিত, এ বাড়িতে পুলিশ? ব্যাপার কী? ভীত সন্ত্রস্ত ভাইপো (বড়দার ছেলে) ঘরে এসে জানাল, কাকু এখন কী হবে! সে ছোট্ট একটি বাকস কাকুর হাতে তুলে বলল বন্ধুরা রাখতে দিয়েছে। বাকসে আছে একটি রিভলবার। তিনি বাকসটি বুদ্ধি করে বাথরুমের জানালা দিয়ে রেলিং বিহীন ছাদের এক কোণে লুকিয়ে রাখলেন। রাত ভোর হতে পুলিশ বাড়ি তল্লাশী করতে এগিয়ে এল। পুলিশবাহিনী বাবার ধমক খেয়ে দরজায় বাইরে থমকে দাঁড়াল। এক অফিসার ভিতরে এসে প্রায় কিছু না দেখেই বললেন, চল কিছু পাওয়া গেল না।

একজন পুলিশ বলল, স্যার, রাতে ছাদের ঐ কোণে একজনকে কিছু রাখতে দেখেছি।

পুলিশ অফিসার জবাব দিলেন, [illegible] একটা ইট, তাই না [illegible]। চল –

পুলিশ চলে যাওয়ার পরই তিনি বাথরুম থেকে বাকসটি তাঁর দিদির বাড়িতে পৌঁছে দেন। দিদি ছিলেন প্রয়াত প্রফুল্ল ঘোষ (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) পরিচালিত অভয় আশ্রমের কর্মী, অহিংসবাদী। কাপড়ের মধ্যে বাকস নিয়ে তিনি বাড়ির ভিতর চলে যান। বিপ্লবীদের রিভলভার পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি।

প্রখ্যাত খেলোয়াড় কানু রায়ের ভাই ধনি রায় ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু, তিনিও খেলতেন। একদিন ধনি রায় এসে জানালেন, বাঘা তোমায় একটা বিশেষ কাজ করতে হবে। গুলিতে আহত এক যুবকের প্রাণ বাঁচাতে হবে। রাত শেষ হবার আগে এই যুবককে তোমায় ট্রেনে চাপরা স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে।

বাঘা সোম রাতের অন্ধকারে তাঁর আবদালির সাহায্যে আহত তরুণকে ট্রেনের একটি কামরায় তুলে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেন। বাইরে প্রবল বৃষ্টি। গাড়ি চাপরা স্টেশনে পৌঁছলে তিনি দেখেন আহত তরুণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে কেউ নেই। তিনি আহত যুবককে সেখানে তাঁর আর এক দিদির বাড়ি পৌঁছে দেন। দিদিকে সব কথা বলে আসেন।

তিনি বললেন, আমি একা নই, সেকালে বহু খেলোয়াড় নানা কাজে নানাভাবে জাতীয় আন্দোলনকে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করেছেন। তাঁরাও নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামী মনে গর্ব অনুভব করতেন। অনেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে খেলার মাঠ ছেড়ে জেলে দিন কাটিয়েছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন এরিয়ান্স ক্লাবের বীরেন ঘোষ। অনেকের নাম এখন আর মনে পড়ছে না।

বাঘা সোমের মুখেও একই কথা, সেকাল ও একালের রাজনীতি ও খেলার জগৎ অনেক বদলে গেছে। আজ আর রাজনীতিতে কোনো আদর্শ নেই, যেমনটি ছিল যৌবনে। □

সাক্ষাৎকার : তৃপ্তি গুহ

‘গাঁও মে কংগ্রেস’ কোথায়?

শ্যামল মুখারজি

কংগ্রেস কোথায়? একদিন বলিষ্ঠ কন্ঠের জবাব মিলতো, ‘গাঁও মে কংগ্রেস’। লক্ষ কন্ঠে ধ্বনিত হত ‘গাঁও মে কংগ্রেস’। সেদিন আর নেই। সেই কংগ্রেসও ভেঙে খান খান। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শক্তি যাচাই হয়েছে গাঁয়ের মাটিতে। শক্ত ঘাঁটি, গ্রামের মাটি।

এই পশ্চিমবংগেই কংগ্রেস-বিরোধীরা যেদিন গ্রামের মাটিতে ঠাঁই করতে পেরেছেন সেদিন কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে।

কংগ্রেস গ্রাম থেকে মুছে যায়নি। কিন্তু আজ বড় কঠিন ঠাঁই। ‘গাঁও মে কংগ্রেস’কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে। সেদিন যাঁরা গ্রামে কংগ্রেসকে গৃহস্থের আপনজন করে তুলেছিলেন আজ তাদের বেশির ভাগই বামপন্থী দলে। কোন ইজম নয়, অতীত অভিজ্ঞতা বলে দিয়েছে গ্রামের মানুষই মূল শক্তি। পঞ্চায়েতী সাফল্য সি পি আই (এম) কে শক্তি যোগাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর যখনই নির্বাচন হয়েছে দেখা গেছে গ্রামের ভোটাররা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন কংগ্রেসকে। আর সব ভেসে গেছে। রাজত্ব চালিয়েছে কংগ্রেস। তারপর? দেখা গেল পশ্চিমবংগের যেসব গ্রাম ছিল কংগ্রেসের ঘাঁটি তাদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস রাজনীতির সামনে নেমে এল বিপর্যয়। গ্রামের বেশির ভাগ ভোট চলে গেল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ভরাডুবি হল। গ্রামাঞ্চলের মাটি থেকে কংগ্রেস প্রায় উৎখাত। ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৮৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবংগের কয়েকটি জেলায় কংগ্রেসের অবস্থা সামান্য একটু ফিরলেও খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। বরং বর্ধমান জেলার মত কৃষি এবং শিল্পসমৃদ্ধ জেলাতে '৮২ র বিধানসভা নির্বাচনে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। স্বাধীনতার পর থেকে এতগুলি নির্বাচনে যে ঘটনা কোনদিন ঘটেনি। ঘটবে বলে কেউ আশংকাও করেননি। জেলায় ২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল কংগ্রেস। সব কটি আসনই ছিনিয়ে নিল সি পি আই (এম) এবং তার সংগী ফরোয়ারড ব্লক দল।

বাঁকুড়া জেলায় ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছে মাত্র একটি আসনে। কৃষি-শিল্পসমৃদ্ধ হুগলি জেলায় ২০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ৪টি। বাকি ক্ষমতাসীন বামফ্রনটের দখলে।

কিন্তু কেন এমন হল? এর জন্যে কি ১৯৭২ সালের তরুণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দায়ী? নাকি স্বাধীনতার যোদ্ধা তৎকালীন বেশ কিছু প্রধান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আচার-আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এই ভবিষ্যতের ভয়াবহ ইশারা। গ্রামাঞ্চলের মাটিতে কংগ্রেস কি আর কোনদিনই পা রাখার মত জায়গা পাবে না? নাকি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কংগ্রেস দল চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে গ্রামগঞ্জের বুক থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার জন্য প্রায় কুড়িদিন পশ্চিমবংগের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জেলা হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়ায় গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছি। কথা বলেছি, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর সংগে। একান্তে কথা বলে যে ধারণা নিয়ে ফিরেছি তাতে স্পষ্টভাষায় লিখে দিতে পারি কংগ্রেসের এই বর্তমান অবস্থার জন্যে বর্তমান তরুণ নেতৃত্ব যেমন দায়ী, সেই আমলের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কম দায়ী নন।

সে কথাই শুনছিলাম ৯০ বছরের বৃদ্ধ বিজয় ভট্টাচার্যের মুখ থেকে। এই সেই বিজয় ভট্টাচার্য একসময় সমগ্র হুগলি জেলায় দোর্দন্ড বৃটিশ পুলিশ যার ভয়ে থরথর করে কাঁপত। এখন এই শেষ বয়সে বর্ধমানে কলানবগ্রামে গড়ে তুলেছেন এক বিশাল শিক্ষানিকেতন। ৯০ বছর বয়সেও এখনও হাঁটা চলা করেন। তবে চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পত্র পত্রিকা পড়েন খুঁটিয়ে। এই বয়োবৃদ্ধ মানুষের সংগে একান্তে কথা বলে দেখেছি এঁদের প্রত্যেকেরই স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। সাল, তারিখ সব মুখস্থ। একটিও এদিক ওদিক হবে না।

বিজয় ভট্টাচার্য কংগ্রেস করতে এসেছিলেন ১৯২১ সালে। হুগলি জেলার ভান্ডারহাটিতে প্রথম কাজ শুরু করেন। বিজয়বাবু বলছিলেন, কংগ্রেসের এই অবস্থার জন্যে তরুণ নেতৃবৃন্দকে কেন দায়ী করব? আমরা প্রবীণরা কি কম দায়ী? সে ইতিহাস তো জান। সুভাষ বসুর মত দেশপ্রেমিককে কংগ্রেস থেকে বলতে গেলে তাড়িয়ে দেওয়া হল। শুধু কি তাই? এই যে দেখছ আজকের ভূমি সম্বাবহার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, বামফ্রনট কমিটির চেয়ারম্যান সি পি আই (এম) নেতা সরোজ মুখারজি – এঁরা সবাই কংগ্রেস করতে এসেছিলেন। কে তাড়িয়েছে ওঁদের? ১৯২১ সালে এই হুগলি জেলায় কংগ্রেসের কাজ করতে এল প্রফুল্ল, (প্রফুল্ল সেন)। ১৯২৬ সালে অতুল্য, (অতুল্য ঘোষ)। ঠিক সেই সময় এই হুগলিতেই আমার কাছে এসেছিল বিনয়, সরোজ। মতে মিলল না। ১৯৩১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখারজির মত কর্মী চলে গেল কমিউনিসট পারটিতে। কই আমরা তো ওদের মত ভাল কর্মীকে কংগ্রেসে ধরে রাখতে পারলাম না। পারবো কি করে? নোংরামি, দলাদলি তখনও যে ছিল। ১৯৩১ সালে বর্ধমান বিভাগীয় সোস্যালিসট কনফারেনস করলাম আমি। সেখানেই প্রচন্ড ঝগড়াঝাটি হল। দল ছাড়লো বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখারজি।

ঠিক একই কথা শুনলাম প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী বর্ধমানের আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁকে শ্রদ্ধা করেন ৭৮ বছর বয়স্ক সেই ফকির চন্দ্র রায়ের মুখে। ফকির চন্দ্র রায় বলছিলেন ১৯২৬ সালে ‘অল বেংগল স্টুডেনটস-অ্যাসোসিয়েশন’ গড়ে উঠল। যুগান্তর, অনুশীলন দলের তরুণ বিপ্লবীরা এসে ভিড় করলেন এই দলে। তার এক বছর আগে ১৯২৫ সালে আমি বর্ধমানে একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল গড়ে তুলেছি। আমাদের একমাত্র স্বপ্ন ‘দেশকে স্বাধীন করব’। ১৯২৬ সালে এই সারা বাংলা ছাত্র সংগঠনের সদস্য হলাম আমি। পুরোদমে নেমে পড়লাম স্বাধীনতা-সংগ্রামে। কিন্তু কাজ করব কী? তখনও সেই চরমপন্থী নরমপন্থী সংঘর্ষ। আমরা সব চরমপন্থী। ভিখ মেঙে স্বাধীনতা আসবে না এটাই আমাদের বিশ্বাস। দুঃখের কথা কি বলবো যেহেতু আমরা নরমপন্থীদের দলে নই তাই কংগ্রেসের তৎকালীন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা যাঁদের বাড়ি থেকে আমাদের খাবার আসতো তাঁরা সব আমাদের ভাত বন্ধ করে দিলেন। না খেয়ে কাটিয়েছি দিনের পর দিন। পরবর্তীকালে এঁরা অনেকেই নামকরা নেতা হয়েছেন। এম এল এ, মন্ত্রী হয়েছেন। নাম? আর জানতে চেয়ো না ভাই। বর্ধমানের মানুষের মনের শ্রদ্ধার আসন থেকে ওদের আর নামিয়ে দিয়ে কি লাভ হবে বল? কি শঠতা যে দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। জানো সে সময় এই বর্ধমানেই অখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ছিলেন রাধাকান্ত দীক্ষিত। সব শুনে তিনি বললেন সে কি, ওরাও তো দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। কেউ ভাত না দিক আমি আমার বাড়ি থেকে খাবার পাঠাব।

আজ আনন্দে শুরু করলাম। খেটে বাঁচলাম। তারপর জেলে গেলাম। বর্ধমান, রাজশাহী, হিজলি, দিনাজপুর, বগুড়া, বহরমপুর, প্রেসিডেন্সি, দেউলি জেলে কাটিয়েছি ১২ বছর।

১৯৪৯ সালে মেমারিতে হল কংগ্রেস অধিবেশন। সেখানে কংগ্রেসের মধ্যেই ঘটি-বাঙাল লড়াই লেগে গেল। তৎকালীন কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির নাম করা কয়েকজন নেতা হুংকার ছাড়লেন কংগ্রেস দল থেকে বাঙাল খেদাও। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা এপারে এসেছেন যত ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা, একাগ্রতাই তাদের থাক না কেন কংগ্রেসে কোন পদে তাদের রাখা চলবে না। দ্যাখো, দাখো কি নোংরামি। আমি যদিও পূর্ববঙ্গের লোক নই তাও প্রতিবাদ করলাম। একি কথা? আসলে কি জান এরা সবাই ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিরোধী ছিলেন। তাই এই বাঙাল খেদাও অভিযান। যেহেতু আমি এই বাঙাল খেদাও অভিযানের বিরোধিতা করলাম তাই তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বের 'শত্রু' বলে আমি চিহ্নিত হয়ে গেলাম। আমি একটা বিষয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ওঁকে আমি পছন্দ করি তার একটাই কারণ। কি জান, ওই কংগ্রেস নামধারী শঠ, দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান নেতাগুলিকে ইন্দিরা দল থেকে তাড়াতে পেরেছেন। আমি তাই ওঁর খুব ভক্ত। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি ইন্দিরার দলই হল আসল কংগ্রেস। আর অন্যগুলি সব নকল, বর্ধমান জেলা পরিষদের দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নারায়ণ চৌধুরী। স্বাধীনতার পর একবার এম এল এ একবার এম এল সি-ও নির্বাচিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় প্রবীণ এই নেতা দীর্ঘদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। অগাধ পান্ডিত্য, প্রচন্ড নীতিবাদী নারায়ণ চৌধুরী তাঁর আদর্শ থেকে এক চুলও কখনও নড়েননি। তিনি বলছিলেন, তরুণদের আর কি দোষ দেব ভাই। প্রবীণদের যে চরিত্র দেখতে পাচ্ছি তাতে আর কি কাউকে কিছু বলার থাকে? ১৯৪৬ সালে আমি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। আমার স্বাক্ষরিত কারড বিলি করা হল, – ঠিক করা হয়েছে গড়ে তোলা হবে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ। আমরা চারজন শচীন মিত্র, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অরুণা সেনগুপ্ত, এবং আমি গেলাম শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের কাছে। সভা হল। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের প্রথম সভাপতি হলেন অতুল গুপ্ত। এই সংঘের নাটক-সংগীত ইউনিট 'অভ্যুদয়' সারা ভারতে আনল আলোড়ন। কমিউনিসটদের 'নবান্নের' বিরোধিতা করার জনোই কংগ্রেস কাজে লাগালো 'অভ্যুদয়কে'। কিন্তু এটা গড়তেও কি কম বেগ পেতে হয়েছে?' কংগ্রেসের প্রবীণ কিছু নেতাই এর বিরোধিতা করলেন। সুরু করলেন অপপ্রচার। সেই সব কংগ্রেসীদের কথা যা জেনেছি তাতে প্রচন্ড ঘৃণা এসেছে। কিছু পাবার জনো তো কংগ্রেসে আসিনি। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক, জেলা পরিষদের সভাপতি – আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলাম দীর্ঘদিন। কোন প্রলোভনের কাছে আদর্শ, নীতিকে তো বিসর্জন দিইনি। কিন্তু এ কি রূপ দেখছি প্রবীণ কিছু নেতার। লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে? আর কথা বলতে পারছিলেন না নারায়ণ চৌধুরী। ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছিল। গলার স্বর বুজে এল। এককালের দুর্দান্ত পুরুষ সিংহ ভেঙে পড়লেন। একটু ধাতস্থ হয়ে আবার কথা সুরু করলেন। জান ১৯৫৭, ৬২, ৬৭, ৭১, ৭৭ বারবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। কখনও লোকসভায় কখনও বা বিধানসভায়। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন কোথাও বিনয় চৌধুরী, কোথাও বা বর্তমান রাজ্য সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লাহ। একবার প্রয়াত এন সি চ্যাটারজির বিরুদ্ধেও লড়েছি। একবার ছাড়া প্রত্যেকবারই অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরেছি। হেরেছি কেন জান? আমার সমসাময়িক কংগ্রেস নেতারাই তলে তলে স্যাবোটাজ করে আমায় হারিয়েছেন। কমিউনিসটরা জিতুক ক্ষতি নেই কংগ্রেস প্রার্থী নারায়ণ চৌধুরী যাতে জিততে না পারে তার জন্যে কংগ্রেসীরাই চেষ্টা চালিয়েছে তলে তলে। আরও শুনবে? মহাত্মা গান্ধী এলেন বর্ধমানে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। আইন জগতের প্রবাদপুরুষ ভামিনী রঞ্জন সেন হলেন সেই সমিতির সভাপতি। একদিন সেন বাড়ি দুর্দিনে কংগ্রেসের জন্যে ত্যাগ করেছে। আর আজ সেই সেন বাড়ির ছেলে মেয়েরা কংগ্রেসের ডাকে আর এগিয়ে আসেন না। এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে? আসবেন কেন? ওঁরা তো কিছু পাবার জনো কংগ্রেস করেননি। ভামিনী রঞ্জন সেনের নাতি দেবরঞ্জন সেন ফরোয়ারড ব্লকের একজন নেতা, এম এল এ। এই সেন বাড়িতেই এসেছিলেন কংগ্রেস নেতা সুভাষ বসু। বৃটিশ পুলিশের লাল চোখকে তোয়াক্কা না করে ভামিনী রঞ্জন সেন বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই বাড়ির ছেলেদের কি আবার ডেকে আনা যায় না? কিন্তু আনবে কে? কে সেই নেতা যাঁর ডাকে ওঁরা আসবেন? তবে নির্বাচনে জয় পরাজয় মানেই যে একটি দলের উত্থান, পতন অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া একথা প্রবীণ, নবীন কোন নেতাই মানতে রাজি নন। নির্বাচনে আদর্শ, নীতির কথা যেমন থাকে তাছাড়া নির্বাচনী কৌশল বলেও একটা জিনিস আছে। এই কৌশল প্রয়োগে যে দল যত অভিজ্ঞ তাদের পক্ষে হয় ততই সহজসাধ্য।

তারপরেও ক্ষমতার অপব্যবহার বর্তমান নির্বাচনের একটি বিশেষ দিক। ক্ষমতার অপব্যবহার, রিগিং বা নোংরামি যে আজকেই শুধু করা হচ্ছে তা নয় এ জিনিস চলেছে দীর্ঘদিন। বর্ধমান বিজয় ভট্টাচার্য বলছিলেন, শোন তাহলে। -- ১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ঠিক করলেন প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কংগ্রেস নির্বাচনে লড়বে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঠিক করলেন বর্ধমানে মহারাজার বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড় করান হবে। আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী হলেন কুমার উদয়চাঁদ মহতাব। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল মহারাজা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন কংগ্রেস প্রার্থীর বিপক্ষে হাওয়া তোলা দুঃসাধ্য। তারপর মহারাজা নিজে নামলেন প্রচারে। তার বিশাল ক্ষমতা, অর্থ, যশ প্রতিপত্তির অপব্যবহার সুরু করলেন। যে করে হোক কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় ভট্টাচার্যকে হারাতেই হবে। আর আমাদের তখন না আছে অর্থবল, না আছে অন্যান্য ক্ষমতা। নির্বাচনের দিনে শুরু করা হল ব্যাপক রিগিং। জান, গোছা গোছা ব্যালট পেপার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছাপ মেরে আবার ফেলে দেওয়া হয়েছে ভোট বাকসে। আমরা প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদ টেকেনি। গণনার সময় দেখা গেল যে বুথে যত ভোটার নেই তার থেকেও ভোট পড়েছে অনেক বেশি। এই রকম পরিস্থিতিতেও কুমারবাহাদুর পেলেন ৩২ হাজার ভোট আমি পেলাম ২২ হাজার। হারলাম মাত্র ১০ হাজার ভোটে। এটা ১৯৩৭ সালের ঘটনা। তখন যদি এত রিগিং, ক্ষমতার অপ-ব্যবহার হতে পারে তাহলে এখনই বা হবে না কেন? বামফ্রনট রাজত্ব চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁদের। অতএব নির্বাচনে তাঁরাই জিতবেন এতে আশ্চর্যের আর কি আছে। এখনও গ্রামে গঞ্জে কংগ্রেস সমর্থক, অনুরাগী অনেক। তাঁদের কাজে লাগানর মত আদর্শবাদী, ত্যাগী নেতৃত্বের অভাব। ফকির রায়, নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে এক সুরে প্রবীণ, নবীন সবাই বলেছেন, এখনও কংগ্রেসের সামনে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কংগ্রেসের সবাই চাইছেন মন্ত্রী, এম এল এ হতে। দলের কাজ করার লোকের অভাব। সি পি এম দলের একজন মন্ত্রী বা এম এল এ থাকলেন কি থাকলেন না সেটা বড় কথা নয় আসল কথা হল সংগঠন। কংগ্রেসে সংগঠন করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না এটাই দুর্ভাগ্যের। খেয়োখেয়ি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নোংরামি কমিয়ে গ্রামগঞ্জে কংগ্রেস কর্মীরা যদি এখনই নিষ্ঠা সহকারে কাজে নামেন তাহলে এখনও চিত্রটা বদলাতে পারে। বাঁকুড়ার একজন প্রবীণ নেতা বলছিলেন, একযোগে এক সুরে কংগ্রেস কর্মীরা কথা বলতে পারছেন না এর একটাই কারণ। বহুদিনের জমে থাকা পাপ। এ আমার পাপ এ তোমার পাপ এই পাপমোচন না হলে কংগ্রেসের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এ বিষয়ে প্রবীণ, নবীন সবাই একমত। কাজে নামতে হবে এতো সবাই জানেন। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ করে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে এটাই হল এখন সমস্যা। □

আপনি যখন সব থেকে চড়া আঁচে রান্না করেন, তখন আপনার জ্বালানীর ৩৫% অপচয় হয়।

"এ তো জ্বালানীর দারুণ অপচয়—এক তৃতীয়াংশেরও বেশী ?"

হাঁ, তাইতো। সব মিলিয়ে অপচয়ের পরিমাণ অনেকখানিই দাঁড়ায়। অথচ আপনি একটু চেষ্টা করলেই এটা এড়াতে পারেন।

আঁচ কমিয়ে দিন।

বাসনে কোনো জিনিস যখন ফুটতে আরম্ভ করবে, তখন গ্যাস স্টোভের চাবিটি ঘুরিয়ে "সিমারে" করে দিন। কেরোসিন স্টোভের বেলায় পলতে নামিয়ে আঁচ কম করে দিন।

এতে করে, রান্নার জিনিস ফুটতে থাকবে, অথচ জ্বালানী বেঁচে যাবে।

কম আঁচে রান্নার জিনিস সেদ্ধ হতে থাকবে। আঁচ বাড়িয়ে দিলে বরং জল শুকিয়ে যাবে অথচ তাপও বাড়বে না।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তরিতরকারী ফুটতে সুরু করলেই যদি আঁচ কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে রান্নার সময়ও বেশী লাগে না। উপরন্তু আপনার ৩৫ শতাংশ ইন্ধনের সাশ্রয় হয়।

ছোট বার্ণারে সব সময়েই জ্বালানী-খরচ কম।

বড় বার্ণারের চেয়ে ছোট বার্ণারে ৬% থেকে ১০% গ্যাস কম খরচ হয়। এতে সময় একটু বেশী লাগবে ঠিকই। কিন্তু সব সময়েই তো আর আপনি তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকছেন না।

হাতে যখন সময় থাকবে তখন ছোট বার্ণারটাই ব্যবহার করবেন। কিম্বা রান্নার বস্তুটি ফুটে গেলেই কড়াই বড় বার্ণার থেকে সরিয়ে ছোটটাতে বসিয়ে দেবেন। এভাবে সময় ও জ্বালানী দুটোরই সাশ্রয় করা যেতে পারে।

হিসেব করে কাজ করলে জ্বালানী অনেকদিন চলতে পারে।

বড় বার্ণারটি যদি অনাবশ্যক জ্বলতে থাকে, তবে গ্যাস

কংগ্রেসে ছিলাম,
এখন বামপন্থী

বর্ধমান কংগ্রেসের ছেলে বলতে লোকে চারজনকে চিনত — সরোজ মুখারজি, বিনয় চৌধুরী, সমরেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী আর অমরেন্দ্রর রায়। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র। দেশের কাজে, মানুষের কাজে লাগতে হবে সেই চিন্তা তখন ওদের পেয়ে বসেছে। ১৯২৫ সাল। ইংরেজির শিক্ষক প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ক্লাসে এসে বললেন, এক বছরের মধ্যে বিশ্বের দুজন মহাপুরুষ মারা গেলেন। একজন সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিন, আর একজন ভারতের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইংরেজিতে রচনা লিখতে হবে। শিক্ষকমশাই প্যাসেজটা বলে দিলেন। সেই প্রথম ওরা লেনিনের নাম শুনলেন। তখন ক্লাস এইট। সরোজ মুখার্জি পরের বছরে ফার্স্ট হয়েছিলেন। বিনয় চৌধুরীও ভাল ছাত্র। রমেন্দ্র চৌধুরী ওঁর মেজদা, সকলেরই মেজদা। অমরেন্দ্র রায় পরে আসানসোলের বিধায়ক নির্বাচিত হন।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা বিজয় ভট্টাচার্য, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন প্রমুখ বলেন, সরোজ-বিনয় চৌধুরীর ঢুকলো দেশে সবাই বলতেন, বিনয় চৌধুরী বাড়ির লোকের দুর্দৃষ্টি পাচ্ছে। তোরা নামের সঙ্গে এই অদ্ভুত মিল।

আজও অটুট মিল দুই বন্ধুতে। সি পি আই (এম) এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক সরোজ মুখারজি আর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, প্রবীণ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী আজন্ম বন্ধু। প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছেন, একই রাজনীতি করেছেন, করছেনও। একটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়নি।

স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে সরোজবাবু বললেন, মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পড়ার সময় আমার আর বিনয়ের সাহিত্য ও সংবাদপত্র সম্পর্কে একটা আকর্ষণ ছিল। বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকরা আমাকে বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের জন্মবার্ষিকীতে রচনা লিখে স্মরণ সভায় পাঠ

[illegible]
উনিশ [illegible]
দু'দশজন। [illegible]
হয়েছিল কংগ্রেসের। [illegible]
আজকের বামপন্থী [illegible]
নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত [illegible]
কংগ্রেসের অনেক [illegible]
এর অনেক নেতা — [illegible]
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা [illegible]
রায়, কৃষক নেতা [illegible]
এবং আরও [illegible]
পার বছর জেলা [illegible]
প্রবীণ সমস্ত নেতা [illegible]
হিসাবে। বামপন্থী [illegible]
সম্পাদকের সাক্ষাৎ [illegible]

বর্ধমান কংগ্রেস বলতে চিনত চারটে ছেলেকে, তার মধ্যে একজন সরোজ মুখারজি

করতে বলতেন। বর্ধমানে যাদবেন্দ্র পাঁজা, ফকির রায় তখন কংগ্রেস নেতা। ফকিরদা ছিলেন যুগান্তর দলের লোক। তাঁর ব্রাহ্মমন্দিরে অস্ত্রশস্ত্র লুকোন ছিল। বিজয় ভট্টাচার্য শিক্ষকতা করতেন। এখন বয়স নব্বই-এর মত। বিজয়দা বর্ধমান থেকে হুগলিতে যেতেন, আশু দাসের উদ্যোগে শক্তি প্রেস চালাতেন। আমার বাবা শিক্ষকতা করতেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ভালবাসতেন। মুচি-মেথর সবাই মানুষ – স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী আমাকে প্রভাবিত করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে। বিনয়দের বাড়িতে ছিল আমাদের আড্ডা। বাইরের ঘরে বসে নাটক-নভেল পড়তাম। বিনয় বেশি মিশত ফকিরদার সংগে। গোপনে ও ফকিরদার কাছ থেকে পথের দাবি, ইতালির মাৎসিনি, গ্যারিবলডি প্রমুখ মনীষীদের জীবনী-বই আনত।

স্কুলের ছুটির পর কংগ্রেস অফিসেও হাজিরা দিতাম, খাদির দোকানে যেতাম। তখন সবই ভাল লাগত। খদ্দর পরাও ভাল, কংগ্রেসও ভাল। গুলি করে সাহেব মারাও ভাল। আবার গরিব থাকবে না - সবারই অবস্থা ভাল হবে – এমন একটা নতুন সমাজ গড়তে হবে। জীবন দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে।

তখন স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশে ফিরে কমিউনিসট দেশের কথা শোনাচ্ছেন যুব-ছাত্রদের। ফকিরদা আর প্রমথ ব্যানারজির কাছে তাঁর নাম শুনে আমি আর মেজদা চলে গেলাম কলকাতায়। আমার মামার বাড়িও ছিল কলকাতায়। প্রতি সপ্তাহে, তারপর ঘন ঘন ভূপেনদার কাছে যেতাম।

আমরা চার বন্ধু ফকিরদার সংগে আলোচনা করে ছাত্র সমিতি গড়ে তুললাম। একদিকে আমাদের টান ছেন যাদব পাঁজামশাই, আর এক দিকে ফকিরদা।

আইন অমান্য আন্দোলনে আমার প্রথম কাজ ছিল কলকাতা থেকে বর্ধমান জেলার জন্য লবণ কিনে নিয়ে আসা। কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত 'আইন অমান্য পরিষদের' দফতর থেকে নিষিদ্ধ লবণ নিয়ে যেতে হত। সেই লবণ বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেস ক্যাম্পে ছোট ছোট পুরিয়া হল। দু সের লবণে তিনশো পুরিয়া। প্রতিটি পুরিয়ার দাম এক আনা।

যেদিন গান্ধীজী ডানডি অভিযান শুরু করলেন সেদিনই আইন অমান্য করা হল। তখন আইন অমান্যের জন্য কংগ্রেসের সব জেলায় একজন করে ডিরেকটর হয়েছিলেন। বর্ধমানে ডিরেকটর হয়েছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। জেলা শাসককে পাঁজামশাই আইন অমান্যের কর্মসূচি জানিয়ে দিলেন – 'সরোজ মুখারজি ও বিনয় চৌধুরী নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করবে সকাল নটা থেকে। আপনার যা করণীয় করবেন ইত্যাদি।'

সরোজ মুখারজি/আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল – লুকিয়ে কিছু করবে না। বৃটিশ সরকারকে বলে সব কিছু করতে হবে। এটাই সত্যাগ্রহী ও অহিংস কংগ্রেস কর্মীদের উপর জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস-ট্রেট জন স্টুয়ারট সকালে সেদিন বাংলোয় বসে আছেন। আমাকে বলা হল – একটা সাইকেলে করে এই নোটিশ ম্যাজিসট্রেটের হাতে দিয়ে আসতে হবে। নির্দেশ মত আমি সাইকেলে করে ওভারব্রিজ পার হয়ে ম্যাজিসট্রেটের বাংলোয় গেলাম।

ম্যাজিসট্রেট বেরিয়ে এলেন – কী চাই?

– এই আইন অমান্যের নোটিশ।

– আচ্ছা ঠিক আছে। চলে যান, আইন অমান্য করুন।

মনে হল জেলা ম্যাজিসট্রেট বয়সে যুবক, ঠান্ডা মাথার লোক। আমাদের নেতারা বললেন, বোধহয় তোমাকে গ্রেফতার করে রাখবে।

এরপর কংগ্রেস থেকে লবণের প্যাকেট নিয়ে বিনয় আর আমি বিজয়চাঁদ রোডের দুধারে দোকান আর বাড়িতে নিষিদ্ধ লবণের প্যাকেট বিক্রি করতে শুরু করলাম নির্ধারিত সময় থেকে। অনেকে ভয়ে কিনতে চাইলেন না, অধিকাংশ লোক কিন্তু কিনলেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করল না।

তারপর রানীগঞ্জে গেলাম। আমরা 'তরুণ' নাম দিয়ে কাগজ বের করতাম। যেদিন চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুন্ঠন হল, সেদিন জোর গলায় কাগজ বিক্রয় করেছি। স্টেশনে সব কাগজ বিক্রি হয়ে গেল। তারপর ১৪৪ ধারা অমান্য করে আমি আর বনোয়ারিলাল ভালুটিয়া খুব বক্তৃতা দিলাম। পুলিশ গ্রেফতার করতে এল। আমরা পালিয়ে গেলাম। যাদব পাঁজা বার বার খবর পাঠাতে লাগলেন, পুলিশের কাছে ধরা দেবার জন্য। ওদিকে ভূপেনদা আর বিপিনদা (বিপিন গাঙ্গুলি) বললেন, ধরা দিও না।

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লাম। ১৯৩০ সালে প্রথম জেল হল। প্রথম নিয়ে গেল আসানসোলে, তারপর দমদম জেলে। ছাড়া পেলাম দশ মাস পর। করাচি কংগ্রেসে গিয়ে-

ছিলাম। ফিরে এসে আমরা বর্ধমান জেলার সম্মেলনে গান্ধীজীর প্রস্তাবকে হারিয়ে দিলাম। পাঁজা-মশাই, বিজয়দা বললেন, এ কী করলে তোমরা! গান্ধীজীর প্রস্তাব নাকচ করে দিলে?

কংগ্রেসে থাকতে ভূপেনদার সংগে জেলায় জেলায় ঘুরেছি। বর্ধমানে ছাত্র সম্মেলন করেছি। ভূপেনদা এসেছেন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এসেছেন। শ্রীরামপুরে জিতেন লাহিড়ীর বাড়িতে ছিল কংগ্রেস অফিস, আমাদের আড্ডা। অতুল্যদা থাকতেন কংগ্রেস অফিসে। সেখানে বঙ্কিম মুখারজি, পাঁচু-গোপাল ভাদুড়ী, আবদুল মোমিন আসতেন।

কংগ্রেসে থাকতে আরও দুবার জেল খেটেছি। একবার এক বছর, আর একবার দেড় বছর। কলকাতারও বহু জায়গায় মিটিং করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় বৃটিশ সরকারের কড়া সমালোচনা করে বক্তৃতা দেওয়ায় জহওরলাল নেহরুকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। আলিপুর জেলে তখন আমি ও আবদুল হালিম ছিলাম। হালিম সাহেবকে নেহরু বললেন, 'তোমরা একটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছ।'

কমিউনিসট পারটিতে এসেছিলাম ১৯৩১ সালে। ভূপেনদা তখন হালিম সাহেবের ঠিকানা দিয়েছিলেন। তারপর এ আই সি সিতে কমিউনিসটদের সংগে যুদ্ধনীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। কমিউনিসটরা ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এল। আমার জীবনেও কংগ্রেসের সংগে পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটল। □

প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে কংগ্রেস ছাড়লেন কেন?

আমরা কংগ্রেসে থেকেই আর এস পি গঠন করেছিলাম ১৯৪০ সালের ১৯ মারচ। সুভাষবাবু প্ল্যাটফরম হিসাবে গড়ে তুললেন ফরোয়ারড ব্লক। অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা এবং ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী আপসে স্বাধীনতার প্রস্তাবকে কংগ্রেস মেনে নিল। তারই প্রতিবাদে আমরা ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস থেকে চিরদিনের মত বেরিয়ে এলাম।' □

কংগ্রেসে ছিলাম, এখন বামপন্থী

আরো বড় আদর্শের সন্ধান পেয়ে কংগ্রেস ছেড়েছি ঃ বিশ্বনাথ মুখারজি

আমি ছেলেবেলা থেকেই বিপ্লবী ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং বৃটিশ শাসন-বিরোধী বই, পত্র-পত্রিকা পড়তাম। আমার দু-একজন সহপাঠীর সংগে ১৯২৯ সালে তমলুকে একটি ছাত্র সমিতি এবং একটি পাঠাগার স্থাপন করেছিলাম। সেখানে জাতীয়তাবাদী বইপত্র থাকত এবং আমরা আলোচনা করতাম। এই ছাত্র সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে আমি নিখিল বংগ ছাত্র সমিতির সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম।

আমাদের পরিবার ছিল স্বদেশী পরিবার, জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক। মধ্যবিত্ত, সচ্ছল, একান্নবর্তী পরিবার। ভাইবোনেদের মধ্যে আমি সকলের ছোট। আমাদের পুরনো বাড়ি ছিল হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়। আমরা জন্মেছি, বড় হয়েছি মেদিনীপুরের তমলুকে।

অত্যাচারী পুলিশের বিরুদ্ধে চৌরিচৌরায় ক্ষিপ্ত কৃষকদের আক্রমণের পর মহাত্মা গান্ধী যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁর কর্মীদের গ্রামে গিয়ে গঠনমূলক কাজ করার ডাক দেন তখন অজয় মুখারজি, সতীশ সামন্ত ও তাঁদের কয়েকজন সহকর্মী কলেজে ফিরে না গিয়ে তমলুকের কাছে গ্রামে পড়ে থেকে গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। ১৯৩০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আবার আন্দোলনের জোয়ার এল তখন বংগদেশে এই আন্দোলন প্রবল আকার নিয়েছিল মেদিনীপুর জেলায়। কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় হয়েছিল প্রবলতম। তমলুক মহকুমায় এই ব্যাপক গণ-আন্দোলনে শুধু শহরের ছাত্র-যুব এবং মধ্যবিত্ত নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষকও যোগ দিয়েছিল এবং তারাই ছিল আন্দোলনের প্রধান শক্তি। এই গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অজয় মুখারজি, সতীশ সামন্ত ও তাঁদের সহকর্মীরা।

সেই ১৯৩০ সাল, এপরিল মাস। আমি বয়সে তরুণ। পনের পেরিয়ে ষোলয় পড়েছি। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল স্রোতে।

সেই আইন অমান্য আন্দোলন অহিংস হলেও এমন গণরূপ ধারণ করেছিল যে তার টানে মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সংকীর্ণ গুপ্তচক্রের গণ্ডি সহজেই ডিঙিয়ে আমি কংগ্রেস পরিচালিত গণসংগ্রামে সামিল হয়েছিলাম। লবণ আইন অমান্যের শুরুতেই নরঘাটে বেআইনি জনতা ছত্রভংগ করার অজুহাতে জেলা শাসক প্যাডি সাহেব তার বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সাহেবের হাতের লাঠির প্রচণ্ড আঘাতের মধ্য দিয়ে আমার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দীক্ষা হল।

আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ দিকে ১৯৩০ সালের নভেম্বরে

আমরা আপস-বিরোধী, তাই কংগ্রেস ছাড়লাম ঃ মাখন পাল

আর এস পি'র প্রবীণ নেতা মাখন পাল একদিন কথায় কথায় বললেন, দলীয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি তো আমার কংগ্রেসে। অবশ্য সেই কংগ্রেস আজ আর নেই। শুধু আমি কেন, আমাদের দলের অনেকেই সেদিন কংগ্রেসের নেতৃত্বেই রাজনীতি করেছি। স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা নিয়েছিলাম অনুশীলন পারটিতে। অনুশীলন, যুগান্তর গোষ্ঠীর সবাই ছিলেন কংগ্রেসেরই মঞ্চে। কৃচ্ছ্রসাধনের দীক্ষা কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কাজ করতে করতে।

স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন: ১৯২৯ সাল। তখন কুমিল্লা কলেজে পড়ি। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় অনুশীলন পারটির সংস্পর্শে আসি। হসটেলে থাকি, ছুটিতে বাড়ি যাই। নোয়াখালির চৌমোহনী স্টেশনে নেমেছি। দেখি আমার এক সহপাঠী বন্ধু আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তখন স্টেশন থেকে নেমে বাড়ি যেতে হত হাঁটা পথে কিংবা গরুর গাড়িতে। বন্ধু নিয়ে গেল চৌমোহনী বাজারে কংগ্রেস অফিসে। তখন আলাপ হল কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ গিরীন্দ্র লাল চৌধুরীর সংগে। খুব বিনয়ী, ভদ্রলোক। ভাল ছাত্রদের তখন কংগ্রেস নেতারা দলে আনার জন্যে উৎসুক।

কংগ্রেস অফিসেই রাত কাটালাম। মেঝেতে চাটাই পেতে শোয়া। মাথায় বালিশ নেই। ডাক্তারের ওষুধের কৌটো দিয়ে অর্থ সংগ্রহের বাকসো তৈরি করলাম। কৌটোগুলো আমরা দোকানে দোকানে রেখে আসতাম। লোকে নিজে থেকে পয়সা ফেলে যেত। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের কাজ করি শুনলে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। লোকে ভাবত, কংগ্রেসের যারা কাজ করে তাদের পেটে ভাত জোটে না। কংগ্রেস কর্মী হয়েছেন ত্যাগের মধ্য দিয়ে। সত্যিই সেদিন কংগ্রেস করা মানে কৃচ্ছ্রসাধন করা। কিন্তু মানুষের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছি।

কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সহ সম্পাদক হয়েছিলাম। প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৩৮ সালের আগসট নাগাদ জেল থেকে ছাড়া পেলাম। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রতিনিধি হয়েছিলাম। সেই ত্রিপুরী কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি হন। পট্টভি সীতারামাইয়া ছিলেন গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী। তিনি পরাজিত হলেন। গান্ধীজী বললেন, সীতারামাইয়ার পরাজয়, আমার পরাজয়।

কংগ্রেস সোসালিসট পারটিতে জয়প্রকাশ নারায়ণকে আমরা সহযোগিতা করেছি, সম্মান দিয়েছি।

কংগ্রেসে ছিলাম, এখন বামপন্থী

লনডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাজভক্ত তথাকথিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক হয়। তখন তার প্রতিবাদে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক আসে। ছোট্ট তমলুক শহরে তখন ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল এবং বিরাট সংখ্যক পাঠান, পাঞ্জাবি, গাড়োয়ালি প্রভৃতি সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল। একটা সন্ত্রাসের আবহাওয়া। তা সত্ত্বেও আমরা শহরে ও নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রামের বেশ কিছু তরুণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ জড়ো হলাম। কালো পতাকা ও জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করতে পেরেছিলাম। বয়সে অনেকের চেয়ে ছোট হলেও আমাকে এই মিছিলের নেতৃত্ব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং খ্যাপা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে গ্রেফতার করল। আমাকে ও আমার কিছু সহকর্মীকে ছমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি হিসাবে জেলে পাঠান হল। এই আমার প্রথম জেল। মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল এবং দমদম অ্যাডিশনাল জেলে থেকেছি।

১৯৩১ সালের মারচে গান্ধী আরউইন চুক্তি হল। অন্যদের সংগে আমিও মুক্তি পেলাম। কারামুক্তির পর প্রতিনিধি হয়ে করাচি কংগ্রেসে গেলাম। ফিরে এসে কংগ্রেসের ডাকে যুবক কংগ্রেস কর্মীদের সভায় যখন আমরা মিলিত হলাম তখন প্রশ্ন উঠল। আমরা স্কুল কলেজে ফিরে যাব, নাকি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রামে আন্দোলনের নতুন জোয়ারের প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করব। নেতারা বললেন, যদিও মহাত্মা গান্ধী লন্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন তবে বৃটিশ সরকার ভারতের দাবি মানবে না এবং লড়াই বাধবেই। যুবক কর্মীদের মধ্যে দোমনা ছিল। কিন্তু কেন জানি না আমি স্থির করে ফেললাম লেখাপড়া বা ঘরে ফিরে না গিয়ে নতুন লড়াই এর প্রস্তুতিতে গ্রামে আত্মনিয়োগ করাই দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য। দুঃখবহুল বিপদ সংকুল দীর্ঘস্থায়ী পথেই আমরা নামলাম।

১৯৩১ সালে যখন দমদম জেলে ছিলাম তখন ম্যাটরিক পরীক্ষা হয়ে গেল, আরও অনেকের মত আমার ভাগ্যেও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হল না।

অল্প বয়সে গ্রামে গিয়ে আমরা যখন কংগ্রেসের সংগঠন গড়তে শুরু করি তখন আমাদের খুবই কষ্ট করতে হয়েছিল। মফস্বলের কংগ্রেস তখন গরিব। কংগ্রেস কর্মীদের হাতে পয়সা কড়ি কিছুই ছিল না। আমরা কৃষকদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে মুষ্টি ভিক্ষা করে কাঁড়া আকাঁড়া চাল সংগ্রহ করে আমাদের ক্যামপে নিজেরাই রান্না করে চাট্টি খেতাম। কখনও কখনও কৃষকদের বাড়িতে অন্নের ভাগ পেতাম। মিটিং করে কৃষকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতাম। তাদের সমাজ জীবনেও অংশ নিতাম। খালি পায়ে, হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের কাপড় পরে, খালি গায়ে বড় জোর খদ্দরের ছোট হাত কাটা ফতুয়া পরে শীতে, ধুলোয় কাদায়, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, দিনে রাতে গ্রামে ঘুরতাম। আমার মত শহুরে মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলের কাছে সে এক নতুন জীবন। কৃষকরা স্নেহ করতেন তাদের ঘরের ছেলের মত। তাঁদেরই গুণে তাদের সংগে একাত্ম হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পরবর্তীকালে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ মারকসবাদ লেনিনবাদ বুঝতে এবং ইতিহাসের সর্বোত্তম বিপ্লবী আন্দোলন কমিউনিসট আন্দোলনের স্রোতধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে এইটাই হয়েছিল আমার সবচেয়ে বড় পাথেয়।□

'জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস ভুলে গিয়েছিল, তাই দল ছাড়লাম' : অশোক ঘোষ

'হ্যাঁ, হাতেখড়ি ফরোয়ারড ব্লক থেকেই। কিন্তু কংগ্রেসের রাজনীতি করতেই হয়েছে। বাইরে তো পরিচয় ছিল কংগ্রেস কর্মী বলেই।'

ফরোয়ারড ব্লকের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ যা বললেন তা খুব পরিষ্কার হল না। অশোকবাবু বললেন, 'স্বদেশী যুগে কমিউনিসট পারটি, কংগ্রেস সোস্যালিসট পারটি, আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক সবই তো কংগ্রেসের ভেতরেই ছিল। বোধহয় সকলের শেষে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছে ফরোয়ারড ব্লক — ১৯৪৮ সালে।

অশোক ঘোষ / আলোকচিত্র : অলোকবরণ

বাড়ি ছিল হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। দেখতে দেখতে বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেল। তখন সবে ম্যাটরিক পাশ করেছি। মাসটারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সে কালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন বিপ্লবী। জয়চন্দ্র পাল মাসটারমশাই - এর শিষ্য। সৎ, নির্ভীক, সাদাসিধে মানুষ। সারা জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তখন যাঁরা ফরোয়ারড ব্লকে এসেছেন সবাই জয়চন্দ্র পালের হাত দিয়ে।

সময়টা ১৯৪০ সাল। সুভাষচন্দ্র বসুর সংগে কংগ্রেসে গান্ধীজীর অনুগামী নেতাদের বিরোধ চলছে। সুভাষবাবু কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েছেন। সারা দেশ জুড়ে একটা উত্তেজনা চলছে।

তখন দুটো কংগ্রেস কমিটি চলছে একটা সাসপেনডেড কংগ্রেস কমিটি আর একটা অ্যাড হক কমিটি। আমরা যাঁরা নেতাজীর অনুগামী তাঁরা ছিলাম অ্যাড হক কমিটির সভ্য।

সেই ১৯৪২ সালে চুঁচুড়ায় একটা জনসভায় হাংগামায় আমরা অনেকেই গ্রেফতার হলাম। জেল হল। আমাকে প্রথমে পাঠান হল হুগলি জেলে। সিকিউরিটি অ্যাকটে গ্রেফতার হয়েছি। ডিসেমবর মাসে হুগলি জেল থেকে নিয়ে গেল দমদম সেনট্রাল জেলে। সেখানে গিয়ে দেখলাম হেমন্ত বসু, সত্যপ্রিয় ব্যানারজি, অনিল রায়, ফণী মজুমদার, যতীন রায়, ব্যোমকেশ মজুমদার, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, সুনীল দাসকে। তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ফজলুল হক। তিনি আদেশ দিলেন যাঁদের বয়স আঠারো বছরের কম তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হোক। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে জেল থেকে ছাড়া পেলাম।

তার পর মাস খানেকের মধ্যে আবার আমাদের কয়েকজনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল। দুই বন্ধু গ্রেফতার হল। আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলাম। অনেক দিন গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছি। ধরা পড়লাম ১৯৪৪ সালের মারচে। দেড় বছরের বেশি জেল। ছাড়া পেলাম ১৯৪৫ সালের নভেমবর মাসে।

১৯৪৬ সালে শরৎচন্দ্র বসু জেল থেকে মুক্তি পেলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সাসপেনডেড কমিটি স্বীকৃতি পেয়েছে। দুটি কমিটি ভেঙে একটিই কংগ্রেস কমিটি। শরৎবাবু বললেন, সবাইকে কংগ্রেসের সদস্য হতে হবে। আমরা সদস্য হলাম।

১৯৪০ সালের ২২ জুন রামগড়ে সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ারড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন ফরোয়ারড ব্লকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেস সদস্য না হলে ফরোয়ারড ব্লকের সদস্য হওয়া যেত না।'

সুভাষবাবু ফরোয়ারড ব্লকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন 'কংগ্রেসের মধ্যে যারা প্রগতিবাদী বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তারা সোসালিসট হক বা নাই হক, ফরোয়ারড ব্লক তাদের সবাইকে একত্র করবে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ফলে ভারত তার জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে, এই সংহতির মধ্যে দিয়ে জনগণ সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে ব্লককে ভেঙে দেওয়া হবে না। এর জীবন ও কর্মপ্রয়াসের নব পর্যায় তার দ্বারা সূচিত হবে। এবং সেই পর্যায় নিঃসন্দেহে হবে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়।'

কথায় কথায় জিগ্যেস করলাম, তাহলে আপনারা কংগ্রেস ছাড়লেন কেন? আর সত্যি সত্যিই ফরোয়ারড ব্লক আলাদা দল হল কবে থেকে?

অশোকবাবু বলতে লাগলেন, 'কংগ্রেস থেকে ফরোয়ারড ব্লক বেরিয়ে এল ১৯৪৮ সালে। মূল কারণ ছিল একটাই। কংগ্রেস তখন জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছে, পুরোপুরি ক্ষমতাভোগী দল হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে আপসের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু জনগণকে শোষণ মুক্তির সংকল্প থেকে কংগ্রেস অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল বা মে মাস হবে, বেনারসে ফরোয়ারড ব্লকের কাউনসিল মিটিং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরোয়ারড ব্লক বেরিয়ে এল। সেই ৪৮ পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্য ছিলাম।।।

জাতীয় কংগ্রেসে সমাজবাদী চেতনা

মনকুমার সেন

নানামুখী স্রোতের টানে, চিন্তা ও চেতনার জোয়ারে, বৃহত্তর আদর্শের আহ্বানে কিংবা প্রবল স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির মধ্যে কংগ্রেস থেকে বেরিয়েও গেলেন অনেকে, বাইরে গিয়ে গোষ্ঠী বা দলবদ্ধ হলেন বিভিন্ন মতাদর্শের কিছু কড়া ধাঁচের মানুষ। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এক নতুন আদর্শে নতুন সমাজ গড়ে তোলার আকৃতি পাশা-পাশিই এগোতে লাগল।

সমাজবাদী চিন্তার ইতিহাস বহু পুরাতন। মারকস-এঙ্গেলস-এর 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ' এর আগেও সমাজবাদী চিন্তার বিস্তর স্ফুলিঙ্গ ইতিহাসের পাতায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মারকসীয় তত্ত্বের যে ব্যব-হারিক গোড়াপত্তন লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত রুশ বিপ্লব, সমাজবাদ বলতে পরবর্তীকালের সংশোধনসহ তাকেই তাত্ত্বিক ব্যক্তি-গণ মান্য করে এসেছেন – দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন বহুলাংশে এই সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিপ্লবের ধারাতেই পরিচালিত হয়েছে। এর আগেও বিপ্লব ঘটেছে, কিন্তু তা কোথাও শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষমতাসীন করেনি, সোজাসুজি ডাক দিয়ে 'সর্বহারা'দের বলেনি – এই জীবন সংগ্রামে 'তোমাদের পায়ের শৃংখল ছাড়া হারাবার কিছু নেই।' দেশে দেশে শ্রমজীবীরাই তো জাতির জীবনকে ধরে রেখেছে, উৎপাদনের হাতিয়ারই তো শ্রমিক। আসলে পুঁজিও তো শ্রমেরই এক ঘনীভূত রূপ, যা অন্যের হাতে চালান হয়ে গিয়ে শ্রমিকেরই ঘাড় ভেঙেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের কবর নিজে খুঁড়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের চিন্তায় সমাজ-বাদই যে সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ, মারকসীয় তত্ত্বের বিরোধীরাও অনেকে এ বিষয়ে একমত। প্রকৃতপক্ষে, সর্বহারা থেকে সর্বোদয়ের আহ্বান জানিয়ে গান্ধীও সমাজবাদেরই এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। যদি ধরেও নেওয়া যায় 'শেষ পর্যন্ত শক্তির লড়াই মারকস ও গান্ধীর মধ্যে তাহলেও আসল বক্তব্যটা থেকেই যাচ্ছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান – যা রুশ বিপ্লবের আগুন থেকে উত্তাপ নিয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও মুক্তির বাণী নিয়েছে কিন্তু তার রক্তস্রাবী বন্দুকের নলকে বর্জন করেছে। ভারতের নিজস্ব প্রতিভা ও ভারতীয় শ্রমিক সমাজের বৃহত্তম অংশ কিষাণ সমাজের সর্বোচ্চ অধিকারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে জাতীয় কংগ্রেসের সমাজবাদী চেতনা। শেষ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে 'গণতান্ত্রিক সমাজ-বাদ'-এর পতাকাই স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররা রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসে সমাজবাদী চেতনার উত্তরণ প্রসংগে কয়েকটি ঘটনার সংকেত না মনে করে উপায় নেই, যদিও ঐ ঘটনাগুলোই কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আমাদের নিয়ে যায়, তাও নয়। যেমন : যে-ব্যারিসটার গান্ধী এক বছরের জন্য মামলা লড়তে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, নির্যাতিত 'ভারতীয় কুলি'দের ব্যারিসটার হলেন, দু বছরের জায়গায় বিশ বছরের এক বিস্ময়কর নিরস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই 'কুলি'দের জন্য মানুষের ন্যূনতম মর্যাদা অর্জন করে তিনি স্বদেশে ফিরলেন ১৯১৫ খৃস্টাব্দে। ১৯১৭-তে কংগ্রেসের সংগে গান্ধীর সরাসরি সংযোগ – এবং তা-ও বিহারের চম্পারণে, নীলকরদের অত্যাচারের ও নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে, নীলচাষী কৃষকের সত্যা-গ্রহের মধ্য দিয়ে। ভারতে গান্ধী-সত্যাগ্রহের এটিই প্রথম প্রয়োগ। একই বছরে ঘটল রুশ বিপ্লব – যদিও এই দুনিয়া-কাঁপানো এগারো-দিনের বিপ্লবের খবর ভারতে ঠিক ঠিক পৌঁছেছে অনেক পরে। ভারতে মারকসবাদীদের অর্থাৎ কমিউনিসট-দের প্রথম সংগঠন ১৯২০-এ, তার চোদ্দ বছর পরে সমাজবাদীরা গঠন করলেন 'কংগ্রেস সোস্যালিসট পারটি'। মোটামুটি কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই বিভিন্ন মতাদর্শের লড়াই চলেছে – চম্পারণের জাগরণ এবং ১৯২০-৩০-এর মধ্যে গান্ধীর অহিংস আইনঅমান্য আন্দোলনের ধারায় অভাবনীয় গণজাগরণ লক্ষ্য করে কংগ্রেস নিশ্চিন্ত মনে তার নেতৃত্ব গান্ধীর হাতে তুলে দিয়েছে। বরং বলা ঠিক, নেতৃত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই গান্ধীর হাতে চলে গিয়েছে। দেশে গণজাগরণের নেতৃত্ব এই প্রথম, যদিও নানাসূত্রে আঞ্চলিক জাগরণ এবং বিচ্ছিন্ন বিস্ফোরণ আগেও বহু ঘটেছে।

মারকস ও গান্ধীর মাঝামাঝি পথ ধরে নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস সমাজবাদের যে নয়া নিশান তুলেছে, একদা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কঠোর সমালোচক ও বিশ্বের নিঃস্বার্থ সমাজবাদী চিন্তানায়কদের অন্যতম জয়প্রকাশ নারায়ণও তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। জয়প্রকা-শের মতে 'জওহরলাল নেহরুর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলোর মধ্যে গণ-তান্ত্রিক সমাজবাদ অন্যতম।' জও-হরলাল ও জয়প্রকাশ ছাড়া কং-

১৮৮৫ সালে অর্থাৎ জন্মসূত্রেই কংগ্রেস 'জাতীয়' হয়ে ওঠেনি। 'জাতীয়' বা 'জাতীয়তা' শব্দটি অত হাল্কা নয় যে, জুড়ে দিলেই কোন নামে তার ছাপ পড়ে যাবে। 'জাতীয়'হয়ে ওঠার শক্তি ও মর্যাদা অর্জন করে নিতে হয়। ইংরেজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত, উচ্চবিত্ত উচ্চশিক্ষিত মুষ্টিমেয় উদ্যোগীর আভিজাত্যের অন্দরমহল পেরিয়ে সাধারণ মানুষের পর্ণকুটিরে পৌঁছতে কংগ্রেসকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেরও শেষাংশে কংগ্রেস এই সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে সর্বসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। তার আগে পর্যন্ত, মোটামুটি তিন দশক, কংগ্রে-সের ইতিহাস প্রধানত ইংলনডে-শ্বরের দরবারে আবেদন নিবেদনেরই ইতিহাস। মাঝে মধ্যে হয়ত কিছু ভিন্ন চরিত্রের নেতৃত্বও প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তাও তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। আজ তো ভাবতে গেলে অবিশ্বাস্যই মনে হয় যে, ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্ত এত জ্ঞানীগুণী ওপরতলাতে থাকা সত্ত্বেও সাকুল্যে মাত্র হাজার পঞ্চাশ ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে পদানত করে রাখতে পেরেছিল! এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই, বিলেত থেকে, ভারতের দূরত্ব যতখানি ছিল, ওপরতলার নেতৃত্ব থেকে দেশের সাধারণ মানুষের দূরত্ব তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। সকলেই জানেন, বিদেশি শাসন ঘরের মধ্যে ঘর তোলার কত ব্যর্থ কৌশল প্রয়োগ করেছিল। আশ্চর্যের কথা জ্ঞানে, অজ্ঞানে দেশের মানুষই বিদেশীয় এই বাজী জেতবার অন্দরমহলে মিস্ত্রির কাজ করেছেন। শোষণের রাস্তাগুলো পাকা করে-ছেন।

আবার এই চালে যা জালে একবারে না পড়ে, না জড়িয়ে যুগের অসম্ভব অবাধ্যতার উজান ঠেলেও কত যুগন্ধর পুরুষ অবনত, প্রথাবদ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে পালটে দিতে চেয়েছেন। এই ধরনেরই কিছু অতিক্রমী সংহত ও সংস্কারমূলক উদ্যমেরই মিলিত মঞ্চরূপে কং-গ্রেসের আবির্ভাব। জাতীয় কংগ্রেস গড়ে ওঠার পর তাতে ক্রমেই চরম মধ্যম নরম বিভিন্ন 'পন্থী'রাই ঠাঁই করে নিলেন। আবার, সমকালের

জ্যোতিষ জগতে এক "অসম ব্যক্তিত্ব"

কয়েকদিন আগেই কথা হচ্ছিল অমৃতলালের সাথে ওর চেম্বারে বসেই। দক্ষিণ কোলকাতায় গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে ঠিক গড়িয়াহাট থানার সামনেই ওঁর নিজস্ব চেম্বার। চেম্বারের ঠিকানাটা হলো 1/8, Dover Lane Calcutta-29. Phone No- 42-65 81, 36-2612

এখানে অমৃতলাল সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত প্রতিদিনই বসে হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচার করেন। এমনকি সাধারণ মানুষের স্বার্থে রবিবারও ওর চেম্বার খোলা কথায় কথায় বললাম – আজকাল

অমৃতলাল। যিনি SUNDAY পত্রিকার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে একটা নির্দিষ্ট Guide line দিচ্ছেন।

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, ট্রেনে জ্যোতিষ সংক্রান্ত আলোচনা হলেই বিভিন্ন মানুষের মুখে আপনার নাম বারবার উচ্চারিত হয়। বয়সে প্রবীণ না হয়েও এই যে আপনার জনপ্রিয়তা – এর মূল উৎস কোথায়?

অমৃতলাল: তাই নাকি? যদি আপনার কথা সত্য হয়, তাহলে এটা আমার অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদের ফল ধরে নিতে হবে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, বহু Astrologer কোন জটিল ব্যাপার হলে আমার কাছে refer করে পাঠিয়ে দেন।

প্রশ্ন: আপনি কি কোন গ্রহরত্ন বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন?

উত্তর: একেবারেই নয়। তবে বহু খ্যাতনামা গ্রহরত্ন বিক্রেতা তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হবার জন্য লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন এবং এখনও আসছেন। এ ব্যাপারটা নীতিগত দিক থেকে আমি সম্মত হতে পারি নি।

প্রশ্ন: কেন, এর মধ্যে কি কোন অলিখিত বাধ্যতামূলক ব্যাপার ট্যাপার----

অমৃতলাল আমার কথা শেষ না হতেই একটু হেসে বললেন – এই প্রশ্ন না-ই বা করলেন।

আমাদের এসব কথাবার্তা চলার সময় স্থানীয় পোস্ট অফিসের একজন কর্মী একগাদা চিঠি, রেজিস্ট্রীপত্র ও Money Order নিয়ে অমৃতলালের চেম্বারে ঢুকলেন। প্রসঙ্গত: বলে

রাখি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা সম্পত্তি ও সময়ের অভাবে ওর সাথে দেখা করতে পারেন না, তারা ডাকযোগের মাধ্যমেই অমৃতলালের পরামর্শ ও ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে থাকেন।

ডাক পিয়ন চলে গেলেই বহুদিনের একটা সঞ্চিত প্রশ্ন অমৃতলালের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম – আপনারা যারা জ্যোতিষী, তারা সবাই হাত বা জন্মকালীন গ্রহ অবস্থান দেখে ব্যক্তি বিশেষের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম বলে দেন। তাহলে আমাদের এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তির ভাগ্য ও কর্ম পূর্ব নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আপনারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষের কি উপকারে আসেন?

প্রশ্নটি কিন্তু অমৃতলালের মধ্যে কোন ভাবান্তর আনলো না। তিনি বললেন – দেখুন, জ্যোতিষ শাস্ত্র কর্মবাদকে বাদ দিয়ে নয়। আবার জ্যোতিষ শাস্ত্র মানতে গেলে জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন এসেই যায়। আর এই জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকৃতি পেতে চলেছে। মানুষ ইহজন্মে যে কর্মফল ভোগ করে তার ৬৫% পূর্বজন্ম থেকে প্রাপ্ত। এর মধ্যে শুভ ও অশুভ মিশ্রিত ফল থাকতে পারে। আর ইহজন্মের কর্মফলের ৩৫% ইহজন্মেই ভোগ করে। বাকি ৬৫% সঞ্চিত থাকে পরজন্মের জন্য। এই যে ইহজন্মের ৩৫% ফল মানুষ পাচ্ছে তা Will Force ও Proper Guidance এর মাধ্যমে Favour এ নিয়ে আসা

দেখতে পাই যে, রামচন্দ্র নিজেকে অবতার জেনেও রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মহাকালের নির্দেশে বহুবার পিছু হটেছিলেন। আর এই মহাকালই হলো সময়। আবার হনুমান যদি তার নিজের বিক্রম ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতেন, তাহলে রাম-রাবণে যুদ্ধই হতো না। আসলে মূল সমস্যাটা কোথায় জানেন? মানুষ তার স্বকীয় যোগ্যতা, প্রতিভা ও অধিকার অনুযায়ী সঠিক পথ ও কর্মকে বেছে নিতে পারছে না। একটা উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গাওস্কার যেমন সত্যজিৎ রায় হতে পারেন না, তেমনি সত্যজিৎ রায়ও ইন্দিরা গান্ধী হতে পারেন না, আবার ইন্দিরা গান্ধীও শংকরাচার্য্য হতে পারেন না। যার যার যোগ্যতা ও অধিকার অনুযায়ী যদি সে সে সঠিক পথ বেছে এগিয়ে যেতে পারে, তবে সে সেই বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে। আর এই যে বিষয় নির্বাচন ও এগিয়ে যাবার পদ্ধতি একমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রই সুচারুভাবে দেখাতে পারে। প্রতিটি মানুষই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। যশ, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও শান্তি প্রতিটি মানুষেরই একান্ত কাম্য। কাজেই কার কোন্ লাইনে যাওয়া উচিত, কখন কোন্ কাজটি করা উচিত, কোন্ কাজে কতটুকু শ্রম দেওয়া উচিত, এ ব্যাপারে একজন বিজ্ঞ জ্যোতিষীর সহযোগিতা ও পরামর্শ ব্যক্তি-জীবনকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্য্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন: আপনি কি নিজেকে একজন সফল ও কৃতী জ্যোতিষী হিসাবে দাবী করতে পারেন?

আমার সফল হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রতিকারের জন্য আপনার আবিষ্কৃত Metal Tablet দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন।

উত্তর: আমার আবিষ্কৃত Metal Tablet এর কার্যকারিতা প্রচুর। এ ব্যাপারে আ নোকে আগেই বলেছি। এই Metal Tablet টির তৈরির পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। মানব শরীর ৭0% জল আর ৩0% অন্যান্য পদার্থ দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে ধাতব পদার্থও বর্তমান। এগুলোর ভারসাম্য কম বেশি হবার জন্য নানারকম সমস্যার মোকাবিলা করতে

অমৃতলাল। যিনি বহু সফল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রবক্তা। যা ইদানীংকালে অন্য কোন জ্যোতিষীর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

হয়। Metal Tablet টি এই সকল সমস্যার মোকাবিলা করতে অদ্বিতীয়। কারণ এটা ব্যক্তিজীবনের জন্মকালীন গ্রহগুলির অবস্থান ও strength বিচার করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন Metal এর আনুপাতিক সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। একটি খাঁটি stone কেবলমাত্র একটি গ্রহকেই প্রতিকার করতে পারে। আর এই Metal Tablet টি প্রয়োজন অনুসারে নয়টি গ্রহকেই প্রতিকার করে। একটি খাঁটি stone এর মূল্য আকাশ-ছোঁয়া। আর Metal Tablet টির মূল্য অনেক কম যা সাধারণের পক্ষে সাধ্যসাধ্য। আমি আজ পর্যন্ত প্রায় সতেরশ ব্যক্তির উপর পরীক্ষা করে দারুণ সুফল দেখেছি। আমি এমন বহু ব্যক্তিকে দেখেছি যারা প্রচুর মূল্যের বিভিন্ন ধরনের বেশ কয়েকটি stone ধারণ করেও উপকার পাননি, এই Metal Tablet ধারণ করে তারাই দারুণ উপকৃত হয়েছেন। যারা আমার কাছে এসে এই Tablet নিতে পারছেন না, তাদের ক্ষেত্রে Regd. Parcel করে পাঠাবার ব্যবস্থাও রেখেছি।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সময় লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। প্রখ্যাত জ্যোতিষী অমৃতলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে দেখি বেশ কয়েকজন সাক্ষাৎপ্রার্থী ইতিমধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ জানবার জন্য Waiting room এ অপেক্ষারত।

– শ্যামল ভট্টাচার্য্য

অমৃতলাল। যিনি Metal Tablet-এর আবিষ্কারক। যেই Metal Tablet ধারণ করে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাপারে দারুণ উপকৃত হয়েছেন।

সম্ভব। এবার দেখুন, পূর্বজন্মের নির্ধারিত কিছু শুভ অংশ এবং ইহজন্মের কৃতকর্মের শুভ অংশ দুইয়ে মিলিয়ে মানুষ অধিকাংশ সুফল ভোগ করতে পারে। আর এই অধিকাংশ শুভফল লাভের ক্ষেত্রে একজন কৃতী ও বিজ্ঞ জ্যোতিষীর ভূমিকা ব্যাপকতর হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাস্ত্র:সিদ্ধ অনুসারে বাস্তবে শুভ কাজ করলেই সুফল পাওয়া যায় না বা কুকর্ম করলেই কুফল পাওয়া যায় না। ফললাভ যথাক্রমে বিপরীতও হতে দেখা যায়। আবার রামায়ণে আমরা

উত্তর: দেখুন জ্যোতিষশাস্ত্র একটা বিরাট ব্যাপার। এর ব্যাপকতা ও গভীরতা কল্পনাই আনা যায় না। পাঁচটি মহাসাগরকে যদি একত্র করা যায়, তাহলে তা যতটা বিরাট ও গভীর হবে, জ্যোতিষশাস্ত্র তারও চেয়ে ব্যাপক। কাজেই মহাসাগরের মধ্যে সাঁতার দিয়ে যদি কেউ বলেন যে সাগরের রত্নরাজি তার করতলগত, তাহলে তাকে মূর্খামী ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। তবে এ শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে যতটুকু আত্মপ্রত্যয় থাকা দরকার তা আমার আছে এবং অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী

গ্রেলের নবীন ও উজ্জ্বলতম তিনটি জ্যোতিষ্কের তৃতীয়টি হলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণের অধিক যদি কিছু দেওয়ার থাকে, তা তিনি দিয়েছেন। মতপথের বিতর্ক যারা করতে চান করুন, – ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসায় মতান্তর ঘটলেও মনান্তর ঘটবে কেন? এবং সব জিজ্ঞাসাকে অতিক্রম করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই-জন্যই বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের যাত্রাপথে চিরদিন জেগে থাকবেন। সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তা বা স্বদেশানুরাগ তো সূর্যের দীপ্তির মত, – সোভিয়েত দেশের সমাজবাদ তাঁকে ঠিক কতখানি আকর্ষণ করেছিল তা নিয়ে কোন প্রশ্নাতীত সিদ্ধান্ত বোধ করি হয়নি। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জনকরূপে তাঁর যে স্থান (দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং তাঁর কংগ্রেস-সভাপতিত্বের সুযোগে তিনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেছিলেন এবং জওহরলালকেই করেছিলেন এই কমিটির সভাপতি) তাতে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রুশবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রুশ সমাজ তাঁকেও নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তিনিও স্বদেশ ও স্বকীয় প্রতিভার কাঠামোর মধ্যেই সমাজবাদের স্বপ্ন দেখতেন, সন্দেহ নেই।

জওহরলাল ইউরোপীয় উদার মানবতাবাদ, মারকসের বৈজ্ঞানিক সমাজ চিন্তা এবং গান্ধীর উদ্দেশ্য উপায়ের পন্থা এই তিন টানকে এক করে এক ভিন্ন সমাজবাদের পরীক্ষায় কংগ্রেসকে প্রবৃত্ত করেছেন। যেখানেই নিপীড়িত মানুষ, নেহরুর মন সেখানে ছুটে গিয়েছে। তার ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা ও অসামান্য মননশীলতা দিয়ে তিনি মারকসপূর্ব ও মারকসীয় সমাজবাদের দিকে ততটুকুই ঝুঁকেছেন যতটুকুতে তাঁর জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রী মন সায় দিয়েছে। ১৯২৭ সালে নেহরুর চিন্তা চেতনায় সমাজবোধকে নিবিড় করে। ঘরে গান্ধীর আশ্চর্য জাদুবলে ইতোমধ্যেই তিনি মুগ্ধ, বাইরে 'নির্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসে' [ব্রুসেলস এ] যোগদান করে এবং স্বল্পকালের সফরে সোভিয়েত দেশে সমতার প্রতি রাষ্ট্রের প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করে এই বৎসরই তিনি সমাজবাদের দিকে আরো বেশি ঝুঁকে পড়েন। ১৯২৯ এর লাহোর কংগ্রেসে তিনি সোজাসুজি নিজেকে একজন সমাজবাদীরূপে ঘোষণা করেন এবং ১৯৩১ এর করাচী কংগ্রেসে 'মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম' প্রসঙ্গে প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে মূল শিল্প ও ভারী শিল্পের জাতীয়করণ করে 'গরিবের বোঝা হাল্কা করার ও ধনীর বোঝা বাড়িয়ে দেওয়ার' ওপর জোর দেন। বস্তুত তাঁর ইংগিতই ছিল অন্য দেশে অর্থনৈতিক মুক্তিযজ্ঞ কীভাবে চলছে তার দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাকে আরও সজাগ করা। একথা সকলেরই জানা – বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তিকে নেহরু অবিভাজ্য মনে করতেন, এবং এই দেশেও গান্ধী ছিলেন নেহরুর অত্যন্ত আপনজন। এই দৃষ্টিভঙ্গির গুণে ও আকর্ষণেই স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু জোটমুক্ত আন্দোলনের পুরোধা হতে পেরেছিলেন - বান্দুং সম্মেলনে যে আন্দোলনের সূচনা। গণতন্ত্র ও সমাজবাদকে একযোগে নিয়ে একটা দেশের উন্নয়নকে কতদূর জনমুখী করা সম্ভব, অর্থনীতিতে এক নতুন কৃষ্টির উদ্ভাবন কতখানি সাধ্যের মধ্যে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তার পরীক্ষা চলছে। এ পর্যন্ত এই পরীক্ষার ফল জনজীবনের পক্ষে কতখানি শুভংকর হয়েছে, তা পৃথক আলোচনার বিষয়। কংগ্রেস এখন অন্য কংগ্রেস, সমাজবাদী, সাম্যবাদীরাও পৃথক দলভুক্ত। কংগ্রেসেই শুধু নয়, এই বামপন্থীদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব একদলের মধ্যে বহু দল বা উপদলের সৃষ্টি করেছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একাগ্রতা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত যে সমাজবাদী চেতনা স্বাধীনতার আগে জাতীয় কংগ্রেসে স্পষ্ট ছিল, আজকের জাতীয় অর্থনৈতিক পদক্ষেপে তা স্পষ্ট নয়। ভারতের সংবিধান এবং ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোনটাই নিচুতলাকে বা শ্রমজীবী মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হয়নি। হয়ত গণতন্ত্রে সকলের অধিকার সমান রাখার আগ্রহই অর্থনৈতিক সমতার বা গান্ধীজীর স্বরাজের দাবিকে এখনও পর্যন্ত ছাপিয়ে আছে। পরিকল্পনার গতি এবং সংবিধানের মতি পরিবর্তন ছাড়া ভারতে সমাজবাদী চেতনা এইভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বেশিদূর এগোবে না। □

জাতীয় কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বাইরের ঘটনাবলীর দ্বারা যে পরিমাণ পরিচিত, অন্তরের সঙ্গে সেই পরিচিতির পরিমাণ বহুগুণ বেশি। তিনি কংগ্রেসের প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্লাটফরমে খুব একটা আসেননি। এমনকি তাঁর কণ্ঠস্বরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনাও শোনা গেছে। তবু বলা যেতে পারে, জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর একটা গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্মরণীয় ঘটনা ঐ সম্মেলনে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছিল।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'রাখী বন্ধন' উৎসব উপলক্ষে তাঁর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি কোন বাঙালির পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। এই সময় তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় যোগ দিতেন, প্রবন্ধ পড়তেন, গান করতেন। ১৯০৮ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ততদিনে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। এই পাবনা অধিবেশনেই বোধ হয়, কংগ্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য সহযোগিতার শেষ সাক্ষ্য বহন করছে। এরপর কংগ্রেসের যে সব সভায় তিনি গেছেন, তা অনুল্লেখ্য।

কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের ধারাটা কখনও ছিন্ন হয়নি। বাইরের উপস্থিতি না ঘটলেও অন্তরের সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, যদিও তার সব ব্যাপারে তিনি একমত ছিলেন না।

আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ পলিটিসিয়ান ছিলেন না। এবং সেই জন্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, কংগ্রেসের প্রকৃত পরিচয় এবং তার প্রকৃত সমালোচনাও শুনতে পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে যা সম্ভব নয়। দূর থেকে কংগ্রেসের মূল বাণী, মূল চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, কংগ্রেস

যেন এক বনস্পতি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কিছুকাল আগেই দেশের মন ছিল মুমূর্ষ। দিগন্তব্যাপী অনুর্বরতা আর ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের সম্বন্ধ অবরুদ্ধ করে বহু যুগকে দারিদ্র করে রেখেছিল। এমন সময় আকস্মিক অল্প কালেই এতবড় কংগ্রেসের আবির্ভাব। ফুলে উঠল দর ভবিষ্যতের অভিমুখে মুক্তির প্রত্যাশা বহন করে বহু শাখায়িত বনস্পতির মত। বিরাট জনসাধারণের মন আশ্চর্য দ্রুত বদলে গেল, সেই মন আশা করতে শিখল, ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধন মোচনের সংকল্প করতে তার সংকোচ আর রইল না।' (দ্রষ্টব্য : কালান্তর)।

শব্দ প্রয়োগটি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'কংগ্রেস বহু শাখায়িত বনস্পতি'। এই শব্দ প্রয়োগের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রকৃত চরিত্র নিরূপায়িত। কংগ্রেসের রূপ কি ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত ও দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি। কংগ্রেস, দেশের স্বাধীনতার জন্য একমাত্র সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রায় দুশো বছরের পরাধীন এবং ভীরু ভারতবাসীকে কী দিয়েছে, আজকের দিনে কংগ্রেসের সেই দানের কথা আমরা ভুলতে বসেছি। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণ সমাজ তা তো জানেনই না। বা তাঁদের জানতে দেবার কোন আয়োজনও আজ প্রায় নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে কঠিন বাস্তব আলোর পটভূমিকায় দেখেছেন। দেখেছেন তার বিপুল গণজাগরণের রূপ, এবং মানুষের সেবায় তার নম্র আয়োজন। কংগ্রেসের সেই রূপ দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বিরাট জনসাধারণের মন আশা করতে শিখল, ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধন মোচনের সংকল্প করতে তার সংকোচ আর রইল না'। অর্থাৎ কংগ্রেস, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নব জাগরণের প্রতীক হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের চোখে কংগ্রেসের এই রূপ এবং এই ঐতিহাসিক রূপান্তর, সুসম্পন্নভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল। কংগ্রেসের আদি যুগে তিনি দেখেছেন এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু আবেদন নিবেদনের পালাই গাইছে। অর্থাৎ তার চরিত্রের মধ্যে বিপ্লবের বহিঃরূপ নেই, নেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার দাবি জানাবার মত বলিষ্ঠ আহ্বান। কংগ্রেসের এই দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। তাই কলকাতা অধিবেশনে তিনি যে গানটি গেয়েছিলেন তা এই :

'মিছে কথার বাঁধুনি, কাঁদুনির পালা
চোখে নেই কারও নীর
নিবেদন আর আবেদনের থালা
বহে বহে নত শির।'

কংগ্রেসের চরিত্র বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ এখানে নির্ভুল শুধু নন, নির্মমও। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সমালোচনা করার অধিকার তাঁরই আছে, যার মধ্যে ভালবাসার অধিকারও অর্জিত। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে ভালবাসতেন বলেই, তাঁর এই কঠিন সমালোচনা।

কিন্তু প্রশ্ন, কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবের চরিত্র কি একদিনে আসা সম্ভব। সে চরিত্র আসবে কোথা থেকে। যে রোগী এক মাস না খেয়ে দুর্বল, তাকে কি লড়াইতে যেতে বলা সম্ভব। তাছাড়া বিপ্লবের জন্মভূমি, উৎস মুখ কোথায়।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা একটি সুন্দর উত্তর পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিপ্লবের চরিত্রের উৎস স্থান তৈরি হয় দেশকে ভালবাসার সত্য উপাদান থেকে।

কী? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'দেশকে প্রকৃত ভালবাসার লক্ষণ, দেশের জন্য নীরবে কাজ করা।'

অর্থাৎ এখানে আমরা কংগ্রেসের শক্তিকে গঠনধর্মী পথে সঞ্চারিত করার একটা নির্দেশ পাচ্ছি। আমরা জানি, গান্ধীজী কংগ্রেসকে গঠন কর্মের পথে পরিচালিত করে তার শরীরে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন এবং তার মধ্যে ব্যাপ্তি এনেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পাবনা কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন, 'তোমরা যে পার এবং যেখায় পার, এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থা-বদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি, শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর।'

কিন্তু এমন কাজে যে আনন্দ নেই, 'থ্রিল' নেই, এমনকি রোমানস নেই। অর্থাৎ এ কাজ কংগ্রেস কর্মীদের কাছে যে নীরস এবং জোলো লাগবে, রবীন্দ্রনাথও তা জানতেন। এবং জানতেন বলেই, ঠিক পরেই তিনি বলছেন, 'এ কার্যে খ্যাতির আশা করিও না। - মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করতে যত্নবান হইব।'

আমাদের মনে রাখা দরকার, কংগ্রেসে গান্ধীজীর গঠন সূচী প্রবর্তনের আগে, রবীন্দ্রনাথ, গণ জাগরণের এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন, স্বাধীনতা পাওয়া মানেই সব কিছু আকাশ থেকে পড়ে যাওয়া নয়। অথবা স্বাধীনতা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া লটারির টিকিটও নয়। গঠন কর্মের পথ ধরেই তাকে দরিদ্র মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সে গঠন কর্ম, কংগ্রেস কর্মীরাই করুন বা বেতনভুক সরকারি কর্মচারীরাই করুন। আসল পথটাই হল 'কনসট্রাকটিভ' পথ।

বিপ্লবের দ্বিতীয় উপাদান কী? এই উপাদান হল মহৎ এবং বৈপ্লবিক নেতৃত্ব। একটি মহৎ নেতৃত্ব – ডান দিকে যত খুশি শূন্য বসিয়ে, তার অনুগামীর সংখ্যা বাড়াতে পারে, যা অন্য সাধারণ নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও, কংগ্রেস নেতৃত্ব ছাড়া, বিপ্লবের আলোড়ন দেশে অন্য কেউ আনতে পারবে না। এবং কংগ্রেসের মধ্যে মহৎ নেতৃত্ব আছে এবং সেই মহৎ নেতা হলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী-ই দেশকে তার তীব্রতা থেকে এবং তার দৈন্য থেকে টেনে তুলতে পারেন। আমরা

অথচ কঠিন, নীরব অথচ বিপুল ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয় পেয়েছিলেন, যা আমাদের দেশের বহু বিরোধী রাজনৈতিক নেতা বুঝতে পারেননি, বুঝতে চাননি, বা তাঁদের বুঝতে দেওয়া হয়নি। আমাদের মনে রাখা দরকার, কংগ্রেসের মঞ্চে তখনও নেতাজীর আবির্ভাব ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের চরিত্রের রূপান্তর ঘটালেন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশের এত বড় পরিবর্তন ঘটতে পেরেছে কেবল একজন মাত্র মানুষের অবিচলিত ভরসার জোরে।' --- 'ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি (গান্ধীজী) অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগ গঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।'

কিন্তু কংগ্রেসের এই রূপান্তরের যুগে রবীন্দ্রনাথ আর তার সংগে যুক্ত নন। মতবিরোধও দেখা দিয়েছে কংগ্রেসের সংগে। তিনি কংগ্রেসের বিদেশি পণ্য বয়কট সমর্থন করলেন না। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলাদলিও তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। অসহযোগ আন্দোলনও তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। ১৯২১ সালের সেপটেমবর মাসে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গান্ধীজীর সংগে এই নিয়ে কথা হল। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে আলোচনার পর, যতদূর জানা যায়, কেউ কাউকে স্বমতে আনতে পারলেন না। আসলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক চিত্রটি ছিল, গান্ধীজী তা অনুধাবন করতে পারেননি।

তেমনি রবীন্দ্রনাথ পারলেন না বিপ্লবীদের গোপন হিংসাত্মক পথকে সকল অন্তর দিয়ে মেনে নিতে, বিপ্লবীদের দুঃসাহস এবং ত্যাগের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধী-বিরোধিতায়ও তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কিন্তু এই কংগ্রেসের পরমমূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও যখন জানি এই কংগ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি তখন হঠাৎ একে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারে না।'

ধীরে ধীরে কংগ্রেসের মধ্যেও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা দিল। তার প্রভূত ক্ষমতা ও শক্তির উত্তাপ, তাকে ব্যভিচারের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে তখন। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সৃষ্টির

তবু বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই বাইরের বিচ্ছিন্নতা অন্তরের বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠল না। কংগ্রেসের কাছে তিনি তখন 'ফ্রেনড অ্যানড ফিলজফার'। তখনও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্রনাথের নাটক কংগ্রেসের জীবনকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করছে। তখন তিনি জাতির গুরু, যে জাতি কংগ্রেসেরই পতাকাতলে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আশ্চর্য মন্ত্রের মত তাঁর গানগুলি: 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলবে', 'আমি ভয় করব না ভয় করব না', 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না' 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান', 'মাতৃমন্দির পুণ্য অংগন কর মহো উজ্জ্বল আজ হে', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ' – এই মৃত্যুসঞ্জীবনী মন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ জাতিকে শুনিয়েছেন। কংগ্রেসের সংগে তাঁর জীবন, বাইরের ঘটনাবলীর দ্বারা চিহ্নিত নয়। সে যোগসূত্রতা শুধু তখন অন্তরের, যা থেকে জাতি দীক্ষা নিয়ে নিয়েছে, প্রেরণা নিয়েছে এবং প্রাণের পাথেয় নিয়েছে।

কংগ্রেসের আসল রোগগুলি' অর্থাৎ নেতৃত্বের কলহ, দেশ গঠনের প্রতি অবহেলা এবং স্বনির্ভরতার প্রতি উপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ তা ধরতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী যখন গঠন কর্মের দিকে চোখ ফেরাতে বললেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ' - নিজের দেশের ভার যে করেই হোক নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর করে থাকলে, দুর্বলতা বেড়েই চলে। --- গান্ধীজী হঠাৎ কাজে হাত বাড়িয়েছেন। দেশকে কোন দিকে থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই গ্রামের কাজে। -- তিনি (মহাত্মাজী) মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল এ কথা আমি বার বার বলেছি' (চিঠিপত্র, একাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২১)। কংগ্রেস রবীন্দ্রনাথের আদর্শের পথে বা গান্ধীজীর আদর্শের পথ ধরে চলেনি। গান্ধীজী বার বার বলতেন, 'দেশ প্রস্তুত নয়, দেশ প্রস্তুত নয়'। দেশ যে স্বাধীনতার জন্য কর্মশক্তি নিয়ে প্রস্তুত ছিল না, তা স্বাধীনতার এত দিন পরে আমরা বুঝতে পেরেছি। এ যেন কীভাবে গলা না সেধে আসরে গাইতে যাবার মত এক বিড়ম্বনা।

রবীন্দ্রনাথ এই অসম্পূর্ণতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস তা শোনেনি।

তবু বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কংগ্রেসের পাওয়া বড় কম নয়। সে কালে জাতির জন্য পূজোর মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার রবীন্দ্রনাথেরই ছিল। দেশকে তিনি চিনেছিলেন, যে দেশ গ্রামকেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পরে অবশ্য গ্রাম উন্নয়নের কার্যসূচি নেওয়া হয়েছে যা রবীন্দ্রনাথ বহু আগে বলেছিলেন। তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিও কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছিলেন আদর্শগতভাবে। এক কথায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্য আলোর উত্তাপ কংগ্রেসের বহু শাখাযিত বনস্পতি গ্রহণ করে জীবনের খাদ্য সংগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে কংগ্রেসের ঋণ অপরিশোধ্য এমনকি তা অস্বীকৃত হলেও। দুঃখ করার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মিথ্যের মিশেল সকল দেশের পলিটিকসে আছে। সে যেন দুধের সংগে জলের মিশোল। আমাদের এখানে গোড়াব জিনিসটাই জল –'।

অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ততদিনে নানান ভেজাল এসে মিশেছে। শুধু হয়েছে নেতৃত্বের মাথা ঠোকাঠুকি। কংগ্রেসের এই অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না। আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারিনি কিন্তু এই কথা মনে রেখো, পাবনা কনফারেনস থেকে আমি বার বার এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। আর, শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ'। (চিঠিপত্র – একাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২২)।

কংগ্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে সরে গেলেন। রাজনীতি তাঁর জীবনের ধর্ম ছিল না। এবং সেটা আমাদের পক্ষে অসীম কল্যাণকর হয়েছে। কিন্তু দূরে সরে গেলেও তিনি স্বীকার করেছেন 'ভারতবর্ষের মুক্তি যাত্রাপথের রথখানাকে আজ কংগ্রেস টেনে রাস্তায় বের করেছে।' কথাটি আকারে ছোট। কিন্তু তার ব্যাপ্তি বিস্তীর্ণ এবং বিস্ময়কর। □

এই কংগ্রেস, সেই গান্ধী

সন্তোষকুমার ঘোষ

আজ অবিশ্বাস্য, প্রায় স্বপ্নের মত ঠেকে। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত অবলোপ। ইচ্ছেটা, শোনা যায়, স্বয়ং গান্ধীজীর। স্বাধীনতা লাভের জন্যেই কংগ্রেস, তা সেই স্বাধীনতা যখন আমলকির মত করতলগত হয়েই গেল, তখন আর ওই সংস্থাটাকে জিইয়ে রেখে কাজ কী, তাঁর ছিল এই যুক্তি। আমরা, অর্থাৎ উত্তরাধিকারীরা অবশ্য তাঁর প্রায় সব আদর্শ-পন্থা ইত্যাদিকে যেভাবে শিরোধার্য করে রেখেছি, কংগ্রেসের বেলাতেও তার ব্যত্যয় হয়নি। মানে কথাটা তাঁর অগুনতি ছবির মত দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি। সোজা কথায় মাথায় রেখেছি, কিন্তু তাঁর বাণীতে কান দিইনি। অথচ তাঁর জীবনই নাকি তাঁর বাণী। তাঁকে জাতির জনকও বলে থাকি। স্বাধীনতার ভোরে ভোরে জাতির জন্যে জীবনই যিনি দিলেন, তাঁর বাণীকেও সেই রাস্তায় পাঠিয়ে দেওয়া, আরে সেটা তো লজিক, উত্তরাধিকারীরা ন্যায্য কাজই করেছেন বৈকি। অবশ্য উত্তরকালের কান্ডারীদের অন্য হিসাবও থাকতে পারে। জেলবাসের মেঘে মেঘে তাঁদের শ্রান্ত বয়সের বেলা বয়ে যায় যায়, এখন মেঘের কোলে যদি রোদ হেসে থাকে, তবে এই শুভসুযোগে ধান শুকিয়ে কেন বা নেওয়া হবে না? অখন্ড দেশের যতটা হাতে এসেছে, আড়ে বহরে তাও তো নেহাত কম নয়। অতএব সেখানেই অবাধ রাজ্যপাট চলুক, প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক।

সুতরাং গান্ধীজী যে বিশের দশক থেকে কংগ্রেসের চেহারা চরিত্র আমূল বদলে দেওয়ার মূলে, সেই ঐতিহাসিক অস্বস্তিটাকে বেমালুম বিস্মৃতির মাটি চাপা দেওয়া হল। যা ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে প্রস্তাব পাশ করানোর সাবধানী সভা, ওই নগ্নপ্রায় সন্ন্যাসী তাকে ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের কলকল্লোল নিনাদে করাল করে তোলেন। ঘড়ায় তোলা জলকে করেন মোহানার তরংগে উত্তাল। 'আমি যদি আঙুল তুলি, তা হলে সারা হিন্দুস্থান উথলে যাবে', এই ঘোষণা করার হক আর হিম্মত একমাত্র তাঁরই ছিল। কারণ এই সসাগরা দেশের সাতলক্ষ গ্রামের সংগে তাঁর ছিল ঘননিশ্বসিত পরিচয়। তাঁর ভারত, বেশির ভাগ নেতার মত, কেবল দিল্লি লাহোর, কলকাতা বোমবে ছিল না।

উপরন্তু তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, বাদ ইত্যাদি যেখানেই থাক, তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ছায়ায় বাম-দক্ষিণ নির্বিশেষে আরও অজস্র মত ও পথ মিলেছিল। সেই সহ অবস্থিতি। তার কাহিনীও আজ স্মৃতি। শুরুতে সাধে কি তাকে স্বপ্ন বলেছি?

যা ছিল শিকল ছেঁড়ার প্লাটফরম, তা ক্রমে ক্রমে আকার নিল পাবটির। কংগ্রেসের শক্তির যতটা নয়, তার চেয়ে অভ্যন্তর রূপের অবক্ষয় দিনে দিনে স্পষ্ট হল। এর লক্ষণ গান্ধীজী তাঁর জীবদ্দশাতেই লক্ষ্য করে থাকবেন। চার আনার সদস্য গিরিতেও ইস্তফা দেওয়াতে সেই মনোভংগেরই অভ্রান্ত ইংগিত। তখন দলবাজিতে ব্যস্ত ব্যাপৃত নেতারা গৌরীশংকরশুভ্র নায়কের কার্যের তাৎপর্য সম্ভবত অনুধাবন করেননি।

সৃষ্টি প্রায়ই স্রষ্টার বা স্রষ্টাদের আদি অভিপ্রায়কে ছাড়িয়ে যায়। যেমন, স্থাপনের সময় কংগ্রেসের জনকেরা (এক জন তো আবার বিদেশি) হয়ত ইংরেজিনবিশদের একটি বশংবদ মজলিশ বসাতে চেয়েছিলেন। কালে কালে, ইতিহাসের অমোঘ ইশারায় সেই মজলিশই বিদেশি শাসককুলের পক্ষে উত্ত্যক্ত বিরক্তির কারণ হয়। গান্ধীজীর আমলে সেই দেওয়ান ই খাসই বদলে দাঁড়ায় দেওয়ান-ই আম এ। তাঁর সময়েই নরমপন্থী মডারেটদের সংগে চিরদিন ছাড়াছাড়ি। পরে স্বরাজ্যপন্থীদের সংগেও মতানৈক্য। মনে রাখা ভাল, সেটা মতেরই অনৈক্য, মনের নয়। ততটা নয় - এখন যে শোচনীয় দৃশ্য দশ হাঁড়ি দশায় নিয়ত প্রত্যক্ষ করি। আবার বামপন্থীদের সংগে মিলে পথ চলাও দায় হয়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য পি সি যোশীর সংগে পত্রাবলী শেষের দিকে তো সত্যি বলতে মুসলিম মানসের বৃহত্তর ভাগের সংগে বস্তুত উপসাগরোপম ব্যবধান, বিচ্ছেদ। খিলাফত থেকে চোদ্দ দফা - কিছুতেই আর সেতুবন্ধ সম্ভব হল না।

নিয়তির এও বড় পরিহাস, এই গান্ধীজীকেই পরে খণ্ডিত দেশে মুসলমানদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তার জন্য নিঃশেষে প্রাণ দান করতে হবে। পরিহাসের কথা যখন উঠলই তখন সসাহসে এও বলি, ভাব ভাবনার দিক থেকে তিনি বোধ হয় নেহরুর চেয়ে সুভাষচন্দ্রেরই ছিলেন নিকটতর। অথচ দ্বিতীয়ের সংগে নয়, প্রথম জনের প্রতিই তাঁকে বেশি উচ্ছ্বসিত দেখি। এমনকি নেতৃত্বের গড়গড়ার নলটি তিনি আয়ুর প্রদোষে বল্লভ ভাইয়ের হস্তেও ন্যস্ত করেননি। স্নেহ একরোখা, একমুখী। এ নিয়ে

আলোকচিত্র : অর্ধেন্দু রায়

প্যাটেলের চাপা অভিমান চিঠিপত্রে বিশেষ গোপন থাকেনি। নথি - বানচ অব ওলড লেটারস। আর সুভাষচন্দ্র? তিনি তো কবে থেকেই দূর থেকে দূরে : নেতাজী। জীবদ্দশায় চার চক্ষুর আর মিলন হলই না, হয়নি। হলে, দেশের ইতিহাস অন্য কোনও বাঁক নিত কি? সে শুধু অলস জল্পনা। আজ অনর্থকও।

আমরা যারা তখন কমবয়সী, গান্ধীবাদের প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করিনি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব মানবতার ধ্যানের পাশে গান্ধী-মূর্তিকে বলেছি অবসকিউর‍্যানটিসট। সাবরমতী আর ওয়ারধার মানুষটির অর্থনীতি, বিকেন্দ্রীকরণের উপদেশ, পত্রপাঠ নস্যাৎ। তবু এই পরিণত বয়সে ওই মূর্তিটি পুরাণের বামনাবতারের মত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে দিগবিদিক ব্যাপ্ত করে ফেলে। তাঁর আন্দোলনে আমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালাদের হাড়মাসে কতটা গত্তি লেগেছে, তা নিয়ে আর সমাজের গজগজানি নেই তো। ছাগদুগ্ধ পান, বিড়লাদের আতিথ্য গ্রহণ, সমস্ত একদা-উপহাস্য ব্যাপার মৌন-গৌণ হয়ে যায়।

কেন? মনে পড়ে যায় কিনা, ওই বিড়লা নিবাসেই তাঁর প্রাণহানি। প্রায় স্বেচ্ছামৃত্যু বলা যায়। নইলে ওই অকুস্থলেই বোমাবিস্ফোরণের পরও তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে গররাজি হতেন কি? পরিণাম তিনটি গুলি। আসলে তাঁর স্বপ্নের ভারত স্বাধীনতার ঊষায় ভূমিষ্ঠ হয়নি। তাই তো দিল্লিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আড়ম্বরের দিনে তিনি কলকাতায়, বেলেঘাটার বস্তিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যিনি একক সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করেন, সেদিন তিনি নিজেই একক সত্যাগ্রহী - সংগ্রামী।

বিড়লা হাউসের চেয়ে ঢের বেশি সত্য ডাংগি কলোনি। চৌরিচাওরার পর সবাইকে স্তম্ভিত করে যিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন, আগস্ট আন্দোলনের প্রেরণা তাঁরই। আর কারো সাহস ছিল স্বকীয় নেতৃত্বকে 'হিমালয়ান ব্লানডার' বলে স্বীকার করার? 'কুইট ইনডিয়া' কথাটা 'বন্দে মাতরম' আর 'জয় হিন্দ'-এর মতই জোরাল মন্ত্র।

সব ছাপিয়ে ওঠে সেই নিদন্ত হাসি। 'ডিজারমিং স্মাইল' কথাটা নেহরুই ব্যবহার করেছিলেন না? গান্ধী। একই অংগে শিশু আর বানিয়া। তিনি বানিয়া প্রতিকূল প্রতিপক্ষের সংগে দরদস্তুরে, যা দুঁদে কূটনীতিক আরউইন ওয়েভেল মাউনটব্যাটেন প্রভৃতির ঘটিয়েছে অস্বস্তি।

স্বাধীনতাপূর্ব আমলের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস : পরাধীন দেশের প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে উমেশচন্দ্র ব্যানারজির সভাপতিত্বে এর প্রথম অধিবেশন আহূত হয় এবং ঐ বছরেই এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের সময় এই দলের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিসট পারটি : মারকস ও লেনিনের মতাদর্শের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সালে এই দল ভারতবর্ষে গড়ে তোলা হয়। দলের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল 'The organisation of the toiling masses in the struggle for an anti-imperialist and agrarian revolution, for complete national independence, for the establishment of a people's democratic state led by the working class, for the realisation of the dictatorship of the proletariat and the building up of socialism according to the teachings of Marxism and Leninism.'

স্বরাজ্য দল : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে এবং পন্ডিত মতিলাল নেহরু ও এন সি কেলকারের সহযোগিতায় এই দল গড়ে তোলা হয়। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামী পারনেল-এর আদর্শে এই দল ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চেয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত সংস্কার আইন অনুযায়ী, ভারতবাসীর পক্ষে কাউনসিলে প্রবেশ করা উচিত হবে কিনা সেই প্রশ্নে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এই দল জন্মলাভ করে।

ফরওয়ারড ব্লক : ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তারই পরিণতি হিসেবে এই দল গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র এই দলগঠনের প্রস্তাব জনসমক্ষে ঘোষণা করেন।

হিন্দু মহাসভা : হিন্দু ধর্মের আদর্শ ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ : হিন্দু মহাসভার মত এই দলটিও মূলত হিন্দু মতাদর্শের পুনরভ্যুত্থানের জন্য গড়ে তোলা হয়। ১৯২৫ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম লিগ : ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার অভিপ্রায়ে ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার আগ্রহাতিশয্যে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এই দল এক সময়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে দলটি পুনরুজ্জীবিত হয়। □

সংকলক : ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

উক্তিকে ছাড়িয়ে ওই ব্যক্তি। রাজনীতিতেও পরিশুদ্ধি সাধনা ছিল যাঁর। আর আগেই বলেছি, তাঁর অসম সাহস। কোপীনবাস সম্বল করে লনডনের শীতে (বাকিংহাম প্যালেসেও) ভাবাই যায় না। তেমনই যায় না সেই তিরিশে জানুয়ারির দিনটি ভোলা। সেই ক্ষণে তিনি দধীচি। নিজের প্রত্যয়ের জন্যে নিজেকেই বলিদানের কথা পুরাণে ইতিহাসে খুব বেশি লেখে না, সোক্রাতেস, যিশু, লিংকন, মারটিন লুথার কিং — সেই লোকোত্তর মহিমার তালিকায় 'গান্ধী'। একটি উজ্জ্বল উদ্ধারোপম সংযোজন। আমরা ক'জন আমাদের বিশ্বাসের মান রাখতে অকাতরে প্রাণ দিই, দিয়েছি বা দিতে পারি — নিজেরা যা পারি না, অন্যে পারলে যেন অন্তত প্রাপ্য অর্ঘটুকু নিবেদন করি।

ব্যক্তি আর তাঁর উক্তি। আজ ভেবে দেখছি, তাঁর উক্তিগুলিকেই বা অগ্রাহ্য করার উপযুক্ত স্থান কবি কোন যুক্তিতে — মারকিন মঞ্চ। সমাবেশ থেকে ধার করা যে কংগ্রেসের নাম, যে কংগ্রেসের বেলগাঁও ছাড়া কোনও অধিবেশনে তিনি বোধ হয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেননি তাকে নগর থেকে পল্লীতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগও তাঁরই। দৃষ্টান্ত হরিপুরা, ত্রিপুরী। তবু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কংগ্রেস পুনরায় মহানগরমুখী। এই কলকাতা এলাকাতেই তো, যতদূর মনে পড়ে, সেই ১৯২৮ সালের পরে (সভাপতি মোতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র সৈনিক প্রতিম পরিচ্ছদে জি ও সি। নেতাজীতে রূপান্তরের সেই কি প্রথম আভাস?), কল্যাণী, (যদি ১৯৩৩ সালে চন্ড শাসকদের আঘাতে বস্তুত পন্ড আয়োজনকে হিশাবে না আনি), সলট লেক বা বিধান-নগর। মাঝে দুর্গাপুর ছিল অবশ্য তবে ওই শিল্পশহর পশ্চিমবঙ্গে হলেও বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত তো কোনমতেই নয়। এবার স্টেডিয়ম। নেতাজীর নামাঙ্কিত হলেও, সেই 'ইনডোর'।

এই 'ইনডোরত্ব' কি গান্ধীর — পারিকল্পের প্রকাশে বোধ হয় বাকি নেই, দেখাটোন উপলক্ষ কংগ্রেস, কিন্তু লক্ষ্য গান্ধীজী — তবু সেই ১৯২৮। একটি সাত বছরের শিশুর স্মরণ হয় হ্যারিসন রোডে বিশাল তোরণ 'স্বাগত মোতিলাল।' পারক সারকাসে বিশাল মেলাও, যেখানে সে হারিয়ে যায়। সেদিনের স্মৃতি আজ মধুর স্মৃতি। কিন্তু এই কংগ্রেস কি সেই কংগ্রেস — সেই দল বহু বিভাজিত, সতীদেহের মত কত যে খন্ডাংশে বিক্ষিপ্ত, তার সঠিক হিশাব রাখে। কোনটা সাচ্চা, ঝুটাই বা কোনটা — উত্তর হাতের কাছেই : দলের বৃহত্তম ভাগ যাঁর নেতৃত্বে একত্র, তাঁর নামও — একান্তই আকস্মিক কারণে — 'গান্ধী' এই পদবীযুক্ত। এবং অবশ্যই তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্রের। ইতিবৃত্ত পরিহাসরসিক, তার পরিক্রমাও বৃত্তাকার। মানে, গান্ধী থেকে সরে এসেও আবার 'গান্ধী'। নামটা কি অংগীকৃত কোনও অংগীকার। আর হতে পারে এই কংগ্রেস সেই কংগ্রেসের অংশমাত্র। তথাপি পূর্ণিমা না হলেও ত্রয়োদশী চতুর্দশী এখনও তো! এখনও কংগ্রেস বিরাট শক্তির আধার — ক্ষমতারও। জাতীয় স্তরে, কই, আজও তার সমর্থ বিকল্প দেখা গেল কই? বিরোধীরা ইতস্তত ক্ষমতায় আসীন হলেও থেকে থেকে জোট বাঁধার চেষ্টা সত্ত্বেও নানা ভাগে বিভক্ত। সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় পতাকার সঙ্গে কংগ্রেসি পতাকার পার্থক্য সামান্যই। তাই, ভাবীকালের সম্ভাবা ক্ষমতার জন্য অন্ধ মোহ-মমতা কিংবা কলহ মত্ততার কথা ভেবে গান্ধীজী যদি একদা এই দলটির বিলোপ বাসনা ব্যক্ত করে থাকেনও, তবু এই সমাবেশ ও উৎসব-উৎসাহের চিহ্নে মহা-সমাগম বা সমাবেশই এবং অন্তত নামের সরব গৌরবে এই কংগ্রেসও গান্ধীরই। যেমন দেশ, তেমনই দল খন্ডিত — সত্য। তবু আসমুদ্রহিমালয় এই ভূখন্ড যে বলকানের মত খান খান হয়নি; সূক্ষ্ম হলেও একটি সূত্রে আজও যে সে গ্রথিত, সেই কৃতিত্ব এই প্রধান দলটিরই প্রধানত। অরওয়েল সাহেবের নিদানের (১৯৮৪) মুখে ছাই দিয়ে ক্রিকেটের পরিভাষায় সেনচুরি করতে তার বিশেষ বাকি নেই — সে শতোত্তরজীবী! □

কী করে
কংগ্রেসে এলাম

'২১ বছর বয়স হবার আগেই কংগ্রেসে এসেছিলাম'
অতুল্য ঘোষ

আমি নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হই ১৯২২ সাল থেকে। কিন্তু তখনও কংগ্রেসের সদস্য হবার অধিকার আমার হয়নি। কারণ তখন ২১ বছর বয়স না হলে কংগ্রেসের সদস্য হওয়া যেত না।

আমাদের বাড়ির সামনে উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় ছিল। তাদের ছিল একটা ভাল লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরিতে যাতায়াতের সূত্রেই আমার সঙ্গে তৎকালীন নেতা রাজেন দেব, সুরেশ মজুমদার, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, হেমন্ত কুমার বসু প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁরা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

এর কয়েক বছর বাদেই আমি কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করি। প্রেরণা যা কিছু পেয়েছিলাম এঁদের কাছ থেকেই। বিপিন গাঙ্গুলি, অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত – যাঁরা একদা হিংসার পথে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদেরও আমি স্নেহের পাত্র ছিলাম। তখন হুগলি জেলার কংগ্রেস কর্মীরা কলকাতায় এলে উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটির অফিসেই উঠতেন। থাকতেনও ওখানে। সেই সূত্রে হুগলি জেলার বিভিন্ন নেতা যেমন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ডাঃ আশুতোষ দাস, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য

অতুল্য ঘোষ / আলোকচিত্র : জয়ন্ত চৌধুরী

কর্মীদের সঙ্গে আলাপ হয়। ঘনিষ্ঠতাও হয়।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে শ্রদ্ধেয় সুরেশদা এবং হেমন্তদা আমাকে বললেন, 'হুগলি জেলার জন্যে একজন কর্মঠ কর্মী দরকার। তুমি যাও। শ্রীরামপুরে একটা কংগ্রেসের অফিস করে কাজ আরম্ভ কর।' এরপর উত্তর কলকাতা জেলা কমিটির আড্ডা থেকে আমাকে স্থানান্তরিত হতে হল হুগলি জেলায়। যদিও কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের কলকাতায় বাস কিন্তু আসলে বাড়ি ছিল আমাদের হুগলি জেলাতেই।

শ্রীরামপুর যাবার পর সেখানে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। প্রথম দিকে আমি সেই কংগ্রেস কমিটির 'স্বেচ্ছাসেবক' হই। পরে সেই প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির সহসম্পাদক ও আরও পরে সম্পাদক নির্বাচিত হই। এইভাবেই আমার 'কংগ্রেস-জীবন' শুরু।

এই কালের মধ্যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সুনজরে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি তার স্নেহ ছিল বাৎসল্য স্নেহের মত।

শ্রীরামপুরের কংগ্রেস অফিস ধীরে ধীরে বিভিন্ন সত্যাবলম্বীদেরও আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমদা (বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় - পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা।), নির্মলদা (বোস), সন্তোষ মিত্র এবং আজকের দিনের খ্যাত অখ্যাত বহু কর্মী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আসা-যাওয়া ছিল ওখানে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়, বর্তমান মন্ত্রিসভার ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীও এর সংস্পর্শে এসেছিলেন। সি পি আই (এম)' দলের পার্লামেন্টারি নেতা বিজয় মোদক পাঁচ বছর আমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করেছেন। সুশীতল রায়চৌধুরী – যাকে নকশাল আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক বলা হয় তার সঙ্গেও ওই শ্রীরামপুরেই ঘনিষ্ঠতা হয়। যাঁদের সঙ্গে সে সময়ে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট হন এবং এখনও পর্যন্ত জীবিত আছেন তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এখনও পুরোপুরি বজায় আছে।

সরোজ এবং সুশীতল – এঁদের মত মৃদুভাষী লোক খুব কমই হয়। 'বিনয়' নামের সঙ্গে বিনয়ের স্বভাবের সাদৃশ্য এত বেশি যে আমরা অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতাম – তোর বাড়ির গুরুজনরা দূরদর্শী ছিলেন। তাই ঠিক নামই রেখেছেন।

আর তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক নেতা হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরে পারিবারিক নেতৃত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। আর বঙ্কিমদা, নির্মলদা ছিলেন যথার্থ অভিভাবক বলতে যা বোঝায়, তাই।

অবশেষে জেল ---- আন্দোলন - -- জেল। তারপর স্বাধীনতা। একটানা ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই ভাবেই জীবন চলে। কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হবার পর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখিনি। বর্তমানে 'বিধান শিশু উদ্যান' নিয়ে আছি। ভালই আছি।

অনুলেখন : পিনাকী মজুমদার

'বাবা-মা'ই আমাকে কংগ্রেসে অনুপ্রাণিত করেন' –
আভা মাইতি

একই জেলা থেকে বাবা ও মেয়ে দাঁড়িয়েছেন একই দলের হয়ে, কিন্তু বাবা হেরেছেন, মেয়ে জিতেছেন। এ দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ইতিহাসে বিরল। ঘটনাটি ১৯৫২ সালের মেদিনীপুর জেলায়। স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সেবার পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের আটজন মন্ত্রী হেরেছিলেন। তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট নেতা নিকুঞ্জ বিহারী মাইতিও ছিলেন। কিন্তু মেয়ে আভা মাইতি ঐ জেলারই ভগবানপুর থেকে নির্বাচিত হন। আবার ৫৭ সালে ঠিক উল্টো হল। বাবা নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি জিতলেন, কিন্তু মেয়ে আভা মাইতি হারলেন, সেই মেদিনীপুর জেলা থেকেই। এ এক অদ্ভুত ট্র্যাজিক ইতিহাস।

কথা বলছিলাম আভা মাইতির সঙ্গে তার কলকাতার দর্জিপাড়ার বাড়িতে। প্রশ্ন করেছিলাম কংগ্রেসে এলেন কী করে?

'সে অনেক কথা' হাসতে হাসতে বলে উঠলেন আভা মাইতি। তবুও ছোট করে বলছি। অতীতের কথা বলতে পারব না, তবে বাবার আমল থেকেই শুরু করছি। বাবারা ছিলেন দুভাই। আমার তিন পিসি। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক, গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাবা শিক্ষকতা ছেড়ে নেমে পড়লেন স্বদেশী আন্দোলনে। বাবা প্রথম কাজ করেন দেশপ্রাণ শাসমলের নেতৃত্বে। মা অহল্যা মাইতিও ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সৈনিক। তখনকার দিনে মেয়েদের পক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল। সে সময়ই কিন্তু মা এগিয়ে এসেছিলেন বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। বাবা প্রথম জেলে যান ১৯২১ সালে। এর পর ছয়বার জেলে গেছেন। তারপর ৪৬-এর ছায়া মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করেন। তার পর থেকে বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন। এছাড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। সত্তর সালে রাজনীতি থেকে অবসর নেন, সাতাত্তর সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। বাবা প্রথম যাঁদের সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে আজ অনেকেই নেই। তবে ডক্টর রাসবিহারী পাল ও সুধীর দাস আজও রয়েছেন। এই হল আমাদের পরিবারের প্রথম কথা।

আভা মাইতি বলতে লাগলেন, ১৯২৫ সালে মেদিনীপুরে কলাগাছিয়া গ্রামে আমার মামাবাড়িতে আমার জন্ম। ১৯৪০ সাল – বাবা জেলে গেছেন খবর পেয়ে আই এ পরীক্ষা আর দেওয়া হল না, তখন পড়তাম বেথুন কলেজে। ফিরে যেতে হল বাড়িতে। একদিকে ঘর আর একদিকে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সালটা খুব সম্ভবত ৪১। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজে ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা, আমি একমাত্র মহিলা বক্তা, প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখলাম। এই শুরু হল আমার রাজনীতির জীবন। ৪২-এর ১৬ অকটোবর কাঁথির ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঘূর্ণি ঝড়, আমি রিলিফের

কাজে নেমে পড়লাম। এই সময় কোন আত্মীয়স্বজনের সাহায্যই আমরা পাইনি। ডাঃ রাসবিহারী পালের আশ্রয়ে মা ও আমরা তিন বোন উঠেছিলাম। ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, সে এক করুণ কাহিনী। যাক সে কথা। ৪৪ সালে বাবা জেলে অসুস্থ হলে চলে এলাম কলকাতায়। ইতিমধ্যে প্রাইভেট-এ বি এ পাশ করেছি। আইন পড়তাম, আর ছাত্র সংসদের সদস্য হিসাবে কাজ করতাম। আমাদের সংসদের সভাপতি ছিলেন শহীদ শচীন মিত্র। তখন যেসব নেতার সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৮-এ প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য হলাম ও মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হলাম। এ ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে নেমে এল দাঙ্গা, রিলিফের কাজে নেমে পড়লাম। ৪৬ এ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই গান্ধীজী গেলেন কাঁথি ও তমলুকে। আমি সেবারই গান্ধীজীকে প্রথম দেখি। গান্ধীজী যেখানে ছিলেন সেখানে মহিলা ক্যাম্পে ছিলাম। এইভাবেই আমার কংগ্রেস জীবন শুরু।

প্রঃ — প্রদেশ কংগ্রেসে আপনাকে কে নিয়ে আসেন?

উঃ — অতুল্য ঘোষ।

প্রঃ — কবে ও কীভাবে বিধানসভার প্রার্থী হলেন? কতবার হয়েছেন?

উঃ — ডাঃ রায় তখন পশ্চিমবাংলার কর্ণধার। কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা দিল্লিতে পাঠিয়েছেন নেতৃবৃন্দের কাছে, তালিকায় আরো কিছু মহিলা প্রার্থী দরকার। ফলে মহিলা প্রার্থীর খোঁজ শুরু হল।

হঠাৎ শ্রীমতী রেণুকা রায় (ত্রাণ মন্ত্রী) আমাকে ডেকে বললেন তোমাকে বিধানসভায় দাঁড়াতে হবে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানা থেকে। আমি তো অবাক, এত অল্প বয়সে দাঁড়াব। ভাবতেই পারছি না। যাই হোক, দাঁড়ালাম এবং জিতলাম। জীবনে ছ বার জিতেছি, চারবার হেরেছি। বিধানসভায় ৭১-এর হেরেছি লোকসভায়, ৭৭-এ জিতেছি। মন্ত্রী একবার রাজ্যে ও একবার কেন্দ্রে হয়েছি। দাঁড়াইনি কেবল ৮২ সালে। ৬০ সালে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি হই। ৬০-এর শেষ দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক। সে সময় কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডি।

প্রঃ — কংগ্রেস ছাড়লেন কবে?

উঃ — কংগ্রেস ছাড়িনি। ৬৯ এ ইন্দিরা গান্ধী ভাগাভাগি করলেন। আমরা রয়ে গেলাম আদি কংগ্রেসে। ৭৭ এ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলি মিলে একটি বিকল্প দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দলের নাম জনতা পারটি। কংগ্রেসও (আদি) তার মধ্যে ছিল। দল ছেড়েছি কথাটা ভুল। আজ আমি পশ্চিমবঙ্গ জনতা পারটির সভাপতি।

প্রঃ — ৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ হবার পর শ্রীমতী গান্ধী পেলেন জাতীয় কংগ্রেস। এটা কি সত্যি?

উঃ — হ্যাঁ। তবে নির্বাচন কমিশনারের রায় অনুসারে। সেই অনুসারেই আমরা হয়ে গেলাম কংগ্রেস (সংগঠন)।

প্রঃ — জরুরী অবস্থার সময় আপনার ভূমিকা কী ছিল?

উঃ — পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কমিটি করে জেলায় জেলায় ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করি। আমরাই প্রথম মহাজাতি সদনে ও ময়দানে জয়প্রকাশ নারায়ণকে এনে সভা করি।

প্রঃ — মন্ত্রী থাকাকালীন আপনি দেশের জন্য কী ভাল কাজ করেছেন?

উঃ — নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য স্কুলের প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কো-এডুকেশন প্রথা চালু করার প্রস্তাব রাখি। ৬২ সালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহের চাঁদ খান্নার কাছে যে প্রস্তাব রাখি তা আংশিক সাফল্য লাভ করে। বৃদ্ধদের পেনসন প্রথা চালু করি। একদিনে সারা রাজ্যে নির্বাচন করার প্রস্তাব আমিই রেখেছিলাম।

প্রঃ — আজ যদি আবার আপনাকে কংগ্রেস (ই) ডাকে যাবেন কি?

উঃ — এখনই বলা সম্ভব নয়। দেশের পরিস্থিতি কী হবে তার ওপর নির্ভর করছে।

প্রঃ — আজকের কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে বিশৃংখলা স্পষ্ট, সেই সম্পর্কে কী মত আপনার?

উঃ — ৬৯ সালের আগে কংগ্রেসের এই চেহারা ছিল না। সেই সময় কংগ্রেসের মধ্যে নীতি ও আদর্শবোধ মেনে চলা হত, কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল না তা একবারে নয়। কিন্তু আজকের কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে সেই আদর্শ ও নীতির অভাব খুবই। বর্তমানে দুর্নীতি বহুগুণ বেড়ে গেছে।

প্রঃ — রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন কে?

কী করে কংগ্রেসে এলাম

উঃ — বাবা।

প্রঃ — বিরোধী নেতাদের সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী?

উঃ — বিরোধী নেতারা কোন ভাল রোল প্লে করতে পারছেন না। ওদের নিজেদের মত ঠিক রাখতে পারেন না, তাই ওদের সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই খারাপ।

প্রঃ — এখন আপনার সংসার চলে কী করে?

উঃ — বাড়ির সম্পত্তি কিছু আছে তাই থেকে আমার সংসার চলে।

প্রঃ — যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি — বিয়ে করলেন না কেন?

উঃ — করা হয়নি, কোন কারণ নেই, বাবা মা এ ব্যাপারে একবার চাপ দিয়েছিলেন, উত্তরে বলেছিলাম অনেকেই তো করে না, না করলে ক্ষতি কী?

প্রঃ — অবসর সময় কাটে কী করে?

উঃ — রান্না ও গল্পের বই পড়ে। তবে দেশবিদেশের ইতিহাস পড়তে ভাল লাগে। □

সাক্ষাৎকার :
মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

‘সমাজ সেবা করতে করতে কংগ্রেসে এসেছিলাম’ — ডঃ ফুলরেণু গুহ

বৃটিশের হাত থেকে পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, নিজের অজান্তেই বহু মানুষ সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাই, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বর্তমানে এ আই সি সি-র সদস্যা দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস কর্মী এবং বহু মহিলা ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ডঃ ফুলরেণু গুহকে যখন জিগেস করেছিলাম কবে, কীভাবে কংগ্রেসে এবং স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, উত্তরে ডঃ গুহ জানালেন, ‘ঠিক কবে যে জড়িয়ে পড়লাম আমি নিজেই জানি না। যদিও আমার জন্ম এই কলকাতায়, দাদামশাই-এর বাড়িতে, ১৯১১ সালের ১৩ আগস্ট। কিন্তু আমার বাবা সুরেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারি চাকরির দরুন আসামেও ছিলেন, ওঁকে আসামের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে হয়েছে। আমাদেরও আসাম যেতে হয়। কিন্তু ওখানে পড়াশুনার অসুবিধার জন্য কলকাতার ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে এবং পরে কিছুদিনের জন্য গোখেল স্কুলে পড়ি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালে সিলেট স্কুল থেকে ফাইনাল পরীক্ষা দিই।

কলকাতা, বরিশাল ও সিলেটে থাকাকালীন আমি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে একটু একটু করে জড়িয়ে পড়ি। আমরা ছিলাম অশ্বিনীকুমার দত্তর বংশের। অশ্বিনী দত্তর প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল। তার পর, যখন আমার আট ন বছর বয়েস তখন বরিশালে আমাদের বাড়িতে চারণকবি মুকুন্দ দাস আসতেন, স্বদেশী গান শোনাতেন। তাছাড়া সন্ধেবেলায় মার কাছে গোখেল, তিলক, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর-এর কথা শুনতে শুনতে আমিও মনে প্রাণে স্বদেশী হয়ে উঠতে লাগলাম। এর মধ্যে একটা ঘটনা আমার শিশুমনে ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল। শিলচরে আমরা থাকি। এক ভীষণ ঝড়জলের রাত্রে একটা ছেলে এল আমাদের বাড়িতে। লোকজন তো হৈ হৈ করে উঠল। ছেলেটি মার সঙ্গে খুব চাপা গলায় আস্তে আস্তে কী সব বলল। ছেলেটা দুদিন ছিল। শুনলাম, শরীর খারাপ বলে আমাদের বাড়িতে আছে। একদিন সকালে উঠে দেখলাম ছেলেটা নেই। পরে শুনেছিলাম ছেলেটি পলাতক বিপ্লবী। তার পর ধরো, ১৯২৩ কি ২৪ সাল, এখন ঠিক মনে নেই, শ্রীহট্ট শহরে এলেন

কী করে কংগ্রেসে এলাম

সরোজিনী নাইডু, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আচার্য পি সি রায়। ওঁদের বক্তৃতা শুনে আমরা ছেলেমেয়েরা সব পাগল, আবার, বোধহয় ১৯২৬ কি ২৭ হবে, কলকাতার উডবারন পার্কে জেলাঞ্জন নিয়োগীর স্লাইডসহ স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বক্তৃতা শুনে মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠত।

প্রশ্ন করলাম, 'শুনেছি আপনি যুগান্তর দলের সংগে যুক্ত ছিলেন?'

'হ্যাঁ সে তো স্কুল থেকেই যুক্ত ছিলাম। আমার সব ভাইরা ওই দলে ছিল। স্বদেশী মুভমেন্টের ওপর বই, পত্রপত্রিকা পড়তাম, পরে কাজকর্ম করেছি।'

'কী কাজ করতেন?'

'প্রথম প্রথম গোপনীয় কাগজপত্র, জিনিস রাখতাম। পরে ওদের অস্ত্রশস্ত্র যেমন ধর রিভলবার, লুকিয়ে রাখতাম তার পর একটু যখন বড় হলাম তখন নেতাদের লেখা নকল করতাম, যা বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হত। বিশেষ করে স্বাধীনতা পত্রিকার জন্য পাঠাতে হত। তার পর যখন বরিশালে গেলাম ১৯৩০ সালে, তখন শহরে খুব উত্তেজনা, চারিদিকে জোর আন্দোলন শুরু হয়েছে। পুলিশের নজর পড়ল আমার ওপর। আমার জেঠিমা কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সংগে সংগে শহর থেকে আমায় গ্রামে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা ছিলেন না, নিতান্তই সাদাসিধে গ্রাম্য মহিলা, কিন্তু সেদিন যদি জেঠিমা বুদ্ধি করে আমায় না সরাতেন তবে পুলিশের হাতে ধরা পড়তামই। তার পর বহু কষ্ট করে, বাবার এক মুসলমান ডি এম বন্ধুর সাহায্যে পাশপোর্ট যোগাড় করে আমাকে ইংল্যান্ডে পাঠান হল। তখন আমার এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় শেষ।

সেদিন ইংল্যান্ডগামী জাহাজে অন্যান্যদের সংগে আমার সংগী ছিলেন এখনকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তখন অবশ্য জ্যোতিবাবুর রাজনীতির সংগে কোন সম্পর্ক ছিল না। ইংল্যান্ডে গিয়ে আমি লনডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্ট্যাডিজে সোশ্যাল সিসটেমের ওপরে কাজ শুরু করি। ওখানে গিয়ে দেশের থেকে আমার কমিউনিসট বন্ধুদের দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ওখানকার কমিউনিসট পারটির সেকরেটারি বেন ব্র্যাডলের সংগে আলাপ করি, পরে প্রমোদ সেনগুপ্তর সংগেও আলাপ জমে ওঠে। পরবর্তীকালে এই প্রমোদ সেনগুপ্ত নকশাল হয়েছিলেন। লনডনে থাকাকালীন বেশ কিছু স্পেন রিফিউজি এসেছিল, ডঃ শশধর সিংহের মাধ্যমে তাদের রিলিফের কাজে জড়িয়ে পড়ি। অবশেষে প্যারিসের সারবোরন ইউনিভারসিটি থেকে ডক্টরেট করে পায় [illegible] ফিরে এলাম।

'ফিরে আসার পর কি [illegible] সমাজসেবার কাজ শুরু করলেন?'

'সমাজসেবা [illegible] সংগে রাজনীতি করার ইচ্ছা [illegible]। তখন ৩৮ সাল, সেবার [illegible] মেডিকেল ইউনিটে যোগ দিলাম। যুদ্ধ বাধবার পর, এটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-বিরোধী লিফলেট প্রকাশ করার সংগে যুক্ত ছিলাম। সরকারের কাছে ওইসব লিফলেট এবং আমাদের যে প্রেস ছিল তা বেআইনি। একদিন পুলিশ এসে প্রেস বন্ধ করে দিল এবং আমাদের বহু সহকর্মীকে গ্রেফতার করল। আমি খবর পেয়ে বিহারের মুংগেরে চলে গেলাম, কারণ এখানে থাকলে গ্রেফতার হতে হত। পরে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তারা পিপলস ওয়ারে যোগ দিতে চাইলে সরকার কেসটা তুলে নিল, আমি আবার কলকাতায় ফিরে এলাম।'

প্রশ্ন করলাম 'কংগ্রেসের কাজ শুরু করলেন?'

'হ্যাঁ, চিরদিনই কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছি। তবে যদি জিগ্যেস কর করে কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে জড়িত হলেন, তা বলতে পারব না, কারণ কাজ করতে করতে করে যে কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছি তা নিজেই জানি না।'

'আপনার সংগে তো কমিউনিসট দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, আপনি কমিউনিসট পারটিতে না গিয়ে কংগ্রেসে এলেন কেন?'

'দেখ বার বার আমার মনে হয়েছে যে, দেশে যারা কাজ করবে, তাদের দেশের রাজনীতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুসারে, কমিউনিসটরা দূরে বসে অরডার করবে, আর সেইমত আমাদের কাজ করতে হবে এটা কোনদিনই আমার পছন্দ ছিল না। তবে কংগ্রেসের সংগে আমার যুক্ত হবার মূল কারণ, ওই যে একটা মুভমেনট হত, ওই সব মুভমেনটে এত লোক জড়িত হয়ে যেত, এটা আমার জীবনে একটা ইমপ্রেসান। বিভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের ভিড় আমার মনে ভীষণ একটা প্রভাব ফেলত।'

'আপনি ১৯৪২ র আন্দোলনে কীভাবে অংশগ্রহণ করেছেন?'

'আমি খুব যে একটা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ছিলাম তা নয়, তবে টাকা পয়সা জোগাড় করা, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এইসব করতাম।'

'এরপর ছেচল্লিশের দাংগার সময় কীভাবে কাজ করেছিলেন?'

'দাংগার প্রসংগে যাবার আগে ৪৩ সালের শেষের দিকে বা ৪৪ র একেবারে প্রথমদিকে যে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার কথা বলি। তখন আমরা কংগ্রেস থেকে বিভিন্ন জায়গায় ক্যামপ খুলেছি নিরন্ন মানুষদের খাবার দাবার দেবার ব্যবস্থা করেছি সাহায্য করেছি, জান, এমন দৃশ্যও চোখে পড়েছে, যে মা মরে গেছে কিন্তু কোলের শিশুটি মৃত মার স্তন চুষে চলেছে। দুর্ভিক্ষ শেষ হতে না হতেই ৪৬ সালে শুরু হল হিন্দু মুসলমানের ভয়ংকর দাংগা। আমাদের দক্ষিণ কলকাতার লেক মারকেট কংগ্রেসের অফিসের কাছে যে সব মুসলমান বাস করত, তাদের নিরাপদ স্থানে পাঠানর ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল দাংগায় বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য। আশুতোষ কলেজের রিলিফ সেনটার খোলা হল, আমাকে ভার দেওয়া হল এই সেনটারের পরিচালনার ব্যাপারে। দেখেছি, চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত সুস্থ মানুষকে শোকে পাগল হয়ে যেতে। তার পর একদিন কুমিল্লা, নোয়াখালি থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। ছুটে গেলাম সেখানে ত্রাণের কাজের জন্য। আমাদের দ্বিতীয় ক্যামপ হল লক্ষ্মীপুরে। গান্ধীজী এলেন। তার পর একদিন সব শান্ত হল। দেশভাগ হল, স্বাধীনতা এল। আমাদের ত্রাণের কাজ কিন্তু বন্ধ হল না, কারণ পূর্ববাংলা থেকে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু মানুষ আসতে লাগল। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় সাহায্য করতে লাগলাম। একটু সামলে উঠতে না উঠতেই হল ৬২ সালের চীনা আক্রমণ।

তখন প্রায়ই কংগ্রেস অফিসে যেতে হত। একদিন অতুল্যবাবু আমাকে ডেকে জানালেন যে আমাকে ওঁরা রাজ্যসভায় পাঠানর জন্য স্থির

কী করে কংগ্রেসে এলাম

করেছেন। এর আগেও দুবার আমার কাছে এম পি হবার জন্য প্রস্তাব এসেছিল তবে তেমনভাবে নয়। তাই গুরুত্ব দিইনি। স্বয়ং অতুল্য ঘোষের কাছে থেকে এইরকম প্রস্তাব পেয়ে আভা মাইতিকে বললাম, এতে আমার সমাজসেবার কাজের কোন ক্ষতি হবে না তো। আভা এবং অন্যান্যরা আমাকে বলল, না কোন ক্ষতি হবে না, বরং কাজের সুবিধে হবে। এর পর আমি রাজ্যসভার সদস্য হলাম। এবং ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হলাম। আইন ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী।

আমার শেষ প্রশ্ন, 'স্বাধীনতার **পরবর্তীকালে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?'**

'স্বাধীনতার সময়ে কংগ্রেস তথা সমগ্র জাতির মধ্যে যে জাতীয়তা বোধ জেগে উঠেছিল, বিশেষ করে মেয়েরা যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিল, এখন সে জাতীয়তাবোধ কী পর্যায়ে আছে তা বোঝা বেশ কঠিন। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন জ্বলছে। বিদেশি শক্তি দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। দেশের মানুষের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। শিশুর খাদ্যেও ভেজাল দেওয়া শুরু হয়েছে। আর কংগ্রেস তো একটা বড় দল, সুতরাং সেখানেও কিছু কিছু গোলমাল হচ্ছে। তবে কোনদিন ভাবিনি যে স্বাধীনতা দেখে যেতে পারব, কিন্তু স্বাধীনতা দেখলাম। দেশের নয় নয় করেও উন্নয়নের কাজ হয়েছে। যদিও আরো হওয়া উচিত ছিল। তাই আমি আশাবাদী, একটা দেশের জাতির জীবনে উত্থানপতন হয়, কিন্তু সুদিন আসে। এক্ষেত্রেও আসবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ☐

সাক্ষাৎকার : সঞ্জয় সিংহ

'মনের দিক থেকে ছিলাম বামপন্থী'—প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি

কংগ্রেসে তো বটেই, রাজনীতিতে এত রেকরড কেউ করেননি। নিজের কথাতেই প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি বললেন, সুনীল গাভাসকার ক্রিকেটে এই সেদিন নতুন রেকরড করলেন। আমি ২৭ বছর বয়সের মধ্যে যেসব রেকরড করেছি সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বা কোন নেতা পারেননি।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি অন্তত এক দশক ধরে যুব-ছাত্র মহলে একটি নাম। পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ছেলে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, আমাদের বাড়িটা কিন্তু স্বদেশী বাড়ি। মা বেণুকণা ছিলেন কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। বাবা প্রয়াত জ্যোতিরিন্দু বরিশালের অশ্বিনী দত্তের অনুগামী। অশ্বিনী দত্তের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের কাজ করেছেন, চাকরি করেননি। আমাদের বাড়িতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে বহু নেতা এসেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং অতুল্য ঘোষও এসেছেন।

স্কুলে পড়ার সময় নাটক, গান বাজনা, আবৃত্তি খেলাধুলো নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াতাম। আবৃত্তি করে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। সুনির্মল বসুর একটা কবিতা 'গান্ধীজী এসো ফিরে' আবৃত্তি করে খুব প্রশংসা পেয়েছিলাম। যখন ক্লাস টুতে পড়ি তখন একটা শ্লোগান আমার কানে বাজত 'উর্দু নয়, বাংলা চাই।' ছেলেবেলার আর একটা শ্লোগান আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল—'নইলে গদি ছাড়তে হবে।'

প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি। আলোকচিত্র : [illegible]

মনের দিক থেকে ছিলাম বামপন্থী। এন সি সি করতাম। এন সি সি-র সিনিয়র আনডার অফিসার হয়েছিলাম। সেজদা ছিলেন বিমান বাহিনীতে। সেজদা চিঠি লিখত, চীনা আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে ওর বন্ধুরা কীভাবে প্রাণ দিচ্ছে। আমার মধ্যে তখন একটা দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটছে। তখন রায়গঞ্জের কলেজে পড়ি। ছাত্র পরিষদের সংস্পর্শে এলাম।

১৯৬২ সালে ছাত্র পরিষদের সদস্য হয়েছি। সেই বছরই রায়গঞ্জ মন্ডল কংগ্রেস কমিটির চার আনার সদস্য হলাম। ১৯৬৩ সালে রায়গঞ্জ মহকুমা ছাত্র পরিষদের সম্পাদক। তার পর চলে এলাম কলকাতায়, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ার জন্য। **১৯৬৪ সালে** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ অর্ধেক ছাত্র পরিষদের দখলে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে আরটস বিলডিংসে আমি সভাপতি হলাম আমিই একমাত্র 'ত্রিমুকুট' পেয়েছিলাম তিনটি পদ দখল করে।

সি পি আই (এম)-এর যুব নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ক্লাস রিপ্রেজেনটেটিভ নির্বাচনে আমার কাছে হেরে যায়। সেই বছর আমি পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হলাম। শ্যামল ভট্টাচার্য তখন ছাত্র পরিষদের সভাপতি।

আমি ছাত্র পরিষদের সভাপতি হলাম ১৯৬৮ সালে ৮ মে। তখন আমাদের কংগ্রেস ভবনে ঢোকার অনুমতি ছিল না।

ছাত্র পরিষদ গঠনের ব্যাপারে তখন কংগ্রেস নেতারা আমল দেননি। যে সময় কংগ্রেসের নাম করলে মার খেতে হয়, সেই সময় ছাত্র পরিষদ করেছি। আমাদের কর্মীরা কমিউনিসটদের হাতে মার খেয়েছে। কিন্তু আমরা পিছিয়ে আসিনি। আমরা বুঝেছিলাম একবার পিছিয়ে এলে আর কোনদিন এগিয়ে যেতে পারব না।

আমরা কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশের কথা না ভেবে ছাত্রদের স্বার্থে আন্দোলনে নেমেছি। ছাত্ররা দেখেছে শুধু বামপন্থী ছাত্র সংগঠন নয়, ছাত্র পরিষদও ছাত্রদের কথা বলছে। ছাত্র পরিষদ প্রশাসন বা ক্ষমতাসীন দলের লেজুড় নয়, ছাত্র পরিষদ অনেক কলেজের নির্বাচনে জয়ী হল। কলকাতার রাস্তায় ফ্ল্যাগ ফেসটুন নিয়ে শোভাযাত্রা বের হল।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ছাত্র পরিষদ নেতাদের কংগ্রেস ভবনে ঢুকতে দিলেন ১৯৬৮ সালে। তখন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসাবে আমার জীবনে স্মরণীয় দিন ১৯৬৫ **সালের ১৮ এপরিল। ছাত্র পরিষদের** সংগঠন-সভা করে রহড়া থেকে **ফিরছিলাম।** সি পি আই (এম)-এর সমালোচনা করেছিলাম আর বন্দে মাতরম শ্লোগান দিয়েছিলাম এই ছিল আমার অপরাধ। সেদিন রাত্রে রহড়ায় সি পি আই (এম) লোকের হাতে মার খেলাম। সে কী প্রচন্ড মার! বুকের পাঁজরা ভেঙে গেল। বাঁ হাত এখনও ভাঙা, কিডনি জখম হল। রাস্তার ধারে ওরা আমাকে **ফেলে রেখে পালাল। ভাবল, আমি মরে গিয়েছি।**

আমাকে বাঁচাতে কিন্তু রহড়ার মানুষই ছুটে এসেছিল। আমি সব সময় আমার আপনজন জনসাধারণকে কাছে পেয়েছি। আমি বুঝলাম, সাধারণ মানুষের কথা বললে সাধারণ মানুষও কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াবে।

ছাত্র পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য হয়েছিলাম ১৯৬৭ সালে। পরিষদের সভাপতি হয়েছিলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ভোটে জেতার পর তখন কংগ্রেস এম এল এরা আর রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে যেতেন না। ভোটারদের কাছে যাওয়াটা যেন দলের নীতির পরিপন্থী। ক্ষমতাসীন দল হলেও কংগ্রেসের যে আলাদা একটা ভূমিকা আছে এটা অনেকে বুঝতে চাইতেন না, কিংবা বিশেষ স্বার্থে তা করতেন না। সেদিন যাঁরা কংগ্রেসের নীতির বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা করেছেন, সরকারি শাসনযন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা নেতাদের বিষ নজরে পড়েছেন।

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এলেন। কংগ্রেস ভবনে মিটিং। অতুলদা মানে অতুল্য ঘোষ আমাকে দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, এই ছেলেটি ছাত্র পরিষদের ভাল সংগঠক, ভাল ছেলে। একে দেখ।

প্রিয়রঞ্জন সংগঠন গড়তে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। আজও ঘোরেন। ওর ধারণা, গ্রামই মূল শক্তি। 'গ্রামে চল' আন্দোলনের কর্মসূচি তুলে দেন যুব কংগ্রেসের হাতে।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনেক। ছাত্র পরিষদের কাজ করতে করতে কতদিন মহাজাতি সদনে চাটাই পেতে রাত কাটিয়েছেন। হ্যারিকেনের আলোয় কবিতা লেখেন, উপন্যাস লেখেন, গল্প প্রবন্ধ পড়েন। আবার বিপদের দিনে একা গ্রামের মানুষের পাশে ছুটে যান। আবার কংগ্রেসের মিটিং থেকে ছোটেন মোহনবাগান ইসটবেংগল, ভারত ওয়েসট ইন্ডিজের টেসট খেলা দেখতে। প্রিয়রঞ্জন রাজনীতিতে আলাদা চরিত্র।

সত্যি সত্যিই প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি অনেক নতুন রেকরড করেছেন। ২২ বছর বয়সে ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। ২৬ বছর বয়সে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ৩২ বছর বয়সে কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির সদস্য। ☐

সাক্ষাৎকার : বিশেষ সংবাদদাতা

'চীন আক্রমণই আমাকে কংগ্রেসে নিয়ে এসেছিল' — প্রদীপ ভট্টাচার্য

সত্তরের দশকের যুব নেতাদের তালিকায় প্রদীপ ভট্টাচার্য একটি বিশিষ্ট নাম। বাহাত্তরে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর যুব-ছাত্ররাই কংগ্রেসের রাজনীতিতে সগর্জে ছড়ি ঘুরিয়েছেন, গোষ্ঠী লড়াইও জোরদার হয়েছে। বিবৃতি-পালটা বিবৃতির বৃষ্টি চলছে তখন। প্রদীপ ভট্টাচার্য গোষ্ঠীতে ছিলেন ঠিকই কিন্তু বিবৃতির লড়াই থেকে শতহস্ত দূরে। হৈ চৈ করে রাজনীতি করার লোক প্রদীপবাবু নন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, রুচিবান, বিচক্ষণ, লেখা-পড়া করা ঠান্ডা মাথার ছেলে।

কথায় কথায় প্রদীপবাবু বললেন আমার কিন্তু রাজনীতি করার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বাসনা ছিল লেখাপড়া করে শিক্ষকতা করব, এখন অবশ্য কলেজে শিক্ষকতা করছি। ডকটরেট করার চেষ্টা চালাচ্ছি। যাই হোক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম বিশেষ একটা সন্ধিক্ষণে। ১৯৬২ সাল। বীরভূমে সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ি — প্রি ইউ। বছর আঠার বয়স। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ ঘটছে। কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। আকর্ষণ কংগ্রেসের প্রতি, জাতীয়তা-বাদী রাজনীতির প্রতি। যুক্ত হলাম ছাত্র পরিষদের সংগে।

বীরভূম টকিজ-এ ছাত্র পরিষদের সম্মেলন হল। কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন শ্যামল ভট্টাচার্য আর প্রদেশ ছাত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ প্রিয়রঞ্জন দাশমুনসি। সেই সম্মেলনে ভাল বক্তৃতা করেছিলাম। কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে জিতলাম, সম্পাদক হলাম।

বাংলায় অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করে এম এ পড়তে চলে এলাম বর্ধমানে। ১৯৬৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম।

বর্ধমানে নতুন পর্যায় শুরু হল। বর্ধমান হল সি পি আই (এম)-এর দুর্গ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ফেডারেশনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তুহিন সামন্ত তখন আমাদের নেতা। বীরভূমে কংগ্রেস রাজনীতি-তে আমাকে এনেছিলেন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মদুলা। আমার প্রেরণা আমার মা। স্বদেশী আন্দোলনের গল্প শুনেছি মা'র কাছে।

বর্ধমানে এসে আমি পুরোপুরি কংগ্রেসী রাজনীতিতে [illegible]

প্রদীপ ভট্টাচার্য। আলোকচিত্র : অভিজিৎ দাস

[illegible]। '৬৭তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদকের পদে দাঁড়িয়েছিলাম, [illegible] গেলাম। '৬৮তে [illegible] পদের নির্বাচনেও পরাজিত হয়েছি। কিন্তু ছাত্র পরিষদের শক্তি সংহত হল।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ জনকে নিয়ে আমাদের একটা গোষ্ঠী ছিল। গোলাপবাগে বসে নিজেদের মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা চক্র বসত। চারণ নামে নাট্যাভিনয় গোষ্ঠী ছিল। জ্যোতির্ময় মজুমদার নাটক লিখত, সবাই অভিনয় করতাম।

আমি নিয়মিতভাবে মার্কস, লেনিন, গান্ধী, নেতাজী পড়তাম।

আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বসন্তের টিকা দিতাম, নিরক্ষরদের স্কুল চালাতাম।

গোটা বর্ধমান জেলা তখন মার্কসবাদীদের কবলে। [illegible] পরা লোকের পাশে দাঁড়াতে [illegible] ভয় পেত। ছাত্র পরিষদ বললে খুন হতে হত। গোপনে সংগঠনের কাজ করতে হত।

বর্ধমানে সি পি আই (এম)-এর হাতে অনেক মার খেয়েছি। ১৯৬৯ [illegible] ৯ জুলাই [illegible]। এখনও ছোরার দাগ আছে, চোখের কোণে, কানের পাশে, মাথায়, সারা গায়ে। পুলিশ আমাকেই ধরে নিয়ে গেল। ৩০৭ ধারার আসামী। থানায় একটা বেনচিতে শুইয়ে দিয়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। 'সি পি আই (এম)-এর গুন্ডাদের' ভয়ে সেদিন কোন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করতে রাজি হননি। সেদিন ডাঃ বুদ্ধদেব সাহস করে আমার চিকিৎসা [illegible] এগিয়ে এসেছিলেন [illegible] না, যেখানে [illegible]

ক্ষত স্থান সেলাই করলেন, ইনজেকশন দিলেন।

পরের দিন সি পি আই (এম) ছাড়া সমস্ত আইনজীবী আমার জামিনের জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন।

একবার কথা হয়েছিল প্রিয় প্রদেশ ছাত্র পরিষদের সভাপতি হবে, আমি সাধারণ সম্পাদক। প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতা হতে দিলেন না, বললেন, মফস্বলের ছেলে সাধারণ সম্পাদক হবে কী করে? কলকাতায় তো ওর কোন থাকার জায়গা নেই।

সেদিন বুঝেছিলাম রাজনীতিতে নৈতিকতা, বিচক্ষণতা, সাহসিকতা সব নয়: রাজনীতিটা কলকাতা কেন্দ্রিক। কলকাতায় বসে গ্রামের রাজনীতি করতে পারলে নেতৃত্বে আসা যায়।

তবু বর্ধমান ছাড়িনি। বর্ধমানে সি পি আই (এম)-এর মোকাবিলা করতে বর্ধমান কংগ্রেস অফিসে আস্তানা করেছিলাম। টেবিলে আর মেঝেতে কত রাত কাটিয়েছি।

যাই হোক, ১৯৭২ সালে নির্বাচনে দাঁড়ালাম, এম এল এ হওয়ার জন্যে নয়, সি.পি আই (এম)কে হারাবার জন্যে। বাহাত্তর সালে জেতার পর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ডেকে পাঠালেন। আমি মন্ত্রী হতে চাইনি, সংগঠন গড়ার কাজ করতে চেয়েছিলাম।

পরে বুঝেছিলাম, সত্যিই আমি ভুল করেছি। মন্ত্রী হয়ে সরকারি কাজে এত বেশি জড়িয়ে পড়লাম যে কংগ্রেসের কাজ করতে পারিনি। আমারও ক্ষতি হয়েছে, জেলা কংগ্রেসেরও ক্ষতি হয়েছে।

মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছে, কলেজে শিক্ষকতা করছি, ডকটরেটের জন্য কাজ করছি। আমি কাজ ভালবাসি। কংগ্রেস (ই) সংগঠনে কাজ করতে চাই সকলের সংগে হাত মিলিয়ে। কংগ্রেস ছাড়ার কথা কোনদিন ভাবিনি আর মন্ত্রিত্ব করার জন্য কংগ্রেস করি না। □

সাক্ষাৎকার :
বিশেষ সংবাদদাতা

কী করে কংগ্রেসে এলাম

রাজা-রাজনীতির নেপথ্যে

এ আই সি সি নিয়ে কংগ্রেসিদের এ লড়াই এহ বাহ্য

নিশীথ দে

সাধারণ লোকের মনে গোড়া থেকেই আশংকা রয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন কি হবে? না আঁচালে বিশ্বাস নেই। অভ্যর্থনা সমিতিতে কে কতটা ক্ষমতা পেলেন তা নিয়েই লড়াই। আসল লড়াইটা কিন্তু অন্য জায়গায়। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনে যাঁরা ছড়ি ঘোরাতে পারবেন তাঁরাই পরে দখল করবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারপর সামনে লোকসভার নির্বাচন। টিকিট বিলির কাউনটারও তাঁরা দখল করবেন। তা ছাড়া নবীন প্রবীণ অনেক কংগ্রেস নেতাই খোয়াব দেখছেন, বাংলার মসনদ থেকে বামফ্রন্টকে হটিয়ে ১৯৭২ সালের মত তাঁরা ক্ষমতা দখল করবেন - মুখ্যমন্ত্রী হবেন, পুলিশ মন্ত্রী হবেন, আরও কত কী।

৭৭ তম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন

এদিকে সি পি আই (এম) নেতারা আশংকা করছেন কংগ্রেস (ই) তাঁদের দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে। বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নেবে কংগ্রেস (ই)। বাস্তব ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই সুযোগ নিয়েছেও। সি পি আই (এম) এর রাজ্য নেতৃত্ব পারটির কর্মীদের এক সারকুলারে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস (ই) বামফ্রনট সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচার চালাচ্ছে আমরা তার মোকাবিলা করতে পারছি না।

বামফ্রনটের শরিকদের মধ্যে যত দিন যাচ্ছে বিরোধ বাড়ছে। বিরোধটা মূলত সি পি আই (এম)-এর সংগে। ফরোয়ারড ব্লক, আর এস পি এবং সি পি আই-এর প্রতিটি জেলায় কর্মীদের একটা বড় অংশ কংগ্রেস (ই) কর্মীদের মত সি পি আই (এম)-বিরোধী। বার বার দাবি উঠছে বামফ্রনট সরকার থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু কোন শরিকই বেরিয়ে আসতে পারছেন না। বেরিয়ে এলে তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল। এই সব শরিক দলের নেতারা ভাবছেন, বামফ্রনটের ভাঙনের পর পুরো সুযোগ নেবে কংগ্রেস (ই)। সি পি আই (এম) বিরাট দল। কোন বামপন্থী দলকেই জনগণ এখনই সি পি আই (এম)-এর বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। তারপর আছে কোন পারটি প্রোটেকশন দিতে পারে - প্রোটেকশন দিতে পারে ক্ষমতাসীন দল - কংগ্রেস (ই) এবং সি পি আই (এম)। অথচ মজার ব্যাপার হল, কংগ্রেস (ই) বামফ্রনটের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিতে পারছে না।

কিন্তু বামপন্থী দলগুলি স্বীকার করুক আর না করুক এটাই বাস্তব সত্য, এ রাজ্যে কংগ্রেসের অনৈক্য ও কংগ্রেসের ভাঙনের সুযোগ নিয়েই অকংগ্রেসিরা ক্ষমতায় এসেছিল, বামফ্রনট সরকার গড়ে উঠেছিল। ১৯৭৭ সালে বামপন্থীরা 'নেগেটিভ ভোটে' জয়ী হয়েছিল। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বামপন্থী দলগুলোর কোন প্রভাব নেই, সবাই কংগ্রেসের ভোটার। এক শ্রেণীর ভোটার থাকেন যাঁরা সব সময় 'ব্যালেনসিং ফ্যাকটর'। সব সময় দুই আর দুইয়ে চার হয় না, বেশিও হতে পারে। অর্থাৎ ঐক্যের দিকে এই নিরপেক্ষ, নির্দল লোকও ভোট দেন। আর সেই ভোটেই গরিষ্ঠতা প্রমাণ করে। কংগ্রেস যদি আজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারত তাহলে সি পি আই (এম) বিরোধী তো বটেই এমনকি যাঁরা নির্দল লোক তাঁদের সমর্থনও পেতে পারত।

১৯৭২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল ভোটের জোরে, না রিগিং করে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ খুনের রাজনীতি, অস্থিরতার রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিতে চেয়েছিল। তা যদি না হত সি পি আই (এম) এর মত শক্তিশালী এবং বিরাট রাজনৈতিক দল 'রিগিং' এবং 'কংগ্রেসি অপশাসনে'র বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারত।

সেই একই পরিস্থিতি না হলেও রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে আজ সন্ত্রাস চলছে। কংগ্রেসের গণ-সংগঠন থাকলে, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব থাকলে সি পি আই (এম)-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠত।

জোরদার আন্দোলন দূরের কথা, নির্ঝঞ্ঝাটে একটা অধিবেশনের প্রস্তুতি চালাবার মত ঐক্য কংগ্রেসের পক্ষে গড়ে তোলা যে সম্ভব নয় সেটা প্রমাণ হয়েছে।

পশ্চিমবংগ কংগ্রেসের সর্বশেষ অধিবেশন হয়েছিল ১৯৭২ সালে, বিধাননগরে। এই ডিসেম্বরেই ২৬ থেকে ২৯। সেবারে অভ্যর্থনা সমিতির সংগে ছিল ১৮টি কমিটি। মাঝখানে এগারটা বছর কেটে গিয়েছে। দেশের সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনীতির অনেক ওলট পালট হয়েছে। সেদিন যাঁরা ছিলেন আজ তাঁদের অনেকে নেই। আবার যাঁরা আজ আছেন সেদিন তাঁরা অন্য দলে ছিলেন।

গতবার বিধাননগর অধিবেশনে আয়োজন ছিল বিরাট, খরচ হয়েছিল ঢালাও। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতি গঠন থেকে কোন ব্যাপারে কোন রকম বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়নি। গতবারের কর্মকর্তাদের অনেকে আছেন, তাঁদের বয়সও এগার বছর বেড়েছে, কিন্তু সকলের শৃংখলা বোধ বাড়েনি, বরং কমেছে।

গতবারের সংগে এবারের মিল খুবই সামান্য। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী। এবার তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী। আজ আর তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্তই কংগ্রেস (ই)-র সিদ্ধান্ত।

সেদিন বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনে ছিলেন বাবু জগজীবন রাম, চন্দ্রশেখর (জনতা দলের বর্তমান সভাপতি), এইচ এন বহুগুণা, সিদ্ধার্থশংকর রায়, স্বর্ণ সিং, নন্দিনী শতপথী, শরৎচন্দ্র সিংহ, নুরুল হাসান, বিজয় সিং নাহার, চন্দ্রজিৎ যাদবের মত অনেক নেতা। মোহন কুমারমংগলম, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ, ললিতনারায়ণ মিশ্র, ডি পি ধর সেদিন কেন্দ্রের মন্ত্রী, আজ আর তাঁরা ইহজগতে নেই। সেদিনের পাঞ্জাবের নেতা জ্ঞানী জৈল সিং এখন দেশের রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবংগের বর্তমান রাজ্যপাল এ পি শর্মা এই বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনে ওয়ারকিং কমিটিতে নির্বাচিত হন। ডঃ শংকর দয়াল শর্মা ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি।

এ রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্রই ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আনন্দ গোপাল মুখারজি তার কিছুদিন আগে সংগঠন কংগ্রেস ছেড়ে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এম এল এ হয়েছেন। এবারের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তখন কংগ্রেস দলের এম পি কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য দূরের কথা, বিশেষ আমন্ত্রিতদের তালিকাতেও ছিলেন না।

বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েক মাস আগে বাংলা কংগ্রেস দল ভেঙে দিয়ে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সদলবলে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কেন্দ্রের বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় তখন বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত রাজ্যসভা সদস্য। অভ্যর্থনা সমিতিতে অজয় বাবুর মত বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য। প্রণববাবুর তখন কংগ্রেস মহলে পরিচিতি খুবই সামান্য।

সেই প্রণববাবুই এবার কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। নেতারা প্রতি সপ্তাহে দিল্লিতে দৌড়োদৌড়ি করেছেন একমাস ধরে। মিটিং এর পর মিটিং হয়েছে। কিন্তু অধিবেশন সফল করার মানসিকতা প্রকাশ পায়নি।

গতবার বিধাননগরে আয়োজন ছিল অনেক বেশি। তখনও কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠী বিরোধ ছিল কিন্তু এমন বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। গত বার খরচ হয়েছিল, অরুণ মৈত্রর হিসাব মত ৩৮ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। এবার খরচ অনেক বেশি, টাকার অভাব নেই। কংগ্রেসের মধ্যে সবই আছে। অভাব শুধু একটা, তার নাম ঐক্য। □

কংগ্রেসের বর্তমান চেহারা

অভিমন্যু সেন

কংগ্রেসের প্লেনারি সেসন বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের চিরকালের রীতি সাংগঠনিক নির্বাচন সেরে এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান করা।

দলের সর্বস্তরের নির্বাচন সেরে সভাপতির নাম প্রস্তাব করে নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ পর্যন্ত মনোনয়নের জন্য অপেক্ষা। তবে তারপর প্রস্তাবিত সভাপতির নাম ঘোষণা করে তাঁকে শোভাযাত্রাসহকারে মঞ্চে নিয়ে আসা হত। তারপর তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতি হিসাবে বরণ করা হত। এরপর আসত ওয়ারকিং কমিটির সদস্য নির্বাচন। সেখানে এগার জনকে নির্বাচিত করে দশজনকে মনোনীত করা হত।

বিগত বিধাননগর বা ৭৪তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পর্যন্ত এই ধারা ছিল অব্যাহত। তারপরই ছেদ পড়ল। পঁচাত্তরতম কামাগাতামারু নগর (পাঞ্জাব) অধিবেশনে শুধু শংকর দয়ালের জায়গায় দেবকান্ত বড়ুয়া সভাপতি হলেন। তারপর নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর মবলংকর হলে কংগ্রেস সভাপতি সহ ১১ জন ওয়ারকিং কমিটি সদস্য নির্বাচন করা হল ১৯৭৭ সালের মে মাসে। এরপর ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর নাগাদ কংগ্রেসের গোলযোগ বাড়ল। ১৯৭৮ সালে দল ভাগ হল। ১৯৭৮ এর ১ জানুয়ারি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে সম্মেলন ডাকলেন তাকেই পরে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের স্বীকৃতি দিয়ে দলের ৭৬তম অধিবেশন বলা হল। তারপর ৭৭তম অধিবেশন বসবে কলকাতায়। নিয়মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কামাগাতামারু নগরের পঁচাত্তরতম অধিবেশনের পর কলকাতা অধিবেশন হল ছিয়াত্তর তম অধিবেশন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর ডাকা ১৯৭৮-এর ১ জানুয়ারি সম্মেলন যেহেতু নির্বাচন কমিশন থেকে স্বীকৃত পেয়েছে তাই তাকেই ছিয়াত্তরতম অধিবেশন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের কাছে ও নিয়মের কাছে এটা বিচ্যুতি।

এক কথায় বলতে গেলে ১৯৭২ সালের পর আর কংগ্রেসের কোন সাংগঠনিক নির্বাচন হয়নি। এরই জন্যে কৃপা, দয়া, মনোনয়ন, অ্যাডহক প্রভৃতির মাত্রা বেড়েছে এবং সংগঠনের কর্তৃত্বের খেলায় দিল্লি-নির্ভর মেরুদন্ডহীন কিছু ব্যক্তিত্ব রাজ্যে রাজ্যে অসহায়ভাবে কংগ্রেসের কলহকে বরদাস্ত করে চলেছে। শ্রীমতী গান্ধী ও রাজীব গান্ধী ছাড়া এই দলের কেউই কোন রাজ্যে কোন সম্মানের অধিকারী নন। কর্মীদের হাতে লাঞ্ছনা অপমান সইতে হয় তাদের প্রায় প্রতিদিন। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এত বেড়েছে যে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পর কুৎসিত আক্রমণ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিচ্ছেন প্রতি নিয়ত। পশ্চিমবাংলার কথা বাদ দিলাম। অন্য রাজ্যের প্রসঙ্গে আসি, দেখা যাক চেহারাটা কেমন।

উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র উত্তর প্রদেশ। সেখানে শ্রীমতী গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকায় গোলমাল বাইরে আসতে পারে না। কিন্তু সেখানে অরুণ নেহরু বনাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত মিশ্রের ঠান্ডা লড়াই চলছে। প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসনেতারা অনেকেই অরুণ নেহরুর আধিপত্য মানেন না। এ ব্যাপারে এক নম্বর সফদরজং রোডের সমর্থনও আছে। কমলাপতি বয়সের ভারে দুর্বল এবং তার পুত্ররাও খুব সন্তুষ্ট নন। কে সি পন্থকে এখনো পুরোপুরি ভরসা করে উঠতে পারেননি। যদিও দলে তার অবস্থার আগের থেকে অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে।

বিহারে ক্রুদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র তার দলবল নিয়ে সময়ের অপেক্ষায় আছেন। চন্দ্রশেখর সিংকে তিনি মেনে নেননি এবং রাজীব গান্ধীর উপর তিনি দারুণ অসন্তুষ্ট। কংগ্রেসবিরোধী শক্তিরাও সেখানে এক জোট।

মধ্যপ্রদেশে বিদ্যাচরণ শুক্লা গোষ্ঠীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং এর বনিবনা নেই। দিল্লির সাময়িক আশীর্বাদ অর্জুন সিং-এর প্রতি থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বিদ্যাচরণ শুক্লাকে আবার রাজীব গান্ধী চটাতে চাইছেন না। মধ্যপ্রদেশের উপনির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস ভাল ফল দেখাতে পারেনি। সেই তুলনায় বি জে পি ভাল করেছে। দিল্লিতে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এক নম্বর আকবর রোডের, সেখানে তাই একটা স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে। হরিয়ানার বংশীলাল দিন গুনছেন ভজনলালের সর্বনাশ মুহূর্তের। তিনি হাই কম্যানডের প্রতি চটে আছেন। পাঞ্জাবে দরবারা গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট। দরবারা-বিরোধীরা অনুপ্রাণিত। হিমাচল প্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান রাজ্যপাল রামলাল গোষ্ঠী এখনও বিরূপ। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিদেও যোশী ও জগন্নাথ পাহাড়িয়া একজোট হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবচরণ মাথুরের বিরুদ্ধে আর সেই সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা নওলকিশোর শর্মাও দূরত্ব রাখছেন মুখ্যমন্ত্রীর ছায়া থেকে।

জম্মু-কাশ্মীরে মীরকাশিম চলে যাওয়ায় কংগ্রেস বেশ দুর্বল। গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী-বিরোধী প্রথম গোষ্ঠী রতুভাই আদানি, মগনভাই বরোট, মহীপতসিং মেহেতারা দল ছেড়ে চলে গেছেন আর দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহ শুরু করেছেন সৌরাষ্ট্রের জিনাভাই দরজী। গোয়াতে প্রতাপ সিং রানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উইলফ্রেড ডিসুজারা পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছেন। দক্ষিণ ভারতের অবস্থাও ভাল নয়। কেরালার অ্যানটনিরা এখনও অমর্যাদার মধ্যে আছেন। ভরদরাজন নায়ার আবার কংগ্রেস (এস) দলে ফিরে গেছেন। করুণাকরণ গোষ্ঠীকে সি এম স্টিফেন গোষ্ঠী অসহযোগিতা করছেন। সেখানে বিরোধী জোটের সঙ্গে ভোটের ব্যবধান খুব সামান্য। তামিল নাড়ুতে বিশৃংখলা। তিনবার প্রদেশ সভাপতি বদল হয়েছে। এবং সম্প্রতি এক সম্মেলনে মুপানারকেও লাঞ্ছনা করা হয়েছে, ভেংকটরমনরা পালিয়ে বেঁচেছেন।

কর্নাটকে দ্রুত ক্ষমতা ফেরত পাবার তাগাদায় কংগ্রেসের ভাবমূর্তি দুর্বল হচ্ছে। এ ছাড়া গুন্ডুরাও গোষ্ঠীর সঙ্গে মইলি গোষ্ঠীর কোন বনিবনা নেই। অন্ধ্রপ্রদেশে যে গতিতে তেলেগু দেশম এগিয়ে গিয়েছিল তার সেই বিজয় রথের গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে, তার বড় কারণ এন টি রামারাওয়ের ভুল দল পরিচালনা। তবুও কংগ্রেস সেখানে ঐক্যবদ্ধ নয়। যদিও বিরোধী নেতা মদন মোহন একজন সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কর্মীদের ক্ষোভ বাড়ছে।

ওড়িশায় কংগ্রেস বলতে গেলে ত্রিধা বিভক্ত। মুখ্যমন্ত্রী গোষ্ঠী, রামচন্দ্র রথ গোষ্ঠী ও শ্যামসুন্দর মহাপাত্র গোষ্ঠী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এম এল এ-র দল ভারী হলেও সাংগঠনিক কর্মীরা ক্রমশই তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন।

মহারাষ্ট্রের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সাংলিতে বলতে গেলে কংগ্রেস হেরেই গেছে। অত কম ভোটে এই আসনে কংগ্রেস এই প্রথম উত্তীর্ণ হল। পাটনেও কংগ্রেস বিধ্বস্ত। চারটে গোষ্ঠী লড়ছে সেখানে। ভোঁসলে গোষ্ঠী, আন্তুলে গোষ্ঠী, আদিক গোষ্ঠী, বসন্ত দাদা পাতিল গোষ্ঠী। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা সাময়িক হালকা বোঝাপড়া হল যে, মুখ্যমন্ত্রীকে কাবু করতে হবে।

আসামের যে সরকার রয়েছে সেখানেও অনোয়ার তাইমুর গোষ্ঠী খুশি নন। ত্রিপুরা পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের কোন্দল শালীনতার সব সীমা অতিক্রম করেছে। ত্রিপুরায় স্টিফেনের সামনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লাঞ্ছিত হয়েছেন আর পশ্চিমবাংলায় তো নেতারা তথাকথিত ছাত্র যুব শক্তির ভয়ে কম্পমান। এই দুই শক্তিকে মদত যোগান কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী। বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলনের থেকেও এরা পরস্পরের প্রতি লড়াই করতেই সোচ্চার।

অভ্যর্থনা সমিতির নামে এরা যা কান্ড করলেন তার ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষ দুবার করে ভাববে এদের হাতে রাজ্যের ক্ষমতা তুলে দেওয়া নিরাপদ কিনা।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রে সব দলের অস্তিত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত। কিন্তু এই বিশাল দেশে যেহেতু একমাত্র সারা দেশ বিস্তৃত বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, সেই কারণেই তার সম্ভ্রম, মর্যাদা ও শৃংখলার সঙ্গে গোটা দেশের রাজনৈতিক কালচার অনেকটা বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কংগ্রেস তাই সমগ্র জাতির কাছে দায়বদ্ধ একটি সুসংহত ও আদর্শবাদী সংগঠনকে গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। এ কাজে বিলম্ব হলে নির্বাচনহীন এই বিশৃঙ্খল মেলায় কংগ্রেস নাম সর্বস্ব হয়ে থাকবে, আর কখনও দল হয়ে উঠবে না। □

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান পুরনো রাজনৈতিক দল, তাদের আদর্শ এবং সংগ্রাম

যীশু চৌধুরী

হবস এর সেই বিখ্যাত উক্তি পৃথিবীতে রাজনৈতিক দল গঠনের তাত্ত্বিক সমর্থন বলা যায়। তিনি বলেছিলেন, হাজার মানুষকে এক সংগে খুব খারাপ অবস্থায় রাখলে সমবেতভাবে সেই বন্দীদশাও আনন্দময় হয়ে উঠবে। যদিও পৃথিবী জুড়ে গোষ্ঠিবদ্ধ সামাজিক কাজকর্ম করার দিকে ঝোঁক আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য প্রসংগও এসে পড়ে। বাণিজ্যিক সংস্থা ইস্ট ইনডিয়া কোমপানি গড়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে সপ্তদশ শতাব্দীতেই।

রাজার দেশে

ইওরোপে ব্যক্তিমানুষের মুক্তি যেমন শিল্প সংস্কৃতিতে, তেমনই রাজনীতিতেও নিয়ে এল আলোড়ন। রেনেসাঁর পরে শিল্পবিপ্লব ছিল আর একটি মাইলস্টোন। ইংলনডে রাজনীতিক অধিকার আদায়ের জন্যে গোষ্ঠিবদ্ধ হবার প্রবণতা দেখা দেয় এই সময়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুইগ পারটি তার যাত্রা শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরোটা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এই পারটি দুটি বিবদমান গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে যায়। লিবারাল এবং কনজারভেটিভ। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে হুইগ পারটির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসে। ১৯৩৫ সালে ইংলনডের হাউস অব কমনসের নির্বাচনে এই পারটির কবর হয়ে যায়। কারণ লয়েড জরজের নেতৃত্বে লিবারালরা ৬১৫টির মধ্যে মাত্র ১৯টি আসন পায়। যদিও লয়েড জরজ ছিলেন ইনডিপেনডেনট লিবারাল গোষ্ঠির নেতা। ১৯৩১ পর্যন্ত এরা ছিলেন স্বীকৃত বিরোধী দল। ৩৫-এর নির্বাচনে এই সাংঘাতিক পরাজয়ে দলে ভাঙন আসে। ফলে পুরনো হুইগ দলের অস্তিত্বই মুছে যায়।

১৮২৮ সালে ইংলনডের আর একটি দল টোরি পারটি অবলুপ্ত হয়ে যায়। বৃটিশ কনজারভেটিভদেরই এই নামে ডাকা হত। কনজারভেটিভ পারটিকে আবার ইউনিয়নিসট পারটি বলেও উল্লেখ করা হত। টোরিদেরও উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এরা ছিলেন পুরোপুরি রাজতন্ত্র সমর্থক। গণতন্ত্রের সামান্যতম সুযোগ দিতে রাজি নন এই টোরিরা। যার জন্যে বৃটেনের গোঁড়া দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদদের এখনও টোরি বলেই উল্লেখ করা হয়।

১৯৩৫ সালের নির্বাচনে হুইগ পারটির অবলুপ্তি ঘটে। নির্বাচনে টোরিপন্থীরা পার্লামেন্টে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা [illegible]। হাউস অব কমনসে ৬১৫টির মধ্যে তারা পায় ৩৭৫টি আসন। বস্তুত এর আগে ১৯২৪ পর্যন্ত টোরিপন্থীরাই ছিল বৃটেনের ভাগ্যবিধাতা। এরা কোন সামাজিক সংস্কারে, শ্রমিক কল্যাণে বা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে বিশ্বাস করতেন না। যদিও চার্চিল 'ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেছিলেন অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে। চেমবারলিনও হাউসিং পলিসি চালু করেছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগেই।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী গোষ্ঠিবিরোধ ছিল। চরম দক্ষিণপন্থীদের বলা হত 'ডাইহারডস' এবং বামপন্থীদের বলা হত কনজারভেটিভ লিবারালপন্থী। শেষোক্তদের প্রভাব পারটিতে ছিল ন্যূনতম। কিন্তু বৃটেনের অনেক নামকরা রাজনীতিবিদ এই গোষ্ঠি থেকেই এসেছেন। যেমন উইনসটন চার্চিল এবং অ্যানথনি ইডেন। কনজারভেটিভ বা টোরিদের সব চেয়ে নামকরা সংগঠন নেতা ছিলেন নেভিল চেমবারলিন। অন্য যাদের নাম মোটামুটি উল্লেখ করা যায় তারা হলেন আরল বলডুইন, স্যার স্যামুয়েল হোর, লরড হ্যালিফ্যাকস, লরড স্যালিসবেরি এবং লরড লনডনডেরি। বলা হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের পুনরুদ্ধার করে গেছেন উইনসটন চারচিল। যদিও চারচিল এবং ইডেনই আবার সারা পৃথিবী জোড়া বৃটিশ উপনিবেশেরও ভাঙন এনেছিলেন। অবশ্য এটা ইতিহাসের ব্যাপার। প্রাকৃতিক ভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হবারই কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই বৃটেনে রাজনৈতিক হাওয়া বদল শুরু হয়েছিল। ১৯৩৫-এর নির্বাচনে [illegible] দেখা যাচ্ছে দুশো বছরের পুরনো রাজনৈতিক দলগুলি তাদের [illegible] কিংবা দুই বা তিনটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সময় নতুন একটি দল রাজনীতির সামনের সারিতে চলে আসে। সেটি হল লেবর পারটি। ১৯৩৫-এর নির্বাচনে তারাই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ৬১৫টির মধ্যে তারা পায় ১৬৮টি আসন।

মূলত লেবর পারটির উপর ফেবিয়ানদের প্রভাব ছিল সাংঘাতিক। মারকসবাদীদের মত এরাও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করত না কিন্তু বিপ্লবেও বিশ্বাসী ছিল না। ফলে ধীরে ধীরে সামাজিক পরিবর্তন ছিল এদের কাম্য। [illegible] শ্রমিক সংগঠন [illegible] প্রগতিশীল ও সমবায় সংগঠনগুলি এই দলে যোগ দিয়েছিল। ১৯২৪ এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ এই দুবার এরা বৃটেনের শাসনাধিকারও পেয়েছিল যুদ্ধের আগে।

লেবর পারটি দেশের যাবতীয় সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করায় এবং উপনিবেশগুলি ধীরে ধীরে স্বাধীন করার পক্ষে প্রচার চালায়। ভারতকে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেবার কথা এরাই প্রথম ঘোষণা করে। কিন্তু দুবারের শাসনকালে তারা এসব কিছুই করতে পারেনি, তার কারণ দুবারই তাদের হাতে ছিল সংখ্যালঘু সরকার। এই দলের নেতৃত্বে এসে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন মেজর অ্যাটলি, আরথার গ্রীনউড, হারবার্ট মরিসন, হিউ ডালটন, লরড স্নেল, লরড পাসফিলড, নোয়েল বেকার, হ্যারলড ল্যাসকি, এলেন উইলকিনসন প্রমুখ। ল্যাসকির নাম তো রাজনৈতিক পন্ডিত হিসাবেও সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত।

বামও নয়, দক্ষিণও নয়

বৃটেনের মত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রেও গণতন্ত্রের ধারা তৈরি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। স্বাধীনতা যুদ্ধ এই গণতান্ত্রিক চিন্তারই ফল। গোষ্ঠিবদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের যে নেতৃত্ব ওয়াশিংটন বা পরবর্তীকালে আবরাহাম লিংকন দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। অবশ্য বৃটেনের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দলীয় আদর্শই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল গঠনে মূল চালিকাশক্তি ছিল। হুইগ এবং টোরিদের আদর্শে এরা দল তৈরি করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত মারকিন রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে রিপাবলিকান পারটি।

রিপাবলিকান পারটি কিন্তু আলাদা কোন দল ছিল না। ১৭৮৭

ডানটন

তৈরি করা হয়। এই ডেমোক্রেটিক পারটিকেই কেউ কেউ রিপাবলিকান পারটি বলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু ১৮২৮ সালের পর থেকে সত্যিই রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটিক পারটি থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই সময় জন কুইন্সি অ্যাডামস এবং হেনরি ক্লে তাঁদের মতাবলম্বীদের নিয়ে 'ন্যাশনাল রিপাবলিকানস' বলে একটি আলাদা গোষ্ঠি গঠন করেন। কিন্তু ১৮৫৪ সালে এরা পুরোপুরি রিপাবলিকান পারটি গড়ে তুললেন। আজকের মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই রিপাবলিকান পারটির ঐতিহ্যই বয়ে চলেছে। পৃথক দল গঠনের ছ বছর পর ১৮৬০ সাল থেকে আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে এই দল মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসে। দলের আদর্শ ছিল ক্রীতদাসদের মুক্ত করা এবং সারা দেশে গণতন্ত্রকে অবাধ করা। ফলে ক্রীতদাসদের একচ্ছত্র ক্ষমতাশালী মালিকরা এই দল এবং তার নেতা আব্রাহাম লিংকনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। দেখা দেয় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। তবুও রিপাবলিকানরা এই সময় ৫২ বছর ক্ষমতা পেয়েছিলেন দেশের কর্তৃত্ব করার। আট বছর পরে ১৯২০ সালে আবার এই দল ক্ষমতায় আসে। ১৯৩২ সালে সারা দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে ক্রেটিক পারটি নিরংকুশ ক্ষমতা-লাভের কাছে মাথা নিচু করে হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে আসে।

রিপাবলিকান পারটির মূল ক্ষমতা উত্তরের শিল্পাঞ্চলে। আগেও এটা লক্ষ্য করা গেছে এবং এখনও পর্যন্ত আধিপত্যের চরিত্রটা সেরকমই।

এই প্রসংগেই উঠবে ডেমোক্রেটিক পারটির কথা। ১৭৮৭ সালে এই পারটি গঠনের পর থেকে পূর্ণাংগ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত না। বৃটেনের সংগে সম্পর্ক রাখায় তাদের বিশ্বাস ছিল। ১৮০১ সালে এই দলেরই নেতা জেফারসন দেশের রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু ১৮১৭ থেকে দেখা গেল দেশে আর কোন রাজনৈতিক দলই নেই। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত এই একপেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলার পর ডেমোক্রেটিক পারটির মধ্যেই ভাঙন দেখা দিল। ১৮২৮ সালে সে ভাঙন পরিপূর্ণ হলে জ্যাকসনের নেতৃত্বে যারা থেকে যান তারাই ডেমোক্রেটিক পারটির হাল ধরেন।

রিপাবলিকান পারটির সংগে ক্ষমতার পাঞ্জা লড়ায় এরা সব সময় পেরে ওঠেনি। তবে বারবারই ক্ষমতা দখল করেছে। ১৯১২ সালে দীর্ঘ রিপাবলিকান শাসনের পর উইলসনের নেতৃত্বে এরা ক্ষমতায় রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু চার বছর পর নির্বাচনে ডেমোক্রাটরা হেরে যায়। আবার ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে রুজভেলটের নেতৃত্বে এরা ক্ষমতা দখল করে। এই রুজভেলটই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং মিত্রশক্তির অন্যতম নেতা হিসাবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ডেমোক্রাটদের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণাঞ্চলে। সে জন্যে তারা নিজেদের মধ্যে একে 'সলিড সাউথ' বলে উল্লেখ করে থাকেন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেছে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাটদের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদল হয়। বৃটিশ রাজনীতি বিষয়ক লেখক ওয়ালটার থেইমার ১৯৪০ সালে বলেছিলেন, এই ক্রমাগত হাতবদলের পেছনে কোন আদর্শের ব্যাপার নেই। এমনকি এদের কেউ বামপন্থী বা কেউ দক্ষিণপন্থীও নন। সাধারণ মানুষ একই শ্রেণীর দুটি দলকে বদলাবদলি করে দৈনন্দিন রাজনীতির স্বাদ বদলায় মাত্র। তবে স্বীকার করতে হবে, এতে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক একটা ধারাও বজায় থাকে।

ভূত এবং ভবিষ্যৎ

সারা ইওরোপের স্বার্থান্বেষী মানুষ সত্যিই কমিউনিজমের ভূত কমিউনিসটস' তৈরি হবার পর থেকে। ১৮৪৮ সালে প্রথম এই অদ্ভুত রাজনৈতিক গোষ্ঠিটির উদ্ভব হয়। কমিউনিসট ম্যানিফেসটোর অন্যতম উদ্গাতা কারল মারকস এই গোষ্ঠিটির দিকদর্শক হিসাবে কাজ করেছিলেন। লিগ অব কমিউনিসটস কোনরকম সংস্কারে বিশ্বাস করত না। তারা চাইত শ্রেণী বৈষম্য নির্মূল করতে এবং সারা পৃথিবীতেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করতে। মূলত জারমানিতে হলেও এই গোষ্ঠির চিন্তা হল সারা পৃথিবীকে ঘিরে।

১৮৬৪ সালে মারকসের নেতৃত্বে 'প্রথম ইনটারন্যাশনাল' ডাকা হয়েছিল। এতে যোগ দিয়েছিলেন পৃথিবীর তাবৎ সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা। প্রথম ইনটারন্যাশনালের প্রভাব পড়ে এই লিগ অব কমিউনিসটসে। কমিউনিসটদের আগে সমাজতন্ত্রীরাই ছিলেন শ্রেণী বৈষম্য দূর করার আদর্শে বিশ্বাসী। বিভিন্ন সময় সমাজতন্ত্রীদের আদর্শ বিভিন্ন রকম হয়েছে। তবে প্রথম দিকে দল গঠনের কোন ঝোঁক এদের মধ্যে ছিল না। স্যার টমাস মুর প্রথম সমাজতান্ত্রিক এক সমাজ গঠনের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। ১৪৭৮ সালে জন্ম হয়েছিল এই ভদ্রলোকের। ১৫৩৫ সালে তাঁর

মৃত্যুর সময় অবধি এই আদর্শের পতাকা বয়ে নিয়ে যাবার মত আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু ফরাসি তাত্ত্বিক ফুরিএরের পর এ আদর্শ ব্যাপক হয়ে পড়ে। ফুরিএরের জীবৎকাল ছিল ১৭৭২ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত।

ফুরিএরের জন্মের ঠিক এক বছর আগে ইংলন্ডে জন্মেছিলেন রবার্ট ওয়েন। ১৮৫০ সালে তার মৃত্যু হয়। শুধু কথায় নয় কাজেও তিনি সমাজতন্ত্রের জন্য আদর্শ তৈরি করে গেছেন। কাপড়ের কল ছিল তাঁর। সেই কারখানায় শ্রমিকদেরও ছিল অবাধ অধিকার। কিন্তু পরবর্তী কালে ফরাসি সমাজতন্ত্রী প্রুঁধোর মতবাদকে অস্বীকার করেন মারকস এবং এঙ্গেলস। তাঁরা দেখান তথাকথিত সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এই সময়ই জারমানিতে গঠিত হয় জারমান সোসালিস্ট পারটি। নেতা ছিলেন ফারদিনানদ লাসাল (১৮২৫-১৮৬৪)।

জারমানি ছিল সমাজতন্ত্রী রাজনীতির একটা বড় কেন্দ্র। ফলে সেখানে বার বার এর পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। জারমান সোসালিসট পারটি মারকসবাদের কাছাকাছি একটি দল হিসাবেই কাজ করত। তবে তারা মনে করত 'সামাজিক রাজতন্ত্র'ই হবে গরিবের মুক্তির পথ। মুর বা ফুরিএর পন্থীদের সংগে এখানেই ছিল অমিল। জারমান সোসালিসট পারটির নেতা ফারদিনানদ লাসাল একটি প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রতিপক্ষের সংগে তরোয়াল দ্বন্দ্বে পরাজিত ও নিহত হন।

অবশ্য নিহত হয়েছে তাঁর আদর্শও। কারণ মারকস এবং এঙ্গেলস লাসালকে নাকচ করেন কয়েকটি তত্ত্বের ভিত্তিতে। পরে একমাত্র মারকসবাদের ভিত্তিতেই মারকসপন্থী ও লাসালপন্থীরা একত্রে পারটি গড়ে তোলেন। তখন থেকে ঐ পারটির নাম হয় সোসাল ডেমোক্রাটিক পারটি। মারকস এবং এঙ্গেলস দুজনেই লনডন থেকে এই পারটির প্রতি নির্দেশ পাঠাতেন এবং আগসট বেবেল ও উইলহেম লিবনেখট সেইমত পারটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই জারমান পারটিরই ব্যাপক প্রভাব পড়ে ইংলনড, ফ্রানস, অসট্রিয়া এবং রাশিয়ায়। ঐ সব দেশেও গত শতাব্দীর পাঁচ এবং ছয়ের দশকে গড়ে ওঠে নানা সমাজতান্ত্রিক দল।

১৮৬৫ সালে মারকস 'ইনটারন্যাশনাল ওয়ারকারস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। এতে সদস্য সংখ্যা প্রথম দিকে মোটেই বেশি ছিল না। পরবর্তীকালে এই রাজনৈতিক সংগঠনই ফারসট ইনটারন্যাশনাল হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ১৮৮৩ সালে মারকসের মৃত্যুর পরেও এঙ্গেলস এটির দায়িত্ব বহন করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এর মধ্যেই ১৮৮৯ সালে এই সংগঠনকে তিনি নতুন রূপ দেন। সারা পৃথিবীর সোসালিসট পারটিগুলি এর পতাকাতলে এসে জড়ো হয়।

ফারসট ইনটারন্যাশনালের মধ্যে দ্বিধাদ্বিত একটি গোষ্ঠি গড়ে ওঠে। তারা মারকসের পথে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ে সরাসরি সায় না দিয়ে 'দেশপ্রেমিক' সেজে বসে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এরকমই চলতে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঘন কালো মেঘ যখন সারা পশ্চিমী পৃথিবীর আকাশ ছেয়ে ফেলে তখন ইনটারন্যাশনাল পন্থ যা হুমকি দেয়, ধনতন্ত্রী সব দেশগুলি বিশ্বযুদ্ধ বাধালে তার দায় তাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে। শ্রমিকরা এই যুদ্ধে সমর্থন তো দেবেই না বরং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ বেছে নেবে।

সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিসটদের এই হুমকিতে কান না দিয়ে বিভিন্ন শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য ১৯১৪ সালের আগসটে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে। সমাজতন্ত্রীদের দিক থেকে যা আশা করা গিয়েছিল তা অবশ্য ঘটল না। অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী দলই নিজের নিজের সরকারকে সমর্থন করল এবং সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিল।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটল রাশিয়ায়। এদেশে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটল এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। এই সংগে লিবনেখটের নেতৃত্বে সোসালিসট পারটির স্পার্টাকাস লিগও শ্রমিক অভ্যুত্থানের পথে এগোল। যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালের নভেমবর মাসে জারমান বিপ্লবে এই গোষ্ঠি রাজনীতির সামনের সারিতে চলে এল।

জারমান সরকার অবশ্য লিবনেখট এবং আর একজন কমিউনিসট নেত্রী রোসা লুকসেমবুরগকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু ততদিনে তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের সংগে কমিউনিসটদের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে এবং ১৯২০ সালে মসকোয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হল তৃতীয় ইনটারন্যাশনাল।

মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য বৃটেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জারমানিতে রাজনৈতিক দলগুলি চিরকালই অগ্রণী থেকেছে। সে হিসেবে কমিউনিসটদের সংগঠনের বয়সও প্রায় দেড়শ বছর হয়ে গেছে। এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা কোন বিশেষ দেশের নয়, সারা পৃথিবীর বিশেষ একটি শ্রেণীর জন্য লড়াই করাই হচ্ছে এর কাজ।

লড়াই যেমনই হোক তা শেষ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক মানুষের কল্যাণে হলে মানুষমাত্রেই তাকে স্বাগত জানায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথম প্রকৃত স্বাধীনতা ও উপনিবেশ মুক্তির সংগ্রাম করা শুরু করে তখন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাকে বরণ করে নিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। সে হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এক উল্লেখযোগ্য দিক চিহ্ন। □

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ যে যোগদানকারী ব্যক্তির নাম এবং ক্রমানুসারে বাসস্থানের ঠিকানা, বয়স, সখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল:

আশিসকুমার সোম □ ক্রম ৫৫
গ্রাম ও পোঃ গোপালপুর ..., মেদিনীপুর। ২২ বছর, সাহিত্য শিল্পসম্মত সিনেমা দেখা রবীন্দ্র সংগীত, স্নাতক, চাকরি।

স্বপন রায় □ ক্রম ৫৬
জি এম অফিস, রাজশাহী টেলি-যোগাযোগ অঞ্চল, পোঃ ও জেলা রংপুর, বাংলাদেশ। উদ্দেশ্য মৈত্রী অবাধ বন্ধুত্ব, অর্থনীতিতে এম এ, চাকরি।

মানস সিংহ □ ক্রম ৫৭
২/১ চক লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী ৭১২২৫৮। ৩১ বছর, ফ্রি ল্যানস সাংবাদিকতা ভ্রমণ পড়াশুনা বিদেশি রেডিও অনুষ্ঠান শোনা, স্নাতক এল এল বি, আইনজীবী।

মনোজকুমার পাল □ ক্রম ৫৮
১১/এ বি টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৬। ২৯ বছর, ভ্রমণ গান খেলাধূলা বন্ধুত্ব, গণিতে অনারস স্নাতক, ব্যবসা।

তপন দত্ত □ ক্রম ৫৯
এম বি টিলা বাজার, অরুন্ধতী নগর, পোঃ অরুন্ধতীনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০৩। ২২ বছর, ভাল পত্রিকা পড়া ভ্রমণ, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, ব্যবসা।

বিজন বাগচী □ ক্রম ৬০
ভূশিলা, পোঃ খিদিরপুর, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর ৭৩৩১০৩; ২০ বছর, নাটক অভিনয় সিনেমা দেখা খেলাধূলা সমাজসেবা, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, ছাত্র।

গৌতম মিত্র □ ক্রম ৬১
ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাংক ফকিরাগ্রাম শাখা, পোঃ ফকিরাগ্রাম, কোকরাঝাড়, আসাম ৭৮৩৩৪৫। ২১ বছর, কবিতা পাঠ ও লেখা মতামত বিনিময় বন্ধুত্ব, গণিতে অনারসে স্নাতক, চাকরি।

মনোজ ঘোষ □ ক্রম ৬২
নলহাটি, বীরভূম। ৪৬ বছর, নাটক অভিনয় পরিচালনা সাংবাদিকতা, স্কুল ফাইনাল এবং বিশ্বভারতী থেকে বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত, শিক্ষকতা।

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের অন্য দিক

এখানেও পড়েছিল দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের অবধারিত ছায়া

নয়া দিল্লি থেকে খগেন দে সরকার

নভেমবরের শেষ সপ্তাহে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল। সরকারিভাবে এই সম্মেলনকে বলা হয় কমনওয়েলথ হেডস অব গভরমেনটস মিট (সি এইচ ও জি এম)। বলা যায় এই সম্মেলনের অনেক ফুলঝুরি ছড়ান হয়েছে। অবশ্য কথা যতই হোক, রাষ্ট্রপ্রধান বা পর্যবেক্ষকরা কেউই কিন্তু এখানে বিপ্লব কিংবা প্রতিবিপ্লব প্রত্যাশা করে আসেননি। আগাগোড়া এখানে সকলে মতানৈক্যই খুঁজেছেন। তার মানে, সাধারণ কোন আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে নীতির ঐকমত্য ঘোষণা।

সাজান-গোছান নয়া দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এবং সপ্তাহ শেষে গোয়ার পানজিমে বিলাসবহুল পরিবেশে ৪৬টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা জড়ো হয়েছিলেন। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা এখন ৪৮। বিভিন্ন মতবাদ নিয়েই এরা এখানে এসেছিলেন। ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী থ্যাচার এবং নিউজিল্যানডের প্রধানমন্ত্রী মালডুনের মত কট্টর দক্ষিণপন্থী, ছিলেন জিমবাবোয়েব প্রধানমন্ত্রী মুগাবে এবং গায়ানার রাষ্ট্রপতি বারনহামের মত বামপন্থী এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর মত এক বিপুল সংখ্যক মধ্যপন্থী নেতা। ফলে বিভিন্ন প্রশ্নে মতানৈক্য আসা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে ব্যক্তিগত বক্তব্যে সকলেই নিজের নিজের মতটুকু অবাধে বলে গিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘের বাইরে এটিই একমাত্র সংগঠন এবং এই গোষ্ঠিতে বৃটেন কানাডা, অসট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যানডের মত শিল্পোন্নত, প্রযুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন রাষ্ট্রও আছে। এই সম্মেলনে কোন বিবাদ নেই, নেই কোন কক্ষত্যাগের ঘটনাও। তবে হ্যা, মতামতের পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাউকে দমিয়ে দেবার প্রয়াস নেই। এই হল এর প্রকৃত পরিবেশ।

প্রকৃত বিষয়গুলি কী? ভাবিত হবার মত তেমন বিষয়গুলি হল : ১. গ্রেনেডা : গত অকটোবরের শেষ সপ্তাহে অরগানিজেসন অব ইসট ক্যারিবিয়ান স্টেটসের আমন্ত্রণে মারকিন নৌবহর এই ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্রটির উপর আগ্রাসন চালায়। অরগানিজেসনে আছে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্র — ডোমিনিকা, সেনট কিটস, বারবাডোজ, অ্যানাটিগুয়া-বারমুডা, সেনট ভিনসেনট এবং সেনট লুসিয়া। এরা এই সংগঠনের অন্যতম সদস্য গ্রেনেডা আক্রমণের জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে ডেকে পাঠায়। গ্রেনেডা এই সম্মেলনে আসেনি। সম্মেলনে উপস্থিত সংগঠনের সদস্য গ্রেনেডায় মারকিন আক্রমণের সপক্ষে জোরাল যুক্তি দেখায়। মূল বক্তা ছিলেন ডোমিনিকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মেরী ইউজিন চারলস। সম্মেলনে উপস্থিত তিন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তিনি একজন। তাদের বক্তব্য, ক্যারিবিয় অঞ্চলে এই ছোট রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব কোন সামরিকশক্তি নেই ফলে তারা সাহায্য চেয়েছিল। তবে এখানে মারকিন অনুপ্রবেশ বিষয়ে কেউ সরাসরি উল্লেখ করেননি। কমনওয়েলথ সম্মেলনে স্বীকার করা হয়, ছোট রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা দরকার। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত কোন সাহায্য করতে কমনওয়েলথ এগিয়ে আসবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

এখানে সমঝোতামূলক একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তে এমনকি গায়ানার বামপন্থী রাষ্ট্রপতি বারনহাম পর্যন্ত সায় দেন। তিনিই ছিলেন মারকিন আগ্রাসনের সোচ্চার সমালোচক।

২। সাইপ্রাস : এই দ্বীপরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে তুরকি প্রভাবিত একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইউ ডি আই-এর তীব্র সমালোচনা করা হয় সম্মেলনে। বলা হয়, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব মত যেন এই একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। এখানে সাইপ্রাসের তুরকি নেতা রউফ ডেংকডাশের বিরুদ্ধে মত দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রপতি স্পাইরাস কিপ্রিয়ানুর প্রতি পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানান হয়। রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে আছে অসট্রেলিয়া, ভারত, গায়ানা, নাইজেরিয়া এবং জামবিয়া।

বৃটেনই মূলত সমঝোতার নীতি নিয়েছিল। চূড়ান্ত খসড়ায় এমনকি বাংলাদেশও খুশি হয়নি। লক্ষ্য করার বিষয় উপরে উল্লেখিত দুটি ঘটনার সংগে দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের যে কোন একটি জড়িত। অর্থাৎ মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলা হচ্ছে। প্রথম ব্যাপারটিতে বলা হচ্ছে যে কিউবা নাকি গ্রেনেডায় একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছিল। স্বভাবতই কিউবার পেছনে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

দ্বিতীয় ঘটনায় দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইউ ডি আই তুরস্কের সমর্থনপুষ্ট। এরাই একমাত্র নতুন সাইপ্রাসকে পৃথক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। তুরস্ক মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক গোষ্ঠির সদস্য। এতে বৃটেন, কানাডা, অসট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যানডও আছে। চূড়ান্ত প্রস্তাবে এই মহাশক্তিদ্বয় বা তার অনুগত রাষ্ট্রগুলির নাম মোটেই করা হয়নি।

৩। নামিবিয়া : নামিবিয়া (দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা)-র স্বাধীনতা প্রসংগ। এখন দেশটি [illegible]

শ্রীমতী গান্ধীর সংগে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মারগারেট থ্যাচার

কাছে এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র আছে তার পেছনে। দক্ষিণ আফ রিকা এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, নামিবিয়ার স্বাধীনতা প্রশ্নের আগে পার্শ্ববর্তী অ্যাংগোলা থেকে কিউবার সমরবাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে। একে বলা হচ্ছে 'লিংকেজ'। কমনওয়েলথ সম্মেলন এই অদ্ভূত শর্ত বাতিল করে দিয়েছে। বৃটেন এবং কানাডাসহ প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রই নামিবিয়ার শর্তহীন পূর্ণাংগ স্বাধীনতায় সায় দিয়েছে। পাঁচটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে এই রাষ্ট্রও দক্ষিণ আফরিকা এবং রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতার জন্য একটি 'কনট্যাকট গ্রুপ' গড়ে তুলেছে। অন্য তিনটি রাষ্ট্র হল মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রানস এবং পশ্চিম জারমানি। কমনওয়েলথ সম্মেলন তাদের প্রস্তাবে এই কনট্যাকট গ্রুপের ওপর দায়িত্ব দিয়েছে তারা যেন কিউবার সামরিক বাহিনীর প্রসংগ ব্যতিরেকেই নামিবিয়ার পূর্ণাংগ স্বাধীনতার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ওপর প্রভাব খাটায়। কট্টর সংরক্ষণবাদী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী থ্যাচার এবং কানাডার পিয়ের ত্রুডো নামিবিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে পুরোপুরি কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই সম্মেলনে। দুই দেশের এই সমঝোতার মনোভাব দেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী একে 'বিরাট অগ্রগতি' (big step forward) বলে উল্লেখ করেছেন।

এ ব্যাপারে দুটি প্রসংগ অনেকেরই মনে আসবে। প্রথমটি হল, ১৯৭৯ সালের লুসাকা সম্মেলনে কমনওয়েলথ জিমবাবোয়ের স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব নিয়েছিল। দ্বিতীয়টি হল, নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফরিকার উপস্থিতির পেছনে রয়েছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র। এ প্রসংগেই আসছে কিউবা, মানে যার পেছনে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৪। পশ্চিম আফরিকা : বিশেষত লেবাননের কথাই বলা যায়। সম্মেলন লেবানন থেকে সিরিয়াসহ প্রতিটি দেশের সেনাবাহিনীর অপসারণ চেয়েছে। এখানেও মহাশক্তিধর দেশ দুটির ছায়া পড়ছে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং পশ্চিমী দেশগুলি লেবানন থেকে সিরিয় বাহিনীর অপসারণ দাবি করেছে। কিন্তু সিরিয়ার মূল উৎসাহদাতা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সিরিয়া সেনা প্রত্যাহারে অসম্মতি জানিয়েছে। ভারত সিরিয়াকে প্রথমদিকে সমর্থন করেছিল, সেই সমর্থন থেকে সরে এসেছে। বলা হচ্ছে, লেবাননের পূর্ববর্তী সরকারের আমন্ত্রণে সিরিয়া এসেছিল, এখনকার গেমায়েল সরকারের আমন্ত্রণে নয়। কিন্তু ভারতের মনে সম্ভবত অন্য চিন্তা রয়েছে। এখন পি এল ও র দুটি গোষ্ঠির মধ্যে লড়াই চলছে। এর মধ্যে সিরিয়ার মদতপুষ্ট গোষ্ঠিটি পি এল ও নেতা আরাফতের অপসারণ চায় লেবানন থেকে। সিরিয়ার অপসারণের এ ক্ষেত্রে আরাফতেরই সুবিধা হবে, কারণ ভারত আরাফতকেই সমর্থন করে।

৫। নতুন এক আন্তর্জাতিক আর্থকাঠামোর গঠনের সুদূরপ্রসারী ঘোষণা : কমনওয়েলথের গোষ্ঠি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কোন দাবি জানায়নি। তবে বিশ্বব্যাংকের মত ঋণদানকারী সংগঠনসমূহের সংগে কাজ করার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলির সংগে একমত হয়েছে। এখানে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নকামী রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আর্থ সংগঠনসমূহে সবচেয়ে বেশি অর্থ যোগায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া পশ্চিম ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এবং জাপান। উন্নয়নকামী দেশগুলি কম সুদে ঋণের দাবি জানিয়েছে এবং কয়েকটি বর্তমান ঋণও কমানর প্রস্তাব দিয়েছে। কমনওয়েলথ সম্মেলনে এ প্রস্তাবও সমঝোতার স্বার্থেই গৃহীত হয়েছে।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে বলা যায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক অবস্থারই প্রভাব পড়েছে। তার চেয়ে বড় কথা যা প্রকট হয়েছে তা হল পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করছে মূলত দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মর্জির ওপর। গোয়ার ঘোষণায় রুপোলি রেখাটুকু হল এই যে, মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি যেন পারমাণবিক শক্তিবলে নিজেদের বা অন্যদের ধ্বংস না করে, তারা যেন আবার নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় বসে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে সকল পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য ঐকমত্যে আনার চেষ্টা করছেন। তাঁর হঠাৎ বেজিং সফরও সেজন্যেই। তবে এটা এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে।

যাই হোক, নয়া দিল্লির কমনওয়েলথ সম্মেলনকে কেউ কেউ বলতে পারেন আধাভর্তি একটা বোতল, আবার কেউ বলতে পারেন অর্ধেক খালি একটা বোতল মাত্র। যিনি যে ভাবে বলবেন আর কি।

এবার কমনওয়েলথ অধিবেশনে তিনজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন : দোমিনিকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মেরি এউগিনিয়া চারলস, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মারগারেট থ্যাচার এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এদের মধ্যে দোমিনিকার প্রধানমন্ত্রী অবিবাহিতা। দিল্লির গৃহবধূদের দাবি হল 'আমরা আরো বেশি বেশি 'ন্যাম' এবং 'চোগাম' চাই। কারণ এই ধরনের বড় বড় সম্মেলন হলেই তাঁরা প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত দূরদর্শনে অনেক ভাল ভাল চলচ্চিত্র দেখতে পান। শ্রীমতী গান্ধী গোয়ায় পৌঁছেই এক জোড়া বাইনোকুলারের খোঁজ করেন। অফিসাররা তাঁর কাছে বাইনোকুলার নিয়ে আসতেই তিনি কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল শ্রিধার্থ রামফলকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ে চলেন সূর্যাস্ত দেখতে। গোয়ায় তিনি প্রায় ৩০ মিনিট নৌকাবিহারও করেছেন। গত ২৬ নভেম্বর রাতে গোয়ার 'তাজে' সাধারণ নৈশভোজে শ্রীমতী গান্ধী পরেছিলেন লুংগি ও কামিজ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মারগারেট থ্যাচার পরেছিলেন নীলচে এবং রুপোলি গাউন। গোয়ার 'তাজে'র ভেতরে বিশেষ কুটিরে রাষ্ট্রপ্রধানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাজের জলের দিকের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিল ভারতীয় নৌবাহিনী আর ডাঙার দিকে আধা-মিলিটারি বাহিনী। গোয়ায় অসট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী খেলেছেন টেনিস। সিংগাপুরের প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রের পাড়ে একা একা জগিং করেছেন। •

তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

কমনওয়েলথ শীর্ষসম্মেলন : মেয়েমহল

গায়ত্রী রায়

বৈঠকের কয়েকদিন বাজারে তরিতরকারী দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। কারণ – জনৈক চোথুরাম নাকি সমুদয় আমদানী জবর দখল করে নিয়েছিল।

ফলের রাজা বলে কি শুধু আমেরই একাধিপত্য ভি আই পি টেবিলে? বৈঠকে কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় ফল হচ্ছে চিকু। শোনা যাচ্ছে জনৈক রাষ্ট্রপতি গিন্নি নাকি চিকুর বীজ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, দেশে ফিরে চিকুর চাষ করবেন।

ভি আই পি সহধর্মিণীদের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে উদয় হয়ে চমক লাগিয়ে দেন Iron lady (ইসপাত মহিলা?) মিস ইউজেনিয়া চারলস, ডমিনিকার প্রধানমন্ত্রী! এবং তাঁর পিছনে পিছনে গুটি গুটি আসেন সেনট লুসিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ত্রিনিদাদ টোবাগোর উপপ্রধানমন্ত্রীও।

জিমবাবোয়ের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী শ্রীমতী স্যালী মুগাবে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সর্বত্র উপস্থিত ছিলেন। কিডনি ডায়ালেসিস মেসিন থেকে একেবারে সোজা গিয়ে ওঠেন আগ্রাগামী বিমানে। প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী জগনথ, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী গৃহিণী একটি অসুবিধায় পড়েছিলেন – বিদেশী ফারসট লেডিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র শাড়ি পরিহিতা। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নাকি মাঝে মাঝেই ওঁকে আটকেছেন।

শ্রীমতী জগনথের পূর্বপুরুষরা বিহারের আরা অঞ্চলের নিবাসী ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে নাকি এখন ভারতের প্রতি টান রয়েছে। সম্প্রতি ওঁর এক আত্মীয় এখানে প্রত্যাগমন করেছেন গংগাতীরে দেহরক্ষা করবার ইচ্ছায়।

সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতির গৃহিণী শ্রীমতী মিমি কিপ্রিয়ানু (mimi kyprianou) জনসভা মঞ্চ এড়িয়ে চলেন। তবে রংগমঞ্চের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে কারণ রংগমঞ্চ থেকে দর্শকদের দেখা যায় না অতএব গলা শুকানর সম্ভাবনা কম।

চতুর্দশ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মমতাজ মহল দেহত্যাগ করেন এবং অনুতপ্ত শাহজাহান তাজমহলের মাধ্যমে তাঁর প্রেমকে অমর করেন। এই বার্তা কি এই বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে কাউকে অনুপ্রাণিত করেছে : শোনা যায়, অন্তত একজন রাষ্ট্রপ্রধান নাকি ১৪টি সন্তানের জনক। ❐

কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের পত্নীরাও চান, আগে বিশ্বশান্তি তারপর নারী-পুরুষের সমতা

গায়ত্রী রায়

শান্তি সমতা এবং উন্নয়নের (development). মাঝে পূর্ববর্তিতা (priority) কার পাওয়া উচিত বিংশ শতাব্দির এই অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীন পৃথিবীতে. বিশেষ করে আধা-দুনিয়ার অধিবাসী নারী, যেখানে এখনো অনেকভাবে বঞ্চিত, সেখানে নারী অগ্রাধিকার দেবে কোনটিকে।

রাষ্ট্রমন্ডলীর (Commonwealth Summmit) শীর্ষ সম্মেলন কালে একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আগত রাষ্ট্রপ্রধানদের সহধর্মিণীরা। নারী উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণের সংগে যুক্ত। বিশিষ্ট সমাজ সেবিকারাও উপস্থিত ছিলেন ভারতের দিক থেকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীমতী তারা আলি বেগ, শ্রীমতী মারগারেট আলভা (সংসদ সদস্যা) বেগম আবিদা (সংসদ সদস্যা), সুশীলা রোহতগী প্রমুখ। বিষয়বস্তু ছিল Women and development (নারী এবং তার বিকাশ) উদ্দেশ্য ছিল যে রাষ্ট্রমন্ডলীর সভা, ছোট বড় সব দেশগুলিতে নারীর সমাজে স্থান ও তার বিকাশ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং যুক্তভাবে একটি পরিকল্পনার প্রণয়ন করা।

এই সভায় অল্প পরিচিত এবং পরিধিতে ছোট, দূর দুরান্তের প্রতিবেশিনীদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেল। যেমন :

সেনট লুসিয়া :

সেনট লুসিয়া পূর্ব ক্যারিবিয়ন সমুদ্রে একটি ছোট দ্বীপ - জন সংখ্যা সাকুল্যে ১ লাখ ২০ হাজার। চার বছর হল স্বাধীন হয়েছে। শ্রীমতী কমপটন, সেনট লুসিয়ার প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সংক্ষেপে জানালেন যে, যদিও দেশের সংবিধানে মেয়েদের অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত করা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে যাতে সম্ভব হয়, সেজন্য পূর্ব ক্যারিবিনের সব দেশের নারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেছেন। সংযুক্ত রাষ্ট্রমন্ডলী এঁদের সাহায্য করেছেন।

গায়ানা :

(গায়ানার রাষ্ট্রপতির সুযোগ্য পত্নী শ্রীমতী ভায়োলা বারজহাম) বললেন তাঁদের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা আছে। এবং নারী ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। তবে এখনো আন্দোলনের প্রয়োজন এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করার জন্য। তাঁর মতে, equality should be regarded as a tool, but not as an end in itself. ব্যবহারিক জীবনে,

সমতা লাভের পর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, একে যেন যন্ত্র হিসবে প্রয়োগ করার প্রয়াস চলতে থাকে যাতে করে ভবিষ্যতে সমগ্র নারীজাতির উন্নয়ন ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারে পৃথিবীর এক কোণ থেকে আর এক কোণে।

মরিশাস :

১৯৬৮ সালে মরিশাস স্বাধীনতা লাভ করে - শ্রীমতী জগন্নাথ, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী আশ্বাস দিলেন যদিও তাঁদের সংবিধানে নারী সমতার উল্লেখ নেই তবু দৈনন্দিন জীবনে নারীকে সম্মান দেওয়া হয় পুরোমাত্রায় উদাহরণ স্বরূপে বললেন যে হিন্দু প্রধান এই দেশে সীতাকে রামের উপর স্থান দেওয়া হয় এবং রাধাকে কৃষ্ণের উপর – যেমন জপের সময় বলা হয় 'সীতা রাম, রাধা কৃষ্ণ' (রাম সীতা বা কৃষ্ণ রাধা নয়) বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফলে শিশুর বয়স থেকে ছেলে মেয়ে উভয়েই লাভবান হচ্ছে।

অস্ট্রিয়া :

প্রধানমন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী হক জানালেন যে ওদের পারলামেনটে শতকরা ১০ জন নারী সদস্যা। তবে নারী পুরুষের সমতা সর্বসাধারণ এখনো মেনে নেয়নি - পুরুষ যেন নারীকে বরদাস্ত করে, এমন একটি ভাব এদেশে প্রচলিত। সমতা লাভের জন্য এখনো অনেক আন্দোলনের প্রয়োজন।

নিউজিল্যানড :

এদেশে ১৮৯৩ সালে মহিলারা ভোটের অধিকার পান। যখন অধিকাংশ দেশেই মেয়েরা পর্দার আড়ালে ছিল – একথা গর্বের সংগে জানান শ্রীমতী মলডুন, নিউজিল্যানডের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। বাধ্যতামূলক শিক্ষার পুরোপুরি লাভ এরা উঠিয়েছেন - নারী পুরুষ নির্বিশেষে। এমনকি ৬ মাস পর্যন্ত কোন অসুস্থ শিশুর জন্যও হাসপাতালে থাকাকালীন স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বৎসোয়ানা :

১৯৬৬ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়েছে। সংবিধানে পুরুষ নারীর সমান অধিকার দেওয়া আছে। জনসংখ্যা ৫ লক্ষ। নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। আপাতত মন্ত্রিসভায় দুজন মহিলা মন্ত্রী সামিল আছেন।

মালাউড়ি :

২০ বছর স্বাধীনতা প্রাপ্ত এই দেশের মেয়েরা এখনো জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন পুরুষের পাশাপাশি। রাষ্ট্রপতি বানডার (Banda) ভগ্নি বললেন যে প্রধান সমস্যা হল পানীয় জল এবং জ্বালানী কাঠের। গ্রামপ্রধান এই দেশের মানুষরা এখনো শহরের জীবনে প্রভাবিত হয়নি।

জামবিয়া :

১৯৬৪ সলে স্বাধীন হয়। রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী শ্রীমতী কাউনডা জামবিয়ার অসাধ্য সাধনের কথা উল্লেখ করলেন। কি ভাবে প্রতিবেশী রোডেশিয়া (পরে জিমবাবোয়ে) মোজামবিক এবং অ্যাংগোলার স্বাধীনতা আন্দোলনে এঁরা জড়িত হয়েছিলেন -- কত বাস্তুহারাকে দিয়েছিলেন আশ্রয়। এখন স্বাধীনতা অর্জনের পরে এরা একসংগে অগ্রসর হয়েছেন নিজেদের প্রসারিত করার দিকে। সংবিধানে নারী পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান বেতনের (equal pay for equal work) নির্দেশ দেওয়া আছে। সমাজের সব স্তরেই নারীর অবদান আছে। আজ যে সংসদের সদস্যা, স্কুলের শিক্ষিকা, হাসপাতালে ডাক্তার, এমনকি কৃষি জগতেও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে লাংগল ধরেছে।

জিমবাবোয়ে :

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী স্যালী মুগাবে আলোচনার মোড়, ঘুরিয়ে দিলেন। সভার সামনে জ্বালাময়ী ভাষায় এঁকে দিলেন ভবিষ্যতের সমূহ বিপদের ছবি। নারী আন্দোলন সমতার জন্য চলবে বটে কিন্তু আমাদের সামনে যখন আসন্ন পারমাণবিক যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে তখন সেই দিকেই কি আমাদের নজর দেওয়া উচিত নয়? কিভাবে এই সংগ্রামকে ঠেকান যায়, শ্রীমতী মুগাবে সেই প্রশ্নই, তুললেন সভার সামনে।

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এই প্রবাদটিই তাঁদের ভাষায় উল্লেখ করে বললেন, শান্তি বিনা এই জগতে বাঁচবার আশা যে করে সে মূর্খ। আগে জীবনকে নিরাপদ করতে হবে আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য। তারপর সমতার কথা ভাবা যাবে।

সভাশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌছান হল যে, জীবনধারণের জন্য এই নিরাপত্তাহীন বিশ্বে সমগ্র মানুষজাতির সংগ্রাম চালানর প্রয়োজন পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সর্বপ্রথম শান্তির প্রয়োজন। তারপরে আনবে সমতা এবং নারী শক্তির বিকাশ। □

আনন্দমঠ একটি সৎ নাট্য প্রচেষ্টা

শতবর্ষ পার হয়ে যাবার পর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী বিতর্কিত উপন্যাস 'আনন্দমঠের' নাট্যরূপ উপস্থাপনা কথা একটি পেশাদারি মঞ্চের কর্তৃপক্ষের পক্ষে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। বিশেষ করে যখন বেশির ভাগ পেশাদারি মঞ্চে বারে এবং বেবারে চলছে শুধু ক্যাবারে আর 'এ' মারকা নাটকের নামে অর্ধ নগ্ন দেহ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, তখন একটি দেশাত্মবোধক নাট্য প্রযোজনাকে নির্দ্বিধায় সাধুবাদ জানাব।

প্রযোজনার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবার পর নাটকের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, কুশীলব এবং দর্শকদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। দর্শকই হচ্ছেন নাটকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। সুতরাং দর্শকদের কথাই আগে বলি। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ দেখে সেই গ্রামের কথাই মনে হয়েছে যে গ্রামের কথা দিয়ে আনন্দমঠ উপন্যাস শুরু। গ্রামের নাম পদচিহ্ন। '১১৭৬ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না।' সেদিন 'উত্তাপ প্রবল ছিল না'। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে দর্শকাসনগুলি দেখে মনে হয়েছে 'আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই।' অথচ সুবেদার রেজা খাঁ এবং দেওয়ান গঙ্গারাম তো বেশ মেজাজেই নাটক শুরু করেছিলেন। যদিও রেজা খাঁর কর্কশ কণ্ঠে ছিল সংলাপ উচ্চারণের বিচিত্র ধরন, যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলা নাটকের ইংরেজের অভিনয় করা বাঙালি অভিনেতাদের মুখে শুনে এসেছি। অথচ নাটকের পরবর্তী দৃশ্যে শুনলাম রেজা খাঁর (সলিল দত্ত) সফিসটিকেটেড বাংলা উচ্চারণ। তদুপরি সুবেদার রেজা খাঁ বিদ্রোহ দমন করে 'সুখ নিদ্রায় রাত্রি যাপনের' উদ্যোগের মুহূর্তে অন্ধকারে যে কাষ্ঠ হাসিটি উপহার দিলেন তা দর্শকদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে পীড়িত করেছে।

মন্বন্তরের সময় 'ধনী নির্ধনের একদর। তাই পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্র সিংহ তাঁর পত্নীকে নিয়ে 'রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।' পথে মহেন্দ্র সিংহ কন্যার দুধ সংগ্রহের জন্য স্ত্রী কন্যাকে একা রেখে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর 'সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী ও তাহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণ বর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।' উপন্যাসে দৃশ্যটি এই রকমই ছিল। কিন্তু মঞ্চে সেটি পরিবেশিত হল অন্যভাবে, মূল উপন্যাসের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে। কল্যাণীর অলংকার লুণ্ঠনের মুহূর্তে দস্যুদের একজন কল্যাণীর প্রায় পদপ্রান্তে বসে বিনতি করছিলেন বলে মনে হল। লুণ্ঠনের সময় লুণ্ঠনকারীর বিনতি? শুধু এই দৃশ্য নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যকার (অশোক গঙ্গোপাধ্যায়) মূল উপন্যাসের প্রতি আনুগত্য দেখাননি।

মহেন্দ্র সিংহ স্ত্রী-কন্যার খোঁজে ঘোরার সময় সিপাহীদের হাতে পড়ে ভবানন্দের সাহায্যে সত্যানন্দের 'আনন্দমঠে' এলেন। ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে দেখে বললেন 'সবাই যা তুমিও তা, কেবল দুধ ঘি-এর যম।' কিন্তু নাটকের মহেন্দ্র সিংহকে (সুজিৎ বসু) দেখে তা মনে হল না। তদুপরি তিনি ছিলেন বড় আড়ষ্ট চলনে, বলনে, অভিব্যক্তিতে, অথচ যুদ্ধে তাঁর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। বরং তাঁর স্ত্রী কল্যাণীর (দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়) ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রায় ম্লান করে রেখেছিল। শুধু তাঁর 'চতুর্ভুজ' শব্দটির উচ্চারণ বড় দীর্ঘ, শ্রুতিকটু।

আনন্দমঠ অধ্যক্ষ সত্যানন্দের মঞ্চে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিবর্তিত হল, নাটকে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য এল। তাঁর দেহ পট, কণ্ঠ এবং ব্যক্তিত্ব দর্শকদের মনে প্রভাব বিস্তার করল। দর্শকরা বুকে নিলেন সত্যানন্দই (ভানু চট্টোপাধ্যায়) আনন্দমঠের প্রথম পুরুষ প্রধান ব্যক্তিত্ব। মূলত সত্যানন্দ এবং তাঁর প্রধান সহচর জীবানন্দই (মৃণাল মুখোপাধ্যায়) নাটকটিতে যথোচিত গাম্ভীর্য আরোপ করেছেন। মৃণালের জীবানন্দ ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠ, সুকণ্ঠ, চলনে বা অভিব্যক্তিতে কোন আড়ষ্টতা নেই এবং তিনি সত্যানন্দের মতই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। মঠের অন্য সন্ন্যাসীরা কেউ এই পর্যায়ের অভিনয় করেননি।

নিজের ব্রাহ্মণী শান্তিকে নিয়ে জীবানন্দের রীতিমত উৎকণ্ঠা ও ভাবনা ছিল। দর্শকরাও ভেবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'ক্রমশঃ শান্তির যৌবন লক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক।' সুতরাং এর থেকেই শান্তির বয়সটা আঁচ করা যায়। তাই শান্তির ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবাকে দেখে দর্শকরাও ভেবেছেন। কারণ সুপ্রিয়া দেবীর বয়স, দেহাবয়ব এবং কণ্ঠ কোনটাই আনন্দমঠের শান্তি চরিত্রে অভিনয়ের উপযোগী নয়। তবে এই দোষ তাঁর নয়, পরিচালকের। কিন্তু ভুল সংলাপ বলাটা শিল্পীরই দোষ এবং সেটা সুপ্রিয়া দেবীর [('গুরুদেব আজ আমার শিখা (টোক গিলে) শিখিলাঙের দিন')]। শান্তি চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে এই সব প্রতিবন্ধকতা নিয়েই দুটি দ্রুত লয়ের গানের সঙ্গে তাঁকে নাচতেও হয়েছে। ('দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে' এবং 'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?')। আর সেই নাচে ছিল হাতে প্রাচোর মুদ্রা, পায়ে প্রতীচোর তাল। শান্তির এই নাচের প্রয়োজন পরিচালক রাসবিহারী সরকারই ভাল জানেন।

সন্তান দলের বিদ্রোহ দমনের জন্য যেসব ইংরেজ তখন ছিলেন, তাদের মধ্যে ক্যাপটেন টমাস (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়), রেশম কুঠির অধ্যক্ষ ডনিওয়ারথ (নির্মল ঘোষ) এবং লিনডেলকেই (প্রদীপ চক্রবর্তী) নাটকে পাওয়া যায়। এরা অনেক সন্তান সেনা নিধন করেছেন। আবার সন্তানদের বুদ্ধির কাছে পরাজিতও হয়েছেন। কিন্তু এদের সংলাপ বলার বিচিত্র ধরনে, কৌতুকাভিনয়ে নাটক গতিশীল হয়েছে, এটাও সত্যি।

অভিনয়াংশে যাদের কথা আগে বলেছি তারা ছাড়া রবিন ঘোষালের 'গঙ্গারাম' সংযত ব্যক্তিত্বপূর্ণ। অমিয় কান্তির 'গোবর্ধন' রিলিফটুকু ভালই দিয়েছেন। আর স্ত্রী চরিত্রে সব চেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল মনে হয়েছে স্বাতী লাহিড়ীর 'নিমাই-মণিকে'। অনুরাধা রায়ের 'গৌরী দেবী' মেকানিক্যাল।

নাটকের আলোক-সম্পাত নিরঞ্জন মায়ের। আলোক সম্পাতীর ভুলে অভিনেতারা কষ্ট পেয়েছেন। বিশেষ করে বিপদে পড়েছিলেন মহেন্দ্র সিংহ। সত্যানন্দের দেখানো স্বপ্ন-রূপের একটি তাঁকে অন্ধকারেই দেখতে হয়েছে। মঞ্চ নিতান্ত মামুলি ঢং-এর। তবে সংগীতাংশ নাটকটির সম্পদ। মোট পাঁচটি গান — মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত তাঁদের সুকণ্ঠে পরিবেশন করেছেন নাটকের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

পরিশেষে বলি জীবানন্দ যুদ্ধে আহত হয়ে রণক্ষেত্রে পড়েছিলেন। শান্তি একাই তাঁকে খুঁজে নিয়ে হাতে হাত ধরে যখন রওনা হলেন তখন পূব আকাশে নতুন সূর্য, লাল আভা ছড়িয়ে উঁকি উঁকি করছে। কিন্তু উপন্যাস তা বলে না। উপন্যাসে রয়েছে 'পূর্ণিমা রাত্রি, সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির ----। শান্তি চাহিয়া দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না মা। জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আইস।' সেই মহাপুরুষের পরামর্শেই শান্তি জীবানন্দকে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে রক্ত ধুয়ে দিল এবং মহাপুরুষ-চিকিৎসক জীবানন্দের ক্ষতস্থানে লতাপাতায় প্রলেপ দিলেন। তার পর জীবানন্দ সুস্থ হলে পর 'দুই জনে ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে অন্তর্হিত হইল।' এই দৃশ্যের পরই আনন্দমঠ নাটক শেষ। কিন্তু উপন্যাসের শেষ আরও পরে, যেখানে এক মহাপুরুষ এসে সত্যানন্দের হাত ধরে বললেন, 'অজ্ঞান, চল জ্ঞান লাভ করিবে চল। হিমালয় শিখরে মাতৃ মন্দির আছে, সেই স্থান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব', সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শেষ। □

উষা ভৌমিক

খেলার আসর

২৩ ডিসেম্বর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

নানা ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে সদ্য সমাপ্ত ভারত : ওয়েস্ট ইন্ডিজ পঞ্চম টেস্টের খবর। শুধু মাঠের নয়, মাঠকে ঘিরে মাঠের বাইরে যা কিছু ঘটেছে, অফিসে পাড়ার মোড়ে এমনকি রান্নাঘরে — তারও নিখুঁত ছবি। সংগে বহু ফটোগ্রাফারের বহু রকমের ছবি।

বোম্বাই থেকে পাঠানো খেলার আসরের প্রতিনিধি পবিত্র দাসের রোভার্স কাপ ফাইনালের রিপোর্ট। কেমন খেলল কলকাতার তিন প্রধান।

কলকাতায় কিছুদিন আগেই হয়ে গেল এশিয়ান ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপ। কিন্তু কী কারণে এই প্রতিযোগিতাকে সফল বলা গেল না। সংগে প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় চীনের চেন চাং জিব একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার

চিরঞ্জীবের দুটি ধারাবাহিক রচনা : লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিকের প্রস্তুতি এবং লাইপজিগ ও মস্কো স্পার্তাকিয়াদ

জানুয়ারি থেকে

খেলার আসর আরও আকর্ষণীয়।

প্রতি সংখ্যায় থাকবে চারটি রঙীন ছবি ও একটি ব্লো-আপ

নতুন বছরের শুরুর সংগে সংগে খেলার আসর নতুনভাবে সেজে বের হচ্ছে। প্রথম এবং শেষ মলাটে পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয় তারকাদের রঙীন ছবি তো থাকছেই। ভিতরে দুই পৃষ্ঠা জুড়ে রঙীন একটি ব্লো আপ ছবি। এ ছাড়া আরও দুটি রঙীন ছবি দুই পৃষ্ঠায়।

পাঠক পাঠিকারা বহুদিন ধরে অনুরোধ জানাচ্ছেন প্রশ্নোত্তর বিভাগ খোলার। এ মাস থেকে নানা খেলা নিয়ে তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে এই বিভাগে। বিভাগটির নাম 'জানাবেন কি?' চিঠি পাঠালে খামের উপর 'জানাবেন কি?' লিখতে ভুলবেন না।

প্রতি সংখ্যায় থাকবে একটি বিষয় নিয়ে 'বিতর্ক'। জানুয়ারির বিতর্কের বিষয় 'খেলতে খেলতে লেখা উচিত কি?' ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এ নিয়ে সম্প্রতি খেলোয়াড়দের সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন নানা কারণে। পরে হয়তো ফুটবল কর্তৃপক্ষও একই বিধি আরোপ করবেন। আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি আমাদের দফতরে পাঠান। খামের উপরে 'বিতর্ক' অবশ্যই লিখে দেবেন।

এ ছাড়া, আবার চালু হচ্ছে ছোটদের নিজস্ব বিভাগ 'উঠছে যারা'। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-খেলার রিপোর্ট প্রবন্ধ, ফটো বা আঁকা ছবি এই বিভাগে ছাপা হবে।

শব্দশৃঙ্খলা — ৭৪

সূত্র : পাশাপাশি

১। নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার
৬। অনেকে গাছে তুলে অনেকে 'মা' [illegible] নয়
৭। 'প্রতিজ্ঞা' করুন
৮। সামনে 'সাপ'
১০। 'সূত্র' খুঁজে নিন
১১। দুবার বলছি জানালায় টাঙালে সব ঠান্ডা থাকবে, সুন্দরও হবে।
১৪। ফেলেংকারি হলে যা হয়
১৬। সাহেবি ভাঁড়ামো
১৭। শুধু বকুনি নয়, সংগে ধাকুনিও আছে
২০। মা লক্ষ্মীর বাহন
২১। কেউ কেউ এ জিনিস বদল করার আগে পণ চায়
২২। জল জাত
২৩। যকৃৎ

সূত্র : ওপর নিচ

১। 'মোকদ্দমা' বলতে যা বুঝি
২। গ্রাম্য 'আমি'
৩। ইনি গৃহিণী
৪। 'ধ্বংস' বললেই হয়
৫। নাকের গহনা
৮। যাচাই করুন
৯। ছটফটে পতংগ
১০। নাবালক নয়, সাবালকও নয়। তবে কে হয়
১২। ছিলিতে 'বোকা'
১৩। বন্ধুকে চিনে নিন
১৪। পদ্মিনী
১৫। এ জিনিস অনেকেই গ্রহপ্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে ধারণ করেন
১৮। কলধ্বনি
১৯। লোহার কারিগর
২০। ইংরেজি পাতা

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি ৮৪।

*

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃঙ্খলা আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নম্বরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খলা — ৭৩

সমাধান

শব্দশৃঙ্খলা ৭৩-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন জ্যোতিপ্রসাদ মুখার্জি (১৭, শশিভূষণ মুখার্জি লেন সালকিয়া, হাওড়া-৬) এবং এ সি সরকার (ওঝর টাউনশিপ, নাশিক, মহারাষ্ট্র-৪২২২০৭)

শব্দশৃঙ্খলা ৭৩-র লটারিতে বিচারক ছিলেন সোমনাথ মিত্র

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

ডিসেম্বর ২১ থেকে ২৭

মেষ : শরীর নিয়ে ভোগান্তি [illegible], মেয়েদের শারীরিক অবস্থার [illegible] উন্নতি। আর্থিক ক্ষেত্রে [illegible] যোগাযোগে অতিরিক্ত [illegible]। কর্মস্থলে সামান্য মনো[illegible] মেয়েদের সুনাম। পারি[illegible] সমস্যা সমাধানে নিজস্ব [illegible] সাফল্য। স্ত্রীর ভ্রমণের [illegible]। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনি[illegible]

বৃষ : ছোটখাট অসুস্থতা লেগে থাকবে এবং বেশ কষ্ট দেবে। মেয়েদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকলেও ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা গৃহীত হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ চলবে। পুরনো বিবাদ বিসম্বাদ মিটে যাবে। ব্যবসায়ীদের অল্প স্বল্প লাভ।

মিথুন : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের পুরনো কোন রোগে নতুন করে ভোগান্তি। আর্থিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি, সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্যমে বাধা, মেয়েদের ভুল বোঝাবুঝি, মনান্তর। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে তুচ্ছ কারণে। মেয়েদের বন্ধুর পরামর্শে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে।

কর্কট : শারীরিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে না, মেয়েদের অল্পবিস্তর শারীরিক ঝামেলা চলবে। অতিরিক্ত লাভের প্রচেষ্টায় বড় রকম ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে দর বাড়ার ইংগিত; মেয়েদের নতুন পরিস্থিতিতে অশান্তি। সন্তানদের কারণ জন্য ভীষণ উদ্বেগ। পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের সুনাম। ব্যবসায়ীদের অবস্থায় পরিবর্তন।

সিংহ : বাত ব্যাধায় পংগু হবার আশংকা; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে না। আর্থিক সচ্ছলতা ও সদব্যয়। কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি আর্থিক লাভ; মেয়েদের তুচ্ছ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে সম্মানহানির আশংকা। পারিবারিক কোন পরিকল্পনা রূপ পেতে পারে। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে নতুন অশান্তি। ব্যবসায়ীদের সামান্য বাধা।

কন্যা : শরীর ভাল-মন্দয় মিলিয়ে চলবে; মেয়েদের শরীর ভাল চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ কিছু উপরিলাভ। কর্মস্থলে আচমকা কোন সিদ্ধান্তে ক্ষতি; মেয়েদের পরিকল্পনামাফিক কাজে সহজ সাফল্য। ধর্মকর্ম ও সাধুসংগ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের আকস্মিক ক্ষতি।

তুলা : শরীর উৎপাত করবে পারে, মেয়েদের শরীর ভাল যাবে না। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন বাধা ঝামেলা। কর্মস্থলে সম্পত্তি লেখের দিকে কোন সুখবর। মেয়েদের নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। পারিবারিক ব্যাপারে স্ত্রীর মতামত প্রাধান্য পাবে। আকস্মিকভাবে সম্পত্তি কেনা বেচার যোগ। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

বৃশ্চিক : অম্বল অজীর্ণ ভোগাবে; মেয়েদের শারীরিক ঝামেলা লেগে থাকবে। প্রচুর ব্যয় ও সঞ্চয় হ্রাস। কর্মক্ষেত্রে নিজ মতামতে স্থির থাকলে ক্ষতি, মেয়েদের কিছু কিছু অধিকার পাওয়া যাবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন দায়দায়িত্ব অশান্তি। কোন বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীর জীবনাশংকা। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

ধনু : শারীরিক ভোগান্তি চলবে; মেয়েদের শরীরও উৎপাতসূচক। আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোন বদলির ইংগিত; মেয়েদের সহকর্মীদের সংগে মনোমালিন্য। স্ত্রীর জন্য বিশেষ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। পারিবারিক ব্যাপারে কোন বন্ধুর অপ্রত্যাশিত সাহায্য। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

মকর : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি। স্বজনসম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনের জন্য বিশেষ অর্থব্যয়। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কারও অযাচিত পরামর্শ লাভ। মেয়েদের কর্মস্থলে নিকট কোন কাজে অনায়াস সাফল্য। দূরের কোন সংবাদ বিচলিত করবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা কেটে যাবে।

কুম্ভ : শরীর মোটামুটি চলবে মেয়েদের উঁচু জায়গা থেকে পড়ে আঘাত পাবার আশংকা। আর্থিক ব্যাপারে আগের কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি কিন্তু আর্থিক সুরাহা নয়; মেয়েদের অন্যেরা ভুল বুঝবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজনের সংগে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

মীন : শরীর নিয়ে ঝামেলা; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার হের ফের হবে না। আর্থিক ব্যাপারে নতুন সমস্যা, বড় রকমের ঋণ। কর্মক্ষেত্রে অন্যেরা সন্দেহের চোখে দেখবে; মেয়েদের শত্রুরা বিশেষ বিব্রত করবে। কর্মপ্রার্থীদের কোন যোগাযোগ শেষ মুহূর্তে ভেস্তে যাবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

বনমানুষের হাড়

কাহিনী : অদ্রীশ বর্ধন
ছবি : পোলারিস

কলকাতার জন-অরণ্যে এসে নিরাপত্তা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অপমানের জ্বালা তো জুড়োল না।

গরিব বলেই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে জুতোর বাড়ি খেয়ে নিরুদ্দেশ হতে হল ---

ইজ্জতের ভয়ে কিন্তু এ অপমান, এ স্মৃতি, এ যন্ত্রণা আমি ভুলব না, মা!

অর্থ না থাকলে নারীর নিরাপত্তা নেই – তাই আঠার বছরের শ্রাবণী দিবানিশি ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে আস্তে আস্তে পালটে গেল। জন্ম নিল আর এক শ্রাবণী।

বিয়ে? ইহজন্মে নয়। টাকা? হ্যাঁ, চাই বৈ কি! অনেক --- অনেক টাকা চাই! ইজ্জৎ? হাঃ – হাঃ – হাঃ! সেটা আবার কী? পৃথিবীটা কার বশ? – টাকার --- টাকার --- টাকার --- কুমারীর নয়!

একদিন ভোররাতে ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে বাসন্তী দেখল – শ্রাবণী চলে গিয়েছে।

মাগো, বাবার বড় ইচ্ছে ছিল মসকো কনজারভেটরিতে যেন দু-বছরের কোরস পড়ে আসি। তাই হবে

কিন্তু টাকা চাই। – অনেক টাকা! তাই সমুদ্রে শয্যা পাততে চলেছি – শিশিরকে আর ভয় করি না! কীভাবে আছি – জানাব যথাসময়ে। ঠিকানা পাবে না। কোনদিন না।

কাহিনী ফুরিয়ে গেল। নিঝুম হয়ে সোফায় এলিয়ে রইল বাসন্তী। কাঁদছে, নিঃশব্দে।

অবনীশ এখনো খুঁজছে শ্রাবণীকে,- তাই না মাসীমা?

হ্যাঁ, বাবা। সাবু চলে যাওয়ার পর সে এসেছিল আমার কাছে

ঠিকানা পেল কোত্থেকে?

সাবুই চিঠি লিখে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। লিখেছিল ---

PARIBARTAN 21—27 December 1983 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 4.00

পরিবর্তন

শীতের ভ্রমণ

রাজ্যপাল অনন্ত প্রসাদ শর্মা

পরিবর্তন

৪ জানুয়ারি সংখ্যার আকর্ষণ

বিহার রাজনীতির অবস্থা এখন টালমাটাল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিং ও পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্রের বিবাদ এখন তুঙ্গে। এই বিরোধে জয়ী হবেন কে? ডঃ মিশ্র কি আবার ফিরে আসছেন? বিরোধী শিবিরেও চলছে দলীয় কোন্দল। তার স্বরূপ কী?

পরিবর্তনের সিনিয়র রিপোর্টার শ্যামল বসু ঘুরে এলেন পাটনা। দেখা করে এলেন বিহার রাজনীতির নায়কদের সঙ্গে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর সরজমিন প্রতিবেদন

বিহার রাজনীতির নেপথ্যে

দূরদর্শন রঙিন হয়েছে। কিন্তু তাতে অনুষ্ঠানের উন্নতি হয়েছে কতটুকু? দূরদর্শনের সম্প্রসারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছেন? পরিবর্তনের দিল্লি প্রতিনিধি তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী এইচ কে এল ভগতের।

১৯৮৪ সাল কেমন যাবে? জ্যোতিষীর চোখে যেমন ব্যক্তিগত রাশিফল দেওয়া হয়েছে, তেমনি যারা জ্যোতিষী নন, বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে যাঁদের খ্যাতি সুবিদিত এমন কিছু ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৮৪ সম্পর্কে। সেই সঙ্গে জরজ অরওয়েল সম্পর্কে এক মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয় মাইতি।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত লিখেছেন কলের জলে আরসেনিক সম্পর্কে এক সরজমিন প্রতিবেদন।

এ ছাড়া অন্যান্য ফিচার।

১৯৮৪ সালের একটি ক্যালেনডার পাবেন ৪ জানুয়ারি সংখ্যা পরিবর্তনের সঙ্গে।

নিবেদনমিদং

ডিসেম্বর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনোদন পর্যায়ের লেখাগুলি শেষ হয়ে গেল। পরিবর্তনের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর। তাঁদের কাছ থেকে প্রায়ই অনুরোধ আসে আপনারা মেয়েদের জন্য বেশি করে পাতা দিন। কিন্তু তাঁদের সে অনুরোধ রাখতে পারি না। তাই আমরা মাঝে মাঝেই মেয়েদের নানা সমস্যা নিয়ে বড় লেখা বার করি। এবারে এমন একটা বিষয় বেছে নেওয়া হয়েছে যা সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে জড়িত। নতুন বছরে আমাদের দেশের মেয়েরা আরও সৌন্দর্য সচেতন হয়ে উঠুন পুরুষেরা হয়ে উঠুন আরও পৌরুষ দীপ্ত, এই প্রার্থনা। তবে আমাদের কাছে দাবি আসছে শুধু মেয়েদের উপযোগী একটা পত্রিকা যেন আমরা প্রকাশ করি। এই প্রস্তাব নিয়ে এখন ভাবনা চিন্তা চলছে।

৩/১৭ নতীম পথ দুর্গাপুর থেকে অমলকান্তি বিশ্বাস লিখেছেন, সমীপেষু বিভাগে সেরা চিঠির জন্য সাম্মানিক বন্ধ করে দেওয়ায় চিঠিপত্রের মান নেমে গিয়েছে। আমরা এই অভিযোগ মানতে পারছি না। অনেক নামী পত্রিকা দপ্তরে বসে কল্পিত নামে চিঠি তৈরি করে ছেপে বাহবা কুড়িয়ে থাকেন। সংবাদপত্রের গ্রীনরুমে কত কী যে কাণ্ড হয় পাঠকরা তার কতটুকু জানেন? তবে আমরা প্রতিটি প্রকৃত চিঠি ছেপে থাকি। ঘরে বসে বানান চিঠি হলে এখুনি একশ ভাল ভাল চিঠি বানিয়ে ছাপান যায়। আমরা এমনিতে এত চিঠি পাই যে চিঠি বানাবার কোন প্রশ্নই আসে না। অনেক পত্র পত্রিকা পাঠককে ভড়কি দেবার জন্য বিনা পয়সায় নামী বিজ্ঞাপন পর্যন্ত ছাপে। এ সবই পাঠক ভোলান অপকৌশল। আমরা যা অর্জন করেছি তা তিল তিল করে। এমনকি আমরা পরিবর্তনের জন্য দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদও করি না। আমাদের এই অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য কেউ কেউ পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছে আমাদের নামে অপপ্রচারও চালিয়ে যাচ্ছেন। খবরের কাগজের দুনিয়ায় যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এ কথা মনে করবেন না। বিশেষ করে ভারতবর্ষে কেউ কিছু গড়ে তুলতে গেলে প্রবল বাধা পান আপনজনের কাছ থেকে। এ সম্পর্কে একটা বিখ্যাত জোক মনে পড়ল: এক ভারতীয় ব্যবসায়ী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঁকড়া সরবরাহ করছিলেন। কিন্তু যে টিনের কৌটোয় করে তিনি কাঁকড়া পাঠাচ্ছিলেন তার কোন ঢাকনা ছিল না। কাস্টমসের লোক কৌটোগুলি দেখে তাঁকে প্রশ্ন করল কৌটোর ঢাকনি নেই, কাঁকড়াগুলো তো পালিয়ে যাবে। ব্যবসায়ী জবাব দিলেন, 'না, ওরা পালাবে না। কারণ ওরা ভারতীয় কাঁকড়া। একজন উঠে পালাতে গেলে আর একজন তাকে টেনে নামিয়ে নেবে। এতে করে কেউ আর পালাতে পারবে না।'

আসুন, আগামী নববর্ষে আমরা আরও একটু সহনশীল হই। অপরকে উঠতে সাহায্য করি। অপরকে নামিয়ে আমরা যেন আনন্দ না পাই।

হ্যাঁ, চিঠির কথায় ফিরে আসি। নির্বাচিত বিষয়ের ওপর চিঠি তো আমরা পুরস্কৃত করছিই, বরং আগের চেয়ে গড়ে বেশি পুরস্কার দিচ্ছি। এই সংখ্যায় প্রকাশিত সমস্ত চিঠির লেখককে আমরা সাম্মানিক দেব।

দিল্লি থেকে একজন মহিলা এক মর্মন্তুদ চিঠি লিখেছেন। চিঠির ভাষা এই: মহাশয়, আমি একজন পরিবর্তনের পাঠিকা। পরিবর্তন পড়তে খুব ভালবাসি। আমি ২৬ বছরের মহিলা। আমার দুটি বাচ্চা। আমার স্বামী ভীষণ রাগী, খুব মারধোর করে। এসব আমি অনেক সহ্য করেছি। আর সহ্য করতে পারি না। এর বিরুদ্ধে যদি কোন আইন থাকে জানালে উপকৃত হব। এই চিঠিতে নির্যাতিতা ওই ভদ্রমহিলা কোন নাম ঠিকানা দেননি। আমরা তাঁকে অনুরোধ করছি আমাদের দিল্লি অফিসে শ্রীমতী গায়ত্রী রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

নতুন বছরে লনডন থেকে লিখছেন একদা কৃতী ভারতীয় ছাত্র, সুপণ্ডিত ও বর্তমানে ইনডিয়া উইকলির সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক প্রেমেন আড্ডি।

পাঠকদের সাজেশান অনুযায়ী আমরা নতুন বছর থেকে প্রতি সংখ্যায় মহাপুরুষ ও মনীষীদের কিছু কিছু বাণী প্রকাশের ব্যবস্থা রাখছি।

বিনা পণে বিবাহেচ্ছু তরুণেরা যারা প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যায় নাম প্রকাশে ইচ্ছুক, তাঁরা অবিলম্বে ৫০ পয়সার ডাকটিকিট সহ ফরমের জন্য আবেদন করুন।

অলমিতি,

সম্পাদকীয়

ঝুলি থেকে বেড়াল বার করলে কার না অস্বস্তি হয়! পরিবহনমন্ত্রী রবীন মুখারজি মহাশয়েরও হয়েছে। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এক আলোচনাচক্রে রাজ্য পরিবহন ব্যবস্থার সমালোচনা করায় রবীনবাবু অত্যন্ত কুপিত হন এবং আলোচনাচক্রের মধ্যেই যতীনবাবুকে ভর্ৎসনা করেন যে প্রকাশ্য সভায় পরিবহন সম্পর্কে সমালোচনা করে তিনি সরকারি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।

গায়ে গা লাগিয়ে ঝগড়া নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। পূর্তমন্ত্রী যতীনবাবু যদি আচমকা কোন বিবৃতি দিয়ে পরিবহন দফতরের সমালোচনা করতেন তাহলে অবশ্য একে নিশ্চয়ই আচরণবিধির খেলাপ বলে অভিহিত করা যেত। কিন্তু রাজ্যের পরিবহন সমস্যা নিয়ে আলোচনাচক্র ডেকেছিলেন একটি বণিকসভা। সেখানে তিন তিনজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাচক্র বা বিতর্কসভার উদ্দেশ্যই এই যে সেখানে খোলাখুলিভাবে যেন অকপট সত্য কথাই উচ্চারিত হয়। তাছাড়া সাজেশন, সমালোচনা, বিশ্লেষণ এগুলি প্রকাশের জন্যই আলোচনাচক্র। অতএব পূর্তমন্ত্রী মন্ত্রী হিসাবে অথবা একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে যদি রাজ্য পরিবহন দফতরের পঙ্গু অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং তার মধ্যে সমালোচনার সুর নিহিত থাকে, তাহলে তাঁকে দায়রা সোপর্দ করার ভয় দেখান শুধু যে অশোভন তা নয়, তা পরিবহন মন্ত্রীর অপদার্থতা ঢাকারই এক হাস্যকর প্রয়াস।

পরিবহন সমস্যা নিবারণের জন্য এই রবীনবাবুই একদা কলকাতার জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন রাত নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে কুলুপ এঁটে শুয়ে থাকতে। বিশ্ব ব্যাংকের ছত্রছায়ায় কলকাতা স্টেট টানসপোরট-এর কোন উন্নতিটা ঘটেছে রবীনবাবু প্রকাশ্য সভা ডেকে কলকাতার জনগণকে একটু দয়া করে বলবেন? বিশ্ব ব্যাংকের টাকায় কিছু নতুন বাসে কেনা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি পুরনো বাসেরই 'রিপ্লেসমেনট' অর্থাৎ বদলি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হাঁ, বেশ কিছু নয়া অফিসার নিয়োগ হয়েছে এবং এই সর্বপ্রথম একজন পারটির লোককে স্টেট ট্রানসপোরটের সর্বময় কর্তা করা হয়েছে। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য বহু টাকা ব্যয় করে তাঁর চেমবারটির পুনর্বিন্যাস ঘটান হয়েছে।

কলকাতা স্টেট বাসের জন্য সরকার এখনও বছরে ২৪ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করে চলেছেন। পরিবহন মন্ত্রীর বক্তব্য : জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই এই টাকা ব্যয় অযৌক্তিক নয়। পরিবহনমন্ত্রী বলে থাকেন কলকাতাতেই নাকি ভারতের মধ্যে বাসের ভাড়া সবচেয়ে কম। এই উক্তি ডাহা অসত্য ভাষণ। পরিবহনমন্ত্রী জেনে রাখুন, দিললিতে এখনও সর্বনিম্ন বাস ভাড়া ত্রিশ পয়সা। দ্বিতীয়ত নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য কংগ্রেসি আমলে মিনিবাস ও এস বাস নামক দুই শ্রেণীর বাস রাজপথে নামিয়ে যাত্রীদের পকেট কাটার এক নিন্দনীয় ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল। বামফ্রনট সেই ব্যবস্থাকে শুধু যে চালু রেখেছেন তা নয়, তাকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন। সারা কলকাতার বিভিন্ন রুট মিনিবাস ও এস বাস-এ ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিনি বাস মালিকের স্বার্থে ও স্পেশাল বাসের অর্থাগমের জন্য বিভিন্ন রুটে সরকারি ও বেসরকারি বাসের সংখ্যা হয় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, না হয় কোন সরকারি বাস রাখাই হয়নি। প্রসঙ্গত সলট লেকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই দূরের যাত্রীদের সুবিধার জন্য কাছের যাত্রী ও দূরের যাত্রীর জন্য একটি সমমূল্যের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সলট লেক থেকে কোথাও যেতে গেলে এই এস বা মিনিবাস ছাড়া গতি নেই। একটি বা দুটি স্টপেজ গাদাগাদি করে গিয়ে যাত্রীরা মিনিবাসে ৮০ পয়সা ভাড়া গুনতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় ন্যূনতম বাস ভাড়া এখন ৬০ বা ৬৫ পয়সাতে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ সব রুটে বেসরকারি বাস সর্বদা মেলে না। অথচ এই সব রুট চালু করার সময় পরিবহনমন্ত্রী দরিদ্র জনগণের কথা একেবারেই ভাবেননি। এ তো গেল কলকাতার কথা, মফস্বলের পরিবহন ব্যবস্থা সে তো এক বিভীষিকা। এ সম্পর্কে আমরা এক তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন শীঘ্রই প্রকাশ করছি। রবীনবাবু যদি গ্রাম বাংলার অধিবাসীদের মানুষ বলে গণ্য করতেন, তাহলে সর্বাগ্রে ছাদের ওপর বাক্স-পেটরার মত মানুষের বাসে চেপে যাওয়া বন্ধ করতেন। এক শ্রেণীর বাস মালিক ও শাসক দলের সঙ্গে যোগসাজশেই যে পর্যাপ্ত বাস পারমিট দেওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা আজ কারও অজ্ঞাত নয়। সমস্ত দিক থেকে রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থায় কোন উন্নতিই হয়নি, উপরন্তু বিশ্ব ব্যাংকের টাকার নয়-ছয় হচ্ছে।

কলকাতার হাজার হাজার মানুষের নিত্যদিনের যন্ত্রণাকেই পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী সেদিন ব্যক্ত করেছেন মাত্র। তিনি কোন সরকারি গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেননি। রবীনবাবুকে তাই অনুরোধ, তিনি আর একজন সহকর্মীকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে [illegible] না করে সেই সময়টুকু পরিবহনের উন্নতির জন্য ব্যয় করুন।

পরিবর্তন

২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩ – ৩ জানুয়ারি ১৯৮৪, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২৬

প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : নিতাই ঘোষ

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

দিললি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মারগ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিললি ১১০০০১, ফোন : ৩১২০২৪

জনমত

বর্তমান সংখ্যার জন্যে 'পুরুষের কোন পোশাক মেয়েদের পছন্দ' এবং 'মেয়েদের কোন পোশাক পুরুষের পছন্দ' এই বিষয়ে আমরা জনমত আহ্বান করেছিলাম। আশাতীত সাড়া আমরা পেয়েছি। আমাদের দফতরে এখন চিঠির সংখ্যা কয়েকশত। কিন্তু বেশির ভাগ পত্রলেখক মূল বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে আধুনিক সাজসজ্জার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, যা আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাই কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত অংশ আমরা প্রকাশ করলাম। প্রকাশিত পত্রগুলির জন্যে লেখক লেখিকারা ২০ টাকা করে সাম্মানিক পাবেন।

পুরুষের চোখে মেয়েদের পোশাক

টিপ, কাজল, সুতির শাড়ি

একটু ভিন্ন সুরে গোড়ার কথাগুলি বলে ফেলা যাক। যেমন ধরুন কখন আপনারা সাজবেন না। মনে করা যাক, সময়টা এখন মাঝগ্রীষ্মের খরতপ্ত দুপুর। দুপুরের খাওয়া শেষে পান রসে আপনার ঠোঁট টুকটুকে। ম্যাটিনি শো-তে যাওয়ার জন্য আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনি আপেল ফর্সা। সূর্য যেন তনুদেহটিতে আগুন ধরিয়েছে। এমন সময় নাই বা পরলেন গাঢ় রঙের শাড়ি আর স্লিভলেস ব্লাউজ। সিনথেটিক শাড়ি পরলে যেখানে পেটিকোটও লাঞ্ছিত হয়, নাই বা পরলেন তা। যাতায়াতের পথে অসতর্ক বা সতর্ক লুব্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগে না। আর ফেস পাউডারের কড়া প্রলেপ যখন সূর্যের তাপে ফুটিফাটা হবে, তার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়বে অনিবার্য লবণাক্ত ঘাম তখন মুখশ্রীতে 'শ্রী' বস্তুটি কি থাকবে? নাই বা নিজেকে করলেন এমন দর্শনীয়। তার চাইতে আসুন, আপনাকে আপনার মত দেখি। সাদা জমির সুতি শাড়িতে থাকল কিছু অনুজ্জ্বল এবং বাহারী ফুল, চুলকে যেমন তেমন সহজ উপায়ে শাসন করলেন। চোখে দিলেন মৃদু কাজলের পরশ আর কপালে ছোট্ট একটি টিপ।

অলক রায়চৌধুরী
কলকাতা ৬

কালো শাড়ি, সাদা ব্লাউজ

যখন দেখি ভারতীয় শাল বা কাশ্মীরি ও পাঞ্জাবি কাজ করা শাড়ি, বাহারি অলংকার, কটকের রূপার বা মহার্ঘ্য সোনার গয়না পরে কোন মহিলা চলেছেন তা সে যে বয়সই হোন না কেন, একটা শ্রদ্ধার ভাব সমস্ত যুবকদের ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ে।

ছেলেদের থেকে পোশাকের বৈচিত্র্য মেয়েদের অনেক বেশি। আজকাল 'ফ্যাশন শো' একটা আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। সুন্দর পোশাক ও অলংকারের টেক্কা টেক্কি চলে এই সব প্রতিযোগিতায়। লোকেদের মধ্যে বহু নিত্যনূতন পোশাকের জন্ম হয় এই ফ্যাশন শো-এ। কিন্তু কালো শাড়ির সঙ্গে সাদা বা রূপালি, ব্রকেট ধরনের ব্লাউজ, কানে ও গলায় রূপোর গহনা, হাতে রূপোর অথবা কাচের সাদা ধরনের চুড়ি পরলে বিয়েবাড়ি গিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করান যায় আর রুচির প্রশংসাও আদায় করা যায়। এই ফ্যাশনে শ্যামবর্ণাদেরও একটা আলাদা শ্রী ফুটে ওঠে।

শান্তনু
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দার্জিলি

ইন্দিরা গান্ধীকে দেখুন

আমরা বাঙালি তথা ভারতীয়। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের নানা ভাষা নানা জাতির নারী-সমাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সারা ভারতের বিভিন্ন সমাজের নারী জাতির আঞ্চলিক পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রূপচর্চা রুচিসম্পন্ন ও চিত্তাকর্ষক এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের মা-বোনদের জাতীয় পোশাক এবং রূপচর্চা আকর্ষণীয়। বিশেষত বাঙালি মা বোনদের কুঁচি দিয়ে পরিপাটি করে শাড়ি পড়া আজ প্রায় পৃথিবীর সব দেশের নারীসমাজের কাছে আদরণীয়। এবং পৃথিবীর পুরুষ সমাজের কাছে মেয়েদের এই সাজ প্রসংশনীয়। তাই শাড়ি ব্লাউজ ভারতীয় নারীসমাজের জাতীয় ও অভিজাত পোশাক বলা যেতে পারে। শাড়ি ব্লাউজে বাঙালি মেয়েদের সব থেকে বেশি সুন্দরী দেখায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাঙালি মায়েদের মত শাড়ি ব্লাউজ পরে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করছেন। গোটা পৃথিবীর ধারণা ভারতীয় নারীসমাজের জাতীয় পোশাক শাড়ি ব্লাউজ।

রতিকান্ত বর্মন
ছোটমোল্লাখালি
২৪ পরগণা

বয়স এবং পোশাক

বর্তমান যুগে মেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে, হচ্ছে স্বাধীনভাবে চলার অধিকার লাভ করেছে অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় কোন অংশে তারা

পিছিয়ে নেই। কিন্তু তা বলে এমন পোশাক কখনই হওয়া উচিত নয় যার দ্বারা সে যেকোন মুহূর্তে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনতে পারে।

মেয়ে বলতে তিন শ্রেণীর বুঝি। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ৭/৮ বৎসর থেকে ১৩/১৪ বৎসর পর্যন্ত। এদের মিডি, ম্যাকসি, সালোয়ার কামিজেই দেখতে ভালই। দ্বিতীয় শ্রেণী ১৫/১৬ থেকে ২৫/৩০ পর্যন্ত। এদের মধ্যে যারা অবিবাহিতা তারা যদি অবাঙালি হন তো সালোয়ার কামিজের সংগে একটা ওড়না ব্যবহারে ভালই দেখায়, ম্যাকসিও মন্দ নয় বরং সভ্য। কিন্তু বাঙালি হলে, সালোয়ার কামিজ যেন মানায় না আর ম্যাকসি ভালই, তবে শাড়ি সবচেয়ে ভাল এবং অবশ্যই রঙচঙে। কিন্তু যারা ৩০/৩৫ বৎসর বা তদূর্ধ্বে তাদের রঙচঙে শাড়ি পরলে ভাল লাগে না। , তারা যদি একটু হালকা রঙ বা সাদা তাঁতের শাড়ি পরেন তবে যেন শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে। **সুশীল সাহা**

বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩

চড়া আধুনিকতা নয়

আমার পক্ষপাতিত্ব শাড়ির প্রতিই বেশি। মেয়েদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে বেশবিন্যাসের সংগে প্রসাধনেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এক্ষেত্রেও বলি বেশি কাটকেটে বা উগ্র প্রসাধন ভাল লাগে না। কারণ তাতে হয় কি মেয়েদের স্বাভাবিক স্নিগ্ধ সৌন্দর্যটা চাপা পড়ে গিয়ে একটা কৃত্রিমতা ফুটে উঠে যা মোটেই নয়নসুখকর লাগে না। আধুনিকতা চাই কিন্তু খুব চড়া যেন না হয়। বেশ ছিমছাম, নিখুঁত, পরিপাটি সাজটাই ভাল লাগে।

সুব্রতকুমার করণ

বাওয়ালি, ২৪ পরগণা

মাধুর্য দিতে পারে শাড়ি

অনেকদিন থেকেই নারী-পুরুষ উভয়েরই পোশাক নির্বাচনে বৈচিত্র্যময়তা ছিল। যদিও পোশাকের উদ্ভব ঘটেছিল লজ্জা নিবারণের জন্য। কিন্তু অতীত থেকে বর্তমানের স্রোতে পোশাক ক্রমশ ব্যবহারিক দিক দিয়ে মূল প্রয়োজন ছাপিয়ে একটা তৃতীয়মাত্রা যোগ করেছে।

একথা খুবই ঠিক যে, এই যুগে নারীও পুরুষের সংগে প্রায় সব ব্যাপারেই সমযোদ্ধা। কি কর্মক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে। এজন্য নারীর সদা-প্রস্তুত গোছের একটি পোশাক প্রয়োজন। ট্রেন বাস-ট্রামে গুঁতোগুঁতি করে উঠতে কিংবা ভিড় ঠেলে রাস্তায় এগোতে শাড়ির অসুবিধা সর্বজনবিদিত। তাই প্যান্ট-শার্ট, সালোয়ার বা মিডি এক্ষেত্রে অনেকটাই উপযোগী।

কিন্তু সমস্ত নারীই যে কিছু দৌড়ঝাঁপ করছে তা নয়। আসলে শাড়ি ব্যতিরেকে অন্য পোশাকের ঝোঁকটাই নব্য তরুণীদের পেয়ে বসেছে বেশি।

সাধারণ বাঙালি তরুণ হিসাবে নারীর স্নিগ্ধ রূপটিই আমার পছন্দ। নারী, বিশেষত বাঙালি নারীর প্রধান পরিধেয় শাড়িই হওয়া উচিত। **শুভ্র মজুমদার**

কলকাতা ৬৪

তাঁতের শাড়ি

মেয়েদের মধ্যে ফ্যাশনের জোয়ারে গা ভাসানোর প্রবণতা আসে প্রধানত সিনেমা থিয়েটারের নায়িকাদের এবং বিজ্ঞাপনের লাস্যময়ী ললনাদের দেখাদেখি।

কীরকম পোশাকে মেয়েদের মানাবে সে কথায় আসি। সিনথেটিক শাড়ির যুগে এখনকার শরীর লেপটান, পেট দেখান শাড়ি পরার কায়দার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু তাতে কি ভাল দেখায়? বরং মা-ঠাকুমার দিকে তাকান। শালীনতা বজায় রেখে শাড়ির মত দীর্ঘ, সেলাইরহিত পোশাকে কত শোভনভাবে তাঁরা সাজেন দেখলে অবাক হতে হয়। বাংলায় তাঁতের শাড়ির অভাব নেই। শুচিস্নিগ্ধ, সুষমামণ্ডিত এইসব শাড়ি গুণেও অনেক উঁচুমানের।

অনুপকুমার দত্ত কলকাতা ৬৪

শাড়ি : তাঁত, পিওর সিলক ও সিনথেটিক

সেই কোন আদিকালে নারী নিজ লজ্জানিবারণে বল্কল, আর শরীরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে লতাপাতার রস দিয়ে নিজের ওষ্ঠ এবং অন্যান্য অংশ রঞ্জিত করতে শিখেছিল। কালে কালে একদিন বিচিত্র সাজ পোশাক আর কসমেটিকস-এর কল্যাণে অপূর্ব রূপ বিন্যাসে নারী পুরুষের মনোহরণ আর নয়নকে তৃপ্ত করল। কোন নারীর রূপ বর্ণনায় সাজ পোশাকের বর্ণনাও তাই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালেও বিভিন্ন সাজ পোশাকের কথা বর্ণিত হয়েছে। নানা পোশাকে সজ্জিত হলেও শাড়িতেই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ, ঠিক নীল আকাশের ব্যাপ্তির মত।

শাড়ি হিসাবে আমার প্রথম পছন্দ তাঁতের শাড়ি। দ্বিতীয় পিওর সিলক, পরে অন্যান্য সিনথেটিক। অবশ্য বিভিন্ন উৎসব আনন্দে কিংবা বিভিন্ন ঋতুতে মেয়েদের পোশাক আশাকেও বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজন আছে। **সুকুমার দত্ত**

সিউড়ি, বীরভূম

পোশাক এবং সংস্কৃতি

ভারতীয় সংস্কৃতিকে ইয়াংকি কালচার, রকনিস, বিটনিকস কালচার ছেয়ে ফেলেছে। শাড়ি পরা বাঙালি ললনা সে দেখতে যতই খারাপ হক তাকে কিন্তু ভাল লাগে ওই সমস্ত ললনাদের চেয়ে।

প্রশান্ত মজুমদার বাটানগর

আগেকার পোশাকই ভাল

হাতকাটা ব্লাউজ না পরে, টাইট পোশাক না পরে, ঠোঁট পালিশ ও মুখে পেনট ব্যবহার না করে, নাভির নিচে কাপড় না পরে, বাঙালি মেয়েরা পূর্বে যে রুচিসম্মত পোশাক পরতেন তা পরলে প্রগতিশীল নারীদের পক্ষে গৌরব বাড়বে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু

সাদি খাঁর দেয়াড়, মুরশিদাবাদ

যে পোশাকে মানবীরূপ

সাজসজ্জা একজনকে কতটা আকর্ষণীয়া করে তুলবে তা নির্ভর করছে পরিবেশ, পরিস্থিতি, উদ্দেশ্য ও মেজাজের ওপর। তাই ভাললাগা মন্দলাগা ব্যাপারটা রিলেটিভ। যে পোশাকে একজন নারীকে বিবাহবাসরে অপরূপা আকর্ষণীয়া মনে হয়েছিল সেই পোশাকে শবানুগমনে তাকে নিশ্চয়ই মানাবে না। শীতের সজ্জা খর বৈশাখে অসহ্য।

সেই পোশাকই কাম্য যে পোশাক মানুষটিকে ভোগের [illegible] হিসেবে প্রতিপন্ন না করে [illegible] সমগ্র সত্তাকে গ্রাস না করে, তা[illegible] তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে উপস্থা[illegible]পিত করে, মানবীরূপে তাকে তা[illegible] পরিচয়েই তুলে ধরে।

রামকুশল বন্দ্যোপাধ্যায়

আনারা, পুরুলিয়া

পছন্দ সালোয়ার কামিজ

প্রথমেই বলে রাখি, চোখের দৃষ্টিতে যদি প্রসন্নতা না থাকে মুখের মধ্যে না থাকে লালিত্য, তবে কোন সাজেই মানায় না। তবু সালোয়ার কামিজ-ওড়না পর[illegible] মেয়েদের দিকে যে একটু বেশি তাকাই, একটু বেশি আকর্ষণ অনুভব[illegible]কার, তার কারণ হয়ত শৈশব কৈশোরের নানান আনন্দস্মৃতিতে নিহিত। যেসব মেয়েদের কাছাকাছি থেকে বড় হয়েছি, লেখাপড়া করেছি, খেলাধূলা করেছি, ঝগড়াঝাটি করেছি, ভাইফোটা নিয়েছি, তাদের সবার শাড়ি না-পরা চেহারাটাই আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বরুড়া, ২৪ পরগণা

শাড়ির ঐতিহ্য

পোশাক পরিধান নিজেকে অন্যের কাছে সুন্দর দেখান এবং লজ্জা নিবারণের জন্য। লজ্জা তো নারীর ভূষণ। সুতরাং নারীর পোশাকের স্থান পুরুষদের তুলনায়

[illegible] উন্নত, রক্ষণশীল রুচিসম্মত এবং বহুলাংশে পুরুষ চক্ষে লজ্জা-নিবারক হওয়া উচিত। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

একটি মেয়ে যখন 'নারী'তে পরিণত হল, অর্থাৎ তার দেহ সৌষ্ঠব প্রকৃত নারীসুলভ হল তখনই তার ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরা উচিত। কিন্তু বর্তমানে দুই সন্তানের জননীও ম্যাকসি পরছে। এই বেশে তাকে কি পুরুষের চোখে সুন্দর লাগে?

শাড়ি হল এমন একটা পোশাক যা নারী অংগকে সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত করে রাখে। বিচিত্র রঙের বিচিত্র ডিজাইনের শাড়ি নারী অংগে বৈচিত্র্য আনে।

অনেক মেয়েকে দেখা যায় পুরোদস্তুর ভারতীয় শাড়ি, প্রাচীন ডিজাইনের ব্লাউজ, শাল ইত্যাদি ব্যবহার করতে। এবং তারাই পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণীয় পোশাকের জোয়ারে ভেসে না গিয়ে ভারতের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ

সাদা ব্লাউজ হলদে শাড়ি

প্রকৃতি ও নারী একই সত্তার দুটো ভিন্ন রূপ। প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন ঋতুতে নিজেকে অপরূপা করে তোলে, ঠিক তেমনি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী বিভিন্ন সাজে অপরূপা হয়।

১৯৭৮-এ শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। রতন পল্লীতে লাল পাড় শাড়ি, লাল ব্লাউজ, শ্যামপু চুলে বেল ফুল, এরকম কয়েকটি মেয়েকে কবিগুরুর দেশে দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

আসলে মেয়েদের সাজগোজটা ভীষণভাবে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

শ্যামপু করা চুলওয়ালা মেয়েদের [illegible] ভাল লেগেছে। সাদা ব্লাউজ হলুদ শাড়ি আমার খুব ভাল লেগেছে।

রতন রায় কলকাতা ৭২

বেশি অংশ ঢাকা থাক

আজ নারী জাগরণের যুগও বলা যায়। নারী কোন অংশে পুরুষের চেয়ে কম নয়। অফিস-আদালত সর্বত্রই নারী স্বীয় প্রতিভা বলে প্রতিষ্ঠিত। চাকরিস্থল কলকাতা (প্রধানত) যে বিভিন্ন সমস্যার ভারে নুয়ে পড়েছে – সে কথা অনস্বীকার্য। তার মধ্যে পরিবহন সমস্যা অন্যতম। সেই সমস্যার মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরও কর্মের খাতিরে আসা যাওয়া করতে হয়। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে – সব জায়গাতেই ভিড়ের ঠেলায় যে জীবন নাজেহাল হয় সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের পোশাকের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

আবার প্রাকৃতিক পরিবেশও নারীদের সাজ-পোশাকের ওপর অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করে।

নারীর সাজ এমন হওয়া উচিত যাতে সর্বাংগ না হোক, বেশি অংশটি যেন ঢাকা থাকে। কারণ কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ দেখলে, মানুষের নিকট তার আকর্ষণ কমে যায়।

এম আনসারুল হক
ডায়মনড হারবার, ২৪ পরগণা

মেয়েদের চোখে পুরুষের পোশাক

পানজাবি পাজামা চুলে শ্যাম্পু

পুরুষদের রূপচর্চা বা ফ্যাশন বলতে বুঝি, যা পরলে তাদের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি বজায় থাকবে। মা মাসিদের মুখে শুনতাম জমিদার বাড়ির তরুণদের ফ্যাশনের কথা। তারা পরতো কালো পাড়ের কল্কাদার মত কোঁচানো ধুতি, আদ্দির গিলে করা পানজাবি, পানজাবির বুকে থাকত হীরের বোতাম, আর শরীর থেকে ভেসে আসত আতরের খুশবু যা তাদের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করত। দিন বদলের সংগে সংগে ফ্যাশনেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তরুণ সমাজের রূপচর্চা বা ফ্যাশন সীমাবদ্ধ হয়েছে পোশাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যে। এখনকার রূপচর্চা কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন। আজকাল সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি যে তরুণরা জিনস (তাও আবার বিভিন্ন স্থানে তাপ্পি দেওয়া), হাত কাটা গেঞ্জি, ডিসকো জুতো পরে অনেকটা ফিরিংগি কায়দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানছি এগুলি আধুনিক ফ্যাশন, কিন্তু আমার মত মেয়েদের চোখ কখনো এই উগ্রতার কাছে নতি স্বীকার করতে পারেনা। চুল বড় রাখাটাও সুরুচির পরিচায়ক নয়। যদি কোন উৎসব আঙিনায় কোন তরুণকে সাদা চিকনের কারুকাজ করা পানজাবি ও পাজামা পরে, এবং ছোট চুলে হালকা শ্যাম্পু করে ঘুরতে দেখি, তবে সবার মধ্যে ঐ তরুণটিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে।

অল্পনা নাথ
চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

আলোকচিত্র : সৌগত রায় বর্মন

ওলড ইজ গোলড

পুরুষের সজ্জা হওয়া উচিত একান্তই পৌরুষ-নির্ভর। সেখানে ইউনিসেকস জাতীয় হাস্যকর পোশাকের কোন স্থান না থাকাই উচিত। দীর্ঘ, কুঞ্চিত কেশদাম অনেক পুরুষের মতে বাঞ্ছনীয় কারণ এতে নাকি তাঁদের [illegible] মনোভাব প্রকাশিত হয় কিংবা পৌরাণিক বীরত্বের ইমেজ জাগে।

এ বিষয়ে ১৯ শতকের রুচিশীল মনোভাব স্মরণীয়। আজকের দিনে হয়তো তা রক্ষণশীলতার পর্যায়ে পড়ে – আধুনিকরা হয়তো পিউরিটান মনোভাব বলে নাসাকুঞ্চন করতে পারেন, তবুও সেই শতবর্ষ আগের পুরুষের পোশাকের স্নিগ্ধ, শান্ত সৌন্দর্যের তুলনা নেই। ধুতি পানজাবি, চোগা-চাপকান, শামলা শেরওয়ানীতে উনিশ শতকের নবজাগরণের রূপটিই ফুটেছে। এই নসটালজিয়ার কারণ হয়তো কিছুটা ওলড ইজ গোলড মনোভাব কিন্তু অনেকটাই মূল্যায়নের সত্য স্বীকৃতি।

তাই আজকের পুরুষের পোশাক 'শুধু [illegible] দিয়ে [illegible] না ভোলায় চোখ।'

রূপশ্রী দত্ত
কলিকাতা ১৩

ধুতি পানজাবি

স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রাইমারির ছাত্ররা পর্যন্ত ডিসকোর স্রোতে এখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। আজকাল সুরুচিপূর্ণ পুরোদস্তুর একজন বাঙালি পুরুষ খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ আমাদের দেশের বেশির ভাগ বাঙালিই এখন হাফসাহেব, হাফবাঙালিতে, পরিণত হয়েছেন।

তবে আধুনিক পোশাকের যত পরিবর্তনই হোক না কেন ধুতি পানজাবির পরিবর্তন কিন্তু আজও হয়নি। পানজাবির পেছনে পকেটও বসেনি আবার ধুতির গায়ে ফুল লতাপাতাও ওঠেনি। ভারতীয় বাঙালির আসল পোশাক কিন্তু ঠিকই আছে। তার পরিবর্তন কোন দিনও হবে না কারণ ওটাই হল বাঙালির আসল ঐতিহ্য।

শিখারাণী কুন্ডু

স্বাদিশাব দেয়াড় মুরশিদাবাদ

জিনস মন্দ নয়, অনুষ্ঠানে পানজাবি

আমার মতে সাজপোশাকের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা। পুরুষের সাজপোশাক হওয়া উচিত যা তার পৌরুষের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলে, উজ্জ্বল, সুন্দর, রুচিসম্পন্ন পোশাক পুরুষরা পরবে এটাই আমার পছন্দ। পোশাক নিশ্চয়ই আধুনিক হবে, পুরনো সেকেলে বা একঘেয়ে নয়। তাতে থাকবে নতুনত্ব এবং সৃষ্টিশীলতার ছাপ। তবে আধুনিকতার নামে তথাকথিত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস আমার ভাল লাগে না। ছেলেদের ট্রাউজার এবং শারট বেশ ভাল মানায়। ট্রাউজার একেবারে কাটকেটে রঙের হবে না আবার ম্যাড়মেড়েও হবে না। তাতে ঔজ্জ্বল্য থাকবে; থাকবে রুচিশীলতা। সুন্দর স্ট্রাইপ বা হালকা রঙের শারটও বেশ ভাল। আজকাল ছেলেরা যে জিনস পরে সেগুলি মন্দ নয় তবে তাপিপ্পরা বা ধাতব গয়না লাগান বা ফিকে করে নেওয়া ইত্যাদির প্রতি অকারণ অনুরাগের অর্থ বুঝিনা। কোনও কোনও অনুষ্ঠানে বা বিশেষ দিনে ঐতিহ্যবাহী পোশাক যেমন ধুতি পানজাবি বেশ সুন্দর মানিয়ে যায়। তবে সব পোশাকই পরা উচিত নিজের সংগে তাল মিলিয়ে।

সুমিত্রা চ্যাটারজি

মিস্ত্রীঘাট, বারাকপুর

জিনস, চাইনিজ শারট, নরথস্টার

বেশ কিছু ছেলেকে দেখি মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লাল নীল রঙের বিভিন্ন দিকে চেন দেওয়া জামা-প্যানট পরে। ঘাড় থেকে গলা অবধি রুমাল দেওয়া থাকে। ড্যানির মতো চুল। পায়ে হানটার বুট। এদের এই সাজপোশাকটা দৃষ্টি আকর্ষণের পরিবর্তে দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। এখন বেলবটসের ঘের কমে গেছে। এই অল্প ঘেরের প্যানটই আমার দেখতে ভাল লাগে। প্যানটে বিভিন্ন নকশা দেওয়া, সামনে দুটো, পেছনে দুটো পকেট আমার একেবারেই অপছন্দ। নকশা একটু থাকবে বইকি। তবে সামনে কিংবা পেছনে একটা বা দুটো পকেটই ভাল। জিনসের প্যানট পরলে তাদেরই ভাল লাগে আমার চোখে যাদের চেহারা ভাল। তবে টাইট ফিটিংসটা পছন্দ করি না।

জামাতেও এখন অনেকরকম ডিজাইন দেখছি। কলারবিহীন জামাও বাজারে এসে গেছে। এই ধরনের জামাকে আমি পছন্দ করি না। আবার বিরাট হাতির কানের মতো লম্বা কলারও ভাল লাগে না। মাঝারি সাইজের কলার পছন্দসই।

চাইনিজ কাটিং জামাগুলো ছেলেদের গায়ে বেশ সুন্দর লাগে। স্বাস্থ্যবান ছেলেদের গায়ে গেঞ্জি অপূর্ব লাগে। কিন্তু গেঞ্জির হালকা রঙটাই আমার পছন্দ।

ডিসকো বুট আমার ভাল লাগে। নর্থস্টারও মন্দ না। ছেলেরা এখন হাওয়াই চপ্পল পরছে রং বেরঙের। তবে চপ্পলগুলোর উচ্চতা অত বেশি না হলে মানানসই হত।

ডাঃ পূর্ণিমা সাহা

শ্রীরামপুর, হুগলী

জাতীয় পোশাকই ভাল

ডিসকো কাটিং জামা প্যানট পরা লম্বা চুলো ছেলেদের দেখলে মস্তান ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। মস্তানি পোশাক মেয়েরা ঘৃণা করে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না আজকাল কার যুবকরা বেশচর্চায় পোশাক পরিচ্ছদে কেন কুরুচির পরিচয় দিচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রতিটি দেশ বিশ্বের সংগে সংস্কৃতি আদান-প্রদান করার সুযোগ পেয়েছে। এবং তার প্রতিফলন ঘটছে মানুষের সাজ পোশাকে। মনে রাখা দরকার সংস্কৃতি বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে পৃথিবীর ভাল জিনিসটাই আমরা গ্রহণ করব। আমাদের দেশের যুব সমাজ কি সেই পথ ধরে চলছে

আমি বাঙালি তাই বাঙালির জাতীয় পোশাকে বেশচর্চা করতে দেখলে আমি খুশী হই। ধুতি পানজাবি, পাজামা পানজাবি পরা ছেলেদের আমার ভাল লাগে।

তন্দ্রা ঘোষ

বসিরহাট, ২৪ পরগনা

স্মারটনেসই আসল পোশাক

পুরুষদের পক্ষে মেয়েদের মত বেশি সাজগোজ উচিত নয়। পুরুষদের সাজসজ্জা যেন পুরুষালী হয়। সাদারঙের পোশাকে পুরুষের সৌন্দর্য বাড়ে, তাছাড়া সাদারঙের মধ্যে সততা ও পবিত্রতার প্রকাশও ঘটে। সাদারঙ পুরুষের ব্যক্তিত্বকে অনেকখানি মর্যাদা দেয়।

যে সব পুরুষ রোগাটে গড়নের, তাদের বড় চুল রাখাই ভাল, তাহলে অতটা রোগা দেখায় না। দশাসই স্বাস্থ্যবান দেহী পুরুষের চুল বড় না রেখে বরং জুলপি একটু বড়সড় থাকলেই মানানসই।

ট্রাউজারের সংগে জামা সবসময় গুঁজে পরাই ভাল। গেঞ্জি পরছে অনেকেই, তবে একটু ভাল স্বাস্থ্য না হলে গেঞ্জি মানাবে কেন। রোগাটে পুরুষের পক্ষে পায়জামা পানজাবি ও চটি পরাই ভাল।

ছাপা জামা পুরুষের পক্ষে বর্জনীয়। এসব পরলে বড্ড মেয়েলী দেখায়। তার চেয়ে ভাল এক রঙা বা গাঢ় রঙের চেক জামা। এতে পুরুষালী ভাব প্রকাশ পায়।

বেলবটসের ওপরে আজকাল অনেকে পানজাবি পরেন, এটা গুরুচণ্ডালী পোশাক বলে মনে হয়। এতে পায়জামা পানজাবির মৌলিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। তবে পুরুষমানুষের সবচাইতে বড় পোশাক স্মারটনেস।

সাথী বিশ্বাস, দুর্গাপুর - ৪

পানজাবির পকেটে ধুতির কোঁচা

পঞ্চদশী আমার মনের গভীরতা থেকে প্রজাপতির রঙিন পাখার মত তিরতিরিয়ে ওঠে। উৎসারিত মুঠো মুঠো রং রামধনু হয়ে ফুটে উঠে আকাশে। সম্মুখে পাট ভাঙা ধুতি এবং পানজাবি। সাদা রঙের মত ডানা মেলে উড়ে চলে নরেশ্বরে। তা, ঐ তো ঐতো আমার মনের মত পোশাক পরা পুরুষ। সদ্য পাট ভাঙা ধুতি এবং পানজাবি পরে দাঁড়িয়ে।

ধুতি এবং পানজাবি বাঙালিদের আদর্শ পোশাক। এই ধুতি পানজাবির একটা শাশ্বত মূল্য রয়েছে। এই পোশাক কারো কাছ থেকে ধার করা নয়। এ একান্ত বাঙালিরই নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী।

অনেকের ধারণা আজকের দিনে প্যানট জামা না পরলে নাকি স্মারট হওয়া যায় না। অবশ্য স্মারটনেস বলতে যদি বিশৃঙ্খলা বোঝায় তাহলে কী বলব। আজকের দিনে স্মারটনেসের মধ্যে একটা অপরাধবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর এই মানসিকতাকে বড় বেশি উগ্র করে তোলে উৎকট সাজ পোশাক। একটা বেপরোয়া মানসিকতার ধাক্কায় মূল্যবোধগুলোও গুঁড়িয়ে যায় তখন। স্মারটনেস কখনও সাজ পোশাক দিয়ে আসে না। ওটা একটা মানসিকতার ব্যাপার। যদি তাই হয় তাহলে ঈশ্বরচন্দ্র কিংবা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মত হাঁটুর উপর ধুতিপরা লোক কখনোই 'বিদ্যাসাগর' বা 'মহাত্মা' হতে পারতেন না। কিন্তু আসলে তাতো নয়। ঐ ধুতির মধ্যেই রয়েছে স্পষ্টতা এবং আশ্চর্য রকমের সরলতা। ভদ্রতা এবং নম্রতার টানাপোড়েনেই বুঝি ধুতিগুলো তৈরি। আমার তো মনে হয় ধুতির শুভ্রতায় নির্মলতা এবং সহজ ভদ্রতা দানা বেঁধে আছে।

দীপ্তি রাণী দত্ত

[illegible], বীরভূম

মন্ত্রীদের 'হোম রুল'

কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য-রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ এক বামপন্থী নেতার সংগে কথা বলতে গিয়ে এক মন্ত্রীর প্রসংগ উঠল। জিগেস করলাম, মন্ত্রী মশাই কেমন আছেন। নেতা বললেন, আছেন মোটামুটি। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই উনি 'হোমে' যাবেন। আমি বললাম, 'হোম' মানে হোম কনসটিটুয়েনসি মানে নিজের নির্বাচনী এলাকায় যাবেন ?

নেতা : না মশাই, হোম মানে নারসিং হোম। মন্ত্রী অসুস্থ, তাই নারসিং হোমে থাকবেন কিছুদিন।

: কেন, এর আগে তো মন্ত্রী মশাইরা অসুস্থ হলে শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতালে থাকতেন। নিখরচায় ভি আই পি ট্রিটমেনট পেতেন। সেখানে কি কোন অসুবিধা দেখা দিয়েছে, যার জন্য মন্ত্রী মশাই নারসিং হোমে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

নেতা : শুধু ওই মন্ত্রী নন, এরপর থেকে সব মন্ত্রীই অসুস্থ হলে নারসিং হোমে যাবেন।

: কেন ? এটা কি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ?

নেতা : না, মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এখন থেকে কোন মন্ত্রী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাবেন না। নারসিং হোমে যাবেন। নারসিং হোমের যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার বহন করবেন।

: তাহলে হাসপাতালে যাবেন জনগণ। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রয়োজনে একই বেডে দুজন রোগী থাকবেন। কিন্তু জন প্রতিনিধিরা যাবেন নারসিং হোমে। আর জনগণ বহন করবেন নারসিং হোমের যাবতীয় খরচ। কী বিচিত্র ব্যবস্থা !

নেতা : কিছু বিচিত্র ব্যবস্থা নয়। একটা মন্ত্রী তৈরির Cost কত জানেন

: আজ্ঞে না। কৃষ্ণমূর্তি সাহেব তো সেরকম কোন হিসেব দেননি।

নেতা : মন্ত্রী তৈরির Cost অত্যন্ত বেশি বলেই মন্ত্রীদের হাসপাতালে পাঠান যায় না। এটা জনগণের বোঝা উচিত।

: আপনি কি বলতে চাইছেন মন্ত্রীদের হাসপাতালে পাঠানতে কোন রিসক আছে ?

নেতা : জুনিয়ার ডাক্তাররা কচি কাঁচা, সিনিয়ার ডাক্তাররা সকাল বিকেল দুবেলা মারচ পাসটের ভঙ্গিতে ওয়ারডের মধ্যে দিয়ে গটমট করে যাওয়ার সময় রোগীর দিকে তাকিয়ে জনপ্রতিনিধিদের মত হাত নাড়েন। রোগী যেটুকু ভাল হয় নারসদের ধমকে।

: হাসপাতালের এহেন অবস্থায় মন্ত্রীরা নারসিং হোমে যেতেই পারেন। জনগণ এটা নিশ্চয়ই অ্যাপরিসিয়েট করবে।

নেতা : বর্তমান মন্ত্রিসভায় ষাটোর্ধ্ব মন্ত্রীই বেশি। তাদের ফিট রাখতে হবে যাতে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ না পড়েন। আর কম বয়সী মন্ত্রীদের ফিট রাখতে হবে যাতে তারা প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক আনাজপাতি বিক্রি করতে পারেন।

: আচ্ছা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত

নেতা : কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এটা পুরোপুরি রাজ্যের অ্যাফেয়ার।

: একে এই রাজ্য ওভারড্রাফট-পীড়ায় পীড়িত, তদুপরি চিকিৎসার জন্য মন্ত্রীদের নারসিং হোমের বিল মেটাতে গিয়ে যদি ওভার ড্রাফটের পরিমাণ বাড়ে তাহলে তো প্রণব মুখুজ্যে ক্যাঁক করে ধরবে।

নেতা : ওভারড্রাফট এক পয়সাও বাড়বে না। আর এর জন্য রাজ্য সরকার কোন অনুদানও চাইবে না।

: নারসিং হোমের যাবতীয় খরচ কি তাহলে মন্ত্রীদের মাইনে থেকে কাটা হবে ?

নেতা : না।

: তাহলে টাকাটা আসবে কোত্থেকে ?

নেতা : সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। নারসিং হোমের যাবতীয় বিল পেমেনট করা হবে চিফ মিনিসটারস রিলিফ ফানড থেকে।

: সত্যিই তো। জনগণের যাদের প্রতি বিলিফ আছে তাঁদেরই রিলিফ দেওয়া দরকার। এটা আর জনগণকে কষ্ট করে বোঝাতে হবে না। জনগণ সহজেই বুঝে নেবে। □

নির্মল বিশ্বাস

অম্লমধুর

লাগলে আগুন ডাকো দমকল
আগুন নেবাবে এসে
বাজারে আগুন লাগলে পরে
নেবাবে আগুন কে সে ?

মাছ, মাংস, সবজি, আনাজ
নাগালের সব বাইরে
আয় সকলে পয়সা কাঁচা
চিবিয়ে সবাই খাইরে।

*

স্বাধীন হয়েছি সন্দেহ নেই
হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি
তাই তো দু'বেলা কাঁকরমণি
পচা চাল, গম খাচ্ছি।
হাসপাতালে ওষুধে ভেজাল
তেল, ডাল আর জলে।
সোজা পথে আর জিনিস মেলে না
ঘুর পথে যায় চলে।

নিতাই ঘোষ

এলেন রাণী দিলেন বাণী
চাপড়ে গেলেন পিঠখানা
পাল্টিয়ে রাজ এসেছে স্বরাজ
কেতা পাল্টায়নি এক আনা।

কুমার মুখোপাধ্যায়

লরেটোতে লাঞ্ছনা
বঙ্গবাসীতে তুলকালাম
মন্ত্রীদের কামনা –
বিপ্লবীদের লাল সেলাম।

অমলকান্তি বিশ্বাস

সকাল বেলায় দুধ আনলাম
মা রেগে কন কানা।
আনতে দিলাম দুধের বোতল
আনলি দেখি ছানা।

সুদর্শন নন্দী

বাগদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ি
কোথায় তোমার বাড়ি
অন্য দেশের পণ্য হয়েই
যাচ্ছ গাড়ি গাড়ি,
তাই ভেবেছি, নিদেন যদি
সরকার দেয় ফাঁসি
শেষ ইচ্ছা বাৎলে দেব –
বাগদা ভালবাসি।

শেখর আহমেদ

ঠাকমা বলেন, হয়ে অস্থির,
'সব হল যে অশুচি!
আর খাব না 'বনস্পতি'-র –
পরোটা বা লুচি!
চর্বি ভেজাল দিয়ে যে হায়
করছে রে পাপ-কর্ম!
বনস্পতির ছোঁয়াতে যায় –
বুঝি সব জাত-ধর্ম!
অন্য ঘিয়ে ভেজাল বাকি?
ঘিয়ের খাবার পেলে,
এবার খেতে হবে না কি
তুলসী পাতা ফেলে?

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

বাসে উঠেই দাঁড়ান দাদা
লেডিস সিটের সামনেই,
উঠছে মানুষ নামছে মানুষ
দাদার নামার নাম নেই!

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকঘরে ছাড়ি চিঠি
ঠিকানাটা বিহারে।
আরও দূরে গেল শেষে
দিল্লির তিহারে!
মধুপুরে ছাড়ি চিঠি
যদু রায় নামে।
গেল সে মধুর কাছে
যদুপুর গ্রামে!

গণেশ পাল

লয়েড সাহায্য করেন
গাওস্কর বাণিজ্য
দু'দেশের ক্রিকেটারে
কী দারুণ সাযুজ্য!

*

রাজনীতিই করছে ওরা
শেখেনি এটিকেট
তুলে দিন দেশ থেকে
কর্মনাশা ক্রিকেট।

*

ক্রিকেট হয়েছে শেষ,
আরেক খেলা শুরু
এই খেলাতে জ্যোতিবাবু
অশোকদা'র গুরু।

নির্মল বিশ্বাস

... ফ্যাশন ...
... স্বাভাবিক ...
...নেরই অংগ। ...
...য়ে তাই নব্য-ফ্যাশনের
চলন হয় তাড়াতাড়ি।
...খানে পোশাক-আসাকের
ডিজাইনও অন্যান্য শিল্প
কলার মত স্বীকৃত সত্তা।
ডিজাইনাররা শিল্পীর মর্যাদা
পান।

আমরা ফ্যাশন ব্যাপারটা এখনও
...তা অর্থেই বুঝি, রুচির অর্থে নয়।
কিন্তু আমাদের মধ্যেও অন্যান্য
শিল্পের যথেষ্ট চর্চা আছে। সেই
...র সংগে সংগে ফ্যাশন বা সাজগোজও
একটা অন্যতম চর্চা হয়ে উঠুক, সেদিকে
...ক্ষ্য রেখেই 'ফ্যাশন ১৯৮৩'-র বিভিন্ন
...গুলি প্রকাশিত হল।

...মরা শরীরকে আরও সাজিয়ে তুলি, নারীরা
আরও সৌন্দর্যময়ী, শিশুরা
... মণ্ডিত। ফ্যাশন
...গুলির উদ্দেশ্য
... আকর্ষণের
...।

মধ্যবিত্ত মেয়েদের রূপচর্চা বিলাসিতা নয়, দরকারি

আরতি মজুমদার

মহাকবি কালিদাস বলেছেন -- 'কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতি নাম্' - যারা স্বভাবতই সুন্দর তাদের সাজসজ্জার আর প্রয়োজনীয়তা কী! রবীন্দ্রনাথও বলেছেন 'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।' বেণী নাহয় এলিয়ে রবে, সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে,' নাই বা হ'ল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ।'

কবিরা যাই বলুন, মানুষের সাজগোজ করার প্রবৃত্তি চিরন্তন। সুন্দর হতে সাধ নেই এমন মানুষ সংসারে আছেন নাকি? সভ্যতার অগ্রগতির সংগে - সময়ের সংগে তাল রেখে মানুষ শ্লীলতা রক্ষা করা ছাড়াও সাজসজ্জার মধ্যে দিয়ে তার মার্জিত রুচি, সৌন্দর্যজ্ঞান ও অভিনব সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। রূপচর্চা একটি বহু আদৃত শিল্পকলা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের ভাষায় 'মোহময়ী লাস্যে রূপসী' হয়ে ওঠার সাধ্য বা উপযোগিতা মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের বিলাসিতার পর্যায়ে পড়লেও সামাজিক প্রথা ও জীবিকার প্রয়োজনে তারাও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশেই নিজেকে লাবণ্যময়ী করে তুলতে যত্নবতী হয়েছেন। তাই, মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যেও ফ্যাশনের হাওয়া লেগেছে। তবে তাদের রূপচর্চা তাদের সাধ্যের পরিধি, ব্যক্তিগত রুচি ও জীবিকার ওপর একান্তভাবে নির্ভর। সম্মোহন করা সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব না হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব কিছুটা সাজগোজেই প্রতিফলিত হয় এ বিষয়ে তারাও সচেতন। এ যুগে সাফল্যের এক চাবিকাঠি হল সাজ পোশাক। তাদের দুশ্চিন্তা শুরু 'বিউটি পারলার' ও ব্যয়-সাপেক্ষ সাজসজ্জার আওতার বাইরে থেকে কত কম খরচে নিজেকে সুশ্রী, লাবণ্যময়ী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না দেখাতে পারেন।

সাজগোজের প্রথম পর্যায়েই আসে পরিচ্ছদ। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ -- একথা সত্য হলেও পোশাক পরিচ্ছদের নির্বাচনে সৌন্দর্য, যুগোপযোগী ফ্যাশন সুরুচির প্রাধান্য বিবেচ্য। সর্বোপরি বয়স অনুযায়ী এবং অবশ্যই চেহারা ও স্বাস্থ্যে যা মানানসই তাই পরিচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করা কর্তব্য।

যদিও সালোয়ার কামিজ ভারতীয় ও অত্যন্ত শালীন ও সুন্দর পোশাক তবুও শাড়িই মধ্যবিত্ত মেয়েদের সর্বক্ষণের পরিচ্ছদ। কেবলমাত্র বাধ্য হয়েই নয়, মধ্যবিত্ত মেয়েদের শাড়ির জন্য আলাদা দুর্বলতাই তাদের মধ্যবিত্ত মনের আর এক পরিচয়। তাই তাদের মধ্যে কাজে-কর্মেও জিনস বা অন্যান্য কি-জাতীয় পোশাকের তেমন চল হয়নি এখনও পর্যন্ত। সবাই যা পরছে তার থেকে আলাদা হতে, বিশিষ্ট দেখাতে অতি সাধারণ মেয়েদেরও মন চায়। তবে একটা বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকা দরকার যে, যে পোশাকে আড়ষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্য না লাগে এমন কাপড় জামা পরলেই তাদের শ্রী ও ব্যক্তিত্ব উন্মুক্ত হবে। তবে কাজ করার শাড়ি টেকসই, সংযত ও ভব্য হওয়া দরকার। সেই সংগে কোমল রং ও পাড়ের বৈচিত্র্য আছে অথচ বাহুল্য নেই এমন শাড়িই তারা বেছে নেবেন। সব অবস্থার সব বয়সী মেয়েরাই আজকাল ... ' ... যত টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, ধনেখালি, ফুলিয়া, রাজবলহাট, বেগমপুর, সমুদ্রগড়ের নতুন নতুন নকশাওলা চওড়াপাড় চমৎকার বুটি ও কল্কার অভিনবত্বে নিজেদের স্বতন্ত্র ও আকর্ষণীয়া করে তুলতে পারেন। ছাত্রী ও কর্মরতা মেয়েরা বৃষ্টি বাদলার দিনে, ট্রামে বাসের ভিড়ে সময়োপযোগী অবদান কিছু পলিয়েসটার, যারসিরাইজ ... ও সিনথেটিক শাড়িও বেছে নিতে পারেন। আর আছে আকর্ষণীয় সৃষ্টি – কোটা শাড়ি আর ছাপা শাড়ির ওপর কিছু প্রিন্ট। এর থেকে অনায়াসে কর্মরতা মহিলা ও স্কুল কলেজের ছাত্রীরা তাদের রুচি অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন।

সৌন্দর্যের অন্যতম বিষয় হচ্ছে

আলোকচিত্র : শংকর নাগ দাস

চুল। অথচ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কর্মময় জটিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবনে কেশচর্চা একরকম বিলাসিতাই। যদিও এদেরই মাথাভর্তি ঘনকৃষ্ণ, সজীব অঢেল চুলের বাহার এখনও রূপকথার 'কেশবতী' কন্যাদের মনে পড়িয়ে দেয়। সৌভাগ্যের বিষয় 'ববু' চুলের ফ্যাশন এদের কাছে আজও অনাদৃত। মসৃণ, সুবিন্যস্ত পরিপাটি কেশ এমন একটা সহজাত সৌন্দর্যে ভরা মুখশ্রী তৈরি করে যা সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চুল বাঁধা নির্ভর করে নিজের মুখের 'কাট' বা ছাঁদের ওপর। যেমন গোল মুখে একরকম চুল বাঁধা মানাবে, লম্বাটে বা চৌকো গঠনের মুখে অন্যরকম। একটু অবকাশ মত নিজেকেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে কী ছাঁদে কবরী রচনা করলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকশিত হবে।

নিজেকে নিখুঁত সুন্দরী না হোক, আকর্ষণীয়া করে তুলতে গেলে চোখ আর ঠোঁটের পরিচর্যা করতে ভুলে গেলে চলবে না। আঁখি হিল্লোলে যে বিজলী চমকায় একথা মনে রেখেই আঁখির শোভাকে মনোলোভা করার জন্য হালকা সুর্মা বা কাজল ব্যবহার করতে হবে। ঠোঁটের চামড়া কোমল আর টানটান থাকলে লিপস্টিক লাগালে ভাল দেখায়। রোজ রাত্রে শোবার আগে মুখ ধুয়ে ঠোঁটে গ্লিসারিন লাগালে ঠোঁট কোমল ও সতেজ থাকে।

রূপচর্চায় মুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্বকের সৌন্দর্য সাধন রূপচর্চার আসল চাবিকাঠি। কোমল, নমনীয় নির্মল ও মসৃণ ত্বক সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। দুর্ভাগ্যবশত বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিশ্রম মধ্যবিত্ত মেয়েদের ত্বকের কোমল বিশুদ্ধতা ও মসৃণতা হরণ করে নিয়েছে। এরা চোখ, ঠোঁট বা চুলের পরিচর্যায় যতটা যত্নবতী, ততটা হাত-পা বা মুখের পরিচর্যায় নয়। তবে সৌভাগ্যবশত একটু যত্ন বা চেষ্টা করলে অতি অল্প আয়াসেই স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে পারা যায়। তবে রূপচর্চা কতখানি করা হল সেটা বড় কথা নয়, কতটা নিয়মিত করা হয় তার গুরুত্ব অনেক বেশি। এগুলো দৈনন্দিন অভ্যাসের অংগ করে নিতে হবে :

১। অত্যধিক রুক্ষ চামড়া নরম করার জন্য গ্লিসারিন ও পাতিলেবুর রস খুব উপকারী। গ্লিসারিনে কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে রোজ রাতে শোবার আগে ঘষে ঘষে মাখতে হবে। এতে চামড়া নরম হয়।

২। মুখের রং পরিষ্কার করতে টক দই খুব ভাল। মাখার পর ১০ মিনিট বাদে ধুয়ে ফেলতে হবে। শসার রসও গায়ের রং পরিষ্কার করার জন্য খুব কার্যকর।

৩। রুক্ষ চামড়া নরম করতে ভাল কোম্পানির কোলড ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। এটিও নিয়মিত ভাল সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে রোজ শোবার আগে মেখে নিতে হবে।

৪। সপ্তাহে মাত্র একবারই মাসক নেওয়া উচিত। বেসনে সর বা দুধ মিশিয়ে (চোখের চারিপাশের কোমল ত্বক বাদ দিয়ে) মুখে মাখতে হবে। বেসন মাখার পর দশ পনের মিনিট রেখে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। এক/দেড় চামচ মধুতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়েও মাসক তৈরি করতে পারা যায়।

সাজ সজ্জা মূলত আত্মতুষ্টির জন্য। মধ্যবিত্ত মেয়েদের সবচেয়ে বড় প্রবণতা বিবাহপূর্ব জীবনে সাজসজ্জায় তারা যতটা মনোযোগী ও সচেতন নিজেকে লাবণ্যময়ী ও আকর্ষণীয়া করে তোলার জন্য ঠিক ততখানিই অমনোযোগী বিবাহোত্তর জীবনে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হোক না কেন, এ ধরনের মানসি অত্যন্ত অনাধুনিক ও সম জীবনের একটি ছোট্ট দোষ বিশেষ। সব কিছু মানিয়ে নেবার ও দায়িত্ব যখন মধ্যবিত্ত মেয়েদেরই, তখন সবচেয়ে ক মানুষদের রুচি পছন্দের কিছুটা দিতে হবে বৈকি। অনেক ক্ষে দেখা যায় স্বামীর রুচিবোধ পুর পন্থী অথবা ঠিক উল্টো বেশে আকর্ষণীয়া অত্যন্ত নিলাই পছন্দ। এ বিষয়ে দুজনে একটা আপসে নিতেই না যায় তাহলে অন্য পথটাই নেওয়া ভাল। কথাটা যখন 'পর পরনা' আর এক্ষেত্রে 'পর' নিজের স্বামী ননদ বা শাশুড়ি, তাদের মতামতের কিছু মূল্য আখেরে তাদের লাভ ছাড়া নেই। তাছাড়া সুখী গৃহবে একজন লাবণ্যময়ী, সুশ্রী, পরি দৃষ্টিনন্দন মহিলাই সন্তুষ্ট অপে কর্মক্লান্ত দিনের শেষে কোন স্বামীর গৃহাগমনকে না ত্বরা করবে।।

আলোকচিত্র : রাজা ঘোষ

মেয়েদের আসল সৌন্দর্য বাড়ে রুচি আর ব্যক্তিত্বে

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ের সময় সব ছেলেরই রাজকন্যা চাই। কেশবতী কন্যা সে, কুঁচবরণ চুল। দুধে আলতা গায়ের রঙ। কালো ভোমরার মতন যার দুটি চোখ টিকোলো নাক। কুন্দদন্তী শরীরে পদ্মগোলাপের গন্ধ, এক কথায় রূপকথার সেই রাজকন্যে। হাসলে ঝরে সোনা, কাঁদলে ঝরবে মুক্তো। কথাটা সত্যি না মিথ্যে 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের দিকে এক নজর দিলেই দেখা যাবে। সকলে চান সুন্দরী সুরূপাদের। শুধু কি তাই? সেই সংগে তাকে রন্ধনে, গৃহকর্মে হতে হবে নিপুণা, সেলাই বুনোন ছাটকাট তাও জানতে হবে। নৃত্যে সংগীতে অংকনে পটিয়সী। এক কথায় সর্বশাস্ত্র-বিশারদ।

আসলে বিয়ের পাত্রদের আমি দোষ দিই না। দোষ আমাদের। ভারতীয় কাব্য সাহিত্য নাটক পুরাণ গাথাগুলির। এই সাহিত্য সম্ভার গুলির সব নায়িকা উপনায়িকা এমনকি পরিচারিকারা পর্যন্ত ছিলেন রূপে লাবণ্যে অশেষ গুণের অধিকারী।

ছেলেবেলা থেকেই এই সব কাব্য সাহিত্যগুলির গল্প শোনার ফলে অজান্তে মনের মধ্যে একটি ছবিই ফুটে ওঠে যার রূপের কোন তুলনা নেই। তারপরও আছে রূপকথার দোনাত্রা। সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা দিয়ে রাজকন্যা শুয়ে থাকেন। এত রূপ! আহা! রাজপুত্রের চোখে পলক পড়ে না!

এই কঠিন কলিযুগে পাত্র বেচারা তাই সুন্দরী বউ পাবার জন্যে পাগলের মতন ছোটে। কোথায় সে স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা? কোন সাত সাগরের পারে?

সত্যি বলতে গেলে সৌন্দর্য ঈশ্বরের দান। সৌন্দর্যের ওপর মানুষের হাত নেই। মানুষ তার জন্মের জন্যে যেমন দায়ী নয়, তেমনি রূপ লাবণ্যও তার হাতের বাইরে।

তাহলেও আজকের দিনে সৌন্দর্য একটা বিরাট প্রতিবন্ধক নয়। যে কোন মেয়েই অপরূপা না হোক, সাধারণ সুন্দর হতে পারেন বৈকি।

স্কুলে কলেজে অফিসে কোরটে কাছারিতে মেয়েরা চাকরি করতে যাচ্ছেন। ট্রাম বাস যান জট রোদ্দুর বৃষ্টি মাথায় করে পুরুষদের মতনই তাঁদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আবার গৃহে, সেখানেও তাঁদের দায়িত্ব সবটাই। তা বলে কি তাঁরা নারী ধর্ম থেকে সরে আসবেন?

দয়া মায়া প্রেম প্রীতি সেবা যত্ন মেয়েদের উজাড় করে দেওয়া কোন পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়েদের এটি সহজাত প্রবৃত্তি। এই মানসিকতার সংগে আরো একটা বিশেষ মন কাজ করে, মেয়েরা নিজেদের সাজাতে ভালবাসে। এটা কোন অন্যায় নয়। সব মেয়েদেরই বিউটি কনসাস অর্থাৎ সৌন্দর্য সচেতন হওয়া উচিত। ঈশ্বর যতটুকু রূপ লাবণ্য দিয়েছেন তাই দিয়েই নিজেকে দীপ্তিময়ী করা যায়।

এ প্রসংগেই কথা হল অফিস পাড়ার বহু মেয়ে বউদের সংগে। গোপা মিত্র, বয়স তেইশ চব্বিশ। ছিমছাম চেহারার উজ্জ্বল মুখশ্রীর মেয়ে। চাকরি করতে আসে সেই মধ্যমগ্রাম থেকে। গোপাকে জিগ্যেস করলাম, চাকরি করতে এসে চেহারার দিকে নিশ্চয়ই নজর দিতে পার না? গোপা বলল, সত্যি একেবারেই সময় পাই না, ভোর পাঁচটায় উঠি। সকাল দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বাস ট্রেন ধরে অফিসে পৌঁছতে হয়। শরীরের যত্ন নেব কখন?

আমি গোপার দিকে তাকালাম। খোলা চুলের বিনুনি, চোখে হালকা কাজল, ঠোঁটে স্বাভাবিক লিপস্টিক, কপালে সোয়েটের টিপ। শাড়ি ব্লাউজ ম্যাচ করা গোলাপী রঙে। এমনকি ওর গলার মুক্তোগুলির রঙও গোলাপী।

গোপা বুদ্ধিমতী। হেসে বলল, দেখুন, এটুকু সাজগোজ না করলে সব মেয়েদেরই ভীষণ বোকা বোকা লাগে। টাকা পয়সা নেই বলে কি এই সামান্য বিলাসিতাও করব না, তাছাড়া বুঝতেই পারছেন, এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ের কথা মাঝে মাঝেই ওঠে। হয়েও যাবে শিগগির। তাই নিজের দিকে তাকাতেই হয়। বিশেষ করে মা কাকিমা ভীষণ রাগারাগি করে। সেজন্য শরীরের যত্নও নিশ্চয় নিতে হয়।

গোপা পরিষ্কার গলায় বলল, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বিউটি পারলারে গিয়ে চুল বাঁধা কি ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না ঠিকই। কিন্তু রোজ রাত্রে শোবার আগে চুল বাঁধতে, মুখে ক্রিম লাগাতে সে কখনও ভোলে না। এটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

গোপার এখনও বিয়ে হয়নি। তার মতে রূপচর্চার প্রয়োজন। কিন্তু সর্বাণী সিংহ, শোভনা সমাদ্দার, পাপিয়া রায় এদের সকলেরই বিয়েথা হয়ে গেছে। কেউ কেউ মাও হয়েছেন। এঁদের কি রূপচর্চার প্রয়োজন নেই? ওঁরা কী বলেন?

শোভনার গায়ের রঙ বেশ কালো। স্বাস্থ্যও যে খুব ভাল তা মনে হয় না। কিন্তু কেউ ওকে দেখতে খারাপ বলবে আমার বিশ্বাস হয় না।

কমলালেবু রঙের শাড়ি ব্লাউজ। রুপোর চেন গলায়, হাতে দুটি সাদা শাঁখাতে অতি সাধারণ শোভনাকে সত্যিই ভারী শোভন লাগছে।

উনি বললেন, বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ের মা বলে কি যোগিনী সাজতে হবে? অফিসে কাজ করি।

এত লোকজনের সংগে মিশতে হয়। মোটা-মুটিভাবে না থাকলে চলবে কী করে?

অফিস পাড়ার মেয়ে বউদের কথা ছেড়েই দিলাম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সমস্ত পেশায় নিয়োজিত মহিলারাই নিজেদের সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালবাসেন। অনেকে অবশ্য সামনাসামনি স্বীকার করতে চান না, বিষয়টা যেন ভারী লজ্জার। যেমন লতিকা চক্রবর্তী বললেন, এত সাজগোজের কী আছে? আমরা কি এয়ার হোসটেস না ফিলমস্টার যে সব সময় চোখ মুখ রঙ করতে হবে, মেক-আপ লাগিয়ে সুন্দরী হতে হবে?

লতিকা চক্রবর্তী রাগ করে চেঁচামেচি করলেও, আমি রেগে যাইনি। শান্তভাবে বলেছিলাম, সৌন্দর্য অথবা রূপচর্চা বলতে কি আপনি চোখ মুখ রঙ করা বোঝেন? নাকি রূপচর্চা শুধু এয়ার হোসটেস, রিসেপশনিস্ট, ফিলমস্টাররা করে থাকেন? এই যে আপনি লাল বুটিদার শাড়িখানি পরে আছেন, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। এই বাজারেও নাকের হীরেটি ঝিকমিক করছে। এ কি সৌন্দর্যচর্চা নয়? আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগবে বলেই আপনি এমন করে সেজেছেন।

লতিকা চক্রবর্তীর মুখের রেখা নরম হয়ে গিয়েছিল। উনি হেসে বললেন, এটুকুও করব না নাকি? আমাদের এটুকুও করতে দিতে চাও না বুঝি?

বললাম, অনেক ফিলমস্টার বান্ধবী আছেন আমার। সত্যি বলতে কি তাঁরা কেউই চোখে মুখে রঙ লাগিয়ে মুখে একরাশ স্নো পাউডার লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান না। এগুলোর ব্যবহার শুধুমাত্র শুটিং করার সময় স্টুডিওর ভেতরে গিয়ে করে থাকেন। এটা কিন্তু ঠিকই, এখনও অনেক মেয়ের ধারণা চোখে ঘন কাজল ঠোঁটে টকটকে লিপসটিক মুখে প্রচণ্ড মেক আপ সংগে দামী শাড়ি ব্লাউজ না পরলে সাজসজ্জা হয় না। বাজে ধারণা একবারে।

একটি মেয়েকে সুন্দরী হতে গেলে বীভৎসভাবে সাজার দরকার হয় না। প্রয়োজন পরিমিত বোধ, এবং সংযমে। সব মেয়েকেই সব কিছু মানায় না। কী ধরনের প্রসাধন সে করতে পারে তা বুঝে ভাল করে যাচাই করে বন্ধুর পরামর্শ নিয়ে করতে হবে।

যাঁর গায়ের রঙ কালো তাঁকে অথবা সাবান ঘসলে, পাউডার মাখলে ভাল তো দেখাবেই না উপরন্তু চামড়া অর্থাৎ শরীরের কোমল ত্বকের জৌলুস কমে যাবে।

মনে রাখা দরকার কালো মানে কুৎসিত নয়। কালো রঙের মধ্যেও এক ধরনের লাবণ্য থাকে। যা হয়ত চোখ ঝলসায় না কিন্তু মনকে স্নিগ্ধ করে।

আর গায়ের রঙ যাঁদের ফরসা তাঁরা তো যা পরবেন তাই মানিয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও একটা কথা ভাল করে মনে রাখা দরকার। আমাদের এই গরম দেশে ফরসা রঙ মেনটেন করা বেশ কঠিন ব্যাপার। রোদ্দুরে অযত্নে অনেক লালচে ফরসাই বিচ্ছিরি পোড়া তামাটে হয়ে যায়। রঙ জ্বলে নষ্ট হওয়া যাকে বলে।

তবে সৌন্দর্যের প্রথম ও প্রধান কথা তো রঙই নয়। সৌন্দর্যের প্রকাশ চোখে মুখে শরীরের গঠনে চলাফেরার আচরণে, তার ব্যক্তিত্বে। সব মিলিয়েই রূপ তৈরি হয়।

অত্যন্ত রূপবান আমার এক বন্ধুর কথা জানি যিনি ভালবেসে বিয়ে করলেন দেখতে একেবারেই ভাল নয় এমন একটি মেয়েকে। মা মাসিরা তো তাজ্জব। এইরকম একটা ছেলে কিনা ওই মেয়েকে বিয়ে করল? ওর নখের যুগ্যি নয়।

আমি অনেক পরে সেই ভদ্রলোককে জিগেস করেছিলাম মেয়েটিকে কেন তিনি পছন্দ করলেন? ভদ্রলোক বলেছিলেন, মেয়েটির কণ্ঠস্বরের লাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছেন। অন্য কারোকে বিয়ে করলে ওই কণ্ঠ কি তিনি শুনতে পেতেন?

তাই একটি সুন্দরী মেয়ের হাসি কথা মান অভিমান প্রকাশের মধ্যেও মুগ্ধতার গুঞ্জন থাকে। ওই যে বললাম রূপকথার রাজকন্যারা শুধুই রূপের ডালি ছিলেন না, তাঁদের হাসিতে হীরে মানিকের ফুলঝুরি ঝরত আর অশ্রুতে মুক্তো রাশি।

অনেকেই হয়ত ভুরু কুঁচকে বলবেন, মহাশয়া কি আমাদের হাসি কান্নাতেও ভেজাল মেশাতে বলবেন? না, তা বলছি না তবে ঠিকমত চলাফেরা, যাকে বলে আদব কায়দা শেখারও তো একটা ব্যাপার আছে। সেটা শিখতে হবে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রেই অমার্জিত আচরণ নয়। রুচির পরিচয় থাকবে সর্বত্র। মনে হয় যাঁর স্বাস্থ্য ভাল, ঝকঝকে তরতাজা জীবন্ত মনের মেয়ে, তিনিই সুন্দরী। এই সৌন্দর্য ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। এসব অর্জন করতে হয়।

বাহ্যিক সৌন্দর্যচর্চার নিশ্চয়ই কিছু প্রয়োজন আছে। একবারের জায়গায় দুবার স্নান। স্নানের আগে রূপটান হিসেবে মুখে গলায় হাতে পায়ে কিছু হলুদ বাটা কাঁচা দুধ মিশিয়ে মাখলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। মসৃণতা বাড়ে। যাঁদের ত্বক খুব তেল তেলে তাঁরা মাঝে মাঝে পাতিলেবুর রসে কয়েক ফোঁটা মধু, দুধ দিয়ে মাখতে পারেন। চোখের নিচের চামড়া ভীষণ নরম। ও জায়গা বাদ দিয়ে। চুলের যত্ন মানেই বুঝি পরিচ্ছন্নতা। বাজারে নানা কোম-পানির শ্যামপু পাওয়া যায়। কোনটি উপযুক্ত বেছে নিতে হবে। যাঁরা শ্যামপু ব্যবহার করবেন না, তাঁদের জন্যে রিঠের জল কিংবা টক দই অথবা মুসুর ডাল বাটা দিয়ে চুল পরিষ্কার করা যায় খুবই চমৎকার ভাবে। তবে এই সংগে এটা ভুললে চলবে না চুলের প্রধান খাদ্য তেল। তেল না মাখলে চুল কিছুতেই টিকবে না। তাই রোজ সম্ভব না হলেও সপ্তাহে দুদিন অন্তত খুব ভাল করে নারকেল তেল মেখে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে। রান্না ঘরে সংসারের কাজে বাইরে ছুটোছুটিতে পরিশ্রম হলেও এতে শরীরের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগের ব্যায়াম হয় না। তাই আলাদা করে কিছু ব্যায়াম করতেই হবে। আসন হচ্ছে সবচেয়ে ভাল উপায়। কে কোন আসনটি করবেন যে কোন মেয়েদের ব্যায়াম সংক্রান্ত বই থেকে দেখে নিতে পারবেন। আর বলি বেশ ভোরবেলা ওঠা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। ভোর-বেলা খালি পায়ে খোলা ছাদ কিংবা বারান্দায় হাঁটুন, শরীর মন দুইই ঝরঝরে হবে। খাওয়া দাওয়ারও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। অতি-রিক্ত তেলমশলা ভাজা জিনিস বর্জন করাই যুক্তিযুক্ত। প্রতিদিন রান্নার সংগে পেঁপে কাঁচকলা কিছু সবুজ তরকারি রাখা খুব ভাল। যাঁরা খুব সর্দিকাশিতে প্রায়ই ভোগেন তাঁরা যদি রোজ আধখানা পাতিলেবুর রস কিংবা আমলকি খান খুব ভাল ফল দেবে। আমলকিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। যা, ত্বকের পক্ষেও খুব ভাল।

তবে সুন্দরী বলব তাকে, যাঁর ব্যক্তিত্ব আছে। যার কথাবার্তা আচরণ মাধুরীমাখা, যার পোশাকে চোখ ঝলসায় না, কিন্তু মনে সম্ভ্রম জাগায়। যে মেয়ের মনে এতটুকু হীনমন্যতা নেই, তিনিই সুন্দরী।

সুন্দরী বলতে আমি এখনও এঁদেরই বুঝি। এ সৌন্দর্য তো আরোপিত নয়। বানানও নয়। শিক্ষা ও সুরুচি এঁদের রূপসী করে। নির্মল অন্তরের প্রকাশ চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। চোখ, মুখ, চুলের সাজগোজের ওপরেও এর স্থান। □

এত পোশাক, তবু শাড়ির যেন তুলনা নেই

সীমা ঘোষ

শাড়ি কিন্তু শুধুমাত্র শরীরের আবরণ নয়। শাড়ি নারীদেহকে যে কোন পোশাকের চেয়ে বেশি সুন্দর করে তুলে ধরতে পারে। একটু বেশি মোটা বা একটু বেশি রোগাদের শরীরে সৌন্দর্যের ঘাটতিটুকু শাড়ি ছাড়া আর কোন পোশাকেই এমন-ভাবে পূরণ করা যায় না। আবার, সুন্দর শরীরকে সুন্দরতম করে তুলতেও শাড়ির কোন জুড়ি নেই।

গত বছর মে মাসে গ্যাংটক গিয়েছিলাম। ওখানে উঠেছিলাম সরকারি টুরিসট লজে। পাশের রুমের মিষ্টি নতুন বউ চন্দ্রিমা রায়ের সংগে আলাপ হল। বর ডাক্তার। ওরা কলকাতার বাসিন্দা। এসেছে হনিমুনে। চন্দ্রিমার রঙটা দেখার মত। টকটকে ফরসা। গায়ের মসৃণ চামড়া রংকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। মিষ্টি মুখ। গভীর দুটি চোখ। বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বলে মনে হয়। উচ্চতা পাঁচ ফুটের মধ্যে। উচ্চতা অনুপাতে একটু বেশি মোটা।

প্রতিদিনই লজ ছাড়াও ছোট্ট গ্যাংটকের এখানে ওখানে চন্দ্রিমার সংগে দেখা হয়ে যেত। ওর পরনে থাকত চীনা সিলক, মুরশিদাবাদি সিলক, দক্ষিণ ভারতীয় সিলক বা পিওর সিলক। ওর প্রতিটি শাড়িই দারুণ উজ্জ্বল রঙের। শাড়িগুলো ওর গায়ে আরো খুলত। চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে আমিই ওর কয়েকটা রঙিন ছবি তুলে রেখে দিয়েছি।

একদিন একটা হোটেলে আমরা সপরিবারে লানচ সারছি, সবিস্ময়ে দেখলাম ডাঃ রায় ও চন্দ্রিমা ঢুকছে। ও কি সত্যিই চন্দ্রিমা! পরনে চুড়িদার কামিজ। কেমন বেঢপ মোটা লাগছে। শাড়িহীন অবস্থায় এই প্রথম ওর শরীরের খুঁতগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে ওকে যারা দেখছে, তারা চিন্তাও করতে পারবে না এই চেহারাই শাড়িতে কত মোহময় হয়ে ওঠে।

কিশোরী ও সদ্য-তরুণীদের কাছে চুড়িদার কামিজ কুর্তা, জিনস প্যানট ও কামিজ, কাফতান, ম্যাকসি, মিডি, ঘাঘরা ও চোলি যথেষ্ট সমাদর আদায় করেছে। কিন্তু যৌবনের রূপ ধরে রাখতে শাড়ি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যে কোন অনুষ্ঠানে, তা সে বিয়েবাড়ি হোক বা তারাযুক্ত হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলের কোন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানই হোক, দেখবেন পোশাকের রাজত্বে শাড়িই সম্রাজ্ঞীর আসন দখল করে রয়েছে।

গত অ্যাজকাটা গভর্নরস কাপ রেসে রেস নিয়ে কী একটা লিখতে আমার কর্তাটি গিয়েছিল মাঠে। ওর সংগিনী ছিলাম আমি, নানান পোশাকের নানা বয়েসের মেয়ে, দেখতে দারুণ লাগছিল। এ যেন ফ্যানসি ড্রেসের প্রদর্শনী। কত রকমের বিচিত্র পোশাকেই না সাজিয়েছে নিজেদের। তবু শাড়িই মাঠের আসর মাত করে রেখেছে। আর নানা ধরনের শাড়ির মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় আসর মাতিয়েছে টাংগাইল শাড়ি। সাদা খোলের সিলক টাঙাইলে মেরুন, লাল বা কালো রেশমের আঁচল ও পাড়ের আভিজাত্য সত্যিই মন কাড়ে। আমার পরনেও ছিল ফাইন সুতোর মুগা পাড়ের টাংগাইল। শাড়িটা যে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তা বুঝতেই পারছিলাম।

সিলক টাংগাইল যে বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েদের মন কী ভীষণ রকম জয় করেছে, তা এই এখানেই প্রথম বুঝতে পারলাম। অবাংগালিদের শরীরে বাংলার টাংগাইল দেখে সেদিন সত্যিই আনন্দ পেয়েছিলাম। টাংগাইল, ধনেখালি শাড়ির নকশার বাহার ও পরার আরাম আজকালকার মেয়েদের মন জয় করেছে। এই সব শাড়ির চাহিদাও এখন খুব বেশি। সংগে বাংলার বিষ্ণুপুরী ও শান্তিপুরী সিলকের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। তবে বছর খানেক ধরে লক্ষ্য করছি, মেয়েরা চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ির চেয়ে সরু পাড় তাঁতের শাড়িই বেশি পছন্দ করছেন।

মেয়েদের শরীরের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাই শাড়ির কাজ। শরীরের গঠন ও গায়ের রঙের কথা মনে রেখে শাড়ি বাছলে ব্যক্তিত্ব ও লাবণ্য সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। অবশ্য সেই সংগে এটাও মনে রাখা উচিত কোথায় কেমন শাড়ি পরব।

কয়েকদিন আগে কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে দেখা হয়েছিল আমার কেরালিয়ান বান্ধবী মাধবীর সংগে। রঙ শ্যামলা কিন্তু শ্যামলা রঙের সৌন্দর্য যে কত সুন্দর হয় মাধবী তার জীবন্ত প্রমাণ। ওর এই সৌন্দর্যের গোপন কথা কিন্তু শাড়ি নির্বাচনের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। সেদিন ওর পরনে ছিল হালকা হলুদ রঙের চীনা সিলকের থান। গায়ে ঐ থানেরই কনুই পর্যন্ত লম্বাহাতা, গোলগলায় ব্লাউজ। সেদিন বার বারই ঘুরে ফিরে ওকে দেখছিলাম। আমি জানি, আমার মতই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আরো অনেকে দুর্নিবার আকর্ষণে ওর দিকে বারবার ফিরে তাকিয়েছিল।

লক্ষ্য করেছি, মাধবী সব সময় হালকা মিষ্টি রঙের শাড়ি পছন্দ করে, যেটা একজন কেরালিয়ানের কাছে আশা করা যায় না। কেরালিয়ান বা দক্ষিণ ভারতীয় রমণীদের উজ্জ্বল রঙের শাড়িই বেশি পছন্দ। বিশেষ করে উজ্জ্বল রঙের সিলকের শাড়ি। এই ধরনের উজ্জ্বল রঙ ফরসা রমণীদের স্বপ্নলোকের সুষমায় পৌঁছে দিলেও শ্যামলকান্তির গায়ে বড় বেশি বেমানান ঠেকে। এতে শাড়ির রঙ যেমন চোখকে পীড়া দেয়, তেমনি গায়ের রঙও আরো বেশি রকমের কালো লাগে।

ফরসাদের উজ্জ্বল রঙে যত সুন্দর লাগে, তেমনটি আর কোন রঙের শাড়িতে লাগে না। যদিও চলতি কথায় আমরা বলি, ফরসারা যা পরে ওদের তাতেই মানায়। কিন্তু ফরসাদের নিজেকে সুন্দরতম করে তুলতে হলে গাঢ় রঙের শাড়িই বেছে নিতে হবে।

শ্রীপর্ণা আমার গানের জগতের বন্ধু। দেবীপ্রতিমার মত দেখতে। স্বামীটি বড় চাকুরে। গানের বাইরে ওর শখ নিজেকে সাজান। শাড়ির অপ্রতুল স্টক তবু নিত্য নতুন শাড়ি না কিনে থাকতে পারে না। শাড়ি পছন্দ করে দেওয়ার জন্য মাকে মার্কেট আমাকে ধরে নিয়ে যায়। ওর জন্য সাধারণত ভারী জমির সিলকের শাড়ি পছন্দ করি। চুড়িদার উজ্জ্বল রঙের ভারী সিলকের শাড়ি ওর গায়ে দারুণ মানায়। ওড়িশার শাড়িতে কনট্রাসট রঙে ফুলপাতার নিদর্শন বা পুতুল টুতুলের মোটিফ হব বলে দীর্ঘাংগীদের অপূর্ব লাগে।

এই শ্রীপর্ণাই যখন হালকা রঙের

সিলক, আমেরিকান জরজেট বা কোন সিনথেটিক শাড়ি পরে তখন ওর রূপ সৌন্দর্য তেমনটি খোলে না।

চওড়া পাড় বা পাড় দেওয়া শাড়ি দীর্ঘাংগীদের গায়ে সুন্দর মানায়, বরং সত্যি বলতে কি যাঁরা অতি দীর্ঘাংগী তাদের শাড়ির চওড়া পাড় অন্যের দৃষ্টির সামনে শরীরকে একটু ছোট করে নিয়ে আসে, সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখায়। সাধারণত বাঙালি মেয়েদের যা উচ্চতা তাতে সরু পাড়ই, মানানসই।

স্বল্প উচ্চতার মেয়েদের, পাড়-বিহীন বা সরু পাড় শাড়িতে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। উমা আমার বান্ধবী। মেজর ঘরণী। শরীর ও ফ্যাশন নিয়ে খুবই যত্নবতী। স্মার্ট ও চৌখশ মেয়ে। গায়ের রং ফরসা, পাড়হীন আর নানা ধরনের সিলকের একরঙা বা প্রিনটেড শাড়িতে নিজেকে সাজাতে ভালবাসে। শাড়ি যে নিছক আবরণ মাত্র নয় তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। গত মাসে ওর কটক-নিবাসী জামাইবাবু একটা কটকি শাড়ি দিয়েছেন। গাঢ় কালচে লাল রঙের পাড়ে ওড়িশি স্থাপত্যের মোটিফ করা। সন্দেহ নেই খুবই লোভনীয় শাড়ি। কিন্তু উমার সুন্দর শরীরকে ঐ শাড়ি পরমা সুন্দরী করে তুলতে পারল না। বরং চওড়া পাড় ও চওড়া আঁচলার ঐ শাড়িতে উমাকে কেমন বেঢপ, মোটা-সোটা মনে হল। এ যেন আগের উমা নয়।

আমার বান্ধবী কুন্তলা পারেখ কয়েক বছর হল দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। ওর আমন্ত্রণে গুজরাটিদের কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। দেখেছি শ্বেত শুভ্র পোশাকে ওরা কত সুন্দর করে নিজেদের সাজায়, ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করে। সাদা শাড়ি যে কত লাবণ্যযুক্ত পোশাক তা ওদের দেখলে বোঝা যায়। গুজরাটি রমণীদের প্রিয় শাড়ি তানচৈ এখন বংগললনাদেরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ঠাস বুনোন জমি, তার মধ্যে নকশা ও সুন্দর জরির কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গুজরাটের সবচেয়ে নামী-দামী শাড়ি পাটোলা দারুণ রকম জমকালো। নববধূদের রূপের আগুন জ্বালাতে পাটোলার জবাব নেই। কলকাতার নববধূরা বেনারসির পরিবর্তে পাটোলায় নিজেদের সাজিয়ে দেখতে পারেন।

গত বছর চলচ্চিত্র পুরস্কার-বিতরণী সভার এক বর্ণাঢ্য সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দেখলাম বোমবের রূপসী চিত্রতারকারাও নিজেদের সাজাতে শাড়ি ছেড়ে অন্য কোন পোশাকের সাহায্য নেননি। তারকাদের পরনের বিচিত্র সিলক, বেনারসী, মুগা শাড়ির ঔজ্জ্বল্যেও যে স্বপ্নলোক তৈরি হয়েছিল তা অন্য কোন পোশাকে সম্ভব ছিল না। একজন অতি নামী বোমবের অভিনেত্রী তো সোচ্চারে জানালেন, বাঙলা ছবির অফার নেন, কলকাতায় এসে নানা ডিজাইনের মনোলোভা সব শাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন বলে।

প্রিনট সিলক, আমেরিকান জর জেট বা অরগেনজা শাড়ির কিন্তু সব সময়ই ভালো চাহিদা রয়েছে। চাহিদা রয়েছে নানা রকম প্রিনট সিফন শাড়ির। আমেরিকান জরজেট দামে সিফনের মত হলেও খুব কাজের শাড়ি। সিফনের তুলনায় বহুগুণ টেকে। কটন অরগেনজা সুন্দর ফিগারে চমৎকার খোলে। কারণ শাড়িটা সুন্দরভাবে গায়ে লেগে থাকে। ভাল চাহিদা আছে ফুলভয়েলের।

সুতির প্রিনটেরও একটি বিরাট বাজার রয়েছে। অফিস এবং মার-কেটিং-এর জন্য বা কলেজের ছাত্রীরা এই সুতির শাড়ি ভীষণ ব্যবহার করে থাকেন। পরে আরাম, ভালই টেকে, দেখতেও সুন্দর লাগে। অফিসযাত্রীরা অর্থাৎ যাঁরা বাসে-ট্রামে যাতায়াত করেন তাঁরা অবশ্য সিনথেটিক শাড়িটাই বেশি পছন্দ করেন, যেমন, আমেরিকান জরজেট, নাইলন কোটা বা অরগেনজা ধরনের শাড়ি। এইসব শাড়ির ভাঁজ নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। কাচা সহজ। ইস্ত্রি করারও হাংগামা নেই, অফিস থেকে এসে ধুয়ে দিন, আবার পরদিন পরে অফিস যান।

এবছর এখানে ওখানে খুব চোখে পড়ছে সাদার উপর নানা রকম প্রিন্টের সিল্ক শাড়ি। সুন্দর ফিগারে চমৎকার মানায়, শাড়িটা গায়ে সুন্দর ড্রেপ করে। মনে হয় শাড়িটা যেন লতার মত দেহকে জড়িয়ে ধরেছে। দেহ আরও আকর্ষ-ণীয় হয়ে ওঠে। এর সংগে লম্বা-হাতা সাদা ব্লাউজটাই বেশি খোলে। শাড়ির সংগে ব্লাউজের ব্যাপারটা অংগাংগিভাবে জড়িত। ব্লাউজ বেমানান বা আনফিট হলে সুন্দর শাড়িতেও কিন্তু দেহের সৌন্দর্য খোলে না।

সাধারণত যাঁদের দেহে একটু মেদ বেশি বা হাত মোটা, তাঁদের হাতা কাটা ব্লাউজে আরও বেশি মোটা লাগবে। তাঁদের উচিত লম্বাহাতা বড়গলার ব্লাউজ পরা। ছোটগলাতে কিন্তু মোটাদের আরও মোটা লাগে। যে সব মহিলারা খুবই রোগা, তাঁদের হাতাকাটা ব্লাউজ কখনই পরা উচিত নয়। এতে তাঁদের আরও রোগা লাগবে। রোগাদের উচিত ম্যাগি-হাতা অথবা মাঝারি-হাতা ও ছোট-গলার ব্লাউজ পরা। রোগাদের শরীরে লম্বা হাতাও ভাল লাগবে না। স্লিম বা সুন্দর চেহারায় যে কোন হাতার ব্লাউজেই ভাল লাগে।

আমার স্বামীর এক ফরাসি শিল্পীবন্ধু স্ত্রীসহ কলকাতায় এসে-ছিলেন। আমার পরনের শাড়ি দেখে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতেই চায় না। অবাক হয়ে জানতে চাইলেন সেলাই ছাড়া এমনকি একটা পিনের সাহায্য না নিয়ে কীকরে বিরাট মাপের শাড়িটাকে এমন সুন্দর করে শরীরে জড়িয়ে সাবলীলভাবে সব কাজকর্ম করে চলেছি।

ফ্রানসে ফেরার আগে আমার কাছ থেকে ছাত্রীর মত অতি মনোযোগের সংগে শাড়ি পরা শিখে নিয়ে কলকাতার কিছু বিখ্যাত বিপণি থেকে একগাদা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন। আর বলে গেলেন – পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ঘুরেছি, কিন্তু কোন দেশের পোশাকেই এত ডিসেনটভাবে ডিসেনসি ও ডিগনিটি ফুটে ওঠে না। □

ফ্যাশন : ইতালিয়ান স্টাইল ১৯৮৩

রোম থেকে শেলী বালা

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে 'ফ্যাশন'ও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফ্যাশনের জগতে প্যারিসের পরই ইতালির নাম করা যেতে পারে। পথে চলতে চলতে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদের সাজসজ্জায় যে অভিনবত্ব এবং জাঁকজমক চোখে পরে তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার মত। চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। ইতালিতে এ বছরের বসন্ত এবং গ্রীষ্মের পোশাক-সজ্জাতে চলতি ফ্যাশন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং আরামদায়ক। পোশাকে এবারে ঝলমলে ভাবটি খুবই কম। বরং sporty এবং casual ভাবটি প্রত্যেকের চেহারাতে একটি সহজ, সুন্দর, সুরুচির আভাস নিয়ে এসেছে।

এ বছরের পোশাক সাজ্জায় রং সবই হালকা ধরনের। এর মধ্যে রয়েছে মরচে (rust), ধূসর (beize), গজদন্ত (ivory), আকাশ নীল (sky blue) এবং ঘাস রঙা পোশাক। এ রংগুলো আবার সাদা কালোর সংমিশ্রণে এসে পোশাকের মাধুর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হালকা ডটস এখন যাবতীয় খেলাধুলার পোশাক থেকে শুরু করে সান্ধ্যকালীন পোশাকগুলোতে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

বসন্তকালের রূপ এ দেশে মুহুর্মুহু বদলায়। কখনও কখনও ঠান্ডা কনকনে হাওয়া বইতে থাকে। এই অনিশ্চিত কতগুলো দিনের জন্য এরা চামড়ার তৈরি পোশাকের ফ্যাশনও রাখতে বাধ্য হয়। লেদারের বয়ন এ বছর গত বছরের চেয়ে বেশ হালকা এবং নরম, ডোরাকাটা প্রাণবন্ত রং-এর জ্যামিতিক আকৃতির চামড়ার পোশাক বেরিয়েছে।

মেয়েদের পোশাকে স্যুটস আবার ফিরে এসেছে। সরু, সোজা স্কারটের সঙ্গে খুব সুন্দর লাগে দেখতে। কিছু কিছু স্যুটস প্যানটের সঙ্গে complete outfit হিসাবেও পরতে দেখা যাচ্ছে।

জ্যাকেট কিংবা ছোটখাট কোটের স্টাইল এ বছর তৃপ্তিদায়ক এক পরিবর্তন এনেছে। কাঁধের ডিজাইন বেশ প্রশস্ত এবং গোলাকৃতি এমনকি মাঝে মাঝে ওভাল শেপেও রূপান্তরিত হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জ্যাকেটগুলো বেশ ছোট ধরনের রাখা হয়েছে। কোমর পর্যন্ত। অবশ্য কিছু কিছু জ্যাকেট নিতম্ব পর্যন্তও দেখা যাচ্ছে।

ইতালির কয়েকজন বিখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনারের পরিবেশিত কিছু ডিজাইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

জরজো আরমানি (Giorgio Armani) : তাঁর ডিজাইনে স্বাচ্ছন্দ্যকর এক সৌন্দর্য এনেছেন। প্রশংসার যোগ্য বলতে হবে। আরমানির ডিজাইনে স্যুট জ্যাকেটগুলো কোমর পর্যন্ত লম্বা, কাঁধ প্রশস্ত এবং কলারের ভাঁজ খুবই চওড়া করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে দু ভাঁজ বেলট, সাবলীল ভঙ্গিতে কোমর ছাড়িয়ে নিতম্বে নেমে গেছে। আরমানির পরিকল্পিত বয়ন এবং ছাঁট যদিও পুরুষোচিত কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিটি পোশাকের ডিজাইনে তিনি মেয়েলী ভাবটা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর Oxford Style-এ ডোরাকাটা লেদারের শারটগুলোতে সুতির কাপড়ের লাইনিং দেওয়া রয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় পোশাকের জন্য তিনি ফুল আঁকা সুতির ছিটকাপড়ের সঙ্গে চেক কাটা সবুজ অরগানডির এক আশ্চর্য রোমানটিক সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। একটুও অশোভন মনে হয় না।

শ্রীমতী লরা বিয়োজতির (Laura Biagiotti) : ডিজাইনে বেশ নতুনত্ব রয়েছে। দেহকে না জড়িয়ে একটি পোশাক কেমন করে ছন্দের তালে তালে দেহকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় বিয়োজতির ডিজাইনে তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। তাঁর পোশাকগুলোকে বলা হয় 'dou dress'–তাঁবুর আকারে রচিত এই পোশাকটি লিনেন, অরগানডি এমনকি leather দিয়েও তৈরি হচ্ছে। অরগানডি কাপড়ে স্তরে স্তরে কুঁচি দেওয়া এই dou dressগুলো সাদা, লাল অথবা হলুদ রঙে তৈরি হচ্ছে। তাতে পোশাকে বেশ পূর্ণতার সৃষ্টি করলেও ওজন বাড়ায় না। স্থূলাঙ্গী রমণী, যারা শরীরের অবাঞ্ছিত মেদ ঢাকতে চান এ পোশাকগুলো তাদের জন্য নিখুঁত বলা যেতে পারে। বসন্তকালীন পোশাকের মধ্যে রয়েছে কাশ্মিরী jumpsuits. লাল, কালোয়, সাদায় তৈরি এ পোশাকটি দেখতে খুবই সুন্দর।

ডিজাইনার ফেনদি (Fendi) কর্মরতা মেয়েদের জন্য এবছর যেন স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন। তিনি এমন ধরনের বস্ত্রের ব্যবহার করেছেন যা সাধারণত পুরুষদের পরিধানের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে বেশি। ডোরাকাটা কাপড় দিয়ে তিনি আস্তিন গুটোন ব্লাউজ ধরনের খাটো জ্যাকেটের সৃষ্টি করেছেন।

পোশাকে নতুনত্ব আনার জন্য ফেনদি সাদা রঙের সঙ্গে শক্ত ধরনের সুতির কাপড় দিয়ে ছয় বোতামের double breasted পোশাক তৈরি করেছেন। এ পোশাকটি ব্লাউজ হিসাবেও পরা যায় অথবা top হিসাবে ফেনদিরই তৈরি কলারহীন শারট এবং টুইল কাপড়ের কুঁচি দেওয়া লম্বা প্যানটের সঙ্গেও পরা যায়। সান্ধ্যকালীন পরিধেয়র জন্য তিনি তৈরি করেছেন কালো হরিনের চামড়ার পোশাক। এর কাঁচুলির সঙ্গে রয়েছে একই বস্ত্রের তৈরি halter neck (এক ধরনের গলায় ফাঁস লাগান দড়ির নমুনা)। কাঁচুলির ওপরে সাদৃশ্য রেখে পরার জন্য রয়েছে হরিনের চামড়া দিয়েই তৈরি এক ধরনের ব্লাউজ।

গিয়ান ফ্রাংকোর (Gian Franco) সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে চোখ জুড়োন, মন ভুলোন পোশাকসমূহ। তাঁর ডিজাইন খুবই পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি পোশাকে নরম সাবলীল ভঙ্গির পরিচয় রয়েছে। প্রকৃতি এবং মাটির সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তার হালকা ধরনের লিনেনের tuxedo জ্যাকেটগুলো ঢিলেঢালা। এর সঙ্গে পরার জন্য তিনি কালো সাটিন দিয়ে স্কারট তৈরি করেছেন। এ স্কারটটির ডিজাইন একেবারেই সোজা, straight cut যাকে বলে এবং এর দু ধারগুলোতে কুঁচি দেওয়া Split রয়েছে। গিয়ান ফ্রাংকো তাঁর পোশাকের নমুনায় খুব কুঁচির ব্যবহার করেছেন। তাঁর কুঁচি দেওয়া

midi স্কারট এবং পাকান (scroll) pleats-এর ব্লাউজগুলো পথেঘাটে বেশ চোখে পড়ে। তাঁর নমুনার বেলটগুলো উজ্জ্বল রঙের বস্ত্র এবং পাতলা চামড়া দিয়ে তৈরি হচ্ছে। মেয়েরা এ বেলটগুলো কোমর জড়িয়ে, নিতম্ব পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরছে।

শ্রীমতী মারুচিয়া মানডেলি (Mariuccia Mandelli) : তাঁর তৈরি পোশাকে 'classical look' রাখাটা পছন্দ করেছেন। তাঁর নতুন ধরনের ডিজাইনগুলোর মধ্যে রয়েছে 'cork cuffed' ট্রাউজার প্যানট। এতে পায়ের গোড়ার অংশগুলো ছিপির মত রাখা হয়েছে। তাঁর তৈরি লিনেনের জ্যাকেটগুলোর ঘাড়ের ডিজাইন ওভাল শেপের। এর সংগে পরার জন্য রয়েছে চামড়ার স্কারট এবং প্যানট।

তবে সত্যিকারের ইতালিয়ান style-এর 'classical look' দেখতে পাওয়া যাবে লুচিয়ানো সরপ্রানির (Luciano Sorprani) ডিজাইনে। তাঁর তৈরি কালো লিনেনের প্যানটের দৈর্ঘ্য গোড়ালির ওপর পর্যন্ত রাখা হয়েছে। এর সংগে 'পাফড' (puffed) হাতার হালকা পুরো রেশমের ব্লাউজ চেহারাতে যেন সত্যিকারের 'classical look' নিয়ে আসতে পেরেছে। তাঁর হাতাবিহীন কোটগুলো এবারের বসন্তকালে খুব দেখা দিয়েছে। পশমের স্যুট প্যানটের সংগে top হিসাবে এ ধরনের জ্যাকেটের ব্যবহার খুব ভাল চলে।

আলবারতা ফেরেটি (Alberta Ferretti) : two piece স্যুটসের যে ডিজাইন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ডোরাকাটা নীলরঙা ব্লাউজের মত দেখতে গ্যাবার্ডিনের জ্যাকেট। এর পেছনের কিছু অংশ আবার সাদা রঙে ঢাকা রয়েছে। এ জ্যাকেটটির সংগে পরার জন্য রয়েছে সাদা রঙের কুঁচি দেওয়া স্কারট।

'ফ্যাশন' কথাটি এ দেশে খুব তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যায়। আজকের 'ফ্যাশন' কালই হয়ত দেখা যাবে অচল হয়ে পড়েছে, অথবা সম্পূর্ণ বদলে গেছে [illegible] এতক্ষণ যেসব নত্না নত্না [illegible] কথা বলা হল তার ব্যাক্তিগত [illegible] আমি নিজেও খুব একটা [illegible] মতামত দিতে পারছি না। [illegible] ইতালিয়ান মেয়েদের ফ্যাশন [illegible] যা কিছু উপাদান সংগ্রহ [illegible] পেরেছি তার থেকে আমার [illegible] বোনদের বঞ্চিত করতে পারি [illegible]

যেসব পোশাক-আশাকের [illegible] বলা হল আমাদের বাঙালি [illegible] সমাজে হয়ত কোনদিনই তা [illegible] পাবে না। কিন্তু এ দেশের [illegible] স্বাধীন সমাজব্যবস্থার [illegible] এদেশের তন্বী, সুন্দরী মেয়েদের দেহে অভিনব সুন্দর এই পোশাকগুলো মোটেও অমার্জিত বা অশোভন বলে মনে হয় না। বরং এর পেছনে কতজনের কত সময়, প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনা রয়েছে তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। □

ফ্যাশন : ফরাসি স্টাইল ১৯৮৩

ফ্যাশনের আন্তর্জাতিক রাজধানী প্যারিসে ঠিক অকটোবর মাসটিতেই বসন্ত যেন একেবারে বিকশিত হয়ে ওঠে। আর তাই নতুন নতুন ফ্যাশনেরও বাহার ছড়ায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই সময় ক্যার দু লুভর-এর সপ্তাহব্যাপী নতুন ফ্যাশনের মেলা দেখতে সারা পৃথিবীর পোশাক-ব্যবসায়ীরা হাজির হন। প্রায় ১২শো-র মত সাংবাদিকও আসেন এই ফ্যাশনের ভালমন্দ বিচার করার জন্যে।

এ বছর ছদিনব্যাপী ফ্যাশন উৎসবে সবশুদ্ধ ৩৬টি ফ্যাশন শো হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার ছিল, ট্রাউজারস আর স্ল্যাকসের বিদায়। সে জায়গায় এসেছে সংক্ষিপ্ত পোশাক। রঙও খুব হালকা। সাদা আর হালকা গোলাপী। কারল লাজার ফেলডের ডিজাইনে বেলট বাঁধা জামার সংগে ঢিলে ঢালা করে চামড়ার কাজও মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যান-ম্যারি বেরেত্তা এবারে মেয়েদের ক্লোকের ডিজাইন বানিয়েছেন খুব চমৎকার। তিনি লিনেনের সংগে কালো বা হলুদ নাইলন লাগিয়ে ছড়ান ক্লোক চালু করেছেন। এতে গলার কাট খুব নিচু আর কাঁধ চওড়া করে সেলাই করা।

ক্লদ মনতানা ফ্যাশন শো-এ সেজে এসেছিলেন এমনভাবে যেন তিনি ছোটখাট একজন নাবিক। অবশ্য মেয়েলিভাব তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি পরেছিলেন একটা স্কারট, তার ওপর ছোট একটা জ্যাকেট। আর সেই সংগে নাবিকদের পোশাকমাফিক ছোট ব্লাউজ। থিয়েরি মুগলার আবার নাবিকদের মত এই ধরনের একটা পোশাকের সংগে পরেছিলেন উলের কাজ করা জামা এবং রুপোর গয়না।

মনদ্রিয়ান স্টাইল আর পিকাসো স্টাইল ডিজাইনের জন্যে যিনি বিখ্যাত সেই সেনট-লরেনট এবার বানিয়েছেন মাতিস আর ফারদানদ লেজার-স্টাইল। এ দুজনও ফ্রানসের নামকরা শিল্পী। পিকাসোর মত এদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে সেনট-লরেনটের ডিজাইনের খ্যাতি জগৎজোড়া। আর এক ফরাসি শিল্পী পল ক্লি-র প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ অন্য এক ডিজাইনার জ্যাকলিন জ্যাকবসন বানিয়েছেন অসাধারণ পোশাক-আশাক। এই পোশাক মূলত আফরিকান পোশাক-রীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এবারের পোশাকের রঙ ব্যবহারের কথা উঠতে পারে। তার উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, এবারকার ফরাসি ডিজাইনে রামধনুর সব রঙই যেন আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম নিনো সেরুত্তির ডিজাইনে। তিনি আগাপাশতলা সাদা ব্যবহার করেছেন। লিনেন শরটস থেকে সিল্কের পোশাক পর্যন্ত এই সম্ভার বন্যা দেখেও অনেকে মুগ্ধ, সপ্রশংস। □

(রেডিও ফ্রানস ইন্টারন্যাশনাল)

সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাকৃতিক উপায়

বিশেষ প্রতিনিধি

গল্প শোনা যায় সম্রাট নিরোর পত্নী পপিয়া গাধার দুধ দিয়ে মুখ ধুতেন। এমনকি সেই প্রাচীনকালেও একথা জানা ছিল যে প্রসাধনের কার্যকরতা নির্ভর করে প্রসাধনের মধ্যে জৈবগত সক্রিয় পদার্থ কী কী আছে তাদের উপরে। জৈবগত সক্রিয় পদার্থ হিসাবে প্রধানত ব্যবহৃত হত চর্বি ও তেল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলাদের জন্য নানারকম ক্রিম (চামড়ায় লাগাবার জন্য) পাওয়া যায়। ডাক্তারদের সুপারিশ অনুযায়ী এই ক্রিমগুলো তৈরি করা হয়েছে। ক্রিমগুলোতে যোগ করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত কিছু মলম যথা, লতাপাতা, গুলঞ্চ, স্বাভাবিক রস ও বিভিন্ন উদ্ভিদের নির্যাস। তার ফলে সোভিয়েতে তৈরি ক্রিম যেমন হয়েছে আরামদায়ক তেমন ভেষজ গুণসম্পন্ন। পক্ষান্তরে প্রসাধনকে ভেষজ গুণসম্পন্ন করাটা সোভিয়েত প্রসাধন বিদ্যার সাধারণ অভীষ্ট। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সোভিয়েত ক্রীমের নাম উল্লেখ করা চলে। যেমন, স্ভেজেস্ট (সজীবতা), ভিক্তোরিয়া (স্ট্রবেরি ক্রিম), তোমাৎনি (টমাটো ক্রিম)। এগুলোতে আছে শত শতাংশ স্বাভাবিক রস। 'ভেচের' (রাত্রি) ক্রিমে আছে পারসলি লতার নির্যাস।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্প্রতি প্রস্তুত হচ্ছে তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া মহিলাদের জন্য ফলপ্রসূ ভেষজ ক্রিম। যেমন, 'একসতেল' (এলিউথেরোকক্কাস সমন্বিত), 'জেসনায়া নিমফা' (অরণ্য পরী নামে লতা গিনসেঙের নির্যাস সমন্বিত) এবং এলিক্সিয়া' (এলিক্সির)। এই ক্রিম গুলোর সাহায্যে চামড়ার পরিচর্যা খুব ভালভাবে করা চলে। শেষোক্ত ক্রিমটি ব্যবহার করলে বয়সের লক্ষণ চাপা পড়ে সকল চর্ম উজ্জ্বল করে তোলে চর্মের গুণাবলী। চর্ম হয়ে ওঠে মসৃণ, নরম ও তাজা চর্ম আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে ও কমনীয় হয়ে ওঠে বয়সের লক্ষণ নিবারক এই ক্রিমে আছে স্বাভাবিক তেল এবং ভিটামিন এ, ই ও এফ।

মসকোর প্রসাধনদ্রব্য গবেষণা ইনসটিটিউটে প্রত্যেকটি প্রকারের প্রসাধন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই সেটি উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হয়।

শুধু চামড়ার খুঁতগুলোকে ঢাকা দিলেই চলে না।' একথা বলেছেন ফরাসি সংস্থা সোকো মেকসট এর প্রধান মাদাম দানুতা ত্রেমস্কি। তাঁর মতামতকে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা খুবই মূল্য দিয়ে থাকেন। তিনি আরও বলেছেন: 'আমি জানি, স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত মলমের ভিত্তিতে ক্রিমের কদর আপনাদের দেশে সবসময়েই আছে। সোভিয়েতে তৈরি ক্রিম খুবই ভাল। তার আছে ভেষজ গুণ ও পুষ্টির গুণ। সোভিয়েতের ক্রিম ফ্রানসেও এখন জনপ্রিয় হয়েছে।'

প্রাচীন রাশিয়ায় মেয়েরা সৌন্দর্যবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করত কাঁচা রং সাদা সিসে ও রুজ সহযোগে মুখে লাগাত প্রচুর রঙ, ভুরুতে লাগাত অতি গাঢ় প্রসাধন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রসাধনের সৌন্দর্য ও ব্যবহার সম্পর্কে মনোভাব ছিল খানিকটা অনুগ্র। তবে ১৯৬০-এর দশকে প্রসাধন পুনরায় মহিলাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ফরাসিরা বলে, তোমার চেহারা বা ফিগার ঠিক রাখ, মুখ তো বানিয়ে নেওয়া চলে। 'মুখ বানিয়ে নিতে গিয়ে' প্রত্যেক মহিলা নিজস্ব রুচির পরিচয় দিয়ে থাকে, প্রচলিত ধারার সঙ্গে তাল রেখে তার নিজস্বতাকে বাড়িয়ে তোলে। আজকের প্রচলিত ধারা হচ্ছে স্বাভাবিকতা ও সরলতা বজায় রাখা। প্রসাধন এমনভাবে করতে হবে যেন কোন কৃত্রিমতা ফুটে না ওঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নিত্যই নতুন নতুন প্রসাধন দ্রব্য উদ্ভাবিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে সোভিয়েতের প্রসাধন উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিতে ৭০টির অধিক প্রকারের প্রসাধন উৎপন্ন হয়েছে। তাদের উপাদান নির্ধারণ করেছে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সুগন্ধী দ্রব্য সম্পর্কিত গবেষণা ইনস্টিটিউট। যেমন, ভুরু ও চোখের পাতার রঙ 'পচোলকা' (মৌমাছি) ব্যবহার করলে চোখের পাতা পুরু ও দীর্ঘ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টও হয়। পাইন ও ফার গাছের নির্যাস যোগ করা হয় যাতে ঠোঁট শুকিয়ে না যায়। আর মুখের রুজ একদিকে যেমন চামড়ায় মনোমত রঙ আনে, অন্যদিকে চামড়াকে বাতাস থেকে রক্ষা করে।

এমনিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসাধন-উৎপাদনকারী শিল্পে এমন সমস্ত কিছুই উৎপন্ন হয়েছে যা দিয়ে মহিলাদের সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী দেখায়।

প্রাচীন কাহিনীতে শোনা যায় রাজকন্যা আরসির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'বল তো আরসি, সত্যি করে বল, এই জগতে সবচেয়ে সুন্দরী কে?'

আধুনিক একজন মহিলা, যে এই সমস্ত প্রসাধন ব্যবহার করে, সে নিশ্চয়ই শুনবে আরসি জবাব দিচ্ছে 'তুমি, তুমি ছাড়া আর কে!'. □

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

মাতৃত্বের রোমাঞ্চ যা একমাত্র আপনিই অনুভব করতে পারেন...

একটি ছোট্টো প্রাণ আপনার ভেতরে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। তারপর একদিন তাকে আপনি নিজের বুকে আঁকড়ে ধরবেন, নিজের দুধ খাইয়ে বড় করবেন। অলৌকিক কিন্তু সত্যি।

শিশুর জন্য সবার সেরা পুষ্টি

আপনার শিশু যাতে প্রথম দিন থেকেই যথেষ্ট পুষ্টিদায়ক বুকের দুধ পায়, তারজন্য আপনার গর্ভাবস্থার শেষ দিক থেকেই নিজের মধ্যে পুষ্টির ভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আর যখন আপনি বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তখন আপনার শরীরের যে পুষ্টি শিশুর মধ্যে যাচ্ছে, তাকেও পূরণ করতে হবে।

তাই গর্ভাবস্থার শেষ দিকে এবং বুকের দুধ খাওয়াবার সময় আপনার মাদার্স স্পেশাল অবশ্যই প্রয়োজন।

মাদার্স স্পেশাল—সত্যিকারের সহযোগ

গর্ভবতী আর স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টিসংক্রান্ত W H O র (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার) নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী একটি অনুপম স্বাস্থ্যকর পানীয় —মাদার্স স্পেশাল, যা আপনার শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের দুধ খাওয়াতে আপনাকে সাহায্য করে।

তাই ডাক্তাররা বলেন যে গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস থেকে শুরু করে যতদিন আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন ততদিন রোজ মাদার্স স্পেশাল দুধের সাথে মিলিয়ে খাবেন।

মনে রাখবেন . . .

ডাক্তাররা বলেন যে অন্তত ছ মাস বয়স পর্যন্ত আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিৎ।

মাতৃত্ব আর শিশু জন্মবিষয়ক প্রয়োজনীয় আরও আবশ্যক খবরের জন্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে "Specially for you and your baby" পুস্তিকাটির জন্য আজই লিখুন।

ঠিকানা: H.M.M. Limited
Department D,
1 Jai Singh Road
New Delhi-110001

ডাক্তারদের মনোনীত মাদার্স স্পেশাল অন্তঃসত্বা এবং সদ্য মায়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির WHO-র মান অনুযায়ী (FAO/WHO-1974—Handbook on Human Nutritional Requirements') প্রস্তুত।

মাদার্স স্পেশাল

মায়েদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর বুকের দুধ দিতে সাহায্য করে।

শরীরের কয়েকটি ছোটখাট সমস্যা, তার প্রতিকার

বিনোদ কুমার

নিজেকে সুন্দর করে তুলতে কে না ভালবাসে? অপরের সামনে সুন্দর হয়ে ওঠার, নিজেকে সুন্দর করে তোলার এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালের। তাই যুগের পর যুগ মানুষ নিজেকে সাজিয়েছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পোশাকে, বিভিন্ন অলংকারে। যুগে যুগে তাই এসেছে রূপচর্চার বিভিন্ন ধারা। কিন্তু শুধু সুন্দর আবরণে নিজেকে ঢাকলেই তো সুন্দর হওয়া যায় না। সুন্দর হতে গেলে চাই সুস্থ এবং সতেজ স্বাস্থ্য ও শরীর। তাই যুগে যুগে রূপচর্চার এক প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে শরীরকে সুরক্ষা করা। আজও তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

মাথাধরা থেকে শুষ্ক ত্বক — শরীরে নানা ধরনের আক্রমণ আসে। এই সব আক্রমণের মূলেই কিন্তু ভিটামিনের অভাব। কাজেই শরীরকে সুস্থ এবং সতেজ রাখতে ভিটামিনের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। এখানে আলোচনা করা হল শরীরের এমন কয়েকটি ছোটখাট অসুবিধের কথা যা আমাদের অনেকেরই হয়ে থাকে আর যার মূলে কাজ করে প্রধানত ভিটামিনের অভাব।

চুল পড়ে যাওয়া

চুল পড়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ শরীরে বি কমপ্লেকস-এর অভাব। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীরে দেখা দেয় বি কমপ্লেকস-এর ঘাটতি। তাই এই ঘাটতি ঠেকাতে সারাদিনের পরিশ্রমের ফাঁকেও মাঝে মাঝে একটু চেষ্টা করুন বিশ্রাম নেওয়ার। দিনে কিছুটা সময় ধরে যোগব্যায়াম আর ধ্যানাভ্যাস করলে আরো ভাল হয়। অতিরিক্ত চা, কফি বা ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়াও কিন্তু চুল পড়ে যাওয়ার আর একটা বড় কারণ। এই ধরনের পানীয়গুলোর মধ্যে এক ধরনের ক্ষার থাকে, যা বেশি পরিমাণে পেটে গেলে শরীরের ভেতর ইনোসিটল এবং কোলাইনের অভাব সৃষ্টি হয়। আর এই দুটোর ঘাটতি হলেই চুল পড়া শুরু হয়। তাই আপনার যদি খুব বেশি চা, কফি বা ক্যামপা কোলা খাবার অভ্যাস থেকে থাকে—তাহলে এখনই তা কমিয়ে ফেলুন। বরং লেবু জাতীয় ফল বা দিনে একটা করে বি-কমপ্লেকস ট্যাবলেট খাবার চেষ্টা করুন। এতে আপনার শরীরে বি কমপ্লেকস, কোলাইন অথবা ইনোটিসলের অভাব হবে না, বন্ধ হবে চুল পড়াও।

খুসকি

ভিটামিন এফ অথবা সেলেনিয়ামের অভাব থেকে মাথায় খুসকির উৎপাত শুরু হয়। শরীরের সেলেনিয়ামের অভাব হলে আপনি খেতে পারেন টমাটো. টিউনা (এক জাতীয় সামুদ্রিক মাছ), গমের দানা প্রভৃতি। এর সবকটাই ভিটামিন এফ-এ পরিপূর্ণ। এছাড়া সেলেনিয়াম আরো পাবেন সূর্যমুখীর বীজে, কুমড়োর বীজে এবং অন্যান্য তরিতরকারির বীজ থেকে তৈরি হওয়া তেলে। আর এখন তো ভিটামিন এফ-এ পরিপূর্ণ ক্যাপসুল পাওয়াই যাচ্ছে। তাও খেতে পাবেন দিনে একটা করে।

রুক্ষ, শুকনো চুল

রুক্ষ এবং শুকনো চুলেরও মূলে কিন্তু ভিটামিন এফ এরই ঘাটতি। শরীরে আয়োডিনের অভাব দেখা দিলেই চুলেরও প্রকৃতি হয়ে ওঠে রুক্ষ এবং শুকনো। রুক্ষ এবং শুকনো চুলকে মোলায়েম করে তুলতে আপনি খেতে পারেন সমুদ্রজাত খাবার, আয়োডিনযুক্ত লবণ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য। এগুলোর ভেতর আপনার শরীর খুঁজে পাবে আয়োডিন। এ ছাড়া আর খাবেন কুমড়োর বীজ আর সূর্যমুখী ফুলের বীজ। খেতে পারেন তরিতরকারির বীজ থেকে তৈরি হওয়া তেল। তবে সব থেকে ভাল হয় যদি রোজ নিয়ম করে একমুঠো কুমড়োর বীজ খেতে পারেন।

মাথাধরা, মাথাব্যথা

মাথাধরা এবং মাথাব্যথার একটা প্রধান কারণ হল শরীরের অতিরিক্ত পরিশ্রম। এই মাথাব্যথা ঠেকাতে সাহায্য করে ভিটামিন বি কমপ্লেকস। তাই এমন কিছু খান যা ভিটামিন বি কমপ্লেকসে পরিপূর্ণ। এ ছাড়া খান একটু বেশি পরিমাণে দুধ, দই, গুঁড়ো দুধ, গুড়, হলুদ চিজ, তিলের বীজ, বাড়িতে তৈরি চিজ, শালগম। আর খান একটু বেশি করে মধু। পারলে চিনির বদলে মধুই খান। এসবের মধ্যেই পাবেন ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম। জানেনই তো এ দুটোই হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিষেধক।

ব্রণ

মুখের ব্রণ যদি এড়াতে চান তাহলে এক্ষুণি কফি বা ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়া বন্ধ করুন। এসব পানীয়ের ভেতর যে ক্ষার থাকে তা-ই কিন্তু আপনার ব্রণকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। এ ছাড়া ভাজা এবং চর্বি জাতীয় কিছু খাবেন না। আর খাবেন না আয়োডিনযুক্ত লবণ, মাখন, চকোলেট, কোকো, শক্ত পুডিং, পেসট্রি এবং চিনি জাতীয় যে কোন খাবার। বরং ব্রণ যদি তাড়াতে চান তাহলে রোজ খাবারের সংগে তিনবার পঞ্চাশ মিলিগ্রাম জিংক মিশিয়ে খান। আর ভিটামিন 'এ' যুক্ত যে কোন খাবার, যেমন মাছের তেল, লিভার, ডিম, দুধ, ক্রিম, চিজ, গাজর, ঘন পাতাওয়ালা শাকসবজি, এসব খান।

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ

আপনি হয়ত রোজ দুবেলাই ভালভাবে দাঁত মাজেন। কিন্তু তবুও আপনার নিশ্বাসে দুর্গন্ধ থেকে যাচ্ছে। তাহলে ঘাবড়াবেন না। জানবেন, আপনার শরীরে জিংকের ঘাটতি হয়েছে, ঘাটতি হয়েছে ক্লোরোফিলের, যার ফলে যা খাচ্ছেন তা ঠিকমত হজম করতে পারছেন না। এরকম হলে খান প্রচুর পরিমাণে সতেজ, সবুজ পাতাওয়ালা তরিতরকারি বিশেষ করে যদি শালুক জাতীয় তরিতরকারি খেতে পারেন তাহলে আরো ভাল হয়। আর খান বিটের উপরাংশ, শালগম আর লালরঙা কিছু তরকারি বা ফলমূল। এর ভেতর আপনি পাবেন ক্লোরোফিল।

ত্বকের শুষ্কতা

ত্বকের শুষ্কতায় সব থেকে কাজ দেয় ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন

'ই'। ত্বকের নিচে যে স্তর থাকে তাকে 'এ' সুরক্ষা করে, ফলে ত্বকের উপরিভাগ হয়ে ওঠে আরো মসৃণ, আরো ঝকমকে। ত্বককে মসৃণ ও সুন্দর করে তুলতে হলে আপনার খাবারের সংগে এমন কিছু গ্রহণ করুন যাতে ভিটামিন 'এ' আছে। খান মিষ্টি আলু, গাজর, লিভার এবং টমাটো। এছাড়া ভিটামিন 'ই' পাবেন আপনি গমের তেল এবং গমের দানায়। আপনার ত্বক শুকনো হলে এই জাতীয় তেল ব্যবহার করুন, ফল দেবে খুব ভাল।

মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া

আপনার মাড়িকে যদি সুস্থ সবল রাখতে চান তাহলে আপনার শরীরের পক্ষে সব থেকে প্রয়োজন ভিটামিন 'সি' এবং বায়োফ্লাভোনয়েডস। বায়োফ্লাভোনয়েডস মাড়ির চারদিকে একটা সুরক্ষিত দেওয়াল গড়ে তোলে। এর ঘাটতি দেখা দিলে ছোট ছোট রক্তকণিকা মাড়ির চারপাশে দানা বাঁধে। মাড়ির গোড়াকে করে তোলে দুর্বল। মাড়ির অসুবিধা হলে তাই শরীরে ভিটামিন 'সি' বাড়ানর চেষ্টা করুন। খান কমলালেবু, পাতি লেবু, পেয়ারা, টমাটো, শালুক জাতীয় ফলমূল। সবুজ পাতাওয়ালা শাকসবজি যাতে ভিটামিন 'সি' রয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

আমাদের ভেতর অনেকেই এই অসুখটিতে ভোগেন। খাবারে আঁশ বা ভুষির অভাব ঘটলেই এ রোগটি শরীরে জাঁকিয়ে বসে। লবণে শুকানো খাবার বেশি করে খেলেই এ রোগটি হবার আশংকা থাকে। এ ছাড়া ময়দা শোধন করে যেসব খাবার তৈরি করা হয়, যেমন কেক বা পেসট্রি এসব খেলেও এই অসুখটি দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে বেশি করে তরিতরকারি খান। আর রোজ দু চামচ করে ইসবগুলের ভুসি খাবার চেষ্টা করুন।

হেমারয়েড

এই রোগটির উৎপত্তি হয় কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে কফি খাওয়া ছাড়ুন। ছাড়ুন ঠান্ডা পানীয় এবং চকোলেট খাবার অভ্যাস। রোজ দু চামচ করে ইসবগুলের ভুসি খান। খান পাতি লেবু অথবা কমলালেবুর রস আর ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবার।

অন্তিম ঋতুজনিত সমস্যা

বি কমপ্লেকস এবং বি ৬-এর অভাব যে সব মহিলার শরীরে বেশি এই অসুখে তারাই কষ্ট পান। বি কমপ্লেকস এই অসুখে সব থেকে বেশি কার্যকর হয়। খাবারে বি কমপ্লেকস্ এবং বি ৬-এর পরিমাণ বাড়ালে এই সময়টাতে মহিলারা এই শারীরিক পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে পারবেন। নারভের ওপরও বি কমপ্লেকস এবং বি-৬ ভাল কাজ দেয়, ফলে রাতে ভাল ঘুম হয়। কাজেই বি কমপ্লেকস আছে এমন কোন খাবার খাওয়া ভাল, যেমন - লিভার, বাড়িতে তৈরি চিজ, সয়াবিন, মাঠা তোলা দুধ, শস্যের দানা এইসব। তবে এরকম কোন অসুখ হলে একবার ডাক্তার দেখান অবশ্যই উচিত।

ভারিকোস ভেইনস

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্যায়াম না করার ফলে এই অসুখটি দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া শরীরে ভিটামিন 'সি' এবং 'ই'-র ঘাটতি হলেও এই অসুখটি দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এরকম অসুখ হলে ভিটামিন 'সি' এবং 'ই' যুক্ত খাদ্য অবশ্যই খাওয়া উচিত।

পায়ের ব্যথা

শরীরে ভিটামিন 'ই' অথবা ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে পায়ে ব্যথা, পায়ের পেশিতে টান এসব দেখা দিতে পারে। শরীরে লবণের অভাব ঘটলেও পায়ের ব্যথা হতে পারে। পায়ের ব্যথা বিপদে ফেললে খান ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার, যেমন দুধ অথবা দুগ্ধজাত কিছু, বাদাম এবং তিল বীজ।

হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া

শরীরের থাইরয়েড গ্ল্যানডগুলো যখন যথেষ্ট পরিমাণ থাইরক্সিন যোগান দিতে পারে না, তখনই হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। এই অসুখে অনেকেই ভোগেন। এক্ষেত্রে কাজ দেয় আয়োডিন এবং ভিটামিন 'ই'। কাজেই এরকম হলে খান আয়োডিন যুক্ত খাবার - মাছ, আয়োডিনযুক্ত লবণ এবং সামুদ্রিক জল। আর শরীরে ভিটামিন 'ই' বাড়াতে খান পুরুষ্টু শস্যদানা আর গমের দানা। □

আলোকচিত্র : নিতাই ঘোষ

ডাঃ ডি সুর রায়চৌধুরী একজন বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে আর জি কর মেডিকেল কলেজে চর্মরোগের প্রধান। রূপচর্চার অপরিহার্য অংগ হিসাবে ত্বকের বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করা হল। এ সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকলে অতি অবশ্য জবাবি খাম বা পোসটকারড সহ পরিবর্তনের ঠিকানায় তাঁকে লিখতে পারেন।

সম্পাদক

'রূপচর্চার আসল চাবিকাঠি হল ত্বকের যত্ন' : ডাঃ দীপ্তি সুর রায়চৌধুরী

পরিবর্তন : কসমেটিকস ব্যবহার করলে কি ত্বকের কোন ক্ষতি হতে পারে?

সুর রায়চৌধুরী : হতে পারে। তার মানে এই নয় যে সবারই ক্ষতি হবে। সাধারণভাবে পরিমিত কসমেটিকস ব্যবহারে ত্বকের কোন ক্ষতি হয় না। তবে অনেকের কসমেটিকস ব্যবহারে অ্যালারজি হয়। আলতা, সিঁদুর, লিপস্টিক ব্যবহার করলে জ্বালা করে বা র‍্যাশ বার হয়। এঁদের ক্ষেত্রে কসমেটিকস ব্যবহার ক্ষতিকর।

পরিবর্তন : যাঁদের খসখসে চমড়া, তাঁদের চামড়া মসৃণ করার উপায় কী?

উঃ অসুস্থতার জন্য চামড়া খসখসে কিনা, সেটা আগে ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে নিন। তবে জলহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে চামড়া খসখসে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' খাবেন। শাকসবজি, পেয়ারা বিশেষ করে গাজরে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' আছে। সাধারণভাবে নারকেল তেল বা তিল তেল গায়ে মেখে দেখবেন।

পরিবর্তন : মেয়েদের চুল ওঠা বন্ধের জন্য কোন ওষুধ আছে কি?

উঃ অনেক কারণে চুল ওঠে। ধরুন, যেসব মেয়েরা পনিটেল করেন তাদের সামনের চুল এমনিতেই উঠে যাবে। সরু চিরুনি দিয়ে তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ালে চুল ওঠে। খুশকির জন্যও চুল ওঠে।

পরিবর্তন : নিয়মিত ত্বকের যত্ন নেবার উপায় কী?

উঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পেট পরিষ্কার রাখা। প্রাত্যহিক ক্রিয়া কর্মের ব্যাপারে নিয়মিত অভ্যাস বজায় রাখা। গ্যাসট্রিক ট্রাবল যাতে না হয় সতর্ক থাকুন। বেশি করে প্রোটিন ও ভিটামিন খাবেন। কারবোহাইড্রেট বা ফ্যাট জাতীয় খাবার পরিহার করুন। আলো হাওয়াযুক্ত বাড়িতে থাকুন।

পরিবর্তন : রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করলে রঙ খারাপ হয়ে যায়, এটা কি বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য?

উঃ হ্যাঁ সত্য। রোদ্দুরে যারা বেশি ঘুরবেন, তাঁদের রঙের ওপর একটা কালো আস্তরণ পড়বে। তবে তাই বলে কি ধবধবে ফরসারা কুচকুচে কালো হয়ে যাবেন? -- তা নয়। একটা বাদামি ভাব আসবে। তবে যারা আবার সাবেক রঙ ফিরে পেতে চান তাঁরা প্যারাঅ্যামাইনো বেঞ্জাইক অ্যাসিড মেখে দেখতে পারেন।

পরিবর্তন : ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কোন জিনিস?

উঃ অত্যধিক কসমেটিকস ব্যবহার যাকে বলে উগ্র প্রসাধন, নোংরা ঘাঁটা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, এক ঘরে বহু লোকের থাকা বা এক শয্যায় অনেকে মিলে শোওয়া। সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। ☐

সাক্ষাৎকার : পারমিতা

কেশবতী কন্যা কীভাবে হওয়া যায়

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পাঞ্চাল রাজকন্যা কৃষ্ণা ছিলেন রূপে গুণে অসামান্যা। তার টানা চোখ, সুডৌল চিবুক, ছোট্ট কপাল, কোমল তনু, শ্যামলা রঙ, এসবের সংগে তার রূপকে যা আরো বাড়িয়ে তুলেছিল তা হল তার বন্যার জলের মত একঢাল ঘন কালো চুল। কৃষ্ণা ছিলেন মহাভারতের আমলের নারী। তারপর অনেক কাল গেছে, অনেক সময় গেছে, পৃথিবীতে আরো অনেক অনেক সুন্দরী ও মোহময়ী নারীরা এসেছেন, নিজেদের সাজিয়েছেন তারা কেয়ূরে এবং কংকণে, কিন্তু চুলের বিন্যাসের পরিপাটির কথা তারা ভুলে যাননি। আলবার্ট খোঁপা থেকে হাল আমলের হরসটেল, লক্ষ্য কিন্তু ঐ চুলের বিন্যাস। তাই সময়ের পর সময় কত কত পুরুষ এসে তার নারীটির কানে কানে বলে গেছে -- চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। যুগ পাল্টেছে। হলুদ ধনেখালি শাড়ির পাশে এখন পাল্লা দিয়ে চলেছে ডেনিম জিনস। তেমনি দীর্ঘ বিনুনির পাশে বয়েজ কাট। কিন্তু যে ধারাই আসুক না কেন চুলের যত্নের কথা কিন্তু কেউ ভুলে যাননি। দীর্ঘ বিনুনির মেয়েটির যেমন দরকার সুস্থ এবং সতেজ চুল, তেমনি বয়েজ কাটেরও দরকার চুলের স্বাস্থ্য। তাই এখানে চুলের যত্ন নিয়েই কয়েকটি কথা বলা যাক।

চুলের সমস্যা নিয়ে রূপচর্চা বিশেষজ্ঞরা অনেক ভেবেছেন। উপায়ও বের করেছেন। চুলের যে সাধারণ সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা অনেকেই ভুগি -- যেমন চুল উঠে যাওয়া, মাথায় খুসকি, রুক্ষ শুকনো চুল, এসব সম্পর্কে তারা কিছু কিছু উপায়ও বাতলেছেন। উপায়গুলো এমন কিছু কঠিনও না। বরং নিতান্তই ঘরোয়া। জানা থাকলে এসব উপায়

হাজার হাজার গৃহিণীরা যা মানে...
স্বস্তিক পপুলার সম্পর্কে অমিতা-ও তাই জানে...

পপুলার
সবসে কম দাম
भरोसे का काम

"হ্যাঁ, সাশ্রয় আমি চাইতাম বটে, তবে সঙ্গে কোয়ালিটিও। আর স্বস্তিক পপুলার একদম তাই। এর দাম অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে কতো কম অথচ কাচা হয় কি দারুণ!"

নীল রঙের স্বস্তিক পপুলার নানান গুণে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার:

- এটি স্প্রে-ড্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চট্‌পট্‌ গুলে যায়।
- এতে অপ্টিক্যাল হোয়াইটেনার মেলানো থাকার দরুন কাপড় বেশী পরিষ্কার ও ধবধবে চমৎকার ধোয়।
- এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খরা জলেও ধোয়া খুবই সহজ।
- এটি স্বস্তিক-এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ।
- ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাবেন।

স্বস্তিক
পপুলার
ডিটারজেন্ট পাউডার

সবচেয়ে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম

১ কিলো কেবল ১০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

Shilpi DM 17/83 Ben.

গুলো যে কেউ-ই চুলের সমস্যায় ব্যবহার করতে পারেন। সজ্জা-বিশেষজ্ঞদের বলা এমন কয়েকটি উপায়ের কথাই বলছি।

প্রথমে আসুন চুল উঠে যাওয়ার সমস্যার কথায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে বা স্নান করে আসার পর, মাথায় চিরুনি চালিয়ে চিরুনির গোড়ায় গোছা গোছা চুল হয়ত অনেকেরই উঠে আসে। তখন যে একটু মন খারাপ হয় না এমন নয়। কিন্তু না, মন খারাপ করবার কিছুই নেই, যদি আপনি আসল উপায়টি জানেন। এরকম ক্ষেত্রে মাথায় ভাল তেল ম্যাসাজ করুন। সপ্তাহে একবার মাথায় টক দই মেখে কিছুক্ষণ রাখুন, তারপর শ্যামপু করুন। পেঁয়াজের রস চুলের গোড়ায় মাখিয়ে রাখলেও ভাল ফল পাবেন।

চুল পড়া বন্ধ করার সবথেকে বড় যে উপায় তা হল আপনাকে আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে সবার আগে। আপনার শরীর কী এবং কতখানি পুষ্টি চায় তা যদি আপনি বুঝে উঠে আপনার শরীরকে যোগাতে পারেন তাহলে চুল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের অভাবেই চুল পড়ে। তাই দিনে দুবার করে ভিটামিন বি কমপ্লেকস খান। আর খান ভিটামিন সি। এ ছাড়া বিভিন্ন লেবু – যেমন, কাগজি, বাতাবি, কমলা – এসব খান। গুড় খান। আর লবণ খান। খান লিভার বা মেটে। তবে মনে রাখবেন, মেটে রান্না করার সময় ভাল করে ঢেকে দেবেন। দেখবেন ওটা যেন বেশি ভাজা না হয়ে যায়।

এবার আসুন খুসকির কথায়। এর উপদ্রবেও অনেকে ভোগেন। অনেকেরই চুলের জৌলুস কমে যায় এর দৌরাত্ম্যে। খুসকি হলে এক চামচে ক্যাস্টর অয়েল গরম করে রাতে শুতে যাবার আগে চুলের গোড়ায় ঘসে ঘসে লাগিয়ে দিন। সারারাত এটা থাকবে। তারপর সকালে উঠে একটু ভিনিগার জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথার চুলে লাগান। মিনিট পনের কুড়ি এভাবে থাকুন। এর পর শ্যামপু করুন। উপকার অবশ্যই পাবেন।

সব শেষে আসা যাক রুক্ষ-শুকনো চুলের কথায়। চুলকে রেশমি-কোমল করে তুলতে কে না চায়। কিন্তু চাইলেই যে হয়, তা তো নয়। অনেকেরই তো চুল থাকে রুক্ষ এবং শুকনো। কিন্তু সঠিক উপায়টা জানা থাকলে রুক্ষ চুলকে রেশমি কোমল করে তোলাটা খুব একটা কঠিন নয়। সপ্তাহে একদিন এক-চামচ মাথায় মাখার তেল গরম করে রাতে শুতে যাবার আগে মাথায় ঘষে ঘষে লাগান। মনে রাখবেন সারা মাথায় যেন তেল লাগে। এরপর প্লাসটিকের টুকরো দিয়ে মাথাটা বেঁধে ফেলুন। প্লাসটিকের টুকরো মাথায় লাগান তেলটুকুর গুণ ধরে রাখবে। এর উপর গরম জলে ভেজান গরম তোয়ালে বেঁধে রাখুন। পরদিন শ্যামপু দিয়ে ভাল করে মাথা ধুয়ে ফেলবেন। যেন মাথা একদম তেল তেলে না থাকে। দেখবেন, উপকার ঠিকই পাবেন। □

আলোকচিত্র :
পাহাড়ী রায়চৌধুরী

উর্বশী'র সৌজন্যে

শাহনাজ ভারতীয় ভেষজ থেকে প্রসাধনী বানিয়ে বিদেশে মাত করছেন

নয়া দিল্লি থেকে বিনোদ কুমার

বিভিন্ন কোম্পানির নানা কসমেটিকস আর তার ব্রানড নামের পেছনেই যখন আমরা দৌড়ই তখন দেখতে পাচ্ছি শাহনাজ হুসেনের ভেষজভিত্তিক উৎপাদনগুলো সারা পৃথিবীতে রীতিমত জায়গা করে নিয়েছে। ভারতে প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই জিনিসগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করতে গেলে অনেকে তাই একে আদর করে 'ভেষজ রানী' নাম দেন।

শাহনাজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিউটি হাউস রুবেনসটিনে প্রসাধন বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর বিষয়ে বিপুল প্রচার চলে। এমন কোন প্রচার মাধ্যম নেই যার সুযোগ তিনি নেননি। যে সব প্রসাধন কোম্পানিতে তিনি গেছেন তারা তাই তার এই খ্যাতির সুযোগ নিয়েছে। তিনি নিজেও প্রায় দু'ডজন পত্র পত্রিকায় 'বিউটি কলামে' লিখে থাকেন। সে বাবদ তাঁর নামটাও তাই ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া ছোট ছোট শহরে তিনি বিউটি পারলারও খোলেন, এটাও ভদ্রমহিলার খ্যাতির অন্যতম কারণ। এই সেদিনই লনডনে খুলেছেন ৫৬তম বিউটি পারলারটি।

শাহনাজের মতে, ভারতীয় মেয়েরা সারা পৃথিবীর সেরা সুন্দরী কিন্তু বিয়ের পর নিজের সৌন্দর্য রক্ষার ব্যাপারে একেবারেই অনীহ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, সৌন্দর্য চোখ ধাঁধাবার জন্য নয়, এটি স্বাস্থ্য ও পরিপূর্ণতার জন্যও দরকার। সে কারণে আমার প্রসাধন দ্রব্যগুলো চামড়ার ঔজ্জ্বল্য এবং চুলের সৌন্দর্য রক্ষার কথা ভেবেই করা হয়। আমি ভেষজ জাতীয় জিনিস চালু করেছি যাতে চামড়া সুন্দর হয় এবং সিনথেটিক প্রসাধনী ব্যবহারে ক্ষতিকারক ব্যাপারগুলো বন্ধ করা যায়। তিনি তাঁর ফ্যাক্টরিতে এখন তাই চামড়া ও চুলের জন্য ডজনখানেক ভেষজ দ্রব্য উৎপাদন করছেন।

আলোকচিত্র : রাজা ঘোষ

নাক-উঁচু বৃটিশ কসমেটিক বাজারে প্রথম ভারতীয় হিসেবে শাহনাজই ঢুকতে পেরেছেন। এই বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন যখন ভেষজ উৎপাদন নিয়ে সেলফ্রিজের বাজারে জায়গা পান। এখানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রসাধন নির্মাতা ডায়র, রেভলোন, রুবেনসটিন এদের সংগে কঠোর প্রতিযোগিতা করেও প্রথম দিনেই প্রায় ১ হাজার পাউনডের মাল বিক্রি করে ফেলেন। তাছাড়া এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে দশ সপ্তাহের চুক্তিবদ্ধ মাল ফুরিয়ে যায় তাঁর। বিদেশে তাঁর ভেষজ উৎপাদন কেনার জন্য যে হুড়োহুড়ি হচ্ছে এটা তার প্রমাণ। লনডনের 'দা ইভনিং ডেইলি' তাই লিখেছে, 'সেলফ্রিজের মন্দা কাটিয়ে দিয়েছে এই ভেষজ উৎপাদনগুলো।'

শাহনাজ বলেছেন, এই বিউটি বিজনেস তিনি টাকার জন্যে করছেন না, বিদেশিরা যখন আমাদের ভেষজ সম্পদ কেনার জন্যে এত উদগ্রীব তখনও আমরা আমদানি করা সিনথেটিক কসমেটিকস নিয়েই বাড়াবাড়ি করছি – এই অসহায় অবস্থাটা বোঝানর জন্যেই আমার ব্যবসা। □

প্রস্তাবিত রেলপথ নিয়ে মেঘালয়ে বিতর্ক

আগরতলা থেকে অমিয় দেবরায়

'বিদেশি' ( ) খেদাও রেল রোখো আন্দোলন এখন মেঘালয়ের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু। প্রবল জনমতের চাপে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপটেন উইলিয়াম এ সাংমাকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। জুলাই মাসে ক্যাপটেন সাংমার নেতৃত্বাধীন এম ডি এফ সরকার মেঘালয়ের বারনিহাট পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ সম্প্রসারণের প্রস্তাবকে অনুমোদন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন " তাঁর সরকার এ সিদ্ধান্তকে ত্রুটিহীন বলেই মনে করেন। জনস্বার্থে রেলপথ স্থাপন প্রয়োজনীয়। প্রস্তাবিত রেলপথ নির্মাণের পক্ষে অনেক অনেক যুক্তি আছে। চাপ সৃষ্টি করে এ ব্যাপারে আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। যদি আমরা কখনও মনে করি আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা আবশ্যক সেটা আমরাই বুঝব। বাইরের কোনপ্রকার চাপে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাচ্ছি না.

কিন্তু জনমতকে ক্যাপটেন সাংমা এবং তাঁর সরকার উপেক্ষা করতে পারেননি। তিন মাস পার হতে না হতেই মন্ত্রিসভা বির্কিং বারনিহাট রেললাইন প্রকল্প সম্পর্কে জনমত যাচাই করতে একটি ক্যাবিনেট সাব কমিটি গঠন করতে বাধ্য হন। বারনিহাট পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পূজার পূর্বে মেঘালয়ে ১৯ ২০ সেপ্টেম্বর ৩৬ ঘণ্টার বন্ধ পালন করা হয়। খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বন্ধের ডাক দেয়। বন্ধ এর পরেই মেঘালয় সরকার একটু থমকে দাঁড়ান। খাসি ও জৈন্তা পাহাড় জেলায় সফল বন্ধ হলেও গারো পাহাড় জেলায় বন্ধের প্রভাব বেশ কম ছিল। আসাম মেঘালয় গারো ছাত্র ইউনিয়ন বন্ধের সমর্থনে গারো জেলার তুরা শহরে একটি মিছিল বের করেছিল। ক্যাবিনেট সাব কমিটি গঠনের পর রেলপথ নির্মাণ নিয়ে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটে। অক্টোবর মাসে খাসি ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডি ডি লাপাং সেক্রেটারিয়েটে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কে এম ডি এফ সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেন। লাপাং বলেছেন এম ডি এফ সরকার জনগণের সরকার। জনমতকে সরকার সম্মান করেন। খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি এন লিংডো বৈঠকে বলেছেন, বিদেশি বিতাড়নের কাজ সামাল দেবার মত মেঘালয় সরকারের কোন যোগ্য সংগঠন নেই। বারনিহাট পর্যন্ত রেলপথ আসলে বিপুল সংখ্যক বিদেশি লোক মেঘালয়ে প্রবেশ করতে থাকবে। এসব বিদেশিকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা সরকার করতে পারবেন না। সরকার পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাওয়ায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, খাসি জৈন্তা জেলায় শাসক এম ডি এফ দলের পায়ের তলার মাটি নেই।

রেলপথ সম্প্রসারণ বিষয়ে জনমত বিভক্ত। গারো পাহাড় জেলায় যেমন রেলপথ স্থাপনের অনুকূলে যথেষ্ট সমর্থন আছে, খাসি জনগণের একটা অংশও এর বিরোধী নন। রেলপথ স্থাপনের ব্যাপারে বিদেশি সমস্যা এসে পড়ায় অ উপজাতি সম্প্রদায় এ বিষয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে চান না। এদের কেউ কেউ মনে করেন, রেলপথকে কেন্দ্র করে বিদেশি হটাও আন্দোলনের ফের মাথা চাড়া দেবার সম্ভাবনাই বেশি। রেলপথের সঙ্গে এই অবাঞ্ছিত আন্দোলনও চিরদিনের মত বাসা বেঁধে বসবে। তাতে শান্তি বিঘ্নিত হবে, আইন শৃংখলার অবনতি হবে। আন্দোলনের বলি হবে অ উপজাতিরা। তাই এরা মনে করছেন রেলপথের দরকার নেই - খাল কেটে কুমীর এনে কী হবে। এরা এও মনে করেন যে, উপজাতিদের একা দায়ী করা চলে না। কিছু লোক এদের মাথায় বিদেশি কথাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। এক শ্রেণীর লোক রেলপথকে সম্বল করে তাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে এবং একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জাঁকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকবে। এক শ্রেণীর উপজাতি বিশ্বাস করে রেলপথ আসলে হাজার হাজার বিদেশি (মেঘালয়ের বাইরের সব ভারতীয় রাজ্যের অধিবাসী এদের কাছে বিদেশি) দলে দলে মেঘালয়ে চলে আসবে বাবসা বাণিজ্য জমি সব দখল করে নেবে। রেলওয়ে কর্মচারী যারা ট্রেন চালাবে, রেল স্টেশনে কাজ করবে এরাও এদের চোখে বিদেশি। জুলাই মাসে মেঘালয় সরকার বারনিহাট পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করলে খাসি পাহাড় জেলা পরিষদের পঁচিশ জন (স্থানীয় পার্টির) সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে বলা হয় সরকার যে কাজে হাত দিয়েছেন তা রূপায়িত হলে উপজাতির স্বার্থবিরোধী কাজ হবে। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদগুলোর সঙ্গে পরামর্শ না করায় এরা মর্মাহত হয়েছেন বলে প্রকাশ করেন। বারনিহাট স্থানটি মেঘালয় রাজ্যের এক কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত। ইতিপূর্বে বি বি লিংডো সরকার আসাম মেঘালয় সীমান্তে বড়দোয়া পর্যন্ত বংগাইগাঁও থেকে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন। ক্যাপটেন সাংমার সরকার প্রতিষ্ঠার আগে লিংডো নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় ছিল। লিংডো সরকার নীতিগতভাবে রেলপথ নির্মাণে সমর্থন করেছিল। কিন্তু মেঘালয়ের ভেতরে রেললাইন বসানোর বিরোধী ছিল এই সরকার।

বড়দোয়া থেকে বারনিহাট এর দূরত্ব প্রায় দু কিলোমিটার হবে। বড়দোয়া তো আসামের এলাকায়। মেঘালয় তাতে আপত্তি করতে পারে না। কারণ ব্যাপারটা আসামের। দু কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ নিয়ে ঝড় উঠেছে। রেলওয়ে বলে দিয়েছে বারনিহাট পর্যন্ত যদি রেল না যায় তবে মেঘালয়ে রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব খারিজ করে দেয়া উচিত। ১৯৭৬ ৭৭ এ মঞ্জুরীকৃত দশ কোটি টাকার ইস্টিমেট বারনিহাট 'রোপওয়ে' নির্মাণের এক প্রকল্প রূপায়ণের অপেক্ষায় রয়েছে। এটির নির্মাণ কাজও বন্ধ পড়ে যাবে। মেঘালয় রেল লিংকের ওপর রোপওয়েটি নির্ভরশীল। বারনিহাট পর্যন্ত রেলপথ না গেলে রোপওয়ে প্রকল্পটিও হবে না। অথচ রোপওয়েটি মেঘালয় রাজ্যের স্বার্থেই প্রয়োজন।

নরথ-ইস্টার্ন কাউন্সিল সত্তর দশকের গোড়ায় প্রস্তাব করেছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব কটি রাজ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। ভারত সরকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশকে রেলপথের সংগে যুক্ত করার পরিকল্পনা রচিত হয়। সত্তর দশকের শুরুতেই মেঘালয়ের বারনিহাটকে উন্নয়নমূলক কেন্দ্রে পরিণত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এদিকে দৃষ্টি রেখেই বংগাইগাঁও থেকে বারনিহাট পর্যন্ত একটি ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বি বি লিংডো রেলওয়ে অফিসারদের নিয়ে বড়দোয়া স্থানটি পরিদর্শন করেন। আগস্ট মাসে রেল কর্তৃপক্ষ মেঘালয় সরকারকে জানান যে, বড়দোয়া স্থানটি একটি টারমিনাস রেল স্টেশন স্থাপনের উপযোগী নয়। ১৯৮১তে দুটির একটি স্থান নির্বাচনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি বারনিহাটকে রেলহেড করার সুপারিশ করেন। কিন্তু লিংডো সরকার রেল কর্তৃপক্ষকে বড়দোয়াতেই রেলহেড স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। রেলমন্ত্রকও বড়দোয়াতে রেলহেড স্থাপনে সম্মত নন। বারনিহাটে এবং এর আশে-পাশে ১৩টি শিল্প স্থাপন করার প্রস্তাব আছে। বড়দোয়াতে রেলহেড স্থাপিত হলে এসব শিল্পের মাল পরিবহন করার সুযোগ থেকে রেলওয়ে বঞ্চিত হতে পারে। স্থানটি 'জাতীয় সড়ক ৩৭' থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

শুধু মেঘালয় নয় মণিপুরও নাকি তথাকথিত বিদেশি প্রবেশের ভয়ে ঐ রাজ্যে রেললাইন স্থাপনে বিরোধী। এদিকে কেন্দ্র অর্থের অভাব দেখিয়ে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বিশেষ করে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণে বিলম্ব করছেন। ত্রিশ বছর রেললাইনের জন্য আন্দোলন করে এ পর্যন্ত মাত্র এগারো কিলোমিটার রেলপথ পেয়েছে। আরো ৩৩ কি মি রেল লাইন নির্মাণের কাজ চলছে। তেত্রিশ কি মি রেলপথ কবে চালু হবে কেউ বলতে পারছে না। তেত্রিশ কি মি রেলপথ বসলেও ত্রিপুরার এক দশমাংশ চাহিদাও পূরণ হচ্ছে না। □

মলিন মুখে ফুটুক হাসি-২

চিন্ময় সেনগুপ্ত

এর আগে আলোচনা করেছি মনকে কীভাবে তৈরি করলে আমরা মনের আঘাত প্রতিরোধ করে, তাকে অনাহত, প্রশান্ত রাখতে পারি।

এতো গেল ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা। কিন্তু যখন অতীত আঘাতের গভীর দাগ মনকে বিষিয়ে রাখে তখন তাকে মুছে ফেলি কী করে।

এক্ষেত্রেও মনের ডাক্তারিটা নিজে নিজেই করতে হবে।

এ-ডাক্তারিটা কোন ধরনের?

শল্যচিকিৎসক দেহের ক্ষত তাঁর ছোট্ট ছুরি (Scalpel) দিয়ে কেটে বাদ দেন। মনের পুরনো ক্ষত বাদ দেবার সেই ছুরিটি হচ্ছে – ক্ষমা। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি আঘাত দিয়ে আমাদের মনকে আহত করেছে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে হবে। তবে ক্ষমাটা আংশিক হলে চলবে না, ক্ষমার ভান করলেও চলবে না। অমুককে অমুক ব্যাপারে ক্ষমা করেছি একথা মনে রেখে অহংকার করাও চলবে না। ক্ষমাটা ষোল আনা হওয়া চাই। ক্ষমাটা তখনই ষোল আনা, যখন আমরা ক্ষমা করে ক্ষমাটা ভুলে যাই। সে ধরনের দুর্লভ ক্ষমাই আহত মনের ক্ষেত্রে অব্যর্থ ওষুধের মত কাজ করবে। এ-ধরনের ক্ষমা মনের পুরনো ক্ষত নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারলে দেখা যাবে যে-আঘাতের স্মৃতি বারে বারে অথবা মাঝে মাঝে মনে জেগে অস্বস্তি বা অশান্তির সৃষ্টি করত সেই পুরনো স্মৃতি এখন বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে।

প্রসংগত, মনের পুরনো ক্ষতচিহ্ন আমরা যে পুষে রাখি তার একটা কারণও আছে।

মনের পুরনো আঘাত লালন করে আমরা একটা বিজাতীয় তৃপ্তি পাই, তাছাড়া অপরকে দোষ দিতে পারার মধ্যেও নিজের একটা গর্ববোধ আছে।

এই ক্ষমা-চর্চার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত পথে কী করে এগোব, এ সম্পর্কে খুব স্বাভাবিকভাবেই যীশুর কথা মনে আসছে। যীশুর নানা প্যারাবেল-এ ক্ষমার কথা হয় সরাসরি, না হয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। একটি প্যারাবল-এ একজন এসে যীশুকে জিগ্যেস করছে, দোষী ভাইকে কতবার ক্ষমা করব, সাত বার? যীশু উত্তর দিলেন, সাতবার নয়, সত্তরগুণিত সাতবার।

এই যীশুই বলছেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। কিন্তু আমাদের সাধারণ মন পাপী আর তার পাপ, দোষী আর তার দোষ – এ দুটোকে পৃথক করে ভাবতে পারে না। যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যায় এ দুটি সত্যিই পৃথক।

কয়েকটা ঘরোয়া উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি ছেলে পরীক্ষায় পর পর দু'বার ফেল করল। তাকে কি 'ফেলুয়া' বলে চিরদিনের জন্য মার্কা দিয়ে দেব? একটা ফুটবল টিম দু একবার ম্যাচ খেলতে গিয়ে হেরে গেল। সে টিমের কি 'হারুয়া' নাম দিয়ে দেব চিরকালের জন্য? দেব না। কারণ ফেল করা ছেলেই আবার পরীক্ষায় খুব ভাল করতে পারে এবং বহু ছেলে এইরকম করে, করছে, করবে, তেমনি দু'বার হেরে-যাওয়া টিম তৃতীয় বারেই চ্যাম্পিয়ান হতে পারে। এই সামান্য দুটো উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কারো কোনো কৃতকর্মের জন্য সেই ব্যক্তি এবং কৃতকর্ম দুটোকে এক করে ফেলতে নেই। যে একবার একটা ভুল করেছে, সে ঐ ভুল শুধরে অনেক নির্ভুল কাজের পরিচয় পরে দিতে পারে।

এ দুনিয়ায় এরকম হামেশা হচ্ছে। তাছাড়া অভাবনীয় উত্তরণের উদাহরণ উজ্জ্বল হয়ে আছে মহামানবদের ক্ষেত্রে। একটি মহাজীবনেও বোধহয় এর ব্যতিক্রম নেই।

মহাপুরুষদের জীবনের ইতিহাসে দেখি, যিনি নিজের প্রথম জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে নিজেকে 'শয়তান' বলে পরিচয় দিয়েছেন, আমরা তার শেষ পরিচয় স্মরণ করে তাঁকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়েছি।

যিনি বোমা তৈরি করে বোমারু হয়েছিলেন, দুনিয়া তাকে দিব্য জীবনের দিশারি বলে পুজো করে চলেছে। যিনি বাল্যে, কৈশোরে স্কুল-পালান ছেলে বলে আখ্যা পেয়েছিলেন, বিশ্ব তাঁকে বিশ্ব-বরেণ্য বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে চলেছে। এরকম কত উদাহরণ দেওয়া যায়! এই সব উদাহরণ ধরে মনকে অনায়াসেই বোঝান যায় যে দোষ এবং দোষী, পাপ এবং পাপী – এগুলো পৃথক। একথা বোঝার ফলে ক্ষমা করাটা সত্যি সোজা হয়ে যায়।

আমিই এ পৃথিবীতে আমার প্রিয়তম ব্যক্তি। আমারই ষোল আনা স্বার্থে এই ক্ষমার চর্চা, দোষীকে ক্ষমা করছি তাকে কৃতার্থ করবার জন্য নয়। ক্ষমা করছি, তার দেওয়া আঘাত মুছে ফেলে নিজের চিত্ত নির্মল করে সুখী হতে হবে বলে। এই 'স্বার্থপরতা' একটুও দূষণীয় নয়, একান্ত কাম্য।

এতক্ষণ অপরকে ক্ষমা করার কথা বলা হল। এবার নিজেকে ক্ষমা করার কথা।

জীবনে আমরা অনেক সময় ভুল করি, বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করে বসি। তার জন্য মনস্তাপ হয়, দুঃখ হয়। বিবেক দংশন ভোগ করি, অনুতপ্ত হই।

এইসব অতীত বেদনাকে লালন করারও আমাদের একটা নেশা আছে, একটা মানসিক বিলাসিতা আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে অতীত বেদনা কখনই বর্তমানের হতে পারে না।

জ্ঞানীরা বলছেন, 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' অর্থাৎ অতীত কৃতকর্মের জন্য মনস্তাপ করা উচিত নয়। তাহলে এক্ষেত্রে চেষ্টা করে দুঃখময়, ব্যথাময় অতীতকে মুছে ফেলতে হবে, ভুলে যেতে হবে।

নিজের অতীতের ভুল বা বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ বা আচরণের কথা আমাদের যুক্তিযুক্ত মন নিয়ে ভাবা উচিত। এভাবে যুক্তি দিয়ে ভাবলে দেখব – আমিই ভুল করেছি ভুল আমাকে করেনি। আমি আর আমার ভুল দুটো পৃথক জিনিস। এই পার্থক্যবোধ মনে মনে সত্যিকারের তৈরি হলে ভাবতে পারব যে আমি ভুল করেছি, সে আমি আবার নির্ভুল হাজারো কিছু করতে পারি।

এইভাবে নিজের অস্মিতা যদি সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে, অনুতাপ জর্জর যে মন মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ত, বিষণ্ণ হত, সে মন আবার প্রাণ স্ফূর্তিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। যে দেহ নুয়ে পড়েছিল, তাতে আবার তারুণ্যের ঋজুতা এসেছে।

আমাদের চারপাশে অনেক চল্লিশোত্তর মানুষকে দেখি, তাদের আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনা একেবারে তরুণদের মত। তারা সব সময় ফূর্তিবাজ, আশাবাদী এবং প্রাণবন্ত। এর কারণ, মনে তারা তারুণ্য বজায় রেখেছেন আর সেই মনের তারুণ্য এদের দেহে, কাজে-কর্মে, আচরণে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। বয়সের কথা তাঁরা ভুলে আছেন। বয়সের ছাপ যেমন তাঁদের মনে পড়েনি, তেমনি তাঁদের মুখেও পড়েনি। তাঁরা চলেছেন সামনের দিকে। অনাগত ভবিষ্যতের অনেক আশা, অনেক বিশ্বাস তাঁদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু এই চল্লিশোত্তরদের এ-তারুণ্য বজায় থাকত না, যদি অপরের প্রতি কোন দীর্ঘকালের আক্রোশ, প্রতিহিংসা নেবার অভিসন্ধি, অপরের দেওয়া অপমান এঁরা মনে মনে বহন করে চলতেন। অথবা স্বকৃত কোন ভুল ত্রুটির জন্য অনুতাপ মনে জিইয়ে রাখতেন। কারণ এইসব বিরূপ চিন্তা শুধু মনকে বুড়ো করে না, দেহকেও বুড়ো করে দেয়।

শেকসপিয়ারের 'মারচেন্ট অব ভেনিস' অভিনয়টি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে প্রৌঢ় বয়সী ইহুদি শাইলক কোন দৃশ্যেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তার পিঠ কুঁজো হয়ে আছে। কীসের বোঝা? সুদখোর হৃদয়হীন ইহুদি হিসেবে শাইলক সকলের কাছ থেকে যে ঘৃণা, অপমান, লাঞ্ছনা পেয়েছে তারই বোঝা সে বয়ে চলেছে। মনের এই বোঝা তার দেহটিকে ন্যুব্জ, কুব্জ করে দিয়েছে!

কিন্তু মনের পুরনো স্বকৃত বা অপরের দ্বারা কৃত ক্ষত চিহ্নের অপসারণ – এর পরেও কথা আছে।

ইতোপূর্বে মনের ক্ষত প্রতিরোধ করবার জন্য মনটিকে শক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। শামুক, ঝিনুক বা কচ্ছপ তো নিজেকে ঘিরে কাঠের মত শক্ত একটা আবরণ রচনা করেছে পাছে কোমল দেহে কেউ আঘাত করে। তাহলে আমরাও কি ওদের মত কখন কে মনে আঘাত দেয় – এই ভেবে নিজের মনের চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য আবরণ তৈরি করব?

তা হয় না। আবার বলছি, মানুষকে বাঁচতে হবে দশজনকে নিয়ে। অপরকে বিশ্বাস করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। মন দেওয়া-নেওয়া জীবনভর চলবে। অপরের কাছে মনের কথা খুলে বলতে হবে, অপরের মনের কথা শুনতে হবে। মানুষের সংগে মানুষের সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান চলতে থাকবে। এই তো মানুষের স্বাভাবিক জীবন চর্যা। মনের আঘাত প্রতিরোধ করতে গিয়ে মনের চারপাশে দুর্ভেদ্য আবরণ রচনা করলে শুধু প্রত্যাশিত আঘাতই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে না, নিজের স্বাভাবিক জীবনটাও নির্বাসিত হবে। তখন আমরা প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকব, কিন্তু মনুষ্য জীবনযাপন হবে না। □

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

অবনীশ, তুমি!
সাবু চিঠি লিখেছে।
সাবুর চিঠি! কী লিখেছে?
লিখেছে -- আমি চলি যাচ্ছি -- যে পথে যাচ্ছি, সে পথ থেকে কেউ ফেরে না ·
আত্মহত্যা ·
না, তার চাইতেও বেশি। শুনুন ঃ তোমার আর ভয় নেই ভয় নেই তোমার বাবার। এবার যেন রেহাই দেন আমার দুঃখিনী মা কে।
সাবু!
শুনুন শেষ পর্যন্ত ঃ তার আর কেউ নেই। আর তাকে জুতো মের না। আমি বিষকন্যা ---
আমার সংস্পর্শে এসে তোমার এত কষ্ট –
কক্‌খনো না
আমাকে গর্ভে ধরে আমার মায়ের এত হেনস্থা। তাই আমি দূরে চলে যাচ্ছি অনেক বড় হতে – আবার অনেক ছোট হতে
কোথায়? কোথায়?
খুঁজতে যেও না – আমাকে পাবে না – শান্তিও পাবে না। বরং বিয়ে কর – শান্তি পাবে ---

আপনার ইঞ্জিন শুধু টিউনিং করে ৬% জ্বালানীর সাশ্রয় করতে পারেন।

আচ্ছা, আমার বাইকটা বোধহয় এখন গ্যারাজে পাঠানো দরকার হয়ে পড়েছে...” আপনি যদি ইঞ্জিনের টিউনিং না করেন তবে টিউনিং-এর খরচের অনুপাতে জ্বালানী খরচ যে আরো বেশী বেড়ে যাচ্ছে, তা হয়তো আপনি বুঝতেও পারবেন না।

আপনার ইঞ্জিনকে নীরোগ রাখুন

নিয়মিত টিউনিং করিয়ে ৬% এরও বেশী পয়সা ও ইন্ধন বাঁচাতে পারেন। যদি ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরো বা টানবার ক্ষমতা কমে গিয়ে থাকে তবে সংগে সংগে ভাল গ্যারাজে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করান। নীরোগ ইঞ্জিনের গ্যাস সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না। স্পার্ক প্লাগে বেঠিক মাপের ব্যবধান এবং ভুল টাইমিং এর দরুণ শক্তি উৎপাদন কমে এবং জ্বালানীর খরচ বেড়ে যায়। প্রস্তুতকারকদের সুপারিশ মতো স্পার্ক প্লাগ ও কনট্যাক্ট ব্রেকার পয়েন্ট বদলে নিন।

ইঞ্জিন ওভারহল করতে দেরী করবেন না।

ইঞ্জিন ওভারহল করতে যে খরচা হবে, হয়তো তে অপচয়ের দরুণ খরচ তার চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াবে

নিয়মিত এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করুন

আপনি কি জানেন ?...

এয়ার ক্লিনার না থাকলে ইঞ্জিনে সিলিণ্ডার বোর ৪৫ গুণ তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় ?

ধুলোবালিতে ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় এবং ইন্ধনের খরচও বাড়ে। বুজে আসা এক্সহস্ট পোর্ট ও সাইলেন্সরের দরুণ ইঞ্জিন ধুঁকতে থাকে। ফলে দহনে

HTD-PCR-8057-B BEN

ত্রুটি আসে। প্রস্তুতকারকদের সুপারিশ অনুযায়ী, নিয়মিত সাইলেন্সর এবং এক্সহস্ট পোর্টগুলি পরিষ্কার করুন।

টায়ারে হাওয়ার দিকে নজর রাখবেন

টায়ারে কম হাওয়া থাকলে চাকা গড়িয়ে চলার সময়ে বেশী বাধা পায় বলে পেট্রোল খরচ বেশী হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, টায়ারে হাওয়ার চাপ ২৫% কম থাকলে জ্বালানী লাগে ৫% বেশী এবং টায়ারের আয়ু ২৫% কমে যায়।

লক্ষ্য রাখুন চোরা লীক আছে কিনা এবং নিয়মিত হাওয়ার চাপ পরীক্ষা করুন।

সঠিক মানের লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করবেন

প্রস্তুতকারকদের সুপারিশমত পেট্রোলের সংগে ভাল মানের তেল, উপযুক্ত অনুপাতে মেশাবেন। অধিকাংশ

OIL

ইঞ্জিনেই জ্বালানীর সংগে ৫% এরও কম তেল মেশাতে হয়। কিন্তু মেশানোটা খুব ভাল হওয়া চাই।

এই সহজ নিয়মগুলো মেনে চলুন এবং ইন্ধন সাশ্রয়ের জন্য আমাদের পরীক্ষিত নানান উপায়ের আরো কতগুলির খোঁজ করুন। কিছুদিন পরে আপনি নিজেই এর সুফল দেখতে পাবেন। আপনার বাহনটির আয়ুষ্কালও বাড়বে আর জ্বালানী খরচে ভালরকম সাশ্রয় হবে।

একটু ভেবে দেখুন।

P C R A

পেট্রোলিয়াম কনজার্ভেশন রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন

৩০৬, সেঠি ভবন, ৭-রাজেন্দ্র প্লেস, নিউ দিল্লী-১১০০০৮.

পেট্রোল বাঁচান

কারণ তেল চিরদিন থাকবে না।

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

তার পর ?

বড় কষ্টের শেষ কথাটা ---- লিখেছে ঃ
আমাকে ভুলে যেও — শুধু মনে রেখ হতভাগিনী একটা মেয়ে এসেছিল তোমার জীবনে ধূপের মত - কেবল ধোঁয়া আর সুগন্ধ হয়ে মিলিয়ে যেতে।

শেষের দিকে কান্নায় গলা বুজে এল বাসন্তীর

থাক, আর বলতে হবে না। এবার বুঝেছি, শ্রাবন্তী গুহ কনট্যাক্ট লেনস পরেছিল কেন

কেন, ইন্দ্র ?

আত্মগোপন করবে বলে।

বাড়ি থেকে বেরোত না ঐ কারণেই ?

হ্যাঁ। পাছে কোনদিন অবনীশের চোখে পড়ে যায় — এই ভয়ে।

মাসিমা, দেখুন তো একে চিনতে পারেন কিনা ?

লালবাজার থেকে আসার সময়ে বৌবাজারের স্বর্ণকারের দোকান থেকে পেনড্যানটটা নিয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ রসিদের বিনিময়ে। মখমলের বাকস খুলে লকেটটা মেলে ধরল

বাসন্তীর চোখের সামনে। স্প্রিং টিপতেই খুট করে খুলে গেল নকল পদ্মরাগের ডালা।

ভেতরে সেই যুগ্ম ফটোগ্রাফ একজন শ্রাবন্তী, আর একজন --- অবনীশ!

(চলবে)

অনন্ত শর্মা : সাধারণ রেলকর্মী থেকে রাজ্যপাল

নিশীথ দে

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মা এ বছর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পদার্পণ করছেন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষেই এই প্রতিবেদনটি এবার প্রকাশ করা হল।

রাষ্ট্রপতি জৈল সিং সম্পর্কে একটি জীবনী গ্রন্থের লেখক তাঁর বইয়ের নামকরণ করেছিলেন 'ফ্রম মাড হাউস টু রাষ্ট্রপতি ভবন' – মাটির ঘর থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে। পশ্চিমবঙ্গের দশম রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মা অবশ্য মাটির ঘর থেকে আসেননি, এসেছেন রেলের দুই কামরার কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ স্টাফ কোয়ারটার থেকে। বাবা ছিলেন সামান্য রেল কর্মচারী। রেলকর্মীর ছেলে রেলের চাকরিকেই জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা বলে ধরে নেবেন এমন ধারণা থাকে অনেকের মনে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তরুণ অনন্তপ্রসাদ এক সময় চাকরি নিয়েছিলেন রেলে। বাড়ির অসচ্ছল অবস্থা তাঁকে এই সাধারণ চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু অনন্তপ্রসাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই লুকিয়ে ছিল দুর্বার সাংগঠনিক শক্তি আর প্রখর রাজনৈতিক চেতনা। তাই বাঁধাধরা চাকরি, প্রমোশন আর নিজের সাংসারিক বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া জীবন তাঁকে বিন্দুমাত্র বেঁধে রাখতে পারেনি। রেলকর্মী থাকতে থাকতেই যোগ দেন ট্রেড ইউনিয়নে। আপন শক্তির জোরেই একদিন বিরাট রেলওয়ে ইউনিয়নের নেতৃত্ব চলে আসে তাঁর হাতে। এই ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতির সূত্র ধরেই তাঁর লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অবশেষে রাজ্যপাল।

গত ১০ অকটোবর আকস্মিকভাবে পূর্বতন রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পানডের বিদায় ও প্রবীণ কংগ্রেসি রাজনীতিক অনন্তপ্রসাদ শর্মার প্রবেশে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট মহল সবিশেষ চিন্তিত, বোধ হয় আশঙ্কিতও। এমনতর আশংকা প্রকাশ পেয়েছিল ভৈরব দত্ত পানডে আসার আগেও। কিন্তু, আই সি এস ভৈরব দত্ত পানডে যে আরেকজন ধরমবীরে পরিণত হননি এটাই ছিল বামপন্থী রাজনীতিকদের স্বস্তির কারণ। ভৈরব দত্ত মোটামুটি বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতায়ও এসে গিয়েছিলেন। নতুন রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মা এখনও বামফ্রন্টকে বুঝে উঠতে পারছেন না। বামফ্রন্ট সরকারের আস্থা অর্জন করবার জন্য এখন একের পর এক নয়া রাজ্যপালকে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে, কারণ ভারতীয় সংবিধানে নেই নেই করেও রাজ্যপালের ক্ষমতা অনেক। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে তিনিই তো কার্যত সর্বময় কর্তা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার মল্লভূমি সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিবিদরা মনে করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন থেকেই রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মার অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে।

সে যাই হোক, সাধারণ মানুষ এমন রাজ্যপালকেই চান যিনি প্রকৃতপক্ষে লাটসাহেব না হয়ে সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি এগিয়ে আসবেন। পঞ্চাশটি বেসরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান বা সভাপতি অথবা পৃষ্ঠপোষক, রাজ্যপাল যত সাধারণ মানুষের কাছের লোক হন, ততই জনগণের মঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখারজিকে মানুষ যে এখনও স্মরণে রেখেছেন তা তাঁর সারল্য ও মানবকল্যাণমূলক কাজকর্মের কথা মনে রেখেই। পশ্চিমবঙ্গের এ পর্যন্ত স্থায়ী রাজ্যপালদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন বাঙালি। পদ্মজা নাইডু বঙ্গভাষী নন, বঙ্গবাসীও নন, কিন্তু তিনি বাঙালি তনয়া। অনন্তপ্রসাদ শর্মার জন্ম বিহারে কিন্তু স্কুল জীবন থেকে শুরু করে তাঁর দীর্ঘ কর্মক্ষেত্র এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই। যে কোন বাঙালির মতই তিনি বাংলা বলতে পারেন, পড়তেও পারেন, পড়েনও। যাবতীয় বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র তাঁর নিত্যদিনের পাঠ্যতালিকার আবশ্যিক অংগ। যেহেতু তিনি সাধারণ অবস্থা থেকে ওপরে উঠেছেন সেহেতু সাধারণ মানুষের প্রতি এখনও তাঁর অগাধ বিশ্বাস। অমায়িক ব্যবহার এবং আলাপচারিতায় রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মাকে এখনও তাঁর অতীত জীবন থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। রাজ্যপাল অনন্ত শর্মার জীবনকাহিনী থেকে যে কোন ব্যক্তিই বড় হবার প্রেরণা পেতে পারেন। দারিদ্র্য যে প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে বেঁধে রাখতে পারে না তার প্রমাণ ভারতীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আছে ভূরি ভূরি। এই ভারতবর্ষে ধনীর ছেলে নেহরু যেমন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তেমনি গরিবের ছেলে লালবাহাদুর শাস্ত্রীও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণণের পাশে চাষীর ছেলে জৈল সিং-ও পেয়েছেন ভারতের প্রথম নাগরিকত্ব। তেমনি ঝানু সিভিলিয়ানদের পাশাপাশি অনন্তপ্রসাদ শর্মার রাজ্যপাল পদপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি সংবাদ, যে অনন্তপ্রসাদ একদিন তিরিশ টাকা

রাজ্যপাল অনন্তপ্রসাদ শর্মা ও পত্নী তারা দেবী

মাইনের চাকরি দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন।

অনন্তবাবুর জন্ম বিহারের গোদাড় গ্রামে। গোদাড় রুদ্রনগর পাশাপাশি গ্রাম, যমজ গ্রাম। গোদাড়ে তখন স্কুল-পাঠশালা ছিল না। যেতে হত রুদ্রনগরে।

বাব। রামনরেশ শর্মা রেলের চাকরিতে বদলি হলেন সীতারামপুরে। এদিকে অনন্তবাবুরও সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ। বাবার সংগে চলে এলেন সীতারামপুরে। ভরতি হলেন আসানসোলের ডি এ ভি স্কুলে। সীতারামপুর থেকে সাত মাইল পথ।

তখনকার দিনে বাঙালি একান্নবর্তী পরিবারের মত বিহারেও বাড়ির বউকে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতে হত। স্বামী যেখানেই বদলি হোন না, সঙ্গিনী হতে পারতেন না। মাকে থাকতে হল গ্রামের বাড়িতে। সীতারামপুরে বাবার সংগে হাতে হাতে সব কাজ করতে হত। রান্না বান্না করে, ঘরের সব কাজ করে লেখা পড়া করতে হত। নিজের হাতে টিফিনও তৈরি করতে হয়েছে।

আসানসোলের ডি এ ভি স্কুলে পড়ার সময় বাংলা, বাঙালি, বাংলার আচার আচরণ কিশোর অনন্তপ্রসাদকে আকৃষ্ট করেছিল। সহপাঠী বাঙালিরাও তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। এই ডি এ ভি স্কুলে পড়ার সময় বাংলা শিখেছেন। এই স্কুলে বেশিদিন পড়তে পারেননি। দু বছর পরে বাবা বদলি হলেন গোমো স্টেশনে। অনন্তবাবু আজও আসানসোল, ডি এ ভি স্কুল, সহপাঠী বন্ধু, বাংলা গান বাজনা, উৎসব অনুষ্ঠানের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় ধরে রেখেছেন। এ তাঁর সুখস্মৃতি।

গোমোতে বাবা তখন রেলের অ্যাসিসট্যানট ফোরম্যান। গোমোতে তখন ভাল স্কুলও ছিল না। সাহাপুর মিডল ইংলিশ স্কুলে ভরতি হলেন। সেখান থেকে আরা টাউন স্কুলে। বাবা চাকরি থেকে অবসর নিলেন।

ম্যাটরিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে পড়তে এলেন বিহারের পাটনায়। ভরতি হলেন বিহার ন্যাশনাল কলেজে। কলেজে পড়ার সময়েই জড়িয়ে পড়েন ছাত্র রাজনীতিতে। ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাব বাড়ছে, কমিউনিসটদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

অনন্তবাবু তখন আরটসে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম – তাঁর মন কেড়ে নিয়েছে। কমিউনিসটদের প্রভাব থেকে ছাত্র সমাজকে মুক্ত করার জন্য আলাদা করে ছাত্র সংগঠন গড়ে তুললেন সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে – সারা বিহার ছাত্র ফেডারেশন।

দেখতে দেখতে বিহারে এই ছাত্র সংগঠন ছড়িয়ে পড়ল। অনন্তবাবু ছিলেন সংগঠনের সহকারী সম্পাদক। কলেজে পড়ার সময়েই অনন্তবাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে। তাঁর পরিবারের কেউ রাজনীতি করেননি।

বাবা রামনরেশ শর্মা চান না, ছেলে রাজনীতি করুক, ইংরেজের রোষে পড়ুক। অনন্তপ্রসাদ বড় ছেলে। বাবা মার কত আশা। রেলে বড় অফিসার হবেন। বিয়ে থা করে সংসারী হবেন। জোত জমি বাড়াবে। সবাই দেখলে বলবে, শর্মাজী নমস্তে। তার বদলে রাজনীতি ? গ্রামের ছেলে শহরে লেখা পড়া শিখে এ কী হল ? না, না, ওসব চলবে না। রাজনীতি ছাড়তেই হবে।

শুরু হল একটা দ্বন্দ্ব, প্রচন্ড মানসিক দ্বন্দ্ব। কী করবেন অনন্তপ্রসাদ ! রাজনীতির পাঠ চুকিয়ে দিয়ে সুবোধ বালকের মত বাবার ইচ্ছা মেনে নেবেন ? তাতে বাবা মা সুখী হবেন। সংসারে সবাই সুখী হবে। কিন্তু তাতে তো অনন্তপ্রসাদ সুখের স্বাদ পাবেন না।

বাড়ি ছাড়তে হল অনন্তবাবুকে। রেলের চাকরি নিলেন। কমারসিয়াল ক্লারক, মাইনে তিরিশ টাকা। টাকার খুব দরকার। রাজনীতি করতে গেলেও পেট চালাতে হবে তো। বাবা রিটায়ার করেছেন। বড় লোকের বাড়ির ছেলে হলে পেটের ভাবনা ভাবতে হত না।

রেলের চাকরিতে ঢুকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগে পরিচয় হল। বাবা রেলে চাকরি করতেন, তখনই দেখতেন রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের কত পীড়ন সইতে হয়, বঞ্চনার শিকার হতে হয়। ট্রেড ইউনিয়ন করার ইচ্ছেটা অনেক দিন থেকেই ছিল। যুক্ত হলেন পূর্ব রেল শ্রমিক কংগ্রেসের সংগে।

১৯৪৫ সাল থেকে পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। সেই সংগে কংগ্রেসের কাজ। একেবারে হোল টাইমার। রেল কর্মচারীদের তিনটি ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সংগে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনের সহ সভাপতি, কার্য-নির্বাহক সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত অনন্তবাবু ছিলেন সাধারণ সম্পাদক।

এই ১৯৭৪ সালের ৮ মে কংগ্রেস বাদে সমস্ত পারটির ট্রেড ইউনিয়ন মিলিতভাবে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের

রাজভবন এবং রাজ্যপাল

কলকাতার রাজভবন তৈরি হয়েছিল বৃটিশ আমলে। তৈরি করতে সময় লেগেছিল চার বছর – ১৭৯৯ থেকে ১৮০৩ সাল। কলকাতা তখন দেশের রাজধানী। ১৯১১ সাল পর্যন্ত ছিলেন গভরনর্স জেনারেল। আদ্যিকালের সেই গভরনর জেনারেলের ফিটন গাড়ি এখনও সাজান আছে।

রাজভবনের কারুকার্য অনেক নবাব-মহারাজের প্রাসাদকে হার মানায়। নিচে মারবেল হল। থ্রোন রুমে মন্ত্রীরা শপথ নেন। নানা অনুষ্ঠানও হয়। তার ওপর বিরাট ব্যাংকোয়েট হল। এর ওপর বল রুম। রাজভবনের মাথার ওপর আছে একটা ডোম।

রাজ্যপালের অফিস দোতলায় খুব অল্প জায়গায়। আবাস তিনতলায়। দুটি মাত্র শোবার ঘর, একটি বসার আর ছোট্ট একটি রান্না ঘর। মারবেল পাথর বসান মেঝে। সমস্ত সিঁড়ি, লিফট দামী কারপেট দিয়ে ঢাকা। কিন্তু রাজ্যপালের খাবারের ঘর নেই।

রাজভবনের দোতলায় ৪টি স্যুট আছে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা এলে ওই স্যুট-এ থাকেন।

রাজভবনের চৌহদ্দির মধ্যে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দফতরের কিছু অফিস, মন্ত্রিনিবাস এবং কয়েকজন সচিবের কোয়ারটার আছে। শুধু রাজভবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্ত দফতরের আলাদা একটা শাখা রয়েছে। যেমন রাজ্যপালের কর্মসূচি এবং অন্যান্য ছাপার কাজের জন্য ডবলু বি জি প্রেসের আলাদা শাখা আছে রাজভবনের ভিতরেই।

নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব সব কলকাতা পুলিশের। উত্তর ফটকে আলাদা অফিস। কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং কনসটেবল সব সময় নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করেন।

কলকাতা রাজভবন ছাড়া রাজভবন আছে দারজিলিং-এ। বারাকপুর লাটবাগানে যে ভবন সেটা ঠিক রাজভবন নয়, ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস।

কলকাতার রাজভবনকে দেখে এখনও লোকে বলে লাটসাহেবের বাড়ি। আজ পর্যন্ত একজন ছাড়া আর কোন রাজ্যপাল প্রাসাদের বাইরে বাস করেননি। ত্রিভুবন নারায়ণ সিং-এর জন্য তৈরি হয়েছিল রাজভবনের চৌহদ্দির মধ্যে একটি টালিচালার কুটির। খরচ পড়েছিল সওয়া লক্ষ টাকার মত।

রাজ্যপালকে রাজভবনের কর্মচারীরা বলেন, লাটসাহেব। অফিসাররা বলেন, 'এইচ ই' অর্থাৎ 'হিজ একসেলেনসি।' রাজ্যপালের ডাক শুনলে অফিসার থেকে আরদালি সবাই বলেন, লাটসাহেব ডাকছেন।

রাজ্যপাল সারাটা দিন কী করেন? সময় কাটে কী করে? রাইটারস বিলডিংস থেকে ফাইল আসে সই করানর জন্য। সই করতে হয় রাজ্যপালকে।

মাঝে মাঝে ডেপুটেশন, প্রতিনিধি দল আসেন রাজ্যপালের কাছে। স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে। বাস, কাজ শেষ? না, রাজ্য মন্ত্রিসভার ফাইল সই করা, স্মারকলিপি ফরোয়ারড করে পাঠান ছাড়াও অনেক কাজ।

রেড ক্রস, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইনডিয়ান মিউজিয়াম প্রভৃতি পঞ্চাশটি বেসরকারি সংস্থার সভাপতি বা চেয়ারম্যান হলেন রাজ্যপাল। আর সারাদিন সাক্ষাৎপ্রার্থী তো আছেই। কেউ আসেন নানা অভিযোগ নিয়ে, আবেদন নিয়ে। অনেকে তাঁদের প্রতিভা দেখানর জন্যও আসেন। যেমন রাঁচি থেকে একজন এসেছিলেন নতুন ধরনের চুল্লি দেখাতে। ভদ্রলোক এমন চুল্লি তৈরি করেছেন যাতে জ্বালানি খরচ কম অথচ রান্না হয় তাড়াতাড়ি।

তার পর আছে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। সরকারি অনুষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠান। প্রোগ্রাম ঠাসা। এক মাস আগে ছাড়া রাজ্যপালের কর্মসূচিতে জায়গা পাওয়া যায় না।

নিশীথ দে

লাগাতর ধর্মঘটের ডাক দেয়। সোসালিসট পারটি, সি পি আই (এম), সি পি আই – সবাই একজোট। সমস্ত অকংগ্রেসি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি কো-অরডিনেশন কমিটি গঠন করল। জরজ ফারনানডেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক। সি পি আই বা সি পি আই (এম)-এর তেমন জোরদার সংগঠন ছিল না।

একটা সময় ছিল যখন সি পি আই-এর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে ইসটবেংগল রেল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে জোরদার ইউনিয়ন ছিল। সেটা চল্লিশের দশকে।

১৯৭৪ সালে যখন রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় তখন রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র, বিহারেরই লোক। কংগ্রেস ইউনিয়নের নেতা অনন্তপ্রসাদ শর্মা বলে ছিলেন, রেল শ্রমিকদের দাবিদাওয়া তাঁরাও সমর্থন করেন যে শুধু তাই নয়, আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মীমাংসার পথ সারা দেশে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের লাগাতর ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিয়ে, দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে অচল করে দিয়ে নয়। রেলমন্ত্রীর সংগে আলোচনার মাধ্যমে মূল দাবি আদায় করতে হবে।

রেল শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট আট দিনের মাথায় ভেঙে গেল। অনন্তবাবুর ইউনিয়ন যে কতটা শক্তিশালী সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। শুধু বিহার বা উত্তরপ্রদেশ নয়, সারা দেশে রেল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি জোরদার সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৭৪ সাল থেকেই অনন্তবাবুর নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ডেকে পাঠালেন দিললিতে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন অনন্তবাবু। শিল্প দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী।

শ্রীমতী গান্ধীর দুর্দিনে যাঁরা সবচেয়ে কাছে ছিলেন, বিপদ জেনে পিছিয়ে যাননি, অনন্তবাবু তাঁদের একজন। অনন্তবাবুর কাছে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার চেয়ে বড় হল পারটির শৃংখলা, পারটির সিদ্ধান্তের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, পারটির নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা।

অনন্তবাবুর সবচেয়ে বড় জিনিস তাঁর নিষ্ঠা এবং মনোবল। অনেক ঝড়ঝাপটা তাঁকে সইতে হয়েছে। অনেক কঠিন বাধা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তিনি পিছু হটেননি বরং দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন।

রাজনীতির শক্ত পাঠ নিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়নে। পণ্ডিত হরিহরনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ সুরেশ ব্যানারজি, দেবেন সেন, খান্দুভাই দেশাই, গুলজারিলাল নন্দ-র মত সুদক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

১৯৪৬ থেকে '৫৮ পর্যন্ত তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের মূল কর্মকেন্দ্র ছিল পশ্চিমবংগে, হাওড়ার চারচ রোডে। হাওড়ায় একটানা চার বছর বাস করেছেন। অবশ্য শুধু ট্রেড ইউনিয়ন বললে ভুল হবে, কংগ্রেসের কাজ করেছেন সক্রিয়ভাবে। শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলেছেন। হাওড়া এবং আসানসোলের অলিগলি তাঁর মুখস্থ। পশ্চিমবংগের শিল্পাঞ্চল তিনি চষে বেড়িয়েছেন।

এ রাজ্যের প্রতিটি জেলা তাঁর

চেনা। এমন কোন জেলা নেই যে জেলার অন্তত দশজন বিশিষ্ট নাগরিককে তিনি চেনেন না। বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে জেলায় জেলায় বক্তৃতা করেছেন। গত নির্বাচনে তিনি ছিলেন এ আই সি সি-র পর্যবেক্ষক।

অনন্তবাবু প্রথম লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়ান ১৯৬২ সালে, বিহারের বকসার কেন্দ্র থেকে। এমন একটা কেন্দ্র যেখান থেকে জেতার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই। কংগ্রেস প্রত্যেকবার মহারাজা ডুমরাও এর কাছে পরাজিত হয়েছে সেই বকসার কেন্দ্রে মহারাজাকে হারিয়ে অনন্ত বাবু লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। তখন অবিভক্ত কংগ্রেস। লিজ লিংগাপ্পা, মোরারজি দেশাই, অতুল্য ঘোষরা কংগ্রেসের নেতা।

১৯৬৭ সালে কিন্তু অনন্তবাবু বকসারে টিকিট পেলেন না। নেতারা ভেবেছিলেন বকসার এবার 'সেফ সিট'। অনন্তবাবুকে সরিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিনডিকেটপন্থী ডাঃ রামসুভগ সিংকে টিকিট দেওয়া হল। ১৯৬৮ সালে অনন্তবাবু রাজ্যসভার সদস্য হলেন।

১৯৬৮ সালে তিনি যখন বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হন তখন কংগ্রেস ভাঙনের মুখে। '৬৭ র নির্বাচনে বিহারসহ নটি রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে 'ইনডিকেট' 'সিনডিকেট' পন্থীদের লড়াই তীব্র হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভি ভি গিরিকে সমর্থন করার প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থকরা প্রকাশ্যে কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে গিরিকে সমর্থন করলেন।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভাঙল। মাত্র তিনটি রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁরা হলেন পাঞ্জাবের জ্ঞানী জৈল সিং, উত্তর প্রদেশের কমলাপতি ত্রিপাঠি এবং বিহারের অনন্তপ্রসাদ শর্মা। সেদিন থেকে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে নেত্রী বলে মেনে নিয়েছেন।

১৯৭১ সালে অনন্তবাবু আবার সেই বকসার কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী হলেন। জয়ী হলেন সংগঠন কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ রামসুভগ সিংকে পরাজিত করে।

সাতাত্তরের নির্বাচনে অনন্তবাবু পরাজিত হন। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারিতে আবার রাজ্যসভার সদস্য হলেন। ১৯৮০ সালের অক্টোবরে ইন্দিরা মন্ত্রিসভায় পর্যটন এবং অসামরিক বিমান দফতরের মন্ত্রী, '৮২-র সেপটেম্বরে যোগাযোগ মন্ত্রী হয়েছিলেন।

রাজ্যপাল শর্মা ও তাঁর সহধর্মিণী

ইতোমধ্যে কংগ্রেস ১৯৭৮ সালে আবার দুভাগ হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর তখন দুর্দিন। অনন্তবাবুই শ্রীমতী গান্ধীকে লনডনে ইনডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের মত আই এন টি ইউ সি-ও দুভাগ হল। এগিয়ে এলেন অনন্তবাবু। অনেক প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, যাঁরা আই এন টি ইউ সি তে নেতৃত্বের নামে কর্তৃত্ব করতেন তাঁদের তিনি হটালেন। পশ্চিমবংগের আই এন টি ইউ সি তে কার্যনির্বাহক সভাপতি পদে বসালেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। অনন্তবাবু তখন আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি।

সুব্রতবাবু তাঁর ছেলের মত। রাজনীতিতে, ট্রেড ইউনিয়নে অনন্তবাবু নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সুব্রতবাবুও তাঁকে অভিভাবকের মত মেনে চলেন।

১৯৬৮ সালের পর থেকে কংগ্রেসে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তখন থেকে এ আই সি সি-র সদস্য। ১৯৭১ সালে ওয়ারকিং কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য। ১৯৭২ সালে বিধাননগর অধিবেশনে ওয়ারকিং কমিটির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালের ২১ ফেবরুয়ারি পারলামেনটারি বোরডের পাঁচজন সদস্যের একজন ছিলেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে অনন্তপ্রসাদ শর্মা সফল স্বামী ও পিতা। প্রবল রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা করেননি। বাবা রামনরেশ শর্মা, বয়স এখন নব্বই পেরিয়ে, থাকেন গ্রামের বাড়িতে। অনন্তবাবুর ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। বড় ছেলে হৃদয় নারায়ণ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার, ছোট ছেলে মনোমোহন দিল্লিতে এয়ার ইনডিয়ার স্টেশন সুপারিনটেনডেনট। চার মেয়ে, বড় জামাই রেলের অফিসার, মেজ জামাই ডাক্তার, সেজ মেয়ে জামাই দুজনেই কানপুরে কর্মরত। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে দিল্লিতে, জামাই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশাল রাজভবনে অনন্তপ্রসাদ আর তাঁর সহধর্মিণী তারা দেবী একাই থাকেন। ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনিরা আসেন মাঝে মাঝে।

রাজ্যপাল হয়ে অনন্তপ্রসাদ প্রথম গিয়েছিলেন কালীঘাটে, তার পর দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠে। মাঝে মাঝেই মন টানে পুরনো দিনের রাজনৈতিক সহকর্মীদের জন্য। যেমন একদিন খবর পেলেন আই এন টি ইউ সি নেতা কালী মুখোপাধ্যায় অসুস্থ। কিন্তু কোথায় তিনি আছেন কেউ জানে না। রাজ্যপাল বললেন পুলিশকে, যে করেই হোক কালীদার ঠিকানা চাই। পুলিশ ঠিকানা খুঁজে বের করল। অনন্তপ্রসাদ ছুটে গেলেন বেহালায়। কালীবাবু তাঁকে দেখে অবাক।

আর একদিন চলে গেলেন বেলগাছিয়া। এক সরকারি ফ্ল্যাটে। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী কামদাকিংকর মুখোপাধ্যায়ের কাছে (কামদাবাবুর ছোট ছেলে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়)। কামদাবাবু তখন শোকাহত। কয়েকদিন আগে তার জ্যেষ্ঠপুত্র মারা গিয়েছেন। অনন্তপ্রসাদ ঘরে পা দিতেই কামদাবাবু বললেন, এখন তো আর নাম ধরে ডাকতে পারব না, লাটসাহেব বলতে হবে। অনন্তবাবু বললেন, আপনি আমার গুরুস্থানীয়, নাম ধরেই ডাকতে হবে। লাটসাহেব বললে বুঝব আপনি আমায় স্নেহ করেন না। কামদাবাবু বললেন, না না, তাই বলব, তোমাকে আগের মতই অনন্ত বলব।

রাজনীতির খোলামেলা আকাশ থেকে রাজ্যপালের এই প্রোটোকল দুরন্ত জীবন কি বন্দীর মতই ঠেকছে? ঠেকছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যাঁরা অনন্তপ্রসাদ শর্মাকে জানেন তাঁদের অভিমত অনন্তপ্রসাদ শ্রীমতী গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত সহকর্মী। নেত্রীর নির্দেশেই তিনি রাজভবনে ঢুকেছেন। তাঁকে পশ্চিমবংগে নিয়ে আসার পিছনে নিশ্চয়ই দিল্লির কোন সুচিন্তিত অংক আছে। এখন সেই অংক মেলে কিনা এটাই দেখা দরকার। □

আলোকচিত্র :
শংকর নাগ দাস

‘আমার বিচার হোক। অপরাধী হলে শাস্তি দিন। নইলে মুক্তি দিন।’ – মনজিৎ সিং

‘জাসটিস ডিলেয়েড ইজ জাসটিস ডিনায়েড’ — এই [illegible] আবর্তে ঘুরে মরছে লিলুয়ার পাঞ্জাবি যুবক মনজিৎ সিং। ১৯৭৯ সালে অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারায় অভিযুক্ত মনজিতের মামলার চারজশিট বালি থানা থেকে হাওড়া কোরটে যেতে সময় লেগেছে ১৯ মাস। তারপর সেই চারজশিট [illegible] আরও ১৯ মাস, মামলার নথিতে এল না। তাই আজও শুরু হল না মনজিতের বিচার। সরকারি দীর্ঘসূত্রতায় এই যুবক ইতোমধ্যেই হারিয়েছে তার চাকরি, হারাতে চলেছে মানসিক স্থৈর্য। পরিবর্তনের ক্রাইম রিপোরটার পিনাকী মজুমদারের তদন্তধর্মী এই প্রতিবেদন পাঞ্জাবি যুবক মনজিৎ সিং-এর সেই করুণ কাহিনী নিয়ে।

হাওড়ার সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেট মাননীয় পি কে মিত্রর এজলাস। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ান লিলুয়া রেল কলোনির বাসিন্দা সুদর্শন পাঞ্জাবি যুবক মনজিৎ সিং ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারায় অভিযুক্ত। মনজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বালি থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ। রেকরড অনুযায়ী Case No 27 dated 20.12.79. সুতরাং গত ২১.১২.৭৯ তারিখে একই অভিযোগে অভিযুক্ত অন্য একজনের সংগে মনজিৎ সিংকেও আদালতে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই এই কেসটি গোয়েন্দা দপ্তর গ্রহণ করেন। গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে যথারীতি আদালতের কাছে আবেদন জানান হয়েছিল যে, ‘এই কেসের তদন্তের প্রয়োজনে আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। সুতরাং ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশি হেফাজতে রাখার অনুমতি দেওয়া হোক।’

পুলিশের এই আবেদন যথারীতি আদালতের অনুমোদন পেয়েছিল। অবশেষে এর পাঁচদিন পর অর্থাৎ গত ২৬.১২.৭৯ তারিখে অভিযুক্ত মনজিৎ সিং জামিন পেয়েছিলেন। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

জামিনে মুক্ত হওয়া মানেই কেস থেকে অব্যাহতি পাওয়া নয়! এর পরই শুরু হয় বিচারপর্ব। বিচার পর্বের জন্যে কেসটিকে ট্রানসফার করা হয় ট্রায়াল কোরটে। কিন্তু বিচারের জন্যে ট্রায়াল কোরটে কেস ট্রানসফার করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি একান্ত প্রয়োজনীয় আইনের ভাষায় তার নাম ‘চারজশিট’। (ফৌজদারি আইনের ১৭৩ ধারা অনুযায়ী: কোন কেসের তদন্ত শেষ হলে তার রিপোরট বিচারের জন্যে আদালতে পাঠানকে ‘চারজশিট’ দেওয়া বা চালান দেওয়া বলা হয়।)

সুতরাং কোন কেস বিচারের জন্য জুডিশিয়াল কোরট থেকে ট্রায়াল কোরটে ট্রানসফার করার ক্ষেত্রে পুলিশের কাছ থেকে চারজশিট আসার অপেক্ষায় থাকতে হয় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিসট্রেটকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ২৬.১২.৭৯ তারিখে অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত

চারজশিটের অভাবে বিচার বিলম্বিত

মনজিৎ সিংকে বার বার ছুটে আসতে হয়েছে আদালতে চারজশিটের আশায়। দিন পড়েছে বারে বারে। বারে বারেই পুলিশের তরফ থেকে আবেদন জানান হয়েছে আদালতের কাছে - ‘সংশ্লিষ্ট আই ও-র (ইনভেসটিগেটিভ অফিসার) কাছ থেকে এখনও চারজশিট এসে পৌঁছয়নি। সুতরাং আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হোক।’

পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই আবেদন সংগে সংগেই মঞ্জুর হয়েছিল। দিন পড়েছিল নতুন করে। কিন্তু পরের তারিখেও পুলিশ কর্তৃপক্ষের মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল একই আবেদন। মঞ্জুর হল সেটাও। এর পর আবারও নতুন করে দিন ধার্য, --- পুলিশ কর্তৃপক্ষের সেই একই আবেদন। আবারও দিন, -- আবেদনও সেই একই। এমন করেই দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর। অবশেষ প্রায় ১৮ মাস পরের একটা তারিখ: ১০.৬.৮১। সেদিনও যথারীতি অভিযুক্ত মনজিৎ সিং আদালতে হাজির। হাজির তার আইনজীবী এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ। ১৮ মাস পরের এই দিনটিতেও সরকার পক্ষ থেকে বলা হল সেই একই কথা - ‘চারজশিট’ আসেনি।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের এ কথায় সেদিন কিন্তু সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেট পি কে মিত্র নতুন কোন দিন ধার্য করেননি। এদিন তিনি তাঁর ‘আদেশনামার’ এক জায়গায় বললেন: ‘‘ Report from expert has already arrived. But no report from I.O. for a long time. I.O. to submit report in final form by the date fixed failing which the accused persons shall be discharged from the bail bonds.

s/d — P.K. Mitra
Sub-Divisional Judicial Magistrate, Howrah.

Order dt. 10.6.81. Accd. Nayan Adak is still absconding..... Accd. person (2) on bail are present. No report or prayer for extention of time inspite of specific direction. Hence in persual of my conditional order dated 14.2.81 the accused persons be discharged from bail bonds. Let a copy of this order and order dt. 14.2.81 be sent to S.P. by name.

s/d — P.K. Mitra
Sub-Divisional Judicial Magistrate, Howrah.

সুতরাং ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন মনজিৎ সিং ওদিন ‘বেল বনড’ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তি পেয়েছিলেন নির্ধারিত সময় অন্তর পুলিশের সংগে দেখা করা এবং নির্দিষ্ট তারিখে তারিখে আদালতে হাজির হওয়ার হাত থেকে। ‘এতে স্বস্তি এসেছিল কিন্তু শান্তি আসেনি।’ কারণ এর পরও যে কোন মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট আই ও র কাছ থেকে চারজশিট এসে পৌঁছতে পারে কোরট ইনসপেকটরের দপ্তরে! সেই অনুযায়ী আদালতে চারজশিট দাখিল করে মামলা চালু করা হয়। অভিযুক্তকে খবর পাঠান হয়। অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট দিনে আদালতে হাজির হয়ে নতুন করে বেল বনড নিতে হয়। আর তারপরই কেসটিকে ট্রায়াল কোরটে পাঠান হয় বিচারের জন্যে। শুরু হয় বিচারপর্ব।

আবার পুলিশের কাছ থেকে চারজশিট যদি দীর্ঘ সময় ধরেও না পাওয়া যায় তবে এক সময় সেই কেসটি স্থগিত রাখা হয়, যা যে কোন সময়ে আবার ‘রি ওপেন’ হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও মূল বিষয় হল ‘চারজশিট’। অর্থাৎ ফৌজদারি আইনে ‘বিচার শুরু’ হতে পারে তখনই যখন চারজশিট প্রস্তুত। সুতরাং পুলিশের দেওয়া চারজশিটের ওপরই নির্ভর করে অভিযুক্তদের ভাগ্য এবং বিচার শুরু হওয়ার বিষয়টিও।

‘কিন্তু এ সবই আইনগত পদ্ধতি। বাস্তবচিত্র অন্য রকম। বহুক্ষেত্রেই আদালতে সময়মত ‘চারজশিট’ পৌঁছয় না! ফলে বহু অভিযুক্তই ‘বেল বনড’ থেকে মুক্তি পায়। এক

কলকাতা হাইকোর্ট / আলোকচিত্র : [illegible]

সময় কেসও স্থগিত হয়ে যায়। স্থগিত হওয়া কেস বহু সময়ই 'রি ওপেন' করা সম্ভব হয় না।' এ মন্তব্য হাওড়া আদালতের কোর্ট ইনসপেকটর কাজী কামারুজ্জামান সাহেবের। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায়, 'শুধু হাওড়া আদালতেই বছরে অন্তত ১০০টা কেসে চারজশিট না পাওয়ার দরুন অভিযুক্তরা 'বেল বনড' থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বেল বনড' থেকে মুক্ত অভিযুক্তদের কেসগুলি এক সময় স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। সে কেসগুলো রি ওপেন করাও সম্ভব হয় না চারজশিট না পাওয়ার জন্যে।'

সুতরাং এই বাস্তবচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'বেল বনড' থেকে মুক্ত হওয়া বহু 'প্রকৃত অপরাধীই' আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বছরের পর বছর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। প্রলুব্ধও হয় নতুন করে অপরাধ করতে। এ অভিযোগ ওয়াকিবহাল মহলের। এমনকি কোরট ইনসপেকটর দপ্তরের দু একজন অফিসারও এ কথা অস্বীকার করেননি।

কিন্তু সব কিছুতেই ব্যতিক্রম বলে কিছু থাকে। এ ক্ষেত্রেও তা আছে। দু একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে 'বেল বনড' থেকে মুক্ত হওয়া অভিযুক্তরা নিজেরাই তদ্বির-তদারকি করেন 'চারজশিটের' জন্যে। এর জন্যে তারা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ জানান। ছুটে যান আদালতে কোরট ইনসপেকটর দপ্তরেও। তাদের এই তদ্বির তদারকিই বলে দেয় – 'তারা নিষ্পত্তি চান, যত শীঘ্র সম্ভব। দোষী প্রমাণিত হলে সাজা, নইলে মুক্তি।'

বেল বনড থেকে মুক্ত হওয়া লিলুয়ার পাঞ্জাবি যুবক মনজিৎ সিংয়ের মুখ থেকেও শোনা গিয়েছে একই রকম অনুনয়। করুণভাবে বলেছেন – 'আমার বিচার হোক। অপরাধী হলে শাস্তি দিন, নইলে মুক্তি দিন। এভাবে ঝুলে থাকতে চাই না। কেস না মেটায় আমার মানসিক শান্তি বিপন্ন। সরকারি চাকরি হাতছাড়া। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের কাছে একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে বিরাজ করছি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।'

বাস্তবিক অর্থেই কেস না মেটার জের হিসেবে মনজিৎ সিংকে খেসারত দিতে হয়েছে তার সরকারি চাকরিটি। রেলকর্মী মহীন্দর সিংয়ের একমাত্র পুত্রসন্তান মনজিৎ সিং প্রায় জন্ম থেকেই লিলুয়ার বাসিন্দা। স্কুল ফাইনাল পাশ করার আগেই রেলের 'অ্যাপ্রেনটিসশিপ' পেয়ে যান। তিন বছরের কোরস। সেই কোরস শেষ হয় ৪-৯-৮১ তারিখে। উত্তীর্ণ হন ভালভাবে।

অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ হবার সংগে সংগেই কিন্তু ওর চাকরি হয় না। বেশ কিছুদিন বেকার অবস্থায় বসে থাকতে হয়। শেষে অরডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় নামেন। মনজিতের এক মামা মেকানিকাল স্পেয়ার পারটসের প্রস্তুতকারক। সেই স্পেয়ার পারটসেরই অরডার সাপ্লাই শুরু করেন মনজিৎ। মনজিতের এক নিকটআত্মীয় গুরমিত সিংও কাছাকাছি অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি একটি কারখানার মালিক। মনজিতের সংগে তাঁরও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

গত ২০-১২-৭৯ তারিখে মনজিতের সেই নিকটআত্মীয় যুবক গুরমিতকে সংগে নিয়ে পুলিশ আসে মনজিতের বাড়ি। এবং সংগে সংগেই মনজিতকে বে-আইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশি সূত্রেই জানা যায়, মনজিতের বাড়িতে একটি ট্রানজিসটর রেডিওর ভেতরে একটি ছ'ঘরা দেশি রিভলবার পাওয়া যায়। তদন্তকারী অফিসারের রিপোরটের ভিত্তিতে গত ১৬-৭-৮১ তারিখে এ ঘটনার যে চারজশিট আদালতে পাঠিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে 'ওই দেশি রিভলবারের কোন লাইসেনস মনজিৎ সিং দেখাতে পারেনি। অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন ওটি একটা দেশি ছ'ঘরা রিভলবার, তবে ওটি বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযুক্ত।'

অভিযুক্ত মনজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ এ রকমই। এর পরিপ্রেক্ষিতে মনজিতের বক্তব্য কী সেটা আদালতে বলার অপেক্ষায় তোলা রইল। মনজিতের অপরাধই বা কতটুকু সেটা বিচারের ভারও মহামান্য আদালতের। কিন্তু এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনজিতের জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে তার খবর কি পুলিশ দপ্তর রাখে?

পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে অভিযোগ চারজশিট হিসেবে পাঠিয়েছে নথিপত্র অনুযায়ী তার তারিখ ১৬-৭-৮১। অর্থাৎ সময় লেগেছে প্রায় ১৯ মাস। সেই চারজশিট আদালতে পৌঁছবার পরও পড়ে থেকেছে অবহেলায় আরও ১৯ মাস। হয়ত পড়ে থাকত আদি অনন্তকাল ধরে, যদি না মনজিৎ নিজেই উদ্যোগী হয়ে চারজশিটের জন্যে তদ্বির তদারকি করতেন।

কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে মনজিতের বিরুদ্ধে চারজশিট পাঠাতে কেন এত দেরি হল, কেনই বা ১৯ মাস ধরে সেই চারজশিটের হদিশ পেল না আদালতের কোরট ইনসপেকটর দপ্তর তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

গোয়েন্দা দপ্তরের এক মুখপাত্র সোজাসুজি বলেছেন – 'পারটিকুলার এই কেসটার চারজশিট পাঠাতে কেন দেরি হল তা বলতে গেলে একটা তদন্ত কমিশন বসাতে হবে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছেন মুখপাত্রটি, তারপর বলেছেন, 'ইন জেনারেল যদি জানতে চান, তাহলে বলতে পারি এর পেছনে অনেক কারণ থাকে, যেমন...।'

সাধারণভাবে বলতে গেলে চারজশিট পাঠাতে দেরি হবার পেছনে কারণ হয়ত অনেকই থাকে। সেই কারণ খুঁজতে গেলে এক দপ্তর দোষ দেন অন্য দপ্তরের। সেই দপ্তর আবার অন্য কোন দপ্তরকে। যারা বেশি মাত্রায় চিন্তাশীল তাদের রোষ এসে পড়ে 'সমাজ ব্যবস্থা' নামক অবয়বহীন একটা Collective force-এর ওপর। 'কিন্তু এর পরিণাম যে কোন কোন মানুষের ওপর কী নির্মমভাবে নেমে আসে তার খবর কজন রাখে -' – অভিমান জড়ান স্বরে জানতে চেয়েছেন মনজিৎ নিজেই। মনজিতের এই অভিমানের পেছনে রয়েছে ওর জীবনের এক করুণতম অধ্যায়।

'আদালতে তখন ওই কেসের দিন পড়ছে একের পর এক। চারজশিট না পাওয়ায় বিচারপর্ব শুরু হবার মুহূর্তটিও পিছিয়ে চলেছে। মনজিতের মানসিক ভারসাম্যও ভেঙে পড়ছে ক্রমশ। ঠিক এরকমই এক সংকটময় মুহূর্তে অসংখ্য আশার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে রেল দপ্তর থেকে এসেছিল একটা জয়েনিং লেটার।' – মনজিতের মা বর্ষীয়সী বিদ্যা দেবীর এক কান্নাজড়ান অভিব্যক্তি। চোখের জল ফেলে বলেছেন – 'কিন্তু এত সুখ ছেলের কপালে সইল না। ছেলে এখন আত্মঘাতী হতে চায়। হে ভগবান, কী বিচার তোমার!'

বিদ্যা দেবীর এই চোখের জল এবং হা হুতাশ শুরু হয়েছিল ২২ জুন ১৯৮২ তারিখ থেকে। ওই দিনই নতুন আশায় উদ্দীপ্ত মনজিতের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল চাকরি ছেদের নোটিস। Order of termination under Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code, volume I অনুযায়ী।

'এই চাকরি চলে যাওয়ার কারণ একটিই। কেস নিষ্পত্তি না হওয়া।'

এ অভিযোগ মনজিতের নিজের। রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি এরকম আশ্বাসও পেয়েছেন যে, কেসের রায়ে যদি তিনি নিরপরাধ প্রমাণিত হয়ে বেকসুর খালাস পান তবে ও চাকরি ফিরে পেতে পারেন। সুতরাং এরপর থেকেই মনজিৎ মরিয়া হয়ে পড়েছেন কেসের চারজশিটের জন্য। চাকরিতে জয়েন করার পরই তিনি জানতেন খুব শীঘ্র পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। সেই প্রয়োজনেই তিনি কেসের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন। নিষ্পত্তি চেয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। 'কিন্তু পুলিশ দপ্তর এমনই দপ্তর যেখানে আসামী নিজে গিয়ে নিজের কেসের চারজশিটের তদ্বির করলেও ফল হয় না। নিষ্পত্তিও হয় না কেসের। ফলে কেউ কোন কেসে জড়িয়ে পড়লে তাকে ঝুলে থাকতে হয় আদি অনন্তকাল ধরে। ঝুলে থাকে তার রুজি রোজগারের পথ এবং সামাজিক সম্মান।' তাই মনজিতের এই প্রচেষ্টা আশু ফল লাভে বঞ্চিত হয়েছে। মনজিৎ অভিযোগ করে বলেছে – 'বহু চেষ্টার পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি

১৯৮৩ তারিখে জানতে পারি যে এই কেসের চারজশিট ১৬ ৭ ৮১ তারিখে পাঠান হয়েছে।'

স্বাভাবিকভাবেই মনজিৎ অবাক হয়েছিল। কারণ যে চারজশিট ১৬ ৭ ৮১ তারিখে পাঠান হল তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না ২০ ফেবরুয়ারি ১৯৮৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ মাস সময়ের মধ্যে। কারণ আইন হচ্ছে চারজশিট পাঠাবার সংগে সংগে 'বেল বনড' থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিকে সে খবর জানান, যাতে সে এসে নতুন করে বেল বনড নিতে পারে এবং বিচারপর্ব শুরু হতে পারে।

মনজিতের অবাক হবার পালা এখানেই শেষ নয়। পুলিশ দপ্তর থেকে চারজশিট পাঠিয়ে দেবার খবর পেয়ে মনজিৎ আদালতে কোরট ইনসপেকটরের দপ্তরে খোঁজ নেন এবং আবেদন জানান কেস চালু করার জন্যে। কিন্তু কোথায় চারজশিট খাতার পর খাতা, ফাইলের পর ফাইল ঘেঁটে বলা হয় -- 'না, চারজশিট আসেনি।' মনজিৎ বিস্ময়ে বিমূঢ়। তিনি গোয়েন্দা অফিসারের বক্তব্য তাদের জানান। 'তাতে ফল হয় উলটো। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীদের কাছ থেকে কটু কথা শুনতে হয়।' এ অভিযোগ করেছেন মনজিৎ নিজেই। বলেছেন 'এরপর বহুদিন ঘোরা ঘুরির পর অবশেষে ২৫ ১১ ৮৩ তারিখে চারজশিটের হদিশ পাওয়া যায়। এর কপি পাওয়ার জন্যে ৪৭ টাকা ব্যয় করতে হয়।'

যাই হোক এরপর মনজিৎ ট্রায়ালের জন্যে কেস টানসফারের আবেদন জানান। আগামী ৫ জানুয়ারি ১৯৮৪তে নতুন তারিখ পড়েছে। এখন তিনি দেখতে চাইছেন ওইদিন কেস টানসফার হয় কিনা!

এই অব্যবস্থা কেন?

চারজশিট সময়মত না আসা, এলেও সময় মত খুঁজে না পাওয়া প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে যথারীতি হাজির হয়েছিলাম হাওড়া আদালতের কোরট ইনসপেকটর দপ্তরে। মনজিতের চারজশিট এসেছে কিনা জানতে চাইতেই কোরট ইনসপেকটর তাঁর এক কর্মচারীকে নথিপত্র আনতে বললেন। একটু বাদেই নথি এল। কোরট ইনসপেকটর খাতা খুলে বললেন -- 'না, মনজিৎ সিংয়ের চারজশিট এখনও আসেনি।'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করাতে কোরট ইনসপেকটর এবার আমার চোখের সামনে খাতা তুলে ধরলেন। বললেন, - 'দেখুন কোথায় বালি থানা, Case No 27-এর চারজশিট এলে এ খাতায় এনট্রি থাকতই।'

বাস্তবিকই ও খাতায় আমি ওই কেসের কোন রেফারেনস খুঁজে পেলাম না। কিন্তু দৃঢ়তার সংগে জানালাম - 'ওই কেসের চারজশিট এসে গেছে এবং অভিযুক্ত তার কপিও হাতে পেয়ে গেছে।'

'সে কী!' কোরট ইনসপেকটরের চোখে বিস্ময়। তারপর বললেন - 'দাঁড়ান তো দেখছি।' বেয়ারাকে ডেকে অন্য একটি খাতা আনালেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁকে নিরাশ হতে হল। বললেন 'না তো! নেই' আপনি ঠিক জানেন চারজশিট এসেছে পুলিশ কিন্তু ওরকমই বলে থাকে।'

অবশেষে আমি চারজশিট পাওয়ার তারিখ উল্লেখ করি। তখন আর একটি খাতা আসে। তারপর কোরট ইনসপেকটরের মুখে আফসোস জড়ান 'চুক চুক' শব্দ ফুটে ওঠে। ' দেখেছেন, খাতায় এনট্রি পর্যন্ত হয়নি। এটা কি আর ফাইল হত। খুঁজেও পাওয়া যেত না। ভাগিস ।'

খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই জানতে চেয়েছিলাম চারজশিট এভাবে 'মিসফাইল' হয় কী করে কোরট ইনসপেকটরের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছে এ কথায়। তারপর বলেছেন -- 'এর উত্তর আমার দেওয়া সাজে না। একটু খোঁজ নিন, তাহলেই জানতে পারবেন।'

কোরট ইনসপেকটরের কথা মিথ্যে নয়। একটু আন্তরিকভাবে কথা বলতেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরেরও একজন অফিসার অনেক তথ্যই তুলে ধরেছেন। সোজাসুজিই বলেছেন - 'চারজশিট মিসফাইল হওয়ার অনেক কারণ আছে। যেমন কোন কোরট অফিসার, জি আর ও, অ্যাসিসট্যানট জি আর ও, ডিলিং স্টাফ প্রভৃতি হঠাৎ বদলির জন্যে তাঁরা নতুন দায়িত্বে যাঁরা আসছেন তাঁদের কাজ বুঝিয়ে যেতে পারেন না। নতুনদের পক্ষেও সম্ভব হয় না। কোথায় কোন চারজশিট আছে তা খুঁজে বার করা। তাছাড়া অনেকেনই তো সমাজের সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতি আছে। আছে এখানেও। একশ্রেণীর পয়সাওয়ালা, সমাজবিরোধী পয়সার জোরে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের যোগসাজসে 'চারজশিট' উধাও করে দেয়।'

কোরট অফিসারদের অভিযোগ আছে পুলিশের বিরুদ্ধেও। তাঁরা খোলাখুলিই বলেছেন - 'পুলিশ অনেক সময়ই মিথ্যে করে বলে দেয় যে চারজশিট পাঠান হয়ে গেছে। তার কারণ সেই সময় হয়ত পুলিশের কোন বড় অফিসার থানা ভিজিট করতে এসেছেন। তখন তড়িঘড়ি করে খাতাপত্রের মাধ্যমে সেই অফিসারকে বুঝিয়ে দেন যে তাঁরা সব চারজশিট সময় মত পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

এ ছাড়াও চারজশিট দেরিতে আসার অন্য অনেক কারণ আছে বলেও তাঁরা মন্তব্য করেছেন। সেই কারণ হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের রিপোরট আসতে দেরি হওয়া। একজন ক্ষোভের সংগে বলেন - 'আজকাল ময়না তদন্তের রিপোরটও সময় মত আসে না। কারণ যে ফরমে রিপোরট পাঠাতে হয় তা নাকি সরবরাহ হচ্ছে না।'

শুধু ময়না তদন্তই নয়, ভিসেরা রিপোরট, ফরেনসিক রিপোরট, প্রভৃতি সব কিছুই আসে বহু সময় পর। এর ফলে চারজশিট দিতে দেরি হয় বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন - 'চারজশিট দিতে দেরি হওয়ার অন্য কারণও আছে। যেমন একটা কেসের কোন আসামী পলাতক। তাকে ধরা না গেলে চারজশিট প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।' শেষমেশ এক অফিসারের ক্ষোভ প্রকাশ 'আসলে কোন দপ্তরের সংগে কোন দপ্তরের সঠিক সমন্বয় নেই, তাই এত অব্যবস্থা।'

'সুতরাং আইন যতই থাকুক তার সঠিক প্রয়োগের জন্যে চাই সমস্ত সরকারি দপ্তরের মধ্যে সঠিক কো-অরডিনেশন।' কোরট ইনসপেকটরদের এ অভিমতের অনুসারী আছেন অসংখ্য মানুষ। তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেন - 'সুব্যবস্থা যতদিন না আসবে ততদিনই বহু সমাজবিরোধী 'চারজশিট না পাওয়ার' সুযোগে আইনকে এড়িয়ে যেতে পারবে।' কিন্তু যাদেরই পুলিশ ধরে তারা সবাই কি প্রকৃত অপরাধী? যদি তাঁদের মধ্যে একজনও নিরপরাধ থেকে থাকেন আর তাঁর কেসের চারজশিট যদি সময় মত এসে না পৌঁছয় তবে তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে এ বিষয়টি কি কেউ ভেবে দেখেছেন? - এ প্রশ্ন আজ বহু মানুষের মুখে মুখে। □

জ্যোতি বসু / আলোকচিত্র : চিরজিৎ ঘোষ

বামপন্থী দলগুলি এখন থেকেই নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে

নিশীথ দে

প্রধানমন্ত্রী বার কয়েক বলেছেন, লোকসভার নির্বাচন ঠিক সময়ে হবে, আগে নয়। কিন্তু কোন দলই নিশ্চিন্ত নয়, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি ভেতরে ভেতরে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে 'আঁতাত', 'মোরচা' এবং 'ফ্রনট'-এর চেহারাও একটু অন্যরকম হবে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতারা নির্বাচন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন না। তবে লোকসভার টিকিট নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তলে তলে তোড়জোড়, তদ্বির শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের রাজনীতিটা এখন জেলাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের কারুর কারুর ধারণা, লোকসভার নির্বাচন চুরাশির মাঝামাঝি হবে। আবার অনেকে ধরে বসে আছেন, শ্রীমতী গান্ধী পাঞ্জাব, আসামের সমস্যার সমাধান না করে কিছুতেই লোকসভার নির্বাচন করবেন না। তা ছাড়া দক্ষিণের রাজ্যগুলি যেভাবে জোট বাঁধছে! বিহারে তো কংগ্রেসের মধ্যে রীতিমত গৃহযুদ্ধ চলছে। জম্মু ও কাশ্মীর বলতে গেলে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মীরকাশিম দল ছাড়ার পর কংগ্রেস (ই)-র কোমরের জোর অনেক কমে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে অনেকদিন আগে থেকেই খরচের খাতায় রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, গুজরাটের ভরসায় তো শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার নির্বাচন করবেন না! তার চেয়েও বড় কথা হল, ইলেকশান করার মত নেতা কংগ্রেস (ই)তে কোন রাজ্যেই প্রায় নেই। অথচ বিরোধীরা জোট বাঁধছে।

লোকসভার নির্বাচন করতে হলে ইন্দিরা গান্ধীকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে। প্রথমত, সবার আগে নিজের ঘর গুছোতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশন নিয়ে যেভাবে জল ঘোলা হল তাতে গায়ে হাত বুলিয়ে বিশেষ কাজ হবে না। একটু কঠোর হতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী যদি মীরকাশিমকে ছেড়ে দিতে পারেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন নেতা আছেন যিনি তাঁর পক্ষে অপরিহার্য? শ্রীমতী গান্ধীর নাম নিয়ে যাঁরা গোষ্ঠী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরাও জানেন, পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে হাত চিহ্ন ছাড়া জামানত বাঁচান যাবে না।

তবে লোকসভার আগামী নির্বাচনে বেশ কিছুটা রদবদল ঘটবে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে। যুব নেতারা যেমন কিছু টিকিট পাবেন তেমনি কয়েকজন প্রবীণ এবং বুদ্ধিজীবীকে কংগ্রেস (ই) টিকিটে দাঁড় করান হবেই।

বামফ্রনটের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে বিগত লোকসভার নির্বাচন থেকেই গোলমালটা শুরু হয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে শরিকী বিরোধ প্রকাশ্যে ঘটেছে। তার জের এখনও চলছে। অবশ্য বামফ্রনটে শুধু নয়, সি পি আই (এম)-এর নিজেদের মধ্যেও বিরোধ জট পাকিয়েছে প্রমোদ দাশগুপ্তর মৃত্যুর পর। বিধানসভার নির্বাচনে দলের লোকই কৌশলে দলীয় কয়েকজন প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

নির্বাচনে টিকিট নিয়ে এবার বামফ্রনটের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে বিরোধ অনেক বেশি। সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃত্ব এবার জেলা কমিটিগুলিকে সামাল দিতে পারবেন না।

সি পি আই (এম)-এর মধ্যে বিরোধ এবার মূলত দুটি ব্যাপারে। এক, কংগ্রেস (ই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি এবং দুই, সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্ব নিয়ে প্রবীণ, মধ্যবয়সী এবং তরুণদের লড়াই।

বিরাশির বিধানসভা নির্বাচনে বাম ফ্রনটের অন্য শরিকদলের কয়েকজন প্রার্থীর পরাজয়ের পিছনে সি পি আই (এম) কলকাঠি নেড়েছে। শুধু অন্য শরিক নয়, নিজের দলের কয়েকজন প্রার্থীকেও হারাবার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। '৮৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম)-এর মধ্যে অনৈক্য আরও প্রকট হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় বামফ্রনটের অনৈক্যও অনেক বেড়েছে।

সি পি আই (এম) নেতারাও বসে নেই। ধরে নিয়েছেন, চুরাশিতেই নির্বাচন হচ্ছে। সি পি আই (এম) নেতাদেরও ধারণা, যত দেরি হবে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে আরও খারাপ হবে। এ বছর ফসলের উৎপাদন বেশ ভাল। অন্তত কৃষিপণ্যের দাম কিছুটা কমবে। ইন্দিরার পক্ষে মন্দের ভাল।

শুধু ইন্দিরা নয়, সি পি আই (এম)-এর পক্ষেও চুরাশিতে নির্বাচন হলে খারাপ নয়। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের যে হাল তাতে পঁচাশিতে কী দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না।

সি পি আই (এম)-এর বেশ একটা বড় অংশের ধারণা, পারটির নেতারা তলে তলে ইন্দিরার সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ফেলেছে, যাতে ক্ষমতায় থাকা যায়, অথচ বামপন্থী সাইনবোরডটাও যেন ঠিক থাকে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-র সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর গোপন আঁতাত হবে কীভাবে? সি পি আই (এম) ওপরে ওপরে বাম এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্লোগান দিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে শরিক দলগুলির বিশেষ করে আর এস পি এবং ফরোয়ারড ব্লকের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে একটা বিরোধ দেখা দেবে। সেই সব আসনে সি পি আই (এম) তলে তলে ওই দুই দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রচারে নামবে এবং কংগ্রেস (ই)-র প্রার্থীর জয়ের সুযোগ করে দেবে।

শুধু সি পি আই (এম) নয়, সি পি আইও তলে তলে কংগ্রেস (ই)-র সঙ্গে গোপনে সমঝোতার চেষ্টা চালাচ্ছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-এর সংগঠনের বেশিটা কাগজে কলমে এসে ঠেকেছে। গোটা রাজ্যের মধ্যে সংগঠন যেটুকু তা মেদিনীপুর জেলায়। মেদিনীপুরে সি পি আই-এর সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর সাপে-নেউলে সম্পর্ক। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বনাথ মুখারজির নেতৃত্বে সি পি আই আবার বামপন্থী বলে জাতে উঠেছে ঠিকই কিন্তু পারটির বিভিন্ন ফ্রনট এখন পুরোপুরি সি পি আই (এম)-বিরোধীদের কবলে।

সি পি আই (এম) এবার প্রবীণদের অনেককেই নির্বাচন প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেবেন। তার বদলে বেশ কিছু তরুণকে লোকসভার নির্বাচনে দাঁড় করান হবে।

এবার সি পি আই (এম) চাইবে আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী যাতে আর নির্বাচনে না দাঁড়ান। তাঁর বহরমপুর আসন সি পি আই (এম) দাবি করবে। ত্রিদিববাবু ১৯৫২ থেকে একটানা লোকসভার সদস্য। মুরশিদাবাদে আর এস পি-র সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়।

আর এস পি, ফরোয়ারড ব্লক এবং সি পি আই-এর প্রায় প্রতিটি বৈঠকে বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব বামফ্রনট থেকে বেরিয়ে আসার দাবি তুলছেন। সি পি আই (এম)-এর বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব চাইছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতা নয়, রাজনৈতিক ইস্যুতে জোরদার আন্দোলন হোক। পারটির রাজ্য নেতৃত্ব কেন্দ্রের কাছে অর্থনৈতিক দাবি তুলে মূল রাজনৈতিক লড়াই এড়িয়ে যাচ্ছেন। □

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী গান্ধী

কিছুদিন আগে কলকাতার 'ইন-ডিয়ান কাউনসিল ফর ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স' আমার এই বিদেশ সফর নিয়ে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিলেন। সেই সভায় আমাকে ক'জন প্রশ্ন করেছিলেন, গ্রীসে এখন সমাজ-তান্ত্রিক সরকার থাকা সত্ত্বেও কেন তারা ন্যাটোর সংগে গাটছড়া বেঁধে রেখেছে? এ প্রশ্ন অনেকেরই। এমনকি আমরাও গ্রীসের সরকারি নেতাদের এই প্রশ্ন বার বার করেছিলাম। বিশেষ করে ক্ষমতায় আসার আগে পাঁপান্দ্রেউ তো বার বার বলতেন, গ্রীসকে ন্যাটো ছাড়তে হবে।

আসলে বিরোধী দলে থেকে গরম গরম কথা বলা আর সরকারে থেকে কোন উগ্রনীতি অনুসরণ করার মধ্যে ফারাক অনেক। বিশেষ করে কোন গণতান্ত্রিক সরকারি কাঠামোর মধ্যে থেকে বিদেশনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটান খুব মুশকিল। ভারতে জনতা সরকারের আমলে সেটি প্রমাণ হয়েছে। জনতা নেতারা অনেকে ইজরায়েলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাঁরা পছন্দ করতেন না। কিন্তু অটলবিহারী বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় আরব-নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। সে সময় আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম সফর করি। আমি ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের খুব বড় রকম পরিবর্তন দেখতে পাইনি। বরং সে সময়ে বহু ঘটা করে বিরাট ভারতীয় মেলা হচ্ছিল মসকো শহরে। অটলবিহারী বাজপেয়ী কট্টর পাকিস্তান-বিরোধী হবেন এমন আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সংগে তখনই সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করে। কোকাকোলা কোমপানিকে জনতা আমলেই যে চলে যেতে হয়েছিল এটা হিসাবে মেলে না।

যাক, যে কথা বলছিলাম, পাঁপা ন্দ্রেউ ক্ষমতায় এসে ন্যাটোর সংগে সম্পর্ক বহাল রেখে দিয়েছেন।

পাঁপান্দ্রেউকে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : গত সাত বছর ধরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোর দার করতে হয়েছে তুরসকোর কথা মনে করেই। তুরসকো এইজিয়ানের জল-স্থল অন্তরীক্ষের অর্ধেকটাই এখন দাবি করছে। ওরা আমাদের নিরাপত্তার পক্ষে বড় বিঘ্ন। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ ব্যয় না করে আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে অর্থবরাদ্দ করতে হচ্ছে, এটাও একটা অভিনব ব্যাপার যে তুরসকো নিজেও কিন্তু ন্যাটোর সদস্য। কিন্তু তবু সে পূর্বদিকে আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোন গ্যারানটি দিতে অস্বীকার করছে। তুরসকোকে নিয়েই আমাদের যত সমস্যা। ওরা আমাদের আকাশসীমা লংঘন করেছে। এখন স্পষ্টতই আমরা একটার বেশি দুটো যুদ্ধ চালাতে পারি না।

প্রশ্ন করা হয়েছিল আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, আমরা কি ধরে নিতে পারি যে আপনারা আক্রমণের আশংকা করছেন শুধু তুরসকো থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নয়? ন্যাটো ছেড়ে দিলে তুরসকোর সংগে আপনাদের সম্পর্ক কী রকম দাঁড়াবে?

প্রধানমন্ত্রীর জবাব : আমার মনে হয় গ্রীকরা একটা গ্যারানটি বেশি পছন্দ করবে। গ্যারানটি হল পূর্ব সীমান্তে যাতে কোন হামলা না হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আটলানটিক চুক্তির উদ্দেশ্য এটা নয়। ন্যাটো আমাদের পূর্ব সীমান্তের চেয়ে উত্তর সীমান্ত সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। দেখা যাচ্ছে গ্রীস যদি তৃতীয় দেশের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ন্যাটোর সদস্যভুক্ত দেশ যদি গ্রীসকে আক্রমণ করে তাহলে তাদের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নেই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এটা তাহলে কোন ধরনের জোট? এই জোটে থেকে আমাদের কী উপকার হচ্ছে? এই সব প্রশ্ন আমরা ন্যাটোর বৈঠকে তুলতে চাই।

আবার প্রশ্ন : আমেরিকা এ ব্যাপারে কী বলছে?

প্রধানমন্ত্রী বললেন : আমেরিকা আটলানটিক চুক্তির মাথা। গ্রীসকে কোন দেশ আক্রমণ করলে তার সীমান্ত প্রতিরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা নেবে ন্যাটো, এমন একটা বিবৃতি আমেরিকা এখনও দেয়নি।

প্রশ্ন : কিন্তু আমেরিকা একবার তো বলেছিল যে, এই এলাকায় কোন সংঘর্ষ চলবে না। আপনারা বোধ হয় ওটা যথেষ্ট মনে করেননি।

প্রধানমন্ত্রীর জবাব ছিল : একটা চিঠিতে এ ব্যাপারে সামান্য উল্লেখ ছিল। ১৯৭৬ সালে আমাদের বিদেশ সচিবকে একটা চিঠিতে হেনরি কিসিংগার লিখেছিলেন, এইজিয়ান অঞ্চলে কোন আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষ হলে আমেরিকা কোন অংশ নেবে না। পূর্ব সীমান্ত থেকে গ্রীসের যে বিপদ রয়েছে, এটা কিছুতেই আমেরিকাকে বোঝান যাচ্ছে না। তুরসকো সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। ১৯৭৪ সালে তুরসকো সাইপ্রাস আক্রমণ করল। সেই আক্রমণে ন্যাটোর অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করেছে। এই অস্ত্র দিয়েছিল আমেরিকা। আমেরিকা, বৃটেন এরা গ্যারানটর পাওয়ার ছিল। ওরা বলেছিল যে ন্যাটোর অস্ত্র ন্যাটোর সদস্যদের ওপর আর এক রাষ্ট্র প্রয়োগ করবে না। কিন্তু ওরা কেউ তুরসকোকে নিবৃত্ত করল না। সাইপ্রাস জোট-নিরপেক্ষ। কিন্তু গ্রীসের স্বার্থ সাইপ্রাসের সংগে জড়িত।

আর একটা কথা জানতে চাই। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ন্যাটো দেশ থেকে যে সামরিক সাহায্য আসছে সেখানেও বৈষম্য। তুরকিরা যদি দশটা অস্ত্র পায় আমরা পাচ্ছি সাতটা। এর ফলে তুরসকো বিরাট অস্ত্রসজ্জা করে ফেলেছে। তাদের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার। তাদের ১৫০টি যুদ্ধবিমান রয়েছে। এই বিমান নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণ উপসাগরে নামাবে না।

মোদ্দা কথা যা বোঝা গেল সেটা হল, ন্যাটোতে থেকে গ্রীসের এখন সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা। ভয়, ন্যাটো ছাড়লে আধুনিক অস্ত্র বলে বলীয়ান তুরসকো যদি আক্রমণ করে বসে। আর ন্যাটোতে থেকেও গ্রীসের কোন ফয়দা হচ্ছে না, গ্রীসকে বোঝান হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নই তাদের বড় শত্রু। তাছাড়া গ্রীসের কমিউনিসট আতংক এখনও কাটেনি। কমিউনিসটরা দীর্ঘদিন সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারছে ভয় অন্যদিক থেকে।

যখন কোন দেশে কোন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান যান, তাঁকে উপলক্ষ করে কোন না কোন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়, সরকারি তথ্যচিত্রে প্রায়ই দেখে থাকেন অমুক দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেনট এসে দিললিতে একটি চুক্তি সই করছেন।

আথেনসে শ্রীমতী গান্ধীর কর্ম সূচির একটা বড় অংশ ছিল এই ধরনের একটি প্রটোকলে স্বাক্ষর দান। ২৩ সেপটেমবর সকাল এগারটা নাগাদ আমরা প্রধানমন্ত্রীর ম্যাকসিমো আবাসে হাজির হলাম। এখানে প্রধানমন্ত্রী থাকেন না। তবে এই বাড়িতে তিনি বিদেশি রাষ্ট্র-নায়কদের অভ্যর্থনা জানান। বাড়ি-টিও বেশ সাজান গোছান। শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলে পড়ে হলঘর। হলের পাশে কতগুলি সভাঘর। এর একটিতে পাঁপান্দ্রেউ ও শ্রীমতী গান্ধী অনেক-ক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা চালা-লেন। আমরা দুদেশের সাংবাদিকরা বাইরে বসে। কখন বৈঠক শেষ হয়ে ব্রিফিং হবে তার জন্য অপেক্ষা।

সৈনিকের স্মৃতি-স্তম্ভে শ্রীমতী গান্ধী

প্রায় দুঘন্টা পর বৈঠক ভাঙল। আমরা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। রিপোরটারদের কোন চক্ষুলজ্জা করলে চলে না। ভিড়ের মধ্যে কনুই দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া নিয়ম। সামনের দিকে না এগুলে ভাল শোনা যাবে না। হ্যানড আউট দেখলেই থাবচা মেরে তুলে নিতে হয়। অনেক সময় হ্যানড আউট ফুরিয়ে যায়। তখন কেঁদে মরে গেলেও কেউ এক কপি দেবে না। অথচ কাজ শেষ হয়ে গেলে তা দিয়ে মুখ মোছা ছাড়া তার আর কোন উপকারিতা নেই।

গ্রীসের সংগে ভারতের এযাবৎ কোন চুক্তিই ছিল না। এই প্রথম একটা চুক্তি হল যাতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক কারিগরি সহযোগিতা হতে পারে। আমরা মিটিং রুমে ঢুকে দেখলাম আলোচনা শেষ। নেতারা শুধু বসে আছেন সই করার জন্য। ক্যামেরাম্যানরা না এলে সই হতে পারছিল না। শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিকদের বললেন : এই আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। দুদেশের সমস্যা বুঝতে পেরেছি। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই শান্তি আসবে। দুই দেশের বৈঠকের প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্য আগের দিন রাতেই সারদাপ্রসাদ ব্রিফ করে দিয়েছিলেন। কাজেই দৈনিক পত্রিকার পক্ষে আগে ভাগে খবরের সারাৎসার পাঠান হয়ে গিয়েছিল।

বেলা দুটোর সময় হোটেলে ফিরে নাকে মুখে গুঁজে আবার ছোটার পালা। তিনটে পনেরর মধ্যে লাউনজে হাজির হতে হবে, না হলে পরবর্তী প্রোগ্রাম মিস করতে হবে। তিনটে পঞ্চান্ন থেকে পাঁচটা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী যাবেন অ্যাকরোপলিসে। এই এক ঘন্টায় কি অ্যাকরোপলিস দেখা যায়, না সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়? ভাগ্যিস, ১৯৬১ সালে আমি প্রায় একটি বেলা অ্যাকরোপলিসে কাটিয়েছিলাম পেনিলপির সংগে। সেটা ডিসেম্বর মাস, অফ সিজন। খুব বেশি ট্যুরিসট ছিল না। অনেক ফাঁকায় ফাঁকায় দেখা গেছে। অনেক সময় ভাবি রাষ্ট্রনায়করা কী হতভাগা। তাঁরা বিদেশে যান, অথচ কিছু তারিয়ে তারিয়ে দেখতে পাবেন না। কত বিরাট বিরাট হোটেলে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রি যাপন করেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারেন না। তাঁদের সম্মানে বিরাট বিরাট ভোজসভা হয়; কিন্তু তাঁরা লজ্জায় বেশি খেতে পারেন না।

অ্যাকরোপলিস উঁচু পাহাড় কেটে বসান প্রাচীন শহর। দেবমন্দির, মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু করে একটি সমৃদ্ধ জনপদের সব কিছু উপকরণই একদা ছিল অ্যাকরোপলিসে। এখন পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। বিরাট বিরাট থাম দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। বিরাট বিরাট পাথরের সিঁড়িতে চোট লেগেছে। তবে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়নি।

আমি ১৯৬১ সালে যখন আসি তখন মূর্তিগুলি আগে যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমন অবস্থাতেই ছিল। এবার গিয়ে দেখলাম সব মূর্তি মিউজিয়ম করে ভেতরে রেখে দেওয়া হয়েছে, সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় মূর্তিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাই এই বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এখন অ্যাকরোপলিসে গেলে দেখা যাবে চারদিকে লোহার টিউব দিয়ে খিলানগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে। এমন করে সারান হচ্ছে যাতে প্রাচীন স্থাপত্যের কোন ক্ষতি না হয়।

অ্যাকরোপলিসে আমাদের পৌঁছতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি শ্রীমতী গান্ধী আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরনে খয়েরি রঙের শালোয়ার কামিজ। বয়স আরও বিশ বছর কমে গেছে। লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত তিনি দুহাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর চলার মধ্যে আছে অস্বাভাবিক দ্রুততা। এই ক্ষিপ্রগতি গান্ধীজীর ছিল বলে শুনেছি। বিনোবাজীকেও দেখেছি এত দ্রুত চলতে। এখন চেনাশোনা নেতার মধ্যে জ্যোতি বসু দারুণ জোরে হাঁটেন, মনে হয় বুঝি দৌড়চ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর হাঁটাও অনেকটা ওই দৌড়নর মত।

সিজনের সময় অ্যাকরোপলিস পর্যটকদের ভিড়ে ভরতি। শ্রীমতী গান্ধীকে দেখে পর্যটকেরা আর চোখ ফেরাতে পারছেন না। সংগে সংগে ক্যামেরায় তাঁকে বন্দী করে ফেলার জন্য একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সে এক দৃশ্য। প্রায় হাজার খানেক ট্যুরিসট এক সংগে শ্রীমতী গান্ধীর ছবি তুলছেন।

আমি একজন পর্যটককে জিজ্ঞাসা করলাম : কোন দেশের লোক আপনি? ভদ্রলোক জবাব দিলেন কানাডা। গলায় ক্যামেরার বাকস ঝোলান। বাকস থেকে বার করে ক্যামেরা বাগিয়ে তিনি ছবি তুলতে ব্যস্ত, উত্তর দেবার সময় নেই।

আমি বললাম : এত জিনিস থাকতে মিসেস গান্ধীর ছবি তুলছেন কেন? তার উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, দর্শনীয় অন্যান্য জিনিস তো পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু আপনি আমাকে বিরক্ত করলে, শ্রীমতী গান্ধীর মত সাবজেকট এখনই পালিয়ে যাবে। []

(চলবে)

আলো / শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

আজ আমাদের বিয়ের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হল। ছেলেমেয়েরা খুব জাঁকজমক করে এদিনটা পালন করল। খুব ভাল লাগছিল – মনে হল এই তো সেদিন বিয়ে হল। ওঁর কেমন সরু একটা গোঁফ ছিল, মাথা ভরতি কোঁকড়া চুল। এখন গোঁফ গেছে উড়ে। মাথায় টাক, চেহারায় কত পরিবর্তন। কিন্তু মানুষটা সেই আগের মতই আছেন, স্বল্পবাক, কথায় কথায় মুচকি হাসি।

হঠাৎ লোডশেডিং - মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার কথা - কথায় বলে স্মৃতি সততই সুখের! সত্যিই তাই। ঘটনাটা ছবির মত চোখের উপর ভাসতে লাগল।

যাঃ, আবার গেল চিমনিটা। মাসে তিন চারটে করে চিমনি ভাঙেই আমার হাত থেকে। কী করে যে হাত থেকে পড়ে যায় বুঝি না। এত সাবধানে ধরি তবুও পড়ে যায়। লোডশেডিং উৎপাতে হ্যারিকেন ঠিক রাখতেই হয়। অনেক ছোট বয়সেই বিয়ে হয়েছিল আমার। শ্বশুর শাশুড়ির খুবই আদরের বউ। ননদ ননদাই জা ভাসুর ভাসুরঝি ইত্যাদি নিয়ে বিরাট বড় পরিবারের বউ আমি। সকলেই আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার বড় ননদাই আমাকে বলতেন বিবি, নিজেকে গোলাম ও আমার স্বামীকে ডাকেন সাহেব বলে। ওরকম স্নেহ পরায়ণ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

আর প্রায়ই তাই চিমনি ভাঙে। শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলে বলি, 'আপনার ছেলে ভেঙেছে।' বাস, সাত খুন মাপ। আমার স্বামী তখন ক্যারিয়ার তৈরি করতে ব্যস্ত। সকাল ছটায় বেরোতেন। ফিরতেন রাত ১১টা সাড়ে ১১টায়। সকালে ল'কলেজ, দুপুরে চাকরি, বিকেলে ইভনিং কলেজে পড়াতেন। সুতরাং চিমনিটা সত্যি সত্যিই ছেলে ভেঙেছে কিনা তার প্রমাণের সুযোগ কখন হত না। কিন্তু কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সুতরাং যথারীতি আবার একদিন চিমনি ভেঙে শাশুড়ির কাছে তাঁর ছেলের নামে দোষ দিচ্ছি, ইতোমধ্যে কখন উনি অসময়ে বাড়ি ফিরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমি জানি না। আমার কথা শুনে উনি বললেন, 'আমি আবার কখন চিমনি ভাঙলাম!' শাশুড়ি বললেন, 'সে কীরে তুই ভাঙিস না, বৌমা তো বলে চিমনি নাকি তুই ভাঙিস!' উনি তো অবাক। আমি মিথ্যা কথায় হাতেনাতে ধরা। পড়ে আর কোন কথা নয়। শাশুড়ি খুব বকুনি দিলেন আমাকে। একনম্বর চিমনি ভাঙা, মানে বউ এর হাতে পায়ে লক্ষ্মী নেই খালি জিনিস নষ্ট করা, দ্বিতীয়ত, মিথ্যা কথা বলা, তৃতীয়ত, তাঁর নিরাপরাধ ছেলের নামে দিনের পর দিন মিথ্যা কথা বলা। সুতরাং তিরস্কার বেশ ভালই জুটল। মা যখন বকছেন উনি দেখছি বেশ মুচকি মুচকি হাসছেন, রাগে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। এ কি বর, না একেবারেই বর্বর। কোথায় স্ত্রীকে অসম্মান থেকে রক্ষা করবে, তা না, তার বদলে শাশুড়ি আমাকে বকছেন বলে উনি স্বর্গীয় আনন্দ পাচ্ছেন। যাই হোক, তখন আর মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে মনে প্রচণ্ড রাগ করেছিলাম। ঘরে গিয়ে রুটি কাটা ছুরিটা নিয়ে বললাম, 'তোমাকে আজ কেটেই ফেলব এটা দিয়ে।' তখনকার দিনে এখনকার মত স্লাইসড রুটি পাওয়া যেত না। তাই রুটি কাটার জন্যে ছুরি সকলের ঘরেই থাকত। সেই ছুরিটা নিয়ে ওকে কাটতে গিয়েছিলাম। উনি তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরৎচন্দ্র পড়ছিলেন। তড়াক করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পরিত্রাহি চিৎকার 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে বিছানার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, আমিও ছুরি নিয়ে পিছন পিছন ছুটছি। ইতোমধ্যে মা মানে আমার শাশুড়ি, আরো অনেকে সে জায়গায় উপস্থিত। কী বোকা লোকটা, সত্যি সত্যিই আমি থোড়াই মারতাম! আমি তো ভয় দেখাচ্ছিলাম। যাই হোক কপালে আর এক প্রস্থ বকুনি। যখন আমাকে সবাই মিলে বকছে তখন ওনার কী মুচকি মুচকি হাসি। চোখে মুখে একেবারে স্বর্গীয় আনন্দের দীপ্তি। খালি আমার ক্ষুদে ননদগুলো আমাকে কাঁচুমাচুমুখে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। ওরা আমার খুব ভক্ত ছিল। কারণ শাশুড়ির ভাণ্ডার থেকে আচার চুরি করা, লুকিয়ে ছাদে গিয়ে গিয়ে খাওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারে আমি একেবারে ওদের আদর্শ ছিলাম। কিন্তু ছোড়দাকে মারতে যাওয়াটা ওদের যেমন পছন্দ হয়নি, তেমনি আমাকে বকাটাও। যাই হোক ওনার হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়। শাশুড়ি বকুন তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু উনি তো একটু সহানুভূতি দেখাবেন। না, এখানে আর থাকা চলবে না। রাগ দেখিয়ে বললাম, 'আমি এখানে আর থাকব না, বাপের বাড়ি যাচ্ছি।' নির্বিকার জবাব এল, 'যাও, কে মানা করছে।' দেখেছ, এখনও একটু সাধে না। রাগে দুঃখে আমার বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল। ধড়াম করে সুটকেশটা বিছানার উপর ফেললাম, শাড়ি জামাগুলো ওটার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখতে লাগলাম, একবার একবার ওঁর দিকে তাকাচ্ছি না, উনি আপন মনে উপন্যাস পড়ে যাচ্ছেন, ঘরের মধ্যে কী হচ্ছে তার কোন খেয়ালই নেই। আচ্ছা এ কীরকম মানুষ উপন্যাসে পড়েছি, সিনেমাতেও দেখেছি, বন্ধুদের কাছে শুনেছি পর্যন্ত বরেরা কত সাধে। না, এ একেবারেই পচাপান্তা মার্কা বর, যাচ্ছেতাই। এ রকম হৃদয়হীন লোক আমি জন্মে দেখিনি। তবুও হায়রে আশা, ভাবছি এই বুঝি উনি সাধবেন, বলবেন, যেয়ো না। না, একবারও সে লক্ষণ দেখা গেল না।

'চললাম আমি।' আবার নির্বিকার জবাব এল, 'যাও না, অনেকক্ষণ থেকে তো যাব যাব বলছ, যাও।' না, সত্যিই একেবারেই বাজে মার্কা লোক। আমার মা কেন যে বলেন অমন ছেলে নাকি লাখে একটাও মেলে না। এখন দেখ কেমন ছেলে। যাই হোক শাশুড়িকে তো আর বলা যায় না, আমি রাগ করে বাপের বাড়ি যাচ্ছি। কারণ উনি এর আগে কখন আমাকে রাগ করতে দেখেননি। কত বকেছেন। একবার মনে আছে আমাদের বাড়ির সামনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। সেটার ডাল ভেঙে নিচে পড়েছিলাম। পেয়ারা গাছটা ঘোষালদের ছিল। ঘোষালমামা এসে আমার শাশুড়ির কাছে নালিশ করেছিলেন। 'তোর দস্যিপনা করে যাবে' চুলের মুঠি ধরে পিঠে ঘা কতক দিয়েছিলেন, ঘোষালমামার সামনেই। খুব রাগ হয়েছিল। ভেংচি কেটেছিলাম ঘোষালমামাকে। বুড়ো মহাপাজী – এদিকে আবার বলে 'মা লক্ষ্মী'। শাসিয়েছিলাম পরে দেখে নেব বলে। যাই হোক এই সামান্য ব্যাপারে আমি একেবারে রাগ করে বাপের বাড়ি যাব, এটা কেউ ভাবতেও পারে না। কিন্তু এ রাগ দুঃখ অভিমান সবই আমার স্বামীর উপরে। আমার খুব কান্না পেতে লাগল। কাঁদো কাঁদো মুখে শাশুড়ির কাছে গিয়ে বললাম, 'মা, আমার মা খুব অসুস্থ টেলিফোন এসেছিল, আমাকে যেতে বলেছে।' আমার শাশুড়ি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। উনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমাকে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আরে পাগলি মা ঠিক ভাল হয়ে যাবেন কাঁদে না, আমার পাগলি মা কোথাকার।' হায়রে সরলপ্রাণা, উনি ভাবলেন আমি মায়ের জন্যে কাঁদছি। আমার বুকের ভেতরটা নরম হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবছি যদি আমার স্বামী আমাকে একবারও সাধেন, বলেন যেও না, তবে আমি যাব না। কিন্তু না, ওদিক থেকে কোন সাড়াই এল না। উঃ, রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল। আমার একেবারে স্থির বিশ্বাস, 'উনি আর আমাকে ভালবাসেন না।' সুতরাং এ জীবন রাখার আর কোন মানে হয় না।

কথায় বলে,

'যার স্বামীতে করে হেলা
তারে রাখালে মারে ঢেলা।'

অর্থাৎ যাকে স্বামী ভালবাসে না তাকে সকলেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখে। সুতরাং আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এ-জীবন আর রাখব না।

সুটকেশ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তো ট্রেনে গিয়ে চাপলাম। এখন সমস্যা মরব কী করে? ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেব? ওরে বাবা, যদি না মরি, হাত পা ভেঙে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকি? তাহলে গলায় দড়ি? হ্যাঁ, গলায় দড়ি ঠিক থাকবে। না না না, খুব লাগবে। গায়ে আগুন ধরিয়ে? ওরে বাবা খুব জ্বলবে। তবে হ্যাঁ, বিষ খাব। ওটাই ঠিক। কিন্তু বিষ পাব কোথায়? মনে পড়ল ও পাড়ায় কানু বাগদির বউ ধুতরো ফুলের বিচি খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল বরের সঙ্গে ঝগড়া করে। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির পিছনে একটা ধুতরো ফুলের গাছ আছে, ছোটবেলায় সেটা থেকে ফুল তুলে কত শিব পুজো করেছি। মা বলতেন শিব ধুতরো ফুলে সন্তুষ্ট হন। আর শিব পুজো করলে নাকি শিবের মত বর পাওয়া যায়। কিন্তু এই নাকি শিবের মত বর? আবার মনে মনে আমার স্বামী সম্বন্ধে অনেক বিষোদ্গার করলাম, খুব খারাপ বর। ভেবে আরো কান্না পেয়ে গেল। পাশে বসা এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বললেন, 'কাঁদছ কেন মা?' - বললাম, 'মায়ের অসুখ।' উনি বললেন, 'ছিঃ মা কাঁদে না, মা ঠিক ভাল হয়ে যাবেন - আহা।' সহানুভূতি পেয়ে আমার বুকের ভিতরের দুঃখটা আরো বেড়ে গেল। দেখ তো, পৃথিবীতে সবাই কত ভাল, এক আমার বর ছাড়া। যাচ্ছেতাই। মনে মনে খুব রাগ করি মানুষটার উপর।

যত বাপের বাড়ির দিকে এগোচ্ছি উত্তেজনা তত বাড়ছে। মা আমাকে একা দেখে কী বলবেন। কারণ আমার মা সব সময় বলতেন, 'মেয়েমানুষের শ্বশুরবাড়িই আসল স্বর্গ। ওখানেই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের জায়গা। বাপের বাড়ির রাজভোগের থেকে শ্বশুরবাড়ির কথাশুখা রুটিও অনেক সম্মানের। যদি দেখি তুমি কোনদিন ঝগড়া করে এখানে এসেছ তবে একেবারে ধুলোপায়েই বিদায় করব।'

সুতরাং একলা যেতে দেখলে মা বুঝবেন যে নিশ্চয়ই ঝগড়া করে এসেছি। সুতরাং আর এক প্রস্থ বকুনি কপালে। জামাই এল না কেন, কী বৃত্তান্ত? হাজার গন্ডা কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি হয়ত বললাম জামাই কাজের জন্যে আসতে পারেনি – পরে আসবে ইত্যাদি। আসলে উনি তো জানেন না ওনার জামাই এক নম্বরের পাজি। ওনার কাছে ওনার জামাই হীরের টুকরো লক্ষ্মীসোনা ছেলে, এমন ছেলে নাকি ভূভারতে নেই। হুঁ, আসল গুণ তো আর জানেন না।

যাই হোক গন্তব্যস্থল তো এসে গেল। ট্রেন থেকে নেমে আবার বাস, প্রায় কুড়ি মিনিট লাগে আমাদের গ্রামে পৌঁছতে। যাই হোক বাসে তো উঠেছি। কিন্তু কনডাকটর আসে না আমার কাছে টিকিট নিতে। প্রায় বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি, কনডাকটরকে বললাম টিকিট নিতে। কিন্তু শুনলাম আমার টিকিট নাকি হয়ে গেছে। কে আবার আমার টিকিট কাটল! পিছন ফিরে দেখি আমার স্বামীর হাতে দুখানা টিকিট। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি মুচকি লাজুক লাজুক হাসছেন। আমার বুকের মধ্যে সহস্র বাতির আলো জ্বলে উঠল। সব রাগ দুঃখ অভিমান এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মনে হল ওর মত ভালবাসতে আর কেউ পারে না। স্বামীর হাত ধরে গর্বিত পদক্ষেপে বাপেরবাড়ির দিকে এগোলাম।

আলো জ্বলে উঠল লোডশেডিং শেষ হয়েছে। ☐

শতবর্ষ আগে যোগোদ্যানে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ

তুষারকান্তি মহাপাত্র

নাম যোগোদ্যান। রেখেছিলেন নাকি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই। অথবা তাঁর উচ্চারিত উক্তি থেকে এ নামের সন্ধান : 'এ যে যোগের স্থান।' সে একশো বছর আগের ঘটনা। তখন এ উদ্যানের প্রকৃত মর্ম বোঝেনি আর কেউ। এমনকি রামচন্দ্র-ও না। আর আজ! 'শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ' রামকৃষ্ণের শিষ্য-ভক্ত-অনুরক্তের কাছে এক তীর্থ, পীঠস্থান।

রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শিষ্য। 'একনিষ্ঠ আদর্শ বীরভক্ত ও সর্ব্বপ্রথম শিষ্য।' সময় সুযোগ হলেই দক্ষিণেশ্বরে যান। অবসর সময়ের প্রধান কাজ নামসংকীর্তন। সময়ে-অসময়ে। সঙ্গে মাসতুতো ভাই নিত্যগোপাল এবং মনোমোহন। সংকীর্তনের উচ্চরোলে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে প্রতিবেশীর। অভিযোগ যায় ঠাকুরের কাছে। তিনি শিষ্যদের এমন স্থান খুঁজতে বলেন যেখানে 'একশত খুন হইলেও কেহ জানিতে পারিবে না।' যেমন আদেশ তেমনি কাজ। পাওয়া গেল এই বাগান। কেনা হল রামচন্দ্রের নামে। অনেকটা ফাঁকা জায়গা, পুষ্করিণী, আর তার পাশে একটা ছোট পাকাবাড়ি। কেনা হল, কিন্তু কেউ নামকীর্তনে এল না। অব্যবহৃতই থেকে গেল। অবশেষে ঠাকুরই তাগাদা দিলেন, 'বাগান কিনলে, আমায় একদিন দেখালে না কেন?' 'চল .... দেখে আসি।' দিন স্থির হল। ঠাকুরের ভাল লাগবে ভেবে বাগানের পূবদিকে একটি তুলসী মঞ্চ তৈরি হল। লম্বা-চওড়ায় ছ'সাত হাত। মঞ্চের তুলসী গাছটি বেশ বড়। মাটি এমন নিকোনো যে মনে হবে প্রতিদিন সভক্তি ব্যবহৃত। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর বুধবার বিকেল প্রায় চারটায় শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে এলেন। সেই প্রথমবার। সঙ্গে শিষ্য। দেখেই জায়গাটি তাঁর খুব পছন্দ। মনে অফুরন্ত আনন্দ। [illegible] 'বাগানটি বেশ। [illegible] [illegible]

বেশ জায়গা। এখানে বেশ ঈশ্বর-চিন্তা হয়।' রামচন্দ্রের দেওয়া ফল-মিষ্টি গ্রহণ করলেন ঠাকুর, পাকা ঘরটিতে বসে। পুষ্করিণী থেকে আঁজলা ভরে জল খেলেন। কিছুক্ষণ কাটালেন বাগানে। বিমুগ্ধ হৃদয়ে মন্তব্যও করে গেলেন, 'রাম, এ যে যোগের স্থান।'

শুধু রামকৃষ্ণের পূত পদার্পণে ধন্য হয়নি এ স্থান। এসেছিলেন শ্রীশ্রীমা। বিবেকানন্দও। একবার নয়, কয়েক বার। রামচন্দ্র দত্ত তো এখানে বসে সাধনা করতেনই, ঠাকুরের গৃহী-ভক্তেরা অনেকেই আসতেন এই উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে যাঁরা প্রখ্যাত স্বামীজী তাঁরাও আসতেন। এঁদের সকলের শুভানুগমনে দিনে দিনে পরিচিতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল স্থানটির।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩। পরদিন তাঁর দেহ ভস্মীভূত করা হল। সাতদিন পরে ৮ ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমী তিথিতে তাঁর ত্যাগী-গৃহী ভক্ত-শিষ্যের দল তাঁর পূতাস্থিপূর্ণ একটি তামার কলসি শোভাযাত্রা করে নিয়ে এলেন 'যোগোদ্যান'-এ। সমাহিত করলেন তাঁরই প্রিয় তুলসীকাননে। মাত্র তিন বছর আগে তাঁর কথামৃতে যে জায়গা মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেখানেই প্রোথিত হল তাঁর দেহাবশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি চেয়েছিলেন গঙ্গার তীরে যেন সমাহিত করা হয়। কিন্তু সাতদিনেও উপযুক্ত জায়গা না পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে আর রামচন্দ্র দত্তের সানন্দ সম্মতিতে এখানেই তা রাখা স্থির হয়। সাতদিন ধরে যে নিত্যপূজা আর ভোগ নিবেদনের আয়োজন চলেছিল পূতাস্থি সমাহিত করার পরও তা বন্ধ করা হয়নি। আজও নিত্য হয়। আর সেদিন থেকে প্রতি জন্মাষ্টমী তিথিতে পালিত হয় 'নিত্যাবির্ভাব দিবস'। প্রথমে নিত্যপূজার দায়িত্ব নেন নিত্যগোপাল, পরবর্তীকালে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে যিনি পরিচিত হন। তিনি অসুস্থ হয়ে এ স্থান ত্যাগ করলে সে দায়িত্ব রামচন্দ্র [illegible] দেওয়া হয়।

সে 'তুলসীকানন' আজ আর নেই। অবশ্য সৌন্দর্য কোথাও [illegible] নেই। সেখানেই গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত মন্দির, বিগ্রহরূপে যার অভ্যন্তরে বিরাজ করছে ঠাকুরের অনিন্দ্য মর্মর মূর্তি। নিত্যপূজা আর লীলাকীর্তনে মুখরিত সে মন্দির। পাশেই রামচন্দ্র দত্তের সমাধিমন্দির। দেড় বছর রোগভোগের পর ৪ মাঘ ১৩০৫ (১৭-১-১৮৯৯) রামচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করলে এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। মন্দিরটি আকারে ছোট কিন্তু মনোলোভন। আর সেই পুষ্করিণী! যেখানে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ হাত-মুখ ধুয়েছেন, পান করে পবিত্র করেছেন যার শীতল সলিল! 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ড' নামে এখন তা পরিচিত। তারই পাড়ে সেই ছোট ঘরটি, যেখানে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই ঘরের ভিতরে একটি ফলকে উৎকীর্ণ, 'ঘরের এই স্থানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তসহ বসেন।' এই ঘরটিকে ঠাকুর যে 'ঠাকুর ঘর' নামে

আত্মস্থ করেন এবং এই স্থানের নাম রাখেন 'যোগোদ্যান', সে তথ্যও এখানে জানা যায়। এরই পাশে একটি দ্বিতল পাকাবাড়ি, তার গায়ে একটি পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ : 'একনিষ্ঠ আদর্শ বীরভক্ত ও সর্ব্ব-প্রথম শিষ্য ও প্রচারক মহাত্মা রামচন্দ্রের আবাসগৃহ।' সংস্কার করে দিয়েছেন এক ভক্ত-শিষ্য। রামকৃষ্ণের নির্দেশে রামচন্দ্র এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি পঞ্চবটীও। এ ছাড়া পরে গড়ে উঠেছে স্বামীজী-দের আবাসস্থান, দীক্ষাদান ঘর। একটি লাইব্রেরিও, যার বই-এর সংখ্যা এখন দু হাজার চারশ পঞ্চাশ। সব মিলিয়ে এক পবিত্র পরিবেশ। বিশেষ, যেদিন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ দীক্ষা দান করেন সেদিন ভক্তসমাগমে ও গাম্ভীর্যে পূর্ণ হয় পরিবেশ।

যোগোদ্যানের পরিচালকেরা এর

পরিচালনাভার বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের হাতে অর্পণ করেন ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে। সেদিন থেকে এ স্থানের পরিচয় বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে। ফলে অন্য শাখাকেন্দ্রের মতই তার ব্যবস্থা। তবু উৎসবগুলির স্বাতন্ত্র্য আজও রক্ষিত। জন্মাষ্টমীতে নিত্যা বির্ভাব, পঞ্চমীতে রামচন্দ্রের জন্ম তিথি, কল্পতরু ইত্যাদি উৎসবের সংগে এগুলিও পালিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে রামচন্দ্রের প্রথম দেখা ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ১৩ নভেমবর (১২৮৬ র কার্তিক)। সংগে গোপাল মিত্র, মনোমোহন, রামচন্দ্র এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পেশায় ডাক্তার, স্বভাবে যুক্তিবাদী। ছিলেন নাস্তিক, হয়েছেন জিগীষু। তিনজনে মিলে তিনটি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তার ঠিক আগে শ্রীরামকৃষ্ণের বন্ধ দরজা খুলে ভিতরে যাবেন কীভাবে যখন ভাবছেন, শ্রীরামকৃষ্ণই দরজা খুলে দিলেন আর ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানালেন তাঁর ভাবী শিষ্যদের। এ আচরণে যাঁরা অবাক, প্রশ্ন তিনটির উত্তর শুনে তাঁরা হতবাক। রবিবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলেন এগার নমবর মধু রায় লেন এর বাড়িতে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে কয়েকবার এসেছেন। প্রথম দর্শনে আকৃষ্ট হলেও রামচন্দ্র আপ্লুত হননি। কিন্তু ভক্তি দেখা দিতে বিশেষ সময়ও লাগেনি। প্রতি রবিবার আর ছুটির দিন যেতে যেতে একটা অভ্যাস আর আকর্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের। বন্ধু আর আত্মীয়ের পরিধিটাও স্মরণীয়। রামচন্দ্র দত্ত, বিশ্বনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের পিতা) ও মনোমোহন মিত্রের (মাসতুতো ভাই) পরিবার ছিল একসূত্রে গাঁথা। সবাই সবার বিপদ-আপদের খবর রাখেন, একজনের পারিবারিক ব্যাপার গোপন না রেখে অন্যজনকে জানানই নিয়ম। রামচন্দ্র তিন পরিবারের যেন কর্তা, মনোমোহনের মা শ্যামাসুন্দরী তিন পরিবারেরই কর্ত্রীস্থানীয়া আর মনোমোহন ছাড়া তো কোন কাজই চলে না। রামচন্দ্রই ১৮৮১ খৃস্টাব্দে বিবেকানন্দকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ দর্শনে নিয়ে যান। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মনোমোহনের বন্ধু। তাঁর মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে দুই মাসতুতো-পিসতুতো ভাই মিলে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনোমোহনের মেয়ে, জামাই, ভগিনীপতি সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য ও শিষ্যা। এ হেন রামচন্দ্র, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রথম প্রচারক, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা চেয়েও পাননি। ঠাকুর একটু একটু করে পরীক্ষা করেছেন তাঁকে। এই স্তরগুলি সত্যিই লক্ষ্য করার মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই চেয়েছেন তাঁর বাড়ি যেতে। রামচন্দ্র এড়িয়ে গেছেন। কারণ, অন্য কিছু না, অকারণ অর্থব্যয় আশঙ্কা। রামকৃষ্ণ যাবেন শিষ্যসহ। ভক্ত সমাগমও কম হবে না। একশো দেড়শো লোকের জন্যে নিদেন খরচ 'দশ টাকা'। কী দরকার! এ ঘটনা ঘটল একাধিকবার। তবু রামকৃষ্ণ এলেন। ফল? 'ভক্তি সেবা করিবার আজ্ঞা দিয়া চলিয়া গেলেন।' অবশ্য তার আগে একটা অঘটন ঘটেছিল। রামচন্দ্র স্বপ্নে দেখেছিলেন রামকৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্র দিলেন আর প্রাতে স্নানান্তে একশোবার জপ করার নির্দেশ দিলেন। রামচন্দ্র স্বপ্ন-ব্যাপার বিস্তারিতভাবে জানাতে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু বলেছিলেন, স্বপ্নসিদ্ধব্যক্তি সৌভাগ্যবান। এতে দীক্ষা নেবার জন্যে তাঁর মনের আকুলতা বাড়ল, কিন্তু দীক্ষাও জুটল না, উপদেশ-ও নয়। পরিবর্তে এই আগমন ও উপদেশ। কিন্তু এর পরের ঘটনা আরও বিচিত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিলিপি ভালবাসেন। শ্যামবাজার মোড় থেকে জিলিপি কিনে দক্ষিণেশ্বরে চলেছেন রামচন্দ্র। পিছনে ভিক্ষুক জিলিপির আশায়। ঠাকুরের ছলনা হতে পারে ভেবে একটা জিলিপি ছুঁড়ে দিলেন রামচন্দ্র। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন জলখাবার চাইলেন রামচন্দ্র জিলিপির ঠোঙাটি এগিয়ে দিলেন। ঠাকুর জিলিপিগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ঠোঙাটি ফেরত দিলেন। বিস্মিত রামচন্দ্রকে জানালেন - নিবেদন করেই তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন। নিবেদন করতে হয় অগ্রভাগ। এ জিলিপির অগভাগ তো আগেই ধূলায় নিবেদিত। অন্তর্যামী শুধু অন্তরের খবরই রাখেন না, ভক্তের জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনার-ও!

আবার যখন তিনি জিলিপি কিনে দক্ষিণেশ্বর গেলেন, সন্তর্পণে গেলেন, যাতে জিলিপি চাওয়ার সুযোগই কেউ না পায়। খুশিমনে তা গ্রহণ করলেন ঠাকুর। এরই পরদিন, রামচন্দ্রের মনে তখন দীক্ষা নেবার ব্যাকুল বাসনা, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে চলে আসছেন রামচন্দ্র। বারান্দায় এসে ফিরে তাকালেন। দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আসছেন। নিভৃত নির্জন। ঠাকুর সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'কি চাও?' বিমূঢ় রামচন্দ্র কী চাইবেন ভেবেই পেলেন না। সেই মনোভাবটিই নিবেদন করলেন। এবার হতচকিত রামচন্দ্রকে ঠাকুরই চেয়ে বসলেন – 'মন্ত্রটী আমায় প্রত্যর্পণ কর।' গুরুর এ কী প্রার্থনা? মন্ত্র না দিয়ে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বলা! কারণটা জানাতেই আনন্দে বিভোর রামচন্দ্র, তাঁর 'আর জপ-

রামচন্দ্র

তপের প্রয়োজন নাই।' ভূমিতে নত রামচন্দ্রের মস্তক স্পর্শ করলেন ঠাকুর তাঁর পায়ের বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দিয়ে। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এভাবেই জুটল শিষ্যত্ব! সমাধিভংগে ঠাকুর বললেন, 'যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে আমায় দেখ এবং যখন আসিবে এক পয়সার কোন দ্রব্য আনিবে।' ভক্তকে কিছু না দিলে অথবা তার কাছ থেকে কিছু না নিলে বোধহয় অসম্পূর্ণ থাকে দীক্ষা অনুষ্ঠান। তাই এই বিচিত্র দান-প্রতিদান। এ প্রসংগে জানা ভাল শ্রীরামকৃষ্ণ কাউকেই মন্ত্র দেননি, শিষ্য বলে স্বীকার করেননি। উৎসুকজনকে বলতেন তিনি কে। 'চাঁদা মামা আমারও মামা তোমার ও মামা।' তাঁর ভক্তেরা তাঁর উপদেশামৃতকেই মন্ত্রজ্ঞান করতেন।

রামচন্দ্র ঠাকুরের শুধু শিষ্য ছিলেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অনেকেই তাঁরই সহায়তায় ঠাকুরের সংগে পরিচিত হন। বিবেকানন্দও তাঁদের অন্যতম। শুধু ভক্ত সমাগমে নয়, প্রচারেও তাঁর ভূমিকা অগ্রণীর। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ঠাকুরের প্রথম জন্মতিথি উৎসব পালনে অথবা ১৮৮২ তে কোন্নগরে নগর সংকীর্তনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কোন্নগরে সাপ্তাহিক নাম প্রচারে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। এমনকি তিনি ও মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে একবার নামসংকীর্তনে তাঁর প্রতিনিধি পর্যন্ত হয়েছিলেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর মাসিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনিই মনোনীত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার-পরাঙ্মুখ ছিলেন। রামচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন তাঁর জীবিতকালে প্রচার শুরুর অর্থ অকালে কাজ আরম্ভ। তাঁর উপমায় এর ফল হবে 'সাঁজ প্রহরে ভাতার মোলো, কাঁদবো কত রাত'-এর মত। তবু রামচন্দ্র ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তাঁর জীবিতকালেই অল্পস্বল্প প্রচার চালান; তাঁর উপদেশগুলি সংগ্রহ করেন, সেগুলি 'তত্ত্বসার', 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' গ্রন্থরূপে

স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ

প্রকাশ করেন। প্রথম পুস্তিকা ও দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আগেই প্রকাশিত হয়। তাঁর অসামান্য কীর্তি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) এবং তত্ত্বমঞ্জরী মাসিক পত্রিকা, (১৮৮৫, '৮৬, নবপর্যায় ১৩০৪-'২৭) যার প্রথম দুটি বর্ষের সম্পাদক ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন (চৈত্র, ১২৯৯)।

রামচন্দ্র যোগোদ্যানকে শুধু দেব আরাধনা বা সাধনার কেন্দ্রে পর্যবসিত করেননি, সেবাকেন্দ্র রূপেও ব্যবহার করেছেন। কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে 'যোগোদ্যানের প্রাঙ্গণে ও পার্শ্ববর্তীমাঠে প্লেগরোগীদিগের জন্য সাময়িক সেবাকুটিরের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্র নিজে ডাক্তার হিসাবে সেই সকল সেবাকুটিরের দেখাশুনা করিতেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ যখন এখানে সমাহিত করা হয় সমাধির ওপরে কোন আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়নি। ফলে বৃষ্টির জলে সমাধিস্থান ভেসে যেতে লাগল। রামচন্দ্র চাইলেন পাকা আচ্ছাদন তৈরি করতে। তাতে হিতে বিপরীত হল। অনেক ভক্ত চাইলেন ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী দেহাস্থি গঙ্গানীরেই পুনরায় সমাহিত করা হোক। ৯ আশ্বিন ১২৯৩ রামচন্দ্রের বাড়িতে এক বিশেষ সভায় অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল অস্থি কখনই স্থানান্তরিত করা হবে না। মন্দির করার বাধা দূর হলে কালীপুজোর আগেই মন্দির নির্মিত হল। এই মন্দিরে ঠাকুরের প্রথম পুজো করেন শ্রীশ্রী মা। শ্রাবণ ১৩০৮ এ এরই সঙ্গে যুক্ত হল একটি নাটমন্দির। রামচন্দ্র তখন পরলোকগত। বীরভদ্র কালীপদ ঘোষ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী অর্থসাহায্য করলেন। মনোমোহনও কিছু ব্যয় করলেন। পরবর্তীকালে মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই মিশন কর্তৃপক্ষ বহন করলেন।

১৯৮৩ র ২৬ ডিসেম্বর সমাগত। যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণের শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলল। বর্তমান পরিচালকেরা সে বিষয়ে সযত্নে সচেতন। অনুকরণীয়ভাবেই তাঁরা উদযাপন করতে চান সেই স্মরণ অনুষ্ঠান। ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ছ'দিনব্যাপী সংগীত-লীলাগীতি ভাষণের মাধ্যমে পালিত হবে উৎসব। ভক্ত অনুরক্তদের মধ্যেও উৎসাহ অসীম। উৎসবের একমাস আগে থেকেই উৎসবের প্রবেশপত্র নিঃশেষিত। এখন অনুরক্তজনের নিত্য তীর্থযাত্রা কাঁকুড়গাছি মোড়ে নেমে রামকৃষ্ণ সমাধি রোড ধরে সাত নম্বর যোগোদ্যান লেনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ' বা 'যোগোদ্যানে।' □

আলোকচিত্র : অর্ধেন্দু রায়

পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ

নিচে পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ-র সদস্যদের নাম এবং ক্রমানুসারে সংখ্যা, ঠিকানা, বয়স, সখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবিকা উল্লেখ করা হল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত □ ক্রম ৬৩
মানবাজার এমপেরর রোড, মানবাজার, পুরুলিয়া ৭২৩১৩১। ২৯ বছর, বন্ধুত্ব ছবি তোলা ভ্রমণ সাহিত্য খেলাধুলা অভিনয়, উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

বৈশালি বিশ্বাস □ ক্রম ৬৪
৯০/২ কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি, দারজিলিং ৭৩৪৪০১। ২৪ বছর, সাহিত্য কবিতা পড়া ও লেখা, স্নাতক, উল্লেখ নেই।

শ্যামলকুমার চন্দ □ ক্রম ৬৫
শয়াবাদ পাওয়ার হাউস, পোঃ বাঁশজোড়া, ধানবাদ, বিহার ৮২৮-১০১। ২৬ বছর, বন্ধুত্ব ভ্রমণ বই পড়া, স্নাতক, চাকরি।

অশোককুমার সিংহ □ ক্রম ৬৬
গ্রাম ও পোঃ জগতাগাঁও, পশ্চিম দিনাজপুর ৭৩৩২০২। ২১ বছর, গান স্নাতক পরীক্ষার্থী।

সুধীর চন্দ্র সিংহ □ ক্রম ৬৭
গ্রাম ও পোঃ জগতাগাঁও, পশ্চিম দিনাজপুর ৭৩৩২০২। ২১ বছর, আবৃত্তি, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

গ্রেনেডায় কিউবান উপস্থিতির যুক্তি মিথ্যে প্রমাণ হওয়ায় রেগান সাড়াশব্দ করছেন না

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সফররত সুদীপ মজুমদার

মাঝরাতে হঠাৎ প্লেনের ঘড়ঘড় আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হল ছাদের ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। মিলিটারি এয়ারপোর্ট তো কাছেই। কিন্তু তা বলে এত রাতে হঠাৎ এত তৎপরতা কেন কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পর পর বেশ কয়েকখানা প্লেন উড়ে গেল কান ফাটান আওয়াজ করে। চোখে আর ঘুম আসে না। পরদিন সকালবেলা মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সংগে কথা বলে যতক্ষণ না জানতে পারি কেন ওই অস্বাভাবিক তৎপরতা, ততক্ষণ যেমন ঘুম আসবেও না। ততক্ষণ মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকবে।

ফোর্ট ব্রাগে সেদিন আমার দ্বিতীয় রাত। নর্থ ক্যারোলিনার জংগলের মাঝে এক বিশাল আমেরিকান মিলিটারি এসটাব্লিশমেন্ট। শুধু আমেরিকান মেরিন, গ্রিন বেরে (Green Beret) অথবা প্যারাট্রুপারদেরই ক্যাম্প নয়, পৃথিবীর নানান দেশ থেকে সেনারা আসে ট্রেনিং নিতে এখানে। মিলিটারি ক্যাম্প পরিদর্শন করার ও আমেরিকান সৈনদের সংগে কথা বলার সুযোগ হওয়ায় উত্তেজিত ছিলাম। সকালে স্পেশাল ফোর্সের কিছু বাছাবাছা অফিসারদের সংগে কথাবার্তা হবে বলে ঠিক ছিল। টেলিভিশনটা অন করতেই স্পেশাল বুলেটিন দেখতে পাওয়া গেল। আমেরিকান সৈনরা ক্যারিবিয়ানের একটা ছোট্ট দ্বীপ, গ্রেনেডাকে আক্রমণ করেছে। মাঝরাতের প্লেন ওড়ার তৎপরতা পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল।

ভিয়েতনামের যুদ্ধের পর আমেরিকা আবার অন্য একটি স্বাধীন দেশে নিজস্ব সৈন্য নামান প্রকাশ্য আক্রমণ করে। গোপনভাবে পৃথিবীর নানা দেশে মারকিন সেনাবাহিনী অথবা এক্সপার্টরা লড়ছে 'কম্যুনিজম'কে রুখতে। কিন্তু সোজাসুজি অন্য একটি স্বাধীন দেশকে ইনভেড (invade) করা এটা অনেকেই চিন্তা করতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল ফোর্ট ব্রাগ থেকে 82nd Airborne Division-এর বাছাবাছা সৈনদের পাঠান হয়েছে গ্রেনেডা আক্রমণ করতে। মিলিটারি অফিসারদের কাছ থেকে এয়ারবরন ডিভিশনের সম্বন্ধে জানতে পারা গেল। এরা একসময়ে ভিয়েতনামে কম্যুনিসট নিধন যজ্ঞের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। হেলিকপটার অথবা এরোপ্লেন থেকে এরা প্যারাসুট নিয়ে কোনও একটা অঞ্চলের ওপর নেমে পড়ে। তার পর গ্রেনেড, মেশিনগান আর অটোমেটিক রাইফেল কিংবা খালি বেয়নেট নিয়েই শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গণহত্যা করতে এদের কোনও রকম দ্বিধা নেই। হিংসা আর রক্তের পুরু ছাপ এদের চরিত্রে।

ফোর্ট ব্রাগে থাকাকালীন গ্রিন বেরে আর স্পেশাল ফোর্সের কিছু অফিসার আর সৈনিকের সংগে কথা হল। এদের ট্রেনিং হওয়ার সময় একটা কথা খুব ভাল করে মাথায় ঢোকায়। তা হল - কম্যুনিজম সারা পৃথিবীর শত্রু তাই কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করা একটা মহৎ কাজ। স্বভাবতই এরা সবাই আমেরিকার গ্রেনেডা আক্রমণ সমর্থন করে। প্রেসিডেন্ট রেগানের যুদ্ধবাজ, মারমুখী নীতির বিরুদ্ধে এখন নানান দেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এদেশে এখনও বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে, কম্যুনিজমকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট রেগান ঠিকই করেছেন।

কিন্তু গ্রেনেডার প্রতি আক্রমণ করার সমালোচনা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে কিছু কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে। গ্রেনেডায় সশস্ত্র অনুপ্রবেশের সময় পেনটাগন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলো আমেরিকার জনগণকে অন্ধকারে রেখেছে, এমনকি এদেশের শক্তিশালী প্রেসকে পর্যন্ত গ্রেনেডা অপারেশনের সম্বন্ধে তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়নি। রিপোর্টারদের গ্রেনেডায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটা গোপনভাবে করা হয়েছে। তাই প্রেসিডেন্টের প্রকাশ্য বক্তব্যগুলোর প্রতি সন্দেহ আরও বেড়েছে।

গ্রেনেডা ক্যারিবিয়ানের দ্বীপপুঞ্জগুলোর একটি ছোট দ্বীপ। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত এটি একটি বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। পুরো দ্বীপটা মাত্র একুশ মাইল লম্বা। প্রায় লাখ দেড়েক মানুষের বাস। বেশির ভাগই কালো মানুষ। ইংরেজি এখানকার সরকারি ভাষা। প্রায় তিন বছর আগে মরিস বিশপের নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান হয়। ফলে একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশপের সরকার স্বভাবতই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে একটি অসহনীয় ডেভলপমেন্ট, তার ওপর গ্রেনেডার সংগে পাশাপাশি কিউবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ওয়াশিংটন ভাল চোখে দেখতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকা আর মধ্য আমেরিকার যে দেশেই মারকসবাদী আন্দোলন সোচ্চার হয়েছে পরম্পরাগত ভাবে প্রত্যেকটি মারকিন সরকার এদের বিরোধিতা করেছে। কম্যুনিজমকে ঠেকাতে সবরকমের ব্যবস্থা নিতে আমেরিকা তৈরি।

গত মাসে গ্রেনেডায় আবার এক অভ্যুত্থান হয় এবং এবার মরিস বিশপ এর সরকারের জায়গায় আর একটি মারকসবাদী গ্রুপ ক্ষমতায় আসে। ফলে মারকিন সরকারের সামনে আরও বড় বিপদ দেখা দেয়। দোরগোড়ায় কম্যুনিজমের অবস্থান! যে করেই হোক ঠেকান দরকার। কিন্তু গ্রেনেডা তো একটি স্বাধীন দেশ। গায়ের জোরে সেখানকার সরকারকে হটান তো বেআইনি, অসৎ ও অমানবিক। তাতে কী হয়েছে? প্রেসিডেন্ট রেগানের কাছে এসব কোনও কারণই নয়। তাই গোপনভাবে আদেশ দেওয়া হল মিলিটারিকে যে, দখল করে নাও গ্রেনেডা আর বসাও সেখানে পুতুল সরকার। কিন্তু দেশের মানুষকে বোঝানর জন্য কয়েকটা মিথ্যা কথা বলা দরকার। এবং ইনফরমেশনকে ম্যানিপুলেট করে জনমত জোগাড় করা দরকার।

প্রেসিডেন্ট রেগান টেলিভিশনের এক বক্তৃতায় গ্রেনেডায় মারকিন সেনা পাঠানর দুটি কারণ দেখান। প্রথমটি হল, গ্রেনেডার মেডিকেল কলেজে প্রায় হাজার খানেক আমেরিকান ছাত্রছাত্রীর সুরক্ষা এবং দ্বিতীয়টি, কিউবা গ্রেনেডায় একটি এয়ারপোর্ট তৈরি করছিল যেটি নাকি আমেরিকান বিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহৃত

করা হত।

অনুপ্রবেশ ঘটার পর এখন ধীরে ধীরে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, যার দ্বারা উপরোক্ত দুটি কারণই যে আসল কারণ নয় তা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। প্রথম কারণটি পরীক্ষা করা যাক। মরিস বিশপের সরকারের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয় তার ফলে আমেরিকান ছাত্র ছাত্রীরা কোনও রকমের বিপদের সম্মুখীন হয়নি। একথা জানা যায় সেখানকারই কিছু ছাত্রদের মুখ থেকে। কিছু ছাত্র অবশ্য স্বীকার করে যে তারা ভয় পেয়েছিল অভ্যুত্থানের সময়। কিন্তু একজন ছাত্র নিউ ইয়র্কে তার বন্ধুর সংগে রেডিও যোগাযোগ দ্বারা জানায় যে তাদের কলেজের ওপর কোনও রকম আক্রমণই হয়নি। শুধু তাই নয়, কলেজের একজন কর্মকর্তা জানান যে, ছাত্ররা সবাই নিরাপদেই আছে। তাহলে আমেরিকান ছাত্রদের নিরাপত্তার কারণ দেখানটা যে একটা ছলনা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। যদি তাদের নিরাপত্তাই কারণ ছিল তাহলে মরিস বিশপের মারকসবাদী সরকারের বিরুদ্ধেই কেন আমেরিকান সৈন্য পাঠান হল না

দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ মিলিটারি এয়ারপোরট বানানর কথাটা যে একেবারে ডাহা মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রমাণগুলো দেখা যাক। গ্রেনেডা একটা ছোট দেশ। এদেশের অর্থনীতি নির্ভর করে অনেকটা পর্যটনের ওপর। গ্রেনেডা সরকার পর্যটনের সুবিধার জন্য পয়েনট সালিনাশে একটা ১০০০০ ফুট লম্বা রানওয়ে বানানর কাজ শুরু করেছে যাতে বড় বড় প্লেনগুলো যাত্রীদের নিয়ে নামতে পারে।

কিন্তু রেগান সরকার সবাইকে জানাল যে, এটি একটি মিলিটারি এয়ারপোরট এবং এটি তৈরি হলে সারা মধ্য আমেরিকার নিরাপত্তা শংকায় পড়বে। এবার দেখা যাক ওই এয়ারপোরটটি আদৌ কোনও মিলিটারি কাজে লাগার মত কিনা।

এয়ারপোরটটি বানানর কনট্রাকট পেয়েছে বৃটেনের প্লেসি এয়ারপোরটস (Plessey Airports) কোমপানি। প্লেসি পৃথিবীর অন্যতম এয়ারপোরট বিলডার। আফরিকায় এরা ১৭টি এয়ারপোরট বানাচ্ছে। কেউই এই কোমপানিটিকে কম্যুনিসট সিমপ্যাথাইজার বলবে না। এই কোমপানিরই ম্যানেজিং ডাইরেকটর ডেরিক কলিয়ার কদিন আগে শিকাগো সান টাইমসের মাইক রয়কোর সংগে এক সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, গ্রেনেডায় যে এয়ারপোরট প্লেসি কোমপানি তৈরি করছে তার সংগে মিলিটারি ব্যবস্থার কোনও যোগাযোগই নেই। 'মিলিটারি এয়ারপোরট' এটি একটি হাস্যকর কথা', ডেরিক কলিয়ার বলেন।

ডেরিক কলিয়ার কয়েকটি এমন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন যেগুলো থাকা দরকার যে কোনও মিলিটারি এয়ারপোরটে। এবং সেই ব্যবস্থাগুলো নেই গ্রেনেডার পয়েনট সালিনাশ এয়ারপোরটে।

প্রথমত সমান্তরাল ট্যাকসিওয়ে। যে কোনও মিলিটারি এয়ারপোরটে পাশাপাশি রানওয়ে থাকা দরকার। কেননা একটি রানওয়েতে প্লেন ওঠা ও নামা দুটোই হলে প্লেন চলাচলের গতিতে বাধা পড়ে। গ্রেনেডায় কোনও রকম সমান্তরাল রানওয়ের ব্যবস্থা নেই।

দ্বিতীয়ত, মিলিটারি রাডার এর কোনও রকম ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে না এই এয়ারপোরটে। তাছাড়া মিলিটারি এয়ারপোরটে জ্বালানি স্টোর করার জন্য ট্যাংক সাধারণত মাটির তলায় থাকে। গ্রেনেডার এয়ার পোরটে জ্বালানি রাখার ট্যাংকগুলো সব মাটির ওপর। এবং এদের ক্যাপাসিটিও তুলনামূলকভাবে কম। আনডারগ্রাউনড অস্ত্রশস্ত্র রাখার ভাঁড়ারেরও কোনও ব্যবস্থা নেই এই এয়ারপোরটে। আর মিলিটারি এয়ারপোরটের মাঝে হঠাৎ একখানা বিশাল প্যাসেন জার টারমিনাল থাকার কোনও অর্থ হয় না।

প্লেসি কোমপানির ইনজিনিয়াররা এয়ারপোরটের সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করছেন। তারা কেউই মনে করেন না যে এই এয়ারপোরটটি মিলিটারি অপারেশনে ব্যবহার করার জন্য করে তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডেরিক কলিয়ার বলেছেন যে প্লেসি কোমপানির দ্বারা তৈরি করা ডিজাইন ও নানান প্রজেকটের ছবি যে কোনও কাউকে দেখাতে রাজি আছেন। কোনও এয়ারপোরট বিশেষজ্ঞই বলবেন না যে এটি একটি মিলিটারি এয়ারপোরট।

প্লেসি কোমপানি অথবা ডেরিক কলিয়ার পুরোপুরি ব্যবসায়ী। এদের ব্যবসা নিয়েই কথা। 'মিলিটারি এয়ারপোরটের' কথাটা তাই এদের বক্তব্য মত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল। রেগান সরকার স্বভাবতই এর কোনও উত্তর দেয়নি এখনও। উত্তর দেবার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই।

আসল কথা হল আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী সরকার সমাজতন্ত্র, মারকসবাদ অথবা গণ অভ্যুত্থান সহ্য করতে পারে না। ভিয়েতনামে মার খাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার পলিসি মেকাররা নতুনভাবে চিন্তা করতে শেখেনি। এই ছলনার রাজনীতি এখন তাই মারকিন প্রেস ও জনসাধারণকেও বিভ্রান্ত করছে। দুটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। গ্রেনেডায় অনুপ্রবেশ হওয়ার পরদিনই ডিফেনস সেকরেটারি ক্যাসপার ওয়াইনবারগার এক প্রেস কনফারেনসে ঘোষণা করেন যে গ্রেনেডায় একটি জেলে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীরা কিছু সিভিলিয়ানকে হোসটেজ করে রেখেছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন রিপোরটাররা সেখানে পৌঁছায় তারা পুরো জেলখানাটা একেবারে ফাঁকা পায়। ওখানে কোনসময়ই সিভি লিয়ানদের হোসটেজ হিসাবে ধরে রাখা হয়নি। তাছাড়া গ্রেনেডায় যখন মারকিন সৈন্যরা আক্রমণ চালাচ্ছিল তখন একটি পাগলাগারদের ওপর বোমাবর্ষণ করে ফাইটার প্লেন। এই কথাটা পুরো চেপে যায় ডিফেনস ডিপারটমেনট। পরে সাংবাদিকরা আবিষ্কার করে যে বেশ কিছু উন্মাদ রোগী ওই আক্রমণে মারা গেছেন।

আক্রমণ চলাকালীন আমেরিকান সরকার বার বার ঘোষণা করে যে কিউবান সৈন্যরা প্রতিরোধ খাড়া করেছে। কিন্তু সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে গ্রেনেডায় ওই সময়ে মাত্র ৭৫০ জন কিউবান কর্মী ছিল। এদের মধ্যে বেশির ভাগই পয়েনট সালিনাশের ওই এয়ারপোরট তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। তাহলে কারা সাতদিন ধরে শক্তিশালী মারকিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে? সহজেই বোঝা যায় যে গ্রেনেডার সাধারণ মানুষ ও সেনাবাহিনী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মারমুখী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে। একথা স্বভাবতই রেগান সরকার স্বীকার করতে রাজি নয়। কেননা তাহলে দেশ দখলের আসল কারণগুলো ধরা পড়ে যাবে। মধ্য আমেরিকার ইতিহাসে মারকিন মাথা গলানর নজির প্রচুর। গুয়াতেমালায় এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় ১৯৫৪ সালে আমেরিকা, ডমিনিকান রিপাবলিকে ১৯৬৫ সালে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় চিলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় মারকিন এজেন-সিরা ১৯৭১ সালে। আর এখন নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সানদিনিসতা সরকারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ঢালছে রেগান সরকার, বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটাতে।

আমেরিকার বিদেশ নীতির আসল চেহারা কী তা পরিষ্কার বোঝা গেল গ্রেনাডার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে। মারকিন অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার খাতিরে এখানকার শাসকচক্র যে কোন জঘন্য কাজ করতে তৈরি। এশিয়া, আফরিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সামনে মারকিন সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারা আবার ফুটে উঠেছে। গ্রেনেডা দখল এত অমানবিক যে পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলো পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করেছে। আজ গ্রেনেডা, কাল নিকারাগুয়া, পরশু.....

তাই সাম্রাজ্যবাদী এই ভয়াবহ দানবের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী দেশগুলোর এখনই জোট বাঁধা দরকার। □

চলতি ঘটনা

বিমানে বোমা নিয়ে 'আই এ' কর্তৃপক্ষের নির্মম রসিকতা

অশোক চৌধুরী

বিমান যখন ঊর্ধ্ব আকাশে তখন হঠাৎ যদি শোনেন [illegible] সেবিকার ঘোষণা : বিমানের ভেতর কোন জায়গায় বোমা রাখা আছে তখন যাত্রীদের মনের অবস্থা কী রকম হয়? পরিবর্তনের প্রধান সম্পাদক অশোক চৌধুরীর কদিন আগে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। গত ৯ ডিসেম্বর তিনি কলকাতা [illegible] যাচ্ছিলেন দিল্লি। [illegible]

৯ ডিসেম্বর সকাল ছটা পঁচিশ। দিল্লি যাওয়ার জন্য এয়ার-বাস তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরাও বসে আছেন কিন্তু রওনা না হওয়ার কারণ একজন যাত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিমান না হয়ে অন্য কিছু হলে দেরি করার দরকার ছিল না। যে ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে তিনি প্রবেশপত্র নিয়ে নিয়েছেন। এটা না হলেও তাঁকে ফেলে চলে যাওয়া যেত। শুধু টিকিট কাটা থাকলে এই অপেক্ষার দরকার ছিল না। তিনি গেলেন কি গেলেন না এ ব্যাপারে ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের মাথাব্যথা ছিল না। প্রবেশপত্র নেওয়া মানেই তাঁর স্যুটকেস বিমানে তোলা হয়েছে। এবং এই স্যুটকেসের মধ্যে একটি টাইম বোমা থাকাও বিচিত্র নয়। সুতরাং ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতে হবেই। সব যাত্রী বিমানে আসন গ্রহণ করলেই এয়ার-লাইনস নিশ্চিন্ত হয়ে যায় বিমানে টাইম বোমা নেই। কারণ বোমা রেখে কেউই সেই বিমানে থাকতে চাইবেন না। মরতে কে চান?

এই রকম একটি খোঁজাখুঁজির খবর বেরিয়েছিল কাগজে। একজন যাত্রীকে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিমান প্রায় চার ঘণ্টা লেট। এক সময় এক ভদ্রমহিলা বললেন আমি দুটি প্রবেশপত্র নিয়েছি অথচ আমি একা। তাই আপনারা একজনকে পাচ্ছেন না। তাঁর একার জন্য দুটি টিকিট কেটে দুটি প্রবেশপত্র নেওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি খুব সহজভাবে উত্তর দিয়েছিলেন 'আপনাদের নিয়ম আছে ছ'মাসের বেশি বয়সের বাচ্চাদের জন্য টিকিট কাটতে হবে। আমার গর্ভে যে বাচ্চাটি আছে তার বয়স ছয়ের বেশি তাই টিকিট কেটেছি এবং আপনারাও প্রবেশপত্র দিয়েছেন।'

এখন খোঁজাখুঁজি প্রায়ই করতে হয়। এই জন্য বিমান ঠিক সময়ে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এর মূল কারণ আমরা আইন অনুসরণ করছি বিদেশের এবং যাত্রীরা ভারতীয়। আমরা ভারতীয়রা এখনও একটা মূল বিষয়ে সজাগ হতে পারিনি। আমরা এখনও ভাবতে শিখিনি আমার জন্য অপরের যাতে অসুবিধা না হয়। বরং নিজের সুবিধা দেখতে পারলেই আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি। সকালের বিমানে এমন অনেক বড় সাহেব আছেন যাঁরা নিজেরা রিপোর্টিং টাইমে না এসে কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেন। তাঁরা প্রবেশপত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকেন সাহেবের অপেক্ষায়। সাহেব জানেন তিনি না যাওয়া পর্যন্ত বিমান ছাড়বে না। তাই তিনি তাঁর সুবিধা মত সময়ে আসেন। ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের এখনই আইন করে দেওয়া উচিত যাত্রী নিজে না এলে প্রবেশপত্র দেওয়া হবে না। তা করলে একজনের জন্য আর একজনের কাজ নষ্ট হবে না। এবং ইনডিয়ান এয়ারলাইনসেরও অনেক টাকা ওভার টাইম হিসাবে বাঁচবে।

যে কথা বলতে বলতে অনেক দূরে চলে এসেছি সে প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। সেদিন দিল্লি যাওয়ার জন্য যে বিমানটি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল আমিও ছিলাম সেই বিমানের একজন যাত্রী। বিমানটির ডানার ওপরের জানলার ধারের ১১এ আসনে বসে অপেক্ষা করছিলাম কখন সেই ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যায়। তখন সাতটা বাজতে দশ। ভদ্রলোক বিমানে আসন গ্রহণ করার পর আমরা রওনা হলাম। যদিও বিমানটির ছাড়ার কথা ছিল সাড়ে ছটায়।

আধঘণ্টা ওড়ার পর আমাদের সকালবেলার খাবার দেওয়া হল। তবে খেতে ইচ্ছা করছিল না কারণ খাবার পর চা বা কফি দেওয়া হবে না বলে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা তাদের নিতে হয়েছে যেহেতু জল গরম করার মেশিন খারাপ হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না বিমান ছাড়ার আগে এটা দেখে নেওয়া হল না কেন। অনেকেই চা না খেয়ে বেরিয়েছেন এটা তাঁদের ভাবা উচিত ছিল। আর চা না খেলে মাথা ধরে এবং মাথা ধরলে কাজ করা সম্ভব হয় না এটা সবারই জানা।

সবারই খাওয়া হয়ে গেছে। বিমান সেবিকারা ট্রেগুলি সংগ্রহ করে নিয়েও গেছেন। তখন আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক ওড়া হয়ে গেছে। আর এক ঘণ্টা উড়লেই দিল্লি পৌঁছে যাওয়ার কথা। এমন সময় কাঁপা কাঁপা সুরে পাইলট ঘোষণা করলেন - টেকনিকাল প্রবলেমের জন্য আমরা কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সবার মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমার মাথায় যে ভাবনা এল তা বোধহয় সবারই মাথায় এসেছিল। এমন কোন প্রবলেম তৈরি হয়নি তো যার ফলে কলকাতায়ও পৌঁছান যাবে না।

একটু পরের আর একটি ঘোষণা উৎকণ্ঠাকে চরমে পৌঁছে দিল। বলা হল - আমাদের বিমানে নাকি একটি টাইম বোমা রাখা আছে। ওই খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই নিশ্চয়ই ভাবছিলেন যেকোন সময় বোমাটি ফেটে যাবে এবং আর প্রিয়জনের মুখ দেখা হবে না। বিমানেই জীবনের চলার পথ শেষ হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত বোমা ফাটল না। এবং প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা সবাই বিমান থেকে নেমে এলাম কলকাতা বিমান বন্দরে। নেমেই দেখলাম বন্দুক হাতে নিরাপত্তারক্ষীরা বিমানটিকে ঘিরে রেখেছে। আমরা বাসে করে লাউনজে চলে এলাম।

নিজের পয়সায় এককাপ চা খেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কোন খবর দেওয়া হল না বিমানে বোমা খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা এবং দিল্লি যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হল কিনা। প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘোষণা করা হল - যাঁরা বিমানে মাল বুক করাননি এবং যাত্রা বাতিল করতে চান তাঁরা দিল্লির কাউনটারে যোগাযোগ করুন। কয়েকজন গেলেন এবং যাত্রা বাতিল করে দিলেন। আমি স্যুটকেস বুক করিয়েছিলাম তাই পরের ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আরও আধঘণ্টা পরে আর কোন ঘোষণা না হওয়ায় দিল্লি কাউন্টারে গেলাম খোঁজ-খবর করতে। জানতে পারলাম আমি যাত্রা বাতিল করতে চাইলে মাল সনাক্ত করে টিকিটের ওপর তাঁদের মন্তব্য লিখিয়ে বাড়ি যেতে পারি। বিমান কখন যাবে ঠিক নেই। তবে কাউকে সব রকমের নিয়ম না মানিয়ে বাড়ি যেতে দেওয়া হবে না। মাল সনাক্ত করে বাড়ি যেতে চাইলে বলা হল – এখনও মাল পরীক্ষা করা শেষ হয়নি। হলে জানানো হবে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন অফিসারকে ধরতে তিনি বললেন, টিকিটে মন্তব্য লিখিয়ে আসুন এবং এক সঙ্গে কয়েকজন হলে আমি মাল সনাক্ত করার জন্য নিয়ে যাব। তাঁর নির্দেশ মত কাজ করে দেখা করতে তিনি আটজনকে বাসে করে মালের কাছে নিয়ে গেলেন। ওগুলি বিমানের কাছে সারি করে রাখা ছিল গোল করে ঘিরে থাকা নিরাপত্তা কর্মীদের মাঝখানে। প্রত্যেকের সঙ্গে একজন কর্মী রইলেন মাল সনাক্ত করার জন্য। এক সময় মাল নিয়ে [illegible] আমরা ফিরে এলাম এবং ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম বাড়ি ফিরব বলে।

এইবারে বলা যাক বোমা রাখা হয়েছে এই খবরটা ইনডিয়ান এয়ার-লাইনস জানল কী করে। তাঁরা নাকি অজানা এক ব্যক্তির ফোন পেয়ে একথা জানতে পেরেছিলেন। আমি যখন বলেছিলাম এটা ছেলে-মানুষিও তো হতে পারে। তখন তার উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন — যাই হোক আমরা আপনাদের জীবন নিয়ে খেলা তো করতে পারি না। তাই এখানে ফিরিয়ে এনেছি। কথাটা শুনে হতাশায় মন ভরে গিয়েছিল। বিমানে চাপার সময় তাহলে [illegible] নিতে হবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেও পারি বা ফেরতও আসতে পারি। কারোর সঙ্গে দেখা করার থাকলে তাকে বলে দিতে হবে দেখা করতেও পারি নাও পারি। সবটাই নির্ভর করবে কেউ ফোন করে বোমা রাখার খবর দিল কিনা তার ওপরে। অথচ বিমানে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা সবাই জরুরী কাজেই তা করেন।

এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কী ভাববেন তাঁরাই জানেন। তবে আর একটা ব্যাপারে বলব এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। বিমানে অবস্থান করার সময় কখনই যেন বলা না হয় — টেকনিকাল প্রবলেম বা বোমা রাখার জন্য আমরা ফিরে যাচ্ছি। বিমানে অনেক অসুস্থ লোকও থাকতে পারেন। বোমা সঙ্গে করে চলেছেন জানতে পারলে যে কোন সুস্থ লোকেরই অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা। অসুস্থ লোকেদের মারাত্মক কিছুও হয়ে যেতে পারে। কিছু ঘোষণা না করেই সেদিনকার দিল্লির বিমানটিকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা যেত। পরে তাঁদের জানানো যেত কেন ফিরিয়ে আনা হল। ☐

বোমবের ফিলমোৎসব শুরু হতে চলেছে অনেক সমস্যা মাথায় নিয়ে

কলিন পাল

ফিলমের শহর বোমবের বুকে শুরু হতে চলেছে ফিলমোৎসব '৮৪, আট বছর বাদে আবার। ১৯৫২-র জানুয়ারিতে ভারতের প্রথম যে চলচ্চিত্র উৎসবের জন্ম হয় এই বোমবের বুকে, সেই উৎসবের পর অনেকগুলো বছর বাদে এবারের বোমবের এই চলচ্চিত্র উৎসবের তফাৎ অনেক। আয়তনে এবং আয়োজনে। সেবার এসেছিল ৭৯টি চলচ্চিত্র, এবার এর মধ্যেই দেড়-শোরও বেশি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে গেছে।

সেই ৫২ সালে ফিলমোৎসবের শুরু এদেশে। তারপর তিন দশক কেটে গেছে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে কমেনি ফিলমোৎসবের গুরুত্ব, চাকচিক্য। বরং বেড়েছে। ৫২-সালে সেই প্রথম, বিদেশি সিনেমা সম্পর্কে এখানকার দর্শকদের যে হলিউডি বা ইংল্যনডীয় ধারণা ছিল, তা ভেঙে যায়। ভেঙে যায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা শিল্পরসে জারিত সেই সব সিনেমার ধাক্কায়, যা সহজে এদেশে আসে না। তার ভেতর ছিল ইতালি এবং ফ্রানস থেকে আসা নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্রও। সেবার ছিল ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিভস', 'মিরাকল ইন মিলান', রোজেলিনির 'ওপেন সিটি', 'পাইসান', দা সানতিসের 'বিটার রাইস', কুরোসাওয়ার 'রসোমন', চিয়াউরেলির 'ফল অব বার্লিন'। অংশগ্রহণকারী দেশ ছিল তেইশটি ভারতকে নিয়ে। আর ভারতের পক্ষে ছায়াছবি ছিল রাজকাপুরের 'আওয়ারা', ভি শান্তারামের 'অমর ভূপালি', আর ভি রেড্ডির 'পটল ভৈরবি' আর অগ্রদূতের 'বাবলা'। ভাবতে পারেন একটা চলচ্চিত্র উৎসবে এইসব ঝকঝকে ছবিগুলো একসংগে দেখার কথা! তবু আরো ভাল চলচ্চিত্র এদেশে তৈরি হওয়ার তখনও বাকি ছিল। তখনও আসেননি সত্যজিৎ রায়। বোধ হয় ৫২-র সেই ফিলমোৎসবই আগামী ভাল ছবিগুলোর পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল। সেই ফিলমোৎসবের পরই একটা পুরো প্রজন্ম যেন হঠাৎ ভাবতে শিখল এই দেশের চলচ্চিত্র ঝকঝকে বিদেশি প্রতিভার পাশে যেন বড় ম্রিয়মাণ, গুণাগুণে যেন অনেক ছোট।

৫২-র সেই উৎসবের পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে আট-আটটা প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আর পাঁচটা ফিলমোৎসব। বোমবের এই আগামী ফিলমোৎসব হতে চলেছে এদেশের ষষ্ঠ ফিলমোৎসব। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার ফিলমোৎসব ৮৪ শুরু হতে যখন আর দু সপ্তাহের মত সময় বাকি তখন কিন্তু ফিলমোৎসব সম্পর্কে পুরোপুরি কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে তা পুরোটাই ভাসাভাসা। মাঝখানে তো এমনও মনে হয়েছিল এই ফিলমোৎসব না বন্ধ করে দেওয়া হয়! ন্যাশনাল ফিলম ডেভেলপমেনট করপোরেশন (এন এফ ডি সি)-এর অধীনস্থ ডাইরেকটরেট অব ফিলম ফেসটিভ্যালস সরকারিভাবে এই ফিলমোৎসবের আয়োজন এবং দায়িত্বভার পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। নভেমবরের গোড়া পর্যন্ত এন এফ ডি সি-তে না ছিলেন কোন চেয়ারম্যান, কোন ম্যানেজিং ডাইরেকটর অথবা ডাইরেকটর অব ফিলম ফেসটিভ্যালস। তার ওপর আবার এন এফ ডি সি-র কর্মচারীরা দিয়েছিল ধর্মঘটের হুমকি। অবশ্য অবস্থা সামাল দেওয়া হয়েছিল কোনভাবে। শেষ মুহূর্তে মালতি তাম্বে বৈদ্যকে ম্যানেজিং ডাইরেকটরের পদে আরও একবছরের জন্য বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হল, আর বীরেন্দ্র লুথারকে করা হল ডাইরেকটর অব ফিলম ফেসটিভ্যালস। আর ২০ নভেমবর ঘোষণা করা হল প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক হৃষীকেশ মুখারজিকে এন এফ ডি সি-র চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হল। এর আগের চেয়ারম্যান ডি ভি এস রাজুর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর এই পদটি খালিই পড়ে ছিল।

কিন্তু এসব ছাড়াও ঝক্কাটের শেষ নেই। এই ফিলমোৎসবে খবরের কাগজ এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর। কিন্তু প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো নভেমবর মাসে প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিল কমনওয়েলথ সম্মেলন নিয়ে। কাজেই তারা ফিলমোৎসব নিয়ে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে একটুও রাজি ছিল না। কাজেই ৩ ডিসেমবর এন এফ ডি সি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার আগে পর্যন্ত সাংবাদিকরা ফিলমোৎসব সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতে পারেননি। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনেই প্রথম হৃষীকেশ মুখারজি আর বীরেন্দ্র লুথার জানালেন বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় একশো জনের মত প্রতিনিধি এই ফিলমোৎসবে আসবেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কোসটা গাভরাস, গোদার, আঁদ্রে ওয়াদা, বেন বারকা, জেরালডিন চ্যাপলিন এবং স্ট্যানলি ক্র্যামার। ফিলমোৎসবের ইনফরমেশন বিভাগে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রানস আর পশ্চিম জারমানির ছবিগুলো। এই উৎসবে 'ফোকাস অন আফরিকা' বলে একটি নতুন বিভাগ খোলা হবে। হয়ত তৃতীয় বিশ্বের দিকে তাকিয়েই এই নতুন বিভাগ খোলার আয়োজন। এছাড়া, আফরিকা থেকেও প্রায় কুড়িটির মত চলচ্চিত্র আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিকল্পনা আছে আরো অনেক। নাগিসা ওসিমা, গুরু দত্ত আর প্রমথেশ বড়ুয়ার ওপর রেট্রসপেকটিভ করা যায় কিনা তাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়া ১৬ মিলিমিটারের ফিচার এবং তথ্যচিত্র বিনামূল্যে জনসাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা ভারতে এই প্রথম।

এই উৎসবে সংবাদমাধ্যম আর প্রতিনিধিদের ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বোমবের সব থেকে বড় সিনেমা হল ১৭৫৯টি আসন বিশিষ্ট মেট্রোতে। এই হলের সাড়ে তিনশোটি আসন রাখা হবে সাংবাদিক আর আলোকচিত্রীদের জন্য। এখানে বলা দরকার সাড়ে তিনশো সাংবাদিক আর আলোকচিত্রীকে এই উৎসবের প্রবেশপত্র দেওয়া হবে। এছাড়া বারোশোর মত আসন থাকবে প্রতিনিধি ও ফিলমোৎসবের কর্মকর্তাদের জন্য সংরক্ষিত। অবশ্য এর মধ্যে আবার আসন নিয়েও কিন্তু লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এই লড়াই চলছে ইনডিয়ান মোশান পিকচারস অ্যাসোসিয়েশনের বোমবে শাখার সংগে দক্ষিণ ভারতের চিত্র প্রযোজকদের। দক্ষিণ ভারতের চিত্র প্রযোজকরা এর মধ্যেই সাতশোটি আসন দাবি করে বসে আছেন। অথচ পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিদের জায়গা দিয়ে সাড়ে তিনশোর বেশি আসন কোনমতেই বোমবে চলচ্চিত্র জগতের লোকজনদের জন্য থাকে না। অবশ্য আই এম পি-এ-র বর্তমান সভাপতি শ্রীরাম ভোরা অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করেছেন। তিনি চলচ্চিত্র জগতের লোকজনদের জন্য মাত্র একসপ্তাহ বলবৎ থাকবে এমন ডেলিগেট কারড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। এর ফলে একজন যদি প্রথম সপ্তাহে ফিলমোৎসব দেখেন তবে দ্বিতীয় তিনি আর দেখতে পারবেন না, সেখানে তার জায়গায় আরেকজন দেখবেন। কিন্তু ভোরার দেওয়া এই মতামতে অনেকেই সন্তুষ্ট নন। কাজেই আসন নিয়ে যে সমস্যা ছিল তা থেকেই গেছে।

ফিলমোৎসব ৮৪ শুরু হচ্ছে আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে। প্রথম দিন দেখান হবে মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর'। কিন্তু ফিলমোৎসব যখন একরকম দরজায় গোড়ায় এসে পড়েছে, তখনও কিন্তু ফিলমোৎসব নিয়ে বোমবাইয়ের কোন মহলই তেমনভাবে সরব নয়। এই শহরের অনেক লোক এখনও হয়ত জানেনই না যে এরকম একটা জমজমাট ফিলমের উৎসব আর কয়েকদিনের ভেতরই বোমবের বুকে শুরু হতে চলেছে। এখনও ফিলমোৎসব নিয়ে বোমবেতে কোন প্রচার নেই, নেই তেমনভাবে কোন আয়োজনও। তবু এন এফ ডি সি এখনও যে কেন সতর্ক হচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছে না। তারা হয়ত ভুলে গেছে ঠিকমত প্রচার না হওয়ার ফলেই নয়া দিল্লির নবম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব জনসাধারণের কাছ থেকে কোন সাড়া পায়নি। ফিলমোৎসব ৮৪তেও যদি ঐ একই ঘটনা হয়, তাহলে হয়ত এদেশে ফিলম উৎসবের ভবিষ্যৎই চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।

সব শেষে বলি এই ফিলমোৎসবে ইনডিয়ান প্যানোরামার কথা। প্যানোরামায় কী কী ভারতীয় ছবি দেখান হবে তা এখন পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি। আর সবথেকে দুঃখের কথা যখন এন এফ ডি সি একদিকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ১৬ মিলিমিটারে তৈরি ছবির আরো প্রসারের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবে, ঠিক তখনই এই ফিলমোৎসবের ইনডিয়ান প্যানোরামায় ১৬ মিলিমিটারের ছবিকে বাদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। ব্যাপারটা দুঃখের এবং অবাক হওয়ার মতও! তবে অবশ্য বিক্রম সিং নামে ফিলমোৎসবের এক কর্তাব্যক্তির মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা কিছুটা হালকা হয়েছে। এখন ঠিক করা হয়েছে ১৬ মিলিমিটারে যদি সেরকম কোন ভাল ছবি পাওয়া যায় তাহলে দেখান হবে। হলেই ভাল। তাহলে অন্তত তথ্যচিত্র পরিচালকরা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন। বিদেশের বাজারে তাদের ছবি বিক্রির সুযোগও কিছুটা বাড়বে। তবে সব ঝামেলা-ঝক্কাট বাদ দিয়ে ফিলমোৎসব এখন কতটা নির্বিঘ্নে হয় সেটাই দেখা যাক। ☐

মাদরাজ থেকে কলিন পাল

গত ২৬ সেপটেমবর ভোরবেলা মধ্য মাদরাজের সম্ভ্রান্ত এবং শৌখিন অঞ্চলের মানুষদের ঘুম ভাঙল পরপর তিনটে বিকট শব্দে। প্রথমটা ওই অঞ্চলের মানুষজন একটু চমকে গেলেও ভেবেছিলেন ওটা বোধহয় কোন গাড়ির টায়ার ফাটার শব্দ। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙল একটু পরেই। ঐ ঘুম-ভাঙানিয়া তিনটে শব্দই ছিল গুলির। ভেসে এসেছিল ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা দক্ষিণী চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত পুরুষ জেমিনি গণেশনের বাড়ি থেকে।

তামিল চলচ্চিত্র জগতে জেমিনি গণেশন সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে পড়েন যারা কয়েক দশক ধরে রাজার মত সাম্রাজ্য চালিয়ে গেছেন। অবশ্য এম জি আর বা শিবাজি গণেশনের মত সর্বার্থে সেলুলয়েডের দেবতা না হয়ে উঠলেও জনপ্রিয়তা জেমিনি গণেশনেরও কিছু কম ছিল না। সেই জনপ্রিয়তা একেবারে হালের কমল হাসান বা রজনীকান্ত রুপোলি পর্দায় আসার আগে অবধি ছিল।

রুপোলি পর্দার এই মানুষটার আর একটা বড় পরিচিতি ছিল তার ঘন ঘন হৃদয় দুর্বলতার জন্য। বহু নারীর মন-হরণকারী এই পুরুষ-মানুষটি রক্ষণশীল তামিল সম্প্রদায়ের ভেতরে থেকেও সমস্ত রক্ষণশীলতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বেশ কয়েকবার মালা বদল করেছিলেন। বম্বের বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী রেখা এই জেমিনি গণেশনেরই মেয়ে। অবশ্য দীর্ঘদিন পরে মাত্র কয়েকবছর আগে গণেশন রেখার পিতৃত্ব স্বীকার করতে রাজি হয়েছেন।

২৬ সেপটেমবরের ঐ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই জেমিনি গণেশনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নারসিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। যে নারসিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটি আবার চালান তাঁর মেয়ে এবং জামাই। সেখানে ছ ঘণ্টা অপারেশনের পরে তাঁর গলা থেকে একটা বুলেট বের করা হয়। অপারেশনের পর গণেশন ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠলেও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলেন না।

ঐ ঘটনার পর থেকেই মাদরাজের বিভিন্ন মহলে জোর গুঞ্জন চালু হয়ে গেল। কেউ এটাকে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা বলে রটিয়ে দিলেন, কেউ কেউ বললেন গণেশনকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু নারসিং হোম থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম বিবৃতি দেওয়া হল। তাঁরা বললেন, গণেশন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন। জেমিনি গণেশনের মেয়ে এবং জামাতা ডাঃ শেলভারাজ কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। অথচ গণেশনের অনেক প্রতিবেশীই পরপর তিনবার গুলি চালানর আওয়াজ শুনেছেন বলে স্বীকার করেন। বিভিন্ন মহলে সন্দেহ আরো প্রবল হয়ে উঠল যখন স্থানীয় সাংবাদিকদের নারসিং হোমে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল না।

সেপটেমবরের ২৮ তারিখে মাদরাজের সান্ধ্য দৈনিক নিউজ টুডে-র প্রতিবেদককে খুব অল্প সময়ের জন্য গণেশনের সংগে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হল। ঐ প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদনে জানান, গণেশন সব সময়ই ঘোরের ভেতর বিড়বিড় করে বলছিলেন, আমি আত্মহত্যা করতে চাইনি। এর ভেতর অবশ্য পুলিশও তদন্ত শুরু করে দিয়েছিল। এমনকি, জেমিনি গণেশনকে নারসিং হোমে ভর্তি করার পেছনে কী কারণ ছিল তা খতিয়ে দেখার জন্য চিকিৎসকদের একটি দলও নিয়োগ করা হয়েছিল। গণেশনের ছেলে এবং পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও জেরা করা হল। তাঁরা আবার সম্পূর্ণ নতুন কথা শোনালেন। তাঁরা বললেন, গণেশনের হারট অ্যাটাক হয়েছিল। অবশ্য পুলিশ থেকে যে চিকিৎসক দলকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা অন্য রিপোরট দিলেন। তাঁদের রিপোরটে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, গণেশন বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। এমনকি গণেশনকে হয়ত দ্বিতীয়বারের জন্যও অপারেশন করা হতে পারে। কারণ তাঁর শরীর থেকে বুলেট বের করা সম্ভব হয়নি। কাজেই গণেশনের সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া বা হারট অ্যাটাকের কথাগুলো যে সাজান তা বোঝাই যায়। এমনকি ডাঃ আরুমুখানের নেতৃত্বে ঐ চিকিৎসকদল যখন গণেশনকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করার কথা বলেছিলেন তখন তাঁর বাড়ি থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

গত ৩ অকটোবর গণেশন পুলিশের কাছে একটি লিখিত বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি জানালেন, রিভলবার সাফ করার সময় হঠাৎ তা থেকে গুলি ছুটে গিয়েই তিনি আহত হন।

ঐ বিবৃতিতে গণেশন আরও জানান, তিনি তাঁর ছেলে সতীশকে ইনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করানর জন্য বাঙালোর যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। প্রত্যেকবারই তিনি মাদরাজের বাইরে কোথাও গেলে কোন একটা আগ্নেয়াস্ত্র সংগে করে নিয়ে যান। এবারও ঐ রিভলবারটা নিয়ে যাবেন বলেই ওটা পরিষ্কার করার দরকার হয়েছিল। দুর্ঘটনা যেদিন ঘটে তার আগের দিন তাঁর বেশ ঠাণ্ডা লেগেছিল। ঠাণ্ডা কাটানর জন্য তিনি একটা পাঁচতারা হোটেলে গিয়ে মদ্যপান করেন। মদ্যপানের মাত্রা তাঁর একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। তাই পরদিন সকালেও তিনি পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। ঐ অবস্থাতেই রিভলবার পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গণেশন পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন সময় এরকম পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি দেওয়ায় পুলিশ জেমিনি গণেশনের এবারের বিবৃতিটিও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশেষত গণেশন নিজে এরকম বিবৃতি দেওয়ার পরও কিন্তু তাঁর মেয়ে-জামাই বলে যাচ্ছেন তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েই আঘাত পেয়েছিলেন।

মাদরাজের চলচ্চিত্র-জগতে অবশ্য এরকম ঘটনা নতুন কিছু নয়। মাত্র কয়েক বছরের ভেতরেই এরকম ঘটনা আরও অনেক ঘটে গেছে। বছর কয়েক আগেই দুজন দক্ষিণী চিত্রাভিনেত্রী আত্মহত্যা করেছেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ও একসময়ের জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা এম জি আর-কে কয়েক বছর আগে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। এছাড়া কিছুদিন আগেই চিত্রপরিচালক বালু মহেন্দ্র-র স্ত্রী চিত্রাভিনেত্রী শোভা মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুরহস্য এখনও পর্যন্ত আবৃতই থেকে গেল। কাজেই মাদরাজের চলচ্চিত্র জগতে জেমিনি গণেশনকে কেন্দ্র করে আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংযোজন ঘটল। এখন দেখার ব্যাপার, মাদরাজ চলচ্চিত্র জগতের অন্যান্য রহস্যজনক ঘটনার মত গণেশনের ঘটনাটিও রহস্যই থেকে যায়, নাকি এর সমাধান হয়। □

জেমিনি গণেশন ও রেখা

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রতিষেধক পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করবে

তপন দাস

সময় এগিয়েছে। এগিয়েছে গ্রামীণ জীবনযাত্রাও। চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, রোগ প্রতিষেধক বেরিয়েছে, সেই সঙ্গে সচেতন হয়েছে গ্রামীণ মানুষও। তার ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ গ্রাম গঞ্জ থেকে অনেকটা দূর হয়েছে। ম্যালেরিয়ার রূপ এখন আর অতটা ভয়বহ নয়।

ম্যালেরিয়া প্রায় উধাও হয়ে যেতে বসেছিল এ দেশ থেকে, তা আবার সম্ভবত ফিরে এল। এই বছরই ম্যালেরিয়ার আক্রমণের কথা আবার শোনা গেছে। এমনকি, এর মধ্যে বেশ কিছু লোক মারাও গেছেন এর প্রকোপে। শুধু তাই নয়, এই মৃত্যুর হার নাকি আগের বছরগুলো থেকে কোন অংশেই খুব কম নয়। এ খবরটা মোটেই ভাল নয়, বরং কিছুটা দুশ্চিন্তারই। আর আরো দুশ্চিন্তার বিষয় যেটা তা হল, প্রতিবছরই এই রোগের ধরন ধারণগুলো এমনভাবে পাল্টাচ্ছে যে ডাক্তারদের পক্ষে প্রথমদিকে সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করাই খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে। এ ছাড়াও দিনে দিনে এই রোগ আগের থেকেও এমন মারাত্মক হয়ে উঠছে যে, ম্যালেরিয়ার জন্য আগে যেসব ওষুধ ব্যবহার করলেই কাজ দিত, সে ওষুধ আর কাজে লাগছে না। শুধুমাত্র এই একটা কারণেই সাম্প্রতিককালে উত্তরপ্রদেশে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রায় দুশো লোক মারা গিয়েছেন।

শুধু এই বছরই নয়, গতবছরও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দেখা গিয়েছিল। খোদ দিল্লিতেই এশিয়ান গেমসের সময় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন অনেকে। অনেকের ধারণা পাকিস্তানে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা জীবাণু নিয়ে যে গবেষণা চালাচ্ছিলেন তারই ফল এটা। এমনকি, এখনও অনেকে মনে করেন ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনারা ভিয়েৎনামে যে জীবাণু বাহিত পদার্থ ছড়িয়েছিল তারই ফলে নাকি পরবর্তীকালে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফরিকার দেশগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়।

অবশ্য শুধু ভারতবর্ষের লোকেরাই যে ম্যালেরিয়ার এই প্রচণ্ড আক্রমণে জর্জরিত একথা মনে করলে ভুল হবে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরো অনেক দেশেই এখন ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ ভাগ এখনও ম্যালেরিয়ার বিপদ বুকে নিয়ে বসবাস করে। তাদের মতে, আফরিকায় প্রতি বছর চোদ্দ বছরের নিচে যাদের বয়স এমন প্রায় ১০ লক্ষ শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ম্যালেরিয়া দূর করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট এবং একটা প্রশংসনীয় ভূমিকাও পালন করে যাচ্ছে। তাদের চেষ্টায় অসট্রেলিয়া, ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর আফরিকার কিয়দংশ থেকে ম্যালেরিয়া একেবারেই দূর করা গেছে।

ম্যালেরিয়া দূর করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নেরও যথেষ্ট অবদান আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের দেশ থেকে বহুদিন আগেই ম্যালেরিয়া দূর করতে সমর্থ হয়েছে। এখন তারা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ম্যালেরিয়া দূর করার ব্যাপারে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে সক্রিয় সাহায্য করে যাচ্ছে। মসকোয় মারটসিনোভসকি ইনসটিটিউট অব মেডিকাল প্যারাসাইটোলজি অ্যানড টপিকাল মেডিসিনে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে ডাক্তারি শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এশিয়া, আফরিকা এবং লাতিন আমেরিকার প্রায় একশোটি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে এখানে শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন। মারটসিনোভসকি ইনসটিটিউট ম্যালেরিয়ার ওপর একটা নতুন ধরনের প্রতি

যেকেও বের করেছে। নাম দিয়েছে 'ভ্যাবেটিন'। খুব তাড়াতাড়ি এটা সরকারি সব হাসপাতালগুলোতে দেওয়া হবে।

মশার আক্রমণ থেকেই যে ম্যালেরিয়া হয় এ কথা সবার জানা। কাজেই ম্যালেরিয়াকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রত্যেকটি দেশ প্রথমেই মশা দূর করার নানারকম প্রতিষেধক ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তাতেও অনেক ভুল থেকে যায়। সাধারণত প্রায় সব দেশেই মশা দূর করার জন্য ডি ডি টি জাতীয় প্রতিষেধক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরিবেশের ওপর এই জাতীয় প্রতিষেধকের একটা খারাপ প্রতিক্রিয়াও হয়। কিন্তু সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেছেন। তারা এমন সব প্রতিষেধক উদ্ভাবন করেছেন যা পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। সাধারণত জলাশয়গুলো, যেখানে মশা ডিম পাড়ে, সেইসব জায়গাগুলো পরিষ্কার রেখেও মশা হতে না দিয়ে তারা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করছেন।

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ভাবনা চিন্তা করে এও দেখেছেন যে, জলাশয় বা জলাধারগুলো একটু আধুনিকভাবে সংরক্ষণ বা নির্মাণ করেও মশা প্রতিরোধ করা যায়। মশা দূর করার আরেকটা ভাল উপায় হচ্ছে যেসব জলাশয়ে মশা ডিম পাড়ে সেইসব জলাশয়ে মাছের চাষ করা। জরজিয়া, আজেরবাইজান, তাজিকস্তান প্রভৃতি জায়গাগুলোতে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এই উপায় অবলম্বন করে ম্যালেরিয়া দূর করতে সমর্থ হয়েছেন।

এ ছাড়াও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ম্যালেরিয়া দূর করার আরো একটা উপায় বের করেছেন। এটি হল ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহিত মশাকে বন্ধ্যাকরণ। কিন্তু এই উপায়টি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি যে এই উপায়টিকে বাস্তবায়িত করা যাবে এমন মনে হয় না।

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এবং স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো যেভাবে এগিয়ে এসে সম্মিলিতভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন, তা দেখে বোঝা যায় এ বিষয়টি নিয়ে সবাই বেশ চিন্তিত। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মনে হয় এমন দিন খুব দূরে নেই যখন ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সত্যিই সম্ভবপর হবে। এখন দরকার শুধু সকলের উৎসাহ, সাহায্য আর নতুন চিন্তা-ভাবনা। □

উন্নত টাইপ-রাইটার

ভারতবর্ষে পোরটেবল টাইপ-রাইটারের চাহিদা তেমন বাড়ছে না, তাই অনেক কোমপানি এই টাইপ রাইটার করা বন্ধ করে দিয়েছেন। সাধারণ টাইপ রাইটারের উৎপাদন বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার। দেশের ভিতর চাহিদা ৯৫ হাজারের মত।

কথা হচ্ছিল টাইপ-রাইটার নিয়ে। সাংবাদিকদের ফ্যাসিট ১৭৪০ মডেলের উন্নত ধরনের টাইপ রাইটার দেখাতে ডেকেছিলেন কনটিনেনটাল কমারসিয়াল কোং। ফ্যাসিট সুইডিশ কোমপানি। এঁদের সহযোগিতায় ভারতে তৈরি হচ্ছে উন্নত ধরনের ফ্যাসিট টাইপ রাইটার ও ক্যালকুলেটর। সিসিকোর জেনারেল সেলস ম্যানেজার জে এন চ্যাটারজি সাংবাদিকদের দেখালেন: ফ্যাসিট ১৭৪০ এর ভেতর আছে পুনরায় প্রোগ্রাম করার মত দুই ট্যাবুলেটর মেমরি। এছাড়া কোথাও ভুল হয়ে গেলে হাফ স্পেসের মধ্যে কারেকশন করাও সম্ভব। থ্রি পজিশনড মারজিন স্টপও খুব কাজে লাগে।

সিসিকো নিজেরা তৈরি করেন, ক্যালকুলেটর, ডুপলিকেটিং মেশিন, অ্যামোনিয়া প্রিনটিং মেশিন, স্টিল ফারনিচার, পানচিং মেশিন – এক কথায় প্রায় গোটা জ্ঞানশিল্প বা নলেজ ইনডাসট্রিই ওঁদের করায়ত্ত।

ভারতীয় ভাষায় টাইপ-রাইটারও ওঁরা তৈরি করেন। হিন্দি টাইপ-রাইটারের চাহিদা বাড়ছে তবে বাংলার তেমন চাহিদা নেই।

তবে টাইপ-রাইটার শিল্প বিদেশে ইলেকট্রনিক যুগে প্রবেশ করেছে। ফ্যাসিটও পিছিয়ে নেই। ওঁরাও ইলেকট্রনিক টাইপ-রাইটারে হাত দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক টাইপ রাইটার কোমপানি এখন বিশেষ ছয়টি। হারমিস, অলিমপিয়া, ট্রায়ামফ অ্যাডলার, আই বি এম ও ফ্যাসিট। □

বিশেষ প্রতিনিধি

শীতে বেড়ান

প্রায় পঞ্চাশ একর জমিতে গাছ গাছালি জলাশয়ে সাজান মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে দেশ বিদেশের নানান জন্তু জানোয়ার যেখানে আবালবৃদ্ধবনিতার মনে আনন্দের সাড়া জাগায় সেই চিড়িয়াখানার বয়স কিন্তু কম হল না। এই তো আট বছর আগে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে শতবার্ষিকী উদযাপিত হল। কলকাতায় একটি চিড়িয়াখানা তৈরির ভাবনা শুরু হয়েছিল অনেক আগে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্যরা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে এক আলোচনা সভায় প্রস্তাব করলেন যে, জনগণের আনন্দের জন্য কলকাতায় একটি উচ্চমানের চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা হোক। সোসাইটির সভাপতি ডঃ জে ফেরার এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর মত

চিড়িয়াখানা : শীতের রোদে পশুপাখির মেলায়

ব্যস্ত মানুষের পক্ষে তো আর এ ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ভাবতে লাগলেন কার উপর এই দায়িত্ব চাপান যায়। যাকে কিনা হতে হবে একজন সত্যিকারের প্রকৃতি-প্রেমিক। তিনি পেয়েও গেলেন এমনি একজন লোককে। তিনি সোসাইটিরই একজন সদস্য, নাম কারল এল সুইনডলার। কাজ করেন টেলিগ্রাফ বিভাগে। চিড়িয়াখানা স্থাপনের ব্যাপারে ডঃ ফেরার তাঁকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরির ভার দিলেন। ডঃ সুইনডলার সানন্দে এই দায়িত্ব গ্রহণও করলেন। শুরু হল কলকাতায় চিড়িয়াখানা গড়ার কাজ। এর পর অনেক বৈঠক বসল। আলোচনা হল। অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সুইনডলার সাহেবের তৈরি পরিকল্পনা এশিয়াটিক সোসাইটি ও এগ্রিহরটিকালচারাল সোসাইটির সদস্যরা অনুমোদন করলেন।

এবার দরকার একটি পছন্দমত জায়গা। তাও পাওয়া গেল। আলিপুরের জিরাট ব্রিজ থেকে শুরু করে বেলভেডিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ত্রিশ একর জমি দিলেন বাংলা সরকার। সেই সংগে পাঁচ হাজার টাকাও মিলল। জোর গতিতে কাজ এগিয়ে চলল। এই কাজে উৎসাহ দাতাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় লেঃ গভর্নর স্যার রিচার্ড টেমপল এর নাম। তাঁর পরেই আছেন মিঃ সুইনডলার, উদ্ভিদ উদ্যানের সুপারিন্টেনডেন্ট ডঃ কিং এবং আরো অনেকে। এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং দেশীয় রাজা মহারাজা ও প্রকৃতি প্রেমিকদের দানে ধীরে ধীরে তৈরি হল আলিপুর চিড়িয়াখানা। অবশেষে এল সেই শুভদিন। ২৭

ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পড়ন্ত বিকেল। প্রিন্স অব ওয়েলস আসছেন চিড়িয়াখানা উদ্বোধন করতে। তাঁর গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সংগে আছেন স্যার টেমপল। প্রিন্স অভ্যর্থনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন চিড়িয়াখানার সভাপতি লরড উলিক ব্রাউন ও আরো অনেক রাজা মহারাজা। প্রিন্স এলেন ও পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে চিড়িয়াখানা দেখলেন। এর কয়েকদিন পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হল চিড়িয়াখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। তবে চিড়িয়াখানার দরজা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল ঐ বছরেরই মার্চ মাসে।

শুরুতে চিড়িয়াখানায় আজকের মত এত জাঁকজমক ছিল না তখন। ছিল গেটের পাশে একটি ছোট বসার জায়গা, জন্তুদের থাকার কয়েকটি ঘর আর তাদের চিকিৎসার জন্য একটি ছোট হাসপাতাল। এই জন্তুদের বেশির ভাগই পাওয়া গিয়েছিল ব্যারাকপুরের সংগ্রহশালা থেকে। এই ব্যারাকপুর থেকেই আনা হয়েছিল চিড়িয়াখানার বিখ্যাত কচ্ছপগুলি। যাকে বলে 'এলিফ্যান্ট টাইন টরটোইস'। এদের দুটি মারা গেছে। আর দুটির বয়স এখন দুশো বছরের বেশি। যে সমস্ত ভারতীয়দের দানে চিড়িয়াখানা সমৃদ্ধিলাভ করেছিল তাঁরা হলেন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, বর্ধমানের মহারাজা, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ময়মনসিংহের রাজা, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, দ্বারভাঙার মহারাজা, ঢাকার নবাব, রাজা রাধাপ্রসাদ সিংহ, কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, কোচবিহারের মহারাজা ও আরো অনেকে। এঁদের দানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য চিড়িয়াখানার বিভিন্ন প্রাণিগৃহকে এই সমস্ত ব্যক্তিদের নামে নামাংকিত করা হয়েছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এই চিড়িয়াখানা আজ যেমন আয়তনে বেড়েছে তেমন দর্শনীয় পশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিড়িয়াখানার তুলনায় বড় বড় চিড়িয়াখানা পৃথিবীতে অনেক আছে। কিন্তু ভারতের প্রধান চিড়িয়াখানার মধ্যে আলিপুর চিড়িয়াখানা প্রধান, পশুর সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে এখনও প্রথম স্থানের দাবি রাখে।

আলোকচিত্র : শংকর নাথ দাস

কারা চালান :

শুরু থেকেই আইন অনুযায়ী গঠিত পরিচালন সমিতি চিড়িয়াখানার সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করে আসছেন। ১৮৭৫ সালের ৯ ডিসেম্বরে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছিল। পাঁচজন অবৈতনিক সদস্য-বিশিষ্ট ঐ সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার লরড উলিক ব্রাউন এবং সি ই বাকল্যান্ড ছিলেন সম্পাদক। ঐ সমিতি গঠিত হওয়ার পরের দিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর সদস্যরা প্রথম চিড়িয়াখানার উন্নতির জন্য আলোচনায় বসেছিলেন। সমিতির দুজন সদস্য সুইনডলার ও এ এম ওয়াটসনের উপর ভার ছিল জন্তুদের থাকার বন্দোবস্ত করার। চিড়িয়াখানার সৌন্দর্য বৃদ্ধির দায়িত্ব ছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ কিং এর উপর। তিনিও ঐ সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। ডঃ কিং এর সহকারী ছিলেন বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল। তিনি 'কিং সাহেবের বাবু' বলে পরিচিত ছিলেন। এই সান্যাল মশায়ই চিড়িয়াখানার প্রথম সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এর পর ১০৮টি বক্স দেখি

শীতে … বেড়ান

গেছে। বহুবার পরিচালন সমিতির পরিবর্তন হয়েছে। ফলে সভাপতি ও সম্পাদকের পদ যেমন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি অলংকৃত করেছেন তেমনি সদস্য সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েছে। বর্তমানে ২৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীমতী সুপ্রিয়া আচার্য। ১৯৬৮ সালের ১৩ জুন থেকে সুপারিনটেনডেনটের পদটিকে ডাইরেকটর পদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। চিড়িয়াখানার বর্তমান ডাইরেকটর অধীর কুমার দাস, ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট সুবীর কুমার চৌধুরী এবং অ্যাসিসট্যানট সুপারিনটেনডেনট সুশান্ত ভট্টাচার্য। এছাড়া চিড়িয়াখানার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানর জন্য আছেন ২৩০ জন কর্মচারী। চিড়িয়াখানার পশুদের চিকিৎসার জন্য পাঁচজন পশুচিকিৎসকও আছেন। চিড়িয়াখানার পুরো ব্যাপারটা তদারকি করে পশ্চিমবংগ সরকারের পরিবেশ দপ্তর।

কীভাবে খরচ চলে

এত বড় একটা চিড়িয়াখানা যেখানে কয়েকশ প্রাণী দেখতে হাজার হাজার দর্শক আসেন তাকে ঠিকমত চালান বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে এই খরচ বাবদ ধার্য ছিল মাসিক ৩০১ টাকা। এখন বছরে খরচের অংক এসে দাঁড়িয়েছে ৫২ লক্ষ টাকা। এই বিশাল খরচের অনেকটাই আসে প্রবেশমূল্য থেকে। গোড়ার দিকে কয়েক বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, বছরে গড়ে সোয়ালক্ষ দর্শক এসেছে চিড়িয়াখানায় আর তাদের কাছ থেকে আদায় হয়েছে প্রায় এগার হাজার টাকা। একশ বছর পর দর্শকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় সতের গুণ। সেই সংগে দর্শনীমূল্য থেকে আয়ের পরিমাণ হয়েছে বছরে গড়ে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। গত বছরে দর্শক এসেছিলেন প্রায় সাড়ে ২২ লক্ষ। এ বছরেও দর্শকের সংখ্যা মোটেই কমতি নয়। ২০ সেপটেমবর ৫৩ হাজার দর্শক এসেছিলেন। প্রবেশমূল্য ছাড়াও আরো কিছু আয়ের পথ আছে। পশ্চিমবংগ সরকার বছরে ১৪ -- ১৫ লক্ষ টাকা দেন। এছাড়া ছবির ক্যারড, পথ-নির্দেশিকা, গণ্ডারের প্রস্রাব (হাঁপানির ওষুধ), পাখি ইত্যাদি বিক্রি করে এবং হোটেল, রেসটুরেনট ও বিজ্ঞাপন বোরড থেকে আদায় হয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

আধ আনা থেকে এক টাকা

১৮৭৫ সালে প্রবেশমূল্যের হার ছিল সোমবার আধ-আনা, মংগলবার এক আনা, বৃহস্পতিবার আট আনা, শুক্রবার দুই আনা এবং শনি ও রবিবার চার আনা। সাধারণ দর্শক বুধবার চিড়িয়াখানায় ঢুকতে পারতেন না। সেদিন কেবলমাত্র চিড়িয়াখানার সদস্যদের জন্য খোলা থাকত। এরপর ১৯০২-এ এই হার হয়েছিল, রবিবার বাদে অন্য সব দিন মাথাপিছু এক আনা ও রবিবার এক টাকা। চিড়িয়াখানার খরচ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় প্রবেশমূল্যও বারেবারে বেড়েছে। এখন এই হার মাথাপিছু এক টাকা। চিড়িয়াখানায় ঢুকে সব জন্তু ও পাখির সংগে আলাপ হওয়ার পরেও যদি আরো আনন্দ পেতে চান তাহলে চার আনা পয়সা খরচ করে যেতে হবে সাদা বাঘের কাছে। তার পর ঢুকুন শিশুদের জন্য তৈরি চিড়িয়াখানায়। হ্যাঁ, এখানে ঢুকতেও পয়সা লাগবে। মাথাপিছু মাত্র তিরিশ পয়সা। তবে দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের জন্য কোথাও টিকিটের দরকার নেই। এর পর আরেকটি জায়গায় যেতে বলব। সেটি হল মাছঘর। মাছ দেখার জন্য বারো বছরের কম বয়সের দর্শকের লাগবে পঁচিশ পয়সা ও অন্যদের পঁচাত্তর পয়সা।

রোজই খোলা

চিড়িয়াখানার একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, চিড়িয়াখানা কবে বন্ধ থাকে। ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'মশায়, শ্মশান আর চিড়িয়াখানা কোনদিন বন্ধ থাকে না।' ব্যাপারটা সত্যিই তাই। অফিস, কাছারি, দোকান-পাট সবই তো সপ্তাহে একদিন পুরো বা অর্ধেক বন্ধ থাকে। কিন্তু এখানকার জন্তু-জানোয়ার, পাখ পাখালির সংগে আপনি যে কোন দিন আলাপ করতে আসতে পারেন। আর সময় - তাও অফুরন্ত। ১ এপরিল থেকে ৩০ সেপটেমবর সকাল ছ'টা থেকে বিকাল পাঁচটা আর ১ অকটোবর থেকে ৩১ মারচ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চিড়িয়াখানা দর্শকের জন্য খোলা থাকে।

চিড়িয়াখানার বিশেষ আকর্ষণ

শিশুদের চিড়িয়াখানা : এটি যদিও শিশুদের কথা ভেবেই তাদের মনমত তৈরি করা হয়েছে তাহলেও বড়দের এখানে আসতে কোন বাধা নেই। এখানকার বিশেষ আকর্ষণ হল অস্ট্রেলিয়ার কাকাতুয়া ও আমাদের দেশের ময়না পাখি। কাকাতুয়ার কাছে গিয়ে 'হ্যালো' বললেই কাকাতুয়া 'হ্যালো' বলে আপ্যায়ন করবে। ময়নাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ময়না ভাল আছ? ময়নার মেজাজ ঠিক থাকলে বলবে, ময়না ভাল আছ? কালো রংয়ের জন্য কাককে কেউ পছন্দ করে না। এখানে আছে পছন্দসই কাক। রং তার সাদা। এছাড়া আছে নানা রংয়ে রাঙান পাখি, বাঁদর, খরগোস, মতিমালা নামের হাতি, ভোঁদড় ও অন্য কিছু জন্তু। মতিমালাকে পয়সা দিলেই সে শুঁড় তুলে নমস্কার জানাবে। আর আছে শিশুদের জন্য একটি লাইব্রেরি। এখানে জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে লেখা বই ছাড়াও দেখা যাবে টাইগনের মরা বাচ্চা ও অসট্রিচ পাখির ডিম।

সাদা বাঘ : এদের ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া সবই সাধারণ বাঘের মত। শুধু গায়ের রংয়েই তফাৎ। সাদা রংয়ের ওপর গাঢ় বাদামি ডোরা। এরা বাস করে ভারত ও সিংহলের জংগলে। চিড়িয়াখানার সাদা বাঘ এসেছে মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার জংগল থেকে। এখানে আছে বরুণ, হিমাদ্রি ও চাঁদনি নামের সাদা বাঘ ও তারা নামে একটি সাদা বাঘিনী।

টাইগন বা বাংহ : ১৯৭২-এর অকটোবর আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রথম টাইগনের জন্ম হয়। 'মুন্না' নামের বাংলার বাঘ ও 'মুন্নি' নামের আফরিকার সিংহীর মিলনে জন্ম হয়েছিল একটি স্ত্রী টাইগনের। পশ্চিমবংগের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় এই বর্ণসংকর শাবকটির নাম রাখেন 'রুদ্রাণী'। পুনরায় 'মুন্না' ও 'মুন্নির' মিলনের ফলে ১৯৭৪ সালের ১৪ মারচ আরেকটি স্ত্রী শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। শ্রীরায় এটির নাম দেন 'রঙ্গিনী'। এদের চেহারায় বাঘের লক্ষণই বেশি। আলিপুর চিড়িয়াখানা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও টাইগন নেই।

লিটিগন : টাইগনের জন্মের পর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা টাইগন রুদ্রাণীর সংগে ভারতীয় সিংহ দেবব্রতর মিলন ঘটানর ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রুদ্রাণী দেবব্রতর প্রেমে পড়ে গেল আর তার ফলে ১৯৮২ এর ২২ মারচ জন্মাল এক বর্ণসংকর পুংশাবক। লায়ন ও টাইগনের মিলনে জন্মেছে বলে এর নাম দেওয়া হল 'লিটিগন'। কিউবার রাষ্ট্রদূত এই লিটিগনটির নাম রাখেন 'কিউবানাকান'। এর পর আরো তিনটি লিটিগন জন্মেছে ও সবগুলিই এখন চিড়িয়াখানায় বহাল তবিয়তে আছে। সারা পৃথিবীর ভিতর কেবলমাত্র আলিপুর চিড়িয়াখানাতেই লিটিগন আছে।

মাছঘর : চিড়িয়াখানার প্রধান গেটের ঠিক উলটো দিকে অর্থাৎ আলিপুর রোডের ধারেই আছে মাছঘর। প্রায় বিঘা খানেক জমির ওপর আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি সুদৃশ্য এই মাছঘরটি ১৯৭৭-এর ৩ ডিসেমবর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কাঁচে ঢাকা জলাধারের মধ্যে রং-বেরংয়ের ছোট বড় মাছের খেলা দেখতে দেখতে সত্যিই অনেকটা সময় কেটে যায়। এখানে আছে প্রায় একশো রকমের মাছ, ছোট জাতের কয়েকটি কচ্ছপ, একটি মরা কুমীর ও একটি বড় কচ্ছপের খোলস। এই মাছঘরে ঢুকে ধূমপান করা ও মাছের ছবি তোলা নিষেধ। আরেকটা জানার বিষয় হল, এই মাছঘর থেকে কোন

মাছ বিক্রি করা হয় না।

চিড়িয়াখানায় শীতের পাখি

কলকাতার বাতাস যখন ভারী হয়ে ওঠে, সকালে ঘাসের ডগায় চিকচিক করে শিশির কণা আর হিমেল হাওয়া বয়ে আনে শীতের আগমন বার্তা তখন এরা আসে। প্রতিবছরই এরা আসে আবার চলে যায়। চিড়িয়াখানার আঁকাবাঁকা জলাশয়ের মাঝে রং বেরংয়ের পাখিগুলিকে প্রতিবছর আসতে দেখে মনে হয় এরা বোধহয় কলকাতার প্রেমে পড়ে গেছে।

চিড়িয়াখানায় সাধারণত পাঁচ ধরনের পাখি শীতের অতিথি হয়ে আসে। মোটামুটিভাবে এদের সবারই আসা শুরু হয় নভেম্বরের শেষে। আর চিড়িয়াখানা ছাড়তে শুরু করে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বা শেষের দিকে। এই অতিথি পাখিদের মধ্যে বেশির ভাগই হল বড় সরাল ও ছোট সরাল। এরা আসে সাইবেরিয়া থেকে। সাইবেরিয়া থেকে আরেক ধরনের পাখি আসে খুব কম সংখ্যায়। এদের নাম গিরিয়া হাঁস। এছাড়া বালি হাঁস আসে নরওয়ে থেকে। নাকতা ও স্পট বিলড হাঁস আসে মানস সরোবর থেকে। প্রতি বছরই ১২০০০-১৫০০০টি পাখি চিড়িয়াখানায় শীত কাটাতে আসে। তবে শীতের পাখির সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কারণ এই সব পাখির আসা-যাওয়ার পথে কিছু মানুষ ফাঁদ পেতে বা ঘুড়ি দিয়ে এদেরকে ধরে। ফলে ওরা ভয়ে চিড়িয়াখানার পথে আসছে না। অবশ্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

এই অতিথিদের আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা? না, বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নেই। এরা নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করে নেয়। সাধারণত জলের শামুক, গুগলি ও পোকামাকড় ধরে খায়। এদের আসল খাওয়া জোটে রাত্রে। আর এজন্য সন্ধ্যা হতে না হতেই পাখিরা দলে দলে উড়তে শুরু করে আশপাশের গ্রামের শস্যক্ষেতের দিকে। সারারাত পেট পুরে শস্য খেয়ে সূর্য ওঠার আগেই চলে আসে চিড়িয়াখানায়।

শীতে বেড়ান

পশু সংগ্রহের সমস্যা

সমস্যা তো থাকবেই এবং তা আছেও। টাকার অভাব-জনিত সমস্যা বা প্রশাসনিক সমস্যা নিশ্চয়ই আছে এবং থাকবেও। কিন্তু চিড়িয়াখানায় নতুন কোন জন্তু আসার সমস্যাটাই এখন সবচেয়ে বড়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের নীতিতে নতুন নতুন প্রাণী জোগাড় করায় অসুবিধা হচ্ছে। এই আইনের চাপে আজকাল আমাদের দেশের আকর্ষণীয় জীবজন্তুর বিনিময়ে বিদেশ থেকে জীবজন্তু আনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া নতুন করে কোন জন্তু আমদানির লাইসেনস দেওয়া হচ্ছে না। এই সব অসুবিধার জন্য অনেক জন্তু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই এই ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসা শুরু করেছেন। ফলে যারা জন্তু ধরে তাদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এতসব সত্ত্বেও বিদেশ থেকে জন্তু আমদানি করার অনুমতি পেলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিদেশি মুদ্রা নিয়ে। সুতরাং চিড়িয়াখানার এই সমস্যার আশু সমাধান দরকার। কারণ যাদের নিয়ে চিড়িয়াখানা তারাই যদি না থাকে তবে চিড়িয়াখানায় কে থাকবে?

কী করা উচিত নয়

দিনের কিছুটা সময় আনন্দে কাটানর জন্যই তো চিড়িয়াখানায় আসা। তাই এখানকার পরিবেশ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে ব্যাপারে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে। ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও এগুলি ফেলা উচিত নয়। জন্তুকে কখনই উত্যক্ত করা উচিত নয়। এতে জন্তুর শারীরিক ক্ষতি হতে পারে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতিটি জন্তুই নির্দিষ্ট খাবার খেতে অভ্যস্ত। তাই বাইরের কোন খাবার খেলে সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং দর্শকদের উচিত তাকে কোন খাবার না দেওয়া। পোষা কুকুর বা বেড়াল সংগে নিয়ে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ও এখানে রান্না করা নিষেধ। □

ডঃ অশোককান্তি সান্যাল

ঝিলমিল: কলকাতার কাছেই অবাধ প্রকৃতি

সি এম ডি এ-র বিশাল কর্ম কাণ্ডের মধ্যে ঝিলমিল প্রকল্পও একটি। ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ ঝিলমিল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় দুটি সংস্থাকে — সল্ট লেক অথরিটি নেন এর ডেভেলপমেনটের ভার আর পশ্চিমবংগ বনবিভাগ নেন ঝিলমিল পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের। খরচ খরচার দায়িত্ব সি এম ডি এ র।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই ঝিলমিলের গেট খুলে দেওয়া হয় ভ্রমণ-পিপাসু মানুষদের জন্যে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল বনবিভাগ তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করেছেন। সমস্ত ঝিলমিল ভরে গেছে সরগাছ আর কাশের জংগলে। হয়ে উঠেছে শাঁখামুঠি আর গেঁড়িভাঙার বিচরণভূমি। দর্শকদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। বনবিভাগের লালন পালনে সর আর হোগলার জংগল বাড়তে লাগল। সাধারণের অভিযোগ ও সংবাদপত্রের যৌথ সমালোচনায় বড় সাহেবদের টনক নড়ল। তাঁরা স্থির করলেন দুজন কর্তা এক সংসারে দরকার নেই। অতঃপর ঝিলমিলের দায় দায়িত্ব পেলেন সল্ট লেক অথরিটি।

প্রায় একশো কুড়ি বাইশ বিঘের এই জায়গাটির কিছু গোলাকার অংশেই মাত্র ভ্রমণ পিপাসুরা ঘুরে বেড়াতে পারেন। অন্য সমস্ত জায়গায় এখন বন ও বিশাল ভেড়ির জলাশয়।

সব থেকে কঠিন সমস্যা হল কলকাতা থেকে ঝিলমিলে পৌঁছন। ধর্মতলা থেকে শুধু রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন একটি দুটি বাস যাওয়া আসা করে — ঝিলমিল স্পেশাল। সত্যিই ঝিলমিলে পৌঁছন ও ঝিলমিল থেকে ফিরে আসা এক রহস্যময় ব্যাপার। আর সে জন্যেই দেখলাম ওখানে ভ্রমণ পিপাসুদের অধিকাংশই প্রাইভেট গাড়িতে উইক এনড সারতে এসেছেন। ট্রানসপোর্টের সমস্যা মিটলে ঝিলমিলে অনেক ভ্রমণ পিপাসু মানুষ বেড়াতে আসতে পারবেন সপ্তাহের শেষে।

সোম ও শুক্রবার বন্ধ থাকে ঝিলমিল। অবশ্য এ দুটো দিন যদি সরকারি ছুটি বা উৎসবের দিন হয় তাহলে দর্শনার্থীদের জন্যে খোলা [illegible] ঝিলমিল। সময় অবশ্য সকাল [illegible] থেকে পাঁচটা। এনট্রি ফি [illegible] পয়সা। তিন বছরের শিশু [illegible]

[illegible] গেটের ডানদিকে চওড়া [illegible] সামনেই টয় ট্রেন। শিশুদের কাছে ঝিলমিলে এটাই প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। টয় ট্রেনে বেড়াবার অধিকার একমাত্র বাচ্চাদের নিচের ক্লাসীদের। তবে ভিড় কম হলে সবাই চড়তে পারে এ ট্রেনে। ভাড়া এক টাকা। মিনিট [illegible] সময় নিয়ে ট্রেনটি ঘুরে আসবে। [illegible] [illegible] লেক মানে [illegible] নালার মত। [illegible] পুকুর যদি ভেবে না [illegible] কর্তৃপক্ষের ভাবনায় [illegible] লেকটা আরো বড় করে [illegible] ব্যবস্থা করবেন। [illegible] বাগান [illegible] ওপর বসার [illegible] তেমন ভাল জায়গা নেই। সমস্ত জায়গাতেই নতুন নতুন গাছ লাগান হচ্ছে। অফিস ঘরের সামনে ফুলের বাগানও তৈরি হচ্ছে।

টয় ট্রেনের স্টেশনের কাছেই পক্ষিশালা। ভেতরে বাচ্চাদের পাখি দেখার ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। অবশ্য ইচ্ছে আছে। আপাতত তারজালের খাঁচার বাইরে থেকেই পাখি দেখে আশ মেটাতে হবে দর্শকদের। ময়ূর, কাকাতুয়া, সারস ইত্যাদি অনেক রকম পাখি আছে দেখলাম। বড় খাঁচার ভিতরে অনেক পাখি ছাড়া আছে। আর ওর মধ্যেই কিছু ছোট

খাঁচায় অনেক রকমের পাখি আলাদা ভাবে রাখাও আছে দেখলাম। শুনলাম এখানে শ' পাঁচেক পাখি আছে। খাঁচার ভিতরেই পাখিদের খাবার উপযোগী বিভিন্ন ফলের গাছ লাগানো হয়েছে, যাতে পাখিরা খাঁচার মধ্যে থেকেও প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকতে পারে।

পক্ষিশালার পাশেই সিমেন্ট বাঁধানো আয়তাকার জলাধার। ওপরে তারের জাল। আমাকে মাছ দেখানোর জন্যে খাবার ছুঁড়ে দেওয়া হল। কিছু সাইপ্রিনাস কারপ (যা আমরা বাজারে আমেরিকান রুই বলে কিনি) খাবার খেতে শুরু করল

ঝিলমিলের আরও একটা বড় আকর্ষণ স্নেক পারক। সর্প বিশারদ ও সর্পপ্রেমিক দীপক মিত্রের তত্ত্বাবধানে এটি চলছে। এখানে ঢোকার জন্যে আলাদা এন্ট্রি ফি, ত্রিশ পয়সা। কিন্তু স্নেক পারকটাকে দীপকবাবু দুয়োরাণীর মত রেখেছেন তা যে কোন দর্শক এলেই বুঝতে পারবেন। সর্পবিশারদ দীপকবাবুকে অনুরোধ এটুকুই যে, যত্ন করলে এই স্নেক পারকটাই একদিন ঝিলমিলের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হবে। এখানে আছে দাঁড়াস, গোখরো, বালিবোড়া, চন্দ্রবোড়া, কেউটে শাঁখামুটি ইত্যাদি। আর আছে একটা চিতা বাঘ। কয়েকটা ছোটখাট ঘোড়া আছে রাইডিং এর জন্যে। রাইডিং এর রেট ছোটদের একটাকা ও বড়দের দুটাকা।

সাধারণ দর্শক হিসেবে ঝিলমিল কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব।

এক : ঝিলমিলে পৌঁছানর ও ফিরে আসার বাসের ঠকঠাক ব্যবস্থা করুন।

দুই : ঝিলমিলের অব্যবহৃত জায়গাগুলো সাফ করে আরও বিস্তৃত করুন।

তিন : টয় ট্রেনের পরিধি বাড়ান।

চার : খাঁচার পাখিদের দেখে সম্পূর্ণই বন্দী মনে হল।

পাঁচ : ওখানে ক্যানটিন বসিয়ে সস্তায় টিফিনের ব্যবস্থা করুন।

ছয় : আর স্নেক পারকের কথা তো বলেইছি। স্নেক পারকের পাশে যে বিশাল অব্যবহৃত ভেড়ি আছে, ওখানে মৎস্য বিশারদ দিয়ে 'কম্পোজিট ফিশ কালচার' করান। কয়েক শো মন মাছ উৎপন্ন হবে। ☐

অশোককুমার কুণ্ডু

শীতে বেড়ান

যাদুঘর অতীত যেখানে মুখর

আমাদের কলকাতার যাদুঘর এশিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম। এর সংগ্রহ কলকাতাবাসীদের গর্ব করার মত। পৃথিবীর অন্যান্য পুরনো জীবিত মিউজিয়ামগুলির মধ্যে এটি নবমতম। আজ যেখানে আমরা যাদুঘরটিকে দেখতে পাচ্ছি সেটা আগে ছিল অন্য জায়গায়, ছোট আকারে। এশিয়াটিক সোসাইটির পুরনো বাড়ির একতলায়।

১৮৭৮ সালে মিউজিয়ামের ছিল দুটি বিভাগ। পুরাতত্ত্ব ও প্রাণী বিভাগ। আজ মিউজিয়ামের ছটি বিভাগের প্রায় চল্লিশটা গ্যালারি। শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বিভাগেরই মোট সংগ্রহ প্রায় লক্ষাধিক। এছাড়া ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সংগ্রহও কম নয়।

কলকাতার এই যাদুঘর সোমবার বন্ধ থাকে। শুক্রবার বিনা প্রবেশ-মূল্যে যাদুঘর দেখা যায়। অন্যান্য দিনগুলি বড়দের জন্যে তিরিশ পয়সা এনট্রি ফি, আর বাচ্চাদের জন্যে দশ পয়সা। গ্রীষ্মকালে সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে, শীতকালে থাকে দশটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত।

যাদুঘরে গেটের মুখেই টিকিট ঘর। একটু এগিয়ে বাঁ দিকে ভূতত্ত্ব বিভাগের ঘর। এখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের বিভিন্ন অংশ রাখা আছে। প্রায় সত্তর শো সংগ্রহ আছে এখানে। এরপর একটু এগিয়ে ডান দিকে বিরাট হলঘরে মধ্যযুগের মূর্তি দেখা যায়। সারা ঘর জুড়ে পাথরের মূর্তি। তারপরের ঘরে আছে পোড়া মাটির জিনিসের সংগ্রহ। তারপর একটু এগিয়ে গেলে ডানদিকে পড়বে পৃথিবীর বিভিন্ন পাথরের প্রাকৃতিক গঠনের চেহারার সংগ্রহ। এমনি করে পর পর ঘরগুলিতে সাজানো আছে প্রাচীন মানুষের তৈরি মাটির ব্যবহার্য সামগ্রী। যাদুঘরের একতলায় আর একটি হলঘরে বাদ্য যন্ত্রের সংগ্রহ দেখার মত। কত রকমের পরিচিত অপরিচিত বাদ্যযন্ত্র এখানে মিলবে। একতলায় আর একটি গ্যালারি দর্শকদের বেশি টানে, সেটা হল বিভিন্ন মুদ্রার সংগ্রহ। এখানে ভারতে ইউরোপীয় শাসকদের চালু করা মুদ্রা থেকে শুরু করে দেশীয় রাজাদের, পূর্ব ভারতের, মুঘল যুগের, স্বাধীন মুসলমান রাজাদের প্রচলিত-মুদ্রাও আছে।

এর পর দোতলায় কতই না সংগ্রহ। তবে দর্শকদের বেশি আসা যাওয়া মমি সংগ্রহের ঘরে, মেয়েরা বেশি আসেন টেকসটাইল গ্যালারিতে, যেখানে বহু দিন থেকে বিভিন্ন ব্যবহৃত পোশাক আছে। আর ছাত্রছাত্রীরা দেখতে মজা পান পশুপক্ষী সংগ্রহের গ্যালারি। বড়দের আকর্ষণীয় গ্যালারি আছে পেনটিং গ্যালারি।

কলকাতার এই যাদুঘরে দর্শক সংখ্যা ভারতের অন্যান্য যাদুঘরের। দর্শক সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। বছরে এর দর্শক সংখ্যা দশ বারো লক্ষ। বেশ কিছুদিন হল কলকাতার যাদুঘরে স্কুল কলেজের

ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসঘর খোলা হয়েছে। তবে কি যাদুঘর দেখতে এসেও পড়াশোনা? না, তা নয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর সময়মত ক্লাস হয়। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা দল বেঁধে আসে। বইয়ে পড়া জিনিসগুলো নিজের চোখে দেখে, তারপর ফিল্ম দেখান হয়। ফলে বইয়ের পড়াটা আর ভোলার ভয় থাকে না। তবে অনেক ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে এখানে

শীতে বেড়ান

আনতে হলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে আগেভাগে মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দিনক্ষণ ঠিক করে রাখতে হয়।

এছাড়া মিউজিয়ামের বিশেষ ব্যবহৃত হাড়ের গহনা দেখান হচ্ছে বিশেষ কোন হলঘরে। সেখানে বিভিন্ন হাড়ের গহনা সাজান হল। এবং ব্যবহৃত গহনার সময়কে মনে রেখে মিউজিক বাজান হয়, ফিলম দেখান হয়। ফলে সমস্ত বিষয়টা দর্শকদের ধরে রাখে অনেক দিন। মিউজিয়ামের মধ্যে এরকম বিভিন্ন অনুষ্ঠান দর্শকদের আসা যাওয়া বাড়িয়ে তুলছে।

এশিয়ার এই বৃহত্তম যাদুঘরের স্নায়ুতে চাপ পড়ছে পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ি। মিউজিয়ামের মেরামতিও চলছে। ভয় হয় হঠাৎ এই বুড়ো ঘরটি যদি ভেঙে পড়ে তো অনেক সংগ্রহ কলকাতার মাটির নিচে চলে যাবে। □

অশোককুমার কুন্ডু

ব্যানডেল চারচ

হাওড়া থেকে অনেক ট্রেন আনাগোনা করে ব্যানডেল স্টেশনের ওপর দিয়ে। কিছু হাওড়া-ব্যানডেল লোকাল ট্রেনও আছে। সময় লাগে ঘণ্টা দেড়েক। এখানে আছে সেই বিখ্যাত চারচ। ব্যানডেল স্টেশনে নেমে চারচে যাবার জন্যে আছে মিনি বাস ও সাধারণ বাস। কিন্তু সে জন্য আপনাকে হয়ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তার থেকে রিকশা নিন। প্রচুর রিকসা। ভাড়াটা একটু বেশি হাঁকবে। দরদাম করলে কিছুটা সস্তা হবে। একজনের দুটাকা, দুজন হলে তিন টাকা। সময় লাগবে মিনিট দশেক।

চারচের সময়টা জেনে রাখুন। চারচ খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা। তার পর দুপুর দেড়টা থেকে পাঁচটা।

চারচে প্রার্থনার সময়টাও জেনে নিন। আপনি হয়ত প্রার্থনায় যোগ দিতে চান। যদি সে প্রয়োজন না থাকে তাহলে চারচের প্রার্থনা ঘরটা তো আপনার দেখা দরকার। আর প্রার্থনা চলাকালীন এদের সদস্যদের ছাড়া প্রার্থনা ঘরে ঢোকা বারণ। প্রার্থনা চলে সকাল সাতটা থেকে আটটা পনের। প্রথমে ইংরিজিতে। পরের বার বাংলায় হয়। রবিবার এগারোটা থেকে বারোটা পনের মিনিট পর্যন্ত ইংরেজিতে ও বিকেল পাঁচটা থেকে [illegible]। সুতরাং প্রার্থনার সময়গুলো বাদ দিয়ে অন্য সময় যে কেউ চারচের প্রার্থনা ঘরে ঢুকে ঘরটি দেখতে পারেন।

প্রধান [illegible] যান চারচের মধ্যে। এই গেটটার সামনের দিকটাই হচ্ছে পুব দিক। গেট ছেড়ে চলে আসুন ভেতরে। অবশ্য এই গেটের মাথার ওপরেই লেখা আছে চারচ খোলার সময়। গেট থেকে ভেতরে ঢুকলেই ডানদিকে পড়বে ফাদারের অফিস ঘর। অফিস ঘরের বাঁ দিকে রয়েছে সাদা পাথরের ওপর চারচের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সোজা চলে আসুন। একটু পরেই পড়বে চারচের সেলস কাউনটার। দুই তরুণ হাসি মুখে জিনিস পত্র বিক্রি করছেন।

চলে আসুন বারান্দা হেঁটে। দু পাশের দেওয়ালে যীশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল বিশাল তৈলচিত্র। এই বারান্দা যেখানে বাঁ দিকে বেঁকেছে ডান দিকে পড়বে একটা ছোট ঘর। ওর মাথায় লেখা Sacristy।

এ ঘর প্রার্থনার আগে পোশাক বদলে নেওয়ার ঘর। মানে এদের প্রার্থনার জন্যে আলাদা পোশাক! হিন্দুদের পুজোর কাপড় বদলানর ব্যাপার আর কি। এই ঘরের সামনে লম্বা বারান্দা। আর এ ঘরের পাশেই প্রার্থনা ঘর। যদি প্রার্থনা চলে, আপনি না ঢুকতে পারেন তাহলে সোজা হেঁটে চলে আসুন। একদম সোজা। চোখ আটকে যাবে একদম কোণের ডান দিকের দেওয়ালে। সাদা পাথরে লেখা একটি মাস্তুলের অলৌকিক কাহিনী। আর সে মাস্তুল আপনি দেখতে পারেন ঐ পাথর থেকে চোখ সরিয়ে সোজা তাকান। বারান্দা ছেড়ে চলে এলেই ছোট্ট মাঠ। এখানে কয়েক হাজার মানুষ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আর এই সমাধির পুব দিকেই জাহাজের দুটো মাস্তুল দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যানডেল চারচের ইতিহাসে মিশে আছে বাংলাদেশে পোরতুগিজদের বসতি ও তাদের ভাঙা গড়ার ইতিহাস। সমস্ত বাংলা দেশটাই পোরতুগিজদের অধিকারে এসে যেত যদি না সম্রাট শাহ জাহানের আদেশে মোঘল সৈনারা তছনছ করে দিত ব্যানডেলে ও হুগলিতে পোরতুগিজদের বসতি।

১৫১৮ সালে সিলভেরা নামে এক পোরতুগিজ বণিক চট্টগ্রামে আসেন। কিন্তু আরাকান রাজ তাকে ব্যবসা করার অনুমতি দেননি। ব্যর্থ হয়ে সিলভেরা ফিরে যান সিংহলে। তার পর ১৫৩৭ সালে নবাব মহম্মদ শা সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রামেও বঙ্গোপসাগরের তীরে চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। পরে বাংলাদেশেও ব্যবসা শুরু করে পোরতুগিজরা। ১৫৮০ সালে পেদ্রো তাভারেস নামে এক পোরতুগিজ ব্যবসায়ী ও তার দলবল আকবরের রাজসভায় আলাপ আলোচনা করে সম্রাটকে খুশি করে বাংলাদেশে স্থায়ী ডেরা গাড়ার অনুমতি পায়। ভাগীরথীর তীরে তারা পত্তন করে 'উগোলিম' শহর। এ শহরের নামই পরে দেশীয় উচ্চারণে হয়ে ওঠে হুগলি। ক্রমে কাছেপিঠে বাবুগঞ্জ, পিপুলবাটি, ব্যানডেল এরকম কয়েকটা গ্রাম এ শহরের মধ্যে এসে যায়। ১৫৯৯ খৃস্টাব্দে পোরতুগিজ ক্যাথলিকরা এই চারচটি তৈরি করেন।

এর পর ১৬৩২ খৃস্টাব্দে পোরতুগিজদের ওপর অনেক ঝড় বয়ে যায়। অনেক পোরতুগিজকে বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলার নবাব কাশিম খাঁ ১৬৩২ সালে পোরতুগিজদের আক্রমণ করেন। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাও ব্যানডেল আক্রমণ করেন।

যাক, এখন চলুন আমরা চারচের দোতলায় উঠে যাই। বেশ চওড়া ছাদ। মাথার ওপরে আকাশ। ছাদের দক্ষিণ দিকে একদম সিঁড়ির মুখে মা মারিয়ার মূর্তি। অনেক অলৌকিক কাহিনী এই মূর্তি নিয়ে। এই মূর্তির বেদিমূলে বসে ফাদার যোয়েম দা ক্রুশ প্রার্থনা করতেন। এখানে বাতিদান আছে। আপনি ইচ্ছে করলে ঐ বাতিদানে মোমবাতি জ্বেলে কিছু প্রার্থনা করতে পারেন মা মারিয়ার কাছে। পাশেই বাকস বসান আছে। প্রণামীও দিতে পারেন। ওপর থেকে এবার নেমে আসুন নিচে।

প্রার্থনা হয়ত এখন শেষ হয়েছে। আপনি ঢুকে পড়ুন বিশাল হলে। বসার চেয়ার সারি দিয়ে। অনেক মানুষ এখানে প্রার্থনা করতে পারেন। এই প্রার্থনা ঘর উত্তর দক্ষিণে লম্বা। উত্তর দিকে মূল বেদি। গির্জার মূল বেদি পাথরের। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে বেদি শ্বেতপাথরে বাঁধান হয়। এখানে লাতিন, আরমেনিয়ান, ফরাসি ও পোরতুগিজ ভাষায় নানা ধর্মীয় কথা খোদাই করা আছে। প্রধান বেদিটি ইতালি থেকে আনা। উনিশ শতকের প্রথমে এক ভক্ত জি ই হাউফার এটা দান করেন। বেদির পিছনে বর্শাবিদ্ধ যীশু দাঁড়িয়ে। এই বর্শাবিদ্ধ যীশু হচ্ছেন আগাসতিনিয়ান ধর্মের প্রতীক 'কোট অব আরমস'। বাঁ দিকের বেদিতে যীশুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ডান দিকের বেদিটি সতের শ সালে তৈরি। ১৯২৮ সালে এই গিরজা পরিচালনার ভার পড়ে 'সলেসিয়' ধর্মসঙ্ঘের হাতে। এ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা জন বসকোর মূর্তি আছে এখানে।

গিরজার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ঘণ্টা ঘর। ঘণ্টা ঘরের চূড়ায় আছে তিনটে ঘণ্টা। উপাসনা ঘরের পুব দিকে নকল পাহাড়ের গুহা বানিয়ে ওপরে মা মারিয়ার মূর্তি। এখানেও আপনি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতে পরেন। বাঁদিকে ছোট্ট বাঁধান জলাশয়ে খুচরো পয়সা ফেলছেন অনেকে। প্রার্থনা ঘরের পুব দিকে ও দক্ষিণ দিকে আট দশটা পুরনো দিনের ঘর। চোরাকুঠরির মত দেখতে। জানলা নেই। ছোট্ট ছোট্ট দরজা। এ ঘরে বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকরা সপরিবারে এসে থাকতে পারেন।

ব্যানডেল চারচের কয়েকটি বিশেষ উৎসবের কথা বলে রাখি।

এক : মারিয়ার পার্বণ।

দুই : বঙ্গীয় ক্যাথলিক সংঘের পার্বণ।

তিন : মারচ অথবা এপরিল মাসের প্রথম রবিবারে ক্রুশবাহী যীশুর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা।

চার : মে মাসে 'শুভ যাত্রার মা মারিয়া'-র পার্বণ।

পাঁচ : নভেমবরে মারিয়ার জপমালার পার্বণ।

কোন অসুবিধা হলে ফাদারের সাহায্য নেবেন। আমাকেও ফাদার মাইকেল এস ডেভি সমস্ত ঘুরিয়ে দেখালেন। □

পরিবর্তন [illegible]

শব্দশৃঙ্খল – ৭৮

■	১		২	৩	■	৪	
৫		■	৬				■
	■	৭			■	৮	
৯	১০		■	১১	১২		■
১৩			■	■		■	১৪
	■	১৫	১৬	১৭	■	১৮	
■	১৯	■	২০		২১	■	
২২				■	২৩		

সূত্র : ওপর নিচ

১। গৌরীর বর, কিংবা ছবি কর
২। মৃদংগ পাই, বাজনা বাজাই
৩। এই নালা বেয়ে,
নোংরা চলে ধেয়ে
৪। সকলে মিলে, একত্র হলে
৫। সাথে যাই, বুঝি তাই
৭। ঐশ্বর্যে ভরা, মোদের প্রিয় ধরা
১০। রেডিওতে নাই,
টেলিগ্রাফে পাই
১২। পয়গম্বর ইনি, নরকাপে জানি
১৪। 'নষ্ট' কিংবা 'ব্যর্থ',
কথাটার অর্থ
১৬। বারো মাসে হয়,
কোন সে সময়?
১৭। প্রচারিত হওয়া,
মুখে মুখে কওয়া
১৯। বলে দিলাম সূত্র, 'নন্দন' অত্র
২১। কাব্য লেখেন ইনি,
তাই তো এঁকে চিনি

সূত্র : পাশাপাশি

১। চোয়াল আছে জানো,
শক্তিধর মানো
৪। নাম লিখলাম নিজের হাতে,
বন্ধুর দেখা পেলাম তাতে
৫। দুধের ওপর পাই,
ভেজে মিষ্টি খাই
৬। দুই শব্দ – অর্থ এক,
অর্থমূল্য ভেবে দেখ
৭। চষে লাঙল, টানে গাড়ি,
বলে দাও তাড়াতাড়ি
৮। এই ফলে ন্যাড়ার ভয়,
কবিরাজে খেতে কয়
৯। আয়ু শেষ হলে, একবাক্যে বলে
১১। মনোবাঞ্ছা পুরোতে,
'প্রতিজ্ঞা' পুজো দিতে
১৩। মন বা হৃদয়,
অন্য কথায় আর কী হয়?
১৫। ব্যাধ বলে পরিচিতি,
বর্ণসংকর বুনো জাতি
১৮। গানের সংগে রবে,
দেবতাও হবে
২০। সামান্য ওজন, জানে সর্বজন
২২। কাঠের কারিগর,
চার অক্ষরে ধর
২৩। হল কলহ, পারলে বলহ

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায়। সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ১২-১-৮৪।

সমাধানের সংগে পরিবর্তনে প্রকাশিত ছকটি এবং প্রত্যেকটি শব্দশৃংখল আলাদা আলাদা খামে পাঠাবেন। খামের ওপর শব্দশৃংখলের নম্বরটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শব্দশৃঙ্খল – ৭৪ (সমাধান)

পা	তা	ল	■	ম	ধু	ই	■
রা	স	ভ	■	রা	জ	ন	■
ব	■	■	উঁ	ব	■	ত	থি
ত	ক	ক	■	য	ত	■	■
■	মা	ল	ভ	■	বি	ধ	বা
শা	■	র	■	ব	ন	■	প
স	র	ব	রা	হ	■	ঘ	ড়া
ন	ত্তি	■	খা	ম	সিং	ড়ি	■

শব্দশৃংখল ৭৪-এর জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন বাদলচন্দ্র দাস (৩৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,২য় তল, কলকাতা-১২) এবং প্রসূন হাজরা (২২/২১, নিউটন অ্যাভিনিউ,দুর্গাপুর ৫)।

শব্দশৃংখল ৭৪ এর লটারিতে বিচারক ছিলেন নির্মল কুমার রায়।

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

ডিসেমবর ২৮ থেকে জানুয়ারি ৩

মেষ : শারীরিক অশান্তি চলবে; মেয়েদের শরীর আগের চেয়ে ভাল যাবে। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি; নতুন যোগাযোগ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে সহজে মতৈক্য, মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন পদ বা দায়িত্ব পাবার ইংগিত। পারিবারিক ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে। কোন গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তির জীবনাশংকা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃষ : অল্পস্বল্প ঝামেলা লেগে থাকবে শরীর নিয়ে, মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আয় বৃদ্ধির ছোটখাট সুযোগ আসবে তবে আকস্মিকভাবে কিছু অর্থ ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের সহায়তায় কোন বড় দায়িত্ব পালন। মেয়েদের কর্মস্থলে কেউ কেউ সন্দেহের চোখে দেখবে। পারিবারিক কোন ব্যাপারে আপস। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা।

মিথুন : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক ভোগান্তি চলবে। অন্যের জন্য বড় রকমের অর্থব্যয়; কিছু ঋণও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোন বাধা দূর হবার সম্ভাবনা; মেয়েদের কর্মস্থলে ছোট খাট বিরোধ। পারিবারিক কোন সমস্যা বিশেষ বিব্রত করবে। কোন সন্তান নিয়ে বড় রকমের ঝামেলা। ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি।

কর্কট : শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক কোন পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা। মেয়েদের কর্মস্থলে বাদানুবাদ; সম্মানহানি। কোন সন্তানের আকস্মিক ও চমৎকার বিবাহ যোগ। মেয়েদের মূল্যবান কিছু হারাতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

সিংহ : শারীরিক ও মানসিক চাপ চলবে; মেয়েদের শরীর উৎপাতসূচক। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু প্রচুর ব্যয় যোগ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে নিজ আদর্শ থেকে সরে আসতে হবে; মেয়েদের উদ্যম প্রশংসিত হবে। পারিবারিক ব্যাপারে ভাই-বোনেদের সংগে মতের অমিল। বয়স্কদের লাভ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

কন্যা : শরীর মোটামুটি চলবে; মেয়েদের কফ, শ্লেষ্মা সংক্রান্ত ঝামেলা। আর্থিক ব্যাপারে বিরাট মনোমালিন্য; কিছু ক্ষতি। কর্মস্থলে চোখ কান খোলা রেখে এগোতে হবে, অন্যথায় ক্ষতি। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু শত্রুলাভ। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের দারুণ মন্দা।

তুলা : পেট সংক্রান্ত ঝামেলা ভোগাবে; মেয়েদের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল চলবে। আর্থিক ব্যাপারে ঝুঁকি নিলে ক্ষতির আশংকা। কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে; মেয়েদের কর্মস্থলে সহজ অগ্রগতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামত গৃহীত হবে। গৃহাদির বদল বা আরম্ভ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বৃশ্চিক : আঘাত ও রক্তপাতের আশংকা; মেয়েদের শরীর অনেকটা সুস্থ থাকবে। আর্থিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন; কিছু ব্যয় সংকোচ। কর্মক্ষেত্রে কোন বাধা-বিপত্তি কেটে যাবে; মেয়েদের চিন্তা ভাবনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসবে। পারিবারিক কোন শুভানুধ্যায়ীর জন্য দুঃখ-বেদনা। ব্যবসায়ীদের অল্পস্বল্প আয় বৃদ্ধি।

ধনু : শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু দায়-দায়িত্বের অবসান; সামান্য সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে অস্থায়ী দায়িত্বলাভ; মেয়েদের কর্মস্থলে মানসিক চাপ। স্ত্রীর জন্য উদ্বেগ চলবে। কর্মপ্রার্থীদের যানবাহন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মলাভের ইংগিত। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মকর : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক অবস্থার সামান্য হের ফের; ব্যয়ের চাপ প্রবলতার হবে। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে স্থায়ী মীমাংসায় বাধা; মেয়েদের কর্মস্থলে কিছু উপরিলাভ। পারিবারিক কোন ব্যাপারে দূরযাত্রা। মেয়েদের প্রেম প্রণয় ব্যাপারে বাধা। ব্যবসায়ীদের লাভ।

কুম্ভ : শরীর ভাল চলবে; মেয়েদের আঘাতজনিত ভোগান্তি বাড়বে। আর্থিক টানাটানি চলবে; কিছু ঋণ। কর্মক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন; মেয়েদের কর্মস্থলে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। পারিবারিক অশান্তি বাড়বে কোন সন্তানের পরামর্শে। মেয়েদের ছোটখাট ভ্রমণ। ব্যবসায়ীদের মন্দা।

মীন : শারীরিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন; মেয়েদের শরীর মোটামুটি চলবে। আর্থিক সমস্যার সুরাহা হওয়া মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নিজ উদাসীনতায় ক্ষতি; মেয়েদের কর্মস্থলে সংযম প্রয়োজন হবে। কোন সন্তানের কর্মলাভের ইংগিত। স্ত্রীর সংগে অবনিবনা। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

বিনয় আচার্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন: ২৪-০৯৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
[illegible] ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN.

IBARTAN 28 December 83 – 3 January '84 Regn. No. 32815/78